শিব পূজা

শিল্পী— শ্রীচারুচন্দ্র সেন।

লক্ষ্মীবিলাস প্রেস, লিমিটেড, কলিকাতা।

৬ষ্ঠ বর্ষ | বৈশাখ—১৩৩৯ | ১ম সংখ্যা

নববর্ষে

বৈশাখে নূতন বছর আসিল—পুরাতনকে বিদায় দিয়া নূতন পাইবার সময় মানুষ মাত্রেরই মন আশা আনন্দে ভরিয়া উঠে—গত দিনের দুঃখ বেদনা, অভাব অভিযোগ, নূতনের আগমনে ধুইয়া মুছিয়া গিয়া আশা আনন্দের উদয় হইবে ভাবিয়া মনে উল্লাস আসে—এই উল্লাসের প্রেরণায়ই নূতনকে আমরা আনন্দের সঙ্গে বরণ করি। ইহাই চিরাচরিত প্রথা—কিন্তু আজ আমরা নূতনকে বরণ করিতেছি শুধু আশা আনন্দের সঙ্গে নয়—এ নূতন বরণ করিবার মধ্যে তার চেয়ে বেশী আছে আশঙ্কা ও ভীতি। মহাযুদ্ধের পর হইতে জগতের অবস্থার দ্রুত পরিবর্ত্তন হইতেছে, কত রাজ্য, সাম্রাজ্যের ওলোট পালট হইয়া গিয়াছে—এখনো জগৎ জুড়িয়া নানা বিক্ষোভ চলিয়াছে। বর্ত্তমান বাণিজ্য, মুদ্রানীতি, সভ্যতা, যুদ্ধসজ্জা সব জিনিষ লইয়াই প্রবল জাগতিক বিক্ষোভ চলিয়াছে। গত দুই বৎসর হইতে রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ সকল ক্ষেত্রেই ভারতের উপর দিয়া ভীষণ ঝঞ্ঝা প্রবাহিত হইয়া যাইতেছে। দুই বৎসরের এই ঝঞ্ঝা সহিয়া এখন সকলে রুদ্ধ নিশ্বাসে ইহার পরিণামের দিকে চাহিয়া আছে। কি হয়, কি হয়—সদাই এই আশঙ্কা! বর্ত্তমান নববর্ষ ১৩৩৯ সালের আগমন হইতেছে এই আশঙ্কার মধ্য দিয়াই।

তবু বর্ত্তমান বর্ষে 'পুষ্পপাত্র'কে আমরা যথাসম্ভব সমৃদ্ধ করিবার চেষ্টা করিব। যাঁহারা পুষ্পপাত্রকে স্নেহচক্ষে দেখিয়া আসিতেছেন তাঁহাদের স্নেহ আমরা বরাবরই চাই। আজ পুষ্পপাত্রের গ্রাহক-গ্রাহিকা, পাঠক-পাঠিকা ও বিজ্ঞাপনদাতা-দিগকে সহস্র ধন্যবাদ জানাইতেছি। পুষ্পপাত্রকে যাঁহারা নানা রচনায় সমৃদ্ধ করিতেছেন সেই লেখক-লেখিকাদেরও অজস্র ধন্যবাদ দিতেছি—তাঁহাদের অনুগ্রহ চিরদিনই আমাদের কাম্য।

নববর্ষ শুভ হউক্—সাহিত্যে, সমাজে, রাষ্ট্রে ভারতীয়ের প্রতিভা দীপ্ত হউক্—মানবতার মহামিলনে সে স্ব-স্থানে সু-প্রতিষ্ঠিত হউক্।

বনের পাখী

গল্প

শ্রীগিরিবালা দেবী

বি, এ, পরীক্ষার পর মায়ের পুনঃ পুনঃ আহ্বানে নগরের নিত্য নূতন আমোদ-প্রমোদ ও বন্ধুগণের মায়াপাশ কাটাইয়া সরলকে পল্লীগ্রামে ফিরিতে হইল।

ছেলেকে নিকটে পাইয়া মা চাপিয়া ধরিলেন, লেখা-পড়া ত একরকম শেষ হল বাবা! এইবার আমার সাধটি পূর্ণ কর। মার অকথিত সাধের সহিত সরলের অনেক দিন হইতেই পরিচয় ছিল, পাঠ্যাবস্থায় বিবাহের অপকারিতা সম্বন্ধে নাতি দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়া সরল এতদিন মাকে থামাইয়া রাখিয়াছিল কিন্তু এখন আর থামাইবার তেমন আগ্রহ নাই। ক্লাশে সংস্কৃত কাব্যালোচনায় তরুণ হৃদয়দ্বারে একখানি সুন্দর শান্তি পূর্ণ মুখ বারম্বার উকি ঝুঁকি দিতে আরম্ভ করিয়াছে।

সরল সংস্কৃত সাহিত্যে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য লাভ করিলেও তাহার আদর্শ সেকালের শকুন্তলা, প্রিয়ম্বদা নহে। একালের সুবেশা সুরুচিসম্পন্না সুশিক্ষিতা উপন্যাসের একটি সুন্দরী নায়িকাকেই সে হৃদয় পটে আঁকিয়া রাখিয়াছিল।

মার অনুরোধে সরল হাসিয়া বলিল, "তোমার সাধ ত অনেক দিন থেকেই শুনে আসচি মা, কিন্তু সাধ আমি পূর্ণ করতে চাইলেই কি সাধের জিনিস মিলে যাবে?"

সরলের মতের পরিবর্ত্তনে মা অত্যন্ত পুলকিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "মাগো ছেলের কথা শোন! সাধের জিনিস নাকি পাওয়া যায় না? একবার "হাঁ" করলে হাজার হাজার মেয়ের বাপ মেয়ে মাথায় করে তোর পায়ে এসে লুটিয়ে পড়বে। আমার বলে বলচিনে। এমন অবস্থা, এমন লেখা-পড়া জানা পাত্তর বাংলা মুল্লুকে কটা আছে?"

"তোমার ত কম অহঙ্কার নেই মা! তোমার ছেলের জুড়ি বাংলা মুল্লুকে কটা আছে বলে বসলে! ভারী গৌরব, এমন বি, এ পরীক্ষা দেওয়া লাখ লাখ ছেলে অলিতে-গলিতে গড়াগড়ি দিচ্ছে। আর সম্পত্তির ভেতর এখানকার যা একটু আর বালিগঞ্জের বাড়ী এমন অনেকেরই থাকে।"

মা দৃপ্ত কণ্ঠে কহিলেন, "হ্যাঁ, থাকে না থাকে। এ গাঁয়ের ভেতরই আমার ছেলের মত ছেলে আমার অবস্থার মত অবস্থা আর একটি দেখা দিকিন?"

মার সন্তান গর্ব্বে সরল আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া প্রীত হইল। সেদিনের মত কথাটা বেশীদূর অগ্রসর না হইলেও মা ভুলিলেন না।

সরল বাল্যেই পিতৃহীন, মার শাসনে সুব্যবস্থায় তাহার চারিটি ভ্রাতা ভগিনী বাল্যের কোঠা উত্তীর্ণ করিয়াছে। পিতা নিতান্ত অসময়ে মহাপ্রস্থান করিলেও তাহাদের নিমিত্ত বালিগঞ্জের ত্রিতল বাড়ী ও গ্রামের ক্ষুদ্র সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছিলেন। তাহারই সাহায্যে মা ছেলেদের মানুষ করিয়া তুলিতেছিলেন। বছর দুই হইল একমাত্র কন্যা সতীকে সুপাত্রে বিবাহ দিয়াছেন। সুশান্ত ও সমীর স্থানীয় স্কুলেই লেখা পড়া শিখিতেছে, বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত সরলকে বিদেশে থাকিতে হয়। বালিগঞ্জের বাড়ীর ত্রিতলটা নিজেদের ব্যবহারের জন্য রাখিয়া অপর দুই অংশ ভাড়া দেওয়া হইয়াছে। ত্রিতলে পুরাতন ভৃত্য রামশরণকে লইয়া সরলের রাজত্ব। মা গঙ্গাস্নান, কালীদর্শন উপলক্ষ্যে মধ্যে মধ্যে বালিগঞ্জে আসিলেও দীর্ঘদিন থাকিতে পারেন না। সম্পত্তিটুকুর তত্ত্বাবধান, বিগ্রহ গোপীনাথের সেবাভার অপরের হস্তে সমর্পণ করিয়া বিশ্বাস হয় না। কারণ পৈত্রিক সম্পত্তিটাই যে তাহার অনাথ সন্তানদের নির্ভরস্থল। আর গোপীনাথ অনাথিনীর পারের সম্বল।

* * * *

কয়েক দিন পর সেদিন সন্ধ্যায় সরল বাড়ী ফিরিয়া দেখিলে মা প্রফুল্ল মুখে কিসের একটা ফর্দ্দ ধরিতেছেন। সরকার তাঁহার আদেশ অনুযায়ী তুলট কাগজে লিখিয়া লইতেছে। সমীর মার কোলের কাছে বসিয়া বালচপলতা বশতঃ মাঝে মাঝে প্রশ্ন করিতেছে, "আচ্ছা সরকার দাদা, পাঁচ মণ দইতে কয় হাঁড়ি দই হয়? এক মণ রুই মাছ কটা।"

এ তালিকা যে কিসের তাহা বুঝিতে সরলের বিলম্ব হইল না। সরলের হৃদয়ে একটা পুলকের শিহরণ তুলিল। সহসা দূর দিগন্ত হইতে যৌবন সমীরণ উচ্ছ্বসিত হইয়া চারিদিক বাসন্তী শ্রীতে বিভূষিত করিল। সরল বিস্মিত হইয়া ভাবিতে লাগিল, তাহারি নিমিত্ত এত সমারোহ, উৎসব-আয়োজন, কিন্তু সেই কেবল জানেনা মা কাহাকে আনিতেছেন। কাহাকে পাইলে তাহার জীবন-পাত্র আনন্দে রসে ভরিয়া যাইবে? সরলকে জিজ্ঞাসা না করিয়াই মা কি তাহার আভাস পাইয়াছেন?

সরল শয়ন কক্ষে ঢুকিয়া ডাকিল, "সমী বেশ মজা করে যে গল্প শোনা হচ্ছে, আজ বুঝি পড়া-শোনা নেই?"

"কাল যে রবিবার দাদা, পড়বো কি? শনিবারের রাতে তুমিই যে পড়তে বারণ করে দিয়েচ।" বলিতে বলিতে সমীর দাদার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল।

সরল বিছানায় বসিয়া বালিসটা কোলের উপর টানিয়া লইয়া চুপে চুপে জিজ্ঞাসা করিল "শনিবারের কথা আমি ভুলে গিয়েছিলাম সমী, ওখানে মা কিসের ফর্দ্দ করছেন রে? ঘটাকরে একটা পূজো-টুজো হবে বুঝি?"

সমীর মাথা দুলাইয়া হাসিতে হাসিতে জবাব করিল, "পূজো না পূজো। তোমার বিয়ের বৌ ভাতে কি হবে তাই মা ঠিক করচেন।"

"বিয়ে, বৌ ভাত? দূর মিছে কথা।"

সমীর রাগিয়া কহিল "আমি বুঝি মিছে কথা কইচি তোমার বিয়ে হবে; তুমি জানো না, তাই বল। পাখীদির সঙ্গে ঠিক হয়ে গেছে—তা সকলেই জানে!"

"পাখীদি? সে আবার কে? মানুষের নাম আবার পাখী হয়? তুই বড্ড ফাজলামি করতে শিখেছিস?"

প্রথমে মিথ্যাকথার দোষারোপ, তারপর ফাজলামির অপবাদ সমীর নির্ব্বিবাদে সহ্য করতে পারিল না। চোখ ঘুরাইয়া, হাত নাড়িয়া বলিতে লাগিল "আমি কি ফাজিল ছেলে যে ফাজলামি করি? নিজে গাঁয়ে থাক না, কারুর নাম জানো না তাই বল। পাখী যদি মানুষের নাম নাই হবে তাহলে হিরুদার মাসতুতো বোনের নাম পাখী হল কি করে? মা তাকে বৌ করবে কি করে? আমি মাকে ডেকে আনছি, মার কাছে শোন মানুষের নাম পাখী হয় কিনা?"

সরল প্রস্থানোদ্যত ছোট ভাইটির হাত ধরিয়া তাহাকে শান্ত করিয়া কহিল "আমি অমন নাম কখনো শুনিনি বলেই বলছি, তাতে কি রাগ করে সমী? যে না জানে তার কথায় রাগ করতে হয় না, মাকে ডাকতে হয় না। হিরুদার বোন এখানে এসেছিল কি করে রে? সে বুঝি দেখতে ভাল? তাই মা—"

দাদার আদরে সমীর প্রসন্ন হইল। সে যাহা জানে দাদা এত বড় হইয়াও তাহা জানে না ভাবিতেই বালকের খুসীর সীমা রহিল না। সে দাদার গা ঘেঁসিয়া আরো একটু সরিয়া বসিয়া বলিল, হিরুদার ছেলের ভাতে পাখীদি ঠাকুমার সাথে এসেছিল। মা তাকে ডেকে এনে খাবার দিতেন, চুল বেঁধে দিতেন, পাখীদির মা নাই বলে মা তাকে খুব ভাল বাসেন দাদা,—তোমার চেয়ে, মেজ দিদির চেয়ে, দিদির চেয়েও।"

সরল সকৌতুক প্রশ্ন করিল "তোর চেয়ে কি মা তোর পাখাদিকে ভালবাসেন? তুই কেবলি ভালবাসার কথা বলছিস, যাকে ভাল বাসেন সে কেমন তাতো বলছিস না?"

মা সমীরকে সর্ব্বাপেক্ষা ভালবাসেন বলিয়া তাহার মনের মধ্যে একটা অহঙ্কার ছিল। সেই অহঙ্কারে আঘাত লাগা মাত্র সমীর গম্ভীর হইয়া বিজ্ঞের মত বলিল, আমার চেয়ে মা আবার কাকে ভালবাসবে ছঃ। পাখীদির মা নেই, তাই মা একটু ইয়ে করেন। পাখীদি আমায় কিন্তু খুব ভালবাসে দাদা। ভারী একটা

মজা হয়েছিল—ও বাড়ীর নেপা বিল থেকে অনেক পদ্ম তুলে এনেছিল। আমার সঙ্গে আড়ি কিনা, তাই আমায় না দিয়ে সবাইকে দিলে। তাই দেখে পাখীদি নেপার গালে একটা চড় বসিয়ে দিয়ে আমায় নিয়ে পদ্মবিলে গেল। আমিত ভাল সাঁতার জানি না, ওযা সাঁতার দেয় হাঁসের মত, অমন আর কারুকে দিতে হয় না।"

সরল উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, সাঁতার কেটে তোকে বুঝি ফুল এনে দিলে?

"দেবে না আবার! মাঝবিলের মধ্যখানে গিয়ে এক বোঝা মস্তমস্ত ফুল এনে আমায় দিলে। আমি তখুনি ছুটে নেপাকে দেখালাম, নেপা জব্দ। পাখীদি শুধু ভাল সাঁতার জানে তা নয় দাদা, গাছে চড়তেও বেশ পারে। গায় যা জোর পালোয়ানের মতন। হাবুদের পেয়ারা গাছের মগ ডালে কয়েকটা পেয়ারা পেকেছিল। একদিন দুপুর বেলা লুকিয়ে আমায় সে-গুলোও পেড়ে দিয়েছিল। পাখীদি খাসা মেয়ে আমি ওকে খুব ভালবাসি দাদা।"

সমীরের সরস বর্ণনায় সরল তেমন আকৃষ্ট হইতে পারিল না। কোথায় সুন্দরী শিক্ষিতা তরুণী, কোথায় শিক্ষাহীনা দুরন্ত প্রকৃতি এক গ্রাম্য বালিকা। কিন্তু তবুও সে মন হইতে সেই অপরিচিতা চপল মেয়েটিকে সরাইয়া দিতে পারিল না। তাহার কল্পিত মূর্ত্তি রূপ কথার সোনার কাঠির ন্যায় সরলের সুপ্ত হৃদয় জাগ্রত করিয়া চোখের সামনে জল্ জল্ করিতে লাগিল।

রাত্রে ছেলেকে আহারে বসাইয়া মা বলিতে লাগি-লেন "ঘুঘু ডাঙ্গার নিরঞ্জন বাবুর মেয়েকে আমি তোর সঙ্গে ঠিক করলাম। সে আমাদের হিরুর মাসতুত বোন, ২রা বৈশাখ বিয়ের দিন ঠিক করেছি। তুই কাল তিনটের গাড়ীতেই সতীকে আনতে যা। মাঝে আর কটা দিন মাত্র, দেরী করলে চলবে না।"

সরল মাথা ভাতগুলিকে লইয়া নাড়িতে লাগিল। মার প্রতি তাহার অভিমানের অন্ত রহিল না। সে কাহাকে চায়, কেমন চায় সেটাও কি মায়ের জানিবার দরকার ছিল না? পাকা করিয়া তবে বলিতে আসিয়া-ছেন। অভিমানের ভিতর একটি কথা স্মরণ হইল—বাল্যাবধি এ পর্য্যন্ত মার ব্যবস্থাতেই তাহার সব হইয়াছে। এত কাল মা যাহা করিয়াছেন, তাহাই যে তাহাকে মাথা পাতিয়া স্বীকার করিতে হইয়াছে। এক্ষেত্রেও মার দেওয়া জিনিস সরলের আনন্দে গ্রহণ করা উচিত।

ছেলের নীরবতায় মা চকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, চুপ করে রইলি কেন সরল? তোর ভয় নাইরে, মা তোকে মন্দ কিছুই দেবেনা। পাখী বেশ মেয়ে, আমার খুব পছন্দ হয়েছে।

এবার আর সরল মৌন হইয়া থাকিতে পারিল না। মুখ তুলিয়া বলিয়া উঠিল, "বেশ মেয়ে বইকি মা, পরের গাছের ফল চুরী, পদ্মবিলে সাঁতার কাটা, ছেলের দলে কোমর বেঁধে গিয়ে তাদের ঠেঙ্গান, বর্ণ-জ্ঞানশূন্য এমন কচি খুকিটী তোমার পছন্দ না হলে হবেই বা কাকে?"

মা হাসিলেন—"নারে, সে কচি খুকি নয়। মায়েরা ছোট চাইলেও ছেলেরা যে তা পছন্দ করে না। সেটা আমার জানা আছে। হিন্দু ঘরের চৌদ্দ পনেরো বছরের মেয়েকে কচি খুকি বলে কে? গাছে চড়া, সাঁতার জানা সেত গুণ সরল। সাত চড়ে মুখে রা নেই—মিন মিনে ভিজে বেড়াল আমি ভাল বাসি না। আমার জমিদারের ঘর তেজস্বিনী ডানপিটে মেয়ের দরকার। বর্ণজ্ঞানশূন্য বলছিস, তার বর্ণ জ্ঞান হয়েচে, কিন্তু বেশী কিছু শেখেনি। বাপ বারমাস বিদেশে থাকে, মা নেই, ভাই, বোন নেই, বুড়ো ঠাকুরমার কাছেই মানুষ। তাই ঠাকুর মার আদরে একটু অশান্ত। তাতে কি হয়েছে? আমিই তাকে সব শিখিয়ে নেব। আমার সতী বিয়ের আগে কি জানতো? এখন কিনা শিখেচে, কিনা জানে?" বলিতে বলিতে প্রবাসী তনয়ার মুখছবি স্মরণ করিয়া মা করুণায় বিগলিত হইলেন।

দীপহীন নির্জ্জন ঘরে আজ সরলের ঘুম আসিল না, প্রথমে সমীরের নিকটে পরে মায়ের মুখে পাখীর প্রসঙ্গ যতটুকু তাহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিয়াছে, তাহাতে কাব্যের লেশও নাই, না থাকিলেও সরলের মানস

নয়নে একদুর্দ্দান্ত চপল বালিকার গতিভঙ্গী ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল।

প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ করিয়া সরল যখন পদ্মবিলের ধারে বেড়াইতে বাহির হইল, তখনো দিনের আলো ঘনপল্লবিত আম্রকুঞ্জে ভালরূপে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে নাই। গোপালের পশ্চাতে দুই একটী রাখাল কেবল চলিতে আরম্ভ করিয়াছে, পাখীরা প্রভাত বন্দনায় কানন প্রান্তর মুখরিত করিতেছে। দিগন্ত প্রসারিত মাঠের মধ্যদেশে অতলস্পর্শী পদ্মবিল। তিনদিকে শ্যামল ক্ষেত্র। পর পারে ক্ষেতের শেষসীমায় অস্পষ্ট গ্রাম রেখা দিক চক্রবালের সহিত মিশিয়া গিয়াছে। শান্ত জলাশয় তখনো নিদ্রামগন। তীরের পদ্মগুলি গোরু বাছুর ও মানুষের অত্যাচারে নির্ম্মূল প্রায়। দূরে গভীর জলে সবুজ পাতার ফাঁকে ফাঁকে পাঁপড়ীর ঘোমটায় মুখ ঢাকিয়া পদ্মসুন্দরীরা সূর্য্যের প্রতীক্ষায় উর্দ্ধমুখে চাহিয়া আছে। প্রভাত বায়ুহিল্লোলে কালোজল উছলিত হইতেছে।

তীরতরুর ছায়ায় বসিয়া সরল অস্ফুটিত ফুলগুলির প্রতি চাহিয়া রহিল। পুষ্প লোভাতুরা যে দুঃসাহসিকা বালিকা লজ্জাভয় পরিত্যাগ করিয়া শীতল জলে ঝাপ দিয়াছিল; সরল তন্ময় হইয়া তাহারি কথা ভাবিতে লাগিল। সে কয়টা পদ্ম তুলিয়াছিল? সে পদ্মগুলি কত বড়? কি বর্ণের পুষ্পগুচ্ছ অঞ্চলে বাঁধিয়া জলদেবীর ন্যায় কোন ঘাটে সে ভাসিয়া আসিয়াছিল? সিক্ত মৃত্তিকায় বনলক্ষ্মীর কোমল পদচিহ্ন এখনো কি খুঁজিলে পাওয়া যায়!

অরুণের সোনার রথ আকাশের পূর্ব্বপ্রান্তে দেখা দিতে না দিতেই চারিদিকে জাগরণের সাড়া পাওয়া গেল। সরলের নিভৃতে ধ্যান করা হইল না। মনে পড়িল সেতো কাহাকেও বলিয়া আসে নাই। মা চা লইয়া হয় তো ঘরে ঘরে তাহাকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন।

সরল দ্রুত পদক্ষেপে বাড়ীর পথ ধরিয়া পথের বাঁকে হাবুদের শাখা বহুল পেয়ারা গাছের তলায় আসিয়া প্রাচীন বৃক্ষটির আগাগোড়া পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল।

হঠাৎ পশ্চাৎ হইতে সমীর আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া কহিল, "দাদা তুমি এখানে পেয়ারা খুঁজে বেড়াচ্ছ, ওদিকে চা জুড়িয়ে গেল। ন'পিসী পেয়ারা পাড়লে বড্ড বকে, তুমি পাড়লে বকবে না, আঁকসীখানা আনবো দাদা?"

সরল হাসিয়া কহিল, "আজ থাক আর একদিন তোকে অনেক পেয়ারা পেড়ে দেব। চা ঠাণ্ডা হয়ে গেল, চল চা খাইগে।" সমীর ক্ষুণ্ণ হইয়া পেয়ারার দিকে চাহিতে চাহিতে দাদার অনুসরণ করিল।

সেই দিনই অপরাহ্নে সরল ভগ্নিপতির কর্ম্মস্থল পশ্চিমে সতীকে আনিতে চলিয়া গেল।

কয়েক দিন পর সতীর আগমনে এবং সরলের প্রতি সতীর কৌতুক-উপহাসে নিরানন্দ গৃহ আসন্ন আনন্দের উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত হইল।

* * * *

নির্দ্দিষ্ট দিনে বিবাহান্তে উজ্জ্বল আলোক ও গগনভেদী বাদ্য ধ্বনির মধ্যে নব বধূ শ্বশুরালয়ে প্রথম পদার্পণ করিল।

বধূর নাম তড়িতা। জন্মের অনতিকাল পূর্ব্বে জননী ফাঁকি দিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন বলিয়া পিতামহী শিশুর নামকরণ করিয়াছিলেন, "ফাঁকি" বয়সের সাথে সাথে ফাঁকি পাখীতে রূপান্তরিত হইয়াছিল।

পাখীর বর্ণ গৌর না হইলেও উজ্জ্বল, বয়সের অনুপাতে বাড়ন্ত গড়ন। চক্ষু দুইটি কিন্তু আশ্চর্য্য দুই খণ্ড বৃহৎ হীরার মত ঝক ঝক করিতেছে। সে চোখে নববধূসুলভ লজ্জা কুণ্ঠার স্থান নাই। বিদ্যুৎ যেন মেয়েটির চোখে মুখে সর্ব্বাঙ্গে ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেছে। সরল ভাবিল কল্পনায় ওই মুখ খানি নিরীক্ষণ করিয়া করিয়া কবি উহারই হাসিকে মাণিক, কান্নাকে মুক্তার উপমা দিয়াছিলেন? সত্যই পাখীর মুখখানি বড় সুন্দর, বড়ই সুমিষ্ট।

মনে মনে একটি স্বপ্নরাজ্য গড়িয়া ফুলশয্যার মাধবী নিশীথে বধূর হাত হাতের মধ্যে তুলিয়া লইয়া সরল স্নিগ্ধস্বরে কহিল "পাখী" তুমি ভারী মিষ্টি, ভারী সুন্দর এমন আর কেউ নয়। তোমাকে দেখামাত্র আমি

ভাল বেসে ফেলেছি। আমি তোমার মত অত সুন্দর নয়। তুমি কি আমায় ভালবাসতে পারবে পাখী ?"

বধূ তাহার ধরা হাত খানা সজোরে টানিয়া লইয়া রুক্ষস্বরে কহিল, "আঃ জ্বালাতন কর কেন? আমার ঘুম পেয়েছে। আমায় ঘুমুতে দাও। আমি তোমায় ভাল-টালো বাস্‌তে পারবো না বাপু।"

ভরা পালের নৌকা যেমন বিপরীত বাতাসে চড়ায় থামিয়া যায়, তেমনি করিয়াই সরলের হৃদয়ের স্পন্দন যেন থামিবার উপক্রম হইল। নিমেষে মাধবী রজনীর অপরূপ মায়াজল অন্তর্হিত হইয়া সরলের আশার সৌধাবলী ধূলায় লুটাইয়া পড়িল।

একটি পঞ্জরভেদী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া অনেকক্ষণ পরে সরল কহিল আমায় ভালবাসতে পারবে না পাখী ? না পারলে, আমি তোমার ভালবাসা চাই না। কিন্তু একটি কথা জানতে চাই, সেখানে তুমি কাকে ভাল বেসেছিলে ? তার নাম কি ? বয়স কত ?"

বধূ বিরক্তির সহিত প্রত্যুত্তর করিল "তাদের কার কত বয়স আমার অত শত মনে নাই, নাম তাদের পটোল, দাসু, বিপিনে, উমা, লক্ষ্মী। আমি ওদেরি ভাল বাস্‌তাম, ওরা আমার খেলুড়ি কিনা।"

সরলের হৃদয়ের কাল মেঘ তিরোহিত হইয়া সেখানে জ্যোৎস্নায় প্লাবিত হইল। সরল পুনরপি জিজ্ঞাসা করিল, "তাদের সাথে কি খেলা খেলতে পাখি ?

"কি আবার! চোর, চোর! বৌ বৌ এই সব।"

সরল পাখীর একখানা হাত পুনরায় হাতের ভিতর বন্দী করিয়া আদরের সহিত কহিল, "আজ আমার সঙ্গে একটু খেলবে পাখী? আমি ত বর আছিই, তুমিও বৌ আছ; বেশ খেলা হবে।" এমন অসম্ভব প্রস্তাবে পাখীর হাস্য স্রোত আর বাধা মানিল না। হাসিতে হাসিতে পাখী কহিল, "এত বড় বুড়ো মানুষের সাথে আবার বৌ বৌ খেলা যায়? তুমি সর, আমার গায়ে হাত দিও না, ভাল লাগে না। বড্ড ঘুম পেয়েচে।" বলিয়া বধূ বিছানার এক পার্শ্বে সরিয়া গিয়া অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘুমাইয়া পড়িল।

সরল তেমনি স্তব্ধ হইয়া রহিল, তাহার কণ্ঠের ফুলের মালা তাহাকে বিদ্রূপ করিতে লাগিল! বাহিরে সতীর চাপা হাসির সহিত সমস্ত বিশ্ব যেন উপহাসের হাসি হাসিতে লাগিল।

বিনিদ্র রাত্রি মনের খেদে কাটাইয়া রাত্রি শেষে সরল তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়াছিল। একটা কলরবে যখন তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, তখনো বেলা বেশী হয় নাই।

প্রভাতের সোনার রৌদ্র বনানী শীর্ষে সবে স্বর্ণ-মুকুট পরাইয়া দিতেছে। দ্বার উন্মুক্ত, বধূ শয্যা ত্যাগ করিয়া বাহিরে গিয়াছে।

সরল শুইয়া শুইয়াই ডাকিতে লাগিল, "সতী, কি হয়েচে রে! সকাল বেলা তোরা এত গোল মাল করছিস কিসের?" ক্ষণকাল পর সতী গৃহে প্রবেশ করিয়া কহিল "সকাল বেলা গোলমালের কথা শুনবে দাদা? কিছুই নয়গো, তোমারি, তোমারি। "তোমার বনের পাখী চপল আঁখি, বনেতে পালায়।" ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে আছ বুঝতে পারছ না? পারবেই বা কি করে? এদিকে তুমি ঘুমে অজ্ঞান ওদিকে বৌ ঘুঘুডাঙ্গার পথ ধরেছিল। ঝি ভোরবেলা কাজে আসছিল, রাস্তায় বৌকে দেখে ধরে এনেচে। কি দস্যি মেয়েগো, ভয় লজ্জা কিছু নেই আবার বলা হচ্ছিল "ঠাকুরমার জন্যে ভাল লাগছিল না, ঠাকুরমার কাছে যাচ্ছিলাম।"

বধূর প্রতি সরলের বাঁকা মনটা আরো খানিকটা বাঁকিয়া গেল।

সেইদিন হইতে মা বধূকে আপন শয্যায় শোওয়াইয়া বালিকার আত্মীয়বিচ্ছেদ ব্যথা বিদূরিত করিতে চেষ্টা করিলেন। সরলের নিকটে রাত্রে বধূকে রাখিতে মার সাহস হইল না। ছেলেকে ফাঁকি দিয়া পাখী যদি আবার পথের বাহির হয়, এমনি প্রতিবেশীনীরা হাসিতেছে, কতকি বলিতেছে। যে অবুঝ তাহাকে সাবধানে না রাখিলে চলিবে কেন?

মার ব্যবস্থায় সরল সমস্ত সংসারের উপর চটিয়া আগুন হইয়া রহিল। সময় কিন্তু তাহার রাগের ধার ধারিল না। প্রভাতে কর্ম্ম-কোলাহলের মধ্যে দিবসারম্ভ হইয়া রজনীর অন্ধকারে বিলীন হইতে হইতে বধূ পিত্রালয়ে চলিয়া গেল। গেজেটে পাশের সংবাদ দেখিয়া

এম, এ ক্লাসে ভর্ত্তি হইবার জন্য সরলকেও বাক্স বিছানা বাঁধিয়া কলিকাতায় রওনা হইতে হইল।

সুখ দুঃখ হাসি অশ্রুর মধ্যে কয়েকটা মাস গড়াইয়া শুভ্রশরৎকাল আসিল জলে স্থলে তীরে নীরে আগমনীর ললিতস্বর ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

কলেজের ছুট হইবার পূর্ব্বে সরল মাকে লিখিল, তাহার শরীর তেমন ভাল নয়। পূজার ছুটিতে সে পশ্চিমে সতীর কাছে যাইবে। মা লিখিলেন, তোমার শরীর ভাল নয় জানিয়া বড়ই চিন্তিত আছি। তুমি সত্বর বাড়ী রওনা হও অন্যথা করিও না। এখন এখানকার স্বাস্থ্য ভাল। কিছুদিন এখানে থাকিলেই তোমার শরীর ভাল হইবে।

বৌমাকে আনাইয়াছি, এখন তাহার অনেকটা বুদ্ধি হইয়াছে।" মার পত্রের শেষ লাইনটি সরলের অশান্ত অন্তরে সুধা বর্ষণ করিতে লাগিল! কুহকিনী আশা কানে কানে কহিল সে এখন বুঝিতে শিখিয়াছে, অনুতপ্তচিত্তে তোমারি আশা পথ পানে চাহিয়াছে।"

সরল বিলম্ব করিতে পারিল না। ছোট ভাই ও পাখীর নিমিত্ত কয়েকটি সৌখিন দ্রব্য কিনিয়া সেই রাত্রেই গৃহাভিমুখে ছুটিল।

আবার সেই ফুলশয্যার ঘর, সেই খাট-বিছানা নীরব নিস্তব্ধ শরৎ যামিনী, সেই আশার আশ্বাসে কম্পিত বক্ষ।

সরলের বেশীক্ষণ প্রতীক্ষা করিতে হইল না। সরলের ঘরে ঢুকিবার একটু পরেই বধূ উপস্থিত হইল। সরল দুইচক্ষু বিস্ফারিত করিয়া পাখীর পানে চাহিয়া রহিল। এই কয় মাসেই পাখী অনেকটা বাড়িয়া গিয়াছে, উজ্জ্বল বর্ণ উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইয়াছে। চক্ষু দুইটি এখনো তেমনি চঞ্চল বিদ্যুৎবর্ষী, রাঙ্গা অধরোষ্ঠে একটা কঠিন অপ্রসন্ন ভাব যেন লুকান রহিয়াছে।

সে মুখ বিষণ্ণ কি প্রসন্ন অতটা তলাইয়া দেখিবার সরলের অবকাশ ছিল না। সরলের মনে হইতেছিল আজ কোন বাধা নাই, অন্তরায় নাই, তাহার যুগ-যুগান্তের মানসী প্রিয়া অনন্ত বিরহের পর তাহারই ব্যগ্র বাহু বন্ধনে ধরা দিতে আসিয়াছে। সরল মুহূর্ত্ত নিজের অস্তিত্বও ভুলিয়া গেল। পাখীর সম্মুখীন হইয়া চোখের পলকে পাখীকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া মুগ্ধকণ্ঠে কহিল "পাখি, এসেছ, এস, এস, আমার আরো কাছে এস।"

পাখী একটানে স্বামীর বাহুপাশ মুক্ত করিয়া পশ্চাতে সরিয়া ঝাঁঝের সহিত বলিল, "আর এস, এস বলে ডাকতে হবে না। আমার ভাল লাগে না। তুমি পশ্চিমে না গিয়ে এখানে এলে কেন? তুমি না এলে এত তাড়াতাড়ি এরা আমায় এখানে আনতো না। বেশ মজা হ'তো।"

সরল ক্ষণেক মৌন থাকিয়া জড়িত কণ্ঠে ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল; "তোমার মজার খবর আমার জানা ছিল না বলেই এসেছি। আচ্ছা কালই আমি এখান থেকে চলে যাব। তুমি মজা করে বাপের বাড়ী গিয়ে থেকো।"

পাখী কিয়ৎকাল ভাবিয়া অন্যমনস্ক ভাবে ঘাড় নাড়িল "না, এখন আর তা হবেনা; তুমি চলে গেলেও এরা আমায় এখন পাঠাবে না। খালি বকবে, ঠাকুমাও বকবে। সব চেয়ে ভাল হত তুমি না এলে।"

একথার পর সরল কোন কথাই বলিতে পারিল না, বলিবার প্রবৃত্তিও হইল না। নিজের বিড়ম্বিত জীবনের গ্লানিতে সমস্ত অন্তঃকরণ তিক্ততায় ভরিয়া গেল।

সেই দিন হইতে সরল আপনার হৃদয়কে দৃঢ় করিয়া পাখীর সহিত কথা-বার্ত্তা বন্ধ করিল।

বধূর পলায়নের লক্ষণ না দেখিয়া মা অনেকটা আশ্বস্ত হইলেন। ভাবিলেন, বনবিহগীকে স্নেহের খাঁচায় পুরিয়া ধীরে ধীরে পোষ মানাইয়া লইবেন। কিন্তু পুত্রের মলিন মুখ মার বুকে পীড়া দিতে লাগিল। তিনি সরলকে কি আনিয়া দিলেন? অমৃতের পরিবর্ত্তে এ যে গরল। সন্তানের দুঃখে মার মুখের হাসি শুকাইয়া গেল।

পাখার হৃদয়ে কিন্তু বিষাদের রেখাপাত হইল না। উচ্চধাবন, উচ্ছ্বসিত হাসি, কলকণ্ঠের সুমিষ্ট ঝঙ্কারে

পাখী বাড়ীটা মাথায় করিয়া তুলিল। লজ্জাহীনা বধূর বুদ্ধিহীন আচরণে মা যেন মরমে মরিয়া গেলেন। আয়ত্তের বাহিরে স্বল্প পরিচয়ে যাহার চাঞ্চল্য তাঁহাকে অভিভূত করিয়াছিল, অল্পদিনেই সেখানে নিদারুণ বিরক্তি আসিয়া উপস্থিত হইল। পুত্রের ছাড়া ছাড়া ভাবে, বধূর অদ্ভুত ব্যবহারে মা অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিলেন ছেলের সহিত বৌকে বালিগঞ্জে পাঠাইয়া স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিবেন। স্কুলে বিদ্যাশিক্ষা করিয়া একাকী স্বামীর নিকটে থাকিয়া বিমূঢ়া বালিকা স্বামীকে ভালবাসিতে শিখিবে, নারীর কর্ত্তব্য শিখিবে। বালিগঞ্জে বধূর মাসী থাকেন, তিনি উহাকে দেখা-শোনা করিবেন, বিশ্বস্ত ভৃত্য রামশরণের অকৃত্রিম সেবা-যত্নে অসুবিধার সম্ভাবনা নাই। অবকাশ সময়ে তিনি নিজে গিয়া উহাদের দেখিয়া-শুনিয়া আসিবেন। চির দিনের মতনই মার এ ব্যবস্থা সরল স্বীকার করিয়া মনে মনে উল্লাসিত হইল।

পাখী এতখানি বয়সে একবারও কলিকাতা দেখে নাই। সহরের আজব গল্প শুনিয়া কলিকাতায় যাইবার আগ্রহে তাহার ক্ষুদ্র হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল।

* * * *

কিন্তু এ আনন্দ স্থায়ী হইল না। বালিগঞ্জে আসিয়াই সরল সর্ব্বাগ্রে পাখীকে বালিকা বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়া দিয়া অনেকটা নিশ্চিন্ত হইল। কোথায় রহিল ছায়াসুশীতল পল্লীর নিভৃত নিকেতন। কোথায় রহিল অশান্ত উদ্দাম সঙ্গীর দল।

সে দিন রবিবার। সন্ধ্যাবেলা সরল পাখীকে মাসীর বাড়ী বেড়াইতে লইয়া গেল। জন্মাবধি পাখীর সহিত মাসীর পরিচয় ছিল না। গম্ভীর মূর্ত্তি মাসীকে পাখীর তেমন ভাল না লাগিলেও তাঁহার উদ্যান বেষ্টিত তপোবন সদৃশ গৃহ পল্লীবক্ষ বিচ্যুত তৃষিত বালিকাকে একটি অপরূপ মায়ার বন্ধনে বাঁধিয়া ফেলিল। এখনকার যা কিছু সবই যেন সেই খানের মত, সেই বৃক্ষে বৃক্ষে জড়া জড়ি, লতায় লতায় গলা-গলি, পাতায় পাতায় মর্ম্মর ধ্বনি, ভেজা মাটীর আর্দ্র গন্ধ সমস্ত মিলিয়া সারা পল্লীকে যেন অন্তরের মাঝখানে ফিরাইয়া আনিতে চায়।

পাখীর এখানে ভারী ভাল লাগিতে লাগিল। সবচেয়ে ভাল লাগিল মাসীর বড় মেয়ে উষাকে। উষা পাখীর বছর তিনেকের বড়, মাস ছয়েক হইল উষার বিবাহ হইয়াছে। সৌন্দর্য্যে আনন্দে মেয়েটি যেন পুষ্পিতা লতার ন্যায় ঝল মল করিতেছে।

মাসী মেয়ে জামাইকে না খাওয়াইয়া পাঠাইলেন না।

আহারান্তে বিদায়ের সময় পাখী বাঁকিয়া বসিল, সে আজ যাইবে না। কিছুতেই না।

অগত্যা ক্ষুন্ন মনে সরলকে একাকীই ফিরিতে হইল। কিন্তু একে একে সুদীর্ঘ তিনটা দিনের মধ্যেও পাখীর আবির্ভাব হইল না দেখিয়া সরল স্থির থাকিতে পারিল না। যে বিহঙ্গী তাহার হৃদয়ে নীড় বাঁধিয়াছে তাহার কলকূজনে খঞ্জন নয়নের অমৃত বর্ষণ বিনা নীড় যে ভাঙ্গিয়া পড়িতে চায়। বধূর নিদ্রিত নারী প্রকৃতি সজাগ না হইলেও তাহাকে লইয়া সরলের প্রবাসের দিনগুলি মন্দ কাটিতেছিল না।

সে দিন অপরাহ্নে কলেজ হইতে ফিরিয়া পরিপাটী বেশভূষা করিয়া গায়ে আতর মাখিয়া সরল বধূকে লইতে আসিল। বধূ তখন ছায়া ঢাকা কুঞ্জ কাননে ছোট ভাই ভগ্নিদের সহিত মহানন্দে লুকোচুরী খেলিতেছে। তখনো তাহার চুলবাঁধা হয় নাই ঝাঁকড়া ঝাকড়া একরাশ কালো চুল চোখে মুখে পড়িয়া সেই মুখ খানি পাতায় ঢাকা গোলাপের মত সুন্দর দেখাইতেছিল। সময়টিও সুন্দর, দিবা যায় যায় সন্ধ্যা আগত, দূরের তালি বনের মাথায় সূর্য্য অস্তাচলে চলিয়াছেন, সূর্য্যের রক্তিমছায় আকাশের খানিকটা লাল হইয়া উঠিয়াছে। সেই সূর্য্য রশ্মি যেন অলক্ষ্য আসিয়া সরলের ভাব প্রবণ রাঙ্গা হৃদয়টাকে গাঢ়লালে অনুরঞ্জিত করিতে লাগিল।

লুকোচুরীর চোর উষার মেজভাই তরুণ চোরের সীমার বাহিরে আসিয়া পাখীকে ডাকিয়া কহিল "ও পাখিদি, অত দৌড়চ্ছিস কেন আমি তোকে ধরতে

আসি নি। দেখ ভাই পিছনে চেয়ে দেখ, কে এসেছে?” পাখী ঘাড় ফিরাইয়া তীব্রকণ্ঠে ঝঙ্কার দিয়া উঠিল “তুমি যে আবার এখানে এসেচ? সবখানেই জ্বালাতন করা, ভাল লাগে না। আমি যাব না, কখনো যাব না। তুমি চলে যাও, এখুনি চলে যাও।”

পাখীর তর্জ্জন-গর্জ্জনে বালক বালিকারা হাসিয়া এ উহার গায়ে ঢলিয়া পড়িল। উহাদেরই অনতিদূরে ঝি কলতলায় বাসন মাজিতে বসিয়াছিল, হাসির উচ্ছ্বাসে সে তাড়াতাড়ি মুখে অঞ্চল চাপিয়া ধরিল।

লজ্জায় অপমানে সরল সেখানে দাঁড়াইতে পারিল না। কাহারো পানে চাহিতে পারিল না। বুকভরা আশা লইয়া যে পথে সে আসিয়াছিল, নতমস্তকে সেই পথেই তাহাকে ফিরিতে হইল।

সেই রাত্রেই সরল একখানি উপনিষদ কিনিয়া হরিদ্বারের টিকিট কিনিয়া গাড়ীতে গিয়া বসিল। যাত্রাকালে মাকে চিঠি লিখিয়া যাইতেও সরলের ত্রুটী হইল না। লিখিল, “মা, সাধুসঙ্গের উদ্দেশে আমি হরিদ্বারে চলিলাম। তুমি আমার জন্যে চিন্তা করিও না। আমি দূরে থাকিলেও সুশান্ত, সমীর তোমার কাছে রহিল। তোমার বৌ তার মাসীর কাছে বেশ মনের আনন্দে আছে।”

* * * °

মাসীর কাণে ঘটনাটা পঁহুছিতে বিলম্ব হইল না। তিনি জামাইকে ডাকিতে পাঠাইয়া শুনিলেন সরল তীর্থ ভ্রমণে চলিয়া গিয়াছে। মাসী ক্ষুব্ধ হইয়া পাখীকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। উষাও চুপ করিয়া রহিল না।

কিন্তু কিসে কি হইল কে জানে? সেইদিন হইতেই পাখীর হৃদয় নদীতে একটা বিপরীত ভাবের তরঙ্গ বহিতে লাগিল। দিনে দিনে পাখী সঙ্গী, মাসী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ল। এখন নির্জ্জনে বসিলেই পাখীর হৃদয়-দর্পণে ফুটিয়া উঠে একখানি সরল সুন্দর মুখ। সেই কাল অপরাহ্ণ, লুকোচুরী খেলা তারপর তাহারই কণ্ঠনিঃসৃত কঠোর বাক্যবাণ। ভাই বোনদের বিদ্রূপপূর্ণ উচ্চ হাসি।

পাখী বেশী ভাবিতে পারে না, প্রস্থানোদ্যত সরলের লজ্জায় রক্তিম বেদনায় বিবর্ণ মুখখানি স্মরণ পথে আসা মাত্র তাহার বক্ষ যন্ত্রণায় টন টন করিতে থাকে।

কয়েক দিন যাইতে না যাইতেই মাসী সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিলেন, পাখী যেন অন্যরূপ হইয়া যাইতেছে। খেলায় উৎসাহ নাই, দুষ্টামিতে আনন্দ নাই। রাম শরণের নিকট হইতে স্বামী হস্তের রেখাঙ্কিত তাহারই নাম লেখা পাঠ্যপুস্তক ক’খানা আনাইয়া মাসীর মেয়েদের সহিত স্কুলে যাইতেছে। অশান্ত বালিকা শান্ত হইতে চেষ্টা করিতেছে। লেখাপড়া শিখিতে যত্ন করিতেছে।

এই শিখিবার চেষ্টার মাঝখান দিয়া মাসখানেক কাটিয়া গেল। পৌষে লক্ষ্মীর স্বর্ণ ঝাপি খুলিবার সঙ্গে সঙ্গেই বড় দিনের বন্ধে উষার স্বামী মিহির শ্বশুর বাড়ী বেড়াইতে আসিলেন। মিহির রাজসাহী কলেজের নবীন অধ্যাপক, দেখিতেও তেমন সুপুরুষ নহে, প্রকৃতিও অত্যন্ত গম্ভীর।

জামাতার আগমনে গৃহে আনন্দের তরঙ্গ বহিতে লাগিল। সর্ব্বাপেক্ষা উল্লসিত হইল উষা, সে যেন আনন্দ সাগরে স্নান করিয়া আনন্দের মদিরা পানে বিহ্বলা হইয়া উঠিয়াছিল।

পাখী উষার প্রসন্ন হাসি নিরীক্ষণ করিয়া আশ্চর্য্য হইয়া চাহিয়া থাকে। মিহিরের ভিতর কি আছে! যাহাকে নিকটে পাইয়া উষার এত আনন্দ, এত তৃপ্তি! মিহিরের চোখে চোখ মিলিলে উষার চক্ষে বিদ্যুৎ খেলে :কেন! মিহিরকে খাওয়াইতে, তৃপ্তি দিতে উষার এত ব্যাকুলতা কেন! কিন্তু মিহিরের চেয়ে সুন্দর মধুর পাখীর কি কেহ ছিল না? পাখী তাহাকে কি দিয়াছে? কি বলিয়া দ্বার হইতে বিতাড়িত করিয়াছে। ভাবিতে ভাবিতে পাখী যেন কেমন হইয়া যায়, নিজের চুল নিজের ছিঁড়িতে ইচ্ছা হয়, নির্দ্দয় ভাবে নিজেকে আঘাত করিতে ইচ্ছা হয়। পাখী আনন্দে যোগ দিতে পারে না, মিহিরের সামনে বাহির হইতে পারে না।

কয়েকদিন পর পুলকের হিল্লোল প্রশমিত হইল। মিহির চলিয়া গেলেন। প্রভাতের দীপ্ত উষা বিরহের মেঘে ম্লান হইল। পাখী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। উৎসব আনন্দ এখন তাহার ভাল লাগে না, এখন সে দুঃখের প্রয়াসী হইয়াছে।

আরও মাস খানেক পর রামশরণ আসিয়া একদিন হাসি মুখে জানাইয়া গেল, কাল সকালেই তাহার দাদাবাবু আসিতেছেন। মা কাশিবাসিনী হইবেন বলিয়া ভয় দেখানতেই দাদাবাবুর ঘরে ফিরিবার মরজি হইয়াছে।

এ সংবাদে কেন কি জানি পাখীর চক্ষু দুটি জলে ভরিয়া গেল।

° ° ° °

পরদিন প্রভাতে মাসী বলিলেন "আজ সরলের আস্‌বার কথা, ছেলেদের কাউকে পাঠিয়ে সরলকে এখানে ডেকে আন উষা!"

উষা কহিল "না মা, এবেলা কাজ নেই। ট্রেণে এসে সে বেচারা হয় তো ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। এ বেলা নিজের বাড়ীতেই নেয়ে খেয়ে ঘুমাক। বিকেলে তুমি আমি দুজনা গিয়ে ওকে ধরে নিয়ে আসবো। পাখী যে কাণ্ড করেছিল, তারপর তুমি নিজে না গেলে ও আসবে না মা।"

মেয়ের যুক্তিতে মা সায় দিয়া গেলেন।

স্কুলের বেলা হইলে ছেলে মেয়েরা স্কুলে ছুটিল। উষা পাখীকে আজ স্কুলে যাইতে দিল না।

আহারান্তে মা দিবানিদ্রায় মগ্ন হইলে উষা পাখীকে নিজের ঘরে লইয়া গিয়া মনের মত করিয়া সাজাইতে লাগিল।

বিস্মিত পাখী জিজ্ঞাসিল "আজ কাদের বাড়ীতে আমায় বেড়াতে নিয়ে যাবে দিদি! এত সাজ কিসের ভাই!"

উষা পাখীর রাঙ্গা গাল দুটি টিপিয়া আরও খানিকটা রাঙ্গা করিয়া দিয়া কহিল, "কিছু যেন জানেন না, এত সাজ কিসের ভাই! এ সাজ হচ্ছে বর আসার জন্য পাখি! আমি খানিক আগেই খবর নিয়ে জেনেচি সরল এসেছে। বর যে কি তাতো এ কয় মাসেই হাড়ে হাড়ে বুঝে নিয়েছিস, খবরদার আর দুষ্টামি করিস নে। আমি এখুনি ঝিকে দিয়ে তোকে সরলের কাছে পাঠাচ্ছি, ঝি তোর বাড়ীর সিঁড়ি পর্য্যন্ত দিয়ে আসবে—তুই ঘরে ঢুকে সরলের দু'পা জড়িয়ে ধরে বলবি "আমি অবোধ তোমার মূল্য বুঝিনি, তোমাকে চিনি নি, তুমি আমায় মাপ করে পায়ে স্থান দাও। আর আমি তোমার অবাধ্য হয়ে কষ্ট দেব না।"

পাখী অঞ্চলে মুখ ঢাকিয়া মাথা দুলাইয়া জানাইল সে এ সব কিছুই পারিবে না। তাহার ভারী লজ্জা করিবে।

উষা সস্নেহে পাখীর গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিতে লাগিল "এ তোকে পারতেই হবে লক্ষ্মি, না পারলে তোমার অনেক দুঃখ আছে। তোর দোষের ক্ষমা হবে না। শুনেছিস তো তোর শাশুড়ীর কথা! তিনি কেমন রেগে আছেন, রাগের মাথায় ছেলেকে আবার বিয়ে দিতেও পারেন। কাল পরশুর ভেতর তিনি এখানে আসবেন, তাঁর আসার আগে সরলকে খুসী করতে হবে।"

পাখী তেমনি মুখ ঢাকিয়া অস্ফুট কণ্ঠে কহিল "তুমি যেয়ে তাকে ডেকে আনো দিদি, আমার লজ্জা করে, আমি যেতে পারবো না।"

"তোকে পারতেই হবে পাখি, তুই যেয়ে মাপ না চাইলে সে আমাদের ডাকে আসবে না। তুই এখন যা, সন্ধ্যে বেলা আমি মাকে নিয়ে তোদের আনতে যাব। লজ্জা করিস নে, এটা তোর লজ্জার সময় না।"

ইহার পর পাখীর আপত্তি করা হইল না। শাশুড়ী রাগিয়া ছেলেকে পুনরায় বিবাহ দিতে পারেন কথাটা তাহাকে ঠেলিয়া সরলের দিকে লইয়া চলিল। পাখী এখন সংসারের জ্ঞানহীনা চপলা বালিকা নহে, বিরহ বিধুরা তরুণী।

উষার শিক্ষানুযায়ী ঝি পাখীকে সরলের বাড়ীর সিঁড়ি পর্য্যন্ত পৌছাইয়া প্রস্থান করিলে, পাখী সেই-খানেই দাঁড়াইয়া রহিল।

বিজন দ্বিপ্রহর চরাচর স্তব্ধ। দূর হইতে ঘুঘুর ক্লান্ত করুণ স্বর ভাসিয়া আসিতেছে। মাঘের শেষ, প্রাঙ্গণে সরলের সাধের কাঁচা মিঠা আমের গাছটি মুকুলে ভরিয়া গিয়াছে। আম্রমুকুলের সুমিষ্ট গন্ধে বায়ু সুরভিত।

ভাড়াটিয়ারা সকলেই বিশ্রাম সুখে শয়ান। রন্ধন-শালার পার্শ্বে এক পাল কাক কলরব করিতেছে।

পাখী আর দাঁড়াইতে পারিল না। যন্ত্র চালিতের ন্যায় সব কটা সোপান অতিক্রম করিয়া একেবারে ত্রিতলে আসিয়া উপস্থিত হইল। সামনেই সরলের শয়ন কক্ষ, এদিকে রামশরণের চিহ্নও নাই। পাখী আস্তে আস্তে গৃহে প্রবেশ করিল।

খাটের উপর সরল শুইয়া আছে; চক্ষু নিমিলিত মুখখানি শুষ্ক মলিন। পাখী এক দৃষ্টে স্বামীর দিকে চাহিয়া রহিল, চাহিতে চাহিতে অশ্রুজলে পাখীর দৃষ্টি ঝাপসা হইয়া গেল। এই পাখীর স্বামী! ইহাকেই সে এত দুঃখ দিয়া দেশ ত্যাগী করাইয়াছিল? জীবনের দুষ্টগ্রহ ভাবিয়া উপেক্ষা করিয়াছিল! আজ এ বিশাল বিশ্বে উহাপেক্ষা প্রিয় পাখীর যে আর কিছুই নাই। সেই কথাটি সে কেমন করিয়া ব্যক্ত করিবে? হৃদয়ের রুদ্ধদ্বার খুলিলেও কণ্ঠের ভাষা যে ফুটিতে চায় না।

হঠাৎ পদতলে মৃদুস্পর্শে সরল চমকিয়া চাহিল, একি, অভাবিত অপ্রত্যাশিত ব্যাপার! সেই দুরন্ত চঞ্চল বালিকার মধ্যে এ ক্ষমাপ্রার্থ প্রেম ভিখারিণী তরুণী কোথা হইতে আসিল? বনের পাখী বনের মায়া কাটাইয়া পতির প্রেম-শৃঙ্খলে আজ ধরা দিতে আসিয়াছে।

সরল বিছানায় বসিয়া রুদ্ধস্বরে কহিল "পাখি, আমি তো তোমায় ডাকিনি? তুমি কার সঙ্গে এলে?"

পাখী কিছুই বলিল না। বলিতে পারিল না। উষার উপদেশ ভুলিয়া তাহার অবাধ্য অশ্রুজল অনুতাপের লজ্জা ঢাকিবার জন্য সরলের পায়ে মুখ লুকাইল।

শিব

শ্রীজগৎ মোহন সেন, বি-এস-সি, বি, ই, ডি,

দূরে শান্ত নীলাকাশে কান্ত মনোহর,
তোমারে দেখেছি আজি সন্ধ্যায় সুন্দর!
শুভ্র-অভ্র-জটাজুটে
কুন্দ-ইন্দু-লেখা ফুটে,
রঞ্জিল কিরণে মোর বিমুগ্ধ-অন্তর;
তোমারে নয়ন ভরি দেখিনু সুন্দর!

নাসারন্ধ্রে শান্তশ্বাস স্নিগ্ধ-সমীরণ;
নীরবে নমিল বনে বনস্পতিগণ।
অকম্প প্রদীপ-শিখা,
রহিলে গগনে লিখা,
অবিচল আঁখি পাতা ধ্যান-নিমগন,
সম্ভ্রমে নমিল তোমা বনস্পতিগণ।

অস্তরাগে রক্ত-রবি রঞ্জিল তোমায়,
নন্দিল বিহগ-কণ্ঠ গীতি-বন্দনায়;
বলাকা গাঁথিল হার
ফুল্ল বন-মল্লিকার
ভূষিতে ও সিতি-কণ্ঠ সিত-সুষমায়;
বন্দিল বিহঙ্গ-কণ্ঠ ছন্দো-বন্দনায়।

তোমারে দেখেছি আজি সন্ধ্যায় সুন্দর!
ভরেছিলে গরিমায় সায়াহ্ন অম্বর।
প্রশান্ত নয়নে তব,
ছিল ছবি অভিনব,
ভরিল কিরণে তার বিমুগ্ধ অন্তর;
তোমারে নয়ন ভরি হেরিনু সুন্দর।

পুরাণী বাঙলা

শ্রী বলাই দেবশর্ম্মা

—প্রবন্ধ—

অদ্যকার যে বাঙলা তাহা বাঙলা না হউক, বেঙ্গল বটে! অদ্যকার বাঙলা একটা মিশ্র বাঙলা। এই বাংলার রূপে তাহার স্বরাজের ছাপ নাই। তাহার চিত্তে শ্রদ্ধা নাই স্বকীয়তার প্রতি। আজিকার বাঙ্গালীর মন তাহার স্বদেশের শস্য শ্যামল আবেষ্টনীর সীমা রেখায় সুস্থির আছে কিনা, সে সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার যথেষ্ট অবকাশ রহিয়াছে। বর্ত্তমান বাংলাই পূর্ণতর কিনা, সে সম্বন্ধে কোনও আলোচনা উপস্থিত করিতেছি না, কিন্তু একটা যে খাঁটি ও অমিশ্র বাংলা ছিল, ইহা সত্য। পুরাণী বাঙলায় সেই স্বরূপ প্রতিষ্ঠিত বাংলার পরিচয় গ্রহণ করিব।

পুরাতন বাঙলা ভাল হউক, মন্দ হউক তাহার একটা নিজস্ব রূপ ছিল। সেই রূপের একটা প্রতিচ্ছবি আঁকিয়া রাখা ভাল। এবং উচিত ও হইয়া উঠিয়াছে। কারণ এমন এক আশঙ্কা জাগিয়াছে যে অচীরকাল মধ্যে বাঙলা এক ফেরঙ্গ বাঙলা হইয়া উঠিবে।

যে বাঙলার কথা কহিতে যাইতেছি, তাহা শতাব্দী পূর্ব্বের দেশ নহে। প্রত্নতাত্ত্বিক যুগের বাঙালী ও বাংলার কথা আলোচনা করিয়া একটা বিতণ্ডার সৃষ্টি করিতে চাহিনা। অর্দ্ধ শতাব্দীরও অল্প দিনের কথা যাহা বয়োবৃদ্ধগুরুজনের মুখে শুনিয়াছি এবং তাঁহাদের আচারে ব্যবহারে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহাই বিবৃত করিতে যাইতেছি। কেবল তাহাই নহে, আমাদের বাল্য জীবনে মাত্র পঁচিশ ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে যাহা দেখিয়াছি, তাহার কথাও পুরাতন বলিয়া মনে করি, তাই সেই কথা গুলিও আঁকিয়া রাখিব।

পুরাতনের প্রতি মানবের একটা স্বাভাবিক শ্রদ্ধা আছে। সেই জন্য প্রায় প্রত্যেক জাতি নিজেদের পুরাতন কথা সযত্নে লিখিয়া রাখে। কেহ রাখে প্রত্নতাত্ত্বিক কৌতূহলের বশে, কেহ বা রাখে স্বকীয়তার প্রতি শ্রদ্ধার ফলে। যাহা হউক, রাখে ও রাখিতে হয়। আমরাও রাখিয়া আসিয়াছি, বর্ত্তমানেও রাখিব।

নিজেদের পুরাণী কথা আঁকিয়া রাখিবার যে বিশেষ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া বক্ষ্যমান বিষয় আলোচনা করিতেছি, তাহা ঐতিহাসিক কুতুহলী মনোবৃত্তি নহে; তাহা স্বজাত্যাভিমান, তাহা নিজস্বতার প্রতি শ্রদ্ধা। পরকীয়তার যে কুহেলিকায় আমাদের নিজস্ব রূপ আচ্ছন্ন হইয়া পড়িতেছে, তাহাকে মুক্ত করা প্রয়োজন।

নিজের রূপ দেখিলে আপনার কথা মনে পড়ে নিজের প্রতি ভালবাসা জাগে। যে দিন আসিয়া পড়িয়াছে তাহাতে আত্মপ্রীতি ত দূরের কথা আপনাদের প্রতি অবজ্ঞাই জাগিতেছে। পরের মত সাজিতে বলিতে কহিতে, জীবন-যাত্রার খুঁটিনাটি অংশগুলিকে পর্য্যন্ত পরকীয়তায় মজাইয়া তুলিতে অনুপ্রাণিত হইয়াছি। হিন্দুকলেজ ও ডিরোজিওর সময়ে ওল্ড ফুল বলিয়া একটা কথা উঠিয়াছিল। সে দিন যাহা উঠিয়াছিল আজ তাহা সম্পূর্ণ। পুরাতনকে আজ আর ফুল বলিয়াই ক্ষান্ত নহি তাহাকে অবজ্ঞার পাষাণ-পেষণে নিষ্পিষ্ট করিয়া উৎখাত করিতে চাহিতেছি। তাই পুরাতনের যবনিকা উন্মোচন করিয়া দেখিব যে কয়েক দিন মাত্র পূর্ব্বেও আমরা কেমন ছিলাম; পিতৃ-পিতামহগণ কোন ধারায় জীবন নির্ব্বাহ করিতেন!

একশত হইতে দেড়শত বৎসরের মধ্যে দেশের

যে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, গত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে তদপেক্ষা অধিক পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। হিন্দু কলেজের দিনে যখন সাহেব সাজার ধুম চলিতেছিল, তখনও পূর্ব্বে পশ্চিমে, অতীতে বর্ত্তমানে একটা সম্বন্ধ ছিল। তখনও মাইকেল মধুসূধনের পাশে ভূদেবকে দেখিতে পাইতাম। মাইকেলও হইয়াছিলেন বাহিরে ভিতরে ছিলেন মধুসূদন। তাই খৃষ্টিয়ান, ইংরেজী স্বপ্ন দেখা মধুসূদনের লেখনী মুখে উৎসারিত হইল:—নাচিছে কদম্ব মূলে

বাজায়ে মুরলী রে !
রাধিকা রমণ !
চল সখি ত্বরা করি দেখিগে প্রাণের হরি
রাধিকা রমণ।

এ কথা যাউক। বলিয়াছি গত অর্দ্ধশতাব্দীর মধ্যে দেশের অন্তরে বাহিরে যে পরিবর্ত্তনটা সংঘটিত হইয়াছে, তাহা বড়ই দ্রুত। শুধু দ্রুত নহে, নিতান্তই সাংঘাতিক।

বাংলায় ইংরেজ শাসনাধিকার প্রতিষ্ঠার পর ইংরেজী শিক্ষার উপর অত্যধিক মমতা দেখা দিল। এই মমতাটা যে অকস্মাৎ আসিয়াছিল, তাহা নহে। রাজনৈতিক চাতুর্য্যের একটা প্রধান কৌশল শিক্ষা সম্মোহন Educational Penetration এদেশের নব আবির্ভূত রাষ্ট্রকর্ত্তাগণ রজনীতিক ক্ষেত্রে এই অমোঘ অস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। ফলে, শিক্ষার ভিতর দিয়া দেশবাসী আত্মবিতৃষ্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল। ইংরেজী শিক্ষার প্রথম আমলে বাঙ্গালী জাতি যে শিক্ষা পাইল তাহা তাহার বুদ্ধি প্রতিভাকে একান্ত ভাবে সম্মোহিত করিতে পারিল না। বঙ্কিম কৃষ্ণ-চরিত্র আঁকিলেন ভূদেব আচার প্রবন্ধ লিখিলেন, নবীন কুরুক্ষেত্রে মহাভারতের কথা কহিলেন, হেম বৃত্রসংহার করিলেন। সে সময়েও গ্রামে গ্রামে পাঠশালা ছিল, চণ্ডিমণ্ডপে দেবী প্রতিমা ছিলেন, পল্লীতে লোক ছিল, বালকের মনে স্বদেশে ও স্বজাতির প্রতি মমতা ছিল।

শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু এই অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। ক্রমশঃ লোকের পল্লীর প্রতি অবজ্ঞা দেখা দিল। নগরে বাস করাকে প্রথমে বিলাস ও শেষে সৌভাগ্য মনে করিল। এখন সেই অবস্থাই চলিতেছে। পল্লী-বিতৃষ্ণা একটা উপসর্গ মাত্র, মূল ব্যাধি আত্ম বিস্মৃতি।

পল্লী ভাঙ্গিতে লাগিল, তাহার সহিত গ্রাম্য পাঠ-শালা ও দেবদেউল বিলুণ্ঠিত হইতে লাগিল। দেশের আচার আচরণের প্রতি অবজ্ঞা দেখা দিল। আজ সাহিত্যে পর্য্যন্ত সেই আত্ম-বিস্মৃতির প্রকাশ। যে বঙ্গ সাহিত্য অতি আধুনিক হইয়া গড়িয়া উঠিতেছে, তাহাতে নামে বাঙ্গালী অনেক থাকিলেও প্রাণে বাঙ্গালী একজনও নাই। আধুনিক বঙ্গ সাহিত্য রাসিয়ান্, নরোএজিয়ান, বেল্‌জিয়ান, সুইডিস্ সাহিত্যের এক অক্ষম প্রতিচ্ছবি। বাঙ্গালী রমণী ডাইভোর্সেরও পক্ষপাতিনী হইয়া উঠিতে ছেন। আন্তর্জ্জাতিক বিবাহের ও যে উপযোগিতা আছে। তাহাও উপলব্ধি করিতেছেন। এক কথায় পশ্চিম সমুদ্রে যে তরঙ্গভঙ্গ উত্থিত হইতেছে, তাহারই ভাঙ্গা ঢেউগুলি আসিয়া প্রাচ্যের বেলা বুকে আছড়াইয়া পড়িতেছে।

এমন অবস্থায় পুরাণী বাঙ্গলার রূপের একটা প্রতিচ্ছবি আঁকিয়া রাখা, নিতান্ত অশোভন ও অসঙ্গত হইবেনা। হয়ত বা নিজের রূপ দেখিতে পাইলে নিজের প্রতি যে ভালবাসা বিলীয়মান হইয়া আসিতেছে, তাহা প্রদীপ্ত হইয়া উঠিবে। এবং তাহাতেই আমাদের নব জীবনের আশা আকাঙ্ক্ষা পরিপূর্ণ হইবে।

বাঙলার পল্লী

অঋণী অপ্রবাসী হওয়াকেই এদেশের লোক আশী-র্ব্বাদ বলিয়া মনে করিত। এই ভাব গত পঁচিশ ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বেও দেশের লোকের মনে বদ্ধমূল হইয়াছিল। কাজেই বাপের ভিটায় পড়িয়া থাকিয়া যে পৈত্রিক ক্রিয়া-কর্ম্ম বজায় রাখিতে চেষ্টা করিত, সেই নিজকে ধন্য বলিয়া মনে করিত। যাঁহারা বৈষয়িক কর্ম্ম উপলক্ষ্যে প্রবাসে থাকিতেন, তাঁহারা সুবিধা পাইলেই গ্রামে আসিতেন এবং যাহা অবশ্য করণীয় ক্রিয়া কর্ম্ম, তাহা বাস্তু-ভিটাতেই সম্পন্ন করিতেন।

এই সম্বন্ধে যে সত্য কাহিনীগুলি জানি ও শুনিয়াছি এখানে তাহারই দুই একটি বিবৃত করিতেছি। এবং তাহা হইতে বুঝিতে পারিবেন,—কিছুকাল পূর্ব্বেও বাঙ্গালীর পল্লীপ্রীতি কি গূঢ় ছিল এবং ছিল কিরূপ আন্তরিক।

প্রায় ষাট সত্তর বৎসর পূর্ব্বে রাঢ়ের কোনও গ্রাম্য ব্যক্তি কলিকাতায় গ্যাস কোম্পানীতে কর্ম্ম করিয়া এবং গুড়ের ব্যবসা করিয়া প্রচুর অর্থার্জ্জন করিয়াছিলেন। আজিকালিকার দিনে তত ধন উপার্জ্জন যাঁহারা করেন, তাঁহারা পল্লী ত দূরের কথা কলিকাতাকেই বাসের অযোগ্য বলিয়া মনে করেন। প্যারিস, বার্লিন, লণ্ডন, চিকাগো নহিলে তাঁহাদের মনে ধরেনা। যাহা হউক, এমনি এক প্রকাণ্ড ধনী ব্যক্তি তাঁহার স্বগ্রামে আসিয়া ক্রিয়াকর্ম্ম করিতেন। এবং প্রতিবারই কলিকাতা হইতে হইতে প্রচুর পরিমাণ মিষ্টান্ন আনয়ন করিতেন। আর যত পরিমাণ মিষ্ট সন্দেশ কলিকাতা হইতে আনয়ন করিতেন, তাহার দ্বিগুণ লইতেন গ্রাম্য মোদকদের নিকট হইতে।

ইহাতে উক্ত ধনী ব্যক্তির আত্মীয়স্বজন বিস্মিত হইতেন, ক্রমশঃ সকলে বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। একদিন তাঁহাকে এই ব্যাপারের কারণ জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি উত্তর দিয়াছিলেন যে বাহিরের ব্যবসায়ী তাঁহার অর্থ লইয়া ধনী হইবে, আর তাঁহার নিজ গ্রামবাসী ও প্রতিবাসীরা তাঁহার অর্থের অংশ পাইবে না! এমন কথাও শোনা যায় যে উক্ত ধনবান ব্যক্তি যত দিন বিদেশে থাকিতেন, ততদিন গুড় ছাড়া অন্য কোন মিষ্টান্ন আহার করিতেন না।

ইহা হইতেছে সে কালের বঙালীর স্বদেশ প্রীতির কথা। ইহা পেট্রিয়টিজিম্ না হউক ইহাই হইতেছে খাঁটি স্বাদেশীকতা। পল্লীভূমির উপর মমতা, গ্রাম্য শ্রম শিল্পের প্রতি দরদ, স্বদেশ প্রেমের ইহা অপেক্ষা আর কি মহনীয় অভিব্যক্তি থাকিতে পারে? আর একজন বড়লোকের কথা শুনিয়াছি যে তিনিও তাঁহার বিপুল ঐশ্বর্য্য সত্বেও কখনও ঢাকা বা শান্তিপুরের কাপড় পরেন নাই। তাঁহার গ্রামের যুগী ও তাঁতির প্রস্তুত কাপড়ই পরিধান করিতেন। এমন কত দৃষ্টান্তই যে আছে, তাহা আর বলিবার নহে। আর কেই বা সে সকল কাহিনী স্মৃতির স্বর্ণ পেটিকায় শ্রদ্ধা সহকারে রক্ষা করিয়াছে।

পল্লীর যাঁহারা বয়োবৃদ্ধ ছিলেন, তাঁহারাই ছিলেন গ্রাম্য মণ্ডল। গ্রাম্য মণ্ডলের দৃষ্টি ছিল পল্লীর সর্ব্ব ব্যাপারের প্রতি। তাঁহারা শুধু পঞ্চাইতি করিতেন না, ইহাও দেখিতেন যে কে কোথায় খাইতে পাইতেছে বা পাইতেছে না, কে নিঃসহায় বা কাহার অর্থ উপদ্রব যুক্ত হইতেছে। আজকাল অনেকেই বলিয়া থাকেন যে উচ্চ বর্ণের হিন্দুরা নিম্ন বর্ণের প্রতি উপদ্রব যুক্ত ছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের দৃষ্টি কিরূপ মমতাপূর্ণ ছিল, দুই একটী দৃষ্টান্তে তাহার পরিচয় দিতেছি।

একটী ক্ষুদ্র পল্লীতে এক গ্রাম্য মণ্ডলের ভ্রাতা বাগ্দী জাতীর কোনও যুবতীর প্রতি কুদৃষ্টি নিক্ষেপ করে। উক্ত যুবতীর অভিভাবক পঞ্চায়েৎ সমক্ষে অভিযোগ করিলে মণ্ডলের যিনি ভ্রাতা, তিনিও অন্য অপরাধীর সহিত সমান শাস্তি পাইলেন। এইখানে একটা কথা বলা প্রয়োজন বোধ করিতেছি যে, উক্ত মণ্ডল ছিলেন ব্রাহ্মণ এবং তিনিই ছিলেন পঞ্চায়েতের শীর্ষ স্থানীয়, এখন যাহাকে বলে প্রেসিডেন্ট। এইত গেল সাম্য বৈষম্যের কথা। দরদের কথা, আধুনিক ভাষায় যাহাকে বলে সাম্য, তৎ সম্বন্ধে একটা ঘটনা উল্লেখ করিতেছি। এবং ঘটনাটি চাক্ষুষ করা ঘটনা।

বাংলার প্রায় প্রতি গ্রামেই ব্রাহ্মণ প্রভৃতি উচ্চ বর্ণের বাসস্থানের পার্শ্বেই নিম্নবর্ণের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইত। এই সব নিম্নবর্ণেরা দুলে, বাগ্দী, হাড়ি, ডোম, মুচী প্রভৃতি। কোন জমিদার গৃহিণী প্রত্যেক দিন প্রাতঃকালে উক্ত দুলে পাড়ায় বেড়াইয়া আসিয়া তাহাদের সুখ দুঃখের খবর লইতেন। কাহার কি খাইতে ইচ্ছা, কাহার জামাই আসিয়াছে, কে রোগ ভোগের পর পথ্য করিয়াছে, কাহার হাঁড়িতে চাল নাই ইত্যাদি ইত্যাদি। এবং গৃহে ফিরিয়া কন্যা প্রভৃতিকে রন্ধনের উপদেশ দিতেন। তাহার পর মধ্যাহ্ন ভোজনের পর নির্দ্দিষ্ট অন্নব্যঞ্জন লইয়া যাহার

াহা প্রয়োজন, স্বয়ং গিয়া তাহা পরিবেশন করিয়া াসিতেন। দুই দিন উপবাস করিয়া আত্মহত্যা করিল এমন সংবাদ এখন সংবাদ পত্রের পৃষ্ঠায় কখন দেখিতে াই। কিন্তু এমন উপেক্ষিত জন সে দিনের বাঙলায় কহ থাকিতে পাইত না। যাঁহারা সমাজপতি ছলেন, তাঁহারা পল্লীর প্রত্যেকেরই হাঁড়ির খবর াইতেন। পঞ্চাশের উর্দ্ধে যাঁহাদের বয়স হইয়াছে এবং াহারা বাল্য ও যৌবন পল্লী ভবনে অতিবাহিত রিয়াছেন, তাঁহারাই এ কথার জীবন্ত সাক্ষ্য।

একজন ব্রাহ্মণ গৃহিণীকে জানি, যাঁহার ভাণ্ডারে পঞ্চাশ বৎসরের গুড়, একশত বৎসরের পুরাতন ঘৃত প্রভৃতি অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সঞ্চিত থাকিত। এবং তিনি সেই সকল বস্তু গ্রামের প্রত্যেককার প্রয়োজনেই ব্যয় করিতেন। তাঁহাকে সকলে "বড় জ্যাঠিমা" বলিত। বড় জ্যেঠিমার ভাঁড়াড়ে থাকিত না এমন জিনিষই নাই। গ্রামের লোক বলিত বড় জ্যেঠিমার কাছে বাঘের দুধ চাহিলেও মিলিয়া যায়।

এইসব হইতেছে আত্মীয়তার কথা। যে আত্মীয়তা ও মিত্রতার অভাবে অদ্যকার মানব জাতি নিতান্তই উৎপীড়িত হইয়া উঠিয়াছে। ইহাকে গ্রাম্যতা যেন না বলি। এই আত্মীয়তাই হইতেছে সমাজ স্থিতির মূল। যাউক এ কথা। এই আত্মীয়তা সম্পর্কে আর একটা কথা বলা প্রয়োজন বোধ করিতেছি যে, পল্লীর নর নারী উভয়েই ছিলেন মানব মিত্র। যে অবগুণ্ঠনকে কুসংস্কার বলিয়া আমরা দুইবেলা গালি পাড়ি, সেই গুণ্ঠনের একটা সঙ্গত সীমা ছিল। তরুণী বধূরাই শীলতার আবরণে আচ্ছাদিতা রহিতেন। যাঁহারা ঘরণী গৃহিণী, যাঁহারা তারুণ্যের আবেগকে একটু এড়াইয়া উঠিতে পারিয়াছেন, গ্রামে তাঁহাদের গতিবিধির কোনই প্রতিবন্ধকতা ছিলনা। এই অবরোধ ও অবগুণ্ঠনের কথা পরে বলিব; এখানে পল্লী-আত্মীয়তার আর একটি চিত্র দেখাইয়া বিষয়ান্তরে প্রবেশ করিব।

গ্রামে কাহারও বাড়ী কোনও কাজ; বিবাহ বা উপনয়ন বা পূজা। এখনকার রীতি সহরে এবং গ্রামে একই প্রকার—পয়সা দিয়া লোক আনাইয়া কর্ম্ম করান হয়। কিন্তু কিছুদিন পূর্ব্বে ব্যবস্থা ছিল অন্য প্রকার। গঙ্গার উত্তর তীর নিবাসী কোনও পল্লী প্রৌঢ়কে দেখিয়াছি তিনি গ্রামের কাহারও গৃহে ক্রিয়া কার্য্য উপস্থিত হইলে গৃহস্থের বিনা আহ্বানেই তাহাদের ক্রিয়া কর্ম্মের কর্তৃত্ব করিতেন। প্রত্যুষ হইতে না হইতে তিনি গৃহস্থের দ্বারে গিয়া ডাকাডাকি করিয়া তাহাদের উঠাইয়া দিতেন এবং কর্ম্মারম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত সমস্ত তত্ত্বাবধান করিয়া ফিরিয়া আসিতেন। বিশেষ কথা এই যে কর্ম্মবাড়ীতে তিনি জল গণ্ডুষ গ্রহণ করিতেন না।

অর্থনীতিক সুসামঞ্জস্যে সাম্য ও মৈত্রির পরিচয় পাওয়া যায়। এসম্বন্ধে বাংলার রীতি নীতি অনুধাবন যোগ্য। পঁচিশ ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বেও যে সব অর্থনীতিক-সমতা পল্লী জীবনে অনুষ্ঠিত হইত, এখানে তাহার উল্লেখ করিতেছি। জোত্র জমা ও মূলধন অভিজাত উচ্চ বর্ণের হস্তেই ছিল সত্য। কিন্তু ধনী ব্যক্তিরা কখনও কাহাকেও শোষণ করিতেন না। বাল্যের স্মৃতি যাহা মনে আছে, তাহাতে দেখিয়াছি যে মধ্যবিত্ত এবং ধনীরা শ্রমিক সম্প্রদায়কে জমিজায়গার ভাগ দিতেন। যে নিতান্ত ছন্নছাড়া, তাহাকে ঘর করিয়া দিয়া, বিবাহ দিয়া সংসারী করিতেন। যাহারা চাষ করিতে তেমন দক্ষ নহে, তাহাদের গোরুর গাড়ী করিয়া দিয়া জীবিকার উপায় করিয়া দেওয়া হইত। গ্রামে দুই এক ঘর লোককে বসতি করানর রীতি ছিল। উচ্চ বর্ণই হউক আর নিম্ন বর্ণই হউক জায়গা জমি দিয়া, গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া কোনও লোককে স্থিতু ভিতু করা প্রত্যেক গৃহস্থের লক্ষ্য ছিল।

পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে এসব ব্যাপার আমরাও দেখিয়াছি। এবং দেখা ব্যাপারই লিপিবদ্ধ করিতেছি। আজ কাল আমাদের মনোবৃত্তি এমন লঘু হইয়াছে যে, ঘরের কথা ও নিজের কথা বিশ্বাস হয় না। বিশ্বাস হওয়া ত দূরের কথা, তাহার উপর অবজ্ঞাই সুপ্রচুর। প্রতীচ্য ঐতিহাসিকরা যাহা বলেন, তাহা নিন্দা ও অবজ্ঞা

মিশ্রিত হইলেও উহাকে ইতিহাস বলিয়া মনে করি এবং সম্মান করি। অথবা পশ্চাত্য ইতিহাস বিজ্ঞান অনুমোদিত প্রত্নতাত্ত্বিক খোঁড়া খাঁড়া অনুসন্ধান হইলেই সেগুলিকে মান্য করি। ইহার একটা কারণও আছে। সে কারণ হইতেছে আমরা আর ঘরের লোককে কিছু শোনাইতে চাইনা। চাহি প্রতীচ্যের অনুমোদন। তাই পাশ্চাত্য রীতি পদ্ধতিই হইয়াছে আমাদের একমাত্র গ্রাহ্য।

এখানে ঘরের কথাই কহিব এবং খুব দীর্ঘদিনের কথা কহিব না, সেইজন্য যাহা জানি ও পূজ্যজনের নিকট যাহা শুনিয়াছি, তাহাই বিবৃত করিব। আমরা কেমন ছিলাম, পিতৃপিতামহগণের জীবন পদ্ধতির ধারা কিরূপ ছিল, এ সম্বন্ধে যাঁহাদের শ্রদ্ধা আছে, তাহাদের জন্যই এই কাহিনী। এতদপেক্ষাও ইহার প্রয়োজনীয়তা বোধ করিতেছি যে, স্মৃতির মণিমঞ্জুষায় বাঙলার স্বকীয় রূপক রক্ষা করা। ভাণ্ডার যে রুদ্র মূর্ত্তি দেখা দিয়াছে, তাহাতে হয়ত আগামী পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে বঙ্গালীকে আর বাঙ্গালী বলিয়া চিনিতে পারা যাইবে না। হয়ত এক ফেরঙ্গ বাঙলা চণ্ডিদাস জয়দেব রামপ্রসাদ কমলাকান্ত স্মৃতিপূত বঙ্গভূমিকে কলঙ্কিত করিবে। তখন যদি স্মৃতির পেটিকা হইতে উন্মোচন করিয়া স্বরূপের ছবিখানি প্রত্যক্ষ করি, তখন হয়ত বৃন্দাবনকে মনে পড়িতে পারে। এবং স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত— হইবার সাধ জাগিতে পারে।

আগামীবারে বাঙলার অর্থনীতিক ব্যবস্থা ও তাহার সমাজ নীতির কথা কহিব। জানিনা, পুরানী কথা কহিতে কহিতে নবীনের গৃহহারা মন ঘরের প্রতি শ্রদ্ধাবান হইয়া উঠিবে কিনা? জিজ্ঞাসা করিতেছি উঠিবে নাকি?

রূপ

গল্প—
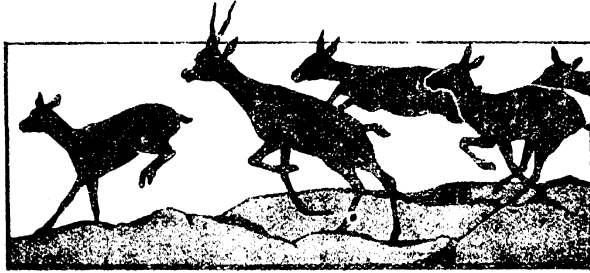
শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী দেবী

অণিমার বাপের চেহারা ছিল অনেকটা গ্রীকদেবতা অ্যাপোলোর মতন। মুখের আকারে, শরীরের গড়নে দীর্ঘতায় তাঁর মতন সুশ্রী সুগঠিত বাঙালী পুরুষ প্রায় দেখা যায় না। ফলে, তাঁর যেমন গর্ব্ব ছিল আপনার রূপের, তেমনি চর্চ্চা ছিল সেই রূপ রাখবার; নিজেরও এবং ছেলে মেয়েদেরও।

তাঁর স্ত্রী অবশ্য সময়ে অর্থাৎ কম বয়সে বেশ সুন্দরী ছিলেন বলা যেত; কিন্তু দেখা গেল ৪।৫টী ছেলে মেয়ে হবার পর তাঁর বয়স যখন ত্রিশ পার হয়ে গেছে, তখন কেমন একটু মোটা হয়ে পড়লেন। অবশ্য সামান্য—ঐ বয়সে মাতৃজনোচিত যেমন হওয়া উচিত তেমনি। কিন্তু তাই নিয়ে তাঁর স্বামীর ভাবনার, অস্বস্তির, পরিহাসের, অনুযোগের শেষ ছিল না। তিনি সময় নেই অসময় নেই, বলতেন, ঐ যে তুমি একটু বেঁটে মানুষ কিনা যদি একটু লম্বা হ'তে তাহলে আর এই রকম করে মোটা হয়ে চেহারাটীর সর্ব্বনাশ হ'ত না—নয়ত—ভাগ্যে অনুটা তোমার মতন বেঁটে হয় নি—দেখো ওর কেমন সুন্দর চেহারা থাকবে! এমনি নানাবিধ কথা।

স্ত্রী বেচারী ভারি সাদাসিদে ছিলেন। তাঁর ধারণা ছিল 'বিয়ে হয়ে গেলে আর রূপের দরকার কি—'? এবং মা হয়ে গেলে আবার রূপের কথা তোলা কেন? অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে তিনি কেবলি বলতেন, 'হ্যাঁ! তোমার যেমন কথা! বুড়ো হলুম ছেলের বউ ও জামাই আসবার কথা! আমার আবার বেঁটে লম্বা মোটা কি? ছেলে মেয়ের সামনে 'ফিগারের' চর্চ্চা আর রূপের আলোচনা তাঁকে অত্যন্ত অপ্রস্তুত করত।

স্বামীর অনেকটা সেই জন্যও বটে আর ও বিষয়ে চর্চ্চার ঝোঁক থাকার জন্যও ওঁকে দেখলেই মেয়ের সঙ্গে আর ছেলেদের সঙ্গে, বাঙালী জাত তার দৈহিক বিপুলতা, পরিধি, দৈর্ঘ্যের অভাব, প্রস্থের প্রাচুর্য্য, বিশেষ বিশেষ স্থানের বিশালতা এই নিয়ে আলোচনার শেষ হ'ত না।

অনুর মার এদানী গা সওয়া হয়ে গিয়েছিল, কোমল ভাবে শুধু হাসতেন।

দিনের পর দিন কেটে যায়। পয়সার অভাব ছিল না ভদ্রলোকের—পৈত্রিক বাড়ী, কিছু 'কাগজ' আর নিজে লাট সাহেবের দপ্তরে মোটা মাইনেতে কাজ করতেন। থাকার ধরণ ছিল অহিন্দুর মতন। কাজেই ছেলে মেয়ের বিয়ে দিয়ে বৌ জামাই আনবার জন্যে ঐ বাঙালীর মেয়েটী অত্যন্ত উৎসুক হলেও স্বামীর সে চেষ্টা একেবারেই ছিল না।

অনুর প্রায় ১৬ বছর বয়স হল, অনুই মায়ের কোলের সন্তান। তার ওপরের তিনটী ছেলে, বড় বিলেত গেল পড়তে, মেজ ছোট ও পড়চে পরে। কর্ত্তার না ছেলের বিয়ের নাম না মেয়ের—একটী মাত্র মেয়ে তবু;—

অনুর মা কেবলি ভাবেন একি সং? নিজের তো ২০ বছরে বিয়ে হয়ে ছিল, এখন খোকার না হোক বড় মেজর আর খুকির তো বিয়ের পূরো বয়স হয়েছে। খুকির বয়সে ওঁর প্রভাত হয়েছে।

অবশেষে বল্লেন একদিন,—'হ্যাগা, অনুর বিয়ের কি করছ? প্রভাতকে তো দিলে বিলেত পাঠিয়ে—অনুর আর ওর এক সঙ্গে বিয়ে দেওয়া ইতো উচিত ছিল।'

কর্ত্তা অট্ট হাস্যে ঘর ভরিয়ে দিলেন 'ষোলো বছরের মেয়ের বিয়ে? উনি কি ক্ষেপে গেছেন?'

স্ত্রী রাগ করলেন—'ষোলো বছরের মেয়ে কি খুকি নাকি? নিজেদের কথা বুঝি মনে নেই?'

অনুর বাবা একটু হেসেই জবাব দিলেন "সে কাল আর এ কাল? আর তাছাড়া আমি অনুর বিয়ে দোব অনেক পরে, এখন নয়। বাঙালীর মেয়েদের সৌন্দর্য্যের ও একটা আদর্শ স্থল হবে। বিয়ে দিলে কি আর সৌন্দর্য্য শ্রী থাকবে! দেখনি সেই চপলাকে কেমনটী ছিল এরি মধ্যে ছেলে হ'তে আরম্ভ করেছে!—

'কে বাবা?' বলে ছেলে মেয়েরা ঘরে ঢুকল।

মা চুপ করলেন, সে কালের সংস্কার তাঁর ওসব বিষয়ে ওদের সঙ্গে কথা কইতে দেয় না।

বাপ বল্লেন 'ওরে, ঐ তোর মার খুড়তুতো বোনের মেয়ে—তোদের চেয়ে কিছু বড়—ভারি সুন্দরী সুশ্রী ছিল চপলা—দেখলি না সেদিন—বেশ মোটা হচ্ছে!'

স্ত্রীর দিকে চেয়ে সহাস্যে বল্লেন 'ও সব হচ্ছে না আমার মেয়ের বেলায়। ওর চেহারাটী বাঙালীর মেয়ের আদর্শ করে তুলতে হবে! ও বিয়ে করবে ৩২ বছর বয়সে, তখনো এমন থাকবে, যে লোকে বিলিতী মেয়েদের দেখে যেমন মুগ্ধ হয় তেমনি হবে!'

অনুর মা স্থির শান্ত মানুষ হলেও এবার রেগে গেলেন। উঠে যেতে যেতে বল্লেন 'হ্যাঁ, দুনিয়ায় আর কাজ নেই!'

কর্ত্তা হাসলেন, ছেলে মেয়েরাও হাসলে অনুকম্পার ভাবে, অনুদের মা এ সব কিছু বোঝেন না! যাই হোক,—অণিমা যে সুন্দরী আর সুশ্রী তাতে যেমন সন্দেহও নেই তেমনি মা বাপ ভাইদের গর্ব্বেরও শেষ ছিল না। ফলে, অণিমারও মনের মধ্যে নিজের সম্বন্ধে একটা বেশ ধারণা ছিল।

একটী একটী বসন্ত শরৎ তার পুষ্পিত ঐশ্বর্য্য নিয়ে চলে যায়। যেন অণিমার গায়ে তার পুষ্পাঞ্জলির সৌরভ লাগে, আভাস লাগে সর্ব্বাঙ্গে, আর রূপের আর সীমা থাকে না।

অশোক তার ঠোঁটে করপল্লবে; কুন্দ তার রংয়ে, রজনীগন্ধা তার তনু দেহে রূপ ধরে, কার মতন সবটা যে বর্ণনা করা যায় না। অণিমা অপরূপ

এক এক করে আঠারো উনিশ কুড়ি হয়ে বাইশ বছর পার হয়ে গেল।

মা হন ব্যস্ত। বাপ হ'ন গর্ব্বিত।

আর আশ-পাশের পরিচিত অপরিচিত মহলে তার স্তাবকের পাণিপ্রার্থীর, ছেলের বিয়ে দেবার জন্য ব্যস্ত মা বাপের অণিমার জন্য জিজ্ঞাসার অবধি থাকে না।

মা রাগ করেন। মেয়ে কি অমনি তালগাছ হয়েই থাকবে? ওতে হবে কি?'—

বাপ হাসেন বলেন, তাহলে কি কাঁটাল গাছ হয়ে ফলে ফলে ভরে উঠ্‌তে থাকবে? তাহলেই বা কি হবে তোমার?'

কিছু হোক না হোক মার রাগ হয় প্রচুর, কথা বেরোয় না একটাও।—

এমনি করতে করতে অনিমার কলেজের পড়া সাঙ্গ হয়। পাণিপ্রার্থীর কত জনের বিয়ে হয়ে যায়। ভাই আসে বিলেত থেকে তার বিয়ে হয়ে সে কাজের জায়গায় চলে যায়। বৌ কিন্তু অণিমার মতন হয় না।—

বাপের কন্যা গর্ব্বের সীমা থাকে না। কালের স্রোতের ঢেউয়ের একটু ধাক্কাও তার দেহে লাগে নি। আরও যেন পরিপূর্ণ হয়ে উঠ্‌ছে।

অনিমার মা আর হতাশ হয়ে, রাগ করে বিয়ের কথা তোলেন না। ভাল ছেলের বিয়ে হয়ে যায়। মেয়ে ঘরে বসে থেকে সুন্দরী থাকলেই বা কি আর না থাকলেই বা কি? রূপ নিয়ে কি ধুয়ে খাবে? উনি বা ওঁরা দুজন চোখ বুজলে কি হবে? এই সংসারের ছিরি হয়ে রইল! তিনি মনে মনে শুধু ভাবেন, আর প্রশ্নোত্তর মালায় আপনিই কথা কন, যেন।

ওঁরা চোখ বুজলে কি হবে? একদিন বল্লেন।

স্বামী বল্লেন, "সে সেকাল গেছে গো, চোখ বুজলে আবার কি হবে! জানো, ওর নামে কত টাকা আলাদা করে রেখেছি! ওর যেদিন বিয়ে করতে ইচ্ছে হ'ব সেদিন কত লোক এসে খোসামোদ করবে ওকে!

মা একটু রেগেই জবাব দিলেন, 'হাতী করবে! খোসামোদ করবে কিসের জন্যে! ভাল ছেলে কি পড়ে

থাকবে! তারা মেয়ের জন্যে চেয়ে চেয়ে বয়েসে আরও ছোট হতে থাকবে! মেয়ের চেয়ে ছোট ছেলেরাই থাকবে!

অট্টহাস্যে স্বামী বল্লেন, 'তোমার মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে। হোলোই বা ছোট, বিলেতে এমন কত হয়।'

হোকগে বিলেতে। কেন ঐ প্রকাশ ঐ ছেলেটী কেমন ভাল, বিলেত থেকেই ডাক্তার হয়ে এলো ওর সঙ্গে দাও না খুকির বিয়ে!'

"ওর সব ভাল একটু লম্বা কম।"

'দেখ ঐ করতে করতে তোমার মেয়ের দিকে আর কেউ ফিরেও দেখবে না', বলে আবেগে চলে গেলেন।

অনুর বয়স বোধহয় ২৬।২৭ পার হয়ে এলো। এমনকালে হঠাৎ একদিন অনুর মা বিনা অসুখ, বিনা কোনো কথা নোটিশ কিছু না দিয়ে চোখ বুঝলেন।

ছোট ছেলেরা দুজন বিলেতে। বড়টী বিদেশে। শুধু স্বামী আর কন্যাকে পাশে রেখে তিনি চলে গেলেন।

অনুর বাবা একেবারে অসহায় হয়ে পড়লেন। তাঁরও বয়স হয়েছিল।

পরামর্শ করবার, তর্ক করবার, ভাববার ভাবনার ভাগ নেবার চিরকালকার পরিচিত সঙ্গিনীটী চলে গিয়ে এখন যেন তাঁর অবস্থিতিটা কতখানি তাঁর উপদেশটী তাঁর কথাগুলি কত দরকার মনে হয়। তাঁর স্থানের শূন্যতার পরিমাণ হয় না আর যেন।—

সবচেয়ে মনে হয় অণিমার কথা।

তাহলে অনুর বিয়ে নাদিয়েই তিনি গেলেন। যদি এবারে—উনি যান?—

—আর মনে হয় না', গেলেই বা'!—'অনুর টাকা আছে!'—আস্তে আস্তে মনের কোণে জাগে, থাক্‌লই বা টাকা, থাকলই বা রূপ, তার উপযোগিতা প্রয়োজনীয়তা কি!—

স্ত্রীর কথা মনে হয়, 'টাকা নিয়ে ধুয়ে খাবে':— 'রূপ নিয়ে কুলুঙ্গিতে, তুলে রাখবে।' কিন্তু কেউতো আর নেই;—

অনুকে ভালবাসতে খুব করত যে ছেলেরা তারা? তারা কই? সত্যেশ, সুধীর, প্রমোদ বিয়ে করেছে—। —সরিৎ কিছু রোজগার করে না। সুরেন, বিমল ও বিয়ে করছে বোধহয়। এদেশেতো নেই, ঠিকানাও জানেন না।

আচ্ছা প্রকাশ? প্রকাশ আছে কোথায় সীমান্তে। সেই বিয়ে করেনি, কিন্তু সেতো এখন আসতে পারবে না!

কিন্তু অনু কি তাকে পছন্দ করে? আচ্ছা অনুর কি কারুর ওপর ভালবাসা আছে?

ব্যাকুল পিতা শুধু আরও ব্যাকুল হ'ন, কন্যাকে কিছু স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করতে সঙ্কোচ হয়।

অনুর মার কথা মনে হয়। তিনি থাকলে কত সহজ হ'ত সব! যদি—অন্য কোনো ছেলে বিয়ে করে? যোগ্য পাত্র যেন দেখতে পাওয়া যায় না।— আগে যেন ওরা অনেক ছিল।

স্ত্রীর কথা মনে পড়ে, সত্যই তো বয়সে ছোটরাই রয়ে গেল সব!

শরৎ বসন্ত যেন আর আসেনা, এখন বৎসর যেন শুকনো পাতার ভারে মর্ম্মর সুরে অজানা দেশের আমন্ত্রণ বার্ত্তা নিয়ে এসে তাঁদের হয়ত তাঁরই, কিন্তু ওঁর মনে হয় সবারি দুয়ারে এসে দাঁড়ায়—। অনুর কপালে কুন্দ ফুলেও আলোর খেলা আজো আছে; ঠোঁটে অশোক কিংশুক; কিন্তু!—

বাবা শুধু ভাবেন কিন্তু;—

ছেলেরা বিলেত থেকে এলো। ছোট বোন এখন যেন দিদি, প্রায় গৃহিণী। বৃদ্ধ বাপের, ছোট ভায়ের দিদি। তেমনি রূপসী অণিমা, তরুণী অণিমা, তন্বী অণিমা, কিন্তু সকলের মনে হয় যেন অণিমা বড়, অনেক বড় আর যেন অন্যসংজ্ঞা মানায় না।

—ভাইদের বিয়ের ঠিক হয়েই ছিল, বড় ভাইয়ের কোন পিস্‌তুতো শালীর সঙ্গে একজনের আর অন্য কোন্ একটী মেয়ের সঙ্গে।

মাতৃহীন সংসারে ননদ ভাজে বিয়ের আয়োজন উদ্যোগ চলে।

পিতা বল্লেন, একবার জ্যেষ্ঠকে, আচ্ছা অনুর জন্য কাকে ঠিক করা যায়?

জ্যেষ্ঠ পুত্র একটু অবাক হয়ে চাইলেন 'অনু এখন আর কাকে বিয়ে করবে? ওর ত্রিশ বছর বয়স হোলো!—আমিতো ওর বিয়ের কথা জানতাম হবে না।'

অপ্রস্তুত বাবা বল্লেন 'না আমি ভাবছি তাহলে কি করে ও চিরদিন'—আর কথা শেষ করলেন না।

উৎসবের রাত্রি।—

রূপসী, সুশ্রী, অরূপা নানাবিধ মেয়ের ভিড়ে বাড়ী অলঙ্কৃত। পুরুষের ভিড়ও বড় কম নয়।

—অনিমা কাজের তদারকে এদিক ওদিক করছিল।—

খানিক পরে শ্রান্ত হয়ে—আর—হয়ত মায়ের কথা মনে পড়ছিল, চুপকরে এসে বারান্দার একটা তাল গাছের টবের পাশে দাঁড়িয়ে—সে বাইরের কোলাহল মুখরিত আলোকিত বাগানের দিকে চেয়ে রইল। হঠাৎ কানে গেল,—'অণিমাদি' ভাই কি সুন্দর—না। —আমার ইচ্ছে করে আমার দাদার সঙ্গে ওর বিয়ে হয়, দাদারও ভারি পছন্দ!

জবাব শোনা গেল তার ভাজের গলার—বিদ্রূপ হাস্যে তিনি বল্লেন বয়স ত জানিস? বয়সের গাছ পাথর আছে।—তোর দাদার দিদি হয়!

অবাক হয়ে মেয়েটি বল্লে, 'যাঃ ঠাট্টা কচ্ছ, আমার মনে হ'ল, আমার বয়সী—'

জ্বালাস্‌নে। খুকি সেজে থাকলেও তো আর ছেলেমানুষ হয় না। আমার চেয়ে বড় ওর আর বিয়ে হবে!

চিরকাল হাড় জ্বালাতে—ঘাড়ে পড়া থুবড়ী হয়ে থাকবে।—

আর রূপ নিয়ে করবেন কি। রূপের কপালখানা!'

ভাজ নিজে সুন্দরী ছিলেন না।

অণিমার মুখ পাঙাশ্ সাদা হয়ে গেল।

বয়েসে সে ভাজের চেয়ে বড় নয়, সমবয়সী; কিন্তু হাড় জ্বালাতন সে কি করেছে তাঁর! আর খুকি সাজা। ছিঃ! তারচেয়ে তিনি নিজে কি কম সাজেন।

হঠাৎ সেই অন্য মেয়েটি বল্লে, 'চল সুধাদি, বারান্দায় একটু হাওয়ায়ে দাঁড়াই গে! বাইরেটা কেমন সাজানো হয়েছে দেখি!'

তারা বেরিয়ে এলো।

অণিমা আস্তে আস্তে ফিরে দাঁড়ালো। কাগজের মত সাদা বিবর্ণ মুখে উৎসবের বাড়ীর আলো ঘরের দরজা জানলা থেকে এসে পড়ল। টবের পাতার আড়ালে তার মুখ আর তাকেও আগে দেখা যায় নি। এমন সবুজ রঙের পাশে তার সাদা মুখ যেমন সুন্দর তেমনি কিরকম যেন দেখাচ্ছিল।

ভাজ আর ভাজের সঙ্গিনী একেবারে আড়ষ্ট হয়ে গেল। 'ঠাকুঝি এখানে? তোমার কি অসুখ করেছে ভাই?'

শুষ্ক মুখে হাসি টেনে এনে অণিমা বল্লে, 'না, গরম হ'চ্ছিল তাই এখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম।'

'কখন এলে দেখলাম নাতো?'—

'এই এখুনি আসছি।—আচ্ছা তোমরা বোসো, আমি দেখিগে ওদিকে কাজকর্ম্ম একবার।'

—অণিমা আস্তে আস্তে রাণীর মত গাম্ভীর্য্যে পা ফেলে ঘরের মাঝে চলে গেল।

কিন্তু ওদের সমস্ত গল্পের কথার রস নষ্ট হয়ে গেল।

যদি শুনে থাকে, ছি, ছি;—যদি বাবার কাছে বলে কিছু!—

অণিমা আস্তে আস্তে আপনার ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ল। আলো নিবাবার আগে আলমারীর প্রকাণ্ড আর্সিখানাতে দেখা গেল একবার আপনাকে। রূপ তার সত্যি আছে!—কিন্তু।

কিন্তু ভাজ বলেছেন, 'রূপের কপালখানা! কি হবে রূপ নিয়ে?'—

অণিমার চোখ দিয়ে টপ টপ করে জল পড়তে লাগল।—

হ্যাঁ, বয়স তার প্রায় ত্রিশ হ'ল। এখানে তার আঙিনার আকাশে উৎসব নেই, দিকদিগন্তের অরণ্যে আনন্দ নেই, ধরিত্রীতে লীলালোক নেই; তার স্বজন নেই, তার স্বপ্ন নেই, তার সুখ দুঃখ কিছুই নেই! তার সবটা সাদা কাগজের মতই সাদা শূন্য!···

এই তার স্বজন? এরা?···

মাকে মনে পড়ে, মা আজ থাকলে বুঝতে পারতেন,

শুনলে তাঁর কত দুঃখ হ'ত। যেন প্রকাশকেও মনে পড়ে।...ছ্যাঁত করে মনে পড়ে এই রূপের সীমা একদিন তাকে পার হ'তে হবেই, হয়ে যাবেই—সেদিন—? —সেদিন কিহবে?—কি করবে সেদিন ও? রূপ যখন থাকবেনা, স্বজন বলে যখন কেউ থাকবে না, বাবাও না, সেদিন কারা থাকবে কি থাকবে ওর? ওঁদের কাছে থাক্‌বে? অণিমা শিউরে ওঠে যেন। সেতো আর বেশী দিন নয়!—মনে হয় অন্যলোকেরা কি করে? চোখের সামনে আগেই ভেসে আসে মায়ের প্রৌঢ় সুন্দর হাসি মুখখানি, প্রৌঢ়া জননীর জীবন-যাত্রা স্নিগ্ধ নিজেদের সংসারখানি।—

অনু চুপকরে শুয়ে থাকে। বাইরের উৎসবের মাঝে ওরা ওকে কেউ কেউ খোঁজে, হয়ত ভাবে কোনো কাজেই আছে। চাকররা এক একবার ডাকতে ডাকতে অন্যদিকে যায়।

ফোঁটা ফোঁটা করে চোখ দিয়ে জল পড়ে।

হঠাৎ পিতার আহ্বান শোনা গেল।—

অণিমা রঙ্গীন বারানসী সাড়ী ছেড়ে সাদা একখানি সাধারণ সাড়ী পরে নেমে গেল, নীচের উঠোনে বাবা ডাকছেন—কোথায় ছিলে?—অসুখ করেছে? সাদা কাপড়ে কেন মা? বাপ জিজ্ঞাসা করলেন।

মেয়ে বল্লে, 'এই খানেই ছিলাম তো; বড় গরম তাই সাদা পরিছি; ভাইয়েরা, ভাজ, বাবা সব কি বিষয়ে পরামর্শ করছিলেন।

সু-সজ্জিতা অপ্রস্তুত ভাজ একটু অবাক হয়ে ননদের দিকে চেয়েছিল।

ঠাকুঝি শরীর ভাল নেই? ভাজ জিজ্ঞাসা করলেন। 'না, ভালই আছি।' অণিমা কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

পরামর্শ শেষ হয়ে গেল।

উঠোনের উজ্জ্বল শুভ্র আলোতে সাধারণ সাদা সাড়ী পরা অণিমাকে কিরকম বিষণ্ণ মর্ম্মর মূর্ত্তির মতন দেখাতে লাগল।

নিমন্ত্রিতাদের গাড়ীতে তুলে দেবার জন্যে সে সেখানে অপেক্ষা করতে লাগল।

বারবার যাতায়াতে শুধু পিতার মনে হ'তে লাগল, অণিমার যেন কি হয়েছে, সে অণিমা যেন আর নেই, অণিমার কি বয়স তবে অনেক হয়েছে!

ভাবেন, উৎসবের আলোর মতন ও অমন নিরাভরণ ঔজ্জ্বল্য নিয়ে কেন দাঁড়াল? ওযেন তাঁর অণিমা বালিকা মেয়ে নয়, যেন প্রতিমা; যেন গড়ানো দেবী! মনের কোন কোণে কাঁটা ফোটে, কোলাহলের মাঝেও সে ভাবনা যায়না।

মনে হয় এ প্রতিমা যেন বিসর্জ্জনের প্রতিমা;—

রূপ? রূপ আছে কিন্তু:—বাপ শুধু ভাবেন।

গান

শ্রীরাসবিহারী মল্লিক

মনের মত সাজাই যত
তোমার সিংহাসন—
যেন আরও আছে বাকি
হয়নি সমাপন।

প্রদীপ যেন হয়নি জ্বালা,
শুখিয়ে গেছে ফুলের মালা,
কাঁদ্‌চে যেন আঁধার-পুরে
আমার আবেদন।

ডাক-নাম

গল্প

শ্রীঅচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত

মাইল সাতেক দূরের গাঁ থেকে সকালবেলায়ই কল্ এসে হাজির। পীরপুরের জোতদার সনাতন ঘোষালের ছেলের কাল থেকে রক্তবমি সুরু হয়েছে—ডাক্তার বাবুকে এখুনি সেখানে যেতে হ'বে। পাল্কি তৈরি করে' পাঠিয়েছে—যতো টাকা ভিজিট লাগুক্, সনাতন পেছপা নয়।

খবরটা পেয়ে সত্যব্রত লাফিয়ে উঠলো। তারপর কলমের ডগায় যা এলো ঝট্ পট্ প্রেসক্রপ্‌শান লিখে হাতের রুগীগুলোকে বিদায় করে', ষ্টেথিস্কোপ্‌টাকে মালার মতো গলায় ঝুলিয়ে পর্দা সরিয়ে সোজা শোবার ঘরে এসে ঢুকলো। বীণার হাতে যখন কাজ থাকে না তখন সে টেবিল গুছোয়, নয় ট্রাঙ্ক থেকে তার শাড়ির স্তূপ বার করে ফের ভাঁজ করতে বসে। ঘর সাজাতে পারলে তার আর কিছু চাইনে।

সত্যব্রত ব্যস্ত হ'য়ে বল্লে,—একটা জরুরি কল্ পেলাম—এক্ষুনি বেরুতে হ'বে। সেই পীরপুর—ফিরতে কোন্ না দুপুর বারোটা হ'বে! প্র্যাকটিস্ প্রায় জমিয়ে ফেলেছি—কী বলো?

বীণা ঠোঁট কুঁচকে বল্‌লে,—কিন্তু এদিকে আমি মরছি শুকিয়ে। আমার ত' কোন চিকিৎসাই হচ্ছে না দেখছি—

তাড়াতাড়ি তাকে দুই বাহুর মধ্যে ধরতে যেতেই বীণা পালিয়ে গেল, মুচকে হেসে বল্‌লে,—থাক্। কিন্তু এত টাকা করে' তুমি কী করবে?

—টাকা লোকে কেন করে?

—আরামের জন্য। সকাল আটটায় বেরিয়ে সাত সাত চোদ্দ মাইল মাঠ যদি চষতে হয় তবে আরাম কোনখানটায়? আর আমি বেচারা জান্‌লা দিয়ে কাঠ-ফাটা রোদ্দুরের দিকে চেয়ে থেকে-থেকে চোখ দুটো ক্ষয় করে' ফেলি। একটা কেউ কোথাও নেই যে দু' দণ্ড সময় কাটাই—তুমি যেন কী!

বলে'ই স্বামীর প্রসারিত বাহুর কামনা থেকে সে ফের ছুটে পালায়।

তবু স্বামীকে সে নিশ্চয় আঁচলের খুঁটে বেঁধে রাখতে চায় না। যা তিনি রোজগার করে' আনবেন তা ও-ই হাত পেতে নেবে, বাক্সে সাজিয়ে রাখবে, প্রতিটি পয়সা হিসেব করে' খরচ করবে,—স্বামীর উপার্জ্জনের উপর ওর অসীম কর্ত্তৃত্ব। অবাধ স্বাধীনতা। গরিব বাপের বাড়িতে একটি পয়সা নিয়েও ও নাড়া-চাড়া করতে পায় নি।

সত্যব্রত পাল্কিতে গিয়ে উঠলো—সঙ্গে ব্যাগভরা ওষুধ, যন্ত্রপাতি। মুখোমুখি বস্‌লো এসে সনাতনের মুহুরি। বেয়ারারা কনুই দুলিয়ে-দুলিয়ে হুম্ হুম্ করতে করতে বেরিয়ে গেলো।

বীণার চোখে জান্‌লার ওপারে নির্জ্জন ফাঁকা মাঠ রৌদ্রে ঝিম্ ঝিম্ করছে। আকাশ ভরে বিরহের সুন্দর শূন্যতা। ডানা মেলে একটা শঙ্খচিল উড়ে চলেছে—তার ওড়ার অশ্রুত শব্দে আকাশের স্তব্ধতা আরো মন্থর হ'য়ে এলো।

কাজ অবশ্যি তার অনেক—পাশের সাব-রেজিষ্ট্রার বাবুর বাড়িতে গেলেই সে কথা কয়ে' গল্প ছাড়তে পারে। নতুন সে-উপন্যাসটা এখনো তার শেষ হয় নি, সেটাও পড়তে পারে অনায়াসে। চিঠি লিখবার আর লোক নেই—এইটেই মস্ত অসুবিধে। স্বামী যখন প্রথমটায় বিদেশ থাকতেন চাকরির খোঁজে, তখন চিঠি লিখে লিখে নিঃশব্দ দুপুর ও অতন্দ্র রাত্রি সে তার অশ্রুসিক্ত কোমল দৃষ্টির মন্ত্রে করুণ

করে' তুল্‌ত—ত্বপুর এখন অতিমাত্রায় রুক্ষ, রাত্রি সর্ব্বাঙ্গ-পরিপূর্ণ পুরুষ স্পর্শের মতো স্পন্দনময়! সে-লাবণ্যটি আর নেই। তার জন্যে সে সংসার গুটিয়ে বাপের বাড়ির বনবাসে যেতে চায় না।

শ্বশুর-ঠাকুর তাদের সঙ্গে বাড়ির খোদ ঠাকুর ও ভুটিয়া চাকর দিয়ে দিয়েছেন। তারা এত বেশি কর্ম্মঠ ও কুশলী যে বীণাকে রাত্রি-দিন ভরে' খালি ত্বঃসহ আলস্য ভোগ করতে হয়। খালি জান্‌লা দিয়ে চেয়ে থাকো—কখন তিনি আসবেন, আর যখন উনি এলেন তখন সব সময় কান খাড়া করে' থাকো—কখন আবার রুগীর ডাক আসে! বিকেলে মাঠেও সে একটু স্বামীর সঙ্গে বেড়াতে পারে না, কোন্ রুগী নাকি সময় বুঝে আকাশ-অন্তরালের অন্ধকারে বেড়াতে চলেছে! সামনে কোথায় নাকি একটা পাহাড়ে নদী আছে—বীণার চোখের মতো কালো তার জলের রঙ, সাম্পানে করে' সেখানেও তার আজ অবধি বেড়ানো হ'ল না।

অগত্যা বীণা স্নান করতে গেল। বেড়া দিয়ে ঘেরা পুকুরে নেমে সে গায়ের কাপড় খুলে রাজহংসের মত সাঁতার কাটছে। কলমী-লতাটির মত শ্যামল তার গায়ের রঙ, সাবানের মতো নরম আর পাথরের থালার মতো ঠাণ্ডা! জলে সাঁতার কাটতে কাটতে সর্ব্বাঙ্গে তার লীলার বন্যা, মুহূর্ত্তে-মুহূর্ত্তে রেখার ঢেউ!

তারপর—স্নান ত' সে করলো, চুল আঁচড়ে' সিঁথিতে সিঁত্বর দিলে, মুখে পাউডার ঘষলে, ঘোমটা খসিয়ে পিঠময় চুল ছড়িয়ে সে বসলো এসে স্বামীর বসবার ঘরে। জান্‌লা তুটো বন্ধ করে' দিলো—জান্‌লা ছুঁয়েই রাস্তা। সামনের দরজাটা অবশ্যি খোলা—পথের খানিকটা মাত্র আভাস আসে। বসে' বসে' সে পড়তে লাগলো কালকের রাতের উপন্যাসটা নয়—মোটা ডাক্তারি একটা বই—ছবিগুলিই অবশ্যি বীণার কাছে ইন্‌টারেষ্টিং লাগছে।

ঠাকুর জিগগেস করে' গেল এখুনি সে খেয়ে নেবে কি না। বেলা আগুনের মতো বেড়ে চলেছে।

ঠাকুরের কথা শোন একবার! বীণা বল্লে,—তোমরা খেয়ে নাও গে। আমাদের ভাত হাঁড়ির মধ্যে থাক্‌, উনি ফিরলে পরে বেড়ে নেব'খন।

কিন্তু ফিরবার ওঁর নাম নেই।

এত টাকা নিয়ে উনি করবেন কী! একটিবার কোথাও যে বেড়াতে যাবেন ওকে নিয়ে সেদিকে বিন্দুমাত্র উৎসাহ নেই। বলেন, রুগী দিতে পারো সেখানে, নিয়ে যাচ্ছি। অন্তত ট্রেন আর হোটেল-ভাড়াটাও ত' উঠে আসা চাই। বিনে পয়সার ছুটি নিলে চলবে কেন?

অথচ বীণার এই ক্লান্তিকর দীর্ঘ ছুটির সমাপ্তি নেই।

বারোটা কখন বেজে গেছে! বাইরে তাকান যায় না, চোখে কান্না জড়িয়ে আসে। স্বামীর ফিরতে তবু দেরি হচ্ছে বলে' ডাক্তারি ছবিগুলো অতিমাত্রায় অর্থহীন হ'য়ে ওঠে।

কাগজে-ব্লটিংএ টেবিলটা একাকার হ'য়ে আছে—তাই বরং গুছোনো যাক্‌! এমনি সময় ঠিক চলন্ত একটা মোটরের ব্রেইক্‌-কসার মতো—খুব জোরে ছুটতে গিয়ে আচম্‌কা থেমে যাবার মতো—একটি যুবক খোলা দরজা দিয়ে ঠিক বীণার টেবিলটার সামনে হুড়মুড় করে' পড়লো। পড়েই সে সামলে নিলে। বলা-কহা নেই দরজাটা দিলে সে বন্ধ করে'।

মুহূর্ত্তে বীণার গায়ের রক্ত জল হ'য়ে গেলো, টুঁটি চেপে ধরে' কে যেন তার গলার স্বর বন্ধ করে' দিয়েছে। চেয়ার ছেড়ে উঠে পর্য্যন্ত সে দাঁড়াতে পারলো না। পা তুটোর আর কোনো চেতনা নেই।

যুবকটি তাড়াতাড়ি ফিরে বিনয়-স্নিগ্ধ হাসিতে মুখ কমনীয় করে আন্‌লে—তারপর হাত তুলে বীণাকে নমস্কার করে বল্লে—দরজাটা বন্ধ করে' দিলাম বলে' ভয় পাচ্ছেন? ভীষণ গরম হাওয়া,—ধুলো উড়ছে—বলেন ত' এই খুলে দিচ্ছি।

বলে' দরজা খোলবার সামান্যতম চেষ্টাও না করে' সে অনায়াসে একটা চেয়ারে পরম আরামে বীণার মুখোমুখি বসলো।

চোখ তুলে পরিপূর্ণ করে' বীণা এবার আগন্তুকের দিকে চাইতে পারছে। মাথার চুল রুক্ষ, পরণের কাপড়-

জামা ঘামে-ময়লায় অপরিচ্ছন্ন, পায়ের স্যাণ্ডেলের ষ্ট্রাপ একটা ছেঁড়া, এক হাঁটু ধুলো। চেয়ারে বসে' কাপড়ের কোঁচায় নির্ব্বিবাদে গলার ও জামা সরিয়ে বুকের খানিকটার ঘাম মুছছে। চওড়া কপালের নীচে দুটো প্রকাণ্ড গর্ত্তের ভেতর থেকে দু'টো আগুনের ঢেলা জলন্ত দৃষ্টির স্ফুলিঙ্গ বিকীর্ণ করছে। ঝড়ের মতো এখুনিই যেন সব কেড়ে-কুড়ে দলে-পিষে লণ্ডভণ্ড করে' একাকার দেবে। তার ঐ দুই চোখে সে এই দুপুরের সমস্ত রোদ জমা করে এনেছে। স্নান করে' উঠেও বীণার সর্ব্ব শরীরে ঘাম দিল।

তবু বীণা সাহস সঞ্চয় করে' প্রশ্ন করলো—কী চান এখানে?

যুবকটি নির্লিপ্তের মতো হাস্‌লে, ডান হাতটা মুখের কাছে তুলে একটা ভঙ্গি করে' বললে,—এক গ্লাশ জল খেতে পারি। রোদে সবটা একেবারে শুকিয়ে গেছে।

এইবার চোখ থেকে ভয়ের কুয়াসা কাটিয়ে বীণা প্রকৃতিস্থের মতো লোকটার দিকে চাইতে পারছে। তারও চোখের দৃষ্টি কেমন মেঘে আচ্ছন্ন হ'য়ে এলো। বীণা তাড়াতাড়ি উৎসুক কণ্ঠে বল্‌লে,—তুমি রতন, না?

যুবকটি হেসে তার দক্ষিণ তর্জ্জনীটি মুদ্রিত ওষ্ঠাধরের উপর রেখে একটা ভঙ্গি করে' বল্‌লে,—চুপ। রতন নই, রাজেন। আর তুমি ত' বীণা—তা আমি আগে থেকেই জানি।

পরে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বললে,—ছুটে এখানে যখন এলাম, তখন আমার কেন-জানি আগে থেকেই মনে হয়েছিলো কোনো আত্মীয়ের দেখা পাবো। ভাগ্য ভালো, বীণা, নইলে এ-রোদে কি জল পাবার আশা রাখি?

পরে ঘরের চারিদিকে দেয়ালে-মেঝেয়, টেবিলে-আলমারিতে, বীণার সারা দেহের উপরে চকিতে চোখ বুলিয়ে রাজেন বল্‌লে,—তা তুমি এখানেই আছ,—বিয়ে হয়েছে,বেশ! স্বামীটি বুঝি ডাক্তার! কই, জল আনলে না।

বীণা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো, আম্‌তা-আম্‌তা করে' বল্‌লে,—তুমি ত' রতন, রাজেন কী বল্‌ছ?

রাজেন শিশুর মতো হেসে উঠলো, বল্‌লে—নামেতে কী আসে-যায়! একটা কিছু বলে' চিন্‌তে পারলেই ত' হ'ল! নাই বা কিছু হলাম—তাই বলে' কি এক গ্লাশ জল পাবো না তোমার কাছে?

বীণার তবু স্বস্তি হ'ল না, চেয়ারের পিঠটা ধরে সামান্য একটু ঝুঁকে পড়ে' শুধোল: তুমি সেই হরকুমার বাবুর ছেলে, না? আমাদের বাড়ীর পাশে যিনি থাকতেন, মোক্তার ছিলেন—

—একেবারে বাপের নাম ধরে' টানাটানি সুরু করলে যে! বাপের নাম কি আর মনে আছে নাকি—বাপের নাম কবে ভুলিয়ে ছেড়েছে। বাড়ীর পাশে থাকাটাই বুঝি বড়ো কথা, তোমার পাশে এসে যে বসেছি সেইটে বুঝি কিছু নয়! বিয়ে করে'ও তোমার বিশেষ কিছু উন্নতি হয়নি দেখছি।

—তবু—বীণা কী যে বলবে কিছু ভেবে পেলে না।

রাজেন বল্‌লে,—তোমার স্বামী বাড়ি আছেন নাকি? তাঁর নামে আমার যেমন ইণ্টারেষ্ট নেই, তেমনি আমার নামেও তাঁর কৌতূহল থাকা উচিত নয়। কী বলো? তোমার যা ইচ্ছা তাই বলে আমার পরিচয় দিয়ো। যখন চিনতে একবার পেরেছ তখন রতনই হই আর রাজেনই হই, কিছু আসে যায় না। কী নাম—রতন! আমাকে তুমি হাসিয়ো না বলছি। অনেক দিন হাসবার অভ্যেস নেই, হাসতে গেলে ভেতরটা কেমন-যেন ব্যথা করে উঠে।

দেখতে-দেখতে সে-মুখ কেমন ভারি হ'য়ে উঠলো। মুখের সে-ভাব না-কাটিয়েই রাজেন বল্‌লে,—জল দেবে না এক গ্লাশ?

—আন্‌ছি। বীণা ভেতরে চলে' গেলো।

কাঁচের গ্লাশে করে, কুঁজোর ঠাণ্ডা জল এনে সে হাত বাড়িয়ে দিলে। বীণার আঙুল ক'টি বাঁচিয়ে রাজেন গ্লাশটা তুলে এক ঢোঁকেই সবটা খেয়ে ফেল্‌লে, গলায় হাত বুলিয়ে বললে,—গলাটা একেবারে কাঠ হ'য়ে ছিলো। কিন্তু বীণা, আমি এমনি লোভী যে এক-গ্লাশ জল পেয়ে একেবারে এক-পুকুর জল

চেয়ে বসেছি। তোমাদের এখানে স্নান করতে পাবো?

বীণা এতক্ষণে অনেকটা সামলে নিয়েছে। বল্‌লে, —পাবে, কিন্তু কোত্থেকে তুমি আসছ আগে বলো।

—আসছি অনেক দূর থেকে। তার আগে দরজটা খুলি।

—না, না, ভীষণ গরম হাওয়া—ও থাক্ বন্ধ। বলো, তোমার এমন দুর্দ্দশা কেন?

হেসে রাজেন বল্‌লে,—দুর্দ্দশা কই? এই জামা কাপড় দেখে বলছ? এ আবার একটা দুর্দ্দশা নাকি? পিপাসায় জল পেলাম, স্নান করতে পাচ্ছি—তুমি বলো কী বীণা? সব বলবো। স্নান করে, খেতে বসে' সব বলবো তোমাকে।

একটু থেমে বীণার মুখের দিকে চেয়ে সে বল্‌লে' —তোমার স্বামী নিশ্চয়ই বাড়ী নেই। তাঁর ভাতটাই আমি খেতে পারবো, তাকে পরে না-হয় রেঁধে দিয়ো।

সামান্য লজ্জিত হ'য়ে বীণা বললে,—তার জন্যে তোমার ভাবতে হ'বে না। আমরা কেউ এখনো খাইনি।

—তা হ'লে আর দেরি করে' লাভ নেই। রাজেন উঠে দাঁড়ালো। গল্প করবার সময় পরে ঢের পাওয়া যাবে—কী বলো? খেয়ে-দেয়েই ত এক্ষুনি পালাচ্ছি নে।

অভিভূতের মত বীণা রাজেনের দিকে তাকালো। সহজে সে এখন চোখ তুলে তাকাতে পারছে যা-হোক্। রাজেনের মুখ-চোখের সেই রুক্ষ উগ্র অসহিষ্ণু ভাবটা—যে-ভাবটা তার ক্লিষ্ট মুখের শীর্ণ ক্ষুধিত রেখায় ছুরির ফলার মতো স্পষ্ট হ'য়ে এসেছিলো—আস্তে-আস্তে কখন জুড়িয়ে এসেছে। এখন তার মুখের দিকে চাইলে চোখ ভয়ে বা ঘৃণায় আহত হয় না, অতি সহজে চাওয়া যাচ্ছে বলে' বরং লজ্জায় কুণ্ঠিত হ'য়ে আসে।

রাজেন বল্‌লে, তার আগে দাড়িটা কমিয়ে নিলে হ'ত। তোমার স্বামীর কামাবার সরঞ্জামগুলো নিয়ে এসো না—হ্যাঁ, জানি, অনেকে অন্যেরটা দিয়ে কামাতে পছন্দ করে না, কিন্তু কী করব বলো, ভিক্ষুকের চাল কাঁড়া না-কাঁড়া ভাববার অধিকার কী।

কথাটা বলে'ই সে হেসে ফেল্‌লে। বল্‌লে,—তোমাকে আমি বিপদে ফেলছি নাকি?—

না, এ আবার বিপদ কিসের! ভেতরের ঘরে এসো—জিনিস পত্র টেবিলের উপর সব গোছানো আছে।

রাজেন বীণাদের শোবার ঘরে এসে উপস্থিত হ'ল। চারিদিকে চোখ বুলিয়ে ঢোঁক গিলে সে বললে,—শোবার তোমাদের এই একখানাই ঘর নাকি? আমাকে তবে কোথায় বিছানা করে' দেবে?

আম্‌তা-আম্‌তা করে' বীণা বল্‌লে,—ও-পাশে আরেকখানা ঘর আছে। তোমার ভাবনা নেই—আমি চাকরটাকে দিয়ে ততক্ষণে ঘরটা সাফ করে' ফেলছি। বলে' সে অদৃশ্য হ'ল।

দেয়ালের গায়ে প্রকাণ্ড আয়না ঝুলছে—অতি ধীরে, সন্তর্পণে, প্রিয়জনের মৃত মুখ দেখতে এগিয়ে আসার মতো স্তব্ধ পায়ে, রাজেন আয়নার দিকে অগ্রসর হ'তে লাগলো। এখুনি সেখানে তার মুখের ছায়া পড়বে। নিজের মুখ যে তার কেমন তা সে মনেই করতে পারে না। আয়নায় সে-মুখ যে তারই নিজের প্রতিবিম্ব এ-সম্বন্ধেও তার বিশ্বাস নেই! এই দুপুর-গরমেও একটা শীতের কাঁপুনি সূক্ষ্ম সূঁচের ডগার মতো তার মেরুদণ্ড ভেদ করে' মাথার মধ্যে উঠে গেল!

না,—এ তারই মুখ বৈ কি, শীতের ঝরা পাতার মতো পাণ্ডুর, বিবর্ণ। সেই বিবর্ণতা গাঢ় হতাশার, মৃত্যুকে যারা ব্যর্থ বলে' ভাবে সেই অমানুষিক দুর্ব্বলতার। নিজের জন্য নিজেরই তার ভারি মায়া করতে লাগলো। সে হঠাৎ এমন গম্ভীর ও কমনীয় হ'য়ে উঠলো কেন? তার মুখ দেখতে এখনো সুকুমার, ঠোঁট দুটি পাৎলা—যে-কথা উচ্চারিত হয় তার পেছনে অর্দ্ধেক থাকে সঙ্কেত, দৃঢ় চোয়ালে দুর্দ্দমনীয় ব্যক্তিত্বের আভাস—যে ব্যক্তিত্ব জোর করে' জাহির করতে হয় না, তার দৃষ্টির তীক্ষ্ণতায় সে ব্যক্তিত্ব উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে। এখনো এই মুখ দেখে মেয়েরা প্রেমে পড়তে পারে। কিন্তু বিষাদের ভাণ করতে গেলেই সে-মুখের দৃঢ়তা ফিকে হ'য়ে আসবে—এবং কোমলতাই হচ্ছে প্রেমের পরিপন্থী। অথচ, আয়নায় নিজের মুখের দিকে তাকিয়ে বিষণ্ণ না হ'য়েই বা তার উপায় কী!

দাড়ি-কামানো সেরে গালে হাত বুলিয়ে রাজেন বললে,—এখন তেমন মন্দ দেখাচ্ছে না—কী বলো!

বীণা না বলে' পারলে না—মন্দ আবার তুমি কবে দেখতে ছিলে!

—এখনো তেমনি সুন্দর আছি নাকি? হ'বে। বলে' রাজেন আয়নায় ফের মুখ দেখলে। কপালের কর্কশ কুটিল রেখা, শীর্ণ গাল, শুকনো ঠোঁট, কোটর থেকে ঠিকরে পড়া জলন্ত চোখ দুটোর ক্ষুধা—কিছুই বীণার চোখে পড়েনি। মেয়েরা কি তলিয়ে কিছু দেখতে পারে? কিন্তু,—রাজেন চোখ কচলে আয়নায় আবার তাকালো —অজানতে কখন তার নিজেকেই সুন্দর বলে' মনে হচ্ছে। এখনো সময় যায় নি।

সময় যায় নি! সে বীণার দিকে চোখ ফেরাতেই দেখতে পেলো হাতে তেলের শিশি, সাবান স্পঞ্জ তোয়ালে, কাপড়, গেঞ্জি—এক রাশ জিনিস নিয়ে হাজির। বললে, —সাঁতার কাটতে জানো ত'? না, তোলা জলে স্নান করবে?

—পুকুরে নামলে যদি ডুবে যাই! অত সহজে মরতে চাই নে।

স্নান সেরে রাজেন একেবারে ভদ্রলোক বনে' গেল। বীণা হেসে বললে,—তুমি রতন না হ'য়েই যাও না।

রাজেন হেসে বললে,—রতনেই রতন চেনে—কী বল? কিন্তু তোমার স্বামীর এইসব জামা-কাপড় যে আমার গায়ে চাপালে—ভদ্রলোক যদি কিছু মনে করেন? আমাকে কি এ-সবে মানায়? তোমার কি মত?

—আমার মত হচ্ছে এখন খেতে চলো।

খেতে বসে' রাজেন বললে,—তুমিও ও-পাশে আসন পেতে বসে' যাও না—

বীণা বললে,—না, আমার এখনো খিদে পায়নি, উনি আগে ফিরুন।

—ও! আমার সে-কথা মনেই ছিলো না। আমার মনে হচ্ছিল এ-বাড়িতে আমরা ছাড়া আর কেউ নেই। কথাটা মনে করিয়ে দিয়ে ভালো করেছ। বলে' বড়-বড় হাঁ করে' সে ভাত গিলতে লাগলো।

খেয়ে, আঁচিয়ে, পান চিবোতে-চিবোতে তৃপ্ত প্রফুল্ল মুখে রাজেন আয়নার সামনে এসে দাঁড়ালো। সত্যি-কারের সে কোথায় চাপা পড়ে' গেছে—কিম্বা কে জানে এই তার সত্যিকারের চেহারা কি না।

হঠাৎ তার মনে হ'ল, বহুদিন আগেকার আর-আর দিনের মতো সে দুপুর বেলায় কলেজ করতে যাচ্ছে—সে-সব দিনের কোথাও এতটুকু পরিবর্ত্তন হয় নি। কলেজ যেতে রাস্তার ধারের দোতলা বাড়ির জানালায় চকিতে যে একটি অপরিচিতা মেয়ে দেখা যেত—বীণা যেন সেই মেয়েটির মতোই বহু দূরের মেয়ে।

পাশের ঘরে বীণা বিছানা করে রেখেছে—শিয়রে টুলের উপর কাঁচের গ্লাশে জল আর রূপোর ডিবেয় পান। সাবানের ফেনার মতো নরম বিছানার মধ্যে ডুবে গিয়ে রাজেন বললে,—তুমি এখন কী করবে?

অসঙ্কোচে বীণা বললে,—এই চেয়ারটায় খানিক বসছি—তোমার গল্প শুনি এবার। খুব গরম হচ্ছে কী! একটা পাখা এনে দি।

একটা পাখা নিয়ে এসে গায়ের উপর আস্তে-আস্তে চালাতে-চালাতে বীণা রাজেনের গল্প শুনতে বসে।

এবং তখুনিই রোদে তেতে-পুড়ে সত্যব্রত ভেতরের বারান্দায় এসে পড়েছে। ফাঁসির আসামীকে ফাঁসি কাঠে চড়াবার আগে যদি দেখা যায় যে সে ভয়ে আগে থেকেই মরে' আছে তখন আবিষ্কর্ত্তার মুখের যে-চেহারা হয় রাজেনের মুখ তেমনি সাদা হ'য়ে গেলো। আর, দ্বিরুক্তি না করে পাখাটা হাত থেকে ফেলে রেখে বীণা স্বামীর কাছে ছুটে এলো।

সত্যব্রতকে মুখ ফুটে কিছু প্রশ্ন করতে হলো না।

বীণা বললে,—ও আমাদের দেশের চেনা—হরকুমার বাবু মোক্তার ছিলেন, তার ছেলে। খুঁজে-বুনে সম্পর্কও ও একটা বা'র করা যায়। বাপ ত মোক্তারি' করে' বিস্তর টাকা জমিয়েছে,—ছেলে নাকি তার একটি পয়সাও ছোঁয় নি, বাপের সঙ্গে ঝগড়া করে' সন্ন্যাসী সেজে বেরিয়ে পড়েছে। খিদের জ্বালা আর সইতে না পেরে শেষকালে

হঠাৎ এখেনে এসে হাজির। আমি ত' অবাক। প্রথম ত' ভালো করে' চিনতেই পারলাম না।

সত্যব্রত নিঃশব্দ গাম্ভীর্য্যে টাই-কলার খুলতে থাকে।

বীণা তাড়াতাড়ি স্বামীর জুতো-শুদ্ধ পা দুটো কোলের কাছে টেনে এনে জুতোর ফিতে খুলতে-খুলতে হেসে বল্লে,—সবাই অমনি সন্ন্যেসি সাজে! তুমিও ত' একবার সন্ন্যেসি সাজবে বলেছিলে।

সত্যব্রত নির্লিপ্ত কণ্ঠে বললে,—সাজলেও খিদে মেটাবার জন্যে দুপুর বুঝে গৃহস্থ বাড়িতে ঢুকে ককখনো বিছানায় গড়াগড়ি দিতাম না। স্কাউণ্ড্রেল!

বীণার আঙুল ক'টি অসাড় হয়ে এলো। স্বর নামিয়ে বললে,—ছি! কী বলছ তুমি যা-তা। শুনতে পাবে যে—

যাতে না শোনে দরজাটা গিয়ে বন্ধ করে এসো।

বীণা অপ্রতিভ হ'য়ে বললে,—রোদে মাথা তোমার গরম হয়ে উঠেছে দেখচি।

মুখ ভেঙচে সত্যব্রত বললে—না, মাথাটি গলে' বরফ হ'য়ে যাবে। আমার বাড়িটা কি একটা সন্ন্যেসির ডেরা নাকি? নধর বাবুটি সেজে মোলায়েম বিছানায় শুয়ে খোস মেজাজে হাই তুলবেন!

—তুমি দস্তুরমতো অভদ্র হচ্ছ দেখছি। কোথায় এর মধ্যে দোষটা আছে শুনি? বুঝিয়ে দাও আমাকে। একজন পরিচিত দূর-সম্পর্কের আত্মীয় ভদ্রলোক যদি অভুক্ত অবস্থায় এসে দু'টো খেতে চায় তাকে তাড়িয়ে দিতে হ'বে? মানুষ মেরে-মেরে তুমি না-হয় কসাই হয়েছ, কিন্তু অমন বুনোর মতো আমি কথা বলতে পারি না।

সত্যব্রত একটানে কোটটা খুলে ফেলে বল্লে,—তবে যাও ও-ঘরে, পাখার হাওয়া করোগে—এখানে এসেছ কেন?

বীণার মুখের ওপর কে যেন সপাং করে' চাবুক মারলে, হঠাৎ তার চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে এলো।

সত্যব্রতের গলার স্বর খানিকটা নরম হ'লো, বল্লে,—কবে যাবে বল্লে?

মুখ ঝাম্‌টা দিয়ে বীণা বলে' উঠলো,—তুমি নিজে গিয়ে জিগগেস করতে পারো না?

—আবার জিগগেস করতে হ'বে নাকি? সোজা ঘাড় ধরে' বাড়ির বা'র করে দেব। এবং তা এখুনিই। বলে সত্যব্রত রাজেনের ঘরের দিকে অগ্রসর হলো।

প্রাণপণে চোখ বুজে, মুখাভাস ধ্যানলীন বুদ্ধের মুখের মতো সৌম্য প্রশান্ত করে' রাজেন তার সমস্ত চেতনা স্তিমিত করে আনলে।

পেছন থেকে বাধা দিয়ে বীণা বললে,—ছি, এখন বলবে কী! এখন একটুখানি উনি ঘুমুচ্ছেন—কত দিন নাকি চোখে এক ফোঁটা ঘুম আসে নি। বিকেলে বরং বলো। এটুকু সময় আর সবুর করতে পারো না?

সত্যব্রত থমকে দাঁড়ালো। চাপা ক্রুর কণ্ঠে শুধু বল্‌ল,—হুঁ!

বিকেলে মেহেরখালি থেকে এক কল্ এসে হাজির —কিন্তু ঐ অভ্যাগতকে তাড়িয়ে তবে সত্যব্রতর অন্য কাজ। ঐ লোকটা তাদের জীবনের অবারিত প্রবাহের মাঝে একটা কুৎসিত ছন্দোহানি—কয়েক ঘণ্টায়ই সে সত্যব্রতর শারীর-প্রক্রিয়ায় অনেক সব বিকৃতি ঘটিয়েছে। রুগী ফেলে রেখে সত্যব্রত সোজা রাজেনের ঘরে ঢুকলো। বীণা ম্লান মুখে ঘরের কাজকর্ম্ম করে' যেতে লাগলো, কিন্তু কান রইলো সজাগ হ'য়ে।

রাজেন বিছানায় চুপ করে' বসে' আছে।

সত্যব্রত ঘরে ঢুকতেই রাজেন হাত তুলে নমস্কার করে' বল্লে—আসুন। আরো আগে আপনার দেখা পাবো ভেবেছিলাম।

সত্যব্রত রুক্ষস্বরে বললে,—দেখা পাবার এত কী দরকার!

একটুও কুণ্ঠিত না হ'য়ে রাজেন বল্লে,—আপনি ডাক্তার, আপনি ছাড়া কে আর দেখবে বলুন।

অবাক হ'য়ে সত্যব্রত বল্লে,—কেন, কী হয়েছে?

বিরস গলায় রাজেন বল্লে,—সমস্ত গায়ে ব্যথা, মাথাটা ছিঁড়ে পড়ছে, দেখুন গায়ে হাত দিয়ে—একেবারে দাউ-দাউ করে' জলছে। কী করা যায় বলুন তো?

—বলেন কি?

সত্যব্রত বিছানার এক পাশে ব'সে রাজেনের

জামা তুলে গায়ে হাত দিয়ে নাড়ী পরীক্ষা করলে। বললে,—বসে' আছেন কেন? শুয়ে পড়ুন। শীত করছে নাকি? দাঁড়ান্ ষ্টেথিস্কোপটা নিয়ে আসি।

দরজার কাছেই বীণার সঙ্গে দেখা। সত্যব্রত বললে,—মোটা একটা-কিছু চাদর ওকে গায়ে দিতে দাও, ভীষণ জ্বর এসে গেছে। পড়া গেলো হাঙ্গামে—ঠিকানা জেনে বাপকে টেলি করে' দাও একটা।

ম্লান হ'য়ে বীণা জিগ্‌গেস করলো,—অসুখ খুব কঠিন নাকি?

—নাই বা হ'ল কঠিন। পরের ঝক্কি মাথা পেতে নিতে কার এমন সাধ হয়? বাপ এসে নিয়ে যাক্।

তবু ভালো। স্বামী তা হ'লে অতিথিকে আর তাড়াতে পারলেন না—অতিথিকে রুগ্ন জেনে তাঁর গৃহস্থ-চিত্তের সঙ্কীর্ণতা মানবহিতৈষীর মহাপ্রাণতার কাছে পরাভূত হয়েছে।

বীণা বললে,—কল-এ গেলে না?

—না, তোমাকে নিয়ে আজ একটু বেড়াতে যাবো ভাবছি।

কথাটায় দস্তুরমতো চমক আছে। বীণাকে বেড়াতে নিয়ে যাবে বলে' নয়, রুগীর আহ্বান উপেক্ষা করলো বলে'। তবু এর কারণটা যেন বীণার দৃষ্টি এড়ালো না। কল-এ চলে' গেলে বীণা কোন্ না চুপি-চুপি রাজেনের শিয়রে গিয়ে বস্‌বে, আর শিয়রে গিয়ে বসলে তার জ্বরো কপালে কোন্ না হাত রাখবে! ভাবতেই সত্যব্রতর সমস্ত স্নায়ু-শিরা কেঁচোর মতো কিল্‌বিল্ করে' উঠলো।

তবু বাইরে স্ফূর্তির ভাণ না করে' বীণার উপায় ছিলো না।

সত্যব্রত নিচু গলায় বল্‌লে,—কিন্তু আমাদের শোবার ঘরটা তালা দিয়ে বন্ধ করে' যেতে হ'বে।

বীণা মানেটা বুঝতে পারলো না, বল্‌লে,—কেন?

—কেন কী! কোথাকার কে লোক—যদি এই ফাঁকে সব চুরি করে' চম্পট দেয়! বলা যায় না তো। দেখতে ত' একটা 'লোফার্!'

কথাটা বীণার অসহ্য লাগলো, ঝাঁজালো গলায় বল্‌লে,—তোমার কত সম্পত্তি আছে যা চুরি করবার জন্যে ওঁর ঘুম হচ্ছে না। তোমার মতো পঞ্চাশটা ডাক্তারকে ও কিনতে পারে।

স্ত্রীর কথায় কান না পেতে সত্যব্রত দরজায় তালা লাগালো, চাকরকে হুকুম দিয়ে গেল ঘরের দিকে কড়া নিজর রাখতে।

বীণা বল্‌লে,—তা হ'লে আমি যাবো না।

মুখ কুটিল করে' সত্যব্রত বললে,—অন্তত এ-সম্পত্তিটি ত' আমি নিজের জিম্মাতেই রাখি। লড়াই ত' অন্তত করতে হ'বে। অগত্যা বীণা আর প্রতিবাদ করতে পারে না। বলে,—রুগী ছেড়ে হঠাৎ তোমার এ কী সখ হলো আজ?

সত্যব্রত উদাসীনের মতো বল্‌লে,—সন্নেসি না সাজলে কি আমাদের একটুও সৌখিন হ'তে নেই?

পর দিন সকালে রুগী দেখতে না বেরলেই নয়। যাবার সময় সত্যব্রত বলে' গেলো ঘরে ঢুকে ওকে যেন বিরক্ত করো না, দেখো। হার্টের অবস্থা ভালো নয় বিশেষ। ও এখন যতো চুপ করে' থাকতে পারে ততই ভালো। ওষুধ পথ্য যা দরকার আমি ফিরে এসেই খাওয়াতে পারবো, বুঝলে? ততক্ষণ তুমি আমার জন্যে ছুটো ফতুয়া সেলাই করে' রেখো—ঘরে লং-ক্লথ ত' আছেই।

সত্যব্রত বেরিয়ে গেলো। এতক্ষণে রাজেন ছুটি পেলো, এতক্ষণে তার জ্বর নেমেছে!

ডাকলে,—বীণা।

বীণা যেন তার ডাকের জন্যে প্রস্তুত ছিলো। তাড়াতাড়ি তার ঘরে গিয়ে বল্‌লে,—এখন আছ কেমন?

—খুব ভালো আছি।

—ভালো আছ কী। বীণা তার কপালে হাত রেখে বল্‌লে,—গা যে তোমার পুড়ে' যাচ্ছে। জ্বরটা সকালেও নামলো না।

হেসে রাজেন বল্‌লে,—তুমিও দেখছি তোমার স্বামীর মতো মাতব্বর ডাক্তার হ'য়ে উঠেছ। জ্বর

নামে নি কী! গায়ে কি-রকম ঘাম দিয়েছে দেখতে পাচ্ছ! আমি ভাবছিলাম তুমি পাশে বসে' আজো আমাকে চারটি ভাত খাওয়াবে।

বীণা বল্‌লে,—পাগল আর-কি!

—তবে এক গ্লাস্ জল খাওয়াও না-হয়—

—তেষ্টা পেয়েছে? তা এনে দিচ্ছি।

বীণা জল নিয়ে এলো। আঙুল ক'টি বাঁচিয়ে রাজেন জলের গ্লাশটা গ্রহণ করলে।

বীণা বল্‌লে,—তোমার বাড়িতে একটা খবর পাঠাই। আমাদের এখানে কি আর তেমন সেবা-শুশ্রূষা হ'বে?

—নাই বা হ'ল।

—পরের ছেলেকে এমনি করে' মরতে দিতে পারি নাকি?

হেসে রাজেন বল্‌লে,—পারো না? আশ্চর্য্য ত'! কিন্তু তুমি দাঁড়িয়ে রইলে কেন? বোস না।

পাশে বসে' বীণা বল্‌লে,—খুব কষ্ট হচ্ছে? মাথাটা টিপে দেব?

—না। খুব ভালো আছি।

—তবু দিই না।

—তুমি আমার মাথায় হাত রাখলেই বরং কষ্ট হ'বে।

বীণা দুঃখিত হ'য়ে বল্‌লে,—তবে ঠিকানা দাও, তোমার বউকেই বরং আসতে লিখে দিই।

শুকনো শীর্ণ মুখে হাসি ভেসে উঠলো। রাজেন বল্‌লে,—বউ? বিয়ে একটা করলে মন্দ হ'ত না। তা হ'লে বউর জন্যে উদ্বেগ না করে এমনি বিছানায়ই শুয়ে থাকতে পারতাম। কী বলো?

—কিন্তু তুমি কোথায় যাচ্ছিলে বলো দিকি?

—কোথায় আবার যাবো? মরতে যাচ্ছিলাম।

—মরতে? বীণা চমকে উঠলো।

হেসে রাজেন বললে,—পৃথিবীতে কে না মরতে চলেছে? তুমি অত অবাক হচ্ছ কেন?

বীণা ব্যস্ত হ'য়ে বললে—উনি ফিরুন, আজই আমি তোমার বাড়িতে টেলি করে' দেব।

—তার এখনো দেরি আছে।

বলে' চোখ বুজে রাজেন আস্তে আস্তে নিশ্বাস টানতে লাগলো।

ভয় পেয়ে বীণা মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে' ডাকলে —রতন-দা!

রাজেন চোক চেয়ে হাসলে, বল্‌লে,—আমাকে তোমার রতন-দাই বলে' মনে হয় নাকি? ভালো করে' চেয়ে দেখ তো।

বীণা বল্‌লে,—নিশ্চয়।

—রতনদা বলে'ই যদি নিশ্চিন্ত হও, আমার আপত্তি কী! কিন্তু কাউকে যেন বলো না রতন বলে এখানে কেউ এসেছে। যদি কেউ নেহাৎ জিগগেস করে, বলো রাজেন না কে রাজমোহন বলে' একজন এসেছিলো।

—রাজেন বুঝি তোমার ভালো নাম? আমার একদম্ মনে পড়ছে না।

—হ্যাঁ, বাইরের লোককে কি ডাক-নাম বলতে আছে? এটা গোপনে ডাকবার নাম—কী বলো?

—কিন্তু তুমি এখন চুপ করলে পারো। তোমার হার্ট নাকি দুর্ব্বল।

—হোক দুর্ব্বল, তবু এত সহজে মরতে এসেছি বলে কি তোমার মনে হয়? সে তুমি চট্ করে বুঝবে না—সত্যব্রত বাবুর ফেরবার বুঝি সময় হ'ল?

অপ্রস্তুত হয়ে বীণা বল্‌লে,—না, না, আমি বসছি তোমার কাছে। তোমার বার্লি এনে দেব? খিদে পায় নি?

রাজেন হেসে বললে—না, উনি আগে ফিরুন।

কিন্তু,—সত্যব্রত অনেক দিন বাঁচবে,—বলা মাত্রই সে চলে এসেছে। মোটকথা কলে সে আজ মোটে বেরোয়ই নি,—রাস্তায় এমনি একটু পাইচারি করে অকস্মাৎ বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়েছে।

ঢুকে পড়েই তার চক্ষু স্থির।

নির্লজ্জের মতো স্ত্রীকে সে মুখের ওপর ধমক দিয়ে উঠলো—এই তুমি আমার ফতুয়া সেলাই করছ?

বীণা নীরবে রাজেনের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে স্বামীর শোবার ঘরে ঢুকলো। তেজী গলায় বল্‌লে,—

বাড়ীতে এমন একজন রুগী, আর আমি বসে' সেলাইর কল্ চালাবো ?

—কিন্তু দিব্যি দেখছি রুগীর সঙ্গে বক্‌বক্ করছ। তোমাকে বারণ করে' দিয়ে গেলাম না ?

কিন্তু জল চাইলে এক গ্লাশ জলও আমি দিতে পারবো না নাকি ? সাত জন্মে এমন কথা ত' কোনোদিন শুনি নি।

—ঠাণ্ডা জল দিয়েছ ত' ? সত্যব্রত মুখ-চোখ কঠিন করে' বল্‌লে,—সব তাতে তুমি কেন ফোঁপর দালালি করতে আস। তুমি ডাক্তারির বোঝ কী !

ঠোঁট উল্‌টে বীণা বল্‌লে,—তুমিও ছাইয়ের ডাক্তার। তুমি বলছ রুগীর অবস্থা খারাপ, আর রুগী ও দিকে দিব্যি চাঙ্গা হ'য়ে কথা কইছে।

—চাঙ্গা ওকে কে করলে ? আমার ওষুধ, না আর কারুর ? বলে' সত্যব্রত রাজেনের ঘরে ঢুকে সৌজন্যের কিছুমাত্র ভণিতা না করে' বল্‌লে,—কেমন আছেন এখন ?

প্রশ্নটা শুনে রাজেন বিস্মিত হ'ল। সকালে উঠে বেরবার আগেই সত্যব্রত একবার তাকে পরীক্ষা করে' গেছে। আবার এখুনি তার কী দরকার হ'তে পারে ঠিক বুঝতে না পেরে রাজেন বল্‌লে,—বেশ ভালই আছি।

—ভালো যখন আছেন তখন আস্তে-সুস্থে বেরিয়ে পড়ুন মশাই। বেশি ভালো থাকা এখেনে আর চলবে না। বলে'ই সত্যব্রত বাইরের ঘরে রুগীর গন্ধ পে'য় তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেলো।

বীণা দাঁত দিয়ে ঠোঁটের একটা প্রান্ত একটু কামড়ে মুখের ভাবকে তার পক্ষে যতদূর সম্ভব হিংস্র করে' তুললে। স্বামী অন্তর্হিত হ'তেই বীণা কোনোদিকে না তাকিয়ে সোজা রাজেনের ঘরে এলো। তার কপালে হাত রেখে বল্‌লে,—আমি, বীণা। ভয় নেই, তোমাকে তাড়িয়ে দিতে আসি নি। বলতে এলাম, তোমার বালি এবার নিয়ে আসবো ?

রাজেন বল্‌লে,—ডাক্তারবাবু যখন বলবেন তখনই নিয়ে এলে চলবে।

—কিন্তু তুমি যেন রাগ করে' বেরিয়ে যেয়ো না।

—বেরোতে গেলেই ত' তুমি দু' হাত বাড়িয়ে ধরে' ফেলবে। মুখের কথা বললেই ত' আর বেরুনো যায় না।

—নিশ্চয় না। বাড়ি ত' খালি একমাত্র আমার স্বামীর নয়,—আমারো। আমার কথায়ই বা থাকবে না কেন ! আমি বলছি—তুমি থাকো। যদ্দিন না ভালো হও।

—নিশ্চয়। রাজেন হেসে বল্‌লে,—ভোটের সংখ্যা দু পক্ষেই সমান, আমার কাস্‌টিং ভোট দিয়ে তোমাকে জিতিয়ে দিলাম। কিন্তু যদ্দিন না ভালো হই—মনে থাকে যেন।

সামান্য অপ্রতিভ হ'য়ে বীণা বল্‌লে,—ভালো তুমি শিগগিরই হ'বে।

—বা, ভালো ত' আমি এখনই হয়েছি। আমার জন্যে তোমার ভাবনা হয় নাকি ?

—তা হয় না ?

—কেন হয় ?

—ধরো তোমার বাড়িতে গিয়ে যদি আমার অসুখ হ'ত, তোমার ভাবনা হ'ত না। আমার সেবা করতে না ? বলে বীণা রাজেনের কপালের ওপর থেকে লম্বা চুলগুলি তুলে তুলে কানের পিঠের কাছে গুঁজতে লাগলো।

পেছনে কার ছায়া পড়েছে। পড়ুক। বীণা একটিবার চেয়েও দেখবে না। তার সমস্ত মন বলছে, রুগীর সেবা করার মধ্যে কোথাও এতটুকু অপরাধ নেই। তবু পেছন ফিরে স্বামীকে সে বল্‌লে, বালি এখন খেতে দেব নাকি ?

—তা তুমিই জানো। তুমিই ত এখন বড়ো ডাক্তার। বলে' সত্যব্রত শোবার ঘরে গিয়ে একটা চেয়ারে ধপ্ করে' বসে' পড়লো।

রাজেন বল্‌লে,—তুমি এখন যাও,—স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করতে নেই।

—আমি কোথায় ওঁর সঙ্গে ঝগড়া করতে গেলাম। তুমি ত' স্বকর্ণে সবই শুনতে পাচ্ছ। বল ত' কার দোষ ?

রাজেন হেসে বল্‌লে,—তোমাদের ঝগড়ায় আমাকে সালিশ মানছ নাকি ?

—হ্যাঁ, ক্ষেতি কী!

দোষ তোমারই। অচেনা লোককে তুমি কেন সেবা করবে!

—হ্যাঁ, তুমি আমার অচেনা বৈ কি। চুপ করো দিকি দয়া করে। পুরুষ হয়ে পক্ষপাতিত্ব তুমি করবে না? জানি না তোমাদের?

—জানো না কি?

আজ্ঞে হ্যাঁ, যাই বলো, আমি যাচ্ছি না।

দুপুরে তুমুল কাণ্ড ঘটে গেলো যা-হোক্। সত্যব্রত যতো স্ত্রীকে শাসন করতে আসে ততোই সে মুখের ওপর কথা ছুঁড়ে মারে—জিহ্বার বল্গা আর কেউ টেনে রাখতে পারে না—পরস্পরের উপর কথার তীব্র কশাঘাত চলতে থাকে। সত্যব্রত তার স্ত্রীকে দুর্ব্বল চরিত্র বলে গাল দেয়, আর বীণা স্বামীর চিত্তদারিদ্র্য থেকে নৈতিক অধোগতির সিদ্ধান্ত করে' তাতে যে কিছুই ভুল হয়নি তা সপ্রমাণ করবার জন্য কণ্ঠস্বরকে অতিরিক্ত স্পষ্ট করে তোলে।

বাড়িতে নেহাৎই একটা অপরিচিত লোক রোগ শয্যায় পড়ে আছে, নইলে সত্যব্রত স্ত্রীর গায়ে দস্তুরমতো হাত তুলতো। ঈর্ষায় তার গায়ের রক্ত জলন্ত অঙ্গারের কণার মতো তাকে দগ্ধ করছে। আরেকটু হলে সে রাগের মাথায় বীণার টুঁটিটাই হয়তো টিপে ধরত।

আর রতন-দা যদি অমনি অসুস্থ হয়ে পড়ে না থাকতেন, তবে বীণাই বা এমনি চুপ করে থাকতো নাকি? দস্তুর মতো রতন-দার হাত ধরে বলতো আমাকে এখান থেকে নিয়ে চলো। হ্যাঁ, বলতো বৈ কি,—মুখ দিয়ে অনায়াসে বার হয়ে আসতো—রতন-দা ওকে তখন সঙ্গে করে নিতেন বা না নিতেন! বলতে ত আর বাধ্‌তো না।

বিকেলের সঙ্গে সঙ্গে ঝগড়ার ঝাঁজটা জুড়িয়ে এলো- এবং রাত্রিতে সত্যব্রত ও বীণা একই শয্যা গ্রহণ করলে। অভিমানের কুয়াসাটা কাটিয়ে উঠতে দেরি হ'ল না। তারপর দুজনই পড়লো ঘুমিয়ে।

কিন্তু মাঝরাতে বীণার ঘুম ভেঙ্গে গেলো। মনে হলো পাশের ঘরে কে যেন চাপা গলায় আর্ত্তনাদ করছে। কার সে-আর্ত্তনাদ বীণার বুঝতে আর দেরি হলো না। তাড়াতাড়ি লণ্ঠনটা সে জ্বালিয়ে টিপি টিপি পা ফেলে পাশের ঘরে চলে এলো।

পাশের ঘরে কেউ কোথাও নেই। বিছানাটা শূন্য। সেদিনের কাপড় জামাগুলি ফেলে রেখে নিজের সেই ময়লা জামা কাপড় পরেই রাজেন রাতের অন্ধকারে কোথায় চলে গেছে।

তবু নীচু হয়ে বীণা অবুঝের মতো তক্তপোষের তলাটা খুঁজতে লাগলো।

পেছন থেকে ভারি গলায় সত্যব্রত বল্‌লে,—ও বুঝি ঐখানে গিয়ে লুকোল?

স্বামীকে দেখে বীণা ঝর ঝর করে কেঁদে ফেল্‌লে। বল্‌লে,—রতন-দা কোথায় চলে গেছেন।

—সত্যব্রত কর্কশ গলায় বল্‌লে,—কী করে টের পেলে শুনি?

—এমনি একবার এসেছিলাম স্বপ্নের মধ্যে তার গোঙানি শুনে। ভাবলাম যন্ত্রণা খুব বেড়ে গেছে হয় ত? কিন্তু এসে দেখি ঘরে তিনি নেই। তুমি অমন ভাবে আমার দিকে চেয়ে আছ কেন সত্যি একবার খোঁজ করে দেখ না—কোথায় গেলেন! এই অসুখ—এক গা জ্বর নিয়ে—

সত্যব্রত শুধু বল্‌লে,—হুঁ! দাও দিকি লণ্ঠনটা।

বলে ঘরের আনাচ-কানাচ সে খুঁজতে লাগ্‌লো? বল্‌লে,—ব্যাটা এখেনেই কোথায় লুকিয়ে আছে? বলেই হাঁক পাড়লে ভিখন!

ভিখন্ এক লাঠি নিয়ে এসে হাজির?

কিন্তু না-ঘরে না-বাইরে—রাজেনকে কোথাও খুজে পাওয়া গেলো না?

তিন দিন পরে বাঙলা দৈনিক খবরের কাগজখানা বীণারই হাতে পড়লো আগে। সত্যব্রত ঘুম থেকে উঠেই শাম্পানে করে' বেরিয়েছে। খবরের কাগজ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়া ছাড়া বীণার আর কাজ কই?

একটা খবরে এসে তার দুই চোখ সহসা আট্‌কে গেল। লাইন ঠেলে আর সে এগোতে পারলো না। নামটা স্পষ্ট লেখা—মনে-মনে বীণা বানান করে' পড়ে' নিলো, ভুল নেই—ঠিক, জান্‌লা দিয়ে বাইরে একবার চেয়ে আবার কাগজের ওপর দৃষ্টি ফিরিয়ে আনলে—ঠিক,—শ্রীরাজেন্দ্র ভূষণ বসু—হর কুমার বাবুরা বসুই তো ঠিক? হ্যাঁ, যতদূর তার মনে পড়ে। বাবা তাঁকে হর্‌কো বোস্ বলেই ত' ঠাট্টা করে' ডাকতেন। পত্রিকা ভুল নাম লিখতে যাবে কেন? তাদের স্বার্থ কী! বীণা হেড-লাইন ছেড়ে নিচে নামলে। হ্যাঁ,—রাজেন্দ্র ভূষণ—কী, কী করেছে? খুন করেছে। খুন করে' এতদিন পালিয়ে বেড়াচ্ছিলো। বীণা আবার থামলে, চোখে সে কিছু দেখতে পাচ্ছে না। রাজেন সত্যিই চলে' গেছে এ-সত্য যখন সাব্যস্ত হ'ল তখন স্বামী ট্রাঙ্ক-বাক্স উল্‌টে-পাল্‌টে তছনছ করে' দেখছিলেন কিছু সে সরিয়ে নিয়েছে কি না। না, কারুর কিছু চুরি করেনি,—খুন করেছে। খুন করে' এত দিন সে নানা জায়গায় পালিয়ে বেড়াচ্ছিল। সম্প্রতি সে ধরা পড়েছে। ধরা যখন পড়ে তখন তার গায়ে একশো চার ডিগ্রি জর—পেছনে তাড়া করলে সে পালাবার একটুও চেষ্টা করে নি। জর?—বীণা তার ডান হাতখানি নিজের কপালের ওপর এনে রাখলো! তার কপাল বরফের মত ঠাণ্ডা—মাথা যেন চিন্তার ভার বইতে পারছে না। কাকে খুন করলো? কবে? বীণা খবরের কাগজের ওপর ঝুঁকে পড়লো। খুন করেছে এক স্ত্রীলোককে—প্রায় দিন পনেরো আগে। স্ত্রীলোকের স্বামীও সেদিন তার ঘাড়ের ওপর হাত রেখে ছিলো—আর একটু চাপ দিলেই সে মরে যেতো। কে সে স্ত্রীলোক? চোখ মেলে মনে-মনে বীণা বানান করে' পড়তে লাগলো—সে স্ত্রীলোকটি চরিত্রহীনা।

দূর করে' কাগজটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বীণা উঠে দাঁড়ালো। যতো সব আজগুবি মিথ্যা কথার কারবার করে' কাগজগুলো ব্যবসা ফাঁপায়। ঘৃণায় বীণা কাগজটাকে একটা লাথি মারলে।

কিন্তু কে জানে খবরটা ওঁর চোখে পড়তে পারে! বীণা তাড়াতাড়ি কাগজটা কুড়িয়ে নিয়ে ফের পড়লে। পড়ে' কুটি-কুটি করে ছিঁড়ে উনুনে ফেলে দিয়ে এলো।

বাঙালা-দেশে রাজেন্দ্র ভূষণ বলে' লোকের আর অভাব নেই। কিন্তু নিশ্চয়ই এ তার রতন-দাদা নয়। কাগজটা পুড়ে ফেলে সে ভালোই করেছে, নইলে স্বামীর চোখে পড়লে তিনি এ থেকে প্রকাণ্ড এক মহাভারত ফাঁপিয়ে তুলতেন। কান পেতে বীণা তার রতন-দার সেই কলঙ্ক কথা শুনতে পারতো না।

আশীর্ব্বাদ

শ্রীঅমলা দেবী

দিবস ঢেকেছে মুখ কাজল আঁচরে
বৃন্ত হ'তে পুষ্প দল ধূলা কোলে ঘরে।
শ্যামল কানন হ'তে মর্ম্মরিয়া আসে
উদাস বাতাস খানি ক্লান্ত দীর্ঘশ্বাসে।
সারাটি গগন মাঝে শ্যামাচল খানি
দিয়েছে ছড়ায়ে। আজ ভাষাহারা বাণী
উতলা বাতাস সাথে বার বার আসি
কি কথা বলিয়া যায় কলকণ্ঠে হাসি।
শ্যামল আঁচল খানি করি খান খান
চকিতে চমকি মোরে করিছে আহ্বান।
বার বার ডেকে যায়। এস এস আজি
হে নির্ব্বাক, চির মুগ্ধ নব বেশে সাজি।
জীবনের রৌদ্র দগ্ধ তপস্যার শেষে
এল কি আশীষ তব শ্রাবণের বেশে!

পরাধীন দ্বীপসাম্রাজ্য

শ্রীসুধাংশু কুমার মিত্র, বি-এস সি

আমাদের যা একান্ত প্রয়োজন তার অতিরিক্ত কিছু পেতে হলে অপরের হরণ করতে হবে এটা একান্ত স্বাভাবিক! পৃথিবীতে আকাঙ্ক্ষা মেটাবার জিনিষের পরিমাণ সমানই আছে। সেজন্য কোন বিশেষ শ্রেণীকে তার ন্যায্য পাওনার উপর পেতে হলেই অপরের জিনিষে হাত দিতে হয়। ফলে দুর্ব্বলের ওপর বলবানের অমানুষিক অত্যাচার পৃথিবীতে একটা প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এই ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ ১৫৬৯ খৃষ্টাব্দে প্রথম য়ুরোপীয় শাসনাধীনে আসে! সেই সময় য়ুরোপীয় জাতিদের মধ্যে স্পেনিস্‌রা সবচেয়ে বলবান ছিল। এরা ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের রত্নসম্ভারে লুব্ধ হয়ে দেশটাকে দখল করে। তারপর ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে স্পেন ও আমেরিকার সন্ধি অনুসারে, এই দ্বীপপুঞ্জ আমেরিকার অধীনে আসে!

ফিলিপাইন বাসীরা দেশীয় প্রথায় রস বাহির করিতেছে।

পাশ্চাত্য জগতের যন্ত্র-তান্ত্রিক সভ্যতার খোরাক যোগাতে অনেক দুর্ব্বল, প্রাচ্য-জাতিকে স্বাধীনতা হারাতে হয়েছে। এদেরই এক হতভাগ্য দেশের কথাই আলোচনার বিষয়।

জগতে বৃটীশ সাম্রাজ্যই সবচেয়ে বড়। বৃটীশ সাম্রাজ্যের মধ্যে যেমন ভারতবর্ষ, আফ্রিকা, ক্যানাডা প্রভৃতি দেশ বর্ত্তমান সেই রকম আমেরিকার যুক্ত-প্রদেশের অধীনেও এক বিশাল সাম্রাজ্য আছে। এই সাম্রাজ্যের নাম ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ।

অনেক ঐতিহাসিকের মতে স্পেনের শাসনাধীনে থাকা কালীন ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের অবস্থা খুব উন্নত ছিল না। সেই সময় জাহাজ জাহাজ মাল রপ্তানি করা হত বিদেশে!

কিন্তু ও দেশের কোন উন্নতি করবার চেষ্টা বা তারাও যাতে বাণিজ্যে উন্নতি করতে পারে তারও চেষ্টা করা হত না। ফিলিপাইবাসীরা প্রায়ই গরীব ছিল—স্পেন গভর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য শোষণ সর্ব্বভাবে সার্থক হয়েছিল।

ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে আগ্নেয়গিরির প্রাদুর্ভাব খুব বেশী। সেজন্য ঘনঘন ভূমিকম্প হয়। এই কারণে এখানকার ঘরদোরে বিশেষত্ব আছে। আবার এর ক্ষতি পূরণ স্বরূপ ভগবান কত যোগাড় করে দিয়েছেন। ওখানকার কাঠ ও মাটি খুব ভাল, ফিলিপাইনে ৪০,০০০ বর্গ মাইল জুড়িয়া বন আছে। তাতে অসংখ্য দামী গাছ আছে।

ফিলিপাইনের আবহাওয়া যে পরিমাণে গরম হওয়া উচিত সেরকম কিন্তু নয়, কারণ সাগরবেষ্টিত দ্বীপপুঞ্জ সমুদ্রের শীতল হওয়ার কিছু ঠাণ্ডা থাকে। রোমান ক্যাথোলিক! এছাড়াও চীন, জাপান ও স্পেন দেশীয় লোক সংখ্যাও নেহাৎ কম নয়। একদেশে এইরূপ বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী ও মতাবলম্বী লোকদের বাস থাকলেই যেরকম মারামারি লাঠালাঠি বাধা স্বাভাবিক এদেশেও সেই স্বাভাবিকতাটা বেশ বজায় ছিল!

অনেকদিন এক সঙ্গে বসবাস করার ফলে আজকাল চীনা ও অন্যান্য জাতীয়দের সঙ্গে ফিলিপাইন দেশীয় ছেলে-মেয়ের বিবাহ হতে আরম্ভ করেছে। এতে আশা করা যায় কিছুকাল পরে মারামারির কারণ কমে আসবে। সম্প্রতি নিখিল
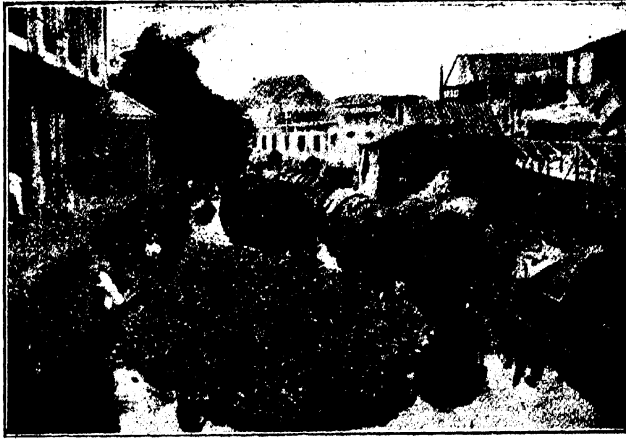
হাজার হাজার নারিকেল এই রকমভাবে নদী ও নৌকার সাহায্যে বিদেশে রপ্তানি হয়।

স্পেন সরকারের শাসনকালে ঐদেশে ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য ব্যাধির প্রকোপ ছিল। কিন্তু এখন যতদূর জানা যায় সেই অবস্থার শতকরা ৯০ ভাগ উন্নতি হয়েছে আমেরিকানদের হাতে গিয়ে! এখন ফিলিপাইন দ্বীপে আধুনিক বৈজ্ঞানিক নিয়মানুসারে খালবিল পুকুর খনন করা হয়েছে।

ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে লোকসংখ্যা এক কোটীর কিছু কম। তার মধ্যে বেশীর ভাগই খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী খৃষ্টানদের মধ্যে আবার দু'শ্রেণী আছে—একদল প্রোটেসটেণ্ট ও একদল রোমান ক্যাথলিক। এরা ভারত মহিলা সভায় প্রশ্ন উঠেছিল Inter-communal marriage। তার সুফলের মধ্যে দেখান হয়েছিল যে এই সব সামাজিক নিয়ম প্রবর্ত্তনের পর হিন্দু-মুসলমানের মারামারি আর তেমন হবে না। এই ধারণাটা কতটা সত্য এটা এদের মধ্যে দিয়েই কিছুদিনের মধ্যে প্রমাণিত হবে।

ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে নারীদের মধ্যে আবরুর বালাই নেই। কিন্তু আজকালকার পাশ্চাত্য রীতি অনুযায়ী ধরতে হলে ওদের নেহাৎ বে-আবরু বলা চলে। ওদের সাজপোষাকের জন্য মেয়েদের অনেক টাকা

খরচ হয়। মেয়েদের মধ্যে গয়না পরবার সখ অবশ্য সব জাতির মধ্যেই সমান। তবুও ভাল ভাল সোনা রূপোর গহনা পরার সখ ওদের ঠিক আমাদের দেশের মাড়োয়ারীদের মতন !

ফিলিপাইন দম্পতি

আর্নল্ড রাইট নামে একজন পণ্ডিত বলেন—"ফিলিপাইনদের আত্মসংযমের তুলনা হয় না। ইহারা সচরাচর অমায়িক মানুষ। ইহারা দয়ালু, বিনয়ী ও কার্য্যশীল। য়ুরোপীয় পর্য্যটক সকল এদের কাছে ভাল ব্যবহার পায়। এদের মধ্যে জাতি-বিচারের কোন বালাই নেই! ইহারা অতিথি-সৎকার পরায়ণ এমন কি অনেকের ঘর সকল রকম অতিথির জন্য সব সময় খোলা থাকে।"

আর একজন পণ্ডিত বলেন—"এই জাতিটা সঙ্গীতপ্রিয়। প্রত্যেক পাড়ায় গান-বাজনার একটা দল আছেই আছে ও ঘরে ঘরে বীণা বা পিয়ানো নিশ্চয়ই পাওয়া যায়। স্বভাবত ইহারা নাট্যকলার প্রতি বেশী আগ্রহান্বিত।

ফিলিপাইন দেশে ভদ্র যুবতীরা

ফিলিপাইনদের মাতৃভাষা বিশেষ উন্নত বলে মনে হয় না। সম্প্রতি শোনা যাচ্ছে এমন কি যে তাদের মাতৃভাষার লোপ ঘটেছে। "তাগালোগ" নামে একটা ভাষা কতক লোক ব্যবহার করে। এতে তাদের কেবলমাত্র কথা-বার্ত্তা হয়। এই ভাষা লিখবার জন্য কোন বর্ণমালার অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। ফিলিপাইনবাসীরা সকলেই একটু একটু ইংরাজি ভাষা লিখতে পারে। স্পেন সরকারের অধীনে থাকা কালীন যদি বা একটু তাদের ভাষার ব্যবহার ছিল যুক্তরাষ্ট্র সরকারের অধীনে সেটুকুও লোপ পেয়েছে। তখন থেকে ইংরাজি ভাষায় ব্যবহার ক্রমেই

বেড়ে চলেছে। "বিজয়" (visonya) নামে একটি ভাষা উন্নত সম্প্রদায়ের মধ্যে চলিত আছে বলে শুনা যায়।

ফিলিপাইন দেশে অপরাধের শাস্তি

ফিলিপাইনে "মিনপালাও" নামে একশ্রেণীর লোক আছে। তারা ভয়ানক তেজী ও স্বদেশপ্রিয় বলে শুনা যায়। এরাও এই "বিজয়" ভাষা ব্যবহার করে। স্বদেশের উন্নতি সাধনে যতগুলো ফিলিপাইন বীর-পুরুষদের নাম পাওয়া যায় তার মধ্যে শতকরা ৯০টী এই শ্রেণী হতে আসে। সেজন্য শাসক সম্প্রদায়ের চোখে সম্প্রদায়টী বিশেষ সুনজরে নেই এটা বলা'ই বাহুল্য। পরাধীন দেশে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি, শ্রেণী বা জাতির অস্তিত্ব কোনমতে শাসক সম্প্রদায় সহ্য করতে রাজি নয়। এই স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রম কোন পরাধীন দেশে হয়েছে বলে জানা যায় না।

ফিলিপাইন দ্বীপমালা শক্তিমান জাতিগুলির সকলের আদরের সম্পত্তি হবার কারণ হল ঐ প্রদেশের স্বাভাবিক উৎপাদিকা শক্তি। সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে যেসব দেশে নারিকেল প্রচুর পরিমাণে জন্মায়—তার মধ্যে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ হল একটী, বৎসরে অন্তত ৩৬৭,০০০,০০০ তামাক ও ৫,১০০,০০০,০০০ চুরুট সেখান থেকে বিদেশে রপ্তানি হয়। যুদ্ধের সময় যে সবদেশ নারিকেলের ব্যবসা করত তাদের অসুবিধা হওয়ায় ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে এই ব্যবসার বিশেষ রূপ উন্নতি লক্ষিত হয়। দিন দিন নারিকেল ব্যবসা বেশ

অপরাধের আর এক রকম

লাভজনক ব্যবসায় পরিণত হচ্ছে। এক এক বছরে সময় সময় ১০০,০০০ টন নারিকেল তেলও প্রস্তুত হয়েছে। ১৯১৮ সালের শেষ ভাগ পর্য্যন্ত কারখানার সংখ্যা প্রায় ১,১০০ এ দাঁড়িয়েছিল। এদেশে অন্যান্য উৎপন্নের অংশও নেহাৎ কম নয়। ১৯১৮ সালে এদেশে ৫৬৬ টন কোকো ও ৭২১ টন কফি উৎপন্ন হয়েছিল।

এখানে চিনি, কাপড়, চুরুট প্রভৃতির কারখানা আছে।

ফিলিপাইনদের ভিতর শিক্ষিতের সংখ্যা নেহাৎ কম নয়। অনেকে বলেন, এদের বোধশক্তিও খুব তীক্ষ্ণ। এরা কলকব্জা ও হাতের কাজ খুব শীঘ্র আয়ত্ত করতে পারে। এই কাজে তাদের একটা ভগবানদত্ত বুদ্ধি

মহিষের গাড়ি

আছে। দেশ শাসনে অনেক কর্ম্মচারী দেশী লোক। কিন্তু শিক্ষা বিভাগ ফিরিঙ্গিদের একচেটে।

রেল রাস্তা প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে ফিলিপাইনে দেশের খনিজ পদার্থের বিশেষ উন্নতি হয়েছে। যেখানে যেখানে খনিজ পদার্থ বর্ত্তমান সে সব দেশে গিয়ে ঐ সব জিনিষ নিয়ে আসা নিয়ে যাওয়ার অনেক সুবিধা হয়েছে! এই খনিজ ব্যবসা বিদেশীর হাতে। এখানে অজস্র রকমের খনিজ পদার্থ পাওয়া যায় যেমন, লোহা, সোনা, রূপা, তামা, পেতল, ইত্যাদি। এসবেসটস, মারবেল পাথরের ব্যবসাদিতেও আমেরিকার ধনিগণ অজস্র টাকা ব্যয় করেছে। এই প্রসঙ্গে একজন

বিলের উপর ফিলিপাইন দেশের একটী গ্রাম

বিশেষজ্ঞ বলেন—"ফিলিপাইনরা স্বায়ত্বশাসন পেয়েও যদিও না এই খনিজ দ্রব্য ব্যবসায়টী হাতে পায় তাহলে এদের স্বায়ত্বশাসন পাওয়ার কোন অর্থ বা সার্থকতা নেই।

তারা চায় স্বায়ত্ব শাসনের কায়া ছায়া নয়।

ভ্রম :—গত সংখ্যার এমিল জেনিংস্ প্রবন্ধে লেখকের নাম ছিলনা, লেখাটি ধীরেন্দ্র লাল ধরের।

"আজ্ঞে আপনার গরীব দুঃখীর প্রতি অসীম দয়া—শুনেই আপনার কাছে এসেছি—এই বন্যা সাহায্য ভাণ্ডারে—কিছু দেবেন কি ?

"নিশ্চই ! এই নাও—এই হাজার টাকার চেক্ দিলুম।"

"আপনি মহৎ ব্যক্তি—কিন্তু মাফ্ কর্ব্বেন—চেকে নাম সই কর্ত্তে ভুলে গেছেন।"

"সে আমি জেনে শুনেই করিনি—বুঝেছ—লোককে দান কর্ব্ব—আর ঢাক পিটে বেড়াব—তা আমি কর্ত্তে চাইনা—নাম কেনার জন্য দান করা আমি পছন্দ করিনা !—আমি অজ্ঞাতভাবেই দান করে থাকি—সেই জন্য নাম সই করিনি —বুঝেছ ?—

শ্রীবিনয় কৃষ্ণ বসু

বিধবা পত্নীর প্রতি

শ্রীজগদীশ গুপ্ত

তোমাতে আমাতে ছিল ভালবাসাবাসি।
বাসা নিছি তাই, প্রিয়ে, নিম গাছে আসি'॥

জীবন্ত মন্ত্রের পাঠে হয়েছিল বিয়ে।
সে চির-বন্ধন মৃত্যু কাটিবে কি দিয়ে॥

দিবানিশি চক্ষু'পরে রহিয়াছ তুমি।
শৈশবের খেলা-ঘর প্রিয় জন্মভূমি॥

দক্ষিণা বাতাসে নড়ে তিত নিম-পাতা।
তার মাঝে রহে মোর চক্ষু দু'টি পাতা॥

আহার করিনা বেশী ঘুচিয়াছে ঘুম।
বসিয়া থাকিতে পারি হইয়া নিঝুম॥

পরিশ্রমে দেহে নাহি দেখা দেয় ঘাম
পাইয়াছি সূক্ষ্ম দেহে অনন্ত বিশ্রাম॥

একাসনে বসে' থাকি বৃক্ষটির ডালে।
স্বাস্থ্যকর বায়ু খাই সকালে বিকালে॥

গা ঘেসিয়া বসে কাক রূঢ়স্বরে ডাকে।
কোকিল অখিলপ্রিয়—সে-ও এসে থাকে॥

আমি বসে থাকি একা, নিস্পন্দ নয়ানে।
চাহি তোমাদের এই গৃহস্থালী পানে॥

ঘোরাফেরা করো তুমি এ-ঘর ও-ঘর।
কখন সহাস্য মুখ কখন কাতর॥

যে ভয় করিতে তুমি আমি বিদ্যমানে।
সে ভয় এখনো দেখি আছে তব প্রাণে॥

তখনো গোপন ছিল এখনো গোপন।
আভাসে তা' বুঝা যেত' ক্বচিৎ কখন্॥

স্বামী বিনা রমণীর কে আছে সংসারে।
আশ্রয় ভরসা বল্ সে-ই একাধারে॥

হলেও নিকটাত্মীয়া আত্মীয়বৎসলা।
স্বামী বিনা নারী একা সহজে দুর্ব্বলা॥

প্রাণে তব সদা ভয় দারুণ সংশয়।
পরাশ্রিতা বলি পাছে কটূ কেহ কয়॥

উঠানেতে ঢাকা দে'য়া ছিল মোর শব।
কেঁদে কেঁদে কয়েছিলে যন্ত্রণা যে সব॥

অর্থাৎ এ বৈধব্যেতে কি হবে উপায়।
এ ঘোর আঁধারে পথ দেখা নাহি যায়॥

এখন নিশ্চিন্ত আমি দেখিয়া তোমারে।
পরাধীনা কিন্তু সুখী দাদার সংসারে॥

অর্থাৎ আঁধার আর নাহিক তেমন।
সম্মুখে পেয়েছ পথ—বসন অশন॥

দেখিয়া নিমের ডালে গা দুলাই আমি।
কখন আনন্দ ভরে হই অধোগামী॥

উঠানেতে নেমে আসি জ্যোৎস্নার রেতে।
তোমার নাকের ডাক শুনি কাণ পেতে॥

কভু কও ঘুমঘোরে কথা আধ আধ।
কখনও শুনি তুমি স্বপ্ন দেখে' কাঁদো॥

বিদরে আমার অস্থি মাংসহীন বুক।
ভরিয়া দিয়েছি তোমা' অন্তহীন দুখ॥
আর শুন, মহীনের মন ভাল নয়।
ও-বাড়ীতে যাতায়াত কম যেন হয়॥
পরিশিষ্টে ইচ্ছা মোর করিব প্রকাশ।
কই মাছ ভাজা খেতে বড় অভিলাষ॥
তুমি ত' বিধবা হ'য়ে ছোঁওনা আমিষ।
কায় মনে শুদ্ধাচারে আছে অহর্নিশ॥

তোমার কথার বাধ্য শ্রীমান্ গণেশ।
তার দ্বারা গোপনেতে কাজ হবে বেশ॥
সে যদি সন্ধ্যার পর গাছের তলায়।
গোটা দুই কই ভাজা রোজ রেখে যায়॥
তা হলে আমার বড় হয় উপকার।
শ্রাদ্ধে যাহা দিয়েছিলে নাই তাহা আর॥
দেহ নাই, কিন্তু যথা রয়েছে মমতা।
তেমনি রয়েছে, প্রিয়ে, হজম ক্ষমতা॥
আসি তবে, কথা রেখ'—ভাজা কই মাছ।
তুমি ও গণেশ আর এই নিমগাছ।

প্রবন্ধ-সাহিত্য

কেবলমাত্র বক্তব্য বিষয়ের যুক্তিমূলক বিবৃতিই যে সাহিত্য নহে, একথা বাঙ্গালা গদ্যের শৈশবাবস্থার লেখকগণও বুঝিয়াছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় কেবল কবি ছিলেন না, বর্ত্তমানযুগের সাহিত্য ধারার সূত্রপাত তাঁহার রচনা হইতেই। রামমোহনকে ঠিক সাহিত্যিক বলিয়া না ধরিলে গদ্য-সাহিত্য ঈশ্বর গুপ্তের প্রভাকর হইতেই আরব্ধ। গুপ্তকবি শব্দালঙ্কারের ঘটা ও ছটার দ্বারা সর্ব্ববিধ বক্তব্যকে সাহিত্যে রূপান্তরিত করিতে চাহিতেন। লোকশিক্ষক মহামনীষী অক্ষয় কুমার দত্ত মহাশয় নানা বিষয় লইয়া প্রবন্ধ লিখিতেন, তিনি কোনপ্রকার সাহিত্য সৃষ্টি করেন নাই; কিন্তু তিনিও বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে প্রবন্ধকেও সাহিত্যের পদবীতে উন্নীত করিতে পারা যায় এবং বক্তব্যবিষয় তাহাতে সরস ও অক্ষয় হইয়াই উঠে। তাঁহার 'স্বপ্ন-দর্শন' এই সাহিত্যবুদ্ধির ফল। তাঁহার সময়কার শিক্ষিত-সম্প্রদায় ও শিক্ষণীয় বিষয়গুলি সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। স্বপ্ন-দর্শনের ছলে রূপকের সাহায্যে সে মন্তব্য প্রকাশ করিলে তাহা সরস সাহিত্য হইয়া উঠিবে, অন্ততঃ ইহা তিনি বুঝিয়া ছিলেন। 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' ও 'ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়ের' লেখকের বিচার-প্রবন্ধকে সাহিত্যে রূপদানের ইহাই ইঙ্গিত।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মৌলিক সাহিত্যরচনার প্রয়াস বিশেষ ছিল না। 'সাহিত্য' কাহাকে বলে তাহা তিনিও বেশ বুঝিতেন,—বুঝিতেন বলিয়াই ঈশপের অত্যুৎকৃষ্ট সাহিত্যের অনুবাদ করিয়াছিলেন এবং সংস্কৃত সাহিত্যের দুইখানি উৎকৃষ্ট নাটককে বাংলাগদ্যে রূপদান করিয়াছিলেন। নিজস্ব বক্তব্যকে সাহিত্যে রূপায়িত করিবার প্রবৃত্তি বা অবসর তাঁহার হয় নাই।

সাহিত্য-রচনার জন্যই তাঁহার প্রতিষ্ঠা নহে। ভাষাগঠনের মহাশিল্পী বিদ্যাসাগর ভাষাকে সাহিত্যগঠনের উপযোগী করিয়া গিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

"সৈন্যদলের দ্বারা যুদ্ধ সম্ভব, কেবলমাত্র জনতার দ্বারা নহে। জনতা নিজেকেই নিজে খণ্ডিত প্রতিহত করিতে থাকে, তাহাকে চালনা করাই কঠিন। বিদ্যাসাগর বাংলাগদ্যভাষার উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে সুবিভক্ত, সুবিন্যস্ত, সুপরিচ্ছন্ন এবং সুসংযত করিয়া তাহাকে সহজ গতি এবং কার্য্যকুশলতা দান করিয়াছেন। এখন তাহার দ্বারা, অনেক সেনাপতি ভাবপ্রকাশের কঠিন বাধাসকল পরাহত করিয়া সাহিত্যের নব নব ক্ষেত্র আবিষ্কার ও অধিকার করিয়া লইতে পারেন।"

এযুগের লেখকদের রচনা পড়িলে মনে হয়—তাঁহারা বোধ হয় শব্দাড়ম্বর ও বাক্যের শাব্দিক ঐশ্বর্য্যকে সাহিত্যের প্রধান অঙ্গস্বরূপ মনে করিতেন। সাধারণ চিরপরিচিত সহজ কথাকে সুলভ অলঙ্কারে ভূষিত ও শব্দঘটায় দীর্ঘায়ত করিয়া তাই সাহিত্যের রূপ দিতে প্রয়াস পাইতেন।

কাদম্বরীর অনুবাদক তারাশঙ্করও বিদ্যাসাগরকেই অনুসরণ করিয়াছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র বেশ ভাল করিয়াই বুঝিয়াছিলেন—সরস করিয়া না বলিতে পারিলে কোন বক্তব্যই সাহিত্যের রূপ ধরে না। তিনিই সর্ব্বপ্রথম বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষাকে সাহিত্যের কাজে লাগাইলেন। বঙ্কিমবাবু আপনার সকল বক্তব্য, মন্তব্য ও

সিদ্ধান্তকেই সাহিত্যের রূপ দেন নাই সত্য,—সকল ক্ষেত্রে তাহা সম্ভবও হয় নাই।

বঙ্কিমবাবু তাঁহার বক্তব্যকে নবনব ভঙ্গিতে সরস করিয়া প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার ভঙ্গিগুলির এখানে সামান্য আভাস দিই।

১। কমলাকান্তের দপ্তরের ভঙ্গি। এই ভঙ্গি যেমন সরস তেমনি অপূর্ব্ব। বঙ্গসাহিত্যে কৌতুক-বুদ্ধির (wit) প্রয়োগে রসময়ী ব্যঞ্জনাময়ী ভঙ্গির নবপ্রবর্ত্তন।

২। 'গগন-পর্য্যটনের' ভঙ্গি। বিজ্ঞান-রহস্য, ও বৈজ্ঞানিক ইতিহাসের মত রসলেশশূন্য বিষয়কে সরস করিয়া লিখিবার এই ভঙ্গি বঙ্কিমের প্রবর্ত্তিত।

৩। দুরূহ তত্ত্বকথাকে সরস সাহিত্যের রূপ দেওয়ার জন্য 'গৌরদাস বাবাজীর ভিক্ষার' ঝুলিতে ও ধর্ম্মতত্ত্বে তিনি কথোপকথনের ভঙ্গির প্রবর্ত্তন করিয়াছেন।

৪। রাজনীতি ও সমাজ-তত্ত্ব সম্বন্ধীয় নিবন্ধে কৌতুক রসে হৃদ্য করিয়া বক্তব্যপ্রকাশের ভঙ্গি বঙ্কিমেরই প্রবর্ত্তিত।

৫। বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের উপযুক্ত নিবন্ধকেও তিনি সরস সাহিত্যের রূপ দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। 'বৃষ্টি'-নামক নিবন্ধের উল্লেখ করা যাইতে পারে।

৬। তিনি যে ব্যঙ্গরসাত্মক ভঙ্গিতে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের ভারতবর্ষীয় গবেষণা ও ঐতিহাসিক সত্যাবিষ্কার-চেষ্টার সমালোচনা করিয়াছেন তাহাও সাহিত্যের রূপ ধরিয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাবের পূর্ব্বের গদ্য রচনা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের অভিমত এখানে উল্লেখযোগ্য—

"তখনকার বাংলা গদ্যে সাধু ভাষার অভাব ছিল না, কিন্তু ভাষার চেহারা ফোটে নাই। তখন যাঁহারা মাসিকপত্রে লিখিতেন, তাঁহারা গুরু সাজিয়া লিখিতেন এইজন্য পাঠকদের নিকট আত্মপ্রকাশ করেন নাই।"

বঙ্কিমচন্দ্র যুক্তিপরম্পরাকে প্রাধান্য দিয়া বহু প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। সেগুলিকে আমরা সাহিত্যের পদবীতে স্থান দিতেছি না। যেগুলি তিনি সরস বিচিত্র ও মনোরঞ্জন ভঙ্গিতে লিখিয়াছেন, সেইগুলিকেই আমরা প্রবন্ধসাহিত্যের উৎকৃষ্ট নিদর্শন বলিতেছি। বঙ্কিম চন্দ্রের এই ভঙ্গির সরসতার হেতু তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ কৌতুক-রসিকতা। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—"নির্ম্মল শুভ্রসংযত হাস্য বঙ্কিমই সর্ব্বপ্রথমে বঙ্গ-সাহিত্যে আনয়ন করেন।" হাস্য রসের প্রাবল্য থাকিলেই সাহিত্য হয় না—বঙ্কিমের স্বভাবসিদ্ধ শুভ্রসংযত হাস্যরসই তাঁহার বহু প্রবন্ধকে সাহিত্যের পদবীতে উন্নীত করিয়াছে।

মনে হইতে পারে যে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা নৈয়ায়িক বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত, যুক্তির সাহায্যে সত্যাবিষ্কারই যে কৃষ্ণচরিত্র-লেখকের জীবনব্রত, তাঁহার লেখনীতে হাস্যরসসিক্ত ভঙ্গি কি করিয়া আসে? ইহার উত্তর রবীন্দ্রনাথ দিয়াছেন—"যে পরিষ্কার যুক্তির আলোকের দ্বারা সমস্ত আতিশয্য ও অসঙ্গতি প্রকাশ হইয়া পড়ে হাস্যরস সেই কিরণেরই একটি রশ্মি। কতদূর পর্য্যন্ত গেলে একটি ব্যাপার হাস্যজনক হইয়া উঠে, তাহা সকলে অনুভব করিতে পারে না; কিন্তু যাঁহারা হাস্যরসরসিক তাঁহাদের অন্তঃকরণে একটি বোধশক্তি আছে, যদ্দ্বারা তাঁহারা সকল সময়ে, নিজের না হইলেও, অপরের কথাবার্ত্তা, আচারব্যবহার ও চরিত্রের মধ্যে সুসঙ্গতির সূক্ষ্ম সীমাটুকু সহজে নির্ণয় করিতে পারেন।"

পূর্ব্বে বিশ্বাস ছিল, হাস্যরস, নাটক-কবিতা-উপন্যাসাদি মূলসাহিত্যাঙ্গেরই উপজীব্য। প্রবন্ধরচনায় যে হাস্যরস চলিতে পারে, তাহা বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম দেখান অর্থাৎ শুভ্রসংযত হাস্যরসে অভিষিক্ত করিলে যে সকল বক্তব্যই সাহিত্য হইয়া উঠিতে পারে, তিনি তাহা সর্ব্বপ্রথম আবিষ্কার করেন। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন,—"বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম দৃষ্টান্তের দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে, এই হাস্যজ্যোতির সংস্পর্শে কোন বিষয়ের গভীরতার গৌরব হ্রাস হয় না, কেবল তাহার সৌন্দর্য্য ও রমণীয়তারই বৃদ্ধি হয়, তাহার সর্ব্বাংশের প্রাণ ও গতি যেন সুস্পষ্টরূপে দীপ্যমান হইয়া উঠে। যে বঙ্কিম বঙ্গসাহিত্যের গভীরতা হইতে অশ্রুর উৎস উন্মুক্ত করিয়াছেন, সেই বঙ্কিমই আনন্দের উদয়শিখর হইতে নবজাগ্রত বঙ্গ সাহিত্যের উপর হাস্যের আলোক বিকীর্ণ করিয়া দিয়াছেন।"

সঞ্জীবচন্দ্র তাঁহার পালামৌ-প্রবাসকাহিনী যে ভঙ্গীতে বিবৃত করিয়াছেন—তাহা তাঁহার নিজস্ব। এই ভঙ্গি অভিনব এবং সরসতায় ভরা। সে যুগে এই ভঙ্গির কেহ কল্পনাও করিতে পারেন নাই।

কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধগুলিতে আবেগ, উচ্ছ্বাস ও অনুভূতির মাধুর্য্য যোগ করিয়া সাহিত্যরূপ দিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। ফলে, তাঁহার রচনা অনেক-স্থলে গদ্যকাব্যের মত সরস হইয়া উঠিয়াছে, এই ভঙ্গি অভিনব নয়। বঙ্কিমবাবুর কোন কোন রচনা-তেই এই ভঙ্গি পূর্ব্বেই অনুসৃত হইয়াছে।

চন্দ্রনাথ বাবুর ত্রিধারা গ্রন্থের নিবন্ধগুলিতে ঐ ভঙ্গি বরং অধিকতর সাফল্য লাভ করিয়াছে। অক্ষয় সরকার মহাশয়ের কোন কোন রচনা সম্বন্ধেও এই কথা খাটে।

চন্দ্রশেখর মনোবেগের উচ্ছ্বাসের আবেষ্টনীর মধ্যে তাঁহার বক্তব্যগুলিকে কৌশলে চালাইয়াছেন। উদ্‌ভ্রান্ত-প্রেমের এই কৌশলটি উল্লেখযোগ্য।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন কবি—কিন্তু তাঁহার আশাকাননকে ঠিক কাব্য বলা চলে না। ছন্দে লেখা হইলেও উহা প্রবন্ধ-রচনারই এক প্রকার সরস পদ্ধতিরূপে গণ্য করা যাইতে পারে। অক্ষয়কুমারের 'স্বপ্নদর্শন' হইতেই অবশ্য এ পদ্ধতির সূত্রপাত হইয়াছে।

ভূদেববাবুর নামটি বাদ গেল। বাদ যাইবারই কথা—প্রবন্ধে তিনি যুক্তি-পরম্পরার প্রাধান্যকে ত্যাগ করিতে পারেন নাই—অভিনব ভঙ্গিরও প্রবর্ত্তন করেন নাই—অন্য প্রবর্ত্তিত সরস ভঙ্গির অনুসরণও করেন নাই।

রাজনারায়ণ বসু ও শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় আত্ম-জীবনচরিতে জীবনের কথাগুলি সরস করিয়া বলিবার চেষ্টা করিয়াছেন—কিন্তু নবীনচন্দ্রই এবিষয়ে যথেষ্ট সাফল্য লাভ করিয়াছেন।

তারপর রবীন্দ্রনাথ আসিলেন। প্রবন্ধ রচনায় ইনি অন্য কাহারো ভঙ্গি অনুসরণ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। ইনি আপনার মন্তব্য ও বক্তব্য প্রকাশে নবনব ভঙ্গির প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। চিরপ্রচলিত ভঙ্গিতেও ইনি অভিনবত্ব সম্পাদন করিয়াছেন। সত্যের প্রতিষ্ঠা বা একটা ধ্রুবসিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াই রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে—রসসৃষ্টির দ্বারা সত্যের ইঙ্গিত করা ও পাঠক-চিত্তের চিন্তাপুঞ্জকে আলোড়িত করিয়া তোলাই তাঁহার উদ্দেশ্য। রবীন্দ্রনাথের প্রত্যেক প্রবন্ধটি সরস সাহিত্য, অথচ বিষয়ান্তরের উপাদানে গঠিত ও ব্যঞ্জনায় পরিপূর্ণ—নিঃশেষ করিয়া বক্তব্যকে বলাই লক্ষ্য নয়,—সত্যসন্ধানে আগ্রহসৃষ্টি ও প্রবৃত্তিদানই লক্ষ্য। যে কথাগুলিকে সরস করিয়া বলিতে পারিবেন না, রবীন্দ্রনাথ তাহা বলেন না—সেজন্য বক্তব্যের মাঝে মাঝে ফাঁক থাকিয়া যায়। সেই ফাঁক পূরণ করিবার ভার পাঠকের উপর। পাঠকের বুদ্ধিবিদ্যার প্রতি ইহাতে তাঁহার শ্রদ্ধাই সূচিত হয়। রবীন্দ্রনাথের রচনার প্রত্যেক পংক্তিটি সরস, অলঙ্কৃত ও সুভাবিত—কাব্যেরই সহোদর। সত্যের আবিষ্কারই তাঁহার প্রবন্ধের বড় কথা নহে—সত্যের আনন্দ লাভই বড় কথা, এই ভঙ্গি বঙ্গসাহিত্যে নূতন। কেহ যদি সত্যের আনন্দ উপলব্ধি করিতে না-ও পারেন, রবীন্দ্রনাথের প্রত্যেক প্রবন্ধকে যুক্তিমূলক নীরস ভঙ্গিতে রূপান্তরিত করিয়া লইয়াও বুঝিতে পারেন, তাঁহারও মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে।

এই ভঙ্গি ছাড়াও রবীন্দ্রনাথ অন্যান্য বহু ভঙ্গিরও প্রবর্ত্তন করিয়াছেন—এখানে কয়েকটির উল্লেখ করি—

১। সাহিত্য-সমালোচনা যে নিজেই 'সাহিত্য' হইয়া উঠিতে পারে—রবীন্দ্রনাথ সরসভঙ্গির সমালোচনা প্রবর্ত্তন করিয়া তাহা দেখাইয়াছেন। তাঁহার 'প্রাচীন-সাহিত্য' 'ও লোকসাহিত্যের' বিশেষ করিয়া উল্লেখ করি।

২। তাঁহার 'পঞ্চভূতে' মৈত্রীময় ভাবের আদান-প্রদান, কথোপকথন ও বাদানুবাদের ভঙ্গিতে বক্তব্য ও মন্তব্য প্রকাশ করার অভিনব ভঙ্গি উল্লেখযোগ্য।

৩। পত্রের ছলে যে বক্তব্যকে সরস করিয়া প্রকাশ করা যায় তাহার প্রমাণ দিবে 'ছিন্নপত্র' ও 'পত্রধারা'।

৪। ঘটনাবৈচিত্র্যময় জীবনকথার বিবৃতি না করিয়া ভাবঘন ও অনুভূতিময় জীবনস্মৃতির বিবৃতি করিয়াছেন বলিয়া জীবনস্মৃতির ভঙ্গিকে অপূর্ব্ব বলিতেছি না। সরস বিবৃতির পদ্ধতিটিই অপূর্ব্ব। ঐ বিবৃতিতে যে ক্রমপারম্পর্য্য অনুসরণ করিয়াছেন, তাহা একটি বিরাট

মনের ক্রমবিবর্ত্তনের ইতিহাসেরই উপযোগী। এসকল কথা চিরপ্রচলিত প্রবন্ধাকারেই ব্যক্ত করিতে হয় সকলে তাহাই জানিত।

৫। কথিকার ভঙ্গি একটি অপূর্ব্ব ভঙ্গি। ইহাকে গদ্য কাব্য বলা যাইতে পারে।

রবীন্দ্রনাথের পাশাপাশি ও পরেও নবনবভঙ্গিতে বক্তব্য প্রকাশের চেষ্টা চলিয়াছে।

রামেন্দ্রসুন্দর ও জগদানন্দ বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গকে সরস করিয়া ব্যক্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

উচ্ছ্বাসময় বক্তৃতার ভঙ্গিতে প্রবন্ধ রচনার চেষ্টা বোধ হয় কেশবচন্দ্র, বিবেকানন্দ ও কৃষ্ণপ্রসন্ন হইতেই সুরু হইয়াছিল। প্রফুল্লচন্দ্র অনেকটা সেই ভঙ্গির অনুসরণ করিতেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের অনুসরণে সরস ভঙ্গিতে রচিত ললিতকুমারের কোন কোন প্রবন্ধ সাহিত্যের মর্য্যাদালাভ করিয়াছে।

বৈঠকী আলাপের অনাড়ম্বর ও সরস ভঙ্গিতে বক্তব্য প্রকাশের চেষ্টা দেখা যায়, হরপ্রসাদশাস্ত্রী মহাশয়ের রচনাতে। ভৌগোলিক ও ভূবিজ্ঞানসম্বন্ধীয় তথ্যকে কতদূর সরস করিয়া প্রকাশ করা যায় জগদীশচন্দ্র তাহা দেখাইয়াছেন,—তাঁহার 'ভাগীরথীর উৎসসন্ধানে।'

ঐতিহাসিক তথ্যকে সরস ভঙ্গিতে প্রকাশ করিবার ঔপন্যাসিক ভঙ্গি অবলম্বনের প্রথা রমেশচন্দ্র ও বঙ্কিমচন্দ্রেই সূত্রপাত হইয়া ছিল। কিন্তু তাঁহাদের রচনায় ঐতিহাসিকতার প্রাবল্য ছিল না কথাসাহিত্যের ধর্ম্মই অধিকতর প্রকট ছিল। কাজেই বঙ্কিমচন্দ্র ও রমেশ চন্দ্র উপন্যাস রচনা করিবার জন্য ঐতিহাসিক উপকরণ গ্রহণ করিয়াছিলেন, বলিলেই ঠিক বলা হয়। আর রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ইতিবৃত্তকেই সরস করিয়া বলিবার জন্য উপন্যাসের ভঙ্গি অবলম্বন করিয়া ছিলেন। তাঁহার শশাঙ্ক ও ধর্ম্মপাল এই ভঙ্গির শ্রেষ্ঠ রচনা। তিনি নীরস প্রত্নতত্ত্বকেও সরস করিয়া বিবৃত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন—তাঁহার 'পাষাণের কথা'র কথা স্মরণ করিতে বলি। শাস্ত্রী মহাশয়ের 'বেনের মেয়ে' ও সত্যেন্দ্রনাথের 'ডঙ্কা নিশানের' নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

এ যুগের আরও ২।৪ খানি উপন্যাসের নাম করা যাইতে পারে যাহা উপন্যাস হিসাবে সম্পূর্ণ সার্থকতা লাভ করে নাই, কিন্তু সে গুলিকে সমাজতত্ত্ব, দাম্পত্য জীবনের রহস্য, পারিবারিক সমস্যা, রাষ্ট্রনীতি, অপরাধ-তত্ত্ব, পল্লীসমস্যা, অর্থনীতিক সমস্যা, হিন্দু জীবনের সংস্কার বৈচিত্র্য ইত্যাদির সরস বিবৃতি বলা যাইতে পারে।

কৌতুকরসে অভিষিক্ত করিয়া ও আলঙ্কারিক ক্রম অনুসরণ করিয়া নিবন্ধ রচনার অপূর্ব্ব ভঙ্গির সাক্ষাৎ পাই বীরবলের রচনায়। ভাষার দিক হইতে বীরবলের রচনায় অপূর্ব্বতা আছে। তাঁহার অপূর্ব্ব ভাষার সহিত অভিনব সরস ভঙ্গির যোগ হইয়া বঙ্গ সাহিত্যে গদ্য রচনার অভিনব পদ্ধতিরই প্রবর্ত্তন লইয়াছে। ব্যঙ্গাত্মক, কৌতুক-রস-ভূয়িষ্ঠ, শ্লেষাঢ্য অলঙ্কৃত ভঙ্গিতে বক্তব্য যে কতটা সরস ও হৃদ্য হইয়া উঠিতে পারে বীরবল তাহা দেখাইয়াছেন। নীরস ভৌগোলিক বিবৃতিকেও তিনি সরস করিয়া তুলিয়াছেন। ইহার ভঙ্গিতে শব্দালঙ্কারে ও অর্থালঙ্কারে অপূর্ব্ব মিশ্রণ ঘটিয়াছে।

নলিনীকান্ত গুপ্ত মহাশয়ের মৃতের কথোপকথনে একটি অভিনব ভঙ্গির সাক্ষাৎ পাই। Landor এর Imaginary Conversation এই শ্রেণীর।

চারুচন্দ্র রায় মহাশয়ের 'কমলাকান্তের পত্রের' রচনা-ভঙ্গিতে বৈশিষ্ট্য আছে। বঙ্কিমচন্দ্রেরই অনুসরণ, কিন্তু সার্থক অনুসরণ বটে। অতুলচন্দ্র গুপ্তের কাব্যজিজ্ঞাসার রচনাভঙ্গিতে কিছু বৈশিষ্ট্য আছে।

কেদার নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের রচনাভঙ্গির সহিত বীরবলের রচনাভঙ্গির কিছু মিল আছে। বীরবলের রচনা-ভঙ্গির ক্রম আলঙ্কারিক এবং বীরবলের রচনায় অর্থালঙ্কারের সংযত ও সুসমঞ্জস প্রয়োগ আছে—সেজন্য বৈচিত্র্য যথেষ্ট। কেদারবাবুর ভঙ্গিটি কৌতুক মধুর ও শব্দালঙ্কার-ভূয়িষ্ঠ। কিন্তু ক্রমটি আলঙ্কারিক নয়—জীবনের অভিজ্ঞতাকেই তিনি প্রাধান্য দেন এবং ঐ অভিজ্ঞতাই তাঁহার রচনার ক্রমনির্দ্দেশ করিয়াছে। আপনার জীবনের অভিজ্ঞতাকে কথা-সাহিত্যের ছলে বিবৃত করিবার কৃতিত্ব তাঁহার আছে। তাঁহার উপন্যাস প্রবন্ধ-সাহিত্যেরই অন্তর্গত।

সতীশচন্দ্রের 'গাছের কথা'র কথা ভুলি নাই। বৈজ্ঞানিক বিষয়কে এরূপ সরস ভঙ্গিতে প্রকাশ করিবার চেষ্টা আজকাল বড় দেখা যায় না।

সাময়িক প্রসঙ্গকে সরস করিয়া বিবৃত করিবার ক্ষমতা উপেন্দ্রনাথের মত কাহারও নাই।

অন্নদাশঙ্করের 'পথে প্রবাসে'র রচনাভঙ্গি আমাদের ভাল লাগিয়াছে—যদিও ঐ ভঙ্গি রবীন্দ্রনাথেরই অনুকৃতি।

'শনিবারের চিঠির' অপূর্ব্ব রচনাভঙ্গির বৈশিষ্ট্যকে প্রশংসা না করিয়া পারি না। এই মুন্সিয়ানা যদি স্থায়ী সাহিত্য রচনায় প্রযুক্ত হইত, তাহা হইলে বঙ্গ-সাহিত্যের সম্পদ্ যথেষ্ট বাড়িয়া যাইত। এ প্রবন্ধে আমরা ভঙ্গিরই আলোচনা করিতেছি—ভঙ্গির চাতুর্য্যের জন্য লেখককে আমরা প্রশংসা করিতে বাধ্য। এ ভঙ্গি বঙ্গ-সাহিত্যে অভিনব। প্রবন্ধ-সাহিত্যের ইতিহাসে ইহার মূল্য কে অস্বীকার করিবে?

যাঁহাদের কথা বাদ্ গেল, সময়মত তাঁহাদের কথা আলোচনা করা যাইবে।

গল্পসাহিত্যের কথা

জীবনের যে আকাঙ্ক্ষা মিটাইবার সামর্থ্য আমাদের নাই, আমরা কল্পনায় সেই আকাঙ্ক্ষা মিটাইতে চাই। সে আকাঙ্ক্ষা যে মিটাইতে পারিয়াছে তাহার গল্প শুনিতে ভালবাসি। এ সংসারে মানুষের সকল সাধ মেটে না, পীড়া আছে, দৈন্য আছে, জরা আছে, মরণ আছে, আরো কত কি বাধা আছে। মানুষ তাই মরণের পারে স্বর্গ কল্পনা করিয়াছে, যেখানে জরা-পীড়া কিছুই নাই, জীবিকা অর্জ্জনের ক্লেশস্বীকার করিতে হয় না। যেখানে অফুরন্ত ভোগ্য বস্তু, অফুরন্ত সম্ভোগের অধিকার, ভোগের ধারায় কোন দিন ছেদ-বিরাম পড়িবে না। মানুষ এই স্বর্গকে কল্পনায় মনের মত করিয়া সাজাইয়াছে। বাসনাই বিশ্বাসের জননী। কল্পনাকে তাই। সে সত্য করিয়া তুলিয়াছে, সত্য বলিয়া যে নিজে বুঝে নাই—সেও সত্য বলিয়া পরকে বুঝাইয়াছে। শেষে স্বর্গ এমনি কাম্যবস্তু হইয়া উঠিয়াছে যে তাহার আশায় মানুষ ইহসংসারের ভোগ্যকেও পায়ে ঠেলিতে শিখিয়াছে। মানুষের সমাজ-গঠন-রক্ষণে ও নীতিধর্ম্মের অনুশীলনে এই 'স্বর্গ' কতই না যুগে যুগে সাহায্য করিয়াছে।

মানুষের অপরিতৃপ্ত বাসনা এমনি করিয়া কল্পতরু, উচ্চৈঃশ্রবা, পক্ষিরাজ, ইত্যাদি এমনি কত সৃষ্টিই না করিয়াছে। স্বপ্নকে সত্য বলিয়া প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য স্বপ্নবিলাসীর দল কত তর্কই না করে কত শ্লোকই না রচনা করে অথবা আবৃত্তি করে—কত চেষ্টাই না করে।

যে সকল কাণ্ড মানুষের ক্ষমতার অতীত—মানুষ যে সকল কাণ্ড ঘটাইতে পারে না বলিয়া ক্ষুন্ন—সে সকল কাণ্ডের অতিরঞ্জিত বা রসরঞ্জিত গল্প শুনিয়া সে অসম্পূর্ণ শক্তির ক্ষোভ নিবৃত্তি করে। সেই জন্য কত দেব দেবী, দৈত্যদানব, অপ্সর-কিন্নর, হুরী-পরী, ভূত-প্রেত, যক্ষ রক্ষঃ, অতিকায় জীবজন্তু, বিকৃতাঙ্গ নর-বানরের সৃষ্টি হইয়াছে। তাহাদের লইয়া কত অলৌকিক গল্পেরই না সৃষ্টি হইয়াছে। কত অপরূপ রূপলাবণ্যের কথা, কত শতহস্তীর মত বলবীর্য্যের কথা, কত কুবেরের ভাণ্ডারের কথা, মণিমুক্তা-সোনাদানার ছড়াছড়ি—বৈজ্ঞানিকযুগের আগের মানুষকে তৃপ্তি দিয়াছে।

দুর্ব্বল শিশুর আকাঙ্ক্ষার সীমা খুব বিস্তৃত নয়—কিন্তু যে সকল সাধ আকাঙ্ক্ষা তাহার মনে জাগে, তাহার কোনটিরই পরিতৃপ্তি-সাধনের ক্ষমতা তার নাই। শিশুর মূঢ়মনে যে সব সাধ জাগে, তাহা যেমন আজগুবি, তেমনি অসম্ভব। তাই তাহার জন্য রচিত গল্প সবই আজগুবি। শিশুর গল্প শুনিবার তৃষ্ণাও অফুরন্ত। নিজের সাধ্যাতীত বলিয়া যে কোন কাণ্ড-কারখানা অবলম্বনে রচিত গল্পই তাহার প্রীতি উৎপাদন করে। বিশ্বাস করিবার ক্ষমতা তাহার অসীম, তাহাকে ভুলাইবার, তাহার দুর্ব্বলতা ও অক্ষমতাকে স্তম্ভিত ও চমকিত করিবার জন্য গল্পের অভাব হয় না।

দরিদ্র ধনরত্নের ছড়াছড়ির, ভোজন-লোলুপ ভোজ্য-দ্রব্যের প্রাচুর্য্যের, কাপুরুষ অলৌকিক শৌর্য্যের কল্পনা করিতে ও গল্প শুনিতে ভাল বাসে।

শিশু যত বড় হইতে থাকে—যত তাহার জ্ঞানোদয় হয়—তাহার অদ্ভুত অসম্ভব আজগুবি সাধ আর থাকে না সত্য, কিন্তু নূতন নূতন আকাঙ্ক্ষা তাহার মনে অঙ্কুরিত হইতে থাকে—সকল আকাঙ্ক্ষাই তাহার মিটে না—তাহার শ্রোতব্য গল্পেরও তাই রূপান্তর হয়, কিন্তু গল্প শুনিবার তৃষ্ণা তাহার কমে না।

এ-সংসারে আদর্শ-পুরুষ খুব অল্পই মিলে। আদর্শ পতিব্রতা নারীও পথে ঘাটে পাতিব্রত্যের চরম দৃষ্টান্ত দেখাইয়াও ঘুরে না—অথচ মানুষের বড়ই ইচ্ছা আদর্শ নরনারী দেখিতে, নিজে যাহা সে হইতে পারে নাই তাহাই চায় সে গল্পে দেখিতে। মানুষ নিজে যতই পাপ করুক—তাহার বড়ই ইচ্ছা ধর্ম্ম পুরস্কৃত হউক—পাপ লাঞ্ছিত হউক, ধর্ম্মের সহিত অধর্ম্মের সংগ্রামে ধর্ম্মই জয়ী হউক। কিন্তু হায় এ সংসারে তাহাতো হয় না। মানুষের এ জন্য ক্ষোভের অন্ত নাই। এই ক্ষোভ সে মিটায় গল্পের নায়কনায়িকার জীবনে। যদি ধর্ম্মের যথোচিত পুরস্কার ও অধর্ম্মের যথোচিত শাস্তি না হইল তবে গল্প শোনা কেন? অধর্ম্মের দণ্ড হইতে অব্যাহতি-তো চোখের সাম্‌নেই সে দেখিতে পাইতেছে।

ইতিহাসের মানুষগুলির যদি শক্তিসামর্থ্য আমাদেরই মত—অসম্পূর্ণ হয়, তবে তাহাদের কথা শুনিয়া আমাদের তৃপ্তি হয় না। তবে আমাদের চেয়ে অধিকতর-শক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তি কেহ যদি, আমরা যাহা পারি না তাহাই পারিয়া থাকে, তবে তাহাদের ইতিহাসটা আমাদের ভাল লাগে। তাহারা যতটা অঘটনই ঘটাক, অলৌকিক কিছুত করিতে পারে না। ইতিহাসেও অদ্ভুতকর্ম্মা লোক খুব বেশী পাওয়া যায় না। তাই ইতিহাস অপেক্ষা উপন্যাসকেই আমরা বেশি ভালবাসি—সত্য অপেক্ষা স্বপ্ন আমাদের অধিকতর প্রিয়। প্রচুর পরিমাণে কল্পনা-সংযোগে যদি ইতিহাস অর্দ্ধোপন্যাস হইয়া উঠে, তাহা হইলে ইতিহাসও আমরা গলাধঃকরণ করিয়া থাকি। রণক্ষেত্রে মৃত্যুমাত্রকেই যদি দেশ বা ধর্ম্মের জন্য প্রাণোৎসর্গ বলিয়া কীর্ত্তিত করা যায়, তবে রণভীরু চিরপরাধীন কাপুরুষ জাতির বড়ই প্রীতিকর হয়। যে ইতিহাসে এই রূপ একটা কিছু আদর্শ খাড়া না করা হয়, সে ইতিহাস পরীক্ষার জন্য পাঠ্য,—চিত্তবিনোদের জন্য নহে।

কেহ কেহ বলেন—

"জীবনে অবাধ ইন্দ্রিয়-লালসার তৃপ্তির উপায় নাই। যাহারা ইন্দ্রিয়-লালসায় অধীর, অথচ সমাজের বিধি বন্ধনের জন্য লালসার পরিতৃপ্তি সাধন করিতে পারে না —কেবল মনে মনে লালসাতৃপ্তির কল্পনা করে, তাহারা কামকেলিময় গল্প রচনা করে অথবা পাঠ করে। জীবনে যাহাদের পরিতৃপ্তির সুবিধা হয় নাই, বিনাইয়া বিনাইয়া তাহারই বর্ণনা করিয়া তাহারা গল্প রচনা করে। সমাজের যে সকল রীতিপ্রথা বা বাধা-বাঁধনের জন্য অবাধ পরিতৃপ্তি সম্ভব হয় না—গল্পে সেইগুলিকে প্রাণপণে নিন্দা করে। আর যাহারা গল্প-রচনা করিয়া অতৃপ্ত বাসনার চরিতার্থতা সাধন করিতে পারে না, তাহারা সেগুলি পড়িয়া মনের খেদ মিটায়।"

একথা আমাদের ও সত্য বলিয়াই মনে হয়।

শিক্ষাসভ্যতার সমুন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চিত্তবৃত্তি মার্জ্জিত হইতেছে, সেই সঙ্গে গল্প আর, কল্প ও জল্পের মাঝামাঝি একটা কিছু অর্থাৎ '**কল্পিত জল্পনা**' মাত্র নয়—এখন গল্প বলা একটা বিশিষ্ট শিল্পকলা বা আর্ট হইয়া উঠিয়াছে। অন্যান্য আর্টের নিকট আমরা যাহা প্রত্যাশা করি—গল্পের কাছেও ঠিক তাহাই প্রত্যাশা করি। এখন আর আমরা গল্পের মধ্যে যাহা ঘটিলে ভালো হইত, যাহা হইলে আমাদের ক্ষোভ মিটিত তাহাই চাই না,—যাহা নিত্য ঘটিতেছে—যাহা কঠোর সত্য, যাহা অবাঞ্ছিত বাস্তব তাহাকেও রসানুরঞ্জিত ও কলাশ্রী-মণ্ডিত রূপে দেখিয়া তৃপ্তিলাভ করি। সভ্যতা ও জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কল্প-বাসনাও সংযত হইয়াছে—মানুষের শক্তির সীমা জানিতে পারিয়াছি—বিশ্বাস করিবার শক্তিও কমিয়াছে—তাই অসম্ভব বা অলৌকিকতাতে আমরা আর ভাল বাসি না। এখন আর গল্পে আমরা আমাদের অপরিতৃপ্ত বাসনা বা আশা আকাঙ্ক্ষারই পরিতৃপ্তি খুঁজি না,—আদর্শ পাতিব্রত্য, কুবেরের অর্থসম্পদ, এককথায়

যাহা কিছু দুর্লভ দুর্গম অথচ চিরাভীপ্সিত তাহাই খুঁজি না। আমরা খুঁজি যাহা সাহিত্যের প্রধান সম্পদ তাহাই অর্থাৎ **রস**। অতৃপ্ত বাসনার চরিতার্থতা-সাধন একেবারে গল্পে চলেনা তাহা হয়, তবে তাহা ততটুকু, যতটুকু শিল্পকলার সহিত অসমঞ্জস নয়—যতটুকু তাহার রসসৃষ্টির পক্ষে সম্পূর্ণ অনুকূল।

কাব্য বিচার

"রথ চলেছে সমারোহে বাজ্‌ছে শানাই ঢোল,
উড়ছে নিশান হাজার লোকে তুল্‌ছে কলরোল।
হুলু দিয়ে পুরাঙ্গনা লাজ বরিষে পথে,
সবই আছে, নেইক কেবল রথের ঠাকুর রথে।"

আমাদের সাহিত্যে কাব্যবিচারের দশাও তাই। ভাষার কথা উঠে, ভঙ্গির কথা উঠে, ছন্দের কথা উঠে, চেরাপুঞ্জী-গোবিসাহারা-মার্কা শাণিত পংক্তির কথা উঠে, দুঃখবাদ, দেহাত্মবাদ ইত্যাদি নানাতত্ত্বের কথা উঠে—কেবল উঠে না কাব্যের আত্মার কথা।

কবির কথার ঈষৎ পরিবর্ত্তন করিয়া বলিতে হয়—

রসের কথা হেথা কেহ ত বলে না .
করে শুধু মিছে কোলাহল।
রসসাগরের তীরেতে বসিয়া
পান করে শুধু হলাহল।

ভঙ্গি, ছন্দ, ভাষা অপূর্ব্ব বা অসাধারণ রকমের না হইলেও, কোন একটা সমস্যা বা তত্ত্বের কথা না থাকিলেও যে কবিতা রসসম্পদ হিসাবে সার্থক হইতে পারে, তাহা আজকালকার নবাঙ্কুরিত প্রতিভার সমালোচকরা ত ভুলিয়াও বলেন না।

রবীন্দ্রনাথের পর কেহ কেহ পদলালিত্য ও ছন্দো বৈচিত্র্যকে প্রাধান্য দিয়া কবিতা লিখিলেন। Poetic Convention গুলির Permutation Combination করিয়া কিছু কিছু চাতুর্য্য দেখাইলেন। তাঁহারা রসকেই কাব্যের প্রাণস্বরূপ মনে করিয়া সাধনা করেন নাই।

আবার একদল ইদানীং আসিয়াছেন—তাঁহারা সব Convention-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ-ঘোষণা করিয়াছেন, কাব্যের ভাষাকে গদ্যাত্মক করিয়া তুলিবার পক্ষপাতী। ইঁহারা কাব্যে একটা তত্ত্ব বা 'বাদ' ফুটিলেই বা কোন একটা তথাকথিত সত্যের আভাস থাকিলেই কাব্য সার্থক হইল মনে করেন ও—মাঝে মাঝে গোটাকতক শাণিত পংক্তি ও মাজিয়া ঘষিয়া কাব্যের মধ্যে পুরিয়া দেন। সমালোচকগণ বলেন, ঐ পংক্তিগুলির মধ্যেই কবির সর্ব্বস্ব ভরা আছে। ইঁহারাও রসকে কাব্যের প্রাণস্বরূপ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন নাই।

'উভয়দলই কাব্যের উপকরণ লইয়াই ব্যস্ত,—উপকরণ গুলিকেই কাব্যের সর্ব্বস্ব মনে করিয়া দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করিয়াছেন। এই দ্বৈত ভাবের সহজেই সামঞ্জস্য হইতে পারে রসকে কাব্যের প্রাণস্বরূপ বলিয়া গ্রহণ করার অদ্বৈতবুদ্ধিতে।

উপকরণকেই সৃষ্টির চরম লক্ষ্য মনে করিয়া তদ্‌গত থাকা সত্ত্বেও উভয়দলের কবিরা মাঝে মাঝে অসতর্ক হইয়া পড়িয়াছেন—তাহাতে মাঝে মাঝে এক-আধটি রসঘন প্রকৃত কবিতার জন্ম হইয়া গিয়াছে। মাঝে মাঝে ইঁহাদের তপোভঙ্গ ঘটিয়াছে, তাই ছোট-ছোট শকুন্তলার জন্ম হইয়াছে। কবিরা সেই গুলিকে অনাদর করিয়া চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু প্রকৃত রস-সমালোচকের কর্ত্তব্য সেইগুলিকে সযত্নে প্রতিপালন করা।

চাই প্রকৃত সমালোচক—যে জানে, রসই কাব্যের মর্ম্ম। সে সমালোচক—একটা শাণিত পংক্তির আঘাতেই মূর্চ্ছা যাইবেন না—সে সমালোচক ছন্দের জলতরঙ্গ শুনিয়াই নিদ্রায় বিভোর হইবেন না—নির্লজ্জ কামলালসার মদিরতার স্বাদ পাইয়াই নেশায় বিভোর হইবেন না—কোন একটা অর্দ্ধ-দার্শনিক অর্দ্ধবৈজ্ঞানিক চিরপুরাতন তত্ত্বের আভাস পাইয়া স্তম্ভিত হইয়া যাইবেন না—তিনি কবিতায় খুঁজিবেন রস, কবির সমগ্র কাব্য-জীবনে খুঁজিবেন একটা ব্রত বা message.

কাব্যের বহিরঙ্গের চমৎকারিতা ও ছন্দোমাধুর্য্যের প্রতি অনেকের সহজ বিদ্বেষ আছে। বিদ্বেষের কারণ, এদেশে এমন কবিতা জন্মিত যাহাতে কেবল ইহাই ছিল, আর-কোন পদার্থ ছিল না। বহিরঙ্গের চমৎকারিতার কোন অপরাধ নাই। ইহা রসসৃষ্টির অনুকূল ছাড়া প্রতিকূল নয়। যদি কেহ বহিরঙ্গের চমৎকারিতার সঙ্গে অন্তরঙ্গেও কিছু দিতে পারে—অর্থাৎ রসসৃষ্টি করিতে,

পারে—তবে কি বহিরঙ্গের চমৎকারিতার অপরাধেই তাঁহার রচনা অস্পৃশ্য হইয়া থাকিবে ?

পক্ষান্তরে—অনেকের বিশ্বাস বহিরঙ্গের সৌষ্ঠব না থাকিলে কাব্যই হয় না—এ ধারণা তাঁহাদের রবীন্দ্র কাব্যের পূর্ব্ববর্ত্তী কবিতাবলীর দুর্দ্দশা দেখিয়া বোধ হয় জন্মিয়াছে। বহিরঙ্গের সৌষ্ঠব ও ছন্দোবৈচিত্র্য ছাড়াও যদি কেহ রসসৃষ্টি করিয়া থাকে তবে তাহার রচনা নিশ্চয়ই কাব্য হইয়া উঠিয়াছে। রসজ্ঞ ব্যক্তি সে শ্রেণীর রচনাকে কখনও অনাদর করিতে পারেন না।

অনেকের বিশ্বাস কাব্যের উপাদান অন্তরের সুকুমার অনুভূতি। তথ্য, তত্ত্ব, সমস্যা বা বুদ্ধিগম্য বিষয় কাব্যের উপাদান হইতে পারে না। সুকুমার অনুভূতি যত সহজে কাব্য হইয়া উঠে, এগুলি তত সহজে কাব্য হইয়া উঠে না। তাই বলিয়া এইগুলিকেও রসে পরিণত করিতে পারা যায় না তাহা নহে। রবীন্দ্রনাথ তাহা পারিয়াছেন। যদি কেহ তাহা পারেন, তবে বুদ্ধিগম্য বলিয়া রসজ্ঞ ব্যক্তি কখনও তাহা উপেক্ষা করিবে না।

যাহারা কাব্যকে সত্যের বিবৃতিমাত্র মনে করেন, তাঁহারা আদৌ রসজ্ঞ নহেন। সাধারণতঃ দেখা যায়, —যাঁহারা কাব্যের Technique ও রসসৃষ্টির কৌশলটি একেবারে বোঝেন না—তাঁহারা কাব্যের উপাদান-স্বরূপ গৃহীত সত্যকেই কাব্যের প্রতিপাদ্য সত্য মনে করেন এবং যে রচনায় কোন সত্য বিবৃত বা ঘোষিত হইয়াছে তাহাকেই সৎকাব্য মনে করেন। আজকাল এই শ্রেণীর সমালোচকের অভাব নাই। যাঁহারা অতুলবাবুর কাব্যজিজ্ঞাসা পড়িয়াছেন—তাঁহারাও এই ভুল করেন। কাব্যজিজ্ঞাসা রসের আদর্শ কি বুঝাইয়াছে—কিন্তু কাব্যের Technique বা কাব্যসৃষ্টির কৌশলটি যে কি তাহাত বলে নাই।

ঠিক ইঁহাদের বিপরীতশ্রেণীর সমালোচকগণ উপাদান-রসকেই কাব্যের উদ্দিষ্ট রস মনে করেন। কারুণ্য কাব্যের উদ্দিষ্ট সেই ব্রহ্মস্বাদ-সহোদর রস নয়—কারুণ্য কাব্যের উপাদানমাত্র—অন্যান্য উপাদান-রসের মত কারুণ্যকে অবলম্বন করিয়া সৎকাব্যের সৃষ্টি হইতে পারে, যদি উহা কাব্যের উদ্দিষ্ট রসও জাগাইতে পারে। কিন্তু এই সমালোচকের দল ঐ কারুণ্যকেই কাব্যের প্রাণস্বরূপ মনে করেন অর্থাৎ দেহকেই আত্মা মনে করেন।

মোটকথা, প্রকৃত সমালোচকের অভাবে এই সকল ভ্রান্তি তথাকথিত সমালোচকদের ধারণায় থাকিয়া গিয়াছে। চাই প্রকৃত সমালোচক—কাব্য একেবারে দুর্লভ নয়, কিন্তু রসজ্ঞ সমালোচক অত্যন্ত দুর্লভ।

প্রাকৃত দুঃখ ও কাব্যের দুঃখ

প্রাকৃত দুঃখের ঘটনা বা ঘটনার বিবৃতি আমাদিগকে বেদনা দেয়—কিন্তু কাব্যের দুঃখ আমাদিগকে আনন্দই দেয়। তাহা যদি না দিত, তাহা-হইলে আমরা করুণরসাত্মক কবিতা এত আগ্রহসহকারে পড়িতাম না—টাকা খরচ করিয়া ট্রাজিডির অভিনয় দেখিতেও যাইতাম না। যে দুঃখ আমাদিগকে বেদনা দেয়—সেই দুঃখই কাব্যের উপাদান হইয়া আমাদিগকে আনন্দ দেয়,—ইহা কিরূপে সম্ভবে ?

কবি দুঃখকে কাব্যে উপভোগ্য করিয়া তোলেন বলিয়াই আমরা তাহা হইতে আনন্দ পাই। কবির রচনাকৌশলে, কবির লেখনীর মাধুরী-স্পর্শে চিরবর্জ্জনীয় চির অনীপ্সিত দুঃখও উপভোগ্য হইয়া উঠে। অন্য সকল রস-উপাদানের পক্ষে উপভোগ্য হইয়া উঠায় বৈচিত্র্য কিছু নাই—অস্বাভাবিকতা কিছু নাই। কিন্তু দুঃখ যে কখনও উপভোগ্য হইতে পারে, তাহা সাধারণ-বুদ্ধিতে আসে না—প্রত্যাশাই করা যায় না যে সে উপভোগ্য হইবে। কাজেই সে যখন উপভোগ্য হয়,—তখন আর সকল রসোপকরণকে সে হারাইয়া দেয়।

দুঃখ উপভোগ্য হইয়া উঠে বলিয়া,—দুঃখ যত গভীর হইবে—তাহা তত বেশী উপভোগ্য হইয়া উঠিবে, একথা কিন্তু সত্য নয়। দুঃখ যত গভীর হইবে, যত প্রাকৃত হইবে—যত বাস্তব হইবে—তাহাকে উপভোগ্য করিয়া তোলা তত কঠিন—এককথায় এরূপ দুঃখ উপভোগ্য হইয়া উঠে না পাঠককে ঠিক আনন্দ দেয় না—পাঠকের অন্তরে কাব্যরস-সঞ্চার করে না—সঞ্চার করে সমবেদনা। পাঠকের চোখে যে জল ঝরে—তাহা সমবেদনায়,—সে যে রচনার সুখ্যাতি করে

তাহা রসবোধের আনন্দের ফলে নয়—কবির সহানুভূতিময় দরদী চিত্তের জন্য। সমবেদনার নাম রসবোধ নয়—দরদী চিত্তের প্রশংসা কবির প্রশংসা নয়। সমবেদনার গভীরতা রসবোধের গভীরতা নষ্ট করিয়া দেয়।

কৌশলী কবি দুঃখকে উপভোগ্য করিয়া তুলিবার জন্য 'ব্যথার' নির্ব্বাচনে খুব সতর্ক। মর্ম্মভেদী ব্যথাকে কবি বর্জ্জন করিয়া চলেন। মানুষের দুঃখ উপভোগ্য করা কঠিন বলিয়া কবিরা প্রকৃতির সহায়তা লইয়াছেন। প্রকৃতির নানা-বৈচিত্র্যে—বিবিধ অঙ্গে—নানারূপে তাঁহারা মানবিকতা আরোপ করিয়াছেন। মানবের বেদনাকে কবিরা প্রকৃতির কল্পিত জীবনে আরোপ করিয়া দুঃখকে উপভোগ্য করিয়া তুলিয়াছেন। তাই কবির কাব্যে—পাখী, ফুল, চন্দ্র, সূর্য্য, তারা, নদী, তরু, লতা, প্রান্তর, গিরি ইত্যাদির বেদনার অন্ত নাই। এ বেদনা কাব্যে উপভোগ্য হয়,—সমবেদনার লোনা জলে এই বেদনার রস বিস্বাদ হইয়া উঠে না।

বাস্তব মানুষের প্রাকৃত বেদনাকে উপভোগ্য করা যায় না বলিয়া কবিরা যুগে যুগে কল্পনার নরনারীর সৃষ্টি করিয়া তাহাদের কল্পিত বেদনাকেই কাব্যের উপাদান করিয়া তুলিয়াছেন। তাহাতে একেবারে সমবেদনা যে জাগে না তাহা নহে। সমবেদনা একেবারে না জাগাইতে পারিলে রসসৃষ্টিই সম্ভব হইত না। তবে সে সমবেদনা পাঠকচিত্তকে ব্যথিত বা পীড়িত করে না—রসাভাস ঘটায় না—তাহার বৃন্তে আনন্দের কুসুমই ফুটিয়া উঠে।

কল্পিত নরনারীর বেদনার পরই ইতিহাসের নরনারীর বেদনার কথা। যাহারা কল্পলোকে বাস করে, তাহাদের কথা আর যাহারা স্মৃতিলোক বা স্বপ্নলোকে বাস করে তাহাদের কথার মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নাই।

যাহারা সকল দুঃখবেদনার অতীত লোকে চলিয়া গিয়া চিরদিনের জন্য তাহাকে এড়াইয়াছে, তাহাদের বেদনার কথাও চিত্তকে অতিরিক্ত পীড়িত করে না।

কবি যখন কল্পিত বা 'প্রেত' নরনারীর বেদনার কথা লইয়া কাব্য রচনা করেন, তখন দুঃখকে উপভোগ্য করিয়া তোলার জন্য দুঃখের সঙ্গে সান্ত্বনা ও আশ্বাসও জুড়িয়া দেন—লাঞ্ছিতের পুরস্কারের ও লাঞ্ছনাকারীর দণ্ডেরও ব্যবস্থা করেন।

যে শ্রেণীর নিদারুণ যন্ত্রণায় মানবাত্মা আর্ত্তনাদ করিয়া উঠে, যে শ্রেণীর গভীর দুঃখে- মানুষের মস্তিষ্ক বিকৃত হয় বা চৈতন্যবিলোপ হয়, সে শ্রেণীর দুঃখকে বর্জ্জন করিয়া কবিগণ কল্পিত নরনারীর জীবনের ছোট খাটো দুঃখকেই কাব্যের উপাদানস্বরূপ গ্রহণ করেন। সেইজন্যই বোধ হয় প্রেমের বেদনা ও বিরহের ব্যথাই কাব্যে এত বেশী স্থান অধিকার করিয়াছে। যে বেদনাকে আশ্রয় করিয়া অমর কাব্য মেঘদূত বিরচিত হইয়াছে—সে বেদনা অরুন্তুদ বেদনা নয় বলিয়া কাব্যে উপভোগ্য বেদনা-বিলাস হইয়া উঠিয়াছে এবং যুগে যুগে এত আনন্দ দান করে। মহাকাব্যের মধ্যে অনেক নিদারুণ যন্ত্রণাভোগের চিত্র আছে—মহাকাব্যকে সম্পূর্ণাঙ্গ করিয়া তুলিবার জন্য তাহার প্রয়োজনও হইয়াছে;—কিন্তু মহাকাব্যের সেই সকল চিত্রগুলি কি অপূর্ব্ব কাব্য হইয়া উঠিয়াছে? যদি তাহাও হইয়া থাকে—তবে ঐ যন্ত্রণাভোগের সৌভাগ্যময় পরিণতির সান্ত্বনা ঐগুলির সহিত বিজড়িত হইয়াই যন্ত্রণাকেও উপভোগ্য করিয়া তুলিতেছে বলিতে হইবে।

গীতিকাব্যের কবি আত্মজীবনের নিজস্ব দুঃখানুভূতিকে কাব্যের উপাদান করিয়া তুলেন। নিজেই নিজের দুঃখকে উপভোগ করিতে না পারিলে কাব্যেও তাহাকে উপভোগ্য করিতে পারেন না। যে দুঃখে কবির জীবন জর্জ্জরিত, যে দুঃখে তাঁহার কল্পনাবুদ্ধি হত-চেতন, যে দুঃখে তাঁহার আত্মা আর্ত্তনাদ করিয়া উঠে—সে দুঃখ লইয়া কবি কাব্য লেখেন না,—লিখিলেও দুঃখকে উপভোগ্য করিয়া তুলিতে পারেন না এবং তাহা ঠিক কাব্য হইয়াও উঠে না—দুঃখের বিবৃতি মাত্র হয়। নিজের দুঃখ হইলেও যাহার বিবৃতিতে কবি নিজে আনন্দ পান—তাহাই কাব্যে উপভোগ্য হইয়া উঠে। শ্রেষ্ঠ কবিগণ নিজ নিজ জীবনের ছোটখাট অতীত দুঃখের দ্বারাই শ্রেষ্ঠ কাব্য রচনা করিতে পারিয়াছেন। যে দুঃখ অতীত হইয়া গিয়াছে, সেই দুঃখের স্মৃতিকেই উপভোগ্য করা চলে। বর্ত্তমানের যে বেদনা কবিকে কাব্য-সৃষ্টিতে বাধা দেয়—পাঠক-চিত্তে সেই

বেদনাই রসসম্ভোগেও বাধা দেয়। কোন কোন কবি নিজ নিজ জীবনের গভীর দুঃখ অবলম্বন করিয়াও শ্রেষ্ঠ কাব্য রচনা করিয়াছেন। কিন্তু সে কখন? গভীর দুঃখের বিক্ষোভ ও আলোড়ন যখন থামিয়া গিয়াছে—যখন চিত্তে আবার প্রসন্নতা, শান্তি ও প্রকৃতিস্থতা ফিরিয়া আসিয়াছে—চিত্তের শান্ত রসস্রোতে যখন গভীর দুঃখের স্মৃতিটুকু কেবল প্রতিবিম্বিত হইয়া আছে অর্থাৎ যখন গভীর বেদনা 'স্মৃতিবিলাসে' পরিণত হইয়াছে।

পাঠকের পক্ষে কাব্যের রসভোগ,—কাব্যকে আপন মনের মাধুরী দিয়া পুনর্গঠন। রসভোগও এক প্রকারের 'কবিকৃতি'। যে দুঃখ কবির রস-সৃষ্টিতে বাধা দেয়, সে দুঃখ পাঠকের চিত্তে কাব্যের পুনঃসৃষ্টিতে যে বাধা দিবে সে বিষয়ে সন্দেহ কি? সুকবি পাঠক-চিত্তে এমন বেদনার সৃষ্টি কখনও করিবেন না—যাহাতে ঐ সৃষ্টির ব্যাঘাত জন্মে।

দুঃখের কথা হইলেই পাঠক-চিত্তে বেদনা জাগিবে এমন কোন কথা নাই। দুঃখের কথাকে কবি যদি বিনাইয়া বিনাইয়া এমন করিয়া বলেন, যাহাতে করুণ অতিকরুণ বা অকরুণরূপে করুণ হইয়া উঠে—পাঠকের চিত্তে রসক্ষরণ অপেক্ষা যদি নেত্রে অশ্রুক্ষরণই কবির উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে পাঠকচিত্ত কেন ব্যথিত হইবে না? মানুষ স্বভাবতঃ সহানুভূতিশীল—তাহার সহানুভূতি জাগাইবার প্রচেষ্টা করিলে তাহা জাগিবেই—আনন্দ জাগিবার অবসরই পাইবে না। সেজন্য কবির লেখনীতে চাই সংযম। কবির পক্ষে সকল ক্ষেত্রেই সংযম পরম ধর্ম্ম—বিশেষতঃ কাব্যের উপাদান যদি হয় দুঃখ,—তখন সংযম ছাড়া কিছুতেই তাহাকে উপভোগ্য করিয়া তোলা যায় না। দুঃখের কথাকেও এমন ভাবে উপস্থাপিত করিতে হইবে, যাহাতে দুঃখ পাঠকচিত্তে তীরের মত না বিঁধিয়া কেবল রসানন্দের উৎস-মুখটি খুলিয়া দিবে। অবারিত জল ধারায় শস্য ভাসিয়া যায়, আলবালের বন্ধন ছাড়া শস্য বাঁচে না। রসের শস্য সম্বন্ধেও সেই কথা।

এই সংযম শুধু দুঃখানুভূতিরই সংযম নয়—প্রকাশ-ভঙ্গিরও সংযম। কাব্যের অন্যান্য অঙ্গের সৌষ্ঠব, শোভনতা, শৃঙ্খলা, সামঞ্জস্য ও মাধুর্য্য সৃষ্টি করিতে গেলেই এই সংযম আপনি আসে। দুঃখের কাহিনী সহজেই পাঠকচিত্ত বিগলিত করিবে এই ভরসায় ছন্দোবন্ধ, আলঙ্কারিকতা, ব্যঞ্জনা, কলাচাতুর্য্য ইত্যাদি কাব্যের বহিরঙ্গের দিকে উদাসীন হইলেত চলিবে না। দুঃখের কাহিনী বলিয়া করুণা করিয়া রসলক্ষ্মী সমস্ত ত্রুটী বা অভাব মার্জ্জনা করিবে না। বরং দুঃখ যখন কাব্যের উপাদান, তখন বহিরঙ্গের চমৎকারিতা সম্পাদন আরও বেশী করিয়াই চাই—নতুবা দুঃখ উপভোগ্য হইয়া উঠিবে কেন? যিনি সৎকবি, তিনি এ কথা বুঝেন। তাই তিনি প্রকাশভঙ্গিকে চিত্তাকর্ষক করিয়া, কাব্যের বহিরঙ্গের অপূর্ব্ব সৌষ্ঠব সম্পাদন করিয়া—চিত্ততর্পণ কলাকৌশলের সাহায্যে দুঃখক্লেশকে উপভোগ্য করিয়া তোলেন—লোনাজলকেও ভাবের জল করিয়া তোলেন—অবাঞ্ছিতকেও বাঞ্ছনীয় করিয়া তোলেন। তাই অজ-বিলাপ রতিবিলাপও উপভোগ্য হইয়া উঠে। তাই তাঁহাদের কাব্যের 'উপকরণ' যদি বা কোন পীড়া দেয় 'অলঙ্করণ' সে পীড়াকে আনন্দে পরিণত করে।

দুঃখকে কাব্যের উপাদান করিতে এতই যদি বিড়ম্বনা,—এতই যদি সতর্কতার প্রয়োজন—তবে যুগে যুগে কবিরা দুঃখকেই কাব্যের উপাদান করিয়াছেন কেন? পাঠকই বা করুণরসের কবিতারই এত পক্ষপাতী কেন? তাহার কারণ—দুঃখের মত মানবচিত্তের সুপরিচিত চিরবর্জ্জনীয়, চির অবাঞ্ছিত অনুভূতিটিকে উপভোগ্য করিয়া তুলিতে কবিরও যত আনন্দ, উপভোগ্যরূপে পাইতে পাঠকেরও তত আনন্দ। আনন্দের যে চির বিরোধী তাহাকে আনন্দে পরিণত করাতেও যেমন কৃতিত্ব—সে আনন্দ উপভোগেও তেমনি অপূর্ব্বতা। পঙ্ক যে পঙ্কজে পরিণত হইয়াছে ইহাতে স্রষ্টার কৃতিত্ব যেমন অপূর্ব্ব—এই চিন্তাতেও আমাদের মনে বিস্ময়, আনন্দ ও তৃপ্তিও জন্মে তেমনি অপূর্ব্ব।

প্রাকৃত দুঃখ কেবল অশ্রুসরোবর—কবিতায় এই দুঃখই যখন উপভোগ্য হইয়া উঠে তখন অশ্রুসরোবর ভরিয়া উঠে রসের পঙ্কজ-মালায়।
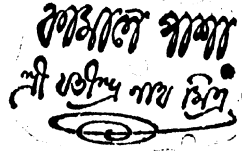
তুরস্কের পূর্ব্ব পরিচয়

সে রাম নাই আর সে অযোধ্যাও নাই এই প্রবাদ বাক্যটী বর্ত্তমান তুরস্ক সম্বন্ধে সর্ব্বাংশেই প্রযোজ্য। সহস্র রজনীর খলিফাদের বসরা ও বাগদাদ হইতে প্রভুত্ব অন্তর্হিত হইয়া গেলে মধ্য এশিয়া হইতে একদল তুর্কি সৈন্য তাহাদের দলপতিদের অধীনে এশিয়া মাইনরে প্রবেশ করিয়া বিখ্যাত শেলজুকস বংশ ধ্বংস করিয়া নিজেদের শাসন প্রতিষ্ঠিত করে। এই সময়ে ইউরোপেও রাষ্ট্র-বিপ্লব সংঘটিত হয়। হুন কর্ত্তৃক রোম ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে, কনষ্টানটীনোপলে রোম-সাম্রাজ্যের রাজধানী স্থাপিত হয়। হারূণ-উল-রসিদ ও তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণকে যেমন রোমের সহিত শক্তি পরীক্ষা করিতে হইয়াছিল, নব প্রতিষ্ঠিত তুর্কী সাম্রাজ্যকেও সেইরূপ এই পূর্ব্ব রোম-সাম্রাজ্যের সান্নিধ্যে আসিয়া শক্তি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে হয়। চেঙ্গিসখান কর্ত্তৃক তুর্কীগণ কতকটা বিধ্বস্ত না হইলে এই পূর্ব্ব-দেশীয় রোম-সাম্রাজ্যের পতন শীঘ্রই হইয়া যাইত। চেঙ্গিসখান দেশ-বিদেশ জয় করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেই অতি অল্প সময়ের মধ্যে এই নূতন জাতি তাহাদের বিধ্বস্ত শক্তি পুনর্ব্বার প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রবল হইয়া উঠে।

কনষ্টাটীনোপলের রোম সাম্রাজ্যে গ্রীক প্রাধান্যই পরিলক্ষিত হইত। প্রাচীন গ্রীকগণ স্বভাবতঃই ভাব-প্রবণ ও শান্তিপ্রিয় জাতি ছিলেন। রোমের জিগীষা প্রবৃত্তি—তাহাদের মধ্যে অল্পই লক্ষিত হইত। ইহা ছাড়া বহু পুরাতন বনিয়াদীবংশ সমূহ আত্মকলহে মগ্ন হইয়া পরস্পর যেমন পরস্পরের ধ্বংসের কারণ হইয়া দাঁড়ায়, এই প্রাচ্যদেশীয় রোম-সাম্রাজ্যেরও সেই দশা ঘটিল। গৃহ-বিবাদ ও জাতি-বিরোধ এই অন্তঃসার শূন্য সাম্রাজ্যকে আরও দুর্ব্বল করিয়া তুলিল। অবশেষে ১৪৫৩ খৃষ্টাব্দে তুরস্কের সুলতান প্রথম মহম্মদ অল্পায়াসেই কনষ্টান্টীনোপল দখল করিয়া, প্রাচীন রোমের অস্তিত্ব ধরা-পৃষ্ঠ হইতে চিরদিনের জন্য মুছিয়া ফেলিলেন।

মধ্য এশিয়া হইতে নবাগত তুর্কীর বিভিন্ন দলগুলি জড়োপাসকই ছিল। তাহারা আরব দেশে নিজেদের প্রাধান্য বিস্তার করিতে গিয়া আবার মুসলমান ধর্ম্ম ও আদর্শের সংস্পর্শে আসিয়া, সেমিটিক ধর্ম্ম ও কাল্চার গ্রহণ করে। তুর্কীগণ জেতা হইলেও বিজিত আরব-গণের ভাষা ও তাহাদের আচার-ব্যবহার সভ্যতার নিদর্শন স্বরূপ তাহাদের সমাজে স্থান লাভ করিল। এই প্রথাই ১৯২৫ সাল পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল। মুস্তাফা কামাল তুর্কীকে একটী স্বাধীন জাতিতে পরিণত করিবার মানসে তুরস্ক হইতে আরবের ধর্ম্ম ও ভাষাকে নির্ব্বাসিত করিয়া দিয়াছেন।

পৃথিবীর ইতিহাসে আমরা যখন দেখি যে কোন জেতা বিজিতদের ধর্ম্ম ও আচার ব্যবহার গ্রহণ করিতে-ছেন, তখনই তাঁহারা তাঁহাদের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিবার জন্য কি ধর্ম্ম সংক্রান্ত কি সমাজ সংক্রান্ত নূতন অভিজাত শ্রেণীও সৃষ্টি করিয়া লইতেছেন। কিন্তু তুর্কীর সুলতানগণ মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেও পৃথক অভিজাত শ্রেণী তৈয়ারী করিবার জন্য কোন প্রকার চেষ্টা করেন নাই। বসরা বা বাগদাদের মুসলমান সম্রাটগণ হজরতের বংশধর হিসাবে আপনাদিগকে তাবৎ মুসলমান-সম্প্রদায়-গুলিরই গুরু বলিয়া দাবী করিতেন। উক্ত বংশদ্বয়ের

পতন হইলে ঐ সম্মান মিশরের সুলতান লাভ করেন। কালক্রমে মিশর তুরস্কের অধীনতা স্বীকার করিলে, তুরস্কের সুলতান 'খলিফা' উপাধিটী গ্রহণ করেন বটে কিন্তু উহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত কোন বিশেষ অভিজাত শ্রেণী সৃষ্টি করিবার প্রয়াস একেবারেই করেন নাই।

সকল সাম্রাজ্যকেই জাতিবিশেষ বা শ্রেণীবিশেষের বাহুবল ও বুদ্ধিমত্তার উপর আত্মনির্ভর করিতে হয়। উন্নতিশীল সকল সাম্রাজ্যই একটী বিশিষ্ট দলের মুখপাত্র হইয়া তাহার শক্তি বিকাশ করে। তুরস্কের সুলতানগণ এই শক্তি অর্জ্জন করিবার জন্য পুরাতন মিশরীয় প্রথা অবলম্বন করেন। প্রাচীন মিশর জাতি পরাজিত দেশসমূহ হইতে বুদ্ধিমান বালক-গণকে সংগ্রহ করিয়া আনিয়া মিশরীয় প্রথায় শিক্ষাদান করিয়া ভবিষ্যতে তাহাদিগকে রাজ্যের বিশেষ শক্তিরূপে পরিণত করিয়া লইতেন। তুরস্কের সম্রাটগণ নানা বিভিন্নজাতি ও জনপদের অধীশ্বর হইয়া উহাদিগকে চিরকালের জন্য পদানত রাখিবার মানসে তাহাদের মধ্য হইতে শক্তিমান যুবকগণকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া রাজকার্য্য ও যুদ্ধ-বিদ্যা শিক্ষা দিতেন। ইহাদিগকে জেনা-সেরিদ বলা হইত। এই জেনাসেরিদগণ জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সংগৃহীত হওয়ায়, তাহাদের মধ্যে কোন প্রকার সংকীর্ণতা একেবারেই দেখা যাইত না। যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারিলেই জেনাসেরিদগণের যে কেহ তুরস্কের প্রধান সচিব অবধি হইতে পারিতেন বলিয়া, কোনরূপ সংকীর্ণতা তাহাদের মনের মধ্যে আদপেই স্থান পাইত না। এই জেনাসেরিদগণের বাহুবল ও বুদ্ধিমত্তার উপর নির্ভর করিয়াই ভবিষ্যতে তুরস্ক সাম্রাজ্য বহু শাখা-প্রশাখায় সুশোভিত হইয়া প্রকাণ্ড মহীরুহে পরিণত হয়।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইউরোপ শতভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। তথায় আর্থিক ও রাজনৈতিক সমস্যা অপেক্ষা ধর্ম্মসংক্রান্ত ব্যাপারই ক্রমশঃ মারাত্মক হইয়া দাঁড়াইতেছিল। রোমান ক্যাথলিক ও প্রোটেষ্টাণ্ট খৃষ্টীয় ধর্ম্মের দুইটি শাখা। এই উভয়দলের বিরোধ ও বৈরীভাব ক্রমশঃ এমনি উগ্রভাবে আত্মপ্রকাশ করিতেছিল যে, উহাদের কলহের মীমাংসা করিয়া দিবার জন্য একটি নিরপেক্ষ শক্তির একান্ত প্রয়োজন হইয়া উঠে। তুর্কীর সম্রাটগণ স্বয়ং মুসলমান হইলেও ধর্ম্মসংক্রান্ত কোন প্রকার গোঁড়ামী তাহাদের ছিল না। পরাজিত খৃষ্টান জাতিগণকে তাঁহারা সকল সময়েই সকল প্রকার উদারতা প্রদর্শন করিবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। বিদেশীয় বাসিন্দাগণকে তুর্কী নানাপ্রকার বিশেষ সুবিধা প্রদান করিতেন। তাহারা যাহাতে স্ব স্ব জাতিগত আইন-কানুন কর্ত্তৃক শাসিত হইতে পারে, সে বিষয়ে তুর্কীর সম্রাটগণের বিশেষ নজর ছিল। এই জন্যই যেখানে প্রটেষ্টাণ্টগণ রোমান ক্যাথলিকগণের গলা টিপিয়া ধরিতেছিল কিম্বা রোমান ক্যাথলিকগণ প্রটেষ্টানদিগকে একান্ত বন্য পশুর ন্যায় হত্যা করিতেছিল, সেখানে উদার মতাবলম্বী তুর্কী শাসন, শান্তি ও সাম্যতার বার্ত্তা বহন করিয়া আনায় অনেক খৃষ্টান-জাতিই এই তুর্কী শাসনকে ভগবানের আশীর্ব্বাদ হিসাবে শির নত করিয়া মানিয়া লইয়াছিল। খুব অল্পসময়ের মধ্যে তুরস্ক সাম্রাজ্য যে অসম্ভব রূপ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল, ইহাই তাহার এক প্রধান কারণ।

তুর্কীর সুলতান প্রথম মহম্মদ একজন দেশ-বিজয়ী বীর ছিলেন। তাঁহার শাসনকালের মধ্যেই সার্ভিয়া এথেন্স, মোরিয়া, এজিন দ্বীপপুঞ্জ, ওয়ালেফিয়া, হারজেগো-ভেনিয়া ও বেলনিয়া তুরস্ক সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। ভেনিসের সহিত সংঘর্ষ হইবার উপক্রম হইলে, সুলতান মহম্মদ তাঁহার সৈন্য সামন্ত সংগ্রহ করিতে ব্যস্ত হয়েন কিন্তু ঠিক সেই সময়ে তাঁহার মৃত্যু হওয়ায় ইটালীর রাজ্যগুলি রক্ষা পাইয়া যায়।

সুলতান মহম্মদের মৃত্যুর পর তুরস্কের রাজদণ্ড লইয়া তাঁহার পুত্রদ্বয়ের মধ্যে ভীষণ ভ্রাতৃ-বিরোধ ঘটে। মহম্মদীয় উত্তরাধিকারতত্ত্ব খুব স্পষ্টভাবে বিধিবদ্ধ না থাকায়, মুসলমান সমাজে এইরূপ জ্ঞাতিদ্রোহ পৃথিবীর সর্ব্বত্রই সংঘটিত হইয়াছে। কিছুদিনের সংঘর্ষের পর জ্যেষ্ঠপুত্র বজাজেদ কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে পরাস্ত ও নিহত করিয়া শাসনদণ্ড গ্রহণ করেন। তিনি সর্ব্বাংশেই পিতার অনুপ-যুক্ত পুত্র ছিলেন। যুদ্ধ অপেক্ষা শান্তিই তাঁহার প্রিয় ছিল। সমরক্ষেত্র তাঁহার অপ্রিয় হওয়ায়, হেরামের

বিলাস কক্ষগুলিকেই তিনি শ্রেয়ঃ বলিয়া স্থির করেন। দুর্দ্ধর্ষ তুর্কীজাতির হৃদয় হইতে রণোল্লাস তখনও দূরীভূত হয় নাই। তাহাদের রণ-তৃষ্ণা তখন অবধি পূর্ব্ববং প্রবল থাকায় এই শান্তিপ্রিয় সম্রাট তাহাদের চক্ষুশূল হইয়া উঠেন। সাম্রাজ্যের স্তম্ভস্বরূপ জেনাসিরিদগণ যুদ্ধবিগ্রহের মধ্য দিয়া আত্মোন্নতি করিতে পারিত বলিয়া তাহারা যুদ্ধ-বিগ্রহের কামনা করিত। অবশেষে এই যুদ্ধপ্রিয় জাতি সুলতানের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যভাবে বিদ্রোহ ঘোষণা করিলে, সম্রাটের জ্যেষ্ঠপুত্র প্রথম সেলিম উপাধি গ্রহণ করিয়া পিতাকে রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য করেন। ১৫১২ সালে তুরস্ক সম্রাট প্রথম সেলিম পিতৃপরিত্যক্ত তুরস্ক-মসনদে আরোহণ করেন। পিতামহের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া নূতন সম্রাট দেশ-বিজয় করিবার জন্য সমস্ত মন-প্রাণ নিয়োগ করিলেন। অতি অল্পসময়ের মধ্যেই তুরস্ক বাহিনী পারশ্যকে পরাস্ত করিয়া মেসোপটামিয়ায় তুরস্ক-শাসন প্রবর্ত্তন করে। মেসোপটামিয়া একটি বহু পুরাতন রাজ্য। ইতিহাস প্রসিদ্ধ বাবিলন, আসেরিয়া এই রাজ্যেরই অন্তর্গত। এইখানেই আরব্যোপন্যাস বর্ণিত খালিফগণ রাজত্ব করিতেন। তাহার পর তুরস্কের বিজয়-বাহিনী মিশর দেশে প্রবেশ করিয়া উহাও তুরস্ক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লয়। ১৫২০ খৃষ্টাব্দে এই দিক-বিজয়ী বীরের মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র সলিমান দি মাগনিফিসেন্ট তুর্কীর সিংহাসনে আরোহণ করেন।

সুলতান সলিমান ১৫৬৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়েই তুর্কী সাম্রাজ্য উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হয়। তিনি ভেনিসের সাধারণতন্ত্রকে পরাস্ত করিয়া তাহাদের অধিকৃত ভূমধ্যসাগরস্থিত দ্বীপগুলি তুরস্কের অধিকারভুক্ত করিয়া লয়েন। সমস্ত গ্রীসদেশে তাঁহার শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। প্রাচীন অষ্ট্রীয়া সাম্রাজ্য ধ্বংস করিবার জন্য তিনি একদল সৈন্য প্রেরণ করিয়া সুপ্রসিদ্ধ রাজধানী ভিয়েনা নগরী অবরোধ পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু বিধাতার বিধানে তুর্কী সৈন্য পরাজিত হইয়া যায়। এইখানে সুলতানের বাহিনী সফলকাম হইতে পারিলে পৃথিবীর ইতিহাস আজ অন্য প্রকার আকার ধারণ করিত।

সলিমান ও তাঁহার বংশধরগণ আপনাদিগকে তিনটি মহাদেশ ও দুইটি সমুদ্রের সর্ব্বময় অধীশ্বর বলিয়া ঘোষণা করিতেন। এইরূপ গর্ব্ব করিবার কারণও যথেষ্ট ছিল। এশিয়া মহাদেশে সমগ্র এশিয়া মাইনর, আর্ম্মেনিয়া, আরব, প্যালেষ্টাইন, সিরিয়া, জেড্ডা ও মেসোপটামিয়া তুরস্ক সম্রাটের শাসনাধীন ছিল। আফ্রিকায় মিশর, ত্রিপোলী, টিউনিস ও মরক্কো সুলতানের শাসন মানিয়া লইয়াছিল। ইউরোপ মহাদেশে সার্ভিয়া, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া, বোসনিয়া, হারদিগোভিনিয়া, গ্রীস ও এজিন দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি জনপদগুলিতে তুর্কী শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। ভূমধ্য সাগর ও লোহিতসাগরে সুলতানের প্রভুত্ব এরূপ সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠালাভ করে যে কালক্রমে এই পথ দিয়া যে ব্যবসা-বাণিজ্য সংঘটিত হইত উহা তুরস্কের বণিকগণের করতলগত হইয়া যাওয়ায় ভেনিসের বণিকগণ তাহাদের নিকট হইতেই প্রাচ্যের পণ্য খরিদ করিয়া পশ্চিম ইউরোপে বিক্রয় করিতেন।

তুরস্ক সাম্রাজ্যের পতন

উন্নতি ঘটিলেই পতনও একদিন অবশ্যম্ভাবী হইয়া দাঁড়ায়। এই সনাতন প্রথানুযায়ী সুপ্রসিদ্ধ তুরস্ক সাম্রাজ্যও কাল পরিবর্ত্তনের সহিত ধ্বংসের পথে আসিয়া দাঁড়াইতে লাগিল।

তুরস্কের সুলতানগণ যে পরিমাণে দুর্ব্বল হইয়া পড়িতে লাগিলেন, ঠিক সেই পরিমাণেই জেনাসিরিজগণের ক্ষমতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সুলতান তৃতীয় সেলিম সৈনিকগণের ক্ষমতা হ্রাস করিবার বিশেষ চেষ্টা করিলেও সফলকাম হইতে পারেন নাই। এদিকে জেনাসিরিজগণ অধিকতর প্রভুত্ব প্রিয় হইয়া উঠায় তাহারা সুলতানের পর সুলতান পরিবর্ত্তন করিয়া চলিল। সুলতান তৃতীয় সেলিমের মৃত্যু হইলে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র চতুর্থ মুস্তাফা নাম গ্রহণ করিয়া তুরস্কের মসনদে আরোহণ করেন। সৈন্যগণের মনস্তুষ্টি সম্পাদন করিতে অকৃতকার্য্য হওয়ায় অবাধ্য সৈন্যগণ তাঁহাকে হত্যা করিয়া তাঁহারই এক ভ্রাতাকে উক্ত মসনদ প্রদান করে। নূতন সুলতান দ্বিতীয়

মহম্মদ সৈনিকগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হওয়ায় একেবারেই তাহাদের হস্তের ক্রীড়নক হইয়া পড়েন।

সম্রাটকে গৃহবিবাদে ব্যস্ত থাকিতে দেখিয়া তুরস্ক-শাসিত প্রদেশগুলির শাসনকর্ত্তাগণও একে একে স্বাধীনতা ঘোষণা করিবার পন্থা অনুসরণ করিতে লাগিলেন। মিশরের শাসনকর্ত্তা মহম্মদআলী ক্রমশঃ প্রবল হইয়া এশিয়া মাইনর পর্য্যন্ত আক্রমণ করেন। মোলডেভিয়া ও ওয়ালিচিয়ার শাসন কর্ত্তাগণ নিজেরা মুসলমান হইলেও স্বাধীন নৃপতি হইবার বাসনায় রাশিয়ার শরণাপন্ন হয়। উত্থানের সময় তুরস্কের সুলতান-গণ জেনাসিরিজদের উপরেই সর্ব্বতোভাবে নির্ভর করিয়া-ছিলেন। এই জেনাসিরিজগণ বিদ্রোহ করিলে তাহা-দিগকে দমন করিতে পারে এমন কোন শক্তিই রাজ্য মধ্যে না থাকায় সমস্ত রাজশক্তি কালক্রমে এই জেনাসেরিজগণের করতলগত হইয়া যায়। এই ক্ষমতা বংশগতভাবে অধিকারভুক্ত করিবার মানসে, নূতন নূতন জেনাসিরিজ সংগ্রহ করিবার প্রথা একেবারে লোপ করিয়া দিয়া তাহারা উহা কুলগত বলিয়া বিধিবদ্ধ করিয়া লয়। রাজ্যের তাবৎ উচ্চপদগুলি আপনাদের মধ্যে বণ্টন করিয়া লইয়া কুলগত করিয়া লওয়ায় জেনাসিরিজদের মধ্যে যে কর্ম্মদক্ষতা ও উদারতা দেখা যাইত, তাহা একেবারেই লুপ্ত হইতে থাকে। এই জন্যই অর্থ ও সম্মান লাভ করিবার জন্য পরাধীন জাতিগুলির উপর অত্যাচার করা এখন হইতে আরম্ভ হয়! রেশারেশি বৃদ্ধির সহিত জাতিগত পার্থক্যও স্পষ্টতর হইয়া উঠিতে থাকে। দক্ষিণ ইউরোপের অধিকাংশ জাতিই আর্য্যবংশ সম্ভূত। তুর্কীগণ মঙ্গলীয় বংশজাত। তাহাদের ধর্ম্ম ও আচার ব্যবহার সেমিটিক সভ্যতা হইতে গৃহীত হইয়াছিল। এই বিভিন্নমুখী সভ্যতা দুইটীর মধ্যে কলহ বৃদ্ধির সহিত পার্থক্যও বেশ স্পষ্টভাবেই আত্ম-প্রকাশ করিতে থাকে। পরাধীন সম্রাট সর্ব্বতোভাবে কতকগুলি জেনাসিরিজ পরিবারের মুখাপেক্ষী হইয়া পড়ায় ন্যায় ও সুবিচার চিরদিনের জন্য তুরস্ক হইতে বিদায় গ্রহণ করে।

জাতীয়তার অভিব্যক্তির সহিত ইউরোপের শক্তিপুঞ্জ তুরস্ককে চিরদিনের জন্য ইউরোপীয় মহাদেশ হইতে বিদায় করিয়া দিবার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়েন। রাশিয়ার জারগণ এই সমস্ত বিদ্রোহীদের নেতা হইয়া যথেষ্ট উৎসাহ প্রদান করিতে লাগিলেন। ঠিক এই সময়ে গ্রীস স্বাধীনতা ঘোষণা করিলে, ইউরোপের তাবৎ শক্তিই প্রকাশ্যে বা পরোক্ষে গ্রীসকে তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য সাহায্য করিতে লাগিল। এই গোল-যোগের সময় জেনাসিরিজগণের উপর নির্ভর করা কোনরকমেই যুক্তিসঙ্গত নহে বিবেচনা করিয়া সুলতান ঐ প্রথা একেবারে উঠাইয়া দিয়া ইউরোপীয় প্রথায় সৈন্যদলগঠন করিবার প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি আধুনিক যুদ্ধ-বিদ্যায় সুশিক্ষিত ও বর্ত্তমান অস্ত্র শস্ত্রে সুশোভিত আড়াই লক্ষ সৈন্যও সংগ্রহ করেন। রাশিয়া বা খৃষ্টান শক্তি-পুঞ্জের সহিত সংঘর্ষ উপস্থিত হইলে, গৃহ শত্রুগণকে দমন করিতে পারিবেন না কিম্বা হয়ত তাহাদেরই প্রাধান্য ঘটিতে পারে, এই আশঙ্কায় সুলতান রাশিয়াকে কৃষ্ণ সমুদ্রের উপর তাহার আধিপত্য স্বীকার করিয়া লইয়া উহার সহিত সখ্যতাসূত্রে আবদ্ধ হয়েন। মোরেভিয়া, সার্ভিয়া ও ওয়ালেচিয়া প্রভৃতি প্রদেশগুলি বিদ্রোহ ঘোষণা করিলে তাহাদিগকে কতকটা স্বাতন্ত্র প্রদান করিয়া তুরস্কের করদরাজ্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লয়েন। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্স ও ইংলণ্ডকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য গ্রীসের স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লন। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় মহম্মদ দেহত্যাগ করিলে, তাঁহার পুত্র আবদুল মজিদ তুরস্কের গদিতে আরোহণ করেন। এই সময়েই তুরস্কের সহিত রাশিয়ার আবার ভীষণ যুদ্ধ বাঁধিয়া উঠে। ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের মধ্যস্থতায় এই বিরোধের অবসান হইলেও, রাশিয়া তুরস্ককে ইউরোপ হইতে বিতাড়িত করিয়া দিয়া কনষ্টান্টী-নোপলে রাশিয়ার পতাকা উত্তোলন করিতে দৃঢ়সংকল্প করেন। তুরস্ক সাম্রাজ্যের মধ্যে যে বিদ্রোহানল তাহার পিতার জীবদ্দশায় ধূমায়মান মাত্র ছিল, এখন তাহা বহ্নি আকার ধারণ করিলে, সুলতান ভীত হইয়া রাশিয়ার সহিত মিত্রতা করিবার জন্য বিশেষ ব্যস্ত

হইয়া পড়েন। ক্রমশঃ সমস্ত দানিউব প্রদেশ রাশিয়ার হস্তে অর্পণ করিয়া উহার সহিত একটী আপোষ করিয়া লয়েন। মোলডেভিয়া ও ওয়ালেচিয়া রাশিয়ার নেতৃত্বে স্বাধীনতা ঘোষণা করিলে, সুলতান উহাদিগকে স্বাধীনতা প্রদান করেন। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে সুলতান আবদুল মজিদের মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র আবদুল আজিজ তুরস্কের সুলতান হ'ন। তাঁহার অভিষেকের সহিত তুর্কীশাসিত বুলগেরিয়া, বোসনিয়া, হারজোগোভেনিয়া, ক্রিয়েট প্রভৃতি প্রদেশ গুলিতে দাবানলের ন্যায় বিদ্রোহ বহ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলে তুর্কী-সৈন্যগণ তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া সুলতান বংশের একব্যক্তিকে দ্বিতীয় আমুরাস উপাধি প্রদান করিয়া ওসমানবংশের রাজতক্ত প্রদান করে। এই হতভাগ্য সুলতান সিংহাসনে পদার্পণ করিবা মাত্রই সৈন্যগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাসিত হ'ন। বিদ্রোহী সৈনিক-গণ তখন পদচ্যুত সুলতান আমুরাসের এক ভ্রাতাকে দ্বিতীয় আবদুল হামিদ উপাধি প্রদান করিয়া তুরস্কের মসনদ প্রদান করে। তুরস্কের এই অন্তর্বিপ্লব উপলক্ষ করিয়া রাশিয়ার সম্রাট রুমানিয়ার মধ্য দিয়া কনষ্টানটী-নোপল দখল করিয়া লইবার জন্য এক বিরাট বাহিনী প্রেরণ করিলেন। অন্তঃসারহীন তুরস্ক-সাম্রাজ্যের এমন শক্তি ছিল না যে এই বাহিনীর গতিরোধ করিতে পারে। কনষ্টানটীনোপল রাশিয়ার করতলগত হইলে ইউরোপের দক্ষিণে শ্লাভ জাতির প্রাধান্য বৃদ্ধি পাইবে এই আশঙ্কায় ইংলণ্ড ও ফ্রান্স বহু কষ্ট স্বীকার করিয়া পতনোন্মুখ তুরস্ক সাম্রাজ্যকে মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা করেন।

এতদিন অবধি তুরস্ক সাম্রাজ্য খৃষ্টান ইউরোপের চক্ষুশূল ছিল। রাশিয়া ধীরে ধীরে তাহার অধিকার বৃদ্ধি করিয়া লইয়া যখন তুরস্ক সাম্রাজ্যকে দুর্ব্বল করিয়া দিতেছিল, পশ্চিম ইউরোপের জাতিবৃন্দ তাহাতে অনেকটা উল্লাস প্রকাশ করিয়া আসিতেছিল। কিন্তু ইউরোপের মানচিত্র হইতে তুরস্কের নাম একেবারে মুছিয়া দিলে ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে রাশিয়ার প্রাধান্য বৃদ্ধি পাইবে, এই আশঙ্কায় ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও জার্ম্মানি তুরস্কের স্বার্থরক্ষা করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে তুর্কী সাম্রাজ্যকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে এক সন্ধিপত্র প্রণয়ন করা হয়। এই সন্ধি অনুযায়ী তুরস্ককে সর্ভিয়া, রুমানিয়া এবং বুলগেরিয়াকে স্বাধীন রাজ্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে হয় এবং বোসনিয়া ও হারজোগোভিনিয়া নামক প্রদেশ দুইটীকে অষ্ট্রীয়ার হস্তে অর্পণ করিতে হয়। এসিয়া মাইনরস্থিত বাটুম ও কারস নামক প্রদেশ দুইটীকে রাশিয়ার হস্তে ছাড়িয়া দিতে হয়। ইহা ব্যতীত ইংলণ্ডের সহিত তুরস্কের এক স্বতন্ত্র সন্ধি স্থাপিত হয়। এই সন্ধি সর্ত্তানুযায়ী তুরস্ক নিজের অধীনস্থ প্রদেশে শাসন সংস্কার করিবার প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন এবং ইংলণ্ড তুরস্ক-সাম্রাজ্যের অবশিষ্ট রাজ্যগুলি রক্ষা করিবার জন্য অঙ্গীকার করেন। এই সন্ধিরই একটী সর্ত্ত অনুসারে ভূমধ্যসাগরস্থিত সইপ্রাস দ্বীপটী ইংলণ্ডকে প্রধান করিতে হয়।

নবীন তুরস্ক (Young Turks)

দেশের এই পতনোন্মুখ অবস্থা একদল তুর্কী-যুবককে বিশেষ ব্যথিত করে। তাহারা স্বদেশকে রক্ষা করিবার জন্য একটী নূতন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে, তাহার নাম রাখা হয় নবীন তুরস্ক। ম্যাটিসিনির আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া তাহারা তুরস্কের তাবৎ জাতিগণের নিকট সংঘবদ্ধ হইয়া এক জাতিতে পরিণত হইবার জন্য সানুনয় নিবেদন জ্ঞাপন করে। এই দলের নেতাগণ সকলেই সৈন্যদলের অধিনায়ক ছিলেন। তুরস্কের সুলতানগণ পরাজিত খৃষ্টান ও ইহুদি জাতিগণকে কখনই সৈন্য শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইতে দিতেন না। এইজন্য ব্যবসা-বাণিজ্য তাহাদের হস্ত ন্যস্ত থাকায় তাহারা ক্রমশঃই বিত্তশালী হইয়া উঠিতে থাকে। তুর্কীর নেতাগণ উপর্য্যুপরি আত্ম-দ্রোহে ক্রমশঃই নিঃস্ব হইয়া পড়িতে থাকে। রাজধানীর বিশেষ বিশেষ স্থানে আড্ডা গাড়িয়া বিদেশী বণিকগণ বিস্তারিত ভাবে আপনাদের কারবারের শাখা-প্রশাখা দেশের মধ্যে বিস্তারিত করিয়া দিবার ফলে তুরস্কের নেতৃগণের আর্থিক অবস্থা ক্রমশঃই ভীষণ শোচনীয়

হইয়া দাঁড়ায়। দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া জেতা তুর্কীরাজপুরুষ-গণ বিজিত জাতিগুলির উপর অর্থের জন্য বিবিধ অত্যাচার করা আরম্ভ করিলে তুর্কীর শাসনের যে সুনাম ছিল তাহা চিরকালের জন্য অন্তর্হিত হইয়া যায়।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি তুরস্ক সাম্রাজ্যে কোন অভিজাত শ্রেণী ছিল না। "বে" "পাশা" ইত্যাদি সম্মান সূচক উপাধি প্রচলন থাকিলেও উহারা অনেকটা রাজ-কর্ম্মচারীদের পদবী মাত্রই ছিল। উহাদের সহিত আভিজাত্যের কোন গন্ধ ছিলনা। তুর্কীজাতি তুরস্কে বসবাস করিবার পূর্ব্বে আরবের বেদুইনদের মতন অনেকটা যাযাবরী করিয়া বেড়াইতে বলিয়াই উহাদের সমাজে কোন প্রকার বদ্ধমূল সংস্কার বা প্রথা ছিল না। আরবের নিকট ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেও সনাতনী ইসলাম ধর্ম্মের সহিত তুরস্কের মুসলমান ধর্ম্মের অনেকটা পার্থক্য লক্ষিত হইত। বলপূর্ব্বক কাফেরদিগকে মুসলমান ধর্ম্মে দিক্ষিত করিবার জন্য তুর্কীরা কখনই চেষ্টা করে নাই। আচার-ব্যবহারে তুর্কীরা চিরকালই সাম্যবাদী ছিল। সাম্রাজ্যের পতনোন্মুখ অবস্থায় সম্রাটগণ দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণের মধ্যে কেহ কেহ কিছু কিছু অর্থ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইলেও প্রকৃতপক্ষে ধনী সম্প্রদায় তাহাদের মধ্যে ছিলনা বলিলেও কোনরূপ অত্যুক্তি করা হইবে না। জেনাসিরিজের প্রভুত্ব শেষ হইলে তুরস্কের নবীন সেনা নায়কগণ তুরস্ক-সাম্রাজের কর্ণধার হইয়া দাঁড়াইল। পাশ্চাত্য শক্তি পুঞ্জের সংস্পর্শে আসিয়া এবং পাশ্চাত্য শিক্ষায় সুশিক্ষিত হইয়া এই নবীন সেনানায়ক মণ্ডলী সর্ব্বাংশেই ইউরোপীয় ভাবাপন্ন হয়েন। রাশিয়ার নিকট পরাস্ত হইয়া এবং রাশিয়াকে তাহাদের চিরশত্রু জ্ঞানে উহার ক্ষমতার হ্রাস করিবার উদ্দেশ্যেই 'নূতন তুরস্ক' দল সংঘটন করেন। এই দলের সহিত সম্রাটের কোন সম্বন্ধ না থাকিলেও এই নূতন দলকে অঙ্কুরেই বিনাশ করিবার জন্য সম্রাট পক্ষ হইতে কোন প্রকার উদ্যোগই করা হয় নাই। জাতীয়তার অভিব্যক্তি হিসাবে তুর্কীফেজ এই দল কর্তৃকই প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়।

পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষা উচ্চ রাজকর্ম্মচারীদের মধ্যে আবদ্ধ থাকায় এবং তুর্কী জনসাধারণ অজ্ঞ এবং নিরক্ষর হওয়ায় উন্নতিশীল দলের ধ্যান ধারণার সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিবার ক্ষমতা সাধারণ তুর্কী প্রজার একেবারেই ছিলনা। এই জন্যই জাতীয়তা-আন্দোলন খুব প্রবল ভাবে পরিচালিত হইলেও সমস্ত দেশমধ্যে উহা ছড়াইয়া পড়িতে পারিল না। তুর্কীর যুবক সেনানায়কগণ উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া মহান ধারণা হৃদয় মধ্যে পোষণ করিতেন, তাঁহাদের অধীনস্থ সৈন্যগণ তাহার কোন আস্বাদই উপভোগ করিতে পারিত না। এই জন্য এই আন্দোলন মাত্র শিক্ষিতদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিয়া যায়, ব্যাপক ভাবে সমগ্র দেশ মধ্যে কখনও ছড়াইয়া পড়ে নাই।

সুলতান আবদুল হামিদের অনেকগুলি সদ্‌গুণ ছিল। তিনি দেখিতে যেমন সুপুরুষ ছিলেন, তেমনি বিচক্ষণ ও সুবিবেচকও ছিলেন। সেনানায়কগণ তাঁহার উর্দ্ধতন দুইজন সুলতানকে উপর্য্যুপরি সিংহাসন হইতে নামাইয়া দিয়াছিল বলিয়া তিনি তাঁহাদিগকে অন্তরে অন্তরে অত্যন্ত ভয় করিতেন। প্রধান সচিব সাদাৎ পাশাকে সমস্ত চক্রান্তের মূল কারণ স্থির করিয়া সুলতান সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই তাঁহাকে কারারুদ্ধ করেন। তথায় তাঁহার মৃত্যু হয়। ১৮৭৬ সালের সন্ধি অনুযায়ী ইংলণ্ডের আদর্শে তুরস্ককে নূতন পার্লামেণ্ট প্রদান করিবার কথা হইয়াছিল! উক্ত পার্লামেণ্ট দুই একবার ডাকা হইলেও পাছে সমস্ত ক্ষমতা উহার হস্তে ন্যস্ত হইয়া পড়ে এই আশঙ্কায় তিনি পার্লামেণ্ট তুলিয়া দিয়া অতি সন্তর্পনে স্বহস্তে রাজ্যশাসন ভার গ্রহণ করেন। জন সাধারণের মধ্যে তুরস্কের সম্রাট ভগবানের অবতাররূপে এখনও পূজিত হওয়ায় এই সমস্ত পরিবর্ত্তনে তাহারা কোন প্রকারই অসন্তোষ প্রকাশ করিল না। দুই চারিজন উচ্চ রাজকর্ম্মচারী যাহারা সম্রাটকে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিতে দেখিয়া ক্রুদ্ধ হ'ন, কিন্তু অপরাপর সঙ্গিদের সহানুভূতি না পাইয়া নীরবেই উক্ত রোষ হৃদয় মধ্যে লুকাইয়া রাখিতে বাধ্য হয়।

কামালের বাল্যকাল

১৮৮০ খৃষ্টাব্দে সালোনিকার নিকট একটি নিভৃত পল্লীতে কামাল জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম আলিরেজা যে এবং মাতার নাম জুবেদা হানুম। তুর্কীজাতি পারিবারিক গৌরব অপেক্ষা tribe বা দলের গৌরবকেই অধিক সম্মান প্রদান করিত বলিয়া, কামালের পূর্ব্বপুরুষগণের কোন বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না। অনুসন্ধানে যতদূর জানিতে পারা গিয়াছে তাহাতে এই অবধি বুঝিতে পারা যায় যে কামালের পূর্ব্বপুরুষগণ এশিয়া মাইনর প্রদেশস্থিত অনাটোলিয়া প্রদেশে বসবাস করিতেন এবং কৃষিই তাঁহাদের একমাত্র জীবিকা ছিল। কামালের পিতা হইতে দুই তিন পুরুষ পূর্ব্বে কেহ সালোনিকায় আসিয়া বাস সুরু করেন। কামালের পিতা পাশ্চাত্য শিক্ষায় স্বয়ং সুশিক্ষিত না হইলেও উক্ত শিক্ষার প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি ও অগাধ বিশ্বাস ছিল। তিনি অন্তরের সহিত বেশ বুঝিয়াছিলেন যে, সমাজে প্রচলিত সনাতনী প্রথাগুলি প্রাচীন কালের জীবন-যাত্রার জন্য সবিশেষ উপযোগী হইলেও বর্ত্তমান যুগে উহারা বিশেষত্বহীন হইয়া যাওয়ায় একেবারেই উদ্দেশ্যহীন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। উন্নতশীল তুর্কীর মস্তক যখন রাশিয়ার নিকট অবনত হইয়া পড়ে তখন তুর্কীকে সর্ব্বাংশে ইউরোপের শিক্ষায় সুশিক্ষিত করিয়া তুলিবার জন্য যে সমস্ত নেতা বদ্ধপরিকর হ'ন, আলবেগ তাঁহাদেরই একজন হইবার ইচ্ছায় উক্ত দলে যোগদান করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার কার্য্য করিবার ক্ষমতা অল্প হওয়ায় এবং অবসরও যথেষ্ট না থাকায় ইচ্ছানুযায়ী কর্ম্ম করিবার সুবিধা বা সুযোগ করিয়া লইতে পারেন নাই।

তুর্কীরা সকলেই রাজকার্য্যকে সম্মানজনক জ্ঞান করিত বলিয়া, আলি বেগও প্রথম জীবনে কাষ্টম হাউসে সামান্য চাকুরী গ্রহণ করিয়াছিলেন। তখনকার প্রথানুযায়ী বেতন অল্পই ছিল, কিন্তু উৎকোচ গ্রহণ করিবার যথেষ্ট অবসর ছিল। আলিবেগ উৎকোচ গ্রহণ করাকে হৃদয়ের সহিত ঘৃণা করিতেন বলিয়া সামান্য বেতনেই কোনরূপে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। পুত্রের বয়োবৃদ্ধির সহিত তাহাকে পাশ্চাত্য শিক্ষায় সুশিক্ষিত করিয়া তুলিবার দারুণ উচ্চাশা হৃদয় মধ্যে উদিত হওয়ায় আলিবেগ সম্মান জনক রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া লাভজনক কাঠের ব্যবসা আরম্ভ করেন। ব্যবসান্তর গ্রহণ করায় বাস্তবিকই অর্থস্বচ্ছলতা ঘটে। আলিবেগ তুর্কীর রাজকর্ম্মচারিদের ন্যায় পোষাক-পরিচ্ছদে বাবু ছিলেন। তিনি সর্ব্বদাই ইউরোপীয় পোষাকে সজ্জিত হইয়া থাকিতে ভাল বাসিতেন। এই জন্য তাঁহার ব্যয়ও যথেষ্ট হইত।

কামালের মাতা জুবেদা হানুম একেবারে প্রচীনকালের মুসলমান মহিলা ছিলেন। তাঁহার ধর্ম্মে যেরূপ অগাধ ভক্তি ছিল, সন্তানগণের প্রতি স্নেহও সেইরূপ প্রগাঢ় ছিল। পতিপ্রাণা জুবেদা স্বামীকে সাক্ষাৎ দেবতা বলিয়া জ্ঞান করিতেন এবং তাঁহার মনস্তুষ্টির জন্য সর্ব্বদাই যত্ন করিতেন। তুরস্কে অবরোধ প্রথা তখন খুব প্রবল ছিল। প্রকাশ্য রাজপথে কোন তুরস্ক মহিলাই বিনা 'বরখায়' চলাচল করিতে সাহস করিতেন না। সন্ধ্যার পর কোন রমণীকেই রাজপথে বা নগর-উদ্যানগুলিতে দেখিতে পাওয়া যাইত না।

জুবেদা হানুম দেখিতে সুন্দরী ছিলেন। তাঁহার মাত্র একটি পুত্র ও একটি কন্যা হওয়ায় তিনি উভয়কেই যথেষ্ট আদর ও যত্ন করিবার সুযোগ ও সুবিধা পাইয়াছিলেন। স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য কামালের মাতার মুখকে সর্ব্বদা আবৃত করিয়া রাখায় হাস্যের লাস্য তাঁহার বদন-মণ্ডলে কখনই ভাসিয়া না উঠিলেও, ঐ গাম্ভীর্য্যের মধ্যে এমন মনোমুগ্ধকর এক মাধুর্য্য ছিল যাহা কামালের বাল্যকালকে মধুময় করিয়া রাখিয়াছিল। সে সময় কোন মুসলমান রমণীরই শিক্ষা-গ্রহণ করিবার সুবিধা ছিল না, কাজেই কামালের মাতাও নিরক্ষরা ছিলেন।

সুলতান হামিদ পার্লামেণ্ট আহ্বান করা বন্ধ করিয়া দিলেও পাশ্চাত্য শিক্ষা যাহাতে দেশমধ্যে প্রচলন করিতে পারা যায়, তাহার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করিতেন না। পাছে আপনার সার্ব্বভৌম শক্তির

হ্রাস হয়, এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া নবীন তুরস্কের দলকে দেশ-মধ্যে শির-উত্তোলন করিয়া আত্মপ্রকাশ করিবার অবসর প্রদান না করিলেও, তুরস্কের যুবকগণকে প্রত্যেক বৎসর ইউরোপের বিভিন্ন দেশগুলিতে প্রেরণ করিয়া নূতন শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া আনাইতেন। পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রদান করিবার জন্য দুই-একটি বে-সরকারী শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠিত হইলে তিনি তাহাদিগকে অর্থ সাহয্য করিতেন। আধুনিক শিক্ষায় সুশিক্ষিত করিয়া তুলিবার জন্য সৈনিকগণের একটি সামরিক স্কুল ও কলেজ স্থাপন করেন। উক্ত বিদ্যালয় ও কলেজের তাবৎ ব্যয়ই সম্রাট বহন করিতেন।

কামালের পিতা কামালকে ঐ রূপ একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে প্রবিষ্ট করাইয়া অকালে প্রাণত্যাগ করেন। বিধবা জুবেদা হানুম পুত্র-কন্যা লইয়া সহরে বাস করিতে গেলে অর্থাভাব ঘটিবে এই আশঙ্কায়, নগরের বাসস্থান তুলিয়া দিয়া এক সুদূর পল্লীতে কোন আত্মীয়ের আশ্রয়ে গমন করেন। এই ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের সহিত কামালের শিক্ষালাভ করাও স্থগিত হইয়া যায়।

জুবেদার আশ্রয়দাতা একজন বর্দ্ধিষ্ণু কৃষক ছিলেন। সহরের হুজুগ বা রাজনীতি তাঁহার নিকট বাতুলতা-মাত্র বলিয়া প্রতীয়মান হইত! কামালকে আপন আয়াত্তাধীনে পাইয়া তাহাকে একজন বিত্তশালী কৃষক করিবেন বলিয়া স্থির করেন। বাল্যকাল হইতেই কামাল বাক্যসংযমী ও নির্জ্জনতাপ্রিয় হওয়ায়, পল্লীর নিভৃত মাঠগুলিতে বসিয়া যথেষ্ট ভাবিবার ও চিন্তা করিবার সুযোগ লাভ করিলেন। পল্লীর শ্রী ও শান্তি তাঁহার হৃদয়ে মোহ আনিতে না পারিলেও খানিকটা শান্তি আনিয়া দিয়াছিল। দিনের পর দিন চলিয়া গেল, চাষীর কার্য্য তাহার উপযুক্ত পেশা নয় এইরূপ অভিযোগ করিতে কামালকে কোনদিন কাহারও নিকটেই শুনা গেল না।

জুবেদা হানুম কিন্তু স্বামীর অভিপ্রায় বিশেষরূপেই অবগত ছিলেন। কোনরকমে সামান্য অর্থ সংগ্রহ করিয়া কামালকে একদিন আপনার সন্নিধানে আহ্বান করিয়া বলেন যে সে সহরে জুবেদা হানুমের কোন আত্মীয়ার নিকট থাকিয়া অধ্যয়ন করুক, ইহার জন্য যে অর্থ প্রয়োজন হইবে তিনি তাহা সংগ্রহ করিয়া দিবেন। উচ্চাশী কামালের নিকট এই অনুরোধ দেবতার বরের ন্যায়ই প্রতীয়মান হইয়াছিল। তিনি আর একদিনও অপেক্ষা না করিয়া শহরে তাঁহার মাতার আত্মীয়ার গৃহে উপস্থিত হন এবং একটি বে-সরকারী বিদ্যালয় যেখানে ইউরোপীয় প্রথায় শিক্ষাদান করা হয়, সেখানে ভর্ত্তি হ'ন।

কামালের ছাত্র-জীবন

কামাল যে স্কুলে প্রবেশ করিয়া অধ্যয়ন সুরু করিলেন, উহা একটী সাধারণ প্রতিষ্ঠান, সরকার পক্ষের সহিত তাহার কোন সংশ্রবই ছিল না। কামাল মেধাবী ছাত্র ছিলেন, কিন্তু সাধারণের সহিত চলাফেরা করিবার বা সহপাঠীদের সহিত প্রাণ খুলিয়া কথাবার্ত্তা কহিবার শক্তি তাঁহার একেবারেই ছিল না। সুবিধা বা সময় পাইলেই কামাল কোন নির্জ্জনস্থানে বসিয়া গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া পড়িতেন। দেশের দুরবস্থার কথা তাঁহার হৃদয়ে শেলসম বিদ্ধ হইত। তাঁহার কোন সহযোগী কামালকে সর্ব্বদাই এইরূপ চিন্তামগ্ন অবস্থায় থাকিতে দেখিয়া উপহাস করিয়া বলিয়াছিল, "তুমি সর্ব্বদাই কি চিন্তা কর? আমি দেখিতেছি তুমি তুর্কীর সুলতান না হইয়া ছাড়িবে না।"

এই বিদ্যালয়ে কামালের শিক্ষা সম্পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই একটী দুর্ঘটনা ঘটিয়া গেল। কামাল একদিন তাহার কোন সহপাঠীর সহিত মনোমালিন্য হওয়ায় তাহাকে মারপিট করিয়া বসেন। আরবী শিক্ষক গরীব কামালের স্কন্ধে তাবৎ দোষ অর্পণ করিয়া সমস্ত ক্লাশের সম্মুখে কামালকে অত্যন্ত অপমানকর ভাবে শাস্তি প্রদান করেন। তখন কামালের বয়স মাত্র বার বৎসর। কিন্তু মানাপমান জ্ঞান তখনই তাঁহার খুব প্রবল ছিল। সাজা লইবার সময় কামাল প্রকাশ্যে কোন প্রকার বিদ্রোহী ভাব না দেখাইলেও গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া তিনি স্থির করেন যে, সুদূর পল্লীতে খামারের কুলী-

জীবনও এইরূপ বর্ব্বরতার অপেক্ষা অনেক অংশেই শ্রেয়। ক্রমশঃ যেখানে ন্যায়-অন্যায় বিচার পাওয়া যায় না সেইরূপ ঘৃণ্যকর পাপজনক স্থানে আর কাল অতিবাহিত করিবেন না বলিয়া দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হ'ন।

অনেক সময় দেখা যায় যে দুর্য্যোগের মধ্য দিয়াই সুখ-সুবিধা আসিয়া থাকে। এই ক্ষুদ্র শহরের নগণ্য বিদ্যালয়ে কামাল যোগ্যতার সহিত উত্তীর্ণ হইলে ভবিষ্যতে হয়ত কেরাণী জীবনকেই বরণ করিয়া লইতে হইত। ভাবী যোদ্ধা কামালকে প্রকৃত পথে পরিচালিত করিবার জন্যই বোধ হয় অদৃষ্ট তাহার সহিত এইরূপ নির্দ্দয় ব্যবহার করিলেন। কামাল পোষাক-পরিচ্ছদে সুশোভিত সেনানিগণকে দেখিয়া ঐরূপ সুসজ্জিত হইবার আশা বহুদিন হইতেই হৃদয়ে পোষণ করিয়া আসিতেছিলেন। স্নেহময়ী জননী একমাত্র পুত্রকে চক্ষের অন্তরাল করিতে যথেষ্টই কষ্ট অনুভব করিতেন। কামাল সৈন্যদলে প্রবেশ করুক এইরূপ ইচ্ছা কামাল-জননীর কোন দিনই ছিল না। মাতার নিকট অনুমতি ভিক্ষা করিতে গেলে ব্যর্থ-মনোরথ হইবেন ইহা স্থির জানিয়া, সৈন্যদলে প্রবেশাধিকার লাভ করিবার জন্য কামাল তাঁহার এক পিতৃ-বন্ধুর শরণাপন্ন হ'ন। এই ভদ্রলোকটী বহুদিন সৈন্যদলে খুব যোগ্যতার সহিত কাজ করিয়াছিলেন। তাঁহারই সাহায্যে কামাল মনিষ্টারের সামরিক বিদ্যালয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবার অনুমতি লাভ করেন। পরীক্ষায় যথেষ্ট সুখ্যাতির সহিত উত্তীর্ণ হইয়া কামাল মাতার বিনা অনুমতিতেই সমর-বিদ্যালয়ে সেনা-নায়কদের শিক্ষা গ্রহণ করিবার জন্য প্রবেশ করিলেন। যথা সময়ে এই কথা কামাল-জননীর কর্ণ-গোচর হইলে ফিরাইয়া আনিবার আর কোন সুবিধা নাই এবং এইরূপ করিতে গেলে পুত্র ব্যথিত হইবে এই আশঙ্কায় তিনি সম্মতিই প্রদান করিলেন। এই স্থলে কামালকে কোন প্রকার ব্যয়ই প্রদান করিতে হইত না। কেননা উহার তাবৎ খরচাই সরকার কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইত। সামান্য হাতখরচ বা নাগরিকদের পোষাক পরিচ্ছাদাদি খরিদ করিবার যে সামান্য অর্থের প্রয়োজন হইত, কামাল তাঁহার মাতার নিকট হইতে পাইতে লাগিলেন। উপায় নাই দেখিয়া জুবেদা হানুম পত্যন্তর গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার বর্ত্তমান স্বামীর কোন পুত্র সন্তান না থাকায় এবং অবস্থাও বেশ স্বচ্ছল হওয়ায় কামাল-জননী তাঁহার পুত্রকে বেশ ভালভাবেই সাহায্য করিতে লাগিলেন।

অর্থকষ্ট দূরীভূত হওয়ায় এবং সহযোগীদের সহিত সমান ভাবে জীবন-যাপন করিবার অবসর পাইয়া কামাল তাঁহার সমস্ত মন পাঠের উপর বিশেষ ভাবে সন্নিবেশ করেন। অল্পদিনের মধ্যে মহাবীর নেপলিয়নের ন্যায় কামালের গণিত শাস্ত্রে অসাধারণ ধী-শক্তি প্রকাশ পাইল। গণিতের অধ্যক্ষ তাঁহার উপর এতদূর সন্তুষ্ট হ'ন যে তিনিই তাঁহাকে 'কামাল' বা শ্রেষ্ঠ এই উপাধি প্রদান করেন। সময়ে সময়ে এই তরুণ ছাত্রকে তাঁহারই সহযোগীদের অধ্যাপনা কার্য্যে নিযুক্ত করা হইত। প্রতিভার পরিচয় দিবার উপযুক্ত অবসর পাইয়া কামাল তাহার সদব্যয়ই করিয়া চলিলেন। কালক্রমে সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষায় বিশেষ সুখ্যাতির সহিত উত্তীর্ণ হইয়া মাত্র অষ্টাদশ বৎসর বয়সে কাপ্টেন উপাধি লাভ করিয়া কামাল রাজধানী কন্‌ষ্টানটীনোপলের সর্ব্বোচ্চ সামরিক শিক্ষালয়ে সর্ব্বোচ্চ সামরিক শিক্ষা গ্রহণ করিবার অধিকার লাভ করিলেন।

কনষ্টানটীনোপল

কনষ্টানটীনোপল সহরটী ইউরোপ ও এশিয়া এই উভয় মহাদেশের সন্ধিস্থলে অবস্থিত। এই জন্যই বিংশ শতাব্দির প্রারম্ভেই প্রাচ্য ও প্রতীচ্য এই দুই সভ্যতার সমন্বয়ে এখানে এক অপূর্ব্ব ভাবের সৃষ্টি হইয়াছিল। তুর্কীদের সহরের নাম ছিল ইস্তাম্বুল, কন্‌ষ্টানটীনোপল খৃষ্টানদের শহর ছিল। এশিয়া মহাদেশের অধিবাসী আরব, আর্ম্মেনিয়ান, সিরীয়ান; ইউরোপ মহাদেশীয় শ্লাভ, রোমেনিয়ান, ইটালিয়ান, টিউটন প্রভৃতি জাতি-বৃন্দ এবং আফ্রিকা মহাদেশের নানা প্রকার জাতির সংমিশ্রণে এই প্রাচ্য শহরটী এক অপূর্ব্ব আকার ধারণ করিত। তুর্কীগণের মাথায় ফেজ থাকিত বলিয়া

অপরাপর জাতিগণ হইতে তাহাদিগকে পৃথক করিয়া চিনিতে পারা যাইত।

তুর্কী জাতির বিশিষ্ট ও সম্ভ্রান্ত অধিবাসিগণ এই শহরেই বসবাস করিতেন। সুলতান হামিদ তাঁহার পূর্ব্বতন সম্রাটগণের পদচ্যুতির কথা কখনই বিস্মৃত হইতে না পারায় কাহারও উপরে বিশ্বাস স্থাপন করিতে সাহস পাইতেন না। এই জন্যই সুলতানের গুপ্তচর সর্ব্বত্রই ঘুরিয়া বেড়াইত। উচ্চ রাজ-কর্ম্মচারিগণ মূল্যবান পোষাক-পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া খুব জাঁক-জমকের সহিত বাস করিলেও ভয় ও সন্দেহ সর্ব্বদাই তাঁহাদের হৃদয় আন্দোলিত করিয়া তুলিত! সামান্য মাত্র কারণে এবং কোন গুপ্তচরের গুপ্ত ইঙ্গিতে কোন ফকীর যেমনি একদিনেই কোন ওমরাহ হইতে পারিত তেমনি বহু পুরাতন ও বিশ্বাসী ও জনপূজ্য ওমরাহ ঐরূপ সামান্য কারণেই সকল প্রকার সম্মান হইতে চ্যুত হইয়া একদিনেই নির্ব্বাসিত হইয়া যাইত।

শিক্ষিত তুর্কীগণের মধ্যে ঠিক এই সময়েই 'নবীন তুরস্ক' সম্প্রদায়টী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, হামিদের মসনদের উপর তাহাদের কোন লক্ষ্য না থাকিলেও শাসন-সংস্কার করিবার জন্য তাঁহারা বদ্ধপরিকর হ'ন। এই প্রতিষ্ঠানে সমস্ত শিক্ষিত তুরস্ক রাজপুরুষগণ বিশেষ আগ্রহ সহকারে যোগদান করিয়াছিলেন। পারিস ও বার্লিন নগরী এই দলের প্রধান কর্ম্মক্ষেত্র ছিল। দেশের যে সমস্ত উচ্চ পদস্থ রাজকর্ম্মচারী সুলতানের খেয়াল অনুযায়ী পদচ্যুত বা অপমানিত হইতেন, তাঁহারাই উহার কার্য্যকরী সভায় দক্ষতার সহিত কার্য্য পরিচালন করিতেন।

তুর্কী সুলতানের আবাসস্থানের নাম ছিল 'নক্ষত্র প্রাসাদ।' এই প্রাসাদটী একটী বড় নগর ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। উহার মধ্যে নানা প্রকার বাগিচা, বড় বড় রাজপথ, অসংখ্য ছোট ছোট প্রাসাদ, ঝরণা, থিয়েটার, বায়স্কোপ ইত্যাদি অবস্থিত ছিল। তুর্কী সম্রাটের ভোজ্য প্রস্তুত করিবার জন্য প্রত্যহ আটশত বাবুর্চ্চিকে মেহনৎ করিতে হইত। পৃথিবীর নানা স্থান হইতে শ্রেষ্ঠা সুন্দরিগণকে সংগ্রহ করিয়া সেরাগলিও বা তুরস্ক রাজের হেরামের কক্ষগুলি সুশোভিত করা হইয়াছিল। স্বয়ং সম্রাট এই বিস্তৃত প্রাসাদের প্রাণ ছিলেন। সর্ব্বত্রই তাঁহার দৃষ্টি প্রখর ছিল। সামান্য একটী ছুঁচ পড়িয়া গেলেও ঐ সংবাদ তাঁহার কর্ণে গিয়া পৌঁছাইত।

সুলতান হামিদ বিশেষ বুদ্ধিমান ও বিবেচক ছিলেন। কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সহিত তাঁহার ক্রমশঃই মতিভ্রম ঘটিতে থাকে। তুর্কীর যুবকগণকে ইউরোপের বিবিধ দেশে প্রেরণ করিয়া নানা প্রকার বিদ্যায় তাহাদিগকে শিক্ষিত করিয়া তুলিবার জন্য তিনি অকাতরে অর্থব্যয় করিতেন সত্য কিন্তু ঐ সমস্ত যুবক দেশে প্রত্যাগমন করিয়া পঠিত বিদ্যাকে কার্য্যকরী করিবার জন্য প্রয়াস পাইলেই তাঁহাদিগকে শত্রুজ্ঞান করিয়া তাঁহাদের বিরুদ্ধাচরণ করিতেন। দেশের মধ্যে সভ্যতার যন্ত্রস্বরূপ মোটর বা ইলেট্রিক প্রচলন করিতে তিনি যথেষ্ট সহায়তাই করেন কিন্তু সমস্ত প্রকৃতপুঞ্জকে সেই সপ্ত-শতাব্দীর আইন-কানুনে বাঁধিয়া রাখিবার জন্য পরিশ্রম করিতে দ্বিধা বোধ করিতেন না। সময়ের গতি কিরূপ দ্রুত পরিবর্ত্তিত-হইতেছে, সভ্যতাও একস্তর হইতে অন্যস্তরে কিরূপ চলিয়াছে এই সমস্ত সংবাদ সুলতানের নিকট অবিদিত না থাকিলেও শাসনসংস্কার বা আধুনিক বিজ্ঞান মধ্য যুগের ধ্যান-ধারণা নষ্ট করিয়া দিয়া খলিফা-সুলতানের সার্ব্বভৌম ক্ষমতার হ্রাস করিয়া দিতে পারে, এই ধারণার বশীভূত হইয়া পাশ্চাত্য শিক্ষাকে খর্ব্ব করিয়া রাখিবার জন্য তিনি প্রাণ-পণ চেষ্টা করিতেন। সৈনিকগণ আধুনিক সামরিক শিক্ষাপ্রাপ্ত না হইলে ইউরোপীয় শক্তি-পুঞ্জের নিকট তাহারা একান্ত ক্রীড়নক মাত্র হইয়া যায় এইজন্য তাহাদিগকে সর্ব্বতোভাবে সুশিক্ষিত করিতে তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা থাকিলেও সর্ব্ব প্রকার কুসংস্কার ধ্বংসকারী বিজ্ঞানকে তিনি প্রাধান্য দান করিতে একেবারেই প্রস্তুত ছিলেন না। বরং লুপ্ত ও ধ্বংসোন্মুখ প্রথাগুলির পুনরোদ্ধার আশায় জেড্ডার সহিত খুব ঘনিষ্ঠভাবে সংলগ্ন হইবার আশায় নূতন একটি রেলপথ উন্মুক্ত করেন। খলিফা যে তাবৎ মুসলমান-দেরই নমস্য এবং গুরু এইমত প্রচার করিবার জন্য বৃত্তিভোগী প্রচারক নিযুক্ত করেন। কাজেই সম্ভবের সহিত অসম্ভবের মিল করিয়া দিতে গেলে যেরূপ হাস্যাস্পদ হইতে হয়, বিজ্ঞান ও বর্ত্তমান সভ্যতার সহিত পুরাতন সনাতনীকে সংযুক্ত করিতে যাইয়া সুলতান আবদুল হামিদকে ও সেইরূপ উপহাসের পাত্র হইতে হইয়াছিল।

ক্রমশঃ

ব্যবসা বাণিজ্য

ভারতীয় বণিক সমিতির পঞ্চম অধিবেশনে সভাপতি মিঃ জামাল মহম্মদের অভিভাষণ :—

দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে ভারতীয় বণিক সমিতি সঙ্ঘের ৫ম বার্ষিক ধিবেশনে সঙ্ঘের সভাপতি মিঃ জামাল মহম্মদ উপস্থিত ছিলেন না লিয়া মিঃ বালচাঁদ হীরাচাঁদ তাঁহার লিখিত বক্তৃতা পাঠ করেন। এই ক্তৃতায় তিনি বলেন,—

সমবেত ভদ্রমহোদয়গণ, আমি আপনাদিগকে সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন রিতেছি। ১৯৩১ সাল নানাদিক দিয়াই গুরুত্বব্যঞ্জক ঘটনাপূর্ণ। থমেই গান্ধী-আরুইন চুক্তির কথা মনে পড়ে। শাসনতন্ত্র রচনার তিহাসে ইহা একটি বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা। এই চুক্তির ফলে গোল-টবিল বৈঠকের দ্বিতীয় অধিবেশনে মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেসের একমাত্র তিনিধিরূপে যোগদান করেন।

আপনারা জানেন, আমাদের এই সঙ্ঘ ভারতীয় শিল্প-বাণিজ্যের পক্ষ ইতে স্যার পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাস, মিঃ বিড়লা ও আমাকে গোল-টবিল বৈঠকের প্রতিনিধি মনোনীত করিয়াছিলেন। লণ্ডনে মহাত্মা ান্ধীর সংস্পর্শে থাকিয়া আপনাদের প্রতিনিধিগণ শিল্প-বাণিজ্য সংক্রান্ত বষয়গুলির আলোচনা বিশেষভাবে লক্ষ্য করেন। এই সময় অকস্মাৎ রটিশ গবর্ণমেণ্টের সম্মুখে এক দারুণ অর্থসঙ্কট উপস্থিত হয়। ইহার তিকারকল্পে এক জরুরী মন্ত্রিসভা গঠন করা হয়। বৃটিশ রাজনীতিক-ণ তখন স্বদেশের সমস্যা লইয়াই বিব্রত হইয়া পড়েন। ইতিপূর্ব্বে াঁহারা ভারতীয় সমস্যা সমাধানে বিশেষ অবহিত হইয়াছিলেন বটে, কন্তু অকস্মাৎ অর্থসঙ্কট উপস্থিত হওয়ায় শেষ পর্যন্ত তেমন মনোযোগের াহিত ভারতীয় সমস্যার আলোচনা করা সম্ভবপর হয় নাই। যুক্তরাষ্ট্র ঠন কমিটি এবং সংখ্যা লঘিষ্ঠ কমিটীর কাজে নানা বিঘ্ন ঘটিয়াছিল। ংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় সম্পর্কিত সমস্যার সমাধান না হওয়ায় শিল্প-বাণিজ্য ংক্রান্ত গুরুতর সমস্যার আলোচনা সরলভাবে হইতে পারে নাই। বঠক প্রায় শেষ হইয়া আসিলে অত্যন্ত তাড়াতাড়ি এই সমস্ত বিষয় আলোচনা করা হইয়াছে। সেই সময় লক্ষ্য করা গিয়াছিল যে, বিস্তৃত ভাবে এই সমস্ত জটিল সমস্যার আলোচনা করিবার অবসর কিম্বা ইচ্ছা বৃটীশ রাজনীতিকগণের নাই। কারণ, তাঁহারা তখন স্বদেশের সমস্যা লইয়াই বিব্রত হইয়াছিলেন।

এই সমস্ত বিষয় আলোচনা করিলে আমার মনে হয়, যেভাবে গোলটেবিল বৈঠকের কাজ শেষ হইয়াছে, তাহাতে নিরাশ হইবার কারণ নাই। অবশিষ্ট কাজগুলি যথাযথভাবে সম্পন্ন করিলে শেষপর্য্যন্ত গোলটেবিল বৈঠকের সন্তোষজনক পরিণতির সম্ভাবনা আছে।

আপনারা জানেন যে, গোলটেবিল বৈঠক কর্ত্তৃক নিযুক্ত বিভিন্ন কমিটির কাজ চলিতেছে। কিন্তু দেশের এখন যে অবস্থা, তাহাতে ধীরভাবে কোন বিষয় বিবেচনা করা সম্ভবপর নহে। গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক দমননীতি অবলম্বন, একটীর পর আর একটি করিয়া অর্ডিন্যান্স জারী এবং এই সমস্ত অর্ডিন্যান্স অতিশয় কঠোরতার সহিত কার্য্যে প্রয়োগ করার ফলে দেশে এক অনিশ্চিত অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। এরূপ উত্তেজনা ও চাঞ্চল্যের মধ্যে ব্যবসায় বাণিজ্যের উন্নতি হইতে পারে না। বিভিন্ন দেশের মধ্যে বন্ধুত্ব ও সহানুভূতির ভাব জাগ্রত না হইলে ব্যবসায়-বাণিজ্য অচল হয়। আমি তাই আশা করি, শাসন সংস্কার সংক্রান্ত গুরুতর বিষয়ের মীমাংসা করিবার প্রাক্কালে গবর্ণমেণ্ট আপোষের নীতি অবলম্বন করিবেন। এবৎসরের অন্যান্য ঘটনার কথা আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে আমি গোলটেবিল বৈঠকে উত্থাপিত দুই একটী সমস্যার কথা উল্লেখ করিতে চাই।

বৃটিশ পার্লামেণ্ট বলেন যে, কয়েকটা সর্ত্তাধীনে জনসাধারণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত জনৈক মন্ত্রীর হস্তে দেশের অর্থ ব্যবস্থার ভার দেওয়া হইবে। তাঁহাদের মতে এরূপ না করিলে, ভবিষ্যতে ভারতের অর্থনৈতিক মর্য্যাদা হ্রাস পাইবে। আমরা ইহার কারণ বুঝিনা। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক মনোনীত একজন মন্ত্রী যদি অর্থ ব্যবস্থার পরিচালক হন, তাহা হইলেই তিনি এদেশের মর্য্যাদা রক্ষার বিশেষ যত্নবান্ হইবেন, আর দেশীয় মন্ত্রী তেমন যত্নবান্ হইবেন না, ইহা আমারা বিশ্বাস করি না। বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের আসল উদ্দেশ্য ইহা নয়, প্রকারান্তরে তাঁহারা এদেশের অর্থব্যবস্থার কর্ত্তৃত্ব হাতে রাখিতে ইচ্ছা করেন।

একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি, ইংলণ্ডে স্বর্ণমান পরিত্যক্ত হওয়ার পর ভারত গবর্ণমেণ্ট এদেশের স্বার্থরক্ষার জন্য অর্ডিন্যান্স জারী করিয়া স্বর্ণবিক্রয়ের দায়িত্ব হইতে সকলকে অব্যাহতি দেন। কিন্তু কয়েক দিন না যাইতেই ভারতসচিব ইহাতে হস্তক্ষেপ করেন এবং

ভারতসরকারের নীতি উল্টাইয়া দিয়া পাউণ্ডের সহিত টাকাকে গাটছড়া বাঁধিয়া দেওয়া হয়। বৃটনের স্বার্থের খাতিরে কিরূপে এদেশের স্বার্থ বিসর্জ্জন করা হয়, ইহা তাহারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

আর একটী প্রয়োজনীয় বিষয় হইল—ব্যবসা-বাণিজ্যে অধিকার ভেদ। বিদেশীকে এদেশবাসীর সমান অধিকার দেওয়া হইবে না এরূপ একটা কথা উঠিয়াছে। আমার মনে হয়, আসল উদ্দেশ্য তাহা নহে। ভবিষ্যতে এদেশের আর্থিক উন্নতির জন্য যে কোন ন্যায় সঙ্গত ব্যবস্থা করিবার অধিকার আইন সভার থাকিবে, ইহাই ব্যবসায়-বাণিজ্যে অধিকার ভেদের মূল কথা। আমি এই সুযোগে, বৃটিশ ব্যবসায়ীদিগকে বলিতেছি, এদেশের ভবিষ্যৎ গবর্ণমেণ্টকে বিশ্বাস করা তাঁহাদের কর্ত্তব্য। এইরূপ বিশ্বাসের দ্বারা প্রকৃতপক্ষে তাঁহারা বন্ধুত্ব ও সহানুভূতির ভাব বর্দ্ধিত করিবেন। তাহাতেই উভয় দেশের ব্যবসায়-বাণিজ্য উন্নতি লাভ করিবে।

গোলটেবিল বৈঠকে নিযুক্ত পরামর্শ সমিতির আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে দেখিতে পাই,—রেলওয়ে বোর্ডকে আইন দ্বারা গঠিত একটী স্থায়ী বোর্ডে পরিণত করা উচিত। ভারতের নানাস্থানে যাতায়াত করা এবং জিনিষপত্রাদি প্রেরণ করার পক্ষে রেলপথ একটী প্রধান উপায়। শিল্পবাণিজ্যের উন্নতিকল্পে জিনিষপত্র এক স্থান হইতে অপর স্থানে প্রেরণ করা অত্যাবশ্যক। সুতরাং এই রেলপথের উপর দেশের উন্নতি অনেকখানি নির্ভর করে। নূতন শাসনতন্ত্রের আমলে যানবাহন ও চলাচল বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী দ্বারা এই সমস্ত রেলপথ পরিচালিত হইবে। সেইরূপ ব্যবস্থা করাই সর্ব্বথা বাঞ্ছনীয়। তাহা না করিয়া এখনই রেলওয়ে বোর্ডকে আইন দ্বারা কায়েম করিবার প্রস্তাব অত্যন্ত অদ্ভুত বলিয়া মনে হয়। বর্ত্তমান বৎসরের ঘটনাবলীর আলোচনা করিতে গিয়া আর্থিক অনটনের কথাই মনে পড়ে। মধ্যে মধ্যে একটু আশার উদ্রেক হইলেও তাহা স্থায়ী হয় নাই।

এবার সর্ব্বত্র ব্যয়-সঙ্কোচ কমিটি গঠিত হইতে দেখা গিয়াছে। এই কমিটিগুলি আপনাদের সঙ্ঘের সহিত পত্রালাপ করিয়াছিলেন। নানা প্রকার প্রস্তাব করা হইয়াছিল। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত দেখা গেল, গবর্ণমেণ্ট কিছুই করিতে রাজী নহেন।

ভারত-সচিব কর্ত্তৃক পাউণ্ড ও টাকার সম্পর্ক স্থায়ী রাখার ব্যবস্থা হওয়ায় এদেশ হইতে প্রচুর স্বর্ণ রপ্তানী হইয়াছে এবং হইতেছে। ১৯৩১ সালের সেপ্টেম্বর হইতে ১৯৩২ সালের ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত প্রায় ৫০ কোটী টাকার স্বর্ণ বিদেশে গিয়াছে। লাভ করিবার জন্য এদেশের লোক স্বর্ণ বিক্রয় করে না। অন্যান্য দেশের মত এদেশে ব্যাঙ্কের সুবিধা নাই। সুতরাং এদেশে কেহ সোনা মজুত করিয়াও রাখে না। এদেশের যাহা কিছু সোনা তৎসমস্তই গহনা। এই গহনা স্ত্রীধন। সহজে লোকে ইহা বিক্রয় করে না। নিতান্ত দায়ে পড়িয়াই এই শেষ সম্বলটুকু তাহারা হাতছাড়া করে। এদেশ হইতে সোনা চলিয়া যাইতেছে, ইহাতেই দেশের আর্থিক দুর্গতির কথা প্রমাণিত হইতেছে।

গবর্ণমেণ্টকে অনেক বলা হইয়াছে। তথাপি তাহারা ইহা বন্ধ করিতেছেন না। ইহার পরিণাম ভাল হইবে না। কেবল ভাল হইবে না, তাহাই বলিতেছি। এই ভারতবর্ষে পৃথিবীর এক-পঞ্চমাংশ লোক বাস করে। ক্রমাগত স্বর্ণ-রপ্তানী করিয়া তাহারা যদি কপর্দ্দকহীন দরিদ্র হইয়া যায়, তাহা হইলে পৃথিবীর নানা দেশের উৎপন্ন পণ্য কে ক্রয় করিবে? ভারতবাসী দরিদ্র হইলে পৃথিবীর শিল্প-বাণিজ্যের ভবিষ্যৎ নষ্ট হইবে।

পরিশেষে আমি কৃষকদের অবস্থার প্রতি গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। উৎপন্ন জিনিষের দাম কমিয়া গিয়াছে। কিন্তু রেল ও জাহাজের ভাড়া কমে নাই। জিনিষপত্র এক স্থান হইতে অন্য স্থানে প্রেরণ করিবার সুবিধা করিয়া না দিলে কৃষিজীবীদের অবস্থার উন্নতি হইবে না। ভূমির রাজস্ব সম্পর্কেও বিবেচনা করিতে হইবে। সাময়িক ভাবে রাজস্ব হ্রাস অথবা মজুর করিলে চাষীদের স্থায়ী উপকার হয় না। বর্ত্তমান অবস্থার প্রতি সামঞ্জস্য রাখিয়া রাজস্বের পরিমাণ হ্রাস করিতে হইবে।

বড়ই দুঃখের বিষয় যে, ভারত গবর্ণমেণ্ট এখনও আয়ব্যয়ের সমতা রক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই। নূতন ট্যাক্স এবং সার ট্যাক্স ইত্যাদি দ্বারাও ঘাটতি পূরণ হয় নাই। এই বৎসরের শেষে প্রায় ১৩ কোটি টাকা ঘাটতি পড়িবে। সামরিক ব্যয় হ্রাস করা এবং শাসনকার্য্যের ব্যয়—বিশেষভাবে কর্ম্মচারীদের বেতন হ্রাস করা একান্ত প্রয়োজন। এদেশে যে সৈন্য রাখা হয়, তাহা দ্বারা বৃটেন অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিলেণ্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা কেনিয়া এবং পূর্ব্ব আফ্রিকার ম্যাণ্ডেট প্রাপ্ত রাষ্ট্রসমূহের উপকার হয়। সুতরাং এই সেনাবাহিনীর ব্যয়ভার কেবল ভারতের ঘাড়ে না চাপাইয়া উপরোক্ত দেশগুলির উপরও আংশিকভাবে চাপান উচিত।

বর্ত্তমান নীতির পরিবর্ত্তন চাই :—

ভারতীয় সম্মিলিত বণিক সভার শেষ অধিবেশনে নিম্নোক্ত প্রস্তাবটি গৃহীত হইয়াছে :—এই ফেডারেশন মনে করেন যে, বিগত গোলটেবিল বৈঠকে যে সমুদায় আলোচনা হইয়াছে, তাহা মোটেই সন্তোষজনক বা জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণের পক্ষে হিতকরী নহে। এই সম্বন্ধে ফেডারেশন প্রস্তাব করিতেছেন যে, সরকার পক্ষ হইতে বর্ত্তমান নীতির পরিবর্ত্তন, ভারতীয় অর্থ-নৈতিক স্বাতন্ত্র্য, রক্ষাকবচ ব্যবসাবাণিজ্যের অধিকার সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং অর্থনৈতিক সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রশ্নাবলী সম্বন্ধে ও ব্যবসা বাণিজ্যের অধিকার এবং অর্থনৈতিক রক্ষাকবচ সম্পর্কিত প্রশ্নাবলী সম্বন্ধে বিশেষরূপে আলোচনা করার পূর্ব্ব অধিকার পরামর্শ কমিটীকে

দিতে হইবে ; উক্ত বিষয়গুলি সম্বন্ধে বিবেচনা করিবার জন্য সমান সংখ্যক ব্রিটিশ ও ভারতীয় কয়েকজন উপযুক্ত সভ্য লইয়া এক কমিটী গঠন করিতে হইবে। অবশ্য ভারতীয় সভ্যবৃন্দ এরূপ হওয়া চাই, যাঁহাদের উপর ফেডারেশন সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারেন।

স্বর্ণ-রপ্তানি ও করবৃদ্ধি :—

গত ১৯শে মার্চ্চ মাদ্রাজে দক্ষিণ-ভারত বণিক সভার বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনে, মিঃ জামাল মহম্মদ সভাপতির অভিভাষণে ভারতের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে বলেন যে, বহু দেশে স্বর্ণের অভাবেই জগৎব্যাপী অর্থসঙ্কট সূচিত হয়। বর্ত্তমান আর্থিক দুরবস্থার দিনে যখন প্রত্যেক দেশেই নিজের স্বর্ণ-ভাণ্ডার পূর্ণ রাখিবার চেষ্টা করিতেছে, তখন ভারতের পুরুষপরম্পরায় সঞ্চিত স্বর্ণ বিদেশে চলিয়া যাইতেছে। স্বর্ণ-রপ্তানী বন্ধ করিবার একান্ত আবশ্যকতা পরিষ্কার-রূপে ভারত-গবর্ণমেণ্টকে বলা হইয়াছে, কিন্তু তথাপি যে গবর্ণমেণ্ট তাহাতে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করিতেছেন না, ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। লোকে অর্থাভাবের পীড়নে সোনা বিক্রয় করিতেছে, কিন্তু সে স্বর্ণ ভারতের বাহিরে যাইতে না দেওয়াই গবর্ণমেণ্টের উচিত। উপরন্তু "রিজার্ভ ব্যাঙ্ক" গঠনের জন্য স্বর্ণ সঞ্চয় অত্যাবশ্যক। সুতরাং জনসাধারণের বিক্রীত স্বর্ণ গবর্ণমেণ্টের কিনিয়া মজুত করা উচিত। ষ্টার্লিংএর তুলনায় টাকার মূল্য নির্দ্ধারণ ব্যবস্থার নিন্দা করিয়া মিঃ জামাল মহম্মদ বলেন যে, এই ব্যাপারে স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া ও অন্য কয়েকটী দেশের দোহাই দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু একথা মনে রাখা আবশ্যক যে, ঐ সকল দেশ স্বেচ্ছায় নিজেদের সুবিধার জন্য নিজেদের মুদ্রাকে পাউণ্ডের সহিত সংযুক্ত করিয়াছে। কিন্তু ভারতে বর্ত্তমান অবস্থায় এইরূপ কৃত্রিম বাট্টা-নীতি অত্যন্ত ক্ষতি করিতেছে। বর্ত্তমানে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক করবৃদ্ধির সম্পর্কে তিনি বলেন যে, দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর হইতে যখন বোঝা কমান অত্যাবশ্যক, তখন এইরূপ করবৃদ্ধি অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। গবর্ণমেণ্ট অবশ্য ব্যয়হ্রাস করিয়াছেন, কিন্তু করবৃদ্ধির পরিবর্ত্তে আরও অনেক ব্যয়হ্রাস করা গবর্ণমেণ্টের উচিত। দেশকে বাঁচাইবার জন্য এই আর্থিক দুরবস্থার সময় শ্রমশিল্প ও ব্যবসাবাণিজ্যের বোঝা সর্ব্ব-প্রকারে হাল্কা করাই একমাত্র কর্ত্তব্য।

ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য :—

ব্রিটিশ ভারতের ফেব্রুয়ারী মাসের আমদানি রপ্তানির হিসাবে দেখা যায় যে, জানুয়ারী মাসের তুলনায় আমদানী ও রপ্তানি উভয়ই হ্রাস পাইয়াছে। ফেব্রুয়ারী মাসে ৯ কোটী ২৫ লক্ষ টাকার মাল আমদানী হইয়াছে, অর্থাৎ জানুয়ারী মাসের তুলনায় ৯৮ লক্ষ টাকা হ্রাস পাইয়াছে। রপ্তানির পরিমাণ ১২ কোটী ৩৮ লক্ষ টাকা, অর্থাৎ জানুয়ারীর তুলনায় ৮২ লক্ষ টাকা কম। ১৯৩১ সালের ফেব্রুয়ারীর তুলনায় এবৎসর ফেব্রুয়ারী মাসে খাদ্যদ্রব্য, পানীয় এবং তামাকের আমদানী ১ কোটী ২০ লক্ষ টাকা হ্রাস পাইয়া ১ কোটী ৪০ লক্ষ টাকায় দাঁড়াইয়াছে। কারখানাজাত পণ্যের আমদানী ১ কোটী ২৩ লক্ষ টাকা হ্রাস পাইয়া ৬ কোটী ১৯ লক্ষ টাকায় এবং কাঁচা মালের আমদানী ১৭ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইয়া ২ কোটী ১২ লক্ষ টাকায় পৌঁছিয়াছে। চিনি, খাদ্য শস্য, ময়দা মদ্য এবং সিগারেট প্রভৃতির আমদানীর হ্রাস পাওয়ার ফলেই খাদ্য-দ্রব্য প্রভৃতির খাতে আমদানী এত কম হইয়াছে। গত বৎসর ফেব্রুয়ারী মাসে ২ কোটী ১০ লক্ষ টাকায় ৯৬ হাজার টন জাভা চিনি আসিয়াছিল। এবৎসর আসিয়াছে ৪৯ লক্ষ টাকায় ৩৮ হাজার টন। বীট চিনি ও মূল্য হিসাবে ২৫ লক্ষ টাকা এবং ওজনে ২২ হাজার টন হ্রাস পাইয়াছে। সিগারেটের আমদানী ওজনে ৩ লক্ষ ৩৯ হাজার পাউণ্ড হইতে হ্রাস পাইয়া ৪৯ হাজার পাউণ্ডে এবং মূল্যে ১৩ লক্ষ টাকা হইতে হ্রাস পাইয়া মাত্র ২ লক্ষ টাকায় নামিয়াছে। মদ্যের আমদানী পরিমাণে ৮ লক্ষ ১২ হাজার গ্যালন হইতে ৪ লক্ষ ১৪ হাজার গ্যালনে এবং মূল্য হিসাবে ৪২ লক্ষ টাকা হইতে হ্রাস পাইয়া ১৭ লক্ষ টাকায় নামিয়াছে। কাঁচা মালের মধ্যে কেরোসিনের আমদানী ৪০ লক্ষ টাকা হইতে ৬৭ লক্ষ টাকায় উঠিয়াছে। কারখানাজাত মালের মধ্যে সূতা ও সূতি জিনিষের আমদানী ২২ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। মোটর গাড়ীর আমদানী ২৬ লক্ষ টাকা এবং মোটর বাসের আমদানী ১৭ লক্ষ টাকা হ্রাস পাইয়াছে। রপ্তানি দ্রব্যের মধ্যে চাউলের পরিমাণ ১ লক্ষ ৪৬ হাজার টন হইতে ২ লক্ষ ৪১ হাজার টনে —মূল্য হিসাবে ১ কোটী ২৯ লক্ষ টাকা হইতে ১ কোটী ৯৬ লক্ষ টাকায় উঠিয়াছে। গম ও চায়ের রপ্তানি বহুল পরিমাণে কমিয়াছে। তুলার রপ্তানি পরিমাণে ৪৮ হাজার টন এবং মূল্যে ২ কোটী ৭০ লক্ষ টাকা হ্রাস পাইয়াছে। পাটের রপ্তানি ৮৪ লক্ষ টাকায় ৫০ হাজার টন হইতে ৪৪ লক্ষ টাকায় ২১ হাজার টনে নামিয়াছে।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(১২)

জৈষ্ঠ্যের গোড়ায় মীনার হাজারি-বাগ যাওয়ার কথা ছিল; সেই অনুসারে শুভ্রাংশু যতীকে বাড়ীতে রেখে নিজেই তাকে নিতে এসেছিলেন। বিয়ের পরে এসে পর্য্যন্ত তার আর যাওয়ার সুবিধা এ পর্য্যন্ত ঘটে ওঠেনি। এবারে মীনা নিজেও খুব ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল, অবিশ্যি বাইরে তার কিছুই বোঝা যেত না। শুভ্রাংশু যেদিন এসে পৌছলেন, তার দুদিন পরেই মীনার যাওয়ার দিন—কিন্তু ভগবান বাদী, এবারেও তার যাওয়া হল না। যাওয়ার আগের দিন সকালে, অসময়ে তার একটী ছেলে হল। জগমোহন কি করবেন ভেবে না পেয়ে ছোট খুড়ীকে ডেকে এনে তাঁর হাতে মীনার ও ছেলের ভার ও একতাড়া নোট্ দিয়ে কেবলই ঘর বাহির করে বেড়াতে লাগলেন।

মীনাকে একটু সুস্থির করে এসে ঠানদি শুভ্রাংশুর কাছে সন্দেশ চেয়ে বস্‌লেন। মীনাকে নিয়ে যাবার মত টাকা ছাড়া আর টাকা তাঁর কাছে ছিলনা। তিনি সেই টাকা থেকে ২০৲ ঠানদির হাতে দিয়ে দিলেন। এখন তো আর মীনা যেতে পাবেনা শুধু শুধু বসে থেকে কি হবে, ভেবে, সেই রাত্রে যাওয়াই ঠিক করলেন। যাওয়ার আগে মীনাকে দেখতে গিয়ে তিনি একটু মুস্কিলেই পড়ে গেলেন। শুধু হাতে তো আর মীনার ছেলেটিকে দেখা যায়না উপস্থিত কিছু হাতেও নেই। ভেবে চিন্তে তিনিনিজের হাতের আংটী খুলে ছেলের মুখ দেখলেন, বল্লেন "এখন আমার আংটীটা, তোর ছেলের কাছে বাঁধা রইলো মীনু, পরে আমি ছাড়িয়ে নেব। আচ্ছা তা'হলে এখন যাই। মাকে গিয়ে বলিগে। পূজোর সময় প্রভাতের সঙ্গে যাস্, বুঝলি? আমিও লিখব। ওকি! চোখ মুছছিস যে আচ্ছা পাগল তো? তোরই তো ভাল হল, ছেলে নিয়ে আমাদের ভুলেই যাবি, আবার প্রভাত ও তো আস্‌ছে!

"বড়দা—তোমার খোকা কেমন হয়েছে—বল্‌লে না তো!"

"তুই জিজ্ঞেসা করেছিস্? নিজের নিয়েই অস্থির! ওই হয়েছে এক রকম—দেখলে মানুষের বাচ্চা বলে চেনা যায়—ব্যস্ তুই ঠিক ঠাক হয়ে থাকিস্! আর খবর টবর যাকে হয় ধরে লিখিয়ে দিস্।" বলে শুভ্রাংশু ঘরের বার হয়ে গেলেন।

নন্দা ও ঠানদি এসে ঘরে ঢুকলেন। বল্লেন "দুবার তোর হাজারি বাগ যাওয়া বন্ধ হলো, ছেলেটার বুদ্ধি আছে। তোর খুব রাগ হচ্ছে নারে?"

"আহা—যত নষ্টের গোড়াতো আপনি! বেশ চলে যেতাম! তা, না, আজ দিন ভাল না, কাল সময় খারাপ করে আপনিই তো এটা ঘটালেন! যেমন ঘটিয়েছেন, তেমনি এখন ভুগুন! আমি নড়ব না তো মোটে, শুয়ে শুয়ে কেবল হুকুম করে আপনাকে খাটাবো! সখ্ মেটাচ্ছি ভাল করে!"

"বয়েই গিয়েছে আমার খাটতে! যে খাটবার সেই খাটবে এসে।"

"নিন্ ঝগড়া পরে করবেন—এখন খেতে টেতে দেবেন, না কি? নিজের তো বেশ এক পেট খাওয়া হয়েছে, আমার এদিকে সব হজম হবার জোগাড়!"

"খাবনা! ছেলে হল তোমার, আর উপোস করব আমি! এত ভালবাসায় কাজ নেই। যখন ভালবাসার কথা মনে থাকবে তখন আমাকে তার একটাও বলবেনা সব জমা করে রাখবে। আর এখন উপোসের বেলায় আমি? না?"

"কে বলছে আপনাকে উপোস করতে? নিজের দুবেলা, আমার দুবেলা এই চারবেলার খোরাক সব খান—তার আগে আমাকে খেতে দিন।"

"যাই—আনি" বলে তিনি বেরিয়ে গেলেন।

নন্দা বসে বসে নতুন ছেলেটিকে দেখে বললে "কার মত হবে দিদি? তোমার সঙ্গে তো কিছু মিল নেই, মৃদু হেসে মীনা বললে "কি জানি! তোর খাওয়া হয়েছে?"

"হাঁা—এই আঁতুড় ঘরে বসে বসেও তুমি কি আমার খবরদারী করবে নাকি? তা আর হচ্ছেনা—ঠানদি বলেছেন, এবার তুমি আমার হাতে! আমি যা' যখন খেতে দেব খেতে হবে। 'না' বললেই ঠান্দিকে ডাকতে হবে। বাবা, খোকা পেটে তুমি যা' জালিয়েছ আমায়।"

"তুই ও না হয় আমাকে সেটা শোধ দিস্। তা হলে তো হবে!"

"যাও। তোমার কথা শুনলে গা জ্বলে যায়। দিদি তুমি বের হলে আমি একবার রাইপুর যাব। না হলে এর পরে তুমি চলে যাবে, আমার আর যাওয়া হবে না।"

"হাঁা—আর ঠাকুরপোরও আসার সময় হবে তখন।"

"হাঁা—আসছে! চিঠিতে তো কই লেখেনা কিছু!"

"না লিখুক এসে পড়বে ঠিক! দেখিস্—তখন বলিস্।"

"তাই—যদি হয় তবে তুমি পূজোর সময় যাবে কি করে?"

"কে যাচ্ছে?" "কেন—বড়দা যে বলে গেলেন, পূজোর সময় তোমাকে নিয়ে যাবেন!"

"আমি যাবনা, পূজোর সময়ে কি বাড়ী ছেড়ে যাওয়া হয়? তারপর ঠাকুরপো যদি আসেন তো কবে যাব তারই ঠিক নেই।"

"তাই করো দিদি! পূজোর সময় তুমি যাবে শুনে আমার ভালই লাগছিল না।"

ঠান্দি ঘরে এসে ঢুকলেন—হাতে মস্ত বড় এক বাটী দুধ-সাগু। সেইটা মীনার সামনে ধরে দিয়ে বল্লেন "খাও"। মুখে তুলে এক চুমুক খেয়ে সে বললে "একি চিজ্ বানিয়েছেন ঠান্দি? বাদসাহী সরবৎ না নবাবী লপাস্?"

"ওই খেতে হবে—তুমি কি ভেবেছিলে, তোমার জন্যে গরম গরম লুচী ভাজ্তে গিয়েছিলাম? এখন কদিন ওই বাদ্শাহী সরবৎ খেতে হয় দেখ।—"

"আপনার কথার আড়ম্বরেই তো আমার অর্দ্ধেক উৎসাহ চলে যাচ্ছে, ঠান্দি! একটু কম করে খেলে হবেনা?" "না, সবটাই খেতে হবে। নন্দা, দেখিস্ তো দিদি, ফেলে টেলে না দেয়! আমি একবার বাড়ী যাই—অবনীকে চা করে দিতে হবে—বড় বৌদির জর হয়েছে।—"

"ছোড়্দির চিঠি পেয়েছেন? সে কবে আসবে" মীনা জিজ্ঞাসা করলে।

কিছুদিন হল শিউলী তার মায়ের কাছে গিয়েছিল। ঠান্দি বল্লেন "আসবে তো, কিন্তু আনে কে? সেই নরেনের ছুটি তাকিয়ে চেয়ে আছি। ঝুলনে যদি ছুটি পায় তো শ্রাবণ মাসে আস্বে, না হলে সেই পূজোয় ছাড়া আর সময় কই?"

"এখন ছোড়দি থাকলে বেশ হত। নন্দার একা একা সব কাজ করতে হবে—সে থাকলে খানিক সাহায্য হত! জানেন, ঠান্দি, ঠাকুরপো বোধহয় 'ভাদ্দর' মাসেই এসে পড়বেন।" "সত্যি নাকি? ওলো, ও নন্দা? তাই তোর মুখে আজকাল হাসি! আমি বলি ছেলেটা হয়েছে তাই বুঝি!"

"আহা! ঠান্দির কি কথা! আগে যেন আমি কেঁদে কেঁদেই বেড়িয়েছি?"

"বালাই! ষাট্! কাঁদবে কেন? তোমাদের এমনি হাসি মুখ দেখে যেন আমি মরতে পারি।"

"এখুনি মরবেন? ঠাকুরদা যে অনাথ হবেন।" "তা, হোক্—তোরা ক' বোনে মিলে সাম্‌লাবি!" মীনা ও নন্দা একসঙ্গে বললে "বুড়ো সামলাতে আমরা পারবো না।"

"আমার বুড়ো আমি সাম্‌লাব—তোদের ছোঁড়াদের তোরা সামলাস্!" বলে তিনি চলে গেলেন।

হাজারিবাগে তো শুভ্রাংশুই খবর নিয়ে গেলেন, প্রভাতের কাছে টেলিগ্রামও চলে গিয়েছে, এখন প্রণবকে একটা খবর দিতে পারলে হয়, জগমোহন এই-ই বসে বসে ভাবছিলেন। প্রভাতের মা যখন মারা যান, তখন প্রভাস মাস কয়েকের ছেলে। সেই অবোধ ছেলে যে মার সাহায্য ছাড়া মানুষ হতে পারেনা ধীরে ধীরে জগমোহনের হাতে মানুষ হয়ে আজ ষোল বছরের হয়েছে, প্রভাত, প্রণবের বিয়ে হয়েছে, অধিক কি, প্রভাত আজ সন্তানের পিতা, এই যে অসহ সুখের ভাগ, তিনি কাকে জানাবেন? আজ তো সংসার 'ভরপুর' হয়ে উঠেছে, শুধু তাঁরই মনে যে অভাব, তা চিরদিনই সমান রইলো! 'মন্দাকিনি! মন্দাকিনি! আর কি একদিনের জন্যেও আস্‌তে পারোনা? আর কি একবারও আগের মত এসে আমার সুখ, দুঃখ, বিষাদ, আনন্দ, তৃপ্তি অতৃপ্তির ভাগ নিতে পারো না? আর কি এক মিনিটের জন্যেও দেখা দিয়ে তুমি বল্‌তে পারোনা যে তোমারও আমার জন্যে শান্তি নেই, সুখ নেই, তৃপ্তি নেই। ভগবানের পায়ে গিয়েও তুমি মানুষ আমাকেই পাবার লোভ করছো! যেদিন আমাকে ছেড়ে গিয়েছ, সেই দিন থেকে সমানে আজ পর্য্যন্ত আমার মনের দাহ জ্বলেই আসছে। একটুও কমেনি।" প্রৌঢ় জগমোহনের চোখে, ধারার পরে ধারা নেমে, তাঁর ষোল বছরের শুকনো চোখকে রাঙা করে বুক বেয়ে নেমে চল্‌ল —

প্রভাতকে জগমোহন তার ছেলে হওয়া খবর দিয়ে যে টেলিগ্রাম করেছিলেন, তার উত্তর দিলে প্রশান্ত। লিখলে "পূজোর সময় আমার চারদিন ছুটী ছাড়া আর ছুটি নেই—তখন গিয়ে খোকা হওয়ার সন্দেশ খাব। ছোড়দাও তখন এসে যাবে। আমরা ভাল আছি—আপনারা কেমন?" ইত্যাদি। চিঠিটা পড়ে জগমোহন একটু হেসে বাক্সে রেখে দিলেন।

আশ্বিনের প্রথমেই সেবার পূজা। ছেলে হওয়া খবর পেয়ে পর্য্যন্ত প্রভাত আর বাড়ীতে কাকেও চিঠি পত্র লেখেনি। শ্রাবণ, ভাদ্র দুটো মাস চোখ বুজে কাটিয়ে, পূজার অনেক আগেই ছুটি নিয়ে সে বাড়ী এল।

মীনার সঙ্গে যখন দেখা হল, তখন তাকে সে কি কথা বল্‌বে তা ঠিক করতে পারলেনা। আগের মত করে কথা আর আসেনা যেন! কিন্তু চুপ করেই বা কতক্ষণ থাকা যায়! নিজের অজ্ঞাতেই সে ধীরে ধীরে ছেলের বিছানার পাশে গিয়ে বস্‌ল! আস্তে আস্তে, চুরি করার মত করে তার যে হাতটা বালিশের ওপর আলগা হয়ে পড়েছিল, সেই হাত খানার ওপর ধীরে ধীরে হাত বুলোতে লাগল। প্রভাতের এই চুরি দেখে মীনার খুব হাসি এল; কিন্তু কিছুই না বলে সে গম্ভীর হয়ে বসে রইলো। ধীরে বিছানার ওপর ঝুঁকে পড়ে প্রভাত ছেলেকে দেখতে লাগল।

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে প্রভাত বল্লে "এই! চিঠি লেখনি কেন?" "বাঃ! তুমি লিখেছিলে? এই দুমাস আমাকে কম ভাবিয়েছ?"

"চিঠি আমি লিখেছিলাম; কিন্তু ডাকে দেওয়া হয় নি। দেখবে?" বলে প্রভাত খাটের নীচ থেকে তার সুটকেসটা বের করে পাঁচ ছ' খানা চিঠি মীনার হাতে দিলে।

সেগুলো সরিয়ে দিয়ে মীনা বল্লে "চাইনে আমি এসব! যখন দরকার ছিল, তখন পেলাম না—এখন কি হবে! রেখে দেও তুমি পড়ো।"

"আমি তো তবু লিখেছিলাম, তুমি কি করেছ! এই দু'মাস বোধহয় এই নতুন খেলনাটা নিয়েই ব্যস্ত ছিলে, না? পুরোনোটা আর মনেই পড়ে নি? না?"

"মোটেই মনে পড়েনি, তা কে বললে? কিন্তু চিঠি লেখ নি বলে রাগও খুব হ'ত।"

"এঃ! এটা আবার কোথা থেকে আমার 'ভাগীদার' হয়ে এল?" বলে প্রভাত ছেলের গালে আঙুল দিয়ে মৃদু আঘাত করলে। ছেলে কেঁদে উঠলো।

"দিলে কাঁদিয়ে? তুমি বড় হিংসুক তো!" বলে মীনা ছেলে কোলে তুলে নিয়ে তাকে চুপ করাতে লাগলো।

"বাঃ, বেশ দেখাচ্ছ! একেবারে গণেশ জননী!"

"যাও, অমন করলে কিন্তু মজা দেখতে পাবে।" "কি মজা—শুনি! আমাকে ডিভোর্স করবে?"

"সে তো সোজা কথা হল, যা করব, তা তুমি ভাবতেও পারবেনা।" "কি করবে শুনি!—"

"কথাও বল্‌বনা, আর এটাকে তোমার ঘাড়ে চাপিয়ে চলে যাব।"

প্রভাত ভয় পাওয়ার ভাণ করে বল্‌লে "দোহাই তোমার, অমন কাজও করোনা—তার চেয়ে এস—সন্ধি। জান, আমি আবার কাল পরশুই যাচ্ছি—প্রণবকে আন্‌তে।"

"তাহলে একেবারে তাঁকে নিয়েই অস্‌তে! আবার দুদিনের জন্য এলে কেন?—"

"কেন এলাম? যদি বলি তোমাকে দেখতে?—"

"তাহলে, বল্‌ব মিথ্যা কথা।" "আচ্ছা, যদি বলি এই 'ব্যাঙাচি' টাকে দেখতে?—"

"কতকটা সত্যি! কিন্তু 'ব্যাঙাচি' কেন?" "তা বই কি' যে কিল বিল কর্‌ছে! রাগ করলে? আচ্ছা, ব্যাঙাচি না, পূর্ণ মানুষ, আমার সোনা, মানিক" বলে প্রভাত হাত বাড়ালে—মীনা তার কোল থেকে ছেলে তুলে নিয়ে স্বামীর হাতে তুলে দিলে, প্রভাত সেই কচি শিশুকে বুকের ওপর চেপে ধরলে—আনন্দ ও গৌরবে মীনার চোখের কোলে জল চক্ চক্ করতে লাগল।

দুদিন হলো প্রভাত কলকাতায় গিয়েছে, প্রণবকে খানিকটা আগিয়ে নেবার জন্যে। আজ তার টেলিগ্রাম এলো দুই ভাইয়ে বাড়ীতে রওনা হয়েছে—জগমোহন ভিতরে ভিতরে অশান্ত হয়ে উঠেছিলেন—প্রায় এক বছরের ওপর হল, ছেলেকে তিনি দেখেননি, কতক্ষণে নির্ব্বিঘ্নে সে বাড়ী এসে পৌছবে এই ছিল তার মনের কথা। কোন্ ঘরখানায় সে থাকবে কোথায় বস্‌বে, এসে কি খাবে, এ সবই একরকম ঠিক হয়ে গিয়েছিল। নন্দার বাবা, রাইপুরের জমিদার, তাঁর কাছে চিঠি লিখে জেনে নিয়েছেন, কোন্ সময় লাগাৎ প্রণবের বাড়ী আসার কথা। তাঁরা স্বামী স্ত্রীতে তাহলে সেই সময়ে এসে জামাইকে দেখে শুনে যাবেন। প্রত্যেকটা জিনিস হাজার রকম করে সাজিয়ে, গুছিয়ে খাবার জিনিস গুলির যোগাড় নিজ হাতে করে রেখেও তাঁর মনে হচ্ছিল হয়তো ঠিক মত কিছু হলনা। প্রবাসী ছেলের সুখ সুবিধার আয়োজন যদি আজ মন্দাকিনী থাকতেন তবে হয়তো আরো বেশী, সুন্দর ও শোভন করে করতে পারতেন। কিন্তু হায়! আজ ষোলো বছর যে তিনি তাঁকে ছেড়ে গিয়েছেন। 'মন্দাকিনী! আশীর্ব্বাদ করো তোমার ছেলেদের সংসার যাত্রার পথ পুষ্পময় হয়েই থাক্।"

বিকেলে প্রভাত ও প্রণব বাড়ী এসে পৌছল। রাস্তাতেই জগমোহন দাঁড়িয়ে ছিলেন—সেইখানেই প্রণব তাকে প্রণাম করে পায়ের ধুলো নিলে। রুদ্ধবাক্ হয়ে তিনি শুধু প্রণবকে দৃঢ় আলিঙ্গন করলেন। পরে কোনো রকমে মুখ ফুটে বললেন "বাড়ী যাও বাবা—আমি একবার ছোট খুড়োকে বলে আসি।"

বাড়ী যাবার এই সুস্পষ্ট ইঙ্গিত বুঝতে প্রণবের একটুও দেরী হলনা। মনটা একবার দুলে উঠল—নন্দা! আঃ এক বছর পরে দেখা! না জানি সে এতদিনে কেমন হয়েছে! কিন্তু, না, তার জন্যে রাতের নিরালা সঞ্চিত থাক্। মুখে সে বললে "সে কি বাবা। ঠাকুরদার কাছে আমিও যে যাব একবার। না হলে তিনি কি আর আমাকে আস্ত রাখবেন? বাড়ী পরে যাব।"

"তবে এস প্রণব, প্রভাত তুমি বাড়ী যাও, বিশ্রাম করোগে।" বলে জগমোহন, প্রণবকে সঙ্গে নিয়ে তার কাকার বাড়ী গেলেন।

শিরীষ চন্দ্রের তখন বৈকালিক দাবা খেলার সময়। ছকটি পেতে সবে বসেছেন, এমন সময় প্রণব ও

জগমোহনকে আসতে দেখে বললেন "বাহা! একি তুমি কখন এলে প্রণব?"

"এই তো আসছি" বলে প্রণব তাঁকে প্রণাম করলে। "ভেতরটা ঘুরে আসি" বলে প্রণব চলে গেল। জগমোহন ও শিরীষচন্দ্রে সাংসারিক কথা বার্তা হতে লাগলো।

"কই, ঠান্দি কোথায়" বলে হাঁক দিয়ে প্রণব বারান্দায় পায়চারী করতে লাগল।

"এই যে দাদা, কখন্ এলে?' বলে ঠানদি বেরিয়ে এলেন, তাঁর হাতে হাতে একখানা মাদুর। সেইটা বিছিয়ে দিয়ে তিনি বললেন, "বসো। কেমন ছিলে, কেমন দেশ সব গল্প করো। দাঁড়াও তার আগে আমি একটু মিষ্টি মুখ করাই!" বলে উঠে গিয়ে একখানা রেকাবীতে লুচী, ভাজা, কিছু ফল, ও একগ্লাস জল নিয়ে ফিরে এলেন। সেগুলো তার সামনে ধরে দিয়ে বল্লেন, "আজ তো আর কিছু নেই। কোনো রকমে এটুকু মুখে দেও—কাল সকালে কিন্তু এখানেই খেয়ো।"

খাবার গুলোর দিকে চেয়ে প্রণব বল্লে "ইস্! করেছেন কি? আমি তো এত খাইনে!"

"এ আর বেশী কি? ছোট বেলার কথাগুলো কি ভুলে গেলি? সকলের খাবার চুরি করেই যে খেয়ে নিতিস্?"

"তুলব কেন ঠান্দি! খাবার খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আপনার হাতের মিষ্টি কান মলাও মনে আছে। বাবা! এখনও মনে হলে কাণ জালা করে।"

"সবটুকু যদি না খাস্ তো এখনও এই বুড়ো বয়সে কাণমলা খাবি! নন্দার সঙ্গে দেখা হয়েছে?"

"নাঃ! সে সব পরে হবে। আগে ঠানদির সঙ্গে দেখা করে নিই! কাকিমা কই? কাকা কই?"

"কাকিমা ঘাটে গিয়েছে, আর অবনী কোথায় আছে কি জানি।"

"ও ঠান্দি—বৌদিরা কি আজও আমার সাম্‌নে আস্‌বেন না? কতদিন পরে এলাম! যদি আর না-ই আস্‌তে পেতাম!"

"বালাই, ষাট! আয় না, ও শিউলী তোরা আয় প্রণবকে দেখে যা।" অসিতাকে ডাক্‌তে তাঁর সাহস হলনা, কারণ সে এসব বেহায়াপণা পছন্দ করে না। ঠান্দির ডাকে শিউলী ঘর থেকে বেরিয়ে এল; "কেন, ঠাকুরপো কি জাপান থেকে নতুন রকমের কিছু হয়ে এসেছেন' যে দেখতে আস্‌তে বল্‌ছেন!"

"যেতে যেতে মুখ তুলে প্রণব বললে "আজ বহুপুণ্যির জোর দেখছি—ছোট বউদি যে আমার সামনে!"

"কি আর করি বলুন! আপনারা যখন ছাড়ছেন না, তখন আর কতদিন অপ্রকাশ থাকবো! তার পর, কেমন ছিলেন, কি দেখলেন, কি আনলেন সব বলুন!"

"আচ্ছা, এখন তো কিছুদিন আছি, ধীরে ধীরে সব শুনবেন—এক দিনে শুন্‌লে সব শেষ হয়ে যাবে যে! এখন উঠি তা হলে ঠাকুমা, কি বলেন, অনুমতি দিচ্ছেন তো!

"ওরে, হ্যাঁ—বল্ যে এখন ঘর মুখো মন হয়েছে! তার আবার অত ফন্দী-ফিকির কি?" হাস্‌তে হাস্‌তে প্রণব উঠে দাঁড়াল।"

সে চলে যেতেই অসিতা বেরিয়ে এসে বল্‌লে, "ছোট বৌ! তুই তো খুব সাহসী মেয়ে! ও বাড়ীর ঠাকুরপোর সঙ্গে কি বলে কথা বল্‌লি?"

"কেন, তিনি কি বাঘ না ভালুক, যে আমাকে খেয়ে ফেল্‌বেন!"

"হোক বাপু! প্রভাত ঠাকুরপোর বৌএর হাওয়া তোকেও লেগেছে দেখছি! ঠাকুরপো যদি কিছু বলে? ভয়ও তো নেই প্রাণে?"

"মীনার হাওয়া যদি আমার গায়ে লেগেই থাকে দিদি, তো আমি মানুষ হয়ে যাব এবার।" আর মানুষের সঙ্গে কথা বল্‌লেই বা বক্‌বে কেন? ভাসুর ঠাকুরের বুঝি মানা আছে, তাই বুঝি, তুমি এদের কারো সঙ্গে কথা বল না।"

ঠোঁটটা উল্টিয়ে অসিতা বল্‌লে, "ইস্! আমাকে মানা কর্‌বে কে? আর কর্‌লেই বা শুন্‌ছে কে? আমি নিজেই কথা বলিনে, এ সব বেহায়া ঠাট্ আমার ভাল লাগে না!"

"আমার ভাল লাগে দিদি। আমার ভাইদের সঙ্গে যখন কথা বলি, তখন ঠাকুরপোদের সঙ্গে বল্‌বও। তবে

পুষ্পপাত্র—

চন্দ্রহার

শিল্পী—শ্রীহেমেন্দ্রনাথ মজুমদার।

লক্ষ্মীবিলাস প্রেস, লিঃ, কলিকাতা।

এতদিন বলিনি, ছোট ছিলাম বলে; এতে যদি কেউ আমাকে বকে বা নিন্দে করে, তার সঙ্গে আমার বোঝা-পড়া আছে।"

মুখখানা অন্ধকার করে অসিতা বললে, "কেউএর কি আর ক্ষমতা আছে তোমাকে বক্‌বার! কটা চামড়ায় আর ওই 'হিজিবিজির' অক্ষরে যে ভুলিয়ে রেখেছ একেবারে!"

শিউলি রাগ করতে গিয়ে, হেসে ফেলে বল্লে, "সেও তো একটা ক্ষমতা! আপন স্বামীকে বশ করতে পারা একটা কম ক্ষমতার কথা নয় দিদি! ভাসুরও তো কম ভালবাসেন না, তোমার সেদিক থেকে দুঃখু করবার কিছু নেই।

'স্বামী ভালোবাসেন,' একথা নিজের মনে খুব ভাল করে জান্‌লেও, তাঁর, এবং অন্যের মুখ থেকে সেটা শুনতে পেলে যেন আরো আনন্দ হয়; তাই অসিতা, শিউলীর কাছে পদে পদে হেরে গিয়েও, তার এই শেষ কথাটায় মনে মনে খুসী হলেও,বাইরে সেটাকে প্রকাশ না করে ঘরে উঠে যেতে যেতে বললে "আমি কালো মানুষ! আমাকে আবার ভালবাসা কি! নেহাৎ এক বাড়ীতে থাক্‌তে হয়, তাই!'

শিউলি তার কাণ্ড দেখে মনে মনে হাসলে।

রাত প্রায় নটা হবে। প্রণব টেবিলের ওপর আলোটা রেখে সামনে একটা বই খুলে, জানালার ভিতর দিয়ে যে আকাশটুকু দেখা যাচ্ছিল, তারই দিকে চেয়েছিল। আলোটা খুব জোরেই, দপদপ্‌ করে জ্বল্‌ছিল।

এই একবছরের, না দেখা নন্দা, আজ তার সামনে কিরূপ নিয়ে, কেমন মন নিয়ে আসবে, এই চিন্তাই তার মনে ঘুরে বেড়াচ্ছিল।

খুট্ করে শব্দ হলো—প্রণব পিছন ফিরে তাকালো। দেখলে মীনা হাতে এক গ্লাস জল নিয়ে ঘরে ঢুক্‌ছে—চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে সে বল্লে "আপনি আবার কষ্ট করে জল আন্‌লেন কেন? দরকার হলে আমিই নিয়ে আসতাম। আপনার খাওয়া হয়েছে? কই আমাদের বাচ্চাটাকে তো দেখ্‌তেও পেলাম না একবার!"

টেবিলের ওপরে জলের গ্লাসটা রেখে, একখানা ছোট রেকাবী দিয়ে সেটা ঢেকে দিতে দিতে মীনা বললে—"খোঁজ করেছিলেন? তার তো এখনও হাত পা স্ব-বশে আসেনি, তাহলে আপনাকে দেখতে আসতো। যাক্, টেবিলের ওপরে লোক দেখানো করে বইখানা খুলে রেখে, মনটাকে আশে-পাশে দৌড় না করিয়ে, বরং দরজার পাশে এর থেকে 'ইণ্টারেষ্টিং' কিছু আছে কিনা, সেটা পরীক্ষা করে দেখলে পারতেন! বেশী দূর যেতে হবে না—দরজার পাশেই পাবেন।"

—কাজ নেই আমার এমন 'ইণ্টারষ্টিংএ'। যিনি দরজা পর্য্যন্ত এসেছেন, তিনি আর একটু এগিয়ে এলেই তো পারতেন!"

"তাই কি হয়? তৃষ্ণাকেও এগিয়ে গিয়ে জল খুঁজতে হয়—জলই সব সব সময় তৃষ্ণা খোঁজে না। বুঝলেন?"

"তাই নাকি? আচ্ছা, তবে আপনি যখন মাননীয়া আর বিশেষ করেই বারে বারে বলছেন; তখন দেখাই যাক্ এর পরে আর কি রহস্য প্রকাশিত হবার অপেক্ষা করছে!—"বলেইসে একলাফে ঘরের বাইরে এসে, যেখানে সুনন্দা দাঁড়িয়ে লজ্জা, সঙ্কোচ ও আনন্দে কাঁপছিল সেইখানে দাঁড়াল। পরে নন্দার হাতটা নিজের হাতের মধ্যে কোমল ভাবে চেপে ধরে, তাকে টেনে আনতে আন্‌তে বল্লে, "একে বৌদি? ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আমাদের গুপ্ত কথা না শুনেছে! অনুমতি করেন তো পরিচয় নিই!"

"হ্যাঁ—নিন্—ভাল করে পরিচয় না পেলে ছেড়ে দেবেন না—আমাকে দরকার হলে জানাবেন।" বলে মীনা হাসতে হাসতে ঘর থেকে ছুটে পালিয়ে গেল। যে স্বামীসৌভাগ্যবতী হয়, সে কখনো অন্যের সেই সৌভাগ্য দেখে হিংসা করে না, তাই মীনা প্রণবের এই সমস্ত কথায় আমোদ পাচ্ছিল খুবই। তার নিজের ঘরেও যে আর একটা তরুণ হৃদয়, আশা, আকাঙ্ক্ষায় বিনিদ্র নয়নে, তাকেই কামনা করছে—সেটা তার অজানা ছিল না; তাই তাড়াও তার নিজের দিক থেকে কিছু কম ছিল না। প্রণবের ঘর থেকে বেরিয়ে সে এক রকম ছুটেই নিজের ঘরে গেল।

ঘরের মধ্যে নন্দাকে টেনে এনে প্রণব যখন খিলটা

বন্ধ করে দিয়ে বেশ কায়েমী হয়ে চেয়ারে বস্‌লো—নন্দা তখনো কাঁপছে। পিছন থেকে একটানে ঘোমটা খুলে দিয়ে প্রণব বল্লে "ঢের হয়েছে—কলা-বৌ ঘোমটা খোল।"

"আঃ! কি যে কর! দিদির সামনে কি কাণ্ডটা করলে বল তো? লজ্জায় মরি!"

"তোমার আবার লজ্জার কমটা হোল কোন্‌খানে? বেশ তো একগলা ঘোম্‌টা দিয়ে ছিলে!" নন্দা দেখলে স্বামী তার কিছুই বদলায় নি! ঠিক সেই ছেলেমানুষই আছে। তাকে কথা বল্‌তে না দেখে প্রণব বল্লে, "কি কথা বল্‌ছ না যে!—রাগ হয়েছে? আচ্ছা, আমিও তো নেহাৎ বেরসিক! কোথায় এতদিন পরে তোমাকে পেয়ে কত কি বল্‌ব, কর্‌ব, তা না তোমাকে হয়তো রাগিয়েই তুল্‌ছি! দাও তো আমার কাণ দুটো মলে!"

নন্দার এবার হাসি এল। বল্‌লে, "মাথা-টাথা খারাপ হয়েছে নাকি? দাঁড়াও তোমাকে আমার প্রণাম করা হয়নি।" বলে নীচু হয়ে প্রণাম করতে যেতেই প্রণব তাকে একেবারে বুকের কাছে টেনে নিলে। বল্লে, "ছিঃ! তোমার আমার সম্বন্ধে প্রণাম চলে কি? তার চেয়ে যা' চলে, তারই চেষ্টা দেখ্।" বলে নন্দার চোখের কালো দৃষ্টির ভিতরে নিজেকে হারিয়ে ফেলে, ধীরে ধীরে গভীর ভাবে তার গালের ওপর আদরের ছাপ এঁকে দিলে। নন্দাও দেখলে, স্বামীর চোখের দৃষ্টিতে কি যেন ফুটে উঠ্‌ছে। আগের সে শিশুর মত সরলপ্রাণ কোথায় হারিয়ে গিয়েছে। সে শিউরে উঠে ধীরে ধীরে মাথাটা নীচু করলে। কাণের কাছে কি যেন একটা এমনি ভাষায় গুঞ্জন উঠছিল—

"—তুমি জ্ঞানী, গুণবান;
তব দাসী হতে নাহি বোধ বল
তাই সদা কাঁদে প্রাণ।
আমি এ অবলা নারী
নীরবে চুম্বন ছাড়া কি আর করিতে পারি?"

ক্রমশঃ

প্রিয় মোর

শ্রীঅমলা দেবী

জানি তুমি লবে বাঁধি হে প্রিয় আমার
সঘন বাহুর বাঁধে। সমস্ত সংসার
বিস্মিত চাহিয়া রবে মিলন-বাসরে
স্নেহ সিক্ত মালা গাঁথি মোর কণ্ঠ পরে
কখন পরায়ে দেবে। নিঃশব্দ নিরবে
চির শান্তি স্নিগ্ধ করে পরশিয়া যাবে
ক্লান্ত ললাটের পরে। ভুল ভ্রান্তি মায়া
চঞ্চল জীবন মাঝে শত আলো ছায়া
ম্লান করে দেবে বন্ধু তব দীপ্ত জ্যোতি।
নিমিষে সম্পূর্ণ হ'বে যত ক্ষয় ক্ষতি
তোমার অক্ষয় দানে। নত শিরে আছি;
এবার পরায়ে যাও তব মালা গাছি।

ইঙ্গ-আইরিশ সন্ধি :—

ইঙ্গ-আইরিশ সন্ধি লইয়া তীব্র বাদ-প্রতিবাদ চলিতেছে। নিম্নে উপরোক্ত সন্ধির যথাযথ পূর্ণ বিবরণী প্রদত্ত হইল :—ব্রিটিশ সাম্রাজ্য নামে পরিচিত বিভিন্ন জাতিসঙ্ঘের মধ্যে কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, নিউ-জিল্যাণ্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকার গবর্ণমেণ্টের তুল্য আয়র্লণ্ডও সমান মর্য্যাদাসম্পন্ন শাসনতন্ত্র পাইবে। এই জন্য আয়র্লণ্ডের একটী পার্লামেণ্ট থাকিবে এবং আয়র্লণ্ডের শান্তি, শৃঙ্খলা ও সুশাসনের নিমিত্ত এই পার্লামেণ্ট আইন প্রণয়ন করিতে পারিবেন। এতদ্ভিন্ন আইরিশ পার্লামেণ্টের নিকট দায়ী একটি শাসন-পরিষদও থাকিবে এবং এই গবর্ণমেণ্টকে আইরিশ ফ্রী ষ্টেট নামে অভিহিত করা হইবে।

(২) পরে যে সমস্ত চুক্তির উল্লেখ করা হইবে, তদ্ভিন্ন ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ও ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট সম্পর্কে কানাডা রাজ্যের অনুরূপ মর্য্যাদা আইরিশ ফ্রী ষ্টেটের থাকিবে এবং ব্রিটিশ রাজ্যের কিম্বা উহার প্রতিনিধির কিম্বা ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের সহিত যে সম্পর্ক থাকিবে এবং সেই সম্পর্ক যে সমস্ত আইন ও শাসনতন্ত্রগত নিয়ম-কানুনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে, তৎবিষয়ে আইরিশি ফ্রী ষ্টেটের কানাডা রাজ্যের অনুরূপ অধিকার থাকিবে।

(৩) কানাডা রাজ্যে যে ভাবে গবর্ণর জেনারেল নিযুক্ত হন, আয়র্লণ্ডেও ব্রিটিশ রাজ্যের প্রতিনিধি সে ভাবে নিযুক্ত হইবেন এবং এই পদ নিয়োগের সময় উক্তরূপ নিয়মকানুন মানিয়া চলা হইবে।

(৪) আইরিশ ফ্রী ষ্টেটের পার্লামেণ্টের সদস্যগণ আনুগত্যের যে শপথ গ্রহণ করিবেন, তাহা নিম্নলিখিত আকারের হইবে :—

আমি...আইন অনুসারে প্রতিষ্ঠিত আইরিশ ফ্রী ষ্টেটের শাসন-তন্ত্রের নিকট বিশ্বস্ত ও অনুরক্ত থাকিব বলিয়া পবিত্রতার সহিত শপথ গ্রহণ করিতেছি এবং আমি আরও শপথ করিতেছি যে, বিভিন্ন জাতির সমষ্টি লইয়া যে বৃটিশ সাম্রাজ্য গঠিত হইয়াছে, উহার সদস্য হিসাবে এবং আয়র্লণ্ড ও গ্রেটবৃটেনের মধ্যে সম্পর্কের দরুণ সাধারণ নাগরিক হিসাবে আমি মহামান্য রাজা পঞ্চমজর্জ্জ কিম্বা আইন অনুসারে যিনি তাঁহার উত্তরাধিকারী বা স্থলাভিষিক্ত হইবেন, তাঁহার প্রতিও বিশ্বস্ত ও অনুরক্ত থাকিব।

(৫) অতঃপর হইতে ইউনাইটেড কিংডমের (ইংলণ্ড, আয়র্লণ্ড ও স্কটলণ্ড) সরকারী ঋণের জন্য এবং বর্ত্তমান সময়ে যে সমর-ঋণ আছে তজ্জন্য আইরিশ ফ্রী ষ্টেট দায়ী থাকিবেন এবং তাঁহার এই সমস্ত ঋণের ন্যায্য অংশ প্রদান করিবেন। কতক টাকার অংশ তাঁহারা পরিশোধ করিবেন, যদি তাহা লইয়া ভবিষ্যতে দাবী ও পাল্টা দাবী উত্থিত হয়, তবে, বৃটিশ সাম্রাজ্যের এক কিম্বা একাধিক নাগরিক লইয়া উহার মীমাংসার জন্য সালিশ নিযুক্ত হইবে।

(৬) যে পর্য্যন্ত উভয় দেশের মধ্যে একটা চুক্তিদ্বারা আইরিশ ফ্রী ষ্টেট স্বীয় সমুদ্রতীর রক্ষার জন্য আলাদা ব্যবস্থা না করেন, ততদিন পর্য্যন্ত মহামান্য বৃটিশ রাজ্যের সেনাদল আয়র্লণ্ডের নৌপথ রক্ষা করিবেন। কিন্তু শুল্ক কিম্বা মৎস ব্যবসায়ের রক্ষার জন্য যদি আইরিশ ফ্রী ষ্টেটের জাহাজ রাখার দরকার হয়, তবে এই চুক্তিদ্বারা উহার উপর কোনরূপ হস্তক্ষেপ করা হইবে না। অদ্য হইতে ৫ বৎসর পর বৃটীশ ও আইরিশ গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধিকে লইয়া একটি সম্মেলন হইবে এবং তাহাতে এই চুক্তির আলোচনা করিয়া দেখা হইবে এবং আয়র্লণ্ড যাহাতে স্বকীয় সমুদ্রতীর রক্ষার জন্য ব্যবস্থা করিতে পারে, সেই উদ্দেশ্য লইয়াই উক্ত সম্মেলন আহ্বান করা হইবে।

(৭) শান্তির সময় আইরিশ ফ্রী ষ্টেট বৃটীশ রাজ্যের সৈন্য-দলের নিকট এমন সমস্ত বন্দর ও অন্যান্য সুবিধা অর্পণ করিতে প্রস্তুত থাকিবেন, যেগুলি উভয় দেশের গবর্ণমেণ্টের মধ্যে আপোষের স্থিরীকৃত হইবে এবং কোন বৈদেশিক শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ বা বিবাদের সময় ও বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রয়োজন অনুসারে উপরোক্ত-রূপ বন্দর ইত্যাদি ব্যবহার করিতে দিতে সম্মত থাকিবেন।

(৮) অস্ত্রশস্ত্র হ্রাস করা বিষয়ে যদি আন্তর্জ্জাতিক মূলনীতি মানিয়া চলিবার উদ্দেশ্য লইয়া আইরিশ ফ্রী ষ্টেট গবর্ণমেণ্ট আত্মরক্ষার জন্য সেনাদল গঠন করেন, তবে গ্রেটবৃটেনের যেরূপ সামরিক ব্যবস্থা আছে, আয়র্লণ্ডেরও লোক সংখ্যা হিসাবে তদপেক্ষা অধিকতর সামরিক ব্যবস্থা থাকিবে না। (৯) গ্রেটবৃটেন ও আইরিশ ফ্রী ষ্টেটের বন্দরসমূহে যথাযথভাবে শুল্ক ও বন্দরের অন্যান্য খাজনা ইত্যাদি দিলেই বৈদেশিক জাহাজ সমূহ স্বাধীনভাবে প্রবেশের অধিকারী থাকিবে। (১০) গবর্ণমেণ্ট পরিবর্ত্তিত হওয়ার দরুণ যে সমস্ত জজ, অফিসার, পুলিশ কর্ম্মচারী কিম্বা অন্যান্য সরকারী কর্ম্মচারী কর্ম্মচ্যুত কিম্বা অবসর গ্রহণে বাধ্য হইবেন, ফ্রী ষ্টেটের গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে উপযুক্ত পরিমাণ ক্ষতিপূরণ দিবেন এবং এই বিষয়ে ১৯২০ সনে যে আইন হইয়াছিল; তদপেক্ষা কম ক্ষতিপূরণ দিলে চলিবে না, কিন্তু সাহায্যকারী পুলিশবাহিনী এবং রয়েল আইরিশ কনেষ্টবুলারী"র সদস্যদের প্রতি এই চুক্তি খাটিবে না। এই সমস্ত ব্যক্তিকে যদি কোন ক্ষতিপূরণ বা পেন্সন দিতে হয়, তবে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টই তাহা দিবেন।

১১। এই চুক্তি পার্লামেণ্টের আইনের দ্বারা গৃহীত হইবার পর একমাস অতীত না হওয়া পর্য্যন্ত আইরিশ ফ্রী ষ্টেটের ক্ষমতা উত্তর আয়র্লণ্ডের পক্ষে প্রযুজ্য হইবে না। উত্তর আয়র্লণ্ডের সহিত ১৯২০ সনের আয়র্লণ্ড শাসন আইনের যতটুকু সম্পর্ক আছে, তাহা পুরাপুরিরূপে বজায় থাকিবে এবং উত্তর আয়র্লণ্ডের পার্লামেণ্টের অন্তর্গত উভয় পরিষদের সিদ্ধান্ত ব্যতীত উক্ত এক মাস শেষ হইবার পূর্ব্বে উত্তর আয়র্লণ্ড হইতে আইরিশ ফ্রী ষ্টেট পার্লামেণ্টের কোন সদস্য নির্ব্বাচিত হইতে পারিবে না।

১২। যদি উক্ত একমাস শেষ হইবার পূর্ব্বে উত্তর আয়র্লণ্ডের পার্লামেণ্ট উপরোক্ত মর্ম্মে ব্রিটিশরাজের নিকট আবেদন করেন, তবে আইরিশ ফ্রী ষ্টেটের গবর্ণমেণ্ট উত্তর আয়র্লণ্ডের পক্ষে প্রযুজ্য হইবে না এবং উত্তর আয়র্লণ্ডের সম্পর্কিত ১৯২০ সনের ধারাগুলি পুরোপুরিভাবে বজায় থাকিবে। যদি এই প্রকার আবেদন করা হয়, তবে, নিম্নলিখিত ৩ জনকে লইয়া একটী কমিশন গঠিত হইবে—আইরিশ ফ্রী ষ্টেটের ১জন প্রতিনিধি উত্তর আয়র্লণ্ডের গবর্ণমেণ্টের একজন প্রতিনিধি এবং বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের একজন প্রতিনিধি। এই কমিশন জনসাধারণের ইচ্ছা ও ভৌগলিক এবং আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া সীমা নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন।

(১৩) আইরিশ শাসনপরিষদের সদস্য নির্ব্বাচনের ক্ষমতা আইরিশ ফ্রী ষ্টেট পার্লামেণ্টের থাকিবে।

(১৪) উপরোক্ত ১মাসের পর যদি ঐ প্রকার আবেদন না করা হয়, তবে, ১৯২০ সনের আইরিশ শাসন আইনের দ্বারা যে, ক্ষমতা তাঁহাদিগকে দেওয়া হইয়াছে, তাহাই তাঁহারা ভোগ করিতে থাকিবেন। কিন্তু যে সমস্ত বিষয়ে তাঁহাদের ক্ষমতা নাই, সেগুলির ব্যাপারে আইরিশ ফ্রী ষ্টেট ক্ষমতা পরিচালন করিবেন।

(১৫) অতঃপর উত্তর ও দক্ষিণ আয়র্লণ্ডের মধ্যে ৫টি বিভিন্ন বিষয়ে (এইগুলি এখানে উল্লিখিত হইল না) রক্ষাকবচ ও সর্ত্ত নির্দ্ধারণের জন্য সময় সময় বৈঠক হইতে পারিবে।

(১৬) ধর্ম্ম সংক্রান্ত বিষয়ে কোন প্রকার বৈষম্য করিয়া উত্তর কিম্বা দক্ষিণ আয়র্লণ্ডের গবর্ণমেণ্ট কোনপ্রকার আইন রচনা করিতে পারিবেন না।

(১৭) আইরিশ ফ্রী ষ্টেট গঠন না করা পর্য্যন্ত সাময়িকভাবে শাসনকার্য্য চালাইবার জন্য একটি অস্থায়ী গবর্ণমেণ্ট গঠন করা হইবে এবং উক্ত গবর্ণমেণ্ট অদ্য হইতে বারমাসের বেশী স্থায়ী হইবে না।

(১৮) উভয় দেশের পার্লামেণ্টে এই চুক্তিপত্র দাখিল করিয়া সমর্থন করিয়া লইতে হইবে।

ডি' ভ্যালেরার মন্তব্য :—এই সন্ধিপত্রে আয়র্লণ্ডের পক্ষ হইতে মাইকেল কলিন্স স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। তিনি ইহার পর নিহত হন। ডি' ভ্যালের এই সন্ধিপত্র অস্বীকার করেন এবং বলেন যে, আয়র্লণ্ডের স্বাধীনতায় বিদেশীর কোন প্রকার হস্তক্ষেপ তিনি মানিতে সম্মত নহেন।

ইংলণ্ডেশ্বরীর স্বদেশ প্রেমিকতা :—লণ্ডনের অক্সফোর্ড ষ্ট্রীটে সাধারণতঃ দরিদ্র লোকদের উপযোগী অল্পমূল্যের জিনিষ বিক্রয় হয়। ইংলণ্ডেশ্বরী নিজে এই অঞ্চলে উপস্থিত হন এবং ৫ শিলিং মূল্যের ১টী ব্যাগ, ২ শিলিং মূল্যের একটী হাতব্যাগ, ৬ শিলিং মূল্যের কতকগুলি চায়ের সরঞ্জাম ও কতকগুলি খেলনা ক্রয় করেন। এই সমস্ত জিনিষই ইংলণ্ডে তৈয়ারী। দোকানদারগণ স্বয়ং রাণীকে এই সব জিনিষ ক্রয় করিতে দেখিয়া খুব বিস্মিত হয়। তবে উহার ফল এই দাঁড়াইয়াছে যে, ইংলণ্ডের লোকেরা রাণীর অনুকরণ করিয়া এই সব জিনিষ খুব বেশী পরিমাণে ক্রয় করিতেছে। দোকানগুলিতে ব্রিটিশ জাত যে সব অন্যান্য পণ্য ছিল, তাহা দেখিয়াও রাণী খুব তারিফ করেন।

তুর্কীর স্বদেশী প্রীতি :—মাদ্রাজের 'হিন্দু' পত্রিকার মিঃ বি, শিবরাও স্বদেশজাত দ্রব্যের ব্যবহারের প্রসার সম্বন্ধে লিখিতেছেন যে, যতবারই দোকানে দ্রব্যাদি খরিদ করিতে যাওয়া হইবে ততবারই যদি দোকানদারকে জিজ্ঞাসা করা যায়,—"ইহা কি স্বদেশী দ্রব্য"; তবেই অতি শীঘ্র দোকানদারেরা খরিদ্দারকে দেখিয়া তাহার প্রশ্নের পুর্ব্বেই বলিতে আরম্ভ করিবে "ইহা ভারতে প্রস্তুত তুর্কির স্বদেশীপ্রীতি সম্বন্ধে স্যর তেজবাহাদুর সপ্রু তাঁহার অভিজ্ঞতা যে বিবৃতি দিয়াছেন, লেখক তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়াছেন :—

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সার তেজ বাহাদুর সপ্রু একবার তুরস্কে গমন করেন। তিনি মুস্তাফা কামাল পাশার বড় ভক্ত ছিলেন। তাঁহার ট্রেনখানি সীমান্তে পৌছিবামাত্রই শুল্ক বিভাগের কর্ম্মচারীগণ তাঁহার কামরার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। স্যর তেজ বাহাদুর সপ্রু খুব সিগারেট ভালবাসিতেন। তিনি ঐ সময় বিদেশী সিগারেট বাহির করিলেন। উক্ত কর্ম্মচারিগণ তৎক্ষণাৎ শান্তভাবে সমস্ত সিগারেটগুলি বাহির করিয়া লইয়া তৎপরিবর্ত্তে তুরস্কে প্রস্তুত সিগারেট রাখিয়া দেন। এইরূপ ব্যবহারের কারণ জিজ্ঞাসা করায় উক্ত কর্ম্মচারিগণ সপ্রুকে বলিলেন—"তুরস্কে তুরস্কের প্রস্তুত সিগারেটেই আপনাকে পান করিতে হইবে।"

ভারতেও কি আমরা এরূপ কথা বলিতে পারি না যে, যখনই আমরা কোন দ্রব্য খরিদ করিতে যাইনা কেন আমরা ভারতীয় দ্রব্যই লইব ?

নবযুগের হেলেন :—কোন মুদির দোকানের জন প্রেস্ নামক এক ব্যক্তির একটী অসাধারণ সুন্দরী স্ত্রী আছে। স্ত্রীলোকটীর রূপ এতই অপূর্ব্ব যে, তাহাকে নবযুগের "হেলেন" বলিয়া অভিহিত করা হইয়া থাকে। ক্যাম্ব্রিজের ডাঃ চার্ল্স পিয়ার্ন নামক একজন চিকিৎসক এই হেলেনকে চিকিৎসা করিতে আসিয়া এতই আকৃষ্ট হন যে, রোগিণীর সহিত তাঁহার প্রগাঢ় বন্ধুত্ব হয় এবং রোগ ছাড়িল বটে, কিন্তু ডাক্তার তাহাকে ছাড়িল না। "হেলেন"ও ডাক্তারের সহিত মোটর অভিযানে যখন তখন বাহির হইয়া যাইতে থাকে। ফলে, "হেলেনের" স্বামী জন প্রেস্ উক্ত ডাক্তারের বিরুদ্ধে স্ত্রীকে ফুসলাইয়া লইয়া যাইবার অভিযোগে ক্ষতিপূরণের মামলা দায়ের করে। বিখ্যাত অবিবাহিত বিচারপতি মিঃ ম্যাককার্ডির এজলাসে এই চাঞ্চল্যকর মামলার শুনানী হয়। মিঃ জাষ্টিস ম্যাককার্ডি ডাক্তারের পক্ষে এই মর্ম্মে রায় দিয়াছেন, "আইনে স্পষ্টরূপেই দেখা যাইতেছে যে, বিবাহিতা নারী তাহার ইচ্ছামত স্বামীর গৃহ ছাড়িয়া যাইবার সম্পূর্ণ অধিকারী। এই ক্ষেত্রে আইন তাহাকে বাধা দিতে পারে না।" বিচারপতি আরও মনে করেন যে, নীতি-শাস্ত্রের সমস্যার সহিত এই বিষয়ে তাঁহার কোন সম্পর্কই নাই এবং আধুনিক আইনকানুনের ফলে সমাজে স্ত্রীলোকের অবস্থার বিপ্লবাত্মক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে।

নারীর অধিকার :—শ্রীমতী আশালতা বিশ্বাস আসানসোলের শ্রীযুক্ত অমূল্য কুমার বিশ্বাসের পত্নী। আশালতার বয়স ২০। তাহার পিতা কলিকাতায় বাস করেন। আশালতা তাহার পিতাকে লিখিয়াছিল যে, তাহার স্বামী তাহার প্রতি অতি দুর্ব্ব্যবহার করেন। সে আর তাহা সহ্য করিতে পারে না; অতএব শীঘ্র তাহাকে লইয়া যাইবেন। আশালতার পিতা সম্পত্তিশালী ব্যক্তি। তিনি আশার মামা ও সরকারকে আসানসোল প্রেরণ করেন। মামা আসানসোলের ম্যাজিষ্ট্রেট রায় বাহাদুর হীরালাল রায়ের নিকট আশাকে স্বামীর অধীনতা হইতে মুক্তি দিবার জন্য এক দরখাস্ত দেন। গত ৪ঠা মার্চ্চ আশা আদালতে হাজির হইয়া স্বামীর দুর্ব্ব্যবহারের বর্ণনা করিয়া পিত্রালয়ে যাইবার জন্য প্রার্থনা করে। স্বামী বলেন, তিনি কখনও স্ত্রীর উপর দৌরাত্ম্য করেন নাই। তাহার স্ত্রী বড়লোকের কন্যা। সে স্বামীর অসচ্ছল সংসারে সন্তুষ্ট চিত্তে থাকিতে পারে না। বাপের বাড়ী যাইবার জন্য ব্যাকুল। সে যাহা হউক, আমি এই একরার করিতেছি যে, স্ত্রীর উপর কখনও দুর্ব্ব্যবহার করিব না। আশালতা স্বামীর প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস না করিয়া বাপের বাড়ী যাইবার জন্য প্রার্থনা করিল। ম্যাজিষ্ট্রেট এই রায় দিয়াছেন যে, বয়স্কা আশালতার স্বামী এই একরার করিয়াছেন যে, তিনি স্ত্রীর উপর দুর্ব্ব্যবহার করিবেন না। তবু স্ত্রী স্বামীর বাড়ীতে যাইতে অস্বীকার করিয়াছে। আশালতা প্রাপ্তবয়স্কা স্ত্রীলোক, সুতরাং সে যেখানে ইচ্ছা যাইতে পারে।" আশালতা তাহার মামার সঙ্গে কলিকাতায় পিত্রালয়ে আসিয়াছে। এই মোকদ্দমার বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া বাঙ্গলার স্বামীদের চৈতন্য হওয়া উচিত। এমন একদিন ছিল, যখন স্বামী স্ত্রীর উপর যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পারিতেন। স্ত্রীরা সব নির্য্যাতন সহ্য করিত। সে দিন চলিয়া যাইতেছে। স্ত্রীকেও সযত্নে রাখা স্বামীদের কর্ত্তব্য, নতুবা সংসার অচল হইবে। 'সঞ্জীবনী'

নারীর সঙ্গে লড়িব না :—

মিঃ আর, ডি, পার্কিন্স কমন্স সভার একজন সদস্য। তাঁহার বয়স হইয়াছে অনেক এবং তিনি বিবাহ করেন নাই। তাঁহার সৌভাগ্য এই যে, তাঁহার নিজের বিমানপোত আছে এবং তাহা তিনি নিজেই চালাইয়া থাকেন। অদ্য তিনি এক বক্তৃতায় নারী বিমানচারিণীদিগকে যে প্রশ্রয় দেওয়া হইয়াছে এবং গবর্ণমেণ্টের ব্যয়ে তাঁহাদিগকে উড়িতে ও বিমানপোত চালাইতে যে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে, তাহার তীব্র নিন্দা করেন। তিনি বলেন, "এদেশের সকলেই একথা ভাল করিয়া জানেন যে, বিমানমার্গে নারীর দল ভয়ঙ্কররূপে বিপজ্জনক এবং তাহাদের দক্ষতা অতি সামান্য। ব্যক্তিগতভাবে আমি বরং আমার গায়ে পাখা লাগাইয়া উড়িব, তবু নারী বিমানচারিণীর সহিত উড়িতে চাই না।'

টলষ্টয়ের গ্রন্থাবলী :—

বর্ত্তমানে রুষিয়ার সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টের উদ্যোগে এবং টলষ্টয়ের বন্ধু ভ্লাডিমির সারকভের তত্ত্বাবধানে টলষ্টয়ের গ্রন্থাবলীর একটি নূতন সংস্করণ বাহির হইতেছে। টলষ্টয়ের অনেক লেখা বিপ্লবমূলক বলিয়া জার গবর্ণমেণ্টের আমলে এবং টলষ্টয়ের জীবিতকালে তাহা প্রকাশ হইতে পারে নাই। বর্ত্তমান গ্রন্থাবলীতে এই সমস্ত

লেখা এবং টলষ্টয়ের অগণিত চিঠি, ডায়েরী ও নোট প্রভৃতি স্থান পাইবে। প্রকাশ যে, টলষ্টয় জীবিতকালে দশহাজার চিঠি লিখিয়াছেন এবং বাহিরের লোকের কাছ হইতে ৪০ হাজার চিঠি পাইয়াছিলেন। এই গ্রন্থাবলীতে টলষ্টয়ের 'এনে কেরেনিনা' নামক প্রসিদ্ধ উপন্যাসের একটি অপ্রকাশিত অধ্যায় এবং "ফর এভরি ডে" প্রভৃতি কতিপয় নূতন পুস্তক স্থান পাইবে। মোটমাট সমগ্র গ্রন্থাবলী ৯০ খণ্ডে সমাপ্ত হইবে। উহার মধ্যে ৪২ খণ্ড সমাপ্ত হইয়াছে। এবং ৮ খণ্ড বাজারে বাহির হইয়াছে। বাকী খণ্ডগুলি ১৯৩৪ সনের মধ্যে প্রকাশিত হইবে আশা করা যায়।

পরলোকে নরসিংহ স্বামী :—

মাদ্রাজের বিখ্যাত হঠযোগী নরসিংহ স্বামী রেঙ্গুণ হাসপাতালে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি কিছুদিন পূর্ব্বে কলিকাতায় এবং মাদ্রাজে বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকগণের সম্মুখে মারাত্মক বিষ, কাঁচের টুক্‌রা, পেরেক ইত্যাদি ভক্ষণ করিয়া সকলের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিলেন। ইনি রেঙ্গুনের বহু লোকের সম্মুখে নানাপ্রকার বিষ, কাঁচের টুকরা ও পেরেক ইত্যাদি ভক্ষণ করেন। ইহার কয়েক ঘণ্টা পরেই অসুস্থ হইয়া পড়েন। তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়; কিন্তু চিকিৎসায় কোন ফল হয় না, তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। হঠযোগের অলৌকিক শক্তি দেখাইবার সময় নরসিংহ স্বামী নাকি এক গ্রেণ নাইট্রিক এসিড, এক ড্রাম বিশুদ্ধ সালফিউরিক এসিড, এক গ্রেণ পোটাসিয়াম সায়নায়েড এবং কয়েকখানি কাঁচের টুকরা ভক্ষণ করিয়াছিলেন। ডাক্তারেরা বলেন যে, ষ্ট্রিকনিনের বিষক্রিয়া সর্ব্বাঙ্গে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহাতেই হঠযোগীর মৃত্যু হইয়াছে। প্রকাশ যে, বিষ, পেরেক ও কাচ ইত্যাদি ভক্ষণের পর নরসিংহ স্বামী নানা প্রক্রিয়া করিয়া এই সমস্ত হজম করিতেন। গতকল্য এই সমস্ত প্রক্রিয়া করিতে তাঁহার একটু বিলম্ব হইয়াছিল, ইত্যবসরে তাঁহার শরীরে বিষক্রিয়া ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

প্রতিনিধি নির্ব্বাচন :—

মুসলমানদের প্রতিনিধি মান্যবর আগা খাঁ, অবনত শ্রেণীর প্রতিনিধি ডাক্তার আম্বেদকার, প্রভৃতি রাউণ্ডটেবিল কনফারেন্সের সভ্য নিযুক্ত হইয়া ইংলণ্ডে গিয়াছিলেন। ইহাঁরা মিলিত হইয়া ভারতের কোন প্রদেশে কতজন উচ্চশ্রেণীর হিন্দু, নিম্নশ্রেণীর হিন্দু, মুসলমান, ইউরোপীয়, এংলো ইণ্ডিয়ান ও ভারতীয় খৃষ্টান ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হইবেন, তাহা নির্দ্ধারণ করেন এবং রাউণ্ডটেবিল কনফারেন্সে উপস্থিত করেন।

বাংলা ও আসাম সম্বন্ধে ইহাঁদের দাবী যে, বাঙ্গালার ব্যবস্থাপক সভার সভ্যসংখ্যা হইবে ২০০। তন্মধ্যে হিন্দু উচ্চশ্রেণীর হিন্দু সভ্য ৩৮, অবনত শ্রেণীর হিন্দু ৩৫, মুসলমান ১০২, ইউরোপীয়ান ২০, এংলো ইণ্ডিয়ান ৩, ভারতীয় খৃষ্টান ২।

আসাম ব্যবস্থাপক সভার সভ্য সংখ্যা হইবে ১০৫। তন্মধ্যে উচ্চশ্রেণীর হিন্দু ৩৮, অবনত শ্রেণীর হিন্দু ১৩, মুসলমান ৩৫, ইউরোপীয় ১০৫ এংলো ইণ্ডিয়ান ১, ভারতীয় খ্রীষ্টান ৩।

জাতি ও ধর্ম্ম অনুসারে যদি সভ্য সংখ্যা নির্দ্ধারণ করিতে হয়, তবে উপরি উক্ত নির্দ্ধারণ যে ন্যায় সঙ্গত হয় নাই, তাহা নিশ্চয়ই স্বীকার করিতে হইবে।

মাতৃভাষায় শিক্ষা ও পরীক্ষার ব্যবস্থা

বাঙ্গলার হাইস্কুলগুলিতে পাঠ্য বিষয়ের সংস্কার করার জন্য যে কমিটি নিয়োগ হইয়াছিল, সেই কমিটি সিনেটের বিবেচনার জন্য এই রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন। যে, ইংরাজী ব্যতীত সমস্ত বিষয় মাতৃ ভাষায় পড়াইতে ও পরীক্ষা লইতে হইবে। ইংরাজী, মাতৃভাষা, গণিত, ইতিহাস ও ভূগোল, প্রাথমিক বিজ্ঞান (জড় বিজ্ঞান ও রসায়ন) এবং কোন প্রাচীন সাহিত্য অবশ্য পাঠ্য বিষয় হইবে। বর্ত্তমানে ম্যাট্রিক ছাত্রগণ যে অতিরিক্ত বিষয় পাঠ করে, তাহা তাহার আবশ্যকতার পক্ষে যথেষ্ট নহে। সুতরাং কতকগুলি অতিরিক্ত বিষয়ের মধ্য হইতে অনধিক দুইটি বিষয় প্রত্যেক ছাত্রকেই পাঠ করিতে হইবে। এই সমস্ত অতিরিক্ত বিষয়ের মধ্যে—হিসাব, জরিপ, প্রাণীতত্ত্ব, ব্যবসায় পদ্ধতি, ব্যবসায়িক ভূগোল, ভারতীয় রাষ্ট্রনীতি প্রভৃতি থাকিবে। ছাত্র ও ছাত্রীদের শিক্ষা বিভিন্ন ধরণের হওয়া আবশ্যক। এ পর্য্যন্ত ছাত্র ও ছাত্রীদিগকে একই প্রকার শিক্ষা দেওয়া হইতেছিল। ছাত্রীদের জন্য সঙ্গীত ও গার্হস্থ্যবিদ্যা অতিরিক্ত বিষয়ের অন্তর্গত করা হউক। সিনেট যদি এই রিপোর্ট গ্রহণ করে তবে উহা ১৯৩৩ সাল হইতে তৃতীয় শ্রেণী হইতে কার্য্যে পরিণত করা হইবে এবং বর্ত্তমানে যে ছাত্র তৃতীয় শ্রেণীতে পড়িতেছে, তাহাকে ১৯৩৬ সালে নূতন নিয়মে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিতে হইবে।

গ্রন্থ-পরিচয়

অনুরাগ কবিতাগ্রন্থ। শ্রীকনকলতা ঘোষ প্রণীত। দাম আট আনা। কনকলতা এই বইখানি তাঁহার পরলোকগত স্বামীকে উৎসর্গ করিয়াছেন। প্রথম কবিতা উৎসর্গ সেই উদ্দেশেই লেখা। হৃদয়-ভরা অনুরাগে সিক্ত শারদ-উষার শেফালীটিরই মত—পতিহারার অনুরাগ কত গভীর এই কবিতাটিই তাহার প্রমাণ। এই গ্রন্থে একত্রিশটি কবিতা আছে। সবগুলি কবিতাই উচ্চভাবে এবং প্রাণের একান্ত অনুরাগে অভিষিক্ত। স্বামীর ভালবাসা ইঁহার অন্তরে কিরূপ রেখাপাত করিয়া আছে ব্যক্তিগতভাবে সে বিকৃত কবিতাগুলিতে

যেমন ফুটিয়াছে, শাশ্বতভাবে স্বামী-স্ত্রী-সম্পর্ক কত নিবিড় তাহাও প্রকাশ পাইয়াছে। 'আঁখিজল, 'কেমনে রহিব হেথা' 'প্রতীক্ষা' প্রভৃতি কবিতাগুলি উল্লেখযোগ্য। পতি-বিয়োগ-বিধুরা কনকলতা সাহিত্যের শরণে কোন রকমে ভুলিয়া থাকিবার ও শান্তির আশ্রয় খুঁজিতেছেন। আমরা তাঁহার সাহিত্য-সাধনার সাফল্য কামনা করি।

'লামাদের দেশ তিব্বতে' শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র প্রণীত। প্রকাশক ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস্, ২২।৬ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম আট আনা। নানা কষ্ট সহিয়া কি করিয়া তিনজনে তিব্বতের রাজধানী লাসা নগরে পৌছিল তাহারই অতি মনোজ্ঞ, পরম কৌতূহলোদ্দীপক চিত্র। লেখক বইখানি বাংলার দুরন্ত ও শান্ত শিশুদের হাতে উৎসর্গ করিয়াছেন। শিশুরা অবশ্য এ বই পড়িয়া খুবই মজা পাইবে, এমনি দুঃখ কষ্ট সহিয়া নানাদেশ দেখিবার প্রবৃত্তিও তাহাদের জাগিবে—শিশুদের সঙ্গে তাহাদের অভিভাবকদেরও এ বইখানি বিশেষ আনন্দ দিতে পারিবে। লেখার সচ্ছন্দগতি, রসোজ্জ্বল কথোপকথন ও মন্তব্যগুলি উল্লেখযোগ্য। বাংলা ভাষায় এমন দেশান্তর যাত্রার শিশুপাঠ্য কাহিনী বেশী নাই এমনধারা বই সে অভাব কিছু পূর্ণ করিতে পারিবে। বই খানিতে কয়েক খানি ছবি আছে—ছবিগুলি ভাল, ছাপা;কাগজ সুন্দর।

'বিচার' শ্রীদামোদর প্রসাদ কবিরাজ কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-তীর্থ কাব্যশাস্ত্রী প্রণীত। মূল্য ৵১০। এই পুস্তিকায় কবিরাজ মহাশয় 'তরুণ সাহিত্যে অযৌক্তিক আক্রমণের' বিচার করিয়াছেন—এবং বহু প্রাচীন কবিদের শৃঙ্গার রসাত্মক কাব্যাংশ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন। সে সব যখন সাহিত্য হইয়াছে তখন তরুণ সাহিত্যের তথাকথিত অশ্লীলতা সাহিত্য হইবে না কেন? কবিরাজ মহাশয় শেষকালে বলিয়াছেন 'সাহিত্য সমালোচনায় অশ্লীলতায় মুখ্য লক্ষ্য রাখলে সমালোচনার দাবী হতে সেটা পদস্খলিত হয়ে পড়ে। কাজেই রস-সাহিত্যের সমালোচনা ব্রণমিচ্ছুক সমালোচকের বিড়ম্বনা মাত্র। শৃগালের মতই হতশ্বাসে সাহিত্য বৃক্ষের মধুররসটীকেও অম্ল বলেই তাদের বিমুখ হতে হবে; অশ্লীলত্ব দোষ স্বরূপেও সাহিত্যের সৌন্দর্য্য বর্দ্ধনে পরিপোষকতা করে; এবং অশ্লীল হলেই সেটা দোষ-পর্য্যায় ভুক্ত হয় না; এবংবিধ সাহিত্যবিচারের নির্দ্দেশ। ইতি' সাহিত্য বিচারের নির্দ্দেশ হইলেও দামোদর প্রসাদের শেষ বাণী ভাল বোধগম্য হইল না। কালিদাস, জ্ঞানদাস, চণ্ডীদাস, সেক্সপিয়র, বাইরন প্রভৃতি অশ্লীল লিখিয়াও মস্ত সাহিত্যিক হইলেন কি করিয়া আর তরুণেরা কেহ স্বল্প দু'চার পাতা লিখিয়াই অশ্লীল হইলেন কি করিয়া ইহা বিচারের বিষয় হইতে পারে কিন্তু সময়ই এ বিচারের ফলাফল নির্দ্দেশ করিবে। যে শরৎচন্দ্রকে লেখক স্থল বিশেষে নজীর ধরিয়াছেন তাঁহার লেখায় স্থল বিশেষ প্রথমে কেহ অশ্লীল মনে করিলেও এখন হয়তো মোটেই তাহা করেন না। বড় বড় কবির সব শৃঙ্গাররসাত্মক কবিতা জড় করিয়া দেখাইলেও যাহাদের প্রতি অশ্লীলতার আরোপ হইয়াছে তাহাদের তৎস্থলে অভিব্যক্তির সম্যক পরিচয় প্রদান না করিলে কি করিয়া অপবাদ খণ্ডন হইতে পারে? কবিরাজ দামোদর প্রসাদ এ বিষয়ে আরো বিস্তৃত আলোচনা করিলে ব্যাপারটা বোঝা যাইবে।

অক্ষরা—শ্রীজগদীশচন্দ্র গুপ্ত। এই পুস্তিকাখানিতে১০টি কবিতা আছে—একটি বাদ সবগুলিই সনেট। মূল্য ছয় পয়সা মাত্র।

অনেকেই জানেন না, জগদীশ বাবু কবিতা লিখিতে পারেন। রবীন্দ্র জয়ন্তী উৎসর্গ গ্রন্থে জগদীশ বাবু কবিগুরুকে কবিতার অঞ্জলি দিয়াছেন। আমাদের এই সংখ্যা পুষ্পপাত্রে তাঁহার একটী কৌতুক কবিতা প্রকাশিত হইতেছে।

এই সনেটগুলিতে কবির বক্তব্য বেশ রসঘন হইয়াছে। 'মা বলে ঐ ডাক দিলে কে'—নামক কবিতাটি একটি সুন্দর লিরিক। লেখকের কাছে আমরা আরও ভাল ভাল কবিতা চাই।

জয়ন্তী—শ্রীপ্রতাপ চন্দ্র সেন বি, এস, সি। রবীন্দ্র জয়ন্তী উপলক্ষে লেখক নিজের কয়েকটি কবিতা জয়ন্তী নামে প্রকাশক করিয়াছেন—পরিচায়িকা লিখিয়াছেন কবি শ্রীকালিদাস রায়। কালিদাস বাবু লিখিয়াছেন—"এই তরুণ কবি কাব্যের বহিরঙ্গের দিকটার প্রশংসাতীত চমৎকারিতা সম্পাদন করিয়াছেন—অনুশীলনে অবহিত হইলে বয়োবৃদ্ধির সহিত কাব্যের অন্তরঙ্গের ঐশ্বর্য্যও যে তাঁহার অধিগত হইবে এ ভরসার ইঙ্গিত কবিতাগুলির মর্ম্মপুটের মধ্যেই বর্ত্তমান।"

আমরা কালিদাস বাবুর সঙ্গে একমত।

চারিদিক নিস্তব্ধ নির্জ্জন। অত্যন্ত নির্জ্জন। নির্জ্জনতা যেন শ্বাস রোধ করিয়া ধরিতে চায়, বুকের উপর পাথর হইয়া বসে।

চারিদিকে ভীষণ উত্তাল জলরাশি এদিকে নয় মাইল, ওদিকে সাত মাইল জুড়িয়া বিস্তৃত। প্রকাণ্ড বিল! গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত বসন্ত সব সময়ে সে ভীষন ভয়ানক। মাঝে মাঝে আকুল জলরাশি নাচিয়া উঠে, খেলা করে, দুই দিকে দূরে বহুদূরে পাহাড় ঘেরা প্রাচীরের গায়ে লাফাইয়া পড়ে আনন্দে আবদারে। ঠিক এইখানে, এই উন্মুক্ত জল রাশির মাঝখানে, একটী ছোট উঁচু জমির উপর একটী ঘর—ছোট্ট, সেইখানে খোলা বারান্দায় বসিয়া থাকে একটী রমণী। সুদীর্ঘ সাত বৎসর সে কাটাইয়াছে এই নির্জ্জনতায়, জগতের সঙ্গে সমস্ত কারবার বন্ধ করিয়া, সমস্ত দাবী দাওয়া চুকাইয়া দিয়া, পৃথিবীর সকলের সহিত সকল সম্পর্ক শেষ করিয়া, জীবনের খেলা-ধূলা সাঙ্গ করিয়া নিজের ইচ্ছায় বরণ করিয়া লইয়াছে সে এই নির্জ্জন কারাবাস। সাতটী কাল বৈশাখীর ঝড় সে খেলিয়া যাইতে দেখিয়াছে এই জলের বুকের উপর দিয়া। প্রবল উত্তাল ঢেউয়ের উল্লাস সে দেখিয়াছে চোখের সামনে, শত প্রলয় নাদে করতালি দিয়া গর্জ্জন করিয়া তাহার ছোট আশ্রয়টুকু গ্রাস করিবার আয়োজন করিতে, সে তাহাতে ভয় পায় নাই, আনন্দে জানাইয়াছে তাহার প্রাণের আকুল আহ্বান। বর্ষার ধূসরতায় সে দেখিয়াছে নীল জলের উপর গাঢ় কালো ছায়া, তাহারই উপর ছুইয়া যাওয়া পাগল হাওয়ার মাতামাতি, আর সেই শিহরণের পুলক সঞ্চার সেই ছোট ছোট ঢেউএর উপর। শরৎ ও হেমন্তের নির্ম্মল আকাশের নীচে সে দেখিয়াছে সিন্ধুর অচঞ্চল জলের সুন্দর গভীর নীলিমা। গম্ভীর নির্জ্জন সন্ধ্যায় সে বসিয়া একদৃষ্টে চাহিয়াছে; কতদিন, কতক্ষণ সেই মৌন গাম্ভীর্য্যের উদ্দেশে। শীতের কুয়াশার আবরণে সে হারাইয়া মিশিয়া যাইতে দেখিয়াছে ঐ বিরাট জলরাশিকে প্রকৃতির অসীম শূন্যতায়। আর বসন্তের মুঞ্জরিত পল্লবিত প্রভাতে, সে দেখে নাই নবীন মঞ্জরী, শোনে নাই পাখীর কাকলী, পায় নাই জীবনের সাড়া, শুধু জল—জল—সে দেখিয়াছে শুনিয়াছে শুধু জল, জলের গর্জ্জন, জলের রহস্যময় অবোধ্য ভাষা, আর পাইয়াছে শুধু জগত ভরিয়া একটা বিশ্ব ক্রন্দনের সাড়া।

সঙ্গে তাহার একটী বৃদ্ধ চাকর আর একটী বৃদ্ধা দাসী। এক মাস পরে পরে সে একটী ছোট নৌকা বাহিয়া যায় দূরে সাত মাইল দূরে পল্লীর বাজারে, সেখান হইতে সে আবশ্যকীয় জিনিস লইয়া ফিরিয়া আইসে।

রমণীর মাথার চুলগুলি প্রায় সাদা হইয়া গিয়াছে। বার্দ্ধক্য তাহার সারা অঙ্গে, মুখে সময়ের দাগ সুস্পষ্ট আঁকিয়া দিয়াছে—তাহাতেও তাহার সৌন্দর্য্যের হানি হয় নাই। বরং তাহার সমস্ত জীবনের সব কিছু অভিজ্ঞতা, সুখ, দুঃখ বেদনা তাহাকে দান করিয়া গিয়াছে অস্বাভাবিক একটা ঔজ্জ্বল্য। দুঃখ ক্লেশ বেদনা তাহার জীবনের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে অনেক-বার। আনন্দও তাহাকে বঞ্চিত করে নাই একেবারে, কিন্তু জীবন তাহার দুঃখের দাহনে জ্বলিয়া জ্বলিয়া সোনা হইয়া গিয়াছে। দুঃখই জীবনের সফলতার মূল, দুঃখই নাকি মানুষকে সম্পূর্ণ করিয়া তোলে, উন্নত করে, সকল কালিমা মুছাইয়া দিয়া উজ্জ্বল করিয়া তোলে অন্তর বাহির। দুঃখেও তৃপ্তি আছে, শান্তি আছে, তাহারই ভিতর

বিশ্বের আনন্দ লুকাইয়া আছে—তাই বুঝি শোকে দুঃখে ভরা পৃথিবীটা মানুষের এত প্রিয়। দুঃখকে চির-সাথী করিয়া তাই লইয়া সে নিজেকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছিল, দুঃখকে সে ছাড়িতে চাহিত না, ভুলিতে চাহিত না, কারণ এই দুঃখই তাহার জীবনের একমাত্র উদ্যম, আশা আনন্দ, বাঁচিয়া থাকিবার জীবনীশক্তি। তাহার সমস্ত জীবনের সমস্ত কথা সে রোজ ভাবে, তাহাতে ব্যথা পায়, বুক ভাঙ্গিয়া যায়, প্রতি পঞ্জর ধ্বসিয়া পড়ে তিলে তিলে, কিন্তু তবু সে আঁকড়িয়া ধরিয়া আছে ঐ দুঃখকে। তাহা তাহার জীর্ণ তন্ত্রী গুলিতে আবার ধ্বনিয়া তোলে কত ছন্দ, কত ভাষা, কত রাগিণী, তাই সে ভাবে, রোজ রোজ—প্রতিদিন। নিঃসঙ্গ জীবনের চির দুঃখের আনন্দে ভরা দিনগুলিকে তাহার সঙ্গি করিয়া লইয়া সে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে, অপেক্ষায় অপেক্ষায়। সে কোন সুদূরের, কোন মিলন-বাসরের অপেক্ষায়। কালের ছায়া স্পর্শ করিয়াছে তাহার জীবন, কিন্তু তবু তাহার এ-দুঃখের ভরা পশরা লইয়া সে কি মিশিয়া যাইবে ঐ জলরাশির সহিত। শূন্য কি তাহা হইবে না? বুঝি আসিবে না সে, সব বুঝি ব্যর্থ হইল, অপেক্ষায় অপেক্ষায়। চুল কি আরো সাদা হইয়া যাইবে একেবারে, চক্ষুর দৃষ্টি ক্ষীণ হইয়া যাইবে একেবারে তখন কি প্রিয় আসিবে? কে বলে সময় নাই? বাহির তাহার শুষ্ক হইলেও অন্তর যে তাহার এখনো সবুজ আছে, বাহির তাহার কালের ছোঁয়া পাইলেও অন্তর তাহার এখনো নবীন তরুণ—তাহাই থাকিবে বুঝি তাহা তাহার অপেক্ষায় যতদিন না তাহার সকল প্রতীক্ষা সফল হইয়া উঠে।

নিজের যত ন্যায় অন্যায়, ভুল মিথ্যা সবই মূর্ত্ত হইয়া উঠে তাহার চোখের সম্মুখে, সে ভুলিতে চায় না, ভুলিতে পারে না—কারণ সে জানে নিজেকে প্রবঞ্চনা করিয়া কোন লাভ নাই, তাহাতে শান্তি পাওয়া যায় না, তাহাতে সুখ নাই। নিজেকে এতদিন সে চিনিতে পারে নাই। সারা জীবনটা তাহার একটা ফাঁকির ভিতর দিয়া চলিয়া গিয়াছে। এই যে তাহার আজ নির্জ্জন বাস ইহা যাহাতে একেবারে ফাকি না হইয়া যায় সেইজন্য সে সব ভাবনা নূতন করিয়া ভাবে বার বার। আর চাহিয়া থাকে খোলা জানালা দিয়া ঐ বিস্তৃত বহুরূপী জলরাশির দিকে। কতদিন চলিয়া গিয়াছে এইখানে তাহা সে গোণে নাই। তাহার সমস্ত ভুল ত্রুটি দোষ জমা খরচ করিয়া, হিসাব মিলাইতে না পারিয়া সে যেদিন আশ্রয় লইয়াছে এই-খানে, সেদিন—সেই দিন হইতে সে আর বৎসর গুণিয়া দেখে নাই। জীবনের এই পাতাগুলি একেবারে সাদা করিয়াই রাখিয়াছে সে, তাহাতে কালির আঁচর এতটুকুও কাটিয়া দেয় নাই।

তারও আগে—তারও আগে—আরো—আরো সমস্ত ঘটনাই স্পষ্ট তাহার মনে পড়ে। প্রতি পল, প্রতি মুহূর্ত্ত প্রতি ঘণ্টা—আর কতগুলি পুরাণো খাতা খুলিয়া সে নিজের মনে পড়ে :—

সুরমা ধনীর কন্যা, ধনীর পুত্রবধূ—শিক্ষিত ধনীর পত্নী। সংসারের বা সমাজের যত রকম বিলাসিতায় রাতদিন ডুবিয়া থাকিত সে। বহু মূল্য শাড়ী প্রতিদিন তাহার অঙ্গ ঘিরিয়া সার্থকতা লাভ করিত। কোন রকমের আনন্দ উল্লাস তাহাকে স্পর্শ না করিয়া চলিয়া যায় নাই। তাই সে যেদিন সব ছাড়িয়া দিয়া বাছিয়া লইল এই নির্জ্জন বাসস্থান সেদিন অনেকে আশ্চর্য্য ও স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে বুঝি নিজেও। কিন্তু এই দুঃখই তাহাকে আনিয়া দিয়াছে শান্তি—তৃপ্তি। বিরহের ব্যথা তাহার সকল মিলনকে নিবিড়তর করিয়া তুলিতে চায়—তাই অপেক্ষা—অপেক্ষা—অপেক্ষা—

জীবনের সুখ দুঃখ ঘেরা দিন গুলি তাহার চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠে প্রতিদিন জ্বলন্ত হইয়া,আগুনের তুলিতে আঁকা ছবির মতন। বাল্যের পবিত্র দৃষ্টির সামনে মেলিয়া ধরা জগতের দৃশ্য কত সুন্দর ছিল! পিতামাতার স্নেহ ভালবাসার রত্ন-খচিত বেদীতে বসিয়া যে সে পুতুলের খেলাঘর পাতিয়াছিল—তাহাও তেমনি আনন্দ উৎসব মুখরিত হইয়া তাহার কোমল প্রাণে কোন এক ভবিষ্যৎ সুখ-গীতিকার গুঞ্জরণ ধ্বনিয়া তুলিয়াছিল। মনে পড়ে বাল্যসখী কণিকার কথা—আরো সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে প্রতিবেশী সুশ্রী বালক বিজয়ের কথা। সেই কণিকা আর সেই বিজয় তাহার খেলা-ঘরের সাথী হইয়াও আবার যে তাহারা ভিন্নরূপে তাহার বাস্তব ঘরের সাথী

হইতে আসিবে তাহা যদি সে তখন জানিতে পারিত—! মানুষ যদি ত্রিকালজ্ঞ হইত, তাহা হইলে এতদিনে পৃথিবী অন্য রকম হইয়া যাইত।

মানুষ নাকি ভাবে এক আর হয় আর। তাই ভাবিয়া চিন্তিয়া যখন একদিন সুরমা নিজেকে চির-বন্ধনের সূতায় বাঁধিয়া ফেলিল, ঠিক তার কিছুদিন পরেই সে বুঝিল, হইয়া গিয়াছে, আর ভাগ্য সে মানে না, কিন্তু তাই বলিয়া তো অনেক কাজের কারণ খুঁজিতে গিয়াও তাহার যুক্তি তর্কে ভরা মনটা কারণের খেই হারাইয়া, গোল পাকাইয়া অবশেষে সেই অদৃষ্টের দোহাই দিয়াই নিজেকে প্রবোধ দিতে বাধ্য হইয়াছে। কারণের কারণও সে খুঁজিতে চায় কিন্তু পায় না। "কারণ সমুদ্রে" হাবুডুবু খাইয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া সে সেই অদৃষ্টের বালুচরে আসিয়া আবার আশ্রয় নেয়! কতগুলা 'কেন' এক সঙ্গে চীৎকার করিয়া তাহার কাছে উত্তর চায়, কিন্তু উত্তর কাহারও সে দিতে পারে না, নিজের প্রশ্নের জালে নিজেই জড়াইয়া অস্থির হইয়া উঠে, তারপরে নিজেই নিজের প্রশ্নের সঙ্গে সুর মিলাইয়া আর্তনাদ করিয়া উঠে—"কেন! কেন!! কেন!!!"

ঘরের খাইয়া বনের মহিষ তাড়াইতে তাহার কেন যে প্রবল একটা ইচ্ছা জাগিয়া উঠিয়াছিল কে জানে? বেশ তো ছিল সে। বাপ মায়ের সাধের মেয়ে, নয়নের মণি, বুকের রক্ত! লেখাপড়াও বেশ শিখিতেছিল, কোন অভাব মানসিক বা সাংসারিক, তাহাকে কখনো ব্যথিত করিতে পারে নাই। বাপমায়ের স্নেহভরা রত্নভাণ্ডারের অধিকারিণী সে দুই হাতে সে রত্নরাজির অপব্যয় করিয়াও তো সে তাহা নিঃশেষ করিতে পারে নাই কোনদিন। আনন্দের ঝরণাধারায় নিত্য স্নান করিয়া সে খেলিত, সুখের পশরাভরা খেলনা লইয়া, তাই বুঝি জীবনটাকেও সে তেমনি হাল্কা ভাবে চালাইয়া লইতে গিয়াছিল। সংসারটা বুঝি এমনিই সে ভাবিয়াছিল, এমনি লঘু চপল গতিতে, এমনি অবলীল ভঙ্গিতে, অনাবিল ভাবে বুঝি সবার দিন কাটে, তাহারও কাটিবে। তাহার ভরা ডালা হইতে সুখের ফুল গুলি সে যেমন ইচ্ছা তেমনি ভাবে ছড়াইয়া বিলাইয়া, ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিবে, তবু তাহার অফুরন্ত ডালা বুঝি থাকিবে চিরকাল ভরপুর। কিন্তু ক্রমে সে মর্মে মর্মে বুঝিল—না গো না—নিজের হাতে সুখের ঘর একবার ভাঙ্গিয়া দিলে আর তাহা গড়িয়া উঠেনা।

কেমন করিয়া একদিন তাহার বিবাহ হইয়া গেল তাহা তাহার কাছে শুধু খেলার মত মনে হইত। বয়সে নেহাৎ ছোট না হইলেও সংসারের জ্বালা যন্ত্রণা তাহাকে কোনদিন স্পর্শ করে নাই বলিয়া ১৯ বছর বয়সেও তাহার মনটী ছিল সংসারনভিজ্ঞা বারো বছরের বালিকার মত। সানাইয়ের মধুর তান, ফুলের সৌরভ, বস্ত্রালঙ্কারের মেলা সবই তাহার কাছে সেদিন সুখকর মনে হইলেও, পরে বুঝিয়াছিল—কতখানি সত্য সেই আনন্দ উৎসবের ভিতর ছিল, ও সেই দিনের সেই গান, সেই সুর, সেই হাসির কলরোল, ফুলের সৌরভ সকলের জীবনে কতদিন-ব্যাপী সুখ-স্বপ্ন বহন করিয়া আনে। ক্ষণিক! ওগো—ক্ষণিক। আর কাহারও জীবনে তাহা হয়তো আনিয়াছে কিন্তু তাহার জীবনে সে স্থায়ীত্বটুকু বেশী দিন ছিল না তো! তাহাদের স্বল্পস্থায়ী সুখের মাদকতা লইয়া, সেইদিনই তাহার নবজীবনের প্রারম্ভেই তাহারা কোথায় মিলাইয়া গিয়াছিল—কে জানে? অসাড় বস্ত্রালঙ্কার তাহাকে জীবনে শুধু উপহাসই করিয়া আসিয়াছে এতটুকু সার্থকতা কেনদিন তাহাকে আনিয়া দিয়াছিল কি?

স্বামীকে সে প্রথম হইতে ভালবাসিয়াছিল মনে প্রাণে। কিন্তু স্বামীর নিকট হইতে কোন প্রতিদান তাহার স্মৃতিমন্দিরের দুয়ার কোনদিন খুলিতে পারিয়াছে বলিয়া তাহার মনে হয় না। দীর্ঘদিন ধরিয়া অধীর প্রতীক্ষায় সে কত রাত্রি কাটাইয়াছে, স্বামী তাহার আসিয়াছে,—হাঁ আসিয়াছে কিন্তু সে আসা তাহার ব্যাকুল চিত্তে মিলনের শান্তি-প্রলেপ লেপন করিয়া দেয় নাই। এক এক দিনের খুঁটিনাটি ঘটনা মনে পড়ে। শীতকাল। রাত্রি—চারিদিক কুয়াশায় ঢাকিয়া গিয়াছে। তবুও নির্জ্জন বালিগঞ্জ অঞ্চলের

পথেও মোটরের বিরাম নাই। স্বামীর অপেক্ষায় অপেক্ষায় বিরক্ত ও ক্লান্ত হইয়া সুরমা আর একবার পাশের টিপয়ের উপর ছোট ঘড়িটির দিকে চাহিয়া দেখিল ১২টা বাজিয়া কুড়ি মিনিট হইয়াছে। একটী দীর্ঘ নিশ্বাস চাপিয়া, হাতের বইখানি বন্ধ করিয়া তারপরে অন্যমনস্ক ভাবে বেড্ সুইচ টিপিয়া, বাতিটি নিবাইয়া চাহিয়া রহিল শূন্য দৃষ্টিতে জমাট বাঁধা গাঢ় অন্ধকারের দিকে। কতক্ষণ সে এইভাবে চহিয়াছিল বুঝিতে পারে নাই—ইহার ভিতর কত চিন্তা এলোমেলো ভাবে তাহার অন্তর নিহিত স্মৃতির তলদেশ অলোড়িত করিয়া চলিয়া গেল। নূতন নহে, এ নিত্যকার প্রতিদিনকার ঘটনা। তবুও কেন কি জানি, সেই একঘেয়ে চিন্তাধারার হাত হইতে সে নিজেকে ছাড়াইতে গিয়া আরো বেশী করিয়া তাহাতেই জড়াইয়া পরে। সে সময়ে তাহার স্বল্প-বিবাহিত জীবনের মাত্র তিনটি বৎসর এই ভাবেই কাটিয়াছে—তাহাতো অতি সত্য। স্বপ্ন, গান বা কবিতার এতটুকু কণাও তো তাহার সে জীবন ধারার গতিরোধ করিয়া একটা পরিবর্ত্তনের উন্মাদনা আনিয়া দেয় নাই কোন দিন? তবে কেন আজো সে এমনি ব্যর্থ প্রতীক্ষা করিয়া রাত্রি কাটায়? আজো কেন অধীর অপেক্ষায় নিজেকে এমনভাবে উপহাস করে সে? স্বামী তাহার কাছে তিন বছরের পরিচিত হইলেও, রাজীব তাহার কাছে অপরিচিত ছিলনা—সে যে তাহাকে বহুদিন হইতে চিনিত। ভাবি স্বামী রাজীব বোসকে সে বেশ ভাল করিয়া চিনিবার বুঝিবার অবসর পাইয়াছিল অনেকদিন হইতে। তবে সে চেনা জানার ভিতর কি সবটাই ফাঁকি ছিল? সে ফাঁকিটা কে কাহাকে দিয়াছিল? রাজীব তাহাকে—না সে নিজের মনকে—তাহা সে আজও ভাবিয়া ঠিক করিতে পারে নাই। তখনকার রাজীবের এইটাই ছিল তাহার কাছে তাহার ব্যক্তিত্ব; এই ছিল তাহার সৌন্দর্য্য—আর এখনকার স্বামীর এই সবার চাইতে বড় অন্যায়—নিষ্ঠুর অবিচার! তবে কি সুরমা তাহার নিজের মনকেই ভুল বুঝিয়াছিল সেদিন? যেদিন তাহার জীবনের সর্ব্বপ্রধান পথনির্ণয়ের ভার বাপ মা তাহার নিজের উপরেই তুলিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত মনে তাহারই ইচ্ছা মানিয়া লইয়াছিলেন? সেদিন সুরমা খেলাচ্ছলে তুচ্ছভাবে অত বড় একটা জীবন-মরণের কঠিন মীমাংসা মুহূর্ত্তে করিয়াছিল কেন? বাস্তবটাকে দূরে সরাইয়া কল্পনার ছবি আঁকিয়া সে নিজের মনে, নিজের ইচ্ছায় নানা রং ফলাইয়া সুন্দর করিয়া তুলিয়াছিল যাহা তাহাই যে হইয়াছিল তাহার সবার চাইতে বেশী মিথ্যা। সেদিনের সে ছবি ঠিকই আছে, শুধু আজ সে নিজে দেখিতে শিখিয়াছে কতটা অনভিজ্ঞ ছিল সে সেদিন, কত ত্রুটি, কত ভুল রহিয়া গিয়াছে সে ছবিতে, আজ যাহা ভুল, একেবারে ভুল—। ছবি আঁকা তাহার কিছুই হয় নাই, হইয়াছে শুধু রং তুলি লইয়া বিরাট একটা শিশু-খেলা। আজ সে ছবির ভুল সংশোধন করিতে গেলে ধুইয়া মুছিয়া একেবারে সাদা করিয়া ফেলিতে হয়।

বাহিরের বড় ঘড়িটায় ঢং ঢং করিয়া দুইটা বাজিল, সঙ্গে সঙ্গে চিরপরিচিত মোটর হর্ণ বাজাইয়া ফটকে প্রবেশ করিল। সুরমার বুকটা অজ্ঞাতসারে একটু কাঁপিয়া উঠিল, অলক্ষ্যে একটী স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া সে পাশ ফিরিয়া শুইল। স্বস্তি কিসের তাহার? সে জাগিয়া থাকুক কি নাই থাকুক—কেহ তো দেখিতে আসিবে না, তবুও এ স্বস্তির তৃপ্তি ভরা আশ্বাস কেন? অকারণে? তাহা সে নিজেই জানে না!

দুই

পরদিন রাজীব নিত্য অভ্যাসমত বেলা দশটার সময় উঠিয়াছে। সুরমা আগে চা ও খাবার পাঠাইয়া দিল, তারপরে নিজে ঘরে ঢুকিয়া খানিকক্ষণ এটা ওটা নাড়াচাড়া করিল, টেবিলের উপরের বইগুলা একটু ঠিক করিয়া মেজে হইতে একটুকরা কাগজ তুলিয়া বাহিরে ফেলিয়া দিল, তারপরে যেখানে বসিয়া রাজীব একমনে খবরের কাগজ পড়িতেছিল, সেইখানে আসিয়া দাঁড়াইয়া পেয়ালায় চা ঢালিতে ঢালিতে জিজ্ঞাসা করিল—"কাল ক'টায় এলে?"

কাগজ না তুলিয়া রাজীব বলিল "কি জানি অত ঘড়ি ধরে সময় দেখিনি !"

সুরমা চায়ের পেয়ালা হইতে মনোযোগ সহকারে একটী পাতা চামচে দিয়া তুলিয়া বাহিরে ফেলিয়া দিয়া বলিল—"তুমি দেখনি, কিন্তু আমি দেখেছি, রাত দুটো—দিনকে দিন তোমার সময় বেড়েই যাচ্ছে দেখতে পাই আজকাল—"

বিরক্তির স্বরে উত্তর হইল "দেখতে পাও তো বেশ ভালই, তাতে আমার কিছু আসে যায় না।"

"সুরমা চায়ের পেয়ালাটা একটু আগাইয়া দিয়া বলিল—"তোমার আসে যায় না তা জানি, কিন্তু আমার আসে যায় কারণ তোমার প্রতি আমার একটা কর্ত্তব্য আছে এবং আমার প্রতিও তোমার তেমনি একটা কিছু আছে তা মানো বোধহয় ?"

খবরের কাগজ সরাইয়া স্বামী বলিল—"তা মানি নিশ্চয় কিন্তু কর্ত্তব্যের ত্রুটটা আমায় কোথায় দেখছ তুমি ? তোমাকে বোধহয় আমি কোনদিন কোন কষ্ট দিই নি, কোন কিছুর অভাব বুঝতে দিইনি।"

সুরমার মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না—যেন কি একটা বলিতে গিয়া সে নিজেকে সামলাইয়া লইল।

রাজীব চাটুকু শেষ করিয়া বলিল—"দেখো, আমি তোমাকে কখনো কোনরকম কষ্ট দিই নি, তবে যেটুকুর জন্য তোমার অভাব অভিযোগ তা আমি বুঝি। কিন্তু সেটুকুর জন্য আমায় দোষ দেওয়া তোমার অন্যায়, আমি তোমাকে কোনদিন ঠকাতে চাইনি, বিয়ের আগে আমাকে তুমি যথেষ্ট জানবার অবসর পেয়েছিলে, তখনো আমি কোনোদিন সাধুর মুখোস পরে তোমার সামনে আসিনি, তবে আজ কেন তোমার অভিযোগ।"

সুরমা রুক্ষস্বর পরিষ্কার করিয়া বলিল—"তা ঠিক, কিন্তু আমাকে তাহলে তোমার বিয়ে করা উচিত ছিল না,—আমিও তোমাকে এমন কিছু পায়ে ধ'রে সাধতে যাইনি। যদি তোমার মনের ভাব এই ছিল, যদি তুমি তখন আমার সঙ্গে এই ব্যবহারই করবে ঠিক করে রেখেছিলে, তবে—তবে—এর চেয়ে ঢের বেশী মনুষ্যত্বের পরিচয় দিতে একেবারে বিয়ে না করলেই—"

রাজীব মৃদু হাসিয়া বলিল,—থামো অত শিগগির আমার মনুষ্যত্বের বিচার করতে বসোনা। তুমি পায়ে ধরে সাধনি ঠিক—কিন্তু আমিই কি পায়ে ধরে সাধতে এসেছিলুম ?"

"পায়ে ধরে সাধনি নিশ্চয়, কিন্তু তুমি তখন এমন কোন ভাবও দেখাওনি যাতে আমি অন্ততঃ বুঝতে পারতুম যে তোমার এই ইচ্ছাই মনের গোপন কোণে লুকোনো ছিল। তাহলে কি আমি—"

বাধা দিয়া রাজীব বলিল—"শোন, শিষ্টাচার, ভদ্রতা গুলোই তোমরা মেয়েরা প্রেমের অপরূপ চিহ্ন বলে ধরে নাও, তা আমার জানা ছিল না, আমি তোমার সঙ্গে মিশতুম মাত্র বন্ধুর মতন, তাছাড়া তোমার দিক থেকেও তো কোন আপত্তি বা বাধা আমি কোনদিন পাইনি।"

সুরমার আত্মাভিমানে কে যেন লাঠি মারল, তাহার মুখ লাল হইয়া উঠিল, সে বলিল—"তবে—তবে কি তুমি বলতে চাও যে আমার সঙ্গে মেশার ভিতর ভালবাসার বন্ধন বিন্দুমাত্র ছিল না ? তবে কেন আমাকে বিয়ে করলে ? দয়া—না অনুকম্পা ?"

"মৃদু হাসিয়া রাজীব বলিল "রাগ করো না, দয়া বা অনুকম্পা নয় সুরমা ! যদি বলি ভালবাসার বন্ধনের বাইরে থেকে হাওয়ার সনে এমন কতগুলি কথা আমার কানে ভেসে এসেছিল তখন যে আমি দেখলুম তোমাকে বিয়ে করা ছাড়া তোমার সুনাম রক্ষা হয় না। তারপরেই সেই জন্য আমি তোমার বাবার কাছে তোমাকে চাইলুম।

দৃঢ়স্বরে সুরমা বলিল—"আমার সম্মান বা মর্য্যাদার ভার আমি তোমার হাতে তুলে দিয়েছিলুম কি ? সে বিচারটা তখন না করলেই, আমার পক্ষে বেশী ভাল হত।" একটু থামিয়া আবার সুরমা বলিল—"কিন্তু —আমি তখন বুঝতে পারিনি যে মিনতির সঙ্গে তোমার এতটা ঘনিষ্ঠতা আছে !"

রাজীব হঠাৎ উত্তর দিতে পারিল না।—একটু পরে বলিল—"ঐ খানেই তোমার ভুল ! ভাল করে ভেবে দেখো সুরমা, সেদিন রাত্রে তোমাদের বাড়ীর

বারান্দায় আমি আমার জীবনের চরম দুর্ব্বলতার কথা চরম অপরাধের কথা সব বলেছিলুম, এক রতি মিথ্যা বলিনি সেদিন, একটী কথাও লুকাইনি। কিন্তু সেদিন তুমি হেসে বলেছিলে, ও সবে আমি আপত্তি করিনা, পুরুষ মানুষ তুমি, একবার ভুল করলে সে ভুলের কি ক্ষমা নেই? তাই সেদিন আমি অনেকখানি শ্রদ্ধাও নিবেদন করে দিয়েছিলুম তোমাকে।—তারপরেও আর এখন আমাকে দোষ দেওয়া তোমার পক্ষে কি খুব সুবিচার করা হচ্ছে? সেদিন তুমি যদি আমাকে বুঝিয়ে দিতে যে আমার এ ভুল বা দুর্ব্বলতা তুমি অপরাধ বলে ধরে নিয়েছ তাহলে আমি বোধহয় তোমাকে বিয়ে করবার দুঃসাহস করতুম না।"

তীব্রস্বরে সুরমা উত্তর দিল—"ভুল তো শেষ হয়ে গিয়েছিল তা করার সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু তা বলে যে তুমি সেই ভুল প্রতিদিনই করে যাবে, তা ভুল জেনেও দোষ জেনেও, অন্যায় জেনেও, এমন কোন কথা তো ছিল না।

রাজীব শান্তস্বরে বলিল "ছিল বৈকি—আমার সমস্ত কথা স্পষ্ট মনে পড়ছে, বলেছিলুম—'তোমাকে আমার করে নেবার আগে আমাকে আমার জীবনের কতগুলি কথা বলতে দাও সুরমা, তারপরে বিচার করে ভেবে দেখে তুমি রায় দিও'—বলিনি? বাবা মারা যাবার পর উনিশ বছর বয়সেই এত বড় সম্পত্তির মালিক হলুম, তা বলে নয়, মাথাটা আমার ঠিকই ছিল, কারণ আমি বেশ শান্তভাবেই আমার কাজের ভার মাথায় তুলে নিয়েছিলুম, এবং একদিনও আমার কোন কর্ত্তব্যে অবহেলা করেছি বলে মনে হয় না। যাক্ তারপরে, কয়েক মাস পরে একদিন শুনলুম একটী লোক সঙ্গে একটী মেয়ে নিয়ে উপস্থিত হয়েছে, আশ্রয় চায়—দেনার দায়ে যা কিছু সম্বল ছিল সব গেছে—তাই আজ নিরাশ্রয়—নইলে বংশ তার নেহাৎ নীচু ছিল না। সেই অবধি মিনতি ও তার বাবা আমার বাড়ীতে রইল। মিনতি সুন্দরী বালবিধবা, বয়স তার তখন ছিল সতেরো কি ষোল। বছর খানিক পরে মিনতির বাবা একদিন তাকে আমার হাতে তুলে দিয়ে মারা গেল।—তার জন্যও নয়, কিন্তু, তার পরে আরম্ভ হ'ল বিরাট একটা ভুলের অধ্যায়, যাবার জন্য আজ আমি ধর্ম্মের চোখেও বন্দী—আর মিনতিকেও ছাড়তে পারিনা। মনে পড়ে তোমার এসব কথাগুলো?

সুরমা খানিক ভাবিয়া উত্তর দিল—মনে পড়ে, কিন্তু শেষের কথা কটা বোধহয় তুমি আজকেই প্রথম বললে—"

এইবার রাজীবের আত্মাভিমানে আঘাত লাগিল—সে কঠোরস্বরে বলিল—"দেখো, আমাকে তুমি কি মনে করেছ সুরমা? আমি কি তোমার বা তোমার টাকার কাঙাল ছিলাম যে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে তোমাকে লাভ করবার চেষ্টা করেছি,—বা এখনো আমার মিথ্যা বলবার কোন দরকার আছে? তোমাকে আর যা কিছু করি কিন্তু ভয় করি না,এটা স্থির জেনে রেখো।"

সুরমাও বেশ একটু জোরের সহিত বলিল—'তা জানি। কিন্তু তোমার আমার Courtship টা যখন লেখাপড়া করে রাখা হয়নি বা বিয়ের সময় agreementও একটা করা হয়নি, তখন আজ এ নিয়ে মারামারি করে লাভ নেই। সে যাই হোক, আমার কথা হচ্ছে,—বেশ, ভুল একটা হয়েছে, হয়েছে—কিন্তু এখনো তার সঙ্গে অত ঘনিষ্ঠতা করবার তো দরকার দেখি না, বা তাকে পথে বের করে দিতেও বলিনা, একটা allowance দিয়ে তুমি তাকে রেখে দাও দূরে। এইটুকুই আমি চাই।—"

রাজীব ক্রুদ্ধস্বরে বলিল "মিনতি সম্বন্ধে তোমার কাছ থেকে আমি কোন উপদেশ চাই না। মিনতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতাও আমি ছাড়তে পারি না, কারণ আমি তার কাছে প্রতিজ্ঞা বদ্ধ—"

রাজীব ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। আর সুরমা স্তব্ধ হইয়া সেইখানে বসিয়া রহিল।

অভিসারিকা সন্ধ্যা অনেক আগে, ধরার বাসরে ফুলের বিছানা পাতিয়াছে। জুঁই বেলের সুরভি মাখিয়া, সন্ধ্যারাণীর আকুল নিঃশ্বাস বহিয়া বাতাস যেন ঘুরিয়া ফিরিতেছিল কোন অজানা প্রিয়ের অন্বেষণে। রাজীব বোসের প্রকাণ্ড বাড়ীটা নিস্তব্ধ শান্ত শোভার আবেশ মাখিয়া কিসের মোহে ঢুলিয়া পড়িয়াছে। ঘরগুলিতে

বেশী বাতি জ্বালানো ছিলনা। পুবদিকের বারান্দাটায় চাঁদের আলো সন্তর্পনে অযাচিত ভাবে আসিয়া লুটাইয়া পড়িয়াছে অধীর আবেগে। সুরমা সেইখানে বসিয়া ভাবিতেছিল।—যেন একঘেয়ে নিজেরি কথা। সে বুঝিতে পারিতেছিল না কিছুতেই কি করিয়া সে তাহার এই পরিহাসময় জীবনের ভার বহিয়া সুদীর্ঘ দিনগুলি কাটাইয়া দিবে। রাজীব যে কথাগুলি সকালে তাহাকে বলিয়াছিল, সে কথাগুলি চুলচেরা বিচার করিয়া তো সে কোনদিন দেখে নাই। "মিনতিকে ছাড়তে পারি না"—এ কথা গুলি রাজীব সেদিন বলুক্ আর নাই বলুক, অথবা সে সেই দিন শুনুক আর নাই শুনুক,—কিন্তু মিনতির অস্তিত্ব তাহার অজ্ঞাত ছিল না ইহা নিশ্চয়। তবু সে কেন অত বড় ব্যাপারটাকে অনায়াসে অবহেলা করিয়াছিল? মনে পড়িতেছিল তাহার মায়ের কথা। যে দিন রাজীব সুরমার পাণি প্রার্থনা করিল সেই দিনই তাহার মা তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "রাজীবকে বিয়ে করতে আপত্তি আছে কিছু তোর?" সুরমা তৎক্ষণাৎ মাথা নাড়িয়া জানাইয়াছিল "না মা।" মা আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন "ধন্যি মেয়ে যাহোক্, বিয়ের নামে একটু লজ্জাও হ'ল না? কিন্তু সব দিক বুঝে বেশ ভাল করে দেখ, বিয়েটা খেলা নয়, বা বায়োস্কোপ, থিয়েটার যাওয়া নয়। জীবনটা অত হাল্কা নয় সুরমা ভেবে দেখ।'

সুরমা এতটুকু ইতস্তত না করিয়া বলিল "ভেবে দেখেছি মা!" মা বলিলেন "এক মিনিটেই ভাবা হ'য়ে গেল? যাকে নিয়ে সারা জীবনটা কাটাতে হবে, তার শুধু রূপ বা টাকা হলেই হয় না, আরো অন্য কিছু চাই। চিরজীবন—সুরমা চিরজীবনের একটা সিদ্ধান্ত এমন খেলাচ্ছলে এক মুহূর্ত্তে ক'রে ফেলিস্ না—আমার ভয় হয়। এখন না কিছুদিন পরেই উত্তর দিস্!"

তারপরে যেদিন সুরমা ভাবিয়া চিন্তিয়া মাকে গিয়া উত্তর জানাইল সেদিনও মা বলিয়াছিলেন—"জানি না, তোর উপর সারা জীবনের পথ বেছে নেবার ভার ফেলে দিয়ে ন্যায় করলুম কি অন্যায় করলুম আমরা কিন্তু মনে হয় তোর ভুল বোধহয় হয়নি। রাজীব ভাল ছেলে, কিন্তু তোর দিক থেকে বলছি সুরমা, তোর মনের ভালবাসার কি এত দৃঢ়তা আজ এসেছে, যা তোকে সুখে দুখে অটল রেখে জীবনের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে? এই সময়ের সাময়িক মনের বিকারকে ভালবাসা ব'লে ভুল করিস নি তো?—ভেবে দেখেছিস?" সুরমা সহজ সুরেই উত্তর দিয়াছিল "হ্যাঁ, মা।" একবার তাহার মনে হইয়াছিল মিনতির কথা বলিবে, কিন্তু তারপরেই সে নিজেকে ধিক্কার দিয়া সামলাইয়া লইয়াছিল। কারণ এই সামান্য একটা কথা বলিয়া সে রাজীবের অপমান করিবে না, অথবা নিজেকেও নীচু করিবে না। কল্পনার প্রেম করিতে পারে ত্যাগ, করিতে পারে আত্মবিসর্জ্জন, কিন্তু বাস্তবে বুঝি তাহা সহজসাধ্য হইয়া উঠে না। তাই সেদিন সে প্রেমের কল্পনায় সুরমা ভাবিয়াছিল অতি মহৎ অতি উচ্চ রাজীবকে। করুণাভরে দেখিয়াছিল অনাথিনী, অনাশ্রিতা, কৃপাপ্রার্থিনী মিনতিকে, দেখাইতে চাহিয়াছিল তাহার হৃদয় নিহিত উদার মহত্বকে। দেখে নাই যে তাহার সেই ফুলের মত সুরভি চিন্তাধারাই আজ সাপের মতন শত ফণা তুলিয়া আসিবে তাহারই সমস্ত অস্তিত্বকে বিযাক্ত করিয়া তুলিতে। সে ভবিষ্যতের অন্ধকার তাহার প্রেমোজ্জল চোখের দূরদৃষ্টি ভেদ করিতে পারিয়াছিল কি?—সুরমা নিশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল—! না পারে নাই, পারে নাই।

হঠাৎ সে মোটরের শব্দ শুনিয়া রেলিং ধরিয়া নীচের দিকে চাহিয়া দেখিল রাজীবের মোটর বাড়ীর ফটকে প্রবেশ করিতেছে। সে একটু অবাক হইল। এখনো তো দশটা বাজে নাই, তবে আজ এতো শিগ্‌গির ফিরিবার মানে? সিঁড়িতে তার পরেই পদশব্দ শুনিয়া সে যাইতে যাইতে দাঁড়াইল, একটু পরেই সে শুনিতে পাইল রাজীব ডাকিতেছে "সুরমা—" সকালের বাক্‌বিতণ্ডার শেষ কথাগুলি তখনো তাহার কানে বাজিতেছিল নির্দ্দয়ভাবে, তাই সে কোন উত্তর না দিয়া ড্রইংরুমে প্রবেশ করিল, রাজীব ঠিক সেই সময় তাহাকে খুঁজিয়াই

আর এক ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছে। তখন তাহার মুখে সকালের সে বিরক্তিভাব ছিল না, তার পরিবর্ত্তে ছিল একটা স্নিগ্ধ, শান্ত, কমনীয়তা। রাজীব সুপুরুষ, সুরমা এক মুহূর্ত্তে তাহার চিরপরিচিত মুখের দিকে চাহিয়া চোখ ফিরাইয়া লইল। রাজীব আগাইয়া আসিয়া বলিল—"এই যে সুরমা, সকালের কথা গুলো ভুলে যাও, এসো বসো, একটা কথা বলি, একটা গান গাও না।"

সুরমা শুধু বলিল,—"আজ মিনতির ওখান থেকে চলে এলে এত শিগগির? কেন?"

রাজীব একটা কৌচে বসিয়া বলিল—"আচ্ছা কেন তুমি বলতো, তোমার মিনতির উপর এত রাগ, এত হিংসা? সমানে সমানেই হিংসা, বিদ্বেষ হয় জানি, কিন্তু সে তোমার চেয়ে কত নীচে, সে তোমার দয়ার ভিখারী, আর তুমি আমার বংশের কুলবধূ, এ বাড়ীর একমাত্র গৃহলক্ষ্মী তুমি, আমার বংশের নাম বহন করবার একমাত্র অধিকার তোমারি। তোমাতে অত হীনতা মানায় না সুরমা—বসো।"

সুরমা বসিল, কিন্তু একটু দূরে। রাজীব তাহা লক্ষ্য করিয়া একটু ভ্রূকুঞ্চিত করিল। সুরমা বলিল—"গৃহলক্ষ্মী ও কুলবধূ হয়েও অনেক সময় জীবনের সার্থকতা খুঁজে পাওয়া যাওয়া যায় না, সবার চাইতে যা বড় তাই তুমি দিয়েছ তাকে, তুমি মিনতিকে ভালবাস!"

রাজীব উচ্চ হাসিয়া বলিল,—"ভালবাসা? সুরমা ওগুলো হচ্ছে ফাঁকা কথা, সত্যি করে ওতে কিছু লাভ হয় না। তুমি কি চাও ঐ ফাঁকা দুটো কথা ব'লে তোমাকে ভুলিয়ে রাখবো? তাতে তোমার কোন লাভ হবে না। তুমি যা আছ—তাই আছ ও চিরকালই থাকবে। তবে ও সব শুধু বাজে কথা নিয়ে মাথা ঘামিও না মিছিমিছি।"

সুরমা উত্তরে কিছু বলিল না। এমন দিন সে অনেক পাইয়াছে, কিন্তু রাজীবের প্রাণহীন ভালবাসার ভাণ বা আদর তাহাকে আনন্দের পরিবর্ত্তে পীড়াই দিয়া আসিয়াছে বেশী। তাহার মনে হইত ভালবাসার গভীরতা যে মিলনকে নিবিড় করিয়া তুলিতে না পারিল সে মিলনের সার্থকতা কিছু আছে কি? হউক স্বামী, তবু তাহার প্রাণের নিভৃততম প্রদেশের তন্ত্রী যদি না বাজিয়া উঠিল উল্লাসের সপ্তসুরে, তাহা হইলে শুধু লালসার আগুন জ্বালাইয়া নিজেকে পুড়াইয়া ছাই করিয়াই বা লাভ কি? ব্যর্থ তাহার সবই ব্যর্থ! জীবনের পূজা করা তাহার হয় নাই কোনদিন, হইয়াছে শুধু রাশি রাশি ফুল চন্দন আর অর্ঘ্য লইয়া খেলা।

রাজীব আবার বলিল—"সুরমা, সকালের কথায় কি সত্যি রাগ করেছ?"

সুরমা সহজ সুরে উত্তর দিল—"কোনটা উচিত বলে তুমি মনে কর? রাগ করা—না না করাটাকে?"

রাজীব কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, তারপরে সুরমার একটী হাত নিজের হাতে লইয়া বলিল—"রাগ না করাটাকেই—সুরমা! কারণ বলেছি একবার তার সঙ্গে তোমার রাগের সম্পর্ক নয়।"

সুরমা হাত ছাড়াইয়া লইল—"রাগ না করলে যে আমার মনুষ্যত্বটাকে অপমান করা হয়, কারণ আমি মানুষ, নেহাৎ বেহায়া পশু নই।"

রাজীব গম্ভীর হইয়া উঠিল। খানিকক্ষণ সে চুপ করিয়া ঘরের ভিতর পায়চারী করিতে করিতে হঠাৎ থামিয়া বলিল—"বেশ, তবে থাকো তুমি তোমার রাগ ও মনুষ্যত্বের অভিমান নিয়ে, তার জন্য আমি আমার নিজের মনুষ্যত্বটাকে বিসর্জ্জন দিতে পারবোনা।"

সুরমা প্রশ্ন করিল—"তবে মিনতিকে ছাড়বে না?"

দৃঢ়স্বরে রাজীব বলিল—"না।"

সুরমাও উঠিয়া দাঁড়াইল, সে বলিল—"তবে তুমিও তোমার মনুষ্যত্ব নিয়ে থাকো, আমি তোমার খেলার পুতুল হয়ে থাকতে পারবো না।"

রাজীব দৃপ্তস্বরে বলিল—"থাকতে পারবে না তো বেশ থেকোনা, কারো খোসামোদ করা আমার স্বভাব নয়। তবে মনে রেখো—এই সঙ্গে আমার যেটুকু কোমলতা ছিল, সবটুকু আজ তুমি নিজের হাতে বিষাক্ত করে দিলে।"

সুরমাও বেশ একটু জোর দিয়া বলিল—"ঠিক। কিন্তু আমি বিষাক্ত ক'রে দিলুম কি তুমি বিষাক্ত

ক'রে দিলে সেটা বিচার সাপেক্ষ। আমি তোমাকে কোনরকম অন্যায় অনুরোধ করিনি, বিষয় সামান্য—আর তা বলবার আমার বোধ হয় যথেষ্ট দাবীও আছে, কিন্তু তুমি যখন তোমার জেদটাই বজায় রাখবে—রাখো, তবে আমিই বা কোন নিজেকে তোমার কাছে নীচু করি?"

রাজীব একটা সিগারেট ধরাইয়া বলিল—"আমার অনুরোধটাও নেহাৎ অন্যায় ছিল না—যার সঙ্গে আমার একটা সম্পর্ক আছে, আর যা প্রথম থেকে তোমার অজানাও ছিল না, সেটাকেই বা তুমি আজ মেনে নিতে চাইছ না কেন? এও সামান্য। যাক্ এ তর্কের মীমাংসা হবার নয়।"

সুরমা উত্তর দিল—"না, হবার নয়, তা জানি, কাজেই বোধ হয় আমাদের পক্ষে যে যার পথে চলাই সুবিধা।"

"তাই চলুক, কিন্তু এর পরেও আর আমার দোষ দিও না।" রাজীব যাইতেছিল কিন্তু সুরমা আবার ডাকিল। সেই দিন অনেক রাত পর্য্যন্ত তর্ক করিয়াও তাহারা কোন মীমাংসায় আসিতে পারে নাই, আর আসিতে পারিত কিনা তাহা সুরমার আজও জানা ছিল না।

ইহার পর দিন চলিয়া যাইতেছিল এক ভাবেই। সুরমা তাহার নিজের মান লইয়া চুপ করিয়া রহিল। মুখে সে যাহাই বলুক মনটা কিন্তু তাহার বারবারই আকুল হইয়া রাজীবের সান্নিধ্য খুঁজিয়া বেড়ায়। মাঝে মাঝে তাহার কথাগুলি ভাবিয়া সে শিহরিয়া উঠিত—সত্যই যদি সে তাহাকে আর এতটুকুও না চায়!

প্রথমে তাহার অভিমান হইল। চিরকাল সে হুকুম করিয়াই অভ্যস্ত, তাহার সামান্য ইচ্ছাও সাদরে পূর্ণ করিয়াছে তাহার পিতা ও মাতা—কিন্তু স্বামী তাহার ন্যায্য অনুরোধও উপেক্ষা করিল একটা রাস্তার সামান্য স্ত্রীলোকের জন্য? রাজীবও তাহার পর হইতে খাম খেয়ালীর মাত্রা আরো বাড়াইয়া দিল—সে প্রায় সারাদিন বাড়ীতে থাকিত না। সুরমার সঙ্গে কথা বলা দূরে থাকুক, দিনান্তে একবারও দেখা হইত কিনা সন্দেহ। সুরমার দুর্ব্বল হৃদয় এক একবার আপনা হইতে অবনত হইয়া পড়িতে চাহিত, তাহারই অন্যায়াচারী স্বামীর কঠোর সঙ্কল্পের কাছে, কিন্তু আবার আত্মাভিমানের প্রাচীরে বাধা পাইয়া তাহা ফিরিয়া আসিয়া দ্বিগুণ আর্ত্তনাদে লাফাইয়া পড়ে তাহারই বুকে। সে আর পারিতেছিল না। তার চাইতে থাকুক মিনতি, থাকুক রাজীবেরই সব—শুধু সেই নিজেকে উৎসর্গ করিয়া দিক প্রেমাস্পদের সুখের পদতলে। মনে হইত, অন্যায় কি তাহারও হইয়াছে কিছু? সেই কি সেদিন অনাবশ্যক ভাবে কতকগুলা কথা বলিয়া রাজীবকে উত্যক্ত করিয়া তুলিয়াছিল? না স্বামীরই দোষ? কিন্তু কার দোষ কে বলিয়া দিবে?

তর্কের মীমাংসা না হইলেও, তাহাদের অন্তরের মীমাংসা হইয়া গিয়াছিল সেদিন যাহাতে ভিতরের ব্যবধান আরো বাড়িয়া গিয়াছিল অনেকখানি বেশী।

তিন

কয়েক মাস পরে একদিন সুরমা কোন এক আত্মীয়ার বিবাহ-উৎসবে গিয়া বহুদিন পরে তাহার ভারাক্রান্ত মনটা একটু হাল্কা করিয়া লইয়া বাড়ী ফিরিল। সেদিন তাহার খুব ভাল লাগিয়াছিল। বার বার নিজের বিবাহের কথাই মনে পড়িতেছিল তাহার,. সেই ফুল, হাসির ছড়াছড়ি, সেই প্রাণ-মাতানো মোহময়ী উৎসবের মাতামাতি, সানাইয়ের করুণ সুর উল্লাসকে গাঢ়তর করিয়া বাজিয়া ফিরিতেছিল অনাহত হইয়া, তাহা আর কাহাকেও না হউক সুরমাকে যেন লইয়া গিয়াছিল কোন অচিনের স্বপ্নপুরে, কোথায় কতদূরে, সেইখানেই বুঝি চিরকাল বসতি করিতে চায় সে! মাঝে মাঝে মনে করিতেছিল, এই আনন্দের পরিণতি কোথায়, এই আনন্দ কি নববিবাহিতার জীবন-বীণায়, এমনি মূর্চ্ছনা ধ্বনিয়া তুলিবে চিরদিন? অথবা এই একদিনের সার্থকতা লইয়া ধূলায় লুটাইয়া পড়িবে অচিরেই—আর এ জীবনে যাহা বাজিয়া উঠিবে না কোনদিন!

যে সবদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, মাঝে মাঝে

কেউ বলিলে একটু কাজকর্ম্মও করিতেছিল। সেই সময় অনেকের সঙ্গে তাহার দেখা হইল। একজন তাহাকে দেখিয়া বলিল—"সুরো নাকি! ওমা কি ছিরিই হয়েছে, অসুখ করেছিল নাকি? সে গালভরা হাসি তোর কোথা গেল রে?"

সুরমা শুষ্ক হাসিয়া বলিল—"কি ক'রে বলবো বল? কোথাও হারিয়ে গেছে হয়তো আর খুঁজে পাচ্ছি না।"

বন্ধুটী সুরমাকে আদর করিয়া বলিল—"খুঁজে পাচ্ছিস না কেন রে? Love marriage করলি তবুও খুঁজে পাচ্ছিস না?"

সুরমা মুখ ঘুরাইয়া বলিল—"যাঃ, এখন বুড়ো বয়সে আর হাসে না, ও সব হাসি তামাসার দিন চ'লে গেছে।"

শান্তি হাসিয়া বলিল—"ইস্—তাই নাকি—এত বুড়ো হয়ে গেলে এর ভেতর। তাতো হবেই। সেই জন্যই তো বলি love marriage হ'লে লোকেদের বিয়েতেই সব romance শেষ হয়ে যায়, তার চেয়ে আমাদের ঢের ভাল, বিয়ের সঙ্গে সঙ্গেই romance আরম্ভ। সব চেয়ে কোনটা ভাল বলতো?"

সুরমা একটু ভাবিয়া বলিল—"কি জানি আমার মতে love marriage ও হবে, আর romance ও থাকবে, সেইটাই ভালো।"

শান্তি বলিল—"বাঃ ঠিক বলেছিস, দুটো দাওই মারা চাই।"

ওদিকে কে একজন ডাকিতে শান্তি চলিয়া গেল। সুরমা সকলের সঙ্গে মৌখিক শুধু কথাবার্ত্তা বলিলেও সকলের সামনে তাহার সারা দেহ মন কিন্তু কুণ্ঠিত সঙ্কুচিত হইয়া নুইয়া পড়িতেছিল। লজ্জায় তাহার মনে হইতেছিল সকলেই জানে রাজীবের কথা, মিনতির কথা, আর সকলে সেইজন্যই তীব্র দৃষ্টিতে তাহার অস্তিত্বটাকেই উপহাস করিয়া বুঝি হাসিতেছে। সেই-জন্য "love marriage" লইয়া শান্তির অত হাসি। অথবা কেহ কেহ হয়তো দয়ার চক্ষে তাহাকে দেখিয়া অপ্রয়োজনীয় সহানুভূতির ধারা ঢালিয়া দিতেছে তাহার উপরে। তাহার আত্মাভিমানী মন অপমানের শাণিত তাড়নায় ভাজিয়া পড়িয়া মাটীর সঙ্গে মিশিয়া যাইতে চাহিতেছিল। নিজেকে সে যেন অনাবশ্যক ভাবেই এখানে আনিয়া দাঁড় করাইয়া দিয়াছে, দয়া সহানুভূতি ও অপমানের সপ্তরথীর মাঝখানে। হঠাৎ বাল্যসখী কণিকার সঙ্গে দেখা হইয়া গেল। কণিকাকে সে দেখিল সুখী, অত্যন্ত সুখী, সুখের আতিশয্যে সে নিজেকে যেন স্থির রাখিতে পারিতেছিল না। তৃপ্তির দীপ্তি, উচ্ছ্বসিত আনন্দের লাবণ্য তাহার সর্ব্বাঙ্গ ঘিরিয়া যেন নৃত্য করিতেছিল। সে অনেক কথা বলিল—"উঃ, কতদিন পরে দেখা, সেই স্কুল, কলেজ, মনে পড়ে সুরো?—কি সুখের দিনই ছিল—"

সুরমা উত্তর দিল—"ছিল বই কি ভাই—কিন্তু এখন"—

কণিকা তাহার কথার ভাব বুঝিল না, মুখের কথাটা কাড়িয়া লইয়াই, যেন আপন মনে বলিল—"হ্যাঁ, আর এখন, এ এক আলাদা সুখ, আলাদা জীবন না ভাই? সত্যি সংসার জুড়ে এত আনন্দ ছ'ড়িয়ে রয়েছে—ছেলে পিলে ক'টি?"

সুরমা একটু হাসিল মাত্র—

কণিকা উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিল—"ও—হবে নাকি? এই কি প্রথম?

সুরমা মাথা নাড়িয়া বলিল—"আর তোর?

"আমার? আমার কোলে একটী মেয়ে—এই আট মাসের। খুব সুন্দর হয়েছে দেখতে, একদিন আয়না আমার ওখানে বীণুকে দেখবি।"

দুই বন্ধুতে নিভৃতে বসিয়া সেদিন অনেক কথাই হইল। কণিকার অফুরন্ত সুখের কাহিনী, সুরমার মধুর লাগিলেও মাঝে মাঝে কোথায় যেন সে একটু বেদনা অনুভব করিতেছিল,—তাহা হিংসা নয় বা পর-শ্রীকাতরতা নয়, শুধু কিসের একটা আক্ষেপ, কিসের একটী অনুশোচনা মাত্র। সে বিশেষ কিছু বলিতে পারে নাই সেইদিন, সব কথার তলদেশ হইতে তাহার সারা হৃদয় কাঁপিয়া উঠিতেছিল "মিনতি—মিনতি।" সর্ব্বশেষ কণিকাও প্রশ্ন করিয়াছিল—"সুরো, এমন হয়ে গেছিস কেন ভাই? সে হাসি সে রূপ গেল কোথায়?"

তারপর হইতে সে কণিকার সঙ্গে অবাধে মিশিতে

লাগিল। প্রায় রোজ দেখা হইত তাহাদের, হয় সুরমা যাইত, নয় কণিকা আসিত। কয়েকদিন পরে সেদিনও কণিকা আসিয়াছিল সুরমার বাড়ীতে।

ঠিক বিকাল বেলা তাহারা বসিয়াছিল সুরমার বসিবার ঘরে। বীণু মোটা মোটা হাত পা, একগাল হাসি আর ঝাঁকরা চুল লইয়া আস্ত ঘরময় হামাগুড়ি দিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, নানা রকমের ভাষায় নিজের মনোভাব প্রকাশ করিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া। সুরমা মাঝে মাঝে তাহাকে কোলে তুলিয়া চুমু দিয়া, আদর করিয়া উত্যক্ত করিয়া তুলিতেছিল। এমন সময় চা আসিল। সুরমা চা ঢালিয়া খুকীকে কোলে লইয়া বিস্কুট খাওয়াইয়া দিল।

কণিকা বলিল—"বেশী দিসনে ভাই, আবার অসুখ করবে, বাচ্চাদের অসুখ হ'লে মহা অশান্তিতে পড়তে হয়।"

সুরমা খুকীর মুখ মুছাইতে মুছাইতে বলিল—"ও অভিজ্ঞতা আমার নেই, তোর কাছ থেকে শিখে নেবো কি বলিস ?

বীণু বিস্কুট খাইয়া আনন্দে আবার মেঝের উপর নামিয়া একটী টেবিলের নীচে বসিয়া অজানা রাগিণীতে গান ধরিয়া দিল। সুরমা খানিকক্ষণ সেই দিকে চাহিয়া একটু হাসিয়া বলিল—"লোকে বলে যে ছেলেরাই বাড়ীর আনন্দ তা ঠিক।"

কণিকা চা শেষ করিয়া বলিল,—"কথাটা ঠিক, আর সেই আনন্দই যে তোর ঘরেও নেমে আসছে, এটা আরো আনন্দের কথা। কিন্তু আমাকে একটা কথা বলবি ? আমার মনে হয় তোর জীবনের কোথায় যেন কিসের একটা ছায়া লুকিয়ে রয়েছে,—আমায় বলবি সেটা কি ?"

সুরমা একটু ভাবিয়া ইতস্ততঃ করিয়া সব বলিল।

কণিকা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—"সত্যি ? ছি ছি ! তোর স্বামী এতটা নীচে নেবে গেছে"—

সুরমা বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল—"কিন্তু কণা, আমি যে তার কথা বিয়ের আগে থেকেই জানতুম, উনি আমাকে সব বলেছিলেন।" তাহার কি জানি কেন অপরের সামনে স্বামীকে কিছুতেই খাটো করিবার ইচ্ছা হইতেছিল না—আর সঙ্গে সঙ্গে যে তাহাকেও অনেকখানি নীচে নামিয়া যাইতে হয়।

কণিকা আরো আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—আর তবু তুই বিয়ে করলি ? ছি! সুরো! তোর কি আর বর জুটতো না ? অন্ততঃ গলায় দড়িও তো জুটতো ? কি আর বলবো—শুধু মুখেই তোর সব, ভেতরে বুদ্ধি এতটুকুও নেই !"

"সত্যি নেই ভাই কণা! তখন আমি ভাবতুম তাতে আর হয়েছে কি ? সে আছে থাক—আমি থাকবো—আমার নিজেকে নিয়ে, কিন্তু এখন দেখছি নিজের মনটাই আমার উল্টো সুর ধরেছে। সত্যি নিজেকেই চিনতে পারলুম না এতদিনেও অন্যকে আর চিনবো কি করে ?"

এমন সময় বীণু পড়িয়া গিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। কণিকা উঠিয়া বীণুকে কোলে তুলিয়া চুপ করাইয়া বলিল—"আমি সব বুঝেছি সুরো—কিন্তু ঐ ভাবনা নিয়ে জীবনটাকে নষ্ট করতে বসেছিস। বাকিটুকু আর ভেবে নষ্ট করিস না! দেখ, একটা কথা বলি, মনটাকে দুঃখের ভারে যতই চেপে রাখবি, ততই ও মুসড়ে পড়বে। ঠিক গাছপালা যেমন সূর্য্যের আলো না পেলে দুর্ব্বল হয়ে নিজের সজীবতা হারিয়ে ফেলে, মনও তেমনি আনন্দ না পেলে কখনই সবুজ থাকতে পারে না।"

সুরমা বলিল,—"আনন্দ যখন বিবাহিত জীবনে কখনো আমার কাছ ঘেঁসে গেল না, তার সঙ্গে যখন বহুদিন থেকে আমার কোন পরিচয়ই নেই, তখন তাকে পাবার আশা কি করে করি ভাই ?"

"পাগল! আনন্দ কখনো নিজে ধরা দেয় না, তাকে ধরতে হয়, চিনে নিতে হয়। কি তুই ? স্বামীর ভালবাসা পেলিনে ব'লে এই রকম অন্তরে গুম্‌রে গুম্‌রে মরে যাবি ? কেন ? তুই ও আমোদ কর না! দেখবি মনের অনর্থক ভারের চাপে জীবনটাকে অত দুর্ব্বহ ব'লে কখনো মনে হবে না।"

"আমোদ ? কি করবো ভাই ? আমোদের ইচ্ছে হয় না যে—তাছাড়া—"

"তাছাড়া কি? আমি তোকে কোনরকম কুপরামর্শ দিচ্ছিনে। নির্দ্দোষ আমোদে দোষ কি? থিয়েটারে যা, বায়োস্কোপে যা, দশ পাঁচ জনের সঙ্গে মেলামেশা কর, নানারকম আলোচনা কর, কথাবার্ত্তা ক'। তুই তো মূর্খ নোস, দেখবি অনেকটা শান্তি পাবি। ও একটা মানুষের জন্য কেঁদে কেঁদে জীবনটা ব্যর্থ করে দেওয়ায় কোন পৌরুষ নেই, বরং ওটা দুর্ব্বলতা!"

"কিন্তু—"

"কিন্তু কি? যদি উনি রাগ করেন তো করবেন। রাগ না করে উনি এখন যা করছেন, তার চেয়ে আর বেশী কি করবেন? তোর মুখের দিকে এতদিনে একবার ফিরে দেখেছেন? তবে তুই-ই বা চাইবি কেন? তাকেও একটু বুঝতে দে না, যে মেয়েমানুষ হলেই ঘরের কোণে ব'সে যে শুধু কাঁদতে হবে তা নয়। হ'লই বা বিয়ের আগে বলেছিলেন সব, তবুও এতদিন ধ'রে এ অন্যায়ের প্রশ্রয় দেওয়া কারোই উচিত নয়। কি অধিকার আছে বলতো একটা নির্দ্দোষ মেয়েকে বিয়ে ক'রে বাড়ী এনে তার কোমলতম ভাবের তারে ক্রমাগত এমন নির্ম্মম ভাবে আঘাত করবার এই পুরুষদের? আর কোথাকার একটা রাস্তার বাজে স্ত্রীলোক তোর সমান মর্য্যাদার আসনে বসে আছে—তুই চুপ করে আছিস সুরো?"

"সহ্য না ক'রে কি করি ভাই?"

"ওই তো বললুম—সহ্য তুই তো করিস না। একে কি সহ্য করা বলে? সহ্য করছিস—বলতুম যদি এ সব তোর মনে কোন রকম ছাপ না বসাতো। উপরে লোক দেখানো সহ্য করতে গিয়ে—ভিতরটাকে যে শুকিয়ে মরুভূমি ক'রে দিয়েছিস। তার চেয়ে সত্যিকারের যদি সহ্য ক'রে সুখে থাকতে চাস্ তো মনটাকে অন্যদিকে ফিরিয়ে দে। সংসারে বেঁচে থাকবার অনেক কিছু উপাদান আছে—শুধু দোষ গুণ বুঝে, বেছে নিতে পারা চাই।—শোন, অত মনমড়া হয়ে থাকিস না—তোর জন্য না হোক্,আর একটা জীবন সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে উঠছে যে। গা ঝাড়া দিয়ে ওঠ্ একটু Societyতে মেশ্— পিয়ানো, অর্গ্যান গুলো দেখি বন্ধ হ'য়ে রয়েছে কতদিন থেকে, বইগুলোর পাতাও বোধ হয় খুলিস নি কতদিন।— এ গুলোর একটু সদ্ব্যবহার কর—দেখবি ভাবা টাবা সব চুলোয় যাবে।"

অন্যান্য কথার পর সুরমা কণিকাকে তাহার বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দিতে গেল। গাড়ীতে সুরমা মৃদু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"তোর স্বামী তো তোঁকে খুব ভাল-বাসেন।" সগর্ব্বে কণিকা উত্তর দিল—"এটা আশ্চর্য্যের কথা নয়, ভাল না বাসাটাই আশ্চর্য্য। আর স্বামীর মত স্বামী হ'লে তিনি দেবতা, নইলে মাটীর ডেলামাত্র।"

কণিকার স্বামী গবর্ণমেণ্ট অফিসে বেশ বড় চাকরী করিত। তাহার অবস্থাও ভাল ছিল। কণিকা সুরমাকে জোর করিয়া তাহার বাড়ীতে নামাইল। শরৎ তখন তাহার অফিসে বসিয়া কি কাজ করিতে-ছিল। কণিকা সুরমার কোলে খুকিকে বসাইয়া গিয়া তাহাকে ডাকিয়া আনিল। শরৎ লোকটী দোহারা গড়ন, ফর্সা। দেখিলে বেশ সরল ও কৌতুকপ্রিয় বলিয়া মনে হয়—এবং সুরমার মনে হইল একটু নিরীহও বোধহয় তাহা না হইলে কণিকার এমন দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ হইবে কেন? এর পূর্ব্বে তাহাদের আর বেশী আলাপ হয় নাই। শুধু দূর হইতে একটা নমস্কার অথবা দুই একটা কথা, এই পর্য্যন্তই। সেদিন কিন্তু সুরমা অনেকক্ষণ বসিয়া গল্প করিল। খানিকক্ষণ অন্যান্য কথার পর বলিল—"সুরো। আমি একটি Party দিচ্ছি সামনের মাসে—একটী ছোট acting করাবার ইচ্ছে আছে, তোকে একটু সাহায্য করতে হবে।"

সুরমা সোৎসাহে বলিল—"বেশতো। সাধ্যমত সাহায্য করবো।"

কণিকা স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিল—পুরুষের সাহায্য না নিয়ে একেবারে শুধু মেয়েদের দিয়ে হবে—মানে আমরাই সব করবো—বুঝলে?"

শরৎ হাসিয়া বলিল—"সিনগুলোও কি তোমরা টানবে না কি?"

কণিকা বলিল—"তা কেন? ওসব ছোট খাটো কাজের জন্যই তোমাদের ডাকা হবে। আর কিছুর জন্য না।"

শরৎ সজোরে মাথা নাড়িয়া বলিল—"উহু, সেটি

হচ্ছেনা। আমরা মোটেই তোমাদের ওসবে হাত দেবো না।"

কণিকা সদর্পে বলিল—"বেশতো করোনা—জানো আজকালকার মেয়েরা পুরুষদের মুখাপেক্ষী হয় না কোন কাজেই—"

শরৎ কৃত্রিম গাম্ভীর্য্য আনিয়া বলিল "ইস্—তাইতো বড্ড ভাবনার বিষয় হয়ে উঠল—"

সুরমা শরতের মুখের ভাব দেখিয়া হাসিয়া উঠিল। শরৎ তাহার দিকে চাহিয়া বলিল—"দেখলেন, মিসেস বোস! আপনার বন্ধুর অবিচার? আপনিও কি ওর পুরুষ বয়কট্ প্রোপগ্যাণ্ডায় যোগ দেবেন নাকি?" সুরমা উত্তর দিবার আগেই কণিকা বলিল—"উনি যখন পুরুষ নন্, তখন যোগ দেওয়া উচিত বইকি!"

শরৎ তৎক্ষণাৎ সায় দিয়া বলিল—"নিশ্চয় উচিত। কিন্তু বিপদ দেখলে হাত ধরতে ছুটে আসবে না তো?"

কণিকা বলিল—"কখনো না, আমরা কি রকম লাঠি তরোয়াল খেলতে শেখাচ্ছি মেয়েদের। দেখনা এর পরে বীর নারীতে দেশ ছেয়ে যাবে। বিপদ আমাদের কাছেও আসবে না—"

শরৎ বলিল—"তা সেই জন্যই তো পালোয়ান মেয়েদের কাছ থেকে দূরে সরে থাকতে চাই।—কিন্তু তোমরা দেখি তাও দেবে না। তোমরা পালোয়ানও হবে কুস্তিও লড়বে, আবার আমাদের ঘাড়েও চেপে থাকবে। এমনি অবলার ভারেই "পরিত্রাহি ডাক ছাড়তে হয়। তার উপর ভীষণ মাংসপেশী সম্বলিতা এক একজন অবলা হলে সে ভারটী কত বড় হবে বল?"

কণিকা ও সুরমা দুইজনেই হাসিয়া উঠিল। কণিকা বলিল—"সে ভয় নেই, মাংসপেশী নিয়ে তোমাদের ঘাড়ে চাপবো না,—অন্ততঃ আমি তো না।"

শরৎ বলিল, "তবে কোন পালোয়ানের ঘাড়েই চেপো—"

কণিকা অপ্রস্তত হইয়া বলিল—"যাও! যা তা বলতে মুখে বাধে না আর কি! এতো বাজে বকতে পার—সুরো—একটা কিছু বাজা না ভাই! বেশ তো গাইতিস আগে—"

শরৎ বলিল—"বেশ, বেশ তাই হোক—মিসেস বোস! যদি আপত্তি না থাকে অর্গ্যানটা খুলে দেবো?"

সুরমা বলিল—"আচ্ছা, আপনি কি মেয়েদের এসব শিক্ষা পছন্দ করেন না?" শরৎ এইবারে সহজভাবে বলিল—"পছন্দ যে একেবারে না করি তা নয়। তবে কি জানেন, আমরা মনটা একটু কোমল এবং আমি একটু আরাম প্রিয়। মেয়েদের ভিতর সলজ্জ কমনীয়তা, কোমলতা এই গুলোই দেখতে ভালবাসি। যদি সকলে মিলে লাঠি খেলতে আরম্ভ করে তা'হলে দেশ থেকে সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত আর্ট শিল্পকলা একেবারে উঠে যাবে যে। আর রয়েছে যখন এই ভারতবর্ষেই সহিষ্ণু নারী জাতি, যেমন মারাঠা গুজরাট, পাঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশ এদের জন্যই ও কাজটা থাক না, তারাও তো ভারতেরই গৌরব। আর বাঙ্গলার মেয়েদের জন্য থাক শুধু—গান, কবিতা আর আর্টের সূক্ষ্মতম মাধুর্য্যের ধারা—"

কণিকা সজোরে বাধা দিল—"থাক্—বরং তোমরাই ঐগুলো নিয়ে থেকো, আমরা প্যান প্যানে গান আর কবিতা নিয়ে থাকছি না, এই করেই তো গেলে তোমরা—"

শরৎ চমকাইয়া উঠিয়া আবার বসিয়া পড়িল—"উঃ বাবাঃ! আর কিছুর না হোক; ধমকাবার গলা তোমার খুব আছে কণা! তুমি বরং তোমার নারী বাহিনীর Commandress-in-Chief হয়ো।"

সুরমা হাসিল বলিল "কণা, সত্যি, আমরও অতটা ভাল, লাগে না ভাই।"

শরৎ সজোরে টেবিল চাপড়াইয়া বলিল "বাস্—আমার দলে মিসেস বোস আছেন।"

কণিকা বলিল—"আমি তোমার দলে কখনো যাবো না" সুরমা আরো দু'একটি কথার পর উঠিয়া বলিল—"রাত হয়েছে আজ উঠি?"

কণিকা বলিল, "দেখতো কাজের কথা কিছুই হ'ল না, শুধু বাজে কথা ব'লে সময় গেল। সুরো actingটা ঠিক করতে হবে, আর তোকে বাজাতে হবে ভাই, যদি একেবারে parctice না থাকে তবে ইতিমধ্যে একটু ক'রে নিস্। আর আমি পরশু তোর ওখানে গিয়ে সব ঠিক করবো।" সুরমাকে নীচে পৌছাইতে শরৎ ও কণিকা দুইজনেই নামিয়া গেল। কণিকা বলিল—"মিসেস মুখার্জ্জির "At Home" Card পেয়েছিস্ সুরো? এবারে refuse করতে পারবি না, যেতে হবে কিন্তু—আচ্ছা—" অনেকদিন পরে খানিকটা হাসিয়া সুরমা অনেকটা সোয়াস্তি পাইল।

ক্রমশঃ

শৈল-স্মৃতি

শ্রীঅনিল চন্দ্র রায় বি-এ

ফাল্গুন-শেষে বর্ষা আপনার সজল নিবিড় মেঘ ইয়া আনন্দ গর্জ্জনে বহুকালবিস্মৃত শৈলরাজীর উপর াসন্ন বর্ষণের ছায়া গাঢ় করিয়া তুলিয়াছে—আনন্দ-লালীর দীর্ঘ অদর্শনে গিরিরাজের বুঝি অশ্রু উদ্বে-ত হইয়া উঠিয়াছে; জানলা খুলিয়া এই দৃশ্য দেখিতে-লাম—হঠাৎ কানে আসিল 'আজ হোলি খেলুং পরস্পর প্রম জানাই।"

বৃন্দাবনে গোপীজন-বল্লভ শ্রীকৃষ্ণ ফাগের সরসতায় ন্তরালোক উদ্ভাসিত করিয়া তুলিয়াছিলেন—বহুযুগ তীত হইলেও তাহারি সরসতাটুকু আজও এই দুর্জ্জয়-ঙ্গের পাষাণ-প্রাচীর প্রাণের ফুরন্ত হিল্লোলে রক্তিম করিয়া তেছে। শ্বেত-শুভ্র পোষাকে াচ্ছাদিত হইয়া আনন্দময় দ্র ক্ষুদ্র পাহাড়ী বালকগণ ত্তাকার ভাবে হাত ধরিয়া াচিতে নাচিতে গান গাহিয়া লিয়াছে—পশ্চাতে অপেক্ষাকৃ ঃ য়স্কগণ কেরাস্ ধরিয়া আবীর ড়াইয়া পথ লাল করিয়া ফলিতেছে। একটি অনাহত আনন্দবেগ মনোরম পার্ব্বত্য প্রদেশে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিয়াছে, বভোর হইয়া এই দৃশ্য দেখি-তছি এমন সময় স্যানিটোরিয়মে খাবার ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। সমস্তদিনের পথশ্রমে শরীর ক্লান্ত হইয়া পড়িয়া-ছিল।—কলিকাতা হইতে দার্জ্জিলিং ভ্রমণ সুখদায়ক, নয়না-ভিরাম পার্ব্বত্যঝরণা শৈলবক্ষে বিচিত্র পত্রপুষ্পশোভিত শ্যামল বৃক্ষরাজী এবং সর্ব্বোপরি মানব মস্তিষ্কের অপূর্ব্ব গবেষণাপ্রসূত ইংরাজ জাতির গর্ব্বস্থল দার্জ্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের বিভিন্ন পথগুলি দর্শকের চিত্ত-ক্ষেত্রে অহরহ আনন্দরসের সঞ্চার করিলেও শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এবং মেরুদণ্ড যেন বহির্মুখী সৌন্দর্য্য পিপাসু মনের সহিত বিবাদের সৃষ্টি করিতে চায়।

গিরিরাজের সহিত প্রথম পরিচয়ের সঙ্কোচ বহুদিন হইল ছিন্ন হইয়াছিল—পাষাণের অন্তর্নিহিত প্রীতিস্নিগ্ধ মোহপাশ আমাকে বহুবার আকর্ষণ করিয়াছে—সময় বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া সাড়াও দিতে হইয়াছে কিন্তু বিচিত্র বর্ণানুরঞ্জিত লতাপাতামণ্ডিত স্যানিট্যা-রিমটি প্রতিবারই আনন্দময় স্বপ্ন মণ্ডিত গৃহের ন্যায় আমাদিগকে অভ্যর্থনার মঙ্গলভার লইয়া পরিতুষ্ট করিয়াছে।
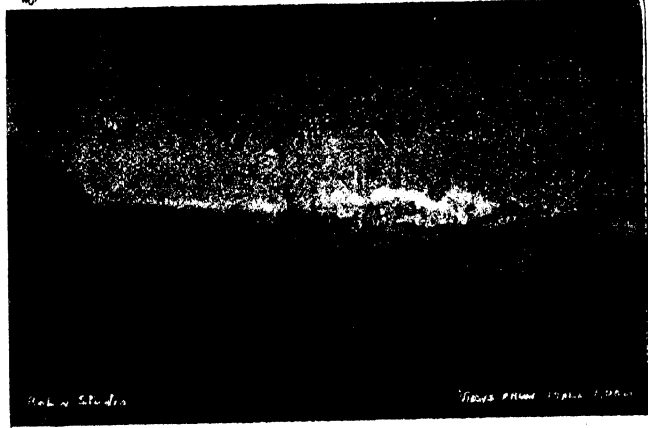
ম্যাল হইতে দৃশ্য— (রবিন ষ্টুডিও, দার্জ্জিলিং)

আমরা তিনটি বন্ধু একঘরে থাকিতাম—আমাদের খেয়াল বা প্রবৃত্তির কোন সুসঙ্গত প্রগতি ছিল না; প্রতিরাত্রেই আহারান্তে তিনজনে উচ্চঃস্বরে গান ধরিতাম—সঙ্গীতচর্চ্চার এই বিরাট অনুষ্ঠানে তপ্পাত্তুর

ব্যক্তিগণ বিশেষ রাজি ছিলেন না এবং আমাদের শ্রোতার মধ্যে পার্শ্বস্থ কুকুরগুলির অধিকাংশই সমস্বরে

লেবং রেস কোর্স— (রবিন ষ্টুডিও, দার্জ্জিলিং)

আমাদিগের সহিত সুর মিলাইয়া অভিনন্দন জানাইত। আমাদের মধ্যে ভৌমিক ছিলেন ম্যাজিসিয়ান অর্থাৎ অত্যাশ্চর্য্য প্রক্রিয়া দেখাইয়া—সাধারণকে হতবুদ্ধি করান—তিনি দ্বিপ্রহরে নর্ত্তনের আয়োজন করিতেন; পদদ্বয়ের নখাগ্র হইতে মস্তিষ্কের সর্ব্ব স্থানে প্রবল কম্পনের সাড়া দেখাইয়া তিনি ঘরের সর্ব্বত্র প্রদক্ষিণ করিতেন, আমরা মাঝে মাঝে দীর্ঘস্বরে বাহবা ব্যঞ্জক শব্দাদির দ্বারা তাঁহাকে আপ্যায়িত করিতে ক্রটী করিতাম না। এইরূপ সঙ্গীত, নর্ত্তনের মধ্যে আমাদের অলস কর্ম্মবিহীন দিনগুলি আনন্দের প্রবাহের মধ্য দিয়া ভাসিয়া যাইতে লাগিল।

একদিন প্রভাতে উঠিয়া দেখি উজ্জল রৌদ্রে চারিদিক ভরিয়া গিয়াছে—দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর সূর্য্যদেব যেন পরম পুলকে আপনার স্বরূপ প্রকাশ করিতেছেন, পাহাড়ীরা পৃষ্ঠদেশে বোঝা লইয়া গান করিতে করিতে চলিয়াছে;—অদূরে মেঘমুক্ত তুষারাবৃত কাঞ্চনজঙ্ঘা সূর্য্যকিরণে রজত শুভ্র আকার ধারণ করিয়া উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। শিশির স্নাত বিচিত্র পুষ্প শোভিত গাছগুলির উপর রৌদ্রকিরণ ঝলমল করিতেছে। এই মনোরম প্রভাতে নাগাধিরাজ আপনার মহিমা বিস্তার করিয়া প্রসন্ন-গৌরব-হাস্যে চারিদিক উদ্ভাসিত করিয়া তুলিয়াছেন—বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করিয়া বাংলা মায়ের এ শ্রী যাঁহারা দেখেন নাই তাঁহারা সত্যই ভাগ্যহীন।

ঘর হইতে কিসের অকর্ষণে আমরা বাহির হইয়া পড়িলাম—আজিকার প্রভাতের রৌদ্রের মধ্যে একটি সবল মাধুর্য্য ছিল—শীতল বায়ুপ্রবাহে শরীর রোমাঞ্চ বোধ হইতে লাগিল। ম্যাকেনজি রোড্ দিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে চৌরাস্তা অভিমুখে চলিলাম—বহু নরনারী বিচিত্র পোষাকে আচ্ছাদিত হইয়া উৎফুল্ল অন্তঃকরণে ভ্রমণে বাহির হইয়া পড়িয়াছে। রবিন ষ্টুডিওর স্বত্বাধিকারী সুহৃদ্বর সুরেন্দ্রনাথ সুপ্রভাত জানাইলেন, কার্য্য নিবন্ধন

বার্চ্চহিল হইতে তুষারের দৃশ্য— (রবিন ষ্টুডিও, দার্জ্জিলিং)

তিনি আমাদের সহযাত্রী হইতে পারিলেন না সে জন্য দুঃখপ্রকাশ করিলেন। ম্যাল রোড দিয়া চৌরাস্তায় উপস্থিত হইলাম—ইহা দার্জ্জিলিংয়ের একটি উচ্চতম স্থান, এখান হইতে পারিপার্শ্বিক দৃশ্য—অতি সুন্দর। উত্তরে কে

ঘুমের বৌদ্ধবিহার (রবিন ষ্টুডিও, দার্জ্জিলিং)
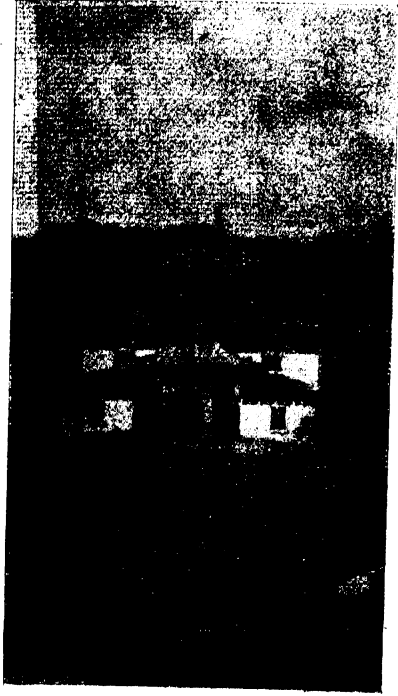
যেন সুবিস্তৃত পর্ব্বতরাশিকে উজ্জ্বল রৌপ্যমণ্ডিত করিয়া দিয়াছে—মেঘচ্ছটাবিহীন সুস্পষ্ট হিমালয় তুষার কিরীট পরিধান করিয়া কর্ম্মপ্রবণ বিশ্বের মধ্যে নির্লিপ্ত অনাহত এবং মৌন হইয়া রহিয়াছে। বৃক্ষশোভিত এবং রেসকোর্সের গোলাকার ক্ষুদ্র বিন্দুবৎ মাঠটি আমাদিগকে দূর হইতে হাতছানি দিতেছিল—আমরা তিনজনে ঘোড়া লইয়া লেবং অভিমুখে চলিলাম; চৌরাস্তা হইতে রঞ্জিত রোড ধরিয়া চলিলাম; খাদের নিম্নাভিমুখী রাস্তায় ঘোড়াগুলিকে ধীরে ধীরে চালাইতে হইল—রাস্তাটি আঁকিয়া বাঁকিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া প্রায় গৃহাভ্যন্তরের মধ্য দিয়াই চলিয়াছে—ছোট ছোট পাহাড়ী ছেলেমেয়েগুলি ঘোড়া দেখিয়া দূর হইতে হাততালি দিতেছে, ইহাদের সদা-আনন্দিত রক্তিম-মুখশ্রী পাহাড়ীদের বাৎসল্যের উৎস জোগাইয়াছে। বাম পার্শ্বে সারি সারি আপেল গাছ—এখান হইতে লেবংয়ের দোকান ঘরগুলি স্পষ্ট দেখাইতেছে—উভয়পার্শ্বে সৈনিকদিগের থাকিবার আস্তানা। রেসকোর্সে আসিবামাত্র ভৌমিকের এবং আমার অপর বন্ধুটির ঘোড়া বেপরোয়াভাবে ছুটিতে আরম্ভ করিল—ঘোড়া দুইটি রেসের ছিল সুতরাং ক্ষেত্র বুঝিয়া তাহারা বিগড়াইয়াছে, বেচারীদের অসহায় অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া কষ্ট অপেক্ষা আমার হাসি পাইতে লাগিল; এদিকে আমারটিরও মধ্যে কিঞ্চিৎ চাঞ্চল্যের ভাব দেখায় আমি আস্তে আস্তে নামিয়া পড়িলাম। সহিস আসিয়া ঘোড়াগুলিকে যখন ধরিল তখন উভয়েই পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে—ভৌমিক অবস্থা সুবিধা না বুঝিয়া ঘোড়া ছাড়িয়া দিয়া মোটরে দার্জ্জিলিং অভিমুখে রওনা হইল—পরে স্যানিট্যারিয়ামে দেখা হইলে বলিলাম "আপনি magic wand লইয়া যান নাই সেইজন্যই এই বিভ্রাট ঘটিয়াছিল।"

পরদিন রৌদ্রতপ্ত মধ্যাহ্নে ঘোড়ায় চড়িবার দুর্দ্দমনীয় বাসনা আমাদিগকে পাইয়া বসিল—পুনরায় ঘোড়া সংগ্রহ করিয়া তিনজনে 'ঘুম' অভিমুখে চলিলাম, বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি ভৌমিক এবারে ঘোড়া মনোনয়ন করিয়া লইয়াছিলেন—ক্যালকাটা রোডের জন-বিরল পরিচ্ছন্ন রাস্তাটি বসন্তের আনন্দ উদ্দীপনায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল—কিছুদূর অগ্রসর হইয়া ঘোড়া কদমে ছুটাইয়া দিলাম। বাঁকের পর বাঁক ঘুরিয়া রাস্তা ক্রমশঃ উপরে উঠিয়া গিয়াছে, দূর হইতে দার্জ্জিলিংয়ের লাল বাড়ীগুলি বৃক্ষশোভিত বিহঙ্গনীড়ের ন্যায় অনুভূত হইতে লাগিল। যতই উপরে উঠিতে লাগিলাম কোথা হইতে কুয়াসা আসিয়া ঘিরিয়া ধরিতে লাগিল—বাতাসের বেগও বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, পর্ব্বত অরণ্যানীর মধ্যে বাতাসের সন্ সন্ শব্দ যেন বহুদূরাগত কান্নাদের আর্ত্তনাদ। নিম্নে রৌদ্রালোকমণ্ডিত কার্টরোডের রেলের লাইনগুলি সাপের মত আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়াছে—উপরে মেঘ ও নীচে রৌদ্রালোক—ইহাদের লীলাচঞ্চল ক্রীড়া উপভোগ্য।

রাস্তা ক্রমে নীচু হইয়া 'ঘুমের' ষ্টেশনে গিয়াছে—এখান হইতে সোজা চলিলাম। দুইপার্শ্বে পাহাড়ীদের দোকান, মাঝে অপ্রশস্ত, অপরিচ্ছন্ন রাস্তা। কুয়াসায় সম্মুখের রাস্তা ভাল দেখা যাইতেছে না, কয়েকটি পাহাড়ী ছেলে

লেখক

ঘোড়া রাখিবে বলিয়া আমাদের পিছু লইল; মন্দিরের সম্মুখে আসিয়া ঘোড়া থামাইলাম; অসংখ্য কারুকার্য্য-শোভিত মন্দির অভ্যন্তরে ধ্যানমূর্ত্তি বুদ্ধদেবের বিরাট প্রতিকৃতি রহিয়াছে—সম্মুখে বন্দনার ঘৃত-প্রদীপ সারির পর সারি জ্বলিতেছে। এই পুরাতন বিহারে অতীত দিবসের এক বিপুল কাহিনী জড়িত আছে—বৈদান্তিক মায়াবাদীর আদর্শ অভ্যন্তরে ধ্যানী বুদ্ধ কর্ম্মের বারতাই যেন বহন করিতেছেন।

বিহার হইতে ফিরিবামাত্র ছোট্ট পাহাড়ী ছেলেমেয়ে গুলি "বাবু, সেলাম বক্‌শিস্" বলিয়া ঘিরিয়া ধরিল; ইহাদের হস্তগ্রহ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার উপায় ছিল না। ইহাদিগকে বিদায় করিয়া আমরা ঘোড়ায় উঠিয়া 'পাইনস্

আলোক চিত্র শিল্পী

হোটেলে" উপস্থিত হইলাম—তথায় চা, রুটি ইত্যাদি পর্য্যাপ্ত পরিমাণে গ্রহণ করিয়া দার্জ্জিলিং অভিমুখে রওনা হইলাম—গৃহাভিমুখীন সুশিক্ষিত ঘোড়াগুলি কদমে ছুটিতে লাগিল, পশ্চাতে কুয়াসাবৃত তুষারশীতল 'ঘুম' অজানা রহস্যপূর্ণ স্বপ্নময় দেশের মত বোধ হইতে লাগিল।

'তখন ও এখন' 'Star'
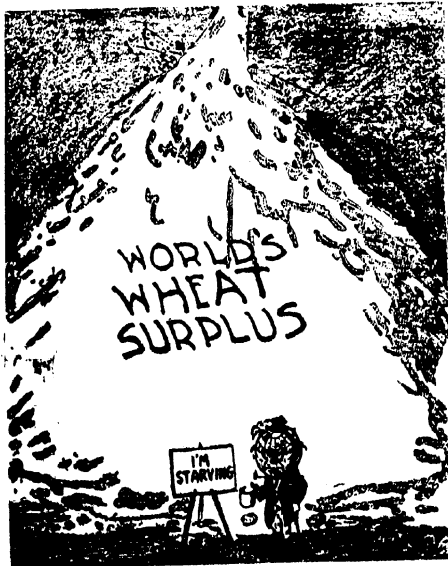
নব্য অর্থনীতি

জগতে খাদ্যদ্রব্যের অতি প্রাচুর্য্য এদিকে মানুষের অৰ্দ্ধাশন অনশন ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে। 'World-Telegram'

বীমাক্ষেত্রে কৃতী বাঙ্গালী

অলস, কর্ম্ম-বিমুখ জাতি পাশ্চাত্যের বিকৃত আদর্শে পরিচালিত হইয়া শুধু মেরুদণ্ডবিহীন অশ্রুভারাক্রান্ত যৌবনের সৃষ্টি করিতেছে—যাহারা স্বপ্নময় ব্যর্থতার মধ্যে আলাদীনের আশ্চর্য্য-প্রদীপের কল্পনার সন্ধানে করিয়াছে—মনুষ্যত্বের এই শোচনীয় কঙ্কালের মধ্যে সবল উন্নত পুরুষাকারের পরমাশ্চর্য্যপ্রকাশ শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র সেনের কর্ম্মকাহিনী অজস্র শক্তি ও শান্তি বহন করিয়া ফিরিতেছে। ব্যবসায়ক্ষেত্রে বাঙ্গালী পশ্চাৎপদ, বাঙ্গালীর দ্বারা ব্যবসায় সম্ভবপর নয়—এই দাসত্ব সুলভ ক্রন্দনের উপর অবিনাশচন্দ্র তীব্র কশাঘাত করিয়াছেন, এবং নিজের কর্ম্মদ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে একাগ্রতা, সততা এবং যত্ন ও চেষ্টা থাকিলে ব্যবসায়ক্ষেত্রে বাঙ্গালী যে কোন জাতিকে পরাভব করিতে পারে।

১৮৭০ খৃষ্টাব্দে নোয়াখালিতে অবিনাশচন্দ্রের জন্ম হয়—তিনি বাল্যকালেই মাতা এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে বিসর্জ্জন দেন। মাতৃহীন বালক জীবনযাত্রার প্রারম্ভেই—মাতৃস্নেহাশীষ মস্তকে ধারণ করিয়া অগ্রসর হইয়াছিলেন—সমস্ত দুঃখ-বিপদের ঘোর ঝঞ্ঝাবাতের মধ্যে অবিনাশচন্দ্র তাঁহারি দীপ্ত চক্ষুর অভয়লাভ করিয়া সাধনাক্ষেত্রে শেষ পর্য্যন্ত ভাগ্যলক্ষ্মী কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হন নাই। ষোল বৎসর বয়ক্রমকালে তিনি পিতৃহীন হন—তখন পরিবারের মধ্যে তিনিই বয়ঃজ্যেষ্ঠ সুতরাং সকলেই তাঁহার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। তরুণ বালক সেই অল্পবয়সেই দায়িত্ব বুঝিয়া আসাম গবর্ণমেণ্টের অধীনে কার্য্য গ্রহণ করিলেন এবং এই সময়ে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইলেন। সাধারণ বাঙ্গালী-জীবনের সব কার্য্যই পূর্ণ হইয়াছিল—মাসান্তে মোটা বেতনও আসিতেছিল কিন্তু এই সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রের নিশ্চিন্ত নির্ভরতা তরুণ যুবকের অফুরন্ত প্রাণশক্তিকে সংযত করিয়া রাখিতে পারিতেছিল না।

বাহিরের বিস্তৃত কর্ম্মক্ষেত্র তাঁহাকে হাতছানি দিতেছিল। তাঁহার প্রিয়তমা পত্নী এবং অন্যতম আত্মীয় শ্রীযুক্ত জগৎচন্দ্র দাসের ঐকান্তিক ইচ্ছায় তিনি উচ্চ সরকারী চাকুরীতে ইস্তফা দিয়া ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় আসিলেন। ব্যবসায়ের প্রাথমিক সূত্রগুলি আয়ত্ত করিবার জন্য তিনি কোনও সদাগরী আফিসে ভর্ত্তি হইলেন—'there is dignity in labour' অবিনাশ চন্দ্র ইহা জানিতেন এবং সরকারী উচ্চ পদ পরিত্যাগ করিয়া এই সামান্যপদে তিনি অধ্যবসায় ও পরিশ্রমসহকারে কার্য্য করিতে লাগিলেন ; তিনি পরবর্ত্তীকালে সৌভাগ্যের যে শীর্ষে আরোহণ করিয়াছেন তাহার মূলে এই পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও সততা ছিল।

ন্যাশন্যাল এজেন্সির স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত দুর্গামোহন দাসের প্রথম পুত্র শ্রীযুক্ত সত্যরঞ্জন দাস বার-এ্যাট-ল মহাশয় বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামের জন্য—এম্পায়ার অব্ ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চীফ্ এজেন্সি লইয়াছিলেন এবং চায়ের ব্যবসায়ে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তরুণ যুবক অবিনাশচন্দ্রের কর্ম্ম প্রিয়তা ও সততার বিষয় দাস মহাশয় অবগত হইয়া তাঁহাকে নিজের ব্যবসায়ের অংশীদার করিয়া লইলেন। তখন সুপ্রতিষ্ঠিত বিদেশী কোম্পানী-গুলির সহিত প্রতিযোগিতা করা বড়ই শক্ত ছিল—চা ও বীমার ব্যবসায়ে মন্দা পড়িল, দাস মহাশয় বিপদ বুঝিয়া সমস্ত বন্ধ করিয়া দিতে চাহিলেন কিন্তু অবিনাশ চন্দ্র দৃকপাত করিলেন না বিপদে স্থির হইয়া ধৈর্য্যের সহিত কার্য্য করিয়া যাইতে লাগিলেন—সততা ও পরি-শ্রমের মূল্য পৃথিবীতে আছেই। তিন লক্ষ টাকার কার্য্য ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে ১২ লক্ষ টাকায় রূপান্তরিত হইল, এই ব্যবসায়ের ক্রমোন্নতির মধ্যে দাস মহাশয় অন্তিম প্রয়াণ করিলেন। অবিনাশচন্দ্রের স্কন্ধে সমস্ত ভার অর্পিত হইল—বৎসরের পর বৎসর যাইতে লাগিল, ব্যবসায়ের ক্ষেত্র ক্রমশঃ বিস্তৃত হইতে লাগিল। আপিসের জন্য তাঁহাকে নূতন স্থান সংগ্রহ করিতে হইল। (ম্যাকলিওড হাউস) এম্পায়ারের ব্যবসা তিন লক্ষ হইতে ৭০ লক্ষে পরিবর্ত্তিত
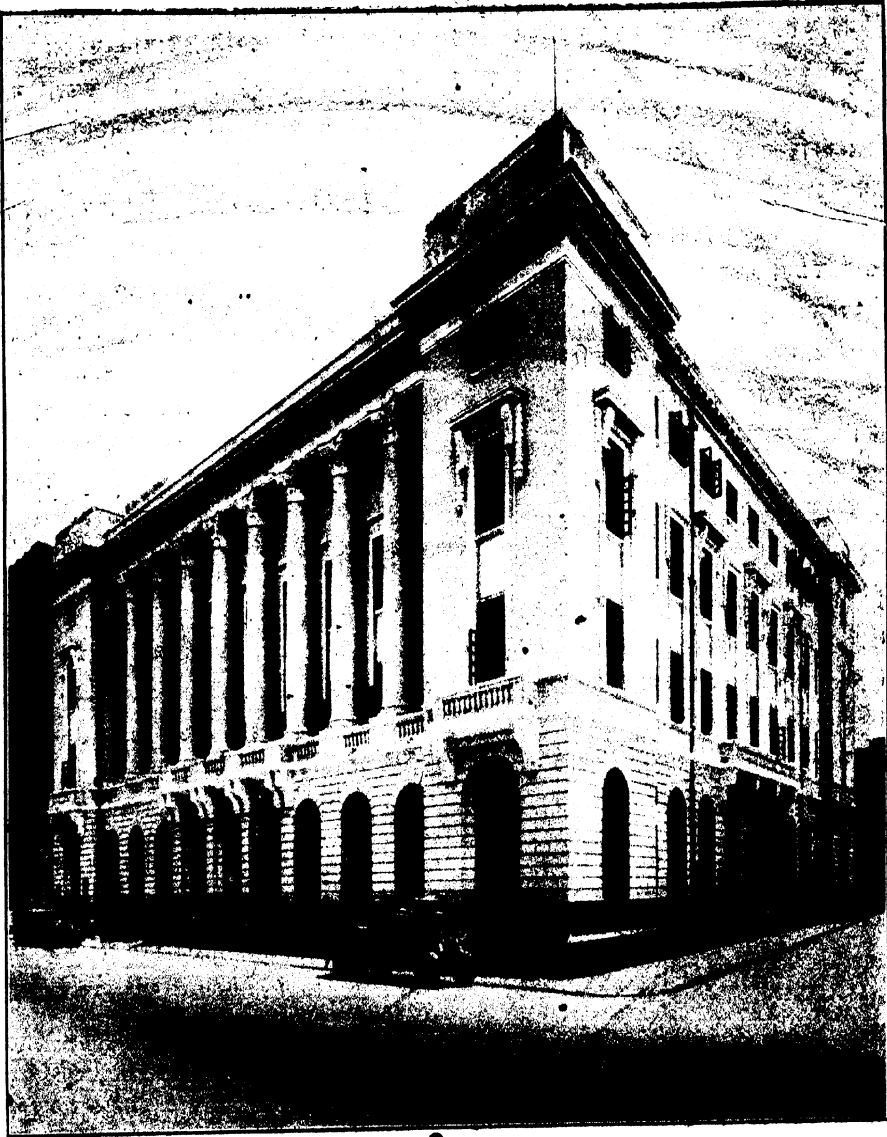
ন্যাশনাল ইনসিওরেন্সের নব নির্ম্মিত প্রাসাদ

হইল, ছয়টি চায়ের কোম্পানী হইতে ৩০টিতে দাঁড়াইল। এই অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তনে বাহির হইতে মনে হয় যেন কোনও আলাদীনের আশ্চর্য্যপ্রদীপ ইহা সম্ভব করাইয়াছে কিন্তু ইহার মূলে রহিয়াছে কোন তরুণ যুবকের প্রাণপাত পরিশ্রম, ঐকান্তিক আগ্রহ এবং সততা!

যৌবনের বিপুল প্রাণশক্তি আজও অবিনাশচন্দ্রকে পরিত্যাগ করে নাই—৫৪ বৎসর বয়সে তিনি পত্নীসহ বিলাতের বহু অঞ্চল পরিভ্রমণ করিয়া পরিণত জীবনে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছেন। আজ বিজয়-লক্ষ্মীর বরমাল্য গলে পরিধান করিয়া অবিনাশচন্দ্র অতীতের সংগ্রামপূর্ণ দিনগুলির দিকে চাহিয়া নিজ প্রথম পুত্রকে জীবন-যুদ্ধে বিজয়ী বীরের ন্যায় চলিবার শিক্ষা দিয়াছেন। অমিয়কুমার পিতার পদতলে বসিয়া—ব্যবসায়ের শ্রেষ্ঠ গুণগুলি যাহার সংযোগ আলাদীনের প্রদীপের অপেক্ষা আশ্চর্য্যজনক হইয়া উঠে তাহাই আয়ত্ত করিতেছেন।

শুধু ব্যবসায়ী ব্যক্তি হিসাবে নহে—নিরাভরণা বিধবার ও আত্মীয়-সহায়হীনের জন্য অবিনাশচন্দ্রের অবদান বাংলার ঘরে ঘরে, বাঙ্গালীর গৃহে ও প্রবাসে চিরদিন উজ্জ্বলরূপে মুদ্রিত থাকিবে।

আজ জীবন-অপরাহ্নে যৌবনের সুদীর্ঘ সংগ্রামের শেষে সমাহিত শান্তির মধ্যে কৃতজ্ঞ দেশবাসীর সহিত আমরা অবিনাশচন্দ্রের শতায়ু কামনা করিতেছি।

(মেঘনাদ)

বিচিত্রা

ওরিয়্যানটাল গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি লাইফ এসিওরেন্স

১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে বোম্বাইতে স্থাপিত ওরিয়্যানটাল্ ভারতীয় প্রতিষ্ঠানগুলির শীর্ষস্থানীয়—কোম্পানি স্থাপিতাবধি কর্ত্তৃপক্ষ জীবন-বীমার প্রকৃত আদর্শ লইয়া কার্য্যপরিচালনা করিতেছেন। এজন্য কার্য্যের অসম্ভব প্রসার হইলেও কোম্পানির ব্যয়ের হার অতি সামান্যই রহিয়া গিয়াছে।

১৯৩০ এর গবর্ণমেণ্ট ব্লু বুক হইতে আমরা জানিতে পারি ভারতীয় কোম্পানিগুলির সম্মিলিত বীমা তহবিল ১৮৩/৪ কোটী টাকা তন্মধ্যে একাকী ওরিয়্যানটালেরই ৯১/২ কোটী টাকা সুতরাং মানদণ্ডের একদিকে সমগ্র ভারতীয় কোম্পানিগুলি অপর দিকে একাকী ওরিয়্যানটাল!

কোম্পানির ১৯৩০ এর ত্রৈবার্ষিক হিসাব নিকাশে ১, ১৬, ২৩ ৫৪ ৩ টাকা উদ্বৃত্ত প্রকাশিত হইয়াছে—ইহার মধ্যে হইতে অংশীদারদিগকে লভ্যাংশ দিয়াও রিসার্ভ ফণ্ডে সঞ্চয় রাখিয়া আজীবনব্যাপী বীমায় হাজার করা ২৫ টাকা এবং মেয়াদী বীমায় ২০ টাকা বোনাস্ ঘোষণা করা হইয়াছে। ভারতের জীবন-বীমার ইতিহাসে ইহা অপূর্ব্ব এবং পৃথিবীর যে কোন প্রতিষ্ঠিত কোম্পানি ইহাতে গৌরব অনুভব করিতে পারেন।

নিম্ন হইতে কোম্পানির দ্রুত উন্নতির ইতিহাস দেখা যাইতে পারে—

বৎসর	পলিসির সংখ্যা	নূতন কার্য্যের পরিমাণ	চাঁদার আয়
৩১-১২-১৯২৬-	১৭,৩৭১-	৩,৯১,৩৯৫১২—	২২,৪০,৫৩০
৩১-১২-১৯২৭-	২১, ৪১৪	৪, ৬৪, ০৪, ০৭৫-	২৬,৪৪, ৩০০
৩১-১২-১৯৩০	২৬,৪৮১	৫,৪৪, ০৮, ৮৯৬	২৯ ,৯৬, ৩৬৯

ক্যালকাটা ফিনান্স এণ্ড এজেন্সি সিণ্ডিকেট

সাধারণ জীবন-বীমা কোম্পানিগুলি আজ পর্য্যন্ত যে সকল পারিবারিক সমস্যার সমাধান করিতে পারে নাই, নবগঠিত "ক্যালকাটা ফিনান্স এণ্ড এজেন্সি সিণ্ডিকেট লিঃ" কতকগুলি অভিনব পদ্ধতি আবিষ্কার করিয়া উহার সমাধানে সচেষ্ট হইয়াছেন।

প্রলুব্ধ পদ্ধতির মধ্যে বালিকাদের বিবাহের পূর্ব্বে অভিবাবকদিগকে ডাওয়ারী কার্ড ইন্সিওরেন্সের পদ্ধতির সুযোগে বিবাহের উপযুক্ত ব্যয় সরবরাহের সহায়তা করিতেছেন। এডুকেশন বা ষ্টুইন্ লাইফ কার্ডের পদ্ধতিতে বালক বালিকার উপযুক্ত সুশিক্ষার সুবন্দোবস্ত করা যাইতে পারে। মেটারনিটি বেনিফিট কার্ড ইন্সিওরেন্সের দ্বারা যুবকগণ অন্নসংস্থানের দ্বারা পারিবারিক সুখশান্তি প্রদান করিবে। আর একটি

শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র সেন

লক্ষ্মীবিলাস প্রেস লিঃ

উল্লেখযোগ্য ব্যাপার এই যে এই কোম্পানির সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ বিনা খরচে সুচিকিৎসকের সাহায্য পাইবেন ও পরে ধাত্রী, সুশ্রুষাকারিণীর সহায়তা লাভ করিবেন।

কোম্পানির বোর্ড অব্ ট্রাষ্টের সভাপতির পদে দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন নিযুক্ত আছেন ও ম্যানেজিং ডিরেক্টার মিঃ এস্, এন ব্যানার্জ্জি বীমা-জগতে সুপরিচিত। কোম্পানির জেনারেল সেক্রেটারী মিঃ এস্ ঘোষ উচ্চশিক্ষিত, কর্ম্মপ্রিয় যুবক—তাঁহাদের আন্তরিক চেষ্টায় কোম্পানি যে ভারতীয় প্রতিষ্ঠানের পুরোভাগে আসিবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

ন্যাশনাল ইনসিওরেন্স কোম্পানি

১৯০৬ খৃষ্টাব্দে স্বদেশী আন্দোলনের সময় এই কোম্পানি জন্মলাভ করে এবং বর্ত্তমানে ইহা ভারতীয় শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠানগুলির অন্যতম বলিয়া বিবেচ্য। কোম্পানির বীমা-তহবিলের পরিমাণ প্রায় দেড় কোটি টাকা হইবে এবং ইহার বার্ষিক আয় প্রায় ৩৬ লক্ষ টাকার উপর—ন্যাশনালের এই গৌরবময় দিনে পান্নালালের অবদান কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করিতে হইবে।

১৯৩০ খৃষ্টাব্দে কোম্পানির যে হিসাব নিকাশ হইয়াছে তাহা হইতে আমরা দেখিতে পাই ১৫,০৯, ১৪৭ টাকা উদ্বৃত্তরূপে প্রকাশিত হইয়াছে এবং বিশেষজ্ঞের অনুমোদনে কোম্পানি আজীবনব্যাপী বীমাপ্রতি হাজার করা ১৫৲ টাকা এবং মেয়াদী বীমায় ১০ টাকা বোনাস্ ঘোষণা করিয়াছে।

কোম্পানির চাঁদার হার অতি সামান্য এবং দাবীর টাকা সত্বর পরিশোধ করিয়া সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন—কোম্পানির হেড অপিসের নবনির্ম্মিত গৃহ নয়নাভিরাম।

নিম্ন হইতে কোম্পনির দ্রুত উন্নতির ইতিহাস বুঝিতে পারা যায়—

বৎসর	বীমা-তহবিল	কার্য্যের পরিমাণ	চাঁদার আয়
১৯২১—	৪২, ৫০, ৩৫৬	২,৫৭, ২৯, ৫৫৬	১২,২৫, ২২৫
১৯২৫	৪২, ৭০, ৩৯৩	৩,৬১,২০,৯৯১	১৭,৮৩,১৫৪
১৯৩০	১,৪৫,৮৭, ৯৩২	৬, ৫৫, ৭০, ৯১৬—	৩০,৮৩৯,৩৬

ইন্ডাষ্ট্রিয়াল ও প্রুডেনশিয়াল এসিয়োরেন্স

১৯১৩ খৃষ্টাব্দে পরলোকগত বিখ্যাত নেতা ফেরজসা মেটাকে সভাপতির পদে স্থাপন করিয়া এই কোম্পানি গঠিত হয়। বর্ত্তমান ডিরেক্টারবৃন্দের মধ্যেও দেশের বহু খ্যাতনামা ব্যক্তি আছেন।

কোম্পানির কার্য্যধারা দুই অংশে বিভক্ত;

(ক) ধনী এবং মধ্যবিত্তের জন্য সাধারণ বিভাগ—

(খ) মজুর এবং অন্যান্যদিগের জন্য 'ইনডাষ্ট্রিয়াল বিভাগ'—এই বিভাগে আড়াইশত টাকার পলিসি দেওয়া হয়। সভ্যদিগের স্বার্থ-সংরক্ষণের জন্য তাঁহাদের মধ্য হইতে দুইজন করিয়া ডিরেক্টার নির্ব্বাচিত হইবার ব্যবস্থা আছে।

কোম্পানি গঠিত হইবার পর হইতেই দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে—কার্য্য পরিচালনে ব্যয়-সংযত হইয়া কর্ত্তৃপক্ষগণ দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন।

১৯৩১ সালের হিসাব-পত্র হইতে দেখা যায় যে কোম্পানির বীমা—তহবিল ২০, ৩০, ২১৬ টাকা—৭ আনা—১ পাই হইতে ২৪, ৬৪, ১৬৩—১৪-৭ এ বৃদ্ধি পাইয়াছে। এতদ্ভিন্ন রিসার্ভ ফাণ্ড হিসাবে ১,০৬, ৮ ৬৬ টাকা ৬ আনা ২-৩ সুদের রিসার্ভ ফণ্ডেরূপে ১, ৩৯, ৯৭৩ ৪-০ স্বতন্ত্ররূপে আছে। কোম্পানির সুদৃঢ় ভিত্তি সত্ত্বেও পরিচালকবৃন্দ প্রয়োজনাতীত সতর্কতা লইয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন।

নিম্ন হইতে কোম্পানির দ্রুত উন্নতির ইতিহাস দেখা যায়:—

বৎসর	পলিসির সংখ্যা	নূতন কার্য্যের পরিমাণ	চাঁদার আয়
		টাকা	টাকা
৩১-১২-১৯২৪	৬২৩	১১, ৭১, ৭৫০	৬৪,০৭৪
৩১-১২-১৯২৫	৫৯৭	১৩, ৬৫ ৭৫০	৮৩,৪৩২
৩১-১২-১৯৩০	২১১৯	৪৪,৪৬,২৫০	২,৪৬০৭৪, ১২-আনা

(শ্রীবিষ্ণুদাস)

সন ১৩৩৮ সালের চৈত্র সংখ্যা ভারতবর্ষে ডক্টর মুহম্মদ শাহীদুল্লাহ্‌. এম-এ ইঁর একটী কবিতা দিয়াছেন। কবিতাটির নাম "পত্র।" (হাফিয হইতে। মূলের ছন্দের অনুকরণে।")

অমর কবি হাফিয হয়ত কখনও কল্পনা করিতে পারেন নাই, বিংশ শতাব্দীর এক "ডাক্তার সাহেবের" হাতে এক চৈত্রের দিনে তাঁহার একটী কবিতার এমন দশা হইবে। অনুকরণ সকল সময় নিখুঁত হয় না ইহা জানি; কিন্তু অনুকরণের নামে মূলককেও যে এমন জবাই করা যায় একথা জানিতাম না। হায় কবি হাফিয! একটু নমুনা দিই—

লিখিনু দিলের খুনে **বঁধুরে পত্রখানি**
পলয়ে বিয়োগ তব **প্রলয় মতন মানি**

পত্তনেই এইরূপ। বাকী অংশের কথা আর বলিলাম না। এমন হইবার কারণ অবশ্য খোদ্‌কারী নয় হাতুড়ে বিদ্যা।

ছন্দের দশা দেখিয়া মূলের ভাবের সহিত এই নকলের কেমন মিল আছে তাহার আন্দাজ পাওয়া যাইবে।

কবিতাটিতে শব্দ ব্যবহারও তারিফ করিবার মত। দুই একটী এখানে না ছাড়িলে বুঝিতে পারিবেন না।

১। "**নিশানি** নয় কি চোখে—"

২। "মেঘ সরায়ে বেরুল সুরজখানি।" সুরজ কি সূর্য্য? নতুবা মেঘ সরাইয়া বাহির হইবে কেন?

৩। "পরাণী বদল দিয়ে—"পরাণী বোধহয় পরাণ? পরাণের আহ্লাদীরূপ বুঝি পরাণী?

৪। "পিয়িতে মেহেরবাণি" মেহেরবাণি কথাটি ফারসী। বানান "পানির" মতই হওয়া উচিত।

৫। "ভিতরে দগদগি ঘা—"

এরূপ অবস্থায় আমরাও বলি—

ওরে হায়! কটকটি যায় হকীমে করবে কিবা?

("দে গরুর গা ধুইয়ে" ছন্দের অনুকরণে রচিত।)

আর একটী কবিতা পাঠ করিলাম, শ্রীরামেন্দু দত্তের। "শীতের শেষে"—বেশ লাগিয়াছে। কিন্তু—

"শিশির ফোঁটায় ঐ যে টোপায়
তোরি চোখের জল!"

ইহার প্রথম কলির "টোপায়" শব্দটির অর্থ "টপ টপ্‌ ঝরিতেছে" নাকি? তাহা হইলে ভোঁতায়=ভোঁতা করিতেছে, বোঁটায়=বোঁটা হইতেছে চলিবে ত?

আরও একটী কবিতা পাঠ করিলাম, শ্রীরাধারাণী দেবীর "সায়াহ্নের অভিসার।" কবিতাটি বোধহয় পার্শ্বে উত্তর। নিভৃতে গোপনে দিলেই ঠিক হইত। যাহা হউক, বেশ হইয়াছে।

গল্প পাঠ করিয়াছি সাতটি। প্রথম গল্প শ্রীআশা গুপ্তের "যে জীবন দীন।" "মানদা, সরযূ, হাবলার মা, জংলীর মাসী" এই চারটি দুঃখিনীর জীবনের দুঃখময় চিত্র। প্রথমটা বেশ। কিন্তু উপসংহারে অত্যধিক রঙ চড়ানো হইয়াছে। জংলীর মাসী দীনা, নিরক্ষর ও বস্তীবাসিনী হইলেও সে মানুষ বিশেষতঃ নারী তাহার হৃদয় কোমল। সে যে সরযূর স্বামীর অসুখে সময় তাহাকে সাহায্য করিবে ইহা স্বাভাবিক। কি প্রাণের ভয় জীবমাত্রেরই আছে। বড় গিন্নীর কা

হইতে খেসারৎ আদায় করিয়া সরযুকে সাহায্য করিতে তাঁহার ছেলের মোটর গাড়ীর নীচে জংলীর মাসী স্বেচ্ছায় পড়িল। (গলা বাঁচাইয়া ও একটু কায়দা করিয়া) এ কথায় তাহার মহানুভবতা প্রমাণিত হইলেও গল্পের Effect নষ্ট হইয়াছে।

দ্বিতীয় গল্প শ্রীঅশোকা ঘোষের "আশ্রয়।" ইহাও একটী দরিদ্রের কাহিনী। জামাইকে দরিদ্র শ্বশুর অর্থাভাবে দস্তুরমত আহারে ও যত্নে পরিতুষ্ট করিতে পারিবে না, এই দুশ্চিন্তার নিদারুণ তাড়নায় গ্রামের মহাজনের নিকট হইতে টাকা কর্জ্জ করিতে যায়। মহাজনের নিকট সে পূর্ব্বে ঋণী থাকায় সফলকাম হয় না। কিন্তু তাহার গোমস্তার অনুপস্থিতিতে খোলা বাক্স হইতে দশটাকার একখানি নোট চুরি করে। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই টাকা কয়টি সে তাহার জামাইয়ের ভোগে লাগাইতে পারে না,—টাকা লইয়া পলায়ন করিবার কালে, ঘটনাক্রমে জমীদারের কাছারীতে গিয়া পড়ে এবং বাকী খাজনার দরুণ জমীদারের আমলা ও পেয়াদা টাকা কয়টি কাড়িয়া লয়। অবশ্য বিনা প্রতিদানে নয়, ঘা'কতক উত্তম-মধ্যম দিবার পর। অতঃপর সেখান হইতে হতভাগ্য শ্বশুর পোষ্ট অফিসে যায় ও পোষ্ট মাষ্টারের হাত হইতে টাকা ছিনাইয়া লইয়া পলাইবার পূর্ব্বেই ধৃত হয়। বেচারার জামাই-ভোজন ব্যাপারটা আর ঘটিতে পায় না। বলা বাহুল্য, ঐ অসৎ কর্ম্মের দরুণ "রাজা তাহাকে আশ্রয় দিলেন।" কাজেই গল্পের নাম হইল—আশ্রয় এবং তাহা আশ্রয় পাইল ভারতবর্ষে আমাদের গল্পরস পিপাসা মিটাইতে। গল্পটির নাম "শ্বশুরের বিড়ম্বনা" দিলে, অন্ততঃ নামের দিক দিয়া মানাইত। বিষয়বস্তু যাহাই হউক, লিখিবার ভঙ্গীতেই রসাল হইয়া উঠে, নতুবা যাহা হয়, তাহা আবর্জ্জনা।

তৃতীয় গল্প শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতীর "মণির মোহে জীবন দহে।" পাঠে তৃপ্তি পাই নাই।

চতুর্থ গল্প শ্রীপ্রফুল্ল কুমার মণ্ডলের "পুরাণো দপ্তর।" গল্প নয় গবেষণা। কাজেই ইহা হইতে গল্পপাঠের আনন্দ পাই নাই।

পঞ্চম গল্প শ্রীহাসিরাশি দেবীর "বে-মানান।" গণিকা গৃহের চিত্র এ পর্য্যন্ত কোন লেখিকা আঁকিয়াছেন বলিয়া মনে পড়ে না। চিত্রখানি হয়ত নিখুঁত হইয়াছে। গল্পটির উদ্দেশ্য গণিকাজীবন অঙ্কন নয়, তাহাদের মাঝে কেমন করিয়া বিনোদিনীর মত দরিদ্রের কন্যা গিয়া পড়ে এবং কিরূপে প্রলুব্ধ হইয়া পাপের পথে ভাসিয়া যায় তাহাই।

ষষ্ঠ গল্প শ্রীসুকুমার রঞ্জন দাস এম-এর "শনি কবচ।" গল্পটির মধ্যে একটী নূতন না হোক, ভাল প্লট ছিল। কিন্তু শক্তির অভাবে একদম মাটি। ওস্তাদের হাতে পড়িলে সরস হইয়া উঠিত সন্দেহ নাই। লেখকের লিখিবার ধারাও "সেকেলে" ;—ভাষা বেগহীনা। পড়িয়া মনে হয়—

"হীরার আয়ী বুড়ী যায় গুড়ি গুড়ি—" ; গল্প লিখিয়া নাম কিনিবার চেষ্টাও বোধহয় শনির দশা!

সপ্তম গল্প শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়ের "লোভী।" গল্প নয় ভাবুকতা। ভাবগুলি কঠিন শব্দের সুদৃঢ় বর্ম্মে আচ্ছাদিত অন্তরকে স্পর্শ করে না, বুদ্ধিকে পীড়ন করে। বোধহয় ইহাদের উৎস হৃদয়ে নয় বুদ্ধি।

রঙিন ছবি দেখিলাম চারখানি।

* * * *

সন ১৩৩৮ সালের ফাল্গুন মাসের বসুমতীতে ছোট গল্প পাঠ করিলাম সাতটি।

প্রথম গল্প শ্রীশরদিন্দু বন্দোপাধ্যায়ের "দুই দিক।" গল্পটি বেশ। Tone বেশ healthy. কিন্তু দিন-কাল বড় খারাপ। লেখক মহাশয় নিশ্চয় সংবাদপত্র পাঠ করেন? পদ্মাপারে দুর্গেশনন্দিনীর অভিনয় বন্ধ হইয়াছিল। সেইরূপ কোন মজার কারণে রৌদ্রশুষ্ক কলিকাতাতেও কিছু না ঘটে।

দ্বিতীয় গল্প শ্রীসৌরীন্দ্র মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের "রামচন্দ্রের মোহর।" চলনসই।

তৃতীয় গল্প শ্রীবরদাপ্রসন্ন দাসগুপ্তের "দীপতারা।" (বিদেশী গল্প হইতে অনূদিত।)

চতুর্থ গল্প শ্রীসতীশ চন্দ্র ঘটক (এম-এ, বি-এল)-এর "ভদ্র ও চাষা।" সরস রচনা। অবশ্য চাষার

দিকটাই ফুটিয়াছে। ভদ্রের দিকটা অন্ধকারে থাকিলেও ভদ্র পাঠক নিজকে দিয়াই মিলাইয়া লইবেন।

কিন্তু "বাঘ যে আগুন দেখে ভয় পায়, এ সত্যটা পর্য্যন্ত এদের কাছে অজ্ঞাত।" এ কথাগুলি অতিশয়োক্তি। জন্তু-জানোয়ারের প্রকৃতি সম্বন্ধে তাহাদের জ্ঞান ভদ্রগণের অপেক্ষা অধিক।

পঞ্চম গল্প কুমার শ্রীধীরেন্দ্র নারায়ণ রায়ের "চলে নীল সাড়ী—" মন্দ লাগে নাই। গ্রাম কর্ত্তারা যদি সত্যই গ্রাম্যশ্রী ফিরাইয়া তাহাকে সুখময় স্থান করিতে পারিতেন, তাহা হইলে বাঙালী একটা কাজের মত কাজ করিতে পারিত। কিন্তু লেখায় ও কাজে প্রভেদ যে অনেকখানি।

ষষ্ঠ গল্প সৌরীনবাবুর "বিধবা-বিবাহ।" সংবাদপত্রে যে ধরণের বিধবা-বিবাহের সংবাদ প্রকাশিত হয়, সে ধরণের নয়। তাহাতে মজা নাই, ইহাতে আছে। পড়িয়া (লিপি) চাতুর্য্যের তারিফ না করিয়া থাকা যায় না।

সপ্তম গল্প শ্রীমতিলাল দাশের "দীক্ষা।" রসহীন রচনা। তবে ভক্তের ভাল লাগিতে পারে। কাম-গন্ধহীন প্রেমের বার্ত্তা ইহাতে পাওয়া যাইবে। এই অবস্থাটা উপলব্ধি না করা গেলেও "আহা,' "উহু"র ছড়াছড়িতে ব্যাঘাত ঘটিবে না। উচ্চ মার্গের ব্যাপার। নব ভক্তমাল গ্রন্থে স্থান পাইবার উপযোগী।

এই সাতটির পরও একটা আছে; সেটিও গল্প এবং আমরা সবটুকু পাঠের চেষ্টাও করিয়াছি। তাহা শ্রীতারক নাথ সাধুর (রায় বাহাদুর) "ফলরেখা।"

রঙিন্ ছবি দেখিলাম তিনখানি।

° ° • °

সন ১৩৩৮ সালের চৈত্র সংখ্যার প্রবাসীতে

ছোট গল্প পাঠ করিয়াছি চারটি।

প্রথম গল্প শ্রীমাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের "যাত্রা।" গান নয় গমন। নবোঢ়া বিবাহের পরদিন পতি-গৃহে যাত্রা করিতেছে। একখানি চিত্র। বেশ লাগে। ইহাতে বর্ণ সমাবেশও আছে নানা। সবচেয়ে ফুটিয়া উঠিয়াছে কারুণ্য।

দ্বিতীয় গল্প শ্রীক্ষীরোদ চন্দ্র দেবের "ভিখারী।" একটা ফরাসী গল্প হইতে।

তৃতীয় গল্প শ্রীসুজিত কুমার মুখোপাধ্যায়ের "প্রায়শ্চিত্ত।" প্রবাসীর ছোট গল্পের ভাণ্ডার কি শূন্য, ন এটিকে পৃষ্ঠাপূরণে মুদ্রিত করা হইয়াছে? রচনাটি তৃতীয় শ্রেণীর তো নয়ই, তাহার আরও কয়েক ধাপ নীচে ফেলিলেও যেন ঠিক হয় না।

চতুর্থ গল্প শ্রীসুবোধ বসুর "ছবি।" বেশ লাগে ভাষা ঝর ঝরে এবং লেখনী বেশ সংযত। গল্পটির মধ্যে একটি প্লট থাকিলেও তাহাতে অবশ্য নূতনত্ব কিছু নাই। প্লটই যে গল্পের সর্ব্বস্ব এবং তাহাতে নূতনত্ব থাকিতেই হইবে, এমন কথাও বলা চলে না!

এ সংখ্যায় রঙিন্ ছবি দেখিলাম দুই চারখানি।
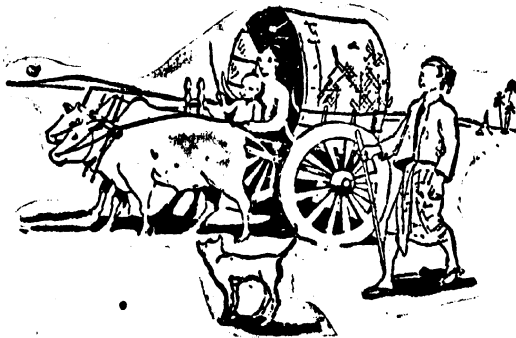
পরলোকে প্রভাত কুমার ঃ—

বাংলার খ্যাতনামা গল্পলেখক ও ঔপন্যাসিক প্রভাত-কুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের যুগে যে ৩।৪ জন গল্পলেখক নিজ বিশেষত্বে গল্প-সাহিত্যে আপনাদের আসন সুপ্রতিষ্ঠ করিয়াছেন প্রভাতকুমার তাঁহাদের মধ্যেই প্রধান একজন ছিলেন। এমন সুন্দর হাস্য-রসোজ্জ্বল গল্প যে-কোন সাহিত্যেরই অলঙ্কার। প্রভাতকুমারের শ্রেষ্ঠ গল্পগুলি ১৩১৬ সাল নাগাৎ প্রবাসী পত্রে বাহির হইয়াছিল, তাঁহার গল্প-গ্রন্থ 'ষোড়শী', 'দেশী বিলাতী' প্রভৃতি অতি বিখ্যাত। রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কাহারও গল্পের বই বোধ হয় এত বেশী বিক্রী হয় নাই। প্রভাতবাবুর 'রমাসুন্দরী' 'সিঁদুর কৌটা,' প্রভৃতি উপন্যাসগুলিও অতি সুন্দর। প্রভাতকুমার অতি অমায়িক সুরসিক লোক ছিলেন। বাহিরে তাঁহাকে খুব গম্ভীর দেখাইত, যাহাদের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা ছিলনা তাহাদের সঙ্গে প্রাণ খুলিয়া মিশিতেও পারিতেন না, কিন্তু যাঁহারা তাঁহার অন্তরঙ্গ ছিল তাঁহাদের সহিত ইনি প্রাণ খুলিয়া মিশিতেন। প্রভাতকুমার কিছুদিন রংপুর ও গয়ায় ব্যারিষ্টারী করিয়াছিলেন, পরে কলিকাতায়ই স্থায়ীভাবে বাস করেন ও সাহিত্য সেবা ও ল' কলেজে অধ্যাপকের কার্য্য করেন। ইনি অধুনা-লুপ্ত 'মানসী ও মর্ম্মবাণীর' সম্পাদক ছিলেন। প্রভাত-কুমারের মৃত্যুতে বাংলা সাহিত্যের যে ক্ষতি হইল তাহা সহজে পূর্ণ হইবার নহে। আমরা তাঁহার শোক-সন্তপ্ত পরিবারবর্গকে সহানুভূতি জানাইতেছি।

বঙ্কিম স্মৃতি ঃ—

সাহিত্য গুরু বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পর ৩৮ বৎসর অতি-বাহিত হইয়া গেল। 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্রের ঋষি বঙ্কিমের স্মৃতিপূজা সেদিন সাহিত্য-পরিষদে হইয়াছে। বাঙ্গালীর দৈনন্দিন জীবনে বঙ্কিমের প্রভাব সামান্য নহে। আজিকার দিনে আমরা সাহিত্য গুরু বঙ্কিমচন্দ্রকে শ্রদ্ধাবনত চিত্তে স্মরণ করিতেছি।

সার ষ্টানলি জ্যাকসন ঃ—

বাংলার জনপ্রিয় শাসনকর্ত্তা স্যর ষ্টান্‌লি জ্যাকসন বাংলা পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশ যাত্রা করিয়াছেন। তাঁহার শাসনকালে নানাপ্রকার কঠোর শাসনতন্ত্র প্রচলিত হইলেও, তাঁহার সহৃদয়তার পরিচয় সর্ব্বত্রই পাওয়া যাইত। সারকুলার রোডের নিকট শিব-মন্দির লইয়া সরকার পক্ষের সহিত সাধারণের কলহ হইবার সূত্রপাত হইলেই সার ষ্টান্‌লি ঐ বিবাদের বীজ অঙ্কুরেই বিনাশ করেন। শ্রীযুত সুভাষচন্দ্রকে ব্রহ্মদেশ হইতে মুক্তি প্রদান করিয়া কলিকাতায় আসিবার সময় নিজের লঞ্চ প্রদান করিয়া-ছিলেন। মহারাজ নদীয়া অকালে মৃত্যু-পথের যাত্রী হইলে, তিনি তাঁহার শোকসভায় সভাপতির কার্য্য করেন এবং বাংলা পরিত্যাগ করিয়া যাইবার দুই চারি দিন পূর্ব্বে আইন সভার গৃহে তাঁহার তৈলচিত্র উন্মুক্ত করেন। স্যার ষ্টান্‌লির অন্তর অতি উন্নত ও মহান ছিল। আমরা তাঁহার দীর্ঘ জীবন ও মঙ্গল কামনা করিতেছি।

স্যার জন এণ্ডারসন ঃ—

কর্ম্ম-জীবনে অসাধারণ সাফল্য লাভ করিয়া অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সেই স্যার জন এণ্ডারসন বাংলার শাসন-তন্ত্রের কর্ণধার হইয়াছেন। আমরা তাঁহার অসাধারণ কর্ম্ম-নিপুণতার কথা শুনিয়াছি। যখন ভারতবর্ষের নূতন ইতিহাস লিখিত হইতে চলিয়াছে, তখন এইরূপ একজন যোগ্য শাসন কর্ত্তার যে বিশেষ প্রয়োজন সে সম্বন্ধে কোন মতভেদই থাকিতে পারে না। স্যার জন সামান্য গৃহস্থের সন্তান। সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উপনিবেশ শাসন-তন্ত্রে যোগদান করিয়া তথাকার অনেক সরকারী অনুষ্ঠানের যথেষ্ট উন্নতি করেন। ইংলণ্ডের সরকার তাঁহার গুণাবলীতে মুগ্ধ হইয়া স্বদেশে লইয়া গিয়া প্রথমে আয়র্লাণ্ডের শাসনকার্য্যে ও পরে ইংলণ্ডের স্থায়ী আণ্ডার-সেক্রেটারী পদে নিযুক্ত করেন। স্যার জন সম্রাট কর্ত্তৃক নানা প্রকার উপাধি ভূষিত হইয়াছেন। ১৯২০ সালে তাঁহার স্ত্রী-বিয়োগের পর তিনি আর বিবাহ করেন নাই। তাঁহার একটী পুত্র ও কন্যা জীবিত আছে, শাসনকর্ত্তার পত্নী না থাকিলে অনেক রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে নানাবিধ অসুবিধা হইতে পারে বলিয়া যাঁহারা আশঙ্কা করিতেছেন তাঁহারা হয়ত শুনিতে পাইবেন যে মিষ্টার ম্যাকডোনাল্ড যেমন তাঁহারা কন্যার সাহায্যে পত্নীর শূন্যস্থান পূরণ করিয়া লইতেছেন ভবিষ্যতে স্যার জনের কন্যাও হয়ত সেইরূপ করিবেন। সম্প্রতি কন্যা তাঁহার সহিত বাংলায় আসেন নাই। আমরা নব-নিযুক্ত বাংলার শাসনকর্ত্তা স্যার জনের নিকট সহানুভূতি ও সু-শাসন পাইবার আশা করি।

নূতন নির্ব্বাচন ঃ—

কয়েকদিন গত হইল ভারত-সচিব স্যার সামুয়েল হোর বলিয়াছিলেন যে ভারতবর্ষে নূতন করিয়া নির্ব্বাচন করিবার সময় আসিয়াছে। নূতন নির্ব্বাচনে জন-সাধারণের বিশ্বাস কোন দলের উপর কতটা তাহা বেশ বুঝিতে পারা যাইবে। সমস্ত নির্ব্বাচন দ্বন্দ্ব যদি সাম্প্রদায়িকতা ও নানাবিধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থের ঘাত-প্রতিঘাতের উপর নিয়ন্ত্রিত করিতে পারা যায় তবে সাম্প্রদায়িক কলহেরও অনেকটা মীমাংসা হইতে পারে এই কথাটা প্রচার হইবার সহিত কাউন্সিল গুলির নূতন নির্ব্বাচন হইবে বলিয়া জোর বাজার গুজব শুনা যাইতেছে। মন্ত্রীগণ ও যাঁহারা শাসন-তন্ত্রের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে সংশ্লিষ্ট তাঁহারা অনেকটা বিচলিত হইয়া পড়িয়াছেন। আমাদের মনে হয় সরকার পক্ষ এখন নূতন নির্ব্বাচন করিবার জন্য আদেশ দিলে আশানুরূপ ফলোদয় হইবে না। কারণ জনসাধারণ নানাপ্রকার আর্থিক দুর্য্যোগে ব্যতিবস্ত। প্রত্যেক নির্ব্বাচনই যথেষ্ট ব্যয় সাপেক্ষ। বর্ত্তমানে যে সমস্ত সদস্যগণ আইন-পরিষদে নানাপ্রকার সৎকার্য্য করিতেছেন, তাঁহারা হয়ত অর্থাভাবে নির্ব্বাচিত হইতে পারিবেন না। শাসন-সংস্কার বিলটী এখনও পার্লামেণ্টে পেশ করা হয় নাই। পার্লামেণ্টে উক্ত বিলটী পেশ করিলে ঐ বিলটী যদি কাউন্সিলগুলি সমর্থন করিতে না পারে তবে উহাদিগকে ভঙ্গ করিয়া নূতন নির্ব্বাচন আহ্বান করাই Parliamentary প্রথা। এখন নির্ব্বাচন করিয়া আবার এক বৎসরের মধ্যে নূতন নির্ব্বাচন প্রবর্ত্তন করিতে গেলে সদস্যগণের যথেষ্টই অসুবিধা হইবে। ভারত-সচিব যদি অনুমান করেন যে এখন নির্ব্বাচন করিয়া লইলে সরকার পক্ষ সমর্থনকারী কতকগুলি দল সৃজন করিয়া লইতে পারিবেন, যাহারা ভবিষ্যতে তাঁহাদিগকে বিশেষ সাহায্য করিবেন। ইহাই যদি নূতন নির্ব্বাচনের একমাত্র কারণ হয়, তবে আমাদের মনে হয়, এ উদ্দেশ্য সফল হইবারও কোনরূপ আশা দেখিতেছি না! কেন না লাহোরে মুসলিম লীগের অধিবেশনে মুসলমানগণ স্পষ্টই বলিয়াছেন যে তাঁহাদের প্রস্তাবে সরকার পক্ষ স্বীকৃত না হইলে তাঁহারাও কংগ্রেস পক্ষের ন্যায় বয়কট চালাইবেন। মুসলমানদের দাবীগুলি ন্যায়সঙ্গত হউক আর নাই হউক, উহার সমস্তগুলি মানিয়া লইয়া দেশে যে শান্তির সহিত শাসন কার্য্য চালাইতে পারা যাইবে না এই ধারণা ভারত-সচিব মহাশয়ের নিশ্চয়ই আছে তাহা না হইলে তাঁহাদিগকেও ধমকাইয়া দিয়াছেন কেন। সুতরাং এখন নির্ব্বাচন দ্বন্দ্ব প্রবর্ত্তন করিলে কতকগুলি কলহেরই অবতারণা করা হইবে মাত্র বলিয়া আমাদের ধারণা হয়।

আপোষ গুজব :—

বাজারে গুজব যে সরকার পক্ষ কংগ্রেস দলের সহিত মিটমাট করিবার জন্য আবার তোড়জোড় করিতেছেন। পণ্ডিত মালবীয়, মিসেস নাইডু এই কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছেন। এই প্রচার হওয়ার সহিতই সরকার পক্ষ হইতে বলা হইয়াছে উহার মূলে কোন সত্য নাই, কংগ্রেসের সহিত সখ্যসূত্রে আবদ্ধ হইতে কোন আপত্তি না থাকিলেও সরকার পক্ষ কংগ্রেসের শেষ দাবী-দাওয়া মানিয়া লইতে আদপেই প্রস্তুত নহেন। কংগ্রেস যে বে-আইনী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান নয় তাহা সরকারীভাবে খুব স্পষ্টই স্বীকার করা হইয়াছে। এই কথা প্রচারিত হওয়া সত্ত্বেও মিসেস নাইডুকে ফজলি হোসেন সাহেবের বাড়ীতে অধিষ্ঠান থাকিতে দেখিয়া অনেকে এইরূপ ভাবিতেছেন যে সরকার পক্ষ গতবারে নিখিল ভারতীয় কংগ্রেসের কার্য্যকরী সভাকে বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন বলিয়াই তাহার সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বর্ত্তমানে তাঁহারা সেইরূপ ভুল না করিয়া কংগ্রেসের সহিত কথাবার্ত্তা কহিবার দ্বার উন্মুক্তই রাখিতেছেন কাজেই সন্ধি করিবার আর কোন প্রয়োজন নাই। ইতিমধ্যে দিল্লীতে কংগ্রেসের অধিবেশন হইবে ও পণ্ডিত মালবীয় সভাপতি হইবেন গুজব বটে কিন্তু সরকার কংগ্রেসের স্থান না দেওয়ায় আপাততঃ তাহাও বন্ধ সুতরাং ব্যাপার ধূমাচ্ছন্নই রহিল। সরকার পক্ষ কংগ্রেসের সহিত সাহচর্য্য করিবার জন্য ব্যগ্র কিনা জানা না যাইলেও ইহা সত্য যে কংগ্রেস বাদ দিয়া কোন শাসনতন্ত্র গঠন করিলে ভবিষ্যতে উহা সর্ব্ববাদিসম্মত ভাবে গৃহীত হইতে না পারে এই আশঙ্কায় তাঁহারা নিশ্চয়ই একটু চিন্তিত বোধ হয়। এই জন্য তাঁহারা হয়তো চাহেন কংগ্রেস তাঁহাদের সাহায্য করুক, আর যদিই তাহা সম্ভব না হয়ত কংগ্রেসকে দাবাইয়া রাখিতে পারে এমন নূতন প্রতিষ্ঠান হউক।

লোথিয়ান কমিটী :—

লোথিয়ান কমিটি বা ভোটাধিকার প্রদান করিবার জন্য যে কমিটি সংগঠন করা হইয়াছিল প্রায় দুইমাস কার্য্য করিবার পর তাঁহারা তাঁহাদের পরিদর্শন ও সাক্ষ্য গ্রহণ কার্য্য শেষ করিয়া তাঁহাদের গবেষণা লিপিবদ্ধ করিতেছেন। ভারতে হিন্দু মুসলমান সমস্যা এই কমিটির সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করিলেই নিষ্পত্তি হইয়া যাইবে বলিয়া কি কেহ মনে করিতেছেন। ভারতবর্ষে হিন্দু মুসলমান সমস্যা বর্ত্তমানে যেরূপ ভাবে দেখা দিয়াছে পূর্ব্বে তাহা ছিল না, কয়েক শতাব্দি পূর্ব্বে ভারতবর্ষ মুসলমানগণ কর্তৃক শাসিত হইলেও হিন্দুগণ যে অধিকার পাইতেন বর্ত্তমানে মুসলমানদলের নেতৃগণ সেই সমস্ত অধিকারও হিন্দুগণকে প্রদান করিতে অস্বীকার করিতেছেন। এই কলহের মূল ভিত্তি সম্পত্তিগত পার্থক্য। এই ভেদ-নীতি দূর করিতে গেলে মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষা সার্ব্বজনীন ভাবে বিস্তৃত করিয়া দেওয়ার সহিত সরকার পক্ষকেও একটু কঠোর হইয়া উহাদের অসম্ভব আবদার মানিয়া না লইয়া যোগ্যতার কঠিন দণ্ডে দাবী গুলিকে ওজন করিয়া লইতে হইবে। যোগ্যতাই মানবকে উন্নত করে, অযোগ্যের উপর অনুগ্রহ প্রদর্শন করিলে অনেক সময়েই উহা অস্বাস্থ্যকর হইয়া দাঁড়ায়।

বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দু-মুসলমান—

সেদিন বাংলার আইন সভায় মুসলমান সভ্যগণ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাদের স্বধর্ম্মাবলম্বীর সংখ্যার অল্পতার কথা তুলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীযুত শ্যামাপ্রসাদ বলিয়াছেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দুগণ প্রায় অর্দ্ধকোটী টাকা প্রদান করিয়াছেন, সেই বিদ্যালয়ে মুসলমানগণের দান মাত্র ১১০০০ এগার হাজার টাকা। জাতির আর্থিক দান জাতির যোগ্যতার মাপকাটি নয় ইহা স্বীকার করিয়া লইলেও ইহা সত্য যে আর্থিক দানে মানুষের অন্তঃকরণের পরিচয় প্রদান করে। বঙ্গীয় মুসলমান সমাজ শিক্ষিত হইয়া আজ উন্নত হইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিলেও ঐ শিক্ষাকে তাঁহাদের স্ববশে আনিবার জন্য যতটা হৃদয়তা থাকা আবশ্যক তাহা কি তাঁহাদের আছে? উত্তরে দুই একজন মুসলমান সভ্য বলিয়াছেন যে তাঁহারা দরিদ্র, দান করিবার ক্ষমতা তাঁহাদের খুবই অল্প। কিন্তু পূর্ব্বে

বাংলায় মুসলমান জমিদার ও জোতদারের সংখ্যা খুব কম নয়। কলুটোলা অঞ্চলে অনেক লক্ষপতি মুসলমান বিদেশী হইলেও কলিকাতায় পুরুষানুক্রমে বসবাস করিতেছেন। এই সমস্ত ভদ্রমহোদয়গণ যদি হুগলীর দানবীর মসিনের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহাদের সমাজের যুবকগণকে উৎসাহিত করিবার জন্য তাঁহাদিগেরই জন্য বিশেষ বৃত্তি ইত্যাদির ব্যবস্থা করিয়া দিতেন তাহা হইলে কি বর্ত্তমানের অপেক্ষা তাঁহাদের শিক্ষিতদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইত না? আসল কথা মুসলমান সমাজ ইংরাজের নিকট পরাভব স্বীকার করিয়া তাঁহাদের আভিজাত্য বিস্মৃত হইতে না পারিয়া হিন্দুগণের সহিত ইংরাজী শিক্ষা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করায় তাঁহারা বর্ত্তমানে শিক্ষায় অনেকটা পশ্চাতে পড়িয়া গিয়াছেন। হিন্দুর সহিত সমানভাবে পা ফেলিতে গেলে যোগ্যতা অর্জ্জন করাই বাঞ্ছনীয়, কতকটা বিশেষ রাজ-অনুগ্রহ লাভ করিলে উহা ব্যক্তি বিশেষের উপভোগ্য হইবে কিন্তু সমস্ত সম্প্রদায় যে তিমিরে সে তিমিরেই থাকিয়া যাইবে, নবীন মুসলমান সম্প্রদায় এ বিষয়টি একবার ভাবিয়া দেখিবেন কি?

চীন জাপান :—

চীন-জাপান যুদ্ধের অবসান ঘটিল দেখিয়া যাঁহারা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিতেছেন তাঁহারা জানিয়া রাখুন যে যেখানে স্বার্থের ঘাত-প্রতিঘাতের উপর কোন শান্তির প্রস্তাব গৃহীত হয়, শান্তি ক্ষণকালের জন্য সেখানে প্রতিষ্ঠিত হইলেও, চিরকালের জন্য নিশ্চয়ই শান্তি প্রবর্ত্তিত হইতে পারে না। জাপান তাহার অস্তিত্বের জন্য মাঞ্চুরিয়ায় প্রভুত্ব চাহে। ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জ জাপানকে এই প্রভুত্ব ছাড়িয়া দিতে রাজী আছেন যদি জাপান খাস চীনে তাহার লোলুপদৃষ্টি নিক্ষেপ না করে। চীনের জাতীয়তাবাদ জাপান ও পাশ্চাত্য শক্তিপুঞ্জ কাহাকেই পছন্দ করে না। এই শক্তির অভ্যুদয় ঘটিলে উভয়েরই আধিপত্য ক্ষুণ্ণ হইতে পারে। জাপান চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া উক্ত জাতীয়তাবাদকে খানিকটা খর্ব্ব করিতে গিয়াছিল মাত্র।

অসন্তোষের বন্যা :—

ভাবী মহাসমরের পূর্ব্ব সূচনা স্বরূপ সারা বিশ্বে একটা ঘোরতর অসন্তোষের বন্যা বহিয়া যাইতেছে। ১৯১২ সালে চীনে স্বাধীনতা-তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইলেও, চীনের আভ্যন্তরিক শান্তি আজ ২০ বৎসরেও স্থাপিত হইল না। স্পেনের শাসনতন্ত্র কয়েক বৎসর হইল সংশোধিত হইয়াছে, কিন্তু উহার গোলযোগ আজও পূর্ব্ববৎই রহিয়াছে। রাজশক্তির বিনাশের সহিত এই অশান্তির নিবৃত্তি হইবে যাঁহারা ভাবিয়াছেন, আজ কয়েক মাস হইল রাজশক্তির ধ্বংশ সংসাধিত হইলেও গোলযোগ একভাবেই থাকায় তাঁহারা অনেকটা হতাশ হইয়া পড়িয়াছেন। অশান্তির ফল্গু রাশিয়ায় ও তীব্রবেগে বহিয়াই চলিয়াছে। আয়র্লাণ্ডের নূতন নির্ব্বাচন দ্বন্দ্ব এক অভিনব সমস্যা বৃটীশ সাম্রাজ্যের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছে। জার্ম্মানিতে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইলেও তথাকার শাসন দণ্ড কতকগুলি বণিকের করতলগত রহিয়াছে বলিয়া ভীষণ অশান্তি ধূমায়মান অবস্থায় রহিয়াছে। আমেরিকার বাজেট বিভ্রাট তাহাকে ভীষণ ব্যস্ত করিয়াছে। হুভার যে মোরেটারিয়ম ঘোষণা করিয়াছিলেন তাহার মেয়াদ বোধহয় অবসান হইয়া আসিল। জার্ম্মাণি এবারে ভার্সেলিজ সন্ধির সর্ত্তানুযায়ী টাকা দিতে পারিবে না বলিয়া ঘোষণা করিলেই ফ্রান্সের সম্মুখে মহাসমস্যার উদয় হইবে।

ইংলণ্ডের আর্থিক সুবিধা :—

সুখের বিষয় ইংলণ্ডের সরকার তাহাদের আর্থিক বিপ্লবের প্রবল আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছেন। পাউণ্ডের মূল্য ডলারের তুলনায় নিত্যই হ্রাস পাইতেছিল। এখন পাউণ্ড ডলারের সহিত উহার স্বাভাবিক মূল্যই প্রাপ্ত হইয়াছে। ইংলণ্ডের ধনীগণ অসাধারণ ত্যাগ স্বীকার করিয়া নানাবিধ করে প্রপীড়িত হইয়া বর্ত্তমান বৎসরে আয়-ব্যয় হিসাবে ব্যয় অপেক্ষা আয়ের আধিক্য ঘটাইতে সমর্থ হইয়াছে। ইহাতে ইংলণ্ডের ব্যবসা-বাণিজ্য নিশ্চয়ই অনেক সুবিধাজনক অবস্থায় আসিতে পারিবে।

কিন্তু হুভার মোরাটেরিয়মের অবসান ঘটিলে, ইংলণ্ড আমেরিকাকে কি বলিবেন !

সামরিক ব্যয় :—

জেনেভার সর্ব্বজাতি সম্মিলনে সমরঋণের প্রত্যাখান করিবার প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া একটী বৈঠক বসাইলে কেমন হয়? অস্ত্র নিয়ন্ত্রিত করা যেমন জাতিগুলির একটী মহাকর্ত্তব্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে, জেনেভার মহাসভা হইতে কর প্রপীড়িত জাতিগুলিকে সমর হইতে অব্যাহতি প্রদান করিলেই জগতের আর্থিক অবস্থা আবার সচ্ছলতার পথে প্রবর্ত্তিত করিতে পারা যায়। আমেরিকার সরকারের আয় অপেক্ষা ব্যয়ের আধিক্য দেখিয়াই এই কথাটা আপনা হইতেই মনে হয়। আমেরিকায় অর্থ-সঙ্কোচ ঘটিয়াছে বলিলে কেহই স্বীকার করিবে না। ব্যবসা-বাণিজ্যে পণ্যের আদান প্রদান কমিয়া যাওয়ায় বাণিজ্য শুল্কের পরিমাণ অনেক কমিয়া গিয়াছে। মহাজনদের আয় কম হওয়ায় আয়-করও হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে। আয়কর ও বাণিজ্য শুল্ক সমস্ত সভ্য দেশের প্রধান রাজস্ব। ব্যয়ের কোনরূপ হ্রাস না করায় উক্ত প্রধান আয়ের পন্থা দুইটী সঙ্কোচ ঘটাতেই আজ বজেটে এই ঘাটতি। এই ঘাটতি অপসরণ করিতে গেলেই আয় বৃদ্ধির সহিত ব্যয়েরও হ্রাস করিতে হইবে। এই জন্যই আমরা বলিতেছিলাম যে জাতীয় মহাসঙ্ঘে অস্ত্র-সমস্যার একটা মীমাংসা করিয়া লইতে পারিলে মিলিটারি সাজ-সরঞ্জাম বাবদে যে অর্থ ব্যয় করা হয় তাহার অনেক লাঘব হইতে পারিবে। সমর-ঋণ হইতে জাতিগুলিকে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিলেই বণিকদের ও জনসাধারণের আর্থিক উন্নতি ঘটিবে, তাহা হইলেই আয়কর ও বাণিজ্য শুল্ক মারফতে যে আয়ের অল্পতা ঘটিয়াছে উহার অনেকটা লাঘব ঘটিবে। কিন্তু জাতির স্বার্থের নিকট ব্যক্তিগত স্বার্থ বলি দিতে হইবে। এই আদর্শ এককালে পাশ্চাত্যে খুবই প্রবল ছিল। এখন উহা অনেকটাই ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। পশ্চিম কি তাহার বহু পুরাতন আদর্শটীকে আবার প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবে না ?

আইরিস সমস্যা :—

ইংলণ্ডের সাম্রাজ্যবাদীগণ ডি-ভেলেরাকে লইয়া মহামুস্কিলে পড়িয়াছেন। গত মহাযুদ্ধের পর আয়র্লাণ্ডকে ফ্রী ষ্টেট বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া হইলে, একদল মধ্যপন্থী উহার রাজদণ্ড গ্রহণ করিয়া এতদিন উহা পরিচালিত করিয়া আসিতেছিলেন। আইরিস বীর ডি-ভেলেরা দেশের স্বাধীনতা অর্জ্জন করিবার প্রধান সহায়ক হইলেও মধ্যপন্থী সরকার তাঁহাকে এতদিন নির্ব্বাসিত ও অপদস্থ করিয়া রাখিয়াছিলেন। ক্রমশঃ মত পরিবর্ত্তনের সহিত আয়র্লাণ্ডে জাতীয় ভাব নূতন ভাবে দেখা দেওয়ায় কস্‌গ্রেভ্ সরকারকে হটাইয়া দিয়া ডি-ভেলেরা আয়র্লাণ্ডের রাজদণ্ড গ্রহণ করিয়াছেন। বিপক্ষের সহিত সংগ্রাম করিতে গেলেই আপনার দলের বিশিষ্টতা রক্ষা করিবার জন্য কোনো না কোন Slogan এর প্রয়োজন হয়। ডি-ভেলেরা শপথ গ্রহণ করা হইবে না এবং ইংলণ্ডকে ভূমিকর প্রদান করা হইবে না বলিয়া ঘোষণা করিয়া আসিয়াছিলেন। রাজক্ষমতা হস্তে পাইয়া তাঁহাকে এই দুইটী সর্ত্তপালন করিবার জন্য, শপথ ও ভূমিকর আইরিস্ পার্লামেণ্টের অনুমোদন লইয়া তুলিয়া দেওয়া হইল বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। শপথ গ্রহণ বর্জ্জন করিলে বাহ্যতঃ ইংলণ্ডের কোন প্রকার ক্ষতি না হইলেও উহার নৈতিক ফল সমস্ত সাম্রাজ্যের উপর সুবিধাজনক হইবে না। আজ আয়র্লাণ্ডকে শপথ গ্রহণ প্রথা পরিত্যাগ করিবার ক্ষমতা প্রদান করিলেই, কালক্রমে তাবৎ উপনিবেশগুলিই উক্ত প্রথার অনুসরণ করিতে পারে। ১৯২৬ সালে ঔপনিবেশিক বৈঠকে উপনিবেশ গুলিকে স্বতন্ত্র রাজ্য বলিয়া ঘোষণা করা হইলেও ইংরাজ-রাজকে তাহাদের রাজা বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে এই সর্ত্ত থাকায় বৃটনের সহিত উহার একটা আন্তরিকতা রক্ষা করা হয়। এই শপথ গ্রহণ বর্জ্জন করিলেই এই প্রথার মূলোচ্ছেদ করা হইবে। সাম্রাজ্ঞী এলিজাবেথের সময় হইতে ইংরাজ অভিজাত-গণ দলে দলে আয়লাণ্ডে গমন করিয়া তথায় তাঁহাদের জমিদারী বা ষ্টেট স্থাপন করিয়া আসিতেছিলেন।

আইরীশ অধিবাসীগণ আমাদের দেশের ভূস্বত্বহীন প্রজা হিসাবে জমির আবাদ করিত মাত্র। আইরীষ ফ্রিষ্টেট ঘোষণাকালে আয়র্লাণ্ডকে সম্পূর্ণরূপে স্বাধীনতা প্রদান করিবার ফলে আয়র্লাণ্ডের অধিবাসীগণ জমির মালিক হয়েন সত্য কিন্তু ক্ষতিপূরণ স্বরূপ ইংলণ্ডের অভিজাতগণকে একটী বার্ষিক কর প্রদান করা হইবে এইরূপ ব্যবস্থা করা হয়, উহারই নাম Land annuity বা ভূমিকর। এই কর প্রদান করিতে অস্বীকার করিলে ইংলণ্ডের আর্থিক ক্ষতিও হইবে। ইংলণ্ডের বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডলী ডি-ভেলেরাকে বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে উক্ত সর্ত্ত দুইটী ভঙ্গ করিলে আইরীষ ফ্রী ষ্টেটের সহিত যে সন্ধি হইয়াছিল উহার অবমাননা করা হইবে। ইংলণ্ডের জনসাধারণ ভয় দেখাইয়াছিলেন যে তাঁহারা আয়র্লাণ্ডের সহিত সমস্ত ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ করিয়া দিবেন। এই দ্বিবিধ ভীতি প্রদর্শনে ডি-তেলেরা বিশেষ ভয় পাইয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। উত্তরে তিনি বলিয়াছেন যে শপথ বর্জ্জন বা ভূমিকর প্রদান বন্ধ করিলে আয়র্লাণ্ডের সহিত ইংলণ্ডের যে সন্ধি হইয়াছিল তাহার কোন সর্ত্তে অপলাপ করা হইবে না। উক্ত সন্ধিপত্র স্বাক্ষরকারীদেরই একজন বিশিষ্ট আইনজ্ঞ পণ্ডিত নাকি ডি ভেলেরার উক্তির সমর্থন করিয়াছেন। ব্যবসা বাণিজ্য বন্ধ করিয়া দিলে ইংলণ্ডেরই ক্ষতি অধিক হইবে বলা হইয়াছে কেননা বৃটনের সহিত আয়র্লাণ্ডের যে সমস্ত পণ্য দ্রব্যের আদান-প্রদান হইয়া থাকে উহাতে রপ্তানি অপেক্ষা আমদানি দ্রব্যেরই আধিক্য অধিক। দেখা যাক ডি-ভেলেরা তাঁহার প্রতিজ্ঞা মত কাজ করিতে পারেন কি না?

প্রাথমিক শিক্ষা বিল

সেদিনকার আইন পরিষদের একটী অধিবেশনে শিক্ষা-সচিব মিঃ নাজিমউদ্দিনকে প্রাথমিক শিক্ষা বিলটীর কি হইল জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিয়াছেন উক্ত বিলটির কথা তিনি বিস্মৃত হয়েন নাই। সরকারের ভীষণ অর্থ-সঙ্কোচ উপস্থিত হওয়ায় উহাকে কার্য্যকরী করিতে পারা যাইতেছে না। সম্প্রতি তিনি মনে করিতেছেন যে জেলা বোর্ডগুলির সহিত একটী বন্দোবস্ত করিয়া ঐ বিলটীর সর্ত্তানুযায়ী কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবেন। দেশকে উন্নত করিতে গেলে দেশের জনসাধারণকে অজ্ঞ ও কুসংস্কারাপন্ন রাখিয়া দিলে কিছুতেই অগ্রসর হইতে পারা যাইবে না। ব্যয় সঙ্কোচ করা যেমন একটী মামুলী প্রথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে ভবিষ্যতে যে সরকার পক্ষ উহা বর্জ্জন করিতে পারিবেন তাহা মনে হয় না। এই জন্যই মনে হয় অপেক্ষা করিতে গেলে চিরকালই অপেক্ষা করিতে হইবে।

বৃটিশ ইণ্ডিয়ানে জমিদার-সম্প্রদায়:—

গত ৩০শে মার্চ্চ বৃটীশ ইণ্ডিয়ান নামক অভিজাতসঙ্ঘের বার্ষিক অধিবেশন হইয়াছে। মামুলী প্রথায় গত বৎসরের সভাপতি মহারাজ শ্রীশচন্দ্র নন্দী মহাশয় তাঁহার বার্ষিক বিবরিণী পাঠ করিয়াছেন। আগামী বৎসরের সভাপতি শ্রীযুত প্রফুল্লচন্দ্র ঠাকুর মহাশয়কে নূতন কিছু বলিতে শুনিলাম না। উভয়েই বলিয়াছেন আর্থিক অবস্থা ক্রমশঃ খারাপ হইয়া যাইতেছে। সরকার পক্ষকে জমিদারগণের ভবিষ্যতের জন্য অবহিত হইবার জন্য আহ্বান করা হইয়াছে। জমিদারগণই বাংলার জনসাধারণের স্বাভাবিক নেতা। বাংলায় ইংরাজ রাজত্ব প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বে এবং প্রবর্ত্তিত হইবার পরও কয়েক বৎসর জমিদারগণই জন সাধারণের পক্ষ হইতে নেতৃত্ব করিয়া আসিতেছিলেন। পাশ্চাত্য সভ্যতার আবহাওয়ায় আত্ম-জ্ঞান বিস্মৃত হইয়া জমিদারগণ যখন হইতে তাঁহাদের তাবৎ কর্ত্তব্য আমলাদের উপর ন্যস্ত করিয়া কলিকাতায় আসিয়া বিলাস-ব্যসনে আত্মোৎসর্গ করেন তখন হইতেই তাঁহাদের নেতৃত্ব ক্রমশঃ জন কয়েক আইন-জীবি ও ডাক্তারগণের হতে গিয়া পড়ে। এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীদ্বয় জমিদারদের মত আপনাদিগকেও অভিজাত শ্রেণীভুক্ত করিয়া লইবার জন্য প্রজার পক্ষ অবলম্বন করিয়া জমিদারগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা

করেন। তাহারই ফলে আজ জমিদারগণ তাঁহাদের সম্মান জনক পদ হারাইয়াছেন। ইহার প্রতীকার করিতে গেলে কলিকাতার বিলাসী ধনী সম্প্রদায়ে পরিণত দেশের জমিজারগণ কলিকাতায় বসিয়া দলবদ্ধভাবে হা-হুতাশ করিয়া সরকারের নিকট আবেদন-নিবেদন করিলে কোন ফলোদয়ই হইবে না ; তাঁহাদিগকে তাঁহাদের স্বস্ব আবাসে ফিরিয়া যাইতে হইবে, পল্লীর সমস্ত অনুষ্ঠান গুলির সহিত ওতপ্রোতভাবে আপনাদিগকে মিশাইয়া দিতে হইবে। কাশিমবাজারের মহারাজের ন্যায় নবীন সম্প্রদায়ের নিকট এইরূপ আশা করিতে পারা যায় নাকি। উক্ত অধিবেশনে কুমার নরেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুত হিরণ্যকুমার মিত্র মহাশয় বেশ গুটি কয়েক কথা বলিয়াছেন। সুন্দর বনে আবাদ প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্ম ১৮২৯ সাল হইতে ১৮৫২ সালের মধ্যে সরকার পক্ষ বণিক সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেক জমি বিলি করেন। আবাদ কার্য্যকে জনসাধারণের প্রিয় করিবার জন্য খাজনার হার বিঘা প্রতি আট-আনার অধিক ধার্য্য করা হয় নাই। এখন সুন্দরবনের হিংস্র জন্তু অধ্যুষিত অংশগুলি অর্দ্ধশতাব্দির চেষ্টায় ও অধ্যবসায় ধনধান্যে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। সরকার পক্ষ নূতন settlement এর অজুহাতে যে তালুকের বার্ষিক কর পূর্ব্বে মাত্র ৯০০৲ টাকা মাত্র ছিল, উহার স্থলে এখন বেগার হাজার ১১,০০০৲ টাকা ধার্য্য করিয়াছেন। নূতন করের হার সর্ব্বত্রই এই অনুপাতে বৃদ্ধি করা হইয়াছে। এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে জমিদারগণের পক্ষ হইতে আন্দোলন করা হইলে মোট আদায়ের উপর শতকরা ৩৭৲ টাকা করিয়া কর ধার্য্য করা হইয়াছে। তিনি বলেন যে জমাজমি খরচা শতকরা ১৫৲, রাস্তা, পথ, ঘাট, সাঁকো নির্ম্মাণ ইত্যাদি কার্য্যের জন্য শতকরা ২০, প্রত্যেক বৎসরের অনাদায়ী ২৫৲ টাকা ধরিলে, প্রদত্ত করের হার শতকরা ৯৭৲ টাকায় গিয়া দাঁড়ায়, ইহার প্রতিবিধান করিবার জন্য জমিদারগণকে তাঁহাদের বিভিন্ন শ্রেণী ভুলিয়া গিয়া সমবেত ভাবে আন্দোলন করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন। শ্রীযুত মিত্র বলেন জমিদারদের মধ্যেও নাকি ভীষণভাবে জাতিভেদ আছে। যাঁহাদের বার্ষিক আয় পাঁচ লক্ষ বা ততোধিক তাঁহারা উঁহাদের মধ্যে মহাকুলীন। যাঁহাদের আয় এক লক্ষের নিম্নে তাঁহারা মৌলিক মাত্র, এই শ্রেণী বিভাগের আরও একটী দিক আছে। যে সমস্ত জমিদার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ভোগ করেন তাঁহারা এক শ্রেণী। যাঁহারা নিরানব্বই বৎসরের সত্ব উপভোগ করেন তাঁহারা আর একশ্রেণী। যাঁহারা মাত্র চল্লিশ বৎসরের উপস্বত্ব ভোগ করেন, তাঁহারা একটী শ্রেণী। অভিজাতদের খুব বিশিষ্ট শ্রেণীবিভাগই বটে !

স্বাস্থ্য-সমিতি :—

কলিকাতার পল্লীগুলিতে প্রত্যেক বৎসরেই স্বাস্থ্য-প্রদর্শনী খোলা হইয়া থাকে। বার্ষিক বিবরণী পাঠ করিলে আমরা শুধুই দেখিতে পাই যে তাঁহারা কতকগুলি রোগের প্রতিবিধান করিবার জন্য প্রাণপণ করিয়াছেন মাত্র। Health Association গুলি যদি রোগ প্রতি-বিধান করার সহিত উহার নিরাকরণ করিবার পন্থা ও অবলম্বন করেন তাহা হইলেই প্রকৃত উদ্দেশ্য সফল হইতে পারে। এই দিকে আমরা কর্ত্তৃপক্ষগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি তাঁহাদিগকে আমাদের আর একটী বলিবার বিষয় আছে। Health Association গুলির বার্ষিক বিবরণী পাঠ করিলে অনেক প্রকার সংক্রামক ব্যাধিরই নাম পাওয়া যায়, কিন্তু যৌন ব্যাধিগুলির কোন প্রকার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। যৌন ব্যাধি অনেক সময়েই স্বেচ্ছাকৃত হইলেও উহা যে ভীষণভাবে আমাদের সমাজে প্রবেশ করিতেছে তাহাতো অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ইউরোপের প্রধান প্রধান নগরগুলিতে যৌনব্যাধির প্রতিকার করিবার জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত আছে। কলিকাতা করপোরেশনকে এই বিষয়ে একটু মনোযোগ প্রদান করিবার জন্য আমরা অনুরোধ করিতেছি।

মেডিক্যাল এ্যাসোসিয়েসন ঃ—

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও কলিকাতাতেই মেডিক্যাল এসোসিয়েসনের বার্ষিক অধিবেশন বসিয়াছিল। বিশেষজ্ঞগণ নানাপ্রকার অভিজ্ঞতাপূর্ণ বিবরিণী পত্র পাঠ করিয়াছেন। জনসাধারণের সহিত তাহাদের অবশ্যই কোন বিশেষ সম্বন্ধ নাই। এই অধিবেশনের এবারকার

বিশেষত্ব নাকি এই যে তাবৎ চিকিৎসকই স্বদেশে প্রস্তুত ঔষধাদি ব্যবহার করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। প্রত্যেক বৎসর আমরা ইউরোপ ও আমেরিকা হইতে প্রায় দুই কোটী টাকার ঔষধাদি আমদানি করিয়া থাকি! ইহা ব্যতীত রাসায়নিক দ্রব্যাদি আমদানী করা হয়। আমাদের দেশে যখন পৃথিবীর তাবৎ ঔষধিই উৎপন্ন হয়, তখন তাবৎ ঔষধই এখানে প্রস্তুত করিবার চেষ্টা করিলে শুধুই যে আমাদের আর্থিক উন্নতি হইতে পারে তাহা নয়, বিদেশ হইতে আগত ঔষধাবলী অনেক সময়েই আমাদের শরীরের উপযোগী করিয়া প্রস্তুত হয় না, আমাদের ব্যবহার্য্য ঔষধাদি এখানে প্রস্তুত করিতে পারিলে এই দোষটী নিশ্চয়ই খণ্ডন করিতে পারা যাইবে। একথাও সত্য যে ভূমধ্যসাগর ও লোহিত সাগরের মধ্য দিয়া আসিবার সময় অনেক ঔষধ ভীষণ গ্রীষ্মের প্রভাবে রূপান্তর প্রাপ্ত হয়। এই সমস্ত রূপান্তরিত ঔষধ অনেক সময়েই দেহের ক্ষতিকর হয়।

টেলিফোনে লেখাও চলিবে :—

Television এর পর Telephone এ Typewriting আসিয়া দেখা দিতেছে। শুনা যাইতেছে দুই এক মাসের মধ্যেই কলিকাতার টেলিফোন কোম্পানী একপ্রকার নূতন টেলিফোনের বাক্স যোগান দিবেন যাহাতে টেলিফোনের হাতলটী তুলিয়া বাক্সের উপর কোন প্রকার লেখা ছাপিলেই নির্দ্দিষ্ট স্থলে বাক্সের উপর ঐ সমস্ত লেখা খোদিত হইয়া উঠিবে। এই ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন হইলে, উকীল, ডাক্তারদিগকে খবর দিবার এবং উহাদিগের নিকট হইতে পরামর্শ লইবার যথেষ্ট সুবিধা হইবে।

প্রেমের খেলা :—

যাঁহারা ভাবেন যে যুবক যুবতীরাই প্রেমে মুগ্ধ হ'ন বা বয়স প্রেমের প্রকৃত প্রতীক তাঁহারা শুনিয়া নিশ্চয়ই আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন যে ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে উনবিংশ হইতে একবিংশ বয়স্ক পঁচাত্তর জন যুবক পঁচিশ হইতে চল্লিশ বৎসর বয়সের যুবতীগণের পাণি পীড়ন করিয়াছেন। আবার কুমারী অপেক্ষা বিধবাগণই অবিবাহিত যুবকগণের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে অধিক সক্ষম বলিয়া প্রকাশ। উক্ত সালে ১৬,১৯৪ জন বিধবার বিবাহ হইয়াছে উহাদের মধ্যে ১০৫০৭ জনের বয়স ৩৫ হইতে ৬০ বৎসরের মধ্যে। এই সমস্ত বিবাহের বিবৃতি পাঠ করিলে মনে হয় অদৃষ্টের পরিহাস ব্যতীত আর কি হইতে পারে?

স্বাদেশিকতা ও সাম্প্রদায়িকতা :—

মহীশূরের দেওয়ান সার মীর্জ্জা মহম্মদ ইস্মেল একজন সম্ভ্রান্ত মুসলমান। তিনি নাকি সম্প্রতি বলিয়াছেন যে পণ্ডিত মদনমোহনের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা দোষ আছে বলিয়া যাহা শুনা যায় তাহা একেবারেই ভ্রম পূর্ণ। তবে একথা সত্য যে পণ্ডিজী একজন পুরাদস্তুর Pro-Indian বা বিশেষ স্বদেশ ভক্ত। আমরা আমাদের মুসলমান নেতৃগণকে এই উক্তিটির সম্বন্ধে সবিশেষ মনোযোগ প্রদান করিতে বলি।

কন্যাপণ :—

আফ্রিকার অসভ্য দেশগুলিতে বিবাহ করিবার জন্য কন্যা-পণ প্রদান করিতে হয়। সভ্যদেশ সমূহে অর্থ-কৃচ্ছতা উৎকট ভাবে আত্মপ্রকাশ করায় উহার ফলাফল উক্ত অসভ্যদেশ গুলিতেও গিয়া পৌছাইয়াছে। সেইজন্য অনেক যুবক বিবাহ করিবার বয়স গেলেও অর্থের অভাবে বিবাহ করিতে পারিতেছে না। ইহাদিগকে বিবাহ করিবার সময় পণ হিসাবে কন্যার পিতাকে গোধন দান করিতে হয়। কন্যার পিতাগণ এই বৎসর এই নিয়ম করিয়াছেন যে যতদিন না অর্থের স্বচ্ছলতা সমাজে ফিরিয়া আসে ততদিন বিবাহপ্রার্থী যুবক একটী গোধন দিয়া কন্যা গ্রহণ করিতে পারিবে এবং অবশিষ্ট গরুগুলি বৎসরে একটী করিয়া দিয়া easy payment করিবে। ব্যবস্থা অবস্থানুযায়ীই হইয়াছে।

আবাহন

লক্ষ্মীবিলাস প্রেস, লিঃ

সতীশচন্দ্র মিত্র প্রতিষ্ঠিত

৬ষ্ঠ বর্ষ | জ্যৈষ্ঠ—১৩৩৯ | ২য় সংখ্যা

পূর্ব্ব ও পশ্চিম

শ্রীযতীন্দ্র নাথ মিত্র এম-এ

ইংলণ্ডের রাজকবি কিপলিং সাম্রাজ্যবাদের মূলমন্ত্র হিসাবে প্রকাশ করিয়াছেন, East is East and West is West, the twain shall never meet. কথাটার মধ্যে একটা সনাতন সত্য প্রচ্ছন্নভাবে আত্ম-গোপন করিয়া আছে তাহা হয়ত তিনিও অনুভব করিতে পারেন নাই। প্রাচ্যের জাতিবৃন্দ সাম্রাজ্যবাদীর এই উক্তিতে অনেকটা মর্ম্মাহত হইয়াই উহার ভীষণ প্রতিবাদ করিয়াছেন, কিন্তু উহার মধ্যেও যে মহান সত্য প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে তখন তাহারাও বুঝিতে পারে নাই।

প্রাচ্যই সভ্যতার জন্মভূমি, জ্ঞান-উষার আবির্ভাব প্রথম প্রাচ্যদেশ সমূহেই হয়। ভারতবর্ষ, চীন, বাবীলন ও মিশরই সভ্যতার আলোক প্রথম প্রাপ্ত হইয়াছিল। সভ্যতার অভ্যুদয়ের সহিত মানবের সুখৈশ্বর্য্য যেমন বৃদ্ধি পাইতে থাকে সেই পরিমাণে একদল অভিজাত সৃষ্ট হইতে থাকে যাহারা ক্রমশঃ সমগ্র মানব জাতির মুখপাত্র হিসাবে সভ্যতার ধারক ও বাহক হইয়া এক স্তর হইতে অন্য স্তরে মানব-সমাজকে আগাইয়া লইয়া চলে। এই অভিজাত-সম্প্রদায়ই কালক্রমে শাসক-সম্প্রদায়ে পরিণত হইয়া দুর্ব্বল ও পতিতদের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে থাকে। প্রাচ্যে এইরূপেই বিবিধ বংশের আবির্ভাব হয়, যাহাদিগকে সাধারণ জন-মানব দেবতার অংশ হিসাবে ভক্তির অঞ্জলি দিতে থাকে। ভবিষ্যতে এই ভক্তির পূজা বাধ্যতায় আসিয়া দাঁড়ায়, অভিজাত-সম্প্রদায় উচ্চশ্রেণী বা দেবসম্প্রদায়ে পরিণত হইয়া পতিতদের সহিত সমস্ত সম্বন্ধ ত্যাগ করে। প্রাচ্যের জাতিভেদ ও বিবাহপ্রথা এই বিষয়েরই জলন্ত উদাহরণ। প্রাচ্যের অভিজাত-সম্প্রদায় বিবাহ-বিধি বলে এমন একটী সংকীর্ণ উন্নত জাতিতে পরিণত হয় যে, পতিতরা চির-কালই পতিত থাকিতে বাধ্য হয় এবং তাহারা কোন

কালেই উন্নত হইয়া অভিজাতদের সমকক্ষ হইবার আশা পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করে।

গ্রীসের হারলোট, ভারতের শূদ্রগণকে কোন প্রকার মানব জাতির অধিকার দেওয়া হইত না। সমাজের অঙ্গ বলিয়া এবং সমাজ তাহাদের পরিশ্রমের উপরও অনেকটা নির্ভর করিত বলিয়া তাহাদিগকে জীবনধারণ উপযোগী ভরণ-পোষণ দেওয়া হইত মাত্র, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সমাজে তাহাদের কোন স্থানই ছিল না। একটা জাতকে চিরকাল অন্ধকার কূপে আবদ্ধ করিয়া আপনাদের সামাজিক অবস্থা সুশৃঙ্খলিত করিতে গেলে যাহা হয়, ভারত, চীন, বাবীলন ও মিশর দেশেও তাহাই হইয়াছিল। অভিজাতগণকে কোন প্রকার প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হইতে না দেওয়ায় তাহাদের মধ্যে adventureএর প্রভাব কমিয়া যায় এবং সমস্ত সম্প্রদায়ই সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কোলে জন্ম হইতে লালিত-পালিত হওয়ায় তাহাদের শারীরিক ও মানসিক দুর্ব্বলতা আসিয়া পড়ে। নূতন কিছু করিবার ক্ষমতা যখন মানবের কমিয়া যায়, আশা যখন মানবের নিকট নিত্য নূতন মূর্ত্তি লইয়া আসিয়া দেখা দেয় না, তখনই মানব ছোট হইয়া পড়ে, তখনই মানব আত্মশক্তিতে বিশ্বাস হারাইয়া যাহা কিছু পুরাতন তাহাকেই মহান সত্য বলিয়া জাপটাইয়া ধরে, পূর্ব্বপুরুষকে দেবতার পদে বসাইয়া পূজা সুরু করিয়া দেয়, এবং কেহ নূতন কিছু করিতে গেলে তাহার পরম শত্রু হইয়া দাঁড়ায়, মোট কথা সকল প্রকার adventureই তাহার কাছে ও তাহাদের সমাজের কাছে ভীষণ প্রতিবন্ধক বলিয়া মনে হয়।

মানুষের জীবনকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে আমরা সাধারণতঃ দুইটী জিনিষ দেখিতে পাই, আড্‌ভেন্‌চ্যর ও রোমান্স। এই দুইটী ছাড়িয়া দিলে মানব-জীবন উদ্দেশ্যহীন হয়, উহার কোন অর্থই থাকে না। প্রাচ্যের অভিজাতগণ যখন দেশ ও দশের উন্নতির জন্য তাহাদের তাবৎ শরীর ও মন বিশেষ ভাবে নিয়োজিত করিয়াছিল, তখন তাহাদের শিরায় শিরায় রোমান্স ও আড্‌ভেন্‌চ্যরের ঢেউ বহিয়া যাইত। তখনি আমরা দেখিতে পাই পিতৃ-সত্য পালনের জন্য রাজপুত্র বনবাস স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া লইতেছে, সৌন্দর্য্যের উপাসক হিসাবে রাজসরাজ তাবৎ সুন্দর জিনিষ দিয়া তাঁহার রাজ্য অলঙ্কৃত করিতেছেন যুদ্ধবিদ্রোহের ভয় কিছুমাত্র বিচলিত করিতে পারে নাই যে সমস্ত রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইত তাহার মূলে ঐ আড্‌ভেন্‌চ্যর ও রোমান্সের প্রেরণা ছিল।

ঐতিহাসিক যুগেও অশোক রোমান্স ও আড্‌ভেন্‌চ্যরের বশীভূত হইয়াই বৌদ্ধধর্ম্মের মূলতত্ত্ব প্রচার করিবার জন্য পৃথিবীর নানা স্থানে প্রচারক প্রেরণ করেন। ক্রমশঃ এই রোমান্স আড্‌ভেন্‌চ্যরের প্রাচ্যদেশসমূহ হইতে অদৃশ্য হইয়া যায়। রাষ্ট্রে অভিজাতগণের প্রাধান্য যেমন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সর্ব্ববাদি সম্মত ভাবে স্বীকৃত হইতে লাগিল সেই পরিমাণে প্রাচ্যজাতিবৃন্দ পুরাতনের ভক্ত ও নূতনের শত্রু হইয়া দাঁড়াইতে লাগিল।

প্রাচ্যের সভ্যতার আলোক পাশ্চাত্যে মাত্র কয়েক শতাব্দী হইল প্রবেশ করিয়াছে। সেখানে সবই নূতন। রাষ্ট্র গঠন ও পরিচালন যেমন অভিনব কৌশল বলিয়া স্বীকৃত হইল, ঐ রাষ্ট্রের প্রসারণও তেমনি এক নূতন সত্য বলিয়া গৃহীত হয়। প্রাচ্য সভ্য হইয়া রাষ্ট্র-গঠন করে সত্য কিন্তু প্রসারণ তাহার ইতিহাসে নাই। পাশ্চাত্যের ইতিহাসে এই সত্যটী মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া দেখা দিতে বাধ্য হয়, কেননা তাহারা যখন সভ্য হয় তখন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ অংশগুলি প্রাচ্যজাতির হস্তগত। প্রাচ্যের ন্যায় পাশ্চাত্যেও অভিজাত শ্রেণী ও একদল শাসক সম্প্রদায় সৃষ্ট হয়। কিন্তু তাহারা প্রাচ্যের আদর্শে ভোগকেই মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া ধরিয়া লইলেও ঐ মুখ্য বস্তু পাইবার জন্য প্রাচ্যের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বীতায় বদ্ধ-পরিকর হয়। গ্রীসের অভিযান ও পারস্য-বিজয়, রোমের দিকবিজয় পৃথিবীর ইতিহাসে নূতন তত্ত্ব। প্রাচ্যের জাতিবৃন্দ সমসাময়িক জাতিবৃন্দের সহিত মিলিবার চেষ্টা করিয়াছে অনেকটা কালচারের মধ্য দিয়া। বাবীলন ভারতকে শিক্ষা দিয়াছে জ্যোতিষ, ভারত তাহার পরিবর্ত্তে বাবীলনকে ধর্ম্মের সত্য তত্ত্বগুলি শিক্ষা দিয়াছে। প্রাচীন কালে সভ্য চীন, সভ্য ভারতে আসিয়া ভাবের আদান-প্রদান করিয়াছে, অস্ত্রের মুখে তাহাদের পরিচয় হয় নাই। গ্রীসের দিকবিজয় পৃথিবীর ইতিহাসে অভিজাতগণকে

এক নূতন সত্য দেখাইয়া দেয়। দেশের ভোগ্যবস্তু যতই থাকুক তাহার পরিমাণ সংখ্যায় গণনা করা যাইতে পারে, কিন্তু দিকবিজয় করিয়া নানা জাতিকে পদদলিত করিতে পারিলে উহার সংখ্যা যে অসীম হইয়া দাঁড়ায় তাহা তাহারা বেশই দেখিতে পাইল।

পাশ্চাত্যের দিকবিজয়ের পূর্ব্বে প্রাচ্যও দিকবিজয়ে বাহির হইত। রঘু দিকবিজয় উপলক্ষ্যে মধ্য এসিয়ার অনেক রাজত্বেই গিয়াছিলেন, পাণ্ডবগণও রাজসূয় যজ্ঞ উপলক্ষে অনেক নৃপতিকেই যুদ্ধে আহ্বান করিয়াছিলেন, পারস্য গ্রীসকে আক্রমণ করিয়াছিল, মিশর ও এসিয়া মাইনরে আধিপত্য করিবার চেষ্টা করিত। সেগুলির মূল উদ্দেশ্য ছিল কিন্তু হয় পরস্পর পরস্পরের সহিত পরিচিত হওয়া না হয়ত সার্ব্বভৌম উপাধিমাত্র লাভ করা। কলোনী হিসাবে রাজ্যশাসন করিবার উদ্দেশ্য কোন প্রাচ্য-বীরেরই ছিল না। গ্রীসের রাজ্যপ্রসারণ ইচ্ছাই কলোনী স্থাপন করিবার জন্য তাহাকে বাধ্য করে। রোমের পররাজ্যহরণ স্পৃহাই তাহাকে কেল্লার ন্যায় তাবৎ সাম্রাজ্যে কলোনী স্থাপন করায়। পাশ্চাত্যের জ্ঞান বৃদ্ধির সহিত যখন দেখিল যে সে ক্ষুদ্র, সঙ্ঘবদ্ধ না হইতে পারিলে, একত্রিত হইয়া একযোগে কার্য্য করিতে না পারিলে পৃথিবী চিরকালই তাহার নিকট অনুর্ব্বর রহিয়া যাইবে, তখন হইতে তাহারা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া একযোগে কাজ করিতে লাগিল। তাহার পর তাহাদের অভিযান সুরু হয়। রোমান্স ও আড্‌ভেন্‌চ্যর তাহাদের শরীরের প্রত্যেক অণু ও পরমাণুকে ওতপ্রোতভাবে সজীব করিয়া তুলিতে লাগিল। সামান্য পালের জাহাজ লইয়া কলম্বস আমেরিকা আবিস্কার করিল। প্রাচ্যের বারুদ ও কামান পাশ্চাত্যের হস্তে ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিল। জীবন-মৃত্যু তাহাদের নিকট পায়ের ভৃত্য হইয়া দাঁড়াইল।

প্রাচ্য বিশাল। তাহার জনমণ্ডলী তাহারই অভিজাত কর্ত্তৃক পশুবৎ বিবেচিত হইয়া আসিতেছিল। শতাব্দির পর শতাব্দি গত হইল কেহ যখন অভিজাত-গণকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সমরে আহ্বান করিল না, তখন তাহারা স্বার্থান্বেষী হীনমনা আয়াসপ্রিয় শ্রেণীতে পরিণত হইল। এই সময়ে সঙ্ঘবদ্ধ পাশ্চাত্য তাহার শিক্ষিত জনতাকে চালিত করিয়া প্রাচ্যের উপর অভিযান করিয়া প্রাচ্যকে শৃঙ্খলিত করিল। যখন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সংঘর্ষ উপস্থিত হয় তখন প্রাচ্যের জ্ঞানোদয় হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু বহু শতাব্দির সুখৈশ্বর্য্য তাহাদের সমস্ত শিরা-প্রশিরাকে দুর্ব্বল করিয়া রাখিয়াছিল, তাহারা পাশ্চাত্যের বীর্য্যকে নূতন চক্ষে না দেখিয়া তাহাদের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ধরণীকে ভোগ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর না হইয়াই আপনাদের অতীত গৌরবে আত্মবিহ্বল হইয়া রহিল এবং পাশ্চাত্যকে বর্ব্বর উপাধি দিয়া তাহাদের হস্ত হইতে আপনাদের সমাজকে রক্ষা করিবার জন্য নিত্য নব ন্যায়ের বিধান রচনা করিতে লাগিল।

এমনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের পার্থক্য একই যষ্টির দুই প্রান্তের দুইটী বিন্দুর ন্যায় হইয়া দাঁড়াইল। প্রাচ্য সমাতনী হইয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিল। পাশ্চাত্য বিদ্রোহী হইয়া আত্ম-শাসন বাড়াইয়া চলিল। প্রাচ্য পুরাতনের পূজা সুরু করিয়া দিয়া তাহার দূরদৃষ্টি কমাইয়া দিল, বিজয়ী পাশ্চাত্য নিত্য নূতনকে বরণ করিয়া প্রকৃতির রহস্য উদ্‌ঘাটন করিয়া ক্রমশঃ মহাসত্যের দিকে আগাইয়া চলিল।

পাশ্চাত্য যতই অগ্রসর হইয়া চলিল, প্রাচ্য ততই পশ্চাতে পড়িয়া থাকিতে লাগিল, ক্রমশঃ উহাদের পার্থক্য এমনই স্পষ্ট হইয়া উঠিল যে উহাদের মিলন একেবারেই অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়, তখনই কবি বলিয়াছেন, "East is East, West is West the twain shall never meet."

ইহার অর্থ প্রাচ্য সনাতনী, পাশ্চাত্য নূতনের ভক্ত। প্রাচ্যের বংশ মর্য্যাদা আছে, তাহাদের 'পেডিগ্রি' তিন হাজার হইতে চারি হাজার বৎসর ব্যাপিয়া রহিয়াছে, পাশ্চাত্য তাহার উত্তরে বলে আমাদের বংশধরগণ বহুশতাব্দি ধরিয়া ভবিষ্যতে তোমাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া যে 'পেডিগ্রি' রচনা করিবে তাহা কত উজ্জ্বল হইবে। প্রাচ্য পুরাতনের ভক্ত। পিতা তাহার স্বর্গ। পিতামহ স্বর্গ অপেক্ষাও বড়। পাশ্চাত্য হাসিয়া বলে আমার পিতা ছোট হইতে পারে তাহাতে কি হইবে, কিন্তু আমিত তোমার শাসক, আমার স্বর্গ আমার ভবিষ্যত বংশধরগণ, তাহারা সমস্ত পৃথিবী ব্যাপিয়া তাহাদের লীলাক্ষেত্র বিস্তার করিবে। প্রাচ্য চায় ধর্ম্ম বংশ-মর্য্যাদা, শৃঙ্খলিত জীবন। প্রতিদ্বন্দ্বীতা হীন, অভিনবতা হীন একঘেয়ে ব্যবস্থা। পাশ্চাত্য চায় সবল প্রাণ, দ্বিধাশূন্য আত্ম-প্রতিষ্ঠা। সকল প্রকার বিশৃঙ্খলা, সকল প্রকার অনাচার, সকল প্রকার উপদ্রব, যাহার মধ্যে নিত্য নূতনের আস্বাদ পাইতে পারে।

কিশোর প্রেম

শ্রীবুদ্ধদেব বসু

চোখের সাম্‌নে বই খুলে' রেবা চুপ করে' বসে' আছে। একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে যে সে নিজের কাছে পড়্‌বার ভাণ করছে। নিজের কাছেই —কারণ ঘরে দ্বিতীয় ব্যক্তি নেই। চোখ তার বইয়ের পাতায় থাকলেও মন বিচরণ করছে অন্যত্র। তা-ও চোখও যে মাঝে-মাঝে ঘোরাফেরি না করছে, এমন নয়। দু' মিনিট পর পরই তার চোখ বইয়ের পাতা থেকে টেবিলস্থিত টাইমপীস্‌-এর ওপরে গিয়ে পড়ছে। ঘড়ির কাঁটাকে যেন ভূতে পেয়েছে আজ—কিছুতেই নড়ছে না। নইলে সাড়ে-নটা বাজ্‌তে এতক্ষণ লাগে! ন'টা তো বেজেছে সে—ই কখন্‌—তারপর একবছর কেটে গেছে, মনে হয়। আর ও-ই বা কেমন! সাড়ে ন'টা বলেছে বলে' কি কাঁটায়-কাঁটায় সাড়ে-ন'টাই করতে হবে! দু' চার মিনিট আগে বুঝি আর করা যায় না! রেবা সাড়ে নটা সময় দিয়েছিলো—কারণ, এটাই সব চেয়ে সুবিধের। বাবা যান স্নান করতে, মা ব্যস্ত থাকেন রান্নার তাদারকে, মণ্টু আটক থাকে তার মাষ্টারের কাছে। ওপরটা একেবারে খালি থাকে—টেলিফোনে যত কথাই বলো, কেউ শুনতে আস্‌বে না। বলা যায় না, হঠাৎ মণ্টুটা যদি লাফাতে লাফাতে এসে উপস্থিত হয়। ওর আবার এক বিশ্রী অভ্যেস—সব কথাই মা-কে গিয়ে বলা চাই! মণ্টকেই রেবার সব চেয়ে বেশি ভয়। ছেলেটা এমন ইয়ে! ওকে যদি আদর করে খুব মিষ্টি সুরে বলা যায় 'লক্ষী, মণ্টু, দেখে এসো তো মা কী করছেন।' তা হলেই ও যেন একেবারে পেয়ে বসে—কিছুতেই সে-ঘর থেকে আর বেরোবে না, হাঁ করে' বসে' কথা গিল্‌বে। কী যে রাগ হয়, তা বলা যায় না।

তবু যা হোক এখন অনেকটা নিশ্চিন্ত। ভোর-বেলাই সে স্নান সেরে রেখেছে; দশটার সময় আবার তার ইস্কুলের বাস আস্‌বে; কোনরকমে খাওয়ার হ্যাঙ্গামটা চুকিয়ে দশটার আগেই সে তৈরি হ'য়ে থাক্‌তে পারবে। কিন্তু ছাই সময়ই যে কাট্‌ছে না! ওকে সওয়া নটা বল্‌লেও হ'তো! ও-ই বা কী—একটু আগেই যদি রিং করে, তা হলে যেন মহাভারত অশুদ্ধ হ'য়ে যাবে! যা-ই বলো, পাংচুয়েলিটি নিয়েও বাড়াবাড়ি করা যায়! রাগ করে সে বই পড়্‌বারই চেষ্টা করলো। এতক্ষণে তার খেয়াল হলো যে তার সামনে খোলা বইটা হচ্ছে অ্যালেজেব্রা। দূর্‌ ছাই—এখন অ্যাল্‌জেব্রা দিয়ে কী হবে? ঠাস্‌ করে বইটা বন্ধ করে সে সেটা সরিয়ে রাখ্‌লো। একটানে অন্য একটা বই আন্দাজে টেনে আন্‌লো। সেটা খুলতেই অনেক দিনের বাসি একটা গোলাপের পাপ্‌ড়ি বেরিয়ে পড়্‌লো। রেবা একবার আল্‌গোছে, আঙুল দিয়ে সেটা স্পর্শ করলো। সেদিনের কথা তার মনে পড়্‌লো, যেদিন ও এই ফুল তাকে এনে দিয়েছিলো—টকটকে লাল একটা গোলাপ। ভারি সুন্দর। দেবার সময় দু'জনের আঙুল লেগে গিয়েছিলো; ওর মুখের হাসি রেবার এখনো মনে পড়ে। ফুলটা পরের দিনই শুকিয়ে গেলো; দু'দিনেই তার পাপ্‌ড়িগুলো খসে' পড়্‌তে লাগ্‌লো, রেবা তখন সেগুলো তার বইয়ের পাতার মধ্যে গুঁজে রেখে দিলে।

শুকিয়ে-যাওয়া, কালো সেই পাপ্‌ড়ির দিকে তাকিয়ে থাক্‌তে-থাক্‌তে সে অনেকক্ষণ ঘড়ি দেখ্‌তে ভুলে গিয়েছিলো; হঠাৎ দেখ্‌লো, ন'টা পঁচিশ। যাক্‌ এতক্ষণে ঘড়িটা একটু ভদ্রলোকের মত চলেছে। বই বন্ধ করে সে চেয়ার ছেড়ে উঠে ঘরের বাইরে গেলো। টেলিফোনটা আবার সিঁড়ির ওপরকার ল্যাণ্ডিং-এ—এমন বিশ্রী কেউ ওপরে উঠে' আস্‌তে থাকলেই কথা শুনতে পায়। আর, এখান দিয়ে সব সময় লোকের আসা-যাওয়া—এমন খোলাখুলি জায়গায় কেউ টেলিফোন রাখে, রেবা কখনো দ্যাখে নি। বাবার কি যে সব খেয়াল!

রেবা টেলিফোনের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো—ওকে যেন একটুও অপেক্ষা করতে না হয়। একেবারে খামকা দাঁড়িয়ে থাকলে খারাপ দেখায়, তাই সে ডাইরেক্টরিটার পাতা ওল্টাতে লাগলো।...এতক্ষণে পাঁচ মিনিট কেটেছে নিশ্চয়ই? কী আশ্চর্য্য, টেলিফোন বাজে না কেন? কী করছে ও? ভুলে' যায় নি তো? রেবার বুকের কাছে হঠাৎ একটা খোঁচা লাগলো। ভুলে' গেছে—না, হতেই পারে না। তা হলে—? উঃ, কতক্ষণ সে অপেক্ষা করছে, আর পারা যায় না। আসুক না ও একবার—রেবাই কি এর প্রতিশোধ না নেবে! হঠাৎ বলবে, 'যাই একটু মিনুদের বাড়ী থেকে ঘুরে আসি'। একদিন, শুধু একদিন ওকে একা বসিয়ে রেখে রেবাকে যেতে হয়েছিলো মিনুদের বাড়ি; মা গেলেন কিনা, তাই তাকেও যেতেই হ'লো, না গিয়ে সে পারতোই না—গিয়ে কতক্ষণই বা ছিলো, পনেরো মিনিটও নয়—অথচ তা-ই নিয়েও এমন মুখ-ভার করে রইলো যে—যা-তা! যেন সে ইচ্ছে করে গিয়েছিলো, যেন মিনুদের বাড়ি যেতে ওর ভালো লেগেছিলো! লোকে যখন না বুঝে'-সুঝে' রাগ করে তখনি রেবার সব চেয়ে রাগ হয়! আর, এখন ও যে টেলিফোন করতে ভুলে' যাচ্ছে, সেটা বুঝি কিছু নয়! দাঁড়াও না—আবার কি আসবে না ও? তখন এমন জব্দ করবে, মিনুদের বাড়ি গিয়ে একবার যে বসবে, আর উঠবেই না।

—ক্রিং ক্রিং।

টেলিফোনটা তুলতে গিয়ে রেবার হাত কেঁপে গেলো, বুক ঢিপ্ ঢিপ্ করতে লাগলো। প্রথম কথা সে বললে, 'এত দেরি করলে যে?'

'কই, না।'

'না? উঃ, কতক্ষণ ধরে'—

'কী?'

'কিছু নয়।'

'বলো না।'

"আমি ভাবছিলাম, তুমি বুঝি ভুলে' গিয়েছো।"

'পাগল!'

'কোত্থেকে কথা বলছো?'

'এক বন্ধুর বাড়ি থেকে।'

'কোথায়?'

'হস্টেলের কাছেই।'

হঠাৎ দু' জনেই চুপ। এত কথা বলবার আছে যে কোন কথাই বলা হয়ে ওঠে না। তারপর রেবা জিজ্ঞেস করলে:

'কাল কখন বাড়ি ফিরলে?'

'ও—প্রায় দশটা।'

'তোমাদের হস্টেলের গেইট্ বন্ধ হয়ে যায় না।'

'ওতে কিছু আটকায় না।'

'খাবার তো ঠাণ্ডা হয়ে যায়?'

'গেলোই বা।'

'কী অন্যায়! রোজ তুমি ঠাণ্ডা ভাত খাবে বুঝি?'

'রোজ বুঝি? কতদিন তো তোমাদের ওখান থেকে খেয়েই আসি।'

'ইস, সেদিন মজাই হ'লো। একসঙ্গে বসলে গল্পই হয়, খাওয়া আর হয় না।'

'আমি চলে' আসবার পর তুমি আবার খেয়েছিলে বুঝি?'

'যাঃ কী যে বলো!'

'তোমাকে দেখলে আমার খিদে-টিদে সব চলে যায়।'

'আমারো তা-ই। কী-রকম যে হয়—কিচ্ছু খাওয়া যায় না।'

'কী রকম হয়?'

'তুমি তা জানো না?'

'অদ্ভুত!'

'কী অদ্ভুত?'

'সবি।—অদ্ভুত নয়?'

রেবা চুপ।

'শোনো।'

'বলো।'

'কাল রাত্তিরে এক স্বপ্ন দেখেছি—ভারি মজার।'

'কী বলো তো?'

'তাতে তুমি ছিলে।'

'যাঃ!'

'যাঃ বল্‌লে কেন?'

'এম্‌নি।—কী দেখ্‌লে?'

'তুমি আর আমি বাস্‌-এ করে শ্যামবাজার থেকে কালিঘাট যাচ্ছি—'

'ও, এ—ই!'

'শোনই না। বাস ভর্ত্তি লোক; আর, সবাই চীৎকার করে' কথা কইছে।—বিশ্রী লাগ্‌ছে আমাদের।'

'সবাই চীৎকার করে' কথা কইছে কেন?'

'বা, এ না হলে আর স্বপ্ন কী?' ওপার থেকে একটু হাসির শব্দ শোনা গেলো; রেবাও হেসে উঠলো বল্‌লে, 'যাক—তার পর?'

'ডিপোর কাছাকাছি এসে বাস্‌ একেবারে খালি হয়ে গেলো, তুমি আর আমি ছাড়া কেউ নেই। কিন্তু ডিপোয় এসে বাস্‌ থাম্‌লো না—ভীষণ জোরে ছুটতে আরম্ভ করলো। নতুন সব রাস্তা; নতুন এক দেশ, মনে হ'লো। দু'দিকে মাঠের পর মাঠ; মাঝখান দিয়ে রাস্তা গেছে—আর সেই রাস্তায় আমাদের বাস্‌ ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে চলেছে।'

'তারপর অ্যাক্‌সিডেন্ট্‌ হ'লো?

'না—অ্যাক্‌সিডেন্ট্‌ হ'লো না। যদিও বাস্‌-এর ড্রাইভার কি কণ্ডক্টর কেউ নেই।'

'নেই? তবে?'

'তবে আবার কী? গাড়ী নিজ থেকেই চলেছে। মাঝে-মাঝে রাস্তার পাশে দাঁড়ানো সব লোক হাত তুলছে, কিন্তু বাস্‌ কারো জন্যেই থাম্‌ছে না। আমি ভাব্‌লাম—বাঃ, এতো বেশ মজা! তুমি জিজ্ঞেস করলে, "আমরা কখন ফির্‌বো?" আমি বল্‌লাম, "ফের্‌বার জন্য তাড়া কী?" তুমি বল্‌লে, "মা যে ভাব্‌বেন।"'

'তারপর?'

'তারপর ঘুম ভেঙে গেলো। জেগে মনে হ'লো একটা পদ্য লিখি—কথা ছিলো এক বাসেতে কেবল তুমি আমি—'

রেবা হেসে উঠলো।

'—কিন্তু মন এত খারাপ লাগ্‌লো যে ঘুম ভেঙে যাবার পরও অনেকক্ষণ শুয়ে রইলাম।'

'মন খারাপ লাগ্‌লো? কেন?'

'স্বপ্ন ভেঙে গেলো বলে।'

রেবা লাল হ'য়ে উঠ্‌লো; কোনো কথা বল্‌তে পার্‌লে না। একটু পরে মৃদু আদরের মত একটা কথা তার কানে এসে বাজ্‌লো, 'ডার্লিঙ্‌।'

রেবার কান ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগ্‌লো। এমন অসম্ভব দুঃসাহস ও আর কখনো করে নি। আরো শোন্‌বার জন্য সে চুপ করে' রইলো।

'এই—চুপ করে আছো কেন?'

'তুমিই বলো।'

'আমি তো বল্‌লাম। এবার তোমার পালা।'

'কী বল্‌বো?'

'বলো, ডার্লিঙ্‌। একবার বলো না।'

রেবা চুপ।

'ওখানে অন্য-কেউ আছে নাকি?'

'আছে।'

'যাঃ—বাজে কথা।'

'মোটেও নয়।' রেবার্‌ ভারি মজা লাগ্‌ছিলো।

'আচ্ছা, তা হলে মনে মনে একবার বলো।'

'মনে-মনে তো—'

'কী?'

'বুঝ্‌তে পারো না?'

দু'দিকেই নীরবতা। তারপর রেবা একবার চারদিকে তাকিয়ে অত্যন্ত মৃদুস্বরে ডাক্‌লে 'ডার্লিঙ্‌।'

আবার চুপচাপ। টেলিফোনের চেয়ে সূক্ষ্ম কোনো যন্ত্র হলে দু'জনে দু'জনের হৃদয়ের শব্দ শুনতে পেতো।

'তা হ'লে এখন—'

'একটু।' রেবা বাধা দিলে, 'আবার কবে আস্‌বে?'

'যেদিন বল্‌বে।'

'আমি কী বল্‌বো? যেদিন তোমার সুবিধে হয়।'

'আমার সুবিধে রোজই।'

'আজকে আস্‌বে?'

'আজই?'

'তাতে কী?'

"আচ্ছা, যাবো।—তোমার ইস্কুলের সময় হ'লো না?"

'হাঁ, হ'য়ে এলো।'

'তা হ'লে এখন ছেড়ে দিই?'

'আচ্ছা—এসো কিন্তু।'

'নিশ্চয়ই।'

রেবা, তিন লাফে সিঁড়ি ডিঙিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে নীচে গিয়ে বল্লে, 'বেলা হয়ে গেলো, মা; শীগ্‌গির খেতে দাও।'

কলেজ থেকে ফিরে নীরেন দেখ্‌লো তার জন্যে ডাকে এক সংখ্যা 'পতাকা' এসেছে। অমনি তার বুকের ভেতরটা ঢিপ্‌ ক'রে উঠলো। এবার—এবার তা হ'লে ওরা তার কবিতা ছেপেছে। তাড়াতাড়িতে মোড়ক খুল্‌তে গিয়ে সে মলাটের খানিকটা ছিঁড়ে ফেল্‌লো। সূচীর ওপর চোখ বুলোতেই অত নামের মধ্যে তার নামটা স্পষ্ট হয়ে, উজ্জ্বল হয়ে ফুটে' উঠ্‌লো। ছাপার অক্ষরে তার নাম যে অত সুন্দর দেখায়, তা তার ধারণা ছিলো না।

পাতা উল্‌টিয়ে সে তার কবিতা বার করলো। একটা ধারাবাহিক উপন্যাস শেষ হবার পর কয়েক ইঞ্চি জায়গা ছিলো; সেখানটায় দুকলমে বিভক্ত হয়ে বর্জ্জাইস্ অক্ষরে তার কবিতা শোভা পাচ্ছে। মুগ্ধ চোখে সে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলো। এ কবিতা তার, তার লেখা আজ মাসিকপত্রে ছাপা হয়েছে। একজন লোক তার হাতের লেখা দেখে-দেখে কম্পোজ করেছে, আর একজন সেই লেখার সঙ্গে মিলিয়ে প্রুফ দেখেছে। এ কাগজের গ্রাহক সংখ্যা অন্ততঃ দু'হাজার; তার কবিতা অন্ততঃ দশ হাজার লোকের চোখে পড়্‌বে; কমপক্ষে হাজার খানেক লোক—আশা করা যায় তার কবিতা পড়্‌বে। বাঙলাদেশে বেশির ভাগ লোকই কবিতা পড়ে না। তবু—এক হাজার পাঠক! ভাবা যায় না! নিজের ঘরের সঙ্কীর্ণ সীমা অতিক্রম ক'রে' হঠাৎ এ কোন বিশাল রাজ্যে সে প্রোমোশোন পেলো! কবিতা সে লিখছে অনেক দিন, কিন্তু অতি গোপনে; কাউকে তার রচনা-প্রয়াস দেখায় নি—তার অতি অন্তরঙ্গ বন্ধু রণজিৎ—যার বাড়ী থেকে আজ সকালে সে টেলিফোন করেছিলো—তাকে নয়; এমন কি রেবা, রেবাকেও নয়। রেবার কাছে সে মাঝে মাঝে পরিহাস-ছলে পদ্য লেখার কথা বলেছে বটে, কিন্তু সে যে সত্যি-সত্যি কিছু লেখে এমন কোন আভাষ তাকে দেয় নি। তার ইচ্ছে ছিলো, যখন ছাপা হবে, তখনি রেবাকে দেখাবে। বহুদিন ধরে সে তার কবিতা ছাপাবার চেষ্টা করছে—ব্যর্থ চেষ্টা করছে। শেষটায় হঠাৎ আজ এই সৌভাগ্য!

বিছানার উপর বসে' পড়ে' নীরেন তার কবিতাটা পড়্‌বার চেষ্টা করলে। প্রথমবার সে কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌লে না। তার রচিত শব্দ-সমাবেশ সে সুসজ্জিত ছাপার অক্ষরে দেখ্‌ছে, এই চেতনাই তার মস্তিষ্ককে আচ্ছন্ন করে' রাখ্‌লো। দ্বিতীয় চেষ্টায় সে কবিতাটি পড়্‌তে পার্‌লো। তারপর আর-একবার পড়্‌লো। বাঃ, মন্দ হয়নি তো কবিতাটা—বেশ হয়েছে। বেশ ভালোই হয়েছে। একবার সে জোরে-জোরে পড়ে' দেখ্‌লো আরো ভাল লাগ্‌লো। ছাপার অক্ষরে একটা জিনিষ যেন অনেক বেশি ভালো লাগে! কবিতাটি প্রথম যখন লেখে, ঠিক বুঝতে পারে নি, কেমন হয়েছে। মাস তিনেক আগে রেবা একদিন একটা নীল শাড়ী পরেছিলো—তা-ই নিয়ে মুগ্ধহৃদয় নীরেন এক কবিতা লিখে' ফেলে। কবিতার নামই 'নীল শাড়ি' এবং আরম্ভটা এই রকম:

> তার' নীল শাড়ি আঁধারের মত
> জড়ায় তা'রে,
> এলো কালো চুল ঝরিছে ঝিকিড়
> মেঘের ভারে;
> তারার মতন ফোটে তা'র মুখ
> অন্ধকারে।

তা'র এই স্তুতি—হঠাৎ নীরেনের মনে হ'লো—রেবা কি বুঝ্‌তে পার্‌বে না? এর চেয়ে স্পষ্ট করে' কী করে' বলা যায়? কবে সে নীল শাড়ি পরেছিলো, রেবার কি মনে আছে? না থাক্‌লেও, এ কবিতা পড়ে' মনে না হয়েই পারে না। নিশ্চয়ই সে সবি বুঝ্‌বে। হয়-তো পড়্‌তে-পড়্‌তে লজ্জায় লাল হ'য়ে উঠ্‌বে—নীরেন তখন কোন্ দিকে তাকাবে, ভেবে পাবে না। হয়তো একটু মৃদু ভৎর্সনার সুরে

বল্‌বে, 'যাও—কী সব যা-তা লিখেছো।' না-হয় রক্তিম মুখে গভীর চোখ তুলে' একবার তাকাবে—উঃ, এক-এক সময় ও যে কী রকম করে' তাকায়, সহ্য করা যায় না। রেবা, রেবা—নিঃশব্দে নিজের মনে মনে নীরেন ডাক্‌লো—ডার্লিং। রেবাও আজ ও-কথাটা উচ্চারণ করেছে—টেলিফোনে-শোনা সেই মৃদুস্বর নীরেন আবার শুন্‌তে পেলো—ডার্লিং! হঠাৎ তার সমস্ত গা কাঁটা দিয়ে উঠ্‌লো।

সন্ধ্যের সময় নীরেন চক্রবেড়ের মোড়ে বাস্‌ থেকে নাব্‌লো। রেবাদের বাড়ীর যতই কাছে আস্‌ছে, ততই তা'র বুক দুড়্‌দুড়্‌ কর্‌ছে; যতই সে চেষ্টা করুক্‌ কিছুতেই শান্ত হয় না, যতই অন্য কথা ভাববার চেষ্টা করুক্‌, রেবার কাছে তার মন ফিরে আসে: আজ্‌কের মত নীরেনের পৃথিবীতে রেবা ছাড়া আর কিছু নেই।

রাস্তা থেকে সে দেখ্‌লো, বাড়ীটা চুপচাপ, অন্ধকার। আজ এই অতি-পরিচিত বাড়ী তা'র কাছে কেমন-যেন রহস্যময় লাগ্‌লো। ভেতরে ঢোক্‌বার আগে সে একটু অপেক্ষা করলো; কোনো সাড়া-শব্দ পাওয়া যায় কিনা। সব চুপ। আশ্চর্য, এ সময়ে তো বাড়ীটা এত শান্ত থাকে না। তবে কি বাড়ীতে কেউ নেই? না, তা কি করে' হয়? রেবা যে বল্‌লে 'এসো কিন্তু।'…সে ভেতরে ঢুকে পড়্‌লো। নীচের ঘরগুলো সব অন্ধকার। তার কেমন ভয়-ভয় কর্‌তে লাগ্‌লো; নিঃশ্বাস জোরে-জোরে পড়ছে; একবার সে ঢোঁক গিল্‌লো। হঠাৎ তার মনে হ'লো সে যেন এক অপরাধ কর্‌তে যাচ্ছে। সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে সে খানিকক্ষণ ইতস্ততঃ কর্‌লো; জুতোর শব্দ কর্‌লো যদি কোনোখান থেকে কেউ বেরিয়ে আসে। কেউ এলো না। সাধারণতঃ, রেবার মা-র সঙ্গে তাঁর প্রথম দেখা হয়; তাঁর সঙ্গে কথা বলে, মণ্টুর সঙ্গে গল্প করে—তারি মধ্যে রেবা এসে উপস্থিত হয়—হঠাৎ যেন নিজেরি অজান্তে সে ওপরে উঠে আসে, একটু পরে, যেন নিজেরি অজান্তে, আসে রেবা। কত অসুবিধে, কিছুতেই দু'জনে একা হওয়া যায় না; কত কথা বলা হয় না, কত কথা শুধু চোখ দিয়ে বল্‌তে হয়, কতদিন রেবার মা সারাক্ষণ ওদের সঙ্গে বসে থাকেন, তাঁর অবিবাহিত জীবনের গল্প কতবার যে শুন্‌তে হয়! তবু—তা-ই ভালো। নীরেন এমন ভাব কর্‌বার চেষ্টা করে যে রেবার প্রতি তার বিশেষ কোনো আকর্ষণ নেই, এবং তা প্রমাণ কর্‌বার জন্য—একবার যখন রেবা ওর মামাবাড়ী সাতদিনের জন্য বেড়াতে গিয়েছিলো, নীরেন সেই সপ্তাহে তিনবার এসে ওর মা-র সঙ্গে দীর্ঘ গল্প করে' গেছে। সেটা খুব সুখের হয়-তো হয়নি, কিন্তু তবু—এ-ই ওর ভালো। আজ কাউকে দেখ্‌তে না পেয়ে সে ভড়কে গেলো, কি কর্‌বে, বুঝ্‌তে পার্‌লো না। ফিরে চলে যাবে?…না—তা কি হয়? রেবা হয়-তো ওপরে আছে; আর তার হাতে সেই মাসিকপত্র, যেখানে তা'র নীল শাড়ির কবিতা বেরিয়েছে। বোকার মত এখানে দাঁড়িয়ে থেকে লাভ কি? ওপরে গেলেই তো হয়। তবু দ্বিধা সে মন থেকে একেবারে তাড়াতে পার্‌লে না; নিঃশব্দে, চোরের মত পা টিপে'-টিপে' ওপরে উঠে এলো।

কোণের ঘরটায় আলো জ্বল্‌ছে; আর, এক্‌রাশ বই-খাতা-ছাড়ানো টেবিলে বসে আছে রেবা।

নীরেন ঢুকেই বললে, 'বাঃ, বাড়িতে আর কেউ নেই?'

রেবা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। বল্‌লে, 'মা মণ্টুকে নিয়ে একটু মিনুদের বাড়ী গেছেন।'

'তুমি গেলে না যে?'

'ইচ্ছে কর্‌লো না।'

'নীচে কাউকে না দেখে ভাবলাম, বাড়ীতে বুঝি কেউ নেই।'

'সত্যি ও-কথা ভেবেছিলে?' বলে' রেবা এমন ভাবে তাকালো, যা সহ্য করা যায় না। নীরেন চোখ নাবিয়ে নিলে।

দু'জনে এমন একা হ'বার সুযোগ ওদের আর হয়নি; পরস্পরের এমন বাধাহীন সান্নিধ্য ওরা আর পায় নি; দু'জনেই একটু অস্বস্তি বোধ করতে লাগলো।

রেবা বল্‌লে, 'বোসো না।'

নীরেন বল্‌লে, 'তুমি বোসো।'

ফলে দু'জনেই দাঁড়িয়ে রইলো।

একটু পরে রেবা জিজ্ঞেস করলে, 'তোমার হাতে ওটা কি?

'একটা মাসিক পত্রিকা।'

'দেখি।'

নীরেন নীরবে সেটা রেবার হাতে দিলে। যে কথাটা বল্‌বে বলে সে বিকেল থেকে তৈরী হ'য়ে আসছে তা কিছুতেই বল্‌তে পার্‌লো না। কিন্তু বলে না দিলে, অতবড় কাগজের ভেতর থেকে পাদপূরণে ছোট অক্ষরের সেই কবিতা কি রেবার চোখে পড়বে? রেবা আন্দাজে পাতা উল্টিয়ে যাচ্ছে—একটু পরে হয় তো রেখেই দেবে। না এ-ই সময়। ঝাঁ করে এক্ষুনি বলে ফেল্‌তে হবে। মনে-মনে সে অনেকবার বল্‌লে, 'ওতে আমার একটা কবিতা বেরিয়েছে।' রেবা কাগজটা বন্ধ কর্‌বার উপক্রম কর্‌ছে। হঠাৎ নীরেন তার নিজের কণ্ঠস্বর শুন্‌তে পেলো 'ওতে আমার একটা কবিতা বেরিয়েছে।'

রেবা অন্যমনস্ক ছিলো; বল্‌লে 'উঁ?'

নীরেনের প্রায় ঘাম বেরিয়ে গেলো। যাক্, এখন আর পেছন হট্‌বার উপায় নেই। 'ওতে আমার একটা কবিতা বেরিয়েছে।' সে পুনরাবৃত্তি করলে।

'তোমার?'

নীরেন মাথা নাড়্‌লে।

'তুমি সত্যি কবিতা লেখো তাহ'লে? এতদিন বলো নি কেন? কী অন্যায় তোমার।'

লজ্জায়, আনন্দে, গৌরবে অভিভূত হ'য়ে নীরেন রুমাল দিয়ে কপাল মুছলো।

'কই, দেখি?' রেবা হুড়মুড় ক'রে পাতা উল্টাতে লাগলো।

'দাও, আমি বার করে দিচ্ছি।'

পৃষ্ঠাটা বার করে দিয়ে নীরেন নিঃশব্দে রেবার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। কবিতাটি পড়তে যেটুকু সময় লাগা উচিত, তার অনেক, অনেক বেশি সময় রেবা সেই পৃষ্ঠার দিকে তাকিয়ে রইলো, একবারও চোখ তুল্‌লো না! তার মুখের দিকে তাকিয়ে নীরেন কিছুই বুঝতে পার্‌লো না। সে-মুখে পরিচয়ের আলো নেই, লজ্জায় তা লাল হয়ে ওঠে নি, আনন্দের দীপ্তিতে স্বচ্ছ হয়ে গিয়ে তা সমস্ত মনকে প্রকাশ কর্‌ছে না। যেমন ছিলো, তেম্‌নি আছে। নীরেনের মন জমে' হিম হয়ে যেতে লাগলো? এ-ও কি সম্ভব, ও বুঝতে পারে নি? এ-ও কি সম্ভব, কবিতার নীল শাড়ী ওকে কিছুই মনে করিয়ে দিচ্ছে না? ও একটু রাগও তো কর্‌তে পারতো, এ-কথাও তো বলতে পারতো, 'যাওঃ—এ-সব কী লিখেছো, আমার ভালো লাগে না।'

কোনো কথা না বলে' রেবা আস্তে-আস্তে কাগজখানা টেবিলের ওপর রেখে দিলে। নীরেন এক ভয়ানক হতাশার সঙ্গে যুদ্ধ করতে-করতে একবার শেষ চেষ্টা করলে। অতি ক্ষীণস্বরে জিজ্ঞেস করলে: 'কেমন লাগলো?'

উত্তরে রেবা অজস্র কথার কলরোলে উচ্ছ্বসিত, প্রথম যৌবনের প্রথম প্রেমে দুঃসহ-সুন্দর চোখ তুলে' একবার নীরেনের দিকে তাকালো; তারপর হঠাৎ নীরেনের এক হাত নিজের হাতে তুলে' নিয়ে মুহূর্ত্তের জন্য তা'র বুকের ওপর রাখ্‌লো। মুহূর্ত্তের জন্য নীরেন এক অজানিত, অকল্পিত, উষ্ণ কোমলতা অনুভব করলে, মুহূর্ত্তের জন্য তা'র সমস্ত শরীর দিয়ে লক্ষ বিদ্যুৎ খেলে' গেলো: তা'র মাথা ঝিম্‌ঝিম্ করছে, তা'র চোখের সাম্‌নে আবছায়া, তা'র সমস্ত চেতনা নেশায় আচ্ছন্ন, অবসন্ন; মনে হলো, সে এখনি মরে যাবে। সে আর কোনো কথা বললে না; নিজে বুঝতে পারলে না, কখন্ রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছে। হাঁট্‌তে হাঁট্‌তে মৃদুস্বরে সে বল্‌তে লাগলো, 'রেবা, রেবা, রেবা।' সমস্ত আকাশ, সমস্ত পৃথিবী যেন স্তব্ধ হ'য়ে তা'র হৃৎস্পন্দনের এই একাক্ষরা সঙ্গীত শুনছে; 'রেবা, রেবা, রেবা।' তা'র এত আনন্দ—এত আনন্দ নিয়ে সে কী করবে? সহস্র চাকায় কাজের বিশাল যন্ত্র ছুটে' চলেছে; আলোয় ভরা, কলরোলে ভরা শহরের পথ, মানুষ পয়সা করছে, পয়সা ওড়াচ্ছে, পরস্পরের শত্রুতা করছে, যশ কুড়োচ্ছে—খরস্রোতে ফেনার মত সব মানুষ এক অলক্ষ্য শক্তির টানে অন্ধভাবে ছুটে বেড়াচ্ছে—এর মধ্যে কোথায় তার স্থান, কোথায় সে তার এই মুহূর্ত্তকে রাখবে? দস্যু সময়কে ফাঁকি দিয়ে কোন্ অজ্ঞাত গভীরতায় এই মুহূর্ত্তের আনন্দকে সে লুকিয়ে রাখবে? সে আর সহ্য করতে পারছে না; সে পাগল হয়ে যাবে। তা'র দু' চোখ দিয়ে হঠাৎ ঝরঝর করে' জল পড়তে লাগলো।
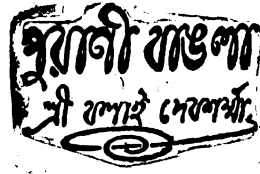
অর্থনীতি ও সামাজিকতা

ইতিহাস-বিজ্ঞান বলিয়া সম্প্রতি যে একটা নূতন বিজ্ঞান য়ুরোপীয় জাতি কর্ত্তৃক উদ্ভাবিত হইয়াছে, বাংলার পুরাণী কথা কহিতে সে বিজ্ঞানের সহায়তা লইবার আবশ্যকতা নাই। কারণ ইহাতে ঘটাঘটি বলিয়া কিছু নাই। পুরাণী বাঙলার কাহিনী ছোটখাট এবং নিতান্তই সেকেলে জীবন-কাহিনী। পূর্ব্বে যে কয়েকটি প্রত্যক্ষ ঘটনা উল্লেখ করিয়াছি, সেইরূপ ঘটনা ও কাহিনী এই পুরাণী কথার অধিকাংশই ব্যাপিয়া রহিয়াছে।

পঁচিশ ত্রিশ বছর পূর্ব্বেও দেখিয়াছি যে, বাঙলার ক্ষেত-খামারই ছিল বাঙ্গালী সাধারণের বিত্ত-সম্পত্তি। চাষই ছিল অর্থোর্জ্জনের প্রধান অবলম্বন। কিন্তু এই প্রধান অর্থনৈতিক ব্যাপারটা কিরূপ প্রণালীতে পরিচালিত হইত তাহার কিছু পরিচয় দিতে চাই। এবং তাহা আজিকার ধনসাম্যবাদের দিনে সমগ্র বিশ্ব মানবতার নিকট হয়ত বা একটা আশার আলোক রেখা ফেলিতে পারে।

ক্ষেত্র মধ্যবিত্ত ও অভিজাত-সম্প্রদায়ের হাতেই চিরকাল ছিল। কিন্তু তাঁহারা মার্কিনী রীতিতে সমগ্র জমি নিজে কর্ষণ করিয়া বিপুল বিত্তশালী হইবার চেষ্টা করিতেন না। প্রায় অধিকাংশ জমি-জায়গা ভাগে দেওয়া হইত। যাহাকে বলে ভাগ-জোত। অন্ততঃ পশ্চিম বাঙলায় এই প্রথাই প্রচলিত ছিল, এখনো আছে। যিনি বা যাঁহারা নিজে চাষ-আবাদ করিতেন, তাঁহাদেরও যদি কাহারো পঞ্চাশ বিঘা জমি থাকিত, তবে পঁচিশ বিঘা ভাগে দিতেন, পঁচিশ বিঘা নিজে করিতেন।

এই ব্যবস্থার মূলে দুইটি অনুপ্রেরণা ছিল। এক—সংস্কারগত স্বাভাবিক মৈত্রী। দ্বিতীয়—আভিজাত্যের শ্লাঘা। দশজনকে প্রতিপালন করা, ইহা পুরাণী-বাংলার আভিজাত্যের একটা বিশিষ্টতা। যাহার গৃহে দশখানা পাতা পড়ে না, দশজন আত্মীয়-কুটুম্ব লইয়া যে ঘর-করণা করে না, সে যেন গৃহস্থ নামের যোগ্যই নহে। এই আভিজাত্য বুদ্ধি বাঙ্গালীর প্রত্যেক অর্থনৈতিক অনুষ্ঠানকে নিয়ন্ত্রিত করিত।

পূর্ব্বে বলিয়াছি গ্রামে নূতন অধিবাসীকে প্রতিষ্ঠিত করা'নর চেষ্টা, একটা বিশেষ চেষ্টা ছিল। ব্রাহ্মণ সজ্জনকে ভূমি দান, গৃহ দান, ইহাও হিন্দু বাঙালীর স্বাভাবিকী; ইহা ব্যতীত দুলে, বাগ্দি, হাড়ি, ডোম প্রভৃতি নিম্ন জাতি এবং নবশাখ প্রভৃতি উচ্চ সম্প্রদায়কেও ভূমিদান ও গৃহদান করিয়া গ্রামে বাস করান হইত। বাংলায় উচ্চ ও অভিজাত-সম্প্রদায়ই ধনী সম্প্রদায়, কিন্তু মজার কথা এই যে ভূসম্পত্তি—চাষের জমি অধিকাংশই প্রায় ঐ নিম্ন শ্রেণীর হাতে। প্রকৃত কৃষক নিম্নজাতিগণ।

সত্তর আশী বা একশত বৎসরের কথা গ্রাম্য বৃদ্ধ কিম্বা বর্ষীয়ান আত্মীয়গণের নিকট শুনিয়াছি যে ভূস্বামী স্বয়ং আসিয়া গৃহের চালে জমির পাট্টা গুঁজিয়া দিয়া যাইতেন। কবলুতি পাইলেন কি না পাইলেন তাহার কোন তত্ত্বই রাখিতেন না। যে জমি আজ দশটাকা খাজনায় পাওয়া যায় না, সেই জমি দশবিঘা দশটাকায় বিলি করা হইয়াছে ইহাও দেখিয়াছি। এইখানে রাজার ও প্রজার নির্লোভিতার সম্বন্ধে একটা কাহিনী কহিতেছি।

রাঢ়ে কাল্‌নার নিকট বাঘ্‌নাপাড়া নামে একখানি গ্রাম আছে। উক্ত গ্রাম গোস্বামী রামচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত।

রামাই ঠাকুর শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর পত্নী জাহ্নবা দেবীর ধর্ম্মপুত্র। ঘটনাটী দুইশত বৎসর পূর্ব্বের। ঠাকুর রামাই তিরোধান করিলে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রগণ তৎ প্রতিষ্ঠিত দেব-সেবার উত্তরাধিকারী হন। দেবসেবকগণের ধর্ম্মভাবে আকৃষ্ট হইয়া তদানীন্তন কৃষ্ণনগরের মহারাজা ছদ্মবেশে দেবদর্শনে আসেন এবং সেবাইতগণকে প্রচুর ভূমিবিত্ত একখানি দানপত্রে দান করিয়া গোপনে প্রস্থান করেন। পরদিন উক্ত দানপত্রখানি কোনও সেবকের হস্তগত হইলে সকলে অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়েন এবং দাতা মহারাজ কৃষ্ণনগরাধিপতি জানিয়া তৎ সমীপে উপস্থিত হইয়া বিষয়টী প্রত্যাখান করেন। দুই পক্ষেরই উপরোধ অনুরোধ। দাতা ফিরিয়া লইবেন না, গৃহিতাও গ্রহণ করিবেন না। অবশেষে উভয় পক্ষের মধ্যে এই ঠিক হইল যে বার্ষিক একটাকা মাত্র খাজনায় উক্ত জমি গ্রহণ করা হইবে। দত্ত জমির পরিমাণ সহস্র বিঘারও অধিক। উক্ত দেবোত্তর সম্পত্তির নাম নরসিংহপুরের চড়া। কাল্না সহরের উত্তরে গঙ্গার পরপারে উহা অবস্থিত।

অর্থনৈতিক সম্বন্ধটা কেমন সহজ ও হৃদ্য ছিল, তাহা দেখাইবার জন্যই উক্ত ঘটনার উল্লেখ করিলাম। এখানে আরও দুই একটি ছোটখাট ঘটনার উল্লেখ করা প্রয়োজন। পুরাণী বাঙালায় একলা কেহ খাইতে জানিত না ও খাইত না। গাছে নূতন ফল শস্য ফলিলে, পুষ্করিণীতে মৎস্য ধরিলে, আত্মীয়-কুটুম্বের গৃহ হইতে তত্ত্ব আসিলে আত্মীয়-স্বজন এবং পাড়া-প্রতিবাসীর মধ্যে বিলাইয়া খাওয়াই ছিল রীতি। এখন সহরে ত বটেই অনেক সহরের নিকটবর্ত্তী গ্রামেই পাশ করিয়া মাছ ধরিবার রীতি প্রচলিত হইয়াছে। কিন্তু এ রীতি ছিলনা। যাহার পুকুর থাকিত ও পুকুরে মাছ থাকিত, সে অবাধে সকলকেই মাছ ধরিতে দিত। এমনও দেখিয়াছি যে কোনও পুষ্করিণীতে মৎস্য ধরিয়া একটা স্বতন্ত্র ভাগ রাখা হইত এবং সেই ভাগ হইতে পাড়ার সকলকে বিতরণ করা হইত। আম নারিকেল প্রভৃতি উৎকৃষ্ট ফলের ব্যাপারেও এমনি একটা রীতি ছিল।

বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থা পূর্ব্বে এমন জটিল ছিল না। জীবনযাপনের বাহুল্য না থাকায় অভাবের তাড়না ছিলনা এবং প্রত্যেকের প্রত্যেকের প্রতি একটা হৃদ্য ও বিশ্বাসের ভাব বর্ত্তমান ছিল। চাহিলেত পাইতই না চাহিলেও পাইবার রীতি পদ্ধতি ছিল। সহজ জীবনযাপনের ফলে দৈন্য কখনও তাহার বিকট মূর্ত্তি প্রকাশ করিতে পারে নাই। পূর্ব্ববঙ্গে একটা কথা প্রচলিত আছে যে, 'নি নাওয়ের শতক নাও। অর্থাৎ যাহার একখানিও নৌকা নাই তাহার একশতখানি নৌকা আছে। কেননা, গ্রামের প্রত্যেকের নৌকা ব্যবহারেরই সে অধিকারী। বাংলার সর্ব্বত্রই এই রীতি প্রচলন ছিল এবং তাহার কতক কতক আমরাও দেখিয়াছি।

সামাজিকতা

সমাজই হইতেছে বাংলার প্রাণধর্ম্মের সর্ব্বস্ব। বাঙ্গালীর জীবন সমাজকে কেন্দ্র করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছিল। কাজেই প্রত্যেক ব্যষ্টি মানব যথার্থ রূপে সামাজিক হইবার চেষ্টা করিত। এইরূপে যাহা সমাজ শৃঙ্খলার বিধি, তাহা সুপ্রতিপালিত হইত এবং যাহা অবিধি তাহা বিশেষ ভাবে পরিবর্জ্জিত হইত। গ্রামের মধ্যস্থলে বা উপকণ্ঠে তাড়িখানা বা শুঁড়ির দোকান দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। মহকুমার সদরে মদের দোকান থাকিত এবং যাহারা মাদক ব্যবহার করিত তাহারা সমাজে নিতান্ত নিন্দিত হইত। এক ঘরে করাই ছিল তাহাদের পক্ষে উপযুক্ত শাস্তি। এক-ঘরের শুদ্ধ ভাষা সামাজিক অসহযোগ।

এই বিধি-বিধানের ফলে যাহাদিগকে অন্ত্যজ বলা হয়, তাহারাও সদ্গৃহস্থের মত জীবনযাপন করিত। ব্যভিচার, পানাসক্তি ছিল না বলিলেই ভাল হয়। আজ যাহাদের পতিত জাতি বলিতেছি, তাহাদের বিধবারাও উচ্চ বর্ণের বিধবার মত নিষ্ঠাপূর্ণ বৈধব্য ব্রত পালন করিত। নিস্তারিণী নাম্নি এক ডুলের মেয়েকে দেখিয়াছি। তাহাকে আমরা মাসি বলিতাম। তাহার কাজ ছিল নববিবাহিতা কন্যার শশুর বাড়ীতে ঝি হইয়া যাওয়া। অন্য সময় সে শাক বেচিয়া উদরান্ন চালাইত। নিস্তারিণী কিছু

টাকা জমাইয়াছিল। পরে সে কাশী, গয়া, বৃন্দাবন, মথুরা প্রভৃতি তীর্থে গমন করে এবং তীর্থ হইতে ফিরিবার পর একটী বৃক্ষ প্রতিষ্ঠা করিয়া দেয়। নিস্তারিণী যে একটি গ্রামের একটি মাত্র নারী তাহা নহে, বাংলার পল্লীতে পল্লীতে এমন ব্রতশীলা নারী অনেক ছিলেন। এই বাঙ্গালীর সুস্থ সমাজ বিন্যাসের পরিণাম।

বাল্যে দলাদলির বড়ই বাড়াবাড়ি দেখিয়াছি। আজও বুঝিতে পারিতেছি না তাহা ভাল কি মন্দ। কারণ, ঐ সব দলাদলির মধ্য দিয়া বাঙ্গালীর এক সতেজ জীবন ভঙ্গিমা প্রস্ফুটিত হইতে দেখা যাইত। আজ দলাদলি নাই, ঐক্যও নাই। আছে বিশ্লেষমুখী এক অবসাদ। কেহ কাহারও সাতে-পাচে থাকিতে চাহে না, ভাল মন্দের ভাগী হয় না। ফলে সব বিশ্লিষ্ট সতীদেহের মত নব্য বঙ্গের পল্লীদেহ যেন খণ্ড খণ্ড হইয়া খসিয়া পড়িতেছে। কিন্তু দলাদলির দিনে এমনটি ছিল না। একটা উদাহরণ লইলেই বিষয়টির ভালমন্দ ভাল করিয়া বোঝা যাইবে।

পদ্মলোচন এক অনাথ যুবক। সে উড়িয়া উড়িয়া বেড়ায়। পৈতৃক দুইচারি বিঘা জোত্র জমা যাহা ছিল, তাহা উড়াইয়া পুড়াইয়া দিতে চাহে। তাহার পিসির অঘরে বিবাহ হইয়াছিল বলিয়া গ্রামের একটা দল তাহার উপর বিশেষ সন্তুষ্ট নহে। এখন যাহারা বিপক্ষদল, তাহারা বিরুদ্ধ দলের বিপক্ষতা করিবার জন্যই পদ্মলোচনের বিবাহ দিল। জমি জায়গা যাহাতে বিক্রয় না হয়, সে বিষয়ে চেষ্টা করিতে লাগিল। বিবাহের যৌতুকে একখানি দোকান করিয়া দিয়া তাহাকে স্থিতুভিতু করিল। দলাদলির ফল হইল একটি বিপথগামী যুবকের সুস্থ গার্হস্থ্য জীবনে প্রতিষ্ঠা। এইরূপ যে কত ঘটনার উল্লেখ করা যাইতে পারে তাহার আর ইয়ত্তা নাই।

অঘরে কথাটার উল্লেখ করিয়াছি, উহা যে কি তাহা হয়ত এখন অনেকেই বুঝিবেন না। ইহা কৌলিন্য-প্রথার অন্তর্গত বিষয়। বংশমর্য্যাদায় অপেক্ষাকৃত ন্যূন ঘরে কন্যাদান করিলেই তাহা অঘরে দান করা হইত। এবং তাহা সামাজিক বিধানে নিতান্তই অমর্য্যাদাকর। এমন একদিন ছিল যখন এই ঘর ও অঘর লইয়া পল্লীজীবনে দলাদলির ঘূর্ণাবাত্যা বহিয়া যাইত।

সামাজিকতায় দলাদলির কথা বলিয়াছি। উহা যে সর্ব্বক্ষেত্রেই সমর্থন যোগ্য, একথা বলিতেছি না। তবে, বর্ত্তমানের অসাড়তার অপেক্ষা উহার উপযোগিতা ছিল। দলাদলির ফলে গ্রামে অনেক ভাল কাজ অনুষ্ঠিত হইয়া যাইত। একটা ব্যাপারের কথা এখনো বেশ মনে আছে, যাহা উল্লেখ করিলে বিষয়টির বাস্তব উপকারিতা বোঝা যাইবে। কোনও গ্রামে পূর্ব্ব পাড়ার দল সরস্বতী পূজায় খুব সমারোহ করিল। দশ বারো দল ইংরাজী বাদ্য আনিয়া, খুব লোকজন খাওয়াইয়া পূজা করা হইল। পশ্চিম পাড়ার দল এসব কিছু না করিয়া পূজা নামে মাত্র সারিয়া দুই তিন ক্রোশব্যাপী রাস্তা নির্ম্মাণ করাইয়া দিল! ঐ পথটি হাটে যাইবার রাস্তা ছিল! ফলে অনেক লোক উপকৃত হইল।

তখনকার দিনে মানবের ব্যক্তিগত ব্যাপারও সামাজিকতার সহিত ওতঃপ্রোত ছিল। বিবাহ, উপনয়ন, শ্রাদ্ধ এই সব ক্রিয়াকর্ম্মে লোকে যথাসাধ্য সামাজিক মঙ্গল কর্ম্মও করিয়া যাইতেন। এইরূপ রীতি ছিল। দেখিয়াছি কোনও বড়লোক তাঁহার পিতৃশ্রাদ্ধে সমারোহ সহকারে লোকজন নিমন্ত্রণ করিয়া আবার মহকুমা যাইবার পথে একটি বৃহৎ সেতু নির্ম্মাণ করাইয়া দিলেন। ঐ পথে মধ্যে ভল্লুকা নামে একটি নদী প্রবাহিত ছিল। বর্ষায় ঐ পথে যাতায়াত অতীব দুর্গম ছিল। সেতু নির্ম্মিত হওয়ায় এখন লোক চলাচলের যেমন সুবিধা হইয়াছে, তেমনি হইয়াছে ব্যবসা বাণিজ্যের।

সেদিনে লোকে যে কোনও কাজ-কর্ম্ম করিত তাহাকেই স্মরণীয় করিয়া রাখিতে চাহিত। এই জন্য একটা উপহার দেওয়া রীতি ছিল। যাঁহার যেমন সামর্থ্য থাকিত, তিনি তেমনই দান করিতেন। কেহ পিতলের গামলায় তৈল বিলাইতেন, কেহ মাটির সরায় সন্দেশ মিষ্ট দিতেন, খুব সঙ্গতিপন্ন যাঁহারা, শাল-দোশালা পর্য্যন্ত বিলাইতেন। লোকে এই সব

ব্যবহারকালে দাতার নাম উল্লেখ করিয়া ব্যবহার করিত। মুখুজ্জেদের ঘড়া, রায়েদের গামলা, মিত্রদের থালা গৃহস্থ বাড়ী দ্রব্যাদি ব্যবহারকালে এই সব কথার উল্লেখ শোনা যাইত। ইহার অর্থ যাঁহাদের বাড়ী হইতে যাহা পাওয়া গিয়াছে, তাঁহাদের নাম করিয়াই ঐ সব বাসনের নাম-করণ হইত।

সামাজিকতা বলিলে এখন হয়ত কিছুই বোঝায় না। যাহা বোঝায়, তাহারও বিশেষ কোনও মূল্য নাই। কয়েকজন লোক মাত্র সংখ্যায় অল্প বা অধিক একত্র বসবাস করা—ইহাই অদ্যকার দিনের সমাজ। পূর্ব্বে সব পল্লীতে সামাজিকতার একটা জীবন্তরূপ ছিল। গ্রামে একজন কাহারও বিবাহ হইলে তাহাতে সারা গ্রামে আনন্দের সাড়া পড়িয়া যাইত। কন্যার বিবাহ হইলে জামাতৃ নিমন্ত্রণ এবং পুত্রের বিবাহ হইলে বউ দেখা। জামাই খাওয়ানো ও বউ-দেখা কথা দুইটার আজ হয়ত আর অর্থ বোঝা যায় না। কিন্তু কিছুকাল পূর্ব্বেও গ্রামে নূতন জামাই আসিলে গ্রামস্থ আত্মীয়-স্বজন পাড়া-প্রতিবাসী প্রত্যেকেই নব জামাতাকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইতেন। খাওয়ানোটা বড় কথা নহে,—আত্মীয়তার সম্পর্কটাই হইতেছে বিশেষ বস্তু। বিশেষ বিষয় হইতেছে আত্মীয়তার সম্পর্ককে নিগূঢ় করিয়া তোলা। তুমি তোমাকে লইয়া থাকিলে এবং আমি আমাকে লইয়া মত্ত থাকিলে তোমার এবং আমার মনুষ্যত্বের তাহাতে মহিমা নাই। মানবতাকে একটু ব্যাপক ও বিস্তৃত করিতেই পুরাণী-বাঙলার রীতি-পদ্ধতি একটু প্রসারিত হইয়াছিল।

যাঁহাদের মধ্যে অন্নপানীয়ের আদান-প্রদান নাই, তাঁহারা নানাবিধ মিষ্টান্ন ও ফলমূল থালায় সাজাইয়া উপহার দিত। এমনও দেখিয়াছি যে, জামাই খাইবেন বলিয়া হয়ত একটা বৃহৎ মৎস্য দিয়া গেল। ময়রা উৎকৃষ্ট সন্দেশ প্রস্তুত করিয়া পাঠাইয়া দিল। বউ দেখাও ইহারই অনুরূপ। তবে নিম্নজাতীয়গণের পুত্রের বিবাহে উচ্চবর্ণেরা সামর্থ্যমত অলঙ্কারাদি যৌতুক দিতেন ইহাও দেখিয়াছি। আমাদের গ্রামে হিরু সর্দ্দার নামে একজন বাগ্দী লাঠিয়াল ছিল। সে গ্রামে চৌকি দিত এবং বরবধূর সাথে লাঠি কাঁধে করিয়া গমন করিত। গ্রামের বিত্তবানেরা হিরুর দ্বারা অনেক উপকার পাইতেন। তাহার প্রতাপে গ্রামে ডাকাতি হইতেই পারিত না। এই হিরুর ছেলে মধুর বিবাহে তাহার বধূ এত অলঙ্কার যৌতুক পাইয়াছিল, যে অদ্যকার দিনের একজন সম্পন্ন গৃহস্থের বধূ বা কন্যার গাত্রেও তত অলঙ্কার থাকে না।

একটা প্রশ্ন উঠিবে বলিয়া মনে হইতেছে যে, এই সব তুচ্ছ কথা, ঐতিহাসিকতার দিক দিয়া একেবারেই যাহা অকিঞ্চিৎকর, তাহা এত বিস্তৃত করিয়া ফুলাইয়া ফাঁপাইয়া বলিবার প্রয়োজন কি? ইহার ঐতিহাসিক মূল্য কি? উত্তরটা এখানে বলিয়া রাখা ভাল।

ব্যক্তি বা জাতির বৃহত্তর কর্ম্মেই তাহার সম্পূর্ণ পরিচয় নহে। জাতি-জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কর্ম্ম—যাহাকে একান্তই তুচ্ছ বলিয়া মনে হইতে পারে, এমন কর্ম্মেই ব্যক্তি ও সমষ্টি মনুষ্যের প্রকৃত পরিচয় পরিস্ফুট হইয়া উঠে। দশের প্রশংসার বিনিময়ে যে দান করে, সে হয়ত তাহার সমাজের মধ্যে অত্যন্ত স্বার্থপর। সংগ্রাম ক্ষেত্রে যে বীর, গৃহে হয়ত সে অত্যন্ত নিষ্ঠুর! আলোচনাকে বাড়াইয়া লাভ নাই। তবে ইহাই সত্য যে, মানবের নিত্যকার সহজ জীবন প্রণালী দেখিয়া বুঝিতে পারি তাহার চরিত্রবত্তাকে। যখন মেগাস্থিনিসের বিবরণ পাঠে জানিতে পারি যে ভারতীয় আর্য্যজাতির ভিতর গৃহের অর্গল বদ্ধ করিবার রীতি ছিল না; তখনই বুঝিতে পারি—ভারতের জাতীয় জীবন ছিল কি মহিমসুন্দর।

পুরাণী বাঙলার সমগ্র কথাই ছোট কথা—সহজ জীবনের কথা। ইহা মোটেই ঐতিহাসিক চরিত্র বিশিষ্ট নহে। আর তাহাকে ঐতিহাসিক রঙে রাঙাইয়া তুলিবার প্রয়োজনীয়তাই দেখিতেছি। কারণ অদ্যকার এই মিশ্রতার পঙ্কিল প্রবাহের পূর্ব্বে বাঙলার যে স্বচ্ছ রূপ ছিল, তাহাই দেখিবার প্রয়াস পাইয়া এই আলোচনার অবতারণা। পুরাণী বাঙলাকে দেখিতে গিয়া তাহার বাসন মাজা, কাপড়-কাচার পর্য্যন্ত পরিচয় লইতে হইবে। অঙ্গলীভূত (Anglicised) জাতির হয়ত তাহা ভাল লাগিবে না। কিন্তু যাঁহারা নিজেকে ভালবাসেন, স্বকীয়তায় শ্লাঘায় যাহারা উদ্দীপ্ত তাঁহারা অন্ততঃ আপনার রূপ বলিয়া পুরাণী বাঙলার পরিচয় লইবেন। আগামী বারে দেখিব পুরাতন দিনের বাঙালীর ঘর ও গৃহস্থালী কেমন ছিল।

যা রটে তার অর্দ্ধেক ত' বটে

শ্রীঅশোককুমার রায়

হঠাৎ কিছু ঘটলেই লোকে ব'লে, ওটা যে হ'বে তা' আমরা আগেই জানতাম। যাঁরা এসব আগেই জানতেন তাঁদের অসূয়াটা তুচ্ছ নয়। তাই যখন সরমা সরমে রাঙা হ'য়ে ঘরে এসে খিল দিল তখন তার বৃদ্ধ বাপ তারই ঘরের পাশের ঘরে, চেয়ারে বসে টেবিলে মাথা গুঁজে মুহ্যমান আর তাঁর পায়ের তলার মাটি ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ে সেঁতিয়ে উঠছিলো। ব্যাপারটা হয়তো দুঃখ নয় তো কিছু। কিন্তু মরার উপর খাঁড়ার ঘা দিতে লোকের রসনা এতটুকুও সংযত হয়নি, লোকে বলবেই বা না কেন?

ব্যাপারটা কিছুই নয়! সরমার বয়স উনিশ। বি,এ পড়ে; এখনও বিয়ে হয় নি। দেখতে সে সুন্দরী হয়তো নয়; তার রংটা বেশ ফর্সা; এই যাকে বলে টোকা দিলে গায়ে লাল টেকা ফুটে ওঠে। নাকটা বেশ স্পষ্ট অর্থাৎ খেঁদা নয়। চোখ দুটো পটলচেরা না হলেও পুঁটি মাছের গড়নের মত আয়ত, তার মধ্যে যে দু'টো ঝক্ ঝকে কালো পাথর বসানো আছে, তা' যদি নির্ভীক স্থির না হয়ে খঞ্জনের মত চঞ্চল হ'তো, তবে ভোমরা বলে ভুল হওয়াই স্বাভাবিক। মুখটা ঈষৎ লম্বা ছাঁচের হওয়াতে গ্রীবাটুকু যেন শাঁকের আভাষ দিত। মাথা আর কাঁধের ব্যবধান বেশ দূর হওয়াতে সে একটু হেঁট মাথাতেই থাকতো, তবে একে রাজহংসের কণ্ঠ বলে কি না, ঠিক বুঝতে পারিনি। তা'র সমস্ত দেহটা পা থেকে সরল হ'য়ে উঠে, ডগার দিকে ধনুকের মত নুয়ে পড়েছিল, যেন সূর্য্যমুখী গাছটি ভরা সন্ধ্যায়।

বাপের কাছেই মেয়ের শিক্ষা সুরু হয়। আর এত দিনের শিক্ষকতায় সরমার কাছে বাপ আর শিক্ষক এক হ'য়ে মিশে গিয়ে উপদেষ্টা আর বন্ধুতে এসে পরিণত হ'য়ে গেছে। তাই যখন, একদিন সরমা এসে তার বাপকে জানালে যে তা'র জীবনপথে আর এক দোসর মিলেছে, যা'র কাঁধে সে একান্তই নির্ভর করতে চায়, তখন তার বাবা শুধু বলেছিলেন—"কৌতূহলই জাগে প্রথম, রংএর চটক এ। যখন লোকে এই প্রথম মোহ কা'টিয়ে ওঠে তখন সে খোঁজে মাধুর্য্য, আস্বাদ। কিন্তু অনেক বিষয় যখন সুস্বাদে আবৃত থাকতে পারে তখন তা'কে ঠিকমত বুঝতে হ'লে বিশ্লেষণ করতে হয়, পরীক্ষা করতে হয়। মোহ হচ্ছে আবেশ, আর মত্ততা হচ্ছে বুদ্ধিভ্রষ্ট অবস্থা।"

এ কথার উত্তরে সরমা নাকি জানিয়েছিল "যে, দেনা-পাওনা অশরীরি অদ্ভুত, তা'র হিসেব-নিকেশ কর্ত্তে হ'লে কি সেই কায়াহীনের ভাষাই সব চেয়ে বড় নয়!

এর উত্তরে সে এই জেনেছিল যে, "কালের বিপণিতেই সব জিনিষের যাচাই হয়। তাই তাড়াতাড়ি যারা কিছু ক'রে বসে, তা'রা আপাত লাভের আশায় বড় লোক-সানই ক'রে।"

এই উপদেশে রুষ্ট সরমা কষ্টি পাথরে কষে দেখতে গেছল, তা'র সেই নবপ্রাপ্ত সুবর্ণের পিণ্ডটাকে। এই মহৎ কার্যে প্রতারিত হওয়ায়, লোকের রসনায় বক্তব্যের প্রেরণা এল। যাক্, কেমন করে রটল, আর কেমন ক'রে ঘটল, তা এবার বলতে সুরু করি। তবে এই প্রেরণার প্রথম উন্মেষটা আগে জানিয়ে রাখি।

তরুণ ব'লে এক ছোকরা সদ্য এম,এ পাশ করে য়ুনিভার্সিটি থেকে বেরিয়ে এসেছে। দিব্যি ফুটফুটে চেহারা, শুধু, তার মুখে মানায় না বর্ম্মা চুরুট আর টরটয়েজ শেলের গোল কাঁচওয়ালা চশমা। বেশ চটপটে আর ঠোঁট দুটো খুব চাপা। কিন্তু যখন কথা কয় তখন যেন খৈ ফোটে। চুলটা তার শুধু স্নানের পর বেশ আঁচড়ানো দেখতে পাওয়া যেত; আর দিনের মধ্যে

যখনই যেখানে দেখা হোক না কেন, তা'কে সেই একই বেশে দেখতে পাওয়া যেত। তবু সে ছিল ধনীর ছেলে।

এমন যে তরুণ সে একদিন বাসে আসতে আসতে দেখতে পেল একটি মেয়ে সেই বাসেই উঠে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে শূন্য বেঞ্চির আশায়। নিরাশ হ'য়ে মেয়েটি তরুণের পাশেই বসে পড়লো, বেশ ব্যবধান রেখে। খানিকক্ষণ পরে একটা বেঞ্চি খালি হ'য়ে যাওয়াতে, যেই সে মেয়েটি উঠতে যাবে, অমনি হাতে দৃঢ় চাপের সঙ্গে সঙ্গে সেও সেখানে ব'সে পড়লো। বিস্মিত ও ক্রুদ্ধ চোখ তুলে যখন মেয়েটা হাতের অধিকারির দিকে তাকাল তখন তরুণ অতি শিষ্ট হাসি মাখান মুখে বললো—"আপনার উপর জোর করবার বেয়াদপী মাপ করবেন। তবে পাশ থেকে উঠে গিয়ে পাশের লোককে অপমান করবারও আপনাকে অধিকার দেওয়া হয়নি। আপনার পক্ষে এ-আসনও যা ও-আসনও তা। তবে আমাদের পাশাপাশি বসায় আমাদের যতখানি ব্যবধান, সামনের আসনে পশ্চাতের আসনে বসাতেও ঠিক তাই থাকে। অন্তরের খুঁৎখুঁতুনি নিয়ে বাস করা মানে, লোকের মনে ব্যথা দিয়ে চলা।" সেদিন সরমা কাঠের পুতুলের মত চুপ করে এই লোকটারই পাশে বসে গন্তব্যস্থান পর্য্যন্ত গেছল। তারপর ?

তরুণ একদিন পথে চলতে চলতে পাশের বাতায়নে দৃষ্টিপাতে স্মিত হাস্যে থমকে দাঁড়াল। একটু পরেই গট গট করে এগিয়ে সেই বাড়ীর দরজায় জোরে করাঘাত ক'রতে লাগলো। একজন চাকর এসে দরজা খুলে দিয়ে জিজ্ঞাসুভাবে তাকাতেই তরুণ বললে—"তোমাদের বাবুকে ডেকে দিতে পার?"

ভৃত্য জানাল "বাবু তো তো বাড়ীতে নেই!"

তরুণ শুধু বললে "আচ্ছা। তোমাদের দিদিমণিকে বলগে আমি বসব, না চলে যাব ?"

চাকর তরুণকে বাইরে ঘরে বসবার বন্দোবস্ত করে দিয়ে, উপরে প্রস্থান করলে। তরুণ ঘরের এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে টেবিলের উপর একখানা বই দেখতে পেলো। বইটা খুলে সে তাতে নিবিষ্ট হ'য়ে পড়ল।'

ভৃত্য এসে যখন জানাল যে "দিদিমণি বলছেন, বাবুকে সন্ধ্যার সময় পাবেন।" একথা শুনে তরুণ বললো—"আচ্ছা তাই আসবো না হয়। তবে এ বইখানি দেখিয়ে জিজ্ঞাসা ক'রে এসো আমি নিয়ে যেতে পারি কিনা? পড়েই ফেরৎ দেব।"

চাকর আবার ফিরে এসে জানালো। "ওটা বাবু কিনে এনেছেন, এখনোও পড়া শেষ হয় নি।"

"তা বেশ! আমি আর দুদিন বাদে এসে পড়তে নিয়ে যাবো। আচ্ছা আসি।" বলেই তরুণ উঠে দাঁড়িয়ে পথের দিকে পা চালিয়ে দিল। এইটা হচ্ছে আদি, পরে উদ্যোগ পর্ব্ব।

রাস্তার ধারে খোলা জানালা দিয়ে ভেতরে দেখা যাচ্ছে একজন সৌম্যদর্শন প্রৌঢ় একজন তরুণ যুবকের সঙ্গে কথা বলছেন। বক্তা হচ্ছে তরুণ শ্রোতা হচ্ছে প্রৌঢ়। অথচ দু'জনের মধ্যে অভিনিবেশের ভাব ঘন গম্ভীর। সময় তখন নিস্তব্ধ অমাবস্যা রাত্রি; শুধু পথের আলো তারার মত জলজ্বল করছে।

বক্তা বলছে—সাহিত্য হচ্ছে কলা কিন্তু বেশীর ভাগ লোকই এর স্বাদ না পেয়ে খোসায় পা ফেলে আছাড় খাচ্ছে।"

শ্রোতা জিজ্ঞাসা করলেন, "কেন—?"

বক্তা বললেন—"তার কারণ, সাহিত্যের ভিত্তি কল্পনায় নয় কামনায় নয়, ত্যাগে! ত্যাগ থেকে ভাবে ওঠা, কল্পনার কথামালা। তার মানে এই নয় যে, যা আছে তা' ত্যাগ করতে হ'বে। শুধু ছাড়তে হ'বে সংস্কারটা; মানে যেটা শুধু সংস্কার। সংস্কার হচ্ছে অভ্যাস, নিয়ম নয়।"

শ্রোতা বললেন—"যেমন?"

বক্তা বললেন—যেমন নিট্‌শের Anti-Christian Prapaganda (ক্রিষ্টিয়ান সংস্কার আন্দোলন)। তিনি তো ধর্ম্মটাকে ছাড়তে চান নি; অথচ তাঁ'র কথার

ভাবে ভাঙ্গনের সুরই কানে এসে ঠেকে। তিনি যা' বলতে চান তা' হ'চ্ছে এই যে, আমাদের ধর্ম্ম অধর্ম্মের মাপকাঠিটা আরও বড় ক'রে গড়তে হ'বে। যে কোনও ধর্ম্মমতই Average এর (গড়পড়তা) মাপকাঠিতে মাপা হয়েছে। এই উপায়ের বড় অসুবিধাটা হচ্ছে এই যে সার্ব্বজনীন হ'লেও সমস্ত সাধারণের সুবিধা হয়নি।

শ্রোতা বল্লেন—"আপনার শেষের কথাটি হেঁয়ালী নয় কি?"

বক্তা সুরু করলেন—"Massএর যা প্রয়োজন তা কি individualএর অভাব ঘোচায়?"

শ্রোতা ঘাড় নেড়ে হেসে বললেন, "সকলের তুষ্টি কি সম্ভব?"

বক্তা আবেগের সঙ্গে বলে উঠলেন—"অসম্ভব ভেবে মানুষ তো অনিশ্চিতকে রেহাই দেয় নি; যদি দিতো তা হ'লে, আল্পস্ আজও দুর্লঙ্ঘ্য থেকে যেত, সমুদ্র আজও অনতিক্রান্ত থাকতো, আকাশে আজও ডানা মেলতে পারতাম না, বিদেশকে ঘরের মধ্যে বসে দেখবার সুযোগ পেতাম না। অসম্ভবই মানুষের চিরন্তন শত্রু আর সুযোগ হচ্ছে সন্ধিপত্র। মানুষকে বড় হয়ে উঠতে হবে, এই পণ যেন বীজ থেকে গাছের আকাশে মাথা ক্রমেই উঁচু করা……

এমন সময় সরমা সেই ঘরে ঢুকে প্রৌঢ়কে নির্দ্দেশ ক'রে বললে—"বাবা, তোমার মত নির্ব্বাক শ্রোতা তরুণ বাবু কখনও পাননি, তাই ও'র আর না পায় ক্ষিদে না পায় ঘুম। তুমি কোনও উত্তর দাও না ব'লে উনি ভাবেন, তুমি বুঝি ওঁর মতামতে সম্মতি দিচ্ছ।"

প্রৌঢ়, শ্রী সুরেশ চ্যাটার্জ্জি, ঘাড় নেড়ে, কি একটা উত্তর দিতে যাবার আগেই তরুণ একটা প্রগল্ভ হাসি হেসে, বলে উঠল—"সুরেশবাবু, মেয়েদের যত বিদ্যেই বাড়ুক না কেন, তারা কোনোদিনই কালের সঙ্গে পা ফেলে চলবে না। চিরকালই পেছনে পড়ে থাকবে। এই সরমার কথাই দেখুন, বিংশশতাব্দিতে যে এতবড় আহাম্মক আছে আমি আগে ভাবতেও পারিনি।"

সুরেশ বাবু মেয়ের পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে বল্লেন—"ওর ছেলেমানুষীটাই আমার মিষ্টি লাগে তরুণ তুমি ওর কথাটাকে অত গভীরভাবে না তলিয়ে অগ্রাহ্য করলেই পার।"

তরুণ অপ্রতিভ ভাবটা চেপে, ব্যঙ্গের সুর সম্পূর্ণ গোপন রেখে বললে, "বয়স হ'লেও যারা ছেলেমানুষী করে তাদের যেন কি বলে? আচ্ছা তা' হ'লে আজ আসি।" এই বলে ছোট একটা নমস্কার করে, সরমার দিকে আড়চোখে একবার চেয়েই, ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সরমা বললে—"তুমি বাবা ওকে বড় প্রশ্রয় দিচ্ছ। বড্ড বাজে বকে, না"

সুরেশ বাবু বল্লেন—"ও যা' বলে তা ও বয়সেরই ধর্ম্ম। তবে লোকটার মধ্যে বেশ গুণ আছে।"

সরমা শুধু বললে—"গুণ আছে না ছাই, ঘুণ ধরেছে।"

সেদিন সন্ধ্যায় সুরেশ বাবু বেরুবার আগে, মেয়েকে সস্নেহে বল্লেন, "তরুণ তো কদিন আসেনি। হঠাৎ যদি ও আসেই, তবে তার কাছে philosophyর (দর্শনের) বিষয়ে তুমি কথা তুলো। তা'তে তোমার পাঠ্য পুস্তকটা অনেক সরস ও সহজ হয়ে আসবে। আমার যেমন দিন ঘনিয়ে আসছে, দুর্ব্বলতাও প্রশ্রয় পাচ্ছে। তোমাকে তো আমি উদার মত দিতে পারি না; এখন যে আমার পুরাণোকে আঁকড়ে ধরার সময় এসেছে। নানান মানুষের নতুন নির্দ্দেশ, তোমার নিজের পথের দৈন্য ও মহার্ঘতাকে নিজের বিচারবুদ্ধিতে সহজ হয়ে ধরা পড়বে। যত শিখবে ততই যে জানবার স্পৃহা বেড়ে ওঠে, মা।"

সরমা সেদিন ঘাড় হেঁট করে একটা মৌন সম্মতি জানিয়েছিল। পিতার পদধ্বনি যখন ক্ষীণতম হ'য়ে মিলিয়ে গেল, তখন সরমা মনের মুখোস খুলে, রেগে উঠে বলতে লাগলো—"ভারী তরুণ! আঘাতেই যা'র আনন্দ। চাই না আমি ওর কাছে শিখতে! আসুক না; আমি বলব বাবা নেই; আজ আর আড্ডা—

এমন সময় নীচে তরুণের গলা শোনা গেল, সে উৎকর্ণ হয়ে উঠলো—

"বাবু নেই। ওঃ তা' হলে ভারী অসুবিধে হ'লো দেখছি। আমি তাঁর সঙ্গে আজ Resurrection দেখতে যাব' মনে ক'রে দু'খানা টিকিট কিনে নিয়ে এসেছি

তাইতো একখানা টিকিট কি করি? আবার একটু পরে শোনা গেল, "তোমাদের দিদিমণিকে ডেকে আর দরকার নেই। ছবি তো শুধু গল্পটাকে প্রত্যক্ষ করা নয়, দেখতে হয় সেই সন্ন্যাসীর কলমকে ছাপিয়ে আলোছায়ায় কত বেশী রূপ প্রকট হয়েছে। আচ্ছা আমি তা' হ'লে চল্লাম; তোমাদের বাবু এলে ব'লো—।

এমন সময় সরমা অগ্রাহ্যের ভাব নিয়ে এসে তরুণকে যেন হঠাৎ দেখে ফেলে—"আপনি কখন এলেন? বসুন, বাবা হয়তো শীঘ্রই আসবেন।" তরুণ চট্ ক'রে আস্তিন গুটিয়ে ঘড়িটায় এক নিমেষ দৃষ্টি দিয়ে বল্লে—"বেশীক্ষণ তো অপেক্ষা করতে পারবো না। মোটে কুড়ি মিনিট সময়; ঠিক ছটায় কি না?"

সরমা জিজ্ঞাসা করলে "ঠিক ছটায় কি? বাবা থাকলে তো যাবার জন্যে এত ছটফট করতেন না।"

"ছটায় বায়স্কোপ সুরু হ'বে। বসি একটু—এলে দুজনেই যাবো।" এই অভিযানে সরমার স্থান না থাকাতে সে মনে আঘাত খুবই পেল, তবু হাসির রেশ রেখেই বললে "তবে একটু চা আনিগে বলে অন্দরের দিকে অদৃশ্য হ'য়ে গেল। যখন সে চা নিয়ে ফিরে এল তখন দেখলে তরুণ চলে গেছে। শুধু চাকরটা জানিয়ে দিল—"বাবু বলে গেলেন আর বসতে পারবেন না।" সরমা চায়ের ট্রেটা বাইরের ঘরের টেবিলে বসিয়ে রেখে ত্বরিতপদে উপরে এসে, খাটেতে উপুড় হয়ে শুয়ে বালিশে মাথা গুঁজে দিল।

সুরেশ বাবুর সে দিন বাড়ী ফেরবার পথে একজন প্রতিবেশী সহৃদয় হ'য়ে তাঁকে বললে—"আপনাদের বাড়ীতে অধর বাড়ুয্যে এটর্ণীর ছেলে তরুণ আসে। আপনারা সবাই তার সঙ্গে—হে হে ব'ল না শ্যাম খুড়ো, সুরেশ বাবুর বরাৎ জোরটা ভালই।——তবে" সুরেশবাবুর এর বেশী শোনবার বাসনা না থাকায়, "তাইতো বাড়ীতে জ্বর-জারি। তা আর একদিন আসবো," বলেই, জোরে ঘরের দিকে পা চালিয়ে দিলেন।

সরমার ঘরে এসে দেখলেন, সে বালিশে মাথা গুঁজে অসময়ে শুয়ে আছে, চাকরটা তাঁকে আগেই জানিয়ে দিয়েছিল যে তরুণ বাবু চা না খেয়েই চলে গেছেন। চায়ের ট্রেটাকেও তিনি বাইরের টেবিলে পড়ে থাকতে দেখে এসেছেন। ঘরে ঢুকেই বুঝতে পারলেন, মেয়ের আজ কী বলবার আছে। বক্তব্যটুকু আগেই জানিয়ে দিয়েছি; তবে সুরেশ বাবুর উপদেশটা আবার জানিয়ে রাখি। তিনি বলেছিলেন—"মোহ হচ্ছে আবেশ, আর নগ্নতা হচ্ছে বুদ্ধিভ্রষ্ট অবস্থা।"

সেদিনকার ব্যাপারে সরমার লজ্জা যতখানি ভেঙ্গেছিল ততখানিই বেড়েছিল সাহস। এবার সে হেস্তনেস্ত করবার জন্যে বেপরোয়া হয়ে উঠলো। সে ভেবে ঠিক ক'রলো, চেপে যাওয়ায় হয়তো চাপাই রয়ে যাচ্ছে; এক্ষেত্রে প্রকাশ করারই একটু প্রয়োজন। তার এই নতুন প্রত্যাদেশ মত নিজেকে প্রস্তুত করে তুললে, যা'তে আর অপ্রস্তুত না হ'তে হয়।

তরুণ আসতেই সুরমা সেদিন মুগ্ধ হাসিতে তাকে অভ্যর্থনা করলে। তরুণ এ ভাবান্তরটা গ্রাহ্য করলে না। নীরস ভাবেই ব'লে উঠলে—"সুরেশ বাবু বুঝি বাড়ী নেই। তাইতো—"

সরমা বলে উঠল—"না না বাড়ীতে রয়েছেন যে" তারপর মিনতি-গাঢ়স্বরে বললে—আমরা কি আপনার সঙ্গে আলোচনা করবারও অনুপযুক্ত।

তরুণ তাকে সম্পূর্ণ এড়িয়ে বললে "আমি এ ঘরে বসছি, সুরেশ বাবুকে একটু জানাবেন কি।" এক মুহূর্ত্তেই সরমার মন মুষড়িয়ে পড়লো। সে স্খলিত স্খলিত চরণে অপসৃত হল।

চাকরের কাছে খবর পেয়ে, চটি ফটফট করতে করতে সুরেশ বাবু বাইরের ঘরে এসে জুটলেন; হাতে খবরের কাগজ। উভয়েরই মুখে সম্ভ্রমের হাসি ফুটে উঠলো; সরমা আড়াল থেকে দেখে সরে গেল।

সুরেশ বাবু প্রথম কথা কইলেন, বললেন—"দেখছো, দিনের পর দিন কত মেঘলা হ'য়ে উঠছে এই দেশের আকাশ?"

তরুণ বললে—"ঝড়ের আঘাত যখন লাগে তখনই শান্তির আশা জাগে।"

সুরেশ বাবু নিরতিশয় স্নিগ্ধ স্বরে বল্লেন, "আশাটা হয়তো স্বাভাবিক; তবে তা' ফলে যাবার সম্ভাবনা কত!"

তরুণ হাসলে; পরে গম্ভীর মুখে বলে উঠলো—"সেটা ধৈর্য্যের উপর নির্ভর করে।"

সুরেশ বাবু বল্লেন—"অর্থাৎ?"

তরুণ বললে—যতখানি পাওয়ার আশা নিয়ে ক্রীড়া সুরু হয়, ততখানি না পেয়েও যদি আপনি ভাবেন পেয়েছেন, তা' হ'লে সবটুকু পাবার অধিকার আপনার শেষ হ'য়ে যায়।"

সুরেশ বাবু বল্লেন—"বড় বেশী ঘোরালো হ'লো কথাটা। তুমি যদি——"

সরমা ঘরে ঢুকছিলো; পিছনে ভৃত্যের হাতে চায়ের ট্রেতে পরিপূর্ণ সরঞ্জাম। সরমা শেষ কথাটা শুনে আচমকা বলে বসলো, "বাবা, তরুণ বাবুর নীতিটাই ওই। উনি সরল সহজটাকে ছেড়ে ঘুরে বেড়ানটাকেই পছন্দ করেন।"

তরুণ এ কথার জবাব না দিয়ে, 'সুরেশ বাবুকে বললে—"আমাকে আমি জটীল করার প্রশ্রয় দিই না; তবে অন্তরের ভাবকে প্রকাশের উপযুক্ত ভাষার দৈন্য পদে পদে অনুভব করি, সুরেশ বাবু। হয় আমি ঠিক বুঝি না নিজে আর নয় পারি না পরকে বোঝাতে। আরও একটা কথা, আমার কাছে যা' অনায়াস, আপনারই হয়তো তা শক্ত ঠেকে। এর মধ্যে দোষ কারও নেই। আছে পার্থক্য।"

সরমা ভাবলে তরুণ তাকেই উত্তর দিলে। তাই সে হেসে এক কাপ চা ঢেলে তরুণের দিকে হাসি মুখে পেয়ালাটা বাড়িয়ে ধরলে। তরুণ বল্লে—"টেবিলেই রাখুন, আমার আবার চা একটু ঠাণ্ডা খাওয়া স্বভাব।"

সরমা টেবিলে পেয়ালাটা নামিয়ে রেখে, সুরেশবাবুকে এক পেয়ালা চা ঢেলে দিয়ে, একটা চেয়ার টেনে এনে মুখোমুখি হ'য়ে বস্‌লে। আজ সরমা তার সব চেয়ে পছন্দের শাড়ী,ব্লাউজে, আয়নার সামনে কড়া সমালোচকের চোখ দিয়ে নিখুঁত করে সেজে এসেছিল।

সুরেশ বাবু মেয়ের এই সজ্জার বহর দেখে শুধালেন—"তোমার বুঝি আজ কোথাও নেমন্তন্ন আছে?"

সরমা হাসির ঝিলিক হেনে, বললে "না, বাবা! এমনিই ইচ্ছে হ'লো। একটু বেড়াতে যাবে?"

সুরেশ বাবু—"এখন কোথায় যাই। আচ্ছা তরুণ, কোন বায়োস্কোপে গেলে হয় না।" তরুণ চায়ে চুমুক দিচ্ছিল। পেয়ালা থেকে মুখ সরিয়ে বল্লে—"বায়স্কোপের সব ছবি তো ঠিক দেখার উপযুক্ত নয়। তা'র চেয়ে যান না একটু ইডেন্ গার্ডেনে বেড়াতে!"

সরমা বল্লে—"All Quiet বইটা সবাই ভাল বলছে; সেখানেই চল না বাবা।"

সুরেশ বাবু বল্লেন—"চল তরুণ, আজ আমরা ওটাই দেখে আসি।"

তরুণ তাড়াতাড়ি পেয়ালাটাকে নিঃশেষ ক'রে নিয়ে বললে—"ও বইখানা এখনও পড়ি নি। না পড়ে, না কল্পনার চোখে ও ছবিটা এঁকে আমি তো যেতে পারি না। আমি যাচ্ছি আজই ও বইখানা কিনে পড়ে ফেলব। আচ্ছা তাহ'লে আজ আসি, আপনারা যান।" বলে সত্যিই সে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লো।

তরুণ ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে পর সুরেশ বাবু বললেন—"আস্ত পাগল। আমোদ-প্রমোদের মধ্যেও নিজেকে ফাঁকি দেয় না।"

সরমা কণ্ঠে শ্লেষ এনে, উত্তর ক'রল—"ওসব কিছু নয়, খামখেয়ালী!"

সুরেশ বাবু একটু মৃদু হাসলেন মাত্র।

সরমা অনেক দিন থেকেই সুযোগের প্রত্যাশায় ছিল। তাই আজ যখন সেটা আচমকাই মিলে গেল, তখন সাবধানের গণ্ডীটা না জেনেই টপকে পার হল।

তরুণ এসে বাইরের ঘরে বসে ছিল। কি জানি একটা ইংরাজী কবিতার বই তন্ময় হ'য়ে পড়ছিল। এমন সময় প্রথম প্রেমের কবিতার মত, শান্ত সঙ্কুচিত হয়ে ঢুকলো সরমা। আজ সে নিজেই এসেছে চায়ের ট্রে আর খাবারের থালা নিয়ে। চা ঢেলে খাবারের থালাটা তরুণের সামনে টেবিলে সাজিয়ে দিয়ে, নিজের জন্য চা ঢালতে ঢালতে মিহি সুরে সে বললে—"তরুণ বাবু, খাবার চা আর পদ্য এ তিনটেতেই মনোযোগ ক'রলে ভাল হ'ত নাকি?" তরুণ প্রথম সরমার মুখের দিকে তাকাল, তারপর দেখল খাবারের থালাটা। পেয়ালার আংটায় আঙুল গলিয়ে মুখের কাছে তুলে নিয়ে, জিজ্ঞাসা করলে—"সুরেশ বাবু কোথায়?"

সরমা বললে—"বাবা না এলে কি সভা অচল !"

তরুণ শুধু বললে—"অচল হবে কেন ? তবে কথা বলে আনন্দ পাই এই যা।"

সরমা রহস্যের ছলে জিজ্ঞাসা করলে—"আমার সঙ্গে কথা বলতে কি আপনার ভাল লাগে না তরুণ বাবু।"

তরুণ বইটাতে মনোযোগ করেছিল, মাথা না তুলেই বললে—"ভারী সুন্দর চা করেছ তো।"

সুরমা খুসী হ'য়ে অনুনয়ের ভঙ্গীতে বললে—"ও খোসামোদ রাখুন। এ খাবারগুলো খাবে কে ?"

তরুণ মাথা তুলে একবার চেয়ে দেখলে; পরে গালে একটা খাবার ফেলে চিবানর সঙ্গে সঙ্গে বলতে লাগলো—"বাঃ খাসা খাবার। কোন দোকানের তৈরী ?"

সরমা বললে—"আমরা কি আর ওসব পারি। দোকান ছাড়া কি ভাল খাবার হয় !"

তরুণ বললে—"ওঃ তোমার তৈরী। বাঃ বড় সুন্দর তো !"

তরুণের প্রশংসায় তার মনও ভরে উঠছে, উত্তেজনাও বেড়ে চলেছে। তাই সে আর এক ধাপ এগিয়ে এল। বললে,—"তরুণ বাবু আপনার মুখে ও টর্টয়েজ শেলের চশমা মানায় না।"

তরুণ বললে—"বটে !"

সুরমা বললে—"আচ্ছা বাসে সেদিন আপনি অমন ক'রে হাত চেপে ধরেছিলেন বা কেন আর সেদিন আমায় দেখেই বা এ বাড়ীতে ঢুকলেন কেন ?"

তরুণ বললে—"কৌতুহল হ'য়েছিল"

সুরমা বিস্ময়ের স্বরে বললে—"শুধু কৌতুহল"

তরুণ বললে—"তুমি কি এর অন্য কিছু কারণ পেয়েছ নাকি ?"

সুরমা বললে—"না আমি কিছু ভাবি নি।' তবে আজ আশ্চর্য্য হ'য়ে যাই, কদিনই বা আপনার সঙ্গে আমাদের আলাপ অথচ মনে হয় যেন চিরকালের জানা।"

তরুণ বললে—"অচেনাকে চেনাই তো হচ্ছে মানুষের গুণ ও জ্ঞান।"

সরমা বললে—"তা হ'লে আপনাকে নিগুর্ণ আর জ্ঞানহীন বলতে হয়।"

তরুণ বিস্মিত হ'য়ে বললে—"কি বললে সরমা ?"

সঙ্কুচিত হয়ে সরমা বল্লে—"আপনার কথাতেই আপনি বোকা প্রমাণ হচ্চেন।"

তরুণ জিজ্ঞাসা করলে—"কেন ?"

সরমা সমস্ত সাহস নিয়ে বললে—"আমাকে তো আপনি আজও চিনতে পারেন নি।"

তরুণ বললে—"খুব পেরেছি।"

সরমা জিজ্ঞাসা জিজ্ঞাসা করলে—"কি বুঝেছেন বলুন দেখি ?"

তরুণ হাঁ হ'য়ে গেল। বলে কি ? সরমাকে চিনি না ? খুব চিনি! ও আবার হেঁয়ালী বলছে। তরুণ ভাববার জন্যে উঠে পায়চারী করবার ইচ্ছায় উঠতেই, সরমা তাকে হাত ধরে চেয়ারে বসিয়ে দিলে; বল্লে—"সেই বাসের ব্যবহারের প্রতিশোধ।"

তরুণ একথায় তত মনোযোগ না দিয়েই বল্লে—"সরমা আমি কি বুঝতে পারি নি', তা' আমায় বুঝিয়ে বল না ?"

সরমা ব্যঙ্গভরা স্বরে বললে, "হা তাই বলি আর আপনি আমায়—" সুরমার যখন কথাটা শেষই করবে না বুঝলে, তখন তরুণ উৎকণ্ঠায় সারা হ'য়ে গিয়ে, বললে "আমি তোমায় কি করবো সরমা ?"

সরমা স্বগতোক্তির মত, বলে উঠলো—"না কাজ নেই। ওই দোষেই শূর্পণখার নাক-কাটার ব্যবস্থা হয়েছিল।"

তরুণ বিস্মিত চাহনী নিয়ে বললে "তোমায় আজ হেঁয়ালীতে পেয়েছে। আচ্ছা আজ তা হ'লে চল্লাম।" বলেই সে উঠে পড়লো। দরজার কাছে এসে টের পেলে যে তার জামা পেছন থেকে টেনে ধরেছে সরমা। বিপুল জোরে জামাটা ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টায় বিফল হ'য়ে সে ফিরে দাঁড়াল মুখোমুখী হ'য়ে। সুরমা প্রদীপ্তমুখে আব্দারের সুরে বললে "বস না ?"

তরুণ বললে—"না !"

সুরমা বললে—"ঠিকই তো; চাওয়ার আগেই পেলে আর সে জিনিষের দাম থাকে না।"

তরুণ চোখে জ্বালা জ্বালিয়ে, দৃঢ়স্বরে বললে—"বাচা-

লতার সীমা আছে ; আজ দেখছি তুমি আমায় ধৈর্য্যচ্যুতি না ক'রে ছাড়বে না। আজ আমি এইখানেই দাঁড়ি টানতে চাই।" বলে সে যাবার জন্যে ফিরল। সরমা সামনে এসে পথ রোধ করে দাঁড়াল। উত্তেজিত হয়ে সে বললে—"সংহার ছাড়া সৃষ্টি কখনই তোমাদের দিয়ে সম্ভব হয়নি।" বলেই সে নিমেষের মধ্যে সেখান থেকে অপসৃত হ'ল।

তরুণের চমকটা ভাঙ্গতেই, সে দেখলে সুরেশ বাবু অপ্রসন্ন মুখে ঘরে ঢুকছে। ঘরে ঢুকেই তিনি বললেন "তরুণ!"

তরুণ বললে—"আজ আমার সবই গুলিয়ে যাচ্ছে সুরেশ বাবু; কাল আপনি আমার সঙ্গে বাড়ীতে দেখা করবেন।" বলেই সে দ্রুত সেখান থেকে সরে পড়ল। তরুণ বুঝেছিল, সরমার শেষ কথা সুরেশ বাবুর কাণে পৌঁছেছে নিশ্চয়।

তরুণ রাস্তায় নেমে একটু যেতেই কেন জানি পিছন ফিরে সরমাদের বাড়ীর দিকে তাকাল। ও বাড়ীর জানলায় আলো সন্ধানের সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পেলে প্রতিবেশীদের মধ্যে দু'চার জনের অঙ্গুলি-সঙ্কেত-নির্দ্দিষ্ট হয়েছে সে। আরও দু'পা এগোতেই, একজন লোক অনাহূত তার নাম ধরে ডেকে, আলাপ জুড়ে দিলে—"হেঁ হেঁ তরুণ বাবু! সুরেশ বাবুর বাড়ী থেকে আসছেন বুঝি।"

তরুণ সংক্ষেপে জবাব দিল—"আজ্ঞে হাঁ।"

লোকটা বল্লে—"বেশ! বেশ! তবে কিনা ওর মেয়েটা বড় বাচাল। একটু সামলে চলবেন। পুরুষের বড় গা ঘেঁসা। হ্যাঁ, মেয়ে বিয়ে করতে হয় তো আমার ভাইঝি, কি রূপ কি—" তরুণের তখন কনের খবরের বিশেষ প্রয়োজন না থাকায় সে আবার চলা সুরু করলে, পথে যেতে অনেক কিছু ভাবলে, শেষে ঠিক করলে, পরের দিনই সে সুরেশ বাবুর কাছে ভিক্ষা চেয়ে বসবে। মনটাকে সে দৃঢ় করে নিলে মায়ের কাছে মিনতি করে অনুমতি পাবার।

বজ্রঝঞ্ঝা

—উপন্যাস—

শ্রীপ্রমীলা রায়

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

১৩

ছুটীর দিনগুলি এক এক করে কেটে আসছিল—এবার প্রভাতের ছুটী ফুরোলে মীনা তার সঙ্গে কল্‌কাতা পর্য্যন্ত যাবে ; সেখান থেকে হাজারিবাগ যাবে, এই ঠিক হয়েছিল। অনেকদিন পরে মায়ের কাছে যাবে বলে, তার আর আনন্দের শেষ ছিল না।

কিন্তু মানুষ গড়ে, ভগবান ভাঙেন একথাটা চিরকাল ধরেই খেটে আস্‌ছে। তাই প্রভাতের ছুটী ফুরোতে যখন আর দিন দুই বাকী, তখন হঠাৎ শুভ্রাংশুর টেলিগ্রাম এলো "মার কলেরা হয়েছে—মীনাকে অবিলম্বে পাঠাও।"

বাপের বাড়ী যাওয়ার আনন্দ বিদায় দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে মীনা, ছেলেটীকে কোলে নিয়ে পাল্কী চড়ে বসল। জগমোহন নদীর ঘাট পর্য্যন্ত সঙ্গে গেলেন ; বল্লেন "ভয় নেই—ভগবান্ করুন্ গিয়ে তুমি তাঁকে একটু ভালই দেখ—আমার দাদা ভাইএর যত্ন করো। একটু সুস্থ হলেই চলে এসো—তোমরা ঘুরে এলেই দাদুর অন্নপ্রাশন হবে।" মীনা কিছু বল্‌তে পারলে না—তার চোখে তখন শ্রাবণের ধারা নেমেছে—'কলেরার রুগী আর দুদিনের পথ! কে জানে মোটেই দেখতে পাব কিনা! ভগবান্—আমার সকল আনন্দের উৎসের ওপরেই, এমন করে পাথর চাপা দাও কেন?"

উৎকণ্ঠায় দু'দিন কাটিয়ে মীনা দেড় বছর পরে যখন আবার হাজারিবাগে ফিরে এল, তখন শুভ্রাংশুর খালি পা ও গলার 'কাচা' তাকে তার মাতৃহীনতার খবর দিলে। চীৎকার করে কাঁদতে একবার ইচ্ছে হোল বটে কিন্তু গলা চেপে গেল—কোনো স্বরই ফুটলো না।

সুধাংশু, হিমাংশু ম্লানমুখে এসে তার পাশে দাঁড়াল—ধীরে ধীরে তার কোল থেকে ছেলেটীকে তুলে নিলে। একটা অসহ আর্ত্তনাদে তার বুকের ভিতরটা এপার-ওপার হয়ে চিরে যাচ্ছিল। কিন্তু মুখে তার ভাষা ছিল না, জড়ের মত সে এক জায়গাতেই পড়ে ছিল। সমস্ত অন্তর ভরে একটা সুর করুণভাবে বলে যাচ্ছিল 'মা' 'মা' 'মা'।

দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে সে বসেছিল। মলিনা তার পাশে এসে বস্‌ল। পিঠের ওপর হাত রেখে ধীরে ধীরে সে ডাকলে 'মীনু' 'মীনা'! অধীর হচ্ছ কেন ভাই? স্বামী হারিয়ে যাকে বেঁচে থাকতে হয়, তার সে বাঁচায় কোনো প্রয়োজন নেই, তা তো আর আজ জান্‌তে তোমার বাকী নেই। বাবা যাওয়ায় পর থেকেই মা বাইরে ঠিক থাক্‌লেও ভেতরে তাঁর কি যন্ত্রণা সহ্য করতে হত, তা তুমি একটু একটু তো দেখেই গিয়েছিলে! ভেতরে ভেতরে ক্ষয়ে গিয়েছিলেন বলেই, এই সামান্য পেটের অসুখটা কলেরায় দাঁড়াল আর তা প্রতিরোধ করবার ক্ষমতা তাঁর হল না। বাবা যাওয়ার এইটুকুমাত্র পরে তিনি গেলেন, তাতে আমাদের যত কষ্টই হোক না কেন, তিনি এ জন্মের মত বেঁচে গেলেন!"

মীনা মুখ তুলে লাল চোখ দুটো মলিনার দিকে ফিরিয়ে বল্‌লে "আমার বাবা নেই, মা নেই, আমার যে কেউ থাক্‌লো না—মা—মাগো।"

স্নিগ্ধ কণ্ঠে মলিনা বল্লে "বাবা, মা, চিরকাল কারোই থাকে না মীনু ; আমারও তো বাবা, নেই। তোমার তো পরম আশ্রয় স্বামী আছেন, ছেলে আছে ; এখন এদের সেবাতেই তুমি আত্ম-নিয়োগ কর। আমরা তো পরের জন্যেই জন্মাই—পর নিয়ে আপন করি।"

একদিন, দুদিন করে করে শতদলের শ্রাদ্ধ হয়ে গেল। এইবার মীনার যাওয়ার পালা ; একবার গিয়েছিল রমাপতির শ্রাদ্ধের পরে, আবার যাবে শতদলের শ্রাদ্ধের পরে। সেবারে মা' ছিলেন—এবারে মা নেই।

হাজারিবাগে আবার কবে আসবে, কেমন ভাবে আস্‌বে—সে চিন্তা তার মনে এখন থেকেই হচ্ছিল। ওদিকে জগমোহনের শরীর খারাপ হয়ে উঠছে, প্রভাতের চিঠিতে এই খবর পেয়ে সে আর থাক্‌তেও পারছিল না।

আশৈশবের চেনা বাড়ীঘর ফেলে, এবার মীনা নতুন করে যেন শ্বশুরবাড়ী গেল—তার যাওয়ার সময়ের ছল্‌ছলে চোখ ছুটোকে শুভ্রাংশু কিছুদিন ধরে ভুলতে পারলেন না। সুধাংশু, হিমাংশু লুকিয়ে লুকিয়ে কেঁদে বেড়ালো। আর যতী! সে ভাবলে রমাপতি তাকে কুড়িয়ে এনেছিলেন, তিনি গেলেন, তার পরে যিনি মায়ের মত স্নেহে তাকে ডুবিয়ে রেখেছিলেন, তিনিও গেলেন, মীনা তো স্বামী, পুত্র নিয়ে সংসারী, তবে কেন আর কিসের টানে এখানে পড়ে থাকা? সসঙ্কোচে সে শুভ্রাংশুর কাছে বিদায় প্রার্থনা করলে, তিনি বল্লেন, "বাবা গেলেন, মা গেলেন, তুমিও গেলে, এই পাষাণ পুরীতে আমি কি করে টিঁকব ভাই? হাঁপিয়ে উঠব যে! আর কিছুদিন যাক্—বিয়ে থা' কর, করে আমাদের একজন হয়ে থাক। হঠাৎ যদি আমি মরে যাইতো সুধাংশু হিমাংশু যে অকূল পাথারে পড়বে! বাবা যে তোমাকে পুত্রাধিক স্নেহ করতেন তাকি ভুলে গেলে?

একটু ম্লান হেসে যতী বল্‌লে "তবে তাই হোক বড়দা। আপনার স্নেহাকাঙ্ক্ষী হয়ে, সুধাংশু, হিমাংশুর হিতকাঙ্ক্ষী বড় ভাই হয়ে, এ সংসারেই আমাকে মিলিয়ে যেতে দিন্। তবে সংসার আমি পাত্‌বো না—সে আমার সহ্য হবে না।"

শুভ্রাংশু তাকে বলবার মত কোনো কথা আর খুঁজে পেলেন না।—

যাওয়ার সময় মীনা যতীকে ডেকে বল্‌লে, "যতীদা, বিয়ে করো—তোমাকে সংসারী দেখলে আমরা সবাই সুখী হব। তুমি এমনি উড়ে উড়ে বেড়াবে—সে কি দেখতে আমাদেরই ভাল লাগে; কি অভাব তোমার, তাই যে তুমি বিয়ে করবে না? রাজী হও যতীদা—পাত্রীর ভার আমি নিলাম।"

ম্লান হেসে যতী বললে, "অভাব? না অভাবই বা কিসের? বিয়ে করা আমার পোষাবে না! তা এক কাজ করনা কেন মীনু, পাত্রীর ভার যদি তুমি নিলে তো বিয়ের ভারটাও তুমি নেও না কেন?"

"বিয়ের ভারও আমি নিচ্ছি যতীদা—তুমি শুধু বিয়ে করে এসো—মা নেই—তোমাকে যত্ন করবার কেউ নেই —যদি বিয়ে করো, তবে আমি বুঝব বড়দাকে দেখবার জন্যে যেমন বৌদি রইলো, তোমাকেও সব সময়ে দেখবার তেমনি একটা লোক হয়েছে।"

"সে হয় না মীনু—ভগবান না করুন্ সে রকম দরকার হলে বোন্ বলে তোমার দরজাতে গিয়ে দাঁড়াব, তুমি আমায় দেখবে না?" ঘাড়ের ওপর মীনার ছেলেটী ধরা ছিল, তাকে ঘাড় থেকে নামিয়ে কোলে নিয়ে চুমু খেতে খেতে বললে "আর এই বেটা? এ বেটা বুঝি তার মামাকে দেখবে না—দরজা থেকেই তাড়িয়ে দেবে? কেমন রে খোকা?"

মীনার চোখ ছুটো জলে ভরে উঠল—আর সময় ছিল না—প্রভাত তাগাদা জুড়েছিল। তবুও মোটরে উঠে বল্‌লে, "যতীদা, পাগলামি ছেড়ে দেও ভাই—বিয়ে করো।"

সামনের সীটে উঠে বস্‌তে বস্‌তে যতী বল্‌লে,—"তুমি আমাকে মাপ কর মীনা, বিয়ে করার কোনো প্রবৃত্তিই আমার নেই—যদি কখনো তা হয়, তাহলে তোমাকে আগে খবর দেব।"

হু, হু করে মোটর চল্লিশ মাইল চলে ষ্টেশনে এসে পৌছাল। ট্রেণের আর বেশী সময় ছিল না—টিকিট করাই ছিল—উঠে বসে, মীনা আবার বল্‌লে, "আমার কথা মনে রেখো, যতীদা সময় হলে খবর দিও।"

ঘণ্টা পড়লো—গাড়ী চলতে আরম্ভ করলো—যতী প্ল্যাটফরমেই দাঁড়িয়ে রইলো। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বল্‌লে, "না জেনে, না বুঝে আমার মনের কোন্ জায়গাটা তুমি ছুরি চালিয়ে ক্ষত বিক্ষত করলে মীনা তার খবর তুমি এ জন্মেও পাবে না। তুমি তো বুঝবে না যে আমার বিয়ে না করার কারণ কি! এক ফুলে কি দুবার পূজো হয়! আজ স্বামী পুত্রের কল্যাণী, মঙ্গলময়ী আমার এ কষ্ট তুমি হয়তো বুঝতে পারবে না—বোঝাতে তা আমি চাইওনা তোমাকে, কিন্তু যখন সময় ছিল, তখনও তো বোঝাবার চেষ্টা করিনি—আজ তুমি আমার জীবনে অন্য রকমে এসেছ বলেই কি মনের কথা মুছে ফেলে দেব? যাও মীনা—তুমি তোমার স্বামীর সঙ্গে তার ঘরে; আর তুমি আমার সামনে এসো না। বুঝতে পারছি এখন, 'ল্যাম্ব' কত বেদনায় বলেছিলেন—Son of Alice Call their Father."

গাড়ীতে বসে মীনা কিন্তু সুস্থির হতে পারছিল না মোটেই। দুষ্টমি করে করে ছেলে যখন ঘুমিয়ে পড়ল, প্রভাতের কোলে থেকে তাকে নিয়ে বেঞ্চের ওপর বিছানা পেতে শুইয়ে দিলে। প্রভাত বরাবরই মীনাকে লক্ষ্য করছিল। ছেলে শুইয়ে দিয়ে, তার পাশে বসে জানলার কাচের ভিতর দিয়ে সে বাইরের দিকে চেয়েছিলো তার এই নীরবতা প্রভাতের মনকে খুব দরদের সঙ্গে

স্পর্শ করলে। ধীরে ধীরে সেও তার পাশে এসে বললে—গলাটা জড়িয়ে ধরে, কাঁধের ওপর মাথাটা রেখে দিয়ে মৃদু স্বরে সে জিজ্ঞাসা করলে, "কি হোল তোমার মীনু ?—আমাকে বলো—তোমার দুঃখ, তোমার অশ্রু সব মুছে নেবার জন্যে আমি যে সব সময়েই ব্যগ্র হয়ে থাকি!—আমার হাতের মধ্যে হলে, তোমাকে কখনো দুঃখ দেব না।—এ কি, তুমি কেঁপে উঠ্‌ছ কেন ? বল আমায়!"

অতর্কিত মাতৃবিয়োগ, তাঁকে না দেখতে পাওয়া, হাজারিবাগ থেকে এই অল্পদিনের মধ্যেই চলে আসা, যতীর সঙ্গে কথাবার্ত্তা—সব কিছু মিলেই তার মনকে তোলপাড় করে তুলছিল। যতীর বিয়েতে অসম্মতি কেন তা বুঝতে মীনার দেরী হয়নি একটুও, সেই জন্যেই তার মনটা আরো খারাপ হচ্ছিল এই ভেবে যে যা নিষিদ্ধ তাতেই মানুষের এত লোভ কেন ? যতী তো ভাল করেই জানে যে সে এখন অপরের স্ত্রী, প্রিয়া, ধর্ম্মপত্নী, তারই সন্তানের জননী! তবে কেন সে ছোটবেলার কথা, যা খেলাচ্ছলেই স্থির হয়েছিল আবার খেলাচ্ছলেই ভেঙে গিয়েছিল, সেই বিয়ের কথা ভুলে যায় না ? যদি সে বিয়ে করে সংসারী হ'ত, তবে হয়তো মীনা মনে করতে পারত যে সে তাদের দেওয়া বেদনার কথা ভুলেছে—স্ত্রীর ভালবাসায়, স্বামীর কর্ত্তব্যে আপনাকে ডুবিয়ে রেখেছে! কিন্তু তা তো হবার নয়! এবার মীনা ভালকরেই বুঝেছে যে যতী বিয়ে করবে না। আর তাই তার এত চেষ্টা ছিল তাকে রাজী করাবার কিন্তু কিছুই হল না। তার দুঃখটা যে কত গভীর তা মীনা যেন বুঝতে পারছিল; কিন্তু তার মনে তো কোনো দুঃখই নেই—এমন স্নেহময় স্বামী, ননীর পুতুলের মত ছেলে যার তার আবার দুঃখ কি! এই তো স্বামীর স্নেহ শীতল হাতখানা তার গলা জড়িয়ে ধরে আছে, এই তো তার প্রতি নিশ্বাসটীও সে অনুভব করতে পারছে!

প্রভাতের বুকের মাঝে মাথা রেখে মীনা, ছোট মেয়ের মত ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল, অনেকক্ষণ কেঁদে সে শান্ত হল। এ কান্না কেন, কার উদ্দেশে তা সে নিজেও ভাল করে বুঝতে পারলে না, প্রভাত তো নয়ই। মেঘ করেছিল—বর্ষণ করে গুমোট কেটে গেল, নির্ম্মল হাসি মীনার মুখে খেলা করতে লাগল। ধীরে ধীরে তার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে প্রভাত বল্লে "কাঁদলে কেন মীনু, আমার কোন ব্যবহার কি তোমাকে কষ্ট দিয়েছে—? না ? তবে কেন কাঁদলে ? তুমি তো কাঁদছিলে—কিন্তু জান কি, তোমার চোখের জল; আমার বুক বেয়ে যতটা গড়িয়ে যাচ্ছিল, রক্তটাও আমার, ততটা হিম হয়ে যাচ্ছিল; কোন গভীর দুঃখ পেয়েছ সন্দেহ নেই, কিন্তু সেইটাকেই তো রাজ্যা করে রাখতে হবে না—আমাকে বললে হয়তো আমি কোনো উপায় করতে পারি।

"কিই বা তোমাকে বলব! জানো তো যে বাবার একবার খেয়াল হয়েছিল, যতীদাকে জামাই করবার—তারপরে তোমাকে পেয়ে পর্য্যন্ত সে কথা তো, আর একবারও শুনিনি। যতীদা কিন্তু সেই আবছায়া রকম শোনার পর থেকেই আর বিয়ে থাওয়া করবে না বলে 'ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা' করেছে। বাবা থাকলে হয়তো এর একটা উপায় হতো—এবারেও আমি খুব অনুরোধ করে-ছিলাম বিয়ে করবার জন্যে কিন্তু তার সেই ধনুক ভাঙা পণ—'দরকার হলে বিয়ে করব।' এ আপত্তি কেন তা কি আমি বুঝি না? আর বুঝি বলেই, এইটা আমাকে পীড়া দিচ্ছে!"

"ভুল মীনা ভুল! যতীবাবুর ওপর শ্রদ্ধা আমার আরো বেড়ে গেল। ভাল, মানুষ, জীবনে একবার বাসতে পারে—দুবার কি দশবার ভালবাসা যায় না! স্নেহ ভক্তি, শ্রদ্ধা এ সব ভালবাসারই বিভিন্ন স্তর। এ সব এক সঙ্গে দশ জনের সঙ্গে আদান-প্রদান করা যায়, কিন্তু প্রেম একজনের, আর এ জিনিস যদি কেউ একবার পায় তো কিছুতেই ছাড়ে না—আমরণ সাথে রাখে—গোপন রত্নের মত লুকিয়ে ফেরে! যতী বাবু বিয়ে করবে কি করে? যাকে বিয়ে করবে তার ওপর যদি ঠিক মত কর্ত্তব্য পালন না করতে পারে তবে সে বিয়েও তো মহাপাপ!—যতী তোমাকে আমরণ ভাল বাসুক, তাতে আমার ক্ষোভের কোনো কারণ নেই—বাগানে ফুল ফুটলে তার সৌন্দর্য্য ও গন্ধে কত লোক মুগ্ধ হয়—কিন্তু ফুলে অধিকার শুধু সেই যার বাগান তার। সেই রকম ভাগ্যক্রমে আমি তোমাকে পেয়েছি বলে কি অপরে তোমাকে ভালবাসবার সুযোগটুকুও পাবে না—এমন হিংসুক আমি নই, তোমার সর্ব্বময় অধিকারী আমি! কিন্তু নীরব পূজা যদি কেউ করে তাতে বাধা দেবার অধিকার আমার তো নেই মীনু—বিশেষ যখন তাতে করে আমাদের কিছু ক্ষতি হচ্ছে না।"

"কিন্তু কেন? আমি যখন তোমার ধর্ম্মপত্নী, তখন কেন অন্যে আমাকে পূজা বল, স্নেহ বল, ভালবাসা বল, করবে ? কেন? এইটাই আমি সইতে পারছি না। যতীদার যদি বৌ থাকতো তবে কি ওর আর এই সব মনে থাকতো ? না সে-ই মনে রাখতে দিতো ? আমার মনে হচ্ছে আমি যেন তোমার কাছে অপরাধিনী হচ্ছি!"

"মোটেই না মীনু! তুমি এই সামান্য কথা নিয়ে মাথা ঘামিয়ো না—জগতে থাকতে গেলে কত রকম দেখতে হয়—এও তারই একটা অংশ বলে ধরে নেও

না।" বলে প্রভাত আরো নিবিড় করে মীনাকে জড়িয়ে ধরে "পারবে কি তোমার যতীদা, তোমাকে আমার এই বাঁধন থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে? কেউ পারবে না মীনু—এক যম ছাড়া।" যমরাজ বোধ হয় সেদিন প্রভাতের এই কথা শুনে মুখ টিপে হেসেছিলেন।

"অনর্থক কি একটা কথা নিয়ে গণ্ডগোল সময় কাটালে বল্ তো! এমন নির্জ্জনতা, এমন সুন্দর সব দৃশ্য—এর মাঝে ও সব কথার স্থান কোথায়? তার চেয়ে তুমি একটা গান কর শুনি, কাণের ও মনের তৃপ্তি হোক্!

মীনাও যেন এ আলোচনা থেকে মুক্তি পেয়ে বাঁচল। রেলের চলার ছন্দে, ছন্দে, সুর মিলিয়ে মৃদুকণ্ঠে সে গেয়ে গেল ;—

"ফুল তো আমার ফুরিয়ে গেছে, শেষ হল মোর গান—
এবার প্রভু লও গো আমার, শেষের দিনের গান।
অশ্রু জলের পদ্মখানি চরণ তলে দিলাম আনি
এই হাতে তুমি লওগো মোরে, লও গো আমার প্রাণ।
ঘুচিয়ে দাও গো সকল লজ্জা, চুকিয়ে দাও গো ভয়
বিরোধ আমার যত আছে সব করে লও জয়।
লও গো আমার নিশীথ রাতি, লওগো আমার প্রেমের বাতি
এবার প্রভু লওগো মোরে, লওগো আমার প্রাণ"—

যতক্ষণ মীনা গানটা করলে প্রভাত চুপ করে শুনে গেল। গানের এই আত্মনিবেদনের ভাব তাকে মুগ্ধ করেছিল। গান শেষ হলে সে দেখলে মীনার চোখে জল টল টল করছে, তার চোখও তখন শুকনো ছিল না। স্ত্রীর মাথাটা বুকের মাঝে চেপে ধরে প্রভাত বল্লে "চোখের এই গঙ্গা-যমুনা ধারাকে সাক্ষী রেখে, আজ থেকে এসো প্রতিজ্ঞা করি যে আমরা দুজনে কেউ কাউকে ভুল বুঝবো না—"যা' সোজা, সরল ও শিব, তাই খুঁজে নেব। লুকোচুরি কিছু থাকবে না। চোখের ভিতর দিয়েই, আমরা আমাদের মন বুঝে নেব।" মীনা একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেল্লে।

কল্‌কাতায় মাত্র একদিন পরেশবাবুর বাসায় থেকে মীনা প্রশান্তর সঙ্গে দেশে চলে গেল। পরেশবাবুর বাসায় এবারে আর মাধবী ছিল না। আই, এ, পাশ করার পরে সে একটা অস্থায়ী কাজ নিয়ে দার্জ্জিলিঙে চলে গেছে। এ খবর মীনা মোটেই জানত না—সুষমার কাছে মাধবীর ঠিকানা নিয়ে—সে আবার তাকে চিঠি লিখবে ঠিক করেছিল।

সেই বাড়ী ঘর, কিন্তু কিছুই যেন ভাল লাগে না! কাজকর্ম্ম সবই আগের মত চলছে! দুপুর বেলা ঘুঘুর করুণ সুরে মনটা এমন উদাস হয়ে যায়—ছোটবেলার মত মীনা মায়ের কোল খুঁজতে যায়! কিন্তু হায়! মা কই! চোখের জলে সব মুছে একাকার হয়ে যায়! মীনা কাঁদে, ছোটমেয়ের অকারণ কান্নার মত কেবলি কাঁদে—এ কান্না, এ আকুলতার কি বিরাম নেই? মা মা আমার! শেষ দেখাও যে দেখতে পেল্যম না মা—মনে তো করতে পারিনে তুমি নেই! আজ আমার স্বামী, পুত্র আত্মীয়ে ভরা সংসারের কথা কাকে বলে শান্তি পাব মা! শুনেই বা কে আনন্দ করবে? মেয়ে বলে একবারও কি মনে হোলো না?

সেদিনও মীনা এমনি ঘরে বসে বসে কাঁদছিল, হঠাৎ প্রভাস ও নন্দা হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এসে বল্লে "শিগ্‌গীর চল তুমি—বাবা কেমন কচ্ছেন।"

"সে কি?" বলে দুই চোখ কপালে তুলে মীনা তাদের আগেই ছুটে বেরুলো শ্বশুরের ঘরে গিয়ে দেখলে সমস্ত হাত-বেঁকে গিয়ে তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন—চোখের তারা দুটী স্থির—মুখ দিয়ে কেবলই ফেনা ভাঙছে। দেখেই তো সে ভয়ে অস্থির হলেও প্রভাসকে সাহস দিয়ে বল্লে "খোকা, যাও তো ভাই, ও বাড়ী। কাকাবাবু কি ঠাকুরদা যাকে হয় ডেকে নিয়ে এসো। বলো বাবার অসুখ হয়েছে!"

পাখা রেখে নন্দা উঠে গেল। অন্য দরজা দিয়ে অবনী ও শিরীষচন্দ্র একসঙ্গেই ঘরে ঢুকে জগমোহনের অবস্থা দেখে চম্‌কে গেলেন। লাঠিটা নামিয়ে শিরীষ তাঁর মাথার কাছে বস্‌লেন—অবনী গেলেন ডাক্তার আন্‌তে।

"কতক্ষণ এ রকম হয়েছে?" শিরীষ মীনাকে প্রশ্ন করলেন।

"বেশীক্ষণ নয় ঠাকুরদা—এই তো ঘণ্টাখানেক হল আমি এঘর থেকে উঠে গিয়েছি—বাবা তখনো কাগজ পড়ছিলেন—তারপরে নন্দাকে পাঠিয়েছিলাম ঘুমোচ্ছেন কি না দেখতে—সে ও খোকা এক সঙ্গে ছুটে গিয়ে আমাকে ডেকে আনে, আমি এসে দেখি এই ব্যাপার। খোকা এই ঘরে ছিল সেই ঠিক বল্‌তে পারবে।"

"হুঁ" বলে শিরীষ চুপ করলেন। ডাক্তার এল—যথারীতি পরীক্ষা হল—শেষে রিপোর্ট বেরুলো, 'সর্ব্বাঙ্গ-ব্যাপী পক্ষাঘাত! আরোগ্য! তা কতদিনে হবে ঠিক নেই। হতেও পারে। তবে যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ।'

প্রভাসকে ডেকে খাম পোষ্টকার্ড বের করে মীনা বললে "খোকা, একটা কাজ কর। সব খবর খুলে কলকাতায় চিঠি লিখে দেও—মায় ডাক্তারের কথা পর্য্যন্ত! এখানে আমরা মেয়েমানুষ আর তুমি একা! আমরা কি করব!—

"হ্যাঁ তাই লিখি বলে প্রভাস খাম পোষ্টকার্ড নিয়ে বাইরে গেল।

ক্রমশঃ

শরীর-রক্ষার্থে ব্যায়ামের প্রয়োজন

শ্রীবিষ্ণুচরণ ঘোষ বি-এস-সি, বি-এল

৫—ক চিত্র

পা দু'খানি সম্পূর্ণ সোজা করিয়া কোমর হইতে দেহের উর্দ্ধাংশ নিম্নাংশের সহিত সমকোণ করিয়া দাঁড়ান। ৫-ক চিত্র দেখুন।

পা বা দেহ না নড়াইয়া (শুধু হাতের জোরে) বারবেলটিকে এতদূর উঠান যাহাতে বারবেলের রড্‌টি বুক স্পর্শ করে। ৫-খ চিত্র দেখুন।

হঠাৎ বারবেলটিকে নামান—এবং ইহাতে যে ঝাঁকুনি লাগিবে তাহা ল্যাটিসিমাস পেশী দুইটি দ্বারা গ্রহণ করুন। যখন বারবেল তুলিবেন তখন সব পেশীগুলিকে শক্ত করিবেন। এই প্রকার কয়েক বার করিবেন। এই ব্যায়ামটি করিবার সময় যখন বারবেলটিকে তুলিবেন তখন যেন কনুই দুইটি যথাসম্ভব উপরের দিকে খাড়া হইয়া থাকে এবং যথাসাধ্য উপরে উঠে।

ইহাতে এই কয়েকটি পেশী বর্দ্ধিত হয় যথা—ল্যাটিসিমাস ডর্সি অর্থাৎ দেহের দুই পার্শ্বে বগলের বাহিরের পেশীদ্বয় এবং পিঠের এক পার্শ্ব হইতে অন্য পার্শ্ব পর্য্যন্ত সমস্ত পেশীগুলি।

বারবেলের ওজন আবশ্যক—৪০ পাউণ্ড।

এই ব্যায়াম কুড়িবার করিতে হইবে।

৫—খ চিত্র

৬—ক চিত্র

৬—ক চিত্রের মত দাঁড়ান। হাতের তালু চিং করিয়া বারবেলের রড্‌টি দুই হাতে মুষ্টিবদ্ধ করিয়া ধরুন। হাত দুইটি দেহে লাগিয়া থাকিবে না; কাঁধ দুইটি নামাইয়া বারবেলটিকে হাত যতদূর যায় ততদূরে উরু দুইটির কাছে (না ছোঁয়াইয়া) ধরিয়া রাখুন।

হাত দুইটিকে সর্ব্বদা দেহ ছাড়া করিয়া রাখিয়া বারবেলটীকে কাঁধের সমান পর্য্যন্ত উঠান; কাঁধের চওড়া হাড় দুইটি দিয়া কাঁধের পেশী (ট্রাপেজিয়াস্) দুইটিকে সর্ব্বদা উপর দিকে ঠেলিয়া রাখিবেন।

৬—খ চিত্রের মত করিয়া ফিগার শেষ করুন।

ইহাতে এই পেশীগুলি বর্দ্ধিত হয় যথা—কাঁধের উপরের ট্রাপেজিয়াস্ পেশীদ্বয় এবং বাহুর বাইসেপস্ পেশীদ্বয়।

বারবেলের ওজন আবশ্যক—২০ পাউণ্ড।

করিতে হইবে—১০ বার।
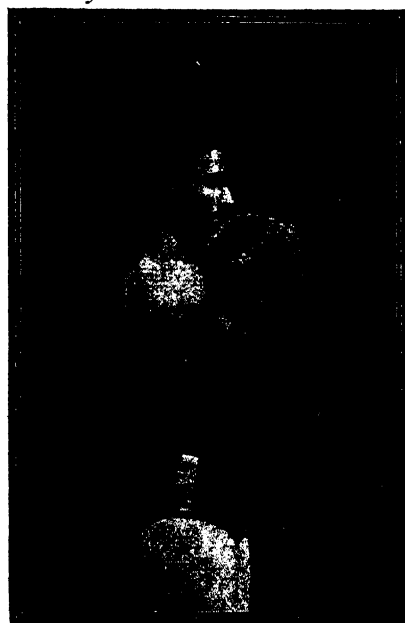
৬—খ চিত্র

বঙ্গ-সাহিত্যে শরৎচন্দ্রের প্রভাব

শ্রীকনকলতা ঘোষ

কিছুকাল পূর্ব্বে বাঙলার সাহিত্যানুরাগী পাঠকসমাজ "শ্রীঅনিলা দেবীর" ছদ্মনামে যাঁহার সুন্দর রচনা পাঠ করিয়া বিস্ময়াভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল, তিনিই যে বর্ত্তমান যুগের কথা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ শিল্পী শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, একথা তখন কে জানিত ?

আর কেইবা বিশ্বাস করিতে পারিত যে আজ যিনি নারীর ছদ্মনামের অন্তরালে আত্মগোপন করিয়া আপনার বাণী পূজার নৈবেদ্য সুধীপাঠক সমাজে বিতরণ করিতেছেন, কাল তিনিই হইবেন শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক, বর্ত্তমান কথা সাহিত্যের একচ্ছত্র সম্রাট !

কালের গতি এমনই—আন্তরিক সত্যনিষ্ঠা ও একাগ্র সাধনার বলে মানুষ পথের ধূলি ঝাড়িয়া ফেলিয়া রত্ন-সিংহাসনে আরোহণের অধিকার লাভ করে, সেই সত্যনিষ্ঠাকে অহঙ্কারে পদদলিত করিয়া সাধনাকে বিদায় দিয়াই আবার যশের উচ্চশিখর হইতে নামিয়া বিদ্রূপের কষাঘাতে জর্জ্জরিত হইতে হয়।

যাঁহারা যশোলাভের পর বিদ্রূপ অপমান লাভ করিতে বাধ্য হ'ন আমি তাঁহাদের অশ্রদ্ধা করি না, কারণ মনে হয় হয়ত সে সময় যশ-ভাগ্য না থাকার জন্যই কার্য্যকালে তাঁহাদের মতিভ্রম হয়। আর যাঁহারা আত্মক্ষমতার বলে একাগ্র সাধনায় পথের ধূলি ঝাড়িয়া উঠিয়া সগৌরবে রত্ন সিংহাসনে আরোহণ করিতে সমর্থ হ'ন তাঁদের আমি অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা করি, তাঁহারা চিরদিন আমার নমস্য। শ্রদ্ধেয় শরৎচন্দ্রকে আমি এই শ্রেণীর মধ্যে গণ্য করি সুতরাং তিনিও যে আমার নমস্য, ইহা বলা বাহুল্য মাত্র। শরৎচন্দ্র যে বঙ্গসাহিত্যের পাঠক সমাজের অন্তরের পূজা পাইয়াছেন, তাহা মাত্র তাহাদের গুণগ্রাহী উদার চিত্তের জন্যই নহে, আপনার অকৃত্রিম দরদী হৃদয়ের গুণে। যে সৌম্য শান্ত প্রেমময় প্রাণের পরিচয়, যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার বুদ্ধি এবং যে অপূর্ব্ব মনস্তত্ব বিশ্লেষণ শক্তি, "পল্লীসমাজ", "গৃহদাহ," "চরিত্রহীন" "দত্তা", "দেবদাস", "দেনা-পাওনা" প্রভৃতি উপন্যাসের মধ্য দিয়া পাঠকের মনশ্চক্ষুর সম্মুখে সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে তাহাকে হৃদয়ের শ্রদ্ধা ও প্রীতি দিয়া বরণ করিয়া না লইয়া থাকা সম্ভব নহে।

শরৎচন্দ্র বঙ্গ সাহিত্যের বিশাল প্রাঙ্গণে যে অর্ঘ্য লইয়া উপস্থিত হইয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ নূতন ও অভিনব, তাহাকে অবহেলা করিবার শক্তি শিক্ষিত পাঠকের নাই।

শরৎচন্দ্র মানব-মনের এমন এক রহস্যময় গুপ্ত অথচ চিরন্তন সত্য ভাবকে সাহিত্যের মধ্যে রূপ দিয়া লোক-চক্ষুর সম্মুখে প্রকাশিত করিয়া দিয়াছেন, পূর্ব্বে যাহার সাহিত্যে প্রবেশ এক প্রকার নিষিদ্ধ ছিল বলিলেও হয়। (বঙ্কিম সাহিত্য ও রবীন্দ্র সাহিত্যে এই ভাব একেবারে প্রবেশ করে নাই ইহা বলা যায় না, তবে যতটা প্রবেশ করিয়াছিল অতি ধীরে সঙ্কোচের সহিত। শরৎসাহিত্যে ইহার পূর্ণ প্রকাশ দেখা গিয়াছে) সেই ভাবকে, অর্থাৎ মনের মিলন নিঃস্বার্থ প্রেমের রুদ্ধ স্রোতকে অপ্রতিহত গতিতে সাহিত্যের প্রাঙ্গণে প্রবেশের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়া শরৎচন্দ্র নবীন সাহিত্যিকগণের সাহিত্য-সাধনার পক্ষে পরম সহায় হইয়াছেন এবং রসগ্রাহী পাঠকের চিন্তাধারাকে এক নূতন পথে প্রবাহিত করিয়া দিয়াছেন। আজিকার কথা সাহিত্যিক তাঁহার রচনা হইতে অনুপ্রেরণা পায়, এবং আজিকার পাঠক তাঁহার আশ্চর্য্য মনস্তত্ব বিশ্লেষণ শক্তি দেখিয়া চমৎকৃত হয়, সাহিত্যিকের পক্ষে সাধনায় সিদ্ধিলাভের ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট প্রমাণ কি থাকিতে পারে জানি না। মানুষ সৌন্দর্য্যের উপাসক, তাই জগতে যা কিছু সুন্দর দেখে, তাহাতে মানুষ আকৃষ্ট হইয়া থাকে, ইহা তাহার পক্ষে স্বাভাবিক তথাপি কোনো পুরুষ কোনো নারীর বা কোনো নারী কোনো পুরুষের

সুন্দর রূপ দেখিয়া যদি প্রশংসা করে, বা কেহ কাহারো অন্তঃসৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া যদি তাহাকে ভালবাসিয়া ফেলে, সে ভালবাসা সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ হইলেও তাহা লোকচক্ষে ভীষণ অপরাধ বলিয়া গণ্য হয়! মানুষের অন্তরে অন্তরে যে উচ্ছ্বসিত প্রেমের প্রবাহ নিঃশব্দে ফল্গুধারার মত বহিয়া চলিয়াছে। তাহা যদি কোনো প্রকারে বাঁধা-ধরা পথ ছাড়িয়া প্রবাহিত হইতে চায়, অমনি সীমা অতিক্রম করিল, অনধিকার প্রবেশ হইয়াছে ইত্যাদি রবে সমাজ সংসার চীৎকার করিয়া উঠিবে। কিন্তু কারণ বুঝিতে চাহিবে না এবং মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করিবার আবশ্যকতা অনুভব করিবে না। এইরূপ বিচার পদ্ধতির জন্যই হয়ত হিন্দু-সমাজ দিন দিন হীনবীর্য্য হইয়া পড়িতেছে।

সামাজিক বন্ধন ব্যতীত কেহ কাহাকে ভালাসিলে, বিবাহ ব্যতীত কেহ কাহার প্রেমে আকৃষ্ট হইলে বাহিরের বিধি নিষেধের চাপে পড়িয়া সে প্রেম সার্থক হইতে পারে না সত্য কিন্তু তথাপি সেই নিঃস্বার্থ প্রেমকে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না, লালসা বলিয়া ছোট করা চলে না। অন্তরের দিক হইতে দেখিলে সেই প্রেমের আকর্ষণকে স্বেচ্ছাকৃত অপরাধ বলিয়াও গণ্য করা যায় না। যাহারা কোনো ঘটনা পরম্পরা বা কোনো গভীর দুঃখ-বেদনার মধ্য দিয়া ঐ প্রকার সামাজিক অধিকারহীন প্রেমের সাক্ষাৎ পায় তাহারা জানে ঐ প্রেমকে জীবনে সার্থক করিয়া তুলিবার কোনো সৎ উপায় নাই, বরং বহু দুঃখ-লাঞ্ছনা ভোগ করিবার পথ প্রস্তুত আছে, তবু তাহারা কিছুতেই অন্তরের সত্যকে অস্বীকার করিতে পারে না, প্রেমের এমনই মহিমা?

সেই প্রেমকে, যে প্রেমে পঙ্কিলতা নাই সীমা নির্দ্দিষ্ট নাই, স্নিগ্ধতা আছে, উচ্ছৃঙ্খলতা নাই, নীরব আত্মাহুতি আছে, যাহাতে অপরকে দহন করিবার স্পৃহা নাই, আপনাকে তিলে তিলে দগ্ধ করিয়া নিঃশেষ হইবার বাসনা আছে, সেই অন্তরের গ্রহণীয়, বাহিরের পরিত্যাজ্য প্রেমকে শরৎচন্দ্র, রমা ও রমেশ (পল্লী সমাজ) পার্ব্বতী ও দেবদাস (দেবদাস) প্রভৃতির ব্যর্থ জীবনের মধ্য দিয়া সাহিত্যে মূর্ত্ত করিয়া তুলিয়াছেন।

রুদ্ধ প্রেমের তীব্র বেদনা বক্ষে লইয়া কত মুকুলিত যৌবন নরনারী যে দিনের পর দিন অন্তরকে নিষ্পেষিত করিয়া বাহিরের কোলাহলে আপনাকে ডুবাইয়া দিয়া কোনোমতে দিন কাটাইয়া যাইতেছে, কে তাহার সন্ধান রাখে? নিস্পন্দ প্রায় সমাজ যে সত্যকে দেখিয়াও দেখে না বুঝিয়াও বোঝে না, উপরিউক্ত চরিত্রগুলি সৃজন করিয়া শরৎবাবু সেই সত্যকেই প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন বলিয়া মনে হয়।

দেবদাস যদি যৌবনের প্রারম্ভে পার্ব্বতীকে জীবন-সঙ্গিনী রূপে পাইত, রমেশ যদি পল্লীসংস্কার করিতে যাইয়া রমাকে উৎসাহদাত্রীরূপে পার্শ্বে পাইত, তাহা হইলে তাহাদের প্রত্যেকের জীবন অপূর্ব্ব মাধুর্য্য মণ্ডিত হইয়া উঠিত এবং বহু দেশ ও সমাজ হিতকর কার্য্য তাহারা অনায়াসে সম্পন্ন করিতে পারিত সন্দেহ নাই।

কিন্তু নানারূপ সামাজিক বিধি-নিষেধের চাপে পড়িয়া তাহাদের অন্তরের অসাধারণত্বকে খর্ব্ব করিয়া অতি সাধারণ পাঁচজনের মতই সংসারে চলিতে হইয়াছিল।

প্রেমের হতাশায় যে মানুষ কতখানি নিরুৎসাহ নির্বীর্য্য হইয়া পড়িতে পারে ঐ সকল চরিত্র পাঠ করিলে তাহা সুস্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম করা যায়।

যে প্রেমের ব্যর্থতায় অচলা (গৃহদাহ), কিরণময়ী (চরিত্রহীন) অন্তরে তীব্র জ্বালা অনুভব করিয়া হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হইয়াছিল, সেই প্রেমের স্পর্শেই সাবিত্রী (চরিত্রহীন) চন্দ্রমুখী (দেবদাস) আপনাদের হারানো নারীত্ব ফিরিয়া পাইয়াছিল।

আমি কয়েকটি মাত্র উল্লেখ করিলাম, শরৎবাবু আরো বহু সুন্দর চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন যাহা পাঠে বিস্ময়ে বিমুগ্ধ না হইয়া থাকা যায় না!

আর বেশী আলোচনা করিতে যাইলে প্রবন্ধটির কলেবর বিশেষ বৃদ্ধি পাইবে অতএব তাহার আবশ্যক নাই। পরিশেষে আর দুই একটি কথা বলিয়া ইহা সমাপ্ত করিতে চাই। শরৎসাহিত্যে নারীর আসন অতিশয় শ্রদ্ধার উপর প্রতিষ্ঠিত, তাঁহার প্রত্যেক গল্প উপন্যাসে নারী এমন একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে, যাহা সচরাচর দৃষ্ট হয় না, এবং নারীর মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে তিনি পুরুষ হইয়া যে নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন তাহা

অত্যাশ্চর্য্য প্রতিভার পরিচায়ক, সন্দেহ নাই। তিনি বহু বৈচিত্রপূর্ণ নারী চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন কিন্তু তথাপি অনেককে একছাঁচে ঢালাই করেন নাই, তাঁহার উপন্যাসের নায়িকারা প্রত্যেকে যেন আপনাতে আপনি সমুজ্জ্বল, স্নেহমমতায় পরিপূর্ণ অথচ নির্ভীক তেজস্বী, এইরূপ নারীই বর্ত্তমান যুগের আদর্শ হইবার উপযুক্ত বলিয়া মনে হয়।

বহু সুন্দর নব নব চরিত্রের স্রষ্টা বলিয়া ও মানুষের মনের গোপন বেদনার রূপকার অপূর্ব্ব মনস্তত্ব বিদ্ বলিয়াই আজ শরৎচন্দ্র শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক, অপরাজেয় কথাশিল্পী, মুগ্ধ পাঠকের অন্তরে তাই তাঁহার জন্য শ্রদ্ধার আসন প্রতিষ্ঠিত। শরৎচন্দ্র আপনার প্রতিভার অভিনব দানে বঙ্গ সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিতে পারিতেছেন বলিয়াই বঙ্গসাহিত্যে তাঁহার অপরিসীম প্রভাবকে অস্বীকার করা যায় না। বর্ত্তমান কথা সাহিত্যে শরৎচন্দ্রের অভিনব দান ও প্রতিভার প্রভাবকে শ্রদ্ধা ও গৌরবের সহিত স্বীকার করিয়া লইয়া আজিকার এই আলোচনা সমাপ্ত করিলাম।

কথা-সাহিত্য

প্রবন্ধ

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী এম-এ, ডি-লিট

"সাহিত্য" কথাটার মূলগত অর্থের মধ্যে যে ব্যাপকতার ভাব আছে, বর্ত্তমানে উহা তদপেক্ষা অনেক সঙ্কীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হয়। সাহিত্য কথাটার দ্বারা আজকাল আমরা যাহা বুঝি ও বুঝাই তাহা এই,—উপন্যাস, গল্প, কবিতা, নাটক ও এতৎসংশ্লিষ্ট আলোচনামূলক প্রবন্ধাদি। তাই সাহিত্য-সম্মেলনের বিভিন্ন শাখার নাম দেওয়া হয়, ইতিহাস-শাখা, দর্শন-শাখা, বিজ্ঞান-শাখা ও সাহিত্য-শাখা। ইতিহাস, দর্শন প্রভৃতিকে যেন আমরা সাহিত্যের পর্য্যায় হইতে কতকটা পৃথক করিয়া ফেলিয়াছি। এইরূপ সঙ্কীর্ণ অর্থে সাহিত্য শব্দটার প্রয়োগ হওয়ার ফলে, উপন্যাস ও গল্প প্রভৃতির স্বাতন্ত্র্য-রক্ষার্থে, কিছুদিন উহাদের নব নামকরণ হইয়াছে "কথা-সাহিত্য।"

কথা-সাহিত্যের যথাযথ সংজ্ঞা নির্ণয় করা বড় কঠিন। তবে মোটামুটি বলা যাইতে পারে, যে সাহিত্য কোন বিশেষ প্রয়োজন-মূলক নহে, মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সুখ দুঃখের চিত্র যাহার মধ্যে ফুটিয়া উঠে, তাহারই নাম কথা-সাহিত্য। কথা-সাহিত্যের ক্ষেত্র এই হিসাবে অত্যন্ত বিস্তৃত। মানব মনের নিগূঢ় রহস্য এই কথা-সাহিত্যের মধ্য দিয়াই আত্ম-প্রকাশ করে। কথাটা একটু পরিষ্কার করিয়া বলা যাউক। মানুষের সৃষ্ট যে কোন পদার্থ মানুষকে বাদ দিয়া টি'কিতে পারে না। ইতিহাস মানুষেরই অতীত চিন্তা ও কার্য্যের বিবরণ। দর্শন, বিজ্ঞান সকলেরই ভিত্তি মানুষের মনের উপর। সহজিয়া কবির সহজ উক্তির অনুসরণ করিয়া বলিতে পারি, "সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।" শাস্ত্র, বিজ্ঞান, চিকিৎসা, দর্শন, সবই মানুষের সৃষ্টি,মানুষের প্রয়োজনীয়তা ইহার প্রত্যেকটার সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে বিজড়িত। শাস্ত্রে রচিত হইয়াছে মানুষকে অসৎপথ হইতে সৎপথে চালিত করিবার জন্য, বিজ্ঞান মানুষের আধিভৌতিক জীবনের সৌকর্য্য সাধন করিতেছে, ইতিহাস দিতেছে মানুষকে অতীতের সংবাদ, দর্শন শাস্ত্র তাহার মনকে জটিল তত্ত্বের মীমাংসা করিয়া দিতেছে, আর সাধারণ সাহিত্য বা "কথা-সাহিত্য" তাঁহাকে দেখাইতেছে মানব মনের নব নব রূপ ও নব নব ভাবের অপূর্ব্ব বিকাশ।

গৃহস্থ বাটীর মাচার উপর লাউগাছ লতাইয়া উঠে, তাহার শ্যাম স্নিগ্ধ লাবণ্যের দ্বারা গৃহস্বামীর নয়ন মন চরিতার্থ করিবার জন্য নহে, তাঁহার পাকশালার প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য; কিন্তু বাটীর প্রবেশ পথে গেটের

উপর যে লতাটী হাওয়ার ভরে দুলিয়া ওঠে সে শুধু সৌন্দর্য্যেরই প্রতীক। প্রয়োজনীয়তার অনুপাতে তাহার মূল্য হয়ত এক কাণা কড়িও নহে। কিন্তু তাই বলিয়া সে তুচ্ছও নহে। আহার বিহারের আরামই মানুষের চরম উপভোগ্য নহে। দেহের খোরাক যে বস্তুটী, তাহার স্থূল প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে মনের খোরাকের মিল 'হুবহু' নাও হইতে পারে। মন যে বস্তুটী একান্তভাবে চাহে, তাহা সৌন্দর্য্য। সৌন্দর্য্য শুধু বহিরঙ্গ বস্তু মাত্র নহে, অন্তরঙ্গও বটে। দেশকাল পাত্রভেদে সৌন্দর্য্যেরও পার্থক্য লক্ষিত হয়। সৌন্দর্য্যের মূলে যে বস্তুটী থাকে তাহার নাম রস। এই রস সৃষ্টিই কথা-সাহিত্যের প্রধান ধর্ম্ম। যে আনন্দের অন্বেষণে মানুষের মন দিবারাত্র ঘুরিয়া মরে, রসই তাহার একমাত্র প্রস্রবণ। এই জন্যই আমাদের শাস্ত্রে ভগবানকে সর্ব্ব রসের মূলীভূত কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। "রসঃ বৈঃ সঃ।"

পাশ্চাত্য সাহিত্যের সংস্পর্শে আসার পর হইতেই বঙ্গ ভাষায় প্রকৃতপক্ষে "কথা-সাহিত্যের" সূচনা হইয়াছে। এখনকার দিনের ছোট গল্প বা উপন্যাসের মত বস্তু আমাদের দেশে একরূপ ছিল না বলিলেই হয়। ইহার অনুরূপ যে "আখ্যায়িকা" "আখ্যান" বা "উপাখ্যানাদি" প্রাচীন সাহিত্যে দেখিতে পাওয়া যায় তাহার "কথা" এই নাম দেওয়া গেলেও "কথা-সাহিত্য" তাহাকে কিছুতেই বলিতে পারা যায় না। আমাদের দেশের ত কথাই নাই, য়ুরোপেও "রেনেসাঁসের" পূর্ব্বযুগ পর্য্যন্ত "সাহিত্য" আর "সুনীতি" একাত্মবোধক ছিল। অর্থাৎ এক একটী নীতি শিক্ষা দিবার জন্যই এক একটী আখ্যায়িকার সৃষ্টি হইত। পাপের শোচনীয় পরিণাম ও পুণ্যের জয় ঘোষণা করা লেখক মাত্রেরই একান্ত কর্ত্তব্য ছিল। সাহিত্যিকের গতি নিয়ন্ত্রণের জন্য আইন কানুন পর্য্যন্ত রচিত হইয়াছিল। নিষেধের গণ্ডী পদে পদে লেখকের স্বাধীন মনকে সঙ্কুচিত করিয়া ফেলিত। ইহার ফলে দিন দিন শুধু পল্লবগ্রাহীদের সংখ্যাই বাড়িয়া চলিতেছিল। মৌলিক সৃষ্টির কার্য্য অগ্রসর হইতেছিল অতি মন্থর গতিতে।

কিন্তু মানুষের মনকে বিধি নিষেধের নাগপাশে চিরকাল বাঁধিয়া রাখা যায় না। মুক্ত প্রকৃতির আহ্বান যখন তাহার কাণে পৌঁছে, বন্ধনের শৃঙ্খল তখন টুটিয়া যায়। আজিকার যুগের কথা সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে "মানুষ"কে তাহার কেন্দ্র করিয়া। কোন মানুষকে সে বাদ দেয় নাই, তাহার কাছে ছোট বড় ভেদ ঘুচিয়া গিয়াছে—প্রতি নরের মাঝে সে আজ নারায়ণকে দেখিতে পাইতেছে। কাঞ্চন-কৌলীন্যের মোহ তাহার নাই, সে আজ শুধু অভিজাতের নহে, আজিকার কথা-সাহিত্য জনগণের সাহিত্য, নবযুগের নবীন জীবনের অগ্রদূত রূপে সে আপনার পথ ধরিয়া চলিয়াছে।

কিছুদিন হইতে সাহিত্য লইয়া একটী বাদপ্রতিবাদের সৃষ্টি হইয়াছে। কেহ বলিতেছেন, সাহিত্যের একটা আদর্শ থাকা চাই। সে আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইলে চলিবে না। সাহিত্য শুধু নিছক্ ভাব বিলাসিতার বস্তু নহে, জাতীয় জীবন গঠনে উহার একটা অতি প্রয়োজনীয় অংশ রহিয়াছে। সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য সাহিত্যের মধ্য দিয়া প্রচার কার্য্য চালাইতে হইবে। সুতরাং "বস্তুতান্ত্রিকতার" দোহাই দিয়া সাহিত্যে যা' তা' জঘন্য চিত্র অঙ্কিত করিলে চলিবে না।

অপর পক্ষ বলেন, সাহিত্য আর sermon এক জিনিষ নহে। সাহিত্যের উদ্দেশ্য রসসৃষ্টি। রসবোধের মধ্য দিয়াই মানব মনের সূক্ষ্ম অনুভূতিকে জাগাইয়া তুলিতে হইবে, তাহার জন্য কতকগুলি স্থূল নীতির বুলি না আওড়াইলেও কোন ক্ষতি নাই। "মরালিটীর" জন্য "আর্টকে" হত্যা করার কোনই আবশ্যক নাই।

এই দুইটী বিবদমান পক্ষের বিভিন্ন মতের ঐক্যসাধন কোন দিন হয় নাই এবং হওয়া সম্ভবও নহে। "ভিন্ন রুচির্হি লোকঃ।"

আধুনিক কথা-সাহিত্যের বিরুদ্ধে অভিযোগকারীগণের সর্ব্বপ্রধান অভিযোগ এই যে, ইহাতে নাকি সর্ব্বত্র শ্লীলতা রক্ষা হইতেছে না। অভিযোগটীর মধ্যে অনেকটা সত্য আছে। দুই একজন উগ্রপন্থী অতি-আধুনিক কথা সাহিত্যিকের লেখায় স্থানে স্থানে "আর্টের" দোহাই দিয়া যে সকল বিশ্রী বিষয়ের অবতারণা করা হইতেছে, উহাকে "আর্ট" বলা কোন মতেই যায়

না। আর্টের মধ্যে অ-সুন্দর কোন কিছু থাকিতে পারে না। শিশুর নগ্নতার মধ্যে সৌন্দর্য্য থাকিতে পারে বটে, তাই বলিয়া নগ্নতা মাত্রকেই সুন্দর বলা চলে না। তবে এ কথাও সত্য যে ক্ষেত্র উর্ব্বর হইলে ধান্যাদি শস্যের সহিত অনেক আ-গাছাও জন্মিয়া থাকে! যাহা আ-গাছা তাহা যত্নের অভাবে মরিয়া যায়, আর যত্ন পাইয়া ফসলের গাছ সতেজ হইয়া উঠে। আধুনিক সাহিত্যে যাহা অ-সুন্দর তাহা আপনা হইতেই বিলুপ্ত হইয়া যাইবে, যাহা যথার্থ সুন্দর তাহাই চিরকাল দীপ্তিমান হইয়া মানব মনের আনন্দ বিধান করিবে। তরুণ সাহিত্যকে যাঁহারা চোখ রাঙাইয়া ও গালিগালাজ পাড়িয়া দাবাইয়া রাখিতে চাহেন, এই কথাটি তাঁহারা মনে রাখিলে অনেকটা সান্ত্বনা পাইবেন বলিয়া আশা করা যায়।

প্রভাত-প্রয়াণে

শ্রীকিরণবালা দেবী সরস্বতী

মাসিক পত্রে প্রভাত বাবুর মধুর লেখা পড়িবার জন্য কি অধীর চিত্তেই না অপেক্ষা করিতাম! পত্রখানি বাড়ীতে আসিলে মোড়ক খুলিয়া প্রথমেই দেখিতাম প্রভাত বাবুর লেখা বাহির হইয়াছে কি না, —তাঁহার লেখা দেখিলেই মন আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠিত। কি সরল, কি স্বচ্ছ, কি সরস, কি জীবন্ত সে কাহিনী! কখনও আমাদের গৃহস্থ সংসারের খুঁটিনাটীর চিত্র তাঁহার মোহন তুলিকায় রঙ্গীন হইয়া উঠিত, কখনও বা ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের বিচিত্র ঘটনা চলচ্চিত্রের মত চোখের সম্মুখে উজ্জ্বল হইয়া উঠিত। লেখনীর একটি আঁচড়ে তিনি একটি জীবন্ত মূর্ত্তি গড়িয়া তুলিতেন, একটি কথার ভঙ্গীতে তিনি অফুরন্ত হাসির উৎস খুলিয়া দিতেন,—আর ত' সে লেখা পড়িবার সৌভাগ্য হইবে না! 'মাসিক বসুমতীতে যখন তাঁহার 'বিদায়-বাণী' বাহির হইতেছিল, তখন কে জানিত এই তাঁহার অসমাপ্ত চির-বিদায়-বাণী? প্রভাত বাবু বিদায় লইয়াছেন,—রচনা করিয়া গিয়াছেন মধুচক্র, নির্দ্দোষ, অনাবিল, মার্জ্জিত রস সাহিত্য, যাহা অসঙ্কোচে তরুণ-তরুণীদের হাতে তুলিয়া দেওয়া যায়।

বাংলা সাহিত্যে তাঁহার আসন কোথায় তাহার বিচার করিবেন আমাপেক্ষা বহু জ্ঞানী, সুধীবৃন্দ। মানুষ হিসাবে তিনি কেমন ছিলেন তাহার পরিচয় দিবেন তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধুগণ। আমি তাঁহার স্মৃতি পূজায় শুধু এই অর্ঘটুকু নিবেদন করিতে চাই যে তিনি আমাদের মত অল্প শিক্ষিতা, অন্তঃপুরচারিণীদিগকে সাহিত্য সেবায় যেরূপ উৎসাহ দিয়া গিয়াছেন, সেরূপ উৎসাহ আর বোধ হয় আমরা পাইব না। আমরা স্কুল কলেজে পড়ি নাই, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীলাভ ত' করিই নাই,—বালিকা বয়সে অবগুণ্ঠিতা বধূরূপে সংসারে প্রবেশ করিয়াছি, সেই অবধি ঘর সংসারের খুঁটিনাটী কাজ করিতে করিতেই সময় কাটিয়া গেল, বাহিরের আলোক আর পাইলাম না। নানা কাজের অন্তরালে অতি গোপনে, অতি সঙ্কোচে, কি জানি কেন আকাঙ্ক্ষা হইল, যদি কেহ বাণী মন্দিরের পথ দেখাইয়া দিত তবে দূর হইতে দুটি ভক্তি অর্ঘ্য মায়ের চরণোদ্দেশে অর্পণ করিতাম। কি দুরাকাঙ্ক্ষা! যাহার বিদ্যা নাই, জ্ঞান নাই, বাহিরের জগতের সহিত পরিচয় নাই, সে করিতে চায় সাহিত্য সেবা! প্রভাত বাবু এই শ্রেণীর মহিলা দিগকে যথেষ্ট উৎসাহ দিয়া গিয়াছেন। তিনি নিজে কষ্ট স্বীকার করিয়া ইহাদের লেখা সংশোধন করিয়া "মানসী-মর্ম্মবাণী"তে স্থান দিয়া গিয়াছেন। কখনও অনবসরের অভিযোগ করেন নাই। বিরক্তি বা উপেক্ষা প্রকাশ করেন নাই বা ছেঁড়া-কাগজের ঝুড়ির দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করেন নাই। প্রবীণ সম্পাদক মহাশয়দের কঠিন মাপ কাঠিতে আমাদের নগণ্য লেখা প্রায়ই অমনোনীত হইয়া ফিরিয়া আসে! আবর্জ্জনা সংস্কার করিয়া উদ্ধার করিবার প্রবৃত্তি, ধৈর্য্য বা অবসর তাঁহাদের নাই,—কিন্তু যতদূর জানি, প্রভাত বাবু এই শ্রেণীর লেখাকে অবজ্ঞা করেন নাই, উৎসাহ দিয়া উন্নতির পথে চালিত করিয়াছেন। তাঁহার অভাবে আজ এই কথাগুলিই বার বার মনে পড়িতেছে ও মন শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতায় তাঁহার স্বর্গগত আত্মার উদ্দেশে নত হইয়া আসিতেছে। তাঁহার আত্মা চির শান্তি লাভ করুক, এই প্রার্থনা।

সমর-ঋণ

AIN'T NOBODY GOIN' TO START ANYTHING AS LONG AS I'M AROUND!
WORLD WAR DEBTS
EUROPE
MARS

70¢ OF EVERY TAX DOLLAR GOES FOR WAR

ফাঁকির নেশা

সুরুচিবালা চৌধুরাণী

চার

রাজীবের কলিকাতার বাড়ীটা খুব বড়। তেতলার উপর দুইটী শুইবার, দুইটী কাপড় পরিবার এবং একটী বসিবার ঘর—আর বাকিটা মস্ত বড় ছাদ। দোতলায় চারিদিকে বারন্দা-ঘেরা ড্রইং রুম, লাইব্রেরী, রাজীবের ও সুরমার বিভিন্ন সিটিং রুম ও ডাইনিং রুম—এইগুলির সঙ্গে ছোট একটী করিডর দিয়া সংযুক্ত ভিন্ন আর একটী ছোট বাড়ী ছিল, তাহাতে পাঁচ ছয়টী বড় বড় ঘর অব্যবহৃত হইয়া পড়িয়াছিল। নীচে রাজীবের অফিস, সাধারণের ভিসিটিং রুম ইত্যাদি, তাছাড়া দুই তিনজন কর্ম্মচারীও থাকিত। বাড়ীটী উপর হইতে নীচ পর্য্যন্ত পরিপাটী রূপে দামী আসবাব দিয়া সাজানো!

বিবাহের পর কিছুদিন রাজীব ও সুরমা এক বেড্-রুম ব্যবহার করিত, তারপরে একদিন সুরমা পাশের ঘরে বিছানা করিয়া প্রকারান্তরে রাজীবকে জানাইয়া দিল যে সে দেরী করিয়া আসার দরুণ তাহার ঘুমের ব্যাঘাত হয়,—সেইজন্য এ নূতন ব্যবস্থা—সেই হইতে সুরমা সেইখানেই রহিল। প্রথমে দুই ঘরের মাঝের দরজা খোলা থাকিত তারপরে তাহাও বন্ধ হইয়া গেল। রাজীব এই বিষয় লইয়া কিছুই বলে নাই বা কোন মন্তব্যও প্রকাশ করে নাই।

কণিকার সঙ্গে মিশিবার পর হইতে সুরমার কয়েক দিন বেশ ভালো ভাবে কাটিয়া গেল। মাঝে সে দুইটা At Home ও চায়ের পার্টিতে যোগ দিয়াছে এবং দুই তিনটা সমিতিরও সভ্য হইয়াছে। দুই একদিন সিনেমায় সে কয়েক জন বন্ধু লইয়াও গিয়াছিল। সে দেখিল এইসব লইয়া সে নিজেকে ভুলিয়া বেশ সুখেই আছে। বেশ একটা নূতন উত্তম, নূতন চাঞ্চল্য তাহার ভিতর যেন একটা নব জীবনের সাড়া তুলিয়া দিল! সুরমা সেদিন এই কথাই ভাবিতে ভাবিতে তাহার ঘরের সামনে ছাদে পায়চারী করিতেছিল। সে ভাবিতেছিল কণিকা ঠিকই বলিয়াছে, কাহার উপর সে রাগ করিয়া অভিমান করিয়া বসিয়া থাকিবে? যে তাহার মর্ম্ম বুঝিল না, যে নারীর অভিমানের মর্য্যাদা দিতে জানিল না, যাহার মর্ম্মর হৃদয়-তলে সে কোন রেখাই আঁকিতে পারিল না, তাহাকে লইয়া কি করিবে সে? কথা না বলিয়া শাস্তি দিবে? কিন্তু তাহাতেই বা তাহার কি হইবে? সে যে তাহার নিকট কিছুই চাহে না—আদর বা উপেক্ষা কিছুরই সে প্রত্যাশী নয়! সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনে হইল মিনতির কথা—নগণ্য একটা ভিক্ষুককে সে দিয়াছে তাহারই সমান মর্য্যাদা। রাজীব হয়তো মিনতিকে গিয়া তাহার করুণ কাকুতি জানায়—আর দুইজনে হয়তো তাহাকে লইয়া কতই না বিদ্রূপ করে। এযে আরো অসহ্য। সে হয়তো তাহার এ অবস্থায় কত হাসিতেছে আজ—কত ব্যঙ্গ করিয়া!

স্বামীর উপর প্রতিশোধ নেওয়া যায় কি করিয়া? কিন্তু তাহার দৃঢ়তার কঠিন বর্ম্মে আহত হইয়া তাহার সকল সঙ্কল্পই টুটিয়া যায় যে. এবং অবশেষে সে নিজেই লুটাইয়া পড়িতে চায় ঐ পাষাণের কঠিনতায়। সুরমা ভাবিল অত চিন্তা তাহাকে একেবারে জর্জ্জরিত করিয়া তুলিয়াছে —এইবারে তাহার সব চিন্তা ডুবাইয়া দিবে সে বিস্মৃতির অতল গর্ভে,—বিশেষতঃ সে যখন মা হইতে চলিয়াছে। প্রথম-মাতৃত্বের সুখানুভূতি তাহার সারা দেহে বিদ্যুৎ-শিহরণ আনিয়া দিল—সে ভাবিল রাজীব জানে কি? না বোধহয় জানে না—জানিলে কি করিবে সে? সন্তান-স্নেহও কি তাহাকে তাহার কাছে আনিয়া দিতে পারিবে

না? অনেকক্ষণ তাহার একলা ভাল লাগিল না, একটু ঠাণ্ডাও বোধ হইল। ইচ্ছা হইল কাহারও বাড়ী একটু বেড়াইয়া আসে—তাহাও ভাল লাগিল না। সে উদ্দেশ্য-হীন ভাবে নীচে নামিয়া গেল। এমন সময় পুরাণা বেয়ারা মোহন খাবার প্রস্তুত জানাইয়া দিয়া গেল।

অল্প কিছু খাইয়া সুরমা তেমনি অনির্দ্দিষ্ট ভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল সমস্ত ঘরময়। ছোট বড় ফ্রেমে আঁটা ছবি—রাজীবের, তাহার, রাজীবের বাবা মা'র বড় বড় তৈলচিত্র, বার বার দেখা ছবিগুলি সে আবার ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিতে লাগিল। রাজীবের একটি ছবি ১৯।২০ বছর বয়সের—সুন্দর ছবিটি পিয়ানোর উপর সাজানো ছিল। সুরমা ফ্রেমশুদ্ধ হাতে নিয়া দেখিয়া একটু অবজ্ঞা-ভরে আবার তাহা ঠেলিয়া রাখিয়া দিল, তাহার মনে হইল ও সেই সময়কার ছবি, যে সময়ে মিনতি আসিয়াছিল। কিসের একটা ব্যথা তাহার সারা প্রাণ মথিত করিয়া চলিয়া গেল। মনে মনে সে গুণিল রাজীবের বয়স এখন ২৮,তাহা হইতে সুদীর্ঘ বৎসর মিনতি তাহার জীবন-সঙ্গিনী হইয়াছে—তাও অবৈধ, অন্যায় ভাবে, আর সে মাত্র চার বৎসর। যদি মিনতি না থাকিত তাহা হইলে তাহার জীবনটা আজ কত সুখের হইত। ফ্রেমে বন্দী রাজীবের ছবিগুলি কি সুন্দর! গভীর উজ্জল চোখের সুনিবিড় দৃষ্টিতে কি ভাষা লুকানো আছে, ঐ ঠোঁটের মোহময় বক্র রেখায় কি ভাব ব্যক্ত করে! সে তাহারই স্বামী—কিন্তু অন্তর তাহার প্রতিবাদ করিয়া উঠিল—সে যে মিনতিরও! সে সেখান হইতে লাইব্রেরীতে ঢুকিল—দেয়াল জুড়িয়া বড় বড় কাঁচের আলমারী ভরা বই—সুন্দর! হঠাৎ ওপাশে সুডৌল সুন্দর একটা দীর্ঘ ঋজু ছায়া দেখিয়া বুঝিল সে রাজীব—টেবিল ল্যাম্পের আলোয় বসিয়া একমনে বই পড়িতেছে। পুরু কার্পেট নীচে পাতা থাকায় সে সুরমার আগমন বুঝিতে পারে নাই, কিন্তু চুড়ীর শব্দে মুখ ফিরাইল এবং শান্ত সহজ ভাবে বলিল "কে? সুরমা! শোন, এদিকে একটু এসে বোস।" সুরমার এ ভাবে ধরা পড়িবার ইচ্ছা ছিলনা। নিরুপায় ভাবে সে একটু কাছে গিয়া দাঁড়াইল। রাজীব নিজের চেয়ার ছাড়িয়া দিয়া বলিল "বোস" সুরমা তবু বসিল না। রাজীব মৃদু হাসিয়া বইটা হাত হইতে টেবিলের উপর রাখিয়া বলিল—"চেয়ারটা তো কোন অপরাধ করেনি—বোস।"

সুরমা বলিল—"কি বলবে বলই না, আমি বসতে আসিনি।"

"বেশ বসতে না আস,—কিন্তু আমি অনুরোধ করছি, তোমার সঙ্গে একটু পরামর্শ আছে।"

সুরমা বসিয়া জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিল। রাজীব ছোট চেয়ারটা টানিয়া বসিয়া বলিল—"তুমি যখন গৃহ-কর্ত্রী, তখন গৃহ সংক্রান্ত ব্যাপারে তোমার মতামত নেওয়া উচিত। দিন দশেকের ভিতর পৃথা আসছে। থাকবেও কিছুদিন—ঘর কোনটা তাকে দেবে সেটা ঠিক করতে হয়। তার দুটী ছেলে মেয়েও আসছে তাদেরও একটা ঘর দিতে হবে।"

পৃথা রাজীবের ছোট বোন, সুরমা তাহাকে দেখিয়াছিল বিবাহের সময়, এবং মনে মনে তাহাকে ভালও বাসিয়াছিল। সে আনন্দিত হইয়া বলিল—"সত্যি? সে তেতলায় থাকবে—সিটিং রুমটা ছেলেদের বেড্রুম করে দিলে হবে।"

রাজীব আবার হাসিয়া বলিল—"চট্ ক'রে ব'লে ফেললে তেতলায়, কিন্তু তারপরে আরো যে ঘর দরকার, —আমারও family বাড়ছে যে"—

সুরমা আরক্ত হইয়া বলিল—"কে বললে তোমায়?"

রাজীব সে কথার উত্তর দিল না, শুধু স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে একবার তাহার দিকে চাহিয়া বলিল—"শোন, আমি বলি ছোট বাড়ী তোমাদের থাক্। ও পাশে আলাদা সিঁড়ি আছে, একটা portico আছে, ও কোয়াটারটা বেশ নির্জ্জনও কি বল?"

সুরমা মাথা নাড়িয়া সম্মতি দিল। রাজীব বলিল, "ঘর সব শুদ্ধ পাঁচটা আছে—তাহলে একটা তোমার বেড্রুম, একটা ডাইনিং, একটা সিটিং; একটায় পৃথা—আর একটায় নার্স, অসুধ পত্র ইত্যাদি। পৃথার ছেলেদের তেতলার একটা ঘরে রাখতে পারবো—কিম্বা পৃথার সঙ্গেই তারা রইল। কিন্তু তোমার ড্রেসিংরুম হল না আর baby—নাঃ—বাড়ীটা বাড়াতে হবে

দেখছি—নইলে কুলোচ্ছে না।" রাজীব হাসিয়া সুরমার দিকে চাহিল।

সুরমা পরে দেখিয়াছিল তাহার ঐটুকু কথার ভিতর কত মানে লুকাইয়া ছিল। "বাড়ী বাড়াতে হবে"—কত বড় সুখের সংসার পাতিবার আশায় রাজীব বলিয়াছিল আশা আনন্দে ভরা ঐ কয়েকটী কথা! সে আবার বলিল "পৃথাকে আমি লিখেছিলুম আসতে,—এ সময়টা একলা নির্জ্জনে থাকা ভালো নয়, মাস দুয়েক পর থেকে একজন নার্স ও থাকবে।"

সুরমা বলিল—"একলাই থাকতে ভাল লাগে, অভ্যাস হয়ে গেছে, বিশেষতঃ সেইদিন থেকে—"

রাজীব বলিল—"তুমিই তো আমাকে উত্যক্ত ক'রে তোল সুরমা, নইলে আমি তোমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করতে চাই না।"

সুরমা বলিল—"আমিও তো তোমাকে উত্যক্ত করতে চাই না,—তবে যদি সামান্য কথায় বিরক্ত হও, তাহলে তোমার সঙ্গে কথা বলাই বিপদ"—তারপরে একটু থামিয়া বলিল—"আজকাল মিনতির ওখানে যাও না?"

রাজীবের ভ্রূ মুহূর্ত্তের জন্য ঈষৎ কুঞ্চিত হইয়া আবার স্বাভাবিক আকার ধারণ করিল, সে বলিল—"তোমার এই অবস্থায়—আমি মিনতি সম্বন্ধে তোমার সঙ্গে কোন কথাই বলবো না।"

সুরমা তবু বলিল—"আচ্ছা, তোমরা আমার কথা নিয়ে খুব হাস না?"

রাজীব অবাক হইয়া প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে সুরমার দিকে চাহিল। সুরমা বলিতেছিল—"আমার মনে হয় তুমি আমার কথা গিয়ে ওখানে খুব বল, আর সেই নিয়ে খুব আলোচনা ক'রে হাস।"

রাজীব বলিল—"সুরমা, তুমি পাগল হয়েছ? কেন মিছামিছি ও সব উদ্ভট কল্পনাকে মনে স্থান দাও? আমি বলেছি কিছু বলবো না সে সম্বন্ধে, তবে এইটুকু বলতে পারি যে তোমার কথা নিয়ে কোনো আলোচনা কোনদিন হয় না,—আর সে তোমাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করে। এখন অন্য কথা বল—একটা কিছু পড়বো—শুনবে? কোন কবিতা—Shelly, Byron, Rossetti, অথবা Shakespeare, রবীন্দ্রনাথ—কি Eddison's Easay, কি History? কিছু একটা শুনবে?" রাজীব উঠিয়া একটা আলমারীর কবাট সরাইয়া বই বাছিতে লাগিল।"

সুরমার অন্তর আবার বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। রাজীব কেন তুচ্ছভাবে তাহার প্রাণটাকে লইয়া এই নিষ্ঠুর খেলা খেলিতেছে? সে কি ছেলে মানুষ? তাহার কি কথার একটা মূল্য নাই। রাজীব মিষ্টি কথায় তাহাকে কত ছলে মিথ্যা আদর জানায়, কিন্তু তার ভিতর থাকে তাহার প্রচ্ছন্ন অবহেলা—তাচ্ছিল্য। সে কি এতই উপেক্ষার বস্তু যে তাহার মিনতির সহিত সুদীর্ঘ অবসর কালের ভিতর সে একবারও তাহার নাম উচ্চারণ করিতে পারে না? বলিয়াছে সে "কোনদিন কোন আলোচনা হয় না" তাহা হইলে মিনতির সহিত আলোচনার যোগ্য বস্তু সে নয়? কেন রাজীব বলে না তাহার কথা? কেন সে বলে না স্ত্রীর অধিকার ও সত্তা স্বামীর উপর কতখানি তাহা হইলে তো মূর্খ স্ত্রীলোকটা তাহার গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবে। সুরমার সারা মন জ্বলিয়া উঠিল। রাজীব তখন ফিরিয়া আসিয়াছে—হাতে Shelly. সে বই খুলিয়া বলিল—"Shelly তোমার প্রিয় ছিল—শোন"—

সুরমা বলিল—"না, আমি চলে যাচ্ছি—"কিন্তু কাজে পারিল না—সে বসিয়া রহিল।—রাজীব তখন গম্ভীর স্বরে ভাবের সুধাধারা ঢালিয়া পড়িতেছিল—

"Hail to the blithe spirit!
Bird thou never wert,
That from heaven, or near it,
Pourest thy full heart
In profuse strains of unpre-
meditated art."

"Like a high-born maiden
In a palace tower,

Soothing her love-laden
Soul in secret hour
With music sweet as love,
Which overflows her bower.

"We look before and after,
And pine for what is not :
Our sincerest laughter
With some pain is fraught
Our sweetest songs are those
that tell of saddest thought."

রাজীব স্ত্রীর দিকে চাহিল,—সুরমা তখন কল্পনার স্বপ্নজাল রচিয়া ডুবিয়া গিয়াছিল বুঝি কোন এক সুখের সাগরে। তাহার নিমিলিত চোখ দুটী রাজীবের সুন্দর মুখের উপর স্থাপিত করিয়া সে হেলিয়া বসিয়া শুনিতে ছিল—অমর কবির মোহময়ী সঙ্গীত—সব ভুলিয়া। কবিতা, গান বাজনা তাহাকে পাগল করিয়া তুলিত, জগৎ ভুলাইয়া দিত। রাজীব থামিল, সন্তর্পণে একটী হাত সুরমার হাতের উপর রাখিয়া সে কোমল স্বরে জিজ্ঞাসা করিল "আর একটা পড়বো—সুরমা ?"

সুরমা অস্ফুট স্বরে বলিল—"চমৎকার ! তোমার মুখে আরো চমৎকার,—পড়—আবার পড়।" রাজীব পড়িতে লাগিল, এবারে "চয়নিকা" হইতে :—

"তুমি মোরে ক'রেছো সম্রাট্। তুমি মোরে
পরায়েছো গৌরব-মুকুট। পুষ্পডোরে
সাজায়েছো কণ্ঠ মোর ; তব রাজটীকা
দীপিছে ললাট মাঝে মহিমার শিখা
অহর্নিশি। আমার সকল দৈন্য লাজ,
আমার ক্ষুদ্রতা যত ঢাকিয়াছ আজ
তব রাজ-আস্তরণে।
হেথা আমি কেহ নহি,
সহস্রের মাঝে একজন, সদা বহি
সংসারের ক্ষুদ্র ভার,—কত অনুগ্রহ
কত অবহেলা সহিতেছি অহরহ ;
সেই শত সহস্রের পরিচয় হীন
প্রবাহ হইতে, এই তুচ্ছ কর্ম্মাধীন
মোরে তুমি লয়েছো তুলিয়া, নাহি জানি
কি কারণে ! অয়ি মহিয়সী মহারাণী
তুমি মোরে করিয়াছ মহীয়ান !

হে মহিমাময়ী মোরে ক'রেছ সম্রাট।"

রাজীব বই বন্ধ করিয়া মৃদুস্বরে ডাকিল—"সুরমা" সুরমা আবেশে শিহরিয়া উঠিল।

এমন সময় অতি কর্কশস্বরে টেলিফোনের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল সজোরে। রাজীব বিরক্তিসূচক একটা শব্দ করিয়া টেলিফোন ধরিতে উঠিয়া গেল, সুরমা চোখ মুছিয়া সচকিত হইয়া উঠিয়া বসিয়া সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল—"কে ?" রাজীব সুরমাকে কোন উত্তর দিল না,—সে টেলিফোনে বলিতেছিল—"কে ? ও ! কি ? আচ্ছা, আমি আসছি—ডাক্তারকে খবর দাও।" সুরমা আবার জিজ্ঞাসা করিল "কে ? কোথায় যাবে ?" রাজীবকে একটু উদ্বিগ্ন দেখাইল,—সে একটু ব্যস্তভাবে বলিল "সুরমা, আমার এক বন্ধু হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছে—এক্ষুনি একবার আমার যাওয়া উচিত, তুমি এইখানেই বসে' কিছু একটা পড়, আয়াকে ডেকে দি ? আমি এখুনি আসছি।" সুরমার সন্দিগ্ধ প্রশ্নাবলী—"কে ? কোন বন্ধু ? কোথায় ? ইত্যাদি শুনিবার আগেই রাজীব ঘর হইতে বাহির হইয়া গিয়াছে —এবং তার পরেই বাড়ী হইতে মোটর বাহির হইয়া গেল।

সুরমা নিজের মনে নানাকথা ভাবিয়া খাণিকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল তারপরে ধীরে ধীরে উঠিয়া উপরে চলিয়া গেল। মিনতি কি টেলিফোনে ডাকিল ? এ প্রশ্নও তাহার মনে বার বার উদয় হইয়া তাহাকে ব্যথিত করিয়া তুলিল,—আজ এ সুখের অবসর তাহাকে এমন করিয়া নষ্ট করিয়া দিল—এমন ভাবে যে খুব কমই পাইয়াছে—রাজীবকে। কিন্তু তাহার এ আন্তরিকতা কি সুরমাকে লক্ষ্য করিয়া, না তাহার অজাত সন্তানকে ?—তবে কি সুরমাকে দিবার তাহার আর কিছুই নাই ? তাহার কুবেরের ঐশ্বর্য্য সে দুই হাতে বিলাইবে অন্যকে, কিন্তু তাহার জন্য সে কি

নিঃসম্বল, নিঃস্ব হইয়া থাকিবে চিরকাল? সুরমা শুইয়া পড়িল—দুই ফোঁটা তপ্ত অশ্রু গড়াইয়া পড়িয়া উপাধানের শুষ্কতায় মিলিয়া গেল।

সুরমা পরে শুনিয়াছিল, সে ডাক সত্যই আসিয়াছিল, মিনতির বাড়ী হইতে। মিনতি তখন টাইফয়েডে ভুগিতেছিল—সেই দিন সে হঠাৎ মূর্চ্ছা যায়। শুনিয়া সুরমা অনেক কিছুই বলিয়াছিল রাজীবকে, কিন্তু রাজীব শুধু শান্তভাবে বলিয়াছিল—"সুরমা, একটু মাথা ঠাণ্ডা ক'রে ভেবে দেখো—মিনতি ব'লে নয়,—এই সময়ে যে কেউ হোক্—তাকেই সকলের দেখা, সাহায্য করা উচিত। এটা মানুষের প্রতি মানুষের কর্ত্তব্য।—" সুরমা অনুযোগ করিয়াছিল "তবে মিথ্যে বললে কেন?" রাজীব উত্তর দিয়াছিল "মিথ্যেটা অনেক সময় না বলে পারা যায় না, এতে অপরাধ হয় না, শাস্ত্রেও আছে—তা ছাড়া আমি সেদিন মিথ্যে বলিনি—সুরমা ভেবে দেখো—মিনতি আমার বন্ধুও—"

আবার সুরমা পূর্ব্বের মতন অভিমানে নিজেকে সরাইয়া লইল দূরে! শত যুক্তি তর্ক দিয়াও সে পারেনা নিজের অন্তরকে চাপিয়া রাখিতে,—বিদ্রোহের উত্তাল সাগরে ঝাঁপ দিয়া সে যেন নাচিয়া উঠিতে চায় শত কলনাদে।

কিন্তু এইবারে সে নিজেকে দূরে সরাইলেও সে লক্ষ্য করিল রাজীব যেন তাহাকে ঠিক যতখানি দূরে সে যাইতে চাহিতেছিল—ততখানি দূরে যাইতে দিতেছিল না। সে অনুভব করিল, বুঝিতে পারিল, রাজীব অলক্ষ্যে থাকিয়া সর্ব্বদাই তাহার সংবাদ লয়। সে ঠিক সময় মত খাইল কি না, সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখে। তাহার মনে হইত মাঝে মাঝে বুঝি তত্ত্বাবধানের মাত্রা অত্যধিক হইয়া উঠিতেছে। একটা তৃপ্তির সহিত সে একটু বিরক্তিও বোধ করিত,—ভাবিত বাহ্যিক কতগুলা শিষ্টাচার ও নিয়ম রক্ষা করিয়া সে কি তাহার কর্ত্তব্য সমাধা করিতেছে? অথবা এ শুধু সন্তান-স্নেহ। কিন্তু আর কি তাহার করিবার, দেখিবার, বুঝিবার, কিছু নাই? না, নাই বোধ হয়, তাহা না হইলে সে এখনো মিনতিকে ত্যাগ করিল না কেন? ঠিক প্রতিশোধ নেওয়া হইত যদি সুরমা তাহার এ আতিশয্য উপেক্ষা করিতে পারিত কিন্তু সেও তাহা পারে না, কারণ সে যে মা। ঠিক এইখানেই যে দুইজনার উদ্দেশ্য একভাবে, এক ধারায় বহিয়া চলিয়াছে, এক স্থানে, এইখানে উভয়ে সমান, উভয় এক। এবং ইহাও সে জানে এ নূতন বন্ধনের সৃষ্টি না হইলে হয়তো সেই একদিনের বিচ্ছেদই তাহাদের হইত চিরবিচ্ছেদ।

পাঁচ

সুরমা তাহার পূর্ব্বভাবকে বেশ একটু জোর করিয়া ফিরাইয়া আনিয়া আবার নিজের ভিতর প্রতিষ্ঠিত করিয়া ফেলিল। পিয়ানো বাজাইতে গিয়া সে দেখিল তাহা অনেকটা হাতছাড়া হইয়া গিয়াছে—তাই সে ৩।৪ দিন ক্রমাগত অভ্যাস করিয়া আবার তাহার স্বাভাবিক মধুর স্পর্শ ফিরাইয়া আনিল। সময়কে সে আর অলস হইয়া বসিতে দিল না। সারাদিন সে বই পড়িয়া, গাহিয়া, বাজাইয়া কাটাইয়া দিত। বাহিরের সভাসমিতির কাজেও সে নিজেকে বেশ ব্যস্ত রাখিত। তার উপর রাজীবের ছোট খাট আদরগুলিও তাহার খুব মিষ্টি লাগিত। সে দেখিল এই দিনগুলাতে সুখ আছে, আনন্দ আছে! তার উপর, সবার উপর মাতৃত্বের গর্ব্ব ও আনন্দ তাহাকে ক্ষণে ক্ষণে পুলকিত করিয়া তুলিতেছিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে সে যেন আরো নূতন করিয়া রাজীবকে ভালবাসিয়া ফেলিল।

একদিন সুরমা একটু চায়ের আয়োজন করিয়া, কয়েকজন বন্ধুকে ডাকিয়া সন্ধ্যাটা বেশ আনন্দে কাটাইয়া দিল। কণিকা বলিল—"বাজনাটা বেশ হয়েছে!"

বীণা কাছেই বসিয়া আরো কয়েকজনের সঙ্গে আলাপ করিতেছিল। সে বলিল—"সুরমার touchটা বড় সুন্দর! কি বাজালে "Beethoven"এর "Minnet" না?

সুরমা বলিল—"হ্যাঁ—"

বীণা অন্তদের দিকে ফিরিয়া বলিল "ইয়োরোপিয়ান মিউসিকটা আমার মনে হয় সব চেয়ে কঠিন, আর বিজ্ঞান সম্মত—"

সুরমা বলিল—"নিশ্চয়! তার আর ভুল আছে? একটা সুরেই একসঙ্গে কত ভাবের সমাবেশ করে রাখে তারা, যা শুনলে একেবারে অবাক হয়ে যেতে হয়। প্রত্যেকটি সুরের লহরী যেন কথা কয়, আর তাদের সেই অপূর্ব্ব ভাষায় ব্যক্ত করে শোক, দুঃখ, আশা আর আনন্দ। কি অভিনব রচনা—!"

ওদিকে কে একজন বসিয়াছিল, সে বলিল—"আমি কিন্তু তোমাদের কথায় মানছি না, তোমরা বলতে চাও কি যে আমাদের ইষ্টার্ণ মিউসিক ওয়েষ্টার্ণের তুলনায় কোন অংশে খাটো?"

বীণা তীব্র প্রতিবাদ করিল—"নিশ্চয়!"

সুরমা এত তীব্রভাবে প্রতিবাদ না করিলেও একটু মৃদু ভাবেই বলিল—"তা বলতে পারি না, তবে ওয়েষ্টার্ণ মিউসিক অনেক বেশী 'রিচ', ভাল ক'রে বলতে গেলে অনেক কিছুই বলতে হয়, কিন্তু সোজা কথায় দেখতো ঐক্যতান ব'লে একটা জিনিষ নেই আমাদের এদিকে! পঞ্চাশটা যন্ত্রে একটা ঐক্যতান বাজালেও ঐ এক সুর বাজবে আর একশোটা যন্ত্র বাজালেও ঐ এক সুর ছাড়া আর গতি নেই। কিন্তু ওদিকে দেখ পঞ্চাশটা যন্ত্র পঞ্চাশ রকমে বেজে যাবে, কিন্তু সেই সঙ্গে সুরের মিল থেকে যাবে নির্ভুল ভাবে।"

মণিকা বলিল—"হ্যাঁ, বুঝেছি! আমাদের বীণার মত যন্ত্র একটীও ওদিকে আছে? অতগুলো তারের আলাদা করে সুর বেঁধে তার ঐক্যতান ঝঙ্কার—সেটা বুঝি কিছুই নয়?"

বীণা বলিল—"ও তো হ'ল একটা যন্ত্র কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্র দিয়ে harmony সৃষ্টি করার কথাই বলছি,—এক একটা symphony কি চমৎকার—"

মণিকা বলিল—"ঐ পিয়ানো নিয়েই যত কারিকুরি তো ওদের—কিন্তু ঐ পিয়ানোই হচ্ছে আমাদের বীণার নকল।"

বীণা বলিল—"সেটা বলা শক্ত—"

মণিকা উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিতেছিল—"আমাদের দেশের নাচ বল, বাজনা বল, গান বল সবই সুন্দর, তার ভিতর সেই হাজার হাজার বছর আগেকার সেই যুগ—সৌন্দর্য্য যেন এখনো ঘিরে রয়েছে। সেই সভ্যতা, সেই গৌরব, সেই হিন্দুর শৌর্য্য সবই তার ভিতর খুঁজে পাওয়া যায়। একটা পবিত্র মাধুর্য্যের ভিতর দিয়ে তা যেন শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য্য বিকাশ করে।"

করুণা বলিল—"সত্যি ভাই যা বলেছ ঠিক।" আজকাল সকলেই নাচে কিন্তু শুধু হাত পা বাঁকালেই নাচা হয় না। প্রকৃত ভারতীয় নাচ শিখতে হ'লে হিন্দুর সব পৌরাণিক বৈদিক বইগুলি পড়তে হবে এবং হিন্দুর ধর্ম্মের সঙ্গে খুব বেশী ক'রে পরিচিত থাকতে হবে, তাই আজ যাঁরা দেশ-বিদেশে বিখ্যাত হয়েছেন ভারতীয় নাচের জন্য, তাঁরা ঠিক এই সূত্র ধ'রে সেই আর্টের সাধনা করেছেন।"

মণিকা বলিল—"তা ঠিক, হিন্দুর ঘরে ঘরে এই যে আরতি, পূজো, সন্ধ্যাদীপ দেখানো, পূজোর নানারকম মুদ্রাগুলো সবেতেই খুব বেশী রকম নীচের ভঙ্গি আছে, আর আসল হিন্দু দেব-দেবীদের নিয়েই তো নাচের সূচনা—"

সুরমা এতক্ষণ সকলকে চা ও খাবার দিতেছিল—সে বলিল—"তাতো ঠিকই। এখানে, আমি তোমাদের কথা মেনে নিচ্ছি—কিন্তু অন্যটা মানছি না—তোমাদেরও কিন্তু যার যেটা ভাল সেটা মেনে নেওয়া উচিত।"

মণিকা বলিল—"আরে তাতো মনে মনে খুব বুঝি, কিন্তু নিজের দেশকে কি ক'রে খাটো করি বল—? আর সত্যি যখন সে খাটো নয়—যেমন তোমার সাড়ীটা সুন্দর—? কিন্তু দেখো আমারটীও সুন্দর—দামী।

সুরমা হাসিল।

করুণা বলিল—"সুরমা, এসো ভাই আমরা একটা "ত্রৈর্য্যত্রিক সম্মিলনী" খুলি, নাচ, গান, বাজনা একসঙ্গে শেখানো হবে। আমাদের নিজস্ব ব'লে আর কিছুই রইলো না, পুব-পশ্চিম সবেতে একেবারে খিচুড়ি পাকিয়ে যাচ্ছে? এটা কত বড় দুঃখের কথা!—আমাদের চেষ্টা করা উচিত সে-সব যেনো আবার ফিরিয়ে আনতে পারি!"

কণিকা একটু আগে সেখানে আসিয়াছিল, সে বলিল—"ও সব পরে হবে; আগে তো মেয়েদের আত্মরক্ষা করতে শেখাও—তারপরে artএর চর্চ্চা করো।"

মণিকা বলিল—"কি যে কণিকার idea! সব এক সঙ্গে গ'ড়ে তুলতে হবে—এও আমাদের একটা সম্পদ ঐশ্বর্য্য, এটার জন্যই বা কেন আমরা জগতের চোখে দীন হ'য়ে থাকবো? সব হবে—এবং একসঙ্গেই হবে। তুমি দেখে নিও।"

খানিকক্ষণ কথাবার্ত্তার পর সকলে গৃহকর্ত্রীকে ধন্যবাদ দিয়া চলিয়া গেল। কণিকা তখনো বসিয়াছিল, সে বলিল—"এ ক'দিনে সুরো তোর চেহারা অনেকটা বদলে গেছে।"

সুরমা একটু হাসিয়া বলিল—"মনটা একটু ভালোই আছে—"

লোকে যে বলে মনের সঙ্গে চেহারার খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে সে কথাটা ঠিক, সেইজন্য মনের কোণের গোপন আনন্দ বা ব্যথা কিছুতেই লুকানো যায় না।"

"যায় বই কি, এমন লোক আছে যারা নিজের মনের ভাবগুলোকে এমন লুকিয়ে রাখতে পারে যে তাকে যত রকম আলো ফেলে দেখতে বা বুঝতে চেষ্টা কর না কেন কিছুতেই তার মনের সন্ধানটী জানতে পাবে না।"

কণিকা একটু ভাবিয়া বলিল, "হ্যাঁ এমন লোকও আছে বটে, কিন্তু খুব কম বোধহয়, কারণ আমি একটীও দেখিনি।"

সুরমা বলিল—"আমার সঙ্গেই একজন আছে, তাকে যে কিছুতেই আমি বুঝতে পারলুম না।"

কণিকা হসিল—"বুঝতে পারলি না। এটা তোর অকৃতকার্য্যতা!"

"অকৃতকার্য্যতা আমার বুঝি?"

"তা নয়তো কি। ওদের আর বুঝতে কি? ওরা তো মেয়েদের চোখের ইসারায় ঘোরে, হাতের ইসারায় চলে। মেয়েরা ইচ্ছে করলেই ওদের নাচিয়ে তুলতে পারে।

"সুরমা অবিশ্বাস ভরে মাথা নাড়িয়া হাসিল—"দূর!"

"দূর বুঝি। ওদের চালাতে জানলেই ওরা ঠিক থাকে।"

সুরমা আবার হাসিল, একটু পরে বলিল, "আচ্ছা কণা সকলে ও কথাটা জানে বোধহয়।"

"কোন কথাটা?"

"মিনতির—

কণিকা একটু ভাবিয়া বলিল—"তা জানে না বোধ হয়, বরং লোকে উল্টাটাই জানে। জানে তুই খুব lucky—রাজীব বোসের অত বড় নাম, position, আর অমন সুন্দর চেহারা, তার সঙ্গে love marriage। কি রকম enviable position তোর।"

"আচ্ছা, তোর যদি আমার মত position হ'ত তো কি করতিস?"

"আমি? আমি হ'লে তুমুল ঝগড়া ক'রে একদিনেই একটা এস্পার-ওস্পার করে তুলতুম।"

"আর বিয়ের আগে থেকে জানলে?"

"বিয়ের আগে থেকে জানলে বিয়ে করা দূরের কথা, তার মুখও কখনো দেখতুম না—"

"ইস্ তুই যে একেবারে strict officer"

"নিশ্চয়!"

"আমার কিন্তু মনে কি হয় জানিস? মাঝে মাঝে ভাবি, ও দুর্ব্বলতাটা থাকলোই বা, তাতে আমার কি। আমি তো লোকতঃ ধর্ম্মতঃ তার স্ত্রী—"

"লোকতঃ ধর্ম্মতঃ অত শত জানি না। আমার সোজা কথা,—সোজা কারবার—tit দিলেই tatটী নিতে হবে—"

"আমি কিন্তু প্যান প্যানে পুরুষগুলোকে দুচক্ষে দেখতে পারিনা। পুরুষ হবে ঠিক পুরুষেরই মতন।"

কণিকা বলিল—"তা জানিনে—বরং প্যান্ প্যানে পুরুষ সহ্য হয় কিন্তু মেয়েদের ঢলঢল প্যান্প্যানে ভাব আমার অসহ্য। আমার সব চেয়ে অসহ্য হ'য়ে ওঠে যখন পুরুষরা মেয়েদের উপর প্রভুত্ব জানায়। আমার মনে হয়, তুমি যা,আমিও তা! আর ইচ্ছে হয় কি জানিস্। শুধু রাতদিন ওদের ধমকে রাখি।"

সুরমা হাসিয়া উঠিল—বলিল—"কিন্তু ভাই দেখ

যাকে ভালবাসা যায় তার ভিতর ঐ প্রভুত্বের ভাবটুকুই বেশ মিষ্টি লাগে, অনেক সময় প্রিয়ের কাছ থেকে একটু শাসন, একটু চোখ রাঙানি বেশ মধুর লাগে।"

"তুই আছিস্ তোর Sentimentality নিয়ে। ওদের জানিস না তো, একটু খানি চোখ রাঙাতে দিলেই রাঙা চোখেই তারা চিরকাল কথা বলবে, তাই প্রথম থেকেই দেখতে হয় যাতে ওরা এতটুকুও চোখ রাঙাতে না পারে। মিষ্টি, মধুর আমি বুঝি না, তবে যদি তুমি চোখ রাঙাও বেশ তবে আমিও রাঙাবো, তুমি আমারটা সহ্য কর, আমিও করবো। দেখো, ওদের আমরাই বড় বেশী উপরে তুলে দিয়েছি, ওদেরকে সঙ্কোচ ক'রে, ভয় ক'রে, শ্রদ্ধা করে! কি করতে হয় জানিস। ওদের কোন কিছুতে importance দিতে নেই। থিয়েটার করবো, বেশ তো, খুব আসো, দেখো, আপত্তি নেই, নেহাৎ গোলমাল কর, বের করে দিতে পারি এ সাহস আছে। ওদের আগে থেকে ভয় ক'রে দূরে সরিয়ে রাখবার কোন দরকার দেখি না, তা'হলে equality claim করা হ'ল না। রাস্তায় যাচ্ছি, আমার গা ঘেঁসে পঞ্চাশ জন চ'লে যাক না, আমার তাতে কি? কিন্তু অভদ্রতা করেছ যদি তার উপযুক্ত শাস্তিও দিতে পারি একটুকু শক্তি আমার আছে। আমি চাই একেবারে equality তার চেয়ে এক চুলও নীচু হব না, ছোট হব না, ওদের আবার লজ্জা, সঙ্কোচ, ভয়। ইস্! অতটা importance নাই বা দিলুম! যতই ও সব করা যায় ততই ওরা পেয়ে বসে।"

সুরমা বলিল—"স্বামীর সঙ্গেও equality।

"হাঁা, নিশ্চয়।"

"কিন্তু ঐ যে বল্লুম প্রেমের জগতটা একটু অন্যরকম।"

"অন্যরকম জানিনা, তবে আমার প্রেমও সমান। তুমি ভালবাস—বেশ আমিও বাসছি, না বাসো, তো জোর করে ভালবাসাতেও পারবো।"

"সুরমা হাসিয়া বলিল—মনে হচ্ছে, কণা তোর বক্তৃতাগুলো শুনে আমার বেশ সাহস বেড়ে যাচ্ছে।"

"ভালো, ভালো—এই তো চাই--cheer up—আজ উঠি, অনেক রাত হ'ল—"

"খেয়ে যা না ভাই—"

"হাঁা, আমি এখানে খেয়ে যাই, আর ওদিকে একজন শুকিয়ে থাক্—কথায় আছে—Be kind and good to all."

"যাঃ স্বামী বুঝি all এর ভিতর এলো।"

"তা না তো আবার কি। তোর দেখি বড্ড টান, তুই একটা S. P. C M. খুলে ফেল, আমিও তাতে যোগ দেবো এখন। বুঝলি। আচ্ছা, আজ আসি। অনেক বকা গেল—Good night, আর নীচে আসিস না তুই।" কণিকা নীচে নামিয়া গেল।

সুরমা কণিকাকে বিদায় দিয়া সমস্ত বাড়ী ঘুরিল, রাজীবের সন্ধানে, কিন্তু তাহাকে পাইল না, জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল রাজীব এখনো ফিরে নাই, সে বাহিরে গিয়াছে। সে ঘড়ি দেখিল—নয়টা বাজিয়া গিয়াছে। ক্ষুব্ধ মনে একলাই কিছু খাইয়া, পিয়ানোটা খুলিয়া বাজাইল, তারপরে একটী বই টানিয়া লইয়া পড়িতে বসিল। কতক্ষণ কাটিয়া গেল সে বুঝিতে পারে নাই, সে ডুবিয়া গিয়াছিল তখন shellyর কবিতার মর্ম্মে মর্ম্মে। অনেকক্ষণ পরে আনমনে ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিল, ১১টা বাজিয়া গিয়াছে। একটী ক্লান্ত নিশ্বাস ফেলিয়া হাই তুলিয়া, বই বন্ধ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতে নীচে শুনিল গাড়ীর শব্দ, তারপরই একটু গোলমাল। সুরমা কৌতূহলবশে সিঁড়ির উপরের প্রশস্ত বারন্দাটায় দাঁড়াইয়া ঝুঁকিয়া নীচের দিকে দেখিল মোটর হইতে একটী লোককে রাজীব ও দুই তিনজন চাকর নামাইয়া আনিতে চেষ্টা করিতেছে। সুরমা ব্যাপারটা বুঝিতে পারিল না, সে খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল, দেখিল লোকটাকে নীচের একটা ঘরের ভিতর লইয়া যাওয়া হইল, সে হাঁটিতে পারিতেছিল, কিন্তু অন্যের কাঁধে ভর দিয়া। সুরমার ইচ্ছা হইতেছিল, কাহাকেও ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করে কি হইয়াছে, কিন্তু কাহাকেও না দেখিয়া সে তেতলায় তাহার শুইবার ঘরে গিয়া শুইল না, আয়াকে বিদায় দিয়া একটী বই লইয়া বসিয়া রহিল রাজীবের অপেক্ষায়।

অনেকক্ষণ পরে রাজীবের পদশব্দ শোনা গেল। রাজীব নিজের ঘরে গিয়া দরজা বন্ধ করিল। সুরমা বই

রাখিয়া সামনের দরজায় গিয়া ধীরে ধীরে করাঘাত করিতে ভিতর হইতে প্রশ্ন হইল "কে ?"

সুরমা মৃদুস্বরে বলিল "আমি, সুরমা !"

তৎক্ষণাৎ দরজা খুলিয়া রাজীব বাহিরে আসিয়া বলিল—"সুরমা ! ঘুমোও নি এখনো তুমি ? চলো ঘরে বসবে"—তাহাকে প্রায় ধরিয়া লইয়া রাজীব নিজের ঘরে একটী সোফায় বসাইয়া দিয়া একটী পাতলা চাদরে সযত্নে পা দুইটী ঢাকিয়া দিয়া, নিজে বসিল না, প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে সুরমার দিকে চাহিল, যেন জিজ্ঞাসা করিয়া—'কি চাও, কেন এসেছ ?' মাস তিনেক পরে স্বামীর ঘরে অনাহুত ভাবে আসিয়া সে বেশ একটু অসোয়াস্তি অনুভব করিল। তাহার মনে হইল, সে কি নিজেকে অনেকখানি খাটো করিয়া ফেলিল ? রাজীব কি তাহাকে অন্য কিছু ভাবিল ? সে একটু থামিয়া বলিল—"তুমি বোস—"

রাজীব মৃদু হাসিয়া আর একটী চেয়ার টানিয়া বসিয়া বলিল—"তুমি এতক্ষণও ঘুমোয়নি কেন ? এত রাত জাগা উচিত কি ?"

সুরমা সে কথার উত্তর না দিয়া বলিল"ও লোকটা কে ?

রাজীব খানিকক্ষণ চুপ করিয়া বলিল—"ও লোকটা—নাই বা জানলে সুরমা ! এ সময়ে ও সবে মন দাও কেন ?"

সুরমা জ্বলিয়া উঠিল—"সবই তুমি ওসব এ সময়ে ভাল নয়, ওটা উচিত নয়, ব'লে লুকিয়ে রাখবে আমার কাছ থেকে ? না বলতে হবে !"

রাজীবের মুখ একটুখানি কঠিন হইয়া উঠিল' সে বলিল—"শুনতে চাও তো শোন ; তোমার কাছ থেকে কোন কিছুই আমি লুকোতে চাই না—ও লোকটী আজ হঠাৎ আমার মোটরের নীচে পড়ে যায়—"

সুরমা অবাক হইয়া বলিল—"তবে হাসপাতালে নিয়ে গেলে না কেন ? এখানে নিয়ে এলে কেন ?"

"প্রথমতঃ সে কোনমতে হাসপাতালে যেতে চাইল না, অনেক কাঁদাকাটি ক'রে আমার কাছে বললো—সে রাস্তায় পড়ে থাকবে তবু হাসপাতালে যাবে না, তার নিজের কোন কারণ থাকতে পারে—"

সুরমা বলিল—"তা হ'লে ওর চিকিৎসার ব্যবস্থা কি হবে ?"

"বিশেষ কিছু আঘাত লাগে নি—বয়স বেশী নয় লোকটার, দেখতে নেহাৎ ছোটলোক ব'লে মনে হ'ল না—কিন্তু অত্যন্ত গরীব—তার কান্না দেখে মায়া হ'ল সেইজন্য এখানেই নিয়ে এলুম।"

"চিকিৎসা হবে না ?"

"সে ডাক্তার ডাকতেও বারণ করছে, আমার এখানে কিছু অসুধ ছিল ; আমি তাই দিয়ে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিয়েছি, বলছে কাল ভোরে এখান থেকে সরে যাবে—"

সুরমা বলিল—"লোকটা নিশ্চয় চোর কি দাগী আসামী তাই ধরা পড়বার ভয়ে হাসপাতাল যেতে চাইছে না—কোথায় এ ঘটনা হয়েছে ? পুলিশ ছিলনা ?"

"না সেখানে পুলিশ ছিল না।"

সুরমা অসহিষ্ণু ভাবে বলিল "কোথায় বললে না ?

রাজীব সে কথার উত্তর না দিয়া বলিল "সুরমা ঘুমোও গিয়ে—একটা বাজে—"

সুরমা স্থির হইয়া বসিয়া রহিল—রাজীব আবার বলিল—"আমার নিজের গোপনীয় তোমার কাছে কিছু নাই, কিন্তু যদি অন্যের কোন গোপন কিছু থাকে তা আমি তোমার কাছে প্রকাশ ক'রতে পারি না সুরমা—তবে—এটুকু যেন রেখো—এ লোকটাকে আমি এর আগে আর কখনো দেখি নি।"

সুরমা নিষ্ফল অভিমানে বিক্ষুব্ধ হইয়া, চুপ করিয়া বসিয়া, পায়ের উপর হইতে রাজীবের দেওয়া চাদরটী টানিয়া ফেলিয়া দিয়া, উঠিয়া দাঁড়াইয়া, একটু জোরের সহিত বলিল—"আমি বুঝতে পেরেছি, কেন তুমি হাসপাতালে না নিয়ে গিয়ে ওকে এখানে নিয়ে এসেছ, কারণ যেখানে এ ঘটনা হয়েছে সে জায়গার নাম তুমি প্রকাশ করতে চাওনা—নয় ?

রাজীব বেশ সপ্রতিভ ভাবেই বলিল—"অনেকটা তাই বটে—কিন্তু সুরমা শোন—" সুরমা চলিয়া যাইতেছিল, রাজীব একটু আগাইয়া গিয়া তাহার একটা হাত একটু চাপিয়া ধরিল—বলিল—"সুরমা তোমাকে একদিন বলেছি—তুমি আমার ওদিকটা কখনো দেখতে যেওনা, কারণ তাহলে তা হ'তে যে ব্যথা পাবে তা লাঘব করার

সাধ্য আমার নেই। অবুঝ হয়োনা, একদিন বলেছি তোমার সঙ্গে প্রথম থে'কে আমি কোন রকম প্রতারণা করি নি, তোমার সঙ্গে আমার অন্য সম্পর্ক—"

"আমি ওসব মানি না—"

রাজীব একটা কি উত্তর দিতে গিয়া থামিয়া গেল, তারপরে বলিল, "একটু ব'সে যাও। আর কাল সকালের ট্রেনেই পৃথা আসছে, মনে আছে? আমি ষ্টেশনে আনতে যাব—" রাজীব তাহাকে এক হাতে লঘুভাবে বেষ্টন করিয়া ধরিয়া বলিল—"একটু কিছু খেয়ে যাও—একটু drink—অত উত্তেজিত হয়ো না—একটু লেমনেড বা —" রাজীব আবার তাহাকে বসাইয়া বলিল—"একটু বোস—আমি বেয়ারাকে ডাকছি—" সে আর উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া চলিয়া গেল।

সুরমার আর উঠিয়া যাইবার শক্তি ছিল না, রাজীব যেন তাহাকে কোন যাদুর প্রভাবে মুগ্ধ করিয়া চলিয়া গেল, যাহা হইতে সে নিজেকে মুক্ত করিতে পারিল না। তার উপর এতক্ষণ বচসা করিয়া সে একটু ক্লান্ত বোধ করিতে ছিল—সোফার কুশনে মাথা রাখিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। অন্তরে তাহার বাধিয়া গিয়াছিল তুমুল দ্বন্দ্ব। স্বামীর কঠোরতাকে সত্য মানিয়া সেও কঠোরতার আবরণে তাহার হৃদয়ের সর্ব্ব-কামনা ঢাকিয়া রাখিবে—না—তাহার কোমলতার আবেশভরা উপাধানে মাথা রাখিয়া রচিয়া তুলিবে সে স্বপ্নময় অপূর্ব্ব নন্দন কানন? কণিকা ভুল বলে—ইহাকে কই সেতো ইচ্ছা মত চালাইতে পারে না। তবু এই ভালো—বুঝি এই ভালো—। মাঝে মাঝে পরাজয়ের লজ্জাও যে হয় অঙ্গের ভূষণ, একথা কি কণিকা বুঝে না—? জয়ের উল্লাস অনেক সময় যে আনন্দের চাইতে লজ্জাই আনিয়া দেয় বেশী করিয়া।

সুরমা ক্রমে ডুবিয়া গেল তাহার অভিনব স্বপ্ন-রাজ্যে! কণিকা মন হইতে কোথায় সরিয়া গেল। সে দেখিল কি সুন্দর সুখের রাজ্য পাতিয়া বসিয়াছে তাহারা—রাজীব আর সে—। ঐ যে রাজীব—তাহাকে তাহার সবল সুঠাম দুই বাহুর ভিতর টানিয়া লইয়া বলিতেছে, "সুরমা, এই তো আমি তোমার কাছে ফিরে এসেছি"—

"আর—আর মিনতি?"

"তাকে ছেড়ে এসেছি সুরমা।—আজ এই বাসন্তী রাতে—আজ এই ফুলের বাসরে শুধু তুমি আর আমি—"

সুরমা আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। সত্যই সে তাহার কোমল মৃদু স্পর্শ অনুভব করিল। কানের কাছে কে তাহাকে ডাকিতেছে—"সুরমা লেমনেড খাও—।" তাহার অর্দ্ধজাগরিত ওষ্ঠাধরের কাছে কে কি সুধা তুলিয়া ধরিল। সে একটু স্পর্শ করিয়া আবার ঢুলিয়া পড়িল কাহার চিরপরিচিত, প্রিয় দৃঢ় বাহুর আলিঙ্গনের ভিতর। তারপরে সে শুনিল "সুরমা এইখানে শুয়ে ঘুমোও তবে—" তারপরে কে ধীরে ধীরে তাহাকে একটি ফুলের মত সযত্নে তুলিয়া কোমল একটা বুঝি ফুলেরই আস্তরণের উপর রাখিয়া দিল। আর—আর—সঙ্গে সঙ্গে কাহার দুটী মোহন ওষ্ঠের ঈষৎ পরশ তাহার ওষ্ঠ স্পর্শ করিয়া কিসের বারতা জানাইয়া দিতেছে—?

সুরমা শিহরিয়া উঠিয়া আবার গভীর ঘুমে ঢুলিয়া পড়িল।
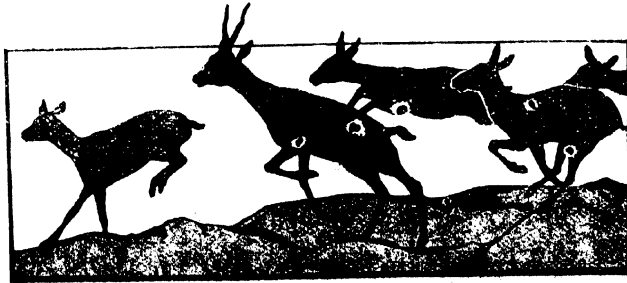
প্রতিশোধ

শ্রীপূর্ণশশী দেবী

জুম্মনের বাঁশী আজও বাজ্ছিল, সেই নির্জ্জন প্রান্তরে তরুবীথির স্নিগ্ধ ছায়াতলে, রোজকার মত।

কিন্তু বাঁশীর গানে আজ প্রাণ ছিল না। উচ্ছ্বাসহীন সুরটুকু তার নিঝুম মধ্যাহ্ন-প্রকৃতির মতই যেন অলসতা-ভরে এলিয়ে পড়ছিল।

বাদক একান্ত উন্মনা। উদাস দৃষ্টি তার শূন্যে নিবদ্ধ। বয়স কৈশোর ছাড়িয়ে গেছে; শ্যামবর্ণ, স্বাস্থ্য পুষ্ট, দৃঢ় পেশী-বদ্ধ সুগঠিত দেহ, কিন্তু মুখখানি শিশুর মত সুকুমার। পরিধানে রঙীন লুঙ্গী, লম্বা কোঁকড়া চুলগুলো জুলফীর আকারে ঘাড়ে এসে পড়েছে। কাছে কেউ ছিল না, সে একলা।

চৈত্রের উতলা বাতাসে সরু সরু হাল্কা বাব্লা পাতাগুলো সির্ সির্ করে কাঁপছিল। গাছ আলো-করা হল্দে রংয়ের ফুল এক একটী করে ঝরে পড়্ছিল নিঃশব্দে।

কোথায় কোন্ অদৃশ্য তরু শাখান্তরাল হতে ভেসে আসছিল ঘুঘুর একটানা করুণ সুর।

অদূরে করমচার ঝোপের কাছে কয়েকটা ছাগল আহার্য্য আহরণে রত। আর কেউ কোথাও নেই।

হঠাৎ অন্যমনা জুম্মনকে চকিত করে পেছন থেকে এক আঁচলা শুক্‌নো বাবলা ফুল তার মাথায় গায়ে ছড়িয়ে পড়্ল। সঙ্গে সঙ্গে হাসি! বালিকা কণ্ঠের সরল হাস্যোচ্ছ্বাস, সে হাসি তার চির-পরিচিত।

—জোহরা!

জুম্মন বাঁশী থেকে মুখ তুলে দেখলে তার অনুমান অভ্রান্ত—জোহরাই বটে, গাছের আড়ালে লুকিয়ে থাকলেও তার আশমানী রংয়ের ওড়না ঐ তো দেখা যায়। এতক্ষণে——

জুম্মনের চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। নিত্যকার অভ্যাসমত সে হাত বাড়িয়ে তাকে ধরতে গেল, কিন্তু হঠাৎ কি মনে করে কি জানি—উদ্যত বাহুখানা নামিয়ে নিয়ে মুখ ফিরিয়ে বাঁশীতে ফুঁ দিতে লাগল—অনাগ্রহের ভাবে।

—ব্যস্ ব্যস্! ঢের হয়েছে! ভারি তো সুন্দর বাঁশী—আহা! শুনলে কান্না পায় যেন!—

অন্তরালবর্ত্তিনী হাস্‌তে হাস্‌তে এসে 'ঝুপ' করে জুম্মনের পাশে বসে পড়্ল।

তার দিকে আড়ে আড়ে তাকিয়ে মুখখানা অসম্ভব গম্ভীর করে জুম্মন।

—যার ভাল লাগে না, সে আসে কেন? আমি তো কাউকে ডাক্‌তে যাইনি—আমার বাঁশী শুন্‌তে—

বলেই বাঁশীটা ছুঁড়ে ফেলে দিলে। তার কণ্ঠস্বরে রাগের চেয়ে অভিমানই বেশী!

—ওরে বাসরে! এত রাগ!

আগাছার ভেতর থেকে বাঁশীটা উদ্ধার করে জোহরা আবার জুম্মনের পাশে এসে বস্‌ল, তার হাতখানি আদর করে ধরে, দরদ ভরা মিষ্টি সুরে সে বল্লে—

জুম্মু ভাই! লক্ষ্মীটী, তোর আজকাল হয়েছে কি বল্ দেখি? কথায় কথায় খামখাই এমন রেগে উঠিস্—

খামখাই! বল্‌তে একটু লজ্জাও হল না তোমার?

তোমার! তবে তো আজকের রাগটা সামান্য নয়! অবশ্য রাগের কারণ একটু আছে বই কি! এবং এই 'একটু'ই যে জুম্মনের কাছে যথেষ্ট, জোহরা তা নিজের মনে বেশ জানে, কিন্তু তার কি দোষ? জুম্মন ভুরু দুটো কুঁচকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে জোহরার সঙ্কোচনত মৌন মুখের পানে খানিক নীরবে চেয়ে রইল, তারপর দৃপ্ত স্বরে ডাকল—

—জোহরা!

সে দৃষ্টিতে—সে স্বরে থতমত খেয়ে গিয়ে জোহরা বল্লে তা—আমি কি করব বল্? আমার কি দোষ?

আমি তো তখুনি চলে আসছিলুম—যখন তুই ছাগল নিয়ে বেরোলি, কিন্তু ওরা আস্‌তে দেয় না যে—

—ওরা কে? রমজান্ চাচা,—আর?—

—ইয়াসিন্ ভাই!

জুম্মন দপ্ করে বলে উঠল।

ওঃ! ওর আস্পর্দ্ধা কম নয় তো! তোর ওপর হুকুম চায় ও কোন্ সাহসে কিসের জোরে—শুনি?

ইয়াসিন যে কিসের জোরে কোন্ সাহসে হুকুমত চালায় তা জোহরার, চেয়ে জুম্মন বেশীই জান্‌ত, কিন্তু—সেটা মনে মনে স্বীকার করাও যে তার পক্ষে বিষম গ্লানিকর! সেই উড়ে এসে জুড়ে বসা আপদ কোথাকার—উঃ!—

রুদ্ধ আক্রোশে ঠোঁট কামড়ে সে বলে উঠল

বেকুব কোথাকার! বোঝে না সোঝে না—আচ্ছা, আমার কাছে তোকে দেখলে ও জলে যায় কেন বলতো? আমি কি তোকে খেয়ে ফেলব? এই সেদিন লোহা পিট্‌তে পিট্‌তে তেষ্টা পেয়ে গেল বলে তোর কাছে জল চেয়েছিলুম—তাতেই বাবুর কি তড়্পানি! ইস্! ইচ্ছে হল তক্ষুণি এক হাতুড়ির ঘায়ে শূয়োরটার মাথার খুলি উড়িয়ে দিই, দেবও কোনদিন তাই, যেরকম বাড়িয়ে তুলেছে—নাঃ, আমার আর সহ্য হয় না জোহরা। সত্যি বল্‌ছি খোদা কসম্—

জুম্মনের কণ্ঠস্বর উদ্‌ভ্রান্ত। চোখ দুটোয় যেন আগুনের ফিন্‌কী ফুটে বেরোচ্ছিল। জোহরা আতঙ্কে শিউরে উঠল। তাড়াতাড়ি জুম্মনের হাত দুখানা চেপে ধরে সে কাকুতি করে বল্লে—

—না না, রাগ করিস্ নে ভাই। আমার কথা শোন। আমি ওকে বুঝিয়ে দেব—তোর সঙ্গে যেন আর না লাগে। ও তো মন্দ লোক নয়,—তবে—

—নাঃ, বড্ড ভাল লোক! তুই তো তা বল্‌বিই রে! ও যে তোর···জুম্মন শেষে শব্দটা উচ্চারণ করতে পারল না। যে কথা মনে আনতেও শিরায় শিরায় রক্ত চল্‌কে ওঠে, সে কথা মুখে আনা সহজ নয় তো।

জুম্মন মুখখানা অন্ধকার করে খানিক গোঁজ হয়ে বসে রইল। তারপর হুস্ করে জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বল্লে—

—বেশ! আমার এখানে থাকা আর পোষাবে না দেখছি। ঘর ছেড়ে, গ্রাম ছেড়ে একদিন বেরিয়ে পড়ব—

দুই চক্ষে ব্যাকুল আগ্রহ ভরে জোহরা জিজ্ঞাসা করলে—

—কেন? কোথায় যাবি!

—যেখানে খুসী! আমার যাবার আর জায়গা নেই নাকি? না তোর বাপের দোকানে লোহা না পিট্‌লে খেতে পাব না? আমার কিসের পরওয়া? একলা প্রাণ, যেখানে মেহনৎ করব সেইখানেই...এদ্দিন কবেই চলে যেতুম, শুধু তোর জন্যে, তোর জ্বালায়—

—ফের!

জোহরা কাঁদ কাঁদ হয়ে বলে উঠ্‌ল —

—আচ্ছা, আমি তোর কি করেছি জুম্মু! সত্যি করে বল তো?

তার সে মিনতি-কাতর সরল প্রশ্নের উত্তরে অনেকগুলো উদগ্র, উচ্ছ্বাসময় রূঢ় বচন জুম্মনের গলার কাছে ঠেলাঠেলি করছিল, কষ্টে তা চেপে রেখে সে নরমভাবে উদাসস্বরে শুধু বল্লে—

—নাঃ তুই আর কি করবি? আমার কিস্‌মৎ!

আবার একটা বুক কাঁপানো তপ্ত দীর্ঘশ্বাস চৈত্র মধ্যাহ্নের উষ্ণশ্বাসে মিশিয়ে গেল। কাছেই একটা শুক্‌নো বাবলার কাঁটা পড়েছিল, জুম্মন কি মনে করে সেটা তুলে নিলে। তারপর জোহরার ক্ষুদ্র কোমল কর দৃঢ় মুষ্টিতে ধরে কাঁটাটা তার হাতে আল্‌গাভাবে আস্তে আস্তে ফোটাতে লাগল।

জোহরা শিউরে উঠ্‌ল—

—উঃ! কি করিস্ জুম্মু! লাগে যে!

লাগে? এইটুকুতেই? কিন্তু এমনি দশ বিশটা কাঁটা আমার কলিজায় ফোটে—যখন—ঐ শুয়োরকা বাচ্চাটা তোকে—

আঃ! ওকে গাল দিয়ে কি হবে বল? অব্বা ওকে আদর করে রেখেছেন বলেই—

—ইঃ রে! বড্ড গায়ে লেগেছে না? বেশ করব, খুব দেব ওকে গাল!

তুই শুন্‌তে না পারিস্‌ চলে যা এখান থেকে—

রাগে, জোহরার হাতখানা ঠেলে দিয়ে জুম্মন তিড়-বিড়্‌ করে বলে উঠল—যাঃ! এক্ষুণি যা! কে তোকে ডেকেছিল?

গলার স্বর কাঁপছিল তার, চোখের দৃষ্টি পাগলের মত বিভ্রান্ত।

জুম্মনের আজ হল কি? জোহরার কেমন গা ছমছম করতে লাগল, কি এক অজ্ঞাত আশঙ্কায়—নির্জ্জন প্রান্তর কাছে-পিঠে কেউ নেই—

সে বিবর্ণ ম্লানমুখে ভয়ে ভয়ে বল্‌লে—আজ তোর হয়েছে কি জুম্মু ভাই?

কিছু হয়নি। তুই এখন যাবি কিনা?

জোহরার আর ভরসা হল না থাকতে; সে জুম্মনের রোষদৃপ্ত মুখের পানে একটা চকিত করুণ দৃষ্টিপাত করে ক্ষুণ্ণ মনে ফিরে চল্‌ল যে পথে এসেছিল সেই পথে আর কথাটি না কয়ে।

জুম্মন বিস্ফারিত নেত্রে নিষ্পলক হয়ে চেয়ে রইল।

ধীরে ধীরে ধীরে, জোহরার আশ্‌মানী ওড়নার শেষ প্রান্ত, ঢিলা ইজারের গোলাপী আভাসটুকু, দোদুল্যমান সুগৌর হাত দুখানি দৃষ্টির অন্তরাল হয়ে গেল—আর দেখা যায় না।

তখন জুম্মনের বেদনাভরা চোখ দুটো জলে ভিজে উঠল।

ধীরে ধীরে সে খানিক এগিয়ে গিয়ে ডাকল—জোহরা!

সে ডাক জোহরা হয়তো শুন্‌তে পেলে না, কিম্বা শুনেও ফিরল না। যাক গে! না এলে তো বয়েই গেল! ভারি তো···

জুম্মনের ক্ষুব্ধচিত্তে অভিমানের ব্যথা উদ্বেল হয়ে উঠেছিল। ফিরে এসে সে গাছতলায় শুয়ে পড়ল অলস শ্রান্ত ভাবে।

উদাস বাতাস চঞ্চল হয়ে উঠল—তার দরদী-প্রাণের ব্যথার গানে—

নাজিম্‌ না থা ইয়ে তুম্‌কো
দিল্‌ লেকে দগা করনা,
মেহেরুম ইয়ে কিস্‌মত্‌ কা
ফের্‌ কিস্‌সে গিলা করনা।

দুই

সেও একদিন ছিল।

যখন জুম্মনকে নইলে জোহরার একদণ্ড চলত না।

জুম্মন তাদের কামারশালায় কাজ করে, জোহরা কাছে বসে দেখে।

ছোটখাট জিনিষগুলো হাতের কাছে এগিয়ে দিয়ে তাকে সাহায্য করে সাধ্যমত। পরিশ্রান্তের তৃষ্ণায় জল, ক্ষুধায় অন্ন মুখে মুখে যোগায়। অবসরকালে জুম্মন যখন তাদের ছাগল নিয়ে মাঠে যায়—তখনও সে ছাড়ে না। সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে খোলা মাঠে ছুটোছুটি করে বেড়ায়। রোদের সময় গাছের ছায়ায় বসে জুম্মনের সাথে গল্প করে। জুম্মন বাঁশী বাজায় জোহরা তন্ময় হয়ে শোনে।

জোহরার যত আদর আব্‌দার, রাগ অভিমান জুম্মন সহ্য করে, নির্ব্বান্ধব সংসারে এই মেয়েটীই ছিল তার একান্ত আপন জন, একমাত্র ভালবাসার পাত্রী।

তাদের দুজনের ছাড়াছাড়ি হত শুধু রাত্রিকালে। কারণ জুম্মনের রাত্রের আস্তানা ছিল নিজের ঘরে। তার ঘর বলতে একখানা খড়ের ছাউনী দেওয়া জীর্ণ কুঁড়ে, তাও শূন্য, তবু পৈতৃক ভিটে তো! ছাড়তে মায়া হয়।

জুম্মন দরিদ্র সন্তান। বাপ্‌কে মনেও পড়ে না তার, দুঃখিনী মা চরখা কেটে দিন গুজ্‌রাণ করত। জুম্মনের বয়স যখন বছর তেরো, তখন তাকে জোহরার পিতা রমজান মিঞার জিম্মায় রেখে সেও চক্ষু বুজেছে।

গ্রামের মধ্যে রমজান মিঞার ধার্ম্মিক ও দয়ালু বলে বেশ একটু খ্যাতি ছিল।

জোহরা তার একমাত্র আদরের ধন, নয়নের মণি, জোহরার মুখ চেয়েই লোকটা স্ত্রীবিয়োগের পর আর 'নিকা' করতে পারে নি।

অনাথ বালক জুম্মন অল্পদিনের মধ্যেই তার প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছিল,—নিজগুণে। সে নিরলস, কর্ম্মঠ, সরল ও সচ্চরিত্র।

তাই জুম্মনকে দোকানের কাজকর্ম্ম শিখিয়ে, দোকান ও একমাত্র স্নেহেরনিধিকে তার হাতে সমর্পণ করে, রাখতে পারবে, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এমনি একটা আশা রমজান মিঞা প্রথম থেকেই মনে মনে পোষণ করছিল, আশাপূর্ণ হতে কোনো বাধাই ছিল না, কিন্তু তার মত উল্টে গেল ইয়াসিন্‌কে দেখে।

ইয়াসিন জুম্মনের মত পরিশ্রমী না হলেও দেখ্‌তে শুন্‌তে বেশ, সভ্য ভব্য, ফিটফাট। হবে না কেন? লাহোর সহরে থাকে, লেখাপড়াও কিছু শিখেছে, এবং ঘরেও কিছু সংস্থান আছে, জুম্মনের মত সে নিরক্ষর নিঃস্ব ও জংলী নয় তো।

তাছাড়া ইয়াসিনের সঙ্গে এদের আত্মীয়তার সম্পর্কও একটা আছে নাকি,—সে রমজান মিঞার দূর সম্পর্কীয় এক চাচাজাদ্‌ ভাইয়ের ছেলে। সুতরাং পাত্র হিসাবে জুম্মনের তুলনায় ইয়াসিন সর্ব্বাংশেই শ্রেষ্ঠ ও বরণীয়। তবে জুম্মনের মত অনুগত বাধ্য হয়ে থাকতে হয়তো সে কোনোকালেই পারবে না। জুম্মন জোহরাকে কি ভালবাসে! তার মত আন্তরিক ভালবাসতে ইয়াসিন্‌ পারবে কি? যদি না পারে রমজান্‌ ভেবে ঠিক করতে পারছিল না, তার এখন কি করা উচিত। অবশ্য জোহরাকে নিজস্ব করে পাবার জন্য ইয়াসিনের দিক থেকেও কম আগ্রহ ছিল না, তন্বী কিশোরীর তরুণ রূপশ্রী তাকে বাস্তবিক মুগ্ধ আকৃষ্ট করেছিল। সে একজন সৌখীন যুবক এবং সুপুরুষও বটে, অতএব তার রুচি মার্জ্জিত হওয়াই সম্ভব।

কিন্তু ঐ জুম্মনটা…

যাকে দোকানের একটা চাকর ভিন্ন আর কিছু ভাবা যায় না, তার সঙ্গে বাড়ীর মেয়ে জোহরার এতখানি গলাগলি ভাব…শুধু তাই নয়, বাড়ীর কর্ত্তার উপর ওর এতটা আধিপত্য ইয়াসিনের নজরে প্রথমাবধিই কেমন অশোভন ও বিরক্তিকর ঠেকছিল। এ সম্বন্ধে কোনো অনুযোগ জানালে জোহরা বিস্ময় প্রকাশ করে বলত। বারে! ও চাকর হতে যাবে কেন? ও যে আমার জুম্মু ভাই!

রমজান তো হেসেই উড়িয়ে দিত, জুম্মন ঘরের ছেলে, 'পর' তো নয়? ছোটবেলা থেকেই ওরা দুটীতে একসঙ্গে ভাই বোনের মত মানুষ হয়েছে, সুতরাং…

দেখে শুনে গা গিস্‌ গিস্‌ করলেও ইয়াসিন জুম্মনের সাক্ষাতে কিছু বলতে ভরসা পেত না। কারণ বয়সে ছোট হলে কি হয়? নির্ভীক প্রকৃতি জুম্মনের ব্যায়ামপুষ্ট বলিষ্ঠ দেহ, লোহা ভাঙ্গা লোহার মতই শক্ত হাত দুখানা তার তুলনায় ইয়াসিনের মত ছিপ্‌ছিপে 'বাবু' লোকের শক্তি যে কত তুচ্ছ তা বুঝতে বাকি ছিল না।

একটুখানি ইসারা পেলেই জুম্মন তার উজ্জ্বল চক্ষের দৃপ্ত দৃষ্টি দিয়ে যে ভাবে চেয়ে থাকৃত, দেখে ইয়াসীনের বুক পর্য্যন্ত শুকিয়ে উঠত। তবু, আড়ালে জোহরাকে জুম্মনের কাছ থেকে তফাৎ রাখতে ইয়াসিন সর্ব্বদাই চেষ্টিত ছিল। সে চেষ্টা তার আংশিকভাবে সফল হয়নি এমন নয়।

ইয়াসিনের সঙ্গ এখন জোহরাকে পীড়া দেয় না, বরং আনন্দ দেয়।

কিন্তু জুম্মনের অসন্তুষ্টিও তাকে কম ব্যথিত করে না। সে যে তার আবাল্যের সহচর, অন্তরঙ্গ প্রিয় সুহৃদ্‌!

জোহরা যখন এমনি দোটানায় পড়ে, সেই সময় ভাগ্যবিধাতা তার জীবনধারার গতি নিয়ন্ত্রিত করে দিলেন অতি আশ্চর্য্য ও অপ্রত্যাশিত ভাবে।

সেদিন দোকানে অনেক কাজ এসে পড়েছে। রমজানকে রুটী খেতে পাঠিয়ে জুম্মন তার অসমাপ্ত কাজ তাড়াতাড়ি শেষ করতে চেষ্টা করছিল। গ্রীষ্মের দুপুর। রোদ ঝাঁ ঝাঁ করছে। লোহার ছাদ দেওয়া দোকান ঘরখানা তাতে যেন আগুন!

সামনের অগ্নিকুণ্ডটা হাপরের ফুৎকারে ক্ষণে ক্ষণে প্রদীপ্ত হয়ে উঠছিল; তার উত্তাপে জুম্মনের শ্যামল মুখখানা লাল হয়ে উঠেছে, সর্ব্বাঙ্গে ঘাম ঝরছে দরদর করে। ক্ষুৎ পিপাসা আকণ্ঠ। এমনি সময়—

দোকান ও অন্দরের মাঝামাঝি দরজার টাঙ্গানো 'চটে'র পর্দ্দাটা সরিয়ে জোহরা চুপি চুপি বল্‌লে—জুম্মু ভাই! হল? আজ কখন্‌ রুটী খাবে বলো দেখি!

ইয়াসিনের ব্যবস্থায় জোহরা আজকাল যখন তখন বাইরে আস্‌তে পায় না, সে দিনের দিন সোনা হচ্ছে তো।

পর্দ্দার ফাঁক থেকে জোহরার হাসিভরা প্রিয় মুখখানা দেখে জুম্মনের সকল ক্লান্তি জুড়িয়ে গেল যেন! গামছায় মুখের ঘাড়ের ঘাম মুছতে মুছতে সে একটু স্নিগ্ধ মধুর হাসি হেসে বল্লে—

—এই যে যাই, আজ বড্ড বেলা হয়ে গেছে না? কি করা যায়—এত কাজ, আমি না করলে যে রমজান চাচা এতক্ষণেও ছুটী···

জুম্মন এখানে-সেখানে ছড়ানো লোহার ছোট টুক্‌রো কব্জা, স্ক্রু প্রভৃতি দরকারি জিনিসগুলো কাঠের বাক্সটায় ক্ষিপ্রহস্তে তুল্‌ছে দেখে জোহরা আর থাকতে পারল না, পর্দ্দা থেকে বেরিয়ে এল, তাকে সাহায্য করতে। আহা বেচারা কি রকম ঘেমে উঠেছে! কত ক্ষিদে পেয়েছে তার, তুপুর গড়িয়ে গেল—এখনো···সত্যি, মানুষের শরীর তো! ইয়াসিন ঠাট্টা করে বলে, তোমার জুম্মু ভাইয়ের দেহখানা লোহা দিয়ে গড়া। বাস্তবিক এত খাটুনী অন্য ছেলে হলে...

জোহরা!

জোহরা ও জুম্মন তুজনেই চমকে উঠে দেখে—ইয়াসিন।

ইয়াসিন জোহরার দিকে চোক পাকিয়ে ক্রুদ্ধকণ্ঠে বল্লে—

কি আশ্চর্য্য! ফের এসেছ এখানে? তোমাকে আমি মানা করেছি না। একবার নয়, একশো বার, তবু শুন্‌বে না তুমি?

জোহরা হাতের কাজ ফেলে মুখখানি চুণ করে বল্লে—আমি তো ডাকতে এসেছিলুম শুধু, জুম্মু ভাই এখনো খায়নি তাই—

—ওঃ! জাহান্নমে যাক্ জুম্মু ভাই। যার পেট জল্‌বে সে আপনিই খাবে, তার জন্যে আবার খোসামোদ করা কেন? কি মুস্কিল! তবু দাঁড়িয়ে থাকে 'হাঁ' করে। আরে ভেতরে যাওনা—লজ্জা করে না এখানে এমন করে—

ইয়াসিন জোহরার হাত ধরে অনুজ্ঞার স্বরে বল্লে—যাও! ভেতরে যাও। এখানে আসবার তোমার কোন দরকার নেই, বুঝলে?

রোষ কষায়িত নয়নের শাণিত দৃষ্টি ইয়াসিনের মুখের ওপর নিক্ষেপ করে জুম্মন তর্জ্জন-স্বরে বলে উঠ্‌ল—

কক্ষণো যাবে না। ও বেশ করবে এখানে থাকবে। তুমি ওকে মানা করবার কে? খবরদার। ফের যদি কখনো শাসন করতে এসেছ তাহলে···

জুম্মনের মুষ্টিবদ্ধ হাত তুখানা ঊর্দ্ধে উত্থিত হল। মুখ চোখ তার আরক্ত, কিন্তু ইয়াসিনেরও আজ কম রাগ হয়নি—সেও ভয় না পেয়ে রুখে দাঁড়াল'—চোপ্‌রও। 'টুক্‌রা' খানে ওয়ালা কুত্তা কোথাকার। আমার 'বিবি'কে আমি শাসন করব তাতে তোর কি? তুই চাকর, চাকরের মত থাকবি—কথাটা শেষ হবার আগেই হারামী। শুয়োরকা বাচ্চা। বল্‌তে বল্‌তে লোহা পেটা হাতুড়ীটা ক্ষিপ্রহস্তে তুলে নিয়ে জুম্মন কুপিত সিংহের মত ইয়াসিনের ওপর লাফিয়ে পড়ল। চক্ষের নিমেষে—একটা বিকট আর্ত্তনাদ করে ইয়াসিন মাটীতে পড়ে গেল। তার মাথা কেটে রক্ত ছুটল ফিন্‌কী দিয়ে।

মারবার সময় হাতুড়ীটা হাত থেকে ফস্‌কে গিয়েছিল, আঘাত গুরুতর হলেও মারাত্মক হয়নি, তাই ইয়াসিন সে যাত্রা বেঁচে গেল।

কিন্তু হত্যার চেষ্টা করার অপরাধে বেচারা জুম্মনকে জেলে যেতে হল অল্পদিন নয় দীর্ঘ সাতবৎসরের জন্য।

তিন

নিস্তব্ধ রাত্রি।

এত অন্ধকার যে কোলের মানুষ চেনা যায় না।

শেটিয়ালা সহর থেকে ধবলান গ্রামের দিকে যে রেলের লাইন চলে গিয়েছে তার তুধারে জঙ্গল। সেই জঙ্গল থেকে আস্তে আস্তে বেরিয়ে এলো একজন লোক, তার মাথা ভরা রুক্ষ ঝাঁক্‌ড়া চুল, পরণে খাকি কুর্ত্তা ও খাটো জাঙ্গিয়া, তাও ছিন্ন ভিন্ন। বড় বড় চোখ তুটো অন্ধকারে হিংস্র পশুর মত জলছে। অতি সন্তর্পণে এদিক ওদিক চাইতে চাইতে আঁধারে গা ঢাকা দিয়ে লোকটা চুপি চুপি খোলা জায়গায় এসে দাঁড়াল। এক মুহূর্ত্ত ঊর্দ্ধে নক্ষত্র দীপ্ত মুক্ত আকাশের পানে চেয়ে থেকে সে গভীর শ্রান্তিভরে একটা সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে আপন মনে বল্লে—

—হা আল্লা! আর যে পারি না! ছত্রিশ ঘণ্টা হয়ে গেল—ক্ষ্যাপা কুকুরের মত জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে মরছি, এতটুকু বিশ্রাম নেই, পেটে একটা দানা নেই,—এর চেয়ে জেলখানা যে হাজার গুণে ভাল ছিল। সেখান থেকে কেন পালিয়ে এলুম? কিসের লোভে? যার জন্যে আমার এ দুর্গতি তাকে একবার—কিন্তু কি হবে দেখে? সে হয়তো—হয়তো কেন নিশ্চয়ই স্বামীর সঙ্গে সুখে আছে,—কম্‌বক্ত্ জুম্মু ভাইকে হয়তো ভুলেও কখনো—উঃ! জোহরা! জোহরা! জান্ আমার!—

অভাগা জুম্মনের দুচোখ ঝাপ্‌সা হয়ে গেল।

—নাঃ, আর গিয়ে কাজ নেই, ফিরে যাই—যে পথে এসেছি—কিন্তু এত কষ্ট করে, এত দূর এসে একবার না দেখেই—শুধু একবার চোখের দেখা,—জীবনে এ সুযোগ আর—

জুম্মন রেল লাইন ধরে চল্‌তে লাগল, কিন্তু দু পা গিয়েই হঠাৎ থম্‌কে থম্‌কে দাঁড়াল, ও কি? ও কিসের শব্দ? কেউ লুকিয়ে পেছু নিয়েছে নাকি? না, একটা শেয়াল বনের ভেতর ছুটে পালাল। তাতেই এত ভয়! হায়! একি বিভীষিকাগ্রস্ত অভিশপ্ত জীবন তার। এর চেয়ে জেলের মধ্যে কয়েদী হয়ে থাকা—নাঃ, কাজ নেই এমন 'আজাদী'তে, সে রাতারাতি ফিরে যাবে, গিয়ে আপন হাতে ধরা দিলে হয়তো তার অপরাধের গুরুত্ব কিছু লাঘব—কিন্তু সেই লোকটা—পলাবার সময় বাধা দিতে এসেছিল বলে জুম্মন যাকে ভারি পাথর ছুড়ে মেরেছে,সে যখম তো হয়েইছে তাছাড়া যদি একই আঘাতে পঞ্চত্ব পেয়ে থাকে—তবেই তো—

তা হলে জুম্মন এখন খুনী, নরহন্তা! উঃ!

ক্ষণিকের জন্য ধৈর্য্যহারা হয়ে, প্রলোভনে পড়ে সে কেন এমন অবুঝের মত কাজ করলে? এতকাল যে ভাবে কেটেছিল—তেমনি ভাবে মেয়াদের শেষ বছরটাও কেটে যেত—তারপর তো মুক্তি—মুক্তি! হায় ভাগ্য! মুক্তি তার একেবারেই মিলবে—সেই ফাঁসী কাঠে! হত্যাকারীর আর শাস্তি কি? ফাঁসী অনিবার্য্য। এমন করে কতদিন আর অনাহারে অনিদ্রায় বনে জঙ্গলে লুকিয়ে থাকা যায়? ধরা সে পড়্‌বেই, তার চেয়ে নিজে গিয়ে যদি ধরা দেয় তাহলে হয়তো...কিন্তু মানুষের জীব[ন] যে বড় প্রিয়। তার কত সাধের এই নবীন জীব[ন] অপরিতৃপ্ত তরুণ যৌবন, শেষে কি না ঘাতকের নির্ম্ম[ম] করে—ইয়া মালিক। তোমার মনে এই ছিল।

দুনিয়ায় এসে তার একি—

ঐ আবার। ও ধারে ওকে? পা টিপে টিপে [কে] আসছে না? পলাতক বন্দীকে শুধু তাই নয়—খুনী আসামীকে ধরতে—

না না, ওযে গাছের ছায়া বাতাসে দুল্‌ছে।

প্রতিপদে বাধা, প্রতি মুহূর্ত্তে বিভীষিকা। তবু [সে] যাবে। জীবনের শেষ সাধ পূর্ণ না করে গেলে সে [যে] মরণেও শান্তি পাবে না।

জুম্মন আবার চল্‌ল—শ্রান্ত অবসন্ন দেহ—টল-মলে পা দুখানা টেনে নিয়ে, শঙ্কিত দৃষ্টিতে এদিক্ ওদিক্ চেয়ে রেল লাইনের ধারে ধারে—

তার দীর্ঘ সবল ছায়া খানা...নিশীথের ঘন আঁধারে মিলিয়ে গেল দেখতে দেখতে।

চার

খাটিয়ায় পাতা মলিন শয্যায় শায়িত রুগ্ন শিশুর পাশে বসে জোহরা গালে হাত দিয়ে কি ভাব্‌ছিল—সে ভাবনার অন্ত ছিল না। শিশুটী কেঁদে কেঁদে ক্লান্ত হয়ে এই মাত্র ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘরে আর তৃতীয় প্রাণী নেই। শুধু কম্পিত দীপশিখার তালে তালে দেয়ালের স্তব্ধ ছায়া গুলো কেঁপে কেঁপে উঠছিল। জোহরার গা ছম্ ছম্ করছিল।

কি জানি ইয়াসিন কত রাত্রে ফিরবে!

ছেলের ওষুধ আন্‌বার বাহানায় সেই যে সন্ধ্যে বেলা বেরিয়েছে, এখনো দেখা নেই। হয়তো মদ খেয়ে কোথাও আড্ডা দিচ্ছে বসে, স্ফূর্ত্তির প্রাণ তার। স্ত্রী-পুত্রের দুঃখ, দরদ সেতো বোঝে না কখনো, বুঝলে কি এই দশা হয় তাদের।

জোহরার পিতা যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন ইয়াসিন এতটা বাড়াবাড়ি করতে পারেনি, তার মৃত্যুর পর একেবারে চুড়ান্ত করে তুলেছে।

তার অবিচারে, অত্যাচারে গরীব গৃহস্থ ঘরের লক্ষ্মীশ্রীটুকু নিঃশেষে অন্তর্হিত। তরুণী জোহরার পরিপূর্ণ যৌবন-সুষমা কীট দষ্ট কুসুমের মত হতশ্রী। আর এই দুগ্ধপোষ্য কচি শিশু নিষ্পাপ নিরপরাধ, জোহরার কত দুঃখের, কত আনন্দের আদরের ধন সে! এ শাস্তি তার উচ্ছৃঙ্খল চরিত্র জনকের দোষে না? হাকিমজী তো স্পষ্টই বলে গেলেন।

কোলে তোলা যায় না, এমন শোচনীয় অবস্থা, আহা বাছারে!

কি জানি জোহরা তাকে ধরে রাখতে পারবে কিনা!

এ দুরন্ত ব্যাধি যদি আরাম না হয়, জোহরার বুকের ধন যদি না বাঁচে, তবে যে···

ঘুমের ঘোরে শিশু চমকে ফুঁপিয়ে উঠল। জোহরা সজল চোখে, গাঢ় মমতায় তার শীর্ণ মুখখানি চুম্বন করে আস্তে আস্তে চাপড়াতে লাগল শিশু আবার ঘুমিয়ে পড়ল।

নিস্তব্ধ কক্ষে, নিদ্রিত পীড়িত সন্তানের পাশে জেগে বসে রইল শুধু চিন্তাকুলা স্নেহময়ী জননী।

ইয়াসিন ফিরল—তখন নিশুতি রাত।

সে ঘরে পা দিতেই জোহরা বুঝতে পারলে তার সন্দেহ সত্য।

স্বামী তার ঠিক স্বাভাবিক অবস্থায় নেই।

জোহরার আহত চিত্ত ধিক্কারে ভরে উঠল। সন্তান রোগশয্যায় পড়ে শুধ্‌ছে—দেখেও স্ফূর্তি করতে প্রবৃত্তি হয়!

ছি! ছি! এমন অমানুষের হাতেও পড়েছিল সে। এর তুলনায় অশিক্ষিত মূর্খ জুম্মন যে···হায়! ব্যথার ব্যথী বাল্যসাথী তার এ দুঃখের দিনে আজ সে কোথায়? কোন অন্ধ কারাগারে?

অনুতাপিতা জোহরার মর্ম্মস্থল মথিত করে জোরে একটা নিঃশ্বাস বেরিয়ে গেল।

উদাস গম্ভীর মুখে ইয়াসিনের দিকে চেয়ে সে জিজ্ঞাসা করলে, ছেলের 'দাওয়াই' এনেছ?

না, কি দিয়ে আন্‌ব? পয়সা—

পয়সা তো আমি দিয়েছিলুম—

—হুঁ। তাতে কি হয়? হাকিমজীর 'নুস্কা' তো তো সহজ নয় এই লম্বা—

বেশ। তাহলে হাত পা ছড়িয়ে ঘুমোও এখন। লজ্জাও করে না তো—বেহায়া, বেসরম্ কোথাকার।

রাগে, ঘৃণায় মুখখানা বিকৃত করে জোহরা আবার ছেলের পাশে গিয়ে বস্‌ল। সে মনে করেছিল আজ স্বামীর সঙ্গে আচ্ছা করে একটা বোঝাপড়া করবে, কিন্তু প্রবৃত্তি হল না।

—হুঁ, তো গাল দেবেই, দুনিয়ায় কায়দাই যে এই। যতদিন হাতে পয়সা থাকে, ততদিনই সব—তক্‌দীর আমার।

অপ্রকৃতিস্থ দেহখানা বিছানায় এলিয়ে দিয়ে ইয়াসিন ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বল্‌লে—

—আর কিছু শুনেছ—নতুন খবর? তোমার জুম্মু ভাই—

জোহরার বুকের ভেতর ধড়াস্ করে উঠল। জুম্মু ভাই। এই মাত্র যে তার কথাই মনে করছিল—কি হয়েছে তার?

ব্যাকুল উৎসুক চিত্তে দুটী চোখে বিপুল আগ্রহ নিয়ে সে স্বামীর মুখপানে চেয়ে রইল রুদ্ধ শ্বাসে। ইয়াসিন গলার স্বর খাটো করে বল্‌লে—স্বভাব যায় না মলে। এতকাল তো খেটেও ছোঁড়ার গোঁয়ার্ত্তমি গেল না,—আবার একটা খুন করে—

অ্যাঁ। কোথায়? কাকে খুন করলে?

—জেলের সেপাইকে। পালাবার সময় ওকে ধরতে গেছল বলে—

—তারপর? ধরে ফেল্‌লে?

—না, চম্পট দিয়েছে তক্ষুনি, একেবারে উধাও।

—এ কবেকার ঘটনা!

এই পরশু দিন, এখনো পাত্তা নেই। শুনলুম সহরে নাকি ট্যাড্‌রা দিয়েছে কয়েদীকে ধরে দিতে পারলে দুশো টাকা বক্সিস দেবে।

এক মুহূর্ত্ত জোহরার বিবর্ণ মুখে বাক্য নিঃসরণ হল না। সে স্তব্ধ হয়ে শুধু ভাবতে লাগল—জুম্মন তাহলে খুনী? সত্যি সত্যিই?

হায়! তার এ অধোগতির জন্য দায়ী কে? তখন জোহরা ছেলেমানুষ ছিল—বুঝতে পারে নি, কিন্তু এখন তো বেশ বুঝতে পারছে,—

হতভাগা জুম্মন তার আশা উৎসাহ ভরা জীবনটাকে এ ভাবে হেয়, বিপন্ন করে তুলেছে কাহার জন্য?

জোহরার দিক্ থেকে সাড়া না পেয়ে ইসাসিন আপনা আপনি বলতে লাগল—

—এখুনি হয়েছে কি? আরো কত খুন খারাপি করবে ও। আমি তো আগেই জেনেছিলুম—ছোঁড়া একজন পাকা খুনে—হ্যাঁ দেখ ইয়াসিন হঠাৎ সোজা হয়ে বসে শঙ্কিত স্বরে বল্লে—

—আমার বড্ড ভয় করছে কিন্তু! অন্ধকারে যখন চলে আসছিলুম পথে কেউ ছিল না, তবু হঠাৎ কেমন খট্‌কা লাগল—মনে হল কে যেন লুকিয়ে আমার পেছু নিয়েছে। আশ্চর্য্য কিছু নয়। ছোঁড়াটার আমার ওপর যে রকম আক্রোশ—একবার নিকেশ তো করেই ছিল—ছাড়া পেয়ে আবার যদি এসে জোটে—জোহরার সারা অঙ্গে কাঁটা দিয়ে উঠল।

—তাই কি। না না, সে যতই নিষ্ঠুর হোক্, তার দ্বারা এতবড় একটা নৃশংসতা—সম্ভব হতে পারে কি?—কিন্তু—না বলা যায়ই বা কি করে? সেবার খুন করতে তো বাকি রাখেনি কিছু, ইয়াসিনের নেহাত আয়ুবল ছিল বলেই সে যাত্রা বেঁচে গেল।

এখন সে যদি আবার আসে, ছুরী হাতে ঘাতকের বেশে উঃ। তাহলে জোহরা ছুটে গিয়ে বুক পেতে দেবে, জীবনে বিতৃষ্ণা ধরে গেছে তার।

ইয়াসিন ঘরের চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টিতে চেয়ে ফিস্ ফিস্ করে বললে—ধরা সে পড়বেই—কতলোক খোঁজ করছে—টাকার লোভে—দুশো টাকা কম তো নয়? আমরা পেলে এ সময় বত্তে—

দরজার শব্দ হ'ল খট্! খট্। খট্। কে ও?

ইয়াসিন্—চম্‌কে উঠে বল্‌লে—কওন হায়।

সাড়া নেই।

জোহরা বল্‌লে—

—করিমের মা বুঝি? দোরটা খুলে দাও তো—

হুঁ। তোমার এক কথা। রাত দুপুরে সে বুড়ী কি করতে আসবে? ও হয়তো বাতাস—

আবার সেই শব্দ।

—ঐ দেখ নিশ্চয়ই করিমের মা। সে বলেছিল ওদের বাগান থেকে 'আনার' এনে দেবে রোগা ছেলের জন্যে, বেচারি তাই বোধ হয় এত রাতে—জোহরা ব্যস্ত সমস্ত হয়ে নিজেই উঠে দোর খুলে দিলে, কিন্তু একি? এ আবার কে?

একটা অস্ফুট আর্ত্তধ্বনি করে সে দুহাত পেছিয়ে এলো। তার চক্ষে পলক নেই মুখখানা মৃতের মত পাংশু।

ইয়াসিন বিস্মিত ত্রস্ত হয়ে বললে—

কে রে বাবা। বল্লুম দরজা খুলো না, তবু—

তার মুখের কথা মুখেই রইল, নেশার ঘোর ছুটে গেল, যখন বাহিরের লোকটা সরাসর ঘরে ঢুকে এসে' পরিচিত স্বরে ডাকলে, জোহরা।

কতদিন কতকাল পরে দেখা—পরিবর্ত্তন কম হয়নি। তবু স্বামী-স্ত্রী দুজনেই চিনে ফেল্লে—তারা এইমাত্র যার কথা আলোচনা করছিল আগন্তুক সেই জেলপলাতক বন্দী জুম্মন। সর্ব্বনাশ! ইয়াসিন খাটিয়া ছেড়ে ধড় মড় করে উঠে পড়ল, কিন্তু এক পা এগোতে, একটা কথা বল্‌তে আর ভরসা হল না। হঠাৎ সামনে ভূত দেখলে যা দশা হয় ইয়াসিনের তখন সেই অবস্থা।

জুম্মন খানিক তীক্ষ্ণ তীব্র দৃষ্টিতে ইয়াসীনের ভীতি-বিহ্বল মুখের পানে তাকিয়ে রইল, পরক্ষণেই দৃষ্টি তার কোমল করুণ হয়ে এলো—খাটিয়ায় শায়িত রুগ্ন শিশুটাকে দেখে, তার অস্থিচর্ম্ম সার, ক্ষুদ্র দেহখানা যেন বিছানায় মিশে গিয়েছে। আহা বেচারা।

তাড়াতাড়ি জোহরার দিকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে একটা মর্ম্মভেদী গভীর নিঃশ্বাস ফেলে, জুম্মন গাঢ় কণ্ঠে বল্লে—জোহরা। আজ অনেক আশা নিয়ে এসেছিলুম প্রাণের মায়া না রেখে, কেন জানো? শুধু তোমাকে একটি বার দেখতে—স্বামী পুত্র নিয়ে তুমি সুখে আছ মনে করেই,—কিন্তু এখন ভাবছি না দেখাই বুঝি ভাল ছিল। তুমি যে এমন করে—

বেপথুমানা জোহরার রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠ থেকে কষ্টে উচ্চারিত হল—জুম্মু ভাই। রহেম্—

—ভয় নেই জোহরা। বেরহেম্ হলেও জুলুম করতে আসিনি আমি, কেবল তোমাকে একবারটী দেখতে—বল্লুম তো। তোমার বাচ্চা—

—হ্যাঁ, ও আর বাঁচবে না জুম্মু।

জোহরার কম্পিত কণ্ঠস্বর কান্নায় ভেঙ্গে পড়ছিল।

—আল্লার মর্জী।

ঘন দীর্ঘশ্বাসে বিকম্পিত বুকখানা দু'হাত চেপে জুম্মন বল্লে এ সময় কিছু টাকা পেয়ে গেলে উপকার হয় না? যে রকম দেখছি—তোমার স্বামীকে যদি আমার সঙ্গে পাঠাতে পারো ভরসা করে—

কোথায়?

থানায়। আমাকে ধরিয়ে দিলে দুশো টাকা বক্সিস্ দেবে সরকার, শোনোনি কি?

ইয়াসিন এতক্ষণ নির্ব্বাকভাবে দাঁড়িয়ে থর থর কাঁপছিল—এবার আর চুপ করে থাকতে না পেরে সে ভীতি ব্যাকুল স্বরে বলে উঠল—না না, টাকার দরকার আমার নেই—

তার দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে জুম্মন ধমক দিয়ে বল্লে—আঃ। থামো। টাকার দরকার তোমার না থাকতে পারে, কিন্তু তোমার স্ত্রী-পুত্রের দশা! আমি ওদের জন্যেই বল্ছি—আমাকে থানায় নিয়ে চলো—সাহস হচ্ছে না?—জোহরা, তুমি বলো, বিশ্বাস না হয় তুমিও আসতে পারো সঙ্গে।

—না জুম্মু ভাই, না। টাকা আমি চাই না। তুমি পালাও, এই মুহূর্ত্তে। এমন জায়গায় যেখানে গেলে বাঁচতে পারো—

—অসম্ভব। এমন বাঁচা না—ই বাঁচলুম জোহরা। মরতে তো একদিন হবেই—একটু প্রতিশোধ তুলে মরলে—

প্রতিশোধ।

হাঁ, চম্কে উঠলে যে? ভয় নেই, কিছু ভয় নেই। এ প্রতিশোধ প্রাণ নিয়ে নয় প্রাণ দিয়ে। যাচ্ছ ইয়াসিন। যাবে? ধরে নিয়ে যেতে হবে।

ইয়াসিনের হৃৎকম্প উপস্থিত হল। দীন নয়নে জোহরার পানে তাকিয়ে হাতে হাত ঘস্তে ঘস্তে সে কাতরভাবে বল্লে—

—আমাকে বাঁচাও জোহরা। আমি এই কাণ ধরছি, তোবা করছি আর যদি কোনোদিন তোমাকে—

—চুপ ভীরু কোথাকার। মরদ হয়ে জরুর কাছে—লজ্জাও করে না? ভাল চাও তো এসো বল্ছি নইলে—সেবারকার 'মার' মনে আছে তো?

বাপ! তা আর মনে নেই। সে কি ভোলবার কথা?

ইয়াসিনের কাঁপুনী বেড়ে গেল। সে স্খলিত কণ্ঠে আর্ত্তস্বরে বলে উঠল—চলো,—চলো আমি যাচ্ছি, কিন্তু আল্লার দোহাই—আমার কোনো দোষ নেই এতে—তুমি আমায় রাখো আর মারো—

কি মুস্কিল। বল্ছি তো কোনো ভয় নেই তবু—এসো, আর দেরী করো না। কেউ যদি দেখে ফেলে তাহলেই ফস্কে যাবে সব—

জুম্মন এগিয়ে গিয়ে ইয়াসিনের হাত ধরলো—বেচারা ইয়াসিনের আর 'না' বলবার শক্তি রইল না, সে যেন মন্ত্র বশীভূত সর্প।

জোহরার কাছে এসে রক্তলেশহীন বিবর্ণ মুখের পানে পলকের জন্য চেয়ে থেকে জুম্মন সনিঃশ্বাসে রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে বল্লে—আচ্ছা তাহলে চল্লুম জোহারা, খোদা হাফিজ—

কথাটা জোহরার কাণে যেন গুম্রে ওঠা কান্নার মত শোনালো, কিন্তু মুখ থেকে একটা শব্দও বার হল না, তার জিভ যেন আড়ষ্ট হয়ে গেছে। ইয়াসিনের হাত ধরে খানিক পথ গিয়ে জুম্মন কি মনে করে একবার পেছন ফিরে দেখলে জোহরা চৌকাঠের ওপর কপাট ধরে দাঁড়িয়ে নিশ্চল ভাবে—তার চোখেও বুঝি পলক নেই।

—জোহরা। ঘরে যাও, ভয় কি? তোমার জুম্মু ভাই পাষণ্ড হতে পারে, কিন্তু বেইমান নয়। ধরা গলায় অতি করুণ আর্দ্রস্বরে কথাটা বলেই জুম্মু শ্লথ চরণের গতি দ্রুত করে হনহনিয়ে চল্লো। জোহরার আর্ত্তকণ্ঠে অস্ফুট-ভাবে উচ্চারিত হল। "জুম্মু ভাই।" উত্তর এলো না। তখন জনহীন অন্ধকার পথে, রজনার নিঝুম স্তব্ধতাকে আকুল করে ফেরারী আসামী নির্ভয়ে গান ধরেছে—

হায়! লজিস্ না থা ইয়ে তুম্‌কো দিল্ লেকে দগা করনা—
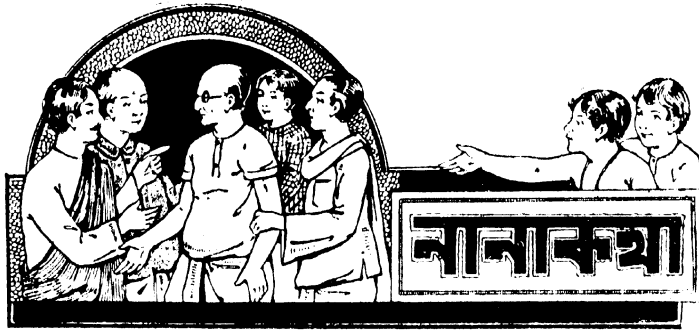
মুসলমান সাম্প্রদায়িকতায় হিন্দুনেতৃবৃন্দের বিবৃতি ২৩শে এপ্রিল বাঙ্গালা দেশের হিন্দু সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ নিম্নলিখিত বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন :—

(১) ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, ভারতে সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান হইল না বিটিশ মন্ত্রিসভাকে ঐ সমস্যার সমাধান করিতে হইবে। সম্ভবতঃ এই কারণেই সাম্প্রদায়িকতাবাদী মুসলমানগণ সম্প্রতি তাঁহাদের দাবী দৃঢ় করিয়াছেন। তাঁহারা শুধু স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন, স্বতন্ত্র প্রতিনিধিত্ব, খাতিরমূলক প্রতিনিধিত্বের অতিরিক্ত সুবিধাই দাবী করিতেছেন না ; বাঙ্গলা এবং পাঞ্জাবের যেখানে তাঁহারা সংখ্যাগরিষ্ঠ, তথায় তাঁহারা আইনে কায়েমভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠের দাবী করিতেছেন। সরকারী চাকুরীতে—ইম্পিরিয়াল প্রাভিন্সিয়াল, লোকাল এবং রেল বিভাগে বিশেষ প্রতিনিধিত্ব, সেনানী পদের শতকরা ৫০টী পদ, আইনসিদ্ধ স্বায়ত্ত শাসনমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহ, মিউমিসিপ্যালিটী, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড এবং লোকাল বোর্ড প্রভৃতিতে সংরক্ষিত প্রতিনিধিত্ব এবং পাবলিক স্কুল ও সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলসমূহে তাঁহাদের প্রতিনিধিত্ব সংরক্ষিত করিবার দাবীও উপস্থিত করিয়াছেন।

(২) এই সব দাবী যদি মানিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে ভারতে গণতন্ত্র ও প্রতিনিধিত্বমূলক শাসনের সকল আশা লোপ পাইবে। আমরা দৃঢ়তার সহিত এই কথা বলিতেছি যে, বাঙ্গালা মুসলমানদের এই সব দাবী জাতীয়তার বিরোধী, স্বার্থমূলক এবং ঐগুলি ন্যায় ও সুবিচারের নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। আইন মোতাবেক পাকাপাকিভাবে বাঙ্গালা দেশের মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠের দাবী যদি মানিয়া লওয়া হয় তাহা হইলে হিন্দুদিগকে চিরকালের জন্য পরের পায়ের নীচে পড়িয়া অক্ষমভাবে থাকিতে হইবে। সম্প্রদায়িক গবর্ণমেণ্ট গঠন ও অত্যাচারই এ দাবীর লক্ষ্য। কোন সংখ্যাগরিষ্ঠ সাম্প্রদায়কে আইনের দ্বারা রক্ষার ব্যবস্থা জগতের কোন শাসনতন্ত্রেই এ পর্য্যন্ত দেখা যায় নাই।

(৩) তাঁহাদের দাবীর পক্ষে তাঁহারা তাঁহাদের রাজনীতিক গুরুত্ব এবং (বাঙ্গলা দেশে) তাঁহাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ও সংরক্ষণের বিশেষ ব্যবস্থা না হইলে যথোপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব লাভ করিবার পক্ষে তাঁহাদের অসুবিধার আশঙ্কা—এই সব কথা বলিতেছেন।

(ক) আমাদের কর্ত্তব্য এই যে, বাঙ্গলা দেশের মুসলমানগণ বিশেষভাবে রাজনীতিক গুরুত্বের কোন দাবী করিতে পারেন না। কারণ তাঁহারা মূলতঃ হিন্দু জাতি হইতেই উদ্ভূত এবং অন্যান্য স্থানের মুসলমানদের সঙ্গে তাঁহাদের তুলনা চলে না। তাঁহারা কোনদিন সেনাবিভাগে কাজ করেন নাই, অথবা সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য কিছুই করেন নাই, পক্ষান্তরে শিক্ষা এবং রাজনীতিক যোগ্যতার দিক হইতে হিন্দুসমাজের শ্রেষ্ঠত্ব, পৌরজনের অধিকার ও রাজনীতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ গঠনে হিন্দুসমাজের অবদান এবং অতীতে রাষ্ট্রশাসনের প্রত্যেক বিভাগে হিন্দুসমাজ যে সব কার্য্য করিয়াছে, তৎসমুদয় এতই সুবিদিত যে, সেগুলির উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। শিল্প সাহিত্য, বিজ্ঞান—এই সব বিষয়ে বাঙ্গালী হিন্দুরা সমগ্র ভারতে অগ্রণী, পক্ষান্তরে বাঙ্গালী মুসলমানের মধ্যে এপর্য্যন্ত এমন একজনেরও নাম করা যায় না, যিনি ঐসব বিষয়ে সমগ্র ভারতে লব্ধপ্রতিষ্ঠিত এমনকি, শিক্ষালব্ধ বৃত্তি—যেমন আইন চিকিৎসা এবং ইঞ্জিনিয়ারিং —এসব বিষয়েও ঐ সমাজের অবস্থা নৈরাশ্যজনক। রাজনীতিক যোগ্যতাকে জাতির জ্ঞান-সাধনা হইতে বিচ্ছিন্ন করা যায় না এবং রাজনীতিক যোগ্যতায় বাঙ্গলার মুসলমানগণ হিন্দুদের অপেক্ষা অনেক নীচে। রাষ্ট্রের বিশেষ দায়িত্বপূর্ণ চাকুরীসমূহের কথা যদি আমরা ছাড়িয়াও দেই, তাহা হইলেও ইহা সর্ব্বজনস্বীকৃত সত্য যে চাকুরীতে মুসলমানদিগকে লইবার পরীক্ষার নিরিখ বিশেষভাবে নীচু করা সত্বেও মুসলমান সমাজ হইতে কেরাণীগিরি এবং সাবর্ডিনেট সার্ভিসের জন্যও লোক পাওয়া গবর্ণমেণ্টের পক্ষে কঠিন হইয়াছে।

(খ) মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে,—শুধু এই যুক্তিতে ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রে তাঁহাদের প্রাধান্যের দাবী আদৌ বিচারসহ নহে। সকলেই জানেন যে, জগতের সর্ব্বত্রই অনুন্নত

প্রথম পুরস্কার

"নদীর পথে"

শ্রীসুরেন্দ্র নাথ ভাস্কর যশোর

দ্বিতীয় পুরস্কার
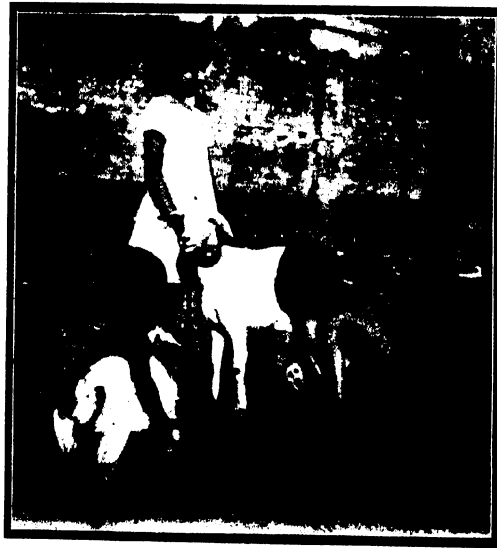
'ছেলেদের খেলা'

পুঃ—২য় পুরস্কার প্রাপ্ত ফটো প্রেরকের নাম পাওয়া যায় নি। নাম সহ আবেদন করুন।

ত্রুটী মার্জ্জনীয়—কার্য্যধ্যক্ষ

লক্ষ্মীবিলাস প্রেস লিঃ

সম্প্রদায়সমূহ সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং মানসিক ক্ষমতায় তাহাদের তুলনায় যাহারা অপেক্ষাকৃত উন্নত, তাঁহাদের অপেক্ষা জনসংখ্যায় দ্রুততরভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। বাঙ্গলাদেশ বর্ত্তমানে যে ভাবে গঠিত, তাহাতে এখানে হিন্দুরা যে সংখ্যায় লঘিষ্ঠ, এবিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু একথা ভুলিলে চলিবে না যে, হিন্দু-প্রধান বঙ্গভাষাভাষী বহু জেলা বর্ত্তমানে বিহার এবং আসামের অন্তর্ভুক্ত আছে, কিন্তু ভাষা এবং জাতিগত রীতিনীতির বিশিষ্টতার ভিত্তিতে প্রদেশসমূহ যখন পুনর্গঠিত হইবে, তখন ঐসব প্রদেশ বাঙ্গলার মধ্যে আসিবেই। ঐ দিক হইতেই প্রদেশসমূহের যে পুনর্গঠন হইবে, ইহাও সুনিশ্চিত। আদমসুমারীর হিসাব হইতে জানা গিয়াছে যে, মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রধানতঃ শিশু এবং যাহারা জাতীয় জীবন হইতে ব্যবচ্ছিন্নভাবে পর্দ্দার আড়ালে থাকেন, সেই সব নারীদিগকে লইয়া। প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের সংখ্যার দিক হইতে হিন্দুরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। বাঙ্গলা দেশে হিন্দুদের সংখ্যা লঘিষ্ঠতা প্রকৃত নহে, উহা অনেকটা কৃত্রিম।

(গ) সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও তাহারা যথোপযুক্ত প্রতিনিধিত্বের সুবিধালাভ করিবেন না,—তাঁহাদের এই যে আশঙ্কা, উহা হইতেই প্রকৃতপক্ষে তাঁহাদের রাজনৈতিক অযোগ্যতা স্বীকৃত হইতেছে। যাহারা বর্ত্তমানে রাজনৈতিক যোগ্যতার দিক হইতে অনুন্নত, ভবিষ্যত শাসনতন্ত্রে তাহাদের রাজনৈতিক প্রাধান্যের দাবী অযৌক্তিক এবং উদ্ভট। বাঙ্গলা দেশে হিন্দুরাই সর্ব্বদা স্বাধীনতা-সংগ্রামে অগ্রণী হইয়া আসিয়াছেন এবং আজ স্বায়ত্তশাসনের যে অমূল্য অধিকার আমাদের হাতের মুঠার ভিতর আসিয়াছে, মুসলমান সম্প্রদায়িকতাবাদিগণ (রাষ্ট্রীয় সংগ্রামে যাহাদের অবদান উপেক্ষণীয়) শাসনতন্ত্রের স্কীমকে ক্ষুণ্ণ এবং বিকৃত করিয়া উহাকে গণতন্ত্রমূলক শাসনতন্ত্রের দিক হইতে মূল্যহীন করিয়া তুলিবেন,—আমরা ইহা হইতে দিতে পারি না।

(ঘ) আমরা সংখ্যালঘিষ্ঠ হইলেও আমরা কোন বিশেষ সুবিধা বা রক্ষাকবচের দাবী করি না। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে শান্তি এবং প্রীতির অতিমাত্র গুরুত্ব আমরা সম্পূর্ণরূপেই উপলব্ধি করিয়া থাকি; কিন্তু স্বতন্ত্রনির্ব্বাচনের জঘন্য নীতি বাঙ্গলা দেশে সাধারণের শান্তি এবং রাষ্ট্রীয় সংহতি বৃদ্ধির পক্ষে যে অনিষ্টকর ইহা প্রতিপন্ন হইয়াছে। যতদিন পর্য্যন্ত ঐ প্রথার বিলোপসাধন করিয়া তৎস্থলে যুক্ত এবং জাতীয় নির্ব্বাচন-প্রথা প্রবর্ত্তিত না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐরূপ শান্তি কিম্বা প্রীতির প্রতিষ্ঠা সম্ভব নহে, আমাদের ইহাই দৃঢ় বিশ্বাস। বর্ত্তমানের সম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন-প্রথা যদি বজায় রাখা হয়, তাহা হইলে উহা বাঙ্গলার রাজনৈতিক জীবন বিষাক্ত করিয়া তুলিবে এবং উভয় সম্প্রদায়কে দুইটি বিবদমান দলে বিভক্ত করিবে। উন্নতিশীল মুসলমানদের মধ্যে অনেক ইতিমধ্যেই এই বিপদ উপলব্ধি করিয়াছেন। এবং এখন যুক্ত নির্ব্বাচন রীতির পক্ষে সংগ্রাম করিতেছেন। আমাদের মতে যুক্তনির্ব্বাচন প্রথার প্রত্যাবর্ত্তন রাজনৈতিক অগ্রগতির যে কোন স্কীমের একান্ত অপরিহার্য্য অঙ্গ; পৌর নীতি-বিগর্হিতভাবে ভোটদাতাদিগকে স্বতন্ত্র নির্ব্বাচনের পেরেক-আঁটা কামরার মধ্যে ভর্ত্তি করা গণতন্ত্রের মূল নীতির বিরোধী এবং উহার ফলে দলগত নীতির ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান সমূহের উন্নতি সাধন অসম্ভব না হইলেও সুকঠিন হইয়া পড়ে।

(ঙ) তথাপি আমাদের মুসলমান ভ্রাতাদের যুক্তিযুক্ত আশঙ্কা নিরসনের নিমিত্ত আমরা হিন্দু-মুসলমান যে কোন সম্প্রদায়ের জন্য কতকগুলি প্রতিনিধি সংখ্যা সংরক্ষিত রাখার বিরোধী নহি, কিন্তু স্বতন্ত্র নির্ব্বাচনপ্রথা যদি রহিত না করা হয়, তাহা হইলে আমরা কিছুতেই লক্ষ্ণৌ-চুক্তি অনুযায়ী বর্ত্তমান প্রতিনিধি আসন-বণ্টনের রীতির (যাহা বিশেষ বিবেচনার পর উভয় সম্প্রদায়ের সম্মতিক্রমে হইয়াছিল) পরিবর্ত্তনে সম্মতি দান করিতে পারি না। আইনে পাকাপাকি কায়েম কোন সম্প্রদায়ের সংখ্যা গরিষ্ঠতাতেই আমরা কোনক্রমে সম্মত হইতে পারি না, তাহার পক্ষে যে যুক্তিই প্রদর্শিত হউক না কেন।

(চ) আমরা প্রদেশিক আইন সভায় স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন-প্রথা বজায় রাখার বিরোধী। মুসলমান সাম্প্রদায়িকতাবাদিগণ সাম্প্রদায়িকতার ঐ ঘৃণিত নীতি স্বায়ত্তশাসনমূলক স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহেও প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য প্রচেষ্টায় অবতীর্ণ হইয়াছেন; তাঁহারা এতদ্বারা ঐ সব বিকাশোন্মুখ প্রতিষ্ঠানে সম্প্রতি জনসেবার যে সৌভ্রাত্রমূলক প্রেরণা জাগিয়া উঠিয়াছিল, তাহা চাপিয়া মারিবার চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহাদের এই কার্য্যে আমরা আশঙ্কিত হইয়াছি।

(ছ) বিশেষ বৃত্তি, স্কলারসিপ প্রভৃতির দ্বারা মুসলমান সমাজের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের ন্যায্য উৎসাহ প্রদানের আমরা সর্ব্বতোভাবে সমর্থন করিয়া থাকি, কিন্তু মুসলমান সাম্প্রদায়িকতাবাদিগণ বিদ্যায়তনের পবিত্র অঙ্গন তাঁহাদের বিভেদমূলক এবং সাম্প্রদায়িক দাবী লইয়া অভিদ্রুত করিতে উদ্যত হইয়াছেন, ইহা দেখিয়া আমরা আতঙ্কিত হইয়াছি। বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রাথমিক স্কুল, যত রকম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে, সর্ব্বত্রই আমরা দৃঢ়ভাবে সর্ব্বপ্রকার সাম্প্রদায়িক নীতি অবলম্বনের বিরোধী।

(জ) উপসংহারে আমরা পুনরায় এই কথা দৃঢ় করিতেছি যে, ভবিষ্যত শাসনতন্ত্র লইয়া সাফল্যের সহিত কাজ করিতে হইলে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে মৈত্রীর গুরুত্ব আমরা সম্পূর্ণরূপেই উপলব্ধি করিয়া থাকি। আমাদের সুদৃঢ় মত এই যে, ন্যায় এবং সুবিচারের ভিত্তির উপরই শুধু এই শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, এক সম্প্রদায়কে অপর সম্প্রদায়ের উপর প্রভুত্বের অধিকার প্রদানপূর্ব্বক সমগ্র জাতির দুর্দ্দৈবের বিনিময়ে সে শান্তি ক্রয় করা উচিত নহে।

মুসোলিনের পদত্যাগের কথা :—"নিউজ ক্রনিকেল" পত্রের রোমস্থিত সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে' ইটালীর রাষ্ট্রনায়ক সিনর মুসোলিনী সম্ভবতঃ শীঘ্রই পদত্যাগ করিবেন। আগামী অক্টোবর মাসে তাঁহার কার্য্যকাল দশ বৎসর পূর্ণ হইবে। তিনি নাকি বলিতেছেন যে, তিনি অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন এবং এজন্য তাঁহার বিশ্রামের প্রয়োজন। তবে ইউরোপীয় সমস্যার সমাধানের পূর্ব্বে তিনি রাজদণ্ড পরিত্যাগ করিবেন বলিয়া মনে হয় না। ভবিষ্যতে মুসোলিনীর স্থলে কে বসিবেন, তাহা লইয়াও জল্পনাকল্পনা হইতেছে। এই প্রসঙ্গে মুসোলিনীর কন্যা এডার শ্বশুর সিনর ক্যাপ্পা সিয়ানো এবং পোপের রাজ্যে ইটালীর রাজদূত সিনর ডি ভেকির নাম উঠিয়াছে। সিনর কট্টাপ্পো বর্ত্তমানে ইটালীর অন্যতম মন্ত্রী আছেন।

বরোদায় বাল্য-বিবাহ নিরোধক আইন :—বরোদা রাজ্যে শারদা আইনের অনুরূপ এক বাল্যবিবাহ-নিরোধক আইন পাশ হইয়াছে। বর্ত্তমানে এই আইনের একটি সংশোধক প্রস্তাব পাশ করিতে গবর্ণমেণ্ট সঙ্কল্প করিয়াছেন। এই প্রস্তাব অনুসারে যদি ৪৫ বৎসরের উর্দ্ধ বয়স্ক কোন লোক ১৮ বৎসরের নিম্ন বয়স্ক কোন মেয়েকে বিবাহ করে, তবে বিবাহ অসিদ্ধ হইয়া যাইবে এবং বরকন্যার পিতামাতা এবং বিবাহে সাহায্যকারিগণের ও পুরোহিতের ৬ মাস কারাদণ্ড ও ৫০০ টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা হইতে পারিবে।

শ্রীযুত শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ৩ খানি নূতন উপন্যাস রচনা—পত্রান্তরে প্রকাশ যে, শ্রীযুত শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্প্রতি ৩খানা নূতন উপন্যাস রচনায় মনোনিবেশ করিয়াছেন। উহার একখানা আগামী আষাঢ় মাসে 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে। শুনিতেছি, শরচ্চন্দ্র কলিকাতায় একটি বাড়ী নির্ম্মাণ করিতেছেন। উহা সম্পূর্ণ হইলেই তিনি স্থায়ী ভাবে কলিকাতায় বসবাস করিবেন।

মৌঃ সৌকত আলির সাদি :—গত ২১শে এপ্রিল বৈকালে খিলাফৎ হাউসে ইংরেজ দুহিতা মিসেস রায়ানের সহিত মৌলানা সৌকৎ আলীর শুভ-বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। মিসেস রায়ান সম্প্রতি করাচীতে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিতা হইয়াছিলেন। বোম্বাইয়ের কাজী সাহেব বিবাহ পর্ব্ব সম্পাদন করেন। কিছুদিন হয় সংবাদ রটিয়াছিল যে, অচিরে এই বিবাহ-ক্রিয়া সম্পন্ন হইবে। খিলাফতী মহলের কেহ কেহ এই সংবাদের প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, মুসলমান আইনে এরূপ বিধান নাই, কিন্তু মৌলানার অভিমত উহার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে ছিল। এসোসিয়েটেড প্রেসের প্রতিনিধির নিকট তিনি বলিয়াছেন যে, গত ১৮ বৎসর যাবত তিনি মৃতদার আছেন এবং পূর্ব্ব বিবাহের উজ্জ্বল স্মৃতি বক্ষে লইয়া বেশ সন্তুষ্ট চিত্তেই জীবনযাপন করিতেছিলেন। কিন্তু গত বৎসর এই করুণাময়ী, সুশিক্ষিতা ও সহানুভূতি সম্পন্না মহিলার সহিত তাঁহার পরিচয় হয় এবং তাঁহার মনে এই ধারণা জন্মে যে, এই মেয়েটি তাঁহার শেষ বয়সের অবলম্বন ও সকল কার্য্যে সাহায্যকারিণী হইতে পারিবেন। মিসেস রায়ান ইয়র্কসায়ারের অধিবাসিনী। গোলটেবিল বৈঠকের পহেলা অধিবেশনের শেষে ইনি মৌলানার সহিত ভারতে চলিয়া আসিয়াছিলেন। বাইকুল্লায় খিলাফৎ কমিটির আফিসের উপরে একটি কক্ষে সম্পূর্ণ বিনাড়ম্বরে বিবাহ সম্পন্ন হয়। বিবাহ-বাসরে মাত্র ৫|৬ জন লোক উপস্থিত ছিলেন, তন্মধ্যে দুইজন মুসলমান মহিলা ছিলেন। কাজি কোরাণ হইতে একটি অংশ পাঠ করেন। উহাতে নাকি জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে, উভয়ে উভয়কে বিবাহ করিতে সম্মত হইয়াছেন কিনা। উভয় পক্ষ হইতে সম্মতিসূচক উত্তর দানের পর কাজি রেজিষ্টারে উভয়ের নাম লিপিবদ্ধ করেন। বর কনেকে ৫০০০৲ টাকা যৌতুক দিবেন স্থির হওয়ার পর বিবাহ-ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। মৌলানার প্রথম পক্ষের বিবাহের পুত্র মিঃ জাহিদ আলী, পিতার বিবাহ সম্পন্ন হওয়ার সংবাদে অতিশয় বিস্ময় প্রকাশ করেন এবং বিবাহে তাঁহার তীব্র আপত্তি জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন যে, তিনি তাঁহার পিতাকে এই বিবাহ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন।

[এই মেয়েটির প্রথমে বিলাতে এক আরব ভদ্রলোকের সঙ্গে বিবাহ হইয়াছিল ; পরে ঐ ভদ্রলোক যখন মারা যান, ঐ সময় গোলটেবিল বৈঠকের প্রতিনিধিত্ব প্রসঙ্গে মৌলানা মহম্মদ আলী বিলাতে ছিলেন। মেয়েটি বিপন্না হইয়া তাঁহার নিকট আশ্রয় লয়। মৌলানা মহম্মদ আলী বিলাতে মারা যাওয়ার পর মেয়েটি মৌলানা সৌকৎ আলীর আশ্রয় লয়। মৌলানা সৌকৎ আলী ভারতে প্রত্যাবর্ত্তনের সময় মেয়েটিও তাঁহার সহিত ভারতে আসে। পরে বোম্বাইয়ে আর একজন মুসলমানের সহিত তাহার বিবাহ হয়। ঐ ভদ্রলোক পরে মেয়েটিকে তালাক দেন। তখন হইতে মেয়েটি মৌলানা সৌকৎ আলীর প্রাইভেট সেক্রেটারী হিসাবে তাহার নিকট ছিল। ইতিমধ্যে গুজব রটিয়াছিল যে, মৌলানা সৌকৎ আলীর সহিত মেয়েটির বিবাহ হইবে ; কিন্তু মৌলানা উহা রহস্য বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলেন ; এক্ষণে উহা সত্যে পরিণত হইল।]

বড়মিঞার কথাঃ—"নারীর পদতলেই স্বর্গ"

শ্রীমতী রায়ানের সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পর মৌলনা সৌকৎ আলী 'টাইমস্ অব্ ইণ্ডিয়ার প্রতিনিধির নিকট বলেন :—"তিনি একেবারে আমার ছাঁচে ঢালা এবং খুব সাহসী। বীর পুরুষের সহিত বীর নারীর মিলন হইল—আমি এ মিলন ত্যাগ করিব না। তিনি শিক্ষিতা এবং জ্ঞানবতী, নিষ্ঠাবতী মুসলমান

এবং আমার প্রতি একান্ত অনুরক্ত। আমি তাঁহার গরবে গরবী; আমি তাঁহাতে মশগুল। আমি মুসলমান, আমি বিশ্বাস করি যে, নারীর পদতলেই স্বর্গ। আঠার বৎসর পূর্ব্বে আমার প্রথম পত্নীর বিয়োগে আমি ছন্নছাড়া হইয়া পড়ি। এই দীর্ঘকাল আমি পবিত্র জীবন যাপন করিয়াছি এবং ব্যাকুলচিত্তে ক্ষুদ্র একখানি গৃহের আশ্রয় খুঁজিয়াছি। নিজের পরিবারে আমার কোন সান্ত্বনাদায়িনী জীবন-সঙ্গিনী মিলিল না, তাই আমি অকস্মাতের আশায় প্রতীক্ষা করিতে থাকি। আমার আয়েষা আমার নিকট উপস্থিত হইল। আমি কাজ করিতে করিতে পূর্ণ সময়ে ইহধাম ত্যাগ করিতে চাই—কেহ আমার জন্য গৃহ প্রস্তুত রাখিবে এই আশা করার অধিকার আমার আছে। যাঁহারা জনসেবক তাঁহাদের জীবনে গোপনীয় কিছু নাই। আমার জীবন সম্পর্কিত এই অতি গুরুতর বিষয়ে আমি আমার সুবিধামত ভাবে সংবাদ সর্ব্বসাধারণকে দিতাম; জনসেবক হিসাবে আমি ভদ্র ব্যবহার পাইবার অধিকারী। কিন্তু দুষ্ট লোকেরা সোয়াস্তিতে থাকিতে দেয় না। আমার জীবনের সমস্তই, যাহা কিছু আমার জীবনে ভাল তাহা সমস্তই লাভ করিয়াছি আমি নারীর নিকট হইতে। আমার ছোট ভাইএর (স্বর্গীয় মহম্মদ আলী) যখন মাত্র ২০ মাস বয়স, তখন আমাদের পিতৃবিয়োগ হয়। আমাদের মা আমাদিগকে লালন-পালন ও শিক্ষাদান করেন। আমার ২২ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত কোন মুস্কিলে পড়িলেই আমি তাঁহার নিকট যাইতাম। তিনিই আমাকে সততা ও নারীকে সম্মান করিতে শিক্ষা দেন। আমি বড়াই করিয়া বলিতে পারি যে, আমি কদাপি কোন নারীকে আঘাত করি নাই। মুসলমান হিসাবে আমি বিশ্বাস করি যে, মায়েদের পদতলেই স্বর্গ। 'আমি আমার পুত্র-কন্যাদিগকে ভালবাসি—পুত্র জাহিদ আলীকে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ভালবাসি। তাহাকে মানিয়া চলিতে আমি আমার সন্তানবর্গকে শিক্ষা দিয়াছি। আমি তাহাদিগকে শিক্ষা দিয়াছি, তাহাদিগের বিবাহ দিয়াছি এবং এখন পর্য্যন্ত ভরণপোষণ করিয়াছি।' খাঁটি মুসলমান আইন অনুসারে আমি এক খাঁটি মুসলমান রমণীকে বিবাহ করিলাম। ইস্লাম বিশ্বধর্ম্ম,—জাতি-বর্ণের বিভেদ ইস্লামধর্ম্মে নাই। আমার স্ত্রী আরবী, পার্শি এবং উর্দ্দু শিক্ষা করিতেছেন। তিনি আমাকে ইংরাজী চিঠিপত্র লিখার কার্য্যে সাহায্য করিতেছেন। আমার স্ত্রী প্রচার পছন্দ করেন না। 'আমার পুত্র ভুল রিপোর্ট দিয়াছে দেখিয়া আমি দুঃখিত। আমি তাহার প্রতি সদ্ব্যবহারই করিয়াছি। কিন্তু পুত্রই হউক, ভ্রাতাই হউক, আত্মীয়ই হউক বা বন্ধুই হউক, আমার কার্য্যে আমি অপর কাহাকেও হস্তক্ষেপ করিতে দিতে পারি না। খোদা ও রসুল উভয়েই সম্মানজনক বিবাহ মঞ্জুর করিয়াছেন। আমি তাঁহাদিগকে সাক্ষী করিয়া এই রমণীর পাণি প্রার্থনা করিয়াছি। এই রমণীকে আমি শ্রদ্ধা করি। তিনি আমাকে গ্রহণ করিয়াছেন। আমার এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করার অধিকার কাহারও নাই। এসম্পর্কে অনেক মিথ্যা এবং অন্যায় কথা প্রকাশিত হইয়াছে দেখিয়া আমি দুঃখিত। এই সমস্ত মিথ্যা প্রচারের ফলে আমার অনেক বন্ধু, বিশেষত মুসলমানগণের মনে আঘাত লাগিবে এবং আমাদের শত্রুদের মনে উল্লাসের সঞ্চার হইবে। কিন্তু আমি চিরদিনই যোদ্ধা, এবারেও যুদ্ধ করিব। এই পবিত্র ব্যাপারে আমি যে জয় লাভ করিব, তাহাতে সন্দেহই নাই। "কিছুদিন পরে আমি আমেরিকায় যাইব। আমার স্ত্রী খাঁটি মুসলমান এবং চিরদিন খাঁটি মুসলমান থাকিবেন—তিনি আমার সঙ্গে যাইবেন। আমেরিকায় আমি ইস্লাম, মুস্লিমদেশ, ভারতবর্ষ এবং অন্যান্য বিষয়ে সত্য প্রচার করিব। আমার স্ত্রী আমাকে সাহায্য করিবেন। "কয়েক দিন পূর্ব্বেই আমার বিবাহ ঠিক হইয়াছিল। পাঠান স্বেচ্ছাসেবকটী যে ইতিমধ্যে মারা যাইবে, তাহা জানা ছিল না। বিবাহ অনাড়ম্বরে সম্পন্ন হইয়াছে। কোন উৎসব, কোন তামাসা, কোন ভোজ হয় নাই। এই বিবাহ করিয়া আমি একটা কর্ত্তব্য কার্য্য করিয়াছি। আমি বৃদ্ধ, আমার সাতটি নাতি-নাতনি আছে। কিন্তু আমি আয়েসাকে বিবাহ করিয়া পয়গম্বরের পদাঙ্কই অনুসরণ করিয়াছি। তিনি ৫১ বৎসর বয়সে বিবাহ করিয়াছিলেন।

সম্পাদকের শোচনীয় মৃত্যু :—গ্রেট বৃটেনের বিখ্যাত সংবাদপত্র "ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ানের" সম্পাদক মিঃ ই, টি, স্কটের মৃতদেহ উইণ্ডারমীয়ার হ্রদে পাওয়া গিয়াছে। মিঃ স্কট তাঁহার পুত্রকে লইয়া হ্রদের মধ্যস্থিত প্রমোদ-তরীতে আরোহণের জন্য একখানা ডিঙ্গী করিয়া যান, কিন্তু ডিঙ্গীখানি ডুবিয়া যায় এবং বালকটি উহার তলা ধরিয়া ভাসিতে থাকে। মিঃ স্কট সন্তরণে খুব পটু ছিলেন, তিনি তীরের দিকে সাঁতার কাটিতে থাকেন, কিন্তু অকস্মাৎ ডুবিয়া যান। মিঃ স্কটের পিতা মিঃ সি, পি, স্কটও মাত্র কয়েকমাস আগে মারা গিয়াছেন। তিনি বিলাতের একজন বিখ্যাত সম্পাদক ছিলেন।

ভিয়েনায় প্যাটেল :—এখানকার ভারতীয়গণ এখানে একটি নাট্যাভিনয় করেন। অভিনয় দর্শনে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ যখন প্রশংসাসূচক ধ্বনি করিতেছিলেন, সেই সময়ে নাট্যাভিনয়ের উদ্যোক্তা দেখিতে পান যে, একটী বক্সে শ্রীযুক্ত ভি, জে, প্যাটেল বসিয়া আছেন। উদ্যোক্তা বলেন, অত্যাচারে আর্ত্তনাদরত ভারতীয় জাতির জনক এখানে বসিয়া আছেন। ঐ সময় শ্রীযুত উদয়শঙ্কর উঠিয়া শ্রীযুত প্যাটেলকে অভিনন্দিত করেন। উত্তরে শ্রীযুত প্যাটেল বলেন যে, "পদানত" ভারতবাসীর পক্ষে এই ধরণের অভিনয় বাস্তবিকই প্রশংসাজনক।

বৃটিশ জনসাধারণের কাছে ইংরাজ মনীষীর আবেদন :—লণ্ডনস্থ ইণ্ডিয়া লীগের সভাপতি মিঃ বারট্রাণ্ড রাসেল বৃটিশ জনসাধারণের নিকট নিম্নলিখিত আবেদন করিয়াছেন :—বৃটিশ

গবর্ণমেণ্ট আপোষের যে হাবভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা কঠোর অত্যাচারের ফলে তিরোহিত হইয়াছে। দমননীতি দ্বারা সুফললাভ হইবে বলিয়া কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিই মনে করেন না এবং কোন সাধু ব্যক্তিই, যিনি সমস্ত বিষয় অবগত আছেন—ইহা সমর্থন করিতে পারেন না। কিন্তু ইংলণ্ডের অধিকাংশ লোকই প্রকৃত ঘটনা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস, যদি তাঁহাদিগকে প্রকৃত ঘটনা অবগত করান যায়, তবে এই ভাবে বর্ত্তমান অবলম্বিত পথে চলিলে পরিণাম যে কি ভীষণ হইবে, তাহা চিন্তা করিয়া তাঁহারাও শিহরিয়া উঠিবেন। অতএব ব্রিটিশ জনসাধারণের নামে ভারতে যাহা করা হইতেছে, এ বিষয়ে সকলেরই অবহিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। আমাদের গবর্ণমেণ্ট লজ্জাকর ও হাস্যাস্পদ ব্যবহার করিতেছেন। আমরা (এবং আমার মনে হয়, আমাদের দেশে অধিকাংশ ব্যক্তিই আমার মত অনুমোদন করিবেন) এখন স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে পারি না এবং গবর্ণমেণ্টের কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারিনা। ভারতকে দমন করার বিষয়ে আমাদের কোন সহানুভূতি নাই, ইহা ঘোষণা করিতে হইবে। আমরা কার্য্য দ্বারা গবর্ণমেণ্টের অবলম্বিত পন্থার প্রতিবাদ করিব, ভারত জানুক শুধু ভারত কেন, সমস্ত পৃথিবী জানুক যে, আমাদের গবর্ণমেণ্ট ও ভারতের কর্ত্তৃপক্ষ যে নিগ্রহ চালাইতেছেন, তাহাতে বৃটিশ জনসাধারণের নৈতিক সমর্থন নাই। দেশের জনসাধারণের পক্ষে কথা বলার যোগ্য ব্যক্তিগণকে জেলে আবদ্ধ রাখিয়া একট শান্তি শৃঙ্খলা স্থাপনের চেষ্টা হাস্যাস্পদ ছাড়া আর কিছুই নহে। ভারত যাহা চায়, অবশেষে সে নিজের চেষ্টায়ই তাহা লাভ করিবেই। কিন্তু ইহা যদি আমাদের ন্যায়বুদ্ধির ফল স্বরূপ না হইয়া শক্তি প্রয়োগের ফল স্বরূপে আসে তবে উহা গুরুতর দুঃখের কারণ হইবে। আমরা যুক্তির পথ অবলম্বন না করিয়া শক্তির পথ অবলম্বন করিব, একথা ভাবিতেও যেন মনে ঘৃণা জন্মে। ভারতের রাজকর্ম্মচারীদিগের উপর সহিষ্ণু মনোভাব বিস্তার করার মত শক্তি আমাদের গবর্ণমেণ্টের নাই। আমাদের কর্ত্তব্য—(যে কোন ইংলণ্ডবাসীরই ইহা কর্ত্তব্য) আমাদের গবর্ণমেণ্ট যে সমস্ত কার্য্য করিতেছেন, তাহা আমাদের জনসাধারণের অনুমোদিত কার্য্য নয় ইহা দেখাইয়া দেওয়া। শুধু নিরপেক্ষ থাকিয়া কিংবা মৌখিক সমবেদনা দেখাইয়া কোন ফল হয় না। ইহাতে আমরা ভারতে বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষ যে নির্দ্দয়তা প্রকাশ করিতেছেন ও বাড়াবাড়ি করিতেছেন, তাহার সহিত সংশ্লিষ্ট হই। ভারতে বর্ত্তমানে যে ধর্ষণনীতি চলিতেছে, তাহা ভারতের ইতিহাসেও কঠোর বলিয়া অভিহিত। আমাদের নিজের দেশের রাজনৈতিক ব্যাপারে যিনি যে মতাবলম্বীই হউন না কেন, আমি দেশের সমস্ত পুরুষ ও মহিলাকেই একটা জাতির নিগ্রহের বিরুদ্ধে এই সংগ্রামে যোগদান করার জন্য আহ্বান করিতেছি। স্বাধীনতা রক্ষা করাই সমস্ত সাধু ব্যক্তির কর্ত্তব্য। ইণ্ডিয়া লীগের সভাপতিরূপে আমি আপনাদিগকে ভারতের এই বিপদে সাহায্য করার সংগ্রামে যোগদান করার জন্য আহ্বান করিতেছি। আমরা আপনাদের অর্থ সহযোগিতা ও পরামর্শ পাইতে আশা করি।

বারট্রাণ্ড রাসেল। সভাপতি, ইণ্ডিয়া লীগ।

মহাত্মাজীর ৪টী অবদান:—স্যার ক্রাথিন ইয়ং হাজবেণ্ড সম্প্রতি "ভারতে নবযুগ" নামক একখানা পুস্তক লিখিয়াছেন এই পুস্তকে তিনি বলেন যে. মহাত্মা গান্ধী ভারতবর্ষকে চারিটি মহৎ দান করিয়াছেন। প্রথমতঃ তিনি ভারতবাসীর মনে সাহস আনিয়া দিয়াছেন এবং উহার ফলে ভারতবাসী নিজের শক্তি বুঝিতে সমর্থ হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ তিনি ভারতবাসীর মনে একটা এক-জাতীয়ত্ববোধ জাগাইয়াছেন। তৃতীয়তঃ তিনি জাতীয় জীবনে ধর্ম্মের প্রয়োজনীয়তাবোধ জাগাইয়াছেন এবং আধুনিক যুগের ভোগবিলাসের নিন্দা করিয়া সকলকে আধ্যাত্মিকতার উপযোগিতা উপলব্ধি করাইয়াছেন। চতুর্থতঃ তিনি ভারতবর্ষের বিষয়ে সমগ্র জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করাইয়াছেন। এবং এইজন্যই আজ জগতের সকল জাতি ভারতে কি হইতেছে তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিতেছে।

উপনয়নের উদ্দেশ্য কি? মহাত্মাজীর অভিমত

গুজরাট বিদ্যাপীঠের শিক্ষক শ্রীযুক্ত মাস্তলিকারের পুত্রের উপনয়ন উপলক্ষে মহাত্মাজী জারবেদা জেল হইতে আশীর্ব্বাদ করিয়া পাঠাইয়াছেন। এই উপলক্ষে মহাত্মাজী বলেন, আজকাল উপনয়নের কিছু উদ্দেশ্য আছে বলিয়া আর আমি মনে করিনা। তথাপি অনেক উহাকে অপরিহার্য্য বলিয়া মনে করেন। আমার মনে হয় যে, বালক সাবালক হইলেই তাহাকে উপনয়ন দেওয়া উচিত। উপনয়নের অর্থই নবজীবন লাভ। উহার পর হইতে প্রত্যেক লোকের উচিত, আত্ম সংযম ও সেবার আদর্শ লইয়া জীবন যাপন করা

প্রজ্ঞা-দৃষ্টি, বোধ-দৃষ্টি ও রস-দৃষ্টি

এই সৃষ্টির মধ্যে বহু দৈন্য, বহু ত্রুটি, বহু প্রকারের অসম্পূর্ণতা ও জঘন্যতা সত্বেও জ্ঞানী যে দৃষ্টিতে ইহাকে দেখিয়া শোভন সুন্দর ও সুসমঞ্জস মনে করেন, তাহাই প্রজ্ঞা-দৃষ্টি। এই দৃষ্টিতেই রুদ্রানন্দে নৃত্যরত নটরাজ এত সুন্দর, এই দৃষ্টিতেই চোখে পড়ে রুদ্রের দক্ষিণ মুখ, এই দৃষ্টিতেই সেই মহাকালী মূর্ত্তি—

"ডান হাতে যার খড়্গ জ্বলে বাঁ হাত করে শঙ্কাহরণ,"

তাহাও সুন্দর! এই দৃষ্টিতেই শঙ্খ ও পদ্মের সহিত চক্র ও গদার সমন্বয় হইতে পারিয়াছে। এই দৃষ্টিতে যে-বসন্ত শুধু ফোটা ফুলের মেলা নয়—ঝরা ফুলেরও শ্মশান সেই বসন্তও সুন্দর হইতে পারিয়াছে। কবি যখন বলিয়াছেন—

সুন্দর বটে তব অঙ্গদখানি তারায় তারায় রচিত,
খড়্গ তোমার হে দেব বজ্রপাণি চরম শোভায় রচিত।

তখন এই দৃষ্টিতে দেখিয়াই বলিয়াছেন। এই দৃষ্টিতে দেখিলে যে নদী এক কূল গড়ে—আর এক কূল ভাঙে, সেই ভৈরবী মহানদীও সুন্দর—পরস্পরবিরোধী ঋতুর বৈচিত্র্য লইয়া বৎসর-চক্রের আবর্ত্তনও সুন্দর—একাধারে নির্ম্মমা ও মমতাময়ী বিশ্ব প্রকৃতিও মাতৃরূপা। এই দৃষ্টিতে দেখার ফলকে কবি ছন্দিত করিয়া বলেন—

মাতা আমাদের অন্নপূর্ণা পিতা যে মোদের চন্দ্রচূড়,
সংসার হ'তে পৃথক হইয়া কেমনে শ্মশান রহিবে দূর?
রুদ্র যেমন শিবরূপ ধরি মিলে একদেহে গৌরীহর,
শ্মশানে এবং সংসারে মিলে তেমনি অর্দ্ধনারীনর।

এই প্রজ্ঞাদৃষ্টি রসদৃষ্টি ও বোধদৃষ্টির উচ্চতর স্তরে সমন্বয় (Synthesis)। এ দৃষ্টি উপভোগের দৃষ্টি নয়, ইহা শিল্পীর দৃষ্টি নয়, ইহা সর্ব্ববিধ দ্বিধা সংশয় অসামঞ্জস্যের সমাধানের তৃপ্তিদান করে। তাহাতে আনন্দ আছে। কিন্তু সে আনন্দ আর রসানন্দ—শিল্পীর সৃষ্টির আনন্দ এক নহে।

বোধদৃষ্টি ও রসদৃষ্টি যেন পরস্পরবিরোধী। জগতের অধিকাংশ লোক সৃষ্টিকে বোধদৃষ্টিতেই দেখে, তাহাতে বেদনাও আছে—আনন্দও আছে। তাহাতে যে আনন্দ আছে তাহা বোধানন্দ মাত্র! শিল্পী সৃষ্টিকে দেখে রসদৃষ্টিতে—এবং পায় সৃষ্টির প্রেরণা ও রসানন্দ। বোধ-দৃষ্টি প্রবল হইয়া উঠিলে রসদৃষ্টিকে ক্ষীণ ও স্তিমিত করিয়া দেয়। রসদৃষ্টি যেমনই উপভোগ্যের আবিষ্কার করে—বোধদৃষ্টি তাহার চারিপাশের ও অতীত ভবিষ্যতের খবর দেয় (সে looks before and after and pines for what is not), সে উপভোগ্যের অন্তস্তলের কথা,—তাহার উপাদান উপকরণের কথা তুলে—তাহার মূল্য-মর্য্যাদার, স্থায়িত্বের ও সারবত্তার পরিমাণাদি নির্ণয় করে—ফলে উপভোগ্য আর উপভোগ্য থাকে না।

বোধদৃষ্টির শক্তির সীমা আছে—তাহা দেশে ও কালে উপভোগ্যের উপরে নীচে ও চারিপাশে খানিক দূর পর্য্যন্ত যাইতে পারে—সে যদি দেশ ও কালকে অতিক্রম করিয়া যাইতে পারিত—যদি সৃষ্টির অন্তস্থল পর্য্যন্ত যাইতে পারিত—তবে তাহা প্রজ্ঞাদৃষ্টি হইয়া পড়িত এবং সকল বিরোধ ও অসামঞ্জস্যের সমাধান করিতে পারিত। কিন্তু সে খানিকটা মাত্র যায় বলিয়া বিরোধ অসামঞ্জস্য ও দ্বন্দ্ব-বৈষম্যেরই সৃষ্টি করে। ফলে চিত্তের অপ্রসন্নতা ও অস্বচ্ছতা ঘটায়—উপভোগের সকল মাধুর্য্য হরণ করিয়া লয়। শিল্পিমন তাই বোধদৃষ্টিকে যতদূর সম্ভব সংহরণ করিয়া সৃষ্টির পানে রসদৃষ্টিতে

চাহে—তাই শিল্পিমন বোধদৃষ্টির রজ্জুদাম ছিন্ন করিয়া উপভোগ্যকে সৃষ্টি হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র করিয়া তাহার রসসম্ভোগ করে। রসদৃষ্টিতে সৃষ্টির পানে তাকাইতে হইলে অনেক কিছু ভুলিতে হয়, মন হইতে অনেককে বাহির করিয়া দিতে হয়, উপভোগ্যের অতীত, ভবিষ্যৎ, উপকরণ, পারিপার্শ্বিকতা সমস্তই কিছু কালের জন্য ভুলিতে হয়—রসানন্দ লাভে জীবনের কতকগুলি মুহূর্ত্তও যে মধুময় হইল, রসিক তাহাকেই যথেষ্ট মনে করে।

রসদৃষ্টি যখন পঙ্কজকে উপভোগ করিতে চায় তখন যদি বোধদৃষ্টি তাহার চোখে পঙ্ক মাখাইয়া দেয় অথবা গলিত শৈবালে ক্লিন্ন জলাঞ্জলি ছড়াইয়া দেয়—তবে পঙ্কজের উপভোগ্যতা কোথা থাকে?

রমণী-সৌন্দর্য্যে যে মুগ্ধতা, তাহা কোন শিল্পীই অভিব্যক্ত করিতে পারিত না, যদি বোধদৃষ্টি তাহার দেহকে অস্থিরক্তমাংসে বিশ্লেষণ করিত অথবা তাহার পরিণামের কথা স্মরণ করাইয়া হরিনাম করিতে বলিত।

ইন্দ্রধনুর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার কথা মনে হইলে ইন্দ্রধনুর মাধুর্য্য বা সৌন্দর্য্য কিছুই থাকিতে পারে না

পল্লীশ্রীর মাধুর্য্য উপভোগ কিছুতেই সম্ভব নয়—যদি সেই সঙ্গে বোধ দৃষ্টি পল্লীর ম্যালেরিয়া দৈন্য, দুঃখ, ইতরতা ইত্যাদির কথা মনে পড়াইয়া রসভঙ্গ করিয়া দেয়।

রসিক তাহার উপভোগ্যকে সৃষ্টি হইতে বিচ্যুত করিয়া দেখে—মহাকাল হইতে কতকগুলি মুহূর্ত্তকে বিচ্ছিন্ন করিয়া উপভোগ করে। নিজের চিত্তকে এই পাপ তাপ দুঃখ দৈন্যময় ধূলিমাটীর ধরা হইতে অনেকটা উৰ্দ্ধে তুলিয়া ধরে—নিজের জীবনের অন্তরের ও বাহিরের রসবিরোধী যাহা কিছু সমস্তকেই ভুলিয়া যায়—এই বিশ্বে যেন উপভোক্তা আর উপভোগ্য ছাড়া কিছু নাই। সে কেমন? কবির কথায়—

> সে কথা শুনিবে না কেহ আর
> নিভৃত নির্জ্জন চারিধার,
> দুজনে মুখোমুখি গভীর দুখে দুখী,
> আকাশে জল ঝরে অনিবার
> জগতে কেহ যেন নাহি আর।

বোধ দৃষ্টির চক্ষুকে মুদ্রিত না করিতে পারিলে "জগতে কেহ যেন নাহি আর—" এই ভাবটুকু আসিতে পারে না।

শিল্পী এই ভাবে সৃষ্টিকে খণ্ড খণ্ড করিয়া উপভোগ করেন—তাঁহার সৃষ্টিও তাই 'ভূতলের স্বর্গখণ্ডগুলির' মত। যিনি ঐ সৃষ্টি উপভোগ করিবেন—তাঁহাকেও ঐ সৃষ্টিকেই আপন মনের মাধুরী মিশাইয়া পুনর্গঠন করিয়া লইতে হইবে। শিল্পী যেমন করিয়া বোধদৃষ্টির চক্ষুকে মুদ্রিত করিয়া রসরচনা করিয়াছেন—শিল্পের উপভোক্তাকেও তেমনি বোধদৃষ্টির নয়ন রুদ্ধ করিয়া উপভোগ করিতে হইবে—নতুবা রসাভাস ঘটিবে, উপভোক্তা রসানন্দে বঞ্চিত হইবে।

এইখানে একটি প্রশ্ন উঠে। বোধ-দৃষ্টি কি সকল সময়ই রসদৃষ্টির উপভোগ নষ্ট করিয়া দেয়? রসদৃষ্টি ও বোধদৃষ্টির যে পরস্পর প্রতিকূলতার কথা বলা হইল তাহা সাধারণভাবে। বোধদৃষ্টি সাধারণতঃ রসদৃষ্টির বিরুদ্ধে যায়, তাই বলিয়া কখনও রসসৃষ্টির সহায়তা করে না তাহাওত নয়। বোধদৃষ্টি যদি আমাদের চিত্তকে পঙ্কজ হইতে মৃণালে লইয়া যায়—তবে সে ক্ষতি করে না, আরও নীচে নামাইলেই রসভঙ্গ ঘটাইয়া দেয়। যতক্ষণ পর্য্যন্ত রসভঙ্গ না ঘটে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত সে দেশে ও কালে উপভোগ্যের অনুকূল আবেষ্টনী বা পটভূমিকার মধ্যে ঘুরিতে থাকে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত সে রসদৃষ্টির সহিত মৈত্রী ও সহযোগিতা রাখিয়া চলে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত রসানন্দ-সৃষ্টির ব্যাঘাত হয় না। কিন্তু সে কি সীমা বা মাত্রার মর্য্যাদা রাখিয়া চলিতে চায়? তাই মনে হয়—রসদৃষ্টি যখন বোধদৃষ্টির স্বাধীন সত্তাকে হরণ করিয়া সম্পূর্ণ আপনার বশীভূত করিয়া লইতে পারে—আজ্ঞাবহ করিয়া তুলিতে পারে—তখনই তাহা বোধদৃষ্টির সহযোগিভাতেই রসানন্দের সৃষ্টি করিতে পারে।

বোধদৃষ্টিকে বশীভূত করিতে না পারিয়া অনেক সময় শিল্পী ভাবেন—রসদৃষ্টির সহিত বোধদৃষ্টির একটা সামঞ্জস্য সাধন করা যাক। কিন্তু হায়, তাহাতে রসসৃষ্টি হয় না—বোধদৃষ্টিতে লব্ধ ভাবানুভূতির শোভন বিবৃতিমাত্র হয়—অথবা প্রজ্ঞাদৃষ্টিতে দেখার ভাণমাত্র প্রকাশ পায়। শিল্পী যে সৃষ্টিকে উপভোগ করিয়াছেন

তাহা বুঝা যায় না। বোধদৃষ্টির সহিত রসদৃষ্টির সামঞ্জস্য সাধনের একটি প্রয়াসের উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে—

শ্মশান তোমারে কত না যত্নে সংসার মাঝে বরণ করি,
নানাভাবে তুমি কল্যাণই রচ কে বলে তোমায় কেবলি ডরি
দিনে শতবার তোমা সনে দেখা বিভীষিকা তব গিয়াছি ভুলি,
দেবতা পূজার অর্ঘ্যোপচার যোগায় তোমার কাঁথার ঝুলি।
কুঞ্চিত কেশে সুন্দর কর অভিনেত্রীর পলিতরূপ,
চামর-সমীরে দেবমন্দিরে বিলাও গন্ধ, জ্বালাও ধূপ।
কীর্ত্তনে তুমি দিলে মৃদঙ্গ, বিষাণে ঘোষিছ বীরের জয়,
দূরিছ শঙ্খকঙ্কালমুখে মাভৈঃ নিনাদে দৈবভয়।
সব সঙ্গীতে তুমি দাও তাল, সব সঙ্গতে তুমিই প্রাণ,
যোগীর আসন রচেছ অজিনে, গায়িছ দেবীর বোধন গান।
দুলাও শিশুর গলে বাঘনখ, পরাও সতীর শ্রীকরে শাঁখা,
চিত্রশালার বিচিত্রতাও তোমার সরস ভুরুতে আঁকা।
কীটের জীবনতন্তুতে তুমি রচ কৌষেয় দুকুল খানি,
তাহারি শোণিতে পেশল চরণ রাঙায় তোমার কুশলপাণি।
নবযৌবনে কর চিত্রিত আঁকি গোরোচনা পত্রলেখা,
দেহে দেহে তুমি বিলসিছ, নিতি গেহে গেহে তব পাই যে দেখা।
রস-সম্ভোগে সব মঙ্গলে জীবমমতায় তোমায় হেরি,
একী বিধাতার ক্রূর পরিহাস জীবনের সাথে মরণে বেড়ি'!
গজদন্তের চারুপালঙ্কে রঙ্কুলোমের শয্যাসুখে,
রাজার দুলালী ঘুমায় অঘোরে, প্রাসাদে না? তব স্নেহের বুকে?
লক্ষ্মীর করে কড়ির ঝাঁপিটি পূর্ণ তোমারে আশীর্ব্বাদে,
শ্যামের চূড়ার ময়ূরপাখাটি তুমি গুঁজে দিলে মোহন ছাঁদে
বিলাসিনীদের কণ্ঠ জড়ায়ে ধরেছ প্রবালমুকুতাদামে,
তব কৌটার কস্তূরীরস ভিয়ায় আবার দগ্ধ কামে।

এখানে সংসারের শ্রীসৌষ্ঠবের উপকরণগুলির পানে চাহিয়া শিল্পীর কেবলি মনে হইতেছে—এইগুলি মানুষ, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ অথবা বৃক্ষলতা, ইহাদের কাহারও না কাহারও শ্মশান হইতে আহৃত। এই কথা মনে পড়াতেই কোনটিই শিল্পীর উপভোগ্য হইয়া উঠিতেছে না। তখন শিল্পী শ্মশানের সঙ্গে সংসারের একটা সন্ধি করিতে চাহিয়াছেন। সন্ধি স্থাপন একটা দেখানো হইয়াছে বটে কিন্তু কোনটিই উপভোগ্য হইয়া উঠে নাই। শিল্পীর বোধদৃষ্টির গতি বেশীদূর যায় নাই—কাজেই প্রজ্ঞা দৃষ্টিতেও উহা পৌঁছায় নাই।

আর দুই একটি উদাহরণ ধরা যাউক

যে বলে তোমার ধর্ম্ম ধ্বংসমাত্র, বুঝে সেত স্থূল
দুষ্কৃত শাসনে, বজ্র্ প্রতিকূলে কর অনুকূল।
তব জয় বশীভূত সে যে হয় সৃষ্টির সহায়
মোরা তারে ধ্বংস ভাবি মূঢ়কণ্ঠে করি হায় হায়।
শক্তি লভে রূপান্তর তব তেজে। সৃষ্টির বাধক
তোমার মঙ্গলব্রতে হয় তব উত্তরসাধক।
মঙ্গলার হাতে খড়্গ, মঙ্গলের হাতে তুমি শূল
আপনাকে বৃত্র ভাবি, বজ্র মোরা নিত্য করি ভুল।

অথবা—

তুমি শুধু মৃত্যু নহ, মৃত্যুঞ্জয় তুমি মহাকাল,
তুমি শুধু রুদ্র নহ—শিব তুমি বিশ্বলোকপাল।
নহ শুধু ফণিধর—চন্দ্রলেখা শোভে ভাল 'পরে
নয়নে কৃশানু বটে জটাজালে হিমগঙ্গা ঝরে।
অট্ট অট্ট হাস্য বটে—হাস্য তব কুন্দেন্দু-সুন্দর,
কণ্ঠে তুমি ধর বিষ, বাণী তবু অমৃত-নির্ঝর।
শ্মশানে সংসার তব—ইন্দ্র তবু পদ সেবা করে,
চিরনিঃস্ব দীন তুমি—অন্নপূর্ণা পত্নী তব ঘরে।
হে স্মরারি ত্রিপুরারি, ক্ষিপ্তোদ্ধত দীপ্ত তব রোষ,
তবু তুমি ভোলানাথ দয়াময় চির আশুতোষ।
হে সংহার, মহাকাল, রুদ্র তোমা নাহি আর ডরি,
রূঢ় বাহ্য আবরণে মঙ্গলের সূত্র আছ ধরি।
ত্রিশূলে দূরিছ তুমি বিশ্ব হতে ত্রিতাপ অশুভে,
নিত্যেরে অমৃত করি বিষ তব দহিছে অধ্রুবে।
অট্টহাস্য উর্ম্মি-ক্ষোভে শঙ্কা তুমি জাগাবে কতই?
মাভৈঃ সান্ত্বনা তব নাচে তায় তাথই তাথই।
তোমার চণ্ডিমা মাঝে বাৎসল্যের চন্দ্রমা যে ভায়,
খদ্যোত-জীবন মম নিভে জ্বলে ভয়ে ভরসায়।
লালসার লোল বক্ষে নিত্য তব প্রচণ্ড তাণ্ডব,
তোমার চিতাগ্নি-তৃষ্ণা তৃপ্ত করে দেহের খাণ্ডব।
তোমার পিনাক হতে নিত্য ছুটে বজ্র অভিশাপ,
বাষ্প হয় ভস্ম হয় বিশ্বগ্রাসী বিশ্বত্রাসী পাপ।

হে শঙ্কর, ত্রাণ তুমি, মুক্তি তুমি এ সংহার-লোকে,
ত্রিপুরের দ্রোহ হ'তে রাখ নিত্য আত্মার দ্যুলোকে।
বাসনা পিশাচী নিত্য পীড়িতেছে তোমার সন্তানে,
ক্ষিপ্র করে তাই রুদ্র আকর্ষিছ তারে বক্ষ পানে।

ইহা কেবল প্রজ্ঞা দৃষ্টিতে দেখার ফলকে ছন্দে বিবৃতি মাত্র। এই কথাগুলিকে সরস করিয়া বিবৃত করিলেই রসসৃষ্টি হিসাবে সার্থক হইয়া উঠিবে না।

মিথ্যা আমি তোমায় ডরি   মিথ্যা কাঁপি মৃত্যু স্মরি
কর-করোটি অমৃতে তব পূর্ণ,
মরণে তুমি করেছ জয়   শরণে তব কিসের ভয়?
শঙ্কর এ শঙ্কা কর চূর্ণ।
ঈশান তব বিষাণ-রবে   প্রলয় আসে ভীষণ, তবে
বিশ্ব নব তাহাতে লভে সৃষ্টি।
মাভৈঃ বাণী গর্জ্জি কহ   শুনিতে শুধু শঙ্কাবহ
বজ্র ছলে জীবনই কর বৃষ্টি।
তৃতীয় আঁখে বহ্নিছটা   বিথারে জলদর্চ্চিঘটা,
গঙ্গা পুনঃ তোমারি জটাপুঞ্জে।
ইন্দু তব ললাটে জলে   জনম দেয় প্রসূন ফলে
ওষধি মধু ভেষজ গিরিকুঞ্জে।
অট্ট-রবে শঙ্কা রটে   তবুও তা'ত হাস্য বটে,
অভ্রভরা শুভ্র যেন কম্বু,
উরগ শত অঙ্গে ধরি   ঘুরিছ প্রেত সঙ্গে করি,
পিতৃস্নেহ লুকাবে কোথা শম্ভু?
অধ্রুব যে তাহারি তরে   রুদ্রশূল তোমার করে,
কাঁপুক ডরে ত্রিপুর, হেমলঙ্কা,
তোমার যারা শরণ লভে   লভেছে তারা মরণ কবে?
ধ্রুবের ছায়া, মোদের কিসে শঙ্কা?
করুণা তব লভিল অহি,   ধন্য বিষ, কণ্ঠে রহি,
হৃদয় তব পাবে না প্রেম অঙ্ক?
মৃতেরো হেয় অস্থিগুলি   আপন দেহে লইলে তুলি,
জীবন কি গো হবে না নিঃশঙ্ক?
প্রমথ পশু পিশাচগণ   হইল তব আপন জন
পাবে না ঠাঁই মানুষ তব সঙ্গে?
বিষ ধুতুরা চরণে তব   লভিল চির শরণ, প্রভো,
নেবে না তুমি মোদের হৃদি-পদ্মে?
মরণ লভি বনের দ্বীপী   বহিয়া জয়-কীর্ত্তি-লিপি,
কৃত্তিপটে শোভিছে তব অঙ্গে,
দগ্ধ হয়ে ভস্ম হ'ব,   তবু ত তব অঙ্গে র'ব
ডরি না তাই তোমার রোষ রঙ্গে।
যা কিছু ভবে ত্যাজ্য হেয়   তোমার ভূষণ ভোজ্য পেয়
অধম আমি নিরাশ নহি তাই গো,
আমাতে তব অংশ যাহা   পাবে না প্রভু ধ্বংস তাহা,
হাড়ের চেয়ে লভিবে উঁচু ঠাঁইগো।
চির অমৃত উষার লাগি   রয়েছি পিতঃ আশায় জাগি,
নাশ হে মম জীবন তমোরাত্রি,
ক্ষুদ্র আমি রুদ্রে র'ব,   চূর্ণ হয়ে পূর্ণ হ'ব,
বিশ্ব হ'তে বিশ্বনাথে যাত্রী।

এই কবিতাটি প্রজ্ঞাদৃষ্টিতে দেখার ফলের বিবৃতিমাত্র নহে ইহাতে ঐ ফলটিকে একটি প্রতীকের মধ্যে পৃথক্ করিয়া লইয়া রসদৃষ্টিতে দেখিবার প্রয়াস দেখা যাইতেছে।

এখানে একটী কথা বলার প্রয়োজন হইতেছে। কবির নিজস্বই হউক আর অন্য কোন দ্রষ্টারই হউক প্রজ্ঞা-দৃষ্টিতে দেখার ফলকে শিল্পী একটি প্রতীক-স্বরূপ গ্রহণ করিয়া রসদৃষ্টিতে উপভোগ্য করিয়া তুলিতে পারেন। কেবল তাহার বিবৃতি, ব্যাখ্যা বা পরিচয়ই রসানন্দ দান করিবে না অর্থাৎ এক্ষেত্রেও রসানন্দ সৃষ্টি পুরামাত্রাতেই চাই। এইভাবে রসানন্দ-সৃষ্টি রবীন্দ্রকাব্যে অজস্র। এ সম্বন্ধে পৃথক প্রবন্ধের প্রয়োজন আছে।

এই রসদৃষ্টিতে দেখিয়া জীবনের কতকগুলি মুহূর্ত্তকে মধুময় করিয়া তোলা—ইহাকে প্রজ্ঞাদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ হয়ত বলিবেন—মায়া, অবিদ্যা, ভ্রান্তি, অশাশ্বত, ক্ষণিক ইত্যাদি—বোধদৃষ্টি যাঁহাদের প্রখর, তাঁহারা হয়ত বলিবেন এটা বাতুলের স্বপ্ন-বিলাস।

প্রজ্ঞাদৃষ্টি অনেক সাধনার ধন—তাহা মানি। বোধ-দৃষ্টি মানব সভ্যতাকে গড়িয়াছে—ইহাকেও বহু আয়াসে শাণিত করিয়া তুলিতে হইয়াছে। আর এই রসদৃষ্টি সহজ স্বাভাবিক। বিনা আয়াসে মানুষ স্বভাবতই ইহা বিধাতার কাছে লাভ করিয়াছে। যাহা সম্পূর্ণ সহজ—

সম্পূর্ণ স্বাভাবিক তাহাই তবে মিথ্যা?—এ মিথ্যার জন্য স্বয়ং বিধাতাই দায়ী। তা ছাড়া, শিল্পীর বোধদৃষ্টির অভাব আছে—তাহাত নয়, সে বোধদৃষ্টিকে সংহরণ করিয়া রসদৃষ্টির সাহায্যে সৃষ্টিকে সম্ভোগ করে এবং সম্ভোগ্য করিয়া তুলে—সে চিরসুন্দরের এই সৃষ্টির সৌন্দর্য্যকে খণ্ড খণ্ড করিয়া উপভোগ করে। ইহাতে অপরাধ কি? সে এই জীবনের কতকগুলি মুহূর্ত্তকে মধুময় করিয়া তুলিতে চায়—সবগুলিকে সে মাধুরী-মণ্ডিত করিতে পারে না বটে। ইহার মধ্যে মিথ্যা কোথায়?

শিল্পী ত স্পষ্টই বলিতেছেন,—

দুদিন বাদে ফুরিয়ে যাবে জাগ্‌ল এ বোধ যবে,
সুখের মোহে গল্‌ল নাক বুক।
ফুরিয়ে যখন যাবে তখন সেই সুখে কি হবে?
এমনি করে গেল কতই সুখ।
ফুরিয়ে যাবে জেনেই এবে সুখকে টানি কোলে,
ফুরিয়ে গেলেও বয় না চোখে জল,
সান্ত্বনা পাই সফল হলো সরস হলো ব'লে,
এই জীবনের কতকগুলি পল।

এই বিশ্বের সৃষ্টি আমাদের কাছে মূলতঃ খণ্ড খণ্ড, জীবনের কালও আমাদের অখণ্ড নহে—আমাদের বোধ-শক্তিই খণ্ড-সৃষ্টি ও খণ্ডকালকে একসূত্রে গাঁথিয়া রাখিয়াছে। দার্শনিক এই কালপ্রবাহ ও সৃষ্টিধারা লইয়া অনেক জল্পনা করিতে পারেন—কবি কিন্তু বোধশক্তির সূত্র ছিন্ন করিয়া খণ্ড-সৃষ্টি ও মুহূর্ত্তগুলিকে রসমণ্ডিত ও উপভোগ্য করিয়া তুলেন। তাই কবি ক্ষণিকের গান গাহেন —সে গানকে বুদ্ধি দিয়া বুঝিতে হয় না—হৃদয় দিয়া অনুভব করিতে হয়। কবি তাই গাহিয়াছেন—

ওরে থাক থাক কাঁদনি
দুই হাত দিয়ে ছিঁড়ে ফেলে দেরে
নিজ হাতে বাঁধা বাঁধনি
যে সহজ তোর রয়েছে সমুখে
আদরে তাহারে ডেকে নেরে বুকে,
আজিকার মত যাক্ যাক চুকে
যত অসাধ্য সাধনি
ক্ষণিক সুখের উৎসব আজি
ওরে থাক থাক কাঁদনি।

সকল বাঁধন ছিঁড়িয়া খণ্ড জীবনকে যে উপভোগ তাহাই রসসৃষ্টির উপভোগ—কবির উপভোগ।

ইহা স্থূল বাস্তব সম্ভোগ নয়—ইহা অতীন্দ্রিয় মানস সম্ভোগ। ইহাদের উপরেও যে তৃতীয় নেত্রের দৃষ্টি—যাহা ব্রহ্মজ্ঞের পরা দৃষ্টি—সেই দৃষ্টিতে ব্রহ্মজ্ঞ—ব্রহ্মকে অনুভব করিয়া যে স্বাদ-সুখ লাভ করেন,—যাঁহাদের বলিবার অধিকার আছে, তাঁহারা বলেন—সেই স্বাদসুখের পূর্ব্বাভাস আছে ঐ রসানন্দে।

রসানন্দকে মিথ্যা বলিয়া যাঁহারা উড়াইয়া দিতে চাহেন—শিল্পী চিরদিনই তাঁহাদিগকে বলিবে—

নির্ম্মম ক্রূর সত্য চেয়ে মিথ্যা আমার ঢের ভালো,
আঁধারও চাই, চাইনে তবু ঝলসায় চোখ যেই আলো।
রবির কিরণ তড়িৎ প্রখর দেখায় যদি রন্ধ্র বিবর
চাইনে তবে, স্বপ্নমায়ার ক্ষণিক জোনাক তাই আলো
গড়েছি এই সাধের জীবন অলীকপুরের মাল দিয়ে,
না-জানার সব ফাঁক ভরেছি সোণার স্বপন জাল দিয়ে।
কর্কশেরে কান্ত ক'রে বেঁধেছি সব মায়ার ডোরে
মাস্তুলের কঙ্কাল ঢেকেছি নায়ের রঙীন পাল দিয়ে।
উর্ণনাভের মতই স্বতই রচেছি এই সংসারে,
আমার প্রাণের স্বপ্নউষা দেছে অরুণ রঙ তারে।
শামুক শাঁখের দেহের মত এ ঘর আমার অঙ্গগত
মৌলবীর আজান ডুবেছে কল্পবীণার ঝঙ্কারে।
মিথ্যে সবি? বয়েই গেল আনন্দ যে সত্যময়,
তৃপ্ত তৃষার তুষ্ট আশার মিথ্যে হবার নেইক ভয়।
স্বস্তি আরাম শান্তি সুধা সত্য মিটায় প্রাণের ক্ষুধা
'থাকবে না সুখ' সত্য হউক, 'সুখে আছি' মিথ্যে নয়।
আশেপাশে গভীর গুহা যায়নাক সাধ দিই উঁকি,
মিথ্যা হউক সত্য হউক যদিন থাকি রই সুখী।
সত্য রচে শ্মশান শুধু কিংবা মরু উষা ধূ ধূ,
শব সাধনার সাধক ত নই, মায়া মোহেই রই ঝুঁকি।
জ্ঞানাঞ্জনের শলাকাটি নিয়ে দোহাই যাও সরো,
জ্ঞানটা তোমার সত্য কিনা আগে তাহাই ঠিক করো।
কাজেই যখন গোড়ায় গলদ রচি মায়ার রঙীন জলদ

ঘুরব দুদিন শূন্যতাতে, যতই কেন ভুল ধর।
সুখের স্বপন ভাঙবে জানি, হবেই শেষে সব ধুলো
তাই বলে কি ঘুরব পথে বাঁধব নাক চালচুলো
পাচ্ছি যাহা হাতে হাতে ভুঞ্জি তাহা আঁতে আঁতে,
সফল তা'ত উড়বে শুধু ভুক্তশেষের ছাইগুলো।
লীলাময়ের সৃষ্টিলীলার অভিনয়ের মঞ্চেতে,
জ্যান্ত পুতুল বিশ্বে মোরা মিথ্যা ঘোরেই রই মেতে।
আমূল আত্ম-বিস্মরণে সাফল্য তাই নট-জীবনে,
সত্যকে যে ভুল্‌বে যত অভিনয়ে সেই জেতে।

মায়ামুগ্ধ সংসারীর মত শিল্পী চিরদিনই বলিবে—

টানো মায়া যবনিকা ভাল ক'রে, ঢেকে দাও দিক্ চক্রবাল,
নিবিড় নীরদ-জালে। রচ নেত্রে অঞ্জনের যাদু ইন্দ্রজাল।
চাহি না অখণ্ড তত্ত্ব, খণ্ডের বিমোহে মত্ত, আহা বেশ আছি,
যত প্রিয়জন আছ স্বপ্নের প্রমোদ কুঞ্জে এস কাছাকাছি।
কে হারাবে সাধ করে সীধুসিক্ত তন্দ্রাঘোরে মধু সম্মোহন?
হায় কি লুটিয়া লবে এত আশা ভালবাসা রুদ্র জাগরণ?
খুলো না দিগন্ত দ্বার অন্তরের বাতায়ন, সত্য তেজোজালে
রঙ্গীন পতঙ্গফুল মায়ার জোনাকী, দগ্ধ হ'বো পালে পালে।

বিদ্বৎসমাজ ও রসিক-সমাজ

মহাকবি ভবভূতি যখন বলিয়াছিলেন—

উৎপৎস্যতে জগতি কোঽপি সমানধর্ম্মা
কালোহ্যয়ং নিরবধিঃ বিপুলা চ পৃথ্বী

তখন তিনি একথা নিশ্চয়ই ভাবিয়াছিলেন—যে আমার রচনা গুলি যদি ধ্বংস না পায়—সযত্নে যদি রক্ষিত হয়, তবে একদিন না একদিন সমানধর্ম্মার দ্বারা সমাদৃত হইবে।

ভবভূতি কাহাদের উপর নির্ভর করিয়া একথা বলিতে পারিয়াছিলেন? দেশের রসিকসমাজ নির্ব্বিচারে সকল সাহিত্যকে রক্ষা করেন না—তাঁহাদের রসোৎসবের দীপান্বিতা ফুরাইয়া গেলেই তাঁহারা কেবল তৈজস প্রদীপ গুলিকেই ধুইয়া মুছিয়া তুলিয়া রাখেন—মৃৎপ্রদীপগুলিকে সম্মার্জ্জনীর তাড়নায় দূর করিয়া দেন।

যুগে যুগে দেশে দেশে রসিক সমাজের রুচিপ্রবৃত্তি ও রসবোধের আদর্শ যদি পরিবর্ত্তিত না হইত—তাহা হইলে কোন কথা ছিল না। কবিও সব সময় রসিক-সমাজের প্রতিনিধি হইয়া অথবা কাল বা দেশবিশেষের অন্তরাত্মার কথা শুনাইতেই অবতীর্ণ হ'ল না। কবি অনেক সময় যুগের অগ্রদূত হইয়া অবতীর্ণ হ'ন—'ভোর না হইতেই ভোরের খবর' বলিতে থাকেন—নয়ত চিরন্তনের বা বিশ্বমানবের অন্তরের সঙ্গীত তাঁহার কণ্ঠে ধ্বনিত হইতে থাকে। আপন দেশের আপন যুগের রসিকসমাজ যে তাঁহাকে চিনিতে পারিবেই এমন কিছু কথা নাই।

রসিক সমাজ রসের উচ্চাদর্শ রসশাস্ত্র হইতে পাইতে পারেন,—নিজের অন্তর হইতেও পাইতে পারেন। কিন্তু দেশে এমন কবিও জন্মগ্রহণ করেন—যিনি অভিনব কাব্যকলার সৃষ্টি করিয়া রসবোধের আদর্শই বদলাইয়া দিতে অবতীর্ণ হ'ন—রসিকসমাজ সহসা তাহাকে চিনিতে না পারিতেও পারে। এক এক সময় তাই মনে হয়, যে যুগের রসিকসমাজ বৌদ্ধ দিঙ্‌নাগের শিষ্যগণের দ্বারা গঠিত সে যুগে আদিরসের সাহিত্যের কি দুর্দ্দশা হইয়াছে—আবার যে যুগের রসিকসমাজ বাৎসায়নের শিষ্যগণের দ্বারা গঠিত, সে যুগে শান্তরসের সাহিত্যের কি দশা হইয়াছে।

ফলে এই দাঁড়ায়, কোন একটি দেশের কোন একটি যুগের রসিকসমাজের বিচারের উপর সৎকাব্যের স্থায়িত্ব যদি নির্ভর করে, তবে রসজগতের বিপুল ক্ষতির সম্ভাবনা। যাঁহারা মৃৎপ্রদীপ বলিয়া রাশি রাশি প্রদীপকে সম্মার্জ্জনী তাড়নায় দূর করেন—তাঁহারা কত শিখামসী-লিপ্ত তৈজস প্রদীপকে যে দূর করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা কি? সে ভুল যে তাঁহাদের হইতে পারে, তাঁহাদের সযত্নে সংরক্ষিত প্রদীপগুলি লইয়া নাড়াচাড়া করিলেই দেখা যায়। আমাদের কি আজ মনে হয় না কত পিতলের দীপকে সোনার দীপ বলিয়া তাঁহারা রক্ষা করিয়াছেন?

মোটকথা, সকল যুগের সাহিত্যকে কতকটা নির্ব্বিচারেই রক্ষা করাই উচিত। অন্ততঃ যে সাহিত্যের মূল্য সম্বন্ধে কোন প্রকার দ্বন্দ্ব সংশয় থাকে—তাহাকে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করাই উচিত। এক যুগে ভাল লাগিল না বলিয়া অন্য যুগেও ভাল লাগিবে না—এক দেশের লোকের মনে রস

সঞ্চার করিতে পারিল না বলিয়া অন্যদেশের লোকের মর্ম্ম-স্পর্শ করিবে না—এমন কিছু কথা নাই। রসবোধের আদর্শই কেবল বদলায় না—যুগধর্ম্মের পরিবর্ত্তন, জাতীয় জীবনের বৈচিত্র্য, নবনব সঞ্চারী ভাবের সমাগম ও মানব-চিত্তের ক্রমবিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে এক যুগের অনাদৃত সাহিত্য অন্যযুগে জনাদৃত হইয়া উঠিতে পারে। রস-বিচারের আদর্শ যে যুগে যুগে বদলায়, কবিগুরু এ সত্য ব্যঙ্গচ্ছলে বলিলেও স্বীকার করিয়াছেন। পরজন্ম সত্য হ'লে—

আমার ভাগ্যে হব আমি দ্বিতীয় এক ভস্ম লোচন
আমায় হয়ত করতে হবে আমার লেখা সমালোচন।

কালের গতি চক্রাকারে,—তাহার সঙ্গে মহামানবের রুচি প্রকৃতি ও আদর্শও নাগরদোলার মত আবর্ত্তিত। এক যুগে বা একদেশে যাহার আদর হইল না—অন্য যুগ বা অন্য দেশ তাহার আদর করিতে পারে। একযুগ বা একদেশ আদর না করিতে পারে,—কিন্তু রক্ষা যদি করে—তবে ত পরবর্ত্তী যুগ বা দূরবর্ত্তী দেশ তাহার বিচারের অবসর পাইবে?

রসিকসমাজ উদাসীন হইতে পারেন—বিদ্বৎসমাজেরই কর্ত্তব্য যুগের সম্পদকে রক্ষা করা। কোন কোন যুগের বিদ্বৎসমাজ তাহাই করিয়াছেন বলিয়া আমরা রসিক-সমাজের মারফতে যে সাহিত্য-সম্পদের সন্ধান পাই নাই—মঠ মন্দিরের ধূলা ঝাড়িয়া সেই সাহিত্য সম্পদের আবিষ্কার করিতে পারিতেছি। আমাদের দেশের বৈষ্ণব কবিগণ তাঁহাদের কাব্যসম্পদের রক্ষার ভার ধর্ম্মের হাতে দিয়া ভালই করিয়াছিলেন—নতুবা কত সম্পদ্ হইতে আমরা বঞ্চিত হইতাম তাহা কে জানে? যে কোন যুগের রসিকসমাজের কাব্যরসবোধের আদর্শ সেইযুগের রচিত অলঙ্কারগ্রন্থে পাওয়া যায়—নানা যুগের অলঙ্কার শাস্ত্র লইয়া নাড়াচাড়া করিলে মনে হয়—বহু কবির প্রতি হয়ত অবিচার হইয়া গিয়াছে।

দেশের বিদ্বৎসমাজ অথবা আর কোন সমাজ যুগসম্পদকে অবশ্যই বাঁচাইয়া রাখিবে এই ভরসাতেই ভবভূতি ঐ স্পর্দ্ধাটুকু প্রকাশ করিতে পারিয়াছিলেন।

আজকাল যুগসম্পদকে সযত্নে রক্ষা করার সুযোগ সুবিধা যেমন হইয়াছে। দেশের লোকের মনে সংরক্ষিণী প্রবৃত্তিও তেমনি পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে ঝুঁটা হোক খাটি হোক—কিছুকাল তাহা অরসিকের আশ্রয়েও বাঁচিয়া থাকিতে পারিবে—পরবর্ত্তী যুগ দূরবর্ত্তী দেশ কিংবা দূর ভবিষ্যৎ তাহার বিচার করিবে। বিদ্বৎসমাজ অবশ্য বাঁচাইয়া রাখিতে পারে—অমরতা দিতে পারে না। যদি চিরজীবী হইবার যোগ্য না হয় তবে একদিন ধ্বংস পাইবেই। কিন্তু তাহাকে বাঁচিবার জন্য সংগ্রাম করিবার অবসর ও সুযোগত দেওয়া হইবে—লাইকারগাসের পদ্ধতিকে কেহই আর সমর্থন করিবে না।

রসিক সমাজ বাঁচিবার অধিকার না দিলেও বিদ্বৎ সমাজ রক্ষা করিবে, সেই ভরসাতেই সাদের (Southey) মত সাহঙ্কারে না হউক, সবিনয়েই আজকালকার একজন নগণ্য কবি বলিতে পারিয়াছেন—

অনাগত বন্ধু রসিক অজ্ঞাত মোর আজকে যারা,
ভবিষ্যতের স্বপ্ন মাঝে সুপ্ত আছ সংজ্ঞা হারা।
তোমাদেরই জন্য বঁধু কণায় কণায় জমাই মধু
তোমাদেরই জন্য আমি যাচ্ছি পুঁতে ফুলের চারা।
নীরবে সই নিন্দা গ্লানি লাঞ্ছনা লাজ আজকে সবি,
অনাদৃত অবজ্ঞাত আমি কাঙাল কুটীর-কবি।
তোমাদেরি আশায় তবু ছাড়িনি এ তন্ত্রী কভু,
লক্ষযোজন দূরে থেকেও তোমাদেরি মৈত্রী লভি।
ধূলিবালির তলে ঢাকা পড়বে আমার পুঁজিপাতি,
দাবাবে তায় মাটির তলে অনেক অনাদরের লাথি।
তবু জানি তোমরা এসে ঢুঁড়বে সে সব অনেক ক্লেশে,
খুঁড়বে মাটি আনবে টেনে আলোয় পুনঃ খুজিপাতি।
কতজনের কত যে ধন বক্ষে ধরে আছেন ধরা,
মানুষের সেই হারাধনেই এ ধরণী বসুন্ধরা।
খুঁজে তোলার লোক মেলে নাই বিশ্ব আজো নিঃস্বরে তাই
আগের সাথে পরের যোগে ছিন্ন হলো পরম্পরা।
সেদিন গেছে আজ জেগেছে প্রত্নধনে যত্ন প্রীতি,
তুচ্ছতম সাধনাকেও হারায় না আজ কালের স্মৃতি।
সকল সাঁচ্চা সকল মিছার তোমরা সখা করবে বিচার,
আবর্জ্জনার ভস্মতলেও জহরকণা খুঁজবে নিতি।
বিশ্ব বিশাল শাশ্বত কাল, ডরি না তাই বর্ত্তমানে,
সরস্বতীর মঠাঙ্গন এই বাড়বে কত কেই বা জানে?

বাণী একা নয়ক কারো বাড়ছে সেবক, বাড়বে আরো
তাদের মাঝে তোমরা র'বে চেয়ে আছি সেদিন পানে।
জীবন আমার দেয়নি যা, তা মরণ দেবে সগৌরবে,
মরণের নীল পক্ষচ্ছায়ে ঈর্ষা পীড়ন আর না রবে।
ভক্তমনের মধুর যোগে মধুর হয়েই লাগ্‌বে ভোগে,
বিলাসে যা চল্‌ল না আজ, চল্‌বে তাহা মহোৎসবে।
জানি আমি তোমরা আমার সব অপরাধ করবে ক্ষমা,
প্রীতির শশিকলায় আমার ঘুচে যাবে মসীর অমা।
হবে আমার উপহরণ নবীন সৃজন উপকরণ,
অনাদৃত কৃপণসম—তাই পুঁজি মোর করছি জমা।
আজ তাই বলিতে ইচ্ছা হয়—

হে আমার অজ্ঞাত অবজ্ঞাত স্বর্গত বন্ধুগণ, তোমাদের প্রাণের বার্ত্তা হয়ত রসিকসমাজের কাছ পর্য্যন্ত পৌঁছায় নাই—হয়ত তোমাদের নিজ জনপদের রসিক সমাজ তোমাদের মর্ম্ম বাণীর মর্ম্ম বুঝে নাই, গ্রামের যোগী বলিয়া হয়ত ভিক্ষা পাও নাই—দ্বিতীয় জনপদের রসিক সমাজের কাছ পর্য্যন্ত হয়ত তোমাদের বাণী পৌঁছায় নাই। নয়ত রসিক-সমাজের অনাদর লাভ করিয়া,সেবাণী অভিমানে আত্মহত্যা করিয়াছে অথবা উপেক্ষায় প্রাণত্যাগ করিয়াছে। হয়ত বিদ্বৎসমাজ তোমাদের প্রাণের কাহিনীকে মঠ মন্দির চতুষ্পাঠীতে রক্ষা করিয়াছিল—কিন্তু বিদ্যা প্রতিষ্ঠানের ধারা-লোপে বা প্রবাহচ্ছেদে, বিদেশীয় বিজাতীয় বা বিধর্ম্মীর আক্রমণে, অগ্নিদাহে, কীটদষ্টে, রাষ্ট্রবিপ্লবে, বন্যা মহামারী দুর্ভিক্ষে সব লোপ পাইয়াছে। তাহাদের মধ্যে কি রত্ন ছিল, ছাই উড়াইয়া আমরা দেখিতেও পাইলাম না। তোমাদের জন্য কিছুমাত্র দুঃখ নাই—তোমরা রসিকসমাজের অভিজাত্যের আঘাত পাইয়াও রস-সৃষ্টির আনন্দ নিশ্চয়ই লাভ করিয়াগিয়াছ। নিজেদের জন্যই একটা অজ্ঞেয় রহস্যময় বেদনা অনুভব করি—জানি না কি ধনে আমরা বঞ্চিত হইলাম। যদি তোমরা প্রাণের বাণী গাহিয়া গিয়া থাক তবে তাহা মানুষের অন্তর নিশ্চয়ই স্পর্শ করিত। তোমাদের প্রতিবেশীদের ভাল না লাগিবার অনেক কারণ থাকিতে পারে—নদীর পর পারের রাখাল-বালকের সঙ্গীতের মত আমাদের হয়ত ভালই লাগিত, আমরা তাহাতে হয়ত কুহেলিকুণ্ঠিত স্বপ্নলোকের মাধুরী পাইতাম।

আজ তোমাদের কথা স্মরণ করিয়া এ যুগের দরদী কবির কণ্ঠে সুর মিলাইয়া বলিতে ইচ্ছা হয়—

ফুটে গন্ধ বিলিয়ে যারা পড়ল ঝরে পড়ল গো
তাদের লাগি আকুল সারা কুঞ্জ যে,
গন্ধ বুকে লয়ে যে হায় অনাদরে ঝর্‌ল গো—
তাহার তরে কি কোন ভ্রমর গুঞ্জরে ?

° ° ° °

মহারাজের পুত্র সে যে থাকৃল হয়ে ভৃত্য গো
পর্ণবাসে কাট্‌ল জনম দুঃখেতে।
গাণ্ডীবী হায় বৃহন্নলা মগ্ন লয়ে নৃত্য গো
তূণীর তোলা রইল শমী বৃক্ষেতে।
শ্রীবৎসরাজ রইল মিশে কাঠুরিয়ার সঙ্গে গো।
নলরাজার কাট্‌ল জীবন রন্ধনে,
কৌস্তভে হায় চিন্‌লে না কেউ উঠল না শ্রীঅঙ্গে গো।
চন্দন হায় লাগল ধরার ইন্ধনে।
পুণ্য মুকুল পারিজাতের শুকিয়ে গেল বৃন্তে গো,
স্বর্ণ মরাল কণ্ঠে ছিল পত্রটি,
অমৃতের সে বার্ত্তাবহ, পারলে না কেউ চিন্‌তে গো
পেলে না কেউ পড়তে লিপির ছত্রটি।
সে যে কালের জতুগৃহে দারুণ তাপটা সইল গো,
করল নাত দিনের তরে রাজ্যভোগ,
বিরাটগৃহে ক্ষুদ্র হয়ে রইল সে যে রইল গো
জীবনে আর আস্‌ল না তার ইন্দ্রযোগ।

কাব্য ও চিত্র-কাব্য

যে ভাল গান গাহিতে জানে সে তাহার সকল বাক্যই মধুরায়িত করিয়া বলিবে ইহাই স্বাভাবিক। যে ভাল নাচিতে পারে—তাহার সকল চলা ফিরাই সৌষ্ঠবময় হইবে ইহাই স্বাভাবিক। কবিও তাঁহার সকল বক্তব্য, সকল চিন্তা, সকল নিবেদন তাই সরস করিয়া বলেন। ছন্দ কবির বশীভূত ভৃত্যের মত—তাই কবি ঐগুলিকে ছন্দে গুম্ফিত করিয়াই বলেন ছন্দিত বাণী তাঁহাই

কবিতা নয়—এ কথা কবি নিজে জানেন। যে বাণীটিকে রসলক্ষ্মী নিজে কবির মুখ দিয়া প্রকাশ করেন নাই—তাহা যে কবিতা নয় তাহা কবির চেয়ে বেশী করিয়া কে জানিবে? লোকে যদি কবির লেখনী-নিঃসৃত ছন্দিত বাণীকেই কবিতা বলিয়া মনে করে অথবা কবিতা বলিয়া ধরিয়া লইয়া প্রকৃত কবিতার রসাদর্শে বিচার করিতে বসে এবং বিচারে উত্তীর্ণ না হইলে কবিকে নিন্দা করে—তবে কবির দোষ নাই—দোষ বিচারকেরই;

যাহা কবিতা হইয়া উঠিতেছে না—কবি তাহা রচনা করিবার ক্লেশ স্বীকার করেন কেন? ইহার প্রথম কারণ, কবির মনে যে সকল চিন্তার উদয় হয় বা যে ভাব বা অনুভূতিগুলি কবি অর্জ্জন করেন—সেগুলিকে বিশৃঙ্খল সৌষ্ঠবহীন বা পুঞ্জীভূত করিয়া রাখিতে বোধ হয় কবি বড় বেদনা ও অস্বস্তি অনুভব করেন—তাই কবি তাঁহার আজ্ঞাবহ ভৃত্য অর্থাৎ ছন্দকে ভার দেন সেগুলিকে চিত্তভাণ্ডারে পরিপাট্য ও সৌষ্ঠবের সহিত সাজাইতে—নতুবা ঐ সমস্ত ভার স্বরূপ হইয়া পড়ে। কবিকে জিজ্ঞাসা করিলে কবি ছন্দেই উত্তর দিবে—

যে জ্ঞান আমার ফুটলনাক জ্ঞানে
সে জ্ঞান আমার ভার হ'য়ে রয় প্রাণে।
যে সঞ্চিত হল না ঝঙ্কৃত,
যে পুঞ্জিত হল না ছন্দিত,
যে আয়োজন হল না মন্ত্রিত
মহোৎসবের বীণ মৃদঙ্গ তানে
সে সব আমার ভার হয়ে রয় প্রাণে॥
যে ফুল নহে মালায় মনোরম
যে মধু নয় কলগীতি-ক্ষম
খরের গ্রীবায় চন্দন ভার সম
সেই আহরণ মাটির দিকেই টানে,
সে সব আমার ভার হয়ে রয় প্রাণে॥
যে বিজ্ঞানে বাঁশীর আওয়াজ কাড়ে,
মরুচে ধরায় বীণার তারে তারে,
চিন্তা যা মোর চিন্তামণির হারে
নাচল না বা দুলল না তাঁর কাণে
সে সব আমার ভার হ'য়ে রয় প্রাণে॥

দ্বিতীয় কারণ, কবির এ বিষয়ে পূর্ণ আত্মকর্তৃত্বও নাই—আপনার চিন্তা অনুভূতি বিদ্যা বা বক্তব্য নানাকারণে অপরকে শুনাইবার স্বাভাবিক আগ্রহ তাঁহার আছেই। তিনি কোন কথা ছন্দে না গাঁথিয়া বলিতে পারেন না—তাহাতে আর কিছু না হউক—হৃদয়টা লঘু হয়—একটা আত্মতৃপ্তি লাভ করেন। প্রকাশের আনন্দটাও ত কবির পক্ষে কম কথা নয়। কোন্‌টি প্রকাশ করা সঙ্গত, কোন্‌টি অসঙ্গত কবির দরদী চিত্তে এ বিচার স্থান পায় না। কবিকে জিজ্ঞাসা করিলে কবি উত্তরে যাহা বলিবে তাহা এইরূপ—

যা কিছু জেনেছি, যা কিছু ভেবেছি, যা কিছু পেয়েছি পাব,
না করি বিচার সকলি তাহার ছন্দে গাঁথিয়া যাব।
ছন্দে রচিত জীবন-চরিত ছড়ানো পুঁথির পাতে,
আমার কি শুধু? কতটুকু মোর তফাৎ তোমার সাথে?
সবি তা সরস কবিতা হইবে, এমন নাহিত কথা,
কোনটি তত্ত্ব, কোনটি সত্য, কোনটি ছন্দে ব্যথা।
কোনটি মূঢ়তা, বাকচপলতা, কোনটি শুধুই গীতি,
কোনটি ব্যঙ্গ, ইঙ্গিত কেউ, কোনটি পুরাণো স্মৃতি।
শিশু ও প্রৌঢ় নবীন প্রবীণ সবে আছে মোর মাঝে
অজ্ঞ বিজ্ঞ কবি ও অকবি সবাই সেথানে রাজে।
কে কবে কখন গেয়ে উঠে তার কিছুই নাহিক ঠিক,
হাসে ফিক ফিক লুকায়ে, যখন লোকে করে ধিকধিক।
ছন্দে গাঁথিয়া সব কথা বলি, গুচ্ছ বাঁধিয়া রাখি,
যার যাহা রুচে শুমুক সে তাই অসীমে মিশুক বাকী।
আমার কল্প-কাননে সতত বিরাজিছে ঋতুরাজ,
সকল গুল্ম লতিকা পরেছে উৎসবোচিত সাজ,
কাঙালিনী মেয়ে ভিক্ষার দান জড়ায়ে পরেছে গায়,
পুঁই মেচুরির রঙীন রসে সে আল্‌তা এঁকেছে পায়,
মাঠের মজুর শুধু রঙ ক'রে গামছা ফেলেছে কাঁধে,
রাখাল শুধুই বাবরীতে চাঁপা গুঁজেছে নতুন ছাঁদে।
তাই বলে আমি ভাবিতে পারি না তারা না আঙনে রয়
সবার মিলনে উৎসব এটা, ধনি মজলিস নয়।

ছন্দঃশিল্পী তাঁহার নির্ব্বিচারে ছন্দোগ্রন্থনার জন্য দায়ী করিবেন অন্তরের ঋতুরাজকে। কিন্তু এটা আসল কথা নয়। আসল কথা—

ছন্দে রচিত জীবন চরিত ছড়ানো পুঁথির পাতে,
আমারি কি শুধু? কতটুকু মোর তফাৎ তোমার সাথে?

ছন্দঃ শিল্পী ভাবেন,—"আমার জীবনের চিন্তা অনুভূতি ইত্যাদির সহিত অপরের জীবনের চিন্তা অনুভূতি ইত্যাদির বিশেষ কোন তফাৎ নাই। সেগুলিকে সরস করিয়া বলিতে পারিলে কবিতা না হইলেও ভাল লাগিবে।

তাই ঋতুরাজের দোহাই দিয়া বলেন—

দোপাটীর বন লোপাট করিয়া শিমূলে নিমূল করি
দ্রোণে দলি পায় অপরাজিতায় পরাজিত করি জোরে,
বেলা চম্পকে মল্লীতে শুধু বনভূমি রবে সাজি
এ বিধি বিধানে আর যেই হোক ঋতুরাজ নয় রাজি।
শুকনো গাছের ডালে ডালে উঠে ঝিঙে ফুলও করে আলো
এমনো দেবতা আছে যে গরল ধুতুরাই বাসে ভালো।

অর্থাৎ শিল্পী বলিতে চাহেন—আমি সবই ছন্দে গাঁথিয়া গেলাম, কবিতা বলিয়া স্বীকৃত না হইলেও কাহারো না কাহারো ভাল লাগিতে পারে, গরল-ধুতুরাকে ভালবাসে এমন দেবতাও যখন আছেন ঝিঙে ফুলও যখন শুষ্ক তরুকে মণ্ডিত করে—তখন আমার রচনারও কোন না কোন পাঠক জুটিবে।"

শিল্পী জানেন--

কোন ফুল যাবে দুদিনে ঝরিয়া, কোন ফুল বেঁচে রবে,
কোন ছোট ফুল আজিকার কথা কালিকার কানে ক'বে।

আপনার সকল চিন্তা অনুভূতি বক্তব্যকে ছন্দে গাঁথার মধ্যে একটা আনন্দ আছে। শিল্পী প্রত্যাশা করেন যে আনন্দ তিনি পাইয়াছেন অন্যেও সে আনন্দ কিছু না কিছু পাইবে—

ভালবেসে যাহা ফুটেছে পরাণে সবার লাগিবে ভালো,
যে জ্যোতিঃ হরিছে আমার আঁধার সবারে দিবে সে আলো।

কবি আপনার সকল বাণীকেই ছন্দে গ্রথিত করিয়া যান বলিয়া তাহাদের সবই কবিতা নয়—কবিও কোন-দিন সবগুলিকে কবিতা বলিয়া দাবি করেন না, পাঠককে ফাঁকি দেওয়াও তাঁহার উদ্দেশ্য নয়, সকলের সঙ্গেই প্রাণের পরিচয় স্থাপন এবং আপনার জীবনচরিতখানি কবি ও কাব্যজীবনের ইতিহাসখানি সকলকে দিয়া যাওয়াই উদ্দেশ্য। যাঁহারা রসজ্ঞ তাঁহারা কবিতা-গুলিকে বাছিয়া লইবেন—ইচ্ছা করিলে বাকীগুলি হইতেও, রসানন্দ না হোক, অন্য এক প্রকার আনন্দ পাইতে পারেন। —তাহা ছাড়া বাকীগুলির জন্য অরসিকগণত আছেনই। আপন মনের মমতা ও মাধুরী মিশাইলে কাহার কাছে কোনটি কি রূপ ধরে তাহারই বা স্থিরতা কি?

বীমা ক্ষেত্রে কৃতী বাঙ্গালী

১৯১৩ খৃষ্টাব্দে নাটোর ক্রীড়া-প্রাঙ্গণে—High Court vs Natore XI ক্রীকেট খেলা হইতেছিল—ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়বৃন্দ লইয়া গঠিত অজেয় নাটোর টীমের বিরুদ্ধে তখনকার দিনে 'রাণ্' করা সহজ ব্যাপার ছিল না, High Court এর সুনিপুণ খেলোয়াড়বৃন্দ ৫০ রাণের মধ্যে সমাপ্তি পাইবার উপক্রম হইল; এমন সময় একটি সুগঠিত তরুণ যুবক ব্যাট হস্তে 'ক্রীজে' প্রবেশ করিয়া বেপরোয়াভাবে hit করিতে আরম্ভ করিলেন—বিখ্যাত Bowler বৃন্দ বিপর্য্যায় গণনা করিলেন। Bowler পরিবর্ত্তন করিতে হইল কিন্তু কেহই এই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তরুণকে পরাভব করিতে পারিলেন না; সেদিন দর্শকবৃন্দের করতালি ও উল্লাসের মধ্যে এই নির্ভীক যুবক মাঠের সর্ব্বত্র hurricane hitting করিয়া ৫০ হইতে ১১৪ 'রাণ' নিমেষের মধ্যে তুলিয়া ফেলিলেন। এই ক্রীড়ানৈপুণ্যে আকৃষ্ট হইয়া পরলোকগত মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ—বাঙ্গলার ক্রীকেটের জন্মদাতা ৺সারদারঞ্জনকে বলিয়াছেন—"Here is a youngster who treats all our bowlers with scant courtscy" মহারাজের এই উক্তি সার্থক হইয়াছিল কারণ সেইবারই Bengali School vs Natore XI তরুণ যুবক পূর্ণচন্দ্র অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইয়া বাঙ্গালীর মুখোজ্জ্বল করিয়াছিলেন। বীমাক্ষেত্রেও পূর্ণচন্দ্র তাঁহার এই "Sporting career" এর মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন—শুধু বাংলার সর্ব্বপুরাতন বীমাপ্রতিষ্ঠানের অধিনায়করূপে নহে—জীবনবীমার দুরূহ জটিল সূত্রগুলি তিনি যেরূপে আয়ত্ত করিয়াছেন তাহা কেবল বাংলায় নহে ভারতেও খুব কম ব্যক্তিই তাহাতে সক্ষম হইয়াছেন, এইজন্য ভারতীয় শ্রেষ্ঠ বীমাবীদ্‌গণের নিকট তিনি একাধারে শ্রদ্ধা ও সম্মান লাভ করিয়াছেন।

পূর্ণচন্দ্র ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে পাবনার উচ্চ বারেন্দ্রবংশে জন্মগ্রহণ করেন এবং তথা হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতায় উচ্চশিক্ষার জন্য আগমন করেন এবং প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্ত্তি হন। তীক্ষ্ণ মেধাসম্পন্ন, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও ক্রীড়ানৈপুণ্যের জন্য সমপাঠি বন্ধু ও অধ্যাপক মহলে এই স্বাধীনচেতা, আত্মনির্ভরশীল সরলপ্রাণ তরুণ অতি অল্প সময়েই একটা ভালবাসার আসন বিস্তার করিয়া ফেলিলেন—তারপর ক্রীড়াক্ষেত্রে প্রেসিডেন্সী কলেজের গৌরবের দিন আসিল—সেদিন পূর্ণচন্দ্রের নেতৃত্বে কলেজ টীম্ উপর্য্যুপরি পাঁচ বৎসর "Elliot Shield" জয় করিয়াছিল। কলেজের এই ক্রীড়ার গৌরব তাঁহাকে হাতছানি দিয়া বাহিরে লইয়া আসিল এবং ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে তিনি বিখ্যাত Sporting union এর ফুটবলের Captain নিযুক্ত হইলেন। উচ্চ শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া পূর্ণচন্দ্র হাইকোর্টে ওকালতী আরম্ভ করিলেন—বাক্‌নৈপুণ্য, বুদ্ধি-মত্তা এবং সততার জন্য তিনি অতি অল্প সময়ের মধ্যেই প্রসিদ্ধি লাভ করিলেন—এই সময়ে 'হাইকোর্ট ক্লাব' তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া প্রতাপশালী হইয়া উঠিল—পূর্ণচন্দ্র বহু বৎসর গৌরবের সহিত ইহার অধ্যক্ষতার কার্য্য করিয়াছেন। এই ক্রীড়া-প্রাঙ্গণেই তিনি কলিকাতার ভূতপূর্ব্ব মেয়র দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহনের সহিত প্রগাঢ় বন্ধুত্বে আবদ্ধ হন এবং অসহযোগ আন্দোলনের সময় হাইকোর্ট পরিত্যাগ করেন। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় পরলোকগত দেশপূজ্য নেতা লালা লাজপতরায়ের সভানেতৃত্বে যে নিখিল ভারত কংগ্রেসের অধিবেশন হয় তাহাতে পূর্ণচন্দ্র স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর অধিনায়কের কার্য্য পরিচালনা করিয়াছেন—এমনি করিয়াই তাঁহার প্রতি কার্য্যাবলীর

মধ্য দিয়া বাংলার উচ্ছ্বসিত যৌবন-শক্তির বিকাশ দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল।

ভারতবর্ষের বীমাক্ষেত্রে পূর্ণচন্দ্রের অবদান কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করিতে হইবে। তাঁহার সংক্ষিপ্ত কর্ম্ম জীবনীর বিবৃতি প্রদান করিতে যাইয়া বীমা—বিষয়ক কোন পত্রিকা বলিয়াছেন—"His Writing have given a new orientation to Indian Insurance" সত্যই সূক্ষ্ম দৃষ্টি, গূঢ় অনুভূতি ও মৌলিক গবেষণা করিয়া তিনি বিবিধ বীমা পত্রে যে সমস্ত সন্দর্ভ প্রকাশ করিয়াছেন তাহা অমূল্য। ভারতের শ্রেষ্ঠ বীমাসঙ্ঘটি (Indian Life Offices Association) পণ্ডিত কে, সন্তানম্ (লক্ষ্মী) ও পূর্ণচন্দ্রের সমবেত প্রচেষ্টায় গড়িয়া উঠে। ১৯২৮ এ এপ্রিল মাসে বোম্বাইতে "ওরিয়্যানটাল বিল্ডিং এ" বীমা সঙ্ঘের যে উদ্বোধন সভা হয় তাহাতে পূর্ণচন্দ্র উপস্থিত ছিলেন ও সঙ্ঘের আইন কানুন গঠন করিবার জন্য তিনি সর্ব্বসম্মতিক্রমে নিযুক্ত হন ও সঙ্ঘ গঠিত হইলে তিনি তিন বৎসর কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্য হিসাবে বীমাসঙ্ঘটিকে অনেক বিষয়ে সাহায্য করিয়াছেন। Bengal National Chamber of Commerce; ও অন্যান্য অনেক জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে বহু গঠনমূলক কার্য্যে পূর্ণচন্দ্র বহু বৎসর আত্মনিয়োগ করিয়াছেন।

পূর্ণচন্দ্রের সর্ব্বাপেক্ষা কৃতিত্বের বিষয় হিন্দু মিউচ্যাল্ জীবন বীমা—কোম্পানিটিকে পুনর্গঠিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত করা। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে সভ্যগণের আন্তরিক ইচ্ছায় তিনি এই প্রতিষ্ঠানের উন্নতিকল্পে আত্মনিয়োগ করেন এবং দশ বৎসর ব্যাপী অসাধারণ পরিশ্রম করিয়া ইহাকে পঙ্কিলতার মধ্যে হইতে উদ্ধার করিয়া প্রথম শ্রেণীর বীমা প্রতিষ্ঠানের পরিণত করিয়াছেন—জীবন বীমার প্রকৃত আদর্শ, মিতব্যয়ীতা ও সততা—এই তিনটির সমন্বয়ে "হিন্দুমিউচাল" বীমা জগতে সুনাম অর্জ্জন করিয়াছে। পূর্ণচন্দ্রের এই পরিশ্রম "labour of love"—সেই জন্যই তিনি ভারতের বৃহৎ প্রতিষ্ঠিত কোম্পানিগুলির নিকট হইতে সম্মানজনক পদপ্রাপ্তির প্রস্তাব পাইয়াও পুরাতন প্রতিষ্ঠানটি পরিত্যাগ করেন নাই।

জীবন-অপরাহ্ণে দাঁড়াইয়া পূর্ণচন্দ্রের আজ এই সান্ত্বনা যে তাঁহারি নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত স্বহস্তগঠিত কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীসুরেশচন্দ্র রায় বীমাক্ষেত্রে তাঁহার শিক্ষার মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন; প্রথম পুত্র কলিকাতা বিশ্ব বিত্তালয়ের এম-এস্ সি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে সর্ব্বোচ হইয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে গবেষণার কার্য্যে নিযুক্ত আছে। সুখদুঃখের অর্দ্ধাঙ্গিনী বাংলার সাহিত্য জগতে প্রতিভাবতী মহিলা লেখিকাদের অগ্রভাবে দণ্ডায়মান হইয়া বঙ্গ সাহিত্য লক্ষ্মীর পদতলে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতেছেন।

(মেঘনাদ)

জীবন বীমা কোম্পানির তহবিল

ও

কোম্পানির কাগজের মূল্যহ্রাস

শ্রীসুধীন্দ্র লাল রায় এম্-এ

ভারতবর্ষের জীবন-বীমা কোম্পানিগুলির অধিকাংশ তহবিল কোম্পানির কাগজে বা গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটিতে লগ্নী করা আছে। গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রকাশিত ১৯৩০ সালের সরকারি বীমা-রিপোর্টে দেখিতে পাই যে প্রায় ৬০টি ভারতীয় কোম্পানির মোট তহবিল ১৭ কোটি টাকার মধ্যে ১২ কোটি টাকাই গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটিতে আমানত আছে। ইহাদের মধ্যে কয়েকটি কোম্পানি আবার তাহাদের তহবিলের প্রায় অধিকাংশ টাকাই ঐ প্রকারে লগ্নী করেন। কতকগুলি কোম্পানি আবার গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটীতে কম টাকা রাখিয়া অধিক সুদের আশায় রেহিনীখতে টাকা ধার দিয়া থাকেন ও নানাবিধ কলকারখানা, চাবাগান ও কয়লারখনির কোম্পানির শেয়ার খরিদ করিয়া রাখিয়াছেন। এই শেষোক্ত প্রকার কোম্পনির এজেণ্টগণ সাধারণকে বুঝাইয়া বেড়ান যে কোম্পনির কাগজের মূল্য এরূপ ভাবে কমিতে আরম্ভ করিয়াছে যে, যে সকল কোম্পানি গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটিতে টাকা রাখেন তাঁহারা অচিরে সমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন।

শুধু এজেণ্টগণ নহে, কোনও কোনও কোম্পানির বিজ্ঞ পরিচালকবর্গও বলিয়া থাকেন যে, গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটির সুদ কম বিধায় বীমা কোম্পানির তহবিলের দ্বারা দেশের শ্রমশিল্পপ্রতিষ্ঠানের শেয়ার খরিদ করিলে সুদও অধিক পাওয়া যাইবে, আবার দেশের শ্রমশিল্পের সাহায্য করিয়া দেশেরও প্রভূত কল্যাণ সাধন করা হইবে। অজ্ঞ সাধারণ ব্যক্তি এই সকল কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিবেন সে বিষয়ে আশ্চর্য্য কি? অতএব আমরা মনে করি যে এই জটিল বিষয়টির সম্বন্ধে সহজবোধ্যভাবে আলোচনা করিলে সাধারণের ধারণা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতে পারে।

জীবন বীমা কোম্পানির তহবিল সম্বন্ধে এই কথাটা সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে, যে উহা "গচ্ছিত ধন।" যাঁহারা বীমা কোম্পানি পরিচালনা করেন তাঁহারা উহার হেপাজত করিতে বাধ্য। দেব-পূজার জন্য নির্দ্দিষ্ট "দেবোত্তরের" মত কিংবা "ওয়াক্‌ফ-সম্পত্তির মত উহা সযত্নে রক্ষিতব্য। বীমাকারীগণ কোম্পানির পরিচালকবর্গের নিকট এ দাবী করিতে পারেন।

বীমা কোম্পানি বৎসরে বৎসরে যে চাঁদা প্রাপ্ত হয়েন, তাহা হইতে খরচবাদে বক্রী টাকা দ্বারাই ফণ্ড বা তহবিল গড়িয়া উঠে। এই তহবিল ও তাহার সুদ ভবিষ্যৎ দাবী মিটাইতে ও প্রত্যর্পণ মূল্যাদি দিবার জন্য মজুত থাকে।

জীব যেমন জলবায়ু ছাড়া বাঁচিতে পারে না, তেমনি মজুত তহবিলের সুদ মারা গেলে জীবনবীমা কোম্পানির অক্সিজেনের অভাবে ক্রমশঃ নাভিশ্বাস উপস্থিত হইতে পারে। এই কথাটি ভাল করিয়া বুঝা দরকার।

বীমা কোম্পানি যখন চাঁদার হার স্থির করেন, তখন তাঁহারা ঐ টাকা লগ্নী করিয়া যে ন্যূনতম সুদ অর্জ্জন করিতে সক্ষম হইবেন বলিয়া মনে করেন সে সুদটা বাদ দিয়া চাঁদা ধার্য্য করেন। চাঁদা স্থির করার প্রণালীটা গণিতশাস্ত্রের একটা জটিল কসরৎ। সে বিষয়ের আলোচনা এস্থানে সম্ভব বা সমীচীন নহে। কিন্তু সহজ দৃষ্টান্তের দ্বারা পাঠককে আমার বক্তব্য বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছি।

প্রতি বৎসরের প্রারম্ভে ১০০৲ টাকা করিয়া লইয়া দশ বৎসর পর ১০০০৲ দিতে পারা যায়। কিন্তু যে টাকাগুলি প্রতি বৎসর পাওয়া যাইবে তাহা ঘরের সিন্দুকে কোনও বুদ্ধিমান ব্যক্তি পুরিয়া রাখিবেন না। সেগুলি যদি অন্ততঃপক্ষে পোষ্টআফিসের সেভিংস ব্যাঙ্কে রাখা যায় তাহা হইলেও বার্ষিক শতকরা ৩৲ সুদে দশ বৎসর পর ১১৬৫৲ টাকায় পরিণত হইবে। সুতরাং দশ বৎসর পর এক হাজার টাকা দিতে হইলে বৎসরে ১০০৲ টাকা না লইলেও চলিতে পারে। বৎসরে যদি ৮৪৲ করিয়া লওয়া যায়, এবং সে টাকা যদি পোষ্টআফিসে আমানত করা যায় তাহা হইলেও সুদে আসলে দশ বৎসর পর ১০০০৲ টাকা দিবার ক্ষমতা হয়। কিন্তু হঠাৎ যদি আমার ইচ্ছা যায় যে টাকাটা বেশী সুদে লগ্নী করিয়া নিজের কিছু লাভ করিয়া নিই এবং সেই উদ্দেশ্যে যদি রামচন্দ্র মণ্ডলকে সুখতে টাকা কর্জ্জ দিয়া বসি, এবং উক্ত রামচন্দ্র মণ্ডল যদি পাট বিক্রয়ের অভাবে সুদ দেওয়া বন্ধ করে, তবে দশ বৎসর পর যাহাকে এক হাজার সমর্পণ করিতে হইবে তাহাকে কি কৈফিয়ৎ দিব?

বীমার চাঁদা উক্ত প্রকারেই স্থির হয়। মৃত্যুহারের অঙ্ক কষিয়া বাৎসরিক যে চাঁদা দাঁড়ায় সেই চাঁদার অঙ্ক হইতে কোম্পানী ভবিষ্যতে যে ন্যূনতম সুদ অর্জ্জন করিতে পারিবেন বলিয়া মনে করেন সেই অঙ্কটা বাদ দিয়া থাকেন। সাধারনতঃ শতকরা ৩৲ টাকা বার্ষিক সুদ চাঁদা (হইতে "বাটা" discount) দেওয়া হয়। কোনও কোনও কোম্পানী আরও সাবধান, তাহার শতকরা ২৷৷০ টাকা বাদ দেয়।

এখন বোধ হয় পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে বীমা-তহবিল যে শুধু সুরক্ষিত রাখিতে হইবে তাহা নহে, লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে এই তহবিল প্রতিবৎসর সুদ আনিতে পারে। এবং সেই কারণেই তহবিলটি নিরাপদ লগ্নীতে রক্ষা করিতে হইবে। কেননা নিরাপদ লগ্নী সেইটাই, যাহার সুদ কখনও মারা যাইবে না; এবং যে লগ্নীর সুদ মারা যায় না, সেখানে মূলধন নষ্ট হয় না।

জ্যামিতির স্বতঃসিদ্ধের মত ইহাও একটা অর্থনৈতিক স্বতঃসিদ্ধ যে সুদ যেখানে বেশী মূলধন মাটি হইবার আশঙ্কা ও সেখানে তত অধিক। তথাচ, মূলধন যত নিরাপদ সুদের হার সে লগ্নীতে তত কম।

অর্থশাস্ত্রের ধন নিয়োগ (investmemt) সম্বন্ধে এই মূলসূত্রটি মনে রাখিলে বীমা কোম্পানীয় তহবিলের অর্থ নিয়োগ সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটির উপযুক্ততা হৃদয়ঙ্গম করিতে কষ্ট পাইতে হয় না।

স্বীকার করি কোম্পানীর কাগজের বাজার দর আজ কমিয়া গিয়াছে। আর্থিক জগতের উত্থানপতনের সঙ্গে সঙ্গে সে দর কমে ও বাড়ে। সে কথা প্রত্যেক বীমাধুরন্ধর জানেন এবং জানিয়া তজ্জন্য যথোচিত উপায় অবলম্বন করিয়া থাকেন। ব্যবসায় জগতে পতন ও অভ্যুদয় দশশালা গতি মানিয়া চলে (trade cycle) হিতোপদেশে পড়িয়াছি যে প্রাজ্ঞ ব্যক্তি যেমন উপায় চিন্তা করেন, তেমনি আপায় ও চিন্তা করেন। যে সকল বীমা কোম্পানী গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটিতে টাকা লগ্নী করেন, তাঁহারা এই লগ্নীর বাজারদর কমবেশী যে হইয়া থাকে তাহা স্মরণ রাখিয়াই নিজেদের ভ্যালুয়েশান নিষ্পন্ন করাইয়া থাকেন এবং সেই কারণেই তাঁহারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েন না।

কোম্পানীর কাগজের বাজার দর কমিয়া যাওয়ার ফল এই যে আজ যদি কোম্পানীর কাগজ বিক্রয় করিতে হয়, তবে যে মূল্যে উহা খরিদ করা হইয়াছে সেই মূল্যে উহা বিক্রয় করা যাইবে না। সুতরাং লোকসান যাইবে। কিন্তু কোনও সুপ্রতিষ্ঠিত ও সচল জীবনবীমা কোম্পানীকেই সেরূপ অবস্থায় পড়িতে হয় না। যখন কোনও কোম্পানীর নূতন কাজ বন্ধ হইয়া যায় তখনই দাবী মিটাইবার জন্য মজুত তহবিলে হাত পড়িবার সম্ভাবনা উপস্থিত হয়। যে কোম্পানী সুপরিচালিত, যাহার চাঁদার হার বিজ্ঞানসম্মত, যাহার তহবিল খাটাইয়া প্রতিবৎসর নূতনতম সুদ নিয়মিত-ভাবে ঘরে আসে। যাহার প্রতিবৎসরই নূতন কাজ জুটিতেছে,—সে কোম্পানীর কোনও দিনই নষ্ট হইবার

আশঙ্কা দেখা যায় না—তহবিলে হাত পড়াত দূরের কথা।

অতএব, কোম্পানীর কাগজের বাজার দর ঘাটতি হওয়ায়, বীমা কোম্পানীর স্থায়িত্ব বা দঢ়তার কোনও ক্ষতি হইতেছে এরূপ মনে করা ভুল।

পক্ষান্তরে, গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটির মূল্য হ্রাস হওয়ায় বীমা কোম্পানী ধন নিয়োগ ব্যাপারে কিঞ্চিৎলাভবান হইতে পারেন।

প্রত্যেক বৎসরই বীমাকোম্পানীর হাতে খরচান্তে একটা মোটা টাকা জমিয়া উঠে যাহা সঙ্গে সঙ্গে invest করিয়া ফেলা সমীচীন। জীবনবীমা পরিচালকদের ইহাই এক বড় সামস্যা। এবং পরিচালকদের সতর্তা কিংবা দূরদর্শীতার অভাব হইলেই যত্র তত্র লগ্নী করার ফলে মূলধনটাই মারা যাইতে পারে। আজকালকার অর্থসঙ্কটের দিনে, নিরাপদ লগ্নীর একান্ত অভাব। এ বাজারে ব্যাঙ্কের অবস্থা ভাল নয়; ব্যবসায় মন্দা হওয়ায় চটকলের, চাবাগানের ও খনিজ ব্যবসায়ের আয় পর্য্যাপ্ত নয়; জমিদার ও ভূস্বামীরা টাকা ধার লইতে উদগ্রীব বটে, কিন্তু তাহার সুদ চালাইবার ভবিষ্যৎ ক্ষমতা এবং মূলধন শোধ করিবার ভবিষ্যৎ সামর্থ্য অনেকস্থলেই সন্দেহ জনক। কাজেই এই বাজারে উক্ত পথে যদি বীমাতহবিল পরিচালিত করা হয়। তবে বলিতে হয় যে পরিচালকদের দুঃসাহস আছে, সদ্বুদ্ধি ও সদ্বিবেচনা নাই।

ফলে এ সময়ে গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটির কথাই ভাবিতে হয়। অদ্য ১লামে তারিখে দেখিতেছি যে কলিকাতায় ৩৷৷০ টাকা শতকরা সুদের কোম্পানীর কাগজ ৬২৳০ দরে বিক্রয় হইতেছে। এই দর পূর্ব্বে আরও হ্রাস পাইয়াছিল। একশতটাকা মূল্যের দুইখানি কাগজ এখন ১২৫৷৷০ খরচ করিলে পাওয়া যায়। অর্থাৎ এখন ১২৫৷৷০ লগ্নী করিলে ৭৲ সুদ বৎসরে পাওয়া যাইবে। যে লগ্নী করিতেছে তাহার শতকরা বাৎসরিক সুদ পড়িবে কিঞ্চিদধিক ৫৷০ টাকা যে বীমা কোম্পানী এই সময় কোম্পানীর কাগজ কিনিয়াছে, সে যদি শতকরা ৩৲ বাটা (discount) ধরিয়া চাঁদা ধার্য্য করিয়া থাকে তবে শতকরা ২৷৷০ টাকা মুনাফা লগ্নীমূলে অর্জ্জন করিবে। একদিকে লগ্নী নিরাপদ, অন্যদিকে সুদে বেশ ভাল মুনাফা—বীমা কোম্পানীর পক্ষে ইহার অধিক আকিঞ্চন ভাল নহে। সস্তায় কোম্পানীর কাগজ ক্রয় করিবার সুযোগ অন্য সময়ে জুটিবে না।

অর্থসঙ্কট যখন কাটিয়া যায় তখন কোম্পানীর কাগজের বাজার দর এখনকার মত কম থাকে না। ৯০।৯২ টাকা থাকেই। কাজেই আমি যদি আজ ১২৫৷৷০ লগ্নী করি তবে কয়েক বৎসর পর আমার সম্পত্তির মূল্য ১৮০।১৮২ দাঁড়াইবে। ফলে, আমার সম্পত্তি অনুরূপ হিসাবে বর্দ্ধিত হইবে। বীমা কোম্পানীর পক্ষে ভবিষ্যতে এই লগ্নীমূলক মুনাফা (profit on investment)তাহার ভ্যালুয়েশানের সময় বিশেষ কাজে লাগিবে।

গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি খরিদ না করিয়া, এই সময়ে যদি বেঙ্গল ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের মত প্রতিষ্ঠানের শেয়ার খরিদ করা হয় তবে সেটা সমীচীন কখনই হইবে না। আবার বন্ধকীসুদে লগ্নীর জন্য বহুক্ষেত্রে নালিশ করিতে হয়। এবং নালিশে খরচান্ত হইয়া পরিশেষে দেখা যায় যে মূলধনও ঘরে ফিরিল না। শুনিয়াছি কলিকাতার এক জীবন-বীমা কোম্পানী করিমগঞ্জ চাবাগানকে ১লাখ টাকা ধার দিয়াছিলেন। এই চাবাগান আজ গতায়ু। এই চাবাগানই তৎপূর্ব্বে পাবনার এক ব্যাঙ্ক হইতে ঐ পরিমাণে টাকা ধার লইয়াছিলেন। পাবনার সেই ব্যাঙ্ক টাকা অনাদায়ী হওয়ায় ফেল পড়িয়াছে। বীমা-কোম্পানীর তহবিল ভরা, তাই এই ক্ষতি সামলাইয়া গেলেন। কিন্তু যে বীমা-কোম্পানীর এইরূপ লগ্নী করাই অভ্যাস, তাঁহাদের অবস্থা ব্যবসায় যখন মন্দা পড়ে তখন কি আশঙ্কাজনক হইয়া উঠে না?

আশা করি আমরা দেখাইতে সক্ষম হইয়াছি যে গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটির মূল্য হ্রাস হওয়ায় কোম্পানীর দৃঢ়তার হানি হয় না।

তবে, বীমাকারী ও বীমাকোম্পানীর অংশীদারদের কিয়ৎকালের জন্য লাভের কিঞ্চিৎ ন্যূনতা হয় বটে।

কেননা, বাজার দরের এই ঘাটতির দিনে যে কোম্পানীকে ভ্যালুয়েশান করিতে হয়, তাঁহারা যে তারিখে ভ্যালুয়েশান করান, সেইদিনের বাজার দরে সম্পত্তির মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে বাধ্য হন। বিত্তের মূল্য হ্রাস হওয়ায় দেনার অঙ্ক যখন তাহা হইতে বাদ দেওয়া হয় তখন উদ্বৃত্তের (surplus) পরিমাণ কমিয়া যাইবেই। ধরুন, যখন কাজের দাম ছিল ১১৲ তখন আমি ১১০০৲ টাকার কাগজ ক্রয় করি। এবং ঐ পরিমাণ সম্পত্তি থাকায় আমি ১০০০৲ দেনা করিয়া বসি এই আশায় যে আমার দেনার পরিমাণ আমার সম্পত্তি অপেক্ষা বেশী নহে। কিন্তু আজ দেখিতেছি যে, কাগজের বাজার দর কমিয়া যাওয়ায় আমার সম্পত্তির মূল্য দাঁড়াইয়াছে ৬২০০৲ অর্থাৎ আমার দেনার পরিমাণ আমার সম্পত্তির মূল্য অপেক্ষা ৮০০৲ বেশী। ফলে আমাকে এই ৮০০৲ টাকার বন্দোবস্ত যে কোন উপায়ে করিতে হইবে। পাঠক এবার বুঝিতে পারিবেন যে বীমা কোম্পানী যদি এই সময় ভ্যালুয়েশন করেন তবে উদ্বৃত্তের পরিমাণ কমিয়া যাইবেই। ভবিষ্যতে প্রাপ্য চাঁদার আন্দাজ মোট ধরিয়া মজুত তহবিলের বর্ত্তমান মূল্য গ্রহণ করিয়া ভবিষ্যৎ দেনা যখন তাহা হইতে বাদ দেওয়া হইবে তখন উদ্বৃত্তের পরিমাণ কম হইবে। ফলে বোনাসের পরিমাণ পূর্ব্বাপেক্ষা কমিয়া যাইবে ও আংশীদারের কম লাভ পাইবেন। কিন্তু অর্থ সঙ্কট ঘুচিয়া গেলে পুনরায় যখন কোম্পানীর কাগজের মূল্য বৃদ্ধি হইবে, তখন বোনাস আবার পূরাপূরি পাওয়া যাইবে, চাই কি বেশীও জুটিতে পারে। এই বোনাস বিষয়ের অসুবিধাটুকু ছাড়া কোম্পানীর কাগজের বাজার দর পড়তির জন্য অন্য কোনও ক্ষতি বীমা কোম্পানীর হইতে পারে বলিয়া আমরা মনে করি না।

বিচিত্রা

Insurance Association of India এর সহঃ সম্পাদকের নিকট হইতে উক্ত সমিতির সম্পাদক (Indian Insurance Journal এর শ্রীবৈদ্যনাথ বিশ্বাস) কে বহিষ্কৃত করিবার কৈফিয়ৎ সম্বলিত একটি বিবৃতি আমরা পাইয়াছি—Indian Insurance Institute অপেক্ষা উক্ত Association অনেকাংশেই প্রতিনিধিমূলক ছিল কিন্তু বর্ত্তমান সম্পাদকের হস্তে পড়িয়া উহার কার্য্যপ্রবাহ বিশ্বাস মহাশয়ের সম্পাদিত কাগজের মতই মন্থর হইয়া গিয়াছিল। Association এর সভাপতি মিঃ আই, অলষ্টনের সভানেতৃত্বে সেদিন এক অধিবেশনে Association এর সম্পর্কে বিশ্বাস মহাশয়ের গর্হিত কার্য্যাবলীর জন্য উপস্থিত সভ্যবর্গ সকলেই তাঁহার বিরুদ্ধে অনাস্থা-মূলক প্রস্তাব পাশ করিয়াছেন ও সমিতি হইতে তাঁহাকে suspend করিয়াছেন এবং এ বিষয়ে Advance ও Patrika তে বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হইয়াছে দেখিলাম। এই অপরিসীম কলঙ্কের পর বিশ্বাস মহাশয় কি বীমা জগতে মুখ দেখাইতে পারিবেন ?

* * *

নিউ ইণ্ডিয়ার লাইফ সেক্রেটারী ডাঃ এস, সি রায় সম্প্রতি ইউরোপ ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। ডাঃ রায়ের সহিত আমাদের 'ভারতের বীমার ভবিষ্যৎ' সম্বন্ধে বহু আলোচনা হইয়াছে। তিনি 'পুষ্পপাত্রকে' যথাসাধ্য সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। কাগজে প্রকা[শ] শ্রীযুক্ত নলিনী রঞ্জন সরকার মহাশয়ও শীঘ্র ইউরো[প] ভ্রমণে বাহির হইবেন। শ্রীযুক্ত সরকার India[n] Life Office Association এর সভাপতি—ভারতে বীমার সম্বন্ধে ঐ অঞ্চলের লোকের ভ্রান্ত ধারণাকে তিনি সংশোধিত করিতে পারিবেন বলিয়া আমরা মনে করি বীমাক্ষেত্রে এই দুইজন কৃতী বাঙ্গালীকে আমরা শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাইতেছি।

পাশ্চাত্যশিক্ষার একটী মুখ্য উদ্দেশ্য জীবনকে ব্যাপকভাবে ফুটাইয়া তোলা। তুর্কীর নবীনসম্প্রদায় পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া ওতপ্রোত ভাবে এই নূতন মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া পড়িল। তাহাদের সমাজে ধর্ম্মের বন্ধন যেমন ক্রমশঃ শ্লথ হইয়া আসিতে থাকে, সেই পরিমাণে বহুকালের বদ্ধমূল পুরাতন সংস্কারগুলি হীনবল হইয়া উঠে। পূর্ব্বে কোন তুরস্ক মহিলা বিনা 'বরখায়' রাজপথে প্রকাশ্যভাবে চলাচল করিতে সাহসী হইতেন না। এখন দুই-একজন বিনা 'বরখায়' রাজপথে চলাচল করা আরম্ভ করিয়া দিলেন। সম্ভ্রান্ত বংশীয়া বা উচ্চশিক্ষিতা মহিলাগণ নৈশ-ক্লাবগুলিতে যোগ দিতে সঙ্কোচহীন হইয়া উঠিলেন। যৌবন-সঞ্চারের সহিত প্রকৃতি দত্ত নিয়মানুসারে নরনারীর পরস্পরের অঙ্গ-লিপ্সা প্রবৃত্তি খুব স্বাভাবিক ভাবেই প্রবল ও সতেজ হইয়া থাকে। এই সময়ে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইলে ভবিষ্যৎ ক্ষুণ্ণ হইয়া যাইতে পারে এই আশঙ্কায় পাশ্চাত্যের অনেক নর-নারীই বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইতে চাহেন না। অঙ্গ-লিপ্সা-প্রবৃত্তিকে দমন করিয়া রাখা স্বাস্থ্যের বা মনের পক্ষে অস্বাস্থ্যকর জ্ঞানে উহাকে পুরা প্রাধান্যই দান করিয়া থাকেন। ফুলের ফুটন্ত অবস্থা যেমন স্বাভাবিক এই শ্রেণীর নর-নারী যৌবনকেও সেইরূপ ভোগবাসনা চরিতার্থ করিবার উপযুক্ত সময় জ্ঞান করিয়া উহাকে পূর্ণভাবে তৃপ্তির সহিত সম্ভোগ করিবার জন্যই সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকেন। ক্রমশঃ এইরূপ মতাবলম্বী একদল নর-নারী তুরস্ক-সমাজেও দেখা দিল। কোন সনাতনী সমাজ নর-নারীর উদ্দাম-মিলন ন্যায়সঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করেন না, তুরস্কের বৃদ্ধগণ ইউরোপের সন্নিকটে বাস করা হেতু নূতন-নীতিকে খুব শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ না করিলেও, প্রকাশ্যে বিশেষ বিরুদ্ধাচরণ করিলেন না। তাঁহারা এই সমস্ত নব-বিধানগুলিকে অনেকটা পাশ্চাত্য শিক্ষার আনুষঙ্গিক ফল বলিয়া ধরিয়া ল'ন। ইহা ব্যতীত এই সমস্ত আচার-ব্যবহার দমন করিতে গেলে রাজশক্তি ব্যতীত, সনাতন ধর্ম্মাশ্রয়ী অভিজাত শ্রেণীরও বিশেষ প্রয়োজন হয়। তুরস্ক সমাজে উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী ব্যতীত কোন বিশেষ অভিজাত শ্রেণী ছিল না, এই জন্যই পাশ্চাত্য হাবভাব ধীরে ধীরে তুরস্ক সমাজে প্রবেশ করিলে কোন মারাত্মক বাধা আসিয়া তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হয় নাই।

এদিকে কনষ্টানটীনোপল শহরে বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে সভ্যতার সমস্ত বিভিন্ন স্তরগুলিই পরিলক্ষিত হইত। বেদুইন আরবগণ কার্য্যোপলক্ষে তথায় গমন করিলে যান হিসাবে যেমন অষ্টশতাব্দীর 'উট'ই ব্যবহার করিতেন, সেইরূপ তথাকার অধিবাসী দরিদ্র শ্লাভজাতি তাহাদের বহু পুরাতন কুকুর চালিত শকটে আরোহণ করিয়া রাজপথে গতায়াত করিত, সুসভ্য ইউরোপীয়গণ মোটর বা অশ্বযান ব্যবহার করিতেন। রাজধানীর বন্দরগুলিতে মধ্যযুগের তুর্কীর ছোট ছোট মৎস্য ধরিবার নৌকাগুলির সহিত সমুদ্রপথে দ্রুতগমনশীল বাষ্পীয়পোত সমূহ, আধুনিক সমস্ত সুখস্বচ্ছন্দতায় সুসজ্জিত হইয়া পোতাশ্রয়ের শোভা বর্দ্ধন করিত। ইলেকট্রীক ট্রেণ হইতে চতুর্দ্দশ শতাব্দীর সূত্রধরের সহিত আধুনিক পোষাক পরিহিত ও যন্ত্রপাতিতে সুদক্ষ কার্পেণ্টার একই ষ্টেশনে অবতরণ করিত। কামাল যখন পল্লীর নগরী মনোষ্টার হইতে অধ্যয়ন করিবার জন্য কনষ্টানটীনোপলে আসিলেন তখন তাঁহাকে এই সমস্ত আবহাওয়ার মধ্যে আসিয়া পড়িতে হইয়াছিল।

সামরিক উচ্চ-বিদ্যালয়

শহরে পদার্পণ করিয়াই কামাল নবীন-তুরস্কের দলে তাঁহার নাম লিখাইয়া ফেলিলেন। তাঁহার অনেক সহপাঠীই এই গুপ্ত-সমিতির সভ্য ছিলেন। ভাবী সেনানিগণ রাজদত্ত অন্নে পুষ্ট হইয়া আপনাদের মেসের মধ্যেই অনেক আপত্তিকর পুস্তক আদান-প্রদান করিতেন। রাত্রে স্ব স্ব গৃহে দরজা বন্ধ করিয়া গুপ্তসমিতির পরামর্শ সভা বসাইতেন। রেজা পাশা নামক এক ব্যক্তি এই সামরিক বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। তিনি এই গুপ্তসমিতির সভ্য না হইলেও নবীন-তুরস্কের কার্য্যকলাপ ভক্তির চক্ষে দর্শন করিতেন। তাঁহার তত্ত্বাবধানে থাকিয়া ছাত্রগণ বে-আইনী রাজনীতি চর্চ্চা করিত এই সংবাদ যে তিনি একেবারেই পান নাই এরূপ মনে হয় না। সংবাদ তিনি নিশ্চয়ই পাইতেন কিন্তু উক্ত সমিতির সহিত শত্রুতা করিবার প্রবৃত্তি না থাকায় কোন প্রকার উচ্চবাচ্য করিতেন না। এই জন্য পরোক্ষে বরং কতকটা তাঁহার কার্য্যকলাপ দ্বারা উৎসাহিত হইয়া ছাত্রগণ তাহাদের আন্দোলন খুব জোর চলাইতেন।

নারী যৌবনের মোহ। এই মোহকে সমূলে বিনাশ করিয়া কোন নেতা বড় হইতে পারিয়াছেন বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায় নাই। যৌবনে পদার্পণ করিলেই কামাল পাশার হৃদয়েও খুব স্বাভাবিক ভাবেই নারী-সঙ্গ-লিপ্সা উদিত হয়। খুব অল্প বয়সেই তিনি একটি বালিকার রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহার প্রেমে পড়েন। এই উদাসভাব তাঁহাকে অনেক দিন বেশ খানিকটা উচ্ছৃঙ্খল করিয়া তুলিয়াছিল। কলেজ হইতে ফিরিয়াই পুস্তকাদি যথাস্থানে রাখিয়া তিনি বালিকাটির দর্শন লাভ করিবার জন্য তাহার বাড়ীর দিকে গমন করিতেন এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত না তাহার দেখা পাইতেন ততক্ষণ পর্য্যন্ত রাস্তায় দাঁড়াইয়া থাকিতেন। বালিকাটী ক্রমশঃ কামালের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া তাঁহাদের বারান্দায় বাহির হইয়া আসিয়া কামালকে দেখা দিতেন। কামাল নৈশ ক্লাব ইত্যাদিতেও যথেষ্ট যোগদান করিতেন। তথাকার রমণীগণকে প্রেমপাশে আবদ্ধ করিতে গেলে যে সমস্ত হাব-ভাব ও আদব-কায়দার প্রয়োজন হয় সে সমুদয়ের জ্ঞান কামালের আদপেই ছিল না। ইহা ব্যতীত কামালও রমণী-বাহুপাশে আবদ্ধ হইয়া, কোমলতার মধ্যে মোহের স্বপ্নে আপনাকে বাঁধিয়া ফেলিতেও প্রস্তুত ছিলেন না। উত্তর জীবনে কামাল বলিয়াছেন যে রমণীর রূপ তাঁহাকে মুগ্ধ করিতে পারে নাই কেননা উহা তিনি যথেষ্ট ভোগ করিয়াছেন। রমণীর রূপ ভোগের জিনিষ, কর্ম্মতপ্ত জীবনে ক্লেশের লাঘবকর মাত্র, উহাই মানব জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য নয়, ইহাই ছিল তাঁহার স্থির বিশ্বাস। এই জন্যই কামালের সুন্দর ও বলদীপ্ত চেহারা দেখিয়া নৈশ ক্লাবের দুই একটী সুন্দরী তাঁহার সহিত বন্ধুত্ব করিবার প্রয়াস পাইলেও কামালের সাবধানতায় উহা সম্ভবপর হইয়া উঠিত না।

পিতার ন্যায় কামালও 'কাপুড়ে বাবু' ছিলেন তাঁহার শার্ট ও কোট কখনই মলিন হইতে পারিত না নেকটাই কখনই বাঁকিয়া যাইত না। মুখমণ্ডলে গোঁপ ব দাঁড়ী কখনই বিসদৃশ ভাবে গজাইয়া উঠিতে পারিত না তাঁহার রুমাল ও বুট সর্ব্বদাই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিত এই চাকচিক্য বজায় রাখিবার জন্য যে অর্থের প্রয়োজ হইত কামাল-জননী সেই অর্থ সর্ব্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকা করিয়া অম্লান বদনে বহন করিতেন।

কামালের একটী কনিষ্ঠা সহোদরা ছিল। কামা তাহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। বাল্যকালে কামা যখন তাঁহার মাতার আত্মীয়ের ক্ষেত্রে কার্য্য করিতেন এ বালিকাটী তাহার ভ্রাতার পার্শ্বে পার্শ্বে থাকিয়া সাহা করিত। কনিষ্ঠার স্কুলে অবস্থানকালে কামাল প্রত্যে মাসে একবার পল্লী আবাসে প্রত্যাগমন করিয়া মাতা ভগ্নীর সহবাস সুখ অনুভব করিয়া আসিতেন। পু বৎসল মাতা পুত্রের সন্নিকটে বাস করিবার জন্য দ্বিতী বার পতিবিয়োগের পর কনষ্টানটীনোপলে আসিয়া এক বাসা করেন। কামাল ছাত্রাবাসে অবস্থান করিলে মাতা ও ভগ্নীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য প্রা তাঁহাদের গৃহে গমন করিতেন। এইরূপ যাতায়াত করি করিতে ক্রমশঃ নবীন তুরস্কের পরামর্শ সভা এখানে

বসাইতে আরম্ভ করিলে একদিন তাঁহার জননী গুপ্ততথ্য অবগত হইয়া কামালকে খুব স্পষ্টভাবে উহার সত্যতার সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে কামাল ও যাহা প্রকৃত সত্য তাহাই মাতার সন্নিকটে প্রকাশ করেন। মাতার হৃদয় এই অকপট সত্যবার্ত্তায় পুত্রের ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া বিশেষ আন্দোলিত হইয়া উঠিলেও, উক্ত গুপ্ত সমিতির সংস্পর্শ ত্যাগ করিবার জন্য পুত্রকে কোন প্রকার অনুরোধই করিলেন না। স্নেহশীলা জননী কোনপ্রকারেই পুত্রের মনে ক্লেশ প্রদান করিতে চাহিতেন না।

সামরিক বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ রেজা পাশার সহিত সমস্ত সৈন্য-বিভাগের তত্ত্বাবধারক ইস্‌মেল পাশার কোন কালেই সদ্ভাব ছিল না। সামরিক বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত গুপ্ত-সমিতির কথা ইসমেল পাশার কর্ণ-গোচর হইলেই তিনি তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী রেজা পাশাকে অবমানিত করিবার উদ্দেশ্যে উক্ত সমিতির তাবৎ তত্ত্বই সম্রাট সকাশে প্রকাশ করিয়া দেন। সুলতান হামিদ চাহিতেন যে তাঁহার প্রধান কর্ম্মচারিগণের মধ্যে যেন কোন সখ্যভাব না থাকে। পরস্পর পরস্পরের সহিত সর্ব্বদা কলহে প্রবৃত্ত থাকুক ইহাই ছিল তাঁহার অভিপ্রেত। কাজেই ইস্‌মেল পাশা যতটা আশা করিয়াছিলেন তাহার কিছুই হইল না। মাত্র একটী সাবধান বাণী প্রচার করিয়া কর্ত্তৃপক্ষ চুপ করিয়া গেলেন। এদিকে ছাত্রগণ পরীক্ষা আগত দেখিয়া পাঠ্য পুস্তকসমূহে মনোনিবেশ করিল। যথাসময়ে কামাল যথেষ্ট যোগ্যতার সহিত তুর্কী সাম্রাজ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সামরিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। এই বিদ্যালয়ে যোগদান করিবার পূর্ব্বে তাঁহাকে যে কাপ্‌টেন উপাধি প্রদান করা হইয়াছিল, উহা এখন তাঁহার পাকা হইল।

বিদ্যালয় হইতে বাহির হইয়া আসিয়া কামাল ও সহযোগিগণ খুব উৎসাহের সহিত তাঁহাদের প্রচার কার্য্য চালাইতে লাগিলেন। এই সময় ফতি বে নামক একজন কর্ম্মচ্যুত সেনানায়ক এই গুপ্ত-সমিতিতে যোগদান করায় সমিতির কার্য্য বেশ উৎসাহ সহকারে চলিতে থাকে। ক্রমশঃ ইহার কার্য্যাবলীর কথা কর্ত্তৃপক্ষগণের কর্ণগোচর হইলে, প্রকৃত ব্যাপারটী ভাল করিয়া তদন্ত করিবার জন্য কৌশলে একজন চর এই সমিতির সভ্য শ্রেণীভুক্ত করিয়া পাঠাইয়া দেওয়া হয়। অচিরে তাবৎ তত্ত্বই এই গুপ্তচর কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইলে তুর্কীর এই নবীন সেনানায়কগণ পুলিশ কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া বিচারার্থ প্রেরিত হয়। রেজা পাশা তাঁহার ভূতপূর্ব্ব ছাত্রগণের পক্ষ অবলম্বন করিয়া সম্রাটের শরণাপন্ন হ'ন। সম্রাটও তাঁহাকে বিশেষ অনুগ্রহ করিতেন। রেজা পাশা সুলতানকে বুঝাইয়া দেন যে তুর্কীর ভবিষ্যৎ স্বরূপ এই সমস্ত সেনানিগণকে বিনাশ করিলে সমূহ ক্ষতি হইবে। তাহাদের বর্ত্তমান দোষকে যৌবনের খেয়াল বলিয়া উপেক্ষার চক্ষেই দেখা যুক্তিযুক্ত। তবে উহাদের ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করিয়া দিবার জন্য, উহাদিগকে দলচ্যুত করিয়া সাম্রাজ্যের সুদূর সীমানায় কর্ম্মভার প্রদান পূর্ব্বক প্রেরণ করিবার জন্য পরামর্শ প্রদান করেন। সম্রাট এই যুক্তির সারবত্তা খানিকটা অনুভব করিয়াই কামাল ও তাঁহার সহচরগণকে সুদূর এশিয়া মাইনর, আরব, মেসোপটেমিয়া প্রভৃতি প্রদেশগুলিতে সুদক্ষ সেনাপতিগণের অধীনে সৈন্য-পরিচালনার ভার দিয়া নির্ব্বাসিত করেন। কামালকে সিরিয়া প্রদেশে একদল অশ্বারোহী সৈন্যের সেনানায়ক হিসাবে রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবার আদেশ দেওয়া হয়। সম্রাটের আদেশ অনুযায়ী কামাল সিরিয়ায় যাইবার জন্য যখন জাহাজে উঠিতেছিলেন, তখন ঐ বন্দরের একটী নিভৃতস্থলে কামাল-জননী কন্যার হস্ত ধারণ করিয়া বিদেশ গমনোন্মুখ পুত্রকে দর্শন করিতেছিলেন।

১৯০৮ সালের বিদ্রোহ

বহুদিন হইতে একদল নবীন কবি ও লেখক সুপ্ত দেশকে প্রবুদ্ধ করিবার জন্য বিশেষ যত্ন করিয়া আসিতে-ছিলেন। তাঁহারা বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে বর্ত্তমান বিংশ শতাব্দীতে বাস করিতে গেলে গো-যানে এক প্রদেশ হইতে অন্য প্রদেশে গমনাগমন করিবার প্রয়াস যেমন বাতুলতামাত্র সেইরূপ পুরাতন প্রথাগুলি অবলম্বন করিয়া থাকিতে গেলে মৃতপ্রায় তুর্কীজাতির পক্ষেও মৃত্যু সেইরূপ—অবশ্যম্ভাবী। রমণীগণকে যে যুগে আবদ্ধ রাখিলে পুরুষদের মধ্যে হাতাহাতি কমিত সেইযুগেই

পর্দ্দাপ্রথার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। জনসাধারণ যখন কোন প্রকার পুস্তক পাঠ করিতে পারিত না, মোল্লা মৌলানার মুখে প্রচারিত ধর্ম্মই তখন একমাত্র দেববাক্য ছিল। কৃষিই যখন একমাত্র সম্পদ ছিল, জমিদার ও প্রজা এই দুইটী শ্রেণী বিভাগ তখন প্রয়োজনীয় হইয়াছিল। সামান্য পাল-তোলা নৌকাই যখন সমুদ্রযাত্রার পক্ষে একমাত্র অবলম্বন ছিল, তখন বাণিজ্যপণ্যের এত হুড়াহুড়ি ছিল না। পিতা বা অভিভাবকগণ কর্ত্তৃকই যখন ভবিষ্যৎ নির্ণিত হইয়া যাইত, সমাজকে স্থির ও ধীর রাখিবার জন্য বাল্য-বিবাহই তখন একমাত্র পন্থা ছিল। পাঠশালায়ই যখন বিদ্যাশিক্ষার চূড়ান্ত হইয়া যাইত, পুস্তকাগারের তখন কোন প্রয়োজনই ছিলনা। সময়ের পরিবর্ত্তনের সহিত, মানবের চিন্তার ধারা যেরূপ পরিবর্ত্তিত হইতেছে। তাহার আচার-ব্যবহারও সেইরূপ পরিবর্ত্তিত হইতেছে বর্ত্তমান যুগে উন্নতিশীল অবস্থা রক্ষা করিতে গেলে বিজ্ঞানের সাহায্য অনিবার্য্য। নবীন তুরস্কের নবীন সেনানীগণ উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া নূতন লেখকদের বর্ণিত তত্ত্বগুলি বিশেষভাবেই হৃদয়ঙ্গম করেন এবং কার্য্যতঃ সফল করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠেন।

জাপানের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া তুরস্কের সম্রাট আবদুল হামিদ যদি এই নবীন তুরস্ক দলের সহিত যোগদান করিতেন তবে তুরস্ক সাম্রাজ্যের অবস্থা নিশ্চয়ই অন্য আকার ধারণ করিত। বহুপুরুষ ধরিয়া স্বয়ং ভগবান বলিয়া পূজিত হইয়া আসা হেতু সুলতান হামিদ তাঁহার সার্ব্বভৌম ক্ষমতার কণামাত্র হ্রাস করিতে চাহিতেন না। নবীন তুরস্ক যখন ইউরোপীয় আদর্শে দেশের মধ্যে জাতীয়তার বীজ বপন করিয়া এক নবশক্তির উপাসনায় ব্যস্ত, সুলতান তখন প্রাচীন ইসলাম ধর্ম্মের সকল প্রকার গোঁড়ামী গুলাকে তাহার শক্তির অঙ্গ বলিয়া জাপটাইয়া ধরিলেন। তুরস্কের নবীন দল সম্রাটকে সিংহাসনচ্যুত করিতে চাহেন নাই। জাপানের মিকাডোর মত তাঁহাকে কতকগুলি আইন-কানুনের অধীন করিয়া সার্ব্বভৌম ভাবেই তুর্কীর মস্‌নদে বসাইয়া রাখিতে চাহিয়াছিলেন। সুলতান তাহাদের মনোভাব সম্যক অবগত না হওয়ায় এই নবীন দল সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় যত্নবান বলিয়া সন্দেহ করিতেন এব তাহাদিগকে সমূলে বিনাশ করিবার অবসর ও সুযো অনুসন্ধান করিতেন।

ক্রমশঃ সাম্রাজ্যের তাবৎ সেনানায়কই এই দলে সভ্য শ্রেণীতে নাম লেখান। এই দলের দুইটী শাখ ছিল। যাঁহারা দ্রুত সংস্কারের পক্ষপাতী ছিলেন তাঁহাদের প্রধান আড্ডা ছিল পারিস নগরী। যাঁহার সংস্কারের পক্ষপাতী হইলেও, সময়ের জন্য অপেক্ষা করিতে চাহিতেন, তাঁহাদের প্রধান কর্ম্মক্ষেত্রে ছিল বার্লি নগরী। পূর্ব্বোক্ত দলের অধিকাংশ নায়কই লেখক কবি, রাজনৈতিক ছিলেন, শেষোক্ত দলের নায়কগ কর্ম্মচ্যুত উচ্চ রাজকর্ম্মচারী, বা বিশেষ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন। বিদ্রোহ সংঘটিত করিবার জন্য উভয়দলই এখন একযোগে কাজ আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল। এই দল দুইটীর অসংখ্য শাখা তুরস্কের প্রধান প্রধান নগর গুলিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইস্‌মেল পাশার চক্রান্তে—এই সমিতিদ্বয়ের কতকগুলি সভ্য স্থানান্তরিত হইলেও উহাদের কার্য্যকলাপ কোনরূপেই হ্রাস পাইল না। সমিতিদ্বয় হাতেলেখা একখানা খবরের কাগজ বাহির করিত, উহা তাবৎ সভ্যদের মধ্যে চলাচল হইতে পারিত বলিয়া, সমিতির মতামতই তাবৎ সভ্যের নিকটেই প্রচারিত হইতে পারিত।

কামাল নির্ব্বাসিত হইয়া প্রাচীন দামস্কস নগরীতে আসিলেন। সহস্র রজনীর খলিফাগণের রাজধানীতে পদার্পণ করিয়াই উহার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে কামাল বিশেষ মুগ্ধ হইয়া পড়েন। নির্ব্বাসিত জীবন যেরূপ দুরূহ হইবে বলিয়া পূর্ব্বে ধারণা করিয়াছিলেন এই স্বপ্ন কুহেলিকার আবৃত নগরীতে আসিয়া দেখিলেন তাহা তাঁহার একেবারেই ভ্রম। নূতন স্থানে তাঁহার অন্তরেও কেমন নূতন কার্য্যকরী শক্তি আসিয়া দেখা দিল।

এখানে দুর্দ্ধর্ষ আরব জাতির কোন একটী শাখার দলপতি আপনাকে হজরৎ বলিয়া ঘোষণা করিয়া সম্রাটের অধীনতা অস্বীকার করিয়া বসে। তাহাকে দমন করিবার জন্য নবীন সেনাপতি কামালকে আদেশ দেওয়া হয়। সামরিক বিদ্যালয়ে আধুনিক যুদ্ধ বিদ্যা শিক্ষা

শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র রায়

লক্ষ্মীবিলাস প্রেস লিঃ, কলিকাতা

করিলেও প্রকৃত যুদ্ধক্ষেত্র চাক্ষুষ দেখিবার অবসর কামাল এইবার প্রাপ্ত হইলেন। এই যুদ্ধ-কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া কামাল বেশ বুঝিতে পারিলেন যে সমগ্র মুসলমান জাতিগুলিকে এক পতাকার অধীনে আনয়ন করিবার জন্য সুলতান পক্ষ হইতে যে উদ্যোগ চলিতেছে উহা বাতুলতা মাত্র। ভবিষ্যতে যদি খৃষ্টান পক্ষীয় কোন শক্তির সহিত তুরস্কের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে আরবের বেদুইনগণ বিপন্ন সুলতানকে কখনই সাহায্য করিবে না। এই অভিজ্ঞতা তিনি এখান হইতেই অর্জ্জন করিয়াছিলেন। এই শিক্ষা তাঁহার উত্তর-জীবনে বিশেষ কার্য্যকরী হইয়াছিল।

বসরার শাসনকর্ত্তা আরব্যোপন্যাসেরই অভিনয় করিতেন। প্রাতঃকালে দুই-এক ঘণ্টা কার্য্য করিয়া দ্বি-প্রহরে নিদ্রাসুখ ভোগ করিতেন। সন্ধ্যার সময় বিখ্যাত নগর-উদ্যানগুলিতে বাঈজীগণের নৃত্যাদির সহিত মদিরার উৎস খুলিয়া দিতেন। গুলবাগানগুলির স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যের সহিত বিবিধ জাতির সুন্দরীদের অপূর্ব্ব সমাবেশ হইত। কামাল শাসনকর্ত্তার দরবারে প্রায়ই নিমন্ত্রিত হইতেন। স্বভাবতঃই গম্ভীর প্রকৃতির হইলেও কামাল এই সমস্ত আমোদ-প্রমোদে যোগদান করিতে কোন প্রকার দ্বিধাই অনুভব করিতেন না। কর্ম্মব্যস্ত মস্তিষ্ককে নূতনত্ব প্রদান করিবার জন্য কিম্বা কার্য্যব্যস্ত হৃদয়কে ক্ষণকাল বিশ্রাম দিবার জন্য ভোগের আবশ্যক ইহাই ছিল কামালের ধারণা। ভোগ কখনই মানুষকে খর্ব্ব করে না, বরং খানিকটা কর্ম্মক্ষমই করিয়া তুলিতে পারে, যদি তাহা ক্ষণকালের জন্য হয়। কামাল ভোগীকে ঘৃণা করিতেন না কিন্তু ভোগের কীট হইতে তাঁহার বিশেষ আপত্তি ছিল।

তাঁহার উপর ন্যস্ত কর্ম্মের অবসান হইলে সালোনিকায় প্রত্যাগমন করিবার জন্য কামালের হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠে। সালোনিকার সেনাপতি তাঁহার পরিচিত ছিলেন। তথায় বদলি হইয়া যাইবার জন্য তাঁহাকে সুপারিশ ধরিয়া একখানা অনুনয়পত্র লেখেন। সেনাপতি মহাশয় কামালকে বিশেষভাবেই জানিতেন। কামাল সালোনিকায় আসিলে আবার গুপ্ত সমিতির কার্য্যকলাপে জড়িত হইয়া পড়িবে এই আশঙ্কায় তাহাকে পত্রের উত্তরে শুধু চেষ্টা করিয়া দেখিবেন, এইটুকু লিখিয়া পাঠান। কামাল এই ছত্রটীর বিশেষ অর্থ কি তাহা জানিবার জন্য কোন প্রকার চেষ্টা না করিয়াই, ছদ্মবেশে বহুকষ্ট স্বীকার করিয়া সালোনিকায় গিয়া উপস্থিত হন। সেনাপতি মহাশয় কামালকে অপ্রত্যাশিত ভাবে উপস্থিত দেখিয়া বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়েন। এদিকে কামাল স্বস্থান পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার উপরিতন অধ্যক্ষগণের অনুমতি না লইয়াই সর্ব্ব ষড়যন্ত্রের পিঠস্থান সালোনিকায় ফিরিয়া আসিয়াছেন সংবাদ কর্তৃপক্ষগণের কর্ণগোচর হইলেই তাঁহারা তাঁহাকে বিশেষ শাস্তি দিবার জন্য বদ্ধ পরিকর হয়েন। সালোনিকার সেনাপতি ও দামস্কসের সেনানায়ক উভয়ে কামালের পক্ষ অবলম্বন করিয়া কামালকে রাজ-রোষ হইতে রক্ষা করেন সত্য কিন্তু কাল বিলম্ব না করিয়া পূর্ব্বস্থানে ফিরিয়া যাইবার জন্য কামালকে কঠোর আজ্ঞা প্রদান করা হয়। অবাধ্যতার ফল পরিণামে ভীষণ হইলে পারে আশঙ্কা করিয়া কামাল আবার গুপ্ত বেশে দামস্কসে প্রত্যাগমন করেন।

সালোনিকার যুবক সেনানিগণ তাঁহাদের ষড়যন্ত্রকার্য্য বেশ সফলতার সহিতই চালাইতেছিলেন। সাধারণ সৈন্যগণের সংস্পর্শে আসিয়া রাজ-বিদ্বেষের বীজ বেশ ব্যাপক ভাবেই বপন করা হইতেছিল। এই সময়ে রাশিয়া জাপানের হস্তে পরাজিত ও লাঞ্ছিত হইয়া তাহাদের সমস্ত শক্তি বলকান অঞ্চলে সন্নিবেশিত করেন। অষ্ট্রীয়া তুরস্কের কয়েকটি স্থান স্বাধিকারভুক্ত করিয়া লইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়েন। অধীনস্থ প্রদেশ মাসিডোনিয়া স্বাধীনতা অর্জ্জন করিবার জন্য চেষ্টা করিতে থাকে। এই সমস্ত প্রদেশের রেলপথগুলি রক্ষা করিবার জন্য একদল সুদক্ষ সেনানীর প্রয়োজন হইলে, স্বয়ং সম্রাট কামালকে উক্ত কার্য্যে নিয়োগ করিয়া সালোনিকায় প্রত্যাগমন করিবার জন্য আদেশ দেন। কামাল তাঁহার নূতন কার্য্যে যোগদান করিলে সমিতির অধিনায়কগণ সুদূর পল্লীতে প্রচার কার্য্য চালাইবার জন্য কামালকে অনুরোধ করেন। কালক্রমে এই সমস্ত গুপ্ত সংবাদ নক্ষত্র প্রাসাদে সম্রাটের কর্ণগোচর হইলেও, কে বা কাহারা এই ষড়যন্ত্রের

নায়ক এবং উহাদের কর্ম্মক্ষেত্রই বা কোথায় বহু চেষ্টা করিয়াও তাহার কোন অনুসন্ধান করিতে পারিলেন না। বহু অর্থ ব্যয় এবং অসংখ্য গুপ্তচর নিয়োগ করিয়াও যখন সম্রাট বিফল মনোরথ হইলেন, তখন এই সমস্ত বিদ্রোহী সেনানীদের সহিত সদ্ভাব স্থাপন করাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করেন। এদিকে বিদ্রোহীকে দমন করিবার জন্য যে সৈন্যদল প্রেরিত হইয়াছিল, তাহারা তাহাদের সহকর্ম্মীদের উপর গুলিবর্ষণ করিতে স্পষ্টতঃ অস্বীকার করিয়া প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করে।

বিদ্রোহীদের নেতা নিয়াজী বে ও আনওয়ার পাশাকে হস্তগত করিবার জন্য সুলতান সর্ব্বপ্রকার কৌশল অবলম্বন করিয়াও বিফল মনোরথ হ'ন। অবশেষে উপায়ান্তর নাই দেখিয়া ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের প্রতিশ্রুত শাসন-সংস্কার প্রদান করিবার জন্য শপথ করেন। বিদ্রোহী সেনানায়কগণ বিনা রক্তপাতে তাঁহাদের চেষ্টা অপ্রত্যাশিত ভাবে সাফল্য গৌরবে মণ্ডিত হইল দেখিয়া যারপর নাই উৎসাহিত হ'ন। পারিস ও বার্লিন নগরী হইতে নির্ব্বাসিত ও পলাতক রাজনৈতিকগণ স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া দেশের শাসনভার গ্রহণ করিলেন।

সওকৎ পাশা

নবীন তুরস্কদলের অসাধারণ সফলতায় তাহাদের সভ্য সংখ্যা মাত্র এক শত হইতে খুব অল্পদিনের মধ্যেই একলক্ষে গিয়া দাঁড়াইল। স্বয়ং সম্রাট এই দলের পৃষ্ঠপোষক হইলেন এবং প্রচুর অর্থ সাহায্য করিবার জন্য প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। নির্ব্বাসিত রাজনৈতিকগণ রাজদণ্ড গ্রহণ করায় যাহারা প্রকৃত বিদ্রোহানল প্রজ্জ্বলিত করিয়া নবযুগ আনয়ন করিল সেই সমস্ত নবীন সেনানায়কগণ তাঁহাদিগের অর্জ্জিত সম্পদ্ হস্তান্তর হইল দেখিয়া ক্ষুন্ন হইয়া সরিয়া দাঁড়াইল। নূতন পার্লামেণ্ট গঠিত হইল। নির্ব্বাচনের জন্য নবীন তুরস্কের দল তাহাদের নামাঙ্কিত প্রবেশপত্র বাহির করিল। এই প্রবেশপত্র দেখাইয়া নবীন তুরস্কদলের মনোনীত ব্যক্তিগণ আইন সভায় ও শাসন পরিষদে প্রবেশ করিল। কামাল পাশা অনেকটা বিরক্ত হইয়াই সালোনিকায় প্রত্যাগমন করিয়া তাঁহার নিজের কার্য্যে ব্যাপৃত রহিলেন।

তুরস্কে এতদিন একজন পুরুষের অত্যাচার সনাতনী প্রথার অঙ্গ বলিয়া চলিয়া আসিতেছিল। সম্রাটের নিকট সমস্ত প্রজাই সমান হওয়ায় ন্যায়-মর্যাদার অবমাননা প্রায়ই তুরস্ক সাম্রাজ্যে দেখা যাইত না। উচ্চ রাজকার্য্যে যোগ্যতাই বিশেষ উপযুক্ত গুণ বলিয়া বিবেচিত হইত। সুলতান কোন জাতি বিশেষের উন্নতি সুনজরে দেখিতেন না। কাজেই সম্রাট পরিবারের একাধিপত্য একেবারে ছিল না। এখন কতকগুলি মধ্য বিত্ত ব্যক্তি রাজদণ্ড গ্রহণ করিয়া ন্যায়ের মর্য্যাদা বিস্মৃত হইলেন। আপনাদের ক্ষমতা অক্ষয় করিয়া রাখিবার উদ্দেশ্যে দেশের সর্ব্বত্র তাহাদের সমিতির শাখা বিস্তার করিয়া দলের লোক দ্বারা ঐগুলি পূর্ণ করিতে লাগিলেন। রাজকার্য্যে কর্ম্মচারী নিয়োগ করিবার সময়েও যোগ্যতার পরিবর্ত্তে অনুকম্পাই ফলপ্রদ হইয়া দাঁড়াইল। ইহা ব্যতীত বিদেশী নেতাগণ ক্ষমতা স্বহস্তে প্রাপ্ত হইয়া আমোদের পূর্ণ করিবার যথেষ্ট সুবিধা ও সুযোগ পাইলেন। এই সমস্ত অনাচার ব্যাপকভাবে চলিলেও জাতীয়তার প্রবলবাত্যা তখন দেশের উপর বহিয়া যাইতেছিল বলিয়াই জনসাধারণ বিদ্রোহী নেতাদের তাবৎ অনুশাসনই অবনত মস্তকে স্বীকার করিয়া লইল।

সর্ব্বত্রই দেখা যায় যে একদল অগ্রসর হইয়া কর্ম্মভার গ্রহণ করিলেই আর একটী বিরুদ্ধবাদী দল উহার শত্রুতাচরণ আরম্ভ করিয়া দেয়। বিদ্রোহীদের বার্লিন নগরের শাখাটী মধ্যপন্থী ছিল। উহাদের মধ্যে অনেক প্রাচীন ধর্ম্মাবলম্বী সভ্য থাকায় পাশ্চাত্যের অনুকরণে সমাজের আমূল পরিবর্ত্তন করিবার জন্য মত তাঁহারা দিতে পারিলেন না। ক্রমশঃ এই দলের সহিত তুরস্কের প্রাচীন দলের সখ্য হইয়া যাওয়ায় উভয়ে মিলিয়া নবীন তুরস্কের শাসক দলটীকে হীনপ্রভ করিবার জন্য ষড়যন্ত্র সুরু করিয়া দিল।

বিদ্রোহীদের যে দল প্যারিস হইতে আসিয়া রাজদণ্ড গ্রহণ করিল তাহারা সর্ব্বাংশেই ইউরোপকে অনুকরণ করিতে চাহিলেন। সুদূর প্রাচ্যে জাপান ইউরোপীয়

শিক্ষাদীক্ষায় শিক্ষিত হইয়া অতি অল্প সময়ের মধ্যেই বিশাল রাশিয়াকে পরাজিত ও অপমানিত করিতে পারিয়াছিল এই কথা তাঁহারা কিছুতেই বিস্মৃত হইতে পারিতেছিলেন না। তাঁহারা তুর্কীসমাজের আচার ব্যবহার, পোষাক পরিচ্ছদ ইত্যাদি সমস্তই ইউরোপীয় আদর্শে গঠন করিবার প্রয়াসী হইয়া পড়েন। তুরস্ক সাম্রাজ্যের মধ্যে নানা প্রকার ভাষার প্রচলন থাকিলেও একমাত্র তুরস্ক ভাষাকেই সরকারী ভাষা বলিয়া ঘোষণা করা হইল, ফেজ উঠাইয়া দিয়া হ্যাটের প্রবর্ত্তন করা হইল। পর্দ্দা বা 'বরখা' তুলিয়া দিবারও কথা হইল। ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক গোঁড়ামী পরিত্যাগ করিবার জন্য মোল্লা ও মৌলানাদিগকে অনুরোধ করা হইল। বিজ্ঞান শিক্ষা দিবার জন্য বিবিধ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হইল।

সমস্ত সমাজেই একদল সনাতন পন্থী আছেন যাঁহারা নূতনকে আবির্ভূত হইতে দেখিলেই আঁৎকাইয়া উঠেন, গুড়ের পর চিনি আবিষ্কৃত হইলেও গুড় দিয়াই দেবার্চ্চন শাস্ত্রানুমোদিত বলিয়া বিশ্বাস করেন। আলুর নূতন আমদানি হইলেও কচু দিয়াই ভোগ রন্ধন করা ন্যায় সঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকেন। পুরাতনের একান্ত অনুরক্ত একদল তখনকার তুরস্ক সমাজেও বিদ্যমান ছিল। মোল্লা, মৌলানাগণ, অজ্ঞ ও নিরক্ষর প্রজাগণ, ক্ষমতাপ্রিয় তাবৎ উচ্চাশী ব্যক্তিগণ এই দলভুক্ত ছিলেন। সুযোগ বুঝিয়া বার্লিনের বিদ্রোহীদল আপনাদিগকে উদারনৈতিক মতাবলম্বী বলিয়া ঘোষণা করিয়া এই দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। সনাতনীদের সহিত এই দলের নানা বিষয়ে মতভেদ থাকিলেও প্যারীসের রাজনৈতিক দলকে ধ্বংস করা সম্বন্ধে উঁহাদের মধ্যে কোন মতান্তর ছিল না। প্যারিসের দল, এই সম্মিলিত দল দুইটীর হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য 'ইউনিয়নিষ্ট' বা 'মিলনকারী' এই আখ্যা গ্রহণ করিল।

সৈন্যদলকে হস্তগত করিতে না পারিলে কোনরূপেই সুবিধা করিতে পারা যাইবে না দেখিয়া তাহাদিগকে হস্তগত করিবার জন্য বিবিধ ষড়যন্ত্র আরম্ভ হইল। প্যারিসের রাজনৈতিকদল তাবৎ রাজক্ষমতা হস্তগত করিয়া লওয়ায় সুলতান হামিদ তাঁহার নক্ষত্র প্রাসাদে প্রায় একরূপ নির্ব্বাসিত হইয়াই বাস করিতেছিলেন। সুলতানের ক্ষমতা হ্রাস প্রাপ্ত হইলেও তাঁহার সম্মান ও প্রতিষ্ঠা তুরস্ক সমাজে বিন্দুমাত্র ক্ষয়প্রাপ্ত হয় নাই। এই রাষ্ট্রীয় দুর্যোগে ইচ্ছা করিলে সুলতান আত্ম-প্রকাশ করিয়া তাঁহার পূর্ব্ব ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য চেষ্টা করিতে পারিতেন। কিন্তু বার্দ্ধক্য হেতু তাঁহার সে সাহস বা উৎসাহের একান্ত অভাব ঘটিল। কাজেই উদারনৈতিক বর্ত্তমান শাসন প্রণালীর বিরুদ্ধে জোর আন্দোলন চালাইলেও, সুলতানের সহিত তাহাদের কোন সম্বন্ধই রহিল না। মোল্লাগণ জনসাধারণকে বুঝাইয়া দিল যে কতকগুলি আচারভ্রষ্ট ও ভণ্ড নির্ব্বাসিত অবস্থায় কাফেরদের সংস্পর্শে আসিয়া পবিত্র ইসলামধর্ম্মের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিয়া উহার মূলোচ্ছেদ করিতে চাহিতেছে। এই সমস্ত ধর্ম্মভ্রষ্ট ও ক্রিয়াকলাপহীন ভণ্ডদের হস্ত হইতে রাজক্ষমতা কাড়িয়া লইতে না পারিলে শুধুই যে পবিত্র ইসলাম অবমাননা হইবে তাহা নয় ভবিষ্যতে হয়ত বা খৃষ্টান ধর্ম্মই প্রবল হইয়া দাঁড়াইতে পারে। ধর্ম্মের নামে ডাক দিলে অজ্ঞদের মধ্যে সমস্ত দেশেই সাড়া পড়িয়া যায়, তখনকার তুরস্কের জনসাধারণের শতকরা নব্বই জন অজ্ঞ থাকায় এই কৌশল অচিরেই সফল হইল, সৈন্যগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া তাহাদের অধিনায়কগণকে হত্যা করিয়া রাজধানী অবরোধ করিয়া বসিল।

এই বার্ত্তা ক্রমশঃ সালোনিকায় গিয়া পৌছাইলে তথাকার প্রধান সেনাপতি সওকৎ পাশা বিশেষ আনন্দিতই হয়েন। ১৯০৮ সালের বিদ্রোহ যেমন সেনানায়কগণ কর্ত্তৃকই সংঘটিত হইয়াছিল, এক বৎসর পরে ১৯০৯ সালের এই বিদ্রোহ ভারতের সিপাহী বিদ্রোহের ন্যায় মাত্র সৈনিকগণের রাজনৈতিক আন্দোলন করিবার প্রয়াস বলিলেও কিছুই অত্যুক্তি করা হইবে না। উদারনৈতিকগণ এই বিদ্রোহ সংঘটনে যথেষ্ট সাহায্য করিলেও উহাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া শান্তি প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক রাজদণ্ড পরিচালন করিবার মত দক্ষতা তাহাদের কাহারই ছিল না।

ইউনিয়নিষ্ট নেতাগণই তাঁহাদের জীবন বিপন্ন করিয়া বিদ্রোহী সৈন্যগণের সম্মুখীন হয়েন এবং তাহাদিগকে নানা প্রকার যুক্তি প্রদর্শন করিয়া ও শাসন সংস্কারের নূতন ব্যবস্থা করা হইবে আশ্বাস দিয়া সৈন্যাবাসগুলিতে প্রত্যাগমন করিবার অনুরোধ করেন। সুলতান হামিদ তাঁহার নক্ষত্রাবস হইতে এই বিদ্রোহের তাবৎ ঘটনাবলীই খুব মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করিলেও কোন পক্ষেই যোগদান করিতে সাহসী হইলেন না।

সালোনিকার প্রধান সেনানী সওকৎ পাশা তাঁহার বাহিনী লইয়া রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। অতি অল্প আয়াসেই ইউনিয়নিষ্টদিগকে বিতাড়িত করিয়া দিয়া রাজ প্রাসাদ অবরোধ করেন। সুলতান প্রাণভয়ে ভীত হইয়া সওকৎ পাশার শরণাপন্ন হইলে, সওকৎ পাশা তাঁহাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত না করিয়া সপরিবারে রাজধানী হইতে নির্ব্বাসিত করেন। তাঁহার এক ভ্রাতাকে পঞ্চম মহম্মদ উপাধি দিয়া তুর্কীর মসনদ তাঁহাকে প্রদান করেন। তাহার পর কমিটি অফ প্রগ্রেস নাম দিয়া সাতজন বিশিষ্ট ব্যক্তি লইয়া একটী শাসন পরিষদ গঠিত হয়।

কামাল সালোনিকায় তাঁহার পূর্ব্বপদে প্রতিষ্ঠিত রহিলেন। কামালের বুদ্ধিমত্তার যথেষ্ট সুখ্যাতি না থাকিলেও, এই সমস্ত বিদ্রোহে কামাল পরোক্ষে সাহায্য করিতেন মাত্র, খুব ঘনিষ্ঠ ভাবে কখনই আপনাকে সংশ্লিষ্ট করেন নাই। তিনি বেশ জানিতেন যে সনাতন প্রথালম্বী কোন একটা দেশকে আধুনিক যুগের শিক্ষায় দীক্ষায় উন্নত করিয়া তুলিতে গেলে হয় দেশের সমস্ত সম্প্রদায় গুলিকেই ভীষণ ভাবে স্বার্থত্যাগ স্বীকার করিতে হইবে, আর না হয় সমস্ত দেশকে কতকগুলি খণ্ড খণ্ড প্রলয়ের মধ্য দিয়া খুব সাবধানতার সহিত লইয়া যাইতে হইবে। ক্রম-পরিবর্ত্তনের সাহায্যে যে কার্য্য সংঘটিত করিতে পারা যায় বিদ্রোহের সাহায্য তাহা সম্পাদন করিতে তিনি একান্তই অনিচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু কি ক্রম-পরিবর্ত্তন বা বিদ্রোহ সংঘটন দ্বারা উহা সম্পাদন করিবার জন্য যে সমস্ত নেতা প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া জনসাধারণের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াল, সময়ের পরিবর্ত্তনের সহিত তাঁহাদিগকে জনধারণের অপ্রিয় হইয়া উঠিতে হইবেই। বাক্সীর শেষ দানের জন্য প্রস্তুত হওয়া কামালের জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য থাকায় এই সমস্ত খণ্ড বিদ্রোহে তিনি কখনই পরিষ্কার ভাবে আত্ম প্রকাশ করিতে চাহিতেন না।

রাজ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইলে রাজকার্য্য উপলক্ষে কামালকে প্যারিসে যাইতে হয়। কামাল ফরাসী ভাষায় বিশেষ দক্ষ ছিলেন। এখানে আসিয়া ইউরোপীয়দের কার্য্যকলাপ দেখিয়া উহাদের উপর তাঁহার আজন্ম প্রতিপালিত ভক্তি বিশেষ ভাবেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। ইউরোপের সৈন্যগণের আদর্শে একদল নূতন তুরস্ক বাহিনী গঠন করিবার মানসে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়াই উক্ত কার্য্যে বিশেষ ভাবে আত্ম-নিয়োগ করেন।

তুরস্ক ক্রমশঃই দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে দেখিয়া ইউরোপের শক্তিপুঞ্জ উহার আফ্রিকামহাদেশস্থ প্রদেশ গুলি হস্তগত করিবার মানসে ষড়যন্ত্র সুরু করিল। এই ষড়যন্ত্র হইতে উহাদের মধ্যে আত্ম দ্রোহ ভীষণ ভাবে প্রকাশ পায়। রাশিয়া তাবৎ তুরস্ককেই গ্রাস করিবার জন্য মুখ ব্যাদন করিয়া বসিল। ফ্রান্স মরক্কো দখল করিয়া লইল। জার্ম্মাণি মধ্য আফ্রিকার কতিপয় দেশ প্রাপ্ত হওয়ায় ইউরোপীয় জাতিগণের তুরস্কাধিকারে কোন আপত্তিই করিল না। এদিকে বলবান শক্তিপুঞ্জও তুরস্ককে দুর্ব্বল হইতে ও গৃহ-বিবাদে ব্যস্ত থাকিতে দেখিয়া সকলেই বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। ১৯১০ সালে তুরস্কের ভিতর ও বাহিরে কোন রূপ শান্তি রহিল না।

এইরূপ অক্ষমতার যথেষ্ট কারণও ছিল। বলকানের খৃষ্টান শক্তিগণ পশ্চিম ইউরোপের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া নব আদর্শে জাতীয়তা গঠন করিবার জন্য দেশে স্বার্থ ত্যাগের প্রবল বন্যা আনয়ন করিতে সমর্থ হওয়ায়, তাহাদের মধ্যে অদ্ভুত শক্তির সঞ্চার হয়। তুরস্কে সনাতন প্রথা এখনও বদ্ধমূল থাকায়, নেতারা যেটুকু চেষ্টা করিতেন তাহা অনেকটা তাঁহাদের নিজেদের স্বার্থ রক্ষা করিবার প্রয়াসমাত্র ছিল। সমগ্র জাতির সহিত এই

দলের মনের মিল না থাকায় আদর্শবিহীন, স্বার্থান্বেষী তুরস্কের রাজশক্তি ক্রমশঃ সর্ব্ব স্থলেই অপমানিত হইয়া হটিয়া আসিতে লাগিল। সার্ভিয়া, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া হইতে তুর্কীর প্রজাগণ বিতাড়িত হইয়া তুরস্কে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল। কামালের মাতা ও ভগ্নী এই সমস্ত পলায়িত প্রজাগণের সহিত তাঁহাদের পুরাতন আবাস পরিত্যাগ করিয়া রাজধানীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই সময়ে ইটালীর বাহিনীকে বাধা প্রদান করিবার জন্য কামালকে ত্রিপোলীতে প্রেরণ করা হইয়াছিল। কামাল প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া ইটালীর তাবৎ শক্তিকে সংযত করেন কিন্তু দেশের মধ্যে বিদ্রোহানল প্রজ্জলিত হইয়া উঠিয়াছে শুনিয়াই তথাকার সৈন্য পরিচালন ভার সহযোগী আনোয়ার পাশার উপর ন্যস্ত করিয়া তুরস্কে ফিরিয়া আসেন।

ইংলণ্ড তুরস্ককে কখনই ধ্বংস করিতে চাহেন নাই। বলকান অঞ্চলের গোলযোগের অবসান করিবার জন্য ইংলণ্ডের রাজনৈতিকগণ লণ্ডন নগরীতে এক শান্তি সভা বসাইলেন। তথাকার সন্ধি অনুযায়ী দার্দ্দিনেলিজ ও গালিপোলি ব্যতীত সমুদয় প্রদেশগুলি ও উহার আফ্রিকা মহাদেশস্থ অধিকারগুলি ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জের হস্তে প্রদান করিয়া সন্ধি ভিক্ষা করিয়া লন। ইংলণ্ডের সহিত তুর্কীর এক স্বতন্ত্র সন্ধি হইলে ইংলণ্ড ভবিষ্যতে তুরস্ককে সর্ব্বপ্রকার বহিঃশক্রর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য প্রতিজ্ঞা করেন। ত্রিপোলী হইতে প্রত্যাগমন করিয়া আনওয়ার পাশা জনসাধারণের বিশেষ প্রিয়পাত্র হইয়া উঠায়, সমস্ত ক্ষমতা তাঁহার হস্তে চলিয়া যাওয়ায় তিনি এখন হইতে তুরস্কের সর্ব্বময় কর্ত্তা হ'ন।

১৯১৩ সালের ইউরোপ

১৫ই জুন, ১৯১৩ সালে, সওকাৎ পাশা গুপ্ত ঘাতকের হস্তে প্রাণত্যাগ করেন। আনওয়ার পাশা, জামাল পাশা ও তালাৎ পাশাকে লইয়া একটী নূতন শাসন-পরিষদ গঠন করা হয়। এই ত্রয়ীর আনওয়ার পাশাই সকলের বয়োকনিষ্ঠ হইলেও, যথেষ্ট বংশ মর্য্যাদার সাহায্যে এবং এক সুলতান কন্যাকে বিবাহ করা হেতু, তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্ষমতার অধিকারী হইয়া পড়েন। ত্রয়ীর অপর দুইজন তালাৎ ও জামাল সামান্য গৃহস্থের গৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়া শুধু নিজেদের চেষ্টায় ও অধ্যবসায় বলে উন্নতির চরম সীমায় আরোহণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

প্রাপ্ত ক্ষমতা রক্ষা করিতে সৈন্যদলই প্রধান অবলম্বন জানিয়া আনওয়ার পাশা ক্ষমতা গ্রহণের সহিত সেনা সংস্কারে বিশেষভাবে মনোযোগ করিলেন। কামালের সহিত আনওয়ারের কোনকালেই সৌহার্দ্দ্য ছিল না। আনওয়ার কামালকে উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে সর্ব্বদাই বিশেষ আশঙ্কা করিতেন। কামাল ও আনওয়ারকে হিংসা না করিলেও তাহার প্রভুত্ব মানিয়া লইতে একেবারেই প্রস্তুত ছিলেন না। এইজন্যই কামাল নূতন বন্দোবস্ত হইয়া গেলেই নিঃশব্দে সালোনিকায় প্রত্যাগমন করেন। এদিকে আনওয়ার পাশা জার্ম্মানি হইতে সমর-বিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য শিক্ষকগণকে আনয়ন করিয়া নূতন সৈন্যদল গঠন করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ফ্রান্স হইতে প্রচুর যুদ্ধ-সম্ভার আনয়ন করিয়া দুর্গগুলিকে সুদৃঢ় করিয়া তুলিলেন। গত শতাব্দীতে সঙ্ঘবদ্ধ জার্ম্মাণি ফ্রান্সকে যেরূপ পদদলিত করিয়াছিল ঠিক সেই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া রাশিয়াকে উপযুক্ত শিক্ষা প্রদান করিবার জন্য আনওয়ার পাশা তাঁহার প্রাণমন ঢালিয়া দিয়া তোড়-জোড় করিতে লাগিলেন।

১৯১৩ সালে ইউরোপের রাজ্যগুলিকে মোটামুটি দুই ভাবে বিভক্ত করিতে পারা যায়। পশ্চিম ইউরোপের রাজ্যগুলি অর্থাৎ ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মাণি ও ইটালী প্রায় তাবৎ পৃথিবীই গ্রাস করিবার জন্য অধীর হইয়া উঠিয়াছিল। পূর্ব্ব ইউরোপের সার্ভিয়া, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া ও গ্রীস নূতন স্বাধীনতা লাভ করিয়া, সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে পশ্চিম ইউরোপের জাতিগণের ন্যায় উন্নত হইয়া উঠিবার জন্য বিশেষ ব্যগ্র হইয়া পড়ে। রাশিয়া জাপানের হস্তে পরাজিত হইয়া তুরস্ককে গ্রাস করিবার জন্য বদ্ধ পরিকর হয়। গ্রীস প্রাচীন হেলেনিক সাম্রাজ্যের স্বপ্নে বিভোর হইয়া এজিন সমুদ্রের দ্বীপগুলির উপর ও এশিয়া মাইনরের দিকে তাহার লুব্ধ দৃষ্টি ফেলিতেছিল। একটী ভীষণ যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী স্থির করিয়া সমস্ত জাতিই উদ্যোগপর্ব্বের ন্যায় শক্তি সঞ্চয়ে বিশেষ ব্যস্ত হয়। পশ্চিম ইউরোপের

বণিকগণ তাঁহাদের ব্যবসা বৃদ্ধির জন্য নূতন নূতন জনপদ আবিষ্কারে সচেষ্ট হ'ন। জর্ম্মাণি পৃথিবীর তাবৎ আবিষ্কৃত দেশগুলিই হয় ফ্রান্স না হয় ইংলণ্ডের অধিকার গত দেখিয়া ইংলণ্ড ও ফ্রান্সকে চূর্ণ করিবার মতলব করিতেছিল। সামান্য ব্যাপারেই ধূমায়মান অগ্নি দাবানলে পরিণত হইয়া ইউরোপকে ভস্মস্তূপে পরিণত করিয়া দিতে পারে ব্যাপার যখন এমনি গুরুতর হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তখন গ্রীস্ ও রুমানিয়া রাশিয়ার উত্তেজনায় বুলগেরিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া বসিল। পুরাতন অষ্ট্রীয় সাম্রাজ্য রাশিয়ার চালাকি বুঝিতে পারিয়া বুলগেরিয়াকে পরোক্ষে সাহায্য করিতে লাগিল। এই সময়ে কামাল সোফিয়া নগরীতে তুরস্কের রাজদূত হিসাবে অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহারই ইঙ্গিতে আনওয়ার পাশা খৃষ্টান শক্তিগণের নিকট হইতে তুরস্ক সাম্রাজ্যের হস্তচ্যুত কতকটা অংশ পুনরাধিকার করিয়া লন। বহুদিন হইতে তুরস্ক সৈন্য খৃষ্টানদিগকে একটী যুদ্ধেও পরাজিত করিতে পারে নাই, এই ব্যাপারে তাহাদের অনেকটা নৈতিক উন্নতি ঘটে।

মহাযুদ্ধের পূর্ব্বাভাস

আনওয়ার পাশাই ১৯১৪ সালে প্রধান হোতা হইয়া তুরস্ককে জার্ম্মাণির পক্ষ অবলম্বন করাইয়া সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ করান। জর্ম্মাণ আদর্শই তাঁহার নিকট ধ্রুব সত্য ছিল। সেডানের যুদ্ধক্ষেত্র যেমন জার্ম্মাণিকে অলৌকিক সাফল্য আনিয়া দিয়া সারা বিশ্বে পূজনীয় করিয়া তোলে, আনওয়ার ও তাঁহার সহচরগণ এই মহা-সমরে যোগদান করিয়া জার্ম্মাণির আনুকূল্যে সেইরূপ একটা বড় যুদ্ধে বলকান রাজ্যগুলির সহিত রাশিয়ার সমস্ত ক্ষমতা ধূলিসাৎ করিয়া দিতে পারিবেন বলিয়া আশা করিয়াছিলেন। জার্ম্মাণ ব্যবসায়ীগণ তুরস্ককে স্বপক্ষে আনিবার জন্য পূর্ব্বাবধিই যথেষ্ট চেষ্টা করিয়া আসিতে-ছিলেন। বার্লিন-বাগদাদ রেল নির্ম্মাণ কার্য্যে ও অন্যান্য নানাপ্রকার প্রতিষ্ঠানে বহু অর্থ তুরস্কে অকাতরে ব্যয় করিয়াছিলেন। যাঁহারা বলিতে চাহেন যে আনওয়ার পাশার হঠকারিতাতেই তুরস্কের সর্ব্বনাশ সংঘটিত হয়, তাঁহারা নিশ্চয়ই সমস্ত তত্ত্বগুলি ভাল করিয়া অনুসন্ধান করিয়া দেখেন নাই, আনওয়ার পাশা বাহ্যতঃ তুরস্কের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইলেও তালাৎপাশা ও জামাল পাশাকে পরিত্যাগ করিয়া বা তাঁহাদের আদপেই কোনপ্রকার পরামর্শ না করিয়া এক পা অগ্রসর হইবারও ক্ষমতা তাঁহার ছিল না। যুদ্ধের প্রারম্ভে সমর-পরিষদের অধিবেশন প্রায়ই বসিত। সেনানায়কগণের অনেককেই তাঁহাদের মতামত জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠান হইয়াছিল। কামালপাশা একজন বিশিষ্ট জ্যোতির্ব্বিদের ন্যায় সর্ব্বদিক বিশেষভাবে খতাইয়া মধ্য ইউরোপের শক্তিগণের সহিত যোগদান করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। তিনজন মহাসমারোহের মধ্য দিয়া এক ক্ষমতাশালী তুরস্ক-সাম্রাজ্য গঠন করিবার স্বপ্ন দেখিতেছিলেন বলিয়াই, তাঁহারা নিজেদের স্কন্ধে সমস্ত দায়িত্ব লইয়া জার্ম্মাণি ও তাহার সহযোগীগণের পক্ষাবলম্বন করিয়া মিত্র পক্ষীয় শক্তিগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল।

যুদ্ধের প্রারম্ভেই প্রায় লক্ষাধিক সৈন্য লইয়া পারস্যের উত্তর প্রান্ত ও আফগানিস্থানের মধ্য দিয়া ভারতবর্ষ আক্রমণ করিবার জন্য স্বয়ং আনওয়ার সৈন্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু দারুণ শীতে ও রাশিয়ার কশাক সৈন্যগণের ভীষণ আক্রমণে সৈন্যদল বিধ্বস্ত হইয়া যাওয়ায় কনষ্টানটিনোপলে ফিরিয়া আসেন। এই ভাগ্য-বিপর্য্যয়ে আনওয়ারের গৌরব-সূর্য্য অস্তগামী হইবে বলিয়া যাঁহারা আশা করিয়াছিলেন তাঁহারা অচিরেই দেখিতে পাইলেন যে আনওয়ার পাশা প্রকাশ্য রাজপথে বাহির হইলেই জনসাধারণ জয়ধ্বনি করিয়া তাঁহাকে যুদ্ধের নায়ক বলিয়া বরণ করিয়া লইল।

জার্ম্মাণি কর্ত্তৃক রাশিয়া বিধ্বস্ত ও অন্তিম দশা প্রাপ্ত হইলে মিত্রশক্তিগণ তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য একদল সৈন্য প্রেরণের স্থান ও সুবিধা অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। এই উদ্দেশ্যে ইংলণ্ডের নেতৃত্বে একদল সৈন্য নৌবহরের সহায়তায় দার্দ্দানিলিজে পাঠান হয়। আনওয়ার পাশা এই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিলেন। যে অস্ত্রশস্ত্র বলবান শক্তিপুঞ্জের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হইবে বলিয়া স্তূপীকৃত করিয়া রাখা হইয়াছিল, এখন তাহার সৎ ব্যবহার চলিল। কয়েকখানি বড় বড় রণপোত নষ্ট হইয়া যাওয়ায়, ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের সৈন্যগণ দার্দ্দানিলিজ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়।

ব্যর্থ মনোরথ হইয়া তুরস্ককে উপযুক্ত শিক্ষা দিবার

জন্য ইংলণ্ড জলপথে তাহার বিপুল নৌবহর লইয়া আক্রমণ করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হ'ন। গ্যালিপোলি তুরস্ক সাম্রাজ্যের একটী পোতাশ্রয়। এই পোতাশ্রয়টী ধ্বংশ করিবার জন্য ইংলণ্ডের বিপুল নৌ-বাহিনী আসিয়া পৌছাইলে, জার্ম্মাণ সেনাপতি লিমানকে প্রধান সেনাপতি পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া এই প্রদেশে প্রেরণ করা হয়। কামাল তাহার সহকারী সেনাপতি পদ প্রাপ্ত হন। এই-খানে আসিয়া কামাল তাঁহার উপস্থিত বুদ্ধি ও বীরত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। একটী উচ্চপর্ব্বত চূড়া দখল করিতে পারিলেই রাজধানীতে যাইবার রাজপথ করতল-গত হইবে এই ধারণায় মিত্রশক্তি তাহাদের সমস্ত শক্তি এই অঞ্চলে সন্নিবেশিত করিলে কামাল সামান্য মাত্র সৈন্য লইয়া বিপুল বিক্রমে তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া বিধ্বস্ত করিয়া দেন। এই যুদ্ধে সেনাপতি লিমান কামালের উপর এতদূর সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে নিজের হস্ত হইতে রিষ্ট-ওয়াচ খুলিয়া উহা কামালের হস্তে বাঁধিয়া দেন। অনর্থক লোকক্ষয় হইতেছে দেখিয়া মিত্রশক্তি তাহাদের সৈন্য-গণকে এই স্থান হইতে তুলিয়া ল'ন।

মহাযুদ্ধের উত্তর ভাগ

যুদ্ধের প্রারম্ভে জার্ম্মাণগণ ফ্রান্সকে ধ্বংস করিয়া বুল-গেরিয়া সাহায্যে রাশিয়াকে চূর্ণ করিয়া দিয়া, এক বৎসরের মধ্যেই সম্পূর্ণরূপে জয়লাভ করিবেন এইরূপ আশা করিয়া-ছিলেন। ক্ষুদ্র বেলজিয়মই তাহাদের বিরাট কল্পনার প্রধান অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়। এইজন্য বেলজিয়মকে সমূলে নিপাত করিয়া জার্ম্মাণবাহিনী যখন পশ্চিম দিক দিয়া ফ্রান্সে প্রবেশ করিবার জন্য সবিশেষ চেষ্টা করিতেছিল, সামান্য মাত্র সময়ের মধ্যেই ফ্রান্সে ইংরাজগণের সাহায্যে বিজয়ী জার্ম্মাণগণকে বাধা প্রদান করিবার বিশেষ শক্তি অর্জ্জন করিয়া লয়। উভয়দলের সৈন্যগণ উভয়দলের সম্মুখীন হইলে ফ্রান্সের শৌর্য্যের নিকট জার্ম্মাণ আক্রমণ ব্যর্থ হয়। এই দিক দিয়া বিশেষ সাফল্যলাভ সময় সাপেক্ষ দেখিয়া জার্ম্মাণ সেনানীগণ অবশেষে লয়েনের দিক দিয়া আর একটী জার্ম্মাণবাহিনী পরিচালনা করিয়া পূর্ব্ব ফ্রান্স আক্রমণ করে। এদিকে অপ্রত্যাশিতভাবে বাধা প্রাপ্ত হইয়া সাতশত মাইল ব্যাপী এক বিরাট সমরাঙ্গন তৈয়ারী করিয়া বসে। এ কথা সত্য যে ১৯১৫ সালের অবসানের সহিত জার্ম্মাণ আক্রমণ বেশ দুর্ব্বল হইয়া যায়।

মধ্য ইউরোপে অষ্ট্রীয়া রাশিয়ার নিকট হটিয়া যাইতেছে দেখিয়া, সেনাপতি হিণ্ডেনবার্গকে পূর্ব্ব-অঞ্চলে প্রেরণ করা হয়। দক্ষ সেনাপতি অল্প সময়ের মধ্যেই সমস্ত পোলণ্ড জার্ম্মাণীর অধিকার ভুক্ত করিয়া, বুলগেরিয়ার সহায়তায় সার্ভিয়া এবং রুমানিয়াকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলেন। তুরস্কের কর্ত্তৃপক্ষগণ মনে করিয়াছিলেন যে এই বিরাট বাহিনী তাঁহাদের সৈন্যদলের সহিত সম্মিলিত হইলেই এক বিরাট অভিযানে অগ্রসর হইবেন। কিন্তু পূর্ব্বাঞ্চলে প্রায় এক সহস্র মাইল ব্যাপী সমরাঙ্গন প্রস্তুত হইয়া যাওয়ায়, এবং একান্ত অতর্কিতভাবে ইটালী যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া মিত্রপক্ষে যোগদান করায়, তুরস্ককে উপযুক্তভাবে সাহায্য করিবার সুযোগ পাওয়া জার্ম্মাণীর পক্ষে এইরূপ অসম্ভব হইয়াই দাঁড়াইল। জার্ম্মাণ সম্রাটকে তাবৎ বিষয় বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দিবার জন্য সেনাপতি কামালকে যুবরাজের সহিত জার্ম্মাণীতে প্রেরণ করা হইল। কাইজার তুর্কীর রাজদূত দুইজনকে যথেষ্ট আদর অভ্যর্থনা করিলেন, ভবিষ্যতে যে তাঁহাদের বিশেষ সাহায্য করিতে পারিবেন এমন কোনই আশা দিতে পারিলেন না। এই সময়ে জার্ম্মাণীর আর্থিক ও নৈতিক অবনতি যথেষ্ট হইয়াছিল। জার্ম্মাণীতে অবস্থান কালে কামাল স্বচক্ষে তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া বর্ত্তমান মহাসমরে তুরস্ক যে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইবে তাহা বুঝিতে তাঁহার আর কোন বাধাই রহিল না। স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়াই কামাল মিত্রশক্তিগণের সহিত সন্ধি করিয়া সমরের অবসান করিবার জন্য কর্ত্তৃপক্ষগণকে উপদেশ দেন। কামালের পরামর্শানুযায়ী কার্য্য করিলে রাজশক্তি হস্তচ্যুত হইয়া যাইতে পারে এই আশঙ্কায় কর্ণধার ত্রয়ী তাঁহার পরামর্শে কোনরূপ কর্ণপাতই করিলেন না।

(শ্রীবিষ্ণু দাস)

বৈশাখ ১৩৩৯ সালের ভারতবর্ষে=

শ্রীবিরেশ্বর সেন "গীতার পরিচয়" পাইয়া তাহা সুধী পাঠক সমাজে দান করিয়াছেন। যদি কেহ তাঁহার প্রতি "প্রখ্যাত হইবার উৎকট আগ্রহ" এই দোষারোপ করেন, তাহার জন্য তিনি প্রবন্ধটির প্রারম্ভেই একছত্র কৈফিয়ৎ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাহা এই যে, যাহার যাহা প্রাপ্য যাহা তাহাকে দিবার "ইচ্ছা দ্বারা প্রণোদিত হইয়াই গীতা সম্বন্ধে এই প্রবন্ধ লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।" "এই জন্য এই প্রবন্ধে" তাঁহার তিনটি বিষয় প্রতিপাদ্য হইয়াছে। প্রথমটি গীতা মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত; দ্বিতীয়টি, গীতার রচয়িতা ছিলেন এক বঙ্গসন্তান, তৃতীয়টি তাঁহার নাম ছিল পদ্মনাভ দত্ত।" এবং দত্ত মহাশয় বৈদ্যকুল উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। সেনমহাশয়ের প্রবন্ধটির বিরুদ্ধে ভারতবর্ষ সম্পাদক স্বয়ং কয়েকটি ক্ষুদ্র মন্তব্য ইহার তলদেশে যুক্ত করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার মন্তব্যের সারবত্তা উপলব্ধি করিয়া আমরাও এ বিষয় কিছু বলিতে ক্ষান্ত হইলাম।

বর্ত্তমান শতাব্দী sensation এর যুগ। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে জনৈক পণ্ডিত কবি কালিদাসকে কালনার লোক বলিয়া প্রমাণ করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। ইহাতে কবি কালিদাস অমরাবতীর কুঞ্জে বসিয়া হাসিয়াছিলেন কি না জানি না, কিন্তু তাঁহার জন্মভূমির সাড়ে তিনটি বঙ্গ সন্তানকে লইয়া একটা সভা করিয়া পরে কালনায় "mass meeting" হইয়াছিল এই খবরটি সংবাদপত্রে পাঠ করিয়া আমরা তো খুব হাসিয়াছিলাম।

যাহা হউক, কালিদাস ও পদ্মনাভ দত্ত বাঙ্গালী হইলেও আপত্তি নাই, অবাঙ্গালী হইলেও খেদ নাই। তাঁহারা যে ভারতসন্তান, ইহাই আমাদের গৌরবের পক্ষে প্রচুর, তা তাঁহারা যে কুলেই জন্মগ্রহণ করুন না।

শ্রীদিলীপকুমার রায় "ফের কলম" ধরিয়াছেন। পরশুরাম কুঠার ধরিয়াছিলেন ক্ষত্রিয় বংশ ধ্বংস করিতে আর এযুগে দিলীপবাবু কলম ধরিয়াছেন কবিতাসুন্দরীর শ্রীঅঙ্গ মসীময় করিতে। কবিতাটির নাম "ইতিহাস।" এবং এই কবিতাটি হিন্দী কবিতা antholagy সংগ্রাহক নির্ব্বাচন করেছেন তাঁহাদের অনুবাদের জন্য।" এই "তলী ছত্রটি" খুব সম্ভব সম্পাদকীয় নহে, ইহা দিলীপবাবু স্বয়ং জুড়িয়া দিয়াছেন কবিতাটির দর বাড়াইবার জন্য। ইহাতে দর অবশ্য বাড়ে নাই কিন্তু "হিন্দী কবিতা antholagy সংগ্রাহকের নির্ব্বাচনকে তারিফ না করিয়া থাকা যায় না। তিনি কবিতা চিনিয়াছেন, কাব্য রসবেত্তাও বটে।

পড়িলাম—

"হায় প্রতিপদে' কেন অন্তর মাঝে
নামে মন্থর তন্দ্রা?
কেন গুরু গুরু ছায়া মৃদঙ্গ বাজে
শঙ্কা জীমূত মন্দ্রা?

ছায়া মৃদঙ্গ যন্ত্রটি কি ছায়া-নির্ম্মিত? অবশ্য ইহা অভিনব বস্তু হইলেও অসম্ভব কিছু নয়; কেননা শুনিতেছি বেতারে সবই সম্ভব। উহাতে নাকি বিনা সাবানে গায়ে সাবান মাখার ব্যবস্থা হইতেছে। এই ছায়া মৃদঙ্গে কি হয় না, জীমূত মন্দ্রা শঙ্কা গুরু গুরু রাজে। জীমূতও বুঝিলাম মন্দ্রাও বুঝিতেছি আর শঙ্কায় বক্ষ সময়ে সময়ে গুরু গুরু করিয়া থাকে। কিন্তু জীমূত মন্দ্রা শঙ্কা বুঝিলাম না তো। মেঘ গুড় গুড় করে, ভয়ে বক্ষ গুরু গুরু করে অতএব শঙ্কা জীমূত-মন্দ্রা! কি বুদ্ধি! কি কবিত্ব শক্তি!

তারপর—

"গণে নিখিলের অমবস্থা প্রমোদ,
সুধায় নিয়ত ফুসিয়া;
"কেন, তন্দ্রিত হিয়া মন্থনে চাঁদ
উদিবে নয়ন তুষিয়া?"

ওগো কেন? কেন তন্দ্রিত হিয়া মন্থন করিয়া চাঁদ নয়ন তুষিয়া উদয় হইবে? কে বুঝিবে এই হেঁয়ালীর অর্থ?

"কণ্টক যে গো গুমরি মরিল!
ফুল তবু তারে দহিবে?"

কণ্টক কেমন করিয়া গুমরিয়া মরে পাঠক যদি না দেখিয়া থাকেন সুপক্ক কাঁটাল স্মরণ করুন যেন কোন পক্ক কাঁটালের (ইঁচোড়ের নয়) কণ্টকাবৃত দেহ এমন ফুলিয়া উঠে যে তাহা তৈল-মসৃন হইয়া যায়। এই তো গেল কণ্টকের গুমরিয়া মৃত্যুর কথা। "ফুল তবু তারে দহিবে," ইহার অর্থ কি? ফুল কি করিয়া দহন করে? ইহা অবশ্য কঠিন প্রশ্ন। "ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা" যাওয়ার কথা অনেকেই জানেন। ইহার সহিত একথাটিও জানিয়া রাখুন ফুল দোহন করে এবং সময় সময় দহনও করিয়া থাকে?

"সুরেলা কণ্ঠের" সুরেলা কথাটা কোন দেশীয়, আর "পঙ্কে পরাগ ফুটায়ে তাহাও যে বুঝিতেছি না। পরাগ যদি ফোটে ফুলের দশা হইবে কি? গাছে গাছে যে ফুলের বদলে পরাগ ফুটিয়া থাকিবে। গোল্লা ছাড়া কেবল বেল রস দিয়াই রসগোল্লার গুলি বাঁধা চলিবে।

শ্রীহরিহর শেঠ "প্রাচীন কলিকাতার পরিচয়" দিতেছেন। এরূপ প্রবন্ধের প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা সম্বন্ধে কাহারো সন্দেহ থাকিতে পারে না। ইহাতে কলিকাতার তথা বাঙ্গলার শ্রেষ্ঠ ও কোন কোন প্রাতঃস্মরণীয় বঙ্গসন্তানের ক্ষুদ্র জীবনী লিপিবদ্ধ হইয়াছে এবং তৎসঙ্গে তাঁহাদের প্রতিকৃতিও দেওয়া হইয়াছে। ইহাদের সকলকে চাক্ষুষ দেখিবার সৌভাগ্য আমাদের হয় নাই। কিন্তু অনেকের প্রতিকৃতি দেখিয়াছি।

ভূদেব মুখোপাধ্যায়, শিবনাথ শাস্ত্রী ও তারকনাথ পালিত প্রভৃতি বাঙ্গালীর মুখোজ্জ্বলকারী পুরুষসিংহগণের যে প্রতিকৃতি দেওয়া হইয়াছে তাহা আমাদের চেনা কেননা একাধিকবার দেখিয়াছি। এবং দেখিয়া মনে হইয়াছে তাঁহারা প্রৌঢ়াবস্থাও পার হইতে চলিয়াছেন। কিন্তু এখন দেখিতেছি আমাদের ধারণা বিলকুল বদলাইতে হইবে। পক্ক গুম্ফ শ্মশ্রু শোভিত প্রতিকৃতিগুলি তাঁহাদের যৌবনের! কিন্তু আমরা জানি ইহারা কেহই অকালে পক্কতা প্রাপ্ত হন নাই। তবে যৌবনান্তে যৌবনের প্রতি টান মানুষের বাড়িয়া উঠে—সে কারণ এ ভুলটি লেখক কি আর কাহারো কে জানে?

শ্রীঅচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্তের গল্প "দ্বিতীয় সংস্করণ।" অবশ্য প্রেম-সম্বন্ধীয়। তবুও আমরা এক নিঃশ্বাসে পড়িয়া ফেলিতে পারি নাই। ইহা বোধহয় গল্পটির দোষ নয়, দোষ আমাদের বয়সের। প্রারম্ভেই দেখি, পিসিমা সলিতা পাকাইতেছেন "ন্যাকড়ার ফালি" দিয়া এবং পায়ের উপর রাখিয়া। তাঁহার গড়ন "নিটোল নিরেট বাঁশের মতো"—শেষোক্ত ছত্রটি পড়িয়াই আমাদের গন্ডময় মনে একটা কথা চট্ করিয়া দেখা ছিল, লেখক বলিতেছেন "পিসিমা যেন একটা বাঁশ।"

আশৈশব বিধবা নিষ্ঠাবতী পিসিমা বলিতেছেন, "দু' দু'বছর বিয়ে হ'ল, এখনো বৌর কোল জুড়ে একটা ছেলে হ'ল না। এ যে তোদের কী ফ্যাসান হয়েছে—।" সত্য সত্যই পিসিমার জন্ম-সংরোধের বিরুদ্ধে এই ক্ষুদ্র মন্তব্যটুকুতে আমরা সায় দিই। তিনি ঠিকই বলিয়াছেন, দু' একটা ছেলের পর যাহা খুসী কর না বাপু। তাঁহার কথা সকলেরই শিরোধার্য্য

করা উচিত। ভাল কথা, জন্ম সংরোধ ব্যাপারটা কি পিসিমার জানা ছিল ? তাঁহার প্রফেসর ভ্রাতুষ্পুত্রটিও যে এই পথেই চলিতেছে, এ খবরই বা তিনি পাইলেন কোথা হইতে ? অবশ্য ভ্রাতুষ্পুত্রবধূটি তাহাদের এ অপরাধ প্রকারান্তরে তিনি উক্ত কথা বলিবার পর তঁাহার নিকট স্বীকার করিয়া ফেলে। ইহা আমরাও স্বীকার করিতে বাধ্য। লোকে কাজে যাহা করে, মুখে তাহা বলায় এমন কি দোষ থাকিতে পারে ? আর লেখাতেই বা এমন কি ক্ষতি ?

পিসিমার ভ্রাতুষ্পুত্রবধূটির নাম শুভা; "গায়ের রঙ কালো, কিন্তু পাথরের মত ঠাণ্ডা ও বর্ষার মেঘের মতো নরম সেই কালো রঙ্।" এরূপ কবিত্ব অবশ্য মৌলিকতারই পরিচায়ক। আর ইহার সমঝদারের অভাব নাই। বঙ্গদেশের বঙ্গ সন্তান পরিচালিত ইংরাজী ও বাংলা দৈনিক আছে, আমরা আছি। গায়ের রঙ্‌, "পাথরের মতো ঠাণ্ডা" ইহা সত্যই অভিনব উপমা। এতকাল জানা ছিল গা এই গরম বা শীতল হয়। আচ্ছা, এ রঙ্ কি টিনে আসে, পিপেতে চালান হয়? এই রঙ্ "মেঘের মত নরম"—টিপিলে আঙ্গুলে রস লাগে ?

আরো আছে। কিন্তু স্থানাভাব ও সময়াভাবহেতু আমরা গল্পান্তরে গমন করেতেছি।

শ্রীবিজয় রত্ন মজুমদার গল্প লিখিয়াছেন "অতীত—বর্ত্তমান—ভবিষ্যৎ।" কোন কালই বাকী রাখেন নাই। যাহার ভবিষ্যৎও নাই, তাহার সবই বৃথা। তাই এটিও একটা ব্যর্থ রচনা।

কুমার শ্রীধীরেন্দ্র নারায়ণ রায়ের "শক্তিশেল" গল্পটি দারুণ। নায়িকা কমলার কোমল বক্ষে এমন নিদারুণ ভাবে তাহা হানা হইয়াছে যে শেষ অবধি পাঠ করা যায় না। সবই পশ্চিমের দোষ; আর সেই দোষে বন্ধু, তুমি-আমিও মরিতেছি !

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের "আলো-আঁধারি "গল্পটি সুন্দর। প্রকাশ ভঙ্গীমা, প্লট, ভাষা এই তিন মিলিয়াছে বেশ। সর্ব্বোপরি সংযম রচনাটিতে একটী শ্রী মাখাইয়া দিয়াছে।

এই সংখ্যায় রঙীন্ ছবি দেখিলাম চারখানি।

শ্রীদুর্গাশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের "কনে-বিদায়" ও শ্রীঅজিত কৃষ্ণগুপ্তের "সূচী-শিল্প" ছাড়া বাকী দুইখানি বেশ লাগিয়াছে।

*　　*　　*　　*

১৩৩৯ সালের বৈশাখের প্রবাসীতে

শ্রীসুধীর কুমার চৌধুরীর একখানি নূতন উপন্যাস দেখিলাম "শৃঙ্খল।" প্রারম্ভেই খুব একটা সোরগোল আছে এবং তাহা হইতে গরু বাছুরও বাদ পড়ে নাই। ক্রমশঃ দেখা যাক্—

শ্রীখগেন্দ্র নাথ মিত্রের গল্প "শোধ" মন্দ লাগে না। কিন্তু একটা নিঃসম্পর্কীয় বালক, যাহার প্রতি গল্পটির প্রধান নায়ক কানাইয়ের একটা আক্রোশ ছিল, এক মুহূর্ত্তেই তাহা জল হইয়া গিয়া তাহার মৃত-পুত্রের কথা স্মরণ করিয়া তাহাকে কোলে তুলিয়া লওয়া অস্বাভাবিক ঠেকে। তবে "গল্পে" অস্বাভাবিক ঘটনার অভাব থাকে না। লেখকের শক্তির গুণেই পাঠকের চোখে মিথ্যাও সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

এক জায়গায় আছে, "লক্ষ্মী তখন আঙিনার এক প্রান্তে প্রদীপ রাখিয়া মাথা কুটিতেছে প্রবাসী কানাইয়ের (তাহার স্বামী) জন্য—।" তখন সন্ধ্যাকাল। পল্লীগ্রামে হিন্দুর গৃহে একটি তুলসীমঞ্চ থাকে। গৃহ লক্ষ্মীরা তাহার তলায় সন্ধ্যা-প্রদীপ দেন। তাঁহারা মনের দুঃখ-বেদনা সেই মাটিতেই মাথা রাখিয়া নিবেদন করেন। তবে লক্ষ্মী খামখা "আঙিনা প্রান্তে" মাথা কুটিতে গেল কেন ? সে নিশ্চয়ই নমাজ পড়িতেছিল না ?

শ্রীমনোজ বসুর গল্প "অরণ্য কাণ্ড" এক কাণ্ড ব্যাপার। পড়িতে পড়িতে ধৈর্য্য থাকে না। ফেনাইয়া, ফাঁপাইয়া গল্পটিকে সুন্দর করিতে যাইয়া পাঠকের শিরঃ পীড়ার কারণ সৃষ্টি করা হইয়াছে। "ক্ষুধিত পাষাণের" পর "নিশীথে" কিন্তু তাহার পর আর কিছু হয় নাই এবং হইলও না। অবশ্য এ রচনাটিতেও মুন্সীয়ানার অভাব নাই; ভাষার কসরৎ আছে, কবিত্ব আছে, তুচ্ছ জিনিষকে প্রকাণ্ড করিয়া বলিবার শক্তিও যথেষ্ট।

এবং রসেরও অভাব নাই। তবুও কেমন এক ঘেয়ে লাগে ক্ষুধিত পাষাণ হয় নাই, অরণ্যকাণ্ডই হইয়াছে।

শ্রীসুবোধ কুমার দাসগুপ্তের গল্প ট্রেণে একরাত্রি মন্দ লাগে নাই। শেষে ছোট একটু প্লট। প্লটটুকু যেন চেনা চেনা, কোথায় যেন দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয়। আর গল্পটির রস ঐ শেষের দিকেই!

শ্রীনলিনীকান্ত সরকারের "তিনশো পঁয়ষট্টির এক!" একখানি চিত্র, অতি করুণ ও বাস্তব। এই একটি মাত্র দিন, একখানি মাত্র চিত্র হইতেই বাঙ্গলার চাষা-ভূষার জীবনকে চিনিয়া লওয়া যায়। রচনাটিতে রসেরও অভাব নাই; অথচ লেখনী বেশ সংযত। ভাষাও সহজ, সরল ও ঝরঝরে।

তিনখানি রঙিন্ ছবির মধ্যে প্রথমখানি প্রাচীন চিত্র; দ্বিতীয়খানি শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর "বধূবরণ।" কিন্তু ছবির বিষয়টি বধূবরণ নয়, আর কিছু। কেননা বধূকে বরণ করিবার কোন উপকরণ এবং সমবেত কুলললনাগণের হাব-ভাবে সেরূপ করিবার কোন লক্ষণই নাই। কাজেই নাম বাদ দিয়া ছবিখানির যাহা থাকে তাহা ভালই। তবে একটা ব্যাপার লক্ষ্য করিবার আছে এই যে, যে-বধূটিকে লইয়া সমবেত ললনাগণের মুখ হাস্যোজ্জ্বল (ইঁহাদের তিন ভাগই বৃদ্ধা;—কাজেই বলিতে হয়, মুখে খুসীর হাসি) তাহার পশ্চাতে আর একখানি কমনীয় মুখ প্রভাহীন চন্দ্রমার মত মলিন। বোধকরি, উভয়ের সহিত তুলনা বা সমালোচনাই উহার কারণ। শিল্পী বোধহয় সেই উদ্দেশ্য লইয়াই ছবিখানি আঁকিয়াছিলেন।

তৃতীয় ছবিখানি "ইন্দ্রের রাজ্যাভিষেক।" প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা। সম্ভবতঃ "প্রবাসী প্রেস" এখানিকে আঁকেন নাই। যিনি আঁকুন, ইন্দ্রের রাজ্যাভিষেকের কালে কেবল অপ্সরাদেরই Free hand ছিল না, দেবগণও তথায় ছিলেন। তবে হীন মনুষ্যকুলে জন্মিয়া আমাদের ভাগ্যে দেব দর্শন সম্ভব নয়। কাজেই অপ্সরা দেখিয়াই সন্তুষ্ট রহিলাম।

* * * *

১৩৩৯ সালের চৈত্রের বসুমতীতে

শ্রীসতীপতি বিদ্যাভূষণের গল্প "বেত্রাহত" কলিকাতার জনৈক পুরোহিত-পুঙ্গবের চেলার চরিত কথা। পাঠ করিয়া প্রচুর আনন্দ-রস পান করিতে না পারিলেও রচনাটিকে আগাগোড়া নিতান্ত মন্দ বলা চলে না। ইহার কতক অংশ চিত্র; তাহাই মন্দ জমে নাই।

একটা ব্যাপার বড় মজার ঠেকে। শ্রীমান্ রঘু যিনি গল্পের প্রধান নায়ক, তাঁহার হাতে খড়ি হইলেও বিদ্যাশিক্ষা হইয়াছিল যৎকিঞ্চিৎ। এবং তাহার সঙ্গোপাঙ্গ বা পরিবেষ্টনীও এমন ছিল না, যাহার ফলে সে সুরেশদার মত শিক্ষিত লোকের কাছে বিশ্ব-প্রেমের বাঁধা-বুলি আওড়াইয়া তাঁহার মতের সঙ্কীর্ণতা ধরাইয়া দিতে পারে।

গল্পটির ভাষা বেশ সরল ও জড়তাশূন্য কিন্তু নামটা বড় বেমানান হইয়াছে।

শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্যের গল্প "ফিরে-পাওয়া" পাঠ করিয়া আমরা তৃপ্তি পাই নাই। মাণিকবাবুর হাত হইতে এমন নিকৃষ্ট রচনা বাহির হইতে পারে এ ধারণা আমাদের ছিল না। মনে হয়, গল্পটা জোর করিয়া লেখা। প্লট অতি সাধারণ ও পুরাতন, ভাষাও বেগহীনা, প্রকাশভঙ্গীও সুন্দর নয়। তবে বসুমতীর উপযোগী বটে।

শ্রীমতী পুষ্পলতা দেবীর গল্প "রূপের আতঙ্ক।" স্বামী কন্দর্পের মত সুন্দর কেবল গঠনেই নয়, রঙও তাঁহার ফর্সা আর স্ত্রীরও গঠন সুঠাম কিন্তু রঙ তাহার স্বামীর রং যে অনুপাতে গৌর ছিল, ঠিক তাহার বিপরীত অনুপাতে কালো ছিল।" এই "বর্ণগত পার্থক্যটাই একটা মহা সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছিল।" বলা বাহুল্য, এ সমস্যার পূরণ হয় নাই। অরুণা (স্ত্রী) "ভয়ে, আতঙ্কে" পরিশেষে যক্ষ্মা রোগাক্রান্ত হইয়া মারা যায় আর স্বামী সুস্থশরীর কন্দর্পের মত রূপ লইয়া জীবিত থাকিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া বসে' আর বিবাহ করিবে না। অরুণার স্বামী তাহাকে ভালবাসিত, তথাপি তাহার মনে আতঙ্ক জাগে!

রচনাটি যতখানি দীর্ঘ, ততখানি রসাল নয়।

কুমার শ্রীধীরেন্দ্র নারায়ণ রায়ের গল্প "দিবা-স্বপ্ন"।

পাঠে আমরা মুগ্ধ না হইলেও আরাম পাইয়াছি। লেখা এক দরিদ্র চিত্র-শিল্পীর প্রেমকে একেবারে রাজবাড়ীর অন্দরে লইয়া ফেলিয়াছেন। অনিন্দ্যসুন্দরী রাজকুমারীও শিল্পীর প্রতি সপ্রেম দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেন। মদন চির-দিনই দুঃসাহসী; তদপেক্ষাও দুঃসাহস দেখা যায় লেখক-দের। বলা বাহুল্য, ব্যাপারটা দস্তুর মাফিক পরিশেষে বিচ্ছেদের ফাঁকে ফাঁসিয়া যায়। গল্পটি বিয়োগান্তক বলিয়াই ভাল নয়, ভাষা, প্রকাশ ভঙ্গী বর্ণনা, লেখকের অনুভূতি প্রভৃতি গুণে ভাল। কিন্তু "বাহিরে প্রকৃতির ভীষণ ধারায় বর্ষণ, ভিতরে নারী হৃদয়ের রুদ্ধস্রোতের ক্ষুণ্ণ সেতুবন্ধন" ব্যাপারটা সম্যক্ বুঝিলাম না। "নারী হৃদয়ের রুদ্ধস্রোতের ক্ষুণ্ণ সেতুবন্ধন" কোনকালে দেখি নাই এবং এই অপূর্ব্ব সেতু কি উপকরণে বন্ধন হয় জানিও না। লেখকের মত অভিজ্ঞ ইঞ্জিনীয়ারগণই বুঝিতে পারিবেন।

(শ্রী) প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের গল্প "দুধ-মা" চমৎকার—প্রবাসীরও কোন গল্পের সহিত ইহার তুলনা হয় না। "গল্প" পাঠের আনন্দ ইহা হইতে লাভ হয় প্রচুর।

ভাদুড়ী ডাক্তারের যশ, বিদ্যা ও অর্থ ছিল প্রচুর কিন্তু তাঁহার কোন সন্তানাদি ছিল না। এ কারণ ডাক্তার দম্পতি পরম অসুখী ছিলেন, একদিন নিশাশেষে তাঁহার দরজায় কে যেন একটী সদ্যজাত শিশুকে রাখিয়া যায়। শিশুটিকে দেখিয়া ডাক্তার গৃহিণীর শূন্য হৃদয়ে মাতৃ-স্নেহ জাগিয়া ওঠে; তিনি শিশুটিকে গ্রহণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। শিশুটি পরিশেষে ডাক্তার সাহেবেরই গৃহে থাকিয়া যায়। প্রথমে তাহার পরিচর্য্যার ভার পড়ে, তাঁহাদের বৃদ্ধা দাসীর উপর। তাহার পর দিন কয়েকের মধ্যেই ফুলটুসিয়া নামে এক আহীর যুবতীকে শিশুটিকে ধাত্রী নিযুক্ত করা হয়। ফুলটুসিয়া ডাক্তার সাহেবেরই পাড়ার গির্জ্জার পাদ্রী সাহেবের আয়ার মেয়ে। ফুল-টুসিয়া একটী সন্তান প্রসব করিবার ঘণ্টা কয়েক পরেই সন্তানটির মৃত্যু হয় ও সেও খুব অসুখ হইয়া পড়ায়, তাহাকে তাহার মাতা হাঁসপাতালে দিয়া যায়। ডাক্তার সাহেবের চিকিৎসায় সত্বরই আরোগ্যলাভ করিলে, ডাক্তার সাহেব তাহাকেই আনেন।

কালক্রমে শিশুটি বড় হইবার সঙ্গে সঙ্গে সে ডাক্তার গৃহিণী ও ফুলটুসিয়ার হৃদয় অধিকার করিয়া বসে—ডাক্তার সাহেবেরও হৃদয়ে পিতৃ-স্নেহ জাগ্রত হয়। শিশুটি যেন তাঁহাদেরই এমনি ভাব তাঁহারা তাহার প্রতি ব্যবহারে, নিজেদের মধ্যে কথা-বার্ত্তায় প্রকাশ করিতে থাকেন। ছেলের নামকরণ লইয়াও বেশ একটু মজাও হয়। ইতি মধ্যে পাদ্রী সাহেবের স্ত্রী একদিন ডাক্তার সাহেবের গৃহে বেড়াইতে আসিয়া ছেলেটিকে খৃষ্টান ধর্ম্মে ব্যাপটাইজ করিবার প্রবল ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এবং তাহা করিবার পক্ষে তাঁহার যুক্তিটাও ছিল সারগর্ভ। কিন্তু ডাক্তার সাহেবের স্ত্রী সে সকল কেবল মাত্র স্নেহের যুক্তি দিয়াই অগ্রাহ্য করেন।

ফুলটুসিয়ার স্বামী থাকিত পাটনায় এক সাহেবের কুঠিতে। বৎসরে একবার করিয়া সাহেবের সহিত কলিকাতায় আসিত। সেবারও "খোকা" যখন এক বৎসরের তখন সে কলিকাতায় বদলী হইয়া আসিল। ফুলটুসিয়া কিন্তু তখনও তাহার কর্ম্মে বহাল রহিয়া গেল। খোকার প্রতি তাহার টান এত গভীর এবং খোকাও তাহার প্রতি এত আকৃষ্ট যে দুইজনের যখন নিভৃতালাপ হয়, তখন মনে হয় মা ও ছেলে। খোকা যখন বৎসর দুয়েকের তখন জানা গেল, ফুলটুসিয়া সন্তান সম্ভাবিতা। ডাক্তার গৃহিণী তাহাকে বিদায় করিলেন, যাইবার কালে সে খোকার জন্য খুব কান্না-কাটি করিল। পরিশেষে ডাক্তার গৃহিণীর আশ্বাস বাণীতে অগত্যা চক্ষু মুছিল। তাহার স্থানে একটী নূতন ঝি নিযুক্ত হইল। কিন্তু সে চলিয়া যাইবার পরও খোকা বা সে কেহ কাহাকেও ভুলিতে পারিল না। খোকা তাহার জন্য কাঁদে, বিশেষ করিয়া রাত্রে, সে মাঝে মাঝে আসিয়া খোকাকে দেখিয়া যায়। খোকার জন্য নূতন ঝিরও ব্যবস্থা হইয়াছে। সে খোকাকে বেশ যত্ন করে; তাহাকে লইয়া ভ্রমণে বাহির হয়।

তাহার পর সংবাদ পাওয়া গেল, ফুলটুসিয়ার একটি পুত্র সন্তান হইয়াছে। মাস এগারো পরের কথা;—কলিকাতায় বসন্তের প্রকোপ দেখা দিয়াছে।

কয়েকদিন পরে খোকারও জ্বর ও গায়ে গুটিকা চিহ্ন

দেখা দিতেই নূতন ঝি পলায়ন করিল। হাঁসপাতাল হইতে নার্স আসিল। চিকিৎসা ও সেবা রীতিমতই চলিতে লাগিল। তথাপি রাত্রি-দিন খোকার কাছে থাকিবার জন্য একজন ঝির অভাব অনুভূত হইল। বৃদ্ধা ঝির পরামর্শে ডাক্তার দম্পতি ফুলটুসিয়া'কে সংবাদ দিলেন। সে সংবাদ পাইবামাত্র তাহার মাতা ও স্বামীর নিষেধ উপেক্ষা করিয়া কোলের ছেলেকে ফেলিয়াই ছুটিয়া আসিল। তাহার "অক্লান্ত সেবা-শুশ্রূষা ও চিকিৎসা সত্ত্বেও খোকা বাঁচিল না।" ডাক্তার গৃহিণী শোকে "শয্যা লইলেন।" ফুলটুসিয়ার মর্ম্ম ভাঙিয়া খোকার জন্য রোদনোচ্ছ্বাস বাহির হইতে লাগিল।

খোকার দেহ সৎকারের সময় এক ক্ষুদ্র সমস্যা উপস্থিত হইল। কিন্তু তাহার সমাধান হইল, এক বিচিত্র ব্যাপারের মধ্য দিয়া। সৎকারের পূর্ব্বে পাদ্রী সাহেব আসিয়া মৃতদেহটি খৃষ্টান প্রথানুযায়ী সমাধিস্থ করিতে চাহিলে ডাক্তার সাহেব তাহাতে সম্মত হন না। তিনি বলেন, "জনক না হইলেও আমি উহার পিতা।" ডাক্তার ভাদুড়ী হিন্দু তিনিই খোকাকে লালন পালন করিয়াছেন। উত্তরে পাদ্রী সাহেব কহিলেন, "আমি উহার পিতামহ।" তারপর ডাক্তার সাহেবের বিস্ময় অপনোদন করিয়া খোকার জন্মবৃত্তান্ত বিবৃত করিয়া যান। খোকা তাঁহারই পুত্র জোসেফের ঔরসে আয়া-কন্যা ফুলটুসিয়ার গর্ভে জন্মগ্রহণ করে; এবং পাদ্রী সাহেবেরই পরামর্শানুসারে শিশুটি ডাক্তার সাহেবের দরজায় পরিত্যক্ত হয়। তাহার পর ফুলটুসিয়া ঘটনাচক্রে হাঁসপাতালে আসিয়া পড়ে ও খোকার ধাত্রী রূপে নিযুক্ত হইয়া তাঁহার গৃহে যায়। ইহার পর পাদ্রীসাহেবের হাতে মৃতদেহটিকে দিতে ডাক্তার সাহেবের আর আপত্তি রহিল না। পাদ্রী সাহেব খৃষ্টান মতে শিশুর দেহ সমাধিস্থ করিয়া, তাহার শিরোদেশে প্রস্তরফলকে খোদিত করিয়া দিলেন—"নামহীন, গোত্রহীন দুই বৎসর সাত মাস বয়স্ক শিশু প্রভু যীশুর কোলে চিরবিশ্রাম লাভ করিল।"

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের গল্প "তারাদা'সের বৈরাগ্য" অন্তঃসার শূন্য রচনা। তবে বাঁধা খরিদ্দার ঠেকাইবার উপযোগী বটে।

শ্রীসরোজনাথ ঘোষের গল্প "শঙ্কা" পাঠ করিয়া মনে হইল লেখক যদি আটখানি পাতায় কেবলমাত্র আটটি বড় বড় প্রশ্ন চিহ্ন ছাড়িয়া দিতেন তাহা হইলেও গল্প না লিখিয়াই তাঁহার কার্য্যসিদ্ধ হইত। শঙ্কাকে শঙ্কা, ডঙ্কাকে ডঙ্কা, এ দুটির কোনটিই অপরাধ ঘটিত না।

ইনি হরবিলাস সর্দ্দার উপর বিষম ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। বলিতেছেন "বাল্যবিবাহের অশুভজনক ব্যাপার জাতির জীবনগঠনে বাধাপ্রাপ্ত হয় (এই পংক্তিটির অর্থ কি?) এ অপূর্ব্ব ধারণা কাহারও চিত্তকে বিক্ষুব্ধ করে নাই এবং জাতিগঠন ব্যাপারে যাঁহারা এ যুগে অগ্রবর্ত্তী, তাঁহারা সকলেই বাল্যবিবাহের ফল।" এই উত্তাপ নিশ্চয়ই অর্দ্ধপক্ব ফলগুলিকে সুপরিপক্ব করিয়া হিঙ্গুল বর্ণে রঞ্জিত করিবে।

শ্রীচারুচন্দ্র সেনগুপ্ত একখানি রঙীন ছবি আঁকিয়াছেন "বসন্তের প্রজাপতি"—আমরা বলি কিন্তু "বৈশাখের নববধূ।" সাজ পোষাকও তেমনি, পরিবেষ্টনীও ছাদনাতলার মত, আর যিনি আঁকিয়াছেন তাঁহার মনেও ঐ ভাব।

শ্রীসুখেন্দুভূষণ চৌধুরীর একখানি পট ও শ্রীকিরণময় ধরের ছবি "নিভৃত মিলন" ব্যর্থ চেষ্টা।

গুপ্তহত্যা

সম্প্রতি মেদিনীপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ডগলাস জেলাবোর্ডের কার্য্য করিবার সময় আততায়ীর গুলিতে নিহত হইয়াছেন, তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী ম্যাজিষ্টেট মিঃ পেডিও এইভাবে নিহত হইয়াছিলেন। এই ব্যাপারে আমরা বড়ই মর্ম্মাহত হইয়াছি। এ ভাবের হত্যা যে যে-উদ্দেশ্যই করুক না কেন ইহাতে যে কি উদ্দেশ্য সাধিত হইবে তাহাও বোঝা যায় না। প্রকাশ হত্যাকারী সন্দেহে ধৃত ব্যক্তির কাছে এক চিরকুটে এইরূপ লেখা পাওয়া গিয়াছিল 'হিজলীর ঘটনার প্রতিশোধ'। অথচ হিজলীর ব্যাপারে মিঃ ডগলাস প্রত্যক্ষ ভাবে কোন অন্যায় করিয়াছেন এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না। রাজনৈতিক কারণে এইরূপ হত্যা হইলে তাহা ভারতের পক্ষে রাজনৈতিক শুভ ফল আনিয়া দিবে এমন ধারণাও ভুল—বরঞ্চ ইহাতে অশুভ ফল হইবে ইহাই সকলের ধারণা। বর্ত্তমান ভারতের শ্রেষ্ঠ চিন্তাশীল মনীষীরা যখন ভারতের মঙ্গল ভাবিয়া নানা নির্য্যাতন বরণ করিয়া লইতেছেন তখন কয়েকজন লোকের এরূপ অপরিণামদর্শী খেয়ালে সকলেই বিশেষ চিন্তান্বিত। ভারতীয়দের দিক দিয়া এইরূপ হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা হইতেছে, দেশের গবর্ণমেণ্টও ইহা দমনের জন্য নানা জরুরী আইন, যথাসম্ভব সুরক্ষিত হইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন—তবু অকস্মাৎ এমন কাণ্ড ঘটিতেছে। যাহারা নিজের প্রাণের ভয় করে না—পরিণাম ভাবে না, একান্ত বেপরোয়া তাহা দর কোন আইনেই দমন সম্ভব কি? দেশের ভদ্র গৃহস্থদের ধন প্রাণ রক্ষার জন্য আগ্নেয়াস্ত্রের পাশ পাওয়া সুকঠিন কিন্তু চোর, ডাকাত বা হত্যাকারীদের যে-পাশে আগ্নেয়াস্ত্র রাখা গবর্ণমেণ্ট আদৌ বন্ধ করিতে পারিয়াছেন কি? তারপর কথা এই ধরণের লোকদের অভিযোগ কি এবং মানবতার দিক দিয়া তাহার কতটা প্রতিকার করা সম্ভব তাহাও দেখিলে ক্ষতি কি? দেশের শ্রেষ্ঠ রাজনীতিক প্রতিষ্ঠানের মতবাদ অহিংসা সুতরাং তার উপর দোষ অনর্থক—কিন্তু এরূপ মর্ম্মন্তুদ্ দুর্ঘটনা যখন উপরি উপরি কয়টি ঘটিল তখন শুধু এ উহার দোষ না দেখাইয়া সরকার ও দেশের নেতাগণ উভয়ে একযোগে ইহার প্রতিকার চেষ্টা করিতে পারেন কি?

সরকারের প্রচার

শুনিতেছি যে ভাবে 'সুলভ সমাচার', 'হক কথা' ইত্যাদির প্রচার হইয়াছিল তেমনি ভাবে নানা পুস্তিকা বিতরণ করিয়া প্রচার করা হইতেছে। দেশীয় সংবাদপত্রগুলি দেশের কথা প্রচার করে কিন্তু সরকার পক্ষের কোন প্রচার যন্ত্র নাই বলিয়া মাঝে মাঝে হা-হুতাশ শোনা যায়। কাগজ বা প্রচারপত্র যাহাই হউক না কেন আজ কালের দিনে একটু জাতীয়তাবাদী না হইলে তা চলা শক্ত। সরকারকেও জনমতকে নিজের দিকে আনিতে হইলে অনেকটা জাতীয়তাবাদী হইতেই হইবে—এ ভাবে সত্য নিরপেক্ষ দেশহিতৈষী জাতীয়তাবাদী সরকারী পত্র যদি কিছু করা সম্ভব হয় তবে তাহা অচল হইবে না এবং ক্রমশঃ প্রসার প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারিবে মনে হয়। এ বিষয়েও একটা সুনির্দ্দিষ্ট মতবাদ চাই—সাময়িক ভাবে প্রয়োজন মত জনমতকে পক্ষে লইবার জন্য কাগজ বাহির করা বা পুস্তিকা প্রচার করা শুধু অর্থের অপব্যয় মাত্র মনে হয়। আর সরকারের

শ্রেষ্ঠ প্রচার কার্য্য হইতে পারে তাহাদের কার্য্য দ্বারা। একটু দয়া একটু মানবতা, জনসাধারণের দায়িত্ব সম্পন্ন প্রতিনিধির উপর শাসন-দায়িত্ব অর্পণ করা এই সবের দ্বারা সরকারী ন্যায়পরায়ণতার কথা সব সংবাদপত্র ও লোকের মুখে মুখে আপনা হইতেই সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়া পড়িতে পারে। বর্ত্তমান যুগ-ধর্ম্ম সকলকেই মানিয়া চলিতে হইবে। এই কথা বিস্মৃত না হইলেই অনেক প্রশ্ন সহজ হইয়া আসিবে। সমস্যার জটিলতা হ্রাস পাইবে।

সূচনা পর্ব্ব

কাল বৈশাখী আরম্ভ হইয়াছে। বাংলার চারিদিক হইতে ঝড়, বজ্রপাতের যে তাণ্ডব লীলার কথা শোনা যাইতেছে তাহাতে বর্ষ আরম্ভেই সূচনা বড় ভাল মনে হইতেছে না—ভগবান এই দুঃসময়ে আর বোঝার উপর শাকের আঁটি না চাপাইয়া একটু করুণা নেত্রে চাহিয়া গেলেই মঙ্গল।

ফরাসী প্রেসিডেণ্টের হত্যা

ফরাসী প্রেসিডেণ্ট মুসে ডুমার কোন রুষ আততায়ীর গুলিতে নিহত হইয়াছেন। মিশরের প্রধান মন্ত্রীকেও হত্যা করিবার চেষ্টা হইয়াছিল। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এ কি ব্যাপার আরম্ভ হইল? জাপানেরও পাচ জন বিখ্যাত লোক জনৈক কোরিয়াবাসীর বোমার আঘাতে আহত ও নিহত। এই বিপজ্জনক অবস্থা হইতে মানব সমাজকে রক্ষা করিয়া জগতের মঙ্গলের জন্য মহাত্মা তাঁহার অহিংসার মন্ত্র দিয়াছেন। যে কোন জাতিকেই আত্মরক্ষার জন্য ইহা গ্রহণ করিতে হইবে—আজ না হয় নিকট ভবিষ্যতে।

পারস্যে রবীন্দ্রনাথ

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ৭১ বৎসর বয়সে বিমানযোগে পারস্যে গিয়া তথায় বিপুল রাজসম্মান ও পারস্যের আতিথেয়তা উপভোগ করিতেছেন। এবার কবি প্রাচ্যের বাণী প্রাচ্যকেই শুনাইতে গিয়াছেন। কবির আশা সফল হউক।

কংগ্রেস ও দেশ

দিল্লী কংগ্রেসের অধিবেশন হইল না। পণ্ডিত মালবীয় ও শ্রীমতী নাইডু উভয়ে মিলিয়া একটা অসম্ভব ঘটাইতে না পারিলেও কিছু একটা করিয়াছেন। এই ব্যাপারে সরকার পক্ষ যে হাত দেখাইলেন তাহাতে ইহাই অনুমান হয় যে কংগ্রেসকে তাঁহারা বে-আইনী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বলিয়া ঘোষণা না করিলেও কংগ্রেস যতদিন না সরকার পক্ষের প্রস্তাবিত সর্ত্তগুলিতে সম্মতি প্রদান করিবেন, ততদিন তাহাদের সহিত কোন প্রকার সম্বন্ধ রাখিতে প্রস্তুত নহেন। অচিরেই অর্ডিনান্সের আয়ুষ্কাল ফুরাইয়া আসিতেছে। গুজব যে জুলাই মাসে ভারতীয় আইন সভার একটি বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করিয়া উহার পরমায়ু কাল বাড়াইয়া লওয়া হইবে। কিন্তু ইহাও গুজব যে পূর্ব্বোক্ত সংবাদ একবারেই ভিত্তিহীন। অর্ডিনান্সের আয়ুষ্কাল ফুরাইয়া গেলে সরকার পক্ষ কংগ্রেসের কার্য্যকারণ ও গতিবিধি বিশেষ ভাবে আলোচনা করিয়া সময় মত বিধান করিবেন। আগামী সেপ্টেম্বর মাসে আবার নাকি গোল টেবিল বৈঠক বসান হইবে। ইহা যদি সত্য হয় তবে কংগ্রেসকে এই গোল টেবিল বৈঠকে যোগদান করিবার অবসর প্রদান করা উচিত নয় কি? প্রথম অধিবেশনে কংগ্রেসকে লওয়া হয় নাই বলিয়াই দ্বিতীয় বারে গান্ধি-আরউইন প্যাক্ট করিতে হইয়াছিল। ব্যাপকভাবে শাসনতন্ত্রের পরিবর্ত্তন করিতে গেলে কংগ্রেসের সাহচর্য্য কি বিশেষ প্রয়োজনীয় নহে? যাঁহারা বলিতে চাহেন কংগ্রেস ভারতীয় জনমতের একমাত্র প্রতিষ্ঠান নহে, তাঁহারা ত একথা বলিতেই পারেন না যে আর যে সমস্ত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান আছে কংগ্রেসকে বাদ দিয়া তাহাদের সমষ্টি ভারতের জনমতের বাহক। মোটকথা কংগ্রেস সমগ্র ভারতের প্রতিষ্ঠান নয় বলিয়া যাঁহারা কংগ্রেসকে ছোট করিতে চাহেন তাঁহারা নিশ্চয়ই জানেন যে সারা ভারতে কংগ্রেসই একমাত্র জাগ্রত প্রতিষ্ঠান। একথা আমরা অবশ্যই স্বীকার করি যে কংগ্রেস শ্রমজীবি বা কৃষিজীবির প্রতিনিধি বলিয়া দাবী করিলেও, তাহাদের সহিত এখনও পর্য্যন্ত তেমন

ঘনিষ্ঠতাসূত্রে আবদ্ধ হইতে পারে নাই। অস্পৃশ্যতা দূর করিবার জন্য কংগ্রেস কতকটা চেষ্টা করিলেও, মাদ্রাজের অল-অচল জাতিগণ কংগ্রেস হইতে এখনও পৃথক হইয়াই আছে। কিন্তু উহা কংগ্রেসের পক্ষে খুব বিশেষ মারাত্মক নয়। কাজেই কংগ্রেসকে ছাটিয়া দিয়া যে-কোন শাসনতন্ত্রের পরিবর্ত্তন হইবে এরূপ মনে হয় না।

নানা সমস্যা

বাংলার নব-নিযুক্ত লাট মহোদয় বড়লাট সকাশে সিমলায় যাত্রা গিয়াছেন। তাঁহার যাত্রা করিবার কারণ লইয়া সাংবাদিক মহলে বেশ গবেষণাও চলিতেছে। অনেকে অনুমান করিতেছেন যে বাংলার আইন-পরিষদের শাসনকাল বাড়াইয়া দেওয়া হইবে কি না, সাম্প্রদায়িক সমস্যার কিরূপ সমাধান করা হইবে এবং নূতন ভারত শাসন আইন কখন্ পরিবর্ত্তিত করিতে পারা যাইতে পারে, এই সমস্ত বিষয় লইয়াই নাকি তথায় বড়লাট মহোদয়ের সহিত বাংলার লাট মহোদয়ের কথাবার্ত্তা হইবে। আইন-সভার পরমায়ুকাল বৃদ্ধি করিবার পক্ষে কতকগুলি যুক্তি বর্ত্তমান থাকিলেও শাসন সংস্কার যদি অচিরেই প্রবর্ত্তিত হয় তবে নূতন নির্ব্বাচন নিশ্চয়ই অবশ্যম্ভাবী। তবে এ কথা সত্য যে নূতন শাসন সংস্কার প্রবর্ত্তন করিতে কিছু বিলম্ব হইবেই। আগামী জুন মাসে ইংলণ্ডের মন্ত্রী সম্প্রদায় ইউরোপীয় রাজনীতি লইয়া ব্যস্ত থাকিবেন, কেন না এই সময়ে হুভার কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত ঋণ অব্যাহতি সময়ের (Hoover's moratorium) অবসান ঘটিবে। জুলাই মাস অটোয়া কনফারেন্সে অতিবাহিত হইবে। আগষ্ট মাস তাঁহাদের বিশ্রামের সময়। কাজেই সেপ্টেম্বরের পূর্ব্বে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে চিন্তা করিবার সময়ের অভাব। সেপ্টেম্বরে অধিবেশন বসিলে, অক্টোবর ও নভেম্বর পর্য্যন্ত উহা চলিবে। এই জন্যই আমাদের মনে হয় ১৯৩০ সালের মার্চ্চের পূর্ব্বে ভারত শাসন সংক্রান্ত কোন বিলই পার্লামেণ্টে পেশ করিতে পারা যাইবে না। কাজেই আগামী জুলাই মাস নাগাদ বিলটা পাশ হইলে ১৯৩৩ সালে নূতন নির্ব্বাচন হইতে পারে। বর্ত্তমান আইন পরিষদ যদি ভাঙ্গিয়া দিয়া আগামী নভেম্বরে নির্ব্বাচন করা হয় তবে ঐ সভা মাত্র এক বৎসর কাজ করিতে পারিবে। এক বৎসরে কোন কাজই হয় না। সবচেয়ে বড় কথা যে প্রত্যেক নির্ব্বাচনই ব্যয় সাপেক্ষ। দারুণ অর্থ সঙ্কটের দিনে মাত্র এক বৎসরের জন্য সভ্য হইবার মানসে কোন ভাল সদস্যই এ সময় চেষ্টা করিবে না।

বাংলায় যুক্ত-নির্ব্বাচন

সাম্প্রদায়িক সমস্যার অদ্যাবধি কোন প্রকার মীমাংসা হইল না। লোথিয়ান কমিটির রিপোর্ট শীঘ্র বাহির হইবার সম্ভাবনা। লোথিয়ান কমিটির সিদ্ধান্ত যাহাই হউক না কেন ইহা স্থির যে বাংলায় হিন্দু-মুসলমান সমস্যার কোন প্রকার সমাধান এখনও পর্য্যন্ত হয় নাই। এই সেদিনও বাংলার লাট মহোদয়কে অভিভাষণ প্রদান কালে বাংলার দুইটি বিশিষ্ট মুসলমান প্রতিষ্ঠান অনেকগুলি বিশেষ রাজনৈতিক সুবিধার দাবী পেশ করিয়াছেন লাট মহোদয় তাঁহাদিগকে কোন প্রকার প্রতিশ্রুতিই দিতে পারেন নাই। বাংলার বাহিরের হিন্দুগণ বাংলার স্বার্থের কথা বিশেষ করিয়া চিন্তা করেন না এ কথা সত্য। বাংলায় মুসলমান জনসংখ্যা কয়েক লক্ষ অধিক এই অজুহাতে তাঁহারা বাংলার হিন্দুগণকে দাবাইয়া রাখিতে চাহেন। জয়েণ্ট ইলেকটরেট বা যুক্ত-নির্ব্বাচন বাংলার বাহিরে যেখানে হিন্দুর সংখ্যাধিক্য আছে সেখানে তাঁহাদের পক্ষে খুবই সুবিধা জনক। কিন্তু বাংলায় এক বর্দ্ধমান বিভাগ ও কলিকাতা পরিত্যাগ করিলে সর্ব্বত্রই মুসলমানদের সংখ্যাধিক্য। এই সংখ্যাধিক্যের ফল কি তাহা ত জেলা বোর্ডগুলির নির্ব্বাচনে আমরা বেশ প্রত্যক্ষ করিয়া আসিতেছি। মুসলমান-প্রধান জেলাগুলিতে কোন হিন্দুই সদস্যরূপে প্রকাশ করিতে পারেন না। এখানে যুক্ত-নির্ব্বাচন প্রথা প্রবর্ত্তিত করিতে গেলে বাংলার সর্ব্বত্র হইতেই মুসলমান সদস্যগণই নির্ব্বাচিত হইবেন, শুধু বর্দ্ধমান বিভাগ ও কলিকাতা হইতে না হয় গুটি কয়েক হিন্দু-সদস্য নির্ব্বাচিত হইতে পারিবেন বলিয়া অনুমান করা যায়। এইরূপে নির্ব্বাচনের ফলে উভয় সম্প্রদায়ের ঈর্ষা ভাব কি ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইবে না?

বঙ্গের বাহিরে হিন্দু প্রধান প্রদেশ গুলিতে হিন্দু ভোটারের সংখ্যাধিক্যে হিন্দুই নির্ব্বাচিত হইতে পারিলেও তথায় weitage বিশেষ মুসলমান সদস্য নির্ব্বাচনের ফলে কতকগুলি মুসলমান সদস্যও নির্ব্বাচিত হইবেন। মোটের উপর মনে হয় যুক্ত নির্ব্বাচন প্রথা প্রবর্ত্তিত করিলে অন্যান্য প্রদেশ গুলির বিশেষ সুবিধা হইলেও বাংলার হিন্দুগণ একেবারেই সকল প্রকার রাজনৈতিক সম্বন্ধ চ্যুত হইয়া পড়িবেন। এই জন্যই মনে হয় কিছুদিন বাংলায় Joint electorate with reservation of seats অর্থাৎ যুক্ত-নির্ব্বাচন প্রণালীর সহিত সম্প্রদায় বিশেষের জন্য আসন নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখা উচিত। এরূপ করিলে জয়েণ্ট নির্ব্বাচনের যাহা গুণ অর্থাৎ কোন দলেরই গোঁড়ারা নির্ব্বাচিত হইতে পারিবেন না কিন্তু সম্প্রদায় বিশেষের জন্য আসন নির্দ্দিষ্ট থাকিলে, সকল প্রকার স্বার্থের সমন্বয় ও সংঘটিত হয়। বাংলার নেতৃগণ গতানুগতিকের ন্যায় অন্যান্য প্রদেশবাসীদের সহিত গলা না মিশাইয়া এই বিষয়টি একটু চিন্তা করিবেন কি?

অর্থসঙ্কট

মধ্য ইউরোপে ও নূতন প্রতিষ্ঠিত রাজ্য সমূহে ভীষণ ভাবে অর্থকৃচ্ছতা দেখা দিয়াছে। এরূপ হইবার বিশেষ কারণ আছে। গত মহাযুদ্ধের পর অষ্ট্রীয়া হাঙ্গেরী সাম্রাজ্যকে ভাঙ্গিয়া তিনটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে পরিণত করা হয়। জেকো শ্লাভোকিয়া, হাঙ্গেরী ও অষ্ট্রীয়া এই রাজ্য তিনটি গঠিত হইলে কোন প্রকার অর্থ-নৈতিক সমস্যার দিকে নজর রাখা হয় নাই। গ্রীক প্রাচীন হেলিনিক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিতে গিয়া কামালপাশার নিকট মার খাইয়া পিছাইয়া আছে। বুলগেরিয়া জার্ম্মানির পক্ষ সমর্থন করিয়াছিল বলিয়া মিত্রশক্তি তাহাদিগকে বিশেষ শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন। নবপ্রতিষ্ঠিত পোলাণ্ড রাশিয়া, অষ্ট্রিয়া ও জার্ম্মানি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আজ অবধি তাহাদের ব্যবসা-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়া উঠিতে পারিল না। রাশিয়াকে ইউরোপ রবিণহুডে পরিণত করিয়া দেওয়ায় যে সমস্ত বলকান রাজ্যসমূহ তাহার সহিত ব্যবসা-বাণিজ্য সূত্রে আবদ্ধ ছিল তাহাদের ভীষণ অর্থ-বিপ্লব ঘটিয়াছে। বুলগেরিয়া ত স্পষ্টই বলিতেছে যে তাহারা সমর ঋণ বহন করিতে পারিতেছে না। জার্ম্মানি প্রাণপণে যুদ্ধের সর্ত্তগুলি পালন করিয়া আসিলেও উহা যে তাহার পক্ষে ভীষণ মারাত্মক হইয়া উঠিয়াছে—তাহা সে প্রকাশ্যেই ঘোষণা করিয়াছে। আমেরিকার প্রধান প্রধান ব্যবসায়ীগণও ভাবিতেছেন যে অধমর্ণ দেশগুলিকে ঋণ হইতে অব্যাহতি প্রদান না করিলে পৃথিবীর বাজারে তাহাদের মাল-বিক্রয়ের কোন সুবিধাই হইবে না। এই মতেরই কতকটা প্রতিধ্বনি করিয়া ইংরাজগণও বলিতেছেন সমর-ঋণের উপর যবনিকা টানিয়া দেওয়ায় প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। ফ্রান্স কিন্তু এই প্রস্তাবে যোগদান করিতে পারিতেছে না। কেন না সমর-ঋণের সাহায্যেই আজ ফ্রান্স তাহার উত্তর-পশ্চিম-পূর্ব্ব সীমান্ত সুদৃঢ় করিয়া লইয়াছে। তাহার ব্যাঙ্কে স্বর্ণের প্রাচুর্য্য ঘটিয়াছে। তবে তাহার ব্যবসা-বাণিজ্যের অবস্থা এখনও মন্দা।

অটোয়া সম্মিলনী

এতদিনে দেখিতেছি রাজনৈতিকগণের চৈতন্যোদয় হইয়াছে। তাঁহারা সমস্ত কার্য্য স্থগিত রাখিয়া আগামী জুলাই মাসে কানাডার রাজধানী অটোয়া নগরীতে ইকনমিক কনফারেন্স বসাইতেছেন। ইহাতে তাঁহাদের অনেকটা স্বার্থসিদ্ধি হইবে। গত নেপলিয়ন যুদ্ধের অবসান ঘটিলে একা ইংলণ্ডই তাহার বিপুল অর্থ ও কলকব্জার সাহায্যে বিপুল পরিমাণ পণ্য প্রস্তুত করিয়া পৃথিবীর তাবৎ দেশের বাজারগুলিই দখল করিয়া বসে। তাহার পর ক্রমে ক্রমে অন্য জাতিগুলির মধ্যে দেশাত্মবোধ ফিরিতে থাকে। জার্ম্মাণ অর্থবিৎ পণ্ডিত ডাক্তার ফ্রেডারিক লিষ্ট বিজ্ঞান সম্মত প্রোটেক্শন (Protection) প্রথা চালাইলে, প্রত্যেক দেশ তাহাদের প্রয়োজন মত শিল্প প্রস্তুত করিতে থাকে। গত মহাযুদ্ধের সময় জার্ম্মাণ সাব-মেরিণ সকল প্রকার সামুদ্রিক ব্যবসা বিপদসঙ্কুল করিয়া তুলিলে, প্রত্যেক দেশ শিল্পবাণিজ্যে স্ব স্ব প্রধান হইবার মানসে বিশেষ ভাবে

উদ্যোগ সুরু করিয়া দেয়, তাহারই ফলে জগতের ইতিহাস হইতে আজ সামুদ্রিক ব্যবসা উঠিয়া যাইতে বসিয়াছে। ব্রিটীশ সাম্রাজ্যের তাবৎ অংশ যদি এক বিরাট প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আসিয়া পরস্পর পরস্পরের স্বার্থের বলিদান দিয়া প্রতিষ্ঠানের স্বার্থকে জাপটাইয়া ধরে তাহা হইলে নিশ্চয়ই এক নূতন আন্তর্জাতিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে। এই অধিবেশনে ভারতকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে। ভারত ইংরাজের অধিকৃত দেশ তাই এই প্রতিষ্ঠানে যোগদান করিবার জন্য যে সমস্ত সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন তাঁহারা সকলেই সরকার কর্ত্তৃক মনোনীত হইয়াছেন। সিভিলিয়ান ধুরন্দর স্যার অতুল চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই দলের নেতা হইবেন। স্যার স্বকুরাম চেটী, পদ্মরাজ জিন ওয়ালা, শেঠ হাজী আবদুল্লা হারুণ, সাহিবজাদা আবদুল সামাদ খান ও স্যার জর্জ্জ রেনী অটোয়া কনফারেন্স ভারতের পক্ষ হইতে যোগদান করিবার জন্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ভারতীয় বণিক সঙ্ঘ সভ্য তালিকার নাম গুলি লইয়া ভীষণ ভাবে সমালোচনা করিয়াছেন। সরকার পক্ষ হইতে বলা হইয়াছে যে ভারতের বিভিন্ন স্বার্থের দিকে বিশেষ নজর রাখিয়া সেই স্বার্থ সমন্বয় করিবার জন্যই উক্ত ভদ্রলোকদের মনোনীত করা হইয়াছে। ভারতীয় বণিক সভা বলেন যে তাঁহারা ভারতের কোন স্বার্থ বা দলেরই প্রতিনিধি নহেন, সরকার হইতে নির্ব্বাচিত হইয়া তাঁহারা সরকারের স্বার্থ রক্ষা করিবার জন্যই ব্যস্ত থাকিবেন। সুতরাং এইরূপ সভ্য পাঠাইবার কি প্রয়োজন ছিল? ইহা ব্যতীত তাঁহারা আর একটি সারগর্ভ কথারও উল্লেখ করিয়াছেন। গত মহাযুদ্ধের পর হইতে ভারতের বহির্বাণিজ্য ইংলণ্ডেতর দেশ গুলির সহিত উত্তোরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে সুতরাং এ ক্ষেত্রে জোর করিয়া ভারতকে ইংলণ্ড ও তাহার উপনিবেশ গুলির সহিত গাঁটছড়া বাঁধিয়া দিলে ভারতের বিশেষ ক্ষতি হইবে। এই কথাটী যুক্তি-তর্কে পূর্ণ হইলেও আমরা শুধু এই কথা বলি যে ভারতকে ইংলণ্ডের সহিত রাজনৈতিক সূত্রে একত্র সংবদ্ধ থাকিতে হইবেই, সুতরাং ঐ সম্বন্ধটা যাহাতে উভয় জাতির পক্ষেই আর্থিক ক্ষতিকর না হয় সেই রূপ কোন গবেষণা আটোয়াতে হইলে ক্ষতি কি?

মিঃ বলডুইন এই কনফারেন্স সম্বন্ধে বেশ একটী সত্য কথা বলিয়াছেন। তিনি বলেন যে অটোয়া সমস্ত ব্রিটীশ সাম্রাজ্যের কেন্দ্র স্থলে অবস্থিত। অটোয়া শহরটী ইংরাজ জাতির বাসের বিশেষ উপযোগী। উহার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর। এখন দেখা যাক যে যাহারা ইংরাজ জাতির রক্ত হইতে উৎপন্ন তাহারা ইংলণ্ডের সহিত এক অর্থনৈতিক সূত্রে আবদ্ধ হইয়া পরস্পর পরস্পরের স্বার্থ-উন্নতি করিতে সঙ্কল্প পরায়ণ কিনা। এই কনফারেন্স যদি ব্যর্থ হয় এবং ইহাই যদি প্রমাণ হয় যে ইংলণ্ডের উপনিবেশ গুলি তাহার সহিত অর্থনৈতিক সূত্রেও আবদ্ধ থাকিতে ইচ্ছুক নয়, তখন ইংরাজ জাতি জন্মের মত তাহাদের সাহত সমস্ত আত্মীয়তা ভুলিয়া পূর্ব্ব-ইউরোপের জাতিগুলির সহিত সখ্যসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা করিবে। কথাটা বিশেষ চিন্তা করিবার বিষয়।

আমেরিকায় ছেলে ধরার ভয়

আমেরিকায় ছেলে-ধরার ভয় দেখা দিয়াছে। সেখানকার গুণ্ডারা কতকগুলি গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠা করিয়া সম্ভ্রান্ত ও ধনী বংশজাত শিশু অপহরণ করিয়া তাহাদিগকে গুপ্ত স্থানে লুকাইয়া রাখিতেছে। তাহার পর তাহাদের অভিভাবকদের নিকট হইতে বিস্তর অর্থ গ্রহণ করিয়া আবার ফিরাইয়া দিতেছে। ইহা দমন করিবার জন্য বিশেষ আইন না থাকায় সকলেই বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িতেছেন।

প্রেততত্ত্ব

Psychic Knowledge বা প্রেততত্ত্ব আজ ইউরোপের একটী বিশেষ সম্পত্তি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিশ বৎসর পূর্ব্বেও যাহারা সকল প্রকার ভূত অবিশ্বাস করিত তাহারাই আজ উহাতে বিশেষ ভক্তিমান হইয়া উঠিয়াছে। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে স্যার অলিভার লজ, কর্ণেল অলকোট ও ম্যাডাম ব্ল্যাভাস্কি ইউরোপে

প্রেততত্ত্ব চর্চ্চা সুরু করেন। এখন তথায় অনেক নর-নারীই এই বিদ্যায় বিশেষ দক্ষ হইয়া উঠিয়াছেন। সম্প্রতি শুনা যাইতেছে যে বিচারকালীন কোন ভদ্রমহিলার মধ্যে প্রেতের আবির্ভাব হওয়ায় তিনি অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া যান। হাকিম না কি ইহাতে বিশ্বাস করেন নাই, এই জন্য তিনি তাঁহার কার্য্য পূর্ব্ববৎ চলাইয়া যান। ইউরোপের এইরূপ মতান্তর ঘটিল কেন? আমাদের দেশে সাম, ঋক ও যজুর্ব্বেদ লিখিত হইবার পর অথর্ব্ব বেদ লিখিত হয়। আমাদের মনে হয় মানবের ঐশ্বর্য্য লাভ ঘটিলেই উহাতে মমতা জন্মায়, তখন পরকাল ও আত্মার উপর বিশ্বাস আসিয়া দাঁড়ায়। সকল দিকে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া ইউরোপ এখন ভূতের ভয় দেখিবে এবং আত্মায় বিশ্বাসবান হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি?

বলশেভিজম

বলশিভিজম কি এবং অর্থ কি অনেকেই জানিতে চাহেন। বলশেভিক একটী রাশিয়ান শব্দ উহার অর্থ সংখ্যাগরিষ্ঠ, কাজেই বিপরীত অর্থ ব্যঞ্জক শব্দ মমশেভিক। বলশেভিকগণ মহাযুদ্ধের পর জারের ধ্বংস করিয়া গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছিল। কল-কারখানা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়া সমগ্র দেশের মধ্য হইতে ধনী সম্প্রদায়কে নির্ব্বাসিত করিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু অচিরেই তাহাদের ভুল বুঝিতে পারিয়া বণিকগণকে ক্রমশঃ তাহাদের সত্ত্ব ও অধিকার ফিরাইয়া দিতেছে। Five year plan নামক একটী project লইয়া তাহারা প্রাণপাত করিতেছে। ১৯৩৪ সালে এই প্লানের মেয়াদ ফুরাইবে। এই প্ল্যান অনুযায়ী কার্য্য হইলে না কি সমস্ত রাশিয়ায় জন-সাধারণ সমান ভাবে সমস্ত সুখ-স্বচ্ছন্দের অধিকারী হইয়া উঠিবে। বর্ত্তমানে রাশিয়াকে যাহারা ভগবান বিদ্বেষী বলিয়া ঘোষণা করেন, তাহারা খানিকটা সত্য প্রকাশ করিয়া থাকেন। জারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া যখন বলশেভিকেরা যে দেশের ধর্ম্ম-যাজকগণ সম্রাটেরই যন্ত্রস্বরূপ তখন তাহারা তাহাদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়। তাহার পর কোন প্রকার ধর্ম্ম মানিয়া লইতে গেলেই গেলেই ব্যক্তি বিশেষের প্রাধান্য স্বীকার করিতে হইবে বলিয়া তাহারা Reason বা বিবেচনা বুদ্ধিকেই প্রাধান্য দিয়াছেন।

খেলার মাঠে ষ্টাডিয়াম্

কলিকাতা সহরে সারা বৎসর ধরিয়াই নানাপ্রকার খেলাধুলা হইয়া থাকে। এই সমস্ত খেলা ধুলা দেখিবার জন্য বিস্তর দর্শকের সমাবেশ হইয়া থাকে। এক ফুটবলের সময়ই এমন অনেকদিন যায় যেদিন প্রায় লক্ষাধিক দর্শকের সমাবেশ হয়। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় আজ অবধি কলিকাতায় কোন stadium বা দর্শক-মণ্ডলীর দণ্ডায়মান হইয়া খেলা দেখিবার ছাওনী তৈয়ারী হইল না। টারফ্ ক্লাবের ছাওনীর মত একটী ছাওনী থাকিলে অনেকেই পূর্ব্বাহ্নে টিকিট খরিদ করিয়া রাখিয়া প্রয়োজনমত উক্তস্থলে যাইতে পারেন। দিল্লীতে শুনা যাইতেছে—একটী stadium নির্ম্মিত হইবে। কলিকাতায় কি এইরূপ একটী stadium নির্ম্মিত হইতে পারে না।

বেতার

সন্ধ্যার পর যাঁহারা বেতারের আমোদ-প্রমোদ উপভোগ করেন তাঁহারা শুনিয়া নিশ্চয়ই আনন্দিত হইবেন যে কলিকাতার বেতার-সঙ্ঘ রহিয়া গেল। তবে উহার আয় ও ব্যয় প্রায়ই সমান। বেতারের সদস্য সংখ্যা নাকি ৫০০০ এবং গড়পড়তা ৮ টাকা হিসাবে অর্থ সংগৃহীত হইলে বার্ষিক আয় ৪০,০০০ টাকা হয়। কাষ্টম্ ডিউটী বাবদ বেতার সংঘকে সরকার পক্ষ ৪০,০০০ টাকা বার্ষিক দেন। মোট আয় ৮০,০০০। উহার খরচাও নাকি ঐ টাকাই। বেতারের অধ্যক্ষগণের উচিত বাংলার পল্লীগুলিতে গিয়া বিশেষভাবে প্রচার কার্য্য সুরু করা। বাংলার পল্লীগুলিতে কোন প্রকার আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা নাই। সেখানে বেতার আমোদের প্রতিষ্ঠা করিতে পারিলে বেতারের আর্থিক কষ্ট দূর হয় এবং পল্লীগুলিরও উপকার করা হয়।

মিশরীয় সভ্যতা

মেসোপটামিয়ায় কিশ নামক একটী নূতন সহর আবিষ্কৃত হইয়াছে। সহরটী নাকি খৃষ্ট পূর্ব্ব ৩০০০ বৎসর পূর্ব্বে স্থাপিত হইয়াছিল। প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ বিষয়টী লইয়া গবেষণা করিতেছেন। মেসোপটামিয়া খুবই

প্রাচীন ভূস্থল। পৃথিবীর ইতিহাস পাঠে জানিতে পারা যায় যে মানবের আদিম জন্মভূমি লইয়া বিশেষ মতান্তর থাকিলেও মিশরনদীর উপকূলে, টাইগ্রেস ইউফ্রেজ নদী দ্বয়ের তীরে ও গঙ্গার দুই ধারে যে তিনটি জন সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হয় তাহারাই প্রাচীন মিশরীর, চালডিয়ান ও ভারতীয় আর্য্যবংশ। মেসোপটামিয়ার চ্যালডিয়া রাজ্য ধ্বংশ প্রাপ্ত হইলে ব্যাবিলোনিয়া ও তাহার পর আসেরিয়া রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। অনেকে বিশ্বাস করেন যে জ্যোতিষ শাস্ত্রের জন্ম হয় এই চ্যালডিয়া রাজ্য হইতেই। ইতিহাস প্রসিদ্ধ নাবুফ্যাডনেদার ও আসুর বাণী পাল এই অঞ্চলেরই রাজা ছিলেন।

প্রদেশ বিচ্ছেদ

এডেন বোম্বাই প্রদেশের অংশভুক্ত হইয়াই শাসিত হইয়া আসিতেছে। সম্প্রতি শুনা যাইতেছে এডেনকে সিংহলের ন্যায় একটী স্বতন্ত্র কলোণী রাজ্যে পরিণত করা হইবে। বোম্বাই প্রদেশচ্যুত হইলে এডেন কি ধন-ধান্যে পূর্ণ হইয়া উঠিবে? আসল কথা এই যে ইংরাজ ব্যবসায়ীরা ভারতবর্ষে ব্যবসা-বাণিজ্যে আর বিশেষ সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না, কাজেই এডেন বা ব্রহ্মদেশকে ভারতবর্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইতে পারিলে তাঁহাদের বিশেষ সুবিধাই হয়। এই জন্যই ইংরাজ সরকারকে তাঁহারা এডেন ও ব্রহ্মকে স্বতন্ত্র করিয়া লইবার জন্য উত্তেজিত কবিতেছেন।

ভাষাগত প্রদেশ বিভাগ

ভারতের প্রদেশগুলি সংগঠিত হইবার সময় ভাষার দিকে নজর না রাখিলেও অনেকস্থলে ভাষার জন্যই প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্য দেওয়া হইয়াছে। এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল শুধু উড়িষ্যার বেলায়। এই প্রদেশের গঞ্জাম প্রভৃতি খানিকটা অংশ মাদ্রাজের অন্তর্ভুক্ত, কটক ইত্যাদি কিছু বেহারের মধ্যে এবং খানিকটা বাংলার মধ্যেও রাখা হয়। এখন শুনা যাইতেছে যখন নূতন শাসন-তন্ত্র প্রবর্ত্তিত হইবে তখন উড়িষ্যাকে একটী স্বতন্ত্র প্রদেশে পরিণত করিবার জন্য বাংলা হইতে সমস্ত মেদিনীপুর জেলাটীকে কর্ত্তন করিয়া লইয়া উহার সহিত সংযুক্ত করিয়া দেওয়া হইবে। তাহা হইলে নূতন বিধানে বাংলা দেশকে ত্রিধা বিভক্ত করা হইবে। বাংলার মানভূম জেলাকে বেহারের মধ্যে রাখিয়া, মেদিনীপুরকে উড়িষ্যার মধ্যে ঢুকাইয়া দিয়া, বাংলারই যে শুধু সর্ব্বনাশ হইবে তাহা নয়, বাংলার হিন্দুগণ চিরকালের জন্য মুসলমানগণের নিকট সংখ্যালঘিষ্ঠ জাতি হিসাবে রহিয়া যাইবে। একমাত্র ভাষাই যদি প্রদেশের সীমানা নির্দ্দেশক হয় তবে বাংলার সমস্ত জেলাগুলি একত্রিত করিয়া প্রকৃত বাংলা গঠনা করা কেন না হইবে?

ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী

লর্ড কার্জ্জনের একটী বিশেষ কীর্ত্তি ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী। সম্প্রতি এই লাইব্রেরীর কতকটা ব্যয়ভার দিল্লী হইতে প্রদত্ত হইলেও ইহার সুবিধা কলিকাতা-বাসীরাই বিশেষ উপভোগ করিয়া থাকেন। কলিকাতায় যখন ভারত-সরকারের রাজধানী ছিল তখন ভারত-সরকার এই পুস্তকালয়ের জন্য অম্লানবদনে অর্থ-ব্যয় করিতেন। রাজধানী দিল্লীতে স্থানান্তরিত হওয়ার পর ইহাকে অনেকটা প্রাদেশিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে ধরায়, সম্প্রতি ইহার অর্থকষ্ট দেখা দিয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানের বাৎসরিক আয় ৮১,০০০ টাকা। উক্ত আয়ের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার জন্য উহার ব্যয় স্থির করা হইয়াছে ৭৩,৫০০ টাকা। এত বড় একটা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এই আয় ও ব্যয় যথেষ্ট নয়। বাংলার সরকার ও বাংলার জনসাধারণের এই বিষয় মনোযোগ দেওয়া একান্ত প্রয়োজন।

সরকারের শৈল বিহার ও ষ্টেট্‌সম্যান

সহযোগী ষ্টেটসম্যান সরকার পক্ষের শৈল-যাত্রা লইয়া একটু ঠাট্টা করিয়াছেন। এই দারুণ অর্থ-সঙ্কটের দিনে যখন সর্ব্বত্রই অর্থ সঙ্কোচ করা হইতেছে তখন এই অতিরিক্ত আরামের জন্য অতিরিক্ত ব্যয় কেন? সহযোগী বলেন সওদাগর সাহেবদের বার্ষিক আয় অনেক সিভিলিয়ান শাসকদের অপেক্ষা যথেষ্টই অধিক তবু সওদাগরী সাহেবগণ যে আরাম উপভোগ না করিয়া কার্য্য চালাইতে পারেন তাঁহাদের অপেক্ষা অল্প ধনী সিভিলিয়ান শাসকগণ তাহা না পারিবেনই বা কেন? সরকার পক্ষ হইতে সাধারণতঃ বলা হইয়া থাকে যে এই শৈল-বিহারের ব্যয় যথেষ্টই কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে, তত্রাচ যেটুকু আছে তাহাই বা না কমিবে কেন? সহযোগীর এ গাত্রদাহ—সওদাগর প্রীতি ও সিভিয়ানদের আরাম বিদ্বেষ দেখিয়া একটু বিস্ময় জাগে। সওদাগর সাহেবেরাই অবশ্য বিজ্ঞাপন মারফতে ষ্টেটস্‌ম্যানের সম্পদ বৃদ্ধির সহায়তা করেন একথাও মনে হয়।

"মাতৃস্নেহ"

লক্ষ্মীবিলাস প্রেস লিঃ

সতীশচন্দ্র মিত্র প্রতিষ্ঠিত

৬ষ্ঠ বর্ষ | আষাঢ়—১৩৩৯ | ৩য় সংখ্যা

সুখ দুঃখ

শ্রীবিশ্বেশ্বর চট্টোপাধ্যায়

তা হোলে এই সুখ-দুঃখের, এই তারতম্যের কারণ কি?

সাংখ্যকার বলেন, প্রকৃতিসংযোগাৎ।

আবার ঘচাৎ-মচাৎ আরম্ভ কোর্‌লে। না তাড়িয়ে ছাড়্‌বে না বল।

তবে একটা গল্প বলি, শোন।

বল।

ভগবান ঈশা একদিন তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে কোথায় যাচ্ছিলেন। পথে দেখ্‌লেন, কোন লোক দুরারোগ্য রোগে ভুগছে। একজন শিষ্য জিজ্ঞাসা কোর্‌লেন, প্রভু, এ এত দুঃখ ভোগ কোর্‌ছে কেন—এ নিজে পাপ কোরেছে না এর বাবা? ভগবান উত্তর কোর্‌লেন, এ-ও পাপ করেনি এর বাবাও পাপ করেনি। তবে? দুনিয়াতে যে আসে সুখ-দুঃখ ভোগ কোর্‌তে সে বাধ্য, কারণ, দুনিয়া সুখ-দুঃখে ভরা।

এক পাও এগুলাম বোলে ত মনে হচ্ছে না। যেহেতু আমি দুঃখ ভোগ কোর্‌ছি, অতএব আমি দুঃখ ভোগ কোর্‌ছি—সেই একই কথা কি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলা হোল না? উল্টেই শোও আর পাল্টেই শোও সেই পায়ের দিকেই পাশ্‌তলা রোয়ে গেল।

তাই। তার চেয়ে বেশী কিছু বল্‌বার নেই।

কেন? জন্মান্তর মান্‌লে কি এ সমস্যার মীমাংসা হয় না?

বুঝ্‌তে পারলাম না।

তুমি কি জন্মান্তর মান্‌তে চাও না?

জন্মান্তর মান্‌তে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু তাতে বর্ত্তমান সমস্যার কি কোরে মীমাংসা হয় বুঝ্‌তে পার্‌লাম না।

আমাদের সুখ-দুঃখের কারণ আমাদের পূর্ব্বজন্মকৃত ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম—এ কথা মান্‌লে কি আমাদের sense of justice চরিতার্থ হয় না?

তা হোতে পারে, কিন্তু তাতে ধর্ম্মকে অত্যন্ত খেলো করা হয়।

কি কোরে?

টাকাকড়ি, ঘরবাড়ী, গাড়ীঘোড়া, নাম যশ ইত্যাদি যাকে তুমি সুখ বোল্‌ছো, তাই হোয়ে দাঁড়ায় মানব জীবনের চরম লক্ষ্য summum bonum—and-in-itself আর ধর্ম্মটা উপলক্ষ্য মাত্র—means to an end। ধর্ম্মের এর চেয়ে খেলো ধারণা আর কিছু হোতে পারে না। তার চেয়ে অধর্ম্ম ভাল।

তবে তুমি জন্মান্তর মান কেন?

নিরবচ্ছিন্নতা প্রকৃতির নিয়ম, মানবজীবন সম্বন্ধে তার ব্যতিক্রমের কোন কারণই খুঁজে পাই না, তাই।

তা হোলে ধর্ম্মের কি কোন পুরস্কার নেই?

আছে—itself।

তার মানে?

Virtue is its own reward—যা কিছু চরম, তারপর—further than that—আর কিছু থাক্‌তে পারেনা।

তা হোলে সুখ-দুঃখ কি mere accident—আমাদের কার্য্যকলাপের সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক নেই?

ব্যক্তিগত ভাবে তাই। কিন্তু সৃষ্টির সবটুকু একসঙ্গে ধারণা কোর্‌তে পার্‌লে তখন আর accident থাকে না, একটা কার্য্যকারণসম্পর্ক বেশ বুঝ্‌তে পারা যায়।

কি রকম?

মানব সমাজ যে পরিমাণে ধার্ম্মিক সেই পরিমাণে সুখী এবং vice versa, কিন্তু ব্যক্তিবিশেষ সম্বন্ধে এ কথা এ ভাবে খাটে না।

তাতে কোরে ব্যক্তিগত মানবের উপর কি অবিচার করা হয় নি?

না। তা না হোলে হোতো।

কেন?

সে কথা ত আর একদিন বোলেছিলাম। এ জগৎ জগদীশ্বরের প্রেমের রাজ্য, তাই আমার সুখ তোমার উপর নির্ভর করে, তোমার দুঃখ আমার কর্ম্মাধীন। না হোলে এ জগৎ বেণের রাজ্যে পরিণত হোতো, লাভ-লোকসানটাই হোতো চরম লক্ষ্য, ইহ এবং পরত্র। আমরা নিজেদের কর্ম্মের দোষে জগৎটাকে কতকটা তাই কোরে তুলেছি—what man has made of man!

তার মানে?

টাকা-কড়ি, বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে যেমন মারামারি, কাটাকাটি, মামলা মোকদ্দমা হয়, একজন আর একজনের কাছ থেকে কেড়ে নিচ্ছে না হয় ঠকিয়ে নিচ্ছে, কোথাও বা বাহুবলের কোথাও বা বুদ্ধির লড়াই চলেছে, হয়ত ধর্ম্ম নিয়েও তাই হোতো। একজন আর একজনকে ঠকিয়ে বা মেরে-ধোরে একটুখানি ধর্ম্ম কোরে নিত, খানিকটা সুখ তার আট্‌কে বাঁধা থাক্‌তো। তাকে কি তুমি ধর্ম্ম বোল্‌তে চাও?

অবশ্য না। কিন্তু এটা ত ধর্ম্মের destructive side, এর একটা constructive side কি নেই?

আছে। যখন আমরা বুঝ্‌তে পারি যে, জগতের সুখেই আমার সুখ, জগতের দুঃখে আমারও দুঃখ এবং সেইমত কাজ করি অর্থাৎ সকলের সুখবৃদ্ধির ও দুঃখ নিবারণের চেষ্টা করি, তখনই আমরা যথার্থ ধর্ম্মের এবং সুখের পথে অগ্রসর হই।

তা হোলে ধর্ম্মের মাপকাটি সুখ না সুখের মাপকাটি ধর্ম্ম?

ধর্ম্মের মাপকাটি ধর্ম্ম আগেই বোলেছি। আর সুখও যদি যথার্থ সুখ হয় তার মাপকাটিও সুখ ছাড়া আর কিছু হোতে পারে না। বাবার উপর যতক্ষণ বাবা থাকে ততক্ষণ আমরা চরম বাবাকে পাই না।

তা হোলে চরম লক্ষ্য এক নয়, দুই বা বহু—ধর্ম্ম, সুখ, ইত্যাদি—তাই কি?

না, চরমে দুই মিলে গেছে।

অর্থাৎ?

ধর্ম্মই সুখ, সুখই ধর্ম্ম।

তার প্রমাণ?

সুখপন্থীর কাছেও সুখের পরিমাণই যথেষ্ট নয়। তাঁকেও সুখের qualityর কথা বোল্‌তে হোয়েছে। ধর্ম্মছাড়া আর কোনও কষ্টিপাথরের সাহায্যে এই quality নিরূপণ করা যায় কি?

বেশ। কিন্তু সুখকে যদি ধর্ম্মই বলা হয়, তা হোলে কি কথাটার মানে বদ্‌লে যায় না? আমরা সাধারণতঃ 'সুখ' কথাটা যে অর্থে প্রয়োগ করি, সে অর্থ কি বজায় থাকে?

না, তা থাকে না।

সুতরাং ?

সুতরাং আমরা যাকে সুখ বলি তা হয়ত সুখ নয়। কেবল কথার মার প্যাঁচ কোরে বোঝাতে চাও যে, সাদা সাদা নয়, কাল। আমরা কি তাই বিশ্বাস কোর্‌বো না নিজের চোখ দুটোকে বিশ্বাস কোর্‌বো ?

নিজের চোখকেই অবশ্য বিশ্বাস কোর্‌তে হবে।

তা হোলে যাকে সুখ বলি, তাকেই সুখ বোল্‌বো।

স্বচ্ছন্দে।

কিন্তু—

আবার কিন্তু কি ? নিজের চোখকে পর্য্যন্ত সন্দেহ কোর্‌ছো নাকি ?

ঠিক সন্দেহ কোর্‌ছি না। তবে চোখ দুটোও যে মাঝে মাঝে ঠকায়, তাও অবিশ্বাস করি না।

তা হোলেই দেখা যাচ্ছে যে, আমাদের চর্ম্মচক্ষু বা চর্ম্মশ্রোত্র final arbiter নয়। ওগুলো কেবল আমাদের পরম্পরাগত অভ্যাস মাত্র।

তুমি কি বোল্‌তে চাও, এই অভ্যাস "can teach the eyes to hear or the ears to see or the hyena to have a conscience ?"

হাঁ। তার প্রমাণ সর্প অক্ষিশ্রবা।

তা হোলে final authority কে ?

চক্ষুর চক্ষু, শ্রোত্রের শ্রোত্র।

সাদা বাংলায় ?

যঃ পশ্যতি স পশ্যতি। Reason's ear—He that hath hear, let him hear.

কিন্তু আমরা যাকে সুখ বলি অর্থাৎ প্রিয়-সংযোগ এবং অপ্রিয়-বিয়োগ যে সুখ নয়, এ কথা মনে করবার কারণ কি ?

নিজের বাইরে যদি সুখ খুঁজি, সুখের বদলে তদ্বিপরীত পাবারই বেশী সম্ভাবনা—

কেন ?

যা আমার নয় তাকে আমার কোর্‌ব কি কোরে ? ঘটনাক্রমে আজ আমার হোলেও কাল যে আমার থাক্‌বে তার নিশ্চয়তা কি ?

তা হোলে ?

আত্মোপলব্ধি ছাড়া সুখ নেই। আত্মোপলব্ধিই সুখ, সুতরাং ধর্ম্মই সুখ।

অর্থাৎ কেবল হাম-আর-হাম। সবই আপ্‌কা ওয়াস্তে। অথচ বোললে, আমার সুখ-দুঃখ তোমার কর্ম্মাধীন, জগতের সুখ-দুঃখের সঙ্গে আমার সুখ দুঃখ জড়িত।

তাই। সেইখানেই ত উপলব্ধি। হাম্‌-আর-হাম্‌ আপ্‌কা-ওয়াস্তে ত উপলব্ধি নয়, উপলব্ধির অভাব।

ঠিক বুঝতে পারলাম না।

মনে কর, তুমি হেঁটে অস্‌ছো। তোমার যদি মোটরে আস্‌তে ইচ্ছা করে অথচ ট্যাঁকে মোটে পাঁচটি পয়সা থাকে, তা হোলে তোমার সে ইচ্ছা পূর্ণ হবে না। হেঁটে আসার কষ্ট, তার উপর অপূর্ণ ইচ্ছার কষ্ট। যদি বাসে বা ট্রামে আসতে চাও তা হোলে তোমার ইচ্ছা হয়ত অপূর্ণ থাকে না। কিন্তু ঐ পাচটি পয়সাও যদি গাঁটকাটা কেড়ে নিয়ে থাকে তখন ত হেঁটে আসা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। হাঁটাটা আমার নিজস্ব, আমি যদি ইচ্ছে করে না হারাই, সে শক্তি কেউ আমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারে না। কিন্তু মোটর বা ট্রাম আমার নিজস্ব নয়, মোটরে বা ট্রামে চোড়তে রেস্ত চাই, সে রেস্ত আমার থাকতেও পারে, না থাকতেও পারে। সুতরাং ও-সব কামনা করা মানে দুঃখ বরণ করা।

তা হোলে কামনা ত্যাগ করাই ধর্ম্ম, তাই কি সুখ ?

এটা কি নূতন কথা ? ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্‌।

কিন্তু কামনা ছাড়া কর্ম্মও সম্ভব নয়। তা হোলে ঠুঁটো জগন্নাথই কি সব চেয়ে বড় আদর্শ ?

জগন্নাথের ঠুঁটো হওয়া সাজে, কারণ তাঁর অসংখ্য হাত-পা আমরা আছি। তিনি না কোর্‌লেও করান, আমাদের করাই তার করা—নিমিত্ত মাত্রং ভব সব্য-সাচিন্‌। কিন্তু আমাদের পক্ষে ঠুঁটো হোয়ে কর্ম্মত্যাগ করা মোটেই সম্ভব নয়। আর কর্ম্মত্যাগ কোর্‌তে তিনিও বলেন নি, আমিও বল্‌ছি না।

তবে ?

যস্তু কর্ম্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে।

ঘুরে ঘিরে সেই একই কথা দাঁড়াল। কর্ম্মফল-ত্যাগ করা মানেই কামনা ত্যাগ করা। কিন্তু নিষ্কাম কর্ম্ম কি সম্ভব, সেটা কি Psychological impossibility নয়? Kant এর categorical imperative কি জগৎ গ্রহণ করতে পেরেছে ?

না। তার কারণ তিনি গ্রহণ করাতে পারেন নি। ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করা মানে আকাঙ্ক্ষার বর্জ্জন নয়, তাহা ঈশ্বরে সমর্পণ তৎ কুরুস্ব মদর্পণম্।

Fine! জলের মত সরল! কামনা ত্যাগ না বুঝলে বুঝতে চেষ্টা করা যায়, কিন্তু তাহা ঈশ্বরে সমর্পণ এখানে কল্পনাও বোধ হয় হার মানে। কোথায় ঈশ্বর আর কোথায় আমার কামনা? ক সূর্য্য প্রভবো বংশঃ, ক চাল্প বিষয়া মতিঃ!

কোথায় ঈশ্বর মনে কোরলেই যত গণ্ডগোল, কিন্তু তিনি বিশ্বময় এ কথা ধারণা কোরতে পারলে আর গোল থাকে না।

কিছু না, সব চ্যাপ্‌টা হোয়ে যায়।

বিশ্বময়ে কর্ম্মফল অর্পণ করা মানে বিশ্বের হিতার্থে কর্ম্ম করা। তাতে যে আমারও হিত হবে না, এমন নয়, কারণ আমিত বিশ্বছাড়া নই। তাই বোল্‌ছিলাম, জগতের সুখ দুঃখের সঙ্গে আমার সুখ দুঃখ জড়ান। শুধু তাই নয়, জগতের সুখ দুঃখ। যেমন আমার কর্ম্মাধীন, আমার সুখ-দুঃখও তেমনি অপরের কর্ম্মাধীন।

বিশ্বের হিতার্থে কর্ম্ম করা মানে? কথাটা একটু বেশী tall হোয়ে যাচ্ছে না কি?

একটুও না। পরের সুখ-দুঃখ নিজের বোলে বোধ করি এমন আর শক্ত কি? তবে সেটা realise কোরতে পারলে তদনুসারে কর্ম্ম করাও শক্ত ঠেকবে না।

কিন্তু ফলে যে সুখ, তার প্রমাণ কি?

Experiment কোরে দেখ্‌তে পার।

কি রকম? এ যে আরও মাত্রা বেশী হোয়ে যাচ্ছে!

দুই বন্ধু, দুই ভাই বা স্বামী স্ত্রী, এই রকম দুজন লোক নিয়ে আগে experiment কোরে দেখ। অপরের সুখ-দুঃখ যদি নিজের ভাবতে পার আর সেই মতো কাজ কোরে যদি সুখ পাও, তা হোলে প্রীতির বিস্তার কোরে যেও। আর তা যদি নাই পাও, ফিরে এসে আমার দু-গালে দুই চড় মেরো।

শশাঙ্ক কবিরাজের স্ত্রী

শ্রীজগদীশচন্দ্র গুপ্ত

গল্প

অনেক বাজে আপত্তি আর পরিহার্য্য ঝঞ্ঝাটের পর শশাঙ্কশেখর গুপ্ত পুনরায় বিবাহ করিল।

শশাঙ্কের প্রথমা স্ত্রী ভোলাদাসী দেবী পিত্রালয়ে থাকিতেন—সেখানেই তিনি পরলোক গমন করিয়াছিলেন। ভোলাদাসীর পরমায়ু যথার্থই শেষ হইয়াছিল কি আরো কিছুদিন তিনি বাঁচিলে বাঁচিতে পারিতেন তাহা নির্ণয় করা শক্ত, এবং ভোলাদাসীর মা সে তর্ক তুলিতেই দিলেন না; তিনি বড়াই করিতে লাগিলেন ইহাই বলিয়া যে, মা আমার সতী-লক্ষ্মী ছিল, ডাক্তারে তার গা ছুঁলে না। শশাঙ্ক শ্বশ্রূঠাকুরাণীর এই পরপুরুষস্পর্শদোষহীন অটুট সতীত্বের ধারণা সমর্থন করিল না, করিল অসহযোগ এবং শ্বশুরবাড়ীর সংস্পর্শ অবিলম্বে একেবারেই ত্যাগ করিয়া বাজারে আসিয়া বসিল—অর্থাৎ শ্বশুররাজ্যে থাকিয়া চাকুরীর চেষ্টা ত্যাগ করিয়া সে আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয় খুলিল। শিব তাহাকে শক্তি দিলেন।

যদি স্বাধীনভাবে জীবিকার্জ্জনের উপায় ছিল তবে শশাঙ্ক চাকুরীর চেষ্টা কেন করিতেছিল? কিম্বা যদি চাকুরীর চেষ্টাই সে করিবে তবে পিতার শিব্যত্ব গ্রহণপূর্ব্বক কষ্ট স্বীকার করিয়া অতীব জটিল দুরধিগম্য আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র সে আয়ত্ত করিয়াছিল কেন?

সে আলাদা কথা।

অবিলম্বেই দেখা গেল, শশাঙ্ক কবিরাজের অন্তরঙ্গ বন্ধুবর্গের মধ্যে দুইটি বিষয়ে একেবারে মত ভেদ নাই:

প্রথমতঃ, গ্রীষ্মপ্রধান ভারতে নূতন ও পুরাতন কঠিন রোগেও স্নিগ্ধ আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধই যথার্থ ফলপ্রদ—উগ্রবীর্য্য বিলাতি ঔষধ নহে—

দ্বিতীয়তঃ, স্বয়ং মহাদেব রাবণকে যে স্বনামধন্য মোদক প্রদান করিয়াছিলেন তাহা বাস্তবিকই ক্ষুধাবর্দ্ধক; আর, শশাঙ্ক কবিরাজের প্রস্তুত সেই মোদক বাজারের ছয় টাকা সেরের কৃত্রিম পানসে জিনিষ নহে।

ক্ষুধাবৃদ্ধির আনন্দে বসুধাকে কুটুম্বিতার চোখে দেখিতে দেখিতে শশাঙ্ক কবিরাজের বিশেষ নিভৃত বন্ধু কার্ত্তিক একদিন প্রস্তাব করিল যে, নূতন কম্পজ্বরেও যখন কবিরাজের খোঁজ পড়িতেছে তখন আর ইতস্তত না করিয়া নূতন করিয়া সংসারপত্তন করা শশাঙ্কের উচিত।

ইহাতে শশাঙ্ক কলরব করিয়া খানিক হাসিল··· তারপর বলিল,—বিয়ে করতে আমার ষোল-আনা ইচ্ছে রয়েছে; না করলে চলবেই না—খাবো কি! আমার এই বয়সে কারো কারো একবার বিয়েই হয় না···মোটে ছাব্বিশ চলছে; কিন্তু গ্রহের কোপে আমাকে একবারের স্থলে দু'বারে করতে হ'ল। কিন্তু—

তারপর স্বর নামাইয়া বলিল বাস যে সর্প পুরীতে!—বলিয়া বহুপূর্ব্বে কথিত কুপিত গ্রহের উদ্দেশে হাত তুলিয়া একটি প্রণাম ত্যাগ করিল।

—ঐ পক্ষের শ্বশুরদের কথা বলছ?

—হ্যাঁগো। শ্বশুরবুড়ো বা পথে আছে; কিন্তু সম্বন্ধীটার সুপথ কুপথ জ্ঞান নেই। খামখাই বলে কি না দেখে' নেব।···একদিন যাঁদের মা বলেছি বাবা বলেছি তাঁদের সঙ্গে শত্রুতা করতে আমি চাইনে—কিন্তু থাকতে হবে সাবধানে—আছিও তাই। বলিয়া

শশাঙ্ক মুখ বাড়াইয়া রাস্তার উজান ভাটি দুটি দিক্ অতিশয় সাবধানতার সহিত দেখিয়া লইল।

কার্ত্তিক প্রশ্ন করিল,—গয়নাগুলো দিলে ?

শশাঙ্ক চুপি চুপি বলিল,—চেয়েছিলাম বলেই ত' সম্বন্ধী···ও আলোচনা না-ই করলে। কিছুদিন যাক্, আপনিই দিবে।

—আর দিয়েছে! বলিয়া পরম হিতৈষী কার্ত্তিক নিরুদ্দেশে বৃদ্ধাঙ্গুলি তুলিয়া মুখ তিক্ত করিয়া তুলিল।

শশাঙ্ক বলিল,—অম্বল হচ্ছে রোজ।

—হিঙ্গাষ্টক্ একমাত্রা খাওনা কেন রোজ!

কবিরাজের প্রদত্ত জ্ঞানকণা কবিরাজের উপরেই প্রয়োগ করিয়া নিজের প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ কার্ত্তিক কিয়ৎ-ক্ষণ গম্ভীর হইয়া রহিল···

তারপর বলিল,—হবে না! রোজ সেদ্ধ পোড়া খেলে স্বয়ং ব্রহ্মার অম্বল হ'তে বাধ্য···তুমি ত' তুমি!

আয়ুর্ব্বেদের সঙ্গে ব্রহ্মার কিছু সংশ্রব আছে—যথা, চতুর্ম্মুখ (লাল), চতুর্ম্মুখ (কালো)—ইহাই স্মরণ করিয়া শশাঙ্ক ব্রহ্মার উদ্দেশে কপালে যুক্তকর স্পর্শ করিল।

কিছুক্ষণ ভক্তিভরে নিঃশব্দে থাকিবার পর বুকে একটু অম্বলের জ্বালা বাজিয়া শশাঙ্ক পুনরায় বলিল,—অম্বল হচ্ছে।···বলিয়া পানীয়ের অভাবে ঢোক গিলিল।

কার্ত্তিক দৃঢ়স্বরে বলিল—আমি যদি হ'তাম তবে বিয়ে, পেটেণ্ট ওষুধ আর ফৌজদারী একসঙ্গে লাগিয়ে দিতাম···

শশাঙ্ক আর একবার ঢোক গিলিতে যাইতেছিল—চম্‌কিয়া বলিল,—ফৌজদারী ? কার সঙ্গে ?

—কার সঙ্গে আবার কি ? আকাশ থেকে পড়লে যে! কার সঙ্গে! শ্বশুর আর শাশুড়ীর সঙ্গে।···দিতাম দু'জনকে আসামী করে' এক নম্বর ঠুকে'···দু'বৎসর শ্রীঘর।···বলিয়া কার্ত্তিক দুই হাত বাড়াইয়া একজোড়া কাল্পনিক লৌহ কপাট দুই বৎসরের জন্য বন্ধ করিয়া দিল।

শশাঙ্ক ক্ষীণস্বরে বলিল,—একদিন যাঁদের মা বলেছি, বাবা বলেছি—

—আর তাঁরা প্রাণপণে কান মলে' তেল নিংড়েছিল··· তাদের সঙ্গে মাম্‌লা গোলমাল! ছিঃ!···অসহ্য, নয়?··· খেতে দিত ভাল করে' ?

অসহ্য বিদ্রূপের ভঙ্গীতে এই কথাগুলি বলিয়া কার্ত্তিক মহাভৃঙ্গরাজ তৈলের ভাণ্ডের দিকে ক্রুদ্ধনেত্রে চাহিয়া রহিল—যেন ভাঁড়ের গায়ের সবুজ রঙের অক্ষর গুলি তাহার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতেছে।

শ্বশুরালয় অবস্থিত বলিয়া বৃহৎ সহরটাকে হিংস্র ও খলতাপূর্ণ সর্পপুরী কল্পনা করিলেও, অম্বলের জ্বালা এবং ষোল আনা ইচ্ছার প্রভাব শশাঙ্ক কবিরাজের সর্পভীতি অপেক্ষা ক্রমশঃ প্রবলতর হইয়া উঠিল···

তদুপরি শশাঙ্কের পিতা লিখিলেন—

বাবা শশ,···একটি সুন্দরী বয়স্থা এবং রন্ধনকার্য্যে পারদর্শিনী কন্যার সন্ধান পাইয়াছি। তোমার মত পাইলে সেইস্থানে বিবাহ সুস্থির করিতে পারি। তোমার শরীর অসুস্থ লিখিয়াছ। কোথাও বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিতে নিষেধ করিয়াছ; কারণ এখন অর্থাৎ অলঙ্কার-গুলি হস্তগত করিবার পূর্ব্বে বিবাহ করিলে অপর পক্ষের আক্রোশই জন্মিবে এবং অলঙ্কারগুলি আদায় করা আরও কঠিন হইবে লিখিয়াছ; কিন্তু শাস্ত্রবাক্য ইহাই যে শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্। অতএব আমার মতে শরীর সুস্থ রাখিয়া অর্থের দিকে দৃষ্টি দেওয়াই বিধেয়।...

আরো ছিল—

এবারকার কুটুম্ব মনের মত হইবে; কন্যার পিতাও কবিরাজ—তাঁহার ঔষধের ভাণ্ডার প্রচুর···ইত্যাদি অনেক সংবাদ পত্রে ছিল...

কিন্তু কার্ত্তিক ঐ পর্য্যন্ত পড়িয়াই লাফাইতে লাগল···

তারপর অলঙ্কার সম্পর্কে শশাঙ্কের আভ্যন্তরিক চতুরতা স্মরণ করিয়া সে অল্প অল্প হাসিতে লাগিল···

বলিল,—তুমি ডুবে' ডুবে' জল খাও।

শশাঙ্ক বলিল,—যাঃ।

—যাঁদের মা বলেছ, বাবা বলেছ, তাঁদের ক্ষুণ্ণ নাই করলে।

শশাঙ্ক আলস্যের সহিত বলিল,—সে পরের কথা।

বিবাহ হইয়া গেল—

—এবং বিবাহের পরই শশাঙ্কের আর সবুর সহিল না—স্ত্রীকে আনিয়া সে খাঁচায় পুরিল।

শশাঙ্ক কবিরাজের এই ছ'টাকা ভাড়ার প্রবাসগৃহ বড়ই সঙ্কীর্ণ। ছ'ফুট লম্বা আর সাড়ে চার ফুট চওড়া রাস্তার ধারের ঘরটিতে সে ঔষধালয় করিয়াছে; কাচের আলমারী দু'টি, চেয়ার একখানি, বেঞ্চি একখানি লইয়া তাহা সম্পূর্ণাঙ্গ। এই ঘরের সম্মুখে দরজা নাই—শিক্ গাঁথা ফটক আছে। ঔষধালয়ের পরের কক্ষটি শয়ন কক্ষ; কিন্তু ঔষধালয় হইতে ভিতরে মানুষ আর বায়ুর অবাধ যাতায়াতের পথের মুখে আলমারী চাপা দিতে হইয়াছে। শয়নকক্ষের আয়তন পূর্ব্ববৎ। তারপর উঠান্ ঐ ছ'ফুট আর সাড়ে চার ফুট। রান্নাঘর আরো ছোট। উঠানের পর যে প্রাচীর উঠান' হইয়াছে তাহা টপ্‌কাইতে পারে এমন ডানপিটে দুর্লভ।

যাহা হউক, ইহা নিজের বাসা—পূর্ব্ব-পক্ষের পিতৃগৃহ নহে। ইহারই ভিতর স্ত্রীকে আনিয়া শশাঙ্ক মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলিল...কিন্তু সে টের পায় না যে স্থানস্বাচ্ছন্দ্যে অভ্যস্ত তার স্ত্রী ইন্দিরার নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়া আসে।

বন্ধুরা আসে যায়; ক্ষুধাবৃদ্ধির ঔষধ সেবন করে; আর শশাঙ্কের "রন্ধনকার্য্যে পারদর্শিনী" স্ত্রীর হাতের রান্না খাইবার জন্য অশেষ লোলুপতা প্রকাশ করে···

শশাঙ্কের অপর কোনো আপত্তি নাই কেবল একটি আপত্তি; বলে,—ওঁদের চোখের সামনে উৎসব করা কি ঠিক্ হবে এখন!···একদিন যাঁদের মা বলেছি, বাবা বলেছি...

বলিয়া ও-পাড়ার এক কন্যাশোকাভিভূত বৃদ্ধ দম্পতির ছবি মনে পড়িয়া অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া উঠে।

কার্ত্তিক বলে,—তুমি ন্যাকা আর ধূর্ত্ত।

শশাঙ্ক নির্লিপ্তভাবে বলে,—সে কথা হচ্ছে না।

সতীশ বলে,—তুমি উৎসব গোপনে করো'···ঢাক ঢোল না-ই বা বাজল' তাঁদের চোখের সামনে।

শশাঙ্ক বলে,—না, আমি তা' বলি নাই।

নবকুমার বলে,—তাঁরা ত' কন্যার শোকে উৎসব বন্ধ রাখেন নাই। সেদিনও নবান্ন করলেন—ঘটাটা দেখলাম।

কার্ত্তিক নিন্দা করিতে পাইলে ছাড়ে না, বলিল,—বাড়ীতে শুনলাম, থিয়েটার দেখতে গিয়ে সেদিন কি ঝগড়া!···কে নাকি বলেছিল, মেয়েটা ম'লো, কিন্তু চিকিৎসা হল না। তোমার শ্বাশুড়ী ঠাক্‌রুণ তাতে বললেন, সে মেয়ে সতী ছিল; সতীর দেমাক্ নিয়ে সে মরেছে।···তোদের মত ···যাক্—তারপর গোলমালে থিয়েটার ভেঙে যায় দেখে শেষে পুলিশ এসে থামায়।··· যত চক্ষুলজ্জা তোমার! বলিয়া যথোচিত অবজ্ঞাভরে কার্ত্তিক অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া রহিল।

শুনিয়া শশাঙ্ক কবিরাজের ধর্ম্মে মতি দ্বিগুণ বাড়িয়া যায়; বলে,—ভাই, আমার ধর্ম্ম আমার কাছে।

কার্ত্তিক বলে,—হুঁ।

কার্ত্তিক শুনাইতে চাহিলেও শশাঙ্ক সে-কথা কানে তোলে না, বলে,—সে উদার ছিল কত!··· একদিন বল্‌লাম, তোমার হাত খরচের টাকা থেকে একটা টাকা দাও দিকি।···টাকা কেন চাইলাম তা' পর্য্যন্ত জিজ্ঞাসা করলে না—অম্লানবদনে এনে দিলে।··· আমি হেসে টাকা ফেরৎ দিলাম, বল্‌লাম, তোমার মন বুঝলাম। টাকা তুমি রাখো।···শুনে' সে-ও হাস্‌তে লাগল।

সতীশ না হাসিয়া বলিল,—হাসির কথাই বটে।

নবকুমার জিজ্ঞাসা করিল,—ইনি কেমন, উদার না অনুদার?

—ইনিও উদার; এ বলে আমায় দেখ, ও বলে আমায় দেখ।...ইনি বলেন, একদিন যাঁদের মা বলেছ বাবা বলেছ, যাঁদের কন্যাকে ভালবেসেছ তাঁদের সঙ্গে সামান্য কয়েক ভরি সোনার দাবি নিয়ে ঝগড়া করো না অশিক্ষিত লোকের মত।...আমার অদৃষ্টে যদি সোনা পরা থাকে তবে অমনিই পরব—আপনিই হবে। অদৃষ্টে যদি না থাকে তবে ও সোনা পেলেও আমায় গায়ে থাকবে না।···বলিয়া এতবড় শক্তিশালী অদৃষ্ট, অর্থাৎ যে শক্তি হস্তগত স্বর্ণের অঙ্গে থাকা নিবারণ করিতে পারে তাহার উদ্দেশে শশাঙ্ক কপালে হাত তুলিয়া প্রণাম করিল।

—সে যাক্। সত্যিই খাওয়াবে কবে?—রান্নার খ্যাতি আরো ছড়ালে' আরো উমেদার বাড়বে।···বলিয়া

নবকুমার, শশাঙ্ক ব্যতীত আর দুজনের এবং নিজের গা ছুঁইয়া এক দুই করিয়া গণিয়া দেখিল, সম্প্রতি তাহারা মাত্র তিনজন উমেদার।

এম্‌নি কথা হইতে হইতে শশাঙ্ক যেন হঠাৎ ভগবানের বিশেষ কৃপা লাভ করিয়া অভিভূত হইয়া পড়িল—এত শীঘ্রই যে খাওয়াইতে পারিবে সে কল্পনা সে করে নাই···

ভগবানের উদ্দেশে হাত তুলিয়া সে বলিয়া উঠিল,—আচ্ছা, পরশু।

কার্ত্তিক বলিল,—আজ কি বার?

—শুক্রবার।

—কাল?

—শনিবার।

—পরশু?

—রবিবার।

—তা' হলে রবিবারে?

—হুঁ।

পরশু অর্থাৎ রবিবার যথাসময়ে আসিয়া পড়িল।

নিরামিষ রন্ধনেই শশাঙ্কের স্ত্রী বিশেষ পারদর্শিনী বলিয়া মিহি চালের ভাত আর অল্প-স্বল্প মৎস্য এবং নিরামিষ তরকারীর বেশী বেশী আয়োজন হইয়াছে।

বাঃ, দিব্যি, অতি সুন্দর, উপাদেয়, চৎকার, ইত্যাদি তুষ্টি এবং বিস্ময়সূচক ধ্বনির মধ্যে ভোজন সমাপ্ত হইল··· আঁচাইতে বসিয়াও সেই ধ্বনিই চলিতে লাগিল··· আঁচাইবার পর বসিবার ঘরে অর্থাৎ ঔষধালয়ে ফিরিবার পথেও সেই ধ্বনিরই পুনরাবৃত্তি চলিতে চলিতে, সকলের পশ্চাতে ছিল সতীশ সে হঠাৎ মুখ ফিরাইয়া দেখিল, শশাঙ্কের স্ত্রী রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়াইয়া আছে—

মুখ অনাবৃত।

কেহ মুখ ফিরাইয়া চাহিবে ইহা ইন্দিরা ভাবিতে পারে নাই, চোখোচোখি হইতেই সে চক্ষু নত করিল······

চোখ নামাইবার ভঙ্গী চমৎকার—তাহাতে নিষেধের অন্ধকার নামিয়া আসিল না···যেন প্রস্ফুটিত শতদল একটি নিমেষের জন্য দলগুলি ঈষৎ সঙ্কুচিত করিল মাত্র—

পূর্ব্বগামীর পায়ের সঙ্গে নিজের পায়ের ঠোক্কর লাগিবার ভয়ে সতীশ পরক্ষণেই সম্মুখের দিকে চাহিয়া চলিতে লাগিল···

আরাম করিতে আসনে বসিয়া নবকুমার বলিল,—খেলাম বটে, গুরু ভোজনই হল; কিন্তু এখন যেন কেমন একটা অরুচি লাগছে। তোমাদের রুচি কেমন তা' জানিনে।

শুনিয়া শশাঙ্ক মরমে মরিয়া গেল; বলিল,—কি ত্রুটি হয়েছে, ভাই? অপরিষ্কার কিছু ছিল কি?

—তুমিই একটা মস্ত অপরিষ্কার! এখন দেখছি, হোটেলে খেয়ে এলাম। হোটেলের রসুয়ে ঠাকুর রাঁধে ভাল—ব্যস, এই পর্য্যন্ত!...অর্থাৎ কথার ভাবার্থ এই যে, তুমি ঢ্যাঙা মিনসে কেন পরিবেষন করলে?

এই কথায় শশাঙ্ক হো হো করিয়া হাসিতে লাগিল... বলিল,—তা' আমি বলি নাই ভেবেছ? নিশ্চয় বলেছি। কিন্তু সে বল্‌লে, আমি দিশে পাব না, হাত কাঁপবে।

—আচ্ছা, আর একদিন। বলিয়া আহারের গুরুত্ব বশতঃ নবকুমার চক্ষু নিমীলিত করিয়া রহিল···

—আমি খেয়ে আসি। তোমরা ততক্ষণ—

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, বিশ্রাম করি। তুমি খেলে' পর ওঁরা খাবেন। ঢের বেলা হয়ে গেছে—যাও।···বলিয়া কার্ত্তিকও চক্ষু মুদ্রিত করিল।

নিস্তব্ধ আবহাওয়ায় শুইয়া বসিয়া ওরা কি ভাবিতে লাগিল তাহা ওরাই জানে; কিন্তু সতীশের মুদ্রিত চক্ষুর সম্মুখে বিরাজ করিতে লাগিল, শশাঙ্ক কবিরাজের স্ত্রী ইন্দিরা—ঠিকই যে শশাঙ্ক কবিরাজের স্ত্রীরূপে তাহা নহে, একটী নারীরূপে...

তার মনে হইতে লাগিল, এ নারী রাঁধে না, খাওয়ায় না, শয্যারচনা করে না, মালা গাঁথে না, বাতায়নে বসে না, এ কেবল মানুষকে রসিক করিয়া তোলে···এ নিকটে নাই, কিন্তু ঘিরিয়া আছে...

এ পথ দেয়, কিন্তু যে জ্যোতিঃ পরিমণ্ডলের সৃষ্টি এ করিয়াছে তাহার বাহিরে যাইবার সাধ্য মানুষের নাই··· যদি কেহ যায় সে ক্ষিপ্তের মত ফিরিয়া আসে···ইহাকে অতিক্রম করিয়া মানুষ নিজের সত্তা সহ্য করিতে পারে

না···ইহার বাহিরে মানুষের প্রসার বন্ধ, দৃষ্টি অন্ধ, নিঃশ্বাস অচল, স্নায়ু নিষ্ক্রিয়, কল্পনা মূক, আনন্দ মূর্চ্ছিত···

এই অক্ষয়যৌবনা মানুষকে জন্ম হইতে জন্মান্তরে আকর্ষণ করিয়া আনে···ইহাকে বাদ দিয়া মানুষ স্বর্গকে কল্পনা করিতে পারে নাই...ইহাকে অন্তরালে রাখিয়া কবির কাব্যরচনা সার্থক হইতে পারে না...

বিরহী যক্ষের প্রিয়া এ, কবির কাব্যলক্ষ্মী মানসী এ; পুরুষের বেদনা ইহারই উদ্দেশে চিরদিন নিবেদিত হইতেছে ...মিলনে বিরহে ইহাকেই কেন্দ্র করিয়া জগতপ্রাণ নিয়ত নৃত্য করিতেছে···

এ কেবল বলিতেছে, আমায় আবিষ্কার করো···

শ্রীর এ সহগামিনী—ভাব-বৈকুণ্ঠে ইহার গতি···

ভাবিতে ভাবিতে ভাতের নেশায় সতীশ কখন তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল; শশাঙ্কর ডাকে চম্‌কিয়া জাগিয়া দেখিল, আরো পান আসিয়াছে—দুটি পান গালে ফেলিয়া সে প্রস্থান করিল।

তিনমাস অতীত হইয়াছে।

সতীশের কাব্যামোদ হুহু শব্দে চলিতেছে—

সে যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছে স্থূল গদ্যে তাহার মর্ম্ম এই যে, অগ্নি অনাবিষ্কৃতা এবং বহুবন্দিতা তুমি একদিকে চিন্ময়ী অপরদিকে তীব্র চেতনাময়ী... তুমি নিত্যাভিসারিকা, তুমি বহু উপভোগ্যা, কিন্তু অনুচ্ছিষ্টা...অতএব তুমি এস···বৃদ্ধ বাল্মীকি তোমাকে যেরূপে পাইয়াছিল, তোমার যে-রূপের তরঙ্গ চির-উত্তাল, সেই-রূপে তুমি আমার যৌবনের দুয়ারে অতিথি হইয়া এস।···

এদিকে কার্ত্তিকের মারফত্‌ কয়েকটি কাবুলী রোগী হাতে আসায় শশাঙ্ক কবিরাজের লক্ষ্মীশ্রী এবং সাইন-বোর্ড উজ্জ্বলতর হইয়াছে; শিল্কের পাঞ্জাবী গায়ে দিয়া সে এখন ঔষধালয়ে "বাহির হয়," এবং হামালদিস্তায় গাছের ছাল কুটিবার জন্য একটি ভৃত্য নিযুক্ত করিয়াছে।

হামিদ খাঁ কাবুলী পূর্ব্বে বলিত, ডাক্তারেরা চোর; কিন্তু তাহার খুক্‌ খুক্‌ কাসি, পাঁজরে ব্যথা এবং তৎসহ স্বরভঙ্গ সাত দিনে বার আনা ভাল হইয়া যাওয়ায় সে-বুলি সে ত্যাগ করিয়া আরো কয়েকটিকে আনিয়া জুটাইয়া দিয়াছে। তবে চিকিৎসা সুরু করিবার পূর্ব্বে কার্ত্তিক আর কবিরাজ উভয়ে মিলিয়া হামিদ খাঁর সাইকেল আর লাঠি কাড়িয়া রাখিয়াছিল...হ্যাণ্ডনোটের ছাপান' খাতাখানাও কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু পারে নাই। আর, চিকিৎসাকালে কার্ত্তিক ঔষধ মাড়িয়া তাহাকে সেবন করাইয়া আসিত।

ওরা দেয় ভাল—এক রকম ঢালিয়াই দেয়; তবু টাকায় দু'-আনা সুদের অধিকাংশ কবিরাজ গ্রাস করিতেছে দেখিয়া খাঁর রাগ হয়—যা' তা' বলে—

শশাঙ্ক মনে মনে বলে, জানোয়ার দেশটাকে ফাঁপা করে দিলে'...মুখে বলে,—তোমার স্বরভঙ্গ মেদজ হ'লে আর বাঁচতে না; পিত্তজ বলেই রক্ষে।···চেঁচিও না বেশী বুঝলে? বলিয়া শশাঙ্ক হাসে; যেন তাহার হাসি দেখিয়া হামিদের রাগ পড়িবার কথা।

হামিদ বলে,—চেঁচাবে না তবে সুদ শালা বাঙালীকে ছেড়ে দেবে?

যাহা হউক, সেদিন হামিদ প্রভৃতি কয়েকটি দুর্দ্ধর্ষ খাঁকে বিদায় করিয়া শশাঙ্ক কবিরাজ ধর্ম্মপরায়ণ হিন্দু হিসাবে ব্যবসায়ের প্রতি লক্ষ্মীর দৃষ্টি আকর্ষণকল্পে ধূপদানীতে টিকার আগুন করিল; চৌকাঠে আর ক্যাস্‌-বাক্সের উপর কূপোদকের ছিটা দিল; ক্যাসবাক্সের ডালা তুলিয়া ভিতরে ধূপগন্ধী ধোঁয়া দিল···তারপরে প্রজ্জ্বলিত লণ্ঠন এবং বিবর্ণ ক্যাস্‌বাক্সের সম্মুখে চক্ষু বুজিয়া বসিয়া উপবীত ধারণ করতঃ ধ্যানক্রিয়া সমাপনপূর্ব্বক যখন সে মুখে বলিতেছে ওঁ, ঠিক তখনই সতীশ, নবকুমার আর কার্ত্তক আসিয়া উঠিল—

ক্যাস্‌বাক্সের উপর কপালের স্পর্শ রাখিয়া দিয়া স্তিমিতনেত্রে শশাঙ্ক বলিল,—বস'।

—বসি। বলিয়া কার্ত্তিক বসিল...তারপর শাসাইল, —মহাদেবের অভিসম্পাৎ লাগ্‌বে কব্‌রেজ।

আয়ুর্ব্বেদের প্রথমতম সৃষ্টিকর্ত্তা শিবের নামটি তখন শশাঙ্কের অম্বলের জ্বালাযুক্ত বুকের ভিতর বাজিতেছিল— পবিত্র সন্ধ্যাবেলায় দেবাদিদেবের উদ্দেশে প্রকাশ্য প্রণাম করিয়া বলিল,—শিবরোং···

তারপর বলিল,—না, না···

কার্ত্তিক বলিল,—অত নিরীহ তুমি নও হে কব্‌রেজ দেবাদিদেবের মোদকে তুমি ফাঁকি চালাচ্ছ।…কই, তেমন ফল হচ্ছে কই ?

সতীশ বলিল,—মাত্রা ডবল্ করো।

কার্ত্তিক হাসিল—

এবং বলা বাহুল্য যে, হাস্যপূর্ব্বক মাত্রা ডবল করা ছাড়া কবিরাজের উপায় ছিল না।

গুলি উদরস্থ করিয়া নবকুমার বলিল,—বৌদি নাকি মাংস রাঁধতে শিখেছেন ভাল ?…শশাঙ্ককে প্রশ্ন করিয়া সে কার্ত্তিকের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

শশাঙ্ক উৎফুল্ল হইয়া হাসিতে লাগিল, বলিল,—আমি ত' বৃথা-মাংস খাইনে…বাপের বাড়ীতেও মাংসের সেরূপ চল্ নেই।

—তা না হোক্ ; এখানে এসে যদি শিখে যান্ তবে ভাইয়েরা যশ করবে…বিদ্যেটা ত কম নয়!

—সময় বড় কম। তা ছাড়া—

—কেবল মুখো সিদ্ধ করাচ্ছ বুঝি ? কত জীবন যে এমনি করে নষ্ট হচ্ছে কে তার হিসাব রাখে!

—তা কিছু কিছু কর্‌তে হচ্ছে ; তাতে আলস্য নাই।…বাপ কবরেজ, আমিও তাই ; নূতন কিছু নয়।

—তবে এখন থাক…কিছুদিন সময় দিলাম ; ইতিমধ্যে শিখিয়ে নাও…অন্নপ্রাশনেই খাওয়া যাবে।

শশাঙ্ক কল্ কল্ করিয়া বলিয়া উঠিল,—আরে, ভাই, তাই বুঝি ঘটে…বমি করছে হেঁই হেঁই করে…

কার্ত্তিক লাফাইয়া উঠিল,—এরই মধ্যে ? তারপর কোলাহল চলিতে লাগিল…কিন্তু সতীশের আবহমান-কালের মানসীর সঙ্গে যে নিস্তব্ধ অন্তরঙ্গতা জন্মিয়াছিল তাহা যেন খাঁড়ার ঘায়ে দ্বিখণ্ডিত হইয়া গেল…বিন্ধ্য-গিরি যেমন সূর্য্যের পথরোধ করিয়া শিরোত্তলন করিয়াছিল তেমনই কঠিন একটি প্রাচীর যেন তাহার ভাবস্রোতের পথ একেবারে রুদ্ধ করিয়া খাড়া হইয়া উঠিল…

অন্ধকার একটি মার্গ দিয়া সে যেন কক্ষচ্যুত গ্রহের মত অন্তরীক্ষ ত্যাগ করিয়া মৃত্তিকার দিকে পড়িতে লাগিল…

তাহার মনে হইল, এ সে নয়।

রূপকথা

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এল

চায়ের দোকানের অভ্যন্তর। ঘরটি বেশ বড়। কয়েকটি মার্ব্বেলটপ্ টেবিল ও তদুপযোগী চেয়ার ঘরের মধ্যে ইতস্ততঃ সাজানো। ঘরের অপর প্রান্তে একটি রান্নাঘর খোলা দ্বারপথে কিয়দংশ দেখা যাইতেছে। রান্নাঘরের দেওয়ালে টাঙানো সারি সারি সসপ্যান ও কাঠের টেবিলের উপর কেট্‌লি পিরিচ পেয়ালা প্লেট ইত্যাদি আংশিকভাবে দৃষ্টি গোচর হইতেছে।

দোকানের নাম 'ত্রিবেণী-সঙ্গম'। কলিকাতার শিক্ষিত যুবক-যুবতীদের চা ও অনুরূপ খাদ্যপানীয় সরবরাহ করিয়া ইহার সর্ব্বজনপ্রিয় স্বত্বাধিকারী অল্পকালের মধ্যেই প্রভূত যশ ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। ত্রিবেণী-সঙ্গমের একটি বিশেষ অভিজাত্য আছে—সকল দ্রব্যেরই দাম প্রায় ডবল। সুতরাং সাধারণ চা-খারদের পক্ষে এস্থান অনধিগম্য, বিত্তবান তরুণ-তরুণীরাই এই 'ত্রিবেণী-সঙ্গমে' সঙ্গত হইয়া থাকেন।

বেলা দু'টা বাজিয়া গিয়াছে—দোকানে খদ্দের নাই। দোকানের এবং সেই সঙ্গে একটি বিরাট উদরের অধিকারী বেণীখুড়ো ওরফে বেণীমাধব চক্রবর্ত্তী একটি লম্বা টেবিলের উপর শয়ন করিয়া পিরাণ ও কাপড়ের ফাঁকে নাভিমণ্ডল উদ্ঘাটিত করিয়া নিদ্রা যাইতেছেন। তাঁহার নাসিকার উদাত্ত-অনুদাত্ত স্বর একটানা করাতের মত ঘরের স্তব্ধতাকে কর্ত্তন করিতেছে।

দোকানের এক মাত্র ভৃত্য বিদ্যাধর—একাধারে পাচক এবং পরিবেশক—অন্য একটা টেবিলের উপর পা তুলিয়া দিয়া, চেয়ারের পিছনের পায়া যুগলের উপর দেহের সমস্ত ভার অর্পণ করিয়া দিয়া মৃদুমন্দ দুলিতেছে ও একমনে একটি বহুব্যবহারে মলিন ও ছিন্নপ্রায় পত্রপাঠ করিতেছে। বিদ্যাধর যুবাবয়স্ক—দেখিতে সুশ্রী, তাহার গায়ে সস্তা ছিটের পিরাণ, কাপড়ের কোঁচার অংশটা দুপাট করিয়া কোমরে জড়ানো।

বিদ্যাধর চিঠিখানার আঘ্রাণ গ্রহণ করিয়া বিড়্ বিড়্ করিয়া বলিল,—গন্ধ ছিল এখন ডুবে গেছে (পত্র খুলিয়া পাঠ) বন্ধুবর! ইঃ—যেন বন্ধুবরের বুক ফেটে যাচ্ছিল। বন্ধুবর না লিখে শুধু বর লিখলেই ত ল্যাটা চুকে যেত। (দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া) না, তা লিখবে কেমন করে। সে ত আর আমি নই, সে যে আর একজন। লিকলিকে চেহারা, ঘাড়ছাঁটা চুল, কোট সোয়েটার পরা, মেয়েলি মেয়েলি গড়ন—দেখলেই জুতো পেটা করতে ইচ্ছে করে। মুখখানা পেছন থেকে দেখতে পেলুম না। দেখিনি ভালই হয়েছে! ঘাড়ের চুলগুলো যেন মুর্গীর বাচ্চার মত, মুখখানাও নিশ্চয় প্যাঁচার বাচ্চার মত হবে।—দূর হোক গে! (পত্র পাঠ) আমি স্কুলের শিক্ষয়িত্রী—ষাট টাকা মাহিনা পাই। তার উপর সম্পূর্ণ আত্মীয়-স্বজন হীনা—বংশ মর্য্যাদাও কিছু নাই। যিনি আমার স্বামী হইবেন তাঁহাকে দিবার মত আমার কিছুই নাই। রূপ—ক'দিনের? গুণও নাই। তাই স্থির করিয়াছি ইহজীবনে বিবাহ করিব না। নিঃস্ব ভাবে, রিক্ত হস্তে কাহারো গলগ্রহ হইতে চাহি না। ছোট ছোট মেয়েদের গুরুমা হইয়াই আমার জীবন কাটাইতে হইবে। তবে যদি দৈবক্রমে কোনদিন অর্থশালিনী হই, তবেই যাঁহাকে ভালবাসি তাঁহার চরণে নিজেকে উৎসর্গ করিয়া ধন্য হইতে পারিব।—ইতি

বিনীতা

মঞ্জুষা—

—হুঁ! এতদিনে তাঁহার চরণে নিজেকে উৎসর্গ করা হয়ে গিয়েছে। এখন ত আর ষাট্‌টাকা মাইনের গুরুমা'টি নয়—, দূর! এই ত মোটে তিনমাস! কিন্তু আমার মনে হচ্ছে যেন তিনশ বছর!—চুলোয় যাক গে, আমি ত বেশ আছি। নিজে রোজগার করে

খাচ্ছি, কোনো ভাবনা নেই। বেঁচে থাক বেণীখুড়ো আর তার রেস্তোরাঁ! (কিছুক্ষণ নিদ্রিত বেণীকে নিরীক্ষণ করিয়া) খুড়োর নাকে রসুনচৌকি বাজছে। ওর পেটে বোধ হয় একটা ব্যাগপাইপ্ লুকোনো আছে—ঘুমলেই বাজতে আরম্ভ করে। (সস্নেহে) খুড়োর আমার ভেতরে-বাইরে সমান—পেটেও ব্যাগপাইপ্ প্রাণেও ব্যাগপাইপ্! অথচ সারাটা জীবন হোটেল করে কাটিয়ে দিলে। এই দুনিয়া! (কিছুক্ষণ চিন্তামগ্ন থাকিয়া) কোথায় দিল্লী আর কোথায় কলকাতা! খুব লম্বা পাড়ি জমানো গেছে, এখানে চেনা লোকের সঙ্গে খামকা মাথা ঠোকাঠুকি হবার ভয় নেই। উপরন্তু যে রকম গোঁফ আর জুলপি গজানো গেছে, দেখা হোলেও কেউ সহজে চিনতে পারবে না। তার ওপর আবার গোদের ওপর বিষ-ফোঁড়া আছে—ইউনিফর্ম্ম। ছদ্মবেশ দিব্যি পাকা রকম হয়েছে। (চিঠিখানা মুড়িতে মুড়িতে) আমি ত খাসা আছি। কিন্তু আর কিছু না, মঞ্জুষারাণী কেমন আছেন, কি করচেন তাই জানতে মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয়। হয়ত সে বেটা মাতাল—আমার টাকাগুলো নাহক্ শুঁড়ির বাড়ী পাঠাচ্ছে—ওকেও হয়ত যন্ত্রণা দিচ্ছে! যাক গে। যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল, আমি আর কি করব। মাতালের শ্রীচরণে যখন নিজেকে উৎসর্গ করেছেন তখন মাঝে মাঝে লাথি-ঝাটা খেতে হবে বৈ কি! টাকাগুলো হয়ত এরমধ্যে সক ফুঁকে দিয়েছে,—মঞ্জুষারাণী আমার যে গুরুমা সেই গুরুমা। না, অতটা পারব না। দুলাখ টাকা তিন মাসের মধ্যে উড়িয়ে দেওয়া সহজ মাতালের কর্ম্ম নয়—

দেয়ালে টাঙানো জাপানী ঘড়িতে ঠং করিয়া আড়াইটা বাজিতেই বেণীমাধবের নাসিকাধ্বনি অর্দ্ধপথে হোঁচট খাইয়া থামিয়া গেল। চক্ষু রগড়াইতে রগড়াইতে উঠিয়া বসিয়া দিগন্তপ্রসারী একটি হাই তুলিয়া বলিলেন,—বিত্তে ওঠ বাবা ওঠ, আর দেরী করিসনে, আড়াইটা বেজে গেল—উননে আগুন দে। এখুনি ছোঁড়াছুঁড়িরা—কিবলে ভাল—ভদ্রলোক আর ভদ্রমহিলারা আসতে আরম্ভ করবে।

বিদ্যা।—তার এখনো ঢের দেরী আছে খুড়ো।

বেণী।—না না তুই ওঠ, মাণিক আমার, উননে আগুন দিয়ে চায়ের জলটা চড়িয়ে দে।—আমার একটু চোখ লেগে গিছল। বলি হ্যাঁরে, আইস্‌ক্রীমটা ঠিক করেছিস ত? কাটলেটের মাছ আর মাংস দিয়ে গেছে তো

বিদ্যা।—হ্যাঁ—

বেণী।—তাহলে আর আলিস্যি করিস নে বাবা আমার, উঠে পড়। এই বেলা গোটাকতক ভেজে রাখ তখন গরম করে দিলেই হবে। নইলে ভিড়ের সময় জুগিয়ে উঠতে পারবি নে। ঢাকাই পরটা-গুলো—?

বিদ্যা।—যাচ্চি খুড়ো, অত তাড়া কিসের! আজ তোমার বেশী খদ্দের হবেনা!

বেণী।—(বিরক্ত হইয়া) ঐ তোর ভারি দোষ বিদ্যা, বড় কথা কাটিস। হোটেল করে করে আমার দাড়ি পেকে গেল, তুই আমাকে শেখাতে এসেছিস আজ খদ্দের হবে কিনা। বলি, আজ শনিবার সেটা খেয়াল আছে?

বিদ্যা—আছে। কিন্তু আজ ব্যারাকপুরে রেস আছে সেটাও যে ভুলতে পারছি না খুড়ো।

বেণী।—হাত্তোর রেসের নিকুচি করেছে—রোজ রেস রোজ রেস!—আচ্ছা রেসের দিন ছোঁড়াছুঁড়িরা আসেনা কেন বলতে পারিস?

বিদ্যা।—রেসে হেরে গিয়ে ভয়ানক মনমরা হয়ে পড়ে কিনা খুড়ো তাই আসে না। তখন আমার কাটলেটও আর মুখে রোচেনা।

বেণী।—ভাগ্যিস মনে করিয়ে দিলি। তা মাছ মাংস কম করে নিয়েছিস ত?

বিদ্যা।—হ্যাঁ—সেজন্য ভেবোনি—

বেণী।—(উঠিয়া আসিয়া বিদ্যাধরের চিবুক স্পর্শ করতঃ চুম্বন করিয়া) ভ্যালা মোর বাপ রে। সোনার চাঁদ ছেলে। তোর কাছে মিথ্যে বলব না বিত্তে, হোটেল আমি ঢের করেছি কিন্তু কপাল খুলল আমার তোর পয়ে। আজকাল তোর তৈরী কাটলেট আর

ঢাকাই পরটা খেতে ছোঁড়াছুঁড়ির ভিড় দেখি আর ভাবি, এমন দিনও আমার গেছে যখন কারখানার উড়ে মিস্তিরিদের ভাত রেঁধে খাইয়ে আমার দিন কেটেছে। তখন দিনান্তে পাঁচ গণ্ডা পয়সা আমার বাঁচত। ঝাড়া-হাত-পা রাঁড় মনিষ্যি বলেই পেরেছিলুম, নইলে মাগছেলে নিয়ে ন্যাঙ্গাল্ হয়ে পড়লে কি পারতুম, না এই বুড়ো বয়সে তোর কল্যাণে ছুটো পয়সার মুখ দেখতে পেতুম ?

বিদ্যা। [পা নামাইয়া বসিয়া] তবেই বল খুড়ো, আমি না হলে তোমার কিছুই হত না।

বেণী। কিছু না রে বাবা কিছুই না। এই যে সব ভাল ভাল চেয়ার, টেবিল, আসবাব, এত টাকা ভাড়া দিয়ে সহরের মাঝখানে দোকান এসব স্বপ্নই রয়ে যেত। 'ত্রিবেণী-সঙ্গম' কেবল তোর পয়ে।

বিদ্যা। খুড়ো, এই জন্যেই ত তোমায় এত ভালবাসি। অন্য মনিব হলে আমাকেই বোঝাতে চেষ্টা করত যে তার পয়ে আমার কপাল খুলেছে। ভুলেও মানত না যে আমার কোনো কৃতিত্ব আছে পাছে আমার দেমাক বেড়ে যায়, বেশী মাইনে চেয়ে বসি।—

বেণী। দূর পাগল! ভুল বোঝালে কি ভবি ভোলে রে? তোর আমার কাছে যতদিন থাকবার ততদিন থাকবি, তারপর যেদিন কাজ ফুরুবে সেদিন কারণে-অকারণে আপনিই চলে যাবি। তোকে আমি ধরেও আনিনি ধরে রাখতেও পারব না। কেউ কি তা পারে? ছুনিয়ায় এই নিয়ম।

বিদ্যা। রস খুড়ো, তোমার দর্শনশাস্ত্র শুনবো। এইবার চট্ করে একটা উননে আগুন দিয়ে আসি।

বিদ্যাধর প্রস্থান করিল। ঘরের এককোণে একটি কাঠের ছোট টেবিল ও টুল রাখা ছিল; টেবিলের উপর বেণীমাধবের ক্যাসবাক্স। এইখানে বসিয়া তিনি খদ্দেরের নিকট পয়সা গ্রহণ করেন। কাছ হইতে চাবি বাহির করিয়া বেণী ক্যাসবাক্স খুলিয়া একটি পুস্তক বাহির করিলেন, তারপর টুলের উপর বসিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন।

খেলো হুঁকার উপর কলিকা বসাইয়া ফুঁ দিতে দিতে বিদ্যাধর প্রবেশ করিল।

বিদ্যা। [হুঁকা বেণীমাধবকে দিয়া] এই নাও টানো। আবার সেই 'শিহরণ-সিরিজ' বার করেছ? এটা কি দখি—ওঃ একেবারে গুদামে গুমখুন। [উচ্চহাস্য] আচ্ছা খুড়ো, এগুলো পড়তে তোমার ভাল লাগে ?

বেণী। তা লাগে বাবা, মিথ্যে বলব না। তোর মত পেটে বিদ্যে ত নেই, ইংরেজী খবরের কাগজটা পর্য্যন্ত পড়তে পারি না। তাই এই সব বইয়ে বিলিতী মেমসাহেবদের কেচ্ছা পড়ে একটু আনন্দ পাই।

বিদ্যা। আমার পেটে বিদ্যে আছে তুমি জানলে কোত্থেকে খুড়ো ?

বেণী। জানিরে বাবা জানি, ওকি আর চেপে রাখা যায়। আজকাল লেখাপড়া শিখে গেরস্তর ছেলেদের এই দুর্দ্দশাই ত হয়েছে। আমি কত সোনার চাঁদ ছেলেকে রাস্তায় রাস্তায় আলুর চপ., ক্যাংড়া, ফুলুরী ফেরী করতে দেখেছি। লজ্জায় ভদ্দরলোকের ছেলে বলে পরিচয় দিতে চায় না, হাঁটু পর্য্যন্ত কাপড় তুলে পিরাণ গায়ে দিয়ে ছোটলোক সেজে বেড়ায়। তুইও সেই দলের। কিন্তু তুই এত লেখা-পড়া শিখেও এমন রাঁধতে শিখলি কোত্থেকে সেইটেই বুঝতে পারি না।

বিদ্যা। তা জাননা খুড়ো? ভারত বিখ্যাত পীর বাবুর্চির নাম শোনো নি কখনো? দেড়শ' টাকা তাঁর মাইনে, রাজা-রাজড়া তাঁর হাতের হোসেনী কাবাব খাবার জন্যে লালায়িত। এ হেন পীর মিঞা হচ্ছেন আমার গুরু। ছুটী বছর তাঁকে মাইনে দিয়ে রেখে—ওর নাম কি তাঁর পায়ের কাছে বসে রান্না শিখেছি। রান্নার এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা তিনি—সুক্তুনি থেকে পেঁয়াজের পরমান্ন পর্য্যন্ত সব রান্নার হুনরী—সকাল বেলা তাঁর তার নাম স্মরণ করলেও পুণ্য হয়। ভাগ্যে তাঁর কাছে শিখেছিলুম, নইলে আজ আমার কি দুর্দ্দশাই না হ'ত খুড়ো?

বেণী। আচ্ছা বিদ্যে, তোকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। এই তিনমাস আমার কাছে আছিস, একদিনের তরেও ত তোকে বাড়ী যেতে দেখলুম না? তোর

বাড়ী কোথায়—বাপ, মা, ভাইবোন সব আছে ত! তাদের একবার খোঁজখবর নিস না কেন? খালি দেখতে পাই, মাঝে মাঝে একখানা চিঠি বার করে বিড় বিড় করে পড়িস। বলি, বাড়ী থেকে ঝগড়া-ঝাটি করে পালিয়ে আসিস্ নি ত?

বিদ্যা। ওসব কথা ছাড়ান দাও খুড়ো। আমার তিনকুলে কেউ নেই, তোমার মত ঝাড়া হাত-পা লোক। তাই ত তোমার সঙ্গে জুটে গেছি। রতনেই রতন চেনে কিনা। তুমি এখন তোমার গুদোমে গুমথুন আরম্ভ কর, আমি একবার ওদিকটা দেখি। এখনি হয়ত লোক এসে পড়বে।

বিদ্যাধর রান্নাঘরের ভিতর প্রস্থান করিল। বেণী হুঁকা টানিতে টানিতে পুস্তকে মনোনিবেশ করিলেন।

কিছুক্ষণ পরে বিদ্যাধর ফিরিয়া আসিয়া হঠাৎ বলিল, —খুড়ো, একটা গল্প শুনবে? তোমার শিহরণ-সিরিজের চেয়ে ভাল গল্প।

বেণী। [বই মুড়িয়া] বলবি? আচ্ছা তবে তাই বল্। অনেক ভাল ভাল ইংরিজী বই পড়েছিস সেই থেকে একটা বল শুনি। এমন গল্প বলিস বিদ্যে যেন শুনতে শুনতে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে।

বিদ্যা। আচ্ছা বেশ। [গলা সাফ করিয়া] এক রাজপুত্তুর ছিল—অর্থাৎ কিনা—

বেণী। [করুণ ভাবে] ওরে, এ যে রূপকথা আরম্ভ করলি বিদ্যে? আমার কি আর রাজপুত্তুর, কোটাল-পুত্তুরের গল্প শোনবার বয়স আছে!

বিদ্যা। রূপকথা নয়, তবে কতকটা আরব্য উপন্যাসের মত বটে। আচ্ছা রাজপুত্তুরকে না হয় ছেড়ে দিলুম,—ধর এক মস্ত বড় মানুষের ছেলে—

বেণী। নাম কি?

বিদ্যা। [মাথা চুলকাইয়া] নাম? মনে কর—রণেন্দ্র সিংহ, কেমন, জমকালো নাম কিনা? তোমার 'গুদামে গুমথুনে' এমন নাম আছে?

বেণী। না,—তারপর বল—

বিদ্যা। কি আশ্চর্য্য খুড়ো, এতদিন লক্ষ্য করিনি! কিন্তু আমাদের সাধারণ বাঙালীর ঘরে সময় সময় এমন এক একটা নাম বেরিয়ে পড়ে যা 'দুর্গেশনন্দিনী' 'জীবন-প্রভাত' খুঁজলেও পাওয়া যায় না। 'রণেন্দ্র সিংহ' শুনলে মনে হয় না যে নামটা একখানা আনকোরা ঐতিহাসিক উপন্যাস থেকে পেড়ে এনেছে? সে যাক, এখন গল্পটা শোনো। এই রণেন্দ্র সিংহের অনেক টাকা; বাপ-মা ভাই-বোন কেউ নেই। বয়স পঁচিশ ছাব্বিশ—চেহারা মোটের ওপর মন্দ নয়, অন্ততঃ ছেলেপুলে অন্ধকারে দেখলে ডরিয়ে ওঠে না। তার বিয়ে হয়নি, কারণ বাপ বিয়ে দেবার আগেই মারা গেছেন। রাজধানীতে সাত মহল বাড়ীতে একলা থাকে—কারুর তোয়াক্কা রাখে না। যেন একটি ছোটখাট নবাব।

এ হেন রণেন্দ্র সিংহ একদিন এক মেয়ে ইস্কুলের গুরুমা'র সঙ্গে—থুড়ি—এক ঘুঁটে কুড়ুনী মেয়ের সঙ্গে প্রেমে পড়ে গেল। ঘুঁটে কুড়ুনী মেয়ে দেখতে ঠিক একটি রজনীগন্ধার কুঁড়ির মত। বলি, রজনীগন্ধার কুঁড়ি দেখেছ ত?

বেণী। দেখেছি রে বাপু, হগ সাহেবের বাজারে ফুলের দোকানে। তুই বলে যা না।

বিদ্যে। রণেন্দ্র সিংহ সেই রজনীগন্ধার কুঁড়ির প্রেমে হাবুডুবু খেতে লাগল। শেষে তার এমন অবস্থা হল, যে মেয়ে ইস্কুল না হয়ে যদি ছেলে ইস্কুল হত তাহলে পোড়ো সেজে ইস্কুলে ভর্ত্তি হয়ে পড়তেও সে দ্বিধা করত না—ঐঃ যা! কি বলতে কি বলে ফেল্‌ছি খুড়ো আমার মাথাটা গুলিয়ে গেছে। ঘুঁটে-কুড়ুনী মেয়ের কথা বলতে কেবলি গুরুমা'র কথা বলে ফেলেছি—

বেণী। তা হোক, আমার বুঝতে একটুও কষ্ট হচ্ছে না। তুই বলে যা।

বিদ্যে। যা হোক, অনেক বুদ্ধি খেলিয়ে রণেন্দ্র সিংহ শেষে মেয়েটির সঙ্গে ভাব করলে। মেয়েটির নাম—ধর, মঞ্জুষা, দুজনের মধ্যে বেশ ভাব হল। ক্রমে রোজ সন্ধ্যাবেলা মেয়েটির কুঁড়ে ঘরে দুজনের দেখা হতে লাগল। হাসি-গল্প গান চা, চপ, কাট্‌লেটের ভিতর দিয়ে বন্ধুত্ব বেশ প্রগাঢ় হয়ে উঠ্‌ল। দূর থেকে দেখেই রণেন্দ্র সিংহ যাকে ভালবেসেছিল, এত কাছে পেয়ে তার প্রেমে একেবারে ডুবে গেল। নিজের বলে তার আর কিছু রইল না।

এমনি ভাবে মাস দুই কাটবার পর রণেন্দ্র সিংহ একদিন মঞ্জুষার কাছে বিয়ের প্রস্তাব করলে। মঞ্জুষা রাণীর মুখখানি লাল হয়ে উঠল,—এক মুহূর্ত্তে রজনী-গন্ধার কুঁড়ি ডালিম ফুলের কুঁড়িতে পরিণত হল। সে কিছুক্ষণ মাথা হেঁট করে থেকে বললে—না। রণেন্দ্র সিংহের বুকের রক্ত থেমে গেল, সে জিজ্ঞাসা করলে,—কারণ জানতে পারি কি?

মঞ্জুষা বললে,—চিঠিতে জানাব।

খালি বুক নিয়ে রণেন্দ্র সিংহ তার সাতমহল বাড়ীতে ফিরে এল।

পরদিন মঞ্জুষার চিঠি এল। সে লিখেছে—সে গরীব মেয়ে, বড় মানুষের ছেলেকে বিয়ে করতে পারবে না। এমন কি বিয়ে করতেই তার ঘোর আপত্তি। তবে যদি ভগবান কখনো তাকে টাকা দেন তখন সে যাকে ভালবাসে তাকে বিয়ে করবে—নচেৎ বিয়ে-থাওয়ার কথা ঐ পর্য্যন্ত!

চিঠি পড়ে আহ্লাদে রণেন্দ্র সিংহের বুক নেচে উঠল; সে তখনি ছুটল উকিলের বাড়ী। উকিলকে দিয়ে এক দলিল তৈরী করালে। নিজের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি নগদ টাকাকড়ি যা ছিল সব ঐ ঘুঁটে কুড়ুনী মেয়ের নামে দানপত্র করে দিলে। তারপর দানপত্র হাতে করে সন্ধ্যে বেলা মেয়েটির বাড়ী গিয়ে হাজির হল।

বাড়ীতে ঢোকবার আগেই রণেন্দ্র সিংহ দেখতে পেলে, দোতলার জানলার সামনে দাঁড়িয়ে মঞ্জুষাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে কে একজন তাকে চুমু খাচ্ছে। জানলা দিয়ে তাদের কোমর পর্য্যন্ত দেখা গেল। যে লোকটা চুমু খাচ্ছে তার সরু লিক্‌লিকে চেহারা, ঘাড়ে ছাটা চুল গায়ে কোট-সোয়েটার। রণেন্দ্র সিংহ তার মুখ দেখতে পেলে না কিন্তু মুখ দেখবার জন্যে সে আর অপেক্ষা করলে না। পা টিপে টিপে চোরের মত সে বাড়ী ফিরে গেল!

সে রাত্তিরটা রণেন্দ্র সিংহ ঘুমাতে পারলে না। পর-দিন সকালে উঠে রেজিষ্ট্রি করে দানপত্রটা ঘুঁটেকুড়ুনী মেয়েকে পাঠিয়ে দিয়ে সে দুর্গা বলে বেরিয়ে পড়ল।

বেণী।—সব দিয়ে দিলি? দানপত্রটা ছিঁড়ে ফেললি না? দূর আহম্মক!

বিদ্যা।—রণেন্দ্র সিংহটা ঐ রকমই আহাম্মকই ছিল, সব দিয়ে দিলে। ভাবল, টাকা পেলেই যখন মেয়েটা যাকে ভালবাসে তাকে বিয়ে করতে পারবে তখন তাই করুক।

বেণী।—হাঁদা গোবিন্দ রণেন্দ্র সিংগির কি দুর্দ্দশা হল?

বিদ্যা।—কি জানি। হাঁদা গোবিন্দদের যা হয়ে থাকে তাই হয়েছে বোধহয়। পথে পথে টো টো করে করে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

আর মেয়েটা?

বিদ্যা।—সে এখন বিয়ে-থা করে সুখে সচ্ছন্দে ঘর-কন্না করছে আর মাতালটার লাথি-ঝ্যাটা খাচ্ছে। এত দিনে রণেন্দ্র সিংহের টাকাগুলো প্রায় শেষ করে এনেছে।

বেণী।—মাতাল, টাকা উড়িয়ে দিয়েছে,—এ খবর তুমি জানলে কি করে?

বিদ্যা।—এর আর জানাজানি কি? এত চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি।

বেণী।—[বহুক্ষণ হুঁকায় টান দিয়া শেষে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া] তোর গল্প একদম বাজে, শেষের দিকে মন একেবারে খিঁচড়ে যায়। তার চেয়ে আমার শিহরণ-সিরিজ ঢের ভাল, শেষ পাতায় নায়ক-নায়িকা চুমু খেয়ে মনের সুখে ঘর কন্না করে। [সহসা হুঁকা রাখিয়া উঠিয়া বিদ্যাধরের স্কন্ধে হাত রাখিয়া] তবে কি জানিস রে বাবা, মরদের বাচ্চা—কিছুতেই দমতে নেই। কোথাকার ঘুটে-কড়ূনী মেয়ে নিজের মাথা খেয়ে ফিরে চাইলে না বলে কি প্রাণটাকে তাচ্ছিল্য করে নষ্ট করে ফেলতে হবে। আবার দেখবি, কত রাজার মেয়ে ঐ রণেন্দ্র সিংগির জন্যে হাত বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ইস্কুলের মাষ্টারণী কদর বুঝলে না বলে কি মণি-মুক্তোর দাম কমে যাবে! দেখিস, ঐ রণেন্দ্র সিংগির একদিন রাজকন্যের সঙ্গে বিয়ে হবে।

বিদ্যা।—তা যদি হতে পারত খুড়ো তাহলে ত কোনো কথাই ছিল না। কিন্তু দুঃখের কথা কি বলব

তোমাক, রণেন্দ্র সিংহ ঐ ঘুটে কুড়ুনী মেয়ে ছাড়া আর কাউকে চায় না। রাজ কন্যার ওপর তার একটুও নজর নেই।

বেণী।—বিভে, যা বাবা তুই কাটলেট ভাজগে যা। আর বুড়োমানুষকে দুঃখ দিসনে। তোর গল্প আর আমি শুনতে চাই না।

এই সময় দোকানের সামনে একটি মোটর আসিয়া থামিল। বেণী উঁকি মারিয়া দেখিয়া তাড়াতাড়ি দেয়ালে টাঙানো একটি কালো রঙের গলাবন্ধ কোট পরিধান করিতে করিতে বলিলেন,…'বিভে, শিগ্‌গির যা, ইউনিফরম্ পরে নে। খদ্দের আসতে সুরু করেছে।

বিদ্যাধর রান্নাঘরের ভিতর প্রস্থান করিল।

বহির্দ্বার দিয়া একটি তরুণীর প্রবেশ। সুন্দরী তন্বী, চোখে বিষাদের ছায়া। পায়ে হাই-হীল্ সোয়েড জুতা, ফিকা গোলাপী রঙের মোজা; পরিধানে দামী সিল্কের বেগুনী রঙের শাড়ী ও ব্লাউজ। হাতে একগাছি করিয়া সোনার চুড়ী। বাম কব্জীতে একটি গিনির মত পাতলা ক্ষুদ্র ঘড়ি। গলায় প্লাটিনামের সরু হারে একটি হীরার লকেট ঝুলিতেছে। কানে কোন অলঙ্কার নাই। মাথার চুল ঈষৎ রুক্ষ, এলো খোপার আকারে জড়ানো। মাথার কাপড় একটা সোনার মুক্তাযুক্ত পিন্ দিয়া খোঁপায় সংযুক্ত।

বেণী। সহর্ষে হাত ঘষিতে ঘষিতে আসুন মা লক্ষ্মী আসুন, এই চেয়ারটিতে বসুন।—এখনো ফাগুন মাস শেষ হয়নি, এরি মধ্যে কি রকম গরম পড়ে গেছে দেখেছেন। পাখাটা খুলে দেব কি

তরুণী ক্লান্তভাবে চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন; বেণী পাখা খুলিয়া দিলেন।

বেণী।—[হাত ঘষিতে ঘষিতে] তা আপনার জন্য কি ফরমাস দেব বলুন ত? চা? কোকো? না এ গরমে চা কোকো চলবে না। ঘোলের সরবৎ? চকোলেট ড্রিল? আইস্ ক্রীম? যা চাইবেন তাই তৈরী আছে। আমি বলি, এক গেলাস বরফ দেওয়া ঘোলের সরবত খেয়ে শরীর ঠাণ্ডা করে নেন, তারপর দুখানা ক্রীম কেক—কিম্বা যদি ইচ্ছা করেন দুটো চিংড়ি মাছের কাটলেট—

তরুণী।—চা দিন এক পেয়ালা—

বেণী।—চা? যে আজ্ঞে তাই দিচ্ছি! এ সময় চায়ে খুব তেষ্টা নাশ করে বটে! ওরে বিদ্যে অর্ডার নিয়ে যা—

অদ্ভুত ইউনিফর্ম পরিয়া বিদ্যাধরের প্রবেশ।

নিম্নাঙ্গে চুড়িদার পায়জামা, উর্দ্ধাঙ্গে জরীর কাজকরা নীল রঙের ফতুয়া, মাথায় হাঁড়ির মত আকৃতি বিশিষ্ট এক টুপী। এই ইউনিফর্ম বিদ্যাধরের স্বকল্পিত সৃষ্টি।

তরুণীর সম্মুখবর্ত্তী হইয়াই বিদ্যাধর ভীষণ মুখবিকৃতি করিতে আরম্ভ করিল।

তরুণী অন্যমনস্ক ভাবে হাতের উপর চিবুক ও টেবিলের উপর কনুই রাখিয়া বসিয়াছিলেন—কিছু লক্ষ্য করিলেন না।

বেণী [বিদ্যাধরকে একটা গুপ্ত ঠেলা দিয়া নিম্নস্বরে] ও কি অমন করে দাঁতমুখ খিচুচ্ছিস কেন? অর্ডার নে।

বিদ্যা। বিকট স্বরে [কি চাই?]

তরুণী চমকিয়া উঠিলেন; অবাক হইয়া কিছুক্ষণ বিদ্যাধরের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। বিদ্যাধর পূর্ব্ববৎ মুখভঙ্গী করিতে লাগিলেন।

তরুণী। [অধর দংশন করিয়া] চা চাই—একটু তাড়াতাড়ি। আমাকে এখনি বারাকপুর যেসে যেতে হবে।

বিদ্যাধর কিছু হটিয়া প্রস্থান করিল।

বেণী। দু-মিনিটের মধ্যে এসে পড়বে—সব তৈরী আছে। তা শুধু চা কি ঠিক হবে? সেই সঙ্গে দুটো কাটলেট—বিভের হাতের কাটলেট এ অঞ্চলে বিখ্যাত—একবার চেখে দেখলে আর ভুলতে পারবেন না।

তরুণী। [ঈষৎ হাসিয়া] আচ্ছা, আনতে বলুন—

বেণী। [নেপথ্যের উদ্দেশ্যে] এক পেয়ালা চা, দুখানা কাটলেট জলদি। [তরুণীর দিকে ফিরিয়া] মাঠাকরুণ এর আগে কখনো 'ত্রিবেণী-সঙ্গমে' পায়ের ধূলো দেন নি, নইলে আগেই বিভের কাটলেট অর্ডার দিতেন। কলকাতায় যত ভাল-ভাল তরুণ-তরুণী আছেন সবাই এখানে পায়ের ধূলো দিয়ে থাকেন। অন্ততঃ

প্রায় একবার বেণী খুড়োর হোটেলে আসাই চাই। তাঁদেরই দয়ায় বেঁচে আছি।

তরুণী। আমি কলকাতায় থাকি না। কখনো কখনো আসি।

বেণী। রেস খেলতে এসেছেন বুঝি? আজকাল অনেক মেয়েরা বাইরে থেকে আসেন—

তরুণী। না রেস খেলতে নয়, রেসে যাচ্ছিলুম অন্য কাজে—আপনিই বুঝি এই রেস্তোরাঁর মালিক।

বেণী। আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি মালিক বটে তবে বিদ্যেই সব করে; আমি শুধু পয়সা কুড়োই।

তরুণী। আপনার ঐ চাকরটির নাম বিদ্যে? ও কি বাঙালী?

বেণী। বাঙালী বই কি, আসল বাঙালী। কায়েতের ছেলে। কিন্তু ওর নাম বিদ্যে নয়, ওর নাম কি জানি না। [গলা খাটো করিয়া] ও মস্ত বড় মানুষ ছিল—নানান্ ফেরে পড়ে এখন গরিব হয়ে গেছে, তাই হোটেলে চাকরী করছে। ওর বাড়ী বোধ হয়—

চা ও কাটলেটের প্লেট লইয়া বিদ্যাধর প্রবেশ করিল এবং হঠাৎ প্রচণ্ডভাবে উপর্য্যুপরি হাঁচিতে আরম্ভ করিল। বেণী ফিরিয়া দেখিলেন বিদ্যাধর গলা ও মাথার চারিপাশে একটা কম্ফর্টর জড়াইয়া আরো অদ্ভুত আকৃতি ধারণ করিয়াছে।

বেণী। [কাছে গিয়া ক্রুদ্ধ ও বিরক্তভাবে] এসব তোর কি হচ্ছে বিদ্যে? গলায় কম্ফর্টার জড়িয়েছিস কেন, অত হাঁচ্ছিস কেন?

বিদ্যা। [বেণীর কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া] খবরদার খুড়ো, একটি কথা বলেছ ত এক কামড়ে তোমার কানটি কেটে নেব, একেবারে ভুবনের মাসী হয়ে যাবে। যা করছি করতে দাও—কথাটি কোয়োনা।

বেণী বিহ্বল হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। বিদ্যা চা ও কাটলেট তরুণীর সম্মুখে রাখিল।

তরুণী। একি! এ আবার কে?

বিদ্যা। আমি বিদ্যে, আমার সর্দ্দি হয়েছে—হাঁচ্ছি, —হাঁ—চ্ছি—

তরুণী। সর্ব্বনাশ! আমার গায়ে হেঁচে দাওনি ত?

বিদ্যা। না—না—গায়ে আমি হাঁচি না—হাঁ—চ্ছি—

তরুণী। কিন্তু চা একেবারে তৈরী করে নিয়ে এলে কেন? আমি যে চায়ে চিনি খাই না।

বিদ্যা। খেয়ে দেখুন, চায়ে চিনি নেই—

[হাঁচিতে হাঁচিতে প্রস্থান]

[তরুণী এক চুমুক চা পান করিয়া অঙ্গুলি সঙ্কেতে বেণীকে ডাকিলেন, বেণী নিকটে আসিলেন।]

তরুণী। দেখুন, আপনার এই চাকরটি বোধহয় পাগল।

বেণী। [মাথা নাড়িয়া] না পাগল ত ছিল না তবে আজ হঠাৎ কেমন ধারা হয়ে গেছে। [গলা খাটো করিয়া] আমার কান কামড়ে নেবে বলে ভয় দেখাচ্ছিল।

তরুণী। সে কি! তবে ত একেবারে উন্মাদ!

বেণী। না উন্মাদ নয়, এই খানিকক্ষণ আগে পর্য্যন্ত বেশ সহজভাবে কথা কইছিল। ওর কিছু একটা হয়েছে—

তরুণী।—যদি উন্মাদ না হয় তা হলে নিশ্চয় অন্তর্যামী, নৈলে আমি চায়ে চিনি খাই না জানলে কি করে!

বেণী।—[চিন্তিত ভাবে] সত্যিই ত! জান্‌লে কি করে?—বিদ্যে, এদিকে আয়—

তরুণী।—থাক, ওকে ডাকবার দরকার নেই। ভাল 'ওয়েটার'রা সাধারণতঃ অন্তর্যামী হয়ে থাকে—ওতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। [চা পান করিতে করিতে] আচ্ছা, আপনার দোকানে ত অনেক লোক আসে যায়, আমি একজন লোককে খুঁজে বেড়াচ্ছি, তার সন্ধান দিতে পারেন? তারি খোঁজে আজ রেস-কোর্সে যাচ্ছিলুম, সেখানে অনেক লোক যায়, যদি তার দেখা পাই।

বেণী।—[সম্মুখের চেয়ারে উপবেশন করিয়া] কি রকম লোক তুমি খুঁজছ মাঠাক্‌রুণ তার বর্ণনাটা একবার দাও ত শুনি। তার নাম ধাম চেহারার একটা আন্দাজ দাও, দেখি যদি বেরিয়ে পড়ে।

তরুণী।—নাম জেনে বিশেষ সুবিধে হবে না, কারণ সম্ভবতঃ সে ছদ্মনামে বেড়াচ্ছে। যা হোক, কাজ

চালানোর জন্যে ধরে নেয়া যাক যে তার নাম—রণেন্দ্র সিংহ ?

বেণী।—কি নাম ? রণেন্দ্র সিংহ ?

তরুণী।—মনে করুন রণেন্দ্র সিংহ। কেন, এ-ধরণের নাম কি আপনি পূর্ব্বে শুনেছেন নাকি ?

বেণী।—হুঁ শুনেছি বলেই মনে হচ্ছে, তবে লোক-টাকে যে চিনি সে কথা জোর করে বলতে পারছি না। লোকটির আর সব পরিচয় ?

তরুণী।—দেখুন, লোকটির পুরো পরিচয় দিতে গেলে একটা গল্প বলতে হয়। আপনার ঐ চাকরটির মত তারো একটু পাগলামীর ছিট আছে।

ইতিমধ্যে বিদ্যাধর হামাগুড়ি দিয়া আসিয়া তরুণীর চেয়ারের পিছনে বসিয়াছিল এবং একাগ্রমনে কথাবার্ত্তা শুনিতেছিল।

বেণী।—বল মা লক্ষ্মী তোমার গল্প, আজ দেখছি আমার রূপকথা শোনবার পালা।

তরুণী।—রূপকথা। হ্যাঁ ঠিক বলেছেন, আমার গল্প রূপকথার মতই আশ্চর্য্য। তবে শুনুন,—একটি গরিবের মেয়ে ছিল, ধরুন তার নাম—মঞ্জুষা—

বেণী।—হুঁ ধরেছি, বলে যাও মা লক্ষ্মী—

তরুণী।—মঞ্জুষা গরীবের মেয়ে, পরের গলগ্রহ হয়ে অনেক দুঃখ পেয়ে সে মানুষ হয়েছিল। তাই যখন সে বড় হয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াতে শিখলে তখন মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলে আর কখনো কারুর গলগ্রহ হবে না; যদি কোনদিন অনেক টাকা পায় তবেই বিয়ে করবে নচেৎ চিরদিন কুমারী থাকবে। কিন্তু অনেক টাকা পাবার কোনো আশাই তার ছিল না, কারণ ছোট ছোট মেয়েদের ক খ শিখিয়ে সে নিজের গ্রাসাচ্ছাদন উপার্জ্জন করত। তাই চিরদিন মিসি-বাবা হয়ে থাকবার সম্ভাবনাই ছিল তার বেশী।

কিন্তু হঠাৎ একদিন এক রাজপুত্তুর কোথা থেকে এসে মঞ্জুষার সঙ্গে ভাব করতে আরম্ভ করে দিলে —তার নাম রণেন্দ্র সিংহ। এরই কথা আপনাকে বলেছিলুম। বাইরে থেকে লোকটিকে সহজ মানুষ বলে মনে হয় কিন্তু ভেতরে ভেতরে সে পাগল। মঞ্জুষার সঙ্গে তার খুব ভাব হয়ে গেল, দুজনের রোজই দেখা হতে লাগল। তার সম্বন্ধে মঞ্জুষার মনের ভাব কি রকম হয়েছিল তা আমি বলতে পারি না কিন্তু মনের ভাব যাই হোক, কোন অবস্থাতেই যে সে তার প্রতিজ্ঞা ভুলবে না তাতে তিলমাত্র সন্দেহ ছিল না। তাই রণেন্দ্র সিংহ যেদিন তাকে বিয়ে করতে চাইলে সেদিন সে রাজী হল না। পরদিন মঞ্জুষা রাজপুত্রকে চিঠি লিখে জানিয়ে দিলে কেন সে তাকে বিয়ে করতে পারবে না। চিঠি পেয়ে এই রাজপুত্র এক অদ্ভুত কাজ করলে, নিজের ধনরত্ন রাজ্যপাট সমস্ত মঞ্জুষার নামে দানপত্র করে দিয়ে কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে গেল।

বেণী! তারপর ?

তরুণী। তারপর আর কি ? মঞ্জুষা সেই পাগলা রাজপুত্তুরকে দেশে দেশান্তরে খুঁজে বেড়াচ্ছে—

বেণী। হু। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, মেয়েটা রাজপুত্তুরের টাকাকড়ি সব নিলে ?

তরুণী। হ্যাঁ নিলে।

বেণী। নিতে তার একটুও বাধ্‌ল না ? হাত পুড়ে গেল না ?

তরুণী। না হাত পুড়ে গেল না। তার অধিকার ছিল বলেই সে নিয়েছিল, নইলে নিত না।

বেণী। কি অধিকার ?

তরুণী। [কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া হেঁট মুখে] বোধ হয় ভালবাসার অধিকার।

বেণী। বুঝলুম না।

তরুণী। [মুখ তুলিয়া] যাঁকে মঞ্জুষা ভালবাসে যাঁকে মনে মনে স্বামী বলে বরণ করেছে তাঁর সম্পত্তিতে তার অধিকার নেই কি ?

বেণী। [কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া থাকিয়া] কিন্তু—কিন্তু—আর একটা কথা, মেয়েটি কি আর একজনকে বিয়ে করেনি ? একটা মাতাল লম্পট বদমায়েসকে—

তরুণী। মিথ্যা কথা। মঞ্জুষা তার কুমারী হৃদয়ের সমস্ত ভালবাসা নিয়ে তার রাজপুত্রকে খুঁজে বেড়াচ্ছে ভগবান তাকে অনেক টাকা দিয়েছেন, সে এখন ইচ্ছে করলেই বিয়ে করতে পারে। কিন্তু সে তার রাজপুত্র ছাড়া আর কাউকে চায় না।

বিদ্যা। [সহসা সম্মুখে আসিয়া] কিন্তু যে লিক্‌লিকে চেহারা ঘাড়ে ছাঁটা চুল, সোয়েটার পরা লোকটাকে মঞ্জুষা দোতলার সামনে দাঁড়িয়ে চুমু খাচ্ছিল সে লোকটা তবে কে ?

তরুণী। মিথ্যে কথা, মঞ্জুষা আজ পর্য্যন্ত কোনো পুরুষকে চুমু খায়নি—

বিদ্যা। তবে সে কে ?

তরুণী। সে আমার বন্ধু রমলা। আমরা দুজনে এক ইস্কুলে পড়াতুম। রমলার চুল শিঙ্গল্‌ করা—

বিদ্যা। [ললাটে করাঘাত করিয়া] অ্যাঁ!—উঃ, মঞ্জু—[তরুণীর হস্তধারণের চেষ্টা করিল]।

তরুণী। [বেণীকে] আপনার চাকর ত ভারি অসভ্য—মেয়ে মানুষের হাত ধরে !

বেণী ! [হুঙ্কার করিয়া] বিদ্যে, শীগ্‌গির হাত ছেড়ে দে বেয়াদব—

বিদ্যা। [কম্ফর্টর ও টুপী খুলিতে খুলিতে] খুড়ো, জলদি ভাগো, রান্নাঘরে গিয়ে ঘোলের সরবত খাও গে নইলে দুটো কানই তোমার কামড়ে শেষ করে দেব—কিছু থাকবে না [খুড়ো পশ্চাৎপদ] মঞ্জু, কখন চিনতে পারলে ?

মঞ্জু। [হাসিয়া] দেখবামাত্রই। মুখ বিকৃতি করে কি আমাকে ফাঁকি দিতে পারো ? জানো না, দাঁত খিঁচিয়েই কেউ কেউ নিজের সত্যিকার পরিচয় দিয়ে ফেলে !

রণেন্দ্র। মঞ্জু, বড্ড ভুল করে ফেলেছি,—সত্যিই আমি পাগল—

মঞ্জু। কি বলে বিশ্বাস করলে? এতটুকু আস্থা নেই ? এই ভালবাসা ?

রণেন্দ্র। [মঞ্জুকে নিকটে টানিয়া] মঞ্জু, এখনি বলছিলে আজ পর্য্যন্ত কোনো পুরুষকে চুমু খাওনি। সে ত্রুটি এইবেলা সংশোধন করে নিলে হত না ?

বেণী। এই খবরদার ! বুড়ো মানুষের সামনে বেয়াদবি করো না, আমাকে আগে রান্নাঘরে যেতে দাও। [যাইতে যাইতে ফিরিয়া] কিন্তু বিদ্যে, তুই ত তোর রাজকন্যে নিয়ে আজ নয় কাল চলে যাবি, এ বুড়োর কি দশা হবে ?

রণেন্দ্র। [বেণীর পিঠ চাপড়াইয়া] ভেবোনা খুড়ো, আমিও যে পথে তুমিও সেই পথে। মঞ্জুর অনেক টাকা, আমাদের দুজনকে অনায়াসে পুষতে পারবে।

বাহিরে বহু মোটর আগমনের শব্দ শোনা গেল।

বেণী। [উকি মারিয়া দেখিয়া] ঐ রে! সব ছোঁড়াছুঁড়িগুলো একসঙ্গে এসে পড়েছে। কিছু যে তৈরী নেই—কি হবে বিদ্যে ?

রণেন্দ্র। কুছ্‌ পরোয়া নেই খুড়ো, আজ আমরা দুজনে কাজ করব,—মঞ্জু তৈরী করবে আমি পরিবেষণ করব। কি বল মঞ্জু—অ্যাঁ! মনে কর এটা তোমার আইবুড়ো ভাতের ভোজ !

মঞ্জু সলজ্জে ঘাড় নীচু করিল।

একদল তরুণ-তরুণীর কল-কোলাহল করিতে করিতে প্রবেশ। সকলের উপবেশন।

হঠাৎ একজন তরুণ এক হাতে একতাড়া নোট তুলিয়া ধরিয়া আন্দোলিত করিতে করিতে গান ধরিল। আর সকলে কেহ গলা মিলাইয়া কেহ বা হাতে তাল দিয়া যোগ দিল :—

বেরালের ভাগ্যে ছিঁড়েছে আজ সিকে।
খুড়ো ডিয়ার খুড়ো !
ইচ্ছে হচ্চে নাচি দিক্‌বিদিকে
খুড়ো ডিয়ার খুড়ো !
বিদ্যে কোথায়, নিয়ে আয় সরবৎ—
খুড়ো, বসে থেকো না জড়বৎ
ঘোড়দৌড়ে জিতেছি আজ পাঁচ কড়া পাঁচ সিকে
খুড়ো ডিয়ার খুড়ো !
খেয়ে বেদম চিংড়ি কাটলেট
আইস ক্রীমে ভরিয়ে নিয়ে পেট
বিয়ে করবো আজ রাত্তিরেই প্রাণের প্রেয়সীকে
খুড়ো ডিয়ার খুড়ো !

যবনিকা !!

বজ্রদগ্ধা

শ্রীপ্রমীলা রায়

ভাবনায় অস্থির হয়ে তিন ভাই যখন বাড়ী এসে পৌঁছাল, জগমোহনের তখন ২৪ ঘণ্টার পরে সবে মাত্র জ্ঞান হয়েছে। কথা কিছুই বোঝা যায় না। হাত, পা সব অবশ, তবে ডান দিক থেকে বাঁ দিকেই যেন আক্রমণটা বেশী হয়েছে। প্রভাস, মীনা, নন্দা ও ঠানদি পালা করে তাঁর শুশ্রূষার ভার নিয়েছিল। এই সময়টা প্রভাস কাছে বসেছিল। জগমোহনের জ্ঞান ফিরে এলেও কথা বলার শক্তি তিনি প্রায় হারিয়েছিলেন বল্লেই চলে। তাঁর মনোভাব আর তিনি কথায় ভাল করে বুঝিয়ে দিতে পারতেন না—শুধু ইঙ্গিতেই তাঁর অভাব, অভিযোগ বুঝে নিতে হত। আর সে ইঙ্গিতেও যে চট্ করে কেউ বুঝবে তা পারতোনা—তবু এ ক'ঘণ্টা বাড়ীর লোকজন থেকে থেকে বুঝে নিচ্ছিল।

প্রভাস তাঁর মুখের দিকে চেয়েই ছিলো—কখন কি বল্বেন তার ঠিক নেইতো! এমন সময়ে দাদাদের সেই ঘরে ঢুক্তে দেখে সে বোধ হয় একটা দায়ীত্ব থেকে মুক্ত হল ভেবে একটু চেঁচিয়েই ডেকে ফেললে "দাদা"!

তার এই দুটী অক্ষরেই জগমোহন আবার চোখ খুল্লেন। তিনি অন্যের কথা বুঝতে পারছিলেন; তাঁর কথাই কেউ বুঝ্তে পারছিল না। তিন ছেলেকেই দেখে জগমোহনের দুটী চোখ দিয়ে ধারার পরে ধারা বইতে লাগ্ল। কপালে হাত দিয়ে কি বল্লেন, কিন্তু বোঝা গেল না কিছুই।

প্রণব ও প্রশান্ত বিছানার ওপর বস্লে—কিন্তু প্রভাত বাবার এই অবস্থা হয়েছে দেখে, একেবারে মুষ্ড়ে পড়্ল। এযে পক্ষাঘাত তা, প্রভাত এক নজরেই বুঝ্তে পেরেছিল; তবে? সাংঘাতিক বিপদ যে মাথার ওপর এসে পড়েছে! ভাইয়েরা তো তার মুখ চেয়ে বসে আছে, সে কার মুখ চায়, কার কাছে পরামর্শ নেয়; ভাবনায়, সেই মাঘের শীতেও তার কপালে ঘাম দেখা দিলে।

তাকে এমনি ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে, জগমোহন যেন তার চিন্তার কথাটা বুঝে নিলেন। ইঙ্গিতে তাকে বিছানায় এসে বস্তে বললেন। প্রভাত বিছানার এক ধারে বসে পড়ে বললে, "বাবা, বাবা এ কি হোল আপনার?"

জগমোহনের চোখের কোণা দিয়ে দু ফোঁটা জল পড়ল। সযত্নে, সে দুফোঁটা জল, কোঁচার খুট দিয়ে মুছিয়ে দিয়ে প্রভাত আবার বল্লে, "আপনাকে এখানে এ অবস্থায়, ফেলে রেখে তো যেতে পারবে না—কাল কি পরশু, সকলে মিলে আপনাকে কল্কাতায় নিয়ে যাব। সেখানে আমরা সকলে থাক্ব; আপনার দেখা-শোনা বা চিকিৎসার ক্রুটী কিচ্ছু হবেনা।"

এই যুক্তিই ঠিক বলে সকলে মেনে নিলে। মীনার সঙ্গে দেখা করে প্রভাত বল্লে, "হয়তো কাল কিংবা পরশু বাবাকে নিয়ে আমরা কল্কাতায়—তুমি সব গুছিয়ে রেখো।" আর দেখা হওয়ার সে আবেগ নেই—না দেখার আকুলতা নেই—বিপদে পড়ে প্রভাত কয়েকঘণ্টাতেই যেন দশ বছর বয়স বাড়িয়ে নিয়েছে। মীনারও কোন সঙ্কোচ হলনা—সেও বল্লে "[illegible] কি যাব?" ম্লান হেসে প্রভাত বল্লে "নিশ্চয়। তো[illegible]

কার কাছে রেখে যাব? বাসা ভাড়া করতে হবে—বুঝলে এখানে চাবী দিয়ে যেতে হবে।"

"ও, আচ্ছা...যাই নন্দাকে বলিগে—সে তার সব জিনিষ-পত্রের ব্যবস্থা করুক।"

প্রণব এসে বললে, "আচ্ছা, দাদা, মেজ বৌকে রাইপুর পাঠিয়ে দিয়ে গেলে কি হয়! আমরা এত জন তো আছি—ও গিয়ে আর কিই বা করবে?"

একটু ভেবে প্রভাত বল্লে, "সে হয়না পিন্থ, যদি রাইপুর থেকে নিতে চাইতেন, তা হলেও বা, কথা ছিল; কিন্তু বলা নেই, কওয়া নেই, ঘরের বৌকে বিনা আহ্বানে, আমি সেখানে যেতে দিতে পারব না—কোনমতেই নয়। বাবার অসুখ হয়েছে আজ তিনদিন কিন্তু খোকার মুখে শুনলাম এ দেশের যত লোক কেউই আস্তে বাকী রাখেন নি—আসেননি কেবল রাইপুরের ওঁরা। সেখানে কি আমি বৌমাকে অম্নি পাঠাতে পারি?

সবিদ্রূপ হেসে প্রণব বল্লে, "কিন্তু ভুলে যাচ্ছ কেন দাদা যে সেটা ওরই বাপের বাড়ী!"

"ভুলিনি প্রণব—কিন্তু তুমিই বা কেন "স্ত্রীরত্নং দুষ্কুল দপি" কথাটা ভুলে যাচ্ছ ভাই?"—

"বেশ যাও নিয়ে—ঠেলা সামলিয়ো। পাড়াগাঁয়ের মেয়ে কলকাতা দেখেনি—তোমারই খরচ বেশী হবে—আমার কি? তখন কিন্তু আমাকে দুষো না। না নিলেই ভাল করতে!

"আচ্ছা—আচ্ছা—তুই চুপ কর। সবাই মিলে মাথাটা আমার গোল করে দিস্‌নে।

ঘরের বাইরে যখন প্রভাত ও প্রণব এই ভাবের কথায় ব্যস্ত, ঘরের ভেতরের দিকে মীনা ও নন্দা তখন দরকারী জিনিষপত্তর বাঁধাছাঁদা করছিল। নন্দারই যেন উৎসাহটা বেশী—কারণ সে এক রাইপুর ছাড়া আর কোথাও যায়নি—একে অন্য দেশে যাওয়া, তার ওপরে আবার কল্‌কাতা সহরে যাওয়া! 'আঃ! সেই যাওয়াই যদি হোল, তবে আবার এসব অসুখ-বিসুখের খোচ একটা রইল কেন? প্রাণ—যা চায়, তা তো করা যাবেনা—তার আবার দিদি সঙ্গে। কেমনই যে দিদির এক স্বভাব, এদিকে কত হাসি, গল্প! ওদিকে কাজে একতিল গাফিলী হলে আর রক্ষে নেই! আরে বাবা, কাজ তো সারা জন্ম ধরেই করা যাবে—তা বলে যে বয়সের যা, তা তো করতে হবে! না কি? বুড়ীদের সঙ্গে বুড়ী হয়ে থাক্‌তে হবে!" তার মনের বিরক্তি মুখে ফুটে উঠ্‌ছিল—বিছানার একটা মোট ঠিক করে রেখে মীনা নন্দার দিকে চেয়ে দেখে বল্লে "নন্দা, কি বাতাসের সঙ্গে ঝগড়া কচ্ছিস্ নাকি? ধরা পড়ে গিয়ে নন্দা বল্লে "না। কই! ঝগড়া করছি!" "তোর মুখ কিন্তু তা বল্‌ছে না।" "আমার মুখ ওই রকমই।" মীনা বুঝ্‌লে যে কারণেই হোক নন্দা 'ধাতস্থ' নেই—সেও আর কিছু না বলে নিজের কাজ করে যেতে লাগ্‌ল। হঠাৎ কি মনে হয়ে মীনা বল্‌লে "ঠাকুরপোকে জিজ্ঞাসা করে আয় তো তিনি এখন কিছু খাবেন কিনা?"

ঠোঁট উল্টিয়ে নন্দা বল্লে "বয়ে গেছে আমার জিজ্ঞেস করতে? কোথায় আছে তার ঠিক নেই, কোথায় গিয়ে তাকে আমি চুড়ে বেড়াব? খিদে পেলে নিজেই খাবে।"

"বাড়ী আসতে না আসতেই আবার কি ঝগড়া হোল তোমাদের? বাবা! বাবা! কথায় কথায় এত ঝগড়াও করতে পারো তোমরা! এদিকে চিঠি আসতে একদিন দেরী হলেও তো অস্থির কাণ্ড লেগে যায়!"

"তুমি বুঝি অস্থির হওনা? আর দেখাই হয়না, তার আবার ঝগড়া হবে কোথা থেকে?"

"ওঃ বুঝেছি। ব্যথাটা তা হলে এখানেই, কিন্তু কি পাগল তুই নন্দা! ওদের বাবার অসুখ শুনে তিন জনে ছুটে এসেছে—এখন আবার তোর অভিমান ভাঙাতে হবে তা বোধহয় ঠাকুরপোর মনে নেই—তা হলে নিশ্চই এসে তোকে দেখে যেতো!',

"হ্যাঁ—যেতো! ভাসুর কিনা তাই! বাবার অসুখ বোধহয় তোমার ঠাকুরপোরই একলা হয়েছে! তাই ভাবনার অন্ত নেই—না দিদি! মানুষটা ওই রকমেরই—মন বলে কোনো জিনিষের বালাই ওর নেই। দেখিনি—জাপান থাক্‌তে? তখন তো আর এক দেশে

থাকা, আর কত দূরদেশে—তা যে না চিঠি লেখার ছাঁচ! দেখে পিত্তি জলে যেতো—তা উত্তর দেব কি? আমার কথায় বিশ্বাস না হয়, তোমাকে আমি সে সব চিঠি দেখাতেও পারি! তুমি তো ভাবো ঠাকুরপো তোমার মানুষ নয়—দেবতা।"

দেখাবি নাকি নন্দা। রাগের মাথায় যে কথা বলেছিস্...ঠাণ্ডা মাথায় কি আবার তা ফিরিয়ে নিবি নাকি? আমি তোর সব চিঠি দেখ্‌তে চাইনে, শুধু আর বছরের বিজয়ার আশীর্ব্বাদী চিঠিখানা দেখাস্ যেখানে ডবল পোষ্টেজ ষ্ট্যাম্প দিয়ে এসেছিল!"

"যাও, দিদি তুমি আর জ্বালিও না বাপু! সে একা আমারই চিঠি! তোমার ছিলনা, তার মধ্যে?"

"ছিল—আটলাইনের একটা শ্লিপ আমারও ছিল। তার জন্য আর একটা ষ্ট্যাম্প লাগেনি দাঁড়া—ঠাকুরপোকে ডেকে আনি—তোর এ অভিমান ভেঙে দিয়ে যাক্।"

সভ্রূভঙ্গে "নন্দা বল্‌লে, ডাকতে তুমি পাবেনা কিছুতেই —কেন সত্যি কি আর ইচ্ছে হলে আস্‌তো না? 'যেচে মান আর কেঁদে সোহাগ' এর কিচ্ছু দাম নেই দিদি! আর তোমার কাছে আজ আমি শোব দিদি!"

"আমার কাছে জায়গা হবেনা। তা ছাড়া আমিই বোধহয় বাবার ঘরে শোব—এঘরে খোকা আর তোর ভাসুর শোবেন, এটা ঠিক। তারপরে আমি শোব কি প্রভাস শোবে কি আর কেউ শোবে। তার ঠিক নেই কিছু। তোকে আজ সারারাত্তির নজরবন্দী থাকতে হবে...তুই বড় দুষ্টু হচ্ছিস দিন্ দিন্। আমার দেওরটীকে ভালমানুষ পেয়ে তাকে জ্বালাবার কত ফন্দীই না বের করছিস! এঁদের মা থাকলে, দেখ্‌তাম একবার—তোর এসব কোথায় থাক্‌তো।" সন্ধ্যা হয়ে গেল দেখে নন্দা, আলো আন্‌তে গেল।

রাত্রে প্রভাত ও প্রণবকে ছুটি দিয়ে মীনা একেবারে তাদের ঘরে পাঠিয়ে দিয়ে, শ্বশুরের কাছে নিজেই বস্‌লো। প্রশান্ত কিছুতেই গেলনা—তখন অগত্যা সেই ঘরেরই মেঝের ওপর তার একটা বিছানা করে দিয়ে মীনা তাকেও শুতে বল্লে। কিন্তু কথা রইলো যে ছুটোর সময় প্রশান্তকে উঠিয়ে দিয়ে সে ঘুমোতে যাবে। তাতেই রাজী হয়ে, সে বিছানার কাছে একটা ইজিচেয়ার টেনে এনে তাতে শুয়ে পড়ে পায়ের ওপর একটা শাল ঢাকা দিয়ে The ships that pass in night. বলে বইখানা পড়্‌তে লাগ্‌লো দশটা থেকে বারটা পর্য্যন্ত বেশ ভাল কাট্‌লো—রোগীর ঘুম খুব গাঢ়—প্রশান্তও বেশ ঘুমোচ্ছে। একটা পরিচ্ছেদ শেষ করে মীনা হাই তুলে বইটা মুড়ে চেয়ারের হাতলের ওপর রেখে দিলে। দরজার দিকে চোখ পড়তে সে দেখ্‌লে, দরজার পর্দ্দার আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে রেখে প্রভাত মুখখানা বের করে তাকে ইসারায় ডাকছে। পাছে ঘরের মধ্যে প্রশান্ত তা দেখ্‌তে পায়, এই ভয়ে সে নিঃশব্দে উঠে বাইরে গেল।

দেখলে, বাইরে আলো-অন্ধকারের খেলা চল্‌ছে—তার মধ্যেই বারন্দায় প্রভাত দাঁড়িয়ে আছে। তাকে বাইরে আস্‌তে দেখে প্রভাত দুহাত বাড়িয়ে তাকে বুকের মধ্যে টেনে নিলে। বল্‌লে "কখন থেকে দাঁড়িয়ে আছি, আর এখন তোমার সময় হল? আমাকে বন্দী-খানায় পাঠিয়ে বেশ মজা করেই আছো, না?"

"আমি ভেবেছিলাম, তুমি ঘুমিয়েছ—এইতো বারটা, আর দুঘণ্টাও আমি এমনি করে কাটিয়ে দেওয়ার মতলবে ছিলাম—তারপরেই তো তোমার কাছে যেতে পার্‌তাম —এ কিন্তু আমার 'ডিউটী' ফাঁকি দেওয়া হচ্ছে।"

"হ্যাঁ ঘুম কি করে আসবে? যদি কেবলই মনে হয়, কখন্ এই হাত দুখানা, এমনি করে গলায় এসে পড়বে, কখন্ কাণের কাছে মৃদুস্বরে কথা আরম্ভ হবে, কখন্ সেই কথার স্বরে বুকের ভিতরের জমাট ব্যথা সরে যাবে, তাহলে কি ঘুম হয়? 'মিছে সখি ধরো অপরাধ!" বলে প্রভাত মীনার হাত দুখানা, মালার মত করে গলায় জড়িয়ে নিলে।

"সব তো বুঝি, আর সেই জন্যেই তোমাকে বাবার ঘরে ঢুকতে না দিয়ে ঘুমোতে পাঠিয়েছিলাম। আমি গেলে তোমার যে আর ঘুম হবে না, আমি জানি; তা হলও তাই—তুমিও ঘুমোলে না, আমিও ঘুমোলাম না।"

কাছেই একখানা ছোট লোহার চেয়ার পড়েছিল, প্রভাত তাতে বসে পড়ে, মীনাকেও তার [illegible]

বস্‌বার জন্যে টান্‌লে। কিন্তু চেয়ারখানায় বসার আর জায়গা নাই দেখে বল্‌লে "এইটুকু চেয়ারে কি দুজনার কুলোয়? তার চেয়ে আমি এখানেই বস্‌ছি," বলে সে বারন্দার আলসের ওপর বস্‌লে। আল্‌সেটা বেশী উঁচু ছিল না।

বাধা দিয়ে প্রভাত বল্‌লে, "ওকি! ওকি! নীচে পড়ে যাবে যে! তার চেয়ে এখানে বসো।" বলে তার পা আল্‌সের মধ্যেকার ফাঁকের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে তার ওপর মীনাকে বসালে।

"তোমার পায়ে লাগবে যে! না, না, আমি মাটীতে বস্‌ছি।…

"লাগবে না—এইটুকু ভার সইবার মত জোর আমার এ পা দুটোতে আছে, বুঝলে সত্যি-মিথ্যে পরীক্ষা করে দেখো। উঠে বসো বল্‌ছি, না হলে আমিও মাটীতে বস্‌ব, পাশাপাশি। আমাকে যদি কেউ বস্‌তে বল্‌ত তবে আমি নিশ্চয়ই বস্‌তাম! কিন্তু কেউই বলে না!"

"আহা! বল্‌লেই অমনি বস্‌বে কিনা? তোমাকে আমি চিনিনে তো! নেও, এই বস্‌লাম, কি বল্‌বে বলো। আমি কিন্তু এখুনি চলে যাব।"

"হ্যাঁ—তা আর না! এখুনি চলে যাবে বলেই যে আমি এত তোড় জোড় করলাম! যাই যাই করছ কেন? বাবা তো ঘুমোচ্ছেন বেশ! সেখানেও বসতে, না হয় সেটা এখানেই বস্‌লে! আমার একটু শান্তি হল! তারপর, কালই বাবাকে নিয়ে যেতে হবে, বুঝলে? আর দেরী নয়। পারবে তো সব গুছিয়ে নিতে? হ্যাঁ ভাল কথা; প্রণব বল্‌ছিল যে বৌমাকে রাইপুর পাঠিয়ে দেবার কথা। আচ্ছা বলতো, সেটা কি উচিত কাজ হবে? তবে যদি বৌমা যেতে চান সে আলাদা কথা!"

"হ্যাঁ—তা আবার সে চাইবে! সে ঠাকুরপোকে যা' ভালবাসে, একটু কথা বল্‌তে, কি কাছে যেতে দেরী হলে যা' চটে যায়! কল্‌কাতায় গেলে, রোজ রোজ তাঁকে দেখতে পাবে, তাই ছেড়ে রাইপুর যেতে ও ভাবছে! আর তা ছাড়া, ওকে ফেলে যদি আমার যাওয়া হয়, তবে ও আর আমার মুখ দর্শন করবে না।"

"বুঝলাম। তাহলে বৌমার যাওয়া স্থির। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, জানতে বড় ইচ্ছা হচ্ছে—নন্দার ভালবাসার কথা তো শুন্‌লাম, তুমি তোমার বরকে কতটা ভালবাসো মীনু? না, চুপ করে থাকলে আমি শুনবো না—মন আমার এক এক সময় এই কথা জান্‌বার জন্যে এত অশান্ত হয়ে ওঠে—কোনদিনই তো এ প্রশ্ন তোমার কাছে তুলিনি মীনু হয়তো আর তুলবোও না, কিন্তু আজ আমার মন এর উত্তর শোনবার জন্যে মাতাল হয়ে উঠ্‌ছে—"

"নিজের মন দিয়ে কি তা' বুঝতে পার না? এও কি আবার মুখের কথায় বলে বুঝিয়ে দিতে হবে? কই আমার মন তো, তোমার ভালবাসার পরিমাণ জান্‌তে ব্যস্ত হয় না—তুমি ভালবাসো আর তা আমি অন্তরে অন্তরে অনুভব করি—ব্যস্ এই তো যথেষ্ট! কিন্তু ওদিকে বোধ হয় দুটো বাজলো—ঠাকুরপো যদি জেগে থাকেন তো কি ভাবছেন বলতো?"

"আচ্ছা, যাও। আমি কিন্তু এখানেই রইলাম, ডিউটী ফুরোলে আমায় ডাক দিয়ো!"

"আচ্ছা," বলে মীনা লঘুপদে ঘরে এলো। দেখ্‌লে নীচের বিছানায় প্রশান্ত তেমনি ঘুমোচ্ছে জগমোহনও গভীর নিদ্রিত। আলোটা তুলে ধরে ঘড়ি দেখলে—পৌনে দুটো। আবার আলোটা ঠিক জায়গায় রেখে দিয়ে, সে সেই ইজি চেয়ারেই শুয়ে পড়্‌ল।

প্রায় আধ ঘণ্টাখানেক পরে, মীনার সবে মাত্র তন্দ্রা এসেছে, প্রশান্ত উঠ্‌লো দেখলে ইজি চেয়ার থেকে একটা হাত মীনার বাইরে এসে পড়েছে, সে যে ঘুমোচ্ছে, তাতে সন্দেহ নেই; কিন্তু কি করে সে তাকে ডাকে! যদিও সে ও প্রশান্ত প্রায় সমবয়সীই হবে, তবুও ঘুমন্ত, তাকে ডাক্‌তে সে যেন সাহস পাচ্ছিল না। ঘরের বাইরে গিয়ে, সে দাঁড়ালে—জেগে থেকে ঘরের মধ্যে থাক্‌তে ইচ্ছে তার হল না। একই বারান্দায় ঘরের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে প্রশান্ত মীনার ঘুম ভাঙার অপেক্ষা করতে লাগলো—আর সেই বারান্দারই শেষ প্রান্তে, অন্ধকারে বসে, প্রভাতও মীনার অপেক্ষা কর্‌ছিল।

ঘড়ীতে আধঘণ্টা বাজার শব্দ হলো, মীনার ঘুম ভেঙে গেল—আড়াইটা বেজেছে দেখে, সে উঠে বস্‌ল—দেখলে জগমোহনের ঘুম তখনো ভাঙেনি। গায়ের চাদরটা একটু সরে গিয়েছে—সে চাদরটা আবার ঠিক করে টেনে দিলে; জানালা যা দু একটা খোলা ছিল, বন্ধ করে দিলে, ঠাণ্ডা বাতাস আস্‌ছে। তারপরে ঘরের পর্দাটা ঠেলে দিয়ে যেমন বাইরে পা দিয়েছে, প্রশান্তর ছায়া দেখে ভয় পেয়ে বললে "কে?"

ফিরে দাঁড়িয়ে প্রশান্ত বল্‌লে "আমি! আপনি এখন যান্—আমি তো ঘুমিয়ে নিয়েছি। যদি বিশেষ কিছু দরকার হয়, তবে আপনাকে খবর দেব।"

"হ্যাঁ—যাচ্ছি যা ঘুম পেয়েছে!" বলে মীনা বারান্দা দিয়ে সোজা চলে একেবারে যেখানে প্রভাত বসেছিল, সেখানে গিয়ে পিছন থেকে তার ঘাড় বেড় দিয়ে বল্লে—"চল—এখন আমার ছুটি! তুমি তো বেশ ওইটুকু ছেলেকে ঘরে একা ফেলে রেখে এখানে এসে বসে আছ!"

"দূর! ছেলে টেলে আমার ভাল লাগে না—মনেই ছিল না তার কথা!"

"না, ভাল লাগে না হিংসুক! তুমি বড় একচোখো!"

"মেনে নিলাম! আর সে চোখটা সর্ব্বদাই এই দিকে ফিরে আছে।" বলে মীনার মুখখানা ঘুরিয়ে নিজের চোখের সামনে ধর্‌লে!

"আঃ! সরো সারা রাতই আজ এখানে থাক্‌বে নাকি? আমার কিন্তু ঘুম আস্‌ছে খুব—আমি চল্লাম।"

"ইস্! আমাকে ফেলেই! Escape me! never dear! বলে প্রভাত তার কোমরের কাছে হাত বেড় দিয়ে ধরে ঘরে চল্‌লো। পথেই নন্দার শোওয়ার ঘর। প্রভাতের হাত ছাড়িয়ে মীনা একবার সেই ঘরের কাছে এসে দাঁড়ালে—কাণ পেতে কিছুই শুন্‌তে পেলে না—তখন খুব চুপ প্রমাণ করে জানলার খড়খড়ি ফাঁক করে তার ভিতরটা দেখবার চেষ্টা করলে—কিন্তু কিছুই দেখা গেল না। খুল্‌তে খুল্‌তে সাহস পেয়ে সে একেবারে গোটা খড়খড়ি একটা খুলে ফেল্‌লে। চোখ নীচু করে ঢুকিয়ে দেখলে, পায়ের কাছে হ্যারিকেনের আলো খুব মিট্ মিট্ করে জল্‌ছিলো—পাতলা একটা 'রাগ' ঢাকা দিয়ে, তুজনেই গভীর ঘুমে অচেতন। ইসারা করে মীনা প্রভাতকে ডাক্‌লে—সে কিন্তু গেল না। তখন সরে এসে সে প্রভাতের একটা হাত ধরে টেনে সেই খড়খড়ির কাছে নিয়ে গেল। প্রভাত তার হাত ছাড়িয়ে সরে এল, বল্‌লে "কি হবে দেখে? নতুন কিছু দেখব নাকি? যা চিরকাল হয়ে আসছে, তাই তো! চলে এসো শীগগির ওখান থেকে!" বলে সে মীনার হাত ধরে একটান দিলে।

"দেখছিলাম, তোমার সাধু পুরুষ ভাইএর কাণ্ডখানা। লোকচক্ষুর সামনে, তুজনে দিনরাত্ ঝগড়া—আর অন্তরালে সবই চলে। ওরা তুটোই সমান।

"তা চলবে না? ওই যে মুখোমুখী ঝগড়া—সেটাও অনুরাগের আর এক স্তর; পরীক্ষা বুঝলে? যুগে, যুগে, স্ত্রী-পুরুষে এই খেলা, এই পরীক্ষা চলেই আস্‌ছে! না হলে, অত বড় প্রেমিক যে শ্রীকৃষ্ণ, তাঁকেও শ্রীরাধিকা এই পরীক্ষা থেকে রেহাই দেননি। সামান্য মানুষের মত তাঁদেরও এই মান-অভিমানের পালা, যুগ-যুগান্ত ধরে চলেছিল। আর তারই ফলে, মান-ভঞ্জন মাথুর, যুগল-মিলন, প্রভৃতির সৃষ্টি। সেই জন্যেই এগুলোর আদর জনসমাজে এত বেশী। তোমাদের অন্ত পাওয়া ভার! কথায় আছে "স্ত্রীণাম্ চরিত্র……দেবতারাও বুঝে উঠতে পারেন না, তা মানুষ! চলো, শুইগে—পরের বৌএর কথা জেনে আমার লাভ নেই; আমি আমার নিজের নিয়েই সন্তুষ্ট!"

সকাল বেলা জানলার খড়খড়ি খোলা দেখে নন্দা একটু আশ্চর্য্য হল; ভাব্‌লে খোলাই কি ছিল? নাঃ! সে তো সব দেখে, জানলার ছিট্‌কিনি লাগিয়ে শুয়েছিল বলেই মনে হচ্ছে—কিন্তু খোলা হল কেমন করে? প্রণব তখনও ওঠেনি। নীচু হয়ে তার কাণের কাছে মুখ নিয়ে, নন্দা বললে "এই! শোন। আঃ ঘুম যে তোমার ভাঙেই না!—"

কোনরকমে চোখ তুটো ফাঁক করে, নন্দার নীচু হয়ে আসা মুখখানাকে, হাত বাড়িয়ে ঘাড়ের ওপর দিয়ে হাত চালিয়ে দিয়ে নিজের মুখখানার ওপর চেপে ধরে বল্‌লে "আর! তুমি যে 'দিক্' করছ—ঘুমোবার যো'ই নেই। রাত থাক্‌তে উঠে পালানো হচ্ছে কোথায়? এখন যেতে পাচ্ছ না।"

"আঃ! শোনই না একটা কথা আমার! খড়খড়িটা খুল্‌লে কে? তুমি উঠেছিলে নাকি রাত্তিরে?" এইবার প্রণবের ঘুম ছুটে গেল। উঠে বসে চোখ রগ্‌ড়ে বল্‌লে "না, আমি তো উঠিনি। কালরাত্রে যে ঝগড়া করেছ হয়তো মাথা গরম হয়ে উঠেছিল বলে, তুমিই খুলে দিয়েছ।"

"না, না, আমি খুলিনি। দেখি তো খোঁজ নিয়ে।" বলে নন্দা বের হয়ে গেল। প্রণব আর একবার ঘুমোবার চেষ্টা করলে।

বাইরে এসে নন্দা দেখলে, মীনা উঠেছে কখন তার স্নানও হয়ে গেছে। দেখে সে শ্বশুরের ঘরে গিয়ে হাজির হল। সেখানে করবার অনেক কিছুই ছিল। মুখ-ধোওয়া, বিছানা-ঝাড়া, ঔষধ-দেওয়া প্রভৃতি শেষ করে, সেও স্নান করতে গেল। যাবার সময় দেখলে রান্না ঘরের বারান্দায় একটা 'মোড়া' পেতে প্রণব হালুয়া ও চা খাচ্ছে। তাকে দেখে সে বললে, "শোন শোন, তোমার 'জানলা-রহস্য' প্রকাশিত হয়েছে। বৌদির মনে এই সন্দিচ্ছাটা জেগেছিল, বুঝলে আমি গোড়া থেকেই জান্‌তাম।"

মীনা বল্‌লে, "দেখছিলাম, আপনাদের ঝগড়া-ঝাঁটি মৌখিক না, আন্তরিক?—আর শুধু আমিই দেখিনি—"

বাধা দিয়ে প্রণব বল্‌লে, "দাদাকেও দেখিয়েছেন তো? সাধু! ঘরে ঢুকলেন না কেন? যে ঝগড়াটী! ওই তো যত নষ্টের গোড়া! বেশ হয়েছে দেখেছেন।"

নন্দার হাসি এল, তবুও ঝগড়া করার জন্যে তার মুখটা চুলকে উঠলো—কিন্তু নেহাৎ সকাল বেলা আর মীনা রয়েছে সামনে, তাই কিছু না বলে সে স্নান করতেই গেল।

ক্রমশঃ

খেয়ালি-ভ্রমণ

শ্রীনির্ম্মল মিত্র

লেখক

পূজার ছুটিতে একদিন বাবা বল্লেন যেখানে হ'ক বেড়িয়ে আসতে। আমিত তাহাই চাই একেবারে লাফিয়ে উঠলাম। অবশেষে ঠিক হ'ল যে কার্সিয়ংএই যাওয়া হবে। যথাসময়ে দার্জ্জিলিং-মেলে গিয়ে উঠলাম। ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল। ঠিক হল—এডভ্যাঞ্চার করা যাবে। প্রথম দিন পাহাড়ের উপরে (কার্শিয়ং হতে ২০০০ ফুট উচ্চ) ১টী চমৎকার বাংলো এবং বাগান দেখতে যাওয়া হল। অনেক কষ্টে প্রায়

রেল পথ

৮টার সময় সিলিগুড়িতে পৌছলাম। তারপর মোটরে করে একেবারে কার্শিয়ং। আমিও আমার সঙ্গে একজন চাকর গিয়েছিল। ওঃ কি আরাম। একেবারে স্বাধীন। যখন তখন যেখানে ইচ্ছা যাই। কিছুদিন পরে কাছাকাছি বাগানগুলির উপর অরুচি ধরে গেল। বেশীদিন এরকম থাকতে হল না, ওখানকারই একদল ৩।৪ ঘণ্টা ধরে উঠলাম। অবশ্য উঠে কষ্টের পুরস্কার স্বরূপ দৃশ্য যা দেখলাম তা অবর্ণনীয়। তার মধ্যে সহরের দৃশ্যই প্রধান।

তারপর পথ কমাবার জন্য জঙ্গলের ভিতর দিয়ে নামতে লাগলুম এবং প্রায় ৩।৪ বার আছাড় খেয়ে কোন রকমে আমরা সন্ধ্যার সময় সহরে এসে পৌছিলাম।

ওখানে তখন বেশই শীত ছিল এবং কোন পাঠককে বলে দিতে হবে না যে ভোরবেলাটা লেপ গায়ে দিয়ে ৮টা অবধি পড়ে থাকতে মন্দ লাগত না।

কিছুদিন এমনি কাটতে লাগল। তারপর একদিন রাস্তা দিয়ে যেতে পারবে না বলে সাধারণ রাস্তা দিয়ে গেল। আমাদের মধ্যে যার পা কিছু জখম হবে সেই ঘোড়ায় চড়ে আসতে পারবে। যাবার সময় চড়বে না। এই কথাই ওদের সঙ্গে হয়েছিল। রাস্তা কম করতে

সিংবালী

ঠিক করা হল যে, সহর হতে প্রায় ৪০০০ ফুট এবং রাস্তা দিয়ে প্রায় ৫ মাইল পথ নীচে "সিংবালী" বলে একটা নদীতে পিক্‌নিক্ করতে যেতে হবে আর সঙ্গে সঙ্গে তার উপর দিয়ে একটা ঝোলা পোলও দেখা যাবে! তারপর গিয়ে যা এক একজনের দুর্দ্দশা হল, তাও বর্ণনা করতে হাসতে হাসতে দম আট্‌কিয়ে যাবে। মাঝে মাঝে অবশ্য ভাল রাস্তা পাওয়া যাচ্ছিল, কিন্তু আবার তারপর মিল ছিল তা পার হবার সময় হাত দিয়ে পথের দুই পাশের

কাঞ্চন-জঙ্ঘা
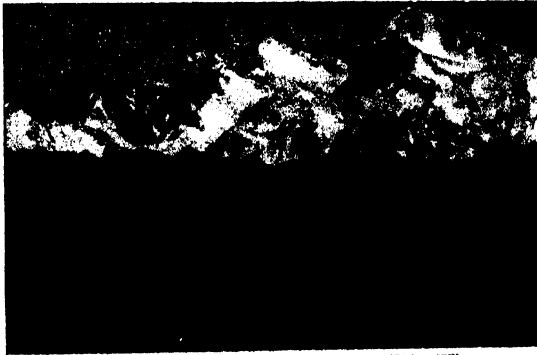
দিন বেলা প্রায় ১১টার সময় আমরা প্রায় ১০ জন ৫টা ঘোড়ায় পিক্‌নিকের সুস্বাদু জিনিষ সব নিয়ে রওনা হওয়া গেল।

ঘোটক প্রবরেরা এবং তাদের রক্ষকেরা খারাপ পাথর ধরে ধরে নামতে হচ্ছিল। যখন প্রায় ২০০০ ফিট নেমেছি তখন উপরের দিকে চেয়ে দেখি কি চমৎকার দৃশ্য। সহরটা এত চমৎকার, এত সুন্দর দেখাচ্ছিল। প্রথমত এখানের সব বাড়ীগুলি সার্সির এবং উপরে টিনের

দ, কি ধনী, কি দরিদ্র সব সমান। উপর দিকে চেয়ে ছি নীচে হাসি শুনে দেখি যে আমাদেরই (বুলু নামক) শ রোগা গোছের এক সহচর এতক্ষণ অতিকষ্টে তাঁর

দার্জ্জিলিং এর দৃশ্য

রীরটা নিয়ে নামতে নামতে হঠাৎ কিসে লেগে ড়াগড়ি দিচ্ছেন।

আমাদের হাসি দেখে সে ত একদম রেগেই অস্থির, । হক তাকে ত কোন রকমে তোলা হল। সে

কাঞ্চন জঙ্ঘার তুষার দৃশ্য

তখন রেগে খোঁড়াতে খোঁড়াতে আমাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলতে লাগল। অতিকষ্টে বেলা প্রায় ৩টার সময় 'সিংবালী'তে গিয়ে পৌঁছলাম। সিংবালীকে নদী বলে বটে কিন্তু আমাদের জলপ্রপাত বলে ভ্রম হয়েছিল। জুতা খুলে দড়ির পোলের উপর গিয়ে বসলুম তখন আমার সেই নদীর প্রকাণ্ড ঢেউ দেখে প্রতি মুহূর্ত্তে মনে হচ্ছিল যে এখনই বুঝি একটী ঢেউয়ে পোলটী ভেঙে ভাসিয়ে নিয়ে যায়।

আমরা সকলে আধ ঘণ্টার মধ্যেই চা, কেক্, স্যাণ্ডুইচ প্রভৃতি আমাদের নেতা অজিত ঘোষ এবং আমাদের কাছে ফুলু বাবু বলে পরিচিত ভদ্রলোকটীর সৌজন্যে খেয়েই উঠে পড়া গেল। সব ঘোড়ারই একটী করে খদ্দের ছিল বলে, আমি ওখানেই আর একটা ঘোড়া

ভাড়া করলুম, এবং তাতে চড়ে সকলের আগেই অজানা পথে বেরিয়ে পড়লাম। কারণ' ঘোড়ার রাস্তা আলাদা।

কিছু দূর যাবার পর পিছু হতে একজন আমায়

কাসিয়ান হইতে কাঞ্চন-জঙ্ঘা

ডাকলে। আমি ঘোড়ার রাশটা হঠাৎ টানতে ঘোড়া ভয় পেয়ে রাস্তার কিনারায় পা দিতে সেখানে মাটী ঘোড়ার সামনের ৩টী পা সুদ্ধ ধ্বসে গেল, আমি চোখ বুজে রাশ টেনে পিছু হটবার কৌশল করলাম। মুহূর্ত্ত পরে
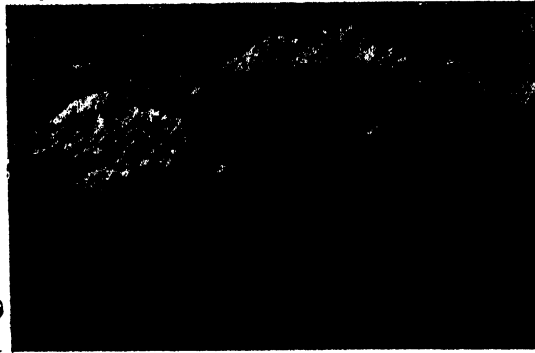
ঝড়ের রাতে

দেখি ঈশ্বরের দয়ায় ঘোড়া উপরে উঠে এসেছে। যে পিছু ডেকেছিলো তার উপর তখন আমার ভয়ানক রাগ হয়েছিল সেইজন্য তার কথা না শুনেই আবার অজানা পথে আরও দৌড় দিলাম। তারপর কোনরকমে আন্দাজে এবং পাহাড়িদের জিজ্ঞাসা করতে করতে প্রায় ৭॥০ টার সময় কার্সিয়ং সহরে পৌছলাম। আমরা গিয়েছিলাম দলবেঁধে কিন্তু ফিরবার সময় প্রতিযোগিতার জন্য সকলেই আলাদা এসেছিল—কেউ পরে, কেউ বা আগে, যা হক যা খাওয়াটা খেয়ে ছিলাম আমি নিজেই আশ্চর্য্য হয়েছিলাম।

তারপরে কাঞ্চনজঙ্ঘা এবং সূর্য্য অস্ত [illegible] হতে উঠেই দেখি, উত্তর দিকে সাদা এবং [illegible] আভাযুক্ত প্রায় ৪।৫টি শৃঙ্গ, তাহা [illegible]

রং বদলাচ্ছে। খানিক পরে (Fog) কুয়াসায় সব ঢেকে গেল। এখানে কুয়াসা লেগেই রয়েছে। আবার সেই একঘেয়ে জীবন—কিছুদিন পরে ঠিক হল যে, এইবার একেবারে সব হতে শ্রেষ্ঠ "টাইগারহিল" দেখতে যাওয়া যাবে। দার্জ্জিলিং ৬০০০ ফুট উঁচু এবং তার হতে "ঘুম" (Ghum) ৮০০০ ফুট উঁচু এবং টাইগার হিল এর চেয়েও ২০০০ ফুট উঁচু। "ঘুমে" অগষ্টের মাঝামাঝি হতেই বরফ পড়তে আরম্ভ করে এবং প্রায় ফেব্রুয়ারীর শেষে বরফ পড়া থামে। এখানে ভয়ানক ঠাণ্ডা। যাহক,

ঘুম

ঠাণ্ডা ভয় করলে ত চলবে না। আমাদের যাওয়া ঠিক হল। আমরা প্রায় ৬জন মিলে কার্সিয়ং হতে মোটরে করে সন্ধ্যা ৭টার সময় দার্জ্জিলিং এসে পৌছলাম। এবার মিষ্টার, এ, কে, ঘোষের ঘাড় ভেঙ্গে Central-Hotel এসে উঠলাম, অবশ্য এবার আমি ছাড়া সবই Ghosh familyএর মধ্যে, যাহক ওখানে ঠিক হল ওঁদের আত্মীয়ের মধ্যে ৩ জন যাবেন। রাত ঠিক ১৷৷০ টার সময় উঠে সব জামা গায়ের উপর চড়িয়ে নেওয়া গেল। ২" ইঞ্চি পুরু দস্তানা। মোটারে উঠতে গেলাম; দেখলাম যে আমাদের দলে সব শুদ্ধ নয় জন।

এই কজনে মিলে প্রায় রাত ২৷৷০ টার সময় "ঘুম" পৌছলাম।

আমি ঘোড়া নিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু যিনি আমাদের হর্ত্তা-কর্ত্তা হুহুবাবু তিনি অনুমতি দিলেন না। কারণ বনের মধ্যে দিয়ে রাস্তা এবং সরু, অন্ধকার, একপাশে খাড়া পাহাড় আর একপাশে অতল গভীর খাদ। প্রায় রাত ৩টার সময় মনের আনন্দে খানিকটা খুব তাড়াতাড়ি উঠলাম কিন্তু তারপর একটু কষ্ট হতে লাগল। যদিও মুখে আস্ফালন দেখাচ্ছিলাম কিন্তু ঠাণ্ডার ভয়ে হার মানতে চাইছিলাম না। অনেক কষ্টে ভোর ৫ টার সময় একেবারে টাইগার হিলে গিয়ে পৌছলাম। পথে আমি একটু হাঁপিয়ে ছিলাম বলে সকলে আমাকে ভয়ানক ভাবে ঠাট্টা করছিল।

উঠতে খুব বেশী কষ্ট হয় নাই কারণ খুব ঠাণ্ডা ছিল। টাইগার হিলে তখন ৩০° টেম্পারেচার—ভয়ানক শীত। মাথার উপর একটী বিশ্রাম কুঠীর (Rest-house) ছিল। তার ছাদে উঠে পশ্চিম দিকে দুইটী পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে দুইটি অতি মনোরম তুষার শৃঙ্গ দেখা যাচ্ছিল, জিজ্ঞাসা করে জানলাম যে, তাহাই পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্ব উচ্চ শৃঙ্গ গৌরীশঙ্কর, উত্তরে প্রকাণ্ড তুষারের উপর সবুজ রংয়ের ছোপ দেওয়া কাঞ্চনজঙ্ঘা অতি মনোরম। মানুষ সব সময়েই দুর্ব্বল সেইজন্য সেই প্রাকৃতিক অতি মনোরম ও আশ্চর্য্য দৃশ্য ভাষার দ্বারা প্রকাশ হয় না।

সূর্য্য উঠবার সময় হল, অমনি পূর্ব্বাকাশ প্রথমবারে সবুজ, দ্বিতীয়বারে নীল ও পরক্ষণেই হল্‌দে হয়ে উঠল।

তারপর প্রায় দশ মিনিট পরে দুই পাশ দিয়ে সবুজ আভা, তার উপরে নীল রংয়ের আভা, তার উপরে হলদে রংয়ের আভা যেন লাল সূর্য্য হতে ছিটকিয়ে পড়ছিল।

কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে দেখি লাল, নীল প্রভৃতি রংও আর নেই তখন সাধারণ সূর্য্যের মতই সাদা। যখন সূর্য্য সাদা হয়ে তার রাগ দেখালে তখন তুষার বৃষ্টির ভয়ে ভয়ে, থেমে গেল। তখন চারিদিকে চেয়ে দেখলাম যে, সব একেবারে পরিষ্কার হয়ে গেছে এবং উত্তরে নেপাল রাজ্যের সীমানা দেখা যাচ্ছিল।

টাইগার-হিল রেষ্ট হাউস্

ডানদিক হইতে :—

মিষ্টার কালী ঘোষ, মিঃ এ, ঘোষ, মিস্ বেলা ঘোষ,
মিঃ বুলু ঘোষ, মিসেস্ ঘোষ, মাষ্টার বট্টল্, মিঃ ঘোষ,
মিঃ এ, কে, ঘোষ, (তুহু বাবু) মিঃ এস্, পি, চৌধুরী।

এই সব রংয়ের মাঝখানে হঠাৎ খানিকটা লাল আগুন দাউ দাউ করে জলে উঠলো। একটুখানি পরে ছোট্ট একটি লাল বল হয়ে পূর্ব্বদিক লালে লাল করে দিলে।

তখন দুই একজন লোক পিছন হ'তে চীৎকার করে উঠল "কি সুন্দর, কি সুন্দর" পিছন ফিরে দেখি যে, কাঞ্চনজঙ্ঘার রং বদলে গেছে। সবুজ রং আর নেই, লাল সূর্য্য তাকেও একদম লাল করে দিয়েছে।

যাহক সব মন ভরে দেখে এবং একটু রোদে চাঙ্গা হয়ে নামতে লাগলাম। প্রায় ছুটেই আমাদের নামতে হচ্ছিল কারণ রাস্তা খুব ঢালু। ঘণ্টা খানেকের মধ্যে ঘুমে (Ghum) পৌছিলাম, তারপর মোটরে করে "ঘুম-বিহারে" (Ghum-monastry), প্রকাণ্ড প্রায় একতলা সমান পিতলের বুদ্ধদেব দেখে আবার দার্জ্জিলিংয়ে ফিরে গেলাম। তারপর ১০॥০টার সময় ছোট হাজরি খেয়ে একদম কার্সিয়ং পৌছলাম।

মেঘনাবক্ষে

শ্রীগোষ্ঠবিহারী ভঞ্জ

কর্ম্মরঙ্গে পূর্ব্ববঙ্গে মেঘনা-অঙ্গে ভাসি,
বাহিয়া তরণী চলেছি ঠেলিয়া ফেনিল উর্ম্মি-রাশি।
জলময় শুধু চারিদিক ধূ ধূ দুরু দুরু কাঁপে প্রাণ,
শুনা যায় দূরে শুধু মিঠে সুরে অচেনা মাঝির গান।
গ্রামের নিশানা ছাড়িয়া অজানা কালতরঙ্গে নাচি,
ভাবি ভগবান যায় বুঝি প্রাণ বুঝি আর নাহি বাঁচি।
ছাড়ি ঘর দ্বার স্নেহ সবাকার জন-কোলাহল দেশ,
আসিলাম কোথা অতল শয়নে করিতে জীবন শেষ।
ছুটিতেছে জল কল কল কল ঢল ঢল চারিদিক্
অকূল অপার, আকুল নয়নে চেয়ে আছি অনিমিখ

০ ০ ০ ০

দূর অম্বরে ডুবে ধীরে রবি বুকের শোণিত ঢালি।
মসি-বাসে নিশি ধীরে ধীরে আসে তারার দীপালি
জ্বালি।

ডাকিয়া উড়িল অযুত হংস চারিদিকে কলনাদে,
সন্ধ্যা তারাটি মিটি মিটি হাসে রজত রূপের ছাঁদে।
আড়ে উঁকি দিয়া প্রতীচি গগনে একটি মেঘের বালা,
চমকি চমকি হাসিয়া উঠিল হানি কটাক্ষ জ্বালা।

০ ০ ০ ০

কে তুমি রূপসী মরম পরশি ধরিয়াছ একি গান,
হের তোমা পানে ছুটে যায় মোর ক্ষুদ্র তরণী খান।
তোমা পানে চেয়ে পশুভূমি বলি মনে হয় এই ধরা
ঐ কি কবির কল্পভুবন সোনার স্বপনে গড়া?
অন্তর মোর ব্যাকুল বিভোর যাইবারে ঐ দেশে,
তুলিয়া কি মোরে লইবে হে দেবী কৃপায় মধুর হেসে।
শিখরে শিখরে ভ্রমিয়া ওপারে হেরিব নিখিল ভুলি
চির বাসনার কল্পনালোকে মাখিব স্বর্ণ ধূলি।
এপারের সব স্রোতে ভেসে যাক্ নেমে যাক সব ভার,
ওপারের ঐ স্বপ্নরাজ্যে ঠাঁই হোক্ অভাগার।

হাঁসপাতালে

শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

খোলা জানালার ধারে শুয়ে' আছি, হাঁসপাতাল—
বাহিরে বাতাস, করে মাতামাতি, বাস-মাতাল;
বাহিরের বনে, কোথায় ফুটেছে, কৃষ্ণকলি—
অবুঝ বেদনা বুকে বাজে তার, কিছু না বলি!
বাহিরের গাঙে জোয়ার জেগেছে, কি কল্লোল!
ভিতরে জীবন মরণ-দোলায় খেলিছে দোল্!

বাহিরের পথে জ্বলে রোশনাই, বিবাহ চলে—
ভিতরে তাহার ছায়া এসে পড়ে, প্রাচীর তলে!
বাহিরে সানাই, কাঁদে উভরায়, আর্ত্তস্বরে;
ভিতরে তাহার ক্ষীণ রেশ আসে ক্ষণেক তরে!
বাহিরে জীবন আছে বহমান আদিম খাতে—
ভিতরে মরণ আনাচে কানাচে আঁচল পাতে!

এই চির-পাতা শয্যা-বধূর বুকেতে শুয়ে';
দীর্ঘ ছ'মাস পাড়ি দিয়ে দিনু, একে ও ছু'য়ে!
কোন দিন রোগ কমে এক চুল, কখনো বাড়ে—
এ পোড়া অসুখ ভালবেসে মোর গলা না ছাড়ে!
তিতা-মিঠা-কড়া নানান্ স্বাদের, ওষুধ পিয়ে'—
ত্যক্ত পরাণে, চেয়ে চেয়ে থাকি, জানালা দিয়ে;—

ভিতর উঠানে কালো করোগেট্ ছাউনী ঘেরা,
বিসূচিকা রোগে যারা সারা হয় তাদের ডেরা!
তার বাম দিকে, বারাণ্ডা দে'য়া রঙীন ঘরে,
যক্ষ্মা রোগীরা ধুঁকে ধুঁকে মরে পুরান' জ্বরে!
আর ঐ দূরে জ্বাল্‌তি টাঙান' ঘরের সারি—
পচে তা'তে মরা ওয়ারীশ-হারা পুরুষ-নারী!

এ হাঁসপাতালে শুয়ে থাকি, আর একলা ভাবি—
সারাটা জীবনই মিটায়েছি খালি রোগের দাবী!
ওষুধ পথ্য খাওয়ায় কেহ, আদর করি;
কেহ বা ক'রেছে অস্ত্রোপচার, ছুরিকা ধরি!
বহু ক্ষত গেছে নিরাময় হ'য়ে, র'য়েছে দাগ—
বহু ব্যথা আছে, গিঁঠাতে গিঁঠাতে, জড়ায়ে পাক!

মস্ত বিছানা বিছান' র'য়েছে আকাশ তলে,
উপরে আশার আসমানী দীপ ঝিমায়ে জ্বলে!
উৎসুক চোখে, চেয়ে চেয়ে দেখি, সমুখে পাছে—
ভরা-বেদনার জলে রোশনাই, সানাই বাজে;
আজিকার ব্যাধি সেরে যেতে পারে, হাঁসপাতালে
জীবনের ব্যাধি সারিবার নয় জীবন-কালে!

চীন জাপান সংঘর্ষ

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

ছয়
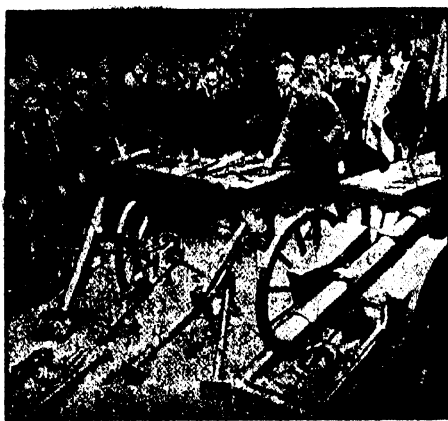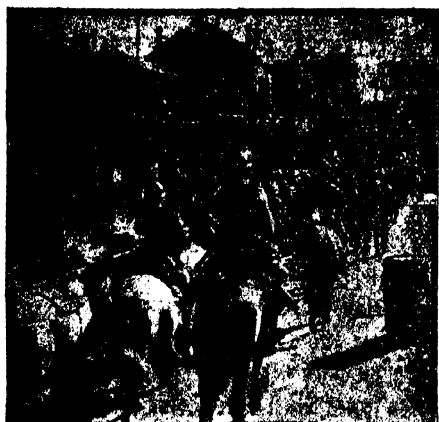
পৃথা আসিয়াছে। তাহার বয়স প্রায় সুরমার মত। মুখে একটা হাসি সর্ব্বদা লাগিয়া আছে। তাহার সুখ-দুঃখ কিছু বুঝা যায় না, মনে যাহাই থাকুক সে যেন সব কিছুই ঢাকিয়া রাখিতে চায় একটা চঞ্চল হাসির আবরণে। সুরমা ভাবিল—ভাই বোনের ভিতর আত্ম-গোপনের ক্ষমতা চমৎকার, পার্থক্য শুধু, একজনের মুখোস গাম্ভীর্য্য, ও আর একজনের উদ্দামতা। তবু পৃথাকে তাহার ভাল লাগিল।

পৃথা আসিবার পর হইতে সুরমার তত্ত্বাবধানের মাত্রা বাড়িয়া গেল, পৃথা করিত শুধু যে কর্ত্তব্যের খাতিরে তাহা নহে, তার ভিতর স্পষ্ট একটা যেন আন্তরিকতার ইঙ্গিত উৎফুল্ল হইয়া ফুটিয়া উঠিত, স্নেহ ভালবাসার শতদল মেলিয়া। কিন্তু সুরমা দেখিল রাজীব যেন আবার তাহার নিকট হইতে অনেক দূরে সরিয়া গেল, সে যেন এত দিন কলের পুতুলের মত শুধু একটা কর্ত্তব্য করিয়া যাইতেছিল মাত্র, তাই আজ সে তাহার এই কর্ত্তব্যের ভার অন্যের হাতে ছাড়িয়া দিয়া বেশ নিশ্চিন্ত হইয়া সরিয়া দাঁড়াইল, স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া। সুরমা সব লক্ষ্য করিয়া শুধু অন্তরে গুমরিয়া মরিয়া নিজেকে শত ধিক্কার দিল। তবে সে কি স্বামীর শুধু কর্ত্তব্যের আড়ম্বরটাকে অন্তরের কোমলতা বলিয়া ভুল করিয়াছে? তাহা হইলে রাজীব তাহার কাজ করিয়াছে মাত্র আর কিছু না?

সুরমা ছোট বাড়ীতে পৃথাকে লইয়া পূর্ব্ব ব্যাবস্থামত রহিল। সেইজন্য রাজীবের সঙ্গে আগে কিছু সম্পর্ক থাকিলেও তাহাও এখন একেবারে কাটিয়া গেল, সেইজন্য পৃথা আসাতে সে মনে মনে আনন্দের সহিত একটু ক্ষুণ্ণও হইয়া উঠিল!

পৃথা অত্যন্ত চটপটে, সৌখীন এবং আদব-কায়দা দুরস্ত। তার উপর সে দুই সন্তানের মা বলিয়া নিজেকে সাংসারিক বিষয়ে অনেকটা বিজ্ঞ মনে করিয়া মাঝে মাঝে উপদেশ দিয়া সুরমাকে ব্যস্ত করিয়া তুলিত। তার উপর তাহার ছিল আত্মম্ভরিতা এবং বংশগৌরবের অহঙ্কার অত্যন্ত প্রবল। সেই অহঙ্কারের সঙ্গে পাশাপাশি ছিল তাহার সমস্ত পৃথিবীর উপর সংসারের উপর একটা দারুণ তাচ্ছিল্যের ভাব। সে যেন চলিত সমস্ত কিছুকেই অবজ্ঞা করিয়া, বিদ্রূপ করিয়া। এবং সুরমা আশ্চর্য্য হইয়া দেখিত তাহার গুণও যথেষ্ট আছে। জুতা সেলাই হইতে চণ্ডীপাঠ, অথবা রান্নাঘর হইতে ড্রইং রুমের উপযুক্ত ছিল সত্যই সে। সে বলিত—"সবই করবো। ডান্সও করবো, পূজোও করবো, কোন কিছুতে পেছ পা হব না। অথবা কেউ যে আমাকে একটা জিনিস শিখিয়ে দিয়ে যাবে সেটা হচ্ছে না।"

পৃথার স্বামী একজন নামজাদা ব্যারিষ্টার কিন্তু সে ব্যারিষ্টারী না করিয়া বম্বেতে মস্ত বড় কারবার খুলিয়া বসিয়াছিল, পৃথাও সেইখানে থাকে। তাহার মেয়েটী বড়, বছর তিনেকের এবং ছেলেটীর বয়স সবে মাত্র এক।

নেহাৎ কোন নিমন্ত্রণ, সম্মিলনী অথবা কোন বন্ধু-বান্ধবের বাড়ী যাইতে না হইলে পৃথা আসিবার আগে সুরমা রোজ বেড়াইতে যাইত না। এ বিষয়ে রাজীব অনেক দিন তাহাকে বলিয়াছে, কিন্তু সে যায় নাই, সে বলিত—"ও কতকগুলো ধুলো খাওয়ার চেয়ে বই নিয়ে বসে থাকা ভাল—" কিন্তু পৃথা আসিয়া রোজ তাহাকে ধরিয়া

লইয়া যাইতে লাগিল। সে বলিত—"রোজ একটুখানি fresh air না নিলে অনিষ্ট হবে বৌদি। রোজ একটু বেড়ানো ভাল—" পৃথার কিন্তু 'একটু' মানে তিন চার ঘণ্টা। তার ভিতর সে অন্ততঃ চার পাঁচটী দোকানে যাইত, বন্ধু-বান্ধবের বাড়ী যাইত এবং কলিকাতার বড় বড় রাস্তা চষিয়া বাড়ী ফিরিত। তাহার নিত্য নূতন সাজ, নিত্য নূতন সাড়ীর বাহার,—সুরমা মনে মনে ভাবিত, পৃথার স্বামী বেচারাকে বোধহয় রোজগারের অর্দ্ধেকের বেশী দিতে হয় পৃথার সাড়ী ও গহনার পিছনে। সুরমা যদি একটু অন্য রকম সাড়ী পরিয়াছে তাহা হইলে আর রক্ষা নাই, সে আলমারী খুলিয়া সাড়ী ছাড়াইয়া তবে ছাড়িবে। তাহার সঙ্গে পড়িয়া সুরমাও কতকগুলি নূতন সাড়ী তৈয়ারী করাইয়া লইল। ইহার ভিতর অনেকগুলি পার্টি ও মিটিংএ তাহাদের যোগ দিতে হইয়াছিল, সে দেখিল কলিকাতার সম্ভ্রান্ত সমাজে পৃথা যথেষ্ট পরিচিতা এবং তাহার ইয়োরোপীয়ান বন্ধুও যথেষ্ট।

পৃথা টাকা খরচ করিত জলের মত। কলিকাতায় আসিয়া সে বড় বড় কোন দোকানই বাদ দিল না। সুরমা একদিন তাহাকে বিরাট ভাবে বাজারের পর হিসাব করিতে দেখিয়া বলিল—"এক সঙ্গে দশ জোড়া জুতো কি করবে পৃথা ?"

পৃথা তাচ্ছিল্যভাবে হাসিয়া বলিল—"দশ জোড়া ? ওতে কি হবে ? সব টাকা ফুরিয়ে গেল কিনতে পারলুম না, সব নতুন সাড়ীগুলোর সঙ্গে ম্যাচ ক'রে কিনেছি, সামনে কতগুলো বড় বড় dance, dinner আছে—"পৃথা আঙুলে বুঝি ডান্‌স ও ডিনারের সংখ্যা গণিয়া বলিল—"ওঃ দশ জোড়া জুতোয় হবে না তো, আরো চার জোড়া চাই যে শুধু এই season এর জন্য। গত বছরের cloakগুলো out of fashion হ'য়ে গেছে, এবারে cloak অন্ততঃ—, উঃ অনেক কিছু বাকী রয়ে গেছে যে, কালকেই একটা dance আছে Firpoতে,—বৌদি telegram form আছে ?

সুরমা হাসিয়া বলিল—"হঠাৎ একেবারে লাফিয়ে উঠে telegram form খুঁজছ কেন ?"

"খুঁজছি একটা wire দেবো বোম্বেতে।"

"কেন, কিসের জন্য ?"

"টাকা,—টাকা—বৌদি—"

"রক্ষে কর, টাকার জন্য নাই বা এতদূর থেকে wire করলে, মিঃ মিটার কি মনে করবেন ? তার চেয়ে আমার কাছ থেকে নাও এখন—"

পৃথা বলিল—"নাঃ, আচ্ছা এখন তুমিই দিয়ে দাও,—কিন্তু telegramটা দিয়ে দি।"

নিত্য বন্ধু সমাগমে, রাজীবের নীরব বাড়ীটী আনন্দ কোলাহলে মুখরিত হইয়া উঠিল। পৃথার তরল হাসিতে ভরপুর হইয়া তাহা যেন নব জীবনে সঞ্জীবিত হইয়া সমস্ত বিষণ্ণতা দূরে সরাইয়া দিয়া নূতন আনন্দে মাতিয়া উঠিল। পৃথা গভর্ণমেণ্ট হাউসে ডান্‌সে গেল, ডিনারে গেল, ইভিনিং পার্টিতে গেল, তার উপর ফিরপো এবং গ্র্যাণ্ডহোটেলের কোন 'বলে'ই সে অনুপস্থিত রহিল না। এত সাজ-গোজের বাহুল্যের ভিতর সুরমার অত্যন্ত ভাল লাগিত পৃথার নির্ব্বিকার এ লামেলো ভাবটী। তাহার স্বভাব-সুন্দর দেহের সৌন্দর্য্য ফুটাইয়া তুলিতে কোন রকম কৃত্রিমতার আশ্রয় সে নেয় না। বহুমূল্য সাড়ী গহনায় যেন সে অভ্যাসের বশেই সাজে, কিসে তাহাকে কেমন দেখাইতেছে এ নিয়া সে কখনো মাথা ঘামায় না। হয়ত মূল্যবান পোষাকে সাজিয়া সুরমার মুখের কাছে দুধের পেয়ালা তুলিয়া ধরিতেছে, অথবা ছেলেটাকে কোলে লইয়া আদর করিতে বসিয়াছে—সে বিষয়ে ভ্রুক্ষেপ নাই

পৃথার সঙ্গে ঘুরিয় ঘুরিয়া সেদিন সুরমা ক্লান্ত হইয়া সন্ধ্যার পরে বাড়ীতেই বসিয়াছিল,—আর পৃথা তাহাকে ভালো করিয়া খাইবার উপদেশ দিয়া এক ইয়োরোপীয়ান বন্ধুর বাড়ীতে ডিনারে গিয়াছিল। রাজীবও বাড়ী ছিল না। সুরমা পৃথার মেয়েকে লইয়া খানিকক্ষণ গল্প করিল—ছেলেকে লইয়া খেলিল—তারপরে তাহার নারীশিক্ষা সমিতির কতকগুলি কাগজ দেখিতেছিল, এমন সময় কণিকা আসিয়া উপস্থিত হইল, বলিল—"সুরো, ক'দিন আসতে পারিনি কেমন আছিস ?"

"আছি ভালই, ক'দিন আমিও খোঁজ নিতে পারিনি, পৃথা ঘুরিয়ে মেরেছে—"

"পৃথা—তোর ননদ ঐ উনি বুঝি মিসেস মিটার ?"

"হ্যাঁ—"

"বাবা ! তোর ননদের যে প্রবল প্রতাপ "

কদিন ধরে যেখানে যাচ্ছি—মিসেস্ মিটারের নাম শুনছি—

"হ্যাঁ ও খুব popular"

"কোথায় গেছেন ?"

"Dinner এ। কখন আসবে কে জানে।"

কণিকা বলিল—শোন, সেদিন কি যে গল্প করে এলি, ওদিকে একজন রোজই তোর কথা জিগেস ক'রে ক'রে অতিষ্ঠ ক'রে তুলেছে।—আমার ওদিকে যাস না যে বড় ?

সুরমা লজ্জিত হইয়া বলিল—"কে ?"

"কে আবার—আমার কর্তাটি,—দিনের ভিতর বেশীর ভাগ তোরই কথা হয়—

সুরমা কৌতুক ভরে বলিল—"কি রকম ?"

ও সে কি প্রশংসা—! নারী স্বভাব-সুলভ মাধুর্য্য নাকি তোতে একেবারে সাংঘাতিক ভাবে বিদ্যমান। সঙ্গে culture, education তো আছেই ! আরে—ভাল কথা—তোর বিজয় মুখার্জ্জিকে মনে আছে ?"

সুরমা ভাবিবার চেষ্টা করিয়া বলিল—"কে ভাই ? কই মনে পড়ছে না তো !"

"আরে মনে নেই, সেই যে একেবারে ছেলেবেলা তো স্কুলে পড়তই তারপরেও আমাদের বাড়ীর পাশে কিছুদিন ছিল, সেই যে আমরা একসঙ্গে খেলতুম। সে এখন মস্ত বড় "দেশভক্ত"। সেদিন দেখা হ'ল মিটিংএ। তোর কথা বলতেই বললো 'মনে আছে বই কি' তারপরে আরো অনেক কথা জিজ্ঞেস করলো। কেমন আছিস ইত্যাদি—তোর স্ত্রীশিক্ষার জন্য এত উদ্যম চেষ্টা সবই খুব প্রশংসা করলো—"

সুরমা বলিল "হ্যাঁ রে মনে পড়েছে, বড্ড ভাল লাগতো আমার তাকে। একদিন নিয়ে আসিস—" কণিকাকে উঠিতে দেখিয়া বলিল—"বোস্ না আর একটু—"

"না ভাই, অনেকক্ষণ বেরিয়েছি। আজ চলি ? আসিস আমার ওখানে কাল, নইলে কর্ত্তাটি হয়তো এখানে ছুটে আসবে।"

সুরমা একটু আরক্ত হইয়া বলিল "তুই আটকাতে পারিস্ না ? এই বুঝি তোর equality ?'

কণিকা হাসিয়া বলিল—"আরে মাঝে মাঝে ছেড়ে দিয়ে দেখতে হয় ওরা কতদূর যায়—তারপরে টেনে আনা না আনা তো আমারি হাতে—।" কণিকা চলিয়া গেল।

সুরমা বসিয়া ভাবিতেছিল কণিকার কথাগুলি, বেয়ারা খবর দিল সেদিনের সেই আহত নোংরা লোকটা আসিয়াছে। এবং সে হুজুরের সঙ্গে দেখা করিতে চায়। মুহূর্ত্তে সুরমা অন্য সব চিন্তা ভুলিয়া গেল। সে বলিল—"বল উনি তো বাড়ী নেই। তবে সে কি চায়, জিজ্ঞেস করে আয়। আমি যদি তাকে কোন রকম কিছু দিয়ে সাহায্য করতে পারি। বেয়ারা খানিক পরে ঘুরিয়া আসিয়া বলিল, সে বলিয়াছে মেমসাহেবের কাছে তাহার কোন আবেদন বা কথা নাই। যা কথা তাহার হইবে সাহেবের সহিত। সুরমা প্রথমটা একটু রাগিয়া গেল। একটা সামান্য লোকের কি কথা থাকিতে পারে রাজীবের সহিত ? কি এমন গুপ্ত কথা থাকিতে পারে যাহা সে জানিতে পারে না ? তাহার একবার ইচ্ছা হইল বলে "লোকটাকে তাড়িয়ে দাও।" কিন্তু সে কি ভাবিয়া তাহা বলিল না, শুধু বলিল' "তবে বসুক।" তাহার মনে হইল রাজীবই বা কেন তাহাকে কিছু বলে না ! কি সম্পর্ক আছে তাহার এই রাস্তার লোকটার সঙ্গে ? যত রাস্তার লোক লইয়াই তাহার কারবার; এই মিনতি ;—এই—, মুহূর্ত্তের জন্য একটা ঘৃণা আসিয়া তাহার সারা অন্তর ছাইয়া ফেলিল। সে সোফায় শ্রান্ত ভাবে শুইয়া ভাবিতেছিল, এমন সময় পৃথা চারিদিকে সেন্টের সৌরভ ছড়াইয়া হাজির হইল। সে খট খট করিয়া আসিয়া বসিবার ঘরে সুরমাকে দেখিয়া বলিল—"বেশ ! তুমি ঘুমোও নি বৌদি ? রাত হয়েছে যে ! উস্ একটা—! যাও যাও ঘুমোও, চল, লক্ষ্মীটী ; আমি বিছানায় শুইয়ে দিচ্ছি।"

সুরমা উঠিবার কোন লক্ষণ প্রকাশ না করিয়া বলিল —কেমন enjoy করলে ?"

"Enjoy ? খুব ;—immense—"

"কার কার সঙ্গে দেখা হ'ল ?"

বেশী না, একরকম family party গোছের, মিঃ উইলিয়ামস্ তোমার কথা জিজ্ঞেস করছিলেন—"

"Dance হ'ল ?

"একটু gramophone এর সঙ্গে—"

হঠাৎ সুরমা গম্ভীর হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—আচ্ছা পৃথা মিঃ মিটার বুঝি একেবারে abstainer ?

পৃথা অবাক হইয়া বলিল—"কে বললো ? একটুও না', ও enjoy করে, আমি enjoy করি,আমরা কেউ কারো সঙ্গে interfere করিনা।"

সুরমা আবার বলিল—"আচ্ছা মিনতিকে জানো ?"

পৃথা বলিল—"এই রাত্রে বৌদি এত সব unearthly প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছ কেন ? না আমি জানিনা। ওঠো Go to bed now. দাদা জানলে বলবে আমি বুঝি তোমাকে আমার bad habitগুলো শিখিয়ে দিচ্ছি।"

সুরমা উঠিয়া বলিল—তুমি খুব সুখী—না পৃথা—? পৃথা বোধহয় তাহার জীবনে সুখ-দুঃখ লইয়া গবেষণা বা বিশ্লেষণ করিয়া দেখে নাই কখনো। সে হাসিয়া বলিল "আজ তোমার কি হয়েছে বৌদি ? সুখ-দুঃখ আমি জানিনা, তবে যত পারি enjoy করি এই যা—"

সুরমা ঘরে যাইতে যাইতে বলিল—"মিঃ মিটার যদি অন্য কাউকে ভাল বাসে ?"

পৃথা অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—"কি অদ্ভুত idea তোমার বৌদি ? ভালবাসে তো বাসবে। so much the better আমি nagging wife হ'তে মোটে ভাল বাসি না। Love জিনিষটা Freedom এর ভিতর দিয়ে গড়ে ওঠে ভাল, bondage এর ভিতর যেন বড় একঘেয়ে হ'য়ে যায়, কোন charm থাকে না। আর না, বিছানায় গিয়ে ও সব বাজে কথা ভাববে না। আজ বাড়ী বসে বুঝি শুধু এই সব ভেবেছ ?"

সুরমা বলিল—"না পৃথা,আমার মনে হয় যে যার পথে চললে সুখ হয় না !"

"হয়—খুব হয় ভাই, চল ঘুমোবে—" পৃথা নিজে তাহাকে সযত্নে কাপড় ছাড়াইয়া, বিছানায় শোয়াইয়া নিজের ঘরে গেল।

পরদিন সকালে চা খাইবার পর পৃথা কতগুলি ডাল-পুরী ভাজিয়া আনিয়া সুরমাকে খাওয়াইয়া দিল—তারপরে হাত ধুইয়া আসিয়া হাসিতে লাগিল অকারণে। সুরমা বলিল—"কি হয়েছে ? হাসছ কেন ?"

পৃথা বলিল "বৌদি কাল রাত্রে, ওসব ভাবনা কেন তোমার মাথায় গজিয়ে উঠেছিল বলতে পারো ?"

সুরমা হাসিয়া বলিল—"জানিনা"—

"মিনতি কে বৌদি ? তুমি চেনো ?"

সুরমা কিছু বলিল না, মুহূর্ত্তের জন্য একটু গম্ভীর হইয়া হাসিয়া পৃথার দিকে চাহিল। পৃথা বলিল—"আমি জানি মিনতি কে !"

"কাল বললে যে জানোনা—"

"জানি বললে কি আর কাল তুমি ঘুমোতে ; তোমার বিয়ের দেড় বছর আগে আমার বিয়ে হয়েছিল, কাজেই মিনতিকে জানাটা আমার আশ্চর্য্য নয়।"

"তুমি দেখেছ ?"

পৃথা হাসিয়া, চোখ টিপিয়া মাথা নাড়িল। সুরমা আগ্রহ ভরে বলিল—"কেমন দেখতে ভাই ? কোথায় দেখলে ?"

"অত excited হয়োনা—দেখতে খুব সুন্দরী না হলেও সুন্দর। খুব গম্ভীর।"

"কোথায় দেখেছ ?

"আমাদের দেশের বাড়ীতে। বাবা মারা যাবার পরেই তো এসেছিল ওরা—তারপরে তার বাপ মারা যাবার কিছু দিন পরে দাদা তাকে কলকাতায় আনে। তারপরে সে এখানে ছিল। আমরা বিলেতে গেলুম।"

"এই বাড়ীতে ?"

"না অন্য একটা বাড়ী ভাড়া করে—এখনো সে আছে বোধহয় ?"

সুরমা বলিল—"আছে বৈকি ! কথা বলেছ ?"

"নাঃ, শুধু দুর থেকে দেখেছিলুম তাও দু একদিন।"

"একেবারে রাস্তার বাজে লোক—না ?"

পৃথা তাচ্ছিল্য ভরে বলিল—"তাই হবে বোধহয় ! ও সব নিয়ে ভেবো না। ও সব hobby পুরুষদের মাঝে মাঝে থাকে। ওদের চোখে সুন্দর অসুন্দর নেই, culture, intellect তারা বোঝে না। হয়তো [illegible] সুন্দর পুরুষ একটা ugly মেয়ের জন্য মরে যাচ্ছে, [illegible]

cultured লোক হয়ত নেহাৎ একটা Raw মেয়েকে ভালবেসে দিব্যি আছে। আমার মনে হয়, ওরা সর্ব্বদা একটা change খোঁজে। যা পায় তা তারা চায় না। যা পায়না তারই জন্য সর্ব্বস্ব দেবে। সে দেওয়ার সে উপযুক্ত হোক কি না হোক। তারা চায় শুধু সারা জীবন একটা পাওয়ার জন্য ছুটতে an eternal chase আর মনে হয় unequal combination এ ওরা বেশী charm খুঁজে পায়। বোধহয় opposition পেয়ে থাকতেই ওরা ভালবাসে—"

সুরমা পৃথার সব কথাগুলি শুনিয়া শুধু বলিল "তা হবে—"

পৃথা বলিল—তুমি দেখনি—না ?"

"না:"

"যাগ্‌গে, সকলের একটা private এদিক্ আছে বৌদি। হোক স্বামী, হোক্ স্ত্রী তার সে privacy টাকে regard করা উচিত। দাদা কিন্তু তোমাকে ভালবাসে খুব—সে জন্য তোমার কোন complain থাকা উচিত নয়।"

"Love না আরো কিছু ও শুধু duty করে, আর কিছু না।"

পৃথা একটু চুপ করিয়া বলিল "তা ওটাকে love ব'লে ধরে নিতে পার। তারপরে শেষে Q. E. D. লিখে নাও।

রাজীব মাঝে মাঝে এইদিকে আসিত, পৃথার সহিত গল্প করিয়া, সুরমার সহিত দু একটা কথা বলিয়া চলিয়া যাইত। সেদিন সে আসিয়াছিল সকালের দিকে। পৃথা সবিস্তার বর্ণনা সহ গত রাত্রের ডিনার পার্টির কথা বলিয়া বলিল—"দাদা, আমাদের বাড়ীতে এসেছে। তোমাকে অভ্যর্থনা করা উচিত। কি খাবে বল!"

"এখন আর খাব না পৃথা, রেখে দে বরং—"

"না। না তুমি বোস, আমি নিয়ে আসছি। নিজের হাতে করেছি খাবে না কি!" পৃথা চলিয়া গেলে, রাজীব সুরমার দিকে চাহিল। সুরমা একটু গম্ভীর হইয়া বসিয়াছিল, সে বলিল—"কাল তোমার সেই লোকটি এসেছিল তোমাকে খুঁজতে—"

রাজীব ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল—"ওঃ কিছু সাহায্য চাইতে—"

"আমি দিতে চেয়েছিলুম। কিন্তু সে বল্‌লো সে তোমার সঙ্গেই দেখা করতে চায়, আমার সঙ্গে তার কোন কথা নেই।"

রাজীব কোন উত্তর দিলনা। সে বুঝি সুরমার প্রশ্নের হাত এড়াইবার জন্য উঠিয়া বলিল—"আমি যাচ্ছি, একটু কাজ আছে—পৃথাকে বলো—

সেই সময়ে পৃথা একটা প্লেট হাতে নিয়া ঘরে ঢুকিল "না, দাদা, খেয়ে যাও, অন্ততঃ একটা please," রাজীব আধখানা ডালপুরী ছিঁড়িয়া মুখে দিল, বলিল—"বাঃ বেশ হয়েছে, বিকেলে তোমরা বাইরে যাচ্ছ নাকি?"

পৃথা বলিল—"হ্যাঁ, নিশ্চয়, কতগুলো ভিসিটিং কার্ড এসে জমা হয়েছে, আমি তো সময়ই পাচ্ছি না অন্ততঃ in return একখানা ক'রে card ও drop ক'রে আসা উচিত তো।"

"আর তুমি?" রাজীব সুরমার দিকে ফিরিল। সুরমা কিছু বলিল না, অভিমানে তাহার অন্তরাত্মা জ্বলিয়া যাইতেছিল। পৃথা বলিল—"বৌদি যাবে বইকি আমার সঙ্গে।"

সুরমা বলিল—"না আমি যাবো কণিকার ওখানে।"

পৃথা বলিল—"Right O! any how একটু outing হবে তো!"

রাজীব যাইতে যাইতে বলিল—"তাহ'লে আমি ছোট গাড়ীটা নিয়েই বেড়োবো।"

সুরমা সেদিন সারাদিন ধরিয়া ভাবিল, রাজীবের সঙ্গে কি রহস্য বিজড়িত হইয়া রহিয়াছে? সে কিছু লুকাইবেনা বলিলেও এটা কি লুকানো নয়? তার চাইতে খোলাখুলি ভাবে সব জানিয়া লওয়া ভাল। কণিকা ও পৃথা যত কিছুই বলুক না কেন সে পারিতেছিল না কিছুতেই নিজেকে রাজীবের মোহের প্রভাব হইতে মুক্ত করিতে।

বিকালে সে কণিকার বাড়ী গেল। শরৎ তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া বলিল—"বসুন, মিসেস বোস, কণিকা দুপুর বেলা কার বাড়ী গিয়েছিল, এক্ষুণি এসে পড়বে।" সুরমা একটু অসোয়াস্তি বোধ করিল। তাহার মনে হইল, কণিকা বুঝি বলিয়াছিল সন্ধ্যার পর সে বাড়ী থাকিবে। সে ভাবিল কণিকার যে রকম স্বামী বশ করিবার ভীষণ

প্রচেষ্টা বেচারা শরৎকে হয়তো ইহার জের সহ্য করিতে হইবে অনেক।

সুরমা বলিল—"তাহ'লে আমি আর একটু ঘুরে আসি!"

শরৎ বলিল,—"না, তাকি হয়? কণা এক্ষুণি এসে পড়বে, আপনি বসুন।" কণিকা যদি আসিয়া শুনে, সে আসিয়া চলিয়া গিয়াছে তাহা হইলেও কিছু ভাবিতে পারে, এই ভাবিয়া সে বসিল। শরৎ পরম আপ্যায়িত হইয়া তাহাকে চেয়ার টানিয়া দিল,—ও-পাশের খোলা জানালা হইতে রোদ আসিয়া তাহার কাপড়ের উপর পড়িয়াছিল, শরৎ তাড়াতাড়ি উঠিয়া পর্দ্দাটা টানিয়া দিল। চা আনিবার কথা বলিতেই সুরমা আপত্তি করিল কিন্তু অবশেষে সে একটা পান খাওয়াইয়া ছাড়িল। তাহার ভাবে কাজে যেন ফুটিয়া উঠিতেছিল অত্যধিক দীনতা ও কৃতার্থতা। সুরমা খানিকক্ষণ কি বলিবে খুঁজিয়া পাইল না। দু' একটা কথার পর শরৎ বলিল—"দেখুন আমাদের মেয়েরা আজকাল অত্যধিক অগ্রসর হয়ে একেবারে মাধুর্য্য ও শীলতা সব হারিয়ে ফেলেছে, যার জন্য তারা বিখ্যাত, কিন্তু আপনি এত শিক্ষিতা হয়েও, সে শীলতা, সে কোমলতাটুকু হারিয়ে ফেলেন নি, এইটুকুই আমার চোখে বড় ভাল লাগে। মেয়েরা সব বিষয়ে এত এগিয়ে যায়, এটা আমার ভাল লাগেনা। তা'বলে যে তারা পিছনে পড়ে থাকবে তাও নয়।"

সুরমা একটু বিব্রত হইয়া মুখে কিছু না বলিয়া মনে মনে ভাবিল বেচারা শরতের ব্যথা কোনখানে। কণিকা বোধহয় রোজ তাহাকে অন্ততঃ একবার করিয়াও স্ত্রী স্বাধীনতাবিষয়ক বক্তৃতা দিয়া, নিজের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে গিয়া, তাহার গৃহবাস অসহ্য করিয়া তুলিয়াছে। শরৎ খানিকক্ষণ আরো কতগুলো কথা বলিয়া বলিল—"কি বলেন? সত্যি নয়? মেয়েরা বলছে equality, তারা রাস্তায় আজকাল ঘুরে বেড়ায় কেমন নির্ভীক ভাবে, যেন কাউকেও গ্রাহ্য করে না। অতটা কি ভালো? তারা আমাদের অলঙ্কার, আমাদের দেশের শোভা, ঘরের কল্যাণী মূর্ত্তি, ঘরের সম্পদ যদি বাইরে চলে যায় তা'হলে আমাদের যথারণ্যম্ তথা গৃহম্—নয় কি?"

সুরমা কিছু বলিল না, একটু হাসিয়া মনে মনে ভাবিল কণিকা থাকিলে ঠিক উত্তর দিতে পারিত। শরৎ আবার বলিল—"কি বলেন মিসেস বোস?"

সুরমা বলিল—"আমি ও বিষয়ে কোন দিন ভেবে দেখিনি, তবে আপনারা ইচ্ছা করলেই তো বাধা দিতে পারেন।"

শরৎ বড় বড় চোখ করিয়া বলিল—"সর্ব্বনাশ! আমরা বাধা দেবো? তাহলে যা-ও বা ঘরে আছি তাও থাকতে পারবো না। মিসেস বোস জানেন তো মেয়েদের প্রপাগাণ্ডা এতদূর ছড়িয়ে পড়েছে যে এখন তা গুটিয়ে আনা শক্ত, মেয়েরা ক্রমে ক্রমে সব সাংঘাতিক কাজে হাত দিচ্ছে, এটা কি ভাল? এর পরে কি যে হবে, দেশের সমস্ত কোমলতা এভাবে নষ্ট ক'রে তুললে আর রইল কি? মিসেস বোস, যত শিক্ষিতা মেয়ে দেখছি, তাদের ভিতর লজ্জাশীলা মেয়ে আপনার মত খুব কম দেখেছি। অথচ আপনি এতো highly cultured কিন্তু দেখলে মনে হয় বুঝি কিছুই জানেন না। কারণ আজকাল মেয়েরা কিছুই জানুক আর না জানুক নিজেকে সর্ব্বদা জাহির করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।"

সুরমা এরকম বিপদে আর কখনো পড়ে নাই,সে একটু লজ্জিত হইয়া বলিল—"তা মেয়েদের লজ্জাটা একটু ছেড়ে দেওয়া উচিত আমার মনে হয়, কারণ ঐটাই তাদের পেছনে টেনে রেখে দেয় অনেক খানি।"

শরৎ একটু বিস্মিত হইয়া বলিল-"আপনি—এই কথা বলেন—?" শরৎ আরো কত কি প্রসংশাসূচক কথা বলিয়া ফেলিল—বলিল "আপনার কাছ থেকে এটা শুনবো আশা করিনি, অথচ আপনি নিজে তা নন।"

সুরমা একটু অসহিষ্ণু হইয়া বলিল—"কণিকা কিছু ব'লে গেছে? কখন আসবে?"

শরৎ একটু ক্ষুণ্ণ হইয়াই যেন বলিল—"বলেছিল তো আসবে এক্ষুণি, কি জানি কেন আসছেনা, বসুন না আর একটু—"

সুরমা অনিচ্ছাসত্বেও আবার বসিল, "আচ্ছা, আরো দশ মিনিট অপেক্ষা করি।"

শরৎ বলিল—"মিসেস বোস, আপনাকে দেখলে

াামার একটা কথা সর্ব্বদা মনে হয়, আর আপনার জন্ত ড় দুঃখ হয়।"

সুরমা বলিল "কি?"

"মনে হয়, আপনার মনে বোধহয় এমন একটা কিছু াাছে যা আপনি সর্ব্বদা লুকিয়ে রাখতে চান।"

সুরমা একটু অবাক হইল। শরৎ এমন ভাবে কথা লিতেছে কেন?—সে বলিল—"আমার মনে এমন কোন াব নেই, আপাততঃ আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।"

"আমি জানি—"

্রমা চমকিয়া উঠিল, বলিল—"কি মিঃ ঘোষ?"

শরৎ বলিল—"দেখুন আমি এর জন্য—"

এমন সময় নীচে গাড়ীর শব্দ পাওয়া গেল, এবং ্ড়িতে জুতার শব্দ, তারপের প্রবেশ করিল বিজয় মুখার্জ্জি! রং বলিল—"এসোনা বিজয়, ইনি মিসেস রাজীব বোস, ার ইনি বিজয় মুখার্জ্জি। "বিজয় ও সুরমা পরস্পরের িকে চাহিল খানিকক্ষণ, তারপরে দুইজনেই অস্ফুট ্চ্চারণ করিল "বিজয়—" "সুরমা—"—।

সুরমা বলিল—"কতদিন পরে দেখা, কেমন আছ?"

বিজয় বলিল—"ভাল আছি সুরমা, তুমি ভাল তো?"

শরৎ বলিল—"চেনা ছিল আগে থেকে?"

বিজয় বলিল—"অনেক দিন থেকে, সেই ছেলেবেলা থকে—।" সুরমা দেখিল বিজয় এখনো ঠিক তেমনি াছে। সে সুন্দর নয়, তবু মুখে তার একটা ব্যক্তিত্বের া সুস্পষ্ট। এখনো উজ্জ্বল তাহার চোখে মনের দৃঢ় ল্পের আভাস ফুটিয়া উঠে, কথায় আগুন খেলিয়া যায়। রমা আরো খানিকক্ষণ বিজয়ের সঙ্গে অনেক কথা বলিল, না প্রশ্ন করিল, বিজয়ের প্রশ্নের উত্তর দিল, তখন তাহারা কেবারে শরতের অস্তিত্ব যেন ভুলিয়াই গিয়াছিল। িমধ্যে কণিকাও আসিয়া দেরী হওয়ার জন্য অনেক মা চাহিয়া লইল। তারপরে সুরমা বিজয়কে বার ার তাহার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিয়া বিদায় ইল। বিজয়কে দেখিয়া তাহার অনেক পুরাণো ি জাগিয়া উঠিতেছিল—তাহা কৈশোরের নবীনতায় ীব—আজও যেন [illegible] বুঝিয়া আনিল তাহার বিষাদময় জীবনে অনেকখানি আনন্দ। কিন্তু শরতের কথা বার বার ঘুরিয়া ফিরিয়া তাহাকে চিন্তিত করিয়া তুলিতেছিল। গাড়ীতে বসিয়া সে ভাবিতে লাগিল শরত কি জানে? সে কি জানে মিনতির কথা? সে কি জানে তাহার অন্তরের লজ্জা, অপমান? রাজীবের অবজ্ঞা? রাজীবের রাস্তার ভিখারীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা? কি করিয়া জানিবে সে? তবে কি কণিকা বলিয়াছে? তাহাও সে বিশ্বাস করিতে পারিল না। নিজেকে শাসন করিয়া সে নিজে বলিল, কণিকা জানে নাই কিন্তু তবু শরত জানে, তাহা হইলে অনেকে জানে,—তাহার অপমানের বার্ত্তা, তাহা হইলে ছড়াইয়া পড়িয়াছে বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে—এত বড় মান, সম্মান, মর্য্যাদার আসনে বসিয়াও সে সম্পূর্ণ রিক্ত। আরো কিছুক্ষণ থাকিলে সে হয়তো জানিয়া লইতে পারিত, কি কথা জানে শরত। সেই জন্য কি তাহাকে লক্ষ্য করিয়া তাহার অত দয়া অনুকম্পা, তাহার চোখে সে জ্বলিয়া উঠিতে দেখিয়াছে! না আরো অন্য জিনিষ!

সে কি?—মানুষ যদি জানে কাহারো ঘরের চাবি ভাঙ্গা তাহা হইলে স্বভাবতঃই তাহারা আসিবে তাহার সর্ব্বস্ব লুঠ করিতে, আজ বুঝি এই হইয়াছে তাহার পদ, তাহার অবস্থা? সুরমা খানিকক্ষণ গঙ্গার ধারে ঘুরিল। তারপরে বাড়ী ফিরিবার পথে দেখিল রাজীবের "টু-সীটার "লাসাল" খানা তাহাকে অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেল, রাজীব তাহাকে দেখে নাই কারণ সে নিজে চালাইতেছিল, কিন্তু সুরমা সবিস্ময়ে দেখিল, রাজীবের পাশে বসিয়া আছে—একটী দীন, দরিদ্র যুবক। সুরমা অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, পৃথা বাড়ী ফিরিয়া আসিয়াছে, এবং পিয়ানোর সঙ্গে মেমসাহেবের মিলিত কণ্ঠস্বরে ও হাসিতে সমস্ত বাড়ী মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। সুরমা উপরে আসিয়া দেখিল, পৃথা খুব উৎফুল্ল হইয়া নূতন ট্যাঙ্গো অভ্যাস করিতেছে বন্ধু মিঃ উইলিয়াম্‌সকে লইয়া, মিসেস উড্ পিয়ানো লইয়া বসিয়াছে আর মিঃ উড্ বইএর পাতা উল্টাইয়া দিতেছে। সুরমা আসিতেই পৃথা সকলের সঙ্গে তাহার পরিচয় করাইয়া দিল। নানারকম কথা-বার্ত্তা বলিয়া, খানিকটা হাসিয়া সুরমার মনটা অনেকটা হাল্কা

হইয়া গেল। খানিক পরে সকলে বিদায় লইয়া চলিয়া গেলে, পৃথা বলিল,—"বৌদি, একটু বাজাও না ভাই।

সুরমা বলিল "Dance music বেশী practice নেই তো—"

তবে একটু gramophone ভাই, বৌদি—Please.

"সুরমা হাসিয়া একটা Tango রেকর্ড দিল। পৃথা নিজে নিজে খানিকক্ষণ নাচিয়া বলিল, "বৌদি—আমি love এ পড়ে গেছি ভাই—"

সুরমা অত্যন্ত অবাক হইয়া গেল, সে ভাবিল এত রকমের লোকও আছে পৃথিবীতে। সে বলিল—"পৃথা অত বড় serious জিনিষটাকে চট্ ক'রে বলে ফেল্লে?"

পৃথা নাচিতে নাচিতে বলিল "love বুঝি serious? কিচ্ছু না—nothing of the sort. Feather-weight বৌদি,—feather-weight. জগতে serious কিচ্ছু নয়। বিশেষতঃ love টাকে seriously নেওয়া কোনমতেই উচিত নয়। তাহলে life টাও serious হয়ে ওঠে।"

সুরমা একবার ভাবিল, মেয়েটার মাথায় দোষ আছে না কি? সে বলিল "কার সঙ্গে love এ পড়লে?"

পৃথা ধপ্ করিয়া একটা কুশন চেয়ারে বসিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল—"মিঃ উইলিয়াম্‌স্—"

সুরমা হাসিল, বলিল—"কবে থেকে পৃথা? এতদিন তো জানিনি।"

"আজ থেকে ভাই।"

"মানে? কি অদ্ভুত মেয়ে তুমি সত্যি।"

"মানে, আজকেই মিঃ উইলিয়াম্‌স্ আমাকে বলছিল, আমাকে সে নাকি বড্ড ভালবেসেছে, তাই শুনে আমারও মনে হল আমিও ভালবেসে ফেলেছি।"

সুরমা খানিকক্ষণ ধরিয়া হাসিল বলিল—"বেশ, ভালো, তোমাকে তোমার ভালবাসার কথাটা বুঝি সে মনে করিয়ে দিল?"

"হ্যাঁ বৌদি বিশ্বাস করছো না? অনেক সময় ও feelingটা মনের কোথায় যেন লুকিয়ে থাকে একজন মনে করিয়ে দিলে তখন মনে হয়।

সুরমা বলিল "পৃথা, তুমি অসম্ভব—! এ ভালবাসাটা কতদিন থাকবে?"

পৃথা সামনের গ্লাস হইতে এক চুমুক লিমন স্কোয়াস খাইয়া বলিল—"কতদিন? তা জানিনা হয়তো মাস খানেক—

সুরমা বলিল "ছিঃ!"

"ছিঃ বুঝি? সকলেই জীবনে অনেকবার ভালবাসে বৌদি, কিন্তু কেউ প্রকাশ করে না—অথবা কেউ দুএকটা প্রকাশ করে বাকিগুলো ধামা চাপাই পড়ে থাকে, আর কারো ভালবাসা কয়েকদিন থাকে—কারো বা মাস, কারো বৎসর—কারো বা কয়েক ঘণ্টা মাত্র। সেগুলো Passing fancy বলতেও পারো—কাজেই আমি বুঝি শুধু ছিঃ হয়ে গেলুম?"

সুরমা শুধু হাসিয়া বলিল—"বেশ আছ কিন্তু তোমরা। মিঃ মিটার শুনলে কি বলবে?"

পৃথা স্বামীকে নাম ধরিয়া ডাকিত। সে বলিল "কিচ্ছু না। সুনীল খুব ভাল। ও বলে বেশ তো, আমাকে পছন্দ না হয়, যাকে পছন্দ হয় তার কাছেই যাও—কিন্তু দেখবে শেষে হয়তো আমার চেয়ে কেউ ভাল নয়। পৃথিবীটা দেখেই এসোনা, আমার কোন আপত্তি নেই।"

"সত্যি বলছি পৃথা, জগতে বোধ হয় তোমার মত লোকরাই সুখী—"

"নিশ্চয় বৌদি! দুঃখকে আমি defy করে বেঁচে থাকি,—খাবে চল।"

সাত

এই ভাবে মাস দুয়েক কটিয়া গেল সুরমার জানা হয় নাই রাজীবের রহস্য এবং শরতের কথা।

তারপরে একদিন প্রণবের জন্ম হইল। আশা আনন্দের মিলিত উচ্ছ্বাসে, প্রেমের পুলকে মূর্ত্ত হইয়া উঠিল, সুরমার প্রাণের সব সাধনা,—সব ব্যথা তাহার দূরে সরাইয়া দিয়া, একি রত্নময় দীপের আলোক শিখা জলিয়া উঠিল, তাহার জীবনে একি নবীন উৎসব আবাহন করিয়া। সবুজের আস্তরণে ফুলের কেয়ারী তাহার ভরিয়া উঠিল বুঝি অসংখ্য মুকুলে, তাহার চারিদিকে স্বর্গীয় সৌরভ বিলাইয়া, মধুর ঝঙ্কারে জাগাইয়া তুলিয়া তাহার সুপ্ত স্নেহের নির্ঝরিণী মনে পড়ে [illegible]

জীবনের উন্মাদনা, উল্লাস তাহাকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিয়াছে। প্রেমের উপাসনা তাহার বুঝি সুফল হইয়াছে আজ তরুণ প্রাণের কোমল স্পর্শ পাইয়া, তাহারই উৎসর্গীকৃত ফুল বুঝি ফিরিয়া আসিয়াছে তাহার বুকে দেবতার আশীর্ব্বাদের শুভ ধারা বহন করিয়া।

সুরমার দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিল, আনন্দে সে যখন দেখিল রাজীব শিশুকে কোলে তুলিয়া লইয়াছে, কিন্তু তাহার চোখে সে সেদিন দেখে নাই তৃপ্তির স্নিগ্ধ দৃষ্টি। বুক কি তাহার ভরিয়া যায় নাই পিতৃত্বের গৌরবে?

নবজাত শিশুর কল্যাণ কামনায় কোন ক্রিয়া কলাপ অপূর্ণ রহিল না। দেশ হইতে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আসিল, আত্মীয় স্বজন আসিল, পৃথা ডান্স, ডিনার মুলতুবি রাখিয়া সারাদিন সুরমার কাছে কাটাইয়া দিত। চির উৎসবের সঙ্গীতে সুরমার গৃহতল ধ্বনিয়া উঠিল। আর রাজীব— সে পিতার কর্ত্তব্য সবই করিয়া গেল শান্তভাবে যদিও, কিন্তু পৃথা শুধু বুঝিয়াছিল, যে তাহার বুকখানিও ভরিয়া উঠিয়াছে তৃপ্তির সুধায়—কাণায় কাণায়!

সুরমা রাজীবকে দেখিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল, সারা মন তাহার মুসড়িয়া পড়িল, বেদনায়; সে ভাবিল তবে রাজীব কি সুখী হয় নাই? অথবা রাজীবের এ পিতৃত্ব নবাগত না?

এই ভাবনা তাহার সমস্ত উৎসব আলোক—এক ফুৎকারে নিবাইয়া দিয়াছিল। কিন্তু শিশুকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া সে চোখের জল মুছিয়া ফেলিল। বুকের প্রতি কন্দর তাহার ভরিয়া উঠিয়াছিল মাতৃত্বের সুধারসে, সেখানে সে সম্রাজ্ঞীর অভিমানে গরিয়সী নারী, তাই সুরমা নিজেকে সামলাইয়া লইয়া আবার হাসিয়া উঠিল, শিশুর কোমল মুখে মুখ রাখিয়া।

সুরমার ভাব দেখিয়া একদিন পৃথা বলিল—"কি যে ভাব বৌদি। স্ত্রীকে লোকে ভাল না বাসতে পারে,— কিন্তু সন্তান সে আলাদা জিনিষ, সেখানে ইচ্ছে অনিচ্ছে নেই, সেটা divine, মানুষের natural instinct সেটাকে তুমি কি করে ভুল বুঝলে?" সুরমা মৃদু হাসিল—বলিল "পৃথা—seriously বলছিস?"

পৃথাও হাসিয়া উত্তর দিল—"হ্যাঁ বৌদি এবারে serious—"

"তবে—"

"তবে কি? দাদা আমার মত হাসলোনা, নাচলো না, চীৎকার ক'রে পাড়া মাত করলো না, এই তো বলতে চাও? দাদার যে natureই ঐ রকমের, তাও বুঝলে না এতদিনে? যাও তোমার সঙ্গে পেরে উঠবো না।"

"সেই যে একদিন বলেছিলে, তাহলে এর পিছনেও Q. E. D. লিখে দেবো কি?—"

পৃথা যাইতে যাইতে বলিল—"না, এখানে Q. E. F." সুরমা তাহাকে ডাকিয়া বলিল—"আচ্ছা! পৃথা, এ আনন্দের স্বাদ যদি তার পাওয়া থাকে আরো আগে?" পৃথা হঠাৎ উত্তর দিতে পারিল না, মুহূর্ত্তের জন্য তাহার চির সরস হাসি শুকাইয়া গেল, কিন্তু তবু সে জোর করিয়া হাসিয়া বলিল—"তবে? তবে—না, না তা হতে পারে না। আর তা হলেই বা কি? ঈস্—কিসে আর কিসে—যাও; বাজে ভাবনা ভেবোনা বৌদি!" কিন্তু সুরমা বুঝিয়াছিল পৃথারও সমস্ত শরীর বুঝি শিহরিয়া উঠিয়াছিল কিসের একটা আশঙ্কায়।

সুরমার একবার ইচ্ছা হইল সে রাজীবকে জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলে, কিন্তু কিসের একটা সঙ্কোচ ও লজ্জা তাহার কণ্ঠস্বর বার বার চাপিয়া ধরিয়াছিল। সে পারে নাই। সে ভাবিল, রাজীব যদি সত্য স্বীকার করিয়া লয়, এখন আর যখন তাহার শারীরিক অনিষ্টের আশঙ্কা নাই। সুরমা শিহরিয়া উঠিল, না গো না, সে পারিবে না সে সত্যের নির্ম্মমতা সহ্য করিয়া লইতে। সে বরং সংশয়ের দুঃসহ ব্যথা সহ্য করিয়া থাকিবে—তবু সে সত্যের কঠিন ভার চিরজীবনের জন্য বুকে তুলিয়া লইতে পারিবে না। মিথ্যার আবরণে সে ঢাকিয়া রাখিবে তাহার সন্দিগ্ধ সত্যকে। তাই ভালো গো, তাই ভালো! তাই সে শুধু একদিন রাজীবকে বলিয়াছিল—"সব অপূর্ণতাকে পূর্ণ করে দিল বুঝি, সত্যের এ বন্ধনটুকু এর অমর্য্যাদা করো না।" রাজীব উত্তরে শুধু তাহাকে নীরবে আদর করিয়া ছোট্ট প্রণবকে ক্ষণেকের জন্য কোলে তুলিয়া লইয়াছিল।

কিন্তু রাজীবের ভাবে বা কাজে কেহ কোন ঔদাসীন্য

বা উপেক্ষা লক্ষ্য করিল না, সুরমা তাহার ক্লিষ্ট ভাবটাকে যথাসাধ্য ভুলিয়া যাইতে চেষ্টা করিল। সে তাহার যত দুঃখ জ্বালা সবই মুছিয়া ফেলিল, শিশুর কোমল হাতের পেলব পরশে। পৃথার কথায় সে ভাল করিয়া দেখিল রাজীবের প্রশান্ত গভীর চোখ উজ্জ্বল হইয়া জ্বলিয়া উঠে, তাহার দৃঢ় মুখের রেখা কোমল হইয়া যায়, সেও একদৃষ্টে চাহিয়া বসিয়া থাকে অনেকক্ষণ ধরিয়া তাহার সন্তানের মুখের দিকে।

রাজীবের দিকে আপনার আত্মীয় বড় কেহ ছিল না, শুধু দূর সম্পর্কের কুটুম্বের ভিতর কয়েকজন আসিয়াছিলেন। মহাসমারোহের সহিত একে একে সমস্ত ব্যাপার সারা হইয়া গেল। পূজা, দান কাঙ্গালী ভোজন, ষষ্ঠী পূজা, নামাকরণ, নিষ্ক্রমণ কিছুই বাকি রহিল না। রাজীব যেন খুঁজিয়া পাইতেছিল না এমন কোন উপায় যাহা দিয়া সে ব্যক্ত করিতে পারে অন্তরের অপার পুলক,যেখানে সে ঢালিয়া দিতে পারে তাহার প্রাণের সীমা হারা আনন্দ রাশি। সমস্ত বাড়ীটা উলট পালট হইয়া গেল। নিত্য বন্ধু-বান্ধবের সমাগমে, আত্মীয়-সম্মিলনে সারাদিন ব্যাপী যেন এক আনন্দ-রাজ্য স্থাপন করিয়া বসিল সুরমার ও রাজীবের ছোট্ট প্রণব।

রাজীব রোজ সকালে সন্ধ্যায় দুইবার আসিয়া দেখিয়া যাইত। সুরমার শয্যা পার্শ্বে বসিয়া কথা বলিত। পৃথা শিশুকে কোলে তুলিয়া দিলে সে পরম স্নেহভরে একবার বুকের কাছে চাপিয়া ধরিয়া, বলিত "নে পৃথা, কাঁদবে।" একটু কাঁদিলে সে নানা প্রশ্নে পৃথাকে অস্থির করিয়া তুলিত "কাঁদছে কেন, অসুখ করে নি তো, ডাক্তারকে খবর দেবো?"

পৃথা হাসিয়া বলিত—"বাঃ কাঁদবে না বুঝি একটুও, বাচ্চারা খুব কাঁদে—" নিত্য নূতন জিনিষে ঘর ভরিয়া উঠিল, দামী রোব, জামা, মোজা, টুপি, সোয়েটার ইত্যাদি প্রয়োজনের মাত্রা ছাড়াইয়া আসিতে লাগিল ডজন হিসাবে। খাট, বিছানা, মশারী দোলনা তাহাও একাধিক। আর কিছু না হউক সুরমা তৃপ্তিভরে শুধু দেখিতেছিল রাজীবের নীরব মৌন আবেগের গভীর উচ্ছ্বাস।

একমাস হইয়া গিয়াছে, সুরমার প্রথম উৎসাহ, প্রথম উন্মাদনা অনেকটা স্থির হইয়া আসিয়াছে। সব উৎসবের জের মিটিয়া গিয়াছে, আত্মীয় স্বজন সকলে চলিয়া গিয়াছে। সুরমার বাবা ও মাও আসিয়াছিলেন তাহাদের দেশ হইতে, তাহারা কন্যাকে দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়া কন্যা ও দৌহিত্রকে আশীর্ব্বাদ করিয়া চলিয়া গেলেন। মা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "সুরো, সুখী হয়েছিস তো?" সুরমা ঠিক সেই প্রথম দিনের মত তেমনি নির্ভরতায়, নিশ্চিন্তে, নিঃসন্দেহে বলিয়াছিল "হ্যাঁ মা!"

কিন্তু সুরমা যাহা ভুলিবার জন্য এত চেষ্টা করিল, ঠিক তাহাই তাহার সব তৃপ্তি, সব শান্তির মসৃণ আবরণ ভেদ করিয়া জাগিয়া উঠিতেছিল তাহার অন্তরের গোপন কোণে, একটা অতৃপ্ততা একটা অশান্তি লইয়া। সংশয়ের নির্দ্দয় রেখা একটা সুস্পষ্ট কঠিন দাগ কাটিয়া দিয়া গিয়াছিল সে শুভ্র-মসৃণ মর্ম্মর পৃষ্ঠে, যাহা ইহজীবনে আর কেহ মুছিয়া ফেলিতে পারিবে কি না কে জানে? তবু মাতৃত্বের আনন্দে নিত্য সিঞ্চিত হইয়া সুরমার দিন কাটিতেছিল অভিনব ভাবে। আজ খোকা হাসিয়াছে, আজ সে ছোট্ট ছোট্ট হাত নাড়িয়া খেলা করিয়াছে, আজ সে মাথা ঘুরাইয়া তাহাকে দেখিয়াছে, আজ সে একটু কাঁদিয়াছে বেশী। এই করিয়া কিছুদিন কাটিয়া গেল। পৃথাকে এখন বেশী তত্ত্বাবধান করিতে হয় না, কারণ দুইজন আয়া ও একজন নার্স সে কর্ত্তব্যের ভার লইয়া আছে। সেই জন্য পৃথা আবার তাহার "এন্‌গেজমেন্টের" তালিকা খুলিয়া বসিল।

সেদিন সকাল বেলা বারান্দার খোলা হাওয়ায় একটা নীচু চেয়ারে, সুরমা ছোট্ট প্রণবকে কোলে লইয়া বসিয়াছিল, রাজীব ঝুঁকিয়া আদর করিতে করিতে বলিল— "সুরমা, ঠিক তোমার মত দেখতে হয়েছে বোধ হয়—না?

"এখনো বোঝা যায় না, তোমার মত হয়তো কপালটা হয়েছে।" রাজীব আবার একটু আদর করিয়া বলিল— "চিঠি পেয়েছি সুনীল শিগ্‌গির আসছে, কি কাজে!"

"কাজে না পৃথাকে নিয়ে যেতে? ও গেলে কিন্তু বড্ড খারাপ লাগবে।"

রাজীব হাসিয়া বলিল "পৃথা কোথাও যাবার [illegible] escort চায় না। তা ওকে কয়েকদিন রাখা যাবে—[illegible]

সুনীল সে রকম নয়, সে নিজের কাজেই আসছে। একবার যে রাধানগরে যেতে হয় সুরমা, প্রজারা দেখতে চেয়েছে তাদের ছোট্ট মুনিবকে। কি বল? তুমি যেতে পারবে কবে তক?"

"এখন না, আরো কিছুদিন পরে—মিঃ মিটার কবে আসছে?"

"বোধ হয় এই weekএ," প্রণব কাঁদিয়া উঠিতে রাজীব শশব্যস্তে নার্সকে ডাকিল। সুরমা বলিল "পৃথা চলে গেলে দিন কতক খারাপ লাগবে বই কি, বেশ ফুর্ত্তিতে ছিলুম—" নার্স প্রণবকে লইয়া চলিয়া গেল। সুরমার ইচ্ছা হইতেছিল অনেক কথা, অনেক কিছু জিজ্ঞাসা করে, অনুযোগ করে, অভিযোগ করে, কিন্তু সে পারিতেছিল না। সে বলিল "পৃথাকে আর কিছুদিন রাখতেই হবে।"

"সুনীল আর পৃথাকে বলো তুমি—"

খানিকক্ষণ দুইজনেই চুপ করিয়া রহিল। অবশেষে সুরমা জোর করিয়া সব বাধা ঠেলিয়া বলিল—"আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞেস করবো।

রাজীব মৃদু হাসিয়া সুরমার দিকে চাহিয়া বলিল—"আবার সেই পুরোণো কথা সুরমা?'

সুরমা একটু থামিয়া বলিল—"না—হ্যাঁ—না। ঠিক তা নয়, তবে এই যে, তোমার কথা কি সকলে জানে?"

"আমার কথা মানে?"

"মিনতির কথা।"

রাজীব বলিল—"তা জানিনা—"

"যদি জানে?"

"জানলে জানুক—"

"জান্‌লে সে যে ভারি লজ্জার কথা হবে।"

"শোনো। আমার কোন লজ্জা বা ভয় কাউকে দিয়ে নেই। সুরমা আমি কোন অন্যায় করছিনা।"

"সুরমা খানিকক্ষণ রাজীবের মুখের দিকে চাহয়া রহিল, তারপরে বলিল—"অন্যায় করছোনা?"

রাজীব স্থির স্বরে বলিল—"না,—"

সুরমা রাজীবকে এই ভাবে অন্যায়কে জোর করিয়া প্রতিষ্ঠিত করিতে দেখিয়া রাগিয়া উঠিল, সে বলিল—'অন্যায় করছোনা? কি বলছ তুমি? একটা বিধবা মেয়েকে—"

রাজীব বাধা দিয়া বলিল—"শোন সুরমা, অন্যায় সব চেয়ে বেশী হত, আমি যদি তাকে আজ রাস্তায় বের করে দিতুম, সংসারে তাকে যদি একা ছেড়ে দিয়ে আমি আমার সুখ স্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে থাকতুম। মানুষের ভুল হওয়া অনিবার্য্য। কিন্তু সে ভুলের উপর আরো অন্যায়কে আশ্রয় দেওয়া মনুষ্যত্ব নয়। একটা নির্দ্দোষ মেয়ের সঙ্গে আমি প্রতারণা করতে পারি না—। জগত জানে জানুক এতে আমার কোন লজ্জা নেই।"

"প্রতারণা করতে পারনা, এবং তোমার কোন কিছুতে লজ্জা নেই তা জানি—কিন্তু পৌরুষও তো আমি কিছু দেখতে পাচ্ছিনা এতে—"

আমার কোন কিছুতে লজ্জা নেই, তা জানো জেনে সুখী হলুম সুরমা—এবং তোমার সূক্ষ্ম বিচার শক্তির প্রশংসা করছি, কিন্তু তুমি যদি আরো ভালো ক'রে দেখতে তাহলে পৌরুষ কিছু দেখতে পেতে বই কি!"

"কি জানি, তুমি আমার সঙ্গে এতো ঠাট্টার ছলে, কথা বলো না, তুমি আমাকে বড় বেশী irritate করে তোল।"

"তবে কি করবো বল? তুমি আমাকে কোন দিক দিয়েই বিচার ক'রে দেখবে না, আমার কথা গুলো, আমার অবস্থা ভেবে বুঝে চুপ করে থাকো সুরমা। আমাকে শান্তিতে থাকতে দাও, আর তুমিও শান্তিতে থাকো। কেনো বলতো? যা জানো,—যা হয়েছে—যা হচ্ছে এবং হবেও তা নিয়ে কেঁদে, ঝগড়া ক'রে, মারামারি করে কি লাভ? তার চেয়ে ভালো সেটাকে মেনে নেওয়া—"

"না, না, আমি মেনে নিতে পারবো না।"

"পারবে না আজ বলছো, কিন্তু সেদিন তো মেনে নিতে পেরেছিলে, সেদিন, সেদিন এর প্রতিকার করলেও হয়তো ক'রে নিতে পারতে—"

"সেদিন মেনে নিয়েছিলুম প্রতিকার করতে পারবো বলেই—"

"ভুল বলছ সুরমা, প্রতিকারের কথা সেদিন তোমার

মনেই আসেনি, কিন্তু তুমি মেনে নিয়েছিলে, পরে মেনে নিতে পারবে বলেই।"

"না—কখনো না, প্রতিকার করতে পারবো বলে—"

"তবে সেইদিন আমাকে তোমার এ সঙ্কল্প স্পষ্ট ক'রে জানিয়ে দেওয়া উচিত ছিল—"

জানাবার উপযুক্ত মনে করিনি বলেই জানাইনি—"

"তা হ'লে আমাকে ফাঁকি দিয়েছিলে?"

"আমি ফাঁকি দিয়েছি না তুমি আমাকে ফাঁকি দিয়েছ?"

"আমি ফাঁকি দিয়েছি? না সুরমা—আর তুমি আমাকেও ফাঁকি দাও নি, ফাঁকি দিয়েছ তুমি নিজেকে নিজে। সেদিন এই ভুল ধারণা মনে পোষণ করেই তুমি আজ হয়তো মিথ্যে এ কষ্টের হাতে নিজেকে ধরা দিয়ে ফেলেছ। এখন কি করবে? ওটা ওল্টানো যায় না, ওটা সত্য, ওটাই ঠিক, সেদিন, তুমি সত্যটাকে এ ভাবে মিথ্যে একটা কল্পনার আবরণে ঢেকে না দিলেও পারতে—"

"পারতুম—কিন্তু তুমি সেদিন তোমার এখনকার মতন উঁচু করে ধরা সত্যটাকে মোটেই এমনি উঁচু করে আমার চোখের সামনে তুলে ধরনি। বলনি তুমি এটাই সত্য। এটাই ধ্রুব, এমনি নিশ্চয় করে তুমি কিছুই বলনি।"

"নিশ্চয় করে না বলি, নেহাৎ অনিশ্চয় করেও তো বলিনি সুরমা—"

"কিন্তু আমি তোমার এ বাজে যুক্তিটাকে অটল বলে মেনে নোবনা।"

"তবে আমি নিরুপায়।" একটু থামিয়া রাজীব আবার বলিল—"কেনো পুরোনো কথাগুলো আবার তুলছ? বারবার বলেছি ও দিকটা ভুলে যাও; মনেই এনোনা—"

ভুলতে চেষ্টা করি বই কি—তাছাড়া পৃথা এসে তো আরো ভুলে গেছি—কিন্তু তুমি ভুলতে দিচ্ছ কই? সব খানেই শুনছি ছোটলোকদের নিয়ে তুমি ঘুরে বেড়াও, সকলে দেখছে, হাসছে, তবুও বল তুমি যে আমি ভুলে যাবো?—"

"কে ছোটলোক আমার সঙ্গে ঘুরে বেড়ায় বললে?—"

"সে দিনের সেই নোংরা লোকটা?"

"সে গরীব হ'তে পারে সুরমা কিন্তু সে ছোটলোক নয়—"

ছোটলোক বই কি?"

"না—সে ছোটলোক নয়, সে,—সে কি বলবো—গরীব বটে—কিন্তু—"

"কিন্তু কি?"

"একদিন বলেছি, আর একজন এর সঙ্গে জড়িয়ে না থাকলে তোমাকে সব বলতুম—"

"কে জড়িয়ে আছে—মিনতি?"

"সে যেই হোক না কেন, তোমাকে বলবো না—"

"আচ্ছা বলো না—কিন্তু মিনতিকেও তোমার সঙ্গে দেখা যায়—"

"মিথ্যে কথা—তাকে তুমি যা ভাবছ সে তা নয়, আমি বললেও সে আমার সঙ্গে কখনো এ ভাবে বেরোবে না সুরমা—তারও আমার মান সম্মান বজায় রাখবার যথেষ্ট চেষ্টা আছে—"

"সুরমার মুখ রাগে দুঃখে সাদা হইয়া গেল।

রাজীব বলিল—"সুরমা আমার কথা শোন—আমি আগেও বলেছি—তুমি যখন ইচ্ছে করে, আমার সব জেনেও এ দুঃখ বল আর সুখ বল বরণ ক'রে নিয়েছ—, তখন তাই নিয়ে সন্তুষ্ট থাকো—"

"না, আমি থাকবো না, ভুল যদি করেই থাকি—তবে সে ভুল শুধরে নেবোই আমি, সে ক্ষমতাও আছে জেনে নিও—"

ক্রমশঃ

রসাস্বাদন

সাহিত্য সক্রিয় থাকিবে, আর পাঠকচিত্ত নিষ্ক্রিয় হইয়া তাহা উপভোগ করিবে, ইহা কখনও হইতে পারে না। সাহিত্যের মধ্যে সংক্রামিত কবির সৃজনী-শক্তি পাঠকের চিত্তেও সৃজনীশক্তির উদ্বোধন করে। পাঠকচিত্ত সদ্যঃপ্রবুদ্ধ সৃজনী শক্তির সাহায্যে সৎসাহিত্যকে 'আপন মনের মাধুরী মিশাইয়া' পুনর্গঠন করিয়া লইবে, তবে তো রসোদ্বোধন। যে সাহিত্য পাঠকচিত্তকে এইভাবে সক্রিয় করে না, তাহা সৎসাহিত্য নয়। আর যে চিত্ত সৎসাহিত্য-পাঠকালে সক্রিয় হইয়া উঠে না তাহা সাহিত্য-রসবোধের অধিকারী নহে। এই সৃজনী-শক্তির প্রয়োগে কিছু ক্লেশ আছে সত্য—কিন্তু তাহার তুলনায় আনন্দ অপরিমেয়। সৎকাব্যপাঠকালে এই সৃজনী-শক্তি প্রয়োগে আনুষঙ্গিক ব্যাপারও কিছু কিছু আছে—তাহাতেও রীতিমত বোধশক্তি ও মনোযোগ প্রয়োগ করিতে হয়, তাহাতেও চিত্তকে সক্রিয় ও সচেতন রাখিতে হয়। এই ক্রিয়াশীলতা চেতনার লীলাও বিশিষ্ট অঙ্গ। নিষ্ক্রিয়তা আনন্দ নহে—জীবনীশক্তির প্রয়োগের নামই আনন্দ। জড়প্রকৃতির লোকই জীবনী-শক্তির প্রয়োগকে ক্লেশ বলিয়া মনে করে।

ঐ আনুষঙ্গিক ব্যাপারের মধ্যে পড়িতেছে—রচনাটীর কুহরে কুহরে যে রস সঞ্চিত ও ঘনীভূত হইয়া রহিয়াছে তাহার আবিষ্কার। কলা-সৌষ্ঠবের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চাতুর্য্য, আলঙ্কারিক বৈচিত্র্য, শব্দের লক্ষ্যার্থ ও ব্যঙ্গ্যার্থ, অনুপ্রাস-শ্লেষ-যমক, মিল ও ছন্দোঝঙ্কার নানা প্রকারের ইঙ্গিত ও ব্যঞ্জনার মধ্যে যে বিন্দুবিন্দু রস ওতপ্রোত হইয়া আছে—যে সমস্তের সক্রিয় উপভোগ করিতে করিতে অগ্রসর হইতে হইবে। কাব্যের সমস্ত পথটি যে উচ্চাবচ হইলেও পুষ্পাস্তৃত, তাহা অনুভব করিতে করিতে চলিতে হইবে—বলিতে পারা চাই—

"আমার পথ চলাতেই আনন্দ।"

এই ভাবে অগ্রসর হওয়াকে ক্লেশ বলে না। ইন্দ্রিয় যখন উপভোগ করে—তখন সে আপনার শক্তিকে একত্র সংহরণ করে এবং তাহাকে সক্রিয় করে। উহাকে ক্লেশ বলিলে উপভোগমাত্রই ক্লেশ। রসনায় সুখাদ্যের স্পর্শে লালা নিঃসৃত হয়—এই লালা সুখাদ্যকে সুস্বাদু করে। এই লালা-নিঃসরণ রসনার ক্লেশজনক ব্যাপার নয়—ইহা তাহার Reflexive action. সকল Reflexive action এর ন্যায়ই ইহাও ক্লেশজনক নয়। কাব্যপাঠকালে সৎপাঠকের চিত্তের সক্রিয়তাও এইরূপ।

চর্ব্বণের জন্য দন্তকে একটু শ্রম করিতে হয়, সুখাদ্য চর্ব্বণকালে দন্ত কি তাহাকে শ্রম বলিয়া মনে করে?

শ্রমের ভয়ে সে কি কখনো সুখাদ্যকে বর্জ্জন করে? দন্তশূল রোগ থাকিলে বা দন্তের সামর্থ্য না থাকিলেই দন্ত কেবল তরল পদার্থকে আশ্রয় দেয়।

আলঙ্কারিকগণ সৎকাব্যের উপভোগকে আপনার আনন্দময় সম্বিতের চর্ব্বণ-ব্যাপার বলিয়াছেন।

সৎকাব্যের মুখে ভাষা বসাইলে সে বলিবে—

বোশেখ মাসের শীতল প্রসাদ নেইক বেলের
ঘোলের পানা।
ঢক করে যে চুমুকে দেবে মেরে,
বোতলভরা নেইক সুরা এ নয় শুঁড়ির সরাইখানা।

পান ক'রে যে বলবে "বাঃ বাঃ বেড়ে!"
মিল্‌বে নাক চা গরম কি ঠাণ্ডী মিঠে রঙিন জল
'আঃ কি আরাম' বলবে যে পান করি—
ডাব কেটে কেউ দেবে নাক নিভাবে না তৃষ্ণানল
বরোফ দিয়ে পেয়ালা গেলাস ভরি।
চাকের মধু নিঙড়ে কেহ মিশিয়ে আঙুর দাড়িম রসে
রাখেনিক হেথায় বাটী বাটী :
ভাঁড় ভরে যে আখ-খেজুরের রস খাবে যে শুয়ে বসে
নেইক উপায় এ নয় গুড়ের ভাটী।
অক্লেশে বা অনায়াসে একটুও না নড়ে খেটে
গলার তলে যা চলে যায় সোজা,
ছটাকখানেক জিভকে দিয়ে সের আড়াই-এক
ঢাল্‌বে পেটে
এমন কিছুই হেথায় বৃথাই খোঁজা।
পথের কাঙাল নয় রসনা কণ্ঠনালীর ভিক্ষা যেচে
রসের সাথে হয় মিতালী তার,
দন্তগুলি অলস হ'য়ে রয় না হেথা বৃথাই বেঁচে
নয়ক তালু ঢালু নালীর ধার।
পেটভরানো বুক জুড়ানো মুখকে করে প্রবঞ্চনা,
চলবে না এ ফলের জলযোগে।
দন্তগণের সেবার গুণে হেথায় রসের প্রতিকণা
ঐ রসনার লাগবে উপভোগে।
শ্রমের গুণে রসের সনে সপরিবার বদনখানি
হর্ষভরা মর্য্যাদা তার পাবে,
তপ্ত ইক্ষু চর্ব্বণসুখ রসিক জানে—বাড়ায় পাণি
'গৌড়ী' ফেলি গুড়শলাকা-লাভে।

সংকাব্যের রসাস্বাদন করিতে যদি একটু ক্লেশ স্বীকার করিতেই হয়—তবে সে ক্লেশের তুলনায় রসিকের লাভ হয় যথেষ্ট। ছত্রধারণে ক্লেশ আছে স্বীকার করি—কিন্তু ছত্রচ্ছায়ার বা ছত্রাশ্রয়ের সুখ যদি তুলনায় অধিক না হইত তাহা হইলে কেহ ছত্রব্যবহার করিত না। বিনা শুল্কে বিনা মূল্যে যে প্রাপ্তি তাহাত সম্পূর্ণ নিজস্ব হইয়া উঠে না।

যে কবিতার রস অন্তর্গূঢ় তাহার রসোদ্ধারে এবং ভাবঘন ও অর্থগৌরবভূয়িষ্ঠ কবিতার অর্থোদ্ধারে রসিককে যে শ্রমস্বীকার করিতে হয়—তাহার পুরস্কার স্বরূপ রসি[illegible] একটা বোধানন্দও Intellectual Sentiment লা[illegible] করে। ঐ বোধানন্দ কেবল উপরি-পাওনা নয়—উহ[illegible] রসানন্দকেও নিবিড়তর ও দৃঢ়তর করিয়া তুলে। শ্রমে বা ক্লেশের মূল্য দিয়া আমরা যে রসাস্বাদ লাভ করি— তাহার সহিত একটা গৌরবের আনন্দও মিলিত হয়।

স্বপ্নদৃষ্টি

বিশ্বপ্রকৃতির সম্বন্ধে জ্ঞান হওয়ার আগে পর্য্যন্ত শিশু এই সৃষ্টিকে যে মধুময় দৃষ্টিতে দেখে, তাহাকে স্বপ্নদৃষ্টি বলা যাইতে পারে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই সৃষ্টির সহিত তাহার পরিচয় যত নিবিড় হইতে থাকে, স্বপ্নদৃষ্টিও ক্রমে ততই তিরোহিত হয়। বিশ্বকে এই স্বপ্নদৃষ্টিতে দেখার মধ্যে একটা আনন্দ আছে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিশু সে আনন্দ হারায়—কেবল তাহার ক্ষীণ স্মৃতিটুকু থাকিয়া যায়। সেই স্মৃতিটুকুর অবলম্বনে শিশু-মনের রঙে মনকে রাঙাইয়া এবং তদ্দ্বারা কৌশলে একটা স্বপ্নাবেশের ভাব আনিয়া অনেক কবি শিশুরঞ্জন স্বপ্ন-সাহিত্য রচনা করেন। ঠাকুরদাদা-ঠাকুরমায়ের ঝোলাঝুলির যত উপকথা, ছেলে ভুলানো ছড়াপাঁচালি এই শ্রেণীর সাহিত্য। আমরাও যে সে-সাহিত্য পড়িয়া আনন্দ পাই—তাহা আমাদের পরিণত মনের মারফতে নয়,—স্মৃতিসুপ্ত শিশুমনেরই মারফতে।

এমনও কবি আছেন—যিনি পরিণত বয়সেও এই সৃষ্টিকে মাঝে মাঝে স্বপ্নদৃষ্টিতে দেখিতে পারেন। এই কবির বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্বপ্নদৃষ্টি একেবারে লুপ্ত হইয়া যায় নাই বুঝিতে হইবে। সে দৃষ্টি সুপ্ত হইয়া থাকে, কবি তাহাকে মাঝে মাঝে জাগাইতে পারেন। এই অতি পরিচিত বিশ্বসংসার তাঁহার স্বপ্নদৃষ্টির জাগরণে সহায়তা করে না বটে, কিন্তু সাধারণতঃ অভিনব অদৃষ্টপূর্ব্ব নিসর্গশ্রী মাধুরী স্পর্শে তাঁহার স্বপ্নদৃষ্টিকে জাগাইয়া তুলে। কবির স্বপ্নদৃষ্টি বয়োবৃদ্ধির সহিত অন্তরের তলে তলে কতটা রূপান্তর লাভ করে, তাহা বলা কঠিন, কিন্তু বিশ্বপ্রকৃতি যে কবির জ্ঞানদৃষ্টি ও রসদৃষ্টিতে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায় সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাই কবিকে কাব্যসৃষ্টির জন্য

ঐ রূপান্তরিত বিশ্বপ্রকৃতির উপরই স্বপ্নদৃষ্টিপাত করিতে হয়। এই স্বপ্নদৃষ্টির ফলে যে কবিতার জন্ম হয় তাহা পরিণত মনেরই উপভোগ্য। যে মন কিছুতেই স্বপ্নাবেশে মগ্ন হইতে পারে না—সে মন কিছুতেই ঐ শ্রেণীর কবিতা উপভোগ করিতে পারে না। এ সংসারের অধিকাংশ মনই প্রখরভাবে জাগ্রৎ—চেষ্টা করিয়াও স্বপ্নাবেশের সৃষ্টি করিতে পারে না। কাজেই ঐ শ্রেণীর কবিতা অতি অল্প মনেরই উপভোগ্য।

আমি প্রথমে কয়েকটি কবিতার এখানে উল্লেখ করিব—যে গুলিকে স্বপ্নদৃষ্টির কাব্য বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে—

উদাহরণ স্বরূপ—রবীন্দ্রনাথের 'সুখ'—

আজি মেঘমুক্ত দিন, প্রসন্ন আকাশ
হাসিছে বন্ধুর মত। সুমন্দ বাতাস
মুখে চক্ষে বক্ষে আসি লাগিছে মধুর
অদৃশ্য অঞ্চল যেন সুপ্ত দিগ্বধূর
উড়িয়া পড়িছে গায়ে, ভেসে যায় তরী
প্রশান্ত পদ্মার স্থির বক্ষের উপরি
তরল কল্লোলে। অর্দ্ধমগ্ন বালুচর
দূরে আছে পড়ি, যেন দীর্ঘ জলচর
রৌদ্র পোহাইছে। হোথা ভাঙ্গা উচ্চতীর;
ঘনচ্ছায়াপূর্ণ তরু; প্রচ্ছন্ন কুটীর;
বক্রশীর্ণ পথখানি দূরগ্রাম হতে
শস্যক্ষেত্র পার হ'য়ে নামিয়াছে স্রোতে
তৃষার্ত্ত জিহ্বার মত।

এই কবিতায় কবির যে দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়—তাহা পূর্ণ প্রবুদ্ধ দৃষ্টি নয় বটে—তাই বলিয়া স্বপ্ন দৃষ্টিও নয়। ইহা রসদৃষ্টি, মনের একটী প্রশান্ত প্রকৃতি (mood) দৃষ্টির জাগ্রৎ ক্রিয়াশক্তি কতকটা হরণ করিয়া লইয়াছে এবং তাহাকে মধুময়ী করিয়া তুলিয়াছে। ইহা যে কবির Day Dream বা স্বপ্নদৃষ্টির ফল নয় কবিতার শেষাংশ তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয় দিতেছে। জীবনের কয়েকটি মুহূর্ত্তকে কবি উপভোগ করিয়া বলিতেছেন—

চারিদিকে
দেখে' আজি পূর্ণপ্রাণে মুগ্ধ অনিমিখে
এই স্তব্ধ নীলাম্বর, স্থির শান্ত জল
মনে হলো সুখ অতি সহজ সরল।

রবীন্দ্রনাথের 'মধ্যাহ্ন' কবিতাও এই প্রকৃতির—

বেলা দ্বিপ্রহর
ক্ষুদ্র শীর্ণ নদীখানি শৈবালে জর্জ্জর
স্থির স্রোতোহীন। অর্দ্ধমগ্ন তরীপরে
মাছরাঙা বসি'; তীরে দুটি গোরু চরে
শস্যহীন মাঠে। শান্তনেত্রে মুখ তুলে
মহিষ রয়েছে জলে ডুবি। নদীকূলে
জনহীন নৌকা বাঁধা। শূন্য ঘাট তলে
রৌদ্রতপ্ত দাঁড়কাক স্নান করে জলে
পাখা ঝটপটি। শ্যাম শষ্প-তটে তীরে
খঞ্জন দুলায়ে পুচ্ছ নৃত্য করি ফিরে। ইত্যাদি

ইহাও অলস মধ্যাহ্ন প্রকৃতির চিত্র হইলেও স্বপ্নদৃষ্টি নয়। ইহাও মনের একটি মধুময় অনন্ত মুহূর্ত্ত। যে মুহূর্ত্তে কবির মনে হইয়াছে

ফিরিয়া এসেছি যেন আদি জলস্থলে
বহুকাল পরে—ধরণীর বক্ষতলে
পশুপাখী পতঙ্গম সকলের সাথে
ফিরে গেছি যেন কোন নবীন প্রভাতে
পূর্ব্বজন্মে, জীবনের প্রথম উল্লাসে
আঁকড়িয়া ছিনু যবে আকাশে বাতাসে
জলে স্থলে মাতৃস্তনে শিশুর মতন
আদিম আনন্দ রস করিয়া শোষণ।

এইগুলিত স্বপ্নদৃষ্টির ফল নহেই। আর একটি মধ্যাহ্নে কবি যে বলিয়াছেন—

মধুর উদাস প্রাণে চাই চারিদিক পানে
স্তব্ধ সব ছবির মতন,
সব যেন চারিধারে অবশ আলস ভরে
স্বর্গময় মায়ায় মগন।
শুধু অতি মৃদুস্বরে গুন্ গুন্ গান করে
যেন সব ঘুমন্ত ভ্রমর,
যেন মধু খেতে খেতে ঘুমিয়েছে কুসুমেতে
সাধিয়া এসেছে কণ্ঠস্বর।

আনমনে ধীরি ধীরি বেড়াতেছি ফিরি ফিরি
ঘুমঘোর ছায়ায় ছায়ায়,
কোথা যাব, কোথা যাই, সে কথা যে মনে নাই,
ভুলে আছি মধুর মায়ায়।

ইহাকে বরং স্বপ্নদৃষ্টির ফল বলিয়া মনে হইতে পারে কিন্তু পরক্ষণেই কবি স্মৃতিলোকের সহিত ইহার যোগ স্থাপন করিয়াছেন। স্মৃতিলোকে প্রেরিত রসদৃষ্টি ও ঐ স্বপ্নদৃষ্টি এক নহে। মোহিত বাবুর সংস্করণে কল্পনা নামক অংশে 'স্বপ্ন' নাম দিয়া যে কবিতাগুলি আছে এবং শৈশবসন্ধ্যা ইত্যাদি কবিতাকে স্বপ্নদৃষ্টির ফল মনে করা অসঙ্গত নয়, কিন্তু ঐগুলিও হয় স্মৃতিলোকে অথবা বাসনালোকে রসদৃষ্টিপাতেরই ফল।

কবিবর অক্ষয়কুমার বড়ালের 'শ্রাবণে' নামক কবিতা-টিকে স্বপ্নদৃষ্টির চিত্র বলিয়া মনে হইতে পারে। কবিতাটি এই—

সারাদিন একখানি জলভরা শ্রান্ত মেঘ
রহিয়াছে ঢাকিয়া আকাশ;
বসিয়া গবাক্ষ ধারে সারাদিন আছি চেয়ে,
জীবনের আজি অবকাশ!
গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি পড়ে, তরুগুলি হেলে দোলে,
ফুলগুলি পড়িছে খসিয়া;
লতাদের মাথাগুলি মাটিতে পড়িছে ঝলি,
পাখীগুলি ভিজিছে বসিয়া।
কোথা সাড়া শব্দ নাই, পথে লোকজন নাই,
হেথা হোথা দাঁড়ায়াছে জল;
ভিজে ঘাস-বন হ'তে ফড়িং লাফায়ে ওঠে
জলায় ডাকিছে ভেকদল।
দীঘিটি গিয়াছে ভ'রে সিঁড়িটি গিয়াছে ডুবে,
কাণায় কাণায় কাঁপে জল;
বৃষ্টি-ঘায় বায়ু-ঘায় পড়িতেছে নুয়ে নুয়ে
আধ ফোটা কুমুদ কমল।
পাড়ে পাড়ে চকাচকী বসে আছে দুটি দুটি
বলাকা মেঘের কোলে ভাসে,
ক্বচিৎ বা গ্রাম্য বধূ শূন্য কুম্ভ লয়ে কাঁখে
তরুশ্রেণী তল দিয়া আসে।
ক্বচিৎ অশথতলে ভিজিছে একটি গাভী
টোকা মাথে যায় কোন' চাষী।
ক্বচিৎ মেঘের কোলে মুমূর্ষুর হাসি সম
চমকিছে বিজলীর হাসি।
সুদূরে মাঠের শেষে জমে আছে অন্ধকার
কোথা যেন হ'তেছে প্রলয়!
ঘরে বসে মুড়ি দিয়া গৃহস্থ স্ত্রীপুত্র সহ
কত দুর্য্যোগের কথা কয়।
চেয়ে আছি শূন্যপানে কোন কাজ হাতে নাই,
কোন কাজে নাহি বসে মন,
তন্দ্রা আছে নিদ্রা নাই দেহ আছে মন নাই
ধরা যেন অস্ফুট স্বপন।
এই উঠি, এই বসি কেন উঠি কেন বসি
এই শুই, এই গান গাই—
কি গান, কাহার গান কি সুখ কি ভাব তার
ছিল কভু, আজ মনে নাই।

মেঘাচ্ছন্ন বর্ষাপ্রকৃতির প্রভাব কবির চিত্তকে কিরূপ আবিষ্ট করিয়াছে—এই কবিতায় তাহাই অভিব্যক্ত হইয়াছে। কবির মন এমনই ভাবাবিষ্ট ও নিষ্ক্রিয় যে তাঁহার দৃষ্টি বর্ষাপ্রকৃতির একস্থানে একটি পলের জন্যও নিবদ্ধ থাকিতেছে না। তাই ইহাতে বর্ষাপ্রকৃতির সতর্ক বর্ণনা-কৌশল নাই—এ যেন প্রকৃতির অঙ্গে অঙ্গে অবসন্ন দৃষ্টিটিকে বুলাইয়া যাওয়া। মনের দৃঢ়তা নাই, কল্পনা অবসন্ন, দৃষ্টি উদাস। মনের এই অবস্থায় সৃষ্টি যে ভাবে প্রতিভাত হয়—ইহা তাহারই বর্ণনা। ভাষার পারিপাট্য বিধানের,—এমন কি,—ছত্রে ছত্রে মিল দেওয়ারও আগ্রহ বা চেষ্টা নাই—ভাষা যেন মনের অবস্থার অনুযায়ী হইয়াই এলাইয়া পড়িয়াছে। এখানে এই অবসন্নতাই রসসৃষ্টির সহায়।

কবি যে দৃষ্টিতে বর্ষাপ্রকৃতির পানে চাহিয়াছেন—তাহা স্বপ্ন-দৃষ্টি নয়। নিদ্রাভঙ্গের পর শিশু যেমন করিয়া অবাক বিস্ময়ে বিশ্বপ্রকৃতির দিকে চাহিয়া থাকে, কবি আজ তেমনি ভাবে তাকাইয়া আছেন। কবির মনও আজি গগনের মতই মেঘাচ্ছন্ন ও স্তম্ভভাবাপন্ন। এ ঘোর নিদ্রা নয়—তন্দ্রাও নয়—স্বপ্নও নয়—ইহার মনের ক্ষণিক বৈরাগ্য বা ঔদাসীন্য;—দেহ ছাড়িয়া বিরাগী মন কোথা উধাও হইয়া গিয়াছে।

নিম্নলিখিত কবিতার লেখক বলিতে চাহিয়াছেন, তিনি সৃষ্টিকে সহসা স্বপ্ন-দৃষ্টিতে দেখিতেছেন—ঘুম-ভাঙার পর ঘুমের স্বপ্ন তাঁহার চোখে এখনো লাগিয়া আছে—তাই এই সৃষ্টিকে স্বপ্ন-মাধুরীতে এত মধুময়ী লাগিতেছে। কবি ইহাকে স্বপ্ন দৃষ্টি মনে করিয়াছেন—কিন্তু ইহাও স্বপ্ন দৃষ্টি নয়—স্বপ্ন-দৃষ্টিতে দেখার ফল হইলে বর্ণনায় এ শ্রেণীর এত সতর্ক শৃঙ্খলা, সামঞ্জস্য ও অলঙ্কৃতি থাকিত না।

বিকাল বেলায় ঘুম ভেঙেছে বসে আছি জান্‌লা পাশে,
অকাল ঘুমের অলস আবেশ তখন' চোখ জড়িয়ে আসে!
এলোমেলো মনটা আমার তখনো ঠিক হয়নি জড়ো,
চির প্রাচীন সৃষ্টিটাকে লাগল্ হঠাৎ মিষ্টি বড়।
আজ মনে হয় গাছপালা-মাঠ সবই যেন চিত্রে আঁকা,
নিত্য-দেখা সঙ্গীগুলি সবই যেন স্বপ্ন-মাখা।
ঝুরঝুরে ঐ বাতাস যেন কইছে কানে রসের বুলি,
ছায়া যেন মায়ার রূপে চোখে বুলায় কাজল-তুলি।
অপূর্ব্বতা পেয়েছে আজ গাছের পাতা রঙ-গড়নে,
নাম-না-জানা পতঙ্গেরা দৃষ্টিতে মোর স্বপন বোনে।
শিউরে-ওঠা শিরীষ তরু অঙ্গে, তাহার আলোকলতা;
কাঠবিড়ালী নাড়ছে মাথা তার সাথে কয় মনের কথা।
এক পলকো একটি ঠাঁয়ে পক্ষী দুটি থির না থাকে,
দুইটি পাখীই পক্ষীভরা করেছে ঐ বৃক্ষটাকে।
দুজন সুখে কূজন করে পুচ্ছ নাচায় দোলায় গ্রীবা,
আদিম যুগের প্রেমের লীলা আড়ি পেতে দেখছি কিবা।
একটি ছোট ধবধবে মেঘ দেখছি ভেসে যাচ্ছে দূরে
সবুজ রঙের একটি ঘুড়ি তাহার সঙ্গে সঙ্গে উড়ে।
চন্দনের ঐ ফোটা ও কি শ্যামলা দিগ্‌বধূর ভালে
তাহার নীচেই একটি ছোট তিল কি জাগে তাহার গালে?
তাল-নারিকেল-কুঞ্জ শিরে আলোর লুকোচুরির ফাঁকি,
আকাশ-বধূর ময়ূরকণ্ঠী চেলির আঁচল দুলছে নাকি?
সোনার আলোয় জ্বলছে দূরে, ঝলছে বিলের বক্ষখানি,
দিনের ওকি পিছন পানে চাউনি সজল, বিদায় বাণী?
চর্‌ছে ঘোড়া দীঘির পাড়ে ঢেউ খেলে যায় তাহার লোমে,
সেই হরষের লহর লাগে অঙ্গে আমার রোমে রোমে।
ভরা কলস আঁকড়ে কাঁখে গ্রামের বধূ ফিরছে ঘরে,
মাঝে মাঝে চমকে জাগে বাঁশবাগানে আড়াল পড়ে।
ওরা যেন ব্রজের গোপী কবির স্বপন দিয়ে গড়া,
চলন ওদের নাচের মতন ঘট কি ওদের সুধায় ভরা?
তৃপ্তি যেন মূর্ত্তিমতী ধেনুগুলি ফিরছে ধীরে,
লক্ষ্মীছাড়ার ঘরে যেন লক্ষ্মী-শ্রীটিই আসছে ফিরে।
ঘুম-ঘোরের আবেশ ভরা নয়নে আজ দেখছি চেয়ে
সৃষ্টি হাসে আমায় হেরে নূতন কলেবরটি পেয়ে।
ঘুম ভেঙে আজ ঘুমের স্বপন মন হতে কি বাইরে এসে,
প্রাচীন ধরায় অভ্র দিয়ে আড়াল ক'রে বেড়ায় ভেসে?
দণ্ড কয়েক অকাল ঘুমের ব্যবধানের মধ্যখানে
সৃষ্টি এমন বদ্‌লে যাবে হয় না মনে—মন না মানে।
দেহ-মনের সব পরিজন এখনো মোর কেউ না জাগে,
শুধু আমার চোখ জেগেছে হঠাৎ আজি সবার আগে।
তাদের কোলাহলের মাঝে যারে পাওয়া যায় না খুঁজি।
নেত্র আমার একলা পেয়ে নিভৃতে তাই ভুঞ্জে বুঝি।

সৃষ্টিকে কেন মধুময়ী লাগিয়াছে—লেখক তাহা শেষ কয় পংক্তিতেইত বলিয়াছেন। অর্দ্ধপ্রবুদ্ধ দৃষ্টি ও স্বপ্নদৃষ্টি এক নহে।

কবি রসদৃষ্টিতে এই বিশ্বলোককে দেখিয়া যাহা কিছু অর্জ্জন করেন তাহা তাঁহার স্মৃতি-ভাণ্ডারে সঞ্চিত থাকে। কবি কবিতারচনাকালে রসদৃষ্টিকে আবার স্মৃতি-ভাণ্ডারে প্রেরণ করেন। স্মৃতিভাণ্ডার হইতে আহৃত উপাদানে এইভাবে রচিত সাহিত্যও স্বপ্নসাহিত্য নয়। করুণানিধানের 'বাসনা' 'অতীত' 'শেষ বাসরে' ইত্যাদি কবিতা স্মৃতি-ভাণ্ডারে এইভাবে রসদৃষ্টি প্রেরণেরই ফল। রবীন্দ্রনাথের—"বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদী এলো বান" 'শৈশব সন্ধ্যা' ইত্যাদি কবিতাও এই শ্রেণীর—স্বপ্ন-সাহিত্যের কাছাকাছি গেলেও স্বপ্ন-দৃষ্টির ফল নহে। কবি যে আপনার স্মৃতিভাণ্ডারেও স্বপ্নদৃষ্টি প্রেরণ করিয়া স্বপ্নসাহিত্য সৃষ্টির উপাদান আহরণ করিতে পারেন না, তাহা নয়, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কোনদিনই তাহা করেন নাই।

ব্যক্তিগত মনেও যেমন স্মৃতিভাণ্ডার আছে, আমাদের জাতীয় মনেরও তেমনি একটি স্মৃতিভাণ্ডার আছে। এই স্মৃতিভাণ্ডারের সাক্ষাৎ পাই আমরা দেশের প্রাচীন ইতিহাস সাহিত্যাদিতে। জাতীয় মনের এই স্মৃতিভাণ্ডারে

কবি আপনার রসদৃষ্টিকে প্রেরণ করেন এবং তদ্দ্বারা উপাদান আহরণ করিয়া নিজের জীবনে একটি কল্পনা-লোকের সৃষ্টি করেন। উপাদান আহরণ করিয়াই এবং কল্পলোকের সৃষ্টি করিয়াই রসদৃষ্টির কাজ ফুরায় না—রসদৃষ্টি কল্পসাহিত্যেরও সৃষ্টি করে। এই শ্রেণীর কাব্য-সাহিত্য রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থে প্রচুর। উদাহরণ-স্বরূপ—স্বপ্ন (দূরে বহুদূরে স্বপ্নলোকে উজ্জয়িনী পুরে ইত্যাদি) কুহুধ্বনি, মেঘদূত, সেকাল ইত্যাদি ও কথা-ও কাহিনীর অনেক কবিতার নাম করা যাইতে পারে। বলা বাহুল্য এইগুলি স্বপ্নসাহিত্য নয়।

এ কথা বলার বিশেষ প্রয়োজন এই যে—আমরা স্মৃতিলোককে সাধারণ কথায় স্বপ্নলোক বলিয়া থাকি—প্রাচীন ভারতের ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্য, গৌরবশ্রী, বিভূতি সবই আজ আমাদের কাছে স্বপ্নবৎ। তাই অতীত যুগ আমাদের কাছে স্বপ্নযুগ—বিশেষতঃ কাব্যের মধ্য দিয়া আমরা যে জগতের সন্ধান পাইতেছি—তাহাকে আমরা স্বপ্নজগৎই বলিয়া থাকি। 'স্বপ্ন' কথাটা 'স্মৃতির' বদলে ব্যবহার করি বলিয়া স্মৃতির উপাদানে রচিত সাহিত্য তথা কথিত স্বপ্নসাহিত্য নয়—যে দৃষ্টি দিয়া রবীন্দ্রনাথ-প্রমুখ কবিগণ ব্যক্তিগত মনের অথবা জাতীয় মনের স্মৃতি-জগৎকে নিরীক্ষণ করেন—তাহাও স্বপ্ন দৃষ্টি নয়।

স্বপ্নদৃষ্টির একমাত্র কবি করুণানিধান। স্বপ্নরস বলিয়া কোন রস নাই। এই কবি স্বপ্নকেও একপ্রকার রসে পরিণত করিয়াছেন। সকল প্রকার মাধুর্য্যের সম্ভোগেই একদিন ক্লান্তি আসে। জাগ্রৎ সক্রিয় সতর্ক দৃষ্টিতে আমরা যে মাধুরী লাভ করি—তাহাতে ক্লান্তি আসিলেই আমাদের অবসন্ন মন কিছুক্ষণ স্বপ্নমাধুরী উপভোগ করিয়া অলস আনন্দ পাইতে চায়। এই স্বপ্ন মাধুরী আমরা কাব্যেও পাইতে পারি,—এই মাধুরী প্রধানতঃ 'রূপে' ফুটিয়াছে করুণানিধানে আর 'ধ্বনিতে' ফুটিয়াছে সত্যেন্দ্রনাথে :—

করুণানিধানের স্বপ্ন মাধুরী—

১। মেঘের পুরীর পর্দ্দা তুলে নীলপাহাড়ের কোল ঘেঁসে,
কোন তারকার ইঙ্গিতে আজ পৌছিব গো কোন দেশে?
হাওয়ায় বাজা বীণার তানে মন ছোটে আজ কোন উজানে?
শূন্যগুহার নূপুর শুনি কোন পুলিনে যাই ভেসে।

উড়ো পাখীর সুরের সুরায় সরল তরুর আবছায়ে,
প্রবালবরণ বৈকালে আজ কোন্ পাষাণী গান গাহে?
ফুল-পরাগের ঘোমটা টানি লুটিয়ে পড়ে আঁচলখানি,
লাজুক মেয়ে সৌদামিনী আলতা পরায় তার পায়ে।

রূপের তরী ভাসায় পরী গৌরী চাঁপার রঙ মেখে,
পদ্ম গোলাপ নিন্দি পাখা পরিয়েছে তার অঙ্গে কে
কোন মহুয়া মদির সুরা পান করে ঐ ফুল বধূরা?
পালিয়ে গেছে প্রাণ বধুঁয়া বিম্বাধরে দাগ রেখে।

* * *

প্রাচীর-ছায়া যায় কি দেখা বৈজয়ন্ত নন্দনে?
স্বপ্নচাতক পক্ষ মেলে মন্ত্রমাখা রঞ্জনে।
মানব জীবন ঢেউয়ের মত কোন বেলাতে মর্ম্মাহত?
নয়ন মুদি ঝর্ণাধূমে কোমল ঘুমের অঞ্জনে।

২। হের,—দিগ্বলয়ে বেগুনি নীল গিরিশ্রেণীর চূড়ায়
পরীরা ঐ সারি সারি মণির ফানুস উড়ায়।
হেথায় যাহা ভাবে আঁকা রূপে হোথায় রাজে,
জলধনুর বীণার পারে আলোর সুরটি ভাঁজে।

৩। কাণের পিঠে তিলটি তোমার এড়ায়নি এই মুগ্ধ চোখ,
দীঘির ঘাটে ঐ যে আঁকা দীপ্ত তোমার অলক্তক।
নারিকেলের কুঞ্জশিরে পদ্মফোটা দীঘির নীরে।
ভাঁজটি খুলে ছড়িয়ে প'ল পরীর পাখার স্বর্ণালোক
স্বপ্নসম তার কাহিনী আজকে প্রিয়ে দ্বিপ্রহরে,
নোনা আতায় সোনার গায়ে রবির কিরণ পিছলে পড়ে,
দূর্ব্বাশ্যামল নিম্বতল দীপ্ত নভোনীলোজ্জ্বল
ঢেউয়ের মাথায় খানিক ভাঙ্গে গাঙ্গের বুকে স্তরে স্তরে।

৪। মরুদ্ ডম্বরু মন্দ্র উতরোল অম্বুধি গর্জ্জন,
বিসর্পিত জলে স্থলে নিশীথের নয়ন কজ্জল
ক্ষিপ্ত নভে জলস্তম্ভ, সংজ্ঞাহারা জ্যোতিষ্কমণ্ডল
সেই সান্দ্র সমুদ্রের অন্ধকার ধূম্র সরোবরে
ফুটে কার লীলাপদ্ম? ডাকে তারে যুগযুগান্তরে।

৫। এই গরিমার তোরণ তলে মন হারানো মনে,
ঝিল্লী রবের সুর বাহারে বলবালাদের সনে

শৈবালে আর ফুলবলয়ে পথ ভুলে এই স্বপ্নালয়ে
জলধরের বিলোল খেলা আধেক জাগরণে।
হে যাদুকর শৈলনগর বঙ্গসাগর-বেলা,
আঁধার রাতে বাতি ঘরের চপল আলোর খেলা,
কালীর বর্ণ অন্তরীপে জ্বালিয়ে স্বর্ণ আকাশ দীপে
পরশমণির রশ্মি পথে ভাসিয়ে দিলাম ভেলা।

৬। নীল আকাশে বুলিয়ে তুলী তুষার সাদা শিখর গুলি
কে আঁকিল মেঘসাগরের পারে ?
বালক ভানুর আলোর কণা রঙ ফলানো কি আলপনা
দিগ্বধূরে সাজায় মোতির হারে।
শ্বেত বিজুলি নিথর হয়ে ঘুমিয়েছে ঐ মূর্ত্তি লয়ে
শিথানে তার উজল ঢেউয়ের সারি,
ছাড়িয়া ঐ উষার তারা সাম্‌নে নেমে আসছে কারা
কটাক্ষেতে স্ফটিক হলো বারি।

৭। হেরব রূপের নীলাম্বরে বিরাট শিখী কলাপ ধরে
তারায় তারায় বরণ-শোভা জাগে,
প্রেম-গোমুখীর মন্দাকিনী চন্দন উদক কল্লোলিনী
অযুত ধারায় ঝরবে রসে রাগে।
দিব্য দেউল দীপালিতে জপারতির মন্ত্র-গীতে
মগ্ন হব কারণ-মধু-নীরে
সুদূর মণিকর্ণিকাতে পরসাদের পূর্ণিমাতে
উত্তরিব অরুণিমার তীরে
লোকান্তরের অবন্তীতে অশ্রু উজল অঞ্জলিতে
করব কবে আত্ম সমর্পণ ?
মৃত্যু যেথায় পায় গো বিনাশ অন্ত আদির চরম বিকাশ
পুরুব শান্ত সত্য নিরঞ্জন।

৮। আমরাই মায়া-স্বপন দোলায় রূপের ফুলের ডালি,
আহতা, দলিতা ফণিনীর মত কাল কূট ফেনা ঢালি।
রসাল শাখার মধুমঞ্জরী
কেতকীর খর কণ্টকে ভরি
পান করি মোরা শ্যামা যামিনীর ছায়া দুকূলের কালী।

উপরের উদাহরণগুলি হইতে সহজেই বোঝা যাইবে —কবি সৃষ্টিকে সম্পূর্ণ স্বপ্নদৃষ্টিতে দেখিয়াছেন। কবির স্বপ্ন দৃষ্টি শুধু বর্ত্তমানের পরিদৃশ্যমান সৃষ্টিকেই স্বপ্ন মাধুরীময় করে নাই, অতীতের স্মৃতির পথে, ভবিষ্যতের আশা আকাঙ্ক্ষার পথেও কবি স্বপ্নদৃষ্টিকে প্রেরণা করিয়াছেন। আপনার সকল সুখ দুঃখ, জীবনের সকল ভাব অনুভূতির উপরও তিনি স্বপ্নদৃষ্টিপাত করিয়াছেন। সে জন্য এই শ্রেণীর অধিকাংশ কবিতায় স্বপ্ন, যাদু, তন্দ্রা, তন্ময়তা ইত্যাদি কথারও বারবার উল্লেখ আছে। কবি সৃষ্টিকে যাদুকরের লীলা মনে করেন—কোথাও এই দৃষ্টিকে বলিয়াছেন নয়নের মায়ামণি,—কোথাও বলিয়াছেন,—'দিনের রঙে এই দুনিয়া তাঁহার চোখে ঝাপসা লাগে'—'আবছায়ারা চোখের উপর আলপনা দেয়।' কোথাও বলিয়াছেন—'কে যেন তাঁহার মনের চোখে মেঘলা কাজল বুলিয়েছে।' অতীত তাঁহার কাছে—'সুদূর স্মৃতির অবগুণ্ঠিত শিখর।' কবি কখনো 'মোহিনীর কুহক রথে গরল ভরা ঘ্রাণে আপনাকে মূর্চ্ছাহত' দেখিতেছেন। কখনো 'তন্দ্রাঘোরে বন্দী হইয়া অস্তপারে চলিয়াছেন, কখনও 'সুনয়নীর মায়ামণির চিরগোপন ইসারাতে' পথ ভুলিতেছেন,—ইত্যাদি

এই কবিতাগুলি যে স্বপ্ন দৃষ্টিরই ফল—তাহার একটা প্রমাণ ইহাদের রচনারীতির Sequence Logical নয়, Emotional নয়, Rhetoricalও নয়—ইহার Sequence স্বপ্নেরই Sequence. যেন অনেকটা Reflexive—ইহার ভাষাও স্বপ্নেরই ভাষা। অন্য শ্রেণীর কবিতায় যে সামঞ্জস্য, শৃঙ্খলা ও অর্থসঙ্গতি থাকে—এগুলির মধ্যে তাহা অক্ষরে অক্ষরে খুঁজিতে যাওয়া বৃথা। স্বপ্ন-মাধুরীই ইহাদের স্থায়ী ভাব—ইহাদের বিভাব অনুভাব সবই স্বপ্নজগৎ হইতে আহৃত এবং কারুণ্য, অনুরাগ, শম ইত্যাদি যে ভাবগুলির আভাস পাওয়া যায়, তাহারাই এ শ্রেণীর কবিতায় সঞ্চারী ভাব। এইগুলির প্রধান সম্পদ ব্যঞ্জনা।

স্বপ্নে যে আনন্দ আছে, তাহা একটা রসানুভূতির সৃষ্টি করে। আলঙ্কারিকরা সে রসানুভূতিকে কাব্যমনস্তত্ত্বের মধ্যে ধরেন নাই—কারণ জ্ঞানজাগ্রৎ মনই তাঁহাদের বিচার্য্য, স্বপ্নাবিষ্ট মনকে তাঁহারা রস রাজ্য হইতে বাদ দিয়াছেন। তাঁহারা বাদ দিলেও কাব্য-রাজ্য হইতে ইহা বাদ যাইতে পারে না। করুণানিধান এই অপূর্ব্ব স্বপ্নকাব্যের সৃষ্টি করিয়া তাহা প্রমাণ করিয়াছেন।

স্বপ্নদৃষ্টি সম্বন্ধে যে কথা বলা হইল—স্বপ্নশ্রুতি সম্বন্ধেও সেই কথা বলা চলে। সত্যেন্দ্রনাথের অনেক কবিতাই

স্বপ্নশ্রুতির মাধুর্য্যসঞ্চার মাত্র। রূপজগতে স্বপ্নদৃষ্টির সাহায্যে করুণা নিধান যে শ্রেণীর সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছেন—ধ্বনি-জগতে স্বপ্নশ্রুতির সাহায্যে সত্যেন্দ্র সেই শ্রেণীরই সৃষ্টি করিয়াছেন। এইগুলি সত্যেন্দ্রনাথের ছন্দের কসরৎ মাত্র নহে—কাণের পথ দিয়া এই গুলি স্বপ্নমাধুরীরই সৃষ্টি করে।

সত্যেন্দ্রনাথের—

১। চোখ তার চঞ্চল এই চোখ উৎসুক,
এই চোখ বিহ্বল ঘুম-ঘুম সুখ-সুখ,
এই চোখ জল জল টল টল ঢল ঢল
নাই তীর নাই তল এই চোখ ছল ছল,
জ্যোৎস্নায় নেই বাঁধ এই চাঁদ উন্মাদ,
এই মন উন্মন তন্ময় এই চাঁদ,
এই গান কোন্ সুর এই ধায় কোন দূর
কোন্ বায় ফুর্ ফুর্ কোন্ স্বপ্নের পুর।
গান তার গুন্ গুন্ মঞ্জীর রুণ্ রুণ,
বোল তার ফিস ফিস্ চুল তার নিশ পিস,
সেই মোর বুল্ বুল্ নাই তার পিঞ্জর
চঞ্চল চুল্‌বুল্ পাখনায় নির্ভর। ইত্যাদি

২। সেথা—তন্দ্রার বীণাকার মঙ্গল গায়,
সেথা—মেঘ মল্লীর বন অঙ্গন ছায়,
সেথা—অর্ব্বুদ পর্ব্বত অদ্ভুত ঠাম
সে যে—দুর্গম দুশ্চর যক্ষের ধাম।
সেথা—ঘুম ডাইনীর ঘুম দেখ ঝাপসায়
যেন—গুগ্‌গুল মশ্‌গুল ঢেউ আফসায়,
সেথা—দিয়ে গায় কুয়াসার ভোটকম্বল
যত—উদাসীন বাতাসের ঘোটমণ্ডল।
সেকি—দৃষ্টির চন্দনবৃষ্টি, মরি
নিতে—সৃষ্টির সন্তাপ রিষ্টি হরি!
সেকি—কাঞ্চনচম্পকলাঞ্ছন রূপ,
সেকি—সৌরভ-তন্ময় পুণ্যের ধূপ,
সেথা—ঝিল্লীর উল্লাস হিল্লোল বায়,
লাগে—নিত্যের নিঃশ্বাস চিত্তের গায়।
সেথা—সূর্য্যের চোখ সদা ধ্যান মগ্ন,
মহা—শান্তির কান্তিতে মন লগ্ন,
সেথা—মহাপুরুষের ছায় মহা মহীয়ান,
কত—তৃষাতুর অমৃতের পায় সন্ধান।
সেথা—বিশ্বের বীণকার যুগ যুগ ধায়,
সেই—কুঙ্কুম রুম্ ঝুম্ ঘুমগুম্ফায়

৩। মেঘলা থমথম সূর্য্য ইন্দু ডুব্‌ল বাদলায় ভুল্‌ল সিন্ধু
হেমকদম্বে তৃণস্তম্বে ফুটল হর্ষের অশ্রুবিন্দু।
মৌন নৃত্যে মগ্ন খঞ্জন মেঘসমুদ্রে চল্‌ছে মন্থন,
দগ্ধ দৃষ্টি বিশ্বসৃষ্টির মুগ্ধ নেত্রে স্নিগ্ধ অঞ্জন।
বাজছে শূন্যে অভ্রকম্বু কাঁপছে অম্বর কাঁপছে অম্বু
লক্ষ ঝর্ণায় উঠছে ঝঙ্কার ওম্ স্বয়ম্ভু, ওম্ স্বয়ম্ভু।
বম্ ববমবম্ শব্দ গম্ভীর বৃন্তে ছম ছম স্তব্ধ জম্বীর
মেঘমৃদঙ্গে প্রাণসারঙ্গে স্বপ্নমল্লার স্বপ্ন হাম্বীর,
সান্দ্র বর্ষণ হর্ষ কল্লোল ঝিল্লী গুঞ্জন মঞ্জু হিল্লোল
মূর্চ্ছে বীণ আর মূর্চ্ছে বীণকার মূর্চ্ছে বর্ষার ছন্দো
হিন্দোল।

৪। ওকে—আসছে গো মুখ ঢেকে লোর পর্দ্দায়
ছেয়ে—কদমের পেখমের ডোর জর্দ্দায়
ওরে—দূর থেকে দেখে মেতে উঠ্‌ল ভুবন
তাই—হাওয়া ফেরে ফরফর সরফর্দ্দায়।
কোন্—দেয়াশিনী রূপসীর বাজ্‌ল নূপুর,
তাই—কেয়াবনে দেয়া সনে মাত্‌ল ময়ুর,
মরি—পাখনার ঢাকনায় স্পন্দে তনু
ভরি—পালখের এসরাজ পুলকের সুর।
ওরে—নড়্‌ল কি ঘোমটার মেঘ্‌লা আষাঢ়?
ওরে—উড়্‌ল কি পর্দ্দার এতটুকু পাড়?
হেথা—অন্তরে সন্তরে সাতশো স্বপন
হোথা—লাগল কি ঢেউ তার জাগল কি সাড়?
আজি—মন ফেরে মেঘে মেঘে অভ্রশিলায়
খুজে—দূর রাকা, দূর রাস দূর রাধিকায়।
আজ—আকাশের রুধি দ্বার রসের রণন
সারা—দুপুরের নূপুরের শিঞ্জিনিকায়।

সত্যেন্দ্রনাথের 'ঝর্ণা' 'হিন্দোলবিলাস' ইত্যাদি কবিতাও এই শ্রেণীর।

সত্যেন্দ্রনাথের কিশোরী, কুঙ্কুম-পঞ্চাশৎ, জ্যোতির্ময়

প্রভৃতি কবিতা করুণানিধানের স্বপ্নকাব্যেরই কাছাকাছি।

পক্ষান্তরে করুণানিধানেরও কোন কোন কবিতায় ধ্বনির দিক হইতেও স্বপ্নমাধুরী ফুটিয়াছে—

যেমন—

হাসে—সুন্দর মুখ খঞ্জন চোখ, জাফরাণ রঙ অঞ্চল,
নাহি—নৃত্যের শেষ সঙ্গীতরেশ ফুলবাণ সব চঞ্চল,
ওই—আনমন চম্পায়, মান-স্বপ্নের আবছায়
কার—যৌবনলোল হাস্যের রোল, রূপদর্পণ ঝলমল।
এলো—জ্যোৎস্নার রাত বন্ধুর সাথ নন্দন ফুলশয্যা
খেল—রঙ্গের ফাগ, চুম্বন রাগ লজ্জায় লাল লজ্জা।
মধু—মল্লীর সৌরভ চুমে—কুন্তল গৌরব
ওরে—চায় প্রাণমন আপনার জন, বনময় ফুলসজ্জা।
ওরে—কঙ্কণসুর ঝঙ্কার তোল আয় ফুল-মৌ পান কর
জাগে—বংশীর তান হর্ষের বান রাত-ভোর গীত-নির্ঝর
খোল—কাঞ্চীর বন্ধন হোক্—উন্মদ ঘূর্ণন
খুলে—দিক ওড়নার কাঞ্চন পাড় কন্দর্পের ফুলশর।
বুকে—তাল দেয় ওই রত্নের হার, ডুব দেয় সব অন্তর
আঁকি—চন্দন রস আলপন আজ জপকর প্রেমমন্তর।
মুখ—মন্দার গন্ধি প্রিয়—দর্শননন্দী
ওই—কজ্জল চোখ যৌতুক দিক উদ্বেল প্রাণ মন তোর।

এ সকল কবিতায় কোন রসাবেশ বা Mood নাই—স্বপ্নশ্রুতিতেই ইহার মাধুর্য্য।

এই দুই কবির প্রভাব পড়িয়াছে কাজীনজরুল ইস্লামের উপর। কাজীনজরুলের কোন কোন কবিতায় স্বপ্নশ্রুতি ও স্বপ্নদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার অনেক গজল গান সুরে না শুনিলে স্বপ্নকাব্য বলিয়াই মনে হইবে—সুরে শুনিলে সঙ্গীত কাব্যকে ছাড়াইয়া উঠে—তখন সঙ্গীতের দিক হইতেই বিচার্য্য হইয়া উঠে।

ব্যঙ্গ্যার্থ

এমন আলঙ্কারিকও আমাদের দেশে ছিলেন, এখনও এমন অনেক পাঠক আছেন—যাঁহারা রসগর্ভ কাব্যের একটা নির্দ্দিষ্ট ব্যঙ্গ্যার্থ না পাইলে তাহাকে কাব্য বলিয়া গণনা করেন না—প্রহেলিকার শ্রেণীভুক্ত মনে করেন। এই সব অর্থলোভী পাঠকগণ ব্যঙ্গ্যার্থের সন্ধানে ব্যস্ত—ব্যঙ্গ্যার্থের উদ্ধার হইলেই তাঁহারা তৃপ্ত—কাব্যপাঠের কর্ত্তব্য তাঁহাদের সমাপ্ত। ব্যঙ্গ্যার্থের আবিষ্কার হইলেই ইহাঁরা আনন্দ অনুভব করেন। কবির তাহাতে কোন আপত্তি নাই—তিনি বলিবেন—

"যখন কবিতাটা লিখিতে বসিয়াছিলাম—তখন কোন অর্থই মাথায় ছিল না। তোমাদের কল্যাণে দেখিতেছি লেখাটা বড় নিরর্থক হয় নাই। * * যাহারা আগ্রহভরে কেবল শিক্ষাংশটুকু (অর্থাৎ ব্যঙ্গ্যার্থ) বাহির করিতে চাহেন—আশীর্ব্বাদ করি তাঁহারাও সুখে থাকুন। * * * যিনি যাহা পাইলেন সন্তুষ্টচিত্তে তাহাই লইয়া ঘরে ফিরিতে পারেন—কাহারও সহিত বিরোধের আবশ্যক দেখি না—বিরোধে ফলও নাই।"

কবি তাহা বলিতে পারেন, কিন্তু আমাদের সঙ্গে অর্থলোভীদের বিরোধ আছে। আমরা বলি—তোমরা যে আনন্দ পাইলে তাহা বোধানন্দ মাত্র (Intellectual Pleasure)—পিত্তলকে কাঞ্চন মনে করিলে—'এহো বাহ্য আগে কহ আর।' কাব্যের আনন্দ বা রসানন্দ উহা নয়। সকল প্রকার আবিষ্কার, সংশয়নিরসন, সমস্যার সমাধানে যে আনন্দ তোমরা পাও এ আনন্দ তাহা ছাড়া আর কিছুই নয়।

কাব্যে ব্যঙ্গ্যার্থ থাকিলে কাব্য যে উচ্চশ্রেণীর হয়, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ঐ ব্যঙ্গ্যার্থকে আলঙ্কারিকগণ বলেন ধ্বনি। বাচ্যাতিশায়িনি ব্যঙ্গে ধ্বনিস্তৎ কাব্যমুত্তমং, অথবা যত্র প্রধানোব্যঙ্গ্যার্থস্তৎকাব্যং ধ্বনিমুত্তমং। কিন্তু সেই ব্যঙ্গ্যার্থ যদি একটিমাত্র নির্দ্দিষ্ট অর্থ হয়, তবে কাব্যে রসবত্তা সংকীর্ণ হইয়া পড়ে। তাহা বোধানন্দকে যতটা সাহায্য করে রসানন্দকে ততটা সাহায্য করে না। ব্যঙ্গ্যার্থের অস্তিত্বের প্রয়োজন আছে—কিন্তু তাহার অনির্ব্বচনীয়তা চাই—তাহা চিত্তকে একটি বাঁধা পথে লইয়া না গিয়া তাহাকে বাচ্যার্থ ছাড়াইয়া দিগ্‌দিগন্তে যুগযুগান্তে লইয়া যাইবে আনন্দের পাথেয় দিয়া। কবি বলিয়াছেন—

নানা জনে লবে এর নানা অর্থ টানি
তোমাপানে যায় এর শেষ অর্থখানি।

এই 'তোমা' ভগবান নয়,—অনন্ত। শেষ অর্থ অনন্তের পানে।—এ অর্থসন্ধানের শেষ হইবে না—এ সন্ধানে ক্লেশ নাই—শ্রম নাই—আয়াস নাই। সন্ধানেই আনন্দ। এ সন্ধান কোন দিন ফুরাইবে না—আনন্দও ফুরাইবে না।

উচ্চশ্রেণীর কবিতার ব্যঙ্গ্যার্থের যে শেষ নাই—তাহার একটি প্রমাণ এই। একশত পাঠককে যদি কবিতায় ব্যঙ্গ্যার্থের কথা জিজ্ঞাসা করা যায়—একশত জন একশত প্রকারের ব্যঙ্গ্যার্থের সন্ধান দিবে—কোনটাই অসমঞ্জস বা অসঙ্গত বলিয়া বোধ হইবে না। পাঠকের আপন মনেই কতপ্রকারের অর্থের উদয় হইবে—জীবনের ঘটনাচিন্তার যোগাযোগে কত নূতন নূতন অর্থের আবিষ্কার হইবে—ফলে পাঠকের চিত্ত সকল অর্থের অতীত আনন্দলোকে গিয়া বিশ্রামলাভ করিবে। বিনা সন্ধানে আপনা হইতে যে সকল অর্থের উন্মেষ হইবে—সেই সকল অর্থও নব নব রসানন্দ দান করিবে।

কোন অর্থ যদি নাই পাওয়া যায়,'ইতি ব্যঞ্জ্যতে' বলিয়া কিছু যদি নাই ধরা যায়, তাহা হইলেই কি কবিতা ব্যর্থ হইল? কোন অর্থের সন্ধান না পাইলে বোধানন্দের সহিত রসানন্দের মিলন হয় না বটে, কিন্তু অবিমিশ্র রসানন্দ লাভে কোন ব্যাঘাতই হয় না। সে জন্য রসজ্ঞ ব্যক্তিগণ সরস কবিতায় কোনপ্রকার ব্যঙ্গ্যার্থের সন্ধানই করেন না। তাঁহারা বোধানন্দের সহিত রসানন্দের মিলন ঘটাইতে চাহেন না।

এখন দুই একটি কবিতা তুলিয়া কথাটা পরিস্কার করা যাক।

"বিধি যেদিন ক্ষান্ত দিলেন সৃষ্টি করার কাজে,
সকল তারা উঠল ফুটে নীল আকাশের মাঝে।
নবীন সৃষ্টি সামনে রেখে সুর-সভার তলে,
ছায়াপথে দেবতা সবাই বসেন দলে দলে,
গাহেন তাঁরা কি আনন্দ একি পূর্ণ ছবি
একি মন্ত্র, একি ছন্দ—গ্রহ চন্দ্র রবি।
হেনকালে সভায় কেগো হঠাৎ বলি উঠে,
জ্যোতির মালায় একটি তারা কোথায় গেছে টুটে,
ছিঁড়ে গেল বীণার তন্ত্রী থেমে গেল গান,
হারা তারা কোথায় গেল পড়িল সন্ধান।
সবাই বলে সেই তারাতেই স্বর্গ হতো আলো,
সেই তারাটাই সবার বড় সবার চেয়ে ভালো।
সে দিন হতে জগৎ আছে সেই তারাটির খোঁজে,
তৃপ্তি নাহি দিনে রাত্রে চক্ষু নাহি বোজে।
সবাই বলে, 'সকল চেয়ে তারেই পাওয়া চাই',
সবাই বলে "সে গিয়াছে ভুবন কানা তাই।"
শুধু গভীর রাত্রি বেলা স্তব্ধ তারার দলে
মিথ্যা খোঁজা, সবাই আছে নীরব হেসে বলে।"

এই যে কবিতাটি ইহা রসাঢ্য কবিতা নয়। ইহাতে বোধানন্দ ছাড়া অন্য কিছু পাওয়ার কথা নয়। এখানে বোধানন্দকে সম্পূর্ণাঙ্গ করিবার জন্য ব্যঙ্গ্যার্থ সন্ধানের প্রয়োজন আছে। নির্দ্দিষ্ট ব্যঙ্গ্যার্থ না পাইলেও রচনাটি কিন্তু ব্যর্থ নয়। ব্যঙ্গ্যার্থ একেবারে না পাওয়াতে বরং একটু রসানন্দও বোধানন্দের সঙ্গে পাওয়া যাইতেছে। নির্দ্দিষ্ট ব্যঙ্গ্যার্থ পাইলে বোধানন্দ সম্পূর্ণাঙ্গ হইবে, কিন্তু রসানন্দ একটুও পাওয়া যাইবে না। কবির symbolএর সাহায্য বলিবার কৌশলটি হইতেই একটা বোধানন্দ পাওয়া যাইতেছে। তাহার সহিত যে একটা রহস্যময়তা বিজড়িত আছে—তাহাতে একটু রসানন্দও পাওয়া যাইতেছে। অর্থের উদ্ধার হইলে ঐ রহস্যটুকুও উবিয়া যাইবে।

আর একটি কবিতা ধরা যাক—

হায়—গগন নহিলে তোমারে ধরিবে কেবা?
ওগো—তপন তোমার স্বপন দেখি যে করিতে পারিনে সেবা।

শিশির কহিল কাঁদিয়া
"তোমারে রাখি যে বাঁধিয়া
হে রবি এমন নাহিক আমার বল
তোমা বিনা তাই ক্ষুদ্র জীবন কেবলি অশ্রুজল।"
"আমি—বিপুল কিরণে ভুবন করি যে আলো
তবু—শিশিরটুকুরে ধরা দিতে পারি বাসিতে পারি যে ভালো।"

শিশিরের বুকে আসিয়া
কহিল তপন হাসিয়া
"ছোট হয়ে আমি রহিব তোমারে ভরি
তোমার ক্ষুদ্র জীবন গড়িব হাসির মতন করি।"

এই কবিতার রসবোধের জন্য ব্যঙ্গ্যার্থের সন্ধানের কি কোন প্রয়োজন আছে? এখানে সূর্য্য কে, শিশির কে, জানিবার জন্য আগ্রহ কখনও রসিক চিত্তে জাগিবে না। রসিক বুঝে—এ ভুবনের মনোবন-ভবন-গণ—প্রান্তরের সকল রবি সকল শিশিরের সম্বন্ধে এই একই কথা। কোন বিশিষ্ট 'তপন' বা কোন বিশিষ্ট 'শিশির' এখানে বড় কথা নয়—বড় কথা একের দাক্ষিণ্য ও অন্যের আকুতি। বিরাটের সহিত ক্ষুদ্রের, বিশালের সহিত তুচ্ছের,—শাশ্বতের সহিত ক্ষণিকের, মহিমার সহিত অণিমার এই যে প্রেম-বিনিময় তাহাতেই কবিতা রসে সার্থকতা লাভ করিয়াছে।

'সোনার তরী' কবিতাটির অর্থ আবিষ্কারের জন্য কি প্রচণ্ড দ্বন্দ্বই না হইয়াছে! বড়ই বিস্ময়ের বিষয় একজন কবিই কাবলিওয়ালার মত কবিতাটির কাছে অর্থ দাবি করিয়াছিলেন। অর্থ যাহাই হউক—এখানে তরীটি কি, ধান কি, ধানের মালিক কে, নেয়ে কে, নদীটি কি, রসিক পাঠক এ সকলের জন্য বৃথা মাথা ঘামাইবে না।

'গগনে গরজে মেঘ' ঘর বরষা ক্ষুর ধারা ভরা নদীর কূলে ক্ষেতের মালিক তাহার ধান লইয়া বসিয়া আছে। 'গান গেয়ে তরী বেয়ে একটি নেয়ে' আসিতেছিল—ক্ষেতের মালিক তাহাকে ডাকিয়া আপনার সোনার ধান সব তরীতে তুলিয়া দিল—ভরসা ছিল সেও ঐ সোনার ধানের সঙ্গে তরীতে ঠাঁই পাইবে, কিন্তু সোনার ধানেই তরী ভরিয়া গেল—ক্ষেতের মালিকের আর তরীতে ঠাঁই হইল না। তরী সোনার ধান লইয়া ভরা পালে চলিয়া গেল। ক্ষেতের মালিক যাহা লইয়া এতকাল নদীকূলে বসিয়া ছিল—তাহাকে বিদায় দিয়া শূন্য নদীর তীরে পড়িয়া রহিল। এই ত ব্যাপার!

ভরা বর্ষার নদীকূলে শ্রাবণ গগনের তলে ক্ষেতের মালিকের এই যে অসহায় দশা—শূন্য ক্ষেতখানির পানে চাহিয়া দীর্ঘশ্বাস—এই যে নদীকূলে দাঁড়াইয়া যতদূর দৃষ্টি যায় তাহার সর্ব্বস্ব-চোর তরীটির পানে অবাক বেদনায় চাহিয়া থাকা—পাঠকের চিত্তকে যে ঐ দূর দূর অকূলের পানে আকর্ষণ, ইহাতেও যদি কবিতা না হয়—তবে ব্রহ্ম,জীবাত্মা, কর্ম্মফল ও জন্মান্তরের কথা টানিয়া আনিলেই কবিতা হইবে?

'পরশ পাথর' কবিতায়—পরশ পাথর কি মহাধন, সেইটাই বড় কথা নয়,—ক্ষ্যাপা কে তাহা জানিয়াও লাভ নাই। ক্ষ্যাপা যেই হোক—তাহার জীবনটাই আমাদের চাই—এ জগতের সকল 'ক্ষ্যাপা'—সকল 'পরশ পাথরের' সম্বন্ধেই কবির বাক্য সমান সার্থক। ক্ষ্যাপার একনিষ্ঠ সাধনা ও স্বয়ম্বৃত দারুণ বেদনার উপরই কাব্যের রস নির্ভর করিতেছে। একটি লোকোত্তর চরম ধনের জন্য মানব জীবনের এই যে আত্মহারা সন্ধান—এই যে আকুল Yearning, এই যে Great Hunger,—ইহাতেও যদি রস সঞ্চার করিতে না পারে—তবে মহর্ষির ব্রহ্মস্বাদ লাভ বা আমাদের ঐহিক জীবনের একটা কোন বিশিষ্ট প্রাপ্তির কথা আনিলেই কবিতাটি রসসার্থকতা লাভ করিবে? এস্থলে ব্যঙ্গ্যার্থের খোঁজ না পাওয়ায় রসিকের রসবোধে কোন বাধাই নাই।

ব্যঙ্গ্যার্থকেই যাঁহারা কাব্যের সর্ব্বস্ব মনে করেন তাঁহাদের কাছে হয় ত এইগুলিকে প্রহেলিকা বলিয়া বোধ হইবে।

যে কাব্যে ব্যঞ্জনা আছে অথচ স্পষ্ট কোন বিশিষ্ট ব্যঙ্গ্যার্থ নাই, তাহা আমাদের চিত্তকে উপরের দিকেই টানে তাহারই নাম রসাভিমুখী হওয়া। অতীন্দ্রিয় ব্যঞ্জনা থাকিলে তাহা অনন্তের দিকেই টানিয়া তুলে—এই অনন্তের অভিমুখী হওয়া এবং রস সম্ভোগ একই কথা। ধ্বনিকেই যাঁহারা কাব্যের আত্মা মনে করেন তাঁহারা সহজে এ কথা বুঝিবে না।

কবিই রসগুরু

কবি যে বস্তুকে আলম্বন করিয়া কাব্য রচনা করেন—সে বস্তু উপভোগ্য হইয়া উঠে। সে উপভোগ্যতা কি ক্ষণকালের? কাব্য পাঠের সঙ্গে সঙ্গেই কি তাহার মাধুর্য্য বা ঐশ্বর্য্যের শেষ হইয়া যায়? কবির কাব্যে যাহাকে সুন্দর লাগিয়াছে—কাব্য পাঠের পরে তাহার কি কোন অপূর্ব্বতাই থাকে না? তাহাই যদি হইত, তাহা হইলে কবির কাব্যের সহিত আমাদের জীবনের একটা চিরন্তন সংযোগ জন্মিতে পারিত না। কাব্য তাহা হইলে কেবল বিলাস কলায় কুতূহলেরই চরিতার্থতা সাধন করিত।

যে জীর্ণ মন্দিরকে আমরা অসুন্দর দেখি—কবি যদি

তাহাকে কাব্যে সুন্দর করিয়া তুলিয়া থাকেন—কবি যদি বলেন—

সুন্দর এসে ঐ হেসে হেসে ভরি দিল তব শূন্যতা,
জীর্ণ হে তুমি দীর্ণ দেবতালয়।
ভিত্তি রন্ধ্রে বাজে আনন্দে ঢাকি দিয়া তব ক্ষুন্নতা
রূপের শঙ্খে অসংখ্য জয় জয়।

তবে এই কথা বার বার শুনিয়া আমরা আর জীর্ণ মন্দিরকে কুশ্রী দেখিতে পারি না। যে চোখে তাহাকে দেখিতাম—কাব্য রস উপভোগের পর আর তাহাকে সে চোখে দেখিতে পারি না।

মেঘকে আমরা সুন্দর দেখি না যে তাহা নয়—কিন্তু মেঘদূতের রস উপভোগের পর মেঘকে সুন্দরতর দেখিবে না এমন কোন্ পাঠক আছে? কোন্ পাঠকের নয়নে মেঘ অপূর্ব্ব স্বপ্নজালের সৃষ্টি করিবে না? যে মেঘের পানে একবার মাত্র তাকাইত—সে দশবার না তাকাইয়া অথবা এক দৃষ্টিতে সরস চিত্তে বহুক্ষণ না তাকাইয়া কি থাকিতে পারে

কেবল প্রকৃতির বৈচিত্র্যের কথা কেন বলিতেছি—কবি যাহাকে স্বপ্নমাধুরীর স্পর্শ দিয়াছেন তাহাই হইয়াছে অপূর্ব্ব—কোনটি চর্ম্মনেত্রে—কোনটি মর্ম্মনেত্রে।

কবির কাব্য পড়িয়া আমরা মানুষকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে শিখিয়াছি—যাহাকে উপেক্ষা করিতাম—তাহাকে শ্রদ্ধা করি যাহার প্রতি উদাসীন ছিলাম—তাহার পানে ঘন ঘন তাকাই—যাহার প্রতি অপ্রীতি ছিল না—তাহাকে ভালবাসিতে শিখি।

কবি প্রিয়াকে প্রিয়তরাও করিয়া তোলেন—কবি আপন প্রিয়াকে যে মাধুরীময়ী দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন—আমরাও সেই দৃষ্টির অংশ পাই। কবির কাব্যে প্রণয়ামৃতের মাধুর্য্য উপভোগ করিলে আমাদের মনের রসনায় সে মাধুর্য্যবোধ চির লগ্ন হইয়া যায়—প্রিয়ার প্রণয়ও তাহাতে স্বাদুতর—উপভোগ্যতর হইয়া উঠে।

যে দুঃখকে আমরা সর্ব্বদা ভয়ে ভয়ে এড়াইয়া চলি সেই দুঃখ কাব্যে কবির প্রীতিস্নিগ্ধ মৈত্রী লাভ করে। কবির কাব্য পড়িয়া দুঃখকে বরণ করিতে শিখি আর না শিখি—দুঃখের সহিত মৈত্রী স্থাপনের জন্য লোভ হয়।

মরণকেও কবি আপনার প্রেমাস্পদ করিয়া তুলেন—কবির কাব্যে মরণ-প্রেমের লীলা দেখিয়া মরিতে লোভ না হইতে পারে, মরণের বিভীষিকা—শ্মশানের বীভৎসতা—মহাকালের রুদ্রতা কি আমাদের কাছে হ্রাস পায় না?

কবি এই সৃষ্টিকে রসদৃষ্টির সাহায্যে যতটা সুন্দর দেখিয়াছেন ঠিক ততটা সুন্দর আমরা দেখিতে পারি না সত্য—কবি এই বিশ্ব-প্রকৃতির রূপরস-গন্ধস্পর্শ-শব্দের পঞ্চপাত্রে যে মাধুরী উপভোগ করিয়াছেন—সে মাধুরী সম্পূর্ণ আমরা উপভোগ করিতে পারি না সত্য—কবি আত্ম জীবনকে কল্প মাধুরী রসে যে ভাবে উপাদেয় করিয়াছেন—সে ভাবে আমাদের জীবনকে উপাদেয় করিয়া তুলিতে পারিনা সত্য—কিন্তু কবির রস জীবনের, মনোবৃত্তির ও রসদৃষ্টির কোন অংশই কি আমরা পাই না?

কবির কাব্যে আমরা একটা সাময়িক উপভোগ্যই লাভ করিনা—আমাদের স্থায়ী লাভও একটা হয়। আমাদের দৃষ্টির প্রকৃতিই যায় বদলাইয়া—আমাদের চিত্তের অঙ্গে নব নব ভোগেন্দ্রিয়ের সৃষ্টি হয়। শুধু আমাদের রসবোধ ও সৌন্দর্য্যবোধই বাড়ে না—সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিবার—রসাবেষ্টনী সৃষ্টি করিবার শক্তিও সঞ্জাত হয়। অসুন্দরকে সুন্দর করিয়া তুলিবার—অনুপভোগ্যকে উপভোগ্য করিয়া তুলিবার—অবজ্ঞেয়কে শ্রদ্ধেয় করিয়া দেখিবার একটা চিরন্তনী শক্তিলাভ করি! কবি অন্তরে যে মাধুরীর উৎস খুলিয়া দেন—তাহা অন্তরেই পরিচ্ছিন্ন নয়—তাহা আমাদের জীবনময় ভুবনময় ছড়াইয়া পড়ে। সমস্ত জীবন,—সমগ্র ভুবনই মধুময় হইয়া উঠে। কবি কাব্যে যে বস্তু, যে চিত্র বা যে দৃশ্যকে শ্রীমাধুরীতে উপভোগ্য করিয়া তুলিয়াছেন—সর্ব্বাগ্রে তাহারাই আমাদের রসদৃষ্টি আকর্ষণ করে সত্য, কিন্তু আমাদের রসদৃষ্টি কেবল তাহার আতিথ্যেই তৃপ্ত হইয়া ফিরে না। একবার সে যখন ঘর ছাড়া হইয়া যাত্রা করে তখন অনেকেরই মধুপর্কের আতিথ্য গ্রহণ না করিয়া সে ফিরে না।—ফলে সকল বস্তুতেই আমরা নবশ্রী দেখিতে পাই—নব মাধুরী উপভোগ করিতে পারি।

এটা যে জীবনের পক্ষে কত বড় লাভ তাহা আমরা ভাবিয়া দেখি না—এ সংসার হাটের কোন মুদ্রা বা পরিমাপকের দ্বারা তাহার মূল্য মর্য্যাদা বা পরিমাণ নিরূপিত হইতে পারে না।

ক্রমশঃ

তুরস্ককে খর্ব্ব করিবার জন্য ইংরাজগণ তৃতীয়বার চেষ্টা করা সুরু করিলেন। মেসোপটোমিয়া,আরব,সিরীয়া প্রভৃতি তুরস্ক অধিকৃত দেশগুলিতে প্রচারক পাঠাইয়া তুরস্কের বিরুদ্ধে প্রচার কার্য্য আরম্ভ করিলেন। দেখিতে দেখিতে বিদ্রোহের দাবানল চতুর্দ্দিকে ধূ ধূ করিয়া প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। সিরিয়া ও জারুজেলাম প্রদেশ দুইটী তুরস্কের হস্তচ্যুত হইয়া গেল। ককেশস প্রদেশের সৈন্যভার দিয়া কামালকে প্রেরণ করা হয়। এই ভীষণ বিপদে সাহায্যপ্রার্থী হইয়া জার্ম্মাণ সম্রাটের নিকট আবেদন করিয়া পাঠাইলে, জার্ম্মাণ সম্রাট তাঁহার বিখ্যাত সেনানী ফাকেনহামকে প্রেরণ করেন। সেনাপতি লিয়ানের সহিত সেনাপতি ফাকেনহামের যথেষ্ট পার্থক্য ছিল। লিয়ান বিদেশী হইলেও তুর্কীর জনসাধারণের প্রীতি অর্জ্জন করিতে পারিয়াছিলেন। ফাকেনহাম লিয়ান অপেক্ষা যুদ্ধ-বিদ্যায় অধিকতর দক্ষ হইলেও জনসাধারণকে তুষ্ট করিতে পারিলেন না। তাঁহার অধীনতায় কামালপাশা কার্য্য করিতে অস্বীকার করেন। অগত্যা পদত্যাগ ব্যতীত উপায়ান্তর নাই দেখিয়া দার্দ্দানেলজ বিজয়ী কামাল সৈন্যদল পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্বস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তুর্কীর রাজশক্তি পরিচালনকারী ত্রয়ী তাহার উপর যথেষ্ট অসন্তুষ্ট হইলেও অত্যন্ত জনপ্রিয় সেনাপতিকে শাস্তি দিতে গেলে জনসাধারণ অসন্তুষ্ট হইতে পারে এই আশঙ্কায়, কামাল কর্ত্তৃক স্বেচ্ছাচার বিনা বাক্যব্যয়ে সহ্য করিলেন। এদিকে ফাকেনহাম বিশেষ কৃতকার্য্য হইতে না পারায় স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন এবং তাঁহার প্রত্যাগমনের সহিত তুরস্কের গৌরব রবি অস্তাচলে গমন করে।

১৯১৮ সাল

১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিম ইউরোপে যেরূপ নূতন যুগ ও রাজ্য-বিপ্লব সংঘটিত হইয়াছিল, ১৯১৮ সালে পূর্ব্ব ইউরোপেও সেইরূপ ভীষণ রাজদ্রোহ ও নব-যুগ অতি উৎকট ভাবে আত্মপ্রকাশ করে। অষ্ট্রীয়া-হাঙ্গেরী রাশিয়া এবং তুরস্ক, এই তিনটী পুরাতন শক্তিশালী সাম্রাজ্য ধ্বংস প্রাপ্ত হয়,এবং বহুদিনের পদদলিত কয়েকটী জাতি স্বাধীনতার মুখ দর্শন করে।

প্রবল বেগে যুদ্ধ চালাইয়া উহা শেষ করিবার মানসে এই বৎসরে মিত্রশক্তিগণ সুপ্রীম ওয়ার কাউন্সিল বা সমর সংসদ সংগঠন করেন। ইংলণ্ডের প্রধান সচিব লয়েড জর্জ্জ, ফ্রান্সের ক্লেমানশু ও ইটালীর আরনাল্ডো এই সংসদের প্রধান পাণ্ডা হয়েন। এই সংসদ ফরাসা সেনাপতি ফস্‌কে মিত্রশক্তির সমুদায় সৈন্যগণের অধিনায়ক নিযুক্ত করেন। আপনাদের স্বার্থকে ন্যায় ও মর্য্যাদার পদে সুপ্রতিষ্ঠিত প্রতিপন্ন করিবার জন্য জগতের তাবৎ সভ্য-দেশ সমূহেই আপনাদের প্রচারকগণকে প্রেরণ করেন। অষ্ট্রীয়াকে তাহার অধীনস্থ জাতিগণের স্বাধীনতার হন্তারক বলিয়া ঘোষণা করা হয়। গত শতাব্দীতে ইটালীকে যেমন পদদলিত করিয়া রাখিবার জন্য সে যেমন প্রয়াস পাইয়াছিল, বর্ত্তমান যুগে শ্লাভ, কোট, রোমান প্রভৃতি জাতিগণকেও স্বাধীনতা অর্জ্জনে বাধা প্রদান করিবার জন্য সেইরূপ প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে বলিয়া প্রচার করা হয়। জার্ম্মানিকে সাক্ষাৎ শয়তানের অবতার বলিয়া জগতের নিকট ঘোষণা করা হয়। বুলগেরিয়াকে মিথ্যাবাদী ও ঘোরতর স্বার্থপর বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা হয়। সুতরাং জার্ম্মানি ও অষ্ট্রীয়াকে ধ্বংস করিতে না পারিলে জগতের শান্তি স্থাপন করিবার সকল চেষ্টাই চিরকাল ব্যর্থ হইয়া যাইবে, এই ধারণা বদ্ধমূল করিয়া দিবার জন্য মিত্রশক্তিগণ যথেষ্ট প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। বলকান অঞ্চলে বুলগেরিয়াকে নষ্ট করিতে পারিলেই শান্তি স্থাপিত হইতে পারে একথাও প্রচার করা হয়। প্রাচ্যের অনেকগুলি জাতিই তুরস্কের অধীন থাকায় তাহাদের মধ্যে মনুষ্যত্বের বিকাশ হইতে পারিতেছে

না বলিয়া ঘোষণা করা হয়। তুরস্ককে পৃথিবীর ইতিহাস হইতে মুছিয়া ফেলা বিশেষ প্রয়োজন বলা হয়, কেননা তাহার বর্ব্বরতা, হেরাম ও স্বেচ্ছাচার শাসন বর্ত্তমান যুগের প্রধান কলঙ্ক। মহাপণ্ডিত ও আমেরিকার যুক্ত-রাজ্যের অধিনায়ক উইলসন সাহেব এই সব প্রচার কার্য্যের বিশেষ সহায়ক হ'ন। সুদূর আটলান্টিক মহাসাগরের পরপারে অবস্থান করিয়া ইউরোপের এই মহাযুদ্ধ তিনি বিশেষ মনোযোগ সহকারেই অবধান করিয়া আসিতে-ছিলেন। লুসিটানিয়ার ধ্বংসের পর জার্ম্মানির সব-মেরিন যুদ্ধ তাঁহার নিকট বিশেষ অসহ্য হইয়া উঠে। মহামানবতার পক্ষ অবলম্বন করিয়া যুক্তি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা করিবার মানসেই তিনি আমেরিকাকে জার্ম্মানির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান করান। এই মহাযুদ্ধে যে সমস্ত জাতি উভয়পক্ষে যোগদান করিয়াছিল, তাহারা সকলেই কোন না কোন স্বার্থসিদ্ধি উদ্দেশ্যে যুদ্ধে যোগদান করে, কিন্তু—আমেরিকা মাত্র এক বিরাট আদর্শকে সম্মুখে রাখিয়া সমরাঙ্গণে অবতীর্ণ হয়। রাষ্ট্রপতি উইলসনের ১৮টী পয়েণ্ট বা সন্ধিসর্ত্তে তাঁহার মনের কথা বেশ স্পষ্টভাবেই প্রকাশ পায়।

আমেরিকা যখন পূর্ণ উৎসাহে, নব উদ্যম লইয়া সমরাঙ্গণে অবতীর্ণ হ'ন তখন মধ্য ইউরোপের সমস্ত শক্তিগুলি ও তুরস্ক অন্তিম দশায় উপস্থিত। পশ্চিম রণ-প্রাঙ্গণে জার্ম্মাণগণ ক্রমশঃই হটিয়া যাইতেছিল। পূর্ব্ব-প্রাঙ্গণে রাশিয়াকে বিধ্বস্ত করিয়া জার্ম্মাণি তাহার অধিকার বিস্তার করিয়া লইলেও ঐ বিস্তৃত সমরস্থল রক্ষা করা তাহার পক্ষে ক্রমশঃই অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইতেছিল। অষ্ট্রীয়া ইটালীর নিকট বারবার পরাস্ত হইয়া দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল। একদল মিত্র সৈন্য স্থলপথে মিশর হইতে অভিযান সুরু করিয়া হেজাজের আরবদিগের সাহায্যে প্যালেষ্টাইন ও জারুজালেম দখল করিয়া লইল। মিত্র-পক্ষের আর একটী বাহিনী মেসোপটামিয়ার মধ্য দিয়া দামস্কস ও আলেপ্পো প্রদেশ দুইটী জয় করিয়া ক্রমশঃ বাগদাদ হইতে মসুল পর্য্যন্ত তাবৎ তুর্কীর জনপদগুলি অধিকার করিয়া লইল। এই সময়ে তুর্কীর সুলতান পঞ্চম মহম্মদ হঠাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইলে তাঁহার ভ্রাতা ষষ্ঠ মহম্মদ উপাধি গ্রহণ করিয়া মসনদে আরোহণ করেন। তুর্কীর শাসনদণ্ডের পরিচালক ত্রয়ী এই সময়ে নির্ব্বাসিত হন।

কামালের সহিত ষষ্ঠ মহম্মদের পূর্ব্ব পরিচয় থাকায় কামালও রাজধানীতে আসিয়া সুলতানের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ঐ শাসন-প্রণালীর আমূল পরিবর্ত্তন করিবার জন্য অনুরোধ করেন। সম্রাট কামালকে বিশেষ ভাবে চিনিতেন এবং তাঁহার ক্ষমতায়ও তিনি কতকটা বিশ্বাসবান ছিলেন। কামালকে এই বিপদের সময় রাষ্ট্রের প্রধান কর্ণধার করিলে পতনোন্মুখ সাম্রাজ্যকে রক্ষা করা যাইতে পারে, এই প্রকার ধারণা সুলতানও হৃদয় মধ্যে পোষণ করিতেন। কিন্তু কামালের পশ্চাতে কোন প্রকার রাজ-নৈতিক দল ছিল না। আনওয়ার পাশা স্বয়ং লোক-সমাজে অপ্রিয় হইয়া উঠিলেও তাঁহার নির্ব্বাসনের সহিত তাঁহার মতের সমর্থকগণের সংখ্যার কিছু হ্রাস হয় নাই। কামালের সহিত যোগদান করিলে পাছে সিংহাসনচ্যুত হ'ন এই ধারণার বশীভূত হইয়া সেনাপতি কামালকে সুলতান কোনরূপেই আশ্বাস প্রদান করিতে পারিলেন না। কামালও বিরক্ত হইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করেন। প্রকাশ্যে রাজদণ্ড গ্রহণ করিবার প্রয়াস তাঁহার এই প্রথম।

এদিকে যে সমস্ত রাজ্য মিত্রশক্তি কর্ত্তৃক পরাজিত হইল, তাহাদের সকলগুলিতেই রাষ্ট্র-বিপ্লব সংঘটিত হইতে লাগিল। ১৯১৮ সালের অক্টোবর মাসে বুলগেরিয়ার রাজা ফার্ডিনাণ্ড নির্ব্বাসিত হ'ন। অতঃপর বুলগেরিয়ায় রাজ-তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত থাকিলেও প্রকৃত ক্ষমতা কতকগুলি সোশিয়ালিষ্টদের হস্তগত হয়। প্রাচীন অষ্ট্রীয়াহাঙ্গেরীতে রাজদ্রোহের দাবানল প্রজ্জলিত হইয়া উক্ত সাম্রাজ্য পুড়িয়া ছারখার হইয়া যায়। অষ্ট্রীয়া ও হাঙ্গেরী পরস্পর, পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়া সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করে। উক্ত সাম্রাজ্যের আর একটী প্রদেশ বোহেমিয়া বুলগেরিয়া হইতে গৃহীত দুই একটী প্রদেশের সহিত সংযোজিত হইয়া জেকোশ্লাভোকিয়া প্রদেশ গঠন করে। মনটিনিগ্রোর সহিত সার্ভিয়া সংযুক্ত হইয়া বৃহত্তর সার্ভিয়া বা জুগোশ্লাভিয়া নামক রাজ্য গঠিত হয়। স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইয়া সমস্ত পোলাণ্ডে এক সাধারণ তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। অন্তঃসার শূন্য হইয়া পড়ায় জার্ম্মানিতেও

বিদ্রোহের বহ্নি জ্বলিয়া উঠে। জার্ম্মানসাম্রাজ্য এই দাবানলে ভস্মীভূত হইয়া গেলে, ঐ ধ্বংস স্তূপের উপর বর্ত্তমান জার্ম্মান সাধারণতন্ত্র স্থাপিত হয়। জার্ম্মানির ছোট ছোট রাজশক্তিগুলিও ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, অধিকাংশ সামান্তরাজকেই তাঁহাদের রাজগদী পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে হয়।

কালক্রমে এই বিপ্লববাদের বন্যা তুরস্কে আসিয়া পড়িল। কালবিলম্ব করিলে ধরা পৃষ্ঠ হইতে তুরস্কের চিহ্ন চিরকালের জন্য লোপ পাইতে পারে এই আশঙ্কায় কামালপাশা আনাটোলিয়াতে গিয়া স্বাধীনতা-সমরে প্রস্তুত হইবার জন্য তাঁহার প্রধান কর্ম্মক্ষেত্র স্থাপন করিলেন। এখানকার চাষী ও জনসাধারণের মধ্য হইতে একদল সৈন্যগঠনের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এদিকে কনষ্টানটিনোপলের তুরস্ক সরকার নতজানু হইয়া মিত্র-শক্তিগণের নিকট সন্ধিভিক্ষা করিয়া লইল। এই সন্ধির সর্ত্তানুযায়ী তুরস্কের অধিকৃত সমস্ত প্রদেশগুলিকেই স্বাধীনতা প্রদান করা হয়। হেজাজে স্বাধীন রাজা বসান হয়। মেসোপটেমিয়া, প্যালেষ্টাইন ও সিরিয়াকে স্বাধীন বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া হয়। দক্ষিণ আনাটোলিয়া ইটালীকে এবং স্মার্ণা, গালিপোলী ও আড্রিয়ানোপল গ্রীসকে প্রদান করা হয়। কনষ্টানটিনোপলের শাসন পরিষদ এই অপমানকর সন্ধি মানিয়া লইলেও কামাল পরিচালিত আনাটোলিয়ার সরকার এই সর্ত্তগুলিকে স্বীকার করিতে অস্বীকৃত হইলে সুলতান কামালের উপর অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে পদচ্যুত করেন। এখন হইতে কামাল প্রকাশ্যভাবেই বিদ্রোহ ঘোষণা করেন।

মুক্তির সংগ্রাম

সকল প্রকার দ্বিধা দূরীভূত করিয়া দিয়া মুক্তি সংগ্রামে প্রস্তুত হইবার জন্য কামালপাশা এইবার বিশেষ তোড়-জোড় আরম্ভ করিলেন। কনষ্টানটিনোপলের সম্রাট মিত্র-শক্তিগণের নিকট তাহাদের হস্তের ক্রিড়নক মাত্র, তাঁহার নিকট জাতির মুক্তি সংগ্রামে কোনরূপ সাহায্য পাইবার আশা নাই নিশ্চিত জানিয়া, একটী নূতন সৈন্যদল সংগঠন করিবার জন্য, এশিয়া মাইনরের তাবৎ অভিজ্ঞ সেনানী-গণের নিকট কামাল স্বয়ং গমন করিয়া দেশের দুরবস্থার কথা জ্ঞাপন পূর্ব্বক দলবদ্ধ ভাবে প্রকৃত কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার জন্য তাহাদিগকে আহ্বান করেন। রুফপাশা, ইসমেৎ পাশা প্রভৃতি বিজ্ঞ রাজপুরুষগণ কনষ্টানটিনোপলের কোন প্রকার সাহায্য না লইয়াই যুদ্ধ চালাইবার জন্য একমত হইলেন। কামাল জানিতেন যে তুর্কীর শিক্ষিত সেনানী-গণ স্বাধীনতা সমরে অবতীর্ণ হইবার জন্য সকলেই এক হইলেও, সুলতানকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া তুরস্ককে ইউ-রোপীয় প্রথায় গঠন করিতে তাহারা কেহই স্বীকৃত হইবেন না।

জেনা সিরিজ সংগ্রহ করিবার প্রথা রহিত করিয়া দিবার পর, তুরস্কের শাসনভার পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত সেনানিগণের হস্তে গিয়া পড়ে। এই সমস্ত সেনানায়কগণ রাজশক্তির আস্বাদ পাইয়া উহা আপনাদের হস্তে দৃঢ় করিয়া রাখিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা পাইতেন।

ইংরাজীতে যাহাকে অলিগর্কি বলে বিংশশতাব্দির প্রারম্ভে তুরস্কের শাসন প্রণালী কতকটা তাহারই অনুরূপ ছিল। প্রধান সচিব ও তাঁহার অনুচরগণ খলিফার নামে তাবৎ রাজক্ষমতাই পরিচালনা করিতেন। অজ্ঞ প্রজাগণ সুলতানকে হজরতের বংশধর হিসাবে তাঁহার প্রাপ্য সম্মান প্রদান করিত। আবদুল হামিদ বা পঞ্চম মহম্মদকে যাঁহারা জাপান ইংলণ্ডের রাজার সহিত তুলনা করেন, তাঁহারা বিস্মৃত হ'ন যে তথাকার রাজশক্তি জনসাধারণ কর্ত্তৃকই পরিচালিত হইয়া থাকে, সামাজিক সমস্যার সমাধানের জন্য রাজাকে মাথার উপর খাড়া করিয়া রাখা হইয়াছে। তুরস্কের সুলতান এখন পর্য্যন্ত সর্ব্বশক্তির আধার বলিয়া জনসাধারণ কর্ত্তৃক বিবেচিত হইতেন, তাঁহার রাজকর্ম্মচারিগণ তাঁহার শক্তির অংশ বিশেষ বলিয়া ধরা হইত। কামালপাশা এই প্রথার মূলোচ্ছেদ করিতে গেলে সুলতানকে মসনদ হইতে নামাইয়া দিতেই হইবে এই কথা বেশ সুন্দররূপে হৃদয়ঙ্গম করেন। এইজন্য তুরস্কে রাজতন্ত্র অপেক্ষা সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করাই বিশেষ প্রয়োজন বলিয়া তাঁহার ধারণা জন্মে।

ধর্ম্ম সম্বন্ধে কামালের ধারণা সম্পূর্ণ আধুনিক ছিল। ঈশ্বর স্বীকার করিতে গেলেই রাজা, পুরোহিত ইত্যাদি

মানিয়া লইতে হয় এবং তাহার আনুষঙ্গিক নানাপ্রকার আচার-ব্যবহার,রীতিনীতি আসিয়া জাতিকে পরাধীনতার ভীষণ নাগপাশে বদ্ধ করিয়া ফেলে। ধর্ম্মই যে সর্ব্বপ্রকার স্বাধীনতার প্রধান অন্তরায় এবং ধর্ম্মের দোহাই দিয়া কতকগুলি লোক চিরকাল বিশেষ সুবিধা ভোগ করিয়া আসিয়াছে, এখন সম্পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জ্জন করিতে গেলে ধর্ম্মকে সমাজ হইতে বিতাড়িত করিতেই হইবে বলিয়া তাঁহার ধারণা জন্মে। কিন্তু ধর্ম্মপ্রাণ কোন জাতিকে তাহাদের বদ্ধমূল কুসংস্কারগুলি পরিত্যাগ করিবার জন্য আহ্বান করিলে উপহসিত হইবেন বলিয়া তিনি খুব সাবধানতার সহিত কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহার হৃদয়ের গূঢ় অভিলাষ তাঁহার খুব অন্তরঙ্গ বন্ধুরাও অবগত হইতেন না।

আনাটোলিয়া প্রদেশটী অনুর্ব্বর এবং পর্ব্বতাকীর্ণ। তুরস্ক সাম্রাজ্যের সমস্ত প্রদেশগুলির মধ্যে এই প্রদেশটীই অত্যন্ত দরিদ্র প্রদেশ। এখানকার লোক সংখ্যাও সামান্য। এখানকার অধিবাসীরা অধিকাংশই কৃষিজীবি এবং কঠিন প্রস্তরের সহিত প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া জীবনযাত্রার উপযোগী সামান্য শস্য সংগ্রহ করিতে পারিত। কামাল এই অনুর্ব্বর প্রদেশকেই তাঁহার কর্ম্মস্থল করিয়া লইলেন। প্রজাগণকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া এবং সামরিক শিক্ষাদান করিয়া তাহাদিগকে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সৈনিকে পরিণত করেন। অর্থ সংগ্রহের জন্য যতদূর মিতব্যয়ী হওয়া প্রয়োজন তিনি ততদূর মিতব্যয়ী হইবার জন্য সকলকেই অনুরোধ করিলেন। সেনানিগণ সকলপ্রকার সামরিক পোষাক-পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিয়া সামান্য নাগরিকের পোষাক গ্রহণ করিল। দুইবেলার পরিবর্ত্তে একবেলা আহার ব্যবস্থা হইল।

সমস্ত দেশকে স্বাধীনতায় প্রবুদ্ধ করিবার জন্য এবং জাতির ক্ষুদ্রতম প্রজাকেও আত্ম-শক্তিতে বিশ্বাসবান করিবার মানসে উত্তর আনাটোলিয়া প্রদেশে সীডা নামক এক নগরীতে একটী জাতীয় মহাসভা আহ্বান করেন। সুদূর পল্লীগুলিতে কামালের দূত যাইয়া সকলকেই সেখানে সমবেত হইয়া দেশ উদ্ধার ব্রতে ব্রতী হইবার জন্য আহ্বান করিল। কামালের অনুচরগণ যাঁহারা কামাল পাছে তাবৎ ক্ষমতার অধিকারী হইয়া আনওয়ার পাশার ন্যায় শক্তিবান পুরুষ হইয়া উঠেন বলিয়া ঈর্ষা করিতেন কামালের এই অভিপ্রায়ে অনেকটা সন্তুষ্টই হইয়া সীডার মন্ত্রণা-সভায় যোগদান করিবার জন্য স্থির সঙ্কল্প হইলেন। যথা সময়ে রাজধানীতে এই সংবাদ পৌছাইলে সম্রাট কামালকে বিদ্রোহী বলিয়া ঘোষণা করেন এবং সীডার মহাসভাকে বে-আইনী মজলিস বলিতেও দ্বিধাবোধ করিলেন না। কিন্তু সম্রাট তাঁহার মন্ত্রণা ঘোষণা মাত্র করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকেন, কামাল বা তাঁহার সহচরগণকে দমন করিবার ক্ষমতা বা চেষ্টা তাঁহার ছিল না। মিত্র শক্তিগণ সম্রাটের উত্তেজনায় স্মার্ণায় অবস্থিত গ্রীক সেনাপতিকে কামালের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করিবার জন্য হুকুম প্রদান করেন। সম্রাট প্রেরিত একজন সেনানায়ক স্থানীয় লোককে উত্তেজিত করিয়া কতকটা গোলযোগ করিবার প্রয়াস পায় মাত্র। কামালের কার্য্যকুশলতার গুণে সম্রাট-সেনাপতি বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিয়া যান। গ্রীকগণ দীর্ঘসূত্রতা হেতু ঠিক সময়ে কোন প্রকার অভিযান না করায় সীডার মহাসভার কার্য্য নির্ব্বিবাদে সম্পাদিত হইয়া যায়। তুর্কীর প্রতিনিধিগণ সকলেই তুরস্ককে রক্ষা করিবার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়েন। মিত্রশক্তিগণের নিকট এই মহাসভার রেগুলেসনের কপি পাঠাইয়া দেওয়া হয়। সম্রাট বিশেষ ব্যতিব্যস্ত হইয়া রাজধানীর মৌলানাগণকে আহ্বান করিয়া কামালকে জাতিচ্যুত ও কর্ম্মচ্যুত করা হইল বলিয়া ঘোষণা করেন। এই সংবাদ আনাটোলিয়ায় পৌছাইলে কামালপাশা অম্লানবদনে তাবৎ রাজকীয় পোষাক পরিচ্ছদাদি ত্যাগ করিয়া হাস্যমুখে সহচরগণকে আহ্বান করিয়া স্পষ্টই বলেন যে, এখন হইতে তাঁহার সহচর থাকিতে হইলে রাজদ্রোহী হিসাবে থাকিতে হইবে। হয়ত বা প্রয়োজন হইলে মস্তক অবধি প্রদান করিতে হইবে। দারিদ্র্যকে অন্তরঙ্গ সুহৃদ বলিয়া আলিঙ্গন করিতে হইবে। শৃগালের ন্যায় ঘৃণিত জীবনযাপন করিতে হইবে। তাহাতে তাঁহারা প্রস্তুত আছেন কিনা জানিতে চাহিলে সকলেই একবাক্যে তাঁহাদের সম্মতি জ্ঞাপন করেন।

রাজশক্তির প্রধান কর্ম্মক্ষেত্র রাজধানী। কামাল এই নূতন রাজশক্তির কর্ম্মক্ষেত্র আঙ্গোরায় প্রতিষ্ঠিত করেন।

আঙ্গোরা এশিয়া মাইনরের মানচিত্রে প্রদর্শিত হইলেও উহা একটী ক্ষুদ্র জনপদ মাত্র ছিল। কোন রাজশক্তির প্রধান কর্ম্মক্ষেত্র হইতে গেলে যে সমস্ত গৃহাদির প্রয়োজন এখানে সে সব কিছুই ছিল না। সামান্য একটী রেলওয়ের প্রাঙ্গণে মহাসভার কর্ম্মস্থল করা হয়। একটু দূরে সামান্য একটী বাংলোয় কামাল তাঁহার বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া ল'ন। পার্লামেণ্ট আহ্বান করিয়া তাহাদের দ্বারা নির্ব্বাচিত মেম্বারগণ কর্ত্তৃক রাজশাসন পরিচালন করা হইবে সীভার মহাসভায় এইরূপ সিদ্ধান্ত করা হইয়াছিল।

এই প্রস্তাব অনুযায়ী পার্লামেণ্ট গঠন করা হইলে, সকলেই মহানুভব কামালকে এই নব প্রতিষ্ঠিত রাজ্যের প্রধান পরিচালকপদ গ্রহণ করিবার জন্য সাদর আহ্বান করেন। কামাল নতশিরে দেশবাসীর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন, রুফ পাশা প্রভৃতি একদল পুরাতন রাজকর্ম্মচারী কামালকে উচ্চাশী বলিয়া সন্দেহ করিতে লাগিলেন। এই দলের অধিনায়কতায় শীঘ্রই এই মহাসভায় কামালের সহিত শত্রুতা করিবার একটী বিরুদ্ধবাদী দলের সৃষ্টি হয়। কামাল এই নূতন অন্তরায়কে বিন্দুমাত্র গ্রাহ্য না করিয়া নিজের প্রতিজ্ঞা পূরণ করিবার জন্য অটল হইয়া রহিলেন।

কনষ্টানটিনোপলের রাজসরকার বলপূর্ব্বক কামালকে দমন করিতে না পারিয়া এক নূতন উপায় উদ্ভাবন করে। কামাল নিয়মমূলক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিতে চাহেন বলিয়া ঘোষণা করায় রাজধানীর রাজসরকার হইতে আঙ্গোরার পার্লামেণ্টে উক্ত প্রকার শাসন সংস্কার করিবার প্রস্তাব পাঠান হয়। কামাল বিন্দুমাত্র আপত্তি না করিয়া উক্ত প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করেন। কামালের বিরুদ্ধবাদী দল কামালের আধিপত্য সমূলে বিনাশ করিবার উদ্দেশ্যে রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিয়া নির্ব্বাচনের জন্য সম্রাট সকাশে আবেদন জানান। সম্রাট এই দলের সহিত যোগদান করিয়া নূতন নির্ব্বাচন করিবার আদেশ দিলে, কামাল বিশেষ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়েন। কামাল আঙ্গোরায় অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি বিশেষ চেষ্টা করিয়া যাহাতে তাঁহারই সমর্থক অধিক সংখ্যায় উক্ত নূতন পার্লামেণ্টে প্রবেশ করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিলেন। নির্ব্বাচন হইয়া গেলে কামালের সমর্থকগণেরই সংখ্যাধিক্য ঘটিয়াছে বলিয়া দেখা গেল। কামাল তাঁহাদের সকলকে একত্রিত করিয়া রাজধানীতে যাইয়া কি কি করিতে হইবে সেই সব বিষয়ে বিশেষ ভাবে উপদেশ প্রদান করেন। তাহার পর তাঁহাকে প্রেসিডেণ্ট করিবার জন্য বলিয়া দেন। সভ্যগণ রাজধানীতে পদার্পণ করিয়া রাজকীয় অনুচরগণের সান্নিধ্যে আসিলেই তাহাদের মনোভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। তাঁহারা সকলেই কামালের বিরুদ্ধবাদী দলে যোগদান করিয়া কামালের এক প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীকে প্রেসিডেণ্ট পদ প্রদান করে, আঙ্গোরার এই সংবাদ পৌছাইলে কামাল একটু ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়েন। পার্লামেণ্টের নামে সম্রাট পক্ষীয় নেতাগণ আঙ্গোরার নেতাকে তথাকার শাসন প্রণালীর উচ্ছেদ করিবার জন্য আদেশ পাঠান। কামাল নানাপ্রকার ওজোর দেখাইয়া কালবিলম্ব করিতে লাগিলেন।

তুরস্কে নূতন রাজ-শাসন প্রবর্ত্তিত হইলে এক নূতন শক্তির আবির্ভাব হয়। কামাল সিলিসিয়া প্রদেশ হইতে ফ্রান্সের সৈন্যগণ দূরীভূত করিয়া দিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। স্মার্ণা পুনর্ব্বার জয় করিবার জন্য গ্রীকদের সহিত তাঁহার সংঘর্ষ চলিল। এই সময়েই রাশিয়ায় সোভিয়েট সরকারকে জব্দ করিবার জন্য মিত্রশক্তিগণ যে সমস্ত তোড়জোড় করিয়াছিলেন তাহা একেবারেই ব্যর্থ হইয়া যাওয়ায় এবং উক্তদেশে সোভিয়েট প্রাধান্য সর্ব্বাদিসম্মত ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেলে, পশ্চিম ইউরোপের শক্তিগণ তুরস্ককে লইয়া বিশেষ বিব্রত হইয়া পড়েন। ইংলণ্ড তুরস্ককে শিক্ষা প্রদান করিবার মানসে লণ্ডন নগরে এক পরামর্শ সভা আহ্বান করেন। জার্ম্মাণির রুঢ় প্রদেশের অধিকার লইয়া ফ্রান্সের সহিত ইংলণ্ডের মনোমালিন্য সংঘটিত হওয়ায় ইংলণ্ড একেলাই এই নূতন সংগ্রামে অবতীর্ণ হন। ১৬ই মার্চ্চ, ১৯২০ সালে একদল ইংরাজ সৈন্য কনষ্টানটীনোপল অবরোধ করিয়া তুর্কীর প্রধান প্রধান নেতাগণকে বন্দী করিয়া দেশান্তরিত করিয়া দেন। কামালপাশা এই সংবাদ শ্রবণ করিবামাত্র আঙ্গোরায় পার্লামেণ্ট আহ্বান করিয়া আঙ্গোরাকেই এখন হইতে তুর্কী রাজ্যের রাজধানী বলিয়া ঘোষণা করেন। কামালকে বিশেষভাবে শিক্ষাপ্রদান

করা ইংরাজ রাজনৈতিকগণের আন্তরিক ইচ্ছা থাকিলেও ইংরাজজাতি নূতন করিয়া যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে অস্বীকার করায় তাঁহাদের এই সঙ্কল্প কার্য্যকরী হইতে পারিল না।

উপায়ান্তর নাই দেখিয়া ইংরাজ সরকার গ্রীসের রাজনৈতিক পাণ্ডা ভেনিজিলস্‌কে প্রাচীন হেলিনিক সাম্রাজ্যের পুনরাধিকার করিবার জন্য আহ্বান করেন। ভেনিজিলস্ এশিয়া মাইনরে পুরাতন আইওনিয়ান নগরগুলির উপর গ্রীসের অধিকার বিস্তার করিয়া এক বিস্তৃত গ্রীক সাম্রাজ্য স্থাপন করিবার স্বপ্ন অনেকদিন হইতেই দেখিয়া আসিতেছিলেন। ইংরাজ রাজ-নৈতিকগণের আহ্বান পাইবামাত্র উহা তিনি সাদরে গ্রহণ করিয়া তাবৎ জাতির সমক্ষে বিংশ শতাব্দির ট্রয় যুদ্ধের ছবি অঙ্কিত করিয়া দিয়া সমরে অবতীর্ণ হইবার জন্য অনুরোধ করেন। ভাবপ্রাণ গ্রীক জাতি এই নূতন ক্রুসেড্‌কে তাহাদের জাতীয় 'পণ' হিসাবে গ্রহণ করিয়া জীবনপণ করিয়া বসিল। এক বিরাট-বাহিনী বিবিধ অস্ত্রশস্ত্রে সুশোভিত করিয়া এশিয়ামাইনরে প্রেরণ করা হইল।

সম্মুখে ভীষণ দুর্য্যোগ উপস্থিত দেখিয়া কামাল সমস্ত আনাটোলিয়াকে এক বিরাট কর্ম্মক্ষেত্রে পরিণত করেন। তাঁহার এক চর সোভিয়েট সরকারে নিকট গিয়া সাহায্য প্রার্থনা করিলে সোভিয়েট সরকার যুদ্ধ সরঞ্জাম ও অর্থ তুর্কীর সাহায্যের জন্য প্রেরণ করেন। সামান্য হাফর গুলিতে বিংশ শতাব্দীর কামান প্রস্তুত হইতে থাকে। নরনারী নির্ব্বিশেষে তাবৎ জনসংখ্যাকেই কোন না কোন কার্য্যে ব্যাপৃত হইতে হয়।

গ্রীক-বাহিনী আসিয়া সীডার প্রধান রেল পথটী দখল করিবার মানসে তাহাদের সমস্ত শক্তি সন্নিবেশিত করিয়া বসে। কামাল তাঁহার অনুচরগণকে উক্ত প্রদেশ রক্ষা করিবার জন্য প্রেরণ করিয়া স্বয়ং আঙ্গোরায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। তুর্কীজাতি স্বাধীনতা মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া গ্রীকজাতিকে এমন ভীষণভাবে আক্রমণ করিল যে গ্রীকগণের সংখ্যাধিক্য না থাকিলে তাহাদিগকে হটিয়াই আসিতে হইত। যুদ্ধের জন্য রসদ ও গোলাগুলি যোগান দিবার জন্য তুর্কীর সামান্য গো-শকট ব্যতীত অন্য অবলম্বন ছিল না। কামালের শিক্ষার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া তুরস্ক রমণীগণ 'বরখা' ফেলিয়া একশত মাইল গো-শকট চালাইয়া যেখানে অগ্নিবর্ষণ চলিতেছে সমর-ক্ষেত্রের সেই অংশে স্কন্ধে বহন করিয়া মালপত্র যোগান দিয়া আসিতে লাগিল। এই যুদ্ধের প্রারম্ভে কামালকে তাবৎ সভ্য জগৎ একজন বিদ্রোহী নেতা মাত্র মনে করিতেন। তাঁহার সৈন্যের দলকে একদল ডাকাত বলিয়াই তাঁহাদের ধারণা ছিল। এই ভীষণ যুদ্ধে সভ্যতার তাবৎ অস্ত্রশস্ত্রে সুশোভিত গ্রীকসৈন্য যখন তুর্কীর কৃষকগণের হস্তে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া তাহাদের অগ্রসর হওয়া বন্ধ হইয়া যায় তখন মিত্রশক্তির সকলেই বিশেষ চিন্তাকুল হইয়া পড়েন। ভেনিজিলস্ সমগ্র গ্রীক জাতিকে নূতন মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া তাহাদিগকেও নববলে বলীয়ান করিয়া তুলিয়াছিলেন। এশিয়া মাইনরের প্রান্তে তাহাদের পুরাতন সহরগুলি অবস্থিত। এইখানেই ট্রয় নগরী ছিল। এইখানেই অসংখ্য গ্রীক এখনও বসবাস করিতেছিল। তাহাদিগকে এক প্রকাণ্ড গ্রীক সাম্রাজ্যের মধ্যে আনয়ন করিবার জন্য গ্রীকগণ প্রাণপণে তুরস্কের গলা কামড়াইয়া ধরিল।

মানুষের যাহা সাধ্য কামাল ও তাঁহার সহচরগণ তাহা সম্পাদন করিবার কোন ত্রুটীই করিলেন না; সংখ্যাধিক্য গ্রীকসৈন্যের নিকট ক্রমশঃ পরাজয় অবশ্যম্ভাবী হইয়া দাঁড়াইল। কামাল স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিয়া তাবৎ অবস্থা স্বচক্ষে পরিদর্শন করিয়া নিতান্ত ভগ্ন-হৃদয়ে ফিরিবার জন্য সৈন্যগণকে অনুমতি দিলেন। তুরস্ক বাহিনী শত্রুগণের হস্ত হইতে ধ্বংস প্রাপ্ত হওয়া অপেক্ষা পশ্চাৎ হটিয়া সাকেরিয়া প্রদেশে গিয়া নূতন উদ্যমে আবার গ্রীক সৈন্যের সম্মুখীন হইবে এই ছিল তাঁহার অভিপ্রায়। এই ভীষণ পরাজয়ে কামালের সহচরগণ হতাশ হন। যাঁহারা তাঁহার ক্ষমতায় ঈর্ষাপরায়ণ ছিলেন তাঁহারা অচিরেই সন্ধি করিবার জন্য পরামর্শ দেন। কামাল অপ্রত্যাশিতভাবে পার্লামেণ্টে প্রবেশ করিয়া এক সুন্দর বক্তৃতা প্রদান করেন। তাঁহার সুন্দর কণ্ঠস্বরের ওজস্বিতায় সভ্যগণের হৃদয়ে আবার নব-আশার উদ্রেক হয়। কামালকে রাজ্যের একমাত্র পরিচালক নির্দ্দেশ করিয়া মহাসভা তাঁহার হস্তে সমস্ত ক্ষমতা প্রদান করেন।

সাকেরিয়া প্রদেশে ভীষণ সংঘর্ষ উপস্থিত হইল।

দারুণ গ্রীষ্মে গ্রীকসৈন্য অস্থির হইয়া উঠিল। জলহীন মরু প্রদেশে সভ্য গ্রীকগণ শুধু নূতন আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াছিল বলিয়াই প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া চলিল। দিন দিন দুর্গতির চরম সীমায় উপনীত হইয়া তুর্কী সেনানীগণ বিন্দুমাত্র হতাশ হইলেন না। তাঁহারা গ্রীক আক্রমণ যথাক্রমে সংযত করিয়া চলিলেন। বহুদিন যুদ্ধ চলিলে বিজয়লাভ অসম্ভব জানিয়া গ্রীকসেনাপতি তাঁহার সমস্ত সৈন্য একত্রিত করিয়া একটী পার্ব্বত্য-পথ দখল করিয়া লইতে দৃঢ় সঙ্কল্প হন। এই পথটী দখল করিতে পারিলে তুরস্কের পরাজয় নিশ্চিত জানিয়া কামাল তাঁহার সেনা-পতিকে উহা রক্ষার জন্য প্রাণপণ করিবার আদেশ পাঠান। ঘণ্টায় ঘণ্টায় যুদ্ধ সংবাদ তাঁহার নিকট আসিতে লাগিল। প্রত্যেকবারেই গ্রীকসৈন্য অগ্রসর হইতেছে এবং তুরস্ক বাহিনী হটিয়া যাইতেছে খবর আসিতে লাগিল। কামাল একবার ভাবিলেন যে তাঁহার সৈন্যগণকে সরাইয়া লইয়া অন্যত্র গমন করিবেন। কিন্তু পার্ব্বত্য পথটী একটী ভীষণ দুর্গ বিশেষ তাঁহার ধারণা হওয়ায় এই দুঃসাহসিক কার্য্য করিতে সাহস পাইতেছিলেন না। এদিকে আঙ্গোরার চতুঃপার্শ্বের স্থানগুলি গ্রীকদের হস্তগত হইয়া যাওয়ায় গৃহহীন শত শত তুর্কী আঙ্গোরায় আসিয়া দারিদ্র্য ও হতাশ বাড়াইয়া তুলিতেছিল। কামাল তাঁহার শেষ আশা অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিলেন। সমর ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া কখনই পরাজিত হয়েন নাই, ভাগ্য-লক্ষ্মী সর্ব্বদাই তাঁহার জয়পতাকা বহন করিয়া লইয়া গিয়াছেন, এক্ষেত্রে অন্যথা হইতে পারে না ইহাই আশা করিতে লাগিলেন। গ্রীকদের কামান গর্জ্জন ক্রমশঃ কর্ণ বধির করিয়া তুলিল। সমরক্ষেত্রের প্রধান নায়ক ইসমেৎ পাশাও ক্রমশঃ হতাশ হইয়া পড়িতে লাগিলেন। রাত্রির পর রাত্রি কাটিয়া গেল চক্ষের পলক ফেলিবার সময় হইল না। অবশেষে এমন একদিন আসিল যাহার প্রত্যেক মুহূর্ত্ত এক একটী বৎসর বলিয়া অনুমিত হইতে লাগিল। দিবাভাগ কোন ক্রমে কাটিল সত্য বটে, দানবের ন্যায় ইসমেৎ পাশা সমস্ত গ্রীক-বাহিনীর প্রবল আক্রমণ ব্যর্থ করিলেন ঠিক কিন্তু রাত্রি ভীষণ বিভীষিকা সৃজন করিল। রাত্রি সাতটা, আটটা, নয়টা, দশটা বাজিল, তুর্কীর অবস্থা ভীষণ শোচনীয় হইয়া উঠিল। এগারটা বাজিল—সংবাদ আসিল পরাজয় অনিবার্য্য, আঙ্গোরার অধিবাসীগণকে স্থানান্তরিত করা হউক। গ্রীকগণ আঙ্গোরা দখল করিবেই বলিয়া পণ করিয়া বসিয়াছেন। বারটা বাজিল সংবাদ পাওয়া গেল গ্রীকসৈন্য অগ্রসর হইতেছে, গ্রীকের কামান গর্জ্জনও ভীষণতর হইয়া উঠিল। একটা বাজিল, কোন সংবাদ পাওয়া গেল না। দুটার সময় টেলিফোনের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। কম্পিত হস্তে কামাল টেলিফোনের হাতলটী গ্রহণ করিয়া কানে তুলিয়াই কম্পিতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি পাশা', তুমি? আমি কি শুনছি গ্রীকরা পার্ব্বত্য-পথটার অর্দ্ধেক ছাড়িয়া দিয়াছে এবং অপর অর্দ্ধেক তুমি এখনই দখল করিয়া লইবে? তবে কি গ্রীকগণ ফিরিয়া যাইবে।

অসম্ভব সম্ভব হইয়া গেল। দারুণ গ্রীষ্মে এবং রসদের ভাল ব্যবস্থা না থাকায় অদ্ভুত বীরত্ব দেখাইয়াও গ্রীকবাহিনী কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। এখানে অবস্থান করিলে সমস্ত বাহিনী ধ্বংস প্রাপ্ত হইতে পারে এইরূপ আশঙ্কা করিয়া গ্রীক সেনাপতি তাঁহার সৈন্যগণকে পশ্চাৎ হটিতে আদেশ দিয়া শিবির উত্তোলন করিলেন। বিজয়ী তুর্কীগণ ইসমেৎ পাশার নেতৃত্বে গ্রীক সৈন্যগণের পশ্চাৎধাবন করিয়া সাকেরিয়ার সন্নিধানে তাহাদের উপর লাফাইয়া পড়ে। পরাজিত ও ছত্রভঙ্গ গ্রীক সৈন্যগণ কোন রকমে আত্মরক্ষা করিয়া স্মার্ণায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। বিজয়ী কামালের নাম ইউরোপের শক্তিগণের নিকট পৌঁছাইলে সকলেই তুরস্কে এক নব-শক্তির আবির্ভাব হইয়াছে তাহা বুঝিতে পারিলেন।

স্বাধীন তুরস্ক।

ফ্রান্স প্যারিসের সন্ধি সর্ত্তগুলি মানিয়া লইলেও সমস্ত এশিয়ায় ইংরাজ প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়া যায় দেখিয়া বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়ে। কামাল যখন গ্রীকবাহিনীকে পরাস্ত করিয়া আনাটোলিয়া প্রদেশ হইতে তাহাদিগকে বিতাড়িত করিয়া দেন তখন ফ্রান্স বেশ আত্ম-সুখ অনুভব করে। নব-জাগরিত তুরস্কের সহিত নূতন সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়া ফ্রান্স তাহার অধীনস্থ প্রদেশগুলি তুরস্ককে

প্রদান করে। ইংরাজ গ্রীককে উৎসাহিত করিলেও অর্থ বা লোকবল দিয়া সাহায্য করিতে পারিলেন না। কাজেই তুর্কীকে এক কনফারেন্সে ডাকিয়া একটা মীমাংসা করিবার জন্য চেষ্টা করেন। গ্রীকগণ কোন প্রকার মীমাংসা করিবার জন্য প্রস্তুত ছিল না। ইংরাজের প্রস্তাবিত সন্ধিসর্ত্তগুলি কামালের মনঃপূত না হওয়ায় আবার সমরানল প্রজ্জলিত হইয়া উঠিল। বিজয়ী তুর্কী সৈন্যগণের নিকট গ্রীক সৈন্যগণ এবার ভীষণভাবে পরাস্ত হইয়া ইউরোপে ফিরিয়া যায়। কামাল প্রতিশোধ লইবার মানসে এশিয়ামাইনরের তাবৎ গ্রীক প্রজাকে এশিয়া-মাইনর পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবার জন্য আদেশ করেন। অতর্কিতভাবে প্রজা বৃদ্ধি হইল দেখিয়া গ্রীক বিশেষ বিব্রত হইয়া পড়ে, এদিকে কামালের সৈন্যগণ কনষ্টানটীনোপলে গমন করিয়া উহা অবরোধ করে। ইংরাজ সেনাপতি মিত্রশক্তিগণের অধিকৃত সীমানায় প্রবেশ করিতে নিষেধ করিলে উভয়দলের সৈন্যগণ পর-স্পরের সম্মুখে তাহাদের তাঁবু গড়িয়া বসিয়া রহিল।

কামালের প্রতিপক্ষগণ সুলতানের পক্ষ অবলম্বন করিয়া প্রকাশ্যভাবে কামালের বিরুদ্ধাচরণ করা সুরু করিয়া দিল। কামাল সেদিকে বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করিয়া মিত্রশক্তিগণের সহিত একটা বুঝা পড়া করিয়া লইবার জন্য দৃঢ় সংকল্প করিলেন। লণ্ডনে একটী কনফারেন্স আহূত হয়। কামাল তাঁহার অনুচর ও বিজয়ী-বীর ইসমেৎ পাশাকে তাঁহার দূত হিসাবে প্রেরণ করেন। কন্‌ষ্টানটীনোপলের প্রতিনিধিও তথায় গমন করেন। ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রস্তাবিত সর্ত্তগুলি উভয় প্রতি-নিধির নিকটই অবমানকর মনে হওয়ায় উক্ত কনফারেন্স ভঙ্গ হইয়া যায়। কামাল পশ্চিম ইউরোপের শক্তিপুঞ্জকে বেশ স্পষ্টভাবেই জানাইয়া দেন যে তিনি সমস্ত দেশের স্বাধীনতা ব্যতীত আর অন্য কোন প্রস্তাবেই রাজী হইবেন না।

স্মার্ণা পুনর্ব্বার দখল করিবার পর কামাল লতিফি হান্নুম নামক একটী সুন্দরীর সহিত পরিচিত হয়েন। স্মার্ণায় অবস্থান কালে এই সুন্দরী কামালের নিকট আসিয়া তাঁহাকে তাঁহার পৈতৃক বাসস্থানে অবস্থান করিবার অনুরোধ করেন। কামাল প্রথমে স্বীকৃত না হইলেও রূপসীর রূপ তাঁহাকে তাঁহার অজ্ঞাতসারে আকর্ষণ করায় একদিন বলিয়া পাঠান যে তিনি লতিফির আবাসেই তাঁহার বাসস্থান করিবেন। লতিফির অতিথি হইয়া কামাল আশ্চর্য্যভাবে লক্ষ্য করিলেন যে তাঁহার তাবৎ প্রয়োজনীয় সামগ্রীই ঠিক যেন কলের দ্বারা চালিত হইয়া তাঁহার হস্তের নিকট উপস্থিত হয়। গুণগ্রাহী কামালের অন্তঃকরণ এই অসাধারণ কর্ম্মকুশলতায় মুগ্ধ হইয়া লতিফির সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠে। তাঁহার প্রার্থনা মত লতিফি কামালের সহিত সাক্ষাৎ করিলে কামাল তাঁহার অজস্র প্রশংসা করেন। লতিফি এই প্রশংসায় উৎসাহিত হইয়া কিছুমাত্র দ্বিধা অনুভব না করিয়া কামালের সহিত পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হইবার জন্য অভিপ্রায় প্রকাশ করে। সে স্পষ্টই বলে যে কামাল যদি তাহাকে বিবাহ করিতে অস্বীকার করে তবে আজীবন কুমারীই থাকিয়া যাইবে। গ্রীক-বিজয়ী এবং তুর্কীর স্বাধীনতার পুনপ্রতিষ্ঠাতা কামালকে হৃদয়েশ্বর করিবার অভিলাষ তাঁহার বহুদিন হইতেই আছে তবে তাঁহার অভিষ্ট সিদ্ধি লাভের জন্য অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল বলিয়াই লতিফি এতদিন মনোভাব ব্যক্ত করেন নাই। হঠাৎ বিবাহ প্রস্তাবে কামাল একটু চমকাইয়া উঠিয়া বলেন যে লতিফিকে বিবাহ করিতে তিনিও রাজী আছেন তবে এখনও যে কার্য্যটুকু অবশিষ্ট আছে তাহা সম্পাদন না করিয়া অন্য-দিকে মনোযোগ প্রদান করিবার তাঁহার একান্তই সময়াভাব।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে কামাল আঙ্গোরা হইতে হঠাৎ লতিফির গৃহে উপস্থিত হন এবং তৎক্ষণাৎ বিবাহিত হইবার অভিলাষ জ্ঞাপন করেন। লতিফিও প্রস্তুত ছিলেন। রাজপথ হইতে এক মোল্লাকে আহ্বান করিয়া আনিয়া উভয়ে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয়েন। এই স্বাধীন প্রকৃতি রমণী সর্ব্বাংশেই কামালের যোগ্যা ছিলেন। কামাল মহিষী হইতে গেলে যে সমস্ত গুণরাশির প্রয়োজন তাহা তাঁহাতে যথেষ্ট পরিমাণেই ছিল। কিন্তু বিধাতার বিধানে এই বিবাহ বন্ধন স্থায়ী হইতে পারে নাই।

কামাল স্ত্রীর উদ্দাম স্বাধীনতা সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহার সহিত বিবাহ-বন্ধন বিচ্ছেদ করিবার প্রস্তাব পাঠাইলেই লতিফি তাহাতে স্বীকৃতা হ'ন। অদ্ভুতভাবে সংঘটিত বিবাহ অদ্ভুতভাবেই বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। এই দুর্ঘটনায় কামাল বা লতিফির হৃদয়ে কোন আঘাত লাগিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। স্বাধীন হৃদয়ের ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করিবার শক্তিও অদ্ভুত।

এদিকে মিত্রশক্তিগণ লুসেনে কনষ্টানটীনোপলকে বাদ দিয়া শুধু আঙ্গোরার সহিত সন্ধি করিবার সম্মতি জ্ঞাপন করিলে, কামাল তথায় তাঁহার প্রতিনিধি প্রেরণ করেন। ১৯২১ সালের ২০শে নভেম্বর লুসেন কন্‌ফারেন্সের প্রথম অধিবেশন বসে। এই অধিবেশন নয় মাস ধরিয়া গম্ভীর গবেষণা করিবার পর কামাল প্রস্তাবিত সর্ত্তগুলিই মিত্র-শক্তিগণ কর্ত্তৃক গৃহীত হয়। তুরস্ককে একটী সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন রাজ্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া হয়। তুরস্ক সরকারের তাবৎ বৈদেশিক ঋণ নাকচ করিয়া দেওয়া হয়। কামাল তাঁহার আজীবন সাধনাকে সফল হইতে দেখিয়া উহাকে ষোলকলায় পূর্ণ করিয়া তুলিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন।

সম্রাটকে কেন্দ্র করিয়া তাবৎ ষড়যন্ত্র অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া কামাল সুলতানকে পদচ্যুত করিতে দৃঢ় সংকল্প হ'ন। কৌশলে পার্লামেণ্টে প্রস্তাবটীর অবতারণা পূর্ব্বক তাঁহার প্রতিপক্ষকে কোনরূপ ভাবিবার অবসর মাত্র প্রদান না করিয়া নব-প্রতিষ্ঠিত তুরস্ক রাজ্য হইতে সুলতান পদটী চিরকালের জন্য তুলিয়া দেন। সম্রাট ষষ্ঠ মহম্মদ দেশত্যাগী হইলে, তাঁহারই এক ভ্রাতাকে খলিফা পদটী প্রদান করিয়া কনষ্টানটীনোপলে রাখা হয়। কালক্রমে উহাও নিষ্প্রয়োজন ও ব্যয় সাপেক্ষ বলিয়া উক্ত পদটী লোপ করিয়া দিয়া তুরস্ককে সর্ব্বপ্রকার পুরাতন বন্ধন হইতে মুক্তি প্রদান করেন। আঙ্গোরায় নূতন রাজধানী স্থাপিত হওয়ায় নূতন আদর্শে নগরটী নির্ম্মিত হয়। যে সমস্ত সমাজ সংস্কার করিতে যাইয়া ১৯০৮ সালে সমাজ সংস্কারকগণ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, কামাল একে একে সে সমুদয়েরই প্রবর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

রমণী-সমাজকে সম্পূর্ণভাবে স্বাধীনতা দিয়া বালকদিগের ন্যায় বালিকাদেরও শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা স্থির করেন। ইউরোপীয় পোষাক পরিচ্ছদ আধুনিক যুগের উপযোগী বলিয়া পুরাতন পায়জামা ও কোট পরিত্যাগ করিয়া প্যাণ্ট ও হ্যাট গ্রহণ করিবার জন্য তুর্কীর জনসাধারণকে অনুরোধ করেন। এখন আঙ্গোরায় গমন করিয়া নবীন তুরস্ককে দর্শন করিলে উহাকে একটী ইউরোপীয় প্রদেশ বলিয়াই অনুমিত হইবে।

কামাল চাহিয়াছিলেন পুরাতনকে সর্ব্বাংশে বর্জ্জন করিয়া নূতনকে বরণ করিয়া লইতে। পুরাতন ধর্ম্ম, পুরাতন আচার-ব্যবহার, পুরাতন রাজ-মুদ্রা, পুরাতন বিদ্যা পুরাকালের পক্ষে উপযোগী হইলেও বর্ত্তমান যুগে উহা একেবারেই অকার্য্যকর ও ক্ষতিকর, উহাদিগকে সনাতন ধর্ম্মের নিদর্শক হিসাবে আঁক্‌ড়াইয়া ধরিলে জাতির অধঃপতন অনিবার্য্য—যেমন তুরস্ক সাম্রাজ্যের অধঃপতন হইয়া যাইতেছিল; এইজন্য এই বিংশ শতাব্দীতে পশ্চিমের সহিত প্রতিযোগিতায় পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন হইতে না পারিলে বাঁচিয়া থাকা অসম্ভব এই ধারণায় তুরস্ককে তিনি সম্পূর্ণভাবে পাশ্চাত্যের আদর্শে ঢালিয়া নূতন করিয়া সংগঠন করিতেছেন।

গান

শ্রীরাসবিহারী মল্লিক

মনের মানুষ নেইকো আমার
তাই তো আমার মন উদাসী;
পরাণ আমার চাইচে সখি
আজকে কারেও ভালবাসি।

* * *

হয়তো কারো পাবো দেখা
নয়তো আমি ফিরবো একা
এই অবেলায় চোখের জলে
ভিজিয়ে আমার বাঁশের বাঁশী।

ঘর-গৃহস্থালী

বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের একটি শ্রেষ্ঠতম পরিচয় তাহার গৃহ-প্রতিষ্ঠা—তাহার ঘর-গৃহস্থালী। বাঙলার গৃহ কেবল মাত্র বাস করিবার আশ্রয় নহে, মাথা গুঁজিবার ঠাঁই নহে। উহা জীবনের অনুশীলন কেন্দ্র। বড়িবার, মনুষ্যত্বে সমৃদ্ধ হইবার এমন অনুশীলন কেন্দ্র আর কিছুই হইতে পারে না। সেই জন্য বাঙলার সভ্যতা-সাধনা গৃহকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল। সেই গৃহের পরিচয় পাইলে সেদিনের বাঙ্গালীরও কতকটা পরিচয় পাওয়া যাইবে।

গৃহ হর্ম্ম্য বা পর্ণকুটীর নহে। আচ্ছাদন বিশিষ্ট একটা আবরণ স্থান নহে। গৃহে মনুষ্যত্বের সৃষ্টি ও পুষ্টি। তাই বাঙলা অথবা ভারতবর্ষের গৃহ হোটেল নহে, গার্হস্থ্য আশ্রম। যেখানে মানুষ বাঁচে, বাড়ে, এবং তাহার ক্ষুদ্র সত্তা হইতে বৃহতে ব্যাপিত হইয়া পড়ে, তাহার মূল্য ও মর্য্যাদা বড় কম নহে। যে যে জাতির মধ্যে, যে যে সভ্যতার ভিতরে এই গার্হস্থ্য আশ্রম সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে, সেই সেই জাতিই সভ্যতা ও মানবতায় পরিপুষ্ট।

'ঘরো বাঙ্গালী' কথাটা আজিকালি একটু অবজ্ঞা-সূচক হইলেও বাস্তবিক উহা নিন্দার নহে। বাঙ্গালী জাতি তাহার গৃহ প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করিয়াই তাহার যাহা কিছু করিয়াছে। সাত ডিঙ্গী লইয়া সুমাত্রা-জাভা, এমন কি সুদূর মিসর দেশ পর্য্যন্ত বাণিজ্য করিয়াছে, কিন্তু সবই সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে তাহার গৃহে। আর এই গৃহে প্রতিষ্ঠিত হইয়াই সে মানবতার পরিচয়কে সমুজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে। বাঙলার গৃহিই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে দেব-দেবালয়, জলাশয় পথ, বৃক্ষ। বৈধ-জীবনে অনুরক্ত গৃহির অমৃত-সিঞ্চনে সমাজ সঞ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছিল। কেমন করিয়া হইয়াছিল, তাহা জানিলে কৌতূহলী বৃত্তিও চরিতার্থ হইবে। আবার বাংলার সুস্থ জীবনের একটা পরিচয় পাইয়া তেমনি হইবার আশাও জাগিবে।

অঋণী অপ্রবাসী ইহাই ছিল মূলমন্ত্র। পারত-পক্ষে কেহ বাহিরে যাইতে চাহিত না। ইংরেজী যুগের আরম্ভ কালে নৌকা লইয়া বন্দরে বন্দরে বাণিজ্য করাও উঠিয়া গিয়াছিল। কাজেই বাঙ্গালী জাতি একেবারে কুণো হইয়া পড়িয়াছিল, ইহা সত্য! ইহার মধ্যে গণ্ডি-বদ্ধতা কতকটা থাকিলেও ব্যাপারটির অভ্যন্তরে ছিল একটি সৌষ্ঠব, একটি শিষ্টতা এবং একটি নিষ্কম্প প্রদীপের মত মিত্রতা। এই গৃহ-নিবদ্ধতা সৃষ্টি করিয়াছিল একটি নিয়মানুগ বৈধজীবন।

আজ গ্রামের দিকে চাহিলে প্রথমেই চোখ পড়ে বাঁশ ঝাড়, বন্য বৃক্ষ, ভাঙ্গা ভিটা এবং হাজিয়া মজিয়া যাওয়া ক্ষুদ্র বৃহৎ পুষ্করিণী। এক ধ্বংসের বিভীষিকা। সন্ধ্যায় কাঁশর-ঘণ্টার শব্দ স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। শুনিতে পাওয়া যায় কেবল অমঙ্গল শিবাধ্বনি। পল্লী ভাঙ্গিয়া নগর গড়িয়া উঠিয়াছে বটে, কিন্তু নাগরিক সমৃদ্ধিতে সমগ্র জাতির বিশেষ কল্যাণ হয় নাই। সমগ্র জাতির সত্যকার প্রতিষ্ঠা নগরে নহে পল্লীতে। যাউক সে কথা।

পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বেও পল্লীবিতৃষ্ণা এমন উগ্র হইয়া উঠে নাই। গ্রামের লোক গ্রামে থাকাকেই সৌভাগ্য বলিয়া মনে করিত। এবং গৃহকে সাজাইয়া গুছাইয়া মানাইয়া সম্পন্ন গৃহস্থ হইবার ঐকান্তিক আকাজ্ঞা পোষণ করিত। এই সাজান-গুছানোর একটু বিশেষত্ব ছিল, তাহা এখনকার মত নহে। এখনকার গৃহসজ্জা বিলাস উপকরণ। তখনকার হইতেছে পুকুর বাগান ক্ষেত খামার। ইহার মধ্যে গাভীও একটি সৌষ্ঠব।

গৃহ ও গৃহস্থালী কথাটার মধ্যে ভাবিবার কথা অনেক রহিয়াছে। ঘর গৃহস্থালী ব্যক্তির। কিন্তু যখন উহা ব্যক্তিত্বের মধ্যেই কেন্দ্রীভূত হইয়া থাকে, তখন উহার মর্য্যাদা হানি হয়। গৃহের ও গৃহস্থালীর একটা ব্যাপকতা আছে। টেবিল, চেয়ার, আলমারি জাপানি ভেস, ফরাসীর কাচ শিল্প, চীনের নানাবিধ শিল্প সম্পদ, ইহার সংগ্রহ ও সমারোহ যতই মহার্ঘ্য হউক, তাহার মধ্যে ব্যক্তিত্বের একটা সংকীর্ণতা আছে। উপরে যে গৃহস্থালীর চিত্র দিলাম তাহা নব্যবাঙলার গৃহপোকরণ। পুরাণী বাঙ্গলার গৃহসৌষ্ঠব ছিল অন্যবিধ।

যিনিই গৃহস্থ ও সম্পন্ন গৃহস্থ ছিলেন, তিনিই প্রথমে দৃষ্টি দিতেন ক্ষেত খামার, জোত-জমা, পুকুর বাগানের দিকে। অবশ্য এইগুলিও ব্যক্তিগত সম্পত্তি। কিন্তু ইহাদের সহিত সাধারণের একটা সংযোগ আছে। বাঙলা দেশের গ্রামে গ্রামে এখনও বহু বাগান আছে, যে বাগানের আম, জাম, নারিকেল দশজনে পড়িয়া খায়। গৃহস্বামী একটি খাইলে পাড়া-প্রতিবাসী দশটি খায়। এক জন পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা করিলে সেই পুষ্করিণীর মৎস্যের অংশে সকলেই অংশী। মৎস্যপ্রিয় বাঙ্গালীর কাছে মাছ অতি প্রিয় খাদ্য। সেই জন্য ছিপে মাছ ধরা পল্লীগ্রামের এক বিশেষ বিলাস। পুষ্করিণী যেমনই হউক, মাছ ধরায় কোনও বাধা ছিল না। বরং দেখিয়াছি গ্রামান্তর হইতে কেহ মাছ ধরিতে আসিলে বিশেষ আদর-আপ্যায়ন করা হইত।

ব্যাপারটি খুব তুচ্ছ। কিন্তু পল্লীর আত্মীয়তার সম্পর্ক কেমন স্বচ্ছ ও বিসর্পিত, তাহা দেখিতে গিয়া এই মাছ ধরার সামান্য কাহিনীও কহিতে হইল। মাছধরার বিলাস বাঙ্গালী এখনো ছাড়িয়া দেয় নাই। কিন্তু নব সভ্যতার কাষ্ঠ সৌজন্যে এখন পাশ হইয়াছে। কোনও পুকুরে মাছ ধরিবে পাশ লাও। অর্থাৎ মূল্য দাও। সেই ফেল কড়ি মাখা তেল, আমি কি তোমার পর!" পুরাণী বাঙলার মানুষগুলি এমন সৌজন্য বুদ্ধি বিহীন ছিল না। তাহারা সেকেলে হইলেও তাহাদের একটু চক্ষু লজ্জা ছিল।

দেখা দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেছি। কোনও পুষ্করিণীতে মাছ ধরা হইতেছে। ধৃত মৎস্য হইতে অৰ্দ্ধেক বিলাইবার জন্য রাখা হইল। সেখানে যাহারা উপস্থিত ছিল, কেহ হয়ত স্নানে আসিয়াছে, কেহ আসিয়াছে মুখ ধুইতে এবং গ্রামের নিম্নবর্ণের অনেককে তাহাদের সেই অৰ্দ্ধেক হইতে কিছু কিছু ভাগ দেওয়া হইল। পুষ্করিণীর মালিক যাহা পাইলেন তাহার সমস্ত গুলিই তাঁহার নিজের উপভোগের জন্য লইলেন না। গ্রাম্য পুরোহিত ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাড়ী কিছু গেল, কিছু গেল পাঠশালার পণ্ডিত মহাশয়ের ঘরে। কাহার জামাই আসিয়াছে, তাহাকেও কিছু পাঠাইতে হইবে। এমনি করিয়া তাহা বিতরিত হইতে লাগিল। বাগানের ফল-মূলের গতিও এমনি হইত। আম নারিকেল কলা কাঁঠাল কেহই একেলা খাইত না।

খুব বড় করিয়া নাম করিয়া ছোটখাট নিতান্ত ছোটখাট কথা কহিবার উদ্দেশ্য বৃহৎ কথায় সমগ্র জাতির চরিত্রকে বোঝা যায় না—সমগ্র জীবনকে পর্য্যবেক্ষণ না করিলে দুই একটা মাত্র ঐতিহাসিক ঘটনায় জাতীয় চরিত্রের স্বরূপকে বরং আবৃতই করা হয়। ঘরের মানুষ ও বাহিরের মানুষে প্রভেদ অনেক। একজন কৃত্রিম এক জন নিতান্ত সহজ ও স্বাভাবিক। বাহিরে আছে একটা আবরণ, একটা সাময়িক প্রলেপ; উহা সহজ রূপকে আবৃত করিয়া রাখে। সেই জন্য ছোটখাট ঘটনায় একেবারে অনাবৃত নগ্ন মানবতাকে দেখা যায়। পুরাণী বাঙলার কথা কহিতে গিয়া সুবৃহৎ সমারোহপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনাগুলির উল্লেখ না করিয়া ছোটখাট ঘর গৃহস্থালীর কথাই কহিতে হইল।

ঘরের কথা কহিতে হইলে গৃহিণীর কথা কহিতে হয়। গৃহিণী গৃহস্থের দীপ্তিদ্যুতি। যাঁহারা শুদ্ধান্তঃপুরিকার অবরোধে অত্যন্ত ব্যথা বোধ করেন, তাঁহারা পুরাণী বাঙলার গৃহিণীর অধিকার ও স্বাধীনতার প্রসার দেখিলে বিস্মিত হইবেন। অবশ্য এ স্বাধীনতা অন্তঃপুর হইতে দেবালয়, দেবালয় হইতে তীর্থ ও গঙ্গার তীর পর্য্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। ইহা বৈধ স্বাধীনতা। লাস্য ব্যসন ও বিলাসের স্বৈর স্বেচ্ছাচার নহে।

এইবার একটু বাস্তব কথা কহিব। সাংসারিক খাওয়া দাওয়া, দেওয়া থোওয়া, আত্মীয়-কুটুম্বতা, এস জন, বস জন এই সমস্তর ভারই গৃহিণীর উপর। গৃহিণী অতি প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিতেন এবং সর্ব্ব শেষে শয্যা গ্রহণ করিতেন। প্রাতঃকালের কার্য্য, স্তোত্র পাঠ করিতে করিতে সংসারের অন্যান্য সকলের নিদ্রা ভঙ্গ করিয়া দেওয়া। তাহার পর পরিবারস্থ শিশুদের প্রাতর্ভোজনের ব্যবস্থা। এই প্রাতঃকালীন জলযোগ অধিকাংশ সময়ই ছিল মুড়ি এবং চিড়া ভিজা। বাড়ির বউ ও ঝিউড়ি যাঁহারা, তাঁহারা স্নানের পর প্রাতঃ খাদ্য গ্রহণ করিতেন। এই খাদ্য ভিজাভাত। পল্লী গ্রামের ভাষায় পান্তা ভাত। শীত-কালের ব্যবস্থা মুড়িচিঁড়া। গৃহিণী যাঁহারা তাঁহাদের জলখাওয়ার ব্যাপারটা প্রায়ই হইয়া উঠিত না। কারণ বাড়ীর কর্ত্তাকে না খাওয়াইয়া স্ত্রীলোকের খাওয়ার প্রথা ছিল না।

গৃহের কার্য্যের ব্যবস্থা করাই গৃহিণীর একমাত্র কর্ত্তব্য ছিলনা। জ্যেষ্ঠ কন্যা বা পুত্রবধূকে গৃহস্থালী ও রন্ধনের উপদেশ দিয়া গৃহিণী পাড়ায় বাহির হইতেন। এই পাড়া বেড়ান ভ্রমণ নহে। পাড়াপ্রতিবাসী, আত্মীয়স্বজনের তত্ত্ব লওয়া। কে কেমন আছে, কাহার কি প্রয়োজন ইত্যাদি সংগ্রহ করা এবং তদুপযোগী আবশ্যকীয় ব্যবস্থাদি করাই এই ভ্রমণ ব্যাপারের প্রধান কার্য্য। ইহার মধ্যে দৈনিক রন্ধনের খোঁজ-খবর নেওয়ার রীতিও প্রচলিত ছিল।

কথাগুলি এমন ফেনাইয়া বলিবার কারণ পুরাণী বাঙলার সমগ্র জীবন পদ্ধতি ছিল—মৈত্রী প্রণোদিত। সকলেরই মূলে ছিল এক আত্মীয়তা। ছাড়া-ছাড়া, ভাসা-ভাসা, একান্ত পর এমনভাব গার্হস্থ্য প্রতিষ্ঠান বা সমাজিক পরিবেষ্টনী কোথাও, কোনও কিছুতে বর্ত্তমান ছিল না।

গৃহস্থালীর কথা কহিতে গিয়া প্রথমেই অন্তঃপুরের কথা কহিতেছি। কারণ নারীর মমতা ও মায়াই মানবের মনুষ্যত্বকে সঞ্জীবিত করিয়া রাখে। রমণীর আকর্ষণে পুরুষ সমাজ উঠে—নামে। কথাটা খুব বিবৃত করিতে চাহি না। কেবল আধুনিক প্রতীচ্য সমাজের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিতেছি।

পল্লী গৃহস্থালীর মধ্যে পাট-ঘাট বলিয়া একটা কথা আছে। পল্লী অঞ্চলে কথাটার এখনো প্রচলন আছে। ঐ পাট-ঘাটের অর্থ গৃহস্থালির প্রাথমিক কাজকর্ম্ম সারিয়া ঘাটে যাওয়া। ঘাটে যাওয়া মুখ্যতঃ স্নান করিতে যাওয়াই বটে। কিন্তু স্নানের ঘাট ছিল—একটা সম্মিলনী—নারী সম্মিলনী। এই সম্মিলনীর উদ্দেশ্য ছিল—গার্হস্থ্য রাজনীতি অথবা মনুষ্যত্ব রাজনীতি।

কথাটা একটু উদ্ভট মনে হইল। গার্হস্থ্য রাজনীতি বা মনুষ্যত্ব রাজনীতি ইহা আবার কেমন ধারা? রাজ-নীতি ত রাষ্ট্র লইয়া। তাহাই বটে! রাজনীতি কথাটা ইচ্ছা করিয়াই ব্যবহার করিলাম। রাজনীতি আলোচনা রাষ্ট্রের ভাঙা গড়া, সংস্কার শুদ্ধি লইয়া আলোচনা করে, এই ঘাটের রাজনীতিরও তেমনি একটা গূঢ় উদ্দেশ্য ছিল। ঘাটে স্নানার্থিনী নারীগণ সম্মিলিত হইয়া ব্যক্তিগত সুখ দুঃখ, গার্হস্থ্য জীবন ব্যক্তিগত চরিত্রের প্রশংসা নিন্দা প্রভৃতি বিষয় লইয়া বেশ গম্ভীরভাবেই আলোচনা হইত। এই ঘাটের সম্মিলনী পরিসমাপ্ত হইতে দুই তিন ঘণ্টা সময় লাগিত।

গম্ভীরভাবে আলোচনা হইত কথাটা লক্ষ্য করিবার বিষয়। নাহিতে গিয়া—সমবয়স্কা তরুণীগণ রহস্যালাপ না করিয়া যে পারলৌকিক কথা বা সেবাধর্ম্ম ও ব্রত তীর্থের কথাতেই ব্যাপৃত থাকিতেন এমন বলিতেছি না। সমবয়স্কাদের মধ্যে সর্ব্ববিধ সুখ-দুঃখের আলোচনাই আলোচিত হইত। বয়স্কা ও বৃদ্ধাদের মধ্যেও তেমনি। তবে ইহার বিশেষত্ব ছিল—এক অতি ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা। যে যুগে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি, এখন কেহ কাহারো সুখ-দুঃখের কথা কওয়া ত দূরের কথা, ডাকিয়া কথা কওয়া এবং নামটা জিজ্ঞাসা করাও ভদ্রতা বিরুদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। ঠিক বলিতে পারি না, তবে এই অবস্থা যেন পুরুষ সমাজ হইতে সংক্রামিত হইয়া নারী সমাজকেও আক্রমণ করিতেছে।

ঘাটের রাজনীতি ছিল নানাবিধ। যে নবীনা সম্প্রতি শ্বশুরবাড়ী হইতে ফিরিয়াছে তাহার শ্বশুরগৃহের খবর লওয়া হইত এবং কাহারো কোন অশিষ্ট আচরণ সম্বন্ধে সংবাদ প্রচারিত হইলে তৎসম্বন্ধে তীব্র সমালোচনা

প্রকাশ করিয়া অশিষ্টাচারিণীকে শাসন করাও হইত। আবার কে কি রাঁধিল, কে কি খাইল, সে সব কথাও জিজ্ঞাসাবাদ করা হইত। এমনি করিয়া ঘাটের রাজনীতি এক হৃদ্য সম্পর্কের অনুশীলন করিয়া ক্ষুদ্র মানব সত্তাটিকে একটু বৃহৎ করিয়া তুলিত।

সাম্যবাদের দিনে ইতরভদ্রে নাকি খুবই মাখামাখি ভাব হইয়াছে। পল্লীতে—একটা আত্মীয়তা ছিল, কিন্তু মাখামাখি ছিল না। দাসী চণ্ডালী, জাতিতে নমঃশূদ্রা জাতীয়া। সেও এই ভদ্র, শিক্ষিতা এবং অভিজাত নারী সম্মিলনীর একজন বিশিষ্টা সভ্যা। দাসী—মুখুজ্জেদের উমাশশীর পিসি, বাঁড়ুজ্জেদের বড় বউএর দাসী ঠাকুরঝি, বোসেদের শ্যামার মাসী এমনি সব সম্বন্ধে সম্বন্ধ বিশিষ্টা। কোনও নববধূর একটু বাচালতা দেখিলে দাসী বাড়ীর গৃহিণীর মতই শাসন করে, সেই গ্রাম্য নারী সম্মিলনীতে সমানভাবে মন্তব্য প্রকাশ করে, জামাই বাড়ীতে তত্ত্ব পাঠাইবার উপকরণ সম্বন্ধে পরামর্শ দেয়, গঙ্গাস্নানের সহযাত্রিণী হয়।

এখানে দাসীর পরিচয় দিবার ইহাই কারণ যে, পুরাণী বাঙলার আত্মীয়তা বোধ কেমন ব্যাপক ছিল, তাহারই পরিচয় দেওয়া। তখন আত্মীয়তা গণ্ডিবদ্ধ ছিল না। বর্ত্তমানের সাম্য সমানে সমানে। যাঁহারা ধনে, মানে, উচ্চ, তাঁহারা ছত্রিশ জাতি হইলেও একত্র মিলিয়া-মিশিয়া পান-ভোজন, আমোদ-প্রমোদ করেন, কিন্তু যে পথ ঝাঁটাইয়া জীবিকার্জ্জন করে, তাহার সহিত নবীন যুগের সাম্যের কোন সম্বন্ধই নাই। আত্মীয়তা সে তো এক কল্পনার কথা।

ঘর-করণার কথা বলিতেছিলাম। গৃহিণী গৃহের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী হইলেও গৃহস্থের মাঝে যিনি বিধবা থাকিতেন, তাঁহারই উপর রহিত বাস্তব কর্ত্তৃত্ব। বিধবা ভগ্নি অথবা কন্যা ত সংসারের কর্ত্তৃত্ব ভার পাইতেনই, দূর-সম্পর্কের কেহ থাকিলেও তিনি সংসারের কর্ত্রী হইতেন। এক সঙ্গতিপন্ন গৃহস্থের গৃহে একজন অতি দূরসম্পর্কীয় বাল-বিধবাকে দেখিয়াছি। তিনি গৃহকর্ত্তার কৈলাসী দিদি ছিলেন। কাজেই কর্ত্তার পুত্রকন্যা ও অন্যান্যেরা তাঁহাকে 'কৈলিসী পিসি' বলিত। কৈলাসী পিসির কথায় সংসারের সর্ব্বকার্য্য সম্পন্ন হইত।

এই খানে একটু গল্প বলিয়া লইব। সে গল্প বলিবার এই উদ্দেশ্য যে গত দিনের বাঙলায় নারীর প্রভাব ও প্রতিপত্তি কতদূর ছিল, তাহাই প্রদর্শন করা। গল্প বলিলাম, কিন্তু গল্প নহে সত্য ঘটনা। উক্ত কৈলাসী পিসির সম্পর্কিত ঘটনা। যে গৃহকর্ত্তার সংসারে উক্ত নারী প্রতিপালিত হইতেন, তিনি বেশ সম্পন্ন গৃহস্থ ছিলেন। গৃহকর্ত্তা কলাইয়ের ডালের ফুলুরি ভাজা খাইতে বড়ই ভাল বাসিতেন। এবং প্রত্যহকার ভোজনের সময় উহা খাইতেন।

ডাউলের যে ক্ষুদ থাকে, গৃহস্থের সংসারে তাহা ফেলিয়া দেওয়া হইত না। উহা হইতেও বড়া-বড়ি প্রভৃতি প্রস্তুত হইত। উক্ত কর্ত্তা কিন্তু ক্ষুদের ফুলুরি খাইতে বড়ই বিরক্ত বোধ করিতেন। কৈলাসী পিসি একদিন ক্ষুদের বড়া করিয়া খাইতে দিয়া গৃহকর্ত্তাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "হ্যাঁরে যজ্ঞেশ্বর, আজ বড়া কেমন হইয়াছে।" যজ্ঞেশ্বর বলিলেন "চমৎকার।" গৃহস্বামীর নাম যজ্ঞেশ্বর। যজ্ঞেশ্বরের উত্তর শুনিয়া কৈলাসী পিসি হাসিয়া বলিলেন যে আজও ক্ষুদের বড়া হইয়াছে। তখন হাস্যের রোল উঠিল। ঐশ্বর্য্যশালী গৃহস্বামী তাঁহার প্রতিপালিতা বিধবাকে কিছু মাত্র না বকিয়া ব্যাপারটিতে একটু আনন্দই বোধ করিলেন। পুরাণী বাঙলার নর-নারীর সম্বন্ধ এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক কেমন হৃদ্য ও ব্যাপক এই ঘটনায় তাহা বোঝা যায় বলিয়া ঘটনাটির উল্লেখ না করিয়া পারিলাম না।

কোনও সামাজিক প্রশ্ন এখানে উপস্থিত করিতেছি না। বাংলার গৃহস্থালীতে নারী ও বিধবা নারীর স্থান কোথায় পুরাণী বাংলার কথায় তাহার পরিচয় সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিবে। বিধবা বিবাহ বাংলার সমাজে প্রচলিত ছিল না। সেই জন্য প্রায় প্রতি সংসারেই একজন না একজন বিধবা থাকিতেন। এই সব বিধবাদের উপরই সংসারের কর্ত্তৃত্বভার অর্পিত থাকিত। আর এই কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এবং বাঙ্গালীর সংসারে বিধবাদের কিরূপ প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল, কৈলাসী পিসির কথায় তাহা বুঝিতে পারিলাম। আর এ সম্বন্ধে অধিক দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন।

একান্নবর্ত্তিত্ব বাংলার চিরন্তন রীতি। ভায়ে ভায়ে এক সংসারে ত থাকিতেনই দূরসম্পর্কের আত্মীয়-আত্মীয়রাও সংসারে স্থান পাইতেন। ভাগিনেয় ভাগিনেয় উহাদের পুত্র: কন্যা সংসারে প্রতিপালিত হইত। এবং গৃহকর্ত্তার সন্তানদের মত একভাবেই প্রতিপালিত হইত। আবার এই সম্পর্কের মধ্যে যদি কেহ শ্রেষ্ঠ থাকিতেন তবে তিনিই কর্ত্তৃত্ব ভার লইতেন।

মাতুলের সংসারে প্রতিপালিত হইয়া তথায় কর্ত্তৃত্ব করার দৃষ্টান্তের অসম্ভাব নাই। একটি সংসারের কথা জানি যেখানে মাতুলের বিদ্যমানতা সত্ত্বেও বয়স্থ ভাগিনেয় সংসারের সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব করিতেন। দেখিয়াছি উক্ত মাতুলের পূজা আর্চ্চা, বিবাহ উপনয়ন, জমিদারীর রক্ষা ও বৃদ্ধি সকলেরই ভার ছিল ভাগিনেয়ের উপর।

পুরাণী বাঙলার ঘর গৃহস্থালী এক পুণ্যের প্রস্রবণ ছিল কেননা সেখানকার শ্রেষ্ঠ বস্তু ছিল আত্মীয়তা, মমতা ও সেবা। সে দিনের বাঙালী গৃহের অন্তঃপুরিকার নিত্য কর্ম্ম ছিল প্রাতে পাট-ঝাঁট তাহা পর স্নানের ঘাট, মধ্যাহ্নে রন্ধন। আহারাদির পর গল্প ও পাঠ। অপরাহ্নে জল আনিতে। সন্ধ্যায় দেব মন্দিরে গমন।

অতি তুচ্ছ কথা। ইতিহাসের অনুপযুক্ত! সভ্য সমাজে লিখিয়া প্রচার করাই একান্ত ধৃষ্টতা। কিন্তু সামান্য কথার মধ্যে এমন অনেক মহামান্য কথা আছে, যাহা আজিকার বাঙ্গালী জানিলে ধন্য হইবে, চলিত কথায় বাঁচিয়া যাইবে। যে অর্থনৈতিক সঙ্কট মুহূর্ত্ত আজ জাতির সম্মুখে বিকট মুখ ব্যাদান করিয়াছে, তাহার গ্রাস হইতে মুক্ত হইয়া এক শিবতম অবস্থার সম্মুখীন হইবে।

সোনার বাংলার অবস্থা আজ সঙ্কটতম। এমন সঙ্কট হয়ত আর কখনই হয় নাই। অর্থনীতিকগণ তাঁহাদের কৃত্রিম শাস্ত্র সিদ্ধান্তে যাহাই স্থির করুন আমার বিশ্বাস এবং যুক্তিমূলক বিশ্বাস বাঙালী জাতি তাহার চিরন্তনীতে আস্থাহীন হইয়া পড়িয়াই তাহার দুর্দ্দিনকে ডাকিয়া আনিয়াছে। সংবাদপত্রে যে বিবরণ পাঠ করিয়াছি, তাহাতে জানিতে পারি যে, ইংরেজী ১৯২৬।২৭ সালে এক বাংলা দেশে বাইশ হইতে চব্বিশ লক্ষ টাকার বিলাতী ফুড্ আসিয়াছে এব ঐ সময় প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকার বিস্কুট ও কে আসিয়াছে। অথচ পাশ্চত্যে চিকিৎসা বিদ্যায় পারদর্শী চিকিৎসকগণই বলিতেছেন মুড়ি, চিড়া, এবং খইএ খাদ্য প্রাণ (ভিটামিন) আছে, বিস্কুট প্রভৃতিতে নাই।

যাউক। এই সব মিশ্ররাজনীতির কথা কহিতেছি না। বক্তব্য হইতেছে পুরাণী বাঙলার রন্ধন কথা আজকাল খাদ্যে খাদ্যে প্রাণ পাইবার জন্য ঘাস পাতা খাইবার ব্যবস্থা হইতেছে। অথচ কিছুদিন পূর্ব্বে এই শাক পাতা দিয়া বঙ্গগৃহিণী অমৃত স্বাদু ব্যঞ্জন রন্ধন করিতেন। শাকের ঘণ্ট, মোচা, থোড় ছেঁচকি যে বা যাহারা খাইয়াছে, তাহারাই—ইহার স্বাদে মজিয়া আছে। নব্যরা হয়ত বলিবেন গোঁড়ামীর অত্যুক্তি। কিন্তু সত্যই তাহা নহে। স্বর্গীয় ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় বিলাত গিয়াছিলেন। তিনি বিলাত হইতে "বঙ্গবাসী" পত্রে কতকগুলি পত্র দিয়াছিলেন। সেই পত্রের একস্থানে লিখিয়াছিলেন যে, "বিলাতে আলু সেদ্ধ ও কপি সেদ্ধ খাইয়া খাইয়া জিবের আড়ষ্টভাব আসিয়াছিল। দেশে আসিয়া আমড়ার অম্বল খাইয়া সেই আড়ষ্টভাব দূর হইয়াছিল।" দেশাত্মকতা ও গোঁড়ামির বাহুল্য বলিলে এক বিমূঢ় নির্ব্বুদ্ধিতাকেই জনগোচর করা হয়।

যাহা হউক, বনের ডুমুর, ঘাটের শাক, থোড় মোচা ইত্যাদি সহজ লভ্য ও স্বচ্ছন্দবনজাত শাক পাতা দিয়া নিত্যকার ব্যঞ্জন পাচিত হইত। নাগরিক আবেষ্টনীতে প্রতিপালিত যাঁহারা, তাঁহারা হয়ত সেই সব খাদ্যের নামই অবগত নহেন। শাক তোলা গ্রাম্য নারীদের একটা নিত্যকর্ম্ম ছিল। পুষ্করিণীর চারিপাশে খুঁটিয়া খুঁটিয়া শুষুনি কল্মি শাক সংগ্রহ করিতে অভিজাত ঘরের কন্যা ও বধূগণও কুণ্ঠিতা হইতেন না। বরং আনন্দ পাইতেন। এই সব ব্যাপারগুলির মধ্যে অর্থনীতির একটি সহজ ধারা এবং জীবনযাপনার একটি স্বাভাবিকতাই অভিব্যক্ত হইয়া উঠিত।

রন্ধনকার্য্য অনেকটা দুর্ভাগ্যের পরিচায়ক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পাচক বা পাচিকা দ্বারা যাহার দৈনিক খাদ্য পাচিত না হয়, তাঁহার সামাজিক মর্য্যাদা যেন ক্ষুণ্ণ।

রন্ধনশালাতে যাওয়া আর সুখের নহে, পরন্তু দুঃখের। নব সভ্যতার এই নব রীতি খুব উন্নত রীতি কিনা বলিতে পারি না, তবে বাংলার জননী, জায়া ও ভগিনী আপনাদের স্বামীপুত্রদের খাওয়াইতে সেই প্রাতঃকালে হেঁসেলে প্রবেশ করিয়া মধ্যাহ্নে বাহির হওয়াকেই নারীজীবনের এক পবিত্রতম কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতেন। যাহার হাতে দশজন খায়, খাইয়া তৃপ্তি পায় তিনি ত পরম সৌভাগ্যবতী। এই সংস্কার বশে বাঙালীর মা ও বোন রন্ধনকার্য্য অতিনিষ্ঠার সহিত সম্পন্ন করিতেন।

একটা কোন গৃহে কোনও একটা সুস্বাদু ব্যঞ্জন রন্ধন হইলে সেই গৃহস্থেরই তাহা খাইবার ব্যবস্থা ছিল না; ভাগ বাঁটোয়ারা করিয়া খাইবার পদ্ধতি ছিল। এ বাড়ী, ও বাড়ী, সে বাড়ী দিবার ব্যবস্থা ছিল। দেখিয়াছি, একজন দূরসম্পর্কীয়া ভ্রাতৃজায়া ডুমুর পাতার ঘণ্ট রাঁধিয়া প্রতিবাসী দূরসম্পর্কীয় দেবরকে খাইবার জন্য দিয়া যাইতেন। এমনই কত কি। প্রাচীন বাংলার পল্লী-সমাজ যেন একটা বৃহৎ পরিবার। অনাত্মীয় হইলেও আত্মীয়। সুখে দুঃখে সমান! পৃথক হইলেও মৈত্রীতে এক এবং অভিন্ন।

ছোট খাট কথাই বলিতেছি। ছোট খাট কথাই বলিব। যেমন করিয়া গুছাইয়া বলিলে বলা হয়, হয়ত তেমন হইতেছে না। কারণ স্মৃতি কথা ঠিক একটা পারম্পর্য্য ধরিয়া প্রকাশ পায় না। যখন যাহাতে হৃদয় আলোড়িয়া উঠে, তাহাই প্রকাশ করিতে হয়। পুরাণী বাঙলার অনেক কথা আছে যাহা মিষ্ট এবং মহিম্ন। নিজস্ব বলিয়া মহিম্ন নহে, সত্যই মহিমান্বিত। নব্য তুরস্কে, রক্ত রাশিয়ায় নিবদ্ধ দৃষ্টি নব্য বাংলার কাছে সেই সব পুরাতনী কহিব। তাঁহারা শ্রবণ ও গ্রহণ করিলে ধন্য হইয়া যাইব।

নানাকথা

কুমার-কুমারীগণের সহ-শিক্ষা-পদ্ধতি—

(অধ্যাপক শ্রীভববিভূতি বিদ্যাভূষণ এম, এ)

বর্ত্তমানকালে আমাদের দেশে কুমার ও কুমারীগণের একত্র শিক্ষালাভের ব্যবস্থা একটী গুরুতর সমস্যার বিষয়। বহু চিন্তাশীল মনীষি ব্যক্তির চিন্তা এ বিষয়ে নিয়োজিত হইয়াছে। প্লেটো তাঁহার "রিপাবলিক" গ্রন্থে কহিয়াছেন যে, স্ত্রীলোকগণ যতদূর সম্ভব পুরুষগণের সহিত একইরূপ শিক্ষালাভ করিবেন। কিন্তু প্লেটোর এই মত পাশ্চাত্য দেশে তৎকালে গৃহীত হয় নাই। কুমার ও কুমারীগণের একই শিক্ষার ব্যবস্থা প্রথমতঃ স্কটল্যাণ্ডে ও আমেরিকায় প্রবর্ত্তিত হয়। ইংলণ্ডে "The Society of Friends" নামক সমিতি এই শিক্ষা-পদ্ধতি প্রথম প্রবর্তন করেন। অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে এই নীতি অবলম্বন করিয়া কয়েকটী মাত্র বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। যথা:—"Ackworth School", "Sideot School" ইত্যাদি। এই শিক্ষা পদ্ধতি প্রচলনের জন্ম ইংলণ্ড আমেরিকার নিকট ঋণী ছিলেন। ১৯০২ খৃষ্টাব্দের "Education Act" অনুসারে এই পদ্ধতি নিয়মবদ্ধ হইয়া ইংলণ্ডে সাধারণভাবে প্রচলন হইয়াছে। কুমার কুমারীগণের একত্র শিক্ষা পদ্ধতির মূলে স্ত্রী ও পুরুষের সাম্যভাব নিহিত। বর্ত্তমান সময়ে এমন কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি দেখা যায় না, যিনি স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে কর্ম্ম বিষয়ে পার্থক্য স্বীকার করেন। লোকালোক পর্ব্বতের মত স্ত্রী ও পুরুষ সম্পূর্ণ বিভিন্ন, একথা মানিবার যুগ এখন আর নাই। আমাদের সামাজিক জীবনে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েরই পরস্পর সহযোগিতায় শান্তি ও সুখ নির্ভর করে। সুতরাং তাহাদের মধ্যে একটা দুর্ভেদ্য প্রাচীর ব্যবধান করিলে সামাজিক জীবনে সুখ ও শান্তির পথে বিঘ্নই উৎপাদন করা হয়। বালক বালিকারা অল্প বয়সে, একত্র খেলা-ধূলা, পড়াশুনা করে ইহাতে কেহই বাধা দেয় না, তখন তাহারা প্রকৃতির শিশু। আবার যখন তাহারা কৈশোর উত্তীর্ণ হইয়া যৌবনে পদার্পণ করে, তখনই বা কেন তাহারা পূজনীয় গুরুর পাদমূলে উপবেশন করিয়া জ্ঞানলাভের অধিকারী না হইবে? তরুণ তরুণীগণ একত্র বিদ্যাশিক্ষালাভ করিবার সুযোগ পাইলে উভয় পক্ষেই পাঠের প্রতি প্রবৃত্তি উদ্দীপিত হইয়া থাকে, এবং ছাত্রগণের পক্ষে সংযম, শিষ্টতা, স্ত্রী জাতির প্রতি সম্ভ্রমভাব ইত্যাদি সদগুণসমূহ উদবুদ্ধ হইয়া থাকে এবং স্ত্রীপুরুষ ভেদজনিত সঙ্কোচভাব বিদূরিত হয়। ইহার ফলে বিশুদ্ধ প্রীতি ও অনাবিল বন্ধুত্ব উভয়ের মধ্যে সংস্থাপিত হইয়া থাকে, এবং নৈতিক দোষ বিনষ্ট হয়।

প্রাচীন ভারতে প্রচলিত:—এই শিক্ষা পদ্ধতির আর একটা দিক প্রণিধান যোগ্য। এই পদ্ধতি অনুসারে সম্মিলিত শিক্ষার প্রচলন হইলে ব্যয় প্রভূত পরিমাণে কমিতে পারে; কেননা বালক ও বালিকাগণের শিক্ষার জন্ম পৃথক্ পৃথক্ অনুষ্ঠান না করিয়া একত্র ব্যবস্থা করিয়া শিক্ষার ব্যয় যথেষ্ট হ্রাস করা যায়। সুতরাং নৈতিক, সামাজিক, আর্থিক, সর্ব্ববিষয়েই এই শিক্ষা পদ্ধতির উপকারিতা পরিলক্ষিত হইতেছে। পাশ্চাত্য দেশের সর্ব্বত্র বর্ত্তমানে ইহা প্রচলিত। আমাদের ভারত এখনও পশ্চাৎপদ। আমাদের দেশে অনেক প্রাচীনপন্থী আছেন, যাঁহারা ইহার ঘোর বিরোধী, কিন্তু বস্তুত এরূপ শিক্ষা প্রাচীন ভারতে প্রচলিত ছিল। সংস্কৃত সাহিত্য হইতে দেখাইব, এ বিষয়ে মহাকবি ভবভূতির দুইখানি নাটক 'উত্তর রচিত," ও "মালতী মাধব" প্রমাণ স্থল। মহাকবি ভবভূতি খৃঃ অষ্টম শতাব্দীর প্রথম ভাগে কনৌজের রাজা যশোধর্ম্মদেবের সভায় রাজকবি ছিলেন। তখন হিন্দু সভ্যতার মাধ্যদিন; কবি তাঁহার নাটকের প্রস্তাবনায় নিজেকে বেদশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ও বেদমতানুবর্ত্তী বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। সুতরাং প্রাচীনপন্থীগণের তিনি আদর্শ স্থানীয়। তাঁহার 'উত্তর চরিতে' দেখিতে পাই যে, 'আত্রেয়ী' নাম্নী জনৈকা তরুণী ছাত্রী বাল্মীকির আশ্রমে কুশ ও লবের সহপাঠী ছিলেন। তীক্ষ্ণ মেধা কুশ ও লবের সহিত একত্র এক পাঠ প্রস্তুত করা দুরূহ বিধায় তিনি বাল্মীকির আশ্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক দাক্ষিণাত্যের অন্য কোন বিদ্যালয়ে অধ্যয়নার্থ প্রস্থান করিতে উদ্যত হইয়াছেন। ঐ সময় কুশ ও লবের বয়স দ্বাদশ বর্ষের অধিক। কেননা ক্ষত্রিয় কুমারগণের দ্বাদশ বর্ষে উপনয়ন সম্পন্ন হওয়াই নিয়ম। ইহা হইতে অবগত হওয়া যাইতেছে যে, তৎকালে তরুণ কুমার ও কুমারীগণ একত্র, এক বিদ্যালয়ে, একই পাঠ অধ্যয়ন করিতেন।

আবার "মালতী মাধবে" দেখিতে পাই যে, "কামন্দকী" (ইনি মহিলা ছাত্রী, পরে পরিব্রাজিকা), নাটকের নায়ক মাধবের পিতা 'দেবরাত' এবং নায়িকা মালতীর পিতা 'ভূরিবসু' ইহাঁরা সহতীর্থ ছিলেন। এবং যে বিদ্যালয়ে তাঁহারা অধ্যয়ন করিতেন সেখানে বহু তরুণ ছাত্র ছাত্রী দেশের নানা প্রান্ত হইতে সমাগত হইয়া একত্র শিক্ষালাভ করিতেন। একত্র শিক্ষালাভ ও অবস্থান হেতু এই তরুণ ছাত্র ছাত্রীগণের মধ্যে অনাবিল প্রীতি সংস্থাপিত হইত। ইহা ঐ নাটকের ঘটনা হইতেই অবগত হইতে পারা যায়। ঐ বিদ্যালয়ে অবস্থান কালে 'দেবরাত' ও 'ভূরিবসু' তাঁহাদের মহিলাবন্ধু কামন্দকীর সমক্ষে এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের পুত্র বা কন্যা হইলে পরস্পর বিবাহ দিয়া মধুর বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হইবেন। এইরূপে শিক্ষার্থী কুমার ও কুমারীগণের এক বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন ও তাহার ফলে তাহাদের মধ্যে পবিত্র সৌহার্দ্দ পূর্ব্বোক্ত নাটকীয় কাহিনী হইতে অবগত হইতে পারা যায়। মহাকবি ভবভূতি যখন তাঁহার দুইখানি নাটকেই এই সম্মিলিত শিক্ষাপদ্ধতির উল্লেখ করিয়াছেন, তখন যে উহা তাঁহার সম্পূর্ণ অনুমোদিত ও অভিপ্রেত, তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। অতএব বর্ত্তমানকালে প্রাচীনপন্থী বেদানুবর্ত্তী মহাকবির মত অনুবর্ত্তন করিয়া এই সমীচীন শিক্ষাপদ্ধতির বিরোধিতা না করিয়া দেশের কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য করতঃ ইহার প্রচলনের সহায়তা করিবেন।

'আনন্দবাজার'

পৃথিবীর স্বর্ণের পরিমাণ—জাতিসঙ্ঘের হিসাব—জাতিসঙ্ঘ হইতে স্বর্ণ সম্বন্ধে যে কমিটি গঠিত হইয়াছিল, তাহার সদস্যগণ হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন যে, ১৯৩১ সনের শেষে পৃথিবীতে মোট ১১৩৪ কোটী ৯০ লক্ষ ডলার মূল্যের স্বর্ণ ছিল। উহার মধ্যে কোন্ স্থানে কত পরিমাণ স্বর্ণ আছে তাহা দেওয়া হইল—ইউরোপ ৫৮৬ কোটী ৪০ লক্ষ ডলার (ফ্রান্স ২৮৬ কোটী ৩০ লক্ষ) ইংলণ্ড ও আয়র্লণ্ড ৫৯ কোটী), আফ্রিকা মহাদেশ ৭ কোটী ডলার, উত্তর আমেরিকা ৪১৯ কোটী ৫০ লক্ষ ডলার, দক্ষিণ আমেরিকা ৫ কোটী ৩০ লক্ষ, এসিয়া ৪৫ কোটী ডলার, অষ্ট্রেলিয়া ৫ কোটী ০ লক্ষ ডলার ও নিউজিল্যাণ্ড ২ কোটী ৮০ লক্ষ ডলার।

সর্পবিষনাশের অভিনব উপায়ঃ—নিশ্বাসের সহিত ময়ূরপুচ্ছের ধূম গ্রহণ :—কিরূপ উপায়ে এক সাধু সর্পদষ্ট ব্যক্তিকে নিরাময় করিয়াছিল তাহা দেখিবার জন্য বহুব্যক্তি সমবেত হয়। রাম নামে এক ব্যক্তি মাঠে ঘাস কাটিতেছিল, এমন সময় একটি প্রকাণ্ড কেউটে সাপ বাহির হইয়া তাহার পায়ে দংশন করে। মুহূর্ত্ত পরেই লোকটি অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া যায়। নিকটস্থ গ্রামের লোকজন ঐ স্থানে আসিয়া সর্পাহত লোকটিকে ঘিরিয়া দাঁড়ায়। ঐ সময় হঠাৎ এক সাধু ঐরাস্তা দিয়া যাইতেছিলেন। তিনি ভিড় দেখিয়া ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করেন এবং সব শুনিয়া কয়েকটি ময়ূরপুচ্ছ আনিয়া দিতে বলেন। সমাগত লোকদিগের মধ্যে এক ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ ময়ূরপুচ্ছ আনিয়া দেয়। সাধু তাঁহার কলিকায় ময়ূরপুচ্ছগুলি টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া দিয় তাহাতে অগ্নি সংযোগ করিয়া দেন এবং একজনকে উহার ধূম সর্পাহত ব্যক্তির নাসারন্ধ্রের মধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া দিবার জন্য নির্দ্দেশ করেন। এক ব্যক্তি তাঁহার আদেশানুযায়ী কার্য্য করিতে থাকে এবং সাধু অস্বাভাবিক উপায়ে জ্ঞানশূন্য ব্যক্তির শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়ার সাহায্য করিতে আরম্ভ করেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, ধীরে ধীরে সর্পদষ্ট ব্যক্তি জ্ঞানলাভ করিতে লাগিল। ঐ লোকটীর বেশ জ্ঞানসঞ্চার হইলে সাধু তাহাকে ঐ ময়ূরপুচ্ছের ধূম নিশ্বাসের সহিত গ্রহণ করিতে আদেশ করেন। সর্পদষ্ট ব্যক্তি ঐরূপ করিলে কিয়ৎক্ষণের মধ্যেই সে সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হয়। অতঃপর সাধুটী চলিয়া যাইবার পূর্ব্বে বলিয়া গিয়াছেন যে অবিরাম বমি হইতেছে দেখিলে ময়ূরপুচ্ছের পালক ভস্ম করিয়া মধুর সহিত তাহা পান করিলে উক্তরূপ বমি বন্ধ হইয়া যায়। জনতার মধ্যে কয়েকজন সাহসী ব্যক্তি সর্পটাকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া মারিয়া ফেলিয়াছে।

পরলোকে বিপিনচন্দ্র—স্বদেশী যুগের বিখ্যাত নেতা, বাগ্মী, রাষ্ট্রবীর, সাহিত্যিক ও সুপ্রসিদ্ধ সংবাদপত্রসেবী শ্রীযুক্ত বিপিন চন্দ্র পাল গত ৬ই জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার অপরাহ্ণ ১টা ২৫ মিনিটের সময় তাঁহার বালীগঞ্জ এভিনিউস্থিত বাসভবনে সহসা সন্ন্যাস-রোগে আক্রান্ত হইয়া পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়ঃক্রম ৭৫ বৎসর হইয়াছিল। তাঁহার স্বাস্থ্য নষ্ট হওয়ায় কয়েক বৎসর হইল তিনি রাজনীতি ক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করেন। অধুনা তিনি তাঁহার 'আত্মচরিত' লিখিতে ব্যাপৃত ছিলেন এবং উক্ত "আত্মচরিতে"র দুইখণ্ড (১৯০৪ সাল পর্য্যন্ত) মাত্র সমাপ্ত হইয়াছিল। গত বৃহস্পতিবার দিন অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত তিনি কাজ করেন এবং নিয়মিতভাবে আহার্য্যগ্রহণের পর শয়ন করেন। শুক্রবার প্রাতঃকালে পরিবারস্থ লোকজন তাঁহার ঘরে গিয়া তাঁহাকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় দেখিতে পায়। ডাক্তারকে সংবাদ দেওয়া হয় ; কিন্তু কিছুতেই তাঁহার লুপ্ত চৈতন্য ফিরিয়া আসিল না এবং অপরাহ্ণ ১টা ২৫ মিনিটের সময় তিনি অন্তিমলোকে গমন করিয়াছেন।

পরলোকে লর্ড ইঞ্চকেপ—"রোভার" নামক বজরার উপর লর্ড ইঞ্চকেপ পরলোক গমন করিয়াছেন। [লর্ড ইঞ্চকেপ পূর্ব্বে স্যার জেমস লাইলী ম্যাকাক নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি ১৯১১ খৃষ্টাব্দে লর্ড খেতাব লাভ করিয়া লর্ড ইঞ্চকেপ নামে পরিচিত হন। তিনি পি এণ্ড ও জাহাজ কোম্পানীর চেয়ারম্যান ছিলেন। ঐ কোম্পানীর কেরাণীরূপে তিনি ২২ বৎসর বয়ঃক্রমকালে ভারতে আগমন করেন। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে তিনি বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নিযুক্ত হন এবং ১৮৯৭ হইতে ১৯১১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইণ্ডিয়া কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন। ইনি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের ব্যয় বাহুল্যের প্রবল বিরোধী ছিলেন। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে তিনি গেডিস কমিটীর সদস্য নিযুক্ত হন। পরে ভারত গবর্ণমেণ্টের ব্যয়সঙ্কোচ কমিটীর সভাপতি হইয়া আসেন। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী তিনি ভাইকাউণ্ট খেতাব লাভ করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার ৭৯ বৎসর বয়স হইয়াছিল।]

বিলাতী কাপড় ও চিনি—কলিকাতার বাজারে ক্রেতা নাই—'ষ্টেটসম্যান' পত্র লিখিতেছেন—গত সপ্তাহে কলিকাতায় বিলাতী কাপড়ের ব্যবসা অসম্ভব রকম মন্দা ছিল। বর্ত্তমানে নূতন মাল কিছু আসিতেছে না। পুরাতন মাল হইতে পাইকারী ক্রেতাগণ মাত্র কিছু কিছু ক্রয় করিয়াছে। সম্ভবতঃ এজন্য বিলাতী কাপড়ের দাম আরও কমাইয়া দিতে হইবে। ভবিষ্যতে বিলাতী কাপড়ের বাজার ভাল হইবে এই বিষয়ে পাইকারদের কোন ভরসা নাই। তজ্জন্য তাহারা খুব সাবধানতার সহিত যে পরিমাণ জিনিষ দৈনন্দিন বাজারে বিক্রয় হয়, সেই পরিমাণ ক্রয় করিতেছে। যদি বস্ত্র ব্যবসায়ীদের বিলাতী কাপড় বিক্রয় হইবার পক্ষে আশা সৃষ্টি করিবার জন্য কোন ব্যবস্থা করা না হয়, তাহা হইলে বাজার আরও সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হইয়া পড়িবার আশঙ্কা। বাজারে বিলাতী সূতাও একদম কাটিতেছে না। যাহারা বিলাতী সূতা আমদানী করিয়াছিল, তাহারা অতি কষ্টে ক্ষতি দিয়া কিছু কিছু মাল বিক্রয় করিতেছে। কাজেই উহাদের আর নূতন

মাল ক্রয় করিবার কোন সম্ভাবনা নাই। কিন্তু ভারতীয় মিলে প্রস্তুত কাপড় চোপড় বাজারে বেশ বিক্রয় হইতেছে এবং নূতন নূতন মালের জন্ত বোম্বাইয়ে ফরমাইস দেওয়া হইতেছে। গত সপ্তাহে বিলাতী চিনির বাজারেও কোন পরিবর্তন হয় নাই। বাজারে বিদেশী চিনি খুব কমই মজুদ আছে। কিন্তু উহার চাহিদা খুব কম। বিলাতী চিনির ব্যবসায়ীগণ কমদরে চিনি বিক্রয় করিতে প্রস্তাব করিতেছেন। কিন্তু উহা সত্বেও বাজারে ক্রেতার অভাব। গত বৎসর কলিকাতায় এই সপ্তাহে ২৭৩০০০ বস্তা (১০ বস্তায় ২৭৷৷০ মণ) বিলাতী চিনি মজুদ ছিল। কিন্তু প্রায় এই সপ্তাহে মাত্র ৪৮০০০ বস্তা চিনি কলিকাতায় মজুদ আছে।

দুই জজে লড়াই—বিখ্যাত অবিবাহিত বিচারপতি মিঃ ম্যাককার্ডি আর এক নূতন চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি আপীল আদালতের লর্ড জাষ্টিস স্ক্রাটনের উপর "প্রকাশ্যভাবে" গালাগালি করিয়াছেন। মিঃ জাষ্টিস ম্যাককার্ডি একটি মামলার বিচার করিতে যাইয়া নিম্নলিখিত মর্ম্মে মন্তব্য করেন :—"যে সমস্ত সাক্ষ্য প্রদত্ত হইয়াছে, আমি যথারীতি সেগুলির নোট রাখিব এবং এমনও হইতে পারে যে, এই মামলার উপর একটা আপীল হইবে। যদি আপীল হয়—এবং যদি সেই আপীল আদালতে লর্ড জাষ্টিস স্ক্রাটন থাকেন, তবে, আমি আমার গৃহীত নোট উক্ত আদালতে পেশ করিব না। আমার ইচ্ছা এই যে, লর্ড জাষ্টিস স্ক্রাটনকে লইয়া যেন উক্ত আদালত গঠিত না হয়। আমি কেন এই মন্তব্য করিলাম, যদি তাহার কোন কৈফিয়ৎ প্রয়োজন হয়, তবে, পরে আমি তাহা দিব। বড়ই দুঃখের বিষয় লর্ড জাষ্টিস স্ক্রাটনকে আমি প্রকাশ্যভাবে এই তিরস্কার করিতে বাধ্য হইলাম।" বিচারপতি মিঃ ম্যাককার্ডি কেন উচ্চতর আপীল আদালতের বিচারক স্ক্রাটনের প্রতি এই প্রকার অদ্ভুত মন্তব্য প্রকাশ করিলেন তাহার কারণ হইতেছে "নবযুগের হেলেনের" মামলা। পাঠকদের স্মরণ থাকিতে পারে যে, কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে ক্যাম্ব্রিজের মিঃ প্রেস নামক এক ব্যক্তি ডাঃ সীয়ার্স নামক একজন ডাক্তারের বিরুদ্ধে তাঁহার (মিঃ প্রেসের) সুন্দরী পত্নীকে প্রলুব্ধ করার অভিযোগে ক্ষতিপূরণের মামলা আনয়ন করিয়াছিলেন। আদালতে বর্ণিত ঘটনা হইতে জানা যায় যে, মিসেস প্রেস এমন অপূর্ব্ব সুন্দরী যে, তাঁহাকে 'নবযুগের হেলেন' আখ্যা দেওয়া হইয়াছিল এবং ডাঃ সীয়ার্স একদিন উক্ত "হেলেনের" চিকিৎসা করিতে আসিয়া উহার প্রেমে পড়িয়া যান। তদবধি মিসেস্ প্রেস ও ডাঃ সীয়ার্স বন্ধুর মত রাত্রে বিহারের জন্ত বাহির হইতেন। কিন্তু মিসেস প্রেসের স্বামী ডাক্তারের বিরুদ্ধে মামমা আনিলে বিচারপতি ম্যাককার্ডি এই বলিয়া ডাক্তারের পক্ষে রায় দেন যে, আধুনিক নারীগণ সম্পূর্ণ স্বাধীন। তাহারা ইচ্ছামত স্বামীর গৃহ ত্যাগ করিয়া যাইতে পারে। এই রায়ের বিরুদ্ধে মিঃ প্রেস উচ্চতর আদালতে আপীল করেন। লর্ড জাষ্টিস স্ক্রাটন উভয় পক্ষের কথা শুনিয়া পুনরায় বিচারের জন্ত আদেশ দেন এবং আদেশ দান প্রসঙ্গে তিনি বিচারপতি মিঃ ম্যাককার্ডির বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত মন্তব্য করিয়াছিলেন :—"একটা সামান্ত মামলাকে অসামান্ত করিয়া তোলা হইয়াছে। কারণ, ডাক্তারের পক্ষের কৌশুলী মনে করিয়াছিলেন যে, মিসেস্ প্রেসের সহিত প্রাচীন কালের ট্রয় নগরীর হেলেনের সাদৃশ্য আছে। 'যে সুন্দর মুখ সহস্র তরুণীকে সমুদ্রে ভাসাইয়াছিল' তেমন কোন ভীষণ যুদ্ধ মিসেস্ প্রেসের সৌন্দর্য্য হইতে উদ্ভূত হইতে পারে, এমন কথা আমি কল্পনাও করি না। "স্ত্রীর সহিত স্বামীর বসবাসের সম্পূর্ণ অধিকার রহিয়াছে এবং যে ব্যক্তি বিনা কারণে এই দাম্পত্য সম্বন্ধকে নষ্ট করে, তাহার বিরুদ্ধে অনায়াসে মামলা করা যাইতে পারে। "মিঃ জাষ্টিস ম্যাককার্ডি এই মামলায় বিচারকগণকে সমাজ বিজ্ঞানের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু আইনের ব্যাপারে সমাজ বিজ্ঞানের কথা যত কম আলোচিত হয়, ততই আমি মঙ্গল বলিয়া মনে করি। যদি স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ লইয়া আলোচনা করিতে হয়, তবে, তেমন বিচারকগণেরই তাহা করা উচিত যাঁহাদের দাম্পত্য সম্বন্ধের জ্ঞান কেবলমাত্র পুস্তকের লেখার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে। "আমি দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম যে, যে ভদ্রলোক জীবনে কোন দিন বিবাহ করেন নাই, তিনি মহিলাদের কি প্রকার নীবীবন্ধ (আণ্ডারওয়েয়ার) পরা উচিত, তাহা লইয়া আলোচনা করিতেছেন।" আপীল আদালতের জজের এই প্রকার মন্তব্যের পর মিঃ ম্যাককার্ডি যখন উক্ত মামলার পুনরায় বিচার করিতেছিলেন, তখন তিনি বিচারপতি স্ক্রাটনকে আক্রমণ করিয়া পূর্ব্বোক্তরূপ তিরস্কার করেন।

বাঙ্গলার ভূমি রাজস্ব—১৯৩০-৩১ সনের রিপোর্ট—১৯৩০-৩১ সনে বাঙ্গলা সরকারের ভূমি রাজস্ব বিভাগের রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। এই রিপোর্টে প্রকাশ যে, এই সনে বাঙ্গালা দেশে মোট ১ লক্ষ ১ হাজার ১৬০টী ভূমি রাজস্ব প্রদানকারী জমিদারী ও তালুকদারী ছিল। উহার মধ্যে ৯৩ হাজার ৭৭৮টী চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আমলের, ৪৪৫২টী অস্থায়ী বন্দোবস্তের আমলের, ২৯৩০টি খাসমহাল ও কোর্ট অব ওয়ার্ডসের সম্পত্তি ছিল। ১৯২৯-৩০ সনে এই তিন প্রকার ভূসম্পত্তির মোট সংখ্যা চিল ১ লক্ষ ১ হাজার ২১টি। সম্পত্তি বাটোয়ারার ফলেই এবার সম্পত্তি সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯২৯-৩০ সনের বকেয়া রাজস্ব ৩৬ লক্ষ ৪৩ হাজার ৯০২ টাকা ধরিয়া বর্ত্তমান বৎসরে সমস্ত জমিদার ও তালুকদারের কাছে ভূমি রাজস্ব বাবদ গবর্ণমেণ্টের মোট ৩ কোটী ৩৮ লক্ষ ১৯ হাজার ৯৩৮ টাকা পাওনা ছিল। উহার মধ্যে ২ কোটী ৭৮ লক্ষ ১৩ হাজার ২৪৭ টাকা অর্থাৎ মোট পাওনার শতকরা ৮২৷০ টাকা আদায় হইয়াছে। ১৯২৯-৩০ সালে শতকরা ৯০ টাকারও উপর আদায় হইয়াছিল। দেশের আর্থিক দুরবস্থার জন্যই এবার অনেক সম্পত্তির মালিক সরকারী রাজস্ব দিতে পারেন নাই। বিভিন্ন প্রকার ভূসম্পত্তির মধ্যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আমলের ভূসম্পত্তির জন্ত এই বৎসরে গবর্ণমেণ্টের ২ কোটি ২৩ লক্ষ ৫২ হাজার

টাকা ও অস্থায়ী বন্দোবস্ত আমলের সম্পত্তির জন্য ২৯ লক্ষ ৫ হাজার ৭২৪ টাকা ও খাসমহালের এবং কোর্ট অব ওয়ার্ডসের জমিদারীর জন্য মোট ৮৫ লক্ষ ৬২ হাজার ৬৫৭ টাকা পাওনা ছিল। উহার মধ্যে প্রথম শ্রেণীর কাছে পাওনার শতকরা ৯২॥০ ভাগ, দ্বিতীয় শ্রেণীর কাছে পাওনার শতকরা ৮০॥ ভাগ এবং তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কাছে পাওনার শতকরা ৫৬ ভাগ আদায় হইয়াছে। এই হিসাব হইতে বুঝা যায় যে জমিদারগণ গবর্ণমেণ্টের কাছে দেয় খাজনার শতকরা ৯০ ভাগ পরিশোধ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। অথচ খাসমহালে গবর্ণমেণ্ট শতকরা ৫৬ টাকার বেশী প্রজাদের কাছ হইতে আদায় করিতে পারেন নাই। উহাতে জমিদারদের অবস্থা বেশ ভালরূপে বুঝা যায়। এবারে বাঙ্গলা দেশে মোট ১৬১২২টী জমিদার বা তালুকদার সদর খাজনা দিতে পারেন নাই এবং উহার মধ্যে ১৪১২টি সম্পত্তি নীলাম হইয়া গিয়াছে। নিম্নে কোন জেলায় কতটী সম্পত্তি নীলাম হইয়াছে তাহা দেওয়া হইল—বর্দ্ধমান ৯০, বীরভূম, ৩৪, মেদিনীপুর ৪৩, হুগলী ৬৬; ২৪পরগণা ১৫৩, নদীয়া ৪১, মুর্শিদাবাদ ৩১, যশোহর ৪০, খুলনা ১৩, ঢাকা ১৪৪, ময়মনসিংহ ৬৫, চট্টগ্রাম ৪৪৫, ত্রিপুরা ৪৪; নোয়াখালী ৯৬, রাজসাহী ৭, দিনাজপুর ১০, রংপুর ৭, বগুড়া ১২, পাবনা ২২, মালদহ ১, এই সব সম্পত্তি নীলাম করিয়া গবর্ণমেণ্ট প্রাপ্য রাজস্বের ২'৬ গুণ পাইয়াছেন। ১৯২৯-৩০ সালে গবর্ণমেণ্ট খাজনা আদায়ের জন্য মোট ৯৪ হাজার ৩ শত ৪৪টী সার্টিফিকেট জারী করেন কিন্তু এই সালে গবর্ণমেণ্ট ১ লক্ষ ২৫ হাজার ৫ শত ৫২টী সার্টিফিকেট জারী করিয়াছিলেন। অধিকাংশ স্থলেই নোটীশ জারীর পর এবং কোন কোন ক্ষেত্রে অস্থাবর সম্পত্তির ক্রোক করিবার পর খাজনা আদায় হইয়াছে। এই বৎসরের প্রথমে মোট ২৪৫টী বাঁটোয়ারা'র মোকদ্দমা নথিভুক্ত ছিল এবং এই বৎসরে নূতন ২৪টী মোকদ্দমা রুজু হয় উহার মধ্যে ৩৮টি মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে। রিপোর্টে গবর্ণমেণ্ট জানাইয়াছেন যে দেশের সর্ব্বত্র জমিদার ও প্রজার মধ্যে বেশ সৌহার্দ্য বর্ত্তমান। তবে বয়কট আন্দোলনের ফলে প্রজাদের মধ্যে অনেকে বিলাতী সূতা ব্যবহার করিতে বাধা পাওয়াতে তাহাদের বুনা কাপড়ে লাভ কমিয়া গিয়াছে।

ভারতীয় রাজা ও তাঁহার কুকুর—"ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান" পত্রের সম্পাদকীয় প্রবন্ধে ভারতীয় দেশীয় রাজারা বিলাতে গিয়া কি ভাবে প্রজার অর্থ অপব্যয় করেন, তাহার দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে। উক্ত পত্র বলেন, ভারতের দেশীয় রাজারা নিজেদের জন্য যে সব রাজপ্রসাদ নির্ম্মাণ করিতেছেন এবং এদেশে আসিয়া যে ভাবে প্রজার অর্থের অপচয় করিতেছেন, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। উঁহাদের কাণ্ডকারখানা দেখিলে অনেক সময়ে উঁহাদিগকে পাগল বলিয়া মনে হয়। এখানে একজন দেশীয় রাজা কুকুরের জন্য অন্ ভব রকম খরচ করিতেছেন। তাঁহার ৭ শত কুকুর আছে। এই সব কুকুরের যত্ন লইবার জন্য ১০০ ভৃত্য নিযুক্ত হইয়াছে। প্রতি ২০টি কুকুরের ভৃত্যদের উপর একজন করিয়া সর্দ্দার ভৃত্য আছে এবং সকলের উপর একজন পশু চিকিৎসককে ভৃত্যদের 'জেনারেল' রূপে রাখা হইয়াছে। কুকুরগুলিকে যাহাতে মশা-মাছিতে কামড়াইতে না পারে তজ্জন্য প্রত্যেক কুকুরের উপর একটি করিয়া বৈদ্যুতিক পাখা ঘোরে এবং ভালমন্দ অনুসারে কোন কুকুরকে এনামেলের বাসনে, কোনটাকে পিতলের বাসনে এবং কোনটাকে লোহার বাসনে খাইতে দেওয়া হয়। যদি কোন কুকুর মারা যায় তবে উহাকে কবর দিয়া উহার উপর স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মাণ করা হইয়া থাকে। সময় সময় কুকুর-কুকুরীর বিবাহ দেওয়া হয় এবং কোন কোন বিবাহে কুকুরীকে ৫০ হাজার টাকার অলঙ্কার দেওয়া হয়। গত ১৯৩০ সালে একদিন ভীষণ গরম পড়ে। এইদিন একজন ইংরাজ উক্ত দেশীয় রাজার সঙ্গে দেখা করিতে যাইয়া বলেন যে, ভয়ানক গরম পড়িয়াছে। উক্ত ইংরাজ আশা করিয়াছিলেন যে, দেশীয় রাজাটি হয়ত তাঁহার জন্য একটা ঠাণ্ডা পানীয় আনাইয়া দিবেন। কিন্তু একথা শুনিয়াই উক্ত রাজা চমকিয়া উঠেন এবং ঘণ্টা টিপিয়া তাঁহার প্রধান মন্ত্রীকে ডাকাইয়া আনেন। প্রধান মন্ত্রী উপস্থিত হইলে উক্ত দেশীয় রাজা তাঁহাকে ইংরাজ ভদ্রলোকটিকে দেখাইয়া বলেন—এই ভদ্রলোকটি বলিতেছেন যে, আজ ভয়ানক গরম পড়িয়াছে। আপনি একটি স্পেশাল ট্রেণের বন্দোবস্ত করিয়া কালই কুকুরগুলিকে সমুদ্রতীরবর্ত্তী কোন স্থানে লইয়া যাইবেন। "ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান" বলেন যে, পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই আজকাল এই ধরণের অমিতব্যয়ী রাজা-রাজড়া আছে।

মণিপুর মহারাজের পুত্রের নিবেদন:—আমি মণিপুর রাজ্যের শ্রীযুক্ত মহারাজা কুলচন্দ্র ধ্বজ সিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে মণিপুর যুদ্ধ হয়। তখন হইতে মণিপুর রাজ্য বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের অধীন হয়। আর শ্রীযুত পিতা মহারাজকে চিরদিনের জন্য আন্দামানে নির্ব্বাসিত করা হয়। তথায় ৩ তিন বৎসর রাখিয়া, তৎপরে হাজারিবাগে মাসিক ৭৫৲ বৃত্তি দিয়া ২০ বৎসর নজরবন্দীতে রাখা হয়। তাঁহাকে মিউনিসিপ্যালিটীর ট্যাক্স ইত্যাদি কিছুই দিতে হইত না। বর্ত্তমানে তিনি শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডে (মথুরা) মাসিক ১০০৲ টাকা বৃত্তিতে এখনও পর্য্যন্ত নজরবন্দীতে আছেন। এই সামান্য বৃত্তি দ্বারা তিনি কোনমতে এক বেলা খাইয়া দিনযাপন করিতেছেন। তাহার উপর আবার বার্ষিক ২৪৲ টাকা মিউনিসিপ্যালিটীর ট্যাক্স দিতে হয়। গবর্ণমেণ্ট একজন ভূতপূর্ব্ব স্বাধীন মহারাজাকে যে রকম বৃত্তি দিয়া রাখিয়াছেন, তাহাতে তিনি যে কত কষ্টে আছেন, তাহা একমাত্র ভগবানই জানেন। তাঁহার এখন ৮০ বৎসর বয়স; অত্যন্ত বৃদ্ধ হইয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট এখনও তাঁহাকে ছাড়িয়া দেন নাই। এই জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলাম, কিছুই হইল না। বৃদ্ধ পিতা, মাতার সেবা করা ছেলেদের একান্ত কর্ত্তব্য, কিন্তু অভাবের জন্য তাহাও পারিলাম না। মহারাজার নিকটে থাকা দূরে থাকুক, নিজেও পেটের দায়ে

পথের ভিখারী হইয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছি। আর আমাদিগকেও ছেলে বেলায় (৪ বৎসর বয়সে) শ্রীহট্টে মাসিক ১০৲ টাকা বৃত্তি দিয়া ১০ বৎসর নজরবন্দীতে রাখিয়া ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে দেশে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। দেশে আসিয়াও অর্থাভাবে লেখা পড়াও ভালরূপে শিখিতে পারিলাম না। তখন হইতে এখন পর্য্যন্ত গবর্ণমেন্ট জীবিকার জন্য কিছুই দেন নাই। এই নিমিত্ত গবর্ণমেন্টের নিকট সাহায্যের জন্য তিনবার দরখাস্ত দিয়া প্রার্থনা করিয়াছিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ আমার প্রার্থনা গবর্ণমেন্ট মঞ্জুর করিলেন না। আর বর্ত্তমান মণিপুরের মহারাজা শ্রীযুত চূড়াচান্দ সিংহ, সি, বি, ই, এর নিকটও একখানি দরখাস্ত দিয়া জীবিকার জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলাম। কিন্তু তিনি জবাব পর্য্যন্ত দিলেন না। মণিপুর ষ্টেটটি আমাদের পূর্ব্বপুরুষ (স্বর্গীয় মহারাজা গরিব নেওয়াজ, ৺ মহারাজা শ্যামসাই সিংহ, ৺ মহারাজা ভাগ্যচন্দ্র সিংহ, ৺ মহারাজা গম্ভীর সিংহ, ৺ মহারাজা চন্দ্রকীর্ত্তি সিংহ, কে, সি, এস, আই, মহারাজা শূরচন্দ্র সিংহ ও শ্রীযুত মহারাজা কুলচন্দ্রধ্বজ সিংহ) দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কিন্তু ষ্টেট হইতে কিছুই সাহায্য পাইলাম না। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, কেবল মরিলে শ্রাদ্ধের জন্য মণিপুর ষ্টেট হইতে ৩০০৲ টাকা করিয়া দেওয়া হয়। তাহাও পরিবারের (স্ত্রী পুত্র ইত্যাদি) জন্য নহে। কেবল নিজের জন্য। গবর্ণমেন্ট আমাদিগকে যে অবস্থায় রাখিয়াছেন, তাহা ভাবিতে গেলে চক্ষের জল নিবারণ করা যায় না। মণিপুর রাজ্য ও রাজবাড়ী সব গিয়াছে। আর বাহিরের যে সমস্ত সম্পত্তি ছিল, অর্থাৎ কাছাড় ও শ্রীহট্টে যে সব জায়গা ছিল, গবর্ণমেন্ট সমস্তই নিলাম করিয়া দিয়াছেন। আমাদের জন্য কিছুই রাখিলেন না। কেবল রাখিয়াছেন ভিক্ষার পথ। আমাদিগকে সাহায্য করা দূরে থাকুক, থাকিবার স্থান পর্য্যন্ত দিলেন না। বর্ত্তমানে পাড়াগাঁয়ে সামান্য একটা বাঁশের কুটীরে পরিবার লইয়া কোনমতে একবেলা খাইয়া দিন যাপন করিতেছি। এখন এমন শোচনীয় অবস্থায় পড়িয়াছি যে, সংসার চালাইতে পারি না। বর্ত্তমানে তিনটি মেয়ে ও একটি ছেলে আছে, তাহাদিগকে পেট ভরিয়া খাওয়াইতে ও ভরণপোষণ করিতে পারি না। অধিক কি আর বলিব, দুইবেলা অন্নসংস্থান করিবার উপায় নাই। এক সময় বৃটিশ গবর্ণমেন্টকে আমরা যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলাম। অর্থাৎ বর্ম্মার যুদ্ধে শ্রীহট্ট, কাছাড় ও নাগাহিলস্ যুদ্ধে যথেষ্ট সাহায্য করিয়া অনেক ব্রিটিশ অফিসারের প্রাণ বাঁচাইয়াছিলাম। এই হতভাগ্য মহারাজকুমারকে সকলে জীবিকার জন্য সাহায্য করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। অতএব আপনারা অনুগ্রহ করিয়া নিম্নের ঠিকানায় অর্থ সাহায্য করিয়া এই দুঃখী পরিবারকে উদ্ধার করিয়া বাধিত করিবেন। ইহাই আমার একান্ত প্রার্থনা। শ্রীটিকেন্দ্র ধ্বজ সিংহ। ঠিকানা মহারাজ কুমার টিকেন্দ্র ধ্বজ সিংহ, সাং থাংমৈবন্দ, পোঃ আঃ ইমফাল, জিঃ মণিপুর ষ্টেট, আসাম।

প্রাদেশিক মুস্লিম লীগের সিদ্ধান্তঃ :—বিশিষ্ট হিন্দু নাগরিকগণ স্বাক্ষরিত নিম্নোক্ত মর্ম্মের একখানা বিবৃতি প্রচারিত হইয়াছে। বাঙ্গলার সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান বিষয়ে গত এপ্রিল মাসে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুস্লিম লীগের বার্ষিক সাধারণ সভায় গৃহীত নিম্নোক্ত প্রস্তাবটিকে আমরা সর্ব্বাপেক্ষা সন্তোষজনক ব্যবস্থা বলিয়া মনে করিয়া উহা সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করিতেছি :—(১)বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার ভবিষ্যৎ ভোটার নির্ব্বাচন পূর্ণবয়স্কগণের ভোটাধিকারের ও যুক্ত নির্ব্বাচন ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করিয়াই হইবে এবং ব্যবস্থাপক সভায় মুসলমানদের জন্য কোন আসন সংরক্ষিত থাকিবে না। (৩) লীগের অভিমত এই যে, বাঙ্গলার সংখ্যাগরিষ্ঠ যে কোন সম্প্রদায়ের জন্য আসন সংরক্ষণ উক্ত বিশেষ সম্প্রদায়েরই স্বার্থের পথে প্রতিকূল হইবে।

কোম্পানীর কাগজের মূল্য হ্রাস ও জীবন-বীমা কোম্পানীর তহবিল

শ্রীসুধীন্দ্রলাল রায়, এম্‌-এ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

অনেকে বলিয়া থাকেন যে, গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটির সুদ কম, সুতরাং অন্যান্য উপায়ে বীমা তহবিল লগ্নী করিয়া অধিক সুদ আয় করায় চেষ্টা করা উচিত। যদি দেশের শ্রমশিল্প-প্রতিষ্ঠানের শেয়ার খরিদ করা হয়, কিংবা তাহাদের প্রয়োজনের সময় টাকা ধার দেওয়া হয় তবে দেশের হিতসাধন করা হয়। বিলাতে ইংরাজী কোম্পানী-গুলি এরূপ করিয়া থাকে, সে নজিরও ইঁহারা দিয়া থাকেন। কিন্তু একটা কথা তাঁহারা বলিতে ভুলিয়া যান কিংবা ইচ্ছা করিয়াই বলেন না। সে কথাটা এই যে, সে দেশে Public Utility Concerns কিংবা গভর্ণমেণ্ট-পুষ্ট শ্রম-শিল্প প্রতিষ্ঠানেই বীমার তহবিল লগ্নী করা হয়। সাধারণ লিমিটেড কোম্পানীতে নহে। সাধারণ লিমিটেড কোম্পানী সে দেশেও অহরহ ফেল পড়িতেছে। বিখ্যাত জুয়াচোর হ্যাট্রির সংবাদ সকলেই জানেন। আইভর ক্রয়জার কিরূপে কারবারগুলি তছনছ করিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে তাহা এখনও টাট্‌কা খবর।

আর একটা কথা মনে রাখিতে হইবে। ইংল্যাণ্ড স্বাধীন দেশ। সে দেশের শ্রমশিল্পকে পোষণ ও রক্ষা করিবার জন্য সে দেশের রাষ্ট্রযন্ত্রটি নিয়ত ঘূর্ণ্যমান। ভারতবর্ষে শ্রমশিল্প-প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করা দূরের কথা, সুবিধা পাইলে দেশীয় প্রতিষ্ঠানগুলির আঁতে ঘা দিতে এখানকার রাষ্ট্র-যন্ত্রটী পরাঙ্মুখ নহে। সুতরাং এদেশে পরের গচ্ছিত ধন লইয়া স্বদেশের সেবা করিবার প্রবৃত্তি পরিত্যাগ করিলেই স্বদেশী বীমা কোম্পানীগুলির যথোচিত সেবা করা হইবে ও স্বদেশী বীমা কোম্পানী গুলিকে দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলেই সত্য দেশহিতৈষণার পরিচয় দেওয়া হইবে। মনে পড়ে বসন্ত কুমার লাহিড়ী কারাগারে যাইবার প্রাক্কালে কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়া ক্ষোভ করিয়াছিল যে, সে তহবিল তছরূপ করে নাই,—দেশ-সেবার প্রেরণায় দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করিতে গিয়াই তাহার দুর্গতি! কোনও কোনও বীমা কোম্পানীর পরিচালক বীমার তহবিল দিয়া ঐরূপে দেশসেবা করিতেছেন ঘোষণা করিয়া দেশের লোকের হাততালি লইবার চেষ্টা করেন। সুখের বিষয় তাঁহারা এখনও কাঠগড়ার বাহিরে আছেন। বাহিরেই তাঁহারা থাকুন ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

ব্যবসায়ের এই দুর্দ্দিনে অন্য যে কোনও লগ্নীর সুদ আদায় হওয়া কঠিন। অনেক ক্ষেত্রেই শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি সুদ দিতে সক্ষম নয়। মনে রাখা দরকার যে, বাৎসরিক সুদটি বীমা কোম্পানীর পক্ষে অবশ্য প্রাপ্য। "অনাদায়ী সুদ" (unrealised interest) "দুই লক্ষ টাকা" assets-এর কোঠায় লিখিয়া বোনাস ঘোষণা করা চলিতে পারে বটে,

কিন্তু কোম্পানীর ভিত্তি যে শিথিল হইল, সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ থাকে না। এমন কি, যাঁহারা ঐরূপে ভ্যালুয়েশান করান তাঁহাদেরও নহে। তবে তাঁহারা বোধ হয় ভাবেন—"After me, the deluge !"

কলিকাতার এক বিখ্যাত নর্ত্তকী মারা গেলে দুইজন লোক স্বামী পরিচয়ে তাহার সম্পত্তি দাবী করে। এই দুই ব্যক্তির একজন কলিকাতাবাসী ও অপর মান্দ্রাজ অঞ্চলের। কলিকাতার লোকটি স্বামীত্ব প্রমাণ করিবার জন্য বিচারালয়ে যে সকল দলিল দাখিল করে, তন্মধ্যে একখানা রেহিনী খত ছিল! উক্ত নর্ত্তকী ঐ রেহিনী খতমূলে কলিকাতার কোনও এক বিরাট বীমা কোম্পানীর নিকট তিন লক্ষাধিক টাকা ধার লয়। তজ্জন্য সে নিজের এক বাড়ী বন্ধক রাখে ও ঐ পুরুষটিকে নিজ স্বামী বর্ণনা করিয়া তাহারও একখানি বাড়ী একই খতে বন্ধক রাখা হয়। মোকর্দ্দমা যখন চলিতেছিল সেই সময় প্রকাশ পায় যে তখনও প্রায় দুইলক্ষ টাকা ও সুদ বাকী পড়িয়া রহিয়াছে। শুধু ইহাই নহে, ঐ পুরুষটির বাড়ী বলিয়া যে সম্পত্তি উক্ত খতে লেখা ছিল, সে বাড়ীতে ঐ পুরুষটির কোনও স্বত্ব নাই। এইরূপ ধরণের লগ্নী কোম্পানী পরিচালকদের নর্ত্তকীপ্রীতির পরিচয় দেয় বটে, কোম্পানীর প্রতি দরদের কোনও প্রমাণ দেয় না।

ঐ মোকর্দ্দমার অব্যবহিত পূর্ব্বে উক্ত কোম্পানী বোনাস ঘোষণা করিয়া বাহবা লইয়াছেন। কে জানে ঐ অনাদায়ী সুদ ও টাকা assetsএর কোঠায় ফেলিয়া বোনাসের অঙ্ক বর্দ্ধিত করা হইয়াছে কি না। দেশের শ্রম-শিল্পের সাহায্যের নামে এই সবই তো চলিয়া থাকে!

বিলাতের কোম্পানীদের নজির দেখাইয়া আমাদের দেশের যে বীমা পরিচালকগণ গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটির বিরুদ্ধে গলাবাজী করেন, বিলাতের সংবাদ দিয়াই দেখাইতে চাই যে গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটির মূল্য যে অনুপাতে কমিয়াছে, এই বাজারে অন্যান্য লগ্নীর বাজারদর তদপেক্ষা বহু অধিক অনুপাতে অধোগতি লাভ করিয়াছে।

বিলাতের The Bankers' Magazine কয়েক বৎসর ধরিয়া কতকগুলি লগ্নীর বাজার মূল্য মাসের পর মাস মুদ্রিত করিতেছেন। তাহা হইতে দেখা যায় যে ১৯৩০ সালের ১৭ই ডিসেম্বর হইতে ১৯৩১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটির মূল্য কমিয়াছে শতকরা ৯·২। কিন্তু অনিশ্চিত সুদের লগ্নীর (variable interest-bearing stocks) মূল্য কমিয়াছে শতকরা ২৩৫। ব্রিটীশ ও ভারতীয় সরকারী কাগজের মূল্য হ্রাস পাইয়াছে শতকরা ৮·৮ মাত্র। কিন্তু British Bank Shares কমিয়াছে ২০·৫% এবং British Railway Ordinary Stocks কমিয়াছে ৪৩%। অতএব পাঠকগণ বুঝিয়া দেখুন যে, এ বাজারে ভ্যালুয়েশান করিতে গেলে কে বেশী ঠকিবে?—যাহারা গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটিতে লগ্নী করে না, যাহারা সাধারণ শেয়ার ও অন্যান্য লগ্নীতে টাকা রাখে? আমাদের দেশেও বিবিধ লিমিটেড কোম্পানীর অধুনা বাজারদর আলোচনা করিলে দেখা যাইবে, যে, কোনও কোনও ক্ষেত্রে শেয়ারের বাজারদর শতকরা ৭৫৲ কমিয়া গিয়াছে। এরূপ অবস্থায় বীমা কোম্পানীর তহবিল এইরূপ লগ্নী রাখিতে কে সাহস করিতে পারে?

বিলাতের কোম্পানীগণ এ অবস্থায় কি করিতেছেন? অনেকে—যেমন National Mutual (ইংলণ্ডের)—এবার ভ্যালুয়েশনে করা একেবারেই স্থগিত রাখিয়াছেন। অনেকে ১৯৩১ সালের ৩১শে ডিসেম্বরের বাজারদর ধরিয়া ভ্যালুয়েশান করিয়া দেখিলেন বোনাস কমিয়া গেল। কিন্তু ১৯৩২ সালের ৩১শে জানুয়ারীর বাজার মূল্য ধরিলে বোনাস কমিত না। অথচ তাঁহারা কম বোনাসই ঘোষণা করিলেন, কেননা ভবিষ্যতের গর্ভে আরও কত বিড়ম্বনা আছে কে জানে? সাবধানতাই এখানে মঙ্গলজনক। ইঁহারা বলিতেছেন—"An office which contrives to maintain its bonus at such a time upon a high level of the previous occasion is more likely to arouse adverse comment than one which, recognising the conditions, boldly faces the position and reduces its rates accordingly." কেন না, "The point which ought not to be overlooked at the present time is the great uncertainty in regard to the future. While, since the close of 1931, there has been a

welcome improvement in the market value of many gilt-edged stocks, it can not be said that the international causes so largely responsible for the crisis have been removed. Many of them have yet to be tackled, and what the position would be a year hence no one can say. Therefore it is more than usually necessary for a life office to adopt a very cautious policy in the matter of distribution of surplus at such a time."

বিলাতের কোম্পানীগণ এইরূপ সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছেন। আমাদের দেশের যে সব নূতন ও ক্ষুদ্র কোম্পানীগণ বোনাস ঘোষণা করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে এখন আশঙ্কাজনক ভবিষ্যতের কথা ভাবিয়া সংযত হওয়া উচিত। এ বৎসরে যাঁহাদিগকে valuatian করাইতে হইবে তাঁহাদিগের উচিত দৃঢ়তম ভিত্তিতে তাহা সম্পাদন করান। তাহার ফলে যে উদ্বৃত্ত বাহির হইবে তাহা ভবিষ্যতের জন্য রিজার্ভ টানিয়া লওয়াই ভাল। বোনাস দিতে পারাটাই বড় কীর্ত্তি নহে। ভবিষ্যতে পলিসির টাকা চুকাইবার ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখাটাই বীমা কোম্পানীর প্রথম কর্ত্তব্য।

আমরা শুনিয়া বিস্মিত হইতেছি যে কলিকাতার কোনও এক জীবন বীমা কোম্পানী তাঁহাদের এজেণ্টের মারফত সাধারণকে বলিতেছেন এবার বোনাসের বৃদ্ধি হইবে অতএব শীঘ্র বীমা করাও। তাঁহাদের বিজ্ঞাপনেও দেখিতে পাই বড় বড় হরফে ছাপা আছে—"1932—a bonus year"। যেন মুর্গীহাটার দোকানদার চীৎকার করিতেছে—"চলে এস খদ্দের লক্ষ্মী, বড় বোনাস, বেশী মুনাফা।" আমরা এই কোম্পানীর লগ্নীর ব্যাপার কিছু কিছু শুনিয়াছি এবং সেই জন্যই মনে করি যে, সত্য গোপন না করিয়া বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ভ্যালুয়েশান করিলে ইহাঁরা বোনাস বৃদ্ধি করা দূরের কথা পূর্ব্বের বোনাসও দিতে সমর্থ নহেন। সেই কারণেই আমরা বিস্মিত হইয়াছি।

যে সমস্ত কোম্পানী সম্পত্তি বন্ধক সূত্রে টাকা ধার দেন, এ যাবৎ ভ্যালুয়েশানের সময় তাঁহারা একটা বিষয়ের সুযোগ গ্রহণ করিয়া আসিয়াছেন—কিন্তু এ দুর্দ্দিনে সে বিষয়ে তাঁহাদের সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। সেটা এই যে, রেহিনী খতের কোনও বাজারদর নাই। কাজেই রেহিনী খতের টাকাটা সম্পূর্ণ assetsএর ঘরে জমা করা যায় ও তাহাই এতদিন হইয়াছে। ধরা যাউক, মিঃ মারদিয়া সাহেবের চা-বাগান বন্ধক লইয়া কোনও এক কল্পিত কোম্পানী তাঁহাকে ছয় লক্ষ টাকা ধার দিল—রেহিনী খত মূলে। এখন, রেহিনী খতের বাজার মূল্য নাই। কাজেই ভ্যালুয়েশানে সম্পত্তির কোঠায় এই ছয় লক্ষ টাকা ধরিয়া লওয়া হইল। এদিকে "মারদিয়া" সাহেব টাকা দিতে অপারগ হওয়ায় বলিলেন—"আমার বাগান বেচিয়া টাকা উসুল কর।" বাগান বেচিতে গিয়া দেখা গেল, যে, অতিকষ্টে চারিলক্ষ টাকা মূল্য পাওয়া যায়। অতএব আমার সম্পত্তি হইতে দুই লক্ষ টাকা উপিয়া গিয়াছে। এ ক্ষেত্রে ভ্যালুয়েশান করিবার সময় উক্ত ঋণের পরিমাণ assetsএর ঘরে ছয় লক্ষ টাকা ধরিলে আইনে আটকায় না বটে কিন্তু সততায় বাধে। আমাদের এই কল্পিত বীমা কোম্পানীর পরিচালক যদি জ্ঞানী ও সদ্‌বুদ্ধিযুক্ত হ্যেন তবে valuation কালে উক্ত রেহিনী খতের মূল্য দুই লক্ষ উপাইয়া দিবেন অর্থাৎ write down করিবেন। কিন্তু আইনে বাধে না বলিয়া এ দেশের বীমা পরিচালকগণ এরূপ সাবধানতা অবলম্বন করেন না। তাহা না করিয়া তাঁহারা পার পাইয়া যান এই জন্য যে, এ দেশের জনসাধারণ এ সব বিষয়ে কোনও সংবাদ জানিতে পারেন না এবং কোম্পানীর ডাইরেক্টার মহোদয়গণের এ সকল বিষয়ে প্রায়শঃই কোনও জ্ঞান নাই।

যে সমস্ত ক্ষুদ্র বা নূতন কোম্পানী এ বৎসর valuation করাইতে বাধ্য হইবেন, তাঁহাদের ডিরেক্টারগুলী ও পরিচালকগণকে আমরা করযোড়ে অনুরোধ করিতেছি যে বোনাসের উদ্দেশ্যে ভ্যালুয়েশান না করিয়া কোম্পানীর ভবিষ্যৎ ভিত্তি দৃঢ় করিতে যেন তাঁহারা তৎপর হন। এবার শিথিল ভিত্তিতে valuation করিলে ভবিষ্যতে কোম্পানী নিশ্চয়ই বিধ্বস্ত হইবে। Assets সমূহের দাম কষিবার সময় যথাসম্ভব কম মূল্যে ধরিয়া যেন সম্পত্তির তায়দাদ ধরা হয়। বোনাসের মোহে অন্যথা করিলে বিপদ অবশ্যম্ভাবী।*

* এই প্রবন্ধের ইংরাজী অংশগুলি বিলাতের Insurance Record নামে মাসিকপত্রিকার Feb-March সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীযুক্ত Murray Laing F. I. A., F. F. A লিখিত "The Security value of a Life Policy" নামক প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

বিচিত্রা

আলোচনা

লক্ষ্মী ইন্‌সিওরেন্স

লক্ষ্মীর ১৯৩১ এর বার্ষিক রিপোর্ট আলোচনার জন্য প্রাপ্ত হইয়াছি। আলোচ্য বর্ষে কোম্পানী ৫৫, ১৯, ১০০ টাকার পলিসি প্রদান করিয়াছেন, ইহার চাঁদার আয় ২, ৭৫, ৬৪৩—১৫·০ কোম্পানির বর্ত্তমান বর্ষের ১২, ১৪, ৪০৫—৪—১০। ইহার মধ্য হইতে ৫০,০০০ টাকা রিজার্ভফণ্ডে সঞ্চিত রাখিয়া ৬, ৭৪, ৯০০০—১১-৪ টাকা বীমা তহবিলের প্রদান করিতে কর্ত্তৃপক্ষ সক্ষম হইয়াছেন বীমা তহবিলের মোট পরিমাণ ২১, ৭৫, ৬৪৭,—৭-৩ হইয়াছে। আর একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার এই যে কোম্পানির ব্যয়ের হার ক্রমশঃ কমিয়া যাইতেছে—আলোচ্যবর্ষে প্রায় ৩২,২৬ হইয়াছে—ইহার পূর্ব্বের বৎসরে ৩৭·৬ছিল। কোম্পানি লাহোরস্থিত হেড অপিসে নয়নাভিরাম বৃহৎ বাটি নির্ম্মাণ করিয়াছেন—অতি অল্প সময়ের মধ্যে লক্ষ্মীর সাফল্য আশাতীত হইয়াছে; কোম্পানির এই গৌরবের দিনে আমরা ইহার কর্ণধার, প্রাণস্বরূপ পণ্ডিত সন্তানমকে অভিনন্দিত করিতেছি—পণ্ডিতজীর আপ্রাণ চেষ্টায় কোম্পানি কঠিন প্রতিকূলতার বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া ভারতীয় প্রতিষ্ঠানগুলির পুরোভাগে আসিয়াছে।

ইষ্টার্ণ জেনারেল

অল্প টাকায় বীমাগ্রহণ করিবার জন্য ব্যাঙের ছাতার ন্যায় অনেক কোম্পানিই আবির্ভূত হইয়াছে দেখিতেছি—অক্ষম, বীমা-বিষয়ে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত এই সকল প্রতিষ্ঠানগুলি অতি অল্প সময়ের মধ্যে লুপ্ত হইয়া দেশের সমূহ বিপদ করিবে। ৪৪ নং বাদুড় বাগান ষ্ট্রীটস্থ ইষ্টার্ণ জেনারেল কোং অল্প টাকায় বীমা প্রদান করিবার জন্য কার্য্যক্ষেত্রে নামিয়াছেন। ইঁহাদের ম্যানেজিং এজেণ্ট কলিকাতার প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী রায় সাহেব বি, এন, মুখার্জ্জি এণ্ড সন্স—ইঁহাদের স্থিতিগুলি বিজ্ঞান-সম্মত। বীমাকারীগণকেও ইঁহারা অনেক সুযোগ ও সুবিধা প্রদান করিতেছেন। সুতরাং এইরূপ প্রতিষ্ঠানের উপযোগীতা সহজেই অনুমেয়।

লাইট-অফ্-এসিয়া

পরলোকগত স্বদেশ প্রেমিক রাজা শ্রীসুবোধচন্দ্র মল্লিক মহাশয় কর্ত্তৃক ১৩১৩ খৃষ্টাব্দে এই প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান ডিরেক্টার বৃন্দের মধ্যেও কর্ম্ম-প্রিয় প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিগণ নিযুক্ত আছেন। ১৯৩০ সালের বার্ষিক রিপোর্ট আমরা আলোচনার জন্য প্রাপ্ত হইয়াছি—কোম্পানির অনেক বিষয়ই সংস্কার করা হইয়াছে কিন্তু এজন্য ব্যয়ের হার বৃদ্ধি পায় নাই পরন্তু অনেক কমিয়াছে —১৯৩০ সালে দাবীর টাকা ১৯২৯ অপেক্ষা অনেক কম হইয়াছে এবং বর্ত্তমান পরিচালকবৃন্দ পূর্ব্ব বৎসরের দাবীর টাকা সত্বর পরিশোধ করিয়া সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন। কোম্পানির বর্ত্তমান সেক্রেটারী মিঃ এস্, দত্ত মহাশয় বীমাক্ষেত্রে সুপরিচিত—তিনি দূর দৃষ্টির সহিত কোম্পানির কার্য্য পরিচালনা করিতেছেন—আমরা আশা করি তাঁহার নেতৃত্বে কোম্পানি উত্তরোত্তর উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়া ভারতের বীমাক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিবে।

বিচিত্রা

শ্রীবৈদ্যনাথ বিশ্বাস সম্পাদিত "স্বদেশ" পূর্ব্বেই [illegible] হইয়াছে—Indian Insurance journal [illegible]

নাকি বহু গোলযোগ চলিয়াছে। হিন্দু মিউচালের গতায়ু এজেন্টের পক্ষে ইহা হয়ত গৌরবজনক হইতে পারে কিন্তু অতঃপর ইহা নিয়মিত চলিবে তো?

° • ° °

উপাসনার শিশু-হৃদয় কবি-সম্পাদক সাবিত্রী প্রসন্ন এই ব্যক্তির পাল্লায় পড়িয়া আরব্য উপন্যাস বর্ণিত "স্কন্ধোপরিবৃদ্ধের" ন্যায় ঘুরিয়া অবশেষে কৌশলে বোঝা বিমুক্ত করিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়াছেন! 'উপাসনা' ও বৈশাখ প্রভাতে আপনার আনন্দ উৎফুল্ল ডালি লইয়া বাহিরে আসিয়াছে—বীমা-প্রসঙ্গের রচনাগুলি অতীব, মনোরম ও কৌতুকহাস্য-মিশ্রিত।

• ° ° °

বীমা-পত্রিকাগুলি দল বা ব্যক্তি ও কোম্পানি বিশেষের মুখপাত্র না হইয়া পড়িলে গৌরবে কার্য্যভার বহন করিতে পারে। শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র আয়ার সম্পাদিত "Indian Insurance" এ বিষয়ে নিরপেক্ষ আছেন বলিয়া আমরা মনে করি। শ্রীযুক্ত আয়ার কোন দল বা ব্যক্তি বিশেষের হস্তে পড়িয়া আপনার পত্রিকার আত্ম-মর্য্যাদা ও প্রতিষ্ঠা ক্ষুণ্ণ করেন নাই সেই জন্য আমরা অতিশয় প্রীত।

তাজ

শ্রীচণ্ডীচরণ মিত্র

(যমুনা-ব্রিজ ষ্টেশন হইতে প্রথম দর্শনে)

অদূরে যমুনাতীরে ঐ শোভে তাজ?—
মমতাজ-পুরী!
এ কী শিল্প দিব্যচক্ষে হেরিলাম আজ
নন্দন-মাধুরী!

এ কী লোকোত্তর কাব্য তুলিছে ঝঙ্কার?—
সুরে মিশে লয়!
এ কী মধুচ্ছন্দা গীতি? কোথা কাব্যকার?—
জাগিছে বিস্ময়!

পাষাণে গঠিত জানি; কোথায় পাষাণ?—
শ্বেত পুষ্পভার
গুচ্ছে গুচ্ছে সাজাইয়া কে দিয়াছে প্রাণ,
আনি' উপচার!

রেখা ও রঙের রূপে এ কী অপরূপ?—
দিলো মোহাঞ্জন!
পুলক-রোমাঞ্চে জাগে প্রতি লোমকূপ
নিশ্চল নয়ন!

সুনীল গগন-পট,—চাঁদ কোথা, কৈ?—
পার্শ্বে গতিহীন!
নিম্নে তারি মর্ম্মরের স্মৃতি-সৌধ ঐ
তুলনাবিহীন!

থাকো পান্থ! চেয়ে থাকো উন্মীলি' নয়ন
সারা দিন রাত,
নির্ব্বাক বিস্ময়ে শুধু করো হে চয়ন
কল্প-পারিজাত!

শ্রীবিষ্ণু দাস

১৩৩৯ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা প্রবাসীতে—

শ্রীকালিকারঞ্জন কানুন গো এম-এর "মহারাণা প্রতাপ সিংহ" শীর্ষক ঐতিহাসিক প্রবন্ধে কয়েকটি নূতন সংবাদ আছে। প্রবন্ধটির ঐতিহাসিক মূল্য অস্বীকার করা যায় না। লেখক প্রবন্ধটির দ্বিতীয় প্যারার প্রথম ভাগে বলিয়াছেন,—"যাঁহারা ভাবের প্রেরণায় প্রতাপ জয়ন্তীর অনুষ্ঠান করিয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই নাটক, উপন্যাস অথবা উপন্যাস-মূলক ইতিহাসের ভিতর দিয়া মহারাণা প্রতাপকে দেখিয়াছেন ইত্যাদি।" ইহাতে মনে হয়, প্রবন্ধটি সর্ব্ব-সাধারণের জন্য লিখিত। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় আমাদের দেশে প্রবন্ধ-পাঠকের সংখ্যা অতি বিরল। মস্তিষ্ক পরিচালনা অপেক্ষা ভাবের স্রোতে মনকে ভাসাইয়া দিয়াই আমরা আরাম পাই। এতকাল কাব্য, উপন্যাস, দৃশ্যকাব্য, গান প্রভৃতি প্রতাপসম্বন্ধীয় সকাল প্রকার কিম্বদন্তীকে যে ভাবে সত্য বলিয়া সর্ব্বসাধারণ্যে উপস্থিত করিয়াছে, তাহার প্রভাব যে এই একটী মাত্র প্রবন্ধে নষ্ট হইবে, তেমন আশা করা যায় না। আরও একটী কথা, যাহারা পূজা করে, পূজ্যকে নিছক সত্যের উপরই প্রতিষ্ঠিত করিয়া তৃপ্তি পায় না, তাহাতে খানিকটা কল্পনার রঙ চড়াইয়া তবে যেন স্বস্তি। ভবিষ্যতে মহারাণা প্রতাপ সম্বন্ধে লেখকের নিকট হইতে আমাদের আরও অনেক কথা জানিবার আগ্রহ রহিল।

প্রথম গল্পটি শ্রীবিমলাংশু প্রকাশ রায়ের "নিরুদ্দেশ" রচনা গল্প না বলিয়া—চিত্র বলিলেই ঠিক হয়—প্রথম হইতে বেশ লাগে। রসও বেশ জমিয়া উঠিয়াছে; প্রকাশ ভঙ্গীও সুন্দর। সাধারণ ও সামান্য বিষয়-গুলিকে সাজাইয়া গুছাইয়া কৌতুকাবহ করিয়া তোলা হইয়াছে। কিন্তু উপসংহারে "শাল্মলীর উচ্চ শাখা হ'তে গম্ভীর প্রতিবাদ এল—ভুৎভুতুম—ভুৎভুতুম!!" ছত্রটি পাঠেই মনে হয়, রসভাণ্ডে যেন সহসা দুই আঁজলা মাটি (গঙ্গার নয়) নিক্ষিপ্ত হইল।

দ্বিতীয় গল্পটি শ্রীভোলানাথ ঘোষের "শেষের খেয়া" পাঠে তৃপ্তি পাওয়া গেল না। কুমারী বালিকা শৈলবালার প্রবাসী পিতার জন্য প্রতীক্ষার পাঠকের মনকেও প্রতীক্ষায় অধীর করিয়া তুলিবে কিন্তু গল্পটির উপসংহারের জন্য। "শেষের খেয়া" নামটিরও কোন সার্থকতা দেখিতে পাওয়া যায় না। গ্রামের চিত্রটিও তেমন মনোজ্ঞ নয়।

তৃতীয় গল্প শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের "শোক-সংবাদ" পাঠে আনন্দ পাওয়া গেল না। লেখকের আরও অনেক গল্প পূর্ব্বে প্রবাসীতে আমরা পাঠ করিয়াছি। সেগুলির তুলনায় ইহা একটী নিকৃষ্ট রচনা। তবে শোক-সংবাদ পাঠে—দুর্জ্জন বা পাওনাদারের নিরানন্দ হওয়াই স্বাভাবিক। আর, পাঠ করিতে করিতে বিরক্তি আসিলে বুঝিতে হইবে Interest নাই। মাত্র কিছুদিন পূর্ব্বে এই কলিকাতারই এক অঞ্চলে গল্পের মধ্যাস্থিত ঘটনাটির প্রায় অনুরূপ একটি ঘটনা ঘটে। কিন্তু নিতান্ত [illegible] লোকের

নয় তাহা শুনিয়া আমরা (অনুচ্চ কণ্ঠে বলিতেছি) একটু 'মজা' উপভোগ করিয়াছিলাম।

শ্রীশৈলেন্দ্র নাথ ঘোষের "মুদী" গল্পটি মুদীর মতই প্রাণহীন রচনা। পল্লীগ্রামের মুদীর দোকান—ছোট হইলেও বিক্রয়োপযোগী সকল প্রকার সামগ্রীই তাহাতে থাকে। জিনিষগুলি চোখে দেখিলে রস পাওয়া যায় না, কিন্তু গল্প বলিবারকালে সেগুলি এক রসলোকের সামগ্রী হইয়া উঠে। গল্পের প্রথম ভাগে এগুলির একটা দীর্ঘ তালিকা ও শুষ্ক বর্ণনা আছে। দোকান সাজাইতে কিছুই বাদ পড়ে নাই। দোকানটি মাল-পত্রে ঠাসাঠাসি; একটু আলোকও সেখানে প্রবেশ করে না। কিন্তু একটী উপাদান বাদ রহিয়াছে—গন্ধ। আর, মুদীর অন্তর ও বহির্মুখী দুটি চোখ। অবশ্য উপসংহারে একটু pathos আছে।

তিনখানি রঙিন ছবির প্রথম খানি শ্রীচৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায়ের "দুয়ারে"—ভারতীয় পদ্ধতিতে আঁকা। এক কৃশাঙ্গী নারী, মুখমণ্ডল, বিশেষ করিয়া ললাট তারুণ্যের পরিবর্তে প্রৌঢ়ত্বের পরিচয় দেয়। আর দুয়ারে দাঁড়াইবার ভঙ্গীতে দেখিয়া মনে হয়, ছবিখানির নাম হওয়া উচিত ছিল "দুয়ারে ধাক্কা।"

দ্বিতীয়খানি শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর "কীর্ত্তন।" বেশ লাগিয়াছে।

তৃতীয় ছবি শ্রীসুধাংশু রায়ের "গাছের তলায়" মন্দ লাগে না।

*　*　*　*

১৩৩৯ সালের বৈশাখের বসুমতীতে—

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস প্রবন্ধে প্রাচীন "সংবাদপত্র ও অন্যান্য বিবরণ হইতে বাঙ্গালা নাটকের ও নাট্যশালার ক্রমবিকাশের একটা ধারাবাহিক বিবরণ" দিতেছেন। মূল্যবান্ (অমূল্য বলিব না) সন্দেহ নাই। পাঠকগণ ইহাতে একটী বিষয় হয়ত লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, নাট্যশালার প্রতিষ্ঠার মূল্যে তখন লোকের মনে ব্যবসাবুদ্ধি ছিল না, ছিল জনসাধারণ যাহাতে "নির্ম্মল-রসে" পরিতৃপ্ত হ'ন ও "যাত্রা, কবি, খেউড় প্রভৃতি দূষ্য উৎসবের দূরীকরণ ঘটিয়া দেশে সুনীতি ও সদ্‌শিক্ষার বিস্তার হয়।" বস্তুতঃ জাতির জীবনে রঙ্গালয়ের প্রভাবের গভীরতা সম্বন্ধে কাহারো মতদ্বৈধ থাকিতে পারে না; শিক্ষা-বিস্তারের ইহাও একটী প্রধান ও সুন্দর উপায়। বর্ত্তমানকালে কলিকাতায় পেশাদারী ও সখের 'থিয়েটার' আছে; মফঃস্বলের ছোট ছোট সহরে ও গ্রামেও সখের 'থিয়েটারের' অভাব দেখা যায় না; সেগুলির অধিকাংশই নিষ্কর্ম্মাদের দ্বারা পরিচালিত। দুই চারিজন উদ্যোগী ও অবস্থাবান্ সৌখীন লোকও যে তাহাদের মূলে থাকেন না, এমনও নয়। কিন্তু শিক্ষিত জন-সাধারণের সহিত যেন তাহাদের আন্তরিকতার অভাব দেখা যায় না। আর, এগুলির উদ্দেশ্যও লোক-শিক্ষা নয়। এমন কি, "থিয়েটার" কথাটিতেই লোকে আজকাল দুর্নীতির আভাস পাইয়া থাকে।

এ সংখ্যায় মাত্র চারটি ছোট গল্প পাঠ করা গেল।

প্রথম গল্প লিখিয়াছেন শ্রীমতিলাল দাশ (এম-এ, বি-এল)—নাম "প্রেমে বিপত্তি।"

নায়ক যৌবনে প্রধানা নায়িকা কুমারী সুনন্দার সহিত পরিচিত হ'ন, সুনন্দা তখন কিশোরী, নায়ক ছিলেন কেবল চেহারাতেই নয়, মনে-প্রাণে দেশী; আর নায়িকা তাঁহার "নব্য ভাবাপন্ন হিন্দু" পিতার প্রভাবে গঠিত হইয়া উঠিতে ছিলেন নব্যভাবে। অবশ্য আজকালকার দিনে বেশী। করিয়া দেশী হইতে যাওয়াটাও একটী নব্যভাব; এই দুই নবীনের পরিচয়ের মধ্যে এই দৃষ্টির অসঙ্গতির ফলে বিরোধ বাধে। কিন্তু বিরোধটা ছিল, বাহিরের। দুই পরিবারের অন্দরমহলে ও নায়কের অন্তরকেন্দ্রে মিলন-উৎসবের কথা-বার্ত্তা ও সামিয়ানা খাটানো চলিতেছিল। কিন্তু নায়কের "বেশী-করিয়া-দেশী" হইতে যাওয়াটা পরিশেষে পাল-ফাঁসাইয়া, বার্ত্তা ভাঙ্গিয়া কুঞ্জনে মত্তহস্তী আনয়ন করিল;—উভয়ের বিবাহ হইল না। বিবাহ হইল না বটে, পূর্ব্বরাগের দস্তুরমত মনের মধ্যে তাহা স্থাণুবৎ রহিয়া গেল। নায়ক মাতৃ-আজ্ঞায় অপরাকে বিবাহ করিলেন, কিন্তু তাঁহাকে লাভ করিয়া সুখী হইতে পারিলেন না। না—পারিবারই কথা। একে তো সুনন্দা

প্রথম প্রণয়িনী, তাহার উপর বেজায় সুন্দরী ছিল। আবার "বেশী-করিয়া-দেশী-স্বামীটি" তাঁহার "প্রাচীন আদর্শে আদর্শ-বধূ, কর্ম্মে অশ্রান্ত, লজ্জায় বেপথুমতী, পূজায় ভক্তিমতী, সংসারের লক্ষ্মী-স্বরূপা" "পত্নীর কাছে যে প্রেমাভিনয় চাহিতেন, সে তাহা করিতে জানিত না,—" কাজেই দুঃখ যে গভীর হইবে তাহা আর বিচিত্র কি? দেখা যাইতেছে, বেশী-করিয়া-দেশী হইয়াও আজকাল বিবাহিত জীবনে সুখী হইবার উপায় নাই। যাহা হউক, নায়ক শ্রীমান্ নিশীথের সহিত সুনন্দার বহুকাল পরে আবার একবার দেখা হয় গয়ায়—প্রেতযোনী প্রাপ্ত হইয়া পিণ্ডগ্রহণ করিবার কালে নয়—সশরীরে। এবং সুনন্দার নিকট সে প্রেমও .নিবেদন করে। কিন্তু সুনন্দা তাহাকে প্রশ্রয় দেয় না; কৌশলে তাহাকে বিবাহিত স্ত্রীর নিকট পাঠাইয়া দেয় ও নিশীথ স্ত্রীকে "আবেগ ও আগ্রহে" বক্ষে টানিয়া লয়। ইহার পর আর কিছু না ঘটিবারই কথা; বোধ হয়, ঘটেও নাই। গল্পের প্লটটি ভাল।

গয়ায় সুনন্দা ও নিশীথের কথোপকথন কালে সুনন্দা বলিল,—

"মিস্ মেয়োর মাদার ইণ্ডিয়া পড়েছ, নিশীথদা?"

"পড়েছি, কেন?"

"পড়ে কি তোমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে ওঠে নি? * * একটা জাতি কেমন কোরে এত দুর্ব্বল হতে পারে, যে এমন ঘৃণ্য অপবাদ সব নির্ব্বিবাদে হজম কোরে নিচ্ছে?"

"কিন্তু মিস্ মেয়ো অনেক সত্য বলেছেন। * *"

"মুখের কথা কাড়িয়া সিংহীর ন্যায় গ্রীবা বক্র করিয়া সুনন্দা বলিল, "সত্য? একে তুমি সত্য বল্‌তে চাও? *"

"কিন্তু কি করতে চাও তুমি?"

"কি করতে চাই আমি? * * আমার মনে হয়, সংস্কার চাই, আমাদের জাতীয় জীবনে যত সব গ্লানি পুঞ্জীভূত হয়েছে, তাদের সমূলে উৎপাটন করতে হবে। দৈন্য যখন থাকবে না, তখনই জাতি সামর্থ্য লাভ করবে। তখনই স্বরাজ আসবে।"

এই উক্তির তাৎপর্য্য বোঝা গেল না। লেখক কি প্রকারান্তরে সুনন্দার মুখ দিয়া মিস্ মেয়োর কথাগুলির সত্যতা স্বীকার করাইয়া লইতে চাহেন? নতুবা সে "পুঞ্জীভূত গ্লানি" দূর করিয়া "সংস্কার" চাহিবে কেন?

ইহার উত্তরে নিশীথ বলিল, "না, ঐটে তোমার মস্ত ভুল। ও বাঁধা বুলির কোন মূল্য নেই। স্বাধীন জাতির জীবনধারা যেন তাজা নদী, আপন প্রয়োজনে সে খাত্ কেটে উল্লাসে বসে যায়। আবর্জ্জনা জম্‌তে পায় না। পরাধীন যারা, তারা মরা নদীর মত। তাদের কোন আশা আছে কি?"

ইহাও অবশ্য আর এক পক্ষের "বাঁধাবুলি।" কিন্তু সুনন্দা পরাধীন জাতিরও উন্নতির কথা বলিতেছিল। উত্তরটা অবান্তর।

দ্বিতীয় গল্পটি "লিটারারী কনফারেন্স"—লিখিয়াছেন বাংলার প্রখ্যাত Literator শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়। গল্পটি বড় সরল। পাঠ করিয়া আমরা হাস্যসম্বরণ করিতে পারি নাই। লেখক বরাবরই রসিক;—বক্ষ্যমান গল্পটিতে তাঁহার স্বাভাবিক ভাঁড়ামীর পরিচয় দিয়া নায়ক কালীপদকে তিনি হাস্যাস্পদ করিয়াছেন।

কাশীপদ লোকটা এইরূপ গল্পের মত মূল্যবান (যাহার বিনিময়ে অর্থাগম হয়) সাহিত্য-সৃষ্টি করে না, লেখে স্কুলের পাঠ্য পুস্তক। তবুও সে নিজেকে ভাবে সাহিত্যিক! দুর্দ্দৈব সন্দেহ নাই। তাহার প্রধান সহায় ছিল, ট্রান্স-গ্যাল্পেটিক পাবলিশিং সিণ্ডিকেটের স্বত্বাধিকারী শ্রীমদন-গোপাল গঙ্গোপাধ্যায়। পাব্‌লিশারের কৃপায় যেমন অনেক গ্রন্থকারের অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান ও পথে-বিপথে অসময়ে কিঞ্চিৎ সাহায্য হয়, কাশীপদরও তাহা হইত। এ কারণ সে মদনগোপালের প্রতি কৃতজ্ঞ ছিল। আর গ্রন্থকারের স্কন্ধে আরোহণ করিয়া যেমন বিস্তর পাব্‌লিশার সংসার দরিয়ায় পাড়ি জমায়, মদনগোপালও সেইরূপ কাশীপদকে বাহনরূপে নিজ ব্যবহারে লাগাইত এবং তাহাকে একটু স্নেহও করিত। অতএব বুঝা যাইতেছে, উভয়ের সম্বন্ধ ছিল, নলচে ও খোলের মত। চুঁচুড়ায় একবার লিটারারী কনফারেন্স হয়। একই মনোবৃত্তির ফেরে পড়িয়া উভয়ে কনফারেন্সে গিয়া উঠে এবং কনফারেন্স শেষ হইলেও মদনগোপাল চুঁচুড়ার প্রসিদ্ধ উকিল তাহার বন্ধু লালবিহারী বাবুর গৃহে মাসখানেক থাকিয়া গেল।

কাশীপদও রহিয়া যায়। কাশীপদ লোকটা ছিল বিপত্নীক। একটু বয়সও হইয়াছিল। বর্ণনা পড়িয়া মনে হয়, প্রৌঢ়তো বটেই। কিন্তু সাহিত্যিক, অ-সাহিত্যিক সকল শ্রেণীর মধ্যেই দুই চারজন তরুণ-প্রৌঢ় আছে অর্থাৎ যে কাঁটাল পাকিয়াও ইঁচোড়ত্ব ছাড় না। কাশীপদও হইয়া উঠিয়াছিল তেমনি তাহার মুখভরা গোঁফ-দাড়ি; মাথার মধ্যস্থলে ক্ষুদ্র "বিঁড়ের" আকারে একটু টাকও ছিল কিনা ঠিক বুঝা যায় না। বোধ হয় ছিল। আর ঘরে ছিল একটী ছেলে ও মেয়ে। ছেলেটি ম্যাট্রিক পাশ করিয়াছিল। মেয়েটি পড়িত কি গান গাহিত লেখকই জানেন।

লালবিহারীবাবুর গৃহে ছেলে-পুলের হাঙ্গাম ছিল না। অত পয়সা ভোগ করিতেছিলেন কেবল তিনি, তাঁহার স্ত্রী ও শ্যালক-পুত্রী "তরুণী, কিশোরী," মলিনা। মনে রাখিবেন, "তরুণী, কিশোরী।" উকীলবাবুর আবাস-গৃহখানি অতি প্রকাণ্ড ও সুসজ্জিত। এই দুই অতিথি বেশ সুখেই সেখানে কালকর্ত্তন করিতেছিল; কিন্তু গোল বাধাইল, কাশীপদ। "তরুণী, কিশোরী" ও "রূপের শিখা" মলিনাকে দেখিয়া তাহার মনে প্রেম দেখা দিল। কারণ বশতঃ লালবিহারী বাবুর স্ত্রী কাশীপদকে কিঞ্চিৎ স্নেহ করিতেন। কাশীপদ তাঁহার নিকট মলিনাকে বিবাহের প্রস্তাব করিয়া ফেলে। লালবিহারী বাবুর স্ত্রীও তাহা মঞ্জুর করিতে দ্বিধা করেন না। কিন্তু মলিনা তো কথাটা শুনিয়া অবধি কাঁদিয়া কাটিয়া সারা। এমন কি ভাবিয়া ভাবিয়া বেচারা দিনকয়েকের মধ্যেই শুকাইয়া গেল। হয়ত শেষ অবধি মলিনার সহিত এই বিপত্নীক, তরুণ-প্রৌঢ় কাশীপদর বিবাহও হইত; ফলে মলিনার জীবনে দুঃখের অন্ত থাকিত না। কিন্তু তাহাকে রক্ষা করিল, লালবিহারীবাবুর ভাগিনেয় সুষেণ। সে অবশ্য নব্য ছোকরা। পাঠক ভাবিতেছেন হয়ত মলিনাকে বিবাহ করিয়া? তাহা নয়, কাশীপদকে clown সাজাইয়া, সে কাশীপদর দাড়ি-গোঁফ কামাইয়া দিয়া তরুণ সাজাইল; গজল গাওয়াইল হাস্যাস্পদ ও উন্মাদ প্রতিপন্ন করিল।

গল্পটি এইখানেই শেষ হইয়াছে। তাই তেমন তৃপ্তি পাওয়া গেল না। আমাদের মনে হয়, "তরুণী, কিশোরী" মলিনা রাণীকে দিয়া তাহার সুচারু টাকে গুটি কয়েক চাঁটি মারিয়া পরিশেষে গাঢ় গঁদের আঠা দিয়া তাহার উপর একখণ্ড কাগজের তাপ্পী সাঁটিয়া—"বিপত্নীকের আর বিবাহ করা উচিত নয়"—কথা কয়টি লিখিয়া দিলে শোভা ও সন্দেশ দুই-ই হইত।

শুনিলাম, আমাদের ভুতনাথ ত্রিপাঠি জাকোবাবাদ হইতে অনুরূপ একটী গল্প পাঠাইয়াছে; নাম "সাহিত্যের অক্টোপাস।" ছাপা হইবার পূর্ব্বে তাহা একবার পড়িয়া দেখিবার কৌতুহল ছিল। কিন্তু সম্পাদক মহাশয় এই অমূল্য (ইহার বিনিময়ে সে মূল্য পাইবে না) পাণ্ডুলিপিখানি কোথায় যে সরাইয়া রাখিয়াছেন, তিনিই জানেন। গোপনে অফিসের সমস্ত দপ্তর ঘাঁটিয়াছি, তবুও পাই নাই। এরূপ সতর্কতার কারণও বুঝিলাম না। তবে শোনা গেল, রৌদ্রের প্রকোপ কমিলে পুষ্পপাত্রের পাঠক-পাঠিকাগণকে তিনি সেটি উপহার দিবেন বলিয়া মনস্থ করিয়াছেন।

তৃতীয় গল্প শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসুর "পুরস্কার"—খাসা হইয়াছে।

আর চতুর্থ গল্প "দান-প্রতিদান"—লেখক শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—বিদেশী গল্প।

এ সংখ্যায় রঙিন্ ছবি দেখা গেল, তিনখানি। প্রথম ছবি, শ্রীসতীশচন্দ্র সিংহের "বেলা যে পড়ে এল; জলকে চল্!" রবীন্দ্রনাথ দেশে ফিরিয়াছেন। এই ছবি ও তাঁহার কবিতা মিলাইয়া দেখিয়া তিনি পরম খুশী হইয়া বসুমতীর রসবোধের তারিফ করিবেন, সন্দেহ নাই।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় ছবি ভাল লাগে নাই।

আর দেখা গেল, জহরলাল, আনসারী ও মহাত্মা গান্ধীর একবর্ণ ছবি। শুনিয়াছিলাম, এই সকল মহাপ্রাণ দেশনায়কগণের ছবি ছাপা নিষিদ্ধ হইয়াছে। কথাটা তবে সত্য নয়?

* * *

১৩৩৯ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা ভারতবর্ষে—

প্রথম গল্পটি লিখিয়াছেন শ্রীরবীন্দ্রলাল রায় বি-এস সি। নাম—"সতী"। গল্পটির তাৎপর্য্য,—লোকে কুল-বধূর সতীত্ব বিচার করে তাহার বাহিরের কাজকর্ম্ম দিয়া,

অন্তরে সে সতী নাও হইতে পারে। অতএব—? কিন্তু লেখক ঠিক কোন্ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন বুঝা গেল না।

গল্পটি বেশ সুখপাঠ্য; ভাষা ঝরঝরে। লেখকের বলিবার ভঙ্গী অতি সরল। আর যেখানে তিনি তরুণী বৌদি অনীতা ও যুবক দেবর নিশীথের মধ্যে প্রেমাভিনয় ঘটাইয়াছেন, সেখানটি বার বার পাঠ করিতে ইচ্ছা হয়। কেননা, এমন রস জীবনে বা গল্পে সচরাচর ঘটিতে পায় না। রোমান্সের প্রতি মানুষের আন্তরিক লোভ। কিন্তু আমাদের দেশের জল-বায়ুর গুণে তাহা অতি বিরল হইয়াছিল। অধুনা বিলাতীর প্রভাবে এই খেদ দূর করিবার যেন সুযোগ গঠিত হইয়া উঠিতেছে।

এই প্রসঙ্গে একটী কথা মনে পড়িল এবং "প্রবাসীর" পৃষ্ঠাতেও যেন তাহা পাঠ করিয়াছি, যে, যে-সকল চিত্র ও রচনায় মনের বৈক্লব্য ঘটায় অর্থাৎ যেগুলির নৈতিক স্বাস্থ্যহানির কারণ হইয়া উঠে, তাহার প্রসার ও প্রভাব নষ্ট করিবার জন্য একটী সঙ্ঘ গঠিত হইয়াছে। ইহাঁরা কি ভাবে কাজ করিবেন বুঝিলাম না; তবে দেশের জন কয়েক গণ্যমান্য ব্যক্তির নাম দেখিয়া মনে হইয়াছে, একটা "জবর" কিছু হইবে। ভারতবর্ষ সম্পাদক রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুরও তাঁহাদের অন্যতম। বস্তুতঃ সুনীতির খবরদারীতে যে রসের পাক হয়, তাহা সকল সময় কেমন এবং রসস্রষ্টাকে সুনীতির কোন্ কোন্ সূত্রগুলি স্মরণ রাখিয়া রসসৃষ্টি করিতে হইবে ও তাহা আদৌ সম্ভবপর কি না ইত্যাদি কথা বর্ত্তমানে আমাদের আলোচ্য নয়। মন হিসাবে সামান্য কারণেও তাহার বৈক্লব্য ঘটা সম্ভব। আর, তাহার স্থায়ীত্ব কাল কম বা বেশীও হইতে পারে। কোন শিল্পীই হয়ত চাহেন না, সমাজে বা জাতির জীবনে নৈতিক স্বাস্থ্যের হানি ঘটুক। বেশী কথা কি? স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও কিছুকালপূর্ব্বে "যোগাযোগ" রচনা করিয়াছেন; তাহার মধ্যে দেবর ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃজায়ার ক্রিয়াকলাপের যে চিত্র আছে, তাহা বক্ষ্যমাণ গল্পটির নিশীথ-অভিসারকেও হার মানায়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে দুর্নীতি প্রচার করিতেছেন, এ কলঙ্ক তাঁহার শত্রুপক্ষ হইতেও কেহ দিবেন না। এখন আমাদের জিজ্ঞাস্য এই, যে, বক্ষ্যমান গল্পটি কোন্ পর্য্যয়ের? অনীতার নিশীথ-অভিসার সকলের বিশেষ করিয়া সুনীতি সঙ্ঘের যে রুচিসঙ্গত হইবে না, তাহা বলাই বাহুল্য। অন্ততঃ আমরা ইহার পক্ষপাতী নহি;—না দেওয়াই উচিত ছিল। কিন্তু ভারতবর্ষ সম্পাদক এটিকে তাঁহার কাগজে মুদ্রিত করায় একটা কথা আমাদের মনে হয়, যে, সঙ্ঘটির ভিত্তি দৃঢ় নয় এবং উহার সহিত সকল সভ্যেরই যে আন্তরিক যোগ আছে, তাহাও নয়। আমাদের এ বিচিত্র দেশ। বক্তা গলা বাজাইয়া সভাস্থল প্রকম্পিত করেন, ঘরে আসিলে তাহাকে আর চেনা যায় না; হুটবিহারী হইয়া পড়েন ললিতমোহন। চমকটা নামে ও "কামে" দুদিকেই!

দ্বিতীয় গল্প অঃ কঃ শ্রীসত্যরঞ্জন সেন এম-এ ইঁর "মুখের কথা"। মন্দ নয়; কেবল "মুখের কথায়" বীণা তাহার দূর সম্পর্কীয়া ভগ্নী উষার সহিত তাহার স্বামীর বিবাহ দিয়া "বোন্ সতীনের" খেদ মিটাইল। অবশ্য এই সঙ্গে আর একটী প্রবল ঘটনারও সমাবেশ আছে।

তৃতীয়টি শ্রীধূর্জ্জটী অধিকারীর "যাযাবর"—একখানি চিত্র। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, মার্জ্জিত, নিখুঁৎ ও জীবন্ত। আমাদের পাঠকগণের মধ্যে রচনাটি কেহ পাঠ না করিয়া থাকিলে তাঁহাকে পাঠ করিতে অনুরোধ করি। রস পাইবেন।

এক যাযাবর বলিতেছেন—"বাংলা পরিভাষা নিয়ে সাহিত্যিকদের প্রসবব্যথা উপস্থিত হয়েছে।" যদি এই সঙ্কিক্ষণে তিনি গুটি কয়েক ধাত্রী লইয়া তাঁহাদের সূতিকাগারের দ্বারে গিয়া উপস্থিত হয়েন তো ভদ্রলোকদের বড় উপকার হয়। বাংলা ভাষাও বাঁচে, তিনিও দু' পয়সা করিয়া লইতে পারেন।

চতুর্থ গল্প শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর "যথাস্থানে (?)" বেশ লাগিয়াছে।

এ সংখ্যায় রঙিন্ ছবি দেখা গেল চারখানি। দ্বিতীয় শ্রীরসিকলাল পারিকের "ভিক্ষু"—সুন্দর লাগিয়াছে। তৃতীয় ছবি শ্রীপ্রভাত নিয়োগীর চাষার বাড়ী"—ভাবের ব্যঞ্জনায় বেশ।

পরলোকে বিপিনচন্দ্র :—

বাংলার ভাগ্যাকাশ হইতে একটী জ্যোতিষ্কের অন্তর্দ্ধান ঘটিয়াছে। শ্রীযুত বিপিনচন্দ্র স্বদেশীযুগের বীর-নেতা। তাহার জ্বালাময়ী ভাষায় বাংলার তথা ভারতের নূতন ইতিহাস সুরু হয়। কর্ম্মী বিপিনচন্দ্র বাগ্মীতায় সুরেন্দ্র নাথের শিষ্য হইলেও বাংলা বক্তৃতায় তাঁহাকে অনেক পশ্চাতে রাখিয়া দিয়াছিলেন, ইংরেজী বক্তৃতাতেও সমান ধরণের ছিলেন। অরবিন্দের সহচর হইলেও মৌলিকতা কোনদিনই তাঁহাকে পরিত্যাগ করে নাই। ধর্ম্মে ব্রাহ্ম হইলেও উত্তর জীবনে তিনি বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া উহার প্রচার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। দেশপূজ্য দেশবন্ধু তাঁহার অনুচর ও ভক্ত ছিলেন। 'নারায়ণ' কাগজে বিপিনচন্দ্র বৈষ্ণব ধর্ম্মের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা প্রচার করেন। বর্ত্তমান বাংলা তাঁহার নিকট বিশেষ ঋণী। তিনিই প্রথম বাংলা ভাষায় বক্তৃতা প্রদান করিবার পথ প্রদর্শন করেন। তিনিই বাংলায় প্রথম রাজনৈতিক গবেষণা ও দর্শন শাস্ত্র লিপিবদ্ধ করেন। ভবিষ্যৎ ইতিহাসে তাঁহার নাম নানাস্থানে উজ্জ্বল ভাবে খোদিত থাকিবে।

পরলোকে মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত :—

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত রচয়িতাও ৭৮ বৎসর বয়সে দেহ রক্ষা করিয়াছেন। যখন সমস্ত দেশ নাস্তিকতায় ভরিয়া গিয়াছিল তখন নরেন দত্ত ও মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া তাঁহার বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম্ম প্রচার করিবার ভার গ্রহণ করেন। মহাত্মা নরেন দত্ত বিবেকানন্দ নাম গ্রহণ করিয়া সুদূর আমেরিকায় তাঁহার গুরুর বাণী প্রচার করেন। শ্রীম কথিতের মহেন্দ্রনাথ স্বদেশবাসীকে ভগবানের অমূল্য বাণী জীবন্ত করিয়া উপহার দেন। যে কারণে লুক, মাথু প্রভৃতি পৃথিবীর ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া আছেন, ইঁহারও তাহাই থাকা উচিত। শ্রীম কথিতের লেখক ভাষা সাহিত্যের মধ্য দিয়া বাংলাকে এক মহৎ দান করিয়া গিয়াছেন।

ফেডারল্ ফাইনান্স কমিটী

ফেডারল ফাইনান্স কমিটী ও ফেডারল ষ্ট্রকচার কমিটী, উভয় কমিটীর রিপোর্টই বাহির হইয়া গেল। কোন রিপোর্ট পড়িয়াই আমরা সুখী হইতে পারিলাম না। ফাইনান্স কমিটী নূতন কর বসাইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া অবশেষে তামাক ও দেশলাইএর উপর নূতন ট্যাক্স বসাইবার পরামর্শ প্রদান করিয়াছেন। তামাক ও দেশলাই এই দুইটীই আমাদের নূতন কুটীর শিল্প। বিড়ির কারখানাগুলিতে কত 'বেকার' অন্নের সংস্থান করিয়া লইতেছে তাহা অনেকেই অবগত আছেন। দেশী দেশলাই ক্রমশঃ জনপ্রিয় হইয়া উঠিতেছে। এই অবস্থায় এই দুইটী শিল্পের উপর নূতন কর স্থাপন করিলে বাংলার বিশেষ ক্ষতি হইবে, এই কথাটা যে কেন আমাদের নেতৃগণ ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতেছেন না তাহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। কাঁচা তামাকের আড়ৎগুলিতে মোট মূল্যের উপর কর স্থাপন করা হইবে এইরূপ প্রস্তাব করা হইতেছে। এইরূপ করিলে কাঁচা তামাকের মূল্য বৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী এবং তাহা হইলে বিড়ি প্রভৃতির দাম বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। তখন বিদেশ হইতে আগত অল্প মূল্যের সিগারেট কি অবাধে প্রচলিত হইবে না? যাঁহারা দার্জ্জিলিং অঞ্চলে গমন করিয়াছেন তাঁহারা নিশ্চয়ই

দেখিয়া থাকিবেন যে তথাকার পাহাড়ীরা অল্প মূল্যের সিগারেট কিরূপ ভীষণ মাত্রায় ব্যবহার করে। বিড়ির প্রচলন তথায় নাই বলিলেও অত্যুক্তি করা হয় না। নূতন কর বসাইয়া তামাকের দাম অস্বাভাবিকরূপে বাড়াইয়া দিলে আমাদের বিড়ি কখনই ঐ সমস্ত অল্প মূল্যের সিগারেটের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে সক্ষম হইবে না।

তাহার পর দেশলাইএর কথা ব্যাপকভাবে ধরিলে একথা নিশ্চয়ই বলিতে হইবে যে এই নূতন শিল্পটীর মস্তকে নূতন কর স্থাপন করিলে, আঁতুড়ে শিশু হত্যার ন্যায়, অতি শৈশবাবস্থায় ইহার বিনাশ সাধন করা হইবে। সুইডেন প্রভৃতির দেশলাই শিল্প বিরাট কারখানায় প্রস্তুত হইয়া বিরাট সঙ্ঘ কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া থাকে। দেশলাই প্রস্তুত করিবার কাষ্ঠ ও তথায় প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। আমাদের সদ্যজাত এই শিল্পটী কুটীর শিল্প বলিলেও অত্যুক্তি করা হয় না। ইহার পিছনে কোন প্রকার অর্থবল বা সঙ্ঘ নাই। ভীষণ অধ্যবসায় বলে ক্রমশঃ ক্রমশঃ আপনার পণ্যক্ষেত্র রচনা করিয়া লইতেছে। এই অবস্থায় এই শিল্পটীর উপর ট্যাক্স বসাইলে উহার দুর্গতি যে কি হইবে তাহা কি আর বলিতে হইবে।

আয় বৃদ্ধিই যদি সরকারের প্রকৃত লক্ষ্য হয় তাহা হইলে এই সমস্ত শিল্পের উপর ট্যাক্স বসানর সহিত বিদেশ হইতে আগত দেশলাই ও সিগারেটের উপর যে কর ধার্য্য আছে তাহার উপর এই নূতন করের মাত্রাটাও যোগ করিয়া দিতে হয়, নতুবা আয় বৃদ্ধি ত হইবে না বরং আমাদের দুইটী মূল্যবান শিল্প নষ্ট হইয়া যাইবে। তাহা করিলেও জনসাধারণের এই কর বৃদ্ধিতে বিশেষ অসুবিধাই হইবে।

ফাইনান্স কমিটী বাংলার জন্য একটু বিশেষ বন্দোবস্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু এই প্রস্তাবিত ব্যবস্থায় মৌলিকত্ব কিছুই নাই। গত বারের মেষ্টন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আন্দোলন করিবার সময় জনসাধারণ যে সমস্ত নূতন উপায়ের ইঙ্গিত করিয়াছিল তাহারই দুই একটী কার্য্যে পরিণত করিবার একটু আগ্রহ প্রকাশ করা হইয়াছে মাত্র। গতবারেও একটী নির্দ্দিষ্ট মাত্রার উপর আয়কর প্রদেশকে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে বলা হইয়াছিল, কিন্তু দুঃখের বিষয় যে সেই নির্দ্দিষ্ট মাত্রা কখনও হয় নাই। তাহার কারণ মেষ্টন সাহেব যখন তাঁহার ব্যবস্থা প্রণয়ন করেন, তখন ভারতের তথা সমস্ত পৃথিবীর ব্যবসা-বাণিজ্য ভীষণ উজান বহিয়া যাইতেছিল। কাজেই মেষ্টন সাহেব আশা করিয়াছিলেন যে তাঁহারা যে নির্দ্দিষ্ট মাত্রা নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন তাহা অল্পদিনের মধ্যেই আসিয়া পড়িবে। কিন্তু মানুষের সব আশাই ভগবান পূর্ণ করেন না। অচিরেই ব্যবসা-বাণিজ্যে ভীষণ দুরবস্থা দেখা দিল। কোম্পানীর পর কোম্পানী উঠিয়া যাইতে লাগিল। কাজেই মেষ্টন নির্দ্দেশ আবুহোসেনী স্বপ্নই রহিয়া যায়। আয়কর প্রদেশগুলিকে বণ্টন করিয়া দিলে বাংলার ঘাটতি পূর্ণ হয় না। অনেকেই বলেন ইহার কারণ বাংলার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। বেহার ও যুক্ত-প্রদেশেও অনেকস্থলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের উপর সমস্ত বাংলার সামাজিক ভিত্তি সংস্থাপিত। কাজেই নেহাৎ 'ভবঘুরের' মত যাঁহারা এইরূপ মত প্রকাশ করেন তাঁহারা তাঁহাদের অনেকটা অজ্ঞতাই প্রকাশিত করিয়া থাকেন। আসল কথা বাংলা ও বোম্বাই শিল্প-প্রধান প্রদেশ হইয়া উঠিয়াছে। বাংলা আবার সমস্ত ভারতের প্রধান পণ্য-ক্ষেত্র। কাজেই আয়করটা বাংলার নিজস্ব হওয়া উচিত। কেন্দ্রীয় সরকারকে সাহায্য করিবার জন্য প্রাদেশিক contribution ব্যবস্থা অন্যান্য প্রদেশগুলির পক্ষে প্রযোজ্য হইলেও বাংলায় তাহা একেবারেই অস্বাভাবিক। যখন নূতন শাসন-পদ্ধতি লিপিবদ্ধ হইবে তখন নেতাগণকে এই বিষয়টী লইয়া একটু নাড়াচাড়া করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি।

ফেডারল ষ্ট্রাকচ্যার কমিটী

লোথিয়ান কমিটী বা ষ্ট্রাকচ্যার কমিটীর রিপোর্টে অনেকেই মতামত প্রকাশ করিয়াছেন। ইংরাজ সংবাদিকগণ বলেন যে প্রধান মন্ত্রী মহাশয় প্রাদেশিক সমস্যা মীমাংসা উহার নিরীকরণীয় বিষয়গুলির মধ্যে এক

নির্দ্ধারিত না করিয়া দেওয়ায় উহার সিদ্ধান্ত লইয়া কোন ফলোদয়ই হইবে না। এই কমিটী জনমাত্রকেই ভোট দিবার ব্যবস্থা না করিলেও, সাধারণের ভোট দিবার ক্ষমতা বৃদ্ধির সুপারিশ করিয়াছেন। আমরা দেখিয়া আনন্দিত হইলাম যে বাংলা সরকার হইতে Group representation বা যৌথ ভোটদান করিবার যে প্রস্তাব করা হইয়াছিল তাহা নাকচ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই অদ্ভুত প্রস্তাব এই বিংশ শতাব্দীতে বাস্তবিকই হাস্যজনক। প্রায় সমস্ত প্রাদেশিক সরকারই লোথিয়ান কমিটীর সহিত একমত হইয়া ভোটার সংখ্যা কিরূপে বৃদ্ধি করিতে পারা যায় তাহার এক একটী তালিকা দিয়াছেন। বাংলার সরকারই খালি যৌথ ভোটাধিকার প্রস্তাব তুলিয়া বর্ত্তমানের ক্ষমতাও হ্রাস করিয়া অভিজাতদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। এইরূপ করিবার একমাত্র কারণ মনটাগু শাসন প্রণালী বাংলায় ব্যর্থ হইয়াছে। এবং উহা ব্যর্থ হইয়াছে বলিয়াই কতকগুলি দায়িত্ব জ্ঞানহীন ব্যক্তি অনুমান করেন যে অভিজাতদের হস্তে শাসন প্রণালী রাখিয়া দিলেই বাংলার শাসনদণ্ড অপ্রতিহত থাকিবে। একথা সত্য যে নূতন শাসন প্রণালী প্রবর্ত্তিত হওয়া হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত যাঁহারা বাংলার শাসন পরিষদে বসিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে দু'একজন ব্যতীত সকলেই অভিজাত। এই অভিজাত শাসিত বঙ্গ নূতন বিধানে সারা ভারতের অন্যান্য প্রদেশের সকলেরই পশ্চাতে পড়িয়া গিয়াছে। নূতন বিধানের সাহায্যে নূতন ব্যবস্থা করিতে গেলে সনাতনী অভিজাত তাহার ধারক ও বাহক হইলে অধঃপতনই ঘটে, ইহাই পৃথিবীর ইতিহাসের সার সত্য। আমরা নূতন কর্ম্মীকে নূতন আদর্শে নূতন শাসনপ্রণালী চালাইতে দেখিতে চাহি। কাজেই এস্থলে যৌথ নির্ব্বাচন চালাইলে বাংলার সুনাম বাড়িবে না।

৩৩ লক্ষ ভোটার হইতে ভোটার সংখ্যা ৪ কোটী দাঁড়াইলে ভোট সংগ্রহে মুস্কিল হইবে কিনা প্রশ্ন উঠিতে পারে কিন্তু ভোট সংগ্রহে খানিকটা মুস্কিল হইলেও জনসাধারণ বুঝিতে পারিবে দেশ তাহাদেরই এবং তাহাদেরই সুখ-সুবিধার জন্য উহা শাসিত হওয়া উচিত। এখনকার ব্যবস্থা অনুযায়ী শুধু রায়ৎ ও জমিদারই ভোট দিবার অধিকারী। মজুরদের জন্য সরকার কর্ত্তৃক মনোনীত সদস্য থাকিলেও তাহাদের ভোটাধিকার নাই বলিলেও চলে। রমণীগণকে কোন কোন প্রদেশে ভোট দিবার অধিকার দিলেও উক্ত প্রথায় এখনও ব্যাপকতা বা আন্তরিকতা দেখা দেয় নাই। ছোট ব্যবসাদার ও গৃহস্থ একেবারেই 'এক ঘরে' হইয়া দেশে বাস করিতেছে। এই কল-কারখানার দিনে প্রাচীন সনাতনী ব্যবস্থা চলিবে কেন? জমিদার রায়ৎ ছাড়াও অন্যান্য শ্রেণীর অস্তিত্ব স্বীকার না করিলে যে সমাজে বিদ্রোহ উপস্থিত হইবে। সুখের বিষয় যে লোথিয়ান কমিটী এই সার সত্যটী উপলব্ধি করিয়া বাংলা সরকার কর্ত্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাব নাকচ করিয়া দিয়াছেন।

মিউনিসিপ্যাল বিল :—

গত মে মাসে প্রায় পনের দিন ধরিয়া দার্জ্জিলিং শৈলশিখরে বঙ্গীয় মিউনিসিপাল বিলের সিলেক্ট কমিটীর অধিবেশন বসিয়াছিল। আমরা প্রথমে শুনিয়াছিলাম যে উক্ত অধিবেশনের ফলাফল সম্প্রতি সাধারণকে জানান হইবে না। তাহার পর দেখা গেল যে দিনের পর দিন উহার কার্য্য বিবরণী প্রায় সমস্ত দৈনিক গুলিতেই প্রকাশ হইতে থাকে। কাজেই প্রস্তাবিত বিষয়গুলি সাধারণের সমালোচনার বস্তু হইয়া দাঁড়ায়। স্বায়ত্ত-শাসনের মন্ত্রী মহাশয় এইজন্যই অনেকটা বিব্রত হইয়া স্বয়ং একটা বিবৃতি এসোসিয়েটেড্ প্রেস মারফৎ প্রকাশ করিয়াছেন। কাজেই ব্যাপারটা এখন সাধারণের সম্পত্তি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ১৯২২ সালে স্বর্গীয় স্যর সুরেন্দ্রনাথ এই বিলটী প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ১৯২৩ সালে তিনি পুনর্ব্বার নির্ব্বাচিত হইয়া মন্ত্রী হইতে পারিলে সেই সময়েই বিলটী পাশ হইয়া যাইত। কিন্তু বিলটীতে অনেক অদল-বদল করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। প্রস্তাবিত বিলে কমিশনারের সমস্ত ক্ষমতা রহিত করিয়া মন্ত্রীর উপর তাবৎ ভার অর্পণ করিবার প্রস্তাবই যে খুব ডেমোক্রাটিক তাহা নয়। মন্ত্রী যদি সরকারী মন্ত্রী অর্থাৎ প্রাদেশিক স্বায়ত্ব শাসন পাইলেও যদি বর্ত্তমান অবস্থার বিশেষ পরিবর্ত্তন না হয় তবে মন্ত্রী মহাশয়

মিউনিসিপ্যালিটিগুলির একমাত্র ভাগ্য-নিয়ন্তা হইলেই তাহার এমন কি জনপ্রিয়তার কারণ ঘটিবে? পৃথিবীর সভ্যদেশ সমূহে যে সমস্ত মিউনিসিপালিটী আছে তাহারা আপনাদের আভ্যন্তরিক ব্যপারে একেবারে স্বাধীন। কেন্দ্রীয় শাসন-পরিষদ অর্থ ও পরামর্শ দিয়া তাহাদিগকে সাহায্য করেন মাত্র। এই জন্যই লর্ড মেয়র জনপূজ্য, অনেক সময়ে তাঁহার নগরীতে তাঁহার প্রাপ্য সম্মান প্রধান মন্ত্রীর সম্মানকেও ছাপাইয়া চলে। এই আদর্শেই চালিত হইয়া স্যর সুরেন্দ্রনাথ কলিকাতা করপোরেশনকে বাংলার সরকারের দপ্তরখানা হইতে মুক্ত করিয়া দেন। তিনি বাঁচিয়া থাকিলে এই ব্যবস্থাই হয়ত সর্ব্বত্র প্রচলিত হইত। প্রস্তাবিত বিলে ভোটার সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার ব্যবস্থা করা হইতেছে। ইহা নিশ্চয়ই আনন্দ সংবাদ। যাহাতে সমস্ত নাগরিকই ভোটার হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। মিউনিসি-পালিটী গুলির আয় বৃদ্ধি করিবার জন্য তাহাদিগকে ট্রেড লাইসেন্স দিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে। কিন্তু এখানে একটু মুস্কিল হইবে না কি। এক একটী জেলায় একই ইনসিওরেন্স বা ব্যাঙ্কিং কোম্পানীর অনেকগুলি শাখা উক্ত জেলার মধ্যে অবস্থিত ভিন্ন ভিন্ন মিউনিসিপালিটীর এলাকায় অবস্থিত হইলে তাহাদিগকে নূতন আইন অনুযায়ী প্রত্যেক স্থলেই ট্রেড লাইসেন্স দিতে হইবে ইহাতে তাহাদের ভীষণ অর্থহানি হইবে। বিলটী যখন আইন পরিষদের সম্মুখে আসিবে তখন সদস্যগণ যেন এই বিষয়ে একটু মনোনিবেশ করেন।

ইউরোপ ও আমেরিকা

ইউরোপ ও আমেরিকা একটা মীমাংসার মধ্যে আসিতে পারিল না। অস্ত্র-নিয়ন্ত্রণের জন্য যতগুলি অধি-বেশন হইলে জাতীয় স্বার্থ লইয়া জাতিবৃন্দ পরস্পর বিব্রত হইয়া পড়ায় তাহা একেবারে ব্যর্থ হইয়া গেল। লুসেনে Reparation লইয়া অনেকগুলি বৈঠক বসিয়াছিল, উহাতেও কোন ফলোদয় হইল না। আমেরিকা এখন স্পষ্টই বলিয়া দিতেছে যে সে ইউরোপের নিকট তাহার ঋণ কড়া ক্রান্তিতে বুঝিয়া লইবে। ফ্রান্স বর্ত্তমান জার্ম্মানির অবস্থা দেখিয়া ভীষণ ভীত হইয়া পড়িয়াছে বলিয়াই মনে হয়। সম্প্রতি 'নাজী' গণের আবির্ভাবের সহিত জার্ম্মানিতে একদল ফ্যাসিষ্ট দেখা দিয়াছে। তাহারা মুসলিনীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া তথায় Dictatorship বা একজনের একাধিপত্য ঘোষণা করিয়াছে। রাশিয়াও ক্রমশঃ সবল হইয়া উঠিতেছে। বলকানের অবস্থা ভীষণ তথায় যে সমস্ত অর্থ নিয়োজিত হইয়াছে উহা হইতে কোন প্রকার লাভ আশা করা যাইতে পারিতেছে না। 'নাজী' শাসিত জার্ম্মানি যদি এখনি বলিয়া বসে যে সে আর ক্ষতিপূরণ দিতে পারিবে না তাহা হইলে ফ্রান্সকে নিশ্চয়ই আমেরিকার নিকট নত জানু হইয়া সমর-ঋণের রেহাই ভিক্ষা করিতে হইবে। কতকটা এই উদ্বেগে ব্যস্ত হইয়া ফ্রান্স আমেরিকাকে বেশ স্পষ্ট ভাষায়ই বলিয়া দিয়াছে যে জার্ম্মানি ফ্রান্সকে ক্ষতিপূরণ না দিলে ফ্রান্সও আমেরিকাকে দিতে পারিবে না। ব্যাপারটা যে অবশেষে এইরূপ অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইবে তাহা আমরা পূর্ব্বেই আভাস দিয়া আসিয়াছি। আর্থিক বিপ্লবে পৃথিবী কম্পায়মান, ফ্রান্স ও আমেরিকার মধ্যে যদি সত্যই মনান্তর হয় তাহা হইলে উহার যে কি ফল হইবে তাহা চিন্তা করিতেও ভয় হয়।

ফ্রান্সের প্রেসিডেণ্ট হত্যা

ফ্রান্সের প্রেসিডেণ্টকে হত্যা করা লইয়া পৃথিবীর তাবৎ সভ্য সমাজই বিশেষ বিচলিত হইয়াছেন। ফ্রান্সের প্রেসিডেণ্ট ইতিপূর্ব্বেও নিহত হইয়াছেন—সে তাঁহার স্বদেশ বাসীর হস্তে। এবারকার ইতিহাস নূতন—একজন রাসিয়ান তাঁহাকে হত্যা করিয়াছে, যে হেতু ফ্রান্স রাশিয়ায় বর্ত্তমানে প্রতিষ্ঠিত বলশেভিক সরকারকে সাহায্য করিয়া আসিতেছিলেন, কথাটা পরিষ্কার করিতে গেলে একটু পুরাতন ইতিহাস পুনরালোচনা করিতে হয়। লেনিন, ট্রসকি শাসিত রাশিয়ান সরকার রাশিয়ায় কমিউনিজম স্থাপন করিলে কতকগুলি মধ্যবিত্ত ও অভিজাত ফ্রান্স ও তুরস্কে পলাইয়া আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাঁহাদের সহিত প্রচুর অর্থ ছিল। কামাল তুরস্ক নূতন শাসন প্রচলন করিলে বলশেভিকদের তুষ্টির জন্য [illegible] নির্ব্বাসিত রাশিয়ানগণকে দেশ হইতে বিতাড়িত [illegible] দেন। কাজেই ফ্রান্স ও বিশেষতঃ প্যারী [illegible]

নির্ব্বাসিতদের প্রধান আশ্রয়স্থল ও কর্ম্মক্ষেত্র হইয়া দাঁড়ায়। জারের শাসনকালে তাহাদের যে পদ-মর্য্যাদা ও অর্থবল ছিল ইহারা তাহা কখনই বিস্মৃত হইতে না পারায়, বলশেভিকদের দুর্ব্বল করিবার জন্য পৃথিবীর সভ্যদেশগুলিতে প্রচারক পাঠায়। ইউরোপের তাবৎ সরকারই এতদিন ইহাদিগকে সাহায্য করিয়া আসিতেছিল। সম্প্রতি জেনেভায় রাশিয়ায় সরকারের স্থান হওয়ায় তাহার আন্তজাতিক অস্পৃশ্যতা দূরীভূত হইয়া যাইতেছে। এই দল এই জন্যই বিশে উদ্বেগযুক্ত হইয়া উঠায়, ইউরোপে যাহাতে আবার সমরানল প্রজ্জলিত হয় তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য তোড় জোর করিতেছে। হত্যাকারী ভাবিয়াছিল যে প্রেসিডেণ্টকে হত্যা করিলে নূতন নির্ব্বাচনকালে এমন একজন সাম্রাজ্যবাদী প্রেসিডেণ্ট হইবেন যিনি কমিউনিষ্ট রাশিয়াকে পদদলিত করিবেন। হত্যা সংসাধিত হইল, কিন্তু জাতির মনোভাব পরিবর্ত্তন করা সহজ নহে। নূতন নির্ব্বাচনে সমগ্র ফরাসী জাতি এই দলের উপর বিজাতীয় ঘৃণা প্রদর্শন করিয়াছে।

জার্ম্মানীর শাসন:—

জার্ম্মানির আভ্যন্তরিক গোলযোগের এখনও অবসান হয় নাই। সম্প্রতি খবর আসিয়াছে যে তথায় একাধিপত্য বা Dictatorship ঘোষণা করা হইয়াছে। ব্যাপারটা নিশ্চয়ই গুরুতর। জার্ম্মাণ রাজনৈতিকগণ এখন ধনিক সম্প্রদায়ের মুখপাত্র হিসাবে দেশশাসন করিতেছেন। দেশের শ্রমিকগণ সর্ব্বপ্রকার সুখ-স্বাচ্ছন্দতাকে জন্মের মত বিসর্জ্জন দিতে বাধ্য হইয়াছেন। কাজেই শৃঙ্খলার জন্য Oordinance দরকার। একাধিপত্য তাহারই নিদর্শন। এইরূপ করিলে কতদিন চলিবে?

কাউন্সিল কি ভাঙ্গিবে?

বাংলার শাসন-পরিষদের সদস্যগণ আশা করিয়াছিলেন যে সিমলা হইতে প্রত্যাগমন করিয়াই স্যর জন এণ্ডারসন বর্ত্তমান কাউন্সিল ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইবে কি উহার পরমায়ু বৃদ্ধি করা হইবে সে সম্বন্ধে সরকার পক্ষের মন্তব্য ঘোষণা করিয়া দিবেন। ক্রমশঃ অনেকদিনই অতিবাহিত হইল বঙ্গেশ্বর কোনরূপই মন্তব্য প্রকাশ করিতেছেন না দেখিয়া অনেকেই একটু বিচলিত হইয়া উঠিয়াছেন। আমাদের মনে হয় কাউন্সিলের পরমায়ু বৃদ্ধি করা হইবে কিনা এই বিষয় লইয়া ভারত সরকারের সহিত ভারত সচিবের শলাপরামর্শ চলিতেছে। আইনতঃ আইন পরিষদের কার্য্যকাল সরকার পক্ষ এক বৎসরের অধিককাল বৃদ্ধি করিতে পারেন না। ১৯৩৪ সালের প্রারম্ভেই যদি নব বিধান অনুযায়ী নূতন শাসন প্রণালী প্রতিষ্ঠিত হয় তাহা হইলে বাংলার আইন পরিষদের পরমায়ু এক বৎসর বৃদ্ধি করিয়া ১৯৩৩ সালের নভেম্বর মাসে নির্ব্বাচন করাইলে চলিতে পারে। কিন্তু নূতন সংস্কার আইন ঘড়ির কাঁটার মত ঠিক এক বৎসরের মধ্যেই পার্লামেণ্ট কর্ত্তৃক বিধিবদ্ধ হইয়া যাইবে এমন কোন সঙ্গত কারণ আছে কি? ইংলণ্ডের অস্ত্রনিরীকরণ, ইকনমিক কনফারেন্স, অটোয়া কনফারেন্স ইত্যাদি বড় বড় আন্তর্জাতিক সমস্যা দিন দিন ভীষণাকার ধারণ করিতেছে। তাই যদি ভারত সংস্কার আইন ১৯৩৪ সালের মধ্যেই কার্য্যে পরিণত করিতে না পারা যায় তাহা হইলে বর্ত্তমান আইন পরিষদের এক বৎসর পরমায়ু বৃদ্ধি করিয়া দিবার কোন কারণ নাই। বর্ত্তমানে জুন মাসে উহার পরমায়ু ফুরাইয়া গেলেই নূতন নির্ব্বাচন আহ্বান করাই যুক্তি সঙ্গত। তবে যদি নূতন সংস্কার আইন ১৯৩৩ সালের শেষাশেষি বিধিবদ্ধ হয় তাহা হইলে এই কয়েক মাসের জন্য নূতন নির্ব্বাচন আহ্বান করা যুক্তি যুক্ত নহে। এই সমস্যার জন্যই বোধ হয় সরকার পক্ষ নির্ব্বাক। তবে এই জুন মাসের শেষ সপ্তাহ নাগাত সরকার পক্ষের অভিমত জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হইতে পারে।

আগামী শাসন-সংস্কার!

নূতন ভারত শাসন আইন বিধিবদ্ধ হইলে উহা কার্য্যকরী হইবে কিনা এই বিষয় লইয়া অনেকেই নানাবিধ মন্তব্য প্রকাশ করিতেছেন। যাঁহারা ভারতের প্রকৃত হিতৈষী নহেন তাঁহারা অবশ্য সকলেই বলিতেছেন যে নূতন বিধিতে ভারতকে অনেকটা ধ্বংসের মুখেই ঠেলিয়া দেওয়া হইবে। তাহাদের কথা ছাড়িয়া দিলে যাঁহারা ভারতে নূতন বিধি প্রতিষ্ঠিত হইতে দেখিতে চাহেন তাঁহাদের মধ্যেও যথেষ্ট মতভেদ আছে। একদল বলিতেছেন যে ১৯২১ সালের ন্যায় এবারও সরকার পক্ষ একদল

মধ্যপন্থীকে লইয়া এই শাসন প্রণালী কার্য্যকরী করিবার চেষ্টা করিবেন। তাঁহারা অনুমান করেন মালব্যজী, তেজ বাহাদুর সাপ্রু, মিসেস নাইডু ইত্যাদিকে নূতন সংস্কারের সমর্থক করিয়া লইতে পারিলেই মহাত্মাজী দুর্ব্বল হইয়া পড়িবেন। এবং নূতন বিধি নির্ব্বিবাদে দেশ বাসী কর্ত্তৃক গৃহীত হইবে। আর একদল যাহারা উগ্র সাম্প্রদায়িক তাহারা ভাবিতেছেন যে ইংরাজ মুসলমান গণকে ও দেশীয় রাজন্যবর্গকে হস্তগত রাখিতে পারিলেই আবার কয়েক বৎসর নির্ব্বিবাদে রাজ্যশাসন করিয়া যাইতে পারিবেম। এই জন্য তাঁহারা ফেডারেল স্কীমে মুসলমান ও রাজন্যবর্গের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত দেখিতে চাহেন। কিন্তু কংগ্রেস আছে এবং তাহা যদি ভারতের পোনের আনা লোকেই মানিয়া লয় তবে কংগ্রেসের দাবীই বা অমান্য করা কি করা সম্ভব হইবে?

প্রাদেশিক ও সর্ব্বভারতীয় মনোভাবঃ—

সম্প্রতি দেখা যাইতেছে কয়েকজন খ্যাতনামা মনস্বী হঠাৎ তাঁহাদের মনোভাব পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীযুত বিনয় সরকারের নাম বঙ্গে সুপরিচিত। তিনি একজন ক্ষমতাশালী সুলেখক। তাঁহার রাজনীতিতে অসাধারণ পাণ্ডিত্য আছে। তিনি কোন স্থলে বক্তৃতা দানকালে নাকি প্রচার করিয়াছেন যে প্রাদেশিক স্বতন্ত্রতা সুদৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত না হইলে আর ভারতের পক্ষে মুক্তি-লাভের উপায় নাই। আমরা শৈশবকাল হইতেই শুনিয়া আসিতেছিলাম যে পাশ্চাত্য লেখকগণ না কি ভারতবর্ষকে একটী মহাদেশ বলেন। ভারতে জাতি ধর্ম্ম ও ভাষাগত পার্থক্য এত অধিক যে তাঁহাদের এই উক্তি খুব যুক্তি সঙ্গত বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। বিনয়বাবুই fundamental unity নামে একখানি পুস্তক প্রণয়ন করিয়া আমাদিগকে বুঝাইবার চেষ্টা করেন যে ভারতবর্ষে নানা প্রকার বৈষম্য থাকিলেও মূলে কোন পার্থক্য নাই সুতরাং সমস্ত ভারতবর্ষই এক জাতি। ১৯০৫ সালে যখন বাংলায় স্বদেশী আন্দোলন চলে তখন কতকটা এই যুক্তিরই দোহাই দিয়া নিঃস্ব বাংলাকে অনেক প্রিমিয়ম দিয়া বোম্বাই হইতে কাপড় গ্রহণ করিবার পরামর্শ দেওয়া হয়। কয়েক বৎসর হইল বাংলার কয়েকজন ধনী বাংলায় বাংলার শিল্পকে প্রাধান্য দিবার জন্য বাংলা শুধু বাঙ্গালীর এইরূপ অভিমত প্রচার করিবার তোড়জোড় করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু বিনয়বাবুর মতন পণ্ডিতকে এই মতের সমর্থন করিতে দেখিয়া আমরা সুখী হইতে পারি নাই। যেখানে খণ্ড ও ভগ্ন ভারত লইয়া এক বিরাট মহাভারতের রচনা সম্বন্ধে গবেষণা হইতেছে সেখানে এই মৌলিকতা-হীন যুক্তির অবতারণা কিরূপ?

ব্যয় সঙ্কোচ:—

প্রায় প্রত্যেক প্রদেশেই ব্যয় সঙ্কোচ কমিটীর অধি-বেশন আরম্ভ হইয়া গিয়াছে! বোম্বাই প্রদেশ কিন্তু কমিটীর মতামত বাহির হইবার পূর্ব্বেই শাসন পরিষদের দুইজন সদস্যপদ ও একজন মন্ত্রীর পদ তুলিয়া দিয়াছেন। এইজন্য আমরা বোম্বায়ের লাট মহোদয়কে সর্ব্বান্তঃকরণে প্রশংসা করিতেছি। বাংলার ব্যয়সঙ্কোচ কমিটী হইয়াছে বলিয়া শুনা গেছে মাত্র। তাঁহাদের কার্য্য সম্বন্ধে কোন সরকারী ইস্তাহার আজ অবধি আমাদের চক্ষে পড়ে নাই। যাঁহারা ফেডারেল ফাইনান্স কমিটীর রিপোর্ট মন দিয়া পড়িয়াছেন তাঁহারা দেখিয়াছেন যে নূতন শাসন বিধিতে বাংলা, আসাম ও বেহারের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইবে। বেহার ও আসাম ছোট প্রদেশ। ব্যয় সঙ্কোচ করা তাহাদের পক্ষে সম্ভব হইতেও পারে। কিন্তু বাংলার ভারতের একটী বড় প্রদেশ। ১৯২১ সাল হইতে বাংলায় জনহিতকর কোন প্রকার কার্য্যের জন্যই অর্থ ব্যয় করিতে পারা যায় নাই। বাংলায় পুলিশ বিভাগের ব্যয় প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে কিন্তু স্বাস্থ্য-বিভাগ, চিকিৎসা-বিভাগ ইত্যাদি জনহিতকর অনুষ্ঠানগুলির কোনই উন্নতি হয় নাই। সুতরাং বাংলা সরকারের আয় ব্যয়ের ঘাটতি মিটাইতে পারিলেই যে বাংলার সরকার কর্ত্তব্য হইতে অব্যাহতি পাইবেন তাহা নহে। এখানে বাৎসরিক অন্ততঃ পক্ষে এক কোটী টাকার প্রয়োজন। বাংলার গ্রামগুলি ম্যালেরিয়ায় জনহীন হইয়া পড়িতেছে উহাদের সংস্কার অত্যন্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। সুজলা বাংলায় জলকষ্ট ভীষণ হইয়াছে উহা নিবারণ করিতে হইবে। আমেরিকার

সংস্কার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সহিত যাহাতে ব্যয়-সঙ্কোচ করিতে পারা যায় সে বিষয়ে বিশেষ নজর দেওয়া প্রয়োজন নতুবা শাসন সংস্কারের কোন মূল্যই থাকিবে না। রাজকর্ম্মচারীদিগকে উচ্চ-বেতন দেওয়ার আমরা পক্ষপাতী। কিন্তু তাই বলিয়া দেশের অবস্থার অতি অনুপযোগী, বাদশাগিরি করিবার মত অর্থ যোগান দিতে বাংলা আর পারিবে না।

লর্ড ইঞ্চকেপ:—

ইংলণ্ডের ভাগ্যাকাশে ও একটী অমূল্য রত্ন চিরকালের জন্য চক্ষু মুদ্রিত করিয়াছেন। লর্ড ইঞ্চকেপের নাম অনেক ভারতবাসীর নিকটও সুপরিচিত। কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ সওদাগরী আফিস ম্যাকিনন্ ম্যাকিঞ্জি কোম্পানীতে তিনি সামান্য কর্ম্মচারী হিসাবে আসিয়া যত্নও অধ্যবসায় বলে জগতের তাবৎ ধনিক সম্প্রদায়ের শীর্ষস্থলে আরোহণ করেন। সুযোগ ও সুবিধা পাইলে মানবের ধীশক্তি কত বর্দ্ধিত হইতে পারে লর্ড ইঞ্চকেপ্ তাহারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

সার বেসিলের সত্যকথা:—

স্যর বেসিল ব্লাকেট ইংলণ্ডে বক্তৃতা প্রসঙ্গে একটী সত্য কথা বলিয়াছেন। তিনি বলেন জিনিষ পত্রের মূল্যাদি বর্ত্তমানে যেরূপ হ্রাস পাইয়াছে এইরূপ থাকিলে ভারত সরকারের আয়-ব্যয়ের হিসাবে ঘাটতি রহিয়া যাইবেই কেননা ভারত সরকারের আয়ের একটী মোটা অংশ বাণিজ্য-শুল্কের উপর নির্ভর করে। এই বাণিজ্য শুল্কের হ্রাস-বৃদ্ধি অনুযায়ী ভারত সরকারের আয়ের ও হ্রাস বৃদ্ধি হয়। এই রোগের উপশম করিতে তিনি এক ভীষণ বিষ বড়ির ব্যবস্থা দিয়াছেন, অর্থাৎ একদিনে অর্ডিনান্স জারি করিয়া কোম্পানী কাগজের সুদ, কর্ম্মচারীদের মাহিনা ইত্যাদি খাদ্য দ্রব্যাদির মূল্যের অনুপাতে হ্রাস করিয়া দিতে হইবে। উৎকট রোগের উৎকট ঔষধের ব্যবস্থা বটে, কিন্তু এক্ষেত্রে ভারত সরকার এই ব্যবস্থা করিতে পারিবেন কি ?

সাংবাদিকের উপাধি:—

সম্রাট মহোদয়ের শুভ জন্মতিথি উপলক্ষে উপাধি বর্ষণ হইয়া গেল। সারা ভারতবর্ষে সর্ব্বশুদ্ধ ১৩ জন ভাগ্যবান স্যর উপাধি পাইয়াছেন। ষ্টেটস্‌ম্যান পত্রের সম্পাদক মিঃ ওয়াটসন, এখন হইতে স্যর এলফ্রেড ওয়াটসন হইলেন। আমরা সহযোগীকে রাজ সম্মানে ভূষিত হইতে দেখিয়া বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি। বাংলা সাংবাদিকগণের মধ্যে বেহারীলাল সরকার ও শ্রীযুক্ত জলধর সেন ব্যতীত আর কেহ রাজপ্রদত্ত উপাধি পান নাই। সাংবাদিকদের রাজ সম্মানে ভূষিত করা সর্ব্বদেশেই প্রচলিত ব্যবস্থা। সুতরাং সরকার পক্ষের উচিত সাংবাদিকগণকে মাঝে মাঝে ডেকোরেশনে ভূষিত করা।

প্রধান মন্ত্রীর কথা:—

প্রধান মন্ত্রী "সাম্রাজ্য দিবস" উপলক্ষে ভারত সম্বন্ধে তাঁহার নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল মত প্রকাশ করেন। তিনি বলিয়াছেন যে গত বৎসর ভারতবর্ষের সঙ্গে আপোষ বন্দোবস্তের পথে কংগ্রেসের পন্থাই বাধা সৃষ্টি করিয়াছিল। কংগ্রেস যাহা চায় তাহাত প্রধান মন্ত্রীর কথিত স্বাধীনতাই, ঐ চাওয়ার ফলে যদি প্রধান মন্ত্রীর তথাকথিত আপোষের পথে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়, তবে দোষ কি কংগ্রেসের ; না, যাহারা ভারতের চাওয়ার অনিবার্য্যতাকে মানিয়া লইতে পারেন না তাহাদের ? বিলাতের বর্ত্তমান প্রধান মন্ত্রী সব সময়ই প্রধান মন্ত্রী ছিলেন না ; ম্যাক্‌ডোন্যাল্ড সাহেব তখন শ্রমিকদলের নিকট প্রতিষ্ঠা লাভের জন্যই হউক অথবা অন্য কোন কারণেই হউক,—ভারত সম্বন্ধে—ভারতশাসন-নীতির সম্পর্কে বহু কথা বলিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন —"India's destiny is fixed above our will and we had better recognise it and bow to the inevitable." যে দুর্ব্বার নিয়তির কাছে মাথা নত করিয়া ভারতের ভাগ্য পরিণতিকে স্বীকার করিতে পারিলে আপোষ রফা হইত—যে সত্যদৃষ্টি ও ঔদার্য্য তাঁহাকে পূর্ব্বে ভারতের যথার্থ সমস্যা বুঝিতে ও মীমাংসার পথ দেখাইতে সাহায্য করিয়াছিল, বর্ত্তমানে সেই দৃষ্টি ও ঔদার্য্যই তাঁহার নষ্ট হইয়াছে—আজ মন্ত্রী হইয়া, ভারতবাসী সহজে স্বাধীনতার যোগ্য হইতে পারে না ইহাই যেন তাঁর নূতন বিশ্বাস। যে সাম্রাজ্য-নীতিকে পূর্ব্বে ম্যাকডোন্যাল্ড সাহেব শতমুখে নিন্দা করিয়া আসিয়াছেন —সেই নীতির ধারক ও বাহক হইয়া আজ তাঁহার মুখেই নূতন কথা শোনা যাইতেছে।

স্বদেশে রবীন্দ্রনাথ:—

পারস্য ভ্রমণ শেষ করিয়া রবীন্দ্রনাথ স্বদেশে ফিরিয়াছেন। বোম্বায়ের দাঙ্গা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন··· 'আজ আমাদের দেশের এক শ্রেণীর মুসলমানেরা যেরূপ হিংস্র ব্যবহার করিতেছে সে রকম কোন ভাব ও-দেশে একেবারেই নাই। সম্ভবতঃ তাহারা স্বাধীন বলিয়াই তাহাদের মন এরূপ উদার ও উন্মুক্ত। পারসিকেরা সর্ব্বপ্রকার সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা এবং জাতিগত

ঔদ্ধত্য হইতে মুক্ত। পারসিকদের জাতীয়তার আদর্শ ভারতের সাম্প্রদায়িক বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিদের পক্ষে শিক্ষণীয় বিষয়।"

বোম্বায়ের দাঙ্গা :-

সপ্তাহের পর সপ্তাহ বোম্বায়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হইয়াছে, বহু হিন্দু মুসলমান হতাহত হইয়াছে। ইহার পশ্চাতে তৃতীয় পক্ষই থাকুক আর মস্তিষ্কই থাকুক ইহার লজ্জা ও গ্লানি ভারতীয় হিন্দু-মুসলমানেরই সবখানি। তবুও এরূপ দাঙ্গাকেই যদি স্বায়ত্বশাসনের বিঘ্ন বলিয়া বলা হয় তবে জোর করিয়া এ কথা বলা যায় যে স্বায়ত্বশাসনের অভাবেই এসব ঘৃণ্য ব্যাপার দেশে ঘটিতে পারিতেছে। স্বায়ত্বশাসন পাইলে আর ইহা দেখা যাইবে না।

সরকারী প্রচার :—

সরকারের কথা প্রচারের জন্য নূতন খবরের কাগজ বাংলায় হইবে কিনা এ সম্বন্ধে জল্পনা কল্পনা চলিতেছে। শুনিতেছি কোন কোন ধুরন্ধর ইতিমধ্যেই দার্জ্জিলিংয়ে ধর্ণা দিয়াছেন। প্রচারের জন্য সরকার পক্ষ হইতে সংবাদ পত্র হইলে কিরূপ হইবে সে অভিমত আমরা পূর্ব্বেই দিয়াছি। সরকার জনমত স্বপক্ষে লইতে চাহিলে প্রজার হিত করিলেই সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে—অপর কিছু না করিলেও চলে। তবে কাগজ আজকালের দিনের একটা ক্ষমতা এই মনে করিয়া যদি কাগজ করিতে চাহেন তবে তাহাও প্রজারঞ্জক নীতিতেই চালাইতে হইবে—নতুবা গৌরী সেনের কিছু অর্থ সাতে ভূতে খাইবে মাত্র।

বাংলার মেয়েদের সঙ্ঘ

শ্রীমতী মৃণালিনী সেনের কর্ত্তৃক বেতার বক্তৃতা :—১১ই মে

আজ আমি বেতার যোগে আপনাদের কাছে দুটী কথা বলতে অনুরুদ্ধ হয়েছি।

আজকাল বাংলার ভদ্রঘরে এমন বোধ হয় কেউ নাই, যিনি অন্ততঃ বাংলা লেখাপড়া অল্পসল্পও জানেন না, কিম্বা দেশে ও সমাজে কোথায় কি রীতি বা কুনীতি প্রচলিত আছে তার খবর রাখেন না। আর এমনও বোধ হয় কেউ নাই, যিনি, সমাজের যে সকল কুরীতি কু-প্রথার দেশের ঘোরতর অনিষ্ট সাধন হচ্ছে, সে সকলের উচ্ছেদ সাধন করা উচিত মনে করেন না।

আমাদের দেশে এবং পৃথিবীর অন্য সর্ব্ব দেশেও চিরকাল ধরেই মধ্যে মধ্যে ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কারের জন্য মহাকর্ম্মী পুরুষ ও নারীর আবির্ভাব হয়। আমাদের তো পুরাণে কথিত দশ অবতার আছেনই, তার উপরেও যে কত অসংখ্য দেবতাতুল্য পুরুষ, দেবীসমা রমণী সময়ে সময়ে জন্মগ্রহণ করে সমাজের ও ধর্ম্মের গ্লানি দূর করেছেন, তা বোধ হয় আপনারা সকলেই জানেন। শ্রীচৈতন্য দেব এই চারশো বৎসর আগে কি ধর্ম্মের স্রোতেই দেশ ধুয়ে দিয়েছিলেন। তার পরে মহাত্মা রজো রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর, এবং আমার শ্বশুর দেবর এবং আরও কতজন নতুন করে আবার, জ্ঞানের স্রোতে ভাবের ও ভক্তির স্রোতে শুধু বাংলা দেশ নয়, সমস্ত ভারতবর্ষকে ভাসিয়ে দিলেন। এই রকম করে নূতন লোক আসছেনই।

পুরাকালের সীতা সাবিত্রীর তো আজও আমাদের দেশের মেয়েদের কাছে জলন্ত দৃষ্টান্ত হয়ে আছেনেই, তাছাড়া এই কলিযুগে ভারতের স্থানে স্থানে কত রমণী ধর্ম্মের তেজ সতীত্বের তেজ দেখিয়ে চির আদর্শ হয়ে আছেন।

কিন্তু আমাদের সমাজে আবার এখন অনেক গ্লানির আবির্ভাব হয়েছে। আমাদের পুরুষরা অনেকেই এখন ধর্ম্মের কোনও ধার ধরেন না, এবং নীতির মধ্যে যেটী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নীতি, শারীরিক ও মানসিক সংযম সেটীও পালন করেন না, আপনাদের মধ্যে যাঁরা মা ও স্ত্রী, তাঁরা একথা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন। আপনাদের বিবাহ হ'তে না হ'তে অল্প বয়স থেকেই বৎসরে বৎসরে সন্তান গর্ভে ধারণ করতে হয়; সেই সূত্রে কত রোগ আপনাদের আক্রান্ত করে, কত শিশু-সন্তানকে এবং কত মাকে অকালে মৃত্যুমুখে পড়তে হয়। বাপদের শরীরও যে এতে ভাল থাকে, তাও নয়। তাঁরা অল্প বয়সেই জরাক্রান্ত হন। কিন্তু এর চেয়েও আরও ভয়ঙ্কর ব্যাপার সমাজে অবাধে চলে যাচ্ছে। আপনারা সকলেই জানেন, অনেক পুরুষ কেবল তাঁদের স্ত্রীদের নিয়েই সন্তুষ্ট থাকেন না; তাঁরা টাকা দিয়ে শরীরের ব্যবসায়িনী মেয়েদের কাছেও যেতে দ্বিধা বোধ করেন না। এই সব মেয়েদের বারাঙ্গনা বলে। তাঁদের অনেকেই কোন না কোন পুরুষের প্রলোভনে ও [illegible] পড়ে প্রথমে ঘরের বার হয়, তার পর যখন [illegible] কাছে আর ঠাঁই না পায়, তখন এই ব্যবসা করতে বাধ্য হয়। আমাদের দেশে বাল্য বিবাহ ও তার ফলে [illegible] বিধবার শোচনীয় অবস্থা, অনেক সময় অনেক [illegible] বিপথে যাবার কারণ হয়। মানুষ যখন [illegible]

তখন তার আর কাণ্ডজ্ঞান থাকে না, তখন তার পাপকে আর পাপ বলে মনে হয় না, তখন তার মধ্যে বিবেক-বুদ্ধি সব লোপ পায়।

অনেক পুরুষও এই মেয়ে যোগাড়ের সাহায্য করে ও তাতে বেশ দুপয়সা উপার্জ্জন করে। এই ব্যবসাজীবি মেয়েরা, বেশীর ভাগই অত্যন্ত জঘন্য রোগে আক্রান্ত। অনেক দেশে গভর্ণমেন্ট মাঝে মাঝে ডাক্তার পাঠিয়ে, এদের মধ্যে খারাপ রোগ দমন রাখ্‌তে চেষ্টা করেন, কিন্তু তবু সর্ব্বদেশেই এর বিস্তার আছে। এ রোগ সকল আবার খুব সংক্রামক। যে সব পুরুষ এই সব মেয়েদের কাছে যায়, তাদেরও এই রকম রোগ হয়, তারা আবার তাদের স্ত্রীদের এই রোগগুলি দেয়, কাজেই অনেক সময়ই, তাদের ছেলে-মেয়েরা অনেক কুৎসিৎ রোগাক্রান্ত হয়ে জন্মায়। ক্রমে সমস্ত দেশে অল্পবিস্তর এই সব রোগ ছড়িয়ে পড়ে—এত ছোঁয়াচে এসব রোগ। এসব রোগের ফল বড় ভীষণ। এসব থেকে আবার কত অন্য কঠিন রোগের উৎপত্তি হয় তার ঠিক নাই।

এই সব দেখে শুনে, আমাদের দেশে কতকগুলি উচ্চ চরিত্র পুরুষ ও মেয়েরা মিলে, এই দুর্নীতি দূর করবার জন্য চেষ্টা কর্‌ছেন। এর মধ্যে অনেক ইংরাজ মেয়ে ও পুরুষও আছেন।

আইন মত এখন আঠার বৎসরের নীচে কোন মেয়ের আর বারাঙ্গনার ব্যবসা কর্‌তে বা তার বাড়ীতে থাকার নিয়ম নাই। আমাদের দেশে ছেলে মেয়েদের আইন নামে ১৯২৩ সালে এই আইন পাশ হয়। ১৯২২ সালে কলিকাতা সহরে বারাঙ্গনা ব্যবসা দমন করার জন্যও এক আইন হয়। কিন্তু সে সব আইন কাজে লাগানর পক্ষে তত সুবিধা হয়নি, আর তা সমস্ত বাংলা দেশের জন্যও ছিল না, তাই আর একটা আইন পাশ করবার কথা হচ্ছে। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় (যিনি Round Table Conferenceএ—গোল টেবিল বৈঠকে দুবারই গিয়েছিলেন, আর যিনি আমাদের বাংলার Councilএর একজন গণ্যমান্য সদস্য)—এই নূতন আইনের এক খসড়া প্রস্তুত করেছেন। বাংলার Councilএর Meetingএ সেটা শ্রাবণ কি ভাদ্র মাসে পড়া হবে, তারপর সেটা পাশ করবার চেষ্টা হবে। এই আইন পাশ হলে, দেশের ও দশের যে পরম মঙ্গল হবে, তার সন্দেহ নেই। আর যে মেয়েরা ব্যবসা করে, তারাও এ পথ ছেড়ে ক্রমে ভাল পথে যেতে পারবে।

পুরুষরা যারা নিজেদের দমন কর্‌তে জানে না, তাদের জন্যই এই ব্যবসার আবির্ভাব ও স্থিতি। তাদের জন্য একদল মেয়ে জাতিচ্যুত হয়ে, কুলমান হারিয়ে, হীন নামে আখ্যাত হয়ে, অস্পৃশ্য, অশৌচ হয়ে, কলঙ্কের ডালা মাথায় নিয়ে চিরকাল বাস করে, আর সেই সব পুরুষ সমাজে গণ্যমান্য ব্যক্তি হয়ে বেশ ঘুরে বেড়ায়। পুরুষরাও যারা এই পাপে ডোবে, যদি জাতিচ্যুত সমাজচ্যুত হয়, তবে এ পাপ সমাজে স্থান পেত না। আজ এ পাপ মোচনের ভার, প্রতি গৃহের মা, বোন, স্ত্রী, কন্যা, আপনাদের হাতে। আপনারা, আপনাদের ছেলেদের ও ভাইদের, ছেলেবেলা থেকে শেখান্ "ইন্দ্রিয় দমন কর্‌তে পার্‌লেই শরীরে মনে অসীম বল সঞ্চার হয়। আর জঘন্য রোগ কাছে আস্‌তে পারে না। আর আপনারা সকলে এই আইন যাতে পাশ হয়, তার চেষ্টা করুন। এই আইন পাশ হলে, কলিকাতা সহরে ও বাংলার সর্ব্বত্র এই ব্যবসা বন্ধ হবে। যারা বাড়ীওয়ালী নামে নামে অভিহিত তারা এ রকম বাড়ী রাখলে কঠিন দণ্ড পাবে। ছোট ছোট মেয়েদের এই কাজ শিখবার জন্য যারা চালান দিতে চেষ্টা কর্‌বে, তাদের কঠিন দণ্ড বিধান হবে। কলিকাতায় দুই একটা আশ্রম এই রকম ছোট মেয়েরা যাদের বেশ্যা বাড়ীতে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়, তাদের জন্য কয়েক বৎসর থেকে হয়েছে।

তার মধ্যে গোবিন্দকুমার Homeএর নাম বিশেষরূপে উল্লেখ যোগ্য। কলিকাতা High Courtএর একজন ইংরাজ জজ, Mr. Greaves ও আমাদের কয়েকটী ভদ্র বাঙ্গালী পুরুষ ও মেয়েরা মিলে প্রথমে Greave's Home বলে এই আশ্রম খোলেন। ১২টী উদ্ধৃতা মেয়ে নিয়ে কাজ আরম্ভ হয় আজ ১০০ মেয়ের জন্য জায়গা হচ্ছে। তাদের জন্য মস্ত এক বাগানবাড়ী গঙ্গার উপরে, শ্রীযুক্ত বাবু গোপালদাস চৌধুরী নামে এক দয়ালু জমীদার তার বাপ স্বর্গীয় বাবু গোবিন্দ কুমার চৌধুরীর নামে এই সৎকার্য্যের জন্য দান করেছেন। এখানে খুব ভাল কাজ হচ্ছে। অনেকগুলি হিন্দু শিক্ষয়িত্রী রাখা হয়েছে। পুলিশরা এই সব মেয়েকে বাড়ীওয়ালীদের কবল থেকে উদ্ধার করে এনে এই Homeএ পাঠায়।

চার পাঁচ বৎসরে মেয়ে থেকে ষোল সতের বৎসরের মেয়েরা এখানে আসে, আর তারা যতদিন ১৮ পূরা না হয় এইখানে থাকে। তারপর কিন্তু আইনে তাদের জোর করে সেখানে রাখা যায় না। এ জন্য কেউ কেউ আবার তাদের পুষিমা বা নিজের মা ও যারা এই ব্যবসা করে, তাদের কাছে ফিরে যেতে বাধ্য হয়। কেউ কেউ কিছুতে ফিরতে চায় না। যদি সৎপাত্র পাওয়া যায়, তাদের কারও কারও বিয়ে দেওয়া হয়, কেউ বা পড়াশুনা করে Teachers হ'তে চেষ্টা করে। কিন্তু তাদের সকলের জন্য (যারা ১৮ বৎসর হয়) বন্দোবস্ত টাকার অভাবে করা এখনও সম্ভব হয় নি। এই সব মেয়েদের থাকবার জন্যও যদি আশ্রম করতে পারা যেত, আর সেখানে তাদের

ভাল কাজ শেখার ব্যবস্থা করা যেত তাহলে এই সব মেয়ের চিরস্থায়ী উপকার করা হ'ত।

Govt. গোবিন্দকুমার Home এর প্রতি মেয়ের জন্য মাসে ১০৲ টাকা করে দেন, আর কলিকাতার Vigilence association নামে যে সমিতি আছে, তা থেকে বাকী সাহায্য করা হয়। এই সমিতির সভাপতি হচ্ছেন ইংরাজ পাদরী লাট সাহেব, অনেক বাঙ্গালী ভদ্র পুরুষ ও রমণী এর সভ্য আছেন, দু একজন অন্য ইংরাজি মিশনরীও সভ্য আছেন; দেশীয় ভদ্র মহিলার মধ্যে এই সংশ্রমে শ্রীমতী হেমলতা মিত্রের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইনি প্রথম থেকেই এই কাজের জন্য খুব খাটছেন। আমি এবং আরও কয়েকজন অন্য রমণীরা, যাঁরা, এর মেম্বর আছে, শ্রীমতী হেমলতা মিত্রের সঙ্গে গোবিন্দকুমার Home এর তত্ত্বাবধান করি। কল্‌কাতায় Refuge বলে একটী আশ্রম আছে। আমরা তার জন্যও একটু আধটুকু কাজ করি। মাননীয় উকীল, বাবু দেব প্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় এই refuge এর Secretary আর মাননীয় আবদুল আলি মহাশয় এর সভাপতি। স্বর্গীয় রায় বাহাদুর প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই Refuge-এর সম্পাদক অনেকদিন ছিলেন এবং এর জন্য প্রাণ মন ঢেলে খেটে ছিলেন। Refuge আতুর অনাথ নিরাশ্রয় দীন দুঃখী পুরুষ মেয়ে ও ছোট ছেলেমেয়ে সকলের জন্য সব দেশের সব রকমের সব ধর্ম্মের লোক এখানে স্থান পায়। অনেক মেয়েরা পুলিশের হাত দিয়ে এখানে আসে। এই রকম আরও দু একটী আশ্রম কলিকাতায় আছে। কিন্তু কল্‌কাতার মত বড় সহরে দু চারটী আশ্রমে কুলায় না। আর মফঃস্বলে এ সব কাজ এখনও প্রায় হয় নি বল্লেও চলে।

যতীন বাবুর এই বিলটা পাশ হলে যে সব মেয়েরা বারাঙ্গনার ব্যবসা ছেড়ে দিতে বাধ্য হবে তাদের সৎপথে আনার ও রাখার জন্য, অনেক আশ্রম করতে হবে। সে কাজের জন্য টাকার দরকার। টাকার সদ্ব্যবহার করলে যেমন সকলেরও দেশের উপকার হয় তেমনি অসদ্‌ব্যবহার করলে মানুষের অধোগতি হয়। আমরা কজনে মিলে এই সব ভাল কাজ কর্‌বার জন্য নতুন একটী সমিতি গঠন করেছি। এর নাম হয়েছে, "All Bengal women's union" অর্থাৎ "বাংলার মেয়ের সংঘ।"

সংঘের সভানেত্রী হয়েছেন, আমার বড় ননদ কুচ-বিহারের মহারাণী শ্রীমতী সুনীতি দেবী। মহারাণী সুনীতি দেবীর নাম আপনারা নিশ্চয়ই খুব ভালরূপে জানেন। ইনি চিরকাল সমাজের নানা হিতকর কাজের উৎসাহ দান করেছেন।

এই নূতন সংঘের সম্পাদিকা বা Secretary দুজন। একজন হচ্ছেন, শ্রীমতী রমলা সিংহ ইনি স্বর্গীয় ব্যারিষ্টার লালমোহন ঘোষের পৌত্রী এবং স্বর্গীয় দেশ গৌরব প্রথম লর্ড সিংহের মধ্যম পুত্রের সহধর্ম্মিণী। শ্রীমতী রমলা সিংহ অল্প বয়সেই সমাজ সংস্কারের কাজে খুব উৎসাহের সঙ্গে ব্রতী হয়েছেন। আর আমাদের একটী Secretaryর নাম Mrs. Neely. এঁর স্বামী B. N. R. এর একজন বড় সাহেব। ইনি অত্যন্ত দয়ার্দ্র হৃদয় আর এই সব কাজ কর্‌তে খুব উৎসুক। অন্য অনেক সুপরিচিত ভদ্র রমণী এই সমিতির সভ্য হয়েছেন। অনেক ইংরাজ রমণীও যোগ দিয়াছেন।

আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে, এই বিলটী পাশ হওয়ায় সাহায্য করা। তার জন্য আমরা ছোট একটী দরখাস্ত ছাপিয়ে তাতে দেশের মেয়ে পুরুষের যত পারা যায় নাম সই নিচ্ছি। আমরা অন্ততঃ চল্লিশ হাজার সই চাই। এই দরখাস্ত আমরা Councilএ পাঠাব, তাতে Councilএর Memberরা জানবেন, এ আইন পাশের জন্য জন-সাধারণের সকলেরই মত আছে। আমাদের দ্বিতীয় কাজ হচ্ছে, টাকা তুলে, উদ্ধৃতা মেয়েদের জন্য জায়গায় জায়গায় আশ্রম করা। এই সব আশ্রমে আমরা তাদের নীতিশিক্ষা, ধর্ম্মশিক্ষা, বিদ্যাশিক্ষা ও সৎকর্ম্ম দেবার বন্দোবস্ত করব। একাজ কেবল দু এক জনের নয়। একাজ দেশের কাজ, সকলের কাজ। আপনারা সকলে এ কাজে যোগ দিলে, একাজ সফল হবেই। এখন আমাদের দেশের মেয়েদের মধ্যে একটা জাগরণ এসেছে, নিজেদের অবস্থা উন্নত করতে প্রবৃত্তি হয়েছে। কিন্তু সমাজের কলঙ্ক মোচন আগে না করলে আমরা কি করে আমাদের উন্নতি সাধন করব? আপনারা ঘরে ঘরে এই বিষয়ে ভাবুন।

আমাদের সঙ্ঘের সভ্য যদি একজন করেও প্রতি ঘরে হ'তে পারেন, আর এই কার্য্যক্ষেত্রে নামেন, তবে বাংলা দেশ সত্যসত্যই আবার সোনার বাংলা হয়ে উঠ্‌বে।

আপনারা যারা সভ্য হতে চান, যদি শ্রীমতী রমলা সিংহকে ২০ নম্বর Loudon St.এ (কল্‌কাতায়) অনুগ্র[illegible] করে লিখে জানান, তা হ'লে সব খবর পাবেন। সভ্য হ'তে গেলে ২৲ টাকা করে বার্ষিক চাঁদা দিতে হয়। আমি আপনাদের কাছে এই দুচারিটী কথা বলে আ[illegible] বিদায় নি। আজ তো আর চাক্ষুষ আলাপ হল না, প[illegible] আশা করি আপনাদের অনেকের সঙ্গে সে আলাপে[illegible] সৌভাগ্য আমার হবে। যাঁরা সভ্য হবেন, তাঁরা সকলে[illegible] পরে মেয়েদের এক বড় সভা ডাক্‌লে যদি আসেন [illegible] সকলে একত্র মিলে এ সব বিষয় ভাল করে আলোচ[illegible] করতে পারা যাবে। আমার পরিচিত, অপরিচিত, [illegible] বোনরা সকলে আমরা সাদর সম্ভাষণ ও নমস্কার [illegible]

পুষ্পপাত্র—

♣

"সম্মুখ উর্ম্মিরে ডাকে
পশ্চাতের ঢেউ—"
"রবীন্দ্রনাথ"

♣

শিল্পী—শ্রীঅবনী সেন

লক্ষ্মীবিলাস প্রেস লিঃ, কলিকাতা

সতীশচন্দ্র মিত্র প্রতিষ্ঠিত

৬ষ্ঠ বর্ষ | শ্রাবণ—১৩৩৯ | ৪র্থ সংখ্যা

বর্ত্তমান যুগের ইউরোপ

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মিত্র

ভারসিলিজ সন্ধির পর হইতেই ইউরোপে বর্ত্তমান যুগের সূত্রপাত হইয়াছে। ইউরোপের রাষ্ট্র-নায়কগণ বহু পুরাতন হোলী-রোমান সাম্রাজ্যকে ত্রিধা বিভক্ত করিয়া অষ্ট্রীয়া, হাঙ্গেরী ও চেকোশ্লাভোকিয়া রাজ্যের পত্তন করেন। সঙ্ঘবদ্ধ জার্ম্মাণ সাম্রাজ্যকে চূর্ণ করিয়া উহার দুইটী মূল্যবান প্রদেশকে উহা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লয়েন। গ্রীসের বহু পুরাতন স্বপ্নকে সফল করিবার জন্য তুর্কীর সর্ব্বনাশ সংসাধন করিয়া গ্রীসকে এক প্রকাণ্ড সাম্রাজ্য প্রদান করিতে সঙ্কল্প করেন। এই গোলযোগের অবসরে রুমানিয়া ও সার্ভিয়াকে স্ব স্ব সীমানা বৃদ্ধি করিয়া লইবার সুযোগ প্রদান করেন। রাশিয়াকে অপদস্ত করিবার জন্য ভীষণ প্রতিজ্ঞা করিয়া বসেন। ফ্রান্স যাহাতে চিরকালই প্রবল থাকে এবং জার্ম্মাণী যাহাতে কোনকালেই শির উত্তোলন করিতে না পারে, তাহার ব্যবস্থা করা হয়। ভূমধ্যসাগর হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত ইংলণ্ড যাহাতে স্থলপথে এক অবিচ্ছিন্ন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন তাহারও ব্যবস্থা হয়। মোট কথা বলিতে গেলে, ভারসিলিজে ইউরোপের রাষ্ট্র-বিৎগণ অধ্যাপক উইল্‌সন্‌কে রাজনৈতিক শিশু বিবেচনা করিয়া, এমনভাবে কূট রাজনীতিজাল বিস্তার করেন যে, যাহাতে ফ্রান্স ও ইংলণ্ড চিরকালই ধরাপৃষ্ঠে প্রবল থাকিতে পারে তাহারই ব্যবস্থা হয়।

প্রবলের বিধান ভাগ্যবিধাতা মানিয়া লইতে প্রস্তুত হইলেন না। এক বৎসর গত হইতে না হইতেই ভার-সিলিজের সর্ত্তগুলির বিরুদ্ধে চতুর্দ্দিকে ষড়যন্ত্র সুরু হইয়া গেল। পরাস্ত ও অপদস্ত তুরস্ক প্রতিশোধ লইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। রাশিয়ায় প্রজা-বিদ্রোহ ক্রমশঃ ভীষণাকার ধারণ করিয়া সমগ্র ইউরোপকে প্রত্যক্ষভাবে চ্যালেঞ্জ করিয়া বসিল। সদ্য-মুক্ত পোলাণ্ড বিশ্ব-বিজয় করিবার জন্য অধীর হইয়া উঠিল। পদানত অষ্ট্রেলিয়া পুনর্ব্বার প্রবল হইয়া নিজ শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য শক্তি সংগ্রহ করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িল। নব-

প্রতিষ্ঠিত রাজ্যগুলির নূতন উদ্যমে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স একটু চঞ্চল হইয়াই উঠে। ভারসির্লিজ সন্ধির প্রত্যেক সর্ত্তটীকে কার্য্যে পরিণত করিতে গেলে, আবার যুদ্ধের উদ্যোগ করিতে হয়, অসংখ্য নর-হত্যার জন্য প্রস্তুত হইতে হয়; বৃদ্ধ রাজনৈতিক ক্লেমানসু ও লয়েড জর্জ্জ উহার জন্য প্রস্তুত থাকিলেও, উভয় দেশের জন সাধারণ আবার বিশ্বব্যাপী সমরের জন্য প্রস্তুত হইতে কিছুতেই স্বীকৃত হইতে চাহিল না।

এঙ্গোরার বিদ্রোহী নেতা কতকগুলি শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সহচর লইয়া যখন গ্রীসের বিপুল বাহিনীকে বিধ্বস্ত করিয়া দিলেন, তখন অনেকেই ভাবিয়াছিলেন এইরূপ হইল কেন? সম্মিলিত শক্তিপুঞ্জ গ্রীসের বিপত্তি দাঁড়াইয়া কি করিয়া দেখিলেন? ইংরাজ রাজনৈতিকগণ শুধুই যে দর্শক হিসাবে নিরস্ত থাকিবেন এইরূপ সঙ্কল্প তাঁহাদের ছিল না। ইংরাজ সমর-সচিব চার্চ্চহিল সাহেব ও প্রধান মন্ত্রী লয়েড জর্জ্জ উভয়েই পুনর্ব্বার রণবাদ্য বাজাইয়া সমরে অবতীর্ণ হইবার মন্ত্রণা করিয়াছিলেন। কিন্তু ইংরাজ জাতি মহাযুদ্ধের আস্বাদ হাড়ে হাড়ে বুঝিতে পারিয়াছিল। জনসাধারণের সকলেই নেতাদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া খুব দৃঢ়স্বরে তাহাদের প্রতিবাদ জানাইয়াছিল। এইজন্য ইংরাজ তুরস্কের বিরুদ্ধে সমরাঙ্গণে অবতীর্ণ হইতে পারে নাই। ভাগ্যবান কামাল এই সন্ধিক্ষণে স্বাধীনতা সমর আরম্ভ করিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি সফলকাম হইতে পারেন নতুবা তাঁহার শুভেচ্ছা চিরকালের জন্য আকাশ কুসুমই রহিয়া যাইত।

এদিকে ফ্রান্স চিরকালের জন্য জার্ম্মাণীর গলা টিপিয়া ধরিয়া রাখিতে চাহিতেছিল। রূঢ়ে যাহাতে তাহাদের অধিকার চিরকালের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয় তাহার জন্য অধীর হইয়া উঠে। এখানে তাহার পরম মিত্র ইংরাজ একমাত্র প্রতিবন্ধক হওয়ায় তাহার স্বপ্ন সফল করিতে পারিতেছিল না। জার্ম্মাণীকে আর্থিকভাবে খর্ব্ব করিবার জন্য ফ্রান্স সমগ্র সাইলেসিয়া প্রদেশটীকে চিরকালের জন্য বিচ্ছিন্ন করিয়া লইবার প্রস্তাব করিলে, একমাত্র ইংরাজ জাতিই তাহার প্রতিবাদ করেন। এই জন্যই ভারসিজ-লিজ সন্ধির পর ফ্রান্স ও ইংলণ্ড উভয়ের মধ্যে বাহ্যতঃ সৌহৃদ্য অক্ষুন্ন থাকিলেও ভিতরে ভিতরে উহা ক্ষুণ্ন হইয়া আসিতেছিল।

Balance of power ইউরোপের বিশেষতঃ ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের রাজনৈতিকগণের একটি বহু পুরাতন রাজনৈতিক চাল। ফ্রান্স যখনই প্রবল হইবার চেষ্টা করিয়াছে, ইংলণ্ড ইউরোপের অন্যান্য শক্তিপুঞ্জের সহিত সম্মিলিত হইয়া ফ্রান্সকে খর্ব্ব করিবার জন্য চেষ্টা করিয়া আসিয়াছে। গত মহাযুদ্ধের পর ফ্রান্স স্থলপথে অপরাজেয় হইয়া উঠে। জার্ম্মাণ প্রদত্ত ক্ষতিপূরণের সাহায্যে সে তাহার বিধ্বস্ত গ্রাম ও নগরগুলির পূর্ণসংস্কার করিয়া লয়। সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিবার জন্য সমগ্র বিশ্বের একত্র সমাবেশ প্যারিসে হওয়ায়, এই সূত্রে যুদ্ধের ঠিক অব্যবহিত পরেই তথায় বিপুলভাবে অর্থ সমাগম হইতে সুরু হয়। বাজেটে অর্থের প্রাচুর্য্য ঘটায় ফ্রান্স তাহার রণ-সম্ভার কিছু মাত্র না কমাইয়া উহা বাড়াইয়াই চলে। পূর্ব্ব ও পশ্চিম প্রান্তে ফ্রান্স এমনভাবে রক্ষিত হইয়া উঠে যে যদি কোনদিন জার্ম্মাণী প্রবল হইয়া উঠে তবে ঐ পথ দিয়া ফ্রান্সকে আক্রমণ করা তাহার পক্ষে বাতুলতা মাত্র হইবে। ইংলণ্ড শিল্প প্রধান দেশ। বাণিজ্যসূত্রে জার্ম্মাণীর সহিত একান্ত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। অলসেস্ লরেন ও সাইলিসিয়া মিশরের নাইল নদীর ন্যায় জার্ম্মাণীর প্রধান অবলম্বন বলিলে কিছুমাত্রই অত্যুক্তি করা হয় না। ফ্রান্সের উপরোধ রক্ষার্থে এই প্রদেশ দুইটী চিরকালের জন্য জার্ম্মাণী হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইলে আর্থিক হিসাবে উহাকে ক্ষুণ্ন করা হয় এবং তাহার ফলে জার্ম্মাণ শিল্প-সম্ভার চিরকালের জন্য চূর্ণ হইয়া যাইবে, এই আশঙ্কায়ই ইংলণ্ড ফ্রান্স কর্ত্তৃক রূঢ় অধিকার বা সমস্ত সাইলেসিয়া জার্ম্মাণ অধিকারচ্যুত হয়, তাহা দাঁড়াইয়া দেখিতে রাজী হয় নাই। ফ্রান্স সাংবাদিকগণ এইজন্য ইংরাজজাতিকে বিশ্বাসঘাতক বা Perfidious Albion আখ্যা প্রদান করে।

বর্ত্তমান রাশিয়ার মূলমন্ত্র প্রচার লাভ করিলে ইংরাজের এশিয়া মহাদেশস্থ সাম্রাজ্যে বিদ্রোহ উপস্থিত হইতে পারে এই আশঙ্কায় রাশিয়া বিধ্বস্ত হউক ইংরাজ চাহিয়াছিল। মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে ইংরাজ পারস্যে ও মিশরে তাহার শক্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া বসিয়াছিল। যুদ্ধের অবসান হইলে

অধিকৃত স্থানগুলিকে স্বাধিকারে রাখিবার জন্য ইংরাজ আরবজাতিকে স্বাধীনতার স্বপ্নে বিভোর করিয়া দিয়া তাহাদিগকে মুক্তিসংগ্রাম ঘোষণা করিবার মন্ত্রণা প্রদান করে। বহু পুরাতন মেসোপটামিয়াকে একটী প্রবল স্বাধীন রাজ্যে পরিণত করা হয়। বাইবেলের প্যালেষ্টাইনকে আবার প্রতিষ্ঠিত করিবার কল্পনা হয়। এই অঞ্চলে ফ্রান্সকে একমাত্র আর্ম্মিনিয়া পাইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে হয়। বলকান অঞ্চলে কোন প্রকার ভৌগলিক বা ঐতিহাসিক তত্ত্বের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়াই যে নূতন ব্যবস্থা করা হয়, তাহাতে মূর্ত্তিমান স্বার্থই প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে। সুদূর প্রাচ্যে ইংরাজ অধিকার ও স্বার্থ সুরক্ষিত হইতে দেখিয়া ফ্রান্স পশ্চিম ইউরোপে তাহার কুট-নীতি প্রসারিত করিতে থাকে। সুগঠিত জার্ম্মাণ সাম্রাজ্যকে শতধা বিভক্ত করা হয়। পুরাতন অষ্ট্রীয়া-হাঙ্গেরী সাম্রাজ্যকে ভাঙ্গিয়া দিয়া পরস্পর বিভিন্নবাদী অষ্ট্রীয়া ও হাঙ্গেরী রাজ্য গঠন করা হয়। বোহেমিয়া প্রদেশটীকে স্বাধীনতা প্রদানপূর্ব্বক উহার সহিত অন্যান্য দেশের কিয়দংশ যোজনা করিয়া দিয়া চেকো-শ্লাভোকিয়া প্রদেশ গঠন করা হয়। এই সমস্ত রাজ্যগুলির স্বার্থ পরস্পরের হন্তারক হওয়ায় সকলেই আত্মরক্ষার জন্য ফ্রান্সের মুখাপেক্ষী হইয়া রহে। আড্রিয়াটিক অঞ্চলেও যুগোশ্লাভিয়া, অলবেনিয়া ইত্যাদি বিবাদমান রাজ্যগুলি সংগঠন করিয়া ফ্রান্স নিজের স্বার্থ প্রতিষ্ঠিত করিতে যত্নবান হয়। এই রাজ্যগুলির গঠনকালে ফ্রান্সের এই বিশ্বাস ছিল, যে, উহারা সর্ব্বদাই আত্ম-কলহে মগ্ন থাকিবে, তাহা হইলে তাহারা চিরকালই ফ্রান্সকে তাহাদের 'রক্ষক' হিসাবে সম্মান করিবে। এই ধারণার বশীভূত হইয়াই ফ্রান্স সকল প্রকার সত্যকে পদানত করিতে চাহিয়াছিল। নব-গঠিত পোলাণ্ড একটী প্রকাণ্ড প্রদেশে পরিণত হয়! উহার একদিকে প্রবল রাশিয়া ও অন্যদিকে বিধ্বস্ত জার্ম্মাণী থাকায়, আত্মরক্ষার জন্য পোলাণ্ড চিরকালই ফ্রান্সের মুখাপেক্ষী হইবে ইহাই ছিল ফরাসী রাজনৈতিকগণের অভিপ্রেত। মিত্র পোলাণ্ড সবল থাকিলে জার্ম্মাণী ও রাশিয়াও অনেকটা শায়েস্তা থাকিবে ইহাই ছিল তাহাদের ধারণা। এই সমস্ত ব্যবস্থার ফলে পশ্চিম ইউরোপে ফ্রান্সের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া পড়িতেছে দেখিয়া, ইংরাজকে প্রাচ্যে তাহার সাম্রাজ্যের জন্য চিন্তিত থাকায় সাময়িক ভাবে উদাসীন থাকিতে বাধ্য হইতে হয়।

এদিকে দক্ষিণ ইউরোপে ফ্রান্সের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে ইটালী প্রকাশ্য রঙ্গভূমে অবতীর্ণ হয়। ফ্যাসিজিম প্রতিষ্ঠিত হইবার পর হইতেই ইটালিতে এক নূতন শক্তি আবির্ভূত হওয়ায়, সে ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের সহিত সমকক্ষ হইবার মানসে শক্তি সঞ্চয় করিতে আরম্ভ করে। নূতন ব্যবস্থা কাহারই মনঃপূত হয় নাই। ব্যর্থ মনোরথ গ্রীস তুরস্কের নিকট অপমানিত ও লাঞ্ছিত হওয়ায় ইংলণ্ডের উপর তাহার বিশ্বাস হারাইয়া আত্মশক্তি প্রবুদ্ধ করিবার জন্য কঠোর সাধনায় নিযুক্ত হইয়াছে। রাশিয়ার প্রজাশক্তি নূতন সত্যের সত্তা সমগ্র সভ্য সমাজে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য অধীর হইয়া উঠিয়াছে। ধনিক ইংলণ্ড ব্যবসা-বাণিজ্য মন্দা পড়ায় এবং 'বেকার সমস্যা' দিন দিন ভীষণ আকার ধারণ করায়, অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। জার্ম্মাণীর আভ্যন্তরিক অবস্থা ভীষণ গোলযোগে পূর্ণ। যে কোন মুহূর্ত্তে তথায় কোন অঘটন সংঘটিত হইয়া যাইতে পারে। Daw's plan অনুযায়ী যুদ্ধের খেসারৎ যোগান দিতে দিতে জার্ম্মাণী রক্তশূন্য হইয়া পড়িতেছে। মহাযুদ্ধের পর তাবৎ জাতিই নিজ নিজ শিল্প-প্রতিষ্ঠিত করিতে যাইয়া সু-উচ্চ tariff wall তুলিয়া দেওয়ায় আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যে এক নূতন সমস্যার আবির্ভাব হইয়াছে। বলকান অঞ্চলের গোলযোগ ও অশান্তি এখনও পূর্ব্ববৎই আছে।

Locarno agreementএর দ্বারা জার্ম্মাণি ও ফ্রান্সের মধ্যে শত্রুতা নিরাকরণ করিবার জন্য ইংরাজ যে প্রতিশ্রুতি দেয়, ফরাসী জাতি উহা ইংরাজের রাজ-নৈতিক চাল বলিয়া ধরিয়া লয়। ব্যবসাদার ইংরাজ জার্ম্মাণিকে দুর্ব্বল হইতে দিতে চায় না, কিম্বা পুরাতন Balance of power নীতি অনুযায়ী দুর্ব্বল জার্ম্মাণিকে পুনরায় সবল করিয়া তুলিতে চায়; এই ধারণার বশীভূত হইয়াই ফ্রান্স জার্ম্মাণির সহিত এক নূতন সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়া রাজনৈতিক ও আর্থিক জগতে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে। ফ্রান্স চিরকালই জার্ম্মাণিকে ভয় করিয়া থাকে। ১৮৭২

সালের পরাজয় ফ্রান্স যেমন বিস্মৃত হইতে পারে নাই, ১৯১৮ সালের পরাজয় তেমনি যে জার্ম্মাণি ভুলিয়া যাইবে ফ্রান্স ইহা ধারণা করিতে পারে না। এইজন্যই বিজেতা ফ্রান্স পরাজিত জার্ম্মাণির সহিত রাজনৈতিক ও আর্থিক মিত্রতা সূত্রে আবদ্ধ হইয়া এক হস্তে ইংরাজকে ব্যবসা জগতে খর্ব্ব করিয়া রাখিতে ও অন্য হস্তে বিদ্রোহী রাশিয়ার নিকট হইতে আত্ম-রক্ষা করিতে ভীষণভাবে চেষ্টা করিতেছে। জার্ম্মাণিতে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইলেও উহা এখনও ধনিক দেশ। গত মহাযুদ্ধে জার্ম্মাণগণ পরাজিত হইবার পর হইতে শিল্প ও বাণিজ্য জগতে আত্ম-প্রতিষ্ঠা সুপ্রতিষ্টিত করিবার জন্য বদ্ধ-পরিকর হইয়াছে। ক্রুপের যে কারখানা হইতে অসংখ্য নর-সংহারক অস্ত্র-শস্ত্র প্রস্তুত হইত, সমর অবসানের সহিত তাহা নূতন আকার ধারণ করিয়া অসংখ্য প্রিন্টিং মেসিন, কৃষিকার্য্যের উপযোগী যন্ত্রপাতি ইত্যাদি তৈয়ারী করিয়া যাইতেছে। মজুরদিগকে জীবন-ধারণোপযোগী ভরণ-পোষণ মাত্র দিয়া সঙ্ঘবদ্ধভাবে এত শিল্প সম্ভার তৈয়ারী হইতেছে যে, জার্ম্মাণীর সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারে এমন শক্তি পৃথিবীর আর কোন জাতিরই নাই। যুদ্ধক্ষেত্রে সম্মিলিত শক্তি-পুঞ্জের নিকট জার্ম্মাণি হটিয়া আসিয়াছিল সত্য, কিন্তু অর্থ জগতে তাহার নূতন শক্তি প্রতিষ্ঠার সহিত তাহার অভিযান প্রতিরোধ করিতে পারে এমন শক্তিমান জাতি পৃথিবীতে আর কেহই নাই। জার্ম্মাণির এই নবোদ্যমে ইংরাজজাতিই বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে, কেননা জার্ম্মাণির ন্যায় সেও শিল্প প্রধান। মহাযুদ্ধের অবসানের পর ইংরাজ জাতি আশা করিয়াছিল, যে, গত শতাব্দীতে নেপলিয়নের পতনের পর তাহারা যেমন দ্রুত উন্নতি করিয়া লইয়াছিল, এক্ষেত্রেও সেইরূপ করিয়া লইবে। এখন তাহারা স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছে, যে, তাহাদের এই ধারণা একেবারেই ভুল। গত শতাব্দীতে ফ্রান্স ও জার্ম্মাণি দুইটা জাতিই আত্ম-কলহের ফলে শক্তিহীন হইয়া পড়ে। ইংরাজ কিন্তু সবল থাকায় ও বৈজ্ঞানিক জগতে নিত্য নূতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হওয়ায় মাত্র অর্দ্ধ শতাব্দির মধ্যেই তাহারা পৃথিবীর অদ্ভুত ধনিকদেশে পরিগণিত হয়। বর্ত্তমান যুগের মহাসমর অবসান হইলে ফ্রান্স জার্ম্মাণ প্রদত্ত খেসারৎ সাহায্যে তাহার ক্ষতস্থান পূরণ করিয়া লয়। ফ্রান্স প্রধানতঃ কৃষিপ্রধান দেশ। ভূ-সম্পত্তিই তথাকার প্রধান সম্পদ। যুদ্ধের ক্ষতি-পূরণ প্রদত্ত অর্থে তাহার সমস্ত ধ্বংস প্রাপ্ত স্থানগুলি পুর্ণগঠিত হইয়া যাওয়ায় এবং বৈদেশিক ভ্রমণকারীগণের অর্থে সবল হইয়া উঠিবার অবসর পাওয়ায় ফ্রান্স ইংলণ্ডের পূর্ব্ববৎ প্রতিদ্বন্দীই রহিয়া গিয়াছে। পরন্ত ক্ষতিপূরণের অর্থ ফ্রান্সের ব্যাঙ্কে স্তুপীকৃত হইয়া উঠায়, পৃথিবীতে স্বর্ণ সমস্যা ভীষণভাবে আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে।

League of Nations বা জাতিসঙ্ঘ সমগ্র পৃথিবীকে এক অপূর্ব্ব ভ্রাতৃত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া পৃথিবী হইতে চিরকালের জন্য যুদ্ধকে নির্ব্বাসিত করিবার জন্য যে স্বপ্ন দেখিতেছে শীঘ্রই যে উহা কার্য্যে পরিণত হইবে কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। এই সঙ্ঘের প্রবর্ত্তক, আমেরিকার একজন প্রেসিডেন্ট হইলেও আমেরিকার যুক্তরাজ্য এই লীগে বহুদিন যোগদান করে নাই। জার্ম্মাণিকে অস্পৃশ্য করিয়া রাখায় লীগের প্রথম কয়েক বৎসর জার্ম্মাণ প্রতিনিধির কোন আসন এই লীগে ছিল না। বিদ্রোহী-রাশিয়াকে পৃথিবীর তাবৎ ধনিক সম্প্রদায়ের পরম শত্রু জ্ঞানে ধনিক সম্প্রদায় কর্ত্তৃক পরিচালিত লীগ রাশিয়ার কোন প্রতিনিধিকে উহার মধ্যে প্রবেশ করিতে দেয় নাই। পৃথিবীর সমস্ত জাতিই এখনও উহাতে যোগদান করে নাই। লীগে এখনও ইংরাজ ও ফরাসী জাতিরই প্রাধান্য লক্ষিত হইতেছে। যতদিন এই প্রভাব অক্ষুন্ন থাকিবে ততদিন লীগ মাত্র দুইটী শক্তিমান জাতির মুখপাত্র হিসাবেই বিবেচিত হইবে।

সামাজিক ও আধ্যাত্মিক বিদ্রোহও ইউরোপে অতি ভীষণভাবে আত্ম-প্রকাশ করিতেছে। ইউরোপের রমণী-গণ অনেকাংশে প্রাচ্যদেশের নারীগণ অপেক্ষা স্বাধীনতা উপভোগ করিলেও তাহাদের মধ্যেও একটা আবরু বা পর্দ্দা ছিল। দিবাভাগে প্রকাশ্য রাজপথে হাঁটুর উপর পরিধেয় বস্ত্র তুলিয়া দিয়া এবং পুরুষকে ধাক্কা মারিয়া যুদ্ধের পূর্ব্বে কোন নারীকেই যাইতে দেখা যাইত না। নারী পুরুষের সমকক্ষ এই কথা প্রকাশ্যে বলিলেও কার্য্যতঃ তাহা কখনই স্বীকৃত হইত না। গত যুদ্ধে ইউরোপের

নারীগণ কলকারখানায় পুরুষগণের সহিত সমানভাবে কার্য্য করে। যুদ্ধ-ক্ষেত্রে অগ্নি-বর্ষণের মধ্যে গমন না করিলেও অনেক সময়েই তাহাদিগকে যুদ্ধক্ষেত্র পর্য্যন্ত গমন করিতে হইয়াছে। যুদ্ধ হইতে প্রত্যাগত সৈন্যগণকে পুনরায় যুদ্ধ-ক্ষেত্রে মৃত্যু-মুখে ফিরিয়া যাইবার জন্য তাহাদিগকে সকল প্রকার উৎসাহ প্রদান করিতে হইয়াছে। ক্ষমতার আস্বাদ পাইলেই সেই ক্ষমতা পরিত্যাগ করিতে কেহই স্বীকৃত হয় না। ইউরোপের রমণীগণই বা কেন প্রাপ্ত ক্ষমতা হস্তচ্যুত করিতে স্বীকৃতা হইবে? তাহার পর ইউরোপে নর অপেক্ষা নারীর সংখ্যা বরাবরই কিছু অধিকই ছিল। যুদ্ধক্ষেত্রে অসংখ্য নর-হত্যা সংঘটিত হইয়া যাওয়ায় নারীর সংখ্যা ইউরোপের প্রদেশ সমূহে বিশেষতঃ ইংলণ্ডে ও ফ্রান্সে বিশেষভাবে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এই নারীদের মধ্যে যুবতীদের সংখ্যাই অধিক। এই অবিবাহিত যুবতীগণ যুবকদের সহবাসে আসিয়া তাহাদের সহিত একত্র বসবাস করিয়া অনেকটা নীতিচ্যুত হইবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি? যুদ্ধের পর আর্থিক কৃচ্ছতা ভীষণভাবে আত্ম-প্রকাশ করায় এবং সামান্য আয়াসেই যে কোন যুবতীকে অন্ততঃ পক্ষে কিয়ৎ দিনের জন্য প্রীতির বন্ধনে বাঁধিতে পারা যায় দেখিয়া ইউরোপের যুবক সম্প্রদায় দিন দিন বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইতে অনিচ্ছুক হইয়া উঠিতেছে। যুবতীগণ গর্ভ-ধারণ ও সন্তান-পালনই যে আদি-যুগে তাহাদিগকে খর্ব্ব করিয়া দেয় এই জ্ঞান লাভ করিয়া গর্ভ-ধারণ ও সন্তান পালন করিতে অস্বীকার করিতেছে।

গত মহাযুদ্ধে কর্ত্তব্যের নামে দেশের যুবকগণকে মৃত্যুর মুখে আগাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। দেশের যুবকগণ যখন হাস্যমুখে অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছিল তখন বৃদ্ধগণ নিরাপদ স্থলে অবস্থান করিয়া তাহাদিগকে পরিচালিত করিয়াছিলেন। এই ঘটনার আনুসঙ্গিক ফল হিসাবে মহাসমরের অবসানের সহিত যুবক-গণ বিদ্রোহী হইয়া প্রতিষ্ঠিত আইন-কানুনগুলির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছে। তাহারা এখন বৃদ্ধদিগের কোন আজ্ঞাই বিনা প্রশ্নে মানিয়া লইতে নারাজ। এদিকে যুবক-যুবতীর দ্বিধাহীন মিলন হইতে যৌন-প্রথার কোন প্রকার আইন-কানুনই কি নর বা কি নারী আর মানিয়া লইতে রাজী হইতেছে না। এইজন্য এখন ইউরোপে Divorce বা বিবাহ-বিচ্ছেদের এত হুড়াহুড়ি পড়িয়া গিয়াছে। Compassionate marriage বা easy divorce law প্রবর্ত্তন করিবার প্রেরণা রাজনৈতিকগণের মধ্যে আপনা হতেই আসে নাই বা নূতন আদর্শের জন্য কোন কিছু নূতন experiment সুরু করা হয় নাই।

ধনিক ও শ্রমিকের কলহ ইউরোপের পুরাতন ব্যাপার। গত মহাযুদ্ধের অবসানের পর হইতে সমগ্র ইউরোপে উহা অতি উৎকট ভাবে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সৈনিক সংগ্রহ করিবার জন্য জনসাধারণকে নানাপ্রকার প্রলোভনে প্রলুব্ধ করিবার বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল। যুদ্ধ শেষ হইয়া গেলে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে প্রত্যাগমন করিয়া যখন তাহারা নূতন সুখৈশ্বর্য্যের পথ অবলম্বন করা দূরে থাকুক যুদ্ধের পূর্ব্বকার অবস্থায়ও ফিরিয়া যাইতে পারিল না, তখনি তাহারা বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া বসে। 'বেকার' দল পাছে বিদ্রোহী হইয়া দাঁড়ায় এই ভয়ে ইংলণ্ড 'ডোল' বা মুষ্টি ভিক্ষা দিয়া তাহাদিগকে শান্ত করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু প্রায় বিশ লক্ষ বেকারকে কতদিন ডোল দিয়া শান্ত করিয়া রাখিতে পারিবে তাহা নিশ্চয়ই ভাবিবার বিষয়? ব্যবসা-বাণিজ্যে উন্নতি সংঘটিত হইলে এই বেকার সমস্যার নিষ্পত্তি হইয়া যাইত। কিন্তু গত যুদ্ধের পর হইতে প্রত্যেক জাতি তাহার জাতীয় বাজারগুলি হইতে বিদেশী পণ্য-সম্ভার হটাইয়া দিবার উদ্দেশ্যে tarrif wall তুলিয়া দেওয়ায় ব্যবসা-বাণিজ্যের বাজারে যে মন্দা পড়িবে তাহাতে আর সন্দেহ কি?

বহুদিনের ধর্ম্মভাবও আজ ইউরোপকে পরিত্যাগ করিতে বসিয়াছে। বিদ্রোহী রাশিয়া 'ভগবান' ও তাঁহার পুরোহিতগণকে সর্ব্বপ্রকার অনাচারের একমাত্র মূলহেতু স্থির করিয়া রাশিয়া হইতে তাহাদিগকে নির্ব্বাসন করিয়া দিয়াছে। কোনপ্রকার উপাসনাই এখন সেখানে আইন-বিরুদ্ধ। বিদ্রোহী নেতা কামাল তাঁহার দ্বারা শাসিত তুরস্ক হইতে ধর্ম্মকে সমূলে উৎপাটন করিবার জন্য বদ্ধ-পরিকর হইয়াছেন। ফ্রান্সও ধর্ম্মকে

নির্ব্বাসন করিবার জন্য উদ্যোগ করিতেছে। ইংরাজ প্রকাশ্যে কোন মত প্রচার না করিলেও অন্তরে অন্তরে ভীষণ ধর্ম্ম-দ্রোহী হইয়া উঠিতেছে।

কয়েক শতাব্দী ইউরোপ তাবৎ সভ্যজগতকে সভ্যতার আলোক দেখাইয়া আসিয়াছে। বর্ত্তমানে যে নবযুগ আসিতেছে ইউরোপেই তাহার সূচনা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। সনাতনিগণ আপন মনকে চক্ষু ঠারিয়া এই নব যুগের বার্ত্তা এখনও স্বীকার করিয়া না লইলেও ভবিষ্যতে এই যুগের বাণী তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিতেই হইবে তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। যুদ্ধ পৃথিবী হইতে নির্ব্বাসিত হয় নাই। বলকানের নূতন ব্যবস্থা কাহারই মনঃপূত হয় নাই। সমরানল ঐ বলকান অঞ্চলেই আবার প্রজ্জলিত হইবে এবং তখন যুদ্ধক্ষেত্র একমাত্র ইউরোপে আবদ্ধ না থাকিয়া সমস্ত পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়িবে ; সেই সমরানলে পূত হইয়া পৃথিবী নূতন কলেবর ধারণ করিবে।

গান

কুমারী লতিকা মুখোপাধ্যায়

ছায়ানট

শোন্ মা, শোন্ মা শ্যামা
প্রাণের ব্যথা তোরে কই!
মা বিনে আর বলি কারে,
শুন্‌বে কে আর মা বই।
দিলি যদি সুখের হাসি,
দিলি কেন কান্না রাশি!
দিলি কেন মা এতই দুখ,
মরণ ভয় সদাই ওই।
সন্তানেরে দিয়ে ব্যথা
সুখ যে কি পাস্, বল্‌গো মা তা'!
কেঁদে কেঁদে জীবন গেল,
সুখী যে মা কেহই নই।

—

গান

কুমারী লতিকা মুখোপাধ্যায়

(ওগো) পথিক—ওগো পথিক,
কোথা তুমি চল একাকী?
মলয় বাতাস ফেলিছে নিশাস,
কেঁদে ফিরে উড়ে পাখী।
দিবস রাতির মিলন বাঁকে
চলেছ খুঁজিয়া কাহাকে?
হাসি, আশা, কি ভালবাসা
করে তোমায় ডাকাডাকি।
কোন অজানার দরশ আশে
চলেছ একা—কি পিয়াসে,
চলেছ কোথা সে, কাহার পাশে
মরমে কি ছবি আঁকি?

—

দেহাতীতা

শ্রীজগৎমোহন সেন বি, এস-সি বি, এড্

তব তনু লতা চাহি নাই সখি মনোমন্দার মালা,
তোমার তরুণ অনুরাগ রাঙা—আমারে পরায়ো বালা।
মৃণাল বাহুর বন্ধন লাগি ব্যগ্র নহে এ হিয়া,
অধরের সুরা গাঢ় চুম্বনে পান করিব না প্রিয়া।
আমি চাহি ঐ নয়নের কোণে, হৃদয়ের যেই শোভা।
জ্বলিয়া জ্বালিল সারাদেহে তব রূপের দীপালি প্রভা,
তারি আরতির রশ্মিধারায় আঁধার হৃদয় ভরি,
আমার সকল দহনের জ্বালা লইতে শীতল করি'।
আমার নয়নে সুন্দর তুমি নহত রূপের লাগি,
নহি আমি তব বর অঙ্গের যৌবন অনুরাগী।
মোর ফাল্গুন আসে নাই সখি তব দেহ উপবনে,
মোর বসন্ত চির জাগ্রত তোমার সবুজ মনে।
তরুণ মনের অরুণ মদিরা তরে এ তৃষিত হিয়া—
মনোনন্দন মন্দার মোরে উপহার দাও প্রিয়া।

দেবী

শ্রীবুদ্ধদেব বসু

'নতুন আর কী প্রেম ট্রেম করলে, বলো।'

'কেন? তোমার টাকার দরকার হয়েছে বুঝি?'

আমি হেসে ফেল্‌লাম।—'তা দ্যাখো, সত্যি একটা গল্প না লিখ্‌লে আর চল্‌ছে না।' অমিতা চন্দর ছোট, শাদা দাঁত মুহূর্তের হাসিতে উদ্ভাসিত হ'লো।

'উঃ, অসহ্য! খারাপ কাজ করো তো করো, তা-ই ব'লে' একটু লজ্জাও কি রাখতে নেই? shamelessly, blatantly, brutally '

'দেবী, করুণা করো। সবাই তো আমরা দুর্ভাগা পাপী—তা ছাড়া আর কি?'

"না—সত্যি। ওঃ, তোমরা গল্প-লেখকরা! তোমাদের মত স্বার্থপর, হীন, কুচক্রী।

"জঘন্য কাম-পশু—"

'নিজের স্তুতি কোরো না; কাম-পশু হ'তে পারলে তোমরা বেঁচে যেতে। ঠাট্টা নয়, তোমাদের হৃদয়হীনতার সীমা বা নিঃসীমতা ভাব্‌লে শিউরে উঠ্‌তে হয়। এই তোমার কথাই ধরো তুমি কি মানুষ? আমার সন্দেহ হয়, তুমি ম'রে গেলে আমার বুক যদি কেটে খোলা হয়, ভিতরে যেখানে হৃদয় থাকা উচিত

'হৃদয় নয়, অমিতা, হৃতপিণ্ড।'

'যা-ই বলো। যেখানে সে-জিনিষটা থাকা উচিত, সেখানে দেখা যাবে কালো, বিশ্রী একটা গর্ত্ত; এমন ভয়ানক দেখ্‌তে যে তোমার মৃতদেহ শ্মশানে নিয়ে যেতে তোমরাও চাইবে না।'

'চমৎকার প্রস্‌পেক্ট্‌। যথাবিধি সৎকার না হওয়ার জন্য আমার প্রেতের মুক্তি হবে না; ঝোড়ো হাওয়ার মত করুণ চীৎকার করতে-করতে আমাকে সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়াতে হবে। তারপর একদিন হয় তো—এক রাত্রে, বাইরে যখন বৃষ্টি, দৈবাৎ তোমার ঘরে এসে উপস্থিত হ'বো, সেখানে বিছানায় শুয়ে' ঘুমের আগে তুমি কবিতার বই পড়্‌ছো, শিয়রে টেব্‌ল্‌ ল্যাম্পের ঠাণ্ডা আলো তোমার শাদা চুলের ওপর পড়ে' তোমাকে আরো সুন্দর করে' তুলেছে '

'থামো, থামো। তোমার চালাকি আমি বুঝ্‌তে পেরেছি। ফ্লাটারি দিয়ে এখন আর আমাকে ভোলাতে পার্‌ছো না।'

'ফ্ল্যাটারি! যা-ই বলো, অমিতা, ফ্ল্যাটার্ড হবার ক্ষমতা তোমার অসাধারণ। কিন্তু এই যে চা। কী খাবে, বল।'

'কী খাবে? Anything. তোমাদের মত আমি ভিটামিন-ফ্যাডিস্‌ট্‌ নই; ডাক্তারি বই দেখে দেখে খাদ্য নির্ব্বাচন করি নে। I am not particular what eat—মুখে খারাপ না লাগলেই হ'লো।'

Sandwiches—chicken, ওয়েইটারকে আমি বল্‌লুম।

'স্যাণ্ডউইচ!' অমিতা বলে' উঠল, 'না। বরং দুটো ডিম নাও—পোচড। উহুঁ—আজকে বড় গরম। দু' একটা ক্রীম রোল হয় তো খাওয়া যেতো—কিন্তু, এখানে ওরা এত বেশী মিষ্টি দ্যায়! যাক্‌ গে—নাও, তোমার স্যাণ্ডউইচই নাও।'

আমি হেসে ফেল্‌লাম।

'হাস্‌ছো যে? আমার এই অব্যবস্থিত চিত্ততা (ঠিক হ'লো?) মনে মনে টুকে রাখছো তো।—পরের গল্পে এক ফাঁকে বসিয়ে দেবে। ইস, তোমার কথা যতই ভাবি, রাগ সামলাতে পারি নে। বন্ধুদেরকে তুমি যা exploit করো—চমৎকার বন্ধু বটে তুমি! চা-টা ঢাল্‌বো? না, এখনো হয় নি। তুমি গল্প লেখক বন্ধুতার মর্য্যাদা তুমি কি বুঝবে?"

"তুমি কী বুঝিবে সন্ন্যাসী—"

দ্যাখো, ঠাট্টা দিয়ে উড়িয়ে দেবার যতই চেষ্টা করো, মনে-মনে তুমি নিশ্চয়ই জানো, আমি যা বল্‌ছি, সব

সত্যি। প্রতিবাদ তুমি করবে কী করে?—সে-মুখ কি তোমার আছে? বন্ধুরা তোমাকে বিশ্বাস করে সব মনের কথা বলে—আর তুমি তার কী প্রতিদান দাও? না, সে বিশ্বাস ভাঙ্গিয়ে রোজগার করো। খুব সহানুভূতির ভাব করে' তো শুনে যাও—এদিকে সব সময় মনে মনে ভাবছো, কী ভাবে এটা থেকে সব চেয়ে ভালো গল্প তৈরি হয়; ঐ জায়গাটা বাদ দিতে হবে, ওখানটা বদলানো দরকার, এখানে কয়েটা ফুটকি বসিয়ে দিলেই চলবে। বন্ধুরা হচ্ছে তোমার শীকার, শকুনের মত তীক্ষ্ণ চোখ মেলে তুমি বসে আছো—একটু ফাঁক পেলেই তাদের পেট চিরে নাড়িভুড়ি 'করে'—

'আর নয়, থামো। নিজের সম্বন্ধে আমার নিজেরি ভয় করছে। এদিকে চা-টা বুঝি তেতো হয়ে গেলো।'

'হোক্, চা আমি তেতো করেই খাই। এই নাও। রটন্ সাণ্ডউইচ—এগ-পোচ নিলেই হ'তো। থাক্—এখন আর দরকার নেই। তোমার মত এমন কপট, খল, কূটপ্রকৃতির—ছাই ভাষাতেও কুলোয় না। তোমাকে একদিন কথায় কথায় একটা গল্প বললুম—আমার ছেলেবেলাকার একটা ব্যাপার—তা সেটা তুমি কাউকে কিছু না বলে' স্রেফ তোমার বইয়ে ঢুকিয়ে দিলে—এমন ভাবে লিখলে, যেন আমি তোমাকে লেখবার জন্যই ও-গল্প বলেছিলুম। perfidy on perfidy! উঃ, কেন লোকের সাহিত্যিক বন্ধু থাকে?'

'ওটা স্বীকার করো, অমিতা, গল্পটা ভালো হয়েছিলো।'

'ছাই হয়েছিলো। ক্লীন ফাঁকি। তারপর—বেচারা অতনুকে ভাবিয়ে তো তুমি জীবন ভরেই খেলে। ও একটা ফ্যাসাদে পড়ে—তুমি লেখো এক গল্প। ঝকমারি, ঝঞ্ঝাট, অশান্তি—সব ওর; তোমার হচ্ছে অর্থ আর যশ। কী অন্যায়! আমি যদি অতনু হতু'ম তোমার কাছ থেকে পঁচিশ পার্সেন্ট কমিশন অন্ততঃ আদায় করে নিতুম। অতনু এ-সব বিষয়ে একটা ইডিয়ট বলে'—! ও নানারকম যন্ত্রণা ভোগ করে তোমাকে ready made মাশমশলা জোগাবে, আর তুমি কাগজের ওপর কলম চালিয়ে বড়লোক হবে। ভয়ানক কথা! আর, ভারি তো তুমি লেখো! জীবনে তো একটা গল্প নিজে ভাবতে পারলে না; শীকারের মুখ থেকে যা শোনো, একটু সাজিয়ে-গুছিয়ে, তা-ই তো লিখে যাও। এমন কি কথাগুলোও তো কত জায়গায় নির্ব্বিবাদে চুরি করো। করো না? অমন লেখার বাহাদুরী কী? দাঁড়াও, একদিন তোমার সব কথা আমি ফাঁস করে দেবো, তোমার সাহিত্যিক কীর্ত্তিস্তম্ভ ধুস্ করে পড়বে ভেঙে।'

'যাক্—স্তম্ভ একটা উঠেছে তা হলে। That's something.

তুমিই বলো—তোমার যা পেশা, তা কি ভয়ানক-রকম স্বার্থপর—এমন কি খানিকটা নিষ্ঠুর নয়? তোমার ঔদাসিন্য, নির্লিপ্ততা—যা নিয়ে তুমি এত জাঁক করো—হৃদয়হীনতা ছাড়া তা আর কী? মানুষের সুখ, দুঃখ, আশা, বাসনা—কিছুই তোমার মনকে স্পর্শ করে না, তোমার চোখ থাকে সব সময় গল্পের ওপর। একটা ভীষণরকম hideous ব্যাপার হয়তো ঘটলো; তুমি তা শুনে মনে-মনে ভাববে, চমৎকার! এ নিয়ে চমৎকার একটা গল্প হয়। তেমনি, ছুরি দিয়ে একটা কার্বঙ্কল্ কেটে রক্ত পুঁজ বার করে একজন ডাক্তার হয়তো বলবেন, "It was a beautiful operation"। Beautiful! যেমন, তোমার চোখে বোকামি, ভাঁড়ামি, হীনতা, ভণ্ডামি—পৃথিবীর যত কুৎসিত জিনিষ, সব beautiful"। সব জিনিষ সম্বন্ধেই তোমার একটা professional interest; তুমি নিজে রক্ত মাংস হৃদয় নিয়ে মানুষ, তুমি—তুমি যেন নেই-ই। জিজ্ঞেস করি, এর নাম কি বেঁচে থাকা?'

'জিজ্ঞেস করতে পারো বটে।'

তোমরা গল্প লিখিয়েরা এক একটি spiritual ghoul, তোমরা নিজেরাও মৃত; মৃত জিনিষ নিয়েই তোমাদের কারবার। যে আমেরিকান জ্যর্ণালিস্ট্ এক সদ্য বিধবার কাছে গিয়ে বলেছিলো, How It Feels To Be a Widow—এ-বিষয়ে তাকে কিছু বলতে তোমরা তারি একটু মার্জ্জিত সংস্করণ মাত্র। যেখানেই যাও, যাই করো কোনখানে একটা "story" পাওয়া যায় কিনা, সে

বিষয়ে তোমাদের মন সম্পূর্ণ সজাগ। মানুষ সুখে কি দুঃখে থাক—মরুক কি বাঁচুক, ভারি তো তোমরা কেয়ার করো; ও-সব জিনিষ "literary" হলেই তোমরা খুসি। ও-সব সুখ দুঃখ হচ্ছে কাঁচা মাল; আর পরের ধাপই প্রকাশকের চেক।'

"তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে, অমিতা একটু আগেই কোনো গল্প লেখক তোমাকে চুমো খেতে চাইতে ভুলে গিয়েছিলো।'

'ভুলিয়ে ভালিয়ে আমাকে দিয়ে যে আর একটা প্রেমের গল্প বলিয়ে নেবে, অমন আশা কোরো না। আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, তোমার কাছে ভীষণ সাবধান থাকবো। চিনিটা কী হ'লো? যা-ই বলো, এ তোমার ভারি অন্যায় আবদার,; তোমার গল্প লেখবার জন্য সবাই প্রেম করে' মর্‌বে। কেন, নিজে প্রেমে পড়ে দেখ্‌তে পারো না?'

'কী কর্‌বো, অমিতা, সবার কপালে সব রকম সৌভাগ্য হয় না।'

'সৌভাগ্য! বটেই তো! একে যদি তুমি সৌভাগ্যই মনে করতে, তা হ'লে—তুমি নিজকে যতই ক্লেভার মনে করো, আমাকে ঠকাতে পারছো না। আসল কথা কী, তা আমি জানি। তুমি চাও মনের শান্তিতে থাকতে—দিব্যি আলগোছে দর্শক সেজে বসে' থাকতে, তোমার ব্যবসায় উন্নতির পক্ষে সেটাই দরকার। কারণ, নিজের বুক যখন যন্ত্রণায় মোচড় দিয়ে ওঠে, তখন আর তা নিয়ে অত হাসি-খেলা করে' লেখা যায় না। যায়?'

'তোমার কথায় আমার একটি শুধু আপত্তি আছে। লেখা জিনিষটা হাসি-খেলা করে' হয় না। তোমার প্রেমিক ভালোবাসায় যত যন্ত্রণা ভোগ করে, আমি একটা গল্প লিখতে গিয়ে তা'র চেয়ে কিছু কম করি নে। বিশ্বাস না হয়, একবার লেখা চেষ্টা করে দেখতে পারো।'

'তা-ই ভাবছি। কিন্তু কাগজ-কলম নিয়ে বসা এক হাঙাম। একটা চিঠির মত চিঠি জীবনে কখনো লিখতে পার্‌লুম না—গল্প তো দূরের কথা। যাক্‌, আমার সব গল্পের সত্ত্ব তোমাকে দিয়ে দিলুম—একেবারে ফ্রী। একটা উৎসর্গ লিপি পর্য্যন্ত চাইলুম না।'

'অনেক ধন্যবাদ।'

'Not so soon একটা সর্ত্ত আছে। সেটা এই যে তুমি কোনো মেয়ের প্রেমে পড়বে। নিজে যে আমাদের ওপর খুব চাল করে' বেড়াও, তোমার প্রেমে-পড়া অবস্থাটা দেখবার জন্য আমি মরে যাচ্ছি।'

'অমিতা: যে মদ তৈরি করে, তা'র মাতাল হলে চলে না।'

'যাও, যাও—আমার কাছে তোমাদের "ক্লিশে" আওড়িয়ো না; ও-সব শুনে'-শুনে' ঘেন্না ধরে' গেছে। স্বীকার করো না কেন যে তুমি ভীরু, তুমি কাপুরুষ?' অমিতা হঠাৎ চুপ কর্‌লো।

অমিতার কথার ধরণে একটু নার্ভাস হ'য়ে গিয়ে আমি চট্‌ করে' নীরবতা ভেঙে দিলুম: 'তা হ'লে এবার আরম্ভ করো।'

'কী আরম্ভ কর্‌বো?'

'তোমার গল্প।'

'বা রে—'

'বা রে আবার কী? এই না বল্‌লে—'

'বলেছি বলে' এখনি তোমার ফর্‌মায়েস-মত গল্প ফাঁদতে বসি আর কি! আহ্লাদ!'

'লক্ষ্মী তো—'

'এ যে অদ্ভুত রকম জুলুম! এরি জন্যে কি আজ বেলা ছুটোর সময় আমাকে চা খাওয়াতে নিয়ে এসেছো?'

'অনেকদিন কল্‌কাতার বাইরে ছিলুম, ফিরে এসে মনটা চট্‌ করে' কাজে বস্‌তে চাইছে না—'

'তার ওষুধ হলাম বুঝি আমি? একাধারে ফস্‌ফোলে-সিথিন আর পেল্‌ম্যানিজম্‌—বিজ্ঞাপন যদি বিশ্বাস করো। O monstrous treachery, treacherous monstery—'

'Teacherous monstery, monstrous treachery!' আমি প্রত্যুত্তরে বল্‌লুম, 'কেমন হ'লো এটা—না, থাক্‌, তোমার যে-রকম মেজাজ দেখছি—'

'তোমার পেয়ালা ফুরোয় নি? কী যে বিষম সময় নাও চা খেতে! দ্যাখো, তোমাকে একটা মনের কথা বলি, হেসো না। সব মেয়ের জীবনেই একটা সময় আসে, যখন সে উপলব্ধি করতে বাধ্য হয়, সে ফুরিয়ে এসেছে।

চোখ বুজে যতই না-বোঝবার ভাণ করো, বয়েস বেড়েই চলে।'

'অমিতা, তুমি—'আমি প্রতিবাদ করলুম।

'থাক, থাক্, ও-সব আর না-ই বললে। শাদা সত্য হচ্ছে এ-ই যে আমি বুড়ো হতে চলেছি। আমার কত বয়েস, জানো?'

'এর পরে এ-কথা বলবে না, আশা করি, যে তোমার তুলনায় আমি নেহাৎ ছেলেমানুষ।'

'সুতরাং' নিজের কথার জের টেনে অমিতা বললে, 'আমার কাছ থেকে আর নতুন প্রেমের গল্প আশা কোরো না। এর পরে হয়-তো ঝাঁ করে একদিন বিয়েই করে' ফেলতে হবে। খোঁজে থেকো, আমার জন্যে একজন স্বামী যদি জোগাড় করে' দিতে পারো। নাও, চা।'

'নাঃ, তোমাকে নিয়ে আমার আর চলতো না, দেখছি।' দ্বিতীয় পেয়ালা চায়ে চুমুক দিয়ে আমি একটা সিগ্রেট ধরালুম, 'এম্‌নিই তো আমার নারী-বিদ্বেষী বলে' দুর্নাম আছে, তার ওপর তোমার ও-সব কথা যদি গল্পে লিখি—নাঃ। দুঃখিত, অমিতা চন্দ, কিন্তু বাঙলা সাহিত্য তোমাকে গ্রহণ করতে পারবে না। ভাবছি, নামটা এবার একটু ভালো করতে হ'বে। কোনো দেবীর গল্প বলতে পারো '

'দেবীর ' অমিতা ভুরু কুঁচকোলে।'

'মানে, এমন-কোনো মেয়ের, কপালে যার বুদ্ধির দীপ্তি, চোখে যার তপস্যার জ্যোতি, যা'র পবিত্রতা বরফের মত, আগুনের মত, হিন্দু নারী নারীত্বের যে—'

'বুঝতে পেরেছি, থাক্। ও-রকম মেয়ে দু'একটা যে না দেখেছি, তা নয়। সাধারণত তারা সূতিকায় মারা যায়।'

'ঠাট্টা নয়, অমিতা। দ্যাখো না ভেবে, কিছু মনে করতে পারো কি না। একটা লাগসৈ গল্প যদি পাওয়া যায়—চাই কি, যে কাগজ আমার ওপর খড়্গ হস্ত, তারাই নিয়ে নেবে হয়-তো। বেশ ভালো দাম দ্যায় ওরা।"

'দাঁড়াও, দেখছি—'অমিতা ঠোঁটের এক কোণ কামড়ালে, 'আশ্চর্য্য, তোমাকে এত বকলুম, তবু, দ্যাখো, এখন তোমাকে সাহায্য করবার জন্য ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছি। আমার কি গরজ? যেখান থেকে পারো, তুমি গল্প কুড়িয়ে নাও। আর দশ মিনিটের ভেতর চা শেষ করে আমি চললুম।'

'যে-কথা মোটেও সত্যি নয় বলে' জানি, সে-কথা মুখে জোর করে' বলার মোহ বুড়ো বয়েস পর্য্যন্ত থেকে যায়, দেখছি।'

'সত্যি নয়? আচ্ছা, দ্যাখো—'অমিতা ঢক্ করে' অনেকখানি চা গিলে' ফেললো। 'হাঁ—একটা মনে পড়েছে, শোনো। ওটা বোধ হয় তোমার কাজে লাগবে। ভারি মজার ব্যাপার।'

'মজার?'

'সেটা নির্ভর করবে, তুমি কী ভাবে লেখো, তার ওপর। ইচ্ছে করলে এ থেকে তুমি একটা হৃদয়-বিদারক ট্র্যাজিডিও করতে পারো। সত্যি বলতে, অনেক-কিছুই তোমার ওপর নির্ভর করবে। কারণ, আমি যেটুকু জানি, তা অত্যন্ত ভাসা-ভাসা, লোকের মুখে শোনা। অনেক ফাঁক তোমাকে নিজে ভর্ত্তি করে' নিতে হ'বে। ব্যাপারটা ঘটেছিলো আমাদের পাশের বাড়িতে, এবং কলকাতায় পাশের বাড়ির দূরত্ব হচ্ছে সব চেয়ে বেশি; তাই বাইরের লোকের কাণে যেটুকু এসে পৌঁছয়, তার বেশি আমি বলতে পারবো না। তবে একটা সুবিধে আছে; তুমি যা চাও, এ-গল্প তাই। এক দেবী নিয়ে।'

'বলো কী? আমার অদৃষ্ট কি হঠাৎ এতই ভালো হয়ে গেলো যে—'

'হ্যাঁ, একেবারে দেবী; কোনো ভুল নেই। মেয়েটি ছিলো—ঐ তুমি যা বললে—বরফের মত, আগুনের মত। একজনের কাছে বরফ, আর-একজনের কাছে আগুন। ওর বরফত্ব আর আগুনত্ব দুই-ই সমান প্রখর ছিলো। আশ্চর্য্য মেয়ে। ওর মত মেয়ে আর-একটু সাবধান যে কেন হয় নি, তা ভেবে অবাক লাগে। তা হলেই আজকে তোমাকে এ গল্প বলা থেকে রেহাই পেতুম। অবিশ্যি, শেষ পর্য্যন্ত ও বেশ সামলে নিয়েছিলো—'

'অমিতা, তুমি ধরে' নিচ্ছো, আমি ব্যাপারটা সব জানি।"

'ব্যাপার কিছুই নয়, দু' মিনিটেই বলা হয়ে যায়।

ভদ্রলোক—কিরণবাবু বুঝি নাম—অনেক খোঁজাখুঁজির পর লাবণ্যকে বিয়ে করেন। লাবণ্যর রূপ ছিলো; এবং চল্‌তি কথা-অনুসারে সে শিক্ষিতাও—মানে, সে রবীন্দ্রনাথের কবিতার লাইন আওড়াতে পারে, ভুল সুরে রবীন্দ্রনাথের গান গাইতে পারে, এবং রবীন্দ্রনাথের মত বানান করে'—এটা আন্দাজ কর্‌ছি—চিঠি লিখ্‌তে পারে। খুব স্বাভাবিক, ও একটা ডায়েরী রাখতো; অন্ততঃ তোমার গল্পে রাখা দরকার হবে। হবে না? ওর চরিত্র সম্পূর্ণ করে ফুটিয়ে তোলবার এ-কৌশল তুমি নিশ্চয় ছাড়বে না '

'তুমি ভুল করো নি তো, অমিতা ও-ধরণের মেয়ের ভেতর কি দেবী পাওয়া যায়? মেসের ঝি কি সাপুড়ের বৌ—

'শোনোই। ভদ্রলোক—কিরণবাবু—বৌ পেয়ে খুব খুসি হলেন, কিন্তু তাঁর কপাল মন্দ, বিয়ের মাসখানেক পরই তাঁর চাকরিতে বদ্‌লি হলো। নিজকে ছিনিয়ে নিয়ে তিনি গেলেন চলে'—কোথায় যেন। বাড়িতে রইলো তাঁর বিধবা মা, আর দুই ছোট ভাই—বরুণ আর বাসব।

'বরুণ বয়েসে বড়—হাসি খুসি, দিলদরিয়া গোছের লোক; হো-হো করে' হাসে, যা মনে আসে, পটাপট বলে' ছায়, বলেই ভুলে' যায়। ওর সম্বন্ধে আমরা দুর্ণাম শুন্‌তে পেতুম, ও নাকি মদ খায়, ওর নাকি "চরিত্র খারাপ।" আচ্ছা, আমাদের দেশের লোক চরিত্র খারাপ বল্‌তে শুধু মদ্যপান বা বিবাহ-অতিরিক্ত যৌন আচার বোঝে কেন, বল্‌তে পারো? অবিশ্যি বেশি মদ খেলে লোকের স্ত্রীকে প্রহার কর্‌বার একটা ঝোঁক হয়, কিন্তু সেটা সচরাচর নয়। আর—যৌন উচ্ছৃঙ্খলতা, সেটা কি বিয়ের মধ্যেও হয় না, কিন্তু তাকে লোকে দোষ ছায় না কেন? স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যখন বিশ্রীরকমের অতি-চার হয়, তাকে কেন দুশ্চরিত্রতা বলা হয় না? আশ্চর্য্য, এ-সব জিনিষ আমি বুঝতেই পারলুম না। যে-লোক চুরি করে, মিথ্যে কথা বলে, লোক ঠকায়, যে-লোক শুধু দৈব-গুণে জেলের বাইরে আছে, সে-ও আমাদের দেশে একজন "চরিত্রবান্‌" বলে' চলে' যায়, যদি তার মদ্য বা অন্য স্ত্রীতে আসক্তি না থাকে। অথচ, যে-লোক সত্যনিষ্ঠ, নির্ভীক, অর্থ সম্বন্ধে অত্যন্ত সৎ—মোটের ওপর, যে ভদ্র-লোক—চরিত্রহীনতার মার্কা সে কিছুতেই এড়াতে পারবে না, যদি ও-সব কোনো বিষয়ে তার দুর্ব্বলতা থাকে। আরো আশ্চর্য্য নয় '

অমিতা চুপ করলো, কিন্তু আমি কোনো কথা বললুম না। এমন চমৎকার অপরাহ্নটা নীতিশাস্ত্রের আলোচনায় কাটিয়ে দিতে আমার ইচ্ছে কর্‌ছিলো না।

'অথচ', অমিতা বল্‌তে লাগলো, 'যত রকম অন্যায় পৃথিবীতে আছে, তার মধ্যে যৌন অনিয়মিততাই সব চেয়ে ক্ষমার যোগ্য—যদি অবিশ্যি সেটাকে অন্যায় বলো। কারণ, সেটার মূলে আছে প্রকৃতির প্ররোচনা, যা অতিক্রম করা খুব শক্ত লোকের পক্ষেও সব সময় সম্ভব হয় না। তা ছাড়া, সেটার সঙ্গে একটা ইমোশন্‌, উষ্ণ হৃদয়বৃত্তি জড়িত থাকে, অন্ততঃ সাধারণত থাকে; এবং তাতে জীবনের ঐশ্বর্য্য বাড়ে। কেউ যদি এ-ব্যাপারে অন্যায় রকম বাড়াবাড়ি করে, তা হলেও তার পক্ষ থেকে এটুকু বল্‌বার আছে যে সে নিজের ছাড়া কারো কোনো ক্ষতি করছে না। অন্যের ক্ষতি করে' নিজে যে লাভবান হয়, তার চেয়ে অন্ততঃ এ ভালো। কিন্তু আমাদের দেশের ভালো-মন্দর ধারণা সম্পূর্ণ আলাদা। এটা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছো যে যে-উপায়ে পয়সা হয়—যতই সেটা অসৎ কি হীন হোক—তারি ওপর লোকের অসীম শ্রদ্ধা—কোনো-রকমে জেলের বাইরে থাক্‌তে পার্‌লেই হলো। প্রকৃত অর্থ সঞ্চয়ের জন্য যে-সব গুণ দরকার, চরিত্র মানে আজ কাল তা-ই। পয়সা করা ছাড়া এখন আর কোনো ধর্ম্ম নেই। যে যত পয়সা পুজো করবে, সে-ই তত পুণ্যাত্মা—ব্যাপার তা-ই দাঁড়িয়েছে।—দ্যাখো, কথা বল্‌তে-বল্‌তে চায়ে চুমুক দিতে ভুলেই গিয়েছিলুম, মনে করিয়ে দিতে হয় না? ঠাণ্ডা। আর আছে নাকি চা? বাঃ; Plenty সাধারণতঃ আমি একসঙ্গে এক পেয়ালার বেশি চা খাই নে, আজ তোমার পাল্লায় পড়ে' অনেক খেয়ে ফেললুম। এখানকার চা-টা বেশ ভালো মনে হচ্ছে। কিন্তু তাই বলে' আর নয়—এ-ই শেষ।' অমিতা পেয়ালায় দুধ ঢাললে, 'হ্যাঁ…গল্পটা শেষ করে ফেল্‌তে হয়…সেই

রেচেড্ গল্প। কী না বল্‌ছিলুম? বরুণ, ঐ রকম ছেলে ছিলো বরুণ। আর, ছোটটি···বাসব, সে হচ্ছে কবি—কবি ছেলে, দুপুর রাতে বিছানা থেকে উঠে বাঁশি বাজায়; জ্যোছ্‌না রাতে ছাতে উঠে সহজে আর নাবে না, কাণ পেতে থাকে—কখন খাবার ডাক আস্‌বে; একটা অত্যন্ত সাধারণ কথা অনেক ঘুরিয়ে, মোচড় দিয়ে বলে; আত্মা-টাত্মা নিয়ে—যাকে হাতের কাছে পায়, তার সঙ্গেই তুমুল তর্ক করে। একটা ছেলেমানুষ-ছেলেমানুষ ভাব—এ-ই ছিল ওর কৌশল; কিছুই-জানি-নে· পবিত্র দেব-দূত গোছের ব্যাপার। ছোট-খাটো একটি বার্লাপ আর কি—বুঝ্‌লে না? কবিতা আওড়াতে-আওড়াতে কৌমার্য্য-হরণ, শিশুর মত, অবোধের মত মৃদুভাবে, অলক্ষিতে আত্মার ভগিনীর শয্যার অংশগ্রহণ। হাস্‌ছো? Ah you hardened professional! বাসব খুব চমৎকার জম্‌বে—তা-ই ভাব্‌ছো? খুব এক হাত দেখিয়ে দেবে, নয়? গল্পটা যখন বইয়ে বেরুবে, তখন জ্যাকেটে নিজে কী লিখে' দেবে, তা·ও বোধ হয় ঠিক করে' ফেল্‌ছো?—"এ বইয়ে লেখকের বিদ্রূপের ক্ষমতা যে-ভয়ঙ্কর নির্ম্মমতা, নিদারুণ সূক্ষ্মতা—"যাক গে, তোমার যা খুসি, তাই লিখো, সম্প্রতি আমি গল্পটা বলে ফেলি।'

'আমি বল্‌বো বাকিটা? নব-বিবাহিত মেয়ে, grass widow, জলজ্যান্ত দুই দেওর—এর পর কী? কী আবার? তোমার কি মনে হয় না এই পুরোণো, পচে-যাওয়া গল্প আমার কাছে বল্‌তে-যাওয়া তোমার পক্ষে একটু দুঃসাহস হয়েছে?'

'উঃ, কী অকৃতজ্ঞতা! না দ্যাখো, তুমি যা ভাবছো, তা কিছু নয়। "নষ্টনীড়" নয়! তা হলে আমি বল্‌তে যাবো কেন? তুমি না দেবীর গল্প চাইলে? শোনো, মজা আছে। শেষের দিকে একটা মোচড় পাবে; সেটা যে-ভাবে ব্যবহার কর্‌তে পারো, তারি ওপর তোমার গল্পের কৃতকার্য্যতা নির্ভর করবে। এখন হলো কী—শুন্‌ছো? বরুণ ওর বৌদির প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট হয়ে পড়লো। স্বভাবতই; কারণ, মেয়েদের সঙ্গ ও খুব পছন্দ কর্‌তো। তা ছাড়া, আগেই বলেছি, লাবণ্যর চেহারা ছিলো ভালো—

'বরুণ তার বৌদির সঙ্গে অতি মৃদু, নিরামিষ গোছের একটা ফ্লার্টেসন্ চালাবার চেষ্টা কর্‌তে লাগ্‌লো। সহস্র উপায়ে লাবণ্যর সঙ্গে অন্তরঙ্গ হবার ফিকির সে খোঁজে; মনের ইচ্ছা গোপন করতে চায় না, চাইলেও পারে না। গায়ে পড়ে' লাবণ্যর সঙ্গে আলাপ কর্‌তে যায়, পড়তে দ্যায় নানারকম বই; সিঁড়িতে কি বারান্দায় হঠাৎ দেখা হ'য়ে গেলে বলে, "সত্যি বৌদি, কী সুন্দর তুমি দেখতে!" না-হয়, একটা হাসির কথা বলতে গিয়ে নিজেই হো-হো করে' হেসে ফেলে—বলা শেষ হয় না। কিন্তু—here comes the দেবী-touch লাবণ্য—ও বাবা, বরফ, একেবারে বরফ। কাঞ্চনজঙ্ঘার তুষার; Balmer Lawrie's Ice। বরুণের মুখের দিকে এমন কি ভালো করে' তাকায় না পর্য্যন্ত; আর যখন তাকায়, কঠিন, পাথরের মত দৃষ্টিতে তা'কে বিদ্ধ করে' নানারকম রক্ত-জমানো উপদেশ দ্যায়। বলে:—"তুমি আমার দিকে অমন করে' তাকাও কেন? তোমার কথা সবি তো জানি—তুমি মদ খাও, তুমি উচ্ছন্নে গেছো। আমার সঙ্গে কথা বোলো না।' না-হয় বলে, "সংযম অভ্যেস করো—না-হয় আর মানুষ হ'লে কিসে? ব্রহ্মচর্য্য পালনের এ-ই তো সময়।" "কী রাবিশ কতগুলো বই নিয়ে এসেছো, কে পড়ে ও-সব? শান্তিনিকেতন সিরিজ পড়েছো?" "নিজে ভালো দেখে একটি মেয়ে বিয়ে করো; তা হ'লে যদি তুমি বুঝতে পারো, দাম্পত্য-জীবন কত পবিত্র।" ইত্যাদি, ইত্যাদি। লাবণ্য যখন কথা বলে, এ-সবই বলে। বেশীর ভাগ সময়ই গম্ভীর হয়ে থাকে, বরুণকে মোটে আমলই দ্যায় না; এমন ভাব করে ওকে যেন চেনেই না। লাবণ্য তার ঘরে একা; হঠাৎ বরুণ হয়-তো ঢুকে' পড়েছে; লাবণ্য তৎক্ষণাৎ জিজ্ঞেস কর্‌বে, "কী চাও?" কী চায়, তা বলা কঠিন; বরুণকে তাই দু, একটা বাজে কথা বলে' সরে' পড়তে হয়। মোট কথা, হাজার চেষ্টা করে'ও বরুণ তা'র বৌদির কাছে এগোতে পারছিলো না; যেন জেসনের ষাঁড়, নিঃশ্বাসে সতীত্বের আগুন ছড়াচ্ছে—কা'র সাধ্যি কাছে আসে। একেবারে কাঁটা-তারের বেড়া-দেয়া সতীত্ব, একটু ছোঁবার উপায় নেই। এ-ই হচ্ছে তোমার সুযোগ—তোমার

দুর্নাম স্খালন করবার সুযোগ। সবিস্তারে লাবণ্যর অবিচলতার, কঠিনতার, কণ্টকময়তার বর্ণনা করবে—তোমার ভাষার যত জোর আছে, সব প্রয়োগ করবে এইখানে; উপমায়, অলঙ্কারে, আড়ম্বরে খুব জমকালো করে সাজাবে এ জায়গাটা; দেখাবে, নারী কত মহিমাময়ী, আর পুরুষ কেমন বর্ব্বর, কামাতুর; বরুণের নারকীয়তার বিরুদ্ধে লাবণ্যর দেবীত্বকে উজ্জ্বল করে' আঁকবে। আহা—তোমার পাঠকদের হাত-তালির শব্দ শুনতে পাচ্ছি।" অমিতা চেয়ারে হেলান দিলে।

'কিন্তু নরকের কীটের তো শাস্তি হলো না।'

'তা হয়েছিলো বই কি—না হ'য়ে পারে? দেবীর অভিশাপ কখনো ব্যর্থ হয় না। বরুণ যদি এতটা বুঝতে পারতো, তা হ'লে হয়-তো আগেই সাবধান হ'তো, সরে' পড়তো। লাবণ্যর সঙ্গে কখনো যদি তা'র ঝগড়াও হ'তো, তা হ'লে সে বেঁচে যেতো। কিন্তু তা'র মেজাজ ছিলো ভয়ানক ভালো, মনে ছিলো অসীম স্ফূর্ত্তি, সব জিনিষই সে নিতো হাল্‌কাভাবে। লাবণ্যর কথা আর ব্যবহার সে গায়েই মাখতো না; হেসে—অনেক সময় লাবণ্যর মুখের ওপর হেসে—উড়িয়ে দিতো। হয়-তো ব্যাপারটা তার কাছে ছিলো খেলার মত; লাবণ্যর কাছ থেকে বাধা পেয়ে মজা আরো জমে' উঠলো। লাবণ্য যতই তা'র ওপর বিতৃষ্ণা দেখায়, ততই সে ঘুরে' ঘুরে' ফিরে' আসে; লাবণ্যর রূঢ়তা যতই রূঢ়তর হয়, ততই বরুণ আরো রসিকতা করবার লোভ সাম্‌লাতে পারে না। বল্‌তে পারো, ছেলেটা একটু brazen ছিলো; তা'র আত্মসম্মানজ্ঞান টন্‌টনে, লজ্জাবোধ তীক্ষ্ণ ছিলো না। যে-কথা এ-ভাবেও বলা যায় যে "আধুনিক" নিউরটিক ছোক্‌রাদের মত একটু ছুঁলেই সে আঁৎকে উঠতো না। তা ছাড়া, ওর দিক থেকে এ-কথাও তুমি ভেবে দেখো যে ওর বৌদি যে সত্যি সত্যি বরফ নয়, তা মনে করবার কারণ ওর ছিলো। লাবণ্য যে কখনোই হাস্‌তো না বা বাজে গল্প করতো না, তা নয়। বাসবের সঙ্গেই তো সে একেবারে আলাদা মানুষ। বাসব ছিলো তা'র প্রিয়পাত্র; তার সঙ্গে ছাতে বসে' অনেক রাত অবধি সে গল্প করতো, দুপুরবেলা দু'জনে বসে' কবিতা পড়তো, তাদের হাসির শব্দ পাশের ঘরে বরুণের দ্বৈপ্রহরিক তন্দ্রা অনেকবার ভেঙে দিয়েছে। কখনো যদি ওদের কথাবার্ত্তার মাঝখানে বরুণ গিয়ে পড়েছে, দু'জনে পরস্পরের দিকে একবার তাকিয়ে চুপ করে গেছে। বরুণ উপস্থিত থাকলে ওরা ভালো করে কথাই কইতো না। বরুণকে বেশ স্পষ্ট করেই বুঝতে দিতো যে তাদের মধ্যে কাব্য এবং আরো যে-সব গভীর বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়, তাতে যোগ দেবার যোগ্যতা তার নেই।'

'বাসব আর লাবণ্য আত্মার দোসরতা পাতালো—বুঝতে পারছি। আঃ, বেশ।'

'এখন থেকেই মনের ঠোঁট চাট্‌তে আরম্ভ করেছো? you fiend! বেশ, এখানে তোমাকে অনেকখানি জায়গা ছেড়ে দিলুম। এটা তুমি এক ইঞ্চি ফাঁকা বা দেড় শো পৃষ্ঠা সাইকলজি দিয়ে ভরতে পারো—যেটা তোমার খুসি। মাস কয়েক সময় ছেড়ে দাও। তারপর ছোট একটা ঘটনা। ঘটনাটা আমি শুনেছিলাম ওপর-ওপর, ভালো করে' বল্‌তো পারবো না। যতদূর মনে হয়, বরুণ দৈবাৎ একদিন বাসব আর লাবণ্যকে চুম্বনে আবদ্ধ দেখতে পায়। ব্যাপারটা তুমি অনেকটা এই ভাবে সাজাতে পারো:—ধরো, তেতলার একটা ঘর; বাসব সেখানে থাকে। বরুণ সাধারণতঃ ছাতে যায় না, সেদিন বিকেলের দিকে—কী মনে করে' যেন গেছে। (কোনো একটা অছিলা বার করে নিয়ো—সেটা অবাস্তব।) বাসবের ঘরের খোলা জান্‌লায় চোখ পড়া মাত্র সে একেবারে হাঁ করে তাকিয়ে রইলো। ঘরের ভেতরে খাটের ওপর লাবণ্য বসে', তার চুল আর শাড়ি অগোছাল; আর তার কোলে মাথা রেখে বাসব শুয়ে, লাবণ্য মাথা নীচু করে' তার মুখের ওপর মুখ এনে রেখেছে—কী দীর্ঘ, দৃঢ় চুম্বন, সাঁড়াশির মত আঁকড়ে আছে; এ যে কখনো শেষ হবে, মনে হয় না। দু'জনের মুখ-চোখের চেহারাই বদলে গেছে।'

'তা আর আশ্চর্য্য কি?'

'পাশে—আমি অনুমান করছি—একখানা পাতা-খোলা চয়নিকা আর একটা বাঁশী পড়ে ছিলো; চয়নিকার কয়েকটা পৃষ্ঠার কোণ দুম্‌ড়ে গেছে। মন্দ নয়, কী বলো?'

'অনেক ধন্যবাদ, অমিতা।'

'বাঃ, এই হলো বুঝি? এদিকে বরুণ যে ছাতে দাঁড়িয়ে দেখছে, তার দিকে একটু মন দেবে না? এখন কথা হচ্ছে, সে কী করবে? তোমার কী মনে হয়? আচ্ছা, তুমিই বলো, এ অবস্থায় তুমি কী করতে?'

'কেন আমাকে লজ্জা দিচ্ছো, অমিতা? তুমি তো জানো এ-সব ব্যাপারে আমি অভিজ্ঞ নই। প্রেমের আর্টটাকে আয়ত্ত করা আমার হয়ে ওঠে নি। তবে, তোমার কুশল প্রেমিক এ-অবস্থায় কী করতো, তা আন্দাজ করতে পারি বটে। সে একটু তাকিয়ে থেকে আস্তে আস্তে অলক্ষিতে নীচে নেবে যেতো; তার মনে খুসি আর ধরতো না। মেয়েটিকে আর একজন পেয়েছে—সুতরাং সেই বা নয় কেন? সুযোগ খুঁজে এখন একবার সাহস করলেই হয়। এবং সুযোগের জন্য বেশী অপেক্ষা তাকে করতে হবে না, তাও ঠিক।'

'তুমি এই বল্লে তো? কিন্তু বরুণ কি করলে, শোনো—ভারি অদ্ভুত। প্রথমতঃ, এ-দৃশ্য দেখে বিস্ময়ের ধাক্কা কাটিয়ে উঠতেই তার অনেকক্ষণ কেটে গেলো—যদিও বিস্মিত হবার এতে কিছুই ছিল না। বরুণ ছেলেমানুষ নয়, অনেক আগেই তার বুঝতে পারা উচিত ছিলো। কিন্তু হয় তো মনে মনে সে একটু ছেলেমানুষই ছিলো, হয়তো তার বৌদিকে সে—বিশ্বাস করেছিলো। যাই হোক, অবাক সে হ'লো, থ হয়ে গেলো, আকাশ থেকে পড়লো। কী-রকম একটা মোহের মধ্যে খানিকক্ষণ কাটিয়ে হঠাৎ সে ব্যাপারটা উপলব্ধি করে' ফেল্লে। সঙ্গে সঙ্গে বিষাক্ত তীরের মত তার বুকে ঈর্ষা এসে বিঁধলো। ও, এ-ই, এ-ই। আজ সে দেখে ফেল্লো—হয়তো অনেকদিন ধরে' চল্ছে; হ্যাঁ, নিশ্চয়ই অনেকদিন ধরে' চল্ছে। আর সে কথা বলতে গেলে পাপ, সে চোখ তুলে তাকালেও নাকি গায়ে ফোস্কা পড়ে। কত উপদেশ কত অপমান। সে উচ্ছন্নে গেছে, নারীত্বের মর্য্যাদা রাখতে সে জানে না। নারীত্বের মর্য্যাদা—তা তো চোখের ওপরই দেখা যাচ্ছে। ঈর্ষার যন্ত্রণায় পাগলের মত হয়ে সে ছুটে ঘরের ভেতর ঢুকে পড়লো। ওদের চুম্বন অসময়ে সমাপ্ত হ'লো। বাসব তাড়াতাড়ি উঠে' অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বসে' রইলো। লাবণ্যর সপ্রতিভতা অনেক বেশী; সে দুর্ব্বলভাবে একটু হেসে চেষ্টাকৃত স্বাভাবিক স্বরে জিজ্ঞেস করলে, "কী এ-সময়ে এখানে যে?" এর পর আর বরুণ অপেক্ষা করলে না, তার মুখ ছুটলো। কথা দিয়ে মানুষকে যত মারা যায়, তা সে লাবণ্যকে মারলে। ঠিক কী কী বলেছিলো, তা আমি জানিনে। জান্‌বার দরকারও করে না; সহজেই আন্দাজ করা যায়। লাবণ্য চীৎকার করে' উঠলো, হাত-পা ছড়িয়ে কাঁদতে লাগলো, শেষটায় মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়লো। সারা বাড়ীতে এক বিষম কেলেঙ্কারী। মূর্চ্ছা ভাঙবার পর লাবণ্য তার শাশুড়ীকে জানালে যে এ অপমান সে কিছুতেই সইবে না; বাসবকে সে ছোট ভাইয়ের মত ভালোবাসে, তার' সঙ্গে বসে' একটা বই পড়ছিলো, এমন সময় বরুণ ঘরে ঢুকে' যা-নয়-তাই বলে তাকে অপমান করে, অন্যান্য কুৎসিত সব ইঙ্গিত করে, তার সঙ্গে এক বাড়ীতে সে কিছুতেই আর বাস করবে না; আজই সে এ বাড়ী ছেড়ে চলে যাবে, এক্ষুণি। অনেক অনুনয় বিনয় করে যা হোক্ সে রাতটা তাকে বাড়ীতে কাটাতে রাজী করানো গেলো, এবং পরদিন সকালে তার স্বামীই এসে উপস্থিত হলেন—ঈস্টারের ছুটীতে। সব ব্যাপার শুনে বরুণকে তিনি জুতো মারলেন—actually, literally জুতো মারলেন। সেদিনই বরুণ বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে গেলো; সুতরাং লাবণ্যর আর সেখানে বাস করতে আপত্তি হলো না।'

'আর বাসব?'

'বাসবের আর কী হবে? সে কবি মানুষ, বাঁশী বাজায়—সংসারের এ-সব কুশ্রী ব্যাপারের সঙ্গে তার কী সম্পর্ক? শুনলুম, ছুটীর পর কাজে ফেরবার সময় কিরণ বাবু তাকে বলে গেছেন তার বৌদির দেখাশুনা করতে। —বাঁচলাম। নাও, ওঠো এবার। উঃ, কত বক্‌তেও পারি আমি। কিন্তু কেমন হ'লো তোমার দেবীর গল্প বলতো? চল্‌বে মাসিকপত্রে?'

গ্রীসে হিন্দু উপনিবেশ

শ্রীরমেশ চন্দ্র মিত্র

বর্ত্তমান ঐতিহাসিকদিগের মধ্যে অনেকের মত যে আর্য্যেরা স্মরণাতীত কাল হইতে ভারতের সপ্তসিন্ধু প্রদেশে বাস করিতেন—তাঁহারা অন্য কোথা আইসেন নাই—এখানে থাকিয়াই তাঁহাদের আর্য্যগরিমা ও কীর্ত্তি কাহিনী প্রচার করিয়াছিলেন; সেই সময়ে রাজপুতনার পূর্ব্বদিক হইতে প্রায় বাংলা দেশ পর্য্যন্ত সাগর ছিল—পরে কোন প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ে সেই সাগর ক্রমশঃ কঠিন মৃত্তিকায় পরিণত হইয়া আর্য্যদিগের বাসভূমিতে পরিণত করিয়াছিল।

পরে যখন আর্য্যেরা নানাবিধ ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক হইয়া নিজ নিজ জ্ঞান গরিমা প্রকাশ করিতেছিলেন সেই সময়ে তাঁহাদের মধ্যে হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের মত বিরোধ হেতু প্রচণ্ড কলহের উৎপত্তি হয়—সেই কলহে অনেকে উৎপীড়িত হইয়া নিজদেশ পরিত্যাগ করিয়া আফ্‌গানিস্থান, পারশ্য, মিসর, গ্রীস ও ইউরোপের নানা স্থানে যাইয়া বাস করিতে আরম্ভ করিল। আমরা বর্ত্তমান সময়ে তাঁহাদের ভাষা, আচার ব্যবহার, পূজা পদ্ধতি ইত্যাদি দেখিয়া বুঝিতে পারি যে, এক বংশ হইতেই বর্ত্তমান সভ্যজাতির উৎপত্তি হইয়াছে।

ইউরোপের প্রাচীন সভ্যতম জাতিদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান জাতি হইতেছেন গ্রীক ও রোমকেরা। এই গ্রীসদেশ আধুনিক কালের পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মতে (পোলক্, জোনস্, টড প্রভৃতি) সর্ব্ব প্রথমে ভারতীয় হিন্দুদিগের দ্বারায় অধিকৃত হইয়া সভ্যতার চরম সীমায় আসিয়াছিল। বর্ত্তমান গ্রীসের কতকগুলি নাম ধীরভাবে পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে নামগুলির সহিত আমাদের ভারতবর্ষ অতি ঘনিষ্টভাবে সংবদ্ধ। আমি সংক্ষেপে ভারতীয় নামের সহিত গ্রীসীয় নামের মিল দেখাইবার চেষ্টা করিব। প্রথমে ধরুন ম্যাসিডোনিয়া—ম্যাকিডন্ হইতে ম্যাকিডোনিয়া পরে ম্যাসিডোনিয়ায় পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এই ম্যাকিডন্ শব্দটী মগধ শব্দ হইতে হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় এবং সেই স্থানে মগধের লোক যাইয়া বসবাস করিয়াছিল এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে।

অবন্তিস্ নামক স্থানটী যে রাজপুতনার অন্তর্গত অবন্তী নগর হইতে আগত লোক কর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়াছে তাহা সহজেই বুঝা যায়।

এটিবাস্ নামক সুবিখ্যাত স্থান সিন্ধুনদস্থ আটক দেশবাসী কর্ত্তৃক পরিস্থাপিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

বুলেনি নামক স্থানটীও বোলনে পাশবাসীদিগের কর্ত্তৃক স্থাপিত বলিয়া অনুমান করা অসংগত বলিয়া মনে হয় না।

চয়োনিয়া নামক স্থানটী আফগানিস্থানের নিকটবর্ত্তি কাহুন নামক স্থানের অধিবাসীরা সেখানে যাইয়া বসবাস করে ও সেই স্থানে আপনাদিগের প্রভাব ধীরভাবে বিস্তার করিতে থাকে।

ডোরিস্...কাশ্মীরের পশ্চিম দিগে দর নামক একটি নদী আছে—সেই স্থানের লোকেরা গ্রীসে যে স্থানে বাস করিতে আরম্ভ করে তাহাকে বর্ত্তমান কালে ডোরিস বলা হয়। গ্রীসের মারডোস্ সহরের ৩০ ক্রোশ দক্ষিণে ক্যাসিওপোলি নামক একটি স্থান আছে বর্ত্তমানকালের ভাগাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা মনে করেন যে উহা ঝিলাম নদের তটে কশ্যপুর নামক যে স্থান আছে তাহার অধিবাসীগণ সেখানে যাইয়া বাস করায় উহাকে এখন ক্যাসিওপোলি বলা হইতেছে।

গ্রীসের প্রধান পর্ব্বতের নাম 'পিণ্ডাস্' এই নামটী অনেকে মনে করেন পাঞ্জাবের ঝিলাম নদের দক্ষিণ পার্শ্বস্থ পিণ্ড—দাদুন পর্ব্বতের নাম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। যখন দেখা যাইতেছে যে পঞ্জাব প্রদেশের লোক

বেশী গ্রীসে যাইয়া বসবাস করিয়াছিল তখন তাহারা যে নিজদেশের পর্ব্বতের নাম সেখানকার পর্ব্বতকে দিবে ইহাতে বিস্মিত হইবার কারণ নাই।

ভাষা আলোচনা করিলে আমরা সহজেই দেখিতে পাইব যে সংস্কৃতের সহিত গ্রীক্ ও লাটিন ভাষার অদ্ভুত মিল আছে—দুহিতা, পিতা, মাতা, শ্যালক, অগ্নি ইত্যাদি বহু শব্দ আছে যাহা আলোচনা করিলে একই জাতি হইতে ইহাদের উৎপত্তি হইয়া বিস্তার হইয়াছে তাহা সহজেই বুঝা যাইবে। "The discovery of Sanskrit with its patent resemblance to Greek and Latin suggested the possibility of a connection which was undreamt of before, and prepared the way for the application of languages of the historical and comparitive method of investigation, which was destined to win its most signal triumph when it was applied subsequently by Charles Darwin and other great scientists to the material universe and to living organisms"—Ancient India—Rapson.

বেদের অনেক দেবতা ও উপখ্যান গ্রীকদিগের ধর্ম্ম শাস্ত্রে স্থান পাইয়াছে তাহা সুধী পাঠক ধীরভাবে আলোচনা করিলে অতি সহজেই বুঝিবেন—এবং ইহাও বেশ ধারণা করিতে পারিবেন যে বহুকাল একত্রে না থাকিলে ওরূপভাবে অন্যের জিনিষ নিজের মতন করিয়া ব্যবহার করিতে পারা যায় না। ঋক্‌বেদের ৪-৩০ সুক্তের সাহায্য না লইলে বেশ ভাল বুঝা যাইবেনা। ইহাতে ইন্দ্রের একটা বীরত্ব কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে—ইন্দ্র কিরূপে উহাকে ধ্বংস করিলেন তাহারি বর্ণনা আছে---এবং সেই বর্ণনার সহিত আপোলো ড্যাকোনকে আলিঙ্গন করিতে যাওয়ায় তাহার ধ্বংস হইল উহার বেশ মিল দেখিতে পাওয়া যায়।

পুরুরবা ও উর্ব্বশীর কাহিনী ইউরিডাইক্ ও অরফিয়সের বর্ণনায় পর্য্যবসিত হইয়াছে।

আমাদিগের বেদের ইন্দ্র, বরুণ, উষা, প্রভৃতির নাম গ্রীকদিগের ধর্ম্মগ্রন্থে স্থান পাইয়াছে—এবং তাহাদিগের কার্য্যাবলীর সহিত বেদের উক্ত দেবতাগণের কার্য্যাবলির যথেষ্ট মিল দেখিতে পাওয়া যায়। বাহুল্যভয়ে তাহার পূর্ণ আলোচনা না করিয়াই ক্ষান্ত রহিলাম।

প্রাচীন গ্রীকেরা মাথার চুল ও পোষাক পরিচ্ছদ ভারতীয়দিগের ন্যায় রাখিতেন ও ব্যবহার করিতেন তাহা আমরা থুইসিডাইসের বর্ণনায় অবগত হইতে পারি। কর্ণেল টড্ তাঁহার রাজস্থানে রাজপুতদিগের অসিপূজার বর্ণনা করিয়াছেন—এবং ঠিক সেই প্রথাই আমারা গ্রীসের এথেন্স্ নগরীর একরোপলিসে এটিলা নামক নরপতি কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইতে দেখি। ইহাতেও আমরা এই দুইটি প্রাচীন জাতির এক সঙ্গে বসবাস ছিল বলিয়া বুঝিতে পারি।

হিন্দুদর্শনের সহিত গ্রীসিয় দর্শনের যে বহু মিল আছে তাহা বর্ত্তমান দার্শনিকগণ সহজেই স্বীকার করিয়া থাকেন এবং অনেকগুলি দর্শন যে ভারতীয় দর্শন হইতে একেবারে লওয়া তাহাও পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন—"As regards philosophy, Colebrooke asserts that the Hindus were teachers and not learners." Cunningham says "Indians have the advantage in point of time; and I feel satisfied that the Greeks borrowed much of this philosophy from the East."

মহারাজ অশোকের সময় ভারতীয় শ্রমণরা গ্রীসে যাইয়া ধর্ম্ম প্রচার করিতেন তাহা আমরা তাঁহার অনুশাসন শিলা হইতে অবগত হইতে পারি। "The Greek Simnoi (venerable) were no other than the Budhist Sramanas (these simnoi whom clement of Alexandria has narrated to have rendered worship to a pyramid originally dedicated to the relics of a God, were the Budhist Arhats (venerable) Sramans"—(Lalitvirtram—C. L. I.)

পূর্ব্বোক্ত বর্ণনা পাঠে পাঠক অনুধাবন করিতেছেন যে ভারতবর্ষ বিশেষ পাঞ্জাব ও তাহার নিকটবর্ত্তি স্থান হইতে বহু লোক গ্রীসে যাইয়া উপনিবেশ সংস্থাপন করায় তাহার ভাষায়, আচার ব্যবহারে, দেবপূজায়, দর্শনে, সাহিত্যে প্রচুর পরিমাণে ভারতীয় ভাব বর্ত্তমান রহিয়াছে। বৌদ্ধ শ্রমণরা পর্য্যন্ত সেখানে যাইয়া ভারতীয় গরিমা বৃদ্ধির সহায়তা করিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ আমরা "ললিত বিস্তার" পাঠে অবগত হই।

চিরন্তনী

গল্প

শ্রীহাসিরাশি দেবী

(১)

মাঘমাস।

কয়েকদিন হইতে যে বৃষ্টিপড়া সুরু হইয়াছে, তাহার যেন আর বিরাম নাই, মাঝে মাঝে শীতের হাওয়া আসিয়াও কাঁপাইয়া যাইতেছিল।

ঘুম ভাঙ্গিতেই উৎপল শুনিল, পাশের ঘরের বাসিন্দা কালীপদবাবু প্রতিদিনকার মত একই সুরে গুরু বন্দনা আরম্ভ করিয়াছেন—

—"অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্—

তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

বোধহয় আজিকার ভোরেও তাঁহার নিত্য স্নান বাদ যায় নাই; যাওয়াও যে অসম্ভব, তাহা তাঁহার দেব-দ্বিজে অসাধারণ ভক্তি ও নিষ্ঠা মাঝে মাঝে স্মরণ করাইয়া দিত, কিন্তু তবু উৎপল বিস্মিত হইল, এই শীত এবং বর্ষায় প্রাতঃস্নানের কষ্ট স্মরণ করিয়া।

জাগিয়াও ঘুমাইবার ভাণ করিয়া থাকা নাকি অস্বস্তি-কর,—তাই, সে দুয়ার খুলিয়া বাহিরে আসিল কিন্তু নীচের তলে যাইতে পারিল না। দেখিল, সিঁড়ির অপরপ্রান্তে, লম্বে ও প্রস্থে হাত দেড়েক জায়গা জুড়িয়া যে দুইটি প্রাণী নিদ্রা যাইতেছে, তাহাদের একটি শিশু, অপরা সম্ভব তাহার মাতা।

না আছে বালিশ, না আছে বিছানা; ছিন্ন মলিন পরিধেয়র প্রান্তভাগে কোনওরূপে সন্তানটিকে ঢাকিয়া দুঃখিনী জননী ঘুমাইয়াছে; মুখের দিকে চাহিলে মনে হয়—দারিদ্র্য এবং দুঃখ-শোকে বিবর্ণ হইলেও একদিন হয়তো সে সুন্দরী আখ্যাই পাইয়াছিল,—এবং তাহার সন্তানের দিকে চাহিলে মনে হয়, পৃথিবীর মেয়াদভোগ হয়তো তাহার কপালে বেশী দিনের জন্ম নহে।

হঠাৎ ছেলেটি নড়িয়া উঠিতেই তাহার মা-ও জাগিয়া উঠিল, উৎপলের দিকে দৃষ্টি পড়িতে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল কিন্তু কথা কহিল না।

উৎপলও চমকিয়া উঠিল।

সরিয়া আসিয়া ডাকিল।

"কালীবাবু!"

বোধ হয় শীত নিবারণের জন্যই গায়ে একখানা মোটা কম্বল জড়াইয়া ঘরের ভিতরে দ্রুত পাদচারণা করিতে করিতে কালীবাবু তখনও কম্পিত ও উচ্চৈঃস্বরে আবৃত্তি করিতেছিলেন—

"অখণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্—ইত্যাদি

ডাক শুনিয়া বাহিরে আসিলেন; সহাস্যে প্রশ্ন করিলেন, "ব্যাপার কি ভায়া? বলি, সকাল বেলাতেই ডাকাডাক সুরু করেছ কেন?"

উৎপল কোনও প্রশ্ন করিল না, নির্ব্বাকে সিঁড়ির দিকটা দেখাইয়া দিতেই কালীপদ বাবু উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিলেন,—"আর বল কেন হে! কপালের ভোগ। কালী-পুজোর নিমন্ত্রণ ছিল কাল টালায়; খেয়ে দেয়ে ফিরতেও রাত প্রায় একটা বেজে গেল; পথে বার হতেই বৃষ্টিও বললে আর কোথায় আছি! কি করি,—মা কালী তখন তো আর ছাতা দিয়ে মাথা রক্ষে করতে এলেন না, কাজেই পথের পাশে খোলার ঘরের কানাচেয় আশ্রয় নিতে হলো, আর নিয়েই তো হলো এই বিপদ! বুঝলে না?…"

উৎপল বিস্মিত দৃষ্টিতে কালীবাবুর মুখের দিকে চাহিয়াছিল, তেমনি ভাবেই প্রশ্ন করিল—"তার মানে?"

"মানে খুবই সোজা। গিয়ে দাঁড়াতেই পা জড়িয়ে ধরে কান্নাকাটি আরম্ভ করে দিলে, বললে,—স্বামী মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে, এখন একটু আশ্রয় চাই,—অন্ততঃ আজকের রাতটার মত তাহ'লে ছেলেটাকে বাঁচাতে পারব, নইলে নয়। কি করি আর! অগত্যা সেই রাতটুকুর কড়ারেই ওকে আনতে হ'লো; কিন্তু তাই ব'লে তার বেশী আর এক মুহূর্ত্তও আমি ওকে এখানে থাকতে দিচ্ছিনে, তা সে কেঁদেও পাবে না, কহিয়েও নয়; সে লোকও এই কালী চক্কোত্তি নয়, তার যে কথা সেই কাজ, কথার খেলাপ হবার যো নেই।"

বলিয়া—স্তম্ভিত, বিস্মিত উৎপলের মুখের দিকে একবার গর্ব্ব পূর্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া তিনি সিঁড়ির দিকে অগ্রসর হইয়া গেলেন এবং নীচের দিকে চাহিয়া কহিলেন—"এই যে! জেগেছ দেখছি! বেশ! এবার তো আমার কথা রাখা হ'লো, রাত্রের মত আশ্রয় দিয়েছিলাম; এখন সকাল হ'য়েছে, ছেলে নিয়ে যেখানে খুশী যেতে পার, আমার আপত্তি নেই।"

উৎপল যে স্থানটিতে দাঁড়াইয়াছিল, সেইস্থান হইতে মা ও ছেলেকে স্পষ্ট দেখা যায়; তাই মুখ ফিরাইতেই দেখিল, কালীবাবুর কথায় রমণী মুখ তুলিয়া একবার মাত্র কাতর দৃষ্টিপাত করিল, তাহার পর রোগ যন্ত্রণাকাতর সন্তানকে বক্ষের উপরে চাপিয়া ধরিয়া নতমুখে বসিয়া রহিল, উঠিল না, বারম্বার ডাকাডাকি সত্বেও মুখও তুলিল না।

(২)

বিরক্ত কালীপদবাবু উৎপলকে সঙ্গে লইয়া নামিতে নামিতে সিঁড়ির শেষ ধাপে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বারম্বার ডাকাডাকি সত্বেও উত্তর না পাইয়া তিক্তস্বরে কহিলেন—"এ বিপদ হবে জানলে কি আর এ কাজ করতুম। নেহাৎ দায় এড়াতে পারিনে তাই দয়া করে তোমায় এনেছিলাম। কিন্তু এখন বুঝছি, তুমি দয়ারও উপযুক্ত নও।"

তাঁহার কণ্ঠস্বর কঠোর হইতে কঠোরতর হইয়া উঠিতেছিল, কিন্তু অপর পক্ষ নীরব, এবারও কোনও উত্তর আসিল না, সে যেমন বসিয়াছিল, তেমনই বসিয়া রহিল।—

কালীবাবু যেন হাল ছাড়িয়াই ক্ষণকাল নির্ব্বাকে রহিলেন, পরে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"বলি তুমি নিজে থেকেই যাবে? না?…

তাঁহার কথা শেষ হইল না, এতক্ষণ যে স্থাণুর ন্যায় বসিয়াছিল, সে উঠিয়া আসিয়া পা জড়াইয়া ধরিতেই কালীবাবু চমকিয়া সরিয়া দাঁড়াইলেন, বিস্ময়ে তাঁহার কথা ফুটিল না।

ভগ্ন কম্পিত স্বরে রমণী বলিয়া উঠিল—"আমায় না হোক আমার এই হতভাগা ছেলেটার দিকে চেয়েও কি আপনারা দয়া করে আমায় একটু থাকবার জায়গা দিতে পারবেন না? আমি আপনাদের কেনা হ'য়ে থাকবো—।"

তাহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল।

কালীবাবু রুক্ষস্বরে কি একটা জবাব দিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু উৎপল বাধা দিল; কালীবাবুর দিকে মুখ ফিরাইয়া শান্তস্বরে কহিল—"কাজ করবার জন্যে একটা লোকেরর তো বিশেষ দরকার কালীবাবু, একেই রাখা যাক্ না।"

তাহার কণ্ঠস্বরে অনুরোধের যেন লেশমাত্রও ছিল না, ছিল আদেশের দৃঢ়তা।

কালীবাবু "না" বলিতে পারিলেন না। না পারিবার কারণও ছিল; তাহা এই—

—সংসারে আপনার বলিতে উৎপলের কেহই ছিল না, অথচ তাহার পিতা পুত্রের জন্য যাহা রাখিয়া গিয়াছিলেন তাহাতে একা শুধু তাহারই নয়—হয়তো তাহার পুত্রেরও জীবন কাটিয়া যাইতে পারে; এবং এই উৎপলের সহিতই একদিন আলাপ করিয়া অর্থাৎ কথায় কথায় আপনার অসুবিধার কথা জানাইয়া কালীবাবু আপনার রংচটা তোরঙ্গ ও বিছানা-বালিশ বহিয়া তাহার বাসায় আসিয়া উঠিলেন এবং ভাড়ার অঙ্কটা নিজের দিকে কিছু কম করিয়া বেশীর ভাগটা কৌশলে উৎপলের ঘাড়েই বেশী চাপাইলেন এবং সংসার খরচ বলিতে যাহা যায়, তাহাও ঐ নিয়ম হইতে উল্টাইল না।

কালীবাবু কোন সওদাগরী অফিসে যাট টাকা মাহিনার কাজ করেন, প্রতি শনিবার বাড়ী যান,—নিকটেই বাড়ী; সংসারে খাইবার মানুষ ছয় জন। মা, বিধবা বোন্, স্ত্রী এবং দুইটী অবিবাহিতা মেয়ে; সংসারে জ্বালা নাকি অনেক, কাজেই তিনি সর্ব্বদাই প্রায় রুক্ষ স্বভাব,—কচিৎ প্রকৃতিস্থ থাকেন।

উৎপলের ও সবের বালাই ছিল না।

চাকরী সে করে না; জিজ্ঞাসা করিলে বলে "চেষ্টায় আছি।" কিন্তু চেষ্টা যে তাহার আদৌ নাই, তাহা তাহাকে দেখিলেই বুঝা যায়। সম্প্রতি কালীবাবু তাহাকে আশ্বাস দিয়াছেন, তাহার যেরূপ তীক্ষ্নবুদ্ধি, তাহাতে

ব্যবসাক্ষেত্রে নামিলে নিশ্চিত উন্নতি করিবে। তবে,—তাহাকেই যে একা ব্যবসাক্ষেত্রে নামাইয়া দিয়া তিনি তফাতে থাকিবেন, তাহাও নহে, কিছু অংশ তাঁহারও থাকিবে। এতটা সুবিধা ও সুযোগ কালীবাবু হেলায় ছাড়িবার পাত্র নহেন;—"আমতা আমতা" করিয়া কহিলেন।

"তা তোমার যখন···ইয়ে···

মধ্য পথে কথাটা হারাইয়া ফেলিয়া তিনি মাথা চুলকাইতে লাগিলেন,—উৎপলও তাঁহার বলিবার ধারা দেখিয়া হাসিয়া ফেলিল; কিন্তু তৃতীয় ব্যক্তি তাহাদের কথা বা হাসিতে যোগ দিল না, যেমন কাতরদৃষ্টিতে উভয়ের মুখের দিকে চাহিয়াছিল, তেমনিই রহিল,—মুখে ভাষা ফুটিল না; শুধু চোখের কোণ দুটি যেন চক্‌চক্‌ করিয়া উঠিল।

উৎপল প্রশ্ন করিল—

"তাহ'লে আপনার আর কোনও অমত নেই তো?"

কালীবাবু নতমুখে কহিলেন—"না; কিন্তু, ঐ সঙ্গে একবার মাইনের কথাটাও···

একটি বাষ্পোচ্ছ্বাসিত কণ্ঠস্বরে উভয়েই চমকিয়া চাহিল—

"মাইনে আমি এক পয়সাও চাইনে, এই যথেষ্ট।"

সঙ্গে সঙ্গে সে দুইটি হাত একত্র করিয়া কপালে ঠেকাইল।

কালীবাবু কহিলেন—তবে আর কি! শুধু খাওয়া পরাই পাবে, আর কিছু পাবেনা; তাতেই থাকতে হয় থাক, না হয় আর কি বলবো!"

আর কিছু বলিবার দরকার হইল না, ইঙ্গিতে নীচের তলের ঘরের মধ্যে একটা দেখাইয়া উৎপল কহিল—

"ব্যস্, আর কোনও কথা নাই। ওরই একটা ঘরে তুমি থাকবে; আর যা দরকার,—চাইলেই পাবে।"

আর কোনও কথা না বলিয়া সে আপনার ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল, ফিরিয়া চাহিলে দেখিত কালীবাবুর মুখ বক্র হইয়া উঠিয়াছে!

(৩)

দিনের পর দিন যাইতে যাইতে তিনটি মাস পূরা হইয়াছে,—আজও উৎপলের, ব্যবসা আরম্ভ হয় নাই,—কালীবাবুও তাহাতে যোগ দেন নাই,—তবে যোগ দেওয়ার কথা মাঝে মাঝে তুলেন বটে। নিত্যকার কাজগুলি আগের মতই সম্পন্ন হয়; কালীবাবু সাড়ে নয়টায় খাইয়া আফিসে যান; উৎপলও বেলা সাড়ে বারটায় খাইয়া টহলদারীতে বাহির হয়; উভয়েই বাসায় ফিরিয়া আসেন প্রায় পাঁচটা।

অফিস হইতে বাসায় ফিরিয়া কালীবাবুর কাজ কিছুক্ষণ জিরাইয়া পরের দিনের বাজার করা,—সংসার খরচের হিসাব রাখা—ইত্যাদি; এবং উৎপলের কাজ খরচের টাকা কড়ি দেওয়া, চা-খাওয়া, এবং আধঘণ্টার মধ্যে আবার বাসার বাহির হইয়া যাওয়া। রাত্রে সে যখন বাসায় ফেরে তখন কালীবাবুর ঘর সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ; পাচক তাহার ভাত রান্নাঘরের একদিকে ঢাকিয়া রাখিয়া চলিয়া যায়, একা শুধু জাগিয়া থাকে—খোকার মা। আগে,—উৎপলের ডাকাডাকিতে উঠিয়া বিরক্ত চিত্তে কালীবাবুই দুয়ার খুলিয়া দিতেন, উপস্থিত খোকার মার উপরে সে ভারটা চাপাইয়া তিনি নিশ্চিন্তে নাক ডাকাইয়া থাকেন। খোকার মা-ই দুয়ার দেয়; খাওয়ার সময়ও সে বসিয়া থাকে, কিন্তু সম্মুখে নয়, একটু আড়ালে, দ্বারের পার্শ্বে। মুখের ঘোমটাও এখন তাহার একটু নামিয়াছে। রান্না ছাড়া সংসারের আর সমস্ত কাজ সেই করে; শুধু উৎপল হইলে হয়তো রন্ধনের ভারও তাহারই উপরে পড়িত, কিন্তু কালীবাবু ও বিষয়ে বড় শক্তলোক, জীবনে কোনও দিন নাকি হোটেলেও খান নাই, তাই তিনি অজ্ঞাত কুল-শীলা ঐ মেয়েটির উপরে হাঁড়ির ভার না দিয়া শুভ্র যজ্ঞোপবীতধারী উড়িষ্যাবাসীর হাতেই তাহা অর্পণ করিয়াছিলেন!

সবই নিয়মিত চলে, শুধু চলেনা খোকার অসুখ; মায়ের সমস্ত চেষ্টা-যত্ন যেন উপেক্ষা করিয়াই খোকার অসুখ দিন দিন বেশীর দিকেই চলিয়াছিল। ডাক্তার ডাকা হয় নাই, তবে মাঝে মঝে কালীবাবু তাহাকে হোমিওপ্যাথি ঔষধ দেন; ভাল হওয়ার উদাহরণ যে না দেন তাহা নহে, তবে সেটা এক্ষেত্রে যে কেন ফলবতী হইল না, ইহা ভাবিয়া বিস্ময়ে আত্মহারা হইয়া পড়েন; শেষে মত প্রকাশ করেন—

"গ্রহের ফেরে পড়েছ বাপু, শান্তি স্বস্ত্যয়ন করলে কতকটা কাটতেও পারে।" খোকার মা নির্ব্বাক্যে নতমুখে বসিয়া থাকে, উত্তর দেয় না। এমনি করিয়াই দিন কাটে, কিন্তু এই দিন কাটিবার মধ্যেই এমন একটা স্নেহ ও যত্ন এই মেয়েটির সকল কাজ ও ব্যবহারে জড়াইয়া উঠিতেছিল, যাহা শুধু এক উৎপলই অনুভব করিল না কালীবাবুও করিলেন, এবং এই আত্মীয়স্বজনহীন বিদেশে যে শুধু চাকর ও চাকুরের দয়ার উপরে নির্ভর করিয়াই জীবন চালান যায় না, এইরূপ একটি স্নেহপূর্ণ হৃদয়েরও প্রয়োজন তাহা বুঝিয়া হিসাবি মনের অপরদিকটা ঐ হতভাগিণী ও তাহার পুত্রের জন্য করুণায় কানায় কানায় পূর্ণ হইয়া উঠিল, কিন্তু হিসাবি মন তাহাকে তাহার সীমানা ছাড়াইতে দিল না। সেদিন দুপুরবেলা; কালীবাবু সাড়ে নটায় ভাত খাইয়া অফিসে গিয়াছেন, উৎপল তখন খাইতে আসে নাই, ঠাকুরও তাহার ভাত তরকারী ঢাকা দিয়া রাখিয়া চলিয়া গিয়াছে, বাসায় ছিল শুধু এক খোকার মা,—তাহার রুগ্ন ছেলের মুখের চাহিয়া। বাসা নিস্তব্ধ, মাঝে মাঝে সম্মুখের গলিপথ হইতে ফেরীওয়ালাদের ক্লান্তকণ্ঠস্বর ভাসিয়া আসিতেছিল।

একটা বাজিয়া গিয়াছে।

খোকার মা যেন উৎপলের ফিরিবার আশায় উৎকর্ণ হইয়াছিল, তাই কড়া নাড়িতেই দ্বার খুলিয়া বলিয়া উঠিল "একবার খোকাকে দেখবেন আসুন না!"

উৎপল চমকিয়া চাহিল, কিন্তু "চল" ছাড়া আর কোনও কথা বলিতে পারিল না, খোকার মায়ের অবগুণ্ঠনশূন্য শুষ্ক বিবর্ণ মুখে ও ভয় কম্পিত কণ্ঠস্বর যেন তাহাকে ক্ষণকালের জন্য কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় করিয়া দিল, এবং খোকাকে দেখিয়াও ডাক্তার ডাকিয়া আনা ছাড়া বিশেষ কিছু করিতেও পারিল না।

খোকা তাহার মায়ের শত সহস্র আবেদন নিবেদন অগ্রাহ্য করিয়াও কয়েক ঘণ্টার মধ্যে যে দেশে চলিয়া গেল, সে দেশের ঠিকানা তাহার মাকেও দিয়া গেলনা।

শোক-শান্ত খোকার মা সেদিনও উঠিল এবং সংসারের কোনও কাজও অসম্পূর্ণ রাখিল না, শুধু কাতর স্বরে জানাইল তাহার নাম আজ হইতে খোকার মা নয়,—তাহারই পিতা ও মাতার দেওয়া—সতী। সন্তানহারা জননীর বেদনা বুঝিয়া কালীবাবুরও কোনও কথা কহিলেন না।

(৪)

সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে।

ঠাকুর তখনও কাছে আসে নাই; উনানে আঁচ দিয়া সতী বাজার আসিবার আশায় চুপ করিয়া বসিয়াছিল।

কালীবাবু অফিস হইতে ফিরিয়া বাজারে গিয়াছেন; —উপরতল হইতে মাঝে মাঝে উৎপলের কাশির শব্দ শুনা যাইতেছিল, সে এখনও বাসার বাহিরে হয় নাই, বাহির হইবার আয়োজন করিতেছিল।

বাহির হইতে দরজার কড়া নড়িল;

সতীই দুয়ার খুলিতে যাইতেছিল, কিন্তু সিঁড়ির উপরে উৎপলকে দেখিয়া সরিয়া গেল।

কি একটা দরকারে উৎপল তাড়াতাড়ি নীচে নামিতেছিল, দরজায় আঘাত শুনিয়া দুয়ার খুলিয়াই থমকিয়া দাঁড়াইল; দেখিল সম্মুখে যে দীর্ঘাকার লোকটি ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, তাহার মাথার চুলগুলি ছ' আনা দু'আনা ও বার আনা করিয়া ছাঁটা, বিশৃঙ্খল; হাঁটু পর্য্যন্ত লম্বা—আদ্দির কামিজ ও আধময়লা কালাপাড় ধুতির কোঁচা কুঁচাইয়া পকেটে ফেলা, এবং পায়ে পাম্প্ সু; মুখে চোখে এমন একটা রূঢ় ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে যাহা না দেখিলে বিশ্বাস করা যায় না।

বাম হাতের বিড়িটা ধরাইয়া,—বার দুই টানিয়া কর্কশ স্বরে প্রশ্ন করিল—

"শুনলাম এখানে নাকি আমার পরিবার এসে আছে, সত্যি কি!"

উৎপল ক্ষণকাল নির্ব্বাকে তাহার দিকে চাহিয়া থাকিয়া শান্তস্বরে উত্তর দিল—

"আপনার পরিবার কে' তাতো' জানিনে মশাই, তবে একজন আছেন বটে…

মধ্যপথে থামাইয়া দিয়া হাত নাড়িয়া লোকটি বলিল "বুঝেছি মশাই, বুঝেছি;—তিনিই আমার পরিবার।

আর একটি ছেলে,—ছেলেটি কেমন আছে বলতে পারেন ?”

বলিতে গিয়াও উৎপলের বাধিল।

লোকটি দুই এক পা অগ্রসর হইয়া আসিল, অধৈর্য্য স্বরে বলিল—“চুপ করে রইলেন যে !”—

কণ্ঠস্বরটা এত তীক্ষ্ণ যে উৎপলের কানে খট করিয়া বাজিতেই সে মুখ তুলিয়া চাহিল; যথাসাধ্য বিরক্তি গোপন করিয়া কহিল,—“সে নেই, মারা গেছে।”

লোকটি চীৎকার স্বরে বলিয়া উঠিল—

“বটে ! এ শুধু, তোমাদের কারসাজি, আমি তোমাদের নামে কোর্ট আনব, এমনি ছাড়ছি না।”

উৎপল হাসিতে গেল কিন্তু পারিল না; বিকৃতস্বরে ওমনি ছাড় বা না ছাড়’ সে কথা ধরি না, কিন্তু ভদ্রভাবে কথা বল।’

লোকটি হাতের অর্দ্ধদগ্ধ বিড়ি ফেলিয়া যেন হিংস্র পশুর মত লাফাইয়া উঠিল; পূর্ব্বাপেক্ষা আরও একপর্দ্দা কণ্ঠস্বর চড়াইয়া কহিল—

“ভদ্র ভাবে মানে ?

একটা ঢোক গিলিয়া পুনরায় কহিল—

“কি আমার ভদ্রলোক রে, তাই ওঁর সঙ্গে ভদ্রভাবে কথা কইতে হবে ’ অমন ভদ্রলোক ঢের দেখেছি, বুঝলে হে ! অমন লম্বা কোঁচার ভদ্রলোক ঢের দেখেছি !”

উৎপল কি একটা উত্তর দিতে গিয়া চুপ করিয়া গেল; শুধু কহিল—

“তোমার মত ছোটলোকের সঙ্গে কথা কওয়াও…

বাধা দিয়া লোকটী উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল—

“বটে ! আমি নয় ছোটলোক, কিন্তু সেই ছোট লোকেরই পরিবার নিয়ে পালান কোন ভদ্রলোকের কাজ শুনি।”

উৎপল নিজেকে সংযত করিতে পারিল না, কখন যে পথের লোক চলাচলও বন্ধ হইয়া লোকজড় হইয়াছিল, সেদিকেও চাহিল না, দ্রুতপদে আসিয়া লোকটির একটি হাত চাপিয়া ধরিতেই সে চীৎকার করিয়া উঠিল—

“বাবারে মেরে ফেললে রে খুন করলে রে।”

সঙ্গে সঙ্গেই একটি ধাক্কায় একধারে ছিটকাইয়া পড়িল এবং উৎপলও সশব্দে দ্বার রুদ্ধ করিয়া উপরে উঠিয়া গেল, রান্নাঘরের দিকে চাহিলে দেখিতে পাইত, দ্বারের পার্শ্বে সতী কাঠের পুতুলের মত দাঁড়াইয়া আছে।

কিছুক্ষণ পরে বাজার হইতে ফিরিয়া কালীবাবু কহিলেন “কাজটা ভালো করনি ভায়া, হাজার হোক… তবু—”

মুখ তুলিয়া উৎপল একবার কালীবাবুর মুখের দিকে চাহিয়াই পুনরায় মুখ নত করিল, কিছু বলিল না।

কালীবাবু মাথা নাড়িয়া বলিলেন—

“কাঁচা বয়েসের তাজা রক্ত একদিন আমাদের গায়ে ছিল হে, বুঝেছ ! কিন্তু তবু কত বিবেচনা করে তবে কাজ করেছি, তাই আজও কেউ একটা কথাও এই কালী চক্কোত্তির নামে বলতে পারে না। নইলে কি আর রক্ষে ছিল !”

কথা বলা শেষ করিয়া তিনি চোখ মুখের এমন এক ভঙ্গি করিলেন যাহাতে নিঃসন্দেহে বুঝা যায় বেশী কথা না বলিলেও ও সব বিষয়ে তিনি বড় পাকা লোক; কিন্তু যাহাকে লক্ষ্য করিয়া তিনি কথাগুলি বলিয়া গেলেন তাহার তরফ হইতে একটা সাড়া পর্য্যন্ত মিলিল না, সে যেন অন্যদিনের অপেক্ষা আজ বেশী গম্ভীর হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া কালীবাবুর মনে হইল।

দিন কয়েক চলিয়া গিয়াছে।

সেদিনটা ছিল কি একটা ছুটীর, কালীবাবু দেশে যান নাই,—বাসায়ই ছিলেন; ছিল না শুধু উৎপল, ভোরে উঠিয়াই সে কোন দূর বন্ধুর বাড়ী নিমন্ত্রণ রাখিতে গিয়াছে, বলিয়া গিয়াছে রাত্রের ট্রেণে ফিরিবে, ভাত যেন ঠিক থাকে।

বেলা পড়িয়া আসিতেই কালীবাবু তাঁহার চটির চটাচট্ শব্দ করিতে করিতে নীচের তলে আসিয়া দাঁড়াইলেন, ডাকিলেন “খোকার মা !”

সতী আপনার ঘরে কি করিতেছিল কে জানে, ডাক শুনিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইতেই কালীবাবু শান্ত স্বরে কহিলেন—“তোমার যা যা জিনিসপত্র আছে গুছিয়ে নাও,—তোমায় যেতে হবে।”

তাঁহার কণ্ঠস্বর শান্ত হইলেও দৃঢ়; সতী চমকিয়া চাহিল, কিন্তু হঠাৎ কোনও উত্তর খুঁজিয়া পাইল না, শুধু অসহায়ের মত প্রশ্ন করিল—

"কোথায় যাব?"

"কালীবাবু কহিলেন—

"যেখান থেকে তুমি এসেছিলে, সেইখানে।"

"সেইখানে?"

সতী যেন শ্বাসরুদ্ধের মত হাঁপাইয়া উঠিল; তাহার পরে প্রশ্ন করিল

"কিন্তু ছোট বাবু...

কালীবাবু তিক্ত কটুস্বরে বাধা দিলেন

"চুপ! ও নাম আর মুখে এনোনা; স্বামীর ঘর থেকে চ'লে এসে নিজের ভাগ্যটা যেমন করে গড়িয়েছ, —তার সঙ্গে আর কোনও ভদ্র-সন্তানকে জড়িও না, তাকে রেহাই দাও।"

সতীর মুখখানা একবার সাদা হইয়াই স্বাভাবিক হইয়া গেল; শুষ্ক দৃঢ়স্বরে সে শুধু কহিল—

"তবে আমি প্রস্তুত, চলুন।

কালীবাবু ক্ষণকাল স্তম্ভিত হইয়া সতীর দিকে চাহিয়া রহিলেন, তাহার পরে দ্বারের দিকে অগ্রসর হইলেন।

রাত্রে বাসায় ফিরিয়া,—খাইতে বসিয়া উৎপল লক্ষ্য করিল আজ দ্বারের পার্শ্ব শূন্য, কেহ সেখানে নাই।

ভাত বাড়িয়া দিয়া ঠাকুর অদূরে বসিয়াছিল, একটু ইতস্তত করিয়া উৎপল প্রশ্ন করিল—

"কালী বাবুর খাওয়া হয়েছে?"

ঠাকুর উত্তর দিল

"না তাঁর শরীর ভালো নয়, কিছু না খেয়েই শুয়ে পড়েছেন।"

"আর;—খোকার মা!

ঠাকুর উত্তর দিল

"তিনি তো নেই, আজকে তাঁর স্বামীর কাছে চলে গেছেন।

উৎপল ক্ষণকাল স্তম্ভিতের মত বসিয়া রহিল, তাহার পরে ধীরে ধীরে হাত গুটাইয়া লইল। ঠাকুরের বিস্মিত দৃষ্টির দিকে চাহিয়া—একটু হাসিয়া কহিল "আজ তেমন ক্ষিদে নেই—খেয়ে এসেছিলাম কিনা।

নিজের ঘরে আসিয়া সে শয্যার উপরে অলসভাবে শুইয়া পড়িল, ঘটনার কতকটা অনুমানে বুঝিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনে হইল—

যে যাইবার, সে যাক, দুঃখ নাই, কিন্তু তাহার এই ছন্নছাড়া স্নেহকাঙাল মনটাকে যে এই কয়েক মাসের মধ্যে ভগিনীর স্নেহে,—মায়ের ভালবাসায়—ভরাইয়া তুলিয়াছিল, তাহাও যেন ধীরে ধীরে খালি করিয়া দিয়া গেল।

ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্ত্তনের কথা

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

১

ইংরেজ সরকারের নির্দ্দেশে পাদরি উইলিয়ম এডাম বাংলা ও বিহার প্রদেশে প্রচলিত দেশীয় শিক্ষা-পদ্ধতি সম্বন্ধে অনুসন্ধান কার্য্য আরম্ভ করেন। ১৮৩৫ সনে তিনি তাঁহার অনুসন্ধানের ফলস্বরূপ যে রিপোর্ট বড়লাট লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের নিকট পেশ করেন তাহাতে প্রকাশ, তখন এই সব অঞ্চলে এক লক্ষ দেশীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত ছিল। বালক-বালিকারা এই সকল বিদ্যালয়ে দেশীয় ভাষায় ও দেশীয় রীতিতে শিক্ষালাভ করিত। এডাম দেখাইয়াছেন, প্রতি তিষট্টি জন বালক-বালিকার জন্য তখন একটি করিয়া বিদ্যালয় ছিল। রিপোর্ট পেশ করিবার কালে তিনি বেণ্টিঙ্ককে যে-পত্র লেখেন, তাহার এক স্থানে বলেন,—

এখানে যে প্রতিষ্ঠানগুলির উল্লেখ করিব তাহার পরিচালনায় ত্রুটী থাকিতে পারে, উদ্দেশ্য সঙ্কীর্ণ হওয়া সম্ভব এবং প্রসার ও উন্নতির সূত্রও হয়ত ইহাতে নাই; কিন্তু দেশের সাহিত্যের প্রাচুর্য্য, পণ্ডিত লোকের আধিক্য —যাঁহারা যুগের পর যুগ সাহিত্যের চর্চ্চা করিয়া আসিতেছেন, এবং জনগণের অধিকাংশের লিখনপঠন-ক্ষমতাই এই সকল বিদ্যালয়ের অস্তিত্ব সপ্রমাণ করিতেছে।*

ইংরেজী শিক্ষা প্রচলনের অব্যবহিত পূর্ব্বে এবং পরে আমরা যে নিতান্তই অজ্ঞান অন্ধকারে নিমজ্জমান ছিলাম না এডাম সাহেবের এই উক্তিই তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। কিন্তু অদৃষ্টের কি পরিহাস, স্বার্থান্ধ ঐতিহাসিক নানা প্রমাণ প্রয়োগে আমাদের মনে এই বিশ্বাস জন্মাইয়া দিতে চাহেন যে, আমরা সে-যুগে ইংরেজী শিক্ষার আলোকের অভাবে অন্ধকারে হাতরাইয়া কাল কাটাইয়াছি। সুশিক্ষিত বলিয়া পরিচিত বঙ্গের অন্যতম ভূতপূর্ব্ব লাট লর্ড রোণাল্ডশে পর্য্যন্ত তাঁহার *Heart of Aryabarta* পুস্তকে এই মামুলি কথার প্রতিধ্বনি করিতে ছাড়েন নাই। দাসত্বের চরম নিদর্শন বাংলা সরকারের প্রচার বিভাগ কর্ত্তৃক সম্প্রতি প্রকাশিত "হায় রে সেকাল" পুস্তিকার কথা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম।

২

দেশীয় রীতিতে শিক্ষা ব্যাপকরূপে প্রচলিত থাকিলেও সে-যুগে ইংরেজী শিখিবার প্রয়োজন বিশেষ করিয়া অনুভূত হইয়াছিল। ব্যবসায়ী ইংরেজ রাজদণ্ড ধারণ করায় নানা প্রয়োজনে বঙ্গবাসীকে তাহার সংশ্রবে আসিতে হইল। উনবিংশ শতকের আরম্ভ অবধি এদেশে ইংরেজী শিক্ষার কোনও সুবন্দোবস্ত হয় নাই। রাম-মোহন নাপিত, কৃষ্ণমোহন বসু, শেরবোর্ণ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে বাঙালী সন্তানগণ বানানের বই হইতে শব্দ চয়ন করিয়া মুখস্থ করিত। কারণ তাহা হইলেই রাজসরকারে ও সওদাগরী হাউসে চাকরী জুটিত। তাহারা এইরূপ ছড়া করিয়া পড়িত,—

পমকিন্ লাউকুমড়া, কোকোম্বর শসা।
ব্রিঞ্জেল বার্ত্তাকু, প্লোম্যান চাষা॥

এইরূপ কত কি ছড়া তখন প্রচলিত ছিল।

ইংরেজের সংস্পর্শে আসিয়া উনবিংশ শতকের প্রথম পাদেই বাংলার মনিষিগণ সম্যক বুঝিতে পারিলেন, জাতির সর্ব্ববিধ উন্নতি সাধন করিতে হইলে নিয়মিতরূপে ইংরেজীর চর্চ্চা প্রয়োজন। ইংরেজী ভাষা শিখিলে যে বিপুল ইংরেজী সাহিত্যের রসাস্বাদনই সম্ভব তাহা নহে,

* "The institutions to which I refer will probably be found defective in their organization, narrow and contracted in their aim, destitute of any principle of extension and improvement ; but of their existence the large body of literature in the country, the large body of learned men who hand it down from age to age, and the large proportion of the population that can read and write are proofs."—Reports on Vernacular Education in Bengal and Behar. P. 3.

পরন্তু পদার্থ বিদ্যা, রসায়ন, ব্যবচ্ছেদবিদ্যা, অঙ্কশাস্ত্র প্রভৃতি বিজ্ঞানের অত্যাবশ্যক বিভিন্ন শাখাও অধিগত করা আমাদের অল্পায়াসসাধ্য। তাঁহারা বুঝিলেন দেশে এমন একদল সাধক কর্ম্মী আবশ্যক যাঁহারা প্রতীচীর জ্ঞান বিজ্ঞান আহরণ করিয়া পরে মাতৃভাষার সাহায্যে সাধারণ্যে তাহা প্রচার করিবেন। সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুদের প্রাচীন সাহিত্যেরও মর্য্যাদা বাড়িবে। বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ধর্ম্মশাস্ত্র চর্চ্চা করিয়া আত্মবিশ্বাস ও আত্মজ্ঞান জন্মিবে।

বাঙালী শিক্ষিত সাধারণের মনে নানা কারণে এই ধারণাই বদ্ধমূল যে, ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্ত্তন ইংরেজ সরকার তথা ইংরেজদেরই কীর্ত্তি। ইহা যে কত ভ্রান্ত তাহা তৎকালীন সরকারী কাগজপত্র পাঠে অবগত হওয়া যায়। ইংরেজী শিক্ষাপ্রাপ্ত শুধু মনীষী রামমোহনের নহে, এমন কি যাঁহাদিগকে আমরা 'টুলো' পণ্ডিত বলিয়া উপেক্ষা করিয়া থাকি, তাঁহারাও ইংরেজী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। কিন্তু রামমোহনই সাধারণের অপরিস্ফুট মনোভাবকে সর্ব্বপ্রথম রূপ দান করেন। তিনি একটি সুনিয়ন্ত্রিত ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব একদিন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যর এডওয়ার্ড হাইড ঈষ্টের নিকট উপস্থাপিত করেন। ১৮১৬ সনের ১৮ই মে এডওয়ার্ড হাইড ঈষ্ট তাঁহার বন্ধু জে, হেরিংটনকে বিদ্যালয় স্থাপনকল্পে প্রথম দিনের সভার বিস্তৃত বিবরণসহ বিলাতে এক পত্র লেখেন। এই পত্র হইতে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ব্যাপারে হিন্দু প্রধানগণ, পণ্ডিতগণ এবং বিশেষ করিয়া রামমোহন রায়ের কৃতিত্বের বিষয় অবগত হই। পত্রের একস্থলে বলেন,—

"মে মাসের প্রথম কলিকাতার এক ব্রাহ্মণ (রাজা রামমোহন রায়) আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জানান, যে, কলিকাতার বহু নেতৃস্থানীয় লোক সম্পন্ন ইউরোপীয়দের মত নিজ নিজ সন্তানগণকে সাধারণ শিক্ষা দানের নিমিত্ত বিদ্যালয় স্থাপনে ইচ্ছুক। এই ব্রাহ্মণকে আমি জানি। ইনি বিদ্যাবত্তার জন্য এবং হিন্দুদের প্রচলিত (ধর্ম্ম) মতে বাধা প্রদানের জন্য বিখ্যাত। আমাদের স্বজাতীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সঙ্গেও ইহার ভাব। ইহার ইচ্ছা আমাদের অনুমোদনে একটি সভা আহূত হয় এবং আমি সভার কার্য্যে সহায়তা করি। সরকার এই কার্য্যকে কি চক্ষে দেখেন তাহা বুঝিতে না পারিয়া প্রথমতঃ পাকা কথা দিই নাই। তাঁহাকে বলিলাম, ব্যক্তিগত ভাবে এ কার্য্যকে যতই উত্তম বলিয়া আমি বিবেচনা করি না কেন, সরকারী কর্ম্মে লিপ্ত থাকায় স্ব-মতে কিছু করিতেছি সতর্ক হইয়াই আমাকে এরূপ ভাব প্রকাশ করিতে হইবে। কারণ আমি জানি গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছা এ বিষয়ে হিন্দুগণ স্বেচ্ছামত কার্য্য করেন।...তাঁহাকে আরও বলিলাম, যে, আমি এ বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিব এবং শেষ পর্য্যন্ত এই প্রস্তাবে আপত্তিকর কিছু না থাকিলে আমি তাঁহাকে সংবাদ দিব। তিনি যদি ইতিমধ্যে আমাকে প্রধান হিন্দুগণের নামের তালিকা প্রদান করেন তাহা হইলে তাঁহাদিগকে আমার বাসায় আহ্বান করিব। বস্তুতঃ তাঁহাদের কয়েকজন ইতিপূর্ব্বে এই প্রস্তাব লইয়া আমার সহিত আলাপ-আলোচনা করিয়াছেন কিন্তু এ যাবৎ আর কেহই এতটা সোজাসুজি প্রস্তাব করেন নাই।"

উদ্ধৃত অংশ হইতে কাহারও বুঝিতে অসুবিধা হইবে না যে, সরকার তখন পর্য্যন্ত এদেশে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্ত্তনের জন্য আদৌ প্রস্তুত ছিলেন না। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি এডওয়ার্ড হাইড ঈষ্টের মত পদস্থ ব্যক্তিকেও সরকারের অনুমতি প্রার্থনা করিতে হইয়াছিল, পাছে সরকার রুষ্ট হন।

যাহা হউক, সরকারের অনুমতি পাইবার পর হাইড ঈষ্টের গৃহে ১৮১৬ সনের ১৪ই মে কলিকাতায় ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপন কল্পে একটি সভার আয়োজন হয়। সভায় দেশীয় বিভিন্ন জাতির গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ সমবেত হন। বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাবের মূলে রামমোহন থাকিলেও তাঁহার স্বাধীন ধর্ম্মমত, প্রচলিত মতের বিরুদ্ধাচরণ এবং অবাধ মুসলমান সংসর্গ প্রভৃতি নানা কারণে সভায় উপস্থিত জনগণ তাঁহার সহিত এক যোগে কার্য্য করিতে, এমন কি, তাঁহার নিকট হইতে চাঁদা গ্রহণ করিতেও অস্বীকৃত হন। পাছে মূল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়, এই জন্য রামমোহন নিরাপত্তিতে সভা হইতে সরিয়া দাঁড়ান। অর্থ সংগ্রহ করিয়া নিজস্ব বিদ্যালয়-গৃহ স্থাপনের প্রস্তাব গৃহীত হইলে, সভাক্ষেত্রেই প্রায় [illegible]

টাকা দানের প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায়। বিদ্যালয়ের পাঠ্য বিষয় সম্বলিত এই প্রস্তাবও ধার্য্য হয়—বাংলা ও ইংরেজী ভাষা অনুশীলন, ব্যাকরণ, ইংরেজী নীতি শাস্ত্র, পাটী-গণিত, ইতিহাস, ভূগোল, জ্যোতিষ, অঙ্কশাস্ত্র প্রভৃতি এবং পরে অর্থ সঙ্কুলান হইলে ইংরেজী সাহিত্য ও কবিতা পাঠেরও ব্যবস্থা হইবে।

সভায় যে কয়টি বিষয় হাইড ঈষ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল তাহাও তিনি পত্রে উল্লেখ করেন। সেগুলি (১) বিভিন্ন জাতির লোকেরা এক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সভায় একত্র মিলিত হইয়াছিলেন। ইঁহাদের সন্তানেরা পংক্তি ভোজন না করিলেও একত্র অধ্যয়ন করিতে পরাঙ্মুখ হইবে না। (২) সর্ব্বাগ্রে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণই ইংরেজী শিক্ষার সপক্ষে তাঁহাদের সম্মতি জানান। প্রধান পণ্ডিত নিজের এবং অন্যান্য পণ্ডিতের পক্ষ হইতে তাঁহাকে বলেন—এক কালে স্বদেশে যে সাহিত্য-চর্চ্চা পূর্ণ-মাত্রায় চলিত এখন হইতে তাহার পুনঃপ্রকাশ হইবে এবং সাহিত্যও দিন দিন সমৃদ্ধ হইতে থাকিবে।

১৮১৭ সনের ২০এ জানুয়ারী সোমবার কলিকাতা গরাণহাটায় (৩০৪, চিৎপুর) গোরাচাঁদ বসাকের বাটীতে প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়। ইহাই হিন্দু কলেজ নামে পরিচিত। বিদ্যালয়ের পরিচালন ভার সম্পূর্ণরূপে বাঙালীরা গ্রহণ করেন। বর্দ্ধমানাধিপতি তেজচাঁদ বাহাদুর ও গোপীমোহন ঠাকুর ইহার প্রথম গবর্ণর, এবং গোপীমোহন দেব, জয়কৃষ্ণ সিংহ, রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় এবং গঙ্গানারায়ণ দাস ডিরেক্টর নির্ব্বাচিত হন। বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় ইহার প্রথম সম্পাদক ও ফ্রান্সিস আর্ভিন ইংরেজী বিভাগের পর্য্যবেক্ষক। ডক্টর আলেকজাণ্ডার ডাফের মতে হিন্দু কলেজই এদেশে সর্ব্বপ্রথম সুনিয়ন্ত্রিত ইংরেজী প্রতিষ্ঠান।

হিন্দু কলেজের পরিচালনকার্য্য হইতে রামমোহন দূরে থাকিলেও তিনি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া ইংরেজী শিক্ষা প্রচারে সহায়তা করিতে লাগিলেন। ১৮১৬ কিম্বা ১৮১৭ সনে তিনি শুঁড়ি পাড়ায় একটি অবৈতনিক ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। হেদুয়ার সন্নিকট নূতন গৃহ নির্ম্মিত হইলে ১৮২২ সনে বিদ্যালয় তথায় স্থানান্তরিত হয়। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর শৈশবে এই বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন,—

"শৈশবকাল অবধি আমার রামমোহন রায়ের সহিত সংশ্রব। আমি তাঁহার স্কুলে পড়িতাম। তখন আরও ভাল স্কুল ছিল। কিন্তু আমার পিতা রামমোহন রায়ের অনুরোধে আমাকে ঐ স্কুলে দেন। স্কুলটি হেদুয়া পুষ্করিণীর ধারে প্রতিষ্ঠিত।"

ইংরেজী শিক্ষার পরিবর্ত্তে সংস্কৃত শিক্ষার প্রচারের

রাজা রামমোহন রায়

জন্য গবর্ণমেণ্ট ১৮২৩ সনে নূতন বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব করেন। ঐ সনের ১১ই ডিসেম্বর রামমোহন তৎকালীন বড়লাট লর্ড আমহার্ষ্টকে এক পত্র লেখেন। তাহাতে তিনি অকাট্য যুক্তি দ্বারা সরকারের প্রস্তাবের অসারতা প্রতিপন্ন করেন। ইংরেজী শিক্ষাদ্বারাই যে জনগণের বিশেষ উপকৃত হইবার সম্ভাবনা ইহাও তিনি বুঝাইয়া দেন।

৩

সুনিয়ন্ত্রিত ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মূলে প্রধানতঃ

বাঙালী মনীষা থাকিলেও একজন মহানুভব স্কটলণ্ডবাসীর মনেও একথা উদিত হইয়াছিল। তিনি তখনও সাধারণ্যে তেমন পরিচিত হন নাই। সবেমাত্র ঘড়ির ব্যবসা পরিত্যাগ করিয়া প্রচুর অর্থ লইয়া এদেশের মঙ্গল কামনায় মন দিয়াছেন। মহাত্মা ডেভিড হেয়ার হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বেই দেশী পাঠশালা স্থাপন করিয়া বাঙালী সন্তানগণকে দেশীয় ভাষায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন। ইংরেজী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়া হিন্দু কলেজ স্থাপনেও সাহায্য করেন। বিদেশী ভাষা আয়ত্ত করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথম দেশীয় ভাষায় ব্যুৎপন্ন হওয়া প্রয়োজন, আবার দেশীয় ভাষার উন্নতি করিতে হইলেও ইংরেজী শিক্ষা করা দরকার। ১৮১৮ সনের ১লা সেপ্টেম্বর কলিকাতা স্কুল সোসাইটী স্থাপিত হইলে, ডেভিড হেয়ার তাহার অন্যতর যুগ্ম সম্পাদক নিযুক্ত হন, এবং উক্ত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আরপুলিতে সোসাইটীর অধীনে নিজ দায়িত্বে একটি স্কুল পরিচালনা করেন। বিদ্যালয়ে ইংরেজী ও বাংলা যে উত্তমরূপে শিক্ষা দেওয়া হইত সমাচার দর্পণে (৮ইমার্চ্চ ১৮২৩) প্রকাশিত নিম্নলিখিত সংবাদে তাহার উল্লেখ আছে,—

"বিদ্যার পরীক্ষা। ১৭ ফাল্গুন বৃহস্পতিবার মোং কলিকাতার শ্রীরাজা গোপীমোহন দেবের বাটীতে কলিকাতা স্কুল সোসাইটির বালকদিগের পরীক্ষা হইয়াছিল তাহাতে শ্রীযুত হের সাহেব ও শ্রীযুত গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার ছয় ক্লাশ অর্থাৎ শ্রেণীবদ্ধ করিয়া অতিসুধারানুযায়ী বালকদিগকে উপযুক্ত স্থানে বসাইয়াছিলেন…… শ্রীযুত হের সাহেবের নিজ পাঠশালার বালক ২০ জন ইংরেজী ও বাঙ্গালী বিদ্যার পরীক্ষা সুন্দররূপে দিল।…"

কলিকাতা স্কুল সোসাইটি হিন্দু কলেজের মূলে রস জোগাইত। কারণ প্রতি বৎসর ত্রিশ জন করিয়া উৎকৃষ্ট ছাত্র এখান হইতে হিন্দু কলেজে প্রেরিত হইত। ডক্টর রেভরেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় হেয়ার সাহেবের স্কুলের ছাত্র ছিলেন।

১৮২৬ সনে হিন্দু কলেজের অবৈতনিক সভ্য নিযুক্ত হওয়ার পর অবধি ডেভিড হেয়ার এই প্রতিষ্ঠানের সহিত বিশেষভাবে মিলিত হন। মধুর ব্যবহারে ও একনিষ্ঠ সেবায় ডেভিড হেয়ার কলেজের ছাত্রগণের হৃদয় জয় করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে (১লা জুন ১৮৪২) রামগোপাল ঘোষ প্রমুখ হিন্দু কলেজের ভূতপূর্ব্ব ছাত্রগণ পরিচালিত দ্বিভাষিক বেঙ্গল স্পেক্‌টেটর (১৪ই জুন, ১৮৪২; পৃঃ ৪৬) লিখিয়াছেন,—

"তিনি ঐ বিদ্যালয়ের উন্নতির নিমিত্তে অতিশয় যত্নবান হইয়া তৎপ্রতি যে যে উপকার করিয়াছেন, তাহা ঐ বিদ্যালয়ের আদ্যন্ত বিবরণ মধ্যে এক প্রধান চিরস্মরণীয় ইতিহাস হইবেক আর তিনি উক্ত বিদ্যামন্দিরের অধ্যক্ষ প্রযুক্ত কেবল যে নির্দ্ধারিত কোন সময়ে কখন কখন আসিয়া রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন এমত নহে কিন্তু প্রায় প্রত্যহ তথায় উপস্থিত হইয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত অবস্থিতি করিতেন এবং প্রত্যেক বালকের পাঠ বিবরণ ও বিদ্যালয়ে আগমন অনাগমন, শারীরিক কুশলাদি ও বিদ্যামন্দিরে ও বাটীতে কি প্রকার ব্যবহার ইত্যাদির অনুসন্ধান করিতেন ও সুশিক্ষিত সগুণ বালকদিগকে উৎসাহ ও পুরস্কার প্রদান করিতেন আর ছাত্রদিগের মধ্যে যে যে বিবাদ উপস্থিত হইত তাহা স্বয়ং ভঞ্জন করিতেন আর বালকদিগের পিতামাতা অথবা অন্য অভিভাবকেরা কোন বিষয়ের নিমিত্তে অনুরোধ করিলে তাহা মনোযোগ পূর্ব্বক শুনিতেন এইরূপে বিদ্যামন্দিরের সুন্দররূপ নির্ব্বাহ ও শ্রীবৃদ্ধির উপয়ানুসন্ধানে সাধ্যানুসারে তাঁহার ক্রটী ছিল না …"

ইংরেজী শিক্ষার প্রসারণে ডেভিড হেয়ারের প্রচেষ্টার কথা হিন্দু কলেজের ছাত্রগণ ভুলিতে পারেন নাই। তাঁহারা শ্রদ্ধা ও প্রীতির নিদর্শন-স্বরূপ হেয়ার সাহেবের এক তৈল চিত্র তুলিতে মনস্থ করেন। এইজন্য তাঁহার অনুমতি প্রার্থনা করিয়া ছাত্রগণ তাঁহাকে একখানা মানপত্রও প্রদান করেন। মানপত্রখানি সমকালিক সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হইলেও পরবর্ত্তী লেখকেরা ইহার অস্তিত্বের কথা ভুলিয়া যান। এমন কি ৺প্যারীচাঁদ মিত্রও তাঁহার "ডেভিড হেয়ার জীবনীতে" ইহা সন্নিবেশিত করিতে পারেন নাই। অথচ এই মানপত্র ও হেয়ার সাহেবের প্রদত্ত উত্তর এদেশের ইংরেজী শিক্ষার ইতিহাসের পক্ষে অত্যাবশ্যক। আমি গবর্ণমেণ্ট গেজেটে (২১এ ফেব্রুয়ারী

১৮৩১) প্রকাশিত এই মানপত্র ও উত্তরের মর্ম্মানুবাদ এখানে দিলাম,—

কলিকাতা, ১৭ই ফেব্রুয়ারি ১৮৩১

মহাত্মা ডেভিড হেয়ার সমীপেষু

প্রিয় মহাশয়,

সামান্যরূপে প্রদর্শিত হইলেও দয়া উপকৃত জনের মনে কৃতজ্ঞতার সঞ্চার করিয়া থাকে। শিক্ষাদান করা বিজ্ঞ লোকের কাজ। এই সর্ব্বোৎকৃষ্ট দান আপনার নিকট হইতে গ্রহণ করার সৌভাগ্য যাহাদের হইয়াছে কি ভাব আজ তাহাদের উদ্বুদ্ধ করিতেছে। জগতের হিতকারীদের সম্মানের বা কৃতজ্ঞতার নিদর্শন না রাখায় বহু যুগের দুর্দ্দশা ও নিন্দা হইয়াছে। এইজন্য আমরা সতর্ক হইয়াছি—অপবাদ দূরীভূত করাই আমাদের বাসনা। আমরা ইহাও বলিতে চাই যে, এদেশের যে মহৎ উপকার আপনি করিয়াছেন তাহার প্রতি অন্যেরা অবহিত না হইতে পারে, কিন্তু যাহারা উপকৃত হইয়াছে সে-কথা চিরদিন তাহাদের মনে গাঁথা থাকিবে। এই হেতু আপনার প্রতিকৃতি তুলিবার জন্য আপনাকে বসিতে অনুরোধ করিব মনস্থ করিয়াছি। আমাদের বিশ্বাস আছে, এই অনুরোধ রক্ষা করিতে আপনার আপত্তি হইবে না। আমরা ইহা কল্পনাও করিতে পারি না যে, সম্মানের এই তুচ্ছ নিদর্শনটুকু আপনার হিতৈষণামূলক কার্য্যের পক্ষে যথেষ্ট বিবেচিত হইবে। আমাদেরই তৃপ্তির জন্য এমন একজন লোকের প্রতিকৃতি তুলিবার অনুমতি আমরা চাহিতেছি যিনি হিন্দুসমাজের প্রাণে নূতন প্রেরণা দিয়াছেন, যিনি বিদেশকে স্বদেশ করিয়া লইয়াছেন, যিনি স্বেচ্ছায় নির্ব্বান্ধব জাতির বান্ধব হইয়াছেন এবং যিনি স্বজাতীয় এবং এদেশীয়গণের সমক্ষে যশকে প্রশংসা করিবার এবং অমরত্বকে অনুকরণ করিবার দৃষ্টান্ত রাখিয়া যাইতেছেন।

আমরা মানপত্রে লিখিত বিষয়ে আপনার অনুমতির অপেক্ষা করিতেছি। এবং এতকাল আপনি যে-ভাবে জীবন যাপন করিয়াছেন সেই ভাবে জীবন যাপন করিবার স্বাস্থ্য ও শক্তি আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করিতেছি।

প্রিয়বর, আমাদের আজ কি আনন্দের দিন! ইতি—

আপনার একান্ত অনুগত সেবকবৃন্দ

কলেজের অন্যতম অগ্রণী ছাত্র দক্ষিণানন্দন (পরে দক্ষিণারঞ্জন বলিয়া খ্যাত) মুখোপাধ্যায় মানপত্র পাঠ করেন। ইহা ৫৬৪ জন ছাত্র যুবক কর্ত্তৃক স্বাক্ষরিত হইয়াছিল। মানপত্রের উত্তরে ডেভিড হেয়ার বলেন,—

বন্ধুগণ,

তোমরা আমাকে যে মানপত্র প্রদান করিলে তাহা শ্রবণে আমি বড়ই অভিভূত হইয়া পড়িয়াছি। এজন্য তোমরা আমাকে ক্ষমা করিও। তোমরা আমার উত্তর ধীরভাবে শ্রবণ কর। এখানে কিছুকাল অবস্থিতির পর কয়েকজন এদেশবাসীর সঙ্গে আলাপ পরিচয়ে বুঝিলাম যে, শিক্ষা ব্যতিরেকে হিন্দুগণের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য লাভ হইবে না। তখন ভারতবর্ষের শ্রীবর্দ্ধনের জন্য আমি আমার সামান্য শক্তি বিনিয়োগ করিলাম। সরকারের ও হিন্দু সমাজের নেতৃবর্গের সম্মতি ও সমর্থন পাইয়া শিক্ষার প্রচারে সচেষ্ট হইলাম।

বন্ধুগণ, আমি দেখিয়া তৃপ্তিলাভ করিতেছি যে, শিক্ষা-তরু ইতিমধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আমি চারিদিকে পুষ্পের কুঁড়ি অবলোকন করিতেছি। আর দশ বৎসর ইহাকে অনায়াসে বর্দ্ধিত হইতে দিলে ইহা এত শক্তি অর্জ্জন করিবে যে, তখন ইহার মূলোচ্ছেদ করা একরূপ অসম্ভব হইবে। যে কার্য্য ইতিমধ্যে আরব্ধ হইয়াছে তাহার রক্ষণ ও পোষণ তোমাদের প্রচেষ্টার উপর সম্পূর্ণ-রূপে নির্ভর করে। তোমাদের স্বদেশবাসীরা তোমাদের নিকট হইতে এই কার্য্যে সাফল্য লাভেরই আশা করেন। কারণ তাঁহারা তোমাদিগকে সমাজের সংস্কারক ও শিক্ষক বলিয়াই গণনা করেন। এই কার্য্যে সিদ্ধিলাভ এবং বিদেশীয়েরা কিরূপে এদেশবাসীর উপকারে আসিতে পারে তাহা প্রদর্শন তোমাদেরই কর্ত্তব্য।

যখন আমার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে জনগণকে লক্ষ্য করি, যখন দেখি যে, সম্মানার্হ ও শিক্ষিত দেশীয় ভদ্র জনেরা মানপত্র প্রদানের জন্য আমার চারিদিকে জড় হইয়াছেন তখন আমার মনে বড়ই আনন্দ উপজন্ম হয়। কারণ, ইহা আমার প্রতি তাহাদের হৃদয়ের অকপট প্রীতিরই দ্যোতক। বন্ধুগণ, আমার কণ্ঠরোধ হইবার উপক্রম হইয়াছে। আমার জীবনে ইহা একটি গরবের

দিন। আমার প্রতি তোমাদের কৃতজ্ঞতার নিদর্শন আমি জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত রক্ষা করিব। আমার পরবর্ত্তিগণের জন্য এই সম্পদ রাখিয়া যাইব যাহাতে তাহারা ইহা দর্শন করিয়া ভ্রাতৃগণের হিতসাধনে সবিশেষ তৎপর হয়।

বন্ধুগণ, স্বীয় প্রকৃতি অনুসরণ করিলে তোমাদের অনুরোধ আমি রক্ষা করিতে পারিতাম না। কারণ নিজেকে সাধারণের দৃষ্টিতে না আনাই আমার রীতি,

ডেভিড হেয়ার। কলিকাতা হেয়ার স্কুলে রক্ষিত

আমি নিরিবিলি জীবন যাপন করিতে চাই। যখন আমি দেখি হিন্দুসমাজের গণ্যমান্য লোকের সন্তানেরা দলবদ্ধ হইয়া আমাকে সম্মান দর্শাইতে আসিয়াছে, যখন লক্ষ্য করি,—এই মানপত্র তাহাদের দ্বারাই স্বাক্ষরিত যাহাদের সঙ্গে আমি ঘনিষ্ঠভাবে মিশি এবং আমার প্রতিকৃতি তুলিতে দিলে যাহারা খুব খুশী হইবে তখন আর আমি তোমাদের অনুরোধ রক্ষা না করিয়া থাকিতে পারি না।

(স্বাক্ষরিত) ডি, হেয়ার

৪

রবিন হুড দস্যুবৃত্তি দ্বারা উপার্জ্জিত অর্থ দীন-দরিদ্রের দুঃখ মোচনে ব্যয় করিত। ইংরেজ ঐতিহাসিক ইহার গুণ কীর্ত্তনে কার্পণ্য করেন নাই। শিশুপাঠ্য পুস্তকেও রবিন হুডের কাহিনী স্থান পাইয়াছে। মানব চরিত্রের যে নান দিক আছে বাংলা তথা ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক এ শাশ্বত সত্য ভুলিয়া গিয়াছেন। রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা হারাইলেও, এমন কি শতবর্ষ পূর্ব্বে সেই অন্ধকার যুগেও, কোন কোন বিষয়ে যে আমরা কৃতিত্ব দেখাইতে পারিয়াছিলাম, পরবর্ত্তী যুগের স্বার্থান্ ঐতিহাসিক তাহা স্বীকার করেন নাই। ফলে আমরা আত্ম-প্রত্যয় হারাইয়া এতকাল আলেয়ার পিছনেই ছুটিয়াছি। সত্যকার ইতিহাস জাতির সুকৃতি দুষ্কৃতি দুইয়েরই পর্য্যালোচনায় গরীয়ান। দিন আসিয়াছে যখন আমাদের ইতিহাসও সত্যের উপর ভিত্তি করিয়া রচিত হইবে। বাংলা তথা ভারতবর্ষে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্ত্তনের মূলে যে বাঙালী মনীষা বর্ত্তমান তাহাও আর আমাদের অগোচর থাকিবে না। বিদেশীদের মধ্যে যাঁহারা এই কার্য্যে আমাদের সহায়তা করিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করিব। আর সঙ্গে সঙ্গে ইহা ভুলিব না যে, ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্ত্তনের মূ উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজী ভাষার মারফত প্রতীচি জ্ঞান বিজ্ঞান আহরণ করিয়া মাতৃভাষার সাহায্যে দিকে দিকে তাহা প্রচার করা।*

* এই প্রবন্ধে নিম্নলিখিত পুস্তক হইতে সাহায্য লইয়াছি

১। Adam's Reports on the Vernacul Education of Bengal, 1835, 1836, 1836

২। সেকাল একাল—রাজনারায়ণ বসু

৩। Rammohun Roy as an Education Pioneer. Published in The Journal of the Bih and OrissaResearch Society, June 1930.—Brajend Nath Banerjee

৪। শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী

৫। A Biographical Sketch of David Hare—Pear Chand Mitra.

চৈনিক সভ্যতা

শ্রীসুধাংশুকুমার মিত্র বি-এস-সি

"A people with little names, little eyes, and little feet, who sit in little bowers, drinking little cups of tea, and writing little odes." Leigh Hunt.

চৈনিক সভ্যতার ধারা আজ স্বপ্নের মত মিলাইয়া গিয়াছে সত্য কিন্তু উহা পৃথিবীর ইতিহাসে যে জিনিষ দান করিয়া গিয়াছে তাহার তুলনা হয় না। অসভ্যতার ঘোর আঁধারে যখন সমগ্র জগৎ নিমজ্জিত চীন প্রদেশ তখন সভ্যতার আলোকে উদ্ভাসিত। চীন সভ্যতার কথা আজ আমরা ততটা শুনিতে পাই না; যতটা পাই গ্রীক সভ্যতার কথা। কিন্তু পাশ্চাত্য মনিষীদের মতেও চীন গ্রীসের বহু বৎসর পূর্ব্বে সভ্য হইয়া উঠে। *

চীন গণতন্ত্রের সভাপতি—চাং কাই সেক

আজ যে জাতি সভ্যতার আদর্শরূপে পরিগণিত হইতেছে, কাল হয় ত পৃথিবীর এমন পরিবর্ত্তন আসিবে যখন ঐ আদর্শবাদ ধূলিসাৎ হইয়া যাইবে; অপর এক জাতি সভ্যতার চরম শিখরে উঠিবে। বর্ত্তমান সময়ে পৃথিবীর উপর দিয়া যে ঝঞ্ঝা বহিয়া চলিয়াছে, ইহার শেষ কোথায় কে বলিবে? অনেকে আশঙ্কা করেন পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বারে শমন হাজির।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পৃথিবীর অপরাপর প্রদেশ যখন অসভ্যতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল তখন চীনদেশের

চীনের ভূতপূর্ব্ব সম্রাজ্ঞী

লোকেরা সমাজ স্থাপন করিয়া বেশ সুষ্ঠুভাবে জীবনযাপন করিতেছিল। চৈনিক জগৎ ব্যতীত অন্য কোন জাতির তখনও বুদ্ধি এইরূপ মার্জ্জিত হয় নাই যে, তাহার ভাবিতে পারে সমাজ সংস্থাপন করিয়া মানুষ অপেক্ষাকৃত নিরাপদে থাকা সম্ভব।

* "The Chinese were a remarkably civilised nation a thousand years before Christ. That was sometime before Greek Civilisation can be said to have began"—Chinese Civilisation—H. A. Giles.

প্রাচীন রাষ্ট্র-প্রণালী

সমাজ স্থাপন করিয়া বাস করা অর্থে কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট নিয়মকানুনের মধ্যে নিজেদের কার্য্যাবলী নির্দ্ধারিত রাখা। সেজন্য যেখানেই সমাজ সংস্থাপিত হইয়াছে, সেইখানেই কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট প্রণালী রহিয়াছে। এই

মৃত ম্যানইয়েট সেনের শোভাযাত্রা

নির্দ্দিষ্ট প্রণালী বিভক্ত হইয়া জাতির সমাজ ও রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত করে। ইতিহাস হইতে জানা যায়, হিয়া বংশীয় খৃঃ পূঃ ২২৮০—১৭৬৬ সাল পর্য্যন্ত চীন দেশে রাজত্ব করিত। সেই সময় রাজত্ব রাজতন্ত্র প্রণালী নির্ব্বাচনের (Elective monarchy) উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল! রাজতন্ত্র-প্রণালী নির্ব্বাচন অর্থে বর্ত্তমানে যেরূপ সকল "স্বদেশী" গভর্ণমেণ্ট প্রজাতন্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ প্রজার নির্ব্বাচনে সরকার প্রতিষ্ঠিত হইয়া রাজকার্য্য চালনা করে, সেইরূপ তখনকার দিনে চীনদেশে একজন মাত্র ব্যক্তি প্রজাদের দ্বারা নির্ব্বাচিত হইয়া শাসনকার্য্য পরিচালনা করিতেন। এইরূপ নির্ব্বাচন প্রায়ই বংশানুক্রমে হইত।

এই সময় চীনরাজারা পুরোহিতের কার্য্যাবলীও করিতেন। কিছুকাল পূর্ব্বে পর্য্যন্ত যেমন তুর্কীর রাজাই মুসলমান ধর্ম্মের প্রধান পুরোহিত বলিয়াও গণ্য হইতেন; চীন রাজারাও তখনকার দিনে এইরূপে একাধারে রাজা ও পুরোহিত দুইই ছিলেন। সেইজন্য তাহাদিগকে পুরোহিত রাজা (Priest King) বলা হইত। প্রত্যেক দেশের রাজাকে যেমন প্রজারা মধ্যযুগ (medieval age) পর্য্যন্ত দেবতা ও দেবতার অংশ বলিয়া ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিত সেই রকম চীনদেশের রাজারও ভগবানের স্বরূপ বলিয়া সম্মানিত হইতেন। ইহাই ছিল তাহাদের নাক্ষত্রিক ধর্ম্ম (Astral Religion)।

এই বিশ্বাসের মূলে ছিল, তখনকার রাজাদের প্রজার হিতার্থে স্বার্থত্যাগ ও আত্মবলিদান। তখনকার লোকের বিশ্বাস ছিল যে, পুরোহিত রাজা যে কেবলমাত্র ঐশ্বরিক শক্তিসম্পন্ন তাহা নয়, তাহারা আবশ্যকমত প্রজার মঙ্গলার্থে ঈশ্বরের নিকট আত্মবলিদানও দিতে সক্ষম।

চীনদেশের শাসন-সংগঠন পরিষ্কাররূপে তিনভাগে ভাগ করা চলে—যেমন আদিযুগ, মধ্যযুগ ও বর্ত্তমান যুগ।

খৃঃ পূঃ ২২১ পর্য্যন্ত আদিযুগ। তারপর চীনসাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। সিন্ বংশীয় রাজা সিন্-সি-হুয়াং দ্বারা। সেই সময় হইতে চীনদেশের মধ্যযুগারম্ভ। মধ্যযুগের অবসান ঘটে ১২৮০ খৃষ্টাব্দে যখন চীনদেশে পাশ্চাত্য জাতিগুলির সহিত ঘনিষ্ঠতা সূত্রে আবদ্ধ হইয়া তাহার

হংকংএ চীন মৃতদেহের শোভাযাত্রা

পুরাতন সংস্কারের উচ্ছেদ সাধন করে। সেই সময় হইতে চীনে বর্ত্তমান যুগের আরম্ভ। বর্ত্তমান যুগের আবির্ভাব ঘটিবার পরও চীনদেশে রাজতন্ত্র প্রচলিত

ছিল ১৯১১ সাল পর্য্যন্ত। সেই সময় চীনে মাঞ্চুবংশ রাজত্ব করিতেছিল। স্বদেশপ্রেমিক ডাঃ স্যান-ইয়েট-সেন (Sun-Yet-Sen) ঐ সময় মাঞ্চুবংশের রাজত্ব ধ্বংস করিয়া প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেন। তারপর হইতে চীন নববেশে নূতন করিয়া জগতে দেখা দেয়।

প্রাচীন ভাষা ও সাহিত্য

কোন জাতির স্বরূপ প্রকাশ পায় সাহিত্যে। তাহার ভাবধারা ও সভ্যতার ভার বহন করিয়া সাহিত্য পরিপুষ্টি লাভ করে। সেজন্য কোন্ জাতি কেমনতর সভ্য জানিতে হইলে একমাত্র সাহিত্য হইতে এই বিষয়ে জানিতে পারা যায়।

চীন জাতির সাহিত্যের ভাণ্ডার ছিল প্রকাণ্ড। সেজন্য বুঝিতে হইবে এ বিষয়ে চীনজাতির শিক্ষা ও সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ ও সাধনা ছিল প্রবল। চীন সাহিত্যে জীবন চরিত, দর্শন, কাব্য ও আলোচনা বহুল পরিমাণে বর্ত্তমান। আর চীন সাহিত্যের একটী বিশেষত্ব এই যে তাহার কাব্য সাহিত্য একেবারে দোষশূন্য। কাব্য সাহিত্য দোষশূন্য অর্থে বর্ত্তমানযুগের সকল দেশের সাহিত্য যেমন কিছু না কিছু vulgar ভাব আছে সেইরূপ কোন ভাব তাহাদের সাহিত্যে দেখা যায় না। চীনদেশের উপন্যাসও উপদেশপূর্ণ ও ধর্ম্ম বিষয়ক ছিল!

চীন মহিলা সূতা কাটিতেছে

নদীর উপর হইতে হংকং

পুরাতন গ্রন্থমণ্ডলীর ভিতর আই-কিং (Book of Changes); শো-কিং (Book of History); সাই-কিং (Book of Poetry); লিকিং (Record of Rites); সুন-সিউ (Spring and Autumn annuals); ইউকিং (Record of Music); হিয়াও-হিং (Book of Filial Pity); তুং-সাই (Complete Chronicales) এই সকল উল্লেখযোগ্য এবং এই সকল উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ব্যতীত চীনদের আরও অসংখ্য গ্রন্থ বর্ত্তমান। এই সকল বহুমূল্য গ্রন্থ হইতে চীনদেশের সভ্যতার কিছু কিছু আভাষ পাওয়া যায়। নিম্নে Book of History "হুং ফান" (Guat Plan) নামক পরিচ্ছেদ হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—

১। পঞ্চভূত—অপ, তেজ, ক্ষিতি, কাষ্ঠ ও ধাতু।

২। পাঁচবিধি কর্ম্ম—ব্যবহার, বাক্য, দর্শন, শ্রবণ ও চিন্তা।

৩। রাষ্ট্রনৈতিক অষ্টবিষয়ক—খাদ্য, বাণিজ্য-

দ্রব্য, বলি, কর্ম্মপ্রদান, শিক্ষাদান, দোষদণ্ড, আতিথ্য ও সৈন্য।

৪। পাঁচপ্রকার কাল নিরূপণ—বৎসর, চন্দ্র, দিবস, তারা, নক্ষত্রপুঞ্জ।

৫। পাঁচবিধ সুখ—দীর্ঘায়ুঃ, ধনসম্পত্তি, স্বাস্থ্য ও শান্তি, ধর্ম্মাশক্তি ও কর্ত্তব্যের প্রতি লক্ষ্য।

৬। ছয়বিধ দুঃখ—দুর্ভাগ্য, রোগগ্রস্ততা, মনোদুঃখ, দারিদ্র্য, দুশ্চরিত্র ও দুর্ব্বলতা।

এই সকল বাক্য হইতে সহজেই প্রতিভাত হয় যে চীনদেশের সভ্যতা কিরূপ উচ্চ ছিল। আর যে জাতির একটী গ্রন্থ এইরূপ রত্নের আধার সেই জাতির অপরাপর গ্রন্থ সকল কিরূপ, তাহা সহজেই অনুমেয়।

ইতিহাস বিশ্রুত চীন প্রাচীর
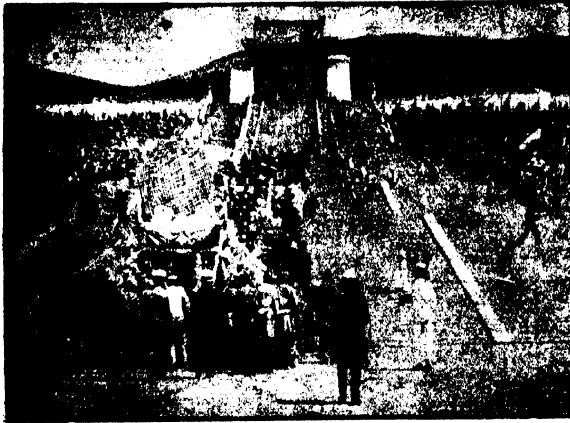
সাংহাইএর একটী রাস্তা

Book of History যে কবে কোন সময়ে লিখিত হইয়াছিল, সঠিক বলা যায় না। তবে ইহা যে ঐতিহাসিক শতাব্দীর অনেক পূর্ব্বে ঐ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আবার আজ যে সকল চীনদেশীয় গ্রন্থমণ্ডলীর কথা জানা যায় তাহা বিরাট গ্রন্থদাহ কাণ্ডের এক অংশমাত্র। কারণ, খৃঃ পূঃ২১৩ সালে সিন-সি হুয়াংএর রাজত্বকালে ঐ দেশে এক বিরাট অগ্নিকাণ্ডের আয়োজন হয়; তাহাতে নানা অমূল্য গ্রন্থ ভস্মীভূত করা হইয়াছিল। এই ব্যবস্থা তৎকালীন রাজার পরামর্শেই সাধিত হয়। রাজা অনুমান করিয়াছিলেন যে ঐ সকল পুরাতন গ্রন্থ ধ্বংস করিয়া তিনি নূতন গ্রন্থ প্রণয়ণ দ্বারা তাহা হইতে প্রজাদিগকে রাজভক্তি শিক্ষা দান করিবেন। কিন্তু তাহার বোধ হয় অনুমানই হয় নাই যে ভবিষ্যৎ জগতের কিরূপ ভয়ঙ্কর ক্ষতিই না তিনি করিলেন। এই প্রকার দাহকাণ্ড চীন দেশে পাঁচবার সংসাধিত হইয়াছিল। এবং আজ আমরা পুরাণী চীন সম্বন্ধে যেটুকু জানিতে পাই সেটা চৈনিক সভ্যতার এক অংশমাত্র।

ঝাঁঝিয়ে নেশা

সুরুচিবালা চৌধুরাণী

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

বেশ! জেনে রাখলুম, আর আমি তোমাকে সম্পূর্ণ অধিকার দিলুম, সে ভুল শুধরে নেবার।"

"তোমার কাছে আমি অধিকার, অনধিকার কিছু চাচ্ছি না, দরকার হয় আমি সে অধিকার নিজেই জোর করে নেবো।"

সুরমা দেখিল রাজীব মৃদু মৃদু হাসিতেছে—হাসি দেখিয়া সে আরো রাগিয়া উঠিল। সে বলিল, "নিশ্চয়, নেবো বই কি!—তুমি—"

রাজীব বলিল—"নিও সুরমা, কিন্তু আমার সন্তানের মা, আমার বংশের বৌ তুমি, সে যেই হোক্—তাকে রক্ষা করাটাও আমার কর্ত্তব্য—আমিও সে কর্ত্তব্য বিচ্যুত হব না—"

"আমি তোমার ও ফাকা কথায় ভয় পাচ্ছি না, আমি আর সইতে পারছি না, জানো সকলে জেনেছে আমার লজ্জা অপমানের কথা?"

"তোমার লজ্জা, অপমান, সুরমা?"

"লজ্জা অপমান নয়? তুমি আমাকে উপেক্ষা ক'রে আর একজনকে নিয়ে—"

"তোমার লজ্জা, অপমান? তোমাকে উপেক্ষা? নিজেকে অত নীচু ক'রে ফেলোনা সুরমা। এর চেয়ে তোমাকে আমি অনেক উঁচু মনে করি,—আমি তুমি তো আলাদা নই—আমার আশ্রিতা সে, সেইজন্য তোমারও আশ্রিতা, দীন, দুঃখী কিন্তু ভদ্র-বংশীয়া মেয়ে সে—আজ যদি সে তোমার কাছে এসে আশ্রয় চায়?—"

সুরমা হঠাৎ উত্তর দিতে পারিল না, সে চুপ করিয়া রহিল। রাজীব বলিল—"একটু ভেবে দেখো—আর ঝগড়া নয় বুঝলে? পৃথা আসছে—আরো কে হয়তো তোমার বন্ধুরা আসছেন—আমি চললুম—।"

রাজীব অন্যদিক দিয়া চলিয়া গেল। যে সমস্যা অসমাপ্ত রহিয়া গিয়াছিল এতদিন, আজও তাহা তেমনি অসমাপ্ত রহিয়া গেল, সুরমার বুকের বোঝা নামিল না, মনের মেঘ কাটিল না। যেমনকার তেমনি রহিল। সুরমা জোর করিয়া মনের প্রফুল্ল ভাবটাকে ফিরাইয়া আনিল।

মীরা ও কণিকাকে দেখিয়া সুরমা বলিল—"আজ যে সকালেই? বোস!"

কণিকা বলিল—"এমনি বেড়াতে বেড়াতে এলুম—ছেলে কোথায়?"

সুরমা বলিল—"ঘুমোচ্ছে—"

পৃথা বলিল—"বোস—একটু শিঙাড়া খেয়ে যেতে হবে কিন্তু—পালিয়ে যেও না, আমি নিয়ে আসছি।"

মণিকা বলিল—"নিজের হাতের বুঝি?"

সুরমা বলিল—"হ্যাঁ, ঐ তো সকাল থেকে ঐ সব করছে।"

পৃথা কতগুলি শিঙাড়া রেকাবিতে সাজাইয়া আনিয়া কণিকা ও মণিকার সামনে ধরিয়া দিল। খাইয়া দুইজনেই বলিল "চমৎকার হয়েছে।"

খানিকক্ষণ কথাবার্ত্তা বলিবার পর, কণিকা বলিল—"পৃথা আর সুরো ঠিক সময়ে আমার partyতে এসো কিন্তু শনিবার—"

পৃথা একটু ভাবিয়া বলিল—"শনিবার? সেদিন যে Ist. Monsoon meeting! তা একটু দেরী হতে পারে।"

কণিকা বলিল "Ist. monsoon meeting মানে? race? ও বাইও আছে না কি?"

সুরমা বলিল,—"আছে না কি? সেদিন ওকে শেকল দিয়ে বেঁধে রাখলেও বোধ হয় ধ'রে রাখতে পারবে না।"

কণিকা বলিল—"তাই নাকি! বাবা! আচ্ছা কি এমন মজা পাও?"

পৃথা বলিল—"মজা পাই নিশ্চয়, তা না হ'লে যাবো কেন? তাছাড়া আরো কি মনে হয় জানো? সংসারে যখন এসেছি তখন সবই experience ক'রে নেওয়া ভালো নয় কি? বাকি বা কিছু থেকে যায় কেন?"

কণিকা বলিল—"রক্ষে কর ভাই! অমন experience এ দরকার নেই, ওসবে অনেক কিছুই stake করতে হয়।"

পৃথা বলিল—"একটা stake সব কিছুতে থাকা উচিত—stake না থাকলে যেন বেঁচে থাকারই সুখ হয় না, সার্থকতা হয় না—আর stake করা সব জিনিষেই সুখ আছে—আনন্দ আছে—।"

কণিকা বলিল—"সারা জীবনটা যদি stake করে কাটাতে হয়, তাহ'লে সে ভারি বিশ্রী হবে কিন্তু—জীবনভরা একটা ধুক্ ধুক্ ভাব, একটা অশান্তি লেগেই থাকবে চিরকাল—"

পৃথা বলিল—"ঐ তো চাই—ওটাই হচ্ছে excitement of life, শুধু ঘুমিয়ে, খেয়ে নিশ্চিন্ত ভাবে জীবন কাটিয়ে দেওয়ায় কোন পৌরুষ নেই—ওতে কোন charm খুঁজে পাওয়া যায় না।"

কণিকা বলিল,—"বাবাঃ—ওসবে আমার দরকার নেই।"

সুরমা বলিল—"কণা, তবে যে equality চাস?—পুরুষরাতো বোধহয় stake করেই জীবন কাটিয়ে দিতে ভালবাসে—তা'হলে যে পেছিয়ে পড়বি।

কণিকা বলিল,—"সে আলাদা, কিন্তু তা ব'লে রোজ টাকা, পয়সা, মান, সম্মান, জীবন যদি stake করতেই থাকি—তাহলে কি রকম বিশ্রী হয়—না?"

পৃথা হাসিয়া বলিল—"আমার কাছে বিশ্রী হয় না, বরং খুব সুশ্রীই হয়। সব stake করেই বেঁচে থাকবো, তাতে—সে বেঁচে থাকায় প্রাণ আছে—উৎসাহ আছে। Lifeকে stake করে একটা কিছু করতে গিয়ে যদি মরেই যাই, তবে সে মরাই আমার সার্থক—ঘরে, বিছানায় শুয়ে রোগে ভুগে, সকলকে জ্বালিয়ে, নিজে জ্বলে মরায় কোন excitement নেই।"

কণিকা বলিল, "কি অদ্ভুত idea তোমার! আমি জীবনটাকে অত lightly নিতে পারি না।"

পৃথা বলিল—"জীবনটা lightly নয়তো আবার কি! কি হবে বসে বসে brood করে, আর চিন্তা করে? জীবনটাকে যত seriously নিবে, ততই মনে হবে চলে যাচ্ছি যেনো কোন অথর্ব্ব বার্দ্ধক্যের জরাজীর্ণ রাজ্যে। সব জিনিসকেই lightly নিতে চেষ্টা কর, দেখবে সময় তোমাকে ছুঁতে পারবে না। এই রকম তরুণ যৌবন নিয়েই একদিন হঠাৎ ঝরে পড়বে পৃথিবীর বুকে।"

সুরমা হাসিয়া বলিল—"Philosophy বলছিস না কি পৃথা?"

পৃথা বলিল—"নাঃ। ও সবের ধার ধারি না।

কণিকা বলিল—"মীরা, কথা বলছিস না কেনো ভাই?

মীরা এতক্ষণ চুপ করিয়াছিল, বলিল—তোমাদের কথাই শুনছিলুম,বেশ লাগছিল!"

কণিকা বলিল, "মীরা, তোমার idealকে কেমন লাগলে ভাই?"

মীরা লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল। সুরমা জিজ্ঞাসা করিল,—"কে মীরার ideal?"

কণিকা বলিল—"বিজয়, বিজয় দেশভক্ত বিজয় মুখার্জ্জি। মীরা একেবারে worohip করে তাকে।"

সুরমা বলিল—"ideal এর সঙ্গে সম্প্রতি দেখা হয়েছে না কি?"

কণিকা বলিল—"হয়েছে বই কি! আমার ওখানে আজকেই।"

পৃথা বলিল—"ভালো! ভালো! romance কি রকম চলছে?"

সুরমা জিজ্ঞাসা করিল—"engagement না কি?"

পৃথা বলিল—"এখন বিয়ে করোনা মীরা—আচ্ছা আর বলবো না—কেন বেচারীকে লজ্জা দিচ্ছ বলতো?—লজ্জা করোনা ভাই—যতই লজ্জা করবে ততই সকলে tease করবে।"

কণা বলিল—"তাই মীরার স্বদেশ-ভক্তি অনেকখানি জমে উঠেছে—সেদিন মিসেস নাগের পার্টিতে মীরা খুব এক চোট কোমর বেঁধে ঝগড়া করেছে দেশের জন্যে!"

মীরা বলিল—"কি যে তখন থেকে বাজে ব'কে যাচ্ছ কণিকা দি—কি জানি—যাও, আর কক্ষনো তোমার সঙ্গে কোথাও যাবো না।"

কণিকা মীরাকে আদর করিয়া বলিল—"আচ্ছা আর বলবো না রে—আজ চললুম অনেক বেলা হয়ে গেল। শনিবারের পৃথা Raceএ দৌড়তে যায় তো যাক্—তুমি কিন্তু এসো ভাই শীগ্‌গির—আর মিঃ বোসকেও বলে দিও—নিশ্চয় আসতে।"

মীরা ও কণিকা চলিয়া গেলে পৃথা বলিল,—"বৌদি ভাই সত্যি, আমি যেন মেয়েদের সঙ্গে কোন কথা বলবার খুঁজে পাই না—"

সুরমা প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে পৃথার দিকে চাহিল—"মানে?"

"মানে বেশীক্ষণ কথা বললেই সব subjectগুলো এক-ঘেয়ে হয়ে যায়। মেয়ে friend বা মেয়েদের কাছে most uninteresting মনে হয়। সব কথাগুলোই যেন ঐ একই দিকে turn নেয় শেষকালে—"

"তবে কি তোমার men friend ভাল লাগে?"

"সেই কথাটাই তো বলতে যাচ্ছিলুম। men friend-এর সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা ব'লে যাওনা, কখনই boring ব'লে মনে হবে না—অবশ্য boring men যথেষ্ট আছে—তবুও ওদেরও বোধ হয় সেই রকমই মনে হয় না? আমার মেয়ে friend একটীও নেই—বড় monotonous ওরা, তাই আমার ভাল লাগেনা।"

সুরমা হাসিয়া বলিল—"অমন কথা বলোনা পৃথা—লোকে বলবে তুমি একটী ভয়ানক খারাপ মেয়ে—"

"তা বলবে জানি, কিন্তু সত্যি বলছি—honestly; কথা বলতে বলতে আমি দেখেছি মেয়েদের ভিতর conversationগুলো একঘেয়ে হয়ে একেবারে থেমে ঝিমিয়ে যায়—সেখানে কিন্তু দু চার জন পুরুষ থাকলেই বেশ জ'মে ওঠে।"

"লোকে বলবে পৃথা তুমি একেবারে জাহান্নমে গেছ।"

"তা জানি, তা লোকের সামনে তো বলছি না। এ বলাটা কিন্তু লোকেরই দোষ। পুরুষদের সঙ্গে মেশা খারাপ, বা pure বন্ধুত্ব যেন তাদের সঙ্গে হ'তেই পারেনা এটাই ওদের ভুল ধারণা। আমার কত men friends আছে true and real."

"সেই passing show না passing fancy কি বলে-ছিলে, তা নয়তো?"

পৃথা হাসিয়া বলিল—"নাঃ—সে আলাদা। আর এরা বৌদি সত্যি আমার একেবারে friend সব সময়ে, অথচ in exchange কিছুই চায়না। এরা ভাইয়ের মত নয়, lover এর মত নয়, father, husband কিছুই নয় এরা, শুধু friend in the truest sense of the word."

সুরমা বলিল—"পৃথা মিঃ উইলিয়ামসের মেয়াদ ফুরোয়নি?"

"না বৌদি! দেখছি এখনো ফুরোয় নি।"

"একটু বলনা কাল কোথায় গেলে?"

পৃথা বেশ সপ্রতিভ ভাবেই বলিল—"ওঃ! মোটরে খুব লম্বা drive দিলুম, তার পরে dinner, dance ক'রে বাড়ী।"

"সে কি বললো?"

"ও সে অনেক কিছুই মামুলি কথা—"

"আর তুমি কি বললে?"

"আমি? শুধু বললুম শ্যামপ্যানের মাত্রাটা বোধ হয় বেশী হয়েছে, বাড়ী গিয়ে ঘুমিয়ে পড়গে।"

সুরমা হাসিয়া উঠিল।

পৃথা বলিল,—"জানো বৌদি? মাঝে মাঝে কাণ দুটো কতগুলো ঐরকম কথা শুনে বেশ তৃপ্তি পায়—"

সুরমা বলিল—"তবে বেচারাকে snub করলে কেন?"

"বেশী, অতিরিক্ত আবার ভাল লাগে না—"

"মিঃ মিটার এরে কি করবে?"

"কি? কিচ্ছু না—"

"যদি বিরক্ত হয়?"

"ও কিচ্ছু হবে না he is a good sport. সুনীল মনে করে,এ সব বাজে কথা ভাবার চেয়ে আরো পৃথিবাতে

অন্য ঢের কথা আছে যা ভাবলে নিজের ও পরের সকলের উপকার হবে। যাও বৌদি স্নান করগে।,'

"তুমি?"

"আমি এই বইটা শেষ করে যাচ্ছি।"

আট

পৃথা আসিবার পর হইতে সত্যই সুরমা কোন ভাবনাই মনে আনিতে পারিত না, কারণ পৃথার পুলকভরা জীবনের আনন্দ উচ্ছ্বাস তাহাকেও সব সময়ে সিঞ্চিত করিয়া রাখিত একটা মধুর সরসতায়। সে ভালো করিয়া ভাবিতে না ভাবিতে একটা কিছু বুঝিতে না বুঝিতে পৃথা তাহার সমস্ত ভাবনা একটা হাসির উচ্ছ্বাসে কোথায় ভাসাইয়া দেয়। তবুও অবসর সময়ে সে একবার ভাবিয়া লয়। সেদিনের রাজীবের কথায় সে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও ক্ষুন্ন হইয়াছিল, এক একবার ইচ্ছা হইত সব বাধা ভাঙ্গিয়া দিয়া, সব বাঁধ দূরে সরাইয়া দিয়া। রাজীবের সঙ্গে সে একটা বোঝাপড়া করিয়া লইবে, কিন্তু সে পারিতেছিল না। ভাল করিয়া স্থির করিবার পূর্ব্বে, পৃথার সাহচর্য্যে, বাহিরের আমোদ-প্রমোদে, সভাসমিতির কাজে সে এত ব্যস্ত হইয়া রহে যে একটা কিছু প্রকাশ করিবার পূর্ব্বেই অন্য আর একটা কিছু আসিয়া তাহাকে আর একদিকে লইয়া যায়। কিন্তু তবু তাহার যত রাগ, দুঃখ, মান, অভিমান জড়াইয়া ধরে রাজীবকে আশ্রয় করিয়া। মাঝে মাঝে সে তর্ক করে, ঝগড়া করে, ঐ এক কথাই লইয়া, একই রকমের তাহার যুক্তি, রাজীবের যুক্তি দিয়া তাহারা উভয়ে উভয়কেই দোষী করিয়া কথার পর কথা বলিয়া যায়, কিন্তু কোন সমস্যারই সমাধান হয় না, একটা অসমাপ্তির—অসম্পূর্ণতার ব্যথা লইয়া দুইজনেই সরিয়া যায়।

রাজীব তাহাকে আদর করে যত্ন করে মাঝে মাঝে সুরমার মনে হয়, একটু ভালবাসাও দেয় হয়তো বা। কিন্তু সে কি চাহে? সে নিজেকে নিজে জিজ্ঞাসা করে আরো কি চায় সে? সে তো সবই পাইতেছে আর কিছু অভাব তো তাহার নাই, তবে নিতান্ত লোভীর মত আরো চায় কেন সে? চাওয়ার কি তাহার অন্ত নাই? কিন্তু আবার ভাবিয়া দেখে পাওয়া তাহার কিছু হয় নাই তো—শুধু ভিক্ষা অথবা দাবী করিয়া লইয়াছে মাত্র কিন্তু সত্যিকারের পাওয়া পাইয়াছে মিনতি। তখনই তাহার সমস্ত মন জ্বলিয়া উঠে। তবু তাহার দিন কাটিতেছিল।

কয়েকদিন পরে সুনীল আসিল। সুনীল লোকটা পৃথার উপযুক্ত স্বামীই বটে। বিধাতা যেন অনেক আগে হইতে ভাবিয়া চিন্তিয়া দুই জনার গাঁটছড়া একত্রে বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন। তাহার কাজে, কথায় শরীরের বলিষ্ঠ দৃঢ় গঠনে। সর্ব্বদা একটা সুন্দর পুরুষোচিত ভাব ফুটিয়া উঠিত, তারও ভিতর একটা উদাস নির্লিপ্ত ভাব। তাহার ব্যক্তিত্বটীকে আরো সুস্পষ্ট করিয়া তুলিত। অর্থ সে যেমন কুড়াইয়া লইত, ঢালিয়াও দিত তেমনি তুচ্ছ ভাবে—পৃথার মত সেও সব জিনিষ হাল্কা ভাবে লইয়া হাসিয়া কাটাইয়া দিত। রাজীব হইতে সে বছর খানিকের বড় ছিল। সুরমা দেখিল পৃথা যাহা বলিয়াছে তাহা বর্ণে বর্ণে ঠিক। আরো সে আশ্চর্য্য হইয়া দেখিল সুনীলের ও পৃথার ভিতর ভলেবাসার বন্ধনটা খুব বেশী। তাহা লোক-দেখানো নয়, বা শুধু কর্ত্তব্য নয়—সেখানে ছিল একটা নিবিড় আন্তরিকতা, একটা গভীর সত্যের মধুরতা! সেইজন্য সুরমা ভাবিত, এত ভালবাসা পাইয়া, ভালবাসিয়া পৃথা কি করিয়া এতখানি উদাসীনভাবে এই লইয়া আলোচনা করে, লঘুভাবে হাসিয়া উড়াইয়া দেয় অন্তরের নিহিত গভীর ভাবগুলিকে।

পৃথা রোজ নিজের হাতে খাবার তৈয়ারী করিয়া স্বামীকে খাওয়ায়—যতক্ষণ বাড়ীতে থাকে কাছে কাছে ঘুরিয়া বেড়ায়। দুইজনে বসিয়া সাহিত্য, ইতিহাস, কবিতা, রাজনীতি আলোচনা করে, গল্প করে। চলিতে ফিরিতে, বসিতে শুইতে সামান্য এতটুকু অসুবিধা নিজের হাতে অপসারিত করিয়া দিতে চায়। সুনীলও সেই রকম উদাসীন ভাবে পৃথার সমস্ত সেবা যত্ন নির্ব্বিকার ভাবে গ্রহণ করে, সেও তাহার সুখ স্বচ্ছন্দতা, সুবিধা অসুবিধা সব দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখে, পৃথার সামান্য ইচ্ছা সে যেন আদেশ বলিয়া মানিয়া লয়। যখন তখন আদরে আদরে তাহাকে ভরিয়া দেয়। কেহ কাহারও কাছে দাবী করেনা, চায় না। কাহারও

কোন অনুযোগ নাই, অভিযোগও নাই। দুই জনেই যেন জানে ইহা তাহারা পাইবেই—এবং চিরকাল পাইয়া আসিয়াছে—ইহার ব্যতিক্রম হইতে পারে না—অন্যথা হইতে পারেনা। সুরমা তাহাদের দেখিয়া খুব কৌতুক বোধ করিত।—

একদিন সে পৃথাকে জিজ্ঞাসা করিল—"পৃথা! মিঃ উইলিয়ামসের মিয়াদ কতদুর?"

পৃথা হাসিয়া বলিল "আমি নিজেই অশ্চর্য্য হচ্ছি বৌদি, মেয়াদ এখনো শেষ হয়নি—"

সুরমা বলিল—"আচ্ছা—মিঃ মিটারকে তো যথেষ্ট ভালবাস তবু মিঃ উইলিয়ামসের সঙ্গে love এ পড়াটা কি রকম বুঝতে পারছি না।"

পৃথা একচোট খুব হাসিয়া বলিল—"বৌদি, সুনীলকে ভালবাসি একরকম, আর Harry হচ্ছে আলাদা। সুনীলকে খুব ভালবাসি, কিন্তু যখন সেটা serious হয়ে পড়ে, তখনই সে seriousness টাকে light করে নেবার জন্য flirt করি। তাতে সুনীলের দিকে আমি যেন নতুন করে attracted হয়ে পড়ি—সেই জন্যই তো—বুঝলে?"

সুরমা কৌতুক ভরে হাসিয়া বলিল—"কি জানি তোমার অদ্ভুত theory ভাই।"

পৃথা বলিল "যখন flirt করিনা বৌদি, তখন কি জানি কেন সুনীলেরও উপর একটা in different ভাব আসে। কিন্তু flirt করার সঙ্গে সঙ্গে সুনীলের উপর loveটা বেড়ে যায় দ্বিগুণ ভাবে।"

সুরমা বলিল—"আর সেও যদি সঙ্গে সঙ্গে flirt করে?"

"তা করুক না। সে তো ভালই। তাহলে বোধ হয় আমি আরো ভালবাসবো! যাকে কেউ চাইল না, যার জন্য কেউ care করলোনা সেই সকলের rejected জিনিষ নিয়ে মোটেই আমি proud হতে চাই না। সকলের desired জিনিসটাই আমি নিয়ে proud হয়ে সকলের envy কুড়িয়ে নিতে চাই—তুমি চাও না?

"কি জানি অত শত ভেবে দেখিনি, তবে আমার মনে হয়, আমি যাকে চাই, তাকে একাই চাই।"

"তোমার সঙ্গে আমার মিলবেনা বৌদি!

"সুনীল জানে না? তুমি যে এত flirt কর?"

"জানে হয়তো, সে আমাকে কখনো জিজ্ঞেস করেনা আমার কথা, আমিও কখনো তাকে জিগেস করিনা তার কথা—তবে বুঝলেও বুঝতে পারে হয়তো। যতটুকু সময় দেখা হয় বৌদি, সব সময়ে তো নিজেদের কথা বলেই কেটে যায়, অন্যের কথা বলবার আর time থাকে কই?"

সুনীল আসিবার পর সুরমা ছোট বাড়ী পৃথা ও সুনীলের জন্য ছাড়িয়া দিয়া তাহার পূর্ব্বের ঘরে গেল! এবং সেই জন্য রাজীবকে অনেক দিন পরে আবার নিকটে পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া উঠিল। রাজীব এক সমান ভাবে সুরমার উদ্দেশে ঢলিয়া দিতেছিল কোমলতা ও স্নেহমমতা, তাহার কঠোরতার আবরণের ভিতর দিয়া। সেই দিনের পর আর কিছুদিন সুরমাও মিনতির কথা বলে নাই। রাজীবের সঙ্গে সে হাসিয়া অন্য কথা বলিত, তাহার সেই ভাব দেখিয়া রাজীবও বুঝি তাহাকে অনেকখানি জড়াইয়া ধরিল। সুরমা তবুও মাঝে মাঝে ব্যথিত হইত। যে ক্ষতের বেদনা তাহাকে অনবরত তাহার ক্ষতের অস্তিত্ব স্মরণ করাইয়া দিতেছিল. সেই যন্ত্রণা সে নীরবে সহ্য করিয়াই যাইতেছিল রাজীবের স্নেহ ভালবাসা, কিন্তু যখনি সে তাহা ব্যক্ত করিতে চাহিতেছিল, তখনি রাজীবের দিক হইতে পাইতেছিল কঠিন আঘাত ও নির্ম্মম তিরস্কার। তাহার এই জীবন। এমনি করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে হইবে তাহাকে বিরাট একটা সমস্যা লইয়া। তাহার মর্ম্মের অনুযোগ চাপিয়া রাখিতে হইবে প্রাণপণে, শুধু পাইবার জন্য হয়তো জোর করিয়া লওয়া কাল্পনিক দান, অথচ সে দান ফিরাইয়া দিয়া সেই দাতার সামনে তাহার প্রাণের সমস্ত আক্ষেপ ঢালিয়া দিলে বিনিময়ে পাইবে শুধু সেই স্থির নিরপেক্ষ তাচ্ছিল্য। সে সুখী হইত যখন সে দেখিত রাজীবের সমস্ত শৈত্য গলিয়া পড়িয়াছে স্নেহের শতমুখী নদী হইয়া, ছোট প্রণবের উদ্দেশ্যে—কিন্তু তাহাতেও একটা আশঙ্কা তাহাকে সর্ব্বদা কাঁটার মত বিধিত নিষ্ঠুর

ভাবে। অন্তর তাহার বার বার বুঝি তাহাকে সতর্ক ইঙ্গিত করিয়া বলিত—হয়তো সন্তানস্নেহ তাহার নূতন নয়। সুরমা সেদিন ঘুমন্ত প্রণবের মুখের দিকে চাহিয়া একদৃষ্টে এই কথাই ভাবিতেছিল, এমন সময় সে খবর পাইল শরৎ আসিয়াছে। সে তাহাকে বসিতে বলিয়া নীচে নামিয়া গেল তাহার বসিবার ঘরে। বাড়ীতে তখন আর কেহ ছিলনা। শরৎকে সুরমা হাসিমুখে অভ্যর্থনা করিল।

শরৎকে সেদিন সে দেখিল পরিবর্ত্তিত, তাহার চির-কৌতুক হাস্যময় ভাবটা যেন কোনদিকে বাধা পাইয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়াছে। শরৎ বলিল "বাড়ীতে কেউ নেই বুঝি ?"

সুরমা বলিল—"না সকলে বেরিয়ে গেছেন বোধ হয়, কণা এলোনা ?

"না কণাও তার কোন বন্ধুর বাড়ীতে গেছে। আমি একা আসাতে কি অসন্তুষ্ট হ'লেন মিসেস বোস ?"

"না, অসন্তুষ্ট কেন হব ? তবে কণা এলোনা কেন সেই কথাই জিজ্ঞেস করছিলুম।"

সে এই partyর জন্য একটু ব্যস্ত হয়ে আছে। আমি আসি কেন মিসেস বোস জানেন ? আসতে ভাল লাগে ব'লেই।"

সুরমা একটু আসোয়াস্তি বোধ করিল, সে তাড়াতাড়ি একটু হাসিয়া বলিল—"আপনি কেন এসেছেন সে কথা তো জিজ্ঞেস করিনি মিঃ ঘোষ,—আপনারা আমাকে বন্ধুর মত দেখেন, স্নেহ করেন সেইজন্য আসেন, এ যে আমার সৌভাগ্য।"

"শুধু স্নেহ নয় মিসেস বোস আরো একটা কিছু,—আপনার জন্য প্রতিনিয়ত আমি অনুভব করছি, মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝতে পারছি—জানি আমি এসব বলা অন্যায়, তবু আজ না বলে থাকতে পারছি না।"

সুরমা অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া গেল। এ কি বলিতেছে তাহাকে কণিকার স্বামী,—সুখী, সৌভাগ্যবতী, সোহাগিনী কণিকার স্বামী,—যে কণিকা চায় পুরুষের সমকক্ষতা —যে কণিকা সাহস রাখে স্বামীকে শাসন করিয়া নিজের পদের প্রতিষ্ঠা। সুরমা প্রথমটা কিছু বলিতে পারিল না, তারপরে সে শান্তস্বরে বলিল—"মিঃ ঘোষ,আমার জন্য যদি আপনি এমন একটা কিছু অনুভব করে থাকেন যা অন্যায় বলে মনে করেন, তবে তা বলবেন না। এবং সে ভাবটাকেও মনে স্থান দেবেন না। অন্যায়কে প্রশ্রয় দিয়ে লাভ কি বলুন ? আর যে অন্যায়টা তদুপরি ফলদায়ক নয়।"

শরতের মুখে করুণ ভাব ফুটিয়া উঠিল—সে বলিল—"বুঝি মিসেস বোস—কিন্তু মানুষ জীবনে অনেকবারই এমন অবস্থায় পড়ে। যখন আর তার ন্যায় অন্যায় বিচার করবার জ্ঞান থাকে না।"

শরতের কাতরভাব দেখিয়া সুরমা একটু দুঃখিত হইল—সে বলিল—"আমি বড় দুঃখিত হলুম, মিঃ ঘোষ—কিন্তু আমি কি করতে পারি বলুন ? আপনি আমার জন্য মনে যে ভাব পোষণ ক'রে আছেন তা সফল ক'রে তুলবার আমার কোন উপায় নেই—তাহলে আমি কি করতে পারি বলুন !"

শরৎ হতাশ ভাবে বলিল—"না, কিছু করতে পারেন না, তা বুঝি—তবে বিনিময়ে আমাকে কি কিছুও দিতে পারেন না ? প্রাণের এতটুকু কোমলতা, হৃদয়ের এতটুকু চিন্তা—এটুকু আশা করতে পারি না কি আপনার কাছে ?"

সুরমা তাহার কথা বন্ধ করিবার জন্যই বলিল—"বেশ তো—এইটুকু নিয়ে যদি আপনি খুসী হন তবে আমার দিতে আপত্তি নেই—কিন্তু আর এ কথা আলোচনা না করাই ভাল।"

"সুখী হলুম—আর আমি যে আজ আপনাকে আমার প্রাণের ব্যথা নিবেদন করে দিতে পারলুম, এইটুকুই আমার সফলতা ব'লে ধরে নেবো চিরকাল। আশা করি আপনি কিছু মনে করেন নি ?"

সুরমা একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"না আমি কিছু মনে করিনি মিঃ ঘোষ—তবে একটু দুঃখিত হয়েছি এই যা।"

"কেন ? আপনাকে দুঃখ পাবার মত তো কোন কথা বলিনি—

"না সেজন্য নয়—তবে কণা আপনাকে বড্ড ভালবসো যে—সেইজন্য—"

"কণাকে তো আমিও ভালবাসি মিসেস বোস—তবে কি জানেন—অত শুষ্কতার ভিতর ভালবাসা, সব যেন শুকিয়ে যায়—কণা ঠিক ভালবাসতে চায় না—সে শাসন করতে চায়।"

"সে তো মনে করে সেটাই হচ্ছে আপনাদের চালিয়ে নেবার প্রকৃষ্ট উপায়।"

"ভুল করে সে—আমরা বলে নই—কিন্তু মেয়েদেরও কি মনে করেন শাসন করে কেউ কখনো চালিয়ে নিতে পেরেছে? তাতে তারা আরো চ'লে যায় শাসনের বাইরে—।" একটু থামিয়া আবার শরৎ বলিল—"তাহ'লে আপনি আমার কিছু অপরাধ হ'ল ব'লে ধরে নেবেন না—মিসেস বোস—এবং আবার আমাকে সেই আগের মতন বন্ধু ব'লেই গ্রহণ করবেন।"

"নিশ্চয়, কিন্তু সত্যি বলতে কি আপনার আগের ভাবটাই আমার ভাল লাগতো সব চেয়ে বেশী, সেই কৌতুক, সেই সরস হাসি, সেগুলোকে যেন অনেকখানি ম্লান ক'রে দিলেন আপনি আজ—তাহলেও আচ্ছা মিঃ ঘোষ—আমার বিষয় আপনি কি জানেন? সেদিন বলেছিলেন তারপরে আর জিজ্ঞাসা করবার অবসর পাইনি।"

শরত এতক্ষণে বাস্তব রাজ্যে ফিরিয়া আসিয়া বলিল—"হ্যা জানি, কিন্তু বললে আপনি দুঃখ পারেন—"

এমন সময়ে সশব্দে পৃথা ঘরে ঢুকিয়া শরতকে দেখিয়া একটু অপ্রতিভ হইয়া "I am sorry" বলিয়া চলিয়া যাইতেছিল। সুরমা বলিল—"দশ মিনিট ভাই, আস্‌ছি।"

পৃথা আর একবার শরতের দিকে দেখিয়া "right O!" বলিয়া চলিয়া গেল। সুরমা বলিল—"না, দুঃখিত হব না, আপনি বলুন।"

শরৎ বলিল—"কথাটা একটু delicate তা হ'লেও আপনি যখন জিজ্ঞেস করছেন তখন বলি—ব্যাপারটা ঠিক আপনাকে নিয়ে নয় কিন্তু মিঃ বোসকে নিয়ে, তা কথাটা একটু publicity পেয়েছে কিছুদিন থেকে।"

সুরমা নিজেকে একটু সংযত করিয়া লইয়া বলিল—"আপনি কোত্থেকে জানলেন? কণার কাছ থেকে কি?"

"না, কণা আর যাই হোক bad friend নয়, আমি বাইরে থেকে শুনেছি, আর লোকে যথেষ্ট নিন্দেও করছে, এর একটা প্রতিকার করবেন।"

সুরমা আরো আগে ঠিক এই কথাই কণিকার মুখে শুনিয়াছিল। সেদিন কণিকা বলিয়াছিল—"সুরো, আগে ভাবতুম কেউ জানেনা বুঝি—কিন্তু অনেকে জেনে ফেলেছে ভাই, মোটরেও সব বাজে লোক দেখা যায় মিঃ বোসের সঙ্গে—" আজ শরতও এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া এই কথা বলিতেছে। এ সত্যটা তাহার কাছে অসহ্য হইয়া উঠিতেছিল—সঙ্গে সঙ্গে সে মনে করিল এই প্রসঙ্গে সেদিন রাজীবের সঙ্গে বাক্‌বিতণ্ডার উত্তরগুলা। সুরমার কাণ দুইটী হঠাৎ গরম হইয়া উঠিল। ভিতর হইতে কে যেন আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল,—হউক যাহাই হউক তাহার কাণ যেন চির বধির হইয়া যায়—সে আর শুনিতে পারিতেছে না—এই জলন্ত সত্য—সে নিজেকে নিজে সান্ত্বনা দিয়া প্রতিবাদ করিয়া বলিল—"মিঃ ঘোষ, অনেক সময় লোকে মিথ্যেটাকে সত্যি ব'লে রটায়—অথবা সত্য এতটুকু থাকলেও তা অতিরঞ্জিত ক'রে তোলে। আপনি আমাদের স্নেহ করেন ব'লেই আপনার মনে হয়তো আঘাত লাগে, কিন্তু যখন কেউ আপনার কাছে এসে এই কথাগুলো বলবে, তখনি আপনার মনটাকে একেবারে নিরপেক্ষ ক'রে ফেলবেন, তাহলে আপনিও আর মিছামিছি অশান্তি ভোগ করবেন না। লোকে কত কি বলে ও সবে কাণ না দেওয়াই ভাল।"

শরত এ উত্তর আশা করে নাই, সে বলিল—"যাক্ আপনি এত বড় কথাটা যে boldly face করেছেন, এতে সুখী হলুম। একেবারে নিরপেক্ষ হ'য়ে সব সময়ে ব'সে থাকা যায় না মিসেস বোস্। যাহোক সত্য এর মূলে আছে এটা ঠিক, আপনারই কর্ত্তব্য এটা আপনি পারেন তো বারণ করবেন। সুরমা থাকিয়া থাকিয়া অন্যমনস্ক হইয়া পড়িতেছে দেখিয়া শরতও দু এক কথার পর বিদায় নিল।

একটু পরেই পৃথা ঘরে ঢুকিয়া অত্যন্ত হাসিতে লাগিল। সুরমার সমস্ত গাম্ভীর্য্য, বেদনা, চিন্তা কোথায়

সরিয়া গেল। সে বলিল—"কি যে সময় অসময়ে হাস পৃথা ভাল লাগে না যাও।"

পৃথা হাসিতে হাসিতে বলিল—"ও বৌদি। বড্ড disturb করেছি না?"

"যাঃ—কি বাজে বকছিস—disturb আবার কি?"

"Disturb বই কি! বৌদি। I can bet my life—ঐ old ninny তোমার কাছে নিশ্চয় love confess করছিল—না বৌদি? সত্যি বল ভাই, like a good sport." সুরমা হাসি চাপিয়া বলিল—"সত্যি পৃথা, তোমার সঙ্গে আমি পেরে উঠবো না, বেচারা ভদ্র লোককে কি যা তা বলছ? মোটেই সে সব নয়।"

পৃথা বলিল—"নয়? impossible বৌদি পুরুষরা love confess করবার আগে, অথবা পরে এক রকম peculiar মুখ বানায়, আমি খুব বুঝতে পারি। exactly সেই রকম expression দেখলুম ভদ্রলোকের মুখে—"

সুরমা একটু হাসিয়া বলিল—"তোমার খুব experience আছে দেখছি!"

"More or less, কিন্তু আমি তোমার মত অতক্ষণ ধ'রে ব'সে ঐ সব humbug শুনিনা—মুখের সেই অবস্থা দেখলেই nip in the bud ক'র ফেলি—উঃ। কি tedious তুমি এতক্ষণ ব'সে শুনলে বৌদি?"

সুরমা এবারে হাসি চাপিতে পারিল না—সে বলিল—"পৃথা যাও, এমনি ক'রে ভদ্রলোকের weakness নিয়ে হাসা উচিত নয়। Poor soul! ওর intention খারাপ ছিল না।"

ছোট্ট একটী শিস্ দিয়া তাচ্ছিল্য ভরে পৃথা বলিল—"Hang it—ওঠো বৌদি dress করবে।"

সুরমা অবাক হইয়া বলিল—"কোথায় যেতে হবে?"

"Cinema—Globeএ Last of Mrs Chaney আছে চমৎকার flim featuring Norma Shearer—একেবারে sensational—"সুরমার মৃদু আপত্তি টিকিল না—পৃথা তাহাকে লইয়া কাপড় পরাইয়া, নার্সকে আয়াকে বেবী সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া নীচে নামিয়া আসিয়া বলিল—"সুনীল বেচারা একলা আছে ওকে ডেকে আনি বৌদি—বোধ হয় dressed আছে—5 minutes ভাই'।

একটু পরেই সুনীলকে সঙ্গে আনিয়া পৃথা গাড়ীর হুকুম দিল। সুরমা কৌতুক ভরে পৃথার পাগলামি দেখিয়া মৃদু হাসিতেছিল। নয়টা বাজিয়া দশ মিনিট হইয়াছে—এমন সময় কে বলিল "ড্রাইভার নাই। সে জানে গাড়ী বাহির হইবে না, তাহাকে বলিয়া দেওয়া হয় নাই, সেইজন্য সে চলিয়া গিয়াছে।" পৃথা অত্যন্ত অস্থির হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"চাবি—চাবি—গাড়ীর চাবি—রেখে গেছে?—"

সহিস বলিল—"হাঁ জি।"

"Tnank God!" বলিয়া পৃথা চাবি লইয়া গ্যারেজ হইতে নিজে চালাইয়া প্রকাণ্ড "ক্যাডিলাক খানা বাহির করিয়া গাড়ী বারান্দার সামনে থামিয়া বলিল—"সুনীল please! আমার lisenceটা নিয়ে এসো darling! Run up! আমার drawerএ আছে।" সুনীল lisence আনিতে দৌড়াইয়া গেল। সুরমা বলিল—"আচ্ছা! এ কি কাণ্ড পৃথা! আজ নইলে কাল গেলেও তো হ'ত—'

পৃথা অসহিষ্ণু হইয়া বলিল—"আঃ বৌদি—তোমাদের life মোটেই নেই, তাতে হয়েছে কি? life—life—সর্ব্বদা—শুধু এগিয়ে যাবে, থামবে না—পিছু চাইবে না। এখন উঠে পড় ঐ যে সুনীল এসেছে—Thank you dear! তুমি আর বৌদি comfortably পেছনে বোস। গাড়ীতে থাকবার জন্য তো একজন চাই, "এই তুম আও", "বলিয়া একজন বেয়ারাকে পাশে বসাইয়া পৃথা গাড়ী ছাড়িল ৫০ মাইল বেগে। সুরমার সমস্ত বিষণ্ণতা, অবসাদ গাড়ীর উদ্দাম গতির সঙ্গে সঙ্গে কোথায় উড়িয়া উধাও হইয়া চলিয়া গেল।

সিনেমা দেখিয়া ফিরিবার পর পৃথা আস্তে আস্তে তিন চার বার গঙ্গার ধারে ঘুরিল, সারা পথ হাসিয়া গল্প করিয়া সে মাতাইয়া তুলিল—বলিল—"বৌদি life চাই, প্রাণ চাই, কি হবে ঘরের কোণে ব'সে ভেবে আর কেঁদে—ঐ ভালবাসা আর পচা পুরোণো সেকেলে নাকে কাঁদা—stagnationএ প'ড়ে থেকোনা বৌদি—শুধু look forward and march on—গত, বর্ত্তমানকে টেনে ছিঁড়ে,

ভেঙ্গে ফেলে দাও—শুধু সামনে চেয়ে দেখ ভবিষ্যতের দিকে। বেঁচে মরে থেকোনা বৌদি! কিন্তু ম'রেও বেঁচে থেকো—কি বল সুনীল?"

সুনীল সায় দিয়া বলিল—"নিশ্চয় পৃথা—life না থাকলে বেঁচে থেকে তো লাভ নেই—তোমাকে কতদিন বলেছি—মনে নেই তোমার?"

পৃথা একটু পিছন দিকে মাথা ঘুরাইয়া বলিল—"কি?"

সুরমা সভয়ে বলিল—"পৃথা দেখো, accident করবে।"

পৃথা হাসিয়া বলিল—"এত ভয় তোমার বৌদি? accident যদি হয়েই যায় তবে কি হবে—ম'রে যাবো আর কি—নয় একটা হাত পা ভাঙ্গবে—ব'য়ে গেছে।"

সুরমা বলিল—"রক্ষে কর ভাই, তোমার মত আমার অত শিগ্‌গির মরতে ইচ্ছে করে না আর এমন ক'রে—"

সুনীল বলিল—"পৃথা একটা dare devil—"

পৃথা বলিল—"এবারে বাড়ী ফিরবো? বৌদি?"

"চল—! শীত করছে বোধ হয় বৃষ্টির জন্য। পৃথা গাড়ীর মুখ ঘুরাইয়া বলিল—"বাড়ী—বাড়ীতে কেন কি জানি আমার বেশীক্ষণ থাকতে ভাল লাগেনা। ইচ্ছে করে রাতদিন এমনি ক'রে ঘুরে বেড়াই—"

সুরমা বলিল—"তোমার মাথা খারাপ আর কি!"

সুনীল হাসিল।

দুই তিন দিন পরে কণিকার "Party". সেদিন তাহার বাড়ীর পিছনের বাগানে ছোট ছোট টেবিল সাজাইয়া দেওয়া হইয়াছে। তার উপর চা, কেক্ ইত্যাদি পরিপাটী করিয়া রাখা হইয়াছে। বাদল-বেলার পড়ন্ত রোদটুকু বেশ মিষ্টি লাগিতেছিল! চারিদিকে থরে থরে ফুল ফুটিয়া গন্ধের ও রঙের মেলা মেলিয়াছে। সুরমা একটু আগে আসিয়াছিল সে টেবিলগুলা দেখিয়া বেড়াইতেছিল কোন কিছু ত্রুটি কোথাও আছে কি না! ক্রমে ক্রমে দুই একজন করিয়া নিমন্ত্রিতেরা আসিতে লাগিল। শরৎ নানা ছুতা করিয়া সুরমার কাছে কাছে ঘুরিতেছিল—"এবারে" সুরমা বলিল—"যান মিঃ ঘোষ, আপনার guestদের receive করুন গিয়ে।"

দেখিতে দেখিতে সমস্ত বাগানটী ভরিয়া উঠিল—নানা রঙে, সৌরভে, কথায়, হাসিতে! টেবিলের চারিদিক ঘিরিয়া সকলে বসিয়া পড়িল। কণিকা ব্যস্ত হইয়া সবদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল; সুরমা দেখিল, শরত তাহার দিকে আসিতেছে,—তাহাকে এড়াইবার জন্যই সুরমা কাছেই একটী টেবিলের কাছে কয়েকজন বসিয়াছিল, তাহাদের কাছে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল "আর একটু চা? আপনি নিন্ না।" সে দেখিল, তাহাদের একটু দূরে মীরা, করুণা, বীণা সকলেই বসিয়া আছে। তাহাকে দেখিয়া সকলে বলিল, "বোস, বোস এদিকে এসো সুরমা—জানো, মীরা যে ভয়ানক স্বদেশী হয়ে উঠেছে—"

"তাই নাকি মীরা?" বলিয়া সুরমা গিয়া বসিল।

মীরা সলজ্জ হাসিয়া বলিল—স্বদেশী টদেশী জানি না তবে আমার নিজের দেশকে ভয়ানক ভাল লাগে। তোমরা কিন্তু আমাকে যাই ভাবো না কেন, আমার অন্য দেশের ভালোটাও ভাল লাগে না।"

করুণা বলিল—"মীরা, তোমার Patriotism আমরা একবাক্যে প্রশংসা করি।"

মীরা বলিল—"ঠাট্টাই কর আর যাই কর আমার যা ভাল লাগে তাই বলি।"

বীণা বলিল—"কতদিন থেকে ভাই?"

মীরা জিজ্ঞাসা করিল "কি?"

"এই ভাল লাগাটা?"

করুণা বলিল—"এই যতদিন থেকে—বলবো মীরা?"

মীরা লজ্জিত হইয়া বলিল—"না ভালো হবে না, কিন্তু—যাও তোমরা অত্যন্ত ভয়ানক বিশ্রী রকমের বাজে লোক—" সকলে হাসিয়া উঠিল।

করুণা বলিল—"আগে কিন্তু মীরার জর্জ্জিয়েট না হ'লে চলতো না—আর এখন একেবারে—"

মীরা বলিল—"নিশ্চয়। সকলেরই এ সময় সাহায্য করা উচিত যে রকমে হোক্—"

"কিন্তু হঠাৎ—"

মীরা বলিল—"হঠাৎ হলে বা দোষ কি? যে মুহূর্ত্তে বুঝবো সেই মুহূর্ত্তে শুধরে নেবো—"

বীণা বলিল—"Bravo! মীরা!"

এমন সময় কণিকা সুরমাকে ডাকিল—"সুরো একটু এদিকে দেখে যা না ভাই—" সুরমা উঠিয়া চলিয়া গেল

সে দেখিল দূরে রাজীব কাহার সঙ্গে কথা বলিতেছে—আর শরৎ একলা দাঁড়াইয়া বোধ হয় তাহাকেই খুঁজিতেছে—সুরমা হাসিল।

কণিকা বলিল—"সুরো, বিজয় একটু তোর সঙ্গে কথা বলতে চায়—ঐ যে ঐ দিকে" কণিকা আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া চলিয়া গেল। সুরমা দেখিল একটী ছোট ফুলে ভরা ঝোপের সামনে বিজয় একটী টেবিলের সামনে একলা বসিয়া আছে! সুরমা কাছে গিয়া ডাকিল—"বিজয়—আমার সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছে?"

বিজয় হাসিমুখে বলিল—"হ্যাঁ সুরমা, বোস না একটু, তোমার অসুবিধা হবে না তো?"

সুরমা বসিয়া বলিল "না—কেমন আছ?"

"ভালোই—তুমি?"

"আমিও ভালো! কতদিন পরে দেখা বিজয়?"

"হ্যা অনেকদিন, সুরমা! চারিদিক থেকে তোমার প্রশংসা, তোমার কথা যত আমার কাণে আসতো, ততই গৌরবে আনন্দে আমি আত্মহারা হয়ে পড়তুম, কারণ আমার সব সময়ে মনে হ'ত সুরমা আমারই ছোট বেলার খেলার সাথী।"

সুরমা বলিল—"কিন্তু আমার প্রশংসা লোকে মিথ্যেই করেছে, ওসব আমার প্রাপ্য নয়। দেশভক্ত বিজয় মুখার্জ্জী যে আমারও খেলার সাথী সেটাও আমার পক্ষে কম গৌরবের কথা নয় বিজয়। যাক্ বিয়ে টিয়ে করেছ?'

"নাঃ এখনো সে রকম কোন ইচ্ছে হয়নি—"

"দেশসেবার বাধা হবে বলে?"

"না তাও নয়—বিয়ে করলে দেশসেবার বাধা কি? কিছু না—"

"তবে?"

"নাই বা শুনলে সুরমা?

"তোমার এ উদ্ভট সখ কবে থেকে হ'ল?"

"কোন্‌টা? বিয়ে না করাটা?—"

"না, এই দেশসেবাটা?"

"এটা সখ নয় সুরমা—এটা প্রয়োজনীয়, আর যদি সখই ধ'রে নাও তবে, দেশের যখন উদ্ভট অবস্থা হয় তখনই লোকের এ রকম উদ্ভট সখ এসে ঘাড়ে চাপে।"

"আশ্রম, টাশ্রম, মেলাই কি কি সব করেছ শুনেছি—"

"হ্যাঁ কিছু কিছু আছে—তুমিও তো কি একটা সমিতি করেছ না?"

"ও কিছু নয়—দেশসেবার জন্য নয়—নিজেকে জাহির করা—অথবা নিজেকে ভুলে থাকার জন্যই—"

"কারণ যাই হোক—তবু একটা সৎকাজ তো হচ্ছে—

সুরমা হাসিল; বলিল—"তা যাক্—আছ কোথায়?"

"আমার আছা-আছি কিছু নেই সুরমা। আমি সারা দেশ জুড়ে আছি। আমার মত সৃষ্টি ছাড়া লোকের কথা শুনে কি করবে? তোমার কথা বল, তোমার কথা শুনতেই ডেকেছিলুম তোমায়।"

"আমার কথা? আমি আছি আর কি! যেমন দেখছ! কি রকম আছি বলে মনে হয় বিজয়?"

"মনে হয় বেশ ভাল আছ!"

"তবে বেশ ভাল আছি—"

"সুরমা তুমি ভাল থাকো তোমাকে অন্তরের সঙ্গে আমি নিত্য আশীর্ব্বাদ করছি—তুমি ভালো থাকো—"

"আমাকে তুমি সেদিন দেখেই চিনেছিলে না? তোমাকে আমি প্রথমটা চিনতে পারিনি!"

বিজয় মৃদু হাসিয়া বলিল—"তোমার তো আমাকে চিনবার কথা নয় সুরমা!"

"কেন?"

"কারণ আমার অস্তিত্বটাই হয়তো তোমার মনে ছিল না, নয় কি? সত্যি বলতো সুরমা!"

সুরমা হাসিয়া বলিল—"হ্যাঁ তা কথাটা তাই বটে,তবে সেদিন কণিকার মুখে তোমার কথা শুনে মনে পড়ে গিয়েছিল।"

"আমার সৌভাগ্য, কিন্তু বিশ্বাস করবে কি? তুমি আমার স্মৃতির বাইরে কখনো যাও নি, একটী দিনের জন্যও না। বিশ্বাস হয় সুরমা?"

"হয়—" খানিক থামিয়া সুরমা বলিল—"আজকাল তোমার চেহারা খারাপ হয়ে গেছে বিজয়, আগে বেশ ছিলে!"

"চেহারা দিয়ে কি হবে—তুমিও তো অনেকটা [illegible]

রকম হয়ে গেছ—সকলেই বদলায় তবে কেউ বা ভিতরে আর কেউ বা বাইরে—"

"আমি কি বাইরে বদলে গেছি ?"

"না ভিতরে—"সুরমা কি বলিতে যাইতেছিল বিজয় হাসিয়া বলিল—"ভয় নেই সুরমা—কথাগুলো চাপা দিও না—আমি সে সব বলবো না—তোমাকে আমি এখনো সম্মান করি, শ্রদ্ধা করি, ভক্তি করি। কখনো দেখবে না আমাকে—আমি কখনো অনাবশ্যক অধিকার চেয়ে তোমার কাছে কিছু দাবী করবো না—আজ তুমি আমাকে মনে রাখ আর নাই রাখো, কথা বল আর নাই বল—দেখা কর আর নাই কর আমার কাছে কিছু আসে যায় না—কিন্তু তুমি আমার কাছে একদিন যা ছিলে ঠিক তেমনি থাকবে চিরকাল আমার কাছে। শুনলুম, একটী ছেলে হয়েছে না ?"

"হ্যা একদিন এসো না বিজয়, দেখবে প্রণব বড় সুন্দর হয়েছে—"

"সুন্দর না হবেই বা কেন ? তবে একবার দেখতে ইচ্ছে করে, কিন্তু সুরমা, তোমার স্বামীর সঙ্গে তো আমার আলাপ নেই।"

"বেশতো এক্ষুণি আলাপ করিয়ে দেবো—উনি এসেছেন বোধ হয়—যাবে ?

"থাক্ একটু পরে—"

"আচ্ছা বিজয়, মীরাকে চেনো ?"

"কে মীরা—? ও। মীরা গাঙ্গুলী—চিনি, তবে বেশীদিন নয়—"

"ওকে বিয়ে ক'রে ফেলো না—বেশ মেয়েটী ?"

বিজয় হাসিয়া বলিল—"ধন্যবাদ ! কিন্তু এখন বিয়ে করবার যে ইচ্ছে নেই, সুরমা—"

এমন সময় কাছেই সুরমা শুনিল—পৃথার স্বর, সে বলিতেছিল—"আজ Clenville কি চমৎকার win করেছে—ও: wonderful—" কয়েকজন পুরুষ সেখানে দাঁড়াইয়াছিল, পৃথারই পরিচিত একজন বলিল, "কিন্তু আমি ভেবেছিলুম "Night Jarই নেবে কারণ খুব ভাল start নিয়েছিল যে—"

পৃথা বলিল—"Night Jar কে শুধু try দিয়ে রেখে দেবে আমি জানি ও reserve থাকবে Viceroy's cup এর জন্য—

"আপনার কি রকম হ'ল আজ ?"

পৃথা বলিল—"আমার ? I have made something কিন্তু loss make up হয় নি —"

"আজ শুধু favourite গুলোই win করেছে—সেইজন্য বেশী কিছু কেউ করতে পারেনি—দর মোটেই ছিল না কোথাও—"

"আরে ! এই যে Ha—do—do—" বলিয়া পৃথা সরিয়া গেল। অন্যদিকে পৃথার গলা আবার শোনা গেল—"এখানে Bracket system নেই—Bombayতে ঐ একটা সুবিধা।"

বিজয় খানিকক্ষণ তাহাদের দিকে চাহিয়া সুরমাকে বলিল—"এই রকম মেয়েদের তোমার ভাল লাগে সুরমা ?"

সুরমা বলিল—"মন্দ কি ? ভাল না লাগবারও তো কোন কারণ দেখতে পাই না—"

বিজয় একটু গম্ভীর হইয়া বলিল—"আমার এদের দেখলে কি মনে হয় জানো ? ইচ্ছে করে সর্ব্বপ্রথম এদের নিয়ে একেবারে আমার আশ্রমে বন্ধ করে রাখি—"

সুরমা হাসিয়া বলিল—"আপাততঃ মনের ইচ্ছাটা মনেই থাক বিজয়—ও মহিলাটী আমার ননদ হয়—এসো আলাপ করিয়ে দি"—

বিজয় বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া বলিল—"তা হোন তিনি তোমার ননদ, অনেক ধন্যবাদ, কিন্তু আমার আলাপ করবার মোটেই ইচ্ছে নেই সুরমা।"

সুরমা হাসিয়া বলিল—"অতটা extremist নাইবা হ'লে—পৃথা খুব ভালো মেয়ে আলাপ ক'রে খুসী হবে।"

বিজয় বলিল—"তোমাদের এটিকেট বিরুদ্ধ হলেও আমি আপত্তি করছি সুরমা, কারণ এদের সঙ্গে আলাপ ক'রে আমি মোটেই নিজেকে আপ্যায়িত মনে করি না, তাছাড়া সেধে গিয়ে কারো সঙ্গে আলাপ করা আমার ভাল লাগে না।"

সুরমা অন্যদিকে চাহিয়া বলিল—' তোমার কষ্ট করতে হ'ল না—পৃথা এদিকে আসছে !"

সুরমা বিজয়ের দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিল—"কেক্-টেক্ কিছু খেলে না যে ?"

বিজয় একটু ব্যঙ্গভরে হাসিয়া বলিল—"কেক্-টেক্ ও গুলো, এ নাড়ীতে সহ্য হয় না সুরমা—"

সুরমা এ কথার মর্ম্ম বুঝিয়াও বলিল—'কেন ? Dyspepsia আছে নাকি ?"

বিজয় বলিল—"হ্যাঁ,—কিন্তু পেটে নয় মনে—"

একটু দূর হইতে পৃথা ডাকিল—"বৌদি ওখানে ব'সে কি করছ—আর আমি খুঁজে খুঁজে একেবারে dead tired—" পৃথা কাছে আসিয়া বিজয়কে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে সুমার দিকে চাহিল—

সুরমা বলিল—"ইনি মিঃ বিজয় মুখার্জ্জি আমার friend—আর ইনি মিসেস্ সুনীল রায় চৌধুরী—" বিজয় নমস্কার করিল, পৃথাও নমস্কার করিয়া বলিল—"আপনার নাম শুনেছি"—

বিজয় বলিল—"আমার সৌভাগ্য"—

পৃথা তাড়াতাড়ি বলিল—"এই বৌদির কাছেই"—

"আরো বেশী সৌভাগ্য। মিসেস্ রায় চৌধুরী"—

পৃথা সুরমার দিকে ফিরিয়া বলিল—"বৌদি সকলে ঘরে যাচ্ছে—আমি চল্লুম—"

সুরমা বলিল—"দাঁড়াও পৃথা, একসঙ্গে যাই—বিজয় চল"—

বিজয় বলিল—"না, আর এক জায়গায় এখুনি যেতে হচ্ছে—তুমি কণিকাকে আমার হ'য়ে বলে দিও সুরমা।"

সুরমা বলিল—"আচ্ছা—কিন্তু আমার ওখানে এসো"—

বিজয় যাইতে যাইতে বলিল—"ঠিক বলতে পারলুম না দেখবো।" বিজয় চলিয়া গেল।

পৃথা বলিল—খুব comfy little tete-a-tete enjoy করছিলে না বৌদি ?"

সুরমা বলিল—"পৃথা এর মুখের অবস্থা দেখে কি মনে হ'ল ? love confession নয় তো ?"

পৃথা হাসিয়া বলিল—"না বৌদি, তবে love suppression মনে হ'ল—anyhow তবু লোকটা sensible—but what a dress !'

যাইতে যাইতে পৃথা বলিল—"বৌদি! আজ দাদার গাড়ীতে একটা trampকে দেখলুম—ওকে? তুমি জানো ?"

সুরমা বুঝিতে পারিয়াছিল সে কে—সে বলিল—"ঠিক যে জানিনা তা নয়, তবে যা একটু জানি, তা এই"—

সুরমা সমস্ত বলিল। পৃথা শুনিয়া ভ্রূ দুইটী টানিয়া বলিল—"ছি! এই সব nasty লোকদের আমি দু চোক্ষে দেখতে পারি না—most shocking যাগ্‌গে—আজ race এ বেশ gain হ'ল"—

"তাহলে তো loss অনেকটা উঠে গেছে ?"

"নাঃ তাও হ'ল না।"

"কেন ?"

পৃথা বেশ হাল্কা ভাবে বলিল—"Harryর একটা businessএ lately বড় loss হয়ে গেছে, বেচারা তার fianceeকে engagement ring দেবে বলে একটা সুন্দর আংটী choose ক'রে রেখেছিল তা বুঝতে পারছ একটু short পড়েছিল, আমি Harryকে আমার সব race gain দিয়ে এসেছি।"

সুরমা একটু অবাক হইয়া পৃথার মুখের দিকে চাহিয়া—বলিল—"তবে যে বললে Harryর সঙ্গে loveএ পড়েছ ?"

"পড়েছি তো—এখনো প'ড়েই আছি।"

'তবে Harryর fiancee ছিল ?"

"না lately হয়েছিল"—

"তুমি জানতে ?"

"হ্যাঁ—তাতে কি ? একটু flirt করলো ব'লে কি বেচারা বিয়ে করবে না ? আর একবার love করলে যে চিরকাল করতে হবে তারও কোন মানে নেই যদ্দিন love থাকে থাকবে—না থাকে ফুরিয়ে গেল—there is nothing to be sorry about or fuss about,"

"তা তার বিয়ের পর তো আর মিশতে পারবে না।"

"না—আর মিশবো না—আজ good-bye ক'রে এসেছি"—

সুরমা বলিল—"শীগ্‌গিরই তাহলে আবার আর একজনার loveএ পড়েছ ?"

"হয়তো বা পড়তেও পারি বৌদি"—বলিয়া পৃথা হাসিয়া উঠিল।

কণিকার ড্রইংরুমে সকলে বসিয়াছে। কয়েকজন একদিকে "ব্রিজ" খেলা পাতিয়াছে। কে একজন অরগ্যান বাজাইয়া গান গাহিতেছিল। সুরমা চারিদিকে চোখ ঘুরাইয়া দেখিল রাজীব নাই। কণিকা তাহাদের দেখিয়া কাছে আসিয়া বলিল—"এতক্ষণ বাইরে ছিলে বুঝি তোমরা? আর আমি এদিকে বেজায় রাগ করে বসে আছি—আমাকে না ব'লে চলে গেলে ব'লে।"

পৃথা এক ব্রিজপার্টির সহিত মিশিয়া গেল। তখন ঘরে গান গল্প খেলা খুব জমিয়া উঠিয়াছে—সুরমার একটু পরে ভাল লাগিল না, সে পৃথাকে জিজ্ঞাসা করিল—"পৃথা বাড়ী যাবে?"

পৃথা তখন সজোরে ডাকিতেছিল "4 No Trumps" সুরমা আস্তে আস্তে বারাণ্ডায় গিয়া দাঁড়াইল। ঘরের ভিতর গরম বোধ হইতেছিল, বাহিরের খোলা হাওয়াটী তাহাকে যেন আদর করিয়া তাহার মুখে হাত বুলাইয়া দিল। হঠাৎ ও পাশে কাহার পায়ের শব্দে সে চাহিয়া দেখিল শরৎ আসিতেছে। তাহাকে দেখিয়াই শরৎ থামিয়া বলিল—"মিসেস বোস—আপনি! এখানে যে?"

সুরমা বলিল—"ঘরে ভিতর ভাল লাগছিল না তাই —এখানে বেশ লাগছে।"

শরৎ বলিল—"একটা চেয়ার এনে দি বসবেন?"

"না, ধন্যবাদ মিঃ ঘোষ আমি বসবো না। অনেকক্ষণ বসেছি।"

কিন্তু শরৎ শুনিল না, সে অন্য ঘর হইতে একটী চেয়ার লইয়া আসিয়া সুরমাকে বসিতে অনুরোধ করিল। সুরমা একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল—"না থাক্ বসবো না, আমি ঘরেই যাই।"

শরৎ অত্যন্ত বিনীত ভাবে বলিল—"একটু ব'সে যান মিসেস বোস—"

সুরমা শরতের মুখের ভাব দেখিয়া বসিল, একটু মায়াও হইল। শরৎ পরম আপ্যায়িত হইয়া বলিল— "মিসেস বোস্, সেদিন আমার কথায় আশা করি বিরক্ত হন নি?"

"আপনাকে আমার কত কি বলতে ইচ্ছে করে কিন্তু ভাষা খুঁজে পাই না। যদি কিছু বলে ফেলি তবে রাগ করবেন না তো?"

সুরমা মৃদু হাসিয়া বলিল—"যদি তাই সন্দেহ হয় তবে বলবেন না। অন্য কথা বলুন।"

"আপনাকে দেখলে অন্যকথা মনে আসে না।"

"তবে বলবেন না"—

"না বললেও একটা অতৃপ্তি, অশান্তি আসে যে"—

"তবে আর কি বলবো বলুন!"

শরৎ বলিল—"মিসেস বোস—কেন যে আমার আপনার সঙ্গে মিশতে, কথা বলতে এতো ভালো লাগে আমি তা ভেবে পাই না"—

আর কিছু না হউক সুরমা শরতের কথা শুনিয়া অত্যন্ত আমোদ অনুভব করিত, সে বলিল—"যদি কণিকা জানে যে আমার সঙ্গে আপনার কথা বলতে এতো ভাল লাগে তবে—?"

শরত ক্ষণিকের জন্য একটু চুপ করিয়া বলিল— "তবে?" তারপরে সে সুরমার দিকে এমন ভাবে চাহিল যে সুরমা হাসি চাপিতে পারিল না। ঠিক এই সময়ে কণিকা উঁকি মারিয়া সরিয়া গেল।

সুরমা হঠাৎ কণিকাকে দেখিয়া একটু সঙ্কোচ বোধ করিল। কারণ সে জানিত যে কণিকা এই ব্যাপারটা সামান্য বলিয়া পৃথার মতন হাসিয়া উড়াইয়া দিবেনা। আর শরৎ! মুহূর্ত্তে যেন সে চারিদিক অন্ধকার দেখিল। সে খানিকক্ষণ হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল—। সুরমা হাসিয়া বলিল,—"বিপদকে এমনি করে ডেকে আনলেন? এখন আপনার উপায়?"

শরৎ শুষ্কস্বরে বলিল—"হ্যাঁ সত্যি কণা বড্ড রাগ করবে।"

সুরমা একটু অন্যমনস্ক ভাবে বলিল—"রাগ? হ্যাঁ। তা কণা করবে বোধহয়।—আপনি যান।" শরৎ বিনা বাক্য ব্যয়ে সুবোধ শিশুর মত সেখান হইতে তৎক্ষণাৎ সরিয়া গেল। সুরমা আরো খানিকক্ষণ সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিল—তাহার মনে মনে একটু ক্ষোভ হইল। অনাবশ্যক

ভাবে বন্ধুর সঙ্গে একটা মনান্তর হইয়া যাইবে কি? এময় সময় পৃথা ডাকিল—"বৌদ বাড়ী যাবেনা? কি করছিলে এতক্ষণ এখানে?"

"সুরমা ফিরিয়া বলিল কিছুনা চল।"

৯

কয়েকদিন হইতে পৃথার বেড়াইবার মাত্রাটা আরো বাড়িয়া গিয়াছে। সে সারাদিনের ভিতর বাড়ীতে খুব কমই থাকে। এমন কি কোন কোনদিন সে সারাদিন ঘুরিয়া সন্ধ্যা বেলা বাড়ীতে আসিয়া কাপড় বদলাইয়া আবার বাহিরে গাড়ী লইয়া উধাও হয়। সুরমাকেও সে টানিয়া লইয়া যায় প্রায়। সেও কয়েক-দিন হইতে একটু বেশী করিয়া ঘুরিতেছিল পৃথার সঙ্গে, কিন্তু তাহাকে শীগ্‌গির বাড়ী ফিরিতে হইত প্রণবের জন্য। তাছাড়া সুরমার অত বেশী বেড়াইবার সখও ছিলনা কোনদিন। সে পৃথাকে জিজ্ঞাসা করে "অত বেড়াও কি ক'রে পৃথা? খাওয়ার ঠিক নাই, নাওয়ার ঠিক নেই, রাত দিন আছ—হৈ হৈ করছ—এতো পারো—

পৃথা স্বাভাবিক তাচ্ছিল্য ভরে বলে—"নাওয়ার খাওয়ার আমার time নেই বৌদি—? আছে বৈকি! আমার টাইমে আমি চলি। তোমাদের timeএ চলিনা এই আর কি!"

"সারাদিন বেড়াও কোথায়—?'

"বেড়াই কি আর সাধে? দেখো সকালে একচোট friends দের visit করতে বেড়োই। breakfast এর ডাকও আছে প্রায়—তার উপর lunch, tea, card গুলো তো আমি নিজে চেয়ে আনিনা—বুঝলে তো? তারপরে সন্ধ্যেটুকু cinema dinner, dance তবু বাড়ী আসতে হয়, ছেলেদের জন্য, সুনীলের জন্য—কেমন আসি না? আরো sweet বৌদির জন্য—সন্ধ্যেবেলা লোকজন আসে সেই জন্য।

"তা না হ'লে তোমার মতলব কি বলতো? বাড়ী একেবারেই আসতে না—না?

"না তা নয়—তা আসতুম নিশ্চয়। কিন্তু হয়তো আরো কম—। দেখো এসে অবধি তো তোমাকে nurse করলুম, এখন আমার duty over. তাই বেড়াই—"

সুনীল বেশ নির্ব্বিকার ভাবে দেখে আর চুপ করিয়া একটি বই হাতে লইয়া সিগারেট আর চুরুটের শ্রাদ্ধ করে। রাজীব তাহার সেই পুরনো চাল লইয়া ঠিক সেই ভাবেই চলে। তাহার ধীর স্থির ভাব বজায় রাখিয়া সে ঠিক সেই ভাবেই বেড়ায়। বাড়ী আসিয়া নিজের কাজকর্ম্ম দেখে আর অধিকাংশ সময় কাটায় library তে। পৃথাতো ২৪ ঘণ্টার ভিতর বারো ঘণ্টা মোটরেই কাটায়। সুরমা কিছু সময় বেড়াইয়া আর বাকি সময় প্রণবকে লইয়া কাটাইয়া দেয়। তাহার নিত্য নূতন খেলা, নূতন করিয়া শেখা হাসি, অবোধ্য কাকলি, তাহাকে নিত্য নূতন আনন্দে ভরিয়া দিতেছিল। রাজীবও তাহার খেলা দেখিতে ভালবাসে। মাঝে মাঝে সেও হয়তো সুরমার সঙ্গে পাশাপাশি তাহার ছোট্ট খাটের পাশে দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে তাহার খেলা দেখিয়া আনন্দিত হইয়া উঠে। একদিন সে রাজীবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল "প্রণবকে তুমি ভাল বাস না?

রাজীব এ অদ্ভুত প্রশ্নের উত্তরে খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিয়াছিল "সুরমা তোমার এ প্রশ্নের উত্তর দিয়ে আমি নিজেকে নীচু করবোনা—তুমি তোমায় নিজেকেই জিজ্ঞেস কর—উত্তর পাবে।"

কয়েকদিন হইতে সুরমার মনটা একটু খারাপ হইয়া ছিল। কণিকা যে সেই ঘটনার পরে রাগ করিয়াছিল তাহা ঠিক। কারণ সে কয়েকদিন আর সুরমার এখানে আসে নাই—ইতিমধ্যে একদিন এক মিটিংএ তাহার সহিত দেখা হইয়াছিল, সেদিনও সে ভাল করিয়া কথা বলে নাই। শরতের উপর সুরমার একটু মায়া হইল। তাহার দুর্ব্বল মন লইয়া সে কণিকার কর্ত্তৃত্বের ভার ঠেলিয়া সরাইয়া দিতে পারিতেছিল না। এবং সেই ভারের চাপে সে বুঝি একেবারে আড়ষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। এই বুঝি তাহার মুক্ত হইবার উদ্যম! তাহার হাসিও পাইল—বেচারা শরৎ সে যদি নিজেকে এতটা বিনীত ও হাস্যাস্পদ করিয়া না তুলিত তাহা হইলে নিজের স্ত্রী না হইলেও হয়তো এমন

কাহাকেও খুঁজিয়া পাইত যে হয়তো তাহার অন্তরের ভাব উপলব্ধি করিতে পারিত! কণিকাকে সে প্রথমে ভাবিয়াছিল সুখী। এবং কণিকাও নিজেকে তাহাই ভাবে—কিন্তু এ কি রকম সুখ! স্বামীকে ক্ষণে ক্ষণে হারাইয়া ফেলিবার উদ্বেগ ও আশঙ্কা সর্ব্বদাই যে তাহাকে চিন্তিত করিয়া তুলিত। কিন্তু পৃথা ভাল বাসিয়া, ভালবাসা পাইয়া হাসিয়া খেলিয়া দিন কাটাইতেছে নিশ্চিন্তে। কতটুকু সার্থকতা সে খুঁজিয়া পায় তাহার জীবনে, কতটুকু বাঁচিয়া থাকিবার আনন্দ ও তৃপ্তি? এবং কতটুকু কণিকা পায় তাহা সে ভাবিয়া পাইল না। আর সে! নিজে? সেও কি কণিকার মত স্বামীর উপর চায় কর্তৃত্ব, না সে তো তাহা চায়না। কিন্তু পৃথার মতনও তো হইতে পারেনা সে! নির্ব্বিকার নির্লিপ্ত ভাবে সে বলিয়া যায় "ও আছে থাকনা বৌদি সুনীলেরও একজন ছিল। but I did not mind her—অবশ্য এখন নেই।" কিন্তু সুরমা ভাবিল সুনীলের সেই her হইতে এ যেন অনেক ভিন্ন। রাজীব বলে, তাহার জীবনমরণের সম্পর্কে সে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এ যে সহ্য করা একেবারে অসম্ভব। ইহাকে হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়া দুষ্কর! পৃথাকে সে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, যদি সে এই অবস্থায় পড়িত তাহা হইলে কি করিত? পৃথা তাহাতে হাসিয়াই উত্তর দিয়াছিল "কিছুনা—যেমন আছি এই রকমই থাকতুম—ও সব trifling affair নিয়ে বৌদি I don't bother my head.

সুরমা ভাবিল—পৃথার মত কেন তাহারও মন হইল না—কিন্তু সত্যিকারের সুখ কি পৃথার মত মন লইয়াই পাওয়া যায়? কে জানে সুখ-দুঃখের এ প্রহেলিকা কে কোনদিন উদ্ভেদ করিয়া প্রকাশ করিয়া ধরিবে জগতের সম্মুখে—? পৃথাও কি ক্রমান্বয়ে নিজেকে নিজে ফাঁকি দিয়া চলিতেছে? কে জানে?

সুনীলকে সুরমার খুব ভাল লাগিল। সুনীলও অবসর সময়ে মাঝে মাঝে সুরমার কাছে বসিয়া অনেক গল্প করিত, তাহার কথাগুলি সরসতায় ভরা—আবার যখন সে গম্ভীর হইয়া কোন বিষয় আলোচনা করিত তখন মনে হইত বুঝি সে কত জানে—তাহার জ্ঞানের ভাণ্ডার বুঝি অসীম। সে কখনো কাহারো কথায় থাকেনা। কখনো কাহারো নিন্দা করেনা। সন্তানদের উপর অত্যধিক স্নেহ এবং স্ত্রীর উপর সমধিক ভালবাসা, অথচ কথায় কাজে একটা নিরপেক্ষ দৃঢ়তা তাহার ভিতর একটা অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ফুটাইয়া তুলিত।

কণিকা একরকম সুরমার সঙ্গ ছাড়িয়া দিল। তাহার এ ভাব সুরমার ভালো লাগিল না, একটু রাগও হইল। বিনা কারণে সে তাহাকে অপরাধী মনে করিল, আর এই সঙ্কীর্ণ মন লইয়া সে আসিয়াছিল বন্ধুত্ব করিতে? সে মনে মনে ভাবিল, এমন লোকের সঙ্গে না মিশাই ভাল। পৃথাকে সে বলিয়াছিল—সব শুনিয়া সে বলিল—"wonder of wonders বৌদি—ঐ tedious looking লোকের জন্য এত fuss? Dash it! ব'য়ে গেছে—তুমি be at peace আমি হ'লে কি করতুম জানো? যদিও নিজের patienceএর উপর ভয়ানক strain পড়তো—তবু আমি ঐ লোকটার সঙ্গে flirt করে ওকে খুব tease করতুম।"

"make up করি গিয়ে পৃথা কি বল?"

"Never বৌদি—তাহলে ভাববে সত্যিই বুঝি তুমি guilty—"

খুব একটা ঝড় বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। বিকালবেলা বৃষ্টির জলে স্নান করিয়া মাঠ গাছ পালা সবুজ হইয়া ধূলাবালি ছাড়িয়া হাসিয়া উঠিয়াছে। প্রণবকে লইয়া অনেকক্ষণ আপনাআপনি কথা বলিয়া বলিয়া সুরমা ক্লান্ত হইয়া উঠিল, বলিল—"আর তোমার সঙ্গে কথা বলবো না আমি, তুমি কথা বলতে পারো না—বুড়ো ছেলে শুধু হুঁ হাঁ—বু—উ—উ আর হাত পা ছোঁড়া—চল পিসির কাছে—প্রণবকে কোলে তুলিয়া লইয়া সুরমা ছোট বাড়ীতে গিয়া দেখিল—বসিবার ঘরে বড় একটা কোচে সুনীল আধ-শোয়া ভাবে হেলান দিয়া বসিয়া আছে—হাতে একখানি বই। আর পৃথা সুনীলের বুকে মাথা রাখিয়া হেলান দিয়া ঐ একই বই পড়িতেছে। সুরমা সরিয়া যাইতেছিল—পৃথা ও সুনীল দুই জনেই ডাকিল—"বৌদি এসো না।" পৃথা বলিল—"চলে যাবার মত কিছু নয় বৌদি, দুজনেই একটা বই নিয়ে খানিকক্ষণ ঝগড়া করে

শেষে এই termএ peace করলুম। বোস না ভাই আরে প্রণব বাবু এসেছে রে—এসো এসো—" বলিয়া পৃথা প্রণবকে কোলে তুলিয়া লইল। সুরমা বলিল—"পৃথা আজ মোটর ছেড়ে—একেবারে বুকে যে? পৃথা বলিল—"আজ ইচ্ছে হ'ল ভাই—সুনীলের কাছে থাকি।" সুনীল বলিল,—"বৌদি, আমি পরশু দিন চলে যাচ্ছি—"

"কেন?"

"আর কেন—? এতদিন রইলুম—তাছাড়া কাজ আছে, কতগুলো wire এসেছে managerএর কাছ থেকে যেতে হবে—"

"তাহলে পৃথা থাক্—"

সুনীল বলিল—"বেশতো থাক না—"

পৃথা বলিল—"না সুনীল, কলকাতাটা বড্ড monotonous লাগছে—এক জায়গায় থাকতে পারি না বেশী-দিন, জানোই তো—" সুরমা জিজ্ঞাসা করিল—"তাহলে তুমিও পরশু দিন যাচ্ছ?"

"না, সুনীল আগে যাক্ আমি কয়েক দিন পরেই follow করবো—"

সুনীল বলিল—"পৃথা তিন মাসের বেশী একজায়গায় থাকে না—প্রায় তো আছেই on tour—আমি আশ্চর্য্য হই এখানে সে সমানে এতদিন রইল কি করে? শেষে ওর শরীর খারাপ হয়ে যাবে—"

পৃথা স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিল—"O darling !—

সুরমা বলিল—"তাহলে প্রণবের অন্নপ্রাশন ceremony তে আসবে না তোমরা? এই তো আর মাস তিনেক পরেই—"

পৃথা সোৎসাহে বলিল—"certainly আসবো—শুনছি তো রাধানগরে [illegible]।"

সুরমা বলিল—"হাঁ—কিন্তু তোমরা না থাকলে পৃথা সত্যি আমি একটুও enjoy করবো না!"

পৃথা বলিল—"surely আসবো ভাই, সুনীল তুমি? কখনো তো যাওনি রাধানগরে—জঙ্গল হলেও fine place lots of shooting—hunting, riding wild life হাতীগুলো আছে তো?"

সুরমা বলিল—"আছে তো—আমি বিয়ের পর এক-মাত্র গিয়েছি—"

পৃথা বলিল—"elephant ride ওঃ তুমি enjoy করবে সুনীল। সেই সময়ে আসবো বৌদি—সুনীলও আসবে—আসবে না? সুনীল সস্নেহে পৃথার দিকে চাহিয়া হাসিল মাত্র! পৃথা প্রণবকে সুনীলের কোলের উপর রাখিয়া কোচ হইতে লাফাইয়া নামিল বলিল—"last days in calcutta বৌদি, it must sit on its legs, firpo dance—

তোমায় যেতে হবে, তুমি সুনীল, আর দাদাকেও আজ নিয়ে যাবো।"

সুরমা বলিল—"উনি তো যান বোধ হয় মাঝে মাঝে। পৃথা বলিল—"সে তো একলা, আজ আমাদের সঙ্গে যেতে হবে।"

সুরমা বলিল—"বেশ তো—আজ খুব enjoy করা যাবে। ওটা কি বই?

সুনীল বলিল—"All Quiet on the Western Front চমৎকার তুমি পড়েছ?"

সুরমা বলিল—"চমৎকার, পড়েছি—পৃথিবীতে কেন যে লোকে যুদ্ধ করে—এত বড় নৃশংসতা, এতটা inhuman জিনিষ এখনো সভ্য জগত অবাধে ক'রে যাচ্ছে মেনে নিচ্ছে এটাই সব চেয়ে আশ্চর্য্য।"

সুনীল বলিল "যুদ্ধ করাটাই হচ্ছে মানুষের animality—barbarityর চিহ্ন। ইতিহাসে দেখোনা—আদিম মানুষগুলোর chief occupationই ছিল যুদ্ধ—animal গুলো দেখো এক সঙ্গে হ'লেই ঝগড়া না করে থাকতে পারে না—? সেই রকম মানুষও এখনো সেই primitive instinct of animalityকে ঝেড়ে ফেলে দিতে পারে নি—যতই garb of civilisation তারা পরুক না কেন ঐ satisfaction of eternal greed তাদের এখনো আছে পুরোমাত্রায়—"

সুরমা বলিল—"আশা করি শিগগিরই world peace হয়ে যাবে, League of Nation হয়ে বড় কিছু এগোয় নি, কিন্তু—"

সুনীল বলিল,—"কি করে এগোবে—যতদিন এই greed of power থাকবে—যতদিন একজাতি চাইবে অন্য জাতির উপর predominate করতে ততদিন হবে না—"

পৃথা বলিল—"আমার কিন্তু warটা খুব ভাল লাগে। চুপচাপ বসে থাকা—খাওয়া ঘুমোনো আর ফুর্তি করা আমার যেন বড় একঘেয়ে লাগে, আজ যদি world peace declared হয়, তা'হলে আমার পৃথিবীর লোকেদের উপর অর্দ্ধেক regard কমে যাবে। warটা কি রকম exciting, interesting, কেমন একটা ওলোট পালোট করে প্রলয়ের মহঝড়ের মত ব'য়ে যায় একটা জাতির উপর দিয়ে, দেশের উপর দিয়ে—একঘেয়ে পৃথিবীটাকে বদলে দিয়ে যায়—History, Geography, science কে উল্টে দিয়ে একটা তুমুল কাণ্ড করে দিয়ে চলে যায়—একটা মস্ত বড় বলশালী দৈত্যের মত। war না থাকলে সুনীল পৃথিবীর মানুষগুলো একেবারে যাকে ব'লে showing dolls হয়ে পড়বে—heroism বলে কোন জিনিষই থাকবে না—

সুরমা বলিল—"পড়লে তো পৃথা এক্ষুণি—war হয় বড়য় বড়য় আর মাঝখান থেকে কতগুলো innocent গরীব বেচারা মশা মাছির মত মরে, যারা হয়তো কোন কিছুতে কোন দিক দিয়েই লাভবান হয় না, হয়তো war মানে কি, অথবা কিসের জন্য war হয়, তাই জানে না।"

পৃথা বলিল—"এটা তো inevitable, বৌদি এটা তো হবেই। অত কিছু ভাবতে গেলে চলে? চলে না, বড় একটা কিছু পেতে হ'লে petty অনেক কিছুই sacrifice করতে হয় সব কিছুতেই—কি বড়, কি ছোট। আর যেটাকে greed বলছো animality বলছো—সেটাই হচ্ছে movement of life তবু একটা motion বোঝা যায়—মানুষ বড় থেকে আরো বড় হ'তে চায়—এটাই ওদেরকে নিয়ে যাচ্ছে নতুন হ'তে আরো নতুনের পথে—তাদের চোখের সামনে খুলে দিয়েছ কত scienceএর অনাবিষ্কৃত অদ্ভুত রহস্য—এই যে একটা search, এই যে একটা marching on—এই যে একটা জাতিকে risk ক'রে, একটা জাতির প্রতিষ্ঠা এইটাই আমার বড্ড ভাল লাগে। আর peace, stagnation, তাতে আর কিছু না—তাতেই ধ্বংস হবে সব তিলে তিলে। মরণ তো আসবেই—যতই কর মরণকে রোধ করতে পারবে না কেউ—তাহলে আর কেন—এগিয়ে চল। যাক্—যত বাজে কথা তুললে—এখন যাই দাদাকে জিজ্ঞেস ক'রে আসি কি বল? নতুন Fox Trot তোমার practice আছে তো?"

সুরমা বলিল—"আছে—"

পৃথা বলিল—"Right O! সুনীল তো up to date সব জানে—কিন্তু ওখানে lady friendsদের নিয়ে, he is always up on his heels,—he is a darling!"

সুনীল হাসিয়া বলিল—"এখানে আমি অনেক বেশী লোককে জানিনা—, আচ্ছা পৃথা programmeটা ঠিক ক'রে ফেলি—আজ তো dance এই time যাবে—তাহলে কাল সকালে একবার shoppingএ যাবো—তুমি আমার সঙ্গে আসবে childrenদের নিয়ে? তার পরে lunchএ যাবো বাইরে—রাত্রের programme তুমি settle করো—"

"With pleasure" বলিয়া পৃথা বাহির হইয়া গেল।

সুনীল বলিল—"আজ আমার সঙ্গে 5 rounds দিতে হবে তোমাকে—"

সুরমা বলিল,—"ইস্—5 rounds! অত কি? না—"

সুনীল বলিল—"না? কি? that wo'nt do, I must. আমি সকলের সামনে তোমাকে drag ক'রে নিয়ে যাবো—"

সুরমা হাসিয়া বলিল—"যাও, সুনীল absurd কথা বলোনা—"

সুনীল খানিকক্ষণ সুরমার দিকে চাহিয়া বলিল—"বৌদি, তোমাকে দেখলে কি মনে হয় জানো?"

"কি?"

মনে হয় তুমি একটা white crystal—আর ইচ্ছে হয় একটা glass caseএর ভিতর বন্ধ করে তোমাকে আমার ঘরে রেখে দি।"

সুরমা বলিল—রক্ষে কর সুনীল, তোমার ঘরে show caseএ ব'সে থাকতে আমার মোটেই ইচ্ছে নেই, পৃথাকে রাখো না কেন?"

সুনীল হাসিয়া বলিল"না,—পৃথা show caseএ রাখবার মত নয়, পৃথা মেঘের মত মুক্ত—লঘু, চঞ্চল—সুন্দর

খাঁচায় ধরে রাখবার মত সে নয়—তাকে নেচে, গেয়ে, হেসে খেলে বেড়াতে দেখেই আমার সুখ—"

"আর আমি বুঝি বন্ধ করে রাখবার মত ?"

"তুমি—তুমি শুধু eternal music of love গাইবার মত, তুমি একটা যেন fountain of bliss—শুধু সেখানে যেন একটা পাথর চেপে রেখেছে কে, কেউ যদি তা একটুখানি সরিয়ে দিতে পারে,তা'হলে দেখবে তুমি create করবে—, an ocean of joy, love and ecstacy"

সুরমা হাসিয়া বলিল—"পৃথাও তো পারে ?"

"পৃথাও পারে, পৃথা একটা brook, gay, jolly, cheerful—সে জীবনের বাধা বিঘ্নের পাথরগুলো অতিক্রম করে লাফিয়ে লাফিয়ে চলে যায় কেউ তার গতি রোধ করতে পারে না সে হেসেই চলে—গেয়েই চলে যায়,—আর তুমি—তুমি হচ্ছ the deep blue fathomless Pacific."

সুরমা শুধু হাসিল কিছু বলিল না, সে জানিত সুনীল তাহাকে কোন রকম লঘু প্রেমোক্তি করে নাই—তাহার মনে সে ভাবও নাই—তবে সে তাহাকে ভালবাসিত, ভালবাসিত খুব—সে ভালবাসা মাঝে মাঝে সুরমা হয়তো বুঝিতে পারিত—তাহা তাহারই অন্তরের মত গভীর, অতলস্পর্শী, সে প্রতিদান চাহে না—শুধু স্থির, সহিষ্ণু প্রতীক্ষায় মুখের দিকে চাহিয়া থাকে—মাত্র।

সুরমা বলিল—"যাই বল, আমি তোমার সঙ্গে অত rounds মোটেই দেবো না—"

সুনীল হাসিয়া বলিল—"বেশ কোন roundই দিওনা, —একদিন হয়তো নিজেই এসে বলবে—সুনীল may I have a round with you—'

সুরমা বলিল—"ইস্—তা বই কি !"

পৃথা আসিয়া বলিল—"সুনীল—দাদা বলেছে join করবে—তাছাড়া দাদাও ওখানেই dinnerএ যাচ্ছিল with a friend of his—তা'হলে please ring up—for three dinners.—

সুনীল বলিল—"দেখো পৃথা বৌদির কি অন্যায়, আমি পাঁচটা dance চাইলুম, কিন্তু পেলুম refusal."

পৃথা সুরমার দিকে চাহিয়া বলিল—"Oh ! what a shame ! বৌদি, আমার সুনীলকে এমন ক'রে reject ক'রে, আমাকে hurt করো না, আচ্ছা সুনীল, I will put it all right."

সুনীল মৃদু হাসিয়া বলিল—"না জোর ক'রে আমি কারো কাছ থেকে কিছু নিতে চাই না।"

পৃথাও হাসিয়া বলিল—"সত্যি, সুনীল, ও জোর করে নেওয়ায় কিছু charm নেই।"

সুরমা বলিল,—"আচ্ছা দেখা যাবে, সুনীল, সে সময়ে, যদি I feel like it."

সুরমা ঘুমন্ত প্রণবকে কোলে তুলিয়া লইয়া চলিয়া গেল।

সন্ধ্যা সাতটার সময় সুরমা তাহার "ড্রেসিং রুমে" প্রকাণ্ড আয়নাটার সামনে একটা নীচু কুশন চেয়ারে বসিয়াছিল, একটু শ্রান্ত ভাবে। কিসের একটা অবসাদ, কিসের একটা শূন্যতা তাহাকে যেন শত আনন্দের মাঝখানে হঠাৎ বিষণ্ণ করিয়া তুলিত—বিশেষতঃ কোন একটা আনন্দ সমাগমের পূর্ব্বে অথবা পরে! সে পাশেই ছোট একটী টেবিলের উপর সাজানো একগুচ্ছ গোলাপের দিকে চাহিয়া চোখ ফিরাইয়া লইল। "ওয়াড্রোবের" উপর রাজীবের একটী ছবি সেইদিকে একবারে চাহিল, থরে থরে সাজানো বিলাসের নানা উপকরণ সেণ্ট—পাউডার, লোশন—ক্রিম স্নো। ওদিকে বড় বড় আলমারী—একটী আধখোলা—ভিতরে ঝুলানো লম্বা দামী ক্লোক্,—ওদিকে সাজানো অন্ততঃ কুড়ি জোড়া নানা রঙের জুতা—হঠাৎ যেন সুরমা ইহাদের কোন সার্থকতা খুঁজিয়া পাইলনা.—সবই যেন তাহার কাছে ব্যর্থ মনে হইতেছিল!—বাহির হইতে কে ধীরে করাঘাত করিল—সুরমা বলিল—"কে ? এসো !"

দরজা খুলিয়া প্রবেশ করিল রাজীব—কালো ইভনিং সুটে তাহাকে অতি সুন্দর দেখাইতেছিল। সে বলিল —"সুরমা, আমি আগে যাচ্ছি—আমার friend এর ওখানে—তোমরা আসছ তো ?

সুরমা বলিল "হ্যাঁ।—পৃথা, সুনীল আর আমি যাচ্ছি, তুমি dance করবে ?

রাজীব মৃদু হাসিয়া বলিল— "কেন? তাতেও তোমার jealousy হবে নাকি?

সুরমা দৃষ্টি নত করিয়া বলিল—"বয়ে গেছে jealousy হ'তে, ওমনি জিজ্ঞেস করছিলুম, jealousy, রাগ, ওসবের সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে ফেলেছি।

"রাজীব সুরমার চেয়ারের হাতের উপর বসিয়া বলিল "খুব বুদ্ধির কাজ করেছ সুরমা। দেখতো কেমন সুখে আছি কিছুদিন থেকে, আর তুমিও নিশ্চয় শান্তিতে আছ—বল অস্বীকার করোনা।"

সুরমা মুখ সরাইয়া বলিল—"ভারী তো শান্তি। এ আবার একটা শান্তি না কি? জোর করে চেপে রাখি মনের কথা গুলো এই যা!

রাজীব জোর করিয়া তাহার মুখ ঘুরাইয়া তুলিয়া ধরিয়া স্থির দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ চাহিয়া বলিল—"সুরমা এখনো তুমি একেবারে একটী kiddy আছে! মনের ভিতর কি চেপে রাখবে? কিছুই তো চেপে রাখবার নেই তবে!"

সজোরে মুখ ছাড়াইয়া লইয়া সুরমা বলিল "নেই বুঝি! তুমি কি জানো!

"জানি সুরমা, কিছু নেই। যা আছে তা ঐ পচা পুরোনো কথা। সেই বিয়ের আগে থেকে জানা কথা—নতুন আর কিছু আছে বল!"

"পুরোনো হ'লে বুঝি ওটা বিষ হ'লনা! ছুরী হ'লনা!

অত কঠিন ভাবে "নেই বা বল্‌লে! আর বেশী কথা নয়, কাল আলোচনা করা যাবে, এখন তুমি তাড়াতাড়ি dress করে নাও, আমি যাই নইলে late হব। cheer up" বলিয়া রাজীব সুরমার মুখটা দুই হাতে তুলিয়া ধরিয়া ছাড়িয়া দিয়া বাহির হইয়া গেল।

ক্রমশঃ

তৃণমঞ্জরী

শ্রীকালিদাস রায়

(১)

এসেছে ঋতুরাজ তাহারে দিয়ে লাজ
অতীত স্মরি কেন বিমুখ কর।
দ্বিগুণ করি তার উৎসবাধিকার
ভবনে শুধু কেন জীবনে বর'।

(২)

প্রকাশে হয় না প্রণয়ের মাপ
বাড়ায় না তায় প্রতিদান।
গুপ্ত রহুক ব্যক্ত রহুক
সমানই তাহার পরিমাণ।

(৩)

আপন পাওনা পেতে বড় সুখ
ঋণে বড় লাজ বেদনা আনে।
সব চেয়ে আমি দানেরে ডরাই
দান মোর প্রাণে বাণই হানে।

(৪)

জগতে আছে পাপ দুঃখ ক্লেশ তাপ
বেশ ত দ্বিগুণিত মহান্ হ'ব।
ধর্ম্মে করি' ভয় পাপেরে করি জয়
দুখেরে সুখ মনে করিয়া লব।

(৫)

নদী হ্রদে বারি যত কর পান
আবার তৃষ্ণা জাগিয়া উঠে।
উৎসে এসরে বৎস হেথায়
চিরদিন তরে পিপাসা টুটে।

(৬)

(অনুবাদ)

তোমার আমার মধ্যে সখি কিছুই মেলেনা
আমার যাহা নাই ঠিক তাই তোমার দেখি আছে।
তাই ত সখি তোমায় ছাড়া আমার চলে না
তোমার সাথে মিলে জীবন পূর্ণ হয়ে বাঁচে।

(৭)

এটা কি কম দয়া যাবে না সবে
বিশ্ব ছেড়ে প্রভু আমার সনে।
আমিই যাব একা সবাই রবে
আমিও থেকে যাব তাদের মনে।

সাহিত্য-প্রসঙ্গ

শ্রী [illegible] দাস রায়

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

কবিই রসগুরু

এইখানেই কাব্যের সহিত আমদের জীবনের প্রকৃত যোগ। কাব্য যদি অন্যান্য ভোগ্যপদার্থের ন্যায় আমাদের ক্ষণকালের উপভোগ্য মাত্র হইত,—যদি তাহা আমাদের দৃষ্টি,মনোবৃত্তি ও চিন্তার প্রকৃতির এরূপ পরিবর্ত্তন না ঘটাইত—তাহা হইলে উহার সহিত আমাদের জীবনের অন্তরঙ্গ যোগ ঘটিতে পারিত না। রসিকমাত্রেই জানেন,—কবির কাব্যের সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি ও রসবৃষ্টি কিরূপে জীবনের চিরসঙ্গী,—চির-সঙ্গী কেন—অঙ্গীভূত হইয়াই যায়।

শুধু ব্যক্তিগত জীবন কেন—জাতীয় জীবনের দৃষ্টি, চিন্তা ও আদর্শের কতটা অংশ কবির কাব্যের দান, তাহা কেহ বিশ্লেষণ করিয়া দেখে নাই। বিশ্বমানবের জীবনের গতি, প্রকৃতি ও রসবিদগ্ধতা কতটা যুগযুগান্তরের কাব্য-পরম্পরার দ্বারা পরিকল্পিত—তাহার পরিমাণ কে নির্দ্দেশ করিতেছে?

কবির কাব্য রসিকের বিশ্বকে ও রসিকের জীবনকে নূতন করিয়া গড়িয়া দেয়—অন্ততঃ নূতন সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত করে। তাহার সমর্থনে রসিকের সাক্ষ্যই এখানে তুলি—

নবশ্রীরূপ সঞ্চারিলে জীবলোকের জীবন ভরি,
নূতন ক'র গড়লে ভুবন পুন মনোলোভন করি'।
কুব্জা হলো অজবিভা অহল্যা তার তুল্‌ল গ্রীবা,
উর্ব্বশীরে মুক্তি দিলে, বল্লীজীবন মোচন করি।

কলির প্রাণে নবীন গন্ধ অলির গানে ছন্দ নব,
মেঘের মুখে মন্ত্র নবীন অর্পিল আনন্দ নব।
অমীরিত অনেক বাণী অঝঙ্কৃত অনেক গানই
শুনালে মূক জড়ের মুখে, সম্ভবিল অসম্ভবও।

নূতন নূতন দ্বার বাতায়ন খুল্‌লে তুমি গগন গায়ে,
সনাতনী ব্রাহ্মী বাণী আবার শুনি গহন ছায়ে।
মর্ম্মে পেলাম কল্পশ্রুতি অতীন্দ্রিয় অনুভূতি,
নূতন নূতন ইন্দ্রিয়দের ফুটালে এই মনের কায়ে।
অনাদৃত হীন হেয় যা নয়নে তাও লাগল ভালো,
জীর্ণ কুঁড়ের ছিদ্রগুলোও ঝর্ণা হয়ে ঢাল্‌ল আলো।
ইন্দ্রধনুর কান্তরাগে তোমার তুলির টানটি জাগে,
তোমার চরণাঙ্ক লভি তৃণাঙ্কুরও মন ভুলালো।

কবি নিজেই কল্পিত কবির মুখ দিয়া একথা বলিয়াছেন—

ধরণীর শ্যাম করপুটখানি ভরি দিব আমি সেই গীত আনি
বাতাসে মিশায়ে দিব এক বাণী মধুর অর্থভরা।
নবীন আষাঢ়ে রচি নবমায়া এঁকে দিয়ে যাব ঘনতর ছায়া
ক'রে দিয়ে যাব বসন্ত-কায়া বাসন্তী বাসপরা।
ধরণীর তলে গগনের গায় সাগরের জলে, অরণ্য ছায়
আরেকটু-খানি নবীন আভায় রঙীন করিয়া দিব।
সংসার মাঝে দুইএকটি সুর রেখে দিয়ে যাব করিয়া মধুর
দুয়েকটি কাঁটা করি দিব দূর তারপরে ছুটি নিব।
সুখহাসি আরো হবে উজ্জ্বল সুন্দর হবে নয়নের জল,
স্নেহসুধামাখা বাস গৃহতল আরো আপনার হবে,
প্রেয়সী নারীর নয়নে অধরে আর একটু মধু দিয়ে যাব ভরে,
আর একটু স্নেহ শিশুমুখ'পরে শিশিরের মত র'বে।

এই ভয়েই ধর্ম্মগুরু কবিকে বলেন—

সর্ব্বনাশ করিতেছ তুমি
আরো রমণীয় করি তুলি এই মায়া-রঙ্গ-ভূমি,
ধরার মৃন্ময় পাত্রে ঢালি নিত্য মদিরা-মাধুরী।
নব মধু সঞ্চারিয়া জীবনের রন্ধ্রগুলি পুরি,

নিসর্গের অঙ্গে অঙ্গে দিয়া নব নব অলঙ্কার
করি লোভনীয় তায় নাশো। ইষ্ট মানব আত্মার
নানাছলে। যায় ভুলে,— হবে তারে ফিরিতে স্ববাসে
মেষ বানাবার মন্ত্র বেশ জানো ধরার প্রবাসে।
নূতন মাধুরীরস বিতরিয়া রমণীর প্রেমে
রজতে করিলে রক্ত সুরভি করিলে তুমি হেমে
প্রিয়তর করে তুলি অবিদ্যার অনিত্য অসারে,
বিমোহ ঘনালে শুধু মায়ামুগ্ধ এ স্বপ্ন-সংসারে
একথা ভেবেছ ভুলে? নরনেত্রে রসাঞ্জনী তুলী
বুলায়ে ভুলায়ে তারে মোহ পাশে রাখিবে আগুলি?
ভুলে গেলে সব ছেড়ে যেতে হবে মৃত্যুর আহ্বানে
বেদনা বাড়ালে শুধু হায় মহাযাত্রীর প্রয়াণে।

কবি উত্তর দিবেন—

জীবনেরে করেছি মধুর
মরণে মধুরতর করেছি যে তাহা-ত ঠাকুর,
দেখিলে না? মরণের রুদ্র দর্প ত্রস্ত বিভীষিকা
হাড়মাল বাঘছাল ললাটের জলদর্চ্চিশিখা
একে একে সব তার হেসে হেসে করেছি হরণ
তাহারে বরের বেশে সাজায়েছি, পুষ্প আভরণ
পরায়েছি অঙ্গে তার। অনন্তের ডাকে সগৌরবে
মৃত্যু তরিবার মন্ত্র শিখায়েছি শঙ্কিত মানবে।
জীবনপথের যাত্রা মধুময় করেছি যদিও
অনন্ত পথের যাত্রা করিয়াছি আরো স্পৃহণীয়,
যাত্রীর অঞ্চলপ্রান্তে সন্তর্পণে দিয়া যে বাঁধিয়া
আনন্দ পাথেয় ধন। অনন্তের সম্বল না দিয়া
বাড়াইনি জীবনের উপভোগ্য রসের বৈভব,
জীবনে দিয়াছি হর্ষ মরণেরে দিয়াছি গৌরব,
সগৌরবে মহোৎসবে মোরি পিছে অমৃত-সন্ধানে,—
ভয় নাই হে ঠাকুর,—যাবে এরা অনন্তের পানে।

কবি ও উপভোক্তা

প্রাচীন কাব্য যে অনেক সময় আদর পায় না, তাহার কারণ সর্ব্বত্রই কাব্যের অপকৃষ্টতা নহে। প্রাচীন কবি যে সমাজের বা যে যুগের প্রতিনিধি, যে সমাজ বা যে যুগের পাঠকগণের রুচি প্রকৃতি, প্রবৃত্তি বা মনোভাবের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বা সামঞ্জস্য সাধন করিয়া প্রাচীন কাব্য রচিত—সেই সমাজ বা সেই যুগের সহিত বর্ত্তমান সমাজ বা যুগের মানসিক ও ব্যাবহারিক মিলই নাই। তাই প্রাচীন কাব্যের আবেদনে আমাদের হৃদয় সাড়া দেয় না। যে পাঠক শিক্ষাদীক্ষা, অনুশীলন ও কল্পনা শক্তির প্রয়োগের দ্বারা প্রাচীন কবির সমসাময়িক যুগ ও সমাজের অন্তরের পরিচয় লাভ করিতে পারেন—আপনাকে কল্পনাবলে অক্লেশে অনায়াসে প্রাচীনযুগ ও সমাজের পরিবেষ্টনীর মধ্যে স্বচ্ছন্দে উপনিবিষ্ট করিতে পারেন, তিনি প্রাচীন কাব্যের রসও উপভোগ করিতে পারেন। বিনা 'কালচারে' বা সামান্য 'কালচারে' বর্ত্তমান সাহিত্যের রস উপভোগ কতকটা সম্ভবে,—প্রকৃষ্ট কালচার ব্যতীত প্রাচীন সাহিত্যের রস উপভোগ সম্ভব নয়।

তবে যদি কোন প্রাচীন কবি,—মানুষের যে মনোবৃত্তি, যে ধর্ম্মরুচি, যে সৌন্দর্য্যবুদ্ধি সর্ব্বযুগে সর্ব্বদেশে চিরন্তন,—তাহার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া কাব্যরচনা করিয়া থাকেন,—যদি তিনি মহামানবের ও সর্ব্বকালের প্রতিনিধি হইয়া অর্থাৎ দেশকালাতীত ভাবলোকে বসিয়া কাব্য রচনা করিয়া থাকেন, তবে তাঁহার কাব্য সর্ব্বযুগে সর্ব্বকালেই সমান উপভোগ্য।

ঠিক এই শ্রেণীর কাব্যের কথায় কবিগুরু বলিয়াছেন—

মেঘমন্দ্র শ্লোক
বিশ্বের বিরহী যত সকলের শোক,
রাখিয়াছে আপনার অন্ধকার স্তরে
সঘন সঙ্গীত মাঝে পুঞ্জীভূত ক'রে।

এই শ্রেণীর কবির কথা বাদ দিলে আমাদের দুইটি কথা মনে হয়। কবির অন্তরে যে ভাব বা অনুভূতি প্রকাশ মাগিতেছে,—সে ভাব বা অনুভূতি কবির একার নহে। কবি যে সমাজে বা যে যুগে জন্মিয়াছেন সে সমাজে বা সে যুগের সকলের মনেই ভাববিশেষ বা অনুভূতি বিশেষ অস্ফুট, অর্দ্ধস্ফুট বা স্ফুট-ভাবে বর্ত্তমান, বীজনিহিত, অঙ্কুরিত, পল্লবিত বা পুষ্পিত। তাহা প্রত্যেক অন্তরেই রূপে সার্থকতা লাভ করিতে চাহিতেছে, কেবল কবির অন্তরে

সম্পূর্ণ পরিপুষ্টতা লাভ করিয়া কাব্য রূপ ধরে। কারণ,—"কবির চিত্তেই ভাবনাগুলি পুরাপুরি ভাব হইয়া উঠিতে পারে এমন রস, এমন তেজ আছে।"

ঐ ভাব বা অনুভূতি অন্য সকলের অন্তরেও প্রকাশ মাগে, কিন্তু সৃজন-শক্তির অভাবে অন্যে তাহাকে রূপদান করিতে পারে না। কেবল কবিই তাহাকে রূপদান করিতে পারেন।

তাই রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—"ঐ ভাব বা অনুভূতি কবির একার নহে।" একার নয় বলিয়াই রক্ষা। কেবল কবির মনেই যদি ঐসকল ভাব বা অনুভূতির জন্ম হইত—তাহা হইলে কবির কাব্য সমসাময়িক স্বদেশবাসীদেরও উপভোগ্য হইত না।

কবির মনে যদি এমন কোন ভাব বা অনুভূতির উদয় হয়—যাহা সমসাময়িক জনগণের মনে উদয় হয় নাই—তবে কবি তাহাকে কাব্যে রূপদান করেন না। —কবি জানেন যে তাহা কোন প্রাণে সাড়া জাগাইবে না। কবি যদি ঐ ভাব বা অনুভূতিকে সকলের মনে সঞ্চারিত করিতে চাহেন—তবে তিনি আগে তাহা অন্য ভাবে প্রচার করিয়া মনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিবেন, পরে কাব্যলক্ষ্মীকে প্রেরণ করিবেন। অনেক কবি এই জন্যই গদ্যও লিখিয়াছেন। গদ্যরচনার দ্বারা প্রথমে নিজস্ব বিশিষ্ট ও স্বতন্ত্র চিন্তা ও অনুভূতির প্রেরণা পাঠকগণের মনে সঞ্চারিত করিয়া, হয়ত কিছুকাল অপেক্ষা করিয়া ঐগুলিকে কাব্যে রূপদান করেন—নতুবা পাঠকগণ বলিবে—"তুমি কে বিদেশিনী, তোমাকে ত চিনিলাম না।"

কবি চিরদিনই তাই তাঁহার ভক্তগণের বাধ্য। ভক্তগণের রুচিপ্রবৃত্তি ও চিন্তানুভূতির সহিত আপোষ করিয়াই তিনি কাব্য সৃষ্টি করেন,—নিজের অনুভূতি ও চিন্তার সহিত সবার অনুভূতি ও চিন্তার সন্ধি করিয়া —প্রয়োজন হইলে সেগুলিকে তাহাদের বশম্বদ করিয়া তুলিয়া তবে কাব্যাকার দান করেন। কারণ কবি জানেন—

"একটী গায়কের নহেত গান গাহিতে হ'বে দুইজনে।
গাহিবে একজন ছাড়িয়া গলা আর একজন গাবে মনে।
তটের বুকে লাগে জলের ঢেউ তবে-ত কলতান উঠে
বাতাসে বনসভা শিহরি কাঁপে তবে-ত মর্ম্মর ফুটে।"

কবি যতই গর্ব্বভরে বলুন—কালোহহ্যয়ং নিরবধিঃ বিপুলা চ পৃথ্বী, তিনি কিছুতেই কাব্যে সে বাণী ধ্বনিত করিতে পারেন না—যাহা চারিপাশের প্রাণেও প্রতিধ্বনিত হইবে না। যিনি একথা বলিয়াছিলেন—তিনি জানিতেন, তাঁহার চারিপাশে—সমানধর্ম্মারাই বিরাজ করিতেছে। তাহা না করিলে ঐ উক্তি বড়ই অশোভন হইত।

কবির কাব্য অর্দ্ধসৃষ্টি—সমানধর্ম্মা পাঠকের মনের দ্বারাই সে সৃষ্টি সম্পূর্ণ। যে কাব্যের অন্তরস্থ চিন্তা ও অনুভূতিকে পাঠকচিত্ত চিরপরিচিত নিজস্ব চিন্তা ও অনুভূতি বলিয়া চিনিতে পারিয়া আলিঙ্গন করিবে না —যে কাব্য অর্দ্ধসৃষ্টি—সম্পূর্ণাঙ্গ নহে। নিজের চিন্তা অনুভূতিকে ফিরিয়া:পাওয়ায় এত আনন্দ কিসে? আনন্দ আছে বৈকি?—যে চিন্তা ও অনুভূতি পাঠকের চিত্তে রহিয়াছে—কিন্তু পাঠক তাহাকে শোভনসুন্দর রূপ দিতে পারিতেছে না—তাহাকে রসমূর্ত্ত দেখার যে মধুময় বিস্ময় তাহাতেই আনন্দ। কবির কথায়—

যাহা ছিল চির পুরাতন তারে পাই যেন হারাধন।

হারাধনকে ফিরিয়া পাওয়ার আনন্দ কি কম?

কবিগুরু তাই বলিয়াছেন—"আমাদের কথা শ্রোতা ও বক্তা দুইজনের যোগেই তৈরি হইয়া উঠে। এজন্য সাহিত্যের লেখক যাহার কছে লেখাটি ধরিতেছে, মনে মনে নিজের অজ্ঞাতসারেও তাহার প্রকৃতির সঙ্গে নিজের লেখাটি মিলাইয়া লইতেছে। দাশুরায়ের পাচালী দাশরথির ঠিক একলার নহে—যে সমাজ তাহার পাচালী শুনিতেছে তাহার সঙ্গে ও যোগে এই পাঁচালি রচিত, এই জন্য এই পাঁচালিতে কেবল দাশরথির একলার মনের পরিচয় পাওয়া যায় না, ইহাতে একটি বিশেষ কালের বিশেষ মণ্ডলীর অনুরাগ বিরাগ শ্রদ্ধাবিশ্বাসরুচি আপনি প্রকাশ পাইতেছে।" অর্থাৎ ব্যক্তিবিশেষ উপলক্ষ মাত্র—ঐ পাঁচালী একটি সমাজেরই সৃষ্টি।

তাই কবির কাব্য তাঁহার যুগের ও সমাজের অর্থাৎ যাহাদের জন্য এবং যাহাদের সঙ্গে একযোগে কবি রচনা

করিয়াছেন, তাহাদের মনের সুখ দুঃখ আশা আকাঙ্ক্ষা তাহাদের সমস্ত মনোবৃত্তির ছন্দিত সরস ইতিহাস।

কোন দেশের বা যুগের, কোন সমাজের বা সম্প্রদায়ের মনের বার্ত্তা জানিতে হইলে সেই সেই দেশযুগ সমাজ সম্প্রদায়ের কাব্য পাঠ করিলেই চলে।

কবিগুরু বলিয়াছেন—"এমন করিয়া লেখকদের মধ্যে কেহবা বন্ধুকে, কেহবা সম্প্রদায়কে, কেহবা সমাজকে, কেহবা সর্ব্বকালের মানবকে আপনার কথা শুনাইতে চাহিয়াছেন। যাঁহারা কৃতকার্য্য হইয়াছেন তাঁহাদের লেখার মধ্যে বিশেষভাবে সেই বন্ধুর, সম্প্রদায়ের, বা বিশ্বমানবের কিছু-না-কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। এমন করিয়া সাহিত্য কেবল লেখকের নয়—যাহাদের জন্য লিখিত তাহাদেরও পরিচয় বহন করে। * * যে বস্তুটা টিকিয়া আছে—সে যে শুধু নিজের পরিচয় দেয় তাহা নহে সে তাহার চারিপাশেরও পরিচয় দেয়। সে কেবল নিজের গুণে নহে, চারিদিকের গুণেই টিকিয়া থাকে।"

যে কবি সমাজবিশেষ বা যুগ বিশেষের জন্য কাব্য-রচনা করিয়াছেন, তাঁহার কাব্য অর্দ্ধসৃষ্টি হইয়াই থাকে। যদি কেহ তদনুরূপ শিক্ষাদীক্ষা বা অনুশীলনের দ্বারা ঐ যুগ বা সমাজের মনোভাব অধিগত করে এবং সেই মনোভাবে তদ্গত হইয়া কাব্যপাঠ করে, কেবল তাহারই মনে তাহা পূর্ণসৃষ্টিরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে।

যে কবি মহামানবের জন্য লেখেন অর্থাৎ নিখিল মানব-গণের চিরন্তন চিন্তা অনুভূতির সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া লেখেন, তিনিই মহাকবি,—সর্ব্বযুগে সর্ব্বদেশেই তাঁহার কাব্য পূর্ণসৃষ্টি।

পূর্ব্ব হইতেই আসন্ন জাতীয় যুগান্তরের বাণী যাহার কাব্যে ধ্বনিত হয়, তাঁহার কাব্যও জাতির মনে সঙ্গেসঙ্গেই পূর্ণাঙ্গতা লাভ করে। কারণ, যুগান্তরের আর অরুণচ্ছটা জাতির মনকে রঞ্জিত ও আশান্বিত করিয়া থাকে। যাহা স্বপ্নের বস্তু, যাহা আশা আকাঙ্ক্ষার য়, তাহার আগমনী-গান জাতির প্রাণে আনন্দ সঞ্চারই রে! এই শ্রেণীর কবিদের লক্ষ্য করিয়াই কবিগুরু লিয়াছেন,—

ভোরের পাখী ডাকে রে ঐ ভোরের পাখী ডাকে,
ভোর না হ'তে কেমন ক'রে ভোরের খবর রাখে?

রসোপকরণ ও রসসৃষ্টি

এক বন্ধু বলিলেন,—"যাহা আন্তরিক ও স্বাভাবিক তাহাই শ্রেষ্ঠ রচনা। সিন্ধু সম্বন্ধে কবিতা লিখিতে হইলে সিন্ধুতীরে দাঁড়াইয়া যে ভাবটি স্বভাবতঃ সহজ সরল স্বচ্ছ মনে জাগে, যাহা অন্তরকে প্রত্যক্ষভাবে স্পর্শ করে, তাহাই ব্যক্ত করিলে কবিতা হইবে, কোন প্রকার সংস্কারাচ্ছন্ন দৃষ্টিতে দেখিলে চলিবে না, কোন জ্ঞান, বিদ্যা বা গ্রন্থগত তত্ত্বাদি তাহাতে যোগ দিলে চলিবে না।"

কথাটা শুনিলে সঙ্গত বলিয়াই মনে হয়। একজন গ্রাম্য অশিক্ষিত ব্যক্তি যদি সিন্ধুতীরে দাঁড়ায়, তবে তাহার মনে যে ভাব জাগিবে তাহাই অবিমিশ্রভাবে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও আন্তরিক। এখন প্রথম কথা হইতেছে, একজন অশিক্ষিত অদীক্ষিতের মনে যে ভাব জাগে, তাহা যে কি আমরা-ত ঠিক জানি না। সেও তাহা ভাষায় প্রকাশ করিতে পারে না।

একজন শিক্ষিত সভ্যব্যক্তি ভাষায় প্রকাশ করিতে পারে, কিন্তু তাহার মনের ভাব তো সম্পূর্ণ সংস্কারমুক্তও স্বাভাবিক হইবে না। সে যদি নিজে ক্ষণকালের জন্য আত্মবিস্মরণ করিতে পারে, নিজের সমস্ত বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান ও সংস্কারকে মন হইতে দূর করিতে পারে, আপনাকে একজন বন্য বর্ব্বর বা শিশুভাবাপন্ন বলিয়া মনে করিতে পারে, তবে প্রত্যক্ষভাবে সিন্ধুর স্বরূপটি হয়ত ধরিতেও পারে। কিন্তু ব্যাপারটা কি দাঁড়ায়?

স্বাভাবিকতা বা গভীর আন্তরিকতা সৃষ্টির জন্য ইহাতে মস্ত বড় একটা অস্বাভাবিকতা ও কাপট্যের আশ্রয় লইতে হইতেছে নাকি? যাহার মূলেই অস্বাভাবিকতা তাহার সৃষ্টিকে স্বাভাবিক কি বলিয়া বলি? মূল কথা, যাহা অন্তরকে প্রত্যক্ষভাবে স্পর্শ করে, যাহা স্বভাবতঃ মনে আসে, তাহাই ব্যক্ত করিলে কবিতা হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু অপরের মন লইয়া সিন্ধুতীরে দাঁড়াইলে চলিবে না। আপনার সংস্কারাচ্ছন্ন মন লইয়া আপনার প্রকৃত স্বরূপেই দাঁড়াইতে হইবে। সভ্য-শিক্ষিত কবির দৃষ্টিতে যাহা স্বাভাবিক, তাহার মার্জ্জিত মনকেই যাহা স্পর্শ করিবে তাহার সরস বিবৃতি কবিতা কেন না হইবে? এই দৃষ্টিতে

কোন কাপট্য থাকিবার কথা নয়। কবি যদি সেখানে বন্য বর্ব্বরের বা শিশু প্রকৃতির অভিনয় করে তবেই কাপট্য আসিবে। এই অকপট দৃষ্টি বা এই স্বাভাবিক চিত্ত যতই সংস্কারাচ্ছন্ন হউক, তাহাতে কিছু আসে যায় না। কেবল দেখিতে হইবে, ঐ দৃষ্টি রসদৃষ্টি কি না।

একজন সভ্যসমাজের কবি সমুদ্রতীরে দাঁড়াইলে তাহার মনে পড়িবে,—কালিদাসের সমুদ্রবর্ণনা, ওডিসি ইলিয়ডের নানা চিত্র, Byronএর সমুদ্র-প্রশস্তি, কবি কঙ্কণের কমলে-কামিনী। তাহার মনে আসিবে, অনন্ত সান্তের সম্বন্ধ লইয়া নানা তথ্য, মনে আসিবে, সমুদ্রের ভৌগোলিক বিস্তার ও সংস্থানের কথা, মনে আসিবে কত পৌরাণিক কাহিনী, মনে আসিবে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বাবলী। আরও কত কি? ইহাই তাহার পক্ষে স্বাভাবিক, ইহাই তার অন্তরের অনুগত, ইহাই তাহার পক্ষে গভীর অনুভূতির উদ্দীপক, রসসৃষ্টির সহায়ক। অন্য দৃষ্টিতে দেখিলে কি দেখা যাইত, তাহার একটা কল্পিত আভাস দিলেই স্বাভাবিক হইবে না।

লেখকের পক্ষ হইতে যে কথা, পাঠকের পক্ষ হইতেও সেই কথা। কবিতাটি যদি অসভ্য লোকেই পড়ে, তবে তাহার সার্থকতা নষ্ট হইয়া যাইবে। কিন্তু পড়িবে কবির মতই শিক্ষাদীক্ষায় উন্নত পাঠকগণ। তাহাদের উহাতেই ত আনন্দ পাইবার কথা।

তবে কোন পাঠক যদি বলেন, আমি আনন্দ পাইতেছি না, তবে বুঝিতে হইবে, তিনি নানা কারণে শিক্ষিত-সমাজের শিক্ষাসংস্কারের প্রতি বিরক্ত হইয়াছেন, প্রকারান্তরে তাহাই বলিতেছেন। বর্ব্বর-মনে সিন্ধু কি প্রভাব বিস্তার করে তাহার ঐতিহাসিক ও মনস্তত্ত্বগত অভিজ্ঞতার জন্য তিনি যতটা আগ্রহান্বিত, রসসম্ভোগের জন্য ততটা নয়। কারণ কবি-তো রসসৃষ্টি করিতে ক্রটী করেন নাই, তবে আনন্দ না পাইবার হেতু কি?

এ সকল কথা বলার উদ্দেশ্য, কাব্যের পক্ষে আসল কথা রসসৃষ্টি।—তাহা যে কোন উপাদানের সাহায্যেই হউক না কেন, সংস্কারাচ্ছন্ন দৃষ্টিতে দেখিয়াই হউক আর সংস্কারমুক্ত দৃষ্টিতে দেখিয়াই হউক, সরল ভাষাতেই হউক আর সমৃদ্ধ ভাষাতেই হউক, ধ্রুপদী ঢঙেরই হউক আর ঠুংরী গজলের ঢঙেই হউক, নানা তথ্যের সমাবেশেই হউক আর সরল প্রাণের অনুভূতির দ্বারাই হউক, প্রসাদগুণের সম্পাতেই হউক, আর অলঙ্কারের বৈচিত্র্য সৃষ্টির দ্বারাই হউক,—তাহাতে কিছু আসে যায় না। মূর্ত্তির উপকরণ সোনাই হউক, আর মাটিই হউক, তাহাতে রসের দিক হইতে কি প্রভেদ হইতেছে?

কাব্যের উপাদান উপকরণ সহজ ও সুপরিচিত না হইলে তাহার পাঠক সংখ্যা কমিয়া যায়। কিন্তু পাঠকের সংখ্যাহ্রাস কাব্যের রস-দৈন্যের প্রমাণ নয়। কাব্যের উপকরণ সমৃদ্ধ ও জ্ঞানাঢ্য হইলে কাব্যকে পণ্ডিত পাঠকের উপরই নির্ভর করিতে হয়।

সুপণ্ডিত পাঠক যদি সারাজীবন পাণ্ডিত্যের অনুশীলন করিয়া পাণ্ডিত্যের উপর বিরক্ত হইয়া থাকেন, পাণ্ডিত্যের নীরস কঠোর রূপ দর্শনে অভ্যস্ত হইয়া তাঁহার যদি পাণ্ডিত্যের সরস রূপকে অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়, মহাবিদ্যাকে নয়-নয় বার রুদ্রাণীরূপে দেখিয়া একমাত্র সেই-রূপই তাহার উপযোগী স্থির করিয়াছেন—কমলাত্মিকারূপে যদি দেখিতে না চাহেন, তবে সে স্বতন্ত্র কথা। কাব্য সে জন্য দায়ী নয়, পণ্ডিতের মনোবৃত্তিই অস্বাভাবিক।

পণ্ডিতের এই মনোবৃত্তিটি যে অস্বাভাবিক তাহার প্রমাণ হয় আর একটি ব্যাপারে অর্থাৎ তাহার কাব্য-বিচার-পদ্ধতিতে। কবির অনাড়ম্বর সরস সরল রচনা পড়িয়া অনেকেই আনন্দ পান, সৌন্দর্য্য বিচার করিতে হইলে সেই কবিতা সম্বন্ধে তাঁহারা আত্মতৃপ্তিদ্যোতক দুই চারিটি কথার বেশি বলিতে পারেন না। রসটিকে যে তাঁহারা উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহা যতটা তাঁহাদের মুখে চোখে প্রকট হয় ততটা ভাষায় নহে। কিন্তু ঐ পণ্ডিত যখন তাঁহার রসবোধের পরিচয় দেন, তখন কবিতাটার সম্বন্ধে যে বক্তৃতা করেন, তাহা যেমন জটিল ও দুরূহ, তেমনি পাণ্ডিত্যের অভিমানে পরিপূর্ণ। প্রবন্ধ লিখিলে তাহা রীতিমত তত্ত্বকণ্টকাকীর্ণ ও দুষ্পাচ্য হইয়া উঠে। আম্রের মিষ্টতা বুঝাইতে ফলের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার মত শোনায়।

এই সকল পণ্ডিতের কাছে পাণ্ডিত্য অসহ্য উত্তপ্ত

যতক্ষণ তাহা অপরের অধিকারে; ঐ পাণ্ডিত্যই পরম স্পৃহণীয় যখন তাহা নিজের অধিকারে।

যাহাই হউক সমৃদ্ধ উপকরণে ভাবাঢ্য রচনার নিজস্ব কোন দোষ নাই। তবে তাহার পাঠকের যখন অভাব অর্থাৎ অপণ্ডিত পাঠক-ত নাই—ই, বহু পণ্ডিতও যখন উহা সহ্য করেন না, তখন ঐরূপ রচনার সৃষ্টি কবির পক্ষে বিড়ম্বনা। কবি যদি 'নিরবধিকাল ও বিপুলা পৃথ্বীর' ভরসায় ঐ শ্রেণীর কবিতা লেখেন, তবে সে স্বতন্ত্র কথা। নতুবা তিনি যদি জীবদ্দশাতেই যশের প্রত্যাশা করেন, তবে তাঁহার প্রত্যাশা বকাণ্ড-প্রত্যাশাই হইবে।

শিব ও সুন্দর

যে চিত্ত কোন ধর্ম্ম-সমাজাদির সংস্কারের দ্বারা আচ্ছন্ন নয়, সে চিত্ত শিল্পশ্রীকে যে চোখে দেখে, সংস্কারে রঞ্জিত চিত্ত সে চোখে দেখে না। সংস্কার-মুক্ত মন কেবল সৌন্দর্য্যই দেখে—আর সংস্কার যুক্ত মন তার উপকরণের মধ্যে ধর্ম্ম ও সামাজিক জীবনের কল্যাণকেও দেখিতে চায়। সৌন্দর্য্যও যে সে দেখে না তাহা নয়—তবে সেটাকে গৌণ ভাবেই দেখে,—স্বাস্থ্য তাহার কাছে মুখ্য, লাবণ্যটা গৌণ।

সংস্কারমুক্ত আদিম মন এখন কোথা পাওয়া যাইবে? —শ্রেষ্ঠ শিল্পও ত বর্ব্বর-মনের সৃষ্টি নয়। রসজ্ঞ সভ্য মানুষ আপনার মনোবৃত্তিগুলিকে বিচ্ছিন্ন ও পৃথক করিয়া বৃত্তি বিশেষে আপনার মানস শক্তিকে অভিনিবিষ্ট করিতে পারেন। সংস্কারযুক্ত মনও আপনার সংস্কারগুলিকে ক্ষণকালের জন্য ভুলিয়া শিল্পে কেবলমাত্র সৌন্দর্য্যই দেখিতে পারে,—শিল্পের বিষয়বস্তুর দোষগুণকে উপেক্ষাও করিতে পারে। এ শ্রেণীর মনের সংখ্যা বিরল।

সভ্য-সামাজিক মানুষের কাছে ধর্ম্মজীবনের ও সামাজিক জীবনের কল্যাণবোধ মানব-সভ্যতার শ্রেষ্ঠ সম্পদ।—এই সম্পদকেই অধিকাংশ পাঠক শিল্পের বিষয়-বস্তুরূপে দেখিতে চায়। তাহার প্রকাশ শোভন না হইলেও চলে, একথা সে বলে না বটে, কিন্তু প্রকাশ-ভঙ্গির জন্য সে তত মাথা ঘামায় না। তাহাদের তুলনায় সংখ্যায় অল্প এক শ্রেণীর পাঠক আছেন—তাঁহারা সাহিত্য-শিল্পের সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যকেই মুখ্য ঐশ্বর্য্য মনে করেন—কিন্তু উপকরণ, আলম্বন বা বিষয়বস্তু সমাজের কল্যাণকর না হউক, অকল্যাণকর না হয়—সে দিকেও দৃষ্টি রাখেন। তাঁহারা সত্য শিব ও সুন্দরের একত্র মিলন দেখিতে চাহেন সাহিত্য শিল্পাদিতে।

ইঁহারাই বিদগ্ধ-সমাজের অগ্রগণ্য ব্যক্তি—ইঁহাদের উপভোগের জন্যই সাহিত্য রচনা। ইঁহাদের মুখের দিকে চাহিয়াই শিল্পীর উচিত বিষয় বস্তু নির্ব্বাচন করা।

সব যুগেই এই শ্রেণীর লোকের দ্বারাই সাধারণতঃ বিদ্বৎসমাজ গঠিত। যাঁহারা সাহিত্য শিল্পের রসোপভোগের সময় চিত্তকে সম্পূর্ণভাবে সংস্কারমুক্ত করিয়া কেবল অবিমিশ্র মাধুর্য্য উপভোগ করিতে পারেন,—ভুলিলে চলিবে না, তাঁহাদেরও কেবল রসিকজীবন নয়,—সামাজিক ও ধর্ম্মজীবনও আছে। তাঁহারা যতই রসিক হউন—সমাজের অকল্যাণকর কিছুই তাঁহাদেরও হৃদ্য হইবে না। যদি কল্যাণকে বা মনুষ্য-চিত্তের উচ্চতর ভাব ও আদর্শকে অবলম্বন করিয়া উচ্চসাহিত্যসৃষ্টি অসম্ভব হইত, যদি নির্দ্দোষ বিষয়বস্তু লইয়া কবিগণ এতদিন রসসৃষ্টি করিয়া না আসিতেন, তাহা হইলে রসতৃষ্ণা-নিবারণের জন্য হয়-ত তাঁহারা বিষয়বস্তু সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীনও হইতে পারিতেন। কিন্তু তাহা-ত সত্য নয়। তাই মনে হয়—ফিক্টে যখন বলিয়াছেন—Poetry is an expression of a religious idea অথবা Plato যখন বলিয়াছেন Poetry is application of moral ideas to life, তখন অনেক ভাবিয়াই বলিয়াছেন।

সেজন্য মনে হয় রসসৃষ্টির জন্য কল্যাণময়, অন্ততঃ দোষ-মালিন্যমুক্ত অর্থাৎ যাহাতে কল্যাণ না হউক—সমাজের অকল্যাণ না হয়—এমন উপকরণই অবলম্বন করা উচিত। সমাজের ইষ্টানিষ্টের জন্য বলিতেছি না। রসের যাঁহারা উপভোক্তা তাঁহাদের চিত্তের কথা ভাবিয়াই বলিতেছি। যাঁহারা উপভোগ করিবেন, তাঁহাদের বিচারে যাহা অকল্যাণকর,—তাহা অসুন্দর, অশ্লীল, কুৎসিত। ঐ অসুন্দরকে শিল্পী সৌন্দর্য্যমণ্ডিত করিয়া তুলিতে পারেন,—শিল্পীর কাছে তাহা সুন্দর হইয়া উঠিতে পারে।

উপভোক্তার কাছে তাহা সম্পূর্ণ সুন্দর কখনই হইবে না। কারণ, শিল্পী সামাজিক জীবনকে একেবারে বিস্মৃত হইতে পারেন—উপভোক্তা তাহা কিছুতেই পারিবে না—তাহার রসিকজীবন রস পাইলেও সামাজিক জীবন রসাভাস ঘটাইবে।

যাহাদের জন্য রসসৃষ্টি তাহাদের মনে কোনপ্রকার অপ্রসন্নতা, বিরক্তি বা অস্বস্তির সৃষ্টি করিলে রসসৃষ্টি সার্থক হইবে না। বরং, কেবল রসের সাহায্যে নয়—রসোপকরণের সাহায্যেও উপভোক্তার অন্তরে প্রীতি, তৃপ্তি ও উল্লাস সৃষ্টি করাই শিল্পসাধনার অঙ্গীভূত। তাই মনে হয় উপভোক্তার চিত্তের সহিত শিল্পিচিত্তের মৈত্রী ও সহানুভূতি বিন্দুমাত্র যাহাতে ক্ষুণ্ণ না হয়, প্রত্যেক শিল্পীর সেই দিকে দৃষ্টি রাখিয়া আলম্বন, বিষয়বস্তু ও উপকরণ নির্ব্বাচন করাই উচিত।

মুখ্য সাহিত্য ও গৌণ সাহিত্য

অন্য কোন অবান্তর উদ্দেশ্য মনে না রাখিয়া কেবলমাত্র রসসৃষ্টির অথবা চিত্তবিনোদনের জন্য রচিত সাহিত্যকে বলা যাইতেছে 'মুখ্য সাহিত্য'। আর ইতিহাস, ধর্ম্ম-নীতি, তত্ত্বব্যাখ্যান ইত্যাদিকে কেবলমাত্র যুক্তিপরম্পরার দ্বারা বিবৃত না করিয়া সরস করিয়া বিবৃতিকে বলা হইতেছে 'গৌণ সাহিত্য।' মুখ্য সাহিত্য ইতিহাসাদিকে কঙ্কাল বা উপাদান স্বরূপ গ্রহণ করিতে পারে—কিন্তু রসসৃষ্টিই তাহার ব্রত; উপাদানকে সে আপনার প্রয়োজনমত পরিবর্ত্তিত বা রূপান্তরিত করিয়া লইতে পারে,—কল্পনার সাহায্যে উহাতে কিছু কিছু যোগবিয়োগ করিয়া লইতে পারে, মাজিয়া ঘসিয়া উহাকে সৃষ্টির উপযোগী করিয়া লইতে পারে—উপাদানের ব্যবহারিক সত্যের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিতেও পারে উপাদানের যুক্তিমূলক বা ঘটনাপরম্পরাগত ক্রম ঠিক না রাখিতেও পারে। রসানন্দলাভের জন্যই মুখ্য সাহিত্য পাঠ করা উচিত—ইচ্ছা করিলে কেহ তাহা হইতে তত্ত্ব ইতিহাস নীতি, উপদেশাদি উদ্ধার করিতে পারেন। তবে তাহার উপর নির্ভর করা নিরাপদ নয়—ব্যবহারিক ও লৌকিক সত্যের দিক হইতে প্রবঞ্চিত বা ভ্রান্ত হইবার সম্ভাবনাই যথেষ্ট।

কবি তাই আগেই সাবধান করিয়া দিয়াছেন—

"সেই সত্য যা রচিবে তুমি
ঘটে যা তা সব সত্য নহে। কবি, তব মনোভূমি
রামের জনমস্থান অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো।"

গৌণ সাহিত্যে তত্ত্ব, নীতি, ইতিহাসাদিই মুখ্য উপজীব্য। ঐগুলিকে সরস করিয়া বিবৃত করা হয় মাত্র। সরস করিয়া বিবৃত না করিলে শুষ্ক নীতি-বিলাস বা ঘটনাবিবৃতি জনসাধারণের রুচিকর হয় না,—তাহাদের চিত্ত আকর্ষণ করা যায় না, তদ্দ্বারা লোকশিক্ষা বা জ্ঞান প্রচারও সম্ভব হয় না। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মধ্যেই ঐগুলি বিশেষজ্ঞের আলোচ্য ও জ্ঞাতব্য হইয়াই থাকিয়া যায় না। জনসাধারণের অধিগম্য হইয়া উঠে। যুগে যুগে দেশে দেশে এই শ্রেণীর সাহিত্য রচিত হইয়া জাতীয় জীবনের পরম কল্যাণ সাধন করিয়াছে।

আমরা যখন বলি—সাহিত্যই শিক্ষার বাহন, সাহিত্যই জাতীয় জীবনের প্রতিবিম্ব,—সাহিত্য জাতীয় জীবনকে গঠিত করে—পরিচালিত করে—জ্ঞানোন্নত করে—মনুষ্যত্বের আদর্শ দান করে—জীবনে জীবনে যোগ স্থাপন করে—জনসাধারণকে সংঘবদ্ধ হইতে শিখায় ইত্যাদি ইত্যাদি,—তখন আমরা একমাত্র মুখ্য সাহিত্যকে সাহিত্য বলিয়া মনে করি না—গৌণ সাহিত্যকেই বিশেষ করিয়া সাহিত্যগোষ্ঠীর মধ্যে স্থান দিই।

মুখ্য সাহিত্য কেবল রসানন্দ দান করে,—আর কোন কল্যাণ সাধন করে না—তাহা নয়। মুখ্য সাহিত্য চিত্তকে বিস্ফারিত করে—আমাদের দৃষ্টিকে আয়ত ও উদার করে—আমাদের জীবনের আদর্শকে বড় করিয়া দেয়—আমাদের কল্পনাকে সুদূরপ্রসারিণী করে—জীবনের ক্লেশ উদ্বেগ ত্বরা জরার জ্বালার উপর শান্তিজল বর্ষণ করে—এবং এই সৃষ্টিকে উপভোগ্য করিয়া তুলে।

কিন্তু আমরা যখন জাতীয় জীবন গঠন বা লোকশিক্ষা ইত্যাদির কথা বলি তখন সাহিত্যের এই ব্রতের কথা ভাবি না। মোট কথা, উচ্চ সাহিত্যের রস জনসাধারণের অধিগম্য নয়—উচ্চ সাহিত্যের মধ্যে একটা আভিজাত্য (aristocracy) আছেই। জনসাধারণ উচ্চসাহিত্য পাঠেও যে আনন্দ পায় না তাহা নহে,—তবে তাহার

অনির্ব্বচনীয় রসের জন্য নয়—তাহার উপাদান উপকরণের মূল্যবত্তা বা মাধুর্য্যের জন্য। গৌণ সাহিত্য পাঠে যাহাদের মন জ্ঞানোন্নত ও মার্জ্জিত হইয়াছে—তাহারাই মুখ্য সাহিত্যের অনির্ব্বচনীয় রস উপলব্ধি করিতে পারে। গৌণ-সাহিত্য যে চিত্তগুলিকে প্রস্তুত করিয়াছে মুখ্য সাহিত্যের রসবীজ সেই চিত্তভূমিতেই উপ্ত হইতে পারে। জনসাধারণ মুখ্যসাহিত্যের অন্য কোনদিকের মর্য্যাদা না বুঝিয়া কেবলমাত্র অনুভূতির দিকটাই কিছু-কিছু বুঝে। ফলে, যে রচনায় অনুভূতির আতিশয্য, উচ্ছ্বাস ও অসংযম আছে তাহাই তাহাদের পক্ষে উচ্চসাহিত্য অর্থাৎ অতিনিম্ন-শ্রেণীর সাহিত্যও তাহাদের কাছে রসভূয়িষ্ঠ সাহিত্য অপেক্ষা অধিকতর চমৎকার।

জাতীয় জীবনের কল্যাণ-সাধনের জন্য গৌণ সাহিত্যের প্রয়োজন ত আছেই, মুখ্য সাহিত্যের জন্যও তাহার সৃষ্টির প্রয়োজন। গৌণ সাহিত্যের রচনাগুলি মুখ্য সাহিত্যে পৌছিবার সোপানাবলী, সেজন্য একহিসাবে মুখ্য সাহিত্য-মন্দিরেরই অঙ্গীভূত। রসজ্ঞগণ এই সোপান পার হইয়াছেন বলিয়া আজ গৌণ সাহিত্যকে উপেক্ষা করেন,—অকাব্য—কুকাব্য ইত্যাদি বলিয়া অবহেলা করেন। কিন্তু একমাত্র তাঁহারাই একটা জাতির সম্বল নহেন। সমগ্র জাতীয় জীবনের পক্ষ হইতে দেখিতে গেলে—মুখ্য সাহিত্যের ভবিষ্যৎ পাঠকগণের দিক হইতে দেখিতে গেলে গৌণ সাহিত্যের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। গৌণ সাহিত্য পাঠ হইতেই রসপ্রধান মুখ্য সাহিত্য পাঠের আগ্রহ ও পিপাসা জন্মে।

রসজ্ঞগণের এক্ষেত্রে একটি কর্ত্তব্য আছে—লোকে যেন গৌণ সাহিত্যকেই মুখ্যসাহিত্য বলিয়া মনে না করে—এবং গৌণ সাহিত্যে তাহারা যে নীতি, তত্ত্ব, যৌক্তিকক্রম, ইতিহাসাদি খুঁজিয়া থাকে—মুখ্য সাহিত্যেও তাহাই না খোঁজে—এ বিষয়ে তাহারা যেন পাঠকসাধারণকে সতর্ক করিয়া দেন। যাহারা মুখ্য সাহিত্যের বিচারে কঙ্কাল লইয়া কলহ করে, অথবা মুখ্য সাহিত্যে ঐ সকল সারবান ভারবান পদার্থগুলি খুজে, তাহারা এখনও মুখ্য সাহিত্য পাঠের অধিকারী হয় নাই। গৌণ সাহিত্য এখনও তাহাদের মনে ক্লান্তি, বিরক্তি ও অতৃপ্তি জন্মায় নাই—অর্থাৎ গৌণ সাহিত্যপাঠ এখনও তাহাদের সমাপ্ত হয় নাই।

জাতীয় সাহিত্যের সমালোচনা

কবি যদি সমালোচক হন, তাহা হইলে অনেক সময় সমালোচ্য কাব্যকে অবলম্বন করিয়া সমালোচনাচ্ছলে তিনি নূতন সৃষ্টিই (creation) করিয়া বসেন। সমালোচ্য কাব্যে যে মাধুর্য্য বা সৌন্দর্য্য নাই—কবি-সমালোচক তাহাও উহাতে আরোপ করিতে পারেন—তাহাতে কবি-সমালোচকের যতটা কৃতিত্ব প্রকাশ পায়—প্রকৃত সমালোচনা ততটা হয় না। সমালোচ্য সাহিত্যে যাহা অত্যন্ত স্পষ্ট ও প্রকট ভাবে ফুটিয়াছে—তাহার বিবৃতি 'সাহিত্যের ইতিহাসের' অন্তর্গত। প্রকৃত সমালোচনা হইতেছে 'আবিষ্কার' অর্থাৎ যাহা প্রচ্ছন্ন ও অনাস্বাদিতপূর্ব্ব তাহারাই উদ্ধার।

কাব্য হইতে কবি বিশেষের মনের গঠন ও প্রকৃতি,গতি ও প্রবৃত্তি ধরা শক্ত নয়। কবিমনকে ধরিয়া তাহার স্বাভাবিক প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি মনোবিজ্ঞানের নিয়মানুসারে যেভাবে উন্মেষ লাভ করিয়াছে—সেই ক্রম অনুসরণ করিয়া, তাহার সৃষ্টির সহিত মিলাইয়া চলিলে আবিষ্কারের একটা সূত্র পাওয়া যায়। পর্য্যবেক্ষণই দেখাইয়া দিবে—কোথায় তাহার অভিব্যক্তি স্পষ্ট হইয়াছে—কোথায় তাহা অস্ফুট ও প্রচ্ছন্ন—কোথায় তাহা আদৌ অভিব্যক্তি লাভ করে নাই! কাব্যে কোথায় চিত্তের স্বাভাবিক অভিব্যক্তিতে বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে, ধরা যাইবে—সে বিচ্ছেদে যাহা থাকিবার কথা তাহা কোথায় গেল তাহার সন্ধান হইবে অথবা বিচ্ছেদের দুই পাশের মধ্যে কি যোগসূত্র তাহাও নিরূপিত হইবে। কোথায় কবি ফাঁকি দিয়াছেন—কোথায় আত্মপ্রবঞ্চনা করিয়াছেন—কোথায় তিনি সত্যনিষ্ঠ—কোথায় তিনি ভাণের ও মিথ্যার আশ্রয় লইয়াছেন, তাহাও ধরা পড়িবে। কোথায় তিনি অবান্তর কথা বলিয়াছেন—কোথায় আত্মগোপন করিয়াছেন—কোথায় তাঁহার আদর্শ ও ব্রত হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছেন—কোথায় ভয়ে ভয়ে বা কোথায় নির্ভয়ে লিখিয়াছেন—কোথায় নিজের আদর্শবাদের সহিত সমাজের প্রচলিত আদর্শের সন্ধিস্থাপন করিয়াছেন—কোথায় বিদ্রোহী হইয়াছেন ইত্যাদি সবই পরীক্ষিত হইবে। যাহা কিছু তাঁহার রচনায় জটিল, দুরূহ, অস্পষ্ট, দুর্ব্বোধ, তাহাও ঐ ক্রম অনুসরণ করিলে চিত্তবিকাশধর্ম্মের পারম্পর্য্যের

সাহায্যে বিশদরূপে ব্যাখ্যাত হইবে। তাই মনে হয়—কবিমনের স্বাভাবিক গতি অনুসরণ করিয়া অগ্রসর হইলে কবিকৃতির প্রকৃত সমালোচনা হইতে পারে।

যাহা ব্যক্তিবিশেষের রচিত সাহিত্য সম্বন্ধে বলা হইল—জাতীয় সাহিত্য সমালোচনাতেও সেই প্রথা অবলম্বিত হইলে বহু তথ্যের আবিষ্কার হইতে পারে। এ ক্ষেত্রে জাতীয় জীবনের ইতিহাসের সূত্র অবলম্বন করিলেই চলে। ঐ ইতিহাস কতকটা দেশের রাষ্ট্রীয় ইতিহাস হইতে পাওয়া যায়—কতকটা সংহত জীবনতত্ত্বের স্বাভাবিক ক্রম অনুসরণে অনুমান করিয়া লইতে হয়।

জাতীয় জীবনের ইতিহাসের ক্রম অনুসরণে কেমন করিয়া সাহিত্যের ধারা পাওয়া যায়—তাহার দুই একটা উদাহরণ দেওয়া যাউক।

কালাপাহাড়ের আবির্ভাবের পূর্ব্বে বাঙ্গালীর মনে দেবদেবীর সম্বন্ধে কি ভাব ছিল—তাহা কতকটা অনুমানে, কতকটা ঐতিহ্য হইতে নির্ণয় করা গেল। তারপর কালাপাহাড় দেশের দেবদেবীর মূর্ত্তি চূর্ণ করিল। দেশের লোক নিশ্চয়ই ভাবিয়াছিল—জাগ্রত দেবতা আত্মরক্ষা করিবেন এবং আততায়ীকেও দণ্ড দিবেন। কিন্তু দেবদেবী আত্মরক্ষা করিতে পারিলেন না,—কালাপাহাড়েরও কোন আধি-দৈবিক দণ্ড হইল না। তখন জাতীয় মনের কি অবস্থা হওয়া স্বাভাবিক? কালাপাহাড় কি কেবল মন্দিরের দেবতাই চূর্ণ করিল? দেশের লোকের মনোমন্দিরের দেবতাগুলিকেও কি চূর্ণ করিল না? দেবদেবী মঠমন্দির গুলিকে অবলম্বন করিয়া যাহারা জীবিকা উপার্জ্জন করিতেছিল—যাহারা দেবদেবীর পৃষ্ঠপোষক হিসাবে দেশে একটা মর্য্যাদা ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল—হিন্দুর পৌরাণিক ধর্ম্মের যাহারা প্রতিভূ, তাহাদের মনের অবস্থা কি হইল? তাহারা দেবদেবীর প্রভাব প্রতিপত্তি যাহাতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়—সেজন্য কি প্রাণপণ চেষ্টা করে নাই? দেশের লোকের পৌরাণিক ধর্ম্মবোধ নিরাশ্রয় হইয়া পড়িলে তাহারা কি নবধর্ম্মের সন্ধান করে নাই? পৌরাণিক ধর্ম্মের বিরুদ্ধে তখন দেশে দুইটি প্রবল ধর্ম্ম বর্ত্তমান—ইসলাম ও বৈষ্ণবধর্ম্ম। বৌদ্ধধর্ম্মও একেবারে মরে নাই—সহজিয়া, আউলিয়া, বাউলিয়া ইত্যাদিতে রূপান্তরিত। তখন দেশের লোকের ধর্ম্মজীবনের অবস্থা কি? বর্ণাশ্রমী ধর্ম্মের সহিত বা পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্মের সহিত বৌদ্ধ, ইসলাম ও বৈষ্ণবধর্ম্মের নিশ্চয়ই স্থলে স্থলে সন্ধি হইয়াছে—দেব-দেবীকে বাদ দিয়া নানা ধর্ম্মমতের নিশ্চয়ই প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। বৈষ্ণবধর্ম্মের বিরুদ্ধে গোড়া বর্ণাশ্রমীরা নিশ্চয়ই শাক্তধর্ম্মকে জাঁকাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছে।

এই ভাবে জাতীয় মনের ধারা অনুসরণ করিয়া সাহিত্যে তাহার সমান্তরাল অভিব্যক্তি খুঁজিতে গেলেই বহু সাহিত্যাংশের আবিষ্কার হইবে—কি কি লুপ্ত হইয়াছে, কোথায় অভিব্যক্তি লাভ করে নাই—কোথায় সত্যই সাহিত্যরূপ ধরিয়াছে, কোথায় ধর্ম্মপ্রচারমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে—কোথায় কলহ-দ্বন্দ্বই সাহিত্যের নামে ভাষায় অভিব্যক্ত হইয়াছে মাত্র—কোথায় সম্প্রদায়বিশেষের আত্মরক্ষার চেষ্টাই প্রকট হইয়া উঠিয়াছে—কোথায় ধর্ম্মকে বাদ দিয়া অব্রাহ্মণ্য সাহিত্য রচিত হইয়াছে,—সমস্তই পরীক্ষিত ও আবিষ্কৃত হইবে। সমগ্র সাহিত্যসৃষ্টি-পরম্পরা যে একটি জাতীয় মনেরই ক্রমাভিব্যক্তি এবং সমস্ত বিশৃঙ্খলা ও বৈচিত্র্যের মধ্যেও যে একটা যোগসূত্র আছে তাহা ধরা পড়িয়া যাইবে। আবার যদি কোন কবির কাব্য জাতীয় জীবনের প্রতিবিম্ব না হইয়া তাঁহার নিজের একটা বিশিষ্ট বাণীকেই অভিব্যক্তি দান করিয়া থাকে—অথবা বিশ্বজনীন আদর্শেই বিরচিত হইয়া থাকে—তাহাও এই সূত্রানুসারে সহজে ধরা পড়িয়া যাইবে।

এইভাবে তথ্যাবিষ্কার সাহিত্যের রসসম্ভোগ নয় বটে—কিন্তু মুখ্য সাহিত্যের ইহা এক প্রকারের সমালোচনা গৌণসাহিত্যের পক্ষে ইহাই একমাত্র সমালোচনা।

ভাবতান্ত্রিক ও বস্তু তান্ত্রিক কাব্য

কাব্যের রসসৃষ্টিতে সুকুমার অনুভূতিরই প্রাধান্য থাকিবে—জ্ঞান গম্য বিষয় বা সূক্ষ্ম চিন্তার প্রাধান্য ঘটিলে বোধানন্দ রসানন্দকে নষ্ট করিয়া দেয়—রসজ্ঞগণ এই কথাই বলিয়া থাকেন। এই সূত্রানুসারে বিচার করিতে গেলে মনে হয় কাব্যকে বুঝি বস্তুতান্ত্রিক হইতে হইবে—ভাবতান্ত্রিক হইলে চলিবে না।

তবে ভাবপ্রধান কাব্য কি রসসৃষ্টি করে না? অনেক

সময় ভাবপ্রধান কাব্যকে চিন্তামূলক রচনা বলিয়া মনে হয়—কিন্তু একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে—ভাবপ্রধান কাব্যমাত্রই চিন্তাপ্রধান নয়। অনুভূতির প্রাধান্য বস্তুতান্ত্রিক কাব্যেও যেমন থাকিতে পারে—ভাবতান্ত্রিক কাব্যেও তেমনি থাকিতে পারে। দেখিতে হইবে, অনুভূতির প্রাধান্য আছে কি না অর্থাৎ কোন বিশিষ্ট অনুভূতির দ্বারা আবিষ্ট চিত্তে কবি কাব্য রচনা করিয়াছেন কি না। কাব্যের প্রধান উপকরণ 'বস্তুও' হইতে পারে—'ভাবও' হইতে পারে।

মানব-সভ্যতার এমন স্তরও ছিল—যখন একমাত্র বস্তুই আমাদের অনুভূতির উপজীব্য ছিল। ক্রমে মানব-সভ্যতার জটিলতা ও ক্রমোদ্বর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভাবও আমাদের রসানুভূতির উপজীব্য হইয়া উঠিয়াছে। বস্তু আমাদের যেমন অন্তরঙ্গ বস্তু ছিল, ভাব আমাদের তেমনি অন্তরঙ্গ সামগ্রী হইয়া উঠিয়াছে। ভাব অনেকস্থলে বস্তুর চেয়ে আমাদের অন্তরের অধিকতর আত্মীয়—Concreteএর চেয়ে abstract অনেকক্ষেত্রে আমাদের অন্তরে গাঢ়তর রসানুভূতি জাগায়। বহু ভাবই আমাদের কাছে বস্তুর মতই প্রত্যক্ষ। যাহা এক সময় মানবমনে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ঐন্দ্রিয়িক ক্রিয়ার জটিলতার সৃষ্টি বলিয়া মনে হইত—তাহা আমাদের আজ বস্তুর মত সহজ ও অপরোক্ষ। তাই আজ আমাদের কাছে ভাব উপাদানে ও বস্তু উপাদানে অনুভূতির পক্ষে বিশেষ কোন পার্থক্য হয় না। রসসৃষ্টির পক্ষে বরং বস্তু অপেক্ষা ভাব অধিকতর অনুকূল হইয়া উঠিয়াছে। ভাবের গঠনে আমাদের বোধশক্তি যতই সহায়তা করুক—ভাব অবলম্বনে যখন আমরা রসসৃষ্টি করি—তখন প্রখর বোধসৃষ্টি আর বাধা দেয় না। সব হতে জটিলতম ভাব যে অসীমতার ভাব—তাহাও রসসৃষ্টির পক্ষে এখন সম্পূর্ণ অনুকূল হইয়া উঠিয়াছে—

কবি বলিয়াছেন—

ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ,
রূপ পেতে চায় ভাবের মাঝারে ছাড়া।
অসীম যে চায় সীমার নিবিড় সঙ্গ,
সীমা হতে চায় অসীমের মাঝে হারা।

ভাব ও রূপের অভিন্নতাবোধ আজ আমাদের মনে এমনই সহজ ও স্বাভাবিক যে ইহা চিন্তার অধিকার ছাড়াইয়া অনেকক্ষেত্রে সম্পূর্ণ রসানুভূতির অধিকারে আসিয়া পড়িয়াছে। প্রাণের যে দরদটুকু রসসৃষ্টির মূল—তাহা দুইএর পক্ষেই সমান।

ভাব ও প্রকাশ ভঙ্গি

কোন একটি ভাবকে ছন্দোবদ্ধে প্রকাশ করিলেই তাহা অভিনব হইয়া উঠে না—অপূর্ব্ব হইয়াও উঠে না—একটি আবিষ্কার হইয়া উঠে না। ভাবটিকে সরস আবেষ্টনীর মধ্যে প্রকাশিত দেখিয়া আনন্দ জন্মিতে পারে এই পর্য্যন্ত। ভাবের অভিনবত্বের নামে যাঁহারা কাব্যবিশেষের প্রশংসা করেন—তাঁহারা দুই প্রকারের ভুল করেন। প্রথম প্রকারের ভুল—চিরপুরাতন ভাবকে ছন্দোবদ্ধে নূতন সজ্জায় দেখিয়া অভিনব বা অপূর্ব্ব বলিয়া ভুল করেন। দ্বিতীয় প্রকারের ভুল—ভাবরাজ্যের সহিত পরিচয় না থাকায়, চিন্তাশীলতার অভাবে অথবা অধ্যয়নাদির অভাবে—পুরাতন ভাবকেই নূতন ভাব বলিয়া মনে করেন। তাঁহার কাছে যে ভাব নূতন, চিন্তাশীল, পণ্ডিত বা অধ্যয়নরত ব্যক্তির কাছে তাহা নূতন নহে। ভাব নূতন হইতে পারে না—কাব্যে তাহার নব প্রবর্ত্তন হইতে পারে তাহাতেও কবির কৃতিত্ব বেশি কিছু নাই।

বামন দণ্ডী ইত্যাদি আলঙ্কারিকগণ রীতিকে, কুন্তল মম্মটভট্ট বক্রোক্তিকে—রুদ্রত ভামহ অলঙ্কারকে, আনন্দ বর্দ্ধন ধ্বনিকে, কাব্যের আত্মা বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন বটে—কিন্তু কেহ ভাব, অনুভাব বিভাব বা সঞ্চারী ভাবকে কাব্যের আত্মা মনে করেন নাই। আজকালকার পণ্ডিতরাই দেখি ভাবকেই কাব্যের প্রাণ ভাবেন।

প্রকাশ ভঙ্গির অভিনবত্বেই কবির কৃতিত্ব, রসসৃষ্টিতেই তাঁহার প্রকৃত কবিত্ব। নবপ্রবর্ত্তিত ভাব অবলম্বনেও অকাব্য হইতে পারে—চিরপরিচিত ভাব অবলম্বনেও কেবল প্রকাশ ভঙ্গির গুণে, শ্রেষ্ঠ কাব্য হইতে পারে।

যাহারা প্রকাশভঙ্গির অপূর্ব্বতা বুঝে না—প্রকাশ ভঙ্গির ক্রমোন্নতি ও গূঢ়তথ্যের কোন খোঁজ রাখে না,—শিল্পসৌষ্ঠব সম্পাদনের মূল সূত্রটি কি জানে না—তাহাদের সম্বল ঐ ভাব, গদ্যেও তাই—পদ্যেও তাই। কবিতাকে অন্য ভাষায় তর্জ্জমা করিলে বা গদ্যে পরিবর্ত্তন করিয়া দিলেও তাহাদের কাব্যের গুণোপলব্ধিতে কোন ক্ষতি হয় না।

ইহারা ভাবকেই মনে করে 'রস'। ইহারা যখন প্রবন্ধ লিখিয়া কাব্যের গুণ ব্যাখ্যা করে—তখন অনায়াসে কবিতাকে গদ্যে পরিণত করিয়া টীকাটিপ্পনী করে এবং ভাবেরই গুণগান করে। ভুলিয়া যায়, ভাবটি কবিতার কঙ্কাল মাত্র। একটি কঙ্কালে আর অন্য একটি কঙ্কালে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই—তাহার বিচারে দেহের বৈশিষ্ট্য দেখানো যায়না। রূপমুগ্ধ ব্যক্তি অঙ্গের কোথায় কিরূপ গঠন সৌষম্য এবং কোথায় কতটুকু লাবণ্য, পৃথক পৃথক ভাবেও দেখিতে পারে এবং কোন্ অঙ্গ দেহের সামগ্রিক কান্তির কতটা অংশ দান করিয়াছে, ইহাও লক্ষ্য করিতে পারে কিন্তু কঙ্কালের এমন কি মজ্জামেদরক্তমাংসের কথা কখনো ভাবিবেও না)

ক্রমশঃ

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

সুখে দুঃখে এমনি করে একটী বছর কেটে গেল। জগমোহনের শরীরের কোনই পরিবর্ত্তন হলনা। প্রশান্ত টাকা জুটিয়ে নিয়ে বিলেত চলে গেল টেলিগ্রাফ শিখতে আর প্রণবের দেশলাইএর কারখানা অল্প অল্প করে গড়ে উঠতে লাগলো।

দেশ ছেড়ে সেই যে সকলে এসেছে সেই থেকে মীনা বা নন্দা কেউই নড়েনি—নিজেদের বাড়ী ছেড়ে যেতেও তারা কোথাও চাইতনা কিন্তু নন্দাকে বাধ্য হয়ে যেতে হল। হঠাৎ খবর এল তার বাবা হার্টফেল করে মারা গেছেন। শুনে চেঁচিয়ে সে অস্থির হয়ে উঠ্‌ল—কোনরকমে তাকে দিয়ে তার বাবার চতুর্থী শ্রাদ্ধ করিয়ে প্রণব রাইপুরে তাকে দিয়ে এলো। পুত্র সন্তান না থাকায় এতবড় সম্পত্তি সবই নন্দার হাতে এলো, এতে একদিকে সে সুখী হলেও, দুঃখও তার কম ছিলনা। যখনই মনে হত তার বাপের জীবনের বিনিময়ে সে এই সম্পত্তির মালিক হয়েছে তখনি বিতৃষ্ণায় তার মন ভরে যেত।

রাইপুরে গিয়েও সে বেশীদিন থাক্‌তে পার্‌লেনা—এতবড় বাড়ী, লোকজন, কিছুতেই তার মন আর উঠছিলনা। কলকাতার বাড়ীর একটা ছোটঘরে গিয়ে লুকোবার জন্যে তার মন ব্যস্ত হয়ে উঠছিল কিন্তু তার মা রুক্মিণীই বা সদ্য সদ্য একা কি করে এত বড় বাড়ীতে থাকবেন এটাও তার একটা ভাবনার কথা হয়ে দাঁড়ালো। অনেক ভেবে সে মীনাকে সব খুলে লিখলে—যদিও এসব লিখতে তার ভাল লাগছিলনা—তবুও সে যখন বড় তখন তাকে লিখতেই হবে। তিন চার দিনের মধ্যেই মীনার উত্তর এলো, "লিখেছে—"মাকে শুদ্ধ নিয়ে তুমি চলে এস—তোমার কাছে ছাড়া তিনি আর কোথায় থাক্‌বেন—যে ক'টা দিন আর বাঁচেন—আমাদের কাছে থাকবেন। বাবাকে তো হারিয়েই ছো—মাকেও হারিওনা"।

সেই চিঠিটা হাতে করে নন্দা মায়ের কাছে গেল। শ্রাদ্ধ শান্তি সবই চুকে গিয়েছে। রুক্ষ চুলের গোছা মাটীতে ছড়িয়ে দিয়ে তিনি বিগত স্বামীর জন্যে লুটিয়ে কাঁদ্‌ছিলেন। এত বড় বংশের নাম ডুবে গেল—শুধু একটি ছেলের অভাবে, তার ওপর নন্দাও তো দু চার দিনের মধ্যে চলে যাবে! তখন কি করে এই শ্মশানে মন টিঁক্‌বে? নন্দা গিয়ে তাঁর কাছে বস্‌ল। কথাটা যে কি ভাবে পাড়বে তা সে বুঝে উঠতে পার্‌ছিলনা! কিন্তু বলাও তো দরকার! যদি যেতে হয় তো ব্যবস্থা সব কর্‌তে হবে। কথাটা শেষে উঠোবার সুবিধা হল। রুক্মিণী নিজেই বল্‌লেন "তোকে কবে নিয়ে যাবে, সে কথা কি প্রণব লিখেছেন নাকি?"

মুখটা নীচু করেই সে বল্‌লে "সে কিছু লেখেনি। তবে আমার জা লিখেছে, যেদিন আমি যেতে চাই, আগে জান্‌লে লোক পাঠাবে!"

"বাস—তাহলে আমি যে এই জেলখানায় কি করে থাক্‌বো তাই ভাবছি। তুই আছিস—তাও মনে কত বল। তুই চলে গেলে যদি পড়েও মরি তো কেউ দেখ্‌তে থাক্‌বে না!"

নন্দা বল্লে "একা তুমি থাক্‌বে কেন মা? আমি তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যাব। এখানে কার কাছে আমি তোমাকে রেখে যাব মা?

রুক্মিণী কথাটা বুঝতে পারলে না—বল্লেন "তুই আমায় কল্‌কাতা যেতে বল্‌ছিস্?" "হাঁ মা না হলে আর উপায় কি? তোমাকে আমি এমন করে ফেলে যেতে পার্‌বোনা—তার চেয়ে আমি যাবোনা।"

"মেয়ে শ্বশুর বাড়ী যাবেনা, এই কি মায়ের কাম্য বাছা! আমার বুদ্ধিতে তো কিছু আস্‌ছে না—যদি ভাল হয় তবে তাই কর। হাঁরে, তোর জা লোক কেমন? শেষে বিপদে পড়বি নে তো।"

"ইস—পড়লেই হলো। তার তাঁবেদারীতে কি তোমার থাক্‌তে হবে?" মেয়ের হাতখানা ধরে রুক্মিণী বল্‌লেন "যা ভাল হয় কর্ বাছা! আমার বুদ্ধি শুদ্ধি সব লোপ পেয়েছে।"

মায়ের সম্মতি পেয়ে নন্দা, প্রণবকে চিঠি লিখলে যে সে তার মাকে নিয়ে দু চার দিনের মধ্যেই কল্‌কাতায় যাচ্ছে। চিঠি পেয়ে প্রণবের চক্ষু স্থির হয়ে গেলো। একে রুক্মিণী, তায় তিনি শোকার্ত্তা, তাতে তারা নিজেরাই অসুস্থ বাপকে নিয়ে পরের বাড়ী আছে, এ অবস্থায় তাঁর এখানে আসা এক বিষম সঙ্কটের ব্যাপার। বারণ করবার সময় নেই, আর করলেও নন্দা ভীষণ রেগে যাবে, কি করবে ঠিক না পেয়ে সে চিঠিটা মীনাকে পড়ে শোনালে ও বল্‌লে "দেখ্‌ছেন তো, ওঁরা এসে পড়বেন ঠিক—কি করা যাবে?"

"কি করা যাবে আর থাক্‌বেন। বিশেষ ওঁর এই সময়ে ওঁকে কি একা রাখা যায়? আমার যতটুকু ক্ষমতা তাঁকে খুসী করে রাখব—মেয়ের কাছে মা আসবেন, এতে এত ভাবনাই বা কিসের?

মুখখানিতে রাজ্যের ভাবনা জড়ো করে "বাবার খাবার হ'ল নাকি? বলে প্রভাত সেখানে এলো। ছুটি ছিল বলে, প্রভাত নিজেই বাবাকে খাওয়ানোর ভারটা নিয়েছিলো। মীনার তাতে যেটুকু সাহায্য হয়!

তরকারীর কড়া উনুন থেকে নামিয়ে রেখে, মীনা বল্‌লে "ঠাকুরপোর শাশুড়ী এখানে আস্‌ছেন শীগ্‌গীরই।" প্রভাত একটু আশ্চর্য্য হলো। কারণ এই দেড় বছর ধরে, জগমোহনের অসুখ চল্‌ছে তাতে যাঁরা একটু খবরও নেন নি—তাঁদের কেউ যে হঠাৎ এখানে এসে উঠবেন এটা তার আশ্চর্য্য লাগ্‌ছিলো। বল্‌লে, "হঠাৎ—দেখতে নাকি? কেমন চল্‌ছে সব?"

"না, থাক্‌তে!—" "থাক্‌তে? তবেই হয়েছে। তা হলে অন্য বাড়ীর সন্ধান করতে হয়। কাকাবাবুর ওপর আর কত চল্‌বে? তুমি তো ভাবিয়ে তুল্‌লে।"

"ভাবনাই বা কিসের! এক তো আমাদের জন্যে? তা তুমি তো সারাদিন আফিসে—আর আমি আমাকে ধরে মারলেও কথা বল্‌ব না। তা হলে তো আর ভাবনার কিছু নেই।"

"শুধু কি তোমার কথা? প্রভাস আছে, আমি আছি, বাবা আছেন—তুমি আছ হয়তো বা প্রণবও আছে—সে যা গোঁয়ার!"

মীনা এবার হেসে অস্থির। বল্‌লে "থাম্‌লে কেন? বলো নন্দা—ঠাকুরপোর জন্যে তোমার কি ভাবনা? তিনি তো তাঁর জামাই আর একমাত্র।"

"তুমি দেখো—গোলমাল যদি হয় তো প্রণবের সঙ্গেই হবে—আর কারো সঙ্গে হবে না।

প্রভাত খুব গম্ভীর হয়ে চলে গেল।

এর তিনদিন পরে নন্দা তার মাকে নিয়ে এসে উঠলো। সঙ্গে এলো তাঁর পুরোণো ঝি কদম—নন্দা মাকে নিয়ে নিজের ঘরে গিয়ে উঠলো। মীনা একবার সেখানে দাঁড়িয়ে, ঝি কদমকে জিজ্ঞাসা করে সব জেনে নিয়ে, মিছরী ভিজিয়ে দিয়ে, তাঁর আহ্নিকের জোগাড় করে দিয়ে, কিছু ফল আন্‌তে প্রভাসকে দোকানে পাঠালো।

কারামোহ

মহম্মদ এছহাক বি-এ

ভূমধ্যসাগরের তীরে ফ্রান্স ও ইটালী রাজ্যের সন্ধিস্থলে মোনাকো নামক একটী অতি ক্ষুদ্র রাজ্য আছে। অনেক ক্ষুদ্র গ্রাম্যনগরীও ইহা অপেক্ষা অনেক বড়। লোকের সংখ্যা মাত্র সাত হাজার। রাজ্যের সমস্ত সম্পত্তি বণ্টন করিলে প্রতি অধিবাসী এক বিঘা জমিও পায় না। কিন্তু এই খেলনা রাজত্বের আবার একজন স্বাধীন রাজা আছেন এবং তাঁহার রাজপ্রাসাদ, সভাসদ্, মন্ত্রী, বিশপ, সৈন্যাধ্যক্ষ ও সেনা সবই আছে।

সৈন্য সংখ্যা ষাইট জন মাত্র কিন্তু তথাপি সেনা ত বটে! এখানেও প্রজার নিকট হইতে যথাবিধি কর সংগৃহীত হয়। তামাক ও মদের উপর শুল্ক ধার্য্য আছে। তাহা ব্যতীত পূর্ব্বে জেজিয়ার মত এক প্রকারের করও প্রচলিত ছিল। এততেও রাজার রাজত্ব চলিত না, যদি না তিনি অর্থসংগ্রহের এক নূতন পন্থা উন্মুক্ত করিতেন। পন্থাটী এই, যে, ইউরোপের অন্যান্য রাজ্যে যখন জুয়াখেলা বন্ধ হইয়া গেল, তখন এই রাজা নিজের রাজ্যে উহা প্রচলিত রাখিলেন। ইউরোপবাসী অন্যান্য যে কোন দেশের লোক জুয়া খেলিতে ইচ্ছুক হইলে, কেবল এখানে আসিয়াই সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে পারিত। জুয়াড়ীদিগের নিকট হইতে রাজা মোটা অর্থ পাইতেন। এক প্রকার তাহা হইতেই রাজ্যের ব্যয় নির্ব্বাহ হইত।

রাজার রাজ্যাভিষেক এবং রাজ দরবার আছে তিনি প্রজাদিগকে পুরস্কৃত ও দণ্ডিত করেন; আবার ক্ষমাও করিয়া থাকেন। অন্যান্য রাজার ন্যায় তাঁহার পুনর্ব্বিচার প্রথা, মন্ত্রণা সভা এবং আইন আদালত সবই আছে—কেবল ক্ষুদ্রাকৃতিতে।

এ হেন পুতুল রাজার দেশে সহসা এক নরহত্যা সংঘটিত হইল। ঐ দেশের লোক সকলেই শান্তিপ্রিয় ছিল। এরূপ ঘটনা পূর্ব্বে কখনও ঘটে নাই। বিচারকযোগ্য প্রথাঅনুযায়ী মামলা শেষ করিলেন। জজ, জুরী, বাদী ও ব্যারিষ্টার সকলেই উপস্থিত ছিলেন। বহু তর্ক-বিতর্কের পর জুরিগণের সহিত একমত হইয়া জজেরা রায় দিলেন, যে, আইন অনুযায়ী আসামীর শিরশ্ছেদন করা হইবে। অনুমোদনের জন্য আদেশপত্র রাজার নিকট প্রেরিত হইল। রাজা দণ্ডাদেশ অনুমোদন পূর্ব্বক বলিলেন, "যদি লোকটাকে হত্যা না করিলেই নয়, তবে হত্যা কর।"

কিন্তু এই ব্যাপারে একটু গোলযোগ উপস্থিত হইল। ঐ দেশে না ছিল কোন শিরশ্ছেদন যোগ্য অস্ত্র, না ছিল ঘাতক। মন্ত্রিগণ একত্রিত হইয়া সাব্যস্ত করিলেন, যে, ফ্রেঞ্চ সরকারকে জিজ্ঞাসা করা হউক, যে, তাহারা অস্ত্র এবং ঘাতক সরবরাহ করিতে পারে কি না, এবং পারিলে সে বাবদ কি পরিমাণ ব্যয়ের আবশ্যক হইবে? পত্র লেখা হইল। সপ্তাহ পরে উত্তর আসিল,—অস্ত্র ও ঘাতক দেওয়া যাইতে পারে, খরচ বাবদ ১৬০০০ ফ্রাঙ্ক লাগিবে। রাজা চিন্তা করিলেন, যোল হাজার ফ্রাঙ্ক। হতভাগাটাকে বিক্রয় করিলেও ত এত টাকা হয় না।" তিনি বলিলেন, "অল্প খরচে কার্য্যটী নির্ব্বাহ করা যায় না কি? যোল হাজার ফ্রাঙ্ক দিতে হইলে লোক সংখ্যা হিসাবে মাথা প্রতি দুই ফ্রাঙ্কেরও অধিক পড়ে। প্রজাগণ ইহাতে সম্মত হইবে না; চাই কি, তাহারা বিদ্রোহও ঘোষণা করিতে পারে।"

সুতরাং কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের জন্য একটী সমিতি গঠিত হইল। স্থির হইল, ইটালীর রাজার নিকটও ঐ একই প্রশ্ন পাঠান হউক। ফরাসী গবর্ণমেণ্ট গণতন্ত্রমূলক—তাহারা রাজার প্রতি যোগ্য সম্মান দেখায় না, ইটালীর অধিপতি ভ্রাতৃতুল্য। তিনি এই কার্য্যটী স্বল্পব্যয়ে নির্ব্বাহ করাইয়া দিতে পারেন। পত্র লেখা হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে উত্তরও আসিল।

ইটালীর গবর্ণমেণ্ট আনন্দের সহিত ঘাতক ও অস্ত্র দিতে প্রস্তুত, যাতায়াতের খরচা সমেত সাকুল্য ব্যয় ১২০০০ ফ্রাঙ্ক লাগিবে। অনেকটা সস্তা বটে, কিন্তু তবু ঢের বেশী বোধ হইতে লাগিল। লক্ষীছাড়াটার মূল্যও ত অত নয়। যাহা হউক, পুনরায় সমিতির বৈঠকে অনেক যুক্তি তর্কের পর মীমাংসা হইল যে, তাহাদের কোন সৈনিক হয়ত, যে কোন গতিকে কার্য্যটী সমাধা করিতে পারে। সেনাপতি সৈন্যদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু কেহই তাঁহার কথায় সম্মত হইল না। বলিল, "যুদ্ধ শিখিয়াছি বটে, কিন্তু ঘাতকতা কেমন করিয়া করিতে হয় তা আমরা জানি না। আমাদিগকে উহা শিখান হয় নাই।"

তাই ত কি করা যায়! পুনরায় মন্ত্রিগণ বিবেচনা ও পুনর্ব্বিবেচনা আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা কমিশন কমিটী ও সাবকমিটী গঠন করিয়া অনেক যুক্তির পর স্থির করিলেন, যে, মৃত্যুর আদেশ পরিবর্ত্তন করিয়া যাবজ্জীবন কারাবাসের আদেশ দেওয়াই সর্ব্বাপেক্ষা যুক্তিযুক্ত। ইহাতে রাজার দয়াও দেখান হইবে, সঙ্গে সঙ্গে কাজটীও অল্প ব্যয়ে সম্পন্ন হইয়া যাইবে।

রাজা সম্মত হইলেন, সুতরাং আর কোন মতদ্বৈধ রহিল না। কিন্তু ইহাতে কেবলমাত্র একটু অসুবিধা হইল যে, যাবজ্জীবন কারাবাসের আদেশ প্রাপ্ত ব্যক্তির জন্য উপযুক্ত কারাগার ছিল না। মোটে ক্ষুদ্র একটী হাজতখানা ছিল—সেখানে কখন কখন দোষী ব্যক্তিকে অস্থায়ীভাবে আবদ্ধ রাখা হইত। চির-কারাবাসীর উপযোগী সুদৃঢ় কোন জেলখানা ছিল না। যাহা হউক, তাঁহারা কোনক্রমে একটী চলনসই স্থান আবিষ্কার করিয়া দণ্ডপ্রাপ্ত যুবককে আবদ্ধ করিলেন এবং সেখানে একজন রক্ষক নিযুক্ত করিলেন। রক্ষকের কার্য্য হইল তাহাকে পাহারা দেওয়া। রাজবাড়ীর পাকশালা হইতে তাহার খাদ্য আনিয়া দেওয়া, ও তাহার যাবতীয় প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহ করা।

এরূপভাবে এক বৎসর কাল কাটিয়া গেল। বৎসরান্তে রাজা একদিন আয়-ব্যয়ের হিসাব দেখিতে বসিয়া খরচের একটী নূতন সূত্র লক্ষ্য করিলেন। সূত্রটী সেই কয়েদীর জন্য ব্যয়—নিতান্ত কম নয়। একজন স্বতন্ত্র রক্ষক নিযুক্ত করিতে হইয়াছে। তাছাড়া দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে অন্ন-বস্ত্র দিতে হইতেছে। ইহাতে এক বৎসরে ছয় শত ফ্রাঙ্কেরও অধিক লাগিয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে লোকটা বেশ স্বাস্থ্যবান এবং যুবক মাত্র; সে যে আরও অন্ততঃ পঞ্চাশ বৎসর বাঁচিবে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। এই সব বিষয় ধীরভাবে চিন্তা করিলে, বাস্তবিকই শিহরিয়া উঠিতে হয়। সর্ব্বনাশ! রাজা মন্ত্রিগণকে ডাকিয়া বলিলেন; "আপনারা এই নরাধমের জীবন যাত্রার কোন সুলভ পন্থা আবিষ্কার করুন। এপন্থা বড়ই ব্যয় সঙ্কুল।"

মন্ত্রীগণ একত্রিত হইয়া বিষয়টী আলোচনা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের একজন দাঁড়াইয়া বলিলেন,—"ভদ্রমহোদয়গণ, আমার মতে রক্ষককে বিদায় করিয়া দেওয়াই যুক্তিযুক্ত।" অপর এক মন্ত্রী বলিলেন,—"তাহা হইলে লোকটী পালাইয়া যাইবে যে!" প্রথম বক্তা বলিলেন,—"যায় যাউক—ও আপদ গেলেই ভাল।" মন্ত্রী-গণ নিজেদের অভিমত রাজার নিকট ব্যক্ত করিলে, তিনি তাহাতে সম্মতি দিলেন। রক্ষককে বিদায় করিয়া দেওয়া হইল এবং কি হয় দেখিবার জন্য তাঁহারা অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

কিছুই হইল না। বন্দী প্রচণ্ড উত্তেজনার বশে সহসা নরহত্যা করিলেও স্বভাবতঃ সে অত্যন্ত আয়েসপ্রিয়, নিরিবিলি ধরণের লোক ছিল। বহির্জগতে তাহার বিশেষ কোন বন্ধন ছিল না। সে যাহা চায় কারাগারে আসিয়া যেন তাহাই পাইয়াছিল—নিয়মিত আহার নিদ্রা ও অনাবিল শান্তি, জীবিকা-নির্ব্বাহের জন্য এতটুকু উদ্বেগেরও আবশ্যক নাই। আর চাই কি।

সুতরাং মধ্যাহ্ন ভোজনের সময় দণ্ডিত ব্যক্তি বাহিরে আসিয়া যখন রক্ষককে দেখিতে পাইল না, তখন কিঞ্চিৎ বিরক্তি প্রকাশ পূর্ব্বক নিজের খাদ্য নিজেই লইয়া আসি-বার জন্য রাজবাড়ীর পাকশালায় গেল। তাহাকে যে খাদ্য দেওয়া হইল, তাহা লইয়া সে কারাগারে ফিরিয়া আসিল, এবং স্বয়ং কারাদ্বার বন্ধ করিয়া ভিতরে রহিল। পরবর্ত্তী দিনেও সে ঐরূপ করিল। তাহার ব্যবহারে

পলায়ন করিবার চিহ্নমাত্রও প্রকাশ পাইল না। তাইত কি করা যায়। ব্যাপারটি পুনর্ব্বিবেচনা করা হইল।

তাঁহারা স্থির করিলেন, "আমরা এবার তাহাকে সোজা কথায় বলিয়া দিব যে আমরা আর তাহাকে চাহি না।" সুতরাং বিচার সচিব তাহাকে নিকটে আনয়ন করিয়া বলিলেন, "তুমি পলায়ন কর না কেন? তুমি যেখানে ইচ্ছা যাইতে পার, রাজা তাহাতে কিছু মনে করিবেন না।"

লোকটি উত্তর করিল, "সে কি কথা, তোমাদের আশ্রয় ছাড়া আমার দাঁড়াইবার স্থান কোথায়? বাহিরের লোক কেহই আমাকে সুচক্ষে দেখিবে না, অধিকন্তু আমার কার্য্য করিবার ক্ষমতা সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তোমরা আমার সহিত যেরূপ ব্যবহার করিয়াছ, তাহা কোনমতেই উচিত হয় নাই। প্রথমতঃ যখন মৃত্যুর আদেশ দিয়াছিলে, তখন আমাকে হত্যা করাই তোমাদের উচিত ছিল। কিন্তু তাহা কর নাই। এটী একটি মহাক্রটী। দ্বিতীয়তঃ, তোমরা আমাকে যাবজ্জীবন কারাবাস দিয়া আমার খাদ্যাদি আনয়নের জন্য একজন ভৃত্য নিযুক্ত করিয়াছিলে, কিছুদিন পরে তাহাকেও অপসারিত করিলে, এবং আমাকে নিজের খাদ্য নিজেই আনিতে হইল। ইহাতেও আমি তোমাদিগকে কিছু বলি নাই। কিন্তু এবার তোমরা স্বয়ং আমাকেই বিদায় হইতে বলিতেছ, আমি ইহাতে রাজী হইতে পারি না। তোমরা যাহা খুসী করিতে পার, আমি কিছুতেই যাইব না।"

এখন কি করা যায়? পুনরায় সমিতির বৈঠক বসিল। তাঁহারা চিন্তা ও গবেষণা করিতে লাগিলেন,—তাঁহাদের কোন্ পন্থা অবলম্বন করা উচিত। সাব্যস্ত হইল, তাহাকে দূর করার একমাত্র উপায় তাহার জন্য একটী বৃত্তি নির্দ্ধারিত করা। তদনুযায়ী তাঁহারা রাজার নিকট রিপোর্ট করিলেন—'ইহা ব্যতীত অন্য কোন উপায় নাই। আমরা যে কোন উপায়ে তাহার হস্ত হইতে নিস্তার লাভ করিবই'। বার্ষিক ভাতা ছয় শত ফ্রাঙ্ক সাব্যস্ত হইল এবং কারাবাসীকে তাহা জানান গেল।

সে বলিল, "আচ্ছা, যতদিন তোমরা ঐ টাকা নিয়মিত-ভাবে দাও, ততদিন আমি তোমাদের প্রস্তাবে সম্মত আছি এবং ঐ চুক্তিতে প্রস্থান করিতেও রাজী হইলাম।"

এইরূপে ব্যাপারটি মীমাংসা হইয়া গেল। বার্ষিক বৃত্তির এক তৃতীয়াংশ সে অগ্রিম প্রাপ্ত হইয়া রাজার রাজ্য ত্যাগ করিল।' রেলযোগে রাজ্য অতিক্রম করিতে মাত্র তাহার পনর মিনিট সময় আবশ্যক হইয়াছিল। সে রাজ্যের সীমান্ত প্রদেশে আসিয়া একটুখানি জমি ক্রয় করিল, এবং সেখানে একটি শব্জীবাগ খুলিয়া এখন বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে আছে। যথা সময়ে বৃত্তির টাকা আনিতে রাজদরবারে যায়। টাকা পাইলে জুয়ার আড্ডায় গিয়া দুই তিন ফ্রাঙ্ক বাজী রাখে। সেখান হইতে কখন বা হারিয়া, কখন বা জিতিয়া সে বাটী প্রত্যাগমন করে। সে বেশ শান্তিপূর্ণ নিরিবিলি জীবন যাপন করিতেছে। তবে এখনও নাকি কর্ম্মহীন, উদ্বেগহীন কারাজীবনের স্মৃতি মধ্যে মধ্যে তাহাকে পীড়া দেয়।*

* টলষ্টয়ের 'Too dear' নামক গল্প অবলম্বনে।

এক পাতা

কুমার কোকনদাক্ষ রায়

হেলিয়োট্রোপ রংএর শাড়ী-পরা মেয়ে।

তার সাথে দেখা হোল নীল সায়রের কূলে।

দুজনে যখন ফিরে এলুম তখন আকাশ তারায় তারায় ভরে গিয়েছে,—সাগরের বুকে সুন্দরী চাঁদের নাচের মজলিস ব'সেছে।

নাম তার অসিতা।

তার চোখ দুটীর ভেতর দিয়ে যেন আমি তার অন্তরতম ভাষাটী পর্য্যন্ত দেখতে পেতুম—তার সেই চোখ দুটী আমায় কোন এক স্বপ্নলোকে নিয়ে যেত।

° ° ° °

"আজি বারি ঝরে ঝর ঝর
ভরা ভাদরে,
আকাশ-ভাঙা আকুল ধরা
কোথাও না ধরে"...

ঘুম ভাঙ্গতেই প্রভাতী বায়ুর সাথে বর্ষার সজল অন্ধকারের মেঘ-মল্লারের গান পাশের ঘর থেকে ভেসে আসছে, বড় মধুর শোনাচ্ছে—এতে বিরহের সুর একটুও নেই। আমার মনে হচ্ছে যেন আমার মন্দির পূর্ণ, হৃদয় কাণায় কাণায় ভরা। মাঝে মাঝে যখন আমার চোখ দুটী তার উজ্জ্বল কালো চোখ দুটীর ওপর গিয়ে পড়ে, কিসের আলো ঐ চোখ দুটীতে জ্বল্ জ্বল্ কোরে ওঠে?

সে কি প্রেমের না করুণার?

মাঝরাত্রে যখন ঘুম ভেঙ্গে যায়, চারিদিক এত নিস্তব্ধ, মনে হয় পৃথিবীর বুকের স্পন্দনধ্বনি শোনা যাচ্ছে। যেন ক্লান্ত শ্রান্ত ধরণী সারাদিন অগণিত পথিকের পায়ে চলার ভার বয়ে বয়ে শ্রান্ত হয়ে পড়েছে—তার সেই শ্রান্তির দীর্ঘনিঃশ্বাস প্রহরে প্রহরে কোন এক অজানা ব্যথায় কেঁপে উঠছে। সেই স্পন্দন ধ্বনির সাথে আমার পূর্ণ হৃদয়টীও যেন তালে তালে একই সুরে, একই ছন্দে রয়ে রয়ে বেজে চলেছে।

সম্মুখের জানালার দিকে অনিমেষ নয়নে রাত্রের গভীর অন্ধকার ভেদ কোরে চিরপিপাসু দৃষ্টিতে চেয়ে থাকি; সেখানেও প্রেম করুণা ভরা আর একখানি অনিদ্র হিয়াও কি ধুকধুক কোরতে থাকে? তার ঐ হিয়ার স্পন্দন যেন আমার হিয়ার স্পন্দনের সাথে তালে তালে বাজতেই থাকে; পৃথিবীর চিরন্তনী স্পন্দনের মত সে ধ্বনি যেন কোনোদিনও না থামে। বাতাস থমথমে হয়ে থাকে। তারাগুলো এত কাছে মনে হয়, যেন মাথার ওপর আলোর মালা জ্বালিয়েছে।

* * * *

"সুরের আলো ভুবন ফেলে ছেয়ে,
সুরের হাওয়া চলে গগন বেয়ে,
পাষাণ টুটে ব্যাকুল বেগে ধেয়ে,
বহিয়ে যায় সুরের সুরধুনী"—

আজকাল সুরে সুরে দিনরাত ভরে গিয়েছে। রাত্রের সব কাজ সেরে খোলা জানলার কাছে অসিতা তার সেতার নিয়ে বসে। তারা ভরা রাত্রের প্রহরগুলি সুরের ঝঙ্কারে ভরে যায়। তারই মন্ত্রশক্তি ছড়িয়ে পড়ে, ভুবনে, ভুবনে, আকাশে, আকাশে, বাতাসে, বাতাসে, লতায়, লতায়, জলে স্থলে ভেসে ওঠে এক অপূর্ব্ব মায়ার পরশ—ছন্দহীন, সংজ্ঞাহীন, শক্তিহীন। সেই সুর-ঝঙ্কার-ভরা রাত জীবনে আমার ক'টাই বা এসেছে, ক'টাই বা আসবে? মিলনের সুর সমানে বেজেই চলেছে···

প্রতিদিন প্রতিক্ষণ আসে তার অতুল সম্পদ নিয়ে, আবার মিলন-খেলার শেষে ক্লান্ত দিবসগুলি, অস্ত-রবির শেষ শিখাটীর সাথে কোন্ অনন্ত আঁধারে তলিয়ে যায়। অসিতার পূর্ণ হিয়ার স্পর্শে আমার হৃদয়ে এক অপূর্ব্ব ভাব এসেছে। সে যখন সেতার নিয়ে বসে, তার সেই সেতারের মীড়ের করুণ রাগিণীর মত আমার হিয়ার অন্তরতম তন্ত্রীটিও কিসের অজ্ঞাত বেদনায় আরও করুণ

সুরে বেজে ওঠে, সমস্ত দেহ মন কেঁপে ওঠে সেই সুরের হিল্লোলে।

"কইতে কি চাই কইতে কথা বাধে,
হার মেনে যে পরাণ আমার কাঁদে,
আমায় তুমি ফেলেছ কোন্ ফাঁদে,
চৌদিকে সুরের জাল বুনি"—

এমনি কোরে অসিতার অপূর্ব্ব সুরের ভিতর নিজেকে হারিয়ে ফেল্লাম। আমাদের এই মিলনের সুরে কোনোদিন যে বিচ্ছেদের বেসুরা রাগিণী বাজবে কল্পনাও করিনি।

*   *   *   *

সুখের পর দুঃখ, আনন্দের পর নৈরাশ্য, আলোর পর আঁধার; তেমনি আমাদের মিলনের পর এল বিচ্ছেদ, তার বিষাদ কালো রূপ নিয়ে। স্বপ্নেও ভাবিনি এই আমাদের চির বিচ্ছেদ······

এই বিচ্ছেদ এল আমাদের মিলন সভায়, শিশির ভেজা ঘাসের ওপর দিয়ে চুপে চুপে স্পন্দিত পদে দুলে দুলে আমাদের অজ্ঞাতে—একেবারে অজ্ঞাতে।

এক বসন্তপ্রাতে এসে অসিতা বল্লে—"তবে আসি?" তখন দেখতে পেলাম রৌদ্রোজ্জ্বল আকাশের ওপর দিয়ে একখানা লঘু মেঘ চলে গেলে নিম্নের প্রদীপ্ত ভূমি যেমন মলিন হয়ে যায়—অসিতার সুন্দর মুখখানিও ঠিক তেমনি মলিন হয়ে গেছে। শুধু মুহূর্ত্তের জন্য অসিতার ওষ্ঠাধরে, অপরাহ্নকালের দিক চক্রবালের নিঃশব্দ বিদ্যুৎ-প্রভার মত, ক্ষীণ একটী ম্লান হাসির রেখা দেখা দিয়ে আবার মিলিয়ে গেল। সে যেন বলে গেল—

"বসন্তের এই ললিত রাগে
বিদায় ব্যথা লুকিয়ে জাগে
ফাগুন দিনে গো
কাঁদন ভরা হাসি হেসেছি।"

ধীরে ধীরে গাড়ীটা পথের শেষপ্রান্তে মিলিয়ে গেল, যেন সাঁঝের বেলায় খাঁচার পাখীটা দূর দিগন্তে অস্তরবির গোধূলির রাঙা আলোর সাথে একেবারে কোন্ স্বপ্নালোকে বিলীন হয়ে গেল। আজ অসিতার বিদায়ের দিন। সে চলে গেল।

সারারাত আর ঘুম হয় না। নীল আকাশের সাগর ভরে অগণিত তারার উজ্জ্বল দীপগুলোর দিকে চেয়ে থাকি; বারবার মনে হয় মৃত্যু আমায় ডাকছে, চুপে চুপে সে বলছে, নিয়ে যাবে সে, গ্রহে গ্রহে তারায় তারায় নীহারিকার অগ্নিময় পথ দিয়ে--লোক লোকান্তরে······ অন্তহীন পথ-যাত্রায়, মঙ্গলগ্রহ প্রদক্ষিণ কোরে, বৃহস্পতি পেরিয়ে অগ্নি-মেখলা শনি ডিঙ্গিয়ে, ইউরেনাসের পাশ দিয়ে বরুণ তারা ছাড়িয়ে সে একেবারে নিয়ে যাবে অসীম তারালোকে! সারারাত হাওয়ার কত রকমের শব্দ, গাছগুলো দুলিয়ে পাশের বাড়ী কাঁপিয়ে সে বারবার বোলছে কোথায় যাবে? তারাগুলো দীপ্ত চোখে চেয়ে ডাকছে—এসো—এসো—এসো।

ভোরের আলোর সাথে একে একে তারাগুলো সব মিলিয়ে গেল—অরুণবরণা উষার কোলে সূর্য্য সোনার শিশুর মত জন্ম নিল—চারিদিক আলোয় আলোয় ভরে গেল। আমার অনিদ্র ক্লান্ত আঁখির উপরও এক ঝলক প্রভাতী আলো এসে ছিটিয়ে পড়ল—সঙ্গে সঙ্গে মনে করিয়ে দিলে জীবনের চিরজাগ্রত সত্যকে।

°   °   °   °

আজ অনেকদিন পরে এই মাধবীরাতে কি জানি কেন অসিতাকে মনে হোল। আজ প্রাণের ভেতর থেকে সমানে প্রশ্ন উঠছে—আমি যে বালু বেলার উপর অসিতার ঠোঁটের উপর ঠোঁট রেখে "ভালবাসি, বড় ভালবাসি" বলেছিলাম, সে কি সত্যিকারের "ভালবাসা", "লাভ্", "প্রেম" না ফুটনোন্মুখ যৌবনের শুধু রঙিন নেশা, যার মোহন অঞ্জনে পৃথিবীর যা কিছু সবই রঙিন হয়ে চোখের সামনে ফুটে ওঠে?

পুষ্পপাত্র ফটোগ্রাফ প্রতিযোগিতা— ৭নং

১ম পুরস্কার

ঝরণা

শ্রীনীহার রঞ্জন গুপ্ত

কৃষ্ণনগর

২য় পুরস্কার

সাঁজের বেলা

শ্রীসলিল মিত্র

কলিকাতা

লক্ষ্মীবিলাস প্রেস লিঃ, কলিকাতা
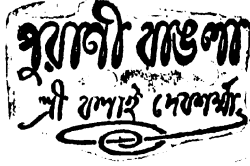
শ্রীবলাই দেবশর্ম্মা

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

ঘরের কথা

'উপরে ন্যাকোন্-চোকন, ভেতরে খ্যাড়ের বোঝা' এইরূপ একটা বাক্য এদেশে প্রচলিত আছে। বর্ত্তমান অবস্থাটা অনেকটা এইরূপ দাঁড়াইয়াছে। বাহিরে দেখা দিয়াছে একটা ঔজ্জ্বল্য, ভিতর কিন্তু অন্ধকার। কাপুড়ে সভ্যতার প্রচণ্ডতায় বাঙলার গৃহ একেবারে শূন্য হইয়া পড়িতেছে। ঘর ত নাই-ই, সবই বাসা। এ বাসাও সমুদ্রে ধ্বংসের উদ্বেলিত বক্ষ বিস্তারে। যাউক এ কথা, কথা হইতেছে বাঙ্গালী বড়ই গৃহ-প্রিয় ছিল। এই ঘর পাইয়া তাহার কত আগ্রহ, কত যত্ন, কত মমতাই উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত বক্ষ্যমান বক্তব্যে তাহাই দেখিতে চেষ্টা করিব।

ঘর-গৃহস্থালীকে সাজান-গোছান বাঙালীর কত আদরেরই না ছিল! এই সাজান র‍্যাফেলের চিত্র দিয়াও নহে। জাপানী ভেস্ দিয়াও নহে। অথবা অর্কিড বা ক্রেটনের বাহার খেলাইয়াও নহে। বরং ইহার বিপরীত। বাগান-বাগিচা, ক্ষেত-খামার এবং পুষ্করিণী গৃহস্থের ইহা একটা লক্ষণ ছিল। সম্পন্ন গৃহস্থের একটা পরিচয় দিতে হইলে এইরূপ ভাষা ব্যবহার করা হইত যে ক্ষেতে খামারে জাজ্জ্বল্যমান।

এখন যাহাদের জনসাধারণ বলিয়া রাষ্ট্রীক পরিভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে চাহি, পূর্ব্বে তাহাকে বলিতাম গৃহস্থ, কতকগুলি নর-নারীর একত্র সমাবেশই গার্হস্থ্য জীবন নহে। কোনও গতিকে আনা, লওয়া, খাওয়া ইহাও গৃহস্থালী নহে। গৃহস্থ-জীবন একটা শিষ্ট রীতি। খাওয়া এবং খাওয়ানো। আনা ও দেওয়া। উহা যেন একটা হৃদ্‌যন্ত্র আকর্ষণ এবং বিকর্ষণ! বঙ্গ গৃহস্থালির লক্ষ্য দশজনের সহিত জীবন-যাপনা। সেই জন্য গৃহস্থ জীবনের একটা বৈধ অনুষ্ঠান আছে।

বাঙলায় একটা প্রবাদ বাক্য আছে, যে গৃহে গাভী ও তুলসী বৃক্ষ নাই, তাহা শ্মশান তুল্য। তাই গোপালন গৃহস্থালির একটা অপরিহার্য্য অঙ্গ ছিল। অধিকাংশ গৃহেই গোয়াল থাকিত, থাকিত গোয়াল পোরা বকনা গাভী! হাল লাঙ্গলও প্রতি গৃহস্থকে রাখিতে হইত। প্রায় প্রত্যেকেই পুষ্করিণী না হউক একটা ডোবাও কাটাইত। আজও যে বাংলার পল্লী-ভবনগুলিতে অসংখ্য খানা ডোবা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা ঐ পুরাতন বাংলার জীবন রীতির অবশেষ। ক্ষেত খামারের সহিত বাগান বাগিচাও প্রত্যেকের একটা সম্পত্তিরূপে পরিগণিত হইত। যাহার উদ্যানের উপযুক্ত ক্ষেত্র থাকিত না, সে আঙিনার মাঝে দুইটা লাউ কুমড়া বেগুন সীমের গাছ রোপন করিয়া নিত্যকার সাংসারিক অভাব মিটাইয়া লইত।

এখন দুইবেলা বাজার, দুইবেলা কেনাকাটি। এক পয়সা আয় হইলে দুই পয়সা ব্যয় হইয়া যায়। লক্ষ্মী যেন ছুটিতেছেন। তাঁহাকে ধরিয়া রাখিবার উপায় নাই। কিম্বা আমরাই যেন তাঁহাকে তাড়াইয়া দিতেছি। কোন রূপেই গৃহে থাকিতে দিব না এমনি করিয়া বিদায় করিয়া দিতেছি। একটুখানি উঠান খুড়িয়া দুইটা শাকের বীজ ছড়াইয়া দৈনিক দুইটা পয়সাও বাঁচিয়া যায়। কিন্তু এই ব্যবস্থায় প্রাচীনতা আছে.

বলিয়া উহা বর্জ্জন করিয়াছি। টাট্‌কা শাক্ শব্‌জিতে খাদ্যপ্রাণ 'ভাইটামিন' আছে বলিয়া প্রত্যহ চারি পয়সার শাক কিনিব, তবু দুই কোদাল মাটি কোপাইয়া একটু শাকের ক্ষেত করিব না। অথচ পঁচিশ ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বেও দেখিয়াছি গ্রাম্য জমিদার গৃহিণী শাকের ক্ষেত খুঁড়িতেছেন, কুমড়া ও লাউয়ের মাচা করিয়া দিতেছেন, বেগুনের গাড়ায় গোড়ায় জল ঢালিতেছেন।

পুরাণী বাঙলার কথা কহিবার কোনই প্রয়োজন দেখি না। একটি মাত্র প্রয়োজন গত দিনের ও আধুনিক দিনের তুলনায় সমালোচনা করিয়া পরিবর্জ্জন ও গ্রহণ। আধুনিক নাকি সমুন্নত, সভ্যতর ও সম্পূর্ণ। কিন্তু এই সমৃদ্ধ আধুনিকে কি পাইয়াছি ও কি হারাইয়াছি, তাহাও ত বিচার করিতে হইবে। উন্নতির দীপ্ত দিনে আর কি হইয়াছি তাহা বলিতে পারিনা, তবে একেবারে যে নিঃস্ব, রিক্ত ও পথের পথিক হইয়া পড়িয়াছি, তাহাতে আর সন্দেহ করিবার কিছুই নাই। পুরাণী দিনে কিন্তু অন্ন বস্ত্র ছিল, ছিল স্বাস্থ্য ও শক্তি, আর ছিল প্রাণের মাঝে অপরিমেয় আনন্দ। আজ শুধু দীর্ঘশ্বাস!

শুকাইয়া মরিয়া সভ্য হইতে পারিনা ও চাহিনা। জগতের কোন মানুষ ও কোন জাতিই এমন হইতে সম্মত নহে। সেই জন্য প্রাচীন দিনের অর্থনীতিক ব্যবস্থাটা পর্য্যবেক্ষণ করিতে চাহিতেছি। পূর্ব্বে বাংলার অতি অল্প গ্রামেই দৈনিক হাটবাজার বসিত। বিশ পঁচিশখানি গ্রামের মধ্যে একটী হাট বসিত। হাট সপ্তাহে দুই দিন বসিবার নিয়ম। পাচের হাট আর তিনের হাট। অর্থাৎ সপ্তাহে রবিবার ও বৃহস্পতিবার কিম্বা সোমবার এবং শুক্রবার এই দুই দিন হাট বসিত। তাহাতেই লোকের যাবতীয় প্রয়োজন সিদ্ধ হইত।

নগদ অর্থ দিয়া কেনাকাটার রীতি ছিল না বলিলেই হয়। ক্ষেতের ধান, পুকুরের মাছ, উঠানের শাক শবজি ইহাতে যে প্রয়োজন মিটিত, তাহা পর্য্যাপ্তরূপে। এখনকার মত হালুইকরের মিষ্ট সন্দেশ, লুচি কচুরি খাওয়ার রীতি ছিল না। গুড় মুড়ি অথবা নারিকেল নাড়ু। অথবা ক্ষীর ছানা। প্রায় প্রতি গৃহেই দুগ্ধ হইত। রপ্তানি খুব কম ছিল। কাজেই ক্ষীর ছানাও প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইত। পঁচিশ ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে টাকায় ল সের দুধ ও আটসের ছানা দেখিয়াছি। একজন অতি সাধারণ গৃহস্থের বাটীতেও ছানা ও গুড় দিয়া জলযোগের রীতি ছিল।

মৎস্যপ্রিয় বাঙ্গালীর মাছ নহিলে চলে না। খাদ্যে মাছের গন্ধও চাই। কিন্তু পল্লীতেও ১৲ টাকা পাঁচ সিকা মাছের সের। সহরের বাজারে বরং পাওয়া যায়, পল্লীতে প্রায় দুষ্প্রাপ্য। এমন যে কেন হইয়াছে, মাছ আর পাওয়া যায় না, যাইলেও দুর্ম্মূল্য। মাছের জন্য রাষ্ট্র কর্তৃপক্ষকে মৎস্য বিভাগ (Fishery Department) খুলিতে হইয়াছে আরও কত হইবে কে জানে!

বাংলার নালায় খালে মাছ পাওয়া যাইত। ছিপে মাছ ধরার রীতিও ছিল, বিলাসও ছিল। যে কোনও ডোবা ডহরে মাছ ধরিতে বসিলে নিমিষের মধ্যে প্রয়োজনাধিক মাছ পাওয়া যাইত। মাছ কিনিত খুব কম লোক। সকলেরই প্রায় পুকুর ছিল। যাহার থাকিত না, সে অন্যের পুকুরে ধরিয়া প্রয়োজন মিটাইত। এমনও দেখিয়াছি কাহারও গৃহে কুটম্ব আসিয়াছে মৎস্য প্রয়োজন। একখানা গাঁতি জাল ফেলিয়া মাছ ধরা হইল। হাটের দিন থাকুক বা না থাকুক, কাহারো গৃহে আত্মীয় স্বজন আসিলে মৎস্যের অভাব কেহই বোধ করিত না। যাহার পুষ্করিণীতে বেশী মাছ সেই খানে ধরাইয়া গৃহস্থকে পাঠাইয়া দেওয়া হইত। এমনি ছিল পুরাণী বাংলার সমবায় জীবন।

গৃহস্থ জীবনের খুঁটিনাটী হইতে তাহার বৃহৎ অনুষ্ঠান পর্য্যন্ত পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইবে। তবে তাহার সমগ্র প্রকৃতির পরিচয় পাওয়া যাইবে। আজ আমরা বৃহৎ বিল্ব দেখিয়া বস্তুর গুরুত্ব পরিমাপ করি। কিন্তু সেই বৃহতের জঠরে কতখানি শূন্যতা তাহার দাবদাহ লইয়া হাহাকার করিতে থাকে, তাহা দেখিতে পাই না, দেখিতে চাহিনা। অধুনাকার সভ্যতা নাকি অনুপম অতুলনীয়। কিন্তু এই সর্ব্বসুন্দর সভ্যতা যাহা উপহার দিতেছে, তাহা রাক্ষসীর আচারের অনুরূপ। অর্থশালী সন্তানসন্ততি লইয়া সুখে থাকিতে পারনা। অর্থের লালসায় পাশ্চাত্য ধনী পিতৃমাতা শিশুপুত্রকে হত্যা করা হইল। এমনি কত [illegible]। [illegible]

উদাহরণ দিব ? দিতে হইলে সাতকাণ্ড রামায়ণ হইয়া দাঁড়ায়। তাই বড় ছাড়িয়া ছোটর পরিচয় লইতে চাহিতেছি।

ঘরকে সাজাইয়া মাজাইয়া তোলা মানবের চিরন্তন প্রকৃতি। আজও ইহা আছে কালও ইহা ছিল; প্রভেদ কেবল ভঙ্গিমার। আজ গৃহকে সৌন্দর্য্যমণ্ডিত করিতে কত কি সংগ্রহ করিতেছি। এই সংগ্রহের মধ্যে অধিকাংশই বিলাস দ্রব্য—মহার্ঘ ও বৈদেশিক। গৃহস্থের অলিন্দে এখন দশটাকা মূল্যের একটা 'অর্কিড' শোভা পায়, কিন্তু একটা কদলী বৃক্ষ কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। সেকেলে বাঙালী গৃহস্থ যে সব ফুলগাছ রোপন করিয়া তাঁহার গৃহসজ্জা করিতেন, তাহা বাংলার স্বভাবজাত। উহা সংগ্রহ করিতে একটা কড়িও ব্যয় হইত না। অথচ সৌন্দর্য্য ও শোভনীয়তার অভাব হইত না। বাঙালীর উদ্যানে চীনের তাল বা সুইজারল্যাণ্ডের ফার্ন—থাকিত না বটে, থাকিত কলা গাছ, থাকিত নারিকেল ও কাঁঠাল গাছ।

সবই ভাবিয়া চিন্তিয়া বেশ হিসাব করিয়া করা হইত কিনা বলিতে পারিনা; তবে পুরাণী বাঙলার জীবন রীতিতে বেশ একটা অর্থনীতিক দূরদৃষ্টি ও স্বদেশিকতার পরিচয় পাই। বর্ত্তমানে যত সব 'ঠুনকো পল্কা' জিনিষ ক্রয় করিয়া আমরা অর্থের অপব্যবহার করি। তখনকার ঝোঁক ছিল পিত্তল কাঁসা ক্রয়ের দিকে। ফেরিওয়ালা সম্ভব চিরকালই আছে। এখনও আছে তখনও ছিল। এখন জামা, কাপড়, সেমিজ হাঁকিলেই বাঙ্গালী পুরাঙ্গনারা এক টাকার দ্রব্য পাঁচ টাকায় ক্রয় করেন; করিয়া কাপুড়ে সভ্যতার আনুকূল্য করেন। তখনকার অন্তঃপুরিকারাও যে বস্ত্রবসন ভালবাসিতেন না এমন বলিতেছি না, তবে তাঁহাদের ঝোঁক ছিল—পিতল কাঁসার দিকেই বেশী।

পূর্ব্বে গঙ্গাস্নান, দেবদেবী দর্শন ও পূজাপার্ব্বণ উপলক্ষ্যে তীর্থে বা দেবস্থানে গমন নারীজাতির একটা কর্ত্তব্য কর্ম্ম ছিল। এই উপলক্ষ্যে তাঁহারা কিছু না কিছু ক্রয় করিতেন। সেই ক্রীত দ্রব্যের মধ্যে অধিকাংশই থাকিত কাংশ ও পিত্তল নির্ম্মিত বস্তু। যেমন—বল্লুরে বাটী, কিস্তুরে থালা, খাগড়াই ঘটী ইত্যাদি ইত্যাদি। দেখিয়াছি বারুণীতে গঙ্গাস্নান করিতে গিয়া কেহ একটি চুমকি ঘটী কিনিয়া আনিতেছেন, ফুলদোল দেবদর্শন করিতে গিয়া একখানি জগন্নাথের থালা কিনিয়া আনিতেছেন। এমনি কত কি?

পুরাণী বাঙলার স্ত্রী ও পুরুষ প্রায় সমভাবাপন্ন ছিলেন। বিলাসী যে কেহ ছিল না—এমন বলিতেছি না। ঐ বিলাসী "অলবড্ডে" বলিয়া সমাজে নিন্দিত হইত। গৃহস্থ মাত্রেরই প্রবণতা ছিল জোত্র জমার দিকে। পুষ্করিণী বাগানের প্রতি। পল্লীর বিশেষ অর্থশালী ও প্রতিপত্তিসম্পন্ন ব্যক্তিকেও দেখিয়াছি, ক্ষেতের আইলে ঘুরিয়া কৃষিকার্য্যের তত্ত্বাবধান করিতে। এখন আভিজাত্য হইয়াছে মিনার্ভা মোটরে ও সুসজ্জিত ড্রয়িংরুমে—বৈঠকখানায়। তখন আভিজাত্যের শ্লাঘা ছিল ক্ষেতে খামারে ও বাজু বাউটীতে। বর্ত্তমানের অভিজাত দশ টাকার পেট্রল পোড়াইয়া বাবুয়ানী করেন, অথচ তাঁহার গৃহে আধভরির সোণা বা রূপাও পাওয়া যায় না। আর গরুর গাড়ীর দিনের বড়লোক—যিনি দশক্রোশ পায়ে হাঁটিয়া চলিতেন, তাঁহার গৃহে বিশ ভরি সোণা মিলিত।

এখনো ঘর একেবারে উৎসাদিত হয় নাই, তবে ভাঙ্গিতে বসিয়াছে। ঘরের প্রতি বাঙ্গালীর আর মমতা নাই। ঘর ও গৃহস্থালী এখনো আছে বটে, তবে তাহা ভৃত্য ও ঝি-তান্ত্রিক। গৃহিণী রন্ধনশালায় না গিয়া সিনেমা হাউসে। গৃহস্থ চণ্ডীমণ্ডপে না বসিয়া ক্লাবগৃহে। ঘর আছে মাত্র। থাকিবার প্রয়োজন হয়ত ফুরাইয়া আসিয়াছে। হয়ত বা অচির ভবিষ্যতে গৃহের প্রয়োজনই ফুরাইবে। হোটেলই হইবে জীবন সর্ব্বস্ব। যেমন পাশ্চাত্যের হইয়াছে।

সেকালের বাঙ্গালীর ছিল গৃহ অন্তঃপ্রাণ। সেই জন্য তাহার ঋদ্ধিও ছিল সমৃদ্ধ। আজ বাঙালীর গৃহে দুইখানা পোর্সিলেনের বাসন ও এ্যালুমিনিয়ামের ডিস্ ছাড়া আর কিছুই খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর হইয়াছে। পূর্ব্বে এক একটি গৃহস্থের গৃহ হইতে যে বাসন কোসন পাওয়া যাইত, তাহাতে পাঁচশত লোকের খাওয়ান দাওয়ান অবধি চলিত। এমন বৃহৎ সতরঞ্চ ও জাজিম থাকিত, যাহাতে সুবৃহৎ সভার কার্য্য অনায়াসে সম্পাদিত

হইত। সঙ্গতিপন্ন গৃহস্থের বাটীতে এক একটা বাসনের ঘরই থাকিত। এই বাসন কেবল মাত্র গৃহসজ্জা নহে, এক একটা সম্পত্তি বিশেষ। যে গৃহস্বামীর ঘরকন্নার তেমন দরদ থাকিত না, তাহাকে হাভাতে হাঘরে বলিয়া নিন্দা করা হইত।

এখন অনেক পল্লীতেই কোঠা বাড়ী হইয়াছে। শত বৎসর পূর্ব্বে ঠিক এরূপ ছিল না। খড়োঘরই ছিল আদরের আবাস স্থান। সেই সব ঘর নিতান্ত পর্ণকুটীর ছিলনা। তাহার নির্ম্মাণ কৌশল, তাহার ছন্দ, তাহার সৌষ্ঠব ছিল—মনোহর। দেখিলে চক্ষু জুড়াইয়া যাইত। অথচ ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহে যে ব্যয় হয় তাহার অর্দ্ধেক ব্যয়ও হইত না। কারণ মাঠের মাটি, জমির খড়, এবং ঝাড়ের বাঁশ ও বাগানের তালগাছে অনেক অর্থই বাঁচিয়া যাইত।

এই সব গৃহকে নিত্য পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন একটা অবশ্য কর্ত্তব্য ছিল। ঘর পরিষ্কারের নাম কাঁথে পাড়ে নিকান। অর্থাৎ আঙিনা হইতে উচ্চ দেওয়াল পর্য্যন্ত নিকানকে কাঁথে পাড়ে নিকান বলে। এই প্রাত্যহিক কার্য্য। অনেক ক্ষেত্রে গৃহিণীরই এইটি কর্ত্তব্য ছিল। স্বদেশী আন্দোলনের সময় বাংলা ১৩১৩ সালে রাঢ়ের এক পল্লীগ্রামে কোনও সামান্য কৃষিজীবির বাটীতে দেখিয়াছি গৃহিণী তাঁহার লতা দেওয়া শেষ করিয়া প্রায় দশটার সময় স্নান করিতে অবকাশ পাইলেন।

যে সম্পন্ন গৃহস্থের কথা উল্লেখ করিলাম, তিনি যেমন তেমন সম্পন্ন নহেন, তাঁহার বাড়ীতে অন্ততঃ পাঁচ হাজার মোন ধান্য বাঁধা দেখিয়াছি। তাহা ছাড়া পুকুর বাগান ক্ষেত খামার ঐশ্বর্য্য যেন উথলিয়া উঠিতেছে। এমনি গৃহের গৃহকর্ত্রী কাঁথে পাড়ে নিকানকে শারীরিক দুর্ভাগ্য বলিয়া মনে করিতেন না। বরং তাঁহার এই ধারণা ছিল যে ইহাই লক্ষ্মীশ্রী লাভের পন্থা। অন্য দিকে এক বিধবা জমিদার গৃহিণীকে আঙিনার আগাছা তুলিতেও দেখিয়াছি। গৃহের প্রতি গৃহস্থালীর প্রতি পুরাণী বাঙলার নর নারীর এমনিই দরদ ছিল আজ গণতন্ত্রের যুগে এই সব হীন কাজ চাকর বাকরদের হাতে পড়িয়াছে।

অদ্যকার বাঙালী পুষ্টিকর খাদ্যোভাবে মরিয়া যাইতেছে সমস্ত দেশ জুড়িয়া এমনই এক রব উঠিয়াছে। কথাটি সত্য। দেশে দুগ্ধ ঘৃত নাই, মৎস মাংস নাই। বাল্য কালে দশ পনেরো সের দুধ দেয় এমন গাভী প্রায় প্রত্যেক গৃহেই প্রতিপালিত হইত। এই প্রতিপালন কথাটা লক্ষ্য করিবার। ডেয়ারি ফার্ম্মের সুবিধার দিনে গো-পালন কার্য্যটা নব্য বাঙালী ভুলিয়া গিয়াছে। কিন্তু পূর্ব্বতন গৃহস্থের এই গো-সেবা ছিল একটা অবশ্য কর্ত্তব্য। চাকর বাকরের হাতে গোপালনের ভার দিয়া গৃহস্থ কখনই নিশ্চিন্ত থাকিতেন না। নিজের হাতেই গোসেবা করিতেন।

এখন গো-সেবার একটু কাহিনী কহিব। ইহা বাস্তব ঘটনা। পঁচিশ ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে ইহা ঘটিয়াছে। একজন অর্থ শালী গৃহস্থ তাঁহার অনেকগুলি গোরু ছিল এবং তাঁহার গো-সেবার সম্বন্ধে একটা খ্যাতিও ছিল। উক্ত সম্পত্তিশালী ব্যক্তি নিজে গোয়াল পরিষ্কার করিতেন। রাত্রে গোয়ালে গিয়া গামছা দিয়া প্রত্যেক গরুর ক্ষুর পরিষ্কার করিয়া দিতেন। খোল খড় ছাড়া তাঁহার গাভীগুলির খাদ্য ছিল কলাই খেঁসারী প্রভৃতি।

উক্ত গ্রামে কামিনী মুখোপাধ্যায় নামে একজন সৌখিন ব্যক্তি বাস করিতেন। তিনি পূর্ব্বোক্ত গৃহস্বামীর কতকটা প্রতিদ্বন্দ্বী। তাঁহারও গো-সেবার সখ ছিল। তিনি তাঁহার গাভীকে মটর সুটী খাওয়াইতেন। যখন মটর সুটীর সের ছয় আনা, আট আনা, তখনই তিনি উহা গাভীর খাদ্যরূপে ব্যবহার করিতেন। কলাই খেঁসারীর মোন একটাকা বা বার আনা, উহা কিনিয়া খাওয়ানতে বাহাদুরী নাই। তাই প্রতিপক্ষের কাছে বাহাদুরি লইতে তাঁহার গাভীকে উক্ত রূপে খাদ্য দিতেন। ঘটনাটি উল্লেখ করিলাম এইজন্য যে, তখনকার লোকের গোসেবার প্রতি কি প্রকার অনুরাগ ছিল, তাহাই দেখিবার জন্য।

এখনকার দিনে বাঙ্গালী শিশু রিকেট্ রোগে মৃত প্রায়, বাঙ্গালী যুবক যক্ষা জর্জ্জর; কিন্তু ফক্স টেরিয়ার কুকুর রূপার শিকল গলায় দিয়া মোটরে চড়িয়া বেড়াইয়া আসে। আর বাঙ্গালীর চিরপূজ্য, গাভী

কসাইখানায় যায়। মরণশীল বঙ্গভূমে যক্ষ্মা ব্যাধি নহে, উহাই তাহার কৃতকর্ম্মের অভিসম্পাত। গোঁড়া ভারত ভক্ত স্বর্গীয় উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব ইংরেজের গো-সেবার মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিয়াছিলেন। আর গাভী যাহাদের দেবমাতা, তাহাদের দেশে গাভী হত্যার ব্যবসায় চালাইবার জন্য বিক্রীত হয়! দাসত্ব শৃঙ্খল কেন যে পাকে পাকে জড়াইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিতেছিনা; ইহা রাষ্ট্রনৈতিক দৌর্ব্বল্য, না অন্য কিছু?

জাতীয় গৌরব গান করিতে গাহিয়া থাকি হেলায় লঙ্কা করিল জয়। দিক্ দিগন্তে বিজয় কেতন উড়াইবার শক্তি বাঙ্গালী কেমন করিয়া এবং কোথা হইতে পাইল, গত দিনের বাঙ্গালীর খাদ্য তালিকায় তাহার একটু পরিচয় পাই। একজন বড়লোকের দৈনন্দিন খাদ্যের পরিচয় দিতেছি। ইহা কতকটা দেখা কথা ও কতকটা শোনা কথা। একজন ব্রাহ্মণ বড়লোক যখন মাসিক সহস্র মুদ্রা উপার্জ্জন করিতেন তখন নিত্য এইরূপ খাদ্য গ্রহণ করেন। এই তালিকা অবশ্য মধ্যাহ্ন ভোজনের। এক ছটাক গব্যঘৃত ক্রয় করা নহে গৃহে প্রস্তুত, কলাইয়ের ডাল, ডালের বড়া এবং একবাটী দুধ। উক্ত দুধের পরিমাণ অন্ততঃ আড়াই সের। রাত্রের খাদ্যেও দুগ্ধের পরিমাণ উক্ত প্রকার। তখন একটা গৃহস্থের যতখানি দুধ প্রয়োজন হইত, সবই প্রায় ঘরের দুধ। অর্থাৎ গৃহপালিত গাভী হইতেই উৎপাদিত। তাহাতে পানা পুকুরের পচা জল, এ্যারারুট গোলা কিম্বা অন্য কোনও স্বাস্থ্য সংহারী ভেজাল থাকিত না। কাজেই পুরাণী বাঙলার সন্তানসন্ততিদের শক্তিশালী হইবার কোনই প্রতিবন্ধকতা থাকিতা না।

বলের কথা যখন উঠিল, তখন এখানে বাঙালীর শক্তিমত্তার একটু ইতিকথা কহিব। সিংহল বিজয়ের কথা প্রায় উপকথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পঞ্চাশ ষাট বছর পূর্ব্বে বাঙালীর কেমন বলবীর্য্য ছিল, তাহারই একটু পরিচয় দিতেছি। বর্দ্ধমান জেলার চাঁদপুর গ্রাম হইতে বর্দ্ধমান সহর ন্যূনাধিক চৌদ্দ ক্রোশ। ষাট সত্তর বৎসর পূর্ব্বে দেশে ডাকাতের খুবই উপদ্রব ছিল। ঐ সময় মানুষ মারা একটা ব্যবসায় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তখন বর্দ্ধমান রাজবাটীতে দেয় খাজনা পৌছাইয়া দেওয়া নিতান্ত নিরাপদ ছিল না। ঐ রকম দিনে চাঁদপুর গ্রামের ৺ভবদেব গঙ্গোপাধ্যায় বর্দ্ধমানে রাজখাজনা পৌছাইয়া দিতে যাইতেন। তিনি ধার্ম্মিক এবং শক্তিশালী বলিয়া অনেকেই তাঁহার হাত দিয়া খাজনা পাঠাইয়া নিশ্চিন্ত হইতেন।

একবার স্বর্গীয় গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় খাজনা দিতে যাইতেছেন। পথে ম'য়ে বলিয়া একটি নদী। ঐ নদী পার হইলেই অনেকটা নিশ্চিন্ত হইতে পারা যায়। ৺গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় নদী পার হইতেছেন এমন সময় কে ডাকিল—কে যায়? বুঝিতে পারা গেল ইহা ডাকাতের আক্রমণ। শক্তিমান গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় উত্তর করিলেন—'তোর বাবা'! তাহার পর একটা গাছে ঠেস দিয়া তিন চারিজন দস্যুর আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে লাগিলেন। এবং তাহাদের এমন আঘাত করিলেন যে দস্যুরা পলাইয়া প্রাণ বাঁচাইল। শোনা যায় যে, বর্দ্ধমান রাজসরকার ৺ভবদেব গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের ঐ সাহসিকতা ও শক্তিমত্তার কথা শুনিয়া তাঁহার সেই বৎসরের সমস্ত খাজনা ছাড়িয়া দিলেন। এবং তাঁহার উত্তর পুরুষের জন্য কতকটা ব্রহ্মোত্তর জমিও দান করিলেন। তাঁহার ভবিষ্যৎ বংশধরেরা এখনো উহা ভোগ করিতেছেন।

বাংলার দুধিভাতির এমনি সামর্থ্য ছিল। উহা সাহসের সহিত শক্তিদান করিয়াছিল। আমরা একান্ত পরমুখাপেক্ষী আত্মবিস্মৃত জাতি। তাই নিজেদের বীর্য্য বিভব কাহিনী জানিনা। জানিলে ও জানিতে চাহিলে বাংলায়ও এক নব রাজস্থান রচিত হইতে পারিত। দেখিতাম বাংলার জাতীয় ইতিহাসে মারাথান এবং থার্ম্মাপলীর উপাদানও রহিয়াছে। প্লুটার্কের বীরচরিত অপেক্ষা বাংলার বীরত্ব কাহিনী ন্যূন নহে।

বাঙ্গালীর ঘর গৃহস্থালির কথা কহিতে বসিয়া কোথায় আসিয়া পড়িয়াছি। কিন্তু গত্যন্তর নাই। এমনই হইবে। কারণ, এই সব কাহিনী বিশ্লিষ্ট নহে। বাংলার গৃহের মাঝে ছিল—পুণ্য, পুণ্যের পাশাপাশি ছিল বীর্য্য বিক্রম। গার্হস্থ্য জীবনের অতি সাধারণ তুচ্ছতার মাঝেই ছিল—মহনীয়তা। সেই জন্য রান্না খাওয়ার কথা কহিতে কহিতেই মহিম্ন অবদানগুলিও বলিতে হইতেছে। নব্য বাংলার যে মন আজ মস্কোয়, বার্লিনে, কনষ্টান্টিনোপলে ছড়াইয়া রহিয়াছে, সেই মন যদি তাহার গোময় লেপিত আঙিনায় শ্রদ্ধাভরে অবনমিত হয়, সেই আশায় পুরাণী বাঙলার তুচ্ছ কথা কহিয়া চলিয়াছি।
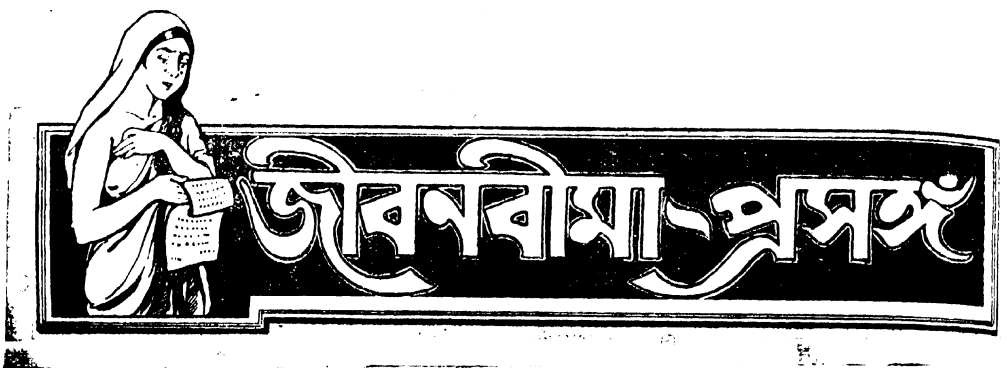
বামাক্ষেত্রে কৃতী বাঙ্গালী

বাংলার চির-বিরহী-যৌবন অন্তরের মণি-কোঠায় প্রেম দেবতাকে উজ্জল করিবার নিস্ফল চেষ্টার ব্যর্থ সম্বল লইয়া শুধু অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিতেছিল—বুভুক্ষিত যৌবনের এই গুমরান বেদনাকে সংহত করিয়া একদা যে দৃঢ়কায় হাস্যোজ্জল তরুণ বাংলায় প্রথম বীমা-প্রতিষ্ঠান স্থাপনা করিল তিনিই শ্রীযুক্ত পান্নালাল বন্দ্যোপাধ্যায় নামে বীমা-জগতে পরিচিত। পান্নালালের কর্ম্মজীবনের ইতিহাসকে বাংলার উচ্ছ্বসিত যৌবন শক্তির বিকাশ বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না—ন্যাশান্যাল বীমা প্রতিষ্ঠানের গৌরবময় প্রবর্ত্তক হিসাবে শুধু নহে, দেশের অজ্ঞ জনসাধারণের প্রতি প্রকৃত মমতা বোধ লইয়া বীমার প্রচলনের জন্য যে প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়াছেন কৃতজ্ঞ দেশবাসী তাহা চিরদিন স্মরণ রাখিবে।

পান্নালাল বাল্য-জীবনে পিতৃসকাশে শিক্ষালাভের সৌভাগ্যলাভ করিয়াছিলেন—তাঁহার পিতৃদেব পরে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হইলেও পূর্ব্বজীবনে হিন্দুস্কুলে শিক্ষকতার কার্য্য করিয়াছিলেন—এইখানেই এই সদানন্দ প্রাণখোলা বালকটি নিয়মিত অধ্যয়নের সহিত ক্রীড়াক্ষেত্রেও প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিতে লাগিলেন। পরবর্ত্তী জীবনে তিনি যখন কণ্টকিত বীমাক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া সৌভাগ্যের উচ্চশীর্ষে আরোহণ করিলেন তখন তাঁহার আখ্যা "Sporstsman"র (বাংলায় যাহার কোন প্রতিশব্দ নাই) মর্য্যাদাকে এক মুহূর্ত্তের জন্য ও ক্ষুণ্ণ করেন নাই—বীমা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ পান্নালালের সততা ও অমায়িকতায় মুগ্ধ হইয়া ফিরিয়া গিয়াছে। আজিকার হাম্বড়া বীমার পরিচালকবর্গ পান্নালালের সফলতার এই কারণগুলি স্মরণ করিলে উপকৃত হইবেন।

পান্নালাল প্রথমে লণ্ডনের সানলাইফ কোম্পানীর 'Sub-agent' হিসাবে বীমার কার্য্য আরম্ভ করেন। নিরভিমানী বালক উৎসাহভরে সততা ও পরিশ্রম সহকারে এই কার্য্য করিতে আরম্ভ করিলেন—প্রতিভা কখনই লুক্কায়িত থাকে না—অতি অল্পদিনের মধ্যেই কর্ত্তৃপক্ষ রতন চিনিতে পারিলেন এবং তাঁহাকে 'চীফ্ এজেণ্টের' পদে নিযুক্ত করিলেন—বাংলাদেশে তদানীন্তন কোম্পানীর ইতিহাস পান্নালালের কার্য্যাবলী ব্যতীত কিছুই নহে। তৎপর নর্থ ব্রিটিশ ও ম্যার্কানটাইলকে তিনি কিছুদিনের জন্য গৌরবান্বিত করিয়াছিলেন।

তারপর ১৯০৬ খৃষ্টাব্দ আসিল। আত্মবিস্মৃত জাতি যেন দীর্ঘকালের মোহনিদ্রাভঙ্গে সহসা চঞ্চল হইয়া উঠিল—স্বদেশী আন্দোলনের এই ইতিহাস বাঙ্গালীর জাগরিত জীবনের এক পরিচয় অধ্যায়—জাতির ধ্যান এবং সাধনা, ভাব এবং কর্ম্ম সেদিন নবযুগের অলক্তক রাগে রঞ্জিত আকার ধারণ করিল। স্বদেশী শিল্প-প্রতিষ্ঠানের দিকেও বাঙ্গালী আবার ফিরিয়া চাহিল। এই নবযুগের উদ্গী-

পনার মধ্যে পান্নালাল মিঃ রের সহকারীতায় বাংলায় 'ন্যাশন্যালের' প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিলেন। ৭নং লায়ন্স্ রেঞ্জে ক্ষুদ্র একটি কামরায় একটি মাত্র কেরাণী লইয়া দৃঢ়প্রতিজ্ঞ পান্নালাল এই দুঃসাহসের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলেন। মিঃ রে অন্য একটি প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকায় পান্নালালের উপর সম্পাদকতা ও কার্য্য বিস্তারের ভার পড়িল—সেদিন এই কর্ম্মনিষ্ঠ একাগ্র তরুণ অনাদর উপেক্ষা ও তীব্র প্রতিযোগীতার কলরোলকে দুই হস্তে সরাইয়া নীরবে আপনার কাজ করিয়া যাইতে লাগিলেন। তাঁহার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ও অক্লান্ত পরিশ্রমে 'ন্যাশন্যাল' দেশের সর্ব্বত্র আপনার প্রভাব বিস্তার করিয়া ফেলিল।

১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি অবৈতনিক প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হইলেন—দীর্ঘকালের পরিশ্রমে তাঁহার স্বাস্থ্য পূর্ব্বেই ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, এই অতিরিক্ত কার্য্যে মনোনিবেশ করিয়া তিনি অকস্মাৎ পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। আরোগ্যলাভের পর ডাক্তারগণ তাঁহাকে সম্পূর্ণ বিশ্রাম লইতে উপদেশ দিলেন কিন্তু পান্নালালের "ন্যাশনালের" প্রতি আকর্ষণ ও মমতা বোধ রোগ ভোগের বহু উর্দ্ধে ছিল কাজেই পুনরায় তিনি ইহার কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিলেন। এবার রোগের আক্রমণ প্রবল হইয়া দেখা দিল—জ্যেষ্ঠপুত্র সত্যেন্দ্র নাথের উপর কার্য্যের ভার দিয়া তিনি বিশ্রাম লইলেন।

সত্যেন্দ্রনাথ পিতার পদতলে বসিয়া অনুপ্রাণিত হইয়া জীবন-বীমার দুরূহ জটিল সূত্রগুলি আয়ত্ত করিয়াছেন—তাঁহার বিলাতের উচ্চশিক্ষা তাঁহাকে বাহিরের জগতের সহিত পরিচয় করাইয়া দিয়াছে কিন্তু স্নেহ হাস্যময় পিতৃদেবের নিকট তিনি যে শিক্ষালাভ করিয়াছেন তাহা চিরন্তন।

ন্যাশনাল আজ ভারতীয় বীমা প্রতিষ্ঠানগুলির পুরোভাগে আসিয়াছে—কোম্পানী সম্প্রতি বহু ব্যয় করিয়া হেড অপিসের জন্য প্রাসাদোপম অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইয়াছেন—প্রতিষ্ঠানের এই গৌরব ও সাফল্যের দিনে আমরা ইহার পরলোকগত পূজনীয় প্রতিষ্ঠাতা ও শৈশবের লালনকর্ত্তাকে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিতেছি।

(মেঘনাদ)

আলোচনা

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্‌সিওরেন্স সোসাইটি

স্বদেশী যুগে যখন আত্ম-বিস্মৃত জাতি নিজেদের ঘর প্রতিষ্ঠান পুনরুদ্ধারের জন্য সচেষ্ট হইল—বিদেশী ফেলিয়া দিয়া ঘরের ঠাকুর কোলে তুলিয়া হইল—সেই প্রেরণাময় যুগে ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে বাংলায় হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভের প্রতিষ্ঠা হয়। তারপর ২৪ বৎসর পর হিন্দুস্থানের ৩০-৪-৩১র বিজ্ঞপ্তি পত্র আমরা আলোচনার জন্য প্রাপ্ত হইয়া সত্যই বিস্মিত হইয়াছি—এই অল্প সময়ের মধ্যে কোম্পানী ভারতের বীমা জগতে একটি গৌরবময় স্থান অধিকার করিয়াছেন।

কোম্পানীর পরিচালন পরিষদের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

ডিরেক্টার—

কুমার কার্ত্তিকচরণ মল্লিক (সভাপতি) শ্রীযুক্ত অখিল চন্দ্র দত্ত। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়। শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী—জমিদার। শ্রীযুক্ত গুণদাচরণ সেন এম-এ, বি-এল। শ্রীযুক্ত মাধবগোবিন্দ রায় বি-এল। ডাঃ নরেন্দ্র নাথ লাহা পি-আর-এস ; পি-এইচ-ডি। ডাঃ পি, কে, আচার্য্য। অধ্যাপক ডাঃ শিশিরকুমার মিত্র ডি-এস-সি।

জেনারেল সেক্রেটারী—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

জেনারেল ম্যানেজার—শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার।

চীফ মেডিক্যাল অফিসার—কাপ্তেন এস, এন, চৌধুরী আই-এম-এস (অবসর প্রাপ্ত), এম্-আর-সি-এস্ ; এল-আর-সি-পি (লণ্ডন)

অডিটার—মেসার্স রায় এণ্ড রায়।

কোম্পানীর সেয়ারহোল্ডারগণ প্রকৃত পক্ষে রক্ষক—কার্য্য পরিচালনে যদি কখনও কোন ক্ষতি হয় তবে তাহার জন্য দায়ী তাঁহারাই আবার অন্যদিকে বীমা তহবিলে শতকরা ৬৲ নিশ্চিত সুদের ব্যবস্থা তাঁহারাই করিবেন—সুতরাং বীমাকারীগণ কোনরূপ দায়ীত্বের মধ্যে না যাইয়া বীমার সমস্ত সুখ সুবিধাই স্বচ্ছন্দে ভোগ করিবেন—বীমা তহবিল হইতে যে লাভ হইবে তাহা সমস্তই পলিসিহোল্ডারগণের প্রাপ্য। কোম্পানীর এই নিয়মটি সর্ব্বত্র বিশেষ সমাদৃত হইয়াছে।

কোম্পানী সম্প্রতি দেশের জনসাধারণের অভাব অভিযোগ হৃদয়ঙ্গম করিয়া কতকগুলি চিত্তাকর্ষক অভিনব বীমা-পদ্ধতি আবিষ্কার করিয়াছেন—বীমা করণেচ্ছু সাধারণ উহার সন্ধান করিলে উপকৃত হইবেন। এতদ্ভিন্ন কোম্পানী কর্ত্তৃক নিষ্ক্রান্ত বিভিন্ন বিজ্ঞপ্তি পত্র পাঠে দেশের অজ্ঞ ব্যক্তিগণ বীমা বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিতে পারেন।

বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে কার্য্য পরিচালনের জন্য কোম্পানী বর্ত্তমান বর্ষে—নূতন কার্য্য সংগ্রহে ভারতীয় বীমা প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছেন—কর্ত্তৃপক্ষ এজন্য আনন্দ প্রকাশ করিতে পারেন। ১৯২৭এ বিখ্যাত একচুয়ারী মিঃ লাইস্, ই, ক্লিন্টন এফ-আই-এ কোম্পানীর ভ্যালুয়েশনের কাজ সম্পন্ন করিয়া বলেন—"সাধারণ বীমা তহবিলটি দ্রুতগতিতে উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে। ১৯২২এর পর হইতে পলিসির সংখ্যা শতকরা ৭৩ সংখ্যক করিয়া বৃদ্ধি পাইয়াছে। গড়পড়তারূপে প্রতি পলিসির মূল্য ১,৩৬০ টাকা হইতে ১,৬১০ টাকায় পরিণত হইয়াছে (শতকরা ১৯৲ টাকা বেশী)। এই উন্নতির জন্য দায়ী ব্যক্তিগণকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করা উচিত।

নিম্নে আমরা কোম্পানীর কয়েক বৎসরের কার্য্যের তুলনামূলক বিবৃতি প্রদান করিলাম।

বৎসর	চাঁদার আয়	বীমা-তহবিল	মোট কার্য্যের পরিমাণ
১৯১৭	৫,৬৮,১৮৯	২৪,৩৩৭৪৭	১,০৯,৬০,৩৩৪
১৯২৭	১৩,২৮,১২০	৬৯,৪৭,৮৭৪	২,৮৫,২২,০৬৩
২৯৩১	১৩,২১,৯৩৬	১,০৪,২২,১৪১	৫,৪৪,৩৬,২৩৯

—০—

ডাঃ নলিনাক্ষ সান্যাল মহাশয় সম্প্রতি "মেট্রোপলিটান" ইনসিওরেন্স কোম্পানীতে যোগদান করিয়াছেন। শুনিতেছি উপাসনার বীমা-বিভাগও তাঁহার সাহায্যলাভ করিয়াছে। আশা করি এই দুইটিস্থানেই তিনি তাঁহার কার্য্যকারীতার প্রমাণ অচিরে প্রদান করিবেন।

আগামী সংখ্যা পুষ্পপাত্রে শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেন গুপ্তের সমাজ-সমস্যা তথা নর-নারীর সমস্যামূলক একটি গল্প বাহির হইবে।

সুকবি শ্রীকালিদাস রায়ের "সাহিত্য-প্রসঙ্গ প্রতিমাসে পড়িতেছেন তো ?
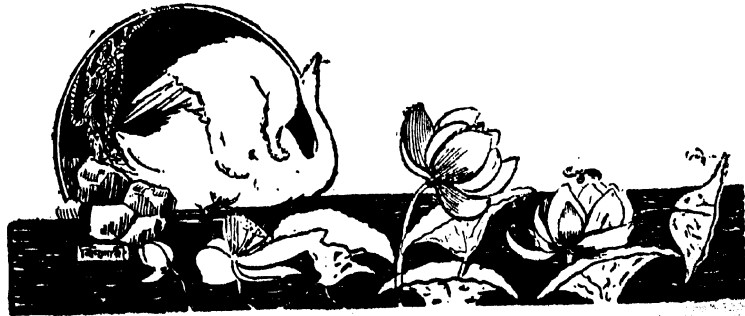
সপ্ত দ্বি-চক্রীর কাশ্মীর ভ্রমণ

শ্রীপ্রফুল্লকুমার দে

তখন বাংলায় নূতন বৎসর পড়িয়াছে। সম্মুখে কলেজের দীর্ঘ ছুটি। সেই অবকাশের ফাঁকে মনটা এক ছুটে গোটা ভারতবর্ষ ঘুরিয়া একেবারে কাশ্মীরের কল্পনায় মশ্‌গুল হইয়া উঠিল। আড্ডায় বসিয়া সপ্ত বন্ধু স্থির করিলাম, কাশ্মীর যাইব,—হাঁটিয়া নয়, উড়িয়া নয়, মোটরে বা ঘরে বসিয়া এমন মনে মনেও নয়—দ্বিচক্রে। অমনি পরামর্শ চলিল, গোপনে। কিন্তু কথাটা প্রকাশ হইয়া পড়িল পাঁচজনের সামনে। তাঁহারা শুনিয়া ভাবিলেন, গরমে আমাদের মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে এবং বন্ধুর মত হাসি-ঠাট্টায় তাহা উড়াইয়া দিয়া আমাদের ব্যাধি আরাম করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। আমরাও সাতজনে এক একটী ভীষ্ম হইয়া প্রতিজ্ঞা পালনে উঠিয়া পড়িয়া লাগিলাম। অবশ্য পথও অনেকটা, যান-বাহনও অভিনব, তাহার উপর দেশটাও নূতন, এ কারণ মন যে সময় সময় নিরুৎসাহ না হইয়া পড়িতেছিল, তাহাও নয়। কিন্তু মনে ভাব গজায় ঠিক দাড়ীর মত;—একবার দেখা দিলে আর তাহা ছাড়ে না। আমরাও তাই জিনিষ-পত্রের আয়োজন করিয়া যাত্রার দিন স্থির করিলাম, ৫ই মে সন্ধ্যা। কিন্তু যাত্রার দুই একদিন আগেই সপ্ত দ্বি-চক্রীর দুই দ্বি চক্রী কাজের টানে দল হইতে কাটিয়া পড়িলেন। বাকী রহিলাম পাঁচজন। তাঁহারা দুইজন আমাদের সহযাত্রী হইল না বটে কিন্তু কাশ্মীর পৌঁছিয়াছিলেন আমাদের বহুপূর্ব্বেই—অবশ্য মনে মনে। সেইজন্য বৃত্তান্তটির শিরোনামে তাঁহাদের বাদ দিতে পারিলাম না।

৫ই মে। দিনটা খুব উজ্জ্বল। যেন এরকম উজ্জ্বলতা অন্য কোনদিন দেখিতে পাই নাই। আকাশও খুব পরিষ্কার। ভোরের আলো সঙ্গে সঙ্গে মনটাও বেশ পুলকে নাচিতে লাগিল। সমস্ত সকালটা জিনিষপত্র বাঁধা-ছাঁদা করা গেল। বেলা ১১টার সময় আহারাদি সম্পন্ন করিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিলাম। তারপর দুপুর ১॥০টা আন্দাজ মায়ের আশীর্ব্বাদ লইয়া বাটী হইতে রওনা হইয়া আমাদের সাথী অনিলচন্দ্র নাগের গৃহে আসিয়া দেখিলাম, অন্যান্য সকলেই উপস্থিত। কিছুক্ষণ খুব হৈ চৈ করা গেল। বেলা ৩॥০টার সময় আমরা পাঁচজন পোষাক-পরিচ্ছদের সুশোভিত হইয়া সাইকেলে কলিকাতা পুলিশের ডেপুটী কমিশনার রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটী Victoria Terraceএর দিকে রওনা হইলাম। সেখান হইতে আমাদের বেলা ৫টার সময় যাত্রা করিবার কথা ছিল। ঠিক পাঁচটার সময় আমাদের কাপ্টেন প্রফুল্ল কান্ত বসু, বিউগলার মণিমোহন সান্যালকে Bugule ফুঁ দিতে বলিল। বাঁশীও বাজিয়া উঠিল। প্রথমে আমাদের কাপ্টেন প্রফুল্লকান্ত বসু, তারপর বিউগলার মণিমোহন সান্যাল, মধ্যে আমি পরে ক্যামেরাম্যান অনিলচন্দ্র নাগ ও সর্ব্বশেষে মেকানিক বীরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় সারি বাঁধিয়া যাত্রা করিলাম। সঙ্গে জনকয়েক বন্ধু সাইকেলে আমাদের আসে-পাশে চলিতে লাগিলেন।

বেলা ৬টায় গড়পারের মোড়ে পৌঁছিতেই চারিদিকে ভিড় জমিয়া গেল! বিউগিল্ আবার বাজিয়া উঠিল। ভিড়ও সেই সঙ্গে বাড়িতে লাগিল। সময় তখনও কিছু আছে দেখিয়া একটী ছোট চায়ের দোকানে চা ও সামান্য খাদ্য সামগ্রী উদরসাৎ করা গেল। স্থির হইল ছবি তোলা হইবে। আমরা পাঁচজন সাইকেল লইয়া পাশাপাশি দাঁড়াইলাম। Photographer কাজ শেষ করিলেন। তখন গোধূলি লগ্ন। Bugule আবার বাজিয়া উঠিল। আমরা হর্ষ-বিষাদে বন্ধু-বান্ধবের ও

আত্মীয়-স্বজনের ছলছল্ চক্ষুর স্মৃতি মনে লইয়া যাত্রা করিলাম। এবার সত্যই কলিকাতা ছাড়িয়া চলিলাম। জানিনা কতদূর কি হইবে? সফলকাম হইতে পারিব কিনা? মন কিছু দমিয়া গেল। যাহা হউক, ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস ও নির্ভর করিয়া বন্ধুদের সহিত হৈচৈ করিতে করিতে Buguleএর ধ্বনির সহিত কলিকাতার জন-প্লাবিত রাস্তার হট্টগোলের ভিতর দিয়া আমরা গ্রাণ্ড-ট্রাঙ্ক রোডের অভিমুখে ছুটিতে লাগিলাম। আমাদের সম্মুখে কয়েকটী বন্ধু মোটর বাইকে vanguard স্বরূপ অগ্রসর হইতেছিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই হাওড়ার পুল পার হইয়া সাল্কের বাজারে পৌঁছিলাম। সেখানে কতক গুলি প্রয়োজনীয় জিনিষ কেনা হইল এবং গাড়ীর আলোগুলি জ্বালিয়া কতকগুলি বন্ধুবান্ধবকে বিদায় দিয়া যাত্রা সুরু করা গেল। অবশেষে রহিলাম আটজন এবং এই আটজনে বর্দ্ধমান অভিমুখে ছুটিতে লাগিলাম। বর্দ্ধমান এখান থেকে ৭২ মাইল।

বালির বাজারের ভিতর দিয়া চলিতে চলিতে আমাদের কাপ্তেনের গাড়ীর সহিত একটী হিন্দুস্থানী ছোকরার colison হইল, colisonর মধ্যে ফাটিল তাঁহার আলোর কাঁচ দোষটা সেই ছোকরার! তাহাকে খানিকটা ভর্ৎসনা করিয়া আবার ছুটিলাম। তখন আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে, চারিদিক জ্যোৎস্নায় প্লাবিত। চন্দ্রদেব যেন আজ পূর্ণরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছেন। রাস্তায় দূরে কালো কালো গাছগুলির উপর চন্দ্রালোক পড়িয়া যেন পাহাড়ের গায়ে মেঘের মেলা মনে হইতেছিল। এক পাশে কলগীতি মুখরা গঙ্গা,প্রকৃতির সুষমায় মনের আনন্দে আমরা আটজন চাকা ঘুরাইতে ঘুরাইতে বালি, উত্তরপাড়া, কোন্নগর, শ্রীরামপুর ইত্যাদি পার হইয়া রাত্রি প্রায় ৯টার সময় চন্দননগরে প্রবেশ করিলাম। একটী হোটেলে বিশ্রাম লইয়া চা পান ও পরে রাত্রির আহারাদি সমাপ্ত করিয়া রাত্রি ১২টার সময় আবার বর্দ্ধমান অভিমুখে রওনা হইলাম।

চন্দননগরের পূর্ব্বে ও পরে কয়েকমাইল পথ বড়ই বিশ্রী। বড় বড় খোয়ার জন্ত রাস্তা মোটেই সমতল নয়। ঝাকুনি খাইতে খাইতে প্রাণ অন্ত। পথে দুই বার আমার গাড়ী পেরেকে বিদ্ধ হইয়া punctured হইল। এই Leak সারাইবার সময়টুকু পাইয়া, কিছুক্ষণ বিশ্রাম করা যাইবে মনে করিয়া সকলেই যেন একটু খুশী হইল, কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যে গাড়ী মেরামত হওয়ায় বন্ধুদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল না। কোলাহল করিতে করিতে আবার যাত্রা সুরু করিলাম। সকলেই পথের পরিশ্রমে ক্লান্ত, যখনই ১০।১৫ মাইল অন্তর সামান্য একটু বিশ্রাম লওয়া হইয়াছে, তখনই ফাঁক পাইয়া কেহ না কেহ একটু ঘুমাইয়া লইয়াছে। কিন্তু কয়েক মিনিট বাদেই তাড়া খাইয়া নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও আবার রওনা হইয়াছে। এইরূপে চলিতে চলিতে ভোরের বাতাসের ও আলোর সঙ্গে মেমারীর নিকটবর্ত্তী একখানিগ্রামে আসিয়া পৌঁছিলাম।

সেই বাতাসে কি এক তীব্র মাদকতা! চারিদিকে চাহিয়া হৃদয় পুলকে নৃত্য করিতে লাগিল। বঙ্গমাতার শান্ত, স্নিগ্ধ রূপে চোখ জুড়াইয়া গেল। সেই স্থানে এক বড় পুষ্করিণীর তীরে প্রাতকৃত্য সমাপন ও চা পান করিয়া, মেমারিতে নামিব না স্থির করিয়া আবার দ্বি-চক্রে আরোহণ করিলাম। কিন্তু মেমারিতে আসিয়া দেখা গেল, এক খাবারের দোকানে জিলাপি ভাজিতেছে! টাট্কা জিলাপীর লোভনীয় গন্ধে সকলেই আকৃষ্ট হইয়া একে একে নামিয়া পড়িলাম। তারপর জিলাপী ইত্যাদি পরিতৃপ্তি সহকারে আস্বাদন করিয়া আবার দ্বিচক্রে চাপিলাম। তখন বেলা ৭টা।

৬ই—প্রাতে ঘণ্টা দুই চলিবার পর আবার আমার গাড়ী Leak হইল। তখন রৌদ্রের তাপ বেশ বাড়িয়াছে। সকলেই গলদঘর্ম্ম কিন্তু সেখানে দুই একটা ছোট ছোট বাবলা গাছ ছাড়া কোন ছায়াবহুল গাছ ছিল না। একটি গাছতলায় সাইকেলের চাকা খুলিয়া Leak সারিতে বসিলাম ও মনে মনে একটু চটিয়াও গেলাম। কিছুক্ষণ পরে কয়েকটী পথিক সেইখান দিয়া যাইতেছিল। তাহাদের সকলের সঙ্গেই কিছু না কিছু একটা পুঁটলী আছে। একজনকে আমাদের মধ্যে একজন ডাকিল—"দাদা, ও দাদা, এদিকে একবার শুনবেন!" একব্যক্তি শুনিতে আসিলে, তাহার নিকট হইতে আমরা

জানিলাম সে শ্বশুরালয়ে যাইতেছে। অতএব তাহার সহিত নিশ্চয়ই মিষ্টান্নাদি কিছু আছে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া কথায় কথায় তাঁহার নিকট হইতে প্রত্যেকের জন্য এক একটী চম্চম্ আদায় করা গেল। দাদাটিও হাসিমুখে দিয়া চলিয়া গেলেন। ইতিমধ্যে গাড়ীও মেরামত হইয়া গিয়াছে। বর্দ্ধমান আর মাত্র ৮ মাইল। চম্চম্ খাইয়া সকলেই খুব জোরে গাড়ী চালাইতে লাগিলাম। এবং সত্বরই বর্দ্ধমান সহরে প্রবেশ করিয়া এক পানওয়ালার দোকানে ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে নামিয়া পড়িলাম। একে পথশ্রম, তাহার উপর শ্বশুরবাড়ীগামী দাদার চম্চম্ তৃষ্ণায় সকলের গলা শুকাইয়া উঠে। পানওয়ালা সকলকে জলদান করিল। তারপর সেখান হইতে পূর্ব্ব ব্যবস্থানুযায়ী শ্রীযুক্ত বাবু শরৎচন্দ্র বসু মহাশয়ের বাটীতে উপস্থিত হইলাম। শরৎবাবু বাটী ছিলেন না, তাহার পুত্র বিজনবাবু আমাদের সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন ও বিশ্রামের সুবন্দোবস্ত করিয়া দিলেন।

স্নানাহারাদি করিতে প্রায় বেলা ১৷৷০টা বাজিল সমস্ত রাত্রি জাগরণে সকলের চোখই ঘুমে ঢুলিয়া আসিতেছে। আহার শেষে শয়ন করিতেই ক্ষণকালের মধ্যে সকলের নাসিকা ডাকিয়া উঠিল। কিন্তু সকলে ঠিক বেলা ৬টার সময় উঠিয়া বর্দ্ধমানের মহারাজার বাটী, কৃষ্ণসায়র ও সের আফগানের সমাধি দেখিয়া আসিলাম।

বাটী ফিরিতে সন্ধ্যা হইল। সেই দিনই রওনা হইতে হইবে। তাড়াতাড়ি অভিরুচি অনুসারে কেহ কেহ স্নানাদি সারিয়া যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলাম। বিজন বাবুকে বিশেষ ধন্যবাদ দিয়া বিদায় গ্রহণ করিলাম। ভেঁপু-ওয়ালা ভেঁপুতে ফুঁ দিল। আমরা যাত্রা করিলাম। বাজার দিয়া যাইবার কালে কয়েকটী জিনিষপত্র কিনিলাম এবং কেহ কেহ চা ইত্যাদি পান করিলেন। এমন করিয়া রাত্রি ৯টা বাজিয়া গেল। গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড ধরিয়া ষ্টেশনের নিকট আমাদের তিনজন বন্ধু শ্রীমান্ সুধাংশুশেখর বসু, ওরফে (ম্যানেজার) শ্রীমান অশোক মুখার্জ্জি, ওরফে (ঠাকুর্দ্দা) ও শ্রীমান সুরেন্দ্রনাথ দাস ওরফে (ভবীর) নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলাম। তখন মনটা বড়ই খারাপ হইল। পরিচিত জনের অবশিষ্ট তিন জনকেও বিদায় দিতে হইল! কোন্ বা সেই দেশ, যাহার জন্য আমরা উন্মাদ। তাহার কি এমনই আকর্ষণ যাহার প্রভাবে কাহারও কোন বাধা না মানিয়া, বন্ধুহীন গৃহহীন পাঁচজন আমরা ছুটিয়া চলিয়াছি। সকলেরই মুখ ম্লান। ইতিমধ্যে আরও কয়েকজন Tourist কলিকাতা হইতে সেখানে আসিয়া পৌঁছিলেন। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, তাঁহারা "বোল-পুর শান্তিনিকেতনে" চলিয়াছেন। আমাদের উৎসাহ আবার আমাদের ধমনীতে Hot Bloodএর Ebulisitic effect আনিয়া দিল। সম্মুখে রাস্তার দিকে চাহিয়া দেখিলাম, গাঢ় অন্ধকার। কোনরূপ আলো নাই। সেই সময় বাতাস একটু জোরে বহিতেছিল। ঝড়ের আশঙ্কাও মনে হইল। দৃঢ়মনে, অদৃশ্য দেবের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানাইয়া সকলে সাইকেল চালাইতে সুরু করিলাম ও কিছুদূর পর্য্যন্ত পশ্চাৎ ফিরিয়া ফিরিয়া আমাদের বন্ধু তিনজনকে দেখিতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম ও মনে মনে বড়ই ব্যথিত হইলাম।

মনে হইতে লাগিল, উহারাও সঙ্গে আসিলে ভালই হইত। তাহারা অন্ধকারে দাঁড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে উৎসাহ দিতে লাগিল। এইরূপে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে হইতে তাহাদের স্বরও আর শুনিতে পাইলাম না। আমরা পাঁচজনে বেশ সতর্কভাবে অতীত স্মৃতি মনে করিয়া গল্প করিতে করিতে সম্মুখে ঘনতমসা রজনীর অন্ধকারের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম।

রাস্তা ভালই। দু'ধারে গাছের সারি কালো কালো দৈত্যের মত মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। ১০।১২ মাইল বাতাসের প্রতিকূলে আমরা আমাদের পদযান ঠেলিয়া চলিলাম। রাত্রি ১টার সময় পানাগড় ষ্টেশনের আলো দেখা দিল। ষ্টেশনে তখনও ৪ মাইল দূর। লাল কাঁকরের রাস্তার উপর দিয়া পাঁচখানি সাই-কেলের দশটী চাকা ঘুরিতে ঘুরিতে সমযোগে শোঁ শোঁ আওয়াজ করিতে লাগিল। সেই আওয়াজ আমাদের কাণে বড়ই মিষ্টি লাগিতেছিল। আমাদের মনের মেঘ প্রায়ই কাটিয়া গিয়াছিল। এক্ষণে নূতনের নেশায়

সকলেই বেশ প্রফুল্ল। ষ্টেশন রাস্তা হইতে ১ furlong দক্ষিণে,—আমরা ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। ষ্টেশন মাষ্টারের ঘরের পাশে platformএর উপর সাইকেলগুলি রাখিয়া সুবিধামত জায়গা দখল করিলাম। সকলেরই ক্ষুধা পাইয়াছে। রুটী, মাখন ও জ্যাম লইয়া সকলেই ব্যস্ত। এদিকে চাও প্রস্তুত। আহারাদি সম্পন্ন হইল। কিছুক্ষণ গল্প-গুজবের পর সকলেই কোনরূপ দ্বিধা না করিয়া Touristএর এই প্রথম way-side-rest মনে করিয়া আনন্দের সহিত শয়ন করিলাম। বেশ ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা বাতাস বহিতেছিল। আকাশ পরিষ্কার। তারাগুলি খুব উজ্জ্বল। তারা যেন আকাশের গায়ে স্থান পাইবার জন্য ঠেলাঠেলি করিতেছে। দূরে signalএর আলোগুলিও নীল, লাল রঙের তারার মত জ্বলিতেছে। তাহারাও চারিদিক নিস্তব্ধ। ভোরে উঠিয়া আবার যাত্রা করিতে হইবে ভাবিয়া সকলে ঘুমাইয়া পড়িলাম।

ক্রমশঃ

গ্রন্থ পরিচয়

নিশি পদ্ম—(গল্পের বই)—শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল প্রণীত। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্ কর্তৃক প্রকাশিত মূল্য ১৷৹ মলাট উল্টাইতেই প্রথমে চোখে পড়ে প্রকাশকের বিজ্ঞাপনটি। এটিতে একটু বাড়াবাড়ি করা হয়েছে—তা' বিজ্ঞাপনে অমন একটু আধটু বাড়াবাড়ি হয়েই থাকে। সেজন্য কিছু আসে যায় না। তবে একটি কথায় মতভেদ হচ্ছে। প্রকাশক বলেছেন আধুনিক সাহিত্যে যাঁহারা যশস্বী, তাঁহাদের মধ্যে একমাত্র প্রবোধকুমারের গল্পই একনিশ্বাসে পড়িয়া ফেলা যায় না কারণ ইত্যাদি—আমাদের মতে ঠিক উল্টা। একমাত্র প্রবোধকুমারের গল্পই একনিশ্বাসে পড়ে ফেলা যায় এইটাই প্রবোধবাবুর গুণ। বড় একটা কিছু দেবার-গম্ভীর ধরণের একটা কিছু শোনাবার—একটা কিছু জটিল সামাজিক অথবা মনস্তত্ত্বগত সমস্যার ইঙ্গিত হানবার—বা একটা প্রকাণ্ড প্রশ্নের সৃষ্টি করে তাক লাগাবার দাবী প্রবোধকুমারের নেই। তাই স্বচ্ছন্দে একনিশ্বাসে প্রত্যেক গল্পটি পড়ে ফেলা যায়। পড়তে পড়তে মনে হয়েছে—ঠিক এগুলো ছোটগল্প বটে কিনা—ছোটগল্পের প্রকৃতি বজায় রেখে প্রবোধবাবু লিখেছেন বলে মনে হয়না। তবে সকল রকম ছন্দে লেখা সাইজ যেমন কবিতা বলে চলে তেমনি ছোট গল্পের আকারে ও ভঙ্গিতে লেখা কথা-সাহিত্য মাত্রকেই ছোট গল্প বলা হয়। সেই হিসাবে এগুলো ছোট গল্প। এগুলো যদি ঠিক ছোট গল্প না হয় তবে কি? এগুলো—কবিতা, চিত্র নাট্য ও গল্পের সমবায়ে একপ্রকারের সৃষ্টি এক প্রকারের সাহিত্য, তা ছোটগল্প হ'তে নিকৃষ্ট নয়। এই হিসাবে প্রবোধকুমারের রচনায় বিশেষত্ব আছে। প্রবোধকুমার কথা-সাহিত্যের কাল বৈশাখীর মধ্যে হারিয়ে যায় নি। একনিশ্বাসেই একএকটি রচনাকে পড়ে ফেলে ঠিক লিরিক পড়ার আনন্দ পাওয়া যায়—এর চেয়ে বড় সুখ্যাতি আর কি হতে পারে? অধিকাংশ রচনার আখ্যান কাল ২।৪ ঘণ্টা কিংবা ২।১ দিনের মধ্যেই শেষ। দণ্ডগুলিকে রসঘন করে দেখালে এ ভঙ্গীটি বড়ই ভাল লাগে—কল্পনাকে দিনের পর দিন মাসের পর মাস পার হবার ক্লেশ ভুগতে হয় না। রচনাগুলি সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলিতে চাই।

১। নিশিপদ্মে কৌশলটি ফুটেছে—আর একটু আখ্যানটি ফোটালে চিত্রটা গল্পের আকার পেতে পারত।

২। নারায়ণ গল্পটাতে কিরণের অত্যাচার অস্বাভাবিক রকমে বেশী বেশী হয়ে গেছে—অতটা বেশী না করলেও যামিনীর দশাটা উপভোগ্য হয়ে উঠতে পারত।

৩। গভীর গল্পটা অনবদ্য,—সকলদিকের মাত্রা ঠিক আছে।

৪। প্রসাধন নামক রচনাটায় ছোট মাসীমাকে অতিরিক্ত ইতর করে না তুল্লে কেবল বুদ্ধির সঙ্গে নয় কল্পনার সঙ্গে ও রচনার একটা যোগ হ'তো। রচনাটার পক্ষে বিগত যৌবনার বেদনা করুণ করবার চেষ্টাটাই যথেষ্ট ছিল—তার সহায়তার জন্য অন্য একটা মনোবৃত্তি না টানলেই হতো।

৫। ছন্দ পতন গল্পটায় প্রবাসীদের সামাজিক জীবনের বৈকল্যের সীমা রেখাটাকে অতিরিক্ত স্থূল ও স্পষ্ট করে দেখালেও গল্পটা মন্দ হয়নি।

কলিকাতায় ফুটবল

শ্রীসুধীর সিংহ বি-এস্-সি

এবারে কলিকাতার মাঠে ফুটবল খেলায় বাঙালীদের মধ্যে যথেষ্ট উত্তেজনার উপাদান ছিল—অবশ্য এখনও যে কিছু না আছে সেটা বলা যায় না—তবে ঠিক যে, আগের মত উত্তেজনার লাঘব ঘটেছে—ঘটবারই কথা।* এবারেও ডারহাম লাইট ইনফেনট্রি প্রথম ডিভিশনের লিগ নিয়েছে। লিগ খেলার শেষ সপ্তাহ পর্য্যন্ত ঠিক হয়নি কে এবারেও লিগ নেবে। কিন্তু মোহনবাগানের হাওড়া ইউনিয়নের কাছে অপ্রত্যাশিত হার, ইষ্টবেঙ্গলের হার এরিয়ানের কাছে, ডারহামস্এর হার কে, আর, আর এর কাছে এই সব অভাবিত ঘটনা শেষ পর্য্যন্ত লিগ খেলার উত্তেজনা বাড়িয়ে দিয়েছিল। তারপর যখন মোহন বাগান ক্যালকাটার সঙ্গে সমান সমান খেললে, তখন লোকে জানলে যে মোহনবাগানের আর কোন আশা নেই। এখন ইষ্টবেঙ্গল ও ডারহামসএর মধ্যে কে লিগ পাবে? যেদিন কে, আর, আর ও ইষ্টবেঙ্গলের খেলা স্থির হয়েছিল সেদিন মুসলধারে বৃষ্টি এসে মাঠের অবস্থা সঙ্গীন করে দিলে তারপর সমান সমান খেলেও ইষ্টবেঙ্গল কে, আর, আর এর নিকট পরাজিত হল আর ডারহামস ওধারে এরিয়ানকে ৪ গোলে পরাজিত করে দ্বিতীয়বারের মত লিগ নিয়ে নিলে। বাঙালীর আশা ও আকাঙ্ক্ষা এবারের মত নির্ম্মূল হল।

ইষ্টবেঙ্গলের কৃতিত্বের পরিচয় এবার যথেষ্ট পাওয়া গেছে। কারণ তারা এবারেই ১ম ডিভিশনে উঠে যে খেলার পরিচয় দিয়েছে তাতে তাদের ধন্যবাদ না দিয়ে পারা যায় না। তবে ইষ্টবেঙ্গলে ফরওয়ার্ড লাইনের তুলনায় ডিফেন্স কিছু না। এখন তাদের লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে পেছনের দিকটা বলবান করে আসছে বারে তারা আরও ভাল করে খেলতে পারে।

মোহনবাগান এবার ভারতীয় দলের মধ্যে সবচেয়ে বেশী বলবান দল। কারণ তারা বেশ well ballanced. যদিও এদের ফরওয়ার্ড ইষ্টবেঙ্গলের মত ক্ষিপ্র নয় তাহলেও এদের সবচেয়ে বলবান দল এইজন্য বলা যে ইষ্টবেঙ্গলের ফরওয়ার্ড ভাল defence কিছু না, আর মোহনবাগানের Offence খুব ভাল ফরওয়ার্ড চলনসই—আবার ডারহামসের ম্যাচের দিন থেকে সামাদ মোহনবাগানে খেলে ফরওয়ার্ডকে আরও বলবান করে দিয়েছে, এবং দ্বিতীয় বারে ক্যালকাটার সঙ্গে ম্যাচ দেখে বুঝা গেছে যে মোহন বাগানের এখন কেবলমাত্র একজন গোল করতে পারে এমন লোক দরকার তাহলেই মোহনবাগানের আর কোন খুঁত থাকবে না। শেষদিকে মোনাদত্ত যে formএ খেলছিল আমাদের মনে হয় মোনা দত্ত আবার খেললেই আবার সব ঠিক হয়ে যাবে। আমরা এদের শিল্ডের খেলায় কৃতিত্ব দেখবার জন্যে অপেক্ষা করছি। শিল্ডে এদের First Roundএ পড়েছে Cemaroniansএর সঙ্গে। এরা লক্ষ্ণৌ থেকে আসছে ও এই প্রথমবার এরা বাঙালীর সঙ্গে খেলবে। দেখা যাক্ কি হয়।

এবারকার এরিয়ান ও যে নেহাৎ "ফ্যালনা" তা নয় তবে ভাল team নিয়ে যে তারা ভাল ফল দেখাতে পারেনি তার কারণ এরা অধিকাংশ দিনই full team দিতে পারেনি। দেখা যাক শিল্ডে এদের ফল কিরূপ হয়।

স্পোর্টিং ও হাওড়া ইউনিয়নের ফল ও নেহাৎ খারাপ হয়নি তবে এরা Junior sides পরে এদের কাছ থেকে ভাল ফলের আশা রাখি। এর পরের বছর থেকে বোধহয় কালিঘাট প্রথম ডিভিশনে খেলবে—তারা বি ডিভিশনে প্রথম হয়ে দাঁড়িয়েছে আশা করি এরা বাঙালীর মান

*ই July তারিখে লীগ খেলার সব উত্তেজনার লাঘব ঘটেছে। সেদিন East Bengal Mohun Bagan কে ৩-২ গোলে পরাজিত করে Runners up Cup জিতেছে। ১৯১৫ পর থেকে এই প্রথম বাঙ্গালী টিম্ মোহনবাগানের উপর গেল।—

বজায় রাখতে সমর্থ হবে। সাহেবদের মান বাঁচিয়েছে ডারহামস। আর সব টিমের অবস্থা অতীব সঙ্গীন সন্দেহ নাই—নবে কে, আর, আর-এর কথা স্বতন্ত্র। ক্যালকাটা ও ডালহাউসির অবস্থা শোচনীয়—ডালহাউসি ত লীগে সবচেয়ে নীচে আছে—এখন কথা উঠেছে ডালহাউসির মত টিমকে নামান উচিত কিনা? ফুটবলের standard এর দিক দিয়ে দেখতে গেলে এতে কোন সঙ্কীর্ণতা অনুভব করা ঠিক না—তবে এটাও ঠিক যে ডালহাউসি সাহেব টিমের মধ্যে ক্যালকাটার সমসাময়িক সেজন্য এবছর তারা কোন বিশেষ কারণে খারাপ খেললেও একটা chance দিয়ে এ বছর তাদের প্রথম ডিভিশনে রাখলে নেহাৎ অবিচার করা হয় না তবে বি ডিভিশন থেকে যে উঠছে তাকে উঠতে দিতে হবে। এখন যে রকম সাহেবদের মধ্যে খেলার নমুনা পাওয়া যাচ্ছে তাতে আশা করা যায় খুব শীঘ্রই বাঙালীর বরাতে লিগের আশা আছে, এবারই হত—নেহাৎ বিধি বিমুখ। কাষ্টমুস এর কথা না বলাই ভাল কারণ এদের "বড বলের" কোন tradition নেই—নাবা-ওঠাতে এদের বিশেষ কিছু আসে যায় না। তবে প্রথম শ্রেণীর খেলার উপযুক্ত টিম হিসাবে গণ্য হতে গেলে এদের Better sportsmanship আরও কিছু শিখতে হবে।

এবার তিন চারটে খেলা বেশ উপভোগ্য হয়েছিল।

(১) মোহনবাগান বনাম ডারহামস (১ম)।

(২) ইষ্টবেঙ্গল বনাম ডারহামস (২য়)।

(৩) কে, আর, আর, বনাম ডারহামস্ (২য়)।

৭ই থেকে শিল্ড আরম্ভ—দেখা যাক এবার বাঙালীদের দৌড় কতদূর। আর একটা জিনিষ না বললে সবটাই অসম্পূর্ণ রয়ে গেল। এবারকার ভারতীয় ও সাহেবদের খেলায় ভারতীয় দলের ৫—০ গোলে জয়লাভ ঘটেছে—এত গোল আর কখনও হয়নি। সেদিনকার খেলা বেশ উপভোগ্য হয়েছিল সন্দেহ নেই। "দাদু" এখনও দু'এক বছর চালাতে পারবেন বলেই বোধ হয়—মোহন বাগানেরই বরাৎ।

ভস্মলোচন

শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন দাসগুপ্ত, এম, এ

গণ্ডযোগে জন্ম আমার নীল সাগরের মাঝখানে,
লঙ্কাদ্বীপের প্রেতশ্মশানে, সবাই আমার নাম জানে।
অমাবস্যা ঝঞ্ঝাবাতে দুর্য্যোগের এক ভীষণ রাতে,
প্রসবিয়ে রাক্ষসী মা অক্কা পেলেন তক্ষনি।
জন্মাবধি মাতৃহারা ভবঘুরে লক্ষ্মীছাড়া
শান্তিলোকের বৈরী আমি সুখসাধের কালফণী।
পরের দুঃখে হর্ষ ভারী হাস্যমুখটি দেখতে নারি
জীবনভরে দিচ্ছি পাড়ি সর্ব্বনাশের সন্ধানে।
শুভ কিছু দেখলে পরে আমার চোখে অনল ক্ষরে
ভুবন ভরা শোভন শোভা আমার বুকে বান হানে।
অন্নপূর্ণা লক্ষ্মী বাণী কারেও আমি নাহি মানি
ভস্মমাখা শ্মশান শিবের ভক্ত আমি ভস্মভূত,
বিশ্বে যত বীভৎসতা তার সাথে মোর আত্মীয়তা
বন্যা মড়ক অগ্নিদাহের আমায় জেনো অগ্রদূত।
বৃন্দাবনে আগুন জ্বালি জতুগৃহে তেল ঘি ঢালি
নন্দনেরে বিবর্ত্তিত করি আমি খাণ্ডবে,
স্বর্গে আমি মিথ্যা জানি নরকেরেই সত্য মানি,
স্বপ্নলোকে প্রলয় আনি নৃত্য করি তাণ্ডবে।
বীণাপাণির বেদিকাতে দাঁড়াই আমি ঝাঁটা হাতে
সবার অর্ঘ্য কেড়ে নিয়ে নর্দ্দমাতে দেই ফেলি,
আমি যখন কলম ধরি ভস্ম দিয়ে নরক গড়ি,
পৌরজনের শড়ক পরি দেখাই আমি কাম কেলি।
জন্ম আমার লঙ্কাদ্বীপে রাবণ রাজার বায়নাতে
অগ্নি চোখে সব দিকে চাই—চাই না শুধু আয়নাতে।

শ্রীবিষ্ণু দাস

১৩৩৯ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা প্রবাসীর বিজ্ঞাপনে উল্লিখিত "রহস্যময় উপন্যাস" ঈষৎ রহস্য উদ্ঘাটন করিয়া **আষাঢ় সংখ্যায়** এক কিস্তি প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে উপন্যাসখানির অন্তরে লুক্কায়িত রহস্যটুকু অবশ্য বেফাঁস হইয়া যায় নাই। কেননা প্রারম্ভেই আছে—"আমি কে?" উপন্যাসের রসটুকু বোধ হয় রহস্যেই--সে কারণ, বিজ্ঞাপনে ঐ কথাটির উপরই জোর দেওয়া হইয়াছিল। আর একখানা বাংলা মাসিকে "ভৌতিক কাণ্ড," "পৈশাচিক কাণ্ড" প্রভৃতি অনেক কাণ্ড থাকে। তাহার জন্য পত্রিকাখানির কাটতি খুব বেশী হয় কি জানা নাই। হয়ত হয়, আর সেই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়াই প্রবাসীও বুঝি রহস্যকাণ্ড সুরু করিলেন। এবার লোমহর্ষক মায়াবিণী সিরিজের বাজার প্রবাসীর রহস্য-লহরীর লহরে একদম তলাইয়া যাইবে।

এ সংখ্যায় ছোট গল্প আছে চারটি; কিন্তু তাহার দুইটি বিদেশী গল্প। একটী অনুবাদ, অপরটি অবলম্বনে রচিত। যেটি অবলম্বনে রচিত সেটির নাম "সন্তান-স্নেহ"—রচয়িতা শ্রীচারু চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। যাঁহারা টুর্গেনিভের Sportsman's sketckes এর সহিত পরিচিত, তাঁহাদের নিকট ইহার নূতনত্ব কিছু নাই।

আর, যেটি অনুবাদ সেটির নাম "আজব-রোগ"—অনুবাদক শ্রীসুরেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। অনুবাদ যত মূলানুগ হয় ততই ভাল। বক্ষ্যমান গল্পটি ও তাহাই হয়ত হইয়াছে। এবং সেই জন্যই "যুবক * * * **ককাচ্ছে**", "**খ্যাক কোরে** উঠে দাসীকে বল্লেন" তারপর "**ছুট্ করিয়ে** চলে গেলেন" প্রভৃতি শব্দ দেখা যায়; আর দেখা যায় বহু স্থলে সাধু ও অসাধু শব্দের অপূর্ব্ব সমাবেশ। গল্পটি অবশ্য চমৎকার।

শ্রীমাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প "ভূমিকম্প" আগা গোড়া জমিয়াছে। লিখিবার ধরণটিও ভাল—ভাষা ঝরঝরে।

শ্রীশৈলেন্দ্র নাথ ঘোষের গল্প "গয়লানী" চলনসই। রস সব জায়গায় জমে নাই সত্য কিন্তু "এমনি আরও কত দিন, কত মাস, কত বৎসর যাবে, তারপর কোন্ লোকে পথ চাওয়া শেষ হবে কে জানে?" উপসংহারের এই রঙ্গটুকু বড় সুন্দর। ইহাতে কিন্তু বঞ্চিত অনুকূলের প্রতি গয়লানীর মনের দরদ উদ্গত হইয়া পড়িয়াছে।

শ্রীশৈলেন্দ্র নাথ দের রঙ্গিন্ ছবি "বিরহী যক্ষ" সুন্দর। এবং শ্রীদেবী প্রসন্ন রায়চৌধুরীর ছবি "নির্ব্বাণ" চমৎকার!

শ্রীমনীন্দ্র লাল বসুর প্রবন্ধ "ফরাসী ইম্প্রেসনিষ্টদের কথা" অতি উপাদেয়—সরস গল্পের মতই উপভোগ্য। আমাদের রসগ্রাহী পাঠক-পাঠিকাগণকে প্রবন্ধটি পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

* * * * *

১৩৩৯ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা **বসুমতীতে** শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার "বঙ্গীয় নাট্য শালার ইতিহাসের" আর এক

কিস্তী প্রকাশ করিয়া পত্রিকাখানির গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন।

শ্রীতারক নাথ সাধু (রায়বাহাদুরের) "পূর্ব্বস্মৃতির" খনন কার্য্য অদ্যাপি শেষ হয় নাই এবং তাহার লক্ষণও দেখা যাইতেছে না। আশা করা যায়, উত্তোলিত রত্ন সম্ভার হইতে সকল শ্রেণীর ব্যবসাদার (চোর, ছ্যাঁচড়া, গাঁটকাটা প্রভৃতি বাদে) লাভবান্ হইতেছেন।

শ্রীযতীন্দ্র মোহন সিংহ প্রভূত শ্রম করিয়া, শ্রুতি টানিয়া, সংহিতা ও সদ্‌গুরু-সঙ্গ খুঁজিয়া, শ্রীযুক্ত প্রমথ তর্কভূষণ মহাশয়কে তর্কে পরাস্ত করিয়া, সেন্‌সাসের রিপোর্ট তুলিয়া এবং আরও কত কাণ্ড করিয়া এক অমূল্য প্রবন্ধ খাড়া করিয়াছেন "সমাজ চিন্তা।" যুক্তিগুলি প্রথম হইতেই অকাট্য ও পরিশেষে পৌঁছিয়া অবশ্য পালনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাঁহার সার কথা হইতেছে, "বঙ্গের জাতিভেদ বাঙ্গালীর পূর্ব্ব জন্মে কৃত পাপ পুণ্য কর্ম্মের ফলে। অতএব ও সব লইয়া আর অস্থির হইও না।" আমরা বলি, কেবল বাঙালীরই কেন, সমগ্র ভারতবর্ষেরই—তাহাই। আর, সেই কারণেই বোধ করি, পূর্ব্বজন্মের ব্রাহ্মণ অথবা ইতর কোন শ্রেণীর যতীন্দ্র বাবু এ জন্মে কায়স্থকুলে—তথা বীর ক্ষত্রিয়-কুলে—জন্মপরিগ্রহ করিয়া লেখনী ধারণ করিয়াছেন। ভারতীয় মানুষের এমন এক সময় ছিল, যখন কেহই উচ্চ বা নীচ জাতি বলিয়া পরিগণিত হইত না। আবার এমন এক সময় আসিয়াছিল, যখন হইতে পাপ ও পুণ্য এই "দুঁহু" মিলিয়া ভারতীয়গণকে First, Second, Inter ও Third class এ বন্দী করিয়া বিচিত্র জীবনপথে নিশিদিন তাড়াইয়া লইয়া চলিতেছে। অবশ্য বলিতে পারেন, মানুষের পাপ-পুণ্যের ধারণা চির পরিবর্ত্তনশীল ও Race admixture প্রভৃতি সিদ্ধান্ত—হউক তাহা। ও সব কথা অসার। আর, যদি বলেন, বাংলায় কেবল হিন্দুই নাই, মুসলমান, খৃষ্টান ও বৌদ্ধগণও আছেন, কিন্তু পাপ-পুণ্য তাঁহাদের মধ্যে এমন কিছু ঘটায় না, তাহা হইলে বলিব, "যাঁহারা একথা বলেন, তাঁহারা হিন্দুধর্ম্মের গোড়ার কথাই অস্বীকার করেন, তাঁহাদের কথার কোন উত্তর নাই।" সত্যই তো, গোড়া বাদ দিলে থাকে কি? এতো আলোক-লতা নয়, এ যে ইক্ষু দণ্ড।

এখানে ভেদনীতির ফলে নীচের প্রতি উচ্চের ঘৃণার কথা আসিয়া পড়ে।" কিন্তু একজনের হাতে জল না খাইলে তাহাকে ঘৃণা করা হয় না, ইহা সকলেই জানে। কথাটা এতই স্পষ্ট! অর্থাৎ Collector Mr. Dobson এর হাতে জল খাইতে না পারিলেও তাঁহার প্রতি ভক্তি যে প্রগাঢ়, এ কথা অস্বীকার করে এমন গোঁয়ার কে আছে? কানাই ঝাড়ুদারের হাতে জল খাই না, সে দ্বারে ধরিয়া দাঁড়াইলে পবিত্র গোময়ের ব্যবস্থা করি, কিন্তু কৃষ্ণের জীব বলিয়া কানাইকে যে ভালবাসিনা, ইহা স্বীকার করিতে বুক ফাটিলেও মুখ ফুটিবে না। উচ্চমার্গে থাকিলে ঘৃণা, লজ্জা, ভয় এ সকল মনোবৃত্তি কাদার মত মনের তলার থিতাইয়া স্বচ্ছ, শীতল উদকরাশিকে উপরে তুলিয়া রাখে। নমঃশূদ্রের ঘরের বারান্দায় মাদুরে উপবেশন করিতে প্রথমটা মনে যে ভাবের উদয় হয়, তাহা অবশ্য প্রেম। আর, তাহার ঘর হইতে ফিরিয়া আসিয়া বস্ত্র পরিবর্ত্তন করি, তাহা শুচি হইবার জন্য। কেন শুচি হই? অবশ্য যতীন্দ্রবাবু ও তাঁহার ন্যায় উচ্চমার্গস্থ বা নির্ব্বিকার ব্যক্তিগণের কথা বলিতেছি না, আমাদের মত সাধারণ মানুষকে লইয়াই তাঁহারও আলোচনা।

যাহা হউক, সমগ্র পৃথিবীতে এক মহাসন্ধিক্ষণ উপস্থিত—ভেদনীতির এই কৃত্রিম গণ্ডীগুলি যে আর থাকিতে পারে না, তাহার লক্ষণ চারিদিকে সুস্পষ্ট। এ নিবন্ধটিকেও তাহার নিদর্শনরূপে ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী এ সংখ্যায় একটী ছোট গল্প লিখিয়াছেন—নাম "ভূতের গল্প।" ভৌতিক কাণ্ড হইলেও বেশ লাগে। "আমার স্ত্রী Pucca Perth, ঘোর খ্রীষ্টান ও সম্পূর্ণ নির্ভীক। সে ভূতে বিশ্বাস করে না, করে শুধু ভগবানে। আর আমি ভগবানে বিশ্বাস করি না; কিন্তু ভূতে করি।" Engineer সাহেবের এ উক্তি বড় মধুর। এই গল্পটি এ সংখ্যার প্রথম গল্প।

দ্বিতীয়টি শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়ের "ল্যাংড়ার কলমে আম্‌ড়া"—একটী নক্সা। আম্‌ড়ার মতই শাঁসালো ও রসাল।

তৃতীয় গল্প শ্রীঅরবিন্দ দত্তের "বঙ্গনারী"—প্রথম শ্রেণীর রচনা না হইলেও প্লটের গুণে শেষটা মন্দ দাঁড়ায় নাই।

"ওদের হাত থেকে (প্রভার অত্যাচারী স্বামীর নিকট হইতে) যখন তোমাকে নিয়ে এলাম, তখন তোমার একটা দিকের পীড়াই দেখলাম—কিন্তু তুমি যে এই বাঙ্গালা দেশেরই মেয়ে, সে কথাটি স্মরণ ছিল না" প্রভার পিতা ব্রজেন্দ্রের এই কথাগুলি বড় করুণ। আর ততোধিক করুণ, প্রভা পিতার কথার উত্তর স্বরূপ—"নিশ্বাস ত্যাগ করিল।"

চতুর্থ গল্প শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসুর "নিদর্শন" ভৌতিক ব্যাপার। কাহারো কাহারো ভাল লাগিতে পারে, আমরা রস পাই নাই।

পঞ্চম গল্প শ্রীসতীপতি বিদ্যাভূষণের "ত্রিমূর্ত্তি" তৃতীয় শ্রেণীর রচনা—দৈনিকে চলিলেও চলিতে পারে যদিও সাপ্তাহিকেরই উপযোগী। গল্পটির নামকরণও ঠিক হয় নাই—"খুড়োর বিয়ে" দিলে বেশ মানাইত।

ষষ্ঠ গল্প শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়ের "স্বর্ণমৃগ" বেশ লাগিয়াছে। উপসংহারটুকুও বেশ।

এ সংখ্যায় শ্রীহরেকৃষ্ণ সাহার একখানি রঙিন ছবি দেখা গেল। নাম "প্রদোষে"—ছবিখানিকে অতি নিকৃষ্ট পট বলিলেও যেন ঠিক হয় না।

° ° ° °

১৩৩৯ সালে আষাঢ় সংখ্যা

ভারতবর্ষে—শ্রীসীতা দেবী বি-এর উপন্যাস "বন্যা" সুরু হইয়াছে। পত্তনটা অদ্ভুত। অবশ্য ভাল মন্দ বিচার এখন হইতে পারে না।

এক যায়গায় আছে "তাহার আত্মীয়-স্বজন সবাই চলিত সমাজ, ধর্ম্ম, গুরু, পুরোহিত, থানার দারোগা, সব কিছুকে মানিয়া।" কিন্তু থানার দারোগাকে না মানিয়া উপায় কি? উহা যে ভূতের চেয়েও ভয়াল।

শরৎচন্দ্রেরও একখানি নূতন উপন্যাস সুরু হইয়াছে "শেষের পরিচয়"—মনে হইতেছে যেন শরৎচন্দ্রের ভাষা পূর্ব্বের সে বেগ হারাইয়া ফেলিয়াছে।

এ সংখ্যার পাঁচটি গল্পের প্রথম গল্প শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের "রুদ্রের আবির্ভাব।" গল্পটাই পাঠকের নিকট "রুদ্রের আবির্ভাব" কি গল্পের নায়ক-নায়িকার নিকট রুদ্র আসিয়া দেখা দিলেন, বলা সহজ নয়। কেননা প্রথম দিকে গল্পের নায়ক "শ্রীআমি" স্ত্রীকে গ্রামে স্বগৃহে লইয়া যাইবার জন্য রুদ্রমূর্ত্তি ধরিয়া ক্রুদ্ধ শ্বশুরের সহিত "tug of war" সুরু করিয়াছে! বলা বাহুল্য, যাহাকে লইয়া টানাটানি সে স্বামীর পাশে সরিয়া গেল। পরাজয়ে শ্বশুর "দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া অস্ফুট চীৎকার করিয়া উঠিলেন।" আর "পথে আসিতে আসিতে শ্রী-আমি" স্ত্রীকে কহিল, "তুমি রামায়ণে সীতার মতোই একটা অসম-সাহসিক সতীর দৃষ্টান্ত দেখালে।" ইহা নিশ্চয়ই শ্রীআমির শ্লেষোক্তি নয়। সীতার সতীত্ব রামের বনানুগমনেই বুঝি? না ইহা "original analogy?"

ইহার পর শান্তি আসিল—স্বামী-স্ত্রী গ্রামে পাকা বাড়ীতে সংসার পাতিয়া বসিয়া নানারকম বিলাস সামগ্রীতে ঘর পূর্ণ ও সুশোভিত করিয়া তুলিল—অবশ্য শ্রীআমির শ্বশুরের পয়সায়। কেননা শ্রীআমির ধন ও দৌলতের মধ্যে বিঘা পাঁচ সাত আবাদি জমি ও পাঁচ সাত ঘর প্রজা ছিল; আর ছিল ঐ পাকাবাড়ীখানি। ঐ জমিরও কিছু আবার শ্রীআমির বন্ধু ব্যোমকেশকে চাষের জন্য ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল। যাহা হউক দিন তাহাদের উভয়ের বেশ সুখেই কাটিয়া যাইতে লাগিল—প্রেম, আর প্রেম।

কিন্তু ঐ গ্রামে ছিল এক নদী- তাহাকে রাক্ষসী বলিলেও সবটা যেন বলা হয় না। সে ক্ষেত, প্রাঙ্গন, বাগান, বাড়ী, গ্রামের পর গ্রাম এক এক থাবায় মুখে পূরিত। এই নদী সেবার তখন—কখন? "এমনি বৈশাখের সন্ধ্যায়"—সব ভাঙিয়া লইতে সুরু করিল। নদীতে যে বৈশাখে ভাঙন ধরে না, একথা বিশ্বাস হইতেছে না? একবার "শ্রীআমির" গ্রামে যাইয়া দেখিয়া আসুন। দেখিবেন, জল, খালি জল—"শাদা, গাঢ় জল।" জল গাঢ় হইলে নীল দেখায়? ছাই। কবির চোখ দিয়া

দেখুন—তাহা হইলে "আকাশের মত শাদা" দেখিতে পাইবেন। যে যুগ আসিয়াছে, তাহাতে originality না দেখাইতে পারিলে উন্নতি অসম্ভব। আর বেপরোয়া না হইলে অর্থাৎ যাঁহা মনে আসে তাহা না লিখিলে original হইতে যাওয়া আর মাথায় হাঁটিয়া পথ-চলা সমান।

কোন পাঠক যদি এক আধটা নয় "চারিদিকের রাশি রাশি রাশি কোলাহল" ও "মুষলধারে বৃষ্টি" প্রভৃতি এই গল্পের ভিতর হইতে আনিয়া অমন বৈশাখী সন্ধ্যার ভাঙনটা মিথ্যা প্রতিপন্ন করিতে আসেন, তাহা হইলে বিনয়ে নত হইয়া তাঁহাকে দেখাইয়া দিব "পুব দিক ঘেঁসে চরও পড়েছে"। বর্ষায় চরও পড়ে, ভাঙনও ধরে।

মনে করিতে পারেন, গল্পে রস জমিল কিনা তাহা না দেখিয়া নদীটাকে লইয়া টানাটানি করিবার হেতু কি? নদীটাই যে বিশেষ করিয়া শ্রীআমি ও তাহার স্ত্রীকে গ্রামছাড়া করিয়া কালীঘাটে লইয়া ফেলিল, আর ঐ নদীটা দিয়াই যে গল্পের রস জোগাইবার চেষ্টা হইয়াছে। তাই উহার নাম জানিতে ইচ্ছা করে। কিন্তু সে উপায় "নির্ভীক লেখক" রাখেন নাই। কেবল এইটুকু জানা যায়, তাহার "লবণাক্ত তিক্ত স্বাদ।" অতএব বুঝা যাইতেছে, সমুদ্রের অতি নিকটবর্ত্তী কোন স্থানের কথা। আমাদের পাঠকগণের মধ্যে যদি কেহ এই নদীটির নাম বলিয়া দিতে পারেন তো ভূগোলের জ্ঞান বৃদ্ধি হইবে। পদ্মা তো নয়ই, কীর্ত্তিনাশাও নয়—তবে? ইহাকে কি বলিব—অজ্ঞতা না অনভিজ্ঞতা?

তারপর ভাষা সম্বন্ধে দু একটী উদাহরণ দিই—গল্পটি অবশ্য সাধু ভাষায় লিখিত—"যতো এগোই", "সত্যি-দত্যিই", "চীৎকার পাড়িতেছে" ("চীৎকার পাড়তেছে" লিখিলে ঠিক হইত)। পরিশেষে আর একটী ব্যাপারের কথা বলিয়া প্রসঙ্গ শেষ করি—শ্রীআমি "বিছানা পাতিয়া লইয়া দুই দেহের নিগূঢ় রহস্য সন্ধান ও সমাধান" করিয়াছে। বোধহয় সকলের চক্ষুর অন্তরালে। সমক্ষে হইলে "নির্ভীক লেখক" নিশ্চয়ই তাহা স্বীকার করিতেন।

এত কথার পর কি করিয়া বলি, গল্পটি ভাল লাগিয়াছে। তবে লাগিত যদি—

দ্বিতীয়টি শ্রীরাধারাণী দেবীর "শূন্যমনা কাঙালিনী মেয়ে"—একখানি চিত্র—সজীব ও করুণ।

তৃতীয় গল্প শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের "গ্রাম-দেবতা।" অলৌকিক কাহিনীতে পরিপূর্ণ—প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ! মানুষ উচ্চমার্গে উঠিলে দিব্য দৃষ্টি লাভ করে, আর, করে আবগারীর কৃপায়। গ্রামশুদ্ধ লোক বরাবর দিব্য দৃষ্টি লাভ করিবে, ইহা বিশ্বাস হয় না। আবার সকলেই যে "তুরিত যানে" আরোহণ করিয়া স্বর্লোক দর্শন করিবে তাহাও নয়। কাজেই মনে হয়, "ছোটগল্প লিখিয়া যাঁহারা নাম করিয়াছেন, তাঁহাদের অন্যতম" লেখক ঐ দুটি অবস্থার একটীতে উন্নীত হইয়া গল্পটি লিখিয়াছেন! ভারতবর্ষে বিজ্ঞাপন তো হইয়াছেই; ঘটনাগুলি আজকালকার বলিয়া চালাইয়া জেলা এবং গ্রামের নির্দ্দেশটাও ঐ সঙ্গে দিয়া "৺শ্রীশ্রীবাবা রুদ্রেশ্বর কোং লিমিটেড খুলিলে আখড়ায় জন সমাগম হওয়া সম্ভব। অবস্থা যখন এইরূপ, সময় থাকিতে চেষ্টা করিয়া দেখিলে ক্ষতি কি? আর ঐ সঙ্গে বটতলায় গল্পটির এক কিস্তী পুস্তিকাকারে ছাপাইয়া বাজারে ছাড়িলে আরও লাভ হইতে পারে বলিয়া আশা করা যায়।

চতুর্থটি কুমার শ্রীধীরেন্দ্র নারায়ণ রায়ের "শেষের দান।"

ইহারও নায়ক শ্রীআমি—প্রেমে পতিত হইয়া বিফল হ'ন, কিন্তু প্রেমাস্পদা হঠাৎ বিধবা হইয়া ঘটনাচক্রে তাঁহারই গৃহে ফিরিয়া আসেন। "প্রেম একবারই হয়।" খুব সম্ভব, লেখক তাঁহার এই দেশের অপূর্ব্ব "কামগন্ধ-হীন ভালবাসার" কথাই বলিতেছেন। কেননা, তাঁহার ধারণায় "প্রতীচ্য শিক্ষায়" যে প্রেম মনে জন্মে তাহা হইতে কামনার উৎকট গন্ধ ছাড়ে। শ্রীআমির কামগন্ধহীন প্রেমের প্রকোপে প্রেমাস্পদা অন্তর্ব্বত্নী হইয়া উঠে, আর শ্রীআমিও বেগতিক দেখিয়া সরিয়া পড়ে, একেবারে বর্ম্মায়। কিন্তু সেখানে গিয়াও নিস্তার ছিল না। হৃদয়ে, একটী নয় দুটি নয়, শত বৃশ্চিক দংশন করিতে সুরু করিল। আবার তিনি ছুটিয়া আসিলেন স্বগৃহে। আসিয়া

প্রেমাস্পদাকে খোঁজাখুঁজি লাগাইয়া দিলেন। বলিয়া রাখি, নায়ক জমিদার ও সখের ডাক্তার। কিন্তু কোথাও যখন তাহার সন্ধান পাওয়া গেল না, তখন চলিয়া গেলেন Great receptacle কাশীতে। সেখানে দৈবক্রমে প্রেমাস্পদার সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। হতভাগিনী তখন মৃত্যুশয্যায়। ক্রোড়ে ছয়মাসের শিশু—শিশুটি শ্রীআমিরই। পরিশেষে প্রেমাস্পদার মৃত্যু হয় ও শ্রীআমি শিশুটিকে বক্ষে জড়াইয়া ধরেন। কেমনা, উহাই "শেষের দান।"

গল্পের প্লটটি ছিল ভাল। কিন্তু জমিয়া উঠে নাই। আর প্রারম্ভে যে ঘটনাটি লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে, তাহারও সার্থকতা দেখিতে পাওয়া যায় না।

পঞ্চমটি শ্রীনগেন্দ্রকুমার গুহ রায়ের হৃদয়োচ্ছ্বাস—"চিত্র-লেখা।" ন্যাকামীতে পরিপূর্ণ।

এ সংখ্যায় চারখানি রঙিন ছবি দেখা গেল। শ্রীপূর্ণ চন্দ্র চক্রবর্তীর "নারায়ণ" ও শ্রীরসিকলাল এল পারিখের "ফকীর" বেশ লাগিয়াছে।

নানাকথা

ভারতের অর্থ-সঙ্কট

ভারত সরকারের নিকট বণিক সমিতির নিবেদন

ভারতের জনসাধারণের বর্তমান অর্থকষ্টের কারণ ও তাহার প্রতিকারের উপায় সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিয়া ভারতীয় বণিক সমিতি ভারত সরকারের নিকট একখানা চিঠি লিখিয়াছেন। এই চিঠিতে বলা হইয়াছে যে, পণ্যের মূল্য ভয়ানক হ্রাস পাওয়ায় দেশে যে দারুণ অর্থ-সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে, একথা স্যার জর্জ সুষ্টারও স্বীকার করিয়াছেন। তিনি একথা স্বীকার করিয়াছেন যে, এই অর্থ-সঙ্কট দূর করিতে হইলে পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি করিতে হইবে। কিন্তু প্রতিকার সম্বন্ধে তিনি বণিক সমিতির সহিত একমত হইতে পারেন নাই। বণিক সমিতির অভিমত এই যে, ভারত সরকার প্রতিকারের ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারেন; স্যার জর্জ সুষ্টারের অভিমত এই যে, বর্তমান অর্থ-সঙ্কট একটা আন্তর্জাতিক সমস্যা, সমস্ত দেশ মিলিয়া এই সমস্যা সমাধান না করিলে পৃথক পৃথক ভাবে কোন সমাধান হইতে পারে না। এই যুক্তির উত্তরে বণিক সমিতি বলেন যে, বৃটিশ মন্ত্রীমণ্ডল অন্য কোন দেশের প্রতীক্ষা না করিয়াই নিজ দেশের সমস্যা সমাধানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন; সুতরাং ভারতবর্ষেরও তাহা করিতে না পারার কোন কারণ নাই।

এ সম্পর্কে বণিক সমিতি বলেন যে, ভারত সরকার ভারতীয় মুদ্রাকে ষ্টার্লিং মুদ্রার বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া দিয়া সঙ্গত কার্য্যই করিয়াছিলেন, কিন্তু বৃটিশ সরকারের আদেশ অনুসারে তাঁহাদিগকে পুনরায় ভারতীয় মুদ্রাকে ষ্টার্লিংএর সহিত বাঁধিয়া রাখিতে বাধ্য হইতে হইয়াছে। ভারত সরকার এ বিষয়ে জনসাধারণের প্রতিবাদে কর্ণপাত করেন নাই। টাকার দর ১৮ পেনী নির্দিষ্ট করিয়া দিয়া এক অন্যায় করা হইয়াছিল, এখন আমার টাকাকে ষ্টার্লিংএর সহিত বাঁধিয়া দিয়া আর একদফা অন্যায় করা হইল। ফল এই হইল যে, ষ্টার্লিংএর দরের পতনের সঙ্গে সঙ্গে টাকার দরও কমিয়া গেল। টাকার অভাবে লোকে সোণা বেচিতে লাগিল, এই সোণা বিদেশে চালান হইতে লাগিল এবং টাকার দর কমিয়া যাওয়ায় সোণা চালান বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এভাবে দেশ হইতে এ পর্য্যন্ত ৬৫ কোটী টাকার সোণা বিদেশে চলিয়া গিয়াছে। বণিক সমিতি ভারত সরকারকে এই সোণা বাজার দরে কিনিয়া রাখিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু সেই অনুরোধ রক্ষিত হইল না। টাকাকে যদি স্বাধীনভাবে থাকিতে দেওয়া হইত এবং সোণা চালান বন্ধ করিয়া দিয়া ভারত সরকার সেই সোণা খরিদ করিয়া মজুত রাখিয়া তদনুপাতে টাকা ও নোট চালাইতেন, তবে টাকার দর স্বাভাবিক ভাবে ১৮ পেনীর নীচে নামিয়া যাইত এবং সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পাইত। এই সোণা মজুদ রাখা সম্পর্কে ভারত সরকার ভারতীয় বণিকের অনুরোধে কর্ণপাত করেন নাই বটে, কিন্তু বিলাতে ব্যাঙ্ক অব ইংল্যাণ্ড কিন্তু সেই পন্থাই অবলম্বন করিয়াছেন। ব্যাঙ্ক অব ইংল্যাণ্ড স্বর্ণ খরিদ করিয়া রাখিতেছেন এবং সেই স্বর্ণের মূল্য ও সুবর্ণমুদ্রার মূল্যের মধ্যে যে ব্যবধান তাহা সরকারী কোষাগার হইতে প্রদত্ত হইতেছে। এমতাবস্থায় ভারতীয় বণিকগণ যদি বলেন যে, বৃটিশ বণিকদের স্বার্থের সহিত ভারতীয় বণিকদের সঙ্ঘাত উপস্থিত হইলে বৃটিশ বণিকদের স্বার্থই

অক্ষুণ্ণ রাখা হয়, তাহা নইলে তাহাদিগকে দোষ দেওয়া চলে না। যাহা হউক অতীতের কথা আলোচনা করিয়া লাভ নাই, এখন ভবিষ্যত দেখিতে হইবে।

ভারত সচিব সেদিন কমন্স সভায় বলিয়াছেন যে, ভারতবর্ষে পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই উক্তিতে হয় অজ্ঞতা নতুবা আত্মপ্রবঞ্চনা প্রকাশ পাইতেছে। বণিক সমিতির মতে ভারতীয় পণ্য দ্রব্যের মূল্য অতিমাত্রায় হ্রাস পাইতেছে। ফলে দেশে চুরি ডাকাতি বৃদ্ধি পাইতেছে, মধ্যবিত্তগণ বেকার হইয়া পড়িতেছে, গ্রাম্য চাষিগণ নিঃস্ব হইতেছে, গবর্ণমেণ্টের আয় হ্রাস পাইতেছে, জমীদারগণ খাজনা আদায় করিতে না পারিয়া জলের দরে জমি জমা বিক্রয় করিয়া দিতেছেন। কৃষকের ঘরে যে সোণা ছিল, তাহা ইতিমধ্যেই প্রায় নিঃশেষ হইয়াছে। এখন প্রশ্ন এই যে, আগামী বৎসর তাহারা কি করিয়া চালাইবে। সুতরাং পরিণাম অতি ভয়ঙ্কর দেখা যাইতেছে। এদিকে রাজস্ব যে ভাবে হ্রাস পাইতেছে; তাহাতে গবর্ণমেণ্টেরই বা কি ভাবে চলিবে, তাহাও ভাবনার কথা। আর ট্যাক্স দিবার ক্ষমতা লোকের নাই। রাজনৈতিক শান্তি প্রতিষ্ঠিত না হইলে পুলিশ বিভাগ, সেনা বিভাগ, কারা বিভাগ প্রভৃতি বড় বড় ব্যাপারের খরচা কমাইবারও উপায় নাই। ভারতবর্ষ হইতে টাকা কর্জ্জ লইয়া যে খরচা কুলান যাইবে, তাহারও সম্ভাবনা নাই। গত জুন মাসে গবর্ণমেণ্ট কর্জ্জ করিয়া যে টাকা তুলিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা একেবারে ব্যর্থ হইয়াছে। অতিকষ্টে মাত্র ১৮ কোটি টাকা উঠিয়াছে; আরও ৫ কোটি আগের ঋণের খত বদল করা হইয়াছে।

এপ্রিল ও মে মাসের বাণিজ্যের হিসাবে দেখা যায় যে পণ্য হিসাবে ঐ দুই মাসে ভারতবর্ষের দিকে যথাক্রমে ৩ কোটি ৪৬ লক্ষ এবং ২ কোটি টাকা ঘাটতি পূরণ করা হইয়াছে। আগামী বৎসর হইতে আর বিক্রয় করার মত সোণাই থাকিবে না। তখন গবর্ণমেণ্ট বিলাতের প্রাপ্য কি করিয়া মিটাইবেন তাহাই সমস্যা। এদিকে দেশের রাজনৈতিক আশান্তি দূর না হইলে এবং জনসাধারণের অবস্থায় উন্নতি না হইলে সরকারী তহবিলের আয় ও বৃদ্ধি পাইবে না। এমতাবস্থায় বণিক সমিতি পুনর্ব্বার প্রস্তাব করিতেছেন যে, টাকাকে ষ্টার্লিং হইতে মুক্ত করিয়া দিয়া এদেশের পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি করা হউক।

স্কটল্যাণ্ডে পূর্ণ স্বাধীনতা আন্দোলন:— স্কটল্যাণ্ড দেশে একটি পৃথক গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহাকে সর্ব্বপ্রকারে ইংলণ্ড হইতে স্বাধীন করিবার জন্য বৃটিশ পার্লামেণ্টে স্কটল্যাণ্ড হইতে নির্ব্বাচিত সদস্য মিঃ জে ম্যাকগভার্ণ একটি আইনের খসড়া পেশ করিয়াছেন। এই আইনের কয়েকটী ধারা এইরূপ— স্কটল্যাণ্ডের জন্য একটী মাত্র ব্যবস্থা-পরিষদ দ্বারা পরিচালিত একটি গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইবে। এই ব্যবস্থাপরিষদে স্কটল্যাণ্ড হইতে নির্ব্বাচিত ১৪৮ জন সদস্য থাকিবেন। এই গবর্ণমেণ্টের রাজধানী হইবে এডিনবার্গ। প্রতি ৩ বৎসরের জন্য একজন স্কচ জাতীয় লোককে এই পরিষদের সভাপতি নির্ব্বাচিত করা হইবে। শাসনতন্ত্র সম্পর্কে কোন বিষয়ে মীমাংসার জন্য স্কটল্যাণ্ডে ৭জন ব্যক্তি দ্বারা গঠিত একটি সুপ্রিম কোর্ট ও প্রতিষ্ঠিত হইবে। মিঃ ম্যাকগভার্ণ বলেন, ইংলণ্ড হইতে সম্পূর্ণভাবে পৃথক হইলেই স্কটল্যাণ্ডের উন্নতি হইতে পারে। আর্থিক ব্যাপার এবং স্কটল্যাণ্ডের উন্নতি বিষয়ক সকল ব্যাপারে আমাদিগকে সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব দিতে হইবে। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আমি মিঃ ম্যাক্সটন বুকানন ও কার্কউড প্রভৃতি বহু রাজনীতিকের সাহায্য পাইতেছি। —'বোম্বে ক্রনিকেল

রুষিয়ার অগ্রগতি:— লর্ড পাসফিল্ড এবং তাঁহার পত্নী মিসেস সিডনি ওয়েব রুশিয়ায় প্রায় চারি হাজার মাইল ভ্রমণ করিয়াছেন। 'রয়টারের' প্রতিনিধির সহিত সাক্ষাতে তাঁহারা বলেন, "বর্ত্তমানে পৃথিবীর অন্য যে কোন জাতি অপেক্ষা রুষিয়ার আশা উদ্যম ও প্রাণের প্রাচুর্য্য অধিক। গবর্ণমেণ্টের কথাই ধরা যাউক, আর জনগণের কথাই ধরা যাউক, সকলেরই কর্ম্মপ্রবণতা অসীম। আমরা যে সমস্ত জায়গায় গিয়াছি, সর্ব্বত্রই কর্ম্ম ও ভাবের সংহতি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। রুষিয়া শুধু শিল্পের উন্নবত সাধন করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, পরন্ত বিশ্বজনীন শিক্ষারও যথেষ্ট প্রসারতা দেখাইয়াছে। রুষিয়াই একমাত্র দেশ যেখানে শিল্পোৎপন্ন দ্রব্য ক্রমবর্দ্ধমান দেখিলাম, আর দেখিলাম সেখানে বেকার বলিয়া কেহ নাই। মিসেস ওয়েব বলেন, "আমি সহরের মেয়েদের পোষাক পরিচ্ছদের যথেষ্ট প্রশংসা না করিয়া পারিতেছি না। কিন্তু ছুটির দিনে আমি কয়েকটী যুবতীকে এমন পোষাক পরিধান করিতেও দেখিয়াছি, যাহা হয়তো কমিউনিষ্ট রুচি ও শ্লীলতার বহির্ভূত হইয়া পড়ে। ওষ্ঠে রং মাখা সম্বন্ধে সরকারের কড়া আইন করা উচিত।"

ভারত শাসন-সংস্কার—

ভারত সরকার ভবিষ্যৎ শাসন-সংস্কার সম্বন্ধে তাঁহাদের যাহা বক্তব্য তাহা ভারত সচিবের দরবারে পেশ করিয়াছেন। ভারত-সচিব এক ইস্তাহারে তাঁহার দীর্ঘ মন্তব্য সাধারণের নিকট প্রকাশ করিয়াছেন। এই মন্তব্যটী পাঠ করিয়া অনেকেই বিশেষ হতাশভাব প্রকাশ করিতেছেন। মধ্যপন্থীগণ তাঁহাদের ইস্তাহার বাহির করিয়া সরকার পক্ষের নিন্দাবাদ করিতেছেন। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে এইরূপ যে হইবে তাহা ত পূর্ব্বেই অনেকটা বুঝিতে পারা গিয়াছিল। সরকার পক্ষ কংগ্রেসের সহিত একটা বুঝাপড়া করিতে কতকটা যে নেহাৎ প্রস্তুত ছিলেন না এমন কথা হইতে পারে না। তবে তাঁহারা চাহিয়াছিলেন সরকার পক্ষের নিকট কংগ্রেস যদি নতজানু হইয়া পূর্ব্বকার অপরাধের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা চাহে, তাহা হইলেই সরকার পক্ষ কতকটা ক্ষমা-ঘৃণা করিয়া তাঁহাদের খানিকটা দাবী-দাওয়া মানিয়া লইবেন। কংগ্রেস কিছু স্বাধীনতা পাইবার আশা করিতে পারিলেই জনসাধারণের মুখ চাহিয়া সরকার পক্ষের নিকট শির নত করিতে পারিতেন কিন্তু কংগ্রেস বেশ স্পষ্টই বুঝিতে পারিতেছেন যে, সরকার পক্ষ ভারতকে কিছুই দিতে পারেন না। মধ্যবিত্ত ইংরাজগণের সন্তান সন্ততির জন্য ভারতে তাহাদের বিস্তৃত কর্ম্মক্ষেত্র থাকা প্রয়োজন। আই-সি-এস, আই-এম এস প্রভৃতি নিখিল ভারতীয় কর্ম্মগুলিতে ইংরাজ জাতির কতকটা প্রাধান্য থাকা চাই। সামরিক বিভাগে ইংরাজ জাতির ক্ষমতা অক্ষুন্ন রাখিতেই হইবে। ব্যবসা বাণিজ্যই ইংরাজ জাতির প্রধান জীবিকা। ভারতবর্ষে তাঁহারা এই উদ্দেশ্যেই পদার্পণ করিয়াছিলেন। এই ব্যবসা-বাণিজ্য যাহাতে পুনর্ব্বার প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে সমগ্র ইংরাজজাতি সেই জন্য বিশেষ চিন্তিত। সুতরাং স্বরাজ এই নাম দিয়া ইংরাজ আমাদের যাহা দিতে পারেন তাহা তাঁহারা দিয়াছেন। আমাদের স্বাস্থ্য রক্ষা করার ভার, ও আমাদের শিক্ষার ভার আমাদের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন। কিন্তু স্বাস্থ্যরক্ষা ও শিক্ষা প্রদানের জন্য ব্যবস্থা করিতে গেলে কতকগুলি নিয়ম প্রবর্ত্তন করা প্রয়োজন। সেই সমস্ত নিয়ম ঠিক সরকারের ইচ্ছানুযায়ী প্রতিপালিত হইতেছে কিনা দেখিবার জন্য শান্তি ও প্রহরীর ব্যবস্থা থাকা দরকার। এইজন্য সরকার পক্ষ Law and order নাম দিয়া প্রাদেশিক পুলিশ বিভাগটী নিজেদের হাতে রাখিতে চাহেন। Dyarchy বা যুগ্ম শাসন প্রণালীই একমাত্র ব্যবস্থা যাহা তাঁহারা আমাদিগকে নিঃস্বার্থভাবে দিয়াছেন এবং আমরা তাহা পাইয়াছি।

ভারতের স্বার্থ—

গত আসেম্বলী সেসনে যখন হাজি তাহার coastal shipping Bill পাশ করিবার জন্য বদ্ধ পরিকর হন, তখন তাবৎ শ্বেতাঙ্গ বণিক সম্প্রদায়, লর্ড ইঞ্চকেপ হইতে ডালহাউসি স্কোয়ারের সামান্য দোকানদারগণ পর্য্যন্ত চমকাইয়া উঠিয়াছিলেন। ভাগ্যক্রমে আসেম্বলী অকালে

গতায়ু হওয়ায় উক্ত মারাত্মক বিলটী মাটী চাপা পড়িয়া গিয়াছে। ইংরাজগণ জানেন যে ভারতকে fiscal স্বাধীনতা দিলে এখনি ভারতে tariff wall বা বাণিজ্য শুল্কের প্রাচীর এত উচ্চ হইয়া উঠিয়া যাইবে যে তাহাতে ইংরাজ-শিল্পেরই ক্ষতি অধিক হইবে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ভারত সরকারের ফাইনান্স মেম্বার জাপানী বস্ত্র শিল্পকে ভারতের বাজার সমূহ হইতে হটাইয়া দিবার জন্য মানচেষ্টারকে একটু অনুগ্রহ দেখাইয়া তথাকার বস্ত্রশিল্পের উপর শুল্কের হার সামান্য কমাইয়া দেন তখন সমগ্র ভারতবাসীই 'অন্যায়' বলিয়া প্রতিবাদ করিয়াছিল। সমস্ত নিখিল ভারতীয় চাকুরীগুলি ভারতবাসীকেই দেওয়া হউক বলিয়া দাবী করিলে ইংরাজ একটু মুচকাইয়া হাসে মাত্র, আমরাই বা কেন না বুঝিতে পারি ইহা সম্ভব নয়। ভারত সরকারের সৈন্য বিভাগে প্রবেশাধিকার লাভ করিবার জন্য আমরা গগনভেদী চীৎকার করিতেছি, কিন্তু ইহা কি সত্য নয় আমরা সকলেই জানি উহা অরণ্যে ক্রন্দনের ন্যায় নিষ্ফল মাত্র।

ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের স্বার্থ—

তবে এখন কথা হইতেছে যে আমরা কি ভারত-সচিবের উক্তিতে হতাশ হই নাই। সত্য কথা বলিতে কি হতাশ আমরাও হইয়াছি অন্য কারণে। আমরা জানিতাম রাজনীতিতে ইংরাজ জাতি খুবই দক্ষ। তাহার রাজনৈতিকগণ জগদ্বিখ্যাত ধুরন্ধর। কিন্তু ১৯২০ সাল হইতে আমরা বেশ স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছি যে ইংরাজ জাতির রাজনীতি বুদ্ধিতে ক্রমশঃ ঘুণ ধরিতেছে। বাংলায় এবং পাঞ্জাবে মুসলমান প্রাধান্য স্থাপন করিয়া ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দুইটি প্রদেশকে সর্ব্বপ্রকারে খর্ব্ব করিতে যাওয়া অনেকটা মূর্খতা নয় কি। বাংলার হিন্দুগণ আজ যে সর্ব্ব বিষয়ে শ্রেষ্ঠ তাহার কারণ ইংরাজ রাজত্ব ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সহিত মুসলমানগণ আপনাদের আভিজাত্য না ভুলিতে পারায় তাহারা ইংরাজ রাজকে বরণ করিয়া লইতে পারে নাই। আজ দেড়শত বৎসর পর মুসলমানগণ যদি সেই ভুল বুঝিতে পারিয়া ইংরাজগণের সহিত মিলিত হইতে চাহেন তাহা হইলে বাংলার হিন্দুসমাজ পদদলিত হইতে পারে কিন্তু ভীষণ অশান্তির অগ্নি যাহা প্রজ্জলিত হইবে তাহা নিবারিত হইবে কি সে? তাহার পর বিশ বৎসরের মধ্যে মুসলমানগণ হিন্দুদের সমকক্ষ হইয়া উঠিলেই, তাহারা বেশ বুঝিতে পারিবে যে উভয়ের স্বার্থই এক। তখন সম্মিলিত আন্দোলন কত প্রবল হইবে? পাঞ্জাবের কথা বলিতে গেলে আমাদের ঐ একই কথা বলিতে হয়। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সারা ভারতে যে বিদ্রোহ বহ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছিল তখন পাঞ্জাবের শিখ ও হিন্দু সম্প্রদায় ইংরাজকে রক্ষা করিবার জন্য প্রাণপাত করিয়াছিলেন। তাহারই পুরস্কার হিসাবে তাঁহারা অনেক সুবিধা পাইয়া আসিতেছিলেন। এই সমস্ত সুবিধালাভ করিয়াই পাঞ্জাব আজ ভারতবর্ষের একটী শ্রেষ্ঠ প্রদেশ। মুসলমানদের উপর অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়া তাহাদিগকে অনেকটা আগাইয়া দিতে পারা যাইবে, কিন্তু উন্নত সমাজকে অবনত কি করিয়া করা যাইতে পারিবে? ভারতের সমস্ত রাজগণ ইংরাজ রাজকে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে চাহেন। তাঁহাদের স্বার্থ অনেকটা ব্যক্তিগত। ব্যক্তিগত স্বার্থের সহিত রাষ্ট্রের স্বার্থ সম্মিলন করিতে গেলে অনেক সময়ে পৃথিবীর ইতিহাসে দুর্য্যোগ ঘটে দেখা গিয়াছে। ভারতের সমস্ত রাজগণকে মধ্যযুগের Feudal Lord বলা যাইতে পারে। Feudal Lord রা কি ইউরোপের স্বেচ্ছাতন্ত্র রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

ইংরেজ ও ভারতীয়ের স্বার্থ—

আমরা অনেকবারই বলিয়াছি স্বার্থই সমস্ত তন্ত্রের মূলমন্ত্র। ইংরাজ তাহার স্বার্থ রক্ষা করিতে চাহিবেন স্বাভাবিক, নিঃস্বার্থভাবে আমাদিগকে সর্ব্বস্ব ছাড়িয়া দিয়া তাঁহারা চলিয়া যাইবেন এইরূপ আশা যাঁহারা করেন তাঁহারা বাতুলমাত্র। স্বার্থের ঘাত-প্রতিঘাতের উপরই সমস্ত রাষ্ট্র সংগঠিত হয়। তবে সাম্রাজ্যগঠনকারীগণের লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন যে এই ঘাত-প্রতিঘাত এমন হইবে যে উহাতে সকল শক্তির সমন্বয় হইবে। ভারতে ইংরাজ জাতি যদি তাঁহাদের স্বার্থ রক্ষার জন্য আজ

বাসীরও কতকটা স্বার্থরক্ষা করিতে বদ্ধপরিকর হন তাহা হইলে এক নূতন রাষ্ট্র সংঘটিত হইতে পারে যাহা জগতের ইতিহাসে এক নূতন জিনিষ হইবে।

স্বেচ্ছাতন্ত্র ও সাধারণতন্ত্র—

পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা গিয়াছে যে কোন তন্ত্রই আদর্শ নয়। স্বেচ্ছাতন্ত্র যখন একমাত্র রাজা কর্তৃকই পরিচালিত হয় তখন ঐ রাজাই যদি রামচন্দ্রের ন্যায় প্রজাদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য রক্ষার জন্য তন্ময় থাকেন, তবে উহাও অনেক সময় সাধারণতন্ত্র অপেক্ষা ভাল। আবার যে সাধারণতন্ত্রে নিম্নশ্রেণীর কয়েকজন জীব প্রবল হইয়া শাসন দণ্ড গ্রহণ করেন, তখন উহাও ঘৃণিত হইয়া দাঁড়ায়। ক্লিওন যখন এথেন্সের ভাগ্য পরিচালক হন, তখন নিশ্চয়ই কেহই পছন্দ করেন নাই। ভেনিসের ধনিকগণের চক্র যতদিন সাধারণ প্রজার স্বার্থরক্ষা করিতে দ্বিধা বোধ করিতেন না ততদিন উক্ত শাসনতন্ত্র বাস্তবিকই আদর্শ ছিল। তাহার পর উক্ত চক্র যখন কতকগুলি পরিবারের স্বার্থ রক্ষার যন্ত্র মাত্রে পরিণত হয়, তখনই উক্ত চক্রের পতন ঘটে। কাজেই আমরাই autocracy পছন্দ করিব না যদি ঐ অটোক্রাসী আমাদের স্বার্থরক্ষা করিতে বদ্ধ পরিকর না হয়।

লুসেন—

লুসেনে এবার নিশ্চয়ই একটা কিছু স্থিরীকৃত হইয়া যাইবে বলিয়া যাঁহারা আশা করিয়া বসিয়াছিলেন তাঁহার হতাশার মধ্যেও শেষকালে আশান্বিত হইয়াছেন। সপ্তাহের পর সপ্তাহ অতিবাহিত হইয়া গেল, লুসেনে কোন ব্যবস্থাই হইল না। পূর্ব্বকার মত এবার এখানে অনেক সমস্যারই আলোচনা হয়, কিন্তু কোন সমস্যারই চূড়ান্ত মীমাংসা হয় নাই। আমেরিকা বলিল আমি ঋণ পরিত্যাগ করিতে পারি যদি তোমরা তোমাদের যুদ্ধ সরঞ্জাম সংগ্রহের ব্যয়সঙ্কোচ কর। ফ্রান্স দারুণ আতঙ্কে চমকাইয়া বলিল সে কি কথা। যুদ্ধ সরঞ্জাম কমাইয়া দিলেই যে আমার ক্ষমতার হ্রাস হইবে। ইটালী ও জার্ম্মাণী প্রবল হইয়া উঠিবে। সুতরাং এই প্রস্তাব গ্রহণ করা আমার সাধ্যাতীত। জার্ম্মাণী বলিল—সে কয়েক বৎসর অবধি যুদ্ধের খেসারৎ যোগাইয়া আসিতেছে। Daw's plan অনুযায়ী সে যখন এই খেসারৎ দিতে রাজী হয় তখন সে ইহাই ভাবিয়াছিল যে তাহার পণ্য-সম্ভার ইউরোপে গৃহীত হইবে। জার্ম্মাণ শিল্পের প্রবল বন্যা আসিয়া দেশজাত শিল্প চূর্ণ হইয়া যায় দেখিয়া ইউরোপের জাতিগণ উচ্চ করিয়া tariff wall তুলিয়া দিতে থাকিলে জার্ম্মাণ পণ্যের প্রবেশাধিকার ক্রমশঃ কঠিন হইয়া উঠে। পণ্য দ্রব্য যদি বাজারে বিক্রয়ই না হয় তবে সে কি করিয়া যুদ্ধের খেসারৎ দিবে। ফ্রান্স বলিতেছেন তবেই ত জার্ম্মাণী যদি আমাকে ক্ষতিপূরণ না দেয় আমিই বা কি করিয়া আমেরিকার সমর ঋণ পরিশোধ করিব। এদিকে বলকান অঞ্চলের সমস্যাও ভীষণ হইয়া উঠিতেছে। চেকোশ্লোভোকিয়া, জুগোশ্লাভিয়া, পোলাণ্ড প্রভৃতি যে সমস্ত রাজ্য ফ্রান্স স্থাপন করিয়া জার্ম্মাণী ও রাশিয়াকে খর্ব্ব করিতে চাহিয়াছিল, তাহাদিগকে সে প্রচুর পরিমাণে ঋণ প্রদান করিয়াছিল। জগৎ ব্যাপী আর্থিক বিপ্লবে ব্যস্ত হইয়া তাহারা এই ঋণ পরিশোধ করিতে ক্রমশঃই অসমর্থ হইয়া উঠিতেছে। এইরূপে বিভিন্নমুখী স্বার্থ লইয়া লুসেনের কার্য্য স্থগিত হইবারই কথা ছিল, শেষকালে জার্ম্মাণী ৩০০ কোটী মুদ্রা দিবে এই সর্ত্তে রফা হইয়াছে। এইবার প্রধান মন্ত্রী ম্যাকডোনাল্ড প্রভৃতির চেষ্টায় যদি জগতের আর্থিক অবস্থা ফেরে। কিন্তু জার্ম্মেনীর নাজী দল ভন-প্যাপেনের এ সর্ত্ত মানিবে কিনা সন্দেহ দেখা যাইতেছে।

কন্‌ফারেন্সের কর্ম্ম—

গত মহাযুদ্ধের পর হইতে অনেকগুলি কন্‌ফারেন্স হইয়া গেল। কিন্তু কোনটীই বিশেষ ফলপ্রদ হয় নাই। অনেকেই বলেন যে এই সমস্ত আন্তর্জাতিক কনফারেন্স একটা বিরাট পিকনিক্ পার্টি মাত্র। বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিকগণ কতকটা সুন্দর প্রাকৃতিক শোভার মধ্যে আমোদ প্রমোদ করিয়া মনের গ্লানি অপনোদন করিয়া

স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। কেননা আজ অবধি যতগুলি কন্‌ফারেন্স বসিয়াছে তাহার অধিকাংশই হয় ইটালীতে না হয় সুইজারল্যাণ্ডে, উভয় দেশই ইউরোপের প্রাকৃতিক শোভার ক্রীড়াক্ষেত্র। পর্ব্বতরাজির মধ্যে, কোন হ্রদের ধারে এই সমস্ত আন্তর্জাতিক কন্‌ফারেন্সের কেন্দ্র নির্ণিত হয়। ১৯২০ সালে ইটালীর স্যানরেমোতে তুর্কীর ভাগ্য নির্ণয় করিবার জন্য এইরূপ এক অধিবেশন বসিয়াছিল। ইংরাজ প্রধান মন্ত্রী সেখানে প্রত্যেক দিন প্রায় কুড়িবার বিভিন্ন ভঙ্গিতে তাঁহার ফটো তুলাইয়াছিলেন। আসল সমস্যার কোন মীমাংসাই যে হইয়াছিল তাহা শুনা যায় নাই। স্পা কনফারেন্সেও মিত্রশক্তিগণ জার্ম্মাণীর নিকট যুদ্ধের খেসারৎ চাহেন মাত্র, কিন্তু রাজনৈতিকগণ দিনকতক পরস্পর পরস্পরকে ভোজ প্রদান করিয়াই স্বদেশে প্রস্থান করেন। Cannes conferenceএর অদৃষ্টেও ঐ একই দশা ঘটে। এখানে লয়েড জর্জ্জ ও ব্রায়েণ্ড সাহেব মনের সাধ মিটাইয়া গল্‌ফ খেলেন এবং উইনষ্টন চার্চ্চিহল সাহেব তাহার তুলি সঙ্গে করিয়া পাহাড়ে পাহাড়ে ছবি আঁকিবার জন্য ঘুরিয়া বেড়াইতেন। লোকার্ণোর কন্‌ফারেন্স অনেকটা picnic পাটী ছিল মাত্র। সহরটী একটী হ্রদের উপর অবস্থিত হওয়ায় অষ্টীন চেম্বারলেন সাহেব ভিন্ন ভিন্ন দেশের অধিনায়কগণকে সঙ্গে করিয়া লইয়া একটী ষ্টীমার পার্টি করেন, তাহাতেই Locarn agreement সংগঠিত হয়।

ডলার ও পাউণ্ড

মধ্যে দিন কয়েক আমেরিকান ডলার ইংলিশ পাউণ্ডের মূল্যের হার অপেক্ষা নামিতে আরম্ভ করিয়াছিল। তবে উহার প্রকৃত হারে কখনই পৌঁছাইতে পরে নাই। আবার এখন দেখা যাইতেছে যে আমেরিকার ডলারের মূল্য বৃদ্ধি ঘটিতেছে। যাঁহারা আর্থিক জগতের বিশেষ খবর রাখেন না তাঁহারা অবশ্যই বলিবেন যে তাহাতে জনসাধারণের বিশেষ ক্ষতি বৃদ্ধি কি হয়। আমরা এখানে সেই কথাই বুঝাইতে চেষ্টা করিব। আমেরিকার ডলারের মূল্য বৃদ্ধি পাইলে আমরা যে সমস্ত দ্রব্য আমেরিকা হইতে এখানে আমদানী করি সেই সব দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি হয়। বাজারের খবর যাঁহারা রাখেন তাঁহারা লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে আমেরিকার ফাউন্‌টেন্ পেন, উহার কালী ইত্যাদির মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে। ইংরাজ সরকারকে আমেরিকার নিকট হইতে গৃহীত সমর ঋণ পরিশোধ করিতে হয়। ডলারের মূল্য বৃদ্ধি ঘটিলে ঐ ঋণের পরিমাণ বর্দ্ধিত হয় এই জন্যই ইংরাজ সরকারকেও খানিকটা ব্যতিব্যস্ত হইতে হয়।

স্বদেশী সঙ্ঘ—

স্বদেশী শিল্পের প্রচারের জন্য অনেকগুলি সঙ্ঘ সংঘটিত হইয়াছে; এই সমস্ত সঙ্ঘগুলির মধ্যে কোন প্রকার মিল না থাকায় সকলেই স্বাধীন ভাবে কাজ করায় কাজের যে বিশেষ সুবিধা হইতেছে মনে হয় না। ১৯০৫ সাল হইতে স্বদেশী দ্রব্য আজ অবধি যাহা বিক্রয় হইয়া আসিতেছে তাহার মূলে দেশবাসীর স্বদেশ ভক্তিই প্রধান। এই দেশভক্তিকে মূলধন করিয়া ভারতে অনেক কারবার গজাইয়া উঠিয়াছে এবং অকালেই কালের গর্ভে লীন হইয়া গিয়াছে। আবার এমন একদল জুয়াচোর আছে যাহারা বিলাতী জিনিষকে দেশী বলিয়া বিক্রয় করিয়া দুই পয়সা উপার্জ্জন করিয়া লইয়াছে। কোন শিল্প নূতন হইয়াছে এবং উহাদের ক্রম পরিবর্ত্তন কিরূপ তাহা জনসমাজের নিকট প্রচার করা উচিত। উদাহরণ স্বরূপ আমরা বলিতে পারি যে সাবান, কালী এবং এসেন্স এখানে প্রস্তুত হইতে পারে না বলিয়া অনেকেরই ধারণা, অথচ এখন দেখা যাইতেছে অসংখ্য সাবান, কালী ও এসেন্স প্রস্তুত করিবার কারখানা ব্যাঙের ছাতির ন্যায় মাথা তুলিয়া গজাইয়া উঠিতেছে। অথচ ভাবিতে ভয় হয় যে এক পিয়ার্স সোপের কারখানা বা রিগডের কারখানা প্রস্তুত করিতে কত সময় ও অর্থের প্রয়োজন হইয়াছিল। প্রায়ই শুনা যায় বিলাতী কালী ও এসেন্স আনয়ন করিয়া উহাতে দেশী ছাপ দেওয়া হয়। এইজন্যই সাধারণকে বুঝাইবার জন্য ও উহাদের মধ্যে আপনাদের শক্তির পরিচয় প্রদান করিবার জন্য এক এক [illegible] শিল্প

একত্রে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া উহার স্বার্থরক্ষা করিবার জন্য বদ্ধ পরিকর হওয়া প্রয়োজন।

কৃষি সম্পদ—

সকলের অপেক্ষা বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে আমাদের কৃষিকে রক্ষা করা। কয়েক বৎসরের অর্থ বিপ্লব সহ্য করিয়াও আমাদের কৃষি দণ্ডায়মান ছিল। বর্ত্তমান বৎসরের দুর্ব্বৎসর বুঝি বা আর কাটে না। এই দারুণ অর্থ-বিপ্লবের দিনে কি জমিদার, জোৎদার বা প্রজা কাহারও নিকট অর্থ নাই। কৃষি পণ্যের মূল্য দিন দিন অসম্ভবরূপে হ্রাস পাইতেছে। বহু জমিদারীই নিলামে উঠিতেছে এবং যাহাদের কিছু সঙ্গতি ছিল তাঁহারা সঞ্চিত অর্থ হইতে রাজস্ব প্রদান করিয়া উহা রক্ষা করিতেছেন মাত্র। এই কৃষিশিল্পকে আমরা রক্ষা করিতে না পারিলে আমাদের অস্তিত্ব ধরা পৃষ্ঠ হইতে লোপ পাইবে এ কথা কি বাংলার মনস্বীরা একবার ভাবিতেছেন। এই দুর্য্যোগে আমাদের মনে হয় যৌথ চাষই একমাত্র উপায়। আমাদের কৃষকগণের কাহারও জোৎজমি বেশী নাই। যাহা আছে তাহাতে তাহাদের সম্বৎসরের সংকুলানও অনেক সময় হয় না। বিজ্ঞানের সাহায্যে চাষের উন্নতি করিবার ক্ষমতা আমাদের কৃষক সমাজের নাই। দেশের এমন অর্থ নাই যে কৃষকগণকে অর্থ সাহায্য করিয়া তাহাদিগকে নূতন নূতন লাঙ্গল ও বীজ কিনিয়া দিবার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। সেই জন্যই আমাদের মনে হয় আমাদের দেশের চাষীরা যদি জমির আল বা সীমানা সূচক মাটীর ঢিপিগুলি তুলিয়া দিয়া এক একটী বৃহৎ জোতের সৃষ্টি করে এবং সকলে একসঙ্গে ঋণ গ্রহণ করিয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে যন্ত্রপাতির সাহায্যে চাষ করে তাহা হইলে এই সমস্যার অনেকটাই মীমাংসা হয়। বাংলার সরকার এই বিষয়ে একটু অবহিত হইলে ভাল হয়, তাঁহার Co-operative Departmentকে প্রকৃত কার্য্যক্ষেত্রে পরিণত করিয়া যৌথচাষীগণকে ঋণ প্রদান ইত্যাদি সাহায্য করিবার ব্যবস্থা করিলে প্রকৃত দেশের কার্য্য হয়। রাজস্ব আদায় হইতেছে না বলিয়া সরকারও ত বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছেন। চাষের বর্ত্তমান অবনতি যদি এইরূপই চলে তবে দুই এক বৎসরের মধ্যে রাজস্ব সংগ্রহ যে একেবারেই অসম্ভব হইয়া উঠিবে তাহাতে কি আর কিছু সন্দেহ আছে? সুতরাং সময় থাকিতে প্রস্তুত হইলে কেমন হয়?

শোকসভা—

আজকাল প্রায়ই নানাপ্রকার শোকসভা হইয়া থাকে। এই শোকসভাগুলির মুখ্য উদ্দেশ্য যাহাই হউক কার্য্যতঃ যে কোনরূপ ফলপ্রদক হয় বলিয়া মনে হয় না। একসঙ্গে কতকগুলি লোক সম্মিলিত হইয়া কোন মৃত আত্মার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেই আমাদের কর্ত্তব্যের শেষ হয় না। মৃত স্মৃতিকে জাগরিত রাখিয়া দেশকে বড় করিতে গেলে মৃতের আদর্শে যাহাতে একটী শ্রেণী বা দল তৈয়ারী হয় তাহার প্রতি নজর রাখা কর্ত্তব্য।

পরলোকে স্বর্ণকুমারী—

পুণ্যশ্লোকা স্বর্ণকুমারী স্বর্গে গমন করিয়াছেন। এই পুণ্যবতী রমণী এক সময়ে বলিয়াছিলেন যে তিনি বহু সন্তানের জননী হইলেও বঙ্গভাষাকে ভুলিতে পারেন নাই। বঙ্গ-ভাষা তাঁহার একটী সন্তান বিশেষই ছিল। গত শতাব্দীতে পশ্চিমের সভ্যতার বাণী এদেশে প্রদেশে আসিলে অনেক পুরুষ প্রবুদ্ধ হয়েন। স্বর্ণকুমারী দেবী সেই যুগের প্রথম ও প্রধান নারী কর্ম্মী। তাঁহার ছোট গল্প প্রথম রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প অপেক্ষাও অধিক খ্যাতি লাভ করে। তাঁহার বিরচিত উপন্যাস তখনকার শিক্ষিত মহলে বঙ্কিমচন্দ্রের নীচেই বলিয়া বিবেচিত হইত। তিনিই প্রথম নারী সম্পাদিকা। তাঁহার সম্পাদনায় ভারতী এককালে তাবৎ শিক্ষিত সমাজে অতি যত্নের সহিত পঠিত হইত। সম্পাদকের প্রধান গুণ এই যে তিনি নিরপেক্ষ সমালোচক হইবেন। স্বর্ণকুমারী দেবীতে এই গুণটী খুবই বেশীভাবে বর্ত্তমান ছিল। তিনি যত নূতন লেখক সৃষ্টি করিয়াছেন, ভারতের কোন সম্পাদকই তত নূতন লেখক সৃষ্টি করিয়াছেন কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে? সতীশচন্দ্র আচার্য্য, শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়,

৺প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ৺মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, শ্রীসরলা দেবী চৌধুরাণী, শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী, শ্রীযুত পি চৌধুরী, শ্রীযুত জলধর সেন, শ্রীযুত কালিদাস রায়, শ্রীযুত বিভূতিভূষণ ভট্ট, স্বর্গীয় মোহিত মজুমদার, ৺সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ইত্যাদি বহু খ্যাতনামা লেখক ও লেখিকা তাঁহার আনুকূল্যে আপনাদের প্রতিভা বিকাশ করিবার সুযোগ লাভ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহাকে জগৎ তারিণী পদক প্রদান করিয়া তাঁহাকে প্রকৃত সম্মানই প্রদান করেন। পরিণত বয়সে মৃত্যু হইলে শোক প্রকাশ করিবার কারণ বিশেষ থাকে না। তবে আমাদের শোক করিবার কারণ এই যে পুরাতন বাংলার একজন শ্রেষ্ঠ মহিলা আজ অন্তর্ধান হইলেন। এখন আমরা অনেক লেখিকাকেই বিবিধ মাসিক পত্রগুলিতে নিয়মিত ভাবে লিখিতে দেখিতে পাই, কিন্তু এই প্রেরণার মূল স্বর্ণকুমারী দেবী, এই জন্য আমাদের শির তাঁহার নিকট ভক্তিভরে নত হয়।

ডি-ভ্যালেরার দৃঢ়তা—

ডি-ভ্যালেরা লণ্ডন হইতে ফিরিয়া গেলেন। Land annuity প্রদান করিবেন না বলিয়া তিনি স্পষ্টই বলিয়া দিয়াছেন। ইংরাজগণ আয়র্লণ্ডকে এক-ঘরে করিবার জন্য বাণিজ্য শুল্ক বৃদ্ধি করিয়া দিবার ভয় দেখাইয়াছেন। প্রত্যুত্তরে ডি-ভ্যালেরাও বলিয়াছেন যে তিনি আয়র্লণ্ডে ইংরাজকে 'এক-ঘরে' করিবেন। গোলা-বারুদের পরিবর্ত্তে এই বাণিজ্য শুল্কে বাণিজ্য শুল্কে লড়াই অভিনব সংঘর্ষ হইবে। দেখা যাক কোন পক্ষে জয় ঘটে।

অটোয়া কনফারেন্স—

সম্রাজ্যের মধ্যে বাণিজ্য-সঙ্ঘ স্থাপন করিবার জন্য অটোয়ায় কনফারেন্স বসিতেছে। ভারতবর্ষকেও তাহার মধ্যে টানিয়া লওয়া হইয়াছে। আমাদের মনে হয় এই কনফারেন্সটীও ইউরোপের কনফারেন্সগুলির ন্যায় অশ্ব-ডিম্ব প্রসব করিবে, কেমনা কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, সাউথ আফ্রিকা স্পষ্টই বলিয়াছে যে তাহারা যতদূর পারিবে স্বদেশী দ্রব্য গ্রহণ করিবে—তাহার পর আপোষের কথা। অর্থাৎ নেহাৎ যদি স্বার্থ বজায় আছে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলেই তাহারা কোন প্রস্তাবে রাজী হইবে, নতুবা নয়। ইহাকেই বলে শেয়ানায় শেয়ানায় কোলাকুলী—উহার ফল অশ্ব-ডিম্ব।

রাশিয়ার কৃষি—

রাশিয়া রাজনৈতিক জগতে যেমন এক অভিনব তত্ত্ব আনিয়া দিয়াছে কৃষি-জগতেও সেইরূপ এক নূতন সত্যে আবিষ্কারের সাধনায় ব্রতী হইয়াছে। তথায় কতগুলি রাষ্ট্রীয় কৃষিক্ষেত্র স্থাপন করা হইয়াছে। এই সমস্ত রাষ্ট্রীয় কৃষিক্ষেত্রগুলির মধ্যে Gigant firm সর্ব্বপ্রধান। এই কৃষিক্ষেত্রটী ৪৫০,০০০ একার বা ৭০৩ বর্গ মাইল জমি ব্যাপিয়া অবস্থিত। শস্য কর্ত্তন করিবার জন্য এখানে ১৩টী ব্রীগেড্ আছে। ৩৭০ জন শ্রমজীবী লইয়া এক একটী ব্রীগেড সংগঠিত হয়। তাহারা শস্যক্ষেত্রেই তাঁবুর মধ্যে বাস করে। ঐ সমস্ত শ্রমজীবিরা প্রত্যেকে ৪০ রুবল করিয়া মাসিক পারিশ্রমিক পায়।

পরলোকে দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু—

শ্রীযুত দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু বা Mr. D. N. Bose পরলোকে গমন করিয়াছেন। এই জনপ্রিয় ও সুদর্শন পুরুষটীকে খেলার জগৎ ব্যতীত অন্যলোকে বিশেষ অবগত হইতে পারেন নাই। স্বর্গীয় ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র হিসাবে দ্বিজেন্দ্র বাবু ও কর্ম্মক্ষেত্রে অনেক সুবিধাই লাভ করিতে পারিতেন। তিনি ব্যবহারজীবি ছিলেন। স্বর্গীয় স্যর বিনোদ তাঁহার বৈবাহিক ছিলেন। কিন্তু তাঁহার মন ও আগ্রহ পড়িয়া থাকিত সকলপ্রকার ব্যায়াম ও খেলার মাঠের দিকে। তিনিই বর্ত্তমান মোহন বাগান ক্লাবটীকে গঠন করেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে I. F. A. এর আইন কানুন লইয়া শাদা কালায় ঝগড়া বাধিলে তিনিই উক্ত কলহের মীমাংসা করিবার জন্য প্রথম অগ্রসর হ'ন। League এর তিনি প্রেসিডেন্ট

Boy scoutএর ডিভিসন্যাল কমিশনার ছিলেন। তাঁহার বিনয় নম্র ও মধুর ব্যবহারে সকলেই মুগ্ধ হইত। তাঁহার মৃত্যু দিন উত্তর কলিকাতার শ্মশান ক্ষেত্র কাশীমিত্রের ঘাটে এক বিরাট জনতার সমাবেশ হয়। এরূপ জনতা তাঁহার খুল্লতাত স্বর্গীয় ভূপেন্দ্রনাথের মৃত্যুতে ও দৃষ্ট হয় নাই। Boy scoutএর বালকগণ ও ভিন্ন ভিন্ন Sporting ক্লাবগুলি তাঁহার শবের উপর নানা প্রকার মালা দিয়াছিল। আমরা তাঁহার শোক-সন্তপ্ত পরিবারকে আমাদের আন্তরিক সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছি।

চীনের খবর—

চীন চিরকালই আজবদেশ। ঠাকুরমার গল্পে আরব্য উপন্যাস চীনকে আজবদেশ হিসাবে আঁকা হইয়াছে। চীনের প্রাচীর এক বিরাট অধিষ্ঠান। পৃথিবীর সপ্ত আশ্চর্য্যের একটী আশ্চর্য্য। সম্প্রতি শোনা যাইতেছে যে বন্যা হস্ত হইতে দেশকে উদ্ধার করিবার জন্য ৩০০০ মাইল ব্যাপী একটী ডাইক বা বাঁধ প্রস্তুত করা হইয়াছে, ১৪ লক্ষ মজুর এই বাঁধটী প্রস্তুত করিবার জন্য মেহনৎ করিয়াছিল। খবরটা আজব দেশেরই মতন নয় কি?

ডি ভ্যালেরা ও ভি জে প্যাটেল—

আমাদের ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেণ্ট মিঃ ভি, জে, প্যাটেল সাহেব মিঃ ডি-ভ্যালেরার সহিত পূর্ব্ব হইতেই পরিচিত ছিলেন। এখন শুনা যাইতেছে যে তিনি মিঃ ডি-ভ্যালেরার সহিত পূর্ব্ব হইতেই পরিচিত ছিলেন। এখন শুনা যাইতেছে যে তিনি মিঃ ডি-ভ্যালেরা কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া হঠাৎ লণ্ডন ত্যাগ করিয়া আয়র্লাণ্ডে গমন করিয়াছেন। অনেকেই অনুমান করিতেছেন যে ইংলণ্ডের সহিত মিটমাট করিবার জন্য কতকগুলি লোককে আয়র্লাণ্ডের পক্ষ হইতে খাড়া করা হইবে। মিঃ ডি ভ্যালেরা নাকি মিঃ ভি, জে, কে এই সম্মান প্রদান করিবেন।

বঙ্গীয় মিউনিসিপ্যালিটি—

বাংলার স্বায়ত্ত শাসন প্রবর্ত্তিত হওয়ার পর হইতে একে একে প্রায় সমস্ত মিউনিসিপ্যালিটী গুলিই বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে, কেবলমাত্র ভাটপাড়া, দার্জ্জিলিং ও কক্স-বাজার মিউনিসিপ্যালিটী তিনটী এখন সরকার কর্ত্তৃক মনোনীত সদস্যগণ দ্বারা পরিচালিত হইয়া আসিতেছে। দার্জ্জিলিং ও কক্স-বাজারে অনেক ইউরোপীয় ভদ্রলোক বাস করেন, তাঁহাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য এই মিউনিসিপ্যালিটী দুইটীকে স্বায়ত্ত শাসন প্রদান করা হয় নাই এই কথা ধরিয়া লইলে অনেকটা বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু ভাটপাড়া মিউনিসিপ্যালিটীকে এখনও সরকারী প্রতিষ্ঠান করিয়া রাখিবার উদ্দেশ্য কি? যদি জুটমিলগুলির সুবিধার জন্য এই ব্যবস্থা হয় তবে গঙ্গার দুইধারে যতদূর পাটের কল আছে সর্ব্বত্রই ত এইরূপ ব্যবস্থা করা উচিত। ভাটপাড়ার মিউনিসিপালিটীর ভাইস-প্রেসিডেণ্ট নাকি তাঁহার এই পদে ৩২ বৎসর প্রতিষ্ঠিত আছেন, অথচ তাঁহার কোন গৃহ বা স্বার্থ ভাটপাড়ায় নাই। তাঁহার মুরুব্বী পাটের কলগুলি তাঁহাকে এই পদে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছেন। নূতন মিউনিসিপাল বিল শীঘ্রই কাউন্সিলে পেশ করা হইবে, তখন আমরা আশাকরি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় Local Self-Governmentএ যে বৈষম্য আছে তাহা রোধ করিয়া দিবেন।

শিক্ষক ট্রেণিং স্কুল—

বি-টী শিক্ষার ক্ষেত্রস্থল ডেভিড হেয়ার ট্রেণিং স্কুলটী সরকার পক্ষ ব্যয় সঙ্কোচের অজুহাতে তুলিয়া দিতেছেন। শিক্ষককে তখন নূতন ধাঁচে ঢালিয়া সাজিবার ব্যবস্থা হইতেছে তখন এই ব্যবস্থা কি ভাল হইল?

ইণ্ডো-ইউরোপিয়ান খেলা—

১৯২০ সাল হইতে প্রত্যেক বৎসরই কলিকাতার গড়ের মাঠে শাদা ও কালার একটী করিয়া ফুটবল ম্যাচ

খেলা হইয়া আসিতেছে। এই খেলায় কালাগণ সাদা খেলোয়াড়গণকে কিরূপ হারাইয়াছে তাহার একটী তালিকা দেওয়া গেল।

সাল	শাদা	কালা
১৯২০	৪	১
১৯২১	০	১
১৯২২	১	৯
১৯২৩	২	১
১৯২৪	১	৩
১৯২৫	০	২
১৯২৬	০	২
১৯২৭	০	১
১৯২৮	২	০
১৯২৯	০	৩
১৯৩০	খেলা হয় নাই।	
১৯৩১	৩	১
১৯৩২	০	৫

পরলোকে সতীশচন্দ্র ঘটক—

ভবানীপুরের লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্য সেবী সতীশচন্দ্র ঘটক মহাশয় গত ২রা আষাঢ় পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৪৭ বৎসর হইয়াছিল। সতীশ চন্দ্র প্রথম জীবনে হাইকোর্টের উকীল ছিলেন—পরে Corporation Teachers Training Collegeএ অধ্যাপনা করিতেন।

সতীশচন্দ্র সাহিত্যের সকল শাখায় কিছু না কিছু দান করিয়া গিয়াছেন। তিনি একাধারে সঙ্গীতজ্ঞ, সঙ্গীত রচয়িতা, নাট্যকার, কথাসাহিত্যিক, কবি, প্রবন্ধ লেখক, বিজ্ঞানবিদ্‌ ও বঙ্গসাহিত্য রচয়িতা ছিলেন। তাঁহার লেখনী গদ্য ও পদ্য উভয় পথেই সমান চলিত। প্যারডি রচনায় তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল—এবিষয়ে তাঁহার সমকক্ষ কেহ নাই এবং ছিল না। তাঁহার অনেক প্যারডি লোকের কণ্ঠে কণ্ঠে গীত হইয়া থাকে। কৌতুক প্রবন্ধ রচনাতেও তাঁহার সমকক্ষ মেলা কঠিন—তাঁহার 'তৈল' 'হাসি' ইত্যাদি প্রবন্ধের নাম করা যাইতে পারে। ছোট গল্প রচনায় তাঁহার কিরূপ কৃতিত্ব ছিল তাহা অনেকে জানেন না—সবুজপত্রের প্রকাশিত তাঁহার দাঁড়কাক নামক গল্পের তুলনা নাই। সতীশচন্দ্র সবুজ-পত্রের নিয়মিত লেখক ছিলেন—সবুজপত্রে তাঁহার উদ্ভিদ্‌ বিদ্যার পুস্তক গাছের কথা প্রকাশিত হয়। বিজ্ঞানকে যে কি করিয়া সাহিত্যে পরিণত করিতে পারা যায়—তাহা সতীশচন্দ্র জানিতেন। তাঁহার যে পুস্তকগুলি প্রকাশিত হইয়াছে তাহার মধ্যে—সতীর জেদ, ঝলক, লালিকা গুচ্ছ, রঙ্গ ও ব্যঙ্গ, অগ্নিশিখা, হাটে-হাঁড়ি, নাটিকাগুচ্ছ, জীবের কথা উল্লেখযোগ্য। তাঁহার অনেক-গুলি সদ্‌গ্রন্থ অপ্রকাশিত অবস্থায় আছে। আমাদের মনে হয় তাঁহার সাহিত্য সাধনার উৎকৃষ্টতর অংশই এখনো অপ্রকাশিত।

সতীশচন্দ্র ভবানীপুর বালক সেবক সমিতি, হরিশ প্রতিষ্ঠান ও রসচক্র সাহিত্য সংসদের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে ছিলেন। গত ১২ই আষাঢ় এ তিনটি প্রতিষ্ঠানের সদস্য-গণের উদ্যোগে পূর্ণ থিয়েটারে অকালমৃত্যুতে শোক প্রকাশের জন্য একটি সভার অনুষ্ঠান হয়। শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয় সভায় সভাপতিত্ব করেন। ঐদিন সন্ধ্যায় ৺দ্বিজেন্দ্রলালের ভ্রাতুষ্পুত্রগণের ভবনে রসচক্রের বৈঠকে সতীশচন্দ্রের সাহিত্য সাধনা সম্বন্ধে আলোচনা হয়। কবি কালিদাস রায় একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। করপোরেশন প্রাইমারী স্কুল সমূহের শিক্ষকগণও শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বেও একটি শোক সভার অনুষ্ঠান করেন।

"বাদলদিনে সাঁঝের বেলায়—"

শিল্পী—শ্রীচারু সেন।

লক্ষ্মীবিলাস প্রেস লিমিটেড, কলিকাতা।

সতীশচন্দ্র মিত্র প্রতিষ্ঠিত

৬ষ্ঠ বর্ষ | ভাদ্র—১৩৩৯ | ৫ম সংখ্যা

নারীজাতির স্বাধিকার

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মিত্র এম-এ

গত শতাব্দীতে মিলের subjection of woman বা নারীজাতির পরাধীনতা সম্বন্ধে প্রবন্ধ বাহির হইলে তখনকার পণ্ডিত সমাজে উহার মুখ্য উদ্দেশ্য লইয়া ভীষণ বাকবিতণ্ডা উপস্থিত হয়। কবি টেনিসন Princess বা 'রাজকুমারী' নামক কাব্য প্রণয়ন করিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাহেন যে রমণী-সমাজের কর্ত্তব্য ভিন্ন, পুরুষের সহিত দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হইয়া সমান অধিকার লাভ করিবার জন্য তাহাদিগের জন্ম হয় নাই। তিনি বলেন, Man is for the sword and woman is for the hearth. কথাটা তখন সনাতন সত্য বলিয়াই বিবেচিত হইয়াছিল। রক্ষণশীল সমাজ রাজকবি তাহাদের দলভুক্ত দেখিয়া স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচিয়াছিল। তাহার পর অর্দ্ধ শতাব্দীর উপর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। জগতেও অনেক অঘটন সংঘটিত হইয়াছে। রমণীগণ পুরুষের সহিত সমানভাবে শিক্ষালাভ করিয়া পুরুষ জাতিকে অনেক ক্ষেত্রেই হটাইয়া দিতেছে। শিক্ষিতা রমণী একজন শিক্ষিত পুরুষের ন্যায় সমানভাবে বর্ত্তমান বিজ্ঞান ও দর্শন শাস্ত্রে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। একের পর একটী করিয়া তাবৎ কর্ম্মক্ষেত্রগুলিই রমণীগণকে ছাড়িয়া দিতে হইতেছে। এখন অনেক রমণী উকিল, ব্যারিষ্টার, ডাক্তার এমন কি এটর্ণি অবধি হইতেছেন দেখিতে পাওয়া যায়। রমণী কেরাণী, পুলিশ, কুলী, প্রহরীও যথেষ্ট হইয়াছে। গত মহাসমরের সময় রমণীগণ যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিয়া লড়াই না করিলেও যুদ্ধক্ষেত্রে নরজাতির সর্ব্বপ্রকার সাহায্য করিয়াছে। ব্যবসায় অনুযায়ী আচার ব্যবহার, পোষাক পরিচ্ছদের পরিবর্ত্তন ঘটে। বর্ত্তমান রমণী সমাজের আচার ব্যবহার পুরাতন রমণী-সমাজের সহিত অনেক অংশেই বিভিন্ন। তাহাদের পোষাক পরিচ্ছদেও খুব স্বাভাবিক ভাবে

যুগান্তর দেখা দিয়াছে। কাজেই যাহা পূর্ব্বে অসম্ভব ছিল এখন তাহা খুব স্বাভাবিক ভাবেই সম্ভব হইয়াছে।

কোন এক সুদূর অতীতে পুরুষ রমণী জাতিকে দাসী বা অধীনস্থ এক শ্রেণী জীবে পরিণত করে। তাহার কারণ পুরুষকে গর্ভধারণ করিতে না হওয়ায় এবং পুত্র সন্তানগণের তত্ত্বাবধান করা হইতে সম্পূর্ণ স্বাধীন হওয়ায়, সে বেশ স্বচ্ছন্দভাবে সর্ব্বত্র আহার বিহার করিবার সুযোগ সুবিধা লাভ করায় তাহার মাংসপেশীগুলি নারীজাতির মাংসপেশী অপেক্ষা সবল হইয়া উঠে। এখনও অষ্ট্রেলিয়ার অসভ্য জাতিদের নারীগণ পুরুষগণ অপেক্ষা শারীরিক বলে বিশেষ ক্ষুণ্ণ না হইলেও, গর্ভধারণ ও সন্তানাদির তত্ত্বাবধানে ব্যাপৃতা থাকায় তাহারা তাহাদের পুরুষজাতি অপেক্ষা দিন দিন হীনবল হইয়া পড়িতেছে। ভারতবর্ষে যাঁহারা সাঁওতাল রমণী ও পুরুষ দেখিয়াছেন তাঁহারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে সাঁওতাল পুরুষগণ তাহাদের রমণীগণ অপেক্ষা শারীরিক বলে বিশেষ উন্নত নয়। আফ্রিকার জঙ্গলে যে সমস্ত অসভ্য জাতি বাস করে, তাহাদের মধ্যেও নর-নারীর মধ্যে শারীরিক বীর্য্যের তারতম্য বিশেষ নাই। স্বাভাবিক বন্ধনের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ হইয়া পড়ায় রমণী-সমাজকে নরের আশ্রয় প্রার্থী হইতে হয়। সন্তান যদিও নর-নারীর যৌথ সম্পত্তি কিন্তু অপেক্ষাকৃত অসভ্য সমাজে যেখানে পাশবিক প্রবৃত্তির প্রাধান্যই অধিক লক্ষিত হয়, সেখানে পুত্রকন্যাগণ মাতারই সম্পত্তি বলিয়া বিবেচিত হয়। মাতার নাম অনুযায়ী পরিচিত হইবার প্রথা আমাদের দেশেও প্রচলিত ছিল। পাণ্ডবগণের একটী সাধারণ নাম ছিল কৌন্তেয়। দাক্ষিণাত্যে মালাবার অঞ্চলে সন্তানগণ মায়েরই সম্পত্তি বলিয়া বিবেচিত হইত বলিয়া তথাকার আইন ছিল যে ভাগ্নেয় তাহার মাতুলের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইবে। নৃতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণও অনুমান করেন যে মাতৃগোষ্ঠী বা Matriarchই প্রথম ব্যবস্থা। Patriarch বা পিতৃগোষ্ঠী পরে সমাজে প্রবেশ করে।

তাহার পর দেশজয়ের যুগ আসিয়া পড়ে। একজন বীর্য্যবান পুরুষ কিছু বিশ্বাসী ও বলবান সহচর সংগ্রহ করিয়া প্রথম তাহারই বংশ সম্ভূত শাখাগুলিকে পরাস্ত করিয়া তাহাদের অধিনায়ক হয়েন। তাহার পর তাহাদের সম্পূর্ণ গোষ্ঠী বা clanটীকে পরাস্ত করিয়া স্বাধিকার বিস্তার করেন। অবশেষে তিনি প্রবল হইতে পারিলে সমস্ত জাতি বা tribeএর উপর তাঁহার প্রাধান্য স্থাপন করেন। এই দলপতি ভবিষ্যতে রাজায় পরিণত হইলে, তাঁহার অনুচরগণ অভিজাত শ্রেণীতে উন্নত হ'ন। অভিজাতদের প্রধান ভোগ্য বসুন্ধরা ও রমণী। দেশের তাবৎ সুন্দরীকে বলপূর্ব্বক বা অর্থসাহায্যে সংগ্রহ করিয়া আনিয়া রাজা এবং তাঁহার অনুচরগণ স্ব স্ব অন্তঃপুর সাজাইতে থাকেন। এই বহু পত্নীত্ব রমণী-সমাজের পদে আর একটী শৃঙ্খল অতি সুদৃঢ় ভাবে পরাইয়া দেয়। প্রকৃত কথা বলিতে গেলে রমণীগণ এখন হইতে একটী বিলাসের সামগ্রী বলিয়াই বিবেচিত হইতে থাকে। সুরা, দ্যূতক্রীড়ার ন্যায় রমণীও রাজা এবং তাঁহার অনুচর অভিজাতদের একটী ব্যসনে পরিণত হয়। এই জন্যই মনু একস্থলে বলিয়াছেন,

স্বভাব এষ নারীণাং নরাণামিহ দূষণং।
অতোঽর্থান্ন প্রমাদ্যন্তি প্রমদাসু বিপশ্চিতঃ।

ইহলোকে পুরুষদের দূষিত করাই স্ত্রীদিগের স্বভাব, এই জন্য পণ্ডিতেরা স্ত্রীলোক সম্বন্ধে কখনই অনবধান হ'ন না। মনু আবার বলিতেছেন,

অবিদ্বাংসমলং লোকে বিদ্বাংসমপি বা পুনঃ।
প্রমদাহ্যুৎ পথং নেতুং কামক্রোধবশানুগং॥

কোন পুরুষই আপনাকে বিদ্বান ও জিতেন্দ্রিয় জ্ঞান করিয়া স্ত্রীলোকের সন্নিধানে বাস করিবেন না। যেহেতু তিনি বিদ্বানই হউন আর অবিদ্বানই হউন দেহ ধর্ম্ম বশে কাম ক্রোধের বশীভূত পুরুষকে কামিনীরা অনায়াসে উন্মার্গগামী করিতে পারগ হয়।

মনুর অনুশাসন আরও একটু আগাইয়া গিয়াছে,

মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা ন বিবিক্তাসনো ভবেৎ।
বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি॥

মাতা, ভগিনী, কন্যা প্রভৃতির সহিতও পুরুষ নির্জ্জন গৃহে বাস করিবে না। যেহেতু ইন্দ্রিয়গণ একত্রে, বলবান, উহারা জ্ঞানবান পুরুষকেও আকর্ষণ করিতে পারে।

মনুর বিধানগুলির প্রতি [illegible]

ইহাই মনে হয় যে তখনকার আর্য্যসমাজ অনার্য্যগণকে সর্ব্বতোভাবে বিধ্বস্ত করিয়া দিয়া এক বিরাট সাম্রাজ্য সংগঠন করিয়াছেন। রমণীগণ এখন আর তাঁহাদের সহচরী নয়, কামের দাসী বা বিলাসের বস্তু মাত্র। কোন বিজেতা জাতি যুদ্ধে আর একটী জাতিকে পরাস্ত করিতে পারিলে তাহাদের ভূসম্পত্তির সহিত রমণী রত্ন ও লুণ্ঠন করিত। এইরূপ করিবার দুইটী কারণ ছিল। রমণীগণ ক্ষেত্র বিশেষ। পরাজিত জাতিকে দুর্ব্বল করিতে গেলে তাহাদের সংখ্যা কমাইবার প্রয়োজন হয়। এইরূপ করিতে গেলে তাহাদের রমণীগণকে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া তাহাদের সহিত সঙ্গমে সন্তানাদি উৎপাদনের দ্বারা শত্রু পক্ষের বলক্ষয় ও নিজপক্ষের বলবৃদ্ধি হইত। আদিম যুগে ইহাই মুখ্য উদ্দেশ্য থাকিলেও, সম্ভোগ হইতে পাশবিক প্রবৃত্তি মূর্ত্তিমান হইয়া উঠে। অভিজাতগণ ইচ্ছামত রমণী সংগ্রহ করিতে সক্ষম হওয়ায় ইন্দ্রিয় দমন করিতে তাঁহারা একেবারেই অসমর্থ হইয়া উঠেন। চন্দ্রের গুরুর পত্নীর প্রতি অনুরাগ, ইহা গল্প কথা হইলেও প্রকৃত মনস্তত্ব প্রকটিত করিয়াছে। ইন্দ্র গোপনে অহল্যার সতীত্ব নষ্ট করিতে কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করেন নাই। এই জন্যই মনু অভিজাতগণের জন্য তাঁহার পূর্ব্বোক্ত শ্লোকগুলির দ্বারা কতকটা restraint বা সংযম বিধি প্রচার করিতেছেন মাত্র। কোন বিজেতা জাতি বিজিতদের রমণীগণকে যখন দাসীরূপে গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের অন্তঃপুরে স্থান দেন, তখন রমণীগণের পরাধীনতার তৃতীয় শৃঙ্খল সৃষ্ট হয়। সমস্ত সভ্য-সমাজেই যখন রমণী-সমাজের উপর এইরূপ অত্যাচার ন্যায় ও ধর্ম্মের নামে প্রবর্ত্তিত হইতে থাকে তখন দুই একজন শিক্ষিতা রমণী ইহার প্রতিবিধান করিবার জন্য যত্নপরায়ণা হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু বিশেষ সফলকাম হইতে পারেন নাই। মহাভারতের যুগে কুন্তী ও তাঁহার পুত্রবধূ কৃষ্ণা স্বাধীন প্রকৃতি ছিলেন। তখনকার প্রথায় তাঁহারা ঠিক চলিতেন না বলিয়াই অনেক সময়ে অনেক গঞ্জনা সহ্য করিয়াছেন। মিশরের রাণী ক্লিওপেট্রা ও ব্রীটন রাজ্ঞী বোডেশিয়া অনেকটা ঐরূপ।

মধ্যযুগে রমণীগণের জন্য অভিজাত শ্রেণী নূতন শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা প্রচলন করেন। খুবই আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই ব্যবস্থা জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সর্ব্বত্রই প্রায় এক। সংসারে শান্তি স্থাপন করিতে গেলে অন্তঃপুরস্থিত বিবাহিতা ও রক্ষিতা রমণীগণের মধ্য হইতে একজনকে প্রধান করিয়া তাহাকে গৃহকর্ত্রী পদে স্থাপন করার বিশেষ প্রয়োজন হয়। রমণীগণের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে গেলে তাহাদিগকে কতকটা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য প্রদান করিতেই হয়। এই জন্য সন্তান প্রসব, ও প্রতিপালনের সহিত রমণীগণকে স্বামীর সেবা, শ্বশুর ও শাশুড়ীর সেবা, দেবর ও ভাসুর প্রভৃতি আত্মীয়গণের পরিচর্য্যা, গৃহস্থালীর তাবৎ পরিদর্শনভার তাহাদের উপর অর্পিত হয়। অবিবাহিতা কুমারীগণ গো-দোহন ও তাহাদের সেবা করিত বলিয়া ভারতে তাহাদের নাম হয় দুহিতা ও পাশ্চাত্য দেশ সমূহে সূতা কাটিয়া কাপড় প্রস্তুত করিয়া পরিবারের সকলের বস্ত্র যোগান দিত বলিয়া তাহাদিগকে spinster বলা হইত। এই জন্যই মনুও অনেক সংযতভাবে গার্হস্থ্য ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহার নীতি প্রচার করিতে গিয়া বলিয়াছেন,

> যত্র নার্য্যাস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।
> যত্রৈ তাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্ব্বাস্তত্রা ফলাঃ ক্রিয়াঃ।
> শোচন্তি জাময়ো যত্র বিনশ্যত্যাশু তৎকুলং।
> ন শোচন্তি তু যত্রৈতা বর্দ্ধতে তদ্ধি সর্ব্বদা।

যে কুলে স্ত্রীলোকেরা বস্ত্রালঙ্কারাদি দ্বারা পূজিতা হয়েন, তথায় দেবতারা প্রসন্ন থাকেন। আর যে কুলে স্ত্রীদিগের অনাদর হয়, সে বংশে সকল ক্রিয়া নিষ্ফল হইয়া যায়।

যে কুলে ভগিনী ও গৃহস্থের সপিণ্ড স্ত্রী, পত্নী, কন্যা, পুত্রবধূ প্রভৃতি স্ত্রীলোকেরা ভূষণাচ্ছাদনাভাবে দুঃখিনী হয়, তৎকুল শীঘ্র নির্দ্ধন হইয়া যায়, এবং দৈব ও রাজাদি দ্বারা পীড়িত হয়। আর যে কুলে ঐ সকল স্ত্রীরা ভোজনাচ্ছাদনাদি প্রাপ্তিতে সন্তুষ্ট থাকে, সে কুল সর্ব্বদা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। মনু আরও বলিতেছেন,

> জাময়ো জানি গেহানি শপন্ত্য প্রতিপূজিতাঃ।
> তানি কৃত্যাহতানীব বিনশ্যন্তি সমন্ততঃ।
> সন্তুষ্ট ভার্য্যয়া ভর্ত্তা ভর্ত্রা ভার্য্যা তথৈবচ।
> যস্মিন্নেব কুলে নিত্যং কল্যাণং তত্রবৈ ধ্রুবং॥

ভগিনী, পত্নী, পুত্রবধূ প্রভৃতি স্ত্রীলোকেরা অপূজিতা হইয়া

যে কুলে শাপ প্রদান করে, সেই কুল ধন পশ্বাদির সহিত সর্ব্বতোভাবে বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

যে কুলে স্বামী পত্নীতে ও পত্নী স্বামীতে সন্তুষ্ট থাকে, সে কুলে কল্যাণ সর্ব্বদাই পরিবর্দ্ধিত হয়।

মধ্যযুগের নারীজাতির এই মর্য্যাদা কেবলমাত্র অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে আবদ্ধ ছিল। মনুর বচনগুলি কেবলমাত্র আর্য্য অভিজাতদের জন্যই রচিত হইয়াছিল। শূদ্র ও পতিত অনার্য্য জাতিগণের রমণীগণকে তখনকার আর্য্য সমাজ ঘৃণার চক্ষেই দর্শন করিতেন। পূর্ব্বোক্ত শ্লোকগুলি একটু বিশেষভাবে পাঠ করিলে ইহাই মনে হয় যে, তাবৎ রমণীকুলকে তখনও সভ্যজাতি প্রীতির চক্ষে দর্শন করিতেন না। কেবল গৃহে শান্তি স্থাপনের জন্য অন্তঃপুরবাসিনীগণকে কতকটা স্ব-চ্ছন্দ্য দান করিবার ব্যবস্থা হয়। রামচন্দ্র যখন শূদ্রককে তাঁহার পত্নীর সম্মুখেই হত্যা করেন, শূদ্রক পত্নী তখন হাঁটু গাড়িয়া করযোড়ে নির্দ্দোষ স্বামীর প্রাণ ভিক্ষা চাহিতেছিল। দুর্য্যোধন যখন সভার মধ্যে ভ্রাতৃবধূ যাজ্ঞসেনীকে বিবসনা করিবার আজ্ঞা প্রদান করেন, কুরু প্রধানগণ তখন সকলেই নীরব ছিলেন, উহার প্রতিবাদ করেন নাই। বেদের ইন্দ্র অনার্য্যরাজ সম্বরের নিরানব্বইটা পুরী ধ্বংস করিয়া অনার্য্য রমণীগণের উপর অত্যাচার করিতে কোন প্রকার দ্বিধাবোধ করেন নাই। বারাঙ্গনা তৎকালের সমাজের একটী বিশেষ অংশ ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। উর্ব্বশী, মেনকা, রম্ভা প্রভৃতি খ্যাতনামা সুন্দরীগণ অনেক সময়েই পত্নীভাবে অনেক মহাপুরুষের সহিত কিছুকাল বসবাস করিতেন। তাহাতে তাহাদের সমাজে কোন প্রকার নিন্দা হইত বলিয়া মনে হয় না। গোধনের ন্যায় নারীজাতিও পণ্য দ্রব্য বিশেষ বলিয়াই বিবেচিত হইত। এইজন্যই কোন রাজার বিবাহ হইলে রাজকন্যার সহিত অনেক দাসী উপঢৌকন প্রদান করা হইত। এই দাসীদের মধ্যে অনেকেই সুন্দরী ও যুবতী থাকিতেন। রাজাগণ অনেক সময়েই এই দাসী সঙ্গম করিতেন। মহর্ষি বিদুর এইরূপ একজন দাসীর সন্তান। শর্ম্মিষ্ঠা যযাতির উপপত্নী মাত্র, তাহার গুলহন পেদাসী গিরিশি কন্যা। ঐতিহাসিক যুগেও আমরা চন্দ্রগুপ্তকে নন্দবংশের একজন রাজার দাসী পুত্র বলিয়া শুনিতে পাই। ইউরোপে সম্ভ্রান্ত অভিজাতগণ একটী মাত্র রমণীর সহিত বিবাহিত হইলেও, তাঁহাদের অসংখ্য দাসীবৎ উপপত্নী থাকিত। এই সমস্ত উপপত্নী গর্ভজাত সন্তানগণের সমাজে যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। Duke of Monmouth এইরূপ একজন দাসীর পুত্র। চতুর্দ্দশ লুইএর উপপত্নী নাকি ফ্রান্সের রাজদণ্ড পরিচালনা করিতেন। এথেন্সের বিখ্যাত রাজনৈতিক প্যারিক্লিসের উপপত্নী এসপেসিয়ার নাম জগদ্বিখ্যাত। নীরবে পুরুষের সামান্য মাত্র সোহাগলাভ করিয়া আপনাকে সম্পূর্ণভাবে তাহার দাসীরূপে আত্মদান করিয়া রমণী-সমাজ আর একটী শৃঙ্খল বা বেড়ী তাহাদের পদদেশে আবদ্ধ করিয়া দেন।

অভিজাতদের মধ্যে প্রচলিত নারী ধর্ম্ম ও শিক্ষা ক্রমশঃ জন-সাধারণেরও আদর্শ হইয়া দাঁড়ায়। সমাজে যখন শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপিত হয় নর বাহিরের কার্য্য আপনাদিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট রাখিয়া গৃহস্থালির তাবৎ কার্য্য নারীজাতির উপর চাপাইয়া দেয়। নারীজাতি অন্তঃপুরের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া এবং অনেকটা দায়িত্বপূর্ণ কর্ত্তব্য প্রাপ্ত হইয়া আপনার গৌরব প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা সুরু করিয়া দেয়। নারী জাতির অন্তঃপুরই তাহার বিশ্ব-বিদ্যালয়ে পরিণত হয়। সেখান হইতে গৃহস্থালীর তাবৎ কর্ত্তব্য সে স্বহস্তে জননী বা শশ্রূঠাকুরাণীর নিকট শিক্ষা করিত। কি করিয়া রন্ধন করিতে হয়, সন্তান পালন করিতে হয়, গুরুজন ও আত্মীয়স্বজনের সেবা করিতে হয়, রোগীর পরিচর্য্যা করিতে হয়, গোধনের তত্ত্বাবধান করিতে হয়, অধীনস্থ দাস-দাসীর সুখ-স্বচ্ছন্দতার সম্বন্ধে নজর রাখিতে হয়, স্বামীর সোহাগ বৃদ্ধি করিতে হয়, পিতৃকুল ও স্বামীকুলের সম্মান রক্ষা করিতে হয়, সতীত্ব রক্ষাই জীবনের চরম লক্ষ্য এবং কিরূপে মৃত্যুর পরম চরম স্বর্গ আনিয়া দে ইত্যাদি ইত্যাদি শিক্ষা প্রত্যেক বালিকা শৈশবাবস্থা হইতে প্রাপ্ত হইয়া এমন এক আবহাওয়ায় মানুষ হইত [illegible] যে অন্যবিধ চিন্তা করিবার তাহার [illegible]

না। এই দাস-মনোবৃত্তিই নারী জাতিকে মধ্য যুগে বিশেষ করিয়া পরবশ করিয়া দিয়াছিল। পুরুষগণ তাহার গৃহে স্বরাজ স্থাপন করিয়া দেশ-জয়, ব্যবসা-বাণিজ্য, ধনৈশ্বর্য্য উপার্জ্জন ইত্যাদি করিয়া বেড়াইতেন। আপনাদের উপার্জ্জিত সুখৈশ্বর্য্যের কিয়ৎ অংশ রমণীগণকে ছাড়িয়া দিয়া তাহাদিগকে অনেকটা সংসারের প্রতি আকৃষ্টা করিয়া তোলেন। একথা বলিতেছি এইজন্য যে সম্পত্তিই তাবৎ অধিকারের মূল ভিত্তি। রমণীগণকে তখনকার সমাজ কোন প্রকার সম্পত্তির অধিকারিণী হইতে দেয় নাই। মনু স্পষ্টই বলিয়াছেন যে রমণী একমাত্র স্ত্রী-ধনের অধিকারী। স্ত্রীধন তাহার স্বোপার্জ্জিত অর্থ নহে, উহা তাহার পিতা, মাতা, ভ্রাতা বা স্বামী কর্ত্তৃক প্রদত্ত অর্থ। বিবাহে প্রাপ্ত যৌতুক তাহার নিজস্ব সম্পত্তি। স্বামীর সম্পত্তিতে স্ত্রীর কোন অধিকার ঘোষিত হয় নাই। পিতার অর্থে ও কন্যাকে কোন অধিকার দেওয়া হয় নাই। শ্বশুর বিদ্যমানে স্বামীর মৃত্যু হইলে মৃত-ব্যক্তির পুত্র উক্ত সংসারে স্থান পাইবেন কিন্তু কোন প্রকার পদ-মর্য্যাদা পাইবেন না। অর্থাৎ একেবারে নিঃস্বভাবে পরিবারকে সেবা করাই নারী-জাতির ধর্ম্ম ছিল। তাহাকে সময়ে সময়ে কিছু হাত-খরচ মাত্র দেওয়া হইত যাহার নাম ছিল স্ত্রীধন। বহির্জগতে কোনপ্রকার যাতায়াত না থাকায় এই স্ত্রীধন অনেক সময়েই পিতা বা স্বামী কর্তৃক ব্যয়িত হইয়া যাইত, মূক নারী তাহা নির্ব্বাক হইয়া সহ্য করিত। কেননা বাহিরে বাহির হইয়া তাহার ব্যথা সমাজে বিজ্ঞাপিত করিবার প্রথা ছিল না। যদি তাঁহার কিছুমাত্র বক্তব্য থাকে তাহা ঐ পরিবারের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তির নিকট পর্য্যন্ত বিচার হইতে পারিত। রমণীগণকে স্বাধীনতা প্রদান করিলে স্বাধীন মনোভাব প্রাপ্ত হইতে পারে এই আশঙ্কায় মনু স্পষ্টই বলিয়াছেন রমণীগণকে কখনই স্বাধীনতা প্রদান করিবে না। বাল্যাবস্থায় পিতার অধীনে প্রত্যেক রমণী প্রতিপালিতা হইয়া যৌবনে স্বামীর, বার্দ্ধক্যে স্বামীর অবর্ত্তমানে পুত্রের তত্ত্বাবধানে থাকিতে হইবে। সমগ্র নারীজাতি এই ব্যবস্থায় অনেকটা সন্তুষ্টই ছিল। অর্থোপার্জ্জনের বোঝা হাতায় তাহাদিগকে সহ্য করিতে হইত না বলিয়া দাস-মনোবৃত্তি তাঁহারা অনেক সময়েই সুখকর বলিয়া মনে করিতেন।

তাহার পর আসিল পর্দ্দার যুগ। রমণী-হরণ যখন ব্যবসায় পরিণত হইল, তখন সুন্দরী রমণীগণকে পর্দ্দার আড়ালে আনিয়া আকাশব্যাপী উচ্চ প্রাচীরের মধ্যে রক্ষা করিতে হয়। জর্জ্জিয়া, আর্ম্মিনিয়া, আরব প্রভৃতি দেশের সুন্দরীগণ বিবিধ দেশের সম্রাটগণের বিলাসের উপাদান হিসাবে সাধারণ পণ্যের ন্যায় প্রেরিত হইতে থাকে। রমণী-হরণ ব্যাধি ভারতে প্রবেশ করিলেই এখানকার পদচ্যুত সামন্ত রাজগণ ও অন্যান্য অভিজাত সম্প্রদায় বিশেষ চিন্তাযুক্ত হইয়া পড়েন। বরখার ন্যায় ঘোমটার আবরু টানিয়া দিয়া তাঁহাদের রমণীদের সিঁথির শোভা নষ্ট করিয়া দেন। উন্মুক্ত গৃহ-প্রাঙ্গনের চতুর্দ্দিকে আকাশব্যাপী প্রাচীর তুলিয়া দিয়া নিজেদের বাসস্থান অস্বাস্থ্যকর করিয়া তুলেন।

এইজন্যই উত্তর ভারতে রমণীগণ ক্রমশঃ দুর্ব্বল প্রকৃতি, ভগ্নস্বাস্থ্য, সৌন্দর্য্যহীনা হইয়া পড়েন। ইউরোপে এই উপদ্রব তত উৎকট ভাবে আত্ম-প্রকাশ করিতে পারে নাই কেননা তুর্কীর বিজয়ী সেনা ভিয়েনায় পরাস্ত হইয়া যায় এবং দীর্ঘকালব্যাপী ক্রুসেড বা ধর্ম্মযুদ্ধ চালায় পশ্চিম-এশিয়ার রমণী-হরণ রূপ সঙ্কট ব্যাধি ইউরোপে প্রবেশ করিতে পারে নাই। এইজন্য তথাকার রমণীগণ মধ্যযুগের মনোবৃত্তি লইয়া বর্ত্তমান যুগে উপস্থিত হ'ন।

বর্ত্তমান যুগের কতকগুলি বিশিষ্টতা আছে। ইউরোপের কতকগুলি বিদ্রোহী সন্তান তাহার সনাতন ধর্ম্মের উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়া যখন আমেরিকায় পদার্পণ করেন তখন হইতেই প্রকৃত পক্ষে নব-যুগের সূচনা হয়। পুরাতন আব-হাওয়া ও পুরাতন আবেষ্টনীর গণ্ডি অতিক্রম করিয়া তাঁহারা আদিম যুগের মধ্যে গিয়া পড়েন। কিন্তু তাঁহাদের সহিত বর্ত্তমানযুগের বিজ্ঞান ও ক্যালচার থাকায় সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে এক নূতন যুগ সৃজন করিবার অবসর তাঁহারা পাইয়াছিলেন। পিলগ্রীম ফাদারগণ আমেরিকায় আসিয়া রাজা বা ধর্ম্মের প্রাধান্য অস্বীকার করেন। রাজা বা ধর্ম তথায় না থাকায় এই

অভিমতে বাধা প্রদান করিবার কোন শক্তি তথায় ছিল না। তাঁহাদের সহিত স্বেচ্ছায় যে সমস্ত রমণীগণ দারিদ্র্য বরণ করিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে উৎসাহিত করিবার জন্য এই আদিম ঔপনিবেশিকগণ সর্ব্বপ্রকার স্বাধীনতা প্রদান করিবার চেষ্টা করিতে থাকেন। কিন্তু প্রাচ্য জগতের মনোবৃত্তি একদিনেই পরিবর্ত্তন করিতে পারা যায় না বলিয়া নর বা নারী কেহই উদ্দাম স্বাধীনতা প্রদান বা গ্রহণ করিতে রাজী না হইলেও বর্ত্তমান নারী-স্বাধীনতার আন্দোলনের মূলই আমেরিকার অপেক্ষাকৃত উন্নত নারী সমাজ। আমেরিকার নূতন সমাজে নারীকে নরের সমান আসন আইনতঃ প্রদান না করিলেও নারীগণ ধীরে ধীরে বিনা আন্দোলনে অনেক স্বাধীনতাই পাইতে থাকেন। প্রাচ্য মহাদেশের কোন দেশেই রমণীকে সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হইতে দেওয়া হইত না। ভূ-সম্পত্তি প্রচুর থাকায় আমেরিকার ঔপনিবেশিকগণ তাঁহাদের রমণীগণের মধ্যে ও উহা বণ্টন করিয়া দিতে লাগিলেন। অসভ্য রেড ইণ্ডিয়ানদের হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য রমণীগণকেও অস্ত্র ব্যবহার করিতে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। নিজেরা একেবারে সংখ্যায় অল্প হওয়ায় রমণীগণকে পুরুষের ন্যায় শিক্ষা প্রদান করিলে কার্য্যে অনেকটা সাহচর্য্য লাভ করিতে পারা যায় দেখিয়া আমেরিকাই রমণীগণকে পরিবার হইতে বাহির করিয়া আনিয়া পুরুষের শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া তুলিতে থাকে। রমণীগণ শিক্ষিত হইলে হোম বা গৃহ ভাঙ্গিয়া যাইবে বলিয়া বর্ত্তমানের হোটেল সমূহ তথায়ই প্রথম স্থাপিত হইতে থাকে। নর-নারী যখন একই শিক্ষা পাইতে থাকে তখন নারীর জন্য স্বতন্ত্র শিক্ষা মন্দিরের প্রয়োজন আমেরিকাই প্রথম অস্বীকার করে। সনাতনী ইউরোপে নারী প্রগতির ঢেউ আসিয়া পড়িলে, নারী আন্দোলন সুরু হইয়া যায়। এইজন্য ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে আমরা দেখিতে পাই ইউরোপে নারী-সমস্যা উৎকটভাবে আত্ম-প্রকাশ করিতেছে। সনাতনী ইউরোপ নারীকে সম্মানের চক্ষে দেখিলেও, তাহার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বিশেষ ব্যবস্থা করিতে রাজী হইলেও, তাহাকে একেবারে স্বাধীন করিয়া দিতে আদৌ প্রস্তুত ছিল না। রমণীগণ পুরুষের ন্যায় শিক্ষায় শিক্ষিত হইবার আন্দোলন সুরু করিলে ইউরোপ প্রথমে অস্বীকার করে। তাহার পর তাহার ব্যবসা-বাণিজ্য যখন বিশ্ব-ব্যাপী হইয়া পড়ে, কেরাণী ও টাইপিষ্টের জন্য রমণীগণকে শিক্ষা প্রদান করিতে স্বীকৃত হয়। রমণীগণকে রমণী দ্বারা চিকিৎসা করাইলে অনেক সময়েই শ্লীলতা বজায় রাখিতে পারা যায় দেখিয়া তাহাদিগকে চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবার অধিকার দেওয়া হয়।

গত ক্রিমিয়ান যুদ্ধের পর হইতে রমণী শুশ্রূষাকারিণী গ্রহণ করা নিয়ম হয়। স্বাধীনতার আস্বাদ পাইয়া রমণীগণ ক্রমশঃই তাহাদের দাবী-দাওয়া বাড়াইয়া চলিতে থাকে। কল-কারখানা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সহিত নিম্নশ্রেণীদের হোম বা গৃহ নষ্ট হইয়া যায়। তাহারা স্ত্রী-পুরুষ সকলেই জীবিকার্জ্জনের জন্য দলে দলে নানাবিধ কারখানায় ও খনিগুলিতে কুলিগিরি করিবার জন্য প্রবেশ করে। টেনিসনের সে উপদেশ man for the sword and woman for the hearth ক্রমশঃই আকাশ কুসুমে পরিণত হয়। কুলী বা শ্রমিকগণ বর্ত্তমান শতাব্দির প্রারম্ভেই পার্লামেণ্ট মহাসভায় ভোটাধিকার প্রাপ্ত হইলে তাহাদের রমণীগণ কয়েক বৎসর পরে ভোটাধিকার পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে। বিলাতের মনস্বীগণ রমণীগণের এই প্রস্তাবে একেবারেই অস্বীকৃত হইতে পারিলেন না। নর-নারীর জন্মগত যে পার্থক্য ছিল এখন একে একে সে সমুদয় রহিত হইয়া যাইতেছে। অন্নের জন্য নর ও নারীর উভয়কেই যখন সমানভাবে পরিশ্রম করিতে হইতেছে, নর এবং নারী উভয়েই যখন একেই কার্য্যে ব্যাপৃত, উভয়েই যখন একই শিক্ষায় শিক্ষিত তখন উভয়ের মধ্যে সনাতনী পার্থক্য রক্ষা করিতে গেলে ন্যায়ের অবমাননা করা হয়। সফরেজিষ্টদল ক্রমশঃ প্রবল হইয়া মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নারীগণকেও দলভুক্ত করিতে সুরু করিলে, বিলাতের মহাসভা তাহাদিগকে ভোটাধিকার প্রদান করিতে বাধ্য হয়েন।

আমেরিকার প্রায় অনেক যুবকই উপার্জ্জন করিতে আরম্ভ করিয়াই লক্ষপতি হইবার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়া বসে। এইজন্য তাহাদিগকে বহুদিন অবিবাহিত থাকিতে

য়। লক্ষপতি হইতে অনেককেই প্রৌঢ় বা বার্দ্ধক্যের সীমার মধ্যে আসিয়া পড়িতে হয়। তখন যুবতী পত্নী বিবাহ করায় অনেকেই মৃত্যুর পর তাঁহার স্ত্রীগণকে তাবৎ সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী নির্দ্দেশ করিয়া যাওয়ায়, এখন আমেরিকার প্রায় শতকরা সত্তরভাগ সম্পত্তি এই নারী-জাতির করতলগত হইয়াছে। এই ব্যাধি ইউরোপে আসিয়া দেখা দিলে ইউরোপেও নারী লক্ষপতি দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে আরম্ভ হয়। কাজেই রমণী জাতিকে ভোটাধিকার প্রদান করিয়া জাতীয় মহাসভায় প্রবেশ করিতে দিব না বলিয়া পুরুষজাতির যে পণ ছিল এখন তাহা ভাঙ্গিয়া দিতে হয়। নর নারী নির্ব্বিশেষে সকলকেই পার্লামেণ্টে প্রবেশ করিবার অধিকার প্রদান করার সহিত নারীর স্বাধিকার পুনর্ব্বার প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে।

কিন্তু দাস মনোভাব একদিনেই পরিবর্ত্তিত হয় না। বহু শতাব্দীর শিক্ষা-দীক্ষা একদিনেই ঠেলিয়া ফেলা যায় না। এইজন্যই রমণী-সমাজ ধীরে ধীরে এখনও বহু আন্দোলন চালাইতেছেন এবং অনেক কার্য্য এখনও আছে যাহা গ্রহণ করিতে রাজী হইতেছেন না; গত মহাযুদ্ধে রমণীগণ দেশের মধ্যে থাকিয়া পুরুষের কার্য্যে ব্যাপৃতা হইতে হয় বলিয়া তাঁহাদের আচার-ব্যবহার, পোষাক-পরিচ্ছদ অনেকটা পরিবর্ত্তন করেন। তাঁহারা রমণীদের এই পরিবর্ত্তনে চমকাইয়া উঠিয়াছিলেন যাঁহারাও এখন বলিতেছেন যে ঐ সব পরিবর্ত্তন খুব স্বাভাবিক ভাবেই আসিয়াছে। যে কেশদাম রমণীর বিশেষ সৌন্দর্য্য বলিয়াই বিবেচিত হইয়া আসিতেছিল, রমণী সমাজ অম্লান বদনে তাহা কর্ত্তন করিয়া কল-কারখানায় প্রবেশ করেন। কেননা কেশ কর্ত্তন না করিয়া গোলা-বারুদের কারখানায় কাজ করিলে সমূহ বিপদ হইতে পারিত। ভূ-লুণ্ঠিত গাউন বাহিরের কার্য্য করিতে গেলে বিশেষ অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায় দেখিয়া তাহাদের পরিধেয় বস্ত্রকে হাঁটুর উপর তুলিয়া দিতে হয়। শ্লীলতার নামে যাঁহারা শিহরিয়া উঠিয়াছিলেন তাঁহারা এখন বেশ বুঝিতে পারিতেছেন যে মানুষের তাবৎ নীতিই কোন কালবিশেষের জন্য প্রস্তুত। যে কালে নারী কামের উপাদান মাত্র ছিল, রমণী হরণ যে যুগের উৎকট ব্যাধি ছিল, সে যুগে শ্লীলতার দোহাই দিয়া রমণীগণকে বস্ত্রের বেষ্টনী দিয়া আবৃত রাখিতে হইত। যে যুগে রমণী পুরুষের সহিত একত্র শিক্ষিত হইয়া, কর্ম্মক্ষেত্রের সর্ব্বত্রই তাহার সহচর রূপে বিচরণ করিতেছে সে যুগে শ্লীলতার দোহাই দেওয়া অনেকটা অযুক্তিকর নহে কি?

বর্ত্তমান যুগে পুরুষ নারীকে সর্ব্বভাবেই স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছে। হোম বা গৃহ ভাঙ্গিয়া যাইবেই। দিন দিন হাঁসপাতাল ও শুশ্রূষাকারিণীর সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটিবেই। হোটেলই আমাদের আহার-বিহারের একমাত্র আশ্রয়স্থল হইবে; ইহাতে সমগ্র মানব-সমাজের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে কি না বলিয়া যাঁহারা সন্দেহ করিতেছেন তাঁহাদিগকে এ কথাই বলিতে হয় যে সকল জাতিরই যেমন স্বাধিকার বলিয়া একটা জিনিষ আছে রমণীগণেরও সেইরূপ একটা জন্মগত দাবী আছে। পৃথিবীর স্বচ্ছন্দতার দোহাই দিয়া কোন জাতি যদি অন্যান্য জাতিগণকে দাসত্ব শৃঙ্খলে বাঁধিতে চাহে তাহাতে যেমন কেহই স্বীকৃত হইতে পারেন না; সেইরূপ তাবৎ মানব জাতির অর্দ্ধেক সংখ্যাকে সুখ-স্বচ্ছতার নামে দাসত্বের বেড়ীতে বাঁধিতে গেলে তাঁহারা স্ব ইচ্ছায় স্বীকৃতা হইবেন কেন? এতদিন যাহা চলিয়াছে তাহা অনেকটা নারী জাতির বুদ্ধি বা ক্ষমতার অভাবেই সম্ভব হইয়াছিল। স্বাভাবিক ভাবে যখন এই বুদ্ধি বা ক্ষমতা নারী জাতির মধ্যে ফিরিয়া আসিতেছে তখন উহার গতিরোধ কে করিবে? তবে একথা সত্য যে নারী জাতির মুক্তির পূর্ণ বিকাশের অন্তরায় বর্ত্তমান সনাতনী সমাজ নয়, নারী জাতি স্বয়ংই। তাঁহাদের দাস মনোভাব এখনও তাঁহাদের মধ্যে ভীষণভাবেই রহিয়া গিয়াছে বলিয়া আশঙ্কা হয়। কেননা যখনই co-education বা একসঙ্গে নর-নারীর শিক্ষা দিবার কথা উঠে তখনি আপত্তি আসে নারীজাতির দিক হইতেই। Co-education প্রবর্ত্তিত হইলে শিক্ষাকার্য্যে শুধুই যে অনেকটা ব্যয়সঙ্কোচ করিতে পারা যায় তাহাই নয়, বাল্যকাল হইতে একসঙ্গে প্রতিপালিত হইলে, সামান্য সঙ্কোচের পর্দ্দা এখন অবধি যাহা রহিয়া গিয়াছে তাহা আপনা হইতেই তিরোহিত হইয়া যাইবে। শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া উত্তর জীবনে যদি পুরুষের সহিত সমানভাবে পা

ফেলিয়া চলিতেই হয় তবে বাল্য ও কৈশোর কালে তাহাদের নিকট হইতে স্বতন্ত্র অবস্থান করিলে, উভয়ের মধ্যে স্বতন্ত্রতার একটী সূক্ষ্ম আবরণ থাকিয়া যাইবেই।

নারীজাতি সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিয়াও এখনও আন্দোলন করিতেছেন, ইহাও তাঁহাদের দাস মনোভাবের আর একটী পরিচয়। আন্দোলন অপেক্ষা গঠনেরই সময় আসিয়াছে। পুরুষগণ Counter Propaganda হিসাবে নূতন আন্দোলন সুরু করিয়াছেন। তাঁহারা সনাতনী যুগে ফিরিয়া যাইবার জন্য নারীজাতির জন্য স্বতন্ত্র শিক্ষাদান করিবার ব্যবস্থা করিতে চাহিতেছেন। Women's university এই চেষ্টার একটী প্রতিবিম্ব মাত্র। রমণীগণকে রন্ধন, বয়ন ও চারুশিল্প শিক্ষা দিবার প্রচেষ্টার অন্তরালে পুরুষের প্রাধান্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়াস আত্ম-গোপন করিয়া রহিয়াছে, রমণীগণ তাহা বুঝিতে পারিতেছেন না কেন। সঙ্গীত বিদ্যা ও নৃত্য রমণী বিশেষের পেশা ছিল সত্য কেননা রমণীগণ দাসী ও অন্তঃপুরবাসিনী ছিলেন। রমণী স্বাধীনতা লাভ করিয়া যদি পুরুষের সহিত সর্ব্বত্র সমানভাবে বিচরণ করে তবে নৃত্য ও সঙ্গীত একমাত্র রমণী-জাতিরই অধীত বিদ্যা থাকিবে কেন? কলাবিদ্যা মানবের সূক্ষ্ম মনোবৃত্তির বিকাশ সংঘটিত করে। এই তত্ত্বই যদি সত্য হয় তবে নর নারী বলিয়া এই বিদ্যা অর্জ্জনে অধিকার ভেদ থাকিবে কেন। বর্ব্বর যুগে দানব মানব হত্যা কার্য্য সমাপ্ত করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলে তাহার অন্তঃপুরবাসিনীগণ সঙ্গীত ও নৃত্য দ্বারা তাহার চিত্তের ক্লেশ অপনোদন করিত। এখন ত এইরূপ হইবার কোন কারণই নাই। আমোদ উপভোগ করিতে গেলে নরকেই বা না কেন নারীর জন্য সঙ্গীত ও নৃত্য শিক্ষালাভ করিতে হইবে? স্বাধীন-হৃদয়ের নৃত্য ও সঙ্গীতই প্রকৃত উপভোগ্য এইজন্যই যে সমস্ত রমণী এখনও পুরাতন দাস মনোবৃত্তি লইয়া এই সব আন্দোলনে যোগদান করিতেছেন তাঁহারা তাঁহাদের শৃঙ্খলই রচনা করিতেছেন মাত্র বলিয়া মনে হয়। পুরুষের সহিত একত্র আহার-বিহার ও ভ্রমণে নারী-সমাজ এখনও যে সঙ্কোচ অনুভব করিতেছেন তাহাতে তাঁহাদের দাস মনোভাবই প্রকাশ পাইতেছে। নারী যে নরের সমকক্ষ, সে তাহার অধীনা নহে—এই এই কথা এখনও মন খুলিয়া চিন্তা করিতে পারিতেছে না। শ্লীলতা বলিয়া যে চীৎকার শুনা যায় ও দাস মনোভাবের অভিব্যক্তি মাত্র। নারীর স্বাধিকার যাহা উপার্জ্জিত হইয়া গিয়াছে উহা কার্য্যকরী করিতে গেলে সমগ্র নারী জাতিকে সর্ব্বপ্রকার দাস মনোভাব পরিত্যাগ করিয়া আপনাদের অধিকার সম্বন্ধে বিশেষভাবে প্রবুদ্ধ হইতে হইবে। সনাতনীরা যাহাই বলুন না কেন নূতন যুগের যে বাণী আসিয়াছে উহাকে বরণ করিয়া লইয়া নূতন সভ্যতা আমাদিগকে সৃষ্টি করিতেই হইবে।

এস

শ্রীসারদারঞ্জন পণ্ডিত

মলয় আসিয়া দিয়া গেল মোরে
অজানা গানের সুরের মালা,
সাঁঝের আরতি সমাপন করি
নিশীথিনী আনে ফুলের ডালা।
যদিও চলিয়া গিয়াছে সন্ধ্যা
রজনীর মধু রজনী সন্ধ্যা
আনিছে বহিয়া অজনা পুলক
ওগো মধুর মন্দ বায়ে।

নীরব নিশীথে দাঁড়ায়ে কে আছে
ওই গভীর কুঞ্জ ছায়ে।
দূরেতে দাঁড়ায়ে থেক না নীরবে
এস রুণু ঝুণু নুপুরের রবে
দাঁড়ায়ে থাকাত সাজে না তোমার
ছুটিয়া এস গো বালা,
তুমি না আসিলে কুটীর আঁধার
হবে না প্রদীপ জ্বালা।

দুর্ঘটনা

শ্রীঅচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত

—গল্প—

সত্যিকারের দেশ বলতে যে গ্রাম, কলকাতা ছেড়ে এই জঙ্গলে চাকরি করতে এসে অমিতাভর তা বুঝতে আর বাকি নেই। তবু দেশের দুঃখ বুঝবার তার সময় ছিলো না, কেননা সন্ধ্যাকে সে সঙ্গে করে নি'য়ে এসেছে।

চাকরিটাতে অবিশ্যি উৎসাহিত হ'বার কিছু নেই, অমিতাভ নিতান্তই একজন সাব্-রেজিষ্ট্রার; কিন্তু তার যা কিছু বিশেষত্ব তা সন্ধ্যাকে এইখানে ছিনিয়ে নিয়ে আসতে পেরেছে ব'লে'। দু' দিনের জন্যে বেড়াতে নিয়ে আসা নয় দস্তুরমতো বিয়ে করে নিয়ে আসা। অনেক বেড়াজাল ছিঁড়ে, অনেক বাধা টপকে, অনেক হাঙ্গাম হুজ্জুৎ করে তবে সে সন্ধ্যাকে নিঃসঙ্গতার কারাবাস থেকে উদ্ধার করতে পারলো। একমাত্র এইখানেই তার যা-কিছু নাম, যা-কিছু পরিচয়—তার থেকে আর চোখ ফিরিয়ে নেয়া চলে না। নইলে, আর-সব ছেড়ে দিলে, বলবার তার আর কিছুই থাকে না;—নিতান্তই সে নিরীহ, সাধারণ, এক কথায় বলা যেতে পারে—ছিরকেলে; এবং সত্যি কথা বলতে কি, এই ঘটনার আগে গল্পের নায়ক হবারো তার দাবি ছিলো না।

অই বলে' সন্ধ্যার দিকে চাইলেই যে দৃষ্টি আটকে থাকবে তাও নয়। দেখতে সে বলতে গেলে কালো-ই, এক ফালি পাৎলা শরীর, তরঙ্গহীন ক্ষীণ জলধারাটির মতো ঝিরঝির করছে, কিন্তু গান গাইতে পারে সে চমৎকার, এই গান গাইবার সময়ই বাকি তার সমস্ত দেহে রাশি-রাশি লাবণ্যের প্লাবন আসে, এবং সেই প্লাবনেরই একটা ঢেউয়ে অমিতাভ হাবুডুবু খেতে খেতে ভেসে পড়লো। গান শুনে প্রেমে পড়া ও পরীক্ষায় ফেল্ করে' আত্মহত্যা করা—দুটোই সমান [illegible] তাই. নিজেই

আপত্তি আর টিটকিরি, শাসন আর বাধা—এমন-কি ত্যাজ্যপুত্র করবেন বলে' বাপের ভীমসেনি হুমকি। কিন্তু একবার যখন ভেসেছে, অমিতাভ পারে ঠিক উঠবেই। সম্পত্তি হাতের মুঠো থেকে ফস্কে গেলেও যা তার হাতে থাকবে তা কৃত্রিম গোল্ড-ষ্ট্যাণ্ডার্ড-এর হিসেবে ধরা পড়বে না বলেই তার বিশ্বাস।

তবু যা মূল্য অমিতাভ দিলো, সন্ধ্যা তাই—সন্ধ্যা তার নিজের চেয়েও বেশি। সে যে চোখে তাকে দেখেছে তাই তাকে সত্যি করে' দেখা। কী সে পেলো তার চেয়ে কী করে' সে পেলো আমাদের সে এইটুকুই কেবল দেখতে বলছে। কেননা কী সে পেলো তা আমরা দূর থেকে কিছু বুঝবো না।

পাশের গ্রামে এক তালুকদারের ছেলের বৌ-ভাতে সস্ত্রীক অমিতাভর নেমন্তন্ন হয়েছে। প্রকাণ্ড একটা মাঠ পেরিয়েই সে গ্রাম, ট্রেণে চাপ্‌লে পরের ডাউন-ষ্টেশনে মাইল-খানেক হাঁটলেই সে বাড়ী। মাঠ দিয়ে গেলে সব মিলে কিন্তু আড়াই-মাইল। কিন্তু বেলাবেলি ডাউন ট্রেণই পাওয়া যাবে।

ফেরবার সময় কাছাকাছি কোনো ট্রেণ নেই। ট্রেণ নিতে হ'লে আরো ঘণ্টা দুয়েক বসতে হ'বে, এবং সেই দেরি বুঝে খাওয়া-দাওয়ার সময়টাও অনেক পিছিয়ে গেছে। সন্ধ্যার সবতাতেই বাড়াবাড়ি—এখুনিই ফিরতে হ'বে, অতো রাত্তে এক গলা খেয়ে বিছানায় শুয়ে সে হাঁপাতে পারবে না। খাওয়াটাই ত' মুখ্য নয়, এই যে এসেছে এটাই হচ্ছে সব। তালুকদার ও তাঁর আত্মীয়বর্গ পাইও'ই করতে লাগলেন।

দুটো সন্দেশ ভেঙে ও দুটো দইয়ের খুরিতে চুমুক দিয়ে দু'জনে উঠে পড়লো।

—অন্ততঃ একটা পাল্কি জোগাড় করে' দি।

—না, না, অমিতাভ বল্‌লে,—এই টুকুন তো মোটে পথ, দেখতে-দেখতে হেঁটে চলে' যাবো।

আপত্তি উঠলো; সে কী কথা? সঙ্গে যে উনি আছেন, উনি হাঁটবেন কী! পাল্‌কি না হোক্‌, অন্ততঃ একটা গরুর গাড়ী। এই বংশী—

অল্প একটু হেসে কোমরের কাছে আঁচলটা লেপটে এনে সন্ধ্যাই সরাসরি বলে' বস্‌লো; কিছু লাগবে না। মাইল-আড়াই তো মোটে পেরোতে হ'বে। আধ ঘণ্টা।

কথা শুনে গোড়ায় সবাই হকচকিয়ে গেলো। তবু এ প্রস্তাবে সহজে কেউ রাজি হ'তে চায় না; না তা হয় না। উঁচু-নীচু মাঠ—তাও সব জায়গায় ফাঁকা নয়, সাপ-খোপের বাসা—একটু কেন বসে'ই যান্‌ না কষ্ট করে'। ট্রেণ আসতে আর দেরি কি। সবাইর সঙ্গে ফিরবেন।

অমিতাভ বল্‌লে,—সেজন্যে নয়। এই মাঠে বেড়াতে এখন বেশ ভালো লাগবে। সন্ধ্যার দিকে সঙ্কেত করে' বল্‌লে,—কল্‌কাতার ঘুপ্‌চি গলিতে মানুষ, মাঠ পেলে আর কথা নেই। এই মাঠ দিয়ে এই দিকে আমরা অনেকদিন বেড়িয়ে গেছি—

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে সন্ধ্যা বল্‌লে,—সব আমাদের মুখস্ত।

—তবে সঙ্গে একটা লোক দিই—লণ্ঠন নিয়ে পথ দেখিয়ে আপনাদের এগিয়ে দিয়ে আসুক। এই কেশব—

অমিতাভ বল্‌লে,—না লোক লাগবে কী করতে? সঙ্গে এই দেখছেন না টর্চ। পাঁচ-সেল্‌। একশো গজ পর্য্যন্ত আলো হয়।

আর কোনো আপত্তিই কানে তুল্‌লো না। দু'জনে বাড়ীর গেইট পেরিয়ে মাঠ ধরলো।

মাঠের অন্ধকার একটু পরিষ্কার হ'য়ে উঠতেই সন্ধ্যা অমিতাভের গা ঘেঁসে বল্‌লে,—সঙ্গে লোক দিলেই হয়েছিলো আর কি।

হঠাৎ সেখানে দাঁড়িয়ে পড়ে' বাঁ হাতে তার কোমরটা ঘন করে' জড়িয়ে ধরে' অমিতাভ সন্ধ্যার মুখের ওপর চুমু খেয়ে বল্‌লে,—তাহ'লে তোমাকে এমনি চুমু খাওয়া হ'তো না।

—হ্যাঁ, এতো বড়ো মাঠটাই মাঠে মারা যেতো একেবারে। সন্ধ্যা খিল খিল করে' হেসে উঠলো। বল্‌লে,—আজ ওঁদের বাড়ীতে এমন সুন্দর ফুলশয্যা, আর আমরা জেগে বসে' ট্রেণের শব্দ শুনি! তাড়াতাড়ি তাই বেরিয়ে পড়লাম। তোমার তো ইচ্ছা ছিলো দলের সঙ্গে ট্রেণেই আস।

—কক্ষনো না। তোমার সঙ্গে ফেরবারই আমার ইচ্ছা।

—নিশ্চয়। দলে পড়ে' গেলে নিজেদের আর কোনো আলাদা অস্তিত্ব থাকে না। যতো সব বাজে-বাজে কথা, ক' মণ ময়দা লাগলো তার হিসেব। তাই তো আমাকে শুনতে হ'ত? ফাঁকা গলায় একটা গান ধরতে পর্য্যন্ত পারতুম না। বলে' সন্ধ্যা সমস্ত অন্ধকার শিহরিত করে' গলা ছাড়লে।

সুরের একটা গমক শেষ না করেই সন্ধ্যা থেমে পড়লো। বল্‌লে,—এই যে আগে চলে' এলুম না, এখন আমাকে নিয়ে কতো না-জানি আলোচনা হচ্ছে! সহরে, একগুঁয়ে,—কত কী! কিন্তু তুমিই বলো যে-রাতে ওরা নতুন বিছানায় শুয়ে নতুন সান্নিধ্য উপভোগ করছে, সে-রাত আমরা গুচ্ছের কতোগুলি লুচি খেয়ে আর ট্রেণের অপেক্ষায় হাই তুলে নষ্ট করতে পারি, নাকি? রাখো, অন্ধকার করে' রাখো, তোমার টর্চ জেলে অন্ধকারকে আর লজ্জা দিয়ো না।

টর্চটা টিপে ধরে' চারদিকে ঘোরাতে-ঘোরাতে অমিতাভ বল্‌লে,—দাঁড়াও, দেখি, ঠিকমতো [illegible] কিনা।

সন্ধ্যা হেসে বল্‌লে,—জীবনের এতো বড়ো রাস্তা কি একটুও বেঠিক এসেছ? সব একেবারে [illegible] গজ-ফিতে দিয়ে মেপে-মেপে, না? হয়েছে, চলো,—না হয় পথই আজ একটু ভুল হ'লো। [illegible] না হয়ে না হয় আজ আমাদের মাঠ [illegible] হ'লো। [illegible] নীচে। বলে শূন্যে হাত দুটি [illegible] করে' [illegible] একেবারে সি-সার্পে গান ধরলে [illegible]

ট্রেণের মাইল অনেক দূরে সরে' গেছে, ফাঁকা মাঠে কোথাও কারো বসবাসের চিহ্ন নেই! খালি দীর্ঘকায় ঝাউয়ের সার চলেছে, কোথাও বা অনেকখানি জায়গা জুড়ে কতোগুলি আগাছা হঠাৎ স্তুপীকৃত হ'য়ে উঠেছে—তারি ভেতর দিয়ে বেণীর আঁকাবাঁকা ফিতের মতো সরু সাদা পথ। লোকজনের চলাচলের চিহ্ন আছে বটে, কিন্তু এখন কোনো পথিককেই দেখা গেলো না। জোরে হাওয়া দিয়েছে, খুসি হ'য়ে সন্ধ্যা পিঠের ওপর আঁচল এলো করে' দিলো।

বৃষ্টি না এলে হয়, হাওয়ার ঝাপটায় আকাশের তারার ঝাঁক উড়িয়ে নিয়ে গেছে—এখন ওপরেও পরিষ্কার অন্ধকার। টর্চের মুখ থেকে অনর্গল আলো উগ্‌রে এরি মধ্যে পথ করে'-করে' দুজনে এগিয়ে চলেছে। হঠাৎ হাওয়া থেমে আকাশটা থম্‌থমে হ'য়ে উঠলো ব'লেই এরাও কেমন একটু গম্ভীর হ'য়ে উঠলো।

তারপর সন্ধ্যা হঠাৎ আঁৎকে উঠে পায়ের দিকের সাড়িটা ঝাড়তে-ঝাড়তে ব্যস্ত হ'য়ে বল্‌লে,—দেখ ত কি একটা যেন আমার পায়ের ওপর দিয়ে চলে' গেল। না, না, এখনো আমার পায়ের সঙ্গে জড়িয়ে আছে।

মুখ-চোখ বিবর্ণ করে' অমিতাভ টর্চ টিপে ধরলো। মরা শুক্‌নো একটা ছোট্ট ডাল সাড়ির সঙ্গে আট্‌কে আছে। কিন্তু সাপ হ'লেই বা কী বাধা ছিলো? দেখতে শুকনো ডাল, কিন্তু হাত ঠেকাতে গেলেই হয়তো ফণা তুলে ছোবল মেরে বসবে।

আরো খানিক দূর এগিয়ে হঠাৎ কতো দূর থেকে একটা আর্ত্তনাদ শোনা গেলো। শব্দটা তীক্ষ্ণ একটা রেখার মতো স্তব্ধতার ওপর দিয়ে দীর্ঘ একটা দাগ কেটে দিলো। সন্ধ্যা চম্‌কে উঠে বল্‌লে,—ও কী, কেউ কাঁদছে নাকি?

টর্চের তেজ দিগন্ত পর্য্যন্ত বিকীর্ণ হ'লো না। অমিতাভ ভীতকণ্ঠে উত্তর দিলো; বোধহয় ট্রেণ আসছে। এখনো অনেক দূরে।

—আমাদের আগেই পৌঁছে যাবে নাকি?

—তাই তো মনে হচ্ছে। রাস্তার যেন এখন ঠিক দিশে পাচ্ছি না।

—বলো কী! সন্ধ্যা ভয় পেয়ে অমিতাভর গায়ের সঙ্গে ঘেঁসে এলো। বল্‌লে,—তাহ'লে এই মাঠেই আমাদের রাত কাটাতে হ'বে? কোথায় এসে পড়লাম তবে?

খানিকক্ষণ দু'জনে নিঃশব্দে আরো হাঁট্‌লো। অমিতাভ উৎফুল্ল হ'য়ে বল্‌লে,—না, ঠিকই এসেছি এই তো সেই বটগাছ দেখা যাচ্ছে, আর ভয় নেই। হাঁটতে পারছ ত'? দেখো।

হঠাৎ অমিতাভর গলাটা দুইহাতে জাপ্‌টে করে' ঝুলে পড়ে' সন্ধ্যা হেসে বল্‌লে, সত্যি পারছি না, কোলে করে' নাও না এবার।

আরো কিছু দূর আসতেই দেখা গেলো তিন চারটে লোক একটা গাছের তলায় বসে জটলা করছে। এবং আরো দু পা এগোতেই মনে হ'লো ওরা এইদিকেই আসছে—জন খেটে সামনের গাঁয়ের দিকেই চলেছে হয়ত। সন্ধ্যা খুসী হয়ে বল্‌লে,— ঐ কারা আসছে দেখ। এবার কোন প্রথে যাবে জিজ্ঞেস করে নাও। যাক্‌ যা বীরত্ব আজ দেখালে।

লোকগুলি একেবারে কাছে এসে পড়েছে। অমিতাভ বল্‌লে,—জিগ্‌গেস করতে হবেনা আর। এবার আমিই ঠিক চিন্‌তে পারবো।

—ছাই, তোমাকে আর চিনি না? আবার কতদূর এসেই হাঁক-পাক সুরু করবে। বাবা, বিছানায় এখন হাত-পা ছড়িয়ে শুতে পারলে বাঁচি। বলে সন্ধ্যাই একজনকে জিগ্‌গেস করলে বেলতলির রাস্তা তো এই দিকেই—ঐ যে কিসের একটা চুড়ো দেখা যাচ্ছে তার পাশ দিয়ে, না?

লোকটা বল্‌লে—আসুন আমার সঙ্গে। ব'লে হঠাৎ মুঠো করে সন্ধ্যার একখানা হাত চেপে ধরলো।

মুহূর্ত্তে কাণ্ডটা যে কী ঘট্‌তে চল্‌ছে অমিতাভ তা আয়ত্ত করতে পারলো না। ক্ষিপ্ত বাঘের মতো তেড়ে উঠে লোকটাকে সে আরেকটু হলে কী করতো কে জানে, কিন্তু দেখলে দুটো লোক কঠিন দুর্দ্ধর্ষ হাতে তার টুঁটি টিপে ধরেছে। গলা দিয়ে একটা আওয়াজও তার বেরুলো না। লোক দুটোর সঙ্গে ধ্বস্তাধ্বস্তি

লড়তে লড়তে সে মাটিতে পড়ে গেলো—টর্চ তুলে তার মাথাটা দিয়ে আততায়ীদের একটারো চোখের ওপর সে বাড়ি মারতে পারলো না—হাত থেকে কখন খসে গেছে। এখন চতুর্দ্দিকে কেবল অন্ধকার—আর সন্ধ্যার চীৎকার সেই অন্ধকার দূর থেকে দূরে ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ছে।

অমিতাভ প্রাণপণে সেই বাধা ঠেলে ফেলে বেরিয়ে পড়তে চাইলো, কিন্তু দুটো লোক প্রকাণ্ড একটা দড়ি দিয়ে একটা গাছের সঙ্গে তাকে বাঁধবার চেষ্টা করছে। অমিতাভ কিছুতেই বশ মানবে না; অগত্যা তাদের একজন কোমরের বাঁধন আলগা করে প্রকাণ্ড একটা ছুরি বের করলে। অমিতাভ আর টুঁ শব্দটি করতে পারলো না। এতগুলি লোকের বিরুদ্ধে তার নিরস্ত্র একাকীত্ব কতোক্ষণ যুদ্ধ করতে পারে?

মূহ্যমান অবস্থাটা একটু ফর্সা হয়ে আসতেই তার হুঁস হলো ধারে পারে কোথাও তার জন্যে সন্ধ্যা প্রতীক্ষা করছে না। লোকগুলিও উধাও। বিস্তীর্ণ মাঠে একেবারে সে একা।

পুলিশ অবিশ্যি সন্ধ্যাকে উদ্ধার করলে। সহরের হাসপাতালে সে আছে।

সন্ধ্যাকে পাওয়া গেছে শুনে অমিতাভ আনন্দে উদ্ভ্রান্ত হয়ে গেলো; সমস্ত-কিছু ফেলে এখুনি সে ট্রেন ধরতে বেরিয়ে পড়েছিলো, কিন্তু তাকে সত্যি নিয়ে আসা যায় কি না সেই বিষয়ে আত্মীয় স্বজনরা ঘোরতর প্রশ্ন করে' উঠলো।

সত্যি, সেই প্রশ্ন অমিতাভকেও প্রতিমুহূর্ত্তে দংশন করছে। সন্ধ্যাকে সত্যি সে ফের তার বাহুর মধ্যে ফিরে পেতে পারে কি না। যাকে সে জীবনে এতোটা অপমান করতে সাহস পেলো তাকে সে কী করে' আবার সিংহাসনে তুলে নিতে পারে! এই সন্ধ্যার [illegible] সে কতো বাধা লঙ্ঘন করেছে, কতো আঘাত ব্যর্থ করেছে। সে তার কী বলদৃপ্ত দুর্দ্দম স্বাধীনতা! অথচ এই [illegible] প্রতিজ্ঞার সন্ধ্যার কাছে তার ছিলো [illegible] ব্যক্তিত্ব সেই [illegible]

তার বশ্যতা স্বীকার করতে হ'লো। সেই সন্ধ্যাকে কি না সে রক্ষা করতে পারলো না। তার মুষ্টি হলো শিথিল, সারথি হয়ে রথের বল্গা সে ছেড়ে দিলে! অথচ পৃথিবীর সমস্ত আশ্রয় থেকে ছিনিয়ে এনে অমিতাভ তাকে তারই পাশে স্থান দিয়েছিলো—বৃহৎ দুর্গপ্রাকারে সে ছিলো সুরক্ষিতা। সেই আশ্রয়ের মর্য্যাদা সে রাখতে পারলো না। এতো বড়ো দায়িত্ব নিয়ে যে তাকে অসম্মান করে নিজের কাছেও তার অস্তিত্বের মূল্য কী? সন্ধ্যাকে সে কী বলে মুখ দেখাবে! এই তার বীর্য্য, এই তার প্রেম, এই তার পৌরুষ! যুদ্ধে সে পিঠ দেখায়, আততায়ীদের অভিভূত করা দূরে থাক্, হাসিমুখে সেই উদ্যত ছোরা যে বুক পেতে নিতে পারলো না, সেই কিনা একদিন প্রেমের তপস্যা করেছিলো?

আত্মীয়-স্বজনরা যতই প্রশ্ন করুক, অমিতাভকে কেউ বাধা দিতে পারলো না। সহরের মুখে সে বেরিয়ে পড়লো।

তার এই জঘন্য নির্বীর্য্যতা তার জীবনে যে গভীর গ্লানি বিস্তার করেছে তার তুলনায় সন্ধ্যার ঐ সাময়িক দৈহিক অসুস্থতাটা কিছুই নয়। ওটা একটা সামান্য দুর্ঘটনা মাত্র, চলন্ত মোটরের তলায় পা হড়কে হঠাৎ পড়ে' যাওয়ার চেয়ে তাতে দাম দেখার কিছু নেই—একটা উচ্ছৃঙ্খল আকস্মিকতা মাত্র; কিন্তু এই সচেষ্ট কাপুরুষতার লজ্জা সে মোছে কি করে? সন্ধ্যার জন্যে সে মরতে পারে বলে সে এতো বড়াই করতো, ছি ছি, সেই অহঙ্কার তার ধূলায় লাঞ্ছিত হলো। এই ব্যক্তিত্বলোপের কলঙ্ক তাকে এক নিমেষে সমস্ত পৃথিবীর চোখে কুৎসিত, নিঃস্ব করে ধরলো। তার সেই [illegible] ভবের মাঝে যে দুর্নীতি আছে তা সমাজ শাসন [illegible] আসেছে না।

সহরে সে সন্ধ্যেই পৌঁছে গেলো। [illegible] খবর নিয়ে জানলে সন্ধ্যা পুলিসের [illegible] স্বামীর কাছে [illegible]

অমিতাভ [illegible] আছে?

হাঁসপাতালের ডাক্তার বল্লেন,—ভালোই আছেন। দু' দিন অনায়াসে আরো বিশ্রাম নিতে পারতেন; কিন্তু বাড়ীর জন্তে ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। তাঁকে আটকে রাখা অসম্ভব হলো।

অমিতাভ আর দাঁড়ালো না, বিকেলের দিকে ফের একটা ট্রেন আছে। বেলতলি যেতে-যেতে রাত প্রায় দশটা বাজবে।

মাঝে দুটি মাত্র দিন, কিন্তু সন্ধ্যার জীবনের পট-ভূমিকাটা হঠাৎ কি-রকম কালো, হয়ে গেলো—কালো অর্থ আগাগোড়া শূন্যতার রঙ। সে কোথায় ফিরে চলেছে! সেখান থেকে কোথায় আবার যাবে। তবু তিনি কেমন আছেন, সুস্থ আছেন কি না, আততায়ীর আক্রমণে কী তাঁর আঘাত লাগলো—সে-সবের খবর না নিয়ে সন্ধ্যা কী করে হাত-পা গুটিয়ে হাঁসপাতালে পড়ে থাকে বলো!

তবু নিজেকে সে রিক্ত করে আসেনি। প্রাণপণে সংগ্রাম করেছে, কৌশল করেছে, বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। এবং তারই ফলে ছোরা দিয়ে ক্ষতাক্ত করতে পেরে-ছিলো বলেই তাদের গ্রেপ্তার করতে পুলিশের বেগ পেতে হয়নি।

অতো কথা উনি না বুঝুন ক্ষতি নেই। কিন্তু তাঁর জীবনে সন্ধ্যা এই যে ব্যর্থতা এনে দিলে। সংসারে তার আর ক্ষতিপূরণ কোথায়? তাঁর জীবনের অতো বড়ো আদর্শকে সে এমন করে' লাঞ্ছিত, অবনমিত করে' দিলে? সন্ধ্যা তাঁর মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়েছে, স্বপ্নের পর এনেছে জাগরণের রূঢ়তা, সমস্ত ছন্দ ও শৃঙ্খলা ভেঙে এ কী অসহায় অশান্তির মধ্যে সে তাকে এনে ফেলেছে। এবং তাঁরই ঘরকে স্বর্গ ও জীবনকে স্বর্গের চেয়েও মহনীয় করবার জন্যে সে সাধ করে' তাঁর হাতে হাত মিলিয়ে ছিলো! আজ তাঁকে সে কোন্ পথহীন প্রান্তরের দিকে বিবাগী করে' দিলে!

বাড়ীতে অমিতাভ নেই—দুর্ঘটনার জরুরি খবর পেয়ে শ্বশুরবাড়ী থেকে দু'একজন পুরুষ আত্মীয়-বন্ধু এসে জুটেছেন। সন্ধ্যার প্রতি তাঁদের কোনো জিজ্ঞাসা নেই, পুলিশের লোকই সমস্ত সংবাদ সবিস্তারে বর্ণনা করেছে।

সন্ধ্যা বড়ো ঘরটায় ঢুকলো,—খাট জুড়ে প্রকাণ্ড বিছানা পাতা, কিন্তু শিয়রে মাত্র একজনের মতো বালিস। টেবলের ওপর একটা ল্যাম্প জ্বলছে, পলতেটার আয়ু বেশীক্ষণ নেই। সন্ধ্যা ঘরের এক কোণে মেঝের ওপর বসে' পড়লো।

কেউ তাকে কোনো কথা জিগগেস করলে না। শেষ মন্তব্যের জন্যে সবাই কেবল অমিতাভর অপেক্ষা করছে।

ষ্টেশন থেকে অমিতাভ হন্ত-দন্ত হ'য়ে ছুটে এলো। হাঁপাতে-হাঁপাতে শুধালে; সন্ধ্যা ফিরে এসেছে নাকি?

পুলিসের লোক ততোক্ষণ পর্য্যন্ত বসে' আছে। দারোগা বল্লে,—হ্যাঁ। ও আপনি—নমস্কার। কোর্টে কাল একবার ওঁর হাজিরী দিতে হবে'—

সে-সব কথা পরে। অমিতাভ আত্মীয়-বন্ধুর নীরব কাতরোক্তি উপেক্ষা করে' দ্রুত পায়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লো। কিন্তু দরজার কাছেই সে থাম্লে। এই সে কোন দিগ্বিজয়ীর বেশে তার প্রিয়ার সম্মুখীন হচ্ছে!

ঘর অন্ধকার। পদক্ষেপগুলি অমিতাভ নিঃশব্দ, মন্থর করে' আনলো।

সন্ধ্যা ভাবছিলো সে ফিরে এসেছে শুনে এই বুঝি তিনি উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে স্নেহে অনর্গল হ'য়ে তার নাম ধরে' ডেকে উঠবেন। অন্ধকারে এ কী কঠিন স্পর্শহীনতা! সহসা সে অজস্র কান্নায় একেবারে ভেঙে পড়লো।

অমিতাভ কান্না লক্ষ্য করে' ছুটে এসে সন্ধ্যাকে বাহুর মধ্যে আঁকড়ে ধরলো। তার মুখ থেকে চুলগুলি সরিয়ে দিতে-দিতে বললে,—এ কী, কাঁদছ কেন? এই ত' আবার তোমাকে ফিরে পেলাম! তুমি আমার হারাবার জিনিস নাকি, সন্ধ্যা?

কান্নায় গলা বুজে আসছে, সন্ধ্যা কোনো কথা বলতে পারলো না।

অমিতাভ বললে,—আবার আমার কাছেই তুমি এলে, কিন্তু তোমাকে আমার মতো অপমান আর কে করলো? দুঃখ তোমার হ'বে কেন, তুমি কেন কাঁদবে?

সন্ধ্যা নিজেকে সরিয়ে নেবার চেষ্টা করে' বললে,—আমাকে তুমি ছুঁয়ো না।

ব্যাকুলতরো বাহুতে তাকে বুকের কাছে তুলে নিয়ে অমিতাভ বললে,—তোমার লজ্জা লজ্জাই নয়, সন্ধ্যা, আমার এই একটি চুমুতেই তা মুছে যাবে। কিন্তু প্রেমের জন্যে আমি প্রাণ দিতে পারলুম না, আমার সেই গৌরবময় অধিকারের মৃত্যু আমি সইতে পারছি না।

তার মুখের দিকে সজল চোখ তুলে সন্ধ্যা বললে,— তা হ'লে কোথায় আমি ফিরে আস্‌তাম? তুমি ছাড়া কে আর আমার ছিলো?

দুই হাতের ওপর সন্ধ্যার দুর্ব্বল দেহের ভর রেখে মুখখানি বুকের ওপর নামিয়ে এনে অমিতাভ বললে,— তোমার শরীর এখন কেমন? বিছানায় চলো। হাঁস-পাতালে আরো দু'দিন ওয়েইট করলে না কেন?

তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলে সন্ধ্যা বললে,—না, এই আমি বেশ আছি।

তেমনি আঙুলে তার ঠোঁট দুটি নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে অমিতাভ বললে—তোমার কাছে আমি কত ছোট হ'য়ে গেছি, না সন্ধ্যা?

—আর আমিই বুঝি তোমার কাছে খুব বড়ো হ'য়ে এলাম? ব'লেই সে আবার কেঁদে ফেললে।

ক্ষীণ অশ্রুধারাটি শান্ত একটি চুম্বনে মুছে নিয়ে অমিতাভ বললে,—সবক্ষেত্রেই মানুষ বড়ো ছোট, বড়ো তার প্রেম। তুমি এবার কাপড়-চোপড় ছাড়, রান্নাবান্না দেখ, ঘর-দোর গুছোও—শরীর ভাল আছে ত'?

—হ্যাঁ। সন্ধ্যা নিমেষে যেন কুয়াসার মতো হাল্কা হ'য়ে গেছে।

—ছোটকাকা এসেছেন, আসুন—কিসের তোমার ভয়! তোমার কি হয়েছে! কলঙ্ক যা কিছু তা আমার! সেই কলঙ্কে আমি তোমাকে নিয়েই থাকবো। এই কলঙ্কই আমার ঐশ্বর্য্য।

সন্ধ্যাকে অমিতাভ বিছানার কাছে নিয়ে এলো। আবার বললে,—তার চেয়ে বরং বিছানায়ই তুমি শুয়ে থাকো। তোমার দুর্ব্বলতা এখনো সারে নি। আমিই সব ব্যবস্থা করছি। দারোগাবাবু আবার বসে' আছেন। কালকে থেকেই মামলা কি? তোমাকে দেখছি আবার হ্যাঙ্গামায় পড়তে হ'লো!

ম্লান কণ্ঠে সন্ধ্যা বললে,—আমাকে নিয়ে তোমারই বরং লজ্জার আর শেষ থাকবে না? তোমার মান, প্রতিপত্তি—

—রাখো, রাখো—আমার কী মান, তা আমি জানি। পরের কথায় কোনোদিন আমি দাম দিই না। দারোগাকে বলি তোমার শরীর আগে সারুক, ম্যাজিষ্ট্রেটকে বলে' তারিখটা কয়েকদিন পিছিয়ে দিক্।

চঞ্চল হ'য়ে সন্ধ্যা বললে,—না, আমি বেশ আছি। যাবো কোর্টে কালকেই। ওদেরই ছোরা দিয়ে ওদের কী-রকম জখম করে' এসেছি তুমিও দেখবে চলো। আত্মরক্ষা করতে ছোরা চালিয়েছি এ-কথা বড় গলায় চারিদিকে রাষ্ট্র করে' দিতে হ'বে না?

অমিতাভ তার দিকে বিস্ময় মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো।

সন্ধ্যা বললে,—সে অনেক কথা। প্রবঞ্চনা একটা চমৎকার আর্ট,—তুমি এসো। খাওয়া-দাওয়া করে' এসো। শুয়ে-শুয়ে তোমাকে তার গল্প বলবো।

রবীন্দ্র-কাব্যে সুন্দরের অভিব্যক্তি

শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায়

রবীন্দ্রনাথের কাব্য গল্পের মায়াপুরীর মতো, রাজকন্যা সেখানে ধূপের ধোঁয়ায় চুল শুকায়, পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়িয়া সেখানে আসে অচেনা দেশের রাজপুত্র, তাহার জানালায় বসিয়া অজানা পথিকের প্রতীক্ষায় রূপসী তরুণী 'ত্রিযামা যামিনী' জাগে এবং পথের ধূলায় অকারণে গলার মণিহার ফেলিয়া দিয়া বিমুগ্ধা নারী ভাবে তাহাতেই বুঝি তাহার চরম সার্থকতা।

কথাটা হয়তো হেঁয়ালীর মতো শুনাইতেছে। সুতরাং একটু খুলিয়া বলি। মায়াপুরীতে যেমন পাওয়া যায় না এমন জিনিষ নাই, তেমনি রবীন্দ্রনাথের কাব্যে পাওয়া যায় না এমন রসও নাই। এত ভাবের, এত রকমের, এত বিভিন্ন ধারার রস রবীন্দ্রনাথ পরিবেশন করিয়াছেন যে, রস-সৃষ্টির আদিম উৎসটাকেই তিনি জয় করিয়া লইয়াছেন বলিয়া মনে হয়। একজন মানুষের পক্ষে এত ভিন্ন ভিন্ন রকমের রসের সন্ধান রাখা কি করিয়া যে সম্ভব হইল, ভাবিয়া তাহার কূল-কিনারা পাওয়া যায় না।

কিন্তু এত বিভিন্ন রস নিখুঁত অনিন্দনীয় ভাবে তাঁহার ভিতর স্ফূর্তিলাভ করিলেও সকলকে ছাপাইয়া উঠিয়াছে তাঁহার সৌন্দর্য্যানুভূতির দীপ্তি। সৌন্দর্য্যের পূজারী হিসাবে বিশ্ব-সাহিত্যে তাঁহার জোড়া নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সৌন্দর্য্যের ধারা তাঁহার ভাষার ভিতর দিয়া উপছাইয়া পড়ে, ছন্দ ও উপমার ভিতর দিয়া লীলায়িত হইয়া উঠে তাঁহার সৌন্দর্য্যের দীপ্তি, সৌন্দর্য্যের অনুভূতি তাঁহার ভাবের ভিতর দিয়া স্বপ্ন-লোকের ইন্দ্রজালের রচনা করে। এইজন্য আমার মনে হয়, রবীন্দ্র কাব্য-সাহিত্যের কেন্দ্র-নায়ক হইতেছেন সুন্দর, আর এই সুন্দরকে ঘিরিয়াই অন্যান্য রস তাঁহার কাব্যে দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু ভাবের ভিতর রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্য্যের অনুভূতি খুঁজিবার আগে, তাহার ভিতর তাহার যে অভিব্যক্তি আছে সেই সম্বন্ধেই দুই একটি কথা বলা দরকার।

কাব্যে প্রকাশ-ভঙ্গি খুব বড় জিনিষ। দেহকে বাদ দিয়া কেবল আত্মাকে লইয়া হয়তো বা কারবার করা চলে, কিন্তু কথা বাদ দিয়া শুধু ভাবকে লইয়া কাব্য-রচনা করা যায় না। দুনিয়ার সাহিত্যে ভাব-রাজ্যের অনেক শক্তিমান সম্রাটও এইজন্য কাব্যের কষ্টিপাথরে নিখাদ সোনার রেখা আঁকিতে পারেন নাই। কিন্তু এ দিক দিয়া রবীন্দ্রনাথ অতুলনীয়। তাহার প্রকাশ-ভঙ্গি অপরূপ। তাহা এত সহজ ও সাবলীল যে ইহার কতটুকু সাধনা-লব্ধ, আর কতটুকু যে সহজাত তাহার হিসাব-নিকাশ করা অসম্ভব। এইজন্য অর্থবোধের আগেই তাঁহার কথার ঝঙ্কার প্রাণের তারে গিয়া ঘা দেয় এবং সঙ্গে সঙ্গে মনকেও জয় করিয়া লয়। যখন শুনি,

> দূরে একদিন দেখেছিনু তব
> কনকাঞ্চল আবরণ,
> নব চম্পক আভরণ।
> কাছে এলে যবে হেরি অভিনব
> ঘোর ঘন নীল গুণ্ঠন তব,
> চল চপলার চকিত চমকে
> করিছে চরণ বিচরণ।
> কোথা চম্পক আভরণ!

অথবা যখন শুনি—

> আম্র মঞ্জরীর গন্ধ বহি' আনি' মৃদু মন্দ
> বায়ু তব উড়াবে অলক,
> ঘুঘু ডাকে ঝিল্লি-রবে কি মন্ত্র শ্রবণে কবে,
> মুদে যাবে চোখের পলক।

পশরা নামায় ভূমে যদি ঢুলে পড় ঘুমে
অঙ্গে লাগে সুখালস ঘোর ;
যদি ভুলে তন্দ্রাভরে ঘোমটা খসিয়া পড়ে
তাহে কোনো শঙ্কা নাহি তোর।

কিম্বা যখন শুনি—

অঙ্গের কুসুম গন্ধ, কেশ ধূপবাস
ফেলিল সর্ব্বাঙ্গে মোর উতলা নিঃশ্বাস।
প্রকাশিল অর্দ্ধচ্যুত বসন অন্তরে
চন্দনের পত্রলেখা বাম পয়োধরে
দাঁড়াইল প্রতিমার প্রায়
নগর-গুঞ্জন ক্ষান্ত নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়।

তখন প্রকাশ-ভঙ্গির অপূর্ব্বতায় হৃদয় বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়ে।

রবীন্দ্রনাথের এই প্রকাশ-ভঙ্গির মতোই বিস্ময়কর তাঁহার উপমার ঐশ্বর্য্য। উপমাও এই প্রকাশ ভঙ্গিরই একটা বিশেষ রীতি মাত্র। উপমার দ্বারা তিনি যাহাকে দেখাইতে চান সে চোখের সামনে যেন একেবারে কথার তুলিতে জীবন্ত হইয়া—মূর্ত্ত হইয়া ফুটিয়া উঠে।

যখন পড়ি—

আঁচলখানি পড়েছে খসি পাশে,
কাঁচলখানি পড়িবে বুঝি টুটি,
পত্র পুটে রয়েছে যেন ঢাকা
অনাঘ্রাত পূজার ফুল দুটি।'

অথবা—

উদয় শিখরে সূর্য্যের মতো সমস্ত প্রাণ মম,
চাহিয়া রয়েছে নিমেষে-নিহত একটি নয়ন সম।

অথবা—

অন্ধকার সন্ধ্যার আকাশে
বিজন তারার মাঝে কাঁপিছে যেমন
স্বর্গের আলোকময় রহস্য অসীম,
ওই নয়নের
নিবিড় তিমির তলে, কাঁপিছে তেমনি
আত্মার রহস্য শিখা।

তখন কেবল বস্তুর বাস্তব রূপই চোখের সাম্‌নে ধরা পড়ে না—সঙ্গে সঙ্গে ধরা পড়ে পড়ে তাহার অন্তর্লোকের সৌন্দর্য্যে। আর এই সৌন্দর্য্যের পরিচয় গ্রহণই তো উপমার চরমতম সার্থকতা!

যাহা রবীন্দ্রনাথের শব্দযোজনা এবং উপমার সম্বন্ধে সত্য তাহাই তাঁহার ছন্দের সম্বন্ধেও সত্য। শব্দ এবং উপমা যদি কাব্য-লক্ষ্মীর বসন ও ভূষণ হয়, ছন্দ তাঁহার দেহ। বিধাতার মতো নির্জ্জনে বসিয়া রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কাব্য-লক্ষ্মীর এই অতুলন তনুলতা রচনা করিয়াছেন। তিলোত্তমার রচনার মতোই নিখিল বিশ্বের সাহিত্য হইতে তিল তিল করিয়া ছন্দের সম্পদ সংগ্রহ করিয়া রচিত হইয়াছে তাঁহার এই ছন্দ-তিলোত্তমা। কোথাও তাহা গ্রহণ করিয়াছে সংস্কৃতের গম্ভীর ধ্বনি-স্পন্দন, কোথাও বা বাংলার ছড়ার নৃত্য-লীলায় গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার কাব্য-দেহের এই ছন্দ-ভঙ্গি হইতে আবার কোথাও বা ইংরেজী বা অন্য কোন বিদেশী ছন্দের গতি বেগের ভিতর হইতে ইঙ্গিত গ্রহণ করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে তাঁহার ছন্দের দেহের কাঠামো। রবীন্দ্রনাথের পূর্ব্বে সাহিত্যিক বাংলার ছন্দে স্বতঃস্ফূর্ত্ত লীলার প্রকাশ ছিল না বলিলেই চলে। তাঁহার সূক্ষ্ম দৃষ্টি খুঁজিয়া খুঁজিয়া এক দিকে যেমন বাহিরের সম্পদ সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে, অন্য দিকে তাহার উন্মেষিণী প্রতিভা তেমনি আবার সৃষ্টি করিয়াছে ছন্দের নূতন তাল, তাহার সঙ্গীতের নূতন মূর্চ্ছনা।

"বসন কার দেখিতে পাই জ্যোৎস্নালোকে লুণ্ঠিত,
নয়ন কার নীরব নীল গগনে,
বদন কার দেখিতে পাই কিরণে অবগুণ্ঠিত
চরণ কার কোমল তৃণ শয়নে।"

এ ঝঙ্কার পুরাপুরি সংস্কৃতের ঝঙ্কার—কিন্তু বাঙলার সাথে তাহা এমন ভাবেই মিতালি পাতাইয়াছে যে—এ ছন্দ যে বাহিরের আমদানি একবারও সে কথা মনে হয় না।

আবার :—

এমনি করে' কালো কাজল মেঘ
জ্যৈষ্ঠ মাসে আসে ঈশান কোণে।
এমনি করে কালো কোমল ছায়া
আষাঢ় মাসে নামে তমালের বনে।
এমনি করে শ্রাবণ রজনীতে
হঠাৎ খুসী ঘনিয়ে আসে চিত্তে।

এ সুর বাংলার মেয়েলী ছড়ার সুর—যাহা শিক্ষিত সমাজের কাছে চির দিন উপেক্ষা লাভ করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু ছন্দ-সরস্বতীর এই বর-পুত্রটির হাতে পড়িয়া ইহা এমনি ভাবে রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে যে, যাহারা শিক্ষা ও সভ্যতার দেমাক করে—এ ছন্দ শুনিয়া তাহারাও বিস্মিত হইয়া বলিয়া উঠে—ছড়ার ছন্দে যে এত রূপ ছিল—'এর আগে কে জানিত তার কথা।'

ছন্দ-বৈচিত্র্যের দ্বারা সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির এমনিতর উদাহরণ রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সমুদ্রের যেখান সেখান হইতে আহরণ করিয়া আনা যায়—তাহা এমনই অজস্র —এমনই সুপ্রচুর।

বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথের ভাষার সৌন্দর্য্য এতই সহজ, এতই সুস্পষ্ট, অথচ এতই নূতন যে, কাব্যানুভূতি যাহার ভিতর অনুমাত্রও আছে ইহার সুর তাহার মনে ঝঙ্কার না তুলিয়া পারে না। এই জন্যে অনেকে এমন অভিযোগও করেন যে, অর্থ বোঝার আগে রবীন্দ্রনাথের ছন্দের ঝঙ্কারই সমস্ত মনটাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে—শব্দই তাঁহার কাছে মুখ্য বস্তু, ভাবটা একবারেই গৌণ।

এ অভিযোগ আর যাহাই ব্যক্ত করুক না কেন, এ কথাটা অবিসম্বাদেই প্রমাণ করে যে, রবীন্দ্রনাথের প্রকাশ-ভঙ্গি কেবল সুন্দর নহে—অপরূপ। সুতরাং কাব্যের এই বাহিরের খোলসটার কথা এইখানেই থাক্, দৃষ্টি ফিরাইয়া আনা যাক্ এইবার ভাবের দিকে।

রবীন্দ্রনাথের ভিতর সৌন্দর্য্যের এই অনবদ্য অনুভূতি মানুষের সংস্পর্শে আসিয়া যতটা গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা অপেক্ষা ঢের বেশী গড়িয়া উঠিয়াছে প্রকৃতির সাহচার্য্যে। প্রকৃতির প্রত্যেক গুপ্ত ভাণ্ডারের চাবি কেমন করিয়া এই রূপকারের হাতে আসিয়া পড়িয়াছে তাহার পরিচয় না লইয়াও বলা যায় রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি সৌন্দর্য্যের বিরাট রহস্যাধার। সে ফাঁকা বর্ণ-বিলাস লইয়া জাঁক্ করে না—সজীব মানুষের মতোই সে প্রাণবান ও গতিশীল। ঋতুর আবির্ভাব রবীন্দ্রনাথের কাছে প্রিয়জনের আবির্ভাবের মতোই তাই পরম ব্যাপার। তাহারা যবে আসিয়া যখন দেখা দেয়, পাছে তাহার আহ্বানে কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটে তাই তিনি নিখিল-জনকে ডাকিয়া বলেন...

তব অবগুণ্ঠিত কুণ্ঠিত জীবনে
ক'রো না বিড়ম্বিত তারে।
আজ খুলিয়ো হৃদয় দল খুলিয়ো,
আজ ভুলিয়ো আপন পর ভুলিয়ো,
এই সঙ্গীত মুখরিত গগনে
তব গন্ধ তরঙ্গিয়া তুলিয়ো
এই বাহির ভুবনে দিশা হারায়ে
দিয়ো ছড়ায়ে মাধুরী ভারে ভারে।

আর তাহারই সঙ্গে সঙ্গে 'সুন্দর বল্লভ কান্ত' যিনি তাহাকে বরণ করিবার জন্য তাঁহার নিজের দেহও উন্মুখ হইয়া উঠে,—চিত্তের সমুদ্রেও ব্যাকুলতার বিক্ষেপ জাগে।

বস্তুতঃ সুন্দরের বহির্বিকাশ প্রকৃতির ভিতর দিয়া ধরা পড়ে বলিয়াই বসন্ত বর্ষা শরৎ তাঁহার বীণায় পলে পলে নূতন সুর জাগায়, নূতন অনুভূতি ও আনন্দের রসদ যোগায়। বসন্তকে ডাকিয়া তিনি বলেন—

নব শ্যামল শোভন রথে
এস বকুল বিছানো পথে,
এস বাজায়ে ব্যাকুল বেণু
মেখে পিয়াল ফুলের রেণু
এসহে এসহে এসহে আমার
বসন্ত এস!

এ আহ্বান সুন্দরেরই আহ্বান। কিন্তু সুন্দর যাহার কাছে একেবারে অন্তরের অন্তরতম বস্তু হইয়া না উঠিয়াছে, এ ধরণের আন্তরিকতার ছোপ আহ্বানের ভিতর দিয়া সে কখনো পরিবেশন করিতে পারে না। কবির এমনি বিমুগ্ধতা আবারও দেখা যায় শরতের আগমনার আভাস যখন আকাশের নীলে, তাহার জল-হারা মেঘে ধরা পড়ে। শরতের অভিনন্দনও তাঁহার সেই একই দেবতার-একই সুন্দরের বন্দনার গান। তাই বন্দনার প্রকাশ-ভঙ্গি বিভিন্ন হইলেও ভিতরের ছন্দের সুর একই রকমের। শরৎকে ডাকিয়া তিনি বলিলেন—

এসগো শারদলক্ষ্মী, তোমার
শুভ্র মেঘের রথে,
এস নির্ম্মল নীল পথে ...
এস ধৌত শ্যামল আলো ঝলমল
বনগিরি পর্ব্বতে।

শরৎ তাঁহার কাছে সুন্দরেরই "অরুণ আলোর অঞ্জলি"

আর শ্যাম গম্ভীর সৌন্দর্য্য যাহার সেই বর্ষার আবির্ভাবও তাঁহার কাছে উপেক্ষার ব্যাপার নহে। মেঘমন্দ্রের ছন্দের ভিতর দিয়া, বিদ্যুতের বিসর্পিত নৃত্যের ভিতর দিয়া সুন্দর আসিয়া তাহার কাছে ধরা দেন। কখনো তিনি গাহিয়া উঠেন—

গুরুগর্জ্জনে নীল অরণ্য শিহরে
উতলা কলাপী কেকা-কলরবে বিহরে
নিখিল চিত্ত হরষা
ঘন গৌরবে আসিছে মত্ত বরষা।

কখনো বা মেঘের ধ্বনির ভিতর দিয়াই তিনি শুনিতে পান তাঁহার সুন্দরের আগমন ধ্বনি। তখন তিনি ডাকিয়া বলেন—

আজি বর্ষা গাঢ়তম ; নিবিড় কুন্তল সম
মেঘ নামিয়াছে মম দুইটি তীরে।
ওই যে শব্দ চিনি নূপুর রিণিকিঝিনি,
কে গো তুমি একাকিনী আসিছ ধীরে
যদি ভরিয়া লইবে কুম্ভ, এসো ওগো এসো মোর
হৃদয়-নীরে।

বর্ষার মেঘ-মেদুর কান্তিতে তাঁহার হৃদয় ভরিয়া যায়, জোয়ারের জলের মতো তাহা হৃদয়ের দুকূল ছাপাইয়া উঠে। তিনি আত্মহারা হইয়া গাহিয়া উঠেন—

হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে
ময়ূরের মতো নাচেরে
হৃদয় নাচেরে।

প্রিয়তমকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য তাঁহার যে আকুতি সে আকুতির ভাষা হইতেছে—

'আমার সজল জলদ স্নিগ্ধ কান্ত সুন্দর ফিরে এসো।'

প্রণয়ীর কাছে তাহার প্রিয়তমার রূপের যেমন অন্ত নাই, প্রিয়াকে নিত্য নূতন পরিচ্ছদে সাজাইয়া যে যেমন আনন্দ পায়, রবীন্দ্রনাথ তেমনি প্রকৃতিকে নূতন নূতন বেশ পরাইয়া নানা ভাবে দেখিয়াছেন, নানা ধাঁচের ভিতর দিয়া তাহার সৌন্দর্য্য উপভোগ করিয়াছেন। বস্তুতঃ প্রকৃতির ভিতর দিয়া সুন্দরের আভাস পাওয়া যায় বলিয়াই বিশ্ব-প্রকৃতি তাঁহার কাছে এত মধুর হইয়া উঠিয়াছে। প্রেমের এই গভীরতার জন্যই প্রকৃতির ভিতর যাহা বিভীষিকার সৃষ্টি ক'রে তাহাও তাঁহার কাছে একটা অভিনব মাধুরী আনিয়া উপস্থিত করিয়াছে। রুদ্র বৈশাখ লোলুপ চিতাগ্নি শিখার দ্বারা বিরাট অম্বরকে যখন লেহন করিতে থাকে তাই তিনি তখন বলেন—

ভাঙিয়া মধ্যাহ্ন তন্দ্রা জাগি' উঠি বাহিরিব দ্বারে,
চেয়ে রব প্রাণী শূন্য দগ্ধ-তৃণ দিগন্তের পারে
নিস্তব্ধ নির্ব্বাক।

তাই পায়ে ঝঞ্ঝার মঞ্জীর বাঁধিয়া উন্মাদিনী কাল-বৈশাখীর নৃত্য যখন সুরু হয় তখনও তিনি বলেন—

রথ চক্র ঘর্ঘরিয়া এসেছ বিজয়ী রাজ সম
গর্ব্বিত নির্ভয়,
বজ্র মন্ত্রে কি ঘোষিলে বুঝিলাম—নাহি বুঝিলাম—
জয় তব জয়।

মৃত্যু প্রকৃতির সকলের বড় ঘটনা। সাধারণের মনে তাহা বিভীষিকারই সৃষ্টি করে। কিন্তু তাহার ভিতরেও রবীন্দ্রনাথ দেখিয়াছেন সুন্দরেরই অভিষেকের উৎসব। সে নিঃশব্দ চরণপাতে যখন দ্বারে আসিয়া দাঁড়ায় তখন তাহার প্রেত-তাণ্ডবের বীভৎসতা তাহাকে ঘা দেয় না, তখন শ্মশানবাসীর সেই কল-কোলাহল শুনিয়া তাঁহার মনে পড়ে গৌরীর আনন্দ ছল ছল আঁখির কথা। মনে পড়ে—

তাঁর বাম আঁখি স্ফুরে থর থর
তাঁর হিয়া দুরু দুরু দুলিছে,
তাঁর পুলকিত তনু জর জর
তাঁর মন আপনারে ভুলিছে।

রবীন্দ্রনাথের ভিতর এই সুন্দর ধীরে ধীরে কেমন করিয়া ধরা দিয়াছেন তাহা বাংলা সাহিত্যের বড় একটা আলোচনার বস্তু। এই অতীন্দ্রিয় সুন্দরের সাক্ষাৎকার তিনি একবারেই লাভ করেন নাই—ধীরে ধীরে তাহার

ভিতর দিয়া তাঁহাকে অগ্রসর হইতে হইয়াছে। প্রথমে তাহার সুন্দরও একান্তই ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য ব্যাপার ছিল। স্থূল রক্ত-মাংসের দেহের ভিতর দিয়া ইহার প্রথম অনুভূতি তাঁহার কাছে দেখা দেয়। বস্তু-তান্ত্রিক কবিদের মতো ভোগের উপাদানেই রচিত হইয়াছিল তাঁহার অন্তরে সুন্দরের পূজার প্রথম অর্ঘ্য। তাই 'কড়ি ও কোমলে' দেখিতে পাই—

প্রাণের মিলন মাগে দেহের মিলন,
হৃদয়ে আচ্ছন্ন দেহ হৃদয়ের ভরে,
মুরছি পড়িতে চায় তব দেহ পরে,
তোমার নয়ন পানে ধাইছে নয়ন,
অধর মরিতে চায় তোমার অধরে।
• • • •
দেহের রহস্য মাঝে হইব মগন।

তাই তিনি চাহিয়াছেন—

ওই দেহখানি বুকে তুলে নেব বালা,
পঞ্চদশ বৎসরের একগাছি মালা।

সুন্দর তাঁহার কাছে ছিল তখন দৈহিক রূপের একটি অভিব্যক্তি মাত্র। তাই দেহ-তান্ত্রিক কবির মতোই বিচ্ছেদের ভয়ে শিহরিয়া উঠিয়া তিনি বলিয়াছেন—

লতায়ে থাকুক বুকে চির আলিঙ্গন,
ছিঁড়ো না ছিঁড়ো না দুটি বাহুর বন্ধন।

দেহ-তান্ত্রিকতার এই প্রগাঢ়তায় ও তীব্রতায় বিস্মিত হইতে হয়। নিবিড় অনুভূতির সঙ্গে যোগ থাকায় ইহার ভিতরে স্থূলতার কর্দম থাকিলেও তাহা পঙ্কজের জন্ম ক্ষেত্র রূপেই রহিয়া গিয়াছে, তাহা আর সকলকে ছাপাইয়া বড় হইয়া উঠে নাই। ভাষার অনবদ্য সৌন্দর্য্যও ভিতরকার ক্লেদকে সংযত করিবার সাহায্য করিয়াছে। কিন্তু তাহা হইলেও রবীন্দ্রনাথের পরবর্ত্তী সুন্দরের কল্পনা হইতে ইহা যে ভিন্ন তাহাতেও সন্দেহ নাই। পরবর্ত্তীকালে তাঁহার সুন্দর দেশ-কাল পাত্রকে ছাপাইয়া চিরন্তনের বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে, কিন্তু এখানে তাঁহার সুন্দর দেশ-কাল-পাত্র দূরের কথা, দেহের গণ্ডীকেও অতিক্রম করিতে পারে নাই।

এই যে দেহ-তান্ত্রিকতা রবীন্দ্রনাথের কাব্য-জীবনে ইহার যুগ খুব বড় নহে। 'কড়ি ও কোমলে'র পর 'মানসী' এবং মোটামুটি ভাবে 'সোনার তরী'তে তাঁহার কবিতায় এই রূপের পূজারীর পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু এই শেষোক্ত দুই গ্রন্থেও তাহার আভাস ক্রমেই মৃদুতর হইয়া আসিয়াছে। প্রশ্ন যে জাগিয়াছে—সংশয় যে দেখা দিয়াছে তাহার পরিচয় এই দুই গ্রন্থেও পাওয়া যায়। তাই

যেন কুঁড়ি দু'টি করে ফুটো ফুটি
অধর খেলা,
মনে পড়ে গেল সে কালের সেই
কুসুম তোলা।

শুনিতে শুনিতে অকস্মাৎ শোনা যায়—

খুঁজিতেছি, কোথা তুমি
কোথা তুমি
সে অমৃত লুকানো তোমায়
সে কোথায়?

'সোনার তরী'তে কবির সুন্দর দেহের অতীত হইয়া দেখা দেন নাই সত্য, তবু 'সোনার তরীতে'ই কবি প্রথম সাক্ষাৎ পাইয়াছেন তাহার সেই মানসী বধূর দেহহীন হইয়াও দেহ-গ্রাহ্য রসাবেশের সাড়া যে অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে জাগাইতে পারে।

বীণা ফেলে দিয়ে এস, মানস সুন্দরী,
দুটি রিক্ত হস্ত শুধু আলিঙ্গনে ভরি'
কণ্ঠে জড়াইয়া দাও,—মৃণাল পরশে
রোমাঞ্চ অঙ্কুরি' উঠে মর্ম্মান্ত হরষে—
কম্পিত চঞ্চল বক্ষ, চক্ষু ছলছল,
মুগ্ধ তনু মরি যায়, অন্তর কেবল
অঙ্গের সীমান্ত প্রান্তে উদ্ভাসিয়া উঠে;

দেহ নাই কিন্তু এখনো তবু দেহের লালসা আছে, ভোগের কামনা আছে, মনের বিলাস দেহের সীমাকে জড়াইয়া জাগিয়া আছে। সুন্দর যেখানে দেবতা তাহার সাক্ষাৎ 'সোনার তরী'তে পাওয়া যায় না, তাহার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁহার পরবর্ত্তী চিত্রায়। সুন্দরের দেবতা এখানে একেবারে দেহাতীত হইয়া দেখা দিয়াছেন। তাই তাঁহার উর্ব্বশী মাতা ও নহে, কন্যাও নহে, বধূও নহে; বুকের কাছে তাহার হৃদে শয্যায় [illegible]

জলিয়া উঠে না, স্তব্ধ অর্দ্ধ রাত্রিতে কম্প্রবক্ষে বাসর শয্যায় তাহার আনাগোনা নাই, সে অকুণ্ঠিতা, উষার উদয় সম অবগুণ্ঠিতা।

আমরা দেবতার মূর্ত্তি গড়ি, কিন্তু সে মূর্ত্তির পিছনে থাকে মহাশক্তির একটা বিভূতি, একটা ধ্যান-লব্ধ কল্পনা। সাধনার পথে যত অগ্রসর হওয়া যায় ততই মূর্ত্তির প্রয়োজন কমিয়া আসে। রবীন্দ্রনাথের ধ্যানে সুন্দরের যে রূপ ধরা পড়িয়াছে তাহারও গোড়াতে মূর্ত্তিপূজার এই আয়োজন ছিল। তাই 'চিত্রাঙ্গদায়' তাঁহার অর্জ্জুনকে এই কথাই বলিতে শোনা যায়—

সাধকের কাছে প্রথমতঃ ভ্রান্তি আসে
মনোহর মায়া কায়া ধরি, তার পরে
সত্য দেখা দেয় ভূষণ বিহীন রূপে
আলো করি অন্তর বাহির।

রবীন্দ্রনাথের ভিতর সুন্দর যেখানে পূর্ণতা লাভ করিয়াছেন, সেইখান হইতেই সাপের নির্ম্মোকের মতো তাঁহার দেহ হইতে বাসনার খোলসটাও ঝরিয়া পড়িয়াছে। তখন তাঁহার সুন্দরের দেহ আছে কিনা সে সম্বন্ধেও কোনো প্রশ্ন জাগে না—সে বিরাজ করে অন্তর্লোকে জ্যোতির একটা প্রবাহের মতো—একটা শরীরি আনন্দের অনুভূতির মতো।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রবীন্দ্রনাথের সুন্দরের সাধনার গোড়ায় দেহ-তান্ত্রিকের রূপ পিপাসা ছিল, কিন্তু আত্মার ভিতর তাঁহার সে দীনতা ছিল না যাহা তাঁহার ঊর্দ্ধগতিতে বাধা জন্মায়। তাই অনেকের পক্ষে যে বীভৎসতার মোহ কাটাইয়া উঠা সম্ভব হয় না, অতি সহজেই তিনি তাহা কাটাইয়া উঠিয়াছিলেন। আত্মার এই সংস্কারগত শক্তিই সাহিত্যের কোনো ক্ষেত্রেই রবীন্দ্রনাথকে কুৎসিত হইতে দেয় নাই।

বাংলা-সাহিত্যে আজ বীভৎস রস সৃষ্টির একটা উদ্দাম আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিয়াছে। দুই একজন তাহাতে যে শক্তির পরিচয় দিয়াছেন, তাহারই তারিফও করিতে হয়। রবীন্দ্রনাথের রচনা হইতে যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে একথা নিঃসংশয়েই বলা যায় যে, তিনি যদি ইচ্ছা করিতেন তবে এই বীভৎস রসের পরিবেশনেও সমস্ত দুনিয়াকে স্তম্ভিত করিয়া দিতে পারিতেন। কিন্তু চিত্তের গড়নই ছিল তাঁহার ভিন্ন ধরণের। তাই ভোগের দিকে ঝোঁক দিয়াও ক্লেদ লইয়া তিনি মাখামাখি করেন নাই। ভোগের ভিতরেও সংযমের কঠিন শাসনকে মানিয়া লইয়াই তিনি সত্যের সন্ধান করিয়াছেন—মিথ্যা তাঁহার কাছে সত্যের আসন অধিকার করিয়া বসিতে পারে নাই। ঠিকভাবে বিচার করিতে গেলে এই কথাই বলিতে হয়, তাঁহার সাধনা কেবল সুন্দরকেই নব নব রূপে আমাদের চোখের সামনে তুলিয়া ধরে নাই বাংলা সাহিত্যকেও রক্ষা করিয়াছে, নতুবা একদিকে পাশ্চাত্য সভ্যতার ভোগলোলুপতা আমাদের বাস্তব জীবনের উপর যে উচ্ছৃঙ্খলতার অভিঘাত আনিয়া দিতেছিল এবং অন্য দিকে ভারতচন্দ্র ও সংস্কৃত সাহিত্যের স্থূল রসিকতা আমাদের মনের উপর যেভাবে প্রভাব বিস্তার করিতেছিল তাহাতে বাংলার রসসাহিত্য যে কোথায় আসিয়া দাঁড়াইত তাহা বলা কঠিন।

সুন্দরকে বিকৃত দৃষ্টিতে দেখিবার এই যে উন্মাদনা আজ জাগিয়া উঠিয়াছে সুন্দরের পূজারী হিসাবে তাহা রবীন্দ্রনাথের কাছে দুঃসহ হইয়া উঠিবারই কথা। বস্তুতঃ আঘাত তাঁহার মর্ম্মে বিঁধিয়াছে।

যখন তোমার গায়
কারা সব ধুলা দিয়া যায়'
আমার অন্তর
করে হায় হায়
কেঁদে বলি হে মোর সুন্দর
আজ তুমি হও দণ্ডধর
করহ বিচার—

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে—সুন্দরের পূজারী তাঁহার বিচারের পদ্ধতিই ভিন্ন রকমের। সর্ব্বশক্তিমান কি দণ্ড দেন ?—

নীরবে প্রভাত আলো পড়ে
তাদের কলুষ রক্ত নয়নের পরে
শুভ্র নব মল্লিকার বাস
স্পর্শ করে লালসার উদ্দীপ্ত নিশ্বাস

সন্ধ্যা তাপসীর হাতে জ্বালা
সপ্তর্ষীর পূজা দীপ মালা
গন্ধের মত্ততা পানে সারা রাত্রি চায়
হে সুন্দর তব গায়
ধূলা দিয়ে যারা চলে যায়।

রবীন্দ্রনাথের সুন্দর সাধারণতঃ করুণ, কোমল, আনন্দময়, ক্ষমা তাহার স্বাভাবিক বিভূতি কিন্তু গ্লানি যখন সীমাকে লঙ্ঘন করিয়া চলে তখন তাঁহার এই ক্ষমাশীল সুন্দরই রুদ্ররূপের উদ্দাম সৌন্দর্য্যে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠেন। তখন তাঁহার গর্জ্জনা—

গর্জ্জমান বজ্রাগ্নি শিখায়
সূর্য্যাস্তের প্রলয় লিখায়
রক্তের বর্ষণে
অকস্মাৎ সংঘাতের ঘর্ষণে ঘর্ষণে

জাগিয়া উঠে। তখন যে সুন্দরের চরণ ভঙ্গে, ললিত অঙ্গে চকিত ছন্দ চমকাইত সেই সুন্দরেই জটাজাল হইয়া উঠে ধূলায় ধূসর রুক্ষ পিঙ্গল। বিরাট অম্বরকে লেহন করিবার জন্য তাহার চোখে জ্বলে তখন লোলুপ চিতাগ্নির শিখা।

রবীন্দ্রনাথের যিনি সুন্দর
ডান হাতে তার খড়্গ জ্বলে
বাঁহাতে করে শঙ্কা হরণ
দুই নয়নে স্নেহের হাসি
ললাট নেত্র আগুন বরণ।

সৃষ্টি এবং ধ্বংসের ভিতর দিয়াই চিরসুন্দর যিনি তাঁহার আবির্ভাব। সৃষ্টির ভিতর দিয়া জাগিয়া উঠে তাঁহার পরম আনন্দ এবং ধ্বংসের ভিতর দিয়া ধরা দেয় তাঁহার চরম কল্যাণ। এ সত্য যেদিন ভারতীয় শিল্প সাধনার যারা আবিষ্কার করিয়াছিলেন সেইদিনই তাঁহাদের বাটালীর মুখে পাথর কুঁদিয়া বাহির হইয়াছে নটরাজের নৃত্য। সাহিত্যের সৃষ্টির সৌন্দর্য্যসৃষ্টির মূলেও যদি কল্যাণ না থাকে তবে সে সাহিত্য সৃষ্টি ব্যর্থ—মানব সমাজের বৃহত্তর সার্থকতার দিক দিয়া তাহার কোনোই মূল্য নাই।

আনন্দ যেমন সাহিত্যের অক্ষয় সম্পদ কল্যাণও আবার তেমনি সাহিত্যের সার্থকতার মাপকাঠি। বিশ্ব-সাহিত্যে যাহাদের দান চিরন্তনের সম্পদ হইয়া আছে আনন্দের সঙ্গে কল্যাণকেও তাঁহারা এক করিয়া দেখিয়াছেন। সকলেই তাঁহারা সুন্দরের পূজারী, কিন্তু পূজারী সেই সুন্দরের, কল্যাণকে যে বর্জ্জন করে নাই কল্যাণকে আলিঙ্গন করিয়াই যে সার্থক হইয়াছে। উদ্দেশ্য যদি সঙ্গীন উঁচাইয়া লেখার ভিতর দিয়া ঘা দিতে থাকে তবে তাহা বরদাস্ত করা যায় না সত্য, কিন্তু সৌন্দর্য্যের শতদলের বুকে সে যখন গন্ধের মতোই গোপন থাকিয়া নিজের আভাস জানায় তখনই সে তার চরম সার্থকতার পরিচয় দেয়। রবীন্দ্রনাথের সুন্দরের সঙ্গে কল্যাণের যোগও অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এবং নিবিড়। তিনি যে মুহূর্ত্তে বলেন—

তবে নন্দন গন্ধ মোদিত
ফিরি সুন্দর ভুবনে।'

ঠিক তার পরের মুহূর্ত্তেই আবার কামনা করেন

সব বিদ্বেষ দূরে যায় যেন
তব মঙ্গল মন্ত্রে।'

ভগবানকে ডাকিয়া তিনি এই কথাই বলেন

'নির্ম্মল কর, উজ্জ্বল কর
সুন্দর কর হে
মঙ্গল কর নিরলস নিঃসংশয় করহে।'

কিন্তু তাহা হইলেও একথার ভিতর কিছুমাত্র ভুল নাই যে, রবীন্দ্র-কাব্যে এই কল্যাণের সুর গৌণ ভাবেই আসিয়া পড়িয়াছে, এবং তাহাতে মুখ্যস্থান অধিকার করিয়া আছেন সুন্দর। কল্যাণ তাঁহার কাব্যে সুন্দরের সঙ্গী মাত্র। অর্থাৎ রসানুভূতিই তাঁহার কাব্যে প্রধান বস্তু এবং এই সুন্দরের সাহচর্য্যে কাব্য-দেহের স্বাস্থ্যে যে স্বাভাবিক লাবণ্যের ছাপ জাগিয়া উঠে তাহা লইয়াও তিনি পাঁয়তাড়া করেন না। বস্তুতঃ এই সুন্দর অনুভূতি তাঁহাকে যে কোথায় টানিয়া লইয়া যাইতেছে তাহাও তিনি জানেন কি না সন্দেহ। এই জন্যই তাঁহাকে প্রশ্ন করিতে দেখা যায়—

আর কত দূরে নিয়ে যাবে মোরে
হে সুন্দরী

বল কোন্ পাড়ে ফিরাবে তোমার
সোনার তরী!

কিন্তু সুন্দরের দেবতা যিনি তিনি প্রচণ্ড রহস্যময়—বিধাতার মতোই তাঁহার বিধান দুর্জ্ঞেয়। কৌতুকের তাঁহার আদিও নাই—অন্তও নাই। কেউ এ কথা জানে না।

এ যে সঙ্গীত কোথা হ'তে উঠে
এ যে লাবণ্য কোথা হ'তে ছুটে
এ যে ক্রন্দন কোথা হ'তে টুটে
অন্তর বিদারণ।

যাহাকে ধরা-ছোঁয়া যায় না তাহার উদ্দেশ্যে এই যে নিরুদ্দেশ যাত্রা ইহার দুঃখ অনেক। তাই রবীন্দ্রনাথ যখন বলেন—

মোর হার-ছেঁড়া মণি নেয়নি কুড়ায়ে,
রথের চাকায় গেছে সে গুঁড়ায়ে,
চাকার চিহ্ন ঘরের সমুখে
পড়ে আছে শুধু আঁকা,
আমি কি দিলাম কারে জানে না সে কেউ
ধূলায় রহিল ঢাকা

তখন সে উক্তি যে তাঁহার একান্ত অভিজ্ঞতা লব্ধ বস্তু তাহাতে সন্দেহ করিবার কোনো কারণ নাই। এমনি ভাবে কঠোরতম সাধনার দ্বারাই রবীন্দ্রনাথের খোঁজা শেষ হইয়াছে, তিনি লাভ করিয়াছেন কাব্যের যাহা চরম কাম্য সেই চিরন্তন সুন্দরকে—আর নিখুঁত তপস্যার যাহা স্বাভাবিক ফল তাহারই প্রভাবে তাঁহার কাব্যে রূপের দেবতার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন কল্যাণ-লক্ষ্মী। কোনো কবিই ইহার চেয়ে বড় সার্থকতার স্বপ্ন দেখিতে পারে না।

আজ যখন বাংলা-সাহিত্যে সুন্দরের আদর্শ বিকৃত ও বিবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, যখন পাঁককেই পঙ্কজ বলিয়া ভুল করিবার মতো দীনতা আমাদের বুদ্ধিকে মোহ-গ্রস্ত করিতেছে, রবীন্দ্রনাথের সুন্দরের আদর্শ আমাদিগকে তখন শুভ বুদ্ধিদান করুক। এই সুন্দরকে যেন আমরা চিনিতে পারি, বুঝিতে পারি, জীবনের ভিতর গ্রহণ করিতে পারি।

"পাওনাদার"

রায় পরিমল রাণী বসু চৌধুরী

আমি পাওনাদার—মহাজন। টাকা ধার দিয়ে আমি—বিপদ-গ্রস্ত দরিদ্র ব্যক্তিদের আশু বিপদ থেকে ত্রাণ করি, রোগ-গ্রস্ত ব্যক্তির আত্মীয়ের মুখে হাসির লহর তুলি, মেয়ের বিয়ের ভাবনা ঘুচিয়ে কন্যাদায়-গ্রস্ত, দুশ্চিন্তা প্রপীড়িত পিতামাতার মনে আনন্দের অবাধ লহর ছোটাই, পিতৃমাতৃ শ্রাদ্ধদায়গ্রস্ত দরিদ্রকে আমিই উদ্ধার করে, সমাজের কঠোর পীড়ন থেকে মুক্তি দিয়ে, পরলোকগত পিতৃপুরুষগণের আত্মার পুণ্যাশীর্ব্বাদ সেই পিতৃমাতৃ-শ্রাদ্ধদায়গ্রস্ত অভাগাদের শিরে বর্ষণ করিয়ে তাদের অন্তরে অফুরন্ত আনন্দের তরঙ্গ তুলি; দুর্ভাবনার পাতাল থেকে তাদের একেবারে নির্ভাবনার স্বর্গে আমিই নিয়ে যাই।

নিজে ভাল খাইনে, পরিনে, স্ত্রীকে গয়না দিয়ে সাজাই নে, ছেলে মেয়েদের জল খাবারের পয়সা দিই নে, নূতন বই কিনে দিই নে, বাবুগিরি করতে দিই নে, নিজেও বিলাসিতা বিসর্জ্জন দিয়ে টাকা জমিয়ে শুধু পরকে দিই, পরের বিপদে সাহায্য করি। আমি ট্রাম, বাস, ঘোড়ার গাড়ী, রিক্সাতে পয়সা দিই নে, কুলি মজুর খাটাই নে, পান সিগারেট খাই নে, থিয়েটার বায়স্কোপ [illegible]

পর্য্যন্ত দিই নে—একটী পয়সা পর্য্যন্ত বাজে খরচ করি নে—পয়সা শুধু জমিয়ে জমিয়ে অকাতরে অকুণ্ঠিত হৃদয়ে হাসিমুখে পরের হাতে টাকার কাঁড়ি তুলে দিই। স্ত্রী রাগ করেন, মা বকেন, ছেলে মেয়েরা অভিমান করে তবু আমি না দিয়ে যে থাক্‌তে পারি নে? আমি যদি পরের বিপদে সাহায্য না করি, আমি যদি অসময়ে পরকে না দেখি, আমি যদি অভাগাদের দুঃখ, দারিদ্র অভাব না বুঝি, না ঘোচাই তবে তাদের দেখে কে? আমি ছাড়া সংসারে তাদের আপন বল্‌তে যে আর কেউ নেই!

আমি যে তাদের জন্যে মরি, তাদের জন্যেই আহার নিদ্রা ত্যাগ করে দ্বিপ্রহরের খাঁ খাঁ রোদে ঘুরে বেড়াই, সুখ শান্তি আবর্জ্জনা রাশির মত পায়ে দলে দিনরাত অক্লান্ত পরিশ্রমে ভূতের বেগার খেটে খেটে নিজের অমূল্য জীবনটা পর্য্যন্ত পাত করে দিই—তবু তো তারা কেউ আমার দুঃখ বোঝে না, আমার দিকে একবার ফিরেও চায় না, আমার দ্বারা জাতি, কুল মান, ধর্ম্ম রক্ষা ক'রেও আমার কাছে আন্তরিক কৃতজ্ঞ থাকে না, একটা মন খোলা ভাল কথাও আমার সাথে বলে না। যদিও কেউ দয়া ক'রে আমার দিকে একবার ফিরে চায়, কিম্বা আমার সাথে একটা কথা কয়—তবে তার সেই চাউনিতে সেই কথায় যে কতটুকু বিরক্তি, কতটুকু ঘৃণা পরিস্ফুট হ'য়ে ওঠে তা আমার দৃষ্টি অতিক্রম করে না। এরাই আবার যখন দায়ে পড়ে আমার কাছে আসে টাকা ধার নিতে তখন এদের চাতুরিতে, খোসামোদে আমি দিশেহারা হয়ে যাই। তখন এরাই সব অতি নিকটতম আত্মীয়ের মুখোস পরে আসে, আমার মঙ্গল কামনা করে, আমায় মহত্বের শ্রেষ্ঠ আসনে তুলে দেয়—নানারূপে আমার মনোরঞ্জন করে। নিজেদের দারিদ্র্য জানায়, বিপদ জানায়, অক্ষমতা জানায়, আমার হাত, পায়ে ধরে, কত কাকুতি মিনতি করে অবশেষে চোখের জলে আমার মন ভিজাতে চেষ্টা করে। আমার হৃদয়ে দয়া, মমতা সহানুভূতির উদ্রেক করে—করুণ রসের প্লাবনে আমার কোমল হৃদয়ও করুণায় সহানুভূতিতে আর্দ্র হয়ে যায়। আমি দয়ার্দ্রচিত্তে আমার বহু কষ্টার্জ্জিত সঞ্চিত অর্থ 'রক্তজল করা টাকা' তাদের হাতে তুলে দিয়ে আত্ম-প্রসাদ লাভ করি, আত্ম-তৃপ্তিতে তৃপ্ত হই।

ভোর বেলায় বিছানা থেকে উঠে বাসি হাতে বাসি মুখে আমি খাতা বগলে বার হই—টাকার তাগাদায়। কিছু জল খাবার কি সামান্য এক পেয়ালা চাও খাইনে। কারণ টাকা যদি নিজের জন্যে, নিজের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যেই ব্যয় করলাম—তবে পরকে দেখবো, পরকে বিপদে রক্ষা করবো কি দিয়ে? আর আমি না দেখ্‌লে তাদের দেখবেই বা কে? সারাদিন না খেয়ে, না নেয়ে একটু বিশ্রাম পর্য্যন্ত না করে, দোরে দোরে পথের ভিখারীর মত ঘুরে বেড়াই—কেউ একটু বস্‌তে বলে না, একটু তামাক খেতে বলে না, একটা পাণ দিয়েও জিজ্ঞেস করে না। অধিকন্তু আমায় দূরে আস্‌তে দেখলেই কাজের অছিলায় অন্দরে ঢুকে পড়ে।

আমি ডাক্‌লে তারা সাড়াটি পর্য্যন্ত দেয় না; অবশেষে ধর্ণা দিয়ে ব'সে ব'সে নিজেরই যখন বিরক্তি এসে যায় তখন সেখান থেকে নিতান্ত অনিচ্ছাসত্বেই উঠে পড়ি। কচিৎ কারও ছেলে বা মেয়ে দোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে বলে যায় "বাবা, এখন বাড়ীতে নেই।" অথচ তার বাপ তখন হয় রান্না ঘরে নতুবা সেই ঘরেরই খাটে বসে কি শুয়ে। একটী কথা পর্য্যন্ত বল্‌বার সুযোগ আমায় না দিয়েই তারা সশব্দে দোর বন্ধ করে চলে যায়—আমি ভ্যাবাচ্যাকার মত কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হ'য়ে কিয়ৎক্ষণ সেখানে ব'সে থাকি।

অন্যত্র গিয়ে দেখি—যে মেয়ের বিয়ের জন্য আমার কাছ থেকে টাকা ধার নিয়েছে সবেমাত্র সে বিধবা হয়ে পিত্রালয়ে ফিরে এসেছে—বাড়ীতে কান্নার উচ্চরোল উঠেছে অথবা যে ছেলের চিকিৎসার্থ আমি টাকা দিয়েছি সবেমাত্র তাকে গঙ্গাযাত্রা করিয়ে মরা কান্না আরম্ভ করেছে কিংবা যে পিতৃমাতৃ শ্রাদ্ধের জন্যে টাকা এনেছে সে 'ধার করা টাকার' পাইটি পর্য্যন্ত নিঃশেষ করেও গলে বস্ত্র দিয়ে কর যোড়ে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের দ্বারে দ্বারে ফিরেও কুকুরের মত বিতাড়িত হয়েও সমাজে একঘরে হয়ে দুঃখ করছে, আক্ষেপ করছে, হা হুতাশ করছে। আমি এক-বার কি বড় জোর দু'বার মাত্র এই সব হতভাগাদের

টাকার তাগিদ দিয়ে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে আসি। সামান্ত টাকার জন্যে এই অসময়ে কি করে আমি তাদের বার বার বলি? রাগ হয় কেমন এই সব অর্ব্বাচীনদের কাণ্ড দেখে! কেন—এই সব মরা ছাড়ার আগে আমার টাকাটা স্বদ সমেত মিটিয়ে দিলেই তো পারে! তাই দু'একবার ব'লেই ফিরে আসি।

শীতে গায়ে কোট নেই, পায়ে জুতা নেই, মোজা নেই বাদল দিনে একটা ছাতা পর্য্যন্ত নেই তবু আমি শীতে কেঁপে, বর্ষায় ভিজে রোদে পুড়ে টাকার তাগাদায় ঘুরে মরি। এ সব কিনিনে কেন জান? আমি যদি এ সব করি তবে পরকে টাকা দিয়ে দেখে কে? দিনের পর দিন মাসের পর মাস বছরের পর বছর এমনি ভাবে শীতে থর থর করে কেঁপে, গ্রীষ্মে রোদে পুড়ে—গলদঘর্ম্ম হ'য়ে বর্ষায় অবিশ্রান্ত জলে ভিজে আমি খাতাটি বগলে করে কলুর বলদের মত কেবল ঘুরে মরি। আমার একটা কাণা কড়িও আদায় হয় না। অবশেষে আমি নিরুপায় হ'য়ে নিতান্ত দায়ে পড়েই যাই আদালতের আশ্রয় নিতে।

নালিশ না করলে যে টাকা আদায় হয় না! টাকা আদায় না হ'লেই বা আমি আবার তাদের কি দেব? কোথা থেকেই বা দেব? আমার তো আর টাকার জালা মাটিতে পোতা নেই?

আদালতের পেয়াদা এসে তাদের ঘর থেকে খাট বিছানা বাক্স সিন্ধুক আলমারী টেবিল চেয়ার—থালা ঘটি বাটি পর্য্যন্ত টেনে বার করে নীলামে ডাকে। অভাগাদের দুঃখ মোচনার্থ দেনা পরিশোধার্থ, পেয়াদার জুলুম নিবারণার্থ আমিই আবার সেগুলো নিজের সঞ্চিত অর্থ খরচ করে কিনি। কি করবো—তা না হ'লে যে পরে নিয়ে যায়! পেয়াদায় জুলুম করে—আমি তার কি ক'রবো? তারা তো আমার কথা শোনে না—আমি তো হাকিম নই? কারো বা বাড়ী ঘর জমিজমা সবই বিক্রি হয়ে গিয়ে, তারা পথে ব'সে চীৎকার করে ক্রন্দন করে—আমার করুণ হৃদয় দুঃখে সহানুভূতিতে ভরে যায়। দুঃখে, ভাবনায় সারারাত আমার চোখে ঘুম আসে না—বিছানায় এ পাশ ও পাশ করে ছট্ ফট্ করে আমি রাত কাটাই। কিন্তু তবুও আমার কিছুই করার হাত নেই। আদালতের পেয়াদা—তারা তো আমার মাইনে করা চাকর নয়?

এমনি ক'রে নিজের ও পরিবারের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য নষ্ট করে, অনাহারে অনিদ্রায় হাড় ভাঙ্গা খাটুনি খেটে খেটে গায়ের রক্ত জল করে টাকা আয় করে পরকে দিই পরের অভাব মোচন করি, কন্যাদায় পিতৃমাতৃ শ্রাদ্ধ দায় উদ্ধার করি, সমাজের কঠোর শাসন পীড়ন থেকে নিষ্কৃতি দেই, পরিশেষে নানা প্রকারে তাদের ঋণের দায় থেকেও মুক্ত করে তাদের পরলোকের পথও প্রশস্ত করি, পরের জন্যে নিজে মরি—তবু আমি লোক ভাল না। আমার অসাক্ষাতে আমারই অধমর্ণ দেনাদারেরা আমায় বলে—আমি কৃপণ, আমি চামার, আমি রক্তশোষক জোঁক। আমার অপরাধের মধ্যে আমি শুধু পাওনাদার। সবই আমার দুরদৃষ্ট। কিন্তু এ সব কিছুই আমি গায়ে মাখি নে—নীরবে হাসিমুখে সহ্য করে আবার সেই হতভাগাদেরই টাকা ধার দিই। কারণ আমি জানি অসাক্ষাতে লোকে রাজারও নিন্দা করে—তাই বলে কি রাজা তাঁর কর্ত্তব্যে অবহেলা করেন?

গান

শ্রীনরেন্দ্র নাথ বসু

বনের বাঁশী মনে বাজে
ঘরে থাকা হো'ল দায়,
মুখে বলি যাব না আর
মন ছুটে যেতে চায়।
সুরের মাঝে কি যে আছে

শুনি শুধু দেবতা মোর
ডাকিছেন—আয় আয়
অধীর মন সারাক্ষণ
থির নাহি রাখা যায়,
মিলন আশে প্রিয় সনে

মুষ্টিযুদ্ধ

মিঃ জে কে শীল

সাধারণের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা—

শরীর নীরোগ আছে বলিয়া স্বাস্থ্য অটুট আছে এমন ধারণা ভ্রান্ত। জীবের স্বাভাবিক অবস্থা গতি—স্থিতি নয়। বায়ুকোষ, হৃৎপিণ্ড ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির কার্য্যাদি পর্য্যবেক্ষণ করিলে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে মানব দেহের পেশীগুলি যথেষ্ট পরিমাণ অনুশীলনের উপযোগী করিয়া সৃষ্ট হইয়াছে। শরীর ধারণের জন্য পরিমিত খাদ্য ও পরিধেয় সংগ্রহের পরিশ্রম ত আছেই; এই পরিবর্ত্তনশীল জগতের সহিত সমতা রাখিয়া চলিতে হইলে অন্নবস্ত্রের সমাধান করিয়া বাঁচিয়া থাকাই যথেষ্ট নয়। ভগবানের অপর্য্যাপ্ত দানের সদ্ব্যবহার করিয়া জীবনকে সুস্থ, সুন্দর ও সার্থক করিতে চাই অমিত বল।

মানব-জীবনে শক্তি-সাধনার বিশেষ প্রয়োজন আছে। জীবনীশক্তির উন্মেষ ও দেহযন্ত্রের সংরক্ষণ একমাত্র শারীরিক ব্যায়াম দ্বারাই সম্ভব। কিন্তু কেবলমাত্র পেশী নিচয়ের বৃদ্ধি ও দৃঢ়তা সাধনেই জীবনী শক্তির স্ফুরণ হয় না। নিয়মানুবর্ত্তীতা ও কঠোর ব্যায়াম সাধনের সঙ্গে চাই ক্রীড়া-কৌতুকের সংমিশ্রণ। মুষ্টি যুদ্ধে এই সমন্বয় সাধিত হয়।

ইউরোপ ও আমেরিকার অনেকে মুষ্টি যুদ্ধকে জীবিকা উপার্জ্জনের উপায় স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে যোদ্ধা ও acrobat সম শ্রেণীর লোক। বস্তুতঃ মুষ্টিযুদ্ধ একাধারে ব্যায়াম ও ক্রীড়া, ইহাতে কাওয়াজের (drill) নিয়মানুবর্ত্তীতা আছে। ব্যায়ামের পেশী নিচয়ের আকুঞ্চন ও সম্প্রসারণ এবং ক্রীড়ার তৎপরতা ও বিচারবুদ্ধি শিখিবার যথেষ্ট আছে। এতদ্ব্যতীত আত্ম-রক্ষার উপায় হিসাবে মুষ্টিযুদ্ধ অতুলনীয়। মুষ্টিযুদ্ধ ফুটবল খেলার মতই চিত্তাকর্ষক। ভার যখন ধারের কাছে বিফল হইয়া যায়, ক্ষুদ্রশক্তি গুরুশক্তিকে পরাস্ত করে তখন মুষ্টিযুদ্ধের উৎসাহিগণ ফুটবল খেলার দর্শকবৃন্দের মতই মাতিয়া উঠেন। অনেকের একটা ভ্রান্ত ধারণা আছে
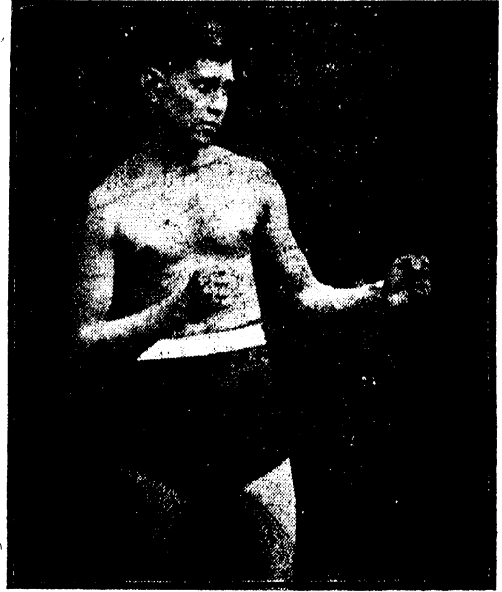
লেখক

যে মুষ্টিযুদ্ধ অতি বিপজ্জনক ক্রীড়া। মুষ্টিযুদ্ধে গুরুতর আঘাত লাগিবার সম্ভাবনা নাই আমি এমন কথা বলি না। কিন্তু নিয়মাবলী মানিয়া চলিলে ও কোন সুস্থ ও সবল যুবকের মুষ্টিযুদ্ধে, ফুটবল অথবা হকি খেলা অপেক্ষা

আহত হইবার সম্ভাবনা অধিক, একথা আমি স্বীকার করি না। যাঁহারা অতি মাত্রায় সাবধান তাহারাও মুষ্টি যুদ্ধ শিক্ষাকালীন কেবলমাত্র হস্ত পদাদির সঞ্চালন দ্বারা যথেষ্ট উপকৃত হইতে পারেন।

ইংরাজীতে একটা প্রবাদ আছে যে আত্মরক্ষাই প্রকৃতির নিয়ম। বিপদে পড়িলে মানুষ ব্যতীত কোন প্রাণীই নিশ্চেষ্ট বশ্যতা স্বীকার করে না। আমরা এমনই বিলাসী ও নির্জীব হইয়া পড়িয়াছি যে স্বজন ও আশ্রিত রক্ষা দূরে থাকুক .আত্মরক্ষা করিবার সাহসও আমাদের নাই। দেশবন্ধু একবার বলিয়াছিলেন যে,দেশকে জাগাইতে হইলে দেশের প্রত্যেক নর-নারীকে বিপদ ও দুর্ব্বৃত্ততাকে বাধা দিবার শক্তি স্ফুরণ করিতে হইবে। দেশবন্ধুর এই উক্তিকে কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে মুষ্টিযুদ্ধ প্রচারের বিশেষ প্রয়োজন।

আজকাল মনোবিজ্ঞানবিদরা বলিয়া থাকেন, যে, যেমন সুস্থ ও সবল হইবার জন্য আমাদের শারীরিক স্বাস্থ্যের প্রয়োজন, তেমনি অধ্যবসায়ী কর্ম্মক্ষম, কষ্টসহিষ্ণু ও নির্ভরশীল হইতে হইলে মানসিক স্বাস্থ্য অটুট রাখিতে হইবে। মুষ্টিযুদ্ধ শিক্ষা ও শিক্ষকতায় আমার সাত বৎসরের অভিজ্ঞতা হইতে বলিতেছি যে মুষ্টিযুদ্ধের দ্বারা মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্য উভয়েরই উৎকট সাধিত হয়।

একবার এক ব্যবসায়ী এক সম্ভ্রান্ত ভূম্যধিকারীকে বলিয়াছিলেন, মহাশয় আপনার টাকা ঘুমিয়ে আছে,আমার টাকা কথা কয়। ভূসম্পত্তিতে আবদ্ধ অর্থ অপেক্ষা চলতি মূলধন এবং কার্য্যকরী শক্তি কত বেশী আপনারা সকলেই জানেন। ব্যবসায়ী ও ভূম্যধিকারীর মধ্যে যে প্রভেদ, মুষ্টিযোদ্ধা ও অন্য উপায়ে যাহারা বল সঞ্চয় করে তাহাদের মধ্যে ততখানিই ব্যবধান। প্রয়োজন হইলে ব্যবসায়ী যেমন অত্যল্পকাল মধ্যে অর্থ সংগ্রহ করিয়া নিজের কার্য্যে নিয়োজিত করিতে পারেন, মুষ্টিযোদ্ধাও তেমনি বিপদে পড়িলে নিমেষ মধ্যে আপনার শক্তি প্রয়োগ করিতে সক্ষম। বণিকদের মধ্যে প্রতিপত্তি তাঁহারই যাঁহারা আছে প্রচুর নগদ অর্থ। শক্তি সাধকদের মধ্যে তেমনি দুর্জ্জয় তিনিই যাঁহারা শক্তি মুষ্টিগত। তাহাদের নিকট আমার সবিনয় নিবেদন যে, তাঁহারা যেন মুষ্টিযুদ্ধের মূলনীতিগুলি কুচকাওয়াজের সঙ্গে স্কুল ও কলেজে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন।

চৈনিক সভ্যতা

শ্রীসুধাংশুকুমার মিত্র বি-এস-সি

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

"The Chinese have a high morality fallen far into decay, and religious notions that are a strange mixture of philosophy and fetishism."

অধ্যাপক শ্রীবিনয়কুমার সরকার তাঁহার "বর্ত্তমান জগতের" চতুর্থভাগে লিখিতেছেন যে সাত রাজবংশের রাজত্বকালে অধুনা চেউলি (Cheouli) নামক চীন গ্রন্থের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রবাদ আছে যে, এই গ্রন্থটী খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বাদশ শতাব্দীতে চীনদেশে প্রচলিত শাসন প্রণালী লিপিবদ্ধ করিবার নিমিত্ত রচিত হইয়াছিল। যদি এই অনুমানই সত্য হয়, তাহা হইলে জগতের রাষ্ট্রনৈতিক বিষয়ক আলোচনায় এই চীনগ্রন্থই সর্ব্ব প্রথম। ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক বিষয়ক প্রথম গ্রন্থ ভিনসেন্ট স্মিথের মতে মনুসংহিতা খৃঃপূঃ ২০০ হইতে ২৮০ খৃষ্টাব্দ মধ্যে রচিত হইয়াছিল এবং কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র খ্রীঃপূঃ ৩২২ সালের পর রচিত হইয়াছে। কারণ প্রায় সেই বৎসরেই চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্যের রাজত্ব আরম্ভ করেন।

চ্যাং লিং

বেণী রচনায় চৈনিক ললনা

যদি বিনয়বাবুর কথাই সত্য বলিয়া মানিতে হয়, তাহা হইলে এই সকল কথার কোন তাৎপর্য্য থাকে না। যাহা হউক, এই সকল বিষয়ে আলোচনা আমাদের প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। আমরা বিনয়বাবুর কথাই মানিয়া লইয়া "চেউলি"কেই রাষ্ট্রনৈতিক বিষয়ে প্রাচীন গ্রন্থ বলিব। কিন্তু এই গ্রন্থে কেবলমাত্র যে শাসনপ্রণালী লিপিবদ্ধ আছে তাহা নয়; উহাতে আছে আরও

অনেক বিষয়ে আলোচনা—যেমন ধাতু সংমিশ্রণ, অলঙ্কার গড়া ইত্যাদি কার্য্যবিধি সম্বন্ধে উপদেশ।

অর্থশাস্ত্র, শুক্রনীতি, আইন-আকবরী ইত্যাদি ভারতীয় গ্রন্থের সহিত এই হিসাবে ইহার তুলনা হয় না।

পুরাণী চীনে চিকিৎসা আয়ুর্ব্বেদীয় মতানুযায়ী হইত। এই বিষয়ে চীনদেশে অনেক শাস্ত্র প্রণীত আছে।*

চীন প্রাচীরের এক অংশ

কিন্তু অস্ত্র চিকিৎসা সেই সময় উল্লেখযোগ্য উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই। কারণ প্রাচীন চীনবাসীরা শরীরের উপর অস্ত্র চালাইয়া অঙ্গ ক্ষত করিবার ভয়ানক বিরোধী ছিল। পরে খৃঃ তৃতীয় শতাব্দীতে একজন চীন ডাক্তার বর্ত্তমানে যাহাকে অসাড় করিয়া অস্ত্র চিকিৎসা বলে সেই রকম ব্যবস্থা প্রচলন করেন।

চীনজাতির জ্যোতিষ বিজ্ঞানও অতীব মনোরম। খৃঃ পূঃ ২২০০ শতাব্দীর বহু পূর্ব্বে চীন পণ্ডিতেরা নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য্য আদির গতি নিরীক্ষণ করিয়া কাল, ফল, দিন পঞ্জিকা প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিতে শিখিয়াছিলেন। তার-

চীন জাপান লড়াইয়ের তোরজোর

পর চীনদেশের রাজারা সভা জ্যোতিষ মনোনয়ন করিয়া জ্যোতিষশাস্ত্রের অনেক উন্নতি সাধনে সাহায্য করিয়াছিলেন।
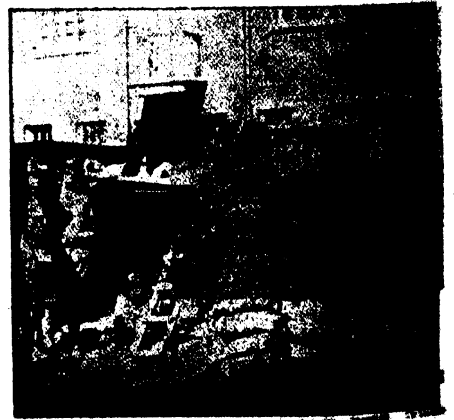
চীন জাপান যুদ্ধের এক দৃশ্য

এই সকল নানাবিধ গ্রন্থ বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও পুরা- চীনে বিদ্যাকল্পদ্রুম (Encyclopaedia) [illegible] অভিধান, ইত্যাদি মূল্যবান পুস্তকাদি রচিত [illegible] মিং বংশীয় য়ুংল (Yung-Lo—১৪০৩ [illegible]

* Chinese Medical literature is on a very voluminious scale, medicine having always occupied a high place in the estimation of the people.—C. A. Giles.

কালে প্রথমে বিদ্যাকল্পদ্রুম সঙ্কলন করা হয় ও ক্রমে ক্রমে উহার কলেবর বর্দ্ধিত হইয়া এখন চীন ভাষার কল্পদ্রুম প্রকাণ্ড হইয়া উঠিয়াছে। এই বিদ্যাকল্পদ্রুমে জ্যোতিষ, ভূগোল, শিল্প ও সাহিত্য এই চার বিষয়ের সঙ্কলন হইয়াছিল।

এই বিশাল বিদ্যাকল্পদ্রুমের ১১,০০০টী (Volume) এ সমাপ্ত এবং ইহার শব্দ সংখ্যার পরিমাণ ৩,৬৬,০০০,০০০। কেমব্রিজের চীন সাহিত্য অধ্যাপকের মতে ইংরাজি বিদ্যাকল্পদ্রুম (Encyclopaedia Britanica) এই গ্রন্থের তুলনায় নগণ্য।*

যখন চীনদেশে ছাপাখানার আবির্ভাব ঘটে সেই সময় হইতে উহা ছাপা হইয়া প্রকাশিত হইত।

পুরাণী চীন সাহিত্য ও ভাষায় এত উন্নতি করিয়াছিল সত্য কিন্তু বর্ত্তমানে সকল দেশে যেমন লেখ্য ভাষা ও কথ্য ভাষায় বিশেষ পার্থক্য লক্ষিত হয় না তখনকার দিনে চীনেও কোন সামঞ্জস্য ছিল না।

চীন সাহিত্যে এমন অনেক জিনিষ আছে যাহা বস্তুর আকৃতি বুঝায়। অর্থাৎ এমন অনেক বস্তু আছে যাহা চীন সাহিত্যে চিত্রাকারে প্রকাশিত হইত। অধ্যাপক বিনয়
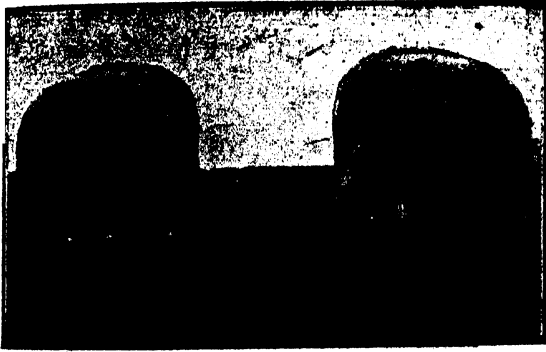
চৈনিক শিল্পের একটী নমুনা

চীন জাপান যুদ্ধের অপর দৃশ্য

এখন সহজেই অনুমেয় যে চীনসাহিত্য প্রাচীনকালে কিরূপ উন্নতি লাভ করিয়াছিল। কেবলমাত্র সাহিত্যে যে পুরাণী চীন এত উন্নতি করিয়াছিল তাহা নহে, পৃথিবীর মধ্যে "পিকিং গেজেট" (Peking Gazette) সবচেয়ে পুরাতন ও সর্ব্বপ্রথম দৈনিক কাগজ বলিয়া ঐতিহাসিকরা অনুমান করেন। খ্রীঃ পঞ্চদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত উহা হাতে লিখিয়া প্রকাশিত হইত। তারপর

কুমার সরকারের মতে চীনদেশে লেখ্য ভাষার নানা রীতি ছিল।

প্রত্যেক রীতিই সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। রীতি প্রধানতঃ চারটি। কাজেই চীনদেশে লেখ্য ভাষা বলিতে চার রকম ভাষা বুঝায়।

১। প্রাচীন রীতি—দর্শনে এই ভাষা ব্যবহৃত হয়।

২। পণ্ডিতী রীতি—ছাত্রেরা পরীক্ষার সময় এই ভাষা ব্যবহার করে।

৩। ব্যবসায়ী রীতি—সর্ব্বসাধারণ ভাষা—রাষ্ট্র শাসন, বিচার, আইন ও দলিলে এই ভাষা ব্যবহৃত হয়।

৪। পরিচিত ভাষা—সকলের সরল ভাষা—এই ভাষায় নাটক নভেল ইত্যাদি প্রণীত হয়।

* Taking 100 Chinese words as eqiuvalent to 130 Engiesh, due to the quarter condensation of Chinese literary style it will be found that even the mighty river of the Encyclopaedia Britanica 'shrinks to a nell' when compared with the overwhelming specimen of the chinese industry—G. A. Giles.

প্রাচীন চীন দর্শন

পুরাণী চীনে দর্শনশাস্ত্রেরও যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। সকল বুনিয়াদি জাতির সভ্যতার আধার দর্শনশাস্ত্রে নিহিত। কনফিউসিয়স্ (খ্রীঃ পূঃ ৫২২—৪৭৯), মতি (খ্রীঃ পূঃ ৪৭০—৩৪০), মেন্সিয়স্ (খ্রীঃ পূঃ ৩৭২—২৮৯) প্রমুখ চীন দার্শনিকদের টীকা সম্বলিত চীন গ্রন্থরাজি যে কোন জাতির গর্ব্বের বিষয়। কনফিউনিয়স কেবলমাত্র চীন জাতির ভিতর নয় পৃথিবীর একজন সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক

চীন জাপান যুদ্ধ

বলিয়া পরিগণিত। তাঁহার দর্শনশাস্ত্র বর্ত্তমান চীন সভ্যতার মূল ভিত্তি। কনফিউসিয়সের মতে প্রত্যেক মানুষ নিষ্পাপ জন্মগ্রহণ করে—কিন্তু পরে কুসঙ্গ চক্রে মানুষ অসৎ হয়। ইহাই প্রকৃতির নিয়ম বলিয়া তিনি মনে করিতেন। তাহুই (Great Learning) নামক গ্রন্থে কনফিউসিয়স্ শিক্ষার মূল ভিত্তি এই বলিয়া দিয়াছেন— "নরসমাজ পরস্পরের স্বাভাবিক সহানুভূতির উপর নির্ভর করে। এই সহানুভূতি প্রথমে অতি আত্মীয় স্বজনের উপর প্রকাশ পায় ও আত্মীয়তা সুদূর হইবার সঙ্গে সঙ্গে এই ভাব কমিয়া আসে।" পুরাণী চীনে নিউটন, জগদীশ বোস, মারকোনি, রণ্টবেন বা রমণের মত যদিও কোন বৈজ্ঞানিকের জন্ম হয় নাই তাহা হইলেও সেদেশে, হোমার, এক্রোসিস, এরিস্টটল মনু প্রভৃতির ন্যায় মনিষীর অভাব কোন দিন ছিল না। কালের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সভ্য জগতের উন্নতি হইতেছে ও বিজ্ঞানের উন্নতি সাধিত হইতেছে। এখনকার মানুষ হইয়া পড়িয়াছে সকল সুখ-সুবিধার অন্বেষণকারী তাই এখন মানুষকে বাঁচিতে হইলে প্রয়োজন হইয়াছে বিজ্ঞানের উন্নতি সাধন করা। তখনকার দিনে মানুষের এত আশা আকাঙ্ক্ষা ছিল না। সেইজন্য তাহাদের কোন বৈজ্ঞানিক প্রথা উদ্ভাবন করিবার জন্য চেষ্টাও ছিল না। ফলে পুরাণী চীনে ও অন্যান্য বুনিয়াদি জাতির ভিতর বিংশ উনবিংশ শতাব্দির কোন বৈজ্ঞানিকের প্রকাশ নাই। যে জাতি অপর সকল বিষয়ে উন্নতি লাভ করিয়াছিল বিজ্ঞানে অত পিছাইয়া থাকার কারণ প্রয়োজনীয়তার অভাব বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না?

ইংরাজিতেই ত প্রবাদ আছে Necessity is the mother of invention

আধুনিক বেশে চীন রমণী

কনফিউসিয়স গ্রন্থে 'পিতা' 'মাতা' 'পুত্র' 'পতি' 'পত্নী' প্রভৃতি নামকরণ অর্থ শূন্য বলিয়া নির্দ্দেশিত। তাঁহার মতে প্রত্যেক বাক্যের দ্বারা এক একটী বিভিন্ন কর্ত্তব্য নির্দ্দেশিত হইতেছে। পিতা বলিতে তিনি কেবলমাত্র পুত্রকন্যার 'ডাক' ইহা মনে করিতেন না— ইহার মধ্যে কর্ত্তব্যের ভাব লুকাইয়া আছে।

এইরূপ বিভিন্ন ডাকের মধ্যে বিভিন্ন কর্ত্তব্যের অনুপ্রেরণা অন্তর্নিহিত রহিয়াছে। আধুনিক শিল্প সভ্যতার চোখ দিয়া দেখিতে গেলে সততই প্রতীয়মান হয় পুরাণী চীনের সৌহৃদ্য সভ্যতার কথা। কর্ত্তব্যবোধ, দয়া, চরিত্র, কৃতজ্ঞতা স্বীকার, পুত্রস্নেহ, পিতৃভক্তি, সত্যপ্রিয়তা, বিনয় ইত্যাদি গুণ চীন ও ভারতীয় সভ্যতা বাদে কোথায় দেখা যায় না। চীনদেশের অতিথি পরায়ণতার কথা সকলদেশেই সুবিদিত।* কনফিউসিয়সের শিক্ষা কেবলমাত্র যে সামাজিক জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহা নয় চীন রাষ্ট্রনীতির উপরও ইহার কম প্রভাব ছিল না।

চীনবাসীর অন্তেষ্টি ক্রিয়া

* Life is remarkably safe in China. The amount of solid honesty to be met with in every class, is simply astonishing, no Chinese magistrate world dream of punishing a hungryman for simple theft of food. In Chinese life, social and political alike, filial piety may be regarded as the keystone of the arch." 'Civilisation of China.'

আগামী কার্ত্তিক মাসের পুষ্পপাত্র 'পূজা-বার্ষিকী' বিশিষ্ট সংখ্যা হইবে। এই সংখ্যায় বিখ্যাত লেখক-লেখিকাদের লেখা ও সুন্দর চিত্রাদি যাইবে। সাধারণ সংখ্যা হইতে পূজা বার্ষিকী অনেক বড় হইবে।

সত্য পিপাসা

শ্রীসারস্বত শর্ম্মা

সত্য যা তা জানতে চাই,
স্বর্গ হ'তে সত্য বড়, স্বর্গে আমার তৃষ্ণা নাই।
সত্য যদি জেনে থাক সাধনা বা গভীর ধ্যানে,
সত্য যদি জেগে থাকেন তোমার প্রাণে তোমার জ্ঞানে,
তোমারই বাণী বলো তবে মানব মোরা চক্ষু বুজি,
সত্য বলে চালায়োনা—ময়নাপড়া পুঁথির পুঁজি।
পরলোকের লোভ দেখায়ে ইহলোকের রাজা হবে ?
সেদিন গেছে—এ যুগে হায় প্রবঞ্চকের সাজা হবে।

তপস্যাতে যা মেলেনা মিল্‌বে তোমার তুড়ীর চোটে ?
তোমার দুটো ফুস্‌মন্তরে হুম্ ক্রীং হ্রীং বষট্ ফোটে ?
দক্ষিণ হাতের ব্যবস্থায় বা দক্ষিণা দান তোমায় ক'রে,
গোণ্ডা দশেক দণ্ডবতে তোমার পায়ের ধূলোর জোরে ?
গঙ্গাজলে ডুব মেরে কি ঘণ্টা নেড়ে ঘন ঘন,
টিকির জোরে গোবর খেয়ে সে ধন পাওয়া যায় কখনো ?
মনে মনে যা মাননা অন্যকে তা মানাতে চাও,
আড়াল থেকে স্বর ঘুরিয়ে দেবীর আদেশ খুব শোনাও।
অন্ধ হয়ে অন্ধকারে পথ দেখায়ে অন্ধজনে ?
চক্ষুষ্মানে পথ দেখাবার গর্ব্ব পোষো মনে মনে।
বিজ্ঞ সেজে লুকাতে চাও আপন বিশাল অজ্ঞতাকে,
অজ্ঞজনে প্রবঞ্চিতে বুদ্ধি তোমার পাকে পাকে।
ফাঁকির হাটে ধোকার টাটি খুলে তুমি ব্যবসা কর,
প্রেতের নামে গ্রহের নামে দেবের নামে বিত্ত হর।

সরল মনের দুর্ব্বলতা অজ্ঞতার মূলধনে ধনী,
হীরা বলে চালাও জিরা কাচ বিলায়ে বলছ মণি।
করতে শাসন লুণ্ঠিতে ধন কথায় কথায় নরক গড়,
আকাশ ফুলের লোভ দেখাযে পায়ে সবায় কর্‌ছ জড়।
ছিনি মিনি খেল্‌ছ ঠাকুর লয়ে দেশের জীবনটা,
তফাৎ কিছু রাখলে না আর ধর্ম্মকারে চর্ম্মকারে।
তোমার মালের কারখানাতে সত্যদেবের আসতে মানা,
ধর্ম্মে সেথায় চুপে চুপে মেশাও তুমি ভেজাল নানা।
স্বাস্থ্যতত্ত্ব, সমাজ তত্ত্ব জ্যোতিষ পাঁজি শিল্প কৃষি,
স্বার্থতত্ত্ব মিশল তোমার ধর্ম্ম মালে সব জিনিষই।
সবই আছে তোমার হাটে সত্য কেবল পাইনা খুঁজি,
বংশ জাতির পাঁতির তলায় পুঁতে তারে রাখলে বুঝি।

খুটী নাটি লোকাচারের খেলনা দিয়ে ফন্দী করে,
মিথ্যা অলীক স্বপ্ন মাঝে রাখলে সবাই বন্দী করে।
সত্যামৃতের তৃষ্ণা ক্ষুধা জাগলনা হায় তাদের প্রাণে,
সত্যধনে খুঁজতে তারা চাইল না আর জগৎ পানে।
যতকাল না-বালক ছিলাম যা বলেছে শুনেওছি তাই।
এখন ঠাকুর চোখ ফুটেছে মানব কেন পুঁথির দোহাই,
আত্মদেবতারে আমার মানার হেতু বোঝাও আসি।
মনের কষ্টি শিলায় কষে নেব তোমার বচন রাশি,
ফাঁকি দিয়ে স্বর্গে যাওয়া, অমন স্বর্গ চাইনে প্রভু
কুম্ভীপাকেই পচ্‌তে রাজী, সত্য দেখে চাই যে তবু।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

সুরমা চুল বাঁধিতে বাঁধিতে ভাবিতেছিল, "পচা পুরোণো কথা" রাজীব বলিয়া গেল অথচ সেই পুরোণো পচা কথা গুলোই তাহার সমস্ত সংসার সুখ ব্যর্থ করিয়া দিতেছিল! তবু পারে না কেন সে সেই কথা গুলোকেই ভুলিয়া যাইতে! অবজ্ঞা করিতে, অথবা কণিকার মত শাসন করিতে, অথবা সব শেষ করিয়া দিয়া, রাজীবের সহিত সকল সম্পর্ক চুকাইয়া ফেলিতে, কিন্তু তাও সে পারে না। অনেক দিন সে এ কথা ভাবিয়াছে কিন্তু মন তাহার সায় দেয় নাই কখনো। রাজীবকে ছাড়িয়া সে বোধহয় স্বর্গে গিয়াও সুখ পাইবেনা। রাজীবের আদর গুলাও মাঝে মাঝে তাহার কটু লাগিত। মনে হইত সারাংশটুকু অপর আর একজনকে দিয়া, অবশিষ্টটুকু তাহাকে দিয়া ভুলাইতে আসিয়াছে ঐ রাজীব? অথবা পৃথার মত সেও তাহার সহিত শুধু চপল আমোদ করিয়া মিনতির প্রেমটাকে গাঢ় করিয়া লয়? কে জানে? সুরমা অত ভাবিয়াও কোন মীমাংসা করিতে পারে না—সে যতই ভাবুক তাহার সমস্ত সঙ্কল্পের দৃঢ়তা কোমল হইয়া উঠিত রাজীবের সান্নিধ্যে, তাহার আদরে!

পৃথা বাহির হইতে ডাকিল "বৌদি হ'ল? প্রায় ৮টা বাজে যে—"

সুরমা বলিল—"এসো না,—হ'ল বলে—" পৃথা ঘরে ঢুকিয়া বলিল—"এখনো চুল বাঁধছো? কি করছিলে এতক্ষণ বলতো? সুরমা তাড়াতাড়ি উঠিয়া বলিল "তাতে কি, এক্ষুনি হ'য়ে যাবে—আয়া—" পৃথা বসিল—বলিল "তুমি কি colour পরবে?"

সুরমা খোলা আলমারীর সামনে দাঁড়াইয়া বলিল —"কিজানি ভাবিনি এখনো,—তুমিত দেখছি silver পরেছ তবে আমি gold পরি—"

পৃথাও উঠিয়া আলমারীর সামনে দাঁড়াইয়া বলিল "না—এ gold টা প'রনা। red and gold গরমে ভাল লাগবে না, black and gold থাকে তো পর—"

সুরমা বলিল—"তাহ'লে ঐ আলমারীটা খোল আয়া—"

"আচ্ছা বৌদি—তোমার contrast colour এর combination কেমন লাগে?"

"তত ভাল লাগে না—"

পৃথা বলিল "আমার খুব ভাল লাগে—। যেমন সাদা আর লাল অথবা কালো, হলদে আর লাল, গ্রীন আর লাল—খুব ভাল লাগে। আমার মোটরের রং কি জানো? একেবারে কালোর পাশে লাল বর্ডার—বাঃ জুতোটা বেশ চমৎকার—চল!"

এমন সময় আয়া আসিয়া খবর দিল নীচে কে একজন বাবু আসিয়াছে। মেম সাহেবের সঙ্গে দেখা করিতে চায়। সুরমা ও পৃথা পরস্পরের মুখের দিকে চাহিল। "কে?" পৃথা বলিল—"যেতে বলে দাও।" সুরমা বলিল—"না, না, নামটা জিজ্ঞেস করি—"

আয়া নাম লইয়া ফিরিয়া আসিল "বিজয় মুখার্জ্জি—"

সুরমা আয়াকে বলিল—"আয়া—বাবুকে বসাও আমি আসছি।" পৃথা বলিল—"ওঃ সেই! miserable looking!"

সুরমা বলিল—"যাও—সবটাতেই তোমার একটা বিশেষণ আছেই—"

"আচ্ছা ওই ভদ্রলোক আমার নামে খুব একচোট

নিন্দে করেছে না?" সুরমা যাইতে যাইতে বলিল— "কে বলেছে?"

"বলবে কে? কেউ না! দেখলেই লোক চেনা যায়—ওরা ঐ এক শ্রেণীর লোক যারা জগতের দুঃখের ভিতর রাতদিন থাকতে ভালবাসে। আনন্দ তারা চায় না—তা দেখলে আরো অসুখী হয়ে ওঠে—তার মুখ দেখেই বুঝতে পারছিলুম—জগতের যত অশ্রু তার চোখেই জমা হয়ে আছে—। সুরমা হাসিল—পৃথা বলিল—"আমাকে কেউ যদি নিন্দে করে তবে আমার খুব ভাল লাগে, প্রশংসার চেয়েও বৌদি কি জানি কেন, আমার মোটেই রাগ হয়না—কারণ আমি খুব জানি আমি কি—! কি বলেছে ভাই বলনা—"

সুরমা হাসিয়া বলিল—"বলেছে যদি পারতো তবে তোমার মত মেয়েদের ওর আশ্রমে নিয়ে বন্ধ ক'রে রাখতো সব চেয়ে আগে—"

পৃথা জোরে হাসিয়া বলিল—সুন্দর কল্পনা! বেশতো! তাহ'লে দেখতে পেতো এক দিনেই তার আশ্রম আনন্দে পূর্ণ হয়ে উঠত। দেরী কোরো না শীগ্‌গির কথা শেষ ক'রে এসো পনের মিনিটের ভেতর।

বিজয় বসিয়াছিল অন্যমনস্ক ভাবে, সুরমার উজ্জ্বল সজ্জা দেখিয়া সে একটু চাহিয়া দেখিল, তারপরে বলিল— "সুরমা অসময়ে এসে কি বিরক্ত করলুম? বাইরে যাচ্ছ?" সুরমা বসিয়া বলিল— "হ্যাঁ বাইরে যাচ্ছি—বিরক্ত কিছু নয়। তবে বেশীক্ষণ বসতে পারবোনা,—এসেছো আমার সেই ভাগ্য—বোস।"

"তা বুঝতে পারছি—।"

"বিজয়। আমি ভেবেছিলুম তুমি আমার স্বামীর সঙ্গে আলাপ না হওয়ার আগে আসবেনা"

"অতটা বেহায়া ভেবোনা সুরমা। তোমার স্বামীর সঙ্গে আলাপ হয়েছে—"

"কোথায়? কবে?"

"সেদিন একটা সভায় উনি সভাপতি ছিলেন। আমিও সেখানে উপস্থিত ছিলাম, সেইখানেই আলাপ হ'ল। তিনি বাড়ী নেই?"

"না"

"তাও আসতুমনা, কিন্তু মনে হ'ল একবার আসি। বিরক্ত হয়েছ?"

"একটুও না। একটু চা কি কিছু খাবে?"

"না"

"তবে পান?"

"না, এখন কিছুই দরকার হবেনা।"

"ধূমপান"?

"না সুরমা তুমি ব্যস্ত হয়োনা—"

"ও— tee to taler?"

"বিজয় হাসিয়া বলিল—"যা বোঝ তাই,—বলছিলুম, একদিন এসোনা আমার আশ্রম দেখতে—!"

"দেখবার কি আছে বলতো সেখানে?"

"দেখবার অনেক কিছু আছে বইকি? তোমার সুরুচির সঙ্গে খাপ না খেলেও আছে বই কি, দুঃখ, ক্লেশ, দারিদ্র্য, দৈন্য। তুমি হয়তো যা চোখেও দেখনি—কোনদিন। তোমার সেন্টের গন্ধ ডুবিয়ে দিয়ে, তোমার বহুমূল্য পোষাকের আবরণ ভেদ ক'রে, চির সুখ-সঙ্গীতের মধুরতাকে আহত ক'রে সে করুণ আর্ত্ত-নাদ এখনো তোমার কানে পৌছায়নি, তোমার প্রাণে আঘাত করেনি। এমন অনেক কিছু দেখবার আছে, শুনবার আছে, জানবার আছে, যাবে?"

"আমার ওসব ভাল লাগে না বিজয়—আমাকে কেন টেনে নিয়ে যেতে চাও বলতো তোমার ও দুঃখ দৈন্যের গোলমালের ভিতর?"

জানি তোমার ভাল লাগবে না—ভাল লাগেও নি, তোমাকে টেনে নিয়ে যাবার সাহসও আমার নেই—তবে কি জানি একটা ইচ্ছে হ'ল। সেখানে গোলমাল কিছুরই নাই সুরমা, শুধু শান্তি—যাবে?"

সুরমা হাসিল, বলিল "রক্ষে কর বিজয়, অত গভীর হয়োনা। তা যেতে পারি—তবে আমাকে [illegible] তোমার দুঃখ, দৈন্য বরণ করে নেবার জন্য উপদেশ দিয়ে অস্থির কোরো না, কিন্তু আমি সন্ন্যাসিনী হতে পারবোনা। কেন বলতো হঠাৎ এ সখ?"

"কেন তা বলতে পারি না, [illegible]

দেখবার একটা সখ হল—সেই ছেলেবেলাকার ভাবটাই হয়তো জেগে উঠেছে আবার, মনে নেই তখন একটা কিছু করলে, তোমাকে না দেখিয়ে তৃপ্তি হতনা, সেই জন্যই হয়তো বা—"

"আচ্ছা, তা একবার ঘুরে আসতে পারি—বিশ্রী নোংরা রাস্তা নয়তো ?"

"না, তাহলে তোমাকে বলতুম না। ফাঁকা খোলা জায়গা, একেবারে মুক্ত। নির্ম্মল হাওয়া খেলে যায়—। তোমার স্বামীও গিয়েছিলেন। সেই জন্য তুমি গেলে তোমার মর্য্যাদার বিশেষ হানি হবে না।"

"উনি গিয়েছিলেন ?—"

"হ্যাঁ উনি আমাদের এই কমিটীর ডিরেক্টর—হয়েছেন এবারে। সৎ কাজে তো তিনিও মুক্ত হস্ত সুরমা। আমার আশ্রমের কাছে প্রকাণ্ড একটা বাড়ী তৈরী করছেন। তিনি সেটা দান করে দেবেন। অনাথা বিধবা মেয়েদের জন্য—"

সুরমা আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—"তাই নাকি ? কই আমি তো জানিনা—"

"তুমি জানতে না ? তাতে কি হয়েছে ! হয়তো জানাতেন পরে—সে যাই হোক—এও একটা সৎ কাজ, আমি বড় খুসী হয়েছি—দেখে। আজ উঠি—তুমি কোথায় যাচ্ছ ?

সুরমা চিন্তিত ভাবে বলিল—"নাচে—"

বিজয় কি বলিতে গিয়া বলিল না, শুধু বলিল—"এই আমার ঠিকানা, যদি যাও, তবে আগে একটু লিখে জানিয়ে দিও। তোমার আনন্দের সময়ে এসে কতগুলো—দুঃখের কথা ব'লে গেলুম,—যাক্ আসি সুরমা—"

"সুরমা সেই ভাবে বলিল আচ্ছা—"

আলোর আলোয় ভরিয়া গিয়াছে 'ফার্পোর' সর্ব্বাঙ্গ—চৌরঙ্গীতে গাড়ীর স্রোত চলিয়াছে অগণন—। একটা সুদৃশ্য বড় গাড়ী হইতে সুরমা, পৃথা ও সুনীল নামিয়া উপরে উঠিয়া গেল। সেখানে সারি সারি সাজানো টেবিলে ভোজন-নিরতা সুবেশ সুবেশীদের মধ্য দিয়া—তিনজন গিয়া তাহাদের নির্দ্দিষ্ট টেবিলে বসিল—। অনেক পরিচিত পরিচিতাদের দেখিয়া তাহারা পরস্পর পরস্পরকে দূর হইতে হাসিয়া মাথা হেলাইয়া অভিবাদন জানাইল। পৃথা বলিল—"বৌদি দেখ মিঃ ও মিসেস উইলিয়ামস্ এসেছে—" সুরমা কৌতুক ভরে সেদিকে চাহিয়া বলিল—"ও হ্যাঁ!"পৃথা চারিদিকে চাহিয়া বলিল—"বৌদি ঐ দেখো মিঃ সুইনবোরন্ সুনীল, মিঃ ও মিসেস্ রবার্টস ঐ যে মিঃ টমাস্ মিসেস্ হপ্‌কিন্সরা !" সুনীল হাসিল, সুরমা বলিল—"বাবা! পৃথা এত রাজ্যের লোককেও জানো—সুপ্ ঠাণ্ডা হ'ল যে—"

খাইতে খাইতে পৃথা বলিল—"বৌদি—দাদাকে দেখেছ ?"

"কৈ ?" বলিয়া সুরমা সামনে চাহিল। সুনীল বলিল "সামনে নয় বৌদি, ডান দিকে ঐ কোণে ঐ যে—"

সুরমা দেখিয়া বলিল—"ও—আর সঙ্গে ও কে ?"

সুনীল বলিল"ঐ তো অরিণ রয়।"

সুরমা বলিল—"সে কে ? তুমি চেনো নাকি ?"

সুনীল বলিল—"চিনি না তবে নাম শুনেছি। সে সর্ব্বদা ইউরোপে থাকে, সেই খানেই বলতে গেলে মানুষ হয়েছে সেই খানেই বসবাসও কচ্ছে। ভারতে আর কখনো আসে নি—এই প্রথম—চারিদিকে খুব কার-বার ছড়িয়ে বসেছে।"

সুরমা ভাল করিয়া দেখিয়া বলিল—"ও, নেহাত দেখতে মন্দ নয়, লোকটা, বেস্ত্রায় কথা বলছে যে, এদেশী ব'লে মনে হয় না কিন্তু, বিদেশে থাকতে থাকতে চেহারা একেবারে বিদেশী হয়ে গেছে।" পৃথা এতক্ষণ বাজনার তালে পা ঠুকিয়া সঙ্গে সঙ্গে গুন গুন্ করিয়া গান গাহিতেছিল।

একটু পরে সকলের খাওয়া হইয়া যাবার পর নাচ আরম্ভ হইল। কয়েকজন পৃথার সুনীলের ও সুরমার পরিচিত মেম সাহেব আসিয়া তাহাদের সঙ্গে যোগ দিয়া—নানা রকমের গল্প আরম্ভ করিয়া দিল। প্রথম নাচটা গল্পেই কাটিল—পরের নাচে সুনীলের দিকে চাহিয়া সুরমা বলিল—"সুনীল— round নেবে ?" সুনীল হাসিয়া বলিল—'নিশ্চয়'। সুনীল ও সুরমা

মিশিয়া গেল আনন্দের তরল তরঙ্গে। বাজনা বাজিতে-ছিল সমস্ত প্রাণ মাতাইয়া শিরায় শিরায় শিহরণ তুলিয়া। সুরমা নাচিতে ভালবাসিত, সে বলিল—"সুনীল তুমি ভারি চমৎকার নাচতে পার—" মৃদুস্বরে উত্তর হইল—"তোমার মত সঙ্গী পেলে—"

তাহাদের পাশ কাটাইয়া চলিয়া গেল পৃথা ও মিঃ উইলিয়ামস্। সুরমা দেখিল, পৃথাও তাহাকে দেখিয়া হাসিয়া সরিয়া গেল।

নাচ শেষ হইবার পরে তাহারা ফিরিয়া গিয়া বসিতে দেখিল রাজীব ও তাহার বন্ধু অরিন রয় সেখানে বসিয়া নিবিষ্ট মনে কি আলোচনা করিতেছে—এদিকে যে এত নাচ—গান বাজনা হইয়া যাইতেছে সেদিকে কাহারো ভ্রূক্ষেপ নাই—তাহারা যেন ক্লাইভ ষ্ট্রীটে ষ্টিফেন্স কোর্টের কোন অফিসে বসিয়া আছে। সুরমা একটু কাছেই দাঁড়াইয়াছিল সে দেখিল প্রথম দৃষ্টিতে লোকটীকে দেখিলে মনে কোনই রেখাপাত করেনা, কিন্তু খানিকক্ষণ দেখিলেই মনে হয় লোকটীর সর্বাঙ্গ ভরিয়া সৌন্দর্য্য খেলিয়া যাইতেছে। বিশেষতঃ চোখ দুটী অতি সুন্দর। তাহাদের দেখিয়া রাজীব উঠিয়া আসিল বন্ধুটীও আসিল। রাজীব সকলের সঙ্গে তাহার পরিচয় করাইয়া দিল। লোকটীর চালচলনে যেন অত্যন্ত ঔদ্ধত্য ও অহঙ্কার ফুটিয়া উঠিতেছিল। সে পরিচিত হইবার পরেও শিষ্টাচার মানিয়া একটীও কথা না বলিয়া, কাহারও দিকে একবারও না চাহিয়া রাজীবকে বলিল—"তারপরে বোস্ জানো! এই oil company যদি float ক'রে তোলা যায়, boring যদি successful হয় B. O. Cর সঙ্গে Grand competition হয়। এটা investigate করবার জন্তই আমার এখানে আসা—মিঃ রায় চৌধুরী—আপনার কি মনে হয় এতে, বলতে পারেন ?" সুরমা পৃথাকে বলিল "লোকটা কি rude" পৃথা হাসিয়া Let him go to hell—" বলিয়া মিঃ এডওয়ার্ডের হাতে হাত দিয়া নাচের দলে মিশিয়া গেল।

সুরমার ইচ্ছা ছিল সুনীলের সঙ্গে আরো দুএকটা এবং রাজীবের সঙ্গে দুই একটা নাচিবে। কিন্তু তাহা হইলনা, লোকটা অভদ্রের মত সেইখানে বসিয়া সমানে বকিয়া যাইতেছিল "ব্যবসা" আর "ব্যবসা"—অন্য বন্ধুদের সঙ্গে দুইটা নাচ নাচিয়া আসিয়া সুরমা দেখিল তখনও তাহারা গম্ভীর হইয়া আলোচনা করিতেছিল পৃথিবীতে তেল খরচ হয় সবশুদ্ধ কত।

সুরমা ভাবিল "লোকটা অত্যন্ত অভদ্র।" একটু অসহিষ্ণু হইয়া কাছে গিয়া ডাকিল, "সুনীল"—সুনীল একটু সরিয়া আসিল, সুরমা বলিল, "বাঃ বেশ! নাচবে না—ওখানে ও লোকটা ব'সে কি কতগুলো বকছে!"

সুনীল হাসিয়া বলিল, "না বৌদি! ও বেশ কতগুলো কাজের কথা নিয়ে আলোচনা কচ্ছিল,—আচ্ছা, চল, তুমি কি এখন নাচবে?"

সুরমা বলিল, "না, এবারে না। একটু হয়রাণ হয়েছি, তুমি কিন্তু এখানে বোস—এর পরের বারে।"

সুরমা দেখিল পৃথা যেন হাওয়ায় ভাসিয়া বেড়াই-তেছে। মাটী তাহার পা যেন একবারও ছুঁইতেছিল না—এমনই বিভোর হইয়া সে নাচের পর নাচ নাচিয়া যাইতেছিল। পরের নাচে সুরমাকে লইয়া সুনীল আবার উঠিল।—shepherd's serenade 'walth' স্বপ্ন জাল রচিয়া রচিয়া বাজিয়া উঠিতেছিল মধুর সুরে—নাচের তালে তালে, গানের সুরে সুরে সুরমারও বুক উঠিতে পড়িতেছিল আবেগে, মাঝে মাঝে সঙ্গে সঙ্গে সকলে গাহিতেছিল "when the stars are smiling in the sky, and the moon is high". সুরমা যেন কোথায় কোন আনন্দ রাজ্যে চলিয়া গিয়াছিল তখন। সে বলিল—"সুনীল যে কোনো lady কে তুমি charm কোরে ফেলবে with your steps."

সুনীল বলিল, "আপাততঃ তো তোমাকে charm করতে পারলুমনা—পেরেছি কি?"

সুরমা শুধু হাসিল কিছু বলিলনা। নাচ শেষে ফিরিয়া আসিয়া তাহারা দেখিল সেই লোকটী উঠিয়াছে বোধহয় যাইবার জন্য, সে রাজীবকে বলিতেছিল—আমি এবার ঘুরে এসে একেবারে [illegible] বছরের জন্য থাকবো—বোস্—পরের [illegible] good night."

"রাজীব বলিল, নাচবে না ?"

লোকটী মৃদু হাসিয়া বলিল, "না, আমি নাচি না—" দুই এক পা অগ্রসর হইয়া আবার ফিরিয়া আসিয়া সে সুরমার সঙ্গে কর মর্দ্দন করিয়া চলিয়া গেল। সুরমা রাজীবকে জিজ্ঞাসা করিল তুমি নাচবে ?"

রাজীব বলিল,—"তেমন বিশেষ ইচ্ছে নেই—। তুমি ? আচ্ছা চল আজ তোমার সঙ্গেই নাচা যাক্ সুরমা"—একটা আধুনিক foxtrot বাজিতেছিল তখন সুরমা দেখিল রাজীবও সুন্দর নাচে, সে বলিল আমাকে সত্যি তুমি ভাল বাসো ?" রাজীব উত্তরে শুধু তাহাকে গভীর ভাবে চাপিয়া ধরিল।

রাজীব আগেই বাড়ী ফিরিয়াছিল! রাত্রি প্রায় দুইটার সময় সুরমা, পৃথা ও সুনীল বাড়ী ফিরিল। ছোট বাড়ীর গাড়ী বারান্দায় সকলে একসঙ্গে নামিয়া উপরে উঠিয়া গেল! পৃথা বলিল "আজ খুব enjoy করেছি—"

"সুরমা বলিল তোমার পায়ে ব্যথা হয়নি পৃথা ?"

"পায়ে ব্যথা ? Dash it! আমি সারা রাত দিন নাচতে পারি বৌদি—আর সুনীল ? ওঃ! সুনীলের সঙ্গে বেশ কেটেছে। বলিয়া সে সুনীলের একটা হাত টানিয়া লইল। সুনীল বলিল,—"আমারও বৌদির সঙ্গে বেশ কেটেছে।" "সত্যি ?" বলিয়া পৃথা হাসিয়া উঠিল—

সুরমা বলিল—"পৃথা আর সুনীল—সত্যি তোমাদের সঙ্গে পারবোনা। রাত দুটো পর্য্যন্ত হৈ হৈ করেও তোমাদের উৎসাহ ফুরোয় না! আমি শুতে চল্লুম—" পৃথা বলিল—"না। না বৌদি—একটু বোস ভাই, "লেমন স্কোয়াস্' খেয়ে যাও—সুনীল দয়া কোরে—"সুনীল বেয়ারাকে ডাকিল। সুরমা বলিল, "পৃথা যত সব তোমার কাণ্ড—তুমি সকাল পর্য্যন্ত খুব স্কোয়াস্ খাও আমি চল্লুম, ঘুমে আমায় চোখ জড়িয়ে আসছে।"

সুনীল বলিল "Darling! ছেড়ে দাও বৌদিকে। আমি তোমার সঙ্গে থাকবো। দু'জনেই সঙ্গের মজা—তিন জনে নয়—

সুরমা—"তাহলে আমি" বলিয়া হাসিয়া চলিয়া গেল।

১০

সুনীল চলিয়া গিয়াছে।

পৃথার সাত আট দিন পরে যাইবার কথা ছিল, কিন্তু সে তিন দিন পরেই একদিন মালপত্র বাঁধিতে হুকুম দিল। সুরমা জিজ্ঞাসা করিল "পৃথা এত শিগ্‌গীর যাবে কেন ভাই ?"

পৃথা তখন অসংখ্য সন্ধকেনা কাগজের বাণ্ডিল, ছোট বড় অনেকগুলি বাক্সের ভিতর বসিয়াছিল। সুরমার কথা শুনিয়া সে বলিল—"থাকতে ইচ্ছে হচ্ছেনা বৌদি—"

"কেন ?"

পৃথা হাসিতে লাগিল—"সুনীলকে ছেড়ে কেমন যেন করছে, সেই জন্য—"

অনেক চেষ্টা করিয়াও পৃথাকে রাখা গেলনা, সে চলিয়া গেল।

সুরমা অত্যন্ত নিঃসঙ্গ বোধ করিল আবার! সমস্ত বাড়ীর নির্জ্জনতা যেন তাহার শ্বাস রোধ করিয়া ফেলিতেছিল। পৃথার হাসি, পৃথার কথা তাহার কানে সর্ব্বদাই লাগিয়া থাকে, পৃথার কণ্ঠের প্রতিধ্বনি সমস্ত বাড়ীটা যেন বুকে করিয়া লইয়া ফিরিতেছে। সমস্ত ভাবনা চিন্তা গুলো আবায় জোট পাকাইয়া তাহার মনের ভিতর বাসা বাঁধিতে থাকে—মাঝে মাঝে সে সহ্য করিতে পারে না, তাই সে আবার আগের মতন পিয়ানো ও বই লইয়া বসিল। তাহার উপর প্রণব আছে। কয়েক দিন ধরিয়া প্রণবকে সে ভাল করিয়া দেখিতে পারে নাই। আমোদ প্রমোদের অদম্য উচ্ছ্বাসে মাতৃ কর্ত্তব্য পর্য্যন্ত সে ভুলিয়া গিয়াছিল। সুরমা নিজের লজ্জায় নিজেকে ধিক্কার দিয়া কয়েকদিন দিনরাত প্রায় প্রণবের কাছে কাটাইয়া তাহার পূর্ব্ব ত্রুটি সংশোধন করিয়া লইল বুঝি। প্রণব বসিতে পারে, অস্ফুট মা ডাকিতে পারে, কত খেলা করে, কত রকম হাসে, সুরমা নূতন ভাবে আনন্দকে খুঁজিয়া পাইল।

রাজীব সেই একই ভাবে কাটায়। অতি আনন্দ

বা দুঃখে সে কোন সময়েই তাহার স্থির গাম্ভীর্য্য হারায়না। পৃথা চলিয়া যাইবার পর শুধু বলিয়াছিল—পৃথা চলে গেল, তোমার একটু একলা লাগবে—না ?"

সুরমা বলিল—"তা লাগলে কি করবো ?" রাজীব বলিল, "বেড়াতে যাওনা কেন ?" সুরমা অভিমানাহতস্বরে বলিল, শুধু বেড়ালেই হয় বুঝি ? তাছাড়া অনেক বেড়ানো হয়েছে আর বেড়াবার ইচ্ছে নেই।"

সুরমা বিজয়ের মুখে শোনা রাজীবের অনাথা বিধবাদের প্রতি করুণ ভাবোদ্রেকের নিদর্শন স্বরূপ বাড়ী ইত্যাদি দান সম্বন্ধে কোন কথা তোলে নাই। তাহার একবার ইচ্ছা হইয়াছিল যদিও, কিন্তু পাছে রাজীব একথা শুনিয়া বিজয়কে অন্য কিছু ভাবে, অথবা খেলো ভাবিয়া বসে, সেই জন্য আরো অনেক কিছু ভাবিয়াই চুপ করিয়া রহিল সুরমা! এবং সে অপেক্ষা করিয়া আশা করিয়া রহিল এ খবরটা রাজীবের নিকট হইতেই প্রথম শুনিবার জন্য। তাহার বিজয়ের কথা মনে হয়। বিজয় তাহার শৈশবের খেলার সাথী, শৈশব কৈশোরের যত কিছু স্মৃতি তাহার বিজয়কে লইয়াই পল্লবিত হইয়া উঠে। খেলাঘরে সুরমার রক্ষী, দারোয়ান, চাকর মালী, নায়েব, বাজার সরকার সবই ছিল তাহার বিজয়। সে কোনদিন তাহার সমান পদ চাহে নাই। কোনদিন তাহাকে হুকুম করে নাই, অবনত মস্তকে হুকুম প্রতিপালন করিয়াই তাহাদের খেলাঘর সে গড়িয়া তুলিয়াছিল। আজো সেই বিজয় ঠিক সেই রকমই আছে, আজো সে হয়তো তাহাকে ঠিক সেই ভাবেই দেখে। সুরমা সেদিন তাহাকে একটা চিঠি লিখিয়া দিল!

পৃথা যাইবার পরে সুরমা তাহার নাচের মজলিসের বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে কিছুদিন দেখা করিল না। অনেক গুলো কার্ড আসিয়া জমা হইয়াছিল, টেলিফোনেও অনেকদিন অনেকে ডাকিল, কিন্তু সে সকলকেই "ক্ষমা করবেন" বলিয়া পাশ কাটাইল। অত্যধিক কিছু তাহার ভাল লাগেনা। বিশেষতঃ অত্যধিক আমোদের পরক্ষণেই সে অবসাদ বোধ করে ঠিক সেই পরিমাণেই। সে আশ্চর্য্য হইয়া ভাবে পৃথা কি করিয়া রাত দিন একটা অস্বাভাবিক মাত্রাধিক ভাবের ঘোরে কাটাইয়া দেয়? হয়তো পৃথারও এই রকমই অবসাদ আসে সেই অবসাদকে সে সহ্য করিতে পারেনা, জোর করিয়া তাহা দূরে সরাইয়া দিবার জন্যই, নিত্য নূতন উন্মাদনা, নিত্য নূতন আনন্দ ভাবিয়া সৃষ্টি করিয়া লয়, তাহার উন্মত্ত প্রাণের খোরাক জোগাইবার জন্য, ঠিক যেন মাতালের মদ খাওয়ার মত! কিন্তু সে তাহা পারেনা, এই অবসাদটাকেই সে উপভোগ করে, তাই করিতে সে ভালবাসে, শুধু অবসাদকে জাগাইয়া রাখিবার জন্যই বুঝি তাহার আমোদ করা। সুনীলের কথাও সে ভাবে, সুনীলই কি সুখী? পৃথার মত সেও কি অবসাদকে জাগাইয়া তুলিবার জন্য, আমোদের স্রোতে নিজেকে ছাড়িয়া দেয়? কিন্তু সুনীলকে সে কখনো দেখে নাই নিজেই তাহা সৃষ্টি করিয়া লইতে, সুনীলের জীবনের বিষণ্ণতাকে পৃথাই জোর করিয়া উল্লাসময় তুলে, সেই জন্যই হয়তো সুনীল পৃথাকে এতো ভালবাসে, পৃথা তাহাকে হয়তো শান্তি দেয়না, তৃপ্তি আনিয়া দেয়না, ঘুম পাড়ায় না, সে দেয় তাহাকে ঔজ্জ্বল্য, আলো, জ্বালা আর জাগরণ। তবুও সুনীল পৃথাকে ভালবাসে, পৃথা সুনীলকে ভালবাসে।

নির্জ্জন দিনগুলি সুরমার চিন্তা দিয়া ভরিয়া থাকে। শরতের ও কণিকার কথা তাহার বহুদিন পরে মনে হইল। কণিকা অনেকদিন আসে নাই। সুরমার ইচ্ছা হইল কণিকার খোঁজ নেয়। কণিকার সঙ্গে নানা কথা বলিয়া, আলোচনা করিয়া অনেক কিছু সে ভুলিয়া থাকিত। সুরমা ডান্স, ডিনার, লাঞ্চের কার্ড সরাইয়া রাখিয়া, সভা সমিতি সম্মিলনীর "ফাইল" খুলিল। কর্ত্তব্য বুঝি আবার তাহার ঘুমন্ত বিবেককে ঠেলিয়া তুলিয়া জাগাইয়া দিল।

সেদিন একটা নারী শিক্ষা সম্মিলনী না কিসের মিটিং ছিল। সুরমা চারটার সময় একটা দেশী সিল্কের ইন্দোর পাড়ের বাহার দেওয়া শাড়ী, পায়ে লাল জরির নাগড়াই পরিয়া মিটিংএ উপস্থিত হইল। পরিচিতা সকলে তাহাকে দেখিয়া ঈষৎ বিদ্রূপ করিয়া উঠিল। কমলা বলিল—"বেশ সুরো, বেশ, বাবা! সেদিন কার্ণোর সামনে খুব বাহার দিয়ে নাবা হ[illegible] বেচারীদের ভুলেই গিয়েছিলে।"

বীণা বলিল—"৩।৪টে মিটিং হয়ে গেল মেম সাহেবের দেখাই নেই—বেশ আছ যাহোক—" আর একজন কে বলিল—"এমপায়ারের সামনে সেদিন রাত্রে,—তা বেশ—যাক্ সবই ভালো—"

সুরমা কাহাকেও কোন উত্তর দিতে পারিল না, তাহার মনে হইল পৃথা থাকিলে বলিত—"সত্যি তো বেশ ছিলুম ভাই—নিজের সুখটাই সব চেয়ে আগে দেখা উচিত।"

কণিকা দূর হইতে তাহাকে দেখিয়া সরিয়া গেল।

মিসেস নাগ বেশ বর্ষিয়সী মহিলা। তিনি সমস্ত সদনুষ্ঠান, প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি কার্য্যে সর্ব্ব প্রধান উদ্যোগী। তিনি কাছেই ছিলেন—করুণা ও বীণার উক্তিগুলাও স্পষ্ট শুনিতে পাইয়াছিলেন মনে ভাবিয়া সুরমা একটু লজ্জিত হইল। মণিকা তখনো বলিতেছিল—"মুখে লম্বা পাইপ নিয়ে খুব ধূমপান করতে শিখেছ?" সুরমা লজ্জায় লাল হইয়া তাড়াতাড়ি সরিয়া গেল, তাহার এবারেও মনে হইল পৃথা থাকিলে বলিত—"ধূমপান করি তো করি ভাল লাগে তাই করি—" মিসেস নাগকে এড়াইতে গিয়া সুরমা ঠিক তাহার মুখের সামনে পড়িয়া গেল। তিনি বলিলেন—"সুরমা ভাল আছ?" সুরমা নত হইয়া প্রনাম করিয়া বলিল—"ভাল আছি মাসী মা!"

তিনি বলিলেন—"ক'টা মিটিংএ আসোনি, রেজোলিউসনগুলো কি কি হ'ল একটু দেখে নিও। তোমরা এখন থেকে শিখে রাখো নইলে আমাদের পরে তো তোমাদেরই এ সব করতে হবে মা! সুলেখা—এবারে সেক্রেটারী হয়েছে, সুলেখা—" লজ্জা সঙ্কুচিতা সুন্দরী একটী মেয়ে আসিয়া দাঁড়াইল। মিসেস নাগ বলিলেন—"সুলেখা সম্মিলনীর জন্য সমানে যা খেটে এসেছে, তা আর কি বলবো—বড় লক্ষ্মী মেয়ে—ওর ঋণ কখনো শুধতে পারবো না আমরা—ক' মাস থেকে নিজের ইচ্ছায় এসে কত কাজ করছে—এমন কি খাওয়া দাওয়া পর্য্যন্ত ভুলে যায়—"

পৃথার একটা কথা মনে করিয়া সুরমার ঠোঁটের প্রান্তে ঈষৎ হাসি খেলিয়া গেল,—পৃথা একদিন বলিয়াছিল—"ও, এরা সব শুধু বাজে কাজে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু তবু সুলেখাকে তাহার খুব ভাল লাগিল। নিরভিমান বলিলেন—"লেখা, সুরমাকে রেজোলিউসনের কাগজপত্রগুলো একটু বুঝিয়ে দাও—আগে এর ভেতর কি কি হয়ে গেছে সব দেখিয়ে দাও মা—"

সুরমা হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। সুলেখা বিনীত ভাবে বলিল—"আফিসে আসবেন? না এখানে এনে দেবো?"

সুরমা বলিল—"আফিসেই যাই চলুন—"

আফিসের সামনে কণিকা দাঁড়াইয়া কাহার সঙ্গে কথা বলিতেছিল, সে সুরমাকে দেখিয়াও না দেখার মত অন্য দিকে চাহিয়া কথা বলিতে লাগিল। সুরমা পাশ কাটাইয়া আফিসে গিয়া কাগজপত্র নিয়া বাহিরে আসিতে দেখিল কণিকা তখনো দাঁড়াইয়া আছে। সুরমা ভাবিল কণিকার সঙ্গে কথা বলিয়া মিটমাট করিয়া ফেলাই ভাল। সে ডাকিল—"কণা! কেমন আছ? একটা কথা বলবো—।"

কণিকা একটু কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া বলিল—"আসছি"

সুরমা বলিল—"কণা, তোমার কি হয়েছে?"

"কিছু না—"

"তুমি আমার সঙ্গে আজকাল কথা বল না কেন? কি হয়েছে বলতে হবে।"

"কি হবে, কিছু হয় নি তো?"

"কিছু হয় নি? কি বলবো? এই কি কিছু না হওয়ার লক্ষণ?"

"কি জানি তুমি কি লক্ষণ দেখতে পাচ্ছ—তা আমি বুঝতে পারিছ না—"

"তুমি আমার ওখানে আসনি কেন?"

"তুমিই বা আসনা কেন?"

"আমি? আমার অনেক এনগেজমেণ্ট ছিল ভাই!"

"আমারও ছিল।"

"দেখলে কথা না বলাটাও এনগেজমেণ্টের জন্য কি?"

"কই আমি তোমাকে দেখিনি তো, এইমাত্রই তো দেখা হ'ল।"

"লুকিয়ে ফল নেই কণা! তুমি সেইদিন থেকে আমার উপর বিরক্ত হয়েছ।"

"কোনদিন?"

"সেইদিন—মনে তোমার আছে নিশ্চয়,—কিন্তু কি

জানো কোন বিষয়ে নিশ্চিত না হয়ে, কোন সিদ্ধান্ত ক'রে ফেলা উচিত নয়।"

"তা জানি কিন্তু সিদ্ধান্তটাই যখন একেবারে নিশ্চিত রূপে ধরা দেয়—তখন ?"

"মহৎ লোকেরাই বলে গেছেন 'Judge not by appearances for too often they blind us to realities."

কণিকা বলিল—"Be deceived not by appearances they also too often blind us to realities."

"তাও হ'তে পারে কিন্তু তুমি অবিচার করছ না কি অনেকটা ?"

"কার উপর ?"

"আমার উপর ?"

"তোমার উপর আমার বিচার অবিচার কি ? তুমি আমার অধীন নও, তবে আমার স্বামীর কথা—তার উপরও তো অবিচার করিনি—এটা ঠিক !"

সুরমা মনে মনে ভাবিল, না জানি কি শাস্তি বেচারা শরত ভোগ করিতেছে।

কণিকা আবার বলিল—"জানো, সে সবের জন্যেও নয়, কিন্তু আমি আশ্চর্য্য হ'য়ে গেছি, আগে কক্ষনো ও এমন ছিল না, আমি আজ একমাস কথা বলিনি, কাছেও যাইনি, তবু সে বেশ নির্ব্বিকার ভাবেই আছে, এ সব তোমাদের বাড়ীর ধরণ, আমাদের গরীব মানুষের পোষায় না, ও সব বড়লোকি কায়দা।"

সুরমা হাসিল—পৃথা থাকিলে শুধু বলিত—"Dash it! Fussy nagging bonehead"—সুরমা ভাবিল এর সঙ্গে মানাইয়া লওয়া অসম্ভব। কণিকার বদ্ধমূল ধারণা হইয়াছে যে শরতের এ বিদ্রোহীভাব শুধু তাহার কাছ হইতে শেখা। তবুও তাহার ইচ্ছা হইল কণিকার সঙ্গে এ বিষয়ে একটু আলোচনা করে—সে বেশ কৌতুক অনুভব করিতেছিল। সুরমা হাসিয়া বলিল—"না কণা তা নয়। তুমিই অতিরিক্ত শাসন করে, বেচারা মিঃ ঘোষকে বিদ্রোহী ক'রে তুলেছ।"

কণিকা একটু ঝাঁঝালো সুরে বলিল—"অতিরিক্ত কি? বরং কমই হয়েছে। কেন বল সেই বা যা ইচ্ছে তাই করবে। কই আমি তো করতে যাচ্ছিনা। বিয়ে যখন করেছে তখন সে আমি সমান। আমি যদি করি, তবে তার একটা করবার দাবী থাকে, কিন্তু দেখ আমি মনে প্রাণে তার জন্য রাতদিন খাটছি, সেবা করছি, যত্ন করছি, তবুও এ সব করবার তার কি অধিকার আছে? এতে বোঝা যায় হয় সে আমাকে নীচু মনে করে, অনুপযুক্ত মনে করে, অথবা গ্রাহ্য করে না। এ আমি কখনো সহ্য করবো না।"

"তুমিও তাই করনা কেন? তুমিও অগ্রাহ্য কর, নয় আনন্দে, আমোদে নিজেকে ডুবিয়ে দাও, যেমন আমাকে একদিন বলেছিলে, তুমিও তোমার নিজেকে নিয়ে থাকোনা কেন ?"

কণিকা একটু চুপ করিয়া বলিল—"অমন আনন্দে আমার দরকার নেই—আমি আমোদ করতে থাকি আর ওদিকে আমার সর্ব্বনাশ হোক্—"

"আমাকে তাই বলে তুমি সান্ত্বনা দিতে চেয়েছিলে কণা"

"তোমার কথা আলাদা—তোমার স্বামীকে ফেরাবার উপায় ছিল না, নেইও বলে আমি বলেছিলুম যে মিছিমিছি এমন ক'রে ভেবে শরীর খারাপ ক'রে লাভ নেই—কিন্তু এখনো আমি তাকে ফিরিয়ে আনতে অপারগ হইনি—"

সুরমা ভাবিল কণিকা কেন যে সামান্য ঘটনাটাকে এত বড় করিয়া দেখিতেছে—এই বুঝি এক প্রকৃতির লোক। সে হাসিয়া বলিল—"কিন্তু শাসন দিয়ে কাউকে বশ করা যায় না কণা! বোধ হয় তার চেয়ে বেশী বশ করা যায় ভালবাসা দিয়ে"

কণিকা বলিল—"সব সময়ে নয়। দেখবে অনেক সময়ে কেউ কেউ ভালবাসায় একেবারে মাথায় উঠে বসে—সেইটুকুর সুবিধা নিয়ে। তাদের শাসন করতে হয়, আর কেউ বা আবার অত্যধিক আবদারেও [illegible] থাকে—লোক বিশেষ আছে।" সুরমা হাসিয়া বলিল "মিঃ ঘোষ কোন রকমের ?"

কণিকা বিজ্ঞের মত বলিল, [illegible] বাবার বশ হবার নয়, তা [illegible]

"কিন্তু শেষে শাসন পেয়ে কেউ কেউ বিরক্ত হয়ে ওঠে, শাসনকে আর ভয় করতে চায়না, তখন তারা চায় সেই শাসনের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াতে—"

"সে লোক বিশেষ আছে।"

সুরমা হাসিয়া বলিল, "তা যেন বুঝলুম, কিন্তু স্বামী দেবতা কণা, তাকে তাচ্ছিল্য করতে নেই—"

"দেবতা যতদিন তার দেবত্ব থাকে, যেদিন দেবত্ব খসে পড়ে সেদিন আর সে দেবতার ভক্তি ভালবাসা পাবে কেন? শুধু স্বামী হলেই যে দেবতা হ'ল তা নয়, তবে কথাটা এই স্বামী হ'লে তাকে দেবতারই মত হ'তে হবে—"

সুরমা একটু বিদ্রূপ করিয়া বলিল—"সীতা সাবিত্রীর পাতিব্রত্য ভুলে যাও কেন?"

"বুঝতুম সত্যবান বা রামের আর একটি স্ত্রী থাকলে তাঁরা কি হ'তেন! দেবতাদেরও ও সব আছে বাবা, দুর্গা আর গঙ্গায় কি রকম ঝগড়া, পদ্মপুরাণে মনসা মহাদেবের মেয়ে হয়েও দুর্গার হিংসার ঠেলায় পাতালে গিয়া লুকোলেন—। এদিকে সুরুচি কৈকেয়ী, যাক্ আর কত বলি? তারা পেরে ওঠেননি, আর আমরা কি করে হিংসা, রাগ, দ্বেষ ত্যাগ করবো বল? ও সব থাকবেই আমাদের ভিতর।"

"কিন্তু কণা তাঁরা স্বামীকে তোমার মত নাকাল করেন নি।"

"করেননি? কে বললো? দুর্গা মহাদেবকে কি রকম ভাবে নাকাল করেছিলেন, গল্প গুলো তো আর এমনি তৈরী হয়নি—বোঝা যায় তখনকার লোকদের এই রকমই মনের গতি ছিল। তখনকার সমাজ এই রকমই ছিল।"

সুরমা হাসিল। "সে যাই হোক—তুমি তোমার স্বামীকে খুব নাকাল ক'রতে থাক, আমার তাতে বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই। কিন্তু তুমি আমার দোষটা কোথায় পেলে বলত?"

কণিকা একটু কোমল সুরে বলিল—"সুরো তোর দোষ থাক না থাক্—কিন্তু আর যাই করি সমাজকে এড়িয়ে চলা যায় না কোন মতেই। সেদিন তার ভিতরের নিহিত উদ্দেশ্য ভাল থাক কি না থাক তার কথা হচ্ছে না, কিন্তু সেই জিনিষটাই ছিল অন্যায়। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে একজন পুরুষের সঙ্গে কথা বলাই অন্যায়—, তা তুমি প্রেমের কথাই বল আর ধর্ম্ম কথাই বল।"

সুরমা বুঝিল তর্ক করিলেই কথা বাড়িয়া যাইবে, অথচ তাহার বলিবারও অনেক কিছু আছে। তাই মনের ভাব মনে চাপিয়া হাসিল!

কণিকা বলিল, "দেখো সুরো—সমাজে মিশে থাকতে গেলে অনেক কিছু ভেবে চিন্তে চলতে হয়, তোমার নামে অনেক কিছু শুনছি—"

"কি?" সুরমা জিজ্ঞাসা করিল।

"বন্ধু মনে করেই বলছি, কিছু মনে করোনা—কিন্তু সম্প্রতি তোমাকে অনেকখানে অনেকে দেখেছে, কার কার সঙ্গে গাড়ীতে যেতে পান করতে—"

সুরমা অবাক হইয়া গেল। সে শুধু বলিল "তোর বিশ্বাস হয় কণা?"

কণিকা বলিল, "কি জানি পৃথিবীতে অবিশ্বাস্য কিছুই নেই। কিন্তু সত্যি বলছি এ সব ভাল নয়।"

সুরমা বলিল, "তাহলে এবারে সকলের উপরেও আমার বিশ্বাস অনেক কমে গেল। নয়কে হয় করায় কোন বাহাদুরী নেই—"

"লোকের দোষ দাও কেন? লোক কি ভিত্তিহীন একটা কথা এভাবে রটাতে পারে?"

"পারেনা জানতুম কিন্তু এখন দেখছি খুব পারে, যা হোক, তোমার অনেক সময় নষ্ট করলুম।"

"সুরো যাচ্ছ?

"হ্যাঁ যাচ্ছি—"

কণিকা ডাকিয়া বলিল—"শোনো সুরো, তুমি আমার বন্ধু তোমাকে আমি কক্ষণো ছাড়তে পারিনা। কয়েকদিন রাগ করেছিলুম সত্যি—কিন্তু তোকে দেখে কথা বলে সে রাগটা পড়ে গেছে—আমি আসবো তোর ওখানে—"

সুরমা শুধু বলিল—"আমি তিন দিন পরে রাধানগরে যাচ্ছি, এলে তার আগেই এসো।"

সুরমা পরদিন বিজয়ের অনাথ আশ্রম দেখিতে

গেল। বেহালা অঞ্চলে মস্তবড় বাগান সমেত দুইটী দোতালা বাড়ী। বাড়ী দুইটী বেশ বড়। একটীতে প্রায় ৫০ জন অনাথ বালক থাকে, পড়ে। আর একটী বাড়ীতে ত্রিশ চল্লিশ জন বালিকা থাকিয়া পড়ে। বালক বালিকারা এদিকে শিশু হইতে ওদিকে ১৫।১৬ বছর বয়স পর্য্যন্ত আছে। উপর তলায় তাহারা থাকে এবং নীচের তলায় পড়ে—সেলাই, তাঁত, সুতাকাটা, মেয়েদের সুচি কর্ম্ম, রান্না, ঘর সংসারের কাজ একসঙ্গে সবই সেখানে হয়। ছেলেদের অংশে দুই তিন জন মাষ্টার ও তত্ত্বাবধায়ক আছেন, ওদিকে মেয়েদের জন্যও কয়েকজন শিক্ষয়িত্রী ও সকলের উপরে একটী বর্ষীয়সী বিধবা আছেন। তিনি মেয়েদের অভিভাবিকা স্বরূপ সমস্ত কাজকর্ম্ম দেখেন, তাঁহাকে সকলে মোক্ষদা দিদি বলিয়া ডাকে। সুরমা সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া বাগানের অন্য পার্শ্বে গিয়া সত্যই দেখিল মস্ত একটা চক্ মিলানো বাড়ীর কাজ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে, সে বুঝিল ইহাই রাজীবের বিধবাশ্রম—সুরমার মনটা নানা প্রশ্নে নানা কথায় ভরিয়া উঠিল কিন্তু সে কিছু বলিল না, শুধু বিজয় বলিতেছিল—"সুরমা, সবচেয়ে আমার দুঃখ রাখবার ঠাঁই হতনা যদি আমি দেখতুম তুমি অপাত্রে পড়েছ, সুখী হওনি, কিন্তু এটাই আমার একমাত্র সান্ত্বনা যে তোমার স্বামী মহৎ—"

সুরমা সে কথার কোন উত্তর না দিয়া বলিল—"মোটামুটী তো দেখা হ'ল এখন ভাল ক'রে ভেতরে গিয়ে দেখি। কিন্তু বিজয়, তুমি বেশ চমৎকার জঁকিয়ে বসেছ দেখছি। শুনলুম তোমার যথাসর্ব্বস্ব এতে দিয়ে দিয়েছ—নিজের জন্য আর কিছুই রাখনি—"

বিজয় বলিল—"নিজের কিবা ছিল সুরমা—? তবে যেটুকু ছিল সবই দিয়েছি বটে, আমার দরকারও ছিল না কিছু, জগতে দরকারটাকে যতই প্রশ্রয় দেবে ততই সে পেয়ে বসবে। এখন যে কিছু নেই, তবু কোন অভাবও নেই, বেশ আছি। জগতে বোধহয় দেওয়ার মত সুখ নেই।"

"কি জানি অত গম্ভীরভাবে জগৎটাকে এখনো ভেবে দেখিনি, তাহলে তোমার কমিটি কিসের আর ডিরেক্টরইবা কিসের?"

"আত্মবিশ্বাস আমার নেই, তা ছাড়া নিজের জীবনটার উপরেও বড় বেশী মায়া নেই, কখন কোথায় হয়তো জীবনটা হারিয়ে বসে থাকবো—তাই বলা যায় না, সেইজন্য আমার যা সামান্য কিছু ছিল, সব একটা কমিটির হাতে তুলে দিয়েছি। তাঁরা এক সঙ্গে মিলে মিশে কাজকর্ম্ম চালাচ্ছেন, বছরে একজন করে ডিরেক্টর তাঁরা নিযুক্ত করে নেন, এবারে তোমার স্বামীকে তাঁরা বেছে নিয়েছেন।"

"তা বললে যে কি কতগুলো কথা, যে তোমার কিছুতে আর দরকার নেই; কেন নেই?"

বিজয় হাসিল, "সুরমা! বড় লোকের মেয়ে, বড়লোকের স্ত্রী তুমি, তোমাদের মত লোক যাদের লক্ষীর ভাণ্ডার সর্ব্বদা পূর্ণ তাদেরই অভাব সব চেয়ে পৃথিবীতে বেশী, কিন্তু আমার মত লোক যার কিছুই নেই, তার অভাবও নেই। দুবেলা চারটী জুটে যায়, আমার বেশ চলে যায়।"

সুরমা খানিকক্ষণ বিজয়ের দিকে চাহিয়া বলিল, "তোমাকে যতই দেখি আমি শুধু আশ্চর্য্য হই বিজয়। তুমি সেই বিজয় কি ক'রে এই হ'লে? কি রকম মনের ভাব হয় তোমাদের যাতে ক'রে এমন সাধু সাজতে পার? নাম কেনবার জন্য নয়তো বিজয়?"

বিজয়ের ঠোঁট দুইটা আহত বেদনায় একটু নড়িয়া উঠিল, সে কিছু বলিতে পারিল না। সুরমা তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিল—"দুঃখ হল? সত্যি আমি সেরকম কিছু ভেবে বলিনি, মাপ করো বিজয়, আমি শুধু জানতে চেয়েছিলুম কি ক'রে তোমার মনে হঠাৎ এ আত্মত্যাগের পাগলা ইচ্ছে জেগে উঠলো?"

"তুমি আমাকে যে এসব ব'লে ব্যথা দেবে সুরমা তা আমি জানি। জানিনা কেন ছেলেবেলা থেকে তোমার এ আঘাত গুলোই সয়ে সয়ে এসেছি,—সে সওয়াতে সুখও পাই, কিন্তু পাগলামি বল আর নাম করবার জন্যই বল, যাই বল, সবই আমি সহ্য করে নেবো। তোমাকে এর উত্তর আমি কিছু দিতে চাই না বা তোমার কাছে নিজেকে আমি [illegible] ধরে দিতেও চাই না। তুমি [illegible]

ভেবে থাকো—তোমার সে ধারণা আমি উল্টে দেবোনা।"

সুরমা বলিল—"সত্যি বিজয়, আমি সে রকম কিছু বলিনি—ওদিকটা কি রান্নাঘর? বাঃ বেশ লাগলো, ছেলেরা পড়ছে বুঝি? ঐ মাটীর উপর ব'সে—',

"মাটীই তো ভাল। তাছাড়া গরীব ছেলে—চেয়ার টেবিল দেবার আমার শক্তিও নেই। ওপরে যাবে?"—

"চল—"

উপরে গিয়া সুরমা চারিদিকে চাহিয়া বলিল, "এই মাটীর উপর বিছানা করেই শুয়ে থাকে এরা? ঠাণ্ডা লাগেনা?"

"সুরমা দেখনি তো যে এমনো লোক আছে এদেশে যারা এই মাটীর উপরেই বিছিয়ে শোবার একটু করে ন্যাকড়াও যোগাড় করতে পারে না—যদি কাঁদতে পারতে তোমরা গরীবের দুঃখে, তাহলে তুমি আজ ঐ সিল্ক পরে ডান্স করতে যেতে পারতেনা—"

সুরমা হাসিয়া বলিল—"রক্ষে কর বিজয়, এই বিরাট দেশের বিরাট দুঃখ আমার দেখবার শক্তিও নেই সাধ্যও নেই, কাজেই ও সব না দেখা না শুনাই ভাল—"

"সকলে মিলে চেষ্টা করলে হয়তো ঘোচাতে পারতে তোমরা—কিন্তু কি জানো, তোমরা করবেনা—চাও না—

"আচ্ছা চেষ্টা করা যাবে—এখন মেয়েদের দিকটা দেখি গিয়ে একবার চল—"

সেখানে তখন কতগুলি মেয়ে রান্নার যোগাড় করিতেছিল। কেহ তরকারী, মাছ কুটিতেছিল, কেহ মসলা করিতেছিল, একটী বড় মেয়ে রান্না করিতেছিল। উঠানের উপর কতগুলি মেয়ে মাদুর পাতিয়া বসিয়া পড়িতেছিল, আর একটী ছোট মোড়ার উপর বসিয়াছিল মীরা। সুরমা অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া গেল মীরাকে দেখিয়া, সে কথা বলিতে পারিলনা। বিজয় বলিল, "মীরা দেবীকে দেখে আশ্চর্য্য হয়ে গেলে সুরমা? তুমি কি জানোনা যে উনি এসে এখানে পড়াচ্ছেন কতদিন থেকে?"

সুরমা বলিল "কৈ আমি তো তা জানতুম না, কবে থেকে মীরা— কি আশ্চর্য্য!"

বিজয় বলিল, "আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই, অনেকেরই প্রাণ গরীবের জন্য কাঁদে—"

মীরা সলজ্জ ভাবটাকে জোর করিয়া ঠেলিয়া সরাইয়া দিয়া বলিল—"সুরমা দি! আমি কিছুদিন থেকেই তো পড়াচ্ছি মেয়েদের, জানেননা বুঝি? বাড়ীতে ব'সে ব'সে কাজকর্ম্ম নেই ভাল লাগেনা, তাই এই কাজটা বেছে নিলুম। বসুন না একটু। বিন্দু তোমরা নমস্কার করলেনা? প্রভা একটা বসবার চৌকী এনে দাও না!"

সুরমা কৌতুকভরে হাসিয়া বলিল, "বেশ মীরা তোমার দরিদ্র-সেবা-প্রীতি দেখে খুসী হলুম ভাই! সারাদিন পড়াও?

"না, আমি সকালে আসি আর দুপুর বেলা চলে যাই। সময়টা বেশ কেটে যায়, মনে হয় দিনটা বেশ সার্থক হয়ে উঠেছে। আচ্ছা বিন্দু যাও এখন তোমাদের ছুটী।"

মেয়েরা নমস্কার করিয়া চলিয়া গেল। সুরমা বলিল, "দিনটা খুব সার্থক ক'রে তোল ভাই, কিন্তু ঐ বাচ্চাদের সঙ্গে সারা সকালটা চেঁচিয়ে কি ক'রে যে তোমার মাথা ঠাণ্ডা থাকে তা তুমিই জানো!"

বিজয় বলিল, "বাচ্চাদের সঙ্গে না চেঁচিয়েও মাথা গরম করবার আরো অনেক বেশী জিনিষ সংসারে আছে দেখতে পাই।"

সুরমা বলিল, "তা বটে। কিন্তু সত্যি মীরা তোমাকে বাহাদুরী দি। নিজে না করলেও তবু আমাদেরই মত কাউকে একটা সংকাজ করতে দেখলে বেশ আনন্দ হয়, আশা করি তোমার এ উদ্যম, চেষ্টা সফল হয়ে উঠবে। কিন্তু বিজয়, তোমার এ আশ্রমের আরো অনেক উন্নতি দরকার।"

"উন্নতি আরো অনেক দরকার সুরমা ঠিক। আমার সামান্য আয়ে এর চেয়ে আর বেশী কিছু হয়না, আর আমি কারো কাছে হাত ও পাততে চাইনা,অবশ্য অহঙ্কার আমার কিছু নেই, হয়তো এর পরে রাস্তায় ভিক্ষা করেও বেড়াতে পারি। কিন্তু ভিক্ষের ঝুলি কাঁধে নিয়ে বড়-লোকের খোসামোদ করাও আমার ধাতে সইবেনা—তবে যদি কেউ দয়া করে চাঁদা কিছু দেন ইচ্ছে করে সে আলাদা—"

সুরমা বলিল, "তাহলে ইচ্ছে করেই হাজার দুয়েক তোমার অনাথ বালক বালিকাদের দিলুম—"

বিজয় বলিল, "সে তোমার দয়া কিন্তু সুরমা তুমি হয়তো ভাববে প্রকারান্তরে এইটুকুর জন্তই তোমাকে আশ্রম দেখাতে আনা—ওটা পরেই দিও। তাছাড়া তোমার স্বামীতো দিয়েছেন পাঁচ হাজার সেদিন।"

সুরমা হাসিয়া বলিল—"না তা ভাববোনা—ওটা তোমায় পাঠিয়ে দেবো, নিও। আজ চলি তাহলে?"

মীরা বলিল, "সমস্ত বাড়ীটা দেখে গেলেন না সুরমা দি?"

"না ভাই আজ বেলা হয়ে গেল, আর একদিন আসবো এখন, এখন আর ভাবনা কি? তুমি আছ, বিজয়তো আছেই, এখন তো এও আমার নিজের মত!" "মীরা অকস্মাৎ লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল। যাইতে যাইতে সুরমা বলিল, "বিজয়, মীরার প্রাণ গরীবের জন্ত কেঁদেছে না কার জন্য?"

"কার জন্ত?"

"কার জন্ত? বুঝতে পারোনা? তোমার চোখ নেই?"

বিজয় ভাবিয়া বলিল, "না আমি বুঝতে পারছিনা"

"বিজয় তুমি এত কিছু ত্যাগ করেও বুদ্ধির দুয়ারটা খুলতে পারলেনা? কি করি বল?"

"তুমিই বুদ্ধির দুয়ারটা একটু খুলে দাওনা সুরমা! তোমার কাছে তো চিরকালই আমি বোকা, মূর্খ—"

"এত সোজা জিনিষটা তোমার চোখে পড়ে না?"

"চোখে পড়ে না সুরমা, চোখ, কান, মুখ, প্রাণ, মন সব যেন আর একটা কিছুতে ভরে আছে আমার। তাকে ছাপিয়ে গিয়ে আর কিছুই দেখতে পাই না, বুঝতে পারিনা। শুনতে পাই না—"

সুরমা তখন মোটরে উঠিয়া বসিয়াছে—বিজয় দরজাটা বন্ধ করিয়া দিয়া বলিল, "সুরমা, বললেনা আমার চোখ কি দেখতে পেলোনা?"

"তোমার চোখ দেখতে পেলনা কার জন্ত মীরার প্রাণ কেঁদেছে?"

"কার জন্ত সুরমা?"

গাড়ী ছাড়িয়া দিয়াছে—সুরমা জানালা দিয়া ঈষৎ মুখ বাড়াইয়া বলিল, "তোমার জন্ত—বিজয় তোমার জন্ত-"

১১

রাধানগর! রেলষ্টেশন হইতে তিন মাইল দূরে। যান বাহন একমাত্র হাতী পাল্কী, অথবা গরুর গাড়ী। স্থানটী একটী ছোট গ্রাম বিশেষ। প্রকাণ্ড জমিদার বাড়ী। তার আশে পাশে অনেকঘর প্রজার বসতি। তাহাদের ছনের অথবা টীনের চালা দেওয়া ঘর, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া মোছা লেপা, মাটীর মেঝে ও উঠান তাও বেশ পরিষ্কার তারই পাশে ছোট্ট একটু জমিতে কোথাও লঙ্কা বেগুনের গাছ, কোন বেড়ার উপর দিয়া লাউ, কুমড়া, উচ্ছে, শশা সীমের লতা উঠিয়াছে। কোন খানে ধান কাটিয়া স্তুপীকৃত করিয়া রাখা হইয়াছে, কোন খানে সেই ধান সিদ্ধ করিয়া শুকাইয়া কুটিয়া চাউল করা হইতেছে। কোনও গ্রাম্য বধূরা ঘোমটার আড়াল হইতে কাজ করিতে করিতে কৌতুহল দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিতেছিল। বহু অর্দ্ধউলঙ্গ বালক বালিকা জড়ির "খাটাটোপ" ঘেরা পাল্কীর আশে পাশে ভিড় করিয়া দাঁড়াইতেছে—সুরমার দেখিয়া খুব ভাল লাগিল। যদিও তাহার কাছে এ দৃশ্য নূতন নয়, তবুও অনেকদিন পরে তাহার চোখ দুইটা যেন অনেকটা তৃপ্ত হইল, শীতল হইল। কিছুদূরেই একটী মাঝারী নদী আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়া গিয়াছে, দোতলা জানালা হইতে সুরমা দেখিতে পায় কত নৌকায় পাল তুলিয়া মাঝিরা গান গাহিয়া গাহিয়া চলিয়া যায়, অস্তগামী সূর্য্যের বিদায় রশ্মির করুণ বাণী শুনাইয়া সে উদাসী সুর মেঠো হাওয়ায় ভাসিয়া ভাসিয়া কোথায় মিশিয়া যায়। সুরমা উদাস হইয়া চাহিয়া থাকে। তারও ওপাশে দূরে ছোট ছোট উঁচু নীচু পাহাড়, কতকাল ধরিয়া ঠিক ঐ একভাবে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, সুরমা বুঝিতে পারেনা, মনে হয় কত ভাষা বুঝি ঐ কঠিনতার বুকে বাসা বাঁধিয়া আছে, কত ভাব তাহার কঠিন বুকে প্রকাশ হইতে না পারিয়া গুমরিয়া উঠিতেছে। সান্ধ্য বাতাস কি তাহা জানাইয়া দিতে পারেনা সারা পৃথিবীকে, পূর্ণিমার দিগন্তপ্লাবী নির্মল জ্যোৎস্না কি পারেনা তাহা ব্যক্ত করিতে—অস্ফুট সুরে—পাপিয়ার গানে?—

সামনে একেবারে খোলা মাঠ,—দৃষ্টি অবারিতভাবে ছুটিয়া যায় বহুদূরে,—অনেকদূরে যেন বন্ধন মুক্ত পাখীর মত। মাঠের বুক চিড়িয়া বরাবর একটী রাস্তা চলিয়া গিয়াছে দূরে, অতি সন্তর্পনে যেন অভিসারিকায় সঙ্কুচিত পাদবিক্ষেপে। মাঝে মাঝে দূরে দূরে জঙ্গল ঝোপ দেখা যায়, তাহা যেন গাঢ় সবুজ মাখিয়া চির নবীনতা বহন করিয়া আনে, সুরমার বিষণ্ণ প্রাণে। সন্ধ্যার ধূসরতা যখন গাঢ় হইয়া আসে সেই সময় সেই পথ বাহিয়া সারি সারি হাতীর পাল হেলিয়া দুলিয়া ফিরিয়া আসে, তাহাদের গলার ঘণ্টার সঙ্গে বাজিয়া বাজিয়া যায় মাহুতের বাঁশের বাঁশীর মন-পাগল-করা সুর। গরুর পাল ধূলা উড়াইয়া চলিয়া যায় রাখালের গানের সাথে আকাশ বাতাস ভরাইয়া দিয়া কি এক অজানা যাতনায়—সুরমা শুধু স্তব্ধ হইয়া দেখে আর শোনে, সঙ্গে সঙ্গে দেবালয়ে কাঁসর, ঘণ্টা, শঙ্খ, ঢাক ঢোল বাজিয়া উঠিয়া স্রষ্টার কাছে দিনশেষে আশীর্ব্বাদ চাহিয়া লয়।—নাটমন্দিরে আরতি কীর্ত্তনের আসর বসে।

চারিদিকে উঁচু দেয়াল ঘেরা অন্দর মহল। তারই ভিতর সুরমা থাকে। দূর সম্পর্কীয়া আশ্রিত আত্মীয়ারা ছোট ছোট ভিন্ন বাড়ীতে থাকে নিজেদের জোত জমা লইয়া, তাহারা এখন সুরমার কাছে কাছে ঘুরিয়া বেড়ায়। রাজীব সারাদিন কাজকর্ম্ম লইয়া বাহিরে বৈঠকখানায় অথবা কাছারী বাড়ীতে কাটাইয়া দেয়—শুধু খাইবার ও ঘুমাইবার সময় অন্দরে আসে। কোন কোন সময় অন্যান্য স্থান পরিদর্শনে যায়।

সুরমা সব ভুলিয়া গেল, কলিকাতার আমোদ উচ্ছ্বাস তাহার মন হইতে একেবারে মুছিয়া গেল। সে সারাদিন এ-ঘর ও-ঘর ঘুরিয়া বেড়ায়, প্রণবকে লইয়া খেলা করে, আর মাঝে মাঝে স্বপ্নজাল রচনা করে বসিয়া বসিয়া উন্মুক্ত বাতায়ন তলে।—

মহাসমারোহে অন্নপ্রাশন হইয়া গেল। ঢাক ঢোল ব্যাণ্ড রসুনচৌকী, নাচ, গান, বাজনা, পূজা, ক্রিয়াকর্ম্ম দান ধ্যান কিছুই বাকি রহিলনা। এ এক আলাদা ব্যাপার। গ্রাম গ্রামান্তর হইতে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আসিল, অসংখ্য প্রজা আসিল,—কত নিমন্ত্রিত আসিল, সুরমা এ বিরাট ব্যাপারে নিজেকে যেন হারাইয়া ফেলিল! একমাস ব্যাপী উৎসব চলিয়া সারাবাড়ী আনন্দ কোলাহলে মুখরিত হইয়া উঠিল। মাসী পিসীরা নাইবার খাইবার জন্য সুরমাকে অস্থির করিয়া তুলে, একটু ডাকিলে সকলে ছুটিয়া আসে! সারাদিন গ্রাম্য মেয়েরা তেল জুবজুবে চুলে পেটো পাড়িয়া, বড় বড় সিন্দুরের টীপ, এক হাত শাঁখা পরিয়া তাহাকে দেখিতে আসে, একটু মুরুব্বীরা হাতে করিয়া কিছু না কিছু লইয়া আসে তাহাকে নজর দিবার জন্য, কেহ কেহ বা একটী দুটী করিয়া টাকা দেয়—সুরমা তাহা হাতে তুলিয়া আবার তাহাদের ফিরাইয়া দেয়। তাহারা কখনো একসঙ্গে গান ধরে, উলু দেয়—সুরমা মাঝে মাঝে অস্থির হইয়া উঠে! এখানে সে যেন দেবতা তাহার সামান্য একটু দৃষ্টি, মুখের কথা পাইলেই তাহারা খুসী হইয়া যায়, জীবন সার্থক মনে করে, তাহার কাছে এ যেন আর এক রাজ্য।

পৃথা ও সুনীল আসিয়াছে। সুরমা পৃথা আসিবার আগে ভাবিয়াছিল, এখানে আসিয়া পৃথার বোধহয় খুবই খারাপ লাগিবে। কারণ এখানে মোটর নাই, ডান্স নাই, ফার্পো নাই, সিনেমা নাই কিন্তু পৃথাকে দেখিয়া সে অবাক হইয়া গেল, সুরমা আশ্চর্য্য হইয়া দেখিল, পৃথার উদ্দামতা, উদ্যম এখানে আসিয়া ঠিক তেমনই আছে। বিন্দুমাত্র সে বিষণ্ণ হইলনা, একবারও সে সহরের জন্য হাহুতাশ করিলনা, তাহার মনে হইল সে বুঝি কারণ চাহেনা, খালি চায় কাজ, সে শুধু নিজেকেই আনন্দ দিতে চায়, উন্মাদনাই খোঁজে, তাহা যে কোন রকম হউক যে কোন দিক দিয়া হউক। পৃথা আসিবার পর বাড়ীতে লোকের ভিড় দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল। সকলেই বলে "কতদিন পরে এলি মা!" সকলে পৃথার জন্য দুধ, তরকারী, মাছ, ঘরের গুড়, মুড়ি, চিঁড়া, যার যা কিছু সম্বল, একটা না একটা কিছু হাতে লইয়া পৃথাকে নজর দিয়া দেখা করিতে আসে। পৃথা কাহাকেও মাসী, কাহাকেও পিসী, কাহাকেও দিদি বলিয়া অসংখ্য গ্রাম্য মেয়েদের সম্বোধন করিয়া বসিয়া বসিয়া কোথায় কাহার মেয়ের বিবাহ

হইয়াছে, কার নাতি কোথায় আছে, কার ছেলে কত বড় হইয়াছে, জিজ্ঞাসা করিয়া তাহাদের সঙ্গে আনন্দে গল্প করে, এবং অসংখ্য লোকের নাম করিয়া কুশল প্রশ্ন করে। পান খাইয়া ঠোঁট লাল করিয়া কোমরে কাপড় জড়াইয়া সমস্ত সকাল পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া দই, চিড়া, বাতাসা খাইয়া আসে, তারপরে কোনদিন ঘোড়ায় কোনদিন হাতীতে চড়িয়া জঙ্গলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া সারাদিন পরে বাড়ী ফেরে। সন্ধ্যার সময় সব মেয়েদের ডাকিয়া গল্প করে, তাহাদের খাওয়ায়, গান গাওয়ায়, নাচায় সঙ্গে সঙ্গে নিজেও নাচে। এমনি করিয়া পৃথা মাতিয়া উঠিল। সে একদিনও জঙ্গল বলিয়া আপশোষ করিল না। সে সব সময়ে বলে "আগে যখন এইখানে থাকতুম আমার খুব ভাল লাগতো, বাবা ঐ খানে সব সময়ে বসতো, মা এইখানে দুপুরবেলা বসতো, বিকালে ঐখানে বসতো। বাইরের ঐ মাঠে সমস্ত হাতীদের বাবা মুখের সামনে খাওয়াতো।"

কখনো হাতীগুলা যখন চড়িয়া ফিরিয়া আসিত পিলখানায় তখন বলিত—"ঐ যে বৌদি কানটা একটু ছেঁড়া, ঐ মেঘমালা, ওর পিঠে আমি ছোটবেলা থেকে চড়তুম। আর ঐ যে তিলোত্তমা—কি সুন্দর! ওর ল্যাজটা একটু বাঁকা ব'লে বাবা একদিন বলেছিল, এটাকে আমি খাওয়াবো না নিয়ে যা সেদিন বেচারী সারাদিন ও কিছু খেলোনা, শেষে বাবা শুনে ডেকে আদর ক'রে আবার খাওয়ালো। ঐ যে বাগ বাহাদুর ও বীর বাহাদুরের ছেলে—বীর বাহাদুর বাবার বড় প্রিয় ছিল। কত শীকারে গেছি বাবার সঙ্গে ওর পিঠে চ'ড়ে। কোনদিন অন্দরের উঠানে অনেক মেয়েদের ভিড় জমাইয়া পৃথা খুব আসর জমায়। হয়তো কোন এক বুড়ীকে সজোরে টানিয়া তুলে "মাণিকের মা, ওঠো নাচো"—

বুড়ী নাচিতে চায় না, পৃথাও ছাড়ে না। সে বলে "নাচো না—আগে তো সুন্দর নাচতে, মা কত ভালবাসতো দেখতে—নাচো বুড়ী নইলে আমি রাগ করবো কিন্তু"—শেষে বুড়ী গান গাহিয়া কত ভঙ্গি করিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচে, গ্রাম্য নাচ আর পৃথা হাতে তালি দিয়া হাসিয়া হাসিয়া লুটাইয়া পড়ে। কোন কোন দিন অনেক রাত পর্য্যন্ত সে তাহাদের কীর্ত্তনের সহিত সজোরে খোল বাজায়। কোন কোনদিন সে ছোট জাল লইয়া হাঁটুজলে নামিয়া মহানন্দে মাছ ধরে। সুরমা ভাবিয়া পাইল না পৃথার কিসে আনন্দ,—তাহা লভে পড়া, ফ্লার্ট করা, ডান্স করায় না এই রকম চাষাদের সঙ্গে মিলিয়া হাতীতে চড়িয়া বন্য জীবন যাপন করায়। সে দেখিল সে সবেতে সমান খুসী, আনন্দ যেন তাহার দাসত্ব করিতেছে—আলাদীনের দৈত্যের মত সে যেন ইচ্ছা করিলেই তাহা তাহার আদেশ মানিয়া লইবে অবনত মস্তকে।

সুনীল একদিন বলিল—"পৃথা শরীর খারাপ হবে যে।"

পৃথা হাসিয়া বলিল—"কিচ্ছু হবে না সুনীল—তুমি ভেবোনা কিছু এই রক্তই আমার সমস্ত শিরায় এ বয়ে যাচ্ছে। চল আজ পাহাড়ে যাওয়া যাক্ ঝরণা দেখতে।"

সুনীল বলিল—"বৌদি?"

পৃথা বলিল—"বৌদি দিনের বেলায়—হাতীতে। কি জানি দাদা আপত্তি করবে না তো? আমার মতে তাতে আর কি হয়েছে? মাও তো হাতী চড়তো অবশ্য রাত্রে,—তা তুমি নয় পাল্কীতে যেয়ো, সে কিন্তু মজা হবে না। দেখি দাদা কি বলে"—

রাজীব বলিল—"আমার আপত্তি নেই, সবখানে খোলা বেড়াচ্ছে—আর এখানে তো নিজের প্রজা—তবে সঙ্গে বরকন্দাজ আর বন্দুক নিয়ে যেয়ো—বলা যায় না বাঘ টাঘ বেরোতে পারে"—

পৃথা বলিল—"দাদা, তুমিও চল।"

রাজীব বলিল—"যেতে পারতুম। কিন্তু একটু কাজ আছে—আচ্ছা তোমরা আগে যাও, আমি বরং ঘোড়ায় গিয়ে তোমাদের সঙ্গে মিলবো। ছোট একটা ক্যাম্প পাঠিয়ে দাও আগে।"

পৃথা একটা হাতীতে খালি গদী আঁটিয়া বসিয়াছিল আরামে। সুনীল ও সুরমা আর এক হাতীতে হাওদার উপর। সুনীল হাওদায় উঠিতে চায় নাই। কিন্তু পৃথাই তাহাকে জোর করিয়া তুলিয়া দিয়াছে। সে বলিয়াছে—"তোমার গায়ে ব্যথা হবে সুনীল, শরীর খারাপ হবে।"

সুনীল বলিল—"পৃথা আমাকে এতই কোমল ভাবলে? আর যদি তোমার গায়ে ব্যথা হয়?"

"আমি হাওদা ভালবাসি না সুনীল, তুমি ওঠো। বলছি, আমি এখানে খুব আরামে যাবো।"

"কিন্তু রোদ লাগবে যে!"

"বয়ে গেছে রোদ—তাছাড়া এই যে ছাতি আছে—মোহনদা ধ'রে যাবে, আমার পেছনে বোস মোহনদা—।"

বনের ভিতর দিয়া যাইতেছিল তাহারা। কোথাও লম্বা লম্বা বেণা ঘাস হাতীর পেট পর্য্যন্ত উঁচু হইয়া উঠিয়াছে, খস্ খস্ শব্দ করিয়া পায়ে শুকনা পাতা, বন মাড়িয়া চলিয়াছিল—তাহারা একদল। কোথাও গাছের ডাল নীচু হইয়া আরোহীদের মাথা ছুঁইয়া যায়, কোথাও অবনত লতা জড়াইয়া ধরিতে চায়, কোথাও ছোট নদী, খাল ডোবা পার হইয়া যাইতে হয়। কখনো নিস্তব্ধ বনানীর গম্ভীর শোভায় তাহারা মুগ্ধ হইয়া চাহিয়া থাকে—কখনো বা পাখীর সরব কাকলীতে চমকিয়া উঠে। হাতী শুঁড় দিয়া জল ছিটাইয়া, ডাল ভাঙ্গিয়া লতা ছিঁড়িয়া চলিতেছিল মন্থর গতিতে। পৃথা সঙ্গের লোকগুলাকে অসংখ্য প্রশ্ন করিতে করিতে পথ চলিতেছিল—"এটা কোন বন?—ও গাছটাকে কি বলে? কি আগে তো কখনো এ পথে আসিনি। তোমার মেয়ে কেমন আছে রঘুনা? কোন নদীতে বেশী স্রোত? আগে তো ও নদীতে অনেক কুমীর ছিল—" ইত্যাদি। সে সুনীলকে ডাকিয়া বলিল—"সুনীল কুমীর শিকারে যাবে?" সুনীল উৎসাহিত হইয়া বলিল—"যাবো। কোথায়?"

"ওই তো ঐ নদীতে আছে—ছোট কুমীর, কিন্তু একেবারে সরু সরু ছোট নৌকোয় উঠতে হবে—কাল যাবো কেমন?" সুরমা বলিল—"কেন বলতো ও সব বিপজ্জনক কাজে যাওয়া—পৃথা যেওনা—"

"নাঃ বৌদি—ঐ হাতীর সঙ্গে যাও না বিশু—হ্যাঁ, আমিই যাবোই কাল, বলেছি তো বিপদের কাজই আমার করতে ভাল লাগে। তোমার শুধু ভয় বৌদি!" সকলে আর কিছুদূর অগ্রসর হইবার পরে পৃথা হাতীর মুখ ঘুরাইতে বলিয়া বলিল—"বৌদি! সুনীল, তোমরা এগিয়ে যাও, আমি ঐ পাহাড়টা ঘুরে আসি" পৃথার হাতী অন্য দিকে চলিয়া গেল।

সুনীল বলিল—"বৌদি, সেদিন সেই নাচে এক সঙ্গে ছিলুম, আবার আজ একসঙ্গে হাতীর পিঠে—আমাদের জীবন কি অদ্ভুত শুধু ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতে ভরা।"

সুরমা বলিল—"এটাই আমার মনে হয় সুনীল এই ঘাত প্রতিঘাতগুলোই জীবনের একটা মস্ত বড় আকর্ষণ, আমার বেশ লাগে।"

"আচ্ছ, বাইরের ঘাত প্রতিঘাত ভাল লাগে কিন্তু মনের সুখ দুঃখের পরিবর্ত্তনটা কেমন লাগে?"

"তাও বেশ ভাল লাগে। সুখ দুঃখটা সমান ভাবে ভোগ করবো এটাই চাই। ক্রমাগত সুখটা যেন আমাকে অশান্তিতে ভ'রে দেয়, দুঃখটাকেও আমি চাই ঠিক সুখটার মতই ভোগ করতে।"

"কেন?"

"কারণ দুঃখটার ভিতরেই আমি সুখটাকে ভাল ক'রে উপভোগ করে নি।"

"দুঃখটা যখন আসবেই তখন তাকে যাতে সুখের ক'রে নেওয়া যায়, তুমি তারই উপায় ক'রে নাও নয় কি?"

"অনেকটা তাই বটে—তোমরা বোধ হয় একেবারে অনাবিল সুখেই জীবনটা কাটিয়ে দিতে চাও—না?"

"না তা আমি চাই না, আমিও চাই ঘাত প্রতিঘাত—উত্থান পতন চাই এবং তা সমান ভাবেই এবং চাই তা চরম ভাবে, চরম সুখভোগ করে চাই চরম দুঃখটাকেও ঠিক সেই ভাবে, বেশ লাগে—একটা পরিবর্ত্তন মনে হয়।"

"ঠিক এই কথাই আমি অনেক দিন ভেবে দেখেছি সুনীল—তুমিও বিষাদকে উজ্জ্বল করতে গিয়েই আনন্দের হাতে নিজেকে ধরা দাও। তুমি পারবে যেমন উল্লাসকে উপভোগ করতে তেমনি যন্ত্রণাকে হাসি মুখে বরণ করতে!"

"কিন্তু পৃথা একেবারে ভিন্ন। সে দুঃখ চায় না, বিষাদ ত'র কাছ ঘেসে যেতে পারে না, ক্লেশ তাকে কখনো স্পর্শও করতে পারে না, সেই জন্য মাঝে মাঝে আমার ভয় হয় যদি কোনদিন অবশ্যম্ভাবী কোন দুঃখ ওকে পেতেই হয় সেদিন ও ঠিক এক গুচ্ছ যুঁই ফুলের মত তৎক্ষণাৎ শুকিয়ে ঝ'রে পড়বে। সেই জন্য আমি যথাসাধ্য এতটুকু দুঃখের ছায়াও কখনো তাকে স্পর্শ করতে দিই না।"

"পৃথা দুঃখটাকে সইতে পারে না তা আমি জানি, সে যে অবস্থার পরিবর্ত্তন ভালবাসে সেও সুখের ভিতর দিয়ে তাও বুঝি, কিন্তু সংসার দুঃখ ছাড়া নয় সুনীল, পৃথাকে অত উদ্দামতার ভিতর দিয়ে আর চলতে দিওনা—" সুরমা একটু থামিয়া আবার বলিল—"তবে এও ঠিক দুঃখটা যদি আসেও তবে তার তাকে অবজ্ঞা ক'রে চলবার ক্ষমতাও আছে, কারণ পৃথা দুর্ব্বল নয়।"

"সব সময়ে সংগ্রাম ক'রে পারা যায় না—নিজের বাহির ও ভিতরের সঙ্গে, একটা না একটা কিছু ভেঙ্গে পড়বেই কালে হয় বাহির নয় ভিতর, আমার পৃথার জন্য বড় ভয় হয়।" একটু চুপ করিয়া সুরমা বলিল—"তোমার জীবনে সুখ দুঃখের ঘাত-প্রতিঘাত খুব এসেছে কি সুনীল?"

"কি জানি বলতে পারছি না"—

"তা তুমি বলতে পারবে না কারণ তোমার নিজের মনের খবর বোধহয় তোমার জানা নেই!"

সুনীল মৃদু হাসিয়া বলিল—"জানা নেই? বল কি? জীবনে সুখটা ভোগ করেছি খুব আর দুঃখটাও ঠিক সমান ভাবে ভোগ করেছি"—

"কি করে?"

"পৃথার জন্য।"

সুরমা একটু শঙ্কিত হইয়া বলিল—"কেন?"

"পৃথাকে আমি ভালোবাসি বৌদি, কিন্তু তার চেয়েও ভালোবাসি পৃথার আমার উপর আত্ম নির্ভর বিশ্বাসের ভাবটাকে যার কাছে আমি নেহাৎ অনিচ্ছায় বন্দী হয়ে আছি।"

"বন্দী আছ?"

"বন্দী বই কি—কারণ আমি পৃথার বিশ্বাসের অমর্য্যাদা কখনো করতে পারিনি। অনেকবার আমার জীবনে অনেক প্রলোভন এসেছে, আমি চেষ্টাও করেছি কিন্তু পারিনি। আমি সাধু নই—কিন্তু জানো কি যখনই মনে হয় যে সে জানলেও আমাকে কোন প্রশ্ন করবে না, কিছু জিজ্ঞাসা করবে না, তার এতটুকু ব্যবহার দিয়েও সে আমাকে তিরস্কার করবে না, তখনি আমি ফিরে এসেছি, পারিনি, এক একজনকে ভালবেসেও আমি তাকে ভালবাসা জানাতে পারিনি কারণ পৃথা সব জেনেও চুপ ক'রে থাকবে ব'লে। একে ঠিক বিশ্বাসও বলতে পারি না, সে যে আমাকে বিশ্বাস করে তাও নয়, কিন্তু এ যেন জেনে শুনেও হাসিমুখে একটা স'য়ে যাওয়ার ভাব যা আমাকে সর্ব্বদা আমার জীবনের সমস্যার ভিতর দিয়ে চালিয়ে নিয়ে যায়।"

"তা আমি বুঝেছি সুনীল, এ যেন বিশ্বাসের চেয়েও আরো বেশী দৃঢ়,—কিন্তু এতে তোমার আনন্দ হওয়া উচিত—দুঃখ বলছো কেন?"

"আনন্দ হয়—কিন্তু সেটা সেই দুঃখের ভিতর দিয়েই। এই যে একটা যন্ত্রণা, নিজেকে মুক্ত ক'রে নেবার প্রবল চেষ্টা, অথচ তারপরেই একটা অসাফল্য, একটা হতাশা আমাকে পুড়িয়ে মেরেছে রাতদিন। আমার মনে হয় পৃথা আমাকে তিরস্কার করুক, সন্দেহ করুক, অবিশ্বাস করুক এইটুকুই আমি চাই। তার সেই যে চির অটল উল্লাসের হাসি যা আমাকে সে দিয়ে যাবে অবাধে প্রস্রবনের উচ্ছ্বাসে আমার অন্যায়ে ন্যায়ে, দোষে গুণে, নীচত্বে মহত্বে ঐটাই আমার সবচেয়ে কঠিন পাথরের প্রাচীর, আমার জীবনের মহা সমস্যার একমাত্র মীমাংসা, ঐটাই আমার জীবনের আনন্দ অথবা নিরানন্দের একমাত্র বাধা—নইলে আজ তোমাকে ভালবেসেও, এত কাছে বসেও আমি যেন সমুদ্রের ব্যবধান দেখতে পাচ্ছি তোমার আমার মাঝখানে। পৃথা তোমাকে আমাকে একসঙ্গে বসিয়া নিজে গাড়ী চালায়, একসঙ্গে সঙ্গী ক'রে দেয় নাচে, এক হাওদায় বসিয়ে নির্জ্জন জঙ্গলের পথে চ'লে যেতে বলে। আমি বড় ভুগছি, বৌদি! কিন্তু এর ভিতরও একটা আনন্দও পাই নিজেকে জয় করতে পারি বলেই—"

সুরমা বলিল—"আর আমার ঠিক মনে হয় সুনীল পৃথাও"—

পৃথার গলা শোনা গেল দূর হইতে একটু পরে তার হাতী আনিয়া সে বলিল, "চমৎকার পাহাড়" বলিয়া পৃথা কতগুলি বন্যফুল ছুঁড়িয়া মারিল সুনীলের ও সুরমার গায়ে।
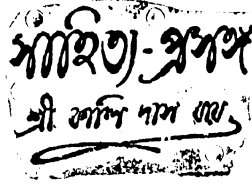
(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

জাতীয় জীবন ও সাহিত্য

একটা কথা চলিয়া আসিতেছে—সাহিত্য জাতীয় জীবনের বাঙ্ময় অভিব্যক্তি—জাতীয় জীবনই সমসাময়িক সাহিত্যে প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে। এই তথ্যটিকে প্রতিপন্ন করিবার জন্য সমালোচকগণ জাতীয় জীবনের সহিত সমসাময়িক সাহিত্যের গতি-প্রকৃতি মিলাইবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। কতক কতক মিলিয়া যায় সত্য—কিন্তু যাহা মিলে না, তাহার সম্বন্ধে তাঁহারা নীরব থাকেন। কোন কবিই তাঁহার সমসাময়িক জাতীয় জীবনের প্রভাব একেবারে এড়াইতে পারেন না—কাজেই সকল কাব্যেই সমালোচকগণ জাতীয় জীবনের প্রতিধ্বনি কতক কতক পাইয়া থাকেন। কিন্তু কবির কাব্যকে অবলম্বন করিয়া বর্ণে বর্ণে তাহার সহযোগিতা যদি জাতীয় জীবনে খুঁজিয়া দেখিতে যান, তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন—কাব্যের কতটা কবির সম্পূর্ণ কল্পনা-সৃষ্ট ও চিন্তাপ্রসূত,—জাতীয় জীবন হইতে আদৌ আহৃত নয়।

যাহাই হোক, কোন কোন কবির কাব্য যে জাতীয় জীবনের আংশিক অভিব্যক্তি, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু এমন কবিও-ত সকল দেশেই জন্মগ্রহণ করেন—যাঁহারা জাতীয় জীবনকেই যথাযথ চিত্রিত করেন না। তাঁহাদের কাব্যে ফুটে, সর্ব্বদেশের সর্ব্বযুগের মানবের সার্ব্বজনীন জীবনবাণী,—তাঁহারা হয়ত তাঁদের কল্পনা-প্রসূত একটা আদর্শ জাতীয় জীবনের চিত্রাভাস দেন তাঁহাদের কাব্যে। হয়ত তাঁহারা জাতীয় জীবনকে ভাঙ্গিয়া গড়িবার জন্য একটা আদর্শ দেন তাঁহাদের রচনায়। হয়ত জাতীয় জীবনকে নবীন পথে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত করিতেই তাঁহারা অবতীর্ণ। হয়ত তাঁহাদের কাব্যে একটা অপূর্ব্ব Message বা বাণী থাকে। হয়ত তাঁহারা ভোরের পাখী, ভোর না হইতেই ভোরের খবর রটাইয়া দেন অর্থাৎ যে জীবন জাতীয় দেহে এখনও সঞ্চারিত হয় নাই—আসন্নমাত্র, সেই জীবনেরই পরিচয় দান করেন।

এমন কবির আকস্মিক আবির্ভাব-ত হইতে পারে,—অপরিসর সংকীর্ণ জাতীয় জীবনটুকু যাঁহার বিরাট শক্তির পক্ষে যৎসামান্য,পূর্ব্ব পূর্ব্ব কবিগণের সঙ্গে যাঁহার একেবারেই যোগসূত্র নাই এবং যাঁহার নিজস্ব জীবন, জাতীয় জীবন হইতে অনেক উর্দ্ধে বা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। কবি তাঁহার নিজের মানস-জীবনকেই তাঁহার সাহিত্যে ফুটাইয়া যাইতে পারেন। কবি হয়ত এমন একটা স্বপ্নলোক বা কল্পলোকের সৃষ্টি করিলেন, যাহার উপাদান উপ-করণ আহরণ করিলেন আপনার বিরাট কল্পনা অথবা অতীত যুগের স্মৃতিলোক হইতে, অথবা চিরজীবন তিনি একটা Millenium এরই স্বপ্ন দেখিয়া গেলেন অথবা অতীন্দ্রিয় ভাবলোকেই বিচরণ করিয়া গেলেন। মোটের উপর, সাহিত্য যে সমসাময়িক জাতীয় জীবনের অভি-ব্যক্তি হইবেই, এমন কোন কথা নাই।

তবে এক্ষেত্রে একটা বিপদ এই হইতে পারে, এই সকল কবির কাব্য আপন দেশে এবং আপন যুগে আদৃত না হইতেও পারে। জীবদ্দশায় আপন দেশে আদর পান নাই এমন কবি-ত সকল দেশেই জন্মগ্রহণ করেন। জাতীয় মনে যে সাহিত্যের 'বাসনা' নাই অর্থাৎ সে সাহিত্যের ভাব অনুভূতি ইত্যাদি উপকরণ

উপাদানের বোধ বা অভিজ্ঞতা নাই, সে সাহিত্য যে আদৃত হইবে না তাহাতে সন্দেহ কি? সেই জন্যই ত বহু কবি 'নিরবধি কাল ও বিপুলা পৃথ্বীর' উপর নির্ভর করিয়া কাব্য লিখিয়া যান।

যে বাসনা জাতীয় মনে পূর্ব্ব হইতে বর্ত্তমান নাই —বহু কবি জাতীয় মনে সেই 'বাসনা' সৃষ্টি করিয়া যান—পরবর্ত্তী যুগ সে বাসনার অধিকারী হয় এবং তাঁহাদের কাব্যকে উপভোগ করিতে পারে। ঐ শ্রেণীর কবি যদি দীর্ঘজীবী হ'ন, তবে তাঁহার যৌবন ও প্রৌঢ় কাল অভিনব বাসনা প্রবুদ্ধ করিতেই কাটিয়া যায় বটে, কিন্তু বৃদ্ধবয়সে দেশের লোকের সমাদর লাভ করিতে পারেন।

বিদ্বৎসমাজের মনে সহজেই অভিনব 'বাসনা' প্রবুদ্ধ করা যায় এবং দেশের বিদ্বৎসমাজের মানস-জীবনের সহিত কবির মানস-জীবনের অনেকটা মিল থাকিবার কথা। কবি সমগ্র জাতির প্রতিনিধি বা মুখ-পাত্র না-ও হইতে পারেন, কিন্তু জাতির রসিকসমাজ বা বিদ্বৎসমাজের বাণীদূত তাঁহাকে বলা যাইতে পারে। সমগ্র জাতীয় জীবনের প্রতিবিম্ব তাঁহার কাব্যে না মিলিতে পারে,—বিদ্বৎসমাজের মানস-জীবনের পরিচয় অবশ্যই পাওয়া যায়। সে জন্য মনে হয়, সাহিত্যকে জাতীয় জীবনের অভিব্যক্তি না বলিয়া দেশের বিদ্বৎ-সমাজের ভাবজীবনের অভিব্যক্তি বলিলে কতকটা সত্যের কাছাকাছি যায়।

সাহিত্যে বেদনা ও ন্যায়নিষ্ঠা

ভগবান নারীজাতিকে বড় দুর্ব্বল করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। তাহার মনের বল থাকিতে পারে—কিন্তু তাহার দৈহিক সামর্থ্য এত সামান্য যে, সে বেশীক্ষণ অদৃষ্টের সঙ্গে যুঝিতে পারে না। সেজন্য তাহার দুঃখ যাতনা—তাহার অসহায়তা, তাহার উপর দৈব ও পুরুষ জাতির অত্যাচার,আমাদিগকে সহজেই ব্যথিত করে। বৃদ্ধ, বালক, অশক্ত ও দীন হীন ব্যক্তিগণ সম্বন্ধেও এই কথা। ইহাদের বেদনা আমাদিগকে ব্যথিত করে বলিয়াই সাহিত্যে ইহাদের বেদনাকে অনেক সময় উপজীব্য ও আলম্বন করিয়া তোলা হয়। ইহাদের বেদনার পরিমাণ যদি অতিদারুণ না হয় এবং তাহার প্রতিকারের বা প্রতিবিধানের কোন ব্যবস্থা বা ইঙ্গিত যদি ঐ সাহিত্যের মধ্যেই থাকে—তবে ঐ বেদনা রসে উত্তীর্ণ হইতে পারে, রসানন্দই দান করে, অশ্রুঘন সহানুভূতিতে আমাদের চিত্তকে বিবশ ও মুহ্যমান করিয়া তোলে না।

সবল পুরুষ মহাষ্টমীর ছাগের মত ভাগ্যের উৎপীড়ন সহ্য করে না। সে ভাগ্যের সহিত প্রাণপণে সংগ্রাম করে। হয় জয়ী হয়,—না হয় হতচেতন হইয়া পড়ে। তাহার বেদনাও আমাদের অন্তর স্পর্শ করে—কিন্তু সে যে ভাগ্যের সহিত প্রাণপণে সংগ্রাম করিয়াছে, এই সান্ত্বনা ঐ বেদনাকে কেবলমাত্র অশ্রুজলে পরিণত করে না—সহজেই তাহাকে রসে উত্তীর্ণ হইতে সাহায্য করে। জগতের বড় বড় মহাকাব্য ও নাটক সবল পুরুষের সংগ্রাম-বেদনাকে অবলম্বন করিয়াই রসসৃষ্টি করিতে পারিয়াছে।

এই সবল পুরুষ যখন অতি বড় দুর্দ্দান্ত, অত্যাচারী ও কল্যাণের মহাশত্রুরূপে ভীষণভাবে চিত্রিত হয়—তখন ভাগ্যের সহিত তাহার সংগ্রাম আমাদের ক্রোধেরই উদ্রেক করে এবং তাহার দারুণ প্রায়শ্চিত্তের ক্লেশ আমাদিগকে আনন্দই দেয়। এই আনন্দ রসানন্দ নয়,—ইহা নৈতিক আনন্দ। অবশ্য কবির রচনাগুণে এই আনন্দও রসে পরিণত হইতে পারে। কিন্তু আমাদের নৈতিক বুদ্ধি ও ন্যায়নিষ্ঠার তৃষ্ণানিবৃত্তির আনন্দটা এক্ষেত্রে এতই প্রবল যে, উহা সহজে রসানন্দে রূপান্তরিত হইতে চাহে না। তবু এক্ষেত্রে রসানন্দের পথ ঐ নৈতিক আনন্দই।

এ সংসারে সকল পাষণ্ডেরই দণ্ড হয় না—সকল পাপিষ্ঠেরই প্রায়শ্চিত্ত ইহলোকে দৃষ্ট হয় না—যাঁহারা বাস্তববাদী সাহিত্যিক তাঁহারা তাই পাষণ্ডের প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিতেই হইবে একথা মানেন না। তাই তাঁহারা তাঁহাদের চিত্রিত পাষণ্ড-চরিত্রের উপর অনেক সময় অবশ্য-দেয় দণ্ডের বিধান করেন না—তাঁহারা শুধু দেখেন স্বভাবানুবর্ত্তী হইল কিনা। এক্ষেত্রে পাঠকের মনের রোষভাব রসভাবে পরিণত হইতেও পারে, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঐ পাষণ্ডের প্রায়শ্চিত্ত ব [illegible] হইতে অব্যাহতি রসানন্দ সৃষ্টি করে না। পাঠকের [illegible]

ক্ষুধা যেখানে অতৃপ্ত থাকিয়া গেল—সেখানে তাহার বিরক্তি ও চিত্তের অপ্রসন্নতা রসোদ্বোধনে বাধা দিবেই। কবির সৃষ্টি বেশ স্বভাবানুগত হইয়াছে বলিয়া যে কবির কৃতিত্ব তাহা পাঠকের বুদ্ধিবৃত্তির কাছে প্রশংসা আদায় করে—কিন্তু রসতৃপ্ত মনের কোন ধন্যবাদ লাভ করে না।

শ্রেষ্ঠ শিল্পী যখন রসসৃষ্টির জন্য পাষণ্ডচরিত্র অঙ্কন করেন, তখন তাহাকে প্রায়শ্চিত্ত হইতে অব্যাহতিও দেন না—একেবারে অমানুষ দানবও করেন না, স্বাভাবিক মানুষই রাখেন। তাহা না হইলে মানুষের অন্তরে কোন সহানুভূতির সৃষ্টি করিতে পারে না। অর্থাৎ কবি ঐ পাষণ্ড-চরিত্রের মধ্যে কতক গুলি মানবিক গুণের সমাবেশ করেন,নিম্নস্তরের হইলেও তাহার জীবনেও একটা আদর্শের প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাহার জীবনটাকে ভুলভ্রান্তি, দুরদৃষ্ট ও অনুতাপের মধ্য দিয়া আগাইয়া লইয়া যান।

তাহার যখন প্রায়শ্চিত্ত হয়, তখন আমাদের নৈতিক আদর্শের ক্ষুধানিবৃত্তির জন্য আমাদের মনে একটা তৃপ্তি ও প্রসন্নতা আসে—সেই সঙ্গে পাষণ্ড হইলেও একটা বিরাট পুরুষের পতনের জন্য, তাহার বিপথে চালিত মনুষ্যত্বের জন্য, একটা সংযত ধরণের বেদনাও জন্মে। এই তৃপ্তি ও বেদনাই পরিপূর্ণ রসানন্দের সৃষ্টি করে। আমি রামায়ণের রাবণ-চরিত্রের কথা স্মরণ করিতে বলি।

কাব্যের মিল

মিল বাংলা কবিতার একটি অপূর্ব্ব অলঙ্কার—শুধু অলঙ্কার নয়, দাতাকর্ণের কবচকুণ্ডলের মত ইহা বাংলা কবিতার অঙ্গের অঙ্গীভূত ও জীবনের সঞ্জীভূত। শ্রুতি-রঞ্জনী শ্রীমাধুরীর জন্য মিলের যুগ্মকে বঙ্গকাব্য-সরস্বতীর শ্রুতিযুগলে কুণ্ডল-যুগল বলা যাইতে পারে।

সংস্কৃতে মাত্রাসমক-শ্রেণীর পাদাকুলক, পজ্ঝটিকা ইত্যাদি ছন্দ ও গীত্যার্য্যা ও গাথা-শ্রেণীর কয়েকটি ছন্দ ছাড়া অন্যান্য ছন্দে মিল নাই। কিন্তু সংস্কৃতে হ্রস্বদীর্ঘ উচ্চারণ-বৈষম্যের জন্য এবং তালমান ও যতি অনুযায়ী বিধিবদ্ধ স্বরসন্নিবেশের জন্য এমন একটি ছন্দঃস্পন্দের সৃষ্টি হয় এবং এমন একটি তরঙ্গায়িত লীলা পদের মধ্য দিয়া নাচিয়া চলে, যাহার জন্য মিলের অভাবে মাধুর্য্যের অভাব হয় না। পংক্তিশেষে কেবল অক্ষর-সাম্যই নাই—কিন্তু প্রত্যেক চরণের প্রত্যেক অক্ষরের স্বর-মাত্রার সহিত অন্যান্য চরণগুলির তৎতৎস্থানীয় অক্ষরের স্বর-মাত্রার অক্ষুণ্ণ মিল ও সাম্য থাকে। ইহা ছাড়া অনুপ্রাস যমকাদি শব্দালঙ্কারের প্রাচুর্য্যও থাকে। স্বরমাত্রার সামঞ্জস্য, সুসন্নিবেশ ও শৃঙ্খলিত বিন্যাসের ফলে সংস্কৃত ছন্দে যে স্বরস্পন্দ ও মধুস্যন্দ ঘটিয়া থাকে—অনুপ্রাস বাহুল্য সত্ত্বেও বাংলা ছন্দে তাহা সম্ভব হয় না। মিল বাংলা ছন্দে সেই অভাব কতকটা দূর করিয়াছে। তাই বাংলা ভাষার সম্পূর্ণ নিজস্ব ছন্দগুলির জন্য মিল অপরিহার্য্য।

মিলই বাংলা কবিতায় তাল, মান, লয়, যতি, বিরতি, সবই নিয়মিত করে,—পদ্যকে গদ্যাত্মকতা হইতে রক্ষা করে,—কবির লেখনীকে বিরাম দেয় ও সংযত করে, আবৃত্তিকালে পাঠকের কণ্ঠস্বরকে উঠা-নামার সাহায্য করে,—স্নেহাক্ত করিয়া তাহার বাগ্‌যন্ত্রকে অবাধে চলিবার বেগদান করে। মিল রচনার গতিক্লিষ্টতা হরণ করে,—সুরকে বারবার নবীভূত করিয়া দেয়—ধ্বনিক্লান্ত কর্ণের ক্লান্তি অপনোদন করিয়া নব নব উত্তেজনা দেয়, দীর্ঘ ছন্দের পথে 'মিল' গুলি যেন মিলনের পান্থনিবাস।

গতি নিয়ন্ত্রিত করিয়া মিল ছন্দকে নব নব রূপ ও সৌষ্ঠব দান করে। তাই বাংলা ছন্দের বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য বহুল পরিমাণে মিলের উপরই নির্ভর করে। মিলের সংস্থানই অনেক সময় এক ছন্দ হইতে অন্য ছন্দকে স্বাতন্ত্র্য দান করে। মিলই একপদকে একাধিক পদে ভাঙ্গিয়া সাজায়—বহু পদ ও পদাংশে গুচ্ছ বাঁধে ও শ্লোকের স্তবক রচনা করে—ধ্রুবপদকে বার বার ফিরাইয়া আনিয়া দেয়, পদ-বৈচিত্র্যের মধ্যে একটা আন্তরিক ঐক্য বন্ধন রক্ষা করে এবং সমগ্র রচনার মাধুর্য্য, লালিত্য, সৌষ্ঠব ও শৃঙ্খলা রক্ষা করে। মিল সংযমের বল্গা ধরিয়া পদান্তে বিরাজ করে এবং কোন পংক্তিকেই উচ্ছৃঙ্খল হইতে দেয় না। দুইটি মাত্র অক্ষরকে অবলম্বন করিয়া মিল পদযুগ্মের বাকি সমস্ত বর্ণগুলিকেই শাসন করে।

'একদা এক বাঘের গলায় হাড় ফুটিয়াছিল,'— এই নীরস গদ্য-পংক্তিও নানা সুরে গাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু গায়ককে এরূপ গদ্য-পংক্তিটি সুরে মধুরায়িত

করিতে রীতিমত ক্লেশ স্বীকার করিতে হয়। অর্থ-মর্য্যাদা ও রস-সৌকর্য্য রক্ষা করিয়া গদ্য বা গদিত বাক্যকে গাওয়া যায় না। তাই সঙ্গীতের জন্য ছন্দিত ও পদবদ্ধ বাণীর এত প্রয়োজন। এই ছন্দিত বাণী যদি মিলের দ্বারা ঝঙ্কৃত হয়, তাহা হইলে উহা সঙ্গীতের অনেকটা নিকটবর্ত্তী হইয়া উঠে—গায়ককে গাহিতেও ক্লেশ পাইতে হয় না। মিল তাহার রাগ-রাগিণীর তরঙ্গলীলা ও স্বরবৈচিত্র্যসৃষ্টির সহায়তা করে—যতি, বিরতির ও সমের সংস্থান নির্দ্দেশ করিয়া স্বরের যাত্রাপথকে সুগম করিয়া দেয়। সঙ্গীতের অর্থ ও রসবোধ করিতে শ্রোতার কোন অসুবিধা হয় না। যাহা গীতিও বটে, কাব্যও বটে অর্থাৎ গীতিকাব্য—তাহাতে মিলই প্রধান ঐশ্বর্য্য। জয়দেব এই মিলের মর্য্যাদা বুঝিয়াছিলেন—তাই সংস্কৃত ছন্দের নানা মাধুর্য্য থাকা সত্বেও তিনি মিলকে যথেষ্ট প্রাধান্য দিয়াছেন। প্রাকৃত পিঙ্গল-সূত্রের অধিকাংশ ছন্দেই মিলের চমৎকারিতা স্বীকৃত হইয়াছে।

বাংলা কবিতায় মিলের সৃষ্টি যেমন শ্রুতিবিনোদন করে—অন্য কোনপ্রকার বর্ণবিন্যাস বা শব্দচাতুর্য্য তেমনটি করিতে পারে না। শ্রুতিবিনোদন করে বলিয়াই উহা স্মৃতিবিনোদন-ও করে। তাই মিত্রাক্ষরান্ত পংক্তি সহজেই স্মৃতিগত হইয়া যায়, এবং ধৃতিক্ষেত্রে স্থায়ী আসন লাভ করে। ছন্দোগতি, একটি শব্দের পর অন্য শব্দটিকে মনে পড়ায়,—মিল একটি পংক্তির পর তাহার মিত্র-পংক্তিকে মনে পড়ায়। সম তৎসমকে মনে পড়ায়—মনস্তত্ত্বের Law of Association by Similarity and Contiguity এক্ষেত্রে কাজ করে।

মিলের আকর্ষণী শক্তি উদাসীন পাঠককেও কবিতার সঙ্গে সঙ্গে আগাইয়া লইয়া যায়। মিল কবিতার ছন্দে তরঙ্গের সৃষ্টি করে—যাহাতে পাঠকের কান ও প্রাণ দুলিতে বাধ্য হয়। ইহা এমন একটি নৃত্য-হিল্লোলের সৃষ্টি করে যে নৃত্যের আবেশ পাঠকের কানে ও প্রাণে লাগিয়া যায়,—কানের সঙ্গে প্রাণও নাচিতে নাচিতে কবিতার দোলযাত্রায় যোগ দেয়। একবার নাচন পাইলে সে নাচন হইতে আর সহজে বাঁচিবার জো নাই। নৃত্যের একটি নির্দ্দিষ্ট বেগ আছে—তাহার একটা পরিমিত তৃষ্ণা আছে। সে তৃষ্ণা মিটিবার আগে যদি নাচন থামিতে বাধ্য হয়, তবে নর্ত্তক বসিয়া বসিয়া নাচে—শুইয়া শুইয়াও খানিকক্ষণ নাচিয়া লয়। 'মিলও' কবিতায় যে নাচনের সৃষ্টি করে, তাহার বে[গ] ও তৃষ্ণার টানে পাঠকের কান ও প্রাণ নাচিতে নাচি[তে] চলে—ক্লান্তি জন্মিবার আগেই যদি কবিতা থামি[য়া] যায়,—তবু সে নাচন থামে না—আরো খানিকক্ষণ অনিচ্ছা[য়] তেও reflexively নাচিতে থাকে। কাজেই ছন্দ ও মিলে[র] রেশের সঙ্গে আবোল তাবোল অর্থহীন কথায়, মনে-ম[নে] মিল দিয়াও নাচন চলিতে থাকে।

দুইটি পদকে মিল একবৃন্তে দুইটি পুষ্পের ম[ত] ফুটাইয়া তুলে, ছন্দ তাহাকে বর্ণসৌষ্ঠব দেয়, রসালঙ্কা[র] মধু ও সৌরভ যোগায়।—মিল দুইটি পদকে এম[ন] অটুট বন্ধনে বাঁধিয়া রাখে যে পাঠকের মনে উহার চির অবিচ্ছিন্ন হইয়া বিরাজ করে, একটা পত্রের দুই[টি] দিকের মত অবিভাজ্য ভাবেই রহিয়া যায়। একটি পংক্তিকে না ভাবিয়া অন্য পংক্তিটিকে ভাবাও যায় না। দুইটি পংক্তি যুগল-বাহুর মত আমাদের চিত্তকে বেষ্টন করিয়া ধরে—সে বাহুবন্ধন সহজে ছাড়ানো যায় না। এই প্রীতি-বন্ধনের জন্য মিলান্ত পদগুলি এত লোককান্ত। সর্ব্ব-প্রকার লোকসাহিত্য এই মিলান্ত ছন্দেই রচিত হইয়া আসিতেছে। সকলদেশের জনসাধারণ তাই মিলের ভক্ত। তাই দেশের অধিকাংশ প্রবাদপ্রবচন, 'বচন' অনুশাসন, মিলান্ত ছন্দে লোকমুখে মুখে রচিত হইয়া জনপরম্পরায় এত সহজে ও অবিকৃতরূপে চলিয়া আসিতেছে। আপনার অক্ষম দুর্ব্বল বচনে যখন আর কুলায় না—আপনার যুক্তিতর্কে যখন চূড়ান্ত মীমাংসা হয় না—যখন আপনার নীরস বাক্যজাল প্রাণপণে বিস্তার করিয়াও তৃপ্তি হয় না, তখন কোন অজ্ঞাতনামগোত্র লোককান্ত কবির সমিল বচন প্রয়োগ করিয়া বক্তা আপন বক্তব্য শেষ করে।

মিল বন্ধনের এমনি প্রতাপ যে সমিল বচনপ্রবচন গুলিই জনসাধারণের বেদকোরাণ, নীতিশাস্ত্র ও [illegible] হইয়া উঠিয়াছে। সমিল বচনে এমনি একটা [illegible] বিজড়িত আছে যে জনসাধারণের [illegible]

শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস উৎপাদন করে। জনসাধারণের বহুদিনের অভিজ্ঞতা, সিদ্ধান্ত ও মীমাংসাগুলি যুগ হইতে যুগান্তরে মিলের সূত্রেই গ্রথিত আছে। মিল যে অপূর্ব্ব লোকসাহিত্য রচনা করিয়া রাখিয়াছে—সেই সাহিত্য, সেই অনুশাসন মালা—সেই অগ্রন্থলব্ধ বিদ্যা,—নিরক্ষর ও বর্ণজ্ঞানমাত্রসম্বল জনসাধারণের একমাত্র অবলম্বন, চরিত্রগঠনের সহায়, জীবনের যাত্রাপথের পাথেয়।

গ্রন্থগত বিদ্যার সহিত অনেক ক্ষেত্রে জীবনের বিশেষ কোন যোগ নাই। উহা বুদ্ধিকে মার্জ্জিত করিতে পারে, যুক্তিতর্কপ্রয়োগে সাহায্য করিতে পারে, ভাষার পারিপাট্য দান করিতে পারে, অন্নার্জ্জনেরও সাহায্য করিতে পারে—কিন্তু জীবনের দৈনন্দিন লোক-যাত্রার সহিত তাহার বিশেষ প্রাণের সম্পর্ক নাই—প্রতিদিনকার ছোট খাট খুঁটিনাটী ঘটনার সহিত তাহার যোগ নাই—গার্হস্থ্য ও সামাজিক জীবনের নিত্যকৃত্যগুলিকে গ্রন্থের বিদ্যা নিয়মিত বা পরিচালিত করে না।

তাহা ছাড়া, গ্রন্থের বিদ্যা এত সহজে পুরুষ-পরম্পরায়,—অতীত হইতে বর্ত্তমানে—বর্ত্তমান হইতে ভবিষ্যতে বিতত হয় না, লোকপরম্পরায় মুখে মুখে এত সহজে অনায়াসে জনসাধারণের মধ্যে বিস্তৃত হয় না এবং কোন দিনই সর্ব্বজনাধিগম্য হয় না। কৌতূহল ও কৌতুকের দুটী পাখার উপর ভর করিয়া পাখীর ঝাঁকের মত, জনারণ্যের সমিল বচনগুলি গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে উড়িয়া উড়িয়া চলিয়া যায়, বিনাক্লেশে—বিনা অবধানেই ধরা পড়ে,—পোষা পাখীর মতই যেন হাতে হাতে উড়িয়া বসে।

সমিল প্রবাদ-প্রবচনগুলি যে বিদ্যা বহন করে তাহার আদানপ্রদানেও বেশ একটা সাধারণতন্ত্রতা (Democracy) আছে, মঠ-চতুষ্পাঠীর চতুষ্কোণের মধ্যেই নিবদ্ধ নয়—এ বিদ্যার সকলেই ছাত্র, সকলেই শিক্ষক। বাড়ীর নিরক্ষর ঠাকুরমার কাছ হইতে আরম্ভ করিয়া পাড়ার মেছুনী পর্য্যন্ত ইহার শিক্ষকতা করে।

এই সংক্ষিপ্ত সমিল সানুপ্রাস বচনগুলি কর্ম্মীদের কর্ম্মজীবনের অভিজ্ঞতার ফল—কর্ম্মক্ষেত্রেরই আবিষ্কার—কর্ম্মশ্রুতির গৃহ্যসূত্র। কর্ম্মজীবন বেদলিক্ত,—কিন্তু তাহার অভিজ্ঞতার ফল মিলের রসে রসসিক্ত। এগুলি খনার বচন, ডাকের বচন ইত্যাদি নানারূপ ধারণ করিয়া কুটীরে কুটীরে কর্ম্মীদের শ্রমযাত্রা নিয়ন্ত্রিত করিতেছে—পল্লীসংসার ও পল্লীক্ষেত্রের সকল জীবন-ধারাকেই নিয়মিত করিতেছে। মিলই এই বচনগুলিকে সাধারণ অমার্জ্জিত ও প্রাকৃত বাক্যাবলী হইতে স্বাতন্ত্র্যদান করিয়া অনাবশ্যক শব্দপুঞ্জকে বর্জ্জন করিয়া সূত্রাকারে রহস্যময় মন্ত্রসূক্ত করিয়া তুলিয়াছে। সেগুলির রচনা শিষ্ট বা সুষ্ঠু নয়, রুচি তেমন মার্জ্জিত বা সমুন্নত নয়—একমাত্র মিলই তাহাদিগকে গৌরব ও বৈশিষ্ট্যদানে শ্রদ্ধার্হ করিয়া রাখিয়াছে।

কর্ম্মকুণ্ঠকে কর্ম্মীরা ঐ বচন সাহায্যেই নিন্দা করে, হঠকারীকে সতর্ক করে, নবব্রতীকে উৎসাহিত করে—ফলাফলের ভবিষ্যদ্বাণী ঘোষণা করে,—সাফল্যলাভ করিলে ঐ বচনেরই জয়মালা কণ্ঠে পরাইয়া দেয়। আবার আত্ম-বিশ্বাস হারাইলে ঐ বচনমধুতেই আশ্বাস দেয়। কেহ উপদেশ বা পরামর্শ চাহিতে গেলে বিজ্ঞজন একটি সমিল প্রবচন উচ্চারণ করিয়াই নীরব হইতে পারেন; উপদেশ প্রার্থী দ্বিতীয় প্রশ্ন না করিয়াই প্রসন্নচিত্তে চলিয়া যায়। সে বুঝে, ঐ সংক্ষিপ্ত বচনের অন্তরে কত বড় সত্য নিহিত আছে।

পল্লীবাসিগণের ভাষাসম্পদ প্রচুর নয়—মিল দেওয়ার কৌশলও তাহারা জ্ঞাতসারে আয়ত্ত করে নাই—অথচ মিল না দিলে তাহাদের তৃপ্তি হয় না—নিজের বচনকে অমর করিতে পারে না। তাহাদের অমার্জ্জিত ও অসম্যক্ মিলে (Uncouth Rhyme) মিলের আগ্রহ-টুকু এমনি উন্মুখ হইয়া আছে যে, যাহারা উচ্চারণ করে তাহারা মিলের ত্রুটী সারিয়া লয়। শ্রদ্ধা ও আগ্রহ চিরকালই এমনি সকল দোষ ত্রুটী উপেক্ষা করিয়াই চলে।

"রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়—উলু খাগড়ার প্রাণ যায়—"

এখানে 'যায়' ও 'হয়'—এ ঠিক মিল হইল না। অনায়াসে—'রাজায় রাজায় যুদ্ধে হায়, উলু-খাগড়ার প্রাণ যায়," এইরূপ মিল কেহ চালাইতে পারিত—কিন্তু তাহা কেহ করে নাই বা করিতে সাহস করে নাই। সিন্দুর-চন্দনলিপ্ত ভগ্নপাণি দারুবিগ্রহের ন্যায় ঐ প্রকার অশিষ্ট-মিল বচনগুলি অমার্জ্জিত অসংস্কৃত রূপেই আবহমান কাল চলিয়া আসিতেছে।—মিলে ত্রুটী থাকুক—মিলের আগ্রহে ও উচ্চারকের শ্রদ্ধায় কোন

ত্রুটী নাই। পূর্ণাঙ্গ মিল বাণীকে ত অমর করেই, মিলের আগ্রহনিষ্ঠাও বাণীর জীবনীশক্তি বাড়াইয়া দেয়—মিলের সম্পূর্ণ দায়িত্বময় কর্ত্তব্য অশিষ্ট মিলও সম্পাদন করিতে পারে।

মিল আমাদের জনসাধারণের জন্য শুধু শাস্ত্র গড়ে নাই,—শস্ত্রও গড়িয়াছে। তাহারা জানিত,—সাধারণ অমিল গদ্য গদার মত কাষ্ঠখণ্ড মাত্র, দেহের মাংসপেশীর উপরই তাহার যত পরাক্রম। মিলের ফলা-লাগানো পদ্যের শর ভিন্ন মর্ম্মস্থল ভেদ করা যায় না। তাই তাহারা ঐ প্রকারের তীক্ষ্ণ শরে তূণগুলি ভরিয়া রাখিয়াছে। প্রতিপক্ষকে নির্ব্বাক করিতে ঐ শর-প্রয়োগের ব্যবস্থা বরাবর চলিয়া আসিতেছে।

এমন কতকগুলি ছড়া প্রবচন আমাদের পল্লীসমাজে প্রচলিত আছে,—যাহাদের অন্তরে মিলের পুটে শতসহস্র বৃশ্চিকের বিষ পুঞ্জীভূত আছে! এগুলির প্রয়োগ বড়ই র্ম্মান্তিক। প্রতিপক্ষ যদি অরসিক হয়, তবে ক্রোধে প্রতিহিংসায় অন্ধ হইয়া উঠে। আর রসিক হইলে তাহার ধৈর্য্যচ্যুতি হয় না—সে-ও মিল-দেওয়া ছড়ায় উত্তর দয় এবং সরোষ না হইয়া সরস সমিল বচনে প্রতিহিংসা াইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া থাকে। কাজেই এ ক্ষেত্রে মিল কটা অভিনব রসের সৃষ্টি করিয়া ক্রোধের রৌদ্ররসে সাভাস ঘটাইয়া দেয়—তখন অবিমিশ্র রোষকে আর াওয়া যায় না।

পল্লীগ্রামে দুইজন পাড়া-কুঁদুলী যখন ঝগড়া জুড়িয়া য়, তখন গ্লানির ভাষা একেবারে নিঃশেষ করিয়া প্রয়োগ রে—কিন্তু কিছুতেই হার-জিতের মীমাংসা হয় না, ত্তেজনারও উপশম হয় না, পুনঃ পুনঃ গালাগালির াবৃত্তি করিয়া রসনার ক্লান্তি আসে, কিন্তু রোষণার াস্তি হয় না। তখন ভামিনীরা ছড়া কাটিতে আরম্ভ রে। তখন বুঝা যায় এইবার শেষ হইয়া আসিয়াছে। শ্রাতাদেরও কর্ণপীড়ার তখন একটু উপশম হয়—রেক্তি ক্রমে কৌতুকে পরিণত হয়। দুইটি নারীর ীনৃত্যও যে রসসঞ্চার করিতে পারে নাই, মিল াই রসের সঞ্চার করিয়া ফেলে। তখন চণ্ডীদ্বয়ের চণ্ডিমায় । রসের আমেজ লাগে, হয় ত হাসিয়া ফেলে, পার্শ্ব-বর্ত্তিনীদের সঙ্গে কথাও কহিয়া ফেলে—কলহে ক্রমভঙ্গ হইয়া যায়, ছড়াও মুহুর্মুহুঃ জুটিয়া উঠে না,—নূতন নূতন ছড়ার কথা ভাবিতে ভাবিতে বাড়ী ফিরিয়া যাইতে হয়।

রাঢ় দেশের বালিকারা ভাদু বা ভাজোর গানের ছড়া কাটাকাটি করিতে গিয়া তীব্র শাণিত মর্ম্মান্তিক ও গ্লানিকর বাক্য নিঃশেষ করিয়াই প্রয়োগ করে—কিন্তু মিলের এমনি মাধুরী ও মহিমা যে শত অমিলের মধ্যেও বিবদমানাদের ভিতর একটা রসের মিল ঘটাইয়া ফেলে। পূর্ব্বে পাড়ায় পাড়ায় গ্রামে গ্রামে সকল বিবাদেরই এমনিতর 'মধুরেণ সমাপন' হইত। এই শ্রেণীর অপূর্ব্ব সরস বিবাদে বাঙালীর জাতীয় চরিত্রের একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য প্রকট হইয়া উঠে।

দুই পাড়া বা দুই গ্রামের কবির দলের লড়াই লাগিয়া যাইত। নিরঙ্কুশ কবি-সৈন্যগণ মুখে মুখে মিল দিয়া শাণিত অস্ত্র প্রয়োগ করিত—গাহিয়া সুরের শাণে আরো শাণিত করিয়া তুলিত। সত্য অসত্য অনেক গ্লানিনিন্দা মিলের গুণে মুখরোচক হইয়া উঠিত—প্রতিহিংসা ক্রমে 'মিলে মিলে' মিলই বাড়াইত। বিবাদটা কিল বা ঢিলের বদলে মিলের সাহায্যেই অগ্রসর হইত। মিলই যেখানে বিবাদের অস্ত্র—সেখানে অমিলটা আর স্থায়ী হইতে পারিত না। নিন্দা গ্লানি অপবাদ যতই তীব্র হউক একমাত্র মিলই প্রতিপক্ষের অন্তরে ক্ষমা ও সহিষ্ণুতার সৃষ্টি করিত। নিতান্ত অরসিক ব্যক্তি, যে মিল-দেওয়া বচনে উত্তর দিতে জানে না, সে ছাড়া অন্য কেহই অসহিষ্ণু হইত না। কবির দলে অবশ্য সে শ্রেণীর অরসিকের ঠাঁইও ছিল না। মিলের মধ্যস্থতায় গ্রাম্য বিবাদগুলিতে যে সন্ধি-স্থাপিত হইত—সে সন্ধিসূত্র সভ্যসমাজের অনেক সুস্বাক্ষরিত সুরচিত সুচিন্তিত সন্ধিপত্র অপেক্ষা মৈত্রী-বলে অধিকতর বলীয়ানই হইত।

দারুণ অভিমান অনেক সময় শ্লিষ্ট সমিল বচনের আকার লাভ করে, কিন্তু মিলের খাতিরে বচনের লক্ষ্য ব্যক্তি সে শ্লেষের জন্য ক্লেশ অনুভব করে না। উদাহরণ-স্বরূপ, "জন (কোথাও কোথাও যম) জামাই ভাগ্‌না—তিন নয় আপনা"—ইহা অভিমানের বাণী এবং রীতিমত তীব্র। এক ঢিলে দুই পাখীকে যমের বাড়ী পাঠানোর [illegible] এক মিলে জামাই ও ভাগনেকে যমের [illegible]

হইয়াছে। কিন্তু এত বড় মর্ম্মান্তিক কথাতে যে জামাই বা ভাগিনা রাগ করে না, তার কারণ বচনটিতে মিল আছে,—অমিল গদ্যে বলিলে কি অনর্থই না ঘটিতে পারে।

বাংলা দেশে পুরুষদের সংস্কৃত শ্লোকে দেবপূজা ও গার্হস্থ্য ধর্ম্মানুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীলোকদেরও বাংলা ছড়ায় একটা পূজাব্রতাদির প্রথা চলিয়া আসিতেছে। ইহা ছাড়া, মানত মানসিক পার্ব্বণাদি আছে—পতিপুত্রের কল্যাণকামনায় অনেক প্রকার ক্রিয়া-কৃত্য অনুষ্ঠানাদি আছে—মৃতবৎস্যা ও বন্ধ্যার পৃথক আরাধনা আবেদন আছে। এ সকলের জন্য একটা বিরাট শাস্ত্রসংহিতা গড়িয়া উঠিয়াছে, তার সবই বাংলা ভাষায় মিল-দেওয়া ছন্দে রচিত। ষষ্ঠী, লক্ষ্মী, শীতলা, চণ্ডী, মনসা, সুবচনী ইত্যাদি যে সকল দেবতা অন্তঃপুরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের উপাসনার ব্যবস্থা সমিল বাংলা ছন্দে।

আমাদের শুদ্ধান্তচারিণীগণ পুরুষগণ অপেক্ষা অধিকতর শুদ্ধির পক্ষপাতিনী। লোকমুখে-মুখে-উচ্ছিষ্ট ও অপবিত্র সাধারণ গদ্য-বাক্যে তাঁহারা দেবতার আরাধনা করিতে চাহেন না। সেজন্য তাঁহাদের দেবতার আরাধনার জন্য মিলবন্ধনে পবিত্র ছন্দিত বাক্যের প্রয়োজন হইয়াছে। তাঁহাদের "আবেদন নিবেদনের থালাগুলি" সমিল বচনের শুভ্রশুচি নৈবেদ্যে পূর্ণ। মিল তাহাদের পক্ষে কেবল শ্রুতি-বিনোদক নয়, শ্রদ্ধা ভক্তিরও উদ্বোধক। উপাসিকাগণ প্রত্যাশা করেন মিল-দেওয়া বচন দেবতার চিত্ত সহজে বিগলিত করিবে। মিলই গার্হস্থ্য তন্ত্রমন্ত্র-সংহিতার মধ্য দিয়া আমাদের অন্তঃপুরিকাগণের ভক্তিধারাকে বহমান রাখিয়াছে। নিরক্ষর পল্লীগৃহিণীগণ মুখে মুখে শিখিয়া কন্যা-বধূদের শিখাইয়া উপাসনা-পদ্ধতিকে অবিকৃত ভাবে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। মিল না থাকিলে ছড়াবচনগুলি মন্ত্রের মর্য্যাদা লাভ করিত না,—সহজে শিখিয়া অপরকে শিখানো ও সহজে মনে রাখাও সম্ভব হইত না।

বালিকা-বয়স হইতেই আমাদের গৃহিণীদের মিলের অনুশীলন চলিয়া আসিতেছে। বালিকারা সমিল বচনেই পুণ্যিপুকুর, গোকল, যমপুকুর ও সাঁজপুজুনীর ব্রত করে—পুতুলের সোহাগ করে,—ছোটভাইকে ঘুম পাড়ায়, ভাইএর কপালে ফোঁটা দেয়, শিবঠাকুরের তিন বৌএর ভাগ্যা-ভাগ্যের কথা শোনে, আপন আপন ভবিষ্যৎসংসার ও গৃহস্থালীর পূর্ব্বাভাস লাভ করে। জীবনের মিলটা তাহাদের তাড়াতাড়িই জোটে, তাই শিশুকাল হইতে মিলের চর্চ্চা করে—শুধু পুতুলের বিবাহ দিয়া নয়—কথায় কথায় বিবাহ দিয়াও। মিলের মালমশলায় একটা স্বপ্নপুরী গড়িয়া রাখে, বিবাহের আগে ভাবে ঐ স্বপ্নপুরীরই বুঝি সে পরী বা রাণী হইবে। বিবাহের পর নববধূ শ্বশুর-বাড়ী যাইবার সময় রাশি রাশি যৌতুকের সঙ্গে রাশি রাশি মিলের কৌতুক সঙ্গে লইয়া যায়। যৌতুক গুলি সকলে লুটিয়া লয়—সম্বল থাকে ঐ কৌতুকগুলি। অপরিচয়ের মাঝখানে নূতন সংসারে বিজনে বসিয়া সেইগুলিকে মৃদুগুঞ্জনে আবৃত্তি করে অথবা শিশুদেবরকে সেগুলি শুনাইয়া নীরস নিরানন্দ সন্ধ্যাগুলি কাটাইয়া দেয়। স্বামীর সহিত হৃদয়ের মিল হওয়ার আগে পর্য্যন্ত শব্দের মিলই তাহার জীবনটিকে সরস রাখে।

জানি না শিশু কোন্ চির মিলনের দেশ হইতে এই অমিলের দেশে আসিয়া পড়িয়াছে। এখনো সেই দেশের স্মৃতি তাহার প্রীতি ও শ্রুতি ভরিয়া আছে। মিল দেখিলেই তাহার দীল খুশী হইয়া উঠে। সে অবাক হইয়া ভাবে এখানে এত অমিল কেন? এত অমিলের মধ্যেও শিশু একটা মিলের জগৎ সৃষ্টি করিয়া লইয়াছে—তাহার ভাবের অভাব নাই—কিন্তু ভাষার পুঁজি বড় কম। শিশুর কাছে সকল শব্দই প্রায় সমান, সকলগুলিই ধ্বনি-ধনে সমান ধনী, লোকে কতকগুলির অর্থ দিয়াছে—কতক গুলির দেয় নাই অথবা কতকগুলির অর্থ বোঝে, কতক-গুলির বোঝে না। তাহাতে শব্দের বা ধ্বনির অপরাধ নাই। ধ্বনি মাত্রেই শিশুর কাছে সার্থক—অর্থের জন্য নহে মাধুর্য্যের জন্য। শিশু-কবি মিল-ঝঙ্কারের এত পক্ষপাতী যে, মিলটি বজায় রাখিয়া যে কোন ধ্বনির দ্বারাই সে ছন্দ পূরণ করিয়া লইয়াছে—অর্থের জন্য একটুও চিন্তা করে নাই। "ঘণ্টা কাঁসর সানাই বাজে"—এমন যে বাদ্য বাজে—নিশ্চয়ই কেউ সাজে,—নতুবা এত বাদ্য কেন? কিন্তু কে সাজে? শিশু নিঃসঙ্কোচে বলে 'আগাডুম—বাগাডুম ঘোড়াডুম' সাজে। আগাডুম ঘোড়াডুমের অর্থ

না থাক্—ধ্বনি আছে—মিলের প্রয়োজন সাধন করিয়াছে ইহাই যথেষ্ট। বাঁশ যে—"ছোটবেলায় কাপড় পরে—বড় হলে ন্যাংটা" এ বড়ই অদ্ভুত—নগ্নশিশুর পক্ষে এ বড় মজার কথা। ইহাতে শিশুর প্রাণে ঢাকাঢোল বাজিয়া উঠে। শিশু বলিয়া উঠিল—'ড্যাং ড্যাং ড্যাং ড্যাংটা'। মিলের জন্য একটি নিরর্থক 'টা'এর আমদানী হইয়াছে, আর আনন্দের ধ্বনি ঐ 'ড্যাং'কেই চারিবার উচ্চারণ করিয়া পদপূরণ করিয়া লইয়াছে।

শিশু সব সময় দুই পংক্তি পূরণ করিয়া লইবারও প্রয়োজন বোধ করে নাই—মিল হইলেই যথেষ্ট। "মোষ,—তোর গোদা পায়ে খোস্" "হাতী, তোর গোদা পায়ে লাথি।" মহিষ যদি বলে—"তুমি অন্যায় বল্‌ছ—আমার পা একটু গোদা বটে—কিন্তু আমার পায়ে খোস্ ত নাই, গাল দেবে দাও, মিথ্যা কথা বলো না।" শিশু বলিবে—"তোমার খোস হয়েছে কি না হয়েছে আমি জানি না, তুমি যখন মোষ,—তখন অবশ্যই তোমার পায়ে খোস্—তোমার পায়ে খোস না থাকাটাই সত্য হলো—তোমার সঙ্গে খোসের যে এমন মিল হয়, সেটা বুঝি মিথ্যে?—তুমি গোরু হ'লে নিশ্চয়ই ও কথা বল্‌তাম না।" হাতী কিছুই না বলিতে পারে—সে শিশুর কচি পায়ের লাথি পাইয়া ধন্য হইয়া বুঝিয়া ফেলে মিলের লোভই শিশুকে এতটা সাহসী করিয়াছে। তবে বাদুড় বলিতে পারে—"আমি যা খাই—তা তেঁত না হয় হলো, কিন্তু খুকুমণি তোমার 'মেঁতো'টা কি?" শিশু বলিবে—"মেঁতো'টা যে কি তা' আমি জানি না—তবে ওটা খুবই দরকারী। ওটা ছাড়া আমি তোমার মিষ্টি মিষ্টি আম-তাল-লিচুকে কিছুতে যে তেঁতো করতে পারি না।" হনুমানকে শিশু যে সম্ভাষণ করিয়াছে—তাহাতে অক্ষরের মিলই আছে, বক্তব্য বিষয়গুলিতে আদৌ মিল নাই। কলা খাওয়ার সঙ্গে জগন্নাথ দেখিতে যাওয়ার—বিশেষতঃ 'মাইতো বৌএর' বাবা হওয়ার কোন সম্বন্ধ বা অর্থ-সঙ্গতি না থাকিলেও পশু কপিবর শিশু কবিবরের কবিত্ব নীরবে উপভোগ করে।

এক ঢিলে দুই পাখী মারার কথা আছে। শিশু কিন্তু একমিলে একটিকে মারিয়াছে—অন্যটিকে আদর করিয়াছে।

"শঙ্খচিলের মাথায় ছাতি—গোদা চিলের মা[illegible] লাথি।" গোদাচিল যতই চীৎকার করুক, মিল য[illegible] ঠিক আছে তখন শিশুর রায় বদলাইবে না।

সুর্য্যিমামা ও চাঁদামামা ছাড়া শিশুর যে মানুষ-মা[illegible] আছে, তার বাড়ী যাওয়ার জন্য শিশু তিন বার 'তা[illegible] দিয়াছে—একবার 'তাই'এ মামার বাড়ীর সম্ভাবিত আদ[illegible] উল্লাস প্রকাশ পাইতে পারে না। "মামার বাড়ী যাই-তার পরই মামীর অনাদরের প্রতিফলস্বরূপ তাহার দুয়া[illegible] অপবিত্র করিয়া 'যাই'। 'তাই'এর এখানে দুইবার 'যা[illegible] এর সঙ্গে মিল আছে। 'যাই'এর সঙ্গে 'যাই'এর আবা[illegible] মিল কি? আমরা দোষ ধরিতে পারি, কি[illegible] শিশুরও উত্তর আছে—"এই দুই 'যাই'ত এক নহে—একবার সোল্লাসে মামার বাড়ী যাই—তারপর ক্ষুণ্ণ হই[illegible] মামার বাড়ী হইতে নিজের বাড়ী যাই—এই দুই যাওয়া [illegible] এক নহে।

শিশু, চন্দ্র, সূর্য্য, মেঘ, বাদল, বৃষ্টি, ঝড়, তরুলতা, পশু পক্ষী—এক কথায় প্রকৃতির সংসারের সকল পরিজনের সঙ্গেই সমিল প্রলাপে (?) আলাপ পরিচয় করিয়া থাকে। সে বচনে না আছে অর্থসঙ্গতি—না আছে ভাবসামঞ্জস্য, না আছে সাহিত্যব্যাকরণের সম্বন্ধ,—আছে কেবল মিলের ধ্বনিরই প্রাধান্য।

শিশু যে দিনান্তে মাতৃঅঙ্কে ঘুমাইয়া পড়ে, তাহা ঐতিহাসিক বর্গীর ভয়েও নয়—কাল্পনিক জুজুর ভয়েও নয়—'ল্যাজ ঝোলার' ভয়েও নয়—মিলের মাধুরীই কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া তাহার নয়ন মুদাইয়া দেয়। শিশু খেলায় মাতে মিলের কৌতুকে, প্রথম পা ফেলিতে শেখে মিলের তালে তালে—নৃত্য করে মিলের করতালিতে। মিলই প্রথম তাহার হাতে-খড়ি দিয়া বর্ণ পরিচয় করায়। মিলের মাধুর্য্যই মসীর বর্ণমালা তাহার কণ্ঠে শশীর স্বর্ণমালা হইয়া শোভা যায়।

ভাষার মিলন ঝঙ্কারের প্রতি শিশুর অহৈতুকী মমতা দেখিয়া মনে হয়—এই মাধুর্য্যবোধক্ষমতা, সৌন্দর্য্যবোধ শক্তির ন্যায় মানুষের সহজাত। শিশুর অন্তুরিতচিত্তে উহা প্রচ্ছন্ন থাকে—উহা তাহার আত্মার অঙ্গীভূত। অনুশীলন করিলে বয়োবৃদ্ধির সহিত ঐ শক্তি বাড়িয়া [illegible]

ক্রমে ছন্দোজ্ঞানে পরিণত হইয়া কবিত্বে পূর্ণাঙ্গ হইতে পারে।—প্রত্যেক শিশুর অন্তরে মিলের প্রীতির অন্তরালে কবিত্বশক্তি প্রচ্ছন্ন থাকে—অনুকূল ব্যবস্থা, শিক্ষার ব্যবস্থা দীক্ষার সুযোগ সুবিধা ঘটিলে কালে প্রবুদ্ধ হইতে পারে। মানুষ কণ্ঠস্বর লাভের সঙ্গে সঙ্গে স্বরের বৈচিত্র্য অনুভব করিতে শিখিয়াছে। শ্রুতিশক্তির ক্রমবিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সে বৈচিত্র্যের মাধুর্য্য ও উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করিয়াছে। কণ্ঠস্বরের বৈচিত্র্যবোধের ফলে যখন তাহার ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে—তখনি যে ধ্বনির সঙ্গে ধ্বনির মিলে অজ্ঞাতসারে আনন্দ অনুভব করিয়াছে।

বর্ব্বরতা হইতে মানবসভ্যতার উদ্বর্ত্তনের সকল স্তরেই সঙ্গীতমাধুর্য্যবোধের সঙ্গে সঙ্গে ছন্দ ও মিলের প্রতি আজন্ম-সিদ্ধ প্রীতি দৃষ্ট হয়। ধ্বনির সহিত অর্থের ধ্রুব সম্বন্ধ নির্ণয়ের আগে, বাগর্থের সংপৃক্তি নির্দ্দেশের আগে—অক্ষর ও লিখন পদ্ধতি আবিষ্কারের বহু আগেই মানুষ যেমন গান গাহিতে জানিত, ঝঙ্কার-মাধুরী উপলব্ধি করিত, তেমনি ছন্দের মাধুর্য্যও বুঝিত, মিলের মাধুর্য্যও উপভোগ করিতে পারিত।

আমরা যেমন করিয়া শব্দবিন্যাসে ছন্দ গঠন করি, ঠিক তেমনই করিয়া তাহারা ছন্দোগঠন করিতে পারিত না সত্য—কিন্তু পাখীর গানে,পশুর কণ্ঠস্বরে,নদীর কলধ্বনিতে, বাতাসের প্রবাহে,—ভ্রমরাদির গুঞ্জনে, প্রকৃতির রাজ্যের সহস্র ধ্বনিপ্রতিধ্বনিতে যে সকল ছন্দ অনবরত ঝঙ্কৃত, সেগুলিকে তাহাদের কর্ণ অবশ্যই ধরিয়া ফেলিত। কেবল শ্রবণপুটে তাহার মাধুর্য্যটুকু পান করিয়াই নিরস্ত হইত না, মাধুর্য্যটুকু বার বার লাভ করিবার জন্য—অর্থহীন ভাষায় তাহার মুহুর্মুহুঃ অনুকরণ করিত!

শিশু যেমন কোকিলের কুহুধ্বনি শুনিয়া উচ্চকণ্ঠে তাহার অনুকরণ করে—অসভ্য মানুষ তেমনি প্রকৃতির সকল ছন্দই উচ্চকণ্ঠে আবৃত্তি করিত। আবার কথা কহিতে কহিতে কতকগুলি ধ্বনির আকস্মিক মিলন যখন শ্রুতিমধুর হইয়া উঠিত—তখন তাহারা সহসা সংঘটিত সেই মিলনের মধ্যে অবশ্যই বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য অনুভব করিত। তখন তাহা শ্রুতি হইতে স্মৃতিতে যাইয়া স্থায়ী আসন লাভ করিত—অথবা তাহারা সেই ধ্বনি-সমবায়কে উচ্চকণ্ঠে গাহিয়া অমর করিয়া ফেলিত। শব্দের ও ধ্বনির ঐ আকস্মিক সমবায়ে শব্দে শব্দে যখন সহসা মিলিয়া যাইত—তখন তাহারা যে মিলনকে উপেক্ষা করিতে পারিত না, যে বাক্যগুলিতে ঐ মিল থাকিত সে বাক্যগুলিকে সুভাষিত ও দুর্ল্লভ মনে করিয়া মুখে মুখে বাঁচাইয়া রাখিত।

এইভাবে নিরক্ষর অসভ্য মানুষের মধ্যে সর্ব্বদেশে এবং সর্ব্বকালে একটা অলিখিত অপঠিত অমার্জ্জিত সহসা-ঘটিত অযত্নলব্ধ কাব্যসাহিত্য প্রধানতঃ মিলকেই অবলম্বন করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। সেগুলি চিরজীবনের সঙ্গী হইয়া অন্ধকারে জোনাকীর মত তাহাদিগকে যুগপৎ আনন্দ ও আলোক দান করিয়াছে। মানবাত্মার সহজাত মিলন-তৃষ্ণা যেমন মানবজাতির কুল-গোষ্ঠী-সমাজ-রাষ্ট্রাদি গঠনে অভিব্যক্ত হইয়াছে—মানবচিত্তের সহজাত শাব্দিক মিল-প্রীতিই তেমনি ক্রমে সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়া মানব-সভ্যতাকে এত ঐশ্বর্য্যশালিনী করিয়াছে।

প্রকৃতি ও প্রেম

শিশু-কবি স্বপ্ন দৃষ্টি দিয়া বিশ্বের পানে চাহে। সেই চাওয়ার ফল তাহার মনের মণিকোঠায় জমা হইতে থাকে। তাহাই হয় পরে তাহার রসসৃষ্টির উপাদান। শিশুর অন্তরে সৃষ্টিশক্তি তখনও প্রসুপ্ত বা অঙ্কুরিত—দৃষ্টি কিন্তু একেবারে বিস্ময়-বিস্ফারিত—কৌতূহলোজ্জ্বল। যৌবনের সঙ্গে সঙ্গে যেমন সৃষ্টিশক্তির উন্মেষ হয়, অমনি চারিপাশে রাশীকৃত রসোপাদান সে সঞ্চিত দেখিতে পায়।

সৃষ্টিশক্তির উন্মেষ হয় কিন্তু সৃষ্টির সে আহরণী শক্তি আর থাকে না। এই বিশ্ব সংসারে নূতন অতিথি রূপে এই সৃষ্টিকে সে যে দৃষ্টিতে দেখিয়াছিল—সে দৃষ্টি আর থাকে না। সে বিস্ময়, সে কৌতূহল আর জাগে না—সৃষ্টির অপূর্ব্বতা ম্লান হইয়া যায়—বারং বার উপভুক্ত হইয়া প্রকৃতির কত অঙ্গেরই সরসতা নষ্ট হইয়া যায়—অতিপরিচয়ের গ্লানি সকল দৃশ্যেরই মাধুর্য্য হ্রাস করিয়া ফেলে। তাহা ছাড়া, উপভোগের জন্য একটা ব্যাকুলতা এমনি তীব্র হইয়া উঠে যে আর সঞ্চয়ের দিকে দৃষ্টি থাকে না। শৈশবে থাকে মনোভাণ্ডার শূন্য, প্রকৃতি দুই হাতে মনোভাণ্ডার তাই পূর্ণ করিয়া দেয়। শৈশবে

মনের সকল দ্বার বাতায়ন থাকে খোলা—অবাধে সৃষ্টির সকল বৈচিত্র্য সহজে মনে প্রবেশ করিতে থাকে।

শৈশবে বোধশক্তিও পরিপুষ্ট হয় না। তাই শিশুর মনের দুয়ারে কোন প্রহরী থাকে না। প্রকৃতির রাজ্য হইতে যে কেহ আসে সকলেই নির্ব্বিচারে প্রবেশ পায়। বোধশক্তি প্রখর হইয়া উঠিবামাত্র সে মনের দুয়ারে প্রহরী হইয়া দাঁড়ায়, ছাড়-পত্র চায়, নির্ব্বিচারে প্রবেশ করিতে দেয় না, কত জনাকে বিদায় করিয়া দেয় নির্ম্মম ভাবে,—সে বাছিয়া বাছিয়া তবে দেয় প্রবেশাধিকার। আর যাহাকে সে প্রবেশাধিকার দেয়, তাহার সরসতাও সে নষ্ট করিয়া ফেলে পরীক্ষা-বিচারে। এই বুদ্ধির সঙ্গে যখন বিদ্যা আসিয়া জুটে—তখন প্রকৃতির সকল আত্মীয়তার বন্ধন দেয় ছেদন করিয়া—সকল প্রীতিবিনিময় দেয় বন্ধ করিয়া।

নিসর্গের সহিত কবির যতটুকু আত্মীয়তা তাহা শিশুকবি শৈশবদোলায় দুলিতে দুলিতেই লাভ করে। তাই যৌবনে কবির যে সকল রচনায় নিসর্গ-মাধুরী পরিস্ফুট তাহাদের উপাদান উপকরণ সবই শৈশবের স্বপ্ন যৌবনেই আহৃত—স্মৃতিপুটে সঞ্চিত।

"শৈশবের সেই সঞ্চয়ই আজ পুঁজি আমার যৌবনে,
আজকে আমার আঢ্যতা তাই তারই উপঢৌকনে।
তরুণ প্রাণের অনুভূতি আগ্রহ বিস্ময় আকূতি
তাজা আছে স্মৃতির পুটে তপ্ত শোণিত-রঞ্জনে,
লক্ষ্মীছাড়া যৌবনে আজ ধনী আমি সেই ধনে।

নিসর্গশ্রীর কণ্ঠে ছিল তখন বাহুর আলিঙ্গন
লতায় পাতায় রবি-তারায় পেতাম সদাই আমন্ত্রণ।
হইনি তখন সুকৌশলী ছিলাম কেবল কৌতূহলী,
ব্যয় ছিল না, কেবল ছিল সঞ্চিত ধন সংগোপন,
আজ তাদের এ শিল্প-শালায় পাচ্ছি ফিরে অনুক্ষণ।

নদীর জলে কলার ভেলায়, ঝুলন-দোলের উৎসবে,
ছেলেবেলার ধূলা-খেলায়, বন বাগানের সৌরভে,
যে মাধুরী যে সুষমা পেলাম, তাহার সবই জমা
হারায়নিক একটি কণা। আজকে স্মৃতি-গৌরবে
যৌবনে মূলধন করেছি শৈশবের [illegible] বৈভবে।

গন্ধ শোভা গানে বোঝাই নৌকা কত আজ ভিড়ে
রঙিন আশায় পাল তুলে ঐ যৌবনের এই মনতীরে।
কল্পনারা উড়ে উড়ে জুটছে আমার চিত্ত জুড়ে,
বাল্য-স্বপন ভিড় করে রয় আমার কলা মন্দিরে।
বাল্য-স্মরণ হতেই রসের মন্দাকিনী বয় ধীরে।

হারায়নিক শিশু-শোকের অশ্রুবারি এককণা,
শুকায়নিক কুহেলিকায় কোন কোরক-কল্পনা।
হাসির ধ্বনি ক্ষীণ অতি ক্ষীণ দিগন্তে তাও হয়নি বিলীন,
যৌবনের এ তন্ত্রীতে আজ লভে সবাই মূর্চ্ছনা,
ছন্দে লভে ঝঙ্কৃত রূপ,—বর্ণে অভিব্যঞ্জনা।

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এই কথাটি কিন্তু সম্পূর্ণ খাটেনা। এই সৃষ্টির যে অপূর্ব্বতা, এই প্রকৃতির যে বৈচিত্র্য ও মাধুর্য্য বুদ্ধিবৃত্তির উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে, শৈশবাত্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে বিলুপ্ত-প্রায় হইয়া যায়—অতিপরিচয়ের গ্লানি যাহাকে ম্লান করিয়া দেয় রবীন্দ্রনাথের জীবনে—তাহা কোন দিনই নষ্ট হয় নাই বলিয়া মনে হয়। যে রসলক্ষ্মী 'লীলা-সঙ্গিনী'রূপে প্রকৃতির মাধুর্য্য সম্ভারে শিশু রবীন্দ্রনাথের অঞ্চল ভরিয়া দিয়াছিলেন—সেই রস-লক্ষ্মী 'বিচিত্রা মানস সুন্দরী'রূপে পরবর্ত্তী জীবনেও তাঁহার কলা মন্দিরে নিত্য নূতন রসোপাদান যোগাইয়া চলিয়াছেন। এই সৃষ্টি তাঁহার নয়নে জীর্ণ ভুক্তশেষ হইয়া উঠে নাই—প্রকৃতি তাঁহার কাছে অতিপরিচয়ের ঔদাসীন্য লাভ করে নাই।

কেন হয় নাই তাহা বলা কঠিন। হয়ত তিনি এই সৃষ্টির সহিত অতিপরিচয়ের ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করেন নাই—হয়ত তিনি চিরদিন এই সংসারের ধূলিক্লিষ্ট পথের জনতাকে এড়াইয়া চলিয়াছেন,—হয়ত তিনি বাতায়নে বসিয়া দ্রষ্টার রূপেই জীবন কাটাইয়া দিলেন—হয়ত তিনি তাঁহার বোধবৃত্তিকে চিরদিনই রসলক্ষ্মীর বশীভূত ভৃত্য করিয়া রাখিতে পারিয়াছেন,—অথবা হয়ত তিনি লোকালয় হইতে বহুদূরে স্বপ্নবিলাসের জীবন কাটাইতে পারিয়াছেন বলিয়া ইহা সম্ভব হইয়াছে।

তবু একথাও সত্য—তাঁহার জীবন-স্মৃতিও সাক্ষ্য দেয়, —রসলক্ষ্মী 'লীলা সঙ্গিনী'রূপে শৈশবে তাঁহাকে যে দৃষ্টিতে এই সৃষ্টিকে দেখাইয়াছে—সেই দৃষ্টিই তাঁহাকে [illegible] লাভবান্ করিয়াছে। যে রসোপচার তিনি [illegible]

আহরণ করিয়াছেন, তাহাই তাঁহার সবচেয়ে বড় সম্বল—বয়োবৃদ্ধি ও বোধশক্তির বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আহরণধারা রুদ্ধ হয় নাই বটে, কিন্তু ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর যে হইয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই—সে কথা কবি বহু কবিতাতেই স্বীকার করিয়াছেন।

প্রেমের সম্বন্ধে কথা স্বতন্ত্র। যৌবনের প্রারম্ভে আসে প্রেম। যৌবনে কবিকে সৃষ্টির উপকরণ ও প্রেরণা যোগায় প্রেম। প্রেমের স্ফুরণে আর একবার সৃষ্টিকে মধুময়ী লাগে—সৃষ্টির সে মাধুর্য্য প্রেমেরই অঙ্গীভূত। কিন্তু যেমনই উপভোগের ব্যাকুলতা জাগিয়া উঠে—সৃষ্টি দূরে সরিয়া যায়—প্রেম কবিকে ভোগমগ্ন করিয়া তুলে। কবি যদি উপভোগে মগ্ন হ'ন, তবে রসসৃষ্টির জন্য আর আগ্রহ থাকে না। উপভোগ সৃষ্টির উপকরণ-সংগ্রহেরও প্রধান অন্তরায়। সৃষ্টি ও উপভোগ দুই-ই একসঙ্গে চলিতে পারে না—তাই চাই বিরহ, চাই ক্লান্তি—চাই কল্পনার লীলার অবসর। শেষ যৌবনের প্রেমকাব্যই—শ্রেষ্ঠ প্রেমকাব্য। বিরহের কাব্য—প্রেমস্মৃতির কাব্যই অপূর্ব্ব কাব্য।

উপভোগের তন্ময়তায় যে সৃষ্টির উপকরণ-সংগ্রহে বাধা জন্মে তাহা কবির খেদোক্তি হইতে জানা যায়—

"কত ফুল নিয়ে আসে বসন্ত আগে পড়িত না নয়নে,
তখন কেবল ব্যস্ত ছিলাম চয়নে।
মধুকর সম ছিনু সঞ্চয় প্রয়াসী
কুসুম কান্তি দেখি নাই, মধু পিয়াসী,
বকুল কেবল দলিত করেছি আলসে
ছিলাম যখন নিলীন বকুল শয়নে।"

মধুকরসম সঞ্চয় উপভোগেরই নামান্তর।

ইহার প্রতিধ্বনি চারিদিকেই শোনা যায়—

"ব্যর্থ অসার বিফল আমার যৌবনের সব আহরণ,
রত্নকোষে যত্নভরে সঞ্চয়ে আজ নেইক মন।
নির্ম্মম সম্ভোগের তৃষা তৃপ্তি খুঁজে দিবস নিশা,
আবাহনের সাথেই আজি কই বিদায়ের সম্ভাষণ,
কোন কাজেই লাগল না হায় যৌবনের এই উপার্জ্জন।

ক্ষুধিত এই অন্তরে আজ একটি কণাও দরদ নাই,
বেদরদী দৃষ্টি দিয়া হয়না কোন সৃষ্টি টাই।
মক্ষী-জীবন হেলায় ত্যজি প্রজাপতির মতন মজি,
যৌবন আমার যোগাল না সৃজন উপকরণ তাই,
তুলী হাতে শৈশবের সেই স্বপ্নলোকের পানে চাই।

তাই সম্ভোগ-রত কবিকে ডাকিয়া বলিতে হয়—

জাগো—ও মধুকর বেলা গেল, মধু-লেহন সাঙ্গ কর,
মূক— কুঞ্জবন মুখর করি এবার গুঞ্জরণটি ধর।
একা ফুলের নওক প্রিয়,
মোদের দিকেও দৃষ্টি দিও,
তুমি—নিতে নিপুণ, দিতে কৃপণ ধরণ তোমার কেমনতর?
জান না কি ফুলের বুকে গুঞ্জরণই যোগায় মধু?
না গুঞ্জিলে কুঞ্জবনে কুসুম কি আর ফুটবে বঁধু?
মগ্ন তুমি ভোগ-বিলাসী,
মোরাই রব উপবাসী?
বঁধু— যশের মধু মিলবে যদি রসের মধু না বিতর?

ভোগমগ্নতায় সৃষ্টি হয় না সত্য—কিন্তু নিঃশব্দে জীবনের তলে তলে সৃষ্টির উপকরণ পুঞ্জীভূত যে হয় না তাহা নহে। তাহা যদি না হইত প্রেমের স্মৃতি অপূর্ব্ব কাব্যের রূপ ধরিতে পারিত না।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

মীনা অল্প ক'দিনের জন্য হাজারীবাগে গিয়েছিল, সেখানে যাবার ক'দিন পরেই প্রভাতের চিঠি পেলে যে পরেশ বাবুর স্ত্রী সুষমার সঙ্গে নন্দার মা রুক্মিণীর দিন রাত গোলমাল চলছে। প্রভাত নূতন বাড়ী খুঁজছে। অতএব প্রভাতের দ্বিতীয় চিঠি পাওয়ার আগে সে যেন চলে না আসে।

চিঠিটা পড়ে মীনা কিন্তু একটু মনমরা হয়ে গেল। আর দুএকদিনের মধ্যেই প্রভাতের কাছে যেতে পারবে এই জেনে সে খুব খুসী হয়েই ছিল—এখন সেই যাওয়া, অনিশ্চিতের মধ্যে পড়ে গিয়ে তার সে সব উৎসাহ নিভে গেল।

বাড়ী ভাড়া হয়ে গেলে প্রভাত মীনাকে লিখলে "তুমি এইবার প্রস্তুত থেকো বাড়ী বদ্‌লানো হয়ে গিয়েছে, দুএক দিনের মধ্যে তোমার আসার ব্যবস্থা করছি।" চিঠিটা ডাক বাক্সে ফেলে দিয়ে খুব জোর পায়ে হেঁটে চল্‌লো—খুব দরকার না হলে ট্রামে বা বাসে সে চড়তো না। 'মানুষ গড়ে ভগবান্ ভাঙেন্' এই কথাটা সফল হবার সময় প্রভাতের জীবনে এসেছিল, তাই 'ফুট পাথে' চলা সত্বেও, অন্য 'ফুটে' যাওয়ার সময়, গলির ভিতর থেকে একটা বাস উল্কার মত বেরিয়ে এসে তাকে ছিট্‌কে মাঝ রাস্তায় ফেলে দিলে—সেখান দিয়ে তখন ট্রাম ও অগুণতি মোটর, বাস ও ঘোড়ার গাড়ীর ছুটোছুটী। তাদের ভিড় থেকে যখন প্রভাতের দেহটা নজরে পড়তে লাগলো, তার অনেক আগেই প্রাণ তার বেরিয়ে গিয়েছে—রাস্তার মাঝে মাঝে জল কাদার সঙ্গে জমাট রক্ত মিশে গিয়ে ভীষণ হয়ে ফুটে রইলো। যথারীতি, পুলিশ, ডায়েরী, মেডিক্যাল কলেজ সব ঘুরে প্রভাতের দেহটা 'মর্গে' গিয়ে পৌঁছুলো।

বাড়ীতে তখন প্রভাস একাই ছিল—ঘণ্টা দুই পরে টেলিফোন হল—খবরটা তার কাছে অস্পষ্ট রকম পৌঁছুলো। পাগলের মত হয়ে ছুটে সে প্রণবের আফিসে গেলো—সেখান থেকে দুই ভাইয়ে মিলে মেডিক্যাল কলেজ! সেখান থেকে খবর নিয়ে 'মর্গে'। পরে যা করণীয় ছিল, দুই ভাইয়ে মন্ত্রমুগ্ধের মত করে যখন বাড়ী এল, তখন তাদের মুখের ভীষণতা দেখে কেউই এগিয়ে জিজ্ঞাসা করতে সাহস পেলে না যে তাদের কি হল? কেনই বা প্রভাস বাড়ী থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল?

পরের দিন খাওয়া দাওয়া সেরে বারান্দায় বসে মীনা ও মলিনা ছেলেমেয়েদের ঘুম পাড়াচ্ছিল। এমন সময় প্রভাস এল। তাকে দেখ মীনা বললে—"কেমন আছেন সব?—বাবা কেমন?"

সংক্ষেপে "সব, ভাল" এই উত্তর দিয়ে প্রভাস বল্লে "আপনি আজ যেতে পারবেন বউদি? আপনাকে নিতেই এলাম!"

হেসে সে বললে "কেন পারবো না? আমি কবে থেকে গুছিয়ে বসে আছি! এই দেখ না, [illegible] কলকাতার চিঠি পেলাম, তাতেও আমার [illegible]

নিভৃতে

শিল্পী—শ্রীচারু সেন।

লক্ষ্মীবিলাস প্রেস লিমিটেড, কলিকাতা।

কথাই লেখা আছে। তুমি বস—আমি আস্‌ছি! বলে সে বেরিয়ে গেল।

আর একদিন থাকবার জন্যে শুভ্রাংশু প্রভাসকে অনেক করে বল্‌লেন, কিন্তু সে আর থাকতে চাইলে না। রাত্রে গাড়ীতে উঠবার সময়েও প্রভাসের সেই গাম্ভীর্য্য রইলো—মীনা তার ভাবগতিক দেখে ঘাবড়ে যাচ্ছিল।

শেষে যখন পরিচিত বাড়ীর দরজাটা দেখা গেলো মীনা দেখলে প্রভাত সেখানেও নেই। প্রভাসের হাজারিবাগ যাওয়া থেকে আরম্ভ করে এ পর্য্যন্ত তার বিস্ময়ের খোরাক অনেকই জুটেছিল—কিন্তু কিছুই সে জান্‌তে পারছিল না।

মীনাকে এ সংবাদ জানাবার জন্যে রুক্মিণী তৈরী হয়েই ছিলেন; দরজার কাছে গাড়ী থামলো, শব্দ পেয়ে তিনি নেমে এলেন; মীনাকে দেখেই তিনি চীৎকার আরম্ভ কর্‌লেন! ঘরের দরজার কাছে যখন সে পৌছিয়েছে, তখন রুক্মিণীর বিলাপের মধ্যে দুটী কথা তার কানে ভাল করেই পৌছে গেল। "বাবারে প্রভাতরে, তোর বউ আজ ঘরে এলো, তুই কোথায় গেলি!" আর শোনার বা জিজ্ঞাসার কিছু দরকার হলো না। চৌকাটে পা বেধে মাথাটা ঘুরে গিয়ে সে পড়ে গেল। এক মুহূর্ত্ত চোখ মুখ সব ঝাঁ, ঝাঁ, করে উঠ্‌লো—তারপরে সব অন্ধকার হয়ে তার চেতনা হারিয়ে গেল।

তার এই ভাগ্য পরিবর্ত্তনের সংবাদ যথাসময়েই হাজারিবাগে পৌছেছিল। শুভ্রাংশু বল্‌লেন "আমাদের ভুলের প্রায়শ্চিত্ত ভগবান বুঝি মীনুর ওপর দিয়ে তুলে নিচ্ছেন।" যতীও শুনলে—বললেনা কিছুই—শুধু ভাব্‌লে তার জীবন্ত প্রতিমার এ সমাধি হল কেন? কয়েক বৎসর আগে যে সংসারে শুধু হাসি, গান ও গল্প ছাড়া আর কিছুই ছিলনা—সে সংসারে উপরি উপরি শোকের আঘাতে মানুষ ক'টার অর্দ্ধ মৃত অবস্থা হলো।

চারিদিকে যখন এইরকম রুক্ষতা, সরসতা মিরে মাধবী হঠাৎ একদিন সেখানে উপস্থিত হলো। বাল্য সখীকে দেখে মীনা কেঁদে উঠ্‌লেও, অনেকদিন পরে যথার্থ দরদী পেয়েছে, বলে, নিজেই থেমে গেল।

মাধবী তখনও দার্জ্জিলিঙে সেই চাকরী কর্‌ছিল। দুতিন দিন থেকে সে মীনার অবস্থা সবই বুঝ্‌তে পার্‌লে—তাকে এখান থেকে কি করে উদ্ধার করা যায়, এই চিন্তাই সব সময়ে তার মনে হতে লাগ্‌লো। একবার মনে হলো, দার্জ্জিলিঙে চাকরী ঠিক করে খবর দিয়ে নিয়ে যাবে, আবার ভাব্‌লে হয়তো তা এরা যেতে দেবেনা—কিন্তু কিইবা করা যায়? এখানে আর কিছুদিন থাকলে মীনা মরে যাবে। যার সুখ শান্তি সব এ জন্মের মত সেই একজনের সঙ্গে চলে গিয়েছে, তার আর সুখ বা শান্তি কি করে ফিরে আসবে—তবু এর মধ্যে যতটা পারে কিছু স্বস্তি হয়তো সে তাকে দিতে পারে।

মাধবী মীনাকে বল্‌লে মীনা, তুই আমার সঙ্গে যাবি? দার্জ্জিলিঙ্ বেশ ভাল জায়গা তুইও এসব থেকে মুক্তি পাবি! যাবি? যদি তুই কাজ নিয়ে যেতে চাস্ তো তারও ব্যবস্থা কর্‌তে পারি। বেশ করে ভেবে দেখ, যাস্ তো চল্—আমাকে তো আর দুদিন পরে যেতে হবেই—তোকে এই অবস্থায় ফেলে যেতে আমার মন সর্‌ছেনা। প্রাভাতদার বোনের অধিকার নিয়ে আমি তোকে নিয়ে যেতেও পারি—সে অধিকার আমাকে তিনি দিয়েছিলেন।

"যাব মাধু? কেউ কিছু বল্‌বে না তো? ঘর ছেড়ে কোথায় যাব? এত যে অশান্তি, এত যে দুঃখু, তাও এই ঘরে থেকেই আমি সব ভুলে যাই। যদি চলেই যাবে, তবে কেন আমাকে এত করে কাছে রেখেছিলো? এযে বড় কষ্ট মাধু! এর তো তুলনা হয় না!"

"কি কর্‌বি বল্! তোর সান্ত্বনা তোর নিজেরি কাছে। তুই হাজারি বাগে চল। দু'চার দিন পরেই মাধু মীনাকে নিয়ে হাজারি বাগে রেখে দার্জ্জিলিং গিয়াছে। অনেক দিন পর—সে দার্জ্জিলিঙে মাধবীকে লিখলে "মাধু! তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে, একবার আস্‌তে পারো?" চিঠি পাওয়ার পর দিনই মাধবী রওনা হয়ে হাজারি বাগে এসে পৌছোল।

"কি কথা কি আছে বললি না?" "বল্‌ব—তুই স্নান কর—খাওয়া দাওয়া কর—বল্‌ব বলেই তো ডেকেছি!"

বলে মীনা তার ঠাকুর ঘরে গিয়ে ঢুকলো। সেখানে, প্রভাতের একখানা ছবি আর কৃষ্ণের একখানা পট ছাড়া আর কিছু ছিল না! মন্ত্র নাই, জপ নাই, আবাহন নাই, বিসর্জ্জন নাই—মীনা দুগাছা মালা নিয়ে ছবি দুটোর গলায় পরিয়ে দিয়ে গলায় আঁচল দিয়ে একে একে প্রণাম করলে। কিছু ফল মূল দুটো ছোট রেকাবীতে ছিল, সেই দুটো ছবি দুটোর সামনে ধরে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল—এই ছিল তার নিত্য পূজা। সারাদিনে মীনা ও মাধবীর কথা আর ফুরোয় না—কিন্তু কাজের কথা কিছু হল না। রাত্রে বিছানায় শুয়ে একটু পরেই উঠে মীনা দেখলে বাগানের মধ্যে যতী স্তব্ধ হয়ে একটা চেয়ার পেতে বসে আছে। মাধবীকে ডেকে এনে সে বললে "দেখতে পাচ্ছিস্ বাগানে একজন লোক বসে আছে, ওকে জানিস্? ওই আমার যতীদা! ওরই জন্যে তোমাকে ডেকে এনেছি। তুমি তো বলেছিলে বিয়ে সম্বন্ধে যদি কখনো মত্ বদ্‌লায় তো যতীদাকে তুমি বিয়ে করবে। এখনও কি মত বদ্‌লায় নি?" বলে সে মাধবীর হাত দুটো চেপে ধরলে!

যতীর দিকে চোখ রেখেই মাধবী বল্লে "হয়তো বদল হবার সময় এসেছে। কিন্তু অপর পক্ষেও যে মতামত আছে সেটা ভুলে যাচ্ছ কেন ভাই? শেষে কি উপযাচিকা হয়ে গিয়ে প্রত্যাখান পাব?"

"তুমি রাজী আছ তো? তার পর ওকে আমিই রাজী করবো।"

"রাজী! হাঁ—তা—নাই বা কেন? এতে যদি ভাল হবে মনে করো, আমি সর্ব্বান্তকরণে রাজী আছি।—আধ অন্ধকারে, যতীর মুখে করুণ ভাব, মাধবীর মনে বোধহয় ছায়া পাত করছিল।

পরের দিন সন্ধ্যাবেলা। যতী তার ঘরে বসে কি একটা বই পড়ছিল—মীনা সে ঘরে ঢুকলো। বিনা ভূমিকাতে সে বললে "যতীদা—তোমার কি সময় হবে ভাই—আমার গোটা কতক কথা—"

বইখানা টেবিলের উপর উল্টিয়ে রেখে যতী বললে সময় আমার খুব হবে মীনা, কিন্তু 'কথার' শেষ কি এজন্মেও হবেনা? তুমি কি বল্‌তে এসেছ তা আমি বুঝেছি।" "কথার শেষ তুমি করতে দিচ্ছ কই? শেষ হলে কি, আর কথা বল্‌তে আসি! হয়নি বলেই এসেছি।" আমার একটা অনুরোধ রাখবে যতীদা! তুমি না আমাকে ভালবাসো বলে অহঙ্কার করো? যদি সামান্য অনুরোধ না রাখ্‌তে পারো তো কিসের সে ভালবাসা?" ধীর, মৃদুস্বরে যতী বললে "ভালবাসি মানে? যে কোন গতিকে হোক তুমি সে তথ্যটা জেনে নিয়েছ, আর তারই সুবিধা বা সুযোগ নিয়ে তুমি আমাকে দিয়ে কোন কাজ করিয়ে নিতে চাও! ভালবাসি কি না বাসি সে কথার হিসেব নিকেশ আজ আর করতে চাইনে—কারণ তা এখন তোমার আমার দুজনের পক্ষেই কষ্টকর—বলো, এখন তোমার যা অনুরোধ, তা আমি নিশ্চয় রখ্‌বো।"

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

মহাত্মাজীর প্রতি রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধাঞ্জলি—

ডাক্তার বি, কে, রায় আমেরিকার "সাইকলজি" পত্রিকার লিখিতেছেন :—

গত ২০ বৎসর ধরিয়া রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে জানিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছে। আমেরিকায় যখন তাঁহাকে কেহ জানিত না, তখন আমি তাঁহার সম্বন্ধে আমেরিকার পত্রিকায় অনেক কথা লিখিয়াছি। তাঁহার নোবেল প্রাইজ প্রাপ্তির পূর্ব্বেই আমি উহা লিখি। কবিবরের সহিত আমি নানাবিষয়ে এবং পৃথিবীর অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তির সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে তাঁহার সহিত আমার কখনও মহাত্মা গান্ধী সম্বন্ধে কোনও কথা হয় নাই। ঐ বৎসর বালগঙ্গাধর তিলকের মৃত্যুর পর তিনি কংগ্রেসীদলের নায়কত্ব লাভ করেন—প্রেসিডেন্ট হার্ডিঞ্জের মৃত্যুতে কেলভিন কুলিজ যেমন ইউনাইটেড ষ্টেটসের প্রেসিডেন্টের পদ লাভ করিয়াছিলেন, ইহাও সেইরূপ।

১৯২০ সালের পর ঠাকুরের সহিত গান্ধী সম্বন্ধে আমার অনেক আলোচনা হইয়াছে। প্রত্যেক বারই রবীন্দ্রনাথ গান্ধীর ব্যক্তিত্বের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছেন। আমি বিভিন্ন সময়ে রবীন্দ্রনাথকে মহাত্মা গান্ধী সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছি, সব সময়েই তিনি এই ক্ষুদ্রকায় মহাপুরুষের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা জানাইয়াছেন।

১৯২০ খৃষ্টাব্দে একদিন আমি কবিবরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—

গান্ধী সম্বন্ধে আপনি কি মনে করেন? তিনি "মহাত্মা" আখ্যা পাইবার যোগ্য কি?

ভক্তিমিশ্রিত স্মিত হাস্যে ঠাকুর উত্তর দিলেন—আমি অকপটে বিশ্বাস করি, মহাত্মা গান্ধী বর্ত্তমান জগতের শ্রেষ্ঠতম মানব।

আমি বলিলাম—আপনি একজন মস্তবড় কবি, আপনার এই উক্তির মধ্যে নিশ্চয়ই কবি জনোচিত অতিশয়োক্তি আছে।

দাড়িতে আঙ্গুল বুলাইতে বুলাইতে দৃঢ়কণ্ঠে কবি উত্তর দিলেন :—

না, মাত্রই না। আপনি এখন পর্য্যন্ত তাঁহাকে দেখেন নাই। যদি তাঁহাকে দেখিতেন, তবে আমার উক্তিতে সন্দেহ করিতেন না। আমি তাঁহাকে বহু বৎসর যাবৎ জানি; দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর তিনি আমাদের এখানে আসিয়া কিছুকাল অবস্থান করিয়াছিলেন। তিনি এত মহৎ যে, তাঁহার মহত্ত্ব কল্পনায়ও মাপা যায় না। তাঁহার স্বভাব ও চরিত্রের প্রকৃত স্বরূপ জানিতে হইলে, অন্ততঃ সাত দিন তাঁহার সহিত অবস্থান করিতে হইবে।

বোলপুরে গান্ধীজী

প্রশ্ন :—বোলপুরে থাকাকালে তিনি এমন কি করিয়াছেন, যাহাতে আপনি এরূপ মুগ্ধ হইলেন?

উত্তর :—আমি অনেক বৎসরের চেষ্টায় যাহা করিতে পারি নাই, তিনি কয়েকদিনের মধ্যেই তাহা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বরাবরই আমার ইচ্ছা ছিল যে, শান্তিনিকেতনের ছাত্ররা স্বহস্তে নিজ নিজ ঘর পরিষ্কার করিবে, নিজেরা বিছানা করিবে, রান্না করিবে এবং থালা মাজিবে। কিন্তু আমাদের ছাত্ররা এতবড় পরিবারের সন্তান যে, তাহাদের দ্বারা আমি উহা করাইতে সমর্থ হই নাই। মূল কথা কিন্তু এই যে আমি নিজেই ঐ সমস্ত কাজ করিতে পারি নাই। কাজে কাজেই ছেলেরাও আমার কথায় বড় একটা গুরুত্ব দিত না। আমি বলিয়া যাইতাম, তাহারা শুনিয়া যাইত।

কিন্তু গান্ধী আসিয়াই ছেলেদের চিত্ত অধিকার করিয়া ফেলেন। তিনি একেবারে ছেলেদের সঙ্গে মিশিয়া গেলেন। তিনি তাহাদিগকে বলিলেন যে, যে-কাজ তাহাদের নিজেদের করা উচিৎ, সে কাজের জন্য ভৃত্য নিযুক্ত করা ঠিক নহে। তিনি নিজেই নিজ ঘর পরিষ্কার করিতেন, নিজের বিছানা করিতেন, থালা মাজিতেন, কাপড় কাচিতেন। ছেলেরা লজ্জা পাইল এবং তখন হইতেই তাহারা সানন্দে স্বহস্তে নিজ নিজ কাজ করিতে আরম্ভ করিয়া দিল। তখনই আমি বুঝিলাম, কি করিয়া গান্ধী ছেলেদের চিত্ত জয় করিয়াছেন।

এদিকে গান্ধী মেথরদিগকে কয়েকদিন কাজ না করিতে বলিলেন। উচ্চ জাতির বালকেরা মেথরের কার্য্য করা কল্পনায়ও আনিতে পারিল না। ময়লার গন্ধে ছেলেদের জীবন অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল। তখন গান্ধী স্বয়ং মলপাত্রগুলি দূর মাঠে লইয়া যাইয়া ময়লা ফেলিয়া আসেন। অল্পদিনেই উচ্চ জাতি ও ধনীপুত্রদের মধ্যে পর্য্যন্ত এই মেথরের কার্য্য সম্মানজনক মনে হইল।

আমি বোম্বাইয়ে এই লোকটির কার্য্য দেখিয়া অবাক হইয়া গেলাম।

শ্রদ্ধায় আমার সমস্ত মনপ্রাণ তাঁহার দিকে নোয়াইয়া পড়িল। তখনই আমি উপলব্ধি করিলাম, এই অজ্ঞাত লোকটি একদিন সর্বজনমান্য হইয়া উঠিবেন। সমগ্র ভারত আজ তাঁহাকে মহাত্মা আখ্যা দিয়াছেন দেখিয়া আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। এই আখ্যা দেশের লোক স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া দিয়াছে।

আমি বলিলাম—আপনার মুখে এই কথা শুনিয়া খুবই আনন্দিত হইলাম। আজ লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীর উপর মহাত্মা গান্ধীর অপরিসীম প্রভাব। তাঁহার এই প্রভাবের কারণ কি?

রবীন্দ্রনাথ বলিলেন :—তাঁহার আধ্যাত্মিক শক্তি এবং আত্মত্যাগই এই সাফল্যের কারণ। অনেক লোক স্বার্থের খাতিরে লোক দেখান ত্যাগ স্বীকার করিয়া থাকে। তাঁহারা ত্যাগ করেন ঠিক সুদে টাকা খাটাইবার মত। মহাত্মা সেরূপ নহেন। তাহার ত্যাগ অপূর্ব্ব। তাঁহার জীবনটাকেই ত্যাগ বলা যাইতে পারে। তিনি ত্যাগের প্রতিমূর্ত্তি। তিনি ক্ষমতা চাহেন না, পদ চাহেন না, সমৃদ্ধি চাহেন না, যশঃ চাহেন না, সম্মান চাহেন না। তাঁহাকে সমগ্র ভারতের সিংহাসন দিউন, তিনি তাহা প্রত্যাখ্যান করিবেন—যদিই বা সিংহাসন ও রাজমুকুট গ্রহণ করেন, তবে তিনি রাজমুকুট হইতে মণিমাণিক্য খুলিয়া লইয়া তাহা দরিদ্রের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিবেন। আমেরিকার সমস্ত ধনদৌলৎ তাঁহাকে প্রদান করুন. তিনি তাহা লইতে অস্বীকার করিবেন বা গ্রহণ করিলেও মানবজাতির সেবায় ব্যয় করিয়া ফেলিবেন। তিনি দিবার জন্যই সতত উদ্‌গ্রীব, প্রতিদান তিনি চাহেন না। ইহাতে কোনই অতিরঞ্জন নাই। আমি তাঁহাকে জানি বলিয়াই একথা বলিতেছি।

তাঁহার মধ্যে ভয়ের লেশ নাই বলিয়াই তাঁহার ত্যাগের শক্তি আরও বেশী।

প্রবল প্রতাপান্বিত সম্রাটগণ ও মহারাজাগণ, বন্দুক ও সঙ্গীন, বন্ধন ও নির্য্যাতন, অপমান ও লাঞ্ছনা এমন কি মৃত্যু পর্য্যন্ত মহাত্মা গান্ধীর সাহস টলাইতে পারে না।

তিনি জীবন্মুক্ত। আপনি যদি আমার শ্বাসরোধ করেন আমি আপনাকে ফেলিয়া দিবার চেষ্টা করিব এবং সাহায্যের জন্য চীৎকার করিব। কিন্তু আপনি যদি গান্ধীর শ্বাসরোধ করেন, তবে তিনি নড়িবেন না, হাসিতে হাসিতে মৃত্যু বরণ করিবেন, আপনার প্রতি বিন্দুমাত্র বিদ্বেষ না পোষণ করিয়া তিনি প্রাণত্যাগ করিবেন।

তিনি শিশুর মত সরল, সত্যে তাঁহার অচল নিষ্ঠা, মানবজাতির প্রতি তাঁহার প্রেম বাস্তব। আমি তাঁহাকে যতই দেখিতেছি, ততই তাঁহার প্রতি আমার শ্রদ্ধা বৃদ্ধি পাইতেছে। জগতের ভবিষ্যৎ গঠনে ভারতের এই মহাপুরুষের যে অনেক দান থাকিবে, তাহা বলাই বাহুল্য।"

আমেরিকায় ও ইউরোপে মহাত্মা গান্ধী যখন একপ্রকার অজ্ঞাত ছিলেন, সে সময় কবি এই কথা বলিয়াছিলেন। সে সময় ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠতম কবি হিসাবে রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীর সর্বত্র পরিচিত ছিলেন। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম :—

"পৃথিবীতে এরূপ লোকের পরিচয় হওয়া আবশ্যক। আপনাকে পৃথিবীর সকলে জানে, আপনি কেন তাঁহাকে পরিচয় করাইয়া দিতেছেন না?"

কবি উত্তর দিলেন—"সে আমি কি করিয়া করিব? তিনি আলোকের সন্ধান পাইয়াছেন, তাঁহার তুলনায় আমি কিছুই না। যিনি প্রকৃতই বড়, তাঁহাকে বড় করিতে অপরের সাহায্যের প্রয়োজন হয় না। তাঁহাদের স্বমহিমাই তাঁহাদিগকে জগতের সমক্ষে প্রকাশ করিয়া থাকে; জগৎ যখন তাঁহাদিগকে গ্রহণ করার যোগ্য হয়, তখনই তাঁহারা বিখ্যাত হইয়া উঠেন। সময় যখন আসিবে, তখন মহাত্মাকেও সকলে চিনিবে, কারণ তিনি যে প্রেম, স্বাধীনতা এবং মৈত্রীর বার্ত্তা লইয়া আসিয়াছেন।

প্রাচ্যের আদর্শের প্রতিমূর্ত্তি তিনি জীবনে দেখাইয়াছেন যে, অধ্যাত্ম জীবনই মানুষের প্রকৃত জীবন, আধ্যাত্মিক ও নৈতিক আবহাওয়ার মধ্যেই মানুষ বাঁচিতে পারে; বিদ্বেষ ও হিংসার আবহাওয়ার মধ্যে মানুষের ধ্বংস অনিবার্য্য।"

আমি বলিলাম—আপনি আজ নিঃসন্দেহে পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠতম চিন্তানায়ক। আপনার মুখে এই কথা শুনিবার সুযোগ লাভ করিয়া ধন্য হইলাম। কিন্তু আপনি তাঁহার অসহযোগ আন্দোলন সম্বন্ধে কি মনে করেন?

কবি একটু হাসিয়া উত্তর দিলেন—"সে আর এক কথা। আপনার বোধ হয় মনে আছে, একবার ভারতে এক বন্ধুর নিকট একখানি চিঠি পাঠাইবার সময় আমি চিঠিখানি আপনাকে দেখাইয়াছিলাম। সেই চিঠিতেই মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ সম্পর্কে আমি আমার মতামত প্রকাশ করিয়াছি। যদি আমাকে গান্ধী বলেন যে, যেহেতু সি এফ এণ্ডরুজ ইংলণ্ডে জন্মিয়াছে বলিয়া তাঁহাকে ত্যাগ করিতে হইবে, তাহা হইলে তাহাতে আমি কদাপি সম্মত হইব না। আমার দেশের মুক্তির জন্য পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সমর্থন করাও আমি ত্যাগ করিব না। মহাত্মা গান্ধীর অমত সত্ত্বেও পাশ্চাত্যের যাহা ভাল, তাহা আমরা গ্রহণ করিব এবং প্রাচ্যের যাহা ভাল, তাহা আমরা দিব। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের এই বৈষয়িক ও আধ্যাত্মিক আদান-প্রদানের ফলে পৃথিবী সমৃদ্ধশালিনী হইবে। বিচ্ছিন্নতা মারাত্মক। যাহা কিছু পাশ্চাত্য, তাহাই বর্জ্জন করিতে হইবে—মহাত্মার এই নীতি ভারতের পক্ষে আত্মহত্যাজনক।"

কবির সঙ্গে আমার এই কথোপকথনের কিছুকাল পরেই মহাত্মা গান্ধীকে জনৈক পাশ্চাত্য শস্ত্র-চিকিৎসকের দ্বারা এপেণ্ডিস অস্ত্রোপচার দ্বারা রক্ষা পাইতে হইয়াছিল।

গতবার কবি যখন আমেরিকায় আসিয়াছিলেন, সে সময় একদিন পারস্যের বাহাউল্লার কথা আলোচনা প্রসঙ্গে কবি, মহাত্মা গান্ধী সম্বন্ধে বলেন, মহাত্মা গান্ধী অতিমানব। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, অতীতের মহাপুরুষদের সহিত তুলনায় মহাত্মা গান্ধীর স্থান কোথায়?

কবি উত্তর দিলেন—"বুদ্ধ, যীশু এবং বাহা-উল-লা প্রভৃতি মহাপুরুষগণ যে বাণী প্রচার করিয়া গিয়াছেন, মহাত্মা গান্ধী ব্যাপকভাবে সেই বাণী কার্য্যতঃ প্রয়োগ করিতেছেন। আজ মহাত্মা গান্ধী পৃথিবীতে যে অধ্যাত্ম শক্তিকে বন্ধনমুক্ত করিয়া দিয়াছেন, তাহার বিশালত্ব উপলব্ধি করিতে হইলে সকল বিষয়েই তাঁহার সহিত একমত হইতে হইবে, এমন কোন কথা নাই। তিনি বর্ত্তমান জগতে শ্রেষ্ঠতম মানব। তাঁহার মধ্যে অমূল্য সম্পদ নিহিত রহিয়াছে।"

আমি বলিলাম—যে ব্যক্তি অহিংস উপায়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের নাগপাশ হইতে ভারতবর্ষকে মুক্ত করিবার প্রয়াস পান, তাঁহার হৃদয়ে অমূল্য সম্পদ নিহিত থাকিতে পারে, কিন্তু তাঁহার মাথায় যে কিছু নাই একথা আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি।

কবিবর আমার মন্তব্য শুনিয়া হাসিয়া ফেলিলেন। যেন তিনি আমার কথাটা বেশ উপভোগ করিয়াছেন, এরূপভাবে একটু চক্ষু টিপিয়া বলিলেন :—"আপনার মনে রাখিতে হইবে যে, মহাত্মা গান্ধী সত্যকে যেভাবে বুঝিয়াছেন, সেভাবে পরীক্ষা করিয়া লইতেছেন। তাঁহার এই পরীক্ষার ফল কি দাঁড়াইবে, তৎসম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করার সময় এখনও আসে নাই।"

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেব

কুমারী ছায়াদেবী

শ্রীরামকৃষ্ণ বাঙ্গালার, বাঙ্গালী জাতির গৌরব। বর্ত্তমানকালে ভারতবর্ষে এমন সাধক আর জন্মগ্রহণ করেন নাই। শ্রীরামকৃষ্ণ চরিত্র সজীব ধর্ম্ম। তিনি কোন নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের সাধক ছিলেন না; কোন বিশেষ মত প্রচার করিবার জন্য অবতীর্ণ হন নাই; অথচ সকল সম্প্রদায়ের ভক্ত, সর্ব্বসাধারণ তাঁহার নিকট যাইয়া, তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করিয়া মনে শান্তি পাইত। শক্তিবান পুরুষের চিহ্নই হইল আকর্ষণ। সাধু সন্ন্যাসীর কথা ছাড়িয়া দিলে দেখিতে পাই, সেইসময়কার দেশনেতা কেশবচন্দ্র সেন, কৃষ্ণদাস পাল, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার হইতে আরম্ভ করিয়া ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি সকল মনীষীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ পরিচয় হইয়াছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ চরিত্র আলোচনা করিবার পূর্ব্বে ধর্ম্মতত্ত্ব আলোচনা করা অতীব প্রয়োজন। ধর্ম্ম কাহাকে বলে? স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়া গিয়াছেন, 'Religion is the manifestation of Divinity which is already in men'. অর্থাৎ নর-নারীর হৃদয়ের ভিতর যে শাশ্বত সু-উচ্চবৃত্তি বিরাজ করিতেছে, তাহার বিকাশের নাম হইল ধর্ম্ম। শাশ্বত সু-উচ্চবৃত্তি বিকাশ করিবার নানা পন্থা আছে; এবং প্রত্যেক পন্থারই নির্দ্দিষ্ট নিয়ম-কানুন আছে। ঐতিহাসিকেরা বলিয়া থাকেন জগতে প্রায় ৬০০ ধর্ম্ম সম্প্রদায় আছে। যে সমস্ত ধর্ম্ম-সম্প্রদায় জগতে বিস্তারলাভ করিয়াছে তন্মধ্যে প্রায় সমস্তগুলি প্রাচ্য জগৎ হইতে উত্থিত হইয়াছে। ভারতবর্ষ হইতে হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম্ম; চীন হইতে কনফুসিয়ান, তাও; ইরাণ হইতে জারতুস্থ; আরব হইতে ইস্‌লাম এবং প্যালেষ্টাইন্ হইতে জুডাইসম্ ও খৃষ্টিয় ধর্ম্ম। এই সমস্ত ধর্ম্ম সম্প্রদায়কে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়—এক সম্প্রদায় হইল যাহারা নিজের দেশের ভিতর ধর্ম্ম প্রচার করিয়া সন্তুষ্ট রহিল; অন্য সম্প্রদায়ের সভ্যকে নিজদলভুক্ত করিবার জন্য ব্যাকুল হয় নাই। হিন্দুধর্ম্ম, জারতুস্থ ধর্ম্ম, কনফুসিয়ান ধর্ম্ম ও জুডাইজিম্ এই সম্প্রদায়ভুক্ত ধর্ম্ম। ইহাদিগকে non-missionary বা non-proselyting in character বলা যায়। আর এক ধর্ম্মসম্প্রদায় হইল যাহারা নিজদিগের ভিতর সন্তুষ্ট না হইয়া অন্য সম্প্রদায়ের সভ্যকে নিজমতে আনয়ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। বৌদ্ধধর্ম্ম, ইস্‌লাম ধর্ম্ম ও খৃষ্টধর্ম্ম এই সম্প্রদায়ভুক্ত। ইহাদিগকে missionary ধর্ম্ম বলা যায়। বর্ত্তমানযুগে হিন্দুধর্ম্মের গতিও হইতেছে missionary ধর্ম্ম। স্বামী বিবেকানন্দ ইহার প্রথম প্রবর্ত্তক।

ধর্ম্মতত্ত্ব আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রত্যেক ধর্ম্ম সম্প্রদায় জনৈক ব্যক্তির অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিতেছে। বৈদিক ধর্ম্ম হইল জন কয়েক ব্যক্তির অভিজ্ঞতার ফল। বৌদ্ধ ধর্ম্ম, ইস্‌লাম ধর্ম্ম, খৃষ্টিয় ধর্ম্ম প্রভৃতি সবই ব্যক্তির অভিজ্ঞতার ফল। এই অভিজ্ঞতার ভিতর একটু নূতনত্ব আছে। বৈদিক ঋষিদের অভিজ্ঞতা তাঁহাদের শিষ্যরা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন; তাহাও বহুকাল পরে। বুদ্ধদেব নিজে কিছু লিখিয়া যান নি; তাঁহার শিষ্যরা কিছুকাল পর লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। যীশু খৃষ্ট নিজে কিছু লিখিয়া যান নাই, তাঁহার শিষ্যরা যা পরবর্ত্তীকালে লিখিয়াছেন তাহাই "বাইবেল" বলিয়া চলিয়া আসিতেছে। এক ইস্‌লাম ধর্ম্ম ব্যতীত সমস্ত ধর্ম্মের শাস্ত্রকর্ত্তা হইল শিষ্যগণ। কিন্তু ইসলাম ধর্ম্মে দেখিতে পাওয়া যায় মহম্মদ স্বয়ং সমস্ত লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। কোরাণ হইল মহম্মদের নিজস্বষ্টি।

বৈদিক ধর্ম্ম আশ্রমী ধর্ম্ম ছিল। পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর সমাজবিন্যাস ঘটে। তৎকালীন পারিপার্শ্বিক অবস্থানুযায়ী সমাজ-বিন্যাস চারিটি আশ্রমে বিভক্ত হইয়াছিল যথা;—ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম, সংসারাশ্রম, বাণপ্রস্থ আশ্রম ও

সন্ন্যাস আশ্রম। প্রত্যেক আশ্রমীই শ্রেষ্ঠ যদি তিনি তৎ আশ্রমের কার্য্য যথাযথ প্রতিপালন করেন। মহাভারতে এ বিষয় যথেষ্ট উদাহরণ আছে। প্রথমে আর্য্যজাতিরা কর্ম্মকাণ্ডের আশ্রয় লইয়াছিলেন। কর্ম্মকাণ্ডের পশ্চাতে স্বর্গবাসই ছিল একমাত্র কামনা। যাগ-যজ্ঞে দেখিতে পাওয়া যায়, দেবতারা স্বয়ং আসিয়া যজ্ঞস্থলে দান গ্রহণ করিতেন। তৎপরে এক সম্প্রদায় আবির্ভাব হইয়া জ্ঞান-মার্গের প্রচার আরম্ভ করিলেন। দুই সম্প্রদায়ে কিছুকাল কলহ চলিল। এমন সময় বুদ্ধদেব আসিলেন। তিনি ছিলেন তৎকালে অহংজ্ঞানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশক। বুদ্ধদেব প্রচার করিলেন, "আমিই সব! আমিই জ্ঞান, আমিই কর্ম্ম!" এইস্থলে একটি বিষয় বিশেষ লক্ষ্য করিবার আছে। বৌদ্ধধর্ম্ম হইল উপনিষদ্ ধর্ম্মের শাখা। অর্থাৎ উপনিষদ্ ধর্ম্ম হইতেই বৌদ্ধধর্ম্মের মূলগত শক্তি আহরণ। কোন্ ঘাতপ্রতিঘাতে বৌদ্ধধর্ম্ম হইল missionary এবং হিন্দুধর্ম্ম রহিল non-missionary? অনেকেই বৌদ্ধ-ধর্ম্ম সম্বন্ধে লিখিয়াছেন কিন্তু এ বিষয় কেহ আজ পর্য্যন্ত গবেষণা করেন নাই। কিরূপ ঘাতপ্রতিঘাতে জাতি আগুয়ান বা পশ্চাৎপদ হয় সেইরূপ মনস্তাত্ত্বিক গবেষণা (psychological study) এ পর্য্যন্ত এদেশে কেহ করেন নাই। কারণ এরূপ বিষয় শিক্ষা দিবার লোকের একান্ত অভাব। অথচ বৌদ্ধধর্ম্মের শাখা-প্রশাখা সবই missio-nary ধর্ম্মসম্প্রদায়। ইহার কারণ কি? যদিও বুদ্ধদেব আসিয়া কর্ম্মকাণ্ডের ও জ্ঞানকাণ্ডের যৎকিঞ্চিৎ মীমাংসা করিলেন কিন্তু তৎস্থানে অবতারবাদ আসিয়া জুটিল।

সত্যকথা বলিতে হইলে জগতে বর্ত্তমানকালে সর্ব্বত্র অবতারবাদের পূজা চলিতেছে। হিন্দুজাতি বর্ত্তমান কালে পৌরাণিক যুগ বা অবতার যুগের পূজা করিতেছে। অবতার পূজায় মানবে মানবে সদ্ভাব হওয়া বড়ই কঠিন; কারণ অবতার পূজায় প্রভুর মহিমারই পূজা-পার্ব্বণ হয়। উচ্চাবস্থা আলোচনা বন্ধ হইয়া যায়। যে সমস্ত দেশে "অবতারবাদ" পূজা হয় সেখানে দুই সম্প্রদায় ব্যক্তির উদয় হয়। একদল অবতারবাদের স্বপক্ষে গুণকীর্ত্তন করে; অন্যদল বিপক্ষে কুৎসা প্রচার করে। psycho-logically দুই দলই abnormal state of mindএর লোক। অবতারবাদের স্বপক্ষে বা বিপক্ষে আলোচনা করিবার বাহিরেও যে ধর্ম্ম জগৎ আছে এই সব fanaticরা সে কথা ভুলিয়া যায়। এই অবতার পূজায় মানুষ ধর্ম্মান্ধ হইয়া জগতে মাঝে মাঝে অনেক কিছু অশান্তি আনে। আবার অবতারবাদের পশ্চাতে দেশাত্মবোধ বা জাতীয়তা বোধ গভীরভাবে লুক্কায়িত থাকে সেজন্য জগতে ধর্ম্ম সম্প্রদায়ে ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ে বিবাদও চিরকাল চলিবে। তাহার পর দুইদল যদি পরাধীন জাতি হয় তাহইলে তো কথাই নাই। সেইজন্য দেশে শান্তি রক্ষার জন্য রাষ্ট্রকে ধর্ম্মের উপর হস্তনিক্ষেপ করিতে হইতেছে। যে দেশ ধর্ম্মকে রাষ্ট্র হইতে পৃথক করিতে পারিতেছে তাহারাই বর্ত্তমান রণক্ষেত্রে জয়ী হইতে পারিতেছেন।

বাঙলা শ্যাম ও শ্যামার দেশ। বাঙলার জলবায়ু বর্ত্তমানেও ভক্তিরসে আপ্লুত। বেদান্তের স্থান বাঙলা দেশে কোনদিন ছিল না। রাজা রামমোহন রায় ও স্বামী বিকানন্দের ধর্ম্মবাদ বাঙলাদেশে এখন স্থান পায় নাই; ইহাদের বেদান্তবাদ বাঙলার জলবায়ু এখন গ্রহণ করে নাই। পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর সমাজ গঠন ও সামাজিক-ধর্ম্ম নির্ভর করে। এক সময় বাঙলা নৈয়ায়িকের দেশ হইলেও জনসাধারণের চিত্ত সহজিয়া ধর্ম্মকে গ্রহণ করিয়াছিল। রাধাকৃষ্ণের তত্ত্বই প্রচার করুন বা শ্যামা-তত্ত্বই প্রচার করুন মূল উদ্দেশ্য দু'টিরই হইল ভক্তিবাদ। বাঙলাদেশে স্বামী বিবেকানন্দ ব্যতীত কোন ধর্ম্মসংস্কারক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে নাই। রামপ্রসাদ শ্যামাতত্ত্ব প্রচার দ্বারা রামকৃষ্ণ পরমহংসের প্রচারপথ সহজ করিয়া দিয়াছেন। সেজন্য এই দুটি সাধকের জীবন একসঙ্গে মনে উদয় হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ ঘন তপমূর্ত্তি। দরিদ্র নিরক্ষর ব্রাহ্মণ সর্ব্বসংস্কার বিবর্জ্জিত একটি অচঞ্চল হৃদয় লইয়া নিজতত্ত্ব অন্বেষণে বাহির হইয়াছিলেন। পূর্ব্ব-ধর্ম্ম-সংস্কার বর্জ্জিত হৃদয় ছিল বলিয়া সর্ব্বধর্ম্মের প্রাণবস্তুটিকে দর্শন করিতে পারিয়াছিলেন। Preconceived idea বা পূর্ব্বগ্রহণীয় ভাব ত্যাগ করা অতীব কঠিন। এই Preconceived idea অনেক সময় নব্য সত্য ধারণা করিতে বাধা প্রদান করে। তাঁহার মনে পূর্ব্ব ভাবের কোন রেখাপাত ছিল না

বলিয়া অতি সহজ সরল মনে সর্ব্ব সাধনায় অগ্রসর হইয়াছিলেন। যাঁহার নিকট কোন কোন সত্য দেখিতে পাইয়াছিলেন তৎক্ষণাৎ তিনি দ্বিধাহীন হৃদয়ে বিনা সঙ্কোচে গ্রহণ করিয়াছেন।

উচ্চস্তরের সাধকের চিহ্ন হইল মন মুখ এক। ইহা হইল যতি ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ পরাকাষ্ঠা। বর্ত্তমানে হিন্দুজাতির ভিতর দুটিমাত্র আশ্রম আছে—সন্ন্যাস ও গৃহস্থাশ্রম। গৃহস্থাশ্রম দ্বি-বিভক্ত ব্রাহ্মণ ও শূদ্র। যতি ধর্ম্মের চিহ্ন হইল মন মুখ এক কিন্তু গৃহীর ঠিক উল্টো। গৃহী যদি মন মুখ এক করে তাহলে বর্ত্তমান জগতে তাহার দুর্দ্দশার সীমা থাকিবে না। গৃহীর ধর্ম্ম হইবে, "To begulie the times look like the times!" কিন্তু পরমহংস জীবনে এই মন মুখ এক করিবার শক্তি অদ্ভুত দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার মন ও দেহ এক জিনিষ ছিল; সমস্ত স্নায়ুগুলিকে স্ববশে আনিয়াছিলেন। মনে যে চিন্তার উদয় হইবে সঙ্গে সঙ্গে দেহেও তাহার ক্রিয়া হইবে। মন বলিল, টাকা ছুঁইব না; হাতও সঙ্গে সঙ্গে বক্র হইয়া যাইল। সাধারণে এ শক্তির বিকাশ হয় না। উচ্চস্তরের সাধকে এ শক্তি সম্ভবে। বর্ত্তমান যুগে তাঁহার জীবনীতে ইহা একটি সম্পূর্ণ নিজ বৈশিষ্ট্য।

যত মত তত পথ। যে যে ভাবের সাধক হউক না কেন যদি নিষ্ঠার সহিত সাধনা করে তাহলে তাহার জয় অবশ্যম্ভাবী। তিনি বলিতেন, "ওরে কারুর ভাব নষ্ট করিস নি। মানুষ যন্ত্র নয় যে সব এক ছাঁচে তৈয়ারী হবে।" নানা কারণে মানসিক শক্তি সকলের এক হয় না; সকলে এক বিষয় সমভাবে গ্রহণ করিতে পারে না। প্রতিযোগিতায় মানসিক শক্তির তারতম্য লক্ষিত হয়। সেজন্য পরমহংসদেব কাহার ভাব নষ্ট করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিতেন না। "যত মত তত পথ" এই জ্ঞান ভক্তদের থাকিলে বর্ত্তমান জগতে সমাজে বা দেশে অনেক কল্যাণ সাধিত হইবে। ধর্ম্ম লইয়া বিবাদ হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না।

নির্ভরশীলতাই তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল। মানুষ যে স্বীয় সংযত ও সমবায় শক্তিতে জগতের অনেক কিছু কল্যাণ সাধিত করিতে পারে, এ বিশ্বাস তিনি করিতেন না। কিন্তু বর্ত্তমান ভারতের চিন্তাধারা হইতেছে নিজের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস রাখা। ভারত আজ জাগ্রত; সে অন্ধকারের উপর বিশ্বাস ন্যস্ত করিতে রাজী নয়। রামকৃষ্ণদেবের প্রভাবের কারণ হইল স্বামী বিবেকানন্দ। স্বামী বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণদেবের শিষ্য হইলেও স্বতন্ত্র চিন্তাশীল ব্যক্তি ছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী বিশ্লেষণ করিলে তিনটি বস্তু দেখিতে পাওয়া যায়। ১ম তাহার একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য; ২য়, রামকৃষ্ণদেবের প্রভাব; ৩য়, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জগত ভ্রমণের প্রভাব। সেইজন্য স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী ও প্রবন্ধের মধ্যে তিনটি বিষয়ের প্রভাব পরিষ্কার ভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। পৌরাণিক যুগের প্রভাব দ্বারা বর্ত্তমান ভারতবর্ষ বিশেষ সুবিধা করিতে পারিবে না। স্বামী বিবেকানন্দ এ বিষয়টি পরিষ্কাররূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন অবতারবাদ পূজার দ্বারা ভারতের উন্নতি সুদূর পরাহত।

রামকৃষ্ণদেবের উপদেশের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়, তিনি প্রত্যেক ধর্ম্মের প্রাণবস্তুকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। ধর্ম্মজীবনেও যে একটি জাগ্রত জীবন্ত শক্তি নিহিত আছে তাহা তিনি বিশেষরূপে জানিতেন। এই প্রাণশক্তি যাহাতে সকলে সম্যকরূপে বোধগম্য করিতে পারে তাহার চেষ্টা সতত তিনি করিতেন। তাঁহার ভাব প্রকাশ করিবার ভাষা ও উপমা ছিল অভিনব। এরূপ সহজ সরলভাবে উচ্চস্তরের বস্তু বুঝাইবার শক্তি বর্ত্তমানকালে কাহার ছিল না। পরমহংসদেবের উপদেশ পড়িলে মনে হয়, সত্য যত উচ্চস্তরের হয় তাহার প্রকাশের ভাষাও ততো সহজ সরল হয়। ভাষাও ভাব-প্রকাশক। আমাদের ভাব মনোমধ্যে যত পরিষ্কার হইবে ভাষাও ততো সরল হইবে। ভাষা ভাবের বাহন। জাতি আজ জাগরিত। সমাজ আজ একতার দিকে অগ্রসর; মানব জীবন একতার দিকে আজ আগুয়ান। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাবরাশিও একতার পথের সহায়ক।

যা-হয় তাই

গল্প

শ্রীবিমল মিত্র

তিনটি প্রাণী লইয়া সংসার।

বড় ভাই হরিপদ তা'র স্ত্রী কামিনী আর বিবাহিতা বোন সুখদা। ছেলে পিলে হয় নাই—হইলে চার পাঁচটি হইতে পারিত! কিন্তু সুখদার কথা আলাদা।

হরিপদ মাঝে মাঝে আক্ষেপ করে—আচ্ছা, তুমিই বল কামিনী আমাদের না হোল না হোল দুঃখ করে কি হবে—কিন্তু সুখদার—

কামিনী মুখে দোক্তা পুরিয়া বলে—হ্যাঁ সে কামনাই করি আরকি! একটাকেই খেতে দিতে দেউলে হবার জোগাড় আরও পুষ্যি আসুক তা নইলে আর সাধ মিটবে কেন?

হরিপদ চুপ করিয়া যায়।

সামান্য ধান চাল বেচিয়া যা হয় তাহাতেই সংসার চলে—সারা বছর ঐ আয়। কিন্তু পাড়াপড়শীর মুখ চাপিয়া রাখা যায়না। তাহারা বলে হরিপদর সিন্ধুকে পিতৃদত্ত বেশ মোটামুটি রকমের কিছু আছে।—সুখদা তাহার অংশ হইতে বঞ্চিত। কিন্তু সুখদার দুঃখের কারণ তাহা নহে।

বাপের মৃত্যুর পর মাতৃহীন সুখদাকে ত' তাহার দাদাই পুরো ছয় কি সাত বৎসর বসিয়া খাওয়াইয়াছে, ইহার পর কি আর অভিযোগ করা চলে? কেহ কেহ বলে তাহার পিতা নাকি উইলে তাহাকেও সম্পত্তির এক চতুর্থাংশ দিয়া গিয়াছে, কিন্তু সেজন্য ঝগড়া করা সুখদার পক্ষে ভাল দেখায় না, কারণ তাহার বিবাহের সময়ইত' প্রায় সে সমস্ত খরচ হইয়া গিয়াছে।

দশ কি বারো অতও নয় সেই বয়সে সুখদার বিবাহ হয়।

পাত্রটি সুপাত্র বলিয়াই গ্রামে পরিচিত—সুতরাং হরিপদর মত হইয়াছিল। কামিনী বলিয়াছিল—সুখদার ভাগ্যির জোর তাই অমন সুপাত্র মিলেছে···কিন্তু কিছুদিন পরে সুখদার ভাগ্যের জোর ফলিয়া গেল!

একদিন রাত্রে সুখদার স্বামী সুখদাকে হরিপদর বাড়ীর উঠানে হাজির করিয়া বলিল—বুঝলে সম্বন্ধি আমার পাওনা টাকা দেবেত' দাও নইলে এই রেখে গেলাম তোমার বোনকে আর ভুলেও আসবোনা, তোমার মত ছোটলোকের বাড়ী!

সেই শেষ!

হরিপদ প্রতিশ্রুত টাকা বাহির করে না—সুখদার স্বামী নটবরও আর আসে না।

এত বড় কাণ্ডটা কাহারও গায়ে লাগে না—লাগে বেশী করিয়া সুখদার। আর কামিনী মাঝে মাঝে বলে—এ তোমার কি রকম কাজ বল দিকি—বলে কুকুর বেরাল তাও খাওয়ালে কাজে আসে, আর এ যে নিষ্কর্ম্মার ঢেঁকি পুষছ, এ সামলাবে কে?

হরিপদ বলে—আহা বোনটি আমার—কতই বা খরচ—কাজও ত কচ্ছে—

কামিনী কিন্তু রাগিয়া ওঠে—বকে—কাজ করছে পিণ্ডি! চোখ থাকতে দেখতে পাও না—আমি ত ছিষ্টি করছি—জুতো সেলাই চণ্ডি পাঠ। মেয়ের নড়ে বসবার ক্ষমতা নেই—

কোনও উত্তর নাই, হরিপদ চুপ!

কিন্তু কথাটা মিথ্যা ভিন্ন আর কিছুই নয়! আজ বাতের অসুখ, কাল সোমবারের ব্রত এমনি একটা না একটা কিছু কামিনীর লাগিয়াই আছে, সেই সময়ে সুখদা মুখ বুজিয়া সবই করে!

হরিপদ জানে সবই:কিন্তু স্ত্রীর মুখের কাছে অত বড় একটা মিথ্যার জবাবও দিতে পারে না—এমনি স্ত্রৈণ!

সংসারে একটা কিছু না লইয়া থাকিলে দিন চলে না—সুতরাং যাহাদের অন্য কিছু নাই—তাহারা পরের উপর দোষারোপ করিয়াই তুষ্ট।

এই সংসারে হইয়াছিল তাই;—সুখদার উপর দোষ বর্ষণও একটা কাজের মধ্যে!

এ সমস্ত গণ্ডগোলই চুকিয়া যাইত যদি হরিপদ তাহার প্রতিশ্রুত অর্থ নটবরকে বিবাহের পরেই শোধ করিয়া দিত—কিন্তু তা হয় নাই—

কামিনী বলিয়াছিল—কেন অত খাতির কেন? আজ না হয় ছেলে-পুলে নেই—হ'তে আর কী! বোনের বিয়ে তাই দেওয়া হোল আবার গুণে নগদ পঞ্চাশ টাকা! টাকা দেখেছেন আমার!

হরিপদ স্ত্রীর কথাতেই সায় দিয়াছিল! কিন্তু এখন বসিয়া বসিয়া খাওয়াইতে কামিনীরও অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু উপায় নাই! আর যাই হোক তাড়াইয়া দেওয়া যায়না, বোনত!

সুখদা হয়ত রান্নাঘর হইতে চীৎকার করিয়া বলে—বৌদি দুধের কড়াটা দিয়ে যাওত।

কামিনী উত্তর দেয়—কেন রাজার ঝী হাতে পোকা ধরেছে নাকি?

হরিপদ রামায়ণ পড়িতে পড়িতে বলে—আহা তুমিই দিয়ে এসনা!

ঐ পর্য্যন্ত!

সুখদার সমস্ত বুঝিবার মত বয়স হইয়াছে!

উনানে হাঁড়ি চড়াইয়া দিয়া বসিয়া বসিয়া ভাবে। বুকের কাছে একটা অস্ফুট বেদনা যেন ফুটি ফুটি করিয়াও ফুটিতে পারে না। পাড়ার লোকের মুখে যাহা কিছু শুনিতে পায় তাহাতেই মনটা কেমন করিতে থাকে!

সুখদারও বন্ধু আছে। তাহার বর কেমন ব্যবহার করে—তাহা সুখদার কাছে বন্ধুর দল শুনাইয়া যায়।

সারদা বলে—আমার তাই লজ্জা করে, সারা রাত ও কথা বলে বকর বকর, আমার ভয় করে, পাছে কেউ শুনে ফেলে, ছিঃ, যতই বারণ করি ততই জোরে আরম্ভ করে হে—হে—হে—

সারদা বরের কথায় পঞ্চমুখ।—ক্ষান্ত, পুঁটি, হেমা সকলেই তাই। নিজেদের স্বামীর কথা পাইলে কিছুই চায় না,—সুখদা শোনে—ওদের সুখে হাসে, নিজের কথায় কাঁদে।

পুঁটি সুখদার বারণ শোনে না, বলে আজ তোকে যেতেই হবে। আর ছাড়ছিনা!

সুখদা চারিদিক একবার চাহিয়া লইয়া ভীতনেত্রে বলিল—চুপ, চুপ, কেউ শুনতে পাবে যা আমি যাব না—বড় লজ্জা করে—বৌদি যদি জানতে পারে?

কাক চিল পর্য্যন্তও জানিতে পারিবেনা এই প্রতিশ্রুতি দিয়া পুঁটি সেদিন সুখদাকে লইয়া চলিল। সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। বাড়ীতে কেহই জানেনা সুখদা কোথায় গিয়াছে।

ষষ্টিতলার সাধুর কাছে আসিয়া পুঁটিও সুখদা দাঁড়াইল। পাশেই একটি মনসা গাছ। গাছের শাখায় শাখায় অজস্র ঢিল বাঁধা;—যাহাদের কখনও পুত্র হয় না সেই সব নারী সাধুজীকে চার আনার পূজা দিয়া গাছে সুতার দ্বারা একটি ঢিল ঝুলাইয়া দিলে মনস্কাম সিদ্ধ হয়, ফল অব্যর্থ!—চারদিকের গ্রাম হইতে নারীরা এইখানে আসিয়া সাধুর কাছে পূজা দিয়া পুত্র কামনা করে—সুখদাকে লইয়া পুঁটি একপাশে দাঁড়াইল।

পূজা দিয়া সুখদা গাছে ঢিল বাঁধিয়া দিতেছিল। পুঁটি বলে—বল্—মা আমার কোলে একটি ছেলে দাও—

সুখদা কোন উত্তর করিল না—মনে মনে কি বলিল সেই জানে। অন্ধকারে নিজেকে লুকাইয়া সুখদা বাড়ী ফিরিল!

হরিপদ দাওয়ায় বসিয়া তখন বলিতেছিল—কামিনী—সুখদা কোথায়? কামিনী বলিল—কি জানি কোথায় আড্ডা—

—এইযে ঘাটে গিয়েছিলুম—আজ মিথ্যা কথা বলিতে সুখদার বাধিল না।

দিন যায়, মাস যায় বৎসরও কাটে। কিন্তু সে না হইলে সকলি বৃথা, সে আর আসেনা। চিঠি লিখিলেও উত্তর আসেনা, নটবর নাকি আবার একটি বিবাহ করিয়াছে—এ খবর দিল পুঁটির বর গোবর্দ্ধন।

সুখদা বলে—কই পুঁটি ফলল না'ত।

পুঁটি তবু আশা ছাড়ে না—আশ্বাস দিয়া বলে—

দেখ্‌বি লো দেখ্‌বি—যখন কোলে একটি পাবি তখন বলিস।

সুখদা অন্তরের আশা গোপন করিয়া বল্লে—ধ্যেৎ হ'লে ত'।

কিন্তু পুঁটি ব্যাপারটি গোপনে সারিয়াছিল। গোবর্দ্ধনের পুরাতন বন্ধু নটবর।

গোবর্দ্ধনকে একদিন পুঁটি নটবরের নিকট পাঠাইয়া দিল।

•

ছাতি কাঁধে লইয়া গোবর্দ্ধন সন্ধ্যাবেলা নটবরের চণ্ডী-মণ্ডপে উপস্থিত।

সেই চোখ, সেই মুখ, সেই ভুঁড়ী—না চিনিবার কোনও কারণ নাই। নটবর তখনই চিনিয়া ফেলিল—বলিল—কিহে অনেকদিন পরে—

গোবর্দ্ধন কাঁধের চাদরটিকে বিনা কারণে স্থানচ্যুত করিয়া বলিল—আর—তুমি ত' ওদিকে যাওনা ভাই—দেখা হয় কি করে'। তবু এদিকে একবার এসেছিলুম তাই ভাবলুম যাই একবার দেখা করে' আসি—

নটবর শ্বশুর বাড়ীর প্রসঙ্গে রাগিয়া উঠিয়াছিল। বলিল—সেই ছোটলোক চামারের বাড়ী আবার যেতে বল? রাম, ভুলেও ওদিকে পা বাড়াব না—

গোবর্দ্ধন বেশ নরম হইয়াই আরম্ভ করিল—আহা তা' আর আমরা জানিনে—বলে সকালবেলা হরিপদর নাম করলে সারাদিন উপোষে কাটে—তার বাড়ী কি তোমায় যেতে বলছি? তবে কিনা—মেয়েটা—সে বেচারী।

নটবর সন্দেহ করিল—বলিল—হরিপদ বুঝি তোমায় ভুজং দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছে—ওসব হচ্ছে না। রূপেয়া আন—আমি বউ আনছি।

গোবর্দ্ধন বেগতিক দেখিয়া আবার বলিল—ভুল বুঝোনা নটবর তোমার বন্ধু হ'য়ে আমি কি হরিপদর কথায় সায় দিতে পারি—না পারা উচিত?

নটবর কোনও উত্তর করিল না।

গোবর্দ্ধন আবার অন্য প্রসঙ্গ ধরিল—বলিল—অনেক দিন বন্ধু একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করিনি—তাই বউ পাঠিয়ে দিলে—এই যদি রক্ষে কর—তবে নেমন্তন্ন বল আর যাই বল তাই করতে এসেছিলাম—তবে তোমার যে রকম তিরিক্ষে মেজাজ—

নটবর বলিল—যাক্‌গে—তা' এই ব্যাপার। আবার তা' হলে'—ও গাঁয়ে যেতে হবে? তা' যেতে পারি তুমি যখন বলছ—তবে কেউ যেন না জানতে পারে এইটি দেখ দয়া করে।

গোবর্দ্ধন ব্যস্ত হইয়া বলিল—আরে রাম—তা'হলে হরিপদ কি আর তোমায় ছাড়বে—পায়ে ধরে—শেষে—ভুজং দিয়ে।

—তাই জন্যেই ত' বল্‌ছি।

—সে জন্যে তোমার কোনও ভাবনা নেই—আমার বউকে বলে দেব—কাক-কোকিলে জানবে না—একটা দিন আমোদ করে'—বুঝলে কিনা—এই সোমবারেই—

শেষ পর্য্যন্ত নটবর রাজীই হইল। হৃষ্টচিত্তে বাড়ী ফিরিয়া গোবর্দ্ধন বউকে খবরটি দিবার জন্য ডাকিল—ওগো, শুনছ; কোথায় গেলে?

•

রাতে সেদিন হরিপদ ও কামিনী গভীর নিদ্রায় মগ্ন!

সুখদা উঠিয়া ধীরে ধীরে বাক্স হইতে বহু পুরাতন একটি কাপড় বাহির করিল।

সিঁথিতে সিন্দুর দিল—কাপড়টি যত্নে অঙ্গে জড়াইল—

তারপর অনেকদিনের লুক্কায়িত একটি টিনের আয়না লইয়া মুখটি দেখিয়া লইল।

আস্তে আস্তে খিড়কীর দরজা দিয়া পান চিবাইতে চিবাইতে বাহির হইল পুঁটির উদ্দেশ্যে?

পুঁটির বাড়ীতে মোটে দুইটী প্রাণী।

দরজা খোলাই ছিল। সুখদা আস্তে আস্তে ভিতরে ঢুকিল!

নটবর বাড়ীতে ফিরিয়া যায় নাই—গোবর্দ্ধনের কথায় ওই বাড়ীতেই তাহার শয়নের ব্যবস্থা হইয়াছিল। ঘরের ভিতর নটবর শয়নের উদ্যোগ করিতেছিল—এমন সময় সুখদা এক গলা ঘোমটা দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল।

চম্‌কাইবার কথা—কিন্তু নটবর সুখদাকে কেন জানিনা চিনিয়া ফেলিয়াছিল!

সুখদা ঘোমটা টানিয়া দিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

নটবর ডাকিল—বলিল এসো এখানে বোস!

পাশে বসাইয়া নটবর সুখদার ঘোমটা টানিয়া দিল; প্রদীপের আলোকে মুখটি বড় সুন্দর মানাইয়াছিল!

নটবর আর ঠিক থাকিতে পারিল না—হাত সরাইয়া লইল।—

এমন রূপ বুঝি স্বর্গেও দুর্লভ—কিন্তু আরত উপায় নাই—তাহার স্থানে যাহাকে আনিয়া সে বসাইয়াছে—সে তাহার দাবী ছাড়িবে কেন? আর মানুষও ত' একটি বই দুটি নয়—নহিলে সে ইহাকেও প্রাপ্য ভাগ দিতে পারিত—কিন্তু তাহাত' হইবার নয়—রাগের বশে যাহা সে করিয়া ফেলিয়াছে—তাহা আর বদলাইবার নয়।

নটবর প্রদীপটি নিবাইয়া দিয়া তৃপ্তি পাইল।…

কিন্তু রাতের ব্যাপার দিনের বেলায় ভুলিয়া যাইতে হয়—

ভোর বেলা আলো না হইতে সুখদা নিজের ঘরে আসিয়া আশ্রয় লইল।

*

পরদিন আবার সেই ব্যবস্থাই হইল—নটবর ইচ্ছা করিয়াই সেদিন বাড়ী ফিরিয়া যায় নাই—

রাত্রে দেখা।

নটবর বলিল—হাতে কি।

সুখদা পাত্রটি আগাইয়া দিয়া ঘোমটার আড়ালে বলিল—পান।

পূর্ব্বদিনের মত সেদিনও নটবরের ভাবান্তর হইবার উপক্রম হইল—

কিন্তু ভোর বেলা তাহা মনে পড়ে না—

এমনি করিয়া ছ'দিন;—

শেষ দিনের দিন নটবর বলিল—আর এসো না—কিছু টাকা যদি দিতে পার ত' আবার আসব—

কিন্তু সুখদার—পরনের কাপড় ভিন্ন আর কিছু নাই—তা'কি দেওয়া যায়? এক দেহ—সুখদা সেদিন প্রসন্ন চিত্তে বাড়ী ফিরিল।

*

মাস দুই পরে ব্যাপারটা জানাজানি হইয়া গেল।

ওষুধের গুণেই বোধহয়—মা ষষ্ঠীর কৃপার লক্ষণ দেখা দিল।

একটা নূতন মানুষের অস্তিত্ব সুখদা নিজের মধ্যে অনুভব করে—অকারণে গায়ে কাঁটা দিয়া ওঠে—অরুচি আছে—বমিও হয়।

দিন রাত্রিই কামিনীর সঙ্গে একটা না একটা কিছু লইয়া বিবাদ লাগিয়াই আছে—

যখন আরম্ভ হয়—তখন শেষ হইবার সম্ভাবনা থাকে না—যখন শেষ হয়—তাহার রেশ মিলায় না।

হরিপদ সব সময়েই স্ত্রীর পক্ষে; তাহার স্ত্রী অন্যায় করিতে পারে ইহা তাহার ধারণার বাহিরে—

সুতরাং ওপক্ষের যাহা কিছু গালাগালি—সুখদাকে তাহা একাই সহ্য করিতে হয়।

হরিপদর সাহায্যবাণী যাহা কিছু তা' ওপক্ষেই ব্যয়িত হয়।

কিন্তু যেদিন সে সামান্য ব্যাপারটি লইয়া কলহ আরম্ভ হইল তাহা যে শেষ হইবে এমন আশা রহিল না—

আরম্ভ হইয়াছিল সকাবেলা—সন্ধ্যাবেলাও তাহার মীমাংসা হইল না—

কলহ যখন মাঝপথে আসিয়াছে—অন্য কোনও উপায় হাতে না পাইয়া কামিনী যে কথাটি প্রকাশ করিল—তাহা অবিশ্বাস্য হইলেও কাহারও সন্দেহ রহিল না।

পাড়ার মেয়েরা অল্প বিস্তর সকলেই জুটিয়াছিল, কথাটা শুনিল সকলেই—সকলেই ছি ছি করিতে লাগিল।

কথাটা এই:—সুখদার সঙ্গে নাকি ওপাড়ার ভাই সম্পর্কে সুরেন হালদারের সঙ্গে কোনও অবৈধ সম্বন্ধ থাকাতে সুখদা অন্তঃস্বত্বা—এতদিন শুধু সুখদার এবং তাহার দাদার বংশের খাতিরে একথাটি বলিতে কামিনী ইতস্ততঃ করিয়াছিল—আজ সে একটা হেস্তনেস্ত না করিয়া ছাড়িতেছে না—তাই এই সত্য কথাটি অপ্রিয় হইলেও তাহাকে বাধ্য হইয়াই বলিতে হইল।

সকলেই একবাক্যে কামিনীকে উপদেশ দিল যে অমন মেয়েকে ঘরে ঠাঁই দিলে বংশের গৌরবকে ত' নষ্ট করা হইবেই—উপরন্তু পাপকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়।

শেষ পর্য্যন্ত তাহাই স্থির হইল—

হরিপদ ঘরের ভিতর হইতে চীৎকার করিয়া জানাইল —চাইনা অমন বোনের মুখ দেখতে—এখনি ও বেরিয়ে যাক্।

উপযাজক উপদেশদাত্রীরা প্রবোধ দিয়া বলিল—কি করবে বল বাছা—ভাই যখন বারণ কচ্ছে কেমন করে বউ তোমাকে ঘরে ঠাঁই দ্যায়।

সুখদা শেষ মিনতি জানাইয়া বলিল—দাদা—আমার কথাটা।

দাদা ঘরের ভিতর হইতে বলিল—কোন কথা শুনতে চাই না।

কামিনী ফোড়ন দিয়া বলিল—যখন দুষ্কর্ম্ম করেছিলে তখন ত' মনে পড়েনি—

সুখদা অন্ধকারের ভিতর বাহির হইয়া পড়িল।

হারাণো-টুপী

কাদের নওয়াজ বি-এ, বি-টি

১

টুপী আমার হারিয়ে গেছে
হারিয়ে গেছে ভাইরে
বিহনে তার এই জীবনে
কতই ব্যথা পাইরে
হাস্‌বে লোকে শুন্‌লে পরে
হারালো সে কেমন ক'রে
কেমন ক'রে বৈশাখী ঝড়
উড়িয়ে নিল মোর সে টুপী
বুঝেছি হায় টুপীর লোভে
দেব্‌তাদেরি একার্চ্চুপি

২

থাক্‌ত টুপী দুপুর রোদে
ছাতার মতই মাথায় মম
কখনও বা বাতাস পেতাম্
ঘুরিয়ে তারে পাখার সম
বক্ষে তাহার নিতুই প্রাতে
ফুল রেখেছি আপন হাতে
সে ছিল মোর ফুল-দানী আর
ফুলের সাজি এক সাথে হায়
জানিনে আজ কোথায় গেছে
কোন্ দেশে সে কোন্ অলকায়

৩

হয়ত এখন পবন-দেবের
মাথায় আছে সেই টুপী মোর
এদিকে তার বিচ্ছেদে হায়
আমার চোখে ঝ'রুতেছে লোর
ভুলতে নারি টুপীর প্রীতি
জাগছে হৃদে শুধুই স্মৃতি
বিদেশ গেলে বালিস্ হ'ত
হায় সে টুপী মোর শিয়রে
চল্‌তে পথে সেলাম পেতাম
থাকলে টুপী মাথার পরে

৪

তিনটী টাকায় কিনেছিলাম
'চাঁদনী' হ'তে সেই টুপীরে
তিন্‌শ টাকা দিবই আজি,
পাই যদি ফের্ তারেই ফিরে
চার্ মিনিটে 'চসার' প'ড়ে
শেষ ক'রেছি টুপীর জোরে
পরীক্ষাতে প্রথম হতাম
থাক্‌লে টুপী মাথার প'রে
দুখের দিনের বন্ধু টুপী
কোথায় গেলি আজকে ওরে

৫

আজিও হায় নিমন্ত্রণে
গেলে সভার মধ্যিখানে
সব ভুলি যে প্রথম আমি
তাকাই লোকের মাথার পানে
দেখি কেবল চুপি চুপি
কার শিরে রয় আমার টুপী
মিলে না খোঁজ সভার থেকে
ফিরে আসি শুষ্ক মুখে
নূতন টুপী কিন্‌ব না ভাই
পণ করেছি মনের দুখে

মন্ত্রশুদ্ধি

শ্রীশ্বেতকুমার মুখোপাধ্যায়

গল্প

প্রায় পনের বৎসর বয়সে ভারতীর যখন বিবাহ হইল তখন শুভদৃষ্টির সময়ে এক নিমেষের জন্য তরুণ কিশোর স্বামী মহিমের দিকে চাহিয়াই তাহার মনে হইল, তাহার মত ভাগ্যবতী আর কেহ নাই। এই স্বামী সৌভাগ্যের গর্ব্ব অনুভব করা তাহার পক্ষে তেমন অসঙ্গত হয় নাই; কেননা কুলে শীলে, রূপে গুণে, স্বাস্থ্যে ও অর্থে ভারতীর স্বামী, স্বামী হইবারই উপযুক্ত। কিন্তু এই সৌভাগ্য তাহার কাছে অতুল সম্পদ বলিয়া মনে হইল, তখন সে বুঝিতে পারিল, স্বামী তাঁহার হৃদয়ের সবটুকু স্নেহ মমতা এবং ভালবাসার অর্ঘ্য দিয়া তাহাকে তাঁহার তরুণ হৃদয়ের রাণী করিয়া লইলেন। ভারতীর মনে হইত তাহার স্বামী দেবতা। দেবতার মতই সে তাঁহার চরণযুগলকে সর্ব্বদা স্মৃতিপটে অঙ্কিত করিয়া রাখিত এবং তাঁহার আরাধনায় নিজেকে বিলাইয়া দিত।

ভারতী শিবপূজা করিত। পূজার উপকরণ সম্মুখে রাখিয়া যখন সে চক্ষু মুদিত তখনি দেখিতে পাইত, তাহার অন্তরের মধ্যে স্বামী মহিমেরই দিব্য মূর্ত্তি দেবত্বের মহিমায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। ভক্তি গদ গদ চিত্তে, এক একটী করিয়া ফুল ও বিল্বপত্র যখন সে দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদন করিত তখন সে দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইত, তাহার প্রত্যেকটী ফুল ও বিল্বপত্র স্বামীর পায়ে যাইয়া স্থান পাইতেছে। পূজা শেষ করিয়া উঠিয়া সে গলায় আঁচল দিয়া, স্বামীর পায়ে প্রণাম করিয়া বলিত, "তুমিই আমার দেবতা, আমার আর অন্য দেবতা নেই।"

মহিম শুনিয়া কেবল হাসিত। ভারতী, স্বামীর এই হাসির মধ্যে তাহার জীবনের চির বাঞ্ছিতের সন্ধান পাইয়া ধন্য এবং তৃপ্ত হইত। এমনি একটানা সুখের স্রোতের মধ্য দিয়া একে একে পঁচিশটি বৎসর কাটিয়া গেল, যুবক যুবতী প্রৌঢ়ত্বের পদে পা দিল, কিন্তু তাহাদের অনাবিল ভালবাসা, তেমনি জীবন্ত, তেমনি জাগ্রত ও তেমনি প্রখর ছিল। পক্ক কেশ ও শিথিল চর্ম্মের অন্তরালে দুইটী হৃদয় ভালবাসার ভরা জোয়ারে ঠিক তরুণ তরুণীর মতই তখনও টলমল্ করিতেছিল।

সে বৎসর পূজার সময়ে ভারতী ও মহিম দেশে আসিল। একদিন বিকালে, তাহাদের প্রতিবেশী অরবিন্দর মাসী গিরিবালা, হরিনামের মালা ঘুরাইতে ঘুরাইতে তাহাদের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভারতী তাঁহার বসিবার জন্য তাড়াতাড়ি একখানা কুশাসন পাতিয়া দিল। গিরিবালা আসনে উপবেশন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কেমন আছিস বৌ? গ্রাম সুবাদে তিনি মহিমকে দাদা বলিয়া ডাকিতেন সেইজন্য ভারতীকে তিনি বৌদি না বলিয়া 'বৌ' বলিয়া ডাকিতেন। উভয়ে প্রায়ই সমবয়স্ক ছিলেন।

ভারতী বলিল "বেশ আছি ঠাকুরঝি।"

"তোর বৌয়েরা বুঝি কেউ আসেনি?"

"না ঠাকুরঝি! শত্রুমুখে ছাই দিয়ে এখন তাদের নিজের নিজের গেরোস্তালি হয়েছে, তারা যে যার সুবিধে বুঝে তবে তো আসবে। আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকলে কি তাদের চলে?"

"আমাদের সময়ে কিন্তু চল্‌তো বউ? বরের কাছা ধরে বেড়ানো, সে আমারা লজ্জায় ভাবতেও পারিনি।" কথাটা একরকম সত্য কারণ গিরিবালা মাত্র দশ বৎসর বয়সে বিধবা হওয়ায় স্বামীর কাছা ধরিয়া বেড়াইবার, সুযোগ বিধাতা তাঁহাকে কোন দিন দেন নাই।

ভারতী বলিল "তা থাক, ঠাকুরঝি, তারা তাদের নিজের সংসার নিয়েই সুখে থাক্।"

গিরিবালা বলিলেন, "এখনকার বউরা; সে তুই বল্‌লেও থাক্‌বে, না বললেও থাকবে। তা থাক্‌গে। তুইই বা তাদের কি তোয়াক্কা রাখিস, মহিম এখন তিনশো টাকা মাইনে পাচ্ছে। ভগবানের ইচ্ছায়, তোর দিন একরকম ভাল ভাবেই কেটে গেল। তা হ্যাঁ, বউ! দিন তো একরকম কেটে যাচ্ছে, পরকালের জন্যে কি কিছু করেছিস্?"

প্রশ্নের অর্থ বুঝিতে না পারিয়া ভারতী গিরিবালার মুখের দিকে জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। গিরিবালা তাহাকে এইরূপ অবস্থায় দেখিয়া বলিলেন, "বলি হাঁ করে দেখছিস কি, এদিকটাতো বেশ সুখে সোয়াস্তিতেই কাটালি; কিন্তু পরকালের জন্যে কিছু করলি কি? পরকাল—সেটা হচ্ছে আসল, সেটার চিন্তা করবার তো এখন বয়স হয়েছে।"

ভারতী হাসিয়া বলিল, "তার আর চিন্তা কি করব, ঠাকুরঝি? সে যা হয় হবে'খন।"

গিরিবালা বিশেষ বিস্ময় সহকারে বলিল "ওমা বলিস কি? পরকালের উপায় কিছু করবিনি, নিজেকে উদ্ধারের চিন্তা করবিনি?"

ভারতীর মনে কেমন যেন একটা ধোঁকা লাগিল। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে দুর্জ্জেয় পরকালের কথার মধ্যে স্বামী বিচ্ছেদের দুর্ভাবনা তাহার মনে উদয় হইত। তাহা ছাড়া সে বিষয়ে যে চিন্তা করিবার আর কিছু আছে বা থাকিতে পারে, তেমন কথা কোনদিন তাহার মনেও আসে নাই। সে জানিত, তাহার স্বামী মহিমই তাহার ইহকালের এবং পরকালের দেবতা; তাঁহাকে পূজা করিয়া তাহার ইহকাল যেমন সুখে কাটিতেছে, পরকালও তেমনি সুখে কাটিবে। কাজেই এই নূতন প্রশ্নে সে একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, মেয়ে মানুষের স্বামীই ইহকাল, আর স্বামীই পরকাল। পৃথিবীতে স্বামী-পূজার মত পূজাই নেই।"

গিরিবালা শুধু গুরু ভরসা বলিয়া একটু নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—"শুনিস্‌নে বৌ, অন্তিমে কেউ কারো নয়। জানিস বৌ, অন্তিমে গুরুই কেবল একমাত্র ভরসা।"

ভারতী উৎসুক চিত্তে বলিল, "স্বামীই ত গুরু, তবে আবার গুরু কে?"

গিরিবালা জিজ্ঞাসা করিলেন, "মন্ত্র নিয়েছিস্ কি বৌ?

ভারতী উত্তর করিল "না।"

যদিও বাগ্মীপ্রবরা গিরিবালা তিনকাল কাটাইয়া মাত্র চল্লিশ বৎসর বয়সে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা হইলেও তিনি অতি মাত্রায় বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "ওমা! এখনও মন্তর নিস্‌নি? ওটা নিয়ে ফেল বৌ, আর দেরি করিস্ নি। হিঁদুর দশকর্ম্মের মধ্যে ওটাও একটা বিশেষ কর্ম্ম। দীক্ষা না নিলে তার কোনদিনই উদ্ধার হয় না। আচ্ছা তোদের কুলগুরু কে?"

ভারতী এতক্ষণ আগ্রহাতিশয্যে গিরিবালার কথাগুলি শুনিতেছিল। এইবার সে সামান্য একটু অন্যমনস্ক হইয়া হইয়া উত্তর দিল "আমাদের গুরুবংশের কেউ আর নেই।"

গিরিবালার মালার থলের সহিত হাতখানা কপালে ঠেকাইয়া বলিলেন, "তা নেই, নেই। আমার গুরুদেব—সাক্ষাৎ দেবতা। ভূত ভবিষ্যৎ তাঁর নখদর্পণে। তাঁর কাছে মন্তর নেনা কেন? তাঁকে একবার দেখলেই তোর চোখ খুলে যাবে। আর কি ক্ষমতা তাঁর, তাকি তুই জানিস! ধুলো মুঠো হাতে করে, সোনা মুঠো করে দেন। আমি স্বচক্ষে দেখেছি বৌ! গুরু—পারের কাণ্ডারী—তুমিই ভরসা" বলিয়া তিনি আবার কপালে হাত ঠেকাইলেন।

ভারতী তথাপি কোন কথাই বলিল না। তখন গিরিবালা আসন হইতে উঠিয়া খুব মুরুব্বিয়ানা ধরণে বলিলেন, "ওটা করে ফেলিস্ বৌ, আর দেরি করিস নি। আমার গুরুদেব কাল সকালেই আসছেন, এলেই তোকে আমি খবর দোব।" বলিয়া মালা ঘুরাইতে ঘুরাইতে তিনি চলিয়া গেলেন। ভারতীর মনের মধ্যে পরকালের কথাটা সেই সময় হইতে কেমন যেন উঁকি-ঝুঁকি দিতে লাগিল।

প্রসাদ গ্রামসুবাদে মহিমের ভাই। সে বি, এ, পাশ করিয়াছে বয়স প্রায় পাঁচিশ কি ছাব্বিশ, কিন্তু এ পর্য্যন্ত বিবাহ করে নাই। পৈত্রিক বিষয়সম্পত্তি [illegible]

আছে, তাহাতেই কোন রকমে চলে। আর সাধু-সন্ন্যাসীর নাম শুনিলেই সেখানে ছুটিয়া যায়। কিছুদিন হইল কোথায় এক অসাধারণ স্বামীজির সহিত তাহার দেখা হইয়াছিল। প্রসাদ তাঁহার নিকটে দীক্ষা লইয়া গেরুয়া পরিধান করিয়া যোগাভ্যাসে মন দিয়াছে। পিতার আশীর্বাদে অর্থোপার্জ্জনে তাহার মন দিতে হয় নাই, কাজেই যোগে মন দেওয়ার অবসর তাহার অখণ্ড ছিল।

প্রসাদ কিছুদিন বাড়ীতে ছিল না, কাশী গিয়াছিল। বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া শুনিল, মহিমরা দেশে আসিয়াছে। মহিমের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিবার জন্য একদিন সে তাহাদের বাড়ীতে গেল। মহিম তখন বাড়ীতে ছিল না, কি একটা কার্য্যে স্থানান্তরে গিয়াছিল। ভারতীকে দেখিয়া প্রসাদ বলিল "ভাল আছ তো বউদি? দাদা কোথায় গেলেন?"

ভারতী প্রসাদের দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, "একি; পেসাদ ঠাকুর পো যে, তোমার দাদা একবার পশ্চিমপাড়ায় গেছে কি তাঁর নিজের দরকারেতে। তোমার এ বেশ কেন বল দেখি?"

প্রসাদ হাসিয়া বলিল "আমি দীক্ষা নিয়েছি কিনা সেইজন্যে।"

প্রসাদ ক্রমান্বয়ে তিন তিনটা পাশ করিয়াছে। বি, এ, পাশ করিয়াছে। বি, এ, পাশের উপরে ভারতীর বড় ভক্তি ছিল, কেননা তাহার স্বামীও বি, এ, পাশ করিয়াছেন। এই বি, এ, পাশ ঠাকুরপোটীও দীক্ষা লইয়াছে শুনিয়া তাহার মনের মধ্যে গিরিবালার সেই পুরাণো কথাগুলি আবার জাগিয়া উঠিল। ভারতীকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া প্রসাদ একটু হাসিয়া কহিল, "দাদার ত এ সব বালাই নেই, না?"

কথাটা উপহাসের যোগ্য হইলেও ভারতীর তাহা ভাল লাগিল না। কেননা তাহার স্বামীর কোন কিছু ত্রুটী ধরিয়া কেহ কিছু ইঙ্গিত করিলেও তাহার সহ্য হইত না। ভারতী স্বামীর দোষকে ঢাকিবার জন্য বলিল, "না, কারণ আমাদের যে গুরু নেই।"

প্রসাদ সুযোগ বুঝিয়া বলিল, "গুরু না থাকলেও পরকাল ত আছে? দাদাকে বুঝিয়ে কারো কাছে সাধন নাও। ওটা না হলে মনুষ্য জন্ম একেবারেই বৃথা জানবে।"

ভারতী সত্যই একটু উদ্বিগ্ন হইয়া বলিল, "সত্যি ঠাকুর পো?"

"সত্যি নাতো কি? শুনতে যদি স্বামীজীর কাছে, তাহলে বুঝতে পারতে কি অন্যায়টাই করেছ। তাঁর সেই শ্রীমুখে ধর্ম্মের গূঢ়তত্ত্ব যদি দাদাও শোনেন তাহলে তাঁকেও তাঁর শিষ্য হতেই হবে, এ কিন্তু তোমাকে বলে রাখলুম। বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, পাতঞ্জল প্রভৃতি সব তাঁর কণ্ঠস্থ। সংসারে থাকলেও একেবারে নিঃস্পৃহ, জীবন্মুক্ত।"

প্রসাদের বর্ণনায় স্বামীজির উপর ভারতীর মনে যথেষ্টই শ্রদ্ধার উদয় হইতে লাগিল। সে বলিল "তিনি কি এদিকে আসবেন না ঠাকুরপো?"

"আসতেও পারেন। তাঁরা কামচর। লোকের মনোভাব বুঝেন, যারা সাধন নেবার জন্য ব্যাকুল, অযাচিত ভাবে তাদের কাছে উপস্থিত হয়ে সাধন দিয়ে যান।"

প্রসাদের কথা ঐখানেই শেষ হইয়া গেল। মহিম তখনও বাড়ী ফিরিল না দেখিয়া, প্রসাদ চলিয়া গেল। রাত্রে স্বামীর পাশে শুইয়া ভারতী দীক্ষার কথাটা তুলিবার চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু স্বামীকে দেখিয়া তাহার ইহকাল পরকাল সব একাকার হইয়া গেল। কিন্তু তবু সে অনেক চেষ্টা করিয়া মহিমকে বলিল, "একটা কথা শুনবে?"

মহিম জিজ্ঞাসা করিল, "কি কথা শুনি?"

ভারতী গম্ভীর হইয়া বলিল, "এস আমরা মন্তর নিই।"

মহিম হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কিসের মন্তর শুনি, সাপের—তা আমার ত আর সময় নেই। আমি চলে গেলে তুমি রোজ সাপ খেলাতে বেরিও।"

ভারতী বলিল, "ছি, এসব কথা নিয়ে ঠাট্টা করতে নেই।"

"আচ্ছা, না হয় নাই ঠাট্টা করলুম। কিন্তু এতদিন পরে হঠাৎ একথাটা আজ মনে হলো কেন শুনি?"

"মনে কি হতে নেই? পরকালের কথা ভাববার ত আমাদের বয়স হয়েছে।"

মহিম হাসিয়া বলিল, "পরকালের ভাবনা ভাববার বুঝি একটা বয়স ঠিক করা আছে? ইহকাল যদি ঠিক

থাকে, তবে পরকালও আপনি ঠিক হয়ে যাবে। তার জন্যে কাকেও আর কষ্ট করে ভাবতে হবে না।"

ভারতী একটী অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া বলিল, "তাই কিনা?"

মহিম একটু গম্ভীর হইয়া বলিল, "হাঁ ভারতী তাই! আচ্ছা কখনো কি মিথ্যে কথা বলেছ?"

ভারতী উত্তর করিল, "না!"

মহিম জিজ্ঞাসা করিল, "কখনও কি চুরি করেছ?"

ভারতী হাসিয়া কহিল, "না।"

"কারো ভাল দেখে কখনও কি হিংসে করেছ?"

ভারতী বিস্ফারিত নেত্রে কহিল, "ভালো দেখলে আবার হিংসে হয় নাকি?"

"তোমার হয় না, কিন্তু অনেকের হয়। যাক তোমার ত হয় না। দুঃখী দেখলে মনে দয়া হয় কি?"

"সেটা এমন কিছু বড় কথা নয়। তা সকলেরি হয়ে থাকে।"

"ভগবানে বিশ্বাস আছে কি?"

ভারতী এইবার একটু অভিমান স্বরে বলিল, "আছে। কিন্তু আমি অত কথার উত্তর দিতে পারি না। আমি বললুম তার এখন উত্তর দাও।"

কথাটা গ্রাহ্যের মধ্যে না আনিয়া মহিম একটু দুষ্ট হাসি মুখে আনিয়া বলিল, আচ্ছা কখনও কি পরপুরুষকে ভালবেসেছ? আর..."

ভারতী স্বামীর মুখ চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "চুপ, কি যে যাতা বল।"

মহিম হাসিয়া বলিল, "তাহলে পরকালের জন্যে তুমি একেবারেই নিশ্চিন্ত হয়েই থাক।"

কথাটা ভারতীর তত মনঃপূত হইল না। গুরুমন্ত্র না হইলে যে সংস্কার অপূর্ণ থাকে, এই কথাটাই তখনও তাহার মনের মধ্যে ঘুরিতে লাগিল। কিন্তু স্বামীর এদিকে তেমন আগ্রহ নাই দেখিয়া সে কিছুদিন চুপ করিয়া রহিল। আর কোনদিন মহিমের কাছে এই প্রসঙ্গে কোন কথা তুলে নাই। প্রায় দুইমাস পরে হঠাৎ একদিন প্রসাদ ঝড়ের মত ভারতীর কাছে আসিয়া বলিল, "বৌদি, তিনি এসেছেন।"

ভারতী জিজ্ঞাসা করিল, "কে ঠাকুর পো?"

"স্বামীজি! নিশ্চয়ই তোমার মনে সাধন নেবার জন্য খুবই একটা আকুলতা জন্মেছে। স্বামীজির আগমন নিশ্চয়ই সেইজন্যে, নইলে এখন তাঁর আসবার কোন কথাই ছিল না।"

দীক্ষার জন্য ভারতীর মনে একটা আগ্রহ জন্মিয়াছিল, সে কথা সত্য। এই অন্তর্দ্দর্শী মহাপুরুষকে একবার দেখিবার জন্য উৎসুক হইয়া প্রসাদকে জিজ্ঞাসা করিল, "তিনি কোথায় আছেন ঠাকুরপো?"

প্রসাদ কহিল, "আমাদের বাড়ীতে। চলনা একবার দেখবে। তাকে দেখলেই তোমার ভক্তি হবে, তোমার সন্দেহ একেবারে কেটে যাবে।"

ভারতী বলিল, "যাবো।"

"কখন?"

"তোমার দাদাকে জিজ্ঞাসা করে বলবো।"

"বেশ! তাহলে কাল দুপুরবেলায় আসবো।" বলিয়া প্রসাদ চলিয়া গেল।

যখন প্রসাদ ও ভারতীর কথা হইতেছিল, তখন মহিম পাশের ঘরে বসিয়া একখানা বই পড়িতেছিল। প্রসাদ চলিয়া যাইতেই মহিম ভারতীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "পেসাদ এসেছিল কেন?"

ভারতী বলিল, "স্বামীজি এসেছেন তাই?"

মহিম চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কৌতুকের স্বরে বলিল, "স্বামীজি?"

ভারতী বিরক্তির সহিত বলিল, "সব কথাতেই তোমার ঠাট্টা।"

"আহা, স্পষ্ট করে না বললে, বুঝবো কি করে?"

"পেসাদ ঠাকুরপোর গুরু, স্বামীজি।"

"ওঃ, বুঝেছি, তা কি হয়েছে?"

ভারতী হাত দিয়া স্বামীর গলদেশ বেষ্টন করিয়া বলিল, "চল না তাঁর কাছে, দীক্ষা নিই গে।"

মহিম গম্ভীর হইয়া বলিল "গুরুর একাক্ষর মন্ত্র কানে না গেলে যে পরকালের পথ মুক্ত হয় না, তা আমি বিশ্বাস করি না ভারতী। গুরু বাক্য যে অভ্রান্ত, তাও আমি বিশ্বাস করতে পারি না।"

ভারতী বলিল, "কিন্তু সকলেই ত বলে যে গুরুবাক্য অভ্রান্ত।"

মহিম একটু হাসিয়া বলিল, "তুমিও তা মনে করতে পার; কিন্তু আমার যে অতটা ভক্তি বা বিশ্বাস নেই, সে কথা ত আগেই বলেছি ভারতী। তবে তুমি যদি তাঁর কাছে দীক্ষা নিতে চাও, ত নাও না কেন? আমি ত আর মাথার দিব্যি দিয়ে বারণ করছি না তোমাকে।"

মহিম জানিত যে তাহাকে বাদ দিয়া কোন কাজ করাই ভারতীর পক্ষে সম্ভব নহে। তাই সে জিজ্ঞাসা করিল, "নেবে?"

মহিম মনে মনে নিশ্চয় জানিত যে ভারতী উত্তর করিবে "না।" কিন্তু ভারতী যখন বলিল, "পরকালের পথ কে না করতে চায়?" তখন মহিমের বুকের মধ্যে কোথায় যেন একটা বিশেষ আঘাত লাগিল। ভারতীর কথায় তাহার কেবলি মনে হইতে লাগিল, যেন পরকালে তারা কেউ কারো নয়। তাহাদের মিলনের নিবিড় বন্ধন, ভারতী যেন এক কথায় শিথিল করিয়া দিল; মহিমের সমস্ত অন্তর ব্যথিত হইয়া উঠিল। সে কতকটা অভিমানের সুরে বলিল, "বেশ ত তুমি দীক্ষা নাও; তোমার পরকালে যাতে গতি হয়, তার আমি মোটেই অন্তরায় হতে চাই না।"

ভারতী কাতর হইয়া বলিল, "তুমিও ত নেবে?"

মহিম কেবল একটী কথায় উত্তর দিল "না, ও-সব বালায়ে আমার কাজ নেই, ভারতী। শোবার সময় ভগবানের নাম করে শুলে পরে, পরকালের ঢের কাজ হবে।"

ভারতী একটা নিশ্বাস ফেলিয়া চলিয়া গেল। সেই দিনই রাত্রিতে মহিম ভারতীকে বলিল, "ভারতী, কাল ভোরে আমি আসাম যাবো। চা বাগানটার টাকাগুলো না গেলে পাওয়া যাবে না। চিঠি দিয়ে দিয়ে হায়রাণ হয়ে গেছি। ফিরতে প্রায় দিন দশেক দেরী হবে।"

পরদিন সকাল বেলায় মহিম আসাম যাত্রা করিল।

দুপুর বেলায় প্রসাদ আসিয়া ডাকিল, "বৌদি!"

ভারতী বলিল, "এই যে ভাই হয়ে গেছে, যাচ্ছি চল।"

ভারতী ও প্রসাদ যখন স্বামীজির নিকটে উপস্থিত হইল। তখন প্রসাদের বৈঠকখানাটী লোকে লোকারণ্য হইয়া গিয়াছে। গ্রামের বহু স্ত্রী পুরুষ তখন সেখানে উপস্থিত। মধ্যস্থলে একখানা আসনের উপরে স্বামীজি উপবিষ্ট আছেন। তাঁহার পুষ্ট, উন্নত, গৌর দেহশ্রী দেখিলেই মনে হয় তিনি একজন মহাপুরুষ। স্নিগ্ধ ও গম্ভীর কণ্ঠে তিনি শ্রোতৃমণ্ডলকে বুঝাইতেছিলেন যে, জগৎ মিথ্যা; পিতামাতা, পুত্রকন্যা, স্বামী স্ত্রী এ শুধু মায়ার সম্বন্ধ, বাজীকরের ভেল্‌কির সমতুল্য। রজ্জুতে যেমন সর্পভ্রম, এ কেবল তাহাই। বেদ, উপনিষদ ও পুরাণ প্রভৃতির জ্ঞান সমুদ্র মন্থন করিয়া তিনি বুঝাইয়া দিলেন এই বিরাট জগৎ একটা মোহের স্বপ্ন। তাঁহার বাক্য বিন্যাসের অসীম কৌশলে, তাঁহার ভাব প্রকাশের অতুলনীয় ভঙ্গিতে, তাঁহার প্রবল যুক্তির মুখে, ফলে ফুলে ভরা, অনন্ত সৌন্দর্য্যময়ী পৃথিবী, শ্রোতাদের চোখের উপর, দেখিতে দেখিতে অবাস্তবে মিলাইয়া গেল; যাহা চাক্ষুষ, যাহা এতদিন রূপে রসে, গন্ধে, স্পর্শে, জীবন্ত, জাগ্রত মূর্ত্তিতে দেখা দিতেছিল, তাহা একটা শূন্যগর্ভ জল-বুদ্‌বুদের মত স্বামীজির প্রবল যুক্তির খোঁচায় বিদীর্ণ হইয়া অসীম শূন্যের মধ্যে লয় পাইল! এত দিনের রক্তের টান, নাড়ীর বন্ধন, সব মিথ্যা হইয়া গেল, আর মৃত্যুর পরপারের চির অন্ধকার—চির-দুর্জ্ঞেয় রহস্য, তাহার কুহেলিকা ভেদ করিয়া, অভ্রান্ত সত্যের আকারে দেখা দিল। ভাবের আবেগে শ্রোতাদের মন টলমল্ করিতে-ছিল। স্বামীজির বক্তৃতা শেষ হইতেই দলে দলে নরনারী তাঁহার পায়ের উপর পড়িয়া সাধন ভিক্ষা করিল। হাসি-মুখে স্বামীজি সকলকে সাধন দিয়া ধন্য করিলেন। সকলের মত ভারতীর মনও প্রবল ঔদাস্যে ভরিয়া উঠিয়াছিল। সকলের মত সেও স্বামীজির পদপ্রান্তে বসিয়া সাধন যাচ্ঞা করিল।

প্রসাদের নিকটে স্বামীজি ভারতীর কথা পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলেন। তিনি ভারতীকে সস্নেহে বলিলেন, "মা, তোমার মনে এখন ধর্ম্মের জন্য দারুণ আকুলতা জন্মেছে। এ অতি শুভ মুহূর্ত্ত। তুমি দীক্ষা নাও, তুমি পরম শান্তি লাভ করবে।"

ভারতী অতি ধীরে বলিল, "কিন্তু আমার স্বামীর অমত।"

স্বামীজি আবার হাসিয়া বলিলেন,—

ন তাতো ন মাতা ন বন্ধুর্নদাতা।
ন পুত্রো ন পুত্রী ন ভৃত্যো ন ভর্ত্তা॥

—কে কার? এত শুধু পথের আলাপ। যিনি প্রকৃত স্বামী তাঁর সন্ধানের পথ তোমায় বলে দেবে। তাঁকে পেলে, একাধারে স্বামী, পুত্র, কন্যা সব পাবে।"

স্বামীজির সহিত ভারতীর অনেক কথা হইল। তাহার সৌম্য-মূর্ত্তি, এবং স্নিগ্ধ-গম্ভীর বাক্যে, ভারতী অভিভূত হইয়া পড়িল। সে নিঃশঙ্ক হইয়া বলিল, "আমি আপনার কাছে দীক্ষা নোবো।"

তারপর স্বামীজি ভারতীর কানে বীজমন্ত্র দিয়া অনেক উপদেশ দিলেন। পরে বলিলেন, "নিজের দেহ ও মন সব সময়ে শুদ্ধ রাখবে। পুরুষের সংস্পর্শ সম্পূর্ণ ত্যাগ করবে। এখন থেকে তোমাকে পৃথকভাবে জীবন যাপন করতে হবে।"

হুজুগের উন্মাদনা যেমন সহজে আসে, তেমনি সহজেই আবার যায়। যাহারা দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিল, তাহাদেরও তাহাই হইল। তাহারা বাড়ীতে আসিয়া যাহা কিছু অসার, তাহাই সার করিয়া পূর্ব্বেকার মতন স্বামী, স্ত্রী ও পুত্র লইয়া সংসারে মন দিল। কিন্তু ভারতীর উন্মাদনা অত সহজে কাটিল না। সে গুরুমন্ত্র জপ করিতে লাগিল। কিন্তু যে অপার্থিব শক্তি এতদিন তাহার দেহ ও মনকে পূর্ণ রাখিয়াছিল, দীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ যেন তাহা কোথায় চলিয়া গেল। গুরুর আদেশ, 'স্বামীর সংস্পর্শ ত্যাগ করিতে হইবে,' সেই কথাটা কেবলই তাহার মনের মধ্যে ওলট্ পালট্ করিতে লাগিল! যতই মহিমের ফিরিবার দিন কাছে আসিতে লাগিল, ততই তাহার একটী গোপন অশান্তি বাড়িয়া যাইতে লাগিল। সে নীরব হইয়া ভাবিতে লাগিল, কেন এমন কথা স্বীকার করিলাম!" কিন্তু গুরুর আদেশ অলঙ্ঘ্য। ভারতী, নিরুপায় হইয়া অবসন্নের মত বসিয়া পড়িল।

হিম বাড়ী ফিরিয়া আসিল। রাত্রে ভারতী, পূর্ব্বের মত নিজে তাহার বিছানা পাতিয়া দিল। ভোজনাদি শেষ করিয়া মহিম শুইয়া পড়িল। ভারতী এখন কি করিবে, ভাবিয়া পাইতেছিল না। আজ পঁচিশ বৎসর তাহার স্থান স্বামীর পার্শ্বে, আজ সে কেমন করিয়া সে স্থান ছাড়িয়া যাইবে। প্রবল আকর্ষণে স্বামীর শয্যা তাহাকে টানিতে লাগিল, অনতিক্রমনীয় বাধার মত গুরুর আদেশ তাহার পথ আগুলিয়া ধরিতে লাগিল। অবশেষ আপনাকে দৃঢ় করিয়া সে মেঝেয় একটা মাদুর বিছাইয়া লইল।

ভারতীকে মেঝেয় মাদুর পাতিতে দেখিয়া মহিম কহিল, "ওকি, মাদুর কেন?"

ভারতীর চোখে জল উথলিয়া উঠিতেছিল। উচ্ছ্বসিত ক্রন্দন গলার কাছে আসিয়া তাহার দম আট্‌কাইয়া দিতেছিল। বুকের মধ্যে উন্মত্ত ঝড়ের দমকা বাতাস কোনমতে বুকের মধ্যেই চাপিয়া রাখিয়া সে বলিল, "শোব।"

মহিম বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "শোবে, তা ওখানে কেন, বিছানায় কি জায়গা নেই?"

ভারতী অপরাধীর মত মাথা নীচু করিয়া উত্তর দিল, "স্বামীজির আদেশ?"

মহিমের হৃৎপিণ্ডটা, ভারতী যেন দুই হাতে নিষ্পেষণ করিয়া দিল। মর্ম্মান্তিক ব্যথায় সে বিছানার উপরে উঠিয়া বসিল এবং জিজ্ঞাসা করিল, "দীক্ষা নিয়েছ?"

ভারতী চোখের জলে, ভাসিতে ভাসিতে, মাথা নীচু করিয়াই উত্তর দিল, "নিয়েছি।"

তীব্র অভিমানে মহিম জিজ্ঞাসা করিল, "তাঁর কি আদেশ?"

ভারতীর বুক ভাঙ্গিয়া যাইতেছিল। সে কোনমতে কহিল, "গুরু আমাকে পুরুষের সংস্পর্শ একেবারে ত্যাগ করতে বলেছেন।"

মহিম দুঃখ এবং স্নেহের স্বরে বলিল, "স্বামীজির আদেশ অবশ্য অলঙ্ঘ্য, আর অভ্রান্ত নিশ্চয়। কেমন ভারতী?"

ভারতী কোন উত্তর দিল না। চোখের জলে, তাহার বুক ভাসিতে লাগিল। [illegible]

প্রসারিয়া উন্মুখ আগ্রহে স্বামীর দিকে ছুটিয়া যাইতে লাগিল। দুর্জ্জয় অভিমানে মহিম আর কোন কথা কহিল না। সে শুইয়া নীরবে, চোখের জলে বিছানা ভিজাইতে লাগিল।

আটমাস কাটিয়া গেল। ভারতী শান্তির বিনিময়ে অসহ অশান্তি এবং দুঃখের বোঝা বহিতে লাগিল। একাধিক সহস্রের স্থানে একাধিক লক্ষ গুরুমন্ত্র জপ করিয়াও তাহার মনের ব্যথা কমিল না, বরং তাহা বাড়িয়াই যাইতে লাগিল। মহিম প্রায় নির্ব্বাক হইয়া দিন কাটাইতে লাগিল। গুরু প্রদত্ত বীজ মন্ত্রের তরবারিখানি, দুইজনের মধ্যের সোনার যোগসূত্র গাছি কাটিয়া দুইখণ্ড করিয়া দিল।

একদিন একখানা ডাকের চিঠি দেখিয়া, ভারতী মহিমকে বলিল, "বৌদির সাবিত্রী ব্রত প্রতিষ্ঠা হচ্ছে। দিন হয়েছে এই মাসের পনেরই। আমাদের যেতে লিখেছেন।"

মহিম সংক্ষেপে উত্তর দিল, "বেশ।"

ভারতী কুণ্ঠিত হইয়া বলিল, "যাওয়া সম্বন্ধে, তাহলে কি বল।"

মহিম দুঃখিত চিত্তে বলিল, "আমার মতের জন্যে ত কিছু আটকায় না, ভারতী। তবে আবার কেন মিছিমিছি জিজ্ঞাসা করছো।"

আঘাতটা ভারতীর বুকে খুবই লাগিল। ভারতী কোন মতে আপনাকে ঠিক রাখিয়া বলিল, "তুমিও যাবো তো?"

মহিম একটু ম্লান হাসিয়া বলিল, "যদি বল, যাবো।"

ভারতী বলিল, "তবে চল।"

মহিম কহিল, "চল।"

ব্রত প্রতিষ্ঠার দিন তাহারা যাইয়া উপস্থিত হইল। কার্য্যও সুসম্পন্ন ভাবে শেষ হইয়া গেল। সমস্ত দিন কাজ কর্ম্মের ঝঞ্ঝাটে বৌদি, মহিমের সহিত কোন কথাই বলিতে পারেন নাই। মহিমকে তিনি একটু অতিরিক্ত ভালবাসিতেন। তাঁহার কারণ, ভারতী ছিল তাহার ছোট ভগ্নিটীর মত। মহিম ও ভারতীর ভালবাসা যাহা একখানা হীরকের মত এই পঁচিশ বৎসর ধরিয়া জল্-জল্ করিতেছে, যাহার আভা একটী দিনের জন্যও ম্লান হয় নাই, তাহা তাঁহার বড় ভাল লাগিত।

কাজ শেষ করিতে করিতে বৌদির প্রায় রাত্রি দশটা, বাজিয়া গেল। তখন বাড়ীর সকলেই ঘুমাইতে গিয়াছে। ভারতীদের ঘরের দরজা গোড়ায় যাইয়া তিনি ডাকিলেন, "ভারতী কি ঘুমিয়েছিস্?"

ভারতী ঘরের মধ্যে বৌদিদির সাবিত্রীব্রতের কথাই ভাবিতেছিল। ইতিমধ্যে বৌদির কণ্ঠস্বর কাণে আসিতেই ভারতী উঠিয়া দরজা খুলিয়া দিয়া বলিল, "না, বৌদি।"

ঘরের ভিতর ঢুকিয়া মেঝেয় ভারতীর বিছানা পাতা দেখিয়া বৌদি প্রথমে একটু বিস্মিত হইয়া এবং কিঞ্চিৎ হাসিয়া মহিমকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "শেষ বয়সে এ আবার কি নতুন রঙ্গ মহিম? বলি ব্যাপার কি?"

মহিম, তাড়াতাড়ি বিছানায় উঠিয়া বসিয়া শান্তস্বরে বলিল, "আমার তো কিছু হয় নি বৌদি! যার হয়েছে, দয়া করে তাকে জিজ্ঞাসা করুন।"

বৌদি ভারতীর দিকে সবিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, "কিলো, তোর আবার হল কি?"

বৌদির প্রশ্নে ভারতীর বুকের মধ্যে ব্যথার ঝন্ঝনা বাজিয়া উঠিল। লজ্জায় সে আড়ষ্ট হইয়া পড়িল। তাহাকে নির্ব্বাক দেখিয়া বৌদি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "চুপ করে কেন? কি হয়েছে বল না? অভিমান; না মহিম তোকে কিছু বলেছে।"

ভারতী কোনমতে চোখের জল আটকাইয়া উত্তর করিল, "না বৌদি, সে সব কিছুই নয়? আমি দীক্ষা নিয়েছি।"

বৌদি ভারতীর এই উত্তর শুনিয়া হি হি করিয়া হাসিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন, "তাই বুঝি বুড়ো বয়সে ব্রহ্মচর্য্য আরম্ভ করেছিস ভারতী!"

ভারতী মাথা নীচু করিয়া উত্তর দিল, "গুরুর আদেশ।"

কথাটা শুনিয়া বৌদি বেশ একটু গম্ভীরমুখে বলিলেন, "ওঃ, ভারী তো' গুরু, তার আবার আদেশ।" যেন এক

কথায় সমস্ত প্রশ্নের মীমাংসা হইয়া গেল। যেন ইহার পরে বলিবার আর কিছুই থাকিতে পারে না।

এই যে নির্ম্মম উপেক্ষা, যাহা গুরুর নামের দোহাই দিয়া, মর্ম্মান্তিক ভালবাসার অবজ্ঞা করিতে পারে, তাহা মহিমের বুকে আগুন ধরাইয়া দিল। অনেকদিন পরে তাহার কথার সংযম ছুটিয়া গেল। সে বৌদিকে বলিতে লাগিল, "বৌদি! আপনাদের কাছে গুরুর আদেশের চেয়ে বড় আদেশ আর কিছুই নেই। কিন্তু এই যে পঁচিশ বছর ধরে আমি প্রাণ, মন ও দেহ সব দিয়ে যে ভালবাসার সাধনা করেছি; সে কি এতই অকিঞ্চিৎকুর যে, একজন অপরিচিতের একদিনের একটা কথায় সে ভালবাসাকে এমন করে তাচ্ছিল্য করা যায়। প্রেমের অপমানে মুক্তির পথ সহজে হয় কিনা, ভক্ত বা শিষ্যেরাই তা জানেন, কিন্তু প্রেম, যা বিশ্বের আনন্দ, তাকে ধ্বংস করে, আনন্দময়ের সন্ধান পাওয়া যায়, একথা আমি বিশ্বাস করতে পারি না। যে ইহকালের সাথী, তারি ছোঁয়াতে নাকি পরকালের পথে আগল্ পড়ে। কিন্তু সকলের চেয়ে আমার কাছে অসম্ভব বলে মনে হচ্ছে এই যে, আমি সারাজীবন দেবীর মত পুজা করে এসেছি, তা উপেক্ষা করে, যারা কামিনীকে নরকের দ্বার বলে ঘৃণা করে; সেই শত্রুর দলে ভারতী অনায়াসে গিয়ে মিশতে পারলো।"

গুরুর আদেশ, তীক্ষ্ণ ছোরার মত আঘাতে আঘাতে মহিমের মর্ম্ম কোরকের বৃন্তটী ছিন্ন করিয়া দিয়া, জগতের কতখানি শাশ্বত সৌন্দর্য্য যে ধ্বংস করিয়া দিয়াছে, বৌদি তাহা ঠিক না বুঝিতে পারিলেও মহিমের কথার ঝাঁঝে থতমত খাইয়া বলিলেন, "সত্যি ভারতী, তোর এতটা বাড়াবাড়ি ভাল হচ্ছে না। তুই নিজেই এর উত্তর নিজের কাছ থেকে পাবি। যার দেবতার মত স্বামী বর্ত্তমান, তার কি আবার গুরুর দরকার হয়, না তাকে আবার দীক্ষা নিতে হয়। সময় মত নিজের মন্ত্রটা শুদ্ধ করে নিস?

ভারতী কোন কথাই বলিল না। বৌদি মহিমকে আরও দুই একটী কথা বলিয়া চলিয়া গেলেন। মহিমও প্রদীপটী নিবাইয়া দিয়া শুইয়া পড়িল, কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই ভারতী, তাহার বুকের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিতে লাগিল, "ওগো! আমায় ক্ষমা কর, ক্ষমা কর। তুমিই আমার গুরু, তোমার চেয়ে বড় আমার আর জগতে কেউ নেই; তুমিই আমার ইহকাল, তুমিই আমার পরকাল। না বুঝে অপরাধ করেছি, আমায় ক্ষমা কর। আমায় চরণে স্থান দাও।"

ভারতীর চোখের জলে মহিমের বুক ভিজিয়া গেল। মহিম সস্নেহে ভারতীকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া নিবিড় চুম্বনে তাহার সকল ব্যথা মুছাইয়া দিল।

দহন ও দগ্ধ

শ্রীজগৎ মোহন সেন

আমি কাম, তব রুদ্র-নয়নে বহ্নিশিখা,
তোমার ললাটে আমার দেহের ভস্ম-টীকা।
মোর চিতারেণু তোমার তনুর আলিপন,
হে দেবতা! কর আমারি শ্মশানে বিচরণ,
আমার প্রণয় তব বরাঙ্গ আভরণ
নয়নে তোমার আমারই কাজল-কুজ্ঝটিকা।
আমি কাম, তব রুদ্র-নয়নে বহ্নিশিখা।

আমারে করেছ অতনু তোমার নয়নানলে
পরমাণু দীপে তাই অসংখ্য জীবন জ্বলে।
ভালবাসা মোর বাঁধা ছিল দেহ-সীমানায়
মুক্তি পেয়েছে ভস্মের কোটি কণিকায়।
কোটিগুণে আজি তোমারে পাবার লালসায়
ভাস্বর হয়ে জ্বলিছে আমারই প্রীতির শিখা।
আমি কাম, তব রুদ্র-নয়নে বহ্নিশিখা।

বীমা-জগতে কৃতী ভারতবাসী

পণ্ডিত সন্তানম্

ধরিত্রীর সদ্যঃবিকশিত পুষ্পের ন্যায় মাতৃঅঙ্ক আলোকিত করিয়া সুদূর মাদ্রাজের কোম্বাকোনাম্ প্রদেশে ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে একটি শিশু জন্মগ্রহণ করে। পরিণত জীবনে এই শিশু যে সমগ্র দেশের বিপুল শ্রদ্ধা ও সম্মানলাভ করিয়া বরেণ্য হইবে বাল্যেই তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছিল।

আনন্দ কোলাহল মুখরিত ধূলিমাখা শৈশবের দিনগুলি পণ্ডিতজীর মামুলি প্রথামতে অতিবাহিত হয় নাই—এই মেধাবী তরুণটির চোখমুখে প্রতিভা যেন জড়িত হইয়া ছিল—তাই ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে তিনি যখন অর্থনীতি—শাস্ত্রে স্বর্ণপদক লইয়া মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে বি-এ পরীক্ষায় সম্মানে উত্তীর্ণ হইলেন তখন এই কৃতিত্বে কেহই বিস্মিত হয়েন নাই। ছাত্রজীবনের উজ্জ্বল উচ্চাকাঙ্ক্ষা পণ্ডিতজীকে হাতছানি দিয়া বাহির করিয়া লইল—১৯০৬ খৃষ্টাব্দে তিনি লণ্ডনে গমন করিয়া আই-সি-এস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন এবং হিসাববিভাগের সম্মানজনক উচ্চপদ প্রাপ্ত হইয়া উহা প্রত্যাখ্যান করিলেন। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে 'Inn temple' হইতে আইন বিষয়ে পারদর্শী হইয়া পণ্ডিতজী স্বদেশে ফিরিয়া আসিলেন এবং পরবৎসর লাহোরে ব্যবহারজীবের কার্য্য আরম্ভ করিলেন।

লাহোর, অমৃতসহর এবং গুজরাণওয়ালায় 'মার্শেল ল' স্থাপিত হওয়ায় সমগ্র দেশব্যাপী এক বিক্ষোভের সৃষ্টি হইয়াছিল—সেদিন এই স্বদেশ প্রেমিক যুবকের মন দেশের জন্য কাঁদিয়া উঠিল—রাজরোষে নিপীড়িত দেশবাসীর পার্শ্বে আসিয়া তিনি দাঁড়াইলেন। তারপর কংগ্রেস কর্ত্তৃক পাঞ্জাবের অত্যাচারের জন্য এক তদন্ত সমিতি গঠিত হইল—পণ্ডিতজী সমস্ত কার্য্য ফেলিয়া ইহার সম্পাদকতার কার্য্য গ্রহণ করিলেন।

দেখিতে দেখিতে ১৯২০ খৃষ্টাব্দ আসিল—অসহযোগ আন্দোলনের স্রোত পঞ্চনদের তটবাট প্লাবিত করিয়া

উচ্ছ্বাসভরে বিপুল আকার ধারণ করিয়া ছুটিতে লাগিল। সর্ব্বসুখসৌভাগ্যব্যক্তিতা পরাধীন দেশমাতৃকা এই কৃতী সন্তানটিকে ঘরের বাহির করিলেন—পণ্ডিতজী আইন

ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশ সেবায় আত্মোৎসর্গ করিলেন এবং ১৯২২ খৃষ্টাব্দে পাঞ্জাব প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি নিযুক্ত হইলেন—১৯২২ খৃষ্টাব্দে—"বাটালায়" পাঞ্জাব কংগ্রেসের যে প্রাদেশিক সম্মিলন হইয়াছিল, তাহাতে পণ্ডিতজী এক অনুপ্রেরণাময় তেজোদৃপ্ত অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন—কংগ্রেসের দৌর্ব্বল্য-বোধ যেন এক নিমিষে তিরোহিত হইয়া গেল। স্বদেশে প্রেমের এই নিদর্শনস্বরূপ পণ্ডিত জহরলালের সহিত সন্তানম্ নিখিলভারতের কংগ্রেস কমিটির যুগ্ম-সম্পাদক নিযুক্ত হইলেন।

ভারতের বীমার ক্রমবিকাশের ইতিহাস বুঝিতে হইলে সন্তানমের নীরব কার্য্যধারাকে অনুসরণ করিতে হইবে। বিছিন্ন ভারতের বীমা প্রতিষ্ঠানগুলিকে সংঘবদ্ধ করিয়া ভারতের শ্রেষ্ঠ বীমা সংঘটীর প্রতিষ্ঠা তিনি করিয়াছেন। কর্ম্মক্ষমতা থাকিলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে বীমা-প্রতিষ্ঠান ভারতবর্ষেও কিরূপ সফলতা দেখাইতে পারে "লক্ষ্মী" তাহার উজ্জ্বল উদাহরণ। পণ্ডিতজী আপনার অসামান্য কর্ম্মক্ষমতা, উজ্জ্বল ধীশক্তি এবং যথার্থ স্বদেশ প্রেমিকতাকে কেন্দ্রীভূত—করিয়া যৌবনের স্বপ্নকে সফল করিয়া তুলিয়াছে।

"লক্ষ্মীর" নবগঠিত মহাপ্রাসাদের নিকট দাঁড়াইয়া ইহার প্রতিষ্ঠাতাকে স্মরণ করিয়া এই কথাই আজ মনে আসিতেছে, হে নীরব কর্ম্মী, দারিদ্র্যনিপীড়িত পরাধীন দেশের দুর্দ্দশামোচনে তুমি যে প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়াছ তাহা দেশবাসী ভুলিয়া যাইবে না—সমবেদনায় ও গৌরবে তাহাদের ভাব-প্রবণ হৃদয়কে পূর্ণ করিয়া তুলিবে।

মেঘনাদ

বিচিত্রা

দ্বীপান্তরের বাঁশীর অমর লেখক, স্বাদেশিকতার পুরোহিত বারীন্দ্রকুমার বীমাক্ষেত্রে "বোমা" লইয়া নামিয়াছিলেন। স্বদেশী আন্দোলনের সেই একান্ত অনুরাগে প্রাণঢালা বিশ্বাসময় তরুণের দল কণ্টকিত বীমা-জগতে বারীন্দার অনুসরণ করে নাই তাই বুঝি অনভ্যস্ত হস্ত হইতে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া "বোমা" তাঁহার মাথায়ই পড়িয়াছে! অগ্নিযুগের পূজারী বারীনদাকে অবলম্বন করিয়া স্বীয় জঘন্যবৃত্তি চরিতার্থ করা ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে সহজ নহে—গত ৩২শে আষাঢ়ের "বিজলীতে" বারীনদার "ক্রটী-স্বীকার" পাঠ করিয়া আমরা আশ্বস্ত হইয়াছি এবং নীল-সিন্ধুর তীরে থাকিয়াও বারীনদা এই "অলীক বিদ্বেষদুষ্ট" সংবাদদাতার স্বরূপ যথার্থরূপে চিনিয়াছেন!

° ° ° ° °

শ্রীকৃষ্ণ প্রিণ্টিংএর ম্যানেজার জানাইয়াছেন—"ইণ্ডিয়ান ইন্সিওরেন্স জার্ণালের" ছাপাখানার বিলের জন্য শ্রীকৃষ্ণ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস কলিকাতার ছোট আদালতে জার্ণাল সম্পাদকের নামে নালিশ করিয়া আফিসের আসবাব পত্র অগ্রিম ক্রোক্ করেন। সম্পাদক মহাশয় ফেডারেল ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর পক্ষ হইতে উক্ত আসবাব পত্র উক্ত কোম্পানীর বলিয়া আপত্তি দেন এবং প্রেসের বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণের এক দাবী উপস্থিত করেন। তাঁহার দাবীর মোকর্দ্দমা টিকিল না কিন্তু পাওনাদার খরচাসমেত ডিক্রি হাসিল করিয়াছেন। সদাশয় জজ সাহেব দয়া পরবশ হইয়া জার্ণাল সম্পাদক মহাশয়কে ডিক্রিকৃত টাকা এক বৎসরের কিস্তিবন্দিতে শোধ করিবার সময় দিয়াছেন—

° ° °

"জীবনবীমা" বাংলা-ভাষার একমাত্র বীমা—পত্রিকা। উক্ত পত্রিকার অধ্যক্ষ মিঃ বি, এম্, সেন বহুদিন হইল বীমাক্ষেত্রে কার্য্য করিতেছেন এবং বলিতে গেলে তিনিই Indian Insurance Instituteএর প্রতিষ্ঠাতা। বাংলায় বীমা-প্রসঙ্গের অনুশীলনের সময় বহুদিন হইল আসিয়াছে সুতরাং "জীবনবীমার" প্রচেষ্টা সাফল্য মণ্ডিত হউক ইহাই আমাদের কামনা!

° ° °

সাহিত্য পত্রিকায় বীমা-প্রসঙ্গের আলোচনা করিয়া আমরা নাকি সাহিত্যের জাত মারিয়াছি। কিন্তু বাণীর একনিষ্ঠ পূজারিগণ যে একে একে বীমাক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেছেন—

রবীন্দ্রনাথ বার্ষিক সংখ্যা "Insurance world"এ বীমার আশীর্ব্বচন করিয়াছেন। কবি প্রিয়ম্বদাও উক্ত পত্রিকায় বীমার উপযোগিতা সম্বন্ধে অনেক কথা বলিতেছেন—পত্রিকার উৎসাহী সম্পাদক অভিমানী শরৎচন্দ্রকে বাদ দিলেন কেন?

° ° °

নাই—দারিদ্র্য পীড়িত ব্যক্তিদের পারিবারিক অন্ন সংস্থানের ব্যবস্থাই কোম্পানীর প্রধান ব্রত ছিল—এজন্যই বোধহয় এত স্বল্প চাঁদার হারের ব্যবস্থা হইয়াছে।

কোম্পানীর পরিচালন পরিষদের নাম আমরা নিম্নে প্রদান করিলাম—

ডিরেক্টারগণ

শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ দাশ গুপ্ত, বি-এ, বি-ই ; এম্-আর স্যান্ (লণ্ডন) সভাপতি।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ননীগোপাল মুখোপাধ্যায় এম্-এ।

ডাঃ কে, ডি, মজুমদার, এম্-বি।

শ্রীযুক্ত সত্যচরণ মুখোপাধ্যায়, এম্-এ, বি-এল।

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু।

শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এম্-এ, বি-এল।

শ্রীযুক্ত পি, সি, রায়, এম্-এ, বি-এল।

সেক্রেটারী

শ্রীযুক্ত পি, সি, রায়।

অডিটার

মেসার্স সাহা এণ্ড মজুমদার।

হেড-অফিস

৩০৯, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১৯৩১এর কোম্পানীর বার্ষিক রিপোর্ট আলোচনা করিবার পূর্ব্বে একটি কথা বলা প্রয়োজন। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে মিঃ পি, সি, রায় যখন এই কোম্পানীর সেক্রেটারী নিযুক্ত হন তখন কোম্পানীর কি অবস্থা ছিল এবং বর্ত্তমানে উহা কিরূপে দাঁড়াইয়াছে তাহার তুলনামূলক বিবৃতি আমরা নিম্নে প্রদান করিলাম—

বৎসর	নূতন কাজের পরিমাণ	চাঁদার আয়	ব্যয়ের হার
১৯২১-২২	১,৩৫,০০০	৫১১২৩	৫৮.৭
১৯৩১	৫,০৫,০০০	১,২৯,৭৭৩	৩০.২

উপরের অঙ্কগুলি হইতেই পাঠকবর্গ বুঝিতে পারিবেন বর্ত্তমান সেক্রেটারী কিরূপ দক্ষতার সহিত কার্য্যপ্রণালী পরিচালনা করিয়াছেন। কোন সুপ্রতিষ্ঠিত কোম্পানীর কার্য্যপ্রণালী পরিচালনা বিশেষ শক্ত নহে। কিন্তু ধ্বংস প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানকে প্রতিষ্ঠিত করা দুরূহ ব্যাপার—হিন্দু মিউচালের অভিজ্ঞ সম্পাদক ইহাই করিয়াছেন এবং এজন্য তাঁহার আনন্দ প্রকাশ করাও অসঙ্গত নহে।

আলোচ্য বর্ষে কোম্পানী ৫,৪৮,০০০ টাকার বীমার প্রস্তাব পাইয়া ৫,০৫,০০০ টাকার পলিসি প্রদান করিয়াছেন—এই নূতন বীমার চাঁদার আয় ২৩,৪৫৬ টাকা। বর্ত্তমান বর্ষে কোম্পানীর বহু টাকার বীমা বাতিল হইয়া গিয়াছে—জগৎব্যাপী অর্থকৃচ্ছ্রতা, রাজনৈতিক গোলযোগ এবং সর্ব্বোপরি ভূতপূর্ব্ব চীফ এজেণ্ট শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ বিশ্বাসের অযোগ্যতা ইহার কারণ এইরূপ রিপোর্টে প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা আশা করি আগামী বর্ষে কোম্পানী lapse ratioর প্রতি যথাযোগ্য দৃষ্টি প্রদান করিবেন।

৩১-১২-৩১ তারিখে কোম্পানীর ভ্যালুয়েশন কার্য্য নিষ্পন্ন হইবার কথা ছিল—কোম্পানীর তহবিলের প্রায় অধিকাংশ টাকাই কোম্পানীর কাগজে লগ্নী থাকায় এবং উক্ত দিবসে ঐ দর হ্রাস হইয়া একেবারে ন্যূনতম হওয়ায় কোম্পানী হইতে সরকার বাহাদুরের নিকট ভ্যালুয়েশন কার্য্য স্থগিত রাখিবার জন্য বা ঐ তারিখের গত পাঁচ বৎসরের গড়পড়তা দর ধরিয়া আবেদন করা হইয়াছিল। কতকগুলি বৃহৎ কোম্পানী হইতেও এই প্রচেষ্টা চলিয়াছিল কিন্তু তাহার কোন উত্তর না পাওয়াতে কোম্পানী ঐ তারিখেই ভ্যালুয়েশনের কার্য্য নিষ্পন্ন করান এবং ভ্যালুয়েশনে উদ্বৃত্ত প্রকাশিত হইয়া কোম্পানীর স্বচ্ছলতা প্রমাণিত হইয়াছে। বিভিন্ন বীমা-পত্রিকা এ বিষয়ে কোম্পানীকে অভিনন্দন জানাইয়াছেন, আমরাও তাহাদের সহিত যোগদান করিতেছি। কারণ ৩১শে ডিসেম্বরের পরে কোম্পানীর কাগজের দর শতকরা ১৫৲ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া কোম্পানীর প্রকৃত উদ্বৃত্তকে বহু পরিমাণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত করিয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে কোম্পানীর ব্যয়ের হার কমিয়া প্রায় ৩০.২ দাঁড়াইয়াছে—এত স্বল্প প্রিমিয়ামে এরূপ ব্যয়ের হার খুবই প্রশংসনীয়। অন্যান্য কোম্পানীর অনুকরণ যোগ্য—আমরা কোম্পানীর অতিশয় সংরক্ষণশীল, ব্যয় সংযত, সুপরিচিত সম্পাদক মহাশয়কে নূতন কার্য্যের পরিমাণ আরও কিছু বৃদ্ধি করিবার জন্য কি অনুরোধ করিতে পারি না?

শ্রীবিষ্ণু দাস

১৩৩৯ সনের আষাঢ় মাসের মাসিক বসুমতীতে কবি কালিদাস একটী কবিতায় গিরিধিতে অবস্থান কালে উস্রিতটস্থিত শাল গাছের নিকট যৌবন-ভিক্ষা করিয়াছেন। প্রার্থনা কালে তিনি রোগে পাণ্ডু, জীর্ণ ও মলিন ছিলেন। গিরিধির শালগাছগুলির রস, তেজ ও প্রাণ আছে প্রচুর;—এমন শাল ছোটনাগপুরের আর কোথাও দেখা যায় না। ক্লিষ্ট কবি তাই উহাদের নিকট স্বাস্থ্য কামনা না করিয়া যৌবন ভিক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু কেন, তাহা অবশ্য তিনি প্রকাশ করেন নাই। তাঁহার সে কামনা পূর্ণ হইয়াছে কিনা এবং অধুনা তিনি কোথায় আছেন, তাহা জানি না।

কুমার শ্রীধীরেন্দ্র নারায়ণ রায়ের "স্পর্শের প্রভাব" এখনও দেখা যাইতেছে। তাঁহার স্পর্শের প্রভাবে চারিদিকে সোনা-রূপা ফলিয়া আনন্দ দান করুক।

প্রথম গল্প—শ্রী অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়ের "ঘরের টান।" মানুষের শৈশব যেখানে অতিবাহিত হয় সে স্থানের প্রতি তাহার নাড়ীর টান থাকে;—আবার নূতনত্বের মোহও তাহাকে সময় সময় অভিভূত করে। গল্পটির তাৎপর্য্য ইহাই। তবে ইহার প্রধান নায়ক এক বালক। তাহার চরিত্রেই লেখক এই কথাটি ফুটাইতে চাহিয়াছেন—ফুটিয়াছেও। কিন্তু স্থানে স্থানে অতি মাত্রায় ফেনানোর দরুণ পাঠ করিতে করিতে বিরক্তি আসে।

দ্বিতীয় গল্প স্বর্গীয় সতীশ চন্দ্র ঘটকের "নীচ-জাতিয়া"—

তৃতীয় গল্প শ্রীপ্রফুল্ল কুমার মুখোপাধ্যায়ের "ভুলের বোঝা।" প্রারম্ভই আছে "বিপিন মুখুয্যে মাতৃ-হীনা কন্যা জয়ন্তীকে শিক্ষা-দিক্ষা দিয়াছিলেন বটে কিন্তু তাহাকে পাত্রস্থ করিবার আর অবকাশ পাইলেন না" ইহা অবশ্য পরম দুঃখের কথা। যাহা হউক, তাহার খুড়ার ঘটকালীতে জয়ন্তী পরিশেষে সৎ-পাত্রে অর্পিত হয়। কিন্তু সম্প্রদানের পূর্ব্ব হইতেই এই শিক্ষিতা মেয়েটি ভুল বুঝিয়া স্বামীর প্রতি যে-ব্যবহার সুরু করিয়া দেয় তাহা অবশ্য তাহার সদ্‌শিক্ষার পরিচায়ক নহে। পিতা তাহাকে নিশ্চয়ই কুশিক্ষা দেন নাই। তথাপি যে-ব্যবহার দ্বারা সে স্বামীর ও তাহার নিজের জীবন তখন হইতে বিবাহের পর বহুদিন অবধি দুঃখময় করিয়া তোলে তাহা অবশ্য তাহার দোষ নয় লেখকের কারসাজীতে। গল্পটিতে একটী ভাল প্লট ছিল; কিন্তু লেখকের শক্তির অভাবে জমে নাই।

চতুর্থটিও গল্প শ্রীদীনেন্দ্র কুমার রায়ের "সহোদর" —(পল্লীচরিত্র) চমৎকার ফুটিয়াছে। উপমা ও ভাষায় একটু প্রাচীনত্ব থাকিলেও রচনাটি সরস।

পঞ্চম গল্প শ্রীদেবেন্দ্র নাথ বসুর "ছাগলাদ্য ঘৃত" বসুমতীতে রক্ষিত হইবার উপযোগী বটে। লেখকের অনুসরণ করিয়া বলি, "একেবারে হাসির হাঁসকল, রসের রসকলি। যত হাস কাছায় টান পড়বে না।"

এবারে ঐ পাঁচটি গল্প দিয়াই বসুমতী রসপিপাসু পাঠক-পাঠিকাগণের তৃষ্ণানিবারণের চেষ্টা করিয়াছেন—অবশ্য একটী পৈশাচিক কাণ্ডও আছে।

এ সংখ্যায় প্রথম রঙ্গিন ছবি শ্রীচারুচন্দ্র সেনগুপ্ত

"রক্তকমল"—একখানি পট। অবশ্য মূর্ত্তিটির ভাব ভঙ্গী ও বসন-ভূষণ নববধূর মত। কে জানে, ঐ ভাব-ভূতেই শিল্পীকে পাইয়াছে কি না। আর রক্তকমলের রক্তের লালিমাও তো মেয়েটির গোন্ড়া মুখে নাই। এখনও কুঁড়িতেই আছে কি?

দ্বিতীয় ছবি স্বর্গীয় চঞ্চল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের "কসরৎ"—ব্যঙ্গচিত্র—বসুমতির রসবোধকেই যেন ব্যঙ্গ ব্যঙ্গ করিতেছে।

তৃতীয় খানি মিঃ টমাসের"

"কি দেখিছ বঁধু মরম মাঝারে
রাখিয়া নয়ন ছুটি?"

কথা গুলি রবীন্দ্রে নাথের। ছবিখানি বোধ হয় কোন সখের ভদ্রলোককে নারী সাজাইয়া আঁকা হইয়াছে। ইহাতে কাহারো আপত্তি হইতে পারে না, এক সেই ভদ্রলোকটি ছাড়া। আর এরকম ছবি ছাপাইয়া বসুমতীও কাগজ-কালী প্রভৃতি যত খুশী নষ্ট করিতে পারেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কবিতার দুইটি লাইন তাহার তলায় বসাইয়া অর্থ করিবার চেষ্টা দেখিয়া মনে হয়, রবীন্দ্র-সাহিত্যের বিরুদ্ধে আন্দোলন বেশ জোর চলিতেছে। বটতলার বট-যুগ ইঁহারা শীঘ্রই ফিরাইয়া আনিবেন।

* * *

১৩৩৯ সনের শ্রাবণ সংখ্যা প্রবাসীতে রবীন্দ্র প্রশস্তি নামক একটী কবিতা পাঠ করা গেল। লিখিয়াছেন শ্রীইন্দুভূষণ দেব বিদ্যা-বিনোদ। কবিতাটী সেই রবীন্দ্রজয়ন্তির ক্ষণেই লেখা হইয়া থাকিবে। কিন্তু কবিতা কখনও পুরাতন হয় না, এই ধারণায় হয়ত প্রবাসী এতকাল পরে ইহা ছাপিয়াছেন। কবিতাটী জয়ন্তী উৎসর্গে একটু স্থান পাইলে ভদ্রলোকটী বোধ করি আরও পুলকিত হইতেন। তবে ইহাকে রবীন্দ্রজয়ন্তীর জের বলা যাইতে পারে। যাহা হউক, বাসি গন্ধ ছাড়িলেও কবিতাটি ভালই হইয়াছিল।

শ্রীযুক্ত কেদার নাথ চট্টোপাধ্যায়ের "পারস্য-ভ্রমণ" আনন্দদায়ক হইলেও পাঠে আমারা তেমন আনন্দ পাইলাম না। তবে উড়োজাহাজ সম্বন্ধে কতকগুলি খবর ইহাতে আছে। স্থানে স্থানে লেখ্য ও কথ্য ভাষার বিশ্রী সমাবেশ দেখা যায়। অবশ্য ইহা পহেলা কিস্তী।

এ সংখ্যায় ছোট গল্প আছে মাত্র তিনটি।

প্রথম গল্প শ্রীবিমল মিত্রের "ছায়ার মায়া।" বেশ লাগিয়াছে—গোড়া হইতে শেষ অবধি বেশ জমাট। ভাষা সহজ ও সরল;—এত সরল যে লেখক লেখ্য ভাষার মাসে "বছর, টের, ঢোকে," প্রভৃতি শব্দ চালাইয়াছেন। এই গল্পটির বিষয়বস্তু সামান্যই কিন্তু লিখিবার গুণে সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে।

দ্বিতীয় গল্প শ্রীমনোজ বসুর "যাও পাখী বলো তারে—," গল্পটীতে দাম্পত্য-প্রেম রস আছে। উপসংহার-টাও Tragic।

স্ত্রী যখন গৃহিণীপদে উন্নীত হয়। তখন আর সে যৌবনের সেই প্রিয়তমা নয়। সে মানুষটা যৌবনের সঙ্গেই মৃত। তাহার মধ্য হইতে আর একজন যে জাগিয়া উঠে সে সম্পূর্ণ অপরিচিতের মতই দেখা দেয়।

তৃতীয় গল্প শ্রীশান্তাদেবীর "পথবাসিনী।" বেশ লাগিয়াছে। গল্পের প্লটটি বেশ।

শ্রীবসন্তকুমার বিদ্যারত্নের প্রবন্ধ "সেকালের বিলাসিতা"তে কতকগুলি জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। লেখক মহাশয় প্রারম্ভে লিখিয়াছেন, "অনেকের ধারণা পুরাকালে ভারতবর্ষে বিলাসিতার চর্চ্চা ছিল না, যদি বা ছিল তাহা অতি স্থূল রকমের। ° ° সেকালের বিলাসিতা আধুনিক বিলাসিতা অপেক্ষা কোন অংশে কম ছিল না।" সত্য কথা। ভারতীয় সভ্যতা কেবলমাত্র আধ্যাত্মিকতার দিক দিয়াই চরমে উপনীত হয় নাই। এখানে "চতুঃষষ্ঠি কলাবিদ্যারও সৃষ্টি হইয়াছে।" এখন অবশ্য সেগুলি অপক রস্তায় পরিণত হইয়াছে।

জসীম উদ্দীন—এম এর প্রবন্ধ—"পল্লীশিল্প" প্রবন্ধটি বেশ। বাংলার পল্লীর সহিত যাঁহারা অতি পরিচিত তাঁহারা ইহার সাক্ষ্য দিবেন।

এ সংখ্যায় রঙীন্ ছবি দেখা গেল, তিনখানি। শ্রীকনু দেশাইয়ের "একাকী" ছবিখানি বাস্তবিকই সুন্দর।

* * * *

১৩৩৯ সালের শ্রাবণ সংখ্যার ভারতবর্ষে—এক কবিপ্রতিভার পরিচয় পাওয়া গেল। এই উথিয়মান কবিটি ডক্টর মহম্মদ শহীতুল্লাহ এম এ ইঃ। ইনি প্যারিস হইতে সাহিত্যের ডাক্তার হইয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। যে কবিতাটিতে তাঁহার প্রতিভার বিকাশ দেখা দিয়াছে তাহার নাম "সন্ধান"। (হাফিজ হইতে মূলের ছন্দের অনুকরণে) অর্থাৎ ইহাতে ছন্দকেই অনুকরণ করা হইয়াছে, ভাবকে নয়। ইহা এক পক্ষে সুবুদ্ধিরই পরিচয় বলিতে হইবে। তবে অনুকরণও যে সকল সময় নিখুঁত হয়, একথা বলা যায় না। এদেশের অনেকেই তো সাহেব সাজে, তাহাদের সবটাই কি সাহেবের সহিত মিলিয়া যায়? বিলাত হইতে অনুকরণে সাহেব সাজিয়া কত-জনই তো আসিতেছে। তবুও তাহারা সাহেব তো? "বাবু" বলিলে তাই চটিবারই কথা!

এখন এই অনুকরণের একটু নমুনা দেওয়া যাক্—

"এ ভাঙা মনের কি ছাই সে পেঁচে উদ্ধার আছে?"
(উদ্ধার পেতে তোমাকে ছাই কে বলেছে কে সেধেছে?)

"মুখটি হেন
পুনঃ পুনঃ

থাম্‌বো না তার,
সেই জীবন নাথ"

যাহা হোক ভারতবর্ষ যে এই কবি প্রতিভাকে চিনিয়া পূর্ব্ব হইতেই কাজ গুছাইয়া রাখিতেছেন, ইহা ভারী চমকপ্রদ! আর কেহ যে পারিবে সে লক্ষণ এখনও দেখা যাইতেছে না।

আচ্ছা এত কবি থাকিতে হাফিযকে লইয়াই এমন ছেঁড়াছেঁড়ি কেন?

"দামোদরের বিপত্তিতে" এবার গবেষণার মত চমৎকার একটী বিষয় পাওয়া গিয়াছে "রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক আকাশ ও তাহার মানচিত্র।" গবেষণাটি মৌলিক হইবে সন্দেহ নাই। কবির পার্শ্বচরদের মধ্যে কেহ যদি চেষ্টা করিয়া দেখেন! বেচারা দামোদর সাহিত্যিক হইলেও পূরা এক ঘণ্টা চেষ্টা করিয়াও পারে নাই।

এ সংখ্যায় ছোট গল্প আছে মাত্র দুটি। প্রথম গল্প শ্রীপ্রবোধ কুমার সান্যালের "অপরাহ্ণে" বা "অনেক রাত্তিরে"। সাঁওতাল পরগণার এক ছোট ষ্টেশনের ছোক্‌রা এ্যাসিষ্টাণ্ট ষ্টেশন মাষ্টারের মায়ের যৌবন-কালের ব্যর্থ প্রেমের এক চাপা কাহিনী। ছোক্‌রাটি এত ছোক্‌রা যে ওষ্ঠোপরি তাহার গোঁফের পরিবর্ত্তে গাছ কয়েক অনুকেশ (ভাতরোঁয়া) দেখা দিয়াছে মাত্র। গল্পটির একমাত্র বিশেষত্ব ইহা এ্যাশিষ্টাণ্ট ষ্টেশন মাষ্টারের মায়ের প্রেমের গল্প। আর ব্যর্থ প্রেমিক সেই ষ্টেশনেরই রিলিভিং ষ্টেশন মাষ্টার। মনে করিয়াছিলাম বেশ জমিবে। কিন্তু লেখকের আলস্য, অনিচ্ছা বা অনভিজ্ঞতা, যাহাই হউক, রসটুকু শেষ অবধি জমাইতে দেয় নাই। কেন জানি না, মহামায়া (এঃ ষ্টেঃ মাঃর মাতা) ও রিলিভিং ষ্টেশন মাষ্টারকে মনে হয় পল্লীসমাজের রমা ও রমেশ। অনু-ধাবন বা অনুকরণের ফলেই হয়ত এরূপ হইয়া থাকিবে। তাহাতেও কিছু যায় আসে না; কিন্তু রস জমে নাই। একটী আড়ষ্ট রচনা।

দ্বিতীয় গল্প শ্রীবুদ্ধদেব বসুর "নিষ্ফল সম্ভাবনা"—সত্যই নিষ্ফল। ইহার মধ্যে আখ্যান ভাগ খুঁজিতে নিষ্ফল হইবার সম্ভাবনা।

"লিখতে খুব বেশী অভ্যাস থাক্‌লে এই একটা লাভ হয় যে যে-কোন রাবিশ বেশ পঠনীয় করে চালিয়ে দেওয়া যায়। বাংলা দেশের পাঠক যে কত অল্পে খুসী, তা ভেবে অবাক হতে হয়।" সত্যই কি তাই? না পাঠকবর্গকে যাঁহারা এই সব রাবিশ কুড়াইয়া রসাল বলিয়া পরিবেশন করেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে এ দোষারোপ খাটে?

গল্পটি কলিকাতার ভাষায় লিখিত। কিন্তু লেখকের তাহা এখনও দুরস্ত হয় নাই। অথবা ইহা সেই সোনা দিয়া শিং বাঁধাইলেও "অর বৃ ষ্" একটু গন্ধ ছাড়িবেই?

পই পই করে না পই পই করে? "পঞ্জাব মেইল" না পঞ্জাব মেল? লা-ছোড়বান্দা না নাছোড়বান্দা?

"নাক চুলবুল" ব্যাপারটা কি রকম, নাক চুলকা কামটিই বা বাদ রহিল কেন?

আর একটি কথা, কাহার দ্বারা কোন কিছু লওয়াইবার ইচ্ছা থাকিলে "তাহার হস্তগত করানোই" উচিত "হস্তগত করা" বড় দোষের।

অবশ্য এ সকল দোষ থাকা সত্ত্বেও একটি গুণ যে আছে তাহা আজকালকার দিনে বিশেষ দরকার—সেটি হইতেছে বীরত্ব। গল্পের দুটি জায়গায় তাহার নিদর্শন আছে।

একটী—"দেখো মা, ০ ০ ০ ০ হয় তুমি এ বাড়ী ছেড়ে চলে যাও, নয় আমি যাই।"

আর একটি "কি যে করবে, সত্যপ্রিয় ভেবে উঠ্‌তে পারছিল না; কিছু চিনেবাসন ভাঙতে পারলে ভালো লাগতো।" হাঁড়ি-কুড়ি না ভাঙ্গিয়া চীনেবাসন ভাঙিতে চাওয়াটো যুগোপযোগী বটে। এতদুভয় কার্য্যে প্রচুর শারীরিক শক্তির প্রয়োজন, কয় জনের তাহা আছে? যাহাদের নাই তাহাদের ধিক!

এ সংখ্যায় রঙিন ছবি আছে চারখানি।

শ্রীযুক্ত নলিনী মজুমদারের "কালাপাহাড়কে" দেখিয়া বড়বাজার নিবাসী জনৈক বানিয়াকে মনে পড়ে। চেয়ারে বসাটা যেন তাহার এখনও দুরস্ত হয় নাই; হাঁটুভাঁটাও মনে হইতেছে নিষ্কুক ভাঙিবার। মুখখানি দেহের অনুপাতে বড়—অবশ্য পাহাড়ে মুখ, ছোট হইবার কথা নয়।

শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

"কোথায় আলো
কোথায় ওরে আলো—"

আমাদের মতে

নুড়ো দিয়ে জ্বালোরে তারে জ্বালো
এমন ছবি পুড়িয়ে ফেলাই ভালো।

শ্রীসুকুমার সরকার "জুয়ারি" কবিতায় খেদ করিয়াছেন—"কখনো হারায়ে গেছে মৃত্তিকার ধরণীতে মোর—"

ধরণীর উপাদান আরও কিছু হয় নাকি?

"নারী দেয় নাই তৃপ্তি, উপভোগে ক্লান্তি নেমে আসে—"বাড়াবাড়ির ফল। ইহার পর হাঁটিতেও কষ্ট হইবে।

"প্রাণহীন এ দেহ দেউলে—" তবে কি প্রেতলোক হইতে কবিতাটী প্রেরিত হইয়াছে?

শ্রীনরেন্দ্র দেব—কায়া ছাড়িয়া অধুনা "ছায়ার মায়ায় লিপ্ত। কিছুকাল পরে দেখা যাইবে কেবল মায়াজাল স্কন্ধে করিয়া তিনি বঙ্গসাহিত্যে বিচরণ করিতেছেন।

কাশ্মীর ভ্রমণ

শ্রীপ্রফুল্লকুমার দে

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

ভোর পাঁচটায় আমার ঘুম ভাঙিয়া গেল। সকলকে ঠেলিয়া তুলিলাম। ইহাতে কেহ কেহ একটু বিরক্ত হইল। তাহাদের তখনকার অবস্থা দেখিলে সত্যই হাসি পায়। যাহা হউক ষ্টেশনে চা প্রস্তুত করিয়া খাইয়া আমরা পানাগড় ছাড়িলাম।

ষ্টেশনের ধারেই দুইচারিখানি খড়েরচালা ঘর আছে, তাহারই মধ্যে কোনটা খাবারের, কোনটা চাউল মশলাদির কোনটা বা তরিতরকারীর দোকান। দুই একখানি পানেরও দোকান আছে। উহাদের মধ্যে একটী একতলা কোঠাবাড়ী পোষ্ট আপিস রূপে ব্যবহৃত হয়। আমরা পোষ্ট অফিস হইতে কয়েকখানি পোষ্টকার্ড কিনিয়া লইলাম।

পোষ্ট অফিস ছাড়িয়া কিছুদূর অগ্রসর হইবার পর লাল মাটীর রাস্তা। দুইদিকে শালবৃক্ষের শ্রেণী; দেখিলে মনে হয় যেন, আর আমরা বাংলা দেশে নাই, যদিও তখন আমরা বাংলার ভিতরে। রাস্তা দিয়া মাঝে মাঝে ২।৪ খানি গরুর গাড়ী যাইতেছিল। তাহাদের কোনটায় কাঠ বোঝাই, কোনটায় বা খড় বোঝাই। পথিকও ২।৪ জন ১।২ মাইল অন্তর দেখা যাইতেছিল। তাহাদের বেশীর ভাগই সাঁওতাল। কেহ কুড়ুল কাঁধে, কেহ কেহ ঝোঁটি

মাথায়। একজনকে ডাকিয়া তাহাদের ভাষায় জিজ্ঞাসা করিলাম 'মাঝি! ওকাতম চালা কানা?' অর্থাৎ তুমি কোথায় যাচ্ছ? তাহার উত্তরে সে বলিল "কাঠ কাটিতে।"

৪।৫ মাইল পথ চলিবার পর সমতল ভূমি প্রায় শেষ হইয়া গেল, ক্রমেই ভূমি উঁচু নীচু ও কিছু পাথর ও কাঁকর মেশান, কতকটা পার্ব্বতীয় প্রদেশের চিহ্ন। বেশ স্ফূর্ত্তিতে চলিতে চলিতে আমরা দুর্গাপুর জঙ্গলে প্রবেশ করিলাম। জঙ্গল খুব বড় নহে; ৪।৫ মাইল মাত্র। জঙ্গলটা রাস্তার দুইধারে সমানভাবে চলিয়াছে—কেবল শালগাছে পূর্ণ। তাহাও বেশী বড় নহে—রাস্তার ধারের গাছগুলি খুবই ছোট, দূরে বড় বড় গাছ দেখা যাইতেছিল। রাস্তা একেবারেই নির্জ্জন কিন্তু খুব পরিষ্কার। বরাবর লাল কাঁকর ও লাল মাটীর তৈয়ারী। একমাইলের পর আমরা প্রথম চড়াই পাইলাম কিন্তু ছোট! তাহার পর আরও দু-একটা চড়াই ও উৎরাই পাওয়া গেল। প্রায় ২০।২৪ মিনিটের মধ্যে আমাদের দুর্গাপুরের জঙ্গল পার হইলাম। তারপর ফরিদপুর ও ভিরিঙ্গি গ্রাম এ দুটিও পার হইয়া চলিয়া গেলাম।

কিছুদূর যাইবার পর বামদিকে অণ্ডালের রাস্তা দেখা গেল। তারপর সোজা চলিতে চলিতে প্রায় বেলা ৯টার সময় আমরা আমাদের পূর্ব্বপরিচিত রাণীগঞ্জের কিছুদূরে এক levelcrossingএ আসিয়া থামিলাম। সেখানে গুমটী রক্ষকের নিকট হইতে একটী খাটীয়া লইয়া কেহ তাহার উপর, কেহ নীচে মাটীতে বসিয়া বিশ্রামকরিতে লাগিলাম। সেখানে পরিতৃপ্তি সহকারে ঠাণ্ডাজল পান করিয়া কিছুক্ষণ বসিয়া গল্প করা গেল। দুই চারখানি motor রাস্তা দিয়া সবেগে প্রবল উৎসাহে ধূলা উড়াইয়া চারিদিক কিছুক্ষণ অন্ধকার করিয়া যাওয়া-আসা করিতেছিল। আরোহীর মধ্যে কেহ কেহ অত ঝাঁকানি খাইয়াও বেশ নিশ্চিতমনে ঘুমাইতেছিল। পথিকের সংখ্যাও অনেক বাড়িয়াছিল। একটী লোক সাইকেলে চড়িয়া মাথায় উড়ানী ও চোখে নীল কাচের চসমা দিয়া যাইতেছিল আমাদের দেখিয়া নিকটে আসিল এবং অনেক গল্প গুজব করিয়া তাহার গন্তব্যপথে চলিয়া গেল। কয়েক মিনিট পরে আমরাও আমাদের রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইলাম। গুমটীওয়ালার সাহায্যে আমাদের জলপাত্রগুলি জলে ভর্ত্তি হইল। তাহাকে কিছু পয়সা দিয়া খুসী করিয়া আমরা আসানসোল অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

গরম বেশ। আশে পাশে কয়লার খনি দেখা যাইতেছিল। তাহাদের প্রত্যেকেরই মস্তকে বড় বড় লৌহচক্র সুদর্শন চক্রের ন্যায় ক্রমাগত ঘুরিয়া চলিয়াছে, যেন বলিতেছে এ কর্ম্মক্ষেত্রে কাহারও বসিয়া থাকিবার অধিকার নাই। সেগুলির ন্যায় খনির কর্ম্মচারী কুলি মজুর সকলেই ব্যস্ত। সাঁওতালী কুলি রমণীরা মাথায় কয়লার ঝুড়ি লইয়া সারি দিয়া, উচু নীচু মাঠের উপর, রাস্তার পাশে পাশে চলিতেছে।

আমাদের একেবারে এসানসোলে আসিবার কথা ছিল, কিন্তু আসিতে পারি নাই, পথে কালীপাহাড়ীতে মণিমোহনের এক বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। তাহাদের এই স্থানে কয়লার খনি আছে। দুপুরবেলা তাঁহারই অফিসে আহার ও বিশ্রামের ব্যবস্থা হওয়ায় সেখানেই থাকিতে হইল। সেখান হইতে দুপুরের পর আমরা গোবিন্দপুর অভিমুখে যাত্রা করিলাম। দুর্ভাগ্যবশতঃ সেই রাত্রে আর গোবিন্দপুর যাওয়া হইল না। এসানসোলের বাজারে কিছু প্রয়োজনীয় দ্রব্য ক্রয় করিয়া সেগুলি সাইকেলে বাঁধিতেছি এমন সময় বেশ জোরে শিলাবৃষ্টি আরম্ভ হইল। বৃষ্টি থামিল প্রায় রাত্রি সাড়ে দশটার সময়। তখনও আকাশে বেশ মেঘ ছিল, উপায়ান্তর না দেখিয়া আশ্রয়ের চেষ্টা করিতে হইল। বর্দ্ধমানের বিজন বাবু এসানসোলের Govt. pleader শ্রীযুক্ত বাবু শৈলেন্দ্র নাথ মিত্র মহাশয়কে আমাদের আশ্রয় দিবার জন্য একখানি পত্র দিয়াছিলেন। আমরা সেই রাত্রে মিত্র মহাশয়ের বাটী খুঁজিয়া বাহির করি এবং তাঁহাকে বেশ একটু বিরক্ত করিয়াছিলাম।

ক্রমশঃ

গ্রন্থ-পরিচয়

ফুলের ডালি। শ্রীরামেন্দু দত্ত প্রণীত। মূল্য ।৹ আনা প্রকাশক—শ্রীকালী কিঙ্কর মিত্র, ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, ২২।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট। ছোট ছেলে মেয়েদের জন্ত রচিত এই গল্পগুলিতে রামেন্দু বাবু যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। গল্পগুলি শুধু চিত্তাকর্ষক নয়—চিত্তোৎকর্ষসাধকও বটে। ফুলের মালার অন্তরালে গুম্ফন সূত্রের মত প্রত্যেক গল্পের অন্তস্তলে একটী করিয়া নৈতিক আদর্শের সূত্র আছে। অথচ উপর হইতে কিছুই বুঝিবার উপায় নাই। এই খানেই রামেন্দু বাবুর কৃতিত্ব। গল্পগুলির ভাষা এমনি স্বচ্ছ সরল প্রাঞ্জল ও সরস যে একবার পড়িতে আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া থাকা যায় না। ফুলের ডালি আবালবৃদ্ধ বণিতা সকলকেই আনন্দ দান করিবে।

ভুলের ফুল—শ্রীরামেন্দু দত্ত। গল্পের বই মূল্য ১৲ টাকা। প্রথম গল্পটীর নামে পুস্তক খানির নাম করণ হইয়াছে। প্রথম গল্পটিতে একজন কেরাণীর একটি ভুলের ফলে কেমন করিয়া পদোন্নতি হইয়াছিল তাহা লইয়া রসিকতা। রস বেশ জমিয়াছে—প্রভাত বাবু এই শ্রেণীর গল্প লিখিতেন—এ শ্রেণীর গল্প আজকাল বড় দেখা যায় না। অনান্ত গল্পগুলির মধ্যে ইগ্নোশিয়া সিকস ছাড়া অন্যগুলিতে রসিকতা নাই—করুণ রসেরই প্রাবল্য। রামেন্দু বাবু সুকবি, গল্পগুলিতে কবি হস্তেরই স্পর্শ সর্ব্বত্র। রামেন্দু বাবু তরুণ গল্প লেখক—কিন্তু তারুণ্যের সংক্রামক ব্যাধি হইতে আত্মরক্ষা করিয়া চলিয়াছেন বেশ স্বচ্ছন্দে। দেহে মনে রামেন্দু বাবুর স্বাস্থ্য শ্রী সমান। সত্যইত যৌন সম্পর্ক ছাড়া মানুষে মানুষে কি আর কোন সম্পর্ক নাই? আমাদের জীবনে রূপজ লালসা ছাড়া কি আর কোন প্রবৃত্তি নাই? রামেন্দু বাবুর গল্পগুলিতে শুচিসংযমের পরিচয় পাওয়া যায় যথেষ্ট।

'সমুদ্রে ও ডাঙ্গায়' শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র প্রণীত। প্রকাশক ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস্। দাম আট আনা। খগেন্দ্র বাবুর 'লামাদের দেশ তিব্বতে' বই খানির সুখ্যাতি আমরা পূর্ব্বে করিয়াছি। এই শিশু পাঠ্য গ্রন্থখানিরও সুখ্যাতি করিতেছি। বই খানি একটি ছেলের নানা বিপদের মধ্য দিয়া সমুদ্র যাত্রার কাহিনী লইয়া রচিত। সে কাহিনী এতই মনোরম ও কৌতূহলোদ্দীপক যে শুধু ছেলেরা নহে বুড়োরা পর্য্যন্ত এ কাহিনী পড়িতে আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া উঠিতে পারিবেন না। এ ধরণের বই পাঠে শিশুদের চিত্ত সবল হইবে একটু 'এ্যাড্ভেঞ্চারের' আকাঙ্ক্ষা জাগিবে। বই খানির ভাষা সুন্দর। বলিবার ভঙ্গী মনোরম ছাপা, কাগজ, ছবি, সুন্দর। শিশুপাঠ্য রূপে বই খানির আদর হইবে আশা করি।

'ভারতে ইংরাজের শাসন' শ্রীগুরুদাস রায় প্রণীত। প্রকাশক :বীণা লাইব্রেরী। মূল্য আট আনা। বইখানি মিঃ এন্, এন্ ঘোষ প্রণীত প্রবেশিকাপাঠ্য Englands work in India, নামক পুস্তকখানির বঙ্গানুবাদ।. ইতিহাসের পরীক্ষা বাংলায়ও দেওয়া চলে এবং এ বই খানি ইতিহাস পাঠার্থীদের অবশ্য পাঠ্য। সে হিসাবে বই খানি বেশ উপযোগী হইয়াছে—ছাত্রেরা ইহা পাঠ করিয়া পরীক্ষা পাশের যোগ্য হইতে পারিবেন এবং নানা বিষয় জানিতেও পারিবেন। গুরুদাস বাবুর ভাষা এবং বিষয় সাজাইবার রীতি সুন্দর।

'মায়া তরু' শ্রীমতি সরোজিনী দেবী প্রণীত কবিতা গ্রন্থ। প্রকাশক শ্রীবিমলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—মুড়াপাড়া, ঢাকা। এই গ্রন্থে ২০।২২টি কবিতা ও গান আছে। অধিকাংশই ভক্তি মুলক। তবে ভক্তির আতিশয্যে লেখিকার স্বভাব কবিত্ব কোথাও ভাসিয়া যায় নাই—তাই কবিতা গুলি সরস সুন্দর হইয়াছে,—কোনটি পাঠেই বিরক্তি আসে না। তাঁহার 'হরগৌরী' 'মদন ভস্ম' 'দশ অবতার' প্রভৃতি সুন্দর। শ্রীমতী সরোজিনী মুড়াপাড়ার প্রসিদ্ধ জমিদার গৃহের ভূস্বামিনী। তাঁহার এই সাহিত্য-প্রীতি বাস্তবিকই আনন্দের বিষয়। গ্রন্থে কোথাও মূল্যের উল্লেখ নাই। ছাপা কাগজ চলন সই।

ইন্কাম ট্যাক্স আইন:—শ্রীসুরেশচন্দ্র সেন বি-এল প্রণীত; প্রকাশক—দাসগুপ্ত এণ্ড কোম্পানী, ৫৪।৩ নং কলেজ ষ্ট্রীট কলিকাতা।

নুতন নিয়মে এক হাজার টাকার অধিক আয় হইলেই ইন্কাম ট্যাক্স দিতে হইবে। সম্প্রতি এই ট্যাক্স আদায়ের জন্ত গবর্ণমেন্ট খুব চেষ্টা করিতেছেন। আইন ভালরূপ না জানায় সাধারণের মধ্যে একটা আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছে। ইন্কাম ট্যাক্স আইনের নিয়মাবলী মোটামুটি জানা থাকিলে সকলেই বুঝিতে পারেন ইন্কাম ট্যাক্স অফিসের জন্ত কি কি দরকার। কিন্তু এরূপ একখানি সরল পুস্তক এতদিন ছিল না। সুরেশবাবু এই পুস্তকখানি লিখিয়া সেই অভাব দূর করিয়াছেন। এই বইখানি সর্ব্বসাধারণের বুঝিবার জন্ত সরল ও সংক্ষিপ্ত ভাষায় লিখিত। বিষয়গুলি এমন সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে যে বুঝিবার পক্ষে আদৌ কষ্ট হয় না। প্রত্যেক গৃহস্থ, এবং ব্যবসায়ীর এই বইখানি রাখা উচিত।

'মানসী ও মর্ম্মবাণী' শ্রীবসন্ত কুমার দাস প্রণীত। কবিতার বই। পত্নী বিয়োগে পতির শান্ত সংযত শোকোচ্ছ্বাস। বাংলার গৃহলক্ষ্মীরা স্বামীর চিত্তে কতদিক দিয়া কি ভাবে প্রভাব বিস্তার করেন তাহারও সুন্দর পরিচয় এই ১৩ পৃষ্ঠার পুস্তিকায় পাওয়া যায়। মূল্যের কোন উল্লেখ নাই।

সরকার ও করপোরেশন:—

কয়েকদিন কলিকাতা করপোরেশনের সভাগৃহে গজ-কচ্ছপের যুদ্ধ হইয়া গেল। গত ১৯২৩ সাল হইতে কলিকাতা করপোরেশন স্বরাজী সভ্যবৃন্দগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া আসিতেছে। পরলোকগত দেশবন্ধু যখন করপোরেশন দখল করিয়া বসেন তখন তিনি সাধারণকে অনেক প্রবোধ বাক্য দিয়াছিলেন। তিনি বাঁচিয়া থাকিলে হয়ত তাঁহার প্রস্তাবিত অনেক সংস্কারই সিদ্ধ হইতে পারিত। কিন্তু জন সাধারণ স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছে যে দেশবন্ধুর স্বর্গারোহণের সহিত অনেক সঙ্কল্পই প্রায় লোপ পাইয়া উহার স্থলে ঘৃণিত স্বার্থ আসিয়া স্থানাধিকার করিয়াছে। কয়েকজন কনট্রাক্টার কবে জেল খাটিয়ছেন এই অজুহাতে বড় বড় কনট্রাক্ট পাইতে লাগিলেন। কয়েকজন খ্যাতনামা দেশকর্ম্মী চাকুরী সংগ্রহ করিয়া লইলেন। এই সমস্ত নামজাদাদের পশ্চাতে কত মূর্খ, অপগণ্ড যে এই করপোরেশনের বারাণ্ডায় আসিয়া দাঁড়াইল তাহার ইয়ত্তা করা সহজ নয়। সাধারণের যে কোন সুবিধাই হয় নাই ইহাও ঠিক নয়। গবর্ণমেণ্ট শাসিত করপোরেশনে যখন একজন ঝানু আই-সি-এস ইহার শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতেন তখন তাঁহার নিকট প্রবেশাধিকার লাভ করা কমিশনারগণের পক্ষেও দুর্লভ ছিল, অন্য পরে কা কথা। সাধারণ এখন সকলের নিকটেই বিনা আয়াসে গতায়াত করিতে পারে, তাহাদের আবেদন নিবেদন পেশ করিতে পারে। সাধারণের কার্য্যের দিকেও কর্ত্তৃপক্ষগণের দৃষ্টি যে বিশেষ ভাবেই আবদ্ধ তাহাতে কোন সন্দেহই নাই। ইংরাজ সদস্যগণ কয়েক বৎসর হইতেই Civic duties বা নাগরিক কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়া আসিতেছিলেন। তাঁহারা বলিতেছিলেন যে রাজনৈতিক কোন আন্দোলনে যোগ দেওয়া করপোরেশনের পক্ষে একান্তই অনুচিত। যে সমস্ত ব্যক্তি রাজনৈতিক ব্যাপারে জেল খাটিয়া আসিয়া করপোরেশনে চাকুরী পাইতেছিলেন, তাঁহারা প্রকাশ্যে না হউক, সমস্ত অন্তরের সহিত তাঁহাদের নিয়োগ প্রথাকে ঘৃণা করিয়া আসিতেছিলেন। পূর্ব্ব-পরিচিত ধনী কনট্রাক্টরগণ স্বরাজী করপোরেশনে কর্ম্মসংগ্রহ করিতে কৃতকার্য্য না হইয়া বেশ পয়সা খরচা করিয়া আন্দোলন করিতেছিলেন। অনেকেরই হয়ত স্মরণ থাকিতে পারে যে পলতা Water works এর contract যখন Kerr & Co. কে দেওয়া হয় তখন অনেক ধনী কোম্পানী ভীষণ অসন্তুষ্ট হইয়াছিল। তাহার পর ঢাল নেই তরওয়াল নেই নিধিরাম সর্দ্দার গোছের এই সমস্ত কোম্পানী যখন রাতারাতি গজাইয়া উঠিয়া বড় বড় কাজ পাইতে থাকে তখন অর্থাভাবে অনেক সময়েই কাজে একটু আধটু কসুর করিয়াছে, এ কথাটা সত্য। শত্রুপক্ষ তাহা অতিরঞ্জিত করিয়া সকলের নিকট প্রচার করিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট যদি এখন এই সমস্ত ব্যাপারে আপনাকে লিপ্ত করেন তাহা হইলে আমরা বলিব যে যাহা সময়ে সংশোধিত হইয়া যাইতে পারিত তাহাতে সরকারের হস্তক্ষেপ ভাল হইতেছে না। যখন দেশে আত্ম-শাসন পাইবার জোর আন্দোলন চলিতেছে তখন যে অজুহাতেই হউক করপোরেশনের

সহিত মনোমালিন্য করা আমাদের মতে সমীচিন হইতেছে না বলিয়াই মনে হয়।

প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় শাসন:—

স্যর সামুয়েল হোর ভারতে স্বায়ত্ত-শাসন প্রবর্ত্তন করা সম্বন্ধে তাঁহার স্পষ্ট মত ব্যক্ত করিলেই, ভারতে ভীষণ অসন্তোষ আত্মপ্রকাশ করে। মডারেট নেতাগণ একবাক্যে বলিয়া বসেন তাঁহারা কিছুতেই আর সহযোগ করিবেন না। এখানকার ইংরাজ পরিচালিত সংবাদপত্র এই ব্যাপারটায় একটু রহস্য দেখিবার মানসেই যেন তাঁহারা মডারেটদের সহিত নানাপ্রকার আপোষের কথা কহিতে থাকেন। কিন্তু আজ অবধি কোন প্রকার আপোষেরই চিহ্ন দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। ইংরাজ তাহার শাসন-সংস্কার প্রদান করিবেই। এই স্থলে আমরা আমাদের নেতৃবৃন্দকে একটী নূতন পরামর্শ দিতেছি। সরকারী খবরে প্রকাশ যে প্রত্যেক প্রদেশে স্বতন্ত্র শাসন দণ্ড প্রদান করিয়া Provincial autonomy বা প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসন প্রবর্ত্তন করা হইবে। কিন্তু সারা ভারতে যখন কোন প্রকার ঐক্যই দেখা যাইতেছে না তখন Centre বা কেন্দ্রীয় সরকারে কোন প্রকারই স্বায়ত্তশান আপাততঃ প্রবর্ত্তন করা হইবে না। প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসন সফল হইলে, কেন্দ্রে সরকারের শাসন শ্লথ করা হইবে। ইহার উত্তরে আমরা কি বলিতে পারি না যে ভারতের ইতিহাস পাঠ করিলে আমরা ইহাই পাঠ করি যে ইংরাজ যেমন এক একটী করিয়া প্রদেশ দখল করিতে থাকেন সেই সঙ্গে সঙ্গে শাসন-ব্যাপারে সুশৃঙ্খলা রক্ষা করিবার জন্য এক একটী স্বতন্ত্র প্রদেশও গড়িতে থাকেন। ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে বাংলা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ এই তিনটী প্রদেশ প্রথমে সংগঠিত হয়। উক্ত প্রদেশ তিনটি প্রথমে স্ব স্ব প্রধান থাকিলেও পিটের Regulating Act অনুযায়ী বাংলাকে প্রাধান্য প্রদান করিয়া দেওয়া হয়। তাহার পর যুক্ত প্রদেশ, পাঞ্জাব, মধ্য প্রদেশ, উত্তর পশ্চিম প্রদেশ, সিন্ধু প্রদেশ, ব্রহ্ম প্রদেশ, প্রভৃতি ইংরাজ শাসনাধীনে আসিয়া পড়ে। বাংলা সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া শাসনদণ্ড পরিচালনা করে। তাহার পর বাংলাকেও পৃথক করিয়া দিয়া সম্পূর্ণভাবে নূতন করিয়া কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করা হয়। এই কেন্দ্রীয় সরকারই সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিলেন। রাজস্ব এই কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তেই থাকিত। প্রাদেশিক সরকারগণ তাঁহাদের প্রয়োজনানুযায়ী ব্যয়াংশ পাইতেন মাত্র। বর্ত্তমানে যে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রবর্ত্তন করিবার কথা হইতেছে তাহাতেও কেন্দ্রীয় সরকারের সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব বজায় রাখাই প্রয়োজন। কেন না কেন্দ্রীয় সরকার প্রদেশ গুলিকে স্বাধীনতা দিয়া স্বতন্ত্র করিয়া দিলে Provincial Jealousy বা প্রাদেশিক রেষারেশি অতি মাত্রায় বাড়িয়া যাইবে। ভারতকে বিভক্ত করিয়া দিবার উপাদান এখানে অনেক আছে। জাতিগত বৈষম্য ও ধর্ম্মগত বৈষম্য এখানে এমন বিরাট যে উহার সমাধান করা এখন অবধি সম্ভবপর হইল না। এক বিরাট শাসনের ছত্রতলে আসিয়া এবং এক ইংরাজী ভাষার আবহাওয়ায় মানুষ হইবার অবকাশ পাইয়াই ভারতের রাজনৈতিক ভাবধারা গড়িয়া উঠিয়াছে। এস্থলে প্রদেশগুলিকে স্বতন্ত্র করিয়া দিলে আর একটী বৈষম্য নূতন করিয়াই সৃজন করা হইবে না কি? আমাদের মনে হয় যদি স্বায়ত্ত শাসন কোথাও প্রবর্ত্তন করা যুক্তিযুক্ত হয়ত উহা কেন্দ্রীয় সরকারেই প্রথমে প্রয়োজন। কেন্দ্রীয় সরকারে স্বায়ত্ত-শাসন প্রবর্ত্তন করিয়া প্রদেশ গুলিতে আপাততঃ কয়েক বৎসরের জন্য সকল প্রকার শাসন সংস্কার বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত। এরূপ করিলে এই ব্যয় সঙ্কোচের দিনে অনেক টাকা সরকারের তহবিলে বাঁচিয়া যাইবে এবং ইহা ছাড়া প্রদেশিক রেষারেষি যাহা দিন দিন অতি ভীষণ ভাবে আত্ম-প্রকাশ করিতেছে তাহা সমূলে বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। Federation বলিয়া যাঁহারা চেঁচাইতেছেন, তাঁহাদের সম্মুখে আমেরিকার যুক্ত রাজ্য গুলিই আছে। আমেরিকার যুক্ত রাজ্যগুলির আদিম ইতিহাস যাঁহারা জানেন তাঁহারা নিশ্চয় বলিবেন যে তথায় কেন্দ্রীয় সরকারে federation প্রবর্ত্তন করা ব্যতীত অন্য উপায় ছিলনা। যে তেরটি প্রদেশ জর্জ ওয়াশিংটনের নেতৃত্বাধীনে ইংরাজের সহিত যুদ্ধ চালাইয়াছিল, স্বাধীনতা লাভ করিয়াই কেহ কাহারও অধীন হইতে অস্বীকার করাতেই

সকলের স্বার্থের উপর সামান ভাবে নজর রাখিবার জন্য পৃথিবীর ইতিহাসে এক অভিনব শাসন প্রণালীর সৃষ্টি হয়, তাহারই নাম federation. ভারতে এরূপ কোন কারণ এখন নাই। কি বাদসাহী আমলে কি ইংরাজ আমলে সব সময়েই প্রদেশ-গুলি কেন্দ্রীয় সরকার কর্ত্তৃক শাসিত হইয়া আসিতেছে। কেন্দ্রীয় সরকারকে সবল ও আত্ম-নির্ভরশীল করিতে পারিলেই ভারতে জাতীয়তা সংগঠিত হইবে, নতুবা উহা চির কালই আকাশ কুসুমবৎ থাকিয়া যাইবে। এই জন্যই আমরা বলিতেছিলাম প্রদেশিক স্বাধীনতা স্থগিত রাখিয়া কেন্দ্রীয় স্বাধীনতায় প্রদান করাই ইংরাজ সরকারের পক্ষে যুক্তিযুক্ত এবং এই বিষয়ে আন্দোলন করা আমাদের নেতাগণের কর্ত্তব্য।

বাংলার সীমা নির্দ্ধারণ :—

গত কয়েকদিন বাংলা আইন পরিষদে বাংলার সীমানা লইয়া বিশেষ আন্দোলন হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র কুমার বসু মহাশয় একটি প্রস্তাব পেশ করিয়া বলেন যে, যে সমস্ত জেলার অধিবাসী বাংলা ভাষা ব্যবহার করে নূতন শাসন সংস্কারের সময় তাহাদিগকে বংলার সহিত সংযোজিত করিয়া দেওয়া হউক। অর্থাৎ ১৯১২ সালের ব্যবস্থা ফলে বর্ত্তমান বিহারের অন্তর্গত মানভূম ও সিংহভূম এবং আসাম সরকারের অধীন আসাম ভ্যালী এই কয়টা স্থান বাংলা হইতে পৃথক করিয়া দেওয়া হইয়াছে। সাইমন কমিশন সীমানা নির্দ্ধারণ প্রস্তাবের মীমাংসা করিতে গিয়া বলিয়াছেন, প্রত্যেক প্রদেশের সীমানা ভাষার উপরই প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। মুসলমান সদস্যগণ ইহাতে তাঁহাদের বাংলায় যে সংখ্যাধিক্য আছে তাহার লাঘব ঘটিবে আশঙ্কা করিয়া জোর প্রতিবাদ করেন। তাহা হইলেই কথা হইতেছে যে যতই কেন আমরা প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসন লইবার জন্য আগ্রহ দেখাই না কেন, প্রত্যেক প্রদেশের স্তরে স্তরে যে সমস্ত স্বার্থ গুপ্ত ভাবে নিহিত আছে, স্বায়ত্তশাসন প্রবর্ত্তিত হইয়া গেলে তাহারা তীক্ষ্ণ ভাবে আত্ম প্রকাশ করিবেই। মুসলমানগণ তাঁহাদের সংখ্যাহ্রাসের ভয়ে যে প্রতিবাদ করিয়াছেন তাঁহারা কি জানেননা যে বাদসাহী আমলে বাংলা বলিলে প্রায় সমগ্র আসাম, বর্ত্তমান বাংলা, বিহারের বর্ত্তমান দ্বারভাঙ্গা জিলা অবধি বুঝাইত। দ্বারভাঙ্গা এই কথাটি দ্বার-বঙ্গ এই বাক্যের অপভ্রংশ মাত্র। দ্বারভাঙ্গার বিদ্যাপতি বাংলারই কবি। বাংলার জাতীয়তার অনেক নিদর্শনই গৌহাটী ও দ্বারভাঙ্গায় রহিয়াছে, বাংলায় জাতীয়তা প্রবর্ত্তিত হইলে তাহাদের পুনরায় ফিরাইয়া আনিবার জন্য দাবী করিবে ইহা যে খুবই স্বাভাবিক, ইহাতে তাঁহারা সাম্প্রদায়িকতার গন্ধ কোথা হইতে পাইলেন? অলশেষ-লরেন জার্ম্মানীর অন্তর্ভুক্ত হইলেও ঐ দুইটি প্রদেশে ফরাসী ভাষা ও আচার ব্যবহার প্রচলিত বলিয়াই গত মহাযুদ্ধের পর ফ্রান্স ঐ দুইটি প্রদেশ বলপূর্ব্বক অধিকার করিয়া লইয়াছে। বর্ত্তমানে যেকো-শ্লাভোকিয়া ও যুগোশ্লাভিয়া নামক যে দুইটি স্বতন্ত্র স্বাধীনরাজ্য মধ্য ইউরোপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে উহার মূলভিত্তি এক ভাষা। পলিটিক্সের পাতা খুলিলে যেখানে লেখা আছে এক জাতি কি করিয়া সংগঠিত হইতে পারে, সেখানে ও খুবই বড় বড় অক্ষরে লেখা থাকে, এক ভাষা, আচার ব্যবহার জাতীয়তার গঠনে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং মূল উপাদান।

যুক্ত ও পৃথক নির্ব্বাচন সমস্যা

বাংলা সরকারের বর্ত্তমান আইন-পরিষদে সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন লইয়াও তর্ক-বিতর্ক হইয়া গিয়াছে। মুসলমানগণ বলিয়াছেন যে তাঁহারা Joint-electorate বা যুক্ত-নির্ব্বাচন প্রথায় রাজী আছেন। কলিকাতায় যে মুসলেম কনফারেন্স বসিয়াছিল তাহাতেও এই প্রস্তাবটী প্রথম গ্রহণ করা হয়। বাংলার প্রাদেশিক হিন্দু সভাও এই প্রস্তাবটী গ্রহণ করিয়াছেন। যুক্ত প্রস্তাবটী হিন্দু-মুসলমান সকলেই গ্রহণ করিলে আমাদের বলিবার কিছু নাই। [illegible] শিখগণ সাম্প্রদায়িক স্বতন্ত্রতার দাবী করিয়া তুমুল আন্দোলন করিবেন [illegible] ভয় দেখাইয়াছেন। [illegible] হইবার মানসেই [illegible]

আন্দোলন অবৈধ ভাবে চালাইলেই কঠোর হস্তে দমন করা হইবে। বিলাতী খবরে প্রকাশ যে এই আগষ্ট মাসের শেষেই ভারত-সচিব সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন সম্বন্ধে তাঁহার অভিমত প্রকাশ করিবেন। কাজেই এই বিষয় লইয়া এখন একটু জোর আন্দোলন চলিতেছে। জেলা বোর্ড বা মফঃস্বলের মিউনিসিপালিটি গুলির নির্ব্বাচন যাঁহারা কয়েক বৎসর বিশেষ মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করিয়া আসিতেছেন তাঁহারা হয়ত দেখিয়া থাকিবেন যে, যে যে জেলায় মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যা অধিক সে সে জেলায় মুসলমান সদস্যেরাই নির্ব্বাচিত হইতে পারেন, হিন্দুদের কোন প্রকার আশাই নাই। এই জন্যই মনে হয় যে যুক্ত-নির্ব্বাচন প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইলে বাংলার ও পাঞ্জাবের হিন্দুগণের বিশেষ অসুবিধা হইবেই, এই নিয়মটী যদি ব্যাপকভাবে ভারতে সকল প্রদেশেই গৃহীত হয় তাহা হইলে বাংলার হিন্দু বা পাঞ্জাবে শিখেদের কোন কথা বলিবার থাকে না, কিন্তু তাহা না হইয়া যদি যেখানে মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যা অল্প তথায় weitage এবং বাংলা ও পাঞ্জাবে শুধু এই প্রস্তাব গৃহীত হয় তাহা হইলে ভারতের হিন্দুগণের বিশেষ আপত্তি করিবার কারণ আছেই। সরকার তাঁহার মতামত প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে এই বিষয়টী চিন্তা করিয়া দেখিবেন বলিয়া আশা করি।

বাংলার আইন পরিষদ :—

আইন-পরিষদের প্রেসিডেন্ট জনপ্রিয় রাজা স্যর মন্মথনাথ রায় চৌধুরী মহাশয় বর্ত্তমান আইন পরিষদ উদ্বোধন করিবার সময় সদস্যগণকে জানাইয়াছেন যে বাংলার মাননীয় লাট বাহাদুর তাঁহার প্রস্তাব-অনুযায়ী আইন-পরিষদ বিভাগটীকে একটী স্বতন্ত্র বিভাগ বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। চারি বৎসর পূর্ব্বে মিঃ ভি, জে পেটেল Assemblyকে ভারত-সরকারের হোম-ডিপার্টমেন্টের হস্ত হইতে মুক্ত করিয়া লইয়া উহাকে একটী স্বতন্ত্র বিভাগ করিয়া প্রতিষ্ঠিত করিলেই, প্রত্যেক প্রদেশেই উহার আদর্শে সম্পূর্ণ স্বাধীন বিভাগ গড়িয়া তুলিবার জন্য আন্দোলন শুরু হয়। অন্য প্রদেশ ও পাঞ্জাবে স্বতন্ত্র আইন পরিষদ বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হইলে, বাংলায় আন্দোলন আরম্ভ হয়। আজ তিন বৎসর বহু পত্র ব্যবহার করিয়া প্রেসিডেন্ট মহাশয় স্বতন্ত্র বিভাগ গঠন করিতে সমর্থ হইয়াছেন দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি।

গবর্ণমেণ্ট ও জমিদার :—

এই বর্ষাকালেই বাংলার লাট সফরে বহির্গত হইয়া থাকেন। বঙ্গ-ভঙ্গের পর ঢাকা নগরীর শ্রীবৃদ্ধি সংসাধিত হয়। দুইটী বঙ্গ সংযোজিত হইয়া গেলেও এই বর্দ্ধনশীল নগরটীর সমৃদ্ধি রক্ষা করিবার মানসে সরকার পক্ষ পূর্ব্ব-বঙ্গের জনসাধারণকে প্রতিশ্রুতি দেন যে বাংলার লাট মহোদয় প্রত্যেক বৎসর জুলাই মাসে এই নগরটীতে আসিয়া কয়েকদিন অবস্থান করিবেন। এই প্রস্তাব-অনুযায়ী বাংলার লাট মহোদয় প্রত্যেক বৎসরই এই সময়ে একবার করিয়া আসিয়া থাকেন। এই প্রথানুযায়ী বর্ত্তমান লাট মহোদয় ঢাকায় পদার্পণ করিলেই, কয়েকটী জমিদার একত্রিত হইয়া তাঁহাকে এক অভিনন্দন প্রদান করিবার সময় অনুরোধ করেন যে সরকার যদি অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাদের জমিদারগুলি কোর্ট অফ ওয়ার্ডের এলেকাভুক্ত করিয়া দেন তাহা হইলে তাঁহারা বিশেষ বাধিত হন। কয়েক বৎসর বাংলার বড়ই দুর্ব্বৎসর যাইতেছে। খাজনা আদায় হইতেছে না। রাজস্ব অনেক সময়েই আপনাদের সঞ্চিত অর্থ হইতে বা করজ করিয়া প্রদান করিতে হইতেছে। কাজেই তাঁহারা ভয় পাইয়া আয়ের পরিমাণকে স্থিতিশীল করিবার জন্যই এই কথাটী বলিয়া ফেলিয়াছেন। উত্তরে লাট মহোদয় বলিয়াছেন যে স্বাবলম্বী না হইতে পারিলে এই প্রতিদ্বন্দ্বীতার যুগে কেহই বাঁচিতে পারে না। জমিদারগণ আপনাদিগকে সাধারণের অভিভাবক বলিয়া ঘোষণা করিয়া থাকেন, সুতরাং যদি অভিভাবকই হ'ন তবে তাঁহাদের উপর যে দায়িত্ব ন্যস্ত আছে তাহা হস্তান্তর কি করিয়া করিবেন ? খুব যুক্তিযুক্ত পরামর্শ। পৃথিবীর তাবৎ অংশেই, সরকার পক্ষ হইতে জমিদারী গুলি ফিরাইবার প্রস্তাব হইতেছে। মধ্যযুগে যখন রাজা সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিলেন, তাঁহাকে সাহায্য

করিবার জন্ত পরিষদ হিসাবে তিনি কতকগুলি ভূস্বামী সৃজন করেন। এখন পৃথিবীতে একাধিপত্যের হ্রাস হওয়ার সহিত জন সাধারণের হস্তে ঐ রাজ-শক্তি আসিয়া পড়িতেছে। দূরদর্শী বিসমার্ক এইজন্তই ১৮৯০ সালেই ছোট ছোট কৃষাণ পরিবার বসাইবার জন্ত Land Acquisition Actএর মধ্যে বড় বড় জমিদারগণকে ফেলিয়া তাহাদের জমির স্বত্ব একটা মূল্যে খরিদ করিয়া লইয়া ঐ প্রাপ্য টাকা ৫০।৬০ বৎসরে পরিশোধ করা হইবে এই বলিয়া স্বীকার করিয়া, উক্ত জমিদারীগুলিকে শতধা বিভক্ত করিয়া ছোট ছোট কৃষাণ পরিবার বসাইয়া যান। ১৮৯৭ সালে দেনমার্কে ও ১৯০৬ ও ১৯২৪ সালে ইংলণ্ডে, ও ১৯২৭ সালে জাপানে এই ধরণের আইন করা হইয়াছে। বাংলার জমিদারগণ যদি অনিশ্চিতের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্ত এইরূপ প্রস্তাব করেন ভবিষ্যতে সরকার পক্ষ হইতে হয়ত এইরূপ বন্দোবস্তও হইয়া যাইতে পারে, তাঁহারা সে বিষয়ে ভাবিয়াছেন কি? তাহার পর বাংলার বর্ত্তমান রাজস্ব দুই কোটী ১৫ লক্ষ। উহার মধ্যে যে সমস্ত জমিদারী কোর্ট অফ ওয়ার্ডসের অধীনে আছে তাহারা প্রায় এককোটী টাকা রাজস্ব দিয়া থাকে। সুতরাং বাংলার অর্দ্ধেক জমিদারীই এখন সরকার পক্ষ হইতে পরিচালিত হইতেছে। বাংলার জমিদারগণকে আমরা শুধু এই কথা বলিব যে সরকারকে জমিদারীর ভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ না করিয়া নিজেরা যাহাতে উহা পরিচালনা করিতে পারেন, সে বিষয়ে একটু সচেষ্ট হউন না কেন?

জার্ম্মাণ সমস্যা :—

জার্ম্মানিতে নূতন নির্ব্বাচন হইয়া গেল। নির্ব্বাচনের ফলাফল নিম্নে প্রদান করা হইল।

নাজি	২২৯
সোশিয়ালিষ্ট	১৩৩
কমিউনিষ্ট	৮৯
সেণ্টার পার্টি	৭৬
জার্ম্মাণ নেশানাল	৩৭
পিউপিল্‌স্ পার্টি	২০
অন্যান্য দল	১৬
	৬০০

লিষ্টটীর উপর দৃষ্টি করিলেই আমরা দেখিতে পাই যে নাজীর দল সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক সদস্য সংগ্রহ করিতে পারিলেও তাহাদের সংখ্যা কাহারও সাহায্য না পাইলে শাসন দণ্ড পরিচালনা করিতে পারিবে না। তাহাদের দশা অনেকটা ১৯২৪ সালের ইংলণ্ডের শ্রমিকদের মতই। এই জন্তই ভন পেপেন কর্ম্মে ইস্তফা না দিয়া বরং বলিয়াছেন যে তিনি যেমন শাসন দণ্ড পরিচালনা করিয়া আসিতেছিলেন তেমনিই করিবেন, মন্ত্রী-সভা ভাঙ্গিয়া নূতন করিয়া গড়িবার কোন কারণই তিনি দেখিতে পাইতেছেন না। এদিকে নাজীর দল মন্ত্রী-সভা গঠন করিবার জন্ত অধীর হইয়া উঠিয়াছে। রাজনীতির সাধারণ নিয়মানুযায়ী তাহারাই মন্ত্রী-সভা গঠন করিবার অধিকারী, এ কথা সত্য কিন্তু তাহারা সংখ্যায় অধিক হইলেও, যত সভ্য থাকিলে মন্ত্রী-সভা দখল করা যাইতে পারে তাহা তাহাদের নাই।

লোক-হিসাবে ভন্-পেপেনের বেশ সুনামই দেশ মধ্যে আছে। তিনিই গত জেনেভা কন্‌ফারেন্স হইতে জর্ম্মাণীর ঋণ-পরিশোধের শেষ সিদ্ধান্ত সর্ব্ববাদিসম্মত ভাবে স্বীকার করাইয়া লইয়াছেন। তিনিই এতদিন সকল প্রকার শৃঙ্খলা রক্ষা করিয়া দেশকে শান্তি ও সম্পদ প্রদান করিয়া আসিয়াছেন। এইরূপ কোন লোকের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়া সম্ভব নয়। প্রেসিডেণ্ট হিন্‌ডেনবার্গ কোন অভিমত প্রকাশ না করিলেও ভন্‌পেপেনকে পদচ্যুত করিতে তিনি সাহসী হইতেছেন না। বর্ত্তমান জার্ম্মাণ সমস্যা বুঝিতে গেলে উহার একটু পূর্ব্ব ইতিহাস বিবৃত করিতে হয়। ১৮৪৮ সালে সারা ইউরোপে যখন বিপ্লবের বন্যা বহিয়া যায়, তখন জার্ম্মাণীর উপর দিয়াও ভীষণভাবে বহিয়া গিয়াছিল। এই যুগটাতেই মধ্যবিত্ত শ্রেণী প্রবল হইয়া রাজশক্তি দখল করিয়া বসে। জার্ম্মাণীতে কিন্তু তখনও মধ্য যুগ চলিতেছিল। রাইন প্রদেশে কল-কারখানা প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ও বহুদিন অবধি প্রদেশটী নেপোলিয়ন ও ফ্রান্স কর্ত্তৃক শাসিত হওয়ায় তথায় অভিজাতগণের ক্ষমতা হ্রাস হয় সত্য, কিন্তু বিসমার্ক শাসিত প্রুশিয়ায় অভিজাতগণের ক্ষমতা পূর্ব্ববৎ অক্ষুণ্ণই ছিল। মনস্বী বিসমার্ক উদীয়মান মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে অভিজাতগণের [illegible]

শ্রেণীতে উন্নীত করিয়া লইয়া একটী সাম্রাজিক দল সংগটন করেন। এইদলে রাইনের শ্রমজীবিগণও যোগদান করে। বিসমার্কের মৃত্যুর পর অভিজাতগণ প্রবল হইয়া উঠিয়া মধ্যবিত্তগণের মধ্যে যাহারা প্রভূত ধনশালী তাহাদের সহিত বিবাহাদি সূত্রে আত্মীয়তায় ও ঘনিষ্টতায় আবদ্ধ হইয়া এক নূতন শক্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া উহারাই সমগ্র পৃথিবী দখল করিবার জন্য উৎসুক হইয়া পড়ে উহারই ফলে ১৯১৪ সালের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যাঁহারা জানিতেন যে উচ্চাশী জার্মাণ সম্রাটই এই যুদ্ধের একমাত্র কারণ তাঁহারা এখন ক্রমশঃই বুঝিতে পারিতেছেন যে সম্রাট মুখ্যতঃ সম্মুখে থাকিলেও জার্মাণীর ঐ নূতন শক্তিই ১৯১৪ সালের যুদ্ধের একমাত্র কারণ। যুদ্ধ পরিচালনা সম্বন্ধে কোন কর্ত্তৃত্বই জার্মাণ সম্রাট বা তাঁহার চান্‌সেলারের ছিল না। ভন্ মল্টকে জার্মাণ সেনাপতিগণের অধিনায়ক হিসাবে প্রথম যুদ্ধ চালাইয়াছিলেন, তাহার পর তাঁহার স্থান অধিকার করিয়াছিলেন জেনারেল লুডেনডর্ফ। লুডেনডর্ফ প্রতিভাশালী ব্যক্তি হইলেও, তাঁহার দূরদর্শিতা ছিল না। জার্মাণ প্রজা তাঁহাকে তাহাদের ধন-প্রাণ দিয়া বিশ্বাস করিয়াছিল কেন না তাহারা আশা করিয়াছিল যে বিজয় লাভের পর ক্ষমতা বিভাগ করিয়া লইবে। যুদ্ধের ফল উল্টা হইয়া দাঁড়াইলে শ্রমজীবি সম্প্রদায় ভীত হইয়া উঠেন, তাঁহারা যে কোন উপায়ে সন্ধি করিবার জন্য ব্যগ্র হন। মধ্যবিত্ত শ্রেণী তাহাদের সহিত যোগদান করিলেই, এই দলটাই প্রবল হয়। অভিজাতগণ যাঁহারা আধিপত্য বিস্তারের জন্য যুদ্ধ করিতেছিলেন, কতকটা মানের জন্য এবং পরাজিত ভাবে সন্ধি ভিক্ষা করিলে অনেকটা ক্ষতি-গ্রস্ত হইতে হইবে এই আশায় তাঁহারা যুদ্ধ হইতে নিরস্ত হইতে চাহিলেন না। ইহারই ফলে ১৯১৮ সালের বিদ্রোহ দেখা দেয়। জার্মাণ মধ্যবিত্ত শ্রেণী শ্রমিকগণের সহিত সম্মিলিত হইয়া অভিজাত-মধ্যবিত্ত সংগটিত শাসন প্রণালীর উচ্ছেদ সাধন করেন। ইহার পর শ্রমিকদল উত্তেজিত হইয়া বিদ্রোহ করিলে উহাদের আন্দোলনের মূলোচ্ছেদ করা হয়। জার্মাণী একটী ধনিক দেশ। উহার ধনিক সম্প্রদায় Dawe's Plan অনুযায়ী যুদ্ধের খেসারৎ প্রদান করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া উহার শাসন ভার গ্রহণ করে। 'সেণ্টার' পার্টি, জার্মাণ কাথলিক পার্টি, জার্মাণ ন্যাশনাল পার্টি, এই সমস্ত ধনিক সম্প্রদায়দের মুখপাত্র মাত্র। মিঃ হিল্‌টার এই ধনিক সম্প্রদায়কে সবল করিয়া গড়িয়া তুলিবার জন্য যুদ্ধের খেসারৎ যাহাতে আর না দেওয়া হয় তাহার জন্য জোর আন্দোলন চালাইতে থাকেন। যে সমস্ত ধনী খেসারৎ দিবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারা শ্রমিকগণকে মাত্র সামান্য গ্রাসাচ্ছাদন দিয়া খাটাইয়া লইতেছেন, সুতরাং তাহাদের প্রাপ্য লভ্যাংশও বেশ মোটাভাবেই হইতেছে। কিন্তু যে সমস্ত ধনিক বৈদেশিক ব্যবসা-বাণিজ্যে নিযুক্ত তাহাদের সমূহ ক্ষতি হইতেছে। মিঃ হিল্‌টার ও ভন্ পেপানের সহিত এইখানেই পার্থক্য। কমিউনিষ্ট পার্টির সহিত কাহারই সদ্ভাব নাই। বর্ত্তমান নির্ব্বাচন ফলের উপর লক্ষ্য রাখিলে ইহাই প্রতীতি জন্মে যে জার্মাণ কমিউনিষ্ট সংখ্যা কমিয়া যাইতেছে। মিঃ হিল্‌টার ইটালীর কর্ম্মবীর মুসলিনীর আদর্শে চালিত হইতেছেন। মুসলিনীর ন্যায় জার্মাণীর শাসনভার গ্রহণ করিতে পারিলে জার্মাণীতে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শাসনদণ্ডই দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইবে।

দেশীয় রাজ্য :—

ভারতীয় করদ মিত্র রাজ্যগুলি সম্বন্ধে যে কমিশন বসিয়াছিল তাহারও সিদ্ধান্ত বাহির হইয়াছে। ভারতীয় রাজ্য সমূহ কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন হইতে গেলে যে সমস্ত অন্তরায় আছে এই কমিটী তাহা আলোচনা করিয়া এক সুদীর্ঘ রায় দিয়াছেন। তাঁহারা বলেন বর্ত্তমানে অনেক রাজ্যকেই কর দিতে হয়। এই করের মাত্রাকে তাহাদের আয়ের একশভাগের ৫ ভাগ স্থির করিয়া যে টাকা উদ্বৃত্ত হইবে উহা তাহাদিগকে রেহাই দেওয়া হইবে বলা হইয়াছে। তবে যে সমস্ত রাজ্য কর দিবার জন্য সৈন্য প্রতিপালন করিয়া আসিতেছেন তাঁহারা তাহাই করিবেন। প্রত্যেক দেশের করদ রাজাদের কতকগুলি প্রাপ্য সম্মান আছে। আপনাদের ব্যবহার্য্য সামগ্রীর জন্য তাঁহাদিগকে কোন প্রকার বাণিজ্য শুল্ক দিতে হয় না। নূতন প্রথায় উহা ত রাখাই হইবে উপরন্তু বড়লাট ও প্রাদেশিক লাটগণকেও উক্ত সুবিধা প্রদান করিবার কথা হইয়াছে। আরো ছোট বড় অনেক সুপারিশ আছে। এই তদন্তে ১০৩০৫ পাউণ্ড ব্যয় হইয়াছে ও সভ্যেরা

১০,০০০ মাইল ভ্রমণ করিয়াছেন। ভারতে দেশীয় রাজ্যের সংখ্যা ৭০০ উপর, উহার অনেকে আবার অন্য রাজ্যের অধীন। এমন দেশীয় রাজ্যও আছে যাহার আয় ৭২৲ মাত্র। সব দেশীয় রাজ্য মিলিয়া বৃটীশ গবর্ণমেণ্টকে কর দেয় ৭২ লক্ষ ২ হাজার ১৬ মুদ্রা। ইহার মধ্যে গবর্ণমেণ্টকে জায়গা ছাড়িয়া দেওয়ার জন্য গবর্ণমেণ্ট বরোদাকে ৪২ লক্ষ ৯৮ হাজার, গোয়ালিয়রকে ১১ লক্ষ ৭৮ হাজার, ইন্দোরকে ১ লক্ষ ১১ হাজার এবং সাঙ্গলীকে ১ লক্ষ ১০ হাজার মুদ্রা বার্ষিক প্রদান করেন। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি রাজ্যের বার্ষিক আয় এইরূপ—বরোদা ২ কোটি ৪৯ লক্ষ; ভূপাল ৬২ লক্ষ ১০ হাজার; ইন্দোর ১ কোটি ৩৬ লক্ষ; গোয়ালিয়র ২ কোটি ১০ লক্ষ; হায়দ্রাবাদ ৭ কোটি ৯৮ লক্ষ ৫৭ হাজার; ত্রিবাঙ্কুর ২ কোটি ৪৮ লক্ষ ৮ হাজার; মহীশূর ৩ কোটি ৪৬ লক্ষ ৪৬ হাজার; কর্পূরতলা ৩৭ লক্ষ, মণিপুর ৭ লক্ষ ৪৬ হাজার; কুচবিহার ৪১ লক্ষ ৫২ হাজার ময়ূরভঞ্জ ২৭ লক্ষ ৩৭ হাজার; কাশী ২০ লক্ষ ৯ হাজার।

পরলোকে দুর্গাদাস লাহিড়ী ঃ—

পৃথিবীর ইতিহাস প্রণেতা দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয় ৮০ বৎসর বয়সে স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। ইনি আজীবন সাহিত্য সেবী ছিলেন ও বহু গ্রন্থ রচনা ও 'অনুসন্ধান' পত্র পরিচালনা করেন। আমরা লাহিড়ী মহাশয়ের পরিবারবর্গের প্রতি সহানুভূতি জানাইতেছি।

পরলোকে মিঃ এলিসন্‌ :—

কুমিল্লার এঃ পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ এলিসন আততায়ীর গুলিতে আহত হইয়া ঢাকা হাঁসপাতালে পরলোক গমন করিয়াছেন। বাংলার গবর্ণর হইতে সকলেই মিসেস্ এলিসনকে তাঁহার শোকে সহানুভূতি জানাইয়াছেন। এ সব হত্যাকাণ্ড এত মর্ম্মন্তুদ্ যে তাহা প্রকাশের ভাষা নাই।

ষ্টেটস্‌ম্যান সম্পাদকের প্রতি আক্রমণ ঃ—

ষ্টেট্‌স্‌ম্যান সম্পাদক স্যর আলফ্রেড্ ওয়াটসনের প্রতিও তাঁহার আফিসের গেটে মোটরে গুলি নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। ভাগ্যক্রমে ওয়াটসন সাহেব এক চুল তফাতের জন্য বাঁচিয়া গিয়াছেন। ইহা হইতেই এ কথার সত্যতা প্রমাণিত হয় 'রাখে কৃষ্ণ মারে কে?' আততায়ী সেইখানেই ধৃত হইবামাত্র পটাসিয়াম সাইনয়েড খাইয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। উচ্চাঙ্গের সংবাদপত্র সেবী অমায়িক স্যর ওয়াটসনের জীবন রক্ষা পাওয়ার জন্য ভগবানকে ধন্যবাদ।

গান

কুমারী লতিকা মুখোপাধ্যায়

ওগো হাওয়া, বিমল হাওয়া,
লুকিয়ে ছিলে কোন অলকায়?
এমন সাঁঝে, মোহন সাজে,
এলে নেমে আজ বরষায়।
তোমার মধু পরশ লেগে,
ফুলের কুঁড়ি উঠ্‌ল জেগে,
উঠ্‌ল জেগে সোনার স্বপন
কার আশায়!
নিয়ে ফুলের বুকের রেণু,
উতল্ করা বাজিয়ে বেণু,
সফল হল বুঝি তোমার
সব পিয়াসায়!
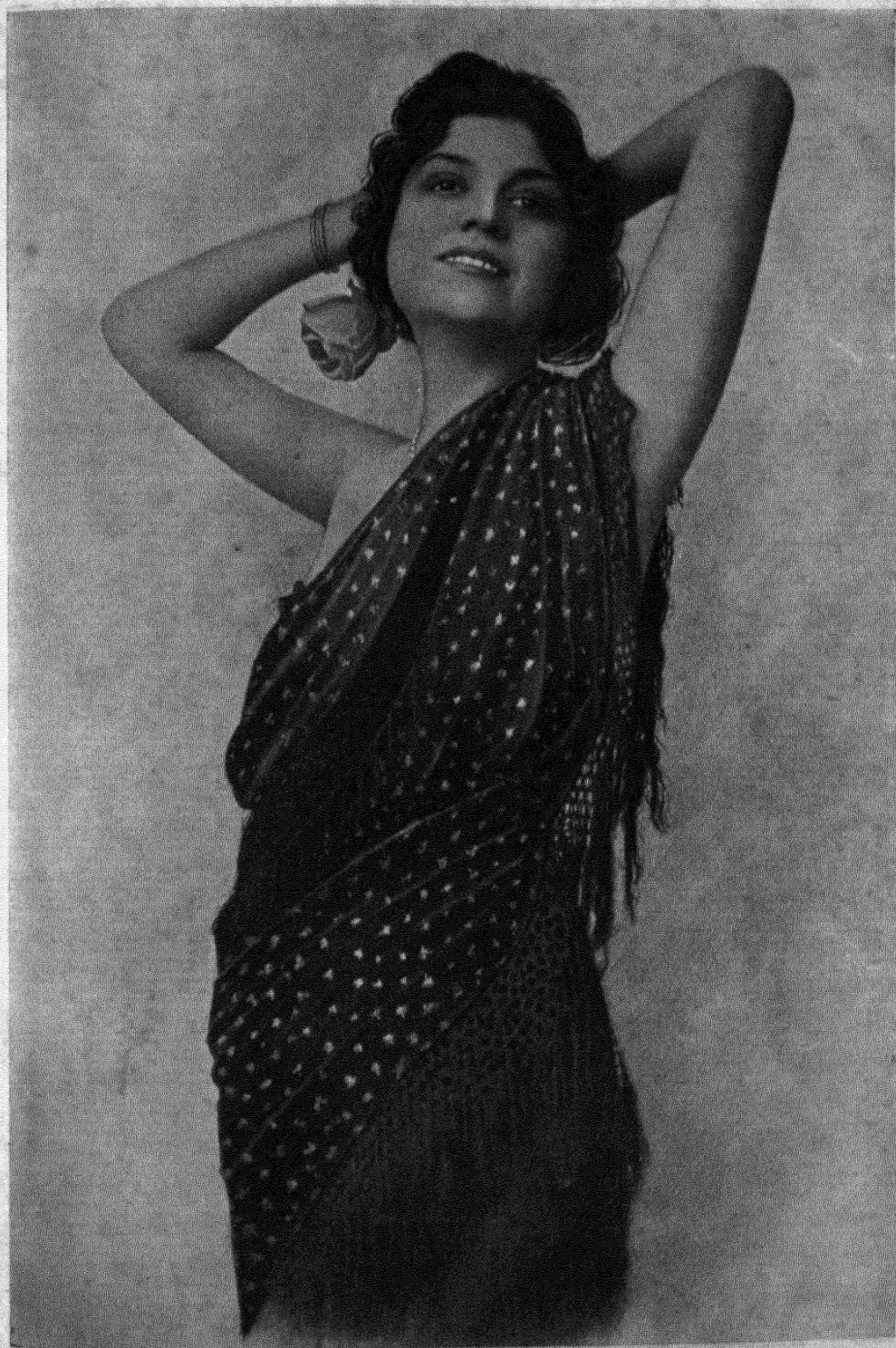
সঙ্কোচহীনা

লক্ষ্মীবিলাস প্রেস লিমিটেড, কলিকাতা।

সতীশচন্দ্র মিত্র প্রতিষ্ঠিত

৬ষ্ঠ বর্ষ | আশ্বিন—১৩৩৯ | ৬ষ্ঠ সংখ্যা

সঙ্ঘ ও মৈত্রী

ডাঃ শ্রীনৃপেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী·ডি-লিট্

ব্যষ্টির সমষ্টি লইয়াই সমাজ গঠিত। ব্যষ্টির উন্নতি না হইলে সমষ্টির উন্নতিসাধন সম্ভবপর নহে। মানুষ সমাজকে গড়িয়া তুলে, তাই বলিয়া সমাজ যে মানুষকে গড়িয়া তুলিতে পারে, একথা সব সময়ে খাটে না। সমাজের বিধি-নিষেধ সকল সময়ে মানুষকে আয়ত্তের মধ্যে রাখিতে পারে না। মানুষের জীবনে এক এক সময়ে এমন মুহূর্ত্ত আসে, যখন মানুষ সামাজিক শৃঙ্খলা ভাঙ্গিয়া চূরমার করিয়া ফেলে ও বিদ্রোহের পতাকা উড়াইয়া দেয়। বিদ্রোহীর সংখ্যা যখন অত্যন্ত অধিক হইয়া উঠে, তখন পুরাতন বিধি-ব্যবস্থার বাঁধন আপনা হইতেই শিথিল: হইয়া আসে, নূতন যুগের উপযোগী নব সমাজধর্ম্মের প্রচার হয়। মানুষের সভ্যতার ইতিহাস এই যুগে যুগে সামাজিক বিধিব্যবস্থার পরিবর্ত্তনেরই ইতিহাস। এ পরিবর্ত্তন একান্ত স্বাভাবিক। কালের স্রোত রুদ্ধ করিবার শক্তি কাহারও নাই। "আমার ধর্ম্ম সনাতন, আমার সমাজও সনাতন—এ চীৎকারে আজ আর কোন লাভ হইবেনা, শুধু অনর্থক শক্তিক্ষয়ই হইবে।" যে যুগের যা ধর্ম্ম তাহাকে না মানিয়া উপায় নাই, তাহাকে অস্বীকার করিতে গেলে আজ শুধু অমঙ্গল-কেই আহ্বান করিয়া আনা হইবে।

বর্ত্তমান যুগ গণতন্ত্রের যুগ। ব্যক্তিগত প্রাধান্য বা স্বৈরাচারের দিন অতীত হইয়া গিয়াছে। বিশ্বরাষ্ট্রে তাই আজ গণশক্তির নব অভ্যুদয় দৃষ্ট হইতেছে। শক্তির প্রথম বিকাশের মধ্যে যে দুর্দ্দমনীয় চাঞ্চল্য দেখা দেয়, উহাতে ভীত হইবার কোন কারণ নাই। নদীতে যখন জোয়ার আসে, তখন তাহার প্রথম আঘাতে কত নৌকার নোঙর ছিঁড়িয়া যায়, হয়ত দুই চারিখানা জলমগ্নও হয় কিন্তু পণ্যবাহী তরণীকে দেশ-দেশান্তরে তাহার গন্তব্য স্থানে পৌছাইয়া দেয়, সেই জোয়ারেরই স্রোত। আজি-কার যুগের গণ-আন্দোলন হয়ত পুরাতন অনেক কিছুরই ভিত্তি টলাইয়া দিবে, কোন কোনটার হয়ত বিলোপ সাধনও করিবে, কিন্তু পরিণামে বিশ্ব-মৈত্রী ও শান্তির

বার্ত্তাও সে বহন করিয়া আনিতে ভুলিবে না। প্রথম আবেগ প্রশমিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সে সংহত হইয়া সঙ্ঘগঠনে মনোনিবেশ করিবে। যুগে যুগে জগতে মৈত্রীর ভাব আসিয়াছে এই সঙ্ঘেরই মধ্য দিয়া।

বহিঃপ্রকৃতিতেও যেরূপ সৃষ্টি বৈচিত্র্য, মানব-সমাজেও তদ্রূপ নানা বৈচিত্র্যের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। ধনী, শ্রমিক, বিদ্বান, মূর্খ, প্রভু, ভৃত্য,—সকলেই বিরাট সমাজ-দেহের এক একটি অঙ্গ। কাহাকেও বাদ দেওয়া চলে না, বাদ দিলে সমাজ চলিতেও পারেনা। বিশাল যন্ত্রশালায় বৃহৎ বৃহৎ লৌহচক্রেরও যেরূপ প্রয়োজন আছে, অতি ক্ষুদ্র সূচের প্রয়োজনও সেখানে তদপেক্ষা কিছুমাত্র কম নহে। উহাকে বাদ দিতে গেলে সমগ্র যন্ত্রশালা অচল হইয়া পড়ে। প্রয়োজনীয়তার অনুপাতে সমাজ দেহে বণিক ও শ্রমিকের স্থান পরস্পরের কাহারও চেয়ে হীন নহে। যে যোগসূত্র পরস্পরের মধ্যে ঐক্যই স্থাপনা করে, তাহার নাম সাম্য বা সম-দৃষ্টি। যখনই এই সমদৃষ্টির অভাব ঘটে, একে যখন অন্যকে ছোট বলিয়া ভাবে, তখনই সমাজের মধ্যে বিপ্লব উপস্থিত হয়, হানাহানির হাহাকারে তখনই দিঙ্মণ্ডল পরিপূর্ণ হইয়া উঠে।

এই যোগসংস্থাপক সাম্যের উদ্ভব হয় কিসে? ইহার উত্তরে বলা যায়,—সমস্বার্থের মধ্যে। ধনিক যখন বুঝেন শ্রমিকের স্বার্থ হইতে তাঁহাদের স্বার্থ ভিন্ন নহে, শ্রমিকের উন্নতি না হইলে তাঁহাদের উন্নতি হইতেই পারে না—তখনই বণিক ও শ্রমিকের চিরন্তন বিবাদ লুপ্ত হইয়া পরস্পরের মধ্যে সহানুভূতির ভাব জাগিয়া উঠে। সমাজের এক এক স্তরের লোকের মাঝে সমকার্য্য, সহকার্য্য ও সমস্বার্থ থাকার জন্য পরস্পরের মধ্যে একটা নৈকট্যের ভাব দেখা যায়। ধনী ধনীর সহিত অন্তরঙ্গতা স্থাপন করেন, পণ্ডিত পণ্ডিতের সঙ্গে মিত্রতা করেন, দরিদ্র দরিদ্রের নিকট নিজ সুখদুঃখের কথা ব্যক্ত করিয়া হৃদয়ের ভার লাঘব করে ও তৃপ্তি পায়। এই যে মেলা মেশা ইহা স্বাভাবিক—প্রকৃতিই জীবকে এই পথে চালনা করেন। কিন্তু যে মানুষ মহৎ যাঁহার আত্মার প্রসার অনেক দূর পর্য্যন্ত গিয়াছে, তিনি বিপুল বিত্তের অধিকারী হইলেও ভাবেন, দরিদ্র আমার ভাই, বিদ্বান হইয়াও মূর্খের সঙ্গে আলাপ করিতে ঘৃণা বোধ করেন না, এবং বিত্ত বা পাণ্ডিত্যের অভিমানে নিজেকে সাধারণ হইতে স্বতন্ত্র করিয়া রাখিতে চাহেন না। প্রকৃতি যাঁহার বশ, সেই মানুষই খাঁটি মানুষ, তিনিই নরগণের মধ্যে নরদেবতা।

দৈনন্দিন জীবনে আমরা নিত্য দেখিতে পাই যে, ব্যষ্টির শক্তি যেখানে পরাভূত ও লাঞ্ছিত, সমষ্টির শক্তি সেখানে বিজয়ী ও সম্মানিত। সমষ্টির মধ্য দিয়াই আত্ম-শক্তির পরিচয় দিতে হইবে। ন্যায্য পাওনার যাহা দাবী তাহাও এই সমষ্টির মধ্য দিয়াই জানাইতে হইবে। সুনিয়ন্ত্রিত সমষ্টির অপর নামই সঙ্ঘ। "সঙ্ঘশক্তি" কলৌ যুগে"—ইহা শাস্ত্রের বাক্য। কেবল মাত্র কলি-যুগই বা বলিব কেন, যুগে যুগে এই সঙ্ঘশক্তিই মানুষকে শক্তিমান করিয়া তুলিয়াছে। স্বাধিকার প্রমত্ত মহিষা-সুরের অত্যাচারে স্থানভ্রষ্ট ও পরাজিত দেবগণ যখনই সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া মহাদেব ও বিষ্ণুর সমীপবর্ত্তী হইলেন, তাঁহাদের মধ্যে সঙ্ঘশক্তির উদ্ভব হইল। সকল দেবতার সম্মিলিত তেজোরাশি হইতে উৎপন্ন মহাশক্তি অসুর নিধন করতঃ দেবতাদিগের ভয় হরণ করিলেন। লাঞ্ছিত দেবগণ আবার নিজ নিজ অধিকার লাভ করিলেন। সঙ্ঘের এমনই শক্তি।

সঙ্ঘের যে কি বিপুল শক্তি, তাহা বুঝিয়াছিলেন বৈদিক ভারতের ঋষিগণ। প্রাচীন ভারতের এক একটি ঋষির আশ্রম বা "গোত্র" এক একটী সঙ্ঘবিশেষ। যাগ যজ্ঞাদি সকল কার্য্যেই সঙ্ঘের সহায়তা আবশ্যক। কেহ সমিধ আহরণ করিবেন, কেহ যজ্ঞক্ষেত্র প্রস্তুত করিবেন, কাহারও কার্য্য হইবে হব্য সংগ্রহ, কেহ হইবেন হোতা, কেহ উদ্গাতা, কেহ ব্রহ্মা আবার কেহ (কোন ক্ষত্রিয়) হইবেন ধনুর্ধারণ করতঃ যজ্ঞরক্ষায় নিযুক্ত। সকলের সহযোগিতারই প্রয়োজন, ইহার মধ্যে যদি একজনও প্রতিকূল হন, তবে যজ্ঞ পণ্ড হইয়া যাইবে। শুধু কার্য্যমাত্রে নহে, মনের চিন্তাও সকলের হইবে একপ্রকার তবেই অভীপ্সিত বস্তুতে সিদ্ধিলাভ হইবে। তাঁহাদের সঙ্ঘের মূল মন্ত্র ছিল—

"সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাম্।"

বৌদ্ধগণ "সঙ্ঘকে" অতি উচ্চস্থান প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন, সঙ্ঘের আশ্রয় ব্যতীত,—অন্য বস্তুর কথা ত সামান্য—স্বয়ং ধর্ম্ম পর্য্যন্ত টিকিতে পারে না। তাই বুদ্ধ ও ধর্ম্মের সমপর্য্যায়েই তাঁহারা "সঙ্ঘের" স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। "সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি।" সঙ্ঘই গণ-শক্তির প্রতীক। গণশক্তির সহায়তা ভিন্ন কোন মহৎ ও কল্যাণকর কার্য্য সফল হইতে পারে না। এই সঙ্ঘের ভিতর দিয়াই পীত পরিচ্ছদধারী বৌদ্ধ শ্রমণগণ একদিন অর্দ্ধজগতে ভগবান তথাগতের অহিংসার মহামন্ত্র বিশ্বমৈত্রীর বাণী প্রচার করিয়াছিলেন।

পুরাণের ব্যবস্থা দেখিতে পাই, সর্ব্ব দেবদেবীর পূজার অগ্রে, সর্ব্ব শুভকার্য্যের সূচনায় গণেশের পূজা করিতে হয়। এই গণেশই সঙ্ঘশক্তির প্রতীক। তিনি গণ-দেবতা; গণশক্তির সহায়তা কামনায় তাই সর্ব্বাগ্রে গণ-পতির পূজার বিধান। সঙ্কল্পিত শুভকার্য্যে বিঘ্ন উপস্থিত হইলে তাহা বিনাশ করিবার শক্তি একমাত্র গণদেবতা ভিন্ন অন্য কাহারও নাই। গণ-শক্তির প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন ও মুষ্টিমেয় সম্প্রদায় বিশেষের স্বেচ্ছাচারিতার ফলেই আজ আমাদের সমাজের এত অধঃপতন ঘটিয়াছে। আমাদের উন্নয়নের একমাত্র উপায় সঙ্ঘশক্তি।

সঙ্ঘ সংগঠন ও সংরক্ষণের মূলে থাকা চাই মৈত্রীর ভাব। আমি উচ্চ পদমর্য্যাদার অধিকারী, আমার বিত্ত অন্যের চেয়ে অনেক বেশী—ইত্যাদি ভাব যতক্ষণ মনের মধ্যে থাকিবে, ততক্ষণ সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কাজ করিবার কোন আশাই থাকিবে না। আত্ম অভিমান ত্যাগ করিতে না পারিলে সঙ্ঘে স্থান লাভ করিবার অধিকার জন্মাইতে পারে না। তরুর চেয়ে সহিষ্ণুতা—কেবলমাত্র ধর্ম্মসাধন ক্ষেত্রে নহে, জীবনের বহু ক্ষেত্রেই প্রয়োজন। মনে রাখিতে হইবে, বড়কে ছোট করায় লাভ নাই, ছোটকে যদি বড় করিতে পারা যায়, তবেই হইবে চেষ্টার চরম সার্থকতা। সমাজ বা রাষ্ট্র যেখানেই হউক না কেন, অসন্তোষের কারণ ব্যাপকভাব ধারণ করিলে তাহা দূর করিবার একমাত্র উপায় সঙ্ঘশক্তি। একজন মানুষকে হয়ত অবহেলা করা চলিতে পারে, কিন্তু দশজন মানুষের সম্মিলিত ইচ্ছার বিরুদ্ধে চলা খুব সহজ নাও হইতে পারে।

সহকর্ম্মী ও সমকর্ম্মীদের মধ্যে মিলনের যোগসূত্র হওয়া চাই—সমদৃষ্টি। যে ছোট সেও হয়ত একদিন বড় হইতে পারে একথা ভুলিলে চলিবে না। আজ যাহাকে হুকুম করিতেছি, কাল হয়ত সে আমার সমতুল্য হইতে পারে বা আমার উপরও হুকুম চালাইবার অধিকার লাভ করিতে পারে—এ কথাটী মনে রাখা বিশেষ দরকার। অভিমানকে জয় করিবার ইহাই সহজসাধ্য উপায়। প্রকৃতির ধর্ম্মই পরিবর্ত্তন। "Old order changeth yeilding place to new."

জগতের দিকে চাহিলে আজ বুঝিতে পারি, যেখানে ধনিকে ও শ্রমিকে, নিয়োগ কর্ত্তা ও নিযুক্ত ব্যক্তির মধ্যে, তথাকথিত বড় ও ছোটর মধ্যে মনোমালিন্যের ভাব জাগিয়া উঠিতেছে, সেখানেই হইতেছে সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা। ব্যষ্টির নিষ্ফল প্রচেষ্টার স্থলে সঙ্ঘশক্তিই জয়ী হইতেছে। দশের শক্তির যাহা প্রতীক সেই সঙ্ঘ যেন উচ্ছৃঙ্খল বা স্বৈরাচারী না হইয়া উঠে। সঙ্ঘের নিয়ন্ত্রণ ভার যাঁহাদের উপর পড়িবে, তাঁহাদের মধ্যে যথেষ্ট ধীরতা ও বুদ্ধিমত্তা থাকার আবশ্যক। উত্তেজনার দ্বারা যেন সঙ্ঘ কখনও পরিচালিত না হয়। একজনের অবিমৃষ্যকারিতা অনেক সময়ে উপেক্ষা করাও চলে, কিন্তু দশজনের হঠকারিতার ফলে বিষম অমঙ্গল সংঘটিত হয়।

প্রকৃত মমত্ববোধ না থাকিলে সঙ্ঘের কার্য্য পরিচালনা করা বিশেষ দুষ্কর হইয়া উঠে। কেবল মাত্র "নামকা ওয়াস্তে" সঙ্ঘের নেতৃত্ব করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। বাক্যের দ্বারা লোকের মন সাময়িকভাবে হয়ত মুগ্ধ করা যাইতেও পারে, কিন্তু স্বার্থত্যাগ ভিন্ন মানুষের প্রেমলাভ করা কখনও সম্ভবপর নহে। সঙ্ঘকে একটী বিপুল পরি-বার স্বরূপ মনে করিতে হইবে! পরিবারস্থ প্রধান ব্যক্তি যেমন স্বক্ষমতার অপব্যবহার না করিয়া আর পাঁচজনের মত লইয়াই পারিবারিক বিষয়গুলির বিধি ব্যবস্থা করেন, সঙ্ঘপতিও তদ্রূপ সাধারণের মতালোচনাপূর্ব্বক ইতি-কর্ত্তব্যতা নির্দ্ধারণ করিবেন।

পরস্পরের স্বার্থের বৈষম্য হইতেই যত অনর্থের সূত্র-পাত। স্বার্থ সংরক্ষণে মানুষ মানুষের রক্তে ধরণী প্লাবিত করিতেও দ্বিধা বোধ করে না। মানুষ যদি পরস্পরের সহিত মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ হয়, তবে মানুষের অন্তরের বৈষম্যও ধীরে ধীরে ঘুচিয়া যায়। সঙ্ঘই মৈত্রীর মিলন-ক্ষেত্র। মিলনের মূলমন্ত্র কার্য্য ও চিন্তার একাভিমুখীতা। মানুষের হৃদয়ে প্রেমের অমৃত নির্ঝর তখনই প্রবাহিত হয়, যখন মানুষ মানুষের সম্বন্ধে সরলচিত্তে বলিতে পারে,—

"সমানো মন্ত্রঃ সমিতিঃ সমানী, সমানং মনঃ সহচিত্তমেষাং।
সমানং মন্ত্র অভিমন্ত্র এব সমানেন বো হবিষা জুহোমি॥"

শীলা-সোমেশ

— গল্প —

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এল

গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোড নামক সর্ব্ববিদিত পথটি সাঁওতাল পরগণার ভিতর দিয়া যাইতে যাইতে যে ক্ষুদ্র সহরটিকে দ্বিধা ভিন্ন করিয়া দিয়া ঊর্দ্ধমুখে চলিয়া গিয়াছে সেই সহর হইতে প্রায় দশ এগারো মাইল উত্তরে পথের ধারেই একটি বাংলো বাড়ী দেখা যায়। ঘন সন্নিবিষ্ট শালবনের মধ্যে কাঁটাতারের বেড়া দিয়া প্রায় বিঘা দুই জমি ঘেরা, তাহারি মধ্যস্থলে উঁচু ভিত্তির উপর বাড়ীখানি প্রতিষ্ঠিত। আশে-পাশে দু'দশ মাইলের মধ্যে কোথাও জনমানবের বাস নাই।

সন্ধ্যার পর নিবিড় জঙ্গলের ছায়ায় যখন পথের শুভ্র রেখাটি মুছিয়া মিলাইয়া যায় এবং বাংলোটির ঘরে ঘরে আলো জলিয়া উঠে তখন দিগ্‌ব্যাপী স্তব্ধতার মধ্যে জঙ্গলের নানাপ্রকার শব্দ পরিস্ফুট হইয়া উঠিতে থাকে। শালের পাতায় পাতায় ঘষিয়া যে মর্ম্মর ধ্বনি উত্থিত হয় তাহার সহিত সহসা 'খট্টাসের' অট্টহাসি মিশিয়া বিশ্রব্ধ মনকে চমকিত সন্ত্রস্ত করিয়া দেয়। কখনো বা গভীর রাত্রে অতি সন্নিকটে ব্যাঘ্রের আকস্মিক গর্জ্জন নিদ্রিত গৃহবাসীকে শয্যার উপর উঠিয়া বসাইয়া দেয়। তখন বাড়ীর রক্ষক কুকুরগুলার ঘেউ ঘেউ শব্দের সদম্ভ আস্ফালন যেন মার খাইয়া থামিয়া যায়।

চন্দ্রনাথ রায়, ফরেষ্ট অফিসার, এই বাংলোতে বাস করেন। বাড়ীর পিছনে তারের বেড়ার ধারে যে এক-সারি ছোট ছোট কুঠরী আছে তাহার একপ্রান্তের কয়েকটি ঘরে তাঁহার অফিস বসে ও গুটি তিন-চার কর্ম্মচারী বাস করে। অপর দিকে আস্তাবল ও সহিসের ঘর। চন্দ্রনাথ বাবুর একটি ঘোড়া ও টম্‌টম আছে, ঘোড়াটি সোয়ারী ও টম্‌টম দুই কার্য্যেই ব্যবহৃত হয়। সাওতাল সহিস সপরিবারে এইখানেই থাকে। বাড়ীর যৎসামান্য কাজের জন্য একটি দাই ও একজন বেয়ারা আছে। বেয়ারা একাধারে ভৃত্য এবং পাচক।

এ সকল ছাড়াও চন্দ্রনাথবাবুর একটি কন্যা আছে—তাহার নাম শীলা। সে-ই সংসারের কর্ত্রী, কারণ চন্দ্রনাথ বাবু বিপত্নীক। শীলার বয়স আঠারো বৎসর। মেয়েটি দেখিতে সুন্দর, ছোটখাটো, ক্ষীণাঙ্গী, সহসা ভাল করিয়া লক্ষ্য করিলে মুখের কোমল সৌকুমার্য্যের ভিতর দিয়া বয়সোচিত দৃঢ় চিত্তবল ও স্বনির্ভরতা ধরা পড়ে।

কন্যাটিকে লইয়া চন্দ্রনাথবাবু নিশ্চিন্তমনে অরণ্যবাস করিতেছেন। চিরজীবন এইভাবেই কাটিয়াছে; তাই মানুষের সঙ্গের প্রতি বড় একটা লিপ্সা নাই। শীলাও তাঁহারি মত—একলা থাকিতে ভালবাসে। কদাচ দুমাস ছ'মাসে পিতাপুত্রী টম্‌টম আরোহণে সহরে গিয়া বন্ধু-বান্ধবের সহিত দেখা-সাক্ষাৎ করিয়া আসেন। তারপর আবার নিরবচ্ছিন্ন বনপর্ব্ব চলিতে থাকে।

ভাদ্রমাস কাটিয়া গিয়াছে, আশ্বিনের আরম্ভ। সন্ধ্যার পর হিম পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে, শেষরাত্রে একটু গা শীত-শীত করে। দিনের বেলাটি শীত-গ্রীষ্ম বিবর্জ্জিত একটি মনোরম সন্ধিকাল। নির্ম্মল আকাশ ও ঝরঝরে বাতাস যেন প্রকৃতির সমস্ত আস্‌বাব ঝাড়িয়া মুছিয়া একেবারে ক্লেদমুক্ত করিয়া দিয়াছে—গাছের পাতায় কি আকাশের হাল্কা মেঘে কোথাও এতটুকু মলিনতার চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই।

বাংলোর সম্মুখে খানিকটা স্থান লইয়া গোলাপের বাগান। বৈকালী সূর্য্যের সঙ্কুচিত সূর্য্যরশ্মি বাগানটিকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে। হাতে একটা খুরপী লইয়া শাড়ীর আঁচলটা গাছ কোমর করিয়া বাঁধিয়া শীলা গোলাপ গাছের তত্ত্বাবধান করিতেছিল। যে গাছে তখনো ফুল ধরে নাই তাহার গোড়া খুঁড়িয়া দিতেছিল, আবার যে গাছটি ফুলে মুকুলে ভরিয়া উঠিয়াছে, একটি ক্ষুদ্র জল ঢা,লবার ঝাঁঝারদার পাত্র হইতে তাহার পাতায় ও মূলে জল দিতেছিল। মালী নাই, ঐ বাগানটি শীলার

নিজের হাতে তৈয়ারী—নিজস্ব। তাই ইহার প্রতি তাহার যত্ন ও মমতার অন্ত ছিলনা। একটি ফুলও সে প্রাণ ধরিয়া কাহাকেও ছিঁড়িতে দিতে পারিত না।

শীলা মন দিয়া বাগানের সেবা করিতেছিল বটে কিন্তু তাহার একটি চোখ ও একটি কাণ পথের পানে পড়িয়াছিল! মাঝে মাঝে যেন পরিশ্রামের পর বিশ্রাম করিবার উদ্দেশ্যেই গেটের কাছে গিয়া দাঁড়াইতেছিল এবং কাঠের ফাটকের উপর ভর দিয়া পথের যে প্রান্তটা সহরের দিকে গিয়াছে, সেইদিকে উৎসুক চোখে চাহিয়া দেখিতেছিল।

চন্দ্রনাথ বাবু বেলা দ্বিপ্রহরে ঘোড়ায় চড়িয়া বন্দুক ঘাড়ে করিয়া বাহির হইয়াছিলেন, এখনো ফিরিয়া আসেন নাই। কিন্তু ইহা নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার, রোজই চন্দ্রনাথ বাবুর ফিরিতে সন্ধ্যা হয় সুতরাং সেজন্য উৎকণ্ঠার কোনও হেতু নাই। শীলার চিত্ত-চাঞ্চল্যের অন্য কারণ ছিল। আসল কথা আজ শনিবার।

আষাঢ় মাসে আকাশে নবীন মেঘোদয় দেখিয়া তরুণীদের মন উন্মনা হয়, এ দেশের প্রাচীন কবিরা এরূপ একটা কথা লিখিয়া গিয়াছেন বটে, তাহাও পথিকবধূ জাতীয় বিশেষ একশ্রেণীর তরুণীদের সম্বন্ধে! কিন্তু শনিবারে, আকাশ একান্ত নির্ম্মেঘ থাকা সত্বেও এরূপ ব্যাপার ঘটিতে পারে, তাহা কোন কাব্যে দেখিয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না। কবিদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা নিন্দুক ভর্তৃহরি কবিও শনিবারের নামে এমন একটা অভিযোগ আনিতে সাহস করেন নাই। তবে আজ কেবলমাত্র শনিবার বলিয়া একটি অনূঢ়া তরুণী গোলাপ গাছের পরিচর্য্যা করিতে করিতে তৃষিত নয়ানে বনপথের পানে চাহিয়া থাকিবে কেন?

গত কয়েকটি শনিবার হইতেই এই ব্যাপার ঘটিতেছিল। মাস দুয়েক পূর্ব্বে চন্দ্রনাথ বাবু সকন্যা সহরে গিয়াছিলেন, সেখানে এক পুরাতন বন্ধুর গৃহে একটি নূতন লোকের সহিত তাঁহাদের পরিচয় হয়। লোকটি সহরে নবাগত, বিধবা জ্যেষ্ঠা ভগিনীর স্বাস্থ্যের জন্য হাওয়া বদলাইতে আসিয়া মস্ত একখানা কম্পাউণ্ডযুক্ত বাড়ী ভাড়া লইয়া বাস করিতেছিল। পুরাতন বন্ধুটি পরিচয় করাইয়া দিলেন, ইনি সোমেশ বসু, ধনীর সন্তান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী এবং অতিশয় সজ্জন। অধিকন্তু, লোকটি যে বিশেষ সুপুরুষ তাহা চন্দ্রনাথ বাবু ও তাঁহার কন্যা স্বচক্ষে দেখিলেন। শীলা মনে মনে বয়স আন্দাজ করিল—ছাব্বিশ সাতাশ।

সোমেশ বসুর সহিত আলাপে আরও একটা জিনিষ প্রকাশ পাইল, সে অতি শীঘ্র আবাল বৃদ্ধবনিতার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিতে পারে। ঘণ্টা দুয়ের মধ্যে সে এতই ভাব জমাইয়া তুলিল এবং এমন ভাবে আচরণ করিতে লাগিল যেন চন্দ্রনাথ বাবু তাহার খুড়া-জ্যাঠা জাতীয় একজন নিকট আত্মীয় এবং শীলা তাহার শৈশবের সহচরী—কেন যে তাহাকে এখনো 'সোমেশদা' বলিয়া বিগলিত কণ্ঠে ডাকিতেছে না ইহাই যেন ভারি আশ্চর্য্যের বিষয়!

সেইদিন সায়াহ্নে সোমেশ বসুর বাড়ীতে চা পান করিয়া তাহার বড় দিদির নির্ম্মিত অপূর্ব্ব জিভে-গজার স্বাদ মুখে লইয়া শীলা ও তাহার পিতা বাড়ী ফিরিলেন। বিদায়কালে সোমেশ আশ্বাস দিয়া বলিল;—কিছু ভাববেন না, শনিবারে শনিবারে গিয়ে আমি আপনাদের নির্জ্জন বাসের ক্লেশ লাঘব করে দিয়ে আসব।

এই আত্মপ্রত্যয়শীল যুবকের কথা বলিবার গম্ভীর ভঙ্গী দেখিয়া শীলার বড় হাসি পাইয়াছিল।

তাহার পর হইতে প্রতি শনিবারে সোমেশ বাইসিক্ল্ আরোহণে চন্দ্রবাবুর বাংলোতে আসিয়াছে এবং ঘণ্টা দুই থাকিয়া চা ও শীলার স্বহস্ত প্রস্তুত কেক সেবন করিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বে ফিরিয়া গিয়াছে।

সম্প্রতি শীলার মনে একটা গোলমাল উপস্থিত হইয়াছে। সোমেশের স্বাস্থ্যপূর্ণ দৃঢ় শরীর, তাহার সুশিক্ষা মার্জ্জিত তীক্ষ্ণবুদ্ধি, তাহার কথা বলিবার হাল্কা অথচ গম্ভীর ভঙ্গী সবই শীলার ভাল লাগে এবং লোকটি যে খুব ভাল এ বিষয়েও তাহার মনে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহার সকল কথাবার্ত্তা আচরণের অন্তরালে যে একটি দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় অজ্ঞাতসারে পরিস্ফুট হইয়া উঠে তাহা শীলার ভাল লাগেনা। ইহা যদি অহমিকা বা আত্মম্ভরিতা হইত তাহা হইলে দু'চারিটি তীক্ষ্ণ কথার বাণে শীলা তাহাকে ধূলিসাৎ করিয়া দিতে

পারিত। কিন্তু ইহা সে বস্তু নয়, বস্তুতঃ ইহার কতখানি ঠাট্টা এবং কতখানি সত্য মনোভাব তাহাই শীলা অনেক সময় বুঝিয়া উঠিতে পারেনা। সে নিজে শৈশব হইতে আত্মনির্ভরশীলা, সর্ব্ববিষয়ে নিজেকে রক্ষা করিতে সমর্থা, কাহারও মুরুব্বিয়ানা বা পৃষ্ঠপোষকতা সে আদৌ সহ্য করিতে পারে না। কিন্তু সোমেশের ভাবে ইঙ্গিতে যেন ঐ বস্তুটারই সে প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত পায়। এবং এই আত্মপরিতোষ যতই তাহার আত্মমর্য্যাদায় আঘাত করিয়া যায়, আঘাত ফিরাইয়া দিতে না পারিয়া ততই সে উৎপীড়িত হইয়া উঠে।

তাছাড়া, বাড়ীতে চন্দ্রনাথ বাবু হইতে আরম্ভ করিয়া চাকরাণীটা পর্য্যন্ত সোমেশের গুণগানে এমনি মুক্তকণ্ঠ হইয়া উঠিয়াছেন যে, একজন কেহ প্রতিবাদ না করিলে সমস্ত ব্যাপারটাই একটা বৈচিত্র্যহীন বন্দনা গীতি হইয়া দাঁড়ায়। তাই সুযোগ পাইলেই সে পিতার সহিত তর্ক করে, যে, সোমেশ বাবু লোকটি অতিশয় অহঙ্কারী এবং উচ্চনীচ সকলকেই পিঠ ঠুকিয়া পেট্রো-নাইজ করা তাহার স্বভাব।

প্রত্যুত্তরে চন্দ্রনাথ বাবু বলেন যে যুবকদের নিরীহ অতি বিনয়ী ভাব তিনি সহ্য করিতে পারেন না এবং আজকালকার ছেলেরা অতিশয় শিষ্ট ও মিষ্টভাষী হইয়া একেবারে উৎসন্নে যাইতে বসিয়াছে।

শীলা তর্ক করে যে সোমেশবাবু সকলকেই মনে মনে তাচ্ছিল্য করিয়া ক্ষুদ্র করিয়া দেখেন। চন্দ্রবাবু বলেন, না, সে নিজেকে সকলের সমানে করিয়া দেখে।

সুতরাং তর্কের নিষ্পত্তি হয় না। নিজের যুক্তির প্রভাবে শীলা সোমেশের প্রতি বিমুখ হইয়া বসিতে চাহে, তাহাকে অবহেলা করিয়া মন হইতে ঝাড়িয়া ফেলিতে চায়। কিন্তু পারেনা, অদৃশ্য আকর্ষণ দৃঢ়তর হইতে থাকে। এইরূপ দোটানার মধ্যে তাহার রাত ও দিনগুলা কাটিতেছে।

নিস্তেজ বাতাসে বহুদূর হইতে সুমিষ্ট কিড়িং কিড়িং শব্দ ভাসিয়া আসিল। শীলা সচকিত হইয়া দাঁড়াইয়া দেখিল তখনো পথের ওপর সাইকল্ বা তাহার আরো-হীকে দেখা যাইতেছেনা। সে বাগানে ফিরিয়া গিয়া পীতপুষ্পনম্র গোলাপলতার মঞ্জুমূলে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া গভীর মনঃসংযোগে তাহার পরিচর্য্যা করিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে সোমেশ আসিয়া ফটকের সম্মুখে অবতরণ করিল; ফটকের গায়ে বাইসিক্ল্ হেলাইয়া রাখিয়া হাতার ভিতর প্রবেশ করিল। শীলা একমনে এতই কাজ করিতেছিল যে, তাহার অভ্যাগম জানিতে পারিল না।

সোমেশের পায়ে রবার সোল্ জুতা ছিল, তাই সে যখন নিঃশব্দে শীলার পিছনে গিয়া দাঁড়াইল, তখনো শীলা মুখ তুলিয়া চাহিল না। কিন্তু হেঁট হইয়া কাজ করিতেছিল বলিয়াই বোধহয় তাহার ঘাড় ও কর্ণমূল ধীরে ধীরে লাল হইয়া উঠিল।

মিনিট দুই চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া সোমেশ মৃদুকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল। শীলা যেন চমকিয়া মুখ তুলিয়া তাহাকে দেখিতে পাইল; সেও একটুখানি স্বগত হাসি হাসিয়া বলিল,—'এই যে! কতক্ষণ এসেছেন?'

সোমেশের অধরোষ্ঠ একবার প্রসারিত ও সঙ্কুচিত হইল। সে বলিল;—'প্রশ্নের উত্তর নিষ্প্রয়োজন। কতক্ষণ এসেছি তা তুমি বিলক্ষণ জানো।'

শীলা আবার ঘাড় গুঁজিয়া গোলাপ গাছে মন দিল, যেন সোমেশের কথা সে শুনিতেই পায় নাই। কিন্তু তাহার মুখ পূর্ব্বাপেক্ষা আরও লাল ও উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। এই লোকটি কথায় কথায় মানুষকে এমন অপ্রস্তুত করিয়া দিতে পারে যে সহসা মুখে কথাই যোগায় না। তা ছাড়া, এতদিন সে শীলাকে 'আপনি' বলিয়া সম্বোধন করিতে-ছিল, আজ হঠাৎ কোন প্রকার ভূমিকা না করিয়াই 'তুমি' বলিতে আরম্ভ করিয়া দিল দেখিয়া শীলার বুকের ভিতরটা তোলপাড় করিয়া উঠিল।

শীলার মুখ সোমেশ দেখিতে পাইতেছিল না, শুধু তাহার মাথার ঘন চুলের মধ্যে সিঁথির ঋজু রেখাটি সোমেশের চোখের নীচে একটি কানন মধ্যবর্ত্তী সুন্দর বীথিপথের মত জাগিয়া ছিল। সেই দিকে চাহিয়া চাহিয়া সোমেশ মুখ টিপিয়া একটু হাসিল, তারপর গম্ভীর হইয়া বলিল,—'এলো খোঁপা বাধ্‌লে তোমাকে বেশ দেখায়।'

এইবার শীলা মনে মনে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল, [illegible]

কথা না বলিয়া গাছ হইতে শুষ্ক পাতাগুলা ছিঁড়িয়া ফেলিতে লাগিল।

সোমেশ হাত বাড়াইয়া একটি আধ-ফুটন্ত ফুল বোঁটা-সুদ্ধ ছিঁড়িয়া লইল। শীলা এতক্ষণে একটা সত্যকার সুযোগ পাইয়া ঘাড় বাঁকাইয়া তাহার দিকে ভ্রূকুটিপূর্ণ দৃষ্টি হানিয়া বলিল,—'আমার গাছ থেকে ফুল ছিঁড়লেন যে?

সে কথার উত্তর না দিয়া, ফুলের দীর্ঘ আঘ্রাণ গ্রহণ করিয়া সোমেশ বলিল,—"আঃ! চমৎকার গন্ধ! মার্শাল-নীল বুঝি?—একবার উঠে দাঁড়াও ত, তোমার খোঁপায় গুঁজে দি।'

বিদ্যুদ্বেগে উঠিয়া দাঁড়াইয়া শীলা বলিল, "সোমেশ বাবু।'

মৃদু বিস্ময়ের দৃষ্টিতে সোমেশ তাহার মুখের দিকে চাহিল, 'কি হল?'

ক্রুদ্ধস্বরে শীলা বলিল,—'আজ এ সব আপনি কি বলছেন? জানেন বাবা বাড়ী নেই?'

সোমেশ সহজভাবে বলিল,—'জানি। তিনি ডন্ কুইক্সটের মত সাজ করে বেরিয়েছেন, পথে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। মাইল খানেক পথ তাঁর সঙ্গে একসঙ্গে এলুম—তারপর তিনি আবার অশ্বপৃষ্ঠে জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করলেন। তোমাকে খবর দিতে বল্লেন, আজ তাঁর ফিরতে দেরী হবে। কোথায় নাকি একটি বাঘের সন্ধান পেয়েছেন।'

রাগে শীলা একেবারে নির্ব্বাক হইয়া গেল। ডন্-কুইক্সটের মত!

সোমেশ পূর্ব্ববৎ বলিতে লাগিল,—'তোমার বাবার সঙ্গে গল্প করতে করতে একটা মজার ইতিহাস বেরিয়ে পড়ল; আমার বাবা এবং তিনি ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে একসঙ্গে ইডেন্ হিন্দু হোষ্টেলে ছিলেন,—দুজনের মধ্যে ঘোর বন্ধুত্ব ছিল। ঠিক করেছি, তোমার বাবাকে এবার থেকে 'কাকাবাবু' বলে ডাকব। ইতিমধ্যে একবার ডেকেও ফেলেছি।'

কথা কহিবার ধরণ যাহার এইরূপ তাহার প্রতি কতক্ষণ রাগ করিয়া থাকা যায়? কিন্তু শীলা তাহার পুরাতন অভিযোগ উপস্থিত করিয়া বলিল,—'আপনি কেন আমার গাছের ফুল তুল্লেন? জানেন, আমার গাছে কেউ হাত দেয় আমি ভালবাসিনা?'

সোমেশ কহিল, "তুললুম, কারণ গাছের চেয়ে তোমার চুলে এ ফুল ঢের বেশী মানাবে।'

শীলা বলিল,—'আবার ঐ কথা! দিন্ আমার ফুল আমাকে।'

'তাইত দিতে চাইছি। পেছন ফিরে দাঁড়াও।'

'না, হাতে দিন্। ওটাকে আমি দূর করে ফেলে দেব।'

সোমেশ মাথা নাড়িয়া বলিল,—'কখনই হতে পারে না। হয় তোমার চুলে, নয় আমার বুকে। ফেলে দেয়া অসম্ভব।'

'বেশ, দরকার নেই আমার' বলিয়া শীলা হাতের খুরপী ফেলিয়া দিয়া বাড়ীর দিকে যাইতে লাগিল। এত বিরক্ত সে আর কখনো হয় নাই। তাহার বোধ হইল, সোমেশ তাহাকে ইচ্ছা করিয়া রাগাইবার চেষ্টা করিতেছে। একবার তাহার মনে এরূপ সন্দেহও হইল যে চন্দ্রনাথ বাবু বাড়ী নাই জানিয়াই সোমেশ তখন স্পর্দ্ধা প্রকাশ করিতে সাহস করিতেছে। ইহাতে তাহার রাগ আরো বাড়িয়া গেল।

'দাঁড়াও, একটা কথা আছে।'

শীলা থমকিয়া দাঁড়াইয়া অন্ধকার মুখ ফিরাইয়া বলিল, 'কি কথা।'

সযত্নে গোলাপ ফুলটি নিজের এণ্ডির কোটের বটন্-হোলে আট্‌কাইয়া সোমেশ বলিল,—'তুমি না নাও, আমিই পরলুম। কিন্তু কি সুন্দর ফুলটি দেখ, কেবলি নুয়ে নুয়ে পড়ছে, নরম বোঁটায় তার মুখখানি তুলে ধরে রাখতে পারছি না। ঠিক যেন স্নেহভারেনত সুকোমল নারী-প্রকৃতি! পুরুষেরই বুকেই এর যথার্থ স্থান।" এই কবিত্বপূর্ণ পুষ্পবাণটি নিক্ষেপ করিয়া সোমেশ শীলার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল, সহজভাবে বলিল,—'এগারো মাইল পথ সাইকেল চালিয়ে এবং তোমার সঙ্গে ঝগড়া করে তৃষিত হয়ে পড়েছি। সুতরাং কেক্ এবং চা দিয়ে অতিথির সম্বর্দ্ধনা যদি করতে চাও ত এই সুযোগ! অলমহং জোঃ!'

অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া শুষ্কস্বরে একটা 'আসুন' বলিয়া শীলা বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইল। সোমেশ তাহার সঙ্গে যাইতে যাইতে বলিল,—'পুরাকালে দুষ্মন্ত বলে এক পরাক্রান্ত নৃপতি ছিলেন। মৃগয়া করতে বেরিয়ে তিনি একদিন এমনি একটি তপোবনে এসে উপস্থিত হন। শকুন্তলা তখন তরু আলবালে জলসিঞ্চন করছিলেন। অবশ্য, তাঁর সঙ্গে দু'জন সখী ছিলেন—'

উত্ত্যক্ত হইয়া শীলা কহিল,—'আমি আপনার উপকথা শুন্‌তে চাই না।'

উদারভাবে হাত নাড়িয়া সোমেশ বলিল,—'আচ্ছা বেশ তাই হোক! উপকথা শোনবার এটা সময় নয় বটে।' তারপর এদিক-ওদিক চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—'কিন্তু তোমার সেই পোষা মৃগশিশুটিকে দেখছি না।'

অধর দংশন করিয়া শীলা চুপ করিয়া রহিল, উত্তর দিল না।

পশ্চিম দিকের ঘন শালবনের অন্তরালে সূর্য্য ঢাকা পড়িল। শালবন হইতে একটি সুমিষ্ট নির্য্যাসগন্ধ উত্থিত হইয়া বাতাসে ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল।

বাংলোর খোলা বারান্দার উপর বেতের চেয়ারে বসিয়া দুইজনে চা-পান সমাপ্ত করিল। শীলা মুখ গম্ভীর করিয়া রহিল। সোমেশ রুমালে মুখ মুছিয়া পকেট হইতে সিগার বাহির করিয়া তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিতেই শীলা বলিয়া উঠিল;—'ঐ পোড়া গন্ধটা আমি সইতে পারি না।'

সোমেশ তৎক্ষণাৎ মুখের সিগারটা বারান্দার নীচে ফেলিয়া পকেট হইতে কুমীরের চামড়ার সিগার-কেস্‌টা লইয়া একে একে সিগারগুলা বাহির করিতে লাগিল। প্রত্যেকটা সিগার ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া দুঃখিত ভাবে মাথা নাড়িয়া ফেলিয়া দিতে লাগিল। শেষে যখন সবগুলা নিঃশেষ হইয়া গেল, তখন কেস্‌-টা উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিয়া সেটাও ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া চেয়ারে হেলান দিয়া বসিল।

শীলা বিস্মিত চোখে তাহার কার্য্যকলাপ দেখিতেছিল, বলিল,—'সব ফেলে দিলেন যে!'

অন্যমনস্কভাবে ঊর্দ্ধদিকে চোখ তুলিয়া সোমেশ বলিল,—'আর খাব না।—ভাল কথা, তোমার বাবার সঙ্গে আর একটা কথা হয়েছিল সেটা বলতে ভুলে গেছি—'

শীলা উঠিয়া গিয়া বারান্দার রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইল। তখন সন্ধ্যার ছায়া ঘনীভূত হইয়া আসিতেছিল, শীলা উদ্বিগ্নস্বরে কহিল,—'সোমেশ বাবু আজ কি আপনি বাড়ী ফিরবেন না? সন্ধ্যা হয়ে গেল যে।'

সোমেশ সেকথা কানে না তুলিয়া বলিল,—'তোমার বাবার কাছে আমি আজ একটা প্রস্তাব করেছিলুম তার উত্তরে তিনি বললেন—"

অধীর হইয়া শীলা বলিল,—'কিন্তু এদিকে যে রাত্রি হয়ে যাচ্ছে, এতটা পথ অন্ধকারে যাবেন কি করে? দু'দিকে জঙ্গল, রাস্তাও নিরাপদ নয়।'

সোমেশ উঠিয়া শীলার পাশে গিয়া দাঁড়াইল। বলিল,—'আজ রাত্রে আমি এইখানেই থাক্‌বো স্থির করেছি, চন্দ্রনাথ বাবু নিমন্ত্রণ করেছেন, বাড়ীতে দিদিকেও বলা আছে। সে যাক্‌। তোমার বাবার কাছে আমি আজ যে প্রস্তাব করেছিলুম তার উত্তরে তিনি বল্লেন, শীলার যদি অমত না থাকে তাঁরও অমত নেই।'

সোমেশের কথার ভঙ্গীতে প্রস্তাবটা যে কি তাহা বুঝিতে শীলার দেরী হইল না। এক ঝলক রক্ত আসিয়া তাহার মুখখানা রাঙা করিয়া দিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনও বিরূপ হইয়া বসিল। জোর করিয়া যথাসাধ্য সহজ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল;—কি প্রস্তাব আপনি করেছিলেন শুনি?'

তাহার একখানা হাত নিজের হাতে তুলিয়া লইয়া সোমেশ বলিল;—"এই পাণিগ্রহণ করবার আবেদন জানিয়েছিলুম।'

তাচ্ছিল্যভরে হাসিয়া শীলা হাত ছাড়াইয়া লইল, বলিল;—'ওঃ এই প্রস্তাব। তা বাবা ঠিকই জবাব দিয়েছেন; আমার মত ত তিনি জানেন না!'

অবিচলিত ভাবে সোমেশ বলিল;—'আমি তাঁকে জানিয়ে দিয়েছি যে তোমার অমত নেই।'

'কি? আপনি বাবাকে বলেছেন—' ক্রোধে বিরক্তিতে শীলার কণ্ঠরোধ হইয়া গেল। সে অধর দংশন করিয়া বলিল;—'আপনি অনধিকার চর্চা করছেন।

কোন্ সাহসে আমার সম্বন্ধে আপনি এমন ধৃষ্টতা প্রকাশ করলেন ?'

সোমেশ গম্ভীরভাবে বলিল ;—'এই সাহসে যে আমি তোমায় ভালবাসি আর তুমিও আমায় ভালবাসো !'

তীব্র অবজ্ঞার স্বরে শীলা বলিয়া উঠিল ;—'আপনি ভুল করছেন। নিজের সম্বন্ধে আপনার ধারণা খুব উচ্চ হতে পারে কিন্তু আমি আপনাকে সাধারণ পাঁচজনের সঙ্গে সমান করেই দেখি।'

সোমেশ বলিল ;—'মিথ্যে কথা। আমি জানি তুমি আমাকে ভালবাসো।"

শীলা উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল। বিদ্রূপভরা স্বরে বলিল ;—'আচ্ছা সোমেশ বাবু, আপনার কি বিশ্বাস আপনার মত যোগ্যব্যক্তি পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নেই ?'

সোমেশ বলিল ;—'তুমি যদি অমন করে হাসো তাহলে আমি লোভ সাম্‌লাতে পারব না।"

ভ্রূভঙ্গী করিয়া শীলা বলিল ;—'তার মানে ?'

'তার মানে—এই' বলিয়া হঠাৎ শীলার দুইহাত ধরিয়া টানিয়া আনিয়া সোমেশ তাহার অধরে চুম্বন করিয়া ছাড়িয়া দিল।

ক্ষণকালের জন্য শীলা একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল। তারপর বাঁ হাতের পিঠ দিয়া নিজের ঠোঁট দুটা মুছিতে মুছিতে, ডান হাতে সজোরে সোমেশের গালে এক চড় বসাইয়া দিয়া পিছু সরিয়া দাঁড়াইল। তাহার দুই চোখ দিয়া যেন আগুন ছুটিয়া বাহির হইতে লাগিল।

চড় খাইয়া সোমেশের গালে চারি আঙুলের দাগ লাল হইয়া ফুটিয়া উঠিল। কিন্তু সে হাসি মুখেই বলিল ;— 'আমি অহিংসা ব্রতধারী—গান্ধীজীর শিষ্য। বাঁ গালে চড় মারলে ডান গাল ফিরিয়ে দিতে—'

চাপা গর্জ্জনে শীলা বলিয়া উঠিল ;—'আপনি যান্— যান্ এখান থেকে। ভদ্র মহিলার সঙ্গে কথা কইবার যোগ্য নন্ আপনি। এই দণ্ডে এ বাড়ী থেকে বিদায় হোন।'

এবার সোমেশের কণ্ঠস্বরে একটু পরিবর্ত্তন হইল। সে যেন ভিতরের বেদনা গোপন করিতে করিতে বলিল ;—

'কিন্তু বলেছি ত, আজ রাত্রে আমি এখানেই থাক্‌ব, চন্দ্র-বাবু নিমন্ত্রণ করেছেন—'

শীলা ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল ;—'তিনি না জেনে নিমন্ত্রণ করেছিলেন, নইলে আপনার মত লোককে কেউ জেনে-শুনে বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করে না।'

সোমেশ চুপ করিয়া অনেকক্ষণ বাহিরের অন্ধকারের দিকে তাকাইয়া রহিল। তারপর আস্তে আস্তে বলিল ; —'কিন্তু এদিকেও রাত হয়ে গেছে দেখছি। পথও বল্‌ছিলে নিরাপদ নয়—'

কণ্ঠস্বরে তীব্র গরল ভরিয়া শীলা বলিল ;—'আপনি খাঁটি বাঙালী বটে। অসহায়া স্ত্রীলোককে অপমান করতে পারেন কিন্তু শেয়ালের ভয়ে পথে বার হতে পারেন না।'

কথাগুলা সাঁওতালী তীরের মত সোমেশের বুকে গিয়া বিঁধিল। অন্ধকারে তাহার মুখ ভাল দেখা গেল না, কিন্তু তাহার গলার পরিবর্ত্তন এবার শীলার কাণেও ধরা পড়িল। তথাপি সোমেশ হাল্কা ভাবেই কথা বলিতে চেষ্টা করিল ;—'আমি খাঁটি বাঙালী তা অস্বীকার করতে পারিনা। কিন্তু শেয়ালের অপবাদটা ভিত্তিহীন, কোনো খাঁটি বাঙালীই শেয়ালকে ভয় করেনা। সে যাক। এখন তাহলে বেরিয়ে পড়ি, এগারোটার মধ্যেই বোধহয় বাড়ী পৌঁছতে পারব। তোমার বাবাকে বলে দিও আজ থাকতে পারলুম না।—আর,—যদি ভুল বুঝে অপমান করে থাকি মাপ কোরো।' বলিয়া সোমেশ ধীরে ধীরে নামিয়া গেল।

অন্ধকারে একাকী দাঁড়াইয়া শীলা শুনিতে পাইল, ফটক খুলিয়া সোমেশ বাহিরে গেল, বাহির হইতে ফটক বন্ধ করিয়া দিল, তারপর সাইক্লখানা হাতে করিয়া লইয়া একবার ঘণ্টা বাজাইয়া তাহাতে আরোহণ করিয়া চলিয়া গেল। সাইক্লের সঙ্গে বাত্তি ছিল না।

শীলা আরো কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া আস্তে আস্তে গিয়া একখানা চেয়ারে বসিয়া পড়িল। ঘড়িতে ঠং ঠং করিয়া আটটা বাজিল।

গালে হাত দিয়া বসিয়া বাহিরের অন্ধকারের দিকে তাকাইয়া তাকাইয়া শীলা একবার শিহরিয়া উঠিল। এগারো মাইল পথ! সঙ্গে একটা দেশালাই পর্য্যন্ত নাই।

ঘরের ভিতর চাকর আলো দিয়া গিয়াছিল; দাসীটা আসিয়া একবার জিজ্ঞাসা করিয়া গেল, শীলা কাপড় ছাড়িবে কি না। কিন্তু শীলা কিছুই শুনিতে পাইল না। দৃষ্টিহীন চক্ষু চারিদিকে মেলিয়া পাষাণ মূর্ত্তির মত বসিয়া রহিল।

বাহিরে ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনা গেল এবং পরক্ষণেই হাঁকডাক করিয়া চন্দ্রনাথ বাবু বাড়ী ফিরিলেন। সহিস আসিয়া ঘোড়া লইয়া গেল। হ্যাট কোট ইত্যাদি খুলিয়া চাকরের হাতে দিয়া চন্দ্রনাথ বাবু বারান্দায় আসিয়া বসিলেন। চায়ের গরম জল তৈয়ার ছিল, শীলা নীরবে চা প্রস্তুত করিতে লাগিল।

মুখহাত ধুইয়া চা পান করিতে করিতে চন্দ্রনাথ বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন;—'সোমেশ এসেছিল—চলে গেছে?'

শীলা নতনেত্রে বলিল;—'হঁ্যা।'

চন্দ্রনাথ বাবু কন্যার মুখের দিকে একটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিলেন কিন্তু ও-বিষয়ে আর কোন প্রশ্ন করিলেন না। একথা-সেকথা আলোচনা করিতে করিতে বলিলেন;—'একটা ম্যান্-ইটার বেরিয়েছে। মাইল বারো চোদ্দ দূরে সাঁওতালদের গাঁয়ে উৎপাত করছিল, কয়েকটা লোককে নিয়েও গিয়েছিল। এখন সাঁওতালদের তাড়া খেয়ে এদিকে পালিয়ে এসেছে। রাস্তার ধারে ধারে অনেকদূর পর্য্যন্ত তার থাবার দাগও দেখলুম, কিন্তু বাঘটার সন্ধান পাওয়া গেল না। কাল জঙ্গল বীট্ করিয়ে তাকে বার করতে হবে।'

ঠিক এই সময় বহুদূর দক্ষিণ হইতে ক্ষীণ অথচ স্পষ্ট শব্দ আসিল;—'ফেউ! ফেউ!'

ফেউয়ের ডাক যে পূর্ব্বে শুনে নাই সে কল্পনাও করিতে পারে না যে একটা দুর্দ্দান্ত বাঘের পিছনে একপাল শৃগাল ল্যাজ উঁচু করিয়া যাইতে যাইতে এমন মানুষের মত গলা বাহির করিয়া চীৎকার করে। শীলা এডাক বহুবার শুনিয়াছে তাই তাহার সর্ব্বাঙ্গ কণ্টকিত হইয়া কাঁপিয়া উঠিল! সোমেশ যে ঐ পথেই গিয়াছে! সে ভয় ব্যাকুল স্বরে বলিয়া উঠিল;—'বাবা, ঐ শোন।'

চন্দ্রনাথ বাবু তাহার ভয় বিবর্ণ মুখ লক্ষ্য না করিয়া সহজ ভাবে বলিলেন;—'হ্যাঁ, আমি ঠিকই আন্দাজ করেছিলুম, বাঘটা ঐ দিকেই আছে।' তিনি সহিসকে ডাকিয়া তাহার পশুগুলাকে সাবধানে রাখিতে হুকুম করিয়া দিলেন।

সমস্ত দিন অশ্বপৃষ্ঠে ঘুরিয়া চন্দ্রনাথবাবু ক্লান্ত হইয়াছিলেন, সকাল সকাল আহারাদি শেষ করিয়া শুইয়া পড়িলেন।

ঘরের ঘড়িতে যখন রাত্রি এগারোটা বাজিয়া গেল তখন শীলা নিঃশব্দে নিজের বিছানা হইতে উঠিল। পিতার ঘরের দ্বারের কাছে গিয়া শুনিল, তিনি গভীর নিদ্রায় নাসিকাধ্বনি করিতেছেন। সাবধানে দরজা খুলিয়া শীলা বাহিরে আসিল। ঊর্দ্ধে তখন এক আকাশ নক্ষত্র দপদপ করিতেছে, তাহারি অস্পষ্ট আলোতে সে বাংলো হইতে নামিয়া সহিসের ঘরের দিকে গেল। সহিসের ঘরে তখনো আলো জ্বলিতেছিল এবং ভিতর হইতে একটা অস্ফুট কাতরোক্তির শব্দ আসিতেছিল। শীলা আস্তে আস্তে কবাটে টোকা মারিয়া ডাকিল:—'ঝিমন!'

ঝিমন জাগিয়াছিল, বাহিরে আসিয়া শীলাকে দেখিয়া একেবারে অবাক হইয়া গেল;—'দিদি, তুমি এত রাত্রে এখানে!'

শীলা চুপিচুপি বলিল;—'ঝিমন, তোমাকে একটি কাজ করতে হবে। এখনি টম্‌টম্ জুতে আমাকে নিয়ে সহরে যেতে হবে।"

ঝিমন ফ্যালফ্যাল করিয়া তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া শেষে বলিল,—"কি বলছ দিদি এই রাত্তিরে—"

শীলা বলিল,—হ্যাঁ, ঝিমন, এই রাত্রে এখনি তোমাকে দশটাকা বখশিশ্ দেব। আর দেরী কোরে না, এখনি যেতে হবে।

ঝিমন ব্যাকুল হইয়া বলিল,— 'কিন্তু কেন, দিদি কেন? এত রাত্রে সহরে কি এমন দরকার।'

শীলা কম্পিতস্বরে কহিল,—'সে কথায় কাজ নেই ঝিমন, কিন্তু আজ আমাকে যেতে হবে।'

ঝিমন চিন্তা করিয়া কহিল,—"ঘোড়া যে ভা[illegible] থকে আছে, দিদি, সে কি যেতে পারবে?"

'পারবে। তাকে এক বোতল মদ খাইয়ে দাও।'

ঝিমন তখন বলিল,—'কিন্তু আমি যে কিছুতেই যেতে পারবনা দিদি। মুহুয়ার মার ব্যথা উঠেছে, আজ রাত্রেই ছেলে হবে। তাকে একলা ফেলে কি করে যাব?' ঝিমন কাতর দৃষ্টিতে শীলার মুখের পানে তাকাইয়া রহিল।

পাঁচ মিনিট স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া অবশেষে শীলা বলিল;—বেশ তোমাকে যেতে হবে না। তুমি খালি টম্‌টম্ জুতে রাস্তায় এনে দাও—আমি একাই যাব। কিন্তু দেখো, শব্দ করোনা। বাবা জেগে উঠ্‌লে আর যাওয়া হবেনা।'

ভোর হইতে আর বিলম্ব নাই—পূর্ব্বদিকে একটা পাংশু শ্বেতাভা ক্রমশঃ পরস্ফুট হইয়া উঠিতেছে, গাছ পালার অস্ফুটমূর্ত্তি পারিপার্শ্বিক স্বচ্ছতার মধ্যে জমাট অন্ধকারের মত দেখাইতেছে। সোমেশ নিজের বাড়ীর গাড়ী বারান্দার নীচে ক্যাম্প খাট পাতিয়া ঘুমাইতেছিল, পায়ের দিকে একপ্রকার অস্বস্তি অনুভব করিয়া জাগিয়া উঠিল। তারপর ধড়্‌মড়্ করিয়া উঠিয়া বসিয়া চক্ষু মুছিয়া যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার হৃৎস্পন্দন স্তব্ধ হইয়া গেল।

সে দেখিল, মাটির উপর নতজানু হইয়া বসিয়া, তাহার পায়ের উপর উপুড় হইয়া মাথা রাখিয়া, পায়ের একটি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দৃঢ়মুষ্টিতে ধরিয়া শীলা ঘুমাইতেছে।

অতি সন্তর্পণে পা ছাড়াইয়া লইয়া সোমেশ উঠিয়া দাঁড়াইল। নিঃশব্দে কিছুক্ষণ শীলার ঘুমন্ত মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বিপুল স্নেহে তাহার নিদ্রাশিথিল দেহ খানি দুইবাহুতে নিজের বুকের কাছে তুলিয়া লইল; কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া মৃদুস্বরে ডাকিল;— 'শীলা! শীলা!'

ঘুমন্ত শীলা চোখ না খুলিয়াই উত্তর দিল;—'উঁ'

বাড়ীর দরজা ভিতর হইতে বন্ধ ছিল না, ভেজানো ছিল মাত্র। সোমেশ শীলাকে কোলে লইয়া নিজের ঘরে বিছানার উপর শোয়াইয়া দিল। তার পর দিদির ঘরে গিয়া দিদির গা ঠেলিয়া চুপিচুপি বলিল,—"দিদি ওঠো। শীলা এসেছে—আমার ঘরে ঘুমচ্ছে। তুমি তাকে দেখো। আমি চন্দ্রনাথ বাবুকে খবর দিতে চল্লুম।" বলিয়া পা টিপিয়া টিপিয়া বাহির হইয়া গেল।

ভালবাসার মূল্য

শ্রীকণকলতা ঘোষ

গল্প

সাধারণ ভদ্রগৃহস্থের সংসার যেমন হইয়া থাকে, তেমনি একটী সম্ভ্রান্ত পরিবারভুক্ত ছিল তারা দুজনে স্বামী আর স্ত্রী।

যে কাহিনী বলতে বসিতেছি তা তাদেরই কয়েক দিনের পথ চলার—

সংসারে আর পাঁচ জন আছেন একান্নবর্ত্তী পরিবারে মিলিয়া মিশিয়া যেমন থাকেন মা ভাই বোন ভাজ ছেলে মেয়ে সকলে আর ছিল তারা দুজনে বিনয় আর বীণাপাণি বাড়ীর সেজ ছেলে ও সেজ বৌ, এবং তাদের ছোট্ট দুটী ছেলে মেয়ে মিণ্টু ও নিভা।

তাদের সংসার ছিল বেশ শান্তি ও আনন্দে ভরা, কারণে অকারণে কলহ লাগিয়া থাকিত না।

সেই জন্যই হয়ত আত্মীয়স্বজন এসে তৃপ্তি পেত। গৃহকর্ত্তা বিনয়দের বাবা কিছুদিন পূর্ব্বে স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন।

তাঁর ছেলেরা কেহ কলিকাতার বাড়ীতে থাকিয়া কেহ বিদেশে গিয়া অর্থোপার্জ্জন করিত বেকার ছিল না কেহই, সেইজন্য খুব বড়লোক না হইলেও ঈশ্বরেচ্ছায় খাওয়া-পরার অভাব অনটন হইত না সংসারে।

এই গেল তাদের সংসারের সাধারণ পরিচয়ের কথা, এইবার বিনয় আর বীণাপাণির পথ চলার কাহিনী সুরু করি।

বিণয় কুমার রায় এম এ, কলিকাতার কোনো বড় কলেজের প্রফেসার, তার স্ত্রী বীণা দেবীকেও সুশিক্ষিতা বলা চলে, অবশ্য বেথুন কলেজ বা ভিক্টোরিয়া ইন্‌ষ্টিটিউসনের পাশ মেয়ে নয়। তা না হইলেও তার সাহিত্য সাধনার ঝোঁক খুব বেশী। কাজ কর্ম্মের অবসরে সময় পাইলেই কাগজ পেন্সিল লইয়া লিখিতে বসে কি লেখে তা সেই জানে। আমরা জানি মাঝে মাঝে সাময়িক পত্রিকায় "শ্রীবীণা দেবীর" রচনা বাহির হয়।

স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ভালবাসার অভাব দেখা যায় না, বরং কিছু বেশীই মনে হয়।

স্ত্রীকে পিত্রালয়ে দুইদিনের বেশী চারিদিন রাখিতে স্বামী নারাজ, স্ত্রীও সেজন্য জিদ করে না, সত্য যদি অসুবিধা হয় কাজ কি বেশীদিন বাপের বাড়ী গিয়া থাকিবার!

ছেলে মেয়ে দুটী পিতার চক্ষের মণি গলার হার। বাড়ী ফিরিয়াই তাদের না দেখিলে মন ব্যস্ত হইয়া উঠে।

তাহারাও যেখানে থাকে পিতার গলার সাড়া পাইলেই ছুটিয়া আসে।

আদর ত পায়ই, তার সঙ্গে কোনদিন নূতন খেলনা কোন দিন লজেঞ্জস চকোলেট। মাতা যদি অনুযোগ করিতে যায়—

"দেখো রোজ রোজ খেলনা পুতুল লবনচুস্ দিয়ে দিয়ে ওদের বড় আদুরে করে তুলছ"

অমনি সঙ্গে সঙ্গে সহাস্য উত্তর পায়—

"কেন তোমার হিংসে হচ্ছে নাকি? ভয় নেই তোমার আদর কমে যাবে না।"

"আহা আমি কি তাই বলছি নাকি?" মিলিত হাস্যের মধ্যে অনুযোগের ভাষা হারাইয়া যায়।

* * *

কলেজে ছেলেদের পরীক্ষা আরম্ভ হইয়াছে, বিনয়ের এখন বাড়ী ফিরতে বিলম্ব হয়। বীণা ছেলে মেয়েকে স্নানাহার করাইয়া ঘুম পাড়াইয়া অপেক্ষা করিয়া বসিয়া

থাকে জানালার ধারে স্বামী বাড়ী ফিরিলে তাঁর নাওয়া খাওয়া হইলে তবে সে নিশ্চিন্ত হয়।

বাড়ীর সকলে ডাকেন, এসনা সেজ বৌ, দু হাত তাস খেল্‌বে কিম্বা হয়ত গল্পের মজবিস বসেছে। সে বলে, আপনারা বসুন না ভাই, আমি এখন যাবনা ছেলেরা উঠে পড়বে নয়ত এসে ডাকলে ওদিকে থেকে শোনা যাবেনা এই রকম কিছু বলে নিজের ঘরে প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকে।

বিনয় আসিয়া আগেই বলে ওঃ বড্ড দেরী হয়ে গেছে তুমি এখনো না খেয়ে বসে আছ লক্ষ্মী? স্ত্রীকে সে আদর করে বাণী লক্ষ্মী বীণা রমা যখন যা ইচ্ছা তখন তাই বলিয়া ডাকে। বাণী হাসিয়া উত্তর দেয় তা কি তুমি ভেবেছ আমি খেয়ে দেয়ে নাকে তেল দিয়ে ঘুমুচ্ছি।

"নাঃ তোমার সঙ্গে পারার যো নেই। কতদিন না বলেছি আমার ফিরতে দেরী হলে তুমি খেয়ে নিও—

"আচ্ছা গো আচ্ছা। কত আর বেলা হয়েছে? এই ত বেলা দুটো, গেরস্থ বাড়ীর বৌয়েরা ও রকম বেলায় অনেক দিন ভাত খায়। তুমি এখন হাত মুখ ধুয়ে শীগগির এসো দেখি, আমি যাই ভাত দিতে বলিগে।"

বিনয় আর দ্বিতীয় কথা বলিবার অবসর না দেখিয়া হাত মুখ ধুইয়া আহারে বসে।

হঠাৎ খাওয়ার মাঝখানে বিনয় বলিয়া বসে "আঃ আজ কালকার ছেলেদের যদি একটু লেখা পড়ায় মন আছে। কেবল বাজে কথা কয়ে ফুটবল খেলা আর বায়স্কোপ দেখে সারাবছরটা ফাঁকি দিয়ে কাটাবে, তার পর পরীক্ষার সময় বাছাধনদের টনক নড়ে উঠে, স্যার এটা একটু ভাল করে বুঝিয়ে দিন, স্যার ওটা ঠিক বুঝতে পারিনি, স্যার এই আর কি—তাই না আরো দেরী হয়ে যায়। শতকরা দশজন ছেলে যদি মনোযোগ দিয়ে পড়ে ত যথেষ্ট।"

বীণা হাসি মুখে বলে, "তা ঠিক খুব মন দিয়ে কম ছেলেই পড়া শুনা করে। তা বলে রাগ করা উচিত নয়, একটু বলে দিলে যদি তোমার ছাত্ররা কয়েক নম্বরের জন্ত ফেল না হয়ে গরীব মা বাপের টাকাগুলো সার্থক করতে পারে, তাতে তোমাদেরও গৌরব তাদের মা বাপের ও আনন্দ হয়।"

বিনয় স্ত্রীর প্রতি স্নিগ্ধদৃষ্টিতে চাহিয়া বলে, "তা তো হয়। কিন্তু আমার রমারাণীকে যে রোজ বেলা তিনটে অবধি উপোস করে বসে থাকতে হয়, আর আমার বকে বকে মাথা গরম হয়ে যায়।"

"ওঃ ভারীত রমারাণী তার আবার দু'চারদিন বেলায় খেতে হলে কষ্ট হবে—মরে যাই। তোমার একটু কষ্ট হয় সত্যি কিন্তু কি করবে বলো? ছাত্রদের উপর শিক্ষকদের সত্যকার স্নেহ থাকা দরকার। সেই স্নেহের খাতিরে তোমাকে ঐ কষ্টটুকু সহ্য করতে হয়। মনে করো তোমরাও ত একদিন ছাত্র ছিলে, আজ শিক্ষক হয়ে সে কথা ভুল্‌লে চল্‌বে কেন?"

প্রসন্ন হাস্যে বিনয়ের মুখখানি ভরিয়া যায়, সে স্ত্রীর কথার পুনরাবৃত্তি করিয়া বলে, 'ঠিক বাণী, আমরাও যে একদিন ছাত্র ছিলুম আজ মাষ্টারী করতে গিয়ে তা ভুল্‌লে চল্‌বে কেন? দেখ, বড় হয়ে লোকে যদি ছোটর কাজের বিচার করতে বসে মনে করে আমরাও একদিন ছোট ছিলুম তা হ'লে বোধহয় তাদের অনেক অপরাধ অনায়াসে মার্জ্জনা করতে পারে।"

বীণা স্বামীর সুন্দর সারল্য ভরা মুখের দিকে তাকাইয়া মৃদু হাসিয়া বলে তাহলে বোধ হয় পারে, কিন্তু সব সময়ে মানুষের বিচার বুদ্ধি খুব সূক্ষ্ম থাকেনা, বাস্তবের কঠিন আঘাতে অনেক সময়ই তা মোটা ও রুক্ষ হয়ে উঠে, নয় কি?"

বিনয় আহারান্তে আসন ত্যাগ করিয়া উঠিতে উঠিতে গম্ভীর ভাবে বলে, "তা ঠিক, সত্যি, তুমি এক একটা কথা বলো যা আমার ভারী সুন্দর লাগে।"

শীত কালের রাত্রি।

দশটা বাজিয়া গিয়াছে, চারিদিক প্রায় নিস্তব্ধ। মাঝে মাঝে রাস্তায় ট্যাক্সি, বাস চলার শব্দ শোনা যাইতেছে, রিক্সার ঠন্ ঠন্‌ও কদাচিৎ শোনা যাইতেছে।

বিনয় বন্ধুর বাড়ী হইতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া বাড়ী ফিরিয়া শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিল, বাণী এক মনে কাগজ কলম লইয়া মেঝেয় বসিয়া কি লিখিতেছে,

তাহার আগমন সংবাদ জানিতে পারে নাই, পা টিপিয়া একেবারে সাম্‌নে দাঁড়াইয়া কহিল, "কি গো তন্ময় হয়ে কার ধ্যান করা হচ্ছে, কল্পনা দেবীর না নিদ্রাদেবীর? না আর কারো?"

স্বামীর কণ্ঠস্বরে চমকিত হইয়া বীণা মুখ তুলিয়া কহিল, "আপাততঃ মহাশয়ের, তবে সঙ্গে সঙ্গে নিদ্রা-দেবীর আশ্রয় নেয়া হয়েছে। তোমার ফিরতে এত রাত হলো যে?

"কি করি বলো উমেশটা কিছুতে ছাড়তে চায় না? খাওয়ালে ত নানা রকম তারপর বস্‌ল গল্প ফেঁদে অনেক কষ্টে দশটা বাজতেই তবু উঠে পড়েছি। তার পর তোমার কি লেখা হচ্ছে গল্প না পদ্য?

বীণা কাগজ কলম গুছাইতে গুছাইতে বলিল, এই ত ঘণ্টা খানেক হবে কাজ কর্ম্ম সেরে বসেছি, তবু দুটো পদ্য আজ হ'ল। বিনয় কাপড় জামা বদল করিয়া শুইয়া পড়িয়া বলিল, একঘণ্টায় দুটো পদ্য তুমি তৈরী করেছ রমা বাঃ বেশত। পড়তে পারো ত আমি শুন্‌তে শুন্‌তে ঘুমুতে পারি।

বীণা হাসিয়া ফেলিল, বেশ মজার লোক তো। উনি নেমন্তন্ন খেয়ে ফিরে এসেই ঘুমোতে গেলেন আর আমি কিনা রাত দুপুরে চেঁচিয়ে পদ্য পড়ে ওঁকে ঘুম পাড়িয়ে তারপর একলাটি জেগে বসে থাকি আরকি কেমন? তুমি কাল সকালে তার চেয়ে নিজেই দয়া করে পড়ে দেখনা তা হলেই বেশ হবে। সামনে টেব্‌লে থাকবে এখন খাতাখানা, আমার ভারী ঘুম পেয়েছে বলে সে খাতা তুলে আলোটার সুইচ টিপে দিয়ে বিছানায় ঢুকে পড়্‌ল। বিনয় এ ব্যবস্থায় অবশ্য খুসীই হ'ল।

হাসিতে হাসিতে বলিল সেই ভালো, আমায় মাপ করো লক্ষ্মী, সত্যি তোমার উপর অবিচার করা হচ্ছিল, আমার জন্যে তুমি জেগে বসে রইলে, আর আমি কি না তোমাকে ফেলে ঘুমুতে এলুম? কি করি বলো? যা খাওয়া হয়েছে, যেন অজগরের আহার।

বীণা স্বামীর বুকে মাথা রেখে বল্‌লে, আজ কিন্তু একটা সুখবর আছে যা তোমার শোনা হয়নি। ওঃ একটা নয়গো দুটো খবর আছে।

বিনয় স্ত্রীকে আদর করিতে করিতে বল্‌লে, কি খবর শুনিই না? শীগগীর বলে ফেলো।

বীণা বলিল "বকুল" পত্রিকায় আমার "প্রভাতী" বলে গল্পটা মনোনীত হয়েছে, আস্‌ছে মাসে প্রকাশ হবে—কবিতা সমেত "কুসুমিকা" পত্রিকা একখানা এসেছে।

বিনয় অত্যন্ত আনন্দে উৎসাহে বলিয়া উঠিল সত্যি বাণী এ দুটোই আমার কাছে খুব সুসংবাদ, কাল সকা-লেই উঠেই "কুসুমিকা"খানা দেখতে হবে, তার পর কদিন বাদে "বকুল"খানাও বেরোবে। তুমি খুব উৎ-সাহের সঙ্গে লিখে যাও, এরি মধ্যে তো কত রচনা তোমার ক'খানা পত্রিকায় বেরিয়েছে, যারা নিচ্ছে লেখা তোমার তাদের কাছেই খুব বেশী পাঠাতে থাকো। অন্য পত্রিকায়ও পাঠিও টিকিট দিয়ে, না ছাপে ফেরৎ দিলেই আবার অন্যটায় দিও। দেখো আর কিছু দিন এই ভাবে লিখতে লিখতেই ক্রমে একজন বড় লেখিকা হয়ে পড়বে, আমায় তখন হয়ত আর মানতেই চাইবেনা।

বীণা সাহস্যে বলিল, কি যে বলো তার ঠিক নেই, বড় লেখিকা হওয়া খুব সামান্য কথা নয়, আর যত বড় লেখিকাই হই, তোমাকে মানতে চাইব না একি আবার একটা কথা? তুমি এতদিন দেখেও কি আমার স্বভাব বোঝ নি, স্বরটা ক্রমশঃ ভারী হইয়া আসিল।

"অমনি অভিমান হ'ল? না গো না তুমি সে রকম নও তা কি আমি জানিনা, একটু ঠাট্টা করে বলেছি তাতে কি রাগ করে? আর বড় লেখিকা তুমি হতে পারবে দেখো—তবে কলম ছাড়লে চল্‌বে না—যত পারবে লিখবে। খুব লিখবে তারপর কিছুদিন বাদে তোমার লেখা কত লোক তাদের পত্রিকার জন্য চেয়ে পাঠাবে। কত সম্পাদক হয়ত বাড়ীতে লেখা পাঠাবার তাগাদা দিয়ে লোক পর্য্যন্ত পাঠাবে, যেমন সাধারণতঃ বড় লেখকদের কাছে পাঠিয়ে থাকে।

"হ্যা আমার লেখা আবার চেয়ে তাগাদা দিয়ে লোকে নিচ্ছে, তোমার খুব ভালো লাগে বলে কি সবাইয়ের আমার লেখা ভালো লাগবে? তবে পাঠালে হয় ত বার বার ফেরৎ না এসে অনেক লেখাই কতগুলি পত্রিকায় প্রকাশ হবে যেমন দুচারটী করে হচ্ছে।

বিনয় দৃঢ়স্বরে বলিল, আচ্ছা তুমি দেখো আমার কথা সত্যি হয় কিনা, হ্যাঁ নিশ্চয় তোমার লেখাই লোকে আগ্রহের সঙ্গে পড়বে, ছাপবার জন্যে কতলোক চেয়েও পাঠাবে। নিরুৎসাহ হয়ো না খুব লেখো।

বীণা গভীর তৃপ্তির সুরে বলিল, তা হতে পারে, তুমি যে উৎসাহ দাও তার জোরেই ত আমি খুব মন দিয়ে লিখতে চেষ্টা করি তা নইলে কি আর আমার এত লেখবার ঝোঁক থাকৃত।

যখনই তুমি আমার লেখা পড়ে সুন্দর হয়েছে, খুব ভালো লেখা হয়েছে বলো তখনি আমার লেখা সার্থক হয়েছে বলে মনে হয়।

দেওয়ালের বড় ঘড়ীতে ঢং ঢং করিয়া বারোটা বাজিয়া গেল।

বীণা বলিয়া উঠিল, রাত বারোটা বেজে গেল যে, ঘুমুবে কখন? সাহিত্যচর্চ্চার কথা এখন ধামা চাপা দেওয়া থাক।

"তা থাক্ কিন্তু সাহিত্যচর্চ্চায় উৎসাহ দেওয়ার পুরস্কারটা ত প্রত্যেকবার লেখার কথা উঠলেই তার সঙ্গে সঙ্গে আদায় করে নেওয়া দরকার, সেটা জমা রেখে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমুই কি করে, বলিয়া উত্তর দেবার অবসর না দিয়া প্রেমময়ী পত্নীকে গভীর আলিঙ্গনে বদ্ধ করিয়া বিনয় তার সুন্দর মুখে আপনার উচ্ছ্বসিত প্রেমের চিহ্ন আঁকিয়া দিল।···সুখে দুঃখে হাসি টাট্টায় পাঁচ রকম কাজ কর্ম্মে আনন্দ কোলাহলের মধ্যে দিনগুলি চলিয়া যাইতেছিল, যেমন সাধারণতঃ গিয়ে থাকে। ভাইয়েদের মধ্যে পূর্ব্ব সৌহার্দ্দ্য বজায় আছে, বৌয়েদের মধ্যে ঝগড়া নাই, কর্ত্রী আগের মতই সংসারের দেখাশুনার ভার লইয়া আছেন, মেয়েরা যাওয়া আসা করে।

মিণ্টু, নিভা এখন একটু বড় হইয়াছে, দাদা দিদিদের সঙ্গে স্কুলে যায়, খেলা করে। বিনয়ের সম্প্রতি বেতন এবং সম্মান বৃদ্ধি হইয়াছে, বীণার সাহিত্য সাধনাও সিদ্ধি পথে অগ্রসর হয়েছে, তার প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'দীপ্তি' স্বামীর একান্ত আগ্রহে প্রকাশিত হইয়াছে, সমালোচকের প্রশংসাও পাইয়াছে। আর বিনয়ের ভবিষ্যদ্বাণীও আশ্চর্য্যরূপে সফল হইতে চলিয়াছে, এখন নাকি অনেক সম্পাদক বাণী দেবীর রচনা চাহিয়া পাঠান।

বীণা আনন্দিতা হয় নিশ্চয়, খুব বিস্মিতও হয়? বিনয় কিন্তু কপট গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে বলে দেখলে ত আমার কথা সত্যি হল কি না?

হুঁ, তুমি মনে করো আমার সব কথাই বুঝি ঠাট্টা আর নেহাৎ বাজে কেমন? তা নয় গো তা নয়। আবার বলছি তুমি খুব উৎসাহের সঙ্গে লিখে যাও আবার দিন কতক পরে আর একখানা বই ছাপাও, নিয়মিত পত্রিকায় লেখা দিতে থাক। এর পর হয়ত দেখবে টাকা দিয়েও নামওয়ালা মাসিকপত্রে তোমার গল্প ছাপতে চাইবে।

বীণা আনন্দোজ্জ্বল মুখে বলে, বেজায় আশা দেখছি যে, একবার কথা ঠিক হয়েছে দেখলে বলে বুঝি আবার ভবিষ্যদ্‌বাণী করা হচ্ছে? সত্যি আমি আশা করিনি গো, আমার লেখা এই মাত্র তিন চার বছর লেখা বেরোতেই লোকে চেয়ে ছাপ্‌বে তুমি কিন্তু ঠিক বলেছিলে।

বিনয় হাসিমুখে বলে কেন বল্‌ব না, আমি যে বীণা দেবীর সুন্দর মনটীর পরিচয় জানি। যার মন ভাল তার সব ভাল। তুমি কি জানো তোমার প্রত্যেকটী লেখা প্রকাশ হলে আমি কত আনন্দ পাই, তোমার গৌরবে কি আমার গৌরব নয়?

বীণা বলে, নিশ্চয় তা আবার নয়, আমি যে তোমার স্ত্রী—বলিয়াই স্বামীর বুকে মুখ লুকোয়।

দুখানি সবল হাত সে মুখখানাকে সাদরে চাপিয়া ধরে। মাসকাবার হলে প্রত্যেক মাসেই ছেলেমেয়েদের জন্য খেলনা পুতুল আনা চাই সেজ বাবুর, তা নইলে যেন তৃপ্তি হয় না। রবিবারে সব বাড়ীর ছেলেমেয়েদের নিয়ে বিনয় বেড়াতে বাহির হয়, কোনোদিন গড়ের মাঠ কোন্দিন বোটানিকেল গার্ডেন এই রকম এক এক দিকে। মিণ্টু বলিল বাবা একদিন বায়স্কোপ দেখ্‌তে যাব, বাবা

প্রসন্ন হাস্যে বলিলেন চল, শনিবার আসিতে যেন বিলম্ব সয় না। নিভা হয় ত বল্লে এবার আমাদের একদিন সার্কাস দেখাতে হবে বাবা। বাবার আপত্তি করবার ইচ্ছা হয় না, বড়দিনের ছুটীর মধ্যে সকলকে একদিন সার্কাস দেখিয়ে তবে মন খুসী হয়।

ছেলেমেয়ে, ভাইপো, ভাইঝি কেউ একদিন বকুনী খায় না। বাড়ীর ছোট ছেলেমেয়েরা বিনয় আর বাণীকে পেলে আর কোথাও যেতে চায় না।

বছরে অন্ততঃ পাঁচ সাত দিন সেজবাবুর অর্থে ও সেজমার সামর্থ্যে (হাতের রান্না) আত্মীয় পরিচিতেরা পরিতোষ হয়ে খেয়ে থাকে, উৎসাহ থাকে এতে তাদের দুজনেরই। খাওয়ার চেয়ে পাঁচজনে একসঙ্গে হয়ে যে আমোদ আহ্লাদ করে সেইটে উপভোগ করতে সকলের বড় ভাল লাগে।

অদৃষ্ট মানুষের সঙ্গে ফেরে। সুখ শান্তি বুঝি আর সহ্য হয় না, তাই কেবল আঘাত দিয়ে দিয়ে মানুষের আশা উৎসাহ সুখ শান্তি সমস্ত নষ্ট করে দেবার পথ খুঁজে বেড়ায়।

সুস্থ শরীরে খেয়ে দেয়ে বিনয় কলেজ গিয়েছিল সেদিন প্রত্যহ যেমন যায় তেমনি, কিন্তু একেবারে খুব জ্বর নিয়ে, সেই যে এসে শুয়েছেন আর সাত দিন জ্ঞান ছিল না, জ্বরে বেহুঁস হয়েই ছিল।

ডাক্তার বৈদ্যে ঘর ভরে যায়, বাড়ী শুদ্ধ সকলে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত। সকলের মুখে চিন্তার ছায়া। ঔষধ পথ্যে টেবিল টিপয় ভরা। ছেলে মেয়ে শুষ্ক মুখে পিতার শয্যার পাশে বসে, পায় হাত বুলোয়, মাথায় বাতাস করে।

আর বীণা নীরবে ধীর ভাবে দিন রাত একাগ্র চিত্তে স্বামীর সেবা করে ঔষধ পথ্য খাওয়ায়, নিজেকে সেবার মধ্যে নিঃশেষে ঢেলে দেয়।

আকুল হয়ে ভগবানের চরণে স্বামীর আরোগ্য কামনা করে, মনে দৃঢ় বিশ্বাস রাখে নিশ্চয় সেরে উঠবেন। বাইরে একটু ব্যস্ততা প্রকাশ করতে চায় না, যদি দুশ্চিন্তায় কাতর হলে স্বামীর ত্রুটী সেবার হয়ে যায়।

সাত দিন পরে বিনয়ের জ্ঞান ফিরে এল, জ্বরটা অনেক কমল, ডাক্তারেরা আশান্বিত হলেন, বল্লেন আর কোন উপসর্গ না হলে ক্রমে সুস্থ হয়ে উঠ্‌বেন। সকলের মনেই আশার সঞ্চার হল।

এইবার বুঝি কমে আসবে।

বহুদিন পরে পিতাকে চোখ চেয়ে তাদের সঙ্গে কথা বার্ত্তা বলতে দেখে মিণ্ট নিভার শুষ্ক মুখে হাসি ফুটল। বিনয় যখন রোগের যাতনায় অধীর হয় তখন পত্নীর সান্ত্বনা বাণী ও দুখানি নিপুণ হাতের সেবা পেয়ে বড় আরাম অনুভব করত, অর্দ্ধেক ব্যাধি যেন তার উপশম হয়ে যেত।

জ্ঞান ফিরে পাওয়া অবধি সে সর্ব্বদা স্ত্রীকে কাছে পেতে চাইত।

একবার না দেখতে পেলে চঞ্চল হয়ে পড়ত, ব্যাকুল স্বরে ডাকত রমা কোথায় গেল, কখনো প্রশ্নের ভাবে বলত হ্যাঁগা তুমি কি ঘরে নেই? বীণা পথ্য তৈয়ার করতে বসেছে হয়ত, ছুটে এসে বলত এই যে আমি রয়েছি তোমার কাছে। বার্লিটী খেয়ে নাও ত লক্ষ্মীটী একবার তার পর বসছি। স্বামীর ক্লান্ত কণ্ঠের ব্যাকুল আহ্বান তাকে অত্যন্ত চঞ্চল করে তুলত নেহাৎ নাওয়া খাওয়ায় যে টুকু সময় বাধ্য হয়ে যেতে হয় তা ছাড়া একবার তাকে রোগীর ঘর ছেড়ে বেরোতে দেখা যেত না।

বিনয়ের ক্রমশঃ সুস্থ হওয়ায় লক্ষণ দেখে বীণা দ্বিগুণ উৎসাহে স্বামীর পরিচর্য্যা করতে লাগল, শ্রান্তির নিদ্রাহীনতার কোন কাতরতার চিহ্ন তার চোখে মুখে দেখা যায়নি একদিন।

প্রায় তের চোদ্দ দিন বেশ উন্নতির লক্ষণ দেখা গেল। হঠাৎ জ্বরের একুশ দিনের দিন থেকে আবার জ্বর খুব বেড়ে গেল নতুন উপসর্গ দেখা দিল।

সহরের বিখ্যাত ডাক্তারও এলেন সঙ্গে অন্যান্যেরাও আছেন সকলের মুখেই অসাধারণ গম্ভীর, ভ্রূকুঞ্চিত। বিনয়ের দাদারা, ছোট ভাই, শালারা উদ্বেগাকুল মুখে বড় ডাক্তারের মুখের দিকে নীরবে চেয়ে আছেন। বহুক্ষণ পরীক্ষার পর ডাক্তার তাঁহাদের সহিত

াহিরে এসে বল্লেন, নিউমোনিয়া, আশা খুব কম। ব্বতেই পারছেন তবে ভগবানের ইচ্ছা হলে সেরে উঠবেন খনি কিছু খারাপ হতে পারে বলে বোধ হয় না। প্রসক্রপসান করে যথারীতি উপদেশ দিয়ে ফি নিয়ে তনি চলে গেলেন। সকলের মুখ আবার গভীর বিষাচ্ছন্ন হয়ে গেল, ভাইয়েরা যথাসাধ্য তত্ত্বাবধান করতে াগলেন, দিন রাত প্রায় একজন না একজন ডাক্তারকে াড়ীতে হাজির রাখলেন। বিনয়ের শ্বশুর মহাশয় ীবিত নাই। বিবাহের পর তিনি স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। বাণীর মায়ের ও শাশুড়ীর মনের অবস্থা শোচনীয়। কেবার রোগীর কাছে বসেন, একবার শয্যাশ্রয় নেন ই ভাবে সময় কাট্‌ছে তাঁদের। পঁচিশ দিনের দিন াবার বিনয়ের চৈতন্য লোপ পাইল। অবস্থা খুব ারাপ বোধ হ'ল। তবু কি আশা ত্যাগ করা যায়, একাগ্রমনে ভগবানকে ডাকে, মনে ভাবে তাঁর দয়া হলে ত শক্ত অসুখই হোক্ না সেরে যাবেই। তার মনের বস্থা অবর্ণনীয়। নিজের দিকে এতটুকু দৃকপাত নেই ন রাত সমান দায়ীত্ব নিয়ে সেবা করছে মন প্রাণ ঢেলে, বাড়ীর সকলে ব্যস্ত হ'ন এমন করে দিন রাত্রি কেজন মানুষ আহার নিদ্রা ছেড়ে দিয়ে শেষে দি তুমি এ সময় রোগে পড় সেজ বৌ তখন কি হবে ?

সেজ বৌ ম্লান হেসে বলে কিছু হবে না আমার, কিছু াস্থি বোধ হলে বলব এখন। এ যে আমারই কর্ত্তব্য— কেদণ্ড কি সরে এসে আমি নিশ্চিন্ত হতে পারি ভাই। াশুড়ী বুড়ো মানুষ তাঁকে কি কষ্ট দেওয়া উচিত? ত্যাদি বলে নিজের কাজে মন দেয়।

অতবড় বাড়ীখানা একেবারে নিস্তব্ধ।

ছেলে মেয়েরা পর্য্যন্ত এত শান্ত হয়ে আছে কেউ াড়া পায় না—সবার মুখেই গভীর বেদনার ছায়া।

এই বাড়ীর একটী আনন্দ কোলাহল মুখরিত ঘরে াজ জীবন মৃত্যুর দ্বন্দ্ব চলছে, কি হয়, কি হয় ভাব কলের মনে, নীরবে কত লোক সেই ঘরে ঢুকছে বেরিয়ে াসছে। রোগীকে দেখে সংবাদ জেনে চিন্তিত মুখে ফিরে াচ্ছে।

এত চেষ্টা এত ব্যাকুল সেবা চিকিৎসা এত দেবতার পায়ে মাথা খোঁড়াখুঁড়ি কিছুতেই কিছু হল না। সব বিফল করে দিয়ে রোগের একত্রিশ দিনের দিন বিনয় পার্থিব জগতের সকল বাঁধন ছিন্ন করে রোগ যাতনা থেকে মুক্তি লাভ করে আনন্দময় দিব্যধামে চলে গেল।

সেই যে পঁচিশ দিনের দিন অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল আর জ্ঞান ফিরল না।

মায়ের ভায়েদের স্নেহ, পত্নীর প্রাণভরা প্রেম, ছেলে মেয়ের নিবিড় মায়া সংসারের সুখ কিছুর টানে আর সে এখানে রইল না, একবার ফিরেও চাইলে না।

হায়রে মানুষ, হায়রে তার সুখের সংসার!

শোকের ভীষণ আক্রমণে সারা বাড়ী ভরে উঠল গভীর হাহাকারে।

ছেলে মেয়ে কেঁদে গড়িয়ে পড়ল।

আর বীণা, জীবনের একান্ত নির্ভর প্রিয়তম স্বামীকে বিদায় দিয়ে সে একেবারে গভীর ব্যথায় লুটিয়ে পড়ল ছিন্নমূল ব্রততীর মত।

তাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে লোকে নীরব হয়ে ফিরে আসে, কারণ সে রুদ্ধ শোকাবেগের নিকটে ভাষাও পরাজিত হয়।

* * *

দিন যায়, সময় কারো জন্যে অপেক্ষা করে না। তবে তখন দিন গত হত আনন্দ কোলাহলের মধ্য দিয়ে আর এখন যায় গভীর নীরবতা ও নিরানন্দের ব্যথা বহন করে, তফাৎ আছে বই কি।

সংসার ক্রমে শান্তভাব ধারণ করে আবার কর্ম্মব্যস্ততার মধ্যে ফিরে আসে।

বীণাও শান্ত হয়েছে বলেই মনে হয়, কিন্তু তার স্বভাবের পরিবর্ত্তন ও অন্তরের চঞ্চলতা স্নেহশীল সতর্ক দৃষ্টির কাছে ধরা পড়ে।

তার সে আনন্দময় ছেলেমানুষী ভাব আর নেই, অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে গেছে, প্রয়োজন ভিন্ন কথা কইতে বড় শোনা যায় না। যথাসাধ্য ধীর ভাবে আপনার কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পন্ন করে নিজের ঘরটীতে পড়ে থাকে।

ছেলেমেয়ের অযত্ন করা সম্ভব নয়, তাদের ডাকে সাড়া দিতেই হয়, তাদের কান্না দেখলে নিজের ব্যথা চেপে রেখে কোলে নিয়ে আদর করে সান্ত্বনা দেয়।

শাশুড়ীর কাছেও বসতে হয়, কেউ এসে ডাকলে কথাও বলে। ননদেরা সেজবৌকে সত্যিই খুব ভালবাসে, তারা একজন করে এসে এখন একমাস করে থাকছে বিপদের সময়, মাস পাঁচ ছয় এই রকম না করলে চলে কি?

প্রত্যেক দিনের মত সেদিনও দুপুরবেলা একলা ঘরে বাণী চুপ করে শুয়েছিল।

ছেলেমেয়ে স্কুলে গেছে।

ছোট ননদ নীহার এসে ডাকলে "সেজ বৌদি ঘুমুচ্ছ কি?" বাণী ঘুমোয় নি বললে "কে ছোট ঠাকুরঝি এসো ভাই।"

নীহার বিছানায় তার পাশে বসে পড়ে বললে, এরকম করে আর কদ্দিন পড়ে থাকবে ভাই তিন মাস হয়ে গেল যে বৌদি ভেবে ভেবে কি করবে? কেবল নিজের শরীর পাত হচ্ছে তা কি দেখ্‌ছ না?

বীণা ক্লান্ত স্বরে উত্তর দিলে, কিছু ত ভাল লাগে না ঠাকুরঝি কি করব বলো, মনে হয় যদ্দিন থাকব এমনি ভাবেই থাকতে হবে। যদি তোমাদের কিছু কাজ করতে পারি বোলো ভাই তখনি করতে চেষ্টা করব।

"আমি কি কাজের কথা বলছি বৌদি, তুমি ত কাজ করছই তাকি দেখতে পাই না?

"না, তুমি বলবেকেন? আমি বলছি যখন যা কাজ থাকবে যা আমি পারি বলতে তোমরা সঙ্কোচ কোরোনা। এমন দীর্ঘ অবসর সহ্য করা খুব সহজ নয় ঠাকুরঝি।"

"দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে ঠাকুরঝি বললে তা কি বুঝি না ভাই? কিন্তু কি করবে উপায় ত নেই! এমনি মুখ বুজে পড়ে থেকে থেকে কি চেহারা হয়েছে দেখছ ত? শেষে একটা শক্ত অসুখ হলে কি হবে ভাবোত?

বীণা ম্লান হেসে বললে, কি হবে তা জানিনা, কিন্তু থাকতে আর ইচ্ছে নেই ভাই। যাবার জন্যেই মন অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে রয়েছে। শরীরের দিকে চাইবার মত মনের অবস্থা ফিরে পাইনি ভাই, তোমার সেজদা আমাকে একেবারে মিথ্যা করে ফেলে রেখে পালিয়েছে ঠাকুরঝি, তাকে হারিয়ে এরকম জীবন নিয়ে আমি চলতে পারছিনা ভাই।"

বীণার চোখ দিয়ে টপ্‌ টপ্‌ করে জল ঝরে পড়ল নীহারের চোখও শুষ্ক রইল না।

কিছুক্ষণ পরে নীহার চোখ মুছে বৌদির পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললে, আমাদের যা কষ্ট তাতো আছেই কিন্তু তার উপর তোমার জন্যেই আরো বেশী দুঃখ হয় ভাই।"

তোমাকে আমরা খুব ভালো করে জানি বলেই বুঝতে পারি কতখানি আঘাতে তুমি এমন হয়ে গেছ।"

"বলবার কিছু পাই না তবে এই বলি যে ছেলে মেয়ের মুখ চেয়ে শক্ত হও, আর সময় না হলে যাবার পথ নাই এই কথাটি বুঝে শরীরের একটু যত্ন নাও।

"আচ্ছা ঠাকুরঝি সকলেই এই রকম বলে যে সময় না হলে যাবার পথ নেই, কিন্তু কার কখন সময় হয় তার কিছু জানা থাকে না, কে বলতে পারে আমার যাবার সময় আসতে বিলম্ব আছে? আমি যদি এখন যেতে পারি সেতো খুব ভালো হবে, 'মিন্টু' নিভাকে তোমরা দেখো।

"আঃ কি যে বলো বৌদি তার ঠিক নেই, এখনি যাবে কেন, কত কাজ তোমার আছে সে সব করো, জামাই হোক, বৌ হোক তারপর ওসব কথা বলো। কত লোক ত এই রকম দুঃখ সয়ে বেঁচে রয়েছে দেখছ ত? কি করবে বলো মানুষের হাতে ত প্রতিকারের উপায় নাই।

"না ভাই আমার কিছুতেই মন স্থির হচ্ছেনা, তবু চুপ করেই থাকি, বুঝি মানুষের হাতে প্রতিকারের উপায় নেই। তুমি বলছ তাই যা আমার মনে হয় বলছি রাগ করবে?

—"তুমি কি পাগল হলে সেজবৌদি? রাগ করব কেন? বলো না ভাই কি মনে হয়?"

ভাজের পাশে সে শুইয়া পড়িল।

বীণা—আমি ভাবি কি জানো ঠাকুরঝি? ভাবি যাকে ছেড়ে থাকতে এতটুকু ইচ্ছা হয় না, যার অভাবে জীবন

জীবনটা একেবারে ব্যর্থ বলেই মনে হয় তাকে ছেড়ে কেন তবে থাকতে হয়? কোনো রকমেই কি তাড়াতাড়ি তার কাছে যাওয়া যায় না?

—"সবই যে কর্ম্মফল' বৌদি, পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফলে যে যেমন ভাগ্য নিয়ে আসে তা সহ্য করতেই হয়, আর পরমায়ু না ফুরোলে ত যাওয়া চলে না তাই যার যতক্ষণ আয়ু থকে তাকে সে সময় অবধি থাকতেই হয়। তা নইলে দেখনা কত দুঃখ পেয়েও লোকে বেঁচে থাকে আবার সবই করতে হয়।"

—কিন্তু ভাই ভালবাসার কোনো মূল্য কি নেই? আমার মনে হয় যথার্থ অন্তরে ভালবাসা থাকলে যদি লোকে তার আকর্ষণে স্বামীর পথের অনুসরণ করে তাঁর কাছে শীঘ্র চলে যাবার জন্যে একাগ্রচিত্তে ভগবানের চরণে প্রার্থনা জানায় তাহলে নিশ্চয় তিনি পথের সন্ধান না দিয়ে থাকতে পারেন না। যাকে কাছে রাখবার জন্য অসীম আগ্রহ—না দেখে থাকতে পারা যায় না, অসুখ করলে মনে হয় যদি না সেরে ওঠে তাহলে কি হবে এই রকম কত ভাবনা হয়। তাকে ভাগ্যদোষে হারাতে হোলে, নিরুপায় হয়ে লোকে থাকে ঐ কথাই মনে করে সান্ত্বনা পায় যে সবই ভাগ্য মানুষের কোন হাত নেই।

কিন্তু আমিত ঠাকুরঝি এ কথায় সান্ত্বনা পাচ্ছিনা, আমি ভাবি যে জীবন দুঃসহ তা থেকে মুক্তি পাবার জন্য আন্তরিক প্রার্থনা জানালে, আর প্রেমকে সত্য বলে মানতে পারলে ভগবান নিশ্চয় তাঁর স্বামীহারা ব্যথিত সন্তানকে মুক্তির পথের তার প্রিয়তমের সঙ্গে মিলিত হবার পথের সন্ধান দেন। মানুষের মন বড় অবিশ্বাসী তাই তারা অত্যন্ত দুঃখ পেলেও সব সময়ে বিশ্বাস করতে পারে না।

আর তারা বাঁচতে হবে বলে মনে করে বলেই অনেক শোক দুঃখ ভুলে আবার এই দুঃখময় সংসারে আপনাকে জড়ায়, মায়ায় বদ্ধ হয় বলেই তাই বাঁচতে পারে। হয়ত আমার কথা ভুল কিন্তু কেবলি আমার এই সব কথা মনে হয় ভাই।"

নীহার তন্ময় চিত্তে বাণীর কথাগুলি শুনছিল, তাকে চুপ করতে দেখে এইবার নীহার বেদনা জড়িত স্বরে বললে "ভাই সেজবৌদি তোমার মনের অবস্থা যখন এমনি অস্থির হয়ে রয়েছে এখনো, মনে হয় হয়ত বেশী দিন তুমি বাঁচবে না, আর নয়ত ভগবান যে কোনো রকমে তোমার মনে শান্তি দিয়ে এ অশান্ত ভাব দূর করে দেবেন। হ্যাঁ ভাই তুমি ত বেশ লিখতে পারতে তাইনিয়ে একটু বসোনা কেন?"

বীণা উদাসভাবে বললে "মন স্থির করে বসতে পারিনা ভাই। যাঁর উৎসাহে আমার লেখার আগ্রহ হ'ত তিনিই যে চলে গেছেন ঠাকুরঝি। চেষ্টা করে তবু দীর্ঘ সময় কাটাবার জন্য এক একবার লিখতে বসি কিন্তু বেশিক্ষণ পারি না।"

নীহার প্রশ্ন করলে "কি লিখছ দেখিনা ভাই—দেখাবে?"

"হ্যাঁ দেখনা" বলে বাণী উঠে একখানা খাতা এনে ননদের হাতে দিলে।

নীহার তা থেকে অশ্রু ও প্রিয় হারা নামক দুটী কবিতা পড়ে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেললে আর পড়া হলনা।

বাণী এই দরদী ননদটীর কাছে সহানুভূতির পরশ পেয়ে আকুল হয়ে কাঁদতে লাগল, নীহার বাধা দিলে না মনটা একটু হাল্কা হ'ক। শুধু তার হাত দুটি চেপে ধরলে।

নীহার ও বাণীর সেদিনকার কথাবার্ত্তার পর প্রায় মাস চারেক গত হইয়াছে। নীহার শ্বশুর বাড়ী চলিয়া গিয়াছে। বাণীর শরীর মন গভীর হতাশায় ও অবসাদে সেই যে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে আর সুস্থ হয় নাই, ধীরে ধীরে সে যেন পরপারে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে তাহাকে দেখিলে এইরূপ মনে হয়।

আজ দশদিন হইল তাহার জ্বর হইয়াছে, প্রথম প্রথম গ্রাহ্য করে নাই, সাতদিন পরে যখন জ্বর ছাড়িল না তখন সকলে বলিয়া বুঝাইয়া একরকম জোর করিয়াই ডাক্তার ডাকিয়াছিলেন, তিনি পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছেন রোগিণী অতিশয় দুর্ব্বল খুব সাবধানে রাখিতে হইবে নতুবা জ্বরের বাঁকা পথ ধরিবার সম্ভাবনা, গায়ে রক্ত নাই ইত্যাদি। ঔষধ পথ্যেরও ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন।

কিন্তু ব্যবস্থা নেয় কে? রোগীর মুখে রোগের ভাবনার চিহ্ন মাত্র নাই বরং জ্বর বাড়ায় এই দুই দিন শয্যাগত হইয়া পড়িয়া সে যেন অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়াছে, এমনি ভাব। যা হোক বলিয়া বুঝাইয়া তবু ঔষধ পথ্য খাওয়ান গেছে এই যা রক্ষা, তার অসুখের সংবাদে ননদেরা দেখিতে আসিল। ছেলে মেয়ে আবার শুষ্ক মুখে মায়ের শয্যাপাশে আসিয়া বসিল।

দেবর ভাসুর শাশুড়ী সকলেই চিন্তিত হইলেন। যথারীতি চিকিৎসা চলিতে লাগিল, রোগ কিন্তু উপশম হইল না উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিল।

বাণীর মা ও ভাই বোনেরা অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া যাওয়া-আসা দেখাশুনা করিতে লাগিলেন।

জ্বর বাড়িল—অন্যান্য উপসর্গও আসিয়া জুটিল। রোগের এক মাসের মাথায় বিকারের লক্ষণ দেখা দিল। মাঝে মাঝে জ্ঞান হয় আচ্ছন্ন ভাবেই বেশীক্ষণ কাটে। বড় ডাক্তার, আইস্ ব্যাগ, ইনজেক্সন্ প্রভৃতি কিছুরই ত্রুটি কিছু হইল না। কিন্তু যাহাকে কাছে পাইলে এ রোগীর নিশ্চিন্ত আরোগ্যের সম্ভাবনা ছিল তাহাকে আনিয়া দিবার সাধ্যত কাহার নাই। জ্ঞানে অজ্ঞানে বাণী কেবলি বলিতেছে, আমি যাই, তোমরা সবাই আমাদের মিণ্টু নিভাকে দেখো আহা ওরা বড় দুঃখ পেলে এই কচি বয়সে, বাপ মা দুজনকেই ওরা হারাল এক বছরের মধ্যে, বড় দুর্ভাগ্য। কি করব আমি যে ওঁকে ছেড়ে কিছুতেই থাক্‌তে পারলুম না তাইত এখনি যাচ্ছি। আর কিছুর অভাব নেই তবু একজনের শুধু এক-জনের অভাবে আমি মিথ্যা—শূন্যময় হয়ে গেছি, মা গো আমি যাই। ক্রমাগত এই সব কথাই বলছে।

প্রায় দেড় মাস রোগ ভোগের পর দুদিন রোগিণীর অবস্থা একটু ভাল মনে হল, হাসি মুখে কথা-বার্ত্তা বলতে শোনা গেল। কথা কিন্তু মোটেই আশাপ্রদ নয়, ডাক্তার বলিলেন, লক্ষণ ভাল নয়, দীপ নির্ব্বাণের পূর্ব্ব অবস্থা।

সত্যিই তাই হইল, বীণা বহুদিন পরে হাসিমুখে আবার দুদিন কথা কহিয়া সকলের কাছে বিদায় লইয়া, ছেলে মেয়েকে প্রাণ ভরিয়া আদর করিয়া তাহাদের দেখা-শুনার জন্য মা-ভাই-বোন-শাশুড়ি-দেবর-যা ননদ সকলকে অনুরোধ জানাইয়া, মাকে ও ছেলে মেয়ে সকলকে খুব বেশী দুঃখ না করিয়া ভগবানের অসীম করুণার কথা স্মরণ করিতে ও তাহাদের স্বামী স্ত্রীর পুনর্মিলনের সূচনায় গৌরব অনুভব করিয়া মনে সান্ত্বনা আনিতে অনুরোধ করিয়া করিয়া তিন দিনের দিন সেই যে চুপ্ করিল আর কেহ তাহার কথা শুনিতে পাইল না

পর দিন ভোরে সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে, তাহাদের ভালবাসা যে কত গভীর এবং সত্যকার প্রেম যে মরণকেও জয় করিতে সমর্থ হয় এই কথা দুইটি প্রমাণ করিয়া দিবার জন্যই বুঝি বাণী স্বামীর মৃত্যুর মাত্র দশ মাস পরে তাঁহার পথের অনুসরণ করিয়া চলিয়া গেল। তাহার বিরহতপ্ত আত্মা শান্তিময়ের চরণে গিয়া শান্তি লাভ করিল। হয়ত বা প্রিয়তম স্বামীর দর্শনও মিলিল, কে জানে! সকলে হাহাকার করিয়া উঠিল। নীহার বিস্ময় বিমুগ্ধ ভক্তের মত কান্না ভরা গলায় বলিয়া উঠিল "ভাল বাসার মূল্য আছে কিনা জান্‌তে চেয়েছিলে সেজ বৌদি—তাই কি আজ নিজের প্রাণ দিয়ে এমনি করেই তার উত্তর দিয়ে গেলে ভাই! ভ্রাতৃজায়ার সুন্দর নিস্পন্দ প্রাণহীন দেহের পার্শ্বে বসিয়া তখন নীহারের কানে কেবলই যেন বাজ্‌ছিল, বাণীর সেদিনের একটী কথা "কিন্তু ভাই ভালোবাসার কোন মূল্য কি নেই?""

'বেড়াজাল'

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ এম-এ বি-টি

গল্প

"ভাই নরেশ,

তোর চিঠির উত্তর দিতে কিছু দেরী হয়ে পড়ল', কিছু মনে করিস না। আমরা সবাই ভাল আছি এবং এখন আমাদের খারাপ কিছু হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। তুই কেমন? ভাল না থাকিস ত' লিখিস্ যা হয় একটা ব্যবস্থা কর্ব্বার চেষ্টা কর্ব্ব—জানিস ত আমি চিরকালই তোর বিশেষ হিতাকাঙ্ক্ষী। তুই কবে আসবি? শীঘ্র আসবার চেষ্টা করিস্। ইতি—যতীন

পুনঃ—আমার এক বন্ধু—সেই 'কটা' সুরেন রবিবার বিকেলের গাড়ীতে তোর ওখেনে যাচ্ছে খনি দেখবার জন্যে—তোর গাড়ীটা পাঠাস্। পাছে সে যেতে আপত্তি করে তাই তোর একটা চিঠির কাগজে (যার কয় কপি আমি না বলে তোর কাছ থেকে চেয়ে এনেছিলাম) তোর নাম দিয়ে তাকে এক নিমন্ত্রণ পত্র পাঠিয়েছি—বুঝলি—? যতীন"

এই চিঠি খানি কাল রাত্রের ডাকে পেয়েছি। যতীন ছেলেটা চিরকালই বড় দুষ্টু। তার অতর্কিত অত্যাচারে সকলকেই ব্যতিব্যস্ত হয়ে থাকতে হয়। কখন কেমন করে যে সে কোন লোককে জব্দ করে তা বলা যায় না। এই জন্যেই যেন তার চিঠির 'পুনশ্চ' টুকুন পড়ে হেঁয়ালীর মত মনে হচ্ছে। 'এপ্রেল-ফুল' করার তারিখও হয়ে গেছে আজ হ'ল ৩রা। আর আমি রোজই সন্ধ্যায় গাড়ী চাপিয়া রেল ষ্টেশনে যাই তাহাও তাহার অজ্ঞাত নয়—সুতরাং আমার আর এ সংবাদে বেকুব হইবার কি আছে। যদি সুরেন-বাবু আসেন ভালই না আসিলেই বা ক্ষতি কি?

আমি শিকারপুর কোল মাইনের ইন্-চার্জ্জ। ই-আই রেল্বের গ্র্যাণ্ড কর্ড লাইনের ছোট একটা ষ্টেশন হতে এই জায়গাটা প্রায় দশ মাইল দূরে অবস্থিত। প্রতিদিন সন্ধ্যায় কলিকাতার ডাক আনিবার জন্য আমি নিজেই গাড়ী হাঁকাইয়া ষ্টেশন সংশ্লিষ্ট পোষ্ট আপিসে যাতায়াত করি। বিকালে কাজের পর বেড়ানও হয় এবং বহির্জগতের সহিত সম্বন্ধও কিছু রাখা হয়। খনির নিকট আমার কোয়ার্টার। তার চার পাশেই কুলীর বস্তি ও কলকব্জার সুবৃহৎ কারখানা। সেখানে থাকিলে বোঝা কঠিন হয় যে এটা ইংরাজত্ব এবং বিংশ শতাব্দী। তাই বিকালে সেই কোলাহল মুখরিত জনপদ পিছে ফেলিয়া হাঁপ ছাড়িবার জন্য ছুটিয়া যাই।

উভয় পার্শ্বে ফাঁকা মাঠের মধ্য দিয়া বাঁধান পথ আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়াছে কোন সুদূর দেশে,—তাহার উপর দিয়া আমি চলিয়াছি আমার নিত্যকর্ম্ম সম্পাদন করিবার জন্য রেলষ্টেশনের উদ্দেশে। চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ; মধ্যে মধ্যে গরুর গাড়ীর চাকা'র শব্দে সেই বিরাট মাঠের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হইতেছে। পথের ধারে মাঝে মাঝে কুলিদের বস্তী—বস্তীর পরই আবার সেই মাঠ।

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বেই কলিকাতার গাড়ী আসে। সেই সময়টিতে ক্ষুদ্র ষ্টেশনটি কিছুক্ষণের জন্য যেন সজীব হইয়া উঠে। দুই চারিজন যাত্রী তাহাদের আপনাপন মাল-পত্রের পুঁটলি লইয়া আকুল আগ্রহে গাড়ীর পথের দিকে চাহিয়া থাকে। অবশেষে বিরাটকায় ট্রেণ গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া আপনার জীবনের দুঃখ কষ্ট জানাইতে জানাইতে ষ্টেশনের মধ্যে দাঁড়াইয়া পড়ে। দুই চারিজন লোক উঠে দুইচারিজন লোক নামে। আবার গাড়ী গর্জ্জন করিতে করিতে সম্মুখের ক্রমান্ধকার পথে ছুটিয়া চলে। এই হইতেছে এই ষ্টেশনটির দৈনন্দিন জীবনযাত্রার বিস্তারিত তালিকা—

অন্যান্য দিন যাত্রীদের উঠানামার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি না থাকিলেও আজ একটু উৎসুক হইয়াই ছিলাম, কেন না যদিই বা যতীনের বন্ধু 'কটা' সুরেনবাবু আসেন। তাই গাড়ী আসিয়া ষ্টেশনে দাঁড়াইতেই সমস্ত গাড়ীর কামরাগুলি ভাল করিয়া দেখিয়া লইলাম। আমার ঈপ্সিত ব্যক্তির সাক্ষাৎও মিলিল। দ্বিতীয় শ্রেণীর এক কামরা হইতে সাহেবী-পোষাক পরিহিত এক ব্যক্তি নামিলেন—তাঁহার পশ্চাতে নামিলেন একজন মহিলা। এই কাপড়পরা মহিলাটিকে সঙ্গে না দেখিলে অনুমান করা কঠিন হইয়া পড়িত যে বাস্তবিকই ভদ্রলোক সাহেব না বাঙ্গালী :এমনিই তিনি 'কটা'। তাঁহারই এক চাকর দেখিলাম বেডিং ট্রাঙ্ক প্রভৃতি নামাইতে লাগিল—যা নামাইল তাহা বিশেষ অল্প নহে, দুই চারিদিন না হয় বড় জোর একমাসের জন্য লোকে যে এত জিনিসপত্র আনিতে পারে ইহা এই প্রথম দেখিলাম। এই মাল পত্র নামাইবার মধ্যে আমি তাঁহাদের দিকে আগাইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম মাপ করিবেন আপনি কি মিঃ মুখার্জ্জি—আপনিই কি শিকারপুর যাইবেন—কেন না আমি নরেশ চ্যাটার্জ্জি—কলিকাতা হইতে এক পূর্ব্বে না দেখা বন্ধুর আগমনের আশা করিতেছি।" ভদ্রলোক তৎক্ষণাৎ তাঁহার বাহিরের গম্ভীর ভাব ত্যাগ করিয়া সহাস্যে তাঁহার দুই হাত বাড়াইয়া আমার দুই হাত ধরিলেন এবং আমায় দেখিয়া যে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছেন তাহা বুঝাইবার জন্য আমার হাতদুটিতে এমনি ঝাঁকানি দিলেন যাহাতে আমার মনে হইল হাত দুটি বুঝি বা স্থানচ্যুত হয়। তাহার পর মহিলাটির দিকে ফিরিয়া আমার সহিত পরিচয় করিয়া দিবার উদ্দেশ্যে বলিলেন "এর নাম সুজাতা—আমার ভগ্নি, আই-এ পরীক্ষা দেওয়ার পর ছুটি পাওয়ায় এও আমার সহিত আসিয়াছে।" আমরা উভয়েই উভয়কে নমস্কার করিলাম। তাহার পর বিশেষ প্রয়োজনের জিনিস পত্র মোটরে উঠাইয়া এবং বাকি জিনিস পত্রের জন্য গরুর গাড়ীর বন্দোবস্ত করিয়া আমরা মোটর ছাড়িয়া দিলাম। সুরেন বাবুর পকেটে দেখিলাম একটি ষ্টেথিস্কোপ উকি মারিতেছে—সুতরাং বুঝিতে কষ্ট হইল না যে তিনি একজন ডাক্তার। যাইতে যাইতে পথে তিনি আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন "আমার বাসা ঠিক হইয়া গিয়াছে কি?" আমি বলিলাম "ব্যস্ত হইতেছেন কেন চলুন শিকারপুর পৌছিয়া যাহা হয় একটা ব্যবস্থা করা যাইবে।" তাহার পর বাসার কথা ছাড়িয়া পারিপার্শ্বিক দ্রষ্টব্য জিনিসগুলির সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা কহিতে আরম্ভ করিলাম।

বাসায় ফিরিয়া যে ব্যাপারটি প্রকাশ পাইল তাহা মজার হইলেও বিশেষ অনিষ্টকর। আমাদেরই মাইনএর আপিসের ছাপা চিঠির কাগজে টাইপ করা এক নিয়োগ পত্র যাহার মর্ম্ম হইতেছে ২৫০৲ মাসিক বেতনে ডাঃ সুরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় এম-বি, ডি-পি-এইচ-কে শিকার পুর মাইনএর প্রধান চিকিৎসক নিযুক্ত করা হইল। নিয়োগকারীর সহি প্রকৃত পক্ষেই অপাঠ্য। ব্যাপারটা বেশই বুঝা গেল—যতীনের সেই নিমন্ত্রণের ব্যাপারটি যে এতদূর গড়াইতে পারে পূর্ব্বে তাহা ধারণাই করিতে পারি নাই। আমাদের মাইনএর চিফ মেডিকেল অফিসারের পোষ্ট খালি হইয়াছে বটে কিন্তু সেই পদ পূরণ করিবার জন্য উপর অফিস হইতে কোনও উপদেশ পাই নাই। অবশ্য এ নিয়োগের ভার আমারই উপর বটে। উপরের অফিসে মাস দুই পূর্ব্বে এ বিষয়ে লিখিয়াছিলাম কিন্তু তাহার কোনও উত্তর এখনও পাই নাই। যতীনকে কথা প্রসঙ্গে ভূতপূর্ব্ব বড় ডাক্তারবাবুটির যাবার কথা বলিয়াছিলাম এবং বলিয়াছিল যে সে যদি উকীল না হইয়া ডাক্তার হইত তাহা হইলে শিকারপুরে দুইজনে একত্র থাকিতাম। এই হইয়াছিল আমার অপরাধ—তাহার জন্যই সুরেন বাবু বেচারীকে এত ভুগিতে হইল। তবে আশার কথা এই যে হয়ত অল্প সময়ের মধ্যে বড় ডাক্তার নিয়োগের উপদেশ আসিতে পারে তখন আমি অনায়াসেই এঁকে নিয়োগ করিতে পারি।

এ সমস্ত কথা সুরেন বাবুকে খুলিয়া বলিলাম। তিনি দেখিলাম ব্যাপারটাকে ভাল ভাবেই গ্রহণ করিলেন এবং উপর আপিসে ব্যাপারটিকে একবার স্মরণ করাইয়া দিতে আমার অনুরোধ করিলেন। তখন আমি তাঁহা

দের যত দিন পর্য্যন্ত না একটা উত্তর আসে ততদিন পর্য্যন্ত আমারই বাসায় থাকিবার নিমন্ত্রণ করিলাম।

তাহাদের পক্ষ হইতেও কোনও অসম্মতির কারণ দেখিলাম না। কেননা যখন এত খরচ করিয়া এই কয়লার দেশে আসিয়া পড়িয়াছেন তখন ফলাফলটি জানিবার জন্য দুই চারি দিন অপেক্ষা করিতেই বা ক্ষতি কিসের ?

দুই দিন পরে যতীনের এক পত্র পাইলাম। পত্রটির কয়েক লাইন নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :—

"যা হোক তোর শারীরিক ও তথা মানসিক অবস্থা খারাপ বিবেচনায় একজন ভাল ডাক্তার পাঠালাম, এ রোগের বিশেষ প্রয়োজন হইতেছে শুশ্রূষা করা তার জন্যও আর একজন যাইতেছেন। ডাক্তার নিয়োগ করার ভারটি যখন আমিই লইয়াছি তখন তুই শুশ্রূষাকারিণী নিয়োগের ভারটি নে। কেননা সুজাতা মেয়েটি বেশ ভাল—এবং সুরেনদের বাড়ীর অবস্থাও ঐ ওর নাম কি বেশ ভাল বলিয়াই জন প্রবাদ। তখন আর এর মধ্যে আপত্তির কি থাকিতে পারে—এ যে একবার যাকে বলে সেই রাজ যোটক যোগ। যা হোক এই বৃহস্পতি বারে কাছারী হয়ে গুড্‌ফ্রাইডের জন্য বন্ধ হচ্ছে আমি শুক্রবার সকালে বাণীকে নিয়ে তোর ওখানে যাচ্ছি। নটার সময় গাড়ীটা ষ্টেশনে পাঠাস।"

ব্যাপারটী কোথায় গিয়া যে শেষ হইবে তাহাই ভাবিবার কথা। অবশ্য "সুজাতা মেয়েটি বেশ ভাল" একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই প্রকৃতই তিনি একজন সুন্দরী, আর এই দুই দিনের আলাপ পরিচয়ে তাঁকে মোটের উপর ভালই লাগিয়াছে। কিন্তু তাঁকে জীবনযাত্রার পথে সঙ্গিনী করিতে পারিব কি না একথা তখন ভাবি নাই। দেখাই যাক আজ ত' মোটে মঙ্গলবার রাত্রি। আর বিবাহ করা না করা ত' আমারই ইচ্ছাধীন।

শুক্রবার দিন বেলা ১১টার মধ্যেই যতীন সস্ত্রীক শিকারপুর পৌঁছাইল। তাহার স্বভাবসিদ্ধ হট্টগোল প্রিয়তা এবং দুষ্টামির জন্য বাসাটি কোলাহল মুখরিত হইয়া পড়িল। সুজাতা দেবীও আমার সম্বন্ধে সে এমনই কথাবার্ত্তা কহিতে আরম্ভ করিল যাহাতে বোধ হইতে লাগিল যেন দশ বৎসর পূর্ব্বেই আমাদের বিবাহ হইয়া গিয়াছে। তিনি ত আমাদের সম্মুখে আসা একেবারে ত্যাগ করিলেন—কিন্তু করিলেই কি নিস্তার আছে! বাণী-বৌদি ইতিপূর্ব্বে বহুবার শিকারপুর আসিয়াছেন—এ বাটীর কোথায় কি আছে না আছে তাহা তিনি ভালভাবেই জানেন এবং এতদিন তাঁহারই রুচি অনুযায়ী ঘরের প্রত্যেকটি আসবাব পত্র আপনাপন নির্দ্দিষ্ট স্থান পাইয়াছে। এখন তাহাদের পুনরায় স্থান পরিবর্ত্তনের সময় হইয়াছে কি না এই গুরুতর গবেষণার জন্য সুজাতা দেবীর মূল্যবান পরামর্শের আবশ্যক হইয়া পড়িল। কেননা ঘরের আসবাব পত্রেরও মধ্যে মধ্যে 'ঠাঁই নাড়া' হওয়া অত্যাবশ্যক। এই দুইজনের সমবেত অত্যাচারের হাত হইতে কথঞ্চিত নিস্তার পাইবার জন্য তিনিও সময়োচিত আচরণ করিতে লাগিলেন। দুর্জ্জেয় স্ত্রী চরিত্র; দেবতারাও সকল সময়ে তাহা বুঝিতে পারেন না—তা আমি সামান্য মানুষ কেমন করিয়া তাহা বুঝিব কিন্তু তথাপি যেন মনে হইল—যে এ সব ব্যাপারে তিনি মোটেই বিরক্ত হইতেছেন না—বরং একটা প্রচ্ছন্ন আনন্দের ভাব তাঁহার মনের মধ্যে গোপনে রহিয়াছে। ইতিমধ্যে যতীনের মারফৎ সংবাদ পাইলাম যে বাণীবৌদি'র জেরায় পড়িয়া ইচ্ছায় হউক বা অনিচ্ছায় হউক তিনি কবুল করিয়া ফেলিয়াছেন যে এ গৃহের গৃহকর্ত্রী হইতে তাঁহার 'বিশেষ' অমত নাই। যতীন এই 'বিশেষ' কথাটির সম্বন্ধে বলিল এ স্থলে এটা সম্পূর্ণ অর্থহীন।

রবিবার দিন বিকালে আমি, নরেনবাবু, বাণী বৌদি ও সুজাতা দেবী নিকটবর্ত্তী পাহাড়ে বেড়াইতে গেলাম। পাহাড়টির উপর একটি সুন্দর ঝর্ণা আছে সেটা বাস্তবিকই দেখিবার যোগ্য। যতীন গেল গাড়ী লইয়া ষ্টেশনে ডাক আনিতে। এখানে থাকিলে এই কাজটি প্রায় সে-ই করিত। সন্ধ্যার কিছু পরেই আমরা বেড়াইয়া ফিরিলাম —গাড়ী বারান্দায় গাড়ীখানি দেখিয়াই বুঝিলাম যতীন ফিরিয়াছে। ঘরে ঢুকিয়া দেখি যতীন ত' ফিরিয়াছেই আর তাহার সহিত আসিয়াছেন আমার বাবা মা ও আর একটি ভদ্রলোক। তাঁহাকে দেখিয়াই সুজাতা দেবী

'বাবা' বলিয়া দৌড়াইয়া গেলেন। সুতরাং তাঁহার যথেষ্ট পরিচয় পাইলাম। আহারাদির পর মা আমায় তাঁর ঘরে ডাকিয়া পাঠাইলেন—সেখানে গিয়া দেখিলাম বাবা ও বাণী বৌদি বসিয়া রহিয়াছেন। আমি যাইতেই মা বলিলেন—"বাবা তোর যে এতদিনে বিয়ে কর্বার মত হয়েছে এতে আমরা বড়ই খুসী হয়েছি যতীনের টেলিগ্রাম পেয়েই তাই আমরা ছুটে এসেছি। সুজাতা মা-টি আমার বড়ই ভালো মেয়ে আমি অনেকদিন থেকেই তাকে জানি —এই বোশেখেই তোর বিয়ে দেব' ঠিক করেছি—তাই সুজাতার বাবা এসেছেন তোকে আশীর্ব্বাদ কর্ত্তে। আমরাও আশীর্ব্বাদ করি যেন তোমরা সুখে স্বচ্ছন্দে দীর্ঘ-জীবন পেয়ে ঘর-কন্না কর। যাও এখন রাত হয়েছে শোওগে।" এই বলিয়া মা আমার আশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায় দিলেন। ঘরের বাহিরে আসিয়া দেখি যতীন দাঁড়াইয়া হাসিতেছে। দেখিয়াই বুঝিলাম হতভাগাটা মায়ের সব কথাই শুনিয়াছে তবু সে আমায় জিজ্ঞাসা করিল—"হ্যাঁরে মাসীমা তোকে মাথায় হাত দিয়ে কি বলছিলেন? বিয়ের কথা বুঝি—বাক্ ভাগ্যিস কাল টেলিগ্রামটা করছিলেম। কেনন বিয়ে কর্ব্বে না যে—তবে এ সব কি—এখন 'বেড়াজালে' পড়েছ জাল ছিঁড়ে বেরোও ত'। এই বলিয়াই সে হলে আমায় টানিয়া লইয়া চলিল—এবং মহা উল্লাসে সেখানে নৃত্য আরম্ভ করিয়া দিল—সে নৃত্য আর থামে না—সে যেন নটরাজের তাণ্ডব নৃত্য। তাহার নৃত্যের চোটে বাড়ীশুদ্ধ সবলোক হলে আসিয়া জড় হইল। অতি অনিচ্ছায় সে নাচ থামাইয়া সে রাত্রির মত শান্ত হইল। বাবা মা ত' হাসিয়াই অস্থির। কেননা যতীনের এ নৃত্যের পরিচয় তাঁহারা পূর্ব্বে অনেকবারই পাইয়াছেন।

তাহার পরের কথা আর বলিতে হইবে কি? বৈশাখের প্রথমেই আমাদের বিবাহ হইয়া গেল এবং সৌভাগ্যক্রমে সুরেন বাবুও আমাদের শিকারপুর মাইনএর চীফ মেডিকেল অফিসার নিযুক্ত হইলেন। আর যতীন বিবাহের রাত্রে আর এক দফা স-গীত তাণ্ডব নৃত্য দেখাইয়া বিবাহ বাড়ী মাতাইয়া তুলিল।

"অর্চ্চনা*"

কুমারী গীতা চ্যাটার্জ্জি

অর্চ্চনা অর্চ্চনা,—
হয়না যে ভাই কারোর সাথে
তোমার রূপের বর্ণনা!
শিশির ধোয়া ফুলের মত,
ধরার মাঝে প্রস্ফুটিত,
তুমি যে ভাই মোদের কাছে
কল্প লোকের কল্পনা!
অর্চ্চনা অর্চ্চনা!!

অর্চ্চনা অর্চ্চনা,—
তোমার রূপেই উঠছে ফুটে
সৃষ্টি রাজের আল্‌পনা!
তুলিটী তাঁর তোমার পরে,
টেনে দেছেন যতন ভরে,
তোমার রূপের সৃষ্টি রাজে
করছে জগৎ বন্দনা!
অর্চ্চনা অর্চ্চনা!!

অর্চ্চনা অর্চ্চনা,—
প্রাণের অর্ঘ্য দিয়ে যে ভাই
হয় না তোমার অর্চ্চনা!
তোমায় পেয়ে মোদের সনে,
কী আনন্দ জাগছে মনে,
কথায় তাহা কইতে নারি
লিখতে গেলেই আন্‌মনা!
অর্চ্চনা অর্চ্চনা!!

অর্চ্চনা অর্চ্চনা,—
আমরা তোমার সৃষ্টি দেবে
সদাই করি আরাধনা!
জীবন তোমার আজি হতে,
পূর্ণ হউক পবিত্রতে,
ধন্য হ'য়ো জগৎ মাঝে
এই শুধু করি প্রার্থনা!
অর্চ্চনা অর্চ্চনা!!

---

* কবিতাটী আমার ছোট ভগ্নী "অর্চ্চনা"কে উপলক্ষ করিয়া লিখিত।

জলধর সম্বর্দ্ধনা

'হিমালয় ভ্রমণে'র লেখক রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত জলধর সেন,সাহিত্যিক মাত্রেরই—ও পরিচিতদের অতি সুপরিচিত —স্নেহময় জলধর দাদা এই ৭৩ বর্ষে পদার্পণ করিলেন। এই উপলক্ষে গত ১২ই ভাদ্র রবিবার রবিবাসরের সদস্য-দের উদ্যোগে বাংলার সকল সাহিত্যিকগণই রামমোহন লাইব্রেরী হলে তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করেন।

এই সম্বর্দ্ধনায় সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন বাংলার অন্যতম সাহিত্যনেতা শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বহু সাহিত্যিক জলধর বাবুর সাহিত্যিক কৃতিত্ব ও তাঁহার স্নেহময় অন্তরের পরিচয় দিয়া গদ্যে পদ্যে বন্দনা করিয়া-ছিলেন, বক্তৃতায়ও কেহ কেহ তাঁহার গুণের পরিচয় দিয়াছিলেন।

এ-সব ব্যাপারে অনেক জায়গাই আতিশয্যের বাহুল্য দেখা যায়—তবে এ ক্ষেত্রে আন্তরিকতার সহিতই সকলে জলধর বাবুকে শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হইল। স্বয়ং শরৎচন্দ্রও এই অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। সকলের মুখে সাহিত্য খ্যাতি শুনিয়া শুনিয়া জলধর দাদা আনন্দাশ্রুপূর্ণ নয়নে আবেগভরা কণ্ঠে বলিলেন—'আমি সাহিত্যিক নহি—সাহিত্যসেবীদের সেবক মাত্র।' জীবনের অধিকাংশকাল নানা সংবাদপত্রের সম্পাদক থাকিয়া শেষকালে সূচনা হইতে আজ পর্য্যন্ত 'ভারতবর্ষের' সম্পাদকরূপে জলধর দাদা সাহিত্য সেবীদের সেবক বা অভিভাবক বিশেষ করিয়াই হইয়াছেন এবং এ বিষয়ে তাঁহার কৃতিত্বও অল্প নহে এ কথা পরম সত্য কিন্তু দাদা যে সাহিত্যিক নহেন এ কথাতো মোটেই সত্য নহে। ভ্রমণ কাহিনী লেখকরূপে দাদার পাশে এখনও গণ্ডায় গণ্ডায় দূরের কথা দু'চারজনও দাঁড়াইতে পারেন নাই। তারপর তাঁহার গল্পে সু-উচ্চ ও অতি সূক্ষ্ম আর্ট ও টেকনিক আছে কি না জানি না তবে দাদার অধিকাংশ গল্প পড়িবার সময় প্রাণে বেশ সাড়া দেয়, কোন কোন সময়ে চোখেও জল বহায়। জলধর সম্বর্দ্ধনা সভায় শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত সত্যই বলিয়াছেন—বাংলার বিশেষ গুণ গুলিই দাদার সাহিত্যে প্রতিফলিত হওয়ায় তাঁহাকে দেশের লোকে অত আপন ভাবিতে পারে—সাহিত্যিকের এ তো বড় সোজা গুণ নয়, তাঁর অনেক বইর ১০।১১টা সংস্করণ হইয়া গিয়াছে, অনেকের ঘরে তাঁর বই দেখা যায়।

সাহিত্যিক কৃতিত্ব ছাড়া দাদার সম্পাদকীয় কৃতিত্ব কতখানি সে সাক্ষ্য শরৎচন্দ্র ও নরেশচন্দ্র দিয়াছেন।
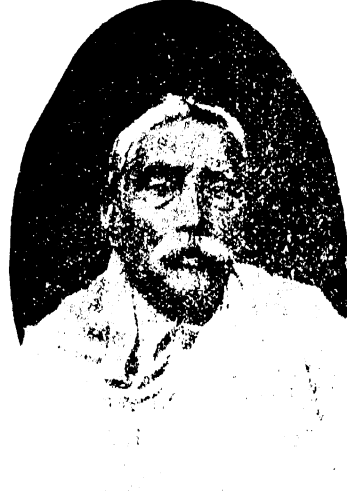
শ্রীজলধর সেন

শরৎচন্দ্র বলেন—দাদার তাড়া, পিঠ চাপড়ানি, উৎসাহ অনুযোগ না পাইলে, তাঁর মত আলসে লোক যা লিখিয়া-ছেন তার অর্দ্ধেকের বেশী লিখিতে পারিতেন না। নরেশচন্দ্র বলেন—দাদাই তাঁহাকে উপন্যাস লিখিতে প্রবৃত্ত করান বার বার তাগিদ দিয়া দিয়া। এ সাক্ষ্য আরো অনেক খ্যাতিমান সাহিত্যিকই দিবেন।

সাহিত্যিক ও সম্পাদক দুই হিসাবেই দাদার খ্যাতি চিরদিন থাকিবে।

নানা জয়ন্তীর বড় বড় বড় ব্যাপারের মধ্যে দাদা জলধরের এই সম্বর্দ্ধনা অতি আন্তরিকতার সহিত হইয়া গেল এ জন্য এই ব্যাপারের উদ্যোগীগণ বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র।

সম্বর্দ্ধনার পরদিন দাদার পরম স্নেহভাজন সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকুমার বসুর উদ্যোগে কলিকাতা হোটেলে এক বিরাট প্রীতি সম্মেলনের আয়োজন হইয়াছিল। এখানে রবি-বাসরের পক্ষ হইতে দাদাকে রৌপ্যাধারে যে মানপত্র ও রূপার দোয়াত কলম সম্বর্দ্ধনায় দেওয়া হয় তাহা প্রদর্শিত হইয়াছিল—তারপরে চব্যচোষ্য লেহ্য পেয় নানারূপ সুস্বাদু আহারের ব্যবস্থা ছিল।

একটা দরজার সামনে টেবিলে বসিয়া দাদা এই আনন্দ ভোজনে যোগ দিয়াছিলেন—এবং আহারাদির পর বাহির হইবার সময় কোন কোন স্নেহভাজনকে বলিতেছিলেন 'এই সঙ্গে নরেন আহারের পর কিছু দক্ষিণা দেবার ব্যবস্থা করলেই পারত, একেবারে শ্রাদ্ধের কাজ হয়ে যেত।'

ভগবানের ইচ্ছায় দাদা আরো দীর্ঘকাল বাঁচুন, এমনি সম্বর্দ্ধনা আরো লাভ করুন। সত্যি দাদার মত লোক এখন আর মেলে না, এমনি স্নেহ এমনি আন্তরিকতা আর কার কাছ থেকে পাওয়া যায়? প্রাচীন যুগ ও বর্ত্তমান যুগের একটা চিরপ্রিয় স্নেহের নিদর্শন, ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র হিসাবেই দাদা শ্রীযুক্ত জলধর সেনকে আমরা চিরদিন মনে করিয়া আসিতেছি—আজ তাঁর এই সম্বর্দ্ধনায় তাঁকে আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি। সম্বর্দ্ধনে অভিনন্দন পত্রের অনুলিপি—

জলধর-সম্বর্দ্ধনা অভিনন্দন পত্র—

রায় শ্রীজলধর সেন বাহাদুর করকমলেষু—

হে শান্ত স্নিগ্ধ আনন্দময় জলধর আমরা তোমায় অভিনন্দন করি।

অর্দ্ধ শতাব্দীর সরস-রসধারা-বর্ষণে তুমি রসিকচিত্তকে উন্মুখ, সাহিত্যাকাশকে শ্যামায়মান এবং সাহিত্যক্ষেত্রকে উর্ব্বর করিয়াছ।

কথা-সাহিত্য তোমার কথার মিষ্টত্বে মধুর হইয়াছে, তোমার কাহিনী দুর্গম ভ্রমণবর্ত্মকে কুসুমাস্তীর্ণ করিয়াছে, তোমার বর্ণনা সুদূরকে সুগম এবং সাধারণকে সৌন্দর্য্যময় করিয়াছে। তোমার রচনা শব্দে শ্রী এবং ভাবের ভঙ্গী দান করিয়াছে।

হে পথিক জলধর, আমরা তোমায় অভিনন্দন করি সংসার তোমার আনন্দের কারণ, কিন্তু প্রবাস তোমার আকর্ষণের বস্তু। তাই ঘর এবং পথ তোমার অন্তরে একটি সুমধুর সামঞ্জস্যে সুষমাময় হইয়া উঠিয়াছে; তাই পর তোমার কাছে পরিজন, পরিচিত তোমার কাছে প্রীতির পাত্র, এবং বান্ধব তোমার কাছে আত্মীয় হইয়া উঠিয়াছে।

হে চির-দিবসের তীর্থযাত্রী, সাহিত্যিকে তুমি তীর্থে পরিণত করিয়াছ, তাই পুণ্যলোভাতুর অসংখ্য জন-সমাগমে সে তীর্থ মুখর হইয়া উঠিয়াছে।

কমল-কিশলয় পাথেয় করিয়া মানসগামী যে রাজ-হংসেরা অনুকূল পবনে পক্ষবিস্তার করে, কৈলাস-অবধি তুমি তাহাদের সঙ্গী হইয়াছ। হিমালয়বিহারী হে জলধর কোন্ বিরহের বার্ত্তা বহন করিয়া লইয়া গিয়া মিলনের লিপি লইয়া আসিয়াছ, সকল সাহিত্যরসগ্রাহীর চিত্ত তাহার উপভোগের আনন্দে পূর্ণ হইয়া আছে। কুসুমধবল শৃঙ্গসমুচ্ছ্বাসে মহাদেবের প্রতি দিবসের যে অট্টহাস রাশীভূত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহাই আহরণ করিতে কি প্রথম যৌবনে তুমি পরিব্রাজক সাজিয়াছিলে? সেই আনন্দময় আহরণের বিতরণে বঙ্গের প্রান্তর প্রফুল্ল হইয়া আছে।

তোমার দৃষ্টি সকলকে সমানভাবে নন্দিত করিয়াছে তোমার প্রীতি অখ্যাতকে খ্যাত এবং নবীনতাকে সম্বর্দ্ধিত করিয়াছে। স্নেহ-বিতরণে তোমার কার্পণ্য নাই, দারিদ্র্যে তোমার কুণ্ঠা নাই, বিলাসে তোমার স্পৃহা নাই; সম্মানে তোমার গর্ব্ব নাই, সামাজিকতায় তোমার শৈথিল্য নাই, বাণীর সেবায় তোমার শ্রান্তি নাই। হৃদয়ের ঐশ্বর্য্যে তুমি শ্রেষ্ঠ, সাহিত্যে ও সমাজে তাই তুমি জ্যেষ্ঠের অধিকারী। হে তাত, আমরা তোমায় অভিনন্দন করি।

গুণমুগ্ধ—সাহিত্যিকবৃন্দ ও রবি-বাসরের সদস্য

আধুনিক চীন

শ্রীসুধাংশুকুমার মিত্র বি-এস-সি

"Thus fares it still in our decay :
And yet the wiser mind
Mourns less for what age takes away,
Than what it leaves behind."
—Wordsworth.

শিক্ষা—

"স্বরাজ" সরকার জাতিকে সকল বিষয়ে শিক্ষাদান করিয়া উন্নত করিতে সর্ব্বদা ব্যস্ত। চীনে এখন পাশ্চাত্য প্রথায় সকল রকম শিক্ষালয় প্রস্তুত হইয়াছে এবং তথায় বহু সংখ্যক ছাত্র প্রতি বৎসর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া

চীন দম্পতি

দেশের কাজে নিযুক্ত হইতেছে। অনেক ধর্ম্মমন্দিরও শিক্ষালয়ের স্থানরূপে ব্যবহৃত হইতেছে ও অনেকানেক উপযুক্ত ছাত্রকে সরকার নিজ খরচায় পাশ্চাত্য জগতের শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ স্থানে শিক্ষালাভের জন্য পাঠাইতেছেন। লেখাপড়াকে ধর্ম্মের একটী অঙ্গ বলিয়া চীনবাসীরা মনে করেন; সেজন্য সকল শিক্ষককে ও পুস্তককে তাহারা যথেষ্ট ভক্তি ও শ্রদ্ধা করে। আজকাল চীনে বড় বড় সরকারী চাকরী উপযুক্ত ব্যক্তিদের দেওয়া হয়। চীনে শিক্ষাদানের এমন প্রচুর বন্দোবস্ত হইয়াছে যে কেবলমাত্র নান্‌কিন্‌ সহরের পরীক্ষাগারটীতে ৩০,০০০ হাজার ছাত্র একসঙ্গে বসিতে পারে। কিছুকাল পূর্ব্বে চীনে "ব্যাচিলার" (Bacheler) উপাধি পাওয়া ভয়ানক শক্ত ব্যাপার ছিল। ছাত্রেরা ইতিহাস ও দর্শন পরীক্ষায় উপস্থিত হইলে তাহাদিগকে প্রতি ১০০০ হাজার ছাত্রকে এক একটী ক্ষুদ্র কুঠরীতে কিছুদিনের জন্য আবদ্ধ রাখা হইত; এবং পরীক্ষার নিয়ম এমন ছিল যে অতিরিক্ত পরিশ্রমের জন্য যদি কোন ছাত্র মারা পড়িত তাহা হইলেও দরজা কখনও নিয়ম ভঙ্গ করিয়া খোলা হইত না; সেই হতভাগ্য ছাত্রের শবটী পুতিয়া ফেলা হইত। এই সকল বাদে তাহাদিগকে আবার রচনা ও কবিতার পরীক্ষা দিতে হইত।* তার

---

*In his teens the youth steeped in Chicnese history and philosophy might present himself for examination at certain centres, where the candidates, to the number of thousands were boxed up for days together in separate cells. * * and so strict were the rules that if an overworked student died under it the door must not be pened. —The World of To-day.
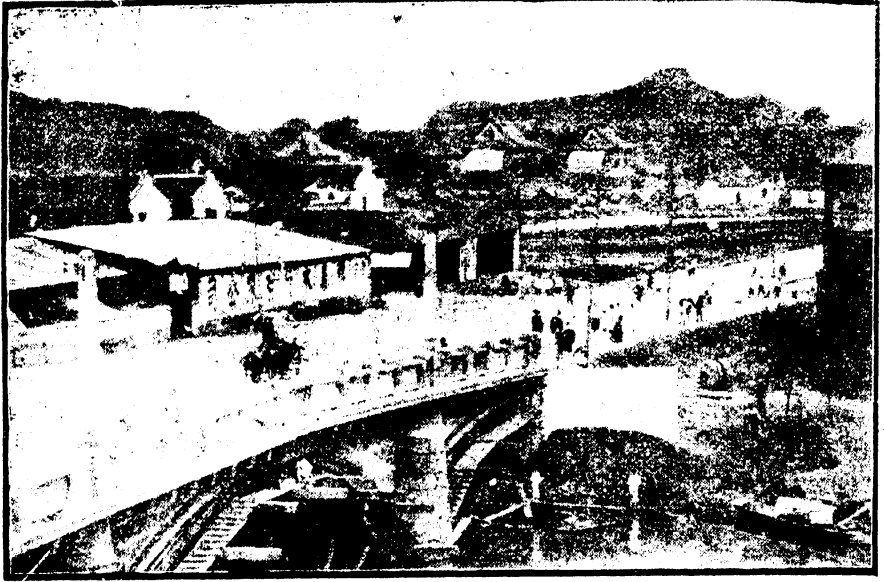
নানাকন্ সহরের একটি পোল

পর তাহারা "ব্যাচিলার" উপাধি লাভ করিত। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দ হইতে এই প্রথার রদ হইল। এখন চীনে আধুনিক প্রথায় শিক্ষাদান হইয়া থাকে।

বিচার—

চীন সম্বন্ধে আমাদের সকলকারই যেন কি রকম বীভৎস ধারণা আছে! আমরা যখনই চীনদের কথা ভাবতে চেষ্টা করি তখনই যেন আমাদের মনে এক অসভ্য রাজ্যের কথা জেগে উঠে, যেখানে বন্দীদের প্রতি অমানুষিক অত্যাচার করা হয়, মানুষকে ইচ্ছামত শূলে ও অন্যান্য ভাবে প্রাণবধ করা হয়, কয়েদীদের এমন ভাবে আবদ্ধ করা হয় যাহাতে তাহারা সমস্ত দিন রাতের মধ্যে শুতে বা বসতে না পারে। বস্তুতঃ এই সকল ঘৃণ্য প্রথার প্রচলন হয় ত কোনকালে থাকাও অসম্ভব নয়—যে কোন জাতির পক্ষেই, কিন্তু আমাদের নব্যচীন সম্বন্ধে কিছু জানিতে হইলে তাহারা কোন কালে কিরূপ ছিল এইমাত্র দেখিলে চলিবে না, আমাদের দেখিতে হইবে তাহারা কি উপায়ে আধুনিকতা লাভ করিয়াছে। চীনেরা সাধারণতঃ একটু মায়ামমতাহীন বলিয়াই বোধ হয় অবশ্য এটা

চীন ধর্ম্মমন্দির

আমাদের ধারণা মাত্র কারণ তাহারা অপর লোকের শাস্তি, এমন কি ফাঁসী পর্য্যন্ত বেশ আনন্দের সহিত উপভোগ করিত; এবং এখনও করে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। *

স্বভাব—

চীনবাসীরা ব্যবহারিক জীবনে অনেক উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে; কিন্তু তাহাদের নিজ নিজ ব্যবহার অত্যন্ত ঘৃণ্য।† তাহারা লোকের সঙ্গে ব্যবহারে ও কথাবার্ত্তায় নির্ভুল ও অমায়িক এবং কথায় কথায় অনেক-কিছু বলিলেও কাজের সময় তাহাদের আন্তরিকতার কোন খোঁজ পাওয়া যায় না ই কথার খাঁটী মিল এমনটী আর কোথাও পাওয়া যায় না যেমন পাওয়া যায় তাহাদের পাঁচজনার কোন কাজে।

বিবাহ—

চীনদের বিবাহ প্রায়ই শৈশবে হইয়া থাকে। পাত্র-পাত্রী পক্ষের ব্যক্তিরাই সকল ব্যবস্থা করিয়া থাকেন এবং প্রায়ই বিবাহের পূর্ব্বে পাত্রপাত্রীর সাক্ষাৎ হয় না। চীনশাস্ত্রে এক পত্নীর কথাই বলা হইয়াছে—তবে পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা অর্থাৎ চীনশাস্ত্রে পুত্র না হইলে আবার পত্নী গ্রহণ করার বিধান দেওয়া আছে। চীন-দেশে সকলেই 'বাবা' হইতে চাহেন এবং পুত্র না জন্ম-গ্রহণ করা পর্য্যন্ত তাহারা অত্যন্ত মনঃকষ্টে দিনযাপন করেন। তবে কন্যার চেয়ে পুত্রের কদর চীনদেশেও বেশী। চীনে মেয়েদের মধ্যেই বেশী আত্মঘাতী হওয়ার সংবাদ পাওয়া যায়! কিন্তু চীন বিদ্রোহের পর হইতে নারী-প্রগতি আরম্ভ হইয়াছে এবং আশা করা যায় যে তীব্র বহ্নি একদিন নানকিন্ সহরে "আম্যাচন্ যুদ্ধ" আরম্ভ করিয়াছে উহার পরিণতি কোনদিকে এর সাক্ষ্য চীনের নারীরা দিবে। চীনদেশের ন্যায় ভারতেও নারী প্রগতি চলিতেছে—আমাদের এই প্রগতিকে অনেকে পাশ্চাত্য ভাব দুষ্ট বলিলেও অনেকে উহার পক্ষ-পাতীও আছেন কিন্তু কোনদিকে ভারতের সত্যকার উন্নতি এর সাক্ষ্য দিবে আমাদের বংশধরগণ। আজ ইহার স্বপক্ষে বা বিপক্ষে বেশী কিছু বলা যায় না।

আচার, ব্যবহার ও সংস্কার—

চীনদেশের মেয়েদের সৌন্দর্য্য তাদের পায়ে। শৈশব হইতে সকল মেয়েদের ওখানে একরকম লোহার জুতা পায়ে দিয়া থাকিতে হইত যাহাতে না তাহাদের পদযুগল ঐ মাপের চাইতে বড় হইতে পারে। ঐ ওখানকার মেয়ে-দের সৌন্দর্য্য ছিল। চীনে মেয়েদের "সুন্দরী" হইতে হইলে কি ভয়ানক কষ্ট সহ্য করিতে হইত! কিন্তু এখন পুরুষের বেণী উঠিয়া যাওয়ার মত মেয়েদের পা খর্ব্ব করার প্রথাও উঠিয়া গিয়াছে। *

---

* It must be confessed, with all their superficial politeness, the Chienese are a cruel, at least an unfeeling people, who if tough-skinned themselves, enjoy the sight of punishment and executions like the bullies of our old public schools. —World of To-day.

† The chienese are outwardly the politest in the world, and not the least so in inward disposition. —World of To-day.

‡ Revenues we e "squeezed" for the benefit of the collectors; roads and embankments go to ruin, while the officials charged with repairing them grow rich; officers draw pay for a thousand men, when their ragged and illarmed regiment does not number half as many. —The World of To-day.

* The most painful of womans wrong is one enforced by the tyranny of custom, the senseless crippling of the feet that costs a girl years of torture,... —The world of Today.

[চৈনিকদিগের ব্যবহারিক জীবন সম্বন্ধে যে সকল অভিযোগ উহা ইংরাজী পুস্তকাদি হইতে সংগৃহীত এবং ঐ সকল পুস্তকাদির লেখকগণ প্রায় সকলেই পাশ্চাত্য দেশবাসী সেইজন্য ঐ সকল লিখন সমূহ কতকটা বিশ্বাসযোগ্য তাহাও বিবেচ্য।]

সবাক চিত্র

শ্রীবামাদাস চট্টোপাধ্যায় এম্-এস্ সি

কয়েক বৎসর যাবৎ চলচ্চিত্র জগতে একটী নূতন সাড়া পড়িয়াছে। তাহার একমাত্র কারণ এই যে **একটী শক্তির** যে অভাব বৈজ্ঞানিকগণ বহুপূর্ব্ব হইতেই নির্ব্বাক চিত্রে অনুভব করিয়া আসিতেছিলেন তাহা দূরীভূত করিতে সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইয়াছেন। এযাবৎ-নির্ব্বাক চিত্র বহু অর্থব্যয় ও পরিশ্রম দ্বারা প্রকৃতই উৎকর্ষের চরম সীমায় উপনীত হইয়াছে। ইহাতে পাশ্চাত্যের চিত্রকরেরা নূতনত্বের আর কিছু বাকী রাখেন নাই। নির্ব্বাক চিত্রের **গবেষণায় সকল উপায়ই এক প্রকার** অবলম্বিত হইয়াছে এবং তাহা সুচারুরূপে কার্য্যে পরিণত করিয়া কলাবিদ্যায় চরম উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে। এক্ষণে নির্ব্বাক চিত্র গৃহীত হইলেই সাধারণে পাশ্চাত্যের অনুকরণ ব্যতীত তাহাতে নূতনত্বের আভাস পান না।

সবাক চিত্রের সঙ্গে সঙ্গে গবেষণায় একটী নূতন পন্থা আবিষ্কৃত হইয়াছে। চিত্রের দৃশ্যপটের চরিত্র অনুযায়ী শব্দ যোজনা যে শুধু বৈজ্ঞানিকগণেরই কৃতিত্বের উপর নির্ভর করে তাহা নহে, চিত্রশিল্পীগণের দক্ষতার প্রয়োজন। বাস্তবিকই সবাক চিত্র কলাবিদ্যাকে একটী নূতন স্তরে আনয়ন করিয়াছে। রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইবার নিমিত্ত যে পাঠক নাট্যকারগণ চিরন্তনপ্রথা অনুযায়ী লিখিয়া আসিতেছেন, সবাক চিত্র যেন তাঁহাদের স্পষ্টই বলিতেছে যে রচনার ধারার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন প্রয়োজন। এই দুইদলের পূর্ণ সমবেশ হইলে, একটী চিত্র সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইয়া ফুটিয়া উঠিবে।

ব্যবসায় ক্ষেত্রে সবাক চিত্র এতদূর সাফল্য লাভ করিয়াছে, যে, সাধারণ প্রেক্ষাগৃহে সকলেই উহা কৃতিত্বের সহিত ব্যবহার করিতে পারিতেছেন;—ইহার মূল কারণ বেতার বা ব্রডকাষ্টিং। বেতারের ক্রমোন্নতির সহিত সবাকচিত্র প্রতি পদে জড়িত রহিয়াছে। আজ ঘরে ঘরে বেতার শুনিতেছেন। কিন্তু ইহার মূলে যে কত অর্থ ব্যয় কত গবেষণা হইয়াছে তাহা ইয়ত্তা নাই। যন্ত্র প্রস্তুত-কারগণ প্রত্যহ নব নব উপায় উদ্ভাবনের নিমিত্ত Research Laboratoryতে বহু অর্থ ব্যয় করিতেছে। বেতারের প্রত্যেকটী অংশ অতি উত্তমরূপে প্রস্তুত করিয়া সবাক চিত্র যন্ত্রে ব্যবহৃত হইতেছে। চিত্রে শব্দযোজনা করিতে "মাইক্রোফোন্" (Micropl one) হইতে আরম্ভ করিয়া প্রেক্ষাগৃহে শব্দ পুনোশ্চারণ করিতে "লাউড-স্পীকার" পর্য্যন্ত প্রত্যেকটী যন্ত্রের গঠনপ্রণালী বেতারের নিকট ঋণী। আবার বেতারের উন্নতি সাধনের নিমিত্ত
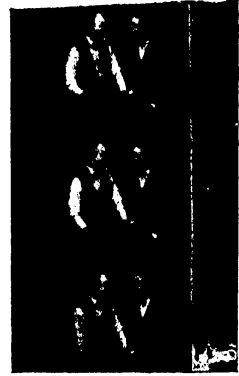
বৈদ্যুতিক যন্ত্রের কারখানাগুলি, এমন কি লোহার কারখানা পর্য্যন্ত গবেষণাতে যত্নবান্।

সম্যকভাবে সবাক চিত্রের অনুশীলন করিতে হইলে পদার্থবিজ্ঞানের কিঞ্চিৎ জ্ঞান আবশ্যক। রেডিও বা বেতারের ন্যায় এতদূর অগ্রসর এখনও হয় নাই, যে, সাধারণ বা Amatureএর নিকট প্রস্তুত প্রণালী সহজ-সাধ্য হইবে। আমরা এখানে কয়েকটী মোটামুটি আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব, অবশ্য অবশ্যাম্ভ বা জটিল

কোন বিজ্ঞানের নিয়মাবলীর যতদূর সম্ভব এড়াইয়া। বহুদিন হইতে চলচ্চিত্রকে মুখর করিয়া তুলিবার একটী চেষ্টা হইতে থাকে এবং প্রথমে গ্রামোফোন রেকর্ডে তোলা হয়। ইহাকে Vitaphone বলা হয় এবং Victor talking machine co বিস্তর ছবি এইরূপে মুখর করিয়া তুলিতে থাকেন। এই রেকর্ডগুলি ছবির সহিত সমান ভাবে চালাইতে হইত, এজন্য সময় সময় ছবি ছিঁড়িয়া যাওয়ার জন্য বাদ দিলে শব্দ ও ছবি তফাৎ হইবার সম্ভাবনা ছিল; কিন্তু ইহার শব্দ খুব স্পষ্ট হইত।

আজকাল ফিল্মের উপরেই শব্দের চিত্র উঠানো হইয়া

থাকে। প্রথমে এই শব্দের আলোক চিত্র লইয়া বহু গবেষণা চলে এবং উহা সাধারণ নির্ব্বাক চিত্রের ফিল্মের মধ্যে রাখা হইবে কিম্বা অন্য কোনও প্রকার চওড়া ফিল্মের প্রয়োজন (30") এই বিষয়ে বহু আলোচনা হয়। প্রথম পরীক্ষা Poulson-Peterson Systemএ চওড়া ফিল্ম করা হইত এবং পূর্ব্বে তাহা দেখানও হইয়াছে। ইহার সুবিধা এই, যে, ফিল্ম প্রশস্ত হওয়াতে শব্দের ছবি তুলিতে বেশী স্থান পাওয়া যায় এবং শব্দ স্পষ্ট হয়। কিন্তু প্রধান অসুবিধা যে পৃথিবীব্যাপী সমস্ত নির্ব্বাক চিত্রের যন্ত্র ফেলিয়া দিতে হইবে, এবং নূতন যন্ত্রের প্রয়োজন। সুতরাং এরূপ অসুবিধার মধ্যে না যাইয়া সাধারণ ফিল্মের ১ দুইয়ের পাঁচ ইঞ্চি প্রশস্ততার পরিমাণকেই সর্ব্ববাদীসম্মত বলিয়া নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে এবং প্রায় দুইয়ের পঁচিশ ইঞ্চি স্থান শব্দের ছায়ারেখাগুলির নিমিত্ত ছাড়িয়া দিতে হইয়াছে।

প্রথমে শব্দ কিরূপভাবে ছবিতে পরিণত করা হয় সেই সম্বন্ধে কিছু আলোচনা আবশ্যক। আমরা সকলেই টেলিফোন জিনিষটা দেখিয়াছি এবং কিরূপে ব্যবহার করিতে হয়, তাহাও একপ্রকার জানা আছে বলিয়া মনে হয়। টেলিফোন "রিসিভারটী"র (Receiver) যে অংশে মুখ রাখিয়া কথা বলিতে হয় তাহাকে "মাইক্রোফোন্" বলে। এইরূপ একটী বেশ ভালরকম যন্ত্র বক্তার সম্মুখে অন্তরালে লুক্কায়িত থাকে। অভিনয় করিতে করিতে তিনি যখনই কোন শব্দ উচ্চারণ করিবেন তখনই ঐ বাতাসের স্পন্দন-সমূহ "মাইক্রোফোনে" (ইহার ডাক নাম 'Miki') আঘাত করে। সাধারণতঃ এই যন্ত্রে একটী বিদ্যুতপ্রবাহ সর্ব্বদাই চালিত অবস্থায় থাকে এবং স্পন্দনগুলি মুহূর্ত্ত মধ্যে বৈদ্যুতিক স্পন্দনে পরিবর্ত্তিত হয়। তৎপরে কয়েকটী "ভাল্‌ভ" (Valve) যুক্ত "এম্‌প্লিফায়ার" (amplifier)এর সাহায্যে এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৈদ্যুতিক স্পন্দনগুলিকে অধিকতর শক্তিশালী করা হয়। বেতারের যন্ত্রাদির সহিত সামঞ্জস্য এই পর্য্যন্ত বেশ দেখিতে পাওয়া যায়, ইহার পরে আর বিশেষ কিছু নাই। পদার্থবিজ্ঞানের Electrical Laboratory experiment যাঁহারা করিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্য জানেন যে Galvanometer নামে যে যন্ত্রটী আছে, তাহা অতি সামান্য তড়িতের স্পন্দনকে আলোকরশ্মির কম্পনে পরিবর্ত্তিত করিয়া থাকে। এইরূপ ধরণের একটী যন্ত্রের সাহায্যে সঙ্কীর্ণ আলোকরেখার
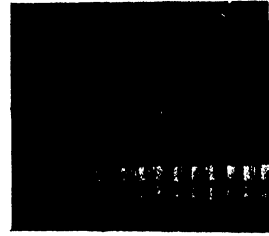
স্পন্দনগুলিকে ফিল্মের উপর আলো-ছায়াতে অঙ্কিত করা হয়। অনেকেই প্রশ্ন করিবেন যে কিরূপে শব্দ ও ছবি একত্র সমাবেশ হয়। ছবির "ক্যামেরা" এবং শব্দের ঐ Galvanometer যুক্ত "ক্যামেরা," এই দুইটী বিভিন্ন Negativeএ প্রস্তুত হয়। একটীতে ছবি থাকে ও

অন্যটিতে ছবি থাকে না, একেবারে সাদা কেবল একধারে কয়েকটী রেখামাত্র অঙ্কিত হয়। (১নং ছবি) পরে ঐ ছবি ও রেখা একত্র আর একটী Positive ফিল্মে ছাপা হয়। তখন ছবির পার্শ্বে রেখাগুলি উঠিয়া যায়। এইরূপ যে ছবি হইল তাহা প্রদর্শনের উপযোগী। (২নং ছবি)

ঐ Galvanometer ব্যতীত আরও একটী উপায়ে ঐ তড়িৎশক্তির স্পন্দনকে আলোকরশ্মিতে পরিণত করা হয়। যেমন একটী বিজলী বাতি, যখনই বিদ্যুতের চাপ কম্পমান হইয়া উঠে, উহার উজ্জ্বলতারও সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করা যায়। এরূপ একটী বাতিকে বিশিষ্ট-ভাবে প্রস্তুত করিয়া ঐ কার্য্যে ব্যবহৃত করা যাইতে পারে। ইহাকে Neon Glowlamp বলে, এবং অনেক যন্ত্রেই ইহা ব্যবহৃত হয়।

আরও একটী তৃতীয় উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে, এবং ইহা এতই জটিল, যে, তাহা সাধারণে ব্যবহার করিতে অনেক অসুবিধা এবং খরচও যথেষ্ট বেশী। ইহার দ্বারা অনেক সময় স্পষ্টতর ও স্বাভাবিক শব্দ পাওয়া যায়। এই যন্ত্রের জন্য Polarised Light ray আবশ্যক এবং ইহার plane of polarisationএর angle বৈদ্যুতিক স্পন্দনের সঙ্গে সঙ্গে অল্পবিস্তর ঘুরিতে থাকে। এই সমস্ত জটিলতার জন্যই ইহা সাধারণ ছবিওয়ালাদিগের নিকট দুর্ব্বোধ্য।

প্রদর্শন যন্ত্র যতই ভাল করা যাক, শব্দের রেখা তুলিবার সময় যদি কোন দোষ থাকে তাহাকে স্বাভাবিক স্বরে পরিণত করা সহজ সাধ্য নহে। বাস্তবিকই শব্দ-রেখাগুলি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক স্বরের অনুযায়ী হয় না, এজন্য পূর্ণ স্বাভাবিকতা থাকে না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ফিল্মের আয়তন ছোট এবং শব্দরেখার জন্য যে স্থান নির্দ্ধারিত হইয়াছে তাহাও অত্যন্ত ছোট, এ অবস্থায় কতকগুলি স্বরের স্বাভাবিক ভাব রাখা কঠিন হইয়া পড়ে। ইহা ব্যতীত ফিল্ম যদি অনেকবার কাটিয়া পুনরায় জোড়া দেওয়া হয়, শব্দরেখার ঘরের বরাবর একটা সমভাব বজায় থাকে না, এজন্য প্রদর্শনযন্ত্রে অনেক সময় একটা ঘড় ঘড় শব্দ হয়।

১নং ও ২নং ছবিতে আমরা দুই প্রকার শব্দরেখার চিহ্ন দেখিতে পাই। দুই একই কেবল তুলিবার যন্ত্রে যে ছিদ্রের ভিতর দিয়া আলোক রশ্মি যায়—তাহারই তারতম্যের উপর নির্ভর করে। ৩নং চিত্রে একটী ছোট সবাক চিত্র উঠাইবার সাজঘরের (studio) নক্সা দেওয়া গেল। ইহাতে দুইটী Microphone ও একটী Camera যেখানে অভিনয় হইবে সেস্থলে রহিয়াছে। Microphoneটী সাধারণতঃ ঝুলান থাকে। ইহাতে নড়া চড়া করিতে সুবিধা হয়।

কৃতী শিল্পী

শ্রীযোগজীবন মিত্র

ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউটের Fine Arts Exibition এ দৃশ্য চিত্রে (Landscape) ফটোগ্রাফিতে, Scottish Church Collegeএর দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণী বিজ্ঞান বিভাগের শ্রীমান যোগজীবন মিত্র প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। ইনি ইতিপূর্ব্বে আরও কয়েক স্থানে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। আমরা এই তরুণ শিল্পীর সাফল্য কামনা করি।
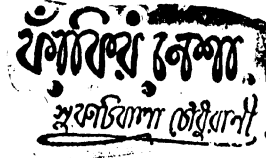
(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

সুরমা বলিল—"আর আমার ঠিক মনে হয় সুনীল পৃথাও"—

পৃথার গলা শোনা গেল দূর হইতে, একটু পরে কাছে হাতী আনিয়া সে বলিল, "চমৎকার পাহাড়" বলিয়া পৃথা কতগুলি বন্যফুল ছুঁড়িয়া মারিল সুনীলের ও সুরমার গায়ে।

পাহাড়ের গায়ে তাঁবু খাটাইয়া চাকর-বাকর আগে হইতে খাবার ও চায়ের বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছিল। তাহারা পৌছিয়া দেখিল রাজীব তাহাদের অপেক্ষা করিয়া আছে।

পৃথা বলিল—"চল উপরে ওঠা যাক্—"

রাজীব বলিল—"সুরমা পারবে তো উঠতে?"

সুরমা বলিল, "পারবো হয়তো।"

রাজীব বলিল, "আগে একটু কিছু খেয়ে নাও সকলে।

চারজনে ক্যাম্প চেয়ারে বসিয়া খাওয়া সারিল। তখন বেলা প্রায় দুইটা। সকলে উঠিতে আরম্ভ করিল কোন খানে একেবারে খাড়া পথ কোনখানে বা বাঁকিয়া একটু সমান হইয়াছে।—পৃথা সকলের আগে লঘু গতিতে উঠিতে-ছিল, রাজীব ডাকিয়া কহিল,—"পৃথা, একেবারে সকলের আগে যেয়োনা—"।

পৃথা মুখ ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কেন দাদা?"

"যদি কোন জন্তু সামনে পড়ে!—আমাকে আগে যেতে দে!"

"না দাদা, তার চেয়ে আমার হাতে পিস্তলটা দিয়ে দাও—"

"তাই বা কি করে তুমি অনেক আগে উঠে গেছ যে"

"তবে থাক বলিয়া পৃথা উঠিতে লাগিল।" সুনীলও পা চালাইয়া উপরে চলিয়া গেল পৃথার কাছে। সুরমা একটু পিছনে পড়িয়াছিল—রাজীব তাহার কাছে ফিরিয়া গেল। সে বলিল,—"সুরমা, বোস, একটু জিরিয়ে নাও—" "সুরমা বলিল—"ওরা যে আগে চলে গেল, যদি কোন জন্তু টন্তু বেরোয়!"

"সুনীল গেছে তো—ওর কাছে একটা রিভলভার আছে।" একটু হাসিয়া রাজীব আবার বলিল—"আর উঠতে তুমি পারবে না—সুরমা অগত্যা বসিয়া বলিল—"কতদূর এসেছি?

"বেশী আসিনি মাত্র দুশো ফিট।"

"ওরা কি একেবারে ওপরে উঠতে পারবে?"

অতদূরে উঠতে পারবে না, তাছাড়া শুধু পাঁচশো ফিট পর্য্যন্ত রাস্তা ভাল আছে, তার ওদিকে আর ভালো রাস্তা নেই!"

"আমার জন্য তোমারও ওঠা হল না।"

"আমারও ছেলেমানুষীর বয়েস গেছে সুরমা—"

"গেছে এত শিগ্‌গির?"

"তাই তো মনে হয়—"

রাজীবের রুমালের উপর সুরমা বসিয়াছিল আর রাজীব দাঁড়াইয়া বলিতেছিল, মনে "হয় তাই!" সুরমার হঠাৎ একটা কথা মনে হইল। সে বলিল—"তাই বুঝি আজ কাল খুব সৎকাজে মন দিয়েছ?"

"তুমি নিজেই ভেবে দেখোনা—"

"ভেবে দেখেছি, আর বুঝতেও পেরেছি, তাতে তোমার আনন্দিত হওয়াই উচিত বলে মনে হয়।"

"আচ্ছা সে কথা যাক্, কিন্তু একটা কথা বলবো কি ?"

মৃদু হাসিয়া রাজীব বলিল—"কি বল !"

"অত বড় একটা সদনুষ্ঠান করছ আমাকে বলনি কেন ?"

"কোন দরকার দেখিনি বলেই বলিনি—"

"আমার বুঝি এটুকু পর্য্যন্ত জানবার কোন অধিকার নেই ?

"নিশ্চয় আছে, যখন প্রয়োজন মনে করতুম তখন বলতুম।"

"কিন্তু বাড়ী তোমার হয়ে গেছে, তবু তুমি এ কথাটা লুকিয়ে রেখেছিলে কেন? আমি কি এতই হেয় যে তোমার এতবড় একটা সৎকাজের আনন্দের অংশও নিতে পারি না ?"

রাজীব একটু থামিয়া বলিল—"বলিনি কারণ তুমি অনর্থক ঝগড়া করবে বলেই, তবে ইচ্ছে ছিল যে তোমাকে দিয়েই ওটা প্রথম খোলাবো।"

"বয়ে গেছে আমি খুলবো না কখনো—"

রাজীব স্থির ভাবে বলিল—"খুলোনা,—তোমাকে দিয়ে আমি জোর ক'রে কোন কিছু করাতে চাই না তো !"

"কিন্তু আবার মনে মনে দুঃখও তো করবে !" রাজীব একটু হাসিল—"না, মনে মনে আমার দুঃখও হবে না, তুমি একটা কিছু করতে চাও না, করো না, তাতে দুঃখ হবে কেন ?"

"তোমার কথা শুনলুম না বলে ?"

"তাও তোমার ইচ্ছা—। তোমার ইচ্ছে হ'ল না, বেশ শুনো না, ইচ্ছে হয় শুনো,—তাতে আমার ভাবের কোন পরিবর্ত্তনই হবে না সুরমা। চল নীচে নেবে যাই।"

সুরমা সুর নরম করিয়া বলিল,—"বোসনা দাঁড়িয়ে আছ কেন ? ওরা কি আসছে না ?"

রাজীব উপরের দিকে চাহিয়া বলিল,—"ঐ যে আসছে বোধ হয়।"

ফিরিবার সময় সন্ধ্যার ম্লান ধূসরতা বিষণ্ণ চরণপাতে নামিয়া আসিয়াছিল বনানীর স্তব্ধ নির্জ্জনতাকে আরো ব্যথিত করিয়া,—অন্ধকার সমাচ্ছন্ন পথে, তাহাদের নীরব যাত্রা সুরমাকে মুগ্ধ করিয়া দিয়াছিল। অনেকক্ষণ কেহ কথা কহে নাই—সুরমার মনে হইতেছিল, এই বুঝি প্রকৃতির অপ্রকাশিত রহস্য—মানুষের জীবনের রহস্যও বুঝি এমনি স্তব্ধ এমনি ধূসর হয়—মাঝে মাঝে যাহার, সেই মৌনতা ভঙ্গ করিতে ভয় হয়—ইচ্ছা হয় না—যেমন রাজীবের। তাহার প্রাণের নিহিত রহস্যের দ্বার সে আজো পর্য্যন্ত উদ্ঘাটিত করিতে সাহস করিতেছে না, কেন ? ভয়েই বুঝি।—খানিক পরে সে পৃথাকে বলিল—পৃথা এই সময়টা কেন মনটা উদাস হয়ে যায়। এই সব দেশের ধূলায়, হাওয়ায় কি যেন আছে, আকাশে, বনে, জঙ্গলে কি যেন কি ব্যথা লুকিয়ে আছে—তোমার হাল্কা মনটাও গম্ভীর হয়ে ওঠে না কি ?"

পৃথা হাসিয়া বলিল—"গম্ভীর হওয়ার কোন কারণ দেখতে পাচ্ছি না তো—বেশ চমৎকার শোভা—আশ্চর্য্য বিস্ময়কর, দেখে বরং আনন্দ হয়।"

সুরমা নিজের মনে ভাবিয়া কোন ভাবনারই কূল কিনারা পায় না। সে দেখিল অত ঝগড়া, অত রাগ অভিমান করিয়া অবশেষে সে বেশ ভালোই থাকে। তাহার মুহূর্ত্তের জন্য জাগিয়া ওঠা মনের বিদ্রোহী ভাবটা মাথা তুলিয়া উঠিতে না উঠিতে আবার ঘুমাইয়া পড়ে। যাহা খুব বেশী অসহ্য বলিয়া মনে হয় এক সময়ে, তাহাও বেশ সহনীয় হইয়া যায়। তাহা হইলে সে কি মানিয়া লইল রাজীবের স্বেচ্ছাচারিতাকে ? রাজীব কি তাহাকে দেখিয়া হাসিয়া ভাবিবে যে তাহার কঠোর মৌন শাসনের ভয়ে ভীতা হইয়াই সে আজ এ ভাবে নির্ব্বিবাদে মানিয়া লইয়াছে তাহার মনের ইচ্ছাটাকেই। অথবা ইহা সুরমারই অন্তরের দুর্ব্বলতা। সেই বুঝি অপারগ হইয়া স্বেচ্ছায় রাজীবের দৃঢ় সঙ্কল্পের পদতলে মাথা রাখিয়াছে। মানুষের বুঝি এই রকমই হয়। প্রথম উদ্দীপনা, অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইবার প্রবল প্রচেষ্টা কি এমনি করিয়াই নিস্তেজ হইয়া বিলীন হইয়া যায়—দীপ্ত শাসন ও সঙ্কল্পের সম্মুখে ? অথবা সে দুর্ব্বল বলিয়া, রাজীবকে ভালবাসে বলিয়া সে চায় না তাহাকে বিরক্ত ও উত্তেজিত করিতে ? অনুশোচনা তাহাকে পীড়িত করিয়া তুলে একই প্রশ্নে বার বার—কেন সে বিবাহ করিল।

সুনীলের কথা তাহার মনে হয়। সুনীল তাহাকে

যে সকল কথা বলিয়াছে তাহা হয়তো সত্য। কিন্তু তাহার মাঝে মাঝে মনে হয় পৃথার আত্মনির্ভরতা ও বিশ্বাস বলিয়া সে ব্যাখ্যা করিয়াছে যাহা তাহা পৃথার অবজ্ঞা নয় তো? যেখানে ভালবাসার অভাব হয় সেইখানেই অবজ্ঞা বা নির্ব্বিকার ভাবে অবস্থান করে। তবে কি পৃথা ও সুনীলের ভালবাসা কিছু না, একটা ফাঁকি মাত্র? সেখানে কি আছে শুধু বিলাসের মোহ, কায়িক আকাঙ্ক্ষা, ও তাহা হইতেই জাত হইয়াছে—একটা নিরপেক্ষ তাচ্ছিল্য? অথবা সুনীলের কথাই ঠিক। ইহা যদি শুধু নিরপেক্ষতা হইত তাহা হইলে সুনীল নিজেকে কখনো হয়তো এ ভাবে প্রতিরোধ করিতে পারিত না—এত বড় প্রলোভনের বিরুদ্ধে। সেইজন্য সে ভাবে হয় তো সুনীলের কথাই ঠিক। আর পৃথা? তাহার সমস্ত উদ্দামতা অথবা তাহার কথায় "লভ ফ্লার্ট" ইত্যাদি লইয়া সে হয়তো অন্য কোনখানে শান্তি পায় না, তাই সেও কি ফিরিয়া আসে আবার সুনীলের "আত্মনির্ভরতা অথবা বিশ্বাসের" প্রাচীরে প্রতিহত হইয়া,—তাহার সমস্ত অশান্ত কামনাকে আবার মিশাইয়া দিয়া সুনীলেরই উদ্দেশে প্রবাহিত তাহার প্রেমের মন্দাকিনী ধারায়? বাহিরে কি শুধু তাহার একটা মিথ্যার মুখোস মাত্র, যাহা তাহাকে জগতের সম্মুখে কঠোর নিন্দা ও তিরস্কারের গ্লানি দিয়াই ভরিয়া দিবে শুধু—আর অন্তর? অন্তর কি তাহার সত্যের উজ্জ্বলতায় নির্ম্মল, শুভ্র, নিষ্কলঙ্ক?

আর সে নিজে? সে ও তো কুড়াইয়া লইতেছে নিন্দা গ্লানি তাহার পশরা ভরিয়া। ঠিক পৃথারই মতন। কিন্তু তাহার মত সে তাহার অন্তর ঠিক নিষ্কলঙ্ক রাখিতে পারিয়াছে কি? কে জানে? রাজীবের প্রতি তাহার অটল মনের ভাব টলিয়া যায়—মাঝে মাঝে তাহার লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া যায়—তাহা হইলে রাজীবের উপর তাহার আর কিছু দাবী করিবার থাকে কি? কিন্তু রাজীবও তো পারে না তাহাকে ঠিক সেই রকম করিয়া ভালবাসিতে। সুনীলের মত সে তো পারে না প্রলোভনকে জয় করিতে। রাজীব যদিও বলে মিনতির প্রতি ইহা তাহার কর্ত্তব্য মাত্র—কিন্তু শুধু কর্ত্তব্য কি? না, না, তাহা নয়—সুরমা কিছুতেই মানিয়া লইতে পারে না তাহার এ কথা। আর পৃথার মতনও সে পারে না স্বামীর উপর বিশ্বাস এবং আত্মভার ন্যস্ত করিতে অবাধে—অথবা সে সহজ সরল ভাবে তাহার অন্যায়টাকে হাসিয়া তুলিয়া লইতে পারে না! তবে সে কি করিবে? বার বার নিজেকে আবার সে ধিক্কার দেয় কেন সে বিবাহ করিল—পরক্ষণেই শিহরিয়া উঠিয়া ভাবে—রাজীব না হইলে বুঝি তাহার সমস্ত জীবন আরো বেশী ব্যর্থ হইয়া যাইত!

১২

কিছুদিন চলিয়া গিয়াছে। পৃথা এখনো সমানে তাহার ফুর্ত্তি লইয়া আছে—তাহার বিরাম নাই, অবসাদ নাই ক্লান্তি নাই। সে যে কলিকাতায় বলিয়াছিল, তাহাও ঠিক—অতীতের দিকে সে ফিরিয়া চাহে না, বর্ত্তমানকেও সে অতীত বলিয়া ধরিয়া লইয়া শুধু চায় সে তাহার ভবিষ্যৎকেই উজ্জ্বল করিতে, ভোগ করিতে।

সুরমা অবাক হইয়া ভাবিতেছিল পৃথার কি এই অবিরাম গতির সীমা নাই? আগের দিনই সুনীল সারাদিন ঘুরিয়া সন্ধ্যার সময় আসিয়া বলিয়াছিল—"বৌদি, পৃথা আজ একেবারে হয়রাণ করে দিয়েছে—"

"কোথায় গিয়েছিলে?"

"উঃ সেই ছোট নৌকয় নদীতে। এ-পাশে ও-পাশে সঙ্গে সঙ্গে ছোট কুমীরগুলো, মাঝে মাঝে আবার ঢেউএর ধাক্কায় কুমীরদের আর শিকারীদের গোলমালে মনে হচ্ছিল বুঝি নৌকো শুদ্ধুই উল্টে যায় বুঝি।"

সুরমা ভাবিল আজ আবার পৃথার এই জেদ। একবার তাহার মনেও হইল মেয়েদের অতটা ভাল নয়—শুধু সুনীলই আবদার দিয়া তাহাকে এত উদ্দাম করিয়া তুলিয়াছে। তাহার মনে হইল সে যাইবে না—কিন্তু আবার ভাবিল—পূর্ব্বদিন সে ঠাকুরের জন্য মালা গাঁথিতে গাঁথিতে বলিয়াছিল "বৌদি—কেমন চমৎকার মালা গেঁথেছি ভাল হয় নি? বম্বেতে সুন্দর সিল্কের মালা পাওয়া যায়, কয়েক গাছি পাঠিয়ে দেবো।—ওই পুতুলগুলোকে আমার দেখতে বেশ লাগে—তার উপর সাড়ী গয়না পরালে আরো চমৎকার লাগে। আমাদের গোবিন্দের মূর্ত্তিটি বেশ।"

"পুতুল বুঝি?"

পৃথা হাসিয়া বলিল—"তা নয় তো কি। ওটা বস্তুরের

পুতুল খেলা। তবু কথনো অমান্ন করতে পারি না যেন। হাতটা আপনা হ'তে কপালে ঠেকে—মাথা নুয়ে আসে—এসব পূর্ব্বপুরুষের কাছ থেকে পাওয়া বোধ হয়। হাজার নাচ করি, আর যাই করি না কেন অন্তরটা বোধহয় সেই বংশ প্রথামত রক্ষণশীলই থেকে যায়। বৌদি সোমবারে চলে যাচ্ছি।"

"কেন? এবারে এত শিগগির যাবে কেন?"

সেবারে প্রণবের জন্য অতদিন ছিলুম। থাকতে ইচ্ছে করছে না—আর। যাবো বৌদি—"

কাজেই সুরমা বুঝিয়াছে—পৃথা যখন বলিয়াছে "যাবো" তখন সে যাইবেই। সুরমা ভাবিল পৃথার অনুরোধ রক্ষা করিয়া সে বজরায় যাইবে।

সাগর বিল। উছলিত জলরাশি আপন আনন্দে আপনহারা হইয়া নাচিয়া নাচিয়া উঠে একটু বাতাসের ভরে। দূরে দূরে পাহাড়, দুই বাহু দিয়া আদর করিয়া ঘিরিয়া রাখিয়াছে এ উদ্দাম চঞ্চল বালিকাকে, কখন সে কোন বিপত্তি বাধাইয়া বসে—এই আশঙ্কায়, এই ভয়ে বুঝি। তবুও রক্ষা নাই, আকাশে একটু মেঘ দেখিলেই সে উদ্দাম হইয়া নাচিয়া উঠে—সামান্য লঘু বাতাসের পরশেই শিহরিয়া উঠে। রাজীবের প্রকাণ্ড সাদা বজরা—একেবারে সাদা ঠিক একটী রাজহাঁসের মত ললিত লীলায় ঢেউ কাটিয়া কাটিয়া আট মাঝির দাঁড়ের জোরে চলিতেছিল, তার উপর পাল উঠিয়াছে। তখনো সূর্য্য ডোবে নাই। পৃথা, সুরমা, সুনীল ও রাজীব ভিতরের কোঠায় বসিয়া "ব্রীজ" খেলিতেছিল। অনেকক্ষণ খেলিবার পর পৃথা উঠিয়া বলিল, "আর খেলবো না দাদা, চল বাইরে যাই, এখন আর রোদ নেই।"

সুরমা বলিল—'গেম' হয়ে আছে—দুপক্ষেরই একটা 'রাবার' হ'য়ে যাক না—"

"না বৌদি গরম লাগছে—"

"তবে থাক" বলিয়া সুরমাও উঠিল।

সকলে বাহিরে বাহির হইয়া ছাতের উপর উঠিল!

আশ্বিনের মাঝামাঝি সময়—নির্ম্মল অশান্ত বিলের জল একেবারে কানায় কানায় ভরিয়া আছে—বহুদূর ব্যাপিয়া—বিস্তৃত হইয়া। তখন হাওয়ার জোর একটু বাড়িয়া গিয়াছিল—সেই হাওয়ায় ভর দিয়া বজরা চলিয়াছিল—দ্রুতগতিতে—তালে তালে। অস্তগামী সূর্য্যের শেষ রশ্মির আবেশ মাখিয়া পশ্চিমাংশের অনেকখানি জল লাল হইয়া গিয়াছে—আর পূর্ব্বদিকে পূর্ণিমার চাঁদের রজত জ্যোৎস্না তরলধারায় ঝরিয়া পড়িয়া জলের সহিত মিশিয়া যাইতে চাহিতেছে—আবরণ-হীন, মুক্ত, অম্বর তলে কাহারও লুকোচুরী চলে না—প্রকৃতি অম্বরহীনা,—সৌন্দর্য্য নগ্না, তাই বুঝি সুদৃশ্য এ সায়াহ্ন বাসরে প্রকৃতির কুঞ্জবনে সূর্য্য চন্দ্রের এ অপূর্ব্ব উন্মুক্ত মিলন অভিসার!

পৃথা বলিল, "বাঃ—কি চমৎকার—ও-পাশে লাল সূর্য্যের আলো এ-পাশে সাদা চাঁদের আলো, কি অদ্ভুত সুন্দর—আঃ, সুন্দর হাওয়া—বোস না সুনীল। গরমে মরে যাচ্ছিলুম ভেতরে, আর ফ্যান গুলোর হাওয়া সে রকম আরামের নয়—আরো গরম লাগে।"

সুনীল তাহার স্বভাব সিদ্ধ প্রফুল্লতা ছাড়িয়া আজ একটু গম্ভীর হইয়া উঠিয়াছে। সুরমা লক্ষ্য করিল কিন্তু কিছু বলিল না। সুরমা বলিল—"বেশ লাগছে—আমার এই সব, এই বজরা, হাতী, পাল্কী, এই সব দেখলে মনে হয়, আমাদের সেই যুগটা নেহাৎ খারাপ ছিল না, এ জিনিষগুলোর বেশ একটা প্রাচীনত্ব আছে।"

পৃথা বলিল—"আর সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে বৌদি আমাদের এখনকার একদিনের পথ এক মাসে যাওয়ার কথা—আর মনটিও সেই সঙ্গে যেনো পিছিয়ে চলে যায় সেই যুগের কোলে—আর এগিয়ে আসতে পারেনা—"

"তোমার তাহলে এগুলো ভাল লাগে না?"

"লাগে। কিন্তু সত্যি বলতে কি মনে হয়, যেন ঠিক সেই রকম চলার গতিটা পাচ্ছি না, ট্রেন, জাহাজ মোটর—কি রকম একটা গতি, জীবন আছে মনে হয় আর এগুলো যেন এগিয়ে যাচ্ছেনা, মনে হয় চলছিনা একটুও, আমি তো অধৈর্য্য হয়ে পড়ি।"

"আমার খুব বেশী গতি ভাল লাগেনা। কেন জানো? মনে হয় মিছি মিছি অত দৌড়ে লাভ কি! কথা নেই বার্ত্তা নেই এনতার দৌড়ে যাচ্ছি—। মনে হয় চলছি যদি, তবে চলার সুখ দুঃখটাই ভোগ করে যাই।"

"আমি ও সব ভালবাসি না। আমি চাই চোখে দেখবো না, কানে শুনবোনা কিছু—শুধু চলে যাবো উদ্দাম গতিতে। আরো কি ইচ্ছে হয় জানো বৌদি? একটা এরোপ্লেন কিনে চালাতে শিখে নিজেই চালাই।"

সুরমা বলিল, "তোমার যে রকম খেয়াল পৃথা কোন দিন যে তুমি কি কাণ্ড করবে, তা তুমিই জানো—সুনীল দেখো ওসব পাগলামি করতে দিও না কিন্তু—।"

সুনীল বলিল, "পৃথার সে ইচ্ছে অনেক দিন আগে থেকেই আছে বৌদি। আমারও কিন্তু এরোপ্লেন চালানোটা শিখবার ইচ্ছে আছে। বেশ জিনিষ।" পৃথা উৎসাহিত হইয়া বলিল—"বৌদি এরোপ্লেন এত সুন্দর লাগে। সুনীলও ভালবাসে। কি রকম মনে হয় যেন কোথা থেকে কোথায় চলে যাচ্ছি, সেই হাওয়ার সাগরের ভিতর দিয়ে, পৃথিবীটাকে তাচ্ছিল্য ক'রে চলেছি কোন এক অজানা রাজ্যের দিকে। সুনীল আসছে বছরে কিন্তু আকাশ পথে ইউরোপ যাব। তুমি এখন থেকে তোমার কারবার গুছিয়ে নাও। দাদা তুমিও চলনা কেন আর একবার বৌদিকে নিয়ে? এক সঙ্গে কেমন দাদা?—"

রাজীব পৃথার দিকে সস্নেহে চাহিয়া হাসিল—"বেশতো পৃথা, আমার অপত্তি নেই, সুরমা কি বল?"

সুরমা বলিল—"আমার ইচ্ছে তো অনেক আগে থেকেই আছে।"

রাজীব বলিল, "সুনীল—কি বল?"

সুনীল বলিল, "আমার ইচ্ছে ছিল এই বছরেই—কিন্তু হ'লনা, তবে মনে ক'রে রেখেছি—অসছে বছর।"

পৃথা সোৎসাহে বলিল—"আমি এখন থেকেই উত্তেজিত হয়ে উঠছি, কি মজা না বৌদি!"

চাঁদের আলো বেশ স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। হাজার চাঁদের ছবি বুকে ধরিয়া সুন্দরী সাগর বিল হাসিয়া উঠিয়াছে। বহুদূর পর্য্যন্ত লক্ষ হীরার রূপালী আলো, লক্ষ ছাঁদে খেলিয়া যাইতেছে। বহুদূরে আকাশের এক কোণে কালো মেঘের বুক চিরিয়া একটি সোনার রেখা জলিয়া উঠিয়া মেঘের আড়ালে লুকাইয়া গেল। বার—বার—তিন চারবার! পৃথা সেই দিকে চাহিয়া বলিল "বাতাসটা পড়ে গেল—আবার গরম লাগছে—ইচ্ছে করে ঐ জলে একটু সাঁতার কাটি। বৌদি, এখন যদি একটা ঝড় আসে তাহলে কি কর?"

সুরমা বলিল "দরকার নেই আর ঝড় এসে। আমি কি আর করবো, সোজা ভয় পাব আর কি।"

রাজীব বলিল, "বড় আশ্চর্য্য নয় ঝড় আসাটা—ওদিকে একটুকরো কালো মেঘ দেখছি।"

বাতাস একটু জোরে বহিতে লাগিল।

পৃথা বলিল—"আঃ বাঁচলুম—বড্ড গরম।"

সুরমা বলিল—"একেবারে ঘেমে গেছি—সত্যি বড় গরম।"

রাজীব বলিল—"দেখো রসিক পালটা নাবিয়ে দাও। আর পারের দিবে মুখ ফেরাও—পার কাছেই আছে—ঐ বোধহয় সাগরপুরী, ঝড় এলেও বিশেষ ভয় নেই—লগির ঠাঁই আছে তো?"

রসিক প্রধান মাঝি সে বলিল—"আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর, এখন ঠাঁই পাওয়া যাবে।"

"তবে লগি ফেল—বাতাস বেশ জোরেই এসেছে।"

"দেখিতে দেখিতে শত কান্নার রোল তুলিয়া—শত প্রলয়ের গর্জ্জন করিয়া উন্মত্ত বাতাস বহিতে লাগিল কোটী কোটী ঢেউ তুলিয়া মহাদেবের তাণ্ডব নাচনে—কোটী কণ্ঠের তুমুল কলরবে। বিরাট বিশ্বের চুল্লীর উপর বসানো পাত্রের জল ফুটিয়া ফুটিয়া উঠিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছিল এলোমেলো ইতস্ততঃ ভাবে—আর পাগল হাওয়ার সঙ্গে সেই পাগল জল সব দিক দিয়া আসিয়া আছাড়িয়া পড়িতেছিল বজরার গায়ে—যেন একটী ক্ষুদ্র গোলক লইয়া লক্ষ হাতের লুফালুফি! পৃথা দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল—"বাঃ—চমৎকার"—

রাজীব বলিল—"নীচে নেবে চল সুরমা—পৃথা—সাবধানে।"

ঘরে বসিয়া সুরমা সত্যই ভয় পাইয়া বলিল—"দেখো ওরা নৌকো ঠিক রাখতে পারছে না—"

"ভয় নেই সুরমা" বলিয়া রাজীব উপরে গিয়া হাল ধরিল—আর সুনীল লগি লইল। আর পৃথা সমানে

হাসিতেছিল—সকলের হুড়াহুড়ি করিয়া নৌকাকে ঠিক রাখিবার ব্যর্থ চেষ্টা দেখিয়া,—সে তখন ভীত ত্রস্ত মাঝি-গুলার মুখে, ভঙ্গীতে কোথায় যে আমোদ আর হাসি খুঁজিয়া পাইল, সুরমা বুঝিতে পারিল না—সে মনে মনে একটু বিরক্ত হইল, আবার পৃথার হাসি দেখিয়া ভীতা হইলেও একটু একটু শুষ্ক হাসি হাসিতেছিল। নৌকা ক্ষণে ঢেউয়ের সঙ্গে সঙ্গে উপরে উঠিতেছিল, নীচে নামিতে-ছিল, ক্ষণে হেলিয়া পড়িতেছিল জলের উপর। পৃথা বলিল —"বৌদি, ভয় পাচ্ছ কেন? ঐ দেখ পার দেখা যাচ্ছে, ঐ যে সাগরপুরী—একটা বাড়ী আমাদের আছে ঐখানে —ঐ তো লোকজন"—

সুরমা সেদিকে দেখিয়া বলিল—"ভয় পেয়েছি অবশ্যি —তবে গেলে এক সঙ্গেই সব যাবো—কিন্তু বলছো যে—পার ত কাছে নয় অনেক দূরে"—

"এমন ঝড়ে কত নৌকো চালিয়েছি এই বিলের উপর দিয়ে। বেশ লাগে আমার,—কমে যাবে এক্ষুণি বৌদি কি ভয়? এসব ছোটখাট ঝড়—ঐ মেঘটাকে সরিয়ে নিয়ে গেল।"

নৌকা হঠাৎ ঘুরিয়া গিয়া একেবারে বাঁকিয়া গেল। সুরমা বলিল—"কই পৃথা কমছে না তো!"

পৃথা বলিল—"কমবে বৌদি—দাদা হালে গেছে, সুন্দর হাল ধরতে জানে দাদা, তাছাড়া ঢাকার মাঝি রসিক—আর ঐ তো পার ঘাট—ঐ তো নাঃ, তুমি একেবারে ছেলেমানুষ কি চমৎকার ঢেউ দেখ—আমার সমুদ্রের কথা মনে হয়, আর ইচ্ছে হয় লাফিয়ে পড়ি"—

সুরমা বলিল—"রক্ষে কর পৃথা লাফিয়ো টাফিয়ো না —কি কাণ্ড, তুমি কি দস্যি মেয়ে"—

পৃথা হাসিয়া উঠিল দ্বিগুণ, সে বলিল—"ঐ তো বাতাস ক'মে গেছে বৌদি,—শুধু ভয় আর ভয়—একটু জলে নাবি—এখানে জল বেশী নেই—আর ঢেউও আছে বেশ। ঝড়ও কমেছে দেখছি।"

পৃথা বজরার জানালা খুলিল। সুরমার বুদ্ধি লোপ পাইল। সে পৃথাকে ধরিতে হাত বাড়াইয়া বলিল—"কি পাগলের পাল্লায় পড়া গেছে, পৃথা কি পাগলামি করছো?"

"একটু নাবি বৌদি, দেখো আকাশ পরিষ্কার হ'য়ে চাঁদ দেখা দিয়েছে, আর ঐ তো আমাদের ঘাট এটুকু সাঁতরে যাই"—ঝপাং—সুরমা ভয়ে চীৎকরিয়া উঠিল—"পৃথা"—

সঙ্গে সঙ্গে সুনীল পাগলের মত ছাতের উপর হইতে লাফ দিল, আর রাজীব হাল ছাড়িয়া দিয়া চীৎকার করিয়া ডাকিল—"সুনীল"—তারপরে গোলমাল—সুরমা খানিক পরেই যেন জ্ঞান ফিরিয়া পাইয়া দেখিল রাজীব তাহার পাশে, নৌকার নঙ্গর ফেলা হইয়াছে। সামনেই তাহাদের এক কাছারীর ঘাট—বড় বড় বাতি জ্বালাইয়া তাহাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছে অনেক লোক। সেখানে ভিজা কাপড়ে পৃথা আর সুনীল দাঁড়াইয়া আছে। পৃথা হাসিতেছিল আর সুনীলের মুখ বাতির আলোয় সুরমা দেখিতে পাইল একেবারে নীল হইয়া গিয়াছে। সিঁড়ি ফেলা হইল! নৌকায় পৃথা ও সুনীল আসিয়া উঠিল।

পৃথা বলিল—"কি কাণ্ডটাই করলে সকলে এইটুকুর জন্য"—

রাজীব বলিল,—"ঠাণ্ডা লাগবে—আগে কাপড় ছেড়ে এসো"—

কাপড় ছাড়িয়া পৃথা আসিয়া বলিল—"অত ভয় পাও তোমরা? সুনীল তোমার কোথাও লেগেছে?"

সুনীল বলিল,—"পৃথা মুহূর্ত্তে আমি যেন পাগল হয়ে গিয়েছিলুম। আমার মনে হয়েছিল তুমি হঠাৎ পড়ে গেছ।"

রাজীব সুনীলের গায়ে হাত দিয়া বলিল,—"কোথাও লেগেছে?"

"নাঃ—বেশ আছি—"

সুরমা বলিল—"আর তোমার তো লাগেনি নিশ্চয়—না পৃথা? কি কাণ্ডটাই করলে—তুমি আর এক প্রলয় নাচন নাচলে"—

পৃথা হাসিয়া বলিল—"সত্যি আমি তোমাদের চমকে দেবার জন্য বা একটা দৃশ্য করবার জন্য করিনি—এমনি ক'রে লাফিয়ে জলে পড়ে সাঁতার কাটতে আমার খুব ভাল লাগে দাদা তো জানে—না দাদা?"—

রাজীব মাথা নাড়িয়া বলিল—"তোমার কথা জানি পৃথা—সুনীলের জন্যই একটু ভাবনা হয়েছিল

পৃথা সুনীলের দিকে চাহিয়া বলিল—"সুনীল তুমি মিছিমিছি কেন পড়লে? আমি দেখলুম ঝড় থেমে গেছে, জানি এ বিলের ঝড় ওমনি আসে, ওমনি যায়—সামনে পার, বাতি লোকজন সবই আছে ওখানে তো ডুব জলও বোধহয় ছিল না"—

রাজীব বলিল—"আমি জানি পৃথার ও চিরকেলে অভ্যাস ছিল—সেইজন্য আমিও চুপ ক'রেছিলুম"—

সুরমা বলিল—"কি অভ্যাসের ছিরি তোমার পৃথা—রক্ষে কর! তা তোমার অনাছিষ্টি অভ্যাসগুলোর নোটিশ আগে থেকে দিয়ে রেখো আমাদের। ট্রেণ থেকে লাফিয়ে পড়ার অভ্যাস নেই তো?"

সকলে হাসিল—পৃথাও হাসিয়া বলিল—"আপাততঃ নেই, পরে হ'লেও হ'তে পারে"—

শুধু সুনীল হাসিতে পারিতেছিল না। সুরমার মনে হইল সুনীল ভয়ানক আঘাত পাইয়াছে, তাহা শরীরে অথবা মনে তাহা সে ঠিক বুঝিতে পারিল না। পৃথার কোন বিপদের আশঙ্কা সুনীলকে এ ভাবে ব্যথিত করিতে পারে যদি, তাহা হইলে সত্যিকারের দুঃখটা যদি আসে তখন? সুরমা খানিক ভাবিয়া পৃথাকে একটু বিদ্রূপ করিয়াই বলিল—"পৃথা, খুব বাহাদুরী দেখালে যা'হোক"—

পৃথা তাচ্ছিল্যভরে বলিল—"যদি মাঝ বিলে ঝড়ের সময় লাফিয়ে পড়তুম তাহলে বাহাদুরী হ'ত বৌদি।"

কর্ম্মচারীরা আয়োজন করিয়াছিল তাই সে রাত্রে সেখানে খাওয়া সারিয়া সকলে বজরায় আবার বাড়ীর সামনে নদীর ঘাটে যখন নামিল তখন রাত্রি ১০টা। কেহই কখনো বারোটার পূর্ব্বে ঘুমায় না। সুরমা তখনও লক্ষ্য করিতেছিল সুনীলের মুখে একটা বেদনার ছাপ সুস্পষ্ট। পৃথা তখন পাড়ার মেয়েদের লইয়া বসিয়া গল্প করিতেছিল। আর চলিয়া যাইবে বলিয়া যে যে উপস্থিত ছিল প্রত্যেককে কাপড় জামা ইত্যাদি মুক্তহস্তে দান করিতেছিল। আর সুনীল প্রশস্ত বারান্দায় একটা বেতের কৌচে শুইয়াছিল—আকাশে তখন একটুকরাও মেঘ ছিল না—চাঁদিনী আবার হাসিয়া লুটাইয়া পড়িয়াছে—ধরণীর সর্ব্বাঙ্গে। সুরমা ডাকিল—"সুনীল, কি হয়েছে তোমার?"

সুনীল একটা যন্ত্রণা সূচক শব্দ করিয়া বলিল,—"বৌদি, বড্ড লেগেছে।"

সুরমা চমকিয়া উঠিল বলিল—"লেগেছে? কোথায়? কখন? সেই সময়ে?"

সুনীল বলিল—"হ্যাঁ সেই সময়ে, যখনি জলে একটা কি পড়ায় সঙ্গে সঙ্গে তোমার চীৎকারে পৃথার নাম শুনেছি, তখনি আমি সব ভুলে গিয়েছিলুম, আর সেই সময়ে লাফ দেবার সময়ে এই পাশে খুব লেগেছে। এখনো ভয়ানক যন্ত্রণা হচ্ছে—"

সুরমা শশব্যস্তে বলিল,—"এতক্ষণ চুপ করে আছ বলনি? ডাক্তারকে ডেকে পাঠাই?"

সুনীল বাধা দিয়া বলিল,—"না, না বৌদি, বরং চুপ ক'রে এখানে বোস—আমি পৃথাকে জানাতে চাই না, আমার অনুরোধ পৃথাকে বলো না—সেই জন্যই এতক্ষণ এতটা যন্ত্রণা স'য়ে চুপ করে আছি।"

"কিন্তু তোমরা সকলে কি যে পাগলামি আরম্ভ করলে সুনীল, সব তোমরা পাগল দেখছি। অসুধ পত্র কিছু দেবে না? পৃথাকে বললে কি হবে?"

সুনীল বিমর্ষ ভাবে হাসিয়া বলিল—"অসুধ আমি নিজে খেয়েছি, একটু মালিসও করেছি—পৃথাকে জানাতে চাই না, কারণ সে ভয়ানক ব্যস্ত হ'য়ে পড়বে। দরকার কি? তাকে আমি কখনো কোন রকমে উদ্বিগ্ন বা উৎকণ্ঠিত করতে চাই না—সে তার আনন্দ নিয়ে থাক।—ওটুকু সেরে যাবে এখন—"

সুরমা ব্যথিত হইয়া বলিল—"কিন্তু সুনীল, সত্যি বড় দুঃখিত হয়েছি আমি। বেশী লেগেছে কি?"

আবার ম্লান হাসিয়া সুনীল বলিল "লাগাটা খুব বেশীই লেগেছে। তা হোক যে আনন্দ আজ পৃথা এ ছেলেমানুষী ক'রে পেয়েছে সে আনন্দ তার সবটুকু গভীর বিষাদে ডুবে যাবে সে যদি এ কথা শোনে—আর তার সেই আনন্দের জন্যই আমার এ আঘাত এতে সে যে ব্যথা পাবে—সে ব্যথা হবে আমার এই আঘাতের ব্যথার চেয়েও বহুগুণে বেশী—সে আমি সইতে পারবো না—বৌদি—সে ভালো থাক্—উঃ—"

সুরমা বলিল,—"আবার ব্যথা করছে ?"

"ব্যথা তো সমানে আছে—মাঝে মাঝে খুব বেশী টন্ টন্ করে উঠছে—"

"সুনীল তুমি যা বললে তার উপর আমার আর বলবার কিছু নেই—তুমি সুখী হও।"

সুনীল একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—"বুঝি বা আজ একেবারে ভাবের মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছি—কিন্তু এই যে প্রিয়জনের আনন্দে নিজের ব্যথাটা—এটুকু সওয়ার ভিতরে আমি যা আনন্দ পাচ্ছি—এই টুকুই মনে হয় আমার সফলতা। আরো, মনটা আমার জীবনে এমন হয়নি, তাই আমি বুঝতে পারছি না আমার কি হল !" খানিকক্ষণ আরো সে চুপ করিয়া রহিল—সুরমা শুব্ধ হইয়া চাহিয়া রহিল—বাহিরে যেখানে তখন বিশ্বপ্লাবী রজত-নির্ঝরের ধারায় সব সাদা হইয়া গিয়াছে। সুনীল আবার বলিল—"নৌকোয় বেড়িয়ে অবধি বার বার অনুভব করেছি—তোমাদের ছেড়ে—তোমাকে ছাড়ার একটা কি রকম অশান্তির ব্যথা, কিসের জ্বালা—যা আমি আর এর আগে কখনো কারো জন্য করিনি—কখনো পৃথা ছাড়া আর এমন ক'রে কারো জন্য ভাবিনি। পরশু দিন চলে যাবো—মাঝে মাঝে মনে করো—"

সুরমা গাঢ়স্বরে বলিল—"নিশ্চয় সুনীল —"

সুনীল আবার বলিল—"তবু—এই ব্যথার ভিতরও সেই আনন্দটুকু খুঁজে পাচ্ছি সুরমা—বৌদি—কারণ আমি জানি—জয় করেছি আমি নিজেকে—আর জয় করেছি—তোমাকেও—নয় কি ?" হয়তো করেছ সুনীল বুঝতে পারছি না ঠিক।

সুনীল এক হাতে আহত স্থান চাপিয়া ধরিয়া বলিল—"বুঝতে পারবে নিজের মনকে জিজ্ঞেস করে দেখো তোমার, আমার জন্য এতটুকুও সেখানে স্থান রেখেছো কিনা—যদি তাই হয় সুরমা তবে সব প্রলোভন জয় করার আনন্দের চেয়েও এ আনন্দ আরো বেশী লোভনীয়। আর কিছু চাই না শুধু ঐ টুকুই চাই—পারো তো চিরদিন তা সমান ভাবে দিয়ে যেও—উঃ—আমি শুই গিয়ে আর সইতে পারছি না।" সুনীল চলিয়া গেল—যন্ত্রনায় সে ঠিক চলিতে পারিতেছিল না—তাহার কাতরোক্তির সঙ্গে মিলিয়া গেল অদূরবর্ত্তিনী পৃথার স্বচ্ছ—সরল হাসি—

সুনীলের ব্যথা পরের দিনও কমিল না—তবু সে চুপ করিয়াছিল; তবু সে পৃথার সঙ্গে হাসিল কথা কহিল। ঘুণাক্ষরেও সে পৃথাকে কিছু বুঝিতে দিল না। তার পরের দিন তাহারা চলিয়া গেল। যাইবার সময়ে পৃথা বলিয়াছিল "বৌদি চল গোবিন্দকে প্রণাম করে আসি—" মন্দিরে গোবিন্দকে প্রণাম করিয়া পৃথা চরণামৃত ও চরণ তুলসী গ্রহণ করিয়া যখন সুরমাকেও একটা প্রণাম করিল—তখন—তাহার চোখদুটী কি জানি কোন বিদায়ের বিষাদ ব্যথায় সজল হইয়া উঠিয়াছে—সে মুখে কিছু বলে নাই, শুধু অন্তরের শুভ আশীর্ব্বাদ নীরবে—পৃথার উদ্দেশে ঢালিয়া দিয়াছে—অজস্র ধারে—

১৩

পৃথার ও সুনীলের যাওয়াটা এবারে খুব বেশী করিয়াই বাজিয়া রহিল সুরমার বুকে কাঁটার মত। সেবারে তাহারা গিয়াছিল আবার শিগগির ফিরিয়া আসিবার জন্য, এবারে সুরমা ঠিক সেই কথাই জিজ্ঞাসা করিতে পৃথা উত্তর দিয়াছিল—আর এবারে বোধ হয় শিগ্‌গির আসছি না বৌদি—এবারে সারা ভারত ঘুরবো ইচ্ছে, তারপরে ইউরোপ।"

কয়েকদিন সুরমার মন বড়ই খারাপ হইয়া রহিল। বিশেষতঃ গ্রামের মৌন শোভা, নিরুদ্ধ নির্জ্জনতা, শুব্ধ দ্বিপ্রহরে পাখীর উদাস কাকলী মাঝে মাঝে তাহাকে বড়ই ব্যথিত করিয়া তুলিত। পৃথা যাইবার পর মেয়েদের ভিড় ক্রমেই কমিয়া গেল। সুরমা তাহাদের সঙ্গে মিশিতে পারিত না ঠিক তাহার মতন করিয়া।—তবু সন্ধ্যাবেলা অনেকে আসিয়া জমা হইয়া পিসি-খুড়ীদের সঙ্গে গল্প করিয়া চলিয়া যাইত। সুরমা বড় সেদিকেও যাইত না—পৃথার মত তাহাদের লইয়া আনন্দ পায় না সে। আনন্দ তাহার স্বভাবজাত নয় তাহাকে তাহা খুঁজিয়া লইতে হয়, সৃষ্টি করিতে হয়।

রাজীবের সহিত তাহার মনের নিরস্বর ভাব ক্রমে বাড়িয়া উঠিতেছিল। যাহা প্রণবের আগমনে সম্মিলিত হইয়া গিয়াছিল তাহা বুঝি আবার স্খলিত হইতে বসিয়াছে। রাজীবের সঙ্গে সে কথা বলে, হাসে, হয়তো বা একটু বেশী

করিয়াই। কিন্তু যতই তাহার বাহিরের ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়া চলিল,—অন্তর তাহার ঠিক সেই পরিমাণে দূর হইতে দূরে সরিয়া যাইতেছিল। বাহিরের বিচ্ছেদ তাহার যে মনকে নিরবচ্ছ বন্ধনে অবিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছিল এতদিন, সে বন্ধন বুঝি তাহার টুটিয়া যাইবে এখন বাহিরের মিলন সংঘাতে। সংগুপ্ত মনোভাব তাহার সে ব্যক্ত করে না, কারণ সে বোঝে রাজীব তাহা জানিতে চায় না আর শুনিতেও চায় না।

সহের শেষ সীমা বুঝি হয় নিবৃত্তি—অথবা বিদ্রোহ। সুরমা বিদ্রোহী হইতে পারিল না, তাই সে বাছিয়া লইল নিবৃত্তির ভিতর তৃপ্তি—তারই ভিতর দুঃখের আনন্দ।

প্রণবকে মাঝে মাঝে রাজীব বাহিরে লইয়া যায় সেখানে তাহাকে বহুক্ষণ রাখিয়া আবার পাঠাইয়া দেয়—তাহার ক্ষুদ্র মুষ্টি ভরিয়া সে টাকা লইয়া ফেরে। এক একদিন? সুরমা বলে "অত টাকা ওর হাতে রোজ রোজ দাও কেন" রাজীব প্রণবকে আদর করিয়া বলে"আমি দিই না, প্রজারা তাদের ছোট্ট জমিদারকে নজর দেয়।"

হাতী চড়া আর নৌকায় বেড়ানো আর তাহার হয় না, সুরমা ভালবাসে না নিরর্গল উন্মত্ত জীবন। সে চুপ করিয়া একদৃষ্টে শুধু চাহিয়া বসিয়া থাকে সর্ব্বদা দূর হইতে দূরান্তরে, যেখান হইতে তাহার সমস্ত চিন্তা আবার প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসে তাহারই বুকে। নির্জ্জনতা তাহার ভাল লাগে, নিঃসঙ্গ দিনগুলি সে উপভোগ করে, চিন্তার ঘূর্ণিচক্রগুলি ঘুরিয়া ঘুরিয়া কত গভীর হইয়া কোন পাতালপুরীতে নামিয়া গিয়া তন্দ্রালস রাজপুত্রের শিয়রের সোণার কাঠি রূপার কাঠি লইয়া নাড়াচাড়া করিয়া জাগাইয়া তুলে, সুপ্ত তাহার বাসনাগুলিকে,—হাজার বাতি জ্বালিয়া সে বাসর সাজায়, হাজার ফুলের কেয়ারী বিনাইয়া, স্বপ্নফুল ফুটাইয়া তুলে।

সুনীলের কথা মনে হয়। গভীর অতলস্পর্শী তাহার প্রাণ, নিরভ্র আকাশের মত নির্ম্মল উদার। তাহার প্রতি সুরমা একটা সৌহার্দ্দ্য, বন্ধুত্ব, প্রীতি অথবা আরো কিছু অনুভব করে বুঝি—যাহা সে নিজের কাছে নিজেই প্রকাশ করিতে শঙ্কিত হয়। সুনীলের নীলরূপ তাহাকেও আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল বুঝি—কি এক—কি এক স্বপ্নময় রঙিন আবেশে, সে—সে ঘুম তাহার ভাঙিতে চায় না, তাহাতেই ডুবিয়া থাকিতে ভালবাসে—

অনেকদিন পরে সে সেদিন বিজয়ের নিকট হইতে এক পত্র পাইল। তাহাতে সে লিখিয়াছে অনেক খবর,—লিখিয়াছে তাহার নিজের কথা প্রথমে ;—

"আমি অনেক জায়গা ঘুরে আজ দিন তিনেক হ'ল এখানে ফিরে এসেছি। এখানেও বেশীদিন থাকতে পারবো না। চারিদিক থেকে কর্ত্তব্যের ডাক শুনতে পাই, যাওয়া না যাওয়াটা নিজের ইচ্ছার উপর হ'লেও, না গিয়ে পারি না, নিজের কাছেই নিজে লজ্জিত হই।

পূর্ব্ববঙ্গে বন্যাপ্রপীড়িতদের সাহায্য করতে গিয়েছিলুম, সেখানকার অবস্থা একটু ভাল দেখে এসেছি। মনটা বিশ্রাম চায় না, তবুও মাঝে মাঝে ক্লান্ত মাথাটা আমার আশ্রয় নেবার জন্য একটা শান্তিময় উপাধান খোঁজে—বই কি! নেই সুরমা, আমার জন্য কিছু নেই। না থাক্ তাতেও দুঃখ নেই। ভুলতে না পারাটাই জগতে সব চেয়ে বড় শক্ত, সেই জন্যই আমার কষ্ট—নইলে আর অন্য কোন কষ্ট বড় নেই।

কণিকার কথা কিছু বলি। শরত একেবারে বদলে গেছে। কণিকার দৃপ্ত শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ তুলে সে নিজেকে একেবারে স্বাধীনতা দান করেছে। কণিকা এখন হয়েছে—অত্যাচারিতা, আর শরত হয়েছে অত্যাচারী। প্রথমে কণিকাকে সুখী দেখে আমিও বড় সুখী হয়েছিলুম কিন্তু এখন কণিকার অবস্থা অন্য রকম হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে যাই, কিন্তু গিয়ে শুধু শুনতে হয় কণিকার অনর্গল বক্তৃতা,আর শরতের অফুরন্ত অন্যায় অত্যাচারের কাহিনী। তখন শরতকে সহানুভূতি দিতুম—এখন তা দি কণিকাকে। মানুষের দিন সমান যায় না সুরমা—।

সর্ব্বশেষ বলি মীরার কথা।

তুমি যা বলে গেছ, হয়তো তা ঠিক। কিন্তু কেন বলতো? অনুপযুক্ত যে তার জন্যই ফুটে আছে স্বর্গের এ পারিজাত ফুল। আমি ছুঁতে পারবো না। ভরসা হয় না, ভয় হয়। তা ছাড়া সাজি আমার যে ভ'রে রয়েছে, আমারি চিরপ্রিয় ফুলে ফুলে। আর কেউ ভাগ্যবান এসে মীরার জীবন সফল ক'রে তুলুক, তুমি পারতো সেই উপদেশটা দিও মীরাকে। কুশল দিও।

সুরমা বিজয়ের চিঠি পাইয়া অবাক হইয়া ভাবিতেছিল কণিকার কথা! কণিকা কি অতিরিক্ত করিতে গিয়া তাহার সমস্ত ক্ষমতা হারাইয়া বসিল আজ শরতের উপর? শরত কেন এমন হইল? মনে পড়ে তাহার চিঠি আসিবার আগের দিন হঠাৎ শরত আসিয়া কতগুলা কথা বলিয়াছিল—তার ভিতর সে বলিয়াছিল—"মিসেস বোস—আপনার কাছ থেকে যখন এতটুকু কিছু পেলুম না, যা নিয়ে আমি হয়তো জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারতুম, তখন আর কেন? অদৃষ্টের হাতেই নিজেকে ছেড়ে দি তা হলে।—"সেদিন সে দেখিয়াছিল তাহার মুখে চোখে উচ্ছৃঙ্খলতার পূর্ব্ব ছবি। কিন্তু সেদিন সে তাহাকে বুঝিতে পারে নাই, সেদিন সে তাহার কথার উদ্দেশ্য ধারণা করিতে পারে নাই। সে ভাবিয়াছিল শরতের বুঝি ইহা স্বভাব সিদ্ধ নিরীহভাব প্রসূত উক্তি মাত্র। কিন্তু আজ সে বুঝিল শরত সেদিন মরিয়া হইয়াই বলিয়াছিল তাহা। সেই শরত—আর এই! কণিকার জন্য তাহার দুঃখ হইল। কণিকাই কি অন্যায় করিয়াছে? না—সে হয়তো করে নাই। শরতের প্রকৃতিগত অনর্গল উচ্ছৃঙ্খলতা কণিকার শাসন মানিয়াই এতদিন প্রকৃতিস্থ হইয়া ঘুমাইয়াছিল বুঝি, কিন্তু আজ তাহা এমন ভাবে জাগিয়া উঠিয়াছে যে আর বুঝি কাহারও সাধ্য নাই তাহাকে নিবৃত্ত করে—কণিকারও নাই। কণিকার অন্যায় নয়—তবে তাহার দুর্ভাগ্য যে সহজ লভ্য জিনিষটাকেই জোর করিয়া আদায় করিয়া সে নিজেকে সৌভাগ্যের চরম শিখরে বসাইয়া রাখিয়াছিল এতদিন, আর আজ তাহার দাতার সামান্য খেয়ালে তাহা ধূলিসাৎ হইয়া তাহাকে একেবারে ধূলায় বসাইয়া দিয়া গেল। কিন্তু কণিকার অন্যায় না হইলেও ভুল হইয়াছিল নিশ্চয়। সে পারিত হয়তো শরতকে বাঁধিতে তাহার কোমলতা দিয়া, তাহা না করিয়া সে কঠিনতার আশ্রয় লইয়া, নিজের সর্ব্বসুখ হারাইয়া শরতকে ঠেলিয়া দিল কোন অনির্দ্দিষ্ট ভবিতব্যের অতল গর্ভে? সে একদিন ভাবিয়াছিল "বেচারা শরত!" আজ ভাবিল "বেচারা কণিকা!" স্ত্রীজাতিই অন্যায়াচারিতা জগতে। তাহার ক্ষমতা নাই, বল নাই। পুরুষ ইচ্ছা করিয়া দয়া করিয়াই যেন তাহাকে দেয় তাহার সামান্য অধিকারটুকু লইয়া শুধু খেলা করিতে, তার পরক্ষণেই ইচ্ছা হইলেই, সমস্ত সত্ব কাড়িয়া লইয়া, তাহাকে বুঝাইয়া দেয়, মর্ম্মে মর্ম্মে যে তাহার সত্যই কোন অধিকার নাই, নিষ্ক্রিয় হইয়া থাকিতে হইবে তাহাকে তাহারই ইচ্ছার অনুসারে! সুরমা আবার ভাবিল—"বেচারা কণিকা!"

পরের ভাবনা ভাবিয়া সুরমার কিছুদিন কাটিয়া গেল। তারপরে একদিন সে বিজয়কে উত্তর লিখিল—প্রথমেই সে লিখিল কণিকার কথা। নানা যুক্তি তর্ক ভরাইয়া দিয়া সে লিখিল—"কণার কোন অন্যায় হয়নি বিজয়। শরতের এই উচ্ছৃঙ্খলতাই বোধ হয় ছিল তার মজ্জাগত স্বভাব, সেটাকেই কণিকা শাসন দিয়ে চেপে রেখে হয়তো ভালই করেছিল, তবু কিছুদিন সে নিজেকে সুখী অন্ততঃ এইটুকু মনে করতে পেয়েছিল, এইটুকুই তার লাভ। সংসারে আমাদের কিসের জোর আছে, আর কিসেরই বা দাবী আছে? কিছু নেই! তোমাদের সে অন্যায় অবিচার গুলো আমি আর বলতে চাইনা কারণ ও সব বলা হয়ে গেছে অনেকবার অনেক দিক দিয়ে। বলা হয়েছে কিন্তু কাজে করা হয়নি কিছু। শুধু মুখে চীৎকার করলে হয় না বিজয়। আরো কি জানো? তোমরা আমাদের পেয়ে বসেছ শুধু আমাদের আর্থিক সমস্যার হর্ত্তা-কর্ত্তা বলেই—নয় কি? নইলে আজ কণার নিজস্ব কিছু থাকলে সে হয়তো আজ শরতের সঙ্গে এক বাড়ীতে কখনো বাস করতো না। আমাদের মেয়েরা পরের দোরে দাসীর অধম হ'য়ে থাকবে সেও ভাল, কিন্তু যদি তারা সদুপায়ে উপার্জ্জন করতে যায়, তোমরা তাদের নিন্দে করবে—তাও যেমন তেমন নিন্দে নয়। কারণ তোমরা চাও তাদের নিঃসহায় নিঃসম্বল, ক'রে দিয়ে তাদের উপর প্রভুত্ব করতে। না? আজ আমার শুধু মনে হচ্ছে—যদি কণা স্বামী-ত্যাগ করতে পারতো! হয়তো তুমি বলবে তাহলে কণাই কি ঠিক করেছিল? প্রথমে শরতকে একেবারে হাতের পুতুল গ'ড়ে তুলবার চেষ্টা ক'রে? হয়তো বলবে স্বজাতির প্রতি সমবেদনায় আজ আমি তার পক্ষ নিচ্ছি, কিন্তু তা নয়। শরত এতদিন কণাকে মেনে চলেছিল কারণ সে তার ভিতর নিজেকে ভুলিয়ে রাখবার [illegible] কোন আনন্দ খুঁজে পেয়েছিল, তাই সে [illegible] কিছুই

ক'রে সহ্য করে নিত। আজ তার সে সখ মিটে গিয়ে তার সত্যিকারের স্বভাব প্রকাশ পেয়েছে, আর কণার এমন কোন মোহ আর নেই হয়তো যা দিয়ে সে তাকে ধ'রে রাখতে পারে। স্বামীকে নিজের ক'রে রাখতে গেলে বহুরূপী সাজতে হয় স্ত্রীদের, নিত্য নূতন আকর্ষণ খুঁজে বের করতে হয়। এমনি জীবন! যাক্—শরত আবার কণার কাছে ফিরে আসুক এই আমার একান্ত কামনা,—কণাকে বোল পারে তো আমাকে চিঠি লিখতে।

তোমার কথা বলি, কেন মিছিমিছি নিজেকে কষ্ট দিচ্ছ বিজয় ? আমি বলি উপাধান তোমার রয়েছে সুন্দর শুভ্র, আর কেন ? নিজেকে অনেক কষ্ট দিয়েছ, এবারে শ্রান্ত মাথাটাকে বিশ্রাম দাও। সাজির ফুল তোমার বাসি হ'য়ে শুকিয়ে গেছে, ওসব ফেলে দাও। দেবতা প্রেরিত স্বর্গের পারিজাত আশীর্ব্বাদের মতন মাথায় ক'রে নাও—দেখবে জীবন তোমার সার্থক হয়ে যাবে। মীরাকে আমি অন্যভাবে জীবন সফল করবার উপদেশ দিতে পারবো না, কারণ—যতটা আমি তার দেখেছি, তাতে বুঝেছি—পারিজাত বরং ব্যর্থজীবন ব'য়ে শুকিয়ে ঝ'রে মাটীতে প'ড়ে ধূলায় মিলিয়ে যাবে তবু অন্যের সাজিতে শোভা পাবে না। ইতি—

দিন কাটিয়া যাইতেছিল। ইতি মধ্যে পূর্ব্বপুরুষানুক্রমিক প্রথামত পূজা হইয়া গেল। একদিন রাজীব বলিল—"সুরমা—এবারে কলকাতায় যাবে ?"

সুরমা বলিল—"না, আরো কিছুদিন থাকবো।"

"পাড়া গাঁ এতোই ভাল লাগলো ?"

"ভালো না লাগারও তো কোন কারণ দেখছি না। বেশ লাগছে"—

"একেবারে একলা যে তোমার কোন বন্ধু বান্ধবও নেই, নিশ্চয় খুব নিঃসঙ্গ বোধ হয়—না ?"

তা বোধহয় মাঝে মাঝে, কিন্তু তবুও ভাল লাগে, বইটই প'ড়ে বেশ থাকা যায়"—

"আমার যে একবার কলকাতায় যাবার দরকার আছে, তাই জিজ্ঞেস করছিলুম তুমি যাও তো চল'—

"তোমার দরকার থাকে তুমি যাও, কিন্তু আমার দরকার নেই আমি থাকি"—

"কিন্তু তোমাকে একলা ফেলে যাবো ?"

"একলা আবার কি ? অত লোকজন কর্ম্মচারী মালখানা ভর্ত্তি বরকন্দাজ বন্দুক তবু একলা বলছ ?"

"না সে কথা বলছি না, তবে সঙ্গী নেই একটীও"—

"তোমার যাওয়া নিয়ে কথা তুমি যাও, তোমার অনুপস্থিতিতে আমি সঙ্গীর অভাব বোধ মোটেই করবো না, কারণ তুমিই বা কোন আমার সঙ্গী হ'য়ে এখানে থাকো আমার কাছে ?"

রাজীব হাসিল বলিল—"তাতো থাকি না, সেখানে তোমার বন্ধুরা আছেন সেইজন্যই বলছিলুম—তবে থাকতে চাও থাকো"—

"আমার কেউ বন্ধু নেই, কারো জন্য আমার অভাবও নেই। তুমি ইচ্ছা হয় স্বচ্ছন্দে যাও—"

"তোমার আদেশই মেনে নিলুম, তবে কালকেই আমি চ'লে যাই ?"

"আদেশ ?"

সুরমা একটু তীক্ষ্ণস্বরেই বলিল—"আদেশ ? আমার ? যাক্—ফিরবে কদ্দিনে ?"

"কদ্দিনে ?" একটু ভাবিয়া রাজীব বলিল—"ফিরবো শিগ্‌গিরই ধর দিন পনেরো পরে। আপত্তি আছে ? না, তুমি কবে ফিরতে বল ?"

"আমি কিছু বলি না। তোমার যখন খুসী ফিরে এসো।"

রাজীব মৃদু হাসিয়া বলিল—"সুরমা, চল আজ কোথাও বেড়িয়ে আসি—তুমি আর আমি"—

"কোথায় ?"

"যেখানে তোমার খুসী।"

"নাঃ ভাল লাগে না, বাড়ীতেই থাকতে ভাল লাগে"—

"আচ্ছা তবে এসো একটু 'শেলী' পড়ি—কেমন ? অনেকদিন পড়িনি সুরমা।"

"কি হবে কবিতা প'ড়ে ?" তখন রাত প্রায় ১১টা। "তবে প'ড় না—" অন্দর মহলের একটী ঘরে রাজীব একটী বড় সোফার উপর অলসভাবে শুইয়া বলিতেছিল—"তবে প'ড় না।" ঘরটী সুরমার। সারাদিন সে প্রায় এই ঘরেই কাটায়। অনেকগুলি সেলফ ভর্ত্তি বই। একটী

দিকে একটী লিখিবার টেবিল, দুইটী সোফা চেয়ার কয়েকটী একদিকে—আর একদিকে একটী পুরু গদি আঁটা কাঠের উপর কারুকার্য্য শোভিত চৌপায়া—সুরমা তারই উপর বসিয়াছিল। "প'ড়না—" বলিয়া রাজীব একটু পাশ ফিরিল "ক'টা দিন ধ'রে অনেক কাজের চাপ পড়েছিল। সমস্ত হিসেব পত্র দেখা, কাছারী গুলো দেখা,—ম্যানেজার কিছুদিন ছুটী নিয়েছে তার মেয়ের বিয়ে না কি—কে জানে,—ভাবলুম নিজে একটু দেখে নি—ভয়ানক খাটুনী। সুরমা তুমি আমার জন্য একটু সহানুভূতিও করনা"—

সুরমা মৃদু হাসিল—"বই আনবো—শুনবে ?"

"না থাক্, একটু বাজাও না সুরমা—আজকাল সেতার বাজাও না ?"

"—ও অভ্যাস চলে গেছে, সেতারের তারেও মরচে ধরেছে—"

"বেশ বাজিও না" বলিয়া রাজীব খানিকক্ষণ চোখ বুজিয়া শুইয়া রহিল, তারপরে বলিল—"পৃথার চিঠি পেয়েছ ?"

"না সে চিঠি লেখে না কখনো। তুমি পেয়েছ ? সুনীল তোমাকে লেখেনি ?"

"না"—

"দুজনেই সমান। সুরমা কাল যাচ্ছি, এই যে ক'দিন দেখবে না, তোমার মন খারাপ করবে না ?"

"নাঃ মন খারাপ আবার কি ?"

"বেশ ভালো, মন খারাপ না হওয়াই ভালো, বাড়ীতে রইলে যখন, একটু চারিদিকে খোঁজ খবর রেখো। এষ্টেটের কাগজ পত্রগুলো দেখো আমার হ'য়ে সব কোরো, তোমাকে সে ক্ষমতা আমি একেবারে লিখে দিয়েছি।

"অতটা বিশ্বাস করলে কেন ?"

"তা আমি বিশ্বাস করেছি—অত নীচ আমাকে নাই বা ভাবলে—যে আমি তোমাকে এ-বিষয়ে অবিশ্বাস করবো।"

"আর অন্য বিষয়ে অবিশ্বাস করবে তাহলে ?"

"তা করতে পারি, জানো সুরমা অবিশ্বাসটাই বন্ধনটাকে আরো দৃঢ় করে তোলে—অথবা বন্ধনটা এখনো দৃঢ় আছে তা বুঝিয়ে দেয় যতদিন অবিশ্বাস থাকে—অনেকে একে খারাপ বলে আমার মনে হয় এটা থাকা ভাল। সন্দেহ অবিশ্বাস—বেশ নতুনত্ব আনে—নয় কি ?"

"এতদিন এসব চলেছে কি ক'রে আজ যে হঠাৎ একেবারে আমার উপর অতবড় ভার দিলে ?"

"ভাবলুম ও থাক্ একটা দিয়ে রাখি, কি হবে, তুমি তো আর পালিয়ে যাচ্ছ না—জানো তোমাকে আমি একেবারে "প্রোপ্রাইটারী রাইট দিয়েছি !"

"তোমার রাইট তুমি রেখে দাও ও দিয়ে আমার কোন দরকার নেই !"

"তোমার না থাক্ আমার আছে। একটু পড় না সুরমা বাতিটা নিবিয়ে দাও,—টেবল ল্যাম্পটা জ্বালিয়ে দাও,—পাখাটা আর একটু কমিয়ে দাও"—

সুরমা মৃদু হাসিয়া বলিল—"আজ যে বেজায় হুকুম করছ—যাবে ব'লে এতটা আধিপত্য নাই বা খাটালে"—

রাজীব অলস চক্ষু মেলিয়া বলিল—"কাছে আর একটু এগিয়ে এসে বোস—ওখানে না এই যে পাশে—ঐ জানলাটা ভালো ক'রে খুলে দাও না,—গাঢ় নীল আকাশে তারাগুলো বেশ লাগে দেখতে—সুরমা, পড়—"

"তোমার হুকুমগুলো পালন করি আগে" একটু পরে রাজীবের একেবারে কাছে একটা নীচু গদি মোড়া চেয়ারে বসিয়া—টেবিল ল্যাম্পের আলোয় সুরমা পড়িতে লাগিল। ওপাশের জানালা দিয়া শির শির করিয়া মৃদু বাতাস বহিয়া আসিতেছিল, সুরমার কপালের অলকগুচ্ছ আদর করিয়া নাড়িয়া দিয়া, বাগান হইতে গোলাপের গন্ধ বহিয়া আনিয়া, তার সঙ্গে রাজীবের অঙ্গসৌরভ মিশিয়া তাহাকে আবিষ্ট করিয়া তুলিল—সে পড়িল—

"The trumpet of a prophecy ! O, wind,
If winter comes, can spring be far behind ?"

রাজীব অবশ হাতে সুরমার একটী হাত টানিয়া লইয়া বলিল—"কথাটী সত্যি সুরমা—If winter comes, can spring be far behind ?—শীত এলে আর কি বসন্ত দূরে থাকতে পারে ? মানুষের জীবনেও শীত এলে বসন্তের আর দেরী থাকে না। আমার জীবনে জীবন

ভরা শীত চলে যাচ্ছে সুরমা—তাই আশা হয় বসন্ত হয়তো আসবে—"

"তোমার জীবনে শীত কিসের? আমি জানি চির-বসন্তের মদির মলয় তোমার জীবনে নিত্য খেলে যায়, তোমার শীত কিসে?"

"তুমি বুঝবে না, তুমি জানো না, কিন্তু আমি জানি, আমারো জীবনে সব শীত সফল ক'রে দিয়ে বসন্ত আসবেই,—আরো একটু কাছে এসো সুরমা,—"

সুরমা আরো একটু—আরো একটু সরিয়া গেল—

১৪

সুরমার এক বছর কাটিয়া গেল—রাধানগরেই। রাজীব ইতিমধ্যে দুই তিনবার কলিকাতা ঘুরিয়া আসিয়াছে। পৃথা চিঠি লিখিয়াছে রাজীবকে ও তাহাকে এতদিন পরে। সে লিখিয়াছে—

"বৌদি, সুনীল আর আমি আকাশ পথে ইউরোপ যাবার যোগাড় কচ্ছি। দাদাকে জিজ্ঞেস ক'রে জানাও তোমরা কি ভাবে যাবে?"

সুরমা রাজীবকে জিজ্ঞাসা করিলে রাজীব বলিল, "তুমি এরোপ্লেনে যেতে পারবে না হয়তো সুরমা,—তা ছাড়া প্রণব আছে। আমরা জাহাজেই যাবো।"

সুরমা বলিল—"তোমার মন খারাপ হবে না?" রাজীব একটু বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কেন?"

সুরমার মুখে কি একটা কথা আসিয়া বাঁধিয়া গেল। সে কিছু বলিল না। রাজীব বলিল—"এবারে সব কাজ কর্ম্ম শেষ করে বেশ একটু অবসর পাওয়া গেছে—সেইজন্য কিছুদিন বেশ নিশ্চিন্তে বেড়িয়ে আসা যাবে—নয়?—"

সুরমা শুধু বলিল—"হুঁ"—

নতুন দেশ দেখার আনন্দ ও নেশা সুরমাকে পাইয়া বসিল। সে "ম্যাপ" লইয়া ভূগোল লইয়া সমস্ত দেশগুলা কোথায় কোনটা বার বার করিয়া দেখিত পড়িত আর রাজীবকে প্রশ্নে প্রশ্নে বিরক্ত করিয়া তুলিত। একদিন সে বলিল—"দেখো যাবার আগে কলকাতায় গিয়ে কিন্তু আমি সকলের সঙ্গে দেখা ক'রে আসবো—আর একবার কালীগঞ্জে যাবো বাবা মার সঙ্গে দেখা করতে—কেমন?"

রাজীব সুরমাকে আদর করিয়া বলিল—"বেশ তো সুরমা যেও—"

অনেক দিন পরে সে বিজয়ের চিঠি পাইল—সে লিখিয়াছে—"সুরমা, সাজি আমার বাসিফুলেই ভরা থাক—পারিজাত স্বর্গের জিনিস, তাতে আমার কোন প্রয়োজন নেই।

শরত দিনকে দিন এগিয়ে যাচ্ছে একেবারে ধ্বংসের দিকে। কণিকাকে বলেছিলুম তোমাকে চিঠি লিখতে, কিন্তু সে বলেছে তুমিই তার সব দুঃখের মূল। এর পরেও তুমি তার কাছ থেকে চিঠি পেতে চাও? কেন সে একথা বলে? আমি কিছু জানিনা, আর তোমাকেও এ বিষয়ে আমি জিজ্ঞাসাও কিছু করবো না তুমি কি ক'রে কণিকার দুর্ভাগ্যের সূচনা করে দিয়েছ। তবে শুধু এইটুকু বলবো যে তোমাকে আমি সে ভাবে কল্পনা করতে পারিনা। আর কণার কথাও আমি বিশ্বাস করিনি, কারণ সন্দেহ অন্ধ। হয় তো তার ভুলও হ'তে পারে।"

সুরমা চিঠি পাইয়া শুম্ভিত হইয়া গেল। কণিকা বলিয়াছে সেই তাহার দুঃখের মূল। এই একটি কথায় কণিকা তাহার মাথায় কত বড় কলঙ্কের বোঝা তুলিয়া দিয়াছে, তাহার ভার সে হয়তো উপলব্ধি করিতে পারিতেছে না। হয়তো সে আরো দশজনকে এই কথাই বলিয়াছে। এই কি বন্ধুত্ব, এই কি সখীত্বের প্রীতি? সুরমা স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল বিজয়কে সে কি লিখিবে। উত্তর তাহার কিছু দিবার নাই। দোষ তাহার না থাকিলেও সে যে পরোক্ষভাবে দায়ী শরতের এ অধঃপতনের জন্য—এ কথা সে কিছুতেই ভুলিতে পারে না যে। তাহার কাছে বিফল হইয়া গিয়াই শরত যে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া দিয়াছে তাহার বন্ধনের পাষাণ ঘের সে জানে। কিন্তু তবু তাহার কোন দোষ নাই—একথা কণিকা কিছুতেই বিশ্বাস করিবে না—আর সকলে বিশ্বাস করিলেও; বিশেষতঃ সেই দিনের সেই ঘটনার পর। তবুও কণিকার প্রতি সে কোন অন্যায় করে নাই—এইটুকুই তাহার পক্ষে যথেষ্ট সান্ত্বনা।

সে বিজয়কে সেদিন উত্তর লিখিল। "বিজয়, তোমার উপর আমি রাগ করবো। অত বাসি ফুলে সাজি ভ'রে

রেখোনা, প'চে দুর্গন্ধ বেরোবে। মীরার সুন্দর জীবনটা তুমি কোন রকমেই ব্যর্থ ক'রে দিতে পারবে না—তোমার খামখেয়ালী করে। আমি শিগ্‌গির আসছি—এসে তোমার সঙ্গে বোঝা পড়া করবো।

কণিকার কথায় সত্যি বড় মর্ম্মাহত হলুম। যদি আমাকে এতদিন জেনে শুনেও আমার উপর তার এই ধারণা হ'য়ে থাকে—, তবে বেশ তাই হোক—আমিও তাই মেনে নিলুম—তোমারও যা ইচ্ছা হয় বুঝে নিও,—ঠিক তোমারি কথাগুলো আবার তোমাকেই বলি—তুমি যা বুঝেছ বোঝ নিজের কোন বিষয় তোমার কাছে আমি জাহির করবো না। এই এপ্রিলে চললুম সাগর পারে। মীরাকে আমার ভালবাসা দিও। ইতি।"

কয়েকদিন হইতে সুরমার শরীর একটু খারাপ হইয়াছে। প্রথম হিমের শীতের বাতাস তাহার সহ্য হইতেছিল না, সেইজন্য তাহার রোজ একটু জ্বর ভাব হইতেছিল। সে রাজীবকে কিছু বলে নাই নাই—নিজেই সামান্যভাবে অসুধ ও পথ্য করিল।

সেদিন সে তাহার বসিবার ঘরে অনেকক্ষণ ধরিয়া প্রণবকে লইয়া খেলা করিতেছিল। তখন বেলা ৫টা। অস্তমান সূর্য্য পশ্চিম আকাশে বিশ্রামের জন্য শয্যা বিছাইয়াছে—নদীতে পাল তুলিয়া কতগুলি নৌকা যাইতেছে—চারিদিক নীরব শুধু অদূরে গাছের উপর একটী বিরহী ঘুঘু তিন চার দিন ধরিয়া ক্রমাগত আর্ত্তনাদ করিতেছিল—কয়েকদিন পূর্ব্বে তাহাদের একটী দরোয়ান একটা ঘুঘু মারিয়া আনিয়াছিল—তাহারই প্রিয়া হারা বিরহী বঁধুর এ নিদারুণ মর্ম্মন্তুদ বিলাপ। কয়েকদিন হইতে শুনিয়া শুনিয়া সুরমার মন অত্যন্ত বিষণ্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, তাই সে বারণ করিয়া দিয়াছে আর যেন কখনো কেউ ঘুঘু না মারে। কোমল প্রাণ প্রেমিক তাহারা বিচ্ছেদ সহিতে পারেনা—বা প্রণয়ীর স্মৃতিও ভুলিতে পারে না—তাহার অদর্শনে তাহারই উদ্দেশে কাঁদিয়া কাঁদিয়া ফিরে তাহারা আকাশ বাতাসকে কাঁদাইয়া, তাহাদের ব্যথাভরা বিরহ গানে, তারপরে তাহারই ছবি ক্ষুদ্র বুকে ধরিয়া বুঝি একদিন ধূলায় লুটাইয়া পড়িয়া মরণকে সার্থক করিয়া তুলে।

প্রণব এখন হাঁটিতে পারে। আধ আধ কথা বলে। "মা" বলিয়া সুরমার কাছে ছুটিয়া গিয়া তাহাকে মাতৃত্বের মহিমায় মণ্ডিত করিয়া পুলকিত করিয়া তুলে। সামনে আয়া বসিয়াছিল। প্রণব সমস্ত ঘরময় ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছিল, আর মাঝে মাঝে মায়ের কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া মায়ের বুকে মুখ লুকাইয়া আয়ার সঙ্গে লুকাচুরি খেলিতেছিল। তাহার হাসির ও অবোধ্য কথার কাকলীতে গ্রাম্য অপরাহ্নের শুষ্ক বিষণ্ণতা সভয়ে যেন সরিয়া যাইতেছিল—দূরে দূরে। একটু পরে সুরমার আদেশে আয়া তাহাকে লইয়া বাহিরে বেড়াইতে চলিয়া গেল।

ঠিক এই সময়ে তাহাদের ডাক আসে। গ্রাম্য ডাকঘর তাহাদের বাড়ীর বেশীদূরে নহে। এ দিকে ডাক একবার আসে একবার যায়। ঠিক এই সময় সূর্য্য যখন ঠিক ঐখানে গিয়া থামিয়া যায়, রৌদ্রের কিরণ যখন বড় বড় গাছের ঘন পাতার অন্তরাল হইতে, চুরি করিয়া ঠিক ঐ মাটির উপর সন্তর্পণে নামিয়া আসে, দূর বনের পদতল যখন ছায়াঞ্চলে আবরিত হইয়া যায়, ঠিক সেই সময়ে তাহাদের ডাক আসে। সুরমা ভাবিতেছিল কত কি বহিয়া আনে তাহা, কত সুখের ও দুখের বারতা, কত উজ্জ্বল, বিবর্ণ মলিন ছবি—কে জানে? ডাকওয়ালা আসে অলস চরণে মন্থরগতিতে, মাঠের মধ্য দিয়া ডাকের থলি কাঁধে ঝুলাইয়া।

সুরমার মাথা ধরিয়াছিল, ডাক আসিয়াছে—তাহার চিঠিগুলি আনিয়া দিয়াছে দাসী,—সে একবার স্মেলিংসল্ট শুঁকিয়া, গায়ে একটী ভারী কাপড় জড়াইয়া ডাক দেখিতে বসিল।

অন্য চিঠিগুলি পড়িয়া সে শেষ চিঠিখানি খুলিল। সুনীল লিখিয়াছে—এতদিন পরে। যাইবার পরে এই প্রথম তাহাকে চিঠি লিখিয়াছে সে। সুরমা প্রথমে লিখিয়াছিল—কিন্তু তাহার কোন উত্তর পায় নাই, তাই সে অভিমান করিয়া আর কোন চিঠি লেখে নাই, বা পৃথার চিঠিতেও তাহার কোন উল্লেখ করে নাই। সুরমা সাগ্রহে পড়িতে লাগিল—কিন্তু পড়িতে পড়িতে [illegible]

মান অভিমান এক মুহূর্ত্তে দূরে সরিয়া গিয়া সমস্ত বুক ভরিয়া উঠিল,—অব্যক্ত যন্ত্রণা ও দুঃসহ জ্বালা।

সে লিখিয়াছে ;—

"তোমার চিঠি পেয়েছিলুম। তার উত্তর না পেয়ে তোমার প্রতি আমার অমনোযোগিতা বা তাচ্ছিল্য ব'লে যদি তুমি ধ'রে নিয়ে থাকো তাহলে তোমার ভুল হয়েছে। কারণ তুমি জানো আমি চপল নই—। মনের যে ভাব নিয়ে এবারে আমি ফিরে এসেছি তা ঠিক তেমনি আছে, অথবা হয়তো তার চেয়েও বেশী হয়েছে,—সেই জন্যই তোমাকে তখন চিঠি লিখতে সাহস করিনি—ভয় হয়েছিল পাছে নিজেকে সংযত করতে না পেরে অন্যায় কিছু প্রকাশ করে ফেলি।

তবে আজ লিখছি কেন? কারণ মনে হয় আমার ভিতরে অনেকখানি আঘাতই লেগেছিল সেদিন। ক্রমে ক্রমে তা বেড়েই যাচ্ছে—শরীরও ভেঙ্গে পড়েছে—মনে হয় পৃথাকে আর লুকিয়ে থাকতে পারবো না বেশীদিন। গোপনে ডাক্তার দেখিয়েছি তারা বলে "হার্টের" অবস্থা ভাল নয়। সমস্ত বুক জুরে ব্যথা—ঠিক হার্টেই ব্যথা—বড় যন্ত্রণা হয়।—একসঙ্গে আমার শরীর ও মন ভেঙ্গে দিয়ে এ জীবনটাকে নিঃশেষ করে দিতে এসেছে সব রকমের আঘাত—কোন—তা বুঝতে পারছি না। মাঝে মাঝে মনে হয় যেন বড় শিগ্‌গির সব শেষ হ'য়ে আসছে। আমি বেঁচে থাকতে চাই—জীবন চাই সুরমা। যদি বেঁচে থাকি তবে যে প্রলোভনকে জয় করে এসেছি এত দিন সেই জয়ের গৌরব নিয়ে আর বুঝি তৃপ্ত থাকতে পারবো না—মন যেন চায় একবার পরাজিত হ'তে। ক্লান্ত দেহ মন আশ্রয় চায়। আর যুঝে উঠতে পারছি না। তার চেয়ে মরা ভাল নয় কি?—

দিনকে দিন বড় দুর্ব্বল হয়ে পড়ছি। প্রায় রাতদিন শুয়ে থাকি—পৃথা অলস বলে ঠাট্টা করে—তবু তাও ভালো। সে না জানুক। যদি শেষ হয়েই যায় সব, তবে আর লুকোতে পারবো না তো—সব শক্তির বাইরে চলে যাবো তখন—তখন তাকে দেখো ওরই জন্য ভয় হয়।

রাজীবকে প্রণবকে সর্ব্বশেষ তোমাকে দেখতে ইচ্ছে করে। ধা ইউরোপ যাবার আয়োজন করছে—কিন্তু আমি কোন যাত্রার আয়োজন করছি—তা জানেন ভগবান। বড়—তাই আশীর্ব্বাদ করি, সুখী হও—"

সুরমা অনেকক্ষণ রুদ্ধ বেদনায় চাহিয়া রহিল শূন্যে—এ কি কথা! একি বারতা! সুনীল। সুনীল! সুনীল!

তারপরে সে চোখের জল ধরিয়া রাখিতে পারিল না। অবাধ্য অশ্রু ঝর ঝর করিয়া ঝরিয়া পড়িল—তাহারই মর্ম্মলিপি সিক্ত করিয়া। সমস্ত পৃথিবীটা যেন কে কালো পর্দ্দায় ঢাকিয়া দিয়াছে, সেখানে একটী তারাও ক্ষীণরশ্মি বিকীরণ করিয়া তাহাকে পথ দেখাইয়া দিতেছে না।

সুন্দর সুষম সুনীল! তাহাকে সে এভাবে কল্পনা করিতে পারে না। উজ্জ্বল সুনিবিড় চোখদুটী তাহার যে আজো চাহিয়া আছে তাহারি দিকে, সে চোখ কি সংসিক্ত হইয়া গিয়াছে—যন্ত্রণার নির্ম্মম আতপে? সুদর্শন দেহ, অচঞ্চল মন তাহার কোন বেদনা সঙ্গোপনে লুকাইয়া আজ ক্লিষ্ট হইয়া উঠিয়াছে? মনে পড়ে তাহার অবলীল, নর্ম্মদ, কথা, ব্যবহার—তাহা কোন অব্যক্ত যাতনা আঘাতে—ভাব ও ভাষা হারাইয়াছে?

কেন—কেন সারা জগত ব্যাপিয়া এ বিষাদের মাতামাতি কেন? নিষ্ঠুর বিধির এ জীবনের রং লইয়া এ দুরপনেয় হোলিখেলা কেন?

সে আর আর ভাবিতে পারিতেছিল না। অব্যাহত ব্যাথাক্লিষ্ট চিন্তারাশি তাহার সমস্ত সংজ্ঞা বিলোপ করিয়া দিতেছিল ধীরে ধীরে—সে দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া শুইয়া রহিল,—অবশ হইয়া—ক্রমে সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হইয়া, তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া দিল—তাহার তমিস্র উত্তরীয়ে—

সেই দিনই অনভিপ্রেত সমস্ত জগত তাহার চোখের সম্মুখে আপ্লুত হইয়া গেল। বিষাদের ঘনছায়ায়। কতদিন—কতদিন—সে যেন কোথায় কোন, আনন্দময় এক স্বপ্ন রাজ্যে বিচরণ করে, সেখানে সে দেখে সুনীলকে, পৃথাকে রাজীব, কণিকা, শরত বিজয়কে—আরো কত কি! বিজয়ের আশ্রমে দেখে মীরাকে,—তাহাদের সঙ্গে সে কথা বলে—কখনো রাজীবের পরিহাসে সে কাঁদে, বিরক্ত হয়, পৃথা সজোরে মোটর চালায়, সে ভয় পায়, বিজয়ের কথায় হাসে।

অসীম অনন্ত নীল সাগরের জল ভেদ করিয়া দেখে

সুনীল ধীরে ধীরে উঠিয়া আসে—তাহার দেহ সুন্দর হইয়াছে—সে কোথা হইতে এক উজ্জ্বল জ্যোতির্ম্ময় আবরণ পাইয়াছে। সুরমা বলে—"বাঃ এই তো ভাল আছ—কি তোমার অসুখ—? মিছিমিছি লিখেছিলে ?"

সে হাসিয়া বলে—"না এখন আর অসুখ নেই সুরমা, বেশ ভাল আছি, খুব আনন্দে আছি—তুমি আসবে কি ?"

সুরমা বলে—"যাবো সুনীল"—

"তবে এসো, হাত ধর" সুরমা হাত ধরিতে চায়, সে তাহাকে লইয়া চলিয়া যায় অতল সাগর গর্ভে। সে ভয় পাইয়া হাত ছাড়াইয়া লইয়া বলে—"না ভয় করে, আমি যাবো না সুনীল"—

সুনীল হাসিয়া বলে—"পৃথার ভয় নেই সুরমা, তোমার বড় ভয়—তবে আমি একাই যাই ?" বলিয়া সে সাগরের নীলিমায় মিলিয়া যায়। সুরমা আর্ত্তস্বরে চীৎকার করে "সুনীল"—"সুনীল"—

কখনো দেখে সুনীল আকাশে শূন্য হইতে শূন্যে মেঘের সপ্তস্তর ভেদ করিয়া গিয়া ডাকে—"আচ্ছা সুরমা ওখানে নয়, এখানে এসো, আসবে সুরমা ? এখাসে বড় আনন্দ, বড় সুখ, আসবে ?"

সুরমা উর্দ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া ভয় পায়—বলে—"না সুনীল, অতদূরে উঠতে পারবো না ভয় করে—"

সুনীল হাসিয়া বলে—"আবার ঐ ভয়? তবে থাকো—"বলিয়া মেঘের আড়ালে অদৃশ্য হইয়া যায়—সে ছুটিয়া গিয়া ডাকে—"সুনীল—সুনীল !"

হঠাৎ রাজীব তাহাকে দুই হাত আগুলিয়া ধরে—বলে—"সুরমা—সুরমা, যেও না"—

মাঝে মাঝে কিসের একটা দুঃসহ যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া উঠে, মাথায়, গায়ে সর্ব্বাঙ্গে কিসের এ বিষদিগ্ধ জ্বালা,—সে সহ্য করিতে পারে না—ইচ্ছা হয় আকণ্ঠ ডুবিয়া থাকে কোন ছায়া শীতল জলগর্ভে। কিন্তু তাহাও পারে না—হাত পা অবশ হইয়া আসে—সে গভীর তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া স্থির হইয়া শুইয়া থাকে। মাঝে মাঝে মনে হয় সে যেন সত্যই শান্তির অতলতলে তলাইয়া গিয়াছে—সেখানে আর কিছু নাই, জ্বালা নাই, যন্ত্রণা নাই শুধু অনাহত কঠিন শুব্ধতায় ভরা।

হঠাৎ একদিন সুরমা দেখিল—সে বিছানায়—আর একজন নার্স হাতে একটী বই লইয়া তাহার পাশে চেয়ারে বসিয়া আছে। সে চারিদিকে চাহিয়া দেখিল—তাহার নিজেরই ঘর। ওপাশে টেবিলে অসংখ্য অষুধের শিশি ছোট বড় জমা হইয়াছে—আইস ব্যাগ গরম জলের ব্যাগ ওপাশে আরো কতগুলা কি। সমস্ত ঘর আইডিন ও ফিনাইলের গন্ধে ভরিয়া গিয়াছে। সে বুঝিল তাহার বেশী রকম একটা কিছু অসুখ করিয়াছে ! মৃদুস্বরে সে বলিল, "আমার কি হয়েছে ?"

নার্স বলিল—"এই যে, বেশ জ্ঞান হয়েছে দেখছি আজ। ও সামান্য জ্বর হয়েছে আপনার সেরে যাবে শিগ্‌গির, একটু কমলা নেবুর রস খাবেন ?"

"না" বলিয়া সে চুপ করিয়া রহিল !—সুরমা দেখিল অনেক কিছুই তাহার জন্য হইয়া গিয়াছে। কলিকাতা হইতে দুই তিন জন ডাক্তার আসিয়াছে। নার্স আসিয়াছে, অষুধ আসিয়াছে—টুকরি ভরিয়া রোজ বেদানা আসিতেছে,—নিকটস্থ সহর হইতে বরফ আসিয়াছে। রাজীব অত্যন্ত বিষণ্নমুখে তাহার কাছে আসিয়া বসে—একদৃষ্টে মুখের দিকে চাহিয়া চলিয়া যায়। সেদিন সে জিজ্ঞাসা করিল—"আমার কি হয়েছে ?"

শুষ্কমুখে করুণ হাসি হাসিয়া সে বলিল—"একটু জ্বর হয়েছে সুরমা ! আর কিছু নয়,—সেরে যাবে—"

"তাতো যাবে—এত ডাক্তার, নার্স, অষুধ—কেন ?"

"এখানে পাড়া গাঁ বলে—পাছে বেশী হয় সেইজন্য আনিয়ে রেখেছি—"

কেহ কিছু না বলিলেও সুরমা বুঝিল, তাহার টাইফয়েড হইয়াছে এবং এই তাহার তৃতীয় সপ্তাহের শেষভাগ।

ক্রমশঃ
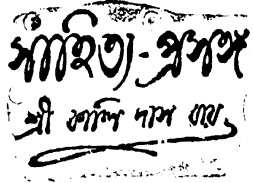
(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

তাত্ত্বিক ও কবি

যদি একটু সরস করিয়া ছন্দে বিবৃত হয় তবে, তত্ত্ববাদীর কথাকে অনেক সময় কবিতা বলিয়া মনে হয়। তত্ত্ববাদীর বাক্যে ধ্বনি থাকে, ব্যঙ্গার্থ থাকে,—তবু তাহা কাব্য নহে, কারণ তাহা অন্তরকে রসের পথে লইয়া যায় না—জ্ঞানাধিগমের তৃপ্তির সন্ধান দেয় মাত্র। দেশে দেশে যুগে যুগে তত্ত্ববাদীর বাক্য শুনিয়া কত লোক বোধানন্দ লাভ করিয়াছে,—সান্ত্বনা পাইয়াছে, সমাধান পাইয়াছে—তাহাতে তাহাদের দ্বিধাসংশয় ও চিত্তের অস্থৈর্য্য দূর হইয়াছে এবং তাহাকে কাব্যও মনে করিয়া আসিয়াছে। যুগে যুগে তত্ত্ববাদীরাও কবি আখ্যাই পাইয়াছেন! আজিও অনেকেই ছন্দোঝঙ্কৃত তত্ত্ববাক্যকে কাব্যই মনে করেন।

আমরা চাই, তত্ত্বকথা এমনই করিয়া অলঙ্কৃত ও ঝঙ্কৃত ভঙ্গিতে ব্যক্ত হউক। তাহার মূল্যবত্তা ও সারবত্তা যথেষ্ট। উচ্চশ্রেণীর গৌণ সাহিত্যের মধ্যেও তাহা পরিগণিত। তাহাতে আমরা যে আনন্দ পাই—সে আনন্দ আমরা অন্ত কোন জ্ঞানবস্তু হইতে পাই না। তবু কবি তাহাকে কাব্য বলিবে না। কবি নিজে যখন রসলক্ষীর প্রেমস্পর্শে আবিষ্ট না থাকেন—তখন তত্ত্ববাদীর মতন ঐ সাহিত্যেরই সৃষ্টি করেন। কিন্তু যখন তাঁহার রসাবেশ ফিরিয়া আসে—তখন তিনিই ঘাড় নাড়িয়া বলিবেন, "না, ও কথা আমার প্রাণের কথা নয়।"

স্নিগ্ধসরস কণ্ঠে সহানুভূতির সুরে তত্ত্ববাদী কবিতার মতন করিয়াই বলেন,—

ও ফুল কালই যাবে ঝ'রে হাস্‌বেনাক হেন,
তাই বলে হায় ও তাই কবি দুঃখ কর কেন?
দুইটি দিনের প্রজাপতি তিনটি দিনের অলি,
শোক করো না ফুলের সাথেই মরবে তারা বলি।
মরণ-লীলার তলে তলে অমরতার ধারা
দেখ্‌বে নাক? দেখ্‌বে তবে হায় কে তুমি ছাড়া?
অমর পারিজাতের শোণিত সকল ফুলেই রয়,
নন্দনের বর-আশীর্ব্বাদে মৃত্যু করে জয়।
মধুতে তার অমৃত যে সংগোপনে জাগে,
ফুল যে রঙিন শোভায় ভরে অমর অনুরাগে।
গন্ধ তাহার কয় কাননে অমরতার বাণী,
মৃত্যুঞ্জয়ের ব্রতে সে সব ভৃঙ্গে আনে টানি'।
জুটে কি অই প্রজাপতি বৃথাই তাহার পাশে?
রঙ্গীন পাখায় অমরতার বীজ লয়ে সে আসে।
মধুকোষের সূক্ষ্মপথে অনেক ব্যথাই সহি,
ভৃঙ্গ পশে সৃষ্টি-দেবীর নিদেশ শিরে বহি'।
প্রজাপতির ঘটকালিতে পুষ্প-পরিণয়,
ফুলের প্রণয় করে ফলের বীজেও প্রাণময়।
পরাগ-পথে ও-রূপ হ'তে পুষ্প রূপান্তরে
আসছে চ'লে আদি হতেই পুষ্পধনুর বরে।
যে ডোর জাগে হরের গলার হাড়ের মালার মাঝে
সেই ডোরেতেই অনন্তকাল ফুলের মালাও রাজে।
মরণলীলার মাঝে তাদের হ্রস্ব জীবনটুক,
চিত্তলোকে অমর হ'তে, তাও দেখ উৎসুক।
শিল্পী, তারে অমর কর, চিত্রটি তার আঁকো।
শোক করো না, ছন্দে কবি অমর করে রাখো,

কবি ইহাতে সান্ত্বনা পান না, তিনি ঘাড় নাড়িয়া চিরদিনই বলিবেন—

"সবই বুঝি তত্ত্বজ্ঞানী ভাই,
সজল চোখেই তবু আমার ফুলের পানে চাই।
সত্য যা তা বুদ্ধি বোঝে, হৃদয় বোঝে কই ?
ব্যথার অকূল পাথারে ভাই পায় না সে যে থই,
গীতায় প্রবীণ তত্ত্বজ্ঞানী বৈরাগীটির চোখে
অশ্রু কি আর ঝরে না ভাই প্রিয়-জনের শোকে ?
ফুলের জীবন রইবে বেঁচে নয়ন অন্তরালে,
নয়ন যাহা হারায় তাহার তরেই ধারা ঢালে।
কি দোষ দেবে নয়নেরে ? বঞ্চিত সে হায়,
ফুলের অমন অমরতায় তার কি আসে যায় ?
অমরতাই নয়ক বড়। অই চাহনি হাসি
পাতার দোলায় ঐ যে দোলন বড়ই ভালবাসি।
ঐ গ্রীবাটির ভঙ্গি সোহাগ, সুরভি নিশ্বাস।
দেবে কি আর ফিরিয়ে তোমার কথাতে বিশ্বাস ?
ফিরবে সবি ? এটাই তবে শেষ কাঁদা নয় হায় ?
বারংবারই কাঁদতে হবে ফুলের বেদনায় ?"

কল্পনা-বিহার

রসজ্ঞগণ বলেন, কাব্যপাঠে পাঠকের চিত্তের গতি হইবে লম্বভাবে অর্থাৎ হয় তাহা ভাবের উচ্চচূড়ায় চিত্তকে তুলিবে—নয় রসের পাতাল-কূপে চিত্তকে নামাইবে। কিন্তু কাব্য কি চিত্তকে অন্য দিকে লইয়া গিয়াও আনন্দ দেয় না ? যে কাব্য আমাদের কল্পনাকে দিগ্‌দিগন্তে, দেশদেশান্তরে, যুগ-যুগান্তরে, লোকে লোকান্তরে লইয়া যায় তাহা কি সৎকাব্য নয় ? কল্পনার এই পরিভ্রমণে কি একটা আনন্দ নাই ? মহাকাব্যের কথা ছাড়িয়া দিলাম, মাইকেলের মেঘনাদবধ বা হেমচন্দ্রের বৃত্রসংহারে আমাদের কল্পনা যে ত্রিলোক পরিভ্রমণ করিয়া আনন্দ পায়—সেই আনন্দই ঐ দুইখানি কাব্যপাঠের মস্ত বড় একটা পুরস্কার নয় কি ?

এখন কথা হইতে পারে, সে আনন্দ-সৃষ্টি গীতিকাব্যের কাজ নয়, খণ্ড-কাব্যের কাজ।

খণ্ডকাব্যে যুগযুগান্তর দেশদেশান্তর-ভ্রমণে যদি আমাদের কল্পনা আনন্দ পায়—গীতিকাব্যে বা গীতিকাব্যের ভঙ্গিতে রচিত কবিতায় সেই আনন্দ সে না পাইবে কেন ? এমন গীতিকবিতা কিংবা তৎশ্রেণীর কবিতা-ও যথেষ্ট রহিয়াছে,—যাহা আমাদের কল্পনাকে পরিশ্রান্ত না করিয়া নবনব দৃশ্য দেখাইতে দেখাইতে দেশে ও কালে বহুদূর ঘুরাইয়া আনে। সে-গুলিকে কি উৎকৃষ্ট কাব্য বলা যাইবে না ?

এখানে কথা হইতে পারে, কল্পনা এক্ষেত্রে যে আনন্দ পায় তাহা রসানন্দ কিনা।

রসানন্দ নিশ্চয়ই, নতুবা তাহা কবিতা-নামই পাইতে পারে না—কবি নিশ্চয়ই কল্পনাকে অযথা পরিভ্রমণ করান না। কল্পনা বিস্ময়ের আনন্দ পায়, মুক্তির আনন্দ পায়, অপূর্ব্বতার আনন্দ পায়। কবি যদি দেশদেশান্তর লোক-লোকান্তরের প্রাণহীন বর্ণনামাত্র করেন—তবে কল্পনা মনঃকুলায় ছাড়িয়া উড়িতে চাহে না। কিন্তু যদি কবির সরস অন্তরের আকর্ষণে লোকলোকান্তরও যুগযুগান্তরের দৃশ্য বা বার্ত্তা আসিয়া পড়ে—ঐ দৃশ্য যদি অপূর্ব্ব হয়, আর ঐ বার্ত্তা যদি চিত্তাকর্ষক হয়, তবে পাঠকের কল্পনা পরিভ্রমণে যাত্রা না করিয়া থাকিতে পারে না।

যে রসের আকর্ষণে কাব্যে লোকলোকান্তর যুগযুগান্তর আসিয়া পড়ে—সেই রসের আনন্দ পাঠকচিত্তও নিশ্চয়ই পাইবে। রসের পাতালকূপে নামিয়া বা ভাবের উচ্চচূড়ায় উঠিয়া আমাদের চিত্ত এই কর্ম্মক্লিষ্ট ধূলিধূমক্লিন্ন বস্তু-জগৎ হইতে দূরে গিয়া যেমন আনন্দ লাভ করে—দিগ্‌ দিগন্তে যুগ-যুগান্তরে ছুটিয়াও তেমনি স্বস্তির আনন্দ পায়। কেবল দেখিতে হইবে—পাঠকের কল্পনা ক্লান্ত বা অবসন্ন হইয়া না পড়ে।

শিল্প-সঙ্কর

কাব্য সঙ্গীতের সহিত, চিত্র কথাসাহিত্যের সহিত এবং নাট্য অভিনয়-কলার সহিত মিলিত হইয়া অনেক-ক্ষেত্রে সার্থকতা লাভ করিয়াছে। এই মিলিত প্রয়াসের রস-সম্ভোগ করিয়া লোকে যখন সাধুবাদ দেয়—তখন কোন্ শিল্পের কতটা প্রাপ্য তাহার বিচার হয় না। যুগে যুগে অনেক কবি সঙ্গীতের আনুকূল্যের ভরসায় অসম্পূর্ণ কাব্য রচনা করিয়াছেন, বহু নাট্যকার অভিনয়-কলার আনুকূল্যের প্রত্যাশায় হীনাঙ্গ নাট্য রচনা করিয়াছেন—

কথা-সাহিত্যের সহায়তার ভরসায় ইদানীং অনেক চিত্রকর অনেক চলনসই ছবিও আঁকিতেছেন। তাহাতে মিশ্র শিল্পের উপভোক্তাদের কোন আপত্তি নাই।

কিন্তু রসজ্ঞ ব্যক্তিগণ এইরূপ একটি শিল্পের ভরসায় রচিত অন্য শিল্পের অসম্পূর্ণতা মার্জ্জনা করিতে চাহেন না। তাঁহারা বলেন—একজন শিল্পী অন্য একজন শিল্পীর ভরসায় কেন তাঁহার সৃষ্টিতে অঙ্গহানি রাখিবেন? উদাহরণস্বরূপ, তাঁহারা রবীন্দ্রনাথের বহু গানের উল্লেখ করিবেন। তান-মানলয়ে ঐ গানগুলি উদ্গীত না হইলেও, কাব্যের রসাদর্শে তাহারা পরিপূর্ণাঙ্গ,—গায়নকণ্ঠের মাধুর্য্য ও চাতুর্য্য সে-গুলিতে সংযুক্ত হইলে গভীরতর বা নিবিড়তর আনন্দই দান করে।

গিরীশবাবু নিজে ছিলেন সুকৌশলী ও শক্তিশালী নট। নাট্যরচনায় তিনি অভিনয়-বিস্তার আনুকূল্যের কথা ভুলিতে পারেন নাই। রঙ্গমঞ্চে যাঁহারা গিরীশবাবুর নাট্যের অভিনয় দেখিয়াছেন তাঁহারা মুগ্ধ হইয়াছেন—এখনো তাঁহার কোন কোন নাটকের অভিনয় হয়। তাঁহার গ্রন্থা-বলী সুলভে বিক্রীত হইতেছে। প্রত্যেক বাড়ীতে গিরিশ গ্রন্থাবলী পাওয়া যায়।—কিছুকাল পরে ঐসকল নাটকের অভিনয় বন্ধ হইয়া গেলে—গ্রন্থগুলির সঙ্গে সকলেরই পাঠ্য-পাঠক সম্বন্ধ মাত্র রহিয়া যাইবে। তখন সাহিত্যের নিজস্ব অবিমিশ্র আদর্শেই নাটকগুলির বিচার হইবে। গিরীশ বাবু যদি অভিনয়-কলার সহযোগিতার উপর নির্ভর না করিয়া নাটকগুলি লিখিতেন,—তাহা হইলে বঙ্গদেশ নাট্য-সম্পদে এত দরিদ্র হইয়া থাকিত না।

গিরীশচন্দ্র সম্বন্ধে যে কথা বলা হইল, দীনবন্ধু সম্বন্ধে সে কথা বলা যায় না। দ্বিজেন্দ্রলাল নিজে নট ছিলেন—অভিনয়-কলার উপর বেশী নির্ভরও করেন নাই—কিন্তু কাব্যের সহিত নাট্যকে মিলাইয়াছেন। এ মিশ্রণ রাজ-যোটক ত হয়ই নাই—বরং দুইটিরই ক্ষতি হইয়াছে।

নাট্যপ্রসঙ্গে গিরীশবাবুর সম্বন্ধে যাহা বলা হইল—গান প্রসঙ্গে নিধুবাবুর সম্বন্ধেও সেই কথা বলা চলে। দ্বিজেন্দ্র-লাল ও রজনীকান্ত গায়ক-কণ্ঠের উপর খুব বেশী ভরসা রাখেন নাই—তাঁহাদের গানগুলি গঠন-সৌষ্ঠবে প্রায় সম্পূর্ণাঙ্গই হইয়াছে।

দেশের যে সকল গীত ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া গায়ক-কণ্ঠের দরদের ভরসায় রচিত হইয়াছে—সাহিত্যের গণ্ডীতে তাহারা পড়েই না।

কাব্যে সঙ্গীত

রসজ্ঞগণ বলেন—সঙ্গীত (Music) না থাকিলে কোন রচনাই 'লিরিক' হইয়া উঠে না। ভাব-বৈচিত্র্য, অর্থ-গৌরব ইত্যাদি অন্যান্য যত ঐশ্বর্য্যই থাকুক—সঙ্গীত না থাকিলে তাহা গীতি-কাব্যের গৌরব লাভ করিতে পারে না। রবীন্দ্রনাথের রচনায় অন্যান্য অনেক ঐশ্বর্য্য আছে—কিন্তু সে সমস্ত একটা অপূর্ব্ব সঙ্গীতের জন্যই কাব্য হইয়া উঠিয়াছে।

ইহা কি ছন্দের ঝঙ্কার, ছন্দো-হিল্লোল, অনুপ্রাসাদির প্রয়োগ? না, এ সকল বহিরঙ্গের কথা। সঙ্গীত বলিতে রসজ্ঞগণ অন্তরঙ্গের বস্তু বুঝেন, কতকটা অনির্ব্বচনীয় সামগ্রী।

তবে কি আলঙ্কারিকগণ যাহাকে রস বলেন—সেই রস আর এই সঙ্গীত এক বস্তু? সঙ্গীত নিজেই রস নয়। উহা রসের প্রধান সহায়ক—রস সমগ্র কবিতার সর্ব্বাঙ্গীন উপভোগের ফল। সঙ্গীত ঐ উপভোগ্যের প্রধান অঙ্গ।

আমাদের প্রত্যেক মনোবেগের একটি সুর আছে—ঐ মনোবেগ যদি কাব্যে অভিব্যক্ত হয়, তবে সে গোড়া হইতেই নিজস্ব সুরের ক্রম ধরিয়াই চলে। যে রচনাকে কোন মনোবেগ জন্ম দান করে নাই—তাহা ছন্দোবদ্ধ গদ্য।

রচনায় কোন বিশিষ্ট মনোবেগের আবেশের অনুকরণ বা ভাণ করিলে মনোবেগের একটা অভিব্যক্তি হয় বটে, কিন্তু তাহার নিজস্ব সুরে নয়। এক্ষেত্রে অন্তর মনোবেগকে মুক্তি দেয়, কিন্তু তাহার সুরকে মুক্তি দেয় না। অর্থাৎ তাহাতে সঙ্গীত থাকে না—Emotional Sequence থাকে—কিন্তু Musical Sequence থাকে না।

প্রকৃত কবিতা তাহার প্রেরণার নিজস্ব সুর লইয়াই আরব্ধ হয় এবং সেই সুর বরাবর স্বাভাবিক ক্রমানুসারে আপনার বেগেই চলিতে থাকে। তবে এমন হইতে পারে—কবির মনোবেগ কিছুদূর গিয়া অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে অথবা ফুরাইয়া আসিয়াছে—কবি তবু কাব্যকে বাড়াইয়া

চলিয়াছেন—প্রজ্ঞার সাহায্যে বুদ্ধির লীলায়। সে ক্ষেত্রে মনোবেগের সহিত সুর অবসন্ন হইয়া পড়িলেও তাহার রেশটা থাকিয়া যায়—তাহাতেই শেষটা কতক রক্ষা পায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ রবীন্দ্রনাথের শাহজাহান কবিতাটির নাম করা যাইতে পারে। রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতায় চিন্তা, আবেগকে ও প্রজ্ঞা, অনুভূতিতে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে—কিন্তু আবেগ বা অনুভূতি তাহার নিজস্ব সঙ্গীতের সুরটি ছাড়ে নাই। তাই সেগুলি কাব্য হিসাবে সার্থকতা লাভ করিয়াছে। রচনার অনেক ত্রুটীই ঐ সঙ্গীতের সুরে ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে। বাণীর ত্রুটি ধ্বনি চিরদিনই ঢাকিয়া ফেলে—সুরধুনী-ধারায় যাহা-কিছু আসিয়া পড়ে, তাহাই পবিত্রতা লাভ করে।

রবীন্দ্রনাথের কবিতার প্রারম্ভ যে এত চমৎকার—তাহার কারণ তাহা মনোবেগের নিজস্ব সুরেই আরব্ধ। ছন্দঃশৃঙ্খলা রবীন্দ্রনাথকে সুর দেয় নাই। সুরই ছন্দ বাছিয়াছে—ছন্দকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করিয়াছে এবং ছন্দকে উপযোগী করিয়া ভাঙ্গিয়া গড়িয়াছে। রবীন্দ্রনাথ সত্যেন্দ্র নাথের মত ছন্দঃশিল্পীরূপে ছন্দের বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেন নাই—তাঁহার কবি-মনের আবেগের সুরই ছন্দে বৈচিত্র্য রচনা করিয়াছে।

এখন জিজ্ঞাস্য, বহিরঙ্গের ধ্বনি-মাধুর্য্য কবির অন্তরঙ্গ সঙ্গীতকে সহায়তা করে কিনা?

কোন কোন কবিতায় ইহা অন্তরঙ্গের সঙ্গীতকে সহায়তা করিয়াছে—কোথাও করে নাই।—অনেক ক্ষেত্রে অন্তরঙ্গের সঙ্গীতকে ক্ষুন্ন করিয়া ফেলিবে,—এই ভয়ে কবি উহাকে বর্জ্জন করিয়াছেন। ইহার ফলেই স্বচ্ছন্দ-গতি পয়ারও অসমমাত্রিক ছন্দের উৎপত্তি—ইহাতে কবির নিজস্ব আবেগের সুর সম্পূর্ণ স্ফূর্ত্তি ও স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে—সুরই এই ছন্দের জন্মদান করিয়াছে—বহিরঙ্গের সঙ্গীত এই ছন্দে প্রায় নিস্তব্ধ।

কবির মনোবেগের সহিত যে সঙ্গীত অঙ্গাঙ্গী ভাবে বিজড়িত—তাহা তাঁহার পক্ষে স্বভাবের দান। ইহা অনুশীলনের দ্বারা মার্জ্জিত হইয়াছে বটে, প্রয়াসের দ্বারা অর্জ্জিত নয়। কবির মনের নিজস্ব প্রকৃতিতে, রসদৃষ্টিতে ও প্রেরণার মূলেই সহজ ভাবে উহা বর্ত্তমান। এই সৃষ্টির সহিত তাঁহার চিত্তের একটা সহজ Harmony আছে—আর সৃষ্টির সুর-সৌষম্যের সমগ্রানুভূতিই তাঁহার রচনাকে প্রেরণা দান করে। সে জন্য তাঁহার কাব্যে সঙ্গীত এত সহজ ও স্বাভাবিক হইতে পারিয়াছে—কৃত্রিম উপায়ে যাঁহারা সঙ্গীতের সৃষ্টি করিতে চাহেন, তাঁহারা কবিগুরুর চেয়ে ঢের বেশী সাধনা করেন, কিন্তু কাব্যকে সুরময় করিয়া তুলিতে পারেন না।

কাব্যের আবৃত্তি

"আবৃত্তিঃ সর্ব্বশাস্ত্রাণাং বোধাদপি গরীয়সী।"

শাস্ত্রের আবৃত্তিকে 'বোধ' হইতেও গরীয়সী বলা হইয়াছে। শুধু বার বার অধ্যয়ন অর্থেই এই আবৃত্তি শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে, বলিয়া মনে হয় না—ছন্দোবদ্ধ বাণীর পক্ষে সুবিহিত সুসমঞ্জস উদীরণও আবৃত্তি শব্দের মর্ম্মার্থের অন্তর্গত। সর্ব্বশাস্ত্রের কথা বলিতে পারি না, কাব্য সম্বন্ধে যে এ কথা সম্পূর্ণ সত্য সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। হ্রস্ব, দীর্ঘ, উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত, দ্রুত, বিলম্বিত ইত্যাদি স্বর-বৈচিত্র্যের মিলনে যে সুর-গাম্ভীর্য্যের বা ঝঙ্কার-মাধুর্য্যের সৃষ্টি হয়, তাহাই পদ্যকে গদ্য হইতে স্বাতন্ত্র্য দান করে,—আর এই মাধুর্য্যই পদ্যের সর্ব্বপ্রধান ঐশ্বর্য্য,—এমন কি প্রাণস্বরূপ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই ঐশ্বর্য্যের সন্ধান আমরা সুসঙ্গত আবৃত্তি ব্যতীত লাভ করিতে পারি না; সেজন্য আবৃত্তি কাব্যের পক্ষে "বোধাদপি গরীয়সী।" যখন সর্ব্বশাস্ত্র কাব্যেই রচিত হইত, তখন বোধ হয় সর্ব্বশাস্ত্র সম্বন্ধেই এ কথা খাটিত।

উদাবৃত্ত না হইলে বেদের কোন বিশিষ্ট মূল্যই থাকে না। বেদসূক্তের,—উক্থের বা উদ্গীথের মধ্যে যে অর্থ নিহিত আছে, তাহাই বেদের সর্ব্বস্ব হইলে বেদ ভারতের মনোজগতের চিরানুশাসক হইত না। উদাবৃত্তি বা উদীরণকালে গাথা, সাম ও উক্থের যে অপূর্ব্ব মন্ত্রশক্তি সঞ্চারিত হয়, তাহাই মনোলোকে অলৌকিক ক্রিয়া সাধন করে। "পাদাক্ষর-সমাসস্বরলক্ষণ-জ্ঞান-সমন্বিত" আবৃত্তি সম্ভব হইলে, তাহা যে "বোধাদপি গরীয়সী" হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ কি? এ যুগে সে আবৃত্তি সম্ভব হইলে যাহারা বেদার্থজ্ঞানরহিত তাহাদিগকেও [illegible]

উচ্চারণ করাইয়া বা শুনাইয়া বেদের মর্য্যাদা কতকটা রক্ষিত হইত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, যাজক ও যজমান উভয়েই বেদমন্ত্রের শ্রুতিসঙ্গত আবৃত্তি করিতে পারেন না বলিয়া সমস্ত বৈদিক অনুষ্ঠানই পণ্ড হইয়া যায়।

কবিতার শব্দ-সমূহে বৈদিক গাথার মত মন্ত্রশক্তি না থাকিলেও মন্ত্রমুগ্ধ করিবার শক্তি আছে। যাহাকে "কাণের ভিতর দিয়াই মরমে" প্রবেশ করিতে হইবে তাহাকে আগেই কর্ণরাজ্য জয় করিতে হইবে। কবি এমনভাবে অক্ষরের উপর অক্ষর সাজাইয়া যান, যে তাহাদের মিলিত কলধ্বনি শ্রুতিকে সহজেই বশীভূত করিয়া ফেলে। কর্ণও বিনালাভে বশ্যতা স্বীকার করে না। লীলা-হিল্লোলিত ছন্দোঝঙ্কার কর্ণের স্নায়ুমণ্ডলকে এমনি তালে তালে স্পন্দিত করে যে, তাহাতে প্রাণমূলে একটী সুখানুভূতি হয়। এই সুখানুভূতিই পাঠক বা শ্রোতার পক্ষে যথেষ্ট লাভ। বিনা অর্থবোধে যে আনন্দ-সঞ্চার তাহার সম্ভোগকে, বলে "অপ্রবুদ্ধ উপভোগ।" সাহিত্য-দর্পণকার বলিয়াছেন,—"অবিদিতগুণাপি সৎকবি-ভণিতিঃ বমতি হি কর্ণেষু মধুরধারাম্।" রস-রচনা 'অবিদিতগুণা' হইলেও কর্ণে মধুধারা বর্ষণ করে।

অর্থই যে বড় একটা লাভ নয়, তাহাও ইংরাজ কবি Wordsworth তাঁহার The Solitary Reaper নামক কবিতায় স্পষ্টই ইঙ্গিত করিয়াছেন। দুর্ব্বোধ ভাষায় বা বিদেশী ভাষায় রচিত সঙ্গীত বা শুধু স-রে-গা-মায় সাধা সঙ্গীতের প্রভাব প্রাঞ্জলার্থক সঙ্গীতের প্রভাব হইতে কিছুমাত্র অল্প নহে। আবৃত্তি সুর-তাল-মান-লয়-যুক্ত 'সঙ্গীত' নহে বটে, কিন্তু উহা স্বর-গ্রামের স্বর-পর্য্যায়ে পাঠ ও সঙ্গীতের মাঝামাঝি,—এমন কি, সঙ্গীতের কতকটা সমীপবর্ত্তী, সেজন্য আবৃত্তি সঙ্গীতের ধর্ম্ম ও মর্ম্মপ্রভাব অনেকটাই লাভ করিয়াছে। যাঁহারা বলেন কবিতার অর্থ না বুঝিলেই কবিতাপাঠ একেবারে ব্যর্থ হইল, তাঁহারা ভ্রান্ত। তাঁহারা কেবলমাত্র সুবিহিত আবৃত্তি হইতেই যে যথেষ্ট লাভ হইতে পারে, সে বিষয়ে অজ্ঞ। মেঘদূতের—

"বিদ্যুত্বন্তং ললিতবনিতাঃ সেন্দ্রচাপং সচিত্রাঃ।
সঙ্গীতায় প্রহতমুরজাঃ স্নিগ্ধগম্ভীরঘোষং।"

বা রবীন্দ্রনাথের—

"ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে—
জলসিঞ্চিত ক্ষিতিসৌরভ-রভসে,—
ঘনগৌরবে নবযৌবনা বরষা,—
শ্যামগম্ভীর সরসা॥"

ইত্যাদি আবৃত্তি করিলে অন্তর স্বতঃই 'মেঘৈর্মেদুরং' হইয়া উঠে, নয়নে ঘন-জাল ঘনাইয়া আসে। জয়দেবের—

"ললিতলবঙ্গলতা-পরিশীলনকোমলমলয়সমীরে,
মধুকরনিকর-করম্বিতকোকিল কূজিতকুঞ্জ-কুটীরে।"

ইত্যাদির আবৃত্তি বসন্তকে প্রমূর্ত্ত করিয়া নয়নসম্মুখে আনিয়া দেয়। সত্যেন্দ্রনাথের 'ঝর্ণা' আবৃত্তির গুণে যেন আমাদের চারিপার্শ্বে নাচিয়া বেড়ায়। তাঁহার 'দূরের পাল্লায়'যেন নৌকার দাঁড় হইতে জলের ছিটে গায়ে লাগে। এ সকল কবিতার অর্থ জানাই কি একমাত্র লাভ? যাহাদের সহিত আবৃত্তি সাহায্যে 'প্রত্যক্ষ' পরিচয় ঘটিয়া যাইতেছে, তাহাদের সহিত জ্ঞানগত 'পরোক্ষ' পরিচয় হয়, ভালই,—না হয় তাহাতেও ক্ষতি নাই।

শ্রুতিসুখদানেই আবৃত্তির মূল্য পরিচ্ছিন্ন হয় না। আবৃত্তি অর্থবোধেরও যথেষ্ট সাহায্য করে। যে অর্থ সাধারণ পাঠে বিশদ হয় না, তাহা উদাবৃত্তিতে অনেক সময় সুবোধ্য হইয়া উঠে। কিন্তু আবৃত্তির সর্ব্বপ্রধান প্রয়োজনীয়তা রসবোধে। অন্তর্নিহিত রসের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াই কবি ছন্দোনির্ব্বাচন ও পদ-বিন্যাস করেন, এবং গতি, যতি, বিরতি, মাত্রা, ছন্দঃস্পন্দ ইত্যাদি নির্দ্দেশ করেন,—সে জন্য সম্পূর্ণ অর্থবোধ না হইলেও ছন্দের রসানুগত আবৃত্তি মাত্রই শ্রোতার চিত্তে রসসঞ্চার করিয়া থাকে। যেখানে অর্থগত রস অনায়াসগম্য, সেখানে আবৃত্তি, রসকে ঘনায়িত ও সুগম্য করিয়া তুলে।

রসসৃষ্টির পক্ষে "কাকুর" প্রয়োজন উপেক্ষণীয় নহে, অর্থ-বোধেও 'কাকু' যথেষ্ট আনুকূল্য করিয়া থাকে। এই 'কাকু'ই আবৃত্তির প্রধান অঙ্গ। আবৃত্তি-কালে স্বরভঙ্গিই মৃদু হাস্যকে অট্টহাস্যে উচ্ছ্বসিত করে, কণ্ঠের গদ্গদ্ ভাবই কারুণ্যকে অশ্রুতে উচ্ছলিত করিয়া তুলে। স্তবপাঠ বা মন্ত্রোচ্চারণকালে ধীরগম্ভীর স্বরতরঙ্গ অর্থানভিজ্ঞ ব্যক্তিরও শীর্ষকে স্বতঃই অবনত করিয়া দেয়, ধর্ম্মদ্রোহীর চিত্তকে

বিগলিত করিয়া দেয়, রোষের অরুণকেও রসের-বরুণের বশাধীন করিয়া তুলে। নাট্যাভিনয় দেখিয়া লোকে যে হর্ষ, সংক্ষোভ, ভাবোন্মাদ, সমবেদনা ইত্যাদিতে অভিভূত বা উত্তেজিত হইয়া পড়ে—অথচ নাটক পাঠে অবিচলিত থাকে, তাহার একটী কারণ নাটকীয় রচনার ভাবানুগত আবৃত্তি।

শিশুর চিত্তে আবৃত্তি যে কি প্রভাব সঞ্চার করে, তাহা সর্ব্বদেশের ঠাকুরমা-রা জানেন, শিশুরাও জানে, তাই তাহারা অর্থহীন 'আগাডুম বাগাডুম' ছড়া শ্লোকও যখন তখন আবৃত্তি করিয়া থাকে। শিশুগণ যখন আবৃত্তি করে, তখন প্রয়োজন-মত ভাবানুযায়ী অঙ্গভঙ্গী না করিয়া থাকিতে পারে না—এমন কি তালে তালে তাহাদের সর্ব্বাঙ্গ লীলায়িত ও চরণদুটী নৃত্যচপল হইয়া উঠে। শিশুগণের আবৃত্তি শুনিয়া ও 'দেখিয়া (?)' মনে হয় আবৃত্তির মধ্যে একাধিক কারুকলা মিলিয়া-মিশিয়া একটী অপরূপ মিশ্র চারুকলার সৃষ্টি করিয়াছে। কবিতা, সঙ্গীত, অভিনয়-বিদ্যা, নৃত্যকলা এই চারিটী কলা-বিদ্যাই—কোনটী স্ফুট, কোনটী অস্ফুটরূপে সচিত্র 'সরূপ' আবৃত্তি-শিল্পের মধ্যে অঙ্গাঙ্গিভাবে বিজড়িত।

রসনাগত বৈচিত্র্য ও ভাবানুগত অঙ্গ-ভঙ্গি সহকারে আবৃত্তি করিলে আমরা পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তিকে উপহাস করিয়া থাকি। "নিশার স্বপনসম তোর এ বারতা,রে দূত"ইত্যাদি অংশের অঙ্গভঙ্গিসহ আবৃত্তির উল্লেখ করিয়া হাস্য-পরিহাসের প্রথা প্রচলিত আছে। কিন্তু, রঙ্গমঞ্চে যখন কলাচাতুর্য্যময় অঙ্গবিলাসসহ সম্পাদিত আবৃত্তি শুনি, তখন প্রশংসায় হাততালি দেই। শোভনাঙ্গী রমণী ও সুকুমার বালক যখন আবৃত্তিকালে অঙ্গভঙ্গি করে, তখন আমরা আনন্দলাভ করি। যদি কোন বালিকা বিদ্যাপতির—

"হাতক দরপণ, মাথক ফুল।
নয়নক অঞ্জন, মুখক তাম্বুল॥
হৃদয়ক মৃগমদ, গীমক হার।
দেহক সরবস, গেহক সার॥
পাখীক পাখ, মীনক পানি।
জীবক জীবন হম তুঁহু জানি॥

এই পদ্যাংশটীর অঙ্গভঙ্গিসহকারে আবৃত্তি করে, প্রয়োজনমত তাহার ক্ষুদ্র পাণি ও অঙ্গুলিগুলিকে একবার দর্পণ, একবার অঞ্জন-শলাকা, একবার তাম্বূল, একবার পাখীর পাখায় পরিণত করিতে থাকে—তবে সে আবৃত্তি আমাদের চিত্তহরণ করিতে বাধ্য। ঐরূপ আবৃত্তিভঙ্গী মনে কল্পনা করিতেই আনন্দ হয়। আমাদের রাঢ়দেশের বালিকাদের ভাদু বা ভাজোর ছড়া আবৃত্তির কথা মনে হয়। আবৃত্তি স্বতই অঙ্গের লাসবিলাসে প্রমূর্ত্ত ও সম্পূর্ণাঙ্গ হইতে চায়। আমরাও ভাবকে ভঙ্গিতে ও রসকে রূপে অভিব্যক্ত দেখিতে ভালবাসি। তবে যে অঙ্গে উহা অভিব্যক্ত বা পরিমূর্ত্ত হইবে, সে অঙ্গটী সুদর্শন ও লীলায়িত হওয়া চাই এবং আবৃত্তি-কারকের কণ্ঠেও বাক্‌স্পষ্টতা, মাধুর্য্য, চাতুর্য্য ও স্বাস্থ্য চাই। সঙ্গীত, অভিনয়-বিদ্যা, নৃত্যকলাও আবৃত্তির মতই ঐরূপ প্রত্যাশা করে। তিথ্যাদিতত্ত্বে আবৃত্তি কিরূপ হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে বিধান আছে।

"বিস্পষ্টমদ্রুতং শান্তং স্পষ্টাক্ষরপদং তথা।
কলস্বর-সমাযুক্তং রসভাব-সমন্বিতং॥
° • ° ° •
সপ্তস্বর-সমাযুক্তং কালে কালে বিশাম্পতে।
প্রদর্শয়ন্ রসান্ সর্ব্বান্ বাচয়েদ্বাচকোনৃপ॥

মার্কণ্ডেয় পুরাণে আবৃত্তির দোষেরও বিবৃতি আছে।

"শঙ্কিতং ভীতমুদ্‌ঘুষ্টমব্যক্তমনুনাসিকং।
বিস্বরং বিরসঞ্চৈব বিশ্লিষ্টং বিসমাহতং॥
কাকস্বরং শিরসিতং তথা স্থানবিবর্জ্জিতং।
ব্যাকুলং তালহীনঞ্চ পাঠদোষাশ্চতুর্দ্দশ।
সংগীতং শিরসঃ কম্পমল্পকণ্ঠমনর্থকং।"

কবির রচনায় কোন ত্রুটী থাকিলে আবৃত্তিকালে ধরা পড়িয়া যায়। পক্ষান্তরে, নির্দ্দোষ আবৃত্তি না হইলে কবির রচনার গুণগুলিও অলক্ষিত রহিয়া যায়। কবির শব্দালঙ্কারগত অনেক প্রয়াস ও অনেক কলাচাতুর্য্যই ব্যর্থ হইয়া যায়—অনুপ্রাস, যমক, ছন্দঃস্পন্দ, মিল, পদ-বিন্যাসগত কলা-কৌশল অনুপভুক্ত ও অনাদৃত রহিয়া যায়।

সংস্কৃতে হ্রস্ব ও দীর্ঘের উচ্চারণের [illegible]

স্বতঃই স্বরবৈচিত্র্যের সৃষ্টি হয়। সুরচিত সংস্কৃত শ্লোকের বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃত মূল্য আবৃত্তির উপরই নির্ভর করে। সেজন্য সংস্কৃতের প্রায় সর্ব্বশাস্ত্রই আবৃত্তি করিয়া পড়িবার নিয়ম ছিল। বেদের কথাত পূর্ব্বেই বলিয়াছি। চতুষ্পাঠীর বালক ছাত্রগণকে ব্যাখ্যা না করাইয়া ব্যাকরণ অভিধান আয়ুর্ব্বেদ পর্য্যন্ত কেবল আবৃত্তি করানো হইত। বালকের মেধা তীক্ষ্ণ ও অক্ষুণ্ণ, কিন্তু বাল্যে ধী-শক্তির উন্মেষ হয় না। আবৃত্তি সহজেই আবৃত্ত গ্রন্থকে স্মৃতির বশীভূত ও ধৃতির অধিগত করিয়া তুলে। আবৃত্তির দ্বারা বালকের মেধাশক্তির সদ্ব্যবহার হইলে ক্রমে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে ও গুরুর উপদেশে বোধের উন্মেষ হইতে থাকে।

আবৃত্তি মানব মনের উপর যে প্রভাব বিস্তার করে, দেবতার মনের উপরও সেই প্রভাব সঞ্চার করিবে,—এই প্রত্যাশায় আর্য্যগণ আপনাদের প্রার্থনা ছন্দে আবৃত্তি করিতেন—তাই পজ্ঝটিকা, তোটক, দোধক, স্রগ্ধরা ইত্যাদি শ্রুতিসুভগ ছন্দে বহু। সৃষ্টি হইয়াছে, স্তোত্রের তাঁহারা স্তবের নির্দ্দোষ আবৃত্তি না হইলে আপনাদিগকে অপরাধী ভাবিতেন, তাই স্তবান্তে বলিতেন—

"যদক্ষরং পরিভ্রষ্টং মাত্রাহীনঞ্চ যদ্ভবেৎ।
পূর্ণং ভবতু তৎসর্ব্বং ত্বৎপ্রসাদাৎ মহেশ্বরি।
যদত্র পাঠে জগদম্বিকে ময়া বিসর্গবিন্দ্বক্ষরহীনমিরীতং।
পূর্ণং তদেবাস্তু তব প্রসাদতঃ সঙ্কল্পসিদ্ধিশ্চ সদৈব জায়তাং॥
যন্মাত্রাবিন্দুবিন্দুদ্বিতয়পদপদদ্বন্দ্ববর্ণাদিহীনং।
ভক্ত্যাভক্ত্যানুপূর্ব্বং প্রভবকৃতিবশাদ্ব্যক্তমব্যক্তমম্ব।
মোহাদজ্ঞানতো বা পঠিতমপঠিতং সাম্প্রতস্তে স্তবেঽস্মিং।
তৎসর্ব্বং সাঙ্গমাস্তাং ভগবতি বরদে ত্বৎপ্রসাদাৎ প্রসীদ॥
"যোঽসৌ ধস্তোমুনিনিগদিতং পঠ্যতে ভক্তিভাবান্
মাত্রাহীনং পদমধিগতং পাদগাথাক্ষরং বা॥
জিহ্বাদোষৈঃ পবনরহিতৈঃ শ্লেষ্মদোষৈঃ প্রকারৈ
র্যৎ দেব্যস্ত্রিভুবনগতা মাতৃরূপাঃ ক্ষমধ্বং॥"

ইত্যাদি।

স্তবাদির আবৃত্তিতে ত্রুটি হইলে কেবল দেবতার কাছে নয়, মানুষের কাছেও অপরাধী হইতে হয়। শ্রোতা ও শ্রোতা উভয়েরই অকল্যাণ হয়। চণ্ডীপাঠ ও গীতাপাঠ ইত্যাদির প্রসঙ্গে অপরাধ ও তাহার আশঙ্কিত দণ্ডের কথা শাস্ত্রে আছে।

ধর্ম্মের প্রসঙ্গ থাকুক;—সকল প্রকার আবৃত্তির সম্বন্ধেই প্রকারান্তরে একথাটা খাটে। নির্দ্দোষ সুবিহিত আবৃত্তি না হইলে অভিজ্ঞ শ্রোতামাত্রেই আবৃত্তিকারকে অপরাধী মনে করেন। শ্রদ্ধাশীল শ্রোতা তাহার বন্দনীয় কবির ছন্দের বিরূপ, বিকৃত ও বিরস আবৃত্তি সহ্য করে না—কাব্য-সরস্বতীর কোন সেবকই সে অপরাধ ক্ষমা করে না। আবৃত্তিকার নিজের কাছেও নিজে অপরাধী। নির্দ্দোষ সুসঙ্গত আবৃত্তিতে যে নির্ম্মল আত্মপ্রসাদ অন্তর হইতে পুরস্কারস্বরূপ পাইবার কথা, তাহা তিনি পান না।

নির্দ্দোষ আবৃত্তি সারস্বত জগতের একটি শোভন সৃষ্টি, চিরসুন্দরের একপ্রকার অর্চ্চনা, একটী কল্যাণময় বাঙ্ময় অনুষ্ঠান। ইহাতে যে রসানুভূতি জন্মে, তাহাতে Intellectual, Moral ও Aesthetic Sentiment তিনই ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সেজন্য নীতি-ভ্রষ্ট ব্যক্তি বিবেকের তাড়নায় অন্তরে যে অস্বস্তি ও অশান্তি ভোগ করে—আবৃত্তি নির্দ্দোষ না হইলে আবৃত্তিকারকের চিত্তে সেইরূপ অশান্তি ও অস্বস্তির উদয় হয়, সরস্বতীর অবমাননা করিয়া সে নিজেই লজ্জাকুণ্ঠিত হইয়া পড়ে।

বৈতালিকগণ প্রভাতে সন্ধ্যায় স্রগ্ধরা, মন্দাক্রান্তা ইত্যাদি ছন্দে রাজবন্দনা আবৃত্তি করিত। মুদ্রারাক্ষস নাটকে চন্দ্রগুপ্তের চারণদ্বয়ের রাজপ্রশস্তি আবৃত্তির প্রভাব যে কত, কবি তাহা দেখাইয়াছেন। বন্দী বৈতালিকের মুখে আপনার মহিমা কীর্ত্তন শুনিয়া রাজার রাজোচিত গৌরব, আত্মনির্ভরতাও ওজঃশক্তি প্রবুদ্ধ হইয়া উঠিত। পরবর্ত্তী যুগে ভাট ও নকীবগণ বৈতালিকের কাজ করিত। নান্দী, মঙ্গলাচরণ, স্বস্তিবাচন, ভরতবচন, প্রণতি, আশীর্ব্বাদ ইত্যাদি সমস্তই আবৃত্তি দ্বারাই নিষ্পন্ন হইত। কবি-পণ্ডিতগণ রাজসভায় আবৃত্তি করিয়া পুরস্কার লইয়া আসিতেন। ব্যাখ্যার জন্য নহে, কেবলমাত্র আবৃত্তির জন্য আজও অনুষ্ঠান-বিশেষে চণ্ডীপাঠ, গীতাপাঠ, বিরাটপাঠ চলিয়া আসিতেছে। নির্দ্দোষ আবৃত্তি আমাদের ধর্ম্মানুষ্ঠানের অঙ্গীভূত—মন্ত্রোচ্চারণের ও সূক্তশ্লোকের আবৃত্তিতে কোন দোষ থাকিলে অনুষ্ঠানের অঙ্গহানি হইত।

কাব্যের ত কথাই নাই—বিনা আবৃত্তিতে মেঘদূত মেঘদূতবধে, কুমারসম্ভব কুমারসংহারে ও ঋতু-সংহার সত্যসত্যই ঋতুর সংহারে দাঁড়াইবে। নৈষধের যাহা প্রাণস্বরূপ, সেই পদলালিত্য, আবৃত্তির উপরই নির্ভর করিতেছে। সুরজ্ঞান না থাকিলে গান গাওয়া যায় না, কিন্তু সামান্য ছন্দোজ্ঞান থাকিলেও গীতগোবিন্দ আবৃত্তি করা চলে। কেবলমাত্র আবৃত্তিই গীতগোবিন্দকে এত শ্রুতিসুভগ করিয়া তুলে যে, সুরতানে পরিগীত না হইলেও গীতগোবিন্দের গীত বা গোবিন্দের অমর্য্যাদা হয় না—স্বর তরঙ্গের হিন্দোলায় ছুলিয়া দোলগোবিন্দও অপ্রসন্ন হন না।

অধিকাংশ বৈষ্ণব কবিগণ মৈথিলীতে পদরচনা করিয়াছেন; মৈথিলীতেও সংস্কৃতের মতই হ্রস্বদীর্ঘ স্বরের প্রভেদ রক্ষার নিয়ম ছিল,সেজন্য বৈষ্ণবপদগুলি আবৃত্তির উপযোগী। কীর্ত্তনীয়াগণ কীর্ত্তনগান-কালে কতক গাহিয়া, কতক কেবলমাত্র আবৃত্তি করিয়া আমাদের চিত্তরঞ্জন করেন। "মঙ্গলকাব্য"গুলিও পালা-হিসাবে কতক 'গীত', কতক আবৃত্ত হইত। কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীদাসের মহাভারত সুর-সংযোগে আবৃত্তি করিয়া পঠিত হইত বলিয়াই বাঙ্গালী নরনারীর চিত্তগঠনে এত সাহায্য করিয়াছে। কবি তাই কৃত্তিবাসকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন,—

"গদ্‌গদ্ প্রৌঢ় কণ্ঠে, প্রবীণের দন্তহীন মুখে
কিশোরীর সুধাস্বরে হাসি অশ্রু ঝরণার দুখে,
তোমার বিজয়বার্ত্তা কোটী কণ্ঠে······
তেজপাতা চিহ্নটী খুলিয়া—
দিনের বেসাতীশেষে মুদী তার ভাঙা কণ্ঠস্বরে,—
লঙ্কাকাণ্ড শেষ করি, বিশ্রামের আয়োজন করে।"

মনসার ভাসান, মাণিকপীরের গান ইত্যাদি নামে মাত্র গান, উহা সুর করিয়া আবৃত্তি মাত্র। সত্যনারায়ণের পাঁচালি হইতে ছেলে-ভুলানো ছড়া পর্য্যন্ত সমস্ত লোক-সাহিত্য এবং ব্রতপার্ব্বণের অঙ্গস্বরূপ সমস্ত অন্তঃপুর-সাহিত্যই আবৃত্তিকেই আশ্রয় করিয়াছে। আবৃত্তিকেই আশ্রয় করিয়া কথকতা বহুকাল আমাদের দেশের লোক-শিক্ষার ভার লইয়াছিল। আজও অনেক বাঙ্গালী পল্লী-বাসিনী পুণ্যশ্লোকগণের নামের পুণ্য শ্লোকমালার সহিত নরোত্তম দাসের 'শ্রীকৃষ্ণের শত নাম' প্রভাতে আবৃত্তি করিয়া গাত্রোত্থান করেন। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার কণ্ঠস্বরে স্তোত্র, ছড়া, পাঁচালী, শ্লোক ও শিশুরঞ্জন ছন্দের মিলিত ঝঙ্কারে পল্লীসন্ধ্যাগুলি কলমুখরিত হইয়া উঠিত।

বর্ত্তমান কাব্যসাহিত্যের মধ্যে মেঘনাদবধ 'মেঘনাদে' আবৃত্তি করিয়া না পড়িলে কবির প্রতি অবিচার করা হইবে। বাঙলাকাব্যে সংস্কৃতের ন্যায় স্বরবৈচিত্র্যের ও হ্রস্ব-দীর্ঘ উচ্চারণ-ভেদের অভাব ছিল, সে জন্য মৈথিলী ভাষার কবিদের পর মাইকেলের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বঙ্গ কাব্য-সাহিত্য আবৃত্তির কতকটা অনুপযোগী হইয়া পড়িয়াছিল। তাই, মাইকেল যখন বহুদিন পরে বঙ্গ-কাব্যসাহিত্যকে আবৃত্তির উপযোগী করিয়া তুলিলেন, বঙ্গীয় পাঠক প্রথমতঃ তাঁহার সৃষ্টি-মর্য্যাদা উপলব্ধি করিতে পারে নাই।

অনেকে তাঁহার প্রবর্ত্তিত বচনাভঙ্গিকে ব্যঙ্গ করিয়া অনেক কুকাব্য অকাব্য রচনা করেন এবং ব্যঙ্গাত্মক বিকৃত আবৃত্তি করিয়া মেঘনাদবধকেই বধ করিবার চেষ্টা করেন। মাইকেল অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্ত্তন করিয়া একটি অপূর্ব্ব স্বর-তরঙ্গের বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিলেন, পয়ার পংক্তিকেই একটী সচ্ছন্দ সাবলীল গতিদানে ও যুক্তাক্ষরবহুল শব্দের প্রভূত সমাবেশে কাব্যের ভাষাকে একটী সবল বঙ্কুর স্বাস্থ্যদান করিলেন। ছেদ ও যতি সংস্থানের মুহুর্মুহুঃ বৈচিত্র্য ঘটাইয়া ছত্র হইতে ছত্রান্তরে ভাবধারাকে বেগানুযায়ী গতিস্বাধীনতা দিলেন এবং ওজস্বিতা ও তেজস্বিতায় বলিষ্ঠ করিয়া ভাষার 'পদবিক্রমকে' পৌরুষশক্তিসম্পন্ন করিয়া তুলিলেন। মাইকেলের ছন্দোভঙ্গি আবৃত্তির উপযোগী হওয়ার পরে উহা বঙ্গদেশের কাব্য ও নাট্যে সাগ্রহে অনু-কৃত হইতে লাগিল।

আবৃত্তির উপযোগিতা হেমচন্দ্রও বুঝিয়াছিলেন—তাই দশমহাবিদ্যায় জয়দেবের ছন্দঃস্পন্দ আনিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু বাংলাভাষায় উহা সাবলীল ও স্বাভাবিক হয় না ইহাও বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাই শেষে মাইকেলের ওজস্বিনী ভঙ্গিরই অনুসরণ করিয়াছেন।

তারপর রবীন্দ্রনাথ বহু বিচিত্র, শ্রুতিসুভগ, সম্পূর্ণ-রসায়ত ভাব-সমঞ্জস ছন্দের প্রবর্ত্তন করিলেন এবং যুক্তাক্ষরের জন্য দীর্ঘমাত্রার মর্য্যাদায় পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিলেন। নানা কৌশলে ছন্দঃস্পন্দ-সৃজনে রচনাকে তরঙ্গায়িত করিয়া

শিশুরঞ্জন ও জনরঞ্জন হসন্তবহুল ছড়ার ছন্দকে ভাবগর্ভ সংকাব্যে আভিজাত্য-গৌরবদান করিয়া এবং অসমমাত্রিক মন্দছন্দগতি 'তাজমহলী' ছন্দের প্রতিষ্ঠা করিয়া বঙ্গকাব্য-সাহিত্যিকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর আবৃত্তির উপযোগী করিয়া তুলিয়াছেন।

তাঁহার প্রধান শিষ্য, ছন্দের যাদুকর সত্যেন্দ্রনাথ হসন্ত ও স্বরান্ত অক্ষরের মিলনমাধুর্য্য লক্ষ্য করিয়া তাহাদের সন্নিবেশ-ব্যবধানকে নিয়মিত করিলেন। তাহার ফলে বঙ্গকাব্যসাহিত্যে অপূর্ব্ব ছন্দোহিল্লোলের সৃষ্টি হইয়াছে। কবিবর দ্বিজেন্দ্রলালও ঐ হসন্ত-বহুল ছড়ার ছন্দে নানাবিচিত্র ভঙ্গী সৃষ্টি করিয়া তাঁহার রচিত কৌতুক কবিতাগুলিকে আবৃত্তির সম্পূর্ণ উপযোগী করিয়া তুলিয়াছেন।

আমাদের কাব্যসাহিত্য এখন আবৃত্তির উপযোগিতায় সংস্কৃত, পারসী, ইংরাজী, ফরাসী ইত্যাদি ভাষার কাব্যসাহিত্য হইতে হীন নহে,—বরং ছন্দোবৈচিত্র্যের এবং নবপ্রবর্ত্তিত ছন্দোহিল্লোলের জন্য ইংরাজীকেও অতিক্রম করিয়াছে বলিয়া মনে হয়।

কবিরা ত তাঁহাদের কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াছেন—কিন্তু 'একাকী গায়কের নহেত গান।—

তটের বুকে লাগে জলের ঢেউ তবে ত কলতান উঠে।
বাতাসে বন সভা শিহরি কাঁপে তবেত মর্ম্মর ফুটে।"

রসপিপাসু পাঠকেরও কর্ত্তব্য আছে—তাহাকেও প্রস্তুত হইতে হইবে, নতুবা তাহার পক্ষে বর্ত্তমান যুগের বাংলা কবিতা পাঠ ব্যর্থ হইবে। সকল শাস্ত্রেরই মর্ম্মজ্ঞকে সকল জ্ঞান-শাখার রসজ্ঞকে সাধনা করিয়া শিক্ষার্থী হইয়া পূর্ব্বেই যোগ্যতা ও অধিকার অর্জ্জন করিতে হয়। কাব্যের বেলায় অন্যথা হইতে পারে না। অথচ আমাদের পাঠকগণের বিশ্বাস কাব্যের রসগ্রহণের জন্য কোনপ্রকার পূর্ব্বতন শিক্ষাসংস্কারের প্রয়োজন নাই। সেজন্য পল্লী-বিপণির গন্ধবণিক হইতে নগরের গ্রন্থবণিক পর্য্যন্ত সকলেই নিঃসঙ্কোচে কাব্যসাহিত্য সম্বন্ধে দায়িত্বশূন্য মতামত ব্যক্ত করেন। সেজন্য এদেশে রবীন্দ্রনাথের কাব্যের সম্যক্ সমাদর হয় নাই।

পাঠককে বর্ত্তমান কাব্যের ছন্দ, যমক, অনুপ্রাস, ছন্দঃস্পন্দ, যতি, মাত্রা, মিল ও কাব্যের অন্যান্য কারু-কৌশলসম্বন্ধে কতকটা জ্ঞান অর্জ্জন করিতে হইবে—শ্রুতি ও মতিকে রসগ্রহণের অধিকারী ও উপযোগী করিয়া তুলিতে হইবে। বাগযন্ত্রের স্বাস্থ্য ও সৌকণ্ঠ্যের সৌভাগ্য সকলের না থাকিতে পারে, কিন্তু শিক্ষা ও অনুশীলনের দ্বারা সকলেই ছন্দোবোধ অর্জ্জন করিতে পারেন। আবৃত্তির পক্ষে স্বরব্যঞ্জনের মাত্রাজ্ঞান, গুরুলঘুবোধ, হ্রস্বদীর্ঘবোধ বিশেষ প্রয়োজনীয়। যতিজ্ঞান আবৃত্তির পক্ষে অত্যন্ত আবশ্যক। শব্দান্তে যতি ধরা সহজ, সংস্কৃত শ্লোকে শব্দের মধ্যে মধ্যে যতি থাকে—যতিজ্ঞান না থাকিলে সংস্কৃত ছন্দের আবৃত্তি অসম্ভব। বাংলা কবিতাতেও অনেক সময় শব্দের মধ্যে যতি থাকে।

"চরণ পদ্মে। মম চিত নিস্। পন্দিত করহে।
নন্দিত কর। নন্দিত কর। নন্দিত করহে॥"

উপরের পংক্তিতে 'নিস্' এর পর যতি দিতে না পারিলে 'নিস্পন্দিত' দেবতার পদে ও কবিতার পদে—দুইয়েতেই নিস্পন্দিত রহিয়া যাইবে।

কোন্ কোন্ ছন্দ সগোত্র সবর্ণ ও সপিণ্ড এবং কোন্ গুলি নয়, কোন্ কোন্ ছন্দের সঙ্কর-মিলন বৈধ, কোন্ শ্রেণীর পদের সহিত কোন্ শ্রেণীর পদ পাংক্তেয়—কোন্ শ্রেণীর পদ অপাংক্তেয়—সে বিষয়ে রীতিমত জ্ঞান চাই। মনে রাখিতে হইবে ছন্দগুলি বর্ণাশ্রমী। প্রাচীন ভট্টচারণের ন্যায় ছন্দঃসমাজের কুলপঞ্জিকা ও ঘটক-কারিকা আবৃত্তিকারের অভ্রান্তভাবে অধিগত থাকা চাই।

ক্রমশঃ

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

"মাধবীকে তুমি বিয়ে করো।" "তুমি না বললেও বিয়ে আমি করতাম—কারণ কিছুদিন থেকে বুঝছি যে সেটা একান্ত দরকার হয়ে পড়ছে। তা তুমি যখন হাতের কাছে পাত্রী এনে দিয়েছ, তখন তাঁকেই আমি বিয়ে করব—এ বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো। তবে একটা কথা, বিয়ে আমি করব বটে তাঁর সুখ দুঃখের কোনো ব্যাপারে আমি থাকব না—তিনি এতে সুখী হবেন মনে করেন ভাল, দুঃখ পান, আমার হাত নেই!"

"মাধবীকে আগে বিয়েই করো—তারপর দেখো সে কেমন!—"

"বেশ, কাল আমি বড়দাকে বলব—কিন্তু এখনও ভেবে দেখ মীনা বিয়েটা ছেলে খেলা নয়, একবার হয়ে গেলে আর ফিরবে না—আমি হয়তো তাঁর আশা কিছুই মেটাতে পারব না।"

"তার চেষ্টাও করোনা যতীদা—আশা তার খুবই কম, তা মিটোতে তোমাকে বেগ পেতে হবে না। তা হলে এই-ই তো স্থির?"

"নিশ্চয়। যতী যা' করে তা মন দিয়েই করে।"

শুভ্রাংশু যখন যতীর মুখে তার বিয়ের শুনলেন, তখন আনন্দে অধীর হয়ে তখনি পাঞ্জী দেখতে বসলেন। মলিনাও খুসী হল বটে, কিন্তু তার মনে তখন আর একটী বিয়ের স্মৃতি জেগে উঠে, সে আনন্দ ম্লান করে দিচ্ছিল।

যাদের বিয়ের নামেই গোলযোগ ছিল, বিয়ের সময়ে তাদের আর কোনো গোল হল না। যতী বিয়ের সময়ের কোনো শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানই বাদ দিলে না—মেয়েলি আচারও নয়—এমন কি বাসরে সে গানও করলে! মীনা একটু আশ্চর্য্য হল, ভাবলে পুরুষের রীতি বোধহয় এই রকমই। যাক্ খুসীও সে কম হল না।

ফুলশয্যার দিনে—মাধবীকে সাজাবার ভার মীনা নিলে। ফুলের বাগানে ফুলের অভাব ছিল না—বাগান উজাড় করে ফুল তুলে এনে মাধবীর মাথায়, গলায়, হাতে বুকে পরিয়ে শেষে বিছানায় ঢেলে দিলে। মাধবীর মুখে কোন কথা ছিল না—সে বসে বসে তার কাণ্ড দেখছিল। ফুল সাজানো শেষ হলে, একটা ভেলভেটের কেস্ খুলে সে মাধবীর গলায় কি পরিয়ে দিলে—ব্যস্ত হয়ে মাধবী বল্লে "ও কি মীনু, না ভাই ও নিতে পারব না—তোমার আনন্দ বেঁচে থাক তার বউ এলে দিয়ো।"

গয়নাটা ঠিক করে পরাতে পরাতে মীনা বল্লে "কেন মাধু? তোমাকে কি আমার কিছু দিতে নেই? কিছুই তো দিতে পারলাম না—শুধু এই সরু চেন টুকু!"

মাধবীর চোখ জলে ভরে এলো! এই সর্ব্বহারা তপস্বিনীকে সে কি বলে সান্ত্বনা দেয়!

রাত তখন তিনটে হবে। বিছানায় কিছুতে থাকতে না পেরে মীনা উঠলো—ওপরের বারান্দায় বেড়াতে বেড়াতে যতীর ঘরের দিকে তার নজর পড়ল, একটা অদম্য কৌতূহল হলো ভেতরের খবরটা জানবার জন্যে। ধীরে ধীরে পা টিপে টিপে সে জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো।

খড়খড়ির পাশের ফাঁক দিয়ে দেখলে ঘরে আলো জ্বলছে, খাটের ওপরে যতী বসে আছে, তার কোল ঘেঁষে বসে আছে মাধবী। দুজনেই, দুজনের দিকে অপলক চেয়ে আছে। কতক্ষণ এমনি বসে থাকার পরে, যতী মাধবীর কোলে মাথা দিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লো—থেকে থেকে তার সমস্ত শরীর কুঁচ্‌কে উঠতে লাগলো! আর মাধবী করুণ চোখে তার লুটিয়ে পড়া দেহের দিকে চেয়ে রইলো। এই দৃশ্যই মীনা দেখতে চেয়েছিল; কিন্তু চোখ জ্বালা করে কেন? তবে, তবে কি সেও যতীকে ভালবাস্‌তো? আজ যতী অন্যকে আপনার করেছে বলে কি এ দুঃখ? ছিঃ ছিঃ! না সে কি করে সম্ভব? হতেই পারে না। না, না এ দুঃখ তার নয়, এ দুঃখ তার অমন আশ্রয় হারিয়েছে বলে, ফিরে পাবার উপায় নেই বলে। থাকো মাধু—অমনি করেই স্বামীর সকল সুখ দুঃখের ভাগী হয়ে—মনে মনে এই আশীর্ব্বাদ করে সে জান্‌লা থেকে সরে এলো—

ঘরে যেখানে তার ছেলে শুয়ে ছিলো, তার মাঝে এসে শুয়ে সে আজ অনেকদিনের পরে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়লো। স্বপ্নে দেখলে পটের শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তিমান্‌ হয়ে তাকে বল্‌ছেন "দেখতো চেয়ে, আমার চেয়ে তোর স্বামী কত সুন্দর, কত কামনার জিনিষ। পৃথিবীর স্বামীর আশা ছেড়ে দিয়ে জগৎ স্বামীর আশ্রয় নে।" ভোর বেলা ঘুম ভাঙার পরে সে কতক্ষণ শুয়ে শুয়ে স্বপ্নের কথা ভাবলে। তারপরে উঠে স্নান সেরে মলিনাকে বল্‌লে "বৌদি, ভাই, গোপাল কোথায় পাওয়া যায়? আমি পাই তো পূজো করি। বড়দাকে বলো তো আনিয়ে দেবেন একটা।" তার মুখের দিকে চেয়ে মলিনা অবাক্‌ হল। দেখলে সে মুখে, শান্তি আর আনন্দ ঘিরে রয়েছে, আগের দিনের মুখের সঙ্গে এ মুখের কোনো মিল নেই। তাকে তার মুখের দিকে চেয়ে থাকতে দেখতে মীনা তার পূজোর ঘরে যেতে যেতে বল্‌লে "হাঁ করে এই পোড়া মুখ খানায় কি দেখছ আজ?—আজ আমার ঘাড় থেকে বোঝা নেমে গেছে যে!"

পূজোর ঘরে ঢুকে সে দরজা বন্ধ করে দিলে। ঘণ্টা খানেক পরে বাড়ীর সকলে আশ্চর্য্য হয়ে শুন্‌লে মৃদু মৃদু ঘণ্টা ধ্বনির সঙ্গে মীনা তার সুকণ্ঠে গান ধরেছে

"মেরা, গিরিধর, গোপাল বিনে
ঔর কোই নেহী—"

এ গানের অর্থ মলিনা বুঝলে—একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে তার কাজে চলে গেল।

সমাপ্ত

দৈবদুর্বিপাকে

শ্রীসন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায়

গল্প

'ভরা নদী, বিকেলের দিকে আবার আজকাল রোজই মেঘ করে, নয় আজকের দিনটা থেকেই যা?'—মা'র কথাটা অগ্রাহ্য করা উচিৎ হয়নি; কিন্তু না করেই বা উপায় কি? যে রিট্রেঞ্চমেণ্টের হিড়িক! লেট্ হলেই পত্রপাঠ বিদায়ের মস্ত বড় সুযোগ। কিন্তু চারদিক্ যে মেঘে ছেয়ে গেল, নৌকোটাও একেবারে নদীর মাঝখানে, যে ঢেউ, একগজ এগুতেই মাঝির প্রাণান্ত!

মাঝিকে বল্লাম, দ্যাখ হে, নৌকোটাকে না হয় ধার দিয়েই নিয়ে চল, আকাশের অবস্থা দেখচ ত?

মাঝি বল্লে, কিছু ভয় নেই কর্ত্তা, ঘণ্টাখানেকের ভেতরই ওপারে পৌঁছে যাব। মেঘটা ত এক্ষুণি কেটে গেল বলে।

মেঘ কিন্তু কাট্‌ল না। অল্প অল্প বৃষ্টির ঝাপটা ছাউনীর ভিতরে প্রবেশ করতে লাগ্‌ল, বাতাসের জোর ক্রমেই বেড়ে চল্‌ল, চারদিক ঝাপ্‌সা হয়ে এল। মাঝি প্রাণপণ শক্তিতে বাতাসের সাথে যুদ্ধ করে অগ্রসর হবার চেষ্টা করল, কিন্তু বাতাস নৌকোটাকে বেশ জোরেই পিছনের দিকে নিয়ে চল্‌ল, অর্থাৎ আমরা ফিরে চল্‌লাম। নৌকোটা ক্রমেই যেন ইলেক্‌ট্রিকের শক্ খেয়ে ছুট্‌তে আরম্ভ করল। মাঝি নিরুপায় হয়ে বাতাসের দিকে মুখ করেই হাল ধরে বসেছিল। নৌকোখানার গতির বেগ দেখে মনে হল, এরকম ভাবে আর খানিকক্ষণ ছুট্‌তে পারলে সশরীরে সাগরে পৌঁছান যাবে।

সঙ্গে আবার বৃষ্টি। মাঝি ত শীতে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে, আমিও প্রায় ঘাম করে উঠেছি। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, নৌকোটা তখনও ডুবছে না—যেন মৃত্যুর সাথে পাল্লা দিয়ে ছুটেছে! প্রকাণ্ড এক একটা ঢেউ নৌকোটাকে যাত্রীশুদ্ধ গ্রাস করতে আসে, কিন্তু মাঝি হাল্‌টা একটু বাঁকিয়ে ধরতেই নৌকোটা সাঁ করে পাশ কেটে ছুটে যায়, কিন্তু যেতে না যেতেই আর একটা, তারপর আর একটা—অফুরন্ত! মৃত্যু যে আসন্ন, সে জন্যে দুঃখ ছিল না কিন্তু অত কষ্টের চাক্‌রীটা যে আর থাক্‌ল না, সে দুঃখটাই যেন সব চাইতে বড় হয়ে বুকে বাজল!

মা'র কথা খুব বেশী মনে হচ্ছিল। আমার মৃতদেহ ত আর খুঁজে পাওয়া যাবে না, কাজেই মা' হয়ত মৃত্যু সম্বন্ধে নিশ্চিত থেকেও দু' একবার ভাববেন, হয়ত বেঁচে আছে! আর খুকীটা যখন জিজ্ঞেস্ করবে, "দাদা কোথা গো! মা তখন কত কি বলে ও'কে ভুলিয়ে রাখবেন! অফিসে কিন্তু কোন গোলমাল হবে না, নম্বুটা একবার বড়বাবুকে জিজ্ঞেস্ করবে হয়ত!

হঠাৎ একটা জোর বাতাসের ঝাপটায় নৌকোটা ছিট্‌কে এসে একটা চরের গায়ে ধাক্কা খেল। মুহূর্ত্তমধ্যে আমি যেন বালুর কাদায় জীবন্ত সমাধিস্থ হতে চল্‌লাম প্রাণপণ চীৎকার করে একবার মাঝিকে ডাক্‌তে চাইলাম কিন্তু কে যেন কণ্ঠনালী সজোরে চেপে ধরল! দম্ বন্ধ হয়ে আস্‌ছিলো। মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও বাঁচবার জন্য প্রকৃতির সাথে ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ করলাম। দুই চার দশ' কোশের মধ্যেও কোন জনমানবের সাড়া নেই, কেবল বালু আর জল। সোঁ, সোঁ, শন্, শন্, শব্দ! আলুথালুবেশা ভয়ঙ্করী প্রকৃতির কি রুদ্র তাণ্ডব! এদিকে আবার ক্ষুব্ধা স্রোতস্বতীর তীব্র গর্জ্জন আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে তুলছে!

মৃত্যুগহ্বর হতে কেমন করে যেন উদ্ধার পেলাম। পরণে একখানি কাপড়, শতছিন্ন। সমস্ত গা' কাদায়, জামাটা যে কোন্ সময় ছিঁড়ে কোথায় গিয়েছে মনে নেই।

ঝড় তখনও পুরোদমেই চলছে। বৃষ্টির ফোঁটাগুলি সূঁচের মত গায়ে বিঁধ্‌ছিলো।

বিদ্যুতের চমকানো আলোকে নদীর ভয়াবহ মূর্ত্তি দেখে শিউরে উঠ্‌লাম। গা কাঁটা দিয়ে উঠ্‌ল—কি করে এই উত্তালতরঙ্গময় খরস্রোতা নদী দিয়ে নৌকো চালিয়ে আস্‌লাম। নৌকোটার জন্যে একটুও দুঃখ ছিল না, ক'খানা কাপড়চোপড় আর গোটা পাঁচেক টাকা শুদ্ধ সুট্‌কেস্‌টার জন্যেও না, দুঃখ হচ্ছিল মাঝি বেচারীর জন্যে আমাকে বাঁচাবার জন্যে কি আপ্রাণ চেষ্টাই না করেছে! নৌকোটা ভেঙে চুরমার হয়ে যাবার এক সেকেণ্ড আগেও সে শক্ত করে হাল ধরে বসেছিল! এতক্ষণে হয়ত তার ক্লান্ত দেহটাকে অনায়াসে খরস্রোতে টেনে নিয়ে কোন অতল তলে রেখে দিয়েছে! তার দুর্নিবার বাঁচবার আগ্রহকে ব্যর্থ করে দিয়ে প্রকৃতি হয়ত ভ্রূকুটি নেত্রে খল্ খল্ করে হেসে উঠেছে! ভাবতে মাথাটা যেন ঝিম্ ঝিম্ করতে লাগল, আশ্রয়ের সন্ধানে অনির্দ্দিষ্ট দিকে ছুটে চললাম।

অনুভবে মনে হল, চরটা একেবারেই ফাঁকা, জনমানব ত নেই-ই, একটা গাছপালাও নেই। তবু হেঁটেই চলেছি, ভয় যদি নদী এসে পিছন থেকে গ্রাস করে। বৃষ্টির জোর আস্তে আস্তে কমে আসছিলো বটে, কিন্তু বাতাসের জোর কম্‌ল না। আঁধার এত গাঢ় যে নিজকে পর্য্যন্ত চেন্‌বার জো নেই কিন্তু অমন সূচিভেদ্য আঁধারের বুক চিরেই অগ্রসর হচ্ছিলাম।

চল্‌তে চল্‌তে অদূরে জোনাকীপোকার মত একটু ক্ষীণ আলোরেখা দেখে বিস্মিত হলাম। আশ্রয়ের আশায় আলোরেখা লক্ষ্য করে ছুটে চল্‌লাম। একেবারে কাছে এসে দেখলাম বাঁশের মাচার 'পর একখানি ছোট চালাঘর, ভেতর থেকে বেড়ার ফাঁক দিয়ে আলোরেখা বেরুচ্ছে। ঘরে নিশ্চয়ই লোক আছে, নয়ত আস্‌বে কোত্থেকে? এটা আবার ডাকাতের ঘর নয়ত! শুনেছি চরের ভেতর নাকি অনেক ডাকাতদলের আড্ডা থাকে; অবশ্য ডাকাত হলেও আমার মত ভিখিরীর ভয় করবার কিছুই নেই। তারপর ডাকাতই হ'ক আর খুনীই হ'ক, মানুষ ত! এ বিপদে তাই বা কোথা' মেলে? এদিকে শীতে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছিলাম, আর খানিকক্ষণ এভাবে ঝড় জলে থাক্‌লে নিশ্চয়ই বরফ হয়ে যাব।

মাচার উপর লাফ দিয়ে উঠে ঝাপ ঠেলে চীৎকার করে বল্‌লাম, কে আছেন, একবার খুলুন, আমি নিরাশ্রয়!

কে একজন ঝাপ্ খুলে দিতেই আমি চট্ করে ভিতরে ঢুকে পড়লাম। ঢুকেই দেখি সাম্‌নে একজন স্ত্রীলোক দাঁড়িয়ে। তার বেশভূষা কতকটা অদ্ভুত রকমের—পরণে শুধু একখানি রঙীন শাড়ী, দু'হাতে ডজন খানেক রেশমি চুরি আর দু'কাণে বড় বড় দুটো রূপোর মাকড়ী। গা'র বর্ণ কালো হলেও বেশ মাজা, মোটাসোটা ও একটু বেঁটে রকমের গড়ন। চোখ দুটি ভাসা ভাসা ও ডাগর, মাথায় একরাশ চুল, পিঠের উপর দিয়ে এলান। ঝড়ের রাতে চরপ্রান্তরে একজন অজানা স্ত্রীলোকের ঘরে অনাহূত ভাবে প্রবেশ করে অত্যন্ত সঙ্কোচ বোধ করছিলাম। বের হয়ে যাব কিনা ভাবছিলাম এমন সময় স্ত্রীলোকটি বসবার জন্যে আমার সামনে একখানি আধ ছেঁড়া মাদুর পেতে দিলে।

হঠাৎ আমার হুঁস্ হল—আমি নগ্নগাত্র, পরণের কাপড় একেবারে ছেঁড়া, সমস্ত গা' জলে ভিজা ও অসহ্য শীতে কাঁপছে। আমার অবস্থা দেখে স্ত্রীলোকটি বোঁচকা থেকে একখানি ছোট কাপড় বার করে আমায় পরতে দিল। ভিজা ছেঁড়া কাপড়টা ছেড়ে তাড়াতাড়ি শুক্‌নো কাপড়টা পরে ফেল্‌লাম; কাপড়ের আঁচল গায় জড়িয়ে যেন প্রাণ ফিরে পেলাম।

বাঁশের মাচার উপর ঘর কিনা, চালাখানি অনেকটা নৌকোর ছাউনীর মত, তাহলেও বেশ প্রশস্ত ও শক্ত। ঘরের ঠিক মাঝখান দিয়ে চালাসংলগ্ন সারি সারি গোটা তিনেক বাঁশের খুটি। মাচার উপর সমস্ত জায়গা জুড়ে চাটাই বিছান। এককোণে দুটো চুপড়ি উপরোউপরি করে সাজান, তার 'পরে আবার একটা কাপড়ের বোঁচকা; পাশেই রান্না করবার হাঁড়ি, কলসী ও একটা আল্‌গা উনন। অপর পার্শ্বে কে যেন একজন কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে বলে মনে হল। তার মাথার উপরে চালার সাথে দড়ি দিয়ে ঝুলান একটা সস্তা কাঁচের লণ্ঠন।

বাইরে তখনও জোর তুফান। বাতাসের ঝাপটায় ঘরটি কটমট করছিল, কিন্তু অত্যন্ত নিচু ও খুব পোক্ত

বলে ঝড়ে তাকে বিশেষ কাবু করতে পারছে না। স্ত্রীলোকটি নিঃসঙ্কোচে আমার পাশে বসে অজস্র প্রশ্ন করতে লাগল—বাড়ী কোথায়, কি করি, ঝড়ের রাতে কি করে চরে এলাম ইত্যাদি। তার সমস্ত কথা বুঝতে পারি না, ভাষাটা কেমন যেন অদ্ভুত রকমের তাই অনেকটা অনুমানের উপর ভর করে উত্তর দিচ্ছিলাম।

তার পরিচয় জিজ্ঞেস্ করিনি, কিন্তু নিজেই সে স্বতঃ-প্রবৃত্ত হয়ে পরিচয় দিতে লাগল। তারা জাতে বেদে, সাপ-খেলা দেখান আর টুনকো মনোহারী জিনিষ বিক্রী করাই তাদের কাজ। নৌকোতেই তারা বেশী সময় থাকে তবে মাঝে মাঝে চরো জমিতেও ঘর বেঁধে বাস করে, এক চরে বেশীদিন থাকে না, একঘেয়ে বোধ হলেই অন্য চরে যেয়ে বাস করে। এখানে আরও কয়েক ঘর বেদে আছে। দু' একদিন পর পর নৌকো করে আশে পাশের গাঁয়ে গাঁয়ে সাপ খেলা দেখিয়ে বা টুনকো মনোহারী জিনিষ বিক্রী করে বেড়ায় আবার কখনও কখনও সাত আট দিন পরেও চরে ফেরে, তার দুনিয়ায় আর কেউ নেই, শুধু এক বুড়ো বাপ, সে ঐ কাঁথামুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে।

হঠাৎ চুপ্‌ড়ি দুটোর দিকে নজর পড়তেই ভয়ে গা কাঁটা দিয়ে উঠ্‌ল। ওরা যখন সাপ খেলা দেখিয়ে বেড়ায়, ও দু'টোর ভেতর নিশ্চয়ই সাপ আছে, মানুষের আওয়াজ পেয়ে সেগুলি হয়ত এক্ষুনি বেরিয়ে পড়বে, তাহলেই সর্ব্বনাশ আর কি! সাপের ভয়ে পেটের নাড়ি-ভুঁড়ি পর্য্যন্ত কুঁকড়ে গেল। ঝড় মাথায় করে দাঁড়িয়ে থাক্‌লেও বাঁচবার কিছু আশা ছিল কিন্তু সাপে ছোবল মারলে আর রক্ষে নেই! সত্যি কিনা জানিনে, কিন্তু মনে হল যেন চুপড়ি দুটো থেকে ফোঁস্ ফোঁস্ শব্দ বেরুচ্ছে। আতঙ্কে আমার অন্তরাত্মা পর্য্যন্ত শুকিয়ে গেল, এত কষ্ট করে প্রাণ বাঁচিয়ে শেষটায় কি না সাপের হাতেই সঁপে দিতে চল্‌লাম।

না, চুপ্‌ড়ি দুটোর দিকে আর চাইব না। কিন্তু হঠাৎ যদি সাপগুলি বেরিয়ে পড়ে? ঝাপ্‌খানি ঘেঁসে বসলাম, যদি নেহাতই বেরোয় তাহলে ঝাপ খুলে বাইরে লাফিয়ে পড়বো। বেদেনী আমার সন্ত্রস্ত চাউনি দেখে ব্যাপার বুঝে আমায় অভয় দিয়ে বলল, চুপড়ি দুটোর একটাতে মাত্র দুটো সাপ আছে বটে, কিন্তু তারা তার পেটের ছেলের মত, কোন অনিষ্ট করবে না, তারপর দুটোরই বিষদাঁত ভাঙা।

সাপ দুটোর বিষদাঁত ভাঙা শুনে কতকটা আশ্বস্ত হলাম, ছোবল মারলেও প্রাণটা ত বেঁচে থাকবে! কিন্তু তবুও ভয় করছিল। হঠাৎ বেদেনী সাপের ভালমানুষি দেখাবার জন্যে উপরের চুপড়িটা নামিয়ে নীচের চুপড়ি থেকে একটা প্রকাণ্ড ফণাওয়ালা সাপ বের করে আদর করতে করতে আমার কাছে নিয়ে এল। সাপের ভীষণ চেহারা দেখে আমার জিভ্ আড়ষ্ট হয়ে এল, 'মা গো' বলে এক বিকট চীৎকারে ঘর কাঁপিয়ে তুল্‌লাম। বেদেনী তাড়াতাড়ি সাপটাকে চুপড়ির ভিতর পুরে রেখে আশ্চর্য্য হয়ে বলল, সাপকে তোমরা এত ভয় কর?

বাইরে তখনও রুদ্র তাণ্ডব! ঝম্! ঝম্! ঝম্! সোঁ! সোঁ! সোঁ!

বেদেনী প্রাণ খুলে তার সুখ দুঃখের ইতিহাস বল্‌তে লাগল।

শিশু অবস্থায়ই বেদেনী মা-হারা, ঐ বুড়ো বাপই কোলে পিঠে করে মানুষ করেছে। এখন সে নিজেই রোজগার করে। গাঁ ঘুরে ফেরবার পথে তারা হাট থেকে চা'ল ডাল, ইত্যাদি যাবতীয় জিনিষ কিনে চরে চলে আসে। এ চরে আর বেশীদিন থাকা চল্‌বে না, কেন না পুরো বর্ষায় হয়ত এটা তলিয়ে যেতে পারে।

বেদেনীকে বিয়ের কথা জিজ্ঞেস্ করাতে অকপটে বললে, বিয়ে সে করেছিল একজনকে কিন্তু এখন আর তার সাথে কোন সম্পর্ক নেই। লোকটা এমনি বেইমান্! সাদির একমাস পরেই একটা ছুঁড়িকে নিয়ে কোথায় যেন ভেগেছে। বেদেনী প্রতিজ্ঞা করেছে, এ জীবনে আর বিয়ে করবে না, এম্‌নিই বেশ আছে, কোন ভাবনা চিন্তে নেই।

এদিকে রাত্রি প্রায় শেষ হয়ে এল। বাতাসের বেগ তখন অনেকটা কমেছে, বৃষ্টি একদম থেমে গেছে। আতঙ্কের ভাব কতকটা কেটে যেতেই অবসাদে আমার

চোখ বুজে আসতে লাগল। বেদেনী কিছু মুড়ি চিড়ে খাবার জন্যে অনুরোধ করল, কিন্তু তখন আমার কিছু খাওয়ার একটুও ইচ্ছা ছিলনা। বোঁচকা থেকে একখানি নূতন কাঁথা বার করে চাটাইর উপর পেতে বিছানা তৈরি হল। বালিশটার চেহারা দেখে মাথায় দিতে ইচ্ছে হলনা, বাঁ হাতখানা মাথার নীচে রেখে শুয়ে পড়লাম। মুহূর্ত্তের মধ্যে সব ভুলে গেলাম—নৌকোডুবি, নদীর মার-মূর্ত্তি, ঝঞ্ঝার দৌরাত্ম্য। সর্পভীতি—কোন চিন্তাই ঘুমের প্রাচীর ভেদ্ করতে সমর্থ হলনা।

খানিক পরেই চেয়ে দেখি চারদিক ফর্সা হয়ে গেছে। বেদেনী আমার পা'র কাছে আঁচল পেতে ঘুমিয়ে পড়েছিল। বেশ রোমাঞ্চকর বোধ হল—চারদিকে অথৈ জল, মাঝখানে একটা চর, তারই কুঁড়ে ঘরে এক তরুণী স্ত্রীলোকের সাথে ঝড়ের রাত্রি যাপন—যেন রূপকথার হারিয়ে যাওয়া রাজপুত্রের মত কাহিনী। ভোরের আলোয় অসম্বৃতা ঘুমন্ত বেদেনীকে দেখলাম, ঝল্সানো সৌন্দর্য্য তার ছিলনা, কিন্তু যৌবনের জোয়ারে তার দেহখানি আনাচে কানাচে ভরপুর, মুখখানিতে বনফুলের মত সারল্যের প্রতিচ্ছবি। এক অজ্ঞাত পথিকের পাশে ঘুমোতে তার একটু সঙ্কোচ বা দ্বিধা বোধ হয়নি।

বাঁশের মাচা থেকে নেমে উন্মুক্ত চর-প্রান্তরে দাঁড়িয়ে প্রভাতের ছবি নিরীক্ষণ করতে লাগলাম। কোথায় বা তখন ঝঞ্ঝা-বাদল, কোথায়ই বা স্রোতস্বতীর সেই ভয়াবহ আস্ফালন, সব শান্ত, মধুর ও বিচিত্র। চরটি দৈর্ঘ্যে অনেকদূর বিস্তৃত কিন্তু প্রস্থে অনেক কম, চারদিক ফাঁকা, মাঝে মাঝে কেবল বাঁশের মাচার 'পর দু' একখানি কুঁড়ে ঘর, হঠাৎ অদূরে ষ্টীমারের ধোঁয়া দেখতে পেয়ে আনন্দের আতিশয্যে লাফাতে লাফাতে নদীর ধারে চল্লুম।

বেদেনী আমায় কিছুতেই না খাইয়ে ছাড়বে না, বললে হাঁড়ি কলসী ধুয়ে পরিষ্কার করে রেখেছে, কেবল উনুনে জ্বাল ধরিয়ে চাপিয়ে দিলেই হয়। ষ্টীমার তখন চর থেকে মাইল কয়েক তফাতে; আমি আর মিছেমিছি খাওয়ার ঝঞ্ঝাট করতে রাজী হলাম না।

বেদেনী খুব মনক্ষুণ্ণ হল, সে ভেবেছিল আমি অন্ততঃ দিন দুই তিন এখানে থাকব। বিকেলবেলা নৌকো নিয়ে দুজনে নদীতে বেড়াতে যাব, মাছ ধরব, একসঙ্গে দুজনে নদীর জলে সাঁতার কাটব, আরও কত কি! এসব কথা নিতান্ত নিঃসঙ্কোচে বল্লে, তার যে একজন উপযুক্ত সঙ্গীর প্রয়োজন সে কথা জানাতে তার একটুও কুণ্ঠা বোধ হল না। অথচ আমি যে পুরুষ, আমার সাথে তার অতটা ঘনিষ্ঠতা যে কত মারাত্মক! তাও একবার ভাবেনি। তার মনের কথা অকপটে আমার কাছে খুলে বললে।

কাপড় উড়িয়ে নিশানা করতেই সারেঙ্ চর ঘেঁসে ষ্টীমার ভিড়াল। আমি সত্যি সত্যিই চলে যাচ্ছি দেখে, বেদেনী দৌড়ে তার ঘর থেকে কি একটা জিনিষ নিয়ে এল—ছোট একটা গাছের শিকড় আমার হাতে দিয়ে বল্লে, আমাকে দেবার মত তার কিছুই নেই; শুধু এই শিকড়টী, এ'র কাছে সত্যি সত্যিই কোন সাপ ঘেঁসতে পারেনা।

ষ্টীমারে উঠতেই সারেঙ্ ড্রাইভার, যাত্রীরদল আমাকে ঘিরে অজস্র প্রশ্নবাণে বিদ্ধ করতে লাগল। আমি তখনও একদৃষ্টে তাকিয়ে দেখছিলাম, চরের 'পর বেদেনীর ছোট্ট ঘর।
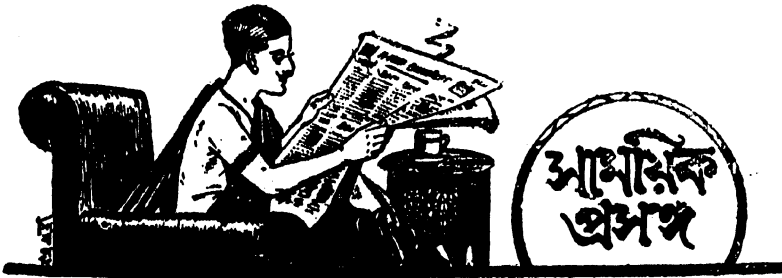
কাশ্মীর ভ্রমণ

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

পরদিন ৮ই আমরা মিত্র মহাশয়কে বিশেষ ধন্যবাদ দিয়া ৬ ঘটিকার সময় এসানসোল ত্যাগ করিয়া গোবিন্দপুর অভিমুখে চলিতে লাগিলাম। গোবিন্দপুর যাইবার পথে বরাকর নদীতে সাঁওতাল মেয়েদের জল সেচন দেখা গেল। নদীতে জল ছিল না, বালিতে পূর্ণ। মেয়েরা কোমর বাঁধিয়া সেই বালি খুঁড়িয়া কলসীগুলি জলে পূর্ণ করিতেছিল।

গোবিন্দপুর আসিয়া পৌছিলাম প্রায় বেলা দশটা গ্রীষ্মের প্রখর রবির কিরণে আমাদের গলদঘর্ম্ম করিয়া তুলিল। আর অগ্রসর হইতে সাহস হইল না। সম্মুখে একখান মিষ্টান্নের দোকানে আশ্রয় লওয়া গেল। বিধাতা আমাদের প্রতি সুপ্রসন্ন ছিলেন। তাঁহার দয়ায় সহসা মণিমোহনের এক সহপাঠীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি আমাদের সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহার গৃহে লইয়া গেলেন। সেদিন তাঁহার গৃহেই আমরা পরিতৃপ্তরূপে আহার করিলাম। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন দেখিয়া কাপ্তেন আহারান্তে রওনা হইবার পরামর্শ দিলেন। কিন্তু বেলা তিনটার সময় গোবিন্দপুর ছাড়িয়া মাইল কয়েক যাইতে না যাইতে আকাশ নিবিড় মেঘাচ্ছন্ন হইল। ক্রমেই অন্ধকার ঘনীভুত হইয়া আসিল, ভয়ঙ্কর মেঘগর্জ্জন ও বজ্রপাত আরম্ভ হইল। সম্মুখে দূরে খান কয়েক কুটীর ছাড়া আর কোন আশ্রয় চোখে পড়িল না।আত্ম রক্ষার আর কোন উপায় না দেখিয়া কোন দ্বিধা না করিয়া আমরা সেই কুটীর গুলির নিকবর্ত্তী হইবা মাত্র অধিবাসিনী সাওতাল রমনারা আমাদের সাহেবি পোষাক দেখিয়া ভীত হইয়া ঘর ছাড়িয়া পলাইল। আমরা তাহাদের বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম যে কোন ভয় নাই, কেবল বৃষ্টির জন্ত কিছুক্ষণ মাত্র থাকিব। কিন্তু তাহারা কিছুই বুঝিল না। যে যেদিকে পারিল ছুটিল। এমন সময় একজন সাওতাল আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল আমরা কি চাই? আমরা সঙ্কেতে বুঝাইলাম যে আমরা বৃষ্টির জন্য কিছুক্ষণের জন্য আশ্রয় চাই সে তৎক্ষাৎ একটি কুটীর অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া দিল। আমাদের সঙ্গী অনিল তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল নিকটে কোন ডাক বাংলা আছে কি? তাহাতে সে আমাদের রাজগঞ্জ ডাক বাংলার কথা বলিল এখান হইতে প্রায় এক মাইল দূর।

ঝড় থামিলেই আমরা তখনই বাংলো অভিমুখে যাত্রা করিলাম। বাংলোটিতে পৌছিবা মাত্র খুব বৃষ্টি আসিল। আমরা ডাক বাংলার চৌকীদারকে বাংলায় থাকিব বলায় সে আমাদের ডাক বাংলার ঘর খুলিয়া দিয়া আলো জ্বালিয়া সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিল। আমরাও ষ্টোভ জ্বালিয়া চায়ের জল চড়াইয়া দিলাম। এখান হইতে বালাদরে উপস্থিত হইরা পোঃ মাষ্টার মহাশয়ের বাটীতে আতিথ্য গ্রহণ করিলাম। এখানে আমাদের এক অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান্ যুবকের সলিত সাক্ষাৎ হইল সে বলিল, সে সাইকেলে লক্ষ্ণৌ যাইতেছে। কিন্তু তাহার অবস্থা দেখিয়া একথা বিশ্বাস হইল না। সেদিন সারা দিনটা আমাদের পোষ্ট অাপিসেই কাটিল। অপরাহ্ন চৌর সময় আমরা পোষ্ট মাষ্টারের নিকট বিদায় লইয়া যাত্র সুরু করিলাম।

এইবার আমরা পথে কিছু কিছু জঙ্গল পাইলাম। এব দুই এক মাইল গিয়াই দলে দলে সাঁওতাল স্ত্রী পুরু দেখিতে পাইলাম ও অনেকগুলি গরুর গাড়ীও দেখিলাম পথিমধ্যে এত লোক দেখিয়া ভাবিলাম। ব্যাপার কি সকলে বলিল, "বাবুজী হাটিয়া ভেঙ্গে গেল তাই আমরা ঘর যাচ্ছে।

ক্রমশঃ

তৃষ্ণা

শ্রীপৃথ্বীশ ভট্টাচার্য্য

— গল্প —

গড়াই নদী যেখানটায় একেবারে মোড় ফিরিয়াছে সেইখানটার ক্ষুদ্র গ্রামটীর নাম গঙ্গারামখালি। গ্রামখানি অতি ক্ষুদ্র, কয়েকঘর জেলে ও নমঃশূদ্রের বাস, তার পূর্ব্বে নদীতীর দিয়া বিস্তৃত মাঠ। এই গ্রামের প্রান্তে দূর হইতে কুঞ্জের মত একটি বাড়ী দেখা যায়। পক্ষী-নীড়ের মত সুন্দর বাড়ীখানি হরিদাস বৈরাগীর।

খড়ের ঘর, কোন আড়ম্বর নাই,—একটি অতি ক্ষুদ্র প্রাঙ্গণ। পূর্ব্বের সীমানায় সদর খিড়কির কাছে একটি শেফালি ফুলের গাছ, সারাদিন মৃদু বাতাসে শাখা আন্দোলিত করে। বাড়ীর চারিপাশে বেড়া চিতার বেড়া, পিছনে একটি দুটি আম ও কাঁঠাল গাছ। ঘরে পাট-কাঠির বেড়া। বাড়ীখানি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

বৈশাখ মাসের মাঝামাঝি হইবে। হরিদাস অতি প্রত্যূষে উঠিয়া দেখে, ওপারের মাঠের পরে যে ক্ষীণমসী-রেখা দিকচক্রবালের গায়ে কলঙ্করেখার মত দেখা যাইতেছে, তাহার উপরে নবারুণের রক্তরশ্মি ফাগের মত ছড়াইয়া পড়িয়াছে। রাত্রের উচ্ছিষ্ট বাসন লইয়া হরিদাস নদীর ঘাটে গেল। প্রভাতের বায়ুতে নীল জল চরের উপর আসিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, জেলের নৌকাগুলির তলায় তরঙ্গাঘাতে মৃদু কুল কুল শব্দ হইতেছে—হারদাস প্রভাতের সহিত সুর মিলাইয়া গুন্ গুন্ করিয়া গান সুরু করিয়া দিল।

একটু দূরেই আর একটি ঘাট। গ্রাম্য বধূগণ কলসী লইয়া ঘাটে আসিয়াছিল, কলসীপূর্ণ করিয়া এখন কলগুঞ্জনে মুখর করিয়া তুলিয়াছে। হরিদাস বাসন মাজিতে মাজিতে ঐদিকে চাহিয়াছিল,—দুইটি খঞ্জন-খঞ্জনী পুচ্ছ নাচাইয়া জলের কিনারে ঘুরিতেছিল। হরিদাস সহসা কি একটা আবিষ্কার করিয়া কহিল—

"ওগো বড় বৌ, ও নূতন লাল পেড়ে কাপড় পরা বৌটি কে গা?"

বর্ষীয়সী বড় বৌ জবাব দিল,—"মঙ্গলের বৌ গো গোঁসাই, এই কাল এসেছে সবে।"

হরিদাস হাসিয়া কহিল—"বেশ বেশ, বৌ কেমন?

বড় বৌ বলিল—নিজেই দেখ না।

বড় বৌ নূতন বধূর অবগুণ্ঠন তুলিতে গেলে, বধূ! সরমে ফিরিয়া দাঁড়াইল।

হরিদাস গর্ব্বের সহিত নিজের বার্দ্ধক্য জ্ঞাপন করিয়া বলিল—"ওই বড় বৌ যে দিন নতুন বৌ হয়ে এসেছিল সেদিনও গাঙের ঘাটে অমনি করেছিল, এ হরিদাস বৈরাগীর কাছে লজ্জা রাখ্‌তে হবে না।"

নূতন বধূর মুখ দেখিয়া হরিদাস হৃষ্টচিত্তে বাড়ী ফিরিল। সকালে যখন নূতন একখানা মুখ দেখিয়াছে তখন দিনটি শুভই হইবে, এবং আজকার দিনে অনেক দ্রষ্টব্য দেখিতে পাইবে। হরিদাস চালজল খাইয়া বেহালা ও ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে করিয়া, মাঠের ওপারে মাঙ্গনডাঙ্গার সরু আঁকা-বাঁকা রাস্তা ধরিয়া চলিতে লাগিল।

হরিদাসের ভিক্ষা ঠিক উপজীবিকা নয়। ভিক্ষা কিছু না মিলিলে তাহার দুঃখ হয় না, কিন্তু ভিক্ষা করিতে বাহির হইতে না পারিলে তাহার চোখ ফাটিয়া জল বাহির হইয়া আসে। চারিপাশের এই গ্রামগুলির ধূলির স্পর্শ না পাইলে হরিদাসের মন বিরহী যক্ষের মত ব্যাকুল হইয়া উঠে। তাই যখন বর্ষায় সমস্ত গ্রাম প্লাবিত হইয়া যাতায়াতের বিঘ্ন ঘটায় তখন হরিদাস ক্ষোভে দুঃখে বর্ষাকে শুধু অভিশাপ দেয়।

মাঙ্গনডাঙ্গার গ্রামের বাহিরে রাস্তার ধারে একটি

প্রকাণ্ড বকুল গাছ ছিল, হরিদাস দূর হইতেই দেখিল, বালক বালিকাগণ ব্যস্ততার সহিত ফুল কুড়াইতেছে, সুবাস বাতাসে ভাসিয়া হরিদাসের তন্দ্রাভিভূত মনটীকে সচেতন করিয়া দিল। মঙ্গল গরু লইয়া মাঠে যাইতেছিল, জিজ্ঞাসা করিল—গোঁসাই কোন্ দিক ?

—নহাট্টয় যাব ভাই,—আজ তিন দিন খাওয়া হয় না। গ্রামের সকলেই ভালতো ?

—'না ভাই,—ওই গুরুচরণের মেয়েটি কাল মারা গেছে।'

—এ্যাঁ মারা গেছে !

মঙ্গল চলিয়া গেল। হরিদাসের প্রফুল্ল সতেজ অন্তরটী, প্রভাতে তরঙ্গ ভঙ্গীর মত উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। সহসা তীরে আঘাত পাইয়া একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। মেয়েটির বয়স ছয় কি সাত কিন্তু বেশ সুশ্রী। হরিদাস ভাবিল—এই বকুলের তলে এমনি প্রভাতে সেই মেয়েটিকে দিদির আশেপাশে হামাগুড়ি দিতে দেখিয়াছে, তারপরে সাঁজি লইয়া আসিয়াছে, বাতাসে কোঁকড়া চুল দোলাইয়া দিয়াছে, ক্ষুদ্র একটি কলসী কাঁখে ঘাটে যাইতে দেখিয়াছে। সেই মুকুলিকা বালিকা আর আসিবে না, আর ফুল কুড়াইবে না, জগতের ধূলার সহিত তাহার সম্বন্ধ লোপ হইয়া গিয়াছে, একেবারে শেষ হইয়া গিয়াছে। হরিদাসের চোখ ফাটিয়া জল আসিতে চাহিল—আঁকা-বাঁকা শুভ্র রাস্তাটী কেমন ঝাপসা হইয়া উঠিল—বেহালায় একটী সুরের আমেজ সুরু করিয়া দিল।.........

খালের পাড় দিয়া পায়ে চলা পথটীর উপর লাঙ্গল উৎক্ষিপ্ত ঢিল আসিয়া পড়িয়াছিল, চোট লাগিয়া পায়ের একটু ছিঁড়িয়া গেল। হরিদাস বেহালা থামাইয়া চোখ মুছিয়া চলিতে লাগিল।

নহাটীর প্রথম বাড়ীটাই জমিদারের। বৃদ্ধ জমিদার হরিদাসের গান শুনিতে ভালবসিতেন। হরিদাস মেঝেয় বসিয়া গান সুরু করিল—রাধিকা দুঃখে ম্রিয়মান হইয়া কহিতেছেন,—আমি ভালবাসি বলিয়াই আমাকে দুঃখ দাও নইলে দুঃখ দিতে না।

জমিদার বলিলেন—হরিদাস গান তো জমল না, বেহালার সঙ্গে গানটী যেন মিলছে না।

হরিদাস মুষ্টি ভিক্ষা লইয়া আবার বাহির হইল। ব্রাহ্মণপাড়ায় যাইয়া দেখে, চাটুয্যে বাড়ীতে সমবেত অনেকেই রহস্যালাপ করিতেছেন। হরিদাস শুধাইয়া জানিল, চাটুয্যে কন্যার বিবাহ ঠিক হইয়া গিয়াছে। হরিদাসের মনটী একটু প্রফুল্ল হইল,—বিবাহ বাড়ীতে গান গাহিয়া পাকা দেখার জলযোগ গ্রহণ করিয়া উঠিল, কিন্তু এই শুভ বিবাহের সূচনায় সে খুব আনন্দ বোধ করিতে পারিল না, বারে বারে অকারণ ক্ষুব্ধ মনে শুধু বেদনাই অগাছার মত ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। ওই মেয়েটি, যার বিবাহ ঠিক হইয়াছে তার নাম পুটু। ওকে হরিদাস শিশুকাল হইতে দেখিয়াছে,—পুঁটু এই গ্রাম ছাড়িয়া কোথায় চলিয়া যাইবে, আর আসিবেনা, তাহার ভিক্ষার ঝুলিতে যুক্তকরে ভিক্ষা দিবে না। হরিদাস ভাবে, কেন এমন হয়, যে যেখানে আছে সে সেখানে থাকলেই ত পারে।

ব্রাহ্মণদের মধ্যপাড়ার সানবাঁধা ঘাটে স্নানার্থিনী বধূগণের ভীড় লাগিয়াছিল। সর্ব্বপশ্চাতে ত্রস্ত চরণপাতে একটি বধূ আসিতেছিল। পশ্চাতে তাঁহার তিন বছরের সুন্দর একটি ছেলে। প্রকাণ্ড একটী লাঠি লইয়া মাতার দেহরক্ষী হইয়া মাতালের মত টলিতে টলিতে আসিতেছিল—বস্ত্রহীন দেহের উপর একটি পাঞ্জাবী, গলায় একটি সদ্য গাঁথা বকুলের মালা। বালকটি কোন মতে বসিয়া বসিয়া দুরধিগম্য সিঁড়ি গুলি আরোহণ করিতেছিল, আর পাড়ার কোন ঠানদির রসিকতার উত্তরে অর্দ্ধস্ফুট কথায় হস্তস্থিত লাঠি আন্দোলিত করিতেছিল।

পাড়ের সরু পথটীর উপরে হরিদাসকে সে সহসা দেখিয়া, মায়ের অনুগমন ফেলিয়া রাখিয়া প্রাণপণে সিঁড়ি অতিক্রম করিতেছিল, মুখে শুধু বলিতেছিল 'বোলেগী—মা—বোলেগী।

হরিদাস তাহাকে কোলে করিয়া আচার্য্যদের রকের উপর বসিল। বালকের আদেশে বেহালা বাজাইয়া গান আরম্ভ করিল—

আমি ভাবতে পারি না আর পরের ভাবনা।

অর্দ্ধনগ্ন ও নগ্ন শিশু শ্রোতার সংখ্যা ক্রমেই বাড়িয়া উঠিল। একটি এক বছরের শিশু তাহার পিঠ ধরিয়া উঠিয়া উল্লাসে চাপড়াইতে লাগিল। হরিদাস আনন্দের সহিত সমস্ত প্রাণ ঢালিয়া গাহিয়া চলিল। শিশুদিগের ফরমাইস্ অনুযায়ী যমুনার গান, বাঁশীর গান ক্রমাগত গাহিতে লাগিল,—এ গানে হরিদাসের ক্লান্তি নাই।

মনের পুঞ্জীভূত বেদনার মেঘ ধীরে ধীরে উড়িয়া যাইতে লাগিল। শ্রোতারা সকলেই মনোযোগী নয়, কেহ কেহ মারামারিও করিল, কিন্তু হরিদাসের গানের সুর তাহাতে পথভ্রষ্ট হইল না। ডালায় ভিক্ষা আসিল, হরিদাস তবুও গাহিতেই লাগিল।

ধীরে ধীরে গ্রীষ্মের দ্বিপ্রহরে রৌদ্র খরতর হইয়া উঠিল, হরিদাসের এখান হইতেই বাড়ী ফিরিতে হইবে। ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া বলিল—বাবা তুমি কিছু ভিক্ষে দেবে না?

বালকটি হস্তস্থিত লাঠি ফেলিয়া দিয়া সন্তুষ্টচিত্তে হরিদাসের হাতে মালাটি ফেলিয়া দিল। হরিদাস পরম তৃপ্তি ও গর্ব্বের সঙ্গে মালাটী গলায় পরিয়া উত্তপ্ত মাঠের ভিতর দিয়া, বাড়ী ফিরিবার সোজা পথ ধরিল। মাথার উপর তীক্ষ্ণ রৌদ্র গায়ে সূচের মত ফুটিতে লাগিল, হরিদাস একটী তৃপ্তি ও আনন্দের অনাবিল তন্দ্রায় অভিভূত হইয়া, আপন মনে গুন্ গুন্ করিতে করিতে চলিতে লাগিল ·········

গড়াই নদীর নীলজলে স্নান করিয়া হরিদাস ভাত তুলিয়া দিল। ঠিক এই সময়েই তাহার প্রাঙ্গণে দুইটি ঘুঘু খাদ্যান্বেষণে আসে, তাহাদের ক্রীড়া দেখিতে দেখিতে হরিদাসের ভাত হয়, কিন্তু আজ তাহারা আসে নাই—হরিদাস কেমন একটি শূন্যতার অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল,—ভাবিয়া একটু শঙ্কাও হইল, বন্দুক লইয়া বাবুরা শিকার করিতে আসে, তাহাদের দুজনকেই হত্যা করে নাই তো! হরিদাস প্রাঙ্গণে চাল ছড়াইয়া দিয়া দেখিল, ঘরের ছায়াও তো যথাস্থানেই পৌছিয়াছে—হরিদাস চিন্তা করিতে লাগিল।·····ঘুঘু দুটি পত্ পত্ করিয়া উঠানে নামিয়া আসিল। হরিদাস ভাতে কাঠি দিয়া দেখে ভাত সিদ্ধ হইয়াছে।

আহারান্তে হরিদাস শুইতে গেলে ঘুঘু দুইটি উড়িয়া গেল। হরিদাস হৃষ্ট মনে চোখ বুজিল, কিন্তু মাঝে মাঝে বকুলতলার সেই মেয়েটি, আর একটি কিশোরী দুখানি সলজ্জ মুষ্টি ভিক্ষার হাত ভাসিয়া উঠিতে লাগিল।

ঘুম হইতে উঠিয়া হরিদাস দেখিল, পশ্চিমে মেঘ ঘনাইয়া উঠিয়াছে, কাল বৈশাখীর দিশেহারা ঝড় চরের মাঠের বালি উড়াইয়া লইয়া চলিয়াছে, মঙ্গলডাঙ্গায় তালগাছের পাতাগুলি দুলিয়া বেড়াইতেছে। তাহার অন্তরাকাশও সঙ্গে সঙ্গে আঁধার হইয়া উঠিল। বৈকালে পাড়ার বধূমহলের সহিত নদীর ঘাটে দেখা হইবে না, মঙ্গলের স্ত্রীর রূপের সমালোচনাটি শুনাইয়া আসিতে পারিবে না, মণ্ডল বাড়ীর একছিলিম তামাক খাইয়া ফসলের সংবাদ শুনিতে পাইবে না,—সমস্ত বৈকালটি ওর একেবারেই বৃথা হইয়া গেল। তামাক সাজিয়া টানিতে টানিতে হরিদাস ভাবিল, গভীর রাত্রে বৃষ্টি হইলেই তো পারিত—এ বিধাতার অবিচার, নিঃসঙ্গ জীবকে আরও নিঃসঙ্গতর করিয়া দেওয়ার কি প্রয়োজন আছে!

কালবৈশাখীর ঝড়-বৃষ্টি থামিল রাত্রি প্রহরেকের সময়। মেঘের ফাঁকে ম্লান চাঁদের একটু আলো হরিদাসের প্রাঙ্গণের শেফালি গাছের সিক্ত পল্লবে পড়িয়া ঝিক্‌মিক্ করিয়া উঠিল। কিন্তু তখন পাড়ায় যাইবার সময় অতীত হইয়া গিয়াছে—

হরিদাস বেহালা বাজাইয়া গান গাহিতে আরম্ভ করিল, আজ ক্রমাগত বিস্তৃত জগতের আঘাতে তাহার অন্তর দুর্ব্বহ দুঃখে ভরিয়া উঠিয়াছিল। গান গাহিল—

আমি পরের জন্যে পরকাল হারালাম রে—

রাত্রি গভীর হইয়া আসিল,—সমস্ত পৃথিবীর গায়ে একটী অলস শীতলতা ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল—পশ্চাতের আম্রবন হইতে রাত্রিচর ভুতুম পাখীটা মানুষের মত কথা কহিয়া হরিদাসের শুইবার সময় জ্ঞাপন করিয়া গেল। ওই পাখীটি নিত্যই আসিয়া গীতমগ্ন হরিদাসকে শুইতে কহিয়া যায়। হরিদাস বেহালা লইয়া উঠিল।

শুইয়া শুইয়া হরিদাস ভাবিল, গাঙে তো জল বাড়িবে। আসন্ন বর্ষার ভয়ে ওর সমস্ত শিরার রক্ত এক সঙ্গে যেন জমিয়া গেল। রাত্রে সুনিদ্রা হইল না, মাঝে মাঝে চাহিয়া বেড়ার ফাঁক দিয়া দেখিল চাঁদ পশ্চিমে ঢলিয়া পড়িতেছে।

সকলে ঘাটে যাইয়া দেখে সত্যই জল বাড়িয়া, চরের অনেকখানি ঢাকিয়া ফেলিয়াছে—

হরিদাসের জীবনে পঞ্চাশটি বৎসর গ্রীষ্ম বর্ষা লইয়া আসিয়াছে,—চলিয়া গিয়াছে। এই সমস্ত গ্রামের দ্বারে দ্বারে গান ফিরি করিয়া, তাহাদেরই সুখে দুঃখে ঝুলি ভরিয়া নিঃসঙ্গ গৃহে ফিরিয়া তাহাদেরই কথা ভাবিয়াছে। এই গানের ফিরি করিতে তাহার আনন্দ,—না করিতে পারিলে অন্তর বেদনায় বিদ্রোহী হইয়া উঠে—

জ্যৈষ্ঠের শেষ।

বৃষ্টি ধারার স্পর্শে বসুন্ধরা লজ্জিতা নবোঢ়া বধূটির মতই ত্বরিতে সারা অঙ্গে শ্যামল-অঞ্চল জড়াইয়া দিয়াছে। মাঠে মাঠে ধানের সবুজ গাছ, হালটে হৃষ্ট পুষ্ট গাভী, বাগানে বাগানে ফল। কিন্তু নদীটিরও চর বর্ষার জলে ভরিয়া গিয়াছে, জলস্রোত কিশোরীর আঁখিকটাক্ষের মত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। আর কয়েক হাত জল বাড়িলেই কাণায় কাণায় ভরিয়া উঠিবে।

হরিদাসের বড় তাড়াতাড়ি পড়িয়া গিয়াছে। নিত্য তিনখানি গ্রাম ঘুরিতেছে,—তাহাতেই দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া যায়। সময় আর নাই, বর্ষা আসন্ন। বাকী কয়েকটী দিন সে পূর্ণভাবে ভোগ করিয়া লইতে চায়।

সেদিন কল্যাণপুর হইতে ধানের বন দিয়া ফিরিতে ফিরিতে হরিদাস ভাবিতেছিল, পাঁচু কর্ম্মকারের বৃদ্ধবয়সে ছেলে হইয়াছে, যা হোক্ বংশটী রহিয়া গেল।

একখানা মেঘ বায়ু সঞ্চালিত হইয়া সূর্য্যকে আড়াল করিয়া ফেলিল, একটু শৈত্য অনুভব করিয়া চাহিয়া দেখে গন্ধারামখালির উপর রৌদ্র ঝিক্ মিক্ করিতেছে, হরিদাস চারিপাশে চাহিয়া দেখিল,—এ যেন বসুন্ধরার বধূ বেশ।

…কিন্তু গৃহের নিকটবর্ত্তী হইতেই তাহার শীত করিয়া জর আসিল। ম্যালেরিয়া জর, দেখিতে দেখিতে বাড়িয়া উঠিল। শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে দুটো সিদ্ধ পক্ক যাহা হয় খাইয়া হরিদাস কাঁথামুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িল…

আজ তার কেবলই মনে হইতে লাগিল, যে-কয়েকটী দিন ছিল তাহাও একেবারে ব্যর্থ হইয়া গেল। নিশীথে ভুতুম পাখী ডাকিয়া গেল। জরের ঘোরে হরিদাস শুধু ভাবিল,—মাঠ ঘাট সব বর্ষার জলে একেবারে প্লাবিত হইয়া গিয়াছে,—আর গ্রামান্তরে যাইবার উপায় নাই। তিনটি মাস এই কারাগৃহে সে শৃঙ্খলিত হইয়া পড়িয়া আছে। তাহার গৃহ-গাত্রে নদীর ঢেউ আসিয়া লাগিতেছে। হরিদাস জরের ঘোরে কাঁদিয়া ফেলিল। সে দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইতে পাইবে না, গ্রামান্তরের বার্ত্তা পাইবে না! হরিদাস ক্রমাগত কাঁদিতেই লাগিল।

পরদিন সকালে অবসন্নদেহে উঠিয়া দেখে বালিশ চোখের জলে ভিজিয়া গিয়াছে।

বর্ষা আসিল—

চারিদিকে অথৈ জলের সমুদ্র; গ্রামান্তরে তো দূরের কথা, বিনা ভেলায় পাড়ায়ও যাইবার উপায় নাই। হরিদাসের বেড়া-চিতার বেড়ায় আসিয়া বায়ু-বিক্ষোভিত তরঙ্গ আছাড় খাইয়া পড়ে। খিড়কির কাছে কাঠ পাতিয়া ঘাট তৈরী করিয়াছে। হরিদাস একমাস যাবৎ একাকী এই গৃহখানিতে বাস করে। শেফালি ফুল ঝরিয়া শুভ্র আস্তরণের মত প্রাঙ্গণে পড়িয়া থাকে। হরিদাস ভোর হইতে প্রহরেক বেলা অবধি কুড়াইয়া কুড়াইয়া সঞ্চয় করে, বৈকালে ম্লান হইয়া আসিলে নদীর জলে ভাসাইয়া দেয়। সকাল সকালই খাওয়া শেষ হইয়া যায়, তামাকু টানিতে টানিতে হরিদাস চাহিয়া দেখে, নীল, লাল, সাদা পাল তুলিয়া দিয়া নৌকার শোভাযাত্রা তাহারই ঘাট দিয়া চলিয়া যায়, ভাঁটি নৌকা তর তর করিয়া চলিয়া যায়। কেহই তরী তাহার ঘাটে ভিড়ায় না। অপরাহ্নে হুকা সাজিয়া ঘাটে বসিয়া থাকে, যদি কাহারও প্রয়োজন হয়, তামাক খাইয়া দুটো কথা কহিয়া যাইবে। পরিচিত লোক দেখিলে ডাকও দেয়, কেহ কাজের দোহাই দিয়া, ব্যস্ততার সঙ্গে নৌকা বাহিয়া যায়, কেহ বা তামাকু [illegible] যায়। সন্ধ্যা পৃথিবীর উপর নামিয়া আসে [illegible] ঝিঁঝিঁ

অন্ধকার বুকে করিয়া, কোনদিন জ্যোৎস্নার স্নিগ্ধতা লইয়া। জ্যোৎস্নার শুভ্রালোকে দূরের উজান নৌকার পালের দিকে তাকাইয়া থাকে, অন্ধকারে নদীর বুকে একটি ক্ষীণালোকের পানে চাহিয়া থাকে। নিশীথ রাত্রি অবধি গান করে,—শ্রীরাধিকার বিরহ সঙ্গীত,—

কালা তুমি ওপার ব'সে বাজাও বাঁশী আমি এপার ব'সে শুনি

কেমন ক'রে যাব আমি, গাঙে অথৈ পানি।...

সেদিন ছিল গঙ্গারামখালির হাটবার! হরিদাস সকাল সকাল আহার শেষ করিয়া, গামছা পরিয়া কোমর সমান জল ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে হাটে যাইয়া উঠিল। হাটে তখনও কেহ আসে নাই। ক্রমে গ্রামান্তরের অনেকে আসিতে আরম্ভ করিল, হরিদাস সকলকে গ্রামের কুশল প্রশ্ন করিল, ব্যস্ত হাটুরিয়া সংক্ষেপে জবাব দিয়া চলিয়া গেল। নহাটীর গুরুচরণ আসিয়াছিল, সংবাদে জানিল, যে চাটুয্যে কন্যার বিবাহের পাকা দেখায় জলযোগ করিয়াছিল, তাহারই বিবাহ অগ্রহায়ণে।

হরিদাস ঠিক যেমন নিখুঁত ভাবে সংবাদ জানিয়া লইতে চায়, ঠিক তেমনটি করিয়া কেহই জবাব দিতে পারে না। হরিদাসের অতৃপ্তি রহিয়া যায়, তাই মনটাও সঙ্গে সঙ্গে ব্যথিত হইয়া উঠে।

হাট বেশ গুলজার হইয়া উঠিল, হরিদাসও গৃহের পথ ধরিল। সন্ধ্যার সময় হরিদাস গৃহের দাওয়ায় প্রদীপ জ্বালাইয়া বসিয়া শুধু মনে মনে বর্ষাকে অভিসম্পাত দিতে লাগিল। একটু বাতাসে প্রদীপ নিভিয়া গেল,—ঝম্ ঝম্ করিয়া বৃষ্টিও নামিল। হরিদাস নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়াই ছিল,—মনের মাঝে শুধু ভাসিয়া উঠিতেছিল একটি ব্রাহ্মণ কন্যার দুখানি ভিক্ষাদানের সলজ্জ বাহু। ওই মেয়েটির শুভ-বিবাহ! রাত্রে সৌষ্ঠব সম্পন্ন সভায় বধূ বেশে বসিয়া থাকিবে, সকালে কুমারীর ললাটে সিঁদুর রেখা উজ্জ্বল হইবে...বৈকালে চিরপরিচিত গৃহ ছাড়িয়া শ্বশুর বাড়ী যাইবার সময় কাঁদিবে,—চলিয়া যাইবে, কতদিনে ফিরিবে কি জানে! তার ভিক্ষার ঝুলিতে আর ভিক্ষা দিবে না। হরিদাসের অন্তরে একটা রিক্ততা হাহাকার করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

তার পর দিন দ্বিপ্রহর অবধি হরিদাস আপন মনে ঝরা শেফালির ফুলে ডালা ভরিয়া লইতেছিল,—দুই একখানি নৌকা পাল তুলিয়া দিয়া চলিয়া গেল, আরও দুই একখানি ভাঁটি নৌকা তীরবেগে ছুটিয়া গেল। সহসা একখানি ভাঁটি নৌকা তাহারই ঘাটে আসিয়া ভিড়িল। হরিদাস ছুটিয়া গিয়া দাঁড়াইল।

একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোক বলিলেন,—এখানে একটু রেঁধে খাওয়া যাবে?

—যাবে। কেন যাবে না? আপনাদের পদধূলি আমার উঠানে পড়বে সেত ভাগ্য। তা—

—আমরা জন দশেক আছি। বিয়ের নৌকো, বিয়ে দিয়ে ফিরছি; এখনও একদিনের পথ যেতে হবে।

—আসুন আসুন, আপনারা স্নান করুন আমি জোগাড় ক'রে দি।

বরযাত্রী প্রভৃতি স্নানাহ্নিক করিতে লাগিলেন। হরিদাস ব্যস্ততার সহিত সমস্ত জোগাড় করিয়া দিল। গৃহে নূতন হাঁড়ি ছিল, জল ঝাঁপাইয়া মণ্ডল বাড়ী হইতে কড়াই আনিয়া দিল। প্রাঙ্গণে উনান খুঁড়িয়া দিল—

আজ হরিদাসের কুটীরে উৎসব,—তার অন্তরে আজ অনবদ্য উল্লাস। হরিদাসের ক্লান্তি নাই। আগত অতিথি-গণের পরিচর্য্যার কোথাও এতটুকু ত্রুটি না হয় সেদিকে আজ তার উদাসী অন্তরের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি।

রন্ধনান্তে পুরুষগণ আহার করিয়া নৌকায় ফিরিলেন। হরিদাস তামাক সাজিয়া লইয়া গিয়া ঘাটের উপর বসিল। নবোঢ়া বধূটি ঝি'র পিছনে পিছনে সরম জড়িত কুণ্ঠিত পদক্ষেপে তাহারই আঙিনায় নামিয়া আসিল, তাহারই দাওয়ায় বসিয়া, অবগুণ্ঠনের অন্তরালে দুটি খাইয়া লইল।

একটু বেলা থাকিতেই বর-বধূ লইয়া পান্‌সী ছাড়িয়া দিবে। হরিদাস বলিল—"বাবু, বাঁকের সাম্‌নে জলটা 'খলবল' করে, 'ধার' যেয়ে লেগেছে ওপারে, কিন্তু নৌকো এপার দিয়েই নেবেন, একটু 'দোয়ানি' ঠেলেই যাওয়া ভাল।

নৌকো তর তর করিয়া ছুটিল। হরিদাস অতৃপ্ত অবস্থায়ই ঘাটে বসিয়া দেখিল, নৌকাখানি ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর হইয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। তাহার মন শঙ্কান্বিত হইয়াছিল, মাঝি যেন কেমন অনভিজ্ঞ। বিশেষ উজান

নৌকা ছিল না, কেবল দূরে একখানি নীল পাল ক্রমেই নিকটবর্ত্তী হইতেছিল। নৌকাখানি তাহার ঘাটের কাছে আসিলে, হরিদাস ডাকিল—নটবর, নটবর খুড়ো—

নটবর মাঝি বোধ হয় মাছ পাইয়াছিল, বলিল,—কেন গোঁসাই?

—তামাক খেয়ে যাও।

নটবর পাল নামাইয়া নৌকা ঘাটে আনিতে আনিতে, হরিদাস ঠাণ্ডা কলিকায় আগুন লইয়া ফিরিল। বলিল—একখানা ভাটি পান্‌সী যেতে দেখলে খুড়ো?

—হ্যাঁ, বিয়ের নাও! বেটারা কি জল চেনে। দিয়েছে ওপারের পাকটার কাছে—নটবর হুঁকা টানিয়া অধিকতর ধূম নিষ্কাশণের প্রয়াস পাইতেছিল।

হরিদাস ব্যাকুলভাবে নড়িয়া বসিয়া ভাবিল,—যে লোকগুলি আজ তাহারই বাড়ীতে উৎসব করিয়া গেছে, তাহারা সেই কিশোরী সলজ্জ বধূটি সকলেই অতল জলের নীচে সলিল-সমাধি লাভ করিয়াছে,—আর উঠিবে না। জীবনের বোধনেই বিসর্জ্জন হইয়া গিয়াছে। ব্যাকুলভাবে হরিদাস কহিল—তারপর, তারপর খুড়ো?

নটবর নাসিকা দিয়া ধূম নির্গত করিয়া, কহিল,—বুঝলামই তো ওপার গেলেই আর ধানের ভাত খেতে হবে না! ডেকে ডেকে ফিরালাম, তাই কি টেনে 'টান' থেকে উঠ্‌তে পারে! শেষে যা হোক—

হরিদাস রুদ্ধ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল—যা হোক্ বেঁচেছে!

—বড় বাঁচা বেচেছে।

সন্ধ্যায় দুটি খাইয়া লইয়া হরিদাস দাওয়ায় বসিয়া পাট কাটিতেছিল। নদীর মাঝখান থেকে চাঁদ উঠিল, তাহার বাড়ীর সাম্‌নের তরঙ্গগুলির মাথায় মাথায়, তরল জ্যোৎস্না ঠিকরাইয়া পড়িতেছিল। হরিদাস অনিমেষ লোচনে চাহিয়া রহিল।

তাহার প্রাঙ্গণে জ্যোৎস্না আসিয়া পড়িল।...আজ দ্বিপ্রহরে তাহার কুটীরে উৎসব হইয়া গিয়াছে, তাহার অবসাদটুকু পড়িয়া আছে—উনানটি কালি মাখিয়া পড়িয়া আছে, দুই একখানা ইট এদিক ওদিক বিক্ষিপ্ত, একখানা ছেঁড়া কলার পাতা, অর্দ্ধদগ্ধ একখানা ঢেলা।

সেইদিকে চাহিয়া চাহিয়া হরিদাসের চোখদুটি সজল হইয়া উঠিয়াছিল—যাহারা চলিয়াই যাইবে তাহারা কেন আসে?

আশ্বিনের প্রথমে গাঙে জল কমিতে লাগিল,—হরিদাসও উল্লসিত হইয়া উঠিল, তার নিঃসঙ্গ দিনের শেষ হইয়াছে।...গৃহে গৃহে নবান্ন হইয়া গেল। মাঠে কোথায়ও চৈতী ফসল জন্মিল, কোথায়ও কিছুই হইল না, সারদেশ্বরীর অর্চ্চনা হইয়া গেল। তাহার পর আসিল শীত তাহার মাংস মেদহীন জরা ক্লিষ্ট দেহভার লইয়া।

শীতের মাঝেই হরিদাসকে গ্রামে গ্রামে টহল দিয়া ফিরিতে হয়, রাত্রিশেষের শীতে সমস্ত শরীর ঠক্‌ঠক্ করিয়া কাঁপে, ঠাণ্ডা শিশির শুষ্ক তৃণ হইতে পায়ে লাগে, হাঁটু পর্য্যন্ত অনুভূতি লেশহীন হইয়া যায়। হরিদাস তবু টহল দিতে যায়।

শীতের শেষে একদিন টহল দিতে দিতে নহাটার প্রান্তে যাইয়া ভোর হইয়া গেল। ভিক্ষা লইয়া বাড়ী ফিরিবার জন্য ব্রাহ্মণ পাড়ায় আসিলে শ্রোতার দল তাহাকে আবার ঘেরিয়া ধরিল,—কিন্তু শীতের হাওয়া ছেলেমেয়েগুলির মুখ ফাটিয়া গিয়াছে,—সমস্ত দেহের কমনীয়তা চলিয়া গিয়াছে, একটা রিক্ততা, রুক্ষতা, সকলের মুখের উপর ভাসিয়া বেড়াইতেছে। সকলেই যেন কেমন জড়সড় হইয়া বসিয়া—উল্লাসের চঞ্চলতা নেই।

ছেলেমেয়ের বিবর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া, হরিদাসের অন্তর বেদনায় ভরিয়া উঠিল। এই কমনীয় সুন্দর শিশুগুলি স্বভাবের অত্যাচারে বিবর্ণ হইয়া গেছে!

হরিদাস গ্রাম ছাড়িয়া মাঠে আসিয়া পড়িল। বসুন্ধরার একটা নূতনরূপ যেন তাহার চোখে ধরা পড়িয়া গেল বিস্তীর্ণ ধূসর মাঠ সাহারার মত হাহাকার করিতেছে বুকে এতটুকুও রস নাই, পিপাসায় কণ্ঠ শুকাইয়া যেন কা[ঠ] হইয়া গিয়াছে। সারা পথ শুধু ভাবিতে ভাবিতে আসিতেছিল,—খিড়কির বাঁশটী খুলিয়া ফেলিয়া আজ বহু দি[ন] পরে তার বর্ষার সহচর শেফালি ফুলের গাছটির বৃন্ত

চহারা আবিষ্কার করিয়া ফেলিল। গাছে একটিও পাতা াই, শুষ্ক পাতায় উঠান ভরিয়া গিয়াছে,—পল্লবহীন ডাল-গুলি শুষ্ক শীর্ণ দেহ লইয়া কোনমতে দাঁড়াইয়া আছে। াছটি যদি মরিয়া যায়। হরিদাস শঙ্কিত হইয়া উঠিল—যদি এ গাছে আর ফুল না ফুটে তবে কাহার তলায় বসিয়া, াহার ফুল কুড়াইয়া বর্ষার নিঃসঙ্গ দিনের পূর্ব্বাহ্নটী সে কাটাইয়া দিবে!

বৈকালে, অস্ত-রবির শেষ আলোটুকু যখন বৃক্ষের শীর্ষে শীর্ষে ঝিল্‌মিল্ করিতেছিল, তখন হরিদাস গাঙের ঘাটে যাইয়া বড় বৌএর দেখা পাইয়া গেল। হরিদাস ব্যস্তভাবে শুধাইল,—হ্যাঁগা, বড় বৌ, আমার শিউলি গাছটার সব পাতাই তো ঝ'রে গেছে। গাছটা বাঁচবে তো?

বড়বৌ অভিজ্ঞের মত হাসিয়া কহিল,—শীতের শেষে সব গাছেরই তো পাতা ঝরে পড়ে গেছে—

—তবুও, তার তো একটীও পাতা নেই! মাটিতেও রস্ কস্ ব'লতে নেই।

—তোমার কি ভীমরতি ধরেছে গোঁসাই, কি হয়েছে তাই!

হরিদাস তার এই অনভিজ্ঞতার জন্য মনে মনে লজ্জিত হইয়া চুপ করিয়া গেল। জল লইয়া ফিরিবার পথে ভাবিল, জলও তো ভীষণ ঠাণ্ডা, গাছের গোড়ায় জল দিলে তো মরিয়াও যাইতে পারে! হরিদাস ঠিক ঠাহর করিয়া উঠিতে পারিল না।

সন্ধ্যার পরে মণ্ডলমাড়ীর আসরে বসিয়া, চাষীদিগকে শুধাইল, কেমন করিয়া এই পত্রহীন গাছটীকে সজীব করিয়া তোলা যায়!

হরিমণ্ডল বলিল,—ভয় নেই গোঁসাই, একটা বাদল হ'য়ে গেলেই পাতা হবে।

—আমি জল দিলেও তো হয়, রোজ সকালে এক কলসী দেব।

—না, না, আরও একটু গরম পড়ুক, নইলে মরে যাবে।...

হরিদাস নিশীথ রাত্রি অবধি বেহালা বাজাইয়া শুইতে গেল, কিন্তু সমস্ত অন্তর জুড়িয়া একটা শঙ্কা ও অবস্তি তাহাকে চিন্তান্বিত করিয়া তুলিল। মায়ের অন্তরের মত তাহার অন্তরটাও রুগ্ন পুত্রের শেষ করুণ পরিণতির কথাই ভাবিয়া আকুল হইয়া পড়িল, পল্লবোদ্গমের কথা ভাবিতে পারিল না।

চৈত্র মাসের শেষ।

দুই চারি দিন বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, শুষ্ক ঘাসগুলি সবুজ হইয়া উঠিতেছে। দক্ষিণের বায়ু তাহার কাণে কাণে কত কহিয়া যায়। হরিদাস গভীর রাত্রি অবধি বেহালা বাজায়, মাঠের ওপার হইতে মৃদু বাতাসের ঢেউ আসিয়া রুক্ষ চুলগুলিকে দোলাইয়া দেয়,—হরিদাস বসুন্ধরার এই কুমারী রূপের দিকে অনিমেষ নয়নে চাহিয়া থাকে। শ্রীরাধিকার প্রণয় কৌতুকের বর্ণনার মাঝে ভাসিতে ভাসিতে গান করে—

পোড়ার মুখী কলঙ্কিনী রাইলো—
তোর মত কুল মজানী গোকুলে আর নাইলো।

...হরিদাস সকালে উঠিয়া দেখিল, তাহার শেফালি গাছে, দুটি কচি পাতা প্রকাশিত হইয়াছে। গাঙের ঘাটে বড় বৌকে খবরটা জানাইয়া আসিয়া হরিদাস বেহালা লইয়া বাহির হইল।

শিশুগুলির মুখের কমনীয়তা ফিরিয়া আসিয়াছে, বৃক্ষের পাতা সবুজ হইয়া উঠিয়াছে। হরিদাস পাড়ায় পাড়ায় গান গাহিয়া কল্যাণপুরের শেষ পর্য্যন্ত চলিয়া গেল—তখন দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে। কর্ম্মকার দাদার দোকানে বসিয়া দেখে ছুরি তৈরী করিবার ভীড় লাগিয়া গিয়াছে, হরিদাস শুধাইয়া জানিল আজ দরিপুরের আড়ং।

হরিদাস ভাবিয়া দেখিল, যারা মাজনডাঙ্গার বকুল তলায় বৈকালে বকুল ফুল কুড়াইয়া সাজি ভরিবে, আজি-কার এই দিনে যদি তাহাদের হাতে একটি একটি পুতুল দেওয়া যায়, তবে তাহাদের মুখগুলি আনন্দে তৃপ্তিতে সুন্দর হইয়া উঠিবে, হরিদাস অতৃপ্ত নয়নে চাহিয়া দেখিবে।

অপরাহ্নে হরিদাস আড়ংএ পৌঁছিয়া ভিক্ষা লব্ধ চাউল বিক্রয় করিয়া দশ পয়সা পাইল। কর্ম্মকার দাদার নিকট হইতে তিন গণ্ডা পয়সা হাওলাত করিয়া কুম্ভকার পটিতে যাইয়া দেখে, পুতুল অশেষ প্রকারের এবং বহু প্রকার

আকৃতির—কোনটী যে বালকেরা পছন্দ করিবে ভাবিয়া পাইল না। চারিদিক হইতে হরেক প্রকারের বাঁশীর আওয়াজ তাহাকে আরও বিব্রত করিয়া তুলিল। বাঁশীটাই হয়তো তাহারা বেশী পছন্দ করিবে—বাজাইয়া সমস্ত গ্রামখানি মুখর করিয়া তুলিবে। হরিদাস পুতুল ছাড়িয়া বাঁশীর দোকানে গিয়া দেখে তাহার দাম অনেক—সাড়ে পাঁচ আনায় পাঁচটিও হয় না। ক্ষুব্ধ হইয়া পুতুলের দোকানে ফিরিতে ফিরিতে তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, বাড়ীতে হাঁড়িটীর মধ্যে আট আনার পয়সা তো ছিল, না আনিয়া সে কি গর্হিত কাজই করিয়াছে!

হরিদাস আশ্চর্য্য হইয়া দোকানীর মুখের দিকে চাহিয়া দেখে, দোকানী চিত্রিত মেটে পাখীর পুচ্ছ ফুঁ দিয়া বাজাইতেছে। হাঁকিতেছে,—এক পয়সা!

হরিদাস কোঁচড় ভরিয়া পাখী-বাঁশী কিনিয়া আড়ংএর বাহিরে আসিয়া দেখে পশ্চিমে সূর্য্য রক্তবর্ণ হইয়া আসিয়াছে। যদি সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে না পৌছান যায়, তবে তাহারা বকুলতলা ছাড়িয়া গৃহে ফিরিয়া যাইবে,—তবে কে আর বাঁশী লইবে!

হরিদাসের বাম বগলে বেহালা, কাঁধে ভিক্ষার ঝুলি, আর কোচড়ে সাড়ে পাঁচ গণ্ডা বাঁশী। বিস্তীর্ণ মাঠের সরু আঁকা বাঁকা পথ ধরিয়া হরিদাস মাঙ্গনডাঙ্গা অভিমুখে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল।

বিরহ

শ্রীমতী অণিমা বসু

চলে যদি যাবে
এসেছিলে কেন?
দুদিনের তরে হাসাতে
মরমে দহিয়া
সরমে বাঁধিয়া
নয়নের জলে ভাসাতে
বিরহের জ্বালা
বুকে জেলে দিয়ে
যাবে যদি তুমি চলিয়া

মিলনের রাতি
কেন বা ফুরাল
শুধু দুটি কথা বলিয়া
কেন বা পোহাল
সে সুখ রজনী
বিরহ জাগাতে শরণে
ফিরে আসিবে না
এ মধু যামিনী
জীবনে অথবা মরণে।

বাঙ্গালা সাহিত্য ও রোমান্‌টিসিসম্‌

শ্রীসন্তোষকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

রোমান্‌টিসিসম্‌ বলিতে কি বুঝায় ও বাঙ্গালা সাহিত্যে ইহার স্থান কবে বা কিরূপ ভাবে হইল, তাহা সম্যক উপলব্ধি করিতে হইলে বাঙ্গালা ভাষার মূল উৎস সম্বন্ধে দুই একটী কথা জানা আবশ্যক। প্রত্যেক জাতির স্বদেশের ভাষায় কিছু না কিছু বৈশিষ্ট্য আছে; স্বদেশের ভাষার ন্যায় জগতে মধুর ভাষা আর নাই; আর বাংলা ভাষা বিশেষতঃ মধুর। ইউরোপে যেমন ইতালীয় ভাষার মাধুর্য্যের ও করুণ রসের জন্য একটা বিশেষ খ্যাতি আছে, বাংলা ভাষাও তেমনি মাধুর্য্য ও লালিত্যের জন্য প্রসিদ্ধ।

বাংলা ভাষার উৎপত্তি।

আর্য্যগণ ভারতবর্ষে অবস্থানকালে, কতকগুলি ভাষার প্রচলন হয়। বঙ্গভাষা এই আর্য্য ভাষার মধ্যে পরিগণিত। আধুনিক সংস্কৃত ভাষা আর্য্যগণের প্রাচীন বৈদিক ভাষা হইতে উদ্ভূত। বৈদিক ভাষা রূপান্তর গ্রহণ করিয়া লৌকিক সংস্কৃত ভাষায় পরিণত হয়। কালক্রমে সংস্কৃত ভাষায় কথাবার্ত্তা বলা লোকের পক্ষে কষ্টকর ও দুরূহ হইয়া উঠে, এবং তাহারা সংস্কৃত ভাষা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঐ সংস্কৃত হইতে উদ্ভূত একপ্রকার ভাষায় তাহাদের কথোপকথন আরম্ভ করেন। এই ভাষা প্রকৃতি পুঞ্জের সাধারণ ভাষা ছিল; এবং ইহা হইতেই এই ভাষার নাম প্রাকৃত হইয়াছিল। দেশভেদে প্রাকৃত ভাষা নানা প্রকারের রূপ গ্রহণ করিয়াছিল, যথা মারাঠী প্রাকৃত, নাগরী প্রাকৃত ইত্যাদি। আমাদের এই বাঙ্গালা ভাষার মূলে এই নাগরী প্রাকৃত। সুতরাং দেখা যাইতেছে, বাঙ্গালা ভাষা সংস্কৃত ভাষার কন্যা নহে—পরন্তু দৌহিত্রী। বাঙ্গালা ভাষার জন্ম সময় সম্বন্ধে অনেক মতভেদ আছে। সংস্কৃত ভাষা যখন মৃতপ্রায়, প্রাকৃত ভাষা যখন বিলুপ্ত তখন বঙ্গভাষা ধীরে ধীরে তাহার প্রভাব বিস্তার করিতে আরম্ভ করে। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের হাজার বছরের পুরাণ ও বৌদ্ধগান ও দোঁহার এ বিষয়ের সাক্ষ্য প্রদান করে। বস্তুতঃ বাঙ্গালা ভাষায় ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ। ইহার পূর্ব্বের গ্রন্থ এখন আবিষ্কৃত হয় নাই। হয়ত কালক্রমে তাহার আবিষ্কার হইতে পারে।

প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যকে সাধারণতঃ ও মোটামুটী গড়ে তিনটী যুগে ভাগ করা যাইতে পারে, যথা—(১) চৈতন্য-পূর্ব্ব যুগ (২) চৈতন্য যুগ (৩) চৈতন্যোত্তর যুগ। এই তিন যুগের লেখকগণের দ্বারা প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য বিশেষ ভাবে প্রভাবান্বিত।

(১) চৈতন্য পূর্ব্ব-যুগ—

এই যুগের বিষয় কিছু বলিতে গেলে, দুইটী নামের কথা বিশেষ ভাবে মনে পড়ে। ইহার মধ্যে একজন মৈথিল কবি বিদ্যাপতি, অপরটী মহাকবি চণ্ডীদাস। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস বৈষ্ণব পদাবলীর স্রষ্টা। বিদ্যাপতি বাঙ্গালী নহেন এবং তিনি মিথিলার রাজা শিব সিংহের সভাসদ ছিলেন। তিনি বাঙ্গালী নহেন বলিয়া এবং মৈথিলী ভাষায় পদ রচনা করায় তাঁহাকে বঙ্গ-সাহিত্যের ইতিহাসে স্থান দেওয়া ন্যায় সঙ্গত কিনা এ বিষয়ে মতভেদ থাকিলেও বাঙ্গালা ভাষায় তাঁহার পদাবলীর যে স্থান অধিকার করিয়া আছে তাহাতে তাঁহাকে বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাস হইতে বাদ দেওয়া চলে না। চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির সমসাময়িক। কিংবদন্তী আছে যে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসে সাক্ষাৎ হইয়াছিল। চণ্ডীদাস বাংলার আদি কবি।

পদাবলী আলোচনায় দেখা যায় যে একাধিক চণ্ডীদাস বঙ্গসাহিত্যে বর্ত্তমান, কারণ অনেক কবি চণ্ডীদাসের নামে আপনাদের পদ সমূহ চালাইয়া গিয়াছেন; সুতরাং খাঁটী চণ্ডীদাস ও নকল চণ্ডীদাসে পার্থক্য বাহির করা শুধু কষ্টসাধ্য নয়, একেবারে অসম্ভব। পদাবলির

চণ্ডীদাস ও শ্রীকৃষ্ণের চণ্ডীদাস পৃথক বলিয়া অনেকেরই ধারণা; যাহা হউক, পদাবলীর চণ্ডীদাস বাঙ্গালা সাহিত্যের একজন দিক্পাল। তাঁহার আলোকে বাংলা সাহিত্য উদ্ভাসিত। বিদ্যাপতির পদে যে পাণ্ডিত্যের আভাস পাওয়া যায়, চণ্ডীদাসে তাহা পাওয়া যায় না বটে কিন্তু ভাবের প্রাচুর্য্যে চণ্ডীদাসকে বিদ্যাপতির উপর স্থান দিতে ইচ্ছা হয়। বৈষ্ণব পদাবলি প্রেমের কবিতা; শ্রীকৃষ্ণ ও রাধার প্রেমলীলার বর্ণনা বৈষ্ণব পদাবলীর ভিতর দেখিতে পাওয়া যায়। চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির কবিতাগুলির ভিতর বেশ একটা বিশিষ্ট ভাবের ধারা আছে। তাঁহারা প্রেমকে আধ্যাত্মিক ভাবের ভিতর দিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির সহিত যদি কোন ইংরাজ কবির, ভাবের সাদৃশ্যের মিল পাওয়া যায়, তাহা এক সুইনবার্ণের ভিতর। সুইনবার্ণের (Swinburne) বিখ্যাত কবিতা "A Match", এই উক্তির জলন্ত সাক্ষ্য দান করিতেছে—"Swinburne's poem "A match" which claims to be one of the most beautiful love lyrics in English literature, depicts the theme that the life remains imperfect to man and woman till love, the cementing principle, effects union of their seperate existence and the union which love effects is as complete and perfect as that of the pair of opposites, pleasure and pain, words and times, the rose and its thorn, life and death"—Caine.

(২) চৈতন্য যুগ—

বাংলা ভাষা বিশেষ ভাবে পঙ্গু হইয়া পড়িয়াছিল। শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই বাঙ্গালা সাহিত্যের আবার নব জাগরণ হয়। সংস্কৃত সাহিত্যের চাপে বাঙ্গালা সাহিত্য একবারে মৃতপ্রায় হইয়া পড়িয়াছিল —পণ্ডিতগণ বাঙ্গালা সাহিত্যকে বেশ একটু ঘৃণার চক্ষুতেই দেখিতেন; কিন্তু শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবে বাঙ্গালা ভাষার প্রতিষ্ঠা বেশ বাড়িয়া গেল। চৈতন্যদেবের জন্মগ্রহণ করিবার পূর্ব্বে আমাদের সাহিত্যে কোন জীবনচরিত ছিল না। চৈতন্যদেবের পরই তাঁহারই অনেকগুলি জীবন চরিত রচিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে, বৃন্দাবন দাসের "শ্রীচৈতন্য-ভাগবত", লোচন দাসের "শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঙ্গল" কৃষ্ণ কবিরাজের "শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত" গ্রন্থই প্রধান, এতদ্ব্যতীত শ্যামাদাসের "অদ্বৈত মঙ্গল", নরহরি চক্রবর্ত্তীর "ভক্তিরত্নাকর", ঈশান নাগের "অদ্বৈত প্রকাশ" জয়ানন্দের "চৈতন্যমঙ্গল" প্রভৃতি গ্রন্থেরও নাম উল্লেখযোগ্য। আবার এই চৈতন্য যুগেই পদাবলীর সাহিত্যের সম্যক্ পরিপুষ্টি ও পরিণতি সাধিত হইয়া থাকে। আমরা অনেক পদ-কর্ত্তার নাম পাইয়া থাকি; এই পদ-কর্ত্তাগণ সকলেই খুব উচ্চাঙ্গের নয়—বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস ইহাদের শিরোমণি ছিলেন।

একদিকে বৈষ্ণবগণের অভ্যুদয়ে বাঙ্গালা সাহিত্যে যেমন বিশেষ উন্নতি হইয়াছে, অপর দিকে মুসলমান রাজন্যবর্গ ও বাংলার ভূম্যধিপগণের পৃষ্ঠপোষকতায় বাঙ্গালা সাহিত্যের বিশেষ প্রভাব ঘটিয়াছে। এই সময়ে প্রাচীন রামায়ণ ও মহাভারতের অনুবাদ পাওয়া যায়। ধর্ম্ম-সাহিত্যের প্রচুর উন্নতি এই যুগেই সাধিত হইয়া থাকে। মুসলমান রাজন্যবর্গ এদেশে আসিয়া দেশীয় ভাবাপন্ন হইয়া পড়েন এবং ধর্ম্মগ্রন্থ ও দেবদেবীগণকে জানিবার জন্য কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া পড়েন—তাহার ফলে বহু অনুবাদ, দেবদেবীর মাহাত্ম্যপূর্ণ ছড়া, গান ইত্যাদি বাঙ্গালা সাহিত্যে স্থান লাভ করে। কৃত্তিবাস ও কাশীদাসের রামায়ণ ও মহাভারতের অনুবাদ এই সময়ে সংঘটিত হয়।

(৩) চৈতন্যোত্তর যুগ—

চৈতন্যদেব বাঙ্গলায় এক ধর্ম্ম প্রবাহের বন্যা প্রবাহিত করেন। তাহার ফলে, চৈতন্যযুগের কিছু পরে বাঙ্গালায় দেবদেবীর মাহাত্ম্য কীর্ত্তনের যুগ আরম্ভ হয়। এই সময়ে মঙ্গল সাহিত্যের সৃষ্টি; মনসা মঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গল এই যুগে। বেহুলার কাহিনী ও মনসা ভাসান লইয়া বহু কবিতা রচিত হয়। এই লেখকগণের মধ্যে কেতকদাস, ক্ষেমানন্দ ও বিজয়গুপ্ত সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান ছিলেন। চণ্ডীমঙ্গলের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লেখক—কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীর আবির্ভাব এই সময়ে হয়। মুকুন্দরাম খুব প্রতিভাশালী কবি ছিলেন; মুকুন্দরাম দুঃখের বর্ণনায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন; কিন্তু তিনি বিশুদ্ধ পরিহাস—রসিকতার সুন্দর নিদর্শন দিয়াছেন। স্বাভাবিকতার গুণে এমন কি

পরবর্ত্তী কবি ভরতচন্দ্রকেও তিনি হার মানাইয়া দিয়াছেন।

এই মঙ্গলগ্রন্থ লেখকের পরেই মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ কবিবর ভরতচন্দ্র রায় গুণাকর ও সাধকশ্রেষ্ঠ রামপ্রসাদের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। ভারতচন্দ্রের লেখায় টেনিসনের (Tennyson) "Arts celere artem" (It is the height of the art to conceal art)এর উক্তির চরম নিদর্শন পাওয়া যায়। ছন্দের লালিত্য, ভাষার মাধুর্য্য, অলঙ্কারের ঐশ্বর্য্যের দিক দিয়া দেখিতে গেলে তিনি বাঙ্গলার একজন শ্রেষ্ঠ কবি, বলা যাইতে পারে। তাঁহার প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের উপর অসীম ক্ষমতা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয়। ভারতচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ কাব্য দুইটী—"অন্নদামঙ্গল" ও "বিদ্যাসুন্দর"। কিন্তু শেষোক্ত কাব্যে তিনি যেমন তাঁহার রচনা বিষয়ে নিপুণতা দেখাইয়াছেন, তেমনি অশ্লীলতা দোষের জন্য তাহাকে অপাঠ্য করিয়া ফেলিয়াছেন। এই অশ্লীলতার জন্য ভারতচন্দ্র একা দায়ী নহেন। সেই সময়ে বাঙ্গালা দেশে রুচিবিকার হইয়াছিল। ভারতচন্দ্রের যুগে সৈয়দ আলোয়ান নামক একজন প্রতিভাশালী মুসলমান লেখকের নাম পাওয়া যায়; "পদ্মাবতী" ইহারই রচিত। তারপর কবিবর রামপ্রসাদের যুগ। রামপ্রসাদ একজন ভক্ত, ও শ্যামা মায়েকে গান অতি সরলভাবে রচনা করিয়াছেন। তাঁহার গান আজও বাংলার আকাশ বাতাস মুখরিত করিয়া রাখিয়াছে। রামপ্রসাদই বাঙ্গলার সাবেকী আমলের শেষ কবি। রামপ্রসাদের যুগ বাঙ্গালার পরিবর্ত্তনের যুগ। কারণ সেই সময়ে বণিকদণ্ড ছাড়িয়া ইংরাজ রাজদণ্ড গ্রহণ করিতেছিল। সাহিত্য সেবার উপযুক্ত সময় এ নহে; সেইজন্যই ১৭৬০ হইতে কবিবর মধুসূদনের যুগ পর্য্যন্ত কোন বড় ও প্রতিভাবান লেখকের আবির্ভাব হয় নাই। এই ১৭৬০ হইতে মাইকেল যুগ পর্য্যন্ত কবিওয়ালার যুগ। তাঁরা মুখে মুখে অতি সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী রচনা করিতে পারিতেন। রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক গান ইত্যাদি রচনা করিয়া ইহারা বাঙ্গালার তাজা আসর জমাইয়া রাখিয়াছিলেন। স্বনাম ধন্য ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এই কবিওয়ালাদের শেষ কবি; ঈশ্বর গুপ্তই প্রাচীন বাঙ্গলা সাহিত্যের শেষ সীমা। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার প্রভাব এদেশে ব্যাপ্ত হইবার পূর্ব্বে বাঙ্গালীর সমাজের যে বিশেষত্ব ছিল, ঈশ্বর গুপ্তের রচনার মধ্যে তাহাই আমাদের বিশেষ লক্ষ্য হয়।

আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্য

ভারতে ইংরাজ শাসন প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই পাশ্চাত্য সভ্যতার ভরা জোয়ার বাঙ্গলার কূলে আসিয়া ধাক্কা দিল। সেই জোয়ারে প্রাচীন সভ্যতা, সমাজ, ধর্ম্ম সকলই ভাসিয়া চলিল। নবভাবে বিভোর নবীন বাঙ্গালা পুরাতন ভাঙ্গিয়া সকলই নূতন করিয়া গড়িয়া চলিল। আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের উদ্ভবের মূলে এই নব-জাগরণ। আধুনিক সাহিত্যের স্বরূপ চিনিতে হইলে ইংরেজী শিক্ষা ও সভ্যতার সহিত বিশেষভাবে পরিচিত হইতে হইবে। কারণ ইংরাজী হাব ভাব বাঙ্গালা সাহিত্যে ভরপুর। কৃত্রিমতার চাপে পুরাতন বাঙ্গালা সাহিত্য যখন তিলে-তিলে মৃত্যুর পথে অগ্রসর হইতেছিল, তখন ইংরাজী সভ্যতার আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া বাঙ্গালা সাহিত্য নব-জীবনলাভ করিল। অনুপ্রাস, অলঙ্কার, অনর্থক শব্দঘটা প্রভৃতি ভীষণ দোষ হইতে মুক্ত হইয়া বাঙ্গালা সাহিত্য নূতন ও আধুনিকভাবে মণ্ডিত হইয়া এক নব সৃষ্টির সূচনা করিল। এই নব সৃষ্টির মূলে রোমান্‌টিসিসম্।

রোমান্‌টিসিসম্ বলিতে আমরা মোটামুটীভাবে বুঝি "The revolt from the Severity pendanticisim, and commonplaceness of a classical or pseudo-classical to a more picturesque, original, free and imaginative style in art and literature" অর্থাৎ এক কথায় আমরা বলিতে পারি, পুরাতনের বিরুদ্ধে নূতনের বিদ্রোহ। প্রকৃতির প্রতি অসীম অনুরাগ, প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে একান্ত আত্মহারা ভাব, প্রকৃতির মূলে এক বিরাট রহস্য (Mystery), প্রকৃতির ভিতর বিশ্ব-চৈতন্যের বিকাশ প্রভৃতির অনুভূতিই রোমান্‌টিসিসমের প্রধান উপাদান।

এখন এই রোমান্‌টিসিসম্ আমাদের সাহিত্যে কিরূপ ভাবে তাহার মোহনজাল বিস্তার করিল তাহা জানা আবশ্যক। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ইংরাজী তাহার হাব

ভাব বাঙ্গালা ভাষাকে বিশেষ ভাবে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল। ১৮০০ খ্রীঃ অব্দে ইংরেজী ভাষার পৌরাণিকতার (Classicism) যুগের অবসান হইয়াছে। পোপ, (Pope) ড্রাইডেন (Dryden), জনসন্ (Johnson) এবং গ্রে (Gray) এই পৌরাণিকতার যুগের শ্রেষ্ঠ কবি। এই পৌরাণিক যুগ "Classical school of English poetry" বলিয়া সাধারণতঃ অভিহিত হইয়া থাকে। কুপার (Cowper), "Romantic school of English petory"র প্রথম কবি বলা যাইতে পারে। কিন্তু ইংরেজী ভাষায় রোমান্টিসিসমের ভেরী পূর্ণমাত্রায় বাজাইয়াছিলেন কবিবর ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ; ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের বিরাট ও সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা রোমান্টিসিসমের নিগূঢ় তত্ত্ব বিশ্লেষণ করিয়া, ইংরেজী সাহিত্য এক নূতন হাওয়া বহাইয়া দিয়াছিলেন। ওয়ার্ডসওয়ার্থ বুঝিয়াছিলেন যে কবির একটা মহৎ উদ্দেশ্য আছে; Poet বা কবি শব্দ গ্রীক শব্দ vates হইতে উৎপত্তি। vates শব্দের দুইটা অর্থ হয় (১) poet (২) prophet ওয়ার্ডসওয়ার্থের প্রত্যেক কবিতা হইতে কিছু না কিছু এমন পাওয়া যায়, যাহা vates শব্দের দ্বিতীয় অর্থটাকে সমর্থন করে। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের মতে কবির মুখ্য উদ্দেশ্য (Business বা mission) হওয়া উচিৎ "to hold the mirror upto nature" ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের সঙ্গে সঙ্গেই বায়রণ (Byron) কীটস্ (Keats) সেলী (Shelley) প্রভৃতি দিকপালগণের আবির্ভাব হয়, এই সকল প্রতিভাশালী লেখকের হাতে ইংরাজী সাহিত্য এক নবীন ভাবের (Romanticism) হিল্লোলে হাবু ডুবু খাইতে থাকে। কি আশ্চর্য্য, যখন ইংরাজী সাহিত্য Classicismএর চাপে কণ্ঠরোধ হইয়া যাইবার উপক্রম হইতেছিল, ঠিক সেই সময়ে এক সঙ্গে এতগুলি প্রতিভার অভ্যুদয় হইল। ইহা ইংরাজী সাহিত্য ও ইংরাজ জাতির মাহেন্দ্রক্ষণ বলিতে হইবে। বিধাতার ইচ্ছা ব্যতিরেকে এইরূপ যুগপ্রবর্ত্তক দিকপালগণের অভ্যুদয় ঘটা অসম্ভব। এই যুগেই ইংরাজী সাহিত্যে Lyric বা গীতি কাব্যের উদ্ভব ও তাহার সম্যক্ পরিণতি সাধিত হয়।

যদিও রোমান্টিসিসমের ভেরী ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ প্রথম বাজাইয়াছিলেন, ব্রাউনিং (Browning) ও টেনিসন্ (Tennyson) সেই ভেরীটাকে আরও মুখর করিয়া তুলিয়াছিলেন—"Romantic revival was at its highest pitch at the hands of Tennyson and Browning"

যখন ইংরাজী সাহিত্য এই নবীনভাবে মণ্ডিত হইয়া বিশ্বের দরবারে এক নূতন বাণী শুনাইতেছিল, ঠিক সেই সময়ে আমাদের বাঙ্গালা সাহিত্যের গতি ও ভাব কিরূপ ছিল তাহা জানা আবশ্যক। বাঙ্গালার দ্বারে তখনও এই নবজাগরণের ঢেউ আসিয়া ধাক্কা দেয় নাই। বাঙ্গালা সাহিত্য তখন তাহার সেই চির পুরাতন পৌরাণিকতার (Classicism of the dead past) ভাবে বিভোর। ঈশ্বরচন্দ্রের যুগ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা সাহিত্যকে প্রকৃত সাহিত্য বলা যায় না—অবশ্য বৈষ্ণব সাহিত্য বাদ। বৈষ্ণব সাহিত্য বাঙ্গালা সাহিত্যকে বিশেষভাবে সৌন্দর্য্যমণ্ডিত ও সম্পদশালী করিয়াছে। বৈষ্ণব সাহিত্য শুধু বাংলা সাহিত্যে একটী অমর দান নহে, পরন্তু ইহা সমগ্র বিশ্ব-সাহিত্যের একটী বিশিষ্ট সম্ভার। ১৯০০ শতাব্দীতে যখন টেনিসন ও ব্রাউনিংএ রোমানটিসিসম সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী হইয়া উঠে, ঠিক সেই সময়ে বাঙ্গালা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রও মধুসূদন তাহাদের সেই চিরপুরাতন পৌরাণিকতার (Classicism of the dead past) ভাব লইয়া বিভোর ছিলেন। একথা দ্বারা আমরা বঙ্কিমচন্দ্র ও মধুসূদনের প্রতিভা ও যশ ম্লান করিবার প্রয়াস পাইতেছি না বা তাঁহাদের লেখার মূল্য হ্রাস করিতেছি না। বঙ্কিমচন্দ্র ও মধুসূদন বাঙ্গালা সাহিত্যের যুগ প্রবর্ত্তক। তাঁহাদের কীর্ত্তি স্তম্ভের আলোকে সমস্ত বাঙ্গালা চিরদিন আলোকিত থাকিবে। তাহারা যে বীজ বপন করিয়া গিয়াছেন তাহা হইতে বাঙ্গালা সাহিত্যের বর্ত্তমান মহীরুহ সৃষ্টি হইয়াছে।

বঙ্কিম ও মধুসূদন সাহিত্য প্রসঙ্গে আমরা এই কথা বলিতে চাহি যে আমাদের সাহিত্য যে গতিতে চলিয়া আসিতেছিল, যদি ঠিক সেই গতিতে চলিয়া আসিত, তাহা হইলে আজ আমরা যাহা বাঙ্গালা সাহিত্যে পাইয়াছি তাহা পাইতাম না। বাঙ্গালা সাহিত্যে রোমান্টিসিসমের সর্ব্বপ্রথম আভাস দিয়াছেন, কবিবর বিহারীলাল

চক্রবর্ত্তী। তাঁহার "হিমালয়" শীর্ষক কবিতা এ কথার সাক্ষ্য দিতেছে। রবীন্দ্রনাথ প্রকাশ্যে আপনাকে তাঁহার মন্ত্র শিষ্য বলিয়া তাঁহার শ্লাঘা বৃদ্ধি করিয়াছেন। রবীন্দ্র নাথের নিম্নলিখিত কথাগুলি ইহার প্রমাণ স্বরূপ উদ্ধৃত করা যাইতে পারে—"এ কথা সাহস পূর্ব্বক বলিতে পারি, সাধারণের পরিচিত কণ্ঠস্থ শত সহস্র রচনা যখন বিনষ্ট ও বিস্মৃত হইয়া যাইবে, "সারদা-মঙ্গল" তখন লোক-স্মৃতিতে প্রত্যহ উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিবে এবং কবি বিহারীলাল যশঃস্বর্গে অম্লান বরমাল্য ধারণপূর্ব্বক বঙ্গ-সাহিত্যের অমরগণের সহিত একাসনে বাস করিতে থাকিবেন।" রবীন্দ্রনাথের ন্যায় প্রকৃতির প্রতি অসীম অনুরাগ তাঁহার আর একটী বিশেষত্ব। তাঁহার "হিমালয়" পড়িতে পড়িতে শেলীর "Mont Blanc"এর কথা মনে পড়ে। কবির একটী অনির্ব্বচনীয় বিরাট রহস্য বোধের (Profound sense of mystery) কথা "হিমালয়" কবিতাটীর মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে। যাহা হউক—বিহারীলালের বাঙ্গালা সাহিত্যে রোমান্‌টিসিসমের প্রবর্ত্তন, ইংরাজী সাহিত্যে রোমানটিসিসমের যুগ পঞ্চাশ বৎসর অতিবাহিত হইলে সাধিত হয়। সুতরাং বাঙ্গালা সাহিত্য ইংরাজী অপেক্ষা অনেক পশ্চাতে পড়িয়া থাকে। এই পঞ্চাশ বৎসরের ক্ষতিপূরণ করিবার রবীন্দ্রনাথ সাধন করেন। রবীন্দ্রনাথ গীতিকাব্যের যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি। গীতিকাব্য যুগ, মহাকাব্যের যুগের পরই আরম্ভ হইয়াছে; মহাকাব্যের যুগের শেষ কবি নবীনচন্দ্র। রবীন্দ্রনাথের সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা বাঙ্গালা সাহিত্যের উপস্থিত শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছে; এবং তাঁহার প্রতিভাই আবার বাঙ্গালা সাহিত্যকে বিশ্বের দরবারে আসন প্রদান করিয়াছে। রোমান্‌টিসিসম্ রবীন্দ্রনাথের হাতে পড়িয়া এক অনাবিল সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছে। পৃথিবীতে যাহা কিছু রবীন্দ্রনাথকে স্পর্শ করিয়াছে, তাহার অন্তরতম অনুভূতিতে তিনি যেন এক হইয়া গিয়াছেন, যেন তাহাদেরই রূপ ধারণ করিয়া এবং তাহাদের ভাবে বিভোর হইয়া তাহাদেরই ভাষায় তিনি তাহাদেরই প্রকাশ করিয়াছেন। এই রোমান্‌টিসিসমের আভাস রবীন্দ্রনাথের "নির্ঝরের-স্বপ্নভঙ্গ" কবিতার মধ্যে বেশ স্পষ্টভাবে পাওয়া যায়—

"আজি এ প্রভাতে রবির কর
কেমনে পশিল প্রাণের পর
কেমনে পশিল গুহার আঁধারে
প্রভাত পাখীর গান
না জানি কেনরে, এতদিন পরে
জাগিয়া উঠিল প্রাণ;
(ওরে) প্রাণের বাসনা প্রাণের আবেগ
রুধিয়া রাখিতে নারি।"

আবার—

"হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি
জগত আসি সেথা করিছে কোলাকুলি।"

রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার নিকট প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ভাব সমাবেশ হইয়া এক নূতন আকার ধারণ করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের কবিতাগুলি পাঠ করে রবার্ট ব্রাউনিং (Robert Browning) এর সমালোচকের ভাষায় বলিতে ইচ্ছা হয় "It is a picture of a man thinking aloud."

রোমান্‌টিসিসম্ রবীন্দ্রনাথের হাতে পড়িয়া যে বন্যার সৃষ্টি করিয়াছে তাহার প্রবাহ বাঙ্গলার গগন পবন আজ ধ্বনিত করিয়া রাখিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার বিশ্লেষণ ও উপলব্ধি করিবার উপযুক্ত স্থান ইহা নহে এবং তাহা সহজ কাজও নহে। আজ এই মনীষীর প্রতি আমাদের গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাইয়া ক্ষান্ত হওয়াই সমীচীন।

ছোটগল্পের টেক্‌নিক্‌

শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর বি-এ

কারাকক্ষের ফাটলের মধ্য দিয়ে এসে পড়া এক ফালী রোদ যেমন উজ্জ্বল তীব্রতা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে, যেমন স্পষ্ট তেমনি দীপ্ত,—ছোটগল্পও তেমনি সমগ্র কাহিনীটার মধ্য হতে বেছে নেওয়া সংক্ষিপ্ত একটী অংশ। জীবন-নাট্যের একটী ছোট সংস্করণ—সংক্ষেপ অথচ সম্পূর্ণ এক-খানি ছবি। ছবিখানির প্রতিটী রেখার সংযমের পরিচয় একটা সম্পূর্ণতার ইঙ্গিত। ছোট গল্প, এর মধ্যে লেখকের পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বর্ণনা করার সঙ্কুলন হবে না, মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুভূতির পরিচয় দেবার মত অবসর নেই, শুধু চারিপাশ থেকে কথার জাল বুনে গল্পটাকে তিনি টেনে নিয়ে যাবেন পরিণতির দিকে। একটী ঘটনাকে কেন্দ্র করেই এর সৃষ্টি, একটী ঘটনাকে স্পষ্ট উজ্জ্বল স্বচ্ছ ও সুন্দর ভাবে পাঠকদের দৃষ্টির সম্মুখে প্রকাশ করাই এর ধারা, এইজন্যই জনৈক বিখ্যাত ইংরাজ লেখক একে Bull's-eye লণ্ঠনের ফোকাশের সঙ্গে তুলনা করেছেন। এরিষ্টটলের কথায় a slice of life—জীবনের একটুকরা কাহিনীই হচ্ছে ছোটগল্প। সমগ্র জীবনের কথা বলবার মত অবসর এর মধ্যে নেই এইজন্যই অনেক সময় বড় বড় নাট্যকার ও ঔপন্যাসিকেরা ছোট গল্প লেখায় সাফল্যলাভ করতে পারেন না—নখদর্পণের মত এর পর্য্যবেক্ষণের বৈশিষ্ট্য আছে, এর লিখনভঙ্গীর মধ্যে আছে একটী বিশেষ ধারা। উপন্যাসের মত এর চরিত্রসৃষ্টি ক্রমগতি-শীল নয়, আকস্মিক সংক্ষিপ্ত কিন্তু সম্পূর্ণ। ছোটগল্পের চরিত্র তার প্রতি বৈশিষ্ট্য নিয়ে মনের উপর স্থায়ী রেখা-পাত করে যায় বড় বড় উপন্যাসও যত গভীরভাবে মনের মধ্যে স্থায়িত্বলাভ করেনা—এইখানেই ছোটগল্পের শ্রেষ্ঠত্ব, ছোট গল্প লেখক জীবনটাকে চিত্রকরের মত এঁকে দেন যেমন রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টি করেছেন কাবুলীওয়ালা, গর্কী Twenty six Men and a Girl দাছনৎসিও Hero, ফ্রাস্ Our Lady's Juggler মোপাসা The Necklece.

এমনি সংযত ও গভীরভাবে লিখতে হলে লেখকের ভাষার উপর দখল থাকা চাই বিশেষভাবে, প্রতি শব্দটীর একটী বিশেষ মূল্য আছে এর মধ্যে। পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বর্ণনার অবসর এর মধ্যে নেই—চরিত্রের উপর একটী অস্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়ে পাঠকের চিন্তাশক্তির উপর লেখককে নির্ভর করতে হবে। গল্পটী পরিণতির দিকে অগ্রসর হবে পূর্ণ গতিতে প্রতি বাক্যটীর লক্ষ্য থাকবে সেই পরিণতির দিকে।

প্রথমেই প্লটের কথা। প্লটটী জটিল হবে না। জটিল প্লটে পাঠকদের সহানুভূতির স্থায়ীত্ব বড়ই অল্পক্ষণ স্থায়ী। এমনি একটী প্লট বা ঘটনা লেখক সৃষ্টি করবেন যার মধ্যে সমগ্রজীবনের সম্পূর্ণতার একটী আভাস থাকবে এবং সেই ইঙ্গিতটুকু পাঠকদের চিন্তাধারার মধ্যে ধরা দেবে সর্ব্বাঙ্গীন পূর্ণতা নিয়ে। তার মধ্যে ভিন্নমুখী কোন আভাষ যেন না থাকে, তাহলে গল্পের চিত্তাকর্ষকতা কমে যাবে। এইজন্যই ঘটনা বা প্লটের নির্ব্বাচন সময়ে লেখকের বিচার ও পর্য্য-বেক্ষণ শক্তি বিশেষ তীক্ষ্ণ হওয়া দরকার।

বিষয় নির্ব্বাচন হয়ে গেলেই তখন চরিত্র সৃষ্টির প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে বিশেষভাবে। ছোট গল্পের প্রত্যেকটী চরিত্র লেখনীর দু'একটী রেখাপাতে স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠবে, কয়েকটী ইঙ্গিতেই সে চরিত্র হয়ে ওঠা চাই সম্পূর্ণ। তার উপর অসাধারণ চরিত্র পাঠকদের বিস্ময়মুগ্ধ করতে পারে কিন্তু তার অস্বাভাবিকতা আনন্দ দিতে পারে না, এইজন্যই প্রায় স্বাভাবিক চরিত্রসৃষ্টি করাই কর্ত্তব্য, রোমান্সের সঙ্গে রিয়ালিজমের মিশ্রণ থাকা প্রয়োজন।

রচনাভঙ্গীর সারল্য ছোটগল্পের তৃতীয় বিশেষত্ব, যত সরল ভাবে গল্পটী রচিত হবে তার ভাবধারার উৎকর্ষতা পাঠক চিত্তে তত বেশী প্রভাব বিস্তার করতে পারবে, করুণ ও হাস্যরস উপভোগ্য হবে তত বেশী। গল্পের গতির সঙ্গে স্বচ্ছচিত্তে অগ্রসর হতে তাহলে পাঠককে

মোটেই কষ্ট পেতে হবে না, সরলতার জন্যই গল্পটী হয়ে উঠবে উপভোগ্য।

তারপর হচ্ছে গল্পের পারিপার্শ্বিক অবস্থার কথা, ইংরাজীতে যাকে বলে atmosphere প্লট, চরিত্র ও প্রকাশ ভঙ্গীর সরলতা—এই তিনটী থেকেই এই atmosphereএর উৎপত্তি। তবে বিশেষভাবে এটী কী তা বলা বড়ই শক্ত। কিন্তু ছোট গল্পের মধ্যেই একটী নিজস্ব atmosphere আছেই।

চতুর্থতঃ ছোট গল্পের মধ্যে একটী অখণ্ড সম্পূর্ণতা থাকবে। প্রতি অংশটী অপরটীর সঙ্গে এমনি নিবিড়ভাবে জড়িত থাকবে যে কোন অংশ বাদ দিলেই অপর অংশটুকু হয়ে যাবে অর্থহীন। পারস্পারিক নির্ভরশীলতা রচনাভঙ্গীর একত্ব (oneness) থাকার প্রয়োজনীয়তা আছে বিশেষভাবেই। অবান্তর থাকবে না কিছুই, যা থাকবে তার একটুকু বাদ দিলে গল্পের গল্পত্ব নষ্ট হবে, সামঞ্জস্য হারিয়ে যাবে—ইহাই গল্পের একত্ব—oneness, ইহার উপরেই গল্পের গভীরতার ভিত্তি।

তা' ছাড়া বাস্তবতার সহিত সামঞ্জস্য না থাকলে, স্বাভাবিক না হলে সে গল্প রসানুবোধের প্রতিকূলতা করে, প্রশ্ন উঠতে পারে রূপকথা—বাইশ যোয়াণ, তেইশ যোয়াণের গল্প, রাজকন্যার চোখের মধ্যে হাতিপড়ার কথা থেকে ছেলেরা রসগ্রহণ করে কেমন করে! তার উত্তরে বলা হবে রূপকথা থেকে ছেলেরাই রসগ্রহণ করতে পারে প্রাপ্ত বয়স্কদের রসানুভূতির সহায়ক তা হয় না, তারা রূপকথা পরে লেখকের বর্ণনাপটুত্ব দেখবার জন্য তার রসসৃষ্টি অনুভব করার জন্য নয়। ক্রমগতিশীল মানব মনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে যে গল্পের সৃষ্টি সেই গল্পের রসানুভূতি সেই সময়েই আনন্দ দিতে পারে যে সময়ের বিচারবুদ্ধির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সে গল্পের সৃষ্টি। এইজন্য বিভিন্ন পরিবর্ত্তনশীল বিচারবুদ্ধির অনুপাতে গল্পের স্বাভাবিকতার এক একটী সীমারেখা টেনে দেওয়া হয়েছে, এই জন্যই ছোটছেলেরা রূপকথার মধ্যে যতটা আনন্দ পায়, যুবকেরা রূপকথার উপর ততটী বীতশ্রদ্ধ। আবার যুবকদের মনে যে রসঘন আনন্দ জাগে ট্র্যাজেডী কমেডী বা রোমান্স পড়ে, বৃদ্ধেরা তার উপর তেমনিই বীতরাগ। এ সব হোল পাঠকদের অনুভূতির কিন্তু এর উপর গল্পের জনপ্রিয়তা নির্ভর করছে বলেই একথা বলতে হোল। গল্পের যত বেশী সামঞ্জস্য থাকে বাস্তবতার সঙ্গে সেই সেই গল্পের গভীরতা তত বেশী গভীর হয়।

তার পর পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা ছোট গল্পের গভীরতা ও গাম্ভীর্য্যটুকু নষ্ট করে। সরলতা ও সংক্ষিপ্ত স্বচ্ছ প্রকাশ ভঙ্গীর উপর ছোটগল্পের ভিত্তি। 'এহ্'টী পদ্ধতিকে বাদ দিলে সে ছোটগল্পের আয়ুব স্থৈর্য্য ক্ষীণ হয়ে আসে।

শুধু এগুলিই সব নয় Joy ও speed—ই হচ্ছে ছোটগল্পের একটী বিশেষ বৈশিষ্ঠ্য। যে গল্প পাঠক চিত্তকে আনন্দ দিতে পারে না, অথবা যে গল্পের শেষ লাইনটী পর্য্যন্ত সমান আনন্দদানে পরিতৃপ্ত না করতে পারে তাকে ছোটগল্প কেন—গল্প বলাই চলে না। আনন্দ আর আকর্ষণ থাকবে শেষ লাইনটী পর্য্যন্ত—সেইখানেই ছোট গল্পের সার্থকতা, আনন্দ ও গতিই হচ্ছে ছোট গল্পের প্রাণ, জনপ্রিয়তা নির্ভর করে শুধু এই দুটীর উপরেই। ছোটগল্পের রচনারীতির মূলকথা হচ্ছে Joy ও speed— এই প্রাণটুকু প্রতিষ্ঠা করার জন্যই এত রীতি নীতির সৃষ্টি। প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে হলে এই টেক্‌নিকের প্রয়োজন। এই সব টেকনিকগুলি সম্পূর্ণতা লাভ করলেই ছোটগল্প সার্থক হয়ে উঠবে।

শ্রীবিষ্ণুদাস

১৩৩৯ সনের ভাদ্র সংখ্যার ভারতবর্ষ—হইতে একটা গান সংগ্রহ করিয়া আমাদের ভূতনাথ সেদিন হারমোনিয়ামের সুর-সংযোগে গাহিতেছিল। সন্ধ্যাকাল। পাড়ার কনসার্টপার্টি তখনও সান্ধ্য কোলাহল সুরু করে নাই। আমি জানালার ধারে বসিয়া শুনিতেছিলাম। দেখিতেছিলাম, ভূতনাথের দেহ সুরের সঙ্গে কথার সঙ্গে কেমন জোট পাকাইয়া দুলিতেছে। এক একবার কাৎ হইয়া পড়িতেছে; আবার পরক্ষণেই সোজা হইয়া উঠিতেছে—নামিতেছে। ক্রমে এই প্রক্রিয়াটা এত বৃদ্ধি পাইল, যে নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকিতে পারিলাম না। তাড়াতাড়ি উঠিয়া গিয়া ভারতবর্ষখানি তাহার হারমোনিয়ামের উপর হইতে তুলিয়া লইলাম। ভূতনাথের নাচন-কোঁদন তৎক্ষণাৎ উপশমিত হইল।

পড়িয়া দেখি, গানটির নাম "আশা পূরণ।" কথা ও সুর—শ্রীদিলীপকুমার রায়ের এবং স্বরলিপির লেখিকা শ্রীমতী সাহানা দেবী! কিন্তু এইটুকুই তো ভূতনাথের ঐরূপ প্রক্রিয়ার যথেষ্ট কারণ নহে। ঘরে আলো ছিল না; জানালার ধারে আনিয়াও স্পষ্টভাবে কারণটি চোখে পড়িল না। পত্রিকাখানি জানালা গলাইয়া বাহিরে ধরিয়া পরাদের সঙ্গে কপাল ঠেকাইয়া দেখিলাম ক্ষুদ্রাক্ষরে লেখা "নৃত্যসঙ্গীত।" এবং গানটির নিম্নে ইংরাজীতে ইহার মূল কবিতাটি।

ইহাতে পাঠ-স্পৃহা ঝটিতি বৃদ্ধি পাইল। ছুটিয়া বাহিরে আসিয়া রোয়াকের উপর দাঁড়াইয়া কবিতাটি পড়িতে লাগিলাম। এবং শেষ করিয়াই উহার তর্জ্জমাটি পড়িতে সুরু করিলাম। কিন্তু সবটুকু পড়িবার পূর্ব্বে মধ্য ভাগেই কেমন অভিভূতের মত হইয়া পড়িলাম। চোখ দুটি পিছলাইয়া পৃষ্ঠাখানির নিম্নে নামিয়া আসিল। দেখিলাম লেখা আছে, "আমার এ অনুবাদটি শ্রীঅরবিন্দ কর্ত্তৃক সংশোধিত।" ইহার পর আর উৎসাহ রহিল না। ধীরে ধীরে ঘরের ভিতর গিয়া ভারতবর্ষখানি ভূতনাথের কোলের উপর ফেলিয়া দিলাম। অন্ধকারে তাহার চোখ দুটি তৎক্ষণাৎ কেরাসিনের ডিবের মত জ্বলিয়া উঠিল। সে আবার গান ধরিল "কৃষ্ণের জীব—"

আমি আর দাঁড়াইতে পারিলাম না, রাজপথে বাহির পড়িলাম।

রাত্রে পত্রিকাখানির পাতা হাতড়াইতে হাতড়াইতে আর একটি রত্নের সন্ধান মিলিল—শ্রীনিধিরাজ হালদারের কবিতা "নহ পুরাতন।" সত্য কথা। রত্ন পুরাতন হইলেও দাম কমে না। বরং কাহারো কাহারো বাড়িয়া যায়।

কবি লিখিতেছেন, "নূতনের অতি জীর্ণ কঙ্কাল।" মেডিক্যাল কলেজেও চলিবে না দেখিতেছি!

কবিতাটিকে পাদ-পূরণে না বলিয়া মুখ রক্ষায় বলিলেই ঠিক হয়।

বাংলার "অপরাজেয় উপন্যাস-সম্রাট" শরচ্চন্দ্র বৃদ্ধ হইয়াছেন সত্য কিন্তু যে বয়সে লোকের ভীম-রতি হয় তাহার সীমানায় তিনি এখনও পদার্পণ করেন নাই বলিয়াই জানিতাম। কিন্তু তাঁহার "শেষের পরিচয়ে" তাহারত পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। ইহা শেষ হইবার পরিচয় নয়; শেষ যে বহুপূর্ব্বে হইয়া গিয়াছে, তাহারই পরিচয়।

শেষের পরিচয়ে তারক কহিল, "ছাখো রাখাল, তর্ক করোনা। মানুষে মানুষের অনেক কিছু জানে, তবু, তার কাছেই সে অনেক কিছু গোপন করে। গরু-বাছুরের এ প্রয়োজন হয় না। * *"

ঠিক। কিন্তু গরু-বাছুরকে ঐ আসরে টানিয়া আনায় কথাগুলির মধ্য হইতে যে ইঙ্গিত ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা আর যাহাই হোক, সুরুচির পরিচায়ক নয়। গরু ও বাছুরের সেই ক্রিয়া চতুষ্টয় ছাড়াও মানুষের জানা আরও আরও অনেক কিছু মানুষ গোপনে সম্পন্ন করিয়া থাকে, যাহা গরু-বাছুরে করে না। অবশ্য এ ধরণের কথাবার্ত্তার রস জমে আড্ডায়। সেখানে গ্রাম্য বা ভদ্র কথার মধ্যে সকল সময় একটী সীমানা রক্ষা করিয়া চলা সম্ভবপর নয়। হয়ত শরৎবাবু লিখিবার কালে ঝোঁকের মাথায় সে কথাটা একদম ভুলিয়া গিয়া থাকিবেন।

আর "নতুন-মা" বা ব্রজ-বাবুর "নতুন-বৌয়ের পতি-ভক্তি দেখিবার মত বটে। শরৎবাবু বলিয়াই এমন একটা অদ্ভুত ঘটনার সৃষ্টি হইতে পারিয়াছে। আর কেহ হইলে (উপ) পতির ডাকে স্বামীর পদরজ মাথায় মাখিয়া পত্নীর লজ্জাহীনার মত তৎক্ষণাৎ প্রস্থান ব্যাপারটা লিখিতে, এমন কি, কল্পনায়ও হয়ত আনিতে পারিত না। একদা শরৎবাবু বঙ্গ সাহিত্যে দুর্নীতি দেখিয়া উৎক্ষিপ্ত প্রায় হইয়াছিলেন। কিন্তু সে বৎসর কয়েক পূর্ব্বের কথা। তাহার পর বয়সও বাড়িয়াছে, জ্ঞানও কমে নাই ; শেষ প্রশ্নের দ্বিতীয় সংস্করণ শেষ হইতে সামান্যই বাকী। বোধকরি বয়স, জ্ঞান ও অচলা ভক্তির সাহায্যে তিনি প্রমাণ করিতেছেন—

"আমি মদ্ খাইনে
সুধা খাই জয় কালী বলে—এ—এ—"

এ সংখ্যায় গল্প আছে দুটি ও কথিকা একটী। প্রথম গল্প শ্রীপ্রেমোৎপল বন্দ্যোপাধ্যায়ের "বিজিত।" নামকরণ বিজিতা হইলেই মানাইত। কেননা পরিশেষে সাহিত্যিক স্বামী সঞ্জয়ের নিকট শিক্ষিতা পত্নী মঞ্জুলাকেই হার মানিতে হইয়াছে। চিরদিন স্বামীরই জয়! যাহা হোক, গল্পটি প্রেমোৎপল বাবুর অন্যান্য গল্পের মত সুখপাঠ্য হয় নাই।

দ্বিতীয়টি শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের "অকাল-বসন্ত।" গল্পটিতে পাখীর গান, ফুলের গন্ধ, নূতন পাতা, দখিন হাওয়া, চুম্বন প্রভৃতির জোয়ায় বহিবে, আশা করা গিয়াছিল। কিন্তু ঐগুলির একটীও না পাইয়া বড় দুঃখিত। শেষে কিনা এক করপোরেশন মেয়ে স্কুলের শিক্ষয়িত্রীর গল্প! অবশ্য দরদী লেখকের অন্তর হইতে তাহার জন্য গভীর দরদ উদ্গত হইয়া পড়িয়াছে। তাহাত কম কথা নয়। তবুও ভাল লাগিল না।

গল্পটি কোলকাতাই ভাষায় লিখিত। কিন্তু কোন কলিকাতার লোককে তো বলিতে শুনি নাই—"মেরেইজ", "গোমুরা", "মেইন", "ট্রেইনিতে", "গেইট"। তবে পূর্ব্বাঞ্চল হইতে কলিকাতায় আসিয়া যাঁহারা "ক্যাল্‌কেসিয়ান্" সাজেন তাঁহাদের কেহ কেহ বলেন বটে। তা, কেবল ambition কথাটা ইংরাজীতে না লিখিয়া বাংলায় "অ্যাম্‌বাইশন্" লিখিলে এমন কি Artএর ক্ষতি হইত ?

আর, বানান, সন্ধি ইত্যাদির কথা ছাড়িয়া দিই। চল্‌তি কথার আবার বানানই বা কি, শুদ্ধ-সন্ধি বা কে করে। জিভের আগায় যাহা আসে তাহাই কোনরকমে লিখিতে পারিলেই হইল। অতএব এইখানেই "নিটোল একটী" চুপ্।

এ সংখ্যায় রঙিন ছবি আছে চারখানি। চারখানিই সমান ভাল।

° ° •

১৩৩৯ সনের ভাদ্র সংখ্যা প্রবাসীতে—রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি রচনা আছে—"পত্রধারা", "কবিতা", ও "প্রবন্ধ।" তন্মধ্যে "ভীরু" ও "মানব পুত্র", বিশেষ করিয়া শেষোক্তটি অপরূপ ছন্দে রচিত। কবি অধুনা অভ্যাসবশেই ছন্দ রচনা করিয়া থাকেন।

তাঁহার মক্তব-মাদ্রাসার বাংলাভাষা নিবন্ধটি বোধকরি নানাস্থানে নানা অবস্থায় পঠিত হইয়াছে। শীঘ্রই ইহার প্রত্যুত্তর দেখিব বলিয়া আশঙ্কা করি। আশঙ্কা করি এইজন্য যে, তাহা "প্রকৃতিস্থ" হইয়া লিখিত হইবে না।

শ্রীকালিকারঞ্জন কানুনগো পি-এইচ-ডির প্রবন্ধ "হলদীঘাটের যুদ্ধ ও মহারাণা প্রতাপের শেষজীবন" কতকগুলি নূতন সংবাদে পূর্ণ। নাটকাদি ও টডের রাজস্থানের ইতিহাস পাঠে মহারাণা সম্বন্ধে লোকের মনে যে ধারণাগুলি বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে, প্রবন্ধটি পাঠ করিলে তাহা বিদূরিত হইবে। অবশ্য কানুনগো মহাশয়ের সিদ্ধান্তগুলির সত্যাসত্য নির্ণয় ঐতিহাসিকের পক্ষেই সম্ভব।

আমরা পাঠ করিয়া আনন্দ লাভ করিয়াছি এবং দুঃখিতও হইয়াছি এই জন্য যে মহারাণার "দেহ-ভস্মের উপর যে একটী ছোট ছত্রী নির্ম্মিত হইয়াছিল, সংস্কারা-ভাবে উহাও জীর্ণ শীর্ণ।" মহারাণা স্বাধীনতার জন্য প্রাণপাত করিয়াছিলেন। কিন্তু স্বাধীনতা বহুদিন হইতেই লুপ্ত। সেই কারণেই বোধ করি স্মৃতি-ছত্রীটি "জীর্ণ-শীর্ণ। ইহার পর সেটুকু থাকিবে না—বিধাতার এমনি বিড়ম্বনা।

এ সংখ্যায় গল্প আছে মাত্র তিনটি। প্রথম গল্প শ্রীমণীন্দ্রলাল বসুর "ইরা।" গল্পটি বড়। কিন্তু সরস ও ও আগাগোড়া সুখপাঠ্য। ভাষার গুণে বর্ণিত চিত্রগুলি চোখের সম্মুখে রূপ ধরিয়া ভাসিয়া উঠে। গল্পটির মাঝে একটী চমৎকার প্লটও আছে।

দ্বিতীয় গল্প শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্রের "অনামী।" আমাদের ভূতনাথের মতে ইহার জলীয় অংশ কিঞ্চিৎ অধিক। রস বা রঙ জমিয়াছে শেষের দিকে। তাহার কথাই ঠিক। ইহাতেও দু একখানি চিত্র আছে। কিন্তু সেগুলি নিতান্ত দরিদ্রের ঘরের। সকলের তাহা ভাল না লাগাই সম্ভব।

তৃতীয় গল্প শ্রীরবীন্দ্রনাথ মৈত্রের "মনস্কাম।" গল্পটীর মাঝে ছোট একটী প্লট আছে, সুন্দর; ভাষাও ঝর ঝরে। তবুও মনে হয়, যেন প্রাণহীন রচনা। সম্ভবতঃ লেখক তাঁহার মনের সমস্ত দরদ ঢালিয়া গল্পটি রচনা করেন নাই বলিয়া এরূপ হইয়া থাকিবে। আরও একটী কথা উপ-সংহারটি Tragic, কিন্তু একটু যেন satirical.

শ্রীকেদার নাথ চট্টোপাধ্যায়ের "পারস্য-ভ্রমণের" দ্বিতীয় কিস্তী উপভোগ্য। "কিন্তু এখানকার লোকদের আতিথ্যের ত্রুটি কিছুমাত্র হয় নি (হওয়াই অনুচিত), তাঁদের কর্ম্ম-কর্ত্তারা আমরা না-আসা পর্য্যন্ত উপবাসেই কাটিয়েছিলেন, রাত্রেও লেপকম্বল যা ছিল আমাদের দিয়ে অনেক আগুনের পাশে কোনোরকমে রাত কাটিয়েছিলেন! কবি এদের আদর অভ্যর্থনায় মহা খুশী হয়ে বললেন—"এই ত প্রাচ্যের প্রথা, এই অভ্যর্থনাতেই হৃদয়ের যোগ রয়েছে। আমি সম্পূর্ণ উপলব্ধি কর্‌ছি। প্রাচীন পারস্যের আত্মার এই প্রকাশ।" এক তরফা আত্মার প্রকাশে আমরা কিন্তু খুশী হইতে পারিলাম না। লেপ-কম্বলগুলি প্রত্যর্পণ করিয়া আগুনের পাশে রাত্রি যাপন করিলে, তাহারা খুশী হইত সন্দেহ নাই।

দুইখানি রঙিন ছবি এ সংখ্যার চিত্র-সম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছে। প্রথম ছবি শ্রীমণীন্দ্র ভূষণ গুপ্তের "হিমালয়ের চটি" বেশ লাগিয়াছে।

শ্রীদেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরীর "ঢেউ" সুন্দর!

° ° ° °

১৩৩৯ সনের শ্রাবণ মাসের বসুমতীতে একটী কবিতা পাঠ করা গেল "দিগ্বিজয়ী গান্ধী";— রচনা করিয়াছেন শ্রীপ্যারীমোহন সেন গুপ্ত! বসুমতীর সহসা এ কি অঘটন! এই দুর্দ্দিনে একেবারে গান্ধী প্রশস্তি! প্রথমে চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারি নাই; কিন্তু কবিতাটির নিম্নে নজর পড়ায় সত্য বলিয়াই বুঝা গেল। ভাল কথা। প্যারীদার চেষ্টায় যদি গতি ফিরে।

কবি কালিদাস পুরীধামস্থ জনৈক বাঙ্গালী বাসীন্দাকে এক সার্টিফিকেট দিয়াছেন—অবশ্য ভাবের সহিত। সার্টিফিকেটখানির নাম "প্রত্নশালায়"—আশা করা যাই-তেছে বাঙ্গালীবাবুরা ইহার পর হইতে পুরীতে বায়ু সেবনের জন্য গেলেই ভদ্রলোকটির প্রত্নশালাটী দেখিয়া আসিবেন। কবি কালিদাস বাড়িখানির অবস্থিতি সম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই, বি, এন, আরের গাইডেও খুঁজিলে তাহা পাওয়া যাইবে না। কিন্তু ভিক্টোরিয়া ক্লাবে খোঁজ করিলে সন্ধান মিলিতে পারে। স্বয়ং কবিও হয়ত এ বিষয়ে সাহায্য করিতে পারেন। ভাবের চাক্‌ড়ার কথা ছাড়িয়া দিতেছি, তাহার ছাটগুলিও আজকাল কেনা যায় না, এমনি দর!

আর একটী উল্লেখযোগ্য কবিতা আছে শ্রীনবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্যের "আমার বিয়ে"। পাঠক তো একই শ্রেণীর নাই; কবিতাটি সেই তাঁহাদের জন্য রচিত ও মুদ্রিত হইয়াছে। দুইটি কলি এখানে তুলিয়া দি—

"রাত পোহাতেই তার পরদিন বাড়ী ফেরার তাড়া
বর কনেকে কত্তে বিদায় পড়ে গেল সাড়া"—

মনে পড়িয়া গেল—

খোকন মণি খোকন মণি করছ তুমি কি?
এই দেখনা আমি কেমন ছবি এঁকেছি—।"

এই সংখ্যায় গল্প পাঠ করা গেল অনেক গুলি।

প্রথমেই শ্রীমতী পুষ্পলতা দেবীর "শিল্পীর সংসার।" প্রকাণ্ড ব্যাপার। সাধারণ গৃহস্থের ঘরে যাহা ঘটে, ইহা তাহা নয়, শিল্পী কেমন করিয়া সংসার করে তাহারই কাহিনী। সাংসারিক বুদ্ধিতে যাহা ভাল ও মন্দ, শিল্পীর চোখে তাহা মূল্যহীন, এমন কি, সেগুলি মর্ম্ম পীড়ার কারণ। গল্পটির মাঝে মাঝে ভাবের বুকনী বড়ই পীড়া-দায়ক। তাহা ছাড়া, গল্পটি প্রথম শ্রেণীর রচনা নয়; আবার তৃতীয় শ্রেণীর বলিয়া হতাদর করাও চলে না।

দ্বিতীয় গল্প শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়ের "মাণিক জোড়"— মজার, কলিকাতার পথে-ঘাটে কত এককড়ি চক্রবর্ত্তী ও তিনকড়ি ভাদুড়ী অহোরাত্র ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। পাড়ায় পাড়ায় খোঁজ করিলেও এমন মাণিক দুই একটী করিয়া নিশ্চয় মিলিবে। কিন্তু দুঃখ হয় এককড়ি চক্রবর্ত্তীর মেয়েটির জন্য। বেচারা খোঁড়া হইলেও পিতার গুন-গুলি তাহার চরিত্রে কোথাও পরিস্ফুট নয়, অথচ তাহার বিবাহ হইল তিনকড়ি ভাদুড়ীর কাণা ও "গোঙা" ভাইপোটির সহিত। অত্যন্ত করুণ!

তৃতীয় গল্প শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়ের "ব্যাঘ্রকবলে চা-কর।" একটা শিকার-কাহিনী। শিশু-সাহিত্যেই আজকাল এই ধরণের গল্পের চল দেখা যায়। বুকানন সাহেব লণ্ডনের কোন বিখ্যাত মাসিকে এই গল্পটি প্রকাশিত করিয়াছেন বলিয়াই কি মূল্যবান? আমরাও এমন গল্প জানি, যাহা কোন বিখ্যাত মাসিকে প্রকাশিত হয় নাই, অথচ ইহার চেয়েও লোমহর্ষক! সে বাঘ চিতা বা গুলবাঘা নয়; প্রকাণ্ড মানুষ-খাকী। এবং হাতিয়ারের মধ্যে কেবল একখানি বেত্রদণ্ড হস্তে করিয়া যিনি ইহার সহিত কিছুকাল ঘোর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন সেই বঙ্গদেশীয় মানুষটি অদ্যাপি জীবিত। আবার মাত্র দিন কয়েক পূর্ব্বে হাতিয়ার শূন্য হইয়া আর এক বাঙালী ভদ্রলোক একটি চিতাবাঘের দুইটি থাবা বজ্রমুষ্টিতে চাপিয়া ধরিয়া তাহাকে পিছনে ঠেলিতে ঠেলিতে নিজ বাড়ীর আঙিনায় আনিয়া স্বীয় শিশুপুত্রের পরম কৌতুক উৎপাদন করিয়াছিলেন, তাহাও জানি। গভীর দুঃখের বিষয় উপরোক্ত বীরদ্বয় কেহই অক্ষত ছিলেন না। প্রথমোক্ত ভদ্রলোকটির স্বাস্থ্য একেবারে ভগ্ন; দেখিলে মনে হয় এক শুষ্কপ্রায় মহীরুহ। দ্বিতীয় ভদ্রলোকটি অদ্যাপি চিকিৎসাধীন। মজা এই, ইহাদের কথা কেহ বলে না!

চতুর্থটিও গল্প—নাম "অনভ্যাসের ফোঁটা"—রচয়িতা শ্রীতারকনাথ সাধু (রায় বাহাদুর)। গল্পটির তাৎপর্য্য —যাহার যাহা কাজ, তাহা লইয়াই তাহার থাকা উচিত। অন্যথায় হিতে বিপরীত হইয়া থাকে। কথাটি খুবই সত্য। যাহাকে যাহা সাজে না, তাহার সেরূপ হইতে যাওয়া বিড়ম্বনা।

পঞ্চম গল্প শ্রীমতিলাল দাস (এম-এ ইঃ) "পত্নীব্রত"। বেশ লেখা অবশ্য propaganda ইহার চেয়েও ভাল হয়।

ষষ্ঠ গল্প শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্যের "অর্থহীনের বন্ধু"। মাণিকবাবুর গল্প বলিয়া খুবই আগ্রহের সহিত পাঠ সুরু করিয়াছিলাম। কিন্তু আমাদের পরম দুর্ভাগ্য, পূর্ব্বের সেই ভাব, ভঙ্গী ও রস ইহার মধ্যে পাইলাম না। সেগুলি যেন কোথায় হারাইয়া গিয়াছে।

এ সংখ্যায় রঙিন ছবি আছে তিনখানি। ছড়া ছাড়া ছবি নাই।

প্রথমেই দেখা যায়, শ্রীচারুচন্দ্র সেনগুপ্তের বিরহিণী—
"নয়নে বাদল—গগনে বাদল—জীবনে বাদল ছাইয়া
এস গো আমার বাদলের বঁধু—চাতকিনী আছে
চাহিয়া।"

এই কলি দুইটি পাশে লেখা আছে "রবীন্দ্রনাথ"। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথই ইহার রচয়িতা।

সাহিত্যের বাজারে চুরি চিরকালই আছে—আজকাল যেন তাহা মাত্রা ছাড়াইয়া যাইতেছে। দুঃখের কথা বলিব কি ? রবীন্দ্রনাথ অতুলপ্রসাদের গান চুরি করিতে-ছেন। আবার অতুলপ্রসাদও রবীন্দ্রনাথের গান চুরি করিয়া বেমালুম হজম করিতেছেন। লোকেও অতশত না জানিয়া সেগুলি গাহিতেছে, আলোচনা করিতেছে এবং বাহবা দিতেছে। কিন্তু বসুমতীর চোখে ধূলি নিক্ষেপ অতুলপ্রসাদের কর্ম্ম নয়। সহযোগিনী ফস্ করিয়া ধরিয়া ফেলিয়াছেন, যে, অতুলপ্রসাদের "কয়েকটি গানের" —"নিদ্ নাহি আঁখি পাতে" গানটি রবীন্দ্রনাথের রচনা। কেননা উহার মধ্যে পূর্ব্বোক্ত কলি দুটিকে পাওয়া যায়। যাহা হউক, আমরা আশা করি প্রসাদ কবি পরবর্ত্তী সংস্করণে তাঁহার এই দোষটি ঢাকিবার চেষ্টা করিবেন।

কি দুর্দ্দৈব ! রবীন্দ্র ভীতি এত প্রবল ? আর ছবি সম্বন্ধে সুমন্তব্য করিবার মত কিছু নাই।

দ্বিতীয় ছবি চঞ্চলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যঙ্গ চিত্র।

তৃতীয় ছবি শ্রীতারকনাথ দাসের আর এক বিরহিণী ইহারও তলদেশে কবিতার তিনটি কলি। কাহার রচনা

ছবিখানি খুব খারাপ লাগে নাই ; কিন্তু মনে হয় যে কাষ্ঠপুত্তলি।

যাব ফিরে

শ্রীকনকভূষণ মুখোপাধ্যায়

দিকে দিকে হেরি আজ সবুজের শান্ত শ্যামলিমা
মাঠের ভুবন ছেয়ে, পল্লী জোড়া মাঠের মহিমা
আজি মোর দোলা দেয় মন—

বর্ষার প্রশান্ত ধারে পূর্ণ যেথা শুষ্ক সরোবর
অনাদৃত খাল, বিল, যেথাকার শুষ্ক বালুচর
রসে ভিজা যেথা বেণুবন।

কাশ ও পলাশ যেথা পল্লীমার মহিমা বাড়ায়
ফুটিয়া মাঠের পাশে ; হাওয়া তারে মেদুল দোলায়
চুমে কভু মাঠ ভরা ধান—

কৃষক বিস্ময়ে ওই দোললীলা দেখে যায় মাঠে
কটীতে জড়ায়ে ধটী ; মেঠো ধান আঁটি করে আঁটে
কাটা ফসলের গাহি গান।

বলদ হাঁকায়ে চলে মাঠের রাখাল খুশী মনে
বাথান বিতানে থামে ; কভু ছুটে পলাশের বনে
হাসি যেন থামিবে না আর—

সে হাসি তৃণের পরে মুক্তঝরা শিশিরের মত
অম্লান কুসুম কম ; যে বিলায় গন্ধ অবিরত
বক্ষে রাখি মাধুরী পাথার।

ওই মাঠে-বালুচরে-কাশ-পলাশের পাছে পাছে,
পল্লীর শ্যামল কোলে যাব ফিরে কৃষকের কাছে
যাব ফিরে রাখালের সুরে—

শরৎ আসিল পুনঃ শ্যামরূপে ভুবনে ভুবনে
প্রিয়া মোর ভাবে বুঝি প্রিয়তম আসে ওইক্ষণে
যাব ফিরে রহিব না দূরে।

নারী ধর্ষণের যোগ্যশাস্তি

প্রাণদণ্ড দানের প্রস্তাব

মুস্লিম জজের অভিমত

গত শতাব্দীর নব্বইয়ের কোটার গোড়ার দিকে সৈয়দ আমীর আলী কলিকাতা হাইকোর্টের জজ ছিলেন। তাহার পর তিনি বিলাতে প্রিভি কৌন্সিলের জজ হন এবং তজ্জন্য "রাইট অনারেবেল" বলিয়া অভিহিত হইতেন। তিনি যখন এদেশে জজিয়তী করিতেন; তখন দলবদ্ধ ভাবে নারী ধর্ষণ এদেশে হইত না কেবল রাজসাহী জেলায় হইতেছিল। তাহার প্রতিকার-স্বরূপ তিনি নূতন আইন করিয়া এইরূপ অপরাধে প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করেন। অষ্ট্রেলিয়ার নজীর তিনি দেখান। গবর্ণমেণ্ট তাঁহার আবেদন মঞ্জুর না-করায় তিনি ও তাঁহার সহকর্ম্মী অন্য একজন জজ সুযোগ পাইলেই ধর্ষকদের যাবজ্জীবন দ্বীপচালান দণ্ড দিতেন। তাহাতে এইরূপ পাশবিক অপরাধ থামিয়া যায়।

নিজাম-রাজ্যের রাজধানী হায়দারাবাদ হইতে ইসলামিক কাল্চার (Islamic Culture) নামক যে পত্রিকা বাহির হয়, তাহার গত এপ্রিল সংখ্যায় সৈয়দ আমীর আলী মহোদয়ের আত্মচরিতের যে অংশ বাহির হইয়াছে তাহাতে ১৭৪ পৃষ্ঠায় এই সকল কথা তাঁহার নিজের ভাষায় বিবৃত হইয়াছে। আমরা তাহা নীচে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

(ইংরাজী হইতে বঙ্গানুবাদ)

"সে সময় একটা অপরাধ ভারতের সর্ব্বত্র না থাকিলেও উচ্ছৃঙ্খল রাজসাহী জেলায় উহা খুব প্রবল ছিল। গুণ্ডাগণ দল বাঁধিয়া সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে নারীধর্ষণ আরম্ভ করিয়াছিল। এই সমস্ত গুণ্ডারা সকলেই যে যুবক ছিল তাহা নহে। এই অপরাধ কঠোর হস্তে দমন করা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল। যে সমস্ত দায়রা জজের নিকট এই সমস্ত মামলা হইতে তাঁহারা ৪ হইতে ১০ বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড দিতেন, কিন্তু তাহাতে ফল বিশেষ হইত না। গুণ্ডাদল নিরীহ কৃষকদের বাড়ীতে হানা দিয়া তাহাদের বিবাহিতা ও কুমারী মেয়েদিগকে বলপূর্ব্বক অপহরণ করিয়া লইয়া যাইত এবং তাহাদের উপর পাশবিক অত্যাচার করতঃ হতভাগিনীদিগকে অর্দ্ধ-মৃতাবস্থায় বাড়ীর দরজায় ফেলিয়া যাইত।

এই সমস্ত অপরাধে প্রাণদণ্ডের বিধান করিয়া একটী সংক্ষিপ্ত আইন করার জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিলাম। ঐরূপ আইন দ্বারা মেলেবোর্ণে লারিকিন্সদের উপদ্রব সম্পূর্ণ বন্ধ করা হইয়াছিল। কিন্তু ভারত সরকার অষ্ট্রেলিয়ানদের মত সাহস দেখাইতে পারিলেন না, আমার আবেদন অগ্রাহ্য হইল। তখন আমি ও আমার সহযোগী এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিলাম। দণ্ডাদেশে পরীক্ষার জন্য কলিকাতা হাইকোর্টের ফৌজদারী আদালতে আসিত এবং প্রায়ই সরকার পক্ষ হইতে লিগ্যাল রিমেমব্রেন্সার মহাশয় দণ্ড বৃদ্ধির প্রার্থনা করিতেন। দণ্ডের পরিমাণ কেন বৃদ্ধি পাইবে না তাহার কারণ দেখাইবার জন্য আমরা আসামীদের প্রতি নোটীশ দিতাম। তাহারা প্রায় সব-সময়েই কৌসলী বা উকীল দ্বারা কারণ দেখাইত। ধীর ভাবে আসামী পক্ষের সমস্ত কথা শুনিয়া আমরা যদি দণ্ডাদেশে বহাল রাখিতাম তাহা হইলে আন্দামানে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডের আদেশ দিতাম। কয়েক মাসের মধ্যেই আমরা শুনিলাম যে, এই পাশবিকতা বন্ধ হইয়াছে।

অনেক স্থলে ধর্ষণ দ্বারা নারীর যে অবস্থা ঘটে তাহা প্রাণনাশ অপেক্ষা ভয়াবহ। সুতরাং সৈয়দ আমীর আলি মহাশয় দলবদ্ধ অত্যাচারীদের যে প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা চাহিয়াছিলেন, তাহা অতি মাত্রায় কঠোর নহে। কিন্তু আমরা সাধারণতঃ প্রাণদণ্ডের পক্ষপাতি নহি বলিয়া মনে করি, যে, এই সকল দুরাত্মার যাবজ্জীবন স্বাধীনতা-লোপ এবং ভ্যাসেক্টোমি দণ্ড হওয়া উচিত। সৈয়দ আমির আলির কথাগুলি গবর্ণমেণ্টের এবং বিচারকদের প্রণিধান-যোগ্য; কারণ, বঙ্গে নারীনিগ্রহ অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার কোন মুসলমান সদস্য সধর্ম্মী সৈয়দ মহাশয়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া নারীনিগ্রাহক দুরাত্মাদের যাবজ্জীবন কারাবাসের আইন প্রণয়নের চেষ্টা করিলে ভাল হয়।—প্রবাসী

পরলোকে জর্জ্জ কিং

বিগত ২রা জুলাই বিখ্যাত বীমাবিদ্ মিঃ জর্জ্জ কিং এফ-আই-এ, এফ-এফ-এ, এফ-এ-এস মহোদয় ৮৬ বৎসর বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে বীমা-জগতের একটী উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক খসিয়া পড়িল।

বীমার জটীল একচুয়ারী শাস্ত্রে মিঃ কিং অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, এবং তাঁহারি লিখিত পুস্তকাবলী বিভিন্ন ভাষায় অনুদিত হইয়া জ্ঞান লিপ্সু ছাত্রগণকে দুস্তর বীমা-সমুদ্র অতিক্রম করিবার যথার্থ পাথেয় প্রদান করিয়াছে।

১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে ২২শে জুলাই আইরলায়রে মিঃ কিং জন্মগ্রহণ করেন; তাঁহার পিতা লর্ড কেলভিনের ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন এবং তাঁহার এক ভ্রাতুষ্পুত্রী প্রধান মন্ত্রী মিঃ ম্যাকডোনাল্ডের সহধর্ম্মিণী ছিলেন।

মিঃ কিং লণ্ডন সহরে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন এবং প্রথমে তিনি এলায়ান্স হেড অফিসে একচুয়ারী-সহকর্ম্মীরূপে কার্য্য আরম্ভ করেন। কিছুকালের জন্য 'গ্লাসগো এবং লণ্ডন' অগ্নি বীমা সঙ্ঘে সম্পাদকের কার্য্য করেন। ১৮৮৫ হইতে ১৮৯৬ পর্য্যন্ত 'আটলাসে' একচুয়ারী ও সম্পাদকের কার্য্য করেন। অতঃপর এই পদ পরিত্যাগ করিয়া তিনি "লণ্ডন এসিওরেন্সে" একচুয়ারী পদ গ্রহণ করেন ও সাধারণভাবেও একচুয়ারীর কার্য্য আরম্ভ করেন। এই দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যগুলি সম্পাদনে মিঃ কিং অনন্যসাধারণ সফলতা লাভ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার ফল ও কর্ম্মনিষ্ঠার কাহিনী পৃথিবীর সর্ব্বত্রই প্রচারিত হইয়াছিল।

মিঃ কিং Institute of Actuaries এর ফেলো ছিলেন এবং আমেরিকার একচুরিয়াল সোসাইটীর অন্যতম সভ্য ছিলেন। কর্ম্মক্ষমতা, অমায়িক স্বভাব এবং প্রগাঢ় জ্ঞানের জন্য—একচুয়ারী মহলে এই স্নেহপরায়ণ ব্যক্তি অসাধারণ শ্রদ্ধা ও সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে Institute কর্ত্তৃক তিনি একটী স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হয়েন; তাহাতে এই কয়েকটি কথা লেখা ছিল—

"Presented to George King F.I.A., F.F.A., F.A.S. in recognition of long and distinguished service rendered to the Institute of Actuaries and to actuarial service. June 1927

Instituteর সহিত মিঃ কিংর সম্পর্ক ১৮৭০ খৃষ্টাব্দ হইতে—ঐ সময়ে তিনি প্রথম ভাগ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েন এবং পর বৎসরে দ্বিতীয় ভাগ ও ১৮৭৪এ পরীক্ষা দিয়া ফেলো নির্ব্বাচিত হয়েন। দ্বিতীয় বিভাগে কিয়ৎকালের জন্য শিক্ষকতা করিয়া ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে তিনি councilএ মনোনীত হয়েন এবং ১৯১৬ পর্য্যন্ত ঐ স্থানে কার্য্য করেন—পরে যথাক্রমে সম্পাদক ও সহঃ সভাপতিরও কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। Instituteএর পত্রিকা সম্পাদন

ও পরীক্ষকের কার্য্যে তাঁহার কর্ম্মক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়।

পরলোকগত ডাঃ টি, বি, স্প্রেগের জীবনীসম্বন্ধে তিনি যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাঁহার নিজের জীবন সম্বন্ধেও তাহা সমভাবে প্রযুজ্য—

"তাঁহার সহিত একবার সখ্যতা-সূত্রে আবদ্ধ হইতে পারিলে চিরজীবনেও আর তাহা ছিন্ন হইত না। চিন্তায় কর্ম্মে এবং ভাবে তিনি সর্ব্বথা অমায়িক ছিলেন—তাঁহার পারিবারিক জীবন সম্বন্ধেও একথা সত্য। বহু বৎসর ধরিয়া তিনি মুক্ত হস্তে বিত্ত দ্বারা উপযুক্ত পাত্রের সাহায্য দান করিয়া আসিয়াছেন। অধুনা যাঁহারা সৌভাগ্যের উচ্চ শীর্ষে আরোহণ করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকেরই অর্থসঙ্কটের দিনে তাঁহার সাহায্য ব্যতীত পরবর্ত্তী জীবনে সার্থকতা লাভ করিবার সুযোগ হইত না।"

—

বিচিত্রা

কলিকাতায় ইংরাজীতে চারিখানি মাসিক বীমা-পত্রিকা পরিচালিত হইতেছে—ইহাদের অধিকাংশেরই পৃষ্ঠপোষকতার জন্য উপযুক্ত ব্যক্তি, দল বা বীমা কোম্পানিরও অভাব দেখিতে পাই না সুতরাং ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সাপ্তাহিকে রূপান্তরিত হইতে পারিলে বীমা-বিষয়ে অনভিজ্ঞ জন-সাধারণের প্রতি প্রকৃত মমতাবোধ দেখান হইবে এবং বীমা-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণও কলিকাতার রহস্যময় পরিবর্ত্তনশীল বীমা কার্য্যালয়ের ইতিহাস পাঠ করিবার জন্য দীর্ঘ একমাস প্রতীক্ষায় থাকিবেন না। আমরা আশা করি পত্রিকার বিচক্ষণ কর্ত্তৃপক্ষগণ আমাদের এ প্রস্তাব বিবেচনা করিবেন।

০ ০ ০

ভারতবর্ষীয় কোনও ইংরাজী বীমা মাসিক পত্রিকা সম্বন্ধে কোনও বিলাতী পত্রিকা আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন যে উহা বিলাত অঞ্চলে মুদ্রিত হইলেও ক্ষতি ছিল না। ইহার কারণ এই যে ঐ পত্রিকা বিলাত অঞ্চলের পত্রিকাদি হইতে প্রবন্ধাদি উদ্ধৃত করিয়াই শুধু নিজের দৈন্যতা বজায় রাখিতেছেন—বীমার সাময়িক প্রসঙ্গ ও তৎসক্রান্ত কার্য্যালয়ের উপর সম্পাদকীয় রচনা ঐ পত্রিকায় কোনদিনই স্থান লাভ করিতে পারে না—মাঝে মাঝে বীমার সংবাদগুলি অতিশয় সংগোপনে আড়ষ্টভাব লইয়া লোকলোচনের সম্মুখে প্রকাশিত হইয়া থাকে। দেশীয় পত্রিকার উপর বিলাতী পত্রিকার এই কটাক্ষপাতে আমরা দুঃখিত হইলেও উহার সত্যতা সম্বন্ধে আমরা নিশ্চিত আছি অন্য উহার অক্ষম সম্পাদককে এই কথাই বলিতে চাহিতেছি—তোমার আর প্রয়োজন নাই—নূতন বেশে, সুশিক্ষিত ভাবে নবানুরাগ লইয়া যাহারা আসিয়াছে তাহারা তোমার মুখে চুণ কালী মাখাইয়া বিলাতী পত্রিকাগুলিকে তীব্র কষাঘাত করিয়াছে, অনাদর উপেক্ষায় জীবন ধারণ করিয়া আর কি করিবে? যন্ত্রচালিত সভ্যতার যুগের নিয়ম হইতেছে—weak and undeserving have to make room for advantageous and gifted!

০ ০ ০ ০

কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধের অবসানে অমিত পরাক্রমশালী ধনঞ্জয় গাণ্ডীব উত্তোলন করিতে যাইয়া ব্যর্থ মনোরথ হইয়াছিলেন—শৌর্য্যবীর্য্যের প্রতীক্ মহাবীর নিজের এই আশ্চর্য্যজনক অক্ষমতায় অধোবদন হইলে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—"নিমিত্ত মাত্র ভব সব্যসাচী।" বাংলার বীমা-জগতেও এইরূপ একটি ঘটনা অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে—প্রতিষ্ঠানের স্থাপয়িতা ও প্রবর্ত্তক নিজেই বিতাড়িত হইয়াছেন—গৌরবের মুখোস খসিয়া কণ্টকিত ক্লেদ বাহির হইয়া পড়িয়াছে। এই রহস্যময় কাহিনী—বাংলার বীমা-জগতের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট কয়েক ব্যক্তি জানেন। সময় সুযোগ ও প্রয়োজন হইলে আমরা ইহা প্রকাশ করিব।

০ ০ ০ ০

উপাস্যকে ভক্তি অর্ঘ্য নিবেদন করা সরসতার পরিচায়ক—প্রাণের অনুরাগচন্দনে-চর্চ্চিত এই নিবেদনগুলি ভাবপ্রবণ বাঙালী হৃদয়কে মাধুর্য্য-মণ্ডিত করিয়া দিয়াছে। সাহিত্যিক-মহলে জয়ন্তীর ধুম পড়িয়া গিয়াছে—প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহোদয় পরিণত বাসে শ্রদ্ধাপুষ্পাঞ্জলি অর্জ্জন করিয়াছেন, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র ও কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের জন্যও আসন্ন বন্দনার গীতি আয়োজন চলিতেছে। বাংলার বীমা-কর্ম্মীগণ বাংলার শ্রেষ্ঠ বীমা-গৌরবের আধার সুরেন্দ্রনাথ, অবিনাশ চন্দ্র, নলিনীরঞ্জন ও পূর্ণচন্দ্র প্রভৃতিকে অভিনন্দন প্রদানের আয়োজনে ঢাক ঢোল লইয়া বাহির হইয়া পড়ুন।

—

প্রধান মন্ত্রীর সাম্প্রদায়িক মীমাংসা—

প্রধান মন্ত্রীর সাম্প্রদায়িক হুকুম নামা (Communal award) বাহির হইয়াছে। আমরা ইতিপূর্ব্বে যে ইস্তাহার বাহির হইবে বলিয়া সন্দেহ করিয়াছিলাম, বর্ত্তমান ইস্তাহার অনেকটাই তাহার অনুরূপ। বাংলায় এ ব্যবস্থার ফলে আইন পরিষদের আকৃতির কিরূপ পরিবর্ত্তন হইবে, তাহারই আলোচনা আমরা নিম্ন করিতেছি।

হুকুমনামা অনুযায়ী সদস্যগণের সংখ্যা।

মুসলমান (৪৮'৪)	১১৯
হিন্দু (৩৯'২)	৮০
দেশী খৃষ্টান	২
অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান	৪
ইউরোপীয়	১১
কমার্স	১৯
জমিদার	৫
বিশ্ববিদ্যালয়	২
লেবর	৮
	২৫০

প্রধান মন্ত্রী বলিয়াছেন যে, যেহেতু আমরা আপনাদের মধ্যে কোন প্রকার আপোষ করিতে পারিলাম না এই জন্য তাঁহার সিদ্ধান্তই বলবৎ থাকিবে যদি না আমরা আমাদের মধ্যে একটা বুঝাপড়া করিয়া তাঁহার কাছে উপস্থিত হইতে পারি। পূর্ব্বোক্ত তালিকাটীর প্রতি দৃষ্টি রাখিলে আমরা স্পষ্টই দেখিতে পাই যে, এক হিন্দু ব্যতীত অপরাপর সকলেই এই সিদ্ধান্তে লাভবান হইয়াছেন। বাংলায় নূতন সেন্‌সাস্ অনুযায়ী হিন্দু মুসলমান উভয় জাতির জনসংখ্যার শতকরা হার ৪৬—৫৪। এই অনুপাতে হিসাব করিতে গেলে হিন্দু মুসলমানের যে সদস্য সংখ্যা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে ইহাতে মুসলমান সদস্য সংখ্যা কিছু বেশী আছেই। জনসংখ্যাকেই যদি সদস্য নির্ণয় করিবার মূল তন্ত্র নির্ণয় করা হইয়া থাকে তাহা হইলে ইউরোপীয়গণ এত অধিক সংখ্যক সভ্য পাইবার অধিকারী কি করিয়া হন? অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানগণ ইউরোপীয়গণ অপেক্ষা সংখ্যায় অধিক হইয়াও এত কম সদস্য সংখ্যা পাইলেন কেন? তাহা হইলেই বলিতে হইবে যে এক হিন্দু জাতি ব্যতীত, অন্যান্য জাতি সমূহ অল্পবিস্তর তাহাদের দাবীর অধিক লাভবান হইয়াছেন, সুতরাং আপোষের কথা এক্ষেত্রে কি ভাবে উঠিবে? কাজেই নতশিরে আমাদিগকে এ বিধান মানিয়া লইতেই হইবে।

প্রধান মন্ত্রীর ঘোষণা বাহির হইলে চতুর্দ্দিকে চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। মুসলমানগণ বলিয়াছিলেন যে তাঁহারা যাহা চাহিয়াছেন তাহার অনেক কম পাইয়াছেন। প্রথমে কথা উঠিয়াছিল যে তাঁহারা এই সিদ্ধান্ত মানিয়া লইতে প্রস্তুত নহেন, সুতরাং হিন্দুদের ন্যায় তাঁহারাও ঘোর

আন্দোলন চালাইবেন। তাহার পর এখন তাঁহারা বলিতেছেন যে, উক্ত ঘোষণা তাঁহাদের মনোমত না হইলেও উহাকে কার্য্যকরী করিতে চেষ্টা করিবেন। জন-সংখ্যা অনুপাতে অত্যধিক সদস্য সংখ্যা লাভ করিয়াও ইউরোপীয় এসোসিয়েসনের কেহ কেহ এখনও বলিতেছেন যে শাসন সংস্কার অপেক্ষা ১৯১৯ সালের ব্যবস্থাই দেশের পক্ষে মঙ্গলজনক। Depressed class বা পতিতজাতি-গণ পৃথক নির্ব্বাচন না প্রার্থনা করিলেও তাহাদিগকে তাহা প্রদান করা হইতেছে। রমণীগণ সদস্যপদ প্রার্থী হইলেও তাঁহারা বলিতেছেন পৃথক নির্ব্বাচন প্রণালী তাঁহারা কখনই ইচ্ছা করেন নাই, এই নূতন শাসন সংস্কারে তাহার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। দেশীয় খৃষ্টানগণও এই আপত্তির কথা বলিতেছেন, সুতরাং স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন প্রথার ব্যবস্থা করিয়া শতধা বিভক্ত জাতির মধ্যে নূতন ব্যবধান সৃজন করা হইল বলিয়াই যদি কেহ কেহ সন্দেহ করে, তাহার উত্তরে সরকার পক্ষের কি বলিবার আছে? স্যর তেজ বাহাদুর সপ্রু বলিয়াছেন যে সর্ব্বদিক খতাইয়া দেখিতে গেলে ঘোষণা যাহা বাহির হইয়াছে তাহা অন্য-রূপ হইবার উপায় ছিল না। স্যর আলি ইমামও অনেকটা সেই ধরণের অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন! সুতরাং সরকার পক্ষ যে ভয় পাইয়াছিলেন যে মধ্য পন্থী-গণ হয় ত নব-প্রবর্ত্তিত শাসন-সংস্কারে যোগদান করিবেন না, এরূপ আশঙ্কা করিবার কোন কারণই এখন পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। সুতরাং এই ঘোষণা অনুযায়ী শাসন-সংস্কার প্রতিষ্ঠিত হইলে উক্ত বিধান অনুযায়ী কার্য্য করিবার লোকাভাব কখনই হইবে না।

বাংলার হিন্দুগণ বলিতেছেন যে এই ঘোষণা অনুযায়ী শাসন সংস্কার প্রবর্ত্তিত হইলে তাঁহারা নব-প্রবর্ত্তিত শাসন-সংস্কার হইতে সরিয়া দাঁড়াইবেন। আমাদের মনে হয় ইহাও একটা কথার কথা মাত্র। হিন্দুজাতি শতধা বিভক্ত, একযোগে কাজ করিবার ক্ষমতা কোন কালেই তাঁহাদের ছিল না, ভবিষ্যতে যে এই ক্ষমতা অর্জ্জন করিতে পারিবেন এইরূপ আশা করিবার কোন লক্ষণই আজ অবধি দেখা যাইতেছে না। সুতরাং এই হুমকিকে ভয় করিবার কোন কারণ নাই। তবে যদি তেমন কিছু হয় তবে হিন্দুর সঙ্ঘবদ্ধ হইবার ক্ষমতা আছে ইহাও লোকে বুঝিবে।

সমস্ত দিক খতাইয়া দেখিলে ভয় করিবার একটা দিক বাস্তবিক আছে। নব-প্রবর্ত্তিত শাসন-সংস্কারে বাংলার সদস্য সংখ্যা হইবে ২৫০ জন। এই ২৫০ জনকে যদি বিবিধ স্বার্থের গণ্ডির মধ্যে ফেলা যায়, তবে তাহাদের আকার নিম্নরূপ ধারণ করে।

হিন্দু	মুসলমান	ইউরোপীয়
রমণী ও পতিত জাতি লইয়া—৮০	রমণী লইয়া—১১৯	সাধারণ—১১
জমিদার— ৪	জমিদার— ১	ব্যবসা দরুণ ১৯
লেবর— ৪	লেবর— ৪	——
বিশ্ববিদ্যালয়— ১	বিশ্ববিদ্যালয়— ১	৩০
——	——	
৮৯	১২৫	

অন্যান্য সম্প্রদায়

দেশী খৃষ্টান—	২
অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান—	৪
	——
	৬

তালিকাটীতে আমরা এইরূপ হিসাব করিয়াছি। সমগ্র বঙ্গদেশে ৫ জন জমিদার সদস্য প্রদান করিবার কথা হইয়াছে। এই জমিদারদের মধ্যে চারিজন হিন্দু সদস্য ও একজন মুসলমান সদস্য হইবেন ধরা হইয়াছে। লেবর দিগকে ৮জন সদস্য প্রেরণ করিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে। এই আটজনের মধ্যে চারিজন হিন্দু ও চারিজন মুসলমান ধরা হইয়াছে। ঢাকা ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এক একজন করিয়া সদস্য প্রেরণ করিবার কথা আছে। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সদস্য হিন্দু ও ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সদস্য মুসলমান হইবেন এইরূপ হিসাব করিয়া একজন হিন্দু ও একজন মুসলমান ধরা হইল। এইরূপ সদস্য সংখ্যার হার একত্র যোগদান করিলে, মোট হিন্দু সংখ্যা ৮৯ জন ও মোট মুসলমান সদস্য সংখ্যা ১২৫ জন হয়। সুতরাং মুসলমানগণ ইচ্ছা করিলে সকল বিষয়ে তাঁহাদের জেদ

বজায় রাখিতে পারিবেন। বহু শাখা ও প্রশাখা বিভক্ত হিন্দুগণ, ইংরাজ ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের সহিত মিলিত হইয়াও মুসলমানগণকে কখনই ভোট যুদ্ধে পরাস্ত করিতে পারিবেন না। একযোগে সম্মিলিত হইতে মুসলমানগণ অনেক সময়েই পারিবেন, কিন্তু বিভিন্ন হিন্দু সম্প্রদায় অন্যান্য সম্প্রদায়ের সহিত একজোট বাঁধিতে কখন পারিবেন কিনা বেশ সন্দেহ আছে। ইংরাজ রাজনৈতিকগণই বরাবর বলিয়া আসিতেছিলেন যে ভারতীয় রাজনীতিক্ষেত্রে একটী নিরপেক্ষ দল থাকা বিশেষ প্রয়োজন। এখন আমরা এ কথা অবশ্যই জিজ্ঞাসা করিতে পারি যে এই নূতন ব্যবস্থায় এই নিরপেক্ষ দল বাংলার রাজনীতি ক্ষেত্রে থাকিবে কি, কর্ত্তৃপক্ষ সে কথা একবার ভাবিয়া দেখিয়াছেন ত? নিতান্ত অভিমানভরে হিন্দুগণকে দুর্ব্বল করিয়া দিব বলিয়াই তাঁহাদের যদি ভীষ্মের পণ হইয়া থাকে, তবে এ কথাও ত ভাবিয়া দেখা প্রয়োজন ইহাতে তাঁহাদের স্বার্থের হানি হইবে না ত? উদাহরণ স্বরূপ যদি বলা যায় যে নূতন ব্যবস্থাপক সভায় বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনটীর সংস্কার করিবার কতকগুলি নূতন বিধি প্রণয়ণ করিবার অজুহাতে বাংলার হিন্দু জমিদার ও ইংরাজ প্লানটারগণের যদি ভীষণ স্বার্থহানি করিবার প্রস্তাব আনয়ন করা হয়, তখন ইংরাজ সরকারকে ত আবার অর্ডিনান্সেরই সাহায্য লইতে হইবে। মুসলমান সদস্যগণকে আবার অসন্তুষ্ট করিতে হইবে। এখন না হয় মুসলমানগণ বলিতেছেন জনসংখ্যার অনুপাতে সরকারী চাকুরীগুলি তাঁহাদিগকে স্বতন্ত্রভাবে ভাগ বাটোয়ারা করিয়া দিলেই তাঁহারা সন্তুষ্ট হইবেন। ক্ষমতা পাইয়া যদি তাঁহারা বলেন যে তাবৎ সরকারী চাকুরীগুলিতে যতদিন পর্য্যন্ত না নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক মুসলমান দ্বারা ভর্ত্তি করা হইতেছে ততদিন পর্য্যন্ত আর কোন সম্প্রদায়কেই চাকুরী প্রদান করা হইবে না, এই বাহ্যতঃ ন্যায় সঙ্গত প্রস্তাব তাঁহারা কোন অজুহাতে আটকাইয়া রাখিবেন? ভবিষ্যত ভাবিয়াই কাজ করা উচিত বলিয়া আমরা এই সমস্ত কথা বলিলাম। কর্ত্তৃপক্ষ যদি ইহার উত্তরে বলেন যে, বাংলা আমরা মুসলমান জাতির হস্ত হইতে গ্রহণ করিয়াছিলাম, বাংলা এখন তাঁহাদেরই হস্তে ফিরাইয়া দিয়া আমরা বানপ্রস্থ অবলম্বন করিব বলিয়া মনস্থ করিয়াছি। তাহারও উত্তরে আমরা এই কথাই বলিব তাহা হইলে হিন্দু সদস্য সংখ্যা আর কিছু কমাইয়া দিয়া, মুসলমান সদস্য সংখ্যা আরও কিছু বাড়াইয়া দেওয়া উচিত। মোট হিন্দু সংখ্যা ৮৪ ও মোট মুসলমান সংখ্যা ১৩০ করিলেই এই উদ্দেশ্য বেশী সফল হইবে। বর্ত্তমান বন্দোবস্তে একটু যেন দ্বিধা আছে। এই ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইলে আমরা তখন বেশই বুঝিতে পারিব যে মুসলমানদের সহিত আপোষ করিতে না পারিলে আমাদের মঙ্গল নাই। একটী সম্প্রদায়ের সহিত আপোষ করিবার কথা চালান যাইতে পারে, কতকগুলি সম্প্রদায়ের সহিত সখ্য স্থাপন করিয়া তালে পা ফেলিয়া চলা কি একেবারেই অসম্ভব নয়?

মিউনিসিপ্যাল বিল :—

বঙ্গীয় মিউনিসিপাল বিলটী বর্ত্তমানে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় বিবেচনাধীন হইয়া রহিয়াছে। নিত্য উহার আলোচনা চলিয়াছে। কেহ কেহ বলিতেছেন যে এই বিলটী আইন আকারে পরিবর্ত্তিত হইলে বাংলায় স্বায়ত্ত শাসনের গঙ্গাযাত্রালাভ ঘটিবে। মান্যবর মন্ত্রী মহাশয় কিন্তু বরাবরই বলিতেছেন যে তিনি স্যর সুরেন্দ্রনাথেরই পদাঙ্কানুসরণ করিয়াছেন মাত্র। এই বিলটী কার্য্যকরী হইলে বাংলার মিউনিসিপালিটিগুলি অনেক নূতন অধিকার লাভ করিবে। আপনার পক্ষ সমর্থন করিবার জন্য তিনি কলিকাতা কর্পোরেশনের গেজেটে একটী মন্তব্যও পাঠাইয়াছিলেন। উহা পাঠ করিয়া হাওড়ার নেতা যোগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলি মহাশয় তাঁহাকে অনেকগুলি কড়াকড়া কথা শুনাইয়া দিয়াছেন। বিলটীতে নাকি বলা হইয়াছে, মিউনিসিপাল সম্পত্তির মূল্য নির্দ্ধারণ করিবার জন্য যে সমস্ত 'এসেসর' নিযুক্ত করা হইবে তাহাদের নামের একটী [illegible] সরকার পক্ষ হইতে প্রকাশ করা হইবে। এই [illegible] যে সমস্ত ব্যক্তির নাম থাকিবে, তাহাদের [illegible] মিউনিসিপালিটি নিযুক্ত করিতে [illegible]

কাহাকেও পারিবেন না। গাঙ্গুলি মহাশয় বলিয়াছেন এইরূপ করিলে কি মিউনিসিপালিটিগুলির স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হয় না। উত্তরে আমরা এই কথা বলিতে পারি নাকি যে উদ্দাম স্বাধীনতা সব সময়েই লোভনীয় নহে। তাহাই যদি হইত তাহা হইলে রাষ্ট্র স্থাপনের কোন হেতুই ত থাকিত না। বন্ধন দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেই কি স্বদেশ প্রীতি হয়? বন্ধনের উদ্দেশ্য ও স্বরূপটা দেখিয়া উহার বিচার করিতে হয়। এসেসরের যে লিষ্ট থাকিবে তাহাতে অনেকরই নাম থাকিবে। তাহাদের একজনকে নিযুক্ত করিলে মিউনিসিপালিটি সমূহের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ কোথায় হইল। একথা কি সত্য নহে যে বর্ত্তমানে মফঃস্বলে অনেক মিউনিসিপালিটি তাহাদের কর্ম্মচারিগণের মধ্য হইতে একজনকে এসেসর নিযুক্ত করিয়া, অনেক সময়ে এই কর্ম্মচারীকে বিপদগ্রস্ত করিয়া থাকেন? এ কথা কি সত্য নহে মফঃস্বল মিউনিসিপালিটীতে ন্যায় ও ধর্ম্মের নামে যেরূপ এসেস্ হওয়া উচিত তাহা প্রায়ই হয় না। সুতরাং নিরপেক্ষ এসেসর নিযুক্ত করিতে আপত্তি হইবে কেন? আমরা বিলটীর পক্ষপাতী নহে। বিলটীর আদ্যপান্ত আমরা পাঠ করিয়াছি। উহার অধিকাংশস্থলে জনসাধারণের ক্ষমতার হ্রাস করা হইয়াছে, সেইগুলি লোকসমাজে প্রচার করিয়া সমালোচনা করাইত যুক্তিসঙ্গত।

অটোয়া-ব্যবস্থা :—

অটোয়া কনফারেন্সের মালসাভোগ শেষ হইয়াছে। রয়টার খবর দিতেছেন যে সরকার কর্ত্তৃক মনোনীত ভারতীয় সদস্যগণ ভূরি ভোজনে আপ্যায়িত হইয়া বিলাতে ফিরিতেছেন। বিলাতে তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য যথেষ্ট আয়োজন চলিতেছে। আমরাও বলি তোমরা ধন্য হও, তোমাদিগকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। কিন্তু রয়টার ইহাও বলিয়াছেন যে, যে নতুন ব্যবস্থা করা হইল তাহাতে ভারতবর্ষের বিশেষ উপকার হইবে। নূতন ব্যবস্থাটি এই,—ভারতবর্ষজাত কৃষি দ্রব্যসমূহ ইংরাজের স্বদেশে বিনাশুল্কে—বা আপেক্ষিক অল্প শুল্কে গৃহীত হইবে। ভারত-জাত [illegible] ইংরাজদের উপনিবেশ সমূহে সাধারণ ক্ষেত্রে যে শুল্ক লওয়া হইবে তাহা অপেক্ষা অল্প শুল্ক লইয়া প্রবেশ করিতে দেওয়া হইবে। এই অনুগ্রহের পরিবর্ত্তে ভারতে ইংলণ্ডের শিল্প দ্রব্যগুলিকে অনেক প্রকার সুবিধা দিতে হইবে। ভারতীয় ধনকুবের বিরলা বলিয়াছেন যে এই ব্যবস্থা কখনই ভারতীয়গণের মনোমত হইতে পারে না, কেন না যে সমস্ত সদস্যগণ এই প্রস্তাবে সহি করিয়া আসিলেন তাঁহারা ভারতের জনসাধারণের নির্ব্বাচিত সদস্য নহেন। এই প্রস্তাবটী কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত হইলে, উহা দ্বারা যদি ওউহা গৃহীত হয়, তাহা হইলেও বুঝিতে হইবে জনসাধারণ উক্ত প্রস্তাবগুলি গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহেন, কেন না বর্ত্তমান কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় জনসাধারণের প্রতিনিধি খুবই বিরল। বোম্বায়ের বিখ্যাত অর্থবিৎ পণ্ডিত ও ধনী স্যার পুরুষোত্তম দাস বলেন, এই ব্যবস্থায় ভারতবর্ষই বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইবে, কেননা ভারত ইংলণ্ডে যে টাকার দ্রব্য রপ্তানি করিয়া থাকে, তথা হইতে আমদানীর হার উহার এক চতুর্থাংশ মাত্র। সুতরাং এই প্রকার আদান-প্রদানে ভারতের ক্ষতি অধিক। বাংলার বিখ্যাত অর্থনীতিক ও বেঙ্গল নেশানাল চেম্বারের সভাপতি শ্রীযুত নলিনীরঞ্জন বলেন যে এইরূপ ব্যবস্থা করিতে গেলে ইংলণ্ড ব্যতীত অপরাপর যে সমস্ত দেশ ভারতের কাঁচা মাল গ্রহণ করে তাহারা আমাদের উপর বিরক্ত হইয়া উঠিবে সুতরাং আমাদের কাঁচা মালের বাজার কমিয়া যাইবে। ইংরাজ ভারতের কাঁচামালের এক চতুর্থাংশ মাত্রই গ্রহণ করিয়া থাকেন। নেতাগণের কথাগুলি মনোযোগ সহকারে পাঠ করিলেই এই উপলব্ধি হয় যে, বামন দৈত্যের সহিত বন্ধুত্ব করিতে গিয়া যেমন সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, এই নূতন ব্যবস্থায় ভারতের সেইরূপ ঘটিবে না ত?

বাংলায় সৈন্য আনয়ন :—

সম্প্রতি শুনা যাইতেছে বাংলায় কয়েক দল সৈন্য আনয়ন করিয়া যেখানে বিপ্লবীদের অধিক প্রাদুর্ভাব সেই সেই স্থলে ঘাঁটি করিয়া তাহাদিগকে স্থাপন করা হইবে। ইহার উত্তরে ষ্টেটস্‌ম্যান কাগজের ভারতীয় লেখক ঠিকই বলিয়াছেন যে এরূপ করিলেই কি বিপ্লবীদের (terrorist)

দের সংখ্যা কমান যাইতে পারিবে। বর্ত্তমানে যে কয়েকটী দুর্ঘটনা ঘটিল, তাহাতে স্পষ্টই দেখা গেল যে এই গুপ্ত ঘাতকগণ আপনাদের প্রাণ লইয়া খেলা করে। প্রাণনাশক সাংঘাতিক বিষ রিভলভারের সহিত তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে বিচরণ করে। সৈন্যের দল আনয়ন করিয়া তাহাদিগকে ভয় দেখাইবার যদি উদ্দেশ্য হয়, তবে ঐ উদ্দেশ্য কতটা সফল হইবে? লেখক এই কথা সত্যই বলিয়াছেন যে, পুলিশ রাউলাট কমিটির রিপোর্টে স্বীকার করিয়াছে যে বাংলার বিদ্রোহকারীগণ বোমা পরিত্যাগ করিয়া বাহির হইতে রিভলভার আনয়ন করিবার ব্যবস্থা করিয়াছে। বর্ত্তমানে যতগুলি রিভলভার পাওয়া গিয়াছে লেখক বলেন যে উহার অধিকাংশই এখানকার অপহৃত বস্তু নহে। গুপ্তহত্যা নিবারণ করিতে পারা যায় যদি এই রিভলভার আনয়ন করিবার গুপ্ত পন্থা বন্ধ করিতে পারা যায়। গোয়েন্দা বিভাগ বিশেষ তৎপরতার সহিত এ বিষয়ে বহু অনুসন্ধান করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছেন। সুতরাং পুলিশকে সাহায্য করিবার জন্য সৈন্যদল আনয়ন করিলে কি এই গুপ্তহত্যা বন্ধ হইবে? গুপ্তহত্যা বন্ধ হউক কায়মনোবাক্যে সকল স্থির প্রকৃতি ব্যক্তিই চাহিবে। গুপ্তহত্যা আন্তরিক ঘৃণ্য বস্তু। কিন্তু দমন করিবার অজুহাতে জনসাধারণকে কোনরূপ সশঙ্কিত করা কি উচিত? কথাটা খুবই বিবেচনার কথা। ভারতীয় লেখককে তাঁহার এই মন্তব্যের জন্য আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

মাঞ্চু-অনুশাসন—

আবার মাঞ্চুরিয়া সমস্যার কথা উঠিয়াছে। জাপানের পররাষ্ট্র সচিব লর্ড লিটনকে স্পষ্টই বলিয়া দিয়াছেন, তাঁহার রিপোর্টে জাপানীরা যাহা চাহে, তাহাই যেন থাকে, তাহা হইলে জাপানীগণ অবলীলাক্রমে তাঁহার কমিটীর অনুশাসনগুলি মানিয়া লইবে, নতুবা তাঁহারা স্যায়তঃ তাঁহাদের অনুশাসন প্রতিপালন করিতে অক্ষমতা প্রকাশ করিবেন। ইহাই বীর্য্যবানের প্রকৃত উক্তি। বীর্য্যবান কাহারও মুখাপেক্ষী হয় না, অপরেই তাহার মুখাপেক্ষী হইয়া থাকে। মাঞ্চুরিয়া জাপানের অন্ন-সমস্যার প্রধান কর্ম্ম-কেন্দ্র। এখানে বিস্তর জাপানী তাহাদের জীবিকা উপার্জ্জন করে। জাপানে কোন প্রকার কাঁচা মালই পাওয়া যায় না। অথচ জাপান একটী প্রধান দেশ। মাঞ্চুরিয়া তাহার হস্তগত না থাকিলে তাহার সমস্ত কল কারখানাগুলি প্রাণহীন হইয়া পড়িবে। বীর্য্যবান জাপান তাই বলিয়াছে, মাঞ্চুরিয়াতে মাঞ্চু-জাপান স্বার্থ বজায় রাখিবার পর, চীনের স্বার্থ দেখা হইবে এবং তাহার পর অপরাপর জাতিদের স্বার্থের কথা ভাবা হইবে। মাঞ্চুরিয়া বে-পরোয়া দেশ নহে, উহার মা-বাপ আছে, সুতরাং উহার সম্বন্ধে কোন অভিমত জগতের নিকট সরকারী ভাবে প্রচার করিতে গেলে, উহার যে অভিভাবক আছেন তাহার অভিমতগুলি গ্রহণ করিতেই হইবে। জগতে যাহা সার সত্য জাপান খুব পৌরষের সহিত তাহা বলিয়াছেন।

জার্ম্মেনী:—

জার্ম্মানীতে নাজী সমস্যা খুবই ভীষণ ভাবে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। আমরা গতবারে বলিয়াছিলাম যে ভন্ পেপেন হয়ত পদত্যাগ করিবেন না। এখন তাহাই দেখা যাইতেছে। সম্প্রতি তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, পদত্যাগ ত করিবেনই না, রেষ্টাগ্ বা মহাসভার অধিবেশনে যদি নাজীর দল তাঁহাকে পদে পদে বাধা প্রদান করে কিম্বা ভোট অফ চেনা কন্‌ফিডেন্স বা তাঁহার দলের উপর জাতির বিশ্বাস নাই এই প্রস্তাব আনয়ন করে তাহা হইলে তিনি পুনর্ব্বার নূতন করিয়া নির্ব্বাচন করিবার ব্যবস্থা করিবেন। এই নূতন নির্ব্বাচনে যাহাতে সরকার পক্ষের অর্থাৎ ভন্ পেপেনের দলের লোক অধিক সংখ্যায় আসিতে পারে তাহার জন্য ভোটার হইবার বর্ত্তমানে যে কোয়ালিফিকেসন আছে উহা বর্দ্ধিত করিয়া দিবেন। এই হুমকীর প্রত্যুত্তরে নাজীর দল বলিয়াছে, তাহার জন্য তাহারা প্রস্তুত আছে। মহাসভার প্রথম অধিবেশনেই তাহারা ভন্ পেপেনের দলকে পদে পদে অপদস্থ করিবে এবং অবিশ্বাসের প্রস্তাব আনয়ন করিবেই। নাজী দলকে দমন করিবার জন্য সরকার [illegible] শাসনদণ্ড গ্রহণ করিয়াছেন। নাজীগণকে [illegible]

ধৃত করিয়া কঠিন দণ্ড প্রদান করা হইতেছে। নাজ্জীগণও ঘোর আন্দোলন চালাইতেছে। সম্প্রতি খবর আসিয়াছে নাজ্জী দলপতি স্বয়ং অতিরিক্ত পরিশ্রম করার ফলে অনেকটা পাগলের মত হইয়া উঠিয়াছেন। তবে তাঁহাকে যদি একান্ত পক্ষে কিছুদিনের জন্য পাগলা আশ্রমে যাইতে হয় তাহার জন্য নূতন নেতা ঠিক করিয়া যাইবেন।

নীলরতন জয়ন্তী ঃ—

বঙ্গীয় মেডিক্যাল ক্লাবের পক্ষ হইতে বঙ্গের বিখ্যাত চিকিৎসক স্যার নীলরতনকে একটী অভিনন্দন প্রদান করা হইয়াছে। সম্প্রতি স্যার নীলরতন সত্তর বৎসর বয়সে পদার্পন করিয়াছেন। গত বৎসর রবীন্দ্র জয়ন্তী হইয়া যাইবার পর হইতে অনেকগুলি জয়ন্তীই হইয়া গেল। স্যার নীলরতন জয়ন্তী তাহারই একটী। জয়ন্তী কথার অর্থ যাহাই হউক কিন্তু এই আদর্শের অন্তরালে যখন শুধু ব্যবসাদারী ও কথার বিনিময় দেখি তখনই ঘৃণা হয়। রবীন্দ্র-জয়ন্তী উপলক্ষে অনেক অর্থোপার্জ্জন হয়। কিন্তু ঐ সমস্ত অর্থের আয় ও ব্যয়ের একটা তালিকা আজ অবধি বাহির হইল না। জয়ন্তীর উদ্যোগীগণ হয় ত বলিতে পারেন যে সাধারণ যে টাকা দিয়াছিল তাহার বিনিময়ে তাহাদিগকে আমোদ প্রমোদ প্রদান হইয়াছে। কথাটা কিন্তু ঠিক এই ভাবেই বলিলে সত্য কথা বলা হয় কি? জয়ন্তীর উদ্যোগীগণ কি বড় লোকদের গৃহে গিয়া তাহাদের অনিচ্ছাসত্ত্বেও টিকিট বিক্রয় করিয়া আসেন নাই? ইহা ছাড়া, সাধারণকে আমোদ-প্রমোদ প্রদান করিলেও উহাত একটী বিস্তৃত ব্যবসাক্ষেত্র ছিল না। তাহাই যদি হয় তাহা হইলে তাঁহারা তাহাই বলুন না কেন? বর্ত্তমানে স্যার নীলরতন জয়ন্তী সম্পাদিত হইয়া গেল। ইহার পশ্চাতে অবশ্য এইরূপ কোন ব্যবসাদারী ছিল না। কিন্তু স্যার নীলরতনকে লইয়া বাংলার জন কয়েক চিকিৎসক এক নিভৃত নিকুঞ্জে একটা সনন্দ প্রদান না করিয়া তাঁহারাই উদ্যোগী হইয়া এক বিস্তৃত সভার আয়োজন করিলেন না কেন? নীলরতনকে আন্তরিক শ্রদ্ধা না করে বাংলায় এমন কে আছে? সাধারণের অর্ঘ্য যে তাঁহার পক্ষে খুবই মূল্যবান হইত।

পরলোকে কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য

বাংলার বিখ্যাত পণ্ডিত কৃষ্ণ কমল ভট্টাচার্য্য মহাশয় বিরানব্বই বৎসর বয়সে দেহরক্ষা করিয়াছেন। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয় সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিম বাবুর সতীর্থ। ভাটপাড়ার সন্নিধানে হুগলীতে উভয়ে একসঙ্গে শিক্ষা প্রাপ্ত হন। স্বর্গীয় গুরুদাস বন্দোপাধ্যায় মহাশয় কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের ছাত্র ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি-এল উপাধি পাইয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় হাওড়ায় ওকালতি করিতে গমন করেন। স্যার সুরেন্দ্র নাথ রিপন কলেজ স্থাপন করিয়া উহার অধ্যক্ষপদ ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে প্রদান করিয়া শিক্ষাদান কার্য্যে তাঁহাকে ব্রতী করেন। বিশেষ দক্ষতার সহিত তিনি কয়েক বৎসর এই কার্য্য করিয়া ১৯০৪ সালে অবসর গ্রহণ করেন। বিপিন গুপ্ত মহাশয় তাঁহার জীবন স্মৃতি বাহির করিয়াছিলেন। সংস্কৃত সাহিত্যে ও নানা ভাষায় ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। খুব পরিণত বয়সে তাঁহার মৃত্যু হইলেও তাঁহার বিয়োগে আমরা বিশেষ দুঃখিত, কেন না তাঁহার স্থান পূরণ করিবার মত ব্যক্তি বর্ত্তমান বাংলায় খুবই বিরল।

পরলোকে দুর্গাদাস লাহিড়ী ঃ—

দুর্গাদাস লাহিড়ীর নামও বঙ্গে সুপরিচিত। বাংলা ভাষায় খুব ব্যাপক ভাবে বেদের প্রচার দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয়ই করিয়াছিলেন। পৃথিবীর ইতিহাসও তাঁহার বিরাট কীর্ত্তি। উপন্যাস রচনায় ও তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল, রাণী ভবানী তাহার জলন্ত নিদর্শন। তাঁহার তিরোধানে বঙ্গ-সাহিত্য একজন রথী হারাইল তাহাতে কোন সন্দেহই নাই। আমরা তাঁহার শোক সন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আন্তরিক সহানুভূতি প্রদান করিতেছি।

বিশ্ব বিদ্যালয়ে বিশ্ব কবির অভিনন্দন :—

কয়েক দিন হইল বিশ্বকবি স্যার রবীন্দ্রনাথকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এক অভিনন্দন প্রদান করিয়াছেন। কয়েক বৎসর হইতে এইরূপ অভিনন্দন কবি রবীন্দ্রনাথ বহু পাইতেছেন সুতরাং ইহাতে নূতনত্ব কিছু নাই।

কিন্তু একটু নূতনত্ব আমাদের চোখে পড়িয়াছে। বিশ্বকবিকে অভিনন্দন প্রদান করিবার পূর্ব্বে দুইটী

অভ্যর্থনা সূচক পদ্য পাঠ করা হয়। এই পদ্য দুইটীর একটী উর্দ্দু ভাষায় লিখিত আর একটী পারস্য ভাষায় রচিত। বাংলার কবি বাংলার বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহার চিরপ্রিয় বাংলা ভাষায় রচিত কোন পদ্যে অভিনন্দিত না হইয়া কোন মনঃপীড়া পাইয়াছিলেন কি? আমরা জানিতাম আমাদের কবি বাংলার মাটী, বাংলার জল, বাংলার হাওয়াকে ভালবাসিতেন। আরও জানিতাম যে বাংলার অধিবাসীদের সহিত তাঁহার এক অবিচ্ছেদ্য আত্মীয়তা আছে। এই ধারণায় আমাদের যেন কেমন একটু শঙ্কা উপস্থিত হইয়াছে। স্যর সুবৃহাবর্দ্দি সুর জাতিয়তা সূত্রে পারস্যের সহিত আবদ্ধ হইতে পারেন। ইহুদিগণ বহু পুরুষ একদেশে বাস করিলেও অন্তরের নিভৃত স্থল হইতে প্যালেষ্টাইনের জন্য তাহাদের আত্মীয়তা বিরাট চীৎকার করিয়া উঠে। কাজেই অভিনন্দনে স্যর সুবৃহাবর্দ্দি পারস্যের অতীত ও বর্ত্তমান গৌরব কাহিনী ব্যাখ্যা করিতে শতমুখ হইয়াছেন। একথা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে এই অভিনন্দন প্রদান করিবার সময় কবিবরের পারস্য ভ্রমণ কাহিনীকে এতটা প্রাধান্য প্রদান না করিলেও চলিত। কিন্তু প্রত্যুত্তরে রবীন্দ্রনাথ যখন বলিলেন যে তাঁহাকে কোন পারশীক যখন জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে কোন আত্মীয়তা সূত্রে পারস্যের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ স্থাপন হইতে পারে কিনা, তাহাতে নাকি কবি বলিয়াছিলেন, তাঁহার অন্তঃকরণ তাঁহাদের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে আত্মীয়তা সূত্রে আবদ্ধ; এই স্বীকারোক্তিতে স্পষ্টই প্রতীতি জন্মিতেছে যে কবি বাংলার মাটী, আলো, হাওয়াকে ভালবাসেন বলিয়া পূর্ব্বে যাহা স্বীকার করিয়াছেন উহা বিদেশবাসী ইহুদীদের মতন adopted countryর প্রতি স্বদেশ প্রীতি মাত্র; প্রকৃত ভালবাসা প্যালেষ্টাইনের প্রতি নাড়ীর টানের ন্যায় কবির ভালবাসা পারস্যের উপর। নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার হইয়াছে। রবীন্দ্র ভক্তগণ ইহা লইয়া thesis লিখিতে পারেন। বিশ্বকবি যখন স্বয়ং বাংলা ভাষার কর্ণধার হইতেছেন তখন D. Litt উপাধি লাভ করিতে আর বিশেষ কষ্ট স্বীকার করিতে হইবে না।

স্যর প্রভাসের মুস্কিল—

স্যর প্রভাসচন্দ্র বড় সহজে মুস্কিলে পড়েন না। এবার কিন্তু একটু বেশ মুস্কিলে পড়িয়াছিলেন। স্যর সুরেন্দ্রনাথের মৃত্যুদিন উপলক্ষে এলবার্ট হলে এক স্মৃতি-বাসরের আয়োজন হইলে সুরেন্দ্রের প্রিয় শিষ্য হিসাবে ঐ সভায় যোগদান করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারেন নাই। সভায় উপস্থিত হইয়া যখন শুনিলেন যে নির্ব্বাচিত সভাপতি কোন কারণে উপস্থিত হইতে পারিবেন না, তখন তাঁহাকে উক্তপদে বরণ করিয়া লইবার প্রস্তাব হইলে উক্ত সম্মানলাভ হইতে আপনাকে বঞ্চিত করিতেও প্রস্তুত হইলেন না। উক্ত বাসরে যথাবিধি বক্তৃতাদির পর জাতীয় পতাকা উত্তোলনের প্রস্তাব উঠিলেই তিনি বলেন স্যর সুরেন্দ্রনাথ স্বয়ং উপস্থিত থাকিলে হয়ত এই প্রস্তাবে রাজী হইতে পারিতেন না এবং বর্ত্তমানে যাঁহারা উপস্থিত আছেন তাঁহাদের অনেকেও রাজী হইবেন না। তাহার পর তিনি সরকারের অজ এই অজুহাত দেখাইয়া পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেন। স্যর প্রভাসকে আমরা জিজ্ঞাসা করি জাতীয় পতাকা উত্তোলন ব্যাপারটা কি এই প্রথম? গ্রীয়ার পার্কের কথা কি তিনি বিস্মৃত হইয়াছেন? আধুনিক ভাবের পতাকা নাই হউক—জাতীয় পতাকা নাম দিয়া বাঁশের উপর পতাকা গ্রীয়ার পার্কে স্বয়ং সুরেন্দ্রনাথই ত উত্তোলন করিয়াছিলেন।

সুভাষচন্দ্রের স্বাস্থ্য—

শ্রীযুত সুভাষচন্দ্রের পীড়ার কথা সারা বাংলায় প্রচারিত হইলে; বাংলার দুইজন শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক স্যর নীলরতন ও ডাক্তার বিধান রায় মাদ্রাজে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহারা সুভাষকে পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছেন তিনি পীড়িত হইলেও, সাংঘাতিক ভাবে পীড়িত হয়েন নাই। অনেকটা আশ্বস্ত হইবার কথা বটে। তবে তাঁহার কোন বিশেষ স্বাস্থ্যকর স্থানে যাওয়া একান্ত দরকার।

ভাগ্যবান রাজপুরুষ—

সরকারী সংবাদে প্রকাশ যে [illegible] বর্ম্মা মন্ত্রকের লাট হইয়া আবার [illegible]

কয়েক বৎসরে আমরা স্বাতীনক্ষত্র জলপ্রাপ্ত এইরূপ কয়েকজন উচ্চ রাজকর্ম্মচারী দেখিলাম। আমাদের স্যর ভূপেন্দ্রনাথ সামান্য মসিজীবি হইতে ভারত সরকারের সদস্যপদ লাভ করিয়াও তাঁহার অবসর গ্রহণ করিবার সময় হইল না। সরকারী ব্যাঙ্কিং কমিটীর প্রধান পরিচালক পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া উহার কার্য্যকাল শেষ হইতে না হইতেই বিলাতে হাই কমিশনারের পদ প্রাপ্ত হন। স্যর অতুলচন্দ্রের অদৃষ্ট এতটা না হউক অনেকটা ইহারই অনুরূপ! স্যর হেলীও এইরূপ ভাগ্যবান পুরুষ। ইনি ভারত সরকারের সর্ব্বোচ্চপদে দুইবার আসীন থাকিবার পর পাঞ্জাব ও যুক্তপ্রদেশের লাটগিরি করিতেছেন। স্যর হিউ বর্ম্মার শাসনকর্ত্তা পদে নিযুক্ত হইয়া এই সমস্ত ভাগ্যবানদের সহিত এক পংক্তিতে উন্নীত হইলেন।

কর্পোরেশন নির্ব্বাচন ও ট্যাক্স—

আগামী মার্চ্চ মাসে কলিকাতা করপোরেশনের নির্ব্বাচন হইবে। এই নির্ব্বাচনের দিকেই যেন খানিকটা দৃষ্টি রাখিয়া কলিকাতার মেয়র বলিয়াছেন যে সম্প্রতি সংবাদ পত্র সমূহে ট্যাক্সের যে রেট বৃদ্ধি করিবার কথা প্রচার করা হইয়াছে তাহা সর্ব্বৈব মিথ্যা, প্রয়োজন হইলে খরচা সংযত করা হইবে, কিন্তু ট্যাক্সের হার কিছুতেই বৃদ্ধি করা হইবে না। কথাটা একটু স্পষ্ট করিয়াই বলা ভাল। কলিকাতা করপোরেশন সংক্রান্ত যে সরকারী আইন আছে, এই আইন অনুযায়ী করপোরেশনের কর্ত্তৃপক্ষগণ ইচ্ছা করিলে করপোরেশনের ট্যাক্সের হার শতকরা ১৯। হইতে ২৩ পর্য্যন্ত করিতে পারেন। বর্ত্তমানে ট্যাক্সের হারের পরিমাণ ১৯। অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা যাহা কম তাহাই আছে। করপোরেশনের আয় হ্রাস ঘটিলে উক্তহারের মাত্রা বৃদ্ধি হইতে পারে, এই আশঙ্কায়ই বোধ হয় উক্ত জনরব প্রচারিত হইয়াছিল। মেয়রের এই মন্তব্যে জন সাধারণ নিশ্চয়ই অনেকটা আশ্বস্ত হইবেন। জনসাধারণের উপার্জ্জন ক্ষমতা দিন দিন হ্রাস পাইতেছে, কিন্তু সরকারী দাবী উহার অনুপাতে বৃদ্ধিই পাইতেছে। আয়কর অসম্ভব বৃদ্ধি পাইয়াছে। উহার কথা ছাড়িয়া দিলে, যাহা:দর গাড়ী আছে তাহাদিগকে নূতন হারে কিছু বেশী টাকাই লাইসেন্স দিতে হইবে। পণ্য দ্রব্যের উপর শুল্কের হার বৃদ্ধি পাওয়ায় বিদেশ হইতে আগত দ্রব্য গুলিকে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক মূল্য দিয়াই খরিদ করিতে হইতেছে। ইহার উপর টেক্সের হার বৃদ্ধি পাইলে মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা হইত। সুতরাং মেয়রের আশ্বাসবাণী অনেকটা অভয়বাণী বলিয়াই গৃহীত হইবে।

ম্যানচেষ্টার ধর্ম্মঘট :—

বিলাতে ম্যানচেষ্টারে তাঁতীদের মধ্যে ভীষণ ধর্ম্মঘট চলিতেছে। প্রায় ছয় লক্ষ লোক ধর্ম্মঘট করিয়া বেকার বসিয়া আছে। বিলাতের বয়ন শিল্পে বিশেষ মন্দা পড়িয়াছে। এই বয়নশিল্পই ইংলণ্ডকে বর্ত্তমান ধনৈশ্বর্য্য, প্রদান করিয়াছে। কাজেই ইংরাজ নানাপ্রকার অসুবিধা ভোগ করা সত্বেও এবং প্রভূত লোকসান স্বীকার করিয়াও এই শিল্পটীকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেছেন। অনেকটা সনাতনী ভাব। উদীয়মান জাতি পশ্চাতের দিকে লক্ষ্য না করিয়া সম্মুখেরই দিতে দৃষ্টি আবদ্ধ রাখে। ইংরাজ জাতি কি সনাতনী হইয়া উঠিলেন, নতুবা এই মৃতপ্রায় বয়ন শিল্প পরিত্যাগ করিয়া অন্য কোন লাভজনক ব্যবসা স্থাপন করিবার চেষ্টা করিতেছেন না কেন? ইহা কি স্বতঃসিদ্ধ নহে যে বয়ন শিল্পকে আর কখনই পুনর্জ্জীবিত করিতে পারা যাইবে না।

হেনরি ফোর্ড ও কৃষি—

বিখ্যাত ধনী ও আমেরিকার অর্থ-জগতে যুগ-প্রবর্ত্তক হেনরী ফোর্ড একটী সার সত্য কথা বলিয়াছেন। তিনি বলেন যে মানব সভ্যতা যতই শ্রমশিল্পের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া শির উত্তোলন করুক না কেন উহার মূল ভিত্তি কৃষি। কৃষিকে পরিত্যাগ করিয়া কোন জাতিই অগ্রসর হইতে পারে না। এই কর্ম্মী তাঁহার জগৎ বিখ্যাত কারখানাগুলির সহিত কৃষিক্ষেত্রও করিয়া রাখিয়াছেন। এই কৃষিক্ষেত্র হইতে উৎপন্ন ফসলই তাঁহার কর্ম্মচারীগণের ব্যবহারের জন্য ব্যয়িত হয়। যাঁহারা এতদিন Free trade এবং International division of labour প্রভৃতি লইয়া মাথা ঘামাইতেছিলেন, তাঁহারা কোটীপতি কর্ম্মীগণের এই বাণীর কি উত্তর দিবেন?

৺ফটিকচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—

প্রসিদ্ধ গল্প লেখক জনপ্রিয় সাহিত্যসেবী ফটিকচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আর ইহলোকে নাই। গত ৯ই ভাদ্র প্রাতে ৫৮ বৎসর বয়সে দেওঘরে নিজবাসভবনে তিনি স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। ফটিক বাবু 'পুষ্পপাত্রের' সম্পাদকতা কিছুদিন করিয়াছিলেন। তিনি সুরসিক, অমায়িক ও বন্ধু বৎসল ছিলেন। 'মানসী ও মর্ম্মবাণী'র সঙ্গেও তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। আরো বহু পত্রে তাঁহার অনেক রচনা বাহির হইয়াছে। তাঁহার অকাল মৃত্যুতে আমরা বিশেষ দুঃখিত—তাঁহার আত্মীয় স্বজনকে সমবেদনা জানাইতেছি।

রসচক্র প্রীতি উৎসব—

গত ১২ ভাদ্র বরাহনগর শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের বাগান বাড়ীতে 'রসচক্রের' বার্ষিক প্রীতি সম্মেলন হইয়া গিয়াছে—এই উৎসবে বহু সাহিত্যিক যোগ দিয়াছিলেন। নানা হাসি গল্প ও ভূরি ভোজনের মধ্যে উৎসব শেষ হয়। রসচক্রের কেন্দ্র কবি শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় ও অন্যান্য সাহিত্যিকবৃন্দ এজন্য ধন্যবাদার্হ।

বাংলায় ডাকাতি বৃদ্ধি—

কাউন্সিলের প্রশ্নোত্তরে বাংলায় ডাকাতির সংখ্যা কি হারে বাড়িতেছে তাহার সঠিক বিবরণ সরকার পক্ষের উত্তরে জানা গিয়াছে। ১৯২৯ সনে সমগ্র বাংলায় ৬৯৩টি ডাকাতি হইয়াছিল। ১৯৩০ সনে ১১০৩টি ডাকাতি হইয়াছিল। আর ১৯৩১ সনে ডাকাতির সংখ্যা হইয়াছে ১৯২৩। ইহার মধ্যে ১৯২৯ সনে ৫২২টি, ৩০ সনে ৯১১টি, ৩১ সনে ১৬১১টি, ডাকাতির কোন সুরাহাই হয় নাই। ইহা ছাড়া বর্ষক্রমে ৬৩, ৯৯ ও ১৬৯ ডাকাতি কেস্ উপযুক্ত সাক্ষ্যাভাবে টেকে নাই। ডাকাতির এইরূপ উজ্জ্বল দৃষ্টান্তের পরও কিন্তু পুলিস ইত্যাদি ক্রমশঃই বাড়িতেছে এবং তাহাদের কৃতকার্য্যতার কথাও উচ্চকণ্ঠে ঘোষিত হইতেছে!

নেপালের মহারাজ—

ভারত সীমান্তের স্বাধীন হিন্দুরাজ্য নেপালের প্রধান মন্ত্রী তথা মহারাজ ভীম সমসের জঙ্গ বাহাদুর পরলোক গমন করিয়াছেন। মহারাজ নানাদিক্ দিয়াই কৃতী পুরুষ ছিলেন কিছুদিন পূর্ব্বে এই বংশেরই প্রধান সেনাপতির কলিকাতায় মৃত্যু হয়। মহারাজের মৃত্যুর পর তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মহারাজ সার যুধা সামসের জঙ্গ বাহাদুর রাণা গদীতে আরোহণ করিয়াছেন।

শিক্ষা বিভাগে সাম্প্রদায়িকতা—

ব্যবস্থাপক সভায় প্রশ্নোত্তরে শিক্ষা মন্ত্রী মিঃ কে, নাজিমুদ্দীনের কথায় জানা যায় যে যোগ্যতর হিন্দু প্রার্থী থাকা সত্ত্বেও মোঃ আবদুল ওয়াহুদ হুগলী কলেজের ইংরেজীর লেকচারার ও মোঃ এম, আমেদ হোসেন প্রেসিডেন্সীর রসায়ন শাস্ত্রের লেকচারার নিযুক্ত হইয়াছেন। এবং শিক্ষা বিভাগে বেশী সংখ্যক মুসলমান নিয়োগ সম্পর্কীয় সরকারী নিয়মানুযায়ীই এই নিয়োগ হইয়াছে।—উত্তম ব্যবস্থা!

সাম্প্রদায়িক মীমাংসা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ:—

সাম্প্রদায়িক সমস্যা সম্পর্কে শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ফ্রী প্রেসের প্রতিনিধির নিকট নিম্নোক্ত রূপ এক বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন,—সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত বিষয়ে ধীরভাবে বিবেচনা করিলে বুঝা যায় যে প্রকৃত সমস্যাগুলি সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টি আচ্ছন্ন করিবার আর একটী উপলক্ষ উপস্থিত হইয়াছে। এই নির্দ্ধারণ আমাদের দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায় ও শ্রেণীসমূহের পরস্পরের মধ্যে বিদ্বেষ ভাব জাগ্রত করিয়া আসন্ন শাসন সংস্কার হইতে আমাদের মনোযোগ অন্য দিকে সরাইয়া লইবে। সুতরাং দেশবাসীর প্রতি আমার উপদেশ এই এই যে, প্রধান মন্ত্রীর সিদ্ধান্ত উপেক্ষা করিয়া সম্মিলিতভাবে নূতন ব্যবস্থাসমূহ বিবেচনা করিবার নিমিত্ত তাহাদের সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত করা উচিত। সাম্প্রদায়িক সমস্যা মীমাংসা করার ভার আমাদের হাতেই রহিয়াছে; অযৌক্তিক সাম্প্রদায়িক ভেদবাদে অধুনা দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনে যে বিক্ষোভ সৃষ্ট হইয়াছে, তাহার সুযোগ গ্রহণ করিয়া নিজেদের মধ্যে একটা নিষ্পত্তি করিয়া লওয়াই আমাদের কর্ত্তব্য। এতদ্বারা আমাদের জাতীয় আত্মবিকাশের পথে অন্যতম প্রধান বিঘ্ন দূর হইবে। ভাব বিলাসে লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়া আমাদের উচিত নাহ। নিজেদের মধ্যে সঙ্ঘবদ্ধ এবং ভাবী অবস্থার জন্য প্রস্তুত হইয়া অদূর ভবিষ্যতে যে সকল বিষয় আমাদের নিকট উপস্থিত করা হইবে তাহার সম্মুখীন হইতে হইবে।

পরলোকে শ্যামসুন্দর:—

প্রসিদ্ধ সাংবাদিক ও দেশসেবী পণ্ডিত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী মহাশয় গত ২২শে ভাদ্র রাত্রে স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। 'সার্ভান্ট' পত্রিকা ছিল শ্যামবাবুর বিরাট কীর্ত্তি—প্রথম অসহযোগের সময় দেশব্যাপী ইহার বিরাট প্রভাব অনুভূত হইয়াছিল। জাতীয় জীবনেও এই দরিদ্র ব্রাহ্মণের দান সামান্য নহে। শ্যামবাবুর আত্মীয় স্বজনকে এই মহাশোকে সমবেদনা জানাইতেছি।

মহাপূজায়

লক্ষ্মীবিলাস প্রেস লিমিটেড।

সতীশচন্দ্র মিত্র প্রতিষ্ঠিত

৬ষ্ঠ বর্ষ | কার্ত্তিক—১৩৩৯ | ৭ম সংখ্যা

এবারের শারদীয়া

১৩৩৯ সালের শারদীয়া সমাগত। আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তীগণ কিম্বা আমরাও ২০ বছর পূর্ব্বে শারদীয়ার আগমনে যেরূপ আনন্দ-উৎসবের প্রেরণা পাইয়াছি এখন আর তা পাই না—বয়সেরই দোষ না দেশের নানা অভাব অভিযোগ এজন্য দায়ী? বাংলার এই চিরন্তন সার্ব্বজনীন উৎসব সময়ে প্রকৃতি অন্তরাত্মাকে যেমন উল্লসিত করিয়া তোলে তেমনি আবার নানা ভাবনায় ভাবাইয়াও তোলে। জগজ্জননীর এ উৎসবে যোগ দিবার অধিকার তাঁহার সব সন্তানেরই সমান—কিন্তু বিয়োগ-বেদনা, অভাব, স্পৃশ্য-অস্পৃশ্যের ভেদাভেদ তাহাতে নানা বিঘ্ন সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে।—১৩৩৭ সালের শারদীয়ার মহানবমীতেই আমরা পুষ্পপাত্রের প্রতিষ্ঠাতা সতীশচন্দ্রকে হারাইয়াছি—সে বিয়োগ-ব্যথা অনপসরণীয় হইলেও তাঁহার পরম স্নেহের পুষ্পপাত্রের সেবা আমরা এখনও করিতেছি ও ভবিষ্যতেও করিবার আশা রাখি, এই আমাদের সান্ত্বনা। এমনি বিয়োগ-ব্যথা সংসারে আরো অনেকে পাইয়াছেন। বিয়োগ-বেদনা ভগবানের দান—ইহাতে মানুষের হাত [illegible] যে সব অভাবে মানুষের জীবন [illegible] দুর্ব্বহ হইয়া ওঠে তাঁহা দূর করা একক মানুষের অসাধ্য হইলেও মানুষ-সমাজের অসাধ্য নয়। এমনি কোন একটা মর্ম্মান্তিক মানব দুঃখ দূর করিবার জন্যই জগতের শ্রেষ্ঠ মানব, ভারতের মুক্তি-পথ-প্রদর্শক মহাত্মা গান্ধী এবারকার শারদীয়ার ১৬ দিন পূর্ব্ব হইতে আমরণ উপবাস-ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। ভারতের হিন্দু সমাজ যদি নিজেদের ভিতরকার স্পৃশ্যাস্পৃশ্যভেদ দূর করিতে পারে—যদি তাহাদের উপরকার বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট আরোপিত স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন রহিত করিতে পারে তবেই মহাত্মা উপবাস ভঙ্গ করিয়া জীবন রক্ষা করিবেন। যারবেদার জেলে মহাত্মা এই উপবাসে রত, সারা ভারত, তথা সমগ্র বিশ্ব মহামানবের এই প্রাণদান সঙ্কল্পে বিচলিত। সত্যদ্রষ্টা মহাত্মার প্রাণদান সঙ্কল্পের মধ্য দিয়াই হয় তো ভারতের হিন্দু-সমাজ নব-জীবন পাইবে। এই আত্মভেদে, স্পৃশ্য অস্পৃশ্য সৃষ্টিতে যে অমূল্য সম্পদ হারাইয়াছে আবার একত্র হইয়া তাহা ফিরিয়া পাইবে।

মহাত্মার এই আত্মদান সঙ্কল্পে বর্ত্তমান ১৩৩৯ সালের মহাপূজা আরো মহিমান্বিত হইয়া উঠিয়াছে। কোন্ দে

ত্রেতায় মহামানব শ্রীরামচন্দ্র দেবীর আরাধনায় নীল কমলের পরিবর্ত্তে নিজের নীল নয়ন উৎসর্গ করিতে গিয়াছিলেন—আরাধনার সে আন্তরিকতা ভুলিয়া আমরা নিজেদের মনুষ্যত্ব, বলবীর্য্য, সংহতি-শক্তির গৌরব পর্য্যন্ত হেলায় বিসর্জ্জন দিয়া যখন বিশ্বের কৃপার পাত্র তখন এবারকার শারদীয়ায় মহাত্মার এ আত্মদান সঙ্কল্প জাতিকে জাগাইবার অমোঘ উপাদান রূপে আসিয়াছে। আজিকার শারদীয়ায় নিখিল ভারতের উৎসব আনন্দ, ব্যথা বেদনা সব যেন এক হইয়া সেই উপবাস-ক্লিষ্ট মহামানবের চরণ প্রান্তে লুটাইয়া পড়িতেছে। ভারতবাসী সঙ্কট নাশিনী জগজ্জননী শ্রীদুর্গার কাছে প্রার্থনা করিতেছে—মহাত্মার জীবন, তাঁহার সম্মান—অগণিত জনশক্তি, কোটী কোটী মূক জনসাধারণের প্রাণ যে মহামায়ার শ্রেষ্ঠ সন্তানের পেছনে আছে জনমত আজ তাহাই প্রচার করিতে চাহিতেছে।

ভারতের রাজনীতি, সমাজনীতি ও জননীতির ক্ষেত্রে মহাত্মার অন্নোৎসর্গের সঙ্কল্পই এবারকার ১৩৩৯ সালের পূজার বিশেষত্ব—কত আশা, কত আকাঙ্ক্ষা—কত ভীতি কত উদ্বেগ লইয়া ভারতীয় এই উপবাসের পল, দণ্ড, দিনগুলি গণিতেছে—মহাত্মার উপবাস হিন্দুকে বুঝাইতেছে সত্য হিন্দুত্ব কি—কি ভাবে বর্ত্তমান হিন্দুস্থানে তাহার সংস্কার আবশ্যক।

শারদ লক্ষ্মী—সিদ্ধি দাও—সার্থক কর তোমার শ্রেষ্ঠ সন্তানের বাসনা—যে নিজে আত্মদান করিয়া তোমার সকল সন্তানের মর্য্যাদা রাখিতে চাহিতেছে।

পতিত সমস্যা

— প্রবন্ধ —

শ্রীসারস্বত শর্ম্মা

যার জনবল নেই, ধনবল নেই, বাহুবল নেই, সে সামান্য কারণেই পতিত। আর যার জমিদারী আছে—আত্মীয়বল আছে—বাহুবল আছে—রাজানুগ্রহবল আছে—পুঁথি ঘেঁটে শ্লোক বার করবার ক্ষমতা আছে অথবা সেজন্য শাস্ত্রাজীবদের পারিশ্রমিক দেওয়ার যার সঙ্গতি আছে—সে গুরুতর কারণেও পতিত নয়। এটাই সাধারণ নিয়ম। একই পাপে কারো প্রায়শ্চিত্ত তুষানল, কারো প্রায়শ্চিত্ত জন কতক স্বজাতি ভোজন। মদ্যব্যবসায়ী এক বিন্দু মদ না খেয়েও পতিত—মদ্যপায়ীরা তন্ত্রমন্ত্রের জোরে দলবলের জোরে পতিত নয়।

মহারাষ্ট্রী ব্রাহ্মণ মাতুলকন্যা বিবাহ ক'রে বাঙালী ব্রাহ্মণের চোখে পতিত, বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ মাছ খেয়ে মহারাষ্ট্রী, হিন্দুস্থানী ও নম্বুদ্রি ব্রাহ্মণের কাছে পতিত। ব্রাহ্মণ নায়ার কন্যা বিয়ে করে শ্বশুর বাড়ীতে রাত্রিবাসের পর স্নান ক'রে বাড়ী ফিরলে আর পতিত নয়—কিন্তু বাড়ীতে বসে তাদের একফোটা জল খেলেই পতিত।

অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গে এলেই পতিত। কান্যকুব্জ হতে আগত পঞ্চ ব্রাহ্মণ রাজানুগ্রহে বাংলাদেশের মাথার চুড়া কিন্তু কান্যকুব্জের কাছে পতিত। কনোজিয়া ব্রাহ্মণ যারা বাংলাদেশে পরে এসেছিল—রাজানুগ্রহ লাভ করে নাই—তারা পতিত। তাদের বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ কেহ কন্যাদান করলে না, কান্যকুব্জ অঞ্চলেও তারা কন্যা পেলে না, তাদের কাছেও তারা হলো পতিত,—ক্রমে তাদের বংশলোপ হয়ে এসেছে। বল্লাল চণ্ডালী বিয়ে করেও পতিত হন নি। পুরাণো নজীরও আছে, চন্দ্রগুপ্ত যবনী বিয়েতেও পতিত হন নি—বাপ্পারাও বাহুবলে বহু যবনী বিয়ে করেও নিশ্চয়ই পতিত হন নি। [illegible] বংশই শ্রেষ্ঠ কুলীনবংশ। শাক্যকুলের [illegible]

চন্দ্ত—পতিতপাবন শাক্যসিংহ নিজে পতিত ছিলেন বলে শোনা যায় নি।

দেবীবর ঘটকের মেল বন্ধনের ইতিহাস যে পড়েছে সেই জানে কত বড় বড় অপরাধেও একদা পাতিত্য ঘটে নি—কলঙ্ক কৌলীন্যেরই চিহ্নস্বরূপ থেকে গেছে। কত সামান্য কারণে যে বৈশ্য সুবর্ণবণিক যোগী ইত্যাদি জাতির পাতিত্য ঘটেছে তা ভাবলে হাসি পায়।

কেউ শ্রাদ্ধের সময় আগে দানগ্রহণ করেছে,—কেউ গ্রহণের সময় দান নিয়েছে, কেউ কোন জাতি বিশেষের দেব-পূজা করেছে বা পৌরোহিত্য করেছে—কেউ স্ব-গোত্রে বিবাহ করেছে—কেউ সপিণ্ডাকে বিয়ে করেছে—কেউ সময়ে কন্যার বিয়ে দিতে পারে নি—কারো কন্যার বিয়ের আগে কৌমার্য্য উত্তীর্ণ হয়েছে,—কেউ অস্পৃশ্যের জল পান করেছে,—কেউ চিকিৎসা করে অর্থ গ্রহণ করেছে, এই রকম কত কারণে যে কত পরিবার পতিত হয়েছে তার ইয়ত্তা নাই।

পক্ষান্তরে অগম্যাগমন, ভ্রূণহত্যা, গো-বধ, নৃ-বধ, সুরাপান, যবনীগমন, অস্পৃশ্যাগমন, গোপনে নিম্নতর জাতির ঔরসে সন্তানোৎপাদন, শবৃত্তি, পরস্বাপহরণ, যবনের বৃত্তিগ্রহণ, পরান্নজীবিতা, শ্বশুরান্নে জীবনধারণ, উঞ্ছবৃত্তি ইত্যাদি মহা মহাপাপ সমাজ দিব্যি প্রয়োজনমত হজম করেছে, কারো পাতিত্য ঘটে নাই।

সহজিয়া, বাউল, তান্ত্রিক, বৌদ্ধ, বৈরাগীরদল নিম্ন জাতীয় স্ত্রীলোকের সঙ্গে সঙ্গত হয়ে তার গর্ভজাত সন্তান সন্ততির সঙ্গে জাতে ফিরে এসেছে, পাতিত্য ঘটে নাই। ভরার মেয়ে চলেছে—গুরুপ্রসাদী চলেছে। ধনবতী শূদ্রাণীর ভিক্ষাপুত্র ধর্ম্মপুত্রেরা বেশ সগর্ব্বে অর্থবলে চলেছে। কতজনা ঘটকের কৌশলে চলেছে—জমিদারের দাপটের সাহায্যে চলেছে—সমাজপতির কৃপাকটাক্ষে চলেছে। অর্থগুণে কত জনের জাত বেঁচে গেছে। প্রভুত্ব প্রিয় স্বজাতিদের পায়ে ধরেও কতজন বেঁচে গেছে।

নিঃস্বের পাতিত্য অতি সহজেই ঘটেছে—আত্মীয় বল যার কম—তার পাতিত্য রোধ করে কে? আর যে সত্যের দোহাই দিয়েছে,—ধর্ম্মের দোহাই দিয়েছে,—স্বজাতির কর্ত্তাদের কাছে মাথা নোয়ায় নাই,—তেজ দেখিয়েছে,—তার পাতিত্য তো অবশ্যম্ভাবী।

কোন কোন পরিবার স্থানভ্রষ্ট হওয়ার জন্যই পতিত হয়ে গেছে—অখাদ্যের ঘ্রাণ গ্রহণ স্বীকার করে কোন কোন পরিবার পতিত—নীচ জাতের ঘরে বা নৌকায় আপদন্ন গ্রহণ ক'রে সত্য কথা বলে কেউ পতিত হয়েছে—মিথ্যা বলে কেউ বা বেঁচে গেছে। সত্য কথা বলার অপরাধে বহু লোকই পতিত হয়েছে—মানুষের বিধানের কাছে সত্য হেরে গেছে, মিথ্যাই হয়েছে জয়যুক্ত। কৌলীন্য ও বহুবিবাহের ফলে কত পরিবারই পতিত হতে পারতো—কিন্তু কুলীন যতদিন দেবতা ছিল—ততদিন মানুষের আইন তাদের সম্বন্ধে খাটে নি। ধনীদের পতিত হবার শতশত কারণ ঘটেছে কিন্তু তাদের পতিত করবে কে?

নদীর একপারের লোকের কাছে অন্য পারের লোক পতিত—এক জেলার লোকের কাছে অন্য জেলার লোক পতিত। কোন জেলার বিধবারা একাদশীতে ফলমূল খায়—কোথাও বা মুসলমানের পাতা দই খায়। কোথাও বা বিধবারা মুড়ির সঙ্গে ছোলা ভিজে খায়। কোথাও শূদ্রবাড়ী ব্রাহ্মণ ভাত খায়—কোথাও লুচি খায় কোথাও নুন-দেওয়া তরকারী খায়—কোথাও আলুনো খায়—কোথাও শ্রাদ্ধের দিনে খায় না—কোথাও ভরভরে অশৌচে দশম দিনেও খায়—কোথাও প্রকাশ্যে গৃহেই নীচজাতীয়া উপপত্নীকে পত্নী ভাবে রাখিলে সমাজ আপত্তি করে না। এমনি কতই যে ছোটখাট ব্যাপার আছে যার জন্যে এক জেলার লোক অন্য জেলার লোকের কাছে হেয়—এমন কি পতিত।

সব চেয়ে মজার কথা—যে কোন' পরিবারকে কুলের পবিত্রতা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা কর—সে পরিবার অন্যান্য অধিকাংশ পরিবারকে অপবিত্র ব'লে ঘোষণা করবে। অমুক পরিবারের এই দোষ, অমুককে অমুক জাত কে বলে? অমুক পরিবার তো গোয়ালা বা কাঁসারী,—অমুকের বাড়ী আমরা পা ধুই না, জলগ্রহণ দূরে থাকুক—ওরা ধোপাকে মন্ত্র দিয়েছে—ওরা ত সোনার বেনের খেয়ে মানুষ ইত্যাদি ইত্যাদি। ফলে এই দাঁড়ায় যে চাঁদা করে অধিকাংশ পরিবারই পতিত।

কেউ চেষ্টা করে তাদের জাতে ঠেলে নি, বলেই জাতে আছে। রমণীর কুলত্যাগ বা গোপন পাপ, আহারবিহারের সংসর্গ, বৈবাহিক আদান প্রদান, অস্পৃশ্য জাতির গুরু-গিরি বা নীচজাতির পৌরোহিত্য, জারজতা ইত্যাদি এমনি একটা সূত্র ধরে এক একটি পরিবার শত শত স্বজাতীয় পরিবারকে পতিত বলে মনে করে, অথচ আর্থিক সুযোগ সুবিধা অথবা স্বার্থগত অনিবার্য্য কারণ ঘটলেই অনায়াসে তাদের সঙ্গে বৈবাহিক করণ কারণ করে বসে।

ভাবতে গেলে—দেখি লোম বাছতে কম্বল থাকে না—ঠক্ বাছতে গ্রাম উজাড়। এই পাতিত্য-সমস্যার সমাধান কি? কে সত্যই পতিত? মানুষকে এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা বৃথা। মানুষের বিচার যে কেমন তা তো কারো জান্‌তে বাকী নেই। আমি ত দেখছি—সমগ্র জাতিই পতিত—এ দেশের মানুষের বিচারের কথা ভেবে বলছি না। সমগ্র জগতের কাছে এ জাতি পতিত।

হে পতিতপাবন—হে পতিতের শরণ্য নারায়ণ তুমি সমগ্র জাতিকেই উদ্ধার করো—তখন আর কেউ পতিত থাকবে না। তুমি ছাড়া আর কেউ এই পতিত সমস্যার সমাধান করিতে পারিবে না। যতদিন অধঃপতিত হয়ে থাকবে ততদিন মোহবশে একে অন্যকে এমনি পতিতই মনে করবে।

——

দুর্গোৎসব

কুমারী ছায়াদেবী

— প্রবন্ধ —

দুর্গাপূজা বাঙ্গলার বিশেষত্ব। ভারতবর্ষে আর কোথাও এভাবে শরৎকালে মূর্ত্তিপূজা নাই। অন্যত্র দেবতার মূর্ত্তি আছে দেবালয়ে মন্দিরে। এভাবে মূর্ত্তি গড়ন করিয়া এত জাঁক-জমক করিয়া প্রতিমা পূজা অন্য কোন প্রদেশে দেখিতে পাওয়া যায় না। বর্ত্তমান দুর্গা প্রতিমা বাঙ্গালীর নিজস্ব। ইহার উৎপত্তি যথায় হউক না কেন বাঙ্গালী নিজভক্তি ও রসজ্ঞান দ্বারা ইহার মাতৃত্ব, মধুরত্ব ও শিল্পজ্ঞানের চরমোৎকর্ষতা দেখাইয়াছে। ভাবের ও রসের রাজ্যে দুর্গা প্রতিমার এক বিশেষ মূল্য আছে।

শরৎকালে একটি উৎসব হইত। গাছ পাতা ধান লইয়া সে উৎসব হইত। ইংরাজীতে যাহাকে Herbage ও Harvest festival বলে। ইহাও তাহাই। এ উৎসব সর্ব্বদেশে হয়। ভারতবর্ষেও ইহা বহুকাল হইতে হই-তেছে। উৎসব করা মানুষের স্বভাব। উৎসবে সমাজকে, জাতিকে, ব্যক্তিকে সবল ও সতেজ করে। জাতি যখন প্রসার লাভ করে, দরিদ্রতা যখন থাকে না, অন্নপূর্ণা যখন দশহাতে অন্নবস্ত্র দান করেন, উৎসবও তখন নানা মূর্ত্তি ধরিয়া জাতির জীবনে আনন্দ দান করে, প্রাণ সঞ্চার করে। পূর্ব্বে গাছ পাতা লইয়া যাহা উৎসব হইত কালক্রমে তাহাই মূর্ত্তিপূজায় পরিণত হইল। পূর্ব্বে যাহা গাছপাতা লইয়া উৎসব হইত বর্ত্তমানে তাহাই নবপত্রিকার পূজা হইতেছে!

শরৎকালের পূজা হইল নবপত্রিকার পূজা। দুর্গা-প্রতিমা হইল রূপক। আসল পূজা হইল নবপত্রিকার। এই শরৎকালে ভারতবর্ষময় সকল সম্প্রদায় নবরাত্রির উৎসব করিয়া থাকে। প্রত্যেক প্রদেশে দশকর্ম্মান্বিত হিন্দু মাত্রেরই গৃহে আশ্বিনের শুক্লা প্রতিপদ হইতে নবমী তিথির শেষ যাম পর্য্যন্ত এই নয় রাত্রের জন্য চণ্ডিকার ঘট স্থাপিত হয়; মন্ত্রে দেবীর পূজা ও মার্কণ্ডেয় চণ্ডীপাঠ হইয়া থাকে। হিন্দু গৃহস্থের ধারণা যে নবরাত্রের সময় গৃহে চণ্ডীপাঠ না হইলে অমঙ্গল ঘটিবে। চণ্ডীদেবীকে হিন্দু গৃহস্থ বড়ই ভয়ের চক্ষে দেখে। চণ্ডীমূর্ত্তি [illegible] আছে কিন্তু ভুবনেশ্বরে যেরূপ চণ্ডীমূর্ত্তি [illegible]

(চণ্ডীমূর্ত্তি) ভারতবর্ষে অন্য কোন স্থানে নাই। ইহা দেখিবার শিখিবার মূর্ত্তি। একাধারে রণমূর্ত্তি ও অভয়া মূর্ত্তি কেমন করিয়া পাথরে মূর্ত্ত করিয়া তুলিতে হয় তাহা হিন্দুজাতি সুস্পষ্ট ও সুন্দরভাবে ভুবনেশ্বরের চণ্ডীমূর্ত্তিতে দেখাইয়া দিয়া গিয়াছেন। স্বাধীন জাত না হইলে স্বাধীন জাত তাহার শিল্পকলার মর্য্যাদা দান করে না। চণ্ডী-মূর্ত্তির সহিত বর্ত্তমান দুর্গামূর্ত্তির ভাবরাজ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে।

চণ্ডীতে যে মহাপূজার কথা আছে আমার মনে হয় সে পূজাটা নবপত্রিকার পূজা। নবরাত্র পালন ও নব-পত্রিকার পূজা অনেক দেশে হইয়া থাকে। নবরাত্রের উৎসব দুইটা আছে, একটা শরৎকালে, অন্যটা বসন্তকালে বাসন্তী নবরাত্র। শরৎকালে নবপত্রিকাকে পূজা করা সহজ। কারণ এ সময় সমস্ত গাছ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। কলা-গাছ, গুঁড়িকচুর গাছ, হলুদ গাছ, জয়ন্তীর ডাল, বেলের ডাল, দাড়িম গাছ, অশোকের ডাল, মানকচুর গাছ ও ধানের গাছ ইহাই হইল নবপত্রিকার গাছ। গাছ যখন দেবতায় পরিণত হইল অর্থাৎ লোকে যখন বুঝিল বা অনুভব করিল যে প্রত্যেক গাছের ভিতর দেবতা বা প্রাণ আছে তখন তাহারা গাছকে ভক্তি সহকারে পূজা করিতে লাগিল। সাধারণের ধারণা লোকে গাছ পূজা করে কিন্তু আসলে তাহা নয়। গাছের ভিতর যে দেবতার বা প্রাণের দর্শন পাইয়াছে তাহাকেই পূজা করে। সেইজন্য আজ পর্য্যন্ত যখন তখন গাছ কর্ত্তন করা নিষেধ। নূতন বৃক্ষ রোপণ করিতে হইলে অগ্রে বৃক্ষকে পূজা করিতে হয়। কিছুদিন পূর্ব্বে বিশ্বভারতীতে বৃক্ষ রোপণ উৎসব দেখিয়াছিলাম। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন। সেখানেও দেখিলাম প্রথমে বৃক্ষকে মন্ত্র দ্বারা পূজা করিয়া রোপণ করা হইল।—সেই জন্য নবপত্রিকার অধিষ্ঠাত্রী নয়টি দেবীর কল্পনা করা হইল। এই নয়টি দেবীর নাম হইল, যথা—ব্রাহ্মণী, কালিকা, দুর্গা, কার্ত্তিকী, শিবা রক্তদন্তিকা, শোকরহিতা, চামুণ্ডা ও লক্ষ্মী। বৃক্ষের রং এর সহিত দেবীর রং যতদূর সম্ভব হয় রক্ষিত হইল। বসন্তকালে নবপত্রিকার পূজা করা শক্ত; কারণ সে সময় অনেক গাছ পাওয়া যায় না। ধান্যের ত কথাই নাই। যাহারা বাসন্তী পূজা করেন তাহারাই জানেন নবপত্রিকা সংগ্রহ করিতে কত কষ্ট পাইতে হয়।

ভাবের দিক ফুটাইয়া তুলিবার জন্য প্রতিমার প্রতিষ্ঠা। সমাজের সকলকে লইয়া সম্মিলিতভাবে উৎসব করিবার উদ্দেশ্যই প্রতিমার প্রতিষ্ঠা। বাল্যকাল হইতে শুনিয়া আসিতেছি শরৎকালে যে দুর্গোৎসব হয় ইহা আসল দুর্গোৎসব নয়; এ পূজা অকালে শ্রীরামচন্দ্র করিয়া-ছিলেন। আসল দুর্গোৎসব হইল বাসন্তী পূজা। ইহাই হইল সাধারণের বদ্ধ সংস্কার। বসন্তকালে যে দুর্গোৎসব হয় তাহার উৎপত্তি ও বিস্মৃতির ব্যাখ্যা আজ পর্য্যন্ত কেহ ভাল ভাবে করেন নাই। বস্তুতঃ বাসন্তী পূজায় তেমন জাঁকজমক হয় না। দেশ মধ্যে একটা গভীর সাড়া পড়ে না। সাধারণের মন মধ্যে তেমন কিছু একটা ভাবের উদয় হয় না। কিন্তু শরৎকালের দুর্গাপূজায় বাঙ্গালী জাত মাতিয়া ওঠে। শরৎকালের দুর্গোৎসব হইল বাঙ্গালী জাতির আনন্দ বিকাশের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। এমনভাবে অন্য কোন পূজায় বাঙ্গালী জাতি আনন্দে জাগিয়া ওঠে না। শ্রীরামচন্দ্র শরৎকালে দুর্গাপূজা করিয়া ছিলেন বলিয়া যে প্রবাদ আছে তজ্জন্য নহে। এই দুর্গা পূজার পশ্চাতে বাঙ্গালী জাতির অনেক কিছু জড়ান-মাখান আছে। এতবড় জাঁকাল কাণ্ড ভারতবর্ষের আর কোন প্রদেশে আছে কিনা বলিতে পারি না। এত অর্থ ব্যয়, এমন গ্রামে গ্রামে দীয়তাং ভুজ্যতাং রব, এমন ধনী দরিদ্র নির্ব্বিশেষে সকলের নববস্ত্র গ্রহণের ব্যবস্থা হিন্দুর অন্য কোন উৎসবে হয় কিনা জানিনা।

শরতের প্রভাতকালে বাঙ্গালী যখন কান পাতিয়া শোনে,—

"গিরি, গৌরী আমার এসেছিল,
স্বপ্নে দেখা দিয়ে, চৈতন্য করিয়ে
চৈতন্যরূপিণী কোথায় লুকাল।"

তখন সে সমস্ত ভুলিয়া যায়। তাহার হৃদয় হইতে দ্বেষ, হিংসা কে যেন অজ্ঞাতে কাড়িয়া লইয়া যায়। গান শুনিতে শুনিতে সে যেন নূতন জগতে ভাসিয়া যায়,

আপনাতে আপনি ডুবিয়া যায়, তখন সে আবার শুনিতে পায়'—

"গা তোল গা তোল
বাঁধ মা কুন্তল
এল বুঝি তোর ঈশানী
ওমা পাষাণী।"

এ সঙ্গীত শুনিতে শুনিতে বাঙ্গালীর প্রাণ আকুল হইয়া ওঠে। আগমনীর ঝঙ্কার কানের ভিতর দিয়া সমস্ত সমাজটাকে সমস্ত দেশটাকে দুইমাস একভাবের ভাবুক; এক রসে রসিক করিয়া রাখিত। সেদিন আজ আর নাই। সে মন মাতান, প্রাণ মাতান আগমনীর গায়ক নাই, ইংরাজী শিক্ষার সংস্পর্শে আসিয়া আমরাও সে কান হারাইয়াছি। আগমনীর মধ্যে বাঙ্গালী গার্হস্থ্য জীবনের একটি অতি সুন্দর মধুর ছবি ফুটান আছে; ঝি জামাইয়ের আদর ঝিয়ের বাপের বাড়ীর প্রতি মমতা-বোধ, মায়ের কন্যার প্রতি প্রবল স্নেহ—বাঙ্গালীর বাঙ্গালীত্বের ইহাই বিশিষ্টতা। বাঙ্গালীর দুর্গোৎসব হইল বাঙ্গালী জাতীর গার্হস্থ্য জীবনের প্রতিমূর্ত্তি। ইহা ভাবের ও রসের দিক দিয়া অপূর্ব্ব বস্তু সৃজন করিয়াছে।

দুর্গোৎসব হইল সকাম পূজা। ইহা গার্হস্থ্য জীবনের সকাম পূজা—সাধকের সকাম পূজা নয়। সাধক পূজা অর্চ্চনা করিবে ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য, সংসার জীবন সুখময় যশোময় করিবার জন্য নয়। সেজন্য সাধক প্রতিমার নিকট প্রার্থনা করেন, মা আমায় শ্রদ্ধা ভক্তি দাও। আমার পাপ-পুণ্য লও, আমার জ্ঞান-অজ্ঞান লও, আমার ধর্ম্ম-কর্ম্ম লও, কেবল আমায় শ্রদ্ধা-ভক্তি দাও। গৃহী কিন্তু কৈবল্যর জন্য দুর্গোৎসব করিবে না। বৈদিক যুগে যাগ-যজ্ঞ হইত রাজাদের মনস্কামনা পূর্ণ করিবার জন্য। ইহার জন্য তাহারা প্রচুর অর্থব্যয় করিতেন। সে যাগ-যজ্ঞ আর চলিত নাই, সে যাগ যজ্ঞের নিয়ম গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় বটে কিন্তু বাস্তব জীবনে দেখিবার অভাবে তাহা শুধু কল্পনা মাত্র রহিয়া যায়। প্রবাদ আছে কলি-যুগে দুর্গোৎসবই হইল শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ। ইহা গরীব দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে না। যাঁহারা দুর্গোৎসব তত্ত্ব জানেন তাঁহারা এ কথার মর্ম্ম বুঝিবেন। তাই বলিতেছি দুর্গোৎসব হইল গৃহস্থের সকাম পূজা। সেইজন্য গৃহী প্রতিমার সম্মুখে নতজানু হইয়া প্রার্থনা জানায়;—

"মধুকৈটভবিধ্বংসি বিধাতৃ বরদে নমঃ।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি॥

° ° ° °

নিশুম্ভ-শুম্ভ নির্ণাশি ত্রৈলোক্য শুভদে নমঃ।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি॥

° ° ° °

চণ্ডীকে সততং যুদ্ধে জয়নি পাপ নাশিনি।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি॥

° ° ° °

প্রচণ্ড দৈত্যদর্পঘ্নে চণ্ডীকে প্রণতায় মে।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি।

° ° ° °

ভার্য্যাং মনোরমাং দেহি মনোবৃত্তানুসারিনীম্।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি॥

ইহাই হইল গৃহীর দেবী সমীপে সকাম প্রার্থনা সাধকের "ভার্য্যাং মনোরমাং" প্রয়োজন হয় না। কারণ সাধক সম্পূর্ণভাবে নিজেকে দেবীর হস্তে অর্পণ করেন—তাঁহার নিজস্ব বলিয়া কিছু রাখেন না।

ভক্ত দেবীর সম্মুখে প্রণাম করেন;—

"সর্ব্বমঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থ সাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোহস্তুতে॥
সৃষ্টিস্থিতি বিনাশানাং শক্তিভূতে সনাতনি।
গুণাশ্রয়ে গুণময়ে নারায়ণি নমোহস্তুতে।
শরণাগত দীনার্ত্ত পরিত্রাণ পরায়ণে।
সর্ব্বস্যার্ত্তি হরে দেবি নারায়ণি নমোহস্তুতে।

বাঙ্গালীর জাতীয়-ভাবের উদ্বোধন

— প্রবন্ধ —

শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাশ এম,-এ, পি এইচ-ডি

ইংরাজ যখন প্রথমে আমাদের এ দেশে পদার্পণ করিল, তখন নানা কারণে আমাদের জাতীয় জীবন দুর্ব্বলতার আধার হইয়াছিল। তখন আমাদের ধর্ম্ম একেবারে নিস্তেজ ও অস্বাভাবিক হইয়া পড়িয়াছিল। একদিকে চিরপুরাতন চিরশক্তির আকর সনাতন হিন্দুধর্ম্ম কেবলমাত্র মৌখিক আবৃত্তি ও আড়ম্বরের মধ্যে আপনার শিবশক্তিকে হারাইয়া ফেলিয়াছিল; অপরদিকে যে অপূর্ব্ব প্রেমধর্ম্ম-বলে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব সমগ্র বাঙ্গলাদেশকে জয় করিয়াছিলেন, সেই প্রেমধর্ম্মের অনন্ত মহিমা ও প্রাণ-সঞ্চারিণী শক্তি কেবলমাত্র বাহ্য আচার-ব্যবহারে নিঃশেষিত হইয়া যাইতেছিল। বাঙ্গলার হিন্দুর সমগ্র ধর্ম্মক্ষেত্র ভক্তিহীন শাক্ত ও প্রেমহীন বৈষ্ণবের ধর্ম্মশূন্য কলহে মুখর হইয়া শ্রীহীন হইয়া গিয়াছিল। তখন নবদ্বীপের চিরকীর্ত্তিময় জ্ঞানগৌরব কেবলমাত্র ইতিহাসের কথা—একেবারে অতীত কাহিনী। বাঙ্গালী জীবনের সহিত তাহার কোনও সম্বন্ধ ছিল না। এইরূপে কি ধর্ম্মে কি জ্ঞানে বাঙ্গলার হিন্দু তখন সর্ব্ববিষয়ে প্রাণহীন ও পঙ্গু হইয়া পড়িয়াছিল। বাঙ্গলার মুসলমানদিগের অবস্থাও অপেক্ষাকৃত ভাল ছিল না। আলিবর্দ্দিখাঁর পর হইতেই বাঙ্গলার মুসলমানও ক্রমশঃ নিস্তেজ ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছিল এবং এই সময়ে তাহাদের সকল জ্ঞান ও শক্তি বলহীনের বিলাসে ভাসিয়া গিয়াছিল। এমন সময়ে সেই ঘোর অন্ধকারের মধ্যে ইংরাজ পাশ্চাত্য সভ্যতা ও জ্ঞানের আলোক লইয়া এ দেশে আগমন করিল, এবং অল্পদিনের মধ্যেই রাজত্ব স্থাপন করিয়া অসাধারণ শক্তির পরিচয় দিল। আমাদের জাতীয় দুর্ব্বলতা-নিবন্ধন আমরা ইংরাজ রাজত্বের সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজের সভ্যতা ও জ্ঞানকে বরণ করিতে গিয়া তাহাদের বিলাসকেও বরণ করিয়া লইলাম। দুর্ব্বল জাতির যাহা হয়, বাঙ্গালীর তাহাই হইল। বাঙ্গালী ইংরাজি সভ্যতার সেই প্রখর আলোক সংযতভাবে ধারণ করিতে পারিল না। অন্ধকার রাত্রে দিগ্‌ভ্রান্ত পথিক যেমন বিস্ময়ে ও মোহে আপনার পদপ্রান্তস্থিত সুপথকে অনায়াসে পরিত্যাগ করিয়া বহুদূরগামী দুর্গমপথকে সহজ ও সন্নিকট মনে করিয়া সেই পথেই অগ্রসর হয়, বাঙ্গালীও ঠিক সেইরূপ নিজের শাস্ত্রকে অবজ্ঞা করিয়া, নিজের সাহিত্যকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করিয়া, তাহার জাতীয় ইতিহাসের ইঙ্গিতকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিয়া ইংরাজের সাহিত্য, ইংরাজের ইতিহাস, ইংরাজের জ্ঞান-বিজ্ঞানের দিকে একান্ত অসংযত-ভাবে ঝুঁকিয়া পড়িল। সেই সময়ে রাজা রামমোহন রায় এ দেশে প্রথমে বিজ্ঞানের তূর্য্যধ্বনি করিলেন, বাঙ্গালীর একটু টনক নড়িল, সে তাহা শুনিয়াছিল বলিয়া মনে করিল এবং কিছু কিছু বিজ্ঞানের বাঁধা-ধরা কথা কণ্ঠস্থ করিয়া উদ্গার করিতে লাগিল। কিন্তু রামমোহন যে গভীর শাস্ত্রালোচনায় জীবন উদ্‌যাপিত করিলেন, তাহার দিকে তখনও বাঙ্গালীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল না। তিনি যে আমাদের সভ্যতা ও সাধনার মধ্যে আমাদের উদ্ধারের পথ অনুসন্ধান করিয়াছিলেন, সে কথা বাঙ্গালী একবারও তখন মনে করিল না। এইরূপে কতদিন গেল। ইংরাজের রাজ্যে নূতন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল, বাঙ্গালীর পাশ্চাত্যের অনুচিকীর্ষা প্রবৃত্তি আরও বৃদ্ধি পাইল, পাশ্চাত্যের সভ্যতায় তাহার নয়ন মুগ্ধ হইয়া গেল। সেই সময়ে সর্ব্বপ্রথমে বঙ্কিম বাঙ্গালার মূর্ত্তি গড়িয়া বাঙ্গালীকে দেশমাতার স্বরূপ দেখাইলেন। বঙ্কিম সেই মূর্ত্তিতে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিলেন। তিনি নিজে ধ্যাননেত্রে বঙ্গজননীকে দর্শন করিলেন; সেই "সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং শস্য-

শ্যামলাং মাতরম্", তাহারই গান গাহিলেন। তিনি বাঙ্গালীকে ডাকিয়া বলিলেন, "দেখ দেখ, এই আমাদের মা, বরণ করিয়া ঘরে তোল!" কিন্তু বাঙ্গালীর ঘুমঘোর মোহের আবরণ তখনও ঘোচে নাই, সে সেই মূর্ত্তি দেখিল না, বুঝি বা দেখিয়াও প্রণিধান করিতে পারিল না, বঙ্কিমের সে গান শুনিল না, বুঝি বা শুনিয়াও অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল না। তাই বঙ্কিম আক্ষেপ করিয়া বলিয়া গেলেন, "আমি একা মা মা করিয়া রোদন করিতেছি।" মাতৃহীনের ডুবিয়া মরাই সঙ্গত এই কথাও তিনি বলিয়া গেলেন, তবুও বাঙ্গালীর টনক নড়িল না, অথবা কিছু চেতনা বুঝি জাগিয়াছিল, কিন্তু তাহা স্থায়ী হইল না। তারপর শশধর তর্কচূড়ামণির হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানের জন্য বিরাট আন্দোলন। এই আন্দোলনের ফলে বাঙ্গালীর, অন্ততঃপক্ষে শিক্ষিত বাঙ্গালীর আত্মস্থ হইবার একটা প্রয়াস, একটা উদ্যম দেখা গেল। তারপর আরও দিন কাটিয়া গেল। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দ হইতে স্বদেশী আন্দোলনের বাজনা বাজিতে আরম্ভ হইল। বাঙ্গালী আপনাকে চিনিতে ও বুঝিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। বাঙ্গলার জাতীয় কবি গাহিলেন—

"বাংলার মাটী বাংলার জল
সত্য কর সত্য কর, হে ভগবান্"

তখন হইতে বাঙ্গলার মাটী বাঙ্গলার জল একটা সার্থকতা উপলব্ধি করিতে লাগিল।

পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে আমাদের দেশে একটা প্রাণহীন জ্ঞানের আবির্ভাব হইয়াছিল! এই মুখস্থ করা জ্ঞানের ক্ষমতা ছিল অল্প, কিন্তু আড়ম্বর ও অহঙ্কার ছিল প্রচুর। এই জ্ঞানে যাঁহারা জ্ঞানী, তাঁহারা সব জিনিষ সেই জ্ঞানের তুলাদণ্ড লইয়া মাপিতে বসিতেন। তাঁহারা ছিলেন অঙ্কশাস্ত্রের শাস্ত্রী, সব জিনিষ লইয়া অঙ্ক কষিতে বসিতেন। কিন্তু প্রাণের যে বন্যা, সে ত আর অঙ্কশাস্ত্র মানিয়া চলে না, সে যে সকল মাপকাঠি ভাসাইয়া লইয়া যায়। এই প্রাণের বন্যা স্বদেশীর আন্দোলনে দেখা দিয়াছিল, একটা ঝড়ের মত সে বহিয়া আসিয়াছিল, একটা প্রবল বন্যায় সে বাঙ্গালীকে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছিল। প্রাণ যখন জাগে, তখন ত সে হিসাব করিয়া জাগে না। মানুষ যখন জন্মায়, তখন সে হিসাব করিয়া জন্মায় না। অথবা সে না জন্মাইয়া পারে না বলিয়াই জন্মায়। প্রাণও সেইরূপ না জাগিয়া থাকিতে পারে না বলিয়াই কোন্ এক শুভ মুহূর্ত্তে জাগিয়া উঠে। সে জাগরণ হয় অকস্মাৎ এক নূতন আলোকে এক নূতন জ্ঞানের স্ফুরণে। এই স্বদেশী আন্দোলনের বন্যায় বাঙ্গালীরও হইল তাহাই, সেই বন্যা বাঙ্গালীকে ভাসাইয়া ডুবাইয়া বাঁচাইয়া দিল। বাঙ্গালী তখন তাহার যে জীবন্ত প্রাণ, তাহার সাক্ষাৎ লাভ করিল। বাঙ্গালার প্রাণে প্রাণে আবহমানকাল হইতে যে সভ্যতা ও সাধনার স্রোত অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত বহিয়া আসিয়াছে, তাহাতেই বান ডাকিল এবং সেই স্রোতস্বিনীতে অবগাহন করিয়া বাঙ্গালী ধন্য হইল। বাঙ্গালার যে ইতিহাসের কথা তাহার কতকটা সে বুঝিতে পারিল। বৌদ্ধের বুদ্ধ, শৈবের শিব, শাক্তের শক্তি ও বৈষ্ণবের ভক্তি সবই তখন বাঙ্গালীর চক্ষুর সম্মুখে প্রতিভাত হইল। চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির গানের অর্থ সে বুঝিতে শিখিল। মহাপ্রভুর জীবনগৌরব বাঙ্গালীর প্রাণের গৌরব বাড়াইয়া দিল। জ্ঞানদাসের গান, গোবিন্দদাসের গান, লোচনদাসের গান, সবই যেন একসঙ্গে সাড়া দিয়া উঠিল। রামপ্রসাদের সাধন সঙ্গীত তাহার হৃদয়ে ঝঙ্কার দিতে লাগিল। তখন বাঙ্গালী বুঝিল রামমোহনের তপস্যার নিগূঢ় অর্থ কি। তখন সে বঙ্কিমের সেই ধ্যানের মূর্ত্তি দেখিয়া চিনিতে পারিল, তখনই সে বলিতে শিখিল—

"তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম্ম
তুমি হৃদি তুমি মর্ম্ম,
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে।
বাহুতে তুমি মা শক্তি
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি
তোমারি প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে।"

বঙ্কিমের এই গান তখন বাঙ্গালীর "কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল।" বাঙ্গালী তখন বুঝিল রামকৃষ্ণের সাধনা কি, সিদ্ধি কোথায়। বুঝিল, কেশবচন্দ্র কাহার ডাক শুনিয়া ধর্ম্মের তর্করাজ্য ছাড়িয়া মর্ম্মের রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তখন সে বুঝিল বিবেকানন্দের

বাণীতে কেন প্রাণ এত ভরিয়া উঠে। তখন সে বুঝিল বাঙ্গালী হিন্দু হউক, মুসলমান হউক, খৃষ্টান হউক, বাঙ্গালী বাঙ্গালী। তখন সে বুঝিল বাঙ্গালীর একটা বিশিষ্ট রূপ আছে, একটা বিশিষ্ট প্রকৃতি আছে, একটা বিশিষ্ট ধর্ম্ম আছে, একটা স্বতন্ত্র সভ্যতা আছে। সে বুঝিল, এই জগতের মাঝে বাঙ্গালীর একটা স্থান আছে, একটা অধিকার আছে, একটা সাধনা আছে, একটা কর্ত্তব্য আছে। বাঙ্গালী তখন চেতনা লাভ করিয়া ধন্য হইল। সে বুঝিল, বাঙ্গালীকে প্রকৃত বাঙ্গালী হইতে হইবে। বিশ্ব বিধাতার যে অনন্ত বিচিত্র সৃষ্টি, বাঙ্গালী সেই সৃষ্টি স্রোতের মধ্যে এক বিশিষ্ট সৃষ্টি। অনন্তরূপ লীলাধারের রূপ বৈচিত্র্যের মধ্যে বাঙ্গালী একটি বিশিষ্ট রূপ লইয়া ফুটিয়াছে। বাঙ্গালী তখন জ্ঞানের আভাস পাইল, তখনই তাহার নব জন্ম, নব দীক্ষা দেখা দিল। স্রষ্টার অখণ্ড রূপের রাজ্যে বাঙ্গলার একটি অপূর্ব্ব রূপের মূর্ত্তি, বাঙ্গালী সেই রূপ শতদলের এক একটি বিশিষ্ট দল। তখনই নিজের রূপ উপলব্ধি করিয়া বাঙ্গালী জাগিল, জাগিয়াই মায়ের বিশ্বরূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইল, সেই রূপের হিল্লোলে তাহার জীবন ভাসিয়া গেল, তখনই সে বুঝিল তাহার জাতীয় জীবনের উদ্বোধন দেখা দিয়াছে। এ উদ্বোধন ধ্যানের সামগ্রী, তপস্যার চরম ফল, জীবনের মাহেন্দ্রক্ষণে এইরূপ উদ্বোধন ঘটিয়া থাকে। বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে তাহাই হইয়াছে।

গৌড়ীয় শিল্পের একটী অধ্যায়

— প্রবন্ধ —

ডাঃ গুরুদাস রায় পি-এইচ-ডি

পরলোকগত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট হইতে মূর্ত্তি বিষয়ক গবেষণার জন্য আমি কতকগুলি লেখা কাগজ ও কয়েকখানি ছবি পাইয়াছিলাম—তাহা হইতে সঙ্কলন ও গবেষণা করিয়া এই প্রবন্ধটী আমি পাঠকবর্গকে উপহার দিলাম।

শতাব্দীব্যাপী বিপুল চাঞ্চল্যের পরে গৌড় রাজলক্ষ্মী পালকুলাবতংস প্রথম মহীপাল দেবের কর গ্রহণ করিয়া স্থির হইলেন—মুহূর্ত্তের মধ্যে শতবর্ষের দারুণ অবসাদ বিদূরিত হইল—ব্রহ্মপুত্র হইতে শোণ নদের তীর এবং হিমাদ্রির পাদমূল হইতে দক্ষিণ সমুদ্রের বেলাভূমি পর্য্যন্ত সমগ্র ভূভাগ পুনর্ব্বার পাল রাজবংশের অধীনতা স্বীকার করিল। গুর্জ্জরের অধিকার নিমেষে সুদূর প্রয়াগ পর্য্যন্ত অপসারিত হইল—অনধিকারী কাম্বোজ পালরাজের পিতৃভূমি হইতে দূরীভূত হইয়া প্রজাপুঞ্জের মধ্যে আশ্রয় লাভ করিল এবং বিক্রমপুরের চন্দ্রবংশীয় রাজা—মহীপালের অধীনতা স্বীকার করিয়া আত্মরক্ষায় সমর্থ হইলেন।

দশম শতকের প্রথম পাদে গৌড়ীয় শিল্পে যে অবসাদ আসিয়াছিল, দ্বিতীয় পাদে তাহা ক্রমশঃ লুপ্ত হইতেছিল, কিন্তু তৃতীয় পাদে তাহার পরিবর্ত্তে নবযৌবনাঙ্কুরে তাহা নব কলেবর গ্রহণ করিয়াছিল। দশম শতকের শেষভাগে নবজীবন লাভ করিয়া গৌড়ীয় শিল্প যে আকার গ্রহণ করিল তাহা শিল্পের ব্যাপ্তির ইতিহাসে নূতন। নবজাত গৌড়ীয় শিল্পের ইতিহাসে এই নবজীবনের যুগ ক্রমবিকাশের দ্বিতীয় গৌরবময় যুগ। এই যুগে গৌড়ীয় শিল্প মগধ হইতে ব্রহ্মপুত্র তীর পর্য্যন্ত সমস্ত প্রদেশের প্রাদেশিক আদর্শ একত্র করিয়া শিল্পাদর্শের এক অপূর্ব্ব সমন্বয় সাধন করিয়াছিল, সেরূপ সমন্বয় ভারতের সুদীর্ঘ শিল্পেতিহাসেও অতীব বিরল। দশম শতকের শেষপাদ হইতে দ্বাদশ শতকের প্রথম পাদ পর্য্যন্ত গৌড়ীয় সাম্রাজ্যের ভিন্ন প্রদেশের শিল্পাদর্শের প্রদেশগত পার্থক্য লুপ্ত হইয়াছিল, প্রাদেশিকতা বর্জ্জন গৌড়ীয় শিল্পের নবজীবনের প্রধান লক্ষণ।

ত্রিপুরা জেলার বাঘাউরা গ্রামের বিষ্ণুমূর্ত্তি, ঢাকা

জেলার বজ্রযোগিনী গ্রামের মৎস্যাবতার—, দিনাজপুর জেলায়—বাণগড়ের বিষ্ণুমূর্ত্তি, মুর্শিদাবাদ নগরের নাককাটিতলার—বিষ্ণুমূর্ত্তি, মুঙ্গেরের কষ্টহারিণী ঘাটের—বিষ্ণুমূর্ত্তি বুদ্ধগয়ায় মহীপালের একাদশ রাজ্যাঙ্কের—বুদ্ধমূর্ত্তি, নালান্দায়—বৃহৎ বরাহমূর্ত্তি ও গোরক্ষপুরের—বিষ্ণুমূর্ত্তি সমস্তই যেন একই শিল্পীর শ্রীমূর্ত্তি রচনার নিদর্শন।

গৌড়ীয় সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের কঙ্কাল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড প্রমাণ একত্র যোজনা করিয়া সংগৃহীত হইতেছে, কিন্তু বিশাল গৌড়ীয় শিল্পের ইতিহাসের ছায়ামাত্র উপলব্ধ হইয়াছে, সে শিল্পের ক্রমবিকাশের লিপিবদ্ধ ইতিহাস কোনও কালে আবিষ্কৃত হইবে বলিয়া বোধ হয় না। সুতরাং কিরূপে গোরক্ষপুর হইতে ত্রিপুরা পর্য্যন্ত বিস্তৃত প্রাচ্যভূমিতে শিল্পাদর্শের সমন্বয় সাধিত হইয়াছিল তাহা কোনও দিন জানিতে পারা যাইবে কিনা সন্দেহ। আবিষ্কৃত শিল্প নিদর্শন হইতে বর্ত্তমানে আমরা এই মাত্র বুঝিতে পারিতেছি যে গৌড়, মগধ ও অযোধ্যক শিল্পী একই প্রণালী অনুসারে এবং শিল্পের একই আদর্শ অনুসরণ করিয়া শ্রীমূর্ত্তি রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল। গৌড়ীয় শিল্পের নবযুগ দশম শতকের শেষপাদ হইতে একাদশ শতকের শেষ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই যুগের অদ্যাবধি আবিষ্কৃত শিল্প নিদর্শন শিলালেখ অনুসারে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে এই যুগে প্রাদেশিক আদর্শ সমন্বয় ব্যতীত গৌড়ীয় শিল্পে প্রভূত পরিবর্ত্তন হইয়াছিল :—

(ক) গৌড়ীয় রাষ্ট্রে ভাগবত বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রাধান্যলাভ ও সঙ্গে সঙ্গে সাম্রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে শত শত চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি নির্ম্মাণ। গৌড়ীয় শিল্পের ইতিহাসের প্রথম যুগে বৈষ্ণব এমন কি হিন্দুমূর্ত্তি অতীব বিরল। এই যুগে বৌদ্ধ মূর্ত্তির সংখ্যার আধিক্য হইতে স্পষ্ট প্রমাণ হইয়াছে যে, মগধে গৌড়ে ও বঙ্গে ব্রাহ্মণ্য বা হিন্দুধর্ম্ম অপেক্ষা বৌদ্ধধর্ম্ম অধিকতর প্রবল ছিল।

(খ) দশম শতকের শেষপাদ হইতে বৌদ্ধধর্ম্মের দ্রুত অবনতি—কেবল লেখযুক্ত মূর্ত্তি হইতেই বুঝিতে পারা যায়। এই যুগে বুদ্ধগয়া বা মহাবোধি এবং নালান্দা প্রমুখ বৌদ্ধতীর্থ ব্যতীত অন্যত্র আবিষ্কৃত বৌদ্ধমূর্ত্তি অত্যন্ত বিরল।

(গ) গৌড়ীয় শিল্পের নবযুগে গৌড়ীয় রাষ্ট্রের সর্ব্ব দিগম্বর জৈনধর্ম্মের অভ্যুত্থানের কথঞ্চিৎ পরিচয় আবিষ্কৃ শিল্প নিদর্শন হইতে পাওয়া গিয়াছে। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ কর্ত্তৃক রাজগৃহের জৈনমন্দির সমূ আবিষ্কৃত সুন্দরতর জৈনমূর্ত্তিগুলি এবং রাজসাহী, বর্দ্ধমা বাঁকুড়া ও মানভূম জিলার অধিকাংশ জৈন দিগম্বর মূ গৌড়ীয় শিল্পের নবজীবন যুগের শিল্প নিদর্শন।

(ঘ) বৌদ্ধ ধর্ম্মের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণ্য বা হি ধর্ম্মের সকল সম্প্রদায় উন্নতিলাভ করিয়াছিল ; কিন্তু কেম করিয়া করিয়াছিল—তাহার ইতিহাস এখনও অজ্ঞাত প্রবল প্রতাপান্বিত প্রথম মহীপালদেব যখন আর্য্যাবর্ত্তে প্রাচ্য ভূখণ্ডের একচ্ছত্র অধীশ্বর,—পরমেশ্বর পরমসৌগ গৌড়েশ্বর যখন বৌদ্ধধর্ম্মের পবিত্র আর্যমহাস্থানে ত্রিরত্নে সৌধমালা সংস্কারে—অজস্র অর্থব্যয় করিতেছেন, তখ রাজশক্তির সহায়ের অভাবে ব্রাহ্মণ্য বা হিন্দুধর্ম্ম কিরূ পালরাজবংশের কুলধর্ম্মকে ধীরে ধীরে নিষ্প্রভ করি গৌড়ীয় রাষ্ট্রের সর্ব্বত্র স্বাধিকার বিস্তার করিয়াছি তাহার ইতিহাস চমৎকার হইলেও অদ্যাবধি সম্পূর্ণরূ অজ্ঞাত।

(ঙ) গৌড়ীয় রাষ্ট্রে বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে শিল্পোৎকর্ষের কেন্দ্র, বৌদ্ধধর্ম্মের কেন্দ্র মগধ হইতে অপ সারিত হইয়া পালরাজ্যের রাষ্ট্রীয় কেন্দ্র বরেন্দ্রভূমিতে আনীত হইয়াছিল।

(চ) দশম শতকের শেষপাদ হইতে গৌড়ীয় শিল্পে শিল্পীর ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা শিল্পশাস্ত্রের দৃঢ়বন্ধনে আব হইয়া সঙ্কীর্ণতর সীমার মধ্যে সংযত হইয়াছিল।

দশম শতকে শিল্পোৎকর্ষের কেন্দ্র যে মগধ হইতে অপসারিত হইয়া বরেন্দ্রভূমিতে আনীত হইয়াছিল তাহা প্রকৃষ্ট প্রমাণ বাণগড়ে আবিষ্কৃত চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি, পর লোকগত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বেঙ্কট নটেশ আয়ার ইহা বাণগ হইতে কলিকাতার সরকারী চিত্রশালার জন্য সংগ্রহ করিয় আনিয়াছিলেন (I. M. No N. S. 2245)। এই বিষ্ণু মূর্ত্তিটির সহিত এই প্রবন্ধে যতগুলি বিষ্ণুমূর্ত্তি উল্লে করা হইল, তাহা তুলনা করিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে আদর্শের সমন্বয় এবং শিল্পশাস্ত্রের [illegible]

শিল্পীর রচনা অন্যান্য প্রাদেশিক শিল্পী অপেক্ষা অধিকতর শ্রীসম্পন্ন :—

(১) কুমিল্লা জেলার বাঘাউরা গ্রামে আবিষ্কৃত—প্রথম মহীপাল দেবের তৃতীয় রাজ্যাঙ্কে প্রতিষ্ঠিত বিষ্ণুমূর্ত্তি।

(২) সুন্দরবনে চব্বিশ পরগণা জেলার চরে আবিষ্কৃত বিষ্ণুমূর্ত্তি (I. M. No. Sn. 1) ইহা শ্রীযুক্ত জে, এইচ রাইলি (J. H. Reily) কর্ত্তৃক ২৫শে জানুয়ারী ১৮৭৭ খৃঃ অঃ কলিকাতায় সরকারী চিত্রশালায় প্রদত্ত হইয়াছিল।

(৩) গোরক্ষপুর নগরের উপকণ্ঠে আবিষ্কৃত বিষ্ণুমূর্ত্তি; প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সর্ব্বাধ্যক্ষ সার জন মার্শাল এই মূর্ত্তিটি দেখিয়া মনে করিয়াছিলেন যে, ইহা প্রাচীন গুপ্ত যুগের শিল্প নিদর্শন এবং

(৪) বাণগড়ের বিষ্ণুমূর্ত্তি।

এই চারিটীর মধ্যে বাণগড়ের মূর্ত্তিটী যে সর্ব্বোচ্চ শিল্পোৎকর্ষের পরিচায়ক সে-বিষয়ে কোনই সন্দেহ থাকিতে পারে না।

হিন্দু ও বৌদ্ধ-মূর্ত্তি একত্র মিলাইয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে গৌড়ীয় রাষ্ট্রের সর্ব্বত্র শিল্পাদর্শের সমন্বয় সাধিত হইয়াছিল। দেবতার মূর্ত্তি মানুষের মূর্ত্তি, একের অধিক মস্তক বা দুইএর অধিক হস্ত যোজনা করিলে শিল্পাদর্শের বিকৃতি হয় না, গৌড়ীয় শিল্পের—নবজীবনের যুগে—সর্ব্ব জাতীয় সর্ব্বধর্ম্মের মানবমূর্ত্তি তুলনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, কেমন গৌড়ীয় রাষ্ট্রের সর্ব্বপ্রদেশে শিল্পাদর্শের সমন্বয় সাধিত হইয়াছিল। ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব্বতীরে অবস্থিত কুমিল্লা জেলার বাঘাউরা গ্রামে অবিষ্কৃত বিষ্ণুমূর্ত্তি দণ্ডায়মান পুরুষমূর্ত্তি। নালান্দার মহাবিহারের দ্বারফলকের শিলালেখ হইতে জানিতে পারা গিয়াছে যে এই মহা বিহার অগ্নিদাহের পরে প্রথম মহীপাল দেবের একাদশ রাজ্যাঙ্কে পুনর্নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই শিলালেখের উপরে কৃত্রিম লতাবিতানের (Arabesque) একটী দণ্ডায়মান পুরুষমূর্ত্তি আছে। সুন্দরবনের, গোরখপুরের এবং বাণগড়ের দণ্ডায়মান পুরুষ মূর্ত্তি। গৌড়ের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে আবিষ্কৃত এবং বর্ত্তমান কালে কলিকাতার সরকারী চিত্রশালায় রক্ষিত সূর্য্যমূর্ত্তিটীও (I. M, Ms, 8) দণ্ডায়মান পুরুষমূর্ত্তি। ঢাকার বজ্রযোগিনীর মৎস্যাবতারের মূর্ত্তি, নালান্দার তথাকথিত নাগার্জ্জুন মূর্ত্তি, বিহার ও উদণ্ডপুরের বজ্রপাণি মূর্ত্তি (I. M. No 3785), মালদহে আবিষ্কৃত এবং বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষদের সংগ্রহ শালায় রক্ষিত স্থিরচক্রমূর্ত্তি (B. S. P. No. C (d) 8, কুচবিহারের মঞ্জুশ্রী মূর্ত্তি (I. M. No Kr 10) বুদ্ধ গয়ার অষ্টভুজ মঞ্জুশ্রী (I. M. No 6271) সমস্তই উপবিষ্ট পুরুষমূর্ত্তি, ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের এই সমস্ত দণ্ডায়মান ও উপবিষ্ট মনুষ্য মূর্ত্তি তুলনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, শ্রীমূর্ত্তির কল্পনায় গৌড়ীয় রাষ্ট্রের সর্ব্বপ্রদেশের শিল্পী সুন্দর মানবের যে মূর্ত্তি আদর্শ করিয়া লইয়াছিল তাহা সর্ব্বত্রই এক। অথচ প্রত্যেক মূর্ত্তিতে ভিন্ন ভিন্ন শিল্পীর ব্যক্তিগত প্রভাব আছে, ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মের আবশ্যকমত মূর্ত্তিগত পার্থক্য আছে এবং কিয়ৎ পরিমাণে আনুষঙ্গিক ও পারিপার্শ্বিক মূর্ত্তি ও বস্তুতে প্রাদেশিকতা আছে।

শিল্পাদর্শের এই প্রদেশ বিস্তৃত সমন্বয়ে গৌড়ীয় শিল্প নব-জীবনের যুগে যে শক্তি সঞ্চয় করিয়াছিল তাহার ফলে গৌড়ীয় রাষ্ট্রের বহির্দেশেও শিল্পিগণ গৌড়ীয় শিল্পাচার্য্যের নিকট ভক্তিভরে মস্তক অবনত করিতে বাধ্য হইয়াছিল। বারানসী পাল সাম্রাজ্যভুক্ত হইলেও সমগ্র কোশল দশম বা একাদশ শতকে পালরাজের অধীনতা স্বীকার করে নাই; অথচ গোরখপুর ও গণ্ডা জেলার গ্রামে গ্রামে রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত দয়ারাম সাহনি গৌড়ীয় শিল্পীর রচিত শিল্প নিদর্শন আবিষ্কার করিয়াছেন। অর্দ্ধশতাব্দীপূর্ব্বে প্রাচীন বৌদ্ধতীর্থ শ্রাবস্তীর ধ্বংসাবশেষ খনন-কালে স্বর্গগত ডাক্তার হোই (Dr. W. Hoey. I C.S.) গৌড়ীয় শিল্পের নব-জীবনের যুগের যে দুটি শ্রীমূর্ত্তি আবিষ্কার করিয়াছিলেন তাহা এখনও লক্ষ্ণৌর সরকারী চিত্রশিলায় রক্ষিত আছে। ৺রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় গর্জ্জর গুর্জ্জর প্রতিহারের রাজধানী প্রাচীন কান্যকুব্জ নগরের ধ্বংসাবশেষ মধ্যেও গৌড়ীয় শিল্প রচিতশ্রীমূর্ত্তি আবিষ্কার করিয়াছেন। মহাযান বৌদ্ধধর্ম্মে বর্দ্ধিত মাথুরক শিল্পনিদর্শন যেমন খৃষ্টাব্দের শতকে পূর্ব্বে রাজগৃহ ও বুদ্ধগয়া, দক্ষিণে বিদিশা ও সাঞ্চী এবং পশ্চিমে মরুপারে সিন্ধু দেশে

সাদরে নীত হইত, সেইরূপ দশম শতকের শেষপাদে ও একাদশ শতকে গৌড়ীয় শিল্পের নবজীবনের যুগে গৌড়ীয় শিল্পনিদর্শন সাদরে মধ্যদেশের সর্ব্বত্র গৃহীত হইত।

নবজীবনের যুগে গৌড়ীয় শিল্পের প্রধান লক্ষণ সাম্য, দৈহিক আকারের অনুপাত, পারিপার্শ্বিক ও আনুষঙ্গিক মূর্ত্তি ও বস্তুর অনুপাতে সর্ব্বত্র সাম্য গৌড়ীয় শিল্পের নব-যুগের প্রধান লক্ষণ। শ্রীমূর্ত্তি গঠন করিতে হইলে ধ্যান বলে যে জম্ভল ক্ষুদ্রাকায় স্থূলকায় ও লম্বোদর শিল্পশাস্ত্র বলে যে, মূর্ত্তির দেহলব্ধ অঙ্গুলীব এই পরিমাণ সর্ব্বাঙ্গের আকার হইবে। গৌড়ীয় শিল্পের প্রথম যুগের শিল্পী পর্য্যন্ত সকলেই দু-চারি-দশটা জম্ভলের মূর্ত্তি রাখিয়া দিয়াছে। প্রথম যুগের শিল্পী প্রকৃতিকে আদর্শ করিয়া যে নিখুঁত স্থূলকায় লম্বোদর মূর্ত্তি গড়িয়া গিয়াছে নবজীবনের যুগের শিল্পী তালমানের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হইয়া তাহা পারে নাই বটে; কিন্তু সে সাম্যের বলে জম্ভলের মূর্ত্তির যে নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছে শিল্পোৎকর্ষের হিসাবে তাহার স্থান কুচবিহারে জম্ভল মূর্ত্তির (I. M, No, Kr, 1) অব্যবহিত পরে (I. M, No 3911)।

গৌড়ীয় শিল্পের ইতিহাস লিখিতে গিয়া কেহ কেহ এককালে বৌদ্ধ শিল্প, হিন্দু শিল্প, ও জৈন শিল্প স্বতন্ত্র করিতে গিয়াছেন; কিন্তু বর্ত্তমানে তাঁহাদের অনুমান মিথ্যা প্রমাণ হইয়াছে। মালদহের স্থিরচক্র, বুদ্ধগয়ার মঞ্জুশ্রী, গৌড়ের সূর্য্য ও বাণগড়ের বিষ্ণু যে শিল্পশাস্ত্র অনুসারে একই রীতির মূর্ত্তি, একথা যাহারা ভাস্কর তাহারা দৃষ্টি মাত্র স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন।

প্রথম মহীপালদেবের রাজ্যের প্রারম্ভে গৌড়ীয় শিল্প নবজীবন লাভ করিয়া কি কি লক্ষণোপেত হইয়াছিল তাহা সংক্ষেপে জানিয়া রাখা উচিত :—

(ক) দেবমূর্ত্তি—অর্থাৎ মনুষ্য মূর্ত্তিমাত্রেই নাতি-দীর্ঘ নাতিস্থূল ও ক্ষামধ্য।

(খ) অস্বাভাবিক অবয়ব সংযোজনের ফলেও শিল্পী মানবদেহের স্বাভাবিকতার—ব্যতিক্রম হইতে দেয় নাই। নালান্দার দ্বিভুজ নাগার্জ্জুন এবং বুদ্ধগয়ার অষ্টভুজ মঞ্জুশ্রীতে আকারগত বিশেষ পার্থক্য নাই।

(গ) শাস্ত্রের বর্ণনা অনুসারে গৌড়ীয় শিল্পী এই যুগে সর্ব্বপ্রথমে 'ললিতাক্ষেপ', 'মহারাজলীলা' প্রভৃতি বক্র, ভঙ্গ, দ্বিভঙ্গ, ত্রিভঙ্গ অনুভঙ্গ, অতি ভঙ্গ প্রভৃতি চারু ললিত দেহসংস্থানের উদাহরণ দিয়াছেন। পরবর্ত্তী-যুগে এই সমস্ত অনুবন্ধ অত্যধিক অনুসরণের জন্য শ্রীমূর্ত্তিকে বিকটাকার করিয়া তুলিয়াছিল।

দেশবাসীর প্রতি রবীন্দ্রনাথের আবেদন

শান্তিনিকেতন, ২২শে সেপ্টেম্বর

কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দেশবাসীর উদ্দেশ্যে নিম্নোক্ত আবেদন প্রচার করিয়াছেন :—"দেশবাসিগণকে আমি এই আবেদন জানাইতেছি যে, তাঁহারা যে তাঁহাদের চতুস্পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চল হইতে সর্ব্ববিধ অস্পৃশ্যতা পাপের সমূল উচ্ছেদ সাধনে বদ্ধপরিকর, আর মুহূর্ত্ত মাত্রও কালক্ষেপ না করিয়া তাহা সপ্রমাণ করুন। অবিলম্বে এবং সার্ব্বজনীনভাবে অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে এই আন্দোলন চারিদিকে ছড়াইয়া দিতে হইবে। এই আন্দোলনের অন্তর্নিহিত মনোভাবের অভিব্যক্তিকে সুস্পষ্ট এবং সুদৃঢ় করিয়া তুলিতে হইবে। এতদ্দেশের কোন কোন সম্প্রদায় যে সকল হীনতা ও অক্ষমতার চাপে নিষ্পেষিত হইতেছে আত্মত্যাগ ও বীরত্ব প্রভাবে অবিলম্বে ঐ সকল বিদূরিত করিতে হইবে। আজ ভারতের সম্মুখে যে বিষম বিপদাশঙ্কা সমুপস্থিত, ঐ বিপদের গ্রাস হইতে দেশকে রক্ষা করিবার কর্ত্তব্য সম্পাদনে এই সঙ্কট মুহূর্ত্তে যাহারা পশ্চাৎপদ হইবে,—দেশকে তথা সমগ্র জগতকে এক দুর্নিবার দুর্দ্দৈবের কবলে নিক্ষেপ করিবার দায়িত্ব তাহাদের স্কন্ধেই আরোপিত হইবে।
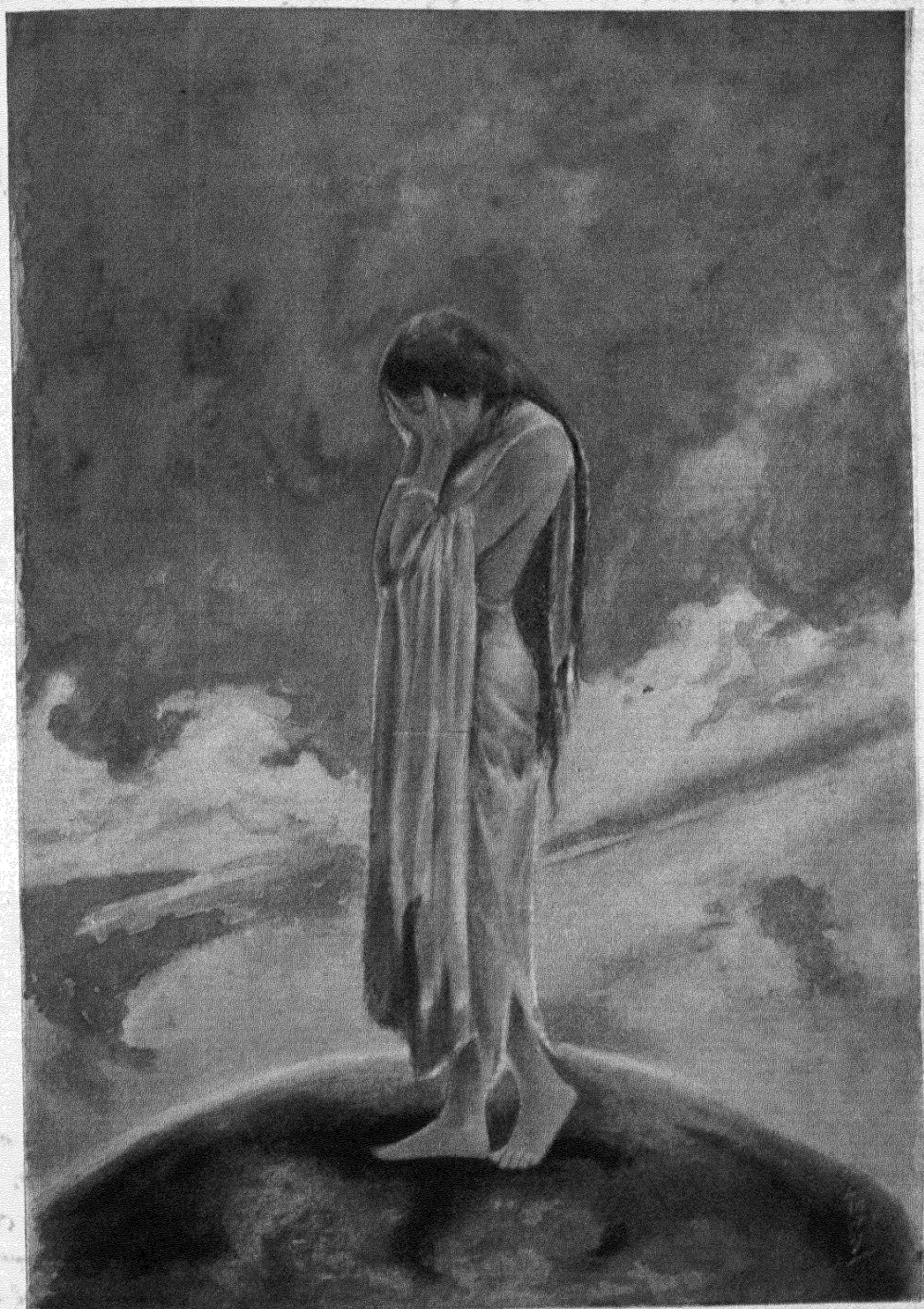
কেন গো মা তো'র নয়নে অশ্রু।
কেন গো মা তো'র ছিন্নকো।

শিল্পী—শ্রীবিনয় বসু।

লক্ষ্মীবিলাস প্রেস লিমিটেড।

শরৎ-বন্দনা

শ্রীকালিদাস রায়

নাটমঞ্চে পাঠমঞ্চে নগরের সভামঞ্চমাঝে,
আচার্য্য বক্তা বা নট—কোন সাজে দৃপ্ত আড়ম্বরে,
কোন দিন তারস্বরে তুমি গুণি, করনি প্রচার
তোমার জীবন-বাণী. গুরু সেজে লোকশিক্ষাভার
কোনদিন লও নাই, দ্বন্দ্বযুদ্ধে করনি আহ্বান,
জটিল বাদানুবাদে। সমস্যার দ্বন্দ্ব সমাধান
তোমার নহেক ব্রত। প্রচারিতে কোন তত্ত্ব গূঢ়
নীরস গম্ভীর কণ্ঠে বলনিক "শোন যত মূঢ়—"

রসের সাধক তুমি রসাবেশে আত্ম-সমাহিত,
পল্লীবট ছায়াতলে বিতরেছ শুধু কথামৃত,
দেশের প্রাণের বাণী মর্ম্মরসে করিয়া সরস,
সঞ্চার করেছ তুমি লোকাতীত অপূর্ব্ব হরষ,
আমাদের প্রাণে প্রাণে, নিভৃতে নীরবে অবিরল,
মুগ্ধ চিত্ত বিগলিয়া নয়নে ঝরেছে অশ্রুজল,
এ জন্ম বাসরে তব, কত ঘটা কত আড়ম্বরে
কতজন তোমা আজি নগরের সভামঞ্চে ব'রে
কত গীতি কত স্তুতি জয়ধ্বনি প্রশস্তি বচনে।
ইন্দ্রনাথ শ্রীকান্তেরে মোর শুধু পড়ে আজি মনে?
আমি তব পল্লী-শিষ্য,—কি বলিতে কি বলিব হায়,
নীরবে নিভৃতে শুধু একটি প্রণাম করি পায়।

গান

কুমারী লতিকা মুখোপাধ্যায়

কে তুমি বাজাও বাঁশী
মন মজানো,
বাঁশীর ছলে, রাধা বলে
সুধা মাখানো,
—প্রাণ কাঁদান!
চারিদিকে ফিরিয়া,
আঁখি ফিরে খুঁজিয়া;
এস হে দয়াল,
ভরি মোর নয়ান।

গান

শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু

যাব কি যাব না যমুনায়
সখি, তাই ভাবি মনে।

ভাবনা না হ'তে শেষ
গিয়ে পড়ি কিনারায়,
সখি, যমুনারি কিনারায়
জানিনে কেমনে!
কি জানি কিসেরি টানে
প্রাণমন সদা টানে
চরণ মানা না মানে
করি কি উপায়।
যমুনারি কালজলে,
কি যে বলে কলকলে,
শুনে মোর তনু টলে
ঝাঁপ দিতে চায়।

গান

শ্রীরাসবিহারী মল্লিক

কোন্ সাগরের পার হতে আজ
এলে অতিথি;
কণ্ঠে তোমার নন্দিত কি
শ্যামলা গীতি

• • • •

ফুল্ সুখে হাস্‌চে ধরা
বাতাস আজি সুবাস ভরা
রঙিন-আলোয়-আলোয়-আলো
কানন বীথি

• • • •

শুনে তোমার হাসির বাঁশী
অশ্রু হ'ল বনবাসী
আজ কি তবে আস্‌বে আমার
চাঁদিনী-তিথি?

পুষ্পপাত্র

শ্রীনীরবালা মিত্র

সুনির্ম্মল দেহখানি তব বুকে বহ পবিত্র সম্ভার,
"পুষ্প" স্মৃতি জাগায়ে রাখিতে "পুষ্পপাত্র" জনম তোমার।
দেবতার প্রীতি অর্ঘ্যভারে দেহ তব পবিত্র মধুর,
ক্ষুদ্র হৃদয়খানি "তার" (ছিল) মধুর হতেও সুমধুর।
তোমার বুকে "তার" হাসিটুকু, হারাণো "মেয়ে"র
স্মৃতি-সুধা গান,
উন্নতি তোমার দেখিয়া নয়নে, আনন্দে ভরিত "তাঁহার"
প্রাণ।
"পুষ্পে"র স্মৃতি সৌরভ তুমি, চির আরাধ্য "দেবতা"র প্রিয়,
"দেবের" আশীষ মাথায় লইয়া,চিরদিন প্রীতি বিলায়ে দিও।
সপ্তাহ তিন বিছানায় শুয়ে, তারি মাঝে হায় তোমার কথা,
"হলনা সাজান মহিলা সংখ্যা" বলিয়া পেলেন কতই ব্যথা।
স্মরিয়া ইষ্ট গুরুর চরণ, "দুঃখিনী"রে দিয়ে সান্ত্বনা বাণী,
"বাঁচায়ে রাখিও পুষ্পপাত্রে সবার স্নেহের পরশ দানি"।
বলিয়া চলিলে অমর ধামে, গুরুভার দিয়া আমার পরে,
হে চিরবাঞ্ছিত, তব শক্তি বিনা, দাসী কোনও কাজ
করিতে পারে?
ঘাত-প্রতিঘাতে ক্লান্ত দেহ, মন, তোমা বিনা সব হেরি যে
শূন্য,
দাও প্রেমময় স্বর্গীয় শকতি, তোমার ইচ্ছা করিতে পূর্ণ।

কণ্টকারী *

কাদের নওয়াজ বি-এ বি টি

কী ব্যথা তুই চাস্ হানিতে
বল্‌রে আমার কণ্টকারী,
তোর ইতিহাস লিখ্‌তে গেলেই
অশ্রু চোখে রুধ্‌তে নারি,
প্রথম দেখি তোর চেহারা
ভাবনু গোলাপ ফুলের চারা
তাই সেঁচিনু বুকের ধারা
নিঃশেষি মোর প্রাণের ঝারী
আজকেরে তুই কণ্টকারী
ডুকরে কাঁদি তাই নেহারি
রেখেছিলাম যত্নে তোরে
মোর হৃদয়ের কেয়ারীতে
ঢেলেছি হায় অশ্রু-সলিল
জল না পেলে দিল্-সরিতে
গেয়েছি গান নিতুই কত
ফুল্লমনে অবিরত
আশায় ভরা সেই তরী আজ
দুখের গাঙে দিচ্ছে পাড়ি।
কণ্টকারী মোর বুকেতেই
হান্‌ছে কাঁটা যন্ত্রণারি।
আজকে দেখি আপনা হতেই
নিলেম গলে কাঁটার মালা।
ঢেকেছি বুক বিষলতাতে
তাইত প্রাণে দারুণ জ্বালা
ছাড়িলে সে আর ছাড়ে না
কণ্টকারী ছল জানে না
জীবনেরি সব মাধুরী
হয় ত বা সে নেয় উজাড়ি
কণ্টকারী! তোর কাছে আজ
হার মেনেছি ফুল্-পূজারী।

* এক রকম কাঁটা গাছ।

বর্ষা

শ্রীযাদবেশ চন্দ্র মজুমদার

রিমি ঝিমি রিমি ঝিমি ঝরিছে ধারা,
হুহু করি বহে বায়ু পাগল পারা!
চিক্ চিক্ করি উঠে বাঁকা বিজুলী,
ঝিল্লী গাহিছে গান আপনা ভুলি।
অশনি উঠিছে ডাকি আকাশ মাঝে,
প্রকৃতি সাজিছে আজ করাল সাজে।
সন্ধ্যা নামি আসে ঐ আঁধার করি,
খেয়া পার শেষ করি ডুবিল তরী।
কাল মেঘ ছুটে চলে তিমির পানে,
বিজলি উজলি উঠি আঘাত হানে।
সে আঘাত লয় পায় আঁধার পাশে,
বজ্র গরজি উঠে প্রলয় ভাষে।
রিম্ ঝিম্ রিম্ ঝিম্ বাদল ঝরে,
আকাশ বাতাস কাঁদে কাহার তরে?
হা হা ক'রে ওঠে বায়ু, আপন হারা,
বরষা আকুলতানে কাঁদিয়া সারা।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মিত্র এম-এ

১

জাতীয়তা কি ?

১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে ইউরোপে এক নূতন যুগের সূত্রপাত হয়। তথাকার পুরাতন রাজ্যগুলি ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া গেলে, মধ্যবিত্ত শ্রেণী অভিজাতদের সহিত মিলিত হইয়া জাতীয়তা নাম দিয়া নূতন সভ্যতার সৃজন করে। এই জাতীয়তার কবি গেটে ও জাস্তে! উভয়েই খণ্ড ও ভগ্ন জার্ম্মাণি ও ইটালীকে অখণ্ড ও যুক্ত জার্ম্মাণি ও ইটালী দেশে পরিণত করিবার জন্য প্রাণপাত করিয়া যান। বিসমার্ক ও কাভুর এই যুগের বিজ্ঞ রাজনীতিক। ভন্ মল্টকে ও গ্যারিবল্ডী এই যুগের যুগ-নায়ক। ইউরোপে যখন নূতন সৃজন চলিতেছিল, তখন সেই যুগ-বার্ত্তা সুদূর প্রাচ্যেও আসিয়া পড়ে। জাপান খুব দ্রুততার সহিত তাহার পুরাতন প্রথাকে বিদায় করিয়া দিয়া নূতন তত্ত্বগুলিকে বরণ করিয়া লয়। ভারতবর্ষেও এই সমস্ত আন্দোলনের ঢেউ আসিয়া পড়ে। রাজা রামমোহন রায় ও ব্রাহ্মসমাজ সমাজকে নূতন আদর্শে স্থাপন করিবার চেষ্টা করেন। বাগ্মী সুরেন্দ্রনাথ ও ভারতকে মহাভারতে পরিণত করিবার জন্য অন্যান্য প্রদেশের কর্ম্মীদের সহিত সম্মিলিত হইয়া এক নূতন স্বপ্ন দেখিতে থাকেন। চীনেও এই আন্দোলনের ঢেউ গিয়া পড়ায় তথায় এক চাঞ্চল্য সুরু হয়। আরব, পারস্য ও মিশরের মুসলমান সমাজও এই আন্দোলনের তত্ত্ব অনুভব করিতে পারিয়াই যেন তাঁহারা সিয়া-সুন্নির কলহ নিবারণ করিয়া Pan Islamism বা সারা বিশ্বে এক নিখিল মুসলমান সমাজ প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য চেষ্টা করিতে থাকেন।

এই সমস্ত আন্দোলনের মূল কারণ অনুসন্ধান করিলেই জানিতে পারি যে উহা অর্থগত। ইংরাজ অর্থনৈতিক আডামস্মিথ ও রিকাডো জগতে প্রচার করেন যে অর্থই জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য। এই অর্থ প্রচুরভাবে অর্জ্জন করিতে গেলে কল-কারখানা প্রতিষ্ঠা করিবার প্রয়োজন। সনাতনী প্রথায় পণ্যদ্রব্য কুটীরে উৎপন্ন করিয়া ও তথা হইতে উহা সংগ্রহ করিয়া লইয়া জগতে বিক্রয় করিলে মুনাফা কখনই অসম্ভব রূপ বৃদ্ধি পাইতে পারে না। বিজ্ঞান ও ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করিতে আরম্ভ করায় অনেক প্রকার কল-কারখানার প্রতিষ্ঠা হইতে থাকে। এই সমস্ত কল-কারখানায় কাজ করিবার জন্য লোকের প্রয়োজন হইলে, কল-কারখানার মালিকগণ তখনকার জমিদার ও অভিজাতদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিয়া serfdom বা জমিগত কৃতদাস প্রথার উচ্ছেদ সাধন করে। Serfdom উঠিয়া গেলেই প্রচুর লোক মুক্তি-লাভ করিয়া কল-কারখানায় প্রবেশ করে, তখন হইতে

চিমনীগুলি শির উচ্চ করিয়া তুলিয়া অনবরত ধূম-নির্গমের সহিত প্রভূত পরিমাণে শিল্প-সম্ভার তৈয়ারী করিয়া চলিতে থাকে।

সনাতনী প্রথায় যে সমস্ত পণ্য দ্রব্য উৎপন্ন হইত তাহা সাধারণতঃ দুই প্রকার। এক প্রকার পণ্য খরিদ্দারদের নিকট হইতে অর্ডার লইয়া তাহাদের প্রয়োজনানুযায়ী তৈয়ারী হইত, উহা ঐ স্থলেই ব্যবহৃত হইয়া ধ্বংস প্রাপ্ত হইত। আর এক প্রকার পণ্য ব্যবসায়ীগণ কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়া দেশ-বিদেশে নীত হইয়া অনেকটা curio বা বিশেষ পণ্য হিসাবে বিদেশে বিক্রীত হইত। এইসময়কার শিল্প-সম্ভারের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে এই প্রতীতি জন্মে যে উহা কখনই চাহিদার অতিরিক্ত উৎপন্ন করা হইত না। তাহার পর তখনকার অর্ণব-পোত সমূহের পণ্য দ্রব্য বহন করিবার ক্ষমতাও খুবই অল্প ছিল। বাষ্পীয় শক্তির আবিষ্কারের সহিত পৃথিবীর ভাব ধারায় এক যুগান্তর উপস্থিত হয়। উহার সাহায্যে নূতন অর্ণব-পোত সমূহ নির্ম্মিত হওয়ায় বহু দূরবর্ত্তী স্থান সমূহও অতি নিকটবর্ত্তী হইয়া দাঁড়ায়। বহুদূরের পরিচিত জনমণ্ডলীর সহিত খুব ঘনিষ্টতা সূত্রে আবদ্ধ হইবার সুযোগ উপস্থিত হয়। শিল্প সম্ভারও কোন প্রকার চাহিদার জন্য অপেক্ষা না করিয়া উৎপন্ন করিয়া যাইবার জন্যই মালিকগণের জেদ আসিয়া দাঁড়ায়। ধর্ম্ম ও নৈতিক জীবনেও যুগান্তর আসিয়া উপস্থিত হয়। পূর্ব্বকার সনাতনী সমাজে অভিজাত ও পুরোহিত শ্রেণীগণ এক বিশেষ শ্রেণী ছিলেন। দেশের গণ্ডি অতিক্রম করিয়াও তাঁহাদের জাতিয়তা প্রসারিত হইত। নিম্ন-শ্রেণীগণ চিরকাল 'ছোটলোক' হিসাবে উচ্চ শ্রেণীদের পদতলে থাকিয়া কায়িক পরিশ্রম করিয়া যাইত। তাহাদের দুঃখময় জীবনে সুখের আবহাওয়া সৃজন করিবার জন্য পূজা-পার্ব্বন সৃষ্ট হইয়াছিল। এই সময়ে তাহাদিগকে ভাল পোষাকাদি ও ভাল খাবার ইত্যাদি প্রদান করিয়া তাহাদের যন্ত্রণার একটা ক্ষণিক লাঘব করা হইত মাত্র। শিক্ষা উচ্চশ্রেণীদের মধ্যে নিবদ্ধ ছিল। নিম্ন শ্রেণীগণ উচ্চশ্রেণীগণের নিকট হইতে যে সমস্ত মৌখিক উপদেশ পাই তাহাই তাহাদের পারলৌকিক জীবনের পক্ষে যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইত। দূর চিরকালই দূর থাকিত, কাজেই নূতনের অভিযান তখন কখনই দেখা যাইত না। একটা সনাতনী 'রুটীন' নেহাৎ পরিচিতের ন্যায় তাহাদিগকে পরিচালিত করিয়া যাইত। Slave mentality বা দাস মনোবৃত্তি এই যুগের চরম কীর্ত্তি, এবং সমাজের স্থিতিশীল ভাব এই যুগের ছিল চরম আরাধনার বস্তু। কবি, দার্শনিক, রাজনৈতিক কেহই পরিবর্ত্তনশীল জগতে পরিবর্ত্তন চাহিতেন না বা পরিবর্ত্তন করিবার ধারণা কল্পনায়ও আনিতে পারিতেন না। এইজন্যই বোধহয় ইংরাজ-সমাজে পোপ এবং আমাদের বাংলায় ভারতচন্দ্র মহাকবি বলিয়া পরিচিত হয়েন।

চাহিদার অতিরিক্ত মাল উৎপন্ন করিয়া যাইলেই উহা বিক্রয় করিবার জন্য বাজারের প্রয়োজন হয়। এই বাজার সৃজন করিবার জন্যই আডাম স্মিথ ও রিকার্ডো তাঁহাদের অর্থ-শাস্ত্র প্রণয়ন করেন। তাঁহারা ব্যক্ত করেন যে প্রকৃতি দেবী সমস্ত জাতিগুলিকেই একপ্রকার ঐশ্বর্য্য দিয়া সৃজন করেন নাই। কেহ বা উচ্চ পর্ব্বত-মালায় বিভূষিত, কেহ বা খর-গামী স্রোতস্বতীর মালিক। কোথায়ও বা প্রকৃতিদেবী বালুর স্তূপ রচনা করিয়া রাখিয়াছেন। কাজেই বিভিন্ন দেশের উৎপন্ন পণ্যও বিভিন্ন প্রকার। মানব-সমাজের সুখ-স্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধি করিতে গেলে এই সমস্ত পণ্যের দ্রুত ও বিশেষ বিনিময়ের প্রয়োজন। আফ্রিকার উট পক্ষীর পাখা তথায় প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গেলেও পরিধেয় বস্ত্র তাহাদের পক্ষেযথেষ্ট প্রয়োজনীয় হইলেও, উহা বিরল। এই উভয় দ্রব্যের পরস্পর বিনিময় হইয়া গেলে, ইউরোপ পরিধেয় বস্ত্র দিয়া তাহার সৌখীন-সমাজের জন্য উট-পাখীর পালক সংগ্রহ করিয়া আনিতে পারে। চা চীন ও জাপানের পণ্য-হিসাবে প্রচুর জন্মাইলেও, উহার প্রয়োজনীয়তা ইউরোপের নিকট কিছুই কম নহে। কাজেই ইউরোপের পশমের সহিত উহার বিনিময় হইলে উভয় দেশেরই যথেষ্ট মঙ্গল সংঘটিত হয়। আন্তর্জাতিক ব্যবসার প্রাণস্বরূপ সর্ব্বকার শুল্ক রহিত স্বাধীন-ব্যবসা প্রথা প্রচলন করিবার বার্ত্তা জগতে উপস্থিত হইলেই, ইউরোপের [illegible]

সম্প্রদায়গণ নানা প্রকার উপায়ে যৌথ কারবার ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করিয়া পৃথিবীর তাবৎ পণ্যেরই বিনিময় ও উৎপন্ন করিবার ভার গ্রহণ করে। এই যুগেই ইউরোপের রাষ্ট্রবিদ্‌গণ আফ্রিকা মহাদেশ তাঁহাদের মধ্যে ভাগ করিয়া লয়েন ও এশিয়া মহাদেশে পণ্য-বিক্রয়ের জন্য কূট রাজনীতি জাল বিস্তার করিয়া বহু পুরাতন রাজবংশ-গুলিকে দুর্ব্বল করিয়া তুলিতে থাকেন। চীনে ও জাপানে ইউরোপ-আমেরিকার বণিকগণ পদার্পণ করিয়াই তথায় আপনাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। আরব-পারশ্য আপনাদের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা করিয়া লইবার জন্য চেষ্টা করিতে থাকেন। ভারত ইংরাজ জাতির অধিকারভুক্ত হয়। শ্বেত জাতিদের মধ্যবিত্ত শ্রেণীগণ কলকারখানায় শ্রমজীবিদের খাটাইয়া লইয়া, তাহাদের জীবন-ধারণ উপযোগী অর্থ মাত্র দিয়া বিপুল বিত্ত সংগ্রহ করিতে থাকেন, কাজেই কালক্রমে তাহারা প্রবল হইয়া অভিজাতগণকে হটাইয়া দিয়া শাসনদণ্ড গ্রহণ করেন। মধ্যবিত্ত শ্রেণীগণ কর্ত্তৃক শাসনদণ্ড গ্রহণের নামই জাতীয়তা। যে দেশে মধ্যবিত্ত শ্রেণী কর্ত্তৃক শাসন পরিচালিত হইতে থাকে তাহাকেই Nationally independent বা স্বাধীন জাতির দেশ বলিয়া ঘোষণা করা হয়। সনাতনী ধর্ম্মকে নির্ব্বাসন করিয়া দিয়া জাতীয়তা নাম দিয়া এক নূতন ধ্যান-ধারণা সৃজন করিয়া যে নূতন ধর্ম্ম জগতে প্রতিষ্ঠিত করা হয় তাহারই নাম Nationalism. এই জাতীয়তা রূপ ধর্ম্মের ধারক ও বাহক হইলেন মধ্যবিত্ত শ্রেণী এবং উহাকে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখিবার জন্য কল-কারখানা উহার অস্ত্রে পরিণত হইল এবং অর্থই জীবনের মূল উদ্দেশ্য বলিয়া ঘোষিত হয়।

জগৎ কি পরিবর্ত্তনশীল

বিংশ শতাব্দীর প্রাক্‌কাল পর্য্যন্ত আমরা ইতিহাসে যাহা পাঠ করিয়া আসিয়াছি তাহা হইতে এইমাত্রই শিক্ষালাভ করিয়াছিলাম যে আমাদের জগৎ ও তাহার চতুর্দ্দিকের বেষ্টনী ও আবহাওয়া সনাতনী। সভ্যতা মাপিবার একটী নির্দ্দিষ্ট মাপকাঠি আছে, উন্নতির একটা বহু পুরাতন মূর্ত্তি আছে, সত্য চির সনাতন, মানব সভ্যতা এই সমস্ত উদ্দেশ্যকে লক্ষ্য করিয়াই রচিত হইয়াছে এবং উক্ত প্রকার উৎকর্ষ লাভ করিলেই তাহার সর্ব্ব আয়াসের শেষ হয়। এই জন্যই প্লেটোর রিপাব্‌লিক লেখা হয় ও স্যর টমাস মুরের Utopia ও অনেকটা এই প্রকার ধারণার পোষণ করে মাত্র। বিশ্ব-জগতে যে পরিবর্ত্তন অনবরত সংসাধিত হইয়া যাইতেছে, প্রত্যেক দিন যে নূতন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া আমাদের সম্মুখীন হইতেছে তাহার কোন প্রকার ধ্যান ধারণাই আমাদের ছিল না।

বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান ও দর্শন এই প্রকার সনাতনী ধ্যান-ধারণার মূলে কুঠারাঘাত করে। বিজ্ঞান আমাদের চক্ষে অঙ্গুলি প্রদান করিয়া দেখাইয়া দেয় যে জগৎ প্রত্যেক মুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতেছে এবং তাহার সহিত সমস্ত দ্রব্যের পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইতেছে। জন্ম, বৃদ্ধি বা যৌবন, ক্ষয় বা মৃত্যু প্রত্যেক বস্তুরই সাধারণ ধর্ম্ম! মৃত্যুর মধ্যেই জীবন নিহিত আছে। মৃত্যু বিভীষিকা আনয়ন করে সত্য কিন্তু উহার মধ্য দিয়াই নূতন জীবন রচিত হয়। মৃত্যু সাধারণ বস্তুকে একধাপ উপরে উঠিতে সাহায্য করে মাত্র। জন্ম, যৌবন, মৃত্যু, এই তিনটী লইয়া একটী বৃত্ত রচিত করিয়া উহারই সাহায্যে নিত্য নূতন পরিবর্ত্তন সংসাধন করিয়া জগৎ কোন এক উদ্দেশ্যের দিকে আগাইয়া চলিয়াছে।

প্রাচীন সমাজ এই সার সত্যটী ঠিক মত বুঝিতে পারিতেন না বলিয়াই সে কালের পণ্ডিতগণ সমাজকে এক নির্দ্দিষ্ট আদর্শে অনুপ্রাণিত করিয়া সমাজকে ঐ আদর্শে চালিত করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেন। প্রাচীন হিন্দুগণ আর্য্য সভ্যতাকে উন্নতির চরম সীমানায় আনয়ন করিয়া উহাকে চিরকাল স্থায়ী করিবার জন্য সংহিতার সূত্রগুলি রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু তখন তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছিলেন কি এই সংহিতার সূত্র-একদিন সমাজকে শত বেষ্টনীতে আবদ্ধ করিয়া উহার গলা টিপিয়া সমাজের গঙ্গাযাত্রা করিবে। তাঁহাদের রাষ্ট্র-নীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি আর্য্য জাতির প্রাধান্য রক্ষার্থ রচিত হইয়াছিল এবং আর্য্যজাতিকে চিরকাল গৌরবময় আসনে বসাইয়া রাখিবার চেষ্টার অন্তরালে পরিবর্ত্তনশীল

প্রকৃতি দেবীর সহিত সংগ্রাম করিবার ইচ্ছা লুক্কায়িত ছিল। তাহার ফলে আমরা দেখিতে পাই যে মুসলমান যুগে ভারতের আর্য্য গরিমার অনেক অন্তিম নিদর্শন বর্ত্তমান থাকিলেও উহার প্রাণ ছিল না। সেইজন্যই সঙ্ঘবদ্ধ আক্রমণকারীগণের নিকট তাঁহাদিগকে হটিয়া যাইতে হইয়াছিল।

বর্ত্তমান জগতে বিজ্ঞান স্পষ্টই স্বীকার করিয়াছে পৃথিবীতে accident বা আকস্মিক ঘটনা বলিয়া কোন দ্রব্যই থাকিতে পারে না। cause and effect বা কার্য্য-কারণ হিসাবে সমস্ত ঘটনাই গাঁট-ছড়ায় আবদ্ধ আছে। এ কথা সত্য যে সব সময়েই আমরা সমস্ত কার্য্য-কারণ ভাল করিয়া বুঝিতে পারি না। অতি প্রাচীনকালে যখন সে সমস্ত কার্য্য-কারণ ভাল করিয়া বুঝা যাইত না তখন তাহার পশ্চাতে একটী নূতন শক্তি বা উপশক্তির কল্পনা করিয়া উহার ব্যাখ্যা করা হইত। উদাহরণস্বরূপ বলিতে পারা যায় যে প্রাচীনকালে কোন পল্লীতে ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব হইলে উহার কার্য্য কারণ নির্ণয় করিতে না পারিয়াই তখনকার সমাজ ওলাউঠার অধিষ্ঠাত্রী দেবী ওলাদেবীর কল্পনা করিয়া উহা নিরাকরণ করিবার উদ্দেশ্যে জনমণ্ডলীকে তাহার উপাসনা করিবার জন্য উপদেশ দিত। সেইরূপ কোন পল্লীতে বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব হইলে, শীতলা দেবীর উপাসনা করাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া ঘোষিত হইত। অজ্ঞাত কারণ সাধারণের ভীতির বস্তু। এই ভীতির বস্তুকে দেব-দেবীর আসন প্রদান করিয়া তাহাকে উপাসনা করা ছাড়া তখনকার সমাজের উপায়ান্তর ছিল না। বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে কলেরা বা বসন্তের প্রাদুর্ভাব হইলে, ঐ রোগ প্রতিষেধক টীকা না লইয়া ওলাদেবী বা শীতলাদেবীর উপাসনা এখন নিশ্চয়ই কেহ করিবেন না। বিজ্ঞান আমাদিগকে স্পষ্টই দেখাইয়া দিয়াছে যে কতকগুলি স্বাস্থ্যরক্ষার আইন অমান্য করিলে উক্ত রোগদ্বয় সমাজে দেখা দেয় এবং যেহেতু উভয়েই ভীষণ সংক্রামক সেইজন্য প্রতিষেধক টীকাই উহাদের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিবার একমাত্র উপায়। Cause and effect বা কার্য্য-কারণের ইতিহাস পাঠ করিলে আমরা দেখিতে পাই যে অনেক দেব-দেবীই আমাদের জন্মগত অন্ধ-বিশ্বাসের চিত্র মাত্র। অর্থ-উপার্জ্জন করিতে গেলে, মানসিক সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করা আবশ্যক। মনের প্রফুল্লতা সম্পাদন করা কর্ত্তব্য। উত্তম রূপ সাজ-সজ্জারও প্রয়োজন। বাহিরের বেষ্টনই মানবকে কর্ম্মঠ ও কার্য্য-নিপুণ করে। মানুষের কর্ম্ম-নিপুণতা বৃদ্ধি করিতে গেলে তাহার বাহিরের আবহাওয়ার প্রকৃতি বেশ আরামদায়ক হওয়া উচিত। এই সমস্ত কার্য্য-কারণের ভাব-ধারার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইতে না পারিয়াই তখনকার প্রাচীন সমাজ অর্থের অধিষ্ঠাত্রী দেবী লক্ষ্মীর মূর্ত্তি রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার মূর্ত্তি প্রশান্ত, তিনি একজন সুন্দরী স্ত্রী, কেননা সুন্দরী স্ত্রী-ই পৃথিবীর ইতিহাসে সর্ব্বপ্রকার Romance সৃজন করিয়া আসিয়াছে। মহা সমুদ্রের উপর বা পার্শ্বে, খেচর বাহনে উপবিষ্টা। শূন্য ও অনন্ত এই ধ্যান ধারণার সীমা। প্রাচীন গ্রীসের দেব-দেবীর মূর্ত্তিগুলিও cause and effect এর ইতিহাস রূপে রচিত হইয়াছিল। প্রাচীন রোমানগণ জুপিটারকে তাহাদেয় জাতীয় দেবতা হিসাবে রচনা করিয়া তাঁহাতে যে সমস্ত গুণাবলী আরোপ করিয়াছিলেন —সেই সমস্ত গুণাবলী তখনকার রোমান নেতাদের মধ্যে প্রায়ই দেখা যাইত। আদিম সমাজে আধ্যাত্মিকতা এইরূপেই প্রবেশ করে।

ধর্ম্ম ও ভগবান জগতের ইতিহাসে বহু পুরাতন বস্তু। যে জাতি যতই পুরাতন হউক না কেন ধর্ম্ম ও ভগবান তাহাদের ছিলই। গ্রীক দার্শনিক প্লেটো, সক্রেটিস ও আমাদের বৈদান্তিক ঋষিগণ যুক্তিমূলক সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। আদিমযুগে মানব যখন সর্ব্বপ্রকার বাধা-বিপত্তির সহিত সংগ্রাম করিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়াছিল তখন অন্ধকারকেই ঐশীশক্তি প্রদান করিয়া দেব আখ্যা প্রদান করে। ভারতবর্ষে আর্য্যগণ প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে অন্ধকার ও সংস্কারকেই দেবতাপদে বসাইয়া পূজা করিত। ভারতের আবহাওয়ায় আসিয়া হিমালয়ের সন্নিকটে বাস করা হেতু, প্রকৃতির মনোরম দৃশ্য তাঁহাদিগকে এত অধিক পরিমাণে আকর্ষিত করে যে তাঁহারা তাঁহাদের ধর্ম্ম-গত মনোভাব [illegible] অন্ধকারের স্থলে আলোকেই দেবতার [illegible]।

মানবের পরিবর্তনশীল মস্তিষ্ক তখন দুই প্রকার শক্তি স্বীকার করিয়া লয়। আলোককে দেবতার পদে বরণ করিয়া লইয়া অন্ধকারকে অসুরের পদে বরণ করে। আলোক-আঁধারের যুদ্ধই দেবাসুরের সংগ্রাম-কাহিনী। বাইবেলে ভগবান-শয়তান সংঘটিত সংগ্রাম-কাহিনীর উৎপত্তিও এইখানে; কিন্তু ভাবুক দার্শনিকগণ ভগবানকে সীমাবদ্ধ করিতে অস্বীকার করিয়া তাঁহাকে বিশ্বরূপী চৈতন্য বলিয়া কল্পনা করেন। গ্রীস ও ভারতীয় দর্শনধারার সহিত যাঁহাদের পরিচয় আছে তাঁহারা স্বীকার করিবেনই উভয় দেশেই ভগবানকে সমস্ত চৈতন্য শক্তির মূল ও আধার বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। ভগবান অনন্ত শয্যায় শায়িত ছিলেন, সৃষ্টির ইচ্ছামাত্র আসিলে বিশ্বরচিত হইয়া গেল, বাইবেলেও এই যুক্তিধারাই রূপান্তর করিয়া প্রদান করা হইয়াছে। পরবর্ত্তীযুগে Revealed religionএ দার্শনিক ব্যাখাকে রূপ প্রদান করিবার জন্যই ভগবানকে বিরাট, অনন্ত মহামানব বলিয়া কল্পনা করা হয়, আমাদের দেহ তাঁহারই শরীরের ক্ষুদ্র অনুকরণ এবং আত্মা তাঁহার আত্মার অংশ বিশিষ্ট মাত্র। এই বিশ্বমানব স্বরূপ ভগবানের সংস্পর্শে আসিয়া জাতির ধ্যান ধারণা পুষ্টিলাভ করে, তখনই জাতীয়তা সৃজন হয়। গ্রীসের দেব ও দেবী কোনরূপ চিত্তের বা ভাবের বিকাশমাত্র। Cause এবং effectএর হারান সূত্রটীকে মূর্ত্তি প্রদান করি।র জন্যই তাহাদের কাঠামো রচিত হয়। এইজন্য তাহাদের ভাব-ধারণা ক্ষুদ্র, সীমাবদ্ধ। সামান্য মানবের ন্যায় তাহারা ব্যক্তিগত স্বার্থ লইয়া ব্যস্ত থাকে। যুদ্ধের সময় কাম ক্রোধের বশীভূত হইয়া কোন একটা পক্ষ অবলম্বন করিয়া যুদ্ধ করে। রোম তাহার ধর্ম্মভাব গ্রীস হইতেই সংগ্রহ করে। কিন্তু গ্রীসের দর্শনশাস্ত্র—রোমের আবহাওয়ায় আসিয়া অনেকটা বিশ্ব-ভাব গ্রহণ করে। এইজন্যই রোম তাহার দেব-দেবীগণকে অনেকটা সঙ্কীর্ণতা হইতে রক্ষা করিয়াছিল। মধ্যযুগে ইউরোপে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারিত হইলে গ্রীস ও রোমীয় ভাব-ধারার প্রাদুর্ভাব থাকা-সত্বেও তখনকার খৃষ্টান ধর্ম্মও অনেকটা গ্রীস ও রোমের আদর্শেই রচিত হইয়াছিল।

বর্ত্তমান বিজ্ঞান ভগবানের এই বিশ্ব-মূর্ত্তিকে সন্দেহের চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছে। প্রাচীনকালে আত্মাকে সর্ব্ব বস্তুর জনক হিসাবে স্বীকার করা হইয়াছিল। ভগবান সমস্ত আত্মার সমষ্টি বা বিরাট-আত্মা বলিয়া কল্পিত হইত। এই বিরাট আত্মা ভূচর, খেচর প্রভৃতি চতুর্দ্দশ ভূমি খেয়াল অনুযায়ী সৃজন করেন। সর্ব্বজাতির সৃষ্টি-তত্ত্বেই এই একই ধ্বনির প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়। পৃথিবী সৃজন করিতে এক মুহূর্ত্ত সময় লাগুক বা সাতদিন লাগুক, প্রকৃত কথা এই যে ভগবৎ শক্তির চেষ্টায় অল্প সময়েই উহার জন্ম—ইহাই সকল দেশে ঘোষিত হইয়াছিল। তাহার পর আসিল ভূতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, দেহতত্ত্ব ইত্যাদি বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখাগুলি। geology বা ভূতত্ত্ব স্পষ্টই দেখাইয়া দিল পৃথিবী সৃজন হইতে লক্ষ লক্ষ বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। নৃতত্ত্ব শিখাইল যে মানব জাতি একদিনে কোন অসাধারণ শক্তির খেয়ালে উৎপন্ন হয় নাই, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণীর পরিবর্ত্তনকালে বহু লক্ষ বৎসর গত হইলে বর্ত্তমান মানব জাতি সৃষ্টি হইয়াছে। প্রাচীন তত্ত্বগুলির মূলে এইরূপ কুঠারাঘাত করিয়াই বিজ্ঞান ক্ষান্ত হইল না। বিজ্ঞান মানব-জাতির বহু পুরাতন ধারণা যে চৈতন্য বা আত্মা প্রথম এই সত্যের তত্ত্ব নিরূপণে নিযুক্ত হইয়া প্রকাশ করে যে জড়ই মূল, জড়ই সমস্ত সৃষ্ট বস্তুর একমাত্র সত্ত্বা, আত্মা জড়ের ভাবান্তর মাত্র। আত্মা বা চৈতন্য প্রথম নয়, জড়ই প্রথম। মাটীর রূপান্তর ঘটিলে কেঁচো জন্মায়। সুতরাং মাটীই প্রথম, কেঁচো কখনই প্রথম হইতে পারে না। Biology স্পষ্টই প্রমাণ করিল যে জড়ের রূপান্তর ঘটিলে কোন প্রকার প্রাণের সঞ্চার হয়, এবং প্রাণীগুলির ক্রম-বিকাশ ফলেই জগতে নানা প্রকার animal বা দেহ-ধারী জীবের সৃষ্টি হইতেছে। ভূমি খনন করিয়া অনেক প্রকার প্রাণীরই কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে, তাহারাও এক সময়ে শরীর পরিগ্রহ করিয়া এই পৃথিবীতেই পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইত। মানব-জাতিরও নানা প্রকার রূপ ছিল। শরীরগত অনেক পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়া গিয়াছে। কাজেই জড়ই যদি প্রথম হয়, সৃষ্টির প্রারম্ভে অজ্ঞান জড়ই যদি প্রথম প্রতিষ্ঠিত থাকে, তাহা হইলে চৈতন্যময়, সর্ব্বশক্তিমান বিশ্ব-আত্মার কল্পনা, ভুল ধারণা প্রসূত,—আদিমযুগের মানব-মস্তিষ্কের ক্রম-

বিকাশ মাত্র, উহা সত্য নহে। পরিবর্ত্তনশীল জগতে কখনও চিরস্থায়ী ভগবান থাকিতে পারে না, বর্ত্তমান যুগের ভাবধারার সহিত প্রাচীন যুগের ভাব-ধারার এই খানেই পার্থক্য। কিছুই স্থায়ী নহে, সবই পরিবর্ত্তনশীল; মানবের দেহ ও আচার-ব্যবহার পরিবর্ত্তনশীল পৃথিবীর সহিত পরিবর্ত্তিত হইতেছে, বর্ত্তমানযুগ এই মহা সত্য শিক্ষা প্রদান করিতেছে।

সনাতন সত্য কি ?

বাল্মিকী রামায়ণে রাম যখন সত্য-পালনের জন্য বনবাস যাত্রা করিবার উদ্যোগ করিতেছেন তখন কবি বলিতেছেন, সত্যই জগতের প্রাণ, সমস্ত জগৎ সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং সত্য সনাতনী, উহার কোন পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয় না। প্রাচীন ভাব-ধারার ইতিহাস পাঠ করিলে আমরা দেখিতে পাই যে সত্য ক্রমশঃ কলেবর পরিত্যাগ করিয়া দেহান্তর ধারণ করিয়া থাকে। বাইবেলের তত্ত্বগুলিকে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করিতে গিয়া দেখা গেল, উহা সত্য নয়। একজাতির আচার ব্যবহার অন্য জাতির গ্রহণীয় হয় না, কাজেই উহাদের মধ্যে কোন্ আচার ব্যবহার সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত তাহা বলা বড়ই কঠিন। বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলিও সার সত্য নহে। একযুগের তত্ত্ব অন্য যুগের গবেষণায় আসিয়া মিথ্যায় পরিণত হইতেছে। ইহার কারণই এই জগৎ পরিবর্ত্তনশীল। কোন একস্থলে একটী শবকে কবর দিয়া রাখিলে এক হাজার বৎসর অন্তে উহার অস্তিত্ব পাওয়া ভার হইয়া উঠে। গৃহের আসবাব পত্র যাহা আজ ঝক্‌ঝক্ করিতেছে দুই হাজার বৎসর অন্তে উহাদের দেহান্তর ঘটিয়া অন্য আকার প্রাপ্ত হইবে, তখন বর্ত্তমানের আখ্যা উহাদিগকে প্রদান করিতে গেলে সত্যের অপলাপ করা হইবেই।

প্রাকৃতিক জগতে যাহা ঘটিয়া যাইতেছে—মানবের সমাজেও তাহারই অনুকরণ চলিতেছে মাত্র। মানব মাত্রই সমাজ প্রিয় জীব। আরিষ্টটল স্পষ্টই বলিয়াছেন যে Man is a Political animal বা সমাজপ্রিয় প্রাণী। কথাটা খুবই যুক্তিপূর্ণ। মানব সমাজ-বদ্ধ ভাবে থাকে বলিয়া প্রত্যেক সমাজেরই একটি স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে। সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া মানব সমাজকে সৃষ্টি করিলেও সমাজের স্বতন্ত্র সত্তা অনেকেই স্বীকার করেন। জলযান ও বাষ্পযান এই দুইটির বায়ুর সংমিশ্রণে জলের সৃজন হয়, কিন্তু যখন জল সৃষ্ট হয় তখন উহা ঐ দুইটি বাষ্পের একটিও নয়। সেইরূপ সমাজ কতকগুলি মানবের সমষ্টি হইলেও, সমাজ সৃষ্ট হইয়া গেলে উহা এক স্বতন্ত্র আকার ধারণ করে। এই স্বতন্ত্র ভাবের ধারক সমাজ উহার অধীনস্থ সর্ব্বসাধারণের স্বার্থ ও সুখ স্বচ্ছন্দতার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া নিত্য নূতন পরিবর্ত্তন সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে। সামাজিক সত্যগুলির এই জন্যই পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়া যাইতেছে। এক শতাব্দীর তত্ত্বের সহিত অন্য শতাব্দীর তত্ত্বের কোন সাদৃশ্যই রক্ষিত হয় না। প্রাচীন যুগে কোন বলবান ব্যক্তি প্রবল হইয়া কতকগুলি বলবান ব্যক্তির সহিত সম্মিলিত হইয়া যে রাষ্ট্র স্থাপন করেন তাহার নাম রাজতন্ত্র। রাজতন্ত্রের অধীনে থাকিয়া সামন্তগণের ক্ষমতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া রাজার ক্ষমতা হ্রাস করিয়া দিলেই সামন্ততন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। পূর্ব্ব যুগে একমাত্র রাজাই দেবতা বলিয়া পূজিত হইতেন। সমস্ত ভূমিই তাঁহার সম্পত্তি বলিয়া বিবেচিত হইত। সামন্ত যুগে এই সত্যের ব্যতিক্রম সংঘটিত হইয়া যায়। জমি এখন শুধুই রাজার একচেটিয়া অধিকার বলিয়া বিবেচিত হয় না। তাহার পর বাণিজ্য বৃদ্ধির সহিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আবির্ভাব হইলে, আইন-কানুনেরও পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়া যায়। দায়ভাগেরও অনেক পরিবর্ত্তন হয়। কল-কারখানার প্রতিষ্ঠার সহিত শ্রমিক জাতি বলিয়া এখন এক নূতন শ্রেণী সমাজে দেখা দিয়াছে। ক্ষেত-খোলার চাষাদের সহিত ইহাদের পার্থক্য আছে। ভূমি-সংক্রান্ত শ্রমজীবিগণ আইনতঃ নাই হউক কার্য্যতঃ তাহারা জমিরই মালিক। তাহাদের জীবিকা অর্জ্জনের পন্থা সনাতনী হিসাবে স্থিরীকৃত। কল-কারখানায় যে সমস্ত কুলী কাজ করে তাহারা দৈনিক মজুরী পায় মাত্র। তাহাদের জীবিকা উপার্জ্জনের কোন স্থায়ী উপায় নাই। কল-কারখানা জোর চলিলে তাহাদের আর্থিক অবস্থা বেশ স্বচ্ছল থাকে, উহার ব্যক্তি

ক্রম ঘটিলেই উহাদের দৈন্য দশা ও দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। গ্রামের কৃষকগণ অনেক সময়ই অজ্ঞ ও কুসংস্কার বিশিষ্ট তাহাদের অনেকেই প্রাচীন সভ্যতার আবহাওয়ায়ই বাস করে। স্বাধীন মনোবৃত্তি তাহাদের সীমানায় আসিতে পারে না। চিরকাল অধীন থাকিয়া দাসত্ব স্বীকার করায় তাহাদের ধর্ম্ম। কিন্তু কলকারখানার কুলীগণ সহরের জীব। তাহারা প্রত্যেকেই অল্পবিস্তর শিক্ষিত। প্রত্যেক দিনের একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য দাসত্ব স্বীকার করিলেও, অন্য সময়ে তাহারা স্বাধীন। তাহারা কি চিন্তা করিবে, কাহাকে উপাসনা করিবে, কোথায় তাহাদের মনের ব্যথা জ্ঞাপন করিবে তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দিবার ভার তাহার মনিবদের উপর নাই। অপেক্ষাকৃত স্বাধীনভাবে চলা-ফেরা করিতে পারে বলিয়াই তাহারা জগতের স্বাধীন মনোভাবের সহিত পরিচিত হইবার অবকাশ পায়। কাজেই এই যুগে যদি মধ্যযুগের সামন্ত রাজগণের নীতি এই কুলীদের মধ্যে প্রচার করিতে যাওয়া যায়, তাহা হইলে খুব স্বাভাবিক ভাবেই উপহসিত হইতে হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি ?

জগতের সভ্যতার ইতিহাসে ধনোৎপাদন একটি মূল উপাদান। অর্থই সভ্যতার মূলমন্ত্র। প্রজাবৃদ্ধির সহিত ধনবৃদ্ধি সংঘটিত করিতে পারিলেই সভ্যতার ক্রমবিকাশ ঘটিয়া থাকে। যে সমস্ত সভ্যতা ধরাপৃষ্ঠ হইতে লয় প্রাপ্ত হইয়াছে বিশেষ অনুসন্ধান করিলেই জানিতে পারা যাইবে, তাহারা জনবৃদ্ধির সহিত ধনোৎপাদন প্রণালীর সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারে নাই। স্থিতিশীল সমাজে যখন কোন আকস্মিক পরিবর্ত্তন আসিয়া দেখা দেয় তখনই বুঝিতে হইবে যে উক্ত সমাজের ধনোৎপাদন করিবার শক্তির হ্রাস ঘটিয়াছে। ক্রম-বিকাশ ও আকস্মিক পরিবর্ত্তন বাহ্যতঃ বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইলেও উহার মূলে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। জলকে উত্তপ্ত করিয়া যখন সেন্‌টিগ্রেডের ১০০° উত্তাপে লইয়া যাওয়া হয় তখনই জল বাষ্পে পরিণত হয়। জলের এই আকস্মিক পরিবর্ত্তন খুবই স্বাভাবিক; আমাদের সমাজেও এইরূপ আকস্মিক পরিবর্ত্তন মাঝে মাঝে সংঘটিত হয়।

যাঁহারা ভাবেন যে আকস্মিকতা বলিয়া জগতে কিছুই নাই, সমস্তই ক্রমবিকাশের ফল, তাঁহাদের যুক্তির মূলে খানিকটা সত্য আছে। ক্রমবিকাশ জগতের অণু-পরমাণুতে অষ্টপ্রহর সংঘটিত হইয়া যাইতেছে। ক্রমবিকাশের শেষ সীমানা মাঝে মাঝে আসে, যেখানে রূপান্তর বা দেহান্তর ঘটে, তাহাকেই জন-সমাজে আকস্মিকতা বলিয়া আখ্যা দেওয়া হয়। ভূগর্ভে অনবরত পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইয়া যাইতেছে, পরিশেষে এমন পরিবর্ত্তন হয় যখন হয় ত বা উন্নতশির পর্ব্বত সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত হয় কিম্বা গভীর সমুদ্রতল উন্নতশির পর্ব্বতে পরিণত হয়। হঠাৎ এই প্রকার পরিবর্ত্তনের নামই আকস্মিক দুর্ঘটনা। সমাজেও এইরূপ আকস্মিক দুর্ঘটনা অনবরত ঘটিয়া চলিয়াছে। চীনের বক্সার বিদ্রোহ, ভারতে সিপাহী বিদ্রোহ, ফ্রান্সের ১৭৯৩ সালের রাজদ্রোহ, ১৯১৪ সালের জগৎব্যাপী সংগ্রাম সমস্তই অবশ্যই ক্রমবিকাশের চরম পরিণতি, কিন্তু ঐ ঐ সনে পূর্ব্বোক্ত ঘটনাগুলির রূপান্তর সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়াই উক্ত সন গুলিকে আমরা আকস্মিক পরিবর্ত্তনের যুগ বলিয়া থাকি।

বর্ত্তমান যুগে আমরা এক জগৎ ব্যাপী পরিবর্ত্তনের সম্মুখীন হইতেছি। পুরাতন ভাবধারা ও আচার-ব্যবহার ক্রমশঃই জন-সমাজের আস্থা হারাইতেছে। একই ভাব-ধারা আসিয়া পৃথিবীর সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িতেছে। পরিবর্ত্তনশীল জগতে যখন স্পষ্টই দেখা যাইতেছে সনাতন সত্য বলিয়া কিছুই থাকিতে পারে না, মানবের অতি প্রিয় ধর্ম্ম ও ভগবানও যখন বিচারের বস্তুতে পরিণত হইয়াছে তখন পুরাতনের দোহাই দিয়া নূতনকে বরণ করিয়া না লইলে পশ্চাতে পড়িয়া থাকিতে হইবে। আমরা পরবর্ত্তী কয়েক অধ্যায়ে এই ভাব-ধারার গতি ও পরিপুষ্টি এশিয়ার জাতি-বৃন্দের মধ্যে কিরূপ দ্রুত সংঘটিত হইয়া যাইতেছে তাহারই একখানি আলেখ্য প্রদান করিব।

“উপবাসী তপস্বীকে অন্নদান কর”

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(মহাত্মাজীর অনশনের সম্বন্ধে বোলপুর শান্তিনিকেতনে তথা-কথিত স্পৃশ্য ও অস্পৃশ্য সকল শ্রেণীর হিন্দুদের যে সভা হয়, তাহাতে রবীন্দ্রনাথ নিম্নলিখিত বার্ত্তা দেশবাসীর নিকট প্রচার করিয়াছেন :—)

যুগে যুগে দৈবাৎ এই সংসারে মহাপুরুষের আগমন হয়। সব সময় তাঁদের দেখা পাইনে। যখন দেখা পাই সে আমাদের সৌভাগ্য। আজকের দিনে দুঃখের অন্ত নেই, কত পীড়ন, কত দৈন্য, কত শোক তাপ আমরা নিত্য ভোগ করচি, দুঃখ জমে উঠেচে রাশি রাশি। তবু সব দুঃখকে ছাড়িয়ে গেছে আজ এক আনন্দ। যে মাটিতে আমরা বেঁচে আছি, সঞ্চরণ করচি, সেই মাটিতেই একজন মহাপুরুষ, যাঁর তুলনা নাই, তিনি ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেচেন।

যাঁরা মহাপুরুষ তাঁরা যখন আসেন, আমরা ভাল করে চিনতে পারিনে তাঁদের। কেননা, আমাদের মন ভীরু, অস্বচ্ছ, স্বভাব শিথিল, অভ্যাস দুর্ব্বল। মনেতে সেই সহজ শক্তি নেই যাতে করে মহৎকে সম্পূর্ণ বুঝতে পারি, গ্রহণ করতে পারি। বারে বারে এমন ঘটেচে, যাঁরা সকলের বড়ো, তাঁদেরই সকলের চেয়ে দূরে ফেলে রেখেচি। যাঁরা জ্ঞানী, গুণী, কঠোর তপস্বী, তাঁদের বোঝা সহজ নয়; কেন না আমাদের জ্ঞান বুদ্ধি সংস্কার তাঁদের সঙ্গে মেলে না। কিন্তু একটা জিনিষ বুঝতে কঠিন লাগে না, সেটা ভালোবাসা। যে মহাপুরুষ ভালোবাসা দিয়ে নিজের পরিচয় দেন, তাঁকে আমাদের ভালোবাসায় আমরা এক-রকম করে বুঝতে পারি। সেজন্যে ভারতবর্ষে এই এক আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটল, যে, এবার বুঝেচি। এমনটি সচরাচর ঘটে না। যিনি আমাদের মধ্যে এসেচেন তিনি অত্যন্ত উচ্চ, অত্যন্ত মহৎ। তবু তাঁকে স্বীকার করেচি, তাঁকে জেনেচি। সকলে বুঝেচি, তিনি আমাদের। তাঁর ভালোবাসায় উচ্চনীচের ভেদ নেই, মূর্খ বিদ্বানের ভেদ নেই। ধনী দরিদ্রের ভেদ নেই। তিনি বিতরণ করেচেন সকলের মধ্যে সমানভাবে তাঁর ভালোবাসা। তিনি বলেচেন, সকলের কল্যাণ হোক সকলের মঙ্গল হোক। যা বলেচেন শুধু কথায় নয়, বলেচেন দুঃখের বেদনায়। কত পীড়া, কত অপমান তিনি সয়েচেন। তাঁর জীবনের ইতিহাস দুঃখের ইতিহাস। দুঃখ অপমান ভোগ করেচেন কেবল ভারতবর্ষে নয়, দক্ষিণ আফ্রিকায় কত মার তাঁকে মৃত্যুর ধারে এনে ফেলেচে। তাঁর দুঃখ নিজের বিষয়-সুখের জন্য নয়, স্বার্থের জন্যে নয়, সকলের ভালোর জন্যে। এই যে এত মার খেয়েচেন, উল্টে কিছু বলেন নি কখনো, রাগ করেন নি। সমস্ত আঘাত মাথা পেতে নিয়েচেন। শত্রুরা আশ্চর্য্য হয়ে গেছে ধৈর্য্য দেখে, মহত্ব দেখে। তাঁর সঙ্কল্প সিদ্ধ হল, কিন্তু জোরজবরদস্তিতে নয়; ত্যাগের দ্বারা, দুঃখের দ্বারা, তপস্যার দ্বারা তিনি জয়ী হয়েচেন। সেই তিনি আজ ভারতবর্ষের দুঃখের বোঝা নিজের দুঃখের বেগে ঠেলবার জন্য দেখা দিয়েচেন।

তোমরা সকলে তাঁকে দেখেচ কি না জানি না। কারো কারো হয়ত তাঁকে দেখার সৌভাগ্য ঘটেচে। কিন্তু তাঁকে জানো সকলেই, সমস্ত ভারতবর্ষ তাঁকে জানে। সবাই জানো, সমস্ত ভারতবর্ষ কি রকম করে তাঁকে ভক্তি দিয়েচে, একটি নাম দিয়েচে—মহাত্মা। আশ্চর্য্য, কেমন করে চিন্‌লে। মহাত্মা অনেককেই বলা হয়, তার কোনো মানে নাই কিন্তু এই মহাপুরুষকে যে মহাত্মা বলা হয়েচে, তার মানে আছে। যাঁর আত্মা বড়ো, তিনিই মহাত্মা। যাদের আত্মা ছোটো, বিষয়ে বদ্ধ, টাকাকড়ি ঘর সংসারের চিন্তায় যাদের মন আচ্ছন্ন, তারা দীনাত্মা মহাত্মা তিনিই, সকলের সুখ দুঃখ, যিনি আপনার করে নিয়েচেন, সকলের ভালোকে যিনি আপনার ভালো [illegible]

জানেন। কেন না, সকলের হৃদয়ে তাঁর স্থান, তাঁর হৃদয়ে সকলের স্থান। আমাদের শাস্ত্রে ঈশ্বরকে বলে মহাত্মা, মর্ত্ত্যলোকে সেই দিব্য ভালোবাসা, সেই প্রেমের ঐশ্বর্য্য দৈবাৎ মেলে। সেই প্রেম যাঁর মধ্যে প্রকাশ পেয়েচে তাঁকে আমরা মোটের উপর এই বলে বুঝেচি যে তিনি হৃদয় দিয়ে সকলকে ভালো বেসেচেন। কিন্তু সম্পূর্ণ বুঝতে পারি না, ভালো করে চিনতে একটু বাধা লাগে। বাঁকা হয়ে গেছে আমাদের মন। সত্যকে স্বীকার করতে ভীরুতা দ্বিধা সংশয় আমাদের জাগে বিনা ক্লেশে যা মানতে পারি, তাই মানি, কঠিনটাকে সরিয়ে রেখে দিই এক পাশে। তাঁর সকলের চেয়ে বড়ো সত্যটাকে নিতে পারলুম না। এইখানেই তাঁকে মারলুম। তিনি এসেচেন, ফিরে গেলেন, শেষ পর্য্যন্ত তাঁকে নিতে পারলুম না।

খ্রীষ্টানশাস্ত্রে পড়েচি আচার নিষ্ঠ য়িহুদিরা যীশুখ্রীষ্টকে শত্রু বলে মেরেছিল। কিন্তু মার কি শুধু দেহের? যিনি প্রাণ দিয়ে কল্যাণের পথ খুলে দিতে আসেন সেই পথকে বাধাগ্রস্ত করালেও কি মার নয়? সকলের চেয়ে বড়ো মার সেই। কি অসহ্য বেদনা অনুভব করে তিনি আজকের দিনে মৃত্যু গ্রহণ করেচেন। সেই ব্রতকে যদি আমরা স্বীকার করে না নিই, তবে কি তাঁকে আমরা মারলুম না? আমাদের ছোটা মনের সঙ্কোচ, ভীরুতা আজ লজ্জা পাবে না? আমরা কি তাঁর সেই বেদনাকে মর্ম্মের মধ্যে ঠিক জায়গায় অনুভব করতে পারব না? গ্রহণ করতে পারব না তাঁর দান? এত ভীরুতা আমাদের? সে ভীরুতার দৃষ্টান্ত তো তাঁর মধ্যে কোথাও নেই। সাহসের অন্ত নেই তাঁর; মৃত্যুকে তিনি তুচ্ছ করেচেন। কঠিন কারাগার, তার সমস্ত লোহার শিকল নিয়ে তাঁর ইচ্ছাকে ঠেকাতে পারে নি। সেই তিনি এসেছেন আজ আমাদের মাঝখানে। আমরা যদি ভয়ে পিছিয়ে পড়ি তবে লজ্জা রাখবার ঠাঁই থাকবে না। তিনি আজ মৃত্যু-ব্রত গ্রহণ করেচেন, ছোট-বড়োকে এক করবার জন্যে। তাঁর সেই সাহস, তাঁর সেই শক্তি আসুক আমাদের বুদ্ধিতে, আমাদের কাজে। আমরা যেন আজ গলা ছেড়ে বলতে পারি, তুমি যেয়ো না, আমরা গ্রহণ করলাম তোমার ব্রত। তা যদি না পারি এত বড়ো জীবনকে যদি ব্যর্থ হতে দিই, তবে তার চেয়ে বড় সর্ব্বনাশ আর কী হতে পারে?

আমরা এই কথাই বলে থাকি, যে বিদেশীরা আমাদের শত্রুতা করচে। কিন্তু তার চেয়ে বড়ো শত্রু আছে আমাদের মজ্জার মধ্যে, সে আমাদের ভীরুতা। সেই ভীরুতা জয় করার জন্য বিধাতা আমাদের জন্ম শক্তি পাঠিয়ে দিয়েচেন তাঁর জীবনের মধ্য দিয়ে, তিনি আপন অভয় দিয়ে আমাদের ভয় হরণ করতে এসেছেন। সেই তাঁর দান সুদ্ধ তাঁকে আজ কি আমরা ফিরিয়ে দেব? এই কৌপীনধারী আমাদের দ্বারে দ্বারে আঘাত করে ফিরেচেন, তিনি আমাদের সাবধান করেচেন কোন্‌খানে আমাদের বিপদ।

মানুষ যেখানে মানুষের অপমান করে মানুষের ভগবান সেইখানেই বিমুখ। শত শত বছর ধরে মানুষের প্রতি অপমানের বিষ আমরা বইয়ে দিয়েচি ভারতবর্ষের নাড়ীতে নাড়ীতে। হীনতার অসহ্য বোঝা চাপিয়ে দিয়েচি শত শত নত মস্তকের উপরে, তারই ভারে সমস্ত দেশ আজ ক্লান্ত দুর্ব্বল। সেই পাপে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারচিনে।

আমাদের চলবার রাস্তায় পদে পদে পঙ্ককুণ্ড তৈরি করে রেখেচি,—আমাদের সৌভাগ্যের অনেকখানি তলিয়ে যাচ্চে তারই মধ্যে। এক ভাই আর এক ভাইয়ের কপালে স্বহস্তে কলঙ্ক লেপে দিয়েছে, মহাত্মা সইতে পারেননি এই পাপ।

সমস্ত অন্তঃকরণ দিয়ে শোনো তাঁর বাণী। অনুভব করো, কী প্রচণ্ড তাঁর সঙ্কল্পের জোর। আজ তপস্বী উপবাস আরম্ভ করেচেন, দিনের পর দিন তিনি অন্ন নেবেন না। তোমরা দেবে না তাঁকে অন্ন? তাঁর বাণীকে গ্রহণ করাই তাঁর অন্ন। তাই দিয়ে তাঁকে বাঁচাতে হবে। অপরাধ অনেক করেচি, পাপ পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেচে। ভাইয়ের সঙ্গে ব্যবহার করেচি দাসের মতো, পশুর মতো। সেই অপমানে সমস্ত পৃথিবীর কাছে ছোটো করে রেখেচে

আমাদের। যদি তাদের প্রাপ্য সম্মান দিতাম তাহলে আজ এত দুর্গতি হত না আমাদের। পৃথিবীর অন্য সব সমাজকে লোকে সম্মান করে, ভয় করে, কেননা তারা পরস্পর ঐক্যবন্ধনে বদ্ধ। আমাদের হিন্দুসমাজকে আঘাত করতে অপমান করতে কারো মনে ভয় নেই বার বার তার প্রমাণ পাই। কিসের জোরে তাদের এই স্পর্দ্ধা সে কথাটা যেন এক মুহূর্ত্ত না ভুলি।

যে সম্মান মহাত্মাজী সবাইকে দিতে চেয়েছেন, সে সম্মান আমরা সকলকে দেব। যে পারবে না দিতে ধিক্ তাকে। ভাইকে ভাই বলে গ্রহণ করতে বাধা দেয় যে সমাজ, ধিক্ সেই জীর্ণ-সমাজকে। সবচেয়ে বড় ভীরুতা তখনই প্রকাশ পায় যখন সত্যকে চিনতে পেরেও মানতে পারি নে। সে ভীরুতার ক্ষমা নেই।

অভিশাপ অনেকদিন থেকে আছে দেশের উপর। সেইজন্যে প্রায়শ্চিত্ত করতে বসেচেন একজন। সেই প্রায়শ্চিত্তে সকলকে মিলতে হবে; সেই মিলনেই আমাদের চির মিলন সুরু হবে। মৃত্যুর বৃহৎ পাত্রে তাঁর প্রায়শ্চিত্ত তিনি আমাদের সকলের সামনে ধরলেন, এগিয়ে দিলেন আমাদের হাতের কাছে। গ্রহণ করো সকলে, ক্ষালন করো পাপ। মঙ্গল হবে। তাঁর শেষ কথা আজ আমি তোমাদের শোনাতে এসেচি। তিনি দূরে আছেন, কিন্তু তিনি দূরে নেই। তিনি আমাদের অন্তরেই আছেন। যদি জীবন দিতে হয় তাঁকে আমাদের জন্যে, তবে অন্ত থাকবে না পরিতাপের।

মাথা হেঁটে হয়ে যাবে আমাদের। তিনি আমাদের কাছে যা চেয়েচেন তা দুরূহ, দুঃসাধ্য ব্রত। কিন্তু তার চেয়ে দুঃসাধ্য কাজ তিনি করেচেন, তার চেয়ে কঠিন ব্রত তাঁর। সাহসের সঙ্গে যেন গ্রহণ করতে পারি তাঁর দেওয়া ব্রত। যাকে আমরা ভয় করচি, সে কিছুই নয়। সে মায়া, মিথ্যা। সে সত্য নয়; মানব না আমরা তাকে। বলো আজ সবাই মিলে, আমরা মানব না সেই মিথ্যাকে। বলো আজ সমস্ত হৃদয় দিয়ে বলো, ভয় কিসের? তিনি সমস্ত ভয় হরণ করে বসে আছেন। মৃত্যু-ভয়কে জয় করেচেন। কোনো ভয় যেন আজ থাকে না আমাদের। লোক ভয়, রাজ ভয়, সমাজ ভয় কিছুতেই যেন সঙ্কুচিত না হই আমরা। তাঁর পথে তাঁরই অনুবর্ত্তী হয়ে চলব, পরাভব ঘটতে দেব না তাঁর। সমস্ত পৃথিবী আজ তাকিয়ে আছে, যাদের মনে দরদ নেই তারা উপহাস করচে। এত বড়ো ব্যাপারটা সত্যই উপহাসের বিষয় হবে যদি আমাদের উপরে কোনো ফল না হয়। সমস্ত পৃথিবী আজ বিস্মিত হবে যদি তাঁর শক্তির আগুন আমাদের সকলের মনের মধ্যে জ্বলে ওঠে, যদি সবাই বলতে পারি, জয় হোক্ তপস্বী, তোমার তপস্যা সার্থক হোক্। এই জয়ধ্বনি সমুদ্রের এক পার থেকে পৌছিবে আর এক পারে, সকলে বলবে, সত্যের বাণী অমোঘ, ধন্য হবে ভারতবর্ষ। আজকের দিনেও এত বড়ো সার্থকতায় যে বাধা দেবে সে অত্যন্ত হেয়, তাকে তোমরা ভয়ে যদি মানো তবে তার চেয়ে হেয় হবে তোমরা। জয় হোক্ সেই তপস্বীর যিনি এই মুহূর্ত্তে বসে আছেন মৃত্যুকে সামনে নিয়ে, ভগবানকে অন্তরে বসিয়ে সমস্ত হৃদয়ের প্রেমকে উজ্জ্বল করে জ্বালিয়ে। তোমরা জয়ধ্বনি করো তাঁর তোমাদের কণ্ঠস্বর পৌঁছুক তাঁর আসনের কাছে, বলো তোমাকে গ্রহণ করলেম, তোমার সত্যকে স্বীকার করলেম।

আমি কী-ই বা বলতে পারি। আমার ভাষায় জোর কথায়? তিনি যে ভাষায় বলচেন সে কানে শোনবার নয়, সে প্রাণে শোনবার; মানুষের সেই চরম ভাষা, নিশ্চয়ই তোমাদের অন্তরে পৌচেছে।

আমাদের সকলের চেয়ে বড় সৌভাগ্য পর যখন আপন হয়। সকলের চেয়ে বড়ো বিপদ, আপন যখন পর হয়। ইচ্ছে করেই যাদের আমরা হারিয়েচি ইচ্ছে করেই আজ তাদের ফিরে ডাকো, অপরাধের অবসান হোক্, অমঙ্গল দূর হয়ে যাক্। মানুষকে গৌরব দান করে মনুষ্যত্বের সগৌরব অধিকার লাভ করি।

অ-মূল লতা

—গল্প—

শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী দেবী

[সুলেখিকা শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী দেবী এই গল্পটিতে সুকৌশলে ভারতের একটি চিরন্তন জীবন্ত সমস্যার মর্ম্মকথার উপর ইঙ্গিত করিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে এই কথাটির উপরে ভারতের চিন্তাশীল নর-নারী মাত্রেরই দৃষ্টি নিবদ্ধ আছে। আশা করি গল্পটির হৃদয়-ভাঙ্গা অশ্রু-সজল-রসের সঙ্গে ভারতের মর্ম্ম-ভাঙ্গা এই কথাটিও পাঠক-পাঠিকার হৃদয় স্পর্শ করিবে]

টিফিনের ঘণ্টা।—

মেয়েরা ছোট বড় দলে দলে খেলা ও ঘুরে বেড়াচ্ছিল। কেউ বা এমনিই ক'জন মিলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করছিল।

ম্যাট্রিক ক্লাসেরা একটা দলে মিনু, বিনু, রেণু, রেবা, বিজয়া, শোভা, শান্তি রমা সুধা সব মিলে কি একটা বিশেষ তর্কে মগ্ন হয়ে উঠেছিল।

সীতা, সাবিত্রী, সতীদের মধ্যে কাকে কার কত ভাল লাগে আর কেবা ওঁদের মধ্যে সত্যি খুব ভাল এই ছিল তর্কের বিষয়।

শোভা বল্লে—'ওঁদের সবাই ভাল ও আমি বুঝতে পারি না—'

বিনু বল্লে, 'ওতো ভাই তোমার ফাঁকি দেওয়া হ'ল—'

মিনু বল্লে, 'হ্যাঁ ঠাকুর দেবতা বলে ও কিছু বলবে না আর কি!

শোভা রেগে উঠল—'দেখ না ভাই রেণুদি'—

শান্তি বল্লে, আচ্ছা, বিজয়া দি' তুমি তো সবায়ের বড়—তুমি কেন বল না?'

সবাই বিজয়াকে ঘিরল।

বিজয়া বল্লে, 'আচ্ছা পণ্ডিত পাকড়েছিস দেখছি—'

মিনু বল্লে,—কার কাকে ভাল লাগে—এইটেই হচ্ছে তর্ক, তোমার কাকে ভাল লাগে সবচেয়ে বল না?—

'তবেই তো!' বলে বিজয়া চুপ করলে চিন্তিতভাবে।

মেয়েরা বল্লে "বল্ না? সবাই বিজয়ার দিকে চেয়ে—

বিজয়া একটু হাসলে—তারপর বল্লে, 'সতী'

তারপরেই বল্লে,—'না, না, সীতা—'

সবাই কোলাহল করে উঠল।

'যা' বলচি—একবারে বল্—একি—যা—'

মৃদু হেসে বিজয়া বল্লে—'আচ্ছা, সাবিত্রী!

মিনু তাকে ঠেলা দিয়ে বল্লে,—'যা' দুষ্টু মেয়ে—সবাইকে বলে নিলে, না না করে।'—

বিজয়া সহাস্যে বল্লে, 'নিলামই তো!—কেউ যদি শাপ দেন আমাকে! ভয় করে না বুঝি—শেষকালে কেউ বলবেন, আমার মতন বনবাস; কেউ বলবেন মরাকে বাঁচাও, কেউ বলবেন, দক্ষ যজ্ঞ কর—এতো আর সত্য ত্রেতা নয়,—তখন—ত্রকনাটী—'

'ফাজিল কোথাকার'—সমস্বরে সকলে বল্লে,—তুই শোভার চেয়ে চালাক!'—

'কি করি তোদের জ্বালায়। আমি ওঁদের প্রশংসা পত্র দেবে এত বড় পণ্ডিত হইনি—চল্ ঘণ্টা বাজল,—'

২

রেবার বাবা তিন পুরুষে দেশী খৃষ্টান ছিলেন। নাম ছিল তাঁর জন সুরেন্দ্র মিত্র। 'জনটা' লুপ্তই থাকত বাপের নামও অমনি চার্লি রামকান্ত মিত্র। কোন একটা মিশনের কলেজে প্রফেসার ছিলেন।

অবস্থা ছিল বেশ সচ্ছল। বাপের একমাত্র মেয়ে রেবার মার সঙ্গে তাঁর পিতৃকুলের লক্ষ্মী তাঁর সোনার ঝাঁপি খানা নিয়ে উত্তরাধিকারসূত্রে মিত্র পরিবারকে আশ্রয় করেছিলেন।

পরিবারের মধ্যে রেবারা দুটী ভাই বোন, আর মা বাবা তাদের! কাজেই আদর প্রশ্রয়ের অবকাশ বেশ প্রচুরই ছিল। মেয়ের নাম মেরী রেবা, ছেলের নামও আর্থার বীরেন্দ্র।

সন্ধ্যে। রেবার বাবার পড়বার ঘরে রেবা ঢুকল।

বই থেকে মুখ না তুলেই বাবা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি খবর?'

সমস্যার মীমাংসাটা বাবার কাছে পাওয়া গেলে মন্দ হয় না।

রেবা বললে, 'আচ্ছা বাবা—সেদিন তুমি বল্লে যে শকুন্তলা চরিত্র নাকি বড় চমৎকার'—

পিতা মেয়ের দিকে চেয়ে হাসলেন, 'হ্যাঁ, কি তা ?"

মেয়ে টেবিলের পাশে দাঁড়াল।

'আজকে ওরা সব তর্ক করছিল, আমাদের ক্লাসের মেয়েরা,—সীতা সতী—সাবিত্রী কেমন এই সব।

তা' তুমি অত সেদিন শকুন্তলার কথা বললে—ওরা একটি বারও কেউ শকুন্তলার নামও করলে না ?'

—বাপ বললেন, 'কেন তুই পড়িস্ নি, সীতা সতীদের কথা ?

শকুন্তলা সুন্দর সৃষ্টি বটে কিন্তু হিন্দুদের আদর্শ হিসেবে সীতা সতী সাবিত্রী ধরা হয়; তা' ওরা কি মীমাংসা করলে সব ?'

'ওরা কেউই কিছু বললে না ভাল করে; বিজয়া মুখার্জ্জি শুধু দুষ্টমী করতে লাগল।'

আচ্ছা তুই বল দিখি কে কেমন ? মৃদু হাস্যে পিতা জিজ্ঞাসা করলেন।

রেবা অপ্রস্তুত ভাবে একটু হাসলে, 'আমি সবটা ভাল করে জানি না ও সব গল্প—'

পিতা বললেন—'তুই পড়িস্ নি ?—আর, তোদের বয়সে যে আমরা ও সব বই পড়ে ফেলেছিলাম।—তখন তো এত তোদের মতন করে লেখা সাহিত্য বেরোয় নি। আমি আমার এক বন্ধু—হিন্দু সে ছেলেটী খুব বই পড়ত,—আমি তার বাড়ীতে কত ছোট বেলায় রাবণের কুম্ভকর্ণের ছবি দেখে মুগ্ধ হয়ে সব রামায়ণখানি পড়েছিলাম। সেকালের বটতলার ছবি রাবণের সারি বাঁধা দশ মাথা, কি ভালই লাগত সব দেখতে—তোদের তো এখন সব নতুন নতুন সভ্য সংস্করণ সভ্য ছবি হয়েছে।'

পিতা হাসতে লাগলেন—'ওঁদের সকলের চরিত্রই ফুটেছে বেশ। বেশ সুন্দরই। প্রত্যেকের আলাদা বৈশিষ্ট্য আছে। তুই পড়বি ?—দেখি দাঁড়া আমার একটা হয়ত সেকেলে সংস্করণ আছে রামায়ণের।'

আলমারীর কোণ খুঁজে একখানি বটতলার রামায়ণ বেরুলো। কাগজ, বাঁধাই, শ্রী দেখে রেবার খুব আগ্রহ হ'ল না পড়তে !

রেবা বললে, 'কিন্তু তুমি তো বললে না ওঁরা কে কেমন ?

পিতা বললেন, 'সে তোরা ভাববি, তোদের ডিবেটীং ক্লাবের কথা—'

ইতিহাস হিসেবে রামায়ণ মহাভারত রেবা গলাধঃকরণ করলে বটে;—কিন্তু বিজয়াদের মতন হিন্দু সঙ্গিনীদের মতন ও তাতে না পেলে কিছু ভক্তির, না পেলে চমৎকারিত্ব।

সীতা যে কেন অত সহ্য করলেন,—সাবিত্রীর যেন গল্প কথা—অভিমানিনী সতীরটা তবু যেন সম্ভব—এমনি মনে হয়। তবু গান্ধারী, শকুন্তলা, সুভদ্রা যেন বোঝা যায় কতকটা, যাই হোক সে পড়ে নিলে।

বিজয়া শুনে জিজ্ঞাসা করলে, 'বেশ না ভাই ?'

রেবা ঈষৎ অপ্রস্তুত ভাবে বললে—'হ্যাঁ বেশ। তা' নিতান্তই গল্পের মতনই তো সব !'

মিনু বললে—"কেন, কি চমৎকার সীতার স্বভাব,—না ?'

একটু চুপ করে রেবা বললে, 'হ্যাঁ বেশ, কিন্তু বড় কষ্ট দিলেন তাঁকে তোমাদের রাম'—

বিজয়া বললে, সেটা ঠিক—তাইতেই কিন্তু তার চরিত্র অত ফুটেছিল তো—'

রেবা শুধু একটু হাসলে, ভালমন্দ কিছু বললে না।

৩

আশ্বিন মাসের প্রথম।

রেবাদের থার্ডইয়ার। 'নন-কো-অপারেশন'এর খুব প্রচার চলছে। কলেজের সুমুখে পিকেটার ছেলেদের মেয়েদের ভিড়।

রেবা কলেজের সুমুখে আসছে—দেখে একটী ছেলে বললে—'ওরে মিস মিত্র, ও আবার [illegible]'

গুটি দু' তিন ছেলে, অন্য ধার থেকে [illegible] এগিয়ে এল। পথের অন্য দিক থেকে [illegible] তিনটী মেয়ে আসছে দেখা গেল।

রেবা খুব বিরক্ত গম্ভীর মুখে চুপ করে দাঁড়াল।

পিকেটার মেয়েটী বললে, 'আপনি একলা গিয়ে আর কি করবেন? ক্লাসই বসছে না। প্রফেসাররাই ফিরে যাচ্ছেন।'

রাগ করে রেবা বললে,—'আপনাদের যে এতে কি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে বুঝিনে! শুধু বাজে একটী হুজুগ—'

রেবা যাবার জন্য ফিরল।

বিজয়া আর অন্য মেয়েরা কিছুই বললে না। আস্তে আস্তে সবাই ফিরতে লাগল।

পথে নেবে বিরক্ত স্বরে রেবা বললে,—'ক'দিন এরকম জ্বালাবে কে জানে—'

'এতে হবে কি ছাই?' অন্য একটী সঙ্গিনী মেয়ে বললে।

বিজয়া বললে—'কিন্তু এড়ানো চায় না যে—'

রেবা বললে—'এড়ানো যায় না বলে নিজের তো ক্ষতি করতে পারা যায় না। এতে তোমাদের দেশ উদ্ধার এক্ষুণি হয়ে যাবে?'

বিজয়া একটু চুপ করে বললে,—'দেশ উদ্ধার হতে পারে, কি, না পারে, জানি না, তবে অনেকেই মেনে চলেন তাই অনেক সময়ে এড়ানো যায় না।

আর আমাদের দেশ বললি,—তোদের বুঝি দেশ নয়?'

রেবা অপ্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল একটু, বললে 'দেশের কথা নয়—নিজের ক্ষতির লাভের কথা ভাবছি, তাই রাগ হচ্ছিল।'

বিজয়া বললে,—'সে তো সবাই ভাবে, তবে কি আর করা যায়? চল্ আমাদের বাড়ী যাবি?

৪

বীরেনের জন্ম দিন। রেবার বাবার ও মার জন কতক দেশী বিলিতী বন্ধু-বান্ধবকে নিমন্ত্রণ করা হয়েছে।

বসবার ঘরে বসে তাঁরা গল্প করছিলেন।

রেবার গড্ মাদার কে এক মেম ছিলেন, রেবার মার বাল্যবন্ধু শ্রীমতী সুবালা রায় ছিলেন, আর একজন কে রেভারেণ্ড ছিলেন। আরও জনচারেক এদিক ওদিকের দেশী বিলাতী সাহেব ছিলেন।

রেবার ধর্ম্মমাতা বললেন, 'রেবা, এবারে তোমার বন্ধু মিস মুখার্জ্জিকে কেন দেখছি না?'

রেবা বললে,—'এবারে সে এখানে নেই,—তার ভাই শঙ্কর মুখার্জ্জির পিকেটিংএর অপরাধে জেল হয়েছে। সেও পড়া ছেড়ে দিয়েছে সে লাহোরে গেছে কাজ নিয়ে।'

সেই মহিলাটী বল্লেন,—'ও! ভারী দুঃখের বিষয় যে সে পড়া ছেড়ে দিলে। বেশ চতুর বালিকা ছিল। কিন্তু কি এই বিশ্রী প্রচার আর গোলমাল বলুন তো। বিরক্তিকর!

মিত্র সাহেবের একজন দেশী ক্রিশ্চান বন্ধু বল্লেন, 'স্কুল কলেজের ছেলে মেয়েদের এ বিষয়ে আলোচনা করাই উচিত নয়, ভারি অন্যায়!'

আর একটি মেম ছিলেন, তিনি বল্লেন, 'আপনারা জানেন না, কি রকমভাবে এটা তাদের মনে বদ্ধমূল হয়েছে। আমি সম্প্রতি পাঞ্জাবে গিয়েছিলাম। সেখানে স্কুলের ছোট ছোট বালিকারা কেউ বিলাতী শাড়ী পরে এলে কি অদ্ভুতভাবে তাকে বিদ্রূপ করে সবাই, কি সব বলা হয়। ছোট ছোট মেয়েরাও অপমানের ভয়ে কেউ বিদেশী পরে না সহজে।'

রেবাদের গডমাদার বল্লেন,—'স্বদেশী প্রচার খুব ভাল জিনিষ, আমি স্বীকার করি; কিন্তু এই রকম বালক-বালিকা নিতান্ত শিশুদের মধ্যে এই ভাবের বিদ্বেষ প্রোপাগাণ্ডা একেবারেই ভাল নয়—'

মিত্র সাহেব বল্লেন,—'তা' সত্য। তবে ঠিক বলা যায় না, প্রচার সত্যই ওভাবে হয় কি না।'

মিত্র মহাশয়ের এক বিলিতী বন্ধু বল্লেন,—'তাছাড়া এরা এই প্রোপাগাণ্ডিষ্টরা চায় কি? এদের যে রকম আন্তর্জাতিক সমস্যা আর যত সব গোলমেলে ব্যাপার,—আপনি আশা করি সব বুঝতে পারেন—কেন না আপনার স্বদেশের ব্যাপার। এর মীমাংসা এরা নিজেরা করতে পারবে? চীনদেশের অবস্থা দেখেন না? গত কয়েক বৎসর আগের হিন্দু-মুসলমান হাঙ্গামার কথা এরা ভাবেনা?'

মিত্র সাহেব, অন্য প্রসঙ্গের অবতারণার উদ্দেশে বল্লেন, —'হ্যাঁ অনেকটা ঠিক। কিন্তু হয় ত এরা এ সব ব্যাপার আপনারাই মীমাংসা করতে পারবেন।

মিস্ সিমসন্ আপনি এই মীনেকারী কাজকরা কাজ করা সুন্দর জয়পুরী ফুলদানীটা দেখেছিলেন কি সেদিন? আমি এবার এনেছি এটা, এটি দেশী শিল্প, পিতলের উপর এনামেল করা। নিতান্ত নিরক্ষর অজ্ঞ, আর্ট সম্বন্ধে কিছুমাত্র জানে না এরা, কিন্তু কি সুন্দর আর্টিষ্টিক জিনিষটা করেছে নয়?—আরও ট্রে ইত্যাদি অনেক দেখলাম—চমৎকার কাজ!—ডিজাইনগুলি নিতান্ত মোটা নয়, সূক্ষ্মতা আছে।'

তিনি মস্ত বড় একটী পিতলের টব আর দু' একটী জিনিষের কারুকার্য্য দেখালেন। 'বাঃ' 'চমৎকার' ইত্যাদি মন্তব্যের মাঝে ইন্দ্রসভা আঁকা একটী ট্রেতে চায়ের সরঞ্জাম এলো। কথা দেশী শিল্পকলার দিকে মোড় নিলে।

৫

অতিথিদের বিদায়ের পর রাত্রে পিতা পুত্রী সুমুখের ছাতে বেড়াচ্ছিলেন, শ্রান্ত জননী শুয়েছিলেন।

রেবার মনে ঘুরছিল অতিথিদের তর্ক বিতর্ক।

দেশী শিল্প কারু-কলার আলোচনাও মনে স্থান নিয়েছিল।

'আচ্ছা বাবা, এই স্কুল কলেজ ছাড়া,—এতে কি সুবিধা হবে সত্যি কিছু?'

বাপ চুপ করে রইলেন একটু,—তারপর বল্লেন, 'ঠিক ওঁদের দিক দিয়ে দেখলে হয় ত ওঁদের মতামত ঠিক মনে হবে।'

রেবা বল্লে—'কিন্তু দেশ তো আমাদেরও! আমি একবার একবার ভাবি বিজয়ারা কেমন সহজে সমস্ত এই ব্যাপারের সঙ্গে মিশে গেছে—যেন ওদের কর্ত্তব্য, ওদের উচিত। কই আমাদের তো ও রকম হয় না। অথচ ওই সব ওদের কথাবার্ত্তা বিশ্রী লাগছিল আমার! সব যেন মুরুব্বিয়ানা ধরণ।'

বাপ মৃদু হাসলেন শেষের কথায়,—বল্লেন—'ওদের মুরুব্বিয়ানা তো সবটা অস্বীকার করতে পার না, যতক্ষণ ওদের হাতে রয়েছি!'

ও একটু চুপ করে বল্লে,—'কিন্তু দেখছ? আমাদের যেন দুধারেই আন্তরিকতা নেই। না এরা আমাদের আপনার হয়,—না বিজয়ারা হয়। আমাদের দেশ আর ধর্ম্মেও যেন মিশ খায় না! না?'

বাপ চুপ করে রইলেন খানিকক্ষণ, তারপর বল্লেন,—'তুমি এ জিনিষটা লক্ষ্য করেছ দেখছি। আমাদের চোখে এত পড়েনি। ঠিক বটে, আমাদের মিশও খায় না আন্তরিকতাও পাই না—মেয়েদের মধ্যে এটা বোধ হয় বেশী প্রকাশ হয়। কিন্তু বিদেশী সভ্যতার ঋণ তো আমরা কেউই অস্বীকার করতে পারি না। উপকার কি তাতে পাইনি যে একেবারে বর্জ্জন করব সব?'

রেবা বল্লে,—'কিন্তু আমি তো তোমার কাছ থেকে যে সব বই নিয়ে গেলাম সেদিন, তাতে অপকারের দিকও কম দেখলাম না।

বাপ একটু হাসলেন, বল্লেন,—'তোমার বিজয়া চলে গিয়ে দেখছি সত্যি মন কেমন করছে। তোমার চিন্তাশীলতা সে বাড়িয়ে দিয়েছে। রাত হ'ল ঢের এবারে শোওগে।' রেবাও হাস্লে। শুতে চলে গেল।

৬

দেশে বিদেশে ধরপাকড়—হৈ হৈ তখনো পুরো উৎসাহে চলেছে। কলেজ খোলা বটে—কিন্তু মনের গতি যেন সবই ঐ কারারুদ্ধদের দিকে। পড়া হোক না হোক তাতে রেবার বন্ধু বান্ধবদের বিশেষ কিছু যায় আসে না।

বিজয়ার চিঠি আসে অনেকদিন পরে পরে। রেবা অন্যমনে ভাবে, দেশের কথা, সঙ্গিনীদের কথা, তাদের সব মনোভাবের কথা। চার্চ্চে যায়, বাইরে মেশে, লক্ষ্য হয় যেন তারা স্রোতের শেওলা। দেশের সঙ্গে মনের যোগ নেই, ধর্ম্মের সঙ্গে প্রাণের বন্ধন নেই। ওদের যারা স্বধর্ম্মী, তারা ওদের স্বদেশবাসী নয়; যারা ওদের স্বদেশবাসী, প্রতিবেশী, তারা ওদের ম্লেচ্ছ মনে করে, দূরে রাখে বিজাতীয় বিধর্ম্মী বলে। ওদের ভাষা ওদের ধর্ম্মের বইয়ের ভাষা নয়; এত বড় মহাদেশে ওদের একটা তীর্থ নেই; ওদের স্বজন নেই, ওদের স্বদেশ বলে গর্ব্ব করবার মত ছোট্ট গ্রাম নেই, পল্লী নেই। আপনার [illegible] কাছে অনেকবার এ মনোভাব এই [illegible] চেষ্টা করেছে—কিন্তু কিছুতেই যায় না। [illegible]

নেই; দেশের উৎসব ওদের নয়, ওদের ধর্ম্মের উৎসব ওদের সঙ্গে পূরো খাপ খায় না।

বাইবেলের সুন্দর উপদেশগুলির স্কুলের মেয়েদের কাছে যে বাংলা বলা হত, অদ্ভুত মনে হত, আবার এখন ইংরাজীতে উপাসনা তাও মনে হয় মাতৃভাষা নয়। মনের সঙ্গে যে ভাষার যোগ, ভাষার সঙ্গে দেশের, দেশের সঙ্গে ধর্ম্মের—রেবার মনের মাঝে বেদনার সমালোচনার ত্রিধারা বয়, কিন্তু তারা একটা অন্যের পথে তো বয় না। তিনটিই পৃথক।

প্রতিবেশীরা ওদের বন্ধু নয়, স্বজন নয়, স্বজন হ'তে পারে না। শ্রদ্ধা সম্ভ্রমের যোগ সেখানে হয় না। দেশের নাড়ীর সঙ্গে, জনতার স্পন্দিত হৃদয়ের সঙ্গে, সমস্ত কর্ম্ম আনন্দের সঙ্গে ওরা যোগ দিতে পারে না। রেবা অন্য-মনে কেবলি একবার স্বধর্ম্মীর আর আবার স্বদেশবাসীর প্রতিবাসীর কথা ভাবে।

ওদের দেশ প্যালেষ্টাইন? ওদের ভাষা তবে? ভাষা, দেশ, ধর্ম্ম মনের মধ্যে জট পাকিয়ে গেছে যেন ছেঁড়া চুলের রাশ। খুললেই বন্ধনহীন দিগদিগন্তে উড়ে ছড়িয়ে যাবে।

৭

বড়দিনের ছুটীতে রেবাদের দুই ভাই বোনের নিমন্ত্রণ এলো রেবার ধর্ম্মমাতার কাছ থেকে। তিনি যাচ্ছিলেন পাঞ্জাবের দিকে এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্যত্রও—আজমীর মার-ওয়াড়া ইত্যাদি দেখতেও পারেন। বিজয়ার কাছ থেকেও নিমন্ত্রণ আসছিল।

বিজয়ার সঙ্গে দেখা করার আগ্রহে ও দেশভ্রমণের আগ্রহেও রেবারা উৎসাহিত হয়ে উঠল।

কলকাতার—বাংলাদেশের সীমা ছাড়িয়ে আস্তে আস্তে নতুন ঈষৎ উষর রুক্ষ দেশের পাহাড় নদী গ্রামের অন্য ধরণ চোখের সামনে ফুটতে মিলাতে মিলাতে ওরা অনেক দেশ পার হয়ে এলো।

হিন্দুর তীর্থ, মুসলমানের নামাঙ্কিত দেশ প্রদেশ,মন্দির, মসজিদ গ্রাম নদী নগর রেবার চোখে আর মনের চোখে ভাসে আর মিলিয়ে যায়। শুধু রেবারাই গ্রন্থিহীন বন্ধন-হীন?

রেবার গডমাদারদেরও হোম আছে। যথেষ্ট গর্ব্বের সহিত তাঁরা সেকথা বলেন। এই খানিক আগেই দেশীয়েরা কি রকম অপরিচ্ছন্ন আর তাঁদের দেশের কি রকম পরিচ্ছন্নতা গল্প করছিলেন।

ক্রমে দিল্লীর ধ্বংসাবশেষের মাঝখান দিয়ে হস্তিনা-পুরীর ধ্বংসস্তূপের মাঝ দিয়ে হুমায়ুন বাবর আকবরের কীর্ত্তি ধ্বংসের চিহ্নের মাঝ দিয়ে দিয়ে রুক্ষ রাঙা জনহীন শ্যামলতাহীন মাঠের মাঝ দিয়ে আসতে আসতে নতুন দিল্লীর নতুন সহর ছাড়িয়ে দিল্লী এসে পড়ল।

দেখাশোনা সবই হ'ল। পুরাতন ধ্বংসাবশেষের দেশ একে একে হস্তিনা, দিল্লী, আজমীর, মারওয়াড়া, রাজ-পুতানা সব জায়গায় নতুন সভ্যতার নতুন আবেষ্টন। এক বিদেশী সভ্যতার শেষের ওপর অন্য বৈদেশিকীর জয়-পতাকা। দেশের শুধু মাটী, যেন বেদনা লজ্জায় মাটীই হয়ে আছে দেশ।

রেবা ভাবে শুধু। গডমাদার মিশনে অতিথি হন নয়ত হোষ্টেলে ওঠেন, মিশনে চোখে পড়ে বিদেশীর আতিথেয়তা তাদেরই ওপর। মিশনে মিশনে দয়া দাক্ষিণ্য। প্রায় সর্ব্বত্রই বড় জায়গায় ওদের মিশন আছে। আর দলে দলে অর্দ্ধ নগ্ন বালক শিশু তাদের পিতামাতাও মিশনের দাতব্য ঔষধালয়ে আসা যাওয়া করে; অবৈ-তনিক স্কুলে পড়ে যায়।

বিদেশীরা শিক্ষা দেয়, ঔষধ দেয় যেন নির্ম্মম দয়ার চোখে দেখে।

রেবার ওপর তাদের আতিথেয়তার শেষ নেই।

কথা সূত্রে কোন এক মিশনের ভার প্রাপ্ত মেম বল্লেন, 'দেখুন মিস মিত্র, ওদের কি অবস্থা! আমরা শিক্ষার জন্য কত প্রাণপণে চেষ্টা করি কিন্তু ওরা ওদের কোনো সংস্কারই ছাড়বে না। কি রকম যে কুসংস্কার, 'ভূতে পাওয়া' বলে একটী ছোট্ট ছেলে তো সেদিন প্রায় মরবার যোগাড় হয়েছিল! আপনি যদি কিছুদিন দেখেন—"

কি রকম একটু অপ্রস্তুত ভাবে হেসে ও চুপ করেই থাকে।

মেম আবার বলেন, 'সমাজেরই বা কি দুর্গতি একবার

শুনুন। ঐ যে ঐ ছোট্ট মেয়েটী দেখছেন, ওটী একটি বেনের ঘরের মেয়ে ; এই চম্পা ইধার আও'—

ছোট্ট একটি ফুট্‌ফুটে সুশ্রী বালিকা এসে দাঁড়াল।

তাকে একটু হেসে কি অন্য কথা বলে মেম অন্যত্র পাঠালেন। তারপর বলতে লাগলেন,—'বছর তিনেক আগে ঐ মেয়েটীর মাকে কূয়ো থেকে সন্ধ্যেবেলা জল ভরে ফেরবার সময় দুটো মুসলমান ধরে নিয়ে যায়। খবর পেয়ে ওর আত্মীয়স্বজনরা চেষ্টা চরিত্র অনেক করে সেই লোকেদের কাছ থেকে ওকে খুঁজে নিয়ে এলো, তারপর লোক দুটীর নামে যথারীতি খরচপত্র করেই কেস করালে, শাস্তিও হ'ল তাদের। কেসটা বেশ যত্ন নিয়ে হচ্ছিল, আর ছোট সহরে বেশ সোরগোলও পড়ে গিয়েছিল, আমরাও তার খবর নিচ্ছিলাম। আশ্চর্য্যের বিষয়, এমন সময়ে শুনলাম, যে ঐ স্ত্রীলোকটীর আত্মীয়রা ওকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে না, ওকে আপনাদের সমাজ বহির্ভূত করে দেওয়া হবে। আর তাতে ও খুব কান্নাকাটি করছে। আমরা সম্পূর্ণ খবর পেলাম না, বুঝলামও না, তখন— যে, কেন, কি জন্য এ ব্যবস্থা হ'ল, অবশ্য পরে তার কাছে শুনে বুঝলাম। যাহোক যখন নিশ্চয় হ'ল যে সে আর তার কোনো আত্মীয়ের কাছেই ফিরে যেতে পাবে না, আমাদের একটী স্কুলের মাষ্টার বল্লে,—সে একেবারে বাইরের স্ত্রীলোক হয়ে যাবে। তখন আমরা আমাদের দয়ালু পবিত্র পিতার নাম নিয়ে তার কাছে গেলাম। দেখলাম তাকে একটা দেবালয়ের একটী ধরম শালায় থাকতে দেওয়া হয়েছে—সে সেখানে খুব ভীত আর কাতর হয়ে আছে। তার কাছে দুটী পাড়ার স্ত্রীলোক এসেছিল, তাদের ভদ্রও মনে হ'ল না, ভালও মনে হ'ল না। আমরা ওকে আমাদের মিশনে নিতে চাইলাম। ধর্ম্মভ্রষ্ট হবার ভয়ে সে তো প্রথমে রাজীই হ'ল না, শুধু কাঁদতে লাগল। আর এই মেয়েটী তখন ৬ মাসের বয়সের। আমরা অনেক বোঝালাম ঐ মেয়েকে মানুষ করব, যত্ন করব, লেখাপড়া শেখাব বলে। আর এও ও বুঝতে পেরেছিল,—ঘরে ওকে তারা ফিরিয়ে নেবে না, ও দ্বিধা ভরে চুপ করে রইল। শেষে আমরা এও বল্লাম তুমি আমাদের আশ্রয় তো নাও, ধর্ম্ম নাও, বা না নাও। তখন ও রাজী হ'ল। যদিও সেই স্ত্রীলোক দুটো নানারকম করে ওকে উল্টো বোঝাবার চেষ্টা করছিল।

যাহোক ওকে আমরা নিয়ে এলাম আজ চার বছর হ'ল, ও বছর খানেক পরেই আমাদের ধর্ম্ম গ্রহণ করেছে এখন ওর বয়স হয়েছে, বুদ্ধিও হয়েছে, ওকে যদি জিজ্ঞাসা করেন সব কথা বলতে পারবে। আর কি বিপদে যে ও পড়ত যদি এই পবিত্র মিশনের আশ্রয় গ্রহণ না করত, তাও ও নিজেই বলে। সেই স্ত্রীলোক দুটো ওকে বিপথে নিয়ে যাবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করেছিল। এই তো ওদের অবস্থা, আর ব্যবস্থা। কিন্তু আমাদের ওরা বিশ্বাস করে না।'

—রেবা চুপ করেই থাকে। শেষে বল্লে, 'ওর স্বামীও ওকে আর মেয়েকে নিয়ে গেল না ?

মেম বল্‌লেন,—'ও যে বিধবা ছিল' !

রেবা যেন আশ্বস্ত হয়ে বলে উঠল,—'ও তাই ! নইলে হয়ত ও আশ্রয় পেত।'

এবার মৃদু হাস্তে মেম বল্লেন,—'ওঃ না ! সেও আমি শুনেছি—ওর কাছে এবং আর একজন মেয়ে জানি তাকে কেউই গ্রহণ করেনি অবশেষে সে বিপথে গেল। তা-ছাড়া ওরা বলে, যে ইসলাম ধর্ম্মও কেউ কেউ গ্রহণ করে কিম্বা করতে বাধ্য হয়। আপনি ঐ প্রেমসুখ বাইরের কাছেই কিছু কিছু শুনুন না ? বুঝবেন কত বিস্তৃতভাবে আমাদের কাজ হয় !—কিন্তু এমন অকৃতজ্ঞ দেশ। ওরা আমাদের নিন্দা করে। অবশ্য আমাদের দেখাদেখি আজকাল আর্য্য সমাজীরা কাজ করে অনেক।'

নতুন শ্রোত্রী পেয়ে রেবাকে ক্রমাগত মিশনের কাজ আর কর্ম্মাদল দেখানো যেন সবারি অভ্যাস হয়ে উঠল।

প্রেমসুখের নাম এখন মরিয়ম।

প্রেমসুখ ওরফে মরিয়মের সঙ্গে মেমের ইচ্ছায় সে একটুখানি আলাপ করলে। বিদেশীর বিরাগ কোথায় লাগে প্রেমসুখের বিরাগের কাছে। মরিয়ম অনর্গল পুরাতন দিনের আচার, বিচার, ব্যবহার, সংযম [illegible] কথা বলে যায়। তার বিতৃষ্ণার [illegible] কৃচ্ছতাকে নিষ্ঠাকে সে বিদ্রূপ করে, অবজ্ঞা করে।

রেবার হিন্দু সমাজের এত খুঁটী-নাটী জানা ছিল না—সে চুপ করেই থাকে।

কেন যে কে জানে, তবু রেবার ভাল লাগে না—

রেবা বল্‌লে,—'তুমি অন্য উপায়ে ভাল থাকতে পারতে তো! কেউ কি তা' থাকে না?'

'ভাল থাকবার উপায় জানতুম কখনো? আপনি জানেন না কি রকম বিপদ সে'—

রেবা চুপ করে যায়।

মিশনে সকলে মিলে তাকে তাদের দেশ দেশবাসী ও ধর্ম্ম কতখানি যে অবিচার আর অন্যায় করে,—আর তারা মুষ্টিমেয় হয়েও কত রক্ষা করে, তাই জানায়।

সত্যিই যে তারা রক্ষা করে, সাহায্য করে, সে রেবা বুঝতে পারে;—'উন্নত' করে তুলতে চায় তাও দেখা যায়;—এবং সেও যে ঐ সমাজভুক্তা সেজন্যে বিশেষ করেই গর্ব্বিত হওয়া উচিত তাও বোঝে; কিন্তু কোন্ একটা গোপন লজ্জা, অপ্রস্তুত ভাব কেবলি তাকে পীড়া দেয়, কাঁটার মতন ফুটতে থাকে মনে।

চারিদিকের মমতাহীন অপর্য্যাপ্ত দয়া উন্নত করার চেষ্টা আর ঋণের ভারে গড়া আবেষ্টনের মাঝে সে যেন হাঁপিয়ে উঠতে লাগল।

৮

ইতিমধ্যে বিজয়ার তাগাদার পর তাগাদা আসে রেবার লাহোরে যাবার জন্য।

নির্লিপ্ত রাজপুতানা ছেড়ে—লাহোরে যখন রেবা এসে পৌঁছল খুব বর্জ্জন ধরপাকড়—পিকেটীং—কারাবাস চলেছে।

নবেম্বরের শেষ। কোনোদিকে আর কোনো আলোচনা নেই, সময়ের স্রোতে সবাই ভেসে চলেছে!

বিজয়া একটী বালিকাবিদ্যালয়ে পড়ায়।

স্কুলের বোর্ডিংএই থাকে।

রেবার অনেকগুলি পাঞ্জাবী, গুজরাটী মেয়েদের সঙ্গে আলাপ হ'ল।

রেবার এবার অন্যদিক দেখবার পালা।

নানাবিধ আলোচনা হয় সবারি মধ্যে। ও নির্লিপ্ত ভাবেই থাকবার চেষ্টা করে। ঝগড়-চোপড়ও তার প্রত্যক্ষ দেখী নয়। সকলেই যেন সংশয়ের চোখে লক্ষ্য করে—কিছু বলা উচিত, না, অতিথি কিছু বলা উচিত নয়,—কেউই ওকে 'আপন' মনে করে না. শুধু ভদ্রতা করে।

দেশ জোড়া দেশের কাজে ছোট বড় সবাই যোগ দেয়। রেবার খাপ খায় না। ওর নির্লিপ্ততাকে সবাই সহজভাবেও নেয় না। ও নিজেও নিতে পারে না। মনে ধাক্কা লাগে। যেন মীমাংসা কিছুতেই করা যায় না।

বিজয়ার সঙ্গে ঘোরে। ওর পরিচয় শুনে সবাই কথা কয় ভদ্রভাবে, আন্তরিক ভাবে নয়।

রেবা যেন আর কাদের'—ওদের নয়; পরগাছা—ওর মূল্য নেই।

এমনি সময়ে একদিন কি একটা উদ্দেশ্যে একটা বিরাট সভা হ'ল।

দর্শক হিসেবেও বটে কৌতূহল হিসেবেও রেবা সেবিকা দলের মধ্যে মিশে সেখানে গেল।

যেমন হয়, সভা আরম্ভ হবার আগেই যথেষ্ট গোলমাল হয়ে মার খেয়ে জনতা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল।

বিজয়ারা রেবাকে পৃথক করবার চেষ্টা অনেক করলে, দ্বিধাভাবে রেবা ওদের সঙ্গেই রইল।

বিজয়া আর দু একটী জানা মেয়ে ছাড়া রেবাকে কেউই চিন্‌ত না, কংগ্রেস কমিটীর কোনো ছাপও ওর ছিল না। কিন্তু পুলিশ ছাড়ল না।

যথারীতি জনকতক সেবিকা ও সেবক সরকারের আশ্রয় ভুক্ত হ'ল।

৯

নাম ধাম পরিচয় লেখার সময় এলো।

একে একে সবাই নাম পরিচয় দিলে।

রেবাকেও জিজ্ঞাসা করা হ'ল—নামে শুনে ভ্রূকুঞ্চিত করে সে দেশী ইন্‌পেক্টর জিজ্ঞাসা করলে, 'আপনার জাত কি লিখব?'

রেবা বল্‌লে—ও 'ঈশাই'।

'ঈশাই?' একটু চুপ করে থেকে সে বল্‌লে,—'আপনি

কি কোনো জামিন দেবেন, না আপনার কিছু বলবার আছে আর ?'

রেবা বল্‌লে,—তার কিছুই বলবার নেই।

সে তারপর কি ভেবে একটু অপ্রস্তুত ভাবে ওকে পৃথক ডেকে জিজ্ঞাসা করলে—'আপনি কি সরকার থেকে নিযুক্ত হয়েছেন এদের লক্ষ্য করার জন্য ?'

রেবার মুখ রাঙা হয়ে উঠল,—সে শুধু 'না' বলে ফিরে এলো। জামিন, বক্তব্য, পরিচয় আর কিছুই সে দিলে না।

সব চুপচাপ হাজতে ফিরে এলো।

বিজয়া অপ্রস্তুত ভাবে বল্‌লে,—'তোর বাবাকে তার করিয়ে দি—তুই কেন কষ্ট পাবি ? দলের মাঝে পড়ে তোর একি কর্ম্মভোগ ! তোর বাবা শুনলে কি ভাববেন আমাকে !'

রেবা একেবারে চুপচাপ ছিল। এবারে বল্‌লে,—'না, তোমাদের সঙ্গে ওদের যা' সম্পর্ক আমার সঙ্গেও তাই। আমি যে দেশের তোমরাও সেই দেশের। বাবাকে খবর দিতে চাও দাও আমি তা' বলে খালাসের বা জামীনের চেষ্টা করতে দোব না।'

বিজয়া আশ্চর্য্য হয়ে গেল, বল্‌লে,—'তুই বুঝতে পারছিস না আমাকে কি ভাববেন সব ! মা কি মনে করবেন'—

'তা' যা হয় মনে করুন। আমি তোমাদের সঙ্গে সমান, সমস্ত ভেবে দেখেছি।'

রেবা দৃঢ়ভাবে বল্‌লে,—আর ওরাও আমাদের বিশ্বাস করে না তোমরাও না, সবাই 'চর' মনে করে—আমি ওদের ভেতর যাব না।

খবর পেয়ে রেবার বাবা ব্যস্ত হয়ে এসে মেয়ের সঙ্গে দেখা করলেন।

'একি মা ? তুমি এমন ছেলে মানুষ, তোমার মা কত ব্যস্ত হয়েছেন। আমি তোমার জামীন করে এসেছি কাল খালাস পাবে। কি বিপদ বলত, বেড়াতে এসে—তোমাকে ওদের নিয়ে আসা উচিত হয়নি ওদের সঙ্গে :—'

মেয়ে বাপকে প্রণাম করে দাঁড়িয়েছিল, একটু হেসে বল্‌লে,—'ওরা আনেনি বাবা, আমি সভায় কেমন লোক হয়, দেখতে এসেছিলাম। কিন্তু তুমি জামীন দিও না।'

'সে কি মা ? জামীন দোব না তো কি করে দেশে ফিরবে ?'

রেবা বল্‌লে,—'খালাস পেলে ফিরব।'

বাপ অবাক হয়ে গেলেন।

তারপর বল্‌লেন,—'তুমি বুঝছ না মা জিনিষটা, এ' যারা করছে এর সঙ্গে আমাদের এমন কোনো সম্বন্ধ নেই—যার জন্যে এই হুজুগে আমরা যোগ দিই। আমাদের উচিত নির্লিপ্ত হয়ে থাকা। এ একটা নিরর্থক চেষ্টা।'

রেবা বল্‌লে,—'সে হয় না বাবা, দেশে থেকে, সব জিনিষের মাঝে থেকে আমরা নির্লিপ্ত হয়ে থাকলে ওদের ও আমরা 'আপন' হই না, এদেরও না। এ নিরর্থক হোক বা না হোক—আমার মনে হয় আমার পথ এই,—আমাকে আমাদের দেশকে এদের মধ্যেই খুঁজে নিতে দাও। আমি অমন তর outcastএর মতন থাকতে পারছিনি আর।' আমি অনেক দেখেছি। দেশে সবাই আমাদের 'পর' করে রাখে, কতক ম্লেচ্ছ মনে করে কতক ভয়ে ভয়ে ; আর বিদেশীরাও আমাদের অশ্রদ্ধা অবজ্ঞার দয়ার চোখে দেখে। মিশনে দেখলাম, বাহিরে দেখলাম—আমরা কারুরই আপনার নই'—

বাপ চুপ করে থেকে বল্লেন,—'তাতে ক্ষতিই বা কি আমাদের ? তুমি জাননা আমি তোমার যেখানে বিয়ের কথা বলছি তারা এটাকে কি ভাবে নেবে। ক্রিশ্চান বলেই তার যে সুযোগ আছে,—তোমাকে নিলে তা নিতে পারবে না হয়ত।'

একটু হেসে রেবা বল্‌লে,—'কিন্তু এইটেই, এই সুযোগটাই আমাদের সবচেয়ে ক্ষতি ;—ধর্ম্মের সঙ্গে দেশকে 'আমার' বলতে না পারা ; কোনো দেশকেই 'আমার' বলতে না পারাই আমাদের সব চেয়ে ক্ষতি। আমাদের সুযোগ না থাক যোগ্যতা দিয়ে সুযোগ হবে'খন। তুমি ফিরে যাও বাবা, আমি মুক্তি পেলেই ফিরব।'

মেয়ে বাপের পায়ের কাছে নীচু হয়ে প্রণাম করলে।

বাপ ব্যাকুলভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন

আকাশের মতন

— গল্প —

শ্রীবিমল মিত্র

[শ্রীবিমল মিত্রের নাম আধুনিক পাঠক ও পাঠিকাদের অজানা নয়। ইঁহার গল্পের নিজস্ব ষ্টাইল আছে, বলিবার কথা ও ভঙ্গিটিও নূতন ধরণের। বর্ত্তমান গল্পটিতে একটি পুরুষ ও একটি নারী হৃদয়ের পরিচয় পরিস্ফুট করিবার প্রচেষ্টা আছে। ইহা 'আকাশের মতন' কি না তাহা পাঠক-পাঠিকাদেরই বিবেচ্য।]

বর্ষায় পোড়াদহের শুষ্ক বিলটি জলে একেবারে পরিপূর্ণ হইয়া গেছে; জেলেরা ওধারে জাল ফেলিয়া মাছ ধরে—চারিদিকে অপার স্তব্ধতা জমিয়া জায়গাটি যেন থম থম করে; কচুরিপানার দামে এ দিকের সব জল ঢাকিয়া ফেলিয়াছে; দু'একটা মাছরাঙা পাখী অদ্ভুত শব্দ করিতে করিতে উড়িয়া যায়, সূর্য্য ঠিক মাথার উপর উঠিয়াছে—বোধ হয়—দুপুরের ক্লান্ত আবহাওয়া সারা বিলখানিকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে।

ছাতিম গাছের তলায় বসিয়া নিশিকান্ত মাছ ধরিতেছিল।

জলের উপর একটি বাঁশের মাচার উপর ছোট মাটীর ভাঁড়ে কিছু চার রাখা; সেইখানেই একপাশে নিশিকান্ত ছিপটি লইয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকে।

ফাৎনাটি একটু নড়ে—অমনি নিশিকান্ত সচকিত হইয়া ওঠে;—তারপর আর কোথাও কিছু নাই—ফাৎনাটি পূর্ব্বের ন্যায় নিথর নিশ্চল অবস্থায় মাথা উঁচু করিয়া ভাসিতে থাকে···নিশিকান্ত সেই দিক পানে চোখ রাখিয়া আবার ভাবিতে বসে।

ভাবিবার কি আর মাথা মুণ্ডু আছে?

ছিদাম রোজই বলিতেছে—আর ভাল লাগেনা—বুঝলে নিশিকান্ত—এই সংসারের কথা বলছিলাম—মনে হয় ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে যাই চলে—যেদিকে দু'চোখ যায়;—ব্যস্‌টা—দু'কুড়ি বয়েস হোল—তিথি ধর্ম্ম কিছু না—কেবল সংসার আর সংসার—কেন রে বাপু?···

নিশিকান্তের আর ভাবনা কি! বাপের রাখিয়া যাওয়া সম্পত্তি যাহা আছে তাহাই একটু দেখিয়া শুনিয়া চলিলে—সারা জীবনের ভাত-কাপড় চলিয়া যায়! কিন্তু তাহার পক্ষে চলাও যা' না-চলাও তাই! নিশিকান্ত ভাবে—যাহার সংসারে কেহ নাই—সে আবার কতকগুলা প্রাণ-হীন জড়পদার্থ সম্পত্তি লইয়াই বা কি করিবে!

ছিদাম বলিত—যাই বল আর তাই বল নিশিকান্ত—ও নরক টরক কিছু নয়—ছেলেপুলে নেই···তুমি আছ বেশ; কথায় বলে না—'ভাগ্যবানের বউ মরে'—তোমার তাই হয়েছে—এ ব্রাহ্মণের কথা—দেখে নিও—এই দেখনা—আমার বউটা পক্ষাঘাত হয়ে পড়ে' রয়েছে আজ ত' এই সাতটি বছর—কই মোল কি? তেমন ভাগ্যই নয়—ঘষা কপাল যে—!

ছিদামের কথা শুনিয়া নিশিকান্তের হাসি আসে। নিজ-হাতে রাঁধিয়া খাওয়ার সুখটা যদি ছিদাম বুঝিত তাহা হইলে আর এমন কথা বলিত না। কামিনী চলিয়া গেছে যাক্—তা' বলিয়া সে ত মাথার দিব্য দিয়া বিবাহ করিতে নিষেধ করিয়া যায় নাই! আর যদি নিষেধই করিয়া গিয়া থাকে—তাহা হইলে সেই নিষেধই যে মানিয়া লইতে হইবে—এমন কি কথা আছে!

নিজের অন্তরের মধ্যে ন্যায়ের সমর্থন পাইয়া নিশিকান্ত মাচার উপর সোজা হইয়া বসিল।

বিলের ধার দিয়া রাস্তা; মাঝে মাঝে দু একটা লোক পথ দিয়া যায়; চাষারা ক্ষেতে কাজ করিতে করিতে দরকার হইলে ঘটী করিয়া জল লইতে আসে। নিশিকান্ত পায়ের শব্দ শুনিয়াই পিছন ফিরিয়া তাকায়।

—কে গো হরনাথ বুঝি?···তোমার ছেলে কেমন আছে হরনাথ?···মাথার বেদনা কেমন?

হরনাথ বলে—পেরনাম ডাক্তারবাবু—অসুখ একটু কমেছে আপনার দয়ায়—কিন্তু ওষুধটা ফুরিয়ে গেছে যে সব—ও বেলা যাব খন—শিশি নিয়ে আসি তা' হ'লে—

হরনাথ চলিয়া গেল। চারিদিকে চাহিয়া নিশিকান্ত আবার চুপ করিয়া বসিয়া থাকে; আজ যে কি হইয়াছে; একটা মাছও টোপ ছুঁইতেছে না; তা' হোক—এই রকম জায়গায় ভাবনাগুলি বেশ মাথা জুড়িয়া বসে।

আকাশের গায়ে এতটুকু মেঘের চিহ্ন নাই; ছাতিম গাছের তলাটিতে কেমন নিবিড় একটি শান্তি; কিন্তু এমন শান্তি ত নিশিকান্ত চাহে নাই—চাহিয়াছিল একটি প্রশস্ত নীড়—যেখানে কামিনীর মত একটি নারী দিবে প্রেম—ছোট একটি ছেলে দিবে স্নেহ—একটি শান্ত শীতল আশ্রয় ঘেরিয়া তাহার জীবনের ছোট রথটি নিরিবিলি একটি নির্জ্জন পথ করিয়া লইবে। কিন্তু তাহা হয় নাই—কামিনী চলিয়া গেছে—সন্তানের কল্পনা কল্পনাই রহিয়া গেছে;...নিশিকান্তের মনে স্মৃতির রাগরেখা আজ ফিকা হইয়া আসিতে চলিল।

ফাৎনাটি একটু নড়িয়া ওঠে।

নিশিকান্ত সোজা হইয়া বসিল—তারপর আস্তে আস্তে অতি সন্তর্পণে ছিপটি হাতে তুলিয়া লইতে যাইবে—হঠাৎ কে যেন পিছনে আসিয়া দাঁড়াইল। যে আসিয়াছিল—তাহার নাড়া লাগিয়া মাচাটি নড়িয়া উঠিল। মাচাও নড়িল—জলও নড়িল; জল নড়িতেই মাছ পালাইয়া গিয়াছে; ফাৎনাটি তখন কেবল ঢেউএর তালে তালে দুলিয়া উঠিতেছে! নিশিকান্ত বিরক্ত হইয়া পিছন ফিরিয়া দেখিল—দেখিয়াই হাসিয়া ফেলিল—আরে তুই? তুই কখন এলি?...

শশি বলে—তুমি খাবেনা আজ?...কত বেলা হ'য়ে গেছে জান? মা বল্লে—মামাবাবুকে ডেকে আন্—ক'টা মাছ ধরলে দেখি—মামাবাবু—দেখি—কই, মাছ কই?

—আজ একটাও মাছ নেই রে—একটাও না—বলিয়া নিশিকান্ত শশিকে কাছে টানিয়া আনিল—কোলের কাছে আনিয়া নিবিড় ভাবে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া বলে—তোর খাওয়া হয়েছে শশি?

—হুঁ—কখন!

—তোর মা'র?

প্রশ্নটা করিয়াই নিশিকান্তের মনে হইল যেন কথাটা বলা তাহার অন্যায় হইয়াছে—শশির মুখের পানে চাহিয়া দেখিল—শশি কিছু বুঝিতে পারিয়াছে নাকি!...শশি বলে—তোমার খাওয়া হ'লে তবে ত' মা খাবে, চল মামাবাবু খাবে চল—তোমার বুঝি ক্ষিদে পায় না?

নিশিকান্ত ছিপ গুটাইয়া লইয়া উঠিল। এখনি গিয়া আবার রান্না চড়াইতে হইবে! চাল আছে—ডালও আছে...কিছু কাঠ কেবল জোগাড় করিতে হইবে। ভাবিতে ভাবিতে মাঠ পার হইয়া নিশিকান্ত শশির হাত ধরিয়া বাগানের কাছে আসিয়া পড়িল।

উমা এখনও খায় নাই! খায় নাই কেন?...কেহ ত তাহাকে মাথার দিব্য দিয়া উপোস দিতে বলে নাই—সাধ করিয়া যে কষ্ট করে...নিশিকান্ত তাহাকে কিছুই বলিবে না! অনাত্মীয়া একটি নারী—তাহার উপর নিশিকান্তের জোর খাটে না;—না খাটিলেও নিশিকান্তের মনে হয়—এই ভাল—এই ভাল।

নিশিকান্ত খাইতে বসিয়াছিল। উমা আসিয়া থালার কাছে একটা তরকারির বাটী রাখিয়া দিল।

—এই তরকারীটা রেঁধেছিলুম—খান্।

নিশিকান্ত তখন লাফাইয়া উঠিয়াছে; কে চাহিয়াছিল তরকারি!

—দিলে ত ছুঁইয়ে—বেশ করেছ,—যাক্—খাওয়া আর হোল না তা হ'লে—উঠলুম বলিয়া নিশিকান্ত উঠিল।

উমা হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছে; চোখ দু'টিতে তাহার অদম্য বিস্ময়—উঠছেন যে—খেলেন না?

নিশিকান্ত রাগিয়া উঠিয়া বলিল—বার বার বলেছি না তোমায়—কারোর ছোঁয়া রান্না খাইনা,—তবু তুমি ছুঁয়ে দিলে? ও আমি আর খাচ্ছি না, ফেলে দাও বাইরে—নয়ত ভুলোকে দাও গে—

নিশিকান্ত ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইতেছিল—দেখিল উমা ঘোমটার ভিতর দিয়া তাহার দিকে কি দুঃখের দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে; কিন্তু জানিয়া শুনিয়া যে এমন দোষ করে—তাহাকে মার্জ্জনা করা যায় না।...

খাইয়াই থাকিবে—অনাত্মীয়া নারী—আপনার কেহ নয়—এতটা দরদ দেখানো ত ভাল নয়।

উমা বলিল—শুধু আলু ভাতে দিয়ে মানুষ খেতে পারে—তাই ওটা দিয়েছিলুম—যদি দোষ হ'য়ে—

নিশিকান্ত বলিল—তোমাকে ত কতবার বলেছি—ব্রত আছে আমার—তাই কারোর হাতে রান্না খাই না—তবু ভুলে গেলে—?...

তারপর নিশিকান্ত নিজের মনেই বলিতে লাগিল—কামিনী থাকলে আজ এতটা অন্যায় করতে পারত না—কখনো পারত না পর পর আপন-আপন, পর আপন হয় না কখনও—

হাত মুখ ধুইয়া নিশিকান্ত চণ্ডীমণ্ডপে আসিয়া শুইয়া পড়িল।

যেদিন হইতে উমা এ-বাড়ীতে আসিয়াছে সেইদিন হইতেই এইরকম একটা-না-একটা ছোট খাট ঘটনা লইয়া বচসা হইত-ই। আজ ত এ নূতন নয়। আত্মীয়ও নয়—চেনা-শোনাও নাই অথচ এ-কদিনেই মেয়েটি আসিয়া তাহাকে এমন আপনার করিয়া ফেলিয়াছে—এমন নিকট সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছে—ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়।

নিশিকান্ত জীবনে কাহাকেও আপনার করিতে পারে নাই; কামিনী আসিয়াছিল—সে চলিয়া গেছে; অজানার ডাকে কোথায় গেছে কে জানে। আজও তাহাকে মনে পড়িলে নিশিকান্তর চোখে জল আসে। এই যে একটা লোক না-খাইয়া পড়িয়া থাকিল—কই কেহ ত একবার খাইবার জন্য সাধিয়াও গেল না; কামিনী থাকিলে যেখান হইতে হোক কিছু জোগাড় করিয়া আনিয়া দিতই, কিন্তু রাগ করাও নিশিকান্তর অন্যায়—কাহার উপর সে রাগ করিবে!...বিবাহ করা স্ত্রীও নয়—মায়ের পেটের বোনও নয়—কোথাকার কে অজ্ঞাতকুলশীলা এক অনাত্মীয়া নারী!...কেবল নারীত্ব ছাড়া তাহার আর কিছু পরিচয় নাই;

নিশিকান্ত প্রথম দিনই জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—তোমার নামটা কি? একটা কিছু বলে' ডাকতে হবে ত?

মেয়েটি বলিয়াছিল—আমায় উমা বলে' ডাকবেন—আর কিছু জিজ্ঞেস করবেন না দয়া করে—তারপর শশির দিকে দেখাইয়া নিশিকান্ত বলিয়াছিল—ও কে হয় তোমার?

—আমার ছেলে। শশি ওর নাম।

বাস্ এই পর্য্যন্ত—তাহাদের ব্যক্তিগত কথা লইয়া আর কোনদিন আলোচনা হয় নাই। উমা ওই দিকের ঘরখানিতে তাহার সংসার পাতিয়াছে—এদিকের ছোট কুঠুরিখানি নিশিকান্তর; উমা জল তুলিয়া দেয়—বাটনা বাটিয়া দেয়—বাসনও মাজে কিন্তু রান্না নিশিকান্ত নিজ হাতেই করিয়া লয়। বলে—ব্রত আছে—পরের হাতের রান্না খেতে নেই।

নিশিকান্ত বিড়ি ধরাইল—অজস্র ধোঁয়া গলধঃকরণ করিয়া বিড়ির শেষ অংশটি জানালা দিয়া ফেলিয়া দিল। আবার ধরাইল—তাও ফুরাইয়া গেল—আবার ধরাইল; ধোঁয়া গিলিয়া নিশিকান্ত ক্ষুধাকে চাপিয়া রাখিতে চায়। কিন্তু আর পারা যায় না।

হঠাৎ কি একটা কথা মনে পড়িতেই নিশিকান্ত উঠিয়া বসিল; উমাও হয়ত এতক্ষণ উপোস করিয়া আছে; কথা মনে হইতেই নিশিকান্তর সব রাগ চলিয়া গেল; অনাত্মীয়া একটি নারী—তাহারই বাড়ীতে অভুক্তা রহিবে কেবল তাহারই জন্য—আর সে কি না এতক্ষণ নিজের কথাই ভাবিতে ব্যস্ত।

নিশিকান্ত উঠিল।

উঠানের উপর একটি পুঁইএর মাচা; উমা নিজ হাতে ওইখানে ছোট একটু বাগান করিয়াছে; দু'টি লঙ্কা চারা—পুঁইচারা—নটে শাক ইত্যাদি।

নিশিকান্ত উঠান পার হইয়া দাওয়ার কাছে আসিয়া ডাকিল—শশি শশি ও শশি উমা—

কেহ সাড়া দিল না; নিশিকান্ত উপরে উঠিয়া ঘরে ঢুকিল; তক্তপোষের উপর শশী ঘুমাইতেছে...অঘোরে ঘুমাইতেছে; উমা নাই—তক্তপোষের একপাশে রামায়ণ খানি খোলা পড়িয়া—পড়িতে পড়িতে উমা কোথায় কাহাদের বাড়ী বেড়াইতে গেছে হয়ত।...ঘরখানির চারিদিকে চাহিয়া নিশিকান্ত দেখে উমার বাক্সটি খোলা পড়িয়া আছে...ভিতরে চিঠিপত্র কত কি—

নিশিকান্ত একবার কাছে গিয়াই আবার ফিরিয়া

আসিল; ফিরিয়া আসিয়া নিজের ঘরে দরজায় খিল বন্ধ করিয়া শুইয়া পড়িল।

ঠিক এই সব মুহূর্ত্তগুলিতে কামিনী পাশে আসিয়া দাঁড়ায়। কামিনীর চোখে-মুখে কি অপূর্ব্ব নির্ভরতা—কেমন দীপ্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে; সেই কঙ্কালসার দেহ তাহার নাই...কালো চিরকুট একখানি কাপড় তাহাকে ঘেরিয়া বিশ্রী আবহাওয়া সৃষ্টি করিত—আজ যেন তাহার নব-জন্ম সূচনা হইয়াছে; যেখানে নিশিকান্ত শুইয়াছিল, সেই স্থানটিতে একটি পাশে বসিয়া কামিনী বলে—আমি আর তেমন নেই গো—তোমাদের সংসারে সেই এতটুকু বেলায় বউ হ'য়ে এসেছিলুম—তারপর তোমরাই আমার পায়ে শেকল পরিয়ে আমায় কয়েদী করে' রেখেছিলে—আজ আমি...মুক্তি পেয়েছি—আমায় ক্ষমা কোর—বুঝলে—ভেবে দেখ ভাল করে' কিছু অন্যায় করিনি—তোমার সব কথা ভুলে গেছি—আমার মনে আর দুঃখু নেই—তুমিও কেমন শান্তিতে আছ—আমিও তাই—ছি কাঁদেনা—দরকার হ'লে আমি আবার একদিন আসব—দেখে নিও ঠিক আসব—ঠিক্—

দরজা ঠেলিবার শব্দে নিশিকান্তর ঘুম ভাঙিয়া গেল। বাহির হইতে উমার কণ্ঠস্বর আসে—দরজাটা একবার খুলুন ত'—

নিশিকান্ত না-খুলিয়া বলিল—কেন—কি দরকার?

—খুলুন না—বলছি,—আপনার সঙ্গে একটা দরকার আছে—এখুনি বেরিয়ে আসব একবার খুলুন না—

নিশিকান্ত দরজা খুলিয়া দিল; উমা ঘরে ঢুকিয়া হাত হইতে থালা নাবাইল।

এই গুলো খেয়ে নিন্ দিকি—এতো আর আমার রান্না তরকারী নয়—নিন আর কষ্ট দেবেন না!

একটি থালায় করিয়া নানারকম ফল কাটিয়া আনিয়া উমা নিশিকান্তের সুমুখে রাখিয়াছিল; পেঁপে কলা—কত কি ফল; নিশিকান্ত খাইবার উদ্যোগ করিতে করিতে বলিল—তুমি খেয়েছ?

উমা হাসিয়া বলিল—আপনি খান আমি খাবখন্—

দু'একটা টুকরা মুখে দিয়া নিশিকান্ত বলিল—এই যে আমার জন্য উপোষ করে রইলে—এত' আর শুধু আজ একদিন নয়—এমন ত' প্রায়ই হয়—শেষকালে যদি একটা অসুখই বাধিয়ে বোস—তখন?

উমা নীচে মাটির উপর বসিয়া পড়িয়াছিল; বলিল—অসুখ হ'লে আপনি ত আর ভুগবেন না ভুগবো আমি—একটু ভুগলামই বা—অমন আমার অভ্যেস আছে।

নিশিকান্ত চাহিয়া দেখিল উমার মুখে হাসি যেন সারাক্ষণই লাগিয়া আছে;

বলিল—ভুগবে তুমি তা'তে আমার আর কি অসুবিধে সত্যি—তবে ডাক্তার খরচ?...ওষুধ পত্তর? সে সব কোত্থেকে আসে?...

উমা বলিল—ডাক্তার ত আপনি নিজেই—ভিজিট ত লাগবে না—হোমিওপ্যাথিক ওষুধের কতই বা দাম। আমাকে বাড়ীতে এনেছেন যখন—বিপদ-আপদে দায়িত্বটা ত আপনারই—কি না বলুন?

কথাটা বলিয়া উমা হাসিল—কিন্তু নিশিকান্ত হাসিতে পারিল না।

উমা চাহিয়া দেখিল নিশিকান্ত তাহার দিকে চাহিয়া আছে—একদৃষ্টে! অন্য দিকে চোখ ফিরাইয়া উমা বলিল—আপনাকে নিয়ে দেখছি ঘর করা বড় শক্ত?—সাধে কি দিদি চলে' গেছে...?

কথাটা যেন নিশিকান্ত শুনিতে পায় নাই; বিস্মিত হইয়া বলিল—কি বললে উমা, কি বললে?

কিন্তু উমা তখন উঠিয়া পড়িয়াছে—দরজার বাহিরে গিয়া বলিয়া গেল। আপনি খান্—এঁটো বাসনগুলো মেজে আমি আসছি বলিয়াই চলিয়া গেল; উমার চলিবার শব্দ ক্রমে ক্ষীণ হইয়া আসিতে থাকে,—নিশিকান্ত [বেড়ার ফাঁক দিয়া উঠান দেখা যায়] দেখে বাসনের গাদা লইয়া উমা তখন পুকুরের দিকে যাইতেছে; পিছন হইতে উমার চঞ্চল গতি-ভঙ্গি দেখিয়া নিশিকান্তর কামিনীকে মনে পড়িয়া যায়—সে যেন চৈত্রের বিশীর্ণ নদীটি—অন্তরপথ [illegible] তাহার লতায় গুল্মে পূর্ণ—আর উমা—যৌবনের পরিপূর্ণতা ইহার সর্ব্বাঙ্গে!

হঠাৎ নিশিকান্ত যেন সচেতন হইয়া উঠিল, [illegible] খোলা নাই—কি আজ আর [illegible]

হইতে পারে...যাহার তাহার হাতে এমন করিয়া ত খাওয়া উচিত নয়!

নিশিকান্ত উঠিয়া একটা ডাক্তারী বই লইয়া পড়িতে বসিল।...পড়িতে পড়িতে তন্ময় হইয়া গেল; শ্রীনাথপুরের একটা রুগী আজ তিন মাস ধরিয়া ভুগিতেছে; সহরের সিবিল সার্জ্জেনও হাল ছাড়িয়া দিয়াছে, দৈব কবিরাজী সব রকম দেখিয়া এখন নিশিকান্তের তদারকে আসিয়াছে; রুগীটি উঠিতে পারে না, শুইয়া শুইয়াই সব করে...বিপুল অর্থের মালিক; তাহার রোগের সম্বন্ধে জানিবার জন্য আজকাল নিশিকান্ত কত রাত অবধি জাগিয়া বই পড়ে—বই পড়ে আর ভাবে; ভাবিতে ভাবিতে নিশিকান্ত সব ভুলিয়া যায়—উমা কামিনী—শশী—সব! চোখের সম্মুখে ভাসিয়া ওঠে রুগীর কঙ্কালসার দেহখানি—রোগের বীজাণু তাহার মস্তিষ্কের ভিতর ঢুকিয়া কিলিবিলি করে।

নিশিকান্ত সেই কথাই ভাবিতেছিল।

উমা আসিয়া বসিল—একি—খেলেন না যে?

উমার কণ্ঠস্বরে নিশিকান্ত পিছন ফিরিয়া দেখিল; বলিল—কেন কি অপরাধটা করেছি যে খাব? বলতে পার—কি অপরাধটা করেছি তোমার কাছে যে খাব—বল কি—কথা বলছ না যে?...

উমা কেবল বলিতে চেষ্টা করে—অপরাধের কথা হচ্ছে না—

—অপরাধের কথা হচ্ছে না যদি—তবে কেন খেতে বলছ? তুমি সারাদিনটা উপোষ করে থাকবে—আর আমি খাব—এ কোন দেশী কথা হোল—আমার আশ্রয়ে এসে যদি আমারই পাপের বোঝা বাড়াবে—তবে কেন আমার বাড়ীতে এলে—?...যাও না যেখানে খুশী কেউ ত' বাধা দিচ্ছে না তোমায়—

উমা কথাটা শুনিয়া হাসিল।

নিশিকান্ত বলিল—হাসছ যে?

উমা বলিল—না—একটা কথা মনে পড়ল—তাই হাসছি!

নিশিকান্ত বলে—কি কথা?

মনে আছে সেই [illegible] সেদিন অন্ধকার রাত, অমাবস্যে ছিল বোধহয়—শশি আমার কোলে ঘুমিয়ে পড়েছিল—তখনো ঘরে ঢুকিনি; আমি বলেছিলুম—এখন ত আমায় ঘরে ঠাঁই দিচ্ছেন—শেষকালে একদিন কিন্তু আপনিই আমায় তাড়িয়ে দেবেন;—আপনি তখন কি বলেছিলেন মনে আছে আপনার?

নিশিকান্ত উত্তর দিল না—জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল কেবল।

—আপনি তখন বলেছিলেন—আমি বেঁচে থাকতে তোমার অনিচ্ছায় কেউ তোমায় স্পর্শ করতে পারবে না—আমার কাছে তুমি সেটুকু আশা করতে পার;—আজ দেখছি আমার কথাটাই সত্যি হোল!...বলিয়া উমা আবার তেমনি করিয়া হাসিল।

নিশিকান্ত চুপ করিয়া বসিয়া রহিল; একটি কথা তাহার মুখে জোগাইল না; অচেনা একটি নারী অনাত্মীয়া—বিবাহ করা স্ত্রী নয়—মায়ের পেটের বোন নয়—তা' হইলেও তবু সহ্য করা যাইত—কিন্তু বাহিরের কোথাকার কে—তাহাকে মার্জ্জনা করা যায় না। ডাক্তারী বইএর ছাপা অক্ষরগুলা চোখের সম্মুখে সারি সারি পীপিলিকার মত মনে হয়—তাহাকে দল বাঁধিয়া কামড়াইতে আসিতেছে—নিশিকান্ত চোখ বুজিল।

উমা বলিল—খাবেন না তাহ'লে—এগুলো?

নিশিকান্ত বলিল—যে মুখের সামনে অপমান করতে পারে—তা'র ছোঁয়া জিনিষ আমি খাইনে—সে বিষ আমার কাছে—

—এতদিন ত' খেয়েছেন তাই—জল তুলে দিই আমি—বাটনা বেটে দিই আমি—তা'তে বুঝি দোষ নেই?

—আর খাচ্ছি না উমা এই শেষ—বলিয়া নিশিকান্ত উঠিল—উঠিয়া পা দিয়া থালাটিতে সজোরে এক লাথি মারিল। উমা কাছে দাঁড়াইয়া ছিল নিকটেই সে থালা গিয়া লাগিল উমার পায়ে; লাগিতেই সেখানটা কাটিয়া ঝর ঝর করিয়া রক্ত ঝরিতে লাগিল। কিন্তু নিশিকান্তর তখন সেদিকে নজর নাই—উমা দেখিল দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়া নিশিকান্ত গলায় আঙুল দিয়া সব বমি করিয়া

ফেলিতেছে ;...তারপর একবার পিছন দিকে না চাহিয়াই হন্ হন্ করিয়া বাড়ীর বাহির হইয়া ওদিকে কোথায় চলিয়া গেল।

দাঁড়াইয়া থাকিতে থাকিতে উমার চোখে যেন জল আসিবার উদ্যোগ হয়। মনে হয়—অদ্ভুত এই মানুষটি—পরের সহিত যে কেমন ব্যবহার করিতে হয় তাহাও জানে না—অথচ এমন আপনার মত করিয়া উমা আর কাহাকেও পায় নাই। ভাবিতে ভাবিতে উমার আর একজনের কথা মনে পড়ে;...এ মানুষটির সঙ্গে কত তফাৎ! যাক্—যে তাহাকে এমন করিয়া ভুলিয়া থাকিতে পারে—উমা তাহাকে ভুলিয়াও স্মরণে আনিবে না।

রাত্রি তখন কত কে জানে।

উমা না খাইয়াই বসিয়াছিল; নিশিকান্ত সেই যে তখন চলিয়া গিয়াছে—আর আসিবার নাম নাই। আর আসিবে কিনা কে জানে। না আসিলেও তো পারে! যদি না আসে আর?

ভাবিতে গিয়া উমা নিজের অজ্ঞাতে খানিকটা শিহরিয়া উঠিল।

বাহিরে কে যেন ডাকিতে লাগিল—শশি ও শশি—শাশ—

নিশিকান্তের গলা নয়—অন্য কেহ হইবে। কি খবর আনিয়াছে কে বলিতে পারে।

শশি ঘুমাইয়াছিল; মায়ের ডাকাডাকিতে ঘুম ভাঙিয়া উঠিয়া বাহিরে আসিয়াছে।

বাহিরে আসিতে লোকটি বলিল—একটা কথা শোন খোকা—এই তোমার মাকে বোল বুঝলে—বোল যে নিশিকান্তদা' আর আসছে না এ বাড়ীতে, তোমরা এ বাড়ী থেকে বিদেয় না হ'লে আর এখানে আসবে না—আমায় এই কথা ব'লতে ব'লে দিয়েছে—বুঝলে মা'কে এখুনি বল গিয়ে—

মা'কে গিয়া আর বলিতে হইল না; আড়ালে দাঁড়াইয়া উমা সমস্তই শুনিল। শুনিয়া সে না কিছুই করিল না। আজ তাহাকে এ বাড়ী হইতে চলিয়া যাইতে হইবে নিশ্চয়ই। এই রাত্রে—এই দুঃসময়ে। আর কান্না আসিলেই বা উমা কি করিতেছে, সে তো এ-বাড়ীতে পর।

উমার মনে হইল—যেখানে হোক—এ-বাড়ীতে নয়! এ-বাড়ীতে নয়! একদণ্ডও নয়! অন্য কোথাও যাইবে—অন্য কোথাও - যেখানে চোখ যায়।

আর আধঘণ্টার মধ্যেই প্রস্তুত হইতে হইল। প্রস্তুত হওয়ায় বিশেষ হাঙ্গাম ছিল না—যা' কিছু লইবার হাতেই বহিতে হয়। শশী আবার ঘুম চোখে এক পাগলামী সুরু করিয়াছে—সে এ-বাড়ী ছাড়িয়া কোথাও যাইবে না! যেন এ তাহার নিজের বাড়ী! এ বাড়ীতে যেন তাহার পূর্ণ অধিকার; এই পোড়াকপালে ছেলেটার বায়না দেখিয়া উমা হাসিল।...

তা' যাহাই হউক—যাইতে যখন হইবে তখন বেশি দেরি করা সমীচীন নয়।

শশীকে তো কোন রকমে রাজী করান গেল—এইবার রওনা—

কিন্তু বাধা আসিল।

বাহিরের দিকের দরজায় কে যেন ডাকিতে থাকে—শশি—ও—শশি—

এবার নিশিকান্তের গলা; উমার অনুমানে ভুল হইবে না কখনও—

কিন্তু নিশিকান্ত ঘরে ঢুকিবার পূর্ব্বে পিছন দিক দিয়া বাহির হওয়া যায় না।

কিন্তু শশি নিশিকান্তের গলা পাইয়াই দরজা খুলিয়া দিয়াছে।

নিশিকান্ত ঢুকিয়াই হুলস্থুল বাধাইয়া দিল। উমা তখন একপাশে জড়সড় হইয়া আছে।

নিশিকান্ত বলে—এই দেখ—যা' ভেবেছি—রাগের মাথায় কা'কে দিয়ে কি কথা বলে' পাঠিয়েছিলাম—সেই কথা শুনেই অমনি তোমরা চলে' যাচ্ছ—কেন—তোমরা কি আমার পর? এস এস ঘরের দাওয়ায় উঠে এস—যা' শশী ঘুমোগে যা'—

উমা দাওয়ার উপর উঠিয়া আসিল।

নিশিকান্ত বলিল—এই নাও কি এনেছি দেখ—এই দেখ—উমা—

উমা দেখিল—নিশিকান্ত হাতের পোঁটলা খুলিয়া কি সব বাহির করিতেছে। খাবার দ্রব্য নিশ্চয়ই; উমার কিন্তু হাসি পাইল।

এই মানুষটিকে সে আজও বুঝিতে পারিল না—বুঝিতে পারিবে কিনা তাও বলা যায় না—না বুঝুক—এই এমনি করিয়া দিনরাত্রি এই লোকটির সঙ্গে বাস করা যে কি কষ্টকর—তাহা বুঝিল;...এবং আরও বুঝিল—কামিনী যে চলিয়া গিয়াছে দোষ সে কিছু করে নাই! এ যেন শরৎকালের দিন;...এই দেখ রোদ—বেশ চনচনে রোদ—পৃথিবীকে পোড়াইয়া একেবারে লাল করিয়া দিতেছে—আবার কোথাও কিছু নাই—রাস্তাঘাট কাদায় পিছল করিয়া দিয়া একেবারে চুপচাপ—

কে বলিবে ইহার ভিতর কি আছে! আর যাহাই থাকুক—প্রাণ বলিয়া একটা জিনিষ ইহার মধ্যে আছে—চঞ্চল প্রাণ—ক্ষুধিত প্রাণ! উমা ইহাকে ভালবাসিতে পারিবে!...

অবধূত সোম

— গল্প —

শ্রীবুদ্ধদেব বসু

[শ্রীবুদ্ধদেব বসুর নাম আধুনিক গল্প-উপন্যাস পাঠক-পাঠিকাদের কাছে সুপরিচিত। বুদ্ধদেব বাবুর গল্প এখন যে ধারায় চলিতেছে অবধূত সোম তাহারই একটা নমুনা।]

অবধূত সোমের নাম আপনারা নিশ্চয়ই শুনেছেন? আজ, এই উনিশ শো বত্রিশে ওর কোনো পরিচয়ের আর দরকার করে না—করে কি? এতদিনে ও প্রতিষ্ঠার এটুকু উচ্চতায় আরোহণ করতে পেরেছে যে কারো কাছে ওর নাম উচ্চারণ করলে তারপর আর-কিন বলতে হয় না এবং আলাপে কি প্রবন্ধে ওকে উল্লেখ করতে হ'লে সাধারণতঃ ওর নামের দ্বিতীয় অংশ বর্জ্জিত হ'য়ে থাকে। এবং, ওর পক্ষে এটা সামান্য কৃতিত্ব নয়; কারণ, ওর বয়েস মাত্র চব্বিশ—হায় রে, পঁচিশও নয়; যেটা হচ্ছে চল্লিশের আগে একমাত্র বয়েস, যখন একজন পুরুষ একথা বলে' আক্ষেপ করতে পারে যে সে বুড়ো হ'য়ে যাচ্ছে। চব্বিশ ওর বয়েস—না বেশী, না কম; সাহিত্যিক জীবনের হিসেবে ও ছেলেমানুষ ছাড়া আর কী?—শিশু, বলা যায়। হ্যাঁ, শিশু, আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের ও হচ্ছে enfant terrible। ভয়ানক ছেলে, অবধূত। আঠারো বছর বয়েসে ও ঈডিপাস-কম্প্লেক্স-মূলক এক উপন্যাস লেখে বেচারা নায়ক—এই বোধ হয় তা'র অবচেতন পাপের শাস্তি—শেষ পরিচ্ছেদে ছাদ থেকে পড়ে' মারা যায়। তা'রো দু' বছর আগে সে এক গল্প লেখে; তা'তে একটি ছেলের শোয়ার ঘরে রোজ রাত্তিরে—উঃ, সে horrible, horrible; আমি তা লিখতে পারবো না। কবিতায় ও এমন-সব সংস্কৃত কথা ব্যবহার করেছে, সত্যি সত্যি ছাপার অক্ষরে লিখেছে, যার বাঙলা মানে হৃদয়ঙ্গম করতে গেলে ফিট্ হ'য়ে যাবার কথা। ওঃ, ভীষণ ছেলে এই অবধূত। এই ক' বছরের মধ্যে ও গল্পে-গল্পে প্রায় দু' হাজার ছাপানো পৃষ্ঠা লিখে ফেলেছে; সে-সব লেখার ভাব, ভাষা, ভঙ্গী, ইঙ্গিত—কী বলবো? সাধারণে প্রচলিত কথাটাই ব্যবহার করছি—অশ্লীল, অসহ্যরকম অশ্লীল। ওর বইয়ের পাতায় দুর্নীতির লক্ষ-লক্ষ মাইক্রোব কিলবিল করছে; একটু খুলেছেন কি আপনার নাক-মুখ দিয়ে প্রবিষ্ট হ'য়ে আপনাকে (অবিশ্যি, হে আমার আদর্শ-চরিত্র পাঠক, আ্যা প না কে নয়; আপনার অ্যান্টি-

সেপটিক, মাইক্রোব-ঘ্ন পবিত্রতার খোঁজ কি আর রাখি নে!) নারকীয় প্রবৃত্তিতে জাগ্রত ক'রে তুলবে। ও-সমস্ত বই পড়তে নেই, দেখতে নেই, ছুঁতে নেই, শুঁকতে নেই। ও-সব বই বাড়ীর ছেলেমেয়েদের হাতে দেয়া আর নিজ হাতে তা'দের হাতে বিষের শিশি তু'লে দে'য়া এক কথা। এবং এ ধরণের কুৎসিত, নির্লজ্জ, জঘন্য সাহিত্য রচনা ক'রে অবধূতও যে নিস্তার পেয়েছে, তা নয়। আপনারা জানেন, পায় নি। আমাদের দুর্ভাগা বাঙলা দেশের গৌরবের পক্ষে এটুকু বলা হোক্ যে ওর বিরুদ্ধে ছাপার অক্ষরে এ-পর্য্যন্ত যত রচনা বেরিয়েছে, তা সব সংগ্রহ ক'রে আপনি একটা সম্পূর্ণ রোববারের দুপুর কাটিয়ে দিতে পারেন—তবু রাত্তিরের জন্য কিছু বাকি থেকে যাবে। নর্দ্দমার পোকা, নরকের কীটের সঙ্গে ও উপমিত হয়েছে। বাঙলার বাইরে এক সাহিত্য-সম্মেলনে একবার প্রস্তাব করা হয় যে যেহেতু এ ধরণের লেখক হচ্ছে সাপের মত, সুতরাং হাতের কাছে পেলেই তা'কে মারা উচিত। এক মহিলা পরামর্শ দেন যে লেখকের বিয়ে না হ'য়ে থাকলে অবিলম্বে বিয়ে দে'য়া দরকার, এবং স্ত্রী পিত্রালয়ে থাকলে তা'কে এক্ষুনি ফিরিয়ে আনা হোক্। আর-এক প্রৌঢ়া মহিলা বলেন যে এ যদি আমার ছেলে হ'তো, আমি একে টুক্‌রো-টুক্‌রো করে' কেটে ফেল্‌তাম। এক নবীন অধ্যাপক বলেন যে অবধূত সোম রাস্তা দিয়ে গেলে তাঁর উদ্দেশ্যে ঢিল ছোঁড়া আমাদের প্রত্যেকের সামাজিক কর্ত্তব্য। এম্‌নি সব। একবার, এমন কি, ওকে কলেজ থেকে তাড়িয়ে দেবার কথা হয়। ওর এক আত্মীয় ভদ্রলোক ওকে বসতে পর্য্যন্ত না বলে' তার বাড়ি থেকে বিদেয় করেন; ওর অপরাধ, ভদ্রলোকের একটি বিবাহযোগ্যা মেয়ে ছিলো। কিছু সময়ের জন্য ওর প্রতিবেশী এক মুন্সেফ—তাঁর ছিলো দ্বিতীয় পক্ষের যুবতী স্ত্রী—ওকে পাড়া থেকে তাড়াবার নানারকম চেষ্টা করেন। আর এ ছাড়া, ব্যঙ্গ-রচনা, প্যারডি, ল্যাম্পূন, ওর ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে আইন বাঁচিয়ে রসালো ইঙ্গিত, কাঁচা মেয়েলি হাতের লেখায় বেনামী চিঠি—এ-সব জিনিষের তো ছড়াছড়ি। ও-সব জিনিষ যে সব সময় শ্লীলতা, ভদ্রতা—এমন কি, নিছক সুরুচি মেনে চল্‌তো, তা নয়; তবে তা'তে কিনা কিছু আসে যায় না; কারণ, ডাক্তারের পুঁজ-রক্ত দিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করা আর মাছির তার ওপর বসা—এ-দুয়ে তফাৎ আছে। সুতরাং, ও-সব রচনার অশ্লীলতায় কেউ কোনো আপত্তি করলেন না। বরং, সবাই তা উপভোগ করলেন। করতেই পারেন।

এতৎসত্ত্বেও—কিম্বা এ-সব কারণেই, ও একই কথা—অবধূত খুব অল্প বয়সেই সাহিত্য-ক্ষেত্রে নাম করে' ফেলেছে। না-করাই ওর পক্ষে অসম্ভব ছিলো; অমন অদ্ভুত হাস্যকর, অসম্ভব নাম—তা বিখ্যাত হ'তে বাধ্য। আমার এক-এক সময় সত্যি মনে হয়, ওর ঐ দুর্লভ অতুলনীয়, অদ্বিতীয় নামই ওকে প্রসিদ্ধ করেছে। ওর নাম সুরেশ কি রমেশ হ'লে কিছুতেই এতটা হৈ-চৈ ও করতে পার্‌তো না; বড় জোর, বাঙলাদেশের একজন 'সুলেখক' হ'তো। আর, অবধূত নাম নিয়ে কিছু না-করে'ও এক রকমের যশ ওর আস্‌তোই। অবধূত—কী নাম! শুনলেই বল্‌তে হয়, কী অদ্ভুত! অনেকে ওকে বলে অদভুত। শত্রুরা ওর নাম দিয়েছে নবভূত ডোম। আর ভক্তরা—আজকাল তা-ও দু'একজন হচ্ছে, শুনছি—আরো কঠিন ব্যঙ্গ করে' ওকে বলে দেবদূত। যে-নামের সঙ্গে এতগুলো ভালো-ভালো মিল হয়, যে-নাম দিয়ে ছড়া কাটা, রসিকতা করা এত সোজা, যে-নামকে বিপর্য্যস্ত, বিকৃত, হাস্যাস্পদ করে' উচ্চারণ করবার প্রলোভন সম্বরণ করা অসম্ভব—প্রথম শুনে' যে-নাম ছদ্মনাম নয় বলে' বিশ্বাস করা শক্ত—সে-নাম তো বিখ্যাত হবেই। যে-ছেলে জ্ঞান হওয়ামাত্র জান্‌তে পারে, তা'র নাম অবধূত সোম, কী করে' সে ভয়ানক রকম চমকপ্রদ কিছু না করে' পারে? হ্যাঁ, চমক ও কিছু লাগালেও; একেবারে আলোর ঝিকিমিকি; আকাশের উল্কার মত ওর গতি—অশুভ, কিন্তু উজ্জ্বল; তা'র অপসারণ কামনা করতে-করতেও চোখ মুগ্ধ না হ'য়ে পারে না।

অবধূত—সাহস করে' কথাটা স্বীকার করে' ফেলছি, যাক্!—আমার বন্ধু; ছেলেবেলা থেকে ওর সঙ্গে আমার আলাপ। তাই বলে' মনে করবেন না, আপনাদের কাছে ওকে সমর্থন করবার উদ্দেশ্য নিয়ে আমি লিখতে বসেছি। যে যে জিনিষের যোগ্য, সে তা-ই পায়।

ওর লেখা সম্বন্ধে আমার নিজের কিছু বক্তব্য নেই; বোধহয় লোকে যা বলে, তা-ই ঠিক—হ্যাঁ, তা-ই ঠিক। বোধহয় ওর মধ্যে একটা জন্মগত, অবিচ্ছেদ্য নারকীয়তা আছে; নইলে প্রথম থেকেই ওর লেখার অমন বিষাক্ত বিকাশ হ'বে কেন? তবে, ওর সম্বন্ধে নানারকম উদ্দাম, ভীষণ জনরব যখন শুনতে পাই, তখন—অবাক অবিশ্যি হই নে; কারণ, ওর লেখার সঙ্গে মিলিয়েই লোকে ওকে তৈরি করবে। অবাক হই নে, কিন্তু হাসি পায়। ওর সম্বন্ধে প্রচলিত মত হচ্ছে যে ও নারী আর সুরার সমুদ্রে ডুবে' আছে; ও কাম-পশু, উচ্ছৃঙ্খলতার এক পিশাচ। কবে নাকি ভোরের দিকে ওকে উলঙ্গ অবস্থায় ডাস্ট্‌বিনে পাওয়া গিয়েছিলো। কোন্ কোন্ মেয়ের ও 'সর্ব্বনাশ' করেছে, তাঁদের নাম ও ঠিকানা অনেকে গায়ে পড়ে' আমাকে দিয়ে গেছেন। এক গণিকাকে উপলক্ষ্য করেও নাকি একবার মার খেয়ে আধ-মরা হয়েছিল। সেদিন শুনলাম, ওর মধ্যে নাকি যক্ষ্মার সমস্ত লক্ষণই দেখা গেছে, বেশীদিন আর ওর নেই। আরো যে-সব মাঝে মাঝে কাণে আসে, তা লেখা যায় না। এখন, অবধূত হচ্ছে অত্যন্ত রোগা, খর্ব্বাকৃতি একটি ছেলে, সমস্ত মুখে এক জোড়া চোখ ছাড়া আর কিছু নেই, বলা যায়, মাথার চুল সব সময় এলোমেলো হ'য়ে আছে—সত্যি ওর যা বয়েস, তা'র চেয়েও ছোট দেখায়। দেখ্‌তে ও একেবারে তুচ্ছ; পেশাদার, নিপুণ প্রেমিক হিসেবে ওকে কল্পনা করা শক্ত। ওর স্বাস্থ্য দুর্ব্বল ব'লে পানাহার সম্বন্ধে ও অত্যন্ত সাবধানী; চায়ের সঙ্গে কাঁচা-কাঁচা টম্যাটো চিবিয়ে খায়; এক সঙ্গে এক পাইণ্টের বেশী বিয়ার ওকে কখনো খাওয়াতে পারিনি। তার ওপর ও অত্যন্ত লাজুক; বেশির ভাগ সময় বাড়ি বসে' থাকে, লিখে' যেটুকু সময় পায়, বই পড়ে' কাটায়। আপনি ওকে প্রথম যখন দেখবেন, অত্যন্ত হতাশ হ'য়ে পড়বেন; এ-কথা বিশ্বাস করতে আপনার অনেক সময় নেবে যে এ-ই হচ্ছে সেই নরকের কীট, ঘৃণিত কৃমি, অমিতাচারের ব্রহ্মদৈত্য, অবধূত সোম। ওর লেখার সঙ্গে এ বর্ণনা মানায় না, তা ঠিক; লোকে যা বলে, তা হ'লেই শোভন, সঙ্গত ও আর্টিস্‌টিক হ'তো, তা-ও ঠিক; কিন্তু fact হচ্ছে fact।

অবধূত মাঝখানে কল্‌কাতায় ছিলো না; বেহারের কোন্ এক শহরে ওর দিদি থাকেন, সেখানে বেড়াতে গিয়েছিলো। ও ফিরে এসেছে খবর পেয়ে সন্ধ্যেবেলা ওর ওখানে গিয়ে উপস্থিত হ'লাম। অধিকাংশ সন্ধ্যাই আমি ওর ঘরে বসে' যাপন করি। ওর এক অদ্ভুত অভ্যেস—সন্ধ্যেটা ঘরে বসে' কাটাতেই সব চেয়ে ভালো-বাসে; আর তাতে আমাদের—যারা ওর বন্ধু—এটুকু সুবিধে হয়েছে যে আর কিছু কর্‌বার না থাক্‌লে (এবং টাকা যাদের নেই, তাদের সাধারণত আর-কিছু কর্‌বার থাকেও না) ওর ওখানে গিয়ে সন্ধ্যেটা একরকম কাটিয়ে দেওয়া যায়। যে ক'দিন ও ছিলো না, সন্ধ্যাযাপন এক দুরূহ সমস্যা হ'য়ে উঠেছিল; ও ফিরে এসেছে, বাঁচলাম।

গিয়ে দেখি, কাগজের সঙ্গে প্রায় মাথা ঠেকিয়ে অবধূত প্রাণপণে প্রুফ দেখে যাচ্ছে। আমাকে দেখে একটু চোখ তুলে শুধু বল্‌লে, 'বোসো।'

'আর সব কোথায়?'

'কেউ আসে নি।' অবধূত অস্পষ্ট জবাব দিলে।

খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে' আমি অসহিষ্ণু হয়ে বল্‌লাম, 'কি ছাই প্রুফ দেখছো এখন! ওগুলো রেখে দাও না।'

'এই—আর এক মিনিট, please—'

এক মিনিটের জায়গায় পাঁচ মিনিট কাট্‌লো। তারপর আমি বল্‌লাম; "ছাখো, এ-ক'দিন তুমি ছিলে না; কথা বলতে না পেরে শুধু মর্‌তে বাকি আছে। এখনো যদি চুপ ক'রে থাকতে হয়—'

হঠাৎ প্রুফ থেকে চোখ তুলে' অবধূত বল্‌লে; 'একটা সময় ছিলো, যখন আমি সত্যি, সত্যি ভালো লিখতাম। তা-ই মনে হয় না তোমার?'

'আর এখন? এখন তুমি শেষ হ'য়ে এসেছো—না, কী?' আমি না হেসে পারলাম না, বাঃ, পৃথিবীর তারুণ্যের রেকর্ড ব্রেক করলে তুমি! চব্বিশই তোমার সত্তর—বেশ। এখন "শেষের—' যা-হোক্ একটা বই লিখে' ঘটা করে' বিদেয় নাও আর কি।'

'না—সত্যি।' অবধূত প্রুফের তাড়া গুছিয়ে ড্রয়ারে ভরে' রাখলো, 'ধরো—এ-বইটা। কবে লিখেছিলাম

এটা? এক বছর আগে—পুরো এক বছরও নয়। অথচ প্রুফ দেখতে-দেখতে এইমাত্র নিজেই মুগ্ধ হ'য়ে যাচ্ছিলাম; মনে হচ্ছিলো, এখন আর ও-রকম লিখতে পারবো না।'

"আর-কিছু না হোক্, পাব্লিসিটির কায়দা শিখেছো বটে। কিন্তু এ-সব প্যাঁচ আমার ওপর খাটিয়ে কি লাভ হচ্ছে?'

অবধূত চেয়ারে হেলান দিয়ে একটা সিগ্রেট ধরালে—'লাভ কিসেই বা হবে? শোনো; এতদিনে নিজের কাছে এ-কথা স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি যে নিজের মনে আমি যতই বড়াই করি নে কেন, বাঙালী পাব্লিক আমাকে গ্রহণ করলে না। করলে না, করলে না, করলে না। তা'র সব চেয়ে বড় প্রমাণ এই যে বিয়ের উপহারে আমার বই মোটেও বিক্রি হয় না।'

'কী ক'রেই বা হ'বে? উপহার দেবার মত করে' যদি লিখতে পারো, তবে তো হ'বে!'

'হুঁ, তা ঠিক, তা ঠিক।' অবধূতের মুখে চিন্তার ছায়া পড়লো। 'আচ্ছা, বলতে পারো, কী রকম লিখলে popular হওয়া যায়?'

'বাঃ, তা পারি নে! শোনো; সিরাপের মত মিষ্টি আর জোলো করে' প্রেমের গল্প লিখবে—শেষটায় বিয়ে হ'বে—না, আজকালকার রেওয়াজ হচ্ছে, বিয়ে হ'বে না। না-হয় কোনো ত্যাগের গল্প লিখবে—বদ্‌খেয়ালী ছোট ভাইয়ের জন্য দেবতুল্য বড় ভাই সর্ব্বস্বান্ত হ'লো; কিম্বা এপ্তেলগোছের ছোট-জা কুচুটী বড় জায়ের ছেলের চিকিৎসার জন্য নিজের সমস্ত গয়না বেচে দিলে; ছেলে অবিশ্যি ভাল হ'লো না—কিন্তু হ'লো দু' জায়ের মিলন —ওঃ, অপূর্ব্ব, স্বর্গীয় দৃশ্য! এই আর কি। আর একটা মনে রাখবে, যখনি সুযোগ পাবে, বেশ মোটা করে' করুণরস ছিটিয়ে দেবে। "পড়তে-পড়তে কান্না পায়"—এর চেয়ে বড় প্রশংসা বাঙালী পাঠক, এবং—which is more important—পাঠিকা জানে না। এ-রকম যদি লিখতে পারো, তাহ'লে দেখবে তোমার বইয়ের কী বিক্রি।'

অবধূত খানিকক্ষণ চুপ করে আমার কথাগুলো চিন্তা করলে। তারপর বললে,—'Thank you—thank you very much. হ্যাঁ, ঐ গোছেরি দু' একখানা বই লিখবো—লিখতেই হ'বে। এতদিন গ্রাহ্য করিনি; কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, কিছু টাকা হ'লে ভালো হয়। তা ছাড়া, আমার ভয়ানক দুর্নাম, সেটাও কাটিয়ে ওঠা দরকার হ'য়ে পড়েছে।'

'তোমার দুর্নাম না থাকলে তুমি থাকবে কোথায়?'

'না, তুমি বুঝতে পারছো না। ছেলেবেলায়—পৃথিবী সম্বন্ধে যখন কমই অভিজ্ঞতা ছিলো—আমিও তা-ই মনে করতুম। লোকে যতই নিন্দে করতো ততই আমার আনন্দ হ'তো। সবাই fools and duffers and blockheads—একমাত্র আমিই হচ্ছি বুদ্ধিমান এই রকম একটা ছেলেমানুষি অহঙ্কার মনে ছিলো। হয়তো সত্যি কথাটাও তাই, কিন্তু এখন আর তা নিয়ে অহঙ্কার করি নে, বরং দুঃখ করি। কারণ, এখন দেখছি, আমার এই দুর্লভ দুর্নামে মোটের ওপর লাভের চাইতে ক্ষতিই বেশি। ঢের বেশি। প্রথম, ছাখো, বইয়ের বিক্রির দিক থেকে। কিন্তু তা ছাড়াও আর একটা মুস্কিল আছে।'

'কী সেটা?'

'ছাখো, আমার মুস্কিল হচ্ছে যে I cannot live upto my reputation। লোকে আমার কাছ থেকে কতগুলো জিনিষ আশা করে, যা আমার শক্তির বাইরে। নিজেকে তো বিপদে পড়তে হয়ই, অন্যকেও বড় বিশ্রী রকম হতাশ করতে হয়। দুর্নাম এত বড় একটা গৌরব, যা বহন করতে পারি, এমন শক্তি আমার নেই। এখন দেখছি, আমার পক্ষে সাধারণ হওয়াই সবচেয়ে আরামের। এবং সুনামের চাইতে সাধারণ আর কী আছে?—মৃদু গোছের একটু সুনাম, যা কাঁটার মত ফুটে থাকে না, তেলের মত গায়ে মিশে' থাকে; যা কাউকে আঘাত করে না; যাঁর মানে হচ্ছে, সবাই অম্লান মুখে প্রশংসা করবে, এবং করেই ভুলে' যাবে। সুতরাং এমন চমৎকার জিনিষ যে সুনাম, তা অর্জ্জন করবার জন্যে, ভাবছি, এবার খানকয়েক "ভালো" বই লিখবো, তুমি যে-ধরণের বললে।'

"যদি কিছু মনে না করো বলতে পারি, ও-রকম বই তুমি কখনো লিখতে পারবে না। You are [illegible] mentally too rotten'—

অবধূত হেসে উঠ্‌লো।—'তবু, চেষ্টা করে' দেখ্‌তে দোষ কী? চেষ্টায় কী না হয়? দুর্নামের গৌরব আর সহ্য করা যায় না। জানো, সেদিন একটি মেয়ে মুখের ওপর আমাকে ইডিয়ট বলে' দিলে।'

'Priceless! কে সেই wonderful মেয়ে?'

'দিদির ওখানে যে গেছলুম, সেখানে তার সঙ্গে দেখা। দিদির ননদ হয়। মীনু নাম। মেয়েটি এত সুন্দর যে ওকে দেখামাত্র অনেকদিন পর হঠাৎ আমার আবার কবিতা লেখবার ইচ্ছে হ'লো।'

'সে-কথা তা'কে বল্‌তেই বুঝি সে তোমাকে ইডিয়ট বলে' দিলে?'

'শোনই। প্রথমে গোড়ার কথা দু' একটা বলে' নিই। মীনুর বয়েস কুড়ির কাছাকাছি। বছর খানেক হয় ওর বিয়ে হয়েছে, এবং বিয়ের পরেই ওর স্বামী চলে' গেছেন বিলেত। সুতরাং ও এখন বাপের বাড়ীতেই আছে। দিদির বাড়ীতে এই আমি প্রথম গেলাম; মীনুকেও তাই, এই প্রথম দেখলাম। দেখে আপশোষ হ'লো, এর আগে কেন ওকে দেখি নি। সত্যি, ও-রকম চেহারা বাঙালী মেয়েদের মধ্যে বড় একটা দেখা যায় না। ভাবলাম, মেয়েটির সঙ্গে ভালো ক'রে আলাপ করা সম্ভব হ'বে কি? কিন্তু মীনুই আমাকে সে ভাবনা থেকে বাঁচালে। আমি ওদের বাড়ী যাওয়া মাত্র মীনু আমাকে জুড়ে' বস্‌লো; বল্‌তে গেলে, খপ্‌ করে' আমাকে ধরে' ওর পকেটের ভেতর ভরে' ফেল্‌লো। প্রথম দিন থেকেই ও আমাকে আর ওর বাড়ির লোককে স্পষ্ট করে'ই বুঝতে দিলে যে যে-ক'দিন ওখানে আছি, আমি একান্ত-রূপে মীনুরই সম্পত্তি। এবং সে ব্যবস্থায় আমিও যে খুব অখুসি হয়েছিলুম, তা নয়।'

'Naturally.'

'আমার সাহিত্যিক খ্যাতি মীনুর কানেও পৌঁচেছিলো—কথায় কথায় আবিষ্কার করেছিলুম যে আমার বইগুলো সবি ওর পড়া আছে। দিদি বল্‌লেন,—ও নাকি আমাকে দেখবার জন্য রীতিমত অস্থির হ'য়ে পড়েছিলো। কিন্তু আমাকে দেখে ও তো হেঁসেই বাঁচে না—"ওমা, বৌদি, এই নাকি তোমার ফেমাস্ ভাই? একে নিয়েই এত! এ যে দেখ্‌ছি নেহাৎ ছেলেমানুষ!" তার পর আমার দিকে তাকিয়ে বল্‌লে—"কিছু মনে কোরো না ভাই, তুমি বয়েসে আমার বড় হ'তে পারো, কিন্তু তোমাকে তুমি ছাড়া কিছু বল্‌তে আমি পারবো না। তুমিও আমাকে তা-ই বোলো।"

আমি বল্‌লুম,—"বেশ তো।" মুখে বল্‌লুম বটে; কিন্তু সদ্য-পরিচিত মহিলাকে প্রথম ধাক্কাতেই তুমি বল্‌তে আমার বিলক্ষণ বেগ পেতে হয়েছিলো। জানো তো, ও-সব জিনিষ আমার ঠিক আসে না।

"অবধূত—কী awful নাম! ও-নাম নিয়ে কী করে' তুমি বেঁচে আছ? উঃ, যতবার তোমাকে ডাক্‌তে হ'বে, ততবার ঐ উৎকট শব্দটা উচ্চারণ কর্‌তে হ'বে—কী শাস্তি! বৌদি, তোমার মা-বাবার কি মাথা খারাপ হয়েছিলো—অমন নাম কী করে' তাঁদের মনে এলো?" দিদি বল্‌লেন,—"আমরা তো ওকে ভূত বলে' ডাকি।" "ভূত—ভূত, এ-ই ঠিক নাম হয়েছে। আমিও তাহ'লে তা-ই ডাক্‌বো। 'ভূতের মতন চেহারা যেমন—' অবিশ্যি নির্ব্বোধ নয়, কী বলো?" মীনু হাস্‌তে-হাস্‌তে আমার চুলগুলো ধরে' এক ঝাঁকুনি দিলে। আমি লজ্জিত হ'য়ে কোনো কথা বল্‌তে পারলুম না।

'দু' দিনের মধ্যেই যা হোক আমার সঙ্কোচও কেটে গেলো; আস্তে-আস্তে আমি খোলস থেকে বেরিয়ে আস্‌তে লাগ্‌লুম। বাপের বাড়ীতে মীনুর কোনো কাজ নেই। ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমার সঙ্গে বসে' ও গল্প কর্‌তো। আর হাস্‌তো—কী হাস্‌তো! সে হাসি শুন্‌লে বাস্তবিক মুগ্ধ হ'য়ে যেতে হয়। মুগ্ধ হ'য়ে আমি গেলুমও। জেইম্‌স্ জীন্‌স্-এর বইগুলো সঙ্গে করে' নিয়ে গিয়েছিলুম পড়বো বলে'; কিন্তু নব-বিজ্ঞানের আশ্চর্য্য সব আবিষ্কারের চাইতে মীনু আমার কাছে আরো বেশি আশ্চর্য্য ঠেক্‌তে লাগ্‌লো।...নাঃ, এইবার বইগুলো পড়তেই হ'বে।

'দুপুরে খাওয়ার পর মীনু আমার ঘরে আস্‌তো, আমি হয় তো তখন বই খুলে' বসেছি। এসে জিজ্ঞেস কর্‌তো, "কি কর্‌ছো, ভূত?" "এই একটা বই পড়্‌ছিলাম, কী অদ্ভুত কথা লিখেছে, শোনো।" "চাইনে শুন্‌তে।" মীনু আমার হাত থেকে বইটা কেড়ে নিয়ে ধুপ্‌ করে' আমার পাশে বসে' পড়্‌লো। "কী ছাই খালি বই পড়ো—পড়ে' কী হয়?" "সত্যি—ঠিক বলেছো। পড়ে' কী হয়?" "তুমি লিখতে তো পারো অমন ভয়ানক সব কথা, অথচ এম্‌নিতে অমন মুখ চোরা কেন?" "কী আর কর্‌বো, বলো; সবার কপালে তো আর সব হয় না।" "এখানে কয়েকদিন থেকে যাও, আমি ঠিক তোমাকে মানুষ করে তুল্‌বো, দেখবে।" "ধন্যবাদ, মীনু।" কথা থেকে কথা উঠ্‌তো; কখন যে বিকেল হ'য়ে যেতো, টেরও পেতুম না।

'একদিন মীনু আমাকে জিজ্ঞেস করলে, "আচ্ছা, 'নিষ্ফলতা' বলে' তুমি যে গল্প লিখেছো, তা কি তোমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে নে'য়া?" আমি হেসে বল্‌লুম, —"এ কথা জিজ্ঞেস করে' তুমি প্রমাণ কর্‌লে, মীনু, যে তুমি মেয়ে।" মীনু তৎক্ষণাৎ জবাব দিলে, "কেন,

আমি যে মেয়ে তা'র অন্য প্রমাণের অভাব আছে নাকি ?" আমি তাড়াতাড়ি বলে' উঠলুম,—"না, না, ও-কথা কোনো পুরুষ জিজ্ঞেস করতো না—এই আর কি।"

'আমার ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে মিনুর কৌতূহলের শেষ ছিলো না। আমার বইগুলোকে আমার জীবন-কাহিনীর বিভিন্ন অধ্যায়ে তর্জ্জমা করতে পারলে তবে ও আনন্দ পেতো। এবং এটা স্বাভাবিক; রবীন্দ্রনাথ যেমন বলেন, রক্ত-মাংসের প্রতি টান মেয়েদের মজ্জাগত। কবে, কোথায়, কী অবস্থায় কোন্ কোন্ মেয়ের সঙ্গে আমার প্রেমের ব্যাপার ঘটেছে, মীনু বার-বার কৌশল করে' কি স্পষ্টভাবে তা জানতে চেয়েছে; এবং বার-বার আমি ও-সব প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়েছি। কারণ, ও-সব বিষয়ে বলবার কিছুই নেই; পৃথিবীর সব প্রেমের ব্যাপারই এক। কিন্তু মীনু তবু ছাড়ে নি; বলেছে, "এমন হতেই পারে না যে এ-পর্য্যন্ত কিছুই তোমার ঘটে নি; তা হ'লে তুমি এত জানলে কি করে'?" বা রে! জানতে আর কী? আমি তো কখনো লটারিতে এক লক্ষ টাকা পাই নি, কিন্তু পেলে মনের কী-রকম অবস্থা হয়, তা কি আর বুঝতে পারি নে!" "যাও, যাও—"মীনু শেষটায় চটে' গেছে, "ও-সব বাজে কথা রেখে দাও; সোজা কথা বলো, তুমি বলবে না। তুমি যে কী ভয়ানক লোক, তা কি বোঝা যায় না, ভেবেছো?" "ওঃ মীনু, মীনু, শেষটায় তুমিও আমাকে এ-কথা বললে!" "যাওঃ, আর ঢঙ করতে হ'বে না।" কিন্তু একটু পরেই রাগ ভুলে' গিয়ে মীনু জিজ্ঞেস করেছে; "আচ্ছা, তুমি বিয়ে করো না কেন?" "কী করে' করবো?—নিজেরি দিন চলে না।" "ইস্—"তোমার আবার টাকার অভাব! বই লিখে' পাও না?" "যা পাই, তাতে বৌয়ের শাড়ির খরচও উঠবে না।" "ইচ্ছে করলে ওতেই বিয়ে করা যায়। দরকার কী অত বাবুগিরি করবার?" "মীনু Convinced হয় নি; মনে-মনে সন্দেহ করেছে, নিশ্চয়ই অন্য-কোনো রোমান্টিক কারণ আছে। প্রায়ই ও-কথা বলতো। শেষটায়, একদিন ও যখন বললে, "আমার মনে হয় শীগ্গিরই তোমার বিয়ে করা উচিত—কেন করছো না?" আমি ওকে জব্দ করবার জন্য বলে' ফেললুম, "যে-হেতু তোমার বিয়ে হ'য়ে গেছে।" এ-ই একমাত্র কথা আমি বলতে পেরেছিলুম, যাতে মীনুর মুখ একটু লাল হ'য়ে উঠেছিলো। এমন কি, একটু সময় ও চুপ করে' রইলো পর্য্যন্ত। আমি নিজে প্রায় হুর্ভাস হ'য়ে উঠছিলাম, এমন সময় মীনুই বললে, "কী ভাবছো?" "কী ভাবছি? দাঁড়াও, ভেবে দেখি।" "আমি বলবো, কী ভাবছো? ফিরে' গিয়ে আমাকে নিয়ে যে-গল্পটা লিখবে, সে-কথা। কেমন নয়?" "ফিরে গিয়ে তোমাকে নিয়ে গল্প লিখবো কেন?" "লিখবে না?" মীনুর স্বরে একটু যেন হতাশা বেজে উঠলো, "যদিই লেখো, আমার প্রতি একটু দয়া কোরো। উঃ, মেয়েদেরকে তুমি যেমন করে' আঁকো—রীতিমত ভয় হয়।" আমি মনে-মনে হাসলাম; মুখে কিছু বললাম না।

'বেশ কাটছিলো দিন; দিদির বাড়ির প্রচুর খাওয়া, সম্পূর্ণ বিশ্রাম, পশ্চিমের স্বাস্থ্যকর জল-বায়ু—ক'দিনেই চেহারা ফিরে' গেলো। কিন্তু ইতিমধ্যে এক কাণ্ড হ'লো। এক রাত্রে একটা ভারি মিষ্টি—এবং আমার পক্ষে পরিচিত—গন্ধে হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙে গেলো। একটু পরেই বুঝতে পারলুম, গন্ধটা আসছে মীনুর মাথা থেকে, যে-মাথা আমার বালিশের এক পাশে রেখে সে শুয়ে' আছে। আমাকে জাগতে দেখেই মীনু আমাকে শক্ত করে' ওর বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে' আমার মুখে এমনভাবে চুমো খেলো যে আমার একেবারে শ্বাসরোধ হ'য়ে এলো। ঠিক বলতে পারবো না, আমার কী-রকম যেন একটা ভয় হ'লো, তাড়াতাড়ি নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে আমি বিছানা থেকে নেবে চট্ করে' আলো জেলে দিলুম। একটু পরে মীনু শিথিল আঁচলটা গায়ে জড়াতে-জড়াতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো; দরজার কাছে এসে আমার দিকে একবার তাকিয়ে বলে' গেলো; "শুধু লিখতেই শিখেছিলে—ইডিয়ট!" ওর সে-দৃষ্টি এখনো আমার মনে পড়ে।'

সব শুনে' আমি বললুম, 'ঠিকই বলেছে। তুমি ইডিয়ট বই কি, একশো বার ইডিয়ট। কিন্তু তারপর?"

'তারপর আর কী? এই তো—এখন আমাকে এখানে দেখছো। আরো কিছুদিন থাকতে পারলে ভালো হ'তো; জায়গাটির চমৎকার স্বাস্থ্য! কিন্তু এখানে এসে থেকে-থেকে খালি মীনুর কথা মনে পড়ছে; কিছুতেই ভুলতে পারছি নে। কাল এখানে এসেছি; দু'দিনের মধ্যে ওর কথা ভেবে চারটে কবিতা লিখে ফেলেছি। ধন্যবাদ মীনুকে—অনেকদিন পর আবার কবিতা লিখতে পারলাম।'

সৌভাগ্যবতী

—গল্প—

শ্রীঅমলা দেবী

[শ্রীঅমলা দেবীর লেখা কয়েকটি গল্প ও কবিতা পুষ্পপাত্রে বাহির হইয়াছে—ইঁহার লেখায় একটা বিশেষ সুর আছে। নর-নারীর অন্তরের গোপনতম কথাটি ইঁহার লেখায় প্রকাশ পাইতে চায়। ভঙ্গিটিও সম্পূর্ণ নিজস্ব। 'সৌভাগ্যবতী'তেও সে পরিচয় পাইবেন।]

সৌভাগ্যবতীদের দৃষ্টান্ত দেখাতে হ'লে মহামায়ার নামটাই দেশশুদ্ধ লোকের আগে মনে হ'ত।

ঘোষালদের বাড়ী মেয়ের বিয়ে উপলক্ষে নিমন্ত্রিতা হয়ে এলেন। সকলের সঙ্গে সমান গল্প করতে পারেন, বয়সের তারতম্যে উনি কখনও ভুলেও লঘু গুরু হ'ন না।

ঘোষাল গিন্নি বল্লেন—'এই যে চল ভাই আর কি করবার আছে দেখে শুনে নেবে চল।"

মহামায়া উঠে পড়লেন "চল।"

—"তুমি চল দিদি, আমি আসছি।"

মহামায়া ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই, ঘোষাল নিম্নস্বরে আরম্ভ করলেন—"খাসা আছে, অমন মহাদেবের মত স্বামী, যা ইচ্ছে তাই করছে, কখন একটা তুমি থেকে তুই বলেনি, কেমন সুখে স্বচ্ছন্দে নোয়া সিঁদুর নিয়ে হেসে খেলে বেড়াচ্ছে, যেন কুড়ি বছরের খুকী। সমবয়সীদের মধ্যে অদ্দেক ত মরে জুড়িয়েছে আর যারা আছে তারাও না থাকার মধ্যে।"

নিজের অলঙ্কার শূন্য হাত দু'খানার দিকে চেয়ে উনি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপ করে গেলেন।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মহামায়া কপালে সিঁদুর টিপ পরছিলের, স্বামী শ্যামাকান্ত এসে ঘরে ঢুকলেন।

লম্বা রোগা মানুষ, রংটা উজ্জল শ্যামবর্ণ নয় অনুজ্জল শ্যামবর্ণই!

মুখ দেখলে একটু বোকা' বোকা ভাল মানুষ মনে হয়।

মহামায়ার দিকে চেয়ে শ্যামাকান্ত জিজ্ঞেস করলেন

—"আজ সর্দ্দিটা কেমন আছে?"

মহামায়া ঘাড় নেড়ে বল্লেন—"আজ ভাল আছি।"

শ্যামাকান্ত একটা হোমিওপ্যাথীর বাক্স আলমারী থেকে টেনে নিয়ে এসে তার মধ্যে থেকে কি একটা ওষুধের শিশি বার করে একটা কাঁচের গ্লাসে কয়েক ফোঁটা ফেলে স্ত্রীকে ডাকলেন—"ওগো শুনছো, এই ওষুধটা খেয়ে ফেল।"

মহামায়া আবদারের সুরে বল্লেন—"আজ ত ভাল আছি, আজ আবার ওষুধ কেন?"

শ্যামাকান্ত মস্ত বড় হাঁ করে বল্লেন—

"ঐ দেখ আমার আবার সর্দ্দি লাগল। নাও ওষুধটা খেয়ে ফেল।"

মহামায়া এবার বিনা আপত্তিতে খেয়ে ফেল্লেন।

শ্যামাকান্ত এতক্ষণ পরে সময় পেয়ে ওর সজ্জার দিকে চেয়ে চমকে উঠলেন—"কি কাণ্ড তোমার! এই ভীষণ শীতে শুধু ঐ একটা সিল্কের জামা! গরম জামা গায়ে দাওনি কেন? তুমি যে কি কাণ্ড করবে তা জানিনা! শিগগির গরম জামা গায়ে দাও। ওগো শুনছো?

ওগো একটু ঘাড় নেড়ে বল্লেন—"গরম জামা আমি গায়ে দিতে পারি না। বিচ্ছিরী দেখায়!"

শ্যামাকান্ত এবার করুণভাবে ওগোর দিকে চাইলেন

—"কি কাণ্ড যে তুমি বাধাবে তা জানি না! লক্ষ্মীটি শুনছো, গরম জামা টা গায়ে দাও।"

বলতে বলতে গরম জামাটা আলনার থেকে তুলে নিলেন, মহামায়া চেয়ারটাতে ভাল করে বসে পড়ে বল্লেন

—"গরম জামা নয়, ঐ শালখানা বরং দাও।"

শ্যামাকান্ত গরম জামাটা রেখে শালখানা এনে দিলেন

—"এই নাও গায়ে দাও। কি যে কর জানিনা।"

বলতে বলতে বাইরে বেরিয়ে গেলেন।

(২)

শ্রাবণ সন্ধ্যা, সকাল থেকে বৃষ্টি নেমেছে, অমরের স্ত্রী জ্যোৎস্না রান্না করছিল, শাশুড়ী উমাতারা রান্নাঘরের একপাশে বসে পাড়ের সুতো তুলছিলেন, আর জ্যোৎস্নার সঙ্গে গল্প করছিলেন—

বাইরের দিকে চেয়ে উমাতারা বল্লেন—"মুখ্রেশুণ; সারাদিন পোড়া আকাশ যেন ছ্যাঁদা হয়েছিল! এতক্ষণে বিষ্টিটা একটু ধরল, যাও ত বৌমা এই বেলা জলের কলসিটা কলের মুখে বসিয়ে দাও।"

অমর এতক্ষণ নিজের ঘরে জানলার কাছে চেয়ার টেনে বসে বসে চুরুটের পর চুরুট শেষ করছিল।

এইবার বৃষ্টিটা থামতে দেখে তাড়াতাড়ি জামাটা গায়ে দিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মাথায় বার কতক ব্রাসটা ঘসে বেড়িয়ে পড়ল।

জননী উমাতারা অমরকে বেরুতে দেখে মুখখানাকে বিকৃত করে বকে উঠলেন—"বিষ্টি একটু থেমেছে কি ছুটলেন শ্যামাকান্তর বৌর কাছে। ঘরে এমন সোণার পিত্তিমা থাকতে ঐ বুড়ী ঠাকুমার বয়সীকে যে কি ভাল লাগে।"

জননীর সব কথাগুলো দাঁড়িয়ে শুনবার সময় অমরের ছিল না, বৃষ্টি আবার আরম্ভ হওয়া কিছু বিচিত্র নয়, ও তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল।

উমাতারা তখনও আপনমনে বলে চলেছিলেন—"ভাল খাগী, সতেক খোয়ারী পাড়া শুদ্ধকে যেন তুক করেছে।"

মহামায়ার বাড়ীতে ঢুকতেই আবার বৃষ্টি আরম্ভ হ'ল অমর ঘরে গিয়ে ঢুকল, ঘরে শেখরনাথ অনেকক্ষণ থেকে বসেছিল; শেখরনাথ বয়সে অমরের চাইতে চৌদ্দ পনের বছরের বড়, দেখতে মন্দ নয়, মস্ত বড় গোঁপ পাকিয়ে পাকিয়ে কাঁকড়া বিছের দাঁড়ার মত উঁচু করা; মহামায়ার পাশের বাড়ীতে থাকে। বিপত্নীক, ছেলে-মেয়েরা স্ত্রীর মৃত্যুর পর মামার বাড়ীতে দিদিমার কাছে থাকে।

অমর শেখরকে একটা নমস্কার করে বল্লে—"কতক্ষণ?"

শেখর ওর দিকে একবার চেয়েই বিশ্বের বিরক্তি মাখা মুখে শুধু ঘাড় নাড়ল কথার কোন উত্তর দিল না।

এ ঘরে মহামায়া বৈকালিক প্রসাধন শেষ করছিলেন; আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সাড়ীর কোঁচ ঠিক করে, মুখে কি একটা মাখছিলেন, পুত্রবধূ লীলা এসে দাঁড়াল—"মা কি রান্না হবে।"

মহামায়া ডানহাতখানা গালের ওপর ঘসতে ঘসতে বল্লেন—"তুমিই যা হয় দেখে শুনে দাও না মা।"

লীলা ফিরে যাচ্ছিল মহামায়া আবার বল্লেন—"হ্যাঁ ভাল কথা, অমর এসেছে?"

লীলা ঘাড় নেড়ে বল্লে—"হ্যাঁ এসেছেন।"

—"তাহ'লে অমরের জন্যেও এক কাপ চা কোর।"

লীলা ঘাড় নেড়ে বেরিয়ে গেল।

অমর জানলার কাছে বাইরে বৃষ্টির দিকে চেয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল, মহামায়া এসে অমরের পাশে দাঁড়িয়ে পীঠে আস্তে একটা চড় মেরে মৃদু স্বরে বল্লেন—"এ ঘোর রজনী মেঘের ছটা কেমনে যাইব বাটে।"

গানের সুরে বলে ওর দিকে চেয়ে হাসতে লাগলেন।

অমর হেসে ওঁর দিকে চাইল—"অর্থাৎ?"

—"বাড়ী ফিরবে কি করে? বিষ্টি আরম্ভ হ'ল।"

—"বাড়ী যাব না এইখানেই থাকব।"

—"তাহ'লে বৌমা মারবেন!"

—"মারলে তুমি বাঁচাবে।"

—"ওরে বাবা! বৌমার কাছ থেকে তোমায় বাঁচাতে পারব না। সেদিন রায়েদের বাড়ী অত লোকের মধ্যে বৌমার সঙ্গে কথা কইতে গেলাম, তা তিনি উত্তর না দিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেলেন। এত রাগ হবার কারণ কি কে জানে বাপু!" অমর কথার কোন উত্তর না দিয়ে, ভ্রূ-কুঞ্চিত করে বাইরের দিকে চেয়ে রইল।

শেখরনাথের চোখ দুটো এতক্ষণ ঈর্ষায় জল জল করছিল, এতক্ষণে মহামায়ার সঙ্গে কথা কইবার সুযোগ পেয়ে যেন বাঁচল, বল্লে—"বৌদি, যে তোমার সঙ্গে কথা কয়না তার সঙ্গে সেধে সেধে কথা কয়ে অপমানিত হতে যাও কেন?"

মহামায়া অমরের দিকে চেয়েছিলেন, হঠাৎ শেখরের অসাময়িক উক্তিতে ভ্রূ-কুঞ্চিত করে বিরক্তি মুখে ওর দিকে চাইলেন, কোন উত্তর দিলেন না।

লীলা এল চা নিয়ে।

মহামায়া একটা কাপ অমরের হাতে তুলে দিয়ে, আর একটা নিজে তুলে নিয়ে লীলাকে বল্লেন—"এক কাপ শেখর ঠাকুরপোকে দাও।

লীলা শেখরের হাতে আর এক কাপ চা দিয়ে দুটো কাপ টেবিলের ওপর রাখল—"বাবা আর উনি আসছেন।"

—"তোমার চা?"

মহামায়া প্রশ্ন করলেন লীলাকে।

—"আমার ও ঘরেই রেখে এসেছি।"

বলে লীলা চলে গেল।

শ্যামাকান্ত পুত্র দীনেশকে সঙ্গে নিয়ে এসে বসলেন। মহামায়া শ্যামাকান্তর পাশে বসে বল্লেন—"তোমার ত চা খেলে রাত্তিরে ঘুম হয় না তবে চা খাচ্ছ কেন?"

শ্যামাকান্ত একটা 'উঁহু' শব্দ করে, এদিক-ওদিক চেয়ে বল্লেন—"দাঁতের গোড়া বড্ড ফুলেছে, নইলে আমি তোমাদের মত অকারণে সারাদিন চা খাইনে। এই দেখ না অমর, চা খেয়ে খেয়েই ত ওর অমন চেহারা, আজ চা খাওয়া বন্ধ করুক, ও ঠিক ইয়া হয়ে উঠবে।"

অমর দীনেশের সঙ্গে গল্প করছিল, একটু হাসল।

চা খাওয়া শেষে মহামায়া পান দিতে দিতে বল্লেন—"এমন বর্ষার দিন, আজ অমরের একটা গান হোক।"

অমর ঘাড় নাড়ল—"না আমার নয়, তোমার।"

—"তুমি না গাইলে আমি গাইব না।"

—"আমি গাইব, কিন্তু তার আগে তোমাকে একটা গাইতে হবে!"

মহামায়া আর কথা কাটাকাটি না করে বাজনার কাছে বসে পড়ে একটা গান আরম্ভ করলেন।

শ্যামাকান্ত চেয়ারে বসে ঢুলতে লাগলেন।

রাত্রে অমর বাড়ী ফিরল। জ্যোৎস্না [illegible] লেপ মুড়ি দিয়ে কাঁপছে, উমাতারা [illegible] লেপ মুড়ি দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন।

অমর দবজা ঠেলতেই ঝি হরির মা এসে দরজা খুলে দিলে। অমর ঘরে ঢুকে স্ত্রীর কপালে হাত রাখল, জ্যোৎস্না অমরের হাতখানা ঠেলে দিয়ে মাথার দিকে লেপটা ভাল করে টেনে আবার কাঁপতে লাগল।

অমর সরে গিয়ে জননীকে একটা ঠেলা দিয়ে ডাকল —মা; ও মা!"

উমাতারা চমকে তাড়াতাড়ি উঠে বসলেন।

অমরের খাবার দিলেন, ও খেতে বসল; উমাতারা ওর সম্মুখে বসে পড়ে বল্লেন—"বৌমার ত আজ আবার জ্বর এল, ভাল করে চিকিৎসা করা বাপু, জ্বরে জ্বরে মেয়ে যেন কি হ'য়ে গেল!" অমর ভ্রূ-কুঞ্চিত করে বল্লে— "চিকিৎসাত হচ্ছে আর কি করবে? এসে পর্য্যন্ত এই পাচ বছরে পাঁচশো রকম রোগ! দুদিন একটু সামলে ছিল, ওমনি কাকার জন্যে প্রাণ কেঁদে উঠল ছুটে দুর্গাপুরে গিয়ে ম্যালেরিয়া নিয়ে এলেন!"

অমরের আহার শেষে উমাতারা বেরিয়ে গেলেন, অমর দরজায় খিল দিয়ে এসে স্ত্রীর পাশে বসল। মুখের লেপটা সরাতে যেতেই জ্যোৎস্না সেটা চেপে ধরল, অমর একটু হেসে বল্ল—"আমার সঙ্গে তুমি পারবে?" বলে লেপের ভেতর হাত চালিয়ে ওর হাত দু'খানা একহাতে ধরে অন্য হাতে লেপটা মুখের ওপর থেকে সরিয়ে নিল। কাঁপুনি ওর থেমে গিইছিল, শুয়ে কাঁদছিল।

অমর সস্নেহে ওর কপালের ওপর হাত বুলিয়ে দিয়ে বল্লে—"কি পাগল!"

—"আর অত আদরে কাজ নেই! আমার শীত করছে সরে যাও। আমি ইচ্ছে করে রোগ করি না?"

—"আমার কথায় রাগ হয়েছে! তুমি সমান ভুগতে লাগলে, আমার মনে কি শান্তি আছে, হঠাৎ বলে ফেলেছি, রাগ কোরনা, লক্ষ্মীটি!"

—"আমার রাগই বা কি আর অভিমানই বা কি—। তোমার ত অশান্তি হবার কোন কারণ দেখছি নে!"

অমর আর কোন উত্তর না দিয়ে আলোটা নিভিয়ে শুয়ে পড়ল।

৩

ডাক্তার নরনাথের পর পর অনেকগুলি পুত্র সন্তানের পর শেষটি এল কন্যা।

নরনাথ কন্যার নাম রাখলেন ডেজি, স্ত্রী স্নেহময়ীর কিন্তু ও নামটা মনঃপূত হ'ল না তিনি নাম রাখলেন দয়াময়ী।

পুত্রের আহারের সম্মুখে খুকুকে কোলে নিয়ে নরনাথের মা খুকীকে আদর করতে করতে বল্লেন—"খুকুর তোর ও ঢেকচি নামের চাইতে বৌমার দয়াময়ী নামই বেশ হয়েছে বাপু!"

নাম বিপত্তি দেখে পুত্র সকাতরে জননীর দিকে চাইলেন, বধূ জয়ের আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে হেসে উঠলেন।

দয়াময়ীর বয়সের সঙ্গে সঙ্গে জননী স্নেহময়ীর শিক্ষার তাড়া পড়ল, ওর মনে হ'ল সমস্ত জ্ঞান শিল্প পৃথিবীর যাবতীয় সমস্ত কন্যাকে আয়ত্ত করিয়ে ফেলবেন।

প্রত্যেক আত্মীয় বন্ধু পরিচিত সবাইকে শুনিয়ে দিলেন যে উনি কন্যাকে ডাক্তার করবেন, বিয়ে দেবেন না।

এই ডাক্তার করার স্বপ্ন দেখতে দেখতে একদিন হঠাৎ দেখা গেল দয়াময়ী জীবনের চৌদ্দটী বর্ষ বসন্তের ডালা ভরে দিয়েছে। মেয়েকে ডাক্তার করার সুর হঠাৎ থেমে গেল।

দেখা গেল তারানাথের পুত্র শিবশঙ্করকে জামাতৃপদে বরণ করবার জন্যে স্নেহময়ী ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন।

স্বামী বল্লেন—"ডেজি পড়ছে পড়ুক, শেষে দেখা যাবে।"

স্নেহময়ী, কিন্তু স্বামীর কথা কিছুতেই মনোমত হয় না, বল্লেন—"বেশ ত পড়ুক না, বিয়ের পর পড়ালেই হ'বে। অমন মেধাবী ছেলে শিবশঙ্কর ওকে হাতছাড়া করা বোকামী হ'বে। বাপের পয়সা আছে লেখাপড়ায় অত ভাল।"

নানা তর্ক বিতর্কের পর স্নেহময়ীর জেদই বজায় রইল। দয়াময়ীর বিয়ে হয়ে গেল শিবশঙ্করের সঙ্গে।

শিবশঙ্কর শুধুই বিশ্ববিদ্যালয়ের সুযোগ্য ছাত্র নয় ও সুযোগ্য জামাইও! দিনের পর দিন যায়, বিয়ের পরেও লেখাপড়া চলতে পারে, এমনি ধারাই স্নেহময়ীর আশা ছিল, কিন্তু বাচস্পতির বংশের বধূদের নাকি লেখাপড়া ভুলতে হয়।

শিবশঙ্কর বিখ্যাত 'সৎবংশ' এবং বনেদী বংশের ছেলে হয়ে, দয়াময়ীর মত 'ম্লেচ্ছ একপুরুষে টাকা' পিতার কন্যাকে দয়া করে বিয়ে করে যে কতখানি উদারতার পরিচয় দিয়েছে সেকথা দিনে দিনে দয়াময়ীকে এবং নরনাথকে জানিয়ে দিতে লাগল।

নরনাথ চুপ করে স্ত্রীর দিকে চেয়ে থাকেন।

স্নেহময়ী কপালে করাঘাত হেনে বল্লেন—"অমন বিদ্বান ছেলের হাতে দিয়েও মেয়ের এমন দুর্দ্দশা হ'ল।"

এমনি করেই বছর কতক পরে বনেদীবংশের বধূত্বের গৌরব সর্ব্বাঙ্গে মেখে মাস কতকের কন্যা মহামায়াকে কোলে নিয়ে দয়াময়ীর কঙ্কালটা আবার মায়ের কোলে ফিরে এল।

বেশীদিন ওকে আর মায়ের কাছেও থাকতে হ'ল না, মৃত্যু দুই হাত বাড়িয়ে বুকে টেনে নিল।

মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত দয়াময়ী কেবলি বলেছে— "মায়াকে তোমাদের কাছে রেখ, ওদের কে দিওনা।"—

তারপর অনেকদিন কেটে গেছে।

আজও স্নেহময়ীর আকাশে বাতাসে কন্যার শেষ যেন নিত্য নব নররূপ ধরে প্রতিদিন যেন ফিরে আসে।

মহামায়া স্কুলে পড়ে, পড়ায় বেশ মাথা আছে।

কোন আত্মীয়ের বাড়ীতে কি একটা উপলক্ষে স্নেহময়ী নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গেলেন।

সেখানে মহামায়ার পিশিমার ননদ শিবসতীও এসেছিলেন, স্নেহময়ীকে দেখে তিনি নানা আত্মীয়তার পর প্রশ্ন করলেন—"হ্যাঁ মা মহামায়ার বিয়ের কি করছ? বেশ বড় হয়ে উঠেছে দেখছি।"

মহামায়ার দিকে চেয়ে স্নেহময়ী দীর্ঘশ্বাস ফেলে বল্লেন—"দয়াকে ওঁর ইচ্ছে ছিল পড়াবার, আমিই ভাল ছেলে দেখে জেদ করে বিয়ে দিয়েছিলাম, তারপর যা হ'ল সেত খুবই হ'ল, অত আদরের মেয়ের কি দুর্গতি। আর এখন মায়ার বিয়ে দেব না, পড়ছে পড়ুক তারপর দেখা যাবে।"

শিবশঙ্করের বাড়ীতে কথাটা প্রচার হ'ল।

বাড়ীশুদ্ধ সবাই ক্ষেপে উঠল, শিবশঙ্করের পিতা তারানাথ কান্নার সুরে বল্লেন—"এর চেয়ে তুই মলিনে কেন রে, হ্যাঁ বাচস্পতিবংশের মেয়ে তুই বেঁচে থাকতে খিশ্চানদের মত বিয়ে করবে না, ফর-ফরিয়ে ইংরিজি বলে রাস্তায় রাস্তায় হাওয়া খেয়ে বেড়াবে! ওরে এর চেয়ে তুই মলিনে কেন রে।"

শিবশঙ্কর যে জীবিত আছে সেই কথাটা প্রমাণ করাবার জন্য সেইদিনই মেয়ে নিয়ে আসতে চলে গেল।

নরনাথ স্নেহময়ীর সবিনয় অনুরোধেও কোন ফল হ'ল না।

শিবশঙ্কর বল্লে—"মেয়ে না দিলে আমি মামলা কোরবো।"

নরনাথ চটে উঠলেন—"যাকগে ওদের মেয়ে ওরা নিয়ে।"

স্নেহময়ীর অবুঝ মাতৃহৃদয় কিছুতেই মানেনা, কিন্তু চোখের জলেও শিবশঙ্কর ভিজল না। মেয়ে নিয়ে চলে গেল।

মাস কতক পরে নরনাথের নামে গোলাপী খামে সবান্ধবে তারানাথের পৌত্রী কল্যাণী শ্রীমতী মহামায়ার বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র এল।

৪

মহামায়া শ্বশুর বাড়ী এল, বৃদ্ধা রুগ্না শাশুড়ী, স্বামী শ্যামাকান্ত আর কেউ নেই।

আত্মীয়রা বলে শ্যামাকান্ত ভালমানুষ, বন্ধুরা বলে বোকা।

মহামায়ার মত স্ত্রী পেয়ে ওর আশঙ্কার অন্ত ছিল না অল্পায়ু মায়ের সন্তান ওকি বাঁচবে!'

তাই প্রতি মুহূর্তে ওর সতর্কতার সীমা ছিল না।

মহামায়া আবদারের সুরে তাড়া দেয়—"কি পাগলামী হচ্ছে!"

শ্যামাকান্ত অবাক হয়ে বোকার মত ওর মুখের দিকে চেয়ে থাকে। মহামায়ার কথার সুর কেটে যায় ওর চেয়ে থাকাতে,ও আর কোন দিকে না চেয়ে রান্নাঘরে ঢুকে পড়ল।

গ্রীষ্মের রাত্রি অন্ধকারে ছাতে শ্যামাকান্ত শুয়ে ছিল, মহাকায়া কাজ সেরে এল। শ্যামাকান্তর শিয়রের কাছে বসে ওর মাথার চুলের ভেতর হাত বুলুতে লাগল।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে শ্যামাকান্ত বল্লে—"অসুখ করবে, শুয়ে পড়।"

—"কিছু হ'বে না।"

বলে মহামায়া পূর্ব্ববৎ মাথায় হাত বুলুতে লাগল।

এবার শ্যামাকান্ত বিব্রত নিরুপায়ভাবে মিনতি করে উঠল—"না গো লক্ষ্মীটী,আমার কথা শোন,অসুখ করবে।"

মহামায়া মাথার কাছ থেকে চট করে উঠে পড়ে সতরঞ্চিখানা ঠিক করে পেতে বালিশটা টেনে নিয়ে শুয়ে পড়ল।

শ্যামকান্ত অবাক হয়ে থাকে, প্রতি মুহূর্তে মহামায়ার অভিমানের অন্ত নেই, অথচ অভিমান যে কেন হয় সে ওর কিছুতেই মাথায় ঢোকে না।

শ্যামাকান্ত শয্যার ওপর উঠে বসে ওর কপালে হাত দিয়ে ডাকে—"মায়া।"

—"কি?"

—"রাগ হয়েছে?"

—"না, ঘুম পাচ্ছে।"

মহামায়ার ঘুম পাচ্ছে শুনে শ্যামাকান্ত নিশ্চিন্ত হয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

মহামায়ার কিন্তু ঘুম আসে না, শয্যা ছেড়ে উঠে ছাতের পাঁচিলের পাশে এসে চুপ করে দাঁড়ায়।

স্বামীর প্রেম ও পেয়েছে সম্পূর্ণভাবেই, কিন্তু তবু কিন্তুটা যেন অনবরত মনের কোণে জেগে ওঠে।

শ্যামাকান্তর প্রেমে গভীর শান্তি আছে, তৃপ্তি নেই।

এক ঘুম দিয়ে শ্যামাকান্তর ঘুম ভেঙ্গে যায়, মহামায়াকে শয্যায় দেখতে না পেয়ে আবার উঠে পড়ে।

মহামায়ার কাছে এসে দাঁড়ায়—"এখানে চুপ করে দাঁড়িয়ে যে!"

—"এমনি।"

ও সস্নেহে মহামায়ার দিকে চেয়ে প্রশ্ন করল—"দিদিমার জন্যে মন কেমন করছে?"

এর চেয়ে শ্যামাকান্ত যদি ওকে [illegible] খাবে?' সেও হয়ত ভাল ছিল।

মহামায়া কোন উত্তর না দিয়ে [illegible]

—"আমার কিছু হয়নি তুমি ঘুমোও

শ্রীবিমলা দেবী

—উপন্যাস—
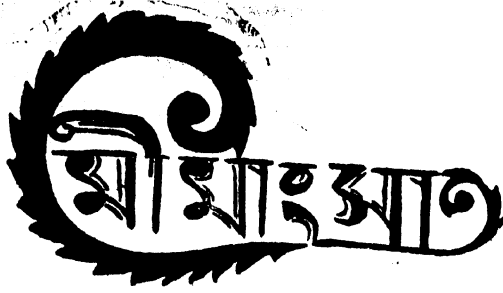
[শ্রীমতী বিমলা দেবীর নাম আজকাল বাংলার পাঠক-পাঠিকাদের কাছে সুপরিচিত। সাহিত্যক্ষেত্রে ইনি অল্পদিন হইল আসিলেও ইতিমধ্যে ছোট গল্প ও ছোট উপন্যাস রচনায় যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। ইঁহার 'ক্রমশঃ' উপন্যাস খানি সুপরিচিত। পুষ্পপাত্রেও ইঁহার ছোট বড় অনেকগুলি গল্প বাহির হইয়াছে। বর্ত্তমান ছোট উপন্যাস 'মীমাংসা' খানিতে ইনি সমাজের একটা মস্ত বড় সমস্যা যাহা লইয়া আমরা অনেক সময় আলোচনা করি তাহারই একটা রূপ বাস্তবতার দিক্ দিয়া দিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। জয়ন্ত আধুনিক রুচিসম্পন্ন পিতা-মাতার শিক্ষিত সন্তান—ঝোঁকের বসে নীতি ও অন্তরের বাণী অনুসরণ করিয়া অজ্ঞাতকুলশীলা কোন বালিকাকে বিবাহ করিল—তাহার পর আদর্শ অনুসরণ করিতে গিয়া সংসারে, সমাজে তাহার কি দশা হইল—এবং এ সমস্যার মীমাংসাই বা কি তাহাই 'মীমাংসা' পড়িয়া দেখিবেন সুলেখিকা বিমলা দেবী কি সুকৌশলে তাঁহার ক্ষমতাশালী লেখনী চালনায় সমাজের এত বড় সমস্যার কিরূপ আন্তরিকতার সহিত বাস্তব চিত্র আঁকিয়াছেন।]

১

বিলাসপুর গ্রামের মধ্যস্থল জুড়িয়া যে প্রকাণ্ড অট্টালিকা সদর্পে আকাশের দিকে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, তাহারি দ্বিতলের একটি সুসজ্জিত কক্ষে বসিয়া একটি তরুণী বধূ সম্মুখে একরাশ পাণ লইয়া সাজিতে বসিয়াছিল। পান সাজা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, কয়েকটি কেবল মোড়া বাকী।

কক্ষটী শয়ন কক্ষ। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

আসবাবের মধ্যে একপাশে একটি বড় পালঙ্ক। তাহার সুশুভ্র শয্যার উপর একটি কারুকার্য্য খচিত ক্রিম রংয়ের ঢাকা, ঢাকার পাশ দিয়া শুভ্র শয্যার কিয়দংশ দৃষ্টিগোচর হইতেছিল।

দ্বারের দিকে কোণে একটি ছোট কাঁচের আলমারি; তাহাতে অনেকগুলি ছোট বড় বই সাজান ছিল। দেওয়ালে টাঙ্গান একটি কাপড়ের ব্রাকেট তাহাতে পুরুষদের উপযোগী কোট সার্ট ধুতী ও কয়েকখানি চওড়া রাঙ্গা পাড় সাড়ী কুঁচাইয়া রাখা ছিল। এক কোণে একটি ছোট টীপয়ের উপর রঙিন কাপড়ের আবরণ ঢাকা আলোকাধার, এবং তাহারি কিয়দ্দূরে একটা মাঝারী টেবলের উপর একটি মাঝারি আয়না ও চিরুণী, বুরুষ, তেলের শিশি, সিন্দুর কৌটা প্রভৃতি অনেকগুলি প্রসাধন উপযোগী সামগ্রী সুশৃঙ্খলার সহিত পরস্পরের গা ঘেঁসিয়া সাজান ছিল।

সহসা নীচে হইতে আহ্বান আসিল—"বৌমা—অ—বৌমা।"

তরুণী চকিতভাবে উঠিয়া পড়িল। তাড়াতাড়ি বাহির হইবার উপক্রম করিতেই একটি যুবক আসিয়া কক্ষে প্রবেশ করিল, প্রস্থানদ্যোতা সুজাতার অঞ্চল বদ্ধ চাবিতে মৃদু টান দিয়া সুরেশ কহিল

—"এই যেও না।"

মৃদু হাসিয়া মুখ ফিরাইয়া সুজাতা কহিল—

—"কেন?"

সুরেশও হাসিল, কহিল—

—"কেন আবার? বারাণ্ডা থেকে দেখনা কে এসেছেন, নেমেছ কি অষ্টে-পৃষ্ঠে মাদুলী, মা আবার তাঁকে যে রকম ঘোরঘটা করে অভ্যার্থনা করছেন তাতে খুব সুবিধে বোধ হ'চ্ছেনা, বুঝলে ত যেওনা।"

—"যাও এই বুঝি, আঃ ছাড় না গো, মা আবার রাগ করবেন।"

বলিয়া সুজাতা এইবার সত্য সত্যই আঁচল ছাড়াইয়া বাহির হইয়া গেল।

নীচে পশ্চিম দিকের টানা দালানে, একটি শুভ্র কেশ বৃদ্ধ পিছনে দড়ি বাঁধা চশমা চোখে লাগাইয়া কুশাসনে বসিয়া গভীর মনোযোগ সহকারে একটি বালিকার হস্ত রেখাদি পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন; আশে পাশে অনেকগুলি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে গোল হইয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া

দাঁড়াইয়াছিল। তাহাদের অনতিদূরে একটি শ্যামাঙ্গী বিধবা প্রৌঢ়া ললাট পর্য্যন্ত অল্প একটু ঘোমটা টানিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন।

সুজাতা অবগুণ্ঠন মুখে ধীরপদে প্রৌঢ়ার পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইল। নিস্তারিণী মুখ ফিরাইয়া সুজাতাকে পার্শ্বে আকর্ষণ করিয়া অনুচ্চ কণ্ঠে কহিলেন—"ওঁকে প্রণাম করো।"

সুজাতা বৃদ্ধের পদতলে নত হইয়া প্রণাম করিতেই, বৃদ্ধ প্রসন্ন নয়নে মুখ তুলিয়া কহিলেন—"এস মা, এস, আমি আশীর্ব্বাদ করছি, তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হ'বে।"

সুজাতার মুখখানা পলকের জন্য রাঙা হইয়া উঠিল।

অনেকক্ষণ ধরিয়া সুজাতার হস্তরেখাদি পরীক্ষা করিয়া, বৃদ্ধ সুজাতার ধৃত হাতখানা ছাড়িয়া দিয়া সুদীর্ঘ একটা নিশ্বাস টানিয়া, নিস্তারিণীর উদ্বিগ্ন মুখের দিকে চাহিয়া, অল্প অল্প মাথা নাড়িতে নাড়িতে কহিলেন—

—"যা দেখলাম, তাতে ভালই মনে হচ্ছে, কোন ভয় নেই, আমি আপনাকে সেই কবচটা পাঠিয়ে দেব; সেইটে ধারণ করালেই আর কোন চিন্তা নেই।"

নিস্তারিণী বৃদ্ধের বাক্যে আশ্বাস পাইয়া মৃদু কণ্ঠে কহিলেন—"আশীর্ব্বাদ করুন আপনার আশীর্ব্বাদেই সব সিদ্ধ হবে। বড়ই মনঃকষ্টে আছি। আর যাবার দিনও ত হয়ে এল, এখন একটি নাতির মুখ দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে যেতে পারলেই বাঁচি।"

বৃদ্ধ নিস্তারিণীকে নানাপ্রকার প্রবোধ বাক্যে আশ্বাস প্রদান করিয়া প্রস্থান করিলেন।

নিস্তারিণীও কার্য্যান্তরে যাইবার উপক্রম করিতে-ছিলেন; এমন সময় ও-পাড়ার হরিশ মুখুয্যের বৃদ্ধা জননী আসিয়া উঠানে দাঁড়াইলেন। কাঁখে তাঁহার একটি বছর দুইয়ের উলঙ্গ শিশু।

গৃহকার্য্যে ব্যাপৃতা পুত্রবধূর নিকট ক্রন্দন-পরায়ণ নাতিটিকে বায়না ধরিয়া পাড়া মাথায় তুলিবার চেষ্টায় রত দেখিয়া, সকাল বেলাতেই তাহাকে কোলে চাপিয়া, পাড়া বেড়াইবার ও সেই সঙ্গে লোকের বাড়ীর হাঁড়ির খবর সংগ্রহের চেষ্টায় বাহির হইয়াছিলেন। পথে রায় বাড়ীর বড় বধূ ঘাট হইতে স্নান সারিয়া গৃহে ফিরিতেছিল; তাহারি নিকট জমিদার গৃহে নূতন জ্যোতিষীর আগমন সংবাদ শুনিয়া; বর্ত্তমান জমিদার সুরেশ চাটুয্যের পত্নী সুজাতা যে নিঃসন্দেহ 'বাঁজা তাল গাছ' মুক্তকণ্ঠে সে কথা প্রচার করিতে করিতে জ্যোতিষীর তথ্য গ্রহণ করিবার সঙ্কল্পে, জমিদার গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নিস্তারিণী তাঁহাকে দেখিয়া, একমুখ হাসিয়া, অভ্যর্থনা করিয়া লইলেন—"এই যে খুড়িমা, এস, এস, কদিন ধ'রে তোমার কথাই ভাবছিলাম, বলি খুড়িমা আর বৌমা বলে মনেও করেন না।"

খুড়িমা নিস্তারিণীর কথায় এক গাল হাসিয়া, দালানে উঠিয়া আসিয়া, ভাল করিয়া জাঁকিয়া বসিয়া কহিলেন—

—"ও মা সে কি কথা; তোমাদের কি ভুলতে পারি? বুড়ো হয়েছি হেঁটোয় আর জোর পাইনা মা, তাই আসতে পারি না নইলে তোমাদের ভুলব? তোমরা কি আমার পর? তোমার শাশুড়ী কি আমাকে কম ভালটা বাস-তেন! তোমার শ্বশুরের সেই কালো গাইটা গো, সেটাকে তুমিও ত দেখেছ, কম দুধটা দিত না বাবু; এক এক বেলায় পাঁচ সের করে দুধ! বাড়ীতে আমারও তখন অনেকগুলি; শাশুড়ী ননদ, যা, দেওর, ভাসুর এক বাড়ী লোক। শাশুড়ী আবার বলতে নেই মা, একটু যেন কেমনতর ছিলেন; পেট পুরে খেতে অবধি দিতেন না। তা যখুনি তোমাদের বাড়ী এসেছি, তোমার শাশুড়ী এই এমনি এক বাটী দুধ নিয়ে ধরে দিতেন—"নে সত্য খা"—

বহুবার শ্রুত কাহিনী সুতরাং নিস্তারিণী প্রসঙ্গটাকে ফিরাইবার অভিপ্রায় কহিলেন—"হ্যাঁ খুড়িমা, রাঙুর যে আসবার কথা ছিল, এল না? তারা পাঠালে না বুঝি?"

—"হ্যাঁ, তুমিও যেমন বৌমা, তারা পাঠাবে কে[illegible] গা! আমার বড় বৌমার সবই কেমনতর অনাছিষ্টি সেবার বোনকে নিয়ে এল, তা, তারা শুনতে পেরে ক[illegible] রাগ করলে। আবার এবার ধূয়ো তুলে রাঙুকে পাঠা[illegible] তাকি কেউ হুট করে অমনি বোনের বাড়ী পাঠায় মা[illegible] তা' আবার যে লোক তা'রা। ওরে ও [illegible] পোড়া ছেলে, জলের ঘটি নিয়ে কি [illegible] যে, ঐ গেল, গেল, ছিষ্টি নৈবেদ্যর [illegible]

হতভাগা ছেলে, এক দণ্ড থির হয়ে বসতে দেবে না; দিলে কাপড়খানা ভিজিয়ে।"

বলিতে বলিতে খুড়িমা তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িলেন। পায়ের কাছের খানিকটা কাপড় জলে ভিজিয়া গিয়াছিল; দুই হস্তে কাপড়ের প্রান্তটা ভাল করিয়া নিঙড়াইয়া লইয়া, সশব্দে কয়েকটা চড় পটলার অনাবৃত পিঠের উপর বসাইয়া দিয়া, হাত হইতে জলের ঘটিটা কাড়িয়া লইয়া ঝঙ্কার দিয়া উঠিলেন—

—"মাগো মা, কোথাও কি দুদণ্ড জুড়োবার যো আছে? বাড়ীর বাইরে পা দিয়েছি কি সঙ্গে চল্ল রাবণের গুষ্টি!"

পটলা তখন পিঠের জ্বালায় চীৎকার জুড়িয়া দিয়াছে; নিস্তারিণী তাড়াতাড়ি তাহাকে কাছে টানিয়া লইয়া সান্ত্বনা দিবার ব্যর্থ চেষ্টায় পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে খুড়িমার দিকে চাহিয়া কহিলেন—"কাপড়খানা ভিজে গেল ওপরে কি করে যাবে খুড়িমা! আমার একখানা কাপড় বৌমা এনে দিন, ছেড়ে ফেল। বৌমা অ বৌমা।"

খুড়িমা ব্যস্ত হইয়া কহিলেন—

—"না না থাক থাক। আজ উঠি মা, এর পর নিশ্চিন্দি হয়ে আসব'খন। হ্যাঁ বলি বৌমা আজ যে কে একজন নতুন গণৎকার এসেছিল শুনলাম, তা কি বল্লে নাত-বৌকে দেখে? কি কপালই তোমার মা! ঐ একটা ছেলে—কত যাগ যুগ্যিই করলে বাছা, তা কিছুতে কিছু না! এই আমারও ত এতখানি বয়স হ'ল চাটুজ্যে বাড়ীতে নাতবৌর মত বৌ কিন্তু একটিও দেখিনি।

তোমার শাশুড়ীরও দেখেছি, তোমারও দেখেছি তোমাদের জন্যই বা কোন গণৎকার এয়েছিল! শাশুড়ীর কথা নাই ধরলাম তোমারও ত হয়েছিল দশ বারোটা অবিশ্যি বাঁচা না বাঁচা ভগবানের হাত হয়েছিল ত বটে। তা আজ আবার কি বলে গেল গো! হ'বে? হবে বইকি মা তবে বয়েস হয়ে গেছে এই যা'। ও বয়েসে তোমার চারটি হয়ে গেছল। কত বয়েস হ'বে গো নাতবৌর ছাব্বিশ? না কুড়ি। তা ঐ হ'ল। ওরে ও পটলা আয় উঠে আয়।

এদের নিয়ে কি কোথাও স্বস্তি আছে মা। এখন উঠি, আবার আসব। আসব বই কি মা।" খুড়িমা পটলাকে লইয়া প্রস্থান করিলেন, নিস্তারিণীও কার্য্যান্তরে উঠিলেন।

২

গ্রীষ্মকাল। সুরেশ দ্বিতলের পশ্চিম দিকের টানা বারাণ্ডায় চেয়ার টানিয়া বসিয়াছিল। শুক্লপক্ষের দশমীর শুভ্র জ্যোৎস্না তখন চতুর্দ্দিক প্লাবিত করিয়া তুলিয়াছিল। মাঝে মাঝে একটুকরা কালো মেঘ কিছুক্ষণের জন্য চাঁদের আলোয় বাধা দিয়া তখুনি সরিয়া যাইতেছিল। আকাশে চাঁদের ও মেঘের কৌতুকপূর্ণ লুকোচুরি খেলা চলিতেছিল। পিছন হইতে সুজাতা জয়ন্তকে কোলে লইয়া সুরেশের পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইল। বাম হস্তে জয়ন্তকে বুকের কাছে বেড়িয়া ধরিয়া, দক্ষিণ হস্তে সে স্বামীর ললাট স্পর্শ করিতেই, সুরেশ প্রফুল্লমুখে পত্নীর হাতখানা ললাটের উপর চাপিয়া ধরিল।

সুজাতা হাসিয়া কহিল—

—"কি অন্যায়! আমি কিন্তু ভেবেছিলুম তুমি চমকে উঠবে।"

সুরেশ চেয়ারের পিঠের দিকে মুখ ফিরাইয়া কহিল—"কি ভেবে! পরস্ত্রী?"

—"তাই ভাবছিলে বুঝি?"

—"যদি বলি হ্যাঁ; কি করবে, মুখ ভার?"

কৃত্রিম নৈরাশ্যসূচককণ্ঠে সুজাতা কহিল—"নাঃ কি আর কোরব! করবার পথ কি কিছু রেখেছ?"

—"সাধু!"

সহসা সিঁড়িতে নিস্তারিণীর পদধ্বনি ও কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

—"ও বৌমা, বৌমা খোকন কি ঘুমিয়েছে।"

সুজাতা তাড়াতাড়ি কক্ষের দিকে ফিরিবার উপক্রম করিতেই নিস্তারিণী আসিয়া পড়িলেন। সুজাতা অপ্রতিভ আরক্ত মুখে ঘোমটা টানিয়া এক পাশে সরিয়া দাঁড়াইল।

পুত্র ও পুত্রবধূর অপ্রস্তুত ভাব দেখিয়া ব্যাপারটা বুঝিয়া লইয়া মনে মনে হাসিয়া, মুখের গাম্ভীর্য্য বজায় রাখিয়া নিস্তারিণী কহিলেন—

—"খোকন ঘুমোয় নি? তা না ঘুমুক গে আমার

কোলে ওকে দিয়ে, তুমি একবার নীচে যাও ত মা। বামুন ঠাকুরকে রান্নাগুলো বুঝিয়ে দিও। যে বামুন ঠাকুরের রান্না, বল্লাম সুরেশকে, যে, কাজ নেই বাবু ও ঠাকুর ফাকুরের হ্যাঙ্গামায়। তা' হ'ল না কলকাতা থেকে ধরে নিয়ে এল; ওর ও কিকির মিকিড় বুঝিও না ছাই; নোংরার হদ্দ, মরি অম্বোসতায়। আর হ্যাঁ বলি বৌমা বিকেলে যে জল খেতে দিলাম তা দিব্যি করে ভাঁড়ারে থুয়ে এলে কার জন্যে গা? তোমায় নিয়ে আর পারলাম না; যাও নাও গে।"

সুজাতা জয়ন্তকে শ্বশ্রূর প্রসারিত ক্রোড়ে শোয়াইতে শোয়াইতে চাপা কণ্ঠে কহিল—

—"আজ আমার ক্ষিদে ছিল না মা।"

—"কবেই বা তোমার ক্ষিদে থাকে বাছা।"

জননীর ক্রোড়ে এতক্ষণ জয়ন্ত দোলা খাইতেছিল, ঠাকুমার কোলে গিয়া অকস্মাৎ দোলা বন্ধ হওয়ায় সে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। সুরেশ পুত্রের দিকে চাহিয়া হাসিয়া কহিল—

"ওঃ গলার জোর বটে! যেমন চেহারা অপূর্ব্ব তেমনি গলাও হয়েছে।"

সুজাতা নীচে যাইতেছিল স্বামীর কথায় রাগ করিয়া সুরেশকে শুনাইয়া কহিল—

—"নিজের চেয়ে সুন্দর!"

সজোরে হাসিয়া উঠিয়া সুরেশ কহিল—"আমার চেয়ে সুন্দর! কখন নয়, ও সব রাগের কথা। হ্যাঁ মা বলত আমার চেয়ে সুন্দর!" বলিতে বলিতে সে ঝুঁকিয়া আপনার দক্ষিণ হস্তের বলিষ্ঠ শুভ্র বাহু জয়ন্তর গোল গোল সুন্দর কচি হাতের পাশে ধরিল।

নিস্তারিণী বারেক সস্নেহ প্রসন্ননেত্রে সেই দিকে চাহিয়া হাসি মুখে কহিলেন—"আসলের চেয়ে সুদই বেশী মিষ্টি লোকে বলে।"

—"যাও বা আশা ছিল তুমি একেবারেই মুখ বন্ধ করে দিলে।"

বলিতে বলিতে সুরেশ হাসিয়া সোজা হইয়া উঠিয়া বসিল।

৩

উঠানের পেয়ারা গাছের ডালে বসিয়া জয়ন্ত একাগ্র মনে অর্দ্ধপক্ক পেয়ারাকুল ধ্বংসের চেষ্টা করিতেছিল। সুরেশ বহির্বাটী হইতে অন্দরে প্রবেশ করিল। সুজাতা বারাণ্ডায় আসিয়া দাঁড়াইয়া চতুর্দ্দিকে ইতঃস্তত দৃষ্টি সঞ্চালন করিতে করিতে ডাক দিল—"জয়ন্ত।"

জয়ন্ত জননীর আহ্বানে, শঙ্কিত মনে, ত্রস্তভাবে আপনাকে পাতার আড়ালে গোপন করিবার চেষ্টা করিতে ছিল; কিন্তু মানসিক অস্থিরতায় অসতর্কভাবে একটা সরু ডালের উপর পা রাখিতেই সে সব শুদ্ধ অকস্মাৎ গাছের নীচে আসিয়া পড়িল।

সুরেশ অন্য মনে চলিয়া যাইতেছিল; পিছনে পতনের শব্দ হইতেই, সে ফিরিয়া চাহিল। সুজাতা খুব রাগের স্বরে চেঁচাইয়া উঠিল—"সমস্ত দিন লেখা পড়া নেই; বিকেলে একটু মুখ হাত ধুয়ে খেলা করতে যাওয়া নেই; দিন রাত্তির ছেলের ঐ পেয়ারা গাছে বসে থাকা হয়েছে কম্ম। তখন থেকে চেঁচিয়ে গলা কাঠ হয়ে এল, সাড়া নেই; দাঁড়াও আজ আমি দেখাচ্ছি মজা।"

পড়িয়া গিয়া জয়ন্তর বিশেষ কোন আঘাত লাগে নাই, কিন্তু উপস্থিত স্বাভাবিক ভাবে উঠিয়া দাঁড়াইলে, জননীর নিকট সেটা পূরণ হইবার প্রবল সম্ভাবনা দেখিয়া, সে হাত পা ছড়াইয়া যেমন পড়িয়াছিল তেমনি পড়িয়া রহিল। সুরেশ অতর্কিতে, অকস্মাৎ, পুত্রের করুণ রসের, ও গম্ভীর বীর রসের মধ্যে পড়িয়া হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছিল। খানিকটা অবাক হইয়া চাহিয়া থাকিবার পর, ব্যাপারটা কতকটা বুঝিয়া লইয়া, খুব খানিকটা উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল। গোলমালের শব্দে, নিস্তারিণী বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। সুরেশ তাড়াতাড়ি গিয়া জয়ন্তকে তুলিয়া ধরিতেই, জয়ন্ত একবারে আড় চোখে, পিতার মুখ ভাবটা দেখিয়া লইল, ভয়ে ভয়ে চুপি চুপি কহিল—"আমি ত পড়া করে এসেছি বাবা।"

পুত্রের কথায় সুরেশের তাহার [illegible] শঙ্কাটা এক নিমেষে কাটিয়া গেল। নিস্তারিণীও [illegible]

প্রথম পুরস্কার—৮নং

এস তৃষ্ণার দেশে এস কলহাস্যে
গিরি-দরী-বিহারিণীর লাস্যে

—সত্যেন্দ্র

ফটোশিল্পী—শ্রীঅমিয়চন্দ্র মুখোপাধ্যায়
কলিকাতা।

দ্রষ্টব্য—২য় পুরস্কার প্রাপ্ত ফটো আগামী মাসে যাইবে।

লেক, শিলঙ
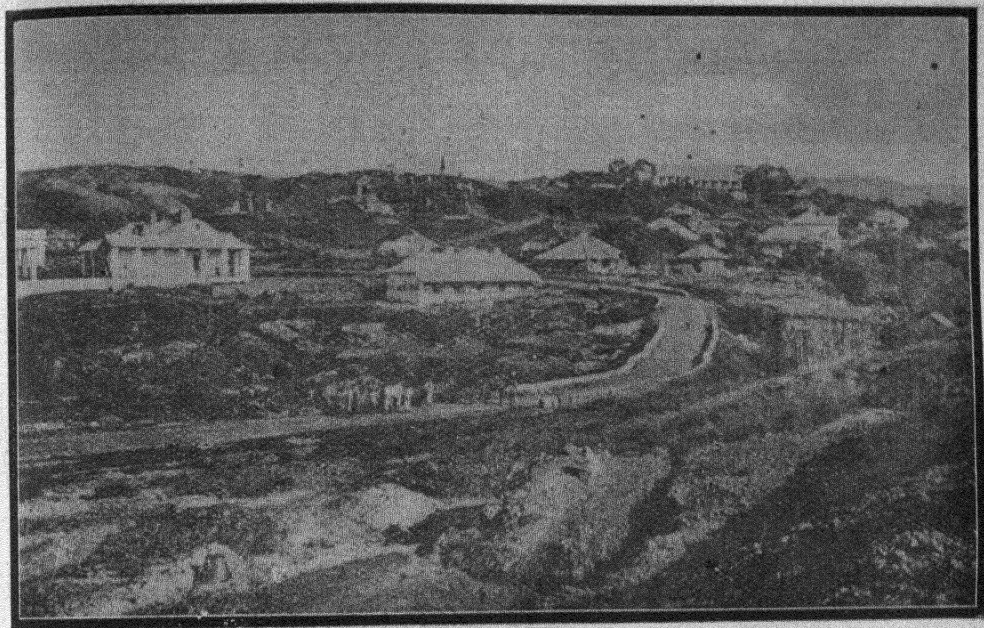
শিলঙ্-গৌহাটী রোড

শিলঙ্ গৌহাটী রোডের অপরাংশ

নৃত্য

ঝরণা

ঝরণা

মন্দির, শিলঙ্

অপর একটী ঝরণা

বাজার, শিলঙ্
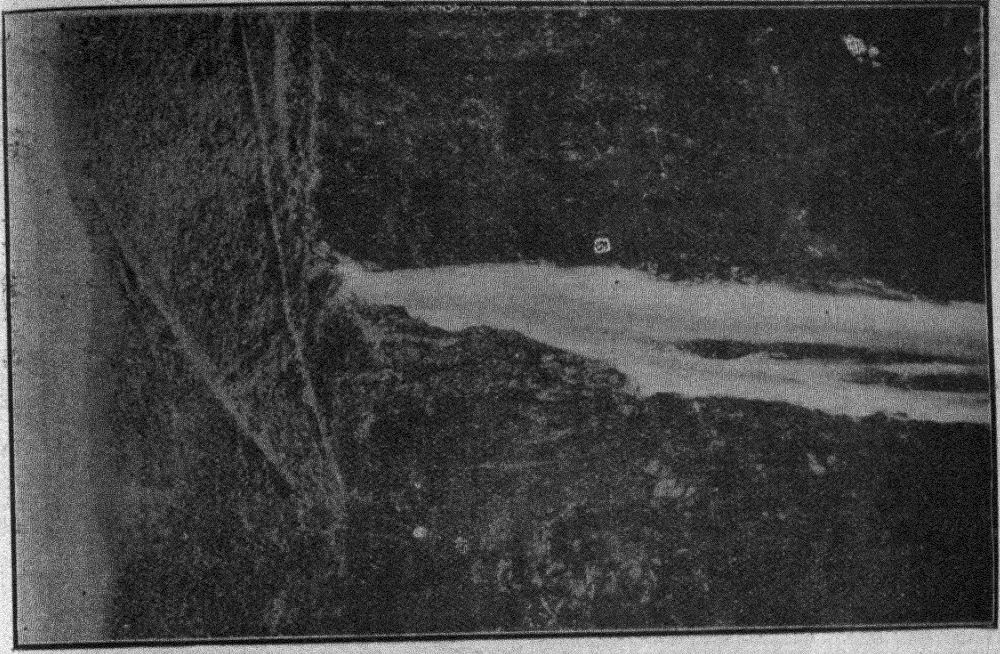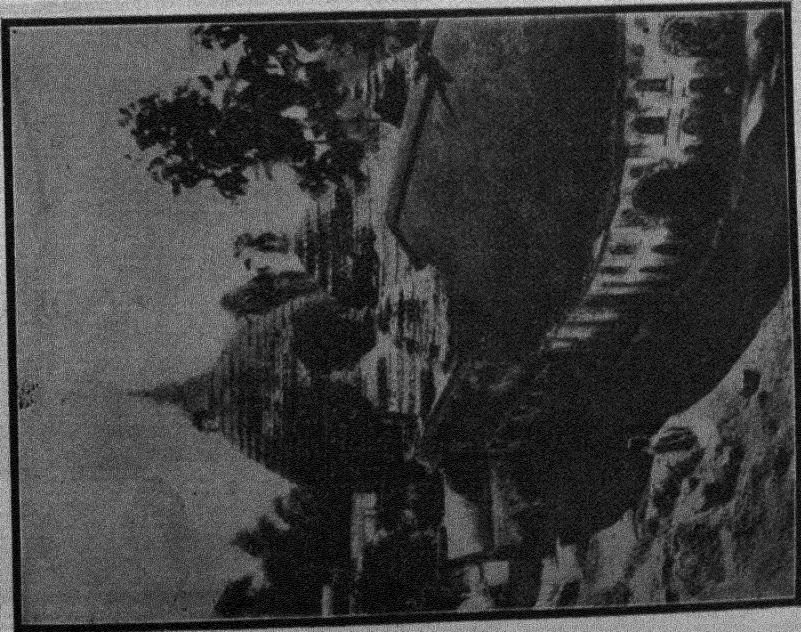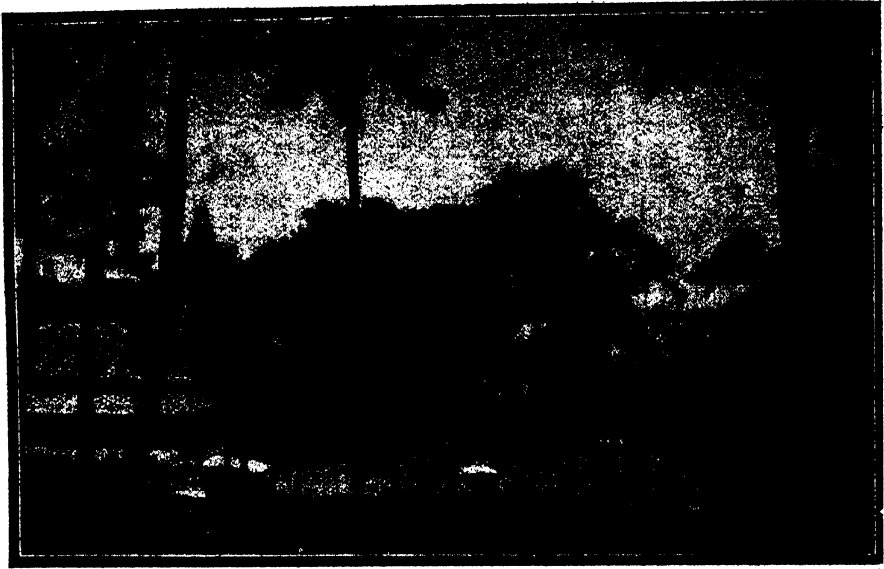
উপাসনা মন্দির

হাসিয়া কহিলেন,—"সর্ব্বরক্ষে—মা গো কি ছেলে! আমি ভাবলাম না জানি কতই না লেগেছে!"

শ্বশ্রূর আবির্ভাবে সুজাতা অপ্রস্তুত হইয়া পড়িয়াছিল; নিস্তারিণীর কথায় চাপা কণ্ঠে তর্জ্জনের সুরে কহিল—"ও কি কম পাজী, দিন রাত্তির ও থেকে লাফাচ্ছে লাগবে কি করে!"

মাতাকে জয়ন্ত মনে মনে যথেষ্ট ভয় করিত, এবং মাঝে মাঝে সুজাতার নিকট চড়টা চাপড়টাও লাভ করিত। সুরেশের নিকট সে প্রশ্রয় পাইত সব চেয়ে বেশী এবং তাহার শাসনটা প্রায়ই বিরক্তি সূচক আঃ শব্দেই সমাপ্তি লাভ করিত; সুতরাং পিতার বিরক্তিকে জয়ন্ত সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ভয় করিত। জয়ন্তর কথায় সুরেশ কোন সাড়া না দেওয়ায়, সে, মনে মনে ভয় পাইয়া, সুরেশের ডান হাতখানি ধরিয়া, মুখ নত করিয়া, ছল ছল চোখে, অপ্রস্তুত মুখে আস্তে আস্তে কহিল—"আমি আর কখন দুষ্টুমি কোরব না বাবা।"

—"কখন করবে না ত?"

—"না।"

সুজাতা কক্ষে প্রবেশ করিতে করিতে পিতাপুত্রের কথা শুনিয়া চাপা কণ্ঠে স্বামীকে শুনাইয়া কহিল—"আহা কি শাসনই হ'ল।"

জয়ন্ত পিতার হাত ছাড়িয়া সুবোধ বালকের পন্থা অনুসরণ করিয়া স্বভাবসিদ্ধ লাফান স্থগিত রাখিয়া ধীরে ধীরে মুখ হাত ধুইতে প্রস্থান করিল।

সুরেশ পত্নীর দিকে চাহিয়া হাসিয়া জননীকে উদ্দেশ করিয়া কহিল—

"তোমার বউর তেজ দেখছ মা!"

মা হাসিলেন, কহিলেন—

"কি করে বাবা, ছেলে ত তোমারই; ওকে কি আর আমরা আটতে পারি?"

৪

—"মা।"

উচ্চকণ্ঠে সাড়া দিয়া জয়ন্ত জননীর কক্ষের দুয়ার ঠেলিতেই, সুজাতা তাড়াতাড়ি ভিতর হইতে কহিলেন "দাঁড়া, আমি আসছি, ঘরে ঢুকিস নে; কোন কাজ আছে!"

গ্রামের তিন চারিটি স্ত্রীলোক সুজাতার সহিত গল্প করিতেছিলেন; জয়ন্তর পদশব্দে চকিত হইয়া উঠিলেন।

জয়ন্ত কণ্ঠস্বরে বুঝিয়া ফিরিয়া যাইতে যাইতে কহিল—"না কাজ নেই, এমনি।"

জয়ন্ত ফিরিয়া যাইতেছিল, পূজার ঘরের সম্মুখে আসিয়া দেখিল কক্ষের সম্মুখের বারাণ্ডায় মাদুর পাতিয়া নিস্তারিণী একখানা পাতা ছেঁড়া মোটা কালীসিংহের মহাভারত মাথার পাশে রাখিয়া শুইয়া আছেন। জয়ন্তকে ফিরিতে দেখিয়া অল্প বিরক্তি মিশ্রিত স্বরে কহিলেন—

—"বৌমার ঘরে বুঝি রাজ্যির মেয়েরা সব জড়ো হয়েছেন। না বাপু এ গাঁয়ের বউ-ঝিদের যদি পাড়া বেড়ানর কোন ছিরি ছাঁদ আছে হ্যাঁ। দুদিনের জন্যে ছেলে এল বাড়ীতে তা ঘর জুড়ে সব রইলেন বসে। আয় বোস এই খেনে।"

জয়ন্ত হাসিয়া নিস্তারিণীর শিয়রের কাছে বসিয়া পড়িয়া কহিল—

—"তা বলে কিন্তু তোমার অত রাগ করা উচিত নয় ঠাক্‌মা। আমাদের গাঁয়েই তবু মেয়েরা একটু বেড়াতে পায়; সহরে যদি দেখ একবার।"

নিস্তারিণী হাসিয়া কহিলেন—

"তা চল না একবার সহরটা দেখে মা কালী দর্শন করে গঙ্গাস্নান করে আসি। আর কবে বলতে কবে মরে যাব, এই বেলা একটু তিথি ধর্ম্ম করে নি।"

—"বেশ ত চল না, হ্যাঁ তোমরা আবার যাবে। সেবার কত করে বাবা বল্লেন তাই বড় গেলে! যে না কুণো তোমরা।"

—"তোমরাই কুণো করেছ বাবা।"

বলিতে বলিতে সুজাতা আসিয়া দাঁড়াইল। জয়ন্ত তাড়াতাড়ি সরিয়া বসিয়া জননীর জন্য স্থান ছাড়িয়া দিল। কহিল—

—"হ্যাঁ এ তোমাদের ভারী সহজ যুক্তি মা; যা করবে সে ও আমাদের দোষ, যা না করবে সে ও আমাদেরই দোষ।"

অল্পক্ষণের মধ্যেই কথা জমিয়া উঠিল ; মাতা পুত্রে তর্ক করিতেছিলেন, নিস্তারিণী চুপ করিয়া শুনিতে ছিলেন।

কথা হইতেছিল হিন্দু বিবাহের সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা সম্বন্ধে ; জয়ন্ত কহিল—

—"শাস্ত্রে আছে কি নেই সে কথা ত হচ্ছে না ; আসল কথা তোমরা ও ধরণের বিয়ে গুলোকে ত বিয়ে বলে স্বীকার কর না, কাজেই লোকে ও রকম অবস্থায় পড়লে ক্রিশ্চান মুসলমান ব্রাহ্ম হয়ে যায়। শাস্ত্রে কি আছে কিম্বা সেকালের মহাভারতের যুগে সমাজ কতখানি উদার ছিল, এখন আর সে শুনে লাভ কি ; এখনকার শাস্ত্র আর সমাজের কি অবস্থা তাই দেখনা।"

সুজাতা হাসিলেন, কহিলেন—

—"এখন যে সঙ্কীর্ণতা বলছিস সেত চিরকাল ছিল না, কাজেই চিরকাল থাকবেও না, দরকার হয়নি তাই বদলও হয়নি, দরকার হলেই বদলাবে।"

জয়ন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিতেছিল, কহিল—

—"বদলাবে ? জোর করে বদলাতে হ'বে, নইলে কিছুতেই বদলাবে না। আচ্ছা ধর আমি নিজেই যদি খুব ছোট শ্রেণীর কোন মেয়েকে বিয়ে করে নিয়ে আসি তোমরা তাকে ঘরে তুলবে ?"

সুজাতা হাসিয়া কহিল—

—"তা বুঝি জানিস না ? জোমের চুবড়ি ধুলেই শুদ্ধ।"

নিস্তারিণীর নাতির উক্তি শ্রুতি মধুর বোধ হইতে ছিল না কহিলেন—

"কি যে বাবু সব কথার ছিরি—যা হোক একটা বল্লেই হ'ল যেন। নাও থাম।"

—"এঃ ঠাকুমা শুনেই চটে গেলে ?"

নিস্তারিণী কি উত্তর দিতে যাইতেছিলেন ; এমন সময় অম্বিকা দাসী আসিয়া ডাক দিল—

—"ওগো দাদাবাবু, বাবু তোমায় বাইরে ডাকছেন।"

জয়ন্ত তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িয়া, চটির মধ্যে অর্দ্ধেকটা পা গলাইয়া হাসিতে হাসিতে উঠিয়া গেল।

নিস্তারিণী সেইদিকে চাহিয়া কহিলেন—

—"এই বার ছেলের বিয়ে দাও বাছা, বুড়ো মানুষ কবে বলতে কবে মরে যাব দেখে যাই।"

—"তোমার নাত বৌ তুমি দেখে শুনে আন না মা, আমি ওতে নেই!"

বলিয়া সুজাতা কার্য্যান্তরে গমন করিলেন।

নিস্তারিণী বধূর কথায় প্রসন্ন হইয়া, মনে মনে ভাবিলেন—'ছেলে, বৌ, আমার চিরদিনই ছোট হয়েই রইল। আহা তা থাক! আমি রইছি বলেই না আড়াল পাচ্চে। নাত বৌ এবার আনতে হ'বে বইকি। ভাল করে পাশটা হয়ে যাক, আসছে বোশেখে টুক্‌টুকে বৌ ঘরে আনব।'

৫

সকাল বেলায় ভাঁড়ার ঘরের সম্মুখে বসিয়া সুজাতা তরকারি কুটিতেছিল। সম্মুখে বসিয়া জয়ন্ত জননীর সহিত গল্প করিতে করিতে, কর্ত্তিত লাউয়ের খোসার সাহায্যে, মেঝের উপর জোরে জোরে নিজের নাম লিখিতেছিল। এমন সময় সুরেশ একখানা দৈনিক সংবাদপত্র হাতে লইয়া আসিয়া দাঁড়াইয়া কহিল—

"রমেশরা চলে গেল!"

সুজাতা আলুর খোসা ছাড়ান স্থগিত রাখিয়া ; স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া কহিল—

"কে রমেশ ঠাকুরপো! কেন ?"

—"ইন্দিরার বিয়ে নিয়ে যে গোলমাল উঠেছিল, সেটা ভেতর ভেতর খুব জোরেই চলছিল ; কাজেই জামাই যখন, নিয়ে যেতে চাইলে, তখন না গিয়ে আর কতকাল উৎপীড়ন সহ্য করে ?"

—"যেমন গাঁয়ের ছিরি, পোড়া কপাল। এমন একটা গণ্যি মান্যি লোককে কি না এমনি করে দেশছাড়া করলে।"

বলিয়া সুজাতা ক্ষুব্ধভাবে অন্যদিকে চাহিয়া রহিল। রমেশ বাবুর বিদায় সংবাদ শুনিয়া জয়ন্তর আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল। উত্তেজিত কণ্ঠে সুরেশের দিকে চাহিয়া জয়ন্ত কহিল—

"তাঁর অপরাধ! তিনি মেয়ের [illegible] বিয়ে দিয়ে গ্রামের যত নিষ্কর্ম্মা লক্ষ্মীছাড়া, [illegible] খাদরামীর পথ বন্ধ করেছেন বলে! [illegible] বেলায় ত সবাই এসে জুটেছেন, কিন্তু [illegible]

পণ্ডিত মশাইরা ছিলেন কোথায়? তোমার কিন্তু এ বিষয় কিছু করা উচিৎ ছিল বাবা।"

—"হুঁ। আমাদের দেশের লোকগুলো, বুদ্ধি দিয়ে ত ভাবে না, ধারা দিয়েই ভাবে!" বলিতে বলিতে সুরেশ কক্ষের দিকে ফিরিল। জয়ন্তও উঠিয়া পিতার সঙ্গে সঙ্গে কক্ষে প্রবেশ করিল।

আহারাদির পর সুরেশ ও জয়ন্ত, পাশাপাশি শয্যায় শুইয়া গল্প করিতেছিল, সুজাতা দ্বার ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া জয়ন্তর পালঙ্কের শিয়রের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

জয়ন্ত কথা কহিতে কহিতে মুখ ফিরাইল, মাথাটা তাড়াতাড়ি সরাইয়া লইয়া কহিল—

—"মা? বোস।"

সুজাতা বসিল; দুই হাতে জয়ন্তর চুলের মধ্যে হইতে সিঁথির রেখা আবিষ্কার করিতে করিতে কহিল—

—"তোর ছুটি এরি মধ্যে ফুরিয়ে গেল?"

—"হ্যাঁ মা।"

—"কালই ত যাবি?"

—"যেতেই হ'বে!"

রাগ করিয়া সুজাতা কহিল—

—"কি যে পোড়ার দেশ হয়েছে, একটা ইস্কুল কলেজও থাকতে নেই; বারোমাস বিদেশে থাকা ছাই লাগে।"

কথা শুনিয়া সুরেশ ও জয়ন্ত যুগপৎ উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল—

—"কলকাতা বুঝি বিদেশ হল!"

সুজাতা অপ্রস্তুত হইয়া চটিয়া উঠিল, কহিল—

—"জানিনে বাবু! সব তাইতেই হাসি।"

জয়ন্ত কহিল—"তুমি বলবে আর আমরা হাসলেই যত দোষ হ'ল?"

ঠাট্টার সুরে সুরেশ কহিল

—"সদর দোরের পর সবটাই বিদেশ!"

—"বিদেশই ত। আমরা কি তোমাদের মত হিল্লি দিল্লি টহল দিয়ে বেড়াই!"

বলিয়া সুজাতা চুপ করিল।

৬

হোষ্টেলের দ্বিতলের কক্ষে বসিয়া ছুটীর দিন সকাল বেলায়, দুই বন্ধুতে তর্ক হইতেছিল।

সমরেশ কহিল—"আমাকে ত দোষ দিচ্ছিস, কিন্তু, সমাজ সংস্কারক সাজা অমনি সহজ কিনা! মুখে অমন সকলেই বলতে পারে। আমার অবস্থায় পড়লে তখন বুঝতে!"

জয়ন্ত কহিল—"তা হয় ত সহজ নয়; কিন্তু বেচারীরা নিরুপায় বলে, তোমার তাদের অমন ধারা ঠাট্টা কোরবার কোন 'রাইট' ছিলনা। যে ভদ্রলোক তোমাকে খবর দিয়েছিলেন, তাঁকে তোমার আশা দেওয়া উচিৎ ছিলনা।"

—"কি মুস্কিল! আমি কি আশা দিয়েছিলাম? আমি শুধু বলেছিলাম যে দেখে যদি পছন্দ হয় বিয়ে কোরব। কথার মধ্যে 'কিন্তু', 'যদি' শব্দগুলোকে একেবারে উড়িয়েই বা দিচ্ছিস্ কেন?"

—"আচ্ছা বেশ ধরে নিলাম। তারপর? পছন্দ হ'ল না?"

—"অপছন্দও হয়নি।"

—"তবে?"

—'তবে' আর 'কেন'র উত্তর নেই। কি যে বলিস; ঐ ধরণের অজ্ঞাত জন্মা মেয়েকে বিয়ে করা অমনি সহজ কি না?" বলিয়া সমরেশ হাসিয়া উঠিল।

জয়ন্ত উত্তেজিত কণ্ঠে কহিল—"নুইসেন্স! কেন সহজ নয়! ধরে তোমায় কেউ মার দিত! মেয়েটির বিয়ে হয়ে গেছে?"

—"পাগল! অমনি চট করে কি কেউ রাজী হয়! কেন করবি না কি?"

এইবার জয়ন্ত হাসিয়া ফেলিল কহিল—"ধর যদিই করি।"

—"তবে তার পর মুহূর্ত্তে শ্রীযুক্ত জয়ন্তকুমারকে বিলাসপুরের প্রাসাদ থেকে গলা ধাক্কা।"

—"কখন নয়।"

—"আরে রেখে দে নয়।"

জয়ন্ত জোরের সুরে কহিল—

—"কিছুতেই নয়, আমার বাবা মা অত সঙ্কীর্ণ মতের নন; হয়ত একটু দুঃখিত হন কিন্তু চটে যান না।"

—"আরে যা যা, বাপ মা অমনি সকলেরই উদার। আমিও ত জানি, মেয়ে দেখতে গেলাম, কোন্ শালা বাবাকে দিলে একখানা চিঠি লিখে। তার পরদিনই বাবা এসে উপস্থিত; জুতো মারতে যা বাকি ছিল! একেবারে যাচ্ছেতাই করে বকুনি! কত করে বুঝিয়ে তবে সে যাত্রা রেহাই পাই; নইলে বি-এ পড়ার দফা রফা হয়েছিল আর কি! নে ওঠ; বাজে কথা ছেড়ে এক কাপ চা কর দিকি, খাওয়া যাক। কেবল সকাল থেকে তোর সঙ্গে বকে বকে গলাটা শুকিয়ে উঠল।"

জয়ন্ত একটা আলস্য সূচক হাই তুলিয়া কহিল—"তুই ওঠ না। কখন কি চা করে খেয়েছি যে পারব। বরং তোর কৃপায় নেশাটা করা যাবে।" বলিয়া সে এতক্ষণের বাঁকা দেহটা সোজা করিয়া তক্তপোসের উপর ছড়াইয়া দিল।

সমরেশ উঠিয়া চা করিতে গেল।

জয়ন্ত চুপ করিয়া শুইয়া ভাবিতে লাগিল।

সমরেশ যে বলিল, তাহার অবস্থায় পড়িলে সেও বুঝিত, বাক্যে ও কার্য্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করা বাস্তবে সাংসারিক লোকের পক্ষে অসম্ভব। তাহা কি সত্য? ধর সে যদি সেই অজ্ঞাত কুলশীলা কন্যাটিকে বিবাহ করিতে অগ্রসর হইত তাহা হইলে তাহার পিতা মাতা কি বাধা দিতেন? না নিশ্চয় দিতেন না। তাঁহাদের কথাবার্ত্তার সুরে নিতান্ত সাধারণ নর-নারীর সঙ্কীর্ণতা-ত থাকে না।

সমাজে এই ধরণের বিবাহ কিন্তু হওয়া আবশ্যক। সংসারের উৎপীড়নে অসহ্য হইয়া, অথবা আপনার দুর্ব্বল বুদ্ধির ভ্রমবশতঃ, যে সমস্ত নারী বিপথে আসিয়া দাঁড়ায়, কালে যদি সে, সে ভুল বুঝিতে পারে এবং অনুতপ্ত চিত্তে আপনার সন্তানকে নিজেদের পঙ্কিল জীবনযাত্রা হইতে পৃথক করিয়া, সমাজে ফিরাইয়া দিতে চায়, তবে তাহাদের সে চেষ্টায় সমাজের সাহায্য করা অবশ্য কর্ত্তব্য। কেন না হিন্দু সমাজের অতি শুচিতা, দিনে দিনে তাহার জীবনীশক্তি ক্ষয় করিয়া তুলিয়াছে। নিরপরাধ শিশুদের বাধ্য করিয়া অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়ায় ফেলিয়া রাখিয়া; জন্মের অপরাধে জোর করিয়া তাহাদের পঙ্কিলতার স্রোতে ভাসাইয়া দিয়া হিন্দু সমাজ যে বিষাক্ত দীর্ঘশ্বাসের ঝড়ো হাওয়া দেশের বুকে জাগাইয়া তুলিয়াছে, তাহারি বিষে সে এমনি করিয়া দিনের পর দিন মরণের পথে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে।

দেশকে, জাতিকে, বাঁচাইতে হইলে তাহার দেহের গোপন ক্ষতের চিকিৎসা হওয়া সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন; সে ক্ষত অজ্ঞতার দোহাই দিয়া ঢাকা দিতে গেলে সে সারিবে না, ধীরে ধীরে সমস্ত দেহে সংক্রামিত হইয়া উঠিবে।

দেশের তরুণদের সে ক্ষতের চিকিৎসার জন্য অগ্রসর হওয়া আবশ্যক।

জয়ন্ত চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিল।—তাহার নিজের কি এ সম্বন্ধে কোন কর্ত্তব্য কোন দায়িত্ব নাই। কি সে করিতে পারে? সে কি সেই মেয়েটির বিবাহ সম্বন্ধে বন্ধুদের অনুরোধ করিবে? নাঃ—হয়ত তাহারা তাহাকে ঠাট্টা করিবে "নিজে কর না।"

ঠিক। অবস্থায় না পড়িলে ব্যবস্থা দেওয়া হাস্যাস্পদ ব্যাপার।

জয়ন্ত ভাবিতে লাগিল, এমন সময় সমরেশ চা আনিয়া তাহাকে একটা প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিয়া কহিল—"নে নে ভাবিস পরে চা খাবিত চটপট উঠে পড়।"

৭

সেদিনের তর্কের রেশটা জয়ন্তর মন হইতে কিছুতেই থামিল না।

শেষে সে কি ভাবিয়া একদিন সমরেশের সহিত মেয়েটিকে দেখিয়া আসিল।

হোষ্টেলে ফিরিবার পথে সমরেশ কহিল—

"মেয়েটিকে দেখলে কিন্তু সত্যি দুঃখ হয় জয়ন্ত! কি রকম কুণ্ঠিত ভাব!"

জয়ন্ত সে কথার কোন উত্তর না দিয়া কহিল—

"আচ্ছা ও ভদ্রলোকটি কে? যিনি খুব জাঁক করে বেড়াচ্ছিলেন; মেয়ের লেখা পড়ার তদারক করছিলেন?"

সমরেশ কহিল—

"উনিই ত মেয়েটির অভিভাবক। মেয়েটির মা মারা যাবার সময়, মেয়েটিকে ওঁরই হাতে দিয়ে যায়; তখন ও খুবই ছোট। শ্রীনাথ বাবু ওকে মানুষ করেন। মেয়েটির মা, মেয়ের যা'তে ভদ্রঘরে বিয়ে হয় সেজন্ত অনুরোধ করে যায়; সেই জন্তে শ্রীনাথ বাবু খুবই চেষ্টা কচ্ছেন; শেষ কি হ'বে, বোঝা যাচ্ছে না। টাকাও ত খুব নেই; পেট ও ভরবে না জাতও যাবে তাতে বোধহয় কেউ রাজী নয়।"

জয়ন্ত কথা কহিল না।

গল্প করিতে, করিতে, তাহারা হোষ্টেলের গেটের কাছে আসিয়া পড়িল।

সমরেশ এতক্ষণ ধরিয়া আপন মনেই কথা কহিয়া চলিয়াছিল; জয়ন্তর কাছে একটিও উত্তর না পাইয়া; এতক্ষণ পরে তাহাকে একটা ধাক্কা দিয়া কহিল—কি রে বেজায় যে গম্ভীর হয়ে পড়লি! এতটা পথ মিছেই বকলাম। প্রথম দর্শনেই মুগ্ধ নাকি?"

সমরেশের কথার মধ্যে প্রচ্ছন্ন শ্লেষ ধ্বনিয়া উঠিল। জয়ন্ত মনে মনে বিরক্তি বোধ করিলেও কোন উত্তরই দিল না।

আহারের পর রাত্রে, অকস্মাৎ সমরেশের কক্ষের দুয়ার ঠেলিয়া, জয়ন্ত আসিয়া প্রবেশ করিল। সমরেশ তখন বিছানার উপর, কোলে একটা বালিশ লইয়া বসিয়া একখানা বই পড়িতেছিল। পদশব্দে মুখ তুলিয়া চাহিয়া, জয়ন্তকে দেখিয়া, কোলের বালিসটা, এক টানে পিছনের দিকে ফেলিয়া দিয়া কহিল—

"কি হে এস, এস, কি মনে করে?"

জয়ন্ত আসিয়া বসিল, হাতের অর্দ্ধদগ্ধ চুরুটটা সমরেশের পাশ দিয়া ঘরের কোণে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িয়া কহিল—

"সব সময় যে কিছু একটা মনে করেই আসতে হ'বে তার কি কোন মানে আছে?"

সমরেশ বন্ধুর ঠেলায় তক্তপোস হইতে পড়িতে পড়িতে, সামলাইয়া লইল; জয়ন্তর পিঠে কনুইর একটা ঠ্যালা দিয়া কহিল—

"ওর জন্মেই যেন বিছানাটা আমি পেতে রেখেছিলাম।"

"তবে কার জন্মে রেখেছিলি?"

সমরেশ বন্ধুকে ঠেলিয়া, নিজের যায়গা করিয়া লইল; সেও তাহারি পাশে শুইয়া পড়িয়া পা দুটা লম্বা ভাবে জয়ন্তর ঘাড়ের উপর চাপাইয়া দি। 'আঃ' বলিয়া আরাম সূচক একটা শব্দ করিয়া কহিল—

"এবার থেকে আমার ঘরে শোবার মতলব থাকলে নিজের বালিস নিয়ে আসিস জয়ন্ত।"

—"উঃ কি ছোট লোকরে! একটুখানি বালিশে মাথা দিয়েছি, যেন খসে গেছে।"

—"গেছেই ত।" বলিয়া নির্ব্বিকার চিত্তে সমরেশ দুটা চুরুট বাহির করিয়া একটা জয়ন্তকে দিয়া, অন্যটা নিজে ধরাইয়া লইল।

গল্প করিতে করিতে এক সময় জয়ন্ত কহিল—"আচ্ছা সমর ঐ মেয়েটির সম্বন্ধে আমাদের কি করা উচিৎ। না, না, সত্যি ঠাট্টা নয়। তোমার কি মনে হয় আমাদের কোন কিছু করবার নেই?"

সমরেশ কথাটা ঠাট্টা করিয়া উড়াইতে গিয়া, সহসা বন্ধুর গম্ভীর মুখের দিকে চাহিয়া থতমত খাইয়া কহিল—"কি আর করবার উপায় আছে?"

—"অত তাড়াতাড়ি উত্তর দিস নে, একটু ভেবে দেখ্। ওর যাতে ভদ্রঘরে বিয়ে হয় সে সম্বন্ধে চেষ্টাও ত করা যায়। আমি ঠাট্টা করছি না।"

সমরেশ অল্পক্ষণ ভাবিয়া কহিল—

"তুই ঠাট্টা করছিসনে যে সে আমি ও বুঝতে পারছি। কিন্তু সে অসম্ভব জয়ন্ত। ধর আমাদের চেনা শোনার মধ্যে ত এই হোষ্টেলের ছাত্র ক'টি, কি কলেজের কয়েকটি ছেলে। কিন্তু এটা এমনি গুরুতর দায়িত্ব যা' সহজে কেউ নিতে পারে না; বিশেষ কলেজের ছেলেরা। আর শুধু দায়িত্বই বা বলি কেন? সমাজের অসন্তোষ, আত্মীয় স্বজনের বিদ্রূপ গ্লানি। কাজেই এ সম্বন্ধে কাউকে বলতে গেলেই সে বলবে তোমার যদি এত দুর্ভাবনা তুমিই কর গে না।"

অনেকক্ষণ ধরিয়া কথা হইল। শেষে হঠাৎ জয়ন্ত

কহিল—"আচ্ছা একবার চেষ্টাই করে দেখ না,-এতগুলো ছেলে কেউ সাহস করবে না? তুই কর না।"

সমরেশ হাসিয়া ফেলিল, কহিল—

"এতক্ষণ পরে ঠিক বলেছিস, এ পর্য্যন্ত বি, এ, পাশ করতে পারলাম না, চাকরীর আশা নেই, বিয়ে করে তারপর খাবই বা কি আর ভদ্র হয়ে সংসারই বা করবো কি করে? আমার এমনিতেই বড় বিয়ে করবার সাহস আছে তা অমনি করে। পাগল, ওর জন্যে শুধু নিজের সাহস নয় অর্থের জোর সমাজের প্রতিপত্তি সবই যে চাই, বরং তুই করলে হ'তে পারে।"

জয়ন্ত কহিল—"ভদ্রলোক কত আশা করে কি রকম কাকুতি করে বলতে লাগলেন; ওঁকে সত্যিই আমাদের সাহায্য করা উচিৎ। আচ্ছা তুই একবার চেষ্টা করে ত দেখ। এত ছেলের মধ্যে কেউ সাহস করবে না এ কখন বিশ্বাস হয়?"

—"আচ্ছা দেখা যাক। কিন্তু শেষে যেন বিপদে ফেলিসনে।"

—"আরে না, না, আমি আছি ত। সে সব ভার আমার।"

৮

সমরেশ ও জয়ন্তর মিলিত চেষ্টায়ও কোন ফল হইল না; এমন অবস্থায় বিবাহ করিতে কেহই রাজী হইল না। উপরন্তু হোষ্টেল শুদ্ধ ছাত্র বিনা আয়াসে এমন একটা মুখরোচক আলোচনার স্বাদ পাইয়া যেন নব জীবন লাভ করিল।

খাইতে শুইতে চলিতে ফিরিতে—

"কি জয়ন্তবাবু কবে বিয়ে করছেন?"

—"নেমন্তন্নে বাদ দেবেন না যেন।"

—"দুখানা লুচি যেন পাই।"

ইত্যাকার তীক্ষ্ণ বিদ্রূপে জয়ন্তর জেদ বাড়িয়া গেল, কহিল—

"কেউ যখন করবে না আমিই করব।"

সমরেশ ভয় পাইল, কহিল—

"না ভাই খেয়ালের বশে, কি অন্যের বিদ্রূপে উত্তেজিত হয়ে ও সমস্ত কাজ না করাই ভাল। তোমার বাড়ীর লোকেরা বিরুদ্ধ হবেন, অমত করবেন।"

—"কে আমার বাড়ীর লোক? এখন জানালে তাঁরা হয়ত আপত্তি করবেন; বিয়ে করে জানাব; তাঁরা কখন রাগ করবেন না সে আমি খুব ভাল করেই জানি। তাঁরা অমন সঙ্কীর্ণ মতের ন'ন।"

বন্ধু বান্ধবদের তীক্ষ্ণ শ্লেষের সুর এক নিমেষে বিস্ময়ে স্তব্ধ করিয়া জয়ন্ত লাবণ্যকে বিবাহ করিয়া আসিল।

তাহার পর সে পিতাকে সমস্ত খুলিয়া একখানা চিঠি লিখিল।

একদিন, দুইদিন, তিনদিন, করিয়া ক্রমে ক্রমে তিন মাস গত হইল; চিঠির উত্তর আসিল না।

জয়ন্ত প্রথম প্রথম উত্তরের আশা করিয়া অবশেষে হতাশ হইয়া পড়িল।

সে কিন্তু এতখানি কোন দিন ভাবে নাই; সদ্য প্রস্ফুটিত তরুণ মনের করুণায় এ কাজের গুরুত্বও সে অনুভব করিতে পারে নাই। যখন অনুভব করিল তখন অনেক দেরী হইয়া গিয়াছে। চাহিয়া দেখিল প্রতিকারের কোন উপায়ই তাহার হাতে নাই।

সমরেশও প্রথমে এতটা বুঝিতে পারে নাই; পারিলে হয়ত বন্ধুকে এমন দুঃসাহসিক কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে বাধা দিত।

জয়ন্তর মুখে তাহার পিতা মাতা সম্বন্ধে গল্প শুনিয়া, তাঁহাদের সম্বন্ধে তাহার মনোভাব অন্যপ্রকার হইয়া উঠিয়াছিল।

জয়ন্তও তাঁহাদের বুঝিতে ভুল করিয়াছিল। কিন্তু সে ভুল যখন ভাঙ্গিল, তখন জয়ন্ত বিহ্বল হইয়া পড়িল।

বন্ধুবান্ধবদের বিদ্রূপ ধিক্কার, চতুর্দ্দিকের নিন্দা ধ্বনি, পিতা মাতার এমন নির্ব্বিকার উপেক্ষা সব [illegible] মিলিয়া তাহাকে যেন কেমন উদভ্রান্ত করিয়া তুলিল।

বাড়ী হইতে তাহার মাসিক খরচ বন্ধ [illegible] সামর্থ্যহীন জয়ন্ত, কি করিবে ভাবিয়া [illegible]

সমরেশ তাহাকে পুনরায় পত্র দিতে পরামর্শ দিল। ফল যা' হইল তাহাতে তাহার বিহ্বল ভাবটা কাটিয়া গেল বটে; কিন্তু প্রচণ্ড একটা অভাবিত আঘাতে তাহাকে পাষাণের ন্যায় কঠিন করিয়া তুলিল।

দ্বিতীয় পত্রখানি অপঠিত অবস্থায় লেফাফা শুদ্ধ ফিরিয়া আসিল। অন্য একখানা পত্রে তাহাদের নায়েব প্রফুল্লচরণ দু ছত্র লিখিয়া পাঠাইল, ভবিষ্যতে জয়ন্ত যেন সুরেশের সহিত, কোন প্রকার সম্বন্ধ রক্ষা করিতে না চেষ্টা করে।

এতদিন পর জয়ন্ত বুঝিল, ক্ষণিকের উত্তেজনার বশে সে যে পথে পদার্পণ করিয়াছে ভবিষ্যতে নিঃসঙ্গ অবস্থায়, একাকী তাহাকে এই পথে শেষ পর্য্যন্ত চলিতে হইবে। অভিমানী অন্তর, অপমানে কঠিন হইয়া উঠিল, সে এম-এ পড়া ছাড়িয়া দিয়া চাকুরীর সন্ধানে ঘুরিতে লাগিল।

৯

চতুর্দ্দিকের অবজ্ঞা, টিট্‌কারী, বিদ্রূপ, উপরন্তু বন্ধু-বান্ধবদের বিরক্ত অন্তরের, মিলিত চেষ্টায়, চাকুরীর আশা পরিত্যাগ করিয়া রিক্ত হস্তে দেশবাস করা জয়ন্তর পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। হোষ্টেলের ছাত্রদল তাহার সহিত একত্রবাসে বিরক্তি প্রকাশ করিতে লাগিল।

অর্থাভাবে ছাত্রাবাসে বাস করাও সম্ভব হইল না।

অবশেষে জয়ন্তর অভিমানী অন্তর মরিয়া হইয়া উঠিল; শেষে জয়ন্ত একদিন সমরেশের নিকট হইতে কিছু অর্থ সাহায্য গ্রহণ করিয়া লাবণ্যকে সঙ্গে লইয়া, ভাগ্যের হস্তে জীবনের হাল ফিরাইয়া দিয়া পশ্চিমের দিকে যাত্রা করিল।

লাবণ্যর অভিভাবকটি জয়ন্তর ঘাড়ে লাবণ্যকে নামাইয়া দিয়া; বেশ প্রফুল্ল মনেই সরিয়া পড়িলেন।

জয়ন্ত পশ্চিম যাত্রার পূর্ব্বে লাবণ্যকে কিছুদিনের জন্য তাঁহার নিকট রাখিয়া যাইবার প্রস্তাব করিল।

তিনি সমস্ত শুনিয়া গম্ভীর ঔদাস্য সহকারে কহিলেন —"আমি আর কি করতে পারি বল? ওর মাকে আমি মৃত্যুকালে কথা দিয়েছিলাম ভদ্রলোকের ছেলের সঙ্গে আমি ওর বিয়ে দেব; সেজন্য এতদিন চেষ্টার ত্রুটি করিনি; এখন আমি কর্ত্তব্যমুক্ত; কাজেই আর কোন দায়িত্ব নিতে আমার ইচ্ছা নেই; আর এত তুমি জেনে শুনেই করেছিলে; এখন তোমার স্ত্রী; সুতরাং তোমার কর্ত্তব্য!"

হয়ত তিনি আশঙ্কা করিয়াছিলেন জয়ন্ত এমনি করিয়া লাবণ্যকে ফেলিয়া সরিয়া পড়িবে।

তাঁহার কথার মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে সেই সুরই ধ্বনিয়া উঠিল! অপমানে, লজ্জায়, বিরক্তিতে, জয়ন্ত কঠিন হইয়া উঠিল!

যাইবার সময় সমরেশ বন্ধুর দুই হাত, নিজের হাতের মধ্যে তুলিয়া লইয়া, মিনতিপূর্ণ সমবেদনার সুরে কহিল—"যদি সেখানে গিয়ে কোন রকম বিপদে পড়িস ভাই, আমাকে একটা খবর দিস। আমার দ্বারা যেটুকু সাহায্য সম্ভব হবে, আমি কখন তা করতে ইতস্ততঃ কোরব না।"

জয়ন্ত উত্তর দিতে পারিল না, শুধু ঘাড় নাড়িয়া জানাইল 'আচ্ছা।'

তাহার মনে হইল মানুষের নিকট হইতে এত বড় প্রাণের দান সে কখন পায় নাই। এত অভাবনীয়ই নয় অমূল্যও বটে।

পশ্চিমের কোন একটা নিভৃত সহরে অনেক ঘুরিয়া ঘুরিয়া অবশেষে তাহার একটা চাকুরী মিলিল; মাহিনা যা স্থির হইল শুনিয়া জয়ন্ত একটা কথাও বলিতে পারিল না, শুধু ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল, যেমন করিয়াই হউক লাবণ্যর ভার তাহাকে বহন করিতেই হইবে মুটে-গিরি করিয়াও।

মাসান্তে যখন মাহিনা আসিল, সে একমনে টেবিলের উপর খাতা খুলিয়া লিখিতে লিখিতে মুখ না তুলিয়াই কহিল—

"রেখে যাও।"

অন্যান্য কেরাণীরা পরস্পরের মুখ চাওয়া-চায়ী করিতে লাগিল; বেতনের টাকার ঝন্ধার শুনিয়াও যে কেহ চোখ না ফিরাইয়া রাখিয়া যাইবার উপদেশ দিয়া লেখার মধ্যে অবিচলিত ভাবে ডুবিয়া থাকিতে পারে এমন লোক

তাহারা জীবনে কখন দেখে ত নাই-ই শোনেও নাই। বেতন লইয়া যখন সে শ্রান্ত পদে গৃহে ফিরিত পকেটের মধ্যে টাকাগুলি গতির বেগে পরস্পরের গায়ে পড়িয়া ঝঙ্কার তুলিত, একটা অপরিসীম অস্বস্তিতে জয়ন্তর মন ভরিয়া উঠিত; ইচ্ছা করিত পকেটের ভিতর হইতে মুঠা করিয়া তুলিয়া সেগুলিকে পথের প্রান্তে টান মারিয়া ফেলিয়া দেয়।

বেলা দশটা হইতে সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টা অবধি প্রাণান্ত পরিশ্রমে জয়ন্ত যে কয়টি মুদ্রা মাসান্তে গৃহে আনিত, তাহা হইতে দুইজনের দুইবেলার উপযুক্ত আহারের ব্যয় নির্ব্বাহ করাও কঠিন হইয়া পড়িত; চাকর রাখিবার সামর্থ্য তাহার ছিল না, একটা ঠিকা ঝি অল্প মাহিনায় দুইবেলা বাসন মাজিয়া যাইত; অন্যান্য গৃহকর্ম্ম লাবণ্যকেই করিতে হইত।

বন্ধুহীন নিঃসঙ্গ জীবনে দারিদ্র্যের কঠোর মূর্ত্তি এক এক সময় জয়ন্তের অসহ্য হইয়া উঠিত।

ধনী গৃহের একমাত্র সন্তান সে জীবনের সুদীর্ঘ চব্বিশ বৎসর সংসারের বহু উর্দ্ধে কল্পনার অসীম রাজ্যে অতিবাহিত করিয়াছে; সেদিন পর্য্যন্ত নিজের প্রতিদিনকার ব্যবহার্য্য কাপড় জামা পর্য্যন্ত সে ঠিক করিয়া গুছাইয়া রাখিতে পারে নাই; আর আজ তাহাকে শুধু নিজের নয় সেই সঙ্গে লাবণ্য ও হয় ত অদূর ভবিষ্যতে আরো কত অনাগত অতিথির জীবনের দায়িত্ব তাহাকে মাথা পাতিয়া লইতে হইবে।

জয়ন্ত নিঃশব্দে ভ্রূকুটীহীন প্রশান্ত মুখে সমস্ত সহ্য করিয়া চলিতে লাগিল। বিরক্তি প্রকাশের অধিকার তাহার নাই; সে স্বেচ্ছায় লাবণ্যকে জীবনের কঠিন সংগ্রামে টানিয়া আসিয়াছে।

রাত্রে আহারাদির পর, জয়ন্ত উঠানে, শয্যায় আসিয়া শুইয়া পড়িল; গ্রীষ্মকাল, শুক্লপক্ষের দশমীর উজ্জ্বল চন্দ্রালোকে চতুর্দ্দিক উদ্ভাসিত।

লাবণ্য আসিয়া কাছে দাঁড়াইল, এত শীঘ্র তাহাকে কাজ সারিয়া আসিতে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া জয়ন্ত কহিল—

—"তুমি খেলে না?"

—"না ক্ষিদে নাই।"

—"ওঃ।"

বলিয়া জয়ন্ত চুপ করিল, কথা খুঁজিয়া পাইল না। কেন যে লাবণ্যর ক্ষুধা নাই, বুঝিতে তাহার বিলম্ব হইল না; সে চুপ করিয়া একদিকে চাহিয়া রহিল। লাবণ্য অল্পক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া, আস্তে আস্তে স্বামীর শিয়রের পাশে সঙ্কুচিতভাবে বসিল। জয়ন্ত তাড়াতাড়ি মাথাটা সরাইয়া লইয়া কহিল—

—"ভাল করে উঠে বোস।"

—"এই যে বসি।"

আবার সব নীরব। দুজনেই নির্ব্বাক নিস্পন্দভাবে, যেন পরস্পরের মনের মুখোমুখি দাঁড়াইয়া পরিচয় করিয়া লইতেছিল।

এক সময় অকস্মাৎ নীরবতা ভঙ্গ করিয়া জয়ন্ত কহিল—"আজ মাসের কত? সাতাশ? না আটাশ? এখনও দুদিন।"

লাবণ্য জয়ন্তর শয্যার উপর রক্ষিত দক্ষিণ হস্তখানা কোলের উপর তুলিয়া লইল। ব্যথিত কণ্ঠে কহিল—

—"কেন ভাবছ? এ দুদিন চলে যাবেই।"

—"কেমন করিয়া!" এ প্রশ্ন করিতে জয়ন্তর সাহস হইল না; চুপ করিয়া রহিল।

জয়ন্ত মুখ ফিরাইয়া লাবণ্যর মুখখানা দেখিবার চেষ্টা করিয়া কহিল—"এদিকে সরে এসে বোস।"

—"কি?" বলিয়া লাবণ্য স্বামীর মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িল।

—"এদিকে এস, আমি তোমায় দে'তে পাচ্ছিনা। এক এক সময় কি ভাবি জান? ভাবি, হয়ত আমার মত ভুল হয়েছে।"

জয়ন্ত কথাটা সহজভাবেই বলিয়াছিল, কিন্তু তাহার অতর্কিত আঘাত, নিমেষে লাবণ্যর মুখখানা বিবর্ণ পাংশু করিয়া তুলিল। সে একটিও উত্তর দিতে পারিল না।

২০

লাবণ্যর মনে নিজের জন্ম সম্বন্ধে যে সঙ্কোচ সে আর কিছুতেই কাটিতে চাহে না। জয়ন্তর মনেও কিসের একটা আড়ষ্ট ভাব জাগিয়াই থাকে; স্পষ্ট করিয়া মনের মধ্যে তাহার কোন মূর্ত্তি ফুটিয়া ওঠে না; সুতরাং তাহাকে মন হইতে তাড়াইয়া দেওয়াও যায় না। ফলে পরস্পরের মধ্যে কিসের একটা দূরত্ব প্রচ্ছন্ন ভাবে রহিয়াই যায়।

জননীকে লাবণ্যর মনে পড়ে না; শুনিয়াছে সে কোন প্রসিদ্ধ রঙ্গালয়ের অভিনেত্রী ছিল। যিনি তাহাকে পালন করিয়াছিলেন, তিনি যে কি সূত্রে তাহার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাও সে স্পষ্ট করিয়া জানেনা।

অনেক বয়স পর্য্যন্ত, বাহিরের সংসার সম্বন্ধে তাহার কোন ধারণাই ছিল না।

ইহ সংসারে শ্রীনাথ বাবুর কোন বন্ধু ছিল না। সুতরাং জ্ঞান হওয়ার সঙ্গে সে শুধু দেখিয়াছিল, শ্রীনাথ বাবুকে, ও তাঁহার গৃহের একটি বহু পুরাতন ভৃত্য কষ্টাকে।

শ্রীনাথ বাবু নিজেই তাহার শিক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন।

নারী সম্পর্কহীন গৃহে বাস করিয়া জীবনে তাহার স্বাভাবিক বিকাশ অনেকখানিই চাপা পড়িয়া গিয়াছিল।

আশ পাশের মেয়েরা তাহার সহিত মিশিত না, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাহার কারণও সে অনুমান করিতে শিখিয়াছিল। এবং যেদিন হইতে আপনার অবস্থা সে ব্যক্ত অনুভব করিতে শিখিল সেদিন হইতে জীবনের প্রতিক্ষেত্রে প্রতি পদক্ষেপে তাহার মনে হইত হয়ত সে তাহার অনধিকারী।

জয়ন্ত যখন লাবণ্যকে বিবাহ করিয়াছিল তখন সে অনেক দিকই ভাবিয়া দেখিবার অবসর পায় নাই, খানিকটা খেয়ালের বশে এবং খানিকটা বন্ধু বান্ধবদের ঠাট্টা বিদ্রূপে উত্তেজিত হইয়াই সে এ কাজ করিয়াছিল। সংসার সম্বন্ধে তাহার জ্ঞান তখনও অস্পষ্টই ছিল; সুতরাং এ কাজের দায়িত্ব অথবা গুরুত্ব সে সময় বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই। বাড়ীতে পিতা মাতার সহিত নানা বিষয়ে আলোচনা করিয়া, এবং নানা বিষয়ে তাঁহাদের উদার মতবাদ শুনিয়া, তাহার কেমন একটা ধারণা হইয়া গিয়াছিল, সাধারণ সংস্কারবদ্ধ নর-নারী হইতে তাহার পিতা-মাতার বহু প্রভেদ আছে।

নিজেকেও সে সম্পূর্ণ সঙ্কীর্ণতা হীন সংস্কারমুক্ত বলিয়াই মনে করিত। সুতরাং সে সময় ইতস্ততঃ করিবার কোন কারণই সে খুঁজিয়া পায় নাই। কিন্তু যে দিন হইতে, বিশ্ব সংসারের, অজস্র ঘৃণা ও গ্লানির বোঝা মাথায় লইয়া নিরাশ্রয়, নিরাবলম্বন, সে বহু উচ্চের আসন হইতে, লাবণ্যর পাশে আসিয়া দাঁড়াইল, সে দিন অতর্কিত অনেকগুলি, কঠোর আঘাতের মধ্যে, সে আরো একটা নূতন তথ্য উপলব্ধি করিল, নিজেও সে সম্পূর্ণ সংস্কারমুক্ত নয়।

লাবণ্যর অসহায়, সম্পূর্ণ নির্ভরশীল, অন্তরকে সে স্নেহ করে, অশ্রদ্ধা করিতে পারে না; অথচ সময়, সময়, তাহার কথা বলিবার বিশেষ সুরটুকু, চলিবার কেমন গতি ভঙ্গিটি, হাসির স্বভাবজাত বক্রতা, তাহাকে, অন্তরে অন্তরে পীড়া দিত। মনে হইত, ইহার মধ্যে কোথায় যেন, অজ্ঞাতে তাহার বিস্মৃতা জননীর অনুকরণ প্রচ্ছন্ন ভাবে লুকাইয়া রহিয়াছে। জয়ন্তর আজন্ম পরিচিত, তাহার মা, জ্যেঠি, পিসি, প্রভৃতির সহিত, কেমন একটা অস্বস্তিকর প্রভেদ ইহার মধ্যে বারে বারে লক্ষিত হইত।

সহরে কয়েক ঘর বাঙালীর, বাস ছিল। আত্মীয় বন্ধুহীন সুদূর প্রবাসে, জয়ন্তর সহিত কিছুদিনের মধ্যেই, তাহাদের আলাপ হইয়া গেল। লাবণ্যর সহিতও মেয়েদের পরিচয় হইতে বিলম্ব হইল না; কিন্তু তাহার স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য ও এতদিনের বাহিরের সম্পর্কহীন আড়ষ্ট ভাবের জন্য পরিচয় তেমন ঘনিষ্ঠ হইতে পারিল না। কচিৎ সে বাহিরে যাইত, এবং দেখা হইলে নিতান্ত ভদ্রতাসূচক কুশল প্রশ্নাদির পর, প্রায়ই আর কথা খুঁজিয়া না পাইয়া চুপ করিয়াই থাকিত। জয়ন্তর সহিত সকলের সহজেই সকলের আলাপ জমিয়া উঠিল। সেদিন বৈকালে স্থানীয় উকিল বীরেশ্বর বাবুর বাড়ীতে আসর বসিয়াছিল

উকিল বাবু লোকটি সরল প্রকৃতির, নিতান্ত সাদাসিধা, ভাল মানুষ গোছের।

নানা বিষয় আলোচনা চলিতেছিল; রাজনৈতিক, সামাজিক সমস্যা, নারী জাগরণ কোনটাই বাদ পড়ে নাই। জয়ন্ত একপাশে চুপচাপ বসিয়া শুনিতেছিল।

নরেশ কহিল—

"আরে রেখে দিন মশায় আপনাদের পতিতা উদ্ধার। আগে নিজেদের উদ্ধার করুন, তারপর বড় বড় কথা বলবেন। একট্রেসদের নিয়ে ঘর সংসার করা. ও বিলেতেই পোষায় আমাদের পোষায় না।"

যতীশ তর্কের সুরে কহিল—

"কেনই বা পোষায় না! কেউ করে না বলেই হয় না নইলে একথা কখন সত্যি নয়, যে তারা আমাদের পাঁচজনের স্ত্রীদের মত স্বাভাবিক ভাবে ঘর সংসার করতে পারে না। আমরা তাদের হীন অবস্থায় ফেলে রেখেছি বলেই না তারা অত ছোট হয়ে গেছে? আর এত যে পতিতা, পতিতা, করে চেঁচাচ্ছেন, তাদের পতিতা করেছে কে শুনি? পতিত পুরুষ যদি স্বামী হয়ে, বাপ হয়ে, থাকতে পারে পতিতা মেয়েরাই বা স্ত্রী হয়ে, মা হয়ে থাকতে পারবে না কেন!"

"স্ত্রী হ'তে পারবে না কি মা হতে পারবে না, সে কথা ত হচ্ছে না, কথা হচ্ছে সে রকম ধরণের বিয়ে আমাদের দেশ চলতে পারে না। ও মুখে বলা বড় সহজ, কাজে করতে গেলেই তখন চক্ষু কপালে! আরে মশাই ও নামটাই খারাপ। পরিচয় নেই, মান নেই, কিছু না। অমন বিয়ে আমাদের দেশে চলতেই পারে না কি বলেন জয়ন্ত বাবু!"

জয়ন্ত ইহাদের তর্কে মনে মনে যথেষ্ট অস্বস্তিবোধ করিতেছিল, এখন নরেশের তাহাকে সাক্ষী মানিতে দেখিয়া অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল। ইহাদের তর্কটা শুধুই তর্ক, চিন্তার কি অভিজ্ঞতার ইহাতে বালাই ছিল না; শব্দ শাস্ত্রে অধিকার থাকিলে উভয় পক্ষেরই জয়ের আশা আছে। সে কথা কহিল না—অল্প একটু হাসিল।

তাহাকে হাসিতে দেখিয়া নরেশ উত্তেজিত হইয়া উঠিল।

বীরেশ্বর বাবু সেই দিকে চাহিয়া উচ্চ হাস্যে কহিলেন—"দেখুন জয়ন্ত বাবু, আপনার মত বুদ্ধিমান লোক কিন্তু আমি আর কখন দেখিনি। আপনি শুধু একটুখানি হেসে দুজনকেই খেপিয়ে দিলেন, অথচ কার কথায় যে সায় দিলেন, বোঝবার জো নেই। নরেশ ভাবছে আমার দিকে, সতীশ ভাবছে আমার দিকে, আর দর্শক দল হতভম্ব হয়ে তিন জনেরই মুখের দিকে বোকার মত চেয়ে আছে!"

জয়ন্ত স্মিতমুখে কহিল—

"কি করি বলুন? ওঁরা যে জিনিষটা নিয়ে নাড়া-চাড়া করছেন, আমার মনে হয় সেটা, তর্কের বিষয় নয় রুচির। আর কোনটা উচিৎ কোনটা অনুচিত, তর্ক করে তার মীমাংসাত হয় না, কেবল উভয় পক্ষের মুঠো, মুঠো, ধুলোতে আর সকলেও অন্ধ হয়ে যায়।"

—"অর্থাৎ আপনি বলতে চান ঐ ধরণের বিয়েটা সমাজে আবশ্যক হয়ে পড়েছে!"

জয়ন্ত একবার নরেশের দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিল তাহার পর শান্তকণ্ঠে কহিল—

"আবশ্যক ত আজকে হয় নি নরেশ বাবু, চিরদিনই হয়েছে; কিন্তু এখনও সময় আসেনি তার; যেদিন সময় হ'বে সেদিন কোন প্রশ্নই উঠবে না।"

—"ঐ ধরণের বিয়ের নিয়ম আমাদের মধ্যে হ'বে?"

—"হবে বই কি; কিন্তু আজকে নয়; এখনও দেরী আছে তার। সেই জন্যেই ত বলছি আপনাদের আজকের তর্ক নিরর্থক; কেন না ওটা রুচির পথ ধরেই সমাজে প্রবেশ করবে তর্কের পথ ধরে নয়। তাই ত মনে হয়, ওতে নিন্দাও নেই প্রশংসাও নেই।"

—"অর্থাৎ আপনি বলতে চান ও কাজটা নিন্দা, প্রশংসার বহু উর্দ্ধে!"

—"না তা ত আমি বলিনি, ওটা নিন্দা, প্রশংসার উর্দ্ধে নয়, সে গণ্ডীর বাইরে।"

—"ভাল, ভাল, জয়ন্ত বাবু। ওহে যতীশ, জয়ন্তবাবু তোমার দিকে আছেন; এই বেলা চটপট একটা বেছে শুনে, শুভ কাজটা করে ফ্যাল, গৃহকর্ত্রীর [illegible] অভিনেত্রীর দুঃখও ঘুচবে।"

—"নিয়মটা ত আমি নিজের জন্তে প্রবর্ত্তন করছি না; তোমরা বরং কর বরযাত্রী যেতে রাজি আছি।"

—"যা' বলেছো, লাখ কথার এক কথা।"

বীরেশ্বর বাবু হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিলেন।

জয়ন্ত অকস্মাৎ উঠিয়া বাহির হইয়া গেল।

১১

শীতের দিনে, সন্ধ্যার পূর্ব্বেই অন্ধকার ঘনাইয়া আসে। পশ্চিমের দূর দিগন্তে, অপরাহ্ণের শেষ আলোক রেখাটি, আকাশের গায়ে, তখনও নিঃশেষে মিলাইয়া যায় নাই। চারিদিক হইতে অতিক্রত অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছিল। জয়ন্ত চলিয়া যাইবার পর, ছয় মাস কাটিয়া গিয়াছে; সে কোথায় আছে, কেমন আছে কোন সংবাদই তাহারা জানে না।

জীবনের সহজ স্বচ্ছন্দ গতির মাঝে অতর্কিতে অভাবনীয় রূপে যে বিপ্লব আসিয়া দেখা দিল নিস্তারিণী তাহাকে আজো সামলাইয়া উঠিতে পারেন নাই; সুজাতা ও ভাবিয়া পায় না এমন অসম্ভব স্বপ্নেরও অগোচর ঘটনা জয়ন্তর দ্বারা ঘটিল কি করিয়া? কেমন সে বালিকা যে মায়ের কোল হইতে এমন করিয়া ছেলেকে কাড়িয়া লইয়া যায়!

ক্রোধে ক্ষোভে অভিমানে সুজাতার দুই চোখ ছাপাইয়া জল ঝরিয়া পড়ে।

সেই অদেখা অচেনা বধূটির সম্বন্ধে তাঁহার সমস্ত মন ঘৃণায় রাগে বিষাইয়া উঠে।

গ্রাম শুদ্ধ ছিঃ ছিঃ করে।

এমন পণ্ডিত জ্ঞানীর ছেলে!

সুরেশ ও সুজাতা ভাবে জয়ন্ত এতবড় নির্লজ্জ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে একবার তাহাদের একটা সংবাদ পর্য্যন্ত দিল না।

তাহাদের পুত্র হইয়া জয়ন্ত এমন কাজ করিল কি করিয়া। কেমন করিয়া সে একটা ঘৃণিতা অজ্ঞাত কুলশীলা নারীকে স্ত্রী বলিয়া পরিচয় দেয়।

এই পুত্রলাভের জন্ত তাঁহারা এত সাধনা করিয়াছিলেন। হায় রে! ইহার চেয়ে পুত্র না জন্মিলেই যে ছিল ভাল। এ গৃহে বাস করা সকলের পক্ষে ক্রমেই দুঃসহ হইয়া উঠিতে ছিল।

নিস্তারিণী কাঁদিয়া কহিলেন,—"আমাকে কাশী পাঠিয়ে দে বাবা।

ওরে এরই জন্তে কি আমি এতদিন সংসার কামড়ে পড়ে ছিলাম।"

দেবতার দেওয়া শোকের সান্ত্বনা আছে—এ ত শুধু শোক নয় ইহার লজ্জা গ্লানিও যে দুস্তর। বাড়ীশুদ্ধ সবাই তাহাকে ভুলিতে চায়; যে এমনি করিয়া তাহাদের বিশ্বের কাছে হাস্যাস্পদ করিয়া তুলিয়াছে।

অথচ পারে না। জয়ন্তর ঘরখানি তালাবন্ধ; এখানে ওখানে ছড়ান তাহার স্মৃতিচিহ্ন মাখা সহস্র ছোট বড় বস্তু যখনি চোখে পড়ে সরাইয়া রাখা হয়, যেন এমনি করিয়াই জয়ন্তর সকল চিহ্ন নিঃশেষে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। কিন্তু মনের নিভৃত কক্ষে যে চঞ্চল প্রসন্ন মূর্ত্তিটি অহরহ উচ্চহাস্যের ঝঙ্কার তুলিয়া কেবলি আসা-যাওয়া করে তাহাকে কোন ক্রমেই দূরে রাখা যায় না।

শূন্যগৃহে তাহার উচ্চকণ্ঠের 'মা' ডাকটি যেন সে চির দিনের মত বন্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছে।

এখনও কতদিন অন্যমনস্কভাবে তরকারী কুটিতে কুটিতে পদশব্দে চকিত হইয়া সুজাতার মনে হয় জয়ন্ত না! মায়ের স্নেহ সে ত দোষগুণ ভাল মন্দের বিচার করিয়া উঠিতে পারে না, যোগ্য অযোগ্যের সীমা রেখা সে কেমন করিয়া করিবে! তবু সংস্কার বাধা দেয়, একটা অজ্ঞাতজন্মা নারীকে, বধূ বলিয়া কাছে টানিতে হাত দুটি সঙ্কুচিত হইয়া আসে।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল, বেশ শীত বোধ হইতেছিল।

সুজাতা নীচে নামিয়া, সুরেশের কক্ষে আলো জ্বলিতে দেখিয়া, সেই ঘরের দুয়ার ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল।

সুরেশ কোচের উপর অর্দ্ধ শয়ান অবস্থায় কিসের হিসাব দেখিতেছিল; পত্নীকে দেখিয়া চশমাটা কপালের উপর তুলিয়া দিল।

সুজাতা আসিয়া কাছে একটা চৌকির উপর চুপ করিয়া বসিল।

খানিকক্ষণ কেহই কথা কহিল না।

এক সময় সুজাতা কহিল—"তোমার এখানকার ব্যবস্থা হয়ে গেছে!"

—"হ্যাঁ প্রায় হয়ে এসেছে।"

সুজাতা অল্পক্ষণ চুপ করিয়া ভাবিল, তাহার পর কহিল—"একবার খোঁজ নিলে না কেন?—"

সুরেশ পত্নীর দিকে চাহিয়া সহসা বাধা দিয়া বিচলিত স্বরে কহিল—"আমাকে সবটা ভেবে নিতে দাও সুজাতা, আমার মাথার মধ্যে সব যেন গোলমাল হয়ে রয়েছে। কিছু এখন বোঝবার শক্তি নেই।"

সুজাতার মাথাটা আপনা হইতেই নত হইয়া আসিল; চোখের কোণে অশ্রুর দুর্দ্দমনীয় আভাস ফুটিয়া উঠিল।

১২

এক দুই করিয়া আপন নিয়মে দিন কাটিয়া যায়; মানুষের সুখ দুঃখ আশা নিরাশার দ্বন্দ্ব তাহার গতিরোধ পারে না, তাই রক্ষা।

জয়ন্তর আচরণ স্বামী স্ত্রীর মধ্যেও একটা বেদনার ব্যবধান তুলিয়া দিয়াছিল।

সুরেশের অসম্ভব গম্ভীর মুখের দিকে চাহিয়া সুজাতা কোন কর্ত্তব্যই স্থির করিতে পারিত না। প্রাণাধিক পুত্রের নির্লজ্জ দুর্ম্মতি সুরেশকে কতখানি বিচলিত করিয়াছে, অথবা কতখানি কঠিন করিয়া তুলিয়াছে সে যেন ঠিক করিতে পারিত না।

দিবা রাত্রির বেশীর ভাগ সময় সুরেশ বাহির বাটীতেই কাটাইত; সুজাতা অথবা নিস্তারিণীর সহিত তাহার অল্প সময় সাক্ষাৎ হইত, এবং সে সময়টা প্রায়ই সে এত বেশী গম্ভীর হইয়া থাকিত, যে কোন কথাই বলা সম্ভব হইত না।

বাহির হইতে দেখিলে, মনে হইত, জয়ন্ত সম্বন্ধে, সুরেশ যেন শেষ মীমাংসা করিয়া লইয়াছে, কিন্তু অর্দ্ধ-রাত্রে; নিভৃত অন্ধকারে, বিনিদ্র নয়নে, সে যখন, অস্থির ভাবে বারান্দাময়, ঘুরিয়া বেড়াইত, তখন তাহাকে দেখিলে, মনে হইত, তাহার এতদিনের, নিতান্ত পরিচিত, স্নেহের জয়ন্তর সহিত, আজিকার বিদ্রোহী, অকৃতজ্ঞ জয়ন্তকে সে কিছুতেই খাপ খাওয়াইতে পারিতেছে না।

সুজাতা মা, তাই জয়ন্তর এত বড় অনাচারকেও ক্ষমা করিতে তাহার বাধিল না; এবং দিনের পর দিন জয়ন্ত সম্বন্ধে তাহার মন যতই কোমল হইতে লাগিল, বধূ সম্বন্ধে আক্রোশ তাহার ততই বাড়িয়া উঠিল। জয়ন্তকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য তাহার মাতৃ-হৃদয় ব্যগ্র বাহু বাড়াইয়া যখনই ছুটিয়া যাইত; অপরিচিতা বধূ আসিয়া পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইত।

জয়ন্তর বধূ, তাহার পুত্রবধূ, একটা অজ্ঞাত কুলশীলা পরিচয়হীনা অস্পৃশ্যা নারী! সুজাতার যেন চীৎকার করিয়া কাঁদিতে ইচ্ছা করিত। কে সে, যে, তাহার জয়ন্তকে এমনি করিয়া ছিনাইয়া লইয়া যায়? বিশ্বসমাজের ঘৃণিতা, একটা ছোট্ট মেয়ের কাছে মাতৃত্বের এত বড় পরাভব ঘটিল। অসহ! সুজাতার অন্তর বাহির যেন চীৎকার করিয়া উঠিত।

সেই জয়ন্ত! কেমন করিয়া সে বলিল, সুজাতার পাশে, নিস্তারিণীর পাশে, সে লাবণ্যকে লইয়া আসিতে চায়! লাবণ্যকে স্থান না দিলে বাধ্য হইয়া জয়ন্তকে অন্যপন্থা অনুসরণ করিতে হইবে, তথাপি, যাহাকে সে, পত্নী বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে, তাহাকে অসহায় অবস্থায় সে ফেলিয়া আসিতে পারে না! পত্নী সম্বন্ধে যাহার এত দায়িত্ববোধ পিতামাতা সম্বন্ধে সে দায়িত্ব তাহার কোথায় ছিল! অকৃতজ্ঞ! অভিমানে সুজাতার দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিত।

আজো সে বুঝিয়া উঠিতে পারে না—লাবণ্যকে তাহারা বধূর আসনে অসঙ্কোচে টানিয়া লইবে, এত বড় ভুল বিশ্বাস জয়ন্ত পোষণ করিল কেমন করিয়া! শুধু কি অন্যায়! অধর্ম্ম যে।

এ যে দেবতার মন্দিরে [illegible]! লাবণ্যকে তাহারা দয়া করিতে পারে, [illegible] পারে, কিন্তু জয়ন্তর বধূ! সে চিন্তার [illegible]!

সুজাতা একলা ঘরে [illegible]

ঠাকুরঝি আসিয়া বসিলেন; একথা সে কথার পর কহিলেন—

—"হ্যা বৌ, এ সব কি শুনছি ভাই!

সত্যি! ও মা কি ঘেন্না! তোমার মত সতীলক্ষ্মী ভাগ্যিমানির পেটে এমন ছেলে জন্মাল। বিশ্বাস আর হয় না কিছুতে! ঘোর কলি, ঘোর কলি, নইলে, এমন সব মাটীর মানুষ তোমরা, সেই বিয়ের কনে থেকে, এত খানি বয়স অবধি দেখলাম, কখন মুখ তুলে যাকে কথা কইতে শুনিনি, তার অদেষ্টে কি না এই ছিল! ওমা ছিঃ ছিঃ কি লজ্জা! কি বলে একটা নাচওয়ালীকে বে করলে?"

সুজাতার মুখে কথা ফুটিল না। সমস্ত দেহ মন যেন আড়ষ্ট হইয়া উঠিল। জয়ন্তকে অপমান করিয়া তাহাদের প্রশংসা! এ যে দেবতাকে নির্ব্বাসন দিয়া, শূন্য মন্দিরকে ভক্তি নিবেদন!

২৩

অপরিসর ছোট্ট শয়ন কক্ষ; আসবাবহীন ঘরখানি ফাঁকা বোধ হয়।

একপাশে মেঝেয় একটি বিছানা; চাদরখানার নানা স্থানে সেলাইর চিহ্ন, দারিদ্র্যের সুস্পষ্ট পরিচয় জ্ঞাপন করিতেছিল; পরিধানের বস্ত্রখানি হইতে গৃহের প্রত্যেকটি আসবাবপত্রেই তাহার কঠোর নিদর্শন ফুটিয়া উঠিয়াছে অথচ তথাপি কোন দিকে চাহিলেই শ্রীহীন মনে হয় না; চারিদিকেই বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কল্যাণ শ্রী রহিয়াছে।

বিছানার একপাশে বালিশ আড়াল দিয়া একটি স্বতন্ত্র ছোট বিছানার সীমা নির্দ্দেশ করিয়া রাখা হইয়াছে। তাহাতে একটি মাস তিন চারের সুন্দর ফুটফুটে একরাশ শুভ্র শিউলী ফুলের মত একটি শিশু ঘুমাইতেছিল; শিয়রে বসিয়া লাবণ্য নিজের গায়ের একটা গরম ব্লাউস কাটিয়া খোকার বর্ত্তমান শীত নিবারণের উপযোগী একটা জামা প্রস্তুত করিতেছিল।

খোকার পাশে জয়ন্ত একখানা বই হাতে করিয়া শুইয়াছিল। রাত্রি নয়টা বাজিয়া গিয়াছে, পৌষমাস; পশ্চিমের দুরন্ত শীতে গায়ে একখানা পুরান ছেঁড়া র‍্যাপার জড়াইয়া এতক্ষণ সূচ চালাইবার পর লাবণ্যর পক্ষে আর বসিয়া থাকা সম্ভব হইল না, সে সব গুলিকে একপাশে ঠেলিয়া রাখিয়া উঠিবার উপক্রম করিতেই জয়ন্ত মুখ ফিরাইয়া চাহিল কহিল—

"হয়ে গেল।"

—"কাল কোরব, বড্ড শীত করছে।"

বলিতে বলিতে লাবণ্য খোকার অন্য পাশে খোকার লেপখানা টানিয়া গলা পর্য্যন্ত মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িল। জয়ন্ত হাতের বইখানা মুড়িয়া শিয়রের পাশে রাখিয়া কহিল—"এই শীতে তোমার ঐ একটি গরম জামা তাও কেটে ফেল্লে; কি করবে! কাল না হয় খানিকটা গরম কাপড় কিনে আনব কি বল?"

লাবণ্য মাথাটাকে লেপের মধ্যে ঢুকাইয়া দিয়া কহিল—

—"টাকা পাবে কোথায়? ধার করে ত!"

আহত কণ্ঠে জয়ন্ত কহিল—

"সে ভাবনা ত তোমার নেই সে আমার, যেখান থেকে হয়।"

লাবণ্য অপ্রতিভ হইয়া পড়িল, কহিল—

"আমি ত তা বলছি না যে আমার ভাবনা, কিন্তু কি হ'বে কাপড় কিনে! আমি ত তোমাকে কতবার বলেছি গরম জামা আমি মোটে পরতে পারি না, কষ্ট হয়।

পরিহাসের সুরে জয়ন্ত কহিল—

—"শীতকালে গরম জামা পরতে কষ্ট হয়, এ কিন্তু আমি কখন শুনিনি! তোমার স্বামী ভক্তি আদর্শ বটে, কষ্ট দেবে না কিছুতেই? যথা লাভ। কিন্তু তোমার শিখলে বল ত?"

জয়ন্ত হাসিয়া উঠিল।

লাবণ্য লজ্জায় আড়ষ্ট হইয়া উঠিল; জয়ন্তর সহজ পরিহাস অকস্মাৎ তাহার ক্ষতের মুখে অজ্ঞাতে তীব্র চাবুকের আঘাত করিল।

সে কোন উত্তর দিল না।

উত্তর না পাইয়া জয়ন্ত বিস্মিত হইল, কিন্তু কোন কিছুই বলিল না।

পরদিন ছুটি, রবিবার।

[illegible] আগমনের আয়োজন সংসারের উপর

ভারটা গুরু হইয়া পড়িয়াছিল। অথচ প্রতিকারের কোন উপায়ই জয়ন্ত খুঁজিয়া পাইল না।

লাবণ্য কি একটা কাজে ঘরে ঢুকিয়া, জয়ন্তকে বিষণ্ণ-মুখে চিন্তিতভাবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া কহিল—"কাল যে তোমায় বীরেশ্বর বাবুর বাড়ী থেকে ডাকতে এসেছিল, গেলে না?"

"না!" বলিয়া জয়ন্ত চুপ করিল, কহিল—"কি হবে গিয়ে?"

—"কি আবার হবে? অমনি করে দিন রাত ভাবলেই কি কিছু হবে? যা' হ'বার তা হ'বেই; কেন মিছে ভেবে যে শরীর মন খারাপ কর জানি না।"

জয়ন্ত মৃদু হাসিল, কহিল,—

"ঠিক বলেছ, বেঁচে থাকতে জীবনটাকে নানা রকম হৈ চৈর মধ্যে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই বোধ হয় বুদ্ধিমানের কাজ; কেন না মরণের পর ভাবনার জন্যে অজস্র সময় পাওয়া যাবে! কিন্তু তবু মাঝে মাঝে ভাবনার ভূতটা ঘাড়ে চাপে। ভবিষ্যতে অক্ষমতার জবাব দিহির ভয় আছে কি না!" বলিয়া জয়ন্ত খোকার দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিল।

লাবণ্য রাগ করিয়া কহিল—"সবাই বুঝি বড় হয়ে অক্ষমতার জবাবদিহীই করে!"

জয়ন্ত আবার হাসিল, কহিল—"না তা করে না, কেন না, তাদের উত্তর আছে কি না! শুধু অক্ষমতা কেন, অমনযোগিতা, দায়িত্ব হীনতা, সব গুলোকেই তারা, পিতৃপুরুষের ঘাড়ে চাপিয়ে সয়ে নেয়। অদৃষ্টের দোষ দেয়। কিন্তু আমাদের ত তা হয় নি; তাই আমাদের বেলায় ও যুক্তি খাটবে না; এ যে দৃষ্ট হয়েই ছিল, অদৃষ্টের দোহাই পাড়তে দেবে কেন?"

—"তুমি কি মনে কর খোকা বড় হয়ে ঐ জবাবদিহিই তোমাকে করবে!"

—"হয়ত করবে না; কিন্তু সত্যিকার মানুষ করতে না পারলে, নিজেকে নিজেই যে আমি ক্ষমা করতে পারব না।"

—"আমাকে বিয়ে করা তোমার অন্যায় হয়েছে?"

—"হয়েছে বই কি। নিজের দিক থেকে নয় কিন্তু ওর দিক থেকে; যদি না ওকে আমি কোন সম্মান দিতে পারি।"

—"তা' সত্যি।" বলিয়া সহসা বিবর্ণ মুখে লাবণ্য বাহির হইয়া গেল।

জয়ন্ত ঝোঁকের মাথায় কথাটা বলিয়া ফেলিয়া অপ্রস্তুত হইয়া পড়িয়াছিল।

অবস্থাটা বুঝাইতেই সে গিয়াছিল; কিন্তু অজ্ঞাতে লাবণ্যকে এমন ভাবে আঘাত করিল; যেটা ফিরিয়া আসিয়া তাহার বুকেও তেমনি ভাবে বিঁধিল।

জয়ন্ত চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

১৪

সমরেশ জয়ন্তকে উপর্য্যুপরি তিন চারিখানা পত্র দিবার পর উত্তর পাইল।

সমরেশ আফিস হইতে ফিরিয়া আসিয়া সন্ধ্যার অন্ধকারে নির্জ্জন কক্ষে শুইয়া সেই কথাই ভাবিতেছিল।

সকাল হইতে অনেকবার সে চিঠিখানা পড়িয়াছে; কি করিবে ভাবিয়া পাইতেছিল না, অথচ জয়ন্তকে এমনি করিয়া দিনের পর দিন নিয়ত কঠোর দারিদ্র্য ও সমাজের সহিত সংগ্রাম করিতে হইবে মনে করিলে ও তাহার মন চঞ্চল হইয়া উঠিতেছিল।

জয়ন্তর পিতামাতার সম্বন্ধে তাহার সমস্ত অন্তর যেন বিষাইয়া উঠিল।

এই তাঁহাদের সন্তান বাৎসল্য, এই তাঁহাদের ঔদার্য্য। এক এক সময় তাহার জয়ন্তর নিকট যাইবার জন্য মন চঞ্চল হইয়া উঠিত কিন্তু সওদাগরী অফিসের অল্প মাহিনার সামান্য কেরাণী সে, ছুটীও নাই, অর্থও নাই।

মাস কাবারে মাহিনা পাইয়া সমরেশের নিজের জন্য কয়েকটা টাকা রাখিয়া খোকার নাম করিয়া জয়ন্তকে পাঠাইয়া দিল। সমরেশ প্রেরিত অর্থ পাইয়া প্রাপ্তী জয়ন্ত বিচলিত হইয়া উঠিল। মনে একটা ধাক্কাও লাগিল। অক্ষমতার বেদনাটা নূতন রূপ ধরিয়া অন্তরের দুয়ারে ঘা দিয়া গেল। মুখে কিন্তু তাহার কোন ভাবই প্রকাশ পাইল না।

সংসারের অনেক রকম ছোট বড় আঘাতের মত এটাকেও সে নিঃশব্দে স্বীকার করিয়া লইল।

কেবল লাবণ্য আসিয়া যখন উজ্জ্বল মুখে কহিল—"সমরেশ ঠাকুরপোর টাকাটা দিয়ে এবার কিন্তু খোকাকে একটা ভাল জামা কিনে দিতে হ'বে, সবটা সংসার খরচে দেওয়া হ'বে না।"

তখন বিস্মিত আহত মুখে জয়ন্ত একবার মাত্র লাবণ্যর দিকে চাহিয়াই মাথাটা নীচু করিয়া লইল।

উত্তর না পাইয়া, লাবণ্য অল্পক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর হঠাৎ কহিল—

"আচ্ছা তুমি বাড়ীতে চিঠি দাও না কেন?"

কণ্ঠস্বরে কৌতূহল ধ্বনিয়া উঠিল। স্বামীর এ দিকটা তাহার কাছে এতই অজ্ঞাত ছিল যে, সে সম্বন্ধে তাহার কৌতূহলের সীমা ছিল না।

পিতা মাতা সম্বন্ধে নিজের মনে তাহার কোন প্রকার স্পষ্ট ধারণাও ছিল না; জন্মাবধি এদিকটা তাহার অসাড়ই ছিল।

পত্নীর কথায় জয়ন্ত আশ্চর্য্য হইয়া মুখ তুলিল—"কাকে?"

—"বাড়ীতে। কেন লেখ না! এখন ও কি তাঁরা তোমার ওপর রাগ করে আছেন? লিখবে?"

—"না।"

—"কি না! লিখবে না তাই! না রাগ করে সেই তাই? কিন্তু লিখেই দেখ না, নিশ্চয় তোমাকে তাঁরা সাহায্য করবেন।"

জয়ন্তর মুখে কে যেন কালি ঢালিয়া দিল; বিরক্তির স্বরে জয়ন্ত কহিল—"কি বকছ লাবণ্য!"

—"তুমি খোকার জন্ত ভাব আর তাঁরা তোমার জন্তে ভাববেন না! এরকম মেয়ের আমি মানে বুঝতে পারি না।" রাগ করিয়া লাবণ্য কহিল।

মুহূর্ত্তের জন্ত জয়ন্ত চঞ্চল হইয়াই স্তব্ধ হইয়া গেল।

—"সে তুমি বুঝতে পারবেও না।"

জয়ন্ত মুখ ফিরাইয়া লইল।

১৮

কি একটা ব্রত উপলক্ষ্যে বিশ্বেশ্বর বাবুর বৃদ্ধা জননী ব্রাহ্মণ ভোজনের আয়োজন করিয়াছিলেন।

জয়ন্ত ব্রাহ্মণ সুতরাং তাহাকেও নিমন্ত্রণ করা হইল। নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া পর্য্যন্ত জয়ন্ত কিছুতেই নিজের কর্ত্তব্য স্থির করিতে পারিতেছিল না।

নিজের তাহার কোন প্রকার সংস্কার ছিল না, লাবণ্যকে বিবাহ করিয়া ধর্ম্মের দিক দিয়া সে কোন প্রকার অন্যায় করিয়াছে একথা সে নিজের মনে কোনদিন স্বীকার করে নাই; তথাপি পূর্ণ সংস্কার সম্পন্না, সমাজের প্রতি ছোট বড় অনুষ্ঠানে একান্ত শ্রদ্ধাশীলা, নিষ্ঠাবতী বিধবার; বীরেশ্বর বাবুর বৃদ্ধা জননীর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে তাঁহার সঙ্কোচ বোধ হইতেছিল।

জয়ন্তর সম্পূর্ণ পরিচয় তাঁহারা জানেন না। সে ব্রাহ্মণ সন্তান, সুতরাং নিজেও সে ব্রাহ্মণ, এমন অবস্থায় তাহার পত্নী সম্বন্ধে তাঁহাদের অকস্মাৎ সংশয়ের হেতু ছিল না; সেই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়াই তাঁহারা তাহাদের নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। লাবণ্যর যথার্থ পরিচয় পাইলে তাঁহারা এ বিড়ম্বনা করিতেন না।

এবং যেদিন জয়ন্তর সত্য পরিচয় প্রকাশ হইয়া পড়িবে সেদিন তাঁহারা জয়ন্তর আচরণে শুধু ঘৃণাই প্রকাশ করিবেন না, নিজেদের অজ্ঞাতে একটা ধর্ম্ম অনুষ্ঠানে তাহাকে আহ্বান করিয়া দেবতার নিকট, নিজেদের অপরাধী মনে করিয়া সন্ত্রস্তও হইয়া পড়িবেন।

সুতরাং সমাজের ছোট বড়, সকল বিধি নিষেধ সম্বন্ধে তাহার নিজের মনে কোন প্রকার শ্রদ্ধা না থাকা সত্বেও, অপরের আজন্মের শ্রদ্ধাকে আঘাত করিতে তাহার হাত উঠিল না। অথচ কোন উপায়ে সহজে এই ব্যাপারটাকে পাশ কাটাইয়া যাওয়া যায়, জয়ন্ত বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। প্রথমটা, সে বীরেশ্বর বাবুকে আপত্তির সুরে বলিয়াছিল—"আমি ব্রাহ্মণ হ'তে পারি কিন্তু আপনাদের হিন্দু সমাজের সমস্ত খুঁটিনাটি ব্যাপার ত আমি মেনে চলি না; কাজেই এরকম অনুষ্ঠানে আমাকে আপনাদের বাদ দেওয়াই উচিত।

বীরেশ্বর বাবু খানিকটা উচ্চ কণ্ঠে হাসিয়া কহিলেন—"আরে কি যে বলেন মশাই তার ঠিক নেই। আজকাল-কার দিনে কে আর কটা জিনিস মেনে চলে বলুন? মুর্গির ঝোল মোছলমানের হাতের জল দুদিন ব্রাহ্মসমাজে ঘোরা এই ত? সে আর কে না করেছে বলুন? আমরা বাইরে থাকি কোনটাই ত মানি না, তাই বলে কি যার যা জাত তা মারা যায়! ঘরে আমাদের ব্রাহ্মণীরা এত বেশী মানেন যাতে আমাদের সব পাপ কেটে যায় বুঝলেন না? শাস্ত্রে বলে পত্নী অর্দ্ধাঙ্গিনী, অর্দ্ধ অঙ্গ শুদ্ধ থাকলে অন্য অর্দ্ধকে অশুদ্ধ করে কার সাধ্যি? আপনি যাই করুন আপনার ব্রাহ্মণীটি সে দোষ ঠিক কাটিয়ে দিয়েছেন।"

জয়ন্তর সমস্ত মুখখানা আরক্ত হইয়া উঠিল।

ঢোক গিলিয়া কহিল—

"কিন্তু আমি আপনাদের ও সব কোন সংস্কারই মানি না। আর ধরুন আমি ত সেদিন এখানে এসেছি, আপনারা কেউ আমাকে ঠিক জানেন না, আমি ব্রাহ্ম কি ক্রিশ্চান ও ত হ'তে পারে।"

অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া পরিহাসের সুরে বীরেশ্বর বাবু কহিলেন—

—"তা হ'লেন ত হলেন, আপনার ব্রাহ্মণীটীত খাঁটি হিন্দু আমরা তাঁকেই নিয়ে আসব।'

জয়ন্ত ব্যাপারটাকে যতখানি গুরুতর ভাবিয়াছিল, লাবণ্যর কিন্তু কিছুই মনে হয় নাই, তাই জয়ন্ত যখন আসিয়া কহিল—

—"আমাদের যাওয়া উচিত হবে না।"

লাবণ্য কথা কহিল না, অতর্কিত আঘাতটাকে সামলাইয়া লইবার জন্য মুখ ফিরাইয়া লইল। জয়ন্ত একবার লাবণ্যর আহত মুখের দিকে চাহিয়া; আস্তে আস্তে মাথা নীচু করিয়া বাহির হইয়া গেল।

১৬

জয়ন্তর কথাবার্ত্তা ব্যবহারে এমনি একটা স্বাভাবিক আলগা ভাব ফুটিয়া উঠিত, যাহার জন্য সে তাঁহার নিমন্ত্রণ গ্রহণ না করায় বীরেশ্বরবাবু বিশেষ বিস্মিত হইলেন না; তবু মনে একটু দুঃখ বোধ হইল। কিন্তু জয়ন্ত সেদিনের পর আর যখন তাঁহাদের গৃহে আসিয়া সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত করিল না, তখন তাঁহার বিস্ময় উত্তরোত্তর বাড়িয়া গেল।

কয়েকদিন অপেক্ষা করিয়া একদিন ভোরে তিনি জয়ন্তর গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

কয়েকবার ডাকাডাকি করিতেই দ্বার খুলিয়া গেল ভিতর হইতে জয়ন্ত আহ্বান করিল—

—"এই যে এই ঘরে আসুন আসুন।"

কক্ষে প্রবেশ করিয়া বীরেশ্বরবাবু একবার চারিদিকে চাহিয়া লইয়া আসন গ্রহণ করিয়া কহিলেন—

"বাঃ বাঃ আপনি ত খুব লোক যাহোক, নিজেও গেলেন না আর কারুকেও যেতে দিলেন না, বাড়ী ছেড়ে কোথায় উধাও, ডাকতে এসে ফিরে যেতে হ'ল, তার পর আর দেখাই নেই। আপনার চেহারাটা বড্ড শুখনো দেখাচ্ছে, অসুখ করেছে নাকি?"

জয়ন্ত দুই তিনটা বালিশের উপর ভর দিয়া সোজা হইয়া আধশোয়া ভাবে বসিয়াছিল। বীরেশ্বরবাবুর কথার উত্তরে কহিল—

"যেতে পারলাম না কিছুতেই আমায় মাপ করবেন। পরদিনই যাব ভেবেছিলাম কিন্তু হঠাৎ শরীর এত খারাপ হ'য়ে পড়েছে অফিস যেতে পারিনি। আফিসের ছুটির জন্যে একটা খবর দেওয়া দরকার ছিল তাও লোক পাইনি।"

জয়ন্ত চিন্তিত মুখে চুপ করিল।

বীরেশ্বরবাবু ব্যস্ত হইয়া কহিলেন—

"তাই নাকি, কি হয়েছে, চিকিৎসা ত করাচ্ছেন না বোধ হয়? আমাদের অন্ততঃ একটা খবর দেওয়া আপনাদের উচিত ছিল। অফিসের জন্যে ব্যস্ত হ'বেন না সে আমি খবর পাঠিয়ে দেব। কিন্তু কি হয়েছে সেইটে আগে বলুন ত?"

জয়ন্ত শুষ্ক মুখে একটুখানি ম্লান হাসিয়া কহিল—

"কি হয়েছে সেত জানিনা তবে কিছু যে একটা হয়েছে সেটা বুঝতে পারছি। চিকিৎসার [illegible] তাই পরীক্ষা করা যাচ্ছে, এমনি শুয়ে শুয়ে [illegible]

—"পাগল নাকি, না না [illegible]

না আপনার চেহারা এমনি বিশ্রী হয়ে গেছে মনে হ'চ্ছে যেন কতদিনের রোগী। যাহোক কিছু একটা ব্যবস্থা করুন।"

—"হ্যাঁ ব্যবস্থা একটা করতেই হ'বে, কিন্তু চিকিৎসার ব্যবস্থাটা পরে করলেও চলবে, অফিসের ব্যবস্থা আগে করুন, নইলে তাঁরা অনাহারের ব্যবস্থাটা করে বসে থাকবেন।"

এমন অবস্থায়ও জয়ন্তর পরিহাস স্পৃহা দেখিয়া বীরেশ্বরবাবু একবার অবাক হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিলেন।

বীরেশ্বরবাবু চলিয়া যাইবার পর লাবণ্য আসিয়া জয়ন্তর পাশে বসিল।

উদ্বিগ্ন মুখে স্বামীর দিকে চাহিয়া সে কহিল—

"দেখ আমার কিন্তু ভয় করছে এ রকম করে, তুমি কাউকে একটা খবর দাও।

জয়ন্ত চোখ বুজিয়া কহিল—

"কাকে?"

…"বাড়ীতে। না, না আমি শুনব না, অর্থাভাবে তোমার চিকিৎসা হ'বে না?"

—"তাদের সঙ্গে আমার অর্থের সম্বন্ধ ছিল না লাবণ্য।"

অভিমানে লাবণ্যর দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিল, কহিল—"তবে তুমি একলাই দেশে ফিরে যাও।"

জয়ন্তর মুখখানা নিমেষে বিবর্ণ হইয়া গেল; চোখ মেলিয়া আহত কণ্ঠে কহিল—

"তুমি এ কথা বলছ! আমি কোন দিন ভাবিনি আমাকে তুমি এতখানি ছোট করে ভাবতে পার!"

৬

—"হ্যাঁ বৌ, তা আমার ফিরবে কবে?"

কৈবল্য ঠাকুরঝি, আসিয়া দাঁড়াইলেন।

সুজাতা তাড়াতাড়ি মেঝের একখানা মাদুর পাতিয়া দিল—"বোস ঠাকুরঝি। কি জানি করে ফিরবে ভাই।"

ঠাকুরঝি, বসিলেন; সমবেদনার সুরে কহিলেন—"তাই বটে; কি যে কখন ঘটে যায়! নইলে কে এমন জানত বল? তা হ্যাঁ বৌ ছেলে তোমার কি বলে গা? খোঁজ খবর কিছু নিইছিলে? ছেলে মানুষ বয়সের দোষে একটা অন্যায় করে ফেলেছে বলেই কি সেটা ধরে রাখতে হয়। খুব ত হ'ল, আর কেন এবার ফিরিয়ে নিয়ে একটা পেরাশ্চিত্তির করিয়ে দাও চুকে যাক! পুরুষ মানুষ অমন কত কি-ই করে থাকে!"

সুজাতার মুখের উপর আশার চকিত শিখা নিমেষে জ্বলিয়াই মিলাইয়া গেল। কহিল—

"সে হয় না ভাই"—

—"নাও, শোন একবার কথা! হয় না-ই বা কেন, যত সব অনাছিষ্টি!"

একথা সে কথার পর কৈবল্য ঠাকুরঝি উঠিয়া গেলেন। সুজাতাও বাহির হইল।

ঠাকুর ঘরের চৌকাঠে নিস্তারিণী বসিয়াছিলেন, সুজাতা আসিয়া পাশে বসিল।

সুরেশ বহির্বাটী হইতে অন্দরে প্রবেশ করিল;—"তবে কাশী যাবারই ঠিক করি মা!"

—হ্যাঁ বাবা; আর কেন! সংসারে আর তিষ্ঠুতে পারছি না যেন!"

সুরেশ আবার ফিরিয়া গেল।

ঘরের মধ্যে পদাচারণ করিতে করিতে কেবলি মনে হইতে লাগিল—'তাহার পর!'

মনের মধ্যে আজো ত শেষ মীমাংসা হইল না।

সন্ধ্যার সময় সুরেশ বাহির হইবার উপক্রম করিতেছিল—সুজাতা আসিয়া কক্ষে প্রবেশ করিল। কহিল—"বেরুচ্ছ?"

—"হ্যাঁ। কেন?"

—"কাশী যাবার ত সব ঠিক করলে"—মধ্য পথে

থামিয়া গিয়া সুজাতা চোখের জল সামলাইয়া লইল; পরে কহিল—"যাবার আগে তার একটা খবর নাও।"

—কিন্তু তারপর ?"

—"তুমি কি!" অকস্মাৎ সুজাতা উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিয়া উঠিল। কহিল—"একবারও কি তার কথা তোমার মনে হয় না? কাশী আমি যাব না।"

বিচলিত স্বরে সুরেশ কহিল—"তুমি বুঝতে পারবে না; আমি যে আজো ঠিক করতে পারিনি কিছু"—

চাকর একটা টেলিগ্রাম লইয়া আসিল। সুরেশ বিস্মিত হইল; শঙ্কিত হইল।

তাড়াতাড়ি সই করিয়া আলোকের সম্মুখে সরিয়া আসিয়া দ্রুত হস্তে খাম ছিঁড়িয়া কাগজখানা মেলিয়া ধরিল; লেখা ছিল—'বৃহস্পতিবার ভোরে হার্টফেল করিয়া জয়ন্তর মৃত্যু হইয়াছে। নীচে নাম সই সমরেশ চৌধুরী।

সুজাতা শঙ্কিত স্বরে ব্যগ্র কণ্ঠে কহিল—"কার টেলিগ্রাম গো! কে করেছে?"

সুরেশ উত্তর দিল না, অর্থহীন শূন্য দৃষ্টিতে পত্নীর দিকে চাহিয়া রহিল।

হুমায়ুন কবির উপহার

সিন্ধু কারা

অনন্ত আকাশ উর্দ্ধে, অনন্ত সাগর পদতলে।
শব্দহীন নীরবতা চারিদিকে মেলিয়াছে জাল।
রজনীতে শশীহীন নভোতলে তারাদীপ জ্বলে।
পূর্ব্ব গগনের সূর্য্য পশ্চিমে লুকায় রক্তভাল।
অন্তহীন কাল ধরি' তারি মাঝে চলিয়াছি যেন,
কবে যাত্রা করেছিনু আজি যেন নাহি আর মনে,
অনন্ত কল্লোলবাহী নীল সিন্ধু সফেদ সফেন,
চেতনা আচ্ছন্ন করে দিবানিশি স্বপ্নে জাগরণে।

তারি মাঝে ক্ষণে ক্ষণে মনে পড়ে কার হাসিখানি
ক্লিষ্ট, ক্লান্ত, সকরুণ, কারে যেন আসিয়াছি ফেলি,
কে যেন রয়েছে বসি' অন্তরে বহিয়া দীপ্তবাণী,
নিমেষে সকল হিয়া ওঠে মম ব্যথায় উদ্বেলি'।
স্বপ্ন পরপারে যেন লক্ষ্মী মম রহিয়াছে বসি'
তিমির সমুদ্র মাঝে দিবানিশি উঠিছে উচ্ছ্বসি'।

বিদায়

আসন্ন বিদায় ক্ষণ অস্বীকার করিবারে আর
উপায় র'লনা কোন। নিশ্চিত জানিনু চিত্তমাঝে
চঞ্চল তরণী ভরি' রজ্জুতে রজ্জুতে এবে বাজে
যাত্রার আভাস ধ্বনি—বিদায়ের অশ্রু হাহাকার।
রৌদ্র ধৌত নভোতলে দাঁড়াইয়া হেরিলাম দূরে
ক্ষীণ হয়ে আসে তট—ক্ষীণতর নরনারীদল
যতক্ষণ দেখা যায় থাকে চাহি নিস্পন্দ নিশ্চল।
উজ্জ্বল আলোক কাঁপে চিত্ত ভরি বিরহের সুরে।

অসহায় বেদনায় দূর হ'তে রিক্ত আঁখি মেলি'
আমি শুধু চেয়ে থাকি। শুধু দেখি তুমি উদাসীন
নয়ন মেলিয়া সখি কুসুম অলস করতলে
নীরবে দাঁড়ায়ে আছ। নীল সিন্ধু উঠিল উদ্বেলি'
নিষ্ঠুর বিদ্রূপ ভরে। দেখিলাম অশ্রু বাষ্প জলে
ম্লান মুখ ছবি তব দূরান্তরে হয়ে এল লীন।

সোহ্‌নী-সিহ্‌ওয়াল

(রোমান্স)

শ্রীপূর্ণশশী দেবী

[শ্রীমতী পূর্ণশশীর নাম আধুনিক পাঠক-পাঠিকাদের অজ্ঞাত নহে। শুধু গল্পে নহে, উপন্যাসেও ইঁহার বেশ খ্যাতি আছে। বহুদিন হয় ইনি উত্তর পশ্চিম প্রদেশ প্রবাসিনী। ওই দেশেরই চলতি জনপ্রিয় একটি রোমান্সের সুন্দর বাংলা রূপ তিনি এই গল্পে দিয়েছেন।]

সোহ্‌নী-সিহ্‌ওয়ালের প্রণয় কাহিনী—পঞ্জাব প্রদেশের একটী প্রসিদ্ধ রোম্যান্স।

এই তরুণ-তরুণী দুটীর আত্মবিসর্জ্জি প্রেম লইয়া পঞ্জাবের কবিরা বহু কবিতা ও গান রচনা করিয়াছেন, গানগুলি এ অঞ্চলে বিশেষতঃ পাতিয়ালা রাজ্যে খুবই প্রচলিত, সে দেশের ভিখারীদের মুখেও সদাসর্ব্বদা শুনা যায়—সোহনী-সিহওয়ালের প্রেম-গীতি—

রাত আঁধেরি, ঘুমন্ ঘেরি
সওর্জা ঠাট্‌ঠা মারে,
ও কি জানে হাল সাভা
তো বস্‌দা নদী কিনারে—ইত্যাদি।

এই গানগুলির অশ্লীল ও নীরস অংশ বর্জ্জন করিয়া ক্রমশঃ অনুবাদ করিবার ইচ্ছা আছে, কিন্তু তৎপূর্ব্বে নায়ক-নায়িকার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া আবশ্যক মনে করিতেছি।

সোহনীর পিতা তুল্লা গিল্‌গে—পঞ্জাব-গুজরাটের একজন অবস্থাপন্ন কুম্ভকার। সোহনী কুম্ভকার কন্যা হইলেও অসাধারণ রূপসী ছিল। সিহওয়ালের প্রকৃত নাম ইজ্জৎ বেগ, পিতা মির্জ্জা আলি বলখ—বোখারার একজন ধনী সওদাগর ও স্বনাম প্রসিদ্ধ লোক ছিলেন। ইনি বহুদিন অপুত্রক থাকিয়া শেষে এক গিরিকন্দরবাসী সিদ্ধ ফকিরের বরে স্কন্দোপম কান্তিমান সিহওয়ালকে পুত্ররূপে লাভ করেন।

সিহওয়াল বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রূপে গুণে অনুপম হইয়া উঠিল। তার রূপে পথের পথিকও ফিরিয়া চায়, গুণে শত্রুও মুগ্ধ হয়। পিতা মাতা তাদের আরাধনার ধন নয়নের মণিটীকে সর্ব্বদা চক্ষে চক্ষে রাখেন, একদণ্ড কাছ ছাড়া করেন না। পুত্রের কোনো আব্‌দারই তাঁরা অপূর্ণ রাখেন না।

সিহওয়াল যখন বিংশতি বর্ষীয় তরুণ যুবক, তখন বন্ধুদের মুখে দিল্লী সহরের শোভা ও সমৃদ্ধির বর্ণনা শুনিয়া তাহার দিল্লী দেখিতে সাধ হইল। স্নেহ প্রাণ পিতা পুত্রের ইচ্ছায় বাধা দিতে পারিলেন না, যথেষ্ট পরিমাণে পাথেয় এবং পাত্র-মিত্র সঙ্গে দিয়া তিনি সিহওয়ালের বিদেশ যাত্রার আয়োজন করিয়া দিলেন।

সেকালে সাজাহান ছিলেন দিল্লীর সম্রাট। সিহওয়াল সম্রাটকে মহার্ঘ্য উপঢৌকন দানে তুষ্ট করিয়া কিছুদিন রাজভবনে অতিথি হইয়াছিল! তাহার পর দিল্লী হইতে স্বদেশ প্রত্যাগমন কালে—পথে কয়েকদিন বিশ্রাম লইবার জন্য গুজরাট সহরে চিনাব নদীতীরে তাহাদের শিবির পড়িল।

গুজরাট অবস্থান কালে তুল্লা কুম্ভকারের রূপসী কিশোরী কন্যা সোহনীর অসামান্য রূপের খ্যাতি সিহ-ওয়ালের কাণেও গেল। তাহার এক বন্ধু সেই রূপের প্রতিমাকে একদিন স্বচক্ষে দেখিয়া আসিল এবং সিহ-ওয়ালের কাছে সোহনীর অপরূপ রূপের বর্ণনা করিয়া তাহাকে একান্ত লুব্ধ আকৃষ্ট করিয়া তুলিল।

মুগ্ধ সিহওয়াল এখন কোনো না কোনো ছলে তুল্লার দোকানে নিত্যই গিয়া রূপসী সোহনীকে দেখিয়া নয়ন ও অন্তরাত্মা তৃপ্ত করিতে প্রয়াস পায়। যত দেখে, দেখার পিপাসা যেন ততই প্রবল হইয়া উঠে। কিশোরী সোহনীও সেই কন্দর্প কান্তি তরুণ যুবকের প্রতি প্রথম দর্শনেই আকৃষ্ট হইল, তাহাকে প্রাণ মন দিয়া ভালবাসিয়া ফেলিল, বড় গভীর ভাবে।

তাহাদের এই চক্ষের দেখাতেও বাধা পড়িল। পিতার নির্ব্বন্ধাতিশয্যে সিহওয়ালকে অচিরে গুজরাট ত্যাগ করিয়া স্বদেশে ফিরিতে হইল। কিন্তু সেই দূর-দূরান্তরে আসিয়া, পিতামাতা প্রিয়পরিজনের অশেষ স্নেহাদর ও

সুখৈশ্বর্য্যের মধ্যে থাকিয়াও ধনীপুত্র সিহওয়াল সেই গুজরাটবাসিনী সুন্দরী সোহনীর অনুপম রূপরাশি মুহূর্ত্তের জন্যও ভুলিতে পারিল না।

সোহনীর স্মৃতি সোহনীর অদর্শনের বেদনা—তাহাকে অহর্নিশি এতই ব্যথিত, পীড়িত করিয়া তুলিল, যে, সিহ-ওয়াল শেষে অধৈর্য্য হইয়া একদিন গোপনে একাকী গৃহ ত্যাগ করিয়া গুজরাটে চলিল।

সেখানে আসিয়া ছদ্মনামে, ছদ্মবেশে সেই ধনীর দুলাল তুল্লা কুম্ভকারের গৃহে বিনাবেতনে দাসত্ব গ্রহণ করিল, শুধু তা'র চিত্তহারিণী, মোহিনী সোহিনীর মধুর সঙ্গ সুখ কামনায়,—কামনা পূর্ণ হইল।

অবাধ ঘনিষ্ঠতার সুযোগ পাইয়া—সেই তরুণ তরুণীর —অন্তরের প্রেমকোরক—বসন্তানিল স্পর্শে গোলাপ কলির মত ধীরে ধীরে বিকশিত হইয়া উঠিল। কিন্তু তাহাদের এই প্রণয় কাহিনী গোপন রহিল না, নিন্দুকের মুখে অবিলম্বে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল।

মাতা কন্যাকে ভর্ৎসনা করিলেন—কুলকলঙ্কিনী বলিয়া গালি দিলেন। পিতা কথাটা সহসা বিশ্বাস করিতে পারিলেন না, তাঁহার স্নেহের চক্ষে সোহনি তখনও সরলা অবোধ বালিকা মাত্র। কিন্তু এ ভুল শীঘ্রই ভাঙ্গিয়া গেল।

একদিন সন্ধ্যাকালে তুল্লা নমাজ পড়িতেছিলেন, তখন সিহওয়ালের বাজার হইতে ফিরিবার সময়, তাই প্রিয়-সন্দর্শন ব্যাকুলা সোহনি দিক-বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া উপাসনা রত পিতার সম্মুখ হইতেই ছুটিয়া যাইতেছিল। উপাসনায় বিঘ্নপ্রাপ্ত হইয়া তুল্লা কন্যাকে তিরস্কার করিলেন, আত্মবিস্মৃত সোহনি তখন পিতার মুখের উপরই বলিয়া বসিল—যে ভগবানের সৃষ্ট একজন জীবের জন্য আমি এতদূর আত্মহারা—তুমি সেই ভগবানের আরাধনা করছ বাবা, কিন্তু তোমার আরাধনায় আমার মত তন্ময়তা নাই, তোমার এ পূজা মিথ্যা।

মনের অধীর ব্যাকুলতার কথাটা পিতৃসকাশে হঠাৎ বলিয়া ফেলিয়া—সোহনী লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া ত্রস্তে পলাইয়া গেল। তুল্লা সেদিন বুঝিতে পারিলেন জনরব মিথ্যা নহে, তাঁহার আদরিণী দুহিতা অজ্ঞাত কুলশীল সিহওয়ালকে বাস্তবিক ভালবাসিয়াছে। কিন্তু এ মিলন তো সম্ভবপর নয়।

তাই সকলে যুক্তি করিয়া সিহওয়ালকে চাকরী হইতে জবাব দিলেন। তার পর সোহনীর বিবাহ তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে সেই গুজরাটবাসী একটী কুম্ভকার যুবকের সহিত দেওয়া হইল।

কিন্তু স্বামীর আলয়ে আসিয়াও সোহনী সিহওয়ালকে ভুলিতে পারিল না এক দণ্ডের জন্য। সিহওয়ালও সোহনীর আশা ত্যাগ করিতে না পারিয়া গুজরাটেই রহিয়া গেল। নির্জ্জন নদীতীরে কুটীর বাঁধিয়া সে ফকির বেশে বাস করিতে লাগিল। এই সময় সিহওয়ালের পিতা নিরুদ্দিষ্ট পুত্রের সন্ধান পাইয়া তাহাকে ফিরাইয়া লইয়া যাইতে আসিলেন, কিন্তু সিহওয়াল আর ফিরিল না, বলিল "আমি ভগবানের আরাধনায় এ জীবন সমর্পণ করিয়াছি, গৃহ-ধর্ম্মে আমার স্পৃহা নাই।"

পুত্রকে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ দেখিয়া পিতা হতাশ হইয়া স্বদেশে ফিরিয়া গেলেন। কিন্তু সিহওয়াল ফকির হইলেও ভগবৎ চিন্তায় মন দিতে পারিল না, তার বিরহী চিত্ত সোহনীর প্রেমে, সোহনীর ধ্যানে আত্মহারা তন্ময়।

সোহনীকে একবারটি চোখের দেখা দেখিবার জন্য সিহওয়াল এতই ব্যাকুল অধীর হইয়া উঠিল, যে একদিন রাত্রে, বর্ষায় ভরা নদী সাঁতার দিয়া পার হইয়া সোহনীর সহিত দেখা করিল। কিন্তু সোহনীর স্বামীগৃহে তাহাদের মিলন সম্ভবপর নয়, তাই সোহনি একাকিনী গভীর নিশুতি রাতে একটী মৃৎকলসীর সাহায্যে নদী পার হইয়া সিহওয়ালের কুটীরে মিলিত হইত।

মাছ সোহিনীর প্রিয় খাদ্য, তাই ফকির সিহওয়াল ভজন সাধন সব ভুলিয়া সারাদিন নদীতে মাছ ধরিত, এবং সেই মাছ প্রিয়তমার জন্য সযত্নে রাঁধিয়া রাখিত।

এইরূপে প্রেমের সুমোহন রঙ্গিন স্বপ্নে আবিষ্ট মুগ্ধ তরুণ-তরুণীর দিনগুলি যেন স্বপ্নের মতই কাটিতেছিল, সে স্বপ্ন একদিন অতর্কিতে ভাঙ্গিয়া গেল বড় নির্ম্মম ভাবে।

সোহনির ননদিনী লালি, সে সিহওয়ালকে দেখিয়াছিল, এবং তার রূপ যৌবনে মুগ্ধ হইয়াছিল। [illegible] সহিত সিহওয়ালের গোপন প্রণয় ব্যাপারও [illegible]

ছিল না। সোহনির নৈশঅভিসারযাত্রা জানিতে পারিয়া ঈর্ষাবশে লালি একদিন রাত্রে চুপি চুপি সোহনির নদীতীরে লুকাইয়া রাখা মৃৎকলসীটী ভাঙ্গিয়া ফেলিল, এবং একটী কাঁচা মাটীর কলসী রাখিয়া আসিল সোহনির অজ্ঞাতে।

সেদিন ভয়ঙ্কর দুর্যোগ। ঝড়, বৃষ্টি, নদীতে তুফান উঠিয়াছে। সিহওয়ালের দিবসব্যাপী চেষ্টা-যত্ন নিষ্ফল হইল, নদীতে একটীও মাছ মিলিল না। অবশেষে হতাশ হইয়া প্রেমিক সিহওয়াল নিজের পায়ের গোছ হইতে একটুকরা মাংস কাটিয়া মাছের অভাব পূর্ণ করিল, এবং অধীর আগ্রহে নদীতীরে গিয়া সোহনির প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

তার ব্যাকুলচিত্ত তখন আশঙ্কায় উদ্বেগে সেই দুর্যোগ সংক্ষুব্ধ নদীর মতই আলোড়িত হইতেছিল। এই বিষম ঝড়-তুফানের মধ্যে যদি সোহনি না আসিতে পারে, কিম্বা মিলনপণ রক্ষা করিতে আসিয়া সে যদি আজ এই ক্ষিপ্ত নদী স্রোতে——

ক্ষণে ক্ষণে শিহরিয়া উঠিয়া সিহওয়াল যুক্ত করে ভগবানের চরণে প্রিয়তমার কল্যাণ কামনা করিতেছিল।

রাত্রি গভীর হইয়া গেল। ঝড় বৃষ্টির তখনও বিরাম নাই।

নিদ্রাহারা, উৎকণ্ঠিতা, সোহনি শয্যাত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিল। আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিল উঃ! কি দুর্যোগ! কি গভীর অন্ধকার! সেই তমিস্রারজনীর নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে সোহনি যেন তার ঘনায়মান মৃত্যুর হাতছানি দেখিতে পাইল, অন্তরে অন্তরে শিহরিয়া সে থমকিয়া দাঁড়াইল।

পরক্ষণেই প্রিয়তম সিহওয়ালের হতাশ ক্ষুব্ধ মুখখানি স্মরণ করিয়া সে মনে মনে বলিল—এই যে ঝড়-বৃষ্টি-তুফান, এক তা'র প্রিয় মিলন আকাঙ্ক্ষার প্রবল গতি-রোধ করিতে পারিবে?—না! এই দুর্যোগ চকিতা নিশীথিনীর সীমাহারা দিশাহারা অন্ধকার, পাগলা ঝড়ের তাণ্ডব নৃত্য,—এই ক্ষণে ক্ষণে গর্জ্জনকারী বিদ্যুত স্ফুরিত ঘন ঘোর মেঘের ঘটা, এই অবিরাম বর্ষণশীল বাদল অশ্রুধারা সমস্ত বিশ্ববাসীকে ভীত ত্রস্ত করিতে পারে, কিন্তু সোহনির বালিকা বয়সের এই পবিত্র একনিষ্ঠ ভালবাসাকে এতটুকু বিচলিত করিতে পারিবে না।

আজ যাই হোক, ঝড়-বৃষ্টি-তুফানে পৃথিবী ভাসিয়া যাক্, প্রবল ভূমিকম্পে পাহাড় পর্য্যন্ত চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাক্ প্রচণ্ড বজ্রাঘাতে সৃষ্টি রসাতলে যাক্, তবু সোহনি তা'র প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিবে, সে তার প্রাণপ্রিয় সিহওয়ালের সঙ্গে মিলিত হইবে।

সোহনি বাহির হইয়া পড়িল।

সেই সূচিভেদ্য নিবিড় অন্ধকার, যে সাক্ষাৎ মৃত্যু দূতের মত জনহীন পথে করাল মুখ ব্যাদন করিয়াছিল,সেই তীব্রচকিত চপলা চমকাইয়া যে আলেয়ার আলোর মত ক্ষণে ক্ষণে ঝলসিয়া উঠিয়া ভীতি বিহ্বলা প্রিয় মিলন ব্যাকুলা বালিকাকে সশঙ্কিত ত্রস্ত করিয়া তুলিতেছিল, সেই প্রলয়ঙ্করী দুর্যোগ রজনীর, ভীষণ ভ্রূকুটী, সেই হৃৎ-কম্পকারী গভীর মেঘগর্জ্জন, তার প্রিয় সম্মিলন যাত্রায় বাধা দিতে পারিল না। হতভাগিনীর সেই শেষ অভিসার যাত্রা।

ঝড়-ঝঞ্ঝা মাথায় করিয়া—সোহনি নদীকূলে উপনীত হইল। চন্দ্র তারাহীন নিকষকালো আকাশের দিকে চাহিয়া সে করযোড়ে কাতরস্বরে বলিল—হে ভগবান! তুমি অন্তর্যামী, শুধু তুমিই জানো, সোহনির প্রেম কত পবিত্র নিষ্কলুষ, তার এ একনিষ্ঠ, আত্মবিসর্জ্জী প্রেমের তুমিই একমাত্র সাক্ষী, আজ মরণের মুখে—তুমিই তার সহায় হও।"

পর মুহূর্ত্তে প্রেম বিহ্বলা সরলা বালিকা তার ননদিনীর রাখা কাঁচা মৃৎ কলসীটী তুলিয়া লইয়া সেই তুফান স্ফীত, আলোড়িত নদীবক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

জলে ভিজিয়া কলসীটী গলিতে আরম্ভ করিল, তখন সোহনি ননদিনীর ষড়যন্ত্রের বিষয় জানিতে পারিল। কিন্তু তখন আর ফিরিবার উপায় ছিল না, থাকিলেও সোহনি ফিরিতে পারিত না। সে তখন প্রিয়তমের আশায় অতিমাত্র ব্যাকুল, অধীর, ভালবাসায় অন্ধ।

তুফানে সংক্ষুব্ধ উত্তাল তরঙ্গরাশির সহিত প্রাণপণে যুঝিতে যুঝিতে সোহনি সাঁতার দিয়া চলিল, কিন্তু মাঝ নদীতে আসিয়া তার দুর্ব্বল বাহুর সকল শক্তি নিঃশেষিত হইল। সে হাবুডুবু খাইতে লাগিল।

তারপর?—আর কয়েক সকরুণ আর্ত্তস্বরে প্রিয়তম সিহওয়ালের নাম উচ্চারণ করিয়া অভাগিনী সোহনির কণ্ঠস্বর নীরব স্তব্ধ হইয়া গেল চিরদিনের মত। তার ক্ষুদ্র জীবন বুদ্বুদটুকু সেই তুফান সংক্ষুব্ধ তমসা ঘন অতল বারিরাশির তলে চিরতরে বিলীন হইয়া গেল।

প্রেম পাগলিনী বালিকার সেই শোচনীয় নিদারুণ মরণ ক্ষণে অন্তরীক্ষ হইতে কে যেন গভীর উদাত্তস্বরে বলিয়া উঠিল—আয় সোহনি! সুন্দর সোহনি! আমার কাছে আয়! এই দুঃখ-ব্যথা-সন্তাপহীন চির শান্তিময় প্রেমের রাজ্যে আয়! পাপ পৃথিবী তোর যোগ্য স্থান নয়।"

নদীতীরে প্রতীক্ষমান, উৎকণ্ঠিত, উৎকর্ণ সিহওয়ালের কাণে সোহনির অস্ফুট আর্ত্ত আহ্বানধ্বনি যাইবামাত্র সে মজ্জমানা প্রিয়তমাকে আসন্ন মৃত্যুর কবল হইতে ছিনাইয়া লইতে সেই মুহূর্ত্তে নদীবক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িল—আর উঠিল না।

পরদিন ধীবররা মাছ ধরিতে আসিয়া নদীগর্ভ হইতে সোহনি ও সিহওয়ালের নিবিড় দৃঢ় আলিঙ্গনাবদ্ধ মৃতদেহ উদ্ধার করিল। এবং সোহনির পিতাকে সংবাদ দিল। সোহনি সিহওয়ালের কবর গুজরাতে অদ্যাপি বর্ত্তমান। সে দেশের অধিবাসীরা এই প্রণয়ী যুগলকে ঈশ্বরের অবতার স্বরূপ মনে করিয়া আজও পূজা করিয়া থাকে।

বাংলা দেশ

(প্যারডি)

শ্রীসৌরেশচন্দ্র চৌধুরী

কোন্ দেশেতে মানুষগুলো
সকল দেশের চাইতে কুঁড়ে?
কোন্ দেশেতে নিত্য নূতন
গজায় নেতা মাটী ফুঁড়ে?
কোথায় রাঙা মাকাল ফলে,
আকাশ কুসুম ফুটেরে?
সে আমাদের বাংলা দেশ,
আমাদেরই বাংলারে!

কোথায় দিনে শেয়াল ডাকে,
ঘুঘু ভিটেয় ভিটেয় চরে?
কোথায় জলে শেওলা পানা
ব্যাধির বীচন সৃজন করে?
কোথায় হাজার দুধের বাছা
আঁতুড় ঘরেই মরে রে?
সে আমাদের বাংলা দেশ,
আমাদেরই বাংলারে!

কোন্ দেশেতে জুজুর স্মরণ,
জাগায় প্রাণে মরণ-ভীতি?
কোথায় গেলে শুনতে পাব
সবহারাদের কাতর-গীতি?
হুজুকপ্রিয় বক্তাগণের
কণ্ঠ কোথায় বাজেরে?
সে আমাদের বাংলা দেশ
আমাদেরই বাংলারে!

কোন্ দেশের দুর্দ্দশায় মোরা
ব'সে থাকি নির্ব্বিকার?
কোন্ দেশের গৌরবের পথে
চলাই মোদের হয় রে ভার?
মোদের পিতৃ পিতামহের
আত্মা কোথায় কাঁদেরে?
সে আমাদের বাংলা দেশ,
আমাদেরই বাংলারে!

ইতর-ভদ্র

গল্প

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এল

[শ্রীযুক্ত শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় খুব বেশী গল্প না লিখিলেও অল্প লিখিয়াই বেশ নাম করিয়াছেন। সরল ভাষায়, নিজস্ব ষ্টাইলে বেশ একটু গল্পের প্লট সৃষ্টি করিয়া ইনি তাহাতে সবল সতেজ পুরুষ চরিত্র ও সুন্দর দৃঢ় নারী চরিত্র মনোজ্ঞ করিয়া আঁকিয়া পাঠক পাঠিকার চিত্ত হরণ করেন। ইতর-ভদ্রেও তেমনি প্লট ও তেমনি নর নারী চিত্র দেখিবেন।]

রাত্রি প্রায় এগারটার সময় রসা রোডে প্রফেসার সরকারের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া সমরেশ বাসায় ফিরিতেছিল। অনেকটা পথ যাইতে হইবে, তাহার বাসা মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটে, কিন্তু এত রাত্রে ট্রাম ও বাসের যাতায়াত কমিয়া আসিয়াছিল; তবু কোনো একটা বাহন পাইবার আশায় সমরেশ ক্লান্তভাবে চৌরঙ্গীর রাস্তা দিয়া চলিয়াছিল।

পাশ দিয়া ছুটা খালি বাস চলিয়া গেল, একটা শূন্য ট্যাক্সির চালক সতৃষ্ণভাবে তাহার দিকে তাকাইতে তাকাইতে ধীরগতিতে বাহির হইয়া গেল। সমরেশ লক্ষ্য করিল না।

এইরূপ অসামান্য অমনোযোগের কারণ, আজ তাহার জীবনে ঘৃণা হইয়া গিয়াছিল। সে অত্যন্ত হতাশ ভাবে এই কথাটাই তোলাপাড়া করিতে করিতে চলিয়াছিল, যে, সে ভদ্রলোক নয় এবং কোনো কালেই ভদ্রলোক হইতে পারিবে না। সুতরাং তাহার পক্ষে বাঁচিয়া থাকা না থাকা দুই সমান।

বাপের পয়সা থাকিলেই যে ভদ্রলোক হওয়া যায় না একথা কে না জানে? প্রকৃত ভদ্রলোক হইতে হইলে আরো কতকগুলি সদ্‌গুণের আবশ্যক। বিলাতী মতে জেণ্টল্‌ম্যান্ বলিতে কতকগুলা সদাচারের সমষ্টি বুঝায়, আমাদের দেশীশাস্ত্রেও আচার বিনয় বিদ্যা প্রভৃতি শব্দের দ্বারা শিষ্টতার একটা আদর্শ খাড়া করা হইয়াছে। সমরেশ বিবেচনা করিয়া দেখিল, সেরূপ গুণ তাহার একটিও নাই। বস্তুতঃ সে যে ভদ্রলোক নয়, এ সন্দেহ তাহার বহুপূর্ব্বেই জন্মিয়াছিল কিন্তু আজ তাহা একেবারে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে।

প্রথমতঃ সে স্ত্রীলোকের সঙ্গে সহজ ভাবে কথা কহিতে পারে না কেন? অন্য স্ত্রীলোকের সঙ্গে যদি বা পারে, সুষমাকে দেখিলেই তাহার বাক্‌রোধ হইবার উপক্রম হয় কেন? তাহার বুদ্ধি আছে, বুদ্ধি না থাকিলে কেহ বি-এ পরীক্ষায় দর্শনশাস্ত্রে অনার্স লইয়া প্রথম স্থান অধিকার করিতে পারে না। তবু সুষমার সঙ্গে কথা কহিবার একটা দূর সম্ভাবনা উদয় হইবামাত্র তাহার বাহেন্দ্রিয়গুলা এবং সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধি-সুদ্ধি অমন জড়ত্ব প্রাপ্ত হয় কেন?

দ্বিতীয় কথা, ভূপেন নামধারী তাহার যে একজন সহপাঠী আছে, যাহার সহিত গত চার বৎসর যাবৎ সে বিদ্যার ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া আসিতেছে, তাহাকে দেখিবামাত্র আজকাল তাহার মাথায় খুন চড়িয়া যায় কেন? ভূপেন অত্যন্ত মিশুক এবং স্ত্রী-পুরুষনির্ব্বিশেষে সকলের সঙ্গে স্বচ্ছন্দে কথা কহিতে পারে; কিন্তু তাই বলিয়া তাহাকে মুখ খারাপ করিয়া গালি দিবার প্রবৃত্তি কোন ভদ্রলোকের হইয়া থাকে?

তৃতীয় কথাটা আজ প্রফেসার সরকারের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ খাইতে গিয়া অত্যন্ত রূঢ় এবং লজ্জাকর ভাবে প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে,—তাহা এই যে, সমরেশ শিক্ষিত ভদ্রসমাজে বিচরণ করিবার মত শিষ্টাচার ও আদব-কায়দা কিছুই জানে না। ইহার পর নিজেকে ভদ্রলোক বলিয়া পরের কাছে ঘোষণা করা দূরের কথা, নিজের কাছে স্বীকার করাও সমরেশের পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে।

নিজের সামাজিক চালচলন নিরপেক্ষভাবে অন্যের সহিত তুলনা করিয়া বিচার করিবার উপযুক্ত অন্তর্দৃষ্টি অনেকেরই থাকে না; সমরেশের সেটা ছিল। তাই সে

আজ নিঃসংশয়ে বুঝিতে পারিয়াছে যে, সে, ভদ্রলোক নয়। কিন্তু ও কথাটা অনেকবার বলা হইয়া গিয়াছে।

এই সূত্রে কিন্তু একটা কথা আজ সমরেশের কিছুতেই মনে পড়িল না ; মনে পড়িলে তাহার মন নিশ্চয় অনেকটা পরিষ্কার হইয়া যাইত। বছর দুয়েক আগে তাহার কলেজের জনৈক সাহেব প্রফেসার অন্যান্য কয়েকটি ভাল ছেলের সঙ্গে তাহাকেও ডিনারে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। খাইতে গিয়া সমরেশ দেখিল। টেবিলের উপর ডিনার পরিবেশণ হইয়াছে এবং ছুরি কাঁটা দিয়া খাইবার ব্যবস্থা। তাহা দেখিয়া সে বলিয়াছিল,—স্যার, ছুরি-কাঁটা চালাতে ত জানিনা, খাব কেমন করে ?

পাদ্রী প্রফেসার হাসিয়া বলিয়াছিলেন,—যেমন করে খেয়ে থাকো তেমনি করে খাবে ; ভগবান তোমাকে অতগুলো আঙুল দিয়েছেন কি জন্যে ?

সমরেশ মাথা নাড়িয়া বলিয়াছিল,—না স্যার তা হতে পারে না, ছুরি-কাঁটা দিয়েই খাব। আপনারা কিন্তু হাস্‌তে পাবেন না।

সেদিন সমরেশ ছুরিকাঁটা দিয়াই খাইয়াছিল এবং তাহার খাইবার ভঙ্গী দেখিয়া প্রফেসার সাহেব ও অন্যান্য ক্রিশ্চান ছেলেরা খুব হাসিয়াছিল। কিন্তু সমরেশ তিলমাত্র লজ্জা বা ক্ষোভ অনুভব করে নাই বরং নিজেও হাসিয়া বলিয়াছিল,—প্রথমবারেই কি হয়। আবার নিমন্ত্রণ করে দেখ্‌বেন, স্যার, টেব্‌ল্‌-ম্যানার্স সব দুরস্ত হয়ে গেছে।

যাঁহারা এতদূর পর্য্যন্ত ধৈর্য্য ধরিয়া পড়িয়াছেন তাঁহারা নিশ্চয় অধীর হইয়া ভাবিতেছেন—কথাটা কি ?

কথাটা সেই পুরাতন কথা। পৃথিবীতে যখন ভদ্রলোক বলিয়া কোনো জীবের বাস ছিল না তখন এ কাহিনীর আরম্ভ হইয়াছিল, এবং ঐ জীবটী পৃথিবী হইতে যখন মরিয়া নিঃশেষ হইয়া যাইবে তখনো এ কাহিনীর সমাপ্তি হইবে না।

কিন্তু একেবারে আদিম কাল হইতে না হোক ব্যাপরটা আর একটু আগে হইতে বলা দরকার।

সমরেশ কলিকাতার ছেলে নয়, তাহার বাপ বাঙলা দেশেরই কোনো একটা বড় সহরের একজন বিখ্যাত ডাক্তার। সমরেশ যখন সম্মানের সহিত প্রবেশিকা উত্তীর্ণ হইল তখন তিনি তাহাকে কলিকাতায় একটা বাসা করিয়া দিয়া কলেজে ভর্ত্তি করিয়া দিয়া গেলেন। সমরেশ একাকী বাসায় থাকিয়া গভীর মনঃসংযোগে পড়াশুনা আরম্ভ করিয়া দিল এবং নিয়মিত কলেজ যাইতে লাগিল।

আই-এ পরীক্ষায় সমরেশ বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিল। যে ছেলেটি ফার্ষ্ট হইল তাহার নাম ভূপেন ঘোষ। ভূপেনকে সমরেশ কখনো চোখে দেখে নাই—ভূপেন অন্য কলেজের ছাত্র,—কিন্তু আগামীবারে তাহাকে পরাস্ত করিবার জন্য সে সুরু হইতেই উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গেল।

বি-এ পরীক্ষায় সমরেশ ফার্ষ্ট হইল, ভূপেন দ্বিতীয় স্থান পাইল। তারপর এম-এ পড়িবার সময় দুইজনে একই কলেজে নাম লিখাইল। দু'জনের একই বিষয়,—এক্সপেরিমেণ্টাল্‌, সাইকলজি। প্রথম কিছুদিন দুজনে একটু দূরে দূরে রহিল, তারপর সামান্য একটু আলাপ হইল। ভূপেন অত্যন্ত সৌখীন ও মার্জ্জিত ভাবের ছোকরা কিন্তু সে-ই যাচিয়া আলাপ করিল,—আপনার সঙ্গে আলাপ হওয়া সৌভাগ্য বলে মনে করি।'

সমরেশ হাসিয়া উত্তর করিল,—'সেটা উভয়তঃ। গোড়া থেকে যাঁর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছে তাঁকে জানবার ইচ্ছা হওয়া স্বাভাবিক। এ ভালই হল আমাদের দ্বন্দ্বের ক্ষেত্র ক্রমেই সঙ্কীর্ণ হয়ে আস্‌ছে। এবার কিন্তু আপনার পালা।'

ভূপেন বলিল,—'এ দ্বন্দ্বে আমার দিক থেকে কোনো গ্লানি নেই, আছে শুধু প্রতিযোগিতার উদ্দীপনা।'

সমরেশ বলিল,—'এ পক্ষেও তাই পরাজয়ে অপমান নেই কিন্তু জিতলে আনন্দ আছে।'

পরিচয় কিন্তু ইহার বেশী অগ্রসর হইতে পাইল না। হঠাৎ একদিন মেয়েলি হাতের একটি ক্ষুদ্র কাঁচি ইহাদের মধ্যেকার ক্ষীণ যোগসূত্রটিকে কাটিয়া দ্বিখণ্ড করিয়া দিল।

সুষমা প্রফেসার সরকারের ভাগিনেয়ী—বয়স [illegible] বৎসর। সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতার মত [illegible] সে জুতামোজা পরে, একাকিনী পথ দিয়া [illegible]

যায় এবং প্রয়োজন হইলেই অল্প দেশী চালে কথাবার্ত্তা বলে। কিন্তু তবু তাহাকে দেখিয়া মনে হয় সে সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতা। অন্ততঃ সমরেশ আজ পর্য্যন্ত তাহার অন্য উপমা খুঁজিয়া পায় নাই। সে কালো কি ফর্সা, সুন্দরী কি মাঝারি, ব্লণ্ড কি ব্রুনেট এ সব কথা ভাবিয়া দেখিবার বেচারা অবসর পায় নাই। এ বিষয়ে বিশ্লেষণ শক্তি প্রস্ফুটিত হইবার পূর্ব্বেই মুকুলেই ঝরিয়া গিয়াছিল।

সুষমা আই-এ পাশ করিয়া বেথুন কলেজে থার্ড ইয়ারে পড়িতেছে; সে হপ্তার মধ্যে দুতিন দিন মামার লেকচার শুনিতে আসিত, প্রফেসার সরকার অনুমতি দিয়াছিলেন। মামার ক্লাশে ছাত্রের সংখ্যা খুবই কম, গুটি সাত-আটের বেশী নয়। তাহাদেরই মধ্যে একটু তফাতে বসিয়া সুষমা একাগ্রমনে মামার উপদেশ শুনিত এবং ঘণ্টা বাজিলে কোনোদিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতার মত উঠিয়া চলিয়া যাইত। দোতলা হইতে সিঁড়ি দিয়া দ্রুত লঘুপদে নামিয়া ফুটপাথের উপর কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিত, পথে খালি ট্যাক্সি দেখিলে সেই ট্যাক্সিতে চড়িয়া বাড়ী যাইত। তাহার বাড়ী সহরের উত্তর দিকে, বোধ হয় হাতিবাগান অঞ্চলে। ক্লাশের একটি ছাত্র বিশেষ করিয়া তাহা লক্ষ্য করিয়াছিল।

মনস্তত্ব ক্লাশের ছাত্রদের মধ্যে অকস্মাৎ এই মেয়েটির অকুণ্ঠিত আগমনে এমন একটি মনস্তত্বের সৃষ্টি হইল যাহা প্রফেসার সরকারের জ্ঞানগর্ভ লেক্‌চারের বিষয়ীভূত নয়।

ভূপেনের সহিত মেয়েটির বোধ হয় পূর্ব্বে হইতেই পরিচয় ছিল। কারণ, সমরেশ লক্ষ্য করিল, প্রথম দিন সুষমা ক্লাশে পদার্পণ করিতেই ভূপেন তাহার দিকে চাহিয়া একটু হাসিয়া ঘাড় নাড়িল। সুষমাও মৃদু হাসিয়া তাহার প্রত্যুত্তর দিল। অপরিচিত যুবকের মুখের দিকে চাহিয়া কোনো ভদ্রমহিলাই হাসে না। সুতরাং সমরেশের অনুমান যে অভ্রান্ত তাহাতে সন্দেহ নাই।

কিন্তু আলাপ যে খুব ঘনীভূত নয় তাহা বুঝিয়া সমরেশ অনেকটা স্বস্তি অনুভব করিল। প্রফেসার ক্লাশে আসিবার পূর্ব্বে কখনো কখনো ভূপেন গায়ে পড়িয়া মেয়েটির সঙ্গে আলাপ করিবার চেষ্টা করিত; কিন্তু আলাপ 'কেমন আছেন' 'ভাল আছি'র বেশী কোনদিনই অগ্রসর হইত না, হয় প্রফেসার আসিয়া পড়িতেন নয় সুষমা পাঠ্যপুস্তকে মনোনিবেশ করিত। সমরেশ দূর হইতে তাহাদের কথার মৃদুগুঞ্জন উৎকর্ণ হইয়া শুনিত এবং মনে মনে অত্যন্ত অসহিষ্ণু হইয়া উঠিত।

এইভাবে মাসদুই কাটিবার পর একদিন বেলা তিনটার সময় একটা ব্যাপার ঘটিল। ব্যাপার এমন কিছু গুরুতর নয় কিন্তু স্নায়ুমণ্ডলীর অন্ধ প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে প্রফেসার সরকার যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহার এমন চমৎকার দৃষ্টান্ত বড় একটা চোখে পড়ে না।

একটা ক্লাশ শেষ হইয়া গিয়াছে, দ্বিতীয় ক্লাশের প্রতীক্ষায় সমরেশ দোতলার সিঁড়ির ঠিক নীচেই অন্যমনস্ক ভাবে পায়চারি করিতেছিল। সুষমা মামার সহিত কি একটা কথা কহিবার পর অভ্যাসমত দ্রুতপদে সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিয়া আসিতেছিল হঠাৎ সিঁড়ির শেষ ধাপে আসিয়া তাহার পা পিছলাইয়া গেল। সে হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া যাইতেছিল, আত্মরক্ষার চিন্তাহীন তাড়নায় সম্মুখস্থ সমরেশের গলা জড়াইয়া ধরিল। হঠাৎ অতর্কিতভাবে আক্রান্ত হইয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় সমরেশ কাঠের খোঁটার মত শক্ত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল এবং একটিও বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতে পারিল না।

দারুণ লজ্জায় সমরেশের গলা ছাড়িয়া দিতেই সুষমা আবার পড়িয়া যাইবার উপক্রম করিল। মাথার মধ্যে বুদ্ধি নামক যে একটি পদার্থ আছে তাহা সমরেশের সম্পূর্ণ বিস্মরণ হইয়াছিল, তবু সে না বুঝিয়া সুঝিয়াই সুষমার একখানা হাত টানিয়া ধরিয়া রহিল।

ক্লিষ্ট হাসিয়া সুষমা বলিল,—'পা মচ্‌কে গেছে।'

সমরেশ নির্ব্বাক হইয়া রহিল, বিস্ময়ের চিহ্ন ভিন্ন তাহার মুখে আর কিছুই প্রকাশ পাইল না।

এমন সময় ভূপেন কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া বলিল— 'এ কি! পড়ে গেছেন নাকি? দেখি দেখি, তাইত! অ্যাঙ্কল্ স্প্রেন হয়েছে দেখছি! এরি মধ্যে ফুলে উঠেছে। নিন্, আমার কাঁধে ভর দিয়ে দাঁড়ান, এখন লজ্জা করবার সময় নয়।—মিত্তির, একটা ট্যাক্সি।'

মিত্তির, অর্থাৎ সমরেশ বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত চমকিয়া উঠিয়া ট্যাক্সি ডাকিতে ছুটিল।

ট্যাক্সি আসিলে সুষমা খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে ভূপেনের স্কন্ধে ভর দিয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। ভূপেনও তাহার পিছন পিছন গাড়ীতে গিয়া উঠিল, চালককে বলিল,—"চালাও হাতীবাগান, জল্‌দি।'

সুষমা আপত্তি করিয়া বলিল,—'আপনার যাবার দরকার নেই—'

ভূপেন বলিল,—'বিলক্ষণ! আপনি গাড়ী থেকে নামবেন কি করে?'

পায়ের যন্ত্রণায় সুষমার মুখ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছিল, কথা কাটাকাটি করিবার তাহার শক্তি ছিল না, সে সমরেশের দিকে ফিরিয়া হাসিবার একটা চেষ্টা করিয়া বলিল,—'ধন্যবাদ সমরেশ বাবু' বলিয়া দুই করতল একবার যুক্ত করিল।

প্রত্যুত্তরে সমরেশের মুখ দিয়া কেবল বাহির হইল—'না, না, না'—কিন্তু তখন ট্যাক্সি চলিয়া গিয়াছে।

সমরেশ ফুটপাথে দাঁড়াইয়া রহিল, মিনিট খানেক পরে তাহার স্মরণ হইল যে সুষমার নমস্কারের প্রতিনমস্কার করা হয় নাই।

সেদিন আর ক্লাশ করা হইল না। বাড়ী ফিরিবার পথে সমস্ত ব্যাপারটাকে তন্ন তন্ন করিয়া বিশ্লেষণ করিয়া সমরেশ তাহার মধ্যে নিজের গৌরবসূচক একটা ঘটনাও খুঁজিয়া পাইল না এবং অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়া মনে মনে সিদ্ধান্ত করিল যে সে এখনো ভদ্রলোক হইতে পারে নাই। কোন্ সময় কি বলা এবং কি করা উচিত ছিল, তাহার একটা জীবন্ত অভিনয় তাহার মনের চিত্রপটের উপর খেলিয়া গেল। কিন্তু তখন আর উপায় নাই। তিথি অনুকূল ছিল বটে কিন্তু শুভলগ্ন অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে।

রাত্রে বিছানায় শুইয়া, সমরেশের কল্পনার রঙ্গমঞ্চে এই ক্ষুদ্র ঘটনাটির বহুবার পুনরভিনয় হইয়া গেল। এবং এই অভিনয়ে সে এমন বাগ্মিতা ও প্রত্যুৎপন্নমতি দেখাইল, সুষমার প্রতি কথার এমন সুন্দর ও সরস উত্তর দিল যে সে নিজেই বিস্মিত হইয়া ভাবিতে লাগিল, এমন চমৎকার ভাবে কথা কহিবার বুদ্ধি যখন তাহার আছে তখন কাজের বেলায় শুধু না না না ছাড়া আর কিছুই সে বলিতে পারিল না কেন?

আর একটা কথা, হতভাগা ভূপেনটা ঠিক সেই সময় কোথা হইতে আসিয়া জুটিল! সে অমন অতর্কিতে আসিয়া পড়িয়া নির্লজ্জভাবে বাক্যচ্ছটা বিস্তার না করিলে ত সমরেশ এমন হতবুদ্ধি হইয়া পড়িত না। ভূপেন যেন ইচ্ছা করিয়া তাহাকে অপদস্থ করিবার জন্যই এমনটা করিয়াছে। আর ট্যাক্সিতে চড়িয়া সুষমার সঙ্গে যাইবার কি দরকার ছিল? গাড়ী হইতে সুষমা নামিতে পারুক না পারুক ভূপেনের কি? অসভ্য বর্ব্বর কোথাকার!

সমরেশ নিজে ভদ্রলোক না হইতে পারে কিন্তু ভূপেনটা যে তাহার চেয়ে ছোটলোক, উপরন্তু নির্লজ্জ এবং বেয়াদব তাহাতে সমরেশের সন্দেহ রহিল না।

তবু এইরূপ আত্মগ্লানি ও বিদ্বেষের মধ্যে দুটি জিনিষ তাহার মনে শেষরাত্রির সুখস্বপ্নের মত জড়াইয়া রহিল। একটি, সুষমা তাহার নাম জানে, নিশ্চয় মামার নিকট তাহার বিষয় শুনিয়াছে। দ্বিতীয়,—নিজের কণ্ঠদেশে সুষমার ভয়ব্যাকুল বাহুর নিবিড় বন্ধনের স্পর্শানুভূতি।

ইহার পর একমাস সুষমা আসিল না। পায়ের জন্যই আসিতে পারিতেছে না তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রফেসার সরকারকে সচ্ছন্দে সুষমার কুশলপ্রশ্ন করা যাইতে পারিত। কিন্তু তিনি মুখে কিছু না বলুন মনে মনেও ত ভাবিতে পারেন,—সুষমার জন্য তোমার এত দুশ্চিন্তা কেন হে বাপু? এই লজ্জায় সমরেশ তাঁহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না।

কিন্তু ভূপেন যে সুষমা সম্বন্ধে সংবাদ রাখে তাহা সে বুঝিয়াছিল। কোন্ অতীন্দ্রিয় শক্তির প্রভাবে বুঝিয়াছিল বলা যায় না; কিন্তু নিঃসংশয়ে বুঝিয়াছিল। সুতরাং ভূপেনকে জিজ্ঞাসা করিলেই সুষমার খবর পাওয়া যাইবে তাহাও একপ্রকার স্বতঃসিদ্ধ। কিন্তু তবু সমরেশ ভূপেনকে প্রশ্ন করিল না, ভূপেনের মারফতে সুষমার কুশল জানিবার হীনতা সে ঘৃণার সহিত বর্জ্জন করিল। উপরন্তু ভূপেনের সহিত পূর্ব্বে যা দু'একটা কথা হইত তাহাও বন্ধ হইয়া গেল।

কিন্তু সর্ব্বদা আত্মবিশ্লেষণ করা যাহার অভ্যাসের মধ্যে দাঁড়াইয়াছে তাহার পক্ষে মনকে চোখ ঠারা চলে না। ভূপেনের প্রতি বিদ্বেষের মূলে যে [illegible]

সত্যকার অপরাধ নাই বরঞ্চ নিজের অক্ষমতাই নিহিত আছে, এই নিগূঢ় সত্যটি গোপন কাঁটার মত নিরন্তর সমরেশের বুকের মধ্যে খচ খচ্ করিতে লাগিল।

পা ভাল হইবার পর সুষমা যেদিন প্রথম কলেজে আসিল সেদিন সমরেশ দোতলার বারান্দায় দাঁড়াইয়া ছিল, সুষমা সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া আসিয়া সম্মুখেই সমরেশকে দেখিয়া সহাস্যমুখে তাহার দিকে অগ্রসর হইয়া গেল। দুটি হাত একত্র করিয়া একটি নমস্কার করিয়া বলিল,—'একমাস আসতে পারিনি—আপনারা নিশ্চয় খুব এগিয়ে গেছেন। এখন আপনাদের নাগাল পাওয়া কি আমার পক্ষে সম্ভব হবে সমরেশ বাবু?'

সমরেশ একেবারেই তৈয়ার ছিল না, তাহার কাণ দুটা লাল হইয়া অসম্ভব রকম ঝাঁ ঝাঁ করিতে লাগিল। এবং তালু হইতে কণ্ঠ পর্য্যন্ত শুকাইয়া কাঠ হইয়া গেল।

সুষমা বলিল,—'আপনার নোটগুলো আমায় একবার দেখাবেন, যতটা পারি টুকে নেব। মামার ত লেখা নোট নেই—মুখে মুখে যা ডিক্‌টেট্ করেন।'

সমরেশ ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল, তারপর একবার কাশিয়া ভগ্নস্বরে কহিল,—'আপনার পা—আপনার পায়ের—'

সুষমা যেন শুনিতে পায় নাই এমনিভাবে বলিল,—'নোটগুলো দেবেন, কৃপণতা করবেন না যেন।' বলিয়া প্রস্থানোদ্যতা হইল।

সমরেশ পুনরায় ঘাড় নাড়িয়া বলিল,—এবার গলার স্বর অনেকটা সাফ্ হইয়াছে,—'আপনার পা এখন বেশ—এই পর্য্যন্ত বলিয়াই হঠাৎ একেবারে মূক হইয়া গেল। সুষমার মুখের উপর লজ্জার যে অরুণাভা ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিতেছিল তাহার কারণটা সহসা বিদ্যুৎচমকের মত বিকশিত হইয়া যেন তাহার মস্তিষ্ককে পুড়াইয়া দিয়া গেল। পা-মচকানোর সঙ্গে এমন একটা দৈবাৎকৃত লজ্জাকর ঘটনা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে গ্রথিত হইয়া আছে যাহার ইঙ্গিত পর্য্যন্ত সুষমার পক্ষে মস্ত সঙ্কোচের কারণ হইতে পারে, তাহা আচম্বিতে স্মরণ করিয়া সমরেশের জিহ্বা একেবারে আড়ষ্ট হইয়া গেল। সুষমা চলিয়া যাইবার পর সে বারম্বার নিজের মস্তকের উপর অশনি-সম্পাত কামনা করিতে করিতে ভাবিতে লাগিল, এত বড় গাধা গরু গবেশের মত প্রশ্ন সে করিতে গেল কেন? তাছাড়া স্ত্রীলোকের পায়ের সম্বন্ধে কোনোপ্রকার কৌতূহলই যে ঘোর অশ্লীলতা!

ক্লাশ শেষ হইবার পর সুষমার সহিত সমরেশের আবার চোখাচোখি হইল। সুষমা আবার হাসিমুখে বলিল,—'সমরেশ বাবু, ভুলবেন না যেন। কাল ত আমি আসব না, পরশু যেন খাতাগুলো পাই।'

সমরেশ অতিমাত্রায় লাল হইয়া উঠিয়া বলিল,—'আচ্ছা—নিশ্চয়! সে আর আপনাকে—তা বেশ ত, কালই আমি—

ভূপেন আসিয়া তাহাদের মধ্যে যোগ দিয়া বলিল,—'কোন্ খাতার কথা বলছেন? ও, নোটের খাতা। তা সেজন্যে আপনি ভাববেন না। আপনার জন্যে বিশেষ করে আমি আর এক কপি তৈরী করে রেখেছি, আজই সন্ধ্যাবেলা আপনার বাড়ীতে পৌঁছে দেব।'

সুষমা কৃতজ্ঞস্বরে বলিল,—'ধন্যবাদ ভূপেনবাবু।' তারপর কুণ্ঠিতভাবে সমরেশের দিকে তাকাইয়া বলিল,—'কিন্তু সমরেশবাবু—'

ভূপেন বাধা দিয়া বলিল,—'ওঁর ভালই হ'ল। নিজের কপিটা আপনাকে দিলে ওর পড়াশুনোর হয়ত ব্যাঘাত হ'ত।—চলুন, আপনার ট্যাক্সি ডেকে দিই।'

সেদিন বাসায় ফিরিয়া সমরেশ দেখিল তাহার পিতার নিকট হইতে এক পত্র আসিয়াছে। অন্যান্য কথার পর তিনি লিখিয়াছেন,—

তোমার মা তোমার বিবাহের জন্য বড় ব্যস্ত হইয়াছেন। কিন্তু আমি তোমার মত ও রুচির বিরুদ্ধে কিছু করিতে চাই না। তুমি নিজে পছন্দ করিয়া বিবাহ কর ইহাই আমার ইচ্ছা। নিজের ও আমাদের সুখ সুবিধা বিবেচনা করিয়া কাজ করিবার বয়স ও বুদ্ধি তোমার হইয়াছে। সুতরাং এ বিষয়ে তোমার মতামত জানাইবে।'

সমরেশ চিঠি পড়িয়া তৎক্ষণাৎ তাহার উত্তর দিতে বসিল;—লিখিল,—'বাবা, কোনো ভদ্রমহিলাকে বিবাহ করিবার উপযুক্ত সামাজিক শিষ্টতা ও ভদ্রতা আমি

এখনো শিখি নাই। যদি কখনো শিখি আপনাকে জানাইব।'

এই লিখিয়া তিক্ত অন্তঃকরণে পোষ্টকার্ডখানা নিজের হাতে ডাকে দিয়া আসিল।

ইহার পর আরো কয়েকমাস কাটিয়া গিয়াছে। এই মাস কয়েকের মধ্যে অনেকবার সুষমা সমরেশের সহিত কথা কহিয়াছে, সমরেশও কতকটা বুদ্ধিবিশিষ্ট প্রাণীর মত তাহার জবাব দিতে আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু অন্তর হইতে সঙ্কুচিত জড়তা কিছুতেই দূর করিতে পারিতেছে না। সুষমার কথাগুলির মধ্যে তাহার প্রতি যে একটি নম্র শ্রদ্ধা প্রকাশ পায় তাহা সে বুঝিতে পারে—বেশ উৎসাহিত হয়। কিন্তু কোথা হইতে দুরপনেয় কুণ্ঠা আসিয়া তাহার সচ্ছন্দ মেলামেশার পথে অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়। নিজের আচরণ প্রতি পদে পরীক্ষা করিতে করিতে আচরণটা প্রতি পদেই আড়ষ্ট ও অস্বাভাবিক হইয়া উঠে।

যখন একলা থাকে তখন নিজেকে শত ধিক্কার দিয়া ভাবে, সুষমা তাহার অসভ্যের মত আচরণ দেখিয়া নিশ্চয় মনে মনে হাসে ও উপেক্ষা করে। হয়ত তাহাকে আরো হাস্তাস্পদ করিবার জন্যই অনেক সময় নিজে উপযাচিকা হইয়া কথা কহিতে আসে।

কিন্তু একথাটা যে কিছুতেই সম্ভব বলিয়া মনে করিতে পারে না যে তাহার লাজুক ও রমণী ভীরু স্বভাবের চর্ম্ম ভেদ করিয়া কেহ তাহার নিভৃত অন্তরের সন্ধান পাইতে পারে। যাহা বাহিরে প্রকাশ তাহাই ত লোকে দেখিবে —মনের খোঁজ পাইবার অন্য পথই বা কোথায়?

সেদিন ক্লাশ শেষ হইবার পর সমরেশ বাড়ী যাইতেছে এমন সময় কলেজের চাপরাশি আসিয়া জানাইল যে প্রফেসার সরকার তাহাকে সেলাম দিয়াছেন। প্রবীণ প্রফেসারের জন্য একটি আলাদা ঘর নির্দ্দিষ্ট ছিল, সমরেশ পর্দ্দা সরাইয়া সেখানে প্রবেশ করিয়া দেখিল প্রফেসারের নিকট ভূপেন ও সুষমা উপস্থিত রহিয়াছে। অজানা আশঙ্কায় তাহার বুকের ভিতর তোলপাড় করিয়া উঠিল।

মেধাবী ছাত্র ও সংযত আত্মসমাহিত প্রকৃতির লোক বলিয়া সমরেশকে প্রফেসার সরকার মনে মনে শ্রদ্ধা করিতেন। তিনি ঈষৎ হাসিয়া একখানা চেয়ার নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন,—'বসো সমরেশ।'

সমরেশ বসিল। প্রফেসার সরকার বলিলেন,—'কাল আমার জন্মতিথি। একসঙ্গে বসে একটু আহারাদির বন্দোবস্ত করা গেছে। নিজের জন্মতিথিতে উৎসব করা আমার ভাল লাগে না, কিন্তু সুষমা শোনে না—প্রতি বৎসরই করতে হয়। এখন ওটা একটা অনুষ্ঠান হয়ে দাঁড়িয়েছে। যাহোক, তুমি আর ভূপেন কাল রাত্রে আমার বাড়ীতেই আহারাদি করবে, নিমন্ত্রণ রইল।'

সুষমা হাসিয়া বলিল,—'মামা, ঐ রকম করে বুঝি নেমন্তন্ন করে? বলতে হয়, মহাশয়, কল্য রাত্রে মদীয় ২সা রোডস্থ ভবনে আগমন পূর্ব্বক—তারপর কি বলতে হয় সমরেশবাবু?'

সমরেশ একটা ঢোক গিলিয়া ক্ষীণ হাস্তে বলিল,—'শুভকর্ম্ম সম্পন্ন করাইবেন; পত্র দ্বারা নিমন্ত্রণ করিলাম, নিবেদন ইতি।'

সুষমা কলকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল। কথা বলিয়া সমরেশও একটু খুশী হইয়াছিল, হাসি শুনিয়া তাহার সারা গা রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। সুষমাকে এমন ভাবে প্রাণ খুলিয়া হাসিতে সে আর কখনো শুনে নাই।

প্রফেসার সরকারও হাসিয়া বলিলেন,—'ঐ হ'ল। সকাল সকাল এসো কিন্তু। আরো অনেকেই আসবেন। সুষমা সকাল থেকেই হাজির থাকবে, ও-ই বলতে গেলে তোমাদের হোষ্টেস্। ওর মামী ত শরীর নিয়ে কোনো কাজই করতে পারেন না।'

সমরেশ উঠিয়া—'যে আজ্ঞে'—বলিয়া বিদায় লইবার উপক্রম করিল।

ভূপেন বলিল,—'আমি এইমাত্র প্রফেসার সরকারকে আমার অভিনন্দন জানাচ্ছিলুম—তাঁর জীবনে এই দিনটি যেন বারবার ফিরে আসে।'

মুহূর্ত্ত মধ্যে সমরেশের মুখ মলিন হইয়া গেল। অভিনন্দন তাহারো জানানো উচিত ছিল, এবং যে [illegible] জানাইত—এতটা নিরেট নির্ব্বোধ সে নয়। [illegible] উপস্থিত থাকায় তাহার মাথার মধ্যে সব [illegible]

হইয়া গিয়াছিল। সে কোনমতে আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিল,—'আমিও—আমিও আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি' —বলিয়া একরকম ঘর ছাড়িয়া পালাইয়া গেল।

অতঃপর প্রফেসার সরকারের বাড়ী নিমন্ত্রণ রক্ষা। এইখানেই সমরেশের চরম দুর্গতি হইয়া গেল।

তাই সেখান হইতে ফিরিবার পথে ক্লান্ত দেহ ও উদ্‌ভ্রান্ত মন লইয়া সে ভাবিতেছিল, ভদ্রোচিত কোনো ব্যবহারই যখন তাহার দ্বারা সম্ভব নয় তখন মনুষ্য সমাজে বাঁচিয়া থাকিয়াই বা লাভ কি ?

এরূপ মর্ম্মান্তিক ভাবনার যথার্থ কারণ ঘটিয়াছিল কিনা তাহা নিমন্ত্রণ ব্যাপারের আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে।

সন্ধ্যা সাতটার পর প্রফেসার সরকারের বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া সমরেশ দেখিল ড্রয়িংরুমে প্রায় পনের-ষোলো জন পুরুষ ও মহিলা সমবেত হইয়াছেন। সমরেশ একবার চারিদিকে তাকাইয়া দেখিল,—চেনা লোকের মধ্যে কেবল ভূপেন ও প্রফেসার বড়ুয়াকে দেখিতে পাইল। বিখ্যাত আচার্য্য বড়ুয়াকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল ছাত্রই চিনিত; এতবড় বিদ্বান সুরসিক ও অমায়িক প্রফেসার সচরাচর দেখা যায় না। তাঁহার হাস্যবিম্বিত মুখ হইতে জ্ঞান কৌতুক দাক্ষিণ্য ও মদের গন্ধ প্রায় সর্ব্বদাই ক্ষরিত হইতে থাকিত। ছাত্রমহলে এমন অব্যাহত প্রসার বিশ্ব-বিদ্যালয়ের আর কোনো আচার্য্যই লাভ করিতে পারেন নাই।

সমরেশ দ্বারের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতেই সুষমা আসিয়া ঈষদরুণ সহাস্যমুখে তাহার অভ্যর্থনা করিল,— 'আসুন সমরেশবাবু। এত দেরী করলেন যে ?'

অতিথিকে লৌকিক আপ্যায়িত ছাড়াও সুষমার কণ্ঠে যে একটি স্বকীয় আনন্দ-আহ্বান ধ্বনিত হইয়াছিল তাহা সমরেশের কানে পৌঁছিল না; অপরাধ করিয়া করিয়া সে এতই সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছে যে অপ্রস্তুত ভাবে বলিল,—'বড্ড দেরী হয়ে গেছে—না ? ভারি অন্যায় করেছি।'

সুষমা বলিল,—'নিশ্চয় অন্যায় করেছেন কিন্তু সেজন্যে আপনি দুঃখিত হবেন না, লোকসান আমাদেরি। আর একটু আগে এলে বাবার সঙ্গে দেখা হত। তিনি এই-মাত্র চলে গেলেন।'

সমরেশ অনুতপ্ত বিমর্ষ মুখে চুপ করিয়া রহিল; সুষমা বলিল,—'ডাক্তার হ'বার ঐ মুস্কিল। দেখুন না কোথায় মামার জন্মতিথিতে একটু আমোদ আহ্লাদ করবেন তা নয় কোথাকার কোন রুগী ফোন করে ধরে নিয়ে গেল।'

সমরেশের মুখ হঠাৎ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, সে ব্যগ্র স্বরে জিজ্ঞাসা করিল,—'আপনার বাবা বুঝি ডাক্তার ?'

—'হ্যাঁ। কেন বলুন ত ?'

সমরেশ তৎক্ষণাৎ সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল, বলিল,— 'না—অম্‌নি—আমার বাবাও ডাক্তার।'

উৎফুল্লনেত্রে চাহিয়া সুষমা বলিয়া উঠিল,—'তাই নাকি! আপনি তাহলে আমার কথার ব্যথা বলুন।' বলিয়াই সুষমা লজ্জিত হইয়া পড়িল, কথাটা চাপা দিবার অভিপ্রায়ে তাড়াতাড়ি বলিল,—'চলুন, মামীর সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দিই।'

প্রফেসার-পত্নী অদূরে একটি কৌচে বসিয়া ছিলেন, সমরেশকে তাঁহার কাছে লইয়া গিয়া সুষমা বলিল,—'মামী, ইনি সমরেশ বাবু, মামার শ্রেষ্ঠ ছাত্র।'

প্রফেসার-পত্নী মুখ তুলিয়া সাদরে বলিলেন,—'এস, বাবা এস।'

তাঁহার রুগ্ন অথচ প্রীতি প্রসন্ন মুখের দিকে চাহিয়া সমরেশের সঙ্কোচের কুয়াশা অর্দ্ধেক কাটিয়া গেল, সে অবনত হইয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিয়া তাঁহার পাশে বসিয়া বলিল,—'আমি প্রফেসার সরকারের একজন ভক্ত ছাত্র। তাঁর জন্মতিথি উৎসবে যোগ দিতে পারা আমার পক্ষে যে কতবড় সৌভাগ্য তা বলতে পারি না। উনি দীর্ঘ জীবনলাভ করে এই দিনটিকে বারবার ফিরিয়ে আনুন এই আমাদের কামনা।'

এমন সহজ আন্তরিকতার সহিত সমরেশকে কথা কহিতে সুষমা পূর্ব্বে কখনো শুনে নাই। তাহার বুকের ভিতরটা দুলিয়া উঠিল, সে আস্তে আস্তে সেখান হইতে সরিয়া গেল।

ঘরের অন্যদিকে প্রফেসার বড়ুয়া নানাজাতীয় চুট্‌কি গল্পে আসর জমাইয়া তুলিয়াছিলেন, মাঝে মাঝে হাসির ঢেউ বহিয়া যাইতেছিল। ভূপেন সেই দলে বসিয়াছিল কিন্তু তাহার চক্ষু দু'টা সতর্কভাবে ঘরময় ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল।

গল্প গুজবে দেড় ঘণ্টা কাটিয়া গেল, সমরেশ এক মুহূর্ত্তের জন্যও প্রফেসার পত্নীর সঙ্গ ছাড়িল না। নয়টা বাজিতেই ভৃত্য আসিয়া জানাইল যে ডিনার প্রস্তুত। সকলেই উঠিয়া পড়িলেন।

'ডিনার' শুনিয়াই সমরেশ চমকাইয়া উঠিয়াছিল, তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল,—'ডিনার? টেবিলে বসে খাওয়া।'

প্রফেসার-পত্নী সমরেশের আতঙ্কের অনুরূপ অর্থ বুঝিয়া বলিলেন,—'আমরা সাধারণতঃ টেবিলে বসে খাই না, পাত পেড়েই খাই। কিন্তু আজ অনেক অতিথি এসেছেন যাঁরা মাটিতে বসে খেতে পারেন না—তাই টেবিলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু রান্না সব বামুনে করেছে, তুমি কি—?' বলিয়া উৎকণ্ঠিতভাবে তাহার মুখের দিকে চাহিলেন।

সমরেশ তাড়াতাড়ি বলিল,—'না না—তা নয়—কিন্তু—'

ভোজনকক্ষে প্রবেশ করিবার সময় সুষমাকে তাহার মামী একবার তীক্ষ্ণচক্ষে নিরীক্ষণ করিয়া নিম্নকণ্ঠে বলিলেন, —'বেশ ছেলেটী সমরেশ, ভারী মিষ্টি স্বভাব। আর কি চমৎকার কথা কয়, যেন কতকালের চেনা।—ওকে মাঝে মাঝে আমার কাছে ধরে নিয়ে আসিস।'

সুষমা কোনো উত্তর দিল না, কেবল একটু মুখ টিপিয়া হাসিল।

টেবিলে খাইতে বসিয়া সমরেশের মনে হইল তাহার মত হতভাগ্য পৃথিবীতে আর নাই। এতগুলা ছুরিকাঁটা লইয়া সে কি করিবে, কোন্‌টাকে কি ভাবে ব্যবহার করিবে, এতগুলা ছোট বড় চামচেরই বা কি প্রয়োজন তাহা কিছুই ধারণা করিতে না পারিয়া সে একেবারে দিশাহারা হইয়া গেল। তাহার একপাশে একটি তরুণী বসিয়াছিলেন, বোধ হয় সুষমার বন্ধু, অন্য পাশে একটি সাহেব বেশধারী ভদ্রলোক। এই দুইজনের মধ্যস্থলে সমরেশ দারুময় জগন্নাথের মত নিশ্চল হইয়া বসিয়া রহিল।

'সুপ' চামচ দিয়া খাইতে হয়, তাহার জন্য ছুরী-কাটার দরকার নাই একথা অতি বড় নির্ব্বোধও বিনা উপদেশে বুঝিতে পারে। সুতরাং সে ফাঁড়াটা সহজেই কাটিয়া গেল। গোল বাধিল মৎস্যের সঙ্গে।

খাওয়া কিছুদূর অগ্রসর হইয়াছে, কথোপকথনের একটা মৃদু গুঞ্জরনের মধ্যে সমরেশ নিজেকে অনেকটা নিরাপদ মনে করিতেছে, এমন সময় ভূপেনের সুস্পষ্ট কণ্ঠস্বরে গুঞ্জনধ্বনি চাপা পড়িয়া গেল। ভূপেন টেবিলের অন্যদিকে ছিল, গলা বাড়াইয়া দেখিয়া মুখখানা বে[illegible] গম্ভীর করিয়া বলিল,—'সমরেশ বাবু, একটু ভুল করেছেন ছুরিটা ডানহাতে ধরতে হয় আর কাঁটা বাঁ হাতে।'

সমরেশের ভুলটা যে কেহই লক্ষ্য করে নাই এ[illegible] নয় কিন্তু এই খোঁচাটা এতই নিষ্ঠুর এবং অপ্রত্যাশিত [illegible] সকলেই চমকিয়া উঠিলেন। সমরেশের মুখ বিবর্ণ হই[illegible] গেল, সে মূঢ়ের মত দুই হাতে ছুরিকাঁটা ধরিয়া নি[illegible] পাতের দিকে বিহ্বল চক্ষে চাহিয়া রহিল।

শিষ্ট সমাজে ক্বচিৎ এইরূপ দুর্ঘটনা যখন ঘটিয়া [illegible] তখন, কিছুই ঘটে নাই এখনি ভাণ করাই একমাত্র ভ[illegible] রীতি। উপস্থিত সকলে সেই রীতি অবলম্বন করি[illegible] যেন শুনিতে পান নাই এমনিভাবে পুনর্ব্বার কথাব[illegible] আরম্ভ করিলেন। শুধু সুষমার দুইগাল রক্তবর্ণ হ[illegible] জ্বালা করিতে লাগিল, সে হাত গুটাইয়া স্তব্ধভাবে ব[illegible] রহিল।

কিন্তু দুর্নিয়তি তখনো সমরেশকে ত্যাগ করে না[illegible] আহার প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে এমন সময় আর এ[illegible] ব্যাপার ঘটিল। অসাবধানে হাত নাড়ার জন্যই বোধ[illegible] একটা ঝোলের বাটি হঠাৎ সমরেশের সম্মুখ হইতে অ[illegible] ভাবে লাফাইয়া উঠিয়া তাহার কোলের উপর পড়িয়া [illegible] এবং তরল সস্নেহ ঝোলে তাহার পাঞ্জাবী ও চাদর অভি[illegible] করিয়া দিল।

পৃথিবী, দ্বিধা হও, আমি তোমার গর্ভে প্রবেশ ক[illegible] এই কামনা সীতাদেবীর পর হইতে বোধ করি অ[illegible]

নরনারীকেই সময়-অসময়ে করিতে হইয়াছে। সমরেশও কায়মনোবাক্যে সেই কামনাই করিতেছিল এমন সময় টেবিলের অপরপ্রান্তে ঝন ঝন শব্দে সকলে সচকিত হইয়া দেখিলেন, সুষমার চমৎকার কলাপাতা রঙের সিল্কের শাড়িটী অনুরূপ তরল সস্নেহ ঝোলে রঞ্জিত হইয়া গিয়াছে এবং সে অপ্রতিভভাবে মুখ নত করিয়া হাসিতেছে।

এই বৃহত্তর দুর্ঘটনায় সমরেশের দুষ্কৃতি চাপা পড়িয়া গেল বটে কিন্তু তাহার মনের অশান্তি দূর হইল না। উপরন্তু কোন্ এক প্রহেলিকার ইঙ্গিত অনুশোচনার সঙ্গে মিশিয়া তাহাকে আরো পীড়িত করিয়া তুলিল।

আহার শেষ হইলে প্রফেসার বড়ুয়া উঠিয়া একটি সুন্দর বক্তৃতা দিয়া সহকর্মীকে অভিনন্দিত করিলেন। উপসংহারে বলিলেন,—'আপনারা পাত্রপূর্ণ করুন, প্রফেসার সরকারের স্বাস্থ্য পান করা চাই।'

প্রফেসার সরকার মৃদুস্বরে আপত্তি করায় বড়ুয়া সাহেব বলিলেন, 'না না, ও কোনো কাজের কথা নয়। কারণবারি না হলে কার্য্য সুসম্পন্ন হবে না। শ্যাম্পেন্ আনাও—শ্যাম্পেনে মহিলাদেরও আপত্তি হতে পারে না।'

প্রফেসার বড়ুয়ার জন্য শ্যাম্পেন আনানো ছিল,অগত্যা তাহাই উপস্থিত করা হইল। সকলের পাত্র পূর্ণ করা হইল। প্রফেসার বড়ুয়া নিজের পাত্রটি উর্দ্ধে তুলিয়া বলিলেন, 'Long life to Professor Sarkar! Drink hearty!'

মহিলারা কেহই পান করিলেন না, শুধু পাত্র অধরে ঠেকাইয়া নামাইয়া রাখিলেন। ভূপেন একচুমুকে নিজের পাত্র শেষ করিয়া ফেলিল। সমরেশও একচুমুক খাইল বটে কিন্তু পাত্র শেষ করিতে পারিল না।

অতঃপর মহিলারা ড্রয়িং রুমে ফিরিয়া গেলেন, পুরুষেরাও ইচ্ছামত কেহ কেহ দু'একপাত্র টানিয়া একে একে তাঁহাদের অনুবর্ত্তী হইলেন।

ঝোল-রঞ্জিত কাপড়চোপড় লইয়া ড্রয়িংরুমে ফিরিয়া যাইবার ইচ্ছা সমরেশের ছিল না, সে অলক্ষিতে কাহাকেও কিছু না বলিয়া পলায়ন করিবার সুযোগ খুঁজিতেছিল। ওদিকে প্রফেসার বড়ুয়াকে কেন্দ্র করিয়া দ্রাক্ষারসের আস্বাদন ও নিম্নকণ্ঠে আলাপ চলিতেছিল, সমরেশের দিকে কাহারো লক্ষ্য ছিল না। এই ফাঁকে সে সরিয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছে এমন সময় ভূপেন পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার আপাদমস্তক একবার নিরীক্ষণ করিয়া মুখের একটা ভঙ্গী করিয়া বলিল,—'পাঞ্জাবী দিব্যি রঙিয়ে ফেলেছেন দেখছি! হোরি খেলত বনুয়ারী? কিন্তু এটা ত ফাগুয়ার সময় নয়? তা এখানে বসে কেন? ড্রয়িং রুমে গেলেই ত পারেন, সেখানে মহিলারা আপনার পাঞ্জাবীর বর্ণ বৈচিত্র্য দেখে নিশ্চয় খুব আনন্দ পাবেন।'—বলিয়া মুচকি হাসিয়া নিম্নকণ্ঠে একটা গানের কলি ভাঁজিতে ভাঁজিতে প্রস্থান করিল।

অপরিসীম আত্মগ্লানির মধ্যেও ক্রোধের শিখা সমরেশের মাথার মধ্যে জ্বলিয়া উঠিল। ভূপেনের পৃষ্ঠের দিকে তাকাইয়া তাকাইয়া তাহার মনের মধ্যে যে কথাগুলা বিষের মত ফেনাইয়া উঠিতে লাগিল, ভাগ্যে সেগুলা মনের মধ্যেই রহিয়া গেল, এই স্থানে মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িলে যে বিশ্রী ব্যাপার ঘটিত তাহার ফলে বোধ করি সমরেশকে আত্মহত্যা করিতে হইত।

মিনিট কয়েক পরে সমরেশ নিঃশব্দে উঠিয়া বাহিরের বারান্দায় গিয়া দেখিল সেখানে কেহ নাই। সে চুপি চুপি বাহির হইয়া যাইতেছিল, হঠাৎ নজর পড়িল দূরে বারান্দার এক কোণে সুষমা ও ভূপেন দাঁড়াইয়া কথা কহিতেছে। সুষমার আরক্ত মুখ ও তীব্র চোখের দৃষ্টি মুহূর্ত্তের জন্য সমরেশের চোখে পড়িল, সে হেঁটমুখে বারান্দা পার হইয়া যাইবার উপক্রম করিল।

সমরেশকে দেখিবামাত্র সুষমা দ্রুতপদে কাছে আসিয়া বলিল,—'সমরেশ বাবু আপনি যাচ্ছেন?'

সমরেশ থমকিয়া দাঁড়াইয়া বলিল,—'হ্যা—রাত হয়েছে,—আমি যাই।'

সুষমা তাহার আরো কাছে আসিয়া মিনতিপূর্ণ স্বরে কহিল,—'একটু দাঁড়াবেন না? আমিও তাহলে আপনার সঙ্গে যেতুম, আপনি আমাকে বাড়ী পৌঁছে দিতে পারতেন। আপনার সঙ্গে না গেলে, এই রাত্রে আবার মামাকে যেতে হবে আমায় পৌঁছে দিতে।'

ভূপেনের বিষাক্ত শ্লেষ তখনো সমরেশের বুকের মধ্যে জ্বলিতেছিল, সুষমার কথাগুলা তাহার কাণে অত্যন্ত

নিষ্ঠুর বিদ্রূপের মত শুনাইল, সে মাথা নাড়িয়া বলিল,—'না, মাফ করবেন—আমি আর থাকতে পারছিনে—'

সুষমা যেন আহত হইয়া ফিরিয়া আসিল; তাহার মুখ ম্লান হইয়া গেল, তবু সে আর একবার বলিল,—'মামীর সঙ্গে দেখা করে যাবেন না? আমি না হয় তাঁকে এইখানে ডেকে আনছি—'বলিতে বলিতে তাহার দৃষ্টি সমরেশের ঝোলমাখা পাঞ্জাবীটার উপর গিয়া পড়িল।

'না—নমস্কার!' সমরেশ নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল। ফুটপাথ হইতে শুনিতে পাইল ভুপেন বলিতেছে—'আপনি চিন্তিত হচ্চেন কেন? আমি ত রয়েছি, আপনার মামা না যেতে পারেন—'

চৌরঙ্গী পার হইয়া সমরেশ ধর্ম্মতলার রাস্তা ধরিল। হাঁটিতে হাঁটিতে ওয়েলিংটন ষ্ট্রীটের মোড় পর্য্যন্ত আসিয়া সে চমক ভাঙিয়া দেখিল রাস্তায় লোক চলাচল বন্ধ হইয়া গিয়াছে, শূন্য পথের দুইধারে গ্যাসের বাতগুলা যতদূর দেখা যায় নির্নিমেষভাবে জ্বলিতেছে। দোকানপাট বন্ধ।

সমরেশ ভাবিল, দূর ছাই, আজ আর গাড়ী পাওয়া যাবে না। গলি দিয়েই যাই।

বাসাতে চাকরটা এখনো তাহার জন্য অপেক্ষা করিয়া জাগিয়া আছে স্মরণ করিয়া সে পার্কের ভিতর দিয়া দ্রুতবেগে চলিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু পাশে একখানা খালি বেঞ্চি তাহার অবিশ্রান্ত দেহকে বেশী দূর অগ্রসর হইতে দিল না। মোটবাহী কুলি যেমন ঘাড়ের মোট নামাইয়া ক্ষণকাল বিশ্রাম করে, সেও তেমনি ভারাক্রান্ত দেহটাকে বেঞ্চির উপর নামাইয়া বসিয়া পড়িল।

মিনিট পনের পরে কিন্তু আবার তাহাকে উঠিতে হইল। পার্কে বেঞ্চির উপর রাত কাটাইয়া কোনো লাভ নাই, বাসায় ফিরিয়া কোনক্রমে এই উচ্ছিষ্ট কাপড়-চোপড়গুলা ছাড়িয়া শয্যা আশ্রয় করিতে পারিলে সে বাঁচে। পায়ের আঙুল হইতে রগের শিরগুলা পর্য্যন্ত অপরিসীম অবসাদে ভাঙিয়া পড়িতেছে; কিন্তু বাকী পথটা যে করিয়া হোক অতিক্রম করিতেই হইবে।

গলি দিয়া যাইতে যাইতে সম্মুখে কিছুদূরে সমরেশ দেখিল একখানা ট্যাক্সি দাঁড়াইয়া আছে এবং তাহার বাহিরে দাঁড়াইয়া একটা লোক হুডের ভিতর মাথা ঢুকাইয়া কাহার সহিত কথা কহিতেছে। আরো খানিকটা অগ্রসর হইয়া শুনিতে পাইল গাড়ীর ভিতরে বসিয়া যে কথা কহিতেছে সে স্ত্রীলোক। এই সব পাড়ায় নির্জ্জন রাত্রে অনেক রকম ব্যাপার ঘটিয়া থাকে তাই সমরেশ তাড়াতাড়ি পা চালাইয়া বাহির হইয়া যাইবার চেষ্টা করিল। দণ্ডায়মান ট্যাক্সি ছাড়াইয়া দু' পা অগ্রসর হইয়াছে, এমন সময় যে পরিচিত কণ্ঠস্বর তাহার কর্ণে আসিয়া পৌঁছিল তাহাতে সে তীরবিদ্ধের মত ফিরিয়া দাঁড়াইল।

—'এ আমাকে কোথায় নিয়ে এলেন? আমি যে বাড়ী যাব।'

উত্তেজনা বিকৃত কণ্ঠে পুরুষটা বলিল,—'রাস্তার মাঝখানে একটা সীন্ কোরোনা সুষমা; কোনো ভয় নেই—এ আমার বাসা। এক ৮রটি নামো, কেউ জানতে পারবে না। তারপর আমি তোমাকে বাড়ী পৌঁছে দেব।'

—'না না, আগে আমায় বাড়ী পৌঁছে দিন।'

ভুপেন সুষমার হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে বলিল,—'নেমে এস, নেমে এস। এসব প্রুডারি কি তোমার মত এডুকেটেড গার্লের সাজে—'বলিয়া একটা বিশ্রী হাসি হাসিল।

এক লাফে সমরেশ ট্যাক্সির পাশে আসিয়া দাঁড়াইল,—'কি হয়েছে? সুষমা?'

সুষমা আর্ত্তস্বরে প্রায় চীৎকার করিয়া উঠিল,—'সমরেশবাবু, আমাকে বাঁচান।'

ভুপেন বিদ্যুদ্বেগে ফিরিয়া সম্মুখে সমরেশকে দেখিয়া একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেল। সমরেশও ভুপেনের মুখ দেখিয়া কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া রহিল—মানুষের মুখ এত অল্প সময়ের মধ্যে এতখানি পরিবর্ত্তিত হইতে পারে তাহা যেন কল্পনার অতীত। যে হিংস্র পশুটাকে ভুপেন এতদিন শিষ্টতার আড়ালে সযত্নে ঢাকিয়া রাখিয়াছিল, শিকার সান্নিধ্যে পাইয়া সেই পশু যেন মুখ বাহির করিয়া দাঁড়াইয়াছে।

সমরেশের বুকের মধ্যে বহুদিন সঞ্চিত বিদ্বেষ ও ঘৃণা একমুহূর্ত্তে ফাটিয়া পড়িল। তাহার [illegible]

ঐ কদর্য্য পাশবিক মুখখানাকে লাথি মারিয়া ঘুষি মারিয়া ভাঙিয়া থেঁতো করিয়া একেবারে লুপ্ত করিয়া দেয়। সে এক বজ্রমুষ্টিতে ভূপেনের চুল ধরিয়া অন্য হাতে তাহার গালে একটা বিরাট চপেটাঘাত করিয়া বলিল,—'হতভাগা ছোটলোক জানোয়ার কোথাকার! ক্যাডা-ভ্যারাস্ কুকুরের বাচ্ছা! আজ তোকে খুন করব।'—বলিয়া আর একটি ততোধিক বিরাট চপেটাঘাত করিল।

ভূপেনও রুখিয়া উঠিয়া বলিল,—'খবরদার বলছি'—

সমরেশ সঙ্গে সঙ্গে তাহার পেটে এক প্রচণ্ড লাথি কশাইয়া বলিল,—'তবে রে'—

তারপর তাহার মুখ দিয়া আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদ্গারের মত যে সমস্ত শব্দ বাহির হইল; হিন্দি উর্দ্দু ইংরাজী বাংলা মিশ্রিত যে অনুষ্টুপ শ্লোক অবাধে অনর্গলভাবে নির্গত হইতে লাগিল তাহার পুনরুক্তি করিবার সাহস বা শক্তি আমাদের নাই। ভূপেন সেই বাক্যের আগুনে যেন একখণ্ড কাগজের মত পুড়িয়া কুঁকড়াইয়া গেল। গাড়ীর মধ্যে সুষমা দুই কানে সজোরে আঙ্গুল পুরিয়া দিয়া, বিস্ফারিত চক্ষে অপূর্ব্ব আলোক ফুটাইয়া নিস্পন্দ বক্ষে বসিয়া রহিল।

প্রিয়তমা নারীর রক্ষার্থ পুরুষ যখন লড়াই করে তখন প্রিয়তমার মনের ভাবটা কিরূপ হয় কে জানে?

ভূপেনের নাকে অন্তিম একটা ঘুষি মারিয়া তাহাকে ফেলিয়া দিয়া সমরেশ বলিল,—'যা শালা কেঁচোর বাচ্চা, নর্দ্দমায় শুয়ে থাকগে যা!' তার পর ট্যাক্সিতে সুষমার পাশে উঠিয়া বসিয়া চালককে বলিল,—'চালাও—হাতী-বাগান।'

গাড়ী চলিল। দুইজনে অন্ধকারের মধ্যে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। এই ভাবে মিনিট পাঁচেক কাটিয়া গেল।

শেষে সুষমা মৃদুস্বরে বলিল,—'কি বলে ঐ সব কথা-গুলো মুখ দিয়ে বার করলেন?'

সমরেশের শরীরে ক্লান্তির কণামাত্র আর অবশিষ্ট ছিল না, সে হঠাৎ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, তারপর বলিল,—'ঐ কথাগুলো মুখ দিয়ে বার করা এবং পদাঘাত মুষ্ট্যাঘাত ইত্যাদি চালানোর সঙ্গে সঙ্গে একটা মস্ত কথা বুঝতে পেরেছি যা এতদিন কিছুতেই বুঝতে পারছিলুম না। সেজন্যে দোষ অবশ্য সম্পূর্ণ তোমার, তুমিই আমার মাথা গুলিয়ে দিয়েছিলে!'

অন্ধকারের মধ্যে সুষমা হাসিল, বলিল,—'কি কথা বুঝতে পেরেছেন শুনি?'

সমরেশ হাতড়াইয়া সুষমার একখানা হাত নিজের হাতের মধ্যে লইয়া বলিল,—'বুঝতে পেরেছি যে আমি একজন খাঁটি ভদ্রলোক। শুধু তাই নয়, আরো অনেক কথা বুঝতে পেরেছি যা চলন্ত ট্যাক্সিতে বসে বলা যায় না।'

সুষমা সাড়া দিল না; সমরেশ তখন তাহার মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া বলিল,—'সুষমা, কাল বিকেলে তোমাদের বাড়ীতে আমার চায়ের নেমন্তন্ন রইল,—ঠিক পাঁচটার সময়—বুঝলে? আগে থাকতে খবর দিয়ে রাখলুম—তৈরী হয়ে থেকো।'

সুষমা চুপিচুপি বলিল,—'আমি ত আপনাকে নেমন্তন্ন করিনি…'

সমরেশ বলিল,—'ওঃ! তাও ত বটে! অনিমন্ত্রিত ভাবে যাওয়া ত কোনোমতেই ভদ্রতা হবে না। তা, এক কাজ কর, সে ত্রুটি তুমি এখনি সংশোধন করে নাও। বল, মহাশয়, কল্য সায়াহ্নে বেলা পাঁচ ঘটিকার সময় আপনি সবান্ধবে—না না সবান্ধবে নয়, সবান্ধবে নয়—একাকী, কি বল? সুষমা?'

সুষমা কিছুই বলিল না; কিন্তু তাহাদের দুজনের বাহু যেখানে আঙুলে আঙুলে জড়াইয়া নিবিড়ভাবে পর-স্পরের পরিচয় গ্রহণ করিতেছিল সেইখানে সমরেশ সামান্য একটু চাপ অনুভব করিল।

জাতি-হারা

গল্প

শ্রীপ্রভাবতী সরস্বতী

[শ্রীপ্রভা দেবী সরস্বতীর নাম বাংলার পাঠক-পাঠিকা কাহারও অপরিচিত নহে। খুব কম সাময়িক পত্রই আছে যাহাতে এই সুলেখিকার লেখা বাহির না হয়। ইঁহার অনেকগুলি উল্লেখযোগ্য উপন্যাসও বাহির হইয়াছে। নানা রসের বহু গল্পও ইনি লিখিয়াছেন। মানুষের সুখ দুঃখ, মানুষের উপর মানুষের ও সমাজের নির্ম্মম আচরণ, নারী ও পুরুষের নানা বৈষম্য ইঁহার নানা লেখায় উজ্জ্বল ভাবে প্রতিভাত হইতেছে। বর্ত্তমান জাতি-হারা গল্পটিতেও প্রভাবতীর কৃতিত্বের পরিচয় পাইবেন।]

১

সুদামের বড় বোন তারা দুপুরে প্রাত্যহিক পাড়া-বেড়ানো শেষ করিয়া মুখখানা অত্যন্ত অন্ধকার করিয়া বাড়ীতে ফিরিয়া আসিল। সুদাম তখন দাওয়ায় বসিয়া নিবিষ্ট মনে খেজুরপাতা দিয়া একখানা বড় আকারের চেটাই তৈরী করিতেছিল।

তারা একবার নিতান্ত অবহেলাভরেই তাহার পানে তাকাইল, আপন মনে গজ গজ করিতে করিতে সে ঘরে ঢুকিতে যাইতেছিল সেই সময় তাহার উপর সুদামের দৃষ্টি পড়িল; সে হাতের কাজ স্থগিত রাখিয়া বোনের পানে তাকাইয়া হর্ষভরা সুরে বলিল,—"দেখে যাও দিদি, কেমন চমৎকার চেটাই তৈরি করছি।"

দিদি প্রথমটা কথা কহিবে না বলিয়াই ভাবিয়াছিল, আবার কি মনে করিয়া মুখ বাঁকাইয়া বলিল,—"যা যা, ভারী চমৎকার চেটাই বুনছে তার আবার—"

"না দিদি, তোমার পায় পড়ি, চেটাইটা একটু তোমায় দেখতেই হবে—"

দিদি উত্তর না দিয়া চলিয়া যায় দেখিয়া সে লাফাইয়া পড়িয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল, অনুনয়ের সুরে বলিল, "সত্যি দিদি, তোমার না দেখলে হবে না।"

বলিতে বলিতে তাহার গম্ভীর মুখখানার পানে তাকাইয়া সে বলিয়া উঠিল,—"বারে, আজ আবার তোমার কি হয়েছে, মুখখানা ও রকম করেছ যে?

"সর্ বলছি সুদাম, আর জালাতন করিস্‌নে। হাড়-মাস আমার ভাজা ভাজা করলি, তোর কথা আমার মোটেই ভাল লাগে না। নিত্যি বলছি—পোড়ারমুখো, বড়-সড় হ'য়েছিস্ এবার একটা কাজকর্ম্ম কিছু দেখ্, ব'সে ব'সে বোনাইয়ের অন্নধ্বংস করছিস, আর চেটাই বুনবি চুপড়ি করবি, একটু লজ্জাও করে না তোর মুখ দেখাতে?"

তিলমাত্র বিলম্ব না করিয়াই সুদাম নিঃসঙ্কোচে বলিল,—"বাঃ রে, এতে লজ্জা কিসের, চেটাই, চুপড়ি, ঝুড়ি, তোমায় কতগুলো বুনে দিয়েছি বল তো? নইলে বস্‌তেই বা কিসে, জিনিষ পত্র রাখতেই বা কিসে? হয় তো তরী-তরকারি মাটিতে পড়ে থাকাত, বোনাই পিঁড়ি না হ'লে বস্‌তে পারতে না—"

গম্ভীর মুখে দিদি সেটা মানিয়া লইয়া বলিল,—"কিন্তু না হ'লেও চলত কিনা দেখতে পেতিস্। যতকাল তুই চেটাই বুনিসনি ততকাল কি তোর বোনাই মাটীতে বসেছে না তরকারী মাটীতে পড়ে প'চেছে? হচ্ছে তাই চ'লে যাচ্ছে, না হ'লেও চলে যেত কিনা দেখতিস্।"

একটু ক্ষুণ্ণ হইয়া সুদাম বলিল,—"সেই ভাল, তুমি আমার ও সব দিয়ে দিয়ো দিদি, আমি রস্বাদের দিয়ে আসব, তারা বিক্রি করলেও অনেক উপকার পাবে।"

দিদি জবাব দিল,—"তাই হবে। ওখানা কি তোর শোওয়ার জন্যে বুনছিস্?"

সুদাম বলিল,—"না, ওখানা বিন্দিদের জন্যে করছি।"

দিদির মুখের কাঠিন্যটা ঘুচিয়া আসিতেছিল, সে মুখ আবার কঠিন হইয়া উঠিল, সে জিজ্ঞাসা করিল, "তা'দের জন্যে তোর এত মাথা ব্যথা কেন রে, সুদাম?"

সুদাম অবাক হইয়া তাহার পানে চাহিয়া রহিল, একটু পরে ধীরে ধীরে বলিল,—"তারা বড্ড গরীব দিদি, বেচারাদের পেতে শোওয়ার কিছু নেই। সেদিন তাদের বাড়ী গিয়ে দেখলুম একটা ছেঁড়া মাদুর কতকালের কে জানে, সেইটা পেতে তা'রা শুয়ে থাকে। দেখে বড্ড দুঃখ হ'ল দিদি তাইতে—"

চটিয়া উঠিয়া মুখভঙ্গী করিয়া তারা বলিল,—"বড্ড দয়াবান তুই তা'দের জন্যে চেটাই বুনছিস্। বোকা না হ'লে কেউ হাতের লক্ষ্মী পায় ঠেলে চির জন্মটা ভাতের জন্য পরের দোরে লাথি ঝেঁটা খায়? পোড়ারমুখোর জন্যে ঘরে পরের কথা শুনতে শুনতে আমি মরি। মা সাত তাড়াতাড়ি ম'রে গেল, আমার হাতে এই হতচ্ছাড়া ভূতটাকে দিয়ে গেল। কবে যে আমি মরব—সব জ্বালা জুড়াব তাই ভাবি। ঘরের পরের কথা কবে আমি এড়াতে পারব, মা কালির কাছে তাই কেবল মাথা খুঁড়ছি। চিরকালটা আমায় জ্বালিয়ে মারলে, একটা দিন একটু শান্তিতে থাকতে পারলুম না। সাত বছর বয়েস থেকে এই উনিশ বছর আমার কাছে থেকে আমায় কেবল দগ্ধে মারছে।"

খুব তীব্রস্বরে কথা বলিতে বলিতে কখন সে স্বর চোখের জলে ভিজিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে তারার চোখ দুইটাও জলে ভরিয়া উঠিল। সে তাড়াতাড়ি আত্মগোপন করিতে ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল।

বোকা সুদাম হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া দিদির কথাগুলা বুঝিবার চেষ্টা করিতেছিল। তাহার জন্য দিদি দগ্ধিয়া মরিতেছে, ঘরের পরের কথা সহ্য করিতেছে এ কথার অর্থ সে কিছুই বুঝিতে পারিতেছিল না। হাঁ ঘরে অর্থাৎ তাহার বোনাই, শ্যামাচরণ, তাহার জন্য তারাকে মাঝে মাঝে বকে বটে। সে বলে তারা বসিয়া বসিয়া খাওয়াইয়া ভাইটার মস্তক চর্ব্বণ করিতেছে। তা' এরকম একটু বকাতে কি আসে যায়? সে কথা কাণেই নেয় না। একদিন শ্যামচরণের তাড়না খাইয়া শ্যামাচরণকে দেখিবামাত্র চুপে চুপে সরিয়া পড়ে, শ্যামচরণের পক্ষে তাহার নাগাল পাওয়া দুষ্কর হইয়া উঠে। বোনাই একটু বকিলেও বকিতে পারে কিন্তু ওই যে দিদি বলিল পরে কথা বলে—এর মানে কি? পরে কে কি লাগাইয়াছে দিদিকে খোঁজ করিতে হইবে, তাহার পর—এতো শ্যামাচরণ নয়, জব্দ করিতে কতক্ষণ? হাঁ, উপায় তো তাহার হাতেই আছে। আগে চেটাইখানা শেষ করিয়া ফেলা যাক, দিদির মনটাও ততক্ষণ একটু ভাল হোক। সুদাম আবার কার্য্যে বসিল।

(২)

এই ভাইটীকে লইয়া তারা বড় মুস্কিলে পড়িয়াছিল। সে যত তাহাকে বুঝাইতে চায় তাহার বয়স হইয়াছে এখন তাহাকে ছেলেমী ছাড়িয়া দিয়া ভগ্নীপতির সহিত কলের কাজে যাইতে হইবে, সে ততই হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকে। তাহার স্কন্ধে কর্ম্মভার চাপাইতে গেলে—দুষ্ট বলদ অকস্মাৎ লাঙ্গল ফেলিয়া যেমন একদিক লক্ষ্য করিয়া ছুটে সেও তেমনি করিয়া ছুটিয়া পালায়। একদিন তাহাকে কার্য্য শিখাইবার জন্য শ্যামাচরণ কাল লইয়া গিয়াছিল, দুই একটা কাজ তাহাকে দিয়া করাইয়া একটু অন্যমনস্ক হইবামাত্র সে পলাইয়াছিল।

এমনি ভাবে কয়েকদিন লইয়া গিয়া সে পলায় দেখিয়া শ্যামাচরণ খুব রাগিয়া গেল। লোকটার ধৈর্য্য অবশ্য বেশ ছিল, না হইলে সাত বছরের শ্যালককে আনিয়া লালন পালন করিতে পারিত না। তাহার নিজের সন্তানাদি হয় নাই, এই ছেলেটীর উপর তাহার কতকটা লক্ষ্য ছিল। এতখানি তাহার বয়স হইল এখনও কোন কাজ-কর্ম্ম সে শিখিল না, শিখিবার উৎসাহও নাই, ইহাতে তাহার রাগ করিবারই কথা। তাহার এমন বয়সে কলে কাজ জুটিয়া গিয়াছিল এবং সে তারাকে বিবাহও করিয়াছিল। তারার বড় সাধ ভাইটীর বিবাহ দিয়া ছোট বউটী লইয়া ঘর করে, কিন্তু এমন অপদার্থকে কন্যা দিবে কে?

সমস্ত দিনটা—কেবল আহারের সময় ব্যতীত তাহার দেখা পাওয়াই ভার। শ্যামচরণ বারটার ভোঁ দিলে বাড়ী আসিত,:একটার আগে আবার চলিয়া যাইত, এ সময়টায় সুদাম বাড়ী আসিত না। যখন বুঝিত শ্যামাচরণ চলিয়া গিয়াছে তখন বাড়ী ফিরিত। বাড়ীর একখানা কাজ বলিলে তাহার মুখ ভার হইয়া উঠিত, পরের কাজে তাহার অসাধারণ উৎসাহ ছিল। কোথায় কার ছেলের অসুখ, ডাক্তার ডাকে, ঔষধ আনে,—দরকার হইলে রাত জাগিয়া সেবা করা,—এ সব কাজে সে সিদ্ধহস্ত ছিল। কোথায় কে খাইতে পাইতেছে না, সে বাড়ীতে লুকাইয়া, দিন মজুরী, ষ্টেশনে কুলীগিরি করিয়া মজুরীটা তাহাদের দিয়া আসিত। কোথাও কেহ দূরবর্ত্তী ছেলেমেয়ের খোঁজ পাইতেছে না, নয় দশ ক্রোশ দূর হইলেও এই ছেলেটী পায় হাঁটিয়া গিয়া খোঁজ খবর লইয়া আসিত। এই গুণে সে গ্রামের প্রিয়পাত্র ছিল।

অনেকে তাহার নিন্দাও করিত—যখন নিজেদের কাজ তাহার নিকট হইতে লওয়া হইত তাহার পরে। এ সব নিন্দা প্রশংসায় এ ছেলেটী দৃকপাতও করিত না, নিজের খেয়াল অনুসারে সে কাজ করিয়া যাইত, কাহারও নিন্দাতে দমিত না, প্রশংসায় স্ফীত হইত না।

গ্রামের ছেলেমেয়েগুলি সুদামকে বড় ভালবাসিত। সে সকলেরই আপনার ছিল, প্রত্যেকেই তাহাকে নিজস্ব বলিয়া মনে করিত। তাহাদের আবদার সব অসঙ্কোচে সে রক্ষা করিয়া যাইত, না বলিত না।

বিন্দুর পিতা গোবর্দ্ধন চটকলে সর্দ্দারী কাজ করিত। সে কোথাকার লোক তাহা কেহ জানিত না। বৎসর পাঁচ ছয় হইবে স্ত্রী কন্যা পুত্র সহ সে এখানে আসিয়া থাকিয়া যায়। বৎসর খানেক হইল গোবর্দ্ধন এখানেই মারা যায়, একটী মাত্র পুত্র রামধনও পিতার অনুগমন করে। বর্ত্তমান ছিল গোবর্দ্ধনের চিররুগ্না স্ত্রী যশোদা, ও বিধবা কন্যা, বিন্দু।

সংসারে তাহাদের কেহই ছিল না। তাহাদের দেশ ঘর থাকিলেও গোবর্দ্ধন চিরকাল বিদেশেই কাটাইয়া আসিয়াছে, তাহার স্ত্রী কন্যা কখনও দেশে যায় নাই। গোবর্দ্ধনের মৃত্যুর পরে যশোদা তাহার খুড়তুতো ভাইকে পত্র দিয়াছিল, সে উত্তর দিয়াছিল, গোবর্দ্ধন যে বিবাহ করিয়াছিল, কিম্বা তাহার স্ত্রী কন্যা আছে, তাহা সে জানে না। এ রকম সন্দেহের স্থলে সে কিছু সাহায্য করিতে পারিবে না।

গোবর্দ্ধনের বিধবা হতাশ হইয়া পড়িল। মেয়ে তাহাকে আশ্বাস দিল, ভয় কি মা আমি লোকের বাড়ী কাজ করে খাব, তোমাকেও খাওয়াব।

কিন্তু, সংসারের নিয়ম তরুণী সুন্দরী বিধবা, বিন্দু কিছু জানিত না। প্রথম দিন কলে মেয়ে মজুরদের সঙ্গে কাজ করিতে গিয়া সে যে ব্যবহার পাইল, তাহাতে তাহার মনটা বড় সঙ্কুচিত হইয়া গেল। সে জানিত যে সে তরুণী বিধবা, তাহাতে সুন্দরী, অনেকগুলি লুব্ধনেত্র তাহার উপর পড়িবে, অনেকের অনেক কথা তাহাকে শুনিতে হইবে। গোবর্দ্ধন তাহার স্ত্রী কন্যাকে যতদূর সম্ভব পর্দ্দার আড়ালে রাখিত তাই বিন্দু বাহিরের পরিচয় পায় নাই।

কিন্তু পাইলেই বা কি? পেট তো চালানো চাই, শুধু সে একা নয়, রুগ্না মায়ের ভারও যে তাহার উপর। রুগ্নার পথ্য চাই, ঔষধ চাই, এ সব সে যোগাইবে কি করিয়া?

প্রথম ধাক্কাটা সামলাইতে তাহার দুইদিন কাটিয়া গেল, তাহার পর সে আবার কলের কাজে প্রবৃত্ত হইল।

চরিত্র তাহার সৎ ছিল, তাই বাহিরের কথাগুলি কাণে আসিয়া বাজিলেও প্রাণে গিয়া বাজিতে পারে নাই। প্রলোভনকে সে এড়াইয়া চলিবার প্রবৃত্তি পাইয়াছিল, তাই কেহই তাহাকে জয় করিতে পারিল না।

পুরুষদের সু-নজরে পড়ায় মেয়েদের বিষনজরে সে পড়িয়া গেল। মেয়েরা প্রথমে গোপনে, তাহার পর প্রকাশ্যেই, তাহার নিন্দা করিতে লাগিল, সে তাহাতে কাণও দিল না।

এই রকম সময়েই হঠাৎ একদিন সুদামের সহিত তাহার দেখা। সেদিন কল হইতে ফিরিতে সন্ধ্যা অতীত হইয়া গিয়াছিল। কি জানি কেন, সর্দ্দার তাহাকে আজ ছাড়িয়া দেয় নাই। শ্রান্ত দেহে সে যখন কুটীরে

ফিরিয়া আসিতেছিল,—সেই নির্জ্জন গ্রাম্য পথে দুইটী পুরুষ তাহার সঙ্গ লইয়াছিল!

ইহাদের কুৎসিত পরিহাসে সে পলাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল, লুকাইতে না পারিয়া আর্ত্তকণ্ঠে যখন কাঁদিতেছিল, সেই সময় বীরদর্পে সেখানে আসিয়া পড়িল সুদাম। তাহাকে দেখিয়া আক্রমণকারী দুরাত্মা দুইটী পলাইল।

সেই দিন হইতে সুদাম বিন্দুর ধর্ম্ম ভাই। বিন্দু তাহার চেয়ে দুই তিন বৎসরের বড়, সেই জন্য সে বিন্দুকে দিদি বলিয়া ডাকে।

এই ছেলেটীকে সহায় পাইয়া বিন্দু বাঁচিয়া গিয়াছিল। সুদামের কাছে সে কলের সর্দ্দার ও মজুরদের আচরণ ব্যক্ত করিয়া ফেলিয়াছিল, রাগে সুদামের চোখ দুইটা জবাফুলের মত লাল হইয়াছিল, সে বলিয়াছিল,—"তুমি আর কলে কাজ করতে যেয়ো না দিদি।"

মলিন হাসিয়া বিন্দু বলিয়াছিল, "কলে কাজ করব না তো খাব কি ভাই, মাকেই বা খাওয়াব কি?"

সুদাম প্রবল উৎসাহে নিজে খাটিয়া আনিবে বলিয়াছিল, কিন্তু বিন্দু তাহার খাটুনির মূল্য লইতে কিছুতেই রাজি হয় নাই।

এই মেয়েটীর সরলতা, হৃদয়ের উচ্চতা সুদামের হৃদয়কে স্পর্শ করিয়াছিল। যদি বিন্দু রাজি হইত তাহা হইলে সে কাজে লাগিতে পারিত; বিন্দু তাহার সে সাহায্য লইল না, অন্য প্রকারে সে যত দূর সম্ভব তাহার সাহায্য করিতে লাগিল।

লোকে এই সম্প্রীতিকে নিতান্ত দূষণীয় বলিয়া জানিল। চারিদিকে কানাঘুষা চলিতে লাগিল। স্পষ্ট কেহ বলিতে সাহস করিল না, কেন না, সুদাম এদিকে নিতান্ত ভালমানুষ হইলেও মিথ্যাকে সে ঘৃণা করিত, সেইজন্য একবার রাগিলে রাগের মাথায় সে খুনও করিয়া ফেলিতে পারিত। জগতের মধ্যে সে যথার্থ ভয় করিত, ভালবাসিত তারাকে; তারা ছাড়া আর কাহারও কথা সে সহ্য করিতে পারিত না।

(৩)

রাগের মাথায় বাড়ী ফিরিয়া শ্যামাচরণ চেঁচাইতে আরম্ভ করিয়া দিল, "হতভাগাকে বাড়ীতে রেখে আমার কত না কথা শুনতে হচ্ছে। আজ যদি ওকে বাড়ী হতে দূর করে না দেই, তবে আমি রামধন কাহারের ছেলেই নই।"

তারা হেঁসেল ঘর হইতে বাহির হইয়া ঝঙ্কার দিয়া বলিল, "কি হ'য়েছে, অত চেঁচাচ্ছো কেন? যা' বলবার আস্তে বললেই হয় সাত গাঁয়ের লোক এক না করলে কথা বলা যায় না?"

একেবারে নিভিয়া গিয়া শ্যামাচরণ নরম স্বরে বলিল, "বলছি তোমার ভাইয়ের কথা।"

"তা' আমি বুঝেছি। আমার ভাইটা আছে বলেই যখন তখন তা'কে নিয়ে নাড়াচাড়া দাও। সত্যি মাথা পাগলা কিনা তাই এত অপমান লাঞ্ছনা সয়েও তোমার দোরে পড়ে থাকে দু'বেলা দু'টো ক'রে ভাত খাওয়ার জন্যে। ওর মধ্যে যদি এতটুকু মনুষ্যত্ব থাকত, তবে কক্ষণো এই তু' করে কুকুরের মত ডেকে ফেলে দেওয়া একমুঠো ভাত খেতে পারত না, যেমন করেই হোক বেরিয়ে গিয়ে নিজের ভাতের সংস্থান করতো। আমি না মরলে ও মানুষ হবে না। মা কালী কবে যে আমায় নেবেন, ওকে মানুষ ক'রে দেবেন, আমি কেবল তাঁর কাছে সেই ভিক্ষে চাচ্ছি। আমি মরলে সবাই বাঁচে, আমারও হাড় ক'খানা জুড়োয়।"

তারা কেবল চোখ মুছিতে লাগিল। ভেবাচাকা খাইয়া শ্যামাচরণ খানিক তাহার পানে তাকাইয়া রহিল।

"ভালো রে, এতে তুমি কাঁদতে ব'সলে কেন? আমি তোমায় কিছু বলেছি যে তুমি কাঁদবে? তোমায় একটাও কথা বলিনি, অথচ শুধু শুধু তুমি—"

বাধা দিয়া তারা বলিয়া উঠিল, "হ্যা, নেহাৎ শুধু শুধু? তুমি আমার ভাইকে যা' না তাই বলবে, আর আমি তা হাসতে হাসতে শুনে যাব? ওর নাকি তেমনি পোড়াকপাল তাই সাত বছর বয়সে মা হারিয়ে তোমার সংসারে এসেছে। কপালে কষ্ট না থাকলে মা সাত

তাড়াতাড়ি মরেই বা যাবে কেন ?"

তাড়াতাড়ি মরণের উত্তরটা খুঁজিয়া না পাইয়া শ্যামাচরণ মাথা চুলকাইতে সুরু করিয়া দিল।

"আজ আসুক সে মুখপোড়া বাড়ীতে, ঝেঁটিয়ে যদি না বিদেয় করি তবে আমি তা'র বড় বোনই নই। তুমি বিদেয় করবে কি—আমিই তাকে সামনাসামনি বলে দেব,—'আমার বাড়ীতে থাকা কারও সহ্য হচ্ছে না, তাকে যেতেই হবে।' যে চুলোয় হোক সে চলে যাক্। রাস্তায় কুকুরগুলোও তো খেতে পায়, সেও না হয় তেমনি ক'রে খাবে তবু যেন বোন বোনায়ের বাড়ীতে সে না থাকে। কেন—খালি কথা শুনবার জন্যে সে পড়ে থাকবে, তুমি দশকথা শুনাবে, পাড়ার লোক দশকথা শুনাবে, কেন? সে কি কারও কিছু উপকারে আসে না, দেহের রক্ত জল ক'রে সে কি এই হতচ্ছাড়া গাঁয়ের লোকের কাজ করে দেয় না? সে ভূতের বেগার খাটছে, —বটে? তার জন্যে আমি মরি লোকের কথা শুনে, আমার বুক ফেটে চৌচির হয়ে যায়—"

বলিতে বলিতে তারা হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

শ্যামাচরণ বড় বিভ্রাটে পড়িয়া গেল। মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল, "ত—এতে তুমি কাঁদছো কেন? আমি তো তাকে যেতে বলছিনে। আমি যা পয়সা পাই তাতে তার মত দশটা ছেলেকে খেতে দিতে পারি; তবে বসে থেকে মাটি হয়ে গেল তাই কথা বলি। এর পরে দেশের লোক গুলো বিন্দুর নাম নিয়ে—"

অকস্মাৎ দীপ্ত হইয়া উঠিয়া তারা বলিল, "চুলোয় যাক, দেশের লোক, আমায় সুদাম সব বলেছে তাইতে আমিই তো তাকে এখন বিন্দুদের বাড়ী যেতে বলি. সে কি আমার যেমন তেমন ভাই, সে কি অন্য লোকদের মতন? এখনও সে পাঁচ বছরের ছেলের মত—কিছু জানে না। নতুন একটা কথা শুনলে সে হাঁ করে চেয়ে থাকে, সে খারাপ কথা কিছু জানে? পোড়া দেশের লোক অধঃপাতে যাক, দেশের লোক মরে যাক।"

শ্যামাচরণ একটু হাসিয়া বলিল, "তা যাক, আমায় এখন একছিলিম তামাক সেজে খাওয়াও দিকিন। ও যে সুদাম, ওরে, এ দিকে শোন এককথা।"

সুদাম ফিরিয়াছিল অনেক আগে, নিকটবর্ত্তী পুঁই শাকের মাচার নীচে জমাট বাঁধা অন্ধকারে, সে এতক্ষ গা-ঢাকা দিয়া ছিল। অপূর্ব্ব পুলকে তাহার মনটা ভরি উঠিয়াছিল—তাই তো দিদির মুখে আজ যে সে নূত কথা শুনিতে পাইতেছে। আজও দুপুরে সে বিন্দুদে বাড়ী যায় বলিয়া দিদি তাহাকে যা-না-তাই বলিয়াছে হঠাৎ দিদির এ শুভমতি দিল কে?

শ্যামাচরণের উঁচু স্বর শুনিয়া সে বাহির হইতে পারি ছিল না। সে স্বর অকস্মাৎ খাদে নামিয়া যাওয়ায় ে ভরসা পাইয়াছিল তাই আস্তে আস্তে বাহির পড়িল।

তারা সপ্তমে গলা চড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল "এ গরমের দিন অন্ধকারে ওখানে বসেছিলি পোড়ারমুখে যদি কিছুতে কামড়াতো? প্রাণে একটু ভয় নেই দি ছোঁড়া?"

মুখ বিকৃত করিয়া ফেলিয়া অ্যাঁ উঁ করিয়া সুদা পিছন দিকে মাচাটার পানে চাহিয়া বলিল, "না ওখানে তো কিছু নেই?"

"কিছু নেই? যদি থাকতো—যদি কামড়াতো তবে কি করতিস মুখপোড়া? এই তিনদিনের কথা পাশের বাড়ীর পটলা ছোঁড়া সাপের কামড়ে ধড়ফড় করে আধ ঘণ্টার মধ্যে মরে গেল, সে কথা তুই জানিস নে? মরবার এত ঝোঁক যদি—তবে আগে মরিস নি কেন, মা যখন গেল মার সঙ্গে গেলি নে কেন? তোরও ভাল হতো আমাকেও এত লোকের কথা সইতে হতো না। দুনিয়া শুদ্ধ সবাই আমায় জ্বালানোর চেষ্টা করছে। জানিনে কার কি করেছি—কার বুকে পাথর ভেঙেছি—"

কাঁদিয়া সে ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল। শ্যামাচরণ অবাক হইয়া বসিয়া রহিল, সুদাম ঘাড় বাঁকাইয়া মাথা নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

তারা ঘর হইতে ডাকিল—"সুদাম, ভাত খাবি আয়। ও বেলা আজ তো না খাওয়া করেই চলে গেছিস, দু'গাল মাত্র ভাত খেয়েছিলি। আগে ভাত খেয়ে নিয়ে তারপর বস গিয়ে।"

শ্যামাচরণ জিজ্ঞাসা করিল "ও বেলা ভাত খাস নি ?"

তেমনি ঘাড় বাঁকাইয়া সুদাম চাপা সুরে বলিল "অল্প দুটো খেয়েছিলুম। দিদি মারতে এসেছিল তাই আমি পালিয়েছিলুম।"

"আচ্ছা, আমায় তামাকটা সেজে দিয়ে ভাত খেতে যা।"

তারা ঘরের মধ্য হইতে বলিল "তামাক সেজে নিয়ে খাও, ও আগে ভাত খেয়ে যাক।"

সুদাম আস্তে আস্তে ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল, শ্যামাচরণ তামাক সাজিয়া লইল।

(৪)

লোকে ঢের কথা বলিলেও সুদাম যেদিন জানিতে পারিল দিদি তাহার কার্য্যকে রাগের চোখে দেখে না, সেদিন হইতে মহা উৎসাহে দিদির সংসারেরও অনেক কাজ করিয়া দিতে লাগিল। বিন্দুদের সুখদুঃখের কথা কোনদিনই সে ভয়ে দিদির কাছে বলিতে পারে নাই, এখন আস্তে আস্তে সে সব কথাও বলিতে আরম্ভ করিল। তাহা, সে বেচারা বড় দুঃখী। একটা অভিভাবক তাহাদের মাথার উপর নাই, বিন্দুকে নিজে খাটিয়া আনিতে হয়। রুগ্না মা তাহার বিছানা হইতে উঠিতে পারে না, বিন্দু কলে গেলে তাহাকে দেখিতে কেহ থাকে না সেইজন্য সুদাম গিয়া তাহাকে দেখাশোনা করে। সে বিন্দুদিদিকে বলিয়াছিল কলের কুলি মজুর সর্দ্দার সকলেই যখন এমন বদ—তখন তাহার কলে কাজ করিতে যাইবার দরকারও নাই। সে বাড়ীতে আগে যেমন থাকিত তেমনিই থাক, সুদাম না হয় এই দুঃস্থ করিবারটীর জন্যই কলে কাজ লইবে, কিন্তু বিন্দুদিদি তাহাতে রাজি হয় নাই। সে রাজি হইবেই বা কেন ? পরের এরূপ দান নিজের সামর্থ্য থাকিতে কেহই লইতে চায় না। সে বলিয়াছে সে যদি সৎ হয় কাহার সাধ্য তাহার অনিষ্ট করে ! সত্যই তাই ; সর্দ্দার ও মজুরেরা জানিয়াছে বিন্দু কলের মজুরণী হইলেও তাহার মন বড় উঁচু ধরণের, তাহার লাগাল কেহ পাইবে না।

তাহার মুখে বিন্দুর বর্ণনা শুনিতে শুনিতে কবে নিজের অজ্ঞাতে তারা তাহাকে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছিল।

সুদাম জিজ্ঞাসা করিয়াছিল "হ্যাঁ দিদি, ওরা নাকি নীচু জাত, আমাদের সঙ্গে চলে না ?"

হাসিয়া তারা বলিয়াছিল "চললে তুই কি তাকে বিয়ে করতিস সুদাম ?"

সুদাম লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিয়াছিল—"দূর দূর, দিদি কি যে কথা বলে ? তুমিও যেমন দিদি সে ও তেমনি দিদি হয় যে—অমন কথা বলতে নেই দিদি।"

ছোট ভাইয়ের হৃদয়ের মহত্ব দেখিয়া তারার বুকখানা ভরিয়া উঠিয়াছিল, সে সেই ছোটবেলার মতই তাহাকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া চুম্বনে চুম্বনে তাহার মাথাটা ভরাইয়া দিয়াছিল, চোখের জলে তাহাকে সিক্ত করিয়া দিয়াছিল। তখন তাহার মনে হয় নাই সে আর সেই ক্ষুদ্র শিশুটী নাই, সে এমন উনিশ কুড়ি বৎসরের একটী তরুণ যুবক।

এমনি ভাবেই দিন চলিতেছিল। সুদামকে জব্দ করিবার জন্য গ্রামের লোক একটা উপায় বাহির করিল ; তাহারা অবিলম্বে প্রচার করিল গোবর্দ্ধন জাতিতে অস্পৃশ্য হাড়ি ছিল, সুদাম হাড়ির গৃহের অন্ন গ্রহণ করিয়াছে অতএব তাহার জাতি নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

শ্যামাচরণ সুদামকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুই তাদের বাড়ী ভাত খেয়েছিস ?"

সুদাম মাথা নত করিয়া তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল, "হ্যাঁ, খেয়েছি তো, তাতে কি হয়েছে ?"

"কি হয়েছে—" শ্যামাচরণের সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া যাইতেছিল—"কি হয়েছে ? তোর জাত গিয়েছে যে হতভাগা। জাতের মধ্যে আর তোর বিয়েও হবে না, খেতেও পাবিনে।"

জাত আবার কি ? ফ্যাল ফ্যাল করিয়া সে শ্যামাচরণের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল, এই জাত যাওয়ার মর্ম্ম সে কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারিল না।

অনেক করিয়া ও তাহাকে বুঝাইতে না পারিয়া ক্রুদ্ধ শ্যামচরণ একটা কঞ্চির দ্বারা বুঝাইবার উদ্দেশ্যে উঠিয়া যাইবামাত্র সুদাম এ ব্যাপারটার মর্ম্ম বুঝিয়া তিন লম্ফে কোথায় উধাও হইয়া গেল, ফিরিয়া আসিয়া শ্যামাচ

আর তাহাকে দেখিতে পাইল না। রাগে সে গর্জ্জিয়া ফিরিতে লাগিল।

তারা একেবারে স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল। সুদাম যে এতটা বাড়াবাড়ি করিয়া ফেলিবে, অবশেষে জাত হারাইয়া আসিবে তাহা সে কখনই ভাবিতে পারে নাই। শ্যামাচরণের যত রাগ, সুদামের অনুপস্থিতে তারার উপর গিয়া পড়িল, সে গর্জ্জিতে লাগিল—তুমিই তো যত নষ্টের মূল নইলে ছোঁড়াটা এরকম করে বয়ে যেত না। এখন তাকে আর ঘরে নেওয়া যাবে না—বেশ হয়েছে। ছোঁড়া এবার বাড়ীর দিকে আসবে কি ঠেঙ্গিয়ে তাকে খোঁড়া করে মারব।"

বাহিরে গ্রাম্য পঞ্চায়েতরা মস্ত বড় সভা করিয়া ফেলিল, ইহাতে স্থির হইয়া গেল সুদাম হাড়ির ভাত খাইয়া যখন হাড়ি হইয়া গিয়াছে তখন কৈবর্ত্ত সমাজে আর কিছুতেই তাহাকে স্থান দেওয়া হইবে না।

মনের মধ্যে নিদারুণ ব্যথা বাজিতে থাকিলেও শ্যামাচরণকে সম্মতি দিতে হইল। বাড়ীর ভিতর আসিয়া সে চেঁচাইতে লাগিল—"তুমি যদি প্রশ্রয় না দিতে, ছোঁড়াটা এমন করে বয়ে যেত না। যত নষ্টের গোড়া তুমিই। এখন কাঁদো আর মাথা খুঁড়ে মর, আমি কিছুতেই তাকে আসতে দেব না, ঘরে উঠতে দেব না। কোথাকার কে ছোঁড়া—তার জন্যে আমি জাতে ঠেলা হয়ে থাকব। মরুক গিয়ে হাড়ির ঘরে জাত দিয়ে আমার তাতে কি।"

'আমার তাতে কি' কথাটা বলা যতদূর সহজ কাজে যদি ততটা হইত তাহা হইলে শ্যামাচরণ দিনের মধ্যে না হোক হাজার বার তাহার কথাই তুলিত না। মনটা তাহার চামড়ার আড়ালে হাড়ের মধ্যে লুটাপুটি খাইতেছিল বাহিরে তাহা কেহই দেখিতে পাইতেছিল না। কি নেমকহারাম মানুষ জাতটা, নইলে সেই সাতবছরের ছেলে—সে কিনা আজ উনিশ বছরের হইয়া—

চুলোয় যাক সে, মরুক সে। জাত হারাইয়া বাঁচিয়া থাকার চেয়ে তাহার মরণই ভাল!

তারা অসুস্থ হইয়া পড়িল; রোগকে উপেক্ষা করিয়া সে শেষটায় একেবারে শয্যাশায়িনী হইয়া পড়িল। শ্যামাচরণ ফাঁপরে পড়িয়া গেল, যত রাগ সব তাহার পড়িল হতভাগা সুদামের উপর। হতভাগা পাড়ায় পাড়ায় কাহার ঘরে অসুখ হইল—কাহার ঔষধ আনা দরকার—জাত হারাইয়াও ইহাই খুঁজিয়া বেড়ায়। জাতের বেলায় লোকে তাহাকে একপাশে ঠেলিয়া রাখিলেও উপকার লইতে এখনও সেই জাত হারারই আশ্রয় লয়। বোনের ব্যারাম সে খবর কি সে পাইতেছে না? তবু—এমনই নিমকহারাম সে—একবার আসিতে পারিল না, একবার খোঁজ লইল না দিদির অসুখ—সে কেমন আছে, ঔষধ পত্রাদি চাই কিনা।

সুদামের উপর অত্যন্ত রাগ করিয়াই সে পনের দিনের ছুটি লইয়া আসিয়া বাড়ীতে বসিল। সে কাজে যাইবে আর সেই সময় চুপি চুপি সুদাম আসিয়া তাহার বোনটীকে দেখিয়া যাইবে—সে কেহ নয়? পাছে তাহার সহিত দেখা হয় সেই ভয়ে তাহার এত লুকাচুরি? বোনটীই তাহার আপনার আর যে কেহ তাহাকে ভালবাসিতে পারে তাহা সে জানে না? উদ্বেলিত অশ্রু শ্যামাচরণের কণ্ঠকে চাপিয়া ধরিল, সে মাথা নাড়িয়া আপন মনে বলিল—"না, তা কক্ষণো হবে না। আসে যদি আমার সামনে আসুক, লুকিয়ে তার আসতে হবে না।"

কিন্তু সে গোপনেও আসে নাই, প্রকাশ্যেও আসিল না। তারার অসুখ দিন দিন বাড়িয়াই চলিল, অবশেষে সে একদিন কাঁদিয়া মুখ ফুটিয়া স্বামীকে বলিল—"ওগো, তোমার পায়ে পড়ি, একবার তাকে আমার কাছে আসতে দাও। সে তোমার জন্যেই আসতে পারছে না, আমায় শেষ একবার তাকে দেখতে দাও।"

মানুষের নির্দ্দয় কথা—বিধাতার কঠোর পরিহাস! তারাও বুঝিয়াছে শ্যামচরণ সুদামকে যথার্থ ঘৃণার চোখে দেখিয়াছে। আচ্ছা তাই হোক, এ কথা সে মানিয়াই লইল।

শ্যামচরণ একটী ছেলেকে অনেক করিয়া বলিয়া সুদামের কাছে পাঠাইয়া দিয়া নিজে বাড়ীর বাহির হইয়া গেল। ভাই-বোনের মাঝখানে ধূমকেতুরূপে বিরাজ করিবার বাসনা তাহার ছিল না।

সন্ধ্যার পরে সে যখন ফিরিয়া আসিল তখন সুদাম দিদির পার্শ্বে বসিয়া আছে। ডাক্তার আনিয়া দেখানো

আশায়

শিল্পী—শ্রীদেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী।

লক্ষ্মীবিলাস প্রেস লিমিটেড।

হইয়াছে, ঔষধপত্র যথাযথভাবে পড়িতেছে। শুধু তাহাকে একবার শেষ দেখা দেখিবার জন্যই তারার চৈতন্য ছিল, সন্ধ্যার সময় সে জ্ঞান হারাইয়া ফেলিয়াছে।

৫

তারার ইহকালের খেলা ফুরাইয়া গেল। সুদাম দিদির বুকের উপর মাথা রাখিয়া নিঃশব্দে খানিক পড়িয়া রহিল। পার্শ্বে শ্যামাচরণ পড়িয়াছিল, নিঃশব্দে সেও চোখের জল ফেলিতেছিল।

সুদাম মুহূর্ত্তে শক্ত হইয়া গেল, উঠিয়া পড়িয়া শ্যামচরণকে একটা ধাক্কা দিয়া বলিল—"ওঠো দাদা, মড়ার একটা গতি করতে হবে তো?"

দুইদিন আগে সে বিন্দুর মায়ের সৎকার করিয়া আসিয়াছে। কোনও লোক মৃতদেহ লইয়া যাইতে রাজি হয় নাই, সে নিজেই বৃদ্ধার জীর্ণদেহ টানিয়া গঙ্গাতীরে লইয়া গিয়াছিল। বিন্দু যখন মায়ের চিতার পার্শ্বে আছড়াইয়া পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেছিল—মাগো আমায় কোথা রেখে গেলে, আমার যে আর কেউ নেই গো।

তখন তাহার মনে হইতেছিল সেও বিন্দুর মত অদৃষ্ট লইয়া আসিয়াছে, দিদি না থাকিলে তাহারও সংসারে আর কেহ থাকিবে না। আজ দিদির মরণের সঙ্গে সঙ্গে সে জানিতেছিল তাহার সব ফুরাইল।

শ্যামচরণ উঠিল না তখন তাহাকেই লোকের চেষ্টায় বাহির হইতে হইল।

সর্দ্দার শ্যামচরণের স্ত্রী মারা গিয়াছে, দলে দলে লোক আসিয়া জুটিল। সুদাম মনের শোক মনেই চাপিয়া বাঁশ কাটিল, দড়ি আনিল, কয়েকজনকে লইয়া চালি প্রস্তুত করিয়া ফেলিল।

মৃতাকে সে নিজেই বহন করিয়া আনিবে ভাবিয়া অগ্রসর হইতেছিল, পঞ্চানন মণ্ডল শক্তস্বরে বলিল,—"দেখ সুদাম, আর সবই তুমি করতে পারো, দেহ ছুঁতে পারবে না।"

সুদাম কাঠ হইয়া গেল, তাহার মুখখানা বিবর্ণ হইয়া গেল, সে ধীর স্বরে জিজ্ঞাসা করিল,—"কেন?"

মণ্ডল তিরস্কারের স্বরে বলিল—"কেন তা তুমি জানো? তোমার কি জাত আছে যে তুমি ছোঁবে? হাড়ির ভাত খাচ্ছো, হাড়ির ঘরে আছ, হাড়ির মেয়েকে বিয়ে করবে—এতেও তুমি জাতের কথা বলতে চাও নাকি? লোকের উপকার তুমি কর তা স্বীকার করছি। আমিও তোমার কাছ হতে অনেক উপকার পেয়েছি—তা বলে তোমার যা করতে নেই তা করতে দিতে পারি নে।"

শ্যামাচরণ সুদামের বিবর্ণ মুখের পানে চাহিয়া অবর্ণনীয় যন্ত্রণা পাইতেছিল। হায়রে অভাগা এতটুকু বেলা হইতে যাহার কোলে মানুষ হইলি, যাহার স্নেহ ভালবাসা পাইলি, আজ তাহার মৃতদেহ স্পর্শ করিবার অধিকারটুকু তোর নাই।

সে জোর করিয়া কথা বলিতে গেল, গ্রামের মণ্ডলেরা ধমক দিয়া তাহাকে থামাইয়া দিল।

সুদাম সকলের পিছনে পিছনে মলিনমুখে শ্মশানে গেল, দূরে দাঁড়াইয়া তাহার মাতৃসমা দিদির দেহ দগ্ধ হইতে দেখিল। দাহান্তে দাহকারীগণ বাড়ী ফিরিয়া গেল। শ্যামাচরণ সুদামের হাত দুখানা চাপিয়া ধরিয়া কাঁদিয়া বলিল—"তুই ঘরে চল সুদাম, আমি তোকে প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে নেব।"

সুদাম রুদ্ধকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—"কিসের প্রায়শ্চিত্ত দাদা?"

"বিন্দুর বাড়ী তোর ভাত খাওয়ার।"

সুদাম সোজা হইয়া দাঁড়াইল, তাহার চোখের জল শুকাইয়া গেল, শুষ্ককণ্ঠে সে বলিল—"কৈবর্ত্তের ঘরে আর আমার ঠাঁই হবে না দাদা, আমি হাড়ির ভাত খেয়েছি, হাড়ির ঘরেই আমি চল্লুম।"

সে অগ্রসর হইয়া পড়িল।

বিন্দুর বাড়ী পৌঁছিয়া সে দাওয়ায় শুইয়া পড়িল। এতক্ষণ সে যে দৃঢ়তার সহিত চলিতেছিল সে দৃঢ়তা তাহার কোথায় চলিয়া গিয়াছিল, এইবার সে আর্ত্তকণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিল—"দিদি"—

বিন্দু নীরবে তাহার কাছে বসিয়া তাহার মাথায়

হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল, তাহার চোখের জল টপ টপ করিয়া সুদামের মাথার উপরে ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

সুদাম মুখ তুলিল, তাহার চোখে তখন প্রবহমান জলধারা।

"আজ আমার কেউ নেই দিদি, আজ তুমি ছাড়া আমার আর কেউ নেই। এতদিন তোমার ঘরে বাস করেও নিজের স্বাতন্ত্র্য বাঁচিয়ে রেখেছিলুম, তুমিও আমার জাতকে বাঁচাতে তোমার একখানা ঘর ছেড়ে দিয়েছিলে। আজ আর স্বাতন্ত্র্যের দরকার হবে না দিদি, আজ হতে সত্যিই আমি তোমার হাতের রান্না খাব। আমার যে দিদি আমি হারিয়ে এসেছি তুমি আমার সেই সত্যিকার দিদি হও, আমি তোমার কোলে মাথা রেখে নীচ হাড়ি বলেও যেন ধন্য হতে পারি।"

বিন্দু ফুলিতেছিল। হায়রে সমাজ, তোমরা জানো না এই তরুণ কতদূর নিষ্ঠার সহিত নিজের জাতীয়তা রক্ষা করিতেছিল, তোমরা তাহাকে এমনই করিয়া দলিয়া পিষ্ট করিয়া দিলে ?

রুদ্ধকণ্ঠে সে বলিল—"এসো দাদা, তোমার দিদি হয়েই আমি যেন নিজের সার্থকতা লাভ করতে পারি।"

সুদাম উঠিয়া বসিল, চোখ মুছিতে মুছিতে বলিল—"দেশের লোক কিছু বুঝলে না দিদি, বুঝলে না তুমি আমার মায়ের মত সেই দিদি, তারা কেমন অসঙ্কোচে এককথা বলে গেল। বলুক ওরা, আমি ওদের কোন কথা কাণে নেব না। তোমায় এখানে আর কাজ করতে হবে না, চল, আমরা টিটাগড়ে চলে যাই। সেখানে আমি কাজের ঠিক করেছি, দুই ভাই বোনে হাড়ি হয়েই সেখানে দিন কাটাব।"

দুদিন বাদে আর তাহাদের দেখা গেল না। গ্রামের লোক হাসিল, হাততালি দিল।

কেবল বড় ব্যথা বাজিল শ্যামাচরণের। সে চোখের জল মুছিতে মুছিতে ভাবিতেছিল মানুষ বড় নেমকহারাম। হাজারই দাও—তারা ফিরে এতটুকু দেবে না। মানুষ শুধু নিতে জানে। ভগবান, আবার যদি জন্ম দাও—সে যদি বিষ্ঠার কীট হয়ে জন্মাই সে-ও আমার প্রার্থনীয়, মানুষ জন্ম যেন আর দিয়ো না।

ঘাসের ফুল

শ্রীজগৎমোহন সেন

ঘাসের বনে হরেক রকম ছোট্ট ফুলের দল
সাজিয়ে রাখে ধরা-রাণীর হরিৎ শ্যামাঞ্চল।
সরল ওদের ধরণ-ধারণ, নাইক আড়ম্বর,
ঘাসের বুকে দুঃখ সুখের ছোট্ট কুঁড়েঘর।
ফুলের দলে ওরা মোটেই নয়ক অভিজাত,—
কোন বড় কাজেই তাদের নাইক কোন হাত।
পূজায় তাদের প্রয়োগ-বিধি শাস্ত্রে নাহি লেখে;
সখের বাগান তাদের ত' হায় ঘৃণার চোখেই দেখে।
আমরা চলি সামনে হেঁটে ওপর-পানে চোখ
থেৎলে চলি পায়ের তলে ও সব ছোটলোক;
পিষ্ট কুসুম পেছনে রয়,—চক্ষে হতাশ্বাস;
পেছন ফিরে দেখতে মোদের কোথায় অবকাশ?
ম্লান হয়ে রয় দলিত ফুল মলিন হাসি হেসে
"কি হ'ল ভাই?" প্রজাপতি শুধায় ছুটে এসে।
কীট এসে তার ক্লিষ্ট হিয়ার ব্যথার ধূলা-বালি
ধোয়াতে চায় সমব্যথার স্নিগ্ধ সলিল ঢালি।
মানুষ! মানুষ! তুমি কি হায় এদেরও হীন হবে?
শ্রেষ্ঠ জীবন-রূপে তোমার সৃষ্টি কেন তবে?
ফুল কি শুধু? যা কিছু সব ছোট তোমার চেয়ে
এমনি করেই পায়ের তলে মাড়িয়ে চল ধেয়ে।

প্রধানমন্ত্রী ও ভারত সচিবের সঙ্গে মহাত্মার পত্র বিনিময়

১৯৩২ সালের ১১ই মার্চ্চ যারবেদা জেল হইতে মহাত্মা গান্ধী সার স্যামুয়েল হোরের নিকট নিম্নলিখিত পত্র প্রেরণ করেন :—

প্রিয় স্যার স্যামুয়েল, আপনার হয়ত স্মরণ আছে, গোলটেবিল বৈঠকে সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় সমূহের দাবী যখন উপস্থিত করা হয়, সেইকালে আমি আমার বক্তৃতার শেষভাগে বলিয়াছিলাম যে, অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য যদি স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন মঞ্জুর করা হয়, তাহা হইলে আমি আমার জীবন দিয়াও তাহার বিরুদ্ধতা করিব। মুহূর্ত্তের আবেগে পড়িয়া কিংবা ভাষার অলঙ্কার হিসাবে আমি ঐ কথা বলি নাই, সম্পূর্ণ [illegible] সহকারেই ঐ বিবৃতি প্রদান করা হইয়াছিল।

আমি আশা করিয়াছিলাম যে, ঐ বিবৃতি অনুসারে স্বতন্ত্র নির্ব্বাচনের বিরুদ্ধে অন্ততঃপক্ষে অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য স্বতন্ত্র নির্ব্বাচনের বিরুদ্ধে আমি জনমত জাগ্রত করিয়া তুলিব; কিন্তু তাহা ঘটিয়া উঠে নাই।

আমাকে যে সব সংবাদপত্র পাঠ করিতে দেওয়া হয়, তাহাতে আমি দেখিতেছি যে, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট যে কোন মুহূর্ত্তে তাঁহাদের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিতে পারেন। প্রথমে আমি মনে করিয়াছিলাম, যদি দেখা যায় যে, ঐ সিদ্ধান্তে অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য স্বতন্ত্র নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহা হইলে আমার প্রতিজ্ঞা পালন করিবার জন্য [illegible]রূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিব। কিন্তু আমার মনে হয় আমি যদি পূর্ব্বে না জানাইয়া কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করি, তাহা হইলে তাহাতে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রতি অবিচার করা হইবে। স্বভাবতঃ আমি আমার বিবৃতিতে যতটা গুরুত্ব দান করি, তাঁহারা তাহাতে ততটা গুরুত্ব দান করিতে পারেন নাই। অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য স্বতন্ত্র নির্ব্বাচনের বিরুদ্ধে আমি যে সব আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলাম, সেগুলির পুনরুক্তি [illegible] আমি অনাবশ্যক মনে করি। আমি নিজকে তাহাদেরই একজন বলিয়া মনে করি। অন্য সকলের হইতে তাহাদের বিষয়টি সম্পূর্ণরূপেই ভিন্ন রকমের। আমি আইন সভাসমূহে তাহাদের প্রতিনিধিত্বের বিরোধী নহি। অন্য সব সম্প্রদায়ের ভোটদানের যোগ্যতার মাপকাটি কঠোরতর হইলেও আমি যোগ্যতা নির্ব্বিশেষে তাহাদের প্রাপ্তবয়স্ক সকল নরনারীর ভোটদানের অধিকার সমর্থন করিব। কিন্তু দৃঢ় বিশ্বাস এই যে নিছক রাজনীতির দিক হইতে যাহাই হউক না কেন, স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন তাহাদের পক্ষে এবং হিন্দু সমাজের পক্ষে অনিষ্টকর। স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন প্রথা তাহাদের পক্ষে কিরূপ অনিষ্টকর হইবে, তাহা সম্যকরূপে উপলব্ধি করিতে হইলে তথাকথিত উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে তাহারা কিরূপভাবে ছড়াইয়া আছে এবং ঐ সব শ্রেণীর উপর তাহাদিগকে কতটা নির্ভর করিতে হয়, সে জ্ঞান থাকা আবশ্যক। হিন্দু-সমাজের কথা বলিতে গেলে এই কথা বলিতেই হইবে যে, স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন প্রথা হিন্দুসমাজকে টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিবে এবং উহাকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিবে। আমার নিকট এইসব সম্প্রদায়ের প্রশ্নটা প্রধানতঃ নৈতিক এবং ধর্ম্ম সম্পর্কিত। রাজনৈতিক দিকটা প্রয়োজনীয় হইলেও নীতি এবং ধর্ম্ম-সম্পর্কিত প্রশ্নের সহিত তুলনা করিতে গেলে উহা নগণ্য হইয়া পড়ে। এই কথাটুকু স্মরণ রাখিলেই আপনি উহাদের মধ্যে আমার মনোভাবের গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইবেন যে, আমার বাল্যকাল হইতেই আমি এইসব শ্রেণীর উন্নতির জন্য আগ্রহপরায়ণ আছি এবং একাধিকবার আমি তাহাদের জন্য আমার সর্ব্বস্ব পণ করিয়াছি।

আমি একটুও অহমিকার বশে এ কথা বলিতেছি না। কারণ আমি মনে করি, বহু শতাব্দী কাল ধরিয়া উচ্চবর্ণের হিন্দুগণ অনুন্নত-সম্প্রদায়কে যেরূপভাবে অধঃপতিত করিয়া রাখিয়াছে, কোনরূপ প্রায়শ্চিত্তের দ্বারাই তাহারা কোনক্রমে তাহার ক্ষতিপূরণ করতে পারে না। কিন্তু আমি জানি, যে নির্ম্মম নিষ্পেষণে এইসব সম্প্রদায় প্রপীড়িত হইয়াছে, স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন তাহার কোনরূপ প্রায়শ্চিত্তও নহে, প্রতীকারও নহে। সুতরাং আমি সবিনয়ে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে জানাইতেছি যে

তাঁহারা যদি অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য স্বতন্ত্র নির্ব্বাচনের সিদ্ধান্ত করেন, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই প্রায়োপবেশনে জীবন বিসর্জ্জন করিব।

আমি বিশেষভাবেই বুঝিতেছি যে, আমি একজন বন্দী। বন্দী অবস্থায় আমি ঐরূপ পন্থা অবলম্বন করিলে তাহাতে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অত্যন্ত বিব্রত হইবার কারণ ঘটিবে এবং আমার ন্যায় স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তির পক্ষে রাজনীতি ক্ষেত্রে ঐরূপ নীতির প্রবর্ত্তন করাকে অনেকে অত্যন্ত অনুচিত মনে করিবেন। তাঁহারা ঐ নীতিকে হিষ্টিরিয়া বা বায়ু-রোগজনিত চিত্তবিক্ষোভ কিংবা তদপেক্ষাও খারাপ কিছু বলিতে পারেন। আমার স্বপক্ষে শুধু ইহাই বলিবার আছে যে, পূর্ব্বসঙ্কল্পিত কোন কার্য্যকে আমি কর্ম্মপন্থা স্বরূপ মনে করি না। উহাকে আমি আমার জীবনেরই অংশস্বরূপ মনে করি। যে আহ্বান আমার বিবেকের আমি তাহা অমান্য করিতে পারি না, স্থির মস্তিষ্কতার জন্য আমার যে কিছু খ্যাতি আছে, যদি উহাতে তাহা নষ্ট হয়, তাহাও স্বীকার।

আমি এখন যতদূর দেখিতে পাইতেছি, বন্দী অবস্থা হইতে আমি যদি মুক্তিলাভ করি, তাহাতেও প্রায়োপবেশন অবলম্বন কর্ত্তব্য ; আমার পক্ষে এই সঙ্কল্প কিছুমাত্র হ্রাসপ্রাপ্ত হইবে না।

যাহা হউক, আমি এই আশা করিতেছি যে, আমি যে সব ভয় করিতেছি, তাহা সম্পূর্ণরূপেই অকারণ। সম্ভবতঃ অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য স্বতন্ত্র নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা করিবার কোন মতলব ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের নাই।

আর একটি বিষয় লইয়া আমি অত্যন্ত চিন্তায় পতিত হইয়াছি। সে বিষয়টির কথাও বলিয়া রাখা ভাল ; কারণ উহার জন্যও আমাকে অনুরূপ উপবাস ব্রত গ্রহণ করিতে হইতে পারে। যেভাবে পীড়ননীতি চলিতেছে, আমি তাহার কথাই বলিতেছি। দমননীতি তাহার মাত্রা ছাড়াইয়া যাইতেছে। সরকারী বিভীষিকা দেশের সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া যাইতেছে। ইংরেজ এবং ভারতীয় কর্ম্মচারী উভয়কেই পশুতে পরিণত করা হইতেছে। গবর্ণমেণ্ট ভারতবাসীদের প্রতি অমানুষিক আচরণকে প্রশংসার্হ বলিয়া পুরস্কৃত করাতে উচ্চনীচ ভারতীয় কর্ম্মচারীরা সকলেই নীতিভ্রষ্ট হইয়া পড়িতেছে। স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকার সঙ্কুচিত করা হইয়াছে। আইন এবং শান্তি রক্ষায় নাকি গুণ্ডাগিরি চলিতেছে। যে সব নারী দেশসেবার জন্য ঘরের বাহিরে আসিয়াছেন, তাঁহাদের মর্য্যাদাহানির আশঙ্কার কারণ ঘটিয়াছে।

আমার মনে হয়, কংগ্রেস যে স্বাধীনতা চাহে, সেই স্বাধীনতার প্রবৃত্তি পিষ্ট করিবার জন্যই এই সব করা হইতেছে। নিষ্ক্রিয়ভাবে সাধারণ বিধিভঙ্গের জন্য দণ্ডদানেই এই পীড়ননীতি নিবদ্ধ নহে। স্বৈরতন্ত্রের নব নির্ম্মিত বিধানরাজি ভঙ্গের জন্য উহা লোকদিগকে বাধ্য করিতেছে ? ঐ সব বিধান অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেশের লোকদের অবমাননার জন্য পরিকল্পিত হইতেছে।

এই সব কার্য্যের মধ্যে আমি গণতন্ত্রের ভাব দেখিতে পাইতেছি না। সত্যই, সম্প্রতি ইংলণ্ড পরিদর্শনে গিয়া আমার এই মত দৃঢ় হইয়াছে যে, আপনাদের গণতন্ত্র একটা সীমাবদ্ধ বস্তু। বিশেষ গুরুত্ব সম্পন্ন বিষয়-সমূহ ও কতকগুলি ব্যক্তি অথবা দল পার্লামেণ্টে সেগুলি না তুলিয়াই সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন, এবং পার্লামেণ্টের যে সব সদস্যের দ্বারা ঐগুলি মঞ্জুর করাইয়া লওয়া হয়, তাঁহারা যে কি করিতেছেন, সে সম্বন্ধে তাঁহাদের স্পষ্ট কোন ধারণাই থাকে না। মিশরের বেলায় ঐরূপ ঘটিয়াছিল, ১৯১৪ সালের যুদ্ধের বেলায়ও ঐরূপ ঘটে। যে শাসনপদ্ধতিকে গণতান্ত্রিক বলিয়া অভিহিত করা হয়, সেই শাসন পদ্ধতিতে একটা প্রাচীন জাতির তেত্রিশ কোটীর অধিক লোকের অদৃষ্ট নিয়মনের অবাধ কর্ত্তৃত্ব একজন লোকের হাতে থাকিবে এবং ধ্বংসের অতি ভীষণ শক্তির আশ্রয়গ্রহণের দ্বারা তাঁহার সিদ্ধান্তসমূহ কার্য্যে পরিণত করা হইবে, এ চিন্তা করিতেও আমার সমস্ত অন্তরাত্মা বিদ্রোহী হইয়া উঠে।

উভয় জাতির মধ্যে অপ্রীতির ভাব দেখা দিয়াছে। ঐ পীড়ননীতি যতই চলিবে, অপ্রীতির ভাব ততই বর্দ্ধিত হইবে, ইহা না হইয়া যায় না। আমার নিজের দায়িত্বে আমি এই গতি কিরূপে রুদ্ধ করিতে পারি এইরূপ চেষ্টা করা আমার ধর্ম্মবিশ্বাসের অঙ্গীভূত। আমি নিজকে এক এক জন প্রকৃতিসিদ্ধ গণতান্ত্রিক মনে করিয়া থাকি। গণতন্ত্রের সম্বন্ধে আমি যে ধারণা পোষণ করি, তাহাতে নিজের অভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে দৈহিক বলপ্রয়োগ করাকে আমি গণতন্ত্রের নীতির সহিত সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যহীন মনে করিয়া থাকি। সাধারণতঃ যে সব ক্ষেত্রে দৈহিকশক্তি প্রয়োগ আবশ্যক এবং সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে, সেই সব ক্ষেত্রেই নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের পদ্ধতি দুঃখকষ্ট বরণ করিবার পদ্ধতি। উহার কার্য্যক্রমের একটি অংশ এই যে, কতকগুলি ক্ষেত্রে নিষ্ক্রিয় প্রতি-রোধকারীকে শেষ পর্য্যন্ত উপবাস করিয়াও আত্মবিসর্জ্জন করিতে হয়। আমার জন্য ঐ মুহূর্ত্ত এখনও সমুপস্থিত হয় নাই। ঐরূপ ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য আমি ভিতর হইতে এখনও অভ্রান্ত আহ্বান পাই নাই। কিন্তু বাহিরে যে সব ব্যাপার ঘটিতেছে, তাহাই আমার অন্তরাত্মা বিচলিত হইবার পক্ষে যথেষ্ট। কাজেই অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য আমার উপবাস ব্রত অবলম্বনের সম্ভাবনার কথা আপনার নিকট লিখিতে গিয়া আমি যদি আপনাকে একথাটাও না জানাই যে, অদূর ভবিষ্যতে অনুরূপ উপবাস ব্রত অবলম্বনের আর একটি সম্ভাবনাও রহিয়াছে, তাহা হইলে আপনার নিকট আমার কর্ত্তব্য পালন করা হইবে না বলিয়া আমি মনে করি।

একথা বলা বাহুল্য যে, আপনার সহিত আমার যে সব চিঠিপত্র লেখালেখি হইয়াছে, আমার দিক হইতে আমি সেগুলি সম্পূর্ণ গোপন রাখিয়াছি। সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল এবং শ্রীযুত মহাদেব দেশাইকে কিছুদিন হইল, আমাদের সহিত যোগদান করিতে প্রেরণ করা হইয়াছে। তাঁহারা অবশ্য এ সম্বন্ধে সব কথা জানেন। কিন্তু আপনি যেমন খুসি এই চিঠি ব্যবহার করিতে পারেন।

ভবদীয় বিশ্বস্ত
(স্বাক্ষর) এম, কে গান্ধী

ভারত সচিবের উত্তর

১৯৩২ সালের ১৩ই এপ্রিল সার স্যামুয়েল হোর মহাত্মা গান্ধীর নিকট নিম্নলিখিত চিঠি লিখেন :—

"প্রিয় মিঃ গান্ধী, আপনি ১১ই মার্চ্চ তারিখে যে চিঠি লিখিয়াছেন, আমি তাহার জবাব দিতেছি। আমি আপনাকে বিশেষভাবেই বলিতেছি যে অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন সম্বন্ধে আপনার মনোভাবের গভীরতা আমি সম্পূর্ণরূপেই উপলব্ধি করি। আমি শুধু এই কথা বলিতে পারি যে, কোন ক্ষেত্রে কিরূপ ব্যবস্থা আবশ্যক, সম্পূর্ণভাবে তাহা বিবেচনা করিয়াই আমরা আমাদের সিদ্ধান্ত প্রদান করিতে স্থির করিয়াছি। আপনি জানেন, লর্ড লোথিয়ানের কমিটি এখনও তাঁহাদের সকল সমাধা করেন নাই। এই কমিটি কি সিদ্ধান্ত করিবেন, তাহা অবগত হইতে আমাদের আরও কয়েক সপ্তাহ নিশ্চয়ই কাটিয়া যাইবে। ঐ কমিটির রিপোর্ট পাইলে তাহাদের সুপারিশগুলি আমাদিগকে বিশেষভাবে বিবেচনা করিতে হইবে। এব কমিটীর মতের সঙ্গে আপনার এবং আপনার সমমতাবলম্বীদের মতের কথাও বিবেচনা না করিয়া আমরা কোন সিদ্ধান্ত প্রদান করিব না। আমার খুবই বিশ্বাস, আপনি যদি আমাদের মত অবস্থায় পতিত হইতেন, তাহা হইলে আমরা যেরূপভাবে কাজ করিব মনে করিয়াছি, আপনিও ঠিক তাহাই করিতেন।

আপনিও ঐ কমিটির রিপোর্টের প্রতীক্ষা করিতেন, উহা পাইবার পর উহার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ভাবে বিবেচনা করিতেন এবং সিদ্ধান্তে পৌছিবার পূর্ব্বে বিতর্কে উভয়পক্ষের অভিব্যক্ত মতামতের সম্বন্ধে বিবেচনা করিতেন। এতদতিরিক্ত আমি আর কিছু বলিতে পারিনা। আমি এতদতিরিক্ত বেশী কিছু বলিতে পারি বলিয়া বোধ হয়, আপনিও আশা করেন না।

অর্ডিন্যান্সগুলির সম্বন্ধে প্রকাশ্যভাবে এবং ঘরোয়াভাবে আমি ইতিপূর্ব্বে যে সব কথা বলিয়াছি, আজিও শুধু তাহারই পুনরাবৃত্তি করিতে পারি। সুনিয়ন্ত্রিত গবর্ণমেণ্টের ভিত্তিমূলে স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে আঘাত করা হইতেছে। এরূপ ক্ষেত্রে ঐগুলি প্রয়োগ করা যে অত্যাবশ্যক এবিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নাই। আমি ইহাও সম্পূর্ণরূপেই বুঝিতেছি যে, ভারত-গবর্ণমেণ্ট ও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহ তাঁহাদের ব্যাপক অধিকারের অপব্যবহার করিতেছেন না এবং পীড়ন এবং আক্রমণাত্মক কার্য্য বন্ধ করিবার জন্য তাঁহারা যথাসম্ভব চেষ্টা করিতেছেন। বৈপ্লবিক উপদ্রব হইতে আমাদের কর্ম্মচারীবৃন্দকে এবং সমাজের অন্যান্য শ্রেণীকে রক্ষা করিবার জন্য যতদিন আমাদিগকে বাধ্য হইয়া জরুরী ব্যবস্থাসমূহ বলবৎ রাখিতে হইবে, তাহার অধিককাল ঐগুলি বলবৎ রাখিব না।

ভবদীয়

[স্বাক্ষর] স্যামুয়েল হোর।

প্রধান মন্ত্রীর নিকট পত্র

মহাত্মা গান্ধী ১৯৩২ সালের ১৮ই আগষ্ট যারবেদা জেল হইতে প্রধান মন্ত্রীর নিকট নিম্নলিখিত পত্র প্রেরণ করেন :—

প্রিয় বন্ধু, অনুন্নত সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে আমি গত ১১ই মার্চ্চ সার স্যামুয়েল হোরের নিকট যে চিঠি লিখিয়াছিলাম, তিনি নিশ্চয়ই মন্ত্রীসভাকে তাহা দেখাইয়াছেন। সেই চিঠিকে এই চিঠির অংশরূপে বিবেচনা করিতে হইবে এবং এতৎসহ উহা পাঠ করিলে ঠিক অর্থ বুঝা যাইবে। সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, আমি তাহা পাঠ করিয়াছি এবং ঐ সম্বন্ধে বিশেষ চিন্তা করিয়াছি। আমি সার স্যামুয়েল হোরের নিকট যে চিঠি লিখিয়াছি এবং ১৯৩১ সালের ১৩ই নবেম্বর সেণ্টজেমস প্রাসাদে গোলটেবিল বৈঠকের সংখ্যালঘিষ্ঠ কমিটীতে যে ঘোষণা করিয়াছিলাম, তদনুসারে আমার জীবন দিয়া আমাকে আপনার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধতা করিতে হইবে। ঐ কার্য্য করিতে গেলে আমাকে এই ঘোষণা করিতে হয়, যতদিন আমার মৃত্যু না ঘটিবে লবণ এবং সোডা সহ জল অথবা শুধু জল ছাড়া অন্য কোনপ্রকার খাদ্য গ্রহণ করিব না। এই উপবাস ব্রত অবলম্বন করিয়া থাকিবার সময় ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট যদি স্বেচ্ছায় অথবা জনমতের চাপে পড়িয়া তাঁহাদের সিদ্ধান্তের পরিবর্ত্তন সাধন করেন এবং অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচনের নীতি প্রত্যাহার করেন শুধু তাহা হইলেই উপবাস ব্রতের বিরতি ঘটিবে। সাধারণ নির্ব্বাচকমণ্ডলী হইতে অনুন্নত সম্প্রদায়কে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিতে দিতে হইবে। ইতিমধ্যে যদি বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সিদ্ধান্তের পরিবর্ত্তন না ঘটে তাহা হইলে প্রস্তাবিত অনশনব্রত স্বাভাবিক মত ২০শে সেপ্টেম্বরের দ্বিপ্রহর হইতে আরম্ভ হইবে। আপনি যাহাতে যথেষ্ট সময় পান সেজন্য আমি এখানকার কর্ত্তৃপক্ষকে এই চিঠির মর্ম্ম তারযোগে আপনাকে জানাইবার জন্য বলিতেছি। যদি খুব বেশী বিলম্বে এই চিঠি আপনার নিকট পৌছে, তাহা হইলেও আপনার বিবেচনার জন্য আমি যথেষ্ট সময় রাখিতেছি। এই চিঠি এবং সার স্যামুয়েল হোরের নিকট আমি যে চিঠি লিখিয়াছি, যথাসম্ভব সত্বর আমি তাহাও প্রকাশ করিতে বলিতেছি। আমার নিজের দিক হইতে আমি কড়াকড়ি রকমে জেলের নিয়ম মানিয়া চলিয়াছি। আমার এই চিঠি দুইখানার বিষয় সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল এবং শ্রীযুত মহাদেব দেশাই, আমার এই দুইজন সঙ্গী ব্যতীত অপর কাহাকেও জানাই নাই। কিন্তু আমার ইচ্ছা যদি আপনাদের পক্ষে সম্ভব হয়, তাহা হইলে জনসাধারণের নিকট আমার চিঠি উপস্থিত করিবেন; এজন্য সত্বর এগুলি প্রকাশ করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি। আমাকে অনশনের সিদ্ধান্ত করিতে হইল বলিয়া আমি দুঃখিত। কিন্তু আমি নিজকে একজন ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তি বলিয়া দাবী করিয়া থাকি। আমার পক্ষে অন্য পথ নাই। আমি সার স্যামুয়েল হোরের নিকট যে কথা লিখিয়াছি, এখনও সেই কথা বলিতেছি।

নিজেরা যাহাতে বিব্রত না হন, সেজন্য যদি বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট আমাকে মুক্তিদান করার সিদ্ধান্তও করেন, তাহা হইলেও আমাকে আমার উপবাস চালাইতে হইবে। কারণ অন্য কোন উপায়ে ঐ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধতা করিবার আশা আমি দেখি না। সম্মানজনক উপায় ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে আমি আমার মুক্তির কল্পনা করিতে পারি না। হয়ত আমার বিবেচনা নির্ভুল নহে এবং অনুন্নত সম্প্রদায়ের স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন তাহাদের পক্ষে অথবা হিন্দু সমাজের পক্ষে অনিষ্টকর মনে করিয়া আমি ভ্রম করিয়াছি। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে জীবনের দার্শনিকতার অন্যান্য দিক হইতেও সম্ভবতঃ আমি ঠিক চলি নাই। সেরূপ ক্ষেত্রে উপবাস ব্রত অবলম্বনের দ্বারা আমার জীবন বিসর্জ্জন একাধারে আমার উক্ত ভ্রান্তির জন্য আমার পক্ষে প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ হইবে এবং যে অসংখ্য নরনারী শিশুর ন্যায় সরলহৃদয়ে আমার বিজ্ঞতায় বিশ্বাস করিয়া আছে, তাহাদের বুক হইতে একটা ভার নামিয়া যাইবে। পক্ষান্তরে আমি যে বিষয়ে নিঃসন্দেহ আমার বিচার যদি তদ্রূপ ঠিকই হইয়া থাকে, তাহা হইলে সঙ্কল্পিত কার্য্যক্রমে আমার জীবনের কর্ম্মপ্রণালীই যথাযোগ্যভাবে পরিপূর্ণ হইবে।

ভবদীয় বিশ্বস্ত

(স্বাক্ষর) এম, কে, গান্ধী

মিঃ ম্যাকডোনাল্ডের উত্তর

১০ নং ডাউনিং ষ্ট্রীট,

৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩২।

প্রিয় মিঃ গান্ধী ;—আপনার পত্র পাইয়া আমি অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত এবং আন্তরিক দুঃখিত হইলাম। আমি মনে না করিয়া পারিতেছি না যে, অনুন্নত সম্প্রদায় সংশ্লিষ্ট সমস্যা সম্পর্কে বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের সিদ্ধান্ত বিষয়ে আপনি ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই ঐ পত্র লিখিয়াছেন। আমি সর্ব্বদাই এই ধারণা পোষণ করিয়াছি যে, হিন্দুসমাজ হইতে অনুন্নত সম্প্রদায়কে চিরদিনের জন্য পৃথক্ করিয়া ফেলার আপনি ঘোরতর বিরোধী। সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় কমিটীর সভায় আপনার আচরণ হইতে উহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত গত ১১ই মার্চ্চ তারিখে সার স্যামুয়েল হোরের নিকট আপনি যে চিঠি লিখিয়াছেন, তাহাতেও উহাই প্রতিফলিত হইয়াছে। আমরা জানি, অধিকাংশ হিন্দুই আপনার মতের পোষক ; এইজন্যই অনুন্নত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব সমস্যা সম্পর্কে বিবেচনার সময় আমরা ঐ বিষয়টীর প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিয়াছিলাম। অনুন্নত সম্প্রদায়ের নিকট হইতে আমরা অসংখ্য আবেদন পাওয়ায় এবং যেরূপ সামাজিক অক্ষমতার মধ্যে উহাদিগকে কাজ করিতে হয় (উহা আপনিও স্বীকার করিয়াছেন) তাহাতে আইন সভায় উহারা যাহাতে যুক্তিযুক্ত প্রতিনিধিত্ব পায় এজন্য কিছু সংরক্ষণমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন, আমরা আমাদের কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিয়াছিলাম। তবে যাহাতে উহারা হিন্দুসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া না পড়ে, তৎপ্রতিও আমরা যথেষ্ট পরিমাণ অবহিত ছিলাম। আপনিও আপনার ১১ই মার্চ্চের পত্রে জানাইয়াছেন যে, আপনিও আইনসভায় উহাদের প্রতিনিধিত্বের বিরোধী নহেন। বৃটীশ সরকারের পরিকল্পনা এই যে, অনুন্নত সম্প্রদায় হিন্দু সম্প্রদায়েরই অঙ্গ বিশেষ হইয়া থাকিবে এবং হিন্দু নির্ব্বাচক মণ্ডলীতে সম অধিকারের ভিত্তিতেই ভোট দানের অধিকার ভোগ করিবে। তবে বর্ত্তমানে মাত্র ২০টী বৎসরের জন্য হিন্দু সম্প্রদায়ের অঙ্গীভূত থাকিয়াও কয়েকটি বিশেষ বিশেষ স্থলে উহাদের নিজেদের অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষিত রাখিবার ব্যবস্থা থাকিবে। আমাদের মনে হয়, বর্ত্তমান অবস্থায় উহা আবশ্যক। যে সকল স্থানে উহাদের জন্য বিশেষ নির্ব্বাচন মণ্ডলীর সৃষ্টি করার ব্যবস্থা করা হইয়াছে, ঐ সকল স্থানে উহাদের সাধারণ হিন্দু নির্ব্বাচকমণ্ডলীতে ভোটদানের অধিকার থাকিবে। ঐ সকল স্থানে উহাদের দুইটী করিয়া ভোট থাকিবে, এই ব্যবস্থায় উহারা অনায়াসে হিন্দু সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত থাকিতে পারিবে।

আমরা অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক—আপনার ভাষায় 'সাম্প্রদায়িক' নির্ব্বাচনমণ্ডলী গঠনের বিরুদ্ধেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছি এবং যাহাতে উচ্চবর্ণের হিন্দুগণকে অনুন্নতদের এবং অনুন্নতদের—উচ্চবর্ণের হিন্দুদের ভোটের প্রত্যাশী থাকিতে হয়, এইজন্য অনুন্নত সম্প্রদায়কে সাধারণ বা হিন্দু নির্ব্বাচকমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্তই রাখিয়াছি। এইভাবে সকল দিক দিয়াই হিন্দু সমাজের ঐক্য বন্ধন অব্যাহত রাখিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। আমরা এটুকু বেশ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি যে, দায়িত্বশীল শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তিত হওয়ার প্রারম্ভে যখন সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের হাতে আইন সভার ক্ষমতার ভারকেন্দ্র নির্ভর করিবে ; তখন ঐ প্রদেশের আইন সভায় অনুন্নত সম্প্রদায়ের অন্ততঃ কয়েকজন প্রতিনিধি যাহাতে নিজেদের স্বার্থ বজায় রাখিবার জন্য ও নিজেদের অভাব অভিযোগ বলিবার জন্য প্রবেশ করিতে পারেন কিম্বা নিজেদের স্বার্থরক্ষা ব্যবস্থায় যাহাতে তাহারা নিজেরা অবহিত হইতে পারেন, প্রত্যেক বিবেচক ব্যক্তিই তাহার পক্ষপাতী। আপনিও সার স্যামুয়েল হোরের নিকট যে পত্র লিখিয়াছেন তাহাতে লিখিয়াছিলেন যে উচ্চবর্ণের হিন্দুগণ যুগ যুগ ধরিয়া অনুন্নত সম্প্রদায়কে অবনতির পথে ঠেলিয়া রাখিয়াছে।

আমরা মনে করি না যে, যুক্ত নির্ব্বাচনের ভিত্তিতে যে কোন যুক্তিযুক্ত ভোটাধিকার নীতিতে আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থায় অনুন্নত সম্প্রদায়ের পক্ষে তাহাদের স্বার্থের প্রতি অবহিত ও দায়িত্বশীল প্রতিনিধি প্রেরণ সম্ভবপর হইবে। কেননা, ঐ সকল প্রতিনিধিরা প্রায় সকল স্থলেই অধিকসংখ্যক উচ্চবর্ণের হিন্দুর ভোটের বলেই নির্ব্বাচিত হইবেন।

সাধারণ হিন্দু নির্ব্বাচকমণ্ডলীতে স্বাভাবিক নির্ব্বাচনাধিকার [illegible] রেকেও কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক নির্ব্বাচনমণ্ডলীর [illegible]

ভারতে যে বিশেষ অধিকার প্রদানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহা হইতে পৃথক সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন দ্বারা অবলম্বিত সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় (যথা মুসলমান) প্রতিনিধি নির্ব্বাচন ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিভিন্ন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, কোন মুসলমান সাধারণ নির্ব্বাচকমণ্ডলীতে ভোট দিতে কিম্বা সাধারণ নির্ব্বাচকমণ্ডলী হইতে নির্ব্বাচন প্রার্থী হইতে পারিবে না। পরন্তু নির্ব্বাচনের ক্ষমতাপ্রাপ্ত অনুন্নত সম্প্রদায়ের যে কোন লোক সাধারণ নির্ব্বাচকমণ্ডলী হইতে নির্ব্বাচনপ্রার্থী হইতে পারিবে। প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাসমূহে মুসলমানদের সংখ্যা এরূপভাবে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাসমূহে তাহাদের পক্ষে সংখ্যা বৃদ্ধি করা সম্ভবপর হইবে না এবং অধিকাংশ প্রদেশে মুসলমানগণ জনসংখ্যার অনুপাতে অধিক সংখ্যক প্রতিনিধি প্রেরণের অধিকার পাইবে। অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য নির্দ্দিষ্ট বিশেষ নির্ব্বাচকমণ্ডলী হইতে প্রেরিত বিশেষ প্রতিনিধি সংখ্যা সমগ্র অনুন্নত সম্প্রদায় হইতে প্রেরিত প্রতিনিধির সংখ্যার অনুপাতে কম হইবে বা তাহাতে ব্যবস্থাপক সভার কেবলমাত্র অনুন্নত সম্প্রদায় কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি সংখ্যা ন্যূনতম হইতে পারে, তজ্জন্য এই ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ব্যবস্থাপক সভাসমূহে অনুন্নত সম্প্রদায় হইতে নির্ব্বাচিত বিশেষ প্রতিনিধির সংখ্যা তাহাদের লোকসংখ্যার অনুপাতে অত্যন্ত কম হইয়াছে। আমি আপনার মনোভাব এই বুঝিতে পারিয়াছি যে, অপরাপর হিন্দুদের সহিত অনুন্নত সম্প্রদায়ের যুক্তনির্ব্বাচন অধিকার লাভের জন্য (যেহেতু এইরূপ ব্যবস্থাই উপর্য্যুক্ত অবলম্বিত হইয়াছে) কিম্বা হিন্দুদের মধ্যে ঐক্য বজায় রাখিবার নিমিত্ত (এরূপ ব্যবস্থাও অবলম্বিত হইয়াছে) আপনি অনশনব্রত গ্রহণ করিয়া মৃত্যুবরণের চরম পন্থা অবলম্বনের প্রস্তাব করেন নাই, পরন্তু অনুন্নত সম্প্রদায়ের লোকেরা (যাহারা বর্ত্তমানে প্রকৃত অসুবিধা ভোগ করিতেছে) যাহাতে ব্যবস্থাপক সভাসমূহে তাহাদের নিজেদের তরফ হইতে কথা বলিবার জন্য নিজেরা নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের ক্ষমতা (এতদ্বারা তাহাদের ভবিষ্যতে প্রভূত উপকার হইবে) পাইতে পারে, তাহাতে বাধা দিবার জন্যই আপনি উক্তরূপ প্রস্তাব করিয়াছেন। এই সব নিরপেক্ষ এবং সতর্ক প্রস্তাবসমূহের দিক হইতে বিবেচনা করিলে পর আপনার উক্তরূপ সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইবার কারণ বুঝিতে পারি না এবং আমার মনে হয় যে, প্রকৃত বিষয়সমূহের অযথার্থ গ্রহণ করিয়া আপনি এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। ভারতীয়েরা নিজেরা একটা আপোষ রফা করিতে অসমর্থ হইয়া গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করায় গবর্ণমেণ্ট এক প্রকার স্বীয় ইচ্ছার বিরুদ্ধে সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় সম্পর্কিত সমস্যার সমাধান করিবার ভার গ্রহণ করেন। গবর্ণমেণ্ট এক্ষণে রায় দিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত সর্ত্ত ব্যতীত গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে এরূপ সিদ্ধান্তের কোন প্রকার পরিবর্ত্তন আশা করা যাইতে পারে না। সুতরাং আমার মনে হয়, উত্তরে আপনাকে জানাইতে হইবে যে, গবর্ণমেণ্টের সিদ্ধান্ত বজায় থাকিবে এবং গবর্ণমেণ্ট নির্ব্বাচন সম্বন্ধে অন্যান্য ব্যবস্থার যৌক্তিকতা সম্বন্ধে যে বিবেচনা করিয়াছেন, কেবলমাত্র তাহা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা আপোষ রফার পরিবর্ত্তিত হইতে পারে।

আপনি এই পত্র ও গত ১১ই মার্চ্চ তারিখে সার স্যামুয়েল হোরের নিকট লিখিত পত্র প্রকাশ করিবার অনুরোধ জানাইয়াছেন। আপনি বর্ত্তমানে আবদ্ধ আছেন বলিয়াই যে আপনার অনশনব্রত গ্রহণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশের কারণ জনসাধারণের নিকট বিবৃত করার সুযোগ হইতে আপনাকে বঞ্চিত করা হইবে, ইহা আমার নিকট ন্যায়সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। আপনি যদি পুনর্ব্বিবেচনার পর উহার পুনরাবৃত্তি করেন, তাহা হইলে আমি দ্বিধাবোধ না করিয়া আপনার অনুরোধ রক্ষা করিব। যাহা হউক, আমি পুনরায় আপনাকে গবর্ণমেণ্ট সিদ্ধান্তের প্রকৃত বিবরণ সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া আপনার সঙ্কল্পিত কার্য্য করা প্রকৃতপক্ষে আপনার পক্ষে যুক্তিসঙ্গত কিনা তাহা মীমাংসা করিবার অনুরোধ জানাইতেছি।

বশম্বদ

(স্বাক্ষর) জে, র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড।

মহাত্মাজীর উত্তর

১৯৩২ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর তারিখে মহাত্মা গান্ধী যারবেদা জেল হইতে মিঃ র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ডের নিকট নিম্নলিখিত মর্ম্মের পত্রখানি প্রেরণ করেন :—

প্রিয় বন্ধু অদ্য আপনার স্পষ্ট উক্তিপূর্ণ বিস্তৃত টেলিগ্রাম পাইলাম। এই জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। যাহা হউক, আপনি আমার সঙ্কল্পিত পন্থার যে ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন, তাহা আমার আদৌ মনে আসে নাই। এজন্য আমি দুঃখিত। আমি যে অবনত সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষায় ব্যাঘাত জন্মাইবার জন্য অনশনে মৃত্যুবরণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছি বলিয়া আপনি আমার প্রতি দোষারোপ করিয়াছেন, আমি সেই সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে কথা বলিবার দাবী উপস্থিত করিয়াছি। আমি আশা করিয়াছিলাম যে, চরমপন্থা অবলম্বন দ্বারা এরূপ কোন প্রকার স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট ব্যাখ্যা নিবারণ করা সম্ভবপর হইবে। আমি দৃঢ়তা সহকারে ইহাও বলিতে চাই যে, এই বিষয় আমার নিকট ধর্ম্মের অঙ্গবিশেষ। শুধুমাত্র অনুন্নত সম্প্রদায়ের ডবল ভোটাধিকার তাহাদিগকে কিম্বা সমগ্র হিন্দুসমাজকে ধ্বংসের মুখ হইতে রক্ষা করিতে পারিবে না।

অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক নির্ব্বাচনমণ্ডলী প্রতিষ্ঠায় আমি দেখিতে পাইতেছি যে, হিন্দুসমাজের ধ্বংসকারী এক কালাগ্নিশিখাই প্রজ্বলিত করা হইয়াছে। উহা অনুন্নত সম্প্রদায়ের পক্ষেও কোনক্রমেই কল্যাণপ্রসূ হইবে না। আমাদের প্রতি আপনাদের যতই সহানুভূতি থাকুক না কেন, একথা বলিলে অসন্তুষ্ট হইবেন না যে, এই ধরণের একটী গুরুত্বপূর্ণ জটিল ও ধর্ম্মসংশ্লিষ্ট বিষয়ে আপনারা যথাযথ সিদ্ধান্ত করিতে অক্ষম। অনুন্নত সম্প্রদায় যদি অতি মাত্রায় বেশী পরিমাণ প্রতিনিধিত্ব পায়,

তাহাতেও আমি আপত্তি করিব না কিন্তু উহারা হিন্দু সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত থাকিবার ইচ্ছুক থাকিলেও উহাদিগকে হিন্দুসমাজ হইতে আইন দ্বারা বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলার আমি বিরোধী। আপনারা কি বুঝিতে পারিতেছেন না যে, যদি আপনাদের সিদ্ধান্ত বহাল থাকে এবং ঐ ধরণের শাসনতন্ত্র ইত্যাদি প্রবর্ত্তিত হয়, তাহা হইলে যে সকল হিন্দু সংস্কারক তাঁহাদের অনুন্নত ভ্রাতৃবৃন্দের উন্নয়ন প্রচেষ্টায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, তাঁহাদের কার্য্যশক্তির অগ্রগতিকে বহুল পরিমাণে ব্যাহত করিয়া দিবেন ?

এই সমস্ত কারণেই আমি আমার পূর্ব্বসিদ্ধান্তে দৃঢ় থাকিতে বাধ্য হইলাম।

আমি আপনাদের সিদ্ধান্ত মধ্যে অনুন্নত সম্প্রদায়ের সম্পর্কিত ব্যবস্থা লইয়া আলোচনা করিলাম বলিয়া মনে করিবেন না যে, আপনাদের অপরাপর সিদ্ধান্ত আমি মানিয়া লইয়াছি বা অনুমোদন করিয়াছি। আমার মনে হয়, অপরাপর আরও বহু অংশ ঘোরতর আপত্তিজনক। তবে অনুন্নত সম্প্রদায় সম্পর্কিত বিষয়ে এই আপত্তি জ্ঞাপন করিতে আমি যেন নিজ বিবেক কর্ত্তৃক বিশেষভাবে অনুরুদ্ধ হইয়াছি। ইতি—

আপনার বিশ্বস্ত বন্ধু

(স্বাক্ষর) এম, কে, গান্ধী।

মহাত্মা ও রবীন্দ্রনাথ

মহাত্মাজীর প্রায়োপবেশন আরম্ভ উপলক্ষে বোলপুর শান্তিনিকেতনে যে সভা হয়, তাহাতে রবীন্দ্রনাথ নিম্নলিখিত বক্তৃতা দেন :—

সূর্য্যের পূর্ণগ্রাসের লগ্নে অন্ধকার যেমন ক্রমে ক্রমে দিনকে আচ্ছন্ন করে, তেমনি আজ মৃত্যুর ছায়া সমস্ত দেশকে আবৃত করচে। এমন সর্ব্বদেশব্যাপী উৎকণ্ঠা ভারতের ইতিহাসে ঘটেনি, পরম শোকে এই আমাদের মহৎ সান্ত্বনা। দেশের আপামর সাধারণকে আজকের দিনের বেদনা স্পর্শ করেচে। যিনি সুদীর্ঘকাল দুঃখের তপস্যার মধ্য দিয়ে সমস্ত দেশকে যথার্থভাবে গভীরভাবে আপন করে নিয়েচেন, সেই মহাত্মা আজ আমাদের সকলের হয়ে মৃত্যু ব্রত গ্রহণ করলেন।

দেশকে অস্ত্রশস্ত্র সৈন্যসামন্ত নিয়ে যারা বাহুবলে অধিকার করে, যত বড় হোক না তাদের প্রতাপ, যেখানে দেশের প্রাণবান সত্তা সেখানে তাদের প্রবেশ পথ অবরুদ্ধ। দেশের অন্তরে সূচ্যাগ্র পরিমাণ ভূমি জয় করবে এমন শক্তি নেই তাদের। অস্ত্রের জোরে ভারতবর্ষকে অধিকার করেচে কত বিদেশী কত বার। মাটিতে রোপণ করেছে তাদের পতাকা আবার সে পতাকা মাটিতে পড়ে ধুলো হয়ে গেছে।

অস্ত্রশস্ত্রের কাটা-বেড়া দিয়ে যারা বিদেশে আপন স্বত্বকে স্থায়ী করবার দুরাশা মনে লালন করে, একদিন কালের আহ্বানে যে মুহূর্তে তারা কোথাও সরে দাঁড়ায়, তখনই ইটকাঠের ভগ্নস্তূপে পুঞ্জীভূত হয় তাহাদের কীর্ত্তির আবর্জনা। আর যাঁরা সত্যের বলে বিজয়ী তাঁদের আধিপত্য তাঁদের আয়ুকে অতিক্রম করে' দেশের মর্ম্মস্থানে বিরাজ করে।

দেশের সমগ্র চিত্তে যাঁর এই অধিকার তিনি সমস্ত দেশের হয়ে আজ আরো একটি জয়যাত্রায় প্রবৃত্ত হয়েচেন চরম আত্মোৎসর্গের পথে। কোন্ দুরূহ বাধা তিনি দূর করতে চান, যার জন্যে তিনি এত বড়ো মূল্য দিতে কুণ্ঠিত হলেন না, সে কথাটি আজ আমাদের স্তব্ধ হয়ে চিন্তা করবার দিন।

আমাদের দেশে একটি ভয়ের কারণ আছে। যে পদার্থ মানসিক তাকে আমরা বাহ্যিক দক্ষিণা দিয়ে সুলভসম্মানে বিদায় করি। চিহ্নকে বড়ো করে তুলে সত্যকে খর্ব্ব করে থাকি। আজ দেশনেতারা স্থির করেছেন যে, দেশের লোকেরা উপবাস করবে। আমি বলি এতে দোষ নেই, কিন্তু ভয় হয় মহাত্মাজী যে প্রাণপণ মূল্যের বিনিময়ে সত্যকে লাভ করবার চেষ্টা করচেন, তার তুলনায় আমাদের কৃত্য নিতান্ত লঘু এবং বাহ্যিক হয়ে লজ্জা বাড়িয়ে তোলে। হৃদয়ের আবেগকে কোনো একটা অস্থায়ী দিনের সামান্য দুঃখের লক্ষণে ক্ষীণ রেখায় চিহ্নিত করে কর্ত্তব্য মিটিয়ে দেবার মতো দুর্ঘটনা যেন না ঘটে।

আমরা উপবাসের অনুষ্ঠান করব কেননা মহাত্মাজী উপবাস করতে বসেচেন, এই দুটোকে কোনো অংশেই যেন একত্রে তুলনা করবার মূঢ়তা কারো মনে না আসে। এ দুটো একেবারেই এক জিনিষ নয়। তাঁর উপবাস, সে তো অনুষ্ঠান নয়, সে একটা বাণী, চরম ভাষার বাণী। মৃত্যু তাঁর সেই বাণীকে সমগ্র ভারতবর্ষের কাছে, বিশ্বের কাছে ঘোষণা করবে, চিরকালের মতো। সেই বাণীকেই যদি গ্রহণ করা আমাদের কর্ত্তব্য হয় তবে তা যথোচিতভাবে করতে হবে। তপস্যার সত্যকে তপস্যার দ্বারাই অন্তরে গ্রহণ করা চাই।

আজ তিনি কি বলচেন সেটা চিন্তা করে দেখো। পৃথিবীময় মানব ইতিহাসের আরম্ভকাল থেকে দেখি একদল মানুষ আর এক দলকে নীচে ফেলে তার উপর দাঁড়িয়ে নিজের উন্নতি প্রচার করে। আপন দলের প্রভাবকে প্রতিষ্ঠিত করে অন্য দলের দাসত্বের উপরে। মানুষ দীর্ঘকাল ধরে এই কাজ করে এসেচে কিন্তু তবু বলব এটা অমানুষিক। তাই দাস নির্ভরতার ভিত্তির উপরে মানুষের ঐশ্বর্য্য স্থায়ী হতে পারে না। এতে কেবল যে দাসত্বের দুর্গতি হয় তা নয় প্রভুত্বেরও এতে বিনাশ ঘটায়। যাদের আমরা অপমানিত করে পায়ের তলায় ফেলি তারাই আমাদের সম্মুখ পথে পদক্ষেপের বাধা। তারা গুরুভারে আমাদের নীচের দিকে টেনে রাখে। যাদের আমরা হীন করি তারা ক্রমশই আমাদের হেয় করে। মানুষখেগো সভ্যতা রোগে জীর্ণ হবে, মরবে। মানুষের দেবতার এই বিধান। ভারতবর্ষে মানুষোচিত সম্মান থেকে যাদের আমরা বঞ্চিত করেচি, তাদের অগৌরবে আমরা সমস্ত ভারতবর্ষের অগৌরব ঘটিয়েচি।

আজ ভারতে কত সহস্র লোক কারাগারে বন্দী। [illegible] তারা পীড়িত অপমানিত। তাহলেও এই [illegible]

শাস্ত্রকে অপমানিত করচে, তাকে গুরুভারে দুর্ব্বহ করচে। তেমনি অনাদর ও অসম্মানের বেড়ার মধ্যে বন্দী করে রেখেচি সমাজের বৃহৎ এক-দলকে। তাদের হীনতার ভার বহন করে আমরা এগোতে পারচিনে। বন্দীশালা শুধু তো কারাপ্রাচীরের মধ্যে নয়। মানুষের অধিকার সংক্ষেপ করার তো বন্ধন। সম্মানের খর্ব্বতার মতো কারাগার তো নেই। ভারতবর্ষে সেই সামাজিক কারাগারকে আমরা খণ্ডে খণ্ডে বড়ো করেচি। এই বন্দীর দেশে আমরা মুক্তি পাব কী করে? যারা মুক্তি দেয় তারাই তো মুক্ত হয়।

এতদিন এইভাবে চলছিল—ভালো করে বুঝিনি আমরা কোথায় তলিয়ে ছিলাম। সহসা ভারতবর্ষ আজ মুক্তির সাধনায় জেগে উঠল। পণ করলাম চিরদিন বিদেশী শাসনে মনুষ্যত্বকে পঙ্গু করে রাখার এ ব্যবস্থা আর স্বীকার করব না। বিধাতা ঠিক সেই সময়ে দেখিয়ে দিলেন কোথায় আমাদের পরাভবের অন্ধকার গহ্বরগুলো। আজ ভারতে যারা মুক্তি সাধনার তাপস তাঁদের সাধনা বাধা পেল তাদেরই কাছ থকে যাদের আমরা অকিঞ্চিৎকর করে রেখেচি। যারা ছোট হয়েছিল তারাই আজ বড়োকে করেছে অকৃতার্থ। তুচ্ছ বলে যাদের আমরা মেরেচি তারাই আমাদের সকলের চেয়ে বড়ো মার মারচে।

এক ব্যক্তির সঙ্গে আর এক ব্যক্তির শক্তির স্বাভাবিক উচ্চনীচতা আছে। জাতিবিশেষের মধ্যেও তেমন দেখা যায়। উন্নতির পথে সকলে সমান দূর এগোতে পারেনি। সেইটেকে উপলক্ষ্য করে সেই পশ্চাদ্বর্ত্তীদেরকে অপমানের দুর্লঙ্ঘ্য বেড়া তুলে দিয়ে স্থায়ীভাবে যখনি পিছিয়ে রাখা যায় তখনি পাপ জমা হয়ে ওঠে। তখনি অপমান বিষ দেশের এক অঙ্গ থেকে সর্ব্ব অঙ্গে সঞ্চারিত হতে থাকে। এমনি করে মানুষের সম্মান থেকে যাদের নির্ব্বাসিত করে দিলুম তাদের আমরা হারালুম। আমাদের দুর্ব্বলতা ঘটল সেইখানেই, সেইখানেই শনির রন্ধ্র। এই রন্ধ্র দিয়েই ভারতবর্ষের পরাভব তাকে বারে বারে নত করে দিয়েচে। তার ভিতের গাঁথুনি আল্‌গা, আঘাত পাবামাত্র ভেঙে ভেঙে পড়চে। কালক্রমে যে ভেদ দূর হতে পারত তাকে আমরা চেষ্টা করে সমাজনীতির দোহাই দিয়ে স্থায়ী করে তুলেচি। আমাদের রাষ্ট্রীক মুক্তি সাধনা কেবলি ব্যর্থ হচ্চে এই ভেদবুদ্ধির অভিশাপে।

যেখানেই একদলের অসম্মানের উপর আর একদলের সম্মানকে প্রতিষ্ঠিত করা হয় সেইখানেই তার সামঞ্জস্য নষ্ট হয়ে বিপদ ঘটে। এর থেকেই বোঝা যায় সাম্যই মানুষের মূলগত ধর্ম্ম। য়ুরোপে এক রাষ্ট্র-জাতির মধ্যে অন্য ভেদ যদি বা না থাকে শ্রেণীভেদ আছে। শ্রেণীভেদে সম্মান ও সম্পদের পরিবেশন সমান হয় না। সেখানে তাই ধনিকের সঙ্গে কর্ম্মিকের অবস্থা যতই অসমান হয়ে উঠচে, ততই সমাজ টলমল করচে। এই অসাম্যের ভারে সেখানকার সমাজ ব্যবস্থা প্রত্যহই পীড়িত হচ্ছে। যদি সহজে সাম্য স্থাপন হয় তবেই রক্ষা, নইলে নিষ্কৃতি নেই। মানুষ যেখানেই মানুষকে পীড়িত করবে সেখানেই তার সমগ্র মনুষ্যত্ব আহত হবেই, সেই আঘাত মৃত্যুর দিকেই নিয়ে যায়।

সমাজের মধ্যেকার এই অসাম্য এই অসম্মানের দিকে মহাত্মাজী অনেক দিন থেকে আমাদের লক্ষ্য নির্দ্দেশ করেচেন। তবুও তেমন একাগ্র চেষ্টায় এই দিকে আমাদের সংস্কার কার্য্য প্রবর্ত্তিত হয়নি। চরকা ও খদ্দরের দিকে আমরা মন দিয়েচি, আর্থিক দুর্গতির দিকে দৃষ্টি পড়েচে কিন্তু সামাজিক পাপের দিকে নয়। সেইজন্যই আজ এই দুঃখের দিন এল। আর্থিক দুঃখ অনেকটা এসেচে বাইরে থেকে, তাকে ঠেকানো একান্ত কঠিন না হতে পারে। কিন্তু যে সামাজিক পাপের উপর আমাদের সকল শত্রুর আশ্রয়, তাকে উৎপাটন করতে আমাদের বাজে, কেননা তার উপরে আমাদের মমত্ব। সেই প্রশ্রয়প্রাপ্ত পাপের বিরুদ্ধে আজ মহাত্মা চরম যুদ্ধ ঘোষণা করে দিলেন। আমাদের দুর্ভাগ্য ক্রমে এই রণক্ষেত্রে তাঁর দেহের অবসান ঘটতেও পারে কিন্তু সেই লড়াইয়ের ভার তিনি আমাদের প্রত্যেককে দান করে যাবেন। যদি তাঁর হাত থেকে আজ আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে সেই দান গ্রহণ করতে পারি তবেই আজকের দিন সার্থক হবে। এত বড়ো আহ্বানের পরেও যারা একদিন উপবাস করে তার পরদিন হতে উদাসীন থাকবে, তারা দুঃখ থেকে যাবে দুঃখে, দুর্ভিক্ষ থেকে দুর্ভিক্ষে। সামান্য কৃচ্ছ সাধনের দ্বারা সত্য সাধনার অবমাননা যেন না করি।

মহাত্মাজীর এই ব্রত আমাদের শাসনকর্ত্তাদের মনকে কী পরিমাণে ও কী ভাবে আঘাত করবে জানিনে, আজ সেই পোলিটিক্যাল তর্ক অব-তারণার দিন নয়। কেবল একটা কথা বলা উচিত বলে বলব। দেখতে পাচ্চি মহাত্মাজীর এই চরম উপায় অবলম্বনের অর্থ অধিকাংশ ইংরেজ বুঝতে পারচেন না। না পারবার একটা কারণ এই যে মহাত্মা-জীর ভাষা তাঁদের ভাষা নয়। আমাদের সমাজের মধ্যে সাংঘাতিক বিচ্ছেদ ঘটাবার বিরুদ্ধে মহাত্মাজীর এই প্রাণপণ প্রয়াস তাঁদের প্রয়াসের প্রচলিত পদ্ধতির সঙ্গে মেলে না বলেই এটাকে এত অদ্ভুত বলে মনে হচ্চে। একটা কথা তাঁদের স্মরণ করিয়ে দিতে পারি—আয়র্লাণ্ড যখন ব্রিটিশ ঐক্যবন্ধন থেকে স্বতন্ত্র হবার চেষ্টা করেছিল তখন কী বীভৎস ব্যাপার ঘটেছিল। কত রক্তপাত, কত অমানুষিক নিষ্ঠুরতা। পলি-টিক্‌সে এই হিংস্র পদ্ধতিই পশ্চিম মহাদেশ অভ্যস্ত। সেই কারণে আয়র্লাণ্ডে রাষ্ট্রীক প্রয়াসের এই রক্তাক্ত মূর্ত্তি তো কারো কাছে, অন্ততঃ অধিকাংশ লোকের কাছে, আর যাই হোক, অদ্ভুত বলে মনে হয় নি। কিন্তু অদ্ভুত মনে হচ্ছে মহাত্মাজীর অহিংস্র আত্মত্যাগ প্রয়াসের শান্ত-মূর্ত্তি। ভারতবর্ষের অবমানিত জাতির প্রতি মহাত্মাজীর মমতা নেই এত বড়ো অমূলক কথা মনে স্থান দেওয়া সম্ভব হয়েচে তার কারণ এই যে, এই ব্যাপারে তিনি আমাদের রাজসিংহাসনের উপর সঙ্কটের ঝড় বইয়ে দিয়েছেন। রাজপুরুষদের মন বিকল হয়েচে বলেই এমন কথা তাঁরা কল্পনা করতে পেরেছেন। এ-কথা বুঝতে পারেন নি রাষ্ট্রীক অস্ত্রাঘাতে হিন্দু সমাজকে দ্বিখণ্ডিত হতে দেখা হিন্দুর পক্ষে মৃত্যুর চেয়ে কম বিপদের নয়। একদা বাহির থেকে কোনো তৃতীয়পক্ষ এসে যদি ইংলণ্ডে প্রটেষ্টাণ্ট ও রোমান্‌ক্যাথলিকদের এইভাবে সম্পূর্ণ বিভক্ত করে দিত তা হলে সেখানে একটা নরহত্যার ব্যাপার ঘটা অসম্ভব ছিল না। এখানে হিন্দু-সমাজের পরম সঙ্কটের সময় সেই বহুপ্রাণঘাতক যুদ্ধের ভাবান্তর ঘটেচে মাত্র। প্রটেষ্টাণ্ট ও রোমানক্যাথলিকদের মধ্যে বহু-দীর্ঘকাল যে অধিকার ভেদ চলে এসেছিল সমাজই আজ স্বয়ং তার সমা-ধান করেছে, সেজন্য তুর্কির বাদশাকে ডাকে নি। আমাদের দেশের সামাজিক সমস্যা সমাধানের ভার আমাদের পরেই থাকার প্রয়োজন ছিল।

রাষ্ট্রব্যাপারে মহাত্মাজী যে অহিংস্রনীতি এতকাল প্রচার করেছেন, আজ তিনি সেই নীতি নিজের প্রাণ দিয়ে সমর্থন করতে উদ্যত এ কথা বোঝা অত্যন্ত কঠিন বলে আমি মনে করিনে।

শান্তিনিকেতন, ৪ঠা আশ্বিন, ১৩৩৯।
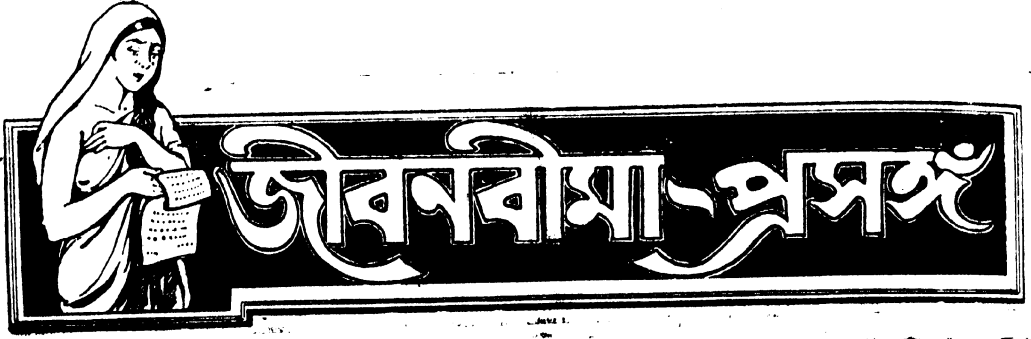
ইণ্ডিয়ান লাইফ অফিস এসোসিয়াসনের সভাপতির শুভ ইচ্ছা

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার

বর্ত্তমান যুগে ভারতে আত্মপ্রতিষ্ঠার দিনে, জীবন-বীমার প্রসার এবং উন্নতির চেষ্টা সর্ব্বতোভাবে হওয়া উচিত। যাহাতে দেশবাসী ইহার উপকারিতা এবং সার্থকতা অধিক পরিমাণে উপলব্ধি করিতে পারেন, তাহার বিধান সকলকেই করিতে হইবে। সংবাদ এবং সাময়িক পত্রগুলি লোক-শিক্ষার বিশিষ্ট উপাদান। যে সকল পত্র ভারতীয় বীমা-সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ করিয়াছেন, তাঁহাদের উদ্যম এবং কার্য্য অতিশয় প্রশংসনীয়। স্বদেশে ব্যবসায় বাণিজ্য ইত্যাদির প্রতিষ্ঠা এবং প্রসারকল্পে জাতীয় অর্থ-নৈতিক সমস্যার সমাধান করিতে জাতীয় বীমা-মণ্ডলী অগ্রণী এবং নির্ভরযোগ্য সহায়। ব্যক্তিগত পারিবারিক এবং জাতীয় উন্নতিই জাতীয় বীমা-কোম্পানীর একমাত্র উদ্দেশ্য। সংবাদ পত্রাদি এই সম্পর্কে দেশ-বাসীকে যথেষ্ট সাহায্য করিতে পারেন। 'পুষ্পপাত্র' এই বিষয়ে বিশেষরূপে যত্নবান হইয়াছেন দেখিয়া আমি অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করিয়াছি। আমি পুষ্পপাত্রের সর্ব্বথা মঙ্গল কামনা করি। দেশবাসীও এই চেষ্টায় মিলিতভাবে নিয়োজিত হউন, ইহাই আমার বিনীত নিবেদন।

শ্রীনলিনীরঞ্জন সরকার

দান

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় ও পুষ্পপাত্র বীমা সম্পাদক শ্রীঅনিলচন্দ্র রায় (দণ্ডায়মান)

জীবন-বীমায় ডাক্তারী পরীক্ষা

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

(ভারতীয় বীমাজগতের পূজনীয় ৺পান্নালাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়ের প্রথম পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন— প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে সম্মানের সহিত বি-এস্-সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া "ন্যাশনাল ইন্সিওরেন্সএ" সহকারী সম্পাদকের কার্য্য করেন—বীমা বিষয়ে শিক্ষালাভ করিবার জন্য দুইবার বিলাত গমন করেন—লণ্ডনের সানলাইফ্ অফিসে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করেন ও Chartered Insurance Instituteএর পরীক্ষা দিয়া সর্ব্বপ্রথম Associateship লাভ করেন। ১৯২১হইতে"ন্যাশনাল"এর দায়িত্বপূর্ণ সম্পাদকের কার্য্য কৃতিত্বের সহিত পরিচালনা করিতেছেন ও ইণ্ডিয়ান ইন্সিওরেন্স ইন্‌ষ্টিটিউটের সিনিয়র ভাইস্ প্রেসিডেণ্টরূপে নিযুক্ত আছেন—মধুর অমায়িক ব্যবহারের জন্য পিতৃদেবের ন্যায় বীমা-জগতের সর্ব্বত্রই বিশেষ সমাদৃত।
—বীমা-সম্পাদক]

আমাদের দেশে এক্ষণে যতগুলি বীমা-কোম্পানী কার্য্য চালাইতেছে তাহাদের সকলেই জীবন-বীমার পলিসি দিবার পূর্ব্বে বীমাকারীকে ডাক্তারী পরীক্ষা করাইয়া লন। এখানে এমন কোন কোম্পানী বা অফিস নাই যাহারা বিনা ডাক্তারী পরীক্ষায় পলিসি দেন। ডাক্তারী পরীক্ষা কিরূপ এবং জীবন বীমা করিতে গেলে কেনই বা আবশ্যক তদ্বিষয়ে আমাদের সকলেরই কিছু জ্ঞান থাকা উচিৎ। ডাক্তার বলিতে আমরা বুঝি যাঁহারা কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী বা কোন বিদেশের ডাক্তারী উপাধিধারী ব্যক্তি। এখানে হোমিওপ্যাথিক উপাধিধারী ডাক্তার বীমাকারীকে পরীক্ষা করিতে পারেন না বা কোন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রীও এ কার্য্যের জন্য উপযুক্ত নহেন। সকল বীমা অফিসেই তাহাদের নিজস্ব ছাপান ফরম্ আছে এবং উহাতে কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট প্রশ্ন দেওয়া হইয়া থাকে। উপযুক্ত পরীক্ষা করিবার পর ঐ সকল প্রশ্নের যথাযথ উত্তরগুলি ডাক্তার মহাশয় লিখিয়া দেন এবং সকল ক্ষেত্রেই ডাক্তারী পরীক্ষার ফলাফল স্বরূপ তাঁহার নিজস্ব মন্তব্য লিখিতে হয়। যথা ডাক্তারকে প্রশ্ন করা হয় যে আপনি কি বীমার প্রস্তাবকারীকে জীবন বীমা করিবার উপযুক্ত মনে করেন? তিনি ইহার উত্তরে নিজের মন্তব্য লিখিয়া দিয়া থাকেন। প্রথমতঃ ডাক্তারী পরীক্ষাতে কতকগুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয় যাহার দ্বারা বীমা আফিস বীমাকারীর পূর্ব্ব জীবনের শারীরিক ইতিহাস জানিতে পারেন। কোন প্রশ্নের উত্তর গোপন রাখিলে বীমাপত্র পরে বাজেয়াপ্ত হইতে পারিবে। যে সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয় তন্মধ্যে সকল প্রশ্ন গুলির সঠিক উত্তর পাইলে যদি সেইগুলি বেশ সন্তোষজনক মনে হয় তবেই বুঝা যাইবে যে বীমাকারীর বর্ত্তমান স্বাস্থ্য ভালই আছে। অনেকগুলি প্রশ্নের দ্বারা বীমাকারীর বংশানুক্রমিক ব্যাধি আদি সম্বন্ধে খবর পাওয়া যায় যদ্দ্বারা বীমাকোম্পানী অনায়াসেই বুঝিতে পারেন যে বংশানুগতিক ধারায় ভবিষ্যতে বীমাকারীর স্বাস্থ্যের কতটুকু হানি হইতে পারিবে। বীমাকারী প্রশ্নগুলির উত্তর দিবার পর ডাক্তার মহাশয়ের সম্মুখে আপনার নাম দস্তখত করিবেন এবং ডাক্তারও নিজের নাম দস্তখত করিবেন। এখানে বলা উচিৎ যে এই দস্তখতের দ্বারা বীমাকারী ডাক্তারের সমক্ষে প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক জানাইলেন যে তাঁহার দেওয়া উত্তরগুলি তাঁহার জ্ঞানমত সকলই সত্য। এক্ষণে ডাক্তার মহাশয় বীমাকারীকে তাঁহার দৈহিক যন্ত্রাদির অবস্থা পরীক্ষার ফলাফল লিখিবেন। এই পরীক্ষার ফলাফলের উপর সমস্ত জীবন-বীমার প্রিমিয়ম নির্ভর করে যদি এই রিপোর্ট হইতে দেখা যায় যে বীমার প্রস্তাবকারী বেশ সুস্থদেহী তবেই তাঁহাকে সাধারণ প্রিমিয়মে বীমাপত্র দেওয়া হয়। ডাক্তার

মহাশয় যদি ইচ্ছাপূর্ব্বক বা ভুলক্রমে রিপোর্টে পরীক্ষার ফল লিখিবার কালীন কোনরূপ ভুল লিখেন তবেই প্রস্তাবকারীর প্রতি যথেষ্ট অন্যায় করা হয়। প্রধানতর বীমার প্রস্তাবকারী ডাক্তারের রিপোর্ট দেখিতে পান না বা কি লিখিত হইল জনিবার সুযোগও পান না। এক্ষেত্রে ডাক্তারের লিখিত রিপোর্ট যেরূপই হউক না কেন বীমার প্রস্তাবকারীর সে বিষয়ে কোনরূপ কথা কহিবার কোন সুযোগ নাই। অসাধু জুয়াচোর ব্যক্তিগণ স্বাস্থ্যহীন ব্যক্তির স্বাস্থ্য সম্পর্কে ইচ্ছাকৃত ভুল রিপোর্ট দিয়া জীবন-বীমা করাইতেছে এবং পরে ঐসব ব্যক্তি মারা গেলে জীবন বীমা কোম্পানীকে ঠকাইয়া দাবীর টাকা আদায়ের চেষ্টা হইতেছে। এই যে জুয়াচুরী চলিতেছে ইহাতে বীমাকারী সাধারণের ক্ষতি হইবে। এই জন্য প্রতারকগণকে ধরাইয়া দেওয়া বীমাকারী সাধারণের কর্ত্তব্য। এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে ডাক্তারী পরীক্ষা যদি যথাযথভাবে নিষ্পন্ন না হয় বা ডাক্তার মহাশয়ের অসাবধানতা বা মূর্খতার জন্য আবশ্যকীয় বিষয় কোম্পানীকে না জানিতে দেওয়া হয় বা ইচ্ছাপূর্ব্বক গোপন রাখা হয় তবেই ডাক্তারী পরীক্ষা করা বা না করা উভয়ের মূল্য একই। প্রকৃতপক্ষে এমন কতকগুলি ডাক্তার আছেন এবং তাঁহাদের সহচর এজেণ্টও আছেন যাঁহাদের কোম্পানীকে ঠকাইবার প্রবৃত্তি অহঃরহ বর্ত্তমান। ডাক্তার ভাল রিপোর্ট না দিলে এজেণ্টের কাজ হয় না এবং ডাক্তার মনোমত রিপোর্ট না দিলে এজেণ্টও অন্য কাজ ঐ ডাক্তারের নিকট আনিতে চায় না এবং অন্য কাজ না আনিলে ডাক্তারও আর কোম্পানীর নিকট তাঁহার মেহনৎ বাবৎ ফি পান না। আজকাল অনেক ডাক্তারই জীবনবীমা কোম্পানীর নিযুক্ত ডাক্তার হইবার জন্য লালায়িত হইয়া বেড়াইতেছেন। নূতন ডাক্তার গুলির কথা ছাড়িয়া দিলেও পুরাতন বহুদর্শী ডাক্তারদের মধ্যেও ঐ প্রবৃত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। জীবনবীমা পত্র সহি করিবার সময় হইতে শেষ পর্য্যন্ত প্রস্তারকারীকে কোম্পানীর পক্ষ হইতে দেখিবার সুযোগ অতি অল্পই আছে। তাঁহাকে চাক্ষুষ দেখেন কেবল এজেণ্ট এবং ডাক্তার। উভয়ে ষড়যন্ত্র করিয়া কোম্পানীকে ফাঁকি দিবার ইচ্ছা করিলে কোনমতেই জুয়াচুরীরোধ করা যায় না। কোম্পানীদের সৌভাগ্যবশতঃ এক্ষণে তাহাদের একটি যৌথ এসোসিয়েশন হইয়াছে যেখান হইতে বদ্‌নামী ডাক্তারদের নামে কার্ড পাঠাইয়া সকল অফিসকেই নাম কাটা ডাক্তারদের নাম জানাইয়া দেওয়া হয়—তদ্বারা এই উপকার হয় যে নামকাটা ডাক্তার দ্বারা আর কোন কোম্পানী তাঁহাদের জীবনবীমার প্রস্তাবকারীদের পরীক্ষা করান না এবং ভবিষ্যতে অপরাপর সাধু বা অসাধু ডাক্তাররাও তাঁহাদের কার্য্যাবলীর প্রতি নজর রাখিয়া সাবধানে কার্য্য করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই জুয়াচুরীর পরিমাণ এতই বাড়িয়া যাইতেছে যাহাতে ভবিষ্যতে মনে হয় ডাক্তারী পরীক্ষার উপর স্বতই কোম্পানীদের একটা বিতৃষ্ণা আসিয়া পড়িবে। (দেখা যাউক) একজন ডাক্তারের সম্মুখে একটি ৫৮ বৎসর বয়সের লোক পরীক্ষা দিতে আসিয়া যদি সে নিজেই বলে তাহার বয়স ৩৮ তবে ডাক্তার সেই ব্যক্তির চেহারা দেখিয়াই বুঝিবেন যে বয়স লুকাইবার চেষ্টা হইতেছে। ডাক্তার যদি সেই ৩৮ লিখিয়া লন তবেই এখানে জুয়াচুরী করা হইল। যে ব্যক্তি ম্যালেরিয়া রোগে শীর্ণ হইয়া যকৃৎ প্লীহা দ্বতে ব্যতিব্যস্ত হইয়াছে তাহাকে সুস্থ ব্যক্তি বলিয়া চালাইয়া দেওয়াও জুয়াচুরী হইল। আবার দেখা যায় অনেক ডাক্তার সূক্ষ্ম বুদ্ধির অভাবে যে সমস্ত সামান্য উপসর্গ হইতে গভীর রোগের অস্তিত্ব বুঝিতে পারা যায়—তাহাদিগকে উপেক্ষাভাবে দেখিয়া পরীক্ষার গভীরত্বকে উড়াইয়া দেন ইহাও আর এক প্রকারের জুয়াচুরী। অবশ্য বলা যাইতে পারে যে মানুষের শরীর একেবারে চিরদিন রোগশূন্য থাকিতে পারে না। সামান্য সর্দ্দি কাশী ও রোগ এবং প্রবল জ্বর ও রোগ কাজে কাজেই নির্ম্মল নির্দ্দোষ শরীর শতকরা কয়টা পাওয়া যায়? মোটামুটিভাবে সাধারণিক রোগগুলিকে বাদ দিয়া আমরা শরীরের সাধারণ সুস্থতা বুঝি। দেহের ওজন বুঝিতে যাহা বুঝি তাহাও আবার ইউরোপীয়দের অনুপাতে ভারতবাসীদের কম। আমাদের দেশীয় কোম্পানীগুলির মধ্যে যে চার্ট দেখিয়া এই ওজনের সমতা দেখা হয় তাহাও আবার অদ্ভুতভাবে প্রাপ্ত। রবার্টসন সাহেব সমস্ত জেলের পুরুষ কয়েদীদের মধ্যে দৈর্ঘও বয়সানুযায়ী ব্যক্তিদের ওজনের [illegible]

তৈয়ার করেন। সমানের মধ্যে কয়েদীগণ সকলেই ভারতবাসী কিন্তু আমাদের সকলেরই জানা আছে যে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন জাতির পুরুষদের বিভিন্ন দৈর্ঘ্য এবং বিভিন্ন ওজন পাওয়া যায়। শিখেরা সাধারণতঃ খুব লম্বা ও বলিষ্ঠ হয় কিন্তু তাহাদের তুলনায় তেলেঙ্গা ও তামিল ভাষীরা অতীব ক্ষুদ্রকায়। জীবনবীমা সকল জাতির লোকেই করিতেছে কিন্তু তাই বলিয়া সকল জাতিকেই এক মাপ কাঠি দ্বারা মাপিলে চলিবে কেন? কিন্তু অফিসগুলি প্রধানতঃ দেখেন যে প্রস্তাবকারী ক্ষুদ্রকায়ই হউন বা দীর্ঘকায় ব্যক্তিই হউন শারীরিক সুস্থতার দিক দিয়া তিনি কিরূপ স্বাস্থ্য রাখেন। যদি সাধারণ বলিয়া মনে হয় সেইরূপ জীবনকেই জীবন-বীমার পলিসি দেওয়া হয়। এক্ষণে বুঝা যাইবে যে জীবন-বীমা করিতে গেলে কেনই বা ডাক্তারী পরীক্ষা আবশ্যক হয়। সাধারণ জীবন সাধারণভাবে চালিত হইলে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, সেই মৃত্যু যখন বয়স অনুপাতে ঘটে—তাহার দ্বারা আমরা বলিতে পারি যে কোন নির্দ্দিষ্ট বয়সের লোককে তাঁহার সমবয়সীদের সহিত একত্র দেখিলে আরও কয় বৎসর বাঁচিতে পারেন। এই কয় বৎসর যদি জীবন বীমার মেয়াদ ধরা যায় এবং যদি বুঝিতে পারা যায় যে এক নির্দ্দিষ্ট কালের পর কতগুলি লোক মারা যাইবে এবং তাহাদিগকে প্রত্যেককে মেয়াদ শেষে একটা মোটা টাকা দিতে হইলে কত টাকা লগ্নী সুদে খাটাইয়া মূলধন বাড়াইয়া সেই সময়ে—সেই টাকার চুক্তি শেষ করিতে পারা যাইবে। ইহাই জীবন-বীমার মূলভিত্তি। লোক নির্ব্বাচন করিয়া পলিসি দেওয়া কোম্পানীর অবশ্য কর্ত্তব্য কিন্তু এই কার্য্যে যদি অসাবধানতা বা জুয়াচুরা চলে তবেই যে গবেষণায় পলিসি দেওয়া হয় তাহার সবটাই ব্যর্থ হইয়া যায় এবং ক্রমশঃ কোম্পানী Claim দিতে দিতে ক্ষীণ হইয়া পড়েন। সকল কোম্পানীরই দেখা উচিৎ যাহাতে ডাক্তারদের দিক হইতে জুয়াচুরীর পন্থা একেবারে বন্ধ হইয়া যায়—এবং যাহাতে এজেন্টগণও তাঁহাদের এই মহৎকার্য্যে সহায় হন।

নারীর জীবন-বীমা

শ্রীসুধীন্দ্রলাল রায়

[লেখক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম্-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া 'সাব ডেপুটি কালেক্টার' রূপে সরকারী চাকুরী গ্রহণ করেন কিন্তু উহার স্বাধীনচেতা আত্মনির্ভরশীল অন্তঃকরণের জন্য তিনি এই পদ পরিত্যাগ করিয়া ওরিয়্যাণ্টাল জীবন বীমা কোম্পানীতে "অরগ্যানাইজার এন্ড এজেন্সীস্" হিসাবে প্রায় তিন বৎসর কার্য্য করেন—এই সুদীর্ঘ কালে নানাস্থানে পরিভ্রমণ করিয়া তিনি আপনার কর্ম্ম ক্ষমতার যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন—বর্ত্তমানে ন্যাশনাল ইণ্ডিয়ান' বীমা কোম্পানীর লক্ষ্ণৌ শাখা বিভাগের সম্পাদক হিসাবে নিযুক্ত আছেন। গবেষণাপূর্ণ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধাবলী লিখিবার জন্য বীমা মহলে বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছেন।—বীমা-সম্পাদক]

জার্মাণীর এলিয়াঞ্জ-উন্ড-ষ্টুটগার্টার বীমা-সঙ্ঘে বীমা করিয়া এক বঙ্গ-মহিলা মারা যান। তাঁর পেটে টিউমার ছিল এবং সে কথা গোপন রাখিয়া বীমা করানো হইয়াছিল এই আপত্তিতে উক্ত কোম্পানী বীমার টাকা দিতে অস্বীকার করে। আদালতে নালিশ করিয়া ফল হয় নাই। সত্য সত্যই পেটে টিউমারের কথা চাপা দিয়া বীমা [illegible] হইয়াছে আদালত এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন ও কোম্পানী মোকর্দ্দমায় জয়লাভ করে।

এই মোকদ্দমা দ্বারা আমাদের কিছু শিক্ষালাভ করা উচিত। সে শিক্ষাটা এই যে মেয়েদের জীবন-বীমা গ্রহণ করার ফলে ভবিষ্যতে এরূপ অনেক টিউমার আবিষ্কৃত হওয়ার সুযোগ উপস্থিত হইবে। বিগত সরকারী রিপোর্টে দেখিতে পাই কোন একটি কোম্পানী প্রায় ৬৬,০০০ টাকার দাবী প্রতারণার অছিলায় অস্বীকার করিয়াছেন! Combined investment নামক এক খামখেয়ালী বীমা-প্রণালীর ফলে যে ঋণ দাঁড়াইয়াছিল সে ঋণের হাত হইতে মুক্ত হওয়ার জন্য আর একটি কোম্পানী যে সমস্ত কারবারই করিয়াছেন ও করিতেছেন

তাহা আমরা দেখিয়াছি ও দেখিতেছি। আজ নারীদের বীমা-পত্র দিয়া কাল সেগুলি অস্বীকার করিবার অনেক সুযোগ জুটিতে পারে বলিয়াই আমরা মনে করি।

এদেশে অনেকে নারীর জীবন-বীমা হইতেছে দেখিয়া উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহাদের মনে রাখা উচিত নারীদের বীমা-পত্রের দাবী লইয়া ভবিষ্যতে অনেক গণ্ড-গোলের সৃষ্টি হইতে পারে। অনেক কোম্পানীই বিপদে পড়িয়া বহু ত্রুটি আবিষ্কার করিয়া টাকা দিতে অস্বীকার করিতে যে না পারেন তাহা কিরূপে বলিব?

বছর তিনেক পূর্ব্বে যখন কলিকাতার এক সুবৃহৎ বীমা কোম্পানী নারীদের বীমা গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন জলপাইগুড়ীতে দেখিলাম, মারোয়াড়ী মহিলারা দলে দলে বীমা করিতে লাগিলেন। ৫৫ বৎসর বয়স্কা বৃদ্ধা ৪০ বৎসর বয়স লেখাইয়া বীমা সুরু করিলেন। কেননা, পর্দ্দানশীল মহিলাকে না দেখিল এজেণ্ট, না পরীক্ষা করিল ডাক্তার। কোনও কোনও ক্ষেত্রে গৃহ চিকিৎসকই আবার কোম্পানীর ডাক্তার। তিনি যখন শ্রীঠকমল বাবুর অনেক টাকা মাসে মাসে লইতেছেন, এটুকু উপকার কি বাবুজী ডাক্তারবাবুর নিকট পাইবেন না? তাছাড়া, কোম্পানী ১০।১২ টাকা দিয়াই তো খালাস!

টাকা পয়সা সম্বন্ধে সুতীব্রভাবে হুঁসিয়ার যে সব মারোয়াড়ী বাবুদের অনেক চেষ্টা করিয়াও বীমা করাইতে পারি নাই, তাঁহারা সহসা বাঙ্গালী কোম্পানীর কৃপায় উঠিয়া পড়িয়া বাড়ীর মেয়েদের ও ঝি-চাকরাণীর বীমা করাইতে লাগিলেন, তাহা দেখিয়া পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিলাম। এই সব ঠকমল বাবুরা মনে করিলেন যে কোম্পানীদের যখন ঠকিবার এমন সদিচ্ছা জাগিয়াছে, তাহার সুযোগ তিনি লইবেন না কেন। বাংলা দেশে আসা কি জন্য?

নারীর জীবন-বীমা গ্রহণ করিতে হইলে কয়েকটি বিষয়ের বিচার দরকার। একে একে তাহার উল্লেখ আমরা করিতেছি। কোনও বিশেষজ্ঞের দ্বারা এ বিষয় বিশদ আলোচনা হইলে ভাল হয়।

(১) **স্বাস্থ্য-পরীক্ষা**—জীবন-বীমার প্রয়োজনানুসারে যদি নারীদের স্বাস্থ্য-পরীক্ষা যথোপযুক্তরূপে না করা হয়, তবে নিকৃষ্ট স্বাস্থ্যের নারী (Sub-standard lives) বহু সংখ্যায় বীমা-পত্র লাভ করিবে, এবং তদ্দ্বারা কোম্পানীর মৃত্যুহার বৃদ্ধি করিবে। নারীদের স্বাস্থ্য-পরীক্ষায় অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত বি, বি, দত্ত মহাশয়ের সুন্দর এক ইংরাজী প্রবন্ধ দেখিয়াছিলাম। তাঁহাকে এই বিষয়টা বাংলায় আলোচনা করিতে অনুরোধ করি। বহু বিজ্ঞ ডাক্তারদের মতে নারীদেহের নিম্নলিখিত অঙ্গগুলি পরীক্ষা করা উচিত।

(ক) প্রজনন-যন্ত্র। আভ্যন্তরিক পরীক্ষা নিতান্ত দরকার। এলিয়ান্‌জ-উণ্ড-ষ্টুটগার্টার কোম্পানীর ডাক্তার সম্ভবতঃ এ বিষয়ে অবহেলা করিয়াছিলেন। সেইজন্যই পূর্ব্বোক্ত মোকদ্দমার সূত্রপাত হয়। নহিলে গোড়াতেই কোম্পানী উক্ত নারীর বীমা অগ্রাহ্য করিতে পারিতেন।

(খ) স্তন-গ্রন্থীর পরীক্ষা। কোনও গ্রন্থীর স্ফীততা (glandular swelling) আছে কিনা তাহা দেখিতে হইলে স্তনদ্বয় ভাল করিয়া টিপিয়া দেখা দরকার।

এদেশে যোগ্য মেয়েদের ডাক্তার নাই। কলিকাতার বাহিরে পুরুষগণই মেয়েদের স্বাস্থ্য-পরীক্ষার রিপোর্ট দিয়া থাকেন। কিন্তু পর্দ্দানশীন মেয়েদের কথা ছাড়িয়া দিলেও আমাদের মনে হয় উচ্চশিক্ষিতা, স্বাধীনা মেয়েরাও এবম্বিধ পরীক্ষায় স্বীকৃতা হইবেন বলিয়া আমরা মনে করি না। অতএব বীমার জন্য বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা না করিয়া নারীদের বীমাপত্র দেওয়া সঙ্গত কি?

(২) **বীমার উদ্দেশ্য**—অবিবাহিতা বা বিধবা নারী যাঁহারা স্বোপার্জ্জনের দ্বারা জীবন-নির্ব্বাহ করেন ও অন্যের ভরণপোষণ করেন, তাঁহাদের বীমা করার প্রয়োজন আছে ও করাও উচিত, তাহা স্বীকার করি। কিন্তু বিবাহিতা নারী যাঁহারা স্বামীর বা অপরের অন্নে প্রতিপালিতা, তাঁহাদের বীমায় উদ্দেশ্য বুঝা যায় না। যে বিবাহিতা নারী স্বয়ং উপার্জ্জন করেন না বা স্বয়ং প্রিমিয়ম চালাইতে অসমর্থা তাঁহাকে বীমা-পত্র দেওয়া ন্যায়-সঙ্গত কি? যে ব্যক্তি মারা গেলে আমার প্রত্যক্ষ আর্থিক ক্ষতি হইবে, তাহার বীমা করাইয়া সে বীমার টাকা চালানো আমার পক্ষে বৈধ। কিন্তু

স্বামী যখন স্ত্রীর বীমা করাইয়া চাঁদা চালাইতে থাকেন, তখন তাহা gamble বা জুয়ার পর্য্যায়যুক্ত হইয়া পড়ে। স্ত্রীর মৃত্যুতে স্বামীর প্রত্যক্ষ আর্থিক ক্ষতি হয় কি? বিবাহিতা নারী এদেশে Economic factor নহে। অতএব insurable interestএর দিক দিয়া দেখিলে, এরূপ বীমা আইনে আটকায় কিনা, এ বিষয়ে কোনও আইনজ্ঞ ব্যক্তি আলোচনা করিবেন কি? তেমনি, বিধবা মাতা, ভগ্নী বা ভ্রাতৃজায়ার বীমা করান অবৈধ হইয়া পড়ে নাকি? বিপদে পড়িলে বা সুযোগ বুঝিলে বীমা-কোম্পানী যে আইনের ছুতায় এই সকল নারীদের বীমার টাকা অস্বীকার করিবেন না, তাহা কে বলিতে পারে? কেননা, আদালতে গেলেই কোম্পানীই জয়লাভ করিবে। অতএব যাঁহারা নারীর বীমা-পত্র লইতে চাহেন, এ বিষয়টা তাঁহারা যেন সম্যক বুঝিয়া দেখেন।

(৩) **এদেশের আইন**—এদেশের আইনে নারীর সম্পত্তিতে অধিকার সাধারণতঃ স্বীকৃত হয় না। যদি বুঝিতাম যে বীমার টাকা যথেচ্ছ ব্যবস্থা করিবার অধিকার তাঁহার আছে তাহা হইলেও বা বিবাহিতা নারীর বীমা করার স্বার্থকতা স্বীকার করিতে পারিতাম। যদি বুঝিতাম যে তাঁহার বীমা-পত্র মূলক টাকায় শুধু তাঁহার বিবাহিতা বা অবিবাহিতা কন্যাদেরই অধিকার থাকিবে, তাহা হইলেও নারীর বীমার একটা সামাজিক সার্থকতা স্বীকার করিতাম। যতদিন এদেশের আইনে সম্পত্তিতে নারীর অধিকার যথোচিত ও স্পষ্টরূপে স্বীকৃত না হইতেছে, যতদিন নারীশিক্ষার অধিকতর প্রসার না হইতেছে, এবং যতদিন নারীকে পর্দ্দার আড়ালে রাখা পরিত্যক্ত হইতেছে, ততদিন নারীর বীমাপত্র গ্রহণ করা সমীচীন নহে। এদেশের বৃহত্তম বীমা-কোম্পানী—ওরিয়েণ্টাল—এখনও এবিষয়ে অত্যন্ত সাবধানতা অবলম্বন করেন। ক্ষুদ্র ও নূতন কোম্পানীরা এ বিষয়ে যে প্রগতি দেখাইবার প্রয়াস পাইতেছেন তাহা প্রোপাগাণ্ডা হিসাবে ভাল, কিন্তু ব্যবসায়ে দূরদর্শীতার পরিচায়ক নহে।

বিচিত্রা

কোনও একস্থানে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় বলিয়াছেন যে আমাদের এই দুর্ভাগা দেশের টাকা বছরে পাঁচ কোটি হিসাবে বীমার প্রিমিয়ামের মূলে বিদেশে চলিয়া যাইতেছে। "Statesman" কাগজের বিজ্ঞ বীমা-সম্পাদক মহাশয় একথায় উষ্মা প্রকাশ করিয়া সরকারী বিবরণ পত্রিকার সাহায্য লইয়া আচার্য্যদেবকে নিছক মিথ্যাবাদী প্রমাণ করিবার দুশ্চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি ধরিয়া লইয়াছেন যে আচার্য্য বীমা সম্বন্ধে কিছু জানেন না এবং গবেষণাগারের বিবিধ গ্যাসের ধূম্রে তাঁহার বীমা-বুদ্ধি নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে। তিনি ইহাও ধরিয়া লইয়াছেন যে রাজনীতিক্ষেত্রে স্যার স্যামুয়েল হোর যেমন দমবাজী মারিয়া কাজ হাঁসিলের চেষ্টায় আছেন, বিদেশী বীমা-বণিকগণও ষ্টেটস্‌ম্যানের বীমা লেখকের দমবাজীর সাহায্যে ভারতবাসীদের ধাঁধাইয়া দিতে সমর্থ হইবে।

• • • •

এই সুবিজ্ঞ ইংরাজ লেখকের বক্তব্য এই :—

"পূর্ব্বে তোমরা মিথ্যাভাষণের সাহায্যে বিদেশী কোম্পানীদের কাজ বন্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছ। কিন্তু বাবাজীরা, এবার সরকার স্বয়ং তোমাদের মিথ্যা ধরাইয়া দিয়াছেন। সরকারী রিপোর্টে ছাপা হইয়া গিয়াছে—(হইতে পারে ইউরোপীয় বণিক-সভার প্ররোচনার ফলেই)—যে বিলাতী কোম্পানীরা ভারত-গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটিতে টাকা লগ্নী করে। তোমরা যত টাকা রাখ তার ঢের ঢের বেশী টাকা আমরা রাখি। অতএব "drain" বলিয়া তোমাদের উল্লম্ফন টিকিল না!

• • • •

"ইনসিওরেন্স হেরল্ড" নামক বীমা বিষয়ক ইংরাজী মাসিক পত্রের বিদ্বান সম্পাদক মহাশয় এ বিষয়ের আলোচনা আগষ্ট সংখ্যার কাগজে করিয়াছেন। কিন্তু আচার্য্যদেব যে উদ্দেশ্যে ও যে কথা মনে করিয়া drain theoryর প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন, সে দিকটা সম্পাদক মহাশয় স্পষ্ট করিয়া দেন নাই। ষ্টেটস্‌ম্যানের বীমা লেখক যাহাই মনে করুন, আচার্য্যদেব বেশ ভাল করিয়াই জানেন, এদেশের টাকা বীমা ভাণ্ড হইতে কোন পথে, কেমন করিয়া চুয়াইয়া পড়িতেছে। আচার্য্যদেব বিশেষ ব্যাখ্যা করেন নাই, কেননা তিনি জানেন দেশের লোক তাঁহার কথা বুঝিতে পারিবে। ষ্টেটস্‌ম্যানের লেখকের ধাপ্পাবাজী ধরিতে পারিবে না, দেশের লোক যে এত নির্ব্বোধ, সে আশঙ্কা আচার্য্যের হয় নাই। এই লেখককে বলিতে ইচ্ছা হয় :—

"বীমা যে একটা "অদৃশ্য রপ্তানী" (invisible export)" সেটা তোমার দেশের লোক যতখানি জানে, আমরাও ততখানি জানি। প্রিমিয়মগুলি আদায় করিয়া তুমি সেগুলি ইংলণ্ডেই লইয়া যাও আর তদ্দ্বারা ভারত গভর্ণমেণ্টের সিকিউরিটিই খরিদ কর, তাহা যে এ দেশের টাকা তোমার দেশে পাঠাইবারই ব্যবস্থা, সে কথা কি আমরা বুঝি না? এখন ব্যবসায় জগতে মন্দা পড়িয়াছে, তোমার দেশের উৎপন্ন মাল এ দেশে বিক্রয় করিয়া তোমরা দেশে টাকা পাঠাইতে পারিতেছ না। বীমা বিক্রয় করিয়া সেই টাকা পাঠাইবার যোগাড় করিতেছ।

• ° • °

গবর্ণমেণ্ট যে এখন ঘন ঘন বিলাতী ঋণপত্র (sterling loans) বিক্রয় সুরু করিয়াছেন তাহা বিলাতী বীমা কোম্পানীদের শুভ সুযোগ নহে কি? গভর্ণমেণ্ট যে ঋণ করিতেছেন তাহার সুদ দিবে কে? ভারতবাসীদেরই ট্যাক্সের উপর ট্যাক্স বসাইয়া তোমাদের শতকরা ৫।০, ৬ ও ৬।০ টাকার সুদের ব্যবস্থা কি হইতেছে না? বছরে বছরে যে সুদটা তোমরা টানিয়া লইয়া যাইতেছ তাহা কি drain নহে? যদি গভর্ণমেণ্টের ঐ সিকিউরিটি এ দেশের লোকে খরিদ করিত তবে সুদটা দেশে থাকিত ও drain হইত না।

• • • °

"এতদ্ভিন্ন, একদিন না একদিন এই কাজের টাকাটা তোমরা গভর্ণমেণ্টের কাছ হইতে ফেরত গ্রহণ করিয়া দেশে পাঠাইবে। তখন সে টাকাটা এ দেশেরই কর-দাতাগণকে পরিশোধ করিতে হইবে। যে টাকাটা প্রিমিয়মভাবে আজ তুমি আদায় করিলে সে টাকাটা দেশে না পাঠাইয়া তুমি এখানকার গভর্ণমেণ্টকে ধার দিতেছ কেননা ইহার সুদটাও টানিয়া লইয়া এ দেশকে দুই উপায়ে শোষণ করিতে চাও। শোষণের যত বৈজ্ঞানিক উপায় আছে তাহা কি তোমরা কখনও ছাড়?

° • ° °

"আর এক কথা এই যে, এই অর্থ কৃচ্ছতার দিনে নিজের দেশে লগ্নী করিয়া কি তোমরা ৫।০ কিম্বা ৬ পারসেণ্ট সুদ অর্জ্জন করিতে পার? সেইজন্যই তোমাদের মত investorsদের সুবিধা দিবার জন্যই ভারত গভর্ণমেণ্ট এত securities বিক্রয় করিতেছেন?

"এসব কথা আমরা বুঝি। বুঝি না, ভারতবর্ষের লোককে নিরেট মনে করিয়া হাস্যজনক যুক্তি তোমরা কেন উত্থাপন কর।"

° • ° °

আচার্য্যদেবের পক্ষ লইয়া ওকালতী করিবার ধৃষ্টতা আমাদের নাই। তজ্জন্য এ আলোচনায় আমরা প্রবৃত্ত হই নাই। আমরা দেখিয়াছি যে বিদেশী কোম্পানীর এজেণ্টগণ উক্ত প্রকার চুক্তির সাহায্যে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন যে ঐ সব কোম্পানীও খাঁটি স্বদেশী। দুঃখের বিষয়, তথাকথিত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনেকে এই চুক্তি স্বীকার করিয়া লন। ইহাদের মধ্যে ডেপুটি, মুন্সেফ ও প্রফেসার জাতীয় জীবই বেশী। ইঁহারা বুঝিতে অক্ষম যে বিদেশী কোম্পানীতে বীমা করার ফলে ভারতবর্ষ 'doubly drained' হইতেছে।

• • •

চলচ্চিত্র অভিনেতৃগণ নিজেদের জীবনের উপর যত বীমা করিয়াছেন তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

নাম	টাকা
জেসি লাস্কি	দেড় কোটী
এডলফ্ জুকন	"
জন ব্যারিমুর	৬২ লক্ষ
মেরি পিকফোর্ড	৩০ "
ডগলাস্ ফেয়ারব্যাঙ্ক	" "
চ্যার্লি চাপলিন	" "
গ্লোরিয়া স্ত নসন্	৬০ "
নরমা টালমেজ	৬০ "
কন্সটান্স টালমেজ	৬০ "

এম্পার অব ইণ্ডিয়া লাইফ এসিয়োরেন্স

এম্পায়ার অব ইণ্ডিয়া লাইফ্ এসিয়োরেন্স কোম্পানি ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হইয়াছিল এবং প্রথমে বোম্বাই সহরের এস্প্লানেড রোডে ক্ষুদ্র একটি ঘরে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিল। কোম্পানীর যুগ্ম প্রতিষ্ঠাতা মিঃ ই, এফ্ এলাম ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে কোনও সুবৃহৎ বিলাতী জীবন-বীমাকোম্পানীকে সাহায্য করিতে বোম্বাই সহরে আগমন করেন। তদানীন্তন সময়ে মিঃ এলামের এ বিষয়ে কোনও অভিজ্ঞতা না থাকিলেও কার্য্য করিতে করিতে তিনি বুঝিতে পারিলেন যে ভারতবর্ষে বীমার প্রচলনের সুযোগ ও সুবিধা আছে। এই মতের অনুবর্ত্তী হইয়া তিনি পরলোকগত মিঃ আর, ই, ভারুচার সহযোগীতায় সামান্য ৫১,৫০০ টাকা মূলধন লইয়া "এম্পায়ার অব ইণ্ডিয়ার" প্রতিষ্ঠা করেন। কোম্পানীর প্রথম চেয়ারম্যান ছিলেন স্বর্গীয় স্যার ফিরোজ এস্ মেটা, কি, সি, আই-ই, এল্-এল-ডি; মিঃ মেটা তাঁহার বহুবিধ কর্ম্মাভ্যন্তরের মধ্যেও 'এম্পায়ারের' বোর্ডে যোগদান করিয়াছিলেন—কোম্পানীর বাল্যজীবনের প্রারম্ভে মিঃ মেটার সহকারীতায় প্রতিষ্ঠানের গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছিল। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে কার্য্যবৃদ্ধির ফলে কোম্পানীকে ১১, এস্প্লানেড সারকেলে নূতন স্থানে পরিবর্ত্তিত করিতে হইল এবং এই স্থানে বহুকালযাবৎ হেড অফিস্ অবস্থিত ছিল। অবশেষে ১৯২৫এর মার্চ্চ মাসে হর্ণবাই রোডে স্বীয় প্রাসাদোপম অট্টালিকায় কোম্পানীর হেড অফিস অবস্থিত হইল এবং ভারতবর্ষ, এডেন, ব্রহ্মদেশ, সিংহল প্রভৃতি সর্ব্বত্র শাখা ও কেন্দ্র অফিস স্থাপন করিয়া গুণানুসারে ও উৎকর্ষের দিক হইতে কোম্পানী ভারতীয় প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে।

কোম্পানীর দ্রুত উন্নতির ইতিহাস আমরা নিম্নে প্রদান করিলাম—

বৎসর	মোট পলিসির পরিমাণ	আয়—বীমা	তহবিল
১৮৯৮—	৪০০—	৫০৯৪৪ (সুদ সহ)	২৫,৫৩৫
১৯১২—	১৯,১২৫—	১৮,২৮,৪৯২	৫৫,৭৬,৬৯১
১৯২২—	৩৩,১৬৭—	২৮,৪১,৬৬৮,	১,৫৯,৪০,৬০৮
১৯৩২—	৫৫,৬৭৮—	৪৯,৬৪,৫৬৯,	৩,৪৯,৯০,২০৬

যদিও কোম্পানী ন্যূনতম চাঁদার হারে বীমার প্রচলন করিতেছেন তথাপি অতি সন্তর্পণে এবং ব্যয় সংযত হইয়া কার্য্য-প্রণালী পরিচালনা করিবার জন্য কোম্পানী প্রতি ভ্যালুয়েসনেই উত্তম "বোনাস" ঘোষণা করিতেছেন। এতদ্ভিন্ন কোম্পানীর চাঁদার হার এত সামান্য যে অন্যান্য কোম্পানীর উচ্চ চাঁদা সমেত উচ্চ বোনাসের তুলনায় ন্যূনতম চাঁদার উপযুক্ত বোনাসে বীমা করিলে লাভ থাকিয়া হয়। ১৯৩২এর ২৯ ফেব্রুয়ারী তারিখে কোম্পানীর যে পঞ্চবার্ষিক হিসাব-নিকাশ সম্পন্ন হইয়াছে তাহারি একখণ্ড রিপোর্ট আমরা আলোচনার জন্য প্রাপ্ত হইয়াছি। বর্ত্তমান ভ্যালুয়েশন নিম্নলিখিত প্রণালীতে করা হইয়াছে—

সুদের হার.......................শতকরা ৪৲ (net)

মৃত্যুহার...........ব্রিটিশ অফিসের "ওত্রম্" টেবল ও তৎসহিত পাঁচ বৎসরের যোগ

অফিস্ প্রিমিয়ামের কত অংশ ধার্য্য...লভ্যাংশযুক্ত পলিসি—

আজীবন—৭৫৲

মেয়াদী—৭৭৲

লাভবিহীন পলিসি :—

সমস্ত প্রকারই—৮৫৲

এই ভিত্তিতে ভ্যালেয়েশনের উদ্বৃত্ত নিম্নরূপ হইয়াছে—

জীবনবীমা ও এনুইটি জনিত দায়— টাকা	জীবনবীমা তহবিল টাকা
৩,১৩,৮২,৮৩৫	৩,৪৯,৯০,২০৬
উদ্বৃত্ত—৩৬,০৭,৩৭১	
টাকা ৩,৪৯,৯০,২০৬	টাকা ৩,৪৯,৯০,২০৬

উপরের হিসাব হইতে দেখা যাইতেছে ৩৬,০৭,৩৭১ টাকা উদ্বৃত্ত রূপে প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯২৭এর ভ্যালুয়েশনে কোম্পানীর সুদের হার ছিল শতকরা ৩¾ বর্ত্তমানে শতকরা ¼ সুদের হার বাড়ান হইয়াছে জগৎ-অর্থকৃচ্ছতার ফলে কোম্পানীর কাগজের দর একেবারে হ্রাস হইয়া যাওয়ায় এই অস্বাভাবিক সময়ের জন্য উহার প্রয়োজন হইয়াছে কিন্তু উহাতে কোম্পানীর গৌরবময় সুদৃঢ় ভিত্তির কোনই পরিবর্ত্তন হয় নাই।

উদ্বৃত্ত অর্থ নিম্নলিখিত উপায়ে বণ্টন করা হইয়াছে—

	টাকা
পলিসি হেল্ডোরদিগকে বোনাস—	২৯,৪৪,৯২৬
কোম্পানীর নিয়মানুযায়ী মেম্বরদিগকে বোনাস্	৩,২৭,২১৪
বীমা-তহবিলে উদ্বৃত্তরূপে জমা—	৩,৩৫,২৩১
	টাকা ৩৬,০৭,৩৭১

১৯৩৪এর মার্চ্চের পূর্ব্বে যে সমস্ত পলিসির দাবী তাহাদের উপর আজীবনব্যাপী বীমায় হাজার ১৬ টাকা মেয়াদী বীমায় ১৪৲ টাকা 'ইনটারীম্' বোনাস্ ঘোষণা করা হইয়াছে। ভ্যালুয়েশনের ভিত্তিকে কোন অংশে দুর্ব্বল না করিয়া এই বোনাস্ বৃদ্ধি কর্ত্তৃপক্ষের পক্ষে অতিশয় প্রশংসার বিষয় বলিয়া আমরা মনে করি। এই প্রসঙ্গে কোম্পানির চেয়ারম্যান মিঃ রস্তম, কে, আরকানা ১৯৩২এর ১১ই আগষ্ট মেম্বরদিগের সভায় যে কয়েকটি সারগর্ভ কথা বলিয়াছিলেন তাহা আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম—

"The Company continues to grow in age and stability and not with standing the adverse condition which have prevailed of late years the company has been able to maintain its bonuses without in any way reducing the high standard of financial strength attained at the last valuation. Reserves have been steadily strengthened and sources of future profit rigidly maintained.

কোম্পানির বঙ্গবিহার উড়িষ্যা ও আসামের প্রতিনিধি মেসার্স ডি এম দাস এণ্ড সন্স—ইহার কর্ণধার শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র সেন মহাশয় বাংলার বীমা জগতের শীর্ষ স্থানীয়। ব্যবসাক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ্ বাঙ্গালীর অকৃতকার্য্যতার বিরুদ্ধে এই প্রতিষ্ঠানটি সগৌরবে মস্তক উন্নত করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে—শ্রীযুক্ত অবিনাশ চন্দ্রের পরিচালনায় অতিশয় সুশৃঙ্খলার সহিত ডি এম্ দাসের একটি গৌরবময় ইতিহাস অতিবাহিত হইল। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে প্রতিষ্ঠানটির সর্ব্বপ্রকার সাফল্য কামনা করিতেছি।

নিউ ইণ্ডিয়া এসিয়োরেন্স

১৯১৯ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই সহরে কতিপয় সম্ভ্রান্ত ব্যবসায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ মিলিত হইয়া নিউ ইণ্ডিয়া স্থাপিত করেন—অগ্নি, নৌ, দুর্ঘটনা প্রভৃতির বীমা বিদেশী কোম্পানীগুলির একচেটিয়া ছিল; এইগুলি কোনও উপযুক্ত স্বদেশী প্রতিষ্ঠান কর্ত্তৃক গৃহীত হয় কর্ত্তৃপক্ষ এই উদ্দেশ্যে বিরাট আকারে এই কোম্পানীর ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করেন—

মূলধন

বিলিকৃত—৬,০০,০০,০০০৲
গৃহীত—৩,৫৬,০৫,২৭৫৲
আদায়ী—৭১,২১,০৫৫৲
মোট তহবিল—১,৪৪,১৯,৫৯০৲

কোম্পানীর পরিচালন পরিষদের ডিরেক্টার পদে বহু গণ্যমান্য কর্ম্মক্ষম ব্যক্তি নিযুক্ত আছেন যথা—
শ্রীযুক্ত এন্, বি, সকলতওয়ালা সি, আই, ই (সভাপতি)।
স্যার লালুভাই শামলদাস কে, টি, সি, আই, ই।

দি অনারেবল স্যার ফিরোজ সি সেটনা, কে, টি, ও বি-ই।
শ্রীযুক্ত এস, এন, পোচখানেওয়ালা।
শ্রীযুক্ত অম্বালাল সারাভাই।

গত বৎসরে কোম্পানীর সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন পরলোকগত স্যার ডোরাব টাটা—এই সমস্ত স্বনামধন্য কর্ম্মক্ষম ব্যক্তি যথায় নিযুক্ত আছেন সেখানে কার্য্যবিস্তৃতি অবশ্যম্ভাবী ও তথায় সাধারণের বিশ্বাস স্বতঃই আসিবে।
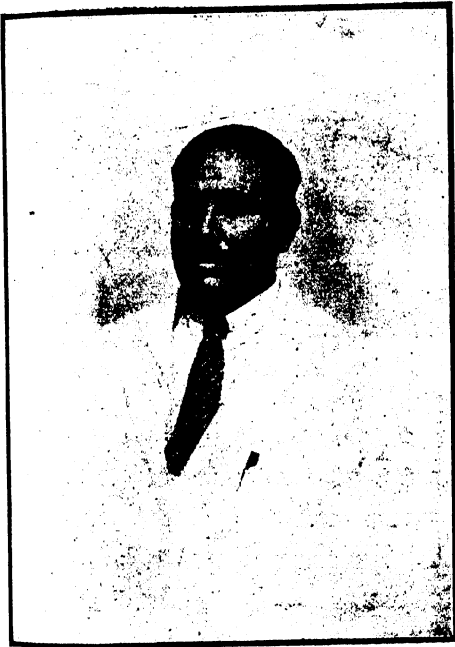
নিউ ইণ্ডিয়ার লাইফ সেক্রেটারী—ডাঃ এস্, সি, রায়

কোম্পানীর কার্য্য পরিচালনের কয়েক বৎসরের মধ্যে অভূতপূর্ব্ব সাফল্যলাভ করায় ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে "জীবনবীমা বিভাগ" ও খোলা হইল—কোম্পানী এই বিভাগেও অতি স্বল্প ব্যয়ে যে সাফল্য লাভ করিয়াছেন ভারতীয় জীবন বীমা কোম্পানীগুলি কার্য্যের প্রারম্ভে কেহই তাহাতে সমর্থ হন নাই।

১৯৩১-৩২ সালে জগৎব্যাপী অর্থ কৃচ্ছ্রতার মধ্যে ও নিউ ইণ্ডিয়ার নব-গঠিত জীবনবীমা বিভাগ ৮৮ লক্ষ টাকার পলিসি প্রদান করিয়া সকলের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছেন।

১৯৩১ সালের ৩১শে মার্চ্চ কোম্পানীর যে বৎসর শেষ হইয়াছে তাহার আয় ব্যয়ের পরিমাণ আমার নিম্নে প্রদান করিলাম—

বিভাগ	নূতন চাঁদার আয় টাকা	ব্যয়ের হার
অগ্নি	৪৭,৯৮,৬৮৪	৩৯·৯
নৌ	২৩,১৯,৫৪৬	১৪·৪
দুর্ঘটনা	৫,৬৪,৭৯৭	৩৩·৪
জীবন	৪,১৩,৯০২	...

নিউ ইণ্ডিয়ার সাফল্যের কারণ বুঝিতে হইলে চুক্তিপত্রগুলির ঔদার্য্য ও সুবিধা এবং সুলভ পণের হার দেখিতে হইবে। ইহার স্বতশ্চল ক্ষতি বিরোধী পণ নিয়ম পণ পরিশোধ বীমা, প্রসারিত বীমা, যুগ্মবীমা, ইচ্ছানুযায়ী নানাপ্রকার সুযোগ লইবার চুক্তিপত্রগুলি আদর্শ। চুক্তি পত্র তিন বৎসর পর্য্যন্ত বলবৎ থাকাকালীন ঐ চুক্তিপত্র নির্দ্দায়িক থাকিলে বীমাকারী তাহার পরিবর্ত্তে লাভ বিহীন একটী "পেড আপটারম" বা প্রসারিত মেয়েদের পণপরিশোধ চুক্তিপত্র লইতে পারেন। এই প্রকার চুক্তিপত্রে নির্দ্ধারিত সময় পর্য্যন্ত বীমার সম্পূর্ণ টাকার দাবী থাকে। যদি দুরারোগ্য ব্যাধি বা কোনও দুর্ঘটনা প্রযুক্ত কোনও বীমাকারী ষাট বৎসর বয়ক্রম পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে কোনও সময়ে সম্পূর্ণ অক্ষম হইয়া পড়েন এবং তাঁহার সেই অক্ষমতা কেবলমাত্র সাময়িক না হয় তাহা হইলে বার্ষিক ১৫০০০৲ টাকার বীমা পর্য্যন্ত কোম্পানির যে কোন তালিকার অন্তর্গত বীমা চুক্তির জন্য বাকী দেয় পণের টাকার দায় হইতে তাঁহাকে অব্যাহতি দেওয়া হয়।

কোম্পানীর জীবন বীমা বিভাগের আশাতীত সাফল্যের মূলে রহিয়াছে লাইফ সেক্রেটারী ডাঃ এস্ সি রায়ের অক্লান্ত পরিশ্রম—ডাঃ রায় একজন প্রবীন বীমাকর্ম্মী তিনি সম্প্রতি ইউরোপ ভ্রমণ করিয়া বীমার নব নব পদ্ধতির সহিত পরিচয় স্থাপন করিয়া আসিয়াছেন— আমরা আশাকরি তাঁহার সুপরিচালনায় জীবন বিভাগ ভারতীয় জীবনবীমাগুলির পুরোভাগে আসিবে।

নিউ ইণ্ডিয়া ভারতের বৃহত্তম বীমা প্রতিষ্ঠান ভারতবর্ষে

সাধারণ বীমার কার্য্যে যে সমস্ত কোম্পানি ব্যাপৃত আছে, তাহাদের সমবেত মূলধনের পরিমাণ ও নিউ ইণ্ডিয়ার সমান নহে। কোম্পানীর পরিচালন পরিষদের ব্যয়ের অঙ্কের উপর দৃষ্টি আছে—কার্য্যের অত্যন্ত প্রসার হইলেও ব্যয়ের হার খুব সামন্যই রহিয়া গিয়াছে; এই সুপরিচালনার ফলে কোম্পানীর রিজার্ভ ফণ্ড দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। ভারতের এই গৌরবময় প্রতিষ্ঠান টির সর্ব্বপ্রকার সাফল্য আমরা কামনা করিতেছি।

ইণ্ডিয়া প্রভিডেণ্ট কোম্পানী

ভারতীয় এই শ্রেষ্ঠ প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডটির নাম প্রত্যেকেই অবগত আছেন—প্রায় ২২ বৎসর পূর্ব্বে ১৯১০ খৃষ্টাব্দে সুপ্রসিদ্ধ বীমা কর্ম্মী শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ সেন মহাশয় কর্ত্তৃক এই কোম্পানী স্থাপিত হয়, আরম্ভ হইতে আজ পর্য্যন্ত কর্ত্তৃপক্ষ প্রকৃত সেবার আদর্শ লইয়া দারিদ্র্যপীড়িত দেশের যে মহান কল্যাণ সাধন করিয়াছেন তাহা বিস্মৃতির মসী-

নিখিল ভারতীয় বীমা কর্ম্মী সম্মিলনের সভাপতি ও ইণ্ডিয়া প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত [illegible]
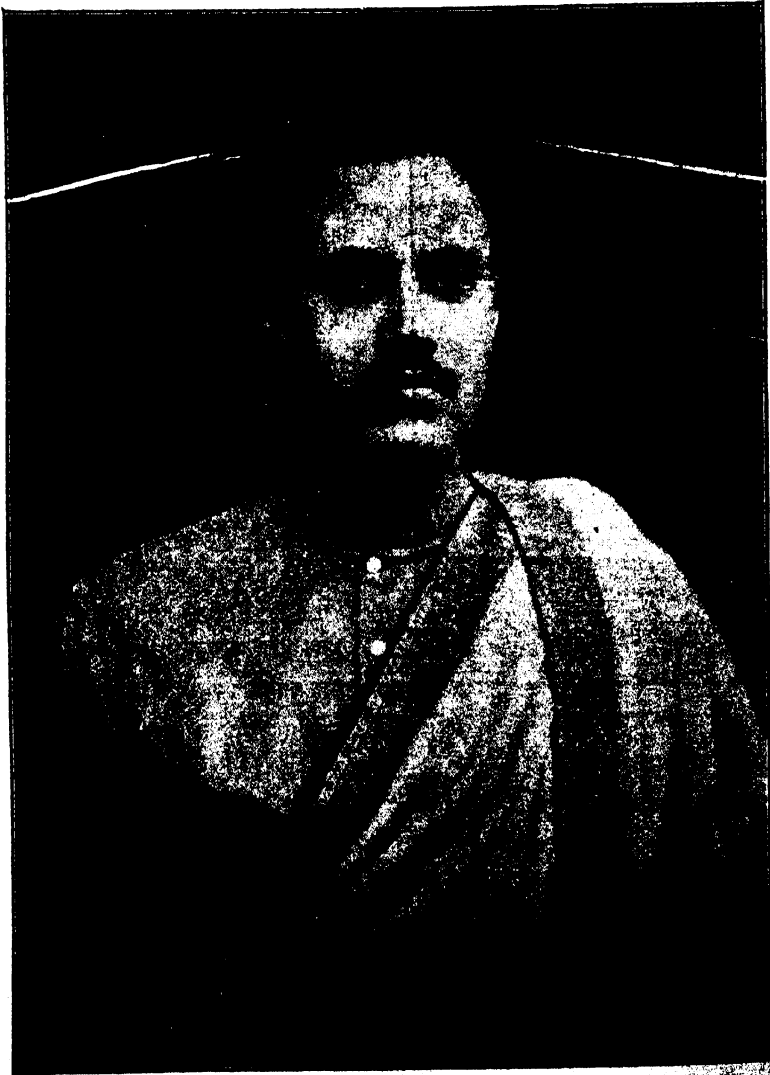
রূপে অবলুপ্ত হইবার নহে। নিম্নে আমরা কোম্পানীর পরিচালন পরিষদের নাম প্রদান করিলাম—

ডিরেক্টারগণ—

শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র মৈত্র বি-এল (এডভোকেট হাইকোর্ট ও ঠাকুর ষ্টেটের ভূতপূর্ব্ব ম্যানেজার)

শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী ঘোষ (বার্ড কোম্পানীর বীমা বিভাগের কর্ম্মাধ্যক্ষ)

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু বি-এল (এডভোকেট হাইকোর্ট)

কবিরাজ শ্রীযুক্ত সারদাকান্ত মজুমদার কবিভূষণ

শ্রীযুক্ত আই, বি সেন

অডিটার—

মেসার্স মুখার্জ্জি এণ্ড কোং

সেক্রেটারী—

শ্রীযুক্ত আই, বি, সেন।

সুতরাং দেখা যাইতেছে কোম্পানীর পরিচালকবৃন্দ অতিশয় সম্ভ্রান্ত এবং কর্ম্মক্ষম—তাঁহাদের ব্যবসার বিষয়ে যথেষ্ট অভিজ্ঞতাও আছে সুতরাং তাঁহাদের নেতৃত্বে কোম্পানীর সাফল্য যে আশাতীত হইয়াছে তাহাতে আশ্চর্য্যজনক কিছুই নাই।

নিম্নের অঙ্কগুলি হইতেই কোম্পানীর দ্রুত উন্নতির ইতিহাস অনুধাবন করা যাইতে পারে :—

বৎসর	মোট আয়	মোট তহবিল
১৯২২	৩০৬৬১৲	৫৪০০৯৲
১৯২৫	৬৬৫২৬৲	১২৬৯৯৬৲
১৯২৮	১৪৪৪৬৩৲	৩১১৮৭৫৲
১৯৩১	২৩৫৭৪৯৲	৭৩৩৯৯৫৲

কার্য্য পরিচালনে ব্যয়সংযত হইয়া কর্ত্তৃপক্ষ দুরদৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন এবং কোম্পানীর তহবিলটিও এজন্য অতি শীঘ্র বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। জীবন নির্ব্বাচনে কর্ত্তৃপক্ষ যথেষ্ট তারতম্য করেন এবং অপর পক্ষে দাবীর টাকা সত্বর পরিশোধ করিয়া সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন—কোম্পানী এ পর্য্যন্ত প্রায় আড়াই লক্ষ টাকার দাবী পরিশোধ করিয়াছেন; ইহা অতীব আনন্দের বিষয় কোম্পানীর উদ্বৃত্ত পত্রের সহিতই দাবীর তালিকা প্রকাশিত হইয়া থাকে। এখানে বীমা করিবার জন্য ডাক্তারী পরীক্ষার আবশ্যক হয় না—নারী পুরুষ (১৮ হইতে ৫০ বৎসর পর্য্যন্ত) সকলেই বীমা করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারেন; প্রভিডেণ্ট এবং ইন্‌ডাষ্ট্রিয়াল এই দুই শ্রেণীর চুক্তিপত্র কোম্পানী প্রদান করিয়া থাকেন—প্রভিডেণ্ট বিভাগে চাঁদা, মাসিক একটাকা ও আট আনা এবং ইন্‌ডাষ্ট্রিয়াল বিভাগে বয়স হিসাবে চাঁদা ধার্য্য হইয়া থাকে।

ইণ্ডিয়া প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড বাঙ্গালীর গৌরব—সুদীর্ঘ বিংশতি বৎসরের সাফল্যমণ্ডিত অতীত ইতিহাস কোম্পানীকে বিজয়যাত্রার পথে অনুপ্রেরণা দিতেছে। প্রতিষ্ঠানের এই শুভদিনে আমরা ইহার প্রাণস্বরূপ, প্রতিষ্ঠাতা স্বজন বৎসল অমায়িক উদার হৃদয় সম্পাদক শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ সেন মহাশয়কে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

হিন্দু মিউচাল লাইফ এসিয়োরেন্স

এই বীমা কোম্পানীর উৎপত্তির ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে ব্যবসায় সংক্রান্ত লাভের জন্য ইহা স্থাপিত হয় নাই। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে মহামারী ইনফ্লুয়েঞ্জা সিমলা সহরে আত্মপ্রকাশ করে এবং ফলে বহু ব্যক্তি মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন। উপার্জ্জনক্ষম যে সকল ব্যক্তিকে একদা স্বচ্ছল ও সঙ্গতিপন্ন বলিয়া বোধ হইত মৃত্যুকালে তাঁহার কিছুই সঞ্চয় না রাখায় তাহাদের মৃত্যুতে তাঁহাদের পরিবার একেবারে নিঃস্ব হইয়া পড়িল। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মজুমদার ইহার প্রতিকারের চেষ্টায় তৎপর হয়েন এবং আগ্রহাতিশয্যে ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের ২৩শে আগষ্ট তারিখে হিন্দু মিউচাল লাই এসিয়োরেন্স কোম্পান তৎকালে হিন্দু প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড নামে স্থাপিত হয়। এইজন্য ইহার চাঁদার হার অন্যান্য সমস্ত জীবন বীমা কোম্পানীর চাঁদার অপেক্ষা এতই কম যে স্বল্প উপার্জ্জনক্ষম ব্যক্তিও এই কোম্পানীতে অনায়াসে বীমা করিয়া স্বীয় পরিবারকে আকস্মিক বিপদ হইতে রক্ষার উপায় করিতে পারেন। সাধারণতঃ এক সহস্র টাকার বীমার জন্য প্রথম শ্রেণীর জীবনবীমা কোম্পানীগুলি যে চাঁদা গ্রহণ করেন সেই চাঁদা দিয়া হিন্দু মিউচালে ১২৫০ হইতে ১৩০০৲ শত টাকার বীমা করা যাইবে। এই অতিরিক্ত ২৫০৲ বা ৩০০৲ টাকা এককালীন নিশ্চিন্ত

বোনাসরূপে ধরা যাইতে পারে। সম্প্রতি কোম্পানী গ্যারাণ্টি দিয়া বোনাস্ দিবার জন্য এক প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন—তদ্বারা এক সহস্র টাকার বীমা করিলে প্রতি বৎসরে ১০৲ টাকা হইতে ক্রমে ২৫৲ টাকা নিশ্চিন্ত বোনাস পাওয়া যাইবে। এই প্রথার বিশেষত্ব এই যে প্রথম শ্রেণীর কোম্পানীগুলি এক সহস্র টাকার বীমার চাঁদা যে হারে লইতেছেন হিন্দু মিউচাল প্রায় সেই হারেই চাঁদা লইয়া নিশ্চিত বোনাস দিতেছেন। বিষয়টির মধ্যে কোন অনিশ্চয়তা নাই—বীমাকারীরা প্রথম হইতেই জানিতেছেন তাঁহাদিগকে কত দিতে হইবে এবং তাঁহারা কত পাইবেন।

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু ডিরেক্টার—হিন্দু মিউচাল

অধিকাংশ বীমা কোম্পানী যৌথ কারবার হেতু অংশীদারগণই সে সব কোম্পানীতে কর্ত্তৃত্ব করিয়া থাকেন। বীমাকারীদের অর্থেই কোম্পানীর উন্নতি অথচ বীমাকারীদের সে সব কোম্পানীতে কোন কর্ত্তৃত্বই নাই। হিন্দু মিউচালের কোন অংশীদার না থাকায় ইহার সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব বীমাকারীরাই করিয়া থাকেন এবং ভারতবর্ষের মধ্যে ইহাই বোধহয় একমাত্র কোম্পানী যাহা বিধবা ও অসহায়দিগের গৃহে গিয়া বীমার নগদ টাকা প্রদান করিয়া থাকেন।

অন্যান্য কোম্পানীর তুলনায় নূতন কার্য্যের পরিমাণের দিক দিয়া হিন্দু মিউচাল একটি ক্ষুদ্র কোম্পানী রূপে গণ্য হইলেও উৎকর্ষের দিক দিয়া ইহা যে একটি প্রথম শ্রেণীর বীমা প্রতিষ্ঠান সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। কোম্পানীর ব্যয়ের হার অতি সামান্য—বাঙ্গালী পরিচালিত কোম্পানীগুলির মধ্যে হিন্দু মিউচালের ব্যয়ের হার সর্ব্বাপেক্ষা কম। কোম্পানী স্থাপিত হইয়া অদ্যাবধি প্রত্যেকটি ভ্যালুয়েশনেই উদ্বৃত্ত প্রকাশিত করিয়াছে। বিগত ৩১শে ডিসেম্বর (১৯৩১) কোম্পানী নূতন হারে ভ্যালুয়েশনরূপ অগ্নি-পরীক্ষা সমাপ্ত করিয়া সানন্দে আপনার অক্ষত সেবা পরায়ণ দেহ লইয়া লোক লোচনের সম্মুখে আসিয়াছে—কোম্পানীর এই অসামান্য সাফল্যে আমরা আন্তরিক অভিনন্দন জানাইতেছি।

জনপ্রিয় ডিরেক্টার উদার হৃদয় শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু মহাশয় বহু ত্যাগ স্বীকার করিয়া প্রত্যহই অফিসে আসিয়া কোম্পানীর কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া থাকেন—আর কর্ণধার বীমাক্ষেত্রে সুপরিচিত শ্রীযুক্ত পি, সি, রায় মহাশয়ের কথা আমরা কি বলিব? হিন্দু মিউচাল বলিতে তাঁহাকেই বুঝায়। শ্রীযুক্ত রায় মহাশয় কিছুদিন পূর্ব্বে—কোনও বীমা কর্ম্মীদের সভায় বলিয়াছিলেন—"Insurance is a social service and not a trade at all"—তাঁহার এই উক্তি বিক্ষোভের সৃষ্টি করিয়াছিল; কিন্তু যাঁহারা বিগত দশ বৎসরের তাঁহার নেতৃত্বে হিন্দু মিউচালের কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন তাঁহারা জানেন এই উক্তি গালভরা শব্দ নহে স্বীয় কার্য্য-কলাপের প্রতিধ্বনি।

প্রভাত ইন্‌সিউরেন্স কোম্পানী লিমিটেড

বোম্বাইএর প্রভাত ইন্‌সিওরেন্‌স্ কোম্পানী অতি আধুনিক উন্নতিশীল কোম্পানীগুলির মধ্যে অন্যতম বীমা প্রতিষ্ঠান। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের ২২শে অক্টোবর এই

কোম্পানী স্থাপিত হয়। ১৯২৯ সনের অক্টোবর মাসে গবর্ণমেণ্টের জামিনের টাকা দাখিল করিবার পর কোম্পানীর কার্য্য প্রকৃতপক্ষে আরম্ভ হয়। অল্পদিনের মধ্যে এই কোম্পানী বৈজ্ঞানিক উপায়ে কার্য্যারম্ভ করিতে সমর্থ হন এবং প্রথম বৎসরেই ১১,৫৩,০০০ টাকায় বীমার প্রস্তাব পাইয়া প্রায় ৮ লক্ষ টাকার বীমা পত্র প্রদান করেন। ইহাদের বার্ষিক প্রিমিয়ামের পরিমাণ ৪১,৫৭৬ টাকা।

কোম্পানীর দ্বিতীয় বর্ষও সম্প্রতি শেষ হইয়াছে এবং বাজারের খারাপ অবস্থা স্বত্তেও কোম্পানীর সুদক্ষ পরিচালকগণের কার্য্যকুশলতায় এ বৎসরেও প্রায় ৮ লক্ষ টাকার বেশী নূতন কাজ হইয়াছে।

প্রথমতঃ বোম্বাইএর সুবিখ্যাত পাব্লিক একাউট্যাণ্ট ও প্রসিদ্ধ ব্যাঙ্কার মিঃ ভি, এ, ভাইকার কোম্পানী স্থাপন করেন। গত ১৯৩১ সনের মাঝামাঝি মিঃ ডি, সি দিনশা কোম্পানীর অন্যতম পরিচালক হিসাবে ইহাতে যোগদান করেন। মিঃ দীনশার পরিচালনায় কোম্পানী খুব দ্রুত উন্নতি করিতেছেন। শীঘ্রই কোম্পানীর হেড অফিস বোম্বাই হইতে লক্ষ্ণৌ স্থানান্তরিত হইবে।

প্রভাত ইন্‌সিওরেন্‌স্ কোম্পানীর বিশেষত্ব এই যে—

(১) কোম্পানীর প্রত্যেকটি বীমাপত্র জীবনবীমার দায়িত্ব ব্যতীত রোগ দুর্ঘটনাবশতঃ স্থায়ী অক্ষমতার দায়িত্ব বহন করে।

(২) কোম্পানীর বীমাপত্র বাসস্থান ও ভ্রমণের দিক হইতে পৃথিবীর সর্ব্বত্র বলবৎ থাকে।

(৩) সামান্য অতিরিক্ত চাঁদায় স্ত্রীলোকদের জীবন বীমাপত্রও গ্রহণ করা হয়।

(৪) ষান্মাসিক ও ত্রৈমাসিক চাঁদায় অতিরিক্ত কিছু আদায় করা হয় না।

(৫) কোম্পানীর স্বতঃসংরক্ষণ ব্যবস্থায় বীমাপত্র অনেকদিন পর্য্যন্ত সজীব রাখা হয়।

(৬) মফঃস্বল বীমাকারী মণিঅর্ডারে প্রিমিয়াম পাঠাইলে মণিঅর্ডার কমিশন প্রিমিয়াম হইতে বাদ দেওয়া হয়। কোন কোম্পানীতেই এই সুবিধা দেওয়া হয় না।

কোম্পানী, ত্রিসর্ত্ত বিশিষ্ট বীমা, Double Anticipatory বীমা, শিক্ষায় Annuity, একমাত্র প্রিমিয়াম দেয় বীমা প্রভৃতি চিত্তাকর্ষক বীমাপত্র প্রদান করিয়া থাকেন।

যুগ্ম-জীবন বীমা-কোম্পানীর বিশেষত্ব। ইহাতে এক কারবারের দুইজন অংশীদার কিংবা স্বামী-স্ত্রী একযোগে বীমা করিতে পারেন। ইহাতে একজনের মৃত্যু হইলে অন্যকে কিংবা মেয়াদী বীমা-পত্রে উভয়েই বাঁচিয়া থাকিলে উভয়কেই দাবীর টাকা প্রদান করা হয়।

প্রভাতের ম্যানেজার—শ্রীযুক্ত বি, বি, দত্ত

প্রায় তিন বৎসর হয় কোম্পানী বাংলা দেশে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। গত ১৯৩১ সনের শেষ ভাগ হইতে মিঃ বি, বি, দত্ত কলিকাতা শাখার ম্যানেজার রূপে যোগদান করিয়াছেন। মিঃ দত্ত বীমা-সম্বন্ধে সুলেখক বলিয়া সুপরিচিত। তাঁহার দূরদৃষ্টি সুযোগ্য পরিচালনায় কর্ম্মচারীবৃন্দ ও এজেণ্টদের প্রতি অমায়িক ব্যবহারে

কোম্পানী অল্পদিনের মধ্যেই জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। মিঃ দীনশা শীঘ্রই মিঃ দত্তকে লক্ষৌ হেড অফিসের জেনারেল ম্যানেজারের পদে নিযুক্ত করিবেন। কার্য্য-পরিচালনে সেক্রেটারী মিঃ Liebenhall ও শ্রীযুক্ত এস, পি, চৌধুরী, বি-এস্-সি, এস্ সি মিত্র, বি-এ, এন্, সি, চৌধুরী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

শৈশবাস্থায়—কোম্পানী যেরূপ সুযোগ্য পরিচালনার পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে কোম্পানীর ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল। আমরা প্রতিষ্ঠানটীর সর্ব্বপ্রকার সাফল্য কামনা করি।

ইষ্ট এণ্ড ওয়েষ্ট ইনসিওরেন্স্ কোম্পানী লিমিটেড্।

১৯১৩ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই সহরে ইষ্ট এণ্ড ওয়েষ্ট ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড প্রতিষ্ঠিত হয়। গত বৎসর সকল ব্যবসায়ীকেই বিশেষ ক্ষতি স্বীকার করিতে হইয়াছে কিন্তু ১৯৩০ সনের ন্যায় ১৯৩১ সনের কার্য্য বিবরণও ইহার অভুতপূর্ব্ব সাফল্যের ইতিহাস। নিম্নের ১৯৩১ সনের তালিকা হইতে কার্য্যবৃদ্ধির ও সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির প্রমাণ পাওয়া যাইবে।

	শতকরা বৃদ্ধি
নূতন কাজের পরিমাণ	৩৬ 0/0
জীবন-বীমা তহবিল	২৪ 0/0
চলতি বীমার পরিমাণ	২২ 0/0

১৯২৯ সনের অপেক্ষা ১৯৩০ সনে হিসাবের বৃদ্ধির পরিমাণ যথাক্রমে ৩৩ 0/0 ২২ 0/0 এবং ২২ 0/0 ছিল।

এই অর্থ সঙ্কটের দিনে ক্রমাগত দুই বৎসর সর্ব্বপ্রকারে এই কোম্পানী উন্নতির পরিচয় দিয়াছেন, শুধু তাহাই নহে ইষ্ট এণ্ড ওয়েষ্ট ক্রমেই জনসাধারণের বিশ্বাসভাজন হইতেছেন ইহা তাহারই পরিচয়। আমরা শুনিতেছি ১৯৩২ সনেও কোম্পানীর নূতন কাজের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পাইতেছে এবং বোনাস ঘোষণা করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এই কোম্পানীতে বীমা-পত্রের স্বতঃসংরক্ষণ প্রণালীটি অতি উদারতার সহিত পরিকল্পিত হইয়াছে। কোম্পানী সম্প্রতি স্ত্রীলোকের বীমাপত্র গ্রহণের নিয়মও প্রবর্ত্তন করিয়াছেন।

দাবী পরিশোধ সম্বন্ধে কোম্পানীর তৎপরতা অতি প্রশংসনীয়। কোম্পানীর দাদন নীতিও সর্ব্বাংশে নিরাপদ এবং পরিচালক মণ্ডলীর বহুদর্শীতার পরিচায়ক। কোম্পানী সম্প্রতি ২,৬৫,০০০্ টাকা ব্যয়ে তাঁহাদের একটী নিজস্ব গৃহ ক্রয় করিয়াছেন।

মিঃ বি মুখার্জ্জী কলিকাতা শাখার সেক্রেটারী।

মিঃ মুখার্জ্জি বহুদিন হইল বীমাক্ষেত্রে কার্য্য করিয়া অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছেন—আমরা আশা করি তাঁহার সুপরিচালনায় ও দূরদৃষ্টিতায় বঙ্গদেশে কোম্পানীর কার্য্যের প্রসার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইবে।

দরিদ্র ভারতবর্ষ

মাথাপিছু হারে জীবনবীমার পরিমাণ

দেশের নাম	জীবনবীমার পরিমাণ
আমেরিকা	৩,০০০্
ক্যানাডা	১০০০্
অষ্ট্রেলিয়া	১৬০০্
নিউজিল্যাণ্ড	১১০০্
ইংল্যাণ্ড	৭৫০্
অষ্ট্রীয়া	৭০০্
নরওয়ে	৫০০্
সুইডেন	৪৫০্
হল্যাণ্ড	৪০০্
ডেনমার্ক	৩৫০্
জাপান	২০০্
ভারতবর্ষ	৩৸০

মহাত্মাজীর উপবাস—

মহাত্মাজীর উপবাস প্রসঙ্গই এবারকার এক বৃহৎ রাজনৈতিক আন্দোলন। মহাত্মাজী যারবেদা জেল হইতে ভারত-সরকার ও ভারত সচিবের সহিত শাসন সংস্কার সম্বন্ধে যে নানা প্রকার কথা কহিতেছিলেন তাহা মধ্যে মধ্যে বিবিধ সংবাদ পত্রে সরকারি ভাবে নাই হউক প্রকাশিত হইত, তাহার পর মহাত্মার পত্রগুলির সহিত ভারতসচিব ও প্রধান মন্ত্রীর পত্র বাহির হইলে, বেশই জানিতে পারা গেল যে সরকার পক্ষকে মহাত্মাজীই অনেকটা স্বপক্ষে আনিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, চেষ্টায় ব্যর্থ মনোরথ হইয়া তিনি তাঁহার ব্রহ্মাস্ত্র আধ্যাত্মিক শক্তির আশ্রয় লইয়াছেন। উপবাস বা প্রায়োপবেশনে আধ্যাত্মিক শক্তি উন্মেষ হয়। মহারাজ পরীক্ষিৎ প্রায়োপবেশনে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। অনেক মহা-পুরুষ আধ্যাত্মিক শক্তি লাভ করিবার জন্যই প্রায়োপবেশন করিয়া গিয়াছেন। মহাত্মা যীশু খৃষ্ট বা বুদ্ধদেবও একাদি-ক্রমে অনেক দিন প্রায়োপবেশন করিয়াই ঐশী শক্তি লাভ করেন। মহাত্মার প্রায়োপবেশনের বার্ত্তায় যাঁহারা বিচলিত হইয়া পড়িয়াছেন তাঁহারা অনুমান করিতেছেন যে মহাত্মাজী আয়র্লণ্ডের পাদরী প্রবর ম্যাক্‌স্থইনীর ন্যায় অনাহারে জীবন ত্যাগ করিবেন। মহাত্মা কিন্তু অনাহারের কথাই বলিয়াছেন, আত্ম হত্যার কথা কহেন নাই, উহা তাঁহার উপর আরোপিত হইতেছে। তর্ক স্থলে যদি ধরিয়াই লওয়া যায় যে মহাত্মাজী অনাহারে প্রাণত্যাগই যদি করেন, তাহা হইলেও কি তাহার একটা ফল এই বহু পুরাতন হিন্দু সমাজে প্রদর্শিত হইবে না। যাঁহারা মহাত্মাকে জানিলেও তাঁহার আধ্যাত্মিক দিকটা ভাল করিয়া দেখিবার অবসর পান নাই, তাঁহারা ভাবিতেছেন, উপবাস মহাত্মার পক্ষে অত্যন্ত বালক সুলভ আবদার মাত্র বলিয়া মনে হইতেছে। যাঁহারা চালবাজ, রাজনীতিই যাঁহাদের ব্যবসা, তাঁহারা মহাত্মাজীর পুণ্যময় জীবনে কলঙ্ক লেপন করিবার মানসে বলিতেছেন, তিনি মারা গেলে ক্ষতি কি? হয় সাধারণ ভাবে মরিতেন না হয় আত্মহত্যাই করিলেন। মহাত্মাজী পতিত জাতিকে তাহাদের নায্য দাবী হইতে বঞ্চিত করিবার জন্যই এইরূপ পণ করিয়া বলিয়াছেন। সাম্রাজ্য-তন্ত্রী ইংরাজ ও মার্কিন মুল্লুকের কাগজওয়ালারাই উক্ত মতটা বেশ জোর গলায় জগতের নিকট প্রকাশ করিয়া মহাত্মাজীকে সাধারণের নিকট হেয় প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছে। ষ্টেটস্‌ম্যান পত্রিকার ভারতীয় লেখক মহাশয়ও এই সমস্ত সাম্রাজ্যবাদীর স্বরের সহিত স্বর সংযুক্ত করিয়া বলিতেছেন, মহাত্মাজী অবতার এবং সমস্ত অবতারই যখন শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে আত্মহত্যা করিয়াছেন তখন মহাত্মাজীই বা না করিবেন

কেন? রামচন্দ্র তাঁহার লীলা অবসান করিয়া সরযু নদীর জলে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। প্রভাস যজ্ঞের পর শ্রীকৃষ্ণ সামান্য একটী ব্যাধের হস্তে জীবন বিসর্জ্জন দেন ইত্যাদি। ভারতীয় লেখক মহাশয়ের উক্তিগুলি শ্লেষপূর্ণ, শ্লেষটা অনেকটা স্বেচ্ছাকৃত তাহাতে সন্দেহ নাই, কাজেই এইপ্রকার উক্তির কোন উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন নাই। তবে সাম্রাজ্যবাদীরা যাহা বলিতেছেন তাহার উত্তরে বলা যায় যে মহাত্মাজীর জীবন লক্ষ্য করিলে আমাদের কি ধারণা স্বতঃসিদ্ধ ভাবে উপস্থিত হয়। নেহাৎ কতকটা philanthropic ভাবেই কি তিনি পতিত কুলী মজুর হইতে আরম্ভ করিয়া সকল প্রকার নিঃস্ব জনসঙ্ঘের পক্ষ হইতে আন্দোলন করিয়া আসিতেছেন? সম্মানজনক ও অর্থ-করী ব্যবসা ত্যাগ করিয়া আফ্রিকার কুলীদের সহিত আপনাকে মিশাইয়া দিয়া সেখানে যে আশ্রম খুলিয়াছিলেন, সেটাও কি তাঁহার philanthropyরই নিদর্শন। আপনার যথাসর্ব্বস্ব পরহিতে নিয়োগ করিয়া স্ত্রী-পুরুষের কারাবরণ করাও কি philanthropy মাত্র? তাহার পর পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতের ইতিহাসের যাঁহারা খবর রাখেন তাঁহারা কি জানেন না যে এই কয়েক বৎসরের প্রাণপাত চেষ্টার ফলেই আজ পতিত জাতিগুলি অনেকটা উন্নত হইয়া উঠিয়াছে। কংগ্রেসে পতিত জাতিদের সমান আসন প্রদান করিবার জন্য যত আন্দোলন হইয়াছে, সেগুলির সহিতই কি মহাত্মাজী ওতপ্রোতভাবে সংযুক্ত নহেন?

তবে রাজ্যশাসন করিতে গেলে চাণক্যনীতি অনুসারে সাম্য, ভেদ ও দণ্ড ইত্যাদি নীতিগুলি আশ্রয় লইতে হয় এই কথা স্বীকার্য্য। ইংরাজ ভারতকে শাসন করিতে চাহেন, কাজেই যে সমস্ত কূটনীতি আশ্রয় গ্রহণ করা তাঁহার পক্ষে প্রয়োজন, সে সমস্ত কূটনীতিগুলিই তাঁহারা একের পর এক একটী করিয়া আশ্রয় লইবেন একথা সত্য। এই কূটনীতির সহিত যুদ্ধ করিতে গেলে কূট-নীতি বা আধ্যাত্মিক শক্তির প্রয়োজন। মহাত্মাজী জীবনে কখনও কোনরূপ রাজনৈতিক ধাপ্পাবাজীর আশ্রয় লয়েন নাই। আধ্যাত্মিকতাই তাঁহার নিকট চিরকাল ব্রহ্মাস্ত্র বলিয়া পরিগৃহীত হইয়া আসিয়াছে, মহাত্মাজী আজ নিজেকে একান্ত বিপন্ন দেখিয়া এই মহাস্ত্র গ্রহণ করিয়াছেন। যাঁহারা গতানুগতিকতার অনুরক্ত, সমস্ত কার্য্যেই যাঁহারা বর্ত্তমান দ্বারা পরীক্ষা করিতে চাহেন, তাহাদিগকে আমরা এই মাত্রই বলি যে মহাত্মাজী কোন কার্য্যই সাময়িক উত্তেজনার বশে করেন নাই। তাঁহার সমস্ত কার্য্যাবলীর মধ্যেই তীক্ষ্ণ ভবিষ্যৎ দৃষ্টি নিহিত থাকে। ইহা তাঁহার ব্যবসায়ী বুদ্ধি নহে ইহা তাঁহার আধ্যাত্মিকতার ফল। ভারতের হিন্দু নর-নারী আজ সহস্র শাখায় বিভক্ত। বিংশ শতাব্দীতে যখন ধর্ম্ম একপ্রকার প্রায় তাবৎ সভ্যদেশ সমূহেই মানব বিশেষের নিজস্ব চিন্তাধারা বলিয়া বিবেচিত হইতেছে, তখন এই ধর্ম্ম-ভাবকে টানিয়া আনিয়া রাজনীতির রূপ গঠন করিবার চেষ্টা কি বাতুলতা নহে। ধর্ম্মের কথা একান্ত ভাবে যদি তুলিতেই হয় তাহা হইলে একথা কি সত্য নহে যে সকল ধর্ম্মেই মানবের ঐক্যতা স্বীকৃত হইয়াছে। তবে একদল মানব আপনাকে উচ্চ শ্রেণী জ্ঞান করিয়া অপর শ্রেণীকে ঠেলিয়া রাখে কোন অজুহাতে? হিন্দু ধর্ম্মের মধ্যে বর্ত্তমানে যে সমস্ত ব্যবস্থা রহিয়াছে উহা মুসলমান যুগে উচ্চশ্রেণীর হিন্দুগণ আপনাদের প্রাধান্য রক্ষা করিবার জন্য প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, একথা এখন সর্ব্ববাদী সম্মত ভাবে স্বীকৃত হইয়াছে। এখন অনুন্নত জাতিগণকে মনুষ্যত্ব বিকাশের তাবৎ সুযোগ আমাদের সমাজে প্রদান করিবার সময় আসিয়াছে। সমাজও একেবারে অন্ধ হইয়া বসিয়া আছে বলিলেও ভুল করা হইবে। তাহাই যদি না হয় তাহা হইলে ডাঃ আমেদকর বা রাও বাহাদুর রাজাকে লইয়া উচ্চশ্রেণীর হিন্দুগণ খাওয়া-দাওয়া করিতেছেন কেন? সেদিনও ত দেখা গেল বাংলার আইন পরিষদ গৃহে স্যর আশুতোষের পুত্র, মহাকুলীন শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু ইত্যাদি বঙ্গের উচ্চশ্রেণীর হিন্দুগণ মেথর সর্দ্দার রাউতকে লইয়া একত্র আহার করিলেন। বরং যাঁহারা আপনাদিগকে পতিত বলিয়া ঘোষণা করেন, সেই সমস্তই ধুরন্ধররাই এই পান-ভোজনে যোগদান করেন নাই। মধ্যযুগের ব্যবস্থা ক্রমশঃই সব দিক হইতে শিথিল করিয়া দেওয়া হইতেছে। তবে যাহারা এখন

তাহাদের জাত ব্যবসা হিসাবে অস্বাস্থ্যকর ব্যবসায় নিযুক্ত তাহাদের সহিত আদান-প্রদান এখনও হয় নাই। এইরূপ আদান-প্রদানই বা কোথায় হইয়া থাকে? ইউরোপের ধনিকগণ কি রাস্তার ধাঙড় ও কুলীগণের সহিত এক সঙ্গে আহার করেন?

সহযোগী ষ্টেটস্‌ম্যান কিন্তু ঠিকই বলিয়াছেন। মহাত্মাজী হিন্দু-সমাজে ঐক্য-স্থাপন করিবার প্রয়াসী। তাঁহার এই চেষ্টায় বাধা প্রদান করা কর্ত্তব্য নহে। বরং তাঁহার এই মহৎ উদ্দেশ্যে আমরা যতটুকু পারি তাঁহাকে সাহায্য করাই উচিত। সরকার পক্ষের সহিত তাঁহার কোন বাদ-বিসম্বাদ নাই। তিনি হিন্দু জাতিকে এক বিরাট প্রতিষ্ঠানে আবদ্ধ রাখিতে চাহেন। তাঁহার চেষ্টা সফল হইলে সরকার পক্ষ নিশ্চয়ই তাঁহারই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন। তবে তিনি যদি সফলকাম হইতে না পারেন, তাহা হইলে বর্ত্তমানে সরকার যা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহাই বলবৎ রহিয়া যাইবে।

আমরা হিন্দুজাতিকে এই কথাই বলিব যে এই মহাসন্ধিক্ষণে সকলপ্রকার স্বার্থ ও অভিমান ত্যাগ করিয়া মহাপুরুষ প্রদর্শিত পথে চলাই আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য। ভারতের হিন্দু নর-নারী মহামানবের আহ্বানে কিরূপ জাগরিত হয় তাহাই এখন দেখিবার বস্তু।

নব রাউণ্ড টেবল্ :—

আবার নূতন রাউণ্ড টেবিলের ধূম পড়িয়া গিয়াছে। শুনা যাইতেছে যে দুই-একজন মহাপুরুষ ইতিমধ্যেই জাহাজের টিকিট খরিদ করিয়াছেন এবং শীঘ্রই বিলাত যাত্রা করিবেন। শীতকালে বিলাত দেশটী নাকি খুবই স্বাস্থ্যকর। যে সমস্ত মহাপুরুষ কলির স্বর্গে গমন করিতেছেন তাঁহারা দেবতা বিশেষ। গোল টেবিলে যে বিশেষ কাজ হয় তাহা নহে, তবে স্বাস্থ্যের উন্নতি অনেকটা সংসাধিত হয়। এবারকার গোল টেবিলে যাঁহারা সরকারের সহিত একমত হইতে পারিবেন এইরূপ সদস্য লওয়া হইবে বলিয়া শুনা যাইতেছে; কাজেই কাজেও কিছু হইতে পারে আশা করা যায়। তাহা হইলে স্বাস্থ্য উন্নতির পক্ষে সর্ব্ব সুযোগই ঠিক থাকিবে।

জয়ন্তী কি ?

এখন জয়ন্তীর যুগ চলিয়াছে। প্রাচীন রোমানযুগে জয়ন্তীর যুগ ছিল! তখনকার যে সমস্ত মহাবীর রোমের হইয়া নানা দেশ জয় করিয়া আসিতেন তাঁহারা খুব ধূমধামের সহিত রাজধানীতে প্রবেশ করিতেন, ইহাকেই রোমান জয়ন্তী বলা হইত। মহাকবি কালিদাস রঘুবংশে রঘুর দিগ্বিজয়ের বার্ত্তা জগতের নিকট প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু বর্ত্তমান যুগে বাংলায় যে জয়ন্তীর যুগ দেখা দিয়াছে উহা সাহিত্যিক জয়ন্তী, অর্থাৎ কোন বড় সাহিত্যিকের ভক্ত ও অনুগত জনসাধারণ এক সম্মেলন করিয়া তাঁহাদের মাননীয় লেখক মহাশয়ের গলদেশে মাল্য ও নানাপ্রকার উপঢৌকন প্রদান করিতেছেন। সম্প্রতি টাউনহলে প্রসিদ্ধ উপন্যাস লেখক শরৎবাবুকে লইয়া এইরূপ একটা মেলার অভিনয় হইবার কথা ছিল। বাংলার যুবকগণ নাকি এই জয়ন্তীর কর্ত্তৃপক্ষগণকে বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে মহামানব মহাত্মা গান্ধীজী যখন মঙ্গলবার হইতে অনশনব্রত অবলম্বন করিবেন তখন এইরূপ আমোদ-প্রমোদ করা সুশোভন হয় না। সম্মেলনের কার্য্য অনেকটা অগ্রসর হইয়া গিয়াছিল বলিয়া কর্ত্তৃপক্ষগণ তাহাদের প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করিতে পারেন নাই। ফলে যাহা হয়, তাহাই হইয়াছিল, অর্থাৎ গুণ্ডামির অভিনয়, বিশিষ্ট ভদ্রলোকগণকে অপমান ইত্যাদি। দোষ কার যদি বিবেচনা করা যায় তাহা হইলে বলিতে হইবে যে বাংলার নেতাগণ যুবকদের প্রার্থনায় কর্ণপাত করিলেই পারিতেন। যুবকগণ সাধারণতঃই ভাবপ্রবণ এইরূপ একটা গোলমাল করিবার অবসর কাহাকেও প্রদান না করিলেই ভাল হইত।

উড়িষ্যা বিভাগ :—

উড়িষ্যা প্রদেশটীকে একটী স্বতন্ত্র প্রদেশ করিবার কথা অনেকদিন হইতেই হইতেছে। লর্ড কার্জ্জনই প্রথম এই কথা তুলিয়াছিলেন। তাহার পর বেহার-উড়িষ্যা

লইয়া যখন একটী স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠিত হয় তখন নাকি ভবিষ্যতে সম্পূর্ণ পৃথকভাবেই রচিত হইবে বলিয়া আশ্বাস প্রদান করা হইয়াছিল। সাইমন কমিশন উড়িষ্যার ন্যায্য দাবী স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন, গত গোলটেবিল বৈঠকেও উড়িষ্যাকে একটী স্বতন্ত্র প্রদেশ করিয়া দেওয়া হইবে বলিয়া আশ্বাস প্রদান করা হয়। এইজন্যই উড়িষ্যার কয়েকজন নেতা সম্প্রতি বড়লাট মহোদয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাদের একটী মন্তব্য পেষ করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন যে উড়িষ্যা প্রদেশটী আয়তনে ক্ষুদ্র হইলেও উহার আর্থিক অবস্থা অনেক প্রদেশ অপেক্ষাই ভাল। ফেডারল্ ফাইনান্স কমিটী নাকি বলিয়াছেন নূতন ব্যবস্থা অনুযায়ী উড়িষ্যার ঘাটতি মাত্র বিশ লক্ষ টাকা হইবে। তাঁহারা এ কথা বলিয়াছেন যে, পাটনাকে রাজধানী করিবার জন্য অনেক টাকা খরচ করা হইয়াছে। উক্ত টাকায় উড়িষ্যার একটা অংশ ছিল। উড়িষ্যা বর্ত্তমানে স্বতন্ত্র প্রদেশ হইলে উক্ত অংশটা উড়িষ্যাকে ফিরাইয়া দিতে হইবে। এই প্রদেশে অনেক খাল আছে। এই খাল বাবদ অনেক টাকা সরকার পক্ষকে কর্জ্জ করিতে হইয়াছিল, সেইজন্য উড়িষ্যাকে বেশ মোটা সুদ দিতে হয়। নেতাগণ বলিয়াছেন যে পূর্ব্বকার খালগুলির অনেকগুলিই নষ্ট হইয়া গিয়াছে না হয় মজিয়া গিয়াছে। সুতরাং উক্ত সুদটা প্রদান করা উড়িষ্যার পক্ষে কষ্টকর। এইজন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে উহা রেহাই দিতে হইবে।

মাঞ্চু সমস্যা :—

লিটন কমিটীর সত্ত অনুযায়ী জাপান মানচুরিয়াকে একটী স্বাধীন রাজ্য বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। অবশ্য এই স্বাধীন রাজ্যে জাপানী স্বার্থ সর্ব্বাগ্রে রক্ষিত হইবে। এই ঘোষণার সহিতই চীনের জাতীয় পরিষদ লণ্ডন, প্যারিস, ওয়াশিংটন, জেনেভা ইত্যাদি সহরগুলিতে তার করিয়া তথাকার সরকারদিগকে এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়া আপনাদের অভিমত জ্ঞাপন করিয়াছেন। স্বার্থে স্বার্থে দ্বন্দ্ব, মীমাংসা হওয়া সুদূর পরাহত।

সার্ব্বজনীন পূজা :—

মাতৃ-পূজা আগত। আমরা সকলেই এক জগদ্ধাত্রীর সন্তান এইরূপ জ্ঞান করিয়া এবারকার পূজা সম্পূর্ণ করা কর্ত্তব্য। কলিকাতার কয়েকটী পল্লীতে সার্ব্বজনীন দুর্গোৎসব সম্পাদিত হইয়া থাকে। উক্ত পল্লীগুলিতে প্রায়ই শুনা যায় জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে মাতৃপূজা করা হয়। কোন কোন স্থলে নাকি অস্পৃশ্য সম্প্রদায় কর্তৃক 'ভোগ' রন্ধন পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। বাংলার বিভিন্ন পল্লীগুলিতে এই সার্ব্বজনীন দুর্গোৎসব অনুষ্ঠিত হইবার বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। কেননা তথায় যে সমস্ত পূজা সাধারণতঃ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে উহা ব্যক্তি বিশেষের পূজা। তাঁহারা খুব স্বাভাবিক ভাবেই জনসাধারণের জন্য সম্পাদন করিতে রাজী না হইতে পারেন। এইজন্যই আমরা বলিতেছিলাম যে, যুবকগণ এবার পূজার সময় দেশে গমন করিয়া সামান্য ঘট প্রতিষ্ঠা করিয়াও এই সার্ব্বজনীন পূজার অনুষ্ঠান করিলে মহাত্মাজীর উদ্দেশ্য অনেকটা সফল হইবে। আমাদের সর্ব্বসময়েই স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে দরিদ্রগণকেই আমাদের শাস্ত্রকারগণ 'নারায়ণ' বলিয়া গিয়াছেন।

ভারতের প্রতিষ্ঠান সমূহ

[বিজ্ঞাপন বিভাগ হইতে রচিত]

"কলিকাতা সোপ ওয়ার্কস্"

বাংলায় যখন 'স্বদেশী আন্দোলন' আরম্ভ হইল আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র দেখিলেন বাংলায় তেমন উল্লেখযোগ্য অঙ্গরাগ দ্রব্য প্রস্তুত করিবার কোন সুব্যবস্থা নাই। তিনি তখন এই কলিকাতা সোপ ওয়ার্কসের প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করেন। তারপর আস্তে আস্তে যখন স্বদেশী আন্দোলন মন্দীভূত হইল কলিকাতা সোপ ওয়ার্কসের অবস্থারও বিপর্যয় ঘটিল। এইরূপে মেছুয়াবাজারে অবস্থান কালীন 'কলিকাতা সোপ ওয়ার্কসের' স্বত্বের হস্তান্তর হইল। তারপর ভূতপূর্ব্ব ম্যানেজার শরৎবাবু, (অধুনা 'কলিকাতা টয়লেট প্রডাক্টসের' অন্যতম ডিরেক্টার ও পরিচালক) 'কলিকাতা সোপ ওয়ার্কসের' অনেক উন্নতি সাধন করেন। তারপর শরৎবাবুর স্থলে পবিত্রবাবু আসিলেন এবং স্বদেশী আন্দোলনের আবার আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে 'কলিকাতা সোপ ওয়ার্কস্' অভাবনীয় উন্নতি সাধন করিল। কলিকাতা সোপ ওয়ার্কসে প্রস্তুত ডালি, প্রতিমা প্রভৃতি সাবান ঘরে ঘরে চলিতেছে। আজকাল এঁরা টুথ পাউডার, দাড়ীকামানোর সাবান প্রভৃতি প্রস্তুত করিতেছেন। আমরা এইরূপ স্বদেশী অনুষ্ঠানের উন্নতি কামনা করি।

"হিমানী"

বাঙালী শিক্ষিত সম্প্রদায় বরাবরই একটু সৌখীন। যখন বাঙালী স্বদেশীতে প্রথম মাতিয়াছিল তখন কলিকাতার এক নিভৃত কোণে শ্রীযুত জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রথম স্বদেশী স্নো হিমানী বাহির হয়। বাঙালী তখন এদিকে নিজেদের সামর্থ্য বুঝিতে পারে নাই কিন্তু যখন "হিমানী" তাহার হিমানীরূপ লইয়া আত্মপ্রকাশ করিল তখন বাঙালীর ধারণা জন্মিল যে এই বিষয়েও বাঙালী কাহার নিকট পরাজিত হইবার নহে। তারপর বৎসরের পর বৎসর চলিয়া গিয়াছে "হিমানীর" নাম সমগ্র ভারত, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতিতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। আমরা জানি পল্লীগ্রামের লোকেরা সকল রকম স্নোকেই হিমানী বলিয়া জানে—যেন স্নোর অপর নামই হিমানী। হিমানী ওয়ার্কস এখন সাবান প্রভৃতি অঙ্গরাগ তৈয়ারি করিতেছেন। আমরা সকল দ্রব্যের 'হিমানী'র মত উন্নতি দেখিতে চাই। অনেক তথাকথিত বড় কারবারওয়ালাদের মত এঁদের কোন 'বটলিঙ' কারবার নাই তাই রক্ষা তা না হলে ওনাদের সকলকারই "ফেনের" দশা হইত। বিস্তারিত পরে।

"লক্ষ্মীবিলাস"

আমাদের যখন জন্ম হয় নাই এবং আপনাদের মধ্যে দু'একজন ব্যতীত কাহারও তখন জন্ম হয় নাই সেই ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে "লক্ষ্মীবিলাসের" জন্ম হয়। আপনারা নিশ্চয়ই "লক্ষ্মীবিলাসের" নাম আপনাদের ঠাকুমা, দিদিমাদের নিকট হইতে শুনিয়া থাকিবেন কারণ আমরা যতদূর জানি লক্ষ্মীবিলাস সর্ব্বপ্রথম কেশ তৈল কারণ তৎপূর্ব্বে কোন কেশ তৈলের ঠিক প্রচলন ছিল না। পূর্ব্বে "লক্ষ্মীবিলাসের" নাম যথেষ্ট ছিল এবং এখনও আছে কিন্তু সময়ের সঙ্গে মানুষের রুচির পরিবর্ত্তন হইতেছে এবং মানুষ এখন চায় বাহ্যরূপ ও সৌন্দর্য্য তাই "লক্ষ্মীবিলাসে"র আদর হয়ত আজকালকার ছেলেমেয়েদের নিকট কমিয়া যাইতে পারে কিন্তু যাহারা কেশ তৈলের উপকারিতা দেখিতে চাহেন আমাদের মনে হয় তাহাদের এখনও 'লক্ষ্মীবিলাস' ব্যবহার করা ভিন্ন উপায় নাই। আমরা এইরূপ কথা বলিলাম কারণ আমাদের এই বিষয়ে খুব প্রত্যক্ষ জ্ঞান আছে। এঁদের গোলাপসার, দদ্রুহুতাশন, সুধাসিন্ধুরস প্রভৃতি বহু অব্যর্থ ভেষজ পদার্থে প্রস্তুত ঔষধাবলী সত্যই আশ্চর্য্যরকম ঐ সকল রোগের আরামদায়ক। আমরা ঐ বাঙালী পরিচালিত প্রায় অর্দ্ধশতাব্দঅতিক্রমকারী প্রাচীন অনুষ্ঠানের যথোচিত উন্নতি কামনা করি।

"কলিকাতা টয়লেট প্রডাক্টস্ লিঃ"

'কলিকাতা সোপ ওয়ার্কসের' ভূতপূর্ব্ব ম্যানেজার শরৎ বাবুর অনুষ্ঠান এই কলিকাতা টয়লেট প্রডাক্টস লিঃ। যদিও এই শিশু প্রতিষ্ঠানটীর বয়ক্রম কিছুমাত্র অধিক ১ বৎসর-কাল হইয়াছে কিন্তু বাজারে এই অল্প সময়ের মধ্যে যে সুনাম এঁরা অর্জ্জন করিতে সক্ষম হইয়াছেন তাহা শরৎবাবুর মত ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব। আশা করি এই শিশু প্রতিষ্ঠানটী অচিরে যথাযোগ্য স্থান দখল করিতে পারিবে।

"ডোয়ার্কিণ এণ্ড সন্স"

বাংলার সর্ব্বপ্রথম বাদ্যবিক্রেতা এই মেসার্স ডোয়ার্কিণ এণ্ড সন্স। আজকাল আমরা বহুরকম হাত হারমোনিয়মের নাম শুনিতেছি কিন্তু এই হাত হারমোনিয়মের উদ্ভাবন-কারীকে জানেন? এই ডোয়ার্কিন এণ্ড সন্সের প্রতিষ্ঠা-কারী দ্বারিকাবাবু। বাংলায় যখন গানের চর্চ্চা আরম্ভ হইল সাহিত্য-সুলভ সংস্করণের ন্যায় দ্বারিকাবাবু হার-মোনিয়মের সুলভ-সংস্করণ হাত হারমোনিয়াম বাহির করিলেন। আধুনিক বাংলা সেজন্য দ্বারিকাবাবুর নিকট অনেক ঋণী। ঘরে ঘরে আজ গানবাজনা হইতেছে এর প্রবর্ত্তনকারী কে? তাঁর কাছে আপনারা কি কম ঋণী? আমরা আপনাদের এঁদের নিকট ঋণের কথাই কেবলমাত্র স্মরণ করাইয়া দিলাম, এবং আশা করি বাঙালী কখনও বিস্মৃত হইবে না।

"রেডিয়ম ল্যাবরেটরী"

রেডিয়মের নাম বাজারে খুব কারণ এঁদের প্রস্তুত স্নো প্রভৃতি অঙ্গরাগ খুব উচ্চাঙ্গের; ইহা কেবলমাত্র যে আমরা বলি তাহা নয় বাংলার অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিই এই কথা বলিয়াছেন। এঁরা কিছুদিন হইল 'রেডিয়ম অয়েল' প্রস্তুত করিতেছেন। আমরা এঁদের উন্নতি কামনা করি।

"শক্তি ঔষধালয়"

আয়ুর্ব্বেদ যুগান্তর আনয়নকারী এই শক্তি ঔষধালয় অধ্যক্ষ মথুরবাবুর একটী অতুলনীয় কীর্ত্তি। ভারত হইতে প্রতি বৎসরে কোটি কোটি টাকা বাহির হইয়া যাইতেছে কেবলমাত্র বিদেশী ঔষধের জন্য কিন্তু আমাদের ভারতের মধ্যেও ঐ রকম ঔষধ প্রাপ্তব্য তাহা মথুর বাবুই প্রথম দেখাইতে সক্ষম হইয়াছেন। তাঁহার কার্য্যালয় এত বৃহৎ যে লর্ড রোণাল্ডসে পর্য্যন্ত দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছেন। এই রকম ঔষধালয় স্থাপন করিয়া ভারতের যে তিনি কি উপকার করিয়াছেন কেবলমাত্র এই কথাই আমরা আমাদের পাঠকবর্গকে স্মরণ করাইয়া দিতে চাই।

"কে সি বসু এণ্ড কোং"

আজকাল অনেক বার্লি বাজারে বাহির হইয়াছে সত্য কিন্তু একটী কোং ক্রমবিকাশে উন্নতি সাধন করিতেছে—এই মন্দা বাজারেও এবং অপর কোন কোং কিন্তু ডঙ্কা-নিনাদ করিয়াও কোন উন্নতি সাধন করিতে পারিতেছে না। এর কারণ কি আমাদের পাঠকবর্গকে আরও ভাল করিয়া খুলিয়া বলিতে হইবে। যদি অপরের চলতি জিনিষ মেকি করিয়া সহজে চালানো যাইত তাহা হইলেত ইংরাজ রাজত্বের কোর্টের সৃষ্টি হইত না। কিন্তু ইংরাজ কোর্ট ত ভুলিল না যে মেকি জিনিষ আসলের চাইতেও ভাল পরন্তু রুষ্ট হইয়া মোটা টাকার খেসারতের দাবী দিল। হায়রে বরাত! বিস্তারিতভাবে দেখিবেন। পার্ল বার্লি এখনও সকল ডাক্তারদের নিকট আদরণীয়। ব্রাণ্ড ট্রাণ্ড বার্লির বড় একটা কেউ ধার ধারে না। 'কে সি বসু এণ্ড কোং' কৃত বিস্কুট ইত্যাদিও বেশ চলিতেছে।

"মল্লিক ব্রাদর্স"

আধুনিক উচ্চাঙ্গের বাদ্য বিক্রেতা। মল্লিক ব্রাদার্সের মল্লিক ফ্লুট হাত হারমোনিয়ম সত্যই প্রশংসনীয়। এঁরা সকল রকম বাদ্য-সরঞ্জামাদি সকল সময়ে ষ্টকে রাখেন। এঁদের বিনম্র ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়াছি এবং আমরা এই প্রতিষ্ঠানের যথোচিত উন্নতি কামনা করি।

"পাবনা শিল্প সঞ্জীবনী"

গেঞ্জি, মোজা ইত্যাদি ঐ প্রকার জিনিষ বরাবরই জাপান ও অন্যান্য বিদেশ হইতে আসিত। কিন্তু 'পাবনা শিল্প সঞ্জীবনী' যখন ঐ সকল গেঞ্জি মোজা প্রভৃতি তৈয়ারি করিতে আরম্ভ করিলেন তখনও কেহ বিশ্বাস

করিতে পারে নাই যে ঐ সকল দ্রব্য ঠিক 'পাবনা' হইতে তৈয়ারি হইতেছে কি না—এইরূপ উচ্চাঙ্গের জিনিষ তাঁহারা প্রথম তৈয়ারি আরম্ভ করিলেন। কিন্তু যখন আমাদের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা কার্য্যালয় দেখিতে আহূত হইলেন এবং তাহারা দেখিয়া ঐ সকল দ্রব্যকে খাঁটী স্বদেশী বলিয়া জানাইলেন সেইদিন বাঙালীর আর এক আনন্দের দিন হইয়াছিল। এঁরা এখন সকল রকম হালফ্যাসানের জিনিষ তৈয়ারি করিতেছেন। ইহাদের তৈরী সব জিনিষই দেখিতে সুন্দর ও টেকসই। এঁদের উন্নতিতে কি বাধা?

"সাধনা ঔষধালয়"

সাধনার আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধাবলী বিশেষ নাম করিয়াছে। অল্প সময়ের মধ্যে সাধনা যে সাফল্য-লাভ করিয়াছে তাহা কেবলমাত্র যোগেশ বাবুর মত ব্যক্তির জন্যই সম্ভব হইয়াছে। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র যে প্রশংসাপত্র সাধনাকে দিয়াছেন তাহা কেবলমাত্র সাধনারই যোগ্য।

"ডোঙ্গরের বালামৃত"

বোম্বাইর ডোঙ্গর কোং প্রস্তুত বালামৃত বাংলায় বিশেষ নাম করিয়াছে। বালামৃত শিশুদিগের পক্ষে বিশেষ উপকারী। স্বদেশী দ্রব্যই ব্যবহার করা উচিত এবং অনুরূপ বিদেশী 'ফুড' অপেক্ষা আমরা বালামৃত ব্যবহারে পক্ষপাতী।

— 'অমৃতাঞ্জন' —

অমৃতাঞ্জনের নাম আজকাল বাংলার ঘরে ঘরে। বেদনা নিবারক ঔষধাবলীর মধ্যে অমৃতাঞ্জন অন্যতম শ্রেষ্ঠ। আমরা এই স্বদেশী প্রতিষ্ঠানের আরও উন্নতি কামনা করি।

"ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়"

আয়ুর্ব্বেদ জগতে 'ঢাকা আয়ুর্ব্বেদ ঔষধালয়ের' দান সামান্য নয়। দিনে দিনে উক্ত প্রতিষ্ঠানটী যেরূপ দ্রুতগতিতে উন্নতি করিতেছে তাহাতে আশা করা যায় অচিরেই তাহাদের স্থান আরও দৃঢ়ভিত্তিতে স্থাপিত হইয়া জগতের কল্যাণ সাধনে ব্রতী হইবে। লোকচক্ষু সম্মুখে সদা-সর্ব্বদাই নামটীকে জাগাইয়া রাখিতে হইবে তবে না একদিন উক্ত প্রতিষ্ঠানটী অনুরূপ আদর্শ প্রতিষ্ঠান হইতে সক্ষম হইবে। আশা করি উহার স্বত্বাধিকারী ও পরিচালকবর্গ এ বিষয়ে অবহিত হইয়া তাহাদের নাম চিরতরে অক্ষুণ্ণ রাখিবেন।

"বান্ধব মিষ্টান্ন ভাণ্ডার"

বাজারে অনেক দোকানেই ত খাবার খাইয়াছি—অনেক নাম করা ডঙ্কানিনাদিত দোকানেও বাদ দেইনি কিন্তু এই বাঙালী পরিচালিত এমন খাবার কোন দোকানে পাইয়াছি; এই অল্প সময়ের মধ্যেও যে উক্ত প্রতিষ্ঠানটী অত উন্নতি করিতে পারিয়াছে উহার কারণ কি পাঠকবর্গকে বুঝাইয়া দিতে হইবে? আমাদের আন্তরিক ইচ্ছা এই প্রতিষ্ঠানটী যথোচিত উন্নতি লাভ করুক।

"বেঙ্গল শটী ফুড"

বাংলার মায়েরা যখন বিদেশ হইতে আনীত মেলিন্স ফুড, এই সকল তাহাদের শিশুদিগের ব্যবহার করিতে ছিলেন তখন অমূল্য বাবুর 'বেঙ্গল শটী ফুড' যে কত কষ্টে চলিয়াছিল এবং তারপর যে পরিমাণে উন্নতি সাধন করিল উহা কেবল অমূল্যবাবুর মত ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব। আজকাল 'বেঙ্গল শটী ফুড' নিজ গুণানুসারে বাংলার ঘরে ঘরে ব্যবহৃত হইতেছে। এই সফল প্রচেষ্টার জন্য আমরা অমূল্যবাবুকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাইতেছি এবং আশা করি তাহার শটী ফুড ক্রমান্বয়ে উন্নতি লাভ করিতে থাকুক।

"পি এম বাক্‌চি এণ্ড কোং"

ইহা বাংলার আর একটী অতি প্রাচীন কোং। এঁরা সর্ব্বপ্রথম বাংলাদেশে কালীর ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং 'পি এম বাকচির' কালী সব সময়েই প্রসিদ্ধ। ক্রমোন্নতিতে এঁরা এখন সকল রকম ব্যবসা করিতেছেন এবং কামনা করি এঁদের ঐ সকল ব্যবসা এদের 'কালীর' মতই উন্নতি লাভ করুক।

— ওটীন —

যাহারা বিদেশী দ্রব্য ব্যবহার করা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই মনে করেন তাঁহাদের নিকটই আমরা [illegible] যে—তাঁহারা [illegible] কোন [illegible] [illegible] [illegible]

ওটীন কোং প্রস্তুত অঙ্গরাগাদি ব্যবহার করিয়া দেখিবেন কারণ আমরাও যখন এক সময়ে বিদেশীজাত দ্রব্য ব্যবহার করিতাম তখন এই ওটীনই আমাদের বিশেষ আনন্দদায়ক ছিল। 'কোয়ালিটির' দিক দিয়ে ওটীন অনেক উচ্চে এবং আশা করি শ্রেণীবিশেষের পাঠকবর্গ আমাদের এই কথাটী দরকারের সময় স্মরণ রাখিবেন।

টি, ডি, কুমার এণ্ড কোং

ক্লাইভ ষ্ট্রীটে অনেক লোহা বিক্রেতা আছে সন্দেহ নাই কিন্তু টি, ডি, এণ্ড কোংর মত সকল রকম লোহার জিনিষ ষ্টকে রাখিতে খুব অল্প দোকানই সক্ষম! সেজন্য কেহ যদি হরেক রকমের জিনিষ এক দোকান হইতে কিনিতে চাহেন তাহা হইলে আমাদের বিশ্বাস তাঁহারা এই কোম্পানীতে যাইয়া লাভবান হইবেন।

'রদাস'

ডালহাউসি স্কোয়ারের অন্যতম বাদ্য বিক্রেতা 'রদাস' কোংর নাম আজকাল সকলেই প্রায় শুনিয়া থাকিবেন। যে অল্প সময়ের মধ্যে ঐ কোম্পানীটি উন্নতি লাভ করিল উহার জন্য আমরা স্বত্বাধিকারী ও পরিচালকের উপর বিশেষ আস্থা স্থাপন করিতে পারি এবং আশা করি উক্ত কোম্পানীটি সততই এইরূপ উন্নতি লাভ করিতে থাকুক।

'কার এণ্ড মহলানবিশ'

কারনোবিস বাঙালীর একটী প্রাচীন প্রতিষ্ঠান এবং অনুরূপ প্রতিষ্ঠানের উন্নতি দেখিলে আমাদের বাঙালী মন সততই উল্লসিত হয়। এঁরা যে পরিমাণে সকল রকম বাদ্য সরঞ্জামাদির ও খেলার জিনিষ ষ্টকে রাখেন তাহা অল্প দোকানের পক্ষেই সম্ভব। আমরা স্বত্বাধিকারী ও পরিচালককে যথোচিত অভিনন্দন জানাইতেছি।

ভোলানাথ দত্ত এণ্ড সন্স

কাগজের ব্যবসা করিয়া যাহারা বিশেষ সুখ্যাতি ও অর্থ অর্জ্জন করিতে পারিয়াছেন তাহাদের মধ্যে 'ভোলানাথ দত্ত এণ্ড সন্স' অন্যতম। 'পুষ্পপাত্রের' যাবতীয় কাগজই এঁরা দিয়া থাকেন। এঁদের সনম্র ব্যবহারে আমরা মুগ্ধ। এবং এঁদের যথার্থ উন্নতি আমাদের কাম্য।

"ইষ্ট বেঙ্গল ষ্টোর"

দু'এক বৎসরের ভিতর যে মনোহারির দোকান কত উন্নতি করিতে পারে উহার নমুনা ইষ্ট বেঙ্গল ষ্টোর। এত অল্পদিনের মধ্যে তাঁহারা যেরূপ উন্নতি করিয়াছেন তাহাতে সত্ত্বাধিকারী ও পরিচালকের কৃতিত্বই প্রস্ফুটিত হইতেছে। কামনা করি এঁদের উত্তরোত্তর উন্নতি হউক।

"গাজীপুর পারফিউমারী ওয়ার্কস"

গাজিপুর পারফিউমারী ওয়ার্কস্ প্রস্তুত তিল তেল ব্যবহার করিয়া আমরা তৃপ্তি পাইয়াছি। এঁদের আরও অনেক রকম তেল আছে এবং ঐ সকলও গুণে তিল তৈলের অনুরূপ। এঁদের ব্যবসা দিন দিন উন্নতি লাভ করুগ। তবে এটাও সত্য যে যে সকল দ্রব্য সৌখীন সম্প্রদায়ের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে সেই সব জিনিষকে প্রচলিত রাখিবার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থার প্রয়োজন।

"জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং"

আমাদের বাল্যকাল হইতে আমরা শুনিয়া আসিতেছি জে, বি, ডি কালীর বড়ির নাম; তখন আমাদের ধারণা ছিল না যে এঁরাই হচ্ছেন জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং। এঁদের প্রস্তুত প্রসাধন সামগ্রীও যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করিয়াছে।

"বারণ্ এণ্ড কোং"

উক্ত কোং কৃত রাণীগঞ্জ টালির নাম খুব অল্প সংখ্যক লোকই জানেন না। সস্তা দরে অথচ মজবুত ও পাকা বাড়ী করিতে এঁদের ঐ টালি ব্যবহার করা ভিন্ন উপায় নাই। স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সিনিয়র পার্টনার মার্টিন এণ্ড কোংর এবং ওরা এঁদের ম্যানেজিং এজেণ্ট। সেজন্য আশা করি এঁদের উন্নতির কোন বাধা নাই।

"ন্যাসকো"

যেখানে যাই সেখানে ন্যাসকো আছেই—ন্যাসকোর এমন প্রচার হইয়াছে। আমরা ন্যাসকোর অনেক সাবান ব্যবহার করিয়াছি এবং আমাদের মতে এঁদের কারখানায় প্রস্তুত প্রায় সকল রকম সাবানই বেশ উচ্চাঙ্গের এবং ঐ শ্রেণীর বিদেশী সাবানের তুল্য নিশ্চয়ই। কামনা করি এই বাঙালী প্রতিষ্ঠানটি উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করুক।

"রেড ক্রশ"

বাঙালীকে ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রকোপের কথা স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে না এবং উহার জন্য ম্যালেরিয়া ঔষধও কম নাই। কিন্তু "রেডক্রশ" ম্যালেরিয়া মিকশ্চার একজন আধুনিক ডাক্তারের হস্তে আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক প্রথায় প্রস্তুত সেইজন্য আশা করি এই "রেডক্রশ" ম্যালেরিয়া মিকশ্চার ব্যবহার করিয়া ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত বাঙালী শান্তিলাভ করিবে।

"বটকৃষ্ণ দত্ত এণ্ড কোং"

বাঙালীর ভিতর বটকৃষ্ণ দত্ত এণ্ড কোং একটী নাম করা ফটোর দোকান। এরা অনেক বিদেশী রাসায়নিক দ্রব্যের এখানকার এজেণ্ট এবং এরা সকল রকম ফটোগ্রাফিক দ্রব্য সকল সময়ে ষ্টকে রাখেন।

"ইষ্টার্ণ ওয়াণ্ডার্স"

মানুষ অনেক সময় ডাক্তারী, কবিরাজী, হোমিওপ্যাথি করিয়া হতাশ হইয়া পড়িয়াছে এমন সময়ও এই ঔষধ ধারণ করিলে ক্ষতিত হয়ই না পরন্তু লাভেরই বেশী সম্ভাবনা এই রকম এঁদের মাদুলির প্রভাব। ইহা দৈব কিছু নহে, প্রাচ্যের বনৌষধিরই প্রভাব। শুনিয়াছি এঁদের মাদুলি প্রত্যক্ষ উপকারী এবং অন্ততঃ একজনের কথা জানি, যিনি এঁদের মাদুলি পরে বিশেষ উপকৃত হয়েছেন। এঁদের উন্নতি দেখিলে আমরা আনন্দিত হইব।

"করুণা ইণ্ডাষ্ট্রীজ্"

সম্প্রতি করুণা ইণ্ডাষ্ট্রীজ নামে যে নূতন অনুষ্ঠানটি হইয়াছে তাহার যে কয়টি জিনিষ বাহির হইয়াছে সবগুলিই উৎকৃষ্ট হইয়াছে। সৌরভ ইত্যাদি বাহ্যিক গুণ ভালই হইয়াছে এবং ডাক্তারগণ ইহার উপকারিতা এবং ব্যবহৃত ঔষধ সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া উচ্চ প্রশংসা করায় আমরা ইহার উৎকর্ষতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইলাম। সাধারণের সহায়তা এবং জিনিষের গুণ এইরূপ বরাবর বজায় রাখা এই দুইটির উপর ইহাদের উন্নতি নির্ভর করিতেছে। আমরা ইহার শুভকামনা করি।

বারান্তরে লক্ষ্মী, ভারত, প্রবলা, প্রভৃতি আরও অনেক ইনসিওরেন্স লেখা বাহির হইবে—
—জীবন বীমা প্রসঙ্গে।

দ্রষ্টব্যঃ—৺পূজা উপলক্ষে আমাদের অফিস ১৮ই আশ্বিন হইতে ১লা কার্ত্তিক পর্য্যন্ত বন্ধ থাকিবে। আবার ২রা কার্ত্তিক হইতে যথারীতি কার্য্যারম্ভ হইবে।

মরুপথে

লক্ষ্মীবিলাস প্রেস লিঃ

সতীশচন্দ্র মিত্র প্রতিষ্ঠিত

৬ষ্ঠ বর্ষ | অগ্রহায়ণ—১৩৩৯ | ৮ম সংখ্যা

স্বদেশ ও সাহিত্য

স্বদেশের সঙ্গে সাহিত্যের যোগসূত্র সুনিবিড়। স্বদেশের াচীনতম যুগ হইতে আধুনিকতম কালের পরিচয় াইতে হইলে দেশের পুরাণ, কথা-কাহিনী, ইতিহাস, াব্য-নাট্য প্রভৃতি সাহিত্যের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ লইয়াই ালোচনা করিতে হয়। সাহিত্য স্বদেশের সঙ্গে পূর্ণ ষাগ আগে বজায় রাখিয়া, পরে তাহা বিশ্ব সঞ্চারিণী ্যাপকতা লাভ করিতে পারে কিন্তু দেশের সঙ্গে যোগ না াখিয়া দেশকাল পাত্র ছাড়াইয়া গেলে সে সাহিত্য অতি বোস্তবই হইয়া দাঁড়ায়—তাহার আয়ু ও দীর্ঘস্থায়ী হইতে ারে না।

সকল দেশের যে সব কাব্য পুরাণ বহু আজগুবি াহিনী থাকা সত্ত্বেও ইতিহাসের মত আদরণীয় ও জন- ামাজে তার চেয়েও বরণীয় হইয়া আছে দেশের নাড়ী- ক্ষেত্রের সঙ্গে যে তাহার যোগ কতখানি তাহা চক্ষুমান ্যক্তিমাত্রেই দেখিবেন—শত আজগুবী কাহিনীর চমকের ধ্যেও তাহাতে দেশের আশা আকাঙ্ক্ষা, শৌর্য্য বীর্য্য, ীরুতা নীচতা প্রভৃতির যে সত্য ও অকৃত্রিম পরিচয় আছে তাহার মধ্য দিয়াই স্বদেশ ও সাহিত্যের আন্তরিক যোগাযোগের যে পরিচয় ঘটিয়াছে তাহাই তাহার দীর্ঘ-স্থায়ী বা চিরস্থায়ী জীবনের সকল রহস্যের মূল।

দেশের সু-অবস্থায়ও সাহিত্য যেমন শক্তিশালী হইতে পারে দেশের দুরবস্থায়ও সাহিত্য তেমনি শক্তিশালী ও জীবন স্পন্দনে স্পন্দিত হইতে পারে। সাহিত্যে জীবনের স্পন্দন, লাস্যলীলা সেইখানেই সমধিক বিকশিত হইতে পারে যেখানে লোকে খোলা প্রাণে বেশ আনন্দে আছে। যাহাদের বন্ধন বেশী নাই—যাহারা মুক্ত স্বাধীন। এই একদিক, আবার সাহিত্য জ্বালাময় হইয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গও ছড়াইয়া থাকে যেখানে লোকে বেশী জর্জ্জর হইয়া পড়িয়াছে। যে দেশে যাহা নাই অথচ সাহিত্যে তাহারই প্রচুর আমদানী দেখা যায় সমজদার লোকে তাহার কৃত্রিমতা সহজেই ধরিতে পারে। তেমন সাহিত্য অস্বাভাবিকতার উন্মাদনায় দু'দিন সচল হইলেও মেকী বলিয়া তাহা শীঘ্রই [illegible]।

সাহিত্যের কারবারই স্বদেশকে লইয়া—স্বদেশের নরনারীই তাহার জীবন্ত চরিত্র। তবে বিদেশী চরিত্র সহযোগেও তাহা ফুটিতে পারে—কিন্তু তাহা মানুষের চরিত্রানুগ হইতে হইবে। দেশ কালের সীমা ছাড়াইয়া মনুষ্যত্বের সীমা যে সাহিত্যের অবদান তাহাও অতি উচ্চ অঙ্গের এবং বর্ত্তমান যুগে তাহার স্থানও সাহিত্যে বিশেষ উচ্চেই হইবে। কিন্তু পৃথিবীর যে কোন দেশের সাহিত্যেরই একটা জাতীয় বিশেষত্ব আছে—এই বিশেষত্ব কোথায় তাহা নির্ণয় করিতে গেলেই স্বদেশ ও সাহিত্যের যোগ কোথায় তাহা বোঝা যাইবে।

স্বদেশ যেমন নানা দিক্ দিয়া বন্দনীয় সাহিত্যও সেইরূপ বন্দনীয়, কেন না দেশের নানা যুগের চিন্তাধারা সাহিত্য সম্বদ্ধ করিয়া রাখে বলিয়াই সাহিত্য বন্দনীয়। তাই উচ্চশ্রেণীর সাহিত্য সম্পদ জাতীয় সাহিত্য আখ্যা পায়। জাতির ভাব-ভঙ্গী, আশা উৎসাহ,—দরদ সাহিত্যে বিকশিত হইবার জন্য সব যুগেই লালায়িত—স্বদেশ সাহিত্যের মধ্যে প্রাণ-শক্তি কামনা যুগে যুগেই করিতেছে—যে যুগের সাহিত্যিকেরা তাহাতে বিশেষ ভাবে প্রাণ সঞ্চারিণী অবদান দিতে পারেন তাঁহাদের সাহিত্যের সঙ্গে তাঁহারাও অমর হন।

বন্দীশালায় প্রাণোৎসর্গের যজ্ঞ

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গভীর উদ্বেগের মধ্যে মনে আশা নিয়ে পুণা অভিমুখে যাত্রা করলেম। দীর্ঘপথ, যেতে যেতে আশঙ্কা বেড়ে ওঠে, পৌঁছে কী দেখা যাবে। বড় ষ্টেশনে এলেই আমার সঙ্গী দুজনে খবরের কাগজ কিনে দেন—উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়ে দেখি। সুখবর নয়। ডাক্তারেরা বলচে মহাত্মাজীর শরীরের অবস্থা danger zoneএ পৌঁছেচে। দেহেতে মেদ বা মাংসের উদ্বৃত্ত এমন নেই যে দীর্ঘকালের ক্ষয় সহ্য হয়, অবশেষে মাংসপেশী ক্ষয় হতে আরম্ভ করেচে। Apoplexy হয়ে অকস্মাৎ প্রাণহানি ঘটতে পারে। সেই সঙ্গে কাগজে দেখচি দিনের পর দিন দীর্ঘকাল ধরে জটিল সমস্যা নিয়ে তাঁকে স্বপক্ষ প্রতিপক্ষের সঙ্গে গুরুতর আলোচনা চালাতে হচ্চে। শেষ পর্য্যন্ত হিন্দুসমাজের অন্তর্গত রূপেই অনুন্নত সমাজকে রাষ্ট্রনৈতিক বিশেষ অধিকার দেওয়া বিষয়ে দুই পক্ষকে তিনি রাজি করেচেন। দেহের সমস্ত যন্ত্রণা দুর্ব্বলতাকে জয় করে তিনি অসাধ্য সাধন করেচেন, এখন বিলেত হতে এই ব্যবস্থা মঞ্জুর হওয়ার উপর সব নির্ভর করচে। মঞ্জুর না হওয়ার কোনো সঙ্গত কারণ থাকতে পারে না, কেননা প্রধান মন্ত্রীর কথাই ছিল অনুন্নত সমাজের সঙ্গে একযোগে হিন্দুরা যে ব্যবস্থা মেনে নেবে তাকে তিনিও স্বীকার করতে বাধ্য।

আশা নৈরাশ্যে আন্দোলিত হয়ে ২৭শে সেপ্টেম্বর প্রাতে আমরা কল্যাণে পৌঁছলেম। সেখানে শ্রীমতী বাসন্তী ও শ্রীমতী উর্ম্মিলার সঙ্গে দেখা হল। তাঁরা অন্য গাড়ীতে কলিকাতা থেকে কিছু পূর্ব্বে এসে পৌঁছেচেন। কালবিলম্ব না করে আমাদের ভাবী গৃহস্বামিনীর প্রেরিত মোটরগাড়ীতে চড়ে পুণার পথে চল্‌লেম।

পুণার পার্ব্বত্য পথ রমণীয়। পুরদ্বারে যখন পৌঁছলেম তখন সামরিক অভ্যাসের পালা চলেচে—অনেকগুলি armoured car, machine gun এবং পথে পথে সৈন্যদলের কুচকাওয়াজ চোখে পড়ল। অবশেষে শ্রীযুক্ত বিঠলভাই থ্যাকারসে মহাশয়ের প্রাসাদে গাড়ী থামল। তাঁর বিধবা পত্নী সৌম্যসহাস্য মুখে আমাদের অভ্যর্থনা করে নিয়ে চললেন। সিঁড়ির দুপাশে [illegible] ছাত্রীরা গান করে অভিনন্দন জানালেন। [illegible]

গৃহে প্রবেশ করেই বুঝেছিলাম গভীর একটি আশঙ্কায় হাওয়া ভারাক্রান্ত। সকলের মুখেই দুশ্চিন্তার ছায়া। প্রশ্ন করে জানলেম মহাত্মাজির শরীরের অবস্থা সঙ্কটাপন্ন। বিলাত হতে তখনও খবর আসেনি। প্রধান মন্ত্রীর নামে আমি একটি জরুরী তার পাঠিয়ে দিলেম।

দরকার ছিল না পাঠাবার। শীঘ্রই জনরব কানে এল, বিলাত থেকে সম্মতি এসেচে। কিন্তু জনরব সত্য কিনা তার প্রমাণ পাওয়া গেল বহু ঘণ্টা পরে।

মহাত্মাজীর মৌনাবলম্বনের দিন আজ। একটার পরে কথা বলবেন। তাঁর ইচ্ছা সেই সময়ে আমি কাছে থাকি। পথে যেতে যারবেদা জেলের খানিক দূরে আমাদের মোটর গাড়ী আটকা পড়ল—ইংরেজ সৈনিক বললে কোন গাড়ী এগোতে দেবার হুকুম নেই। আজকের দিনে জেলখানায় প্রবেশের পথ ভারতবর্ষে প্রশস্ত বলেই তো জানি। গাড়ীর চতুর্দ্দিকে নানা লোকের ভিড় জমে উঠল।

আমাদের পক্ষ হতে লোক জেলের কর্ত্তৃপক্ষের কাছে অনুমতি নিতে খানিক এগিয়ে যেতেই শ্রীমান দেবদাস এসে উপস্থিত—জেল প্রবেশের ছাড়পত্র তাঁর হাতে। পরে শুনলেম মহাত্মাজি তাঁকে পাঠিয়েছিলেন। কেননা তাঁর হঠাৎ মনে হয় পুলিশ কোথাও আমাদের গাড়ী আটকেচে, যদিও তার কোনো সংবাদ তাঁর জানা ছিল না।

লোহার দরজা একটার পর একটা খুলল, আবার বন্ধ হয়ে গেল। সামনে দেখা যায় উঁচু দেয়ালের ঔদ্ধত্য, বন্দী আকাশ, সোজা লাইন করা বাঁধা রাস্তা, দুটো চারটে গাছ।

দুটো জিনিষের অভিজ্ঞতা আমার জীবনে বিলম্বে ঘটেচে। বিশ্ববিদ্যালয়ের গেট পেরিয়ে ঢুকেছি সম্প্রতি। জেলখানায় প্রবেশে আজ বাধা ঘটলেও অবশেষে এসে পৌঁছান গেল।

বাঁ দিকে সিঁড়ি উঠে দরজা পেরিয়ে দেয়ালে-ঘেরা একটি অঙ্গনে প্রবেশ করলেম। দূরে দূরে দু-সারি ঘর। অঙ্গনে একটি ছোট আম গাছের ছায়ায় মহাত্মাজী শয্যাশায়ী।

মহাত্মাজী আমাকে দুই হাতে বুকের কাছে টেনে নিলেন—অনেকক্ষণ রাখলেন। বললেন, কত আনন্দ হল।

শুভ সংবাদের জোয়ার বেয়ে এসেচি এজন্য আমার ভাগ্যের প্রশংসা করলেম তাঁর কাছে। তখন বেলা দেড়টা। বিলাতের খবর ভারতময় রাষ্ট্র হয়ে গেছে—রাজনৈতিকের দল তখন সিমলায় দলিল নিয়ে প্রকাণ্ড সভায় আলোচনা করছিলেন পরে শুনলেম। খবরের কাগজওয়ালারাও জেনেচে। কেবল যাঁর প্রাণের ধারা প্রতি মুহূর্ত্তে শীর্ণ হয়ে মৃত্যুসীমায় সংলগ্নপ্রায় তাঁর প্রাণ-সঙ্কট মোচনের যথেষ্ট সত্বরতা নাই। অকি দীর্ঘ লাল ফিতের জটিল নির্ম্মমতায় বিস্ময় অনুভব করলেম। সওয়া চারটে পর্য্যন্ত উৎকণ্ঠা প্রতিক্ষণ বেড়ে চলতে লাগল। শুনতে পাই দশটার সময় খবর পুণায় এসেছিল।

চতুর্দ্দিকে বন্ধুরা রয়েচেন। মহাদেব, বল্লবভাই, রাজগোপালাচারী, রাজেন্দ্রপ্রসাদ এঁদের লক্ষ্য করলেম। শ্রীমতী কস্তুরীবাঈ এবং সরোজিনীকে দেখলাম। জওহর-লালের পত্নী কমলাও ছিলেন।

মহাত্মাজীর স্বভাবতঃই শীর্ণ শরীর শীর্ণতম, কণ্ঠস্বর প্রায় শোনা যায় না। জঠরে অম্ল জমে উঠচে তাই মধ্যে মধ্যে সোডা মিশিয়ে জল খাওয়ানো হচ্চে। ডাক্তারদের দায়িত্ব অতিমাত্রায় পৌঁছেচে।

অথচ চিত্তশক্তির কিছুমাত্র হ্রাস হয়নি, চিন্তার ধারা প্রবহমান, চৈতন্য অপরিশ্রান্ত, প্রায়োপবেশনের পূর্ব্ব হতেই কত দুরূহ ভাবনা, কত জটিল আলোচনায় তাঁকে নিয়ত ব্যাপৃত হতে হয়েচে। সমুদ্রপারের রাজনৈতিকদের সঙ্গে পত্র ব্যবহারে মনের উপর কঠোর ঘাত-প্রতিঘাত চলেচে। উপবাসকালে নানান দলের প্রবল দাবী তাঁর অবস্থার প্রতি মমতা করেনি, তা সকলেই জানেন কিন্তু মানসিক জীর্ণতার কোন চিহ্নই তো নেই। তাঁর চিন্তার স্বাভাবিক স্বচ্ছ প্রকাশধারায় আবিলতা ঘটেনি। শরীরের কৃচ্ছ্রসাধনের মধ্য দিয়েও আত্মার অপরাজিত উদ্যমের এই মূর্ত্তি দেখে আশ্চর্য্য হতে হল। কাছে না এলে এমন করে উপলব্ধি করতেম না কত প্রচণ্ড শক্তি এই ক্ষীণদেহ পুরুষের।

আজ ভারতবর্ষের কোটি প্রাণের মধ্যে পৌঁছল মৃত্যুর বেদীতলশায়ী এই মহৎ প্রাণের বাণী। কোনো

বাধা তাকে ঠেকাতে পারল না; দূরত্বের বাধা, ইট-কাঠ-পাথরের বাধা, প্রতিকূল পলিটিক্‌সের বাধা, বহু শতাব্দীর জড়ত্বের বাধা আজ তার সামনে ধূলিসাৎ হোলো।

মহাদেব বললেন, আমার জন্যে মহাত্মাজী একান্ত-মনে অপেক্ষা করছিলেন। আমার উপস্থিতি দ্বারা রাষ্ট্রিক সমস্যার মীমাংসা সাধনে সাহায্য করতে পারি এমন অভিজ্ঞতা আমার নেই। তাঁকে যে তৃপ্তি দিতে পেরেচি, এই আমার আনন্দ!

সকলে ভিড় করে দাঁড়ালে তার পক্ষে কষ্টকর হবে মনে করে আমরা সরে গিয়ে বস্‌লেম। দীর্ঘকাল অপেক্ষা করচি কখন খবর এসে পৌছবে। অপরাহ্নের রৌদ্র আড় হয়ে পড়েচে ইটের প্রাচীরের উপর। এখানে ওখানে দুচারজন শুভ্র খদ্দর-পরিহিত পুরুষ নারী শান্ত-ভাবে আলোচনা করচেন।

লক্ষ্য করবার বিষয় কারাগারের মধ্যে সংযত এই জনতা। কারো ব্যবহারে প্রশ্রয়জনিত শৈথিল্য নেই। চরিত্রশক্তি বিশ্বাস আনে—জেলের কর্তৃপক্ষ তাই শ্রদ্ধা করেই এঁদের সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে মেলামেশা করতে দিতে পেরেচেন। এঁরা মহাত্মাজীর প্রতিশ্রুতির প্রতি-কূলে কোনো সুযোগ গ্রহণ করেন নি। আত্মমর্য্যাদার দৃঢ়তা এবং অচাঞ্চল্য এঁদের মধ্যে পরিস্ফুট। দেখলেই বোঝা যায় ভারতের স্বরাজ্য সাধনার যোগ্য সাধক এঁরা।

অবশেষে জেলের কর্তৃপক্ষ গবর্নমেণ্টের ছাপ মারা মোড়ক হাতে উপস্থিত হলেন। তাঁর মুখেও আনন্দের আভাস পেলুম। মহাত্মাজি গম্ভীরভাবে ধীরে ধীরে পড়তে লাগলেন। সরোজিনীকে বললেম, এখন ওঁর চার পাশ থেকে সকলের সরে যাওয়া উচিত। মহাত্মাজি পড়া শেষ করে বন্ধুদের ডাকলেন। শুনলাম তিনি তাঁদের আলোচনা করে দেখতে বললেন এবং নিজের তরফ থেকে জানালেন কাগজটা ডাক্তার আম্বেদকরকে দেখানো দরকার, তাঁর সমর্থন পেলে তবেই তিনি নিশ্চিন্ত হবেন।

বন্ধুরা একপাশে দাঁড়িয়ে চিঠিখানি পড়লেন। আমাকেও দেখালেন। রাষ্ট্রবুদ্ধির রচনা, সাবধানে লিখিত সাবধানেই পড়তে হয়। বুঝলেম মহাত্মাজির অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধ নয়। পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরুর পরে ভার দেওয়া হল চিঠিখানির বক্তব্য বিশ্লেষণ করে মহাত্মাজীকে শোনাবেন। তাঁর প্রাঞ্জল ব্যাখ্যায় মহাত্মাজির মনে আর কোনো সংশয় রইল না। প্রায়োপবেশনের ব্রত উদ্‌যাপন হল।

প্রাচীরের কাছে ছায়ায় মহাত্মাজির শয্যা সরিয়ে আনা হল। চতুর্দ্দিকে জেলের কম্বল বিছিয়ে সকলে বসলেন। লেবুর রস প্রস্তুত করলেন শ্রীমতী কমলা নেহেরু। Inspector Genaral of Prisons—যিনি গবর্নমেণ্টের পত্র নিয়ে এসেচেন—অনুরোধ করলেন রস যেন মহাত্মাজীকে দেন শ্রীমতী কস্তুরীবাঈ নিজের হাতে। মহাদেব বললেন—"জীবন যখন শুকায়ে যায় করুণা ধারায় এসো"—এই গীতাঞ্জলীর গানটি মহাত্মাজির প্রিয়। সুর ভুলে গিয়েছিলেম। তখনকার মতো সুর দিয়ে গাইতে হলো। পণ্ডিত শ্যামশাস্ত্রী বেদ পাঠ করলেন। তারপর মহাত্মাজি শ্রীমতী কস্তুরীবাইয়ের হাত হতে ধীরে ধীরে লেবুর রস পান করলেন। পরিশেষে সবরমতী আশ্রমবাসিগণ এবং সমবেত সকলে "বৈষ্ণব জন কো" গানটি গাইলেন। ফল ও মিষ্টান্ন বিতরণ হল—সকলে গ্রহণ করলেন।

জেলের অবরোধের ভিতর মহোৎসব। এমন ব্যাপার আর কখনো ঘটেনি। প্রাণোৎসর্গের যজ্ঞ হল জেলখানায়, তার সফলতা এইখানেই রূপ ধারণ করলে। মিলনের এই অকস্মাৎ আবির্ভূত অপরূপ মূর্ত্তি একে বলতে পারি যজ্ঞসম্ভবা।

রাত্রে পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরু প্রমুখ পুণায় সমবেত বিশিষ্ট নেতারা এসে আমাকে ধরলেন, পরদিন মহাত্মাজির বার্ষিকী উৎসব সভায় আমাকে সভাপতি হতে হবে, মালব্যজীও বোম্বাই হতে আসবেন। মালব্যজীকেই সভাপতি করে, আমি সামান্য দুচার কথা লিখে পড়ব এই প্রস্তাব করলেম। শরীরের দুর্ব্বলতাকেও অস্বীকার করে শুভদিনের এই বিরাট জনসভায় যোগ দিতে রাজি না হয়ে পারলেম।

বিকালে শিবাজি মন্দির নামক বৃহৎ [illegible]

বিরাট জনসভা। অতি কষ্টে ভিতরে প্রবেশ করলেম। ভাবলেম অভিমন্যুর মতো প্রবেশ তো হোলো, বেরোবার কি উপায়। মালব্যজী উপক্রমণিকায় সুন্দর করে বোঝালেন তাঁর বিশুদ্ধ হিন্দী ভাষায় যে অস্পৃশ্য বিচার হিন্দুশাস্ত্রসঙ্গত নয়। বহু সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করে তাঁর যুক্তি প্রমাণ করলেন। আমার কণ্ঠ ক্ষীণ, সাধ্য নেই এত বড়ো সভায় আমার বক্তব্য শ্রুতিগোচর করতে পারি। মুখে মুখে দুচারটি কথা বললেম, পরে রচনা পাঠ করবার ভার নিলেন পণ্ডিতজীর পুত্র গোবিন্দ মালব্য। ক্ষীণ অপরাহ্ণের আলোকে অদৃষ্টপূর্ব্ব রচনা অনর্গল অমন সুস্পষ্টকণ্ঠে পড়ে গেলেন এতে বিস্মিত হলেম।

আমার সমগ্র রচনা কাগজে আপনারা দেখে থাকবেন। সভায় প্রবেশ করবার অনতিপূর্ব্বে তার পাণ্ডুলিপি জেলে গিয়ে মহাত্মাজির হাতে দিয়ে এসেছিলেম।

মতিলাল নেহেরুর পত্নী কিছু বললেন তাঁর ভ্রাতা-ভগিনীদের উদ্দেশ করে, সামাজিক সাম্যবিধানের ব্রত-রক্ষায় তাঁদের যেন একটুও ত্রুটি না ঘটে। শ্রীযুক্ত রাজ-গোপালাচারী, রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রমুখ অন্যান্য নেতারাও অন্তরের ব্যথা দিয়ে দেশবাসীকে সামাজিক অশুচি দূর করতে আবাহন করলেন। সভায় সমবেত বিরাট জনসঙ্ঘ হাত তুলে অস্পৃশ্যতা নিবারণের প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করলেন। বোঝা গেল সকলের মনে আজকের বাণী পৌঁছেচে। কিছুদিন পূর্ব্বেও এমন দুরূহ সঙ্কল্পে এত সহস্রলোকের অনুমোদন সম্ভব ছিল না।

আমার পালা শেষ হল। পরদিন প্রাতে মহাত্মাজির কাছে অনেকক্ষণ ছিলাম। তাঁর সঙ্গে এবং মালব্যজীর সঙ্গে দীর্ঘকাল নানা বিষয়ে আলোচনা হল। একদিনেই মহাত্মাজি অপ্রত্যাশিত ফল লাভ করেচেন, কণ্ঠস্বর তাঁর দৃঢ়তর blood pressure প্রায় স্বাভাবিক। অতিথি অভ্যাগত অনেকেই আসচেন প্রণাম করে আনন্দ জানিয়ে যেতে। সকলের সঙ্গেই হেসে কথা কইচেন। শিশুর দল ফুল নিয়ে আসচে, তাদের নিয়ে তাঁর কী আনন্দ। বন্ধুদের সঙ্গে সামাজিক সাম্যবিধান প্রসঙ্গে নানাবিধ আলোচনা চলচে। এখন তাঁর প্রধান চিন্তার বিষয় হিন্দুমুসলমানের বিরোধ ভঞ্জন।

আজ যে মহাত্মার জীবন আমাদের কাছে বিরাট ভূমিকায় উজ্জ্বল হয়ে দেখা দিল, তাতে সর্ব্বমানুষের মধ্যে মহামানুষকে প্রত্যক্ষ করবার প্রেরণা আছে। সেই প্রেরণা সার্থক হোক ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র।

মুক্তি-সাধনার সত্য পথ মানুষের ঐক্য সাধনায় রাষ্ট্রিক পরাধীনতা আমাদের সামাজিক সহস্র ভেদবিচ্ছেদকে অবলম্বন করেই পুষ্ট।

জড়প্রথার সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে দিয়ে উদার ঐক্যের পথে মানবসভ্যতা অগ্রসর হবে সেই দিন আজ সমাগত।

(পুণা ভ্রমণ সম্পর্কে শান্তিনিকেতনে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বক্তৃতা)

গান

শ্রীঅলক রায়

আজ শরতের মেঘলাকাশে
বাদল রাণীর পরশ পেয়ে,
কালো মেঘের ওপার থেকে
নামলো ধারা আকাশ বেয়ে।
নাচে বাদল
গাছের পাতায়
তালের বনে
বটের মাথায়
ভুঁই কদমের মালা গেঁথে
কাজ্‌রী গায় কাজ্‌লা মেয়ে।
কেয়ার জল
পড়িছে ঝরি
শিউলি-ফুলি
বসন পরি
ঘোমটা খুলি গ্রামের বধূ
চলিছে আকাশ পানে চেয়ে।

অনিলার অদৃষ্ট

—গল্প—

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী বি-এল

রাম বাগানের পূর্ণশশী তাহার নিজের জীবনের অভিজ্ঞতার ফলে মেয়ে অনিলাকে স্কুলে দিয়াছিল—উদ্দেশ্য ছিল, তাহাকে লেখাপড়া শিখাইয়া সুখে ও সৎপথে রাখিবে। কিন্তু ভগবান কতকগুলি পাথরের কুঁচি দিয়া যাহার অদৃষ্ট গড়েন, মানুষের কোন ক্ষমতাই তাহাকে ভাঙ্গিয়া চুড়িয়া অন্য ভাবে গড়িতে পারে না—তাই কিছু দিন না যাইতেই অনিলার ভাগ্যে বিপর্য্যয় ঘটিল এবং তাহারই ফলে না পূর্ণ হইল তাহার মায়ের আশা, আর না হইল সুখী নিজে।

মায়ের শুভেচ্ছা লৌহ বর্ম্মের মত নিরন্তর ঘিরিয়া রাখিয়াও যে কারণে মেয়েকে এই বিপর্য্যয়ের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারিল না, তাহার মূলে ছিল অনিলার ভুবন ভুলানো রূপ, যৌবন এবং তাহারই গৃহ শিক্ষক বিশ্বপতি! কি করিয়া যে ইহা ঘটিল তাহাই এই গল্পের প্রতিপাদ্য বিষয়।

মেয়ে তের বৎসরে পা দিতেই যৌবন যখন ছুঁই ছুঁই করিয়াও ঠিক ছুঁইতেছিল না, সেই সময়ে একদিন তাহার কাঁঠালী চাঁপার পাঁপড়ীর মত মনোরম মুখখানির পানে চাহিয়া পূর্ণশশী অকস্মাৎ একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে কহিল, মিথ্যা ভালবাসার মোহে পড়িয়া নিজের দুর্ল্লভ দেহ ও রূপের বেসাতি করিয়া অনেক অর্থই সে জীবনে উপায় করিয়াছে বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে একটী দিনের তরেও সুখ শান্তি পায় নাই। কারণ তাহার অন্তর শুধু অর্থই আকাঙ্ক্ষা করে নাই—তাহার চেয়ে অনেক বড় জিনিস আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিল—কিন্তু প্রতিপদে ব্যর্থতাই তাহার বুকে জমিয়া যাইত। সে যে নারী—তাহার নারী হৃদয় কি কৃত্রিম জিনিসে সুখী হইতে পারে?

ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া পরে সে অনেকটা আপন মনেই বলিয়া উঠিল, না—আর নয়—এই কৃত্রিম ভালবাসার মোহ থেকে, এই কুৎসিৎ পথ থেকে মেয়েকে রক্ষে করতে হবে—নিজের জীবনটাকে নিয়ে অনেক ছিনিমিনি খেলেছি—মেয়েকেও কি আবার……

সেই মুহূর্ত্তেই সে স্থির করিল, মেয়েকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়া মানুষ করিয়া তুলিবে এবং দিন সাতেকের মধ্যেই একদিন সে মেয়েকে সত্যসত্যই ছাত্রীর বেশে সাজাইয়া হাতে কয়েকখানা লাল নীল রঙের পুথি পুস্তক ও খাতা দিয়া তাহাকে সঙ্গে করিয়া স্কুলের উদ্দেশে যাত্রা করিল। যাত্রার ঘটাও একটু বিচিত্র রকমের—অর্থাৎ ফটকের সম্মুখে দুইটী কলাগাছ, মাঝখানে একটা কলসী, গায়ে তাহার সিন্দুর, মাথর উপর ডাব নারিকেল।

তাহারা ফটকের কাছে আসিতেই পাশের বাড়ীর বারান্দা হইতে একদল রঙ-বেরঙের নারী একসঙ্গে হুলুধ্বনি দিয়া উঠিল। পূর্ণশশী একবার উপরের দিকে চাহিয়া ঘৃণায় তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া লইল, কারণ সে বুঝিয়াছিল, এ ধ্বনি আনন্দের বা শুভেচ্ছার নয়—বিদ্রূপের। তাই ক্ষিপ্রগতিতে মেয়েকে লইয়া গাড়ীর কাছে গিয়া কোচোয়ানকে বলিল, শীগগির গাড়ী ছেড়ে দে বাবা—দেরী করিস নে—

মেয়েকে স্কুলে ভর্ত্তি করাইয়া বাড়ী ফিরিতে সেদিন সে তৃপ্তির নিশ্বাস ছাড়িয়া মনে মনে কহিল, সবাই আজ তাহাকে বিদ্রূপ করিতেছে বটে, কিন্তু একদিন সে তাহাদিগকে চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দেবে, মেয়ে তাহাদের মত কৃত্রিম ভালবাসার মোহে পড়িয়া দুঃখময় জীবন যাপন করিবে না—সে সৎপথে থাকিয়া সুখে থাকিবে। আর শুধু তাই নয়—সে নিজেও হয় তো অদূর ভবিষ্যতে বঙ্গবিখ্যাত হইয়া পড়িবে একজন লেখী

ডাক্তারের বা স্কুল শিক্ষয়িত্রীর মা বলিয়া। কল্পনার দৌড় অনেক দূর তাই সে তখন ইহাও ভাবিয়াছিল যে, কে জানে, হয়তো এমন একটা সুযোগও ঘটিতে পারে যে তাহাকে বিবাহ করিবার জন্য কোনদিন বা কোন ডাক্তার উকীল কিম্বা ব্যারিষ্টার···মেয়ের রূপটা তো আর অগ্রাহ্য করিবার নয়। কথাটা মনে হইতেই অব্যক্ত আনন্দে তাহার বুকখানি ভরিয়া উঠিল—সেইদিনই সে তাড়াতাড়ি বাড়ী পৌছাইয়া ঘরের দেয়ালে দক্ষিণেশ্বর ৺কালীর যে মূর্ত্তিখানা ছিল, তাহারই নিকট গড় হইয়া প্রণাম করিয়া নিবেদন করিল, মা, তোমার মনে কি আছে জানি নে, যদি বা আমার আশা ব্যর্থই হয়—অন্ততঃ আমার অনুকে সুখে রেখো, সৎপথে রেখো—

নিজের অতীত জীবনটা যাহার কাটিয়াছে উচ্ছৃঙ্খলতার ভিতর দিয়া, তাহার মত অসতী নারীর মুখে মেয়ের সতীপনার জন্য এই কাতর প্রার্থনা সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক হইলেও, সে ইহা করিয়াছিল খেয়ালের বশে নয়—নিজের সুখ দুঃখের খতিয়ান করিয়া দেখিয়াই। এবং এই কারণেই সে অনিলার প্রতি বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি রাখিল ও কিছুদিনের মধ্যে তাহার জন্য যে গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করিল, তাহার চরিত্র যে খুবই ভাল ইহা তাহার মাথার উপর কদম ছাটা চুল এবং সাদাসিধা বেশভূষা দেখিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়।

২

লক্ষ্মীন্দরকে সাপের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য সদাগরের সতর্কতার অন্ত ছিল না—কিন্তু নিয়তিকে তিনি লঙ্ঘন করিতে পারেন নাই। তেমনি মেয়েকে বিপদের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য পূর্ণশশীরও সতর্কতার অবধি ছিল না—কিন্তু অদৃষ্টের লিখনকে ডিঙ্গাইয়া যাওয়া বুঝি বা অসম্ভব, তাই কিছুদিন না যাইতেই গৃহশিক্ষক বিশ্বপতির শুষ্ক নীরস মনোরাজ্যে ক্রমে ক্রমে কিশোরী অনিলার কুসুমকলি সদৃশ মুখের জ্যোতি আগুন জ্বালাইয়া দিল। আর স্বয়ং অনিলার চিত্তেও কুসুমধন্বা অতি অজ্ঞাত ভাবে আসন পাতিয়া বসিল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতি ছাত্র বিশ্বপতি নিজের একবার আত্মপ্রত্যয় হারাইয়া বসিল বটে—কিন্তু এ দুর্ব্বলতা ঘুণাক্ষরেও সে অনিলকে জানিতে দিল না। শেষ পর্য্যন্ত সে হয়তো মনের চাপা আগুনকে সবলে মনের ভিতর চাপিয়াই নীরবে এই রঙ্গমঞ্চ হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিত—কিন্তু দুষ্ট বিধাতার তাহা সহিল না—তাই বৎসর দুই পরে একদিন এক বিশৃঙ্খলা ঘটিয়া পড়িল, যেদিন অসতী মায়ের মেয়ে অনিলা পড়িতে পড়িতে অকস্মাৎ বলিয়া উঠিল, আচ্ছা বিশুদা, একদিন 'রত্নমঞ্জুষার' পঞ্চসতীর গল্প পড়বার সময় বলেছিলে যে 'সতীত্বই নারীর শ্রেষ্ঠ রত্ন' এ কথাটার অর্থ সেদিন ঠিক বুঝতে পারিনি—সতীত্ব কাকে বলে বিশুদা?

অনিলা প্রথম হইতেই বিশ্বপতিকে 'মাষ্টার মশাই' বলিয়া ডাকিত—কিন্তু মাস তিনেক পরে সে নিজেই একদিন অনিলাকে বলিয়াছিল যে 'মাষ্টার মশাই' ডাক ভাল শোনায় না—সে যেন তাহাকে 'বিশুদা' বলিয়া ডাকে—আর শুধু তাই নয়—'আপনি' বলিলেও সে রাগ করিবে। সেই দিন হইতেই বিশ্বপতি অনিলার 'বিশুদা' হইয়াছে এবং এই ভাবে মিশিতে মিশিতে সেও বিশ্বপতির প্রতি এক অজ্ঞাত প্রীতির আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছে।

সেদিন কিশোরী অনিলার মুখে অপ্রত্যাশিতভাবে এই অদ্ভুত প্রশ্ন শুনিয়া বিশ্বপতি স্তব্ধ বিস্ময়ে ক্ষণকাল তাহার স্নিগ্ধ মুখপানে চাহিয়া থাকিয়া কহিল, ও কথাটার প্রকৃত অর্থ আজ ঠিক বুঝতে পারবে না অনু আর একটু বড় হও—তারপরে বলবো'খন—

অনিলা ঝঙ্কার দিয়া অভিমান ভরে বলিল, বাঃ রে, পোনর পেরুয়ে ষোলয় পড়লুম—তুমি এখনও আমাকে তেমনি ছেলেমানুষটা মনে করছো নাকি বিশুদা?

বিশ্বপতি চম্‌কাইয়া উঠিল। তাই তো, অনিলা এখন আর ছেলেমানুষ নয়—যৌবনের মধুর স্পর্শে আজ তাহার সমগ্র দেহের উপর সৌন্দর্য্যের তরঙ্গ খেলিয়া গিয়াছে—মুখের উপর অসামান্য লাবণ্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। ডাগর চক্ষু দুইটীর এ কি ভাষা—এ কি মন মাতান রূপ!

এই সৌন্দর্য্যময়ী নারীর প্রশ্নের উত্তরে কি যে সে বলিবে কিছুই খুঁজিয়া পাইল না—কেমন যেন এক অজানা লজ্জা আসিয়া তাহাকে আড়ষ্ট করিয়া ফেলিল। সে

তাড়াতাড়ি তাহার দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়া অন্যদিকে চাহিয়া বলিল, তা হোক্—আজ থাক্ এর ব্যাখ্যা অন্যদিন বলবো'-খন—আজ আমি যাই, বিশেষ জরুরী কাজ আছে।

অনিলা মাতার একমাত্র সন্তান—তাহা ছাড়া অত্যন্ত স্বচ্ছলতার ভিতরে প্রতিপালিত ও পরিবর্দ্ধিত—কাজেই অভিমান ও যেমন ছিল তাহার বেশী—জেদ্‌ও তেমনি ভয়ঙ্কর। বিশ্বপতির কথায় সে আরও বেশী জেদ্ করিয়া বসিল, এ কথাটার অর্থ আজ তাহার জানা চাই-ই। কেন যে, চাই তাহারও একটু বিশেষ কারণ আছে।

গতকল্য সন্ধ্যায় সে যখন তাহার বাড়ীর ছাদের উপর বসিয়া একাকী জ্যোৎস্নার ভিতর নিজেকে বিলাইয়া দিয়া আপন মনে গাহিতেছিল,—

"সন্ধ্যারাণী, ওগো সন্ধ্যারাণী,
এই যে মোদের গোপন মিলন,
কেউ জানে না আমরা জানি—"

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে তাহার প্রতিবাশিনী ও সই সুপ্রভা অকস্মাৎ উপস্থিত হইয়া বিদ্রূপ করিয়া হাসিয়া বলিয়াছিল, কিলো অণু, এই ভর সাঁঝে এমন গোপন মিলনটা কা'র সঙ্গে হচ্ছে ভাই?

অনিলা তাহার দিকে একবার ফিরিয়া তাকাইয়া মৃদু হাস্যের সহিত উত্তর করিল, কা'র সঙ্গে আবার—সন্ধ্যারাণীর সঙ্গে—

তবুও ভাল—আমি তো ভেবেছিলুম—বুঝি বা বিশু মাষ্টারের সঙ্গে—আজকাল যেরূপ ঢলাঢলি চল্‌ছে—কিন্তু দেখিস্ ভাই—এই বলিয়াই সে মৃদুস্বরে গান ধরিল,

"দেখিস্ লো সই, সাম্‌লে চলিস্
প্রেম সাগরের তুফান ভারী"—

অনিলা হাসিয়া তাহাকে মৃদু ধাক্কা দিয়া কহিল, কত রঙ্গই যে জানিস্ তুই—

না সত্যি ঠাট্টার কথা নয়—তোর ভাব দেখে আমার খুব ভয় হচ্ছে—কি জানি শেষকালটায় আবার কেঁদে বেড়াতে না হয়—

কেঁদে বেড়াবো কেন?

কেন নয়? একজনের পায়ে মনপ্রাণ বিলিয়ে দিলে চোখের জলের অবধি থাকে না—শুনিস্ নি, রাধার কত কাঁদতে হয়েছিল?

কিন্তু তিনি তো—একনিষ্ঠার ফলেই তাঁর দয়িতকে পেয়েছিলেন—

তিনি পেয়েছিলেন তাঁর অনেকগুলো গুণ ছিল বলে—কিন্তু তুই পাবি কেমন করে?

অনিলা স্মিতহাস্য করিয়া কহিল, আমার একাগ্র ভালবাসার গুণে—সুপ্রভা হো হো করিয়া খানিকটা বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বলিল, কিন্তু এক ফোঁটা এসিডেই যে তোর সব দুধটুকু নষ্ট হয়ে গেছে—তুই যে অসতী মায়ের মেয়ে—অনিলা একটু কি ভাবিল, পরে বলিল, তা বটে—কিন্তু তাই বলে আমি তো অসতী নই—

ইস্ বড় সতীলক্ষ্মী নাকি? আমাদের মত মানুষের সতী হওয়া অম্‌নি মুখের কথা কিনা—

নয়? আচ্ছা, দেখে নিস্ প্রভা, আমি তোদের মত যেমন তেমন মেয়ে নই—এই কথাগুলি কোনপ্রকারে উচ্চারণ করিয়াই সে ধপ্ ধপ্ করিয়া পা ফেলিয়া নীচে চলিয়া গেল।

সেদিন সারাটা রাত্রিই সে সুপ্রভার শ্লেষব্যঞ্জক কথাগুলি মনে মনে বেশ করিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিল। নিজের চঞ্চল চিত্তকে প্রশ্ন করিল, সত্যিই কি সে বিশ্বপতিকে ভালবাসে? কিন্তু কোন উত্তর সে পাইল না—ভাবিল, সুপ্রভা মিথ্যা বলিয়াছে—ছি, ছি, তাই কি হয়!

ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া আবার সে চিন্তা করিল, কি জানি কেন বিশ্বপতির সঙ্গ তার এত ভাল লাগে—একটা দিন সে না আসিলে মনে হয়, বুঝি বা সেদিনটী তাহার কাটিবার মত কাটে না। কেন এমন হয়? ইহারই নাম কি·········না—না—সুপ্রভা মিথ্যা বলিয়াছে সে কাউকে ভালবাসে না। কিছুকাল নীরব থাকিয়া পরে আবার মনে মনে কহিল, আর যদি বেসেই থাকে, তবে কি অসতী মায়ের মেয়ে বলিয়াই তাহার ভালবাসা ব্যর্থ হইয়া ফিরিবে? কেন, সে কি নিজে সতী হইতে পারে না?

সারাটা রাত্রিই সে এমনি চিন্তায় জাগিয়া কাটাইয়া দিল। ভোর বেলায় তাহার মনে হইল, [illegible]

'সতী' কথাটার প্রকৃত অর্থ কি? ইহা কি এতই শক্ত যে সে হইতে পারে না?

তাই পরদিন সকাল বেলায় অনিলা ইহার প্রকৃত ব্যাখ্যা শুনিবার জন্যই বিশ্বপতির শরণাপন্ন হইয়াছিল। কথাটার অর্থ খুব অবোধ্য না হইলেও, আজ সে অস্পষ্ট অর্থে শান্তি পাইতেছে না—সে জানিতে চায় ইহার সীমা কতটুকু—কি প্রকারে ইহার রক্ষা করা যায়? কিন্তু বার বার অনুরোধ করা সত্ত্বেও যখন বিশ্বপতি তাহাকে এড়াইবার জন্য চেষ্টা করিল, তখন অভিমানে তাহার চক্ষু দুইটী ছল ছল করিয়া উঠিল। সে সহসা বিশ্বপতির ডান হাতখানি নিজের দুইটী হাত দিয়া চাপিয়া ধরিয়া গম্ভীর কণ্ঠে কহিল, না বিশুদা, ফাঁকি দিয়ে পালালে চল্‌বে না—আজ এর প্রকৃত অর্থ আমার জানা চাই-ই—

বিশ্বপতির তরুণ হৃদয় অনিলার কোমল স্পর্শে এক অনবদ্য অনুভূতিতে অভিভূত হইয়া পড়িল। এ কি আশ্চর্য্য শক্তি এই স্পর্শের! সে ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া তাকাইয়া থাকিয়া পরে বলিল, আচ্ছা বলছি,—বলিয়াই সে অনিলার পাশে ধপ্‌ করিয়া বসিয়া পড়িল। তারপর দুই একবার কাশিয়া ঢোক গিলিয়া, এদিক ওদিক চাহিয়া অবশেষে মৃদুকণ্ঠে কহিল, এর অর্থ খুব শক্তও নয়, আবার সোজাও নয়—কিন্তু এই জিনিসটাই হচ্ছে নারীর শ্রেষ্ঠ রত্ন।

অনিলা হাসিয়া বলিল, তা'তো পুঁথি পুস্তকেও পড়েছি—কিন্তু এর প্রকৃত অর্থ কি বিশুদা তাই আজ বেশ করে বুঝিয়ে দাও—

প্রকৃত অর্থ? বিশ্বপতি ঘামিয়া উঠিল। ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া পরে কহিল, প্রকৃত অর্থ মানে এই—এই—স্ত্রীলোকের এক স্বামীত্বে অর্থাৎ স্বামীকেই শুধু ভালবাসিতে হইবে—অন্য কাউকে নয়—অর্থাৎ অন্য কোন পুরুষকে মনের ভিতর স্থান দেওয়াও মহাপাপ—

কথাটার তো বেশ সহজ মানে করে দিলে—কিন্তু যা'দের বিয়েই হয় না, এই যেমন অসচ্চরিত্র নারীদের মেয়েরা—তা'রা সতী হতে পারে কেমন করে?

বিশ্বপতি বিপদে পড়িল—কি যে উত্তর দিবে ভাবিয়া ঠিক পাইল না। দুই একবার ঢোক গিলিয়া পরে কহিল, তা'দের কথা ছেড়ে দাও—তা'রা…

যা খুসী করুক গে, এই তো? কেন বিশুদা, কুৎসিৎ আবহাওয়ায় প্রতিপালিত বলে কি তা'রা মানুষের পংক্তিতে পড়তে পারে না? জন্ম ও আবহাওয়ার জন্যই কি সতীত্বের কবাটও তা'দের বিরুদ্ধে চিরদিনের মত বন্ধ হ'য়ে গেছে? তা'দের কেউ কি সতী হতে পারে না বিশুদা?

তা'রা? সতী? বিশ্বপতি বিদ্রূপের হাসি হাসিল।

তাহার এই বিদ্রূপাত্মক কথায় অত্যন্ত ক্রোধে অনিলার মাথার শিরাগুলি দপ্ দপ্ করিয়া ফুলিয়া উঠিল। সে সহসা গ্রীবা বাঁকাইয়া তীব্রকণ্ঠে কহিল, বিদ্রূপের হাসি হাস্‌ছ বিশুদা—ধন্য তুমি! তুমি না এম-এ পাশ দিয়েছ—অথচ আজ তোমার অন্তরের যে ছবি দেখতে পেলুম তা আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি নি। ছি ছি আমাদের সম্বন্ধে এমনি কুৎসিৎ মনোভাব তুমি পোষণ কর! আমিও তো তা'দেরই একজন—

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া পরে আবার বলিল, কিন্তু আজ আমি বলে যাচ্ছি বিশুদা, অসতীত্বের আঁতাকুঁড়েই না হয় আমার জন্ম হয়েছে—তাই বলে সতীত্বে আমি কারো চেয়ে এক তিলও কম যাব না জেনো—

সহসা গলায় আঁচল জড়াইয়া বিশ্বপতির পায়ের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, বিয়ে আমার হবে না জানি—কিন্তু এক স্বামীত্বের ধর্ম্ম থেকে একচুলও যেন আমি বিচ্যুত না হই, এ আশীর্ব্বাদ তুমি আমায় করো বিশুদা—

বলিয়াই সে ক্ষিপ্রবেগে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। আর বিশ্বপতি স্তব্ধ বিস্ময়ে তাহার পথের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল।

৩

দারুণ দুঃখে ও ক্ষোভে সেদিন অনিলার ভারী কান্না পাইতেছিল। ছি, ছি, বিশ্বপতি এ কি কথা বলে—সতীত্ব তা'দের জন্য নয়? তারা নারী হইয়াও নারী নয়—অন্য তাহাদের নারীত্বকে পায়ে দলিয়া পিষিয়া

ফেলিয়াছে—তাই সেও তাহার প্রতিবাসিনী বিজলী, কমলা ও সুপ্রভার মতই দিনের পর দিন মাসের পর মাস নিত্য নূতন পুরুষের কামে ইন্ধন যোগাইয়া চলিবে! ইহাই কি তাহার অদৃষ্টের লিখন—ইহাই কি তাহার বিধিলিপি?

এইরূপ কত কি ভাবিতে ভাবিতে সে সারাটা রাত্রি ছটফট করিয়া কাটাইতে লাগিল। প্রতিক্ষণেই তাহার মনে হইতেছিল, ছি, ছি, বিশ্বপতি সম্ভবতঃ ভাবিয়াছে, সেও তাহার প্রতিবাসিনীদের মতই রূপের বেসাতি খুলিয়া বসিবে—নারীত্বের টুঁটি টিপিয়া ধরিয়া একটীর পর আর একটীর সঙ্গে ভালবাসার কৃত্রিম অভিনয় করিয়া যাইবে। কি লজ্জা—কি ঘৃণা!

দুঃখ ব্যথায় সে কাৎরাইয়া উঠিল—অকস্মাৎ তাহার বুকের অন্তস্তল হইতে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস বাহির হইয়া আসিল। গভীর রাত্রিতে সে একবার উঠিয়া সম্মুখের বারান্দা দিয়া কয়েকবার পায়চারি করিল। মনে মনে কহিল, বিশ্বপতি নিশ্চয়ই ধারণা করিয়াছে যে সেও অন্যান্যর মত দুর্বিনীত পুরুষের কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য একটী অতি জঘন্য যন্ত্রী মাত্র—তাহার রূপ, তাহার দেহ বিক্রয় হইবে কয়েকটী রৌপ্য মুদ্রার বিনিময়ে—তাই বুঝি সে নিজেও;……আর সে ভাবিতে পারিল না, অত্যন্ত মনোবেদনায় তাহার মাথাটা টন্ টন্ করিয়া উঠিল। কল্পনায় দেখিতে পাইল বিশ্বপতির দেওয়া পূজার উপহার, জন্মতিথির উপহার গুলি একে একে তাহার নিকটে আসিয়া সগর্ব্বে যেন বলিতেছে, ওরে অনিলা, তোর ঐ লীলায়িত দেহখানা আয়ত্ত করবার জন্যই যে আমাদের শুভাগমন—

অনিলার চোখ দুইটি জল্ জল্ করিয়া উঠিল, সে তৎক্ষণাৎ উঠিয়া গিয়া বাক্স খুলিয়া বিশ্বপতির দেওয়া টাঙ্গাইলের শাড়ী খানা পট্ পট্ করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল—টেবিলের উপর হইতে তাহার দেওয়া "বেলা" "চন্দন" "নবপুষ্প" প্রভৃতি লইয়া সজোরে নর্দ্দমায় ছুঁড়িয়া ফেলিল। তারপর বিছানার উপর বসিয়া মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, আর নয়, কালই বিশ্বপতিকে বিদায় করিয়া দিবে—কি স্পর্দ্ধা তাহার, গুরুর পদে বসিয়া শিষ্যার প্রতি এই মনোভাব পোষণ করা!

সারাটা রাত্রি একপ্রকার জাগিয়া কাটাইয়া শেষের দিকটায় সে বিছানার উপর এলাইয়া পড়িল। পূর্ণশশী রোজই ভোরে গঙ্গার ঘাটে স্নান করিতে যায়। সেদিনও সে তেমনি যাইবার সময় একবার আড় নয়নে চাহিয়া দেখিল মেয়ে তখনও জাগে নাই…মাথার একরাশ চুল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত, চোখ দুইটী যেন বসিয়া গিয়াছে। ভাবিল, গরমের জন্য বুঝি বা সে রাত্রিতে ঘুমাইতে পারে নাই…তাই এখন একটু ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। কাজেই সে মেয়েকে না ডাকিয়া বরং নীচে পড়িবার ঘরে প্রবেশ করিয়া সদ্য আগত বিশ্বপতিকে কহিল, বাবা তুমি একটু বস—এই সে এলো বলে। একটু মৌন থাকিয়া পুনরায় কহিল, অনুর এখন পড়াশুনা কেমন হচ্ছে একটু বেশী বয়সে লেখাপড়া আরম্ভ করেছে…তা পারছে তো?

বিশ্বপতি দাঁড়াইয়া মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল, তা বেশ পারছে, অনুর মত মেয়ে কোথায় আছে মা? একবার বলে দিলেই ও বেশ ধরতে পারে…বড় পরীক্ষায় ও খুব ভাল ফল করবে। এমন শান্ত, বুদ্ধিমতী মেয়ে হাজারে একটী মেলে কিনা সন্দেহ—

পূর্ণশশীর মুখখানি আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। সে হৃষ্টমনে কহিল, তোমার মুখে ফুল চন্দন পড়ুক বাবা…

এই বলিয়া সে গাড়ীতে গিয়া উঠিল এবং উপরের দিকে চাহিয়া যোড় হাত করিয়া মনে মনে বলিল, ঈশ্বর, তুমি আমার অনুকে মানুষ করে দাও ও যেন সমস্ত বাধা বিপত্তির হাত থেকে নিস্তার পেয়ে উন্নতির দিকে অগ্রসর হতে পারে যে আগুন আমার জীবনটাকে পুড়িয়ে ক্ষার করে দিয়েছে, তার আঁচও যেন তার অন্তরে না লাগে।

সে গঙ্গার দিকে চলিয়া যাওয়ার পর বিশ্বপতি আরও প্রায় ঘণ্টা খানেক বসিয়া থাকিয়া পরে ভৃত্য রামদীনকে অনিলাকে ডাকিবার জন্য পাঠাইয়া দিল।

অনিলা তখনও নিদ্রায় অভিভূত ছিল, অকস্মাৎ রামদীনের আহ্বানে জাগিয়া উঠিয়াই রুক্ষকণ্ঠে কহিল, ষাঁড়ের মত চেঁচাচ্ছিস্ কেন মাষ্টার বাবুকে যেতে বলে দে, আমি তাঁর মত হীনচেতা লোকের কাছে পড়বো না।

রামদীন মুহূর্ত্তকাল স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া পরে ধীরে ধীরে চলিয়া যাইতেই, সে তৎক্ষণাৎ তড়াক্ করিয়া লাফাইয়া উঠিয়া নীচের দিকে ত্বরিৎ বেগে যাইতে যাইতে বলিল, তোর দরকার নেই রামদীন, আমি নিজেই বলে আস্‌ছি'খন।

ক্ষণকাল পরে পড়িবার ঘরে ঢুকিয়াই সে বিশ্বপতির দিকে চাহিয়া কর্কশ কণ্ঠে কহিল, আপনার কাছে আর আমার পড়া হবে না মাষ্টার মশাই, যা পাওনা আছে কাল এসে মা'র কাছ থেকে হিসেব করে নিয়ে যাবেন। আমার সম্বন্ধে আপনার যে মনোভাব, এরূপ নীচ মনোভাব নিয়ে আর কখ্‌খনো আমার চোখের সাম্‌নে আস্‌বেন না বলে দিচ্ছি, যান এক্ষুণি আপনি এখান থেকে চলে যান।

কথাগুলি ঝর ঝর করিয়া এক নিশ্বাসে বলিয়া ফেলিয়াই সে ক্ষিপ্রবেগে উপরে উঠিয়া গেল। বিশ্বপতি আড়ষ্টপদে সেইখানেই বজ্রদগ্ধ তালবৃক্ষের মত নিশ্চল হইয়া একখানা চেয়ারের হাতল ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

৪

সেদিন গঙ্গার ঘাটে যাওয়া, স্নান করা ও ফিরিয়া আসা এই সময়ের সর্ব্বক্ষণই পূর্ণশশীর চিত্ত এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দে পরিপূর্ণ ছিল। বিশ্বপতির কথাগুলি ঘুরিয়া ফিরিয়া বারংবার তাহার কাণের ভিতর বাজিতেছিল 'পরীক্ষায় ভাল ফল করিবে' 'এমন শান্ত ও বুদ্ধিমতী মেয়ে হাজারে একটা মেলা ভার'। পূর্ণশশী ভাবিতেছিল, বিশ্বপতি সচ্চরিত্র, বিদ্বান্ সে যাহা বলে তাহা মিথ্যা হইতে পারে না। অনিলা সত্যই হয়তো ভবিষ্যতে একজন বিদুষী বলিয়া বিখ্যাত হইয়া পড়িবে। তাহার মান তাহার যশের হয়তো ইয়ত্তা থাকিবে না কিন্তু···তাহার বুকটা ছ্যাৎ করিয়া উঠিল চোখের কোণে জল জমিল, অমনি তাড়াতাড়ি যোড় হাত করিয়া উপরের দিকে চাহিয়া মনে মনে কহিল, ঈশ্বর, মায়ের অপরাধে মেয়ের শাস্তি দিও না। নিয়তি, আমার জীবনটাকে নিষ্ঠুরের মত দুমড়ে দিয়েছিলে তোমার পায়ে পড়ি, আমার অভুর জীবনটা এমনি করে ভেঙে দিও না—তাকে সুখে রেখো সৎপথে রেখো।

বাড়ী ফিরিবার পথে কেবলই সে ভাবিয়াছে, মেয়ের প্রথম অন্তরায় রূপ, যৌবন। পুরুষ পতঙ্গ ইহাতে ঝাঁপ দিলে, সে নিজেও পুড়িবে, মেয়েকেও পোড়াইবে। কাজেই কোন পুরুষ যাহ'তে তাহার মনের কোণে ছায়াপাত না করে সেই দিকে লক্ষ্য রাখাই এখন তাহার প্রধান কর্ত্তব্য। অকস্মাৎ তাহার মানস পথে ফুটিয়া উঠিল বহুদিনের পূর্ব্বের একটী বিশেষ রজনীর কথা যেদিন সে দূর সম্পর্কীয় একজন প্রিয়দর্শন তরুণ আত্মীয়ের হাতে হাত মিলাইয়া নারীত্বকে পায়ে দলিয়া নিজের এতবড় সর্ব্বনাশ টানিয়া আনিয়াছিল—যাহার জন্য আজ তাহার দুঃখ ও মনস্তাপের অন্ত নাই, পরলোকেও অন্ত থাকিবে না।

নিজের জীবনের এই অভিজ্ঞতাই তাহার মাতৃত্বকে সজাগ করিয়া তুলিয়াছিল—তাই সে মেয়ের জন্য বিশেষ সতর্ক হইল। মনে মনে কহিল, কোন যুবককে যে সে অনিলার নিকট আসিতে দেয় না, এই ব্যবস্থা সম্পূর্ণ রূপে উপযুক্ত হইয়াছে—এক বিশ্বপতি—কিন্তু তাহার মত এমন সচ্চরিত্র যুবক কয়জন আছে?

সেদিন পূর্ণশশী বাড়ী পৌঁছাইয়াই উপরে উঠিয়া দেখিল পাশের বারান্দায় একখানা ইজি চেয়ারের উপর বসিয়া অনিলা গালে হাত দিয়া চিন্তিত মনে বাহিরের দিকে চাহিয়া আছে। জিজ্ঞাসা করিল, আজ এত সকালেই পড়া হয়ে গেল মা?

অনিলা অন্যমনস্ক ভাবেই উত্তর করিল, হ্যাঁ মা—

তা হো'ক, দু' একদিন কম পড়াতে ক্ষতি হয় না—বিশু আজ ভর সকালে বল্লে, এমন শান্ত, বুদ্ধিমতী মেয়ে হাজারে একটী মেলাও ভার—

অনিলা মুখ ফিরাইয়া মায়ের আনন্দে উদ্ভাসিত উজ্জল ও স্নিগ্ধ মুখপানে চাহিয়া সপ্রতিভ হইয়া প্রশ্ন করিল, কে বল্লে মা?

পূর্ণশশী উচ্ছ্বসিত আনন্দ চাপিয়া সহাস্যে কহিল, মেয়ের আমার কথা দেখ—কে আর বল্‌বে—আর আমি তেম্‌নি বাপের মেয়ে নাকি যে যা'র তা'র কথায়···

থাক্ মা—ভূমিকা রাখ, তোমার বাপের কুষ্ঠি আমি জান্‌তে চাই নে—যা জিজ্ঞেস করছি তা'র উত্তর দাও—কে ঐ সব কথা তাই বল না—

তাই তো বল্‌ছি মা—বিশু বল্লে—বিশু তোর বিশুদা—যাই বলিস্‌, এমন ছেলে কিন্তু আর দ্বিতীয়টী হয় না—যেমন বিদ্যা, বুদ্ধি, তেমনি চরিত্র—

অনিলা একটু চম্‌কাইয়া উঠিল—পরে ক্ষুণ্ণ মনে কহিল, বাজে বক্‌ছো কেন মিছে?

বাজে বক্‌ছি? একে তুই বল্‌ছিস্‌ বাজে বকা? এই সদ্য গঙ্গাস্নান করে এসেই বল্‌ছি—এর একবর্ণ মিথ্যে হয় তো আমি...

থাক্‌ হয়েছে দিব্যি গাল্‌তে হবে না—তুমি এখন আহ্নিক করগে যাও—

এই বলিয়া অনিলা সেখান হইতে উঠিয়া বিছানার উপর গিয়া শুইয়া পড়িল। মনটা তাহার সকাল বেলাকার বিশ্রী ব্যাপারের দরুণ এমনি ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল যে তাহার দেহের শক্তি পর্য্যন্ত কে যেন কাড়িয়া লইয়াছে বোধ হইতেছিল। কোন রকমে নির্জ্জীবের মত চক্ষু বুজিয়া নিশ্চল হইয়া পড়িয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ সদ্য-বলা মায়ের কথাগুলি তাহার স্মরণ পথে বার বার ঘুরিয়া ফিরিয়া আনাগোণা করিতে লাগিল। ভাবিল, মায়ের কথাগুলি কি সত্য? সত্যই কি বিশুদা তাহার সম্বন্ধে এমনি সব কথা বলিয়াছে সত্যই কি সে বুদ্ধিমান সৎ?

একদিন দুইদিন করিয়া এমনি অসম্বদ্ধ ভাবনা চিন্তার ভিতর দিয়া প্রায় একমাস কাটিয়া গেল—অথচ বিশ্বপতি না আসিল অনিলাকে পড়াইতে—না আসিল তাহার প্রাপ্য টাকা বুঝিয়া লইতে। নানা কথা ভাবিয়া অনিলা অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া পড়িল—পূর্ণশশী জিজ্ঞাসা করিলে সে উত্তর করিত, কি একটা জরুরী কাজে তাহার কোথায় যাইবার কথা আছে তাই কিছুদিন আসিতে পারেন নাই। মা'কে এই মিথ্যা অজুহাতে সন্তুষ্ট করিত বটে—কিন্তু সে নিজে ইহাতে এতটুকু শান্তি পাইত না। প্রতি মুহূর্ত্তেই একরাশ অস্বস্তি আসিয়া তাহাকে অতিমাত্রায় বিব্রত করিয়া তুলিত—সে অনুতাপে ও দুশ্চিন্তায় দগ্ধ হইয়া কোন প্রকারে দিনগুলি অতিবাহিত করিতেছিল।

এক একদিন সে নিজেই চঞ্চল মনকে প্রবোধ দিত এই বলিয়া যে, কেন মিছে সে বিশ্বপতির জন্য এত ভাবে—সত্যিই তো আর সে তাহাকে ভালবাসে না—বিশ্বপতি গৃহ শিক্ষক বই তো নয়। আর এমন নীচ হৃদয় শিক্ষকের নিকট পড়া শেখা বা তাহার সংস্পর্শে আসা উচিৎ নয় বলিয়াই তো সে তাহাকে তাড়াইয়া দিয়াছে - ইহাতে কি এমন অন্যায় হইয়াছে?

এমনি সব চিন্তায় যখন তাহার মনটা পরিপূর্ণ ঠিক সেই সময়ে অকস্মাৎ একটী সন্ধ্যায় সুপ্রভা আসিয়া তাহাকে ছাদের উপর টানিয়া লইয়া মৃদু কণ্ঠে কহিল, আজ এক মজার সংবাদ আছে রে অনি—আমি সকাল বেলায় গঙ্গায় নেয়ে বিডন্‌ স্কোয়ার দিয়ে আড়াআড়ি ভাবে আস্‌ছি হঠাৎ চেয়ে দেখি কি একখানা বেঞ্চের উপর গালে হাত দিয়ে বসে তোর সেই বিশু মাষ্টার। কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলুম, 'আজকাল যে দেখি নে বড়' তা'তে মুখখানি আশ্চর্য্য রকমের কালো করে বল্লেন, 'কি করে আর দেখবে বল অণু যে আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে'—

একটু মৌন থাকিয়া পুনরায় কহিল, শুধু তাই নয় আরও কি বল্লেন জান বল্লেন, 'তোমাদের অণু বড় ভাল মেয়ে আমি তা'কে খুবই ভালবাসতুম সুপ্রভা—কিন্তু সে বিনে দোষে আমাকে তাড়ালে তা'কে বলো, সে যেন লেখাপড়া শিখে উন্নতি লাভ করে, সুখে থাকে—আমি চিরদিন ভগবানের কাছে তাই প্রার্থনা করবো'।

অনিলার চিত্ত কেমন চঞ্চল হইয়া উঠিল সে কি একটা কথা বলিবার জন্য মুখ তুলিয়া চাহিতেই, সুপ্রভা বলিল, কি যে রোগা হয়ে গেছে অণু, দেখলে গা শিউরে উঠে...গাল দু'টী চুপ্‌সে গেছে হাত পা লিক্‌লিকে।

অনিলা সহসা কাতর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, কেন?

সুপ্রভা কহিল, বল্লেন, বাড়ীর অবস্থা খুব খারাপ, টাকা পয়সা না পাঠালে মা, ভাই, বোন খাবে কি! তাই একটা কাজ কর্ম্মের জন্য ঘুরে ঘুরে, তোমার এখানে যে চল্লিশটি করে টাকা পেতেন তাও আর নেই শুনলুম দু'দিন নাকি মোটে খাওয়াই হয় নি।

অনিলার বুকখানি ফাটিয়া কান্না ঠেলিয়া উঠিল

চাহিল, সে কোন প্রকারে নিজেকে সংযত করিয়া বলিল, পরের দুঃখ দৈন্যের ইতিহাস শুনবার মত অবসর আমার নেই, প্রভা ঢের কাজ পড়ে রয়েছে।

এই বলিয়া সে ধুপ ধুপ্ করিয়া ত্বরিত বেগে নীচে চলিয়া আসিয়াই বিছানার উপর এলাইয়া পড়িল। ক্ষণকাল পরে অন্তরের অন্তঃস্তল হইতে একটা দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া আসিল—ভাবিল, হায় হায়, আজ তাহার আহার্য্যের অন্ত নাই, অথচ...চোখের উষ্ণ জলে বালিস ভিজিয়া গেল। সে বালিসটা বুকে সজোরে চাপিয়া উপুড় হইয়া পড়িয়া থাকিয়া সুপ্রভার কথাগুলি মনে মনে আওড়াইতে লাগিল—ভাবিল, বিশ্বপতি সত্যই তাহাকে ভালবাসে—অথচ তাহারই বিনিময়ে সে পাইয়াছে লাঞ্ছনা—অপমান! শুধু তাই নয়—আজ সে তাহারই জন্য অনাহারী! ছি ছি, কত বড় অমানুষ সে!

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া পরে আবার চিন্তা করিল, হায় আজ যদি একটিবার সে ছুটিয়া গিয়া তাহার পায়ের উপর পড়িয়া বলিতে পারিত, বিশুদা, আমিও সত্যি সত্যি তোমায় ভালবাসি—ভালবাসি—অসতী মায়ের মেয়ে বলে আমার সতীত্বে যদি তুমি সন্দেহ রাখ—না হয় আমার সকল সাধ সাগরের অতল জলে নিক্ষিপ্ত হবে, তা'তে আমি কারো কাছে কাঁদবো না—কোন অভিযোগ করবো না—কিন্তু তবু আজ তুমি আমায় ক্ষমা কর—

৫

হঠাৎ কি মনে করিয়া সে বিছানার উপর উঠিয়া বসিল, চাহিয়া দেখিল রাত্রি অধিক হয় নাই—দেয়ালের ঘড়ীতে ৮টা বাজিয়াছে মাত্র। তৎক্ষণাৎ সে বাক্স খুলিয়া কাগজের নীচ হইতে দশ টাকার পাঁচখানা নোট বাহির করিল, এই টাকা সে মায়ের নিকট হইতে পার্ব্বণী স্বরূপ পাইয়া পাইয়া সংগ্রহ করিয়াছিল। তারপর ভাল ভাল গহনা পরিল—হেলিয়োট্রোপ রঙের শাড়ী ও ব্লাউজ বাহির করিয়া ড্রেস করিয়া আঁচলটা বাম বক্ষের উপর দিয়া টানিয়া বাম স্কন্ধের উপর দিয়া পিঠের দিকে ঝুলাইয়া দিল। পরে বড় আয়নার সম্মুখে গিয়া বেশ করিয়া চুল আঁচড়াইয়া কাণ দুইটী ঢাকিয়া হালফ্যাসানের খোঁপা বাঁধিল, কপালের উপর বড় একটা সিন্দুরের ফোঁটা দিয়া ক্ষণকাল আয়নার দিকে চাহিয়া মনে মনে কহিল, আজ যদি চোখের জলে তাঁর মন গলাতে না পারি, এ রূপ-যৌবন দিয়েও কি পারবো না? যদি না পারি, গঙ্গার জল তো আছে তবে আর ভয় কি?

তারপর একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া মায়ের কাছে গিয়া বলিল, মা, আমি একটু 'চিত্রা' থেকে ঘুরে আসছি আজ একটা ভাল ফিল্ম আছে।

পূর্ণশশী জানিত বায়স্কোপ দেখা মেয়ের একটা সখ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আগে সপ্তাহে দুইদিন করিয়া সে বিশু মাষ্টারের সঙ্গে বায়স্কোপে যাইত এখন সে ছুটীতে আছে, কাজেই মেয়েরও এ সুযোগ ঘটিয়া উঠে না। এতদিন পরে এখন যদি এ খেয়াল তাহার চাপিয়া বসিয়াছে, সে না করিবে কিরূপে? তাই কহিল, তা যাও মা, সাবধানে থেকো, দারোয়ানকে সঙ্গে করে নিয়ে যাও।

অনিলা 'আচ্ছা' বলিয়া নীচে নামিয়া গেল। তারপর কিছুক্ষণ পরে দারোয়ানকে সঙ্গে করিয়া ঘোড়ার গাড়ীতে চড়িয়া বসিয়া কোচয়ানকে বিবেকানন্দ রোডের দিকে যাইতে আদেশ দিল।

মিনিট কয়েক পরে গাড়ী আসিয়া একটা তেতালা বৃহৎ বাড়ীর নিকটে দাঁড়াইল। ইহা একটী মেস্—বিশ্বপতি এই মেসের দোতালার কোণের ছোট ঘরে বাস করে—অনিলা এই রাস্তা দিয়া যাতায়াত করিতে করিতে বিশ্বপতির নিকট হইতে ইহা অবগত হইয়াছিল। কাজেই গাড়ী এই বাড়ীর কাছে আসিতেই অনিলা কোচয়ানকে গাড়ী থামাইতে বলিল ও পরে বিশ্বপতির খোঁজ করিবার জন্য দারোয়ানকে উপরে পাঠাইয়া দিল! খানিক পরে দারোয়ান ফিরিয়া আসিয়া অনিলাকে বলিল, ম্যানেজার বাবু বলিলেন যে মেসের টাকা পয়সা দিতে না পারায় মেস হইতে তাহার নাম কাটিয়া দেওয়া হইয়াছে—সে নাকি বর্ত্তমানে পাশের গলিতে একটা খোলার ঘরে বাস করিতেছে।

এই সংবাদ অনিলার বুকে আঘাত করিল—সে একবার কি ভাবিল, তারপর কোচোয়ানকে সেই গলির

দিকে গাড়ী লইতে বলিল। গাড়ী বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারিল না—কারণ গলিটা বড় সরু। কাজেই সে তাহাদিগকে সেইখানে অপেক্ষা করিতে বলিয়া নিজে একাকী গলির দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। খানিকটা গিয়াই সে একটা লম্বা খোলার ঘর পাইল—মেঝে স্যাঁৎ-স্যাতে, সম্মুখে নানারূপ আবর্জ্জনাপূর্ণ ডাষ্টবীন্—চারিদিকে নোংড়া—সেখানে প্রবেশ করিতে তাহার প্রবৃত্তি হইল না, তথাপি কোনপ্রকারে ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিল লম্বা বারান্দার এক পাশে একটা কেরোসিনের ডিবা জ্বালাইয়া কতকটা নিম্নশ্রেণীর লোক হল্লা করিয়া তাস খেলিতেছে। অনিলার গা শিহরিয়া উঠিল—একটু থমকাইয়া দাঁড়াইল—পরে আবার নিজের চিত্তে সাহস সঞ্চয় করিয়া ঐ লোকগুলিকে জিজ্ঞাসা করিল, বিশ্বপতির খোঁজ তাহারা জানে কি না ?

তাহারা অনিলার অসামান্য রূপ যৌবন দেখিয়া বিস্মিত হইল, পরে কহিল, কে জানে বাপু কোথায় সে থাকে—তবে ঐ পাশের ঘরে একটা বাবু থাকে বটে—ইত্যাদি।

অনিলা সেই মুহূর্ত্তেই বিশ্বপতির অনুসন্ধানে উদ্‌গ্রীব হইয়া পাশের ঘরের দিকে চলিল। দরজা ভেজানো ছিল—সে ধীরে ধীরে তাহা কিছু ঠেলিয়া দিয়া চাহিয়া দেখিল, একটা ভীট্‌জ লঠনের আলো মিট্ মিট করিয়া জ্বলিতেছে। এক কোণে কয়েকটা হাঁড়ি, একটা ষ্টোভ ও বাসনপত্র আছে বটে—কিন্তু রান্না হওয়ার কোন লক্ষণ নাই। অদূরে বিছানার উপর বিশ্বপতি তাহার চোখের উপর হাত রাখিয়া নিদ্রায় অভিভূত। অনিলার চক্ষু দুইটী অন্তর্বেদনায় ছল্ ছল্ করিয়া উঠিল। বিশ্বপতির এই দুর্দ্দশার একমাত্র কারণ যে সে নিজে ইহা তাহার বুঝিতে বাকী রহিল না। ক্ষণকাল কি ভাবিল, তারপর নোটগুলি আঁচল হইতে খুলিয়া অতি সন্তর্পণে বিশ্বপতির বিছানার নীচে রাখিয়া দিল, এবং একটু পরে বিছানার উপরে বসিয়া ধীরে ধীরে তাহার শীর্ণ পায়ে হাত বুলাইতে লাগিল।

পায়ে তাহার স্পর্শ অনুভব করিয়া বিশ্বপতি চমকাইয়া উঠিয়া চাহিয়া যাহা দেখিল তাহাতে তাহার বিস্ময়ের অবধি রহিল না। মুহূর্ত্তকাল পরে সম্বিৎ ফিরিয়া সে মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, এ কি আশ্চর্য্য ! অনিলা, তুমি এখানে !

অনিলা তাড়াতাড়ি দাঁড়াইয়া গলায় আঁচল জড়াইয়া কাতরকণ্ঠে বলিল, ক্ষমা চাইতে এসেছি অনেক ক[illegible] দিয়েছি, নিজেও তার খুব শাস্তিভোগ করেছি, আ[illegible] আমি সইতে পারি নে চল, গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে।

বিশ্বপতি স্তব্ধ হইয়া ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া থাকিয়া পরে কহিল, কিসের ক্ষমা আর আমি কোথায় যাব অনিলা ?

অনিলা বলিল, আজ আর সে সব প্রশ্ন করো না কোন ওজর আপত্তি করো না। সুপ্রভার কাছে তোমার অন্তরের সত্যিকার পরিচয় পেয়েছি, তাই না নিজে আমি লজ্জার বাঁধ ভেঙ্গে তোমার কাছে উন্মাদিনীর মত ছুটে এসেছি আমার অন্তরের কথা জানাতে। অসতী মায়ের মেয়ে বলে আমার সতীত্বে হয় তো তোমার আস্থা নেই কিন্তু ভগবান সাক্ষী করে বলছি, আমার যৌবন প্রভাতে যিনি দেবতার মূর্ত্তি ধরে আমার অন্তরের বেদীতে এসে বসেছেন, তিনিই আমার সকল দেবতার বড় দেবতা নারী-জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রত্ন।

কিন্তু সে কথা এখানে কেন অনু ?

প্রয়োজন আছে বলে…এই কথা বলিয়াই সে খপ্ করিয়া বিশ্বপতির পায়ের উপর মাথা রাখিয়া বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে কহিল, আমার অপরাধের অন্ত নেই কিন্তু আজ আমার সকল অপরাধ ক্ষমা করে আমার সঙ্গে চল তোমার দুঃখ কষ্ট আর আমি সইতে পারি নে ! তোমার স্ত্রী হবার সুকৃতি আমার নেই জানি তাই আজ মিনতি করে বলছি, অন্ততঃ দাসী হয়ে এই চরণ সেবা করবার অধিকার আমায় দাও।

বিশ্বপতি স্তম্ভিত হইয়া কিছুকাল দাঁড়াইয়া থাকিয়া পরে কহিল, তা কি কখনও সম্ভব ?

অভিমানিনী অনিলা সহসা মুখ তুলিয়া বলিল, কেন নয় ? আমি অসতী মায়ের মেয়ে বলে ? আমার জন্মের জন্যে আমি অপরাধী ? তাই কি আমার বুকভরা অফুরন্ত ভালবাসা মূল্যহীন ? আমার রূপ, যৌবন, আশা, আকাঙ্ক্ষা সবই তোমার কাছে এক মুষ্টি ধূলির মত তুচ্ছ ? [illegible] তোমার পায়ে পড়ি, আমার মায়ের [illegible] আমাকে শাস্তি দিও না। একবার [illegible] পরীক্ষার সুযোগ দাও।

আমায় মাপ কর অনিলা, আমি অসমর্থ।

অসমর্থ? ছি ছি, তুমি না আজ সুপ্রভাকে বলেছে আমায় ভালবাস! তবে এ কথা কেন—কুসংস্কারের জন্য? তুচ্ছ কুসংস্কার এসে আমাদের এতবড় পবিত্র ভালবাসাকে চূর্ণ করে দেবে? তুমি না বিদ্বান, বুদ্ধিমান তথাপি কুসংস্কারকেই উচ্চে স্থান দিলে, ভালবাসাকে নয়? ধন্য তুমি ধন্য।

কথাগুলি আর্দ্রকণ্ঠে কোনপ্রকারে বলিয়াই অনিলা টলিতে টলিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

বাড়ীতে ফিরিয়া সে একরূপ না খাইয়াই শুইয়া পড়িল। মনের দুঃসহ যন্ত্রণায় তাহার মাথাটা ছিঁড়িয়া পড়িতেছিল। সারাটা রাত্রিই সে লজ্জা,ঘৃণা ও অবমাননার জ্বালায় ছট্‌ফট করিয়া কাটাইতেছিল হঠাৎ শেষ রাত্রিতে সে শয্যার উপর উঠিয়া বসিল ভাবিল, আর কেন, এই তো মহা সুযোগ এখনই তো গঙ্গার জলে সে তাহার দুঃসহ অশান্তি দূর করিতে পারে।

কথাটা মনে হইবামাত্রই সে টেবিলের কাছে গিয়া বসিল এবং দোয়াত কলম লইয়া মাতাকে পত্র লিখিতে বসিল, লিখিল, 'মা, আমি তোমার অভাগিনী মেয়ে, তাই তোমার সাধ পূর্ণ করতে পারলুম না, তোমার শুভেচ্ছা ও শুভাশীষ আমাকে দুরদৃষ্টের হাত থেকে রক্ষে করতে পারলে না। বিশুদা'কে বলো, যে শিক্ষা প্রাণের দাবীর চেয়েও কুসংস্কারকে উচ্চে স্থান দেয়, আমি সেই শিক্ষার মাথায় পদাঘাত করে আজ গঙ্গার জলে চিরশান্তি লাভ করতে চল্লুম।

চিঠিখানি শেষ করিয়া বিছানার উপর স্থাপন করিয়া সে ক্ষিপ্রবেগে গঙ্গার দিকে ছুটিয়া চলিল।

পরদিন সকাল বেলায় পূর্ণশশী অন্যান্য দিনের মত গঙ্গায় স্নান করিতে যাইবার সময় দেখিল অনিলার ঘরের দরজা তখনও ভেজানো রহিয়াছে। ভাবিল, মেয়ে ঘুমাইয়া রহিয়াছে।

স্নান শেষ হইলে বাড়ী ফিরিবার পথে প্রৌঢ়া প্রতিবাসিনী জহরমণির সঙ্গে দেখা। এক সময় নিজের অসামান্য রূপ ও যৌবন বেচিয়া প্রচুর অর্থ উপায় করায় এই নাম তাহার হইয়াছিল কিন্তু এখন দুঃখের সীমা নাই, সুখের সাথীরা তাহাকে ছাড়িয়াছে, সোণার দেহ রোগে জরাজীর্ণ।

পূর্ণশশীর সঙ্গে সে সুখ দুঃখের আলাপ করিতে করিতে কথাপ্রসঙ্গে কহিল, তা তোমার মেয়েকে বেশ পথে দিয়েছ শশী ও লেকাপড়া শিখে সৎপথে তোমার মুখ উজ্জ্বল করবে।

পূর্ণশশীর বুকখানি আনন্দে নাচিয়া উঠিল বলিল, আশীর্ব্বাদ কর দিদি, আমার অনু যেন লেকাপড়া শিখে সুখে ও সৎপথে থাকে তাই না সমস্ত প্রলোভনের হাত থেকে ওকে দূরে রেখেছি

সেদিন জহরমণির মুখে মেয়ের প্রশংসা শুনিয়া প্রফুল্ল মনে সে বাড়ী ফিরিল ফিরিয়া দেখিল অনিলার ঘরের দরজা তখনও বন্ধ ভাবিল, মাষ্টার ছুটিতে আছে, তাই হয়তো মেয়ে একটু ঘুমিয়ে নিচ্ছে বয়স কালের ঘুম।

কাজেই তাহাকে না ডাকিয়া সে আহ্নিকে বসিল। কিন্তু আহ্নিকের সময় মন্ত্রগুলি যত না তাহার মনে পড়িল তাহার চেয়ে অনেক বেশী মনে পড়িল অনিলার কথা। গর্ব্বে তাহার বুকখানি ফুলিয়া উঠিল মনে মনে কহিল, সুখদা, চাঁপা, সরযূকে আজই সে বলিবে, কেমন, মেয়ে না মানুষ হবে না বলেছিলে?

কোনপ্রকারে সে আহ্নিকটা শেষ করিয়াই মেয়েকে ডাকিবার জন্য ঘরের দরজায় ধাক্কা দিল, হঠাৎ দরজা খুলিয়া গেল কিন্তু হায় মেয়ে কোথায়? পূর্ণশশীর বুকটা একটা অজ্ঞাত আশঙ্কায় ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল। দেখিতে পাইল বিছানার উপর একখানা চিঠি পড়িয়া আছে। সে কম্পিত দেহখানি কোনরূপে টানিয়া তাড়াতাড়ি বিছানার কাছে গিয়া চিঠিখানি হাতে লইল। তারপর খুলিয়া যাহা সে পড়িল তাহাতে অসীম ব্যথায় তাহার বুকখানি চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল। সে একটা অব্যক্ত কাতরধ্বনি করিয়া ধুপ করিয়া মেঝের উপর লুটাইয়া পড়িয়া বিকট কান্নায় বাড়ীখানি কাঁপাইয়া তুলিল।

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে বিশ্বপতি বিছানার নীচে পাওয়া নোটগুলি অনিলাকে ফিরাইয়া দিতে আসিয়া কান্নার রোল শুনিয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল।

(ক্রমশঃ)

ভারতের আর্থিক সর্ব্বনাশের মূল কারণ

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে মেকলে একবার বলিয়াছিলেন, "রক্তে এবং বর্ণে ভারতীয় কিন্তু রুচিতে, মতবাদে এবং বুদ্ধিতে ইংরাজ এমন এক শ্রেণীর লোক গড়িবার জন্য আমাদিগকে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে হইবে।" তখন হইতে আজ ঠিক একটি শতাব্দী কাটিয়া গিয়াছে, আমরা দেখিতেছি ইংরাজ রাজনীতিকের স্বপ্ন সফল হইয়াছে। আমাদের অজ্ঞাতসারে আমরা আজ পাশ্চাত্যরীতি ও জীবন-প্রণালীর কদর্য্য অনুসরণ করিতেছি। সংমিশ্রণে সৃষ্ট জীব আমরা। আয়ের অতিরিক্ত ব্যয় করা, বাহিরে সর্ব্বদা একটা ভড়ং লইয়া থাকা—ইহাই ভারতের রীতি দাঁড়াইয়া গিয়াছে। আমাদের দেশীয় নৃপতিগণ ত সকলকে অতিক্রম করিয়াছেন। রাজকুমার কলেজের শিক্ষা-দীক্ষাকে ধন্যবাদ! বিপুল বিলাসিতার জন্য তাঁহারা অজস্র অর্থ অপব্যয় করিতেছেন, কিন্তু তাঁহাদেরই হতভাগ্য প্রজাগণ দুইবেলা পেট ভরিয়া খাইতে পায় না।

আমাদের গবর্ণমেণ্ট অসম্ভব রকম অমিতব্যয়ী। যোগ্য শিষ্যরূপে এ দেশীয় নৃপতিরা তাঁহার সহিত প্রতিযোগিতা করিতেছেন। আমাদের উচ্চ বেতনভোগী রাজকর্ম্মচারী, কৃতী আইন ব্যবসায়ী ও ডাক্তারেরা এবং জমিদারগণও এই বিষয়ে উন্মত্তভাবে কদর্য্য প্রতিযোগিতা আরম্ভ করিয়াছেন।

আমি এমন লোক জানি, যাহাদের আয় ৫০০্ টাকারও ন্যূন। কিন্তু তাহাদের একটি করিয়া "বেবি অষ্টিন" থাকা চাই। নিম্ন তালিকা হইতে বুঝা যাইবে যে, কৃত্রিম রেশমের জন্য কি উন্মত্ত নেশা ভারতকে পাইয়া বসিয়াছে। ১৯২২-২৩ সালে এই দ্রব্যের আমদানী হয় ২২৫ পাউণ্ড; ১৯২৬-২৭ সালে এই সংখ্যা উঠে, ৫১১৭ পাউণ্ডে, অর্থাৎ ৪ বৎসরে ইহার ব্যবহার ২৫ গুণ বাড়িয়া যায়। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ১৯২৫-২৯ সালে ৪ কোটি টাকার কৃত্রিম রেশম আমদানী হয়, ফলে হইয়াছে এই যে, মুর্শিদাবাদ ও মালদহের রেশম শিল্পগুলি—যাহা এককালে খুব সমৃদ্ধ ছিল—সেগুলি লোপ পাইতে বসিয়াছে। আরও কয়েকটি বিলাস উপকরণের হিসাব নীচে দেওয়া গেল—মোটরগাড়ী (ট্যাক্সি সমেত) ৪ কোটি টাকারও অধিক; সিগারেট ২ কোটি; সমস্ত প্রকার কার্পাস দ্রব্য (দোসুতি ও সুতাসমেত) ৬৩ কোটি, ঔষধ ও মাদক ২ কোটি এবং রাসায়নিক দ্রব্য ২॥ কোটি।

যন্ত্র সভ্যতা ও বেকার সমস্যা

যন্ত্র-সভ্যতাকে বিচার করিয়া দেখা গিয়াছে যে, উহা আমাদের অভাব দূরের পক্ষে যথেষ্ট নহে। তথাপি আমাদের দেশের শিক্ষিত যুবকগণ উহার জন্য উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে। একটি দৃষ্টান্ত দ্বারাই বুঝা যাইবে যে, যন্ত্র পদ্ধতি আমাদের কতদূর সুবিধা দিতে পারিয়াছে। যন্ত্র-কবলিত ইউরোপ ও আমেরিকার বেকার সংখ্যা আজ ২ কোটি ৫০ লক্ষে পৌছিয়াছে। কি ভয়াবহ ব্যাপার! "মাঞ্চেষ্টার গার্ডেয়ান", "ষ্টেটস্‌ম্যান" প্রভৃতির সংবাদ হইতে বুঝা যায় যে, যান্ত্রিক উন্নতির দ্বারা মানুষের জীবনে কোনই সুরাহা হয় নাই। ক্ষুধিত জনগণকে অন্ন দিবার মত খাদ্যদ্রব্য দেশে উৎপন্ন হইতেছে না।

চরকার কথা

আমাদের অর্থনীতিবিদ্‌গণ শুধু কলেজেই অধ্যাপনা করেন। চরকার নাম শুনিলে মুখ বাঁকাইয়া বিদ্রূপ করাই তাঁহাদের স্বভাব। কিন্তু বৎসরের মধ্যে যে ৬ হইতে ৯ মাস সাধারণ লোককে বসিয়া কাটাইতে হয় সেই সময় তাঁহাদের জন্য যে কোন কাজের একটা উপায় উদ্ভাবন করিতে যখন তাহাদিগকে বলা হয় তখন তাঁহারা নিরুত্তর থাকেন। যে কোটি কোটি টাকা পূর্বে [illegible]

ভারতের সূতাকাটুণী ও তাঁতিদের মধ্যে চলাচল হইত সেই টাকা আজ সে বিদেশে পাঠায়। তাহার জাতীয় শ্রম-শিল্পের ধ্বংসের ফলে তাহাকে আজ ল্যাঙ্কাশায়ার ও জাপানী বণিক প্রভুদের নিকট এই সেলামী পাঠাইতে হয়।

বোম্বাই কাপড়ের কলগুলি ৩ হইতে ৪ লক্ষ লোককে কাজ দিয়াছে, হুগলীর উপরে পাটের কলগুলিও ঐরূপ। সম্ভবতঃ কাণপুর মিলগুলি লাখ দুয়েক লোককে কাজ দিয়াছে। বড় জোর ২০ লক্ষ লোক শ্রম-শিল্পের কেন্দ্রে জীবিকার্জ্জন করিয়া থাকে। কিন্তু বাকী—৩১ কোটি ৮০ লক্ষ লোকের অবস্থা কি? আপনারা কি গ্রাম্য ভারতকে শ্রম-শিল্পময় করিয়া ফেলিবেন? কলিকাতা, মাদ্রাজ, বোম্বাই এবং করাচী ছাড়া প্রকৃত পক্ষে ভারতে আর সহরই নাই; সুতরাং এ ক্ষেত্রে আপনাদের প্র-য়ের দিন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইবে।

আসল কথা ভারতবর্ষ কৃষিজীবি দেশ এবং চিরকালই উহাই থাকিবে। সমস্যা হইতেছে, কি করিয়া উন্নত ধরণের কৃষিপদ্ধতি দ্বারা জমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করা যায় এবং আনুষঙ্গিক কার্য্যের ব্যবস্থা করিয়া কি ভাবে গ্রামবাসীদের স্বল্প আয়কে কথঞ্চিৎ পুষ্ট করা যায়। আমার দৃঢ় মত এই যে, সূতা-কাটা ও কাপড়-বোনা ভারতের সর্ব্বত্র প্রয়োগযোগ্য একটি গৃহ-শিল্পের দুইটি অংশ। আমাদের শাসকেরা বলিয়া থাকেন যে, ব্রিটিশ রাজত্বে লোকের অবস্থা ক্রমশঃ সমৃদ্ধ হইতেছে। অর্থনীতিবিদ্‌গণ বলেন যে, যাতায়াত ও মাল-চালানের সহজ ও দ্রুত ব্যবস্থার ফলে লোকে যখন উৎপন্ন দ্রব্যের জন্য বেশী দাম পাইতেছে তখন তাহাদের সম্পদ্ আরও বাড়িতেছে। সুতরাং তাঁহারা বলেন যে, অতিরিক্ত উৎপন্ন দ্রব্য এখন সুবিধা মত বিক্রয় করা যায়।

কিন্তু উন্নত যানবাহন পদ্ধতির ফলে দরিদ্র কৃষকদের যে শুধু উপকার হয় নাই একথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। মিঃ র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ডই তাঁহার "ভারতের জাগরণ" নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, রেলওয়ে হওয়ার ফলে ভারতে দুর্ভিক্ষের প্রসার বাড়িয়াছে। তদুপরি যাতায়াতের এই সুবিধার ফলে মোকদ্দমায় দরিদ্র গ্রামবাসীদের অর্থনাশের একটা পথ হইয়াছে।

ভারতের সর্ব্বত্রই যে মাঝে মাঝে স্বদেশী দ্রব্যের প্রদর্শনী হইতেছে, ইহা খুবই সুলক্ষণ।

বাজারের কাজ হইতেছে ক্রেতা এবং বিক্রেতাকে একত্র আনা। কিন্তু উভয়ের এই সম্পর্ক ক্ষণস্থায়ী। কিন্তু প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য আরও ব্যাপক, যদিও প্রদর্শনীতে ফল হয়ত অতি প্রত্যক্ষ নয় এবং কেনাবেচাও বাজারের তুলনায় কিছুই নহে। প্রদর্শনী যে পরিদর্শন করিতে আসে সে ক্রয় করা অপেক্ষা প্রদর্শিত বিচিত্র দ্রব্যসম্ভার দেখিতেই আসে। কিন্তু সে যখন ফিরিয়া যায়, তখন যে সকল দ্রব্য তাহার আগ্রহ আকর্ষণ করিয়াছে, মনের মধ্যে তাহাদের একটা ছাপ লইয়া যায় এবং ভবিষ্যতে ঐ সকল জিনিষই সে কেনে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, প্রদর্শনী একটা একত্রীভূত বিজ্ঞাপনের কাজ করে এবং উহার শিক্ষাদানের মূল্য বেশী।

আমাদের দেশে প্রদর্শনী জিনিষটি নূতন নহে। বহু প্রাচীনকাল হইতেই ভারতবর্ষে যথানিয়মে অসংখ্য মেলা অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে।

আমাদের দেশের লোকে কোন একটি বিশেষ অভাব তীব্রভাবে বোধ করিতেছে, তাহার জন্যই এই সকল স্বদেশী মেলার উদ্ভব হইয়াছে। আমরা অনুভব করিতেছি যে, দৃশ্যমান প্রাচুর্য্যের মধ্যে আমরা যে অনাহারে রহিয়াছি।

আমাদের দেশবাসীর কর্ম্ম-প্রচেষ্টার প্রতীক এই সকল প্রদর্শিত দ্রব্যসম্ভার দেখিয়া প্রত্যেকের হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠে। হয়ত কোন কোন দ্রব্যের মূল্য একটু বেশী। আমরা যে সকল দ্রব্যের সহিত পরিচিত তাহাদের পরিবর্ত্তে যদি এই সকল দ্রব্য ক্রয় করি, তবে কি আমরা ঠকিব? কিছুতেই না। যতই আমরা ক্রয় করিব ততই উৎপন্ন দ্রব্য এবং যাহারা উৎপাদন করে তাহাদের সংখ্যা বাড়িয়া যাইবে। অপরিহার্য্য স্বাভাবিক পদ্ধতিতে উৎপাদনের পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতা হইবে, তাহারা উত্তরোত্তর নিপুণ ও কর্ম্মকুশল হইতে থাকিবে এবং অদূর ভবিষ্যতে যোগ্যতম যে সে টিকিয়া যাইবে। আপনারা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, ক্রেতাদের কি লাভ? আমি জিজ্ঞাসা করি, আমরা সকলেই কি সরকারী

চাকুরীয়া, বিদেশী দ্রব্যের ব্যবসায়ী, আইন ব্যবসায়ী ডাক্তার বা স্কুলমাষ্টার—আপাত দৃষ্টিতে যাহাদের শ্রমশিল্পের উন্নতিতে কোন স্বার্থ নাই। নিশ্চয়ই তাহা নহে। আমাদের অনেকে, বা আমাদের পুত্রেরা বা বন্ধুরা কোন ভারতীয় শ্রমশিল্পের সহিত সংশ্লিষ্ট। আমাদের নিজেদের জন্য, আমাদের প্রিয়জনের জন্য এরূপ শ্রমশিল্পের উন্নতির সহিত আমরা একান্তভাবে জড়িত। অন্যান্য শ্রমশিল্পকে সাহায্য করিয়া আমরা নিজেদেরই সাহায্য করি এবং আমাদের আত্মীয় ও বন্ধুগণকে বেকার হইয়া পড়া হইতে বাঁচাই।

আমাদের ইচ্ছানুরূপ শুল্ক-প্রাচীর তুলিয়া আমাদের শ্রমশিল্পগুলিকে বাঁচাইতে আমরা অক্ষম। অটোয়া সম্মেলনে অন্য সকলে যেভাবে নিজেদের ইচ্ছা ব্যক্ত করিয়াছে আমরা তাহা পারি নাই আমাদের একমাত্র অস্ত্র নিজেদের মধ্যে সহযোগিতা এবং স্বেচ্ছায় স্বদেশী বস্ত্র ক্রয়।

আমাদের স্বদেশী শিল্পকলা ও শ্রমশিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করিতে হইবে, উহাকে উৎসাহ দিতে হইবে। লুপ্ত শিল্পকলা পুনরুদ্ধারের জন্য এবং শ্রমশিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য আমরা যদি প্রস্তুত না হই এবং তাহার জন্য ঐকান্তিক চেষ্টা না করি, তাহা হইলে মুখে স্বদেশী ক্রয় কর বলিয়া চীৎকার করিয়া কোনই লাভ নাই।

আপনারা কেহ কেহ জানেন যে, আমি একজন ছোটখাট শ্রমশিল্পী এবং সেই হিসাবে এই প্রদর্শনীতে যোগ দিয়াছি। মহাত্মা যদি চরকার ঋষি হন, তাহা হইলে আমি দাবী করি যে, চরকার মন্ত্রপ্রচারে আমি তাঁহার মূক। এবং তথাপি আমার কারখানা আজ দৈনিক ১৫ টন ফটকিরি, ১৫ টন সালফিউরিক এসিড এবং কয়েক টন ম্যাগনেসিয়াম সালফেট এবং অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুত করে।

আমি আবার বলিতেছি যে পাশ্চাত্য সভ্যতার বহিরঙ্গের আলেয়ার পশ্চাদ্ধাবন হইতে আমাদিগকে বিরত হইতে হইবে। উহার পশ্চাদ্ধাবনই আমাদের সর্ব্বনাশ আনিয়াছে। সেচ-ব্যবস্থায় উর্ব্বর গমের ক্ষেত্র যতদিন পাঞ্জাব কৃষকের পকেট ভর্ত্তি করিয়াছে ততদিন সে বেশ মোহগ্রস্ত হইয়া দিন কাটাইয়াছে। সে অনুকরণ প্রবৃত্ত হইয়া জীবনযাত্রার বিলাসিতা ক্রমশঃ বাড়াইয়া চলিয়াছিল, মাসিক ১৫০৲ হইতে ২৫০৲ টাকা পাঠাইয়া পুত্রকে লাহোরের কলেজে পড়াইতেছিল ঠিক লেখা পড়া শিখিবার জন্য নহে, কায়দা শিখিবার জন্য। কিন্তু আজ সর্ব্বনাশ আসিয়াছে। কলিকাতার বন্দর জাহাজ ভর্ত্তি অষ্ট্রেলিয়ার সস্তা গমে আক্রান্ত হইয়াছে। বাঙ্গলার করদাতাকে সংরক্ষণ শুল্কের আকারে দুর্ভাগা পাঞ্জাব কৃষককে সাহায্য করিতে হইবে।

একজন গ্রাজুয়েটের গড়পড়তা মাসিক আয় ২৫ হইতে ৩০ টাকার বেশী নহে। তথাপি এই অতল্প আয়ের উপর বাঁচিয়া থাকিতে তাহার আনন্দ, গ্রামে সে কিছুতেই যাইবে না। ফল এই হয় যে, তাহার স্ত্রীপুত্র শারীরিক ও মানসিক অপুষ্টিগ্রস্ত। বায়ু ও সূর্য্যালোক প্রবেশ করিতে পারে না এমন সঙ্কীর্ণ ঘরের মধ্যে অবস্থান তাহার দুর্দ্দশাকে আরও বাড়াইয়া তোলে। দাবানলের মত যক্ষ্মারোগ ছড়াইতেছে এবং শিশু-মৃত্যুর হার ভয়াবহ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

এক কথায় আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত গ্রাম ও স্ব-ভূমিতে ফিরিয়া যাওয়া।

(২০শে অক্টোবর করাচীতে নিখিলভারত প্রদর্শনীর উদ্বোধনে আচার্য্যের অভিভাষণের মর্ম্মানুবাদ।)

অস্তবেলার আলো

গল্প

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী এম্-এ, ডি-লিট্

লোকে তাকে বলে—"নেড়ির মা।"

নেড়ি ওকে ছেড়ে অজানা লোকে চলে গেছে অনেকদিন আগে, ওর মাঝে তবু নিজের নামটাকে সে বাঁচিয়ে রেখে গেছে।

নেড়ির মা অন্ধ—অনেকদিন থেকেই সে দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছে। আট নয় বছরের একটা ছেলে ওর হাত ধরে দুয়ারে দুয়ারে নিয়ে বেড়ায়। ওকে ডাকে দাদী ব'লে।

আসলে কিন্তু ছেলেটা ওর কেউ নয়।

ওদের পাড়ার সন্ন্যাসীচরণের মেয়ে ফুলি তের বছর বয়সে বিধবা হয়ে বাপের বাড়ী ফিরে আসে। সমাজের মোড়লরা এসে ডেকে বলে,—সন্ন্যাসী, হরি মোড়লের ছেলে নফরার সাথে ফুলির বিয়েটা এইবার দিয়ে দে।

নফরের সঙ্গে ফুলির বিয়ে হবে এইটে ঠিক ছিল অনেকদিন আগে থেকে। দীঘির পাড়ের বটতলায় খেলতে গিয়ে নফরকে দেখলেই ফুলি একছুটে দৌড়ে পালাতো। খেলার সাথীরা চেঁচিয়ে বলতো,—"ও ফুলি পালাদনে, তোর বর যে তোকে দেখতে এয়েছে।" লজ্জায় মুখ লাল করে নফরও সেখান থেকে সরে পড়তো।

শেষটায় কিন্তু খালধারের একটা জমি নিয়ে হরি মোড়লের সাথে সন্ন্যাসীর ভারী বিবাদ লেগে গেল। মেয়ের বিয়ে সে ওখানে না দিয়ে কামারগাঁতির নীলু সর্দারের ছেলের সাথে দিলে। বছর খানেক বাদে ফুলি যখন বিধবা হয়ে বাপের ঘরে ফিরে এল, সমাজপতিরা এসে সন্ন্যাসীকে ধরে বসলো,—বিধাতার নির্বন্ধ নফরই যে ফুলির সত্যিকার বর। যা হবার তাত হলো; যা শত্রুতা বিবাদ, হরির সঙ্গে চলে গেছে। এইবার নফরার সাথে ফুলির বিয়েটা দিয়ে দে। ওরা সুখে ঘর-সংসার করুক।

ওদের সমাজে ওরকম খুবই চলে।

সন্ন্যাসী কিন্তু সমাজপতিদের কথার কোন জবাব দেয় না। শেষটায় পীড়াপীড়ি করায় বলে,—মেয়ের বিয়ে আমি আর দেব না। মেয়ে আমার ঘরেই থাকবে।

কেউ কেউ ঠাট্টা ক'রে বলে,—কেন রে! বামুন-পাড়ার কাছে বাস করিস্ বলে তুইও কি বামুন হয়ে উঠ্‌লি নাকি? এর ফল কি ভাল হবে বলে মনে করিস্?

সমাজপতিদের কথা ফ'লে যায়। ফল সত্যি সত্যিই ভাল হয় না।

বছরখানেক সুখে দুঃখে কেটে যায়। ফুলির দিকে চেয়ে তার মা-বাপের মাথায় শেষে একদিন আকাশ ভেঙে পড়ে। এত বড় শত্রুতা সাধলে কে? সন্দেহটা অবশ্য নফরের উপরই গিয়ে পড়ে। ফুলিকে জিজ্ঞাসা করতে সে কোন উত্তর দ্যায় না। মাথা নীচু করে চুপচাপ বসে থাকে।

অনেক ভেবে চিন্তে সন্ন্যাসী শেষে ডোমপাড়ার সাধু ডোমের মাকে আনতে যায়। এসব বিষয়ে তার অষুধ একেবারে অব্যর্থ।

বাড়ী ফিরে এসে যা দেখে, তাতে সন্ন্যাসীর চোখের তারা একেবারে মাথায় উঠে যায়। এরই মধ্যে তার হিতৈষীদের কেউ থানায় গিয়ে খবর দিয়ে এসেছে। স্বয়ং ছোট দারোগাবাবু সশরীরে হাজির!

সন্ন্যাসীকে দেখে তার মুখের উপর একটা নিষ্ঠুর হাসির রেখা ফুটে উঠে। সে শুধু বলে,—খুব হুঁসিয়ার! এর আইন কিন্তু ঠিক খুনের আইনের মত কড়া।

দুঃখ সাগর মন্থন করে ফুলির কোলে যে আসে, সে ওই নেড়ির মার "বাহন"—'কুড়োন'। ওকে প্রসব করবার পর বাপের ঘরে আর তার জায়গা হয় না। এক হতভাগিনী এসে আর এক দুঃখিনীর কুঁড়েয় আশ্রয় নেয়।

নেড়ির মা ওকে অভয় দেয়,—ভয় কি ফুলি? আমি দীনদুঃখী মানুষ, আমার ত আর সমাজের ভয় নেই, থাক্ তুই আমার এখানে।

ফুলির কথা ফুটে না, চোখ ছুটী শুধু জলে পুরে উঠে।

বাঁশের লাঠিখানা নিয়ে ঠক্ ঠক্ শব্দ করতে করতে নেড়িরমা গিয়ে চাটুয্যে বাড়ী হাঁক দেয়,—"কইগো! ছোট ঠাকুরাণ, আজ আর ধান ভানতে হবে না?"

চাল ঝেড়ে ধামায় তুলতে তুলতে ছোট বউ বলে,—"ফুলিকে বুঝি তোর বাড়ীতে ঠাঁই দিলি নেড়িরমা? তুইত বাপু নিজেই খেতে পাসনে, তাকে আবার খাওয়াবি কোত্থেকে?"

জিভ কামড়ে নেড়ির মা বলে,—"অমন কথা বলো না বউ ঠাকুরাণ। কে আবার কাকে খাওয়াতে পারে! জীব দিয়েছেন যিনি, আহারও দিবেন তিনি।

আহারের যোগাড় সে এইভাবেই করে।

ফুলি ঘাটে পথে যায়, বুড়ী তখন ছেলেটাকে কোলে নিয়ে সোহাগ করে,—"অ আমার কুড়োনে সোণা! অ আমার দাছ! তুই হাঁটতে শিখলে তোকে কোমরপাটা গড়িয়ে দোব, পায়ে মল দোব",—এমনই সব কত কী!

ফুলি এসে দেখে শুধু একটা নিঃশ্বাস ছাড়ে—যেন একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস।

এক এক সময় বুড়ী ফুলির মাথায় ও মুখে হাত বুলায় আর বলে,—তুই বড় কাহিল হয়ে পড়েছিস ফুলি! আহা সোমত্ত মেয়ে, ছুটী পেট পুরে খেতেও ত পাসনে বাছা!

ফুলি প্রতিবাদ করে উঠে,—না, না, রোগা কেন হব বুড়ো মা! আমি ত বেশ ভালই আছি।

যে চিন্তারোগ ওর দেহে ও মনে প্রবেশ করেছে, সে যে ওকে তিলে তিলে ক্ষয় করে আনছে—সে খবর ত আর বুড়ী জানে না।

ফুলি বেশ বুঝে যে যাবার দিন তার ঘনিয়ে এসেছে। যে মাটীর ধরণী একদিন ওর কাছে এত ভাল লেগেছিল, সে আজ শুধু বিষে ভরা। নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে তার দেহের মধ্যে শুধু বিষই প্রবেশ করছে!

ছেলেটার কথা ভাবতে বড় কষ্ট হয়!

না ডাকতে যে আপনি এসেছে, সে হয় ত একদিন কারও ডাকবার অপেক্ষা না রেখে নিজেই চলে যাবে!

মায়ের মন! তবু ভাবে, বুড়ো মা ওকে মানুষ করতে পারবে। ওর বুড়ো মা নিজেই যে কত অসহায় তা ও ভাবতেও পারে না।

সংসার ওকে একদিন বর্জ্জন করেছিল, ও তাই হয়ত অভিমানেই সংসার ছেড়ে চলে যায়!

নেড়ির মা বসে পোড়া অদৃষ্টের কথা ভাবে,—হায়রে যে নিজের বোঝা নিজে বইতে পারে না, তার ঘাড়ে আবার পরের বোঝা চাপে!

বোঝা কিন্তু শেষটায় আর পরের থাকে না, নিজেরই হয়ে পড়ে।

মা-হারা শিশুকে বুকের মধ্যে চেপে ধরে ও প্রার্থনা জানায়,—তুঃখিনীর ধনকে বাঁচিয়ে রেখো ঠাকুর!

এবার আর একা নয়।

ছুধের শিশুকে বুকে আঁকড়ে ধরে পা টিপে টিপে টিপে গৃহস্থ বাড়ী গিয়ে বুড়ী ভিক্ষা চায়,—অন্ধকে দয়া কর মা! কাঙালের ধনকে একটু ছুধ দিয়ে বাঁচাও!

সে তুঃখের ডাক মায়ের বুকে সাড়া জাগায়। মা বলেন,—কিসে ছুধ নিবি নেড়ির মা! এই নে ধর।

মলিন বসনের অন্তরাল হতে একটী পুরাণো এনামেলের বাটী বের করে নেড়ির মা বলে,—এই যে, এতেই দাও বৌমা! কোলের ছেলে তোমার চিরজীবি হয়ে বেঁচে থাকুক মা! ধনে পুত্রে লক্ষ্মী লাভ হোক্।

এই ভাবে দশ তুয়ারে কুড়িয়ে সে তার কুড়োনেকে মানুষ করে।

একদিন যার বাঁচবার কোন আশাই ছিল না, সেও বাঁচে, বড় হয়।

চাষার ঘরের ছেলে, ছয় সাত বছর হলেই ত কত ছোট-খাট কাজ করতে পারে।

সমবয়সী খেলার সাথীদের মধ্যে ঝড়ো, কেষ্টো, মানকে, ধোনা,—এদের কেউ থাকে চাটুয্যে বাড়ী, কেউ বোসেদের গরু চরায়, কেউ কেউ আবার মাথায় করে মাঠে গিয়ে কৃষাণদের ভাত দিয়ে আসে।

বুড়ীর হাত ধরে তুয়ারে তুয়ারে ঘুরতে কুড়োনের আর ভাল লাগে না। বাপরে! বুড়ীটা না ধরলে, মোটেই চলতে পারে না। তার মন চায় মাঠে গিয়ে [illegible]

সাথে ছুটোছুটি করতে, পোড়ো ভিটের ভাটিবনে লুকোচুরি খেলতে।

রাত্রে নেড়ির মার কোল ঘেঁসে শুয়ে সে বলে,—ভিক্ষে করতে তোর সাথে আমি আর যেতে পারবো না দাদী! আমি পটলবাবুদের গোরু দুটো চরাব।

মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলে,—আর একটু বড় হ' দাদু, গরু চরাস্। এখনও যে তুই বড্ড ছোট।

কুড়োনে ভাবে, কেন? মাথায় সেত ঝড়ু বা মানুকের চেয়ে ছোট নয়, তবু দাদী আরও বড় হওয়ার কথা বলে কেন? কি করে তাড়াতাড়ি বড় হওয়া যায় তাই ভাবতে ভাবতে কখন সে ঘুমিয়ে পড়ে।

নিজের গায়ের এক দিকটা খালি করে বুড়ী ময়লা ছেঁড়া কাঁথাখানি তার গায়ের উপর টেনে দেয়।

শিশুর মনের যে চিরকেলে দুরন্তপনা সে শুধু কথায় বাগ মানতে চায় না।

বুড়ী এখন আর কুড়োনের সঙ্গে পেরে উঠে না। ফাঁক পেলেই সে ছুটে গিয়ে ছেলেদের দলে মেশে।

আসতে তার একটু দেরী হলে বুড়ী লাঠি ভর দিয়ে বটতলায় গিয়ে হাজির হয় আর ডাকতে থাকে,—কুড়োনে আছিস এখানে! অ কুড়োনে!

এক একটা দুষ্ট ছেলে কুড়োনের গলার মত স্বর করে বলে,—আছি।

বুড়ী সে চালাকি ধরতে পারে। একটুখানি ম্লান হাসি হেসে বলে,—ঠাট্টা করিস্ কেন দাদারা? আমি কাণা মানুষ; কুড়োনেকে একটু ডেকে দে।

কুড়োনে নিজেই এসে বলে,—এই যে আমি। চল্ দাদী ঘরে যাই।

দৃষ্টিহীনার অন্ধনয়ন দুটী এমনি করে একটী অনাথ ছেলেকে দিনরাত পাহারা দ্যায়।

গ্রামের নিষ্কর্মা যুবকরা মিলে একটা যাত্রার দল গড়ে তুলে। গাঙ্গুলীদের হরিনাথ তার ম্যানেজার।

গুটিকয়েক গাইয়ে ছোকরা চাই—নইলে সখীর ব্যাচ ভাল জমবে না।

হরিনাথ খুঁজে বেড়ায় কার গলার স্বর মিঠে, হঠাৎ কুড়োনেকে সে আবিষ্কার করে ফেলে।

খাসা ছেলেটি, গলাটীও নেহাৎ মন্দ নয়। গানের মাষ্টার নিতাই বাগদী মত দ্যায়, শিখিয়ে নিলে আসরে কাজ করবে ভাল।

হরিনাথ নেড়ির মার কুঁড়েয় গিয়ে উপস্থিত হয়। বুড়ীকে বুঝিয়ে বলে,—ছেলেটা এতে থাকবে ভাল, ভদ্রলোকদের সাথে মিলে মিশে ওর দিন ফিরে যাবে।

নেড়ির মা বলে,—অতটুকু ছেলে, ও কি রাত জেগে গান করতে পারবে দাদাঠাকুর! সাঁজ না হতেই যে ওর ঘুম পায়। ওকে ছেড়ে আমিই বা থাকবো কি করে?

হরিনাথ বুঝায়—ভেবে দেখত তোমার আর কদিন নেড়ির মা? এখন থেকে একটা হিল্লে না ধরলে ও দাঁড়াবে কোথায়? গরু চরানোর চেয়ে এ কাজটা কি কিছু মন্দ? কত বামুন কায়েতের ছেলে করছে, আর ও পারবে না? তুমি আপত্তি করে ওর আখেরটা মাটী করে দিও না। এ কাজে নামও যেমন, পয়সাও তেমনি আছে। কালই আমরা ওকে নতুন জামা-কাপড় কিনে দিচ্ছি।

রাত্রিবেলায় কুড়োনেকে বুকে টেনে নিয়ে নেড়ির মা জিজ্ঞাসা করে—তুই বাবুদের যাত্রারদলে যাবি কুড়োনে?

যাত্রার দলের চকচকে পোষাক তখনও কুড়োনের মনে স্বপ্নের জাল বুনছে! বুড়ীর কথার উত্তরে সে শুধু জানায় যাত্রার দলে যেতে তার আপত্তি নেই।

—ওরা হয়ত বিদেশে বায়না গাইতে যাবে। আমার জন্যে তোর মন কেমন করবে না?

—মন কেমন করলে তখনই এক ছুটে তোর কাছে চলে আসবো।

কুড়োনে ঘুমিয়ে পড়বার পর বুড়ী ভাবে, হরিনাথ ঠিক কথাই বলেছে—সে আর কয় দিন! তার চেয়ে কুড়োনে যদি এখন থেকেই একটা আশ্রয় পায়, সেই ভাল!

পরদিন হরিনাথ আসতেই নেড়ির মা বলে,—দাদাঠাকুর অন্ধের নড়ি তোমার হাতে দিলাম। যেখানেই নিয়ে যাও, আমার শেষ সময়টায় দাদুকে যেন একবার দেখতে পাই।

সেইদিন থেকেই কুড়োনে যাত্রার দলে গিয়ে মহলা দিতে সুরু করে।

আজকাল ঘরে ফিরতে তার একটু রাত হয়। গাঙ্গুলী

বাড়ীর চাকর ল্যাপ্‌লা আলো নিয়ে তাকে এগিয়ে দিয়ে যায়।

উঠানে পা দিয়েই সে ডাকে,—দাদী!

ঘর থেকে সাড়া আসে,—আয় আমি জেগে আছি।

এক এক দিন সে ম্যানেজার বাবুর বাড়ী থেকে খেয়ে আসে। কত ভাল ভাল জিনিষ বাবুরা তাকে খেতে ছায় সে গল্প শুনে বুড়ীর চোখে জল আসে। কুড়োনের মুখ-খানাকে বুকের মাঝে চেপে ধরে সে বলে,—ওরা তোকে খুব ভালবাসে, না কুড়োনে?

সে উত্তর ছায়—হুঁ।

তার পর ধীরে ধীরে বলে,—তুমি কিন্তু ও ব'লে আর আমাকে ডেকোনা দাদী! বাবুরা বলে, ও নামটা ভারী বিশ্রী! তারা আমার নাম রেখেছে,—মাখন।

বুড়ীর মুখে হাসি ফুটে উঠে—অতি দুঃখের হাসি।

ও যে তার কত কষ্টের ধন তাত আর বাবুরা জানেনা। দীন-দুঃখীর দেওয়া নামটা বাবুদের পছন্দ হবে কেন?

সেদিন একটু সকাল সকাল কুড়োনে ঘরে ফিরে। লাফাতে লাফাতে বুড়ীর কাছে গিয়ে বলে,—দাদী তোর জন্যে একটা জিনিষ এনেছি।

বুড়ী জিজ্ঞাসা করে—কি এনেছিস দাদু?

—তা বলবো না। তুই হাঁ কর, আমি মুখে পুরে দি।

এক রকম জোর করে সে বুড়ীর মুখে পুরে ছায়—একটা সন্দেশ।

বুড়ী বলে,—সন্দেশ কোথায় পেলি দাদু, বাবুরা দিয়েছে বুঝি?

—না গো না; কাল পালেদের ঠাকুর বাড়ী আমাদের গান হ'লো না? আমার গান শুনে মতিবাবু একটা টাকা বথ্‌শিশ্‌ দিয়েছে—তাই থেকে তোর জন্য কিনে এনেছি! ভাল সন্দেশ নয় দাদী?

বছর কয়েক আগে চাটুয্যে বাড়ীর ন' কর্তার নাতির অন্নপ্রাশনে খুব ধূম ধাম হয়। দীন দুঃখীরাও পেট পূরে সন্দেশ রসগোল্লা খেতে পায়। সে সন্দেশের কথা বুড়ীর এখনও বেশ মনে আছে। কুড়োনের এ সন্দেশ যেন তার চাইতেও মিষ্টি!

—সেই গানটা শুনবি দাদু বলেই কুড়োনে সুর ধরে,—

"আয় মা চলে আয়, হেথায় আর থাকিস্‌ নে।
হরি বলে বেরিয়ে পড়ি, আর বিলম্ব করিস্‌ নে।"

—বালকের কোমল কণ্ঠের করুণ সুর আকাশে বাতাসে করুণার ফোয়ারা ছুটিয়ে ছায়!

বুড়ীর চোখ সজল হয়ে উঠে। ফুলির কথা মনে পড়ে, হায় হতভাগিনি! যদি দেখে যেতেও পারতিস্‌!

শোলাদানার বারোয়ারিতে গাইবার জন্য হরিনাথদের দলের বায়না হয়। এইবার বিদেশ যেতে হবে।

নেড়ির মার কাণে কথাটা যেতে মনটা তার পাগল হয়ে উঠে। কুড়োনেকে ছেড়ে সে কেমন করে থাকবে!

কুড়োনেকে সাথে নিয়ে হরিনাথ নিজেই আবার আসে। বুড়ীকে বলে,—আমাদের ন্যাপলার কাছে পাঁচটা টাকা রেখে গেলুম, তোমার যখন যা দরকার হয় ওকে বললেই ও এনে দেবে। মাখনের জন্যে তুমি ভেবো না। দুচারটা বায়না গেয়েই আমরা দেশে ফিরবো।

যাবার আগে বুড়ী কুড়োনেকে বুকে জড়িয়ে ধরে। তার অন্ধ চোখ দুটী দিয়ে টস্‌ টস্‌ করে জল ঝরে পড়ে।

বুড়ীর বুকের মধ্যে টিপ্‌ টিপ্‌ শব্দ শুনে কুড়োনের কেমন ভয় করে। নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে সে আস্তে আস্তে হরিনাথের অনুসরণ করে। আর একবার বুড়ীর চোখে জগতের আলো নিভে যায়!

... ...

শোলাদানার বারোয়ারিতে গান করে হরিনাথদের দলের খুব নাম পড়ে যায়। চারিদিক্‌ থেকেই বায়না আসতে সুরু করে।

সুরখালির বাজারে এসে এবার তারা আস্তানা গাড়ে। ক্রমাগত আমোদ-প্রমোদের মাঝ থেকে নেড়ির মার কথা ভাববার অবকাশ কুড়োনে বড় একটা পায় না। শুধু যেদিন গান না থাকে, সেই দিনই [illegible] দাদীর কথা ভেবে মনটা তার কেঁদে উঠে। [illegible] ছেলেরা দেখতে পেলে ঠাট্টা করবে বলে, সে [illegible] চোখের জল মুছে ফেলে। চাঁদপুরের [illegible] একখানা মেডেল পেয়েছে—তার দাদী [illegible]

হবে! ঝড়, কেষ্ট, মানকে, খেনো, এরা সবাই হয়ত তাকে এবার কত সমীহ করে চলবে!

হঠাৎ একদিন দলের লোকেরা পালাতে সুরু করে। সুরখালির বাজারে কলেরা সংহার মূর্ত্তি নিয়ে দেখা ছায়!

হরিনাথ দলের ম্যানেজার। কুণ্ডুদের বাড়ীতে সেদিন গান হয়ে গেছে। পোষাকের বাক্সগুলো সব সেখানে পড়ে আছে। সেগুলো না নিয়ে যায় কি করে।

তার সঙ্গে আছে শুধু কুড়োনের মত দু'তিনটে ছেলে, নিজের লোক কেউ সঙ্গে না থাকায় পালাতে পারে নি।

যে ভয় হরিনাথের মধ্যে উঁকি দিয়ে যায়, সে শেষে দেখা ছায় রূপ ধরে।

কাল রাত থেকে কুড়োনের কলেরা হয়েছে।

হরিনাথের মুখ শুকিয়ে উঠে। সে মনে মনে কেবলই ডাকে,—ভগবান! মুখ রেখো। কাঙালের ধন যেন ভালয় ভালয় কাঙালের হাতে পৌঁছে দিতে পারি।

একটাকা ভিজিটের ডাক্তারকে দশ টাকা দিয়ে সে কাছে বসিয়ে রাখে। ডাক্তার তার জানা, না-জানা সকল বিদ্যা শেষ করে। কিছুতেই কিছু হয় না। গম্ভীরভাবে হরিনাথের মুখের দিকে চেয়ে সে বলে,—কি করবো মশাই! এ রিয়েল এশিয়াটিক।

যন্ত্রণায় কুড়োনে মুখ বিকৃত করে। মাঝে মাঝে বলে উঠে, দাদী! দাদীরে!

হরিনাথের চোখ দিয়ে টস্ টস্ করে জল ঝরতে থাকে। অনেক টাকার লোভ দেখিয়ে সে বাজারের একটা লোককে একখানা চিঠি দিয়ে তাদের বাড়ী পাঠিয়ে দ্যায়। ন্যাপলা যেন নেড়ির মাকে নিয়ে রওনা হয়।

খাল নালার মাঝ দিয়ে ছুটো লগির জোরে হোগলা বনের গা ঘেঁসে শির শির শব্দ করতে করতে ডিঙি নৌকা ছুটে। পথ তবু শেষ হয় না।

নেড়ির মা বলে,—আমার দাদু বেঁচে আছে ত ন্যাপলা? সুরখালির সে মানুষটা কি বলে গেল? ওরে, আমার মন যে কিছুতেই বুঝতে চাচ্ছে না।

ন্যাপলা ধমকে উঠে,—ও রকম করে অমঙ্গল ডেকে এনো না নেড়ির মা, ভগবানকে ডাক, তিনি তোমার কুড়োনেকে ভাল করে দেবে না।

চোখের জল মুছে বুড়ী কাঠের মত চুপ করে বসে থাকে।

সন্ধ্যার মুখোমুখি নৌকা গিয়ে সুরখালির ঘাটে পৌঁছে। চারিদিকেই একটা নিস্তব্ধ ভাব।

বুড়ীর হাত ধরে ন্যাপলা গিয়ে হরিনাথের বাসায় পৌঁছায়।

ঘরের দুয়ার খোলা। একধারে একটা কেরোসিনের ডিপা মিটিমিটি জ্বলছে।

হরিনাথের চোখে মুখে জলের শুকনো দাগ দেখে ন্যাপলার প্রাণ উড়ে যায়। সে চুপ করে থমকে দাঁড়ায়।

নেড়ির মা বলে উঠে,—তুই থামলি কেন ন্যাপলা? এই কি দাদা ঠাকুরের বাসা নাকি? কই গো দাদা ঠাকুর! আমার দাদু কই?

আস্তে আস্তে তার হাত ধরে নিয়ে হরিনাথ তাকে বিছানার পাশে বসিয়ে ছায়।

কুড়োনের মুখের উপর হাত পড়তে বুড়ী চমকে উঠে। ভয়ে ভয়ে সে তার বুকের উপর হাত দিয়ে কী যেন দেখতে চায়! তারপরেই চেঁচিয়ে উঠে,—দাদাঠাকুর! আমার দাদুর সমস্ত গা এত ঠাণ্ডা কেন! হাত পা এত শক্ত কেন? তা হলে কি দাদু আমার—

কথাটা সে শেষ করতে পারে না। উত্তরের আশায় দুটী অন্ধ চোখ তুলে অনুমানে হরিনাথের মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

হরিনাথ দেখে, বুড়ীর মুখে এক অস্বাভাবিক ভাব। তার দেহের সমস্ত শক্তি যেন তার অন্ধ চোখ দুটীর মাঝ দিয়ে ফুটে বেরুতে চাইছে!

চোরের মত পা টিপে টিপে সে ঘরের বাইরে এসে কোঁচার খুঁট দিয়ে চোখ মুছতে থাকে!

ঘরের কাণাচে কাঁঠালগাছে কতকগুলো পেঁচা শুধু বিকট শব্দ করে উঠে!

একটা দমকা হাওয়া এসে হরিনাথের চোখে মুখে আগুনের জ্বালা মাখিয়ে দিয়ে যায়।

ছিন্ন-বীণা

শ্রীস—

এই জীবনের প্রদীপ শিক্ষা নিভিয়ে দেবার ক্ষণিক আগে,
জ্বাললো সাকির সুরার স্বপন ওমর কবির অমর বাগে ;
সেই নিরালা কানন বীথির মৃদুল হাওয়ার লাগ্‌লো সাড়া,
মৃত্যু পেলো জীবন পরশ ঘুমিয়ে পোলো সকল কাড়া।

২

কোন্ তরুণী হৃদয় সুধা সম্মুখে মোর ধ'রলো তুলে,
অমৃত তার প্রেমের পরশ এই জীবনের বোধির মূলে ;
মিথ্যা হ'লো ঘোর নিরাশা তলিয়ে যাওয়া অগাধ জলে,
মিথ্যা হ'লো মরার বেদন মরুস্থানের ছায়ার তলে।

৩

আজ্‌কে তোমায় প্রণাম করি, সত্য হ'লো সোণার স্বপন,
সত্য তোমার পায়ের তলায় রাখ্‌তে আমার প্রাণের গোপন
ওই রঙেতে ডুব দিয়ে হায় আজ্‌কে আমি দেখ্‌ছি আলো,
প্রণাম তোমায় অমর কবি জ্ঞানের প্রদীপ হিয়ায় জ্বালো।

৪

মৃত্যুটা আর ভাগ্য লিখন ঐখানে গেলে সত্য কবি,
আজ জীবনে তোমার মরার পাচ্ছি যেন অমর ছবি,
স্বপ্ন নিয়ে ঘুমিয়ে প'ড়ে সত্য পরশ উঠলো জেগে,
সকল ত্যাগের আশীর্ব্বাদের প্রসাদ তোমার মাথায় লেগে।

৫

খর্জ্জুরে আর আঙুর রসের মৌতাতে প্রাণ যাচ্ছে নেমে,
ওই জীবনের চূর্ণ করা পূর্ণ করা সকল প্রেমে ;
ওই প্রদীপের দীপ্ত শিখায় আজকে আমার পরাণ জ্বলে,
তোমার স্বপন ফুটছে কবি এই হৃদয়ের পদ্মদলে।

৬

হারিয়ে যাওয়া পান্থশালার দিগ্বিদিকে পাই নিশানা,
সাগর আমায় বাঁচতে হোলো, সুখের স্বপন নয় মিছা না ;
মনের আমার ভাস্‌ছে বুকে হিম্ অচলের উর্ম্মি নিয়ে,
হ'চ্ছে খুসী ডুবিয়ে দেবো, ডুবিয়ে দেবো সবার হিয়ে।

৭

কোন্ বসোরার যোলাপ গোলা আঙুর নধর দুই গালেতে,
জুঁই ফুলী প্রেম ঘুম্ দিয়ে যায় পিচ্‌কারী কার রঙ ঢালে সে,
কোন্ ফাগুনের ফাগ মেশানো দোলন দিনে ঝুলন মিলায়
আজ পরাণের অন্তঃপুরে হাস্ত জাগার লাস্ত লীলায়।

৮

অবুঝ প্রাণের সবুজ দোলায় তরুণ আশার ফুট্‌লো কুঁড়ি,
পেয়ালা সাকি দাওনা সুধার আমার হিয়ার সাগর জুড়ি ;
জগৎটাকে ভাসিয়ে দেবো আনন্দেরি বন্যাবুকে,
দুঃখভরা দুর্গতদের শোকের আগুন নিভিয়ে সুখে।

৯

কোন্ দুরাশারপ্রাচীন ভেঙ্গে আজ্‌কে আমায় আস্‌তে হোবে
কোন্ পূরবীর পুলক রাগে সঙ্গিনী মোর শিহর তোলো,
ভাব্‌ছো কি আর প্রশ্ন সখি, এগিয়ে এসে ঝাঁপিয়ে পরো
প্রিয়ের পরশ লও জীবনে, প্রিয়ার মধুর স্বপ্ন গড়ো।

১০

অন্তরে ঐ চঞ্চলবায় দেহ লতায় দোদুল ব্যথা
আর কেন গো রাখছো সখি, লুকিয়ে প্রাণে করুণ কথা
বলেই ফেলো ভয় কি তোমার জীবন কারো নয়কো কেনা
আস্‌মানি ঐ স্বপ্ন নিয়ে কেন বাড়াও দুখের দেনা।

১১

তৃষ্ণাকাতর সঙ্গিনী মোর, মরুপথের স্বপ্ন শোনো,
সে যেন গো আমার মত সর্ব্বহারা বিষাদ কোনও ;
ঘুমিয়ে আছ অন্ধকারে গোপন ঘরে শার্শি ঢাকা,
রঙ্ মাখানো অনুরাগের টিপটি তাহার পার্শ্বে আঁকা!

১২

লুকিয়ে থাকা আর সহেনা জ্যোৎস্না উজল কমল মুখে,
দূরবীণে আর চাঁদ চাহি না চাঁদ চাহি এই রিক্ত বুকে ;
গল্প তোমায় বল্‌বো কত সঙ্গেনী মোর প্রশ্ন শোনো,
আমার মত কে গো তোমার ভালোবাসার আপন জনও।

১৩

কাঞ্চনে আর সুখ নাহি মোর সুখ আছে মোর দুখের পাতায়
সুখ আছে মোর সঙ্গিনী তোর লুকিয়ে রাখা প্রেমের গাঁথায়
ওষ্ঠে আমার পরশ লাগুক তোর পেয়ালায় চুমুক সাড়া
ঠুহুক্ক ক'রে লাগুক্ বুকে ঠোঁট নামানো তৃষ্ণা [illegible]।

১৪

আয়না সাকি, পিয়াস মেটা লাল গেলাসের [illegible]
এই জীবনের স্বপ্ন খিফল ধুইয়ে দে সব [illegible] ;
কোনখানে কার শেষ হবে বেশ [illegible]
প্রাণ তরীতে ভয়ের তুফান, [illegible]।

আড়াই দিনের কাহিনী

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ দাস

দেশ ঘোরবার নেশা অতি ছোটবেলা থেকেই উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলুম, তাই আমাকে বাংলা ছেড়ে দিল্লীতে আস্তানা নিতে হয়েছে কতকটা সেই নেশারই মাত্রাধিক্যে। জন্মাষ্টমী আসতেই শ্রী ব্রজের দিকে পাড়ি দেওয়ার কথার বন্ধুদের সাথে জল্পনা করতে লাগলুম।

ঠিক হ'লো, আঠারই ভাদ্র (১৩৩৮ সাল) শুক্রবারের রাত্রের গাড়ীতে প্রথমেই আগ্রায় যেতে হবে। সেখানে একদিন থেকে পরের দিন মথুরা ও বৃন্দাবনের দিকে যেতে হবে।...আয়োজন পূর্ণোদ্যমে চল্‌তে লাগলো। নির্দ্দিষ্ট দিনের সকাল থেকেই বৃষ্টি সুরু হয়ে গেলা। ভাবলুম, ভাদুরে বৃষ্টি, ঘাবড়াবার কিছু নেই, এখনই আবার সূর্য্যের হাসিমুখ দেখতে পাবো। কিন্তু দেখতে দেখতে ভাদরের শেষ বেলাটুকুনও শেষ হয়ে এলো, তবু বৃষ্টি দেবতার শান্ত হওয়ার কোন লক্ষণই দেখা গেল না। এদিকে আমরাও সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়লুম, কারণ সন্ধ্যের কিছু পরেই (রাত ৯টায়) আমাদের ট্রেণ। বাহিরে কিন্তু সন্ধ্যের বাতি জ্বালা শেষ হয়ে গেছে। কাজেই 'বৃষ্টি-থামার' আশা ছেড়ে দিয়ে যাত্রার জন্য তৈরী হতে লাগলুম। আটটা বাজতেই আমরা চার বন্ধু "শ্রীদুর্গা" বলে দিল্লী ষ্টেশনের অভিমুখে রওনা হলুম।

গাড়ীতে পা দিতেই আমাদের যাত্রা শুভ বলে মনে হলো, অর্থাৎ গাড়ীখানা প্রায় খালিই পেলুম। দু'খানা তাকে ও দু'খানা বেঞ্চে আমাদের আপন আপন মৌরসী স্থান চিহ্নিত করে এক জায়গায় এসে বসা গেল, ১৫।২০ মিনিট বাদেই গাড়ী ছাড়বে। এক ঝলক স্বস্তির নিশ্বাস বেরিয়ে এলো, এতক্ষণে সবাই ধাতস্থ হলুম।

কিছুক্ষণ বাদে বাহিরে [illegible] বাজলো। গাড়ীও হেল্‌তে দুল্‌তে চল্‌তে সুরু করে দিলে। [illegible] উৎকণ্ঠা [illegible] আমাদের [illegible] হয়ে এলো, এ কথা, সে কথা অনেক কথাই আরম্ভ করা গেলো কিন্তু কোনটাই জমান গেলো না, শেষে জানলায় মুখ বাড়িয়ে ঘর-বাড়ী আর গাছ-পালা আমাদের সাথে পাল্লা দিয়ে ছুটবার ব্যর্থ চেষ্টা দেখতে লাগলুম। ষ্টেশনের পর ষ্টেশন পেছনে রেখে গাড়ী সেই গাঢ় আঁধারের বুক চিরে হুস্ হুস্ করে ছুটে চলেছে।
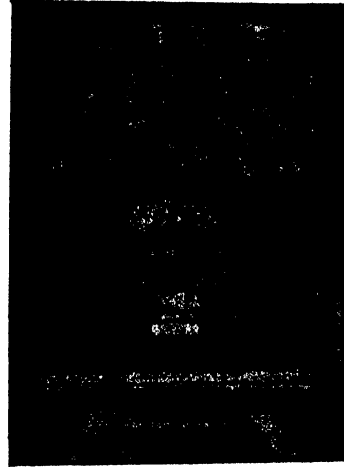
আর বসা চলে না। গাড়ীর মৃদু ঝাঁকুনিতে চোখের পাতায় ঘুম জড়িয়ে আসতে লাগলো। উঠতে হলো, ক্লান্ত শরীর ও ক্লান্ত মন নিয়ে বিছানায় আশ্রয় নিলুম।

"চা গরম", "গরম চা," "মথুরাজীকা পেঁড়া" প্রভৃতি রূপ উৎকট চীৎকার ঘুমের সুখ কেটে গেলো। বুঝলুম গাড়ী মথুরা ষ্টেশনে এসেছে। উঠে পড়লুম;...মথুরাজীকার পেঁড়ার নাম শুনে সেই শেষ রাতেও লোভ সামলাতে পারলুম না;...নেওয়া গেলো। কিন্তু মুখে দিয়েই [illegible] 'বাপস্' লোভ সাম্‌লে নিতে হলো। পেঁড়া [illegible]

যেন চিনির ঢেলা। অন্ততঃ ষ্টেশনের এই উৎকৃষ্ট পেঁড়ার পক্ষে এই কথা বললে, একটুও সত্যের অপলাপ করার ভয় থাকে না।

গাড়ীর বাঁশী বাজলো। আবার সেই ছোটবার পালা। শুনলুম এখনও নাকি ৩।৪ ঘণ্টা সময় লাগবে আগ্রায় পৌছিতে। আকাশের অবস্থা এখন খুবই ভাল; এক ফোঁটা কালো ছায়াও আর নেই,...যাকে বলে সু-নির্ম্মল, জানালায় মাথা রেখে বাহিরে নীল আকাশের গায়ে তারার খেলা দেখতে দেখতে চোখের পাতায় আবার 'ঢুল' ধরে আসতে লাগলো। কাজেই ফিরে 'শুভুম' করাই সমীচীন মনে করলুম। যখন ঘুম ভাঙল, উঠে দেখি রাতের আঁধার প্রায় কাবার হয়ে এসেছে।
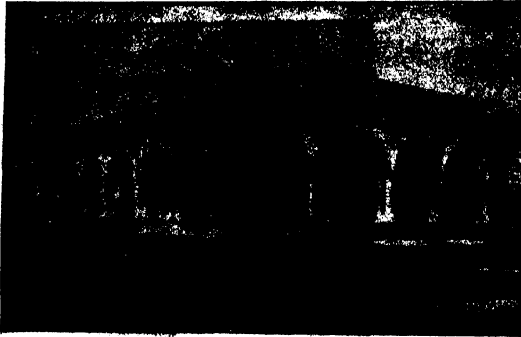
এইবারেই আগ্রার রাজাকামুণ্ডী ষ্টেশন।—আমাদের নামতে হবে, দেখতে দেখতে ট্রেণের গতি মন্দীভূত হয়ে এলো। কুলীকে দিয়ে জিনিষ পত্তর নামিয়ে নিয়ে, আমরা সবাই নেমে পড়লুম।

দিল্লী থেকেই আমরা ঠিক করেছিলুম, আগ্রায় ৺কালী বাড়ীতেই আস্তানা পাড়বো। কাজেই আর মিছে সময় নষ্ট না করে ৺কালী বাড়ীর উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লুম।

ভোরের বাতাস ঝির্ ঝির্ করে এসে ক্লান্ত দেহ মনের ওপর তার কোমল পরশ দিয়ে গেলো, এতক্ষণে যেন পূর্ণ তৃপ্তি পেলুম। মাথার ওপরে নীল আকাশের রাজ্যে তারাদের রাত জাগবার পালা তখনও শেষ হয়নি;... 'ঘুমে নয়ন আসে ছেয়ে' চোখে উষা দেবীর প্রতীক্ষায় আছে।

জীবনের পেছনে-ঠেলে-দেওয়া অনেক দিনে, ভোর বেলাকার এই রকম আলো আঁধারের মাঝখান দিয়ে প্রকৃতির বুকে ঘুরে বেড়িয়েছি কিন্তু আজকের মতন বুক-ভরা আনন্দ কোনদিন পাইনি। প্রকৃতির এই স্নিগ্ধ মূর্ত্তিটা আজ ভারী ভালো লাগলো। সকলেই অনন্যচিত্তে প্রকৃতির এই মনোরম দৃশ্য উপভোগ করতে করতে ৺কালী বাড়ীর দরজায় এসে হাজির হলুম। ভাঙ্গা দরজার শিকল (কড়া ছিল না) নাড়া দিতে দিতে সুখ নিদ্রায় ব্যাঘাত জনিত রুক্ষ কণ্ঠে সাড়া এলো—"কোন হ্যায়?" উত্তরে আমাদের অবস্থা জানিয়ে বললুম,..."শুধু একদিন থাকবার জন্য একটু জায়গা চাই। আমরা বিদেশী যাত্রী।" নেপথ্যে থেকে পূর্ব্ব কণ্ঠেই জবাব এলো—"হিঁয়া বিল্ কুল খালি নেহি হ্যায়।"

ব্যস্ এখন উপায়! এই বিদেশে আরতো কোথায়ও কিছু জানা আস্তানা নেই। শেষে আমাদের টঙ্গাওয়ালা আশ্বাস দিলে, তার একটা বাড়ী জানা আছে, সেখানে দিন পিছু কিছু ভাড়া দিলে যত দিন ইচ্ছা থাকতে পারা যায়। কি আর করা যাবে! পুনরায় টঙ্গায় উঠা গেলো, তার-ই কথিত বাড়ীর উদ্দেশ্যে।

যখন আমরা সেই বাড়ীতে এসে পৌছলুম, পূব-আকাশে তখন বেশ রং ধরে গেছে, একটু একটু করে প্রকৃতির বুকে চেতনারও সাড়া ফিরে আসতে আরম্ভ করেছে। আমরা দোতালার একখানা ঘর দখল করলুম ভাড়া দিন পিছু অর্দ্ধমুদ্রা। সবাই বললে...এই বেশ।

সংক্ষেপে প্রাতঃক্রিয়া শেষ করে প্রথমেই বেরিয়ে পড়লুম সাজাহানের সেই একনিষ্ঠ প্রেমের কীর্ত্তি তাজমহলে মাথা ছোঁয়াতে!

এখানকার টঙ্গাওয়ালাদের [illegible] দরকার। নতুন লোক দেখলে [illegible] মতন নির্মম ভাবে রক্ত চুষতে [illegible] কোট থেকে [illegible] তার-ই [illegible]

দাবী করে বসলো। পেয়ে অনেকখানি মোলায়েম বুলি খরচ করাতে আধা খরচেই দিয়ে চললো।...এই রকমই এদের স্বভাব।

এখানেও কাল সারাদিন বৃষ্টি হ'য়েছিলো। সদ্যস্নাতা তরুণীর মতই তাই আজকের সকালকে এত মধুর দেখাচ্ছিলো। আমরা ধীরে ধীরে কৌতূহল দৃষ্টিতে 'পুলকিত তনু' হয়ে, প্রেম-তীর্থের সেই বিরাট তোরণদ্বারে গিয়ে উপস্থিত হলুম, লাল পাথরের বুকে চিরে নেওয়া সেই বিরাট কারুকার্য্য পূর্ণ তোরণদ্বার, দর্শক মাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে, আমরা মুগ্ধ দৃষ্টিতে সমস্ত দেখতে দেখতে ভিতরে প্রবেশ করলুম। সামনে যে ছবি মূর্ত্তিমতী হয়ে আমাদের আজন্মের বাসনাকে চরিতার্থ করে দিলে, জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তা' বোধ করি কখন মলিন হয়ে যাবে না।

এতদিন যার কল্পনা, অতীতের দিকে ঠেলে দেওয়া দিনগুলির সাথে কতবার কতরূপে এঁকেছি, আজ সেই পুণ্য মহান—সাজাহানের প্রেমের সাক্ষী—ভারত-শিল্পের অতুলনীয় নিদর্শন, তাজমহল আমাদের চোখের সামনে। কি দেখলুম! শ্বেতপাথরে তৈরী এ যেন এক বিরাট ত্যাগের অভিব্যক্তি! কথা সাজিয়ে এর এই চির নতুন সৌন্দর্য্যের পরিচয় দেওয়া ধৃষ্টতা মাত্র,—অনুভব করতে হয়।

আমরা মোহ-মুগ্ধের মতন ভাষাহীন হ'য়ে চলতে লাগলুম, উপরে, নানাবিধ মূল্যবান পাথরে কাজ করা শ্বেতপাথরে মোড়া দু'টো কবর দেখা গেলো। গাইড বল্লে, এই দু'টোর একটাতে সাজাহানের অপরটীতে মমতাজের সমাধি আছে। আসলে কিন্তু তা' নয়। ঠিক এরই নীচের তলায় এরই মতন একটা ঘরে আসল কবর দু'টো দেখতে পাওয়া যায়। এই ঘরটী অপেক্ষাকৃত অন্ধকার। বাতি নিয়ে না গেলে ভারী অসুবিধায় পড়তে হয়। সে-কালে কিন্তু তার কোন দরকার হ'ত না, কবরের গায়ে ও কক্ষ-দেওয়ালে যে সমস্ত দীপ্তিমান মণি-মাণিক্য শোভা পেত তার আলোতেই বাহিরের সূর্য্যালোকের [illegible] [illegible] সমস্ত মণিমাণিক্য [illegible] [illegible]

প্রায় সাড়ে চারটার সময় বন্ধুদের ডাকাডাকিতে ঘুম থেকে উঠে অনেকখানি সুস্থ মনে করলুম, খানিকটা দুধ গিলে আবার বেরুবার জন্য তৈরী হতে লাগলুম।

একখানা টঙ্গা ভাড়া করা গেল। সন্ধ্যের আগেই সহরের মোটামুটি সব কিছু দেখে নিতে হবে, আমরা বেরিয়ে পড়লুম।

সন্ধ্যে হয় হয় এমন সময় যমুনার ঘাটে যাওয়া গেল, আজ জন্মাষ্টমীর স্নান যাত্রা, ঘাট থেকে ঘাটের চতুর্দ্দিক পর্য্যন্ত লোকে লোকারণ্য, আমরা অপেক্ষাকৃত এক জনবিরল ঘাটে গিয়ে যমুনার জল স্পর্শ করে খানিকটা পুণ্যি করে নিলুম। তারপর বসে বসে কচ্ছপদের খেলা দেখতে লাগলুম।

সারাদিন পরে আকাশের কোলে এখন দু'একখানা মেঘের টুক্‌রো দেখা দিতে সুরু করলে, ভাদুরে মেঘ,—বসতে সাহস হয় না, উঠে পড়লুম, আজ এখানকার মিউনিসিপ্যালিটীর হলে জননায়ক পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু বিলাতে গোল টেবিল বৈঠকে মহাত্মাজীর দাবী-দাওয়ার সম্বন্ধে বক্তৃতা করবেন, বিশে শতাব্দীর বাঙ্গালীর ছেলে—শরীরের পক্ষ থেকে যাওয়ার অনিচ্ছা জানালেও নিস্তার নেই; ভিতর থেকে ঠেলা আসে চলো।

বক্তৃতা-সভায় উপস্থিত হতে না হতে বৃষ্টি এমন জোরে এল যে সভায় সকলেই পালাতে বাধ্য হ'লেন, [illegible] [illegible] এখনও দেরী আছে। [illegible] [illegible] [illegible] আমাদিগকেও বাসামুখো হ'তে হ'লো।

এদিকে সাঁঝের আঁধারও একটু একটু করে ঘোর হয়ে আসতে লাগলো।

বাসায় ফিরে বন্ধুরা রাত্রের মতন কিছু জলযোগ করে নিলে, তারপরে সবাই তল্পী-তল্পা বাঁধতে লেগে গেলুম। এইবারে আমাদের আগ্রাকে বিদায় দিয়ে মথুরার দিকে ধাওয়া করতে হবে।

বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে ষ্টেশনে যাওয়া গেল। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের—ট্রেণ তখন চলার পথে পাড়ি দিয়েছে, দ্বিতীয় ট্রেণ, সেই রাত একটায়, আমরা বিছানা খুলে নিয়ে ষ্টেশনের দরাজ বুকে লুটিয়ে পড়লুম।

কতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলুম মনে নেই, তবে যখন মামাবাবুর (রাম প্রসাদ মিত্র) গলার আওয়াজে ঘুম ভাঙল, চেয়ে দেখি ট্রেণ প্লাটফরমে দাঁড়িয়ে হুস্ হুস্ করেছে,—আমাদের নাকি এতেই যেতে হবে।

গাড়ীতে উঠতেই ট্রেণ ছেড়ে দিলে, জানলায় মাথা রেখে আগ্রার শেষ দৃশ্য দেখে নিলুম, বাহিরের ঠাণ্ডা বাতাসে আর গাড়ীর মৃদু ঝাঁকুনিতে আবার ঘুম আসতে লাগলো, শুয়ে পড়লুম।

রাত আন্দাজ সাড়ে চারটায় মথুরা ষ্টেশনে নামলুম। বৃষ্টি এখানে এত বেগে বর্ষণ সুরু করে দিয়েছিলো যে ট্রেণ থেকে ষ্টেশনের ভিতর যেতেই একেবারে ভিজে কাকটী হয়ে গেলুম। এদিকে আবার যাত্রীদের সংখ্যাধিক্য ষ্টেশনে আজ ন স্থানং তিল ধারণং। রুমালের সাহায্যে মাথাটা একটু মুছে নিয়ে সেই ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে 'ঝিমুতে' লাগলুম। তারপর ঘণ্টাখানেক বাদে বৃষ্টির বেগ একটু ধাতস্থ হলে, টাঙ্গাওয়ালী-কথিত এক ধর্মশালার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লুম।

মথুরার সিংহদ্বার পার হয়ে সহরে ঢোকবার পথেই যে জল জমেছিল, তা'তে মনে হ'লো ছোট ছোট খোকারাত বটেই চিত্তরঞ্জন গোসাইর মত 'রাম খোকারা'ও বেশ সাঁতার খেলতে পারে, আমাদের অশ্বরাজ ভীত চিত্তে সেই 'এক গলা' জল ঠেলতে ঠেলতে চলতে লাগলো। রাত-কাবার হতে তখনও আধঘণ্টাটাক দেরী আছে, আমরা ধর্মশালায় এসে গেলুম, কিন্তু গলাকাটা চীৎকারেও একটী প্রাণের সাড়া পেলুম না, কাজেই অন্য পথ দেখতে হলো, নিকটেই "বাঙ্গালী আশ্রম" নামে একখানা যাত্রীশালা ছিলো, দৈনিক একটাকা হিসাবে একখানা ঘর (আঁতুড় ঘরের গ্রাম্য সংস্করণ বিশেষ) নিয়ে, আজকের দিনের জন্য আমাদের আস্তানা ঠিক করলুম।

এদিকে ধরায় বুকের কালো আঁধারের সাথে আকাশের কোলের সজল মেঘও একটু একটু করে ফিঁকে হয়ে আসতে লাগলো। সুবোধদা' ও আমি এই আলো-আঁধারের মাঝখানে যমুনার দৃশ্য দেখবো বলে, ঘাটের দিকে চললুম। পর পর সারি-বাঁধা ঘাট তার ওপরেই বড় বড় বাড়ী নীল আকাশের দিকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। দৃশ্য সামঞ্জস্যে অনেকখানি কাশীর কথা মনে করিয়ে দেয়।
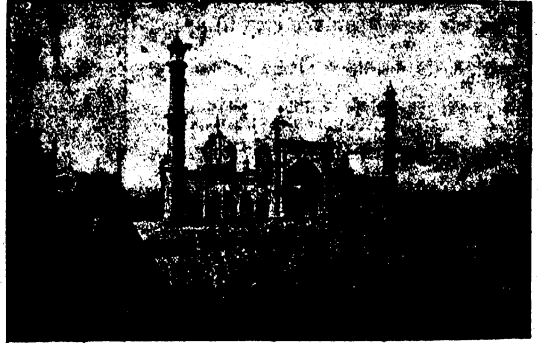
মথুরায় আজ ঘরে ঘরে নন্দোৎসব; দিনের আলো ভাল করে ফোটবার আগেই তাই আনন্দ কোলাহল সুরু হয়ে গেছে। দলে দলে সব নরনারী প্রাতঃস্নান করতে ঘাটের দিকে চলেছে, আমরা ঘাটে ও অঘাটে কিছুক্ষণ পায়চারী করে বাসায় ফিরলুম, তারপর প্রাতঃক্রিয়া সমাপনান্তে কিছু গরম জিলাপী ও কচুরী উদরস্থ করে মথুরার দ্রষ্টব্য স্থান ও মন্দিরাদির দেখবার জন্য বেরিয়ে পড়লুম।

পথে বেরুতেই দুই একজন পাণ্ডা মার্কা ভদ্রলোক ... লম্বকর্ণ ভদ্রলোক বগলে দোকানের ... একখানা করে কেতাব নিয়ে ... খিচুড়ি পরিবেশন করতে আমাদের ...

আছি',—'কোথা থেকে এসেছি',—আমাদের বাপ-ঠাকুরদাদারা কে করে এখানে এসেছিলেন, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

ধরমশালাওয়ালাদের ব্যবহারে সেই শেষ রাত থেকেই সুবোধদার মেজাজ চটে ছিলো। ফলে কেহ-ই অধিকক্ষণ কথা কাটাকাটি করতে সাহস করলে না। বিশেষতঃ পাণ্ডারা যখন দেখলে, সাথে কোন বৃদ্ধা বা ঐ জাতীয় কোন তরুণী উপসর্গ নেই, তখন কিছু সুবিধা হবে না বলে সরে পড়লো, আমরাও আমাদের বইয়ে পড়া অভিজ্ঞতা অনুসারে ঘাট ও মন্দিরাদির দিকে চলতে আরম্ভ করলুম।

যমুনার জলে শুদ্ধ হয়ে দেব-দর্শনে মন্দিরে যাওয়াই নাকি শাস্ত্র বিধি, হিন্দুর সন্তান আমরা, শাস্ত্র-বাক্য লঙ্ঘন করার মতন দুঃসাহস কোনদিন ছিল না, এখন নেই, কাজেই 'বিশ্রাম ঘাটের' দিকে চললুম। কিন্তু স্নান করবো কি! ঘাটে কৃষ্ণের জীবগুলি যে জলকেলি আরম্ভ করে দিয়েছে। শেষে পুণ্যি করতে গিয়ে কি এই কলিযুগে নর-কচ্ছপের যুদ্ধ করে এক অক্ষয় কীর্ত্তি করে বসবো? দরকার নেই, আমরা ঘাটের উপর থেকেই জল মাথায় দিয়ে নিয়ে সাক্ষেপ মতে শুদ্ধ হয়ে নিলুম।

কাশীর দশাশ্বমেধ ঘাটের মতন মথুরার বিশ্রাম-ঘাটেই যাত্রীদের আনাগোনা খুব বেশী, এখানে নাকি শ্রীকৃষ্ণ মাতুল কংসকে নিধন করে বিশ্রাম করেছিলেন, সন্ধ্যার পরে এই ঘাটটীর বৈশিষ্ট্য আরও বেশী মনোরম, এই সময় শঙ্খ-ঘণ্টাধ্বনির মধ্যে যমুনা দেবীর আরতী দেখতে আবাল—বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই ছুটে আসে।

মথুরার দ্রষ্টব্য স্থানগুলির মধ্যে কংস-কারাগারটী অন্যতম, সহরের একপ্রান্তে যমুনার তীরে এখনও এই কারাগারটী অতীতের স্মৃতি বুকে নিয়ে কোন রকমে টিকে আছে, পাণ্ডাদের কাছে শুনলুম এককালে ইহা নাকি তিন তালা প্রকাণ্ড বাড়ী ছিলো, এখন কিন্তু কালের অকরুণ পরিহাসে আর [illegible] সঙ্গে মিশে গেছে। [illegible]

এখান থেকে একবারে আমরা মন্দিরে দেব-দর্শনে চললুম। রাস্তায় হোলীখেলার মত ছোট ছোট ছেলেরা হলুদগোলা জল যাত্রীদের গায়ে ছিটিয়ে দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে, আজ নন্দোৎসব, সকলের মুখেই বেশ একটা প্রাণ-খোলা হাসি।

এখানে মন্দিরের সংখ্যা অনেক, তার মধ্যে দ্বারকানাথ-জীর মন্দির সব চেয়ে বড় ও দেখবার মতন, বিশেষ বিশেষ মন্দিরগুলি ঘুরে এসে, শেষে এই মন্দিরে এসে উঠলুম। মহানন্দে উৎসব হচ্ছে, কারো কোন খেয়াল নেই, মন্দিরের মধ্যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-বৃত্তান্ত নিয়ে এক হাস্যকর অভিনয় দেখা গেল। একজন পরচুলী খাটিয়ে গোপরাজ নন্দ সেজে মহাব্যস্ততার সঙ্গে সকলকে আদর-অভ্যর্থনা করছেন আর তাঁর গোঁপ কামান, গাল চড়ান স্ত্রী যশোমতী গন্ত-রাত্রে ভূমিষ্ঠ শিশুটীকে ঘন ঘন চুমু দিচ্ছেন, অভিনয়টী বেশ উপযোগ্য।
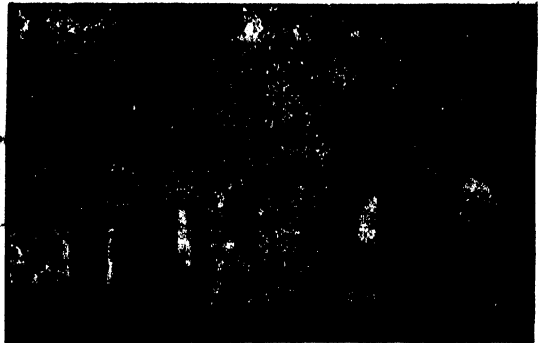
সময় বেশী ছিল না, তাড়াতাড়ি মন্দিরটী প্রদক্ষিণ করে বাসায় ফিরলুম। প্রায় একটা বাজে;—এখানে আমাদের আবার বৃন্দাবনে ছুটতে হবে, তারপর সেখান-কার সব দেখাশুনা শেষ করে আজ রাত্রেই ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যেতে হবে। কাজেই তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়া শেষ করে, দেড়টার সময় বেরিয়ে পড়লুম।

বৃন্দাবন এখান থেকে পাকা ছ'মাইল, ট্রেণে, মোটর ও টাঙ্গায় যাওয়ার বন্দোবস্ত আছে, আমরা বাসে যাওয়াই

ঠিক করলুম। কমপিটিশানের (Competition) বাজার, এক বাসওয়ালা মাথাপিছু দু'আনা নিয়েই ছেড়ে দিলে, আমরাও খানিকটা আরামের নিশ্বাস ফেলে দু'ধারের পড়ো মাঠ আর ধেনুর বদলে মহিষের পাল দেখতে দেখতে ছুটতে লাগলুম, রাস্তা থেকে খানিক দূরে সেই মাঠের মাঝখানে একটা ভাঙা মন্দির দৃষ্টিপথে পড়লো। পাশের যাত্রীটী বললেন, নন্দ-দুলালের গোষ্ঠলীলার অনেক স্মৃতি এর সাথে জড়ান আছে। অসম্ভব কিছু নেই, পুরাণ-তত্ত্ববিদেরাএই সব স্থানগুলিকেই শ্রীকৃষ্ণের লীলাক্ষেত্র বলে নির্দ্দেশ করেছেন, আমরা এই সব আলোচনা করতে করতে ঘণ্টাখানেকের ভিতর ব্রজের দ্বারে এসে গেলুম।
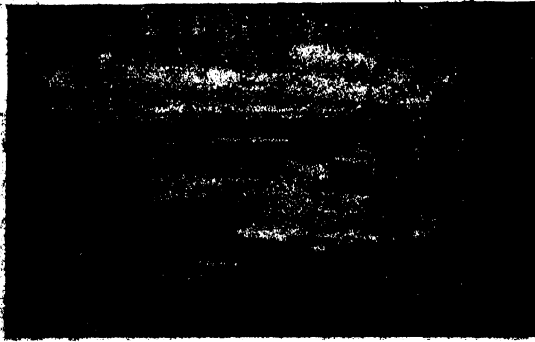
বৃন্দাবনে দর্শনীয় স্থানের ও মন্দিরের সংখ্যা হয় না বললে অত্যুক্তি হয় না, শুধু মন্দিরই নাকি পাঁচ হাজারের উপর আছে। তার মধ্যে ৺গোবিন্দজীর মন্দির, শেঠের মন্দির, সাহজীর মন্দির, লালাবাবুর মন্দির প্রভৃতি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য, আমরা প্রথমেই মুর্শিদাবাদের প্রসিদ্ধ ধনকুবের জগৎ শেঠের মন্দিরে চললুম, এখানে নাট-মন্দিরের সামনে উঠোনের উপর একটা চল্লিশ হাত দীর্ঘ সোনার গরুড় স্তম্ভ আছে, আমার মাতৃদেবী যখন এখানে ছিলেন তখন তাঁকে এটাকে "সোণার তালগাছ" বলতে শুনতুম। কিন্তু তালগাছের সঙ্গে এর কোনই সাদৃশ্য দেখতে পেলুম না।

আমরা শ্বেতপাথরে বাঁধান নাট-মন্দিরের চত্বরে খানিকক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে মন্দিরাধিষ্ঠিত বিগ্রহ শ্রীরঙ্গজীর ঘরের সামনে ভক্তি ভরেমাথা ঠুকে এবং খানিকটা চরণামৃত উদরস্থ করে সেই বিরাট মন্দির প্রদক্ষিণ করতে উঠলুম, একধারে একখানা সোনার পাল্কী দেখলুম, শুনলুম জন্মাষ্টমী উপলক্ষে আজ সকালে এই পাল্কীতে শ্রীরঙ্গজীকে শোভাযাত্রা করান হয়েছিলো। জগৎ শেঠ যে ধনকুবের ছিলেন তা তাঁর এই সমস্ত থেকেই বেশ বোঝা যায়। আমরা এইবার শ্রীরঙ্গজীর চরণে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম, তারপর একে একে মদনমোহনের মন্দির, বঙ্কুবিহারীর মন্দির ও কাত্যায়নীর মন্দির দেখে আমরা যমুনার ঘাটে কালীয়দমন দেখতে চললুম। পথে বৃষ্টি দেবতা এমন ঘন-ঘোর-ঘটা করে নেমে এলেন যে আমরা আর আশ্রয় না নিয়ে পারলুম না, কালীয়দমন ঘাটের উপরেই যে একটি কুঞ্জ আছে আমরা সেখানে গিয়ে আশ্রয় নিলুম। কুঞ্জের মালিক একজন অশীতিপর কুব্জ-পৃষ্ঠ-কুব্জ-দেহ বাঙালী বৃদ্ধা। আমাদের বাঙালী দেখে আনন্দে আলাপ করতে লাগলেন, কথায় কথায় আমাদের অবিবাহিত জীবনের কথা শুনে, খুব একচোট স্নেহতাড়না করলেন। শেষে এমনও বললেন, "বিয়ে সংসারের সনাতন নিয়ম, এ নিয়ম লঙ্ঘন করলে, মহা-নরকে পর জীবনে দারুণ কষ্টভোগ করতে হবে।"

বাহিরে বৃষ্টি থেমে এসেছিল। আমরা হাসি চাপতে চাপতে তাঁর কাছে বিদায় নিয়ে কালীয়দমন দেখতে চললুম। এখানে দেখবার মতন বিশেষ কিছুই দেখলুম না। ঘাটের উপরে একটা গাছের তলায় আমাদের দেশের তুলসীমঞ্চের মতন ছোট একটা মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণের কালীয় দমন মূর্ত্তি বিরাজিত। প্রণামান্তে বিদায় নিয়ে আবার আমরা শ্রীকৃষ্ণের মৃদার দেখতে ছুটলুম।

ছেলে থেকে থুত্থুড়ে বুড়ো পর্য্যন্ত ব্রজবাসী সবাই এসে এখানে হাজির হয়েছে। [illegible] বিশ পঁচিশ বছরের 'রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম' [illegible] উন্নত আছে। এখানেও আমার সেই [illegible] [illegible] কৌতুহলাক্রান্ত [illegible] প্রণাম নিয়ে গোবিন্দজীর মন্দির উদ্দেশে [illegible]

মন্দিরে গিয়ে যা দেখলুম, জীবনে [illegible]

পারবো না। লাল পাথর দিয়ে তৈরী করা এই বিশাল মন্দিরটীর অপূর্ব্বশিল্প নিদর্শন দর্শকমাত্রকেই মোহিত করে দেয়। শোনা যায় সেকালে নাকি এই মন্দির পঞ্চচূড় বিশিষ্ট ছিল। সর্ব্বোচ্চ চূড়ায় যে আলো জলতো দিল্লীর ফোর্ট থেকে তা' দেখা যেত। একদিন মুসলমান কুলভূষণ ঔরঙ্গজেব দিল্লী থেকে সেই আলো দেখতে পেয়ে পার্শ্বদকে জিজ্ঞাসা করে জানলেন উহা হিন্দু-মন্দিরের আলো। পরদিন ঔরঙ্গজেব সেই সর্ব্বোচ্চ চূড়াটী ভেঙ্গে তার উপর মসজিদ বানিয়ে নামাজ পড়ে ঘরে ফিরলেন। সেই থেকে গোবিন্দদেবের মন্দির স্কন্ধকাটা কবন্ধ গোছের হয়ে আছে।

আজ এই মন্দিরে পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুর নেতৃত্বে এক সভার আয়োজন করা হয়েছে। নেতৃবৃন্দ এখনও এসে উপস্থিত হন নাই। তবে স্বদেশী সৈনিকেরা ভরসা দিলে তাঁদের আসতে আর মোটেই দেরী নেই, কাল দৈব-দুর্ব্বিপাকে পড়ে আগ্রাতে জহরলালজীর বক্তৃতা শোনা হয় নাই, তাই আজকের এই সুবর্ণ সুযোগ ছেড়ে যেতে মন চাইলে না। আমরা উৎসুক চিত্তে তাঁর আগমন প্রতীক্ষা করতে লাগলুম!

যথাসময়ে পণ্ডিতজী সবান্ধবে সভাসীন হলেন। জনসাধারণ সহর্ষ বন্দে মাতরং ধ্বনির দ্বারা তাঁকে অভিনন্দন জানালে। দু'টী হিন্দুস্থানী বালিকা বীণানিন্দিত কণ্ঠে বাংলায় স্বরাজ সংগ্রামের পুরোহিত বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায়ের

বন্দেমাতরং

সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাং

বন্দেমাতরং

গানখানি গাইলে, পরে গোলমাল থাম্‌লে বক্তৃতা আরম্ভ হলো, কাল আগ্রাতে যে বিষয়ে বক্তৃতা দিয়েছিলেন আজও এখানে সেই বিষয়ে বক্তৃতা হলো, সকলে মহাত্মাজীর সাগরপারের অদ্ভুত স্বরাজ সংগ্রামের কথা ভাবতে লাগলো।

এদিকে বেলা পড়ে আসতে লাগলো, আমরাও সভা থেকে বিদায় নিয়ে মথুরায় ফিরবার জন্য বাসের (Bus) আড্ডায় চললুম।

মথুরায় ফিরে তাড়াতাড়ি হাত-মুখ ধুয়ে খাওয়া-দাওয়া সেরে নিলুম। আন্দাজ দশটায় সময় দিল্লীর ট্রেণ। আমাদের সেই ট্রেণ ধরতে হবে। পাছে আগ্রার মতন ট্রেণ বিভ্রাটে পড়ে সেই ভয়ে প্রায় ঘণ্টা দেড়েক আগে, 'গমনে বামনঞ্চৈব' স্মরণ করে বেরিয়ে পড়লুম। কিন্তু কপালে দুর্ভোগ লেখা ছিলো, খণ্ডাবে কে? টাইম টেবল দেখার দোষে আবার সেই ট্রেণ বিভ্রাট।

সামনে একখানা ট্রেণ দাঁড়িয়ে ছিলো, বন্ধুদের খেয়াল অনুযায়ী তাতেই চড়া গেলো এবং পঞ্চাশবার ট্রেণ বদল করতে করতে পরদিন সকাল আটটায় দিল্লী এসে নামলুম। আমাদের আড়াই দিনের কাহিনী এতক্ষণে শেষ হলো।

বাস্তু-ভিটা

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম-এ

'আমার নিজের ভিটাখানি' এই কয়টি কথা
মধুরতম স্বপন চোখে আনে,
বাজিয়ে তোলে হৃদয়-বীণায় মধুরতম সুর,
ভাসায়ে দেয় কপোল যুগ অশ্রুধারার বাণে।
হোক্ না ছোট, হোক্ না কেন পরের কাছে হেয়—
আমার কাছে শ্রেষ্ঠ তাহা নয় গো হেয় নয়,
ধরার মাঝে তীর্থ সে মোর স্মরণ সম সে যে—
সাত পুরুষের ভিটা কিগো তুচ্ছ কভু হয়?

প্রতি ভাঙা ইটের মাঝে শতেক স্মৃতি আছে গাঁথা
প্রাচীন শিলা-লিপির চেয়েও দামী,
পিতামহের পিতামহ এই মাটীতেই হলেন মানুষ—
এ সব কথা স্মরণ করি আমি।
তীর্থ আমার, স্বর্গ আমার, ওগো আমার বাস্তুভিটা,
লোটাই মাথা তোমার মাটির তলে,
দুঃখে সুখে হৃদয় মাঝে স্মরণ প্রদীপ সম
তোমার স্মৃতি নিত্য যেন জ্বলে।

মহিলা সংবাদ

মার্কিন কবি দুহিতার জীবন পণ :—মার্কিন কবি জর্জ গ্রামকুকের কন্যা নীলা গ্রামকুক গত বৎসর হিন্দু ধর্মের আশ্রয়ে আসিয়া নীলানাগিনী নাম গ্রহণ করিয়াছেন। মহীশূর শক্তি মন্দিরে তাঁহাকে প্রবেশাধিকার দেওয়া হয় নাই। প্রকাশ যে সম্প্রতি তিনি এই সঙ্কল্প করিয়াছেন যে তাঁহাকে এখনও যদি উক্ত মন্দিরে প্রবেশ করিতে না দেওয়া হয় তবে তিনি অনশনে প্রাণত্যাগ করিবেন।

দুর্নীতি দমন বিল :—অসদুদ্দেশ্যে বালিকা আমদানী ও বিক্রয় ইত্যাদি বন্ধ করিবার জন্য ১৪ই অক্টোবর, মহীশূর ব্যবস্থাপক সভার কোনও বে-সরকারী সদস্য এক প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছিলেন। আলোচনায় বিলের পক্ষে ৯৩ ভোট এবং বিপক্ষে ১০৩ ভোট হওয়ায় ইহা অগ্রাহ্য হইয়াছে। গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে বলা হয় যে, দুর্নীতি দমনের জন্য প্রচলিত সাধারণ আইনই যথেষ্ট। ইহার অতিরিক্ত অপর কোন প্রকার আইনের দরকার নাই।

গোয়ালিয়র মহিলা সম্মিলনী :—গোয়ালিয়র মহিলা সম্মিলনীর তৃতীয় অধিবেশনে শ্রীযুক্ত রাম স্বরূপ হাকসার সভাপতিত্ব করেন। এই সভায় প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় যে, মহিলাগণের জন্য অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হৌক। অস্পৃশ্যতা ও পর্দ্দার অপসারণ করিতে হইবে। অন্য একটি প্রস্তাবে বাল্যবিবাহ নিরোধক আইন সমর্থন করা হয় এবং বিবাহিত স্ত্রী ও পুরুষকে 'জন্ম নিরোধ' সম্বন্ধে শিক্ষা দিবার কেন্দ্র খুলিতে বলা হয়।

মধ্য প্রদেশ মহিলা সম্মেলন :—২০শে অক্টোবর নাগপুর, রিজেণ্ট থিয়েটারে মধ্য প্রদেশ (দক্ষিণ) মহিলা সম্মেলনের ষষ্ঠ অধিবেশন হয়। বোম্বাইয়ের শ্রীযুক্তা যমুনাবাই হিরলেকার সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্তা কামা বলেন যে, দেশীয় প্রতিষ্ঠানগুলিতে আরও অধিক সংখ্যক মহিলা প্রতিনিধি আবশ্যক। সভানেত্রী বলেন যে, এরূপ শিক্ষাপদ্ধতি অবলম্বনের প্রয়োজন যদ্বারা নারী সমাজের মানসিক দৈহিক এবং সর্ব্ববিধ বিষয়েই উৎকর্ষ সাধিত হইবে এবং যাহা তাঁহাদিগকে নিজ নিজ ভার গ্রহণে সুন্দররূপে গড়িয়া তুলিবে। এতৎসম্পর্কে তিনি পণ্ডিত মালব্যজীর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় এবং ডাঃ ঠাকুরের বিশ্ব ভারতীর উদাহরণ দেন। সরকারী শিক্ষাপদ্ধতির নিন্দাবাদ করিয়া বলেন যে, ঐরূপ শিক্ষাপদ্ধতি নারী সমাজের উন্নতির পথ সম্পূর্ণরূপে রোধ করিয়া দিয়াছে। এই সম্বন্ধে জাপান, সোভিয়েট, রুষিয়ার ও তুরস্কের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, তাঁহাদের শিক্ষাপদ্ধতি নারী সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়া তাঁহাদিগের অগ্রগতির পথে সহায়তা করিয়াছে। অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের জন্য নারী সমাজকে অনুরোধ করিয়া যাহাতে আন্তর্জাতিক বিবাহ ও বিভিন্ন ধর্ম্মীদের মধ্যে একতা সম্পাদিত হয় তজ্জন্য চেষ্টা করিতে বলেন এবং পূর্ণভাবে স্বদেশী হইবার জন্য অনুরোধ করেন। প্রধান মন্ত্রীর সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তে নারী সমাজের জন্য পৃথক নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা খুবই অন্যায় হইয়াছে। যাহাতে বয়ঃপ্রাপ্তেরা ভোটাধিকার লাভ করে তাহার ব্যবস্থার জন্য তিনি পুরুষ ও নারী উভয় সম্প্রদায়ের নিকটই অনুরোধ জানান। অস্পৃশ্যতা দূরীকরণে মহাত্মাজীর প্রচেষ্টার সাফল্যের জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া বালিকাদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার জন্য সরকারকে অনুরোধ করা হয়। প্রস্তাব হয় যে পর্য্যন্ত স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন রহিত না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত ভবিষ্যৎ শাসনপদ্ধতির সর্ব্বাধিক কার্য্য বর্জ্জন করা হইবে। বয়স্কদিগের জন্য যৌনশিক্ষা ও জন্মনিরোধক শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা সম্পর্কে অন্যান্য প্রস্তাব গৃহীত হয়।

মুস্‌লিম মহিলা সমাজ :—১৫ই অক্টোবর মীরাটের মুস্তাফা ক্যাসেলে আঞ্জমান-ইস্লাম-উল খাতিনের (মহিলা সংস্কার সম্মিলনের) অধিবেশন হয়। মৌলানা আবুল কালাম আজাদের ভগিনী আবরু বেগম সাহেবা সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করেন। বিশিষ্ট দর্শকদের মধ্যে নাদীজ দুলান সাহেবা, বেগম মৌলানা মহম্মদ আলী এবং বেগম সহিদ হোসেন প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। আঞ্জুমানের প্রতিষ্ঠাত্রী এবং অভ্যর্থনা সমিতির সভানেত্রী বেগম নবাব ইসমাইল খান তাঁহার অভিভাষণে মুস্লীম মহিলাদিগকে ধর্ম্মে দৃঢ় থাকিতে বলেন এবং পাশ্চাত্যের অন্ধভাবে অনুকরণের নিন্দাবাদ করেন। সভানেত্রী তাঁহার অভিভাষণে মুসলমান সমাজের মধ্যে ও হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা এবং শিশুদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের উপর জোর দেন। বেগম সাহিদ হোসেন মুসলমানদিগকে বিলাসিতা বর্জ্জন করিতে অনুরোধ করেন। লেহর বাহিরে একটি পর্দা প্রদর্শনী এবং [illegible] বসিয়াছিল। সম্ভ্রান্ত পরিবারের মুসলমান মেয়েরা ঐ [illegible] খুলিয়াছিলেন।

একদিনের ব্যাপার

—গল্প—

শ্রীরেণুকা দাস

ফুলশয্যার রাত্রে বীণা বিছানায় বসিয়া ভাবিতেছিল, কেমন করিয়া এই অজানা লোকটার পাশে শুইয়া ঘুমাইবে।

বিবাহের রাত্রে সকলে মিলিয়া যে কয় মিনিটের জন্য বাসর শয্যায় দিয়াছিল, সে সময় সে ঘুমায় নাই—তার লজ্জাও করে নাই, সব দরজা জানালা খোলা ছিল। বিবাহ হইয়াছিল রাত্রি চারিটায়। অজিত অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া যখন বীণার হাত ধরিয়া বলিল, "আর কত রাত করবে বসে বসে, এবার শুয়ে পড়ো," বীণা লজ্জায় লাল হইয়া আস্তে শুটি-সুটি হইয়া বিছানার এক কোণে শুইয়া একটু পরেই ঘুমাইয়া পড়িল। সকালবেলা ঘুম ভাঙ্গিয়া সে চোখ মেলিয়া দেখিল, অজিত অনেক আগেই উঠিয়াছে, টেবিলের কাছে একখানা চেয়ারে বসিয়া কতগুলি বইপত্র নাড়া-চাড়া করিতেছে। যাই হোক লোকটার লজ্জা সরম আছে ভাবিয়া সে যেন বেশ আরাম বোধ করিতে লাগিল।

সেই ষোল বছরের বীণা এখন বাইশ বছরে পড়িয়াছে। দীর্ঘ ছয়টী বছর তাহার জীবনে অনেক সুখ-দুঃখ দিয়াছে। সে স্বামীকে এখন নিবিড়ভাবে আঁকড়াইয়া থাকিতে পারিলে সুখী হয়। কিন্তু স্বামী যে কি চায়, কি করিলে বেশ স্বাভাবিক হয়, সেটা বীণা আজও ভাল বুঝিতে পারিল না, সে যে কি ভালবাসে আর কি না বাসে চেষ্টা করিয়াও বীণা তাহা আবিষ্কার করিতে পারে না। অন্যায় অসম্ভব আব্দার করিয়া স্বামীকে চটাইতে চেষ্টা করিয়া বিফল হইয়াছে। তাহাকে সুন্দর রুমাল শেলাই করিয়া দিয়া সুন্দর পাঞ্জাবী নিজ হাতে নিখুঁতভাবে তৈয়ার করিয়া স্বামীর মুখে প্রশংসা শুনিতে আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছে; অজিত এমনি নির্মম সে শুধু বলে, 'তুমি করলে আবার ? বেশ !' এই খুব এর বেশী কথা যেন সে বলিতে পারে না। বড় জায়ের সঙ্গে তর্ক করিয়া রাগের ঝোঁকে বীণা আসিয়া স্বামীর গায়ের উপর হুড়মুড় করিয়া কাঁদ কাঁদ হইয়া বলে' 'এমন মানুষের হাতে পড়েছি—তার সাম্‌নে যদি কেউ থেঁতলে দেয় টুঁ শব্দ করবে না।' অজিত হাসিয়া ফেলিত, 'কেন গো, তোমার সঙ্গে গিয়ে লাঠি বাজিতে যোগ দেব নাকি ?' বীণা রাগিয়া ঘর ছাড়িয়া চলিয়া যায়। স্বামীর এই সব ব্যবহারে বীণা বড় আঘাত পায়, কেন এমন হয়, তিনি কেন তার সকল অবস্থার সহিত জড়িত হন না ?

সেদিন শনিবার অজিত সকাল সকাল বাড়ী আসিয়া ঘরে ঢুকিয়াই দেখিল, বীণা মনোযোগের সহিত চুল বাঁধিতেছে আর গুন্‌গুন্ করিয়া কি একটা গানের সুর ভাঁজিতেছে।

আল্‌নায় একখানা দামী শাড়ী জামা ইত্যাদি ঝুলিতেছে, অজিতকে দেখিয়া বীণা হাসিয়া ফেলিল। অজিত বলিল, 'ব্যাপার কি ? বড় যে ঘটা করে খুব খোঁপা বাঁধা হচ্ছে ?'

বীণা বলিল, 'এখন বল্‌ব না, তুমি মার কাছে শুনবে। অজিত মনে মনে ঠিক করিল যে কোথাও যাত্রার উদ্যোগ চলিতেছে। অজিত আর কোন কথা না বলিয়া মায়ের ঘরে গিয়া খাবারের আল্‌মারিটা খুলিল। অজিতের মা বাড়ী ছিলেন না, সবেমাত্র উঠানে আসিয়া পা দিয়াছেন; ছেলেকে ঘরে দেখিয়া বলিলেন, 'অজি, দাঁড়া বাবা, আমি এসে খাবার দিচ্ছি।' মা আসিয়া ছেলেকে কিছু আম আর একটু সর দিলেন, কাছে বসিয়া হাওয়া করিয়া না খাওয়াইলে মার মোটেই তৃপ্তি হয় না।

খাইতে খাইতে অজিত মার কাছে শুনিল, সকালে

দুই বধূ ও-বাড়ীর ননীকে দিয়া বায়োস্কোপের টিকিট কিনাইয়া আনিয়াছে, কি নাকি একটা প্রসিদ্ধ ছবি আসিয়াছে না দেখিলেই নয়। কিন্তু দুইটার পর খোকার প্রবল বেগে কম্প দিয়া জর আসিল, আর তাদের যাওয়ার আনন্দও জল হইয়া গেল, বড় বউ কিছুতেই যাইতে পারে না, ছোট কি করিয়া যায়, যাদের সঙ্গে ওরা যাইবে ঠিক করিয়াছে, তাদের খবর পাঠাইয়া দুই জা অত্যন্ত বিমর্ষ হইয়া রহিল। টিকিট দুইটা বিক্রি করাও গেল না। কেই বা খোঁজ নেয়? কত লোক যায় একটু ঘুরিলেই হয়। আর যখন কোন সুরাহা হইল না, মা বলিলেন, "তুই ওকে নিয়ে আজ দেখিয়ে আন্, খোকার জর সেরে গেলে বড় বউ বরং আর একদিন যাবে।"

মার ঘর হইতে বাহির হইয়া অজিত কথাটা মনে মনে আওড়াইতে লাগিল। বীণাকে না লইয়া গেলে ওর মনে বড় আঘাত লাগিবে। কারণ সে কথাটা নিজে না বলিয়া মাকে দিয়া বলাইয়াছে। কাজেই অজিত আর দ্বিধা করিতে পারিল না, বীণাকে অন্ততঃ আজকের দিনটা সে খুব আনন্দ দিবে। অজিত অনেক সময় অনেক কাজ চক্ষুলজ্জার খাতিরে করিতে পারে না। আজ সে বীণাকে লইয়া যাইবে ঠিক করিল।

বীণা তখন সংসারের কাজ সারিয়া লইতে চলিয়া গিয়াছে। অজিত আসিয়া দেখিল, আয়নার ড্রয়ারের উপর মাথার পিন্ দুটী সে রাখিয়া গেছে। অজিতের বুকের ভিতরটা মোচড় দিয়া উঠিল আহা বেচারা, বীণাকে আজ কিছুতেই বিমুখ করা যায় না।

ছয়টার 'শো'তে তাহারা যাইবে, একটা ঘোড়ার গাড়ীতে দুইজনে পাশাপাশি বসিল। অজিত বীণার মুখের দিকে চাহিয়া হাসিয়া ফেলিল। বীণাকে বেগুনি শাড়ী পরিলে বেশ মানায়, তাহার এই মনের কথাটা বীণা যেন টের পাইয়াই আজ বেগুনি শাড়ীখানাই পরিয়াছে। তাহারা যখন বায়োস্কোপ হলের প্রায় কাছাকাছি গিয়াছে, তখন রাস্তার বিপরীত দিক হইতে একখানা মোটর হর্ণ বাজাইয়া উঠিল। গাড়োয়ান যথাসম্ভব রাশ টানিয়া গাড়ীখানা রাস্তার একপাশে লইতে চেষ্টা করিল, মোটরখানা যখন পাশ কাটাইয়া চলিয়া গেল, গাড়োয়ান টাল সাম্‌লাইতে অক্ষম হইয়া পড়িল। এত সঙ্কীর্ণ রাস্তা যে গাড়ীর একটা চাকা পাশে ড্রেনে পড়িয়া গেল। হতভম্ব গাড়োয়ান ঘোড়াকে নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করিয়াও গাড়ীর চাকা রাস্তায় উঠাইতে পারিল না, ফলে গাড়ী একেবারে কাত হইয়া ড্রেনে পড়িয়া গেল। ধাক্কা খাইয়া অজিত গড়াইয়া পড়িল বীণার গায়ের উপর। এবং বাঁ হাতের কনুইর উপর ইঁটের আঘাত লাগিয়া খানিকটা ছড়িয়া গেল। গাড়ীর জাল্‌নায় বীণা বিষম ধাক্কা খাইল, তাহার মাথা ঝিম্‌ঝিম্ করিয়া উঠিল—একটু পরে সে অজ্ঞান হইয়া পড়িল।

সেই রাস্তার উপরে এক জানালার কাছে দাঁড়াইয়া পরিমল এই দৃশ্য দেখিল। তাড়াতাড়ি সে ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিল। বিপদের সময় অজিত পরিমলকে পাইয়া একেবারে হাতে আকাশ পাইল। পরিমল বীণাকে পাঁজাকোলা করিয়া আনিয়া তাহার নিজের বিছানায় শোয়াইয়া দিল এবং চোখে-মুখে জলের ঝাপ্‌টা দিতে লাগিল। চাকরকে কিছু বরফ আনিতে পাঠাইয়া নিজে সাম্‌নের বাড়ীতে সারদা ডাক্তারকে ডাকিতে প্রায় দৌড়াইয়া গেল। ডাক্তার আসিয়া বরফ দেওয়াই উত্তম ব্যবস্থা বলিয়া একটা ওষুধ লিখিয়া দিলেন। ভয়ের কোন কারণ নাই, মাথায় একটু চোট লেগেছে বটে, তবে তেমন কিছু নয়। ডাক্তারবাবু বিদায় হইতে চাহিলেন, কিন্তু অজিত কিছুতেই যাইতে দিল না, যতক্ষণ না বীণা ভাল করিয়া চোখ মেলিয়া চাহিল। ইহার মধ্যেই অজিতের মা আসিয়া পৌঁছিলেন, পরিমল যে মাকে খবর দিতে ভোলে নাই, সেজন্য অজিত পরিমলকে ধন্যবাদ জানাইল।

পরিমল আগাগোড়া নিজেকে সংযত রাখিতে চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু এক এক সময় তাহার মুখের চেহারা যে বদ্‌লাইতেছে, তাহা একটু লক্ষ্য না করিলে দেখিতে পাওয়া যায় না। দীর্ঘ ছয়বছর পর, বীণার সঙ্গে আজ প্রথম দেখা, কিন্তু বীণাকে অত্যন্ত বিপদে পড়িয়া পরিমলের আতিথ্য গ্রহণ করিতে হইয়াছে।

বীণার আঘাতটা পরিমলের বুকে [illegible]

বাজিয়া আনন্দের কলরব করিয়া উঠিল। এমন দুর্ঘটনা না হইলে, সে কি আজ বীণাকে এমন ভাবে কাছে পাইতে পারিত! অনেকদিন আগে যেমন ভাবে বীণা পরিমলের কাছটী ঘেসিয়া বসিত, আজ বহুদিন পরে তেম্‌নি বীণার একান্ত কাছে বসিয়া পরিমলের হৃদয় দুলিয়া উঠিতেছিল আনন্দে।

পরিমলরা বহুদিন এই সহরে বাস করিয়া গিয়াছে, তখন তার বাবা এখানে চাকুরি করিতেন। পিতার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে এখানকার সকল সংশ্রব কাটিয়া গিয়াছে। কিন্তু তবু পরিমলকে বছরে একবার করিয়া আসিতে হয় সরকারি কাজে। এই রাস্তার উপরের ছোট্ট বাড়ীটী সে ভাড়া লইয়াছে, সঙ্গী একটি পশ্চিমা চাকর। অজিতের স্ত্রী হইয়া বীণা মনের আনন্দে যে বাড়ীটি আলো করিয়া আছে, সে বাড়ীখানা পরিমলের অত্যন্ত আকর্ষণের বস্তু, কিন্তু তবু কোনদিন পরিমল সে বাড়ীর ত্রিসীমায় ঘেষিত না। সে নিজের দুর্ভাগ্য লইয়া থাকিবে অজিতের সৌভাগ্যে কটাক্ষপাত করিতে তাহার প্রবৃত্তি নাই। অজিতের বাড়ীর কাছ দিয়া যাতায়াত করিলে পাছে হঠাৎ কোন দিন বীণার সঙ্গে দেখা হইয়া যায়, এই আশঙ্কায় পরিমল ঐদিক মাড়ায় না। অজিতকেও যথাসম্ভব এড়াইয়া চলে।

বীণা যখন প্রথম চোখ মেলিয়া চাহিল, পরিমল বরফ ভাঙ্গিয়া আনিতে অন্যত্র গিয়াছিল। অজিতকে সুস্থ অবস্থায় তাহার কাছে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া সে অত্যন্ত স্বস্তি বোধ করিল। তখন কেমন করিয়া এই ঘটনা ঘটিল, বীণা তাহা বলিতে আরম্ভ করিলে ডাক্তার বাবু বলিলেন "আপনি বেশী কথা বলবেন না, একটু ঘুমোতে চেষ্টা করুন।" বলিয়া চলিয়া গেলেন। আইস-ব্যাগ লইয়া বীণার মাথায় দিতেই চোখ তুলিয়া চাহিয়া বীণা পরিমলকে দেখিল। বীণা প্রথমে কেমন একটু ভড়কাইয়া উঠিতেই অজিত বলিল "চিনলে না ওকে? ও যে পরিমল, তোমার শিক্ষক", বীণা আবার ভাল করিয়া একবার পরিমলকে দেখিয়া লইয়া আবার চোখ বুজিল। আবার যেন তাহার শরীরের রক্ত মাথায় উঠিয়া আসিতে চাহিল। নিশ্চয় আবার সে অজ্ঞান হইয়া যাইবে। কিন্তু তাহা হইল না, বিস্মৃতির কুয়াশা কাটিয়া গিয়া তাহার মনে আস্তে আস্তে স্মরণের আলো জ্বলিয়া উঠিতে লাগিল। তাই মা যখন আসিয়া বীণার মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া আস্তে ডাকিলেন 'বীণা' অজিত বলিল 'মা ওকে এখন ডেকো না, বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছে, একটু চুপ করে থাকা দরকার।'

বীণা কিন্তু ঘুমায় নাই, তাহার চিন্তার স্রোতে এমন বেগ যে সে শাশুড়ীর ডাকে সাড়া দিতে পারিল না।

বীণার পিতা পরমেশ বাবু কলিকাতায় সামান্য ষাট্‌ টাকা বেতনে কোন সওদাগরি আফিসে কাজ করিতেন। একমাত্র সন্তান বীণাকে কাছে না রাখিলে পরমেশ বাবু অত্যন্ত কষ্টবোধ করিতেন। একটা মাঝারী রকমের গোটা বাড়ী ভাড়া লইয়া নীচের তলাটী বারমাস ভাড়ায় খাটাইয়া আশুবাবু বেশ সুবিধা করিয়া লইয়াছিলেন। পরমেশ বাবু এই আশুবাবুর নীচের তলার দুই খানা ঘর ভাড়া লইয়া সপরিবারে আসিয়া সংসার পাতিলেন। ছোট্ট বীণা তাহার মিশুক স্বভাব ও সুন্দর চেহারা দিয়া নিঃসন্তান আশুবাবু এবং তাহার স্ত্রীকে মুগ্ধ করিল। বীণা বড় হইয়াছে ইস্কুলে যায়, আশুবাবুর স্ত্রী পূজার সময় সুন্দর শাড়ী জামা উপহার দেয়, সেও মাসীমা বলিতে অজ্ঞান। এম্‌নি করিয়া গরীব পরমেশ বাবুর পরিবার, আশুবাবুর সচ্ছল সংসারের সহিত এক হইয়া গেল।

বীণা বাসে চড়িয়া ইস্কুলে যায় দামী শাড়ী পরিয়া বেড়াইতে বাহির হয়, সবই আশুবাবুর স্ত্রী বীণাকে দিয়াছেন। সন্তানের সকল আকাঙ্ক্ষা তাঁহার যেন বীণাই পূরণ করিতেছে। বীণা যখন ফোর্থক্লাশে পড়ে, পরিমল তখন আই-এ পড়িতে কলিকাতায় আসিয়া আশুবাবুর বাড়ীতে উঠিল—আশুবাবুর স্ত্রী পরিমলের মাসীমা, পরিমলকে আর কোথাও যাইতে দিলেন না, নিজের বাড়ীতেই থাকিয়া পড়িতে অনুরোধ করিলেন। পরিমল যেন বেশ আরামই বোধ করিল। মেসের গণ্ডগোলের চেয়ে এখানেই বেশ সচ্ছন্দে থাকা যাইবে।

প্রথম দিন কয়েক বীণা পরিমলের সাম্‌নে বড় একটা বাহির হইত না, কিন্তু যাহারা বলিতে গেলে একই বাড়ীতে বাস করে, তাহারা কতদিন আর যাওয়া রক্ষা

করিয়া চলিবে? ধীরে ধীরে তাহারা যে বেশ সহজভাবে কথা বলিয়া পরস্পরকে কত কাছে টানিতেছে, তাহা নিজেরাই টের পাইল না। ছুটীর দিনে অথবা সকাল বেলায় বীণা কতদিন পরিমলের কাছে পড়া শিখিয়া লইতে যায়। পরিমল যত্ন করিয়া বীণাকে পড়ায়। এমনি করিয়া দুবছর কাটিয়া গেল, পরিমল আই-এ পাশ করিয়া বি-এ পড়িতেছে। বীণাও সেকেণ্ডক্লাশে উঠিল,কিন্তু বীণার আর বেশীদিন পড়া চলিবে না, পরমেশবাবু মেয়ের বিবাহ দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন। বীণা কাঁদিয়া কাটিয়া মাকে অস্থির করিয়াছে, সে ম্যাট্রিক পাশ করিবে, কেন তাহাকে জোর করিয়া বিবাহ দেওয়া। গ্রীষ্মের ছুটির পর পরিমল আসিয়া দেখিল, বীণা আর ইস্কুলে যায় না।

তাহার মনটা কেমন দমিয়া গেল। বিকাল বেলা বাড়ী ফিরিয়া সে অস্থির মন, ক্লান্ত দেহ লইয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল। তবে কি বীণার বিবাহ ঠিকই হইয়া গেল? কই মাসীমা তো কিছু বলিলেন না। পরিমল আজ প্রথম অনুভব করিল, বীণা তাহার কতখানি জুড়িয়া বসিয়াছে, তাহাকে ভাল লাগে, কিন্তু ভালবাসে বলিয়া কোনদিন মনে হয় নাই। আজ বীণার বিবাহের নামে তাহার এই অন্তর্দাহ কেন? উহাকে কি বলে, ভাল লাগা না—ভালবাসা? আচ্ছা বীণা কি বিবাহে মত দিয়াছে? তাহার তো লেখাপড়ায় বেজায় ঝোঁক। রাত্রে খাইতে বসিয়া মাসীমার নিকট পরিমল শুনিল, বীণার বিবাহ ঠিক হইয়াছে, মেয়েটার কপাল জোর, নইলে এমন বর জোটে? বি-এ পাশ সত্তর টাকা বেতনে চাকুরি করে ইত্যাদি। তাহারা বিয়ের পর বীণাকে পড়াইবেও নাকি। 'প্রথম তো মেয়ে বেঁকেই বসেছিল, তারপর অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে রাজি করানো গেছে। কাল্‌কে ওরা পাকা দেখা দেখতে আস্‌বে।' পরিমল কোন-প্রকারে খাওয়া শেষ করিয়া আঁচাইয়া উঠিয়া গেল। এবং আলো নিবাইয়া শুইয়া পড়িল। যখন বিছানাও তাহার কাছে অসহ্য বোধ হইল, তখন বারাণ্ডায় আসিয়া পায়চারি করিতে লাগিল। বীণাকে তাহার বড় দরকার অথচ আর সময়ও নাই যে বীণাকে তাহার নিজের করিয়া লইবার ব্যবস্থা করিতে পারে। পরিমল ভাবে নাই বীণা এত তাড়াতাড়ি অন্যের হইয়া যাইবে। বীণাকে তাহার বিবাহ করা দরকার, তাহাও তাহার কখনো মনে হয় নাই, কিন্তু আজ আর সে কিছুতেই নিজের মনকে সহজ গতিতে চালাইতে পারিল না। বীণাকে আর জীবনে একটু চোখের দেখা দেখিবার অধিকার থাকিবে না।

যথাসময়ে বীণার আশীর্ব্বাদ হইয়া গেল, সেদিন সন্ধ্যার পর পরিমল তাহার ঘরে চেয়ারে বসিয়া টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া কাহাকে চিঠি লিখিতেছিল। বীণা চেয়ারের হাতলের উপর বাঁহাতখানা রাখিয়া পরিমলের অতি নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। আশীর্ব্বাদের দামী আংটীটি তাহার হাতে বড় মানাইয়াছে। বীণাকে দেখিয়া পরিমল চিঠি লেখা রাখিয়া দিল; বলিল, "বীণা, তোমার কোন কাজ আছে? এখানে বস্‌তে একটু সময় হবে কি? তুমি একেবারে পর হ'য়ে যাবার আগে তোমাকে দু'একটা কথা বল্‌তে চাই।' বলিয়া পরিমল বাহিরে গেল, বাথরুমে গিয়া মুখে চোখে জল দিয়া শরীরটাকে একটু ঠাণ্ডা করিয়া লইল। বীণাকে তেমনি আড়ষ্টভাবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া বলিয়া ফেলিল, 'এই জান্‌লাটার কাছে এসে বোসো, এখানে হাওয়া আছে।' দুজনে দুখানা চেয়ারে বসিয়া পড়িল। বীণা বুঝিয়া উঠিতে পারিল না, কি এমন কথা যাহার জন্য এত আড়ম্বর। কতক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া পরিমল বলিল, 'তুমি তো যাচ্ছ মহা কোলাহল আর আনন্দের মাঝখানে, কিন্তু আমি কি করে থাক্‌বো বীণা? আমি যে বড় একা, তুমি আমায় তোমার করে নিলে না কেন? তোমাকে যে আমার এত প্রয়োজন তা আমি আগে বুঝতে পারিনি, যদি পারতাম তবে বোধ হয় সে ব্যবস্থাই হোতো। পার তো আমায় আজকের এই উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য ক্ষমা করো' পরিমল দুহাত দিয়া বীণার মাথাটা নিজের দিকে সরাইয়া আনিয়া কাণের কাছে মুখ লইয়া আস্তে আস্তে বলিল, 'তুমিই আমার সব, আমি আর কাউকে জানি না।' কথাটা শুনিয়া বীণা লজ্জায় একেবারে লাল হইয়া গেল। পরিমলের দুঃখে তাহার অন্তর কাঁদিয়া উঠিল, তাই সে একটা প্রতিবাদ করিতে পারিল না, নীরবে সব কথা শুনিয়া বাহির হইয়া গেল।

সে রাত্রে বীণা ভাল করিয়া ঘুমাইতে পারিল না, বিছানায় শুইয়া ছটফট করিয়া কাটাইতে লাগিল। পরিমলের কথা সে যতই ভাবে ততই তাহার কেমন মায়া হয়। কিছুদিন আগেও যদি সে জানিতে পারিত, তবে নিশ্চয়ই মাকে বলিয়া সে পরিমলের হইতে পারিত। এখন আর সে উপায় নাই, আশীর্ব্বাদের পর কেমন করিয়া সম্ভব হয়। পরিমলকে ভালবাসার কথা বীণা কোনদিন মনে করিতে পারে নাই, আজ সে যেন অনুভব করিল, পরিমলকে তাহারও ভাল লাগে।

বীণার বিবাহ হইয়া গেল। তারপর আর পরিমলের সঙ্গে তাহার দেখা হয় নাই। যে কয়টা কালো দাগ বীণার বুকে আঁচড় কাটিয়াছিল, অজিতের ভালবাসায় তাহা ক্রমে ক্রমে অস্পষ্ট হইয়া গেল।

রাত যখন প্রায় দশটার কাছাকাছি, বীণা সহজ-ভাবেই চাহিল এবং আস্তে দু' একটা কথা বলিতে লাগিল। পরিমল অজিতের মাকে পাশের ঘরে বিছানা পাতিয়া দিয়া একটু শুইয়া লইতে বলিল। 'অনেক রাত হয়েছে আপনার শরীরও ভাল নয়, একটু শুয়ে পড়ুন।' অজিতও মাকে শুইতে জোর করিল, 'আমরা দুজন রইলাম, ভাব্‌না কি তুমি একটু শুয়ে নাও মা।' অগত্যা অজিতের মা যাইতে বাধ্য হইলেন। প্রায় আধ ঘণ্টা পর বীণাকে বেশ সুস্থ দেখিয়া বাড়ী লইয়া যাইবার জন্য একটা মোটরের সন্ধানে অজিত বাহির হইয়া পড়িল। অজিত চলিয়া যাওয়ার পর বীণা কিম্বা পরিমল কোন কথা বলিতে পারিল না। এতক্ষণ অজিতের সাক্ষাতে যে সহজ ভাবটুকু ছিল এবার তাহা মিলাইয়া গেল। অনেকক্ষণ পরে পরিমল বীণার মুখের দিকে তাহার হৃদয়ের সবস্ত বেদনা লইয়া এমন করুণ দৃষ্টি দিয়া তাকাইল যে বীণা লজ্জায় চোখ বুজিল। পরিমল কাছে আসিয়া বীণার বাঁ হাতখানা নিজের হাতে তুলিয়া লইয়া একটু জোরে চাপ দিল, তাহাতে বীণার সমস্ত হৃদয়তন্ত্রী বাজিয়া উঠিল। পরিমল যতই শান্ত সংযমী হোক এবার সে বড় চঞ্চল হইয়া উঠিয়া বলিতে লাগিল, 'আমাকে তোমার মনে আছে বীণা? এখন তুমি আগের চেয়েও অনেক সুন্দর হয়েছো। রংটা একটু ময়লা হয়ে গেছে কিন্তু।' বীণা মৃদু হাসিয়া বলিল, 'আপনার চেহারাও অনেক বদ্‌লেছে। তারপর বিয়ে করলেন কবে, একটু খবরও পেলাম না।' খানিক চুপ থাকিয়া পরিমল বলিল, বিয়ে তো আমি করিনি, তুমি খবর পাবে কেমন করে?

"বীণা যদি জানতে তুমি আমার কি ক্ষতি করেছো, তাহলে আর ওকথা মুখেও আন্‌তে পারতে না। আমার জীবন তুমিই খালি করে চলে এসেছিলে। সে শূন্যতা আজও আমি পূরণ করতে পারিনি। কিন্তু বীণা আমি পরকাল মানি। আমি তারই প্রতীক্ষায় আছি। তুমি আমায় চাও বা না চাও আমি তোমায় চাই।' বীণা স্তম্ভিত হইয়া পরিমলের কথা শুনিতেছিল। তাহার জন্য একটা মূল্যবান্ জীবন একেবারে ব্যর্থ হইয়া গেল। আজ পর্য্যন্ত সে বিবাহ করে নাই তাহারই জন্য। শ্রদ্ধায় বীণার মাথা পরিমলের পায়ে লুটাইয়া পড়িতে চাহিল।

যে ভক্ত সমস্ত পূজার অর্ঘ্য অলক্ষ্যে তাহাকে নিবেদন করিয়া তৃপ্ত হইতেছে, তাহাকে সে কেমন করিয়া বঞ্চিত করিবে? বীণার ইচ্ছা হইতেছিল, পরিমলের কাছ হইতে ছুটিয়া পলাইয়া বাঁচে। তাহার জীবনে কেন এমন রহস্য হইল? পরিমলকে একটু সুখী করিবার কোন ক্ষমতাই তাহার নাই। অজিত যখন আসিয়া ঘরে ঢুকিল, তখন তারা দুজনেই চুপ করিয়া বসিয়াছিল। বীণার হাত ধরিয়া অজিত বলিল, 'বীণা, গাড়ী এসেছে, বাড়ী যাবে চলো'। মোটরের হর্ণের শব্দে জাগিয়া উঠিয়া অজিতের মাও হাই তুলিতে তুলিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বীণা করুণ দৃষ্টিতে একবার পরিমলের দিকে তাকাইয়া, স্বামীর সঙ্গে মোটরে গিয়া উঠিয়া বসিল।

নারী-সাহিত্যে শরৎচন্দ্র

শ্রীশ্বেতকুমার মুখোপাধ্যায়

আজ যৌবনের কোঠায় আসিয়া কেবল একটা কথাই ছায়ার মত মনে পড়ে। বাল্যে যখন পিতামহীর নিকট গল্পের জন্য দরবার করিতাম তখনই তিনি আরম্ভ করিতেন, "এক যে ছিল রাজা, তার ছিল দুই রাণী, সুয়োরাণী আর দুয়োরাণী; সুয়োরাণী ছিল রাজার মাথার মণি, আর দুয়োরাণী ছিল দু'চক্ষের বিষ" ইত্যাদি আরো কত কি!

কথা সাহিত্যে দেখি, সেই রাজকীয় প্রথা অক্ষুণ্ণ। উপন্যাস বা সাহিত্য সম্রাট শরৎচন্দ্রের নারী চিত্রাঙ্কণ তাঁহার সুয়ো এবং পুরুষ চিত্র তাঁহার দুয়ো রাণী। তাঁহার দরদী বুকের সকল কিছু প্রীতি, সহানুভূতি ও অনুরাগ নিঃশেষে ঢালিয়া দিয়াছেন নারী চরিত্রে; আর, পুরুষের ভাগ্যে বিরাগলাভ সম্পূর্ণরূপে না ঘটিলেও উপেক্ষা এবং অবহেলা সুপ্রচুর। পুরুষ চরিত্রগুলি তিনি অঙ্কিত করিয়াছেন তাঁহার নারী-চরিত্র বিকাশের পূর্ণ সহায়করূপে —নারীত্বের বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি ও পরিপুষ্টির প্রয়োজনীয় ঘাত-প্রতিঘাতের পারিপার্শ্বিক রচনার উপকরণ করিয়া।

নারী-হৃদয়ের সকল কক্ষেই শরৎচন্দ্রের প্রীতিপ্লুত রশ্মি অবাধে প্রবেশলাভ করিয়া কত না অজ্ঞাত, অপরিচিত ও অভাবনীয় তথ্যের আবিষ্কার করিয়াছে। নারীর কোমলতা, স্নেহমাধুর্য্য, সেবানৈপুণ্য, সংযম, মাতৃত্বের গর্ব্ব এবং তাহার কঠোরতা, কলহশীলতা, পরশ্রীকাতরতা, ঈর্ষাভিমান—এই সকল দোষগুণেরই সন্ধান রাখিয়া এই রূপদক্ষ যে সমগ্র নারীত্বের স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা অভিনব হইলেও অনাত্মীয় বলিয়া বাঙ্গালী তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারে নাই।

শরৎচন্দ্রের নারী চরিত্রাবলী বৈচিত্র্যে উজ্জ্বল এবং চরিত্রগত দোষগুণের অপূর্ব্ব সমাবেশ। নারীকে কেবল মহিমান্বিত করিয়া তিনি চিত্রিত করেন নাই, তাহাদের দৈন্য ও দুর্ব্বলতাকেও তিনি মূর্ত্ত করিয়াছেন। নারীর সুগভীর মর্ম্মস্থল স্পর্শ করিয়া তাহার অন্তর্নিহিত ভালমন্দের বিচিত্র সমাবেশকে তিনি নানারূপে রূপ দিয়াছেন তাঁহার অতুল তুলিকাপাতে। নারীর সমগ্র হৃদয়ের তেজস্বিতা ও দুর্ব্বলতা, মাধুর্য্য ও দৃঢ়তা, ঈর্ষা ও সংযম, বিদ্রোহ ও সহনশীলতা প্রভৃতি পরস্পর বিরোধী মনোবৃত্তির পরিচয় তাঁহার রচনাবলীর মধ্যে সুপ্রচুর। নারীহৃদয়ের সকল মনোবৃত্তির নিখুঁত চিত্রে শরৎ-সাহিত্য যে কতদূর পরিপুষ্ট, তাহার কয়েকটি মাত্র নিদর্শন দিবার সামান্য একটু চেষ্টা করা যাক:—

সেবা-নৈপুণ্যে নারী

সেবা নিরতা নারীর চিত্র শরৎ-সাহিত্যে সুপ্রচুররূপে বিদ্যমান। "অন্নদা দিদি"র স্বামী সেবা, ধর্ম্মত্যাগী স্বামীর জন্য সর্ব্বস্বত্যাগ—সে এক অপূর্ব্ব কাহিনী। "বড়দিদি মাধবীর" সেবানৈপুণ্যে আত্মীয়বৃন্দ, এমন কি অনাত্মীয় দাসদাসীরাও তাহার গুণে মুগ্ধ ও তাহার একান্ত অনুগত। "শৈলজার" প্রাণপাত সেবা, "বিরাজ বৌ"এর সেবার প্রভাব, "মৃণালে"র অক্লান্ত সেবা, 'গুরুচরণে' সংসারে কিশোরী "ললিতার" কৃতজ্ঞতাপূর্ণ সেবা, 'অতুলের' মারাত্মক ব্যাধিতে 'জ্ঞানদার' প্রাণান্ত সেবা, 'মৃত্যুঞ্জয়কে' লইয়া যমের সহিত "বিলাসীর" দীর্ঘকালব্যাপী অমানুষিক সংগ্রাম —এই সকলের চিত্র কত না মধুর। খৃষ্টানী "ভারতীর" বসন্তরোগে 'তেওয়ারীর' নিঃসঙ্কোচ ও নির্ভয় সেবা এবং 'অপূর্ব্বের' প্রতি প্রাণঢালা সেবার ইতিহাসে পথের দাবী চির-উজ্জ্বল হইয়া থাকিবে। মুসলমান বালিকা অশিক্ষিতা আমিনার পিতৃসেবার চিত্রও কত সকরুণ।

গৃহকর্ত্রীত্বে নারী

নারীর স্থান গৃহস্থালীতে। গৃহিণীপনার উপর গৃহের শুভাশুভ যে পরিমাণে নির্ভর করে, অন্য কিছুর উপর ততটা নহে। সুগৃহিণীর সুবিবেচনায় গৃহে শান্তি [illegible]

থাকে এবং গৃহিণীর অশেষ নির্ব্বুদ্ধিতার ফলে কত না পরিবার অশান্তি ও অকল্যাণে নিপীড়িত হয়। জ্যেঠাই-মা 'বিশ্বেশ্বরীর' পাকা গৃহিণীপনার অভাবে পল্লীসমাজের চিত্র কত বিভিন্ন হইয়া যাইত। শেখরের মা 'ভুবনেশ্বরী' সুগৃহিণী বলিয়াই 'পরিণীতা' নাম সার্থক হইয়াছে। 'বৈকুণ্ঠের' দ্বিতীয়পক্ষ 'ভবানীর' সুবিবেচনার কাহিনী কি মনোরম! 'উষার' গৃহকর্ত্রীত্বে 'শৈলেশ্বরের' সংসারে কয়েক দিনেই নববিধান প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। 'বিরাজ-বৌ' 'বিরাজের' গৃহিণীপনার চিত্তগ্রাহী উপাখ্যান।

মাধুর্য্যে নারী

নারীর মাধুর্য্যই স্বাভাবিক বলিয়া বিবেচিত। শরৎ-চন্দ্রের নারী চিত্রগুলি অধিকাংশই মাধুর্য্যে উজ্জ্বল। 'ইন্দ্রনাথ' ও 'শ্রীকান্তের' প্রতি 'অন্নদা দিদির' অকৃত্রিম ভ্রাতৃস্নেহ, 'বড়দিদি' 'মাধবীর' মধুর স্নেহ প্রবণতা, মেজদি 'হেমাঙ্গিনীর' 'কেষ্টার' জন্য ব্যাকুল মমতা, 'সরযুর' অপূর্ব্ব প্রীতি, 'সুরবালার' সরলতা পাঠকমাত্রকেই মুগ্ধ করে। 'সব্যসাচী' 'ডাক্তারের' প্রতি 'ভারতীর' স্নেহ কোমলতা, 'পথের দাবী'র কঠোরতাকে মধুময় করিয়া তুলিয়াছে। 'বিজলীর' প্রতি 'রাধারাণীর' সৌজন্য, "আঁধারে আলো" জ্বালিয়াছে। এমন কি, পোড়াকাঠখানা 'ভামিনীরও' মাধুর্য্যের আস্বাদলাভ করিয়া 'অরক্ষণীয়া' 'জ্ঞানদা' ও তাহার মাতা চমৎকৃতা হইয়াছিলেন। 'রমা' ও 'বিজয়ার' 'রমেশ' ও 'নরেন্দ্রকে' আহার করাইবার চিত্রদ্বয় মাধুর্য্যে অতীব সমুজ্জ্বল। আরাকানে পলায়ন করিবার পূর্ব্বে 'কিরণময়ী' ও 'দিবাকরের' পরিহাস, তরল রসালাপ অতীব সরস ও সুন্দর।

সংযম ও ধৈর্য্যে নারী

মাধুরী নারী চরিত্রের ভূষণ হইলেও সংযম ও সহন-শীলতার অভাবে তাহা নিষ্প্রভ হইয়া পড়ে। এই দুইটির অভাবে অনর্থ ঘটিতে কিছুমাত্র বিলম্ব হয় না। নারী-হৃদয়ের মধুর কোমলতা এবং সংযত দৃঢ়তার অপূর্ব্ব সমাবেশই তাহাকে এত বিচিত্র ও রহস্যময় করিয়া তুলে। 'সাবিত্রীর' সংযম শরৎ-সাহিত্যেও বিরল। প্রেমাস্পদের কল্যাণের জন্য আপনার সকল সুখের আশা বিসর্জ্জনের মধ্যে, যে সংযম ও স্বার্থত্যাগের পরিচয় সে দিয়াছে, তাহার বোধ করি তুলনা নাই। তাহার দৃঢ়তা এবং আত্মদমনের প্রসাদেই 'সতীশের' জীবনের ধারা পরি-বর্ত্তিত হইল। অথচ এই 'সাবিত্রীরই' স্নেহকোমল হৃদয়ের চিত্র কতই না সুমধুর। 'বৈকুণ্ঠের' মৃত্যুর পর 'গোকুল' ও তাহার পত্নী 'মনোরমার' আচরণে দিবানিশি মর্ম্মপীড়ায় উৎকণ্ঠিতা 'ভবানী' কি অপরিসীম ধৈর্য্য সহকারে সকল অত্যাচার সহ্য করিয়াছেন। তাঁহার সহনশীলতার যে সুন্দর চিত্র শিল্পী আঁকিয়াছেন, তাহা সকলেরই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। 'অপূর্ব্বের' হাতে লাঞ্ছিতা হইয়াও ভারতীর সংযম অক্ষুণ্ণ ছিল এবং তাহারই কল্যাণের জন্য তাঁহার সাহেব-মেজাজী স্বামী এবং পুত্র-গণের অপমান চিহ্নিত আচরণ হাসিমুখেই আজীবন সহ্য করিয়াছিলেন। 'সরোজিনীর' মা 'জগত্তারিণীও' এইরূপ নির্য্যাতন প্রসন্নচিত্তে সহ্য করিয়াছিলেন। 'বেণী ঘোষালের' মা 'বিশ্বেশ্বরী' পুত্রের অনাচারে মর্ম্মপীড়া কিছু অল্প ভোগ করেন নাই। 'কেষ্টার' প্রতি অত্যাচারের প্রতিবাদ মেজদি 'হেমাঙ্গিনীর' সঙ্কল্পের দৃঢ়তায় 'বিপিনকে' শেষ পর্য্যন্ত এই অনাথ বালকটিকে আশ্রয় দিতে হইয়াছিল। আর 'গঙ্গামণির' দৃঢ়তাই গয়ারামের বিরুদ্ধে মামলার ফলকে বিফল করিয়া দিয়াছিল। তরুণী অনভিজ্ঞা 'বিজয়ার' দৃঢ়তাও উল্লেখযোগ্য। কৌশল এবং শেষে ভীতি প্রদর্শন করিয়াও কপট চূড়ামণি বৃদ্ধ 'রাস-বিহারী' তাহার নিকট হইতে দলিল-পত্রাদি হস্তগত করিতে সাহসী হন নাই।

'অন্নদাদিদির' অসাধারণ সহনশীলতা, 'কুসুমের' সংযম, 'ষোড়শীর' দৃঢ়তা, 'শৈলজার' ধৈর্য্য, 'সত্যেন্দ্রের' নিকট অপমানে 'বিজলীর' ক্ষমা, 'রমার' আজীবন 'রমেশের' নিকট আত্মগোপন এবং নিরপরাধে নির্ব্বাসিতা 'সরযূর' সংযত আচরণ শরৎ-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। নির্ব্বাসিত 'কমলের' চরিত্র 'শেষপ্রশ্নের' মধ্যে এক অদ্ভুত-পূর্ব্ব ঘটনা। আজীবন ব্রহ্মচর্য্য সহকারে কাটাইয়া, প্রশ্নের পর প্রশ্ন সমাধান করিয়া 'কমলও' আমাদের চোখে চির জাগরূক আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকিবে।

পাণ্ডিত্যে নারী

শরৎচন্দ্রের নারীবৃন্দের মধ্যে একমাত্র 'কমলই' সর্ব্বগুণ-সম্পন্না। অগাধ পাণ্ডিত্যে ব্যুৎপত্তি হয়ত সে সম্পূর্ণ লাভ করিতে পারে নাই কিন্তু শেষপ্রশ্নে এমন কোন বিষয়ের অবতারণা করা নাই যাহা হয়ত 'কমলের' কাছে অজ্ঞাত। একজন দীনা নারী যে শাস্ত্র হইতে তন্ত্রসার পর্য্যন্ত এরূপ ভাবে করায়ত্ত করিয়া রাখিতে পারে তাহা আমরা সেই পৌরাণিক যুগের এক খনা ও লীলাবতী ব্যতীত আর কাহাকেও দেখিনা। সত্য কথা বলিলে 'কমলকে' লইয়া শরৎবাবু একটি সমালোচনা যোগ্য বস্তু বাহির করিয়াছেন যাহার উত্তর হয়ত আমাদের মত স্বল্পবুদ্ধি প্রযুক্ত লোকে সঠিক দিতে পারে না। একমাত্র কমল ব্যতীত শরৎ-চন্দ্রের নারীমহল আধুনিক উচ্চশিক্ষিতা না হইলেও, নারীর সহজ শিক্ষা প্রায় প্রত্যেকেরই আছে। বিজয়া, নলিনী, অচলা, লাবণ্যপ্রভা, ভারতী সুশিক্ষিতা ছিলেন। রমা, ললিতা, অলকা, সন্ধ্যা, নির্ম্মলা, ঊষা, সুরবালা, সরোজিনী, হেমনলিনী, বিন্দু, মাধবী, সৌদামিনী প্রভৃতি সকলেই শিক্ষিতা, তবে পাণ্ডিত্যে কিরণময়ী, সুমিত্রা ও কমলের সমকক্ষ কেহ নাই। শাস্ত্র, সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতি জটিল বিষয়েও তাঁহাদের যথেষ্ট অধিকার ছিল। ডাক্তার পর্য্যন্ত সুমিত্রাকে 'বিদূষী' বলিতেন, 'আশুবাবুও' কমলকে দেবী আখ্যা দিয়াছিলেন এবং তাঁহার বিদ্যা ও জ্ঞানের প্রশংসা করিতেন। কমলের মত দ্বিতীয় বিদূষী নারী শরৎ-সাহিত্যে দুটি দেখিলাম না।

নেতৃত্বে নারী

পথের দাবীর বিচিত্র ও বিশাল সঙ্ঘের নেত্রী ছিলেন সুমিত্রা। ডাক্তার ইহার প্রতিষ্ঠাতা এবং অদ্বিতীয় নেতা হইলেও সুমিত্রা ছিলেন সভানেত্রী। এই দায়িত্বপূর্ণ গুরুভার অসঙ্কোচে এক নারীর মস্তকে তিনি অর্পণ করিয়াছিলেন, নিশ্চয়ই তিনি সেই নারীর সামর্থ্যে সম্যক পরিচয় পাইয়াছিলেন বলিয়া। তারা-দাসের পলায়নের পর ষোড়শী বা অলকা একাকীই জমিদারের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিল। রমা জমিদারী রক্ষণে বেণীঘোষালের সমকক্ষেরও অধিক ছিল। জ্যেঠাই-মা বিশ্বেশ্বরী কর্ণধার না হইলে রমেশের পিতৃশ্রাদ্ধ কতদূর গড়াইত কে জানে?

মাতৃত্বে নারী

মাতৃত্বেই নারীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অধিকার। মাতৃগর্ব্বের যে চিত্র শরৎচন্দ্র আঁকিয়াছেন, তাহা প্রকৃতই অতুলনীয়। নারী সৌন্দর্য্যের বিশ্লেষণ করিতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন, সন্তানধারণের উপযোগী রূপই নারীর শ্রেষ্ঠ রূপ। গর্ভে ধারণ না করিলেও মাতৃস্নেহ যে নারীর হৃদয়কে স্নিগ্ধ ও মধুর করিয়া তুলে এবং অপরের সন্তানের শিরে শত-ধারায় বর্ষিত হইয়া তাহাকে ধন্য করিয়া দেয়, শরৎ সাহিত্যের ইহা একটী মূল কথা। অমূল্যর প্রতি বিন্দুর অকৃত্রিম মাতৃস্নেহ তাহার কল্যাণ কামনায় ননদ এলোকেশী এমন কি তাহার পিতামাতার সহিত মনোমালিন্য বিন্দুর ছেলে নামটীকে সত্য করিয়া তুলিয়াছে। মাতৃহীন দেবর রামের প্রতি নারায়ণীর মাতার অধিক স্নেহ এবং নিজের স্বামী ও মাতার সহিত কলহ 'রামের সুমতির' প্রধান কারণ। মাতৃহীন দেবর পুত্র গয়ারামের প্রতি গঙ্গামণির অপূর্ব্ব মাতৃস্নেহ স্বীয় স্বামী ও ভ্রাতার বিরুদ্ধাচারণে তাহাকে প্রবৃত্ত করিয়াছিল। অসহায় অনাথ বালক কেষ্টার জন্য সেজদি হেমাঙ্গিণীর মনোভাব ও আত্ম-নির্য্যাতন, কাদম্বিনীর সহিত বিবাদ এবং পরিশেষে তাহাকে আশ্রয় দানের জন্য পতিগৃহত্যাগের মাতৃস্নেহের চিত্র কত করুণ ভাবেই না ফুটিয়া উঠিয়াছে। পরীক্ষাতে সপত্নীপুত্র গোকুলের অকৃতকার্য্যতায় ভবানীর সমবেদনা প্রকাশের ছোট চিত্রটী কত না মধুর! স্বীয় সন্তানের স্বার্থ বলি দিয়া একান্তভাবে গোকুলের উপর তাঁহার নির্ভরতা, তাঁহার মাতৃহৃদয়ের পরিচয় দিতেছে। বেণী ঘোষালের অনাচারে বিশ্বেশ্বরীর মর্ম্মভেদ আক্ষেপ। পুত্রের হস্তে মুখাগ্নির ভয়ে তাঁহার কাশীতে প্রয়াণ, তাঁহার জননী হৃদয়ের নিবিড় বেদনার গভীরতা কি মর্ম্মান্তিক ভাবেই না প্রকাশ করিয়াছে। বহু [illegible] সপত্নীসন্তানপরিবৃতা রাজলক্ষ্মীর [illegible] দেখিয়া পাটনার পিয়ারী বাইজিকে চেনা [illegible]।

শেখরের মা ভুবনেশ্বরী ও অপূর্ব্বর মা করুণাময়ীও অপূর্ব্ব স্নেহময়ী। এমন কি, পোড়াকাঠখানা ভামিনীরও মাতৃহৃদয় অরক্ষণীয়া জ্ঞানদার কুপাত্রের বিবাহের চেষ্টাতে স্বামীর বিরুদ্ধে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। গর্ভস্থ সন্তানের প্রতি মমতাই বিধবা জ্ঞানদা ও নির্য্যাতিতা সরযুকে আত্মহত্যার মহাপাতক হইতে পরিত্রাণ করিয়াছিল।

পাতিব্রত্যে নারী

অন্নদাদিদির কাহিনী প্রথমেই শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিতে হয়। এই ব্রাহ্মণকন্যা নারী-হন্তা, নর-পিশাচ, ধর্ম্মত্যাগী স্বামীর জন্য স্বেচ্ছায় কলঙ্কের ডালা মাথায় তুলিয়া লইয়া সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া বসিল। তাহারই বিধবা অগ্রজাকে কলুষিত করিয়া যে হত্যা করিয়াছে, তাহাকে নির্ম্মমভাবে যে পরিত্যাগ করিয়াছে, পিতৃপিতামহের ধর্ম্মকে যে ত্যাগ করিয়া বিধর্ম্মী হইয়াছে, সেই মহাপাতক স্বামীর জন্য সে হাসিমুখে অশেষ দুঃখ ও দারুণ দৈন্য বরণ করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইল না। বিরাজ বৌএর পতিসেবা ও পাতিব্রত্য উল্লেখযোগ্য। অর্দ্ধাশনে, অনশনে দিনের পর দিন কঠোর দারিদ্র্যের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের মধ্যেও তাহার পতিভক্তি অক্ষুণ্ণ ছিল। এই নিদারুণ দৈন্য ও মনস্তাপের দিনে স্বামীর তীব্র আঘাতই তাহাকে ক্ষিপ্ত করিয়াছিল এবং সেই ক্ষিপ্ততার ফলে সে রাজেন্দ্রের অনুগামিনী হইয়াছিল। পরে প্রকৃতিস্থ হইবামাত্র পলায়নপূর্ব্বক আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল। সরযুর একনিষ্ঠ পতিভক্তির তুলনা বাঙ্গালা সাহিত্যে বিরল। নিরপরাধী স্বামী পরিত্যক্তা হইয়াও সেই স্বামীর প্রতি একদিনের তরেও সে বিমুখ হয় নাই। মুমূর্ষু স্বামীর শান্তিলাভের জন্য স্বীয়পুত্র বিনোদকে পিতৃসম্পত্তি হইতে অকুণ্ঠিত চিত্তে বঞ্চিত করিয়া ভবানী স্বামীভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। খেলার ছলে গাঁদাফুলের মালা বদলকে বিবাহ জ্ঞানে চতুর্দ্দশী ললিতা শেখরকেই স্বামীত্বে বরণ করিয়া দীর্ঘ চারি বৎসর কি ভাবে যাপন করিয়াছিল, তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। পরমোপকারী উন্নতচেতা, গিরীন্দ্রের অনুনয়কে সে হাসিমুখে প্রত্যাখান করিয়াছিল। রাধারাণীর লজ্জা দেখিয়া অসঙ্কোচেই বিজলী বলিয়াছিল "তাঁর পায়ে আমার শতকোটী প্রণাম জানিয়ে বোলো, সে হবার নয়। আমার নিজের বলে আর কিছু নেই। অপমান করলে, সমস্ত অপমান তার গায়েই লাগবে।" সমাজে পতিতা বিজলীর এই বিজয়োক্তিতে যাহা আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, তাহাকে পাতিব্রত্য বলিয়া অভিনন্দিত করিতে দ্বিধাবোধ করি না। সতীশের কল্যাণের জন্য সমাজচ্যুতা সাবিত্রীর অকুণ্ঠিত আত্ম-বলিদানে পাতিব্রত্যের উৎকর্ষ সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। আর একটী পতিতা নারীর পতিভক্তির প্রসঙ্গ শরৎসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। শ্রীকান্তকে আশ্রয় করিয়া যে অপূর্ব্ব অনুভূতি পিয়ারী বা রাজলক্ষ্মীর নারীহৃদয়কে সরস করিয়া তুলিয়াছিল এবং তাহার জীবনে অপরূপ ভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছিল, তাহাকে পাতিব্রত্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। শ্রীকান্তের প্রতি তাহার সেই সেই সগর্ব্ব উক্তি 'এই আমার ঈশ্বর দত্ত ধন। যখন সংসারের ভাল-মন্দ জ্ঞান পর্য্যন্ত হয়নি তখনকার; আজকের নয়, তাহার প্রেমের গভীরতাকে সুস্পষ্ট করিয়া তুলে।

বিদ্রোহে নারী

অমূল্যর অকল্যাণে ভীতা বিন্দুর বিদ্রোহ, দারিদ্র্যের অত্যাচারে ও স্বামীর নির্য্যাতনে, বিরাজ বৌএর বিদ্রোহ স্বামী ও ভ্রাতার বিরুদ্ধে গঙ্গামণির বিদ্রোহ, অরক্ষণীয়া জ্ঞানদার পক্ষ লইয়া পোড়াকাঠ ভামিনীর স্বামীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, বেণী ঘোষাল প্রভৃতির বিরুদ্ধে রমার বিদ্রোহ—কত না বিদ্রোহের কাহিনী, শরৎ-সাহিত্যে নারী হৃদয়ের তেজস্বিতার পরিচয় দিতেছে। কেষ্টার প্রতি অত্যাচারের প্রতিকারকল্পে স্নেহময়ী হেমাঙ্গিনী স্বামীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহিনী হইয়া উঠিয়াছিল। সর্ব্বাপেক্ষা সুতীব্র ভাবে বিদ্রোহের বাণী উচ্চারিত হইয়াছিল অভয়ার কণ্ঠে। সমাজের অত্যাচারের প্রতিবাদ তাহার সেই সুতীক্ষ্ণ প্রশ্ন 'একদিন আমাকে দিয়ে বিয়ের মন্ত্র বলিয়ে নেওয়া হয়েছিল, সেই বলিয়ে নেওয়াটাই কি আমার জীবনের একমাত্র সত্য, আর সমস্তই একেবারে মিথ্যা? এত বড় অন্যায়, এত বড় নিষ্ঠুর অত্যাচার কিছুই আমার পক্ষে একেবারে

কিছু না? আর আমার পত্নীত্বের অধিকার নেই; আমার মা হওয়ার অধিকার নেই?" আজিও প্রশ্ন হইয়াই কানে বাজিতেছে, সদুত্তর তাহার মিলে নাই।

বিবাদে নারী

নারীসুলভ এই ক্ষমতাটার নিদর্শন শরৎ-সাহিত্যে বিরল নহে। মাসীর অত্যুগ্র বিষোদ্গারে 'রমাকে' পর্য্যন্ত স্বীকার করিতে হইয়াছিল "তুমি যখন নিজে বলেছ মাসী, তখন সেই তো সকলের চেয়ে ভাল হয়েছে। যে যতই বলুক না কেন, এতখানি বিষ জিভ দিয়ে ছড়াতে কেউত পেরে উঠতো না?" তারপর ক্ষ্যান্ত মাসী। এই মাসীটিরও রসনা বড় কম জ্বালাময়ী নয়। অতুলের মাসী স্বর্ণমঞ্জরীর এখানে উল্লেখ না করিলে, তাঁহার কলহ-কুশলতাকে অযথা খর্ব্ব করা হয়। ষোড়শী, নয়নতারা, রাসমণি, লক্ষ্মী, ভামিনী, কাদম্বিনী, মনোরমা ও জগদ্ধাত্রী, ইহারা সকলেই এ বিদ্যায় পারদর্শিনী ছিলেন। 'রমা'ও নিতান্ত অপটু ছিল না। নারায়ণীর মাতা কাত্যায়নী নিজের দুহিতা ও জামাতার কল্যাণের জন্য তাহাদেরই সহিত, তাহাদেরই আশ্রয়ে, বাক্যয় রণ-কৌশলের যে নমুনা দেখাইয়াছিলেন তাহা অতীব উচ্চাঙ্গের।

ঈর্ষায় নারী

ঈর্ষা, নারীর প্রকৃতিতে অসাধারণ পরিবর্ত্তন ঘটায়। স্নেহময়ী কোমল হৃদয়া রমণী ঈর্ষাবশে নির্ম্মম ও নৃশংস হইয়া উঠে, সে ঈর্ষা প্রকৃত, অথবা কাল্পনিকই হউক। নরেন্দ্রের উপর বিজয়ার ভালবাসার পরিসীমা ছিল না, কিন্তু নলিনীর প্রতি নরেন্দ্রের কল্পিত অনুরাগের ঈর্ষা তাহার সমস্ত চিত্তটি তিক্ত করিয়া দিয়াছিল। যে নরেন্দ্রের জন্য সে বিলাসবিহারী ও তাহার পিতা রাসবিহারীকে কষ্ট করিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হয় নাই, আচার্য্য দয়ালচন্দ্রের বাটীতে সেই নরেন্দ্রকেই মুখের একটা সম্ভাষণ পর্য্যন্ত না করিয়া কি উপেক্ষা ও অবজ্ঞা প্রদর্শনই না সে করিয়া বসিল! ঠিক এই ভ্রমেই সুমিত্রা ভারতীর প্রতি ঈর্ষান্বিতা হইয়াছিলেন, অথচ ডাক্তারকে কেন্দ্র করিয়া ভারতীর শ্রদ্ধা ভগিনীর স্নেহকে কদাচ অতিক্রম করে নাই। সতী-মায়ের সতী মেয়ে নির্ম্মলার ঈর্ষার প্রচণ্ড প্রতাপে তাহার স্বামী হরিশের অন্তরাত্মা পর্য্যন্ত অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু কি করুণ ও নির্ম্মম কিরণময়ীর ঈর্ষার ইতিহাস! উপেন্দ্রকে সে ভালবাসিয়াছিল। তাহার হৃদয়-জয়ের বিধিমত প্রয়াস পাইয়াও সে বিফল হইয়াছিল। এই বিফলতার আক্রোশে উপেন্দ্রকে কঠোরতম আঘাত দিবার মানসে সে উপেন্দ্রও সুরবালার অশেষ প্রিয় নিষ্কলুষ দিবাকরকে নিম্নতম সোপানে টানিয়া আনিয়াছিল। নিজের দুর্গতির প্রতি লক্ষ্য করিবার অবসরও একবার তাহার মিলে নাই।

এইরূপে নারী-চরিত্রের সকল দিকই শরৎ-সাহিত্যে যথাযথ চিত্রিত হইয়াছে। নারী-হৃদয়ের প্রেম, প্রীতি, মাধুর্য্য, স্নেহ প্রভৃতি সব কিছু সুন্দরেরই উজ্জল চিত্র শিল্পী তাঁহার অতুল তুলিকাপাতে যেরূপ আঁকিয়াছেন, নারীর অক্ষমতা, ত্রুটী বিচ্যুতি, সকল দুর্ব্বলতারই সন্ধান রাখিয়া তেমনই অবিকৃতভাবে বিবৃত করিতে তিনি প্রয়াস পাইয়াছেন। তিনি আদর্শ নারীর চিত্র অঙ্কিত করেন নাই বা নারীর আদর্শ সৃষ্টি করিয়া বিশ্ববাসীর সম্মুখে স্থাপিত করিতে প্রয়াস পান নাই। তিনি আঁকিয়াছেন দোষগুণসম্পন্না আমাদের বাঙ্গালী মেয়ের নিখুঁত ছবি। নারীর আদর্শ কত মহান্ ও উন্নত হওয়া উচিৎ; নারী-হৃদয়ের বিশালতা ও গভীরতার পরিমাণ, বা তাহার কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্যের সীমানির্দ্দেশ করিতে গিয়া তাঁহার লেখনী অযথা ভারাক্রান্ত হয় নাই; অন্তঃপুরান্তরালবাসিনী, অবগুণ্ঠনাবৃতা, মূক মানবীদলের গোপন মর্ম্মের সহজ বিকাশটুকু যা জাতিগত, দেশগত, রক্তগত ও শিক্ষাগত, সংস্কার ও সমাজের কঠোর শাসনপাশের মধ্য দিয়া একটী বিশেষ বৈশিষ্ট্যে প্রস্ফুট বা অর্দ্ধস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে, তাহার সত্য রূপটী, আপনার অসাধারণ অনুভূতি, শক্তি ও সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে সাহিত্যগগনে তিনি সুস্পষ্টরূপে প্রতিফলিত করিয়া তুলিয়াছেন।

শরৎচন্দ্রের নারী মহিমান্বিতা, তেজোদৃপ্তা, স্নিগ্ধিনী, কখনও বা লজ্জা বিনম্রা মমতাময়ী কল্যাণী; কখনও বা সে গর্ব্বাহতা হিংসাময়ী ফণিণী, [illegible] দেখি বেদনাপ্লুতা নিরুপায়া [illegible]

তুলিকায় নারী-হৃদয়ের এই সুন্দর অসুন্দর আলো-ছায়া, স্বর্গ মর্ত্ত্য অপূর্ব্বভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। নারী-হৃদয়ের ভালো মন্দ,গুণ ত্রুটী, কল্যাণ অকল্যাণের বৈচিত্র্য তাহাকে যে বৈশিষ্ট্য প্রদান করিয়াছে সেই তাহার নারীত্ব, এবং এই নারীত্বই সম্পূর্ণরূপে পরিস্ফুট হইয়াছে শরৎচন্দ্রের নারীচরিত্রাবলীতে। প্রত্যেক নারীর হৃদয়ে,—হউক সে ভাগ্যবতী, স্বামী সোহাগিনী অশেষ শ্রদ্ধার পাত্রী, পুণ্যবতী সন্তান গর্ব্বিতা স্নেহময়ী জননী, শুদ্ধচারিণী পতিপ্রাণা বিধবা, বা উপেক্ষিতা অনাদৃতা পতিতা হত-ভাগিনী ;—নারী মাত্রেরই হৃদয়ে তাহার দোষগুণের বৈচিত্র্যের অন্তরালে ফল্গুধারার মত তাহার নারীত্ব চির-প্রবাহিত। পতিতা সাবিত্রী, রাজলক্ষ্মী, বিজলী, চন্দ্রমুখী, গৌরী, সৌদামিনী প্রভৃতির হৃদয়েও এই নারীত্বের বিকাশ দেখিতে পাই।

শরৎচন্দ্র নারী-অন্তরের গোপন কক্ষটী ও নারী-চরিত্রের মূল মেরুদণ্ডটী ঠিক আবিষ্কার করিতে পারিয়াছেন, যেখানে নারীর প্রধান শক্তি, মূল বৈশিষ্ট্য ও প্রধান দুর্ব্বলতা বিরাজমান ! যাহা হইতে নারী মহিমাময়ী এবং যাহা হইতে নারী ধ্বংসময়ী মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন। তাই শরৎ-সাহিত্যে নারী চরিত্র সম্পূর্ণ সত্য ও সত্য হইয়া ফুটিয়াছে।

শরৎচন্দ্রের নারী, খাঁটী ষোল আনাই নারী স্ত্রী—নর নহে। সর্ব্ববিষয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া নরের অধিকার সমূহ অর্জ্জনের প্রয়াসে ইহারা নারীত্ব বর্জ্জন করে নাই। নরের পরিপোষকতা করিয়া নারী জগতেই ইহারা বিচরণ করে এবং নিজেদের স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। ইহারা Suffragist নারী নহে, সুতরাং নরত্ব অর্জ্জনকেই নারীত্বের চরম বিকাশ মনে করেন না। আজিকার নারী-জাগরণের দিনে খাঁটী নারী-চিত্র আঁকিয়া এই সুনিপুণ চরিত্রশিল্পী নারীর তথা সমাজের প্রকৃত কল্যাণ সাধন করিতেছেন।

শরৎচন্দ্রের, নারীর প্রতি শ্রদ্ধা অপরিসীম। এতখানি অকপট শ্রদ্ধা আর কাহারও দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। মুক্তকণ্ঠে তিনি একস্থানে স্বীকার করিয়াছেন, "স্ত্রীলোককে কখনও আমি ছোট হীন করে দেখতে পারলুম না। বুদ্ধি, বিবেক দিয়ে যতই কেন না তর্ক করি, সংসারে পিশাচী কি নেই ! নেই যদি তবে পথে ঘাটে এত পাপের মূর্ত্তি দেখি কাদের ? সকলেই যদি ইন্দর দিদি হন, তবে এত প্রকার দুঃখের স্রোত বহাচ্ছে কারা ? তবু যেন কেমন ক'রে মনে হয়, এ সকল তাদের বাহ্য আবরণ ; যখন খুসী ফেলে দিয়ে ঠিক তার মতই সতীর আসনের উপর অনায়াসে গিয়ে বসতে পারে।" অন্যত্র বলিয়াছেন "আমি একটা সত্য বস্তু লাভ করেছি। নারীর কলঙ্ক আমি সহজে বিশ্বাস করতে পারি না। না জেনে নারী-কলঙ্ককে অবিশ্বাস করে সংসারে বরঞ্চ ঠকাও ভাল, কিন্তু বিশ্বাস ক'রে পাপের ভাগী হওয়ায় কোন লাভ নেই।" এ শুধু তাঁহার অনর্থক বাক্যাড়ম্বর নহে, তাঁহার প্রাণের জীবন্ত প্রত্যয়। তাঁহার সমগ্র রচনার কোনও স্থলে নারীর প্রতি অশ্রদ্ধার পরিচয় পাওয়া যায় না। এইজন্য সু-সাহিত্যিক শ্রীনরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত এম, এ, ডি, এল মহাশয়কে একখানি পত্রে অতি ঘৃণাব্যঞ্জক সুরে বলিয়াছেন "সুহৃদ্বর নরেশবাবু লেখেন ভাল, একজন বড় সাহিত্যিকও তিনি। কিন্তু আমাদের মা-বোনকে নিয়ে তিনি এ কি চিত্র দিনের পর দিন আঁকতে সুরু করেছেন। তিনি কি আমাদের দেশের মা-বোনকে একটু ভাল চোখে দেখতে পান না ! যখনই তাঁর লেখা কুচরিত্রা কোন স্ত্রীলোকের চিত্র আমার চোখে পড়ে, তখনই লজ্জায় আমার মাথাটা মাটীতে মিশে যায়।"

শরৎচন্দ্রের নারী খাঁটি বাঙ্গালী মেয়ে হইলেও বিশ্ব-মানবী হইতে বিচ্ছিন্ন নহে। দেশ, কাল ও সামাজিক অনুশাসনের বিভিন্নতায় তাহার রূপ বিশিষ্ট হইলেও সমগ্র নারীজাতির বৈশিষ্ট্য হইতে বিচ্যুত হয় নাই। সেইজন্য বর্ম্মা-দুহিতা 'মা শোয়ের'র অভিমানক্ষুব্ধ হৃদয় আমাদের অতি পরিচিত ; এবং আর একটীর প্রেমাস্পদের সহিত বিচ্ছেদাশঙ্কায় মর্ম্মভেদি বিলাপের সমস্ত ব্যথাই আমাদের বুকে বাজে। বাস্তবিকই সেই বর্ম্মা-প্রবাসী বাঙ্গালীর, তাহার বর্ম্মা-প্রবাসিনী প্রণয়িনীর সহিত প্রতারণা ও নির্ম্মম আচরণে পাঠক মাত্রেরই মন তাহার প্রতি বিমুখ হইয়া উঠে। সেইজন্যই খৃষ্টানী ভারতীর প্রেম নিবেদনের ইতিহাস অতটা প্রীতি-উজ্জ্বল এবং সেইজন্য মুসলমানী

আমিনার পিতৃসেবার করুণ কাহিনীটুকু সহজেই মর্ম্মস্পর্শী হইয়া উঠিয়াছে।

শরৎচন্দ্রের নারী সজীব। ইহারা আমাদের সুপরিচিতা আত্মীয়ার মত। অস্বাভাবিকতার লেশ কাহারও এতটুকু স্পর্শ করে নাই। সহজ, সরল এবং স্বচ্ছন্দ গতিতে আমাদের মধ্যে বিচরণ করিতেছে। অথচ প্রত্যেকেরই স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ। এই জিনিষটাই সর্ব্বাপেক্ষা পরিস্ফুট হইয়াছে, "বারোয়ারী"র 'কমলা'র চিত্রে। শরচন্দ্রের লেখনীই তাহাকে তাহার নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য দিয়া আখ্যানের ধারা পরিবর্ত্তিত করিয়া দিয়াছে।

শরৎচন্দ্রের নারী-চিত্র বাঙ্গালা সাহিত্যের অতুল সম্পদ। এমন করিয়া পূর্ব্বেকার অপ্রকাশকে কেহ উদ্ঘাটিত করিয়া দেয় নাই। কলা ছিল, শিল্প ছিল, ছিল না দরদ। এত-খানি দরদ দিয়া আর কোনও শিল্পী নারীমূর্ত্তি গড়িয়া তুলে নাই। শরৎ সাহিত্যেও নারী-চিত্রের অনুমত কোনও চরিত্র-চিত্র শিল্পীর দরদী হৃদয়ের এতখানি অধিকার করে নাই এবং সেই কারণেই এতখানি শ্রদ্ধা ও সমবেদনা লাভে সমর্থ হইয়া উঠে নাই। শরৎচন্দ্র বাস্তবিকই নারী-চিত্রাঙ্কণে তাঁহার হৃদয়ের সমস্ত অনুভূতি, তাঁহার প্রতিভার সকল শক্তিই অকৃপণ, অকুণ্ঠিত হস্তে ঢালিয়া দিয়াছেন। নারীর অন্তর্নিহিত নিগূঢ় ভাবৈশ্বর্য্য তিনি সূক্ষ্মতম রেখায় নিজেরই অন্তরপটে নিরীক্ষণ করিয়া তাহার সুপ্রকট প্রোজ্জ্বল লেখা চরাচর ব্যাপ্ত করিয়া দিয়াছেন। পুরুষ চরিত্র-চিত্র—নারী-চিত্রের নিকট কত ছোট কত ম্লান; শিল্পীর হাতে উপেক্ষিত, অনাদৃত বলিয়া মনে হয়। একমাত্র রাসবিহারীর চিত্রে তাঁহার সযত্ন তুলিকাপাত দেখিতে পাই। তাই কি অপূর্ব্ব চিত্রই না ফুটিয়া উঠিয়াছে! সব্যসাচী ডাক্তারের চিত্র মানবের নহে, অতি মানবের। যাহা কিছু অসম্ভব তাহাই এই মানুষটীর দ্বারা শুধু সম্ভব নহে স্বাভাবিক; এবং যাহা কিছু বিস্ময়কর তাহা ইহার দ্বারা না হইলেই আমরা বিস্ময়ে নির্ব্বাক হই। বিপ্লবীর আদর্শ ইহা হইতে পারে, কিন্তু ইহা মানব-দেহ-ধারী বিপ্লবীর চিত্র কদাচ হইতে পারে না। বরং মানুষ হিসাবে অনেক খাটো, অপূর্ব্বর চিত্র অনেক বেশী স্বাভাবিক; এবং এইরূপদক্ষের নিপুণ তুলিকার দুই একটী টানে আর তাঁহার দরদের একটী কণায় ভাঙ্গা বেহালার অধিকারী 'শশীর' ছোট চিত্রখানি কি করুণ হইয়াই না ফুটিয়াছে। নারী-চিত্রাবলীতে কিন্তু এইরূপ চিত্র আদৌ অপ্রচুর নহে। নারী ও তাহার নারীত্বের প্রতি তাঁহার অসাধারণ শ্রদ্ধাই হয়ত তাঁহার নারী চরিত্র-চিত্রের উৎকর্ষের মুখ্য কারণ।

শরৎচন্দ্রের নারী সম্বন্ধে সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, খাঁটী বাঙ্গালী মেয়ের মনের ছবি শরৎচন্দ্র অপেক্ষা অধিকতর সুন্দর ও সত্যরূপে ইতিপূর্ব্বে আর কেহ আঁকিতে পারিয়াছেন কিনা সন্দেহ। শরৎ সাহিত্যে বিভিন্নতর ভালমন্দ চরিত্রগুলির মধ্যে আমাদের প্রতিচ্ছবি দেখিতে পাই, তাহাদের মুখের ভাষা আমাদের মর্ম্মবাণীর সত্য প্রতিধ্বনি। বাঙ্গালার মেয়েরা শরৎচন্দ্রের নিকট বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ, কারণ তাহাদের অন্তরের অকৃত্রিম রূপটী সুখে, দুঃখে, বেদনায়, অভিমানে, সেবায়, ত্যাগে, সংযমে ও সত্যে যেমন বিকশিত হয়, তিনি তাহা চিত্রিত করিতে গিয়া কোথাও বিকৃত বা অতিরঞ্জিত করেন নাই। যেস্থানে রংটীর যতটুকু প্রয়োজন, এই সুনিপুণ চরিত্র চিত্রকর কোনও স্থানে তাহার কম বেশী করিয়া ফেলেন নাই। আজ তাঁহারা শরৎচন্দ্রের প্রতিভা-পূর্ণিমালোকে সকলের সম্মুখে, সগৌরবে আসিয়া দাঁড়াইয়া-ছেন, এবং তাই আজ সমগ্র বাঙ্গালাদেশের মেয়েদের মনের গভীর কৃতজ্ঞতা, নিবিড় আশীর্ব্বাদ ও আন্তরিক প্রণতি তাঁহাকে সানন্দে অভিনন্দন জানাইতেছে।

শরৎচন্দ্রের নারী ও তাহার নারীত্ব অপূর্ব্ব প্রতিভার বিচিত্র বিকাশ; তাঁহার একনিষ্ঠ সাহিত্য সেবার গৌরব-পূর্ণ অর্ঘ্য। তাঁহার বলিষ্ঠ প্রতিভার এই গরিমদানে বাঙ্গালা-সাহিত্য আজ বিশেষ সমৃদ্ধ। এই নারীত্বে, নারীর মাতৃত্ব, সতীত্ব প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত। দেহের সৌন্দর্য্য তাহার থাকিতে পারে কিন্তু তাহার নিখুঁত বর্ণনার আকর্ষণে পাঠকের চিত্ত মুগ্ধ করিবার সনাতন প্রথা শরৎচন্দ্র অবলম্বন করেন নাই। দেহ-শ্রীর প্রতি ইঙ্গিত হয়ত তাঁহার আছে, কিন্তু নারীর হৃদয়ের বৈশিষ্ট্যই তাঁহার মূলধন। তাহার দেহকে তিনি বড় করিয়া দেখিতে কখনও পারেন নাই। নারীর মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে গিয়া যে নারীত্বের পূর্ব্বাভাস তিনি দিয়াছিলেন তাহাই তাঁহার কথা-সাহিত্যে পরিপূর্ণ বিকাশ লাভ করিয়াছে।

শরৎচন্দ্রের নারী তাঁহার সাহিত্য-সাধনার অভিনব সৃষ্টি এবং বাঙ্গালা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ।

প্রসাধন

শিল্পী—শ্রীভবানীচরণ লাহা

লক্ষ্মীবিলাস প্রেস লিঃ
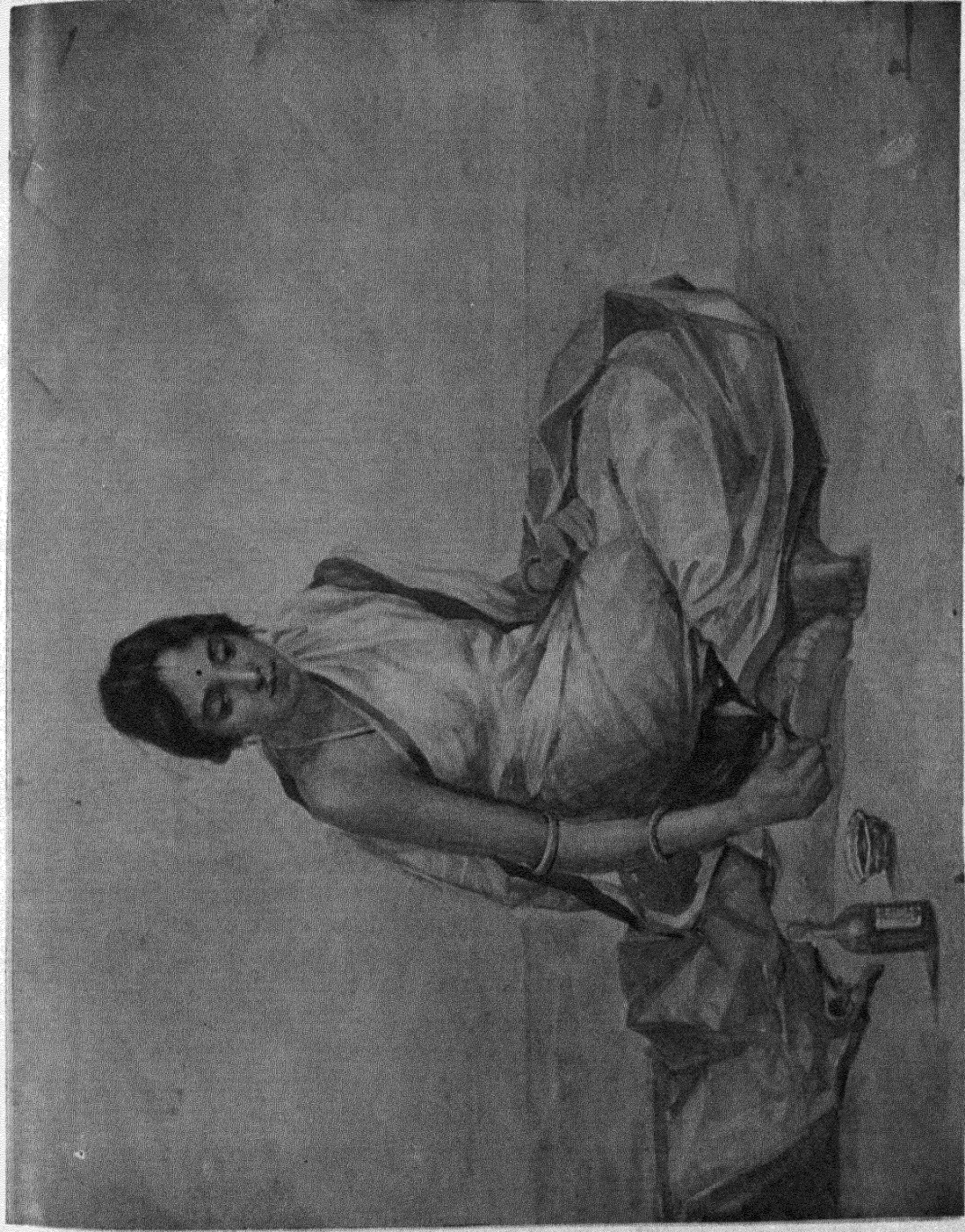
শ্রীযতীন্দ্রনাথ মিত্র এম-এ

(২)

এশিয়া ও ইউরোপ

এমন দিন ছিল যখন এশিয়া ইউরোপকে তাহার জ্ঞান ও বিদ্যা দিয়া প্রবুদ্ধ করিয়াছিল। তাহার পর এশিয়া উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়া তাবৎ সমাজ ও রাষ্ট্রগুলিকে সনাতনীর বেড়ী দিয়া বাঁধিবার চেষ্টা করে। এশিয়ার তাবৎ তন্ত্রই যখন এক একটি নির্দ্দিষ্ট যন্ত্রে পরিণত হইয়াও ক্রম পরিবর্ত্তনের গূঢ়তত্ত্বের উপর কটাক্ষপাত করিয়া অনন্তকে জয় করিবার মানস করে তখনই ইউরোপ এশিয়াকে পশ্চাতে ফেলিয়া অগ্রসর হয়। ধনোৎপাদনের জন্য ব্যগ্র হইয়া ইউরোপ আমেরিকা ও আফ্রিকার দক্ষিণ উপকূল আবিষ্কার করে। বিজ্ঞানের সাহায্যে বিপুল বাণিজ্য-সম্ভার প্রস্তুত করিয়া অসম্ভবরূপ ধনী হইয়া পড়ে। এই সমস্ত পরিবর্ত্তনের জন্য তাহাদের রাষ্ট্রে ও সমাজে, যুগান্তর আসিয়া দেখা দেয়। মধ্যযুগে যখন কৃষক ও জমিদারই শুধু ধনোৎপাদনের এজেন্টরূপে দৃষ্ট হইত তখন উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব রক্ষা করিতে পারিলেই চলিত। সমাজের অনেকটা স্থিতিশীল ভাব ছিল। তাহার পর যখন কল-কারখানা আসিয়া শির উত্তোলন করে, তখন ধনিক ও শ্রমিক সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হয়। ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার সহিত মানবের মূলধন আসিয়া দেখা দেয়। আলস্যের পরিবর্ত্তে পরিশ্রম মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া সমাজে আত্মপ্রকাশ করে। আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্য জগতের বিভিন্ন জাতি সমূহকে এক মহা [illegible] [illegible] আবদ্ধ করিয়ার [illegible] পরিণত হয়। মানব-জাতির গৃহ বা হোম ভাঙিতে আরম্ভ হয়। স্ত্রীজাতি অবরোধ পায়ে ঠেলিয়া গৃহের বাহিরে আসিতে শিখে। অভিজাতদের গর্ব্ব ও ক্ষমতার হ্রাস সংঘটিত হয়, মধ্যবিত্তদের উন্নতির সহিত অভিজাত-গণ তাহাদের সহিত যৌনসম্বন্ধ স্থাপন করিয়া একজাতিতে পরিণত হইতে থাকে। বহু পুরাতন ধর্ম্মভাবও শ্লথ হইয়া আসে। জমিদার প্রজা সম্বন্ধে অনেকটা ব্যবসাদারী ভাব আসিয়া দেখা দেয়। কাঁচা মাল সংগ্রহ করিবার জন্য সারা পৃথিবীতে কূট রাজনীতিজাল প্রসারিত হইয়া পড়ে। পূর্ব্বে জাতীয়তাই মূল মন্ত্র ছিল। উনবিংশ শতাব্দীতে ধর্ম্মের প্রভাব লোপ প্রাপ্ত হইলে উহার স্থলে জাতীয়তা আসিয়া অর্ঘ্য গ্রহণ করিতে আরম্ভ করে। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই জাতীয়তা এক মারাত্মক যন্ত্রে পরিণত হওয়ায় ১৯১৪ সালের মহাসমর সংঘটিত হইয়া যায়। তাহার পর নব-যুগ সূচিত হইয়া গিয়াছে।

এশিয়া উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপের সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর Renaissance বা যুগান্তের মধ্যে ছিল বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে তথায় দ্রুত পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইতে থাকে। ইংরাজ-জাতির আবহাওয়ায় আসিয়া অনেকেই মধ্যবিত্ত শ্রেণী কর্ত্তৃক পরিচালিত পার্লামেন্ট বা আইন মহাসভা ও তাহার নির্ব্বাচন প্রণালী গ্রহণ করে দর্শন ও ধর্ম্মশাস্ত্রকেই একমাত্র অধীত বিষয় না রাখিয়া বিজ্ঞানকেও পাঠ্য হিসাবে গ্রহণ করে। পাশ্চাত্ত্যের আদর্শে কল-কারখানা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সহিত, প্রাচ্যে

ক্রমশঃ একদল ধনিক ও শ্রমিক আসিয়া দেখা দিতে থাকে। ১৯২৪ সাল হইতে এই ধনিক শ্রমিক সমস্যা লইয়া জাপান বিব্রত হইয়া পড়িতেছে। এই ধনিক ও শ্রমিক সমস্যার জন্যই চীনদেশ দুইখণ্ডে বিভক্ত হইয়াছে। ভারতেও ১৯২৪ সালে নানা প্রকার ধর্ম্মঘট সংঘটিত হইয়াছিল ও শ্রমজীবি সঙ্ঘ বা trade union স্থাপিত হয়। এশিয়া এখন ইউরোপের মন্ত্রশিষ্যরূপে তাহার আচার-ব্যবহার একে একে গ্রহণ করিতেছে। তাহার সনাতনী ধর্ম্মভাবেও যুগান্তর আসিয়া দেখা দিয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতেই এশিয়া তাহার ধর্ম্মভাবগুলির একটা সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। বর্ত্তমান যুগে এশিয়া ধর্ম্মযুগ অতিক্রম করিয়া এক বিশ্ব-যুগে আসিয়া পড়িয়াছে। গত মহাযুদ্ধের পর ইউরোপ সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে পৃথিবীকে ভোগ করিবার জন্য তোড় জোড় স্বরু করিলে এশিয়ায় এই চেষ্টার প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইবার ক্ষীণ আগ্রহ আসিয়া দেখা দেয়। তাহারই ফলে সমস্ত এশিয়ায় আজ দুইটী আন্দোলন প্রবল হইয়া উঠিতেছে! উত্তর আফ্রিকার দেশসমূহ, তুরস্ক, আরব, পারশ্য, আফগানিস্থান, বেলুচিস্থান ও ভারতের উত্তর পশ্চিম অংশে আরবীয় সভ্যতাকে কেন্দ্র করিয়া এক বিরাট মুসলমান সঙ্ঘ জমাট বাঁধিবার চেষ্টা করিতেছে। ভারতবর্ষ, সিংহল, তিব্বত, চীন ও জাপান প্রভৃতি দেশ সমূহে ভারতীয় সভ্যতাকে আদর্শ করিয়া আর একটি প্রতিষ্ঠান মাথা ঠেলিয়া উঠিবার চেষ্টায় আছে। নানাজাতি একত্রিত হইয়া সঙ্ঘবদ্ধভাবে ভাবের আদান-প্রদান ব্যাপারে এশিয়া ইউরোপের পদানুসরণ করিতেছে মাত্র।

আরবীয় ভাবধারা

আর্য্য ও আরবীয় সভ্যতার মধ্যে একটি বিশেষ বৈলক্ষণ দৃষ্ট হয়। আর্য্য সভ্যতা জমির উর্ব্বর শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় উহা চিরকালই অভিজাতমূলক ছিল। যোদ্ধা ও পুরোহিতগণ আর্য্যসমাজের ধারক ও বাহক ছিলেন। আরবদেশ এক বিশাল মরুভূমি। বহুক্রোশ অতিক্রম করিলে কদাচিৎ একটী মরু-উদ্যান বা oasis দেখিতে পাওয়া যায়। একসঙ্গে দলবদ্ধ হইয়া এখানকার জাতিবৃন্দকে বাস করিতে হয় বলিয়া সৌভ্রাতৃত্ব এই জাতির অস্থিমজ্জাগত। এইজন্যই অভিজাত শ্রেণী এইখানে কোনকালেই শির উত্তোলন করিতে পারে নাই। আর্য্যধর্ম্ম যেমন আর্য্যজাতির সামাজিক, নৈতিক, আর্থিক তাবৎ জীবন ধারণের প্রধান মূলমন্ত্র ছিল, আরবীয় ধর্ম্মও ঠিক সেইরূপ তখনকার আরবীয় সমাজকে সজীব ও প্রবুদ্ধ করিবার জন্য রচিত হইয়াছিল। শতধা বিভক্ত আরবের গোষ্ঠীগুলিকে একজাতিতে পরিণত করিয়া সঙ্ঘবদ্ধ করাই মহাত্মা মহম্মদের উদ্দেশ্য ছিল। তাহাদের মধ্যে জাতি-বিদ্রোহ দমন করিয়া শান্তি স্থাপন করাই ছিল তাঁহার চরম লক্ষ্য। আরবকে এক বিশাল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ও অধিকারী করা তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। পারলৌকিক সম্পদের কথা বলিয়া ইহকালের উচ্ছৃঙ্খল জীবন শৃঙ্খলিত করাই ছিল তাঁহার চরম সাধনা। এইজন্যই মহাত্মা মহম্মদ কর্ত্তৃক প্রচারিত ধর্ম্মের আমরা ভ্রাতৃভাবের পূর্ণবিকাশ দেখিতে পাই। ধনোৎপাদনের কোন স্বতন্ত্র প্রথা বা যন্ত্র না থাকায়, সমস্ত গোষ্ঠীর উপর উহার পোষ্যদিগের ভরণ-পোষণের ভার ন্যস্ত থাকায়, আরব সমাজেই মানবজাতির ঐক্য প্রথম জোর গলায় স্বীকৃত হয়।

ওয়াহিবী আন্দোলন—হজরতের মৃত্যুর পর তাঁহার মনোনীত খলিফা বা উত্তরাধিকারীগণ দামস্কসে বাসকালীন তাঁহার মতাবলম্বী হইয়া চলিতে থাকেন। দামস্কসের শাসকগণ কোন বিলাস-ব্যসনকে তাঁহাদের অঙ্গস্পর্শ করিতে দিতেন না। সর্ব্বরকমেই তাঁহারা মধ্যযুগের puritanদের ন্যায় জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। রোম ও পারশ্য সাম্রাজ্য দুইটি তাঁহাদের হস্তগত হইলে ধীরে ধীরে উক্ত সাম্রাজ্য দুইটির অনুকরণে তাঁহাদের মধ্যে বিলাস ব্যসন ঢুকিতে থাকে। তাহার পর রাজধানী বাগদাদে স্থানান্তরিত হইয়া বিশাল সাম্রাজ্য হস্তে আসিয়া পড়িলে আরবীয় নীতির মূলে কুঠারঘাত হইয়া যায়। আরবজাতি প্রথমে নানা দেশ জয় করিলে তাঁহাদের ধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য বিশেষ ব্যস্ত হইতেন না, কেন না অমুসলমানরাই রাজস্ব প্রদান করিত; [illegible] মুসলমান হইলেই আরবীয় [illegible]

অধিকার পাওয়া যায় দেখিয়া পরাধীন জাতিবৃন্দ ক্রমশঃ তাহাদের ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া উহা প্রচার করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা সুরু করিয়া দেয়। অচিরে আরবীয় সভ্যতার সহিত উহার ধর্ম্মও পৃথিবীর নানাদেশে প্রচারিত হইতে থাকে। যে যে দেশে এই ধর্ম্ম প্রচারিত হয়, সার্ব্বজনীন আকার ধারণ করিবার জন্য তথাকার আচার-ব্যবহার আইন-কানুন, দেব-দেবী, এই ধর্ম্ম আপনার দেহের মধ্যে স্থান দেওয়ায় হজরত প্রচারিত ধর্ম্ম হইতে অনেকটা রূপান্তর গ্রহণ করে। মুসলমান ধর্ম্মের প্রচারকগণ এই বিষয় লক্ষ্য করিয়া ক্রমশঃ ঘোষণা করেন যে কোরাণের ব্যাখ্যাই মূলধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করা উচিত। ঐ ব্যাখ্যা দেশ জাতি হিসাবে ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করিল। ক্রমশঃ মুসলমান ধর্ম্ম খৃষ্টানদের ক্যাথলিক ধর্ম্মের আকার ধারণ করে। ক্যাথলিক ধর্ম্ম প্রচারের সহিত রোমের পূর্ব্ব গৌরব প্রচারের চেষ্টা যেমন লুক্কায়িত থাকে, এই বিশ্বজনীন মুসলমান ধর্ম্ম প্রচারের অন্তরালে আরবীয় প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা আরবীয় নেতাগণ কয়েক শতাব্দী ধরিয়া করিয়া অবশেষে হতাশ হইয়া হাল পরিত্যাগ করেন। লুথার যেমন প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্ম প্রচার করিয়া দেশাত্ম বোধ জাগরিত করিয়া দেন, সেইরূপ আরবীয় সংস্কার ও দেশ প্রীতি জাগরিত করিবার জন্য খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীতে এক নূতন আন্দোলনের সৃষ্টি হয়, ইহার নামই ওয়াহিবী আন্দোলন।

ইবনে আবদুল ওয়াহাব এই নূতন আন্দোলনের প্রবর্ত্তক। তিনি মধ্য আরবের অন্তর্গত নেজ নগরে জন্মগ্রহণ করেন। লুথারের ন্যায় তিনি কোরাণের প্রত্যেক অক্ষরকে সজীব জ্ঞান করিয়া কোন প্রকার ব্যাখ্যা গ্রহণ না করিয়া উহার মূল অর্থ গ্রহণ করিবার জন্য তাঁহার অনুচরগণকে আদেশ করেন। সকলপ্রকার বিলাস-ব্যসন ত্যাগ করিয়া এক অখণ্ড ভ্রাতৃত্বভাবে বদ্ধ হইবার জন্য আরবদেশের তাবৎ গোষ্ঠীপতিগণকে আহ্বান করেন। আরবীয় ধর্ম্মের মধ্যে উহার পরাধীন জাতিগণের নিকট হইতে সংগৃহীত নূতন নূতন অবদানগুলিকে বর্জ্জন করেন। এমন কি মসজিদের মিনারেটকে তুর্কীর দান বলিয়া বিনা মিনারেটে মসজিদ নির্ম্মাণ করিতে অনুরোধ করেন। মালা জপা বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে বলিয়া মুসলমানগণকে উহা বর্জ্জন করিতে বলা হয়। মদ, তামাক, অহিফেণ প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার মাদক দ্রব্য বর্জ্জন করিতে আদেশ প্রদান করা হয়। মোটকথা কঠিন তাপসিকের জীবন গ্রহণ করিয়া পারলৌকিক জীবনের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া ইহ-জীবন পরিচালন করিবার জন্য সকলকে উপদেশ দেওয়া হইতে থাকে।

কোনপ্রকার ধর্ম্মমত প্রচার করিতে গেলেই রাজ-শক্তির বিশেষ প্রয়োজন হয়। দরিয়া নগরের শাসক সেখ মহম্মদ ইবনে সাউদ এই ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া সমস্ত আরবে উক্ত মত প্রচার করিবার জন্য যত্নপরায়ণ হয়েন। অল্প সময়ের মধ্যেই হজরতের শিষ্যগণের ন্যায় ইবনে সাউদ্ সমস্ত মধ্য আরব জয় করিয়া কারবেলা, মক্কা, ও মদিনা জয় করিয়া লয়েন। বিশ্বজনীন মুসলমান ধর্ম্মের কেন্দ্রগুলি হস্তগত করিয়া, ওয়াহিবগণ আরবীয় বিশুদ্ধতা পুনরুদ্ধার করিবার মানসে ঐ সমস্ত কেন্দ্রগুলিতে যে যে স্থলে বৈদিশিক স্মৃতির চিহ্ন মাত্র আছে বলিয়া তাহাদের সন্দেহ হয় তাহা তাহারা ধ্বংস করিয়া দেয়। ঐ সমস্ত কেন্দ্রগুলিতে যে সমস্ত অধিবাসী তাহাদের মতবাদ গ্রহণ করিতে অস্বীকার করে, ওয়াহিবগণ তাহাদের প্রাণ সংহার করে। মদিনায় হজরতের কবরটীর উপর অনেক বৈদিশিক চিহ্ন বিদ্যমান আছে সন্দেহ করিয়া ঐ সমস্ত চিহ্ন ধ্বংস করিয়া দিয়া হজরতের সমাধির অবমাননা করে ও তথাকার ধনরত্ন লুট করিয়া লয়।

তুর্কির সুলতান এই অত্যাচারে ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া মিশরের শাসক মহম্মদ আলীকে এই ওয়াহিবদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। কয়েক বৎসরের সংঘর্ষের ফলে ওয়াহিবগণ সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হইয়া যায়। ওয়াহিবদের রাজধানী দরিয়া নগরটীকে মাটীর সহিত মিশাইয়া দিয়া, ইবনে সাউদের পৌত্রকে বন্দী করিয়া ইস্তাম্বুলে প্রেরণ করা হয়। তথায় তাহার প্রাণদণ্ড হয়। এইখানে ওয়াহিব রাজশক্তির বিনাশ সংঘটিত হইলেও, উহার মূলনীতি কিন্তু পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী হইয়া উঠে। ওয়াহিব আন্দোলন এখন হইতে জাতীয় আন্দোলনে

পরিণত হয়। ওয়াহিবগণ যেরূপ মধ্য আরব ব্যতীত, হেজাজ, ইমেন, ওমান ও আলহেসা প্রদেশগুলিকে একত্রিত করিয়া এক বিরাট আরব জাতীয় রাজ্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করিতেছিল, সেইরূপ উহার মূলমন্ত্র অন্যান্য প্রদেশে ছড়াইয়া পড়ায় আরবীয় সভ্যতার আব-হাওয়ায় থাকিয়া যে সমস্ত দেশ এতদিন সভ্য হইয়া উঠিয়াছিল, উহারই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া প্রবল জাতীয় রাজ্যে পরিণত হইবার জন্য চেষ্টা করিতে থাকে।

ওয়াহিব আন্দোলনের মূলমন্ত্রই ছিল কঠোর জাতীয়তা। বহু জাতির সংমিশ্রণে আসিয়া আরব জাতি তাহার স্বাতন্ত্র হারাইয়া ফেলিয়াছিল। বিস্তৃত সাম্রাজ্য শাসন করিতে যাইয়া তাহার সমাজে ও ধর্ম্মে পরাধীন জাতিদের অনেক প্রথাই আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। কালক্রমে তুরস্ক জাতির অধীন হইয়া আরবগণ নানাপ্রকার অসুবিধা ভোগ করিতে থাকে। পূর্ব্বে মুসলমান হইলেই যেমন কতকগুলি সুবিধা পাওয়া যাইত তেমনি কোন সুখ-সুবিধা আর না থাকায় আরব-জাতি অনেকটা ক্ষুণ্ণ হয়। তুর্কীর সুলতান ওয়াহিব আন্দোলনকে তাঁহার সার্ব্বভৌম ক্ষমতার বিশেষ অন্তরায় জানিয়া উহার উচ্ছেদ সাধন করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়েন। কিন্তু সকল প্রকার বাধা-বিপত্তি উল্লঙ্ঘন করিয়া এই ধর্ম্ম ভাব তাং মুসলমান জগতে ছড়াইয়া পড়ে।

ওয়াহিব আন্দোলনের প্রতিষ্ঠা—সয়েদ আহম্মদ ও হাজি ইসমেল নামক দুইজন ভারতবাসী মক্কায় হজ করিতে যাইয়া তথা হইতে ওয়াহিবী আন্দোলনের মূল-মন্ত্র শিক্ষালাভ করিয়া দেশে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে উহা প্রচার করিবার জন্য বদ্ধ-পরিকর হয়েন। তখন ভারতবর্ষে অধিকাংশ মুসলমানই নামে মুসলমান ছিল মাত্র। আচার ব্যবহারে তাহারা সর্ব্বত্রই হিন্দুদের অনুকরণ করিত। নবযুগ প্রবর্ত্তক প্রচারকদ্বয় ভারতীয় মুসলমানগণকে প্রবুদ্ধ করিবার মানসে কোরাণ-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মে ফিরিয়া যাইবার জন্য জোর আন্দোলন সুরু করেন। তাহারা কিছুদিনের জন্য পাঞ্জাবে ওয়াহিব রাজ্যও পর্য্যন্ত স্থাপন করিতে সক্ষম হন। কিন্তু শিখ বীর রণজিৎ সিংএর নেতৃত্বে পরিচালিত হইয়া শিখগণ এই ওয়াহিব রাজত্ব অঙ্কুরেই বিনাশ করিয়া দেয়। এই আন্দোলনের ফলেই ভারতীয় মুসলমান সমাজে Puritanic ভাব প্রবেশ করে। মুসলমানগণ সর্ব্ব প্রকার পৌত্তলিক পূজা পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করেন এবং ভারতীয় নামকরণ বর্জ্জন করিয়া আরবীয় নাম ইত্যাদি ধারণ করিতে আরম্ভ করেন।

উত্তর আফ্রিকার ওয়াহিব আন্দোলন আশাতীত ভাবে সফলতা লাভ করে। মহম্মদ বেন আলি এস্ সেনুসী নামক একজন উচ্চবংশজাত আলজিরার মুসলমান ওয়াহিব ধর্ম্মের মূলসূত্রগুলি আপন মাতৃভাষায় ভাষান্তরিত করিয়া জনসমাজে প্রচার করেন। ইউরোপীয়দের হস্ত হইতে আত্ম-রক্ষা করিবার মানসে হজরতের যুগে আরবে যে পিউরিটান ভাব ছিল সেই সমুদায়ের প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য বদ্ধ পরিকর হয়েন। ত্রিপোলী এই আন্দোলনের প্রথম ভিত্তি ভূমি হয়। তাহার পর তুর্কীর সুলতানের নিকট হইতে আত্মরক্ষা করিবার মানসে পূর্ব্ব-সাহারায় এই ধর্ম্মের কর্ম্মস্থল স্থাপন করা হয়। প্রতিষ্ঠাতার মৃত্যুর পর তাঁহার কনিষ্ঠপুত্র আল মাধি এই ধর্ম্মের নেতৃপদ গ্রহণ করেন। আলমাধি একজন বহুদর্শী ও বিবেচক ব্যক্তি ছিলেন। বলবান ইউরোপের সহিত সংঘর্ষ ঘটিলে বলক্ষয় ঘটিবে এই আশঙ্কায় ১৯১০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি সর্ব্বপ্রকার রাজনীতি হইতে আপনাকে পৃথক করিয়া রাখিয়াছিলেন। উক্ত সনে ইটালী ত্রিপোলী রাজ্য আক্রমণ করিলে বিশ্বজনীন মুসলমান ধর্ম্মের সাহায্যকারী হিসাবে তিনি তুরস্কের সম্রাটকে সহায়তা করেন। ১৯১৪ সালের মহাযুদ্ধে তুরস্কের অধীনতায় পরিচালিত হইয়া মিশর দেশ আক্রমণ করিয়া ইংরাজকে বিব্রত করিয়া তুলিয়াছিলেন। মহাসমরের অবসান ঘটিলে আলমাধির উত্তরাধিকারী গ্রাণ্ড সেখ সিদি আহম্মদ সেরিফ তুরস্কে যাইয়া বিজয়ী কামালের সহিত যোগদান করেন। তাঁহার উত্তরাধিকারী সিদি মহম্মদ এল ইদ্রিস্ গ্রেট ব্রীটেন ও ভারতের সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়া পূর্ব্ব সাহারার গ্রাণ্ড সেখ হিসাবে এখনও [illegible]।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

"প্রণব কই? কার কাছে থাকে—"

রাজীব বলিল,—"প্রণবের জন্য ভাবছ কেন সুরমা? আমি তো এখনো মরে যাইনি!—

আরো কিছুদিন চলিয়া গেল, সন্তর্পণে ভয়ে ভয়ে— ক্রমে সে পথ্য পাইতে লাগিল। তাহার ভাত পথ্য পাইবার আরো সাতদিন পরে, বিপদ অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে বলিয়া ডাক্তররা সকলে বিদায় গ্রহণ করিল।— শুধু দুইজন নার্স রহিল।

কিন্তু সুরমা ভাল করিয়া লক্ষ্য করিতেছিল রাজীবের সমস্ত সুখ-তৃপ্তির ভাব ভেদ করিয়া, অন্তর হইতে একটা শঙ্কাকুল বিমর্ষ কাতরতা উঁকি মারিয়া উঠিয়া তাহার অজ্ঞাতসারে, অনিচ্ছায় আত্মপ্রকাশ করে—! সে এক জায়গায় স্থির হইয়া বসিতে পারে না। সুরমা ভাবিল— চির অচঞ্চল রাজীবকে কোন অজ্ঞাতপূর্ব্ব চিন্তা এমন করিয়া আচ্ছন্ন করিয়া ধরিয়াছে যাহাতে তাহার সমস্ত স্বচ্ছন্দতা কাড়িয়া লইয়া তাহাকে অস্থির অধীর করিয়া তুলিয়াছে? সে একদিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—

"আজকাল এতো অস্থির হয়েছে কেন?" রাজীব শুধু বলিল—"কাজ আছে কিনা তাই বার বার উঠে যেতে হয়—" তারপর হইতে রাজীব আত্মগোপনের চেষ্টা করে। তবুও সুরমা বুঝিতে পারে একটা কিছু পরিবর্ত্তন কোথাও হইয়া গিয়াছে—নিশ্চয়।

সুরমা শুনিল সে দেড় মাস একেবারে বিছানায় ছিল। তারপরে এখন আরো প্রায় একমাস চলিয়া গিয়াছে। নার্সরা তাহাকে ঘড়ি ধরিয়া চালাইয়া অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছে। তাহারা তাহাকে বেশী কথা বলিতে দেয় না। রাজীবকেও কাছে বেশীক্ষণ থাকিতে দেয় না—প্রণবকে একেবারে কাছে আসিতে দেয় না। সে বই পড়িতে চায় তাহারা বারণ করে—একটু এদিক ওদিক হাঁটিয়া বেড়াইতে চায়, তাহাতেও তাহারা চীৎকার করিয়া উঠে। সে বিরক্ত হয়। ঐ এক বিছানায় রাতদিন থাকিতে হয়, শুইয়া নয় বসিয়া ঐ একই দৃশ্য আজ সে দুই মাস ধরিয়া দেখিতেছে। ঐ সামনে আমের গাছের পাতাবহুল ডালগুলি দেখা যায়। ঠিক তাহার জানালা গুলির মাপ করিয়া কাটা প্রকৃতির সে একই ছবি দেখিতে পায়— রোজ,—প্রতিদিন—একই ভাবে। সেই আকাশ সেই সব। সে বিরক্ত হয়। একটু সামান্য কারণেই রাগ হয়।

নার্স সর্ব্বদা তাহার কাছে বসিয়া গল্প করে। অন্যান্য বাড়ীর কথা কয়। সুরমার তবু একটু ভাল লাগে— তাহার ইহাদের উপর মমতা হয়। সবার চাইতে কঠিন কর্ত্তব্যের ভার, অপরের জীবন মরণের দায়িত্ব হাতে লইয়া ইহারা জীবন কাটায় এক অপূর্ব্ব সেবাব্রতে। সে সারাদিন তাহাদের সঙ্গে গল্প করে। একজন নার্স সারারাত্রি তাহার কাছে বসিয়া কাটায়—সে বলে—

"আপনি ঘুমোন গিয়ে"

সে বলে "না, বেশ আছি,—তাছাড়া কাজ ফেলে যাবো কি ক'রে?"

সুরমা তবু বলে—"এই তো আমি বেশ আছি—" তবু সে যায় না। দেখিয়া দেখিয়া তাহার অত্যন্ত দয়া হয়।

এত করিয়াও সুরমা ভাবনার হাত এড়াইতে পারে না। সুনীলের কথা তাহার মনের অন্তরাল হয় নাই, সুনীলের চিঠি তাহার দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া যায় নাই। সুনীলের মুখ তাহার মানস নয়নের অতীত হইয়া যায় নাই।

সেদিন রাজীব আসিতে সে জিজ্ঞাসা করিল,— "সুনীলের চিঠি পেয়েছ?"

রাজীব বেশ প্রফুল্লভাবেই উত্তর দিল।—"পেয়েছি সুরমা, সে বেশ ভাল আছে।"

"ভালো আছে সত্যি বলছ ?"

"সত্যি বলছি বই কি !"

"পৃথা লিখেছে ?"

"লিখেছে—"

"তাহলে যাবার কথা কি হল ? আমি যে এখনো বিছানায়।—কি যে হ'ল হঠাৎ—জানো আমি সুনীলের চিঠি পেয়েছি, তাতে সে লিখেছিল তার অসুখের কথা—"

রাজীব প্রফুল্ল ভাবটাকে বজায় রাখিয়া তাচ্ছিল্যভরে বলিল—"সব জিনিষ হঠাৎই হয় সুরমা তাতে কি হয়েছে এই তো সেরে উঠেছ—আর সুনীল তোমার সঙ্গে হয়তো ঠাট্টা করেছে। এবারে আর যাওয়া হল না। এবারে থাক্ পরের বছর যাওয়া যাবে কি বল ?"

"বাঃ থাক্ কেন এপ্রিলের কত দেরী এখনো --তখন পর্য্যন্ত কি এমনি থাকবো ?"

"তা থাকবে কেন, তবে দুর্ব্বল হয়েছ তো ?"

"পৃথা সুনীল চলে যাবে তাহলে—"

"পৃথা সুনীলও থাকবে এবারে আমি লিখে দিয়েছি।"

"আমার খুব জর হয়েছিল না ?"

"হ্যাঁ, তোমার খুব জর হয়েছিল, আমি ভয় পেয়েছিলুম।"

"জরের ঘোরে আমি অনেক কিছু দেখেছিলুম। যেন সুনীল কোথায় চলে গেছে—সেইখান থেকে বার বার আমাকে ডাকছে।"

"ও সব বিকারের ঘোরে দেখেছে, ও কিছু না।"

সুরমা একটু চুপ করিয়া মৃদুস্বরে বলিল—"কি জানি—"আমি ম'রে গেলে বেশ হ'ত না ?"

"রাজীব একটু চমকিয়া উঠিয়া বলিল—"বেশ হ'ত ? কিসে ?"

"তুমি রক্ষে পেতে "

"না রক্ষে পেতুম না, সুরমা। তাছাড়া তুমি বেঁচে থাকাতে আমার এমন কোন অসুবিধে হচ্ছে না, যাতে তুমি ম'রে গেলে আমি রক্ষে পাই।

সুরমা খানিকক্ষণ চুপ করিয়া কি ভাবিয়া বলিল-"আচ্ছা সত্যি বলছ ওখানে কিছু হয়নি ?"

"হ্যাঁ সত্যি বলছি সুরমা, ওখানে কিছু হয়নি। সব কিছু ভেবো না তুমি চুপ ক'রে শুয়ে থাকো।"

সুরমা রাজীবের কথা বিশ্বাস করিলেও—সে তাহা মন হইতে বিকারের ঘোরে দেখা ছবিগুলা কিছুতেই মুছিয়া ফেলিতে পারিতেছিল না। যে সব স্বপ্ন সে দেখিয়াছিল—সবগুলা তাহার মনে হয়—না, তবু কিছু যাহা মনে পড়ে—তাহাতে সে শিহরিয়া উঠে কোন অনির্দ্দিষ্ট অমঙ্গল আশঙ্কায়।

সুস্থ হইয়া তাহার রাধানগরের নির্জ্জন, নিস্তব্ধতা আর ভাল লাগিতেছিল না। মাঝে মাঝে তাহা যেন তাহাকে বিষণ্নতার গুরুভারে চাপিয়া ধরে—সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনে হয় পৃথার কথা, সুনীলের কথা। তাহারা থাকিতে এই গ্রাম্য-জীবনই তাহার অতুলনীয় বলিয়া মনে হইয়াছে, আর তাহাদের অভাবে ঠিক সেই স্থানই তাহার কাছে নিরানন্দময় নির্জ্জীব হইয়া গিয়াছে। মানুষ বুঝি নিজে বহুরূপী। নিজের মন কখন কি বেশে সাজিয়া নিজেকে ভুলাইয়া দেয়, তাহা সে নিজেই বুঝিতে পারে না!

একদিন রাজীব বলিল—"চল সুরমা এইবার কলকাতায় যাই।' সুরমা অন্যমনস্কভাবে উত্তর দিল—"একবার মায়ের কাছ থেকে ঘুরে এসে তারপরে যাব।'

১৪

অনেকদিন পরে বাপের বাড়ী হইতে ঘুরিয়া কলিকাতায় আসিয়া সুরমার ভালই লাগিল। ঘরগুলি যেমনকার তেমনই আছে, রাখিয়া যাওয়া জিনিষগুলি তেমনই সাজানো আছে। অল্পদিনেই সে আবার গুছাইয়া নিজেকে সচ্ছন্দ করিয়া ফেলিল।

প্রথমে তাহার ইচ্ছা হইল একচোট টেলিফোন করিয়া বন্ধু-বান্ধবদের তাহার আগমন সংবাদ জানাইয়া দেয়—কিন্তু ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গেই অনিচ্ছা বাধা দিয়া উঠিল—সে ভাবিল "থাক্ অত তাড়াতাড়ি দরকার কি।

এক একবার তাহার মনে হইল [illegible]

হোটেলে অথবা কোথাও "ডান্সে" যায়, কিন্তু পরক্ষণেই বিকট একটা অবসাদ—তাহার সর্ব্ব উৎফুল্ল আনন্দকে চাপিয়া ধরিয়া তাহাকে অভিভূত করিয়া ফেলে। অবশেষে এমন কি, বিকালে একটু বেড়াইবারও সাধটুকু কোথায় চলিয়া যায়, সে নিজেই বুঝিতে পারে না। বিনা কারণে এত বিষণ্নতা তাহাকে ঘিরিয়া ধরে কেন? সারা সন্ধ্যাটা একলা নির্জ্জনে বসিয়া সে পিয়ানো বাজায়, বই পড়িয়া কাটাইয়া দেয়—রাজীব তখন বাহিরে থাকে। বাজাইতে বাজাইতে কতবার মনে হয় পৃথা ও সুনীলের পুলকভরা চোখের আলো এই গৃহতল আলোকিত করিয়া রাখিয়াছে বুঝি আজো,—মনে হয় এইখানে এখনো ঘুরিয়া ফিরিতেছে তাহাদেরই উছলিত তরল হাসির উৎস। সে প্রতিধ্বনির মত সযত্নে তাহা স্মৃতির কন্দরে লুকাইয়া রাখিয়া সঙ্গোপনে উপভোগ করে। বাছিয়া বাছিয়া সে অনেকগুলি 'ফক্স-ট্রট্' 'ট্যাঙ্গো' বাজাইয়া মনে করে পৃথা থাকিলে নিশ্চয় আনন্দে নাচিত। 'সোনেটা' বাজাইয়া মনে করে সুনীল থাকিলে কত মন প্রাণ দিয়া শুনিত দুই কাণ ভরিয়া এবং সুন্দর চোখের দৃষ্টিতে তৃপ্তি ভরিয়া তাহার দিকে নীরবে চাহিয়া থাকিত—অন্তরের গভীর ভাষায় প্রশংসা জানাইয়া।

সেদিনও আকাশ ভরিয়া চাঁদের মাতামাতি। সুরমা আবেগ ভরে বিথোভেনের 'মুন লাইট' বাজাইয়া বাজাইয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে তারপরে সেইখানে বসিয়া পাশের টেবিল হইতে একটী বই টানিয়া লইয়া খুলিতেই—কি কতগুলা কথা, কতগুলা ছবি তাহার মনের ভিতর খেলিয়া গেল। সেদিনও ঠিক এমনি দিনে, এমনি সময়ে, এইখানে ঠিক এই বইখানি হাতে লইয়া সে পাতা উল্টাইতেছিল, সুনীল এই সময়েই আসিয়া, ঐ সোফায় শুইয়া বলিয়াছিল "একটা 'সোনেটা' বাজাও না বৌদি"—সুরমা বাজাইয়াছিল সেদিন প্রাণ দিয়া, সমস্ত দেহ মনের উষ্ণ পরশ ঢালিয়া। বাজনা ধীরে ধীরে ফুটাইয়া তুলিয়াছিল একই সাথে শ্রোতার ও বাদিকার মানস চক্ষে কি সে এক উৎসবময়ী স্বপ্নকুঞ্জের ছবি। সুর লহরে লহরে বাজিয়া বাজিয়া সেইখানে একসাথে মিশাইয়া দিয়াছিল, চন্দ্রকর সমাচ্ছন্ন রহস্যময়ী বন বীথিকার বুকের ভিতর খেলিয়া যাওয়া ক্ষীণকায়া নির্ঝরিণীর চঞ্চল চকিত কলধ্বনির সাথে তাহাদের অন্তরের মিলিত গান। এই অপূর্ব্ব সৃষ্টির জীবন-সঞ্চারিণী সুন্দরী প্রিয়ার সাথে কি অমর সুরস্রষ্টা কল্পনার মিলনবাসর রচিয়া বিশ্ব-ব্যাপিয়া ছড়াইয়া দিয়াছে তাহাদের প্রাণের অনুপম মিলন সুষমা? এ কি মিলনের তৃপ্তিভরা সুখোচ্ছ্বাস? অথবা অনন্ত অতৃপ্তির হতাশাবাহিনী বিরহ-সঙ্গীত? কে জানে? ঘুরিয়া ফিরিয়া বার বার কতবার সে বাজাইয়াছিল সেদিন তাহার মনে নাই—আর সুনীলও কতক্ষণ শুনিয়াছিল তাহাও সে জানে না—অনেকক্ষণ পরে সে রুদ্ধস্বরে বলিয়াছিল 'চমৎকার—! স্বর্গ আকাশে নয়, বৌদি, স্বর্গ এইখানে, এত মধুরতা, এত সৌন্দর্য্য, এই পৃথিবীর বুকে গ'ড়ে ওঠে। সৌন্দর্য্য জগতের প্রাণ, সৌন্দর্য্য সৃষ্টির আদি—আর সেই সৌন্দর্য্য মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে, প্রাণ পেয়েছে এই পৃথিবীতে, সৌন্দর্য্যই আনন্দ—সেই আনন্দ যত পার ভোগ করে নাও—হেলায় দিন হারিও না—পায়ের নীচে দ্রুতগতিতে সময় চলে যাচ্ছে—এইখানেই সব, তাই এইখানেই বেঁচে থেকে এইখানের সব ভোগ করে নাও।"

এমন সময়ে রাজীব বেড়াইয়া বাড়ী ফিরিল, এবং সুরমার উদ্দেশে সেইখানে আসিয়া, তাহার পাশে একটী চেয়ার টানিয়া বসিল। সুরমা কোন কথা বলিল না। সে তখন অন্যমনস্ক ভাবে বইএর পাতা উল্টাইতে ছিল। রাজীব বলিল—"সুরমা, কলকাতা ছেড়ে আমাকে একবার যেতে হচ্ছে।"

বই হইতে মুখ না সরাইয়া সুরমা বলিল—"কোথায়?"

"একটু দূরে—"

"কেন?"

রাজীবকে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া সুরমা বলিল—"জানি তুমি আমাকে বলবে না—"

খানিক ভাবিয়া রাজীব কোমলস্বরে বলিল—"বলিনি—তুমি দুর্ব্বল শরীরে এ আঘাত সহ্য করতে পারবে না ব'লেই—"

সুরমার বুকে খানিকটা রক্ত ছলাৎ করিয়া খেলিয়া গেল, সে চমকিয়া রাজীবের দিকে চাহিয়া বলিল—"কি?"

তবুও রাজীবকে নিরুত্তর দেখিয়া সুরমা অসহিষ্ণুভাবে বলিল—"কি বলছ না কেন?"

মৃদুস্বরে রাজীব বলিল—"আর লুকিয়ে রেখে লাভ নেই সুরমা—সুনীল মারা গেছে"

সুরমা যে ভাবে বসিয়াছিল—অনেকক্ষণ সেইভাবেই বসিয়া রহিল—স্তব্ধ হইয়া স্থির দৃষ্টিতে রাজীবের মুখের দিকে চাহিয়া—এক চুলও নড়িল না—একবারও চমকিল না। তাহার সমস্ত দেহ মন শক্তি তখন অচল হইয়া গিয়াছে, যেন প্রচণ্ড একটা আঘাত পাইয়া সমস্ত জীবনের গতি থমকিয়া থামিয়া গিয়াছে। অনেকক্ষণ পরে সে শুনিল রাজীব বলিতেছে—"পরশু দিন আমি বোম্বে যাবো সুরমা—তোমার অসুখের সময় এ খবর একদিন হঠাৎ এসে আমার কাছে পৌচেছিল। তুমি কয়েকদিন ভাল ভাবে থেকো—মন খারাপ করে সঙ্গে সঙ্গে শরীরটা আবার খারাপ ক'রে ব'সনা। আমার শুধু ভয় হয় পৃথার জন্য—পৃথা এত বড় আঘাত সইবে কি করে।"

জমাট অশ্রু সুরমার সারা বুক মথিত করিয়া শ্বাসরুদ্ধ করিয়া দিতে চাহিতেছিল। সে জোর করিয়া কোনরকমে নিজেকে সংবরণ করিয়া রহিল—কিন্তু একটু পরেই রাজীব যখন বাহিরে চলিয়া গেল, সে নিজেকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না—খোলা পিয়ানোর উপর মাথা রাখিয়া গুমরিয়া কাঁদিয়া উঠিল—সঙ্গে সঙ্গে পিয়ানোটা অনৈক্য করুণ সুরে আর্তনাদ করিয়া থামিয়া গেল।

সুরমার সমস্ত মন,—চিন্তারাশি আবার বাঁধন ছিঁড়িয়া কোথায় কোন দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া সরিয়া গেল সে কিছুতেই আর তাহা গুছাইয়া আনিতে পারে না। সারা দিন রাত তাহার কাটিয়া যায় কি এক মহাশূন্যতার ভিতর তাহার সমস্ত অস্তিত্বকে পর্য্যন্ত উদাস করিয়া দিয়া! শুধু সব সময়ে চোখের সামনে উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠে দুইটি মুখ—তাহা পৃথার ও সুনীলের। মৃত্যুর সঙ্গে এর পূর্ব্বে তাহার আর এত ঘনিষ্ঠ পরিচয় কখনো হয় নাই, তাই তাহার এ প্রথম সাক্ষাৎ তাহাকে অনেকখানি আঘাত দিয়া গেল। তাহার মনে হয় সুনীলেরও হাস্য-রঞ্জিত মুখ স্থির, নর্ম্মহীন, কঠিন হইয়া গিয়াছে—চোখ দুটি নিস্পন্দ, অচঞ্চল, সকল হাসির উৎস শুকাইয়া প্রশান্ত গুম্ভের ভিতর লুকাইয়াছে, উষ্ণ স্পর্শ তাহার চিরশীতল, হিম হইয়া গিয়াছে। এ কি নিষ্ঠুর খেলা প্রকৃতির। তারপরে—তারপরে, যখন তাহার কল্পনায় উজ্জ্বল হইয়া উঠে ধূ ধূ এক অগ্নিশিখা আকাশের সঙ্গে মিশিয়া যাইতে চাহিতেছে সুনীলেরই সুন্দর দেহকে ঘিরিয়া নাচিয়া নাচিয়া—সে আর ভাবিতে পারে না, শিহরিয়া উঠে। কেন এমন হয়? মানুষ আসে, যায়, কোথায় যায়?—কে জানে? সুখ, দুঃখ, মায়া, মমতা, ক্ষমতা ঐশ্বর্য্য এক মুহূর্ত্তে সব ত্যাগ করিয়া বিরাগী, উদাসী হইয়া তাহারা কোন পথে কোথায় চলিয়া যায়। কে ইহার সিদ্ধান্ত করিতে পারিবে? যুগ যুগ ধরিয়া কেহ পারে নাই, কোন বেদ, পুরাণ ইহার সঠিক খবর দিতে পারে নাই—পৃথিবীতে হয় তো সব হইবে কিন্তু মৃত্যুর রহস্য দুয়ার চিরকালই বুঝি অনুদ্‌ঘাটিত হইয়া রহিবে জগতের কাছে। মৃত্যু আছে বলিয়াই জীবন এত মধুর, ত্যাগ আছে বলিয়াই বুঝি ভোগ এত স্পৃহনীয়—প্রিয়! আর পৃথা! সে কি করিয়াছে, কি করিতেছে? তাহার বিলাসী প্রাণ মন লইয়া সে কি করিয়া বরণ করিয়া লইয়াছে ত্যাগের এ মহা আহ্বান।

কয়েকদিন পরে সে রাজীবের চিঠি পাইল। সে লিখিয়াছে—"সুরমা, পৃথা বেশ শান্ত ভাবে তার এ দুর্ভাগ্য বরণ করে নিয়েছে! এবং কঠোর ভাবে সমস্ত নিয়ম প্রতিপালন করছে। সে আমাকে দেখে কাঁদেনি। কোন রকম হা হুতাশ বা কাতরতা জানায় নি। উপরে সে অনেকটা যেমন ছিল তেমনি আছে, তবে মনে হয় ভিতরটা তার ভেঙ্গে গেছে।"

সুরমা চোখের জল ফেলিয়া উত্তর লিখিল—"পৃথাকে এখানে নিয়ে এসো।"

রাজীব লিখিল—"পৃথা এখন আসবে না। সে বলে এক বৎসর অন্যের অন্নগ্রহণ করতে নেই। মাসান্তে শ্রাদ্ধ সে নিয়ম মত বিমুকে দিয়ে করিয়েছে। পৃথা যখন আসবে না—তখন আমি শিগ্‌গিরই ফিরে আসছি।"

সুরমার দারুণ শোকের উচ্ছ্বাস কয়েক দিনে কিছু কমিয়া গিয়া বাহিরে সে অনেকটা শান্ত হইলেও অন্তরের গভীর শূন্যতাকে সে কিছুতেই কোন কিছু দিয়া ভরিয়া তুলিতে পারিতেছিল না। তবু সে বাহিরে নিজের স্বাভাবিক ভাব ফিরাইয়া আনিল। [illegible]

শোক করিবার তাহার অধিকার নাই—কিন্তু অন্তরে সে যদি তাহাকে বসাইয়া রাখে তাহার সর্ব্বোচ্চ প্রীতির আসনে তাহা হইলে কাহারও কিছু বলিবার নাই। মৃত্যু সুনীলকে যেন তাহার আরো নিকটে আনিয়া দিয়াছে।

সে একেবারে আপনতম হইয়া গিয়া সুরমার নিজের অস্তিত্বের সহিত এক হইয়া মিশিয়া গেল। সব কাজে তাহার সমস্ত হৃদয় মথিত করিয়া বাজিয়া উঠে রণিয়া রণিয়া শুধু সুনীলেরই কথা। তাহার বাঁচিয়া থাকিবার আগ্রহ, পৃথিবীর সর্ব্বসুখ উপভোগ করিবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা জ্বলন্ত হইয়া যেন তাহাকেই পুড়াইয়া মারিতে চায়। শেষ পত্রে সে যে প্রাণের সমস্ত আবেগ ঢালিয়া লিখিয়াছিল "আমি বাঁচতে চাই সুরমা, জীবন চাই—" কিন্তু সব আশার সাথে তাহার সুন্দর জীবনও কেমন করিয়া নিয়তির কোন অন্ধকার গর্ভে ডুবিয়া গেল কে বলিবে?

কয়েক দিন পরে রাজীব ফিরিয়া আসিল। সুরমা জিজ্ঞাসা করিল সর্ব্বাগ্রে পৃথার কথা—"পৃথা কি করছে?"

রাজীব বলিল—"তোমাকে যা লিখেছিলুম ঠিক তাই—পৃথা তার সমস্ত শক্তি দিয়ে এ অপরিহার্য্য দুঃখকে বেশ বরণ করে নিয়েছে।"

"তুমি গিয়ে কি দেখলে?"

"আমি দেখলুম সে তার বিলাসিতার সমস্ত উপকরণে সাজানো প্রকাণ্ড বাড়ীর চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে, যদিও তার সমস্ত চলাফেরার ভিতর একটা দারুণ অস্বচ্ছন্দতার ভাব। আমি যেতে বসতে বলে নিজে মাটীর উপর ব'সে পড়লো—তারপরে তোমার কথা, প্রণবের কথা বেশ শান্ত ভাবেই জিজ্ঞেস করলো।

"আর কিছু বললো না?"

"হ্যাঁ বললো অনেক সব অবান্তর বাজে কথা—সেখানে নূতন কি কি পরিবর্ত্তন হয়েছে—রাধানগরের বিশু খুড়ো কেমন আছে—এই সব, আমি দেখলুম—তাকে সান্ত্বনা দিতে যাওয়া আমারি ধৃষ্টতা হয়েছে—আমি আর কি বলবো ভেবে পেলুম না—তার কথা নিয়েই আলোচনা করলুম। কোন কিছু জিজ্ঞেস করবার উপক্রম করতেই দেখলুম সে সে কথাটাকে অন্য কথা দিয়ে চাপা দেবার জন্য ব্যগ্র হ'য়ে উঠেছে।"

"কেন?"

"অনেকে আছে—যারা অত্যধিক যন্ত্রণাটাকে চাপা দিয়েই রাখতে চায়। ক্ষতের সে যন্ত্রণা নিজেই ভোগ করে আর কাউকে তা জানাতে চায় না—আর কেউ বা তা প্রকাশ করে, তাকে জাগিয়ে রেখে শান্তি পায়। সেই জন্য মনে হ'ল পৃথা যেন সুনীলের কোন কথাই আলোচনা করতে চায় না!"

"কি হয়েছিল?"

"তা আমি জিজ্ঞেস করি নি, আর ইচ্ছেও হয়নি কারণ মনে হ'ল তার বুকের কালো জমাট বাঁধা প্রকাণ্ড সমুদ্র একটু বাতাসেই দুলে উঠবে আকুল হয়ে—তাই আর তাকে ঘাটাতে সাহস করলুম না।"

সুরমা ব্যথিত হইয়া ভাবিল, এই হাসির উৎস কোথায় গিয়া লুকাইয়া, কোন বন্যায় দুকূল ভাসাইবে কে জানে! ও বুকে লুকানো অশ্রুবিন্দুগুলি জমাট হইয়া কোন আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত রচিয়া তুলিবে কে জানে? সে মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"সে কাঁদেনি?"

"না, আমি তাকে কাঁদতে দেখিনি, মনে হ'ল সমস্ত কান্না জমে পাথর হয়ে চেপে বসেছে ভারি হ'য়ে তার বুকে—তার চোখে জলের বদলে আগুন দেখেছি, সে আগুনে যেন তারই সমস্ত দেহ মন পুড়ে ছাই হ'য়ে গেছে।"

সুরমা আপন মনে বলিল—"সেই পৃথা—যে সমস্ত জীবনটাকেই তুচ্ছভাবে নিয়ে চ'লে এসেছে, আজ তার সেই জীবনেই চিরবাস্তব এত বড় কঠোর মূর্ত্তিতে এসে দেখা দিবে কে ভেবেছিল? কেন এমন হয় কে জানে!"

রাজীব বলিল—"কিন্তু পৃথার এ ভাবটা আমার ভাল লাগলো না—এমন ক'রে যদি সে তার জীবনের সব চেয়ে বড় ক্ষতিটাকে সহ্য করে নেয়, তা'হলে সেও মনে হয় শিগগিরই মুসড়ে ভেঙে পড়বে।"

সুরমা একটু ভাবিয়া বলিল—"কিন্তু আমার কি মনে হয় জানো? পৃথা সব ভুলে যেতে চেষ্টা করবে প্রাণপণে, আমি জানি সে কোন জিনিষই গম্ভীরভাবে নিতে পারে না।"

রাজীব একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—"কিন্তু

হয়তো তোমার কথাই ঠিক সুরমা—তাকে আমি বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে গল্প করে হাসতে দেখেছি।"

"তা'হলে হাসির উৎস তার শুকিয়ে যায়নি? তবে যে বললে সে গভীর ভাবে সব সহ্য করে যাচ্ছে!"

"এক একবার তাই যেন মনে হয়েছে তাকে দেখে—যে তার বুকে খালি আগুন খেলে যাচ্ছে—কিন্তু এও ঠিক মাঝে মাঝে তাকে খুব হাসতেও দেখেছি। কি জানি—"

"আমার একবার যেতে ইচ্ছে করে—একলাই তো আছে?"

"একলা আছে বটে—কিন্তু প্রায়ই সহানুভূতি জানাবার জন্য অনেকে এসেছে আসছেও—সে সকলের সঙ্গে সমানে মিশছে তুমি গিয়ে আর কি করবে—সে বলেছে নিজেই আসবে—"

"তা'হলে সে ভুলতেই চেষ্টা করছে বোধ হয়—"

"কিন্তু এত বড় জিনিষটাকে সে গভীরভাবে নেবেনা—এটা কি তাচ্ছিল্য বা ঔদাসীন্য?"

"কি জানি ঠিক বুঝতে পারছি না—বাবার মৃত্যুর পরেও সে ঠিক এই ভাবে একদিনও নিজেকে লুকিয়ে রাখতে চায়নি—সে সকলের সঙ্গে সমানে মিশেছিল—কিন্তু এক একদিন দেখতুম—তার সমস্ত দেহ মন দিয়ে সে যেন যুদ্ধ করছে নিজের সঙ্গে, বাবাকে সে খুব ভালবাসতো—"

রাজীবের কথা শুনিয়া সুরমা কি রকম একটা অভূতপূর্ব্বভাব অনুভব করিল। পৃথা তাহা হইলে হাসিমুখেই এ আঘাত সহ্য করিয়াছে, হয়তো বেশ হাল্কা ভাবেই নিয়াছে সে অদৃষ্টের এ দারুণ পরিহাসকে। রাজীব তাহার ভাই তাহার চক্ষে ভগিনীর এ অবিচলিত সহজভাব একটা বড় রূপ নিয়া দেখা দিয়াছে, কিন্তু সত্য নিরপেক্ষ দর্শীর কাছে পৃথার এ ভাব কি ভাবে দেখা দিবে কে জানে? রাজীব তাহার ভিতর যে সহের ভস্মাচ্ছন্ন আগুন দেখিয়াছে তাহা হয়তো শুধু কল্পনায় মাত্র। কিন্তু পৃথা হয়তো তেমনি তাচ্ছিল্য ভরেই বলিয়াছে "O! dash it।" সুরমা ব্যথিত হইয়া আবার ভাবিল না, না তাহা হইতে পারে না, আর যাহাই হউক পৃথা সুনীলকে ভালবাসিত, সমস্ত প্রাণ, মন, দেহ সব দিয়া, অন্ততঃ স্বামী বলিয়া না হইলেও "ভালবাসিত" শুধু এইটুকুর জন্য কি একবারও তাহা অভাবটাকে চোখের জল দিয়া বরণ করে না? তাহা কি সে হাসি দিয়া অভ্যর্থনা করিয়া লয়? পৃথার প্রতি তাহার একটু অশ্রদ্ধা হইল। সুনীলের প্রিয়তমা পৃথা সে হাসি মুখেই হয়তো শেষ বিদায় সম্ভাষণ জানাইয়াছে—স্বামীকে, তাহার মহাযাত্রার দিনে—কি ভীষণ—মানুষে এতটা পারে কি?. কিন্তু পরক্ষণেই আবার মনে হয় সে মিছামিছি শুধু একটা কথার উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া তাহাকে এত বড় অভিযোগে অভিযুক্ত করিতেছে কেন? রাজীব তাহাকে শুধু হাসিতে দেখিয়াছে—হাসাটা পাপ নয়। পৃথা সহানুভূতি চায় না, সমবেদনা চায় না—কাহারও দয়া-মায়া চায় না, সেইজন্যই হয়তো সে সকলের সম্মুখে মাথা উঁচু করিয়াই নিয়তির এ কঠোর ব্যঙ্গকে হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছে, তাহারই কথায় "ভাগ্যকে তাচ্ছিল্য" করিয়াছে, কিন্তু সর্ব্ব চক্ষুর অন্তরালে সে কি সুনীলের পরিত্যক্ত গৃহতলে লুটাইয়া পড়ে না? তাহারও অন্তরাত্মার মর্ম্মভেদী বিলাপধ্বনি শূন্য পথচারী সুনীলের মুক্ত আত্মাকে মর্ত্ত্যের গৃহ পানে ফিরাইয়া লইয়া আসে না কি? কে জানে!

প্রবল একটা ঝঞ্ঝা একটা প্রলয় কাণ্ড সৃষ্টি করিয়া, কতগুলা কি উলট পালট করিয়া দিয়া চলিয়া গেলে, তাহার প্রভাবে অভিভূত থাকিয়া কিছুদিন কাটিয়া যায়, তারপরে ক্রমে পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে সকলের ভিতর আবার স্বাভাবিক ভাব ফিরিয়া আসে। রাজীবও শান্তভাবে আবার নিজের কাজে ডুবিয়া গেল, কিন্তু সুরমা এত শীঘ্র অত বড় কঠিন আঘাতের বেদনা ভুলিয়া যাইতে পারিল না।

তাহার শরীর আবার খারাপ হইয়া গেল। মুখ পাংশু হইয়া উজ্জ্বল চোখ দুটী সমস্ত প্রভা হারাইয়া ফেলিল। রাজীব একদিন বলিল—"সুরমা, তোমার শরীর খারাপ হয়ে যাচ্ছে একবার চেঞ্জ ক'রে আসি চল—"

"কোথায়?"

"যেখানে খুসী—"

সুরমা একটু ভাবিল, কিন্তু এমন কোন [illegible] পাইল না, যেখানে গেলে সে সম্পূর্ণভাবে [illegible]

যাইতে পারে—সবই তাহার কাছে সমান হতাশার, সম অন্ধকার ভরা, সবই তাহার কাছে শূন্য। সে বলিল—"কোথায় যাবো আর—অন্য কোথাও ভাল লাগে না।"

রাজীব জোর করিয়া বলিল—"নির্জ্জন কোন জায়গা বোধ হয় তোমার ভাল লাগবে না, চল কিছুদিন আর কোন সহরে থেকে আসি—।"

"কোন সহর?"

"আগ্রা দিল্লী?"

সুরমা একটু বিরক্তিস্বরে বলিল—"আগ্রা দিল্লা এতো প'চে গেছে যে আর ভাল লাগে না—"

রাজীব বলিল—"তা ঠিক, তার উপর ভ্রমণ কাহিনী লিখে লিখে আরো লোকে বেশী পচিয়ে ফেলেছে—কিন্তু তোমায় আমি তাজ বা সেই বিগত-শৌর্য্যের ধ্বংসস্তূপ দেখাতে নিয়ে যেতে চাই না, তবে কি জানো নির্জ্জন জায়গা ভাল লাগবে না, অথচ একটু চেঞ্জও দরকার সেই জন্যই বলছিলুম দিল্লীর কথা, সেখানে একটা ভাল 'টকি হাউস' আছে, বেড়াবারও ভাল জায়গা আছে, আমার কয়েকজন বন্ধুও আছে—"

"আর অন্য কোন সহর—"

"কলকাতার চেয়ে জমকালো সহর তো আর ভারতে দেখতে পাচ্ছি না একটাও, দিল্লীটা ধ্বংসের একটা মহা-শ্মশান হ'লেও ইদানীং একটু ভাল হয়েছে,—তাছাড়া একটা Society পাবে—এই শীতকালেই সেখানে ভাল সময়—" সুরমা অনেকক্ষণ পরে মৃদুস্বরে বলিল—"এইখানেই ভালো—"

"কিন্তু তুমি শুধু ভেবে ভেবে শরীর খারাপ করছ যে—"

সুরমা একটু লজ্জিত হইল—"ভেবে ভেবে" সে কাহার জন্য শরীর খারাপ করিতেছে তাহা কি রাজীব বুঝিয়াছে? সে বলিল—"ও ঠিক হয়ে যাবে।"

রাজীব উত্তর দিল—"আর অসুখটা ক'রে বসনা তাহলে—"

কাজেই রাজীব আর অন্যত্র যাইবার সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া রহিয়া গেল। আর সুরমা নিজেকে কাজে ব্যাপৃত রাখিয়া তাহার পুরাণো সভা সমিতির খাতাপত্র নূতন করিয়া খুলিয়া বসিল। কলিকাতার পারিপার্শ্বিক অবস্থা যদিও তাহার পক্ষে প্রীতিকর নহে তবুও সে কলিকাতা ছাড়িয়া যাইতে চাহিতেছিল না কারণ অবসন্ন মনটার সহিত সমস্ত শরীরও যেন অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে, এখন অন্য কোথাও গিয়া নূতন করিয়া আর গুছাইয়া বসিবার তাহার শক্তি নাই। কলিকাতা তাহার পক্ষে তিক্ত কটু রসে ভরা—এখানে মিনতি আছে,কণিকা আছে, রাজীবের দীনদরিদ্র বন্ধুরা আছে, শরত আছে—আর সঙ্গে সঙ্গে তাহার নিন্দা, গ্লানি, অপবাদ আছে—তবুও এই মাটীর সঙ্গেই তাহার কি কতগুলি স্মৃতিও বিজড়িত হইয়া গিয়াছে বুঝি যাহা লইয়া খেলা করিয়া থাকিতে সে ভাল-বাসে শান্তি পায়।

ভুলিতে চাহিয়াও ভুলিতে পারে না সে—বিস্মৃতির অতল সাগরে ডুব দিতে গিয়া সে বার বারই ভাসিয়া উঠে স্মৃতির উজ্জ্বল বেলাতটে। ভাবে থাকুক স্মৃতি—তাহার জীবনের সাথী হইয়া, তারপরে শেষ দিনে তাহাই যেন মহামিলনের মঙ্গল শঙ্খ বাজাইয়া পুষ্প আস্তরণ বিছাইয়া দেয় তাহার শুভ যাত্রা পথে।

১৮

কিছুদিন পরে হঠাৎ একদিন বিজয় আসিয়া তাহাকে সংবাদ দিল। সুরমা আবার বহুদিন পরে প্রণবের সঙ্গে একটু হাল্কামনে কথা বলিতেছিল—বিজয়ের নাম শুনিয়া সে পরম আগ্রহভরে তাহাকে ডাকাইয়া নিজের বসিবার ঘরে বসিল। বিজয় তাহাকে দেখিয়াই বলিল—"কি হয়েছে তোমার? এত শুকনো দেখাচ্ছে যে?"

"সুরমা ম্লান হাসিয়া বলিল—"অসুখ হয়েছিল, তোমার খবর অনেকদিন ধরে পাইনি—তুমি কোথায় ছিলে?"

"আমি এখানে সেখানে ঘুরছিলুম, হঠাৎ অনেকগুলো কাজ এসে পড়েছে,—কাল ফিরে এসে শুনলুম তুমি আমাকে ডেকেছিলে—তাই ভাবলুম দেখি খোঁজ ক'রে কেন—"

"না ডাকলে আসতে না—না?"

"তা বলতে পারি না সুরমা, তবে অনাহুত কোথাও যেতেও ভালবাসি না আমি জানো তো?"

"তা জানি, সেইজন্যই ডেকেছিলুম—"

"তবে ২।১টী জায়গা আছে যেখানে অনাহুত হ'য়েও আমি যাই—এখন কেমন আছ?"

"ভালই আছি—"

"কিন্তু তবু তোমাকে এত বিমর্ষ লাগছে কেন? কি হয়েছে? তোমরা চিরকাল সুখ আনন্দকেই কিনে রেখেছ—দুঃখের সঙ্গে তোমাদের পরিচয় তো দেখতে পাই না।"

"কে বললো তোমায়? বিজয়, দুঃখটাই চিরসাথী আমাদের, তার ভিতর থেকে আনন্দকে আমরা জোর করে জাগিয়ে তুলি—তোমার আশ্রম কেমন চলছে?"

"চলছে একরকম, কি জানো, আমি দেখেছি এ সব কাজ কখনো আটকায় না, চ'লে যায় কোনরকম ক'রে। তোমাদের কাছে মূর্খ বোকা হ'তে পারি, কিন্তু এখনো এখনো নিজে খেতে না পেলেও আমার চেয়েও দুঃখী যারা তাদের খাবার একটু জোগাড় ক'রে দেবার শক্তি আছে।"

"কোত্থেকে মাথা গরম ক'রে এলে বলতো, শুধু যে ঝগড়াই করছ—? আমার কিন্তু ঝগড়া করবার মোটে ইচ্ছে নেই—"

বিজয় হাসিয়া বলিল—"তাই নাকি? পান টান আছে? না সাহেবিয়ানার বাধা—!"

সুরমা পানের বাটা হইতে পান তুলিয়া দিয়া বলিল—"কি যে বল—আমার ঠোঁট দুটো তো কখনো সাহেবিয়ানার মর্য্যাদা রাখতে সাদা থাকে না—সব খবর বল বিজয়—তোমার, মীরার কণিকার আমি শোনবার জন্য একেবারে আকুল হয়ে আছি।"

"খবর—! খবর আমি জানবো কি ক'রে?"

"না! তুমি আজ ঝগড়াই করবে শুধু—তাহলে ব'কে যাও, আমি চুপ করে থাকি—"

"সত্যি বলছি—বিশেষ কোন খবর জানি না।

"মীরার খবর জানো না?"

"কিছু জানি! সে নিজেকে ছড়িয়ে দিয়েছে আরো কর্ম্মের ভিতর। সে বেশ আছে,"

"দেখো মেয়েটার জীবন নষ্ট করে দিও না বিজয়!"

"আমি নষ্ট করছি কি রকম?"

"নষ্ট করছো না? তোমার জন্য বেচারা সন্ন্যাসিনী সাজলো, আর তুমি তাকে একেবারে অবহেলা ক'রে দূরে সরিয়ে দিচ্ছ"—

"কিন্তু সুরমা,—এর ভিতর দূরে সরানো আর কাছে আনার কোন রকম কথা আছে তা আমি জানি না—আর আমি এর ভিতর এত বড় একজন কর্ত্তাকারক ব'লে স্বপ্নেও ভাবিনি—কি বলছো!"

"হ্যাঁ তাই—তোমাকে তো এই কথাই লিখেছিলুম—"

"আমাকে কি করতে বলছ তুমি? আর যদি তাই বল, যে সে আমার জন্যই সন্ন্যাসিনী সেজেছে—তা'লে আমি বরং তাকে সৎপথেই অগ্রসর হ'তে সাহায্য করছি ব'লে মনে হয়—কিন্তু নষ্ট করছি—কি রকম?"

"ঐ সন্ন্যাসিনীর মত জীবন কাটিয়ে দেওয়াটাই ভাল হল?"

আমার মনে হয় তাই ভাল—"

"কিন্তু সত্যি সন্ন্যাসিনী কেউ হ'তে পারে কিনা সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে বিজয়।"

"তুমি নিজে পার না ব'লে আর অন্য কারো পারা না পারার উপর সন্দেহ ক'রে লাভ নেই তো—যা নিজে কখনো করনি বা করবেও না—তাই নিয়ে অন্যকে সমালোচনা করাটা কি ভুল নয়?"

"নিজে না পারলেও মানুষের মন মানুষ অনেকটা বুঝতে পারে না কি?"

"তা হয়তো পারো—কিন্তু তুমি যা পার না তা অন্যেও করতে পারে এমন ভাবাটাও তো অন্যায়! তুমি ছবি আঁকতে পার না বলে যে Raphael ছিল না, তুমি বেহালা বাজাতে জানো না ব'লে যে Stadivarius বা Kubleik ছিল না বা নেই, তার তো কোন মানে নাই—"

"তা নেই না থাক্—কিন্তু তোমার এক্ষেত্রে ও সব কোন যুক্তিই খাটে না বিজয়! মীরা অন্তরে সন্ন্যাসিনী হয় নি, সে দায়ে প'ড়ে হয়েছে—আর তুমিও অন্তরে সব ত্যাগ করতে পেরেছ কি?"

"আমার কথা তোমার জেনে দরকার নেই—তবে মনে হয় যে ভাবেই হোক্ মীরা যা করছে এতে সে [illegible] অবনত হবে না—"

"বাজে কথা! ও কি যে তোমরা এক ভাবের কথা শিখেছ—কাজ, দরিদ্রসেবা, আত্মদান ও সবে কি আছে—? আত্মদান করে আমি মারা গেলুম, যত দুঃখ, দৈন্য, কষ্ট সহ্য করলুম, আর ফলে হ'ল কিনা য'দের জন্য করলুম তারাই আমার পিছনে আরামে বসে বললো 'fool'—পৃথিবীর ধারা এমন নয়, যত পারো নিজে ভোগ করে যাও, ফুর্ত্তি ক'রে যাও—তবু লোকে একদিন বলবে—'লোকটা ভোগী ছিল বটে—"

"জগতটাকে অত হেয় ক'রে নাই বা দেখলে সুরমা, কেন আমাদের দেশে ত্যাগের আদর কি কেউ করে নি? বা করছে না? না আজ সকলে ত্যাগী মহাপুরুষদের fool' ব'লে গালাগাল দিচ্ছে? তোমার বড় অন্যায়—"

"আচ্ছা বেশ আমার অন্যায় মেনে নিচ্ছি, নইলে—আর কিছু বললে—একেই তুমি চটে আছ—তাছাড়া ও পৃথিবীর কথা নিয়ে আলোচনা করে মাথা গরম করা ছাড়া আর কোন লাভ দেখতে পাচ্ছি না—নিজেদের কথা গুলোই আলোচনা করা যাক—তুমি মীরাকে সুখী কর—"

"আমি মীরাকে দুঃখী করিনি—সুখী করতে পারবো ব'লে মনে হয় না সুরমা,—আর চিঠিতে তো তোমাকে লিখেছি—আমি তার যোগ্য নই—"

"যোগ্য নওই বা কেন? ছিঃ বিজয়, তোমাকে আমি এর চেয়ে আরো শক্ত ব'লে জানতুম—পুরুষ মানুষের অত দুর্ব্বলতা সাজে না—"

"দুর্ব্বলতা আমার কোথায় দেখলে?"

দুর্ব্বলতা দেখেছি বই কি—কি কি কতগুলা লিখে-ছিলে—সেই কথাই বলছি—"

"ওঃ তা আমাকে ঠাট্টা করতে পার—কারণ তোমরা এ সবের মর্ম্ম বোঝ না সুরমা—আর আমি সর্ব্বপ্রকারে গরীব, দীন, রিক্ত আমাদের জীবনের সম্বল যে বস্তুটুকু তা কাদামাখা হোক্ অথবা ধূলো ভরা হোক্ আমার কাছে তাই মহামূল্য সম্পদ—একে যদি দুর্ব্বলতা বল তবে তাই—"

"যা'ক্ আগে ছিল ফুল—এখন হ'ল তা মহামূল্য সম্পদ পরে আরো কত কি হবে—"

"বেশ ফুল ফুলই নয় রইল—তাই আমার থাক্—মরুভূমির ওক কঠোরতার মধ্যে জীবনটা কাটিয়ে দিতে হবে, তখন ঐ ফুলটুকুই আমার নীরস প্রাণে সঞ্জীবনী ধারা বইয়ে দেবে বলেই যদি আমি যত্ন ক'রে তা রেখে দি?"

"মরুভূমিতে ফুল ছাড়া, জল খাবার এই সব জিনিষই দরকারী বেশী, তাই বলি বিজয়, বাঁচতে চেষ্টা কর ও শুকনো ফুল শুঁকে ম'রে গিয়ে লাভ নেই।"

"তোমার আমার মতে কখনো মিলবে না সুরমা—আর কথায় কথা বাড়িয়ে লাভ নেই আজ উঠি।"

"না বোস আর একটু—"

"ব'সে শুধু তর্ক করা ছাড়া আর তো কথা নেই—কিন্তু, সুরমা কি জানি এটা হয়তো আমারই দুর্ব্বলতা—যাকে আমি অন্তরে পূজা করি—সে আমার কাছে দেবী তার স্বরূপ মূর্ত্তি তুমি—"

"সত্যি বিজয়—তোমার দুর্ব্বলতা অথবা বোকামি বটে—কেন যে তুমি অলীক যত কিছু মনে গ'ড়ে তাই নিয়ে বেঁচে থাকতে চাও তা জানি না—আমি দেবী দূরের কথা মানুষ কিনা তাই বলতে পারি না—"

"তা তুমি কিছু না হও—তবু জানি না কেন তোমাকে আমি বেশ উঁচু করেই দেখি তোমার সমস্ত দোষগুলো জেনেও,—তুমি যা আছ তা দেখেও,—অথবা এর চেয়েও আরো বেশী দেখলেও আমার অন্তরে তুমি যা তাই থাকবে—

"তুমি অত্যন্ত Sentimental বিজয়!"

"জানো তো হিন্দুরা খড়, মাটি, রাংতা দিয়ে মূর্ত্তি গ'ড়েই তাকে পূজো করে—তুমি খড় হও মাটি হও সুরমা—আমার সাধনার বলে তোমাতেই প্রাণ সঞ্চারিত ক'রে নেবো—যে পূজক বা ভক্ত তার কাছেই মূর্ত্তির সমাদর—অবিশ্বাসীর কাছে তা মাটী মাত্র—"

"আচ্ছা থাক্ আমার এই প্রাণটুকু নিয়ে বেশ আছি বিজয়, আর অন্য কোন প্রাণ চাই না—তুমি মীরাকে বিয়ে কর এই আমার—মানে দেবীর অনুরোধ অথবা আদেশ—

"তা হয় না সুরমা,—দেবীর কাছে বরই প্রার্থনা করি আদেশ নয়—"

"তা'হলে তোমার ইচ্ছামত তোমার দেবী ... এই

বুঝি তোমার সাধনা—?" আচ্ছা বিজয়! তোমার এ কি অন্যায় নয়?"

"কি?"

"এই সব যা বলছ—কাউকে যদি তোমার মনে মনে পূজো করেই থাক তবে কর—তাকে যখন অন্যভাবে পাবার আশা নেই তখন যদি তাকে শুধু নীরবে পূজা ক'রে যাওয়াই তোমার উদ্দেশ্য হয়, তবে তোমার এতে কি আপত্তি আছে?"

"আপত্তি আছে সুরমা, আর তোমরাই বা কেন ও মেয়েটিকে অত সহানুভূতি, দয়া, দেখিয়ে অযাচিত ভাবে তার "ভালো" করবার জন্য অত উঠে প'ড়ে লেগেছ বল ত? সে নিজে কোনদিন বলেছে? আমার মনে হয় তোমরা তাকে যতটা কৃপা প্রার্থিনী বলে মনে করছ সে ততটা নয়। আমি আজ উঠি অনেক বকা গেল—"

"উঠবে ওঠো কিন্তু তুমি একবার ভাল ক'রে ভেবে দেখো—বুঝলে? মীরা আর কারো কৃপাপ্রার্থিনী হ'লেও তোমার নয়—তোমার জন্যই বলছিলুম—তোমাকে সুখী দেখলে আমিও সুখী হতুম—তবে যদি তুমি তা না চাও তবে থাক্—তোমাকে আমার আর বলবার কিছু নেই!"

বিজয় উঠিয়া বলিল—"রাগ করো না সুরমা! অত শীগ্‌গির আমি নিজেকে একেবারে বদ্‌লে ফেলতে পারি না—বেশ তো আছি—এই জীবনই সয়ে গেছে, ভাল লাগে, আর কেন বল? একটু আগে তুমি যা বলেছ কিন্তু আমি কাউকে কোন ভাবে পাবার কখনো আশা করি না, করিও নি! সে ভাবের কোন রকম অন্যায় চিন্তাও আমার মনকে কখনো কলুষিত করেনি—শুধু জেনে রেখো আমি আর যাই হই—কিন্তু এটুকু মনের জোর আছে—যাকে একবার পূজো করেছি—তাকে সে সিংহাসন থেকে নাবিয়ে পথের ধূলার উপর ফেলে দিতে পারি না—কাজে তো নয়ই—সামান্য চিন্তার দ্বারাও নয়—" বিজয় ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

১৬

কতদিন চলিয়া গেল।

শোকে হউক দুঃখে হউক দিন চলিয়া যায়। তিলে তিলে মানুষ অগ্রসর হইয়া যায় অনির্দ্দিষ্ট পথ বহিয়া নির্দ্দিষ্ট অদৃষ্টের কোলে। সুরমারও দিন চলিয়া যাইতেছিল। শোক, দুঃখ জ্বালা, যন্ত্রণা যদি চিরস্থায়ী ভাবে মনরাজ্যে বাসা বাঁধিত তাহা হইলে আজ সারা জগত একটা নৈমিষারণ্যে পরিণত হইত বুঝি। নানা ভাবের আবেগ মনের উপর দিয়া চলিয়া যায় আসে, থাকেনা কিছুই—শুধু থাকে মানুষ তাহার জন্য নির্দ্ধারিত দুঃখ সুখ ভোগ করিয়া শেষের দিনের হিসাব নিকাশ করিতে। সুরমার মনে আজকাল এই চিন্তাই রাতদিন খেলে। কতবার তাহার মনে বৈরাগ্য আসে,—কতবার ইচ্ছা হয় কাজ নাই সংসারে,—কোথাও গিয়া নির্জ্জনে একলা জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি কাটাইয়া দিবে, মনে হয় দিন বুঝি তাহার ফুরাইয়া গিয়াছে, এবং আর এ জীবনে সে আগের মত হাসিতে পারিবে না, আর তেমন করিয়া মন ঢালিয়া আনন্দ করিতে পারিবে না। কিন্তু ক্রমে সে দেখিল—হাসি তাহাকে একেবারে ত্যাগ করিয়া যায় নাই,—সংসার অসার বলিয়া সব সময়ে মনে হয় না—এমন কি নির্জ্জন বাসের চিন্তাও মনকে একটু শঙ্কিত করিয়া তুলে। কখনো কোন আনন্দ তাহার মনকে উল্লসিত করিয়া তুলে। আবার মাঝে মাঝে মনে হয়, জীবন যদি এতই ছোট, এত ক্ষণভঙ্গুর হয়, তাহা হইলে সব চাইতে ভাল এই স্বল্পস্থায়ী দিনগুলাকে সার্থকতা দিয়া ভরিয়া দেওয়া। জীবনের যত মাধুর্য্য আছে সব কিছুই একে একে ভোগ করিয়া লইতে হইবে—নহিলে দিন ফুরাইয়া যায়—সুনীলের কথা মনে হয় "এইখানেই সব আরম্ভ হয় সব শেষ হয়"—সব সময়ে সে নিজেকে লইয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে ভালবাসে—কিন্তু পারে না—সকলের সঙ্গে মিলিতে হয়—সমাজের সকল কাজে যোগদান করিতে হয়, হাসিতেও হয়—আবার মীরাকে ও বিজয়কেও উপদেশ দিয়া সংসারের কর্ত্তব্য ও উপকারিতা বুঝাইয়া দিতে হয়। সে ক্লান্ত হইয়া উঠে—বাড়ী ফিরিয়া শ্রান্তিভরে বিছানায় লুটাইয়া ডুবিয়া যায় চিন্তার অতল সাগরে।

পৃথার দুর্ভাগ্য রাজীবের মনে কতখানি ব্যথার বিষ ঢালিয়া দিয়াছে তাহা সে বুঝিতে পারে। তাহার মুখে ইতিমধ্যে দু'একটী রেখা গভীর হইয়া উঠিয়াছে, [illegible] মাত্রা অনেকখানি বাড়িয়া গিয়াছে [illegible]

সহানুভূতি ও অনুকম্পা অনুভব করে স্বামীর প্রতি। রাজীব মুখে কিছু বলে না কিন্তু অন্তর তাহার ভগিনীর দুর্ভাগ্য স্মরণ করিয়া কতখানি মর্ম্মাহত হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতে চায় তাহা সে বুঝে। সেই জন্য সুরমা তাহাকে অন্তরে খানিকটা নিজের করিয়া লইল। দূরে সরিয়া যাইতে চাহিয়াছিল সে অনেকদিন আগে, এবং যাইতেও ছিল ক্রমে ক্রমে, কিন্তু প্রণবের আগমন যে বন্ধন দৃঢ় করিয়া দিয়াছিল তাহাই বুঝি দূরীভূত হইতেছিল শোকের তীব্র দাহনে। কিছুদিন এই ভাবেই কাটিয়াছে, কিন্তু দূরীভূত হইয়াও যেন কোথায় কোন বন্ধনী একটু শিথিল হইয়া রহিল ফলে রাজীবের প্রতি তাহার স্নেহ, মমতা, সহানুভূতি, অনুকম্পা সবই স্ফুরিত হইয়া উঠিল নারীত্বের সর্ব্ব কোমলতা বিজড়িত হইয়া কিন্তু সেই সঙ্গে কেমন করিয়া ধীরে ধীরে তাহার অন্তর্নিহিত রঙিন প্রেমের আচ্ছাদনীটি খুলিয়া পড়িয়া কোথায় সরিয়া গেল তাহা সে বুঝিতে পারিল না। মিনতি থাকুক বা না থাকুক তাহার নামে বিদ্বেষের জ্বলন্ত অঙ্গার আর তাহার সর্ব্বাঙ্গে ছড়াইয়া যায় না। রাজীব তাহার সঙ্গে একটু হাসিল বা হাসিল না তাহা লইয়াও সে আর ভাবিয়া ভাবিয়া কল্পনায় হাসে কাঁদে না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে তাহার সহিত সপ্রতিভ ভাবে কথা বলে কিন্তু মিনতির নামোল্লেখ—বা তাহাকে লইয়া বিন্দুমাত্র অভিযোগ করে না। তাহার যে সাহচর্য্য সে আগে জোর করিয়া লইতেছে ভাবিয়া কুণ্ঠিত হইয়া উঠিত তাহাই সে আজকাল অকুণ্ঠিত ভাবে লয়। সুরমা রাজীবের সহিত কথা বলিয়া খানিকক্ষণ ভুলিয়া থাকে সুখ পায়—কিন্তু তাহার পরশ তাহার অন্তরে শিহরণ জাগাইয়া তুলে না—তাহার মুখের একটী কথা তাহাকে আবেগে মুগ্ধ করিয়া দিয়া আর তন্দ্রাচ্ছন্ন করিয়া দিতে পারে না!

সুনীলের মৃত্যু তাহাকে সব বিষয়ে বিরাগী করিয়া দিয়াছিল। সেইজন্য সে সকলের প্রতি নিরপেক্ষ হইয়া উঠিল। তাছাড়া আর ঝগড়া করিয়া ফল নাই—এই ভাবিয়াও সে একেবারে নির্ব্বিকার হইয়া গেল রাজীবের প্রতি। তাহার সহিত রাজীবের বিচ্ছেদ বুঝি বিধাতারই অনভিপ্রেত এই ভাবিয়া সে বিধান সে মানিয়া লইয়া-ছিল অবনত মস্তকে, তবুও যাহা সে ভুলিতে পারে নাই, সে ক্ষতের বেদনা তাহার অজ্ঞাতসারে প্রতি ক্ষণে তাহাকে ব্যথিত করিয়া তুলিয়াছিল এতদিন, যাহার প্রতিকার করিবার সুযোগ সে এতদিন পাইয়াও পাইতেছিল না—এতদিন যখনি সে ভাবিয়াছে একটা বোঝা পড়া করিয়া সকল সমস্যার সমাধান করিয়া লইবে তখনই তাহা ঘটনা-চক্রে অপরিহার্য্য হইয়া তাহাকে উপহাস করিয়াছে। তাহার প্রথম জীবনের সে দৃপ্ত গর্ব্বিত সঙ্কল্প যাহাতে সে সকল সম্পর্ক চুকাইয়া ফেলিয়াছিল স্বামীর সহিত, পরে যাহা নিস্তেজ ব্যর্থ হইয়া, চিরসাথীরূপে তাহার জীবনের আনন্দ কোলাহলের মাঝখানে সঙ্গুপ্ত করিয়া রাখিয়াছিল একটা বিষাদের করুণ সুর, যাহা নিরন্তর বাজিয়া যাইত, হয়তো মাঝে মাঝে অস্ফুট করুণ সুরে, কিন্তু একেবারে বিলীন হইয়া যাইত না, মিলিয়া যাইত না যাহা তাহার অন্তর নিহিত সর্ব্বত্যাগী ভাবধারার সহিত,—কিন্তু আজ তাহা ক্রমে বিলীন হইয়া মিলিয়া না গেলেও ব্যাধিগ্রস্তবৎ, মৃতবৎ একপাশে পড়িয়া রহিল নির্জীব হইয়া, তাহার সমস্ত কার্য্যকরী শক্তি হারাইয়া নিস্তেজ হইয়া। কে আছে, কে নাই, কে কি করিল না করিল এ ভাবনা তাহাকে আর অস্থির করিয়া তুলে না! তাহার প্রেমের শতমুখী মন্দাকিনী শুষ্ক হইয়া গিয়া রহিল শুধু তাহার ক্ষীণ রেখাটুকু, উত্তাল তরঙ্গ-রাশি শুখাইয়া গিয়া রহিল নীরস বালুকারাশি মাত্র—।

এও এক রকম ভাল হইল। গভীর শোকের বেদনার ভিতর সে খুঁজিয়া পাইল একটা অভাবনীয় শান্তি—তবে কি তাহার চিত্তকে জয় করিবার উপায় খুঁজিয়া পাইয়াছে? জীবনে এমন অনেক সময় আসে যখন একদিনের জীবন-মরণ সমস্যাটাকে অত্যন্ত হাস্যাস্পদ বলিয়া মনে হয়—পরে। ঠিক ইহাই সুরমা ভাবে কি করিয়া এক একদিন মিনতির প্রসঙ্গ লইয়া, অথবা রাজীবের সামান্য একটু হাসি বা কথার জন্য তুমুল কলহের সৃষ্টি করিয়া সে মান অভিমান করিয়াছে। রাজীব তাহার এ নূতন ভাবে কিছু বিশেষত্ব পাইয়াছিল কিনা সে বুঝিতে পারে না, কিন্তু সে লক্ষ্য করে, রাজীব তাহাকে যেন আপন করিয়া পাইতে চায়, যে মিনতির কথা সুরমা অনেকবার জিজ্ঞাসা করিয়া-

উত্তর পায় নাই হয়তো শুধু তিরস্কারই পাইয়া আসিয়াছে তাহাই রাজীব মাঝে মাঝে আলোচনা করিতে চায় কিন্তু সুরমা ইহা অতি পুরাতন ও পচা বলিয়া সে কথা শুনে না, অথবা ইহাতে আর কোন রকম নূতনত্ব না পাইয়া, সে কথা চাপা দিয়া অন্য কথা বলে। সে নিজেই আশ্চর্য্য হইয়া ভাবে এতটা পরিবর্ত্তন তাহার কিসে হইল! সুনীলের মৃত্যু, রাজীবের প্রতি নিরপেক্ষতা, বয়সের সহিত বুদ্ধি-বৃত্তির পরিপক্কতা ও সেই সঙ্গে মনেরও শক্তি বৃদ্ধি, অথবা এ আলোচনা এখনো তাহার প্রাণে একটা অজানা বেদনার সৃষ্টি করিয়া দেয়,—না বেদনা নয়। সুরমা ভাবে ব্যথার তীব্রতা কমিয়া গিয়াছে, ক্ষতের স্পন্দিত যন্ত্রণার উপশম হইয়াছে, তাই বুঝি সে সর্ব্বসন্তাপহারী বিস্মৃতির শরণ লইয়াছে। কিন্তু ভাল করিয়া খুঁজিয়া দেখিলেও এই ভাবহীনতার ভিতর কোথাও এতটুকু অভিমানের লেশ উঁকি মারে কি? কি জানি—তবু ভাল—সুখশয্যা কণ্টকিত বলিয়া মনে হয় না,—এখন সে শোয় বেশ নিশ্চিন্তভাবে, মোটরের হর্ণ শুনিবার জন্য উৎকর্ণ হয় না, রাজীব কখন আসিল তাহা ভাবিয়া বার বার ঘড়ি দেখিয়া চোখ দুইটা আগ্নময় করিয়া তুলে না। শান্ত ভাবে সে বিছানায় শুইয়া সুখচিন্তায় বিভোর হইয়া কখন সুপ্তির কোলে ঢুলিয়া পড়ে সে বুঝিতে পারে না। পূর্ব্বে কোন কাজ তাহাকে বেশীক্ষণ বাঁধিয়া রাখিতে পারিত না, এখন কিন্তু সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাজের ভিতর ডুবিয়া থাকে—রাজীবের উদ্দেশে অস্থির হইয়া আর ঘুরিয়া বেড়ায় না। বরং রাজীবই তাহাকে খুঁজিয়া ফিরে। অনেকদিন কাটিয়া গেল এই ভাবে।

সেদিন রাজীব সকালে সুরমার দরজায় আসিয়া ডাকিল—"সুরমা—"সুরমা ভিতর হইতে উত্তর দিল "আসছি" রাজীব "চা খাবে এসো" বলিয়া নীচে নামিয়া গেল। সুরমা খানিকক্ষণ পরে খাবার ঘরে ঢুকিতে রাজীব স্মিতহাস্যে বলিল—"বোস এত দেরী করলে যে!" সুরমা প্রাতঃ রাশ সজ্জিত টেবিলের সামনে চেয়ার টানিয়া বসিয়া বলিল "খুব বেশী দেরী করেছে কি? কি না তো!"

রাজীব মৃদু হাসিয়া বলিল—"হয়েছে বৈকি। কাল ফিরতে একটু রাত হ'য়ে গিয়েছিল, অবিনের সাথে রাতে অনেকক্ষণ আড্ডা দিয়ে তার পরে মিনতির শেষ বন্দোবস্ত গুলো—"

সুরমা নিবিষ্ট মনে সামনে প্রসারিত খবরের কাগজের দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিল "দেখেছো—কি রকম ভূমিকম্প হয়েছে কি ভীষণ—ইস্—"

"কোথায়" বলিয়া রাজীব ঝুঁকিয়া দেখিল—আমেরিকা ও! এখনো কাগজটা পড়িনি—"

সুরমা ঠিক সেইভাবে মনোযোগ সহকারে পড়িতে লাগিল—

রাজীব বলিল—"কাগজ পড়ো পরে—তোমার চা ঠাণ্ডা হ'ল যে—"

সুরমা মুখ তুলিয়া বলিল—"এই যে খাচ্ছি—তুমি ঢেলে রেখেছ? ধন্যবাদ!" কাগজ একটু সরাইয়া চায়ের পেয়ালা টানিয়া নিয়া সুরমা বলিল—"কি রকম কাণ্ড হচ্ছে দেশে,—এর পরে কি যে হবে তাও বলা যায় না, সত্যি আমরা যাই বলি না, যাই করি না কেন, কিন্তু ভাবতে গেলে গর্ব্ব যে একটা না হয় তা নয়,—পৃথিবীর ভিতর এত বড় একটা দেশ—"

"রাজীব বলিল—"সঙ্গে সঙ্গে অনেক কিছু ওলোট-পালোট হয়ে যাচ্ছে, কি রকম দেশ জুড়ে একটা নিরাশার ভাব আসছে। অবিন বলছিল—"

"তোমার বাজে বন্ধুদের কথা রাখো—"

"অবিন বাজে বুঝি!"

"তা নয়তো কি—! আজকাল কাগজে প্রায় দেখি, দেখে বেশ আনন্দ হয় চারিদিকে বেশ একটা কিসের যেন সাড়া প'ড়ে গেছে—আমরা কোন কাজেই আসছি না—কিন্তু—"

আলোচনা করিয়া অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল একটু চুপ করিয়া রাজীব বলিল—"সুরমা মাঝে মাঝে বড় শ্রান্ত বোধ করি—চল কোথাও ঘুরে আসি,—দেখো তোমার কথা মত আমি মিনতিকে—"

সুরমা আবার পাশের কাগজটা নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতেছিল, সে বলিয়া উঠিল—"একটা ভালো ফিল্ম এসেছে দেখছি—যাবে নাকি আজ?"

"আজ তো মিসেস সেনের ওখানে [illegible] যাচ্ছো না"

"যাবো বোধ হয়—"

"তবে সিনেমা ?"

"তাতে কি—আমি যেতে পারি—"

"কোন ফিল্ম"

"The Smiling Lieutenant—Maurice আর Claudet, Maurice এর গান গুলো আমার খুব ভাল লাগে—"

"ওর একটা style আছে—তবে আমার খুব বেশী এসবের উপর ঝোঁক নেই—"

"আমারও ছিল না, পৃথাই আমার মাথায় এ সব ঢুকিয়ে দিয়ে গেছে, আচ্ছা পৃথা তো আসছে না, চিঠিও লিখছেনা—কি হ'ল ওর ?—"

রাজীব একটু ভাবিয়া বলিল—"সেই কথা আমিও ভাবছিলুম সুরমা কাল একটা টেলিগ্রাফ করে দেবো—"

সুরমা উঠিয়া একটা হাই তুলিয়া ক্লান্ত ভাবে বলিল—"আমি তো লিখে লিখে হয়রাণ হয়ে গেছি, সে উত্তর দেয় না,—অনেক বেলা হয়ে গেল, যাই একটু কাজ আছে—প্রণবও স্নান করবে—" সুরমা চলিয়া গেল।

তখন শীত আসিয়া আবার নিদাঘ তাপিত দেশের বুকে তৃপ্তির শীতল হস্ত বুলাইয়া দিয়াছে। মিসেস সেনের "গার্ডেন পার্টির" উৎসবে যোগদান করিয়াছে বহু সম্ভ্রান্ত গণ্যমান্য ব্যক্তি, সুরমা উপস্থিত হইয়াই চারিদিকে চোখ ঘুরাইয়া দেখিয়া লইল আগন্তুকদের। দেখিল অনেকে আসিয়াছে, চেনা, অচেনা—। হঠাৎ পিছন হইতে কে বলিল "নমস্কার মিসেস বোস—"সুরমা পিছন ফিরিয়া চমকিয়া উঠিল—দেখিল শরত! সে একটু অবাক হইয়া বলিল—"আপনি ? কেমন আছেন ?"

"যাক্ তবু কথা বললেন—আপনাকে অনেক দিন থেকে খুঁজছি মিসেস বোস, দেশ থেকে ফিরে এসেছেন, তারপরে অনেকদিন দেখা করতে চেয়েছি কিন্তু হয়ে ওঠে নি—"

"কোন কারণ ছিল কি ?"

"কারণ ছিল ও আছে, আর তা আজকেই বলবো আপনাকে—"সর্বজনের সমক্ষে এ ভাবে শরতের সহিত কথা বলিতে সুরমার সংকোচ বোধ হইতেছিল। সে বলিল—"যে দিন সুবিধে হবে বলবেন—শুনবো—"সে সরিয়া যাইতেছিল কিন্তু শরত একটু অস্বাভাবিক স্বরে বলিল "সরে যাবেন না, শুনুন, আজকেই যখন আপনার দেখা পেয়েছি তখন আজকেই বলবো—"

সুরমা বলিল—"আজ আমি আপনার কথা কিছুতেই শুনতে পারবো না মিঃ ঘোষ—"

ব্যঙ্গ স্বরে শরত বলিল—"এখন শুনতে চাইবেন না আমি জানি, কিন্তু একদিন শুনতেন—"সুরমা কোন উত্তর না দিয়া সরিয়া যাইতে দেখিল ওদিকে কয়েকজন এতক্ষণ তাহাকে ও শরতকে দেখিতেছিল,—একটু লজ্জিত হইয়া সে আরো অন্যদিকে সরিয়া গেল। একটু দূরেই বীণার সঙ্গে দেখা হইল, সে বলিল—"বাঃ এই যে, আমাদের একেবারেই ভুলে গেছ—না ?"

সুরমা বলিল—"না ভুলবো কেন ? ভালো তো !"

"ভালো কই ? কতদিন অসুখ বিসুখে গেল—"

"আমারও তো,—আচ্ছা বলতে পার কণিকা এসেছে কি ?"

বীণা সুরমার দিকে চাহিয়া একটু চুপ করিয়া রহিল, বোধ হয় এই কথা ভাবিয়া যাহার সঙ্গে সে এত বড় অন্যায়াচরণ করিয়াছে, আজ দিব্য সপ্রতিভভাবে সে তাহারই খোঁজ করিতেছে। সুরমা আবার বলিল—"কণা আসেনি বীণা ?"

বীণা এদিক ওদিক চাহিয়া বলিল—আসবার তো কথা ছিল আসবে নিশ্চয়,—তা আমাদের ওদিকটা যে মাড়াও না,—ব্যাপার কি ?—"

"ব্যাপার কিছু না ভাই, সময় পাই না—"

একটু থামিয়া বীণা বলিল—"কণার খোঁজ করছ কিন্তু কণা তোমার খোঁজ করা ছেড়ে দিয়েছে জানো তো ?"

"জানি—আমি কিন্তু বেহায়ার মত খোঁজ করি তবুও—"

হঠাৎ বীণা একটু দূরে চাহিয়া বলিল—ঐ তো কণা—"

"কই" বলিয়া সুরমা চাহিয়া দেখিল সত্যই কণিকা—তাহাকে যেন বড় শুষ্ক ও ম্লান দেখাইতেছিল—সে বলিল—"বীণা, কণাকে একটু ডেকে আনতে পারবে ?"

"সর্বনাশ তোমার নাম শুনলেই ও রেগে যায়—)

সেদিন বিনীতা দেবীর ওখানে—" এমন সময় বীণাকে কে ডাকিলে,—সে "আসছি" বলিয়া কথা অসমাপ্ত রাখিয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেল। তাহার একবার ইচ্ছা হইল কণিকাকে নিজে ডাকে, কিন্তু নানা কথা ভাবিয়া সে সঙ্কল্প ছাড়িয়া একবার চারিদিকে শরতের সন্ধানে চাহিল, তাহার ইচ্ছা হইতেছিল শরতের সঙ্গে কথা বলিয়া চেষ্টা করিয়া দেখিবে—যদি সে কণিকার সুখের সংসার আবার পাতিয়া দিতে পারে। কিন্তু শরতকে সে দেখিতে না পাইয়া একখানি চেয়ার একটু দূরে টানিয়া লইয়া গিয়া বসিয়া পড়িল।

প্রকাণ্ড বাগানে ছোট টেবিল সাজাইয়া দেওয়া হইয়াছে—চারিদিকে সিজন ফুলের মেলা—মাঝে মাঝে পাম গাছের ঝোপ, তাহারই ফাঁকে ফাঁকে সহরের সৌখীন নর নারীগণ ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল—কেহ বা তখনো টেবিলের কাছে বসিয়া চা পান করিতে করিতে গল্প জমাইয়া তুলিয়াছিল। একপাশে একদল "ষ্ট্রীংব্যাণ্ড" নানারকমের সুমধুর সুর বাজাইয়া সকলের ভিতর এক নূতন উন্মাদনার সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছিল। শীতের বেলার অস্তগামী সূর্য্য-রশ্মিটুকু সোণালী আলোর ফোয়ারা ধারায় সে আনন্দ সভার চারিদিক ভরিয়া দিতেছিল। সুরমা একটী নাসটার সিয়ামের বেদীর কাছে বসিয়াছিল চুপ করিয়া। বাজনার সঙ্গে সঙ্গে তাহার চোখের সামনে নাচের মজলিসের ছবি ফুটিয়া উঠিল, ও তাহার ভিতর সে পৃথা ও সুনীলকে দেখিতে পাইল। একটা আবেশ মাখা সুখ-স্মৃতির আবেষ্টনেও সে ব্যথিত হইয়া উঠিল, চোখদুটী অজ্ঞাতসারে সজল হইয়া গেল। তখন বাজিতেছিল প্রতি সুরে আনন্দ ও বেদনা ঝঙ্কারিয়া সুনীলেরই প্রিয় একটী সুর "valentia"—মাঝে মাঝে পরিচিত পরিচিতা অনেকে অনেক সম্ভাষণ জানাইয়া, কেহ বা দু'একটী প্রশ্ন করিয়া চলিয়া যাইতেছিল—তাহার তখন কাহারো সহিত কথা বলিবার ইচ্ছা হইতেছিল না।

কতক্ষণ অন্যমনস্ক ভাবে বসিবার পর হঠাৎ কাহার কণ্ঠস্বরে সে চাহিয়া দেখিল বিজয়! বিজয়কে দেখিয়া সে একটু খুসী হইয়াই বলিল—"ওঃ তাহ'লে এখানে তোমার মত ভিখিরীরাও আসে না বিজয়?"

"আসে বই কি সুরমা, ভিক্ষুকের সর্ব্বত্র গতি জানো তো, বিশেষতঃ এই বিশিষ্ট জনসমাগম—এই দিনে, এতে যদি আমার আসবার লোভ না হয়, তবে কার হবে বল—তোমার?"

"আমারও লোভ হয় বই কি!"

"তা'হলে অন্য কারণে হ'তে পারে, কিন্তু আমি যে তোমাদের "কেক্" "আইস্‌ক্রিম" খেতে আসি, আর দু' দশটা বড়লোক দেখে চোখ দুটো সার্থক ক'রে নিতে আসি—"

"কেক্, আইস্‌ক্রিম ও বড়লোকদের সৌভাগ্য বলতে হবে—বোস না—"

বিজয় আর একটী চেয়ার আনিয়া বসিয়া বলিল—"তুমি যূথভ্রষ্ট কেন?"

"আমার যূথও নেই কাজেই আমি ভ্রষ্টও নই—"

"যূথ না থাকাটা একরকম ভালোই—সেদিনের কথায় রাগ করেছিলে না? তাই এতদিন খোঁজ নাওনি—"

"রাগ একটু করেছিলুম বই কি! কিন্তু আর রাগ করবো না বিজয়, আর তোমাকে কোন অনুরোধও করবো না—"

"কেন সুরমা? আমার দিকটাও ভেবে দেখো—হঠাৎ তুমি বললে বিয়ে কর আর আমিও বললুম হাঁ—এ কি সম্ভব?"

"সম্ভব নয়ই বা কেন? মীরা তোমার অজানা মেয়ে নয়—"

"বুঝলুম কিন্তু মীরার মা বাপ আছেন—তাঁরাই বা আমার মত একটা ভবঘুরের হাতে মেয়ে দেবেন কেন?"

"ও! তাহ'লে মীরার বাবা মার মত হ'লে তোমার আপত্তি নেই তো?—"

"তারও ঠিক নেই সুরমা, মোট কথা এখনো ও সব ভাবিনি, আর ভাববার সময়ও নেই—"

"তবুও ঠিক নেই—?"

"না,—থাক্ ও সব কথা—শরত এসেছে—"

"দেখেছি—চেহারা একেবারে বদলে গেছে—"

"কণিকার সঙ্গে দেখা হয়েছে? [illegible]"

"না—তবে শরতের সঙ্গে কথা হয়েছে—[illegible]

বলছিল কি কতগুলো কথা বলবে। কিন্তু আমার শোনবার ভরসা হ'লনা—"

"কেন নিন্দের ভয়ে না মনের অনিচ্ছায়?"

"মনের ইচ্ছা ছিল—বলতে গেলে নিন্দের ভয়েই—যদিও ওটা একরকম গা সওয়া হ'য়েই গেছে—"

"মনের ইচ্ছা ছিল?"

"ছিল বৈ কি? কেন থাকাটায় কিছু দোষ আছে?"

"কি জানি তোমার শাস্ত্রে নেই তা জানি,—যাক্ তোমার স্বামীর দান সেই বিধবা আশ্রম শেষ হ'য়ে গেছে—পরশুদিন বোধ হয় প্রথম খোলা হবে।"

সুরমা একটু নিরপেক্ষভাবে বলিল—"তা হবে হোক্ ভালই—আমার স্বামীর এ সুমতির জন্য তাকে ধন্যবাদ দেবো। কিন্তু তোমার ঐ আশ্রমটি যে যত হতাশ প্রেমিকদের আড্ডাঘর হয়ে উঠলো বিজয়—"

"হয় হোক্—হতাশ প্রেমিকরা তবু ভালো—"

"কেন?"

"হতাশ প্রেমিকরা একনিষ্ঠ হয়—"

"ছাই হয়—হতাশ হ'য়ে হ'য়ে যখন একেবারে সীমা ছাড়িয়ে যায় তখন বহুনিষ্ঠ হয়ে ওঠে—"

"ভুল সুরমা—সকলে তা নয়—"

"আচ্ছা বেশ, তবে তাই—" একটু চুপ করিয়া সুরমা বলিল—"বিজয় আজ তোমাকে আমি তোমার আশ্রমে পৌঁচে দেবো—"

"হঠাৎ এ অনুগ্রহ কেন?"

"অনুগ্রহ নয়, মীরার সঙ্গে দেখা করতে যাবো—"

"তা যাও কিন্তু আমি তোমার সঙ্গে যাবো কেন?"

"গেলেই বা, তাতে তোমার অকলঙ্ক নামে কলঙ্ক কালিমা পড়বে না বিজয়—"

বিজয় হাসিয়া বলিল "যদি পড়ে,—তাছাড়া আমার মত একটি রাস্তার লোকের সঙ্গে তুমি, সমাজের একজন বিশিষ্ট মহিলা—"

"না বিজয়, আমি সমাজেরও নই, বিশিষ্টাও নই। রাস্তার লোক? তা আমিও তার চেয়ে বড় বেশী ভাল নই..."

"এত বিনয় কেন?"

"বিনয় নয় সত্যি কথাই বলছি—"

"জানো গাড়ী মোটর আমার সহ্য হয় না,—তাই আমি যতদূর পারি ওগুলোকে এড়িয়ে চলি"

"তা চল, আমার আপত্তি নেই, কিন্তু আজকের দিনটা নাই বা এড়ালে?"

বিজয় উঠিয়া বলিল—"আচ্ছা তাহ'লে যাবার সময় আমাকে বলো—আমি একটু ওদিকটা ঘুরে আসি আর জ্যোতিবাবুকে দু একটা কথা ব'লে আসি—"

"একটু সামনেই থেকো—"

"আচ্ছা" বলিয়া বিজয় ভিড়ের ভিতর মিশিয়া গেল। সুরমা সেখান হইতে উঠিতে যাইবে এমন সময় দেখিল বেশ একটু প্রফুল্লভাবে বাজনার সঙ্গে শিশ দিতে দিতে তাহার দিকে রাজীব আসিতেছে। তাহার পাশে আর একজন কে। মুখটি অনেকটা চেনা মনে হইল, কিন্তু হঠাৎ সে ঠিক করিতে পারিল না কে,—একটু কাছে আসিতে সুরমা বুঝিতে পারিল, কোথায় যেন ইহাকে দেখিয়াছিল আজ মনে হইল লোকটী সুন্দর মোটেই নয়—তবে চোখ দুটি মন্দ নয়,—মনে পড়িল সেদিন রাত্রে পৃথা ও সুনীলের সঙ্গে ফার্পোতে দেখিয়াছিল। কাছে আসিয়া রাজীব বলিল—"সুরমা—মনে আছে? মিঃ অরিন রয়—"

সুরমা হাত বাড়াইয়া দিল। লোকটী সম্বন্ধে তাহার প্রথম দিন হইতে খুব ভাল ধারণা হয় নাই। আজও তাহার ভাব দেখিয়া, তাহার সঙ্গে একটি কথাও বলিতে ইচ্ছা হইল না। মিঃ রয় সুরমার সহিত করমর্দ্দন করিয়া প্রায় তাহার মুখের উপরই একমুখ দামী "হাভানা চুরুটের" ধুঁয়া ছাড়িয়া, রাজীবের দিকে ফিরিয়া বলিল—"বোস্—I've just explained to you. দুটো Oil field এর Report আমি পেয়েছি—তার ভিতর আসামের fieldটাই নিশ্চয় ব'লে মনে হয়। ইংলণ্ডে গিয়ে দেখলুম—কোন ইংরেজ কোম্পানী এখন ভারতে কোন মূলধন ফেলবে না বা নূতন কোন কারবারও আরম্ভ করবে না—সেইজন্য আমি ঠিক করেছি যে ব্যবসাটা নিজেই আরম্ভ কোরবো। একটা লিমিটেড কোম্পানী করতে চেষ্টা করবো। যদি পারি ভালই, না পারি কুছ পরোয়া নেই—আমি মূলধন

ফেলবো যত দরকার হয়—তাহলে তুমি আমার অংশীদার হও।"

রাজীব বলিল—"তা হ'তে পারি—এ ব্যবসাও খুব লাভের—কিন্তু এই দিনে সুবিধা হবে কি ?"

সিগারের শেষ অংশ তাচ্ছিল্য ভরে মাটীতে ফেলিয়া দিয়া অরিণ বলিল—"ও—নিশ্চয়। তাছাড়া depression এসেছে সত্য, কিন্তু কতদিন ? Crisis বেশীদিন থাকবে না—শীগ্‌গিরই সুদিন আসবে। বেশ সুরটা বাজছে তো!" বলিয়া সে সুরমার মুখের দিকে একটু চাহিয়া রাজীবকে বলিল—"তা'হলে তুমি আর আমি আরম্ভ করি বোস্ ? না তুমি সুদিনের অপেক্ষায় থাকবে ?"

"নিশ্চয়ই নয়—এখনি আরম্ভ করা যেতে পারে।'

"তাহলে কখন আমার সঙ্গে দেখা করবে বল !"

"তার চেয়ে তুমি কাল এসে আমাদের সঙ্গে চা খাও না—অবশ্য যদি তোমার অবসর থাকে—কি বল সুরমা ?"

"কাল ?" না ধন্যবাদ—কাল আমার কাজ আছে। যাক্ আমি তোমায় ফোনে ডাকবো। আচ্ছা আজ বিদায় বন্ধু !"

রাজীবের হাত ধরিয়া সজোরে একটা ঝাঁকুনি দিয়া অরিণ চলিয়া গেল। রাজীব সুরমার দিকে চাহিয়া বলিল—"মনে হয় কারবারটা লাভের হবে—না সুরমা ?"

সুরমা ঈষৎ মুখ ঘুরাইয়া বলিল—"কি জানি তুমি ঠিক না জেনে শুনে হাত দিয়োনা, ও লোকটা শেষে যেন তোমাকে না ঠকায় ;"

রাজীব হাসিয়া উঠিল—"ওঃ, অরিণ রয় আমাকে ঠকাবে—যার সমস্ত জগতের সঙ্গে কারবার, টাকা নিয়ে যে খেলা কচ্ছে—তাছাড়া আমাকে এত বোকা পেলে—তুমি একেবারে খুকিটি !"

"কি জানি লোকটাকে দেখলে কিন্তু ঠগ—জোচ্চোর ব'লেই মনে হয়—বড়লোক তো দূরের কথা ভদ্রলোক ব'লেই সন্দেহ হয়—যাগ্‌গে—শোন—আজ আর সিনেমায় যাচ্ছি না—"

"কেন ?"

"ওম্‌নি"

"তাহ'লে শিগ্‌গির বাড়ী ফিরবে তো সুরমা ?

"কেন ?"

"তোমাকে একটা কথা বলবো, তাছাড়া তুমি না থাকলে বাড়ীতে একলা বসে থাকতে ভাল লাগে না,—আমি একটু পরেই বাড়ী ফিরে যাবো—তুমি পারতো শিগ্‌গির এসো—"

সুরমা নির্ব্বিকার ভাবে বলিল—"আচ্ছা—দেখবো—"

রাজীব চলিয়া গেল। সুরমার মনে হইল অরিণ রয়—বিশেষ কোন অপরাধ না করিলেও লোকটার আগাগোড়া যেন সর্ব্বপ্রকার দোষে ভরা।

ইতিমধ্যে ওদিকে কি কতগুলা অভিনয় ইত্যাদি হইতেছিল। সেইখান হইতে তাহার কাণে একটু একটু গানের ও কথার রেশ ভাসিয়া আসিতেছিল। ক্রমে সূর্য্যের আলোটুকু সরিয়া গেল। শীতের সন্ধ্যা ম্লান ধূসর হইয়া নামিয়া আসিতে না আসিতে, তাহাকে উপহাস করিয়া বাগানের বড় বড় গাছগুলি ভরিয়া পাতার ফাঁকে ফাঁকে হাজার বাতি জ্বলিয়া উঠিল। শীত বোধ হইতেছিল বলিয়া সুরমা উঠিয়া "ক্লোক্ রুমের" দিকে অগ্রসর হইল। পথে দেখা হইল আবার শরতের সহিত, শরত বলিল—"মিসেস্ বোস্ আমার কথাগুলো শুনতেই হবে—" সুরমার মনে হইল সে তখন ঠিক প্রকৃতিস্থ ছিল না—সে বলিল—"এখন পারবো না মিঃ ঘোষ—"

"কেন নিন্দের ভয়ে ?"

"নিন্দের ভয়ে হয়তো হতে পারে—"

শরত যেন জ্বলিয়া উঠিল—"আজ নিন্দের ভয় হ'তে পারে আপনার, কিন্তু যখন আগে আপনি ইচ্ছে ক'রেই আমার সঙ্গে কথা বলতেন, তখন নিন্দের ভয় কোথায় ছিল ? কিন্তু আজ আমি নিন্দের ভয় এড়িয়ে গেছি—"

সুরমা বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া বলিল—"অবো মিঃ ঘোষ—কিন্তু আজ আমাকে যেতে হচ্ছে এখুনি—"

ক্রমশঃ

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

কাব্যে মণ্ডন-কলা

রসসৃষ্টি করিতে হইলে,—সরস করিয়া অনুভূতি বা চিন্তাকে প্রকাশ করিতে হইলে—কাব্যে রসময় চিত্র দিতে হইলে, কাব্যরচনায় মণ্ডন-কলার প্রয়োজন আছে। আব-হাওয়া বা আবেষ্টনী, চালচিত্র ও পটভূমি রচনা করিতে হয়—সঙ্গীতের মাধুর্য্যের সৃষ্টি করিতে হয়, বিন্যাস-সৌষ্ঠবের সৃষ্টি করিতে হয়। এ সমস্ত মণ্ডনকলার অঙ্গীভূত।

কাব্যে সাধারণতঃ শব্দালঙ্কারের দ্বারাই এই কলার প্রসাধন করিতে হয়—মিল, অনুপ্রাস, যমক, ছন্দো হিল্লোল ইত্যাদি এই মণ্ডনকলার উপকরণ। ইহা ছাড়া, ছন্দের সৌষ্ঠব, সৌষম্য, সামঞ্জস্য ও বৈচিত্র্যও সৃষ্টি করিতে হয়।

এই মণ্ডনকলা কাব্যের আত্মা নয়, প্রাণ নয়, দেহও নয়—দেহের লাবণ্যও নয়। কাব্যের কান্তিবর্দ্ধনের জন্য ভূষণ-গৌরব,প্রসাধন-সৌষ্ঠব ও ভূষা-পারিপাট্যের সৃষ্টি ছাড়া অন্য কিছুই নয়।

যাঁহারা উচ্চ শ্রেণীর কবি, তাঁহারা মণ্ডনকলাকে উপেক্ষা করেন না বটে—কিন্তু ইহাকে অতিরিক্ত মর্য্যাদাও দেন না। তাঁহাদের বিশ্বাস অতিরিক্ত মণ্ডনে লাবণ্যের উপচয় না হইয়া অপচয়ই হইয়া থাকে—স্বাভাবিক কান্তি স্ফূর্তি পায় না। লাবণ্য-বর্দ্ধনের বা বিকাশের জন্যই মণ্ডন। মণ্ডন যদি তাহার অন্তরায় হয়, তবে বৃথা সেজন্য শ্রম করিয়া ফল কি? আলঙ্কারিক কুন্তল যাহাকে বৈদগ্ধ্য-ভঙ্গীভণিতি বা ইউরোপে যাহাতে Euphuism বলে, তাহার মূল্য আজকাল আর স্বীকৃত হয় না।

যাঁহাদের অন্তরে রস-সম্পদের অভাব আছে, তাঁহারা মণ্ডন-চাতুর্য্যের আতিশয্যের দ্বারা তাহার ক্ষতিপূরণ করিতে চান। এ যেন অঙ্গে স্বাভাবিক লাবণ্যের অভাব থাকিলে কৃত্রিম বেশভূষার পরিপাট্যের দ্বারা লাবণ্য-বিকাশের চেষ্টা।

এইশ্রেণীর রচনাও সকল দেশেই জনাদর লাভ করিয়াছে। যাহারা আদর করিয়াছে, তাহারা ঠিক রস-পিপাসু নয়,কেবল ক্ষণকালের জন্য 'বিলাস কলাসু কুতূহল' চরিতার্থ হইলেই তাহারা সন্তুষ্ট। এই শ্রেণীর কাব্য-পাঠকের সংখ্যা খুববেশী হইলেও প্রকৃত রসজ্ঞ ব্যক্তি তাহাকে মর্য্যাদা দেন না।

আর এক শ্রেণীর কবি আছেন—তাঁহাদিগকে ঠিক কবি না বলিয়া শব্দ-শিল্পী বলিলেই ঠিক হয়। তাঁহারা মণ্ডনকলাকেই কবিত্ব বলিয়া চালাইতে চাহিয়াছেন। অবশ্য একথাও সত্য, কোন কবিই সমস্ত জীবন ধরিয়া তাহাই করেন নাই। তাঁহাদের কতকগুলি রচনা আছে যাহা মণ্ডলকলারই উৎকৃষ্ট নিদর্শন,—কাব্য একেবারেই নয়। অথচ ছন্দে গ্রথিত বলিয়া এবং বহিঃসঙ্গীতের মাধুর্য্য আছে বলিয়া কাব্য নামে চলিয়া গিয়াছে। মণ্ডনকলা এক শ্রেণীর শিল্প সন্দেহ নাই—চতুঃষষ্টিকলার মধ্যে তাহার অতি উচ্চস্থান—তাহাতে বিদ্যা, সৌন্দর্য্যবোধ, শৃঙ্খলা, সামঞ্জস্য, মাত্রা ইত্যাদির জ্ঞানের যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা আছে—তবু ইহা কাব্য নয়। কাব্য জড়শিল্প মাত্র নহে—কবি কাব্যে রসের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন—শিল্প কাব্যের একটা অঙ্গমাত্র,—মণ্ডনকলা প্রাণহীন শিল্পমাত্র। কাব্য যদি হয় রসগন্ধময় কুসুম,—মণ্ডনকলার নিদর্শন হইবে মোমের ফুল।

কাব্যের অনুক্রম

রচনার ক্রম সাধারণতঃ তিন প্রকারের—যুক্তিমূলক ক্রম (Logical Sequence), আবেগাত্মক ক্রম (Emotional Sequence) ও আলঙ্কারিক ক্রম (Rhetorical Sequence)। ইহা ছাড়া ঐতিহাসিক, কাহিনীমূলক ইত্যাদি ক্রমের উল্লেখ করা যাইতে পারে—কিন্তু তাহারা সবই অনেকটা যুক্তিমূলক ক্রমেরই অন্তর্ভুক্ত।

গদ্য ও পদ্য উভয়বিধ সাহিত্যের ক্রমই ঐগুলির একটি—না—একটি হইতে পারে। মিশ্রক্রমে গদ্য, পদ্য দুই-ই লেখা যাইতে পারে। প্রাধান্য বিবেচনা করিয়া দেখিলে বলিতে হয়—গদ্যের ক্রম যুক্তিমূলক এবং কাব্যের ক্রম আবেগাত্মক।

সম্পূর্ণ যুক্তিমূলক অনুক্রমে অনেক পদ্যই লিখিত হইয়া থাকে। রসজ্ঞগণ তাহাকে ছন্দে গুম্ফিত প্রবন্ধ মাত্র বলিয়া থাকেন—কাব্য বলেন না। যুক্তি ও আবেগে মিশ্রিত অনুক্রমে রচিত কবিতা রসজ্ঞগণের নিকট কাব্য বলিয়া সমাদৃত হইয়া থাকে—আবেগমূলক অনুক্রমে রচিত কাব্যকেই তাঁহারা অধিকতর মর্য্যাদা দেন। কিন্তু এই আবেগে যদি সংযম না থাকে—অর্থাৎ সুসঙ্গতি, সামঞ্জস্য ও সৌষম্যের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া মনোবেগ যদি অবল্গিত উচ্ছ্বাসে পরিণত হয়—তাহা হইলে আবেগাত্মক ক্রমে রচিত হইলেও তাহার অভিব্যক্তিকে তাঁহারা কাব্য বলেন না।

সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্যবোধের দ্বারা পরিচালিত আবেগাত্মক অনুক্রমে রচিত পদ্যই শ্রেষ্ঠ কাব্য।

এই দুইটি অনুক্রমকে অনুসরণ না করিয়া আমাদের দেশের অনেক প্রাচীন সংস্কৃত কবিগণ আলঙ্কারিক অনুক্রম অনুসরণ করিয়া কাব্য রচনা করিয়াছেন। আলঙ্কারিক ক্রমটি কি?

সংস্কৃত কবি যখন শ্লোকের পর শ্লোক রচনা করিয়া গিয়াছেন, তখন একটি দিকে খর দৃষ্টি রাখিয়া চলিয়াছেন। তাহা এই, প্রত্যেক শ্লোকটিকে অলঙ্কৃত ভঙ্গিতে সরস করিয়া প্রকাশ করা চাই। তাহাতে যদি অনেক কথা বাদ পড়িয়া যায়, যাক—যাহাকে সরস ও অলঙ্কৃত করিয়া বলা যাইতেছে না—তাহা বলার প্রয়োজন নাই। মনোবেগের ধারা অনুসরণ করিয়া চলিতে যদি অলঙ্কৃতির ব্যাঘাত হয় তবে সে ধারাকে অনুসরণ করারও প্রয়োজন নাই। কোন বস্তু,ব্যক্তি বা ভাব সম্বন্ধে যে কথাগুলিকে অলঙ্কৃতরূপে শ্লোকবদ্ধ করা যায়, সেই কথাগুলিই শুধু বলা হইবে।

একটি শ্লোকের পর পরবর্ত্তী শ্লোকটির কেন আবির্ভাব হইল তাহার কোন যুক্তি নাই—মনোবেগের ধারার সহিত সে পরম্পরার সামঞ্জস্য নাই। সেই জন্য অনেক সংস্কৃত কাব্যে—বিশেষতঃ বর্ণনামূলক কাব্যে আমরা একটি শ্লোকের পর যে ভাবের বা যে রসের শ্লোকের প্রত্যাশা করি—তাহা পাই না। যাহা পাই তাহাতে মনোমত শৃঙ্খলা পাই না—পাই বিস্ময়। বলা বাহুল্য, একটা সূক্ষ্ম যোগ-সূত্র অবশ্য তলে তলে আছেই। কিন্তু তাহাকে পরম্পরা বলা যায় না—ঐ সূত্রে শ্লোকগুলি 'সূত্রে মণিগণা ইব' ঝলমল করিয়া আমাদের আনন্দ দান করে। প্রত্যেক শ্লোকে আবেগ, ভাব ও যুক্তি আছে কিন্তু পরম্পরাটি ঠিক তাহাদের দ্বারা পরিচালিত নয়। এ শ্রেণীর কাব্যও সং-কাব্য বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। কালিদাসের অজ-বিলাপ, রতিবিলাপ, হিমাদ্রিবর্ণনা, সমুদ্রবর্ণনা ইত্যাদির উল্লেখ করা যাইতে পারে। বর্ত্তমান যুগে সত্যেন্দ্রনাথ কতকটা ঐ ভঙ্গিরই অনুসরণ করিয়াছেন।

আজকালকার বাংলা কাব্যে যেরূপ ছন্দ, অনুচ্ছেদ ও মিলের পারিপাট্যের দিকে প্রখর দৃষ্টি দেওয়া হয় তাহাতে উহা তিনটি অনুক্রমেরই মর্য্যাদারক্ষা করিয়া চলে বলিয়া মনে হয়। তিনটি অনুক্রম পরস্পরের মধ্যে সন্ধি করিয়া একটি মিশ্র ক্রমের সৃষ্টি করিয়াছে। ঐ মিশ্র ক্রমকেই কবিরা অনুসরণ করিয়া থাকেন। কাব্যের উপাদান যত সূক্ষ্ম চিন্তামূলক ও অবাস্তব হইয়া উঠিতেছে, ততই এই অনুক্রমের প্রাধান্য বাড়িতেছে।

আজকাল 'স্বপ্নপাত্মক-ক্রম' নামে একটি ক্রম কাহারও কাহারও কাব্যে দেখা যাইতেছে। কবি মধু-বিহ্বল প্রজাপতির মত স্বপ্নগতির ক্রম অনুসরণ করিয়া যেন সৃষ্টির এক একটি অঙ্গকে স্পর্শ করিয়া চলিয়াছেন। সেই স্পর্শ-মাধুরী এক একটি পংক্তিতে [illegible]। ইহাকেও কেহ কেহ উচ্চশ্রেণীর কাব্য [illegible]।

কাব্যে পৌরুষশক্তি

আজকাল কেহ কেহ দুঃখ করিয়া বলেন—কাব্যে পৌরুষশক্তির অভিব্যক্তি আর দেখা যায় না। পৌরুষ শক্তির অভাবে বাঙ্গালা কাব্য প্রাণহীন হইয়া পড়িতেছে। ইঁহারা প্রেম, সহৃদয়তা, মমতা, কারুণ্য, বাৎসল্য, আত্মোৎসর্গ, নিষ্ঠা ইত্যাদিকে পৌরুষ ধর্ম্ম মনে করেন না, নারীর ধর্ম্ম বলিয়া মনে করেন এবং আস্ফালন, হুঙ্কার, অঙ্গবিক্ষেপ, চাঞ্চল্য, বিদ্রোহ, বাহ্বাস্ফোটন ইত্যাদিকেই প্রাণের ধর্ম্ম বলিয়া গণ্য করেন এবং ধীর শান্ত চিত্তে হৃদয়-বৃত্তির অনুশীলনকে প্রাণহীনতার লক্ষণ মনে করেন। যাক—ইঁহারা যাহা মনে করেন, করুন। পৌরুষভাব কাব্যের অপরিহার্য্য অঙ্গ নয়—অর্থাৎ কোন কবিতার মধ্যে খানিকটা পৌরুষভাব না থাকিলে সেটা কবিতাই হইবে না—ইহাত হইতে পারে না। তবে পৌরুষভাব-দ্যোতক কবিতা একটিও একেবারে না থাকিলে জাতীয় সাহিত্যের অঙ্গহানি যে হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

সকলপ্রকার সুকুমার, শান্তসংযত হৃদয়বৃত্তিকে নারীত্বের অঙ্গীভূত বলিয়া বাদ দিলে যে কয়টি হৃদয় বৃত্তি বাকী থাকে—গীতিকবিতার পক্ষে তাহারা যে উৎকৃষ্ট রসবস্তু নয়—কবিরা ক্রমেই তাহা উপলব্ধি করিতেছেন। মহাকাব্যে বহু রসের অভিব্যক্তি থাকিত—চরিত্র-সৃষ্টি এবং চরিত্রের ঘাত-প্রতিঘাত থাকিত—একটা কথা বস্তু তাহার মেরুদণ্ডস্বরূপ বর্ত্তমান থাকিত—ঘটনা-পরম্পরা থাকিত—রাজা-রাজ্যের উত্থান-পতন—যুদ্ধ-বিগ্রহ-অভিযানাদি থাকিত—তাহাকে সম্পূর্ণাঙ্গ করিবার জন্য পৌরুষ-ভাবদ্যোতক রসসৃষ্টির প্রয়োজন হইত। মহাকাব্যের মধ্যে রৌদ্র, বীর, ভয়ানক ইত্যাদি রসের অভিব্যক্তি অন্যান্য সুকুমার রসের প্রাধান্যের জন্য সামঞ্জস্য লাভ করিত—অশোভন হইত না।

খণ্ডকাব্যগুলিতেও মহাকাব্যের অনেক ধর্ম্ম বর্ত্তমান আছে। কাজেই এইগুলিতেও অতিরিক্ত মর্য্যাদা লাভ না করিলেও পৌরুষরসের যথাযোগ্য স্থান হইয়াছে। পরে যখন খণ্ড-কাব্যের কর্ত্তব্যের বিভাগ হইয়া গেল—অর্থাৎ যখন নাটক, উপন্যাস, ছোটগল্প, সঙ্গীত ও গীতিকবিতা খণ্ডকাব্যের কর্ত্তব্যকে আপনাদের মধ্যে ভাগ করিয়া লইল—তখন নাটক এবং উপন্যাস কতকটা খণ্ডকাব্যের পৌরুষাংশটা পাইয়া গেল, বহু রসের একত্র সমবায়ের দায়িত্ব-গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে।

যে কয়টি রস অবলম্বনে তথাকথিত পৌরুষশক্তির অভিব্যক্তি, রসশাস্ত্রের রসপর্য্যায়ে তাহারা শূদ্রশ্রেণীর বা নিকৃষ্ট জাতীয়। সে জন্য গীতিকবিতা সে গুলিকে বর্জ্জন করিতে বাধ্য হইল। গীতি কবিতা একটি কোন বিশেষ রসকে অবলম্বন করিয়া রচিত। তাহাকে যখন একটিমাত্র রসকেই অবলম্বন করিতে হইবে, তখন সে নিকৃষ্টশ্রেণীর রসকে গ্রহণ করিবে কেন? নাটকের পক্ষে সে অসুবিধা নাই।

মাইকেল খণ্ডকাব্যের মধ্যে পৌরুষ রসের স্থান দিয়াছেন—কিন্তু সেই রসই তাঁহার কাব্যে প্রবল হইয়া উঠিল না—করুণ রস বা নারীত্বের মাধুর্য্যকেই তিনিও প্রাধান্য দিতে বাধ্য হইলেন। তাহা না হইলে বেণীসংহারের দশা হইত মেঘনাদবধের। তথাকথিত পৌরুষরস যে গীতি-কাব্যের পক্ষে উৎকৃষ্ট রস নয় তাহা তিনি বুঝিয়াছিলেন—বলিয়া তিনি ব্রজাঙ্গনা কাব্যে এবং কবিতাবলীতে ঐ রসকে প্রশ্রয় দেন নাই।

হেমচন্দ্র কবিতাবলীতে ঐ রসকে পরিবেষণ করিয়া গিয়াছেন—কিন্তু সেগুলির আজ কি দুর্দ্দশা! সেগুলিকে কেহ বক্তৃতা ছাড়া আর কিছু কি মনে করে?

যাঁহারা পৌরুষ-রসের অভাবে জাতীয় সাহিত্যের অঙ্গহানি হইতেছে মনে করেন—তাঁহারা নাটকগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে পারেন। আর যদি সাহস, বিক্রম, উৎসাহ, তেজস্বিতা, আত্মোৎসর্গ, মুক্তি-তৃষ্ণা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা ইত্যাদিকে পৌরুষ-ধর্ম্মের অন্তর্গত মনে করেন—তবে তাঁহারা পৌরুষ রসের কাব্য যথেষ্টই পাইবেন। আর যদি Majesty, Sublimity, Vigour, Grandeur ইত্যাদির অভিব্যক্তিকে পৌরুষরসের অভিব্যক্তি মনে করেন—তবে রবীন্দ্রনাথের রচনায় অভাব কি?

কিন্তু তাহা ত নয়। যাঁহারা পৌরুষ-শক্তির কাব্যে অভিব্যক্তির পক্ষপাতী, তাঁহারা চাহেন কাব্যে বিদ্রোহ, পাশবিকতা, বর্ব্বরতা ও কর্কশতা। কোন কবি যদি

তাঁহার কাব্যে বিধাতার কাণ মলিয়া দিতে চাহেন অথবা ভগবানকে প্রাণপণে ভর্ৎসনা করেন। ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্রগণকে চাবুক মারেন, নিজের জননীকেই বেশ্যা বলিয়া অপূর্ব্ব সাহস দেখান, নিজের প্রণয়িনীকে বলেন—'তোমার হাড়-মাস চিবাইয়া খাইব', শালগ্রাম শিলা লইয়া ভাঁটা খেলিতে চাহেন অথবা শত শত বৎসরের সভ্যতার সহস্র চেষ্টায় যে আদিম বর্ব্বর মনোবৃত্তিগুলি শাসিত হইয়া আছে, সেই মনোবৃত্তিগুলির উন্মত্ত উত্তেজিত অভিব্যক্তি করিয়া বসেন—তবে এই শ্রেণীর সমালোচকগণ পৌরুষশক্তির বিকাশ বলিয়া স্বীকার করিবেন।

এই রূঢ়তা পৌরুষ নহে—ইহা পাশবিকতা। পৌরুষ ভাব হইলেই শুধু চলিবে না—আর্ট হইয়া উঠা চাই। এই শ্রেণীর রূঢ়তা আর্টের পক্ষে গুণ নহে—দোষ। কর্কশকে মসৃণ, চিক্কণ ও সুগঠিত করিয়া তোলাই আর্ট। কার্কশ্য প্রকৃতির মধ্যে আছে সত্য—কিন্তু প্রকৃতির অনুকরণই ত আর্ট নয়। পাশবিকতাও পৌরুষ নয়। পাশবিকতার সংযমনের নামই পৌরুষ। মানবমনের সকল বৃত্তিই সাহিত্যের উপাদান হইতে পারে—সেসকল বৃত্তি মানবের যেমন আছে দানবেরও তেমনি আছে। কবির সরস লেখনীর স্পর্শে মানুষের বর্ব্বরতম বৃত্তিরও পাশবিকতার কদর্য্যতা দূর হইয়া যায়। আর্টের সঙ্গে ব্রীড়ার অর্থাৎ শ্রীর সঙ্গে হ্রীর অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। নির্লজ্জতা কখনও শ্রীসম্পাদন করে না।

যাহা কিছু পুরাতন তাহাকে নিন্দা করায় বা তাহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার মধ্যে পৌরুষ নাই। পুরাতন মানুষের চিত্তহরণ করিয়া আসিয়াছে—আজ তাহাতে মানুষের আর তৃপ্তি হইতেছে না—তাহার বিরুদ্ধে মানুষের মনকে বিষাক্ত করিয়া তোলায় পৌরুষ নাই। পুরাতনের পাশে নূতনকে দাঁড় করাইয়া, বাহুবলে নয়—ভাবশক্তির বলে, তাহাকে অধিকতর চিত্তহর করিয়া তোলাতেই পৌরুষ। জোর গলায় একটা বিদ্রোহের কথা লম্ফ দিয়া হুঙ্কার করিয়া বলিলেই পৌরুষভাবের কবি হওয়া যায় না। কোকিলের স্বর মিষ্ট বলিয়াই সকলের বিশ্বাস, কোকিলের 'স্বর মিষ্ট নয়, কর্কশ' এই কথাটা বারবার গর্জ্জন করিয়া বলিলেই বা কাকের স্বর সুমিষ্ট এই কথাটা চীৎকার করিয়া বলিলেই কোকিলের প্রতি কাহারও বিতৃষ্ণা জন্মিবে না—নূতন সত্যের বা পৌরুষের সন্ধান পাইলাম বলিয়া লোকে উল্লসিত হইয়া উঠিবে না। এমন একটি কলকণ্ঠ পক্ষীকে আনিয়া হাজির করিতে হইবে, যাহার স্বর শুনিয়া আর চিরপুরাতন কোকিলকে ভাল লাগিবে না। যে কোন পক্ষীকে আনিয়াই কেবল চীৎকারের দ্বারা এমন কি জোরালো যুক্তির দ্বারাও তাহাকে সুকণ্ঠ বলিয়া প্রমাণ করিলে চলিবে না।

আমাদের দেশের কাব্য-সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে শৃঙ্খলা, গঠন-পারিপাট্য, সংযম ও শান্ত-শ্রীর প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। এগুলি কাব্য সাহিত্যের পক্ষে এমনি স্বাভাবিক ও অপরিহার্য্য অঙ্গস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে যে অনেকের নিকট অতিপরিচয়ের জন্য তাহার বৈচিত্র্য বা অপূর্ব্বতা নাই, অনেকে তাহার মধ্যে একটা স্থূলতার গ্লানি অনুভব করেন।—তাঁহারা চাহেন,—একটা নূতন কিছু শুনিতে, চাহেন একটা নূতন বিপরীত ধরণের বাণী, দেখিতে চাহেন একটা বিচিত্র ভঙ্গী,—শুনিতে চাহেন একটা চমকপ্রদ নূতন হুঙ্কার। তাই সংযম ও শৃঙ্খলার বিপরীত একটা কিছু দেখিলেই পৌরুষের আনন্দে লম্ফ দান করেন—ভাবেন, বুঝি যুগপ্রবর্ত্তক আসিলেন।

তাঁহাদের কাছে উচ্ছৃঙ্খলতার নামই নূতনত্ব, পাশবিকতার নাম বৈচিত্র্য, কর্কশতার নাম পৌরুষ। কিন্তু হায়, এ সকল ত নূতন জিনিষ নয়—এইগুলিই চির পুরাতন। বহুদিনের চেষ্টাতেই সংযম, শৃঙ্খলা, সৌকুমার্য্য ও আধ্যাত্মিকতা ঐ গুলিকে জয় করিয়া উঠিয়াছে—মানব জাতির সভ্যতারও তাহাই প্রাণস্বরূপ।

সমাজের সর্ব্বত্র শিষ্ট আলাপ শুনিতে শুনিতে বিরক্ত হইয়া শেষে কুৎসিত অশ্লীল কথা শুনিবার জন্য যে ব্যগ্রতা—নরনারীকে সর্ব্বত্র বেশভূষামণ্ডিত দেখিতে দেখিতে বিরক্ত হইয়া বীভৎস বিবসনতা দেখিবার জন্য যে আগ্রহ—সুপক্ব সুখাদ্য ভোজনে বিরক্ত হইয়া কাঁচা মাংস খাইবার জন্য যে লোভ, তাহার সহিত কাব্য সাহিত্যের সংযম, শৃঙ্খলা, সৌকুমার্য্যের স্থূলতায় বিরক্ত হইয়া পৌরুষের নামে উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খলতায় প্রতি [illegible] কোন পার্থক্য নাই।

খণ্ড-কাব্য ও গীতি কাব্য

আজও কেহ কেহ দুঃখ করিয়া বলেন—এ যুগে একটা মহাকাব্য জন্মে না—একটা খণ্ডকাব্যও কেহ লেখে না। কেন লেখে না? খণ্ডকাব্যের যুগ অতীত হইয়াছে। অন্য দেশের কথা ছাড়িয়া আমাদের নিজের দেশের কথাই বলি।

যখন গদ্য ভাষা সাহিত্যের উপাদান হইয়া উঠে নাই, তখন কাব্যকে একাধারে অনেকগুলি কাজ করিতে হইত। কাব্য তখন হইত একাধারে—কাব্য, সঙ্গীত নাটক, উপন্যাস, ইতিহাস, ধর্ম্মতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্ব। মুদ্রাযন্ত্র ছিল না—সকল কবির ভাগ্যে রাজসভাও জুটে নাই—সেজন্য কাব্যকে পালাগানে পরিণত করিয়া গ্রামে গ্রামে তাহার গাওনার ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে—সেজন্য কাব্যকে সঙ্গীত হইয়া উঠিতে হইয়াছে। দেশে জ্ঞানপ্রচার বা লোকশিক্ষার ব্যবস্থা ছিল না, সেজন্য কাব্যকে ধর্ম্মতত্ত্ব সমাজতত্ত্বের ভার গ্রহণ করিতে হইয়াছে। ইতিহাস লেখার প্রথা ছিল না সেজন্য ইতিহাসের বার্ত্তাও তাহাকে বহন করিতে হইয়াছে। একাধারে এতগুলি কাজ যাহাকে করিতে হইয়াছে—বলা বাহুল্য, তাহার দ্বারা কোন কাজটাই সুচারুরূপে সাধিত হয় নাই। তাহা না হউক, 'মঙ্গল কাব্য'গুলি দেশের লোককে মঙ্গলের সঙ্গে জ্ঞান ও আনন্দ দান করিয়াছে।

তারপর ক্রমে যুগপরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ও যুগ-সম্পদের অতিরিক্ত বৃদ্ধিতে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ ও কর্ম্মবিভাগ-পদ্ধতি প্রচলিত হইল। খণ্ডকাব্যের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্যেরও বিভাগ হইল। খণ্ডকাব্যের বদলে আসিল—উপন্যাস, নাটক, গল্প, ইতিহাস, ধর্ম্মতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব ইত্যাদি গদ্যে, এবং গীতি কাব্য ও সঙ্গীত আসিল পদ্যে। সকলেই স্বতন্ত্র ভাবে আত্মপ্রকাশ করিতে লাগিল। কাব্য আর অন্য কাহারও সহিত একত্র মিলিত হইতে চাহিল না—কাজেই তাহার খণ্ডকাব্য হইবার সুবিধা চলিয়া গেল—তাহাকে গীতিকাব্যের রূপই ধরিতে হইল।

কাব্যের নিজস্ব একটা অভিমান আছে—যে নিজের শক্তিতেই যখন জয়ী হইতে পারে—তখন সে কেন অপরের সহায়তা লইয়া যৌথ ব্যবস্থা করিয়া তৌথ আদায় করিতে যাইবে?

যুগধর্ম্মের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানবসভ্যতার শ্রীবৃদ্ধির ও মনোজগতের জটিলতার সঙ্গে সঙ্গে কাব্যের নিজস্ব উপকরণ যেমন বাড়িয়া গেল—প্রেরণার পরিমাণ ও সংখ্যাও তেমনি বৃদ্ধি পাইল। কাব্যের আর অন্যের দিকে চাইবার প্রয়োজন বা অবসর নাই।

তাই বলিয়া এ যুগের কবি যে ইচ্ছা করিলে খণ্ডকাব্য লিখিতে পারেন না তাহা নহে—কিন্তু তাহাতে তাঁহার লেখনীর স্বাধীনতা নষ্ট হইবে, কবি ইহাই ভাবেন। আত্মীয় ভাববস্তুতে তাঁহার যে স্বাধীনতা, অনাত্মীয় (Impersonal) বিষয়বস্তুতে সে স্বাধীনতা নাই—খণ্ডকাব্য লিখিতে হইলে কবিকে কাব্যের নিজস্ব ক্রম (Sequence) ত্যাগ করিয়া ঐতিহাসিক, যুক্তিমূলক বা কাহিনীমূলক ক্রম অবলম্বন করিতে হয় অথবা নিজস্ব ক্রমকে এইরূপ ক্রমের অধীন করিয়া তুলিতে হয়। ফলে, আগাগোড়া সরস হইয়াও উঠে না—চিত্ত স্বাধীন স্ফূর্ত্তিও লাভ করে না। এই সব ভাবিয়া কবিরা খণ্ডকাব্য রচনা করিতে চাহেন না। গত শতাব্দীতে খণ্ডকাব্য রচনার Experiment হইয়া গেছে—তাহাতে দেখা গেল, সেগুলির মধ্যে যতটুকু লিরিক ততটুকুই কাব্য হইয়া উঠিয়াছে, বাকীটুকু অসার।

Message বা বাণী

কেহ কেহ বলেন,—প্রত্যেক শ্রেষ্ঠ কবির কাব্যে একটা বাণী বা Message থাকিবেই। দেশের লোকের পক্ষ হইতে যাহা বাণী বা Message—কবির পক্ষ হইতে তাহাই কবি জীবনের মূল প্রেরণা। ইহাদের মতে প্রত্যেক কবির জীবনে একটি মূল প্রেরণা আছে—একটি সত্যকে তিনি অবিষ্কার করিয়াছেন—সেই সত্যকেই নানা ছন্দে নানা ভঙ্গিতে ভিন্ন ভিন্ন কবিতায় অভিব্যক্ত করিয়া থাকেন।—অর্থাৎ ইহাদের মতে বড় কবিমাত্রই নবীও।

কবি যদি একাধারে দার্শনিক ও কবি, অথবা সাধক ও শিল্পী হ'ন তবেই একথা খাটে। কিন্তু এ জগতে কেবল-মাত্র অবিমিশ্র কবিরই বা অভাব কি? এমন কবি যথেষ্ট আছেন—যাঁহাদের জীবনে কোন একটি বিশিষ্ট মূল প্রেরণা নাই। একটী বক্তব্যকেই নানা ছন্দে নানা কবিতায়

বলেন নাই—কোন সত্যকে আবিষ্কারও করেন নাই—বিশ্বমানবের চিরন্তন ভাব, অনুভূতি ও চিন্তাগুলিকেই রসরূপ দিয়াছেন, পরের আবিষ্কৃত সত্যগুলিকেই সরস করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহারাও কি বড় কবি নহেন? কালিদাস কি বড় কবি নহেন? সেক্সপিয়রের বাণী বা Message কি?

কবি সৌন্দর্য্যের উপাসক—এই বিশ্বের অন্তরে বাহিরে যেখানে তিনি সৌন্দর্য্য পাইয়াছেন—খণ্ড-খণ্ড ভাবে তিনি উপভোগ করিয়াছেন—আমাদিগকে উপভোগের ভাগ দিয়াছেন। যাহা কুৎসিত, উপেক্ষিত, রূঢ় তাহাকেও তিনি মধুর, শোভন ও উপভোগ্য করিয়া তুলেন। তিনি যখন যেভাবে আবিষ্ট হইয়াছেন—সেই ভাবেরই সরস অভিব্যক্তি আমরা তাঁহার কাব্যে দেখিতে পাই। বিভিন্ন সময়ে তিনি পরস্পরবিরোধী ভাবেও আবিষ্ট হইতে পারেন। তাহার ফলোপভোগে আমাদের চিত্তে কোন বিরোধের উদয় হয় না। কারণ কবির সৃষ্টি ও আমাদের উপভোগ দুই-ই বস্তুজগৎ ও মনোজগতের সমগ্রতা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়াই সম্ভব হয়।

কবির এই সাধনাকেই যদি Message বলিয়া ধরা হয়, তাহা হইলে সকল কবির Message এক।

অনেক কবির রচনাগুলির মধ্যে কোন একটি বিশিষ্ট ভাবের যোগসূত্র কিছুই ধরা যায় না। তবে সে গুলি যে কোন একটি বিশিষ্ট মানসদৃষ্টির ফল—তাহা বুঝা যায়। এই মানসদৃষ্টির অভিব্যক্তিকে Message বলিলে সকলেরই এক একটা Message আছে।

আর একটি ঐকিকতা দেখা যায়—রচনাভঙ্গিতে। প্রত্যেকের রচনা-ভঙ্গিতে বৈশিষ্ট্য আছে—ইহাকে নিশ্চয়ই কেহ Message বলিবেন না।

মহাকাব্যের কবির একটা যে Message আছে তাহা অবশ্য ধরা যায়। বোধ হয় তাহা হইতেই অথবা সাধক কবিদের কাব্যাদর্শ হইতেই বোধ হয়, সকল কবির কাব্যেই Message অনুসন্ধানের প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে এবং Message না থাকিলে বড় কবি হওয়া যায় না—এইরূপ একটা ধারণা জন্মিয়া গিয়া থাকিবে।

কবি না হইলেও একজনের বাক্যে, কর্ম্মে, রচনায় ও রসনায় Message থাকিতে পারে। আবার কোন একটা বিশিষ্ট Message না থাকিলেও একজন বড় কবি হইতে পারে। যাহার কব্যে একটা বিশিষ্ট Massage আছে তিনি অন্য কবিদের চেয়ে কবি হিসাবে বড় না-ও হইতে পারেন—কিন্তু মানুষহিসাবে যে বড়, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই—কারণ তিনি কবি এবং সত্য-প্রচারক দুইই একসঙ্গে।

তথ্য ও সাহিত্য

যে কোন তত্ত্ব, যে কোন' তথ্য বা যে কোন সমস্যাকে সরস করিয়া বিবৃত করিতে পারিলে—শোভন ভঙ্গিতে যে কোন' বিষয়ের আলোচনা করিতে পারিলে যে সাহিত্য হইয়া উঠে, তাহা রবীন্দ্রনাথের নানা ধরণের রচনা হইতে বুঝিতে পারা যায়। তাহা হইতে মনে হয় সাহিত্যের বিষয়ীভূত হইতে পারে না—এমন জিনিস খুব অল্পই আছে বা আদৌ নাই।

যে কোন বিষয়কে সাহিত্যের পদবীতে উন্নীত করিবার জন্য চাই রস-প্রতিভা ও কলাকুশলতা। যাঁহার এই প্রতিভা আছে—কলাকুশলতা আছে, তিনি ইচ্ছামত বিষয় ও উপকরণ নির্ব্বাচন করিতে পারেন,—এমন কি সমসাময়িক সমাজও যদি তাঁহার হাতে তাহার নিজের প্রয়োজনমত কোন সমস্যা বা বিষয়বস্তুর ভার সমর্পণ করে—তবে তিনি প্রতিভাবলে তাহাকে সাহিত্য করিয়া তুলিতে পারেন। নিজস্ব সৌন্দর্য্যদৃষ্টি বা রস-সৃষ্টির মর্য্যাদা বিন্দুমাত্র ক্ষুন্ন না করিয়াও সুসাহিত্যিক সমাজের আকিঞ্চন ও আকাঙ্ক্ষা মিটাইতে পারেন। যাহাদের প্রতিভা নব নব উন্মেষশালিনী নয়—যাহাদের লেখনী কলাকুশলতায় পরিপক্কতা লাভ করে নাই—তাহারাই কেবল সুবিধামত বিষয় নির্ব্বাচন করিয়া আপনাদের সঙ্কীর্ণ ক্ষমতাটুকু প্রয়োগ করে,—আর বলে—কোন' উদ্দেশ্য লইয়া সাহিত্য হয় না—সাহিত্যের দ্বারা সৌন্দর্য্য-পিপাসা ছাড়া অন্য কোন পিপাসার নিবৃত্তি হইতে পারে না—কোন তত্ত্ব, তথ্য, সমস্যা বা সিদ্ধান্তকে সাহিত্য করিয়া তুলিতে পারা যায় না।

গীতি-কবিতা জিনিষটা অনেকটা Inspiration বা ভাবাবেগের ফল—তাহাতে কবির পক্ষে বিষয়-নির্ব্বাচনের

বাস্থ স্বাধীনতা নাই। কিন্তু খণ্ড-কবিতা বা মহাকাব্যে কবি ইচ্ছামত বিষয়নির্ব্বাচন করিয়া লইতে পারেন। প্রবন্ধ-রচনাকে সম্পূর্ণ সাহিত্যের কোটায় আনা যাইতে পারে। প্রবন্ধ জিনিসটা কেবল সমালোচনামূলক হইবে তাহারও কিছু মানেনাই। প্রবন্ধ একটা কলাকৌশলময় সৃষ্টিও (Creation) হইতে পারে—সমালোচনাও নিজেই একটা 'সৃষ্টি' হইয়া উঠিতে পারে। রচনার পারম্পর্য্যের ক্রম যুক্তি-মূলক হইলেই তাহা সাহিত্য ছাড়া অন্য কিছু হইবে, এমনটা ভাবিবার সঙ্গত কারণ দেখা যায় না। রস বা সৌন্দর্য্যের প্রধান পরিপোষক শৃঙ্খলা। এই শৃঙ্খলা যদি যুক্তিমূলক হয়, তাহাতে সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির কোন ক্ষতি হইবে এমন কথা ভাবিবার হেতু কি? প্রবন্ধ যদি সৎসাহিত্যের কোটায় স্থান পায়—তবে সাহিত্যসৃষ্টির উপকরণ-নির্ব্বাচনেও সাহিত্যিকের স্বাধীনতা আছে স্বীকার করিতে হয়।

নাট্য ও উপন্যাস রচনা ক্ষণিক Inspirationএর ফল নয়—সাহিত্যিকের লেখনীর বোঁটায় এ গুলি ফুলের মতই স্বভাবতঃই ফুটে উঠে না। লেখককে অনেক বিচার-বিবেচনা করিয়া বিষয়বস্তু ও উপকরণ নির্ব্বাচন করিতে হয়—বুদ্ধি ও ইচ্ছাশক্তিকে যথেষ্ট সজ্ঞানেই খেলাইতে হয়। এমন বিষয়বস্তু লইয়া নাট্য ও উপন্যাস রচনা করা যাইতে পারে—যাহাতে রসসৃষ্টির মর্য্যাদা বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ না করিয়াও শিল্পী ধারবান, সারবান ও ভারবান এমন কিছু দিতে পারেন, যাহা শুধু মনের সুরা নয়—জ্ঞানের খোরাকও যোগাইতে পারে—শুধু পাঠকসমাজকে বিমল আনন্দ নয়, সেই সঙ্গে তাহার চিত্তের কল্যাণও কিছু সাধন করিতে পারে। শিল্পীর রচনা 'শাঁসে জলে' ডাবের মতই চমৎকার হইয়া উঠিতে পারে; ডাবের জলে প্রাণ ঠাণ্ডা হইতে পারে—আবার তাহার শাঁসে কিছু জীবনের পুষ্টিও পাওয়া যাইতে পারে। যাহাতে বিন্দুমাত্র জ্ঞানবৃদ্ধি হয় না—বাস্তব কল্যাণ কিছু লাভ করা যায় না—কেবল আনন্দ পাওয়া যায়, তাহা অলস সাহিত্যমাত্র একথা কেহই বলিবে না। কিন্তু একাধারে যদি কিছুতে সবই পাওয়া যায়—তবে তাহাকে অসাহিত্য মনে করিবার কারণ তো নাই-ই—বরং কেহ তাহাকে উচ্চতর সাহিত্য মনে করিলে দোষ দেওয়া যায় না।

লেখকের লেখনীকে একটি ফুলের ডালের সঙ্গে উপমিত করা যাইতে পারে। কিন্তু লেখনীর মূলে যে একটি দায়িত্বপূর্ণ মননশীল চিন্তারত মন আছে তাহাও সত্য বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়। লেখক ইচ্ছা করিলে আনন্দ দিতে পারেন, তাহার সঙ্গে এমন কিছু দিতে পারেন যাহা সে আনন্দকে চির অম্লান করিয়া রাখিতে পারে—যাহা নব নব আনন্দের উৎস-স্বরূপ হইয়া থাকিতে পারে। শিল্পী সেই সঙ্গে আনন্দের উপভোক্তার মানস-প্রকৃতিতে এমন পরিবর্ত্তন ঘটাইতে পারেন—যাহাতে উপভোক্তা আনন্দ শত গুণ বৃদ্ধি পাইতে পারে। ধ্বনির পক্ষে প্রতি ধ্বনির মত—আনন্দ শতভাবে প্রতিফলিত হইতে পারে—আনন্দকে জ্ঞানের অক্ষয়বৃন্তে চিরদিনের জন্য ফুটাইয়া রাখিতে পারে। তাহাতে আনন্দের একটা বংশধারা চিরবহমান থাকিয়া যাইতে পারে। অর্থাৎ সাহিত্যশিল্পী লাবণ্যের সঙ্গে স্বাস্থ্যও দিতে পারেন। মনে রাখিতে হইবে, তাজমহল শুধু মর্ম্মরস্বপ্নমাত্র নয়। উহা নবনীর মত শুভ্রচিক্কণ হইলেও, শিলা দিয়াই গঠিত এবং যমুনার কূলে অতি দৃঢ়-গভীর অটল ভিত্তির উপরই স্থাপিত।

শুধু রবীন্দ্রনাথের লেখনীতে নয়, ইউরোপে আজকাল এমনি সারে, ভারে, ধারে সমৃদ্ধ নাট্য-সাহিত্য ও উপন্যাস-সাহিত্য সম্ভব হইতেছে বলিয়াই এ সব কথা বলা হইল।

জননী কোথায় ওরে?

শ্রীপ্রতিভা ঘোষ

(১)

নবমী প্রভাতে নেমেছে বিজয়া
আমার নয়ন-মাঝ!
বোলোনা বাঁধিতে কবরী, সখি গো,
পরিতে নূতন সাজ!
হারায়ে ফেলেছি জনকে আমার
এ নিখিলে খুঁজে পাবো না তো আর
"মা" বলে আদরে ডেকে কে আমারে
এনে দিবে নব সাজ?
তাই দু' আঁখিতে বিষাদ-অশ্রু
নবমী প্রভাতে আজ!

(২)

পূজা-মণ্ডপে কোথা পার্ব্বতী
বরদাত্রী সে রূপ?
"মা", "মা" ব'লে ডাকি, নীরব, নিথর
নড়ে না মাটীর স্তূপ!
নয়ন ভরিয়া সলিলাঞ্জলি
এনেছি, কোথা মা দেনা তোরা বলি
মা কি আছে বেঁচে, বাহার পীঠে
হ'য়েছে মাটীর স্তূপ!
পূজা-মণ্ডপে কোথা শঙ্করী
কোথা সে অভয়া রূপ?

(৩)

চারিদিকে শুধু জরা ও মৃত্যু
রুটী লাগি কলরোল!
স্বার্থের লাগি ভায়ে ভায়ে আজি
বেঁধেছে দ্বন্দ্ব গোল!
লজ্জা ঢাকিতে নাহিকো বসন
ক্ষুধায় কাতর কে দেবে অশন
দুর্গতি হরা কোথা মা দুর্গা
মিছে সখি উতরোল
মা কি আছে সখি, ব্যথা মুছে দেবে
দানিয়া তনয়ে কোল?

(৪)

হের সখি, ওই ভিখারিণী বালা
পরিয়া ছিন্ন বেশ—
এসেছে দুয়ারে ভিক্ষার লাগি
রুক্ষ মলিন কেশ!
সুচারু বসনে ঢাকিব অঙ্গ
এ কি সখি তব নিঠুর রঙ্গ
দিয়ে আয় তোরা আমার যা আছে—
রিক্তা? এই তো বেশ!
মা-হারা বুঝিবা ভিখারিণী বালা
কত না তাহার ক্লেশ!

(৫)

বৃথা কেন সখি মা এসেছে ব'লে
ভুলাইতে চাহ মোরে?
বাংলার মাঠে সবুজের ঢেউ
দেখেছ শারদ-ভোরে?
শেফালী—বালিকা জাগেনি তো তারা
নদ নদী খালে কোথা জল-ধারা,
পয়ঃহীনা গাভি, দুধের বাছারা
দুধ বিনা যায় মরে!
আঁতুড়ে মরিছে লাখো লাখো শিশু
জননী কোথায় ওরে?

—

সনাতন ধর্ম্মের আদর্শ সম্বন্ধে মহাত্মাজী

যারবেদা জেল হইতে মহাত্মাজী যে প্রচারকার্য্য চালাইবেন, তৎসম্পর্কে ভারতভৃত্য সমিতি মহাত্মা গান্ধীর বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন।

মহাত্মার বিবৃতি

"আমার উপবাস ব্রত ভঙ্গের পর আমি অস্পৃশ্যতার প্রশ্নটির সম্বন্ধে যে ভাবে চর্চ্চা করিব বলিয়া মনে করিয়াছিলাম, কতকগুলি কারণ বশতঃ ততটা সম্পূর্ণরূপে ঐ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে আমি সমর্থ হই নাই। যে সব কারণে আমি উহাতে অসমর্থ ছিলাম, সেগুলির উপর আমার কোন হাত ছিল না। এই কাজের সম্পর্কে সাধারণ্যে প্রচারকার্য্য চালাইবার জন্য গবর্ণমেণ্ট এখন আমাকে অনুমতি প্রদান করিয়াছেন। সুতরাং যে সব অসংখ্য পত্র প্রেরক যারবেদা চুক্তির সমালোচনা হিসাবে অথবা অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে প্রচারকার্য্য সমুদ্ভূত বিভিন্ন প্রশ্নের সম্বন্ধে আমার নিকট হইতে পরামর্শ পাইবার জন্য কিংবা ঐ গুলির সম্বন্ধে আমার অভিমত জানিবার নিমিত্ত আমার নিকট চিঠিপত্র লিখিয়াছেন, আমি তাঁহাদের সম্বন্ধে বিবেচনা করিতে সমর্থ হইব। আমরা এই প্রাথমিক বিবৃতিতে আমি শুধু প্রধান প্রধান প্রশ্নগুলিরই আলোচনা করিতে চাহি।

পুনরায় উপবাস ব্রত অবলম্বন

অস্পৃশ্যতার মূলোচ্ছেদ আবশ্যক

আমার উপবাসব্রত পুনরায় আরম্ভ করিবার প্রশ্নটির সম্বন্ধেই আমি প্রথমে বিবেচনা করিব। কোন কোন পত্র-প্রেরক এই তর্ক তুলিয়াছেন যে, উপবাসের ভিতর জুলুমের গন্ধ আছে, এবং ঐ পন্থা অবলম্বন করা আদৌ উচিত ছিল না, সুতরাং পুনরায় উহার আশ্রয় গ্রহণ করা সঙ্গত হইবে না। অপর কেহ কেহ এই যুক্তি দেখাইয়াছেন যে আমি যেরূপ উপবাস করিয়াছি, সেইরূপ উপবাস করিবার অনুকূলে কোন বিধান হিন্দুধর্ম্মে অথবা অন্য কোন ধর্ম্মে নাই। আমি ধর্ম্মের দিক হইতে ইহার বিচার করিতে চাহি না। ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ভগবানের আহ্বানেই আমি গতবার উপবাস ব্রত অবলম্বন করি। এবং যদি কখনও উহা পুনরায় আরম্ভ করিতে হয়, তাঁহার আহ্বানেই করিব। কিন্তু প্রথমবার যখন উহা অবলম্বিত হয়, অস্পৃশ্যতার মূলোচ্ছেদ করিবার জন্যই যে অবলম্বিত হইয়াছিল, এবিষয়ে সন্দেহ নাই। উহা যে আকার পরিগ্রহ করে, তাহা আমার নিজের ইচ্ছামত হয় নাই। মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত আমার জীবন-মরণের সমস্যাকে ত্বরান্বিত করিয়া দেয়; কিন্তু আমি জানিতাম যে, বৃটিশ মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তের পরিবর্ত্তন শুধু এই পাপের মূলোচ্ছেদের প্রারম্ভমাত্র হইয়াছে।"

"সম্ভবতঃ এ যুগে আমার মত কেহই ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত এত অধিক পরিভ্রমণ করে নাই, অথবা এত অধিক গ্রামে গ্রামে ঘুরে নাই, এবং আমি যেরূপ লক্ষ লক্ষ লোকের সংস্পর্শে গিয়াছি, এরূপ কেহ যায় নাই। আমার জীবনের সব কথা তাহাদের জানা আছে এবং তাহারা শুনিয়াছে যে, স্পৃশ্য ও অস্পৃশ্যের মধ্যে এক জাতি এবং অপর জাতির মধ্যে আমি কোন ব্যবধান বৈষম্য মানি না, আমার মুখে তাহারা তাহাদের মাতৃভাষায় অত্যন্ত তীব্রভাবে অস্পৃশ্যতার নিন্দা করিতে শুনিয়াছে; আমি উহাকে হিন্দুধর্ম্মের অভিসম্পাত এবং কলঙ্কস্বরূপ বলিয়া অভিহিত করি, ইহা অনেকে অবগত আছে। ভারতের সকল প্রদেশে শত শত জনসভা এবং ঘরোয়া বৈঠক সমূহে আমি অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে প্রচারকার্য্য চালাইয়াছি; কিন্তু দুই একটী ক্ষেত্র ব্যতীত কোথাও তাহার প্রতিবাদ হয় নাই। জনমণ্ডলী অস্পৃশ্যতার নিন্দাবাদ করিয়া সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছে এবং নিজেদের ভিতর হইতে ঐ পাপ দূরীভূত করিবার নিমিত্ত প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হইয়াছে। অসংখ্য ক্ষেত্রে তাহারা ভগবানকে সাক্ষী করিয়া ঐ সব প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিয়াছে এবং

প্রতিশ্রুতিরক্ষায় তাহাদিগকে শক্তিদান করিবার জন্য ভগবানের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিয়াছে। এই সব লক্ষ লক্ষ লোকের বিরুদ্ধে আমি উপবাস ব্রত অবলম্বন করি। তাহাদের স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রেমধারাই পাঁচ দিনের ভিতর অঘটন ঘটায় এবং যারবেদার চুক্তিকে সম্ভব করিয়া তুলে। ঐ চুক্তি যদি তাহারা পুরাপুরি প্রতিপালন না করে; তাহা হইলে তাহাদের বিরুদ্ধেই উপবাস ব্রত পুনরায় আরম্ভ করিতে হইবে গবর্ণমেণ্ট এখন প্রকৃতপক্ষে এই ব্যাপারের বাহির হইয়া গিয়াছেন। এই সম্পর্কে তাঁহাদের যে বাধ্যবাধকতা ছিল, তাহারা ক্ষিপ্রতার সহিত তাহা প্রতিপালন করিয়াছেন। যারবেদা চুক্তির বহুলাংশ ঐ সব লক্ষ লক্ষ লোকদিগকে এবং যে সব তথাকথিত বর্ণ হিন্দু আমার ঐ সব সভাসমিতিতে সমবেত হইত, তাহাদিগকেই প্রতিপালন করিতে হইবে। তাহাদিগকে তাহাদের নির্য্যাতিত ভ্রাতা এবং ভগিনীদিগকে আপনার জ্ঞানে আলিঙ্গন পাশে বদ্ধ করিতে হইবে, নিজেদের দেবমন্দিরে নিজেদের বাড়ী-ঘরে এবং নিজেদের বিদ্যালয়সমূহে আদর করিয়া ডাকিয়া লইতে হইবে। গ্রামবাসী অস্পৃশ্যদিগের ইহা উপলব্ধি করাইতে হইবে যে, তাহাদের শৃঙ্খলপাশ ছিন্ন হইয়াছে, তাহারা তাহাদের গ্রামবাসী অন্যান্য সকলের অপেক্ষা কোন অংশে হীন নহে। গ্রামবাসী অন্যান্য সকলে যে ভগবানের উপাসক, তাহারাও সেই একই ভগবানের উপাসনা করিয়া থাকে; অন্যান্য সকলে যে সব সুযোগ সুবিধা এবং অধিকার ভোগ করিয়া থাকে, তাহারাও সেই সব ভোগ করিবার অধিকারী।

"আমার জীবন প্রতিভূস্বরূপ" :—

কিন্তু চুক্তির এই প্রধান সর্ত্তটি যদি বর্ণ হিন্দুদের দ্বারা প্রতিপালিত না হয়, তাহা হইলে ঈশ্বর এবং মানব ইহাদের সম্মুখে আমার জীবন ধারণ করা কি ভাবে সম্ভব হইতে পারে? আমি ডাক্তার আম্বেদকর, রাও বাহাদুর রাজা এবং অনুন্নত সম্প্রদায়ের অন্যান্য বন্ধুদিগকে সাহস করিয়া এমন কথা পর্য্যন্ত বলিয়াছি যে বর্ণ হিন্দুরা যাহাতে চুক্তির সর্ত্তগুলি যথাযথ ভাবে প্রতিপালন করে, তজ্জন্য তাঁহারা আমার জীবন প্রতিভূস্বরূপ মনে করিবেন।

উপবাস যদি কোনদিন অবলম্বন করিতে হয়, তাহা হইলে সংস্কারের যাহারা বিরোধী, তাহাদের উপর জুলুমের হিসাবে উহা অবলম্বিত হইবে না; কিন্তু যাঁহারা আমার সহকর্ম্মী অথবা যাঁহারা অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের জন্য প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে কর্ম্মে প্ররোচিত করিবার উদ্দেশ্যেই উহা অবলম্বিত হইবে। তাঁহারা যদি তাঁহাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন, অথবা উহা প্রতিপালন করিবার ইচ্ছা আদৌ তাঁহাদের না থাকে, তবে তাঁহাদের হিন্দুয়ানী ধাপ্পাবাজী মাত্র; তেমন ক্ষেত্রে জীবন ধারণে আমার কোন লালসা থাকিবে না।

সুতরাং আমার উপবাস ব্রত সংস্কারের যাঁহারা বিরোধী, তাঁহাদের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করিবে না, এমন কি যে সব লক্ষ লক্ষ লোক আমার মনে এই বিশ্বাস সৃষ্টি করিয়াছেন যে অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে তাঁহারা আমার সঙ্গে এবং কংগ্রেসের সঙ্গে আছেন, তাঁহারা যদি পরে বিচার বিবেচনা দ্বারা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেন যে, অস্পৃশ্যতা ভগবান এবং বিশ্বমানবের বিরুদ্ধে পাপ নহে, তাঁহাদের উপরও ঐ উপবাস কোন প্রভাব বিস্তার করিবে না। নিজের এবং অপরের চিত্তশুদ্ধির জন্য উপবাস ব্রত অবলম্বন একটি যুগাগত প্রক্রিয়া বলিয়া মনে করিয়া থাকি। মানুষ যতকাল ঈশ্বরে বিশ্বাসী থাকিবে ততদিন পর্য্যন্ত ইহা বিলুপ্ত হইবে না। ইহা সর্ব্বশক্তিমানের নিকট ব্যথাতুর অন্তরের প্রার্থনা স্বরূপ। কিন্তু আমার যুক্তি বুদ্ধিমত্তাসম্পন্নই হউক, কিম্বা নির্ব্বোধের মতই হউক, যে পর্য্যন্ত আমি উহার ভুল নিজে না বুঝিতেছি, সে পর্য্যন্ত আমি উহা হইতে বিচ্যুত হইতে পারি না। বিবেকের আহ্বানে এবং যারবেদা চুক্তির সর্ত্তসমূহ প্রতিপালনে বর্ণ হিন্দুদের অপরাধমূলক ঔদাসীন্যবশতঃ যদি ঐ যুক্তি সুস্পষ্টভাবে ব্যর্থ হয়, তবে শুধু সেই ক্ষেত্রেই উহা পুনরায় অবলম্বন করা হইবে। তাঁহাদের ঐরূপ ঔদাসীন্য হিন্দুধর্ম্মদ্রোহিতারই সামিল হইবে। আমি বাঁচিয়া থাকিয়া উহা স্বচক্ষে দেখিতে চাহি না।

গুরুভায়ুর মন্দির সমস্যা :—

"কেরলের গুরুভায়ুর মন্দিরে অস্পৃশ্যদের [illegible] সম্পর্কে আমার অবিবৃত [illegible] একটি উপবাস [illegible]

অবলম্বনের সম্ভাবনা আছে। আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধেই শ্রীযুত কেলাপ্পান তিনমাসের জন্য তাঁহার উপবাস ব্রত স্থগিত রাখিয়াছেন। ঐ তিনমাসের জন্য তিনি মৃত্যুর প্রায় দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ১৯৩৩ সালের ১লা জানুয়ারী তারিখে কিংবা তৎপূর্ব্বে যদি ঐ মন্দিরের দ্বার অস্পৃশ্যদের জন্য উন্মুক্ত না হয়,এবং শ্রীযুত কেলাপ্পানের পক্ষে উপবাস ব্রত পুনরায় আরম্ভ করা আবশ্যক হয়, তাহা হইলে আমিও তাঁহার সহিত উপবাস অবলম্বন করিতে বাধ্য হইব।

দুই তিনটি স্থান হইতে কড়া চিঠি পাইয়াছি বলিয়া উপবাস ব্রতের সম্ভাবনা সম্বন্ধে আমাকে এত কথা বলিতে হইল। যাঁহারা আমার সহকর্ম্মী ঐ সম্ভাবনার জন্য তাঁহাদের চঞ্চল হওয়া উচিত নহে। যাহাতে উহা ঘটা অসম্ভব হইতে পারে, সেজন্য সমস্ত শক্তি নিয়োগ করাই উহা এড়াইবার সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়।

আন্তর্জ্জাতিক ভোজ ও বিবাহ ঃ—

আন্তর্জ্জাতিক ভোজ এবং অসবর্ণ বিবাহ অস্পৃশ্যতা-বিরোধী আন্দোলনের অঙ্গ কি না কোন কোন পত্রপ্রেরক উহা জানিতে চাহিয়াছেন। আমার মতে ঐ গুলি তাহা নহে। ঐগুলি বর্ণ হিন্দু এবং অনুন্নতদিগকে সমভাবে স্পর্শ করে, সুতরাং আন্তর্জ্জাতিক আহার অথবা আন্ত-র্জ্জাতিক বিবাহে আত্মনিয়োগ করা অস্পৃশ্যতা-বিরোধী আন্দোলনের কর্ম্মীদের পক্ষে বাধ্যতামূলক নহে। ব্যক্তি-গতভাবে আমার এই মত যে, এই সংস্কার অপ্রত্যাশিত-রূপ দ্রুততার সহিতই আসিতেছে। আন্তর্জ্জাতিক আহার এবং বিবাহে বাধা-নিষেধ হিন্দুধর্ম্মের অঙ্গ নহে, উহা একটি সামাজিক আচার মাত্র; সম্ভবতঃ হিন্দুধর্ম্মের অবনতির সময় উহা সমাজ-দেহে প্রবেশ করিয়াছে, সমাজের সংহতি যাহাতে বিচ্ছিন্ন হইয়া না যায়, তজ্জন্য সাময়িক সংরক্ষণ ব্যবস্থা স্বরূপেই ঐ সব বাধা-নিষেধ অবলম্বিত হইয়াছিল মনে হয়। ঐ সব নিষেধ বিধি ক্রমেই শিথিল হইয়া পড়িতেছে, ঐগুলির উপর জোর দিলে জীবনের অভিব্যক্তির পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি হইতেই জনসাধারণের দৃষ্টি অন্যদিকে গিয়া পড়িবে।

স্পৃশ্য এবং অস্পৃশ্য হিন্দু এবং অহিন্দু যে সব ভোজে যোগদানের জন্য আমন্ত্রিত হইয়া যে সব অনুষ্ঠানে লোকে স্বেচ্ছায় যোগদান করে আমি তাহাতে সুলক্ষণ বলিয়াই আনন্দ বোধ করিয়া থাকি। এই সংস্কার যতই বাঞ্ছনীয় হউক না কেন, আমি উহাকে নিখিল ভারতীয় সংস্কার আন্দোলনের অঙ্গস্বরূপ করিবার কথা কখনও কল্পনা করি না। আমরা সকলেই জানি অস্পৃশ্যতা দুষ্ট ক্ষতের ন্যায় হিন্দু-সমাজকে জীর্ণ করিয়া ফেলিতেছে। আহার এবং বিবাহ সম্পর্কিত বাধা নিষেধ হিন্দু-সমাজের উন্নতিতে বাধা দিতেছে এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্যকে আমি মৌলিক মনে করিয়া থাকি। আন্দোলনের একটা ঝড় তুলিয়া প্রধান বিষয়কে বিপন্ন করা আমি অবিবেচনার কাজ হইবে বলিয়া মনে করিয়া থাকি। অস্পৃশ্যতার দূরীকরণ সম্বন্ধে যেরূপ বিশ্বাসে তাহাদিগকে বিশ্বাসী হইতে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে, হঠাৎ তদপেক্ষা ভিন্ন ভাবে জনসাধারণকে বিষয়টি দেখিতে বলিলে তেমন কার্য্য তাহাদের প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতার সমান বলিয়াও বিবেচিত হইতে পারে। সুতরাং জনসাধারণ যেখানে ইচ্ছুক তথায় আন্তর্জ্জাতিক আহার চলিতে থাকুক; কিন্তু উহাকে ভারতব্যাপী আন্দোলনের অংশীভূত করা ঠিক হইবে না।

যাঁহারা নিজেদিগকে সনাতনী বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন, তাঁহাদের নিকট হইতে আমি কতগুলি চিঠি পাইয়াছি। কতকগুলি চিঠি ক্রুদ্ধভাবে লিখিত হইয়াছে। তাঁহাদের মতে অস্পৃশ্যতা হিন্দু-ধর্ম্মের প্রাণস্বরূপ। তাঁহাদের কেহ কেহ আমাকে ধর্ম্মদ্রোহী মনে করিয়া থাকেন, কেহ কেহ মনে করেন যে, খৃষ্টান এবং ইস্লাম-ধর্ম্মের মত অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধ ধারণায় আমি অনুপ্রাণিত হইয়াছি। কেহ কেহ অস্পৃশ্যতার পক্ষে শাস্ত্রবচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই বিবৃতির মারফতে আমি তাঁহাদের উত্তর দিব এই প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়াছি। আমি ঐ সব পত্রপ্রেরককে এই কথা বলিতেছি যে, আমি নিজে একজন সনাতনী, আমি এই দাবী করিয়া থাকি। সনাতনী বলিতে তাঁহারা যাহা বুঝেন, সনাতনী সম্বন্ধে আমার ধারণা অবশ্য তাহা হইতে বিভিন্ন। আমার মতে সনাতন ধর্ম্ম একটি প্রাণবন্ত ধর্ম্ম যুগ-যুগান্তর হইতে এমন

কি প্রাগৈতিহাসিক কাল হইতে ঐ ধর্ম্ম চলিয়া আসিতেছে, বেদ এবং তৎপরবর্ত্তী কালের ঋষিদের অনুশাসনের উপর উপর উহার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। আমার মতে শ্রীভগবান যেমন অনির্দ্দেশ্য, হিন্দুধর্ম্ম যেমন অনির্দ্দেশ্য বেদসমূহও তদ্রূপ অনির্দ্দিশ্য। ছাপার অক্ষরে যে চারখানা বেদ দেখিতে পাওয়া যায়, সেই চারখানাই বেদ, একথা বলিলে তাহা আংশিকভাবে মাত্র সত্য হইবে। অজ্ঞাতনামা তত্ত্বদর্শীদের আত্মোপলব্ধির কিছু অংশ মাত্র ঐ চারখানা গ্রন্থে তাঁহারা রাখিয়া গিয়াছিলেন, পরবর্ত্তী যুগের তত্ত্বদর্শিগণ সেই রত্ন মঞ্জুষায় নিজের নিজের সম্পদ যোগ করিয়াছেন। তৎপর একজন মহাপ্রাণ পুরুষপ্রবরের অভ্যুত্থান ঘটে; ইনিই গীতাশাস্ত্রের প্রণেতা। তিনি সমগ্র শাস্ত্র মন্থন করিয়া হিন্দু জাতিকে হিন্দুধর্ম্মের সারসত্য প্রদান করেন, উহা যেমন একাধারে সুগভীর দার্শনিকতাপূর্ণ; তেমনই সকলের পক্ষেই সহজে বোধগম্য।

গীতা মাহাত্ম্য

অনুসন্ধিৎসু প্রত্যেক হিন্দুর নিকট এই একখানি মাত্র পুস্তক উন্মুক্ত আছে এবং অন্য যত শাস্ত্র আছে, সে যদি ভস্মীভূত হইয়াও যায়, হিন্দুধর্ম্ম কি, কি ভাবে হিন্দুর আদর্শে জীবনযাপন করিতে হয়, তাহা জানিবার পক্ষে গীতার এই সপ্তশতী শাশ্বত এবং অবিধ্বংসি গাথাই যথেষ্ট। আমি নিজকে একজন সনাতনী বলিয়া দাবী করি; তাহার কারণ এই যে, ৪০ বৎসরকাল ধরিয়া আমি অক্ষরে অক্ষরে গীতার শিক্ষার উপযোগী ভাবে জীবনযাপন করিতে চেষ্টা করিতেছি। এই গীতা শাস্ত্রের মুখ্য বিষয়ের যেগুলি বিরোধী, আমি সেগুলিকে অহিন্দুর আচরণ বলিয়া অগ্রাহ্য করিয়া থাকি। গীতা কোন ধর্ম্মবিশ্বাসকে বর্জ্জন করিতে বলে না; কোন ধর্ম্মোপদেষ্টাকে তুচ্ছ করে না। আমি গীতার মতই ভক্তিসহকারে বাইবেল, কোরাণ জেন্দাবেস্তা এবং জগতের অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করিয়াছি, একথা বলিতে আমার বিশেষ আনন্দ হয়। এই সশ্রদ্ধ স্বাধ্যায় গীতাতে আমার বিশ্বাসকে দৃঢ়ই করিয়াছে। উহা আমার দৃষ্টিকে এবং সেজন্য হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে আমার ধারণাকেও উদার করিয়াছে। যরথুষ্ট্র, যীশু এবং মহম্মদের জীবনী, আমি যেভাবে বুঝিয়াছি, তাহাতে গীতার বহু সত্য আমার নিকট সমুদ্ভাসিত হইয়াছে। সুতরাং এই সব সনাতনী বন্ধুগণ বিদ্রূপ স্বরূপে আমার উপর যে সব বাণ বর্ষণ করিয়াছেন, সেগুলি আমার পক্ষে সান্ত্বনারই উৎস স্বরূপ হইয়াছে। আমি নিজকে একজন হিন্দু বলিতে গর্ব্ববোধ করিয়া থাকি; কারণ আমি বুঝিয়াছি, হিন্দু এই সংজ্ঞা শুধু অপরের ধর্ম্মমতে সহিষ্ণু হইতেই বলে না, জগতের যেখানে যত মহাপুরুষ জন্মিয়াছেন, তাঁহাদের সকলের শিক্ষাই গ্রহণ করিতে বলে। জীবনস্বরূপিনী এই গীতাতে আমি অস্পৃশ্যতার পক্ষে কোন বিধান দেখিতে পাই না। পক্ষান্তরে গীতা তাহার মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় আমাকে এই বিশ্বাসে বিশ্বাসী হইতেই বাধ্য করে যে, সকলের জীবনই এক, এবং সেই জীবনধারা ভগবান হইতে আসিয়াছে এবং তাঁহাতেই প্রত্যাবর্ত্তন করিবে। এই গীতা-জননী যে শিক্ষা দিয়াছেন, তদনুসারে মানুষের জীবন আনুষ্ঠানিক আচার প্রভৃতিতে নিবদ্ধ নহে, সুগভীর আত্মশুদ্ধি এবং দেহ মন আত্মা সেই ভগবৎ সত্ত্বায় নিমজ্জিত করাই জীবনের উদ্দেশ্য। গীতার এই অগ্নিময়ী বাণী আমার জীবনকে প্রদীপ্ত করিয়াছে, আমি সেই বাণী লইয়া জনসাধারণের নিকট লক্ষ লক্ষ লোকের নিকট উপস্থিত হইয়াছি; তাহারা আমার কথাটী শুনিয়াছে। তাহারা আমার রাজনীতিক বিজ্ঞতা অথবা বাগ্মিতার জন্যই যে আমার কথা শুনিয়াছে ইহা নহে; আমি তাহাদেরই একজন, তাহাদেরই ধর্ম্মবিশ্বাসে আমি বিশ্বাসী, তাহারা সহজ বুদ্ধিতে ইহা বুঝিয়াছে বলিয়াই তাহারা আমার কথা শুনিয়াছে! দিন যতই যাইতেছে, ততই আমার এই বিশ্বাস দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইতেছে যে, নিজে আমি একজন সনাতনী ধর্ম্মী, আমার এই দাবী করা অসঙ্গত নহে, এবং ভগবানের যদি ইচ্ছা থাকে, আমার ঐ দাবী আমার মৃত্যুর দ্বারা তিনি আমাকে দৃঢ় করিতে দিবেন।

"অনেক পত্রলেখক উদার শিক্ষালাভ সত্ত্বেও প্রস্তাব করিয়াছেন যে, "হরিজন"দিগকে উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের সহিত সমপর্য্যায়ভুক্ত করিবার পূর্ব্বে তাহাদিগকে ঐরূপ মর্য্যাদা লাভ করিবার জন্য উপযুক্ত হইতে হইবে— তাহাদের নোংরা অভ্যাসসমূহ ত্যাগ করিতে হইবে

পশুর মৃতদেহ ভোজন ত্যাগ করিতে হইবে। আর এক জন এতদূর পর্য্যন্ত বলিয়াছেন যে, নোংরা পেশায় নিযুক্ত "ভাঙ্গী" ও "চামার"দিগকে তাহাদের পেশা ত্যাগ করিতে হইবে। এই সকল সমালোচক ভুলিয়া যাইতেছেন যে, "হরিজন"দের মধ্যে যে সকল মন্দ অভ্যাস দেখা যায়, উচ্চাঙ্গের হিন্দুগণই তাহার জন্য দায়ী, অস্পৃশ্যদিগকে মার্জ্জিত ও সুসংস্কৃত জীবনযাপনের জন্য তথাকথিত উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুগণ কোনও প্রেরণা দেন না। কাজেই তাহারা ঐ সুযোগ হইতেও বঞ্চিত। মেথরের কাজ ও চামড়া পাকা করার পেশা অন্য কোন পেশা অপেক্ষা অধিকতর নোংরা নহে, শুধু এই সকল কাজ আরও অন্য অনেক কাজের ন্যায় নোংরা প্রণালীতে সম্পন্ন করা হয়। তাহাও উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুদের অন্যায় উপেক্ষা ও গর্হিত অবহেলার ফল। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে আমি বলিতে পারি যে, মেথরের কাজ ও চামড়া পাকা করার কাজ সম্পূর্ণ পরিষ্কার প্রণালীতে করা যাইতে পারে। প্রত্যেক মাতাই তাহার ছেলের সম্পর্কে মেথর এবং আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রত্যেক ছাত্রই চামড়া কাটে, কারণ তাহাকে শব ব্যবচ্ছেদ করিতে হয়। কিন্তু আমরা তাহাদের পেশাকে পবিত্র বলিয়া বিবেচনা করিয়া মাতা ও চিকিৎসকের কাজ যেমন পবিত্র ও প্রয়োজনীয়, সাধারণ মেথর ও মুচির কাজ তাহা অপেক্ষা কম পবিত্র ও প্রয়োজনীয় নহে। উচ্চশ্রেণীর হিন্দুগণ যদি আপনাদিগকে "হরিজনদের" প্রতি অনুগ্রহ বিতরণের জন্য মুরুব্বি বিবেচনা করেন, তাহা হইলে আমরা অন্যায় করিব। "হরিজনদের" জন্য উচ্চশ্রেণীর হিন্দুগণ এক্ষণে যাহা করিবেন, তাহা তাহাদের প্রতি বংশপরম্পরায় অনুষ্ঠিত অনাচারের ক্ষতিপূরণ মাত্র হইবে। বর্ত্তমানের অবস্থাতেই তাহাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে। অতীত অপরাধের ইহা উপযুক্ত শাস্তি হইবে। কিন্তু উন্মুক্ত হৃদয়ে তাহাদিগকে গ্রহণ করা হইলে তাহা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার জন্য পর্য্যাপ্ত প্রেরণা দান করিবে এবং উচ্চশ্রেণীর হিন্দুগণ তাঁহাদের নিজ স্বাচ্ছন্দ্য ও সুবিধার জন্য "হরিজন"দিগকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকিবার জন্য সুবিধা প্রদান করিবেন।

"হরিজন"দের প্রণানত মস্তকের উপর আমরা অন্যায়ের বোঝা কিরূপ স্তূপীকৃত করিয়াছি, তাহা আমাদের স্মরণ করা উচিত। সামাজিক হিসাবে তাহারা কুষ্ঠরোগীর ন্যায় অস্পৃশ্য; অর্থ-নৈতিক দিক দিয়া তাহাদের অবস্থা ক্রীতদাস অপেক্ষাও শোচনীয়। ধর্ম্মের দিক দিয়া— আমরা যে স্থানকে ভুল করিয়া ভগবানের আলয় বলি, তথায় তাহাদিগকে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না। সাধারণ রাস্তা, সাধারণ বিদ্যালয়, সাধারণ হাসপাতাল, সাধারণ কূপ, সাধারণ জলের কল, সাধারণ পার্ক ইত্যাদি উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুদের ন্যায় তাহাদিগকে সমভাবে ব্যবহার করিতে দেই না। কোন কোন স্থানে নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে তাহাদের উপস্থিতি সামাজিক অপরাধ এবং ক্বচিৎ কোন স্থলে তাহাদের দৃষ্টির মধ্যে আসাই অপরাধ। তাহাদের বাসের জন্য সহরের বা গ্রামের সর্ব্বাপেক্ষা খারাপ স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখা হইয়াছে। উচ্চশ্রেণীর হিন্দু উকীল বা ডাক্তারেরা তাহাদের কাজ করেন না। ব্রাহ্মণগণ তাহাদের ধর্ম্মানুষ্ঠানে পৌরহিত্য করেন না। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাহারা অস্তিত্ব রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে বা এখনও তাহারা হিন্দুসমাজের মধ্যে আছে! তাহারা এতদূর দলিত যে, দলনকারীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিবার সামর্থ্য পর্য্যন্ত তাহাদের নাই। যারবেদা চুক্তির অর্থকামীরা যাহাতে স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে, সেই জন্যই আমি এই সকল শোচনীয় ও লজ্জাকর ঘটনার বর্ণনা করিলাম। শুধু অক্লান্ত পরিশ্রমের দ্বারা এই সকল নিপীড়িত ব্যক্তিগণকে উত্তোলিত করিতে পারা যায়। হিন্দুধর্ম্মকে নিষ্কলুষ করুন এবং সমগ্র হিন্দুসমাজ ও তৎসহ সমগ্র ভারতকে উন্নীত করুন। এই সকল অন্যায় ব্যবহারের বর্ণনায় আমরা যেন বিমূঢ় না হই। অনশন সপ্তাহে যে সাড়া পড়িয়াছিল, তাহা যদি উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুদের পক্ষে অনুশোচনাজ্ঞাপক হয়, তাহা হইলে সমস্তই মঙ্গল এবং সমস্ত "হরিজন" স্বাধীনতার আনন্দ অনুভব করিবে; কিন্তু এই ঈপ্সিত ফললাভের পূর্ব্বে স্বাধীনতার বাণী গ্রামে গ্রামে বহন করিয়া লইয়া যাইতে হইবে।

প্রকৃতপক্ষে বড় সহর অপেক্ষা গ্রামে কাজ করা অনেক কঠিন, কারণ সহরে অল্প সময়ের মধ্যেই জনমত গঠন করা সম্ভব। এক্ষণে নিখিলভারত অস্পৃশ্যতাবিরোধী সঙ্ঘ

গঠিত হইয়াছে ; উহার সহিত সহযোগিতায় কর্ম্মীগণের কাজ করা উচিত।

এস্থলে আমি, ডাক্তার আম্বেদকর আমাকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ করিতে চাই। তিনি বলিয়াছিলেন, "দলিতগণের যাহা আবশ্যক, তাহা তাহাদের নিজেদের অপেক্ষা তাহাদের সংস্কারকেরা বেশী জানেন বলিয়া পূর্ব্বে দাবী করিতেন ; সেই পুরাতন পদ্ধতির যেন আর পুনরাবৃত্তি না হয়।" সুতরাং তিনি বলেন, "হরিজনরা প্রথমে কি চাহে, তাহা তাহাদের প্রতিনিধিগণের নিকট হইতে আপনার কর্ম্মীগণকে নির্দ্ধারণ করিতে বলুন। আন্দোলনের দিক দিয়া একত্র ভোজন ভাল, কিন্তু উহাতে বাড়াবাড়ি হইতে পারে। উহার মধ্যে একটা মুরুব্বিয়ানার ভাব আছে। আমি ত নিজে উহাতে যোগদান করিব না। অধিকতর শোভন পদ্ধতি হইতেছে কোনরকম হৈ-চৈ না করিয়া সাধারণ সামাজিক অনুষ্ঠানে আমাদিগকে আমন্ত্রণ করা—এমন কি, মন্দির প্রবেশও অপেক্ষা করিয়া থাকিতে পারে। একান্ত প্রয়োজন হইতেছে আর্থিক অবস্থার উন্নতি করা এবং প্রাত্যহিক সংশ্রবে ভাল ব্যবহার করা।" তিনি তাঁহার তিক্ত অভিজ্ঞতা হইতে যে সকল মর্ম্মবিদারক বিবরণ দেন, আমি আর তাহার পুনরাবৃত্তি করিতে চাই না। আমি তাঁহার মন্তব্যের যৌক্তিকতা উপলব্ধি করিয়াছি। আমি আশাকরি, পাঠকগণের প্রত্যেকেই তাহা করিবেন।

সংস্কারকগণ কি কর্ম্মপন্থা অবলম্বন করিবেন, সে সম্বন্ধে অনেকে অনেক প্রস্তাব প্রেরণ করিয়াছেন। তাহার মধ্যে একটী স্বামী শ্রদ্ধানন্দজী প্রায়শঃই বলিতেন। তাহা এই —প্রত্যেক হিন্দুর বাড়ীতে একজন করিয়া "হরিজন" রাখা উচিত। সে প্রকৃত পক্ষে বাড়ীর লোকের মতনই থাকিবে। ভারতের কল্যাণকামী একজন অহিন্দু প্রস্তাব করিয়াছেন যে, প্রত্যেক সঙ্গতিপন্ন হিন্দুর উচিত একজন হরিজন যুবক বা যুবতীর (যদি সম্ভব হয়) নিজের তত্ত্বাবধানে উচ্চশিক্ষা দেওয়ার ব্যয়ভার বহন করা, যাহাতে সে শিক্ষা শেষ করিয়া তাহার সম্প্রদায়ের উন্নতির জন্য কাজ করিতে পারে। দুইটি প্রস্তাবই বিবেচনার এবং গ্রহণের যোগ্য। যাঁহারা কোন ফলপ্রদ প্রস্তাব করিতে চান, তাঁহাদিগকে আমি অনুরোধ করিতেছি যে, তাঁহারা ঐ সকল প্রস্তাব সঙ্ঘের নিকট পাঠাইয়া দিন, পত্র-লেখকগণ আমার উপর বিধি-নিষেধ যেন স্মরণ রাখেন। আমি এই সকল পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করার কোন অংশ গ্রহণ করিতে সক্ষম নহি। তাঁহারা এ কথাও যেন মনে রাখেন যে, আমার সমস্ত মতামত অ-পর্য্যাপ্ত তথ্য এবং অপ্রত্যক্ষভাবে প্রাপ্ত সংবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত, সুতরাং নূতন ঘটনাবলী অনুসারে তাহার সংশোধন হইতে পারে। অতএব এই মতামতকে সতর্কতার সহিত গ্রহণ করিতে হইবে।

একজন পত্র লেখক যে আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন এবং এমন কি সংবাদপত্রে চাপাভাবে যাহা লেখা হইয়াছে, এখন অতীত ইতিহাস হইলেও সে সম্বন্ধে আমি কিছু বলিব। যারবেদা চুক্তির রাজনৈতিক অংশের উল্লেখ করিয়া তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, "উহার দ্বারা আপনারা কি লাভ করিয়াছেন?" প্রধানমন্ত্রী যাহা দিয়াছিলেন, "হরিজনেরা" নিশ্চয়ই তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী পাইয়াছে। ঠিক উহাই লাভ। ঐ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আমার আপত্তি এই ছিল যে, উহাতে রুটির বদলে পাথর দেওয়া হইয়াছে। পুণাচুক্তিতে রুটির টুকরা কিছু দেওয়া হইয়াছে। হরিজনদিগকে যদি হিন্দুদের জন্য নির্দিষ্ট সমস্ত সদস্যপদগুলি দেওয়া হইত, তাহা হইলে ডাঃ মুঞ্জের সহিত আমি ব্যক্তিগতভাবে আনন্দিত হইতাম। হিন্দুদের পক্ষে ও হিন্দুধর্ম্মের পক্ষে ইহাই সর্ব্বাধিক লাভের বিষয় হইত। উচ্চশ্রেণীর হিন্দুগণ এবং হরিজনগণ পরস্পরের মধ্যে সম্পূর্ণ মিশিয়া যাক্—ইহাই আমি চাহিয়াছিলাম এবং এখনও চাহি। আমার সুচিন্তিত অভিমত—যাহা নূতন কোন ঘটনার দ্বারাই পরিবর্ত্তিত হইতে পারে না—এই যে, দলনকারীরা দলিতগণকে যত অধিক দিবে, ততই তাহাদের লাভ। তাহাদের যে ঋণ এতদিনে জমিয়া উঠিয়াছে, তাহা হইতে সেই পরিমাণ তাহারা মুক্ত হইবে। যতক্ষণ না উচ্চবর্ণের হিন্দুরা ঐরূপ বিনীত, অনুতপ্ত, ধর্ম্মনিষ্ঠ এবং ঠিকভাবে এই প্রশ্নের সমাধানে অগ্রসর হইবেন, ততদিন চুক্তির [illegible]

হিন্দুসমাজে যে মনোভাবের জাগরণ দেখা গিয়াছিল, সেই মনোভাবের সহিত প্রতিপালিত হইবে না।

যে সকল দেশীয় নৃপতি তাঁহাদের রাজ্যস্থিত মন্দির-সমূহ হরিজনদের জন্য উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন এবং তাঁহাদের রাজ্য হইতে অস্পৃশ্যতার নির্ব্বাসন ঘোষণা করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে আমি আমার অভিনন্দন জানাইতেছি। এই কাজ করিয়া তাঁহারা তাঁহাদের এবং তাঁহাদের প্রজাগণের পক্ষ হইতে কিছু প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন। আমি আশা করি যে, এই সব রাজ্যের অধিবাসী হিন্দুরা এই সকল ঘোষণার বিষয় বস্তুকে কার্য্যে পরিণত করিবেন এবং হরিজনদিগের সহিত ভাইয়ের মত এমন ব্যবহার করিবেন যে, হরিজনেরা অনুভব করিবে, তাহারা কোনদিনই যেন হিন্দু মনুষ্য-সংহতির মধ্যে ঘৃণিত সমাজ বহির্ভূত লোক ছিল না। আমরা দুঃখময় ঘটনাস্থলের এত নিকটে আসিয়া পড়িয়াছি যে, আমরা বুঝিতে পারি না, অস্পৃশ্যতার দুষ্টক্ষত সীমা ছাড়াইয়া বহুদূরে গিয়াছে এবং সমগ্র জাতির ভিত্তিকে অন্তঃসারশূন্য করিয়া ফেলিয়াছে! "আমাকে ছুঁইওনা"র মনোভাব সমস্ত আবহাওয়া পরিব্যাপ্ত করিয়াছে।

সুতরাং এই পাপের মূলে যদি আঘাত করা যায়, তাহা হইলে আমি এ বিষয়ে নিশ্চিত যে, আমরা শীঘ্রই জাতি ও ধর্ম্মসম্পর্কিত বিভেদ ভুলিয়া যাইব এবং একথা বিশ্বাস করিতে আরম্ভ করিব যে, সমস্ত হিন্দুরা যেমন এক ও অবিভাজ্য, তেমনই সমস্ত হিন্দু, মুসলমান, শিখ, পার্শী, ইহুদী এবং খৃষ্টান একই মহীরুহের শাখা মাত্র। যদিও ধর্ম্ম বহু, তথাপি ধর্ম্ম এক অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম হইতে আমরা যেন এই শিক্ষাই লাভ করিতে পারি এবং আমরা যদি অপ্রতিহত সঙ্কল্প লইয়া ধর্ম্মনিষ্ঠভাবে এই কার্য্য করি, তাহা হইলেই এই শিক্ষা লাভ করিব।"

"একজন পত্রপ্রেরক মনে করেন যে, তিনি সমস্ত কর্ম্মতালিকা গ্রহণ করিতে পারেন না।" তিনি হিন্দীতে একখানি দীর্ঘ পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। আমি এই পত্রপ্রেরককে ভালরূপ চিনি। তিনি অস্পৃশ্যতা আন্দোলনে সহানুভূতিসম্পন্ন। তিনি তাঁহার চিঠিতে যাহা লিখিয়াছেন, আমি তাহা হইতে নিম্নলিখিত চুম্বক প্রদান করিলাম।

তিনি লিখিয়াছেন:—"আমার এই আশঙ্কা হয় যে, দেশের সর্ব্বত্র আন্দোলন ঠিক গণ্ডীর ভিতরে থাকিয়া চলিতেছে না। আমি জানি, কোন কোন ক্ষেত্রে যাঁহারা নিজদিগকে এই আন্দোলনের কর্ম্মী বলিয়া দাবী করেন, তাঁহারা আপত্তিজনক উপায় সমূহ অবলম্বন করিতেছেন। তাঁহারা প্রাচীন পন্থীদিগকে গালাগালি করিতেছেন এবং শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিদিগের উপর বিদ্রূপবাণ বর্ষণ করিতেছেন। যে কেহ সাহস করিয়া আপনার উক্তি অথবা লেখার তীব্রভাবে সমালোচনা করেন, তাঁহারা বিদ্রূপভাজন হইতেছেন এবং তাঁহাদিগকে ধর্ম্মদ্রোহী বলিয়া অভিহিত করা হইতেছে, এমন কি তাঁহাদের কার্য্যের ফল ভাল হইবে না বলিয়া তাঁহাদিগকে ভীতি প্রদর্শন পর্য্যন্ত করা হইতেছে। মনে হয়, তাঁহারা অস্পৃশ্যদের আর্থিক উন্নতি, নৈতিক উন্নতির ধার ধারেন না। তাঁহারা মনে করেন যে, বিশৃঙ্খল ধরণের ভোজ এবং দেবমন্দিরগুলিতে হরিজনদের ভিড় লইয়া ঢুকাইতে পারিলেই তাঁহাদের কার্য্য সমাধা হইল। ঐ সব দেবমন্দিরের ট্রাষ্টিদের ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াও তাঁহারা উহা করিতে প্রস্তুত। হরিজনদের কিছুমাত্র সেবা না করিয়া গোঁড়াদের মনে আঘাত প্রদান করিয়া শুধু লোক দেখান আড়ম্বরে এই আন্দোলন পর্য্যবসিত হউক, আপনি ইহা নিশ্চয়ই চাহেন না।"

গত মাসে আমি অস্পৃশ্যতা সম্বন্ধে প্রায় ১শত পত্র পাইয়াছি, তন্মধ্যে এই চিঠিখানাতেই কর্ম্মীদের আচরণের বিরুদ্ধে প্রথম অভিযোগ করা হইয়াছে। আমার সংবাদ দাতা কর্ম্মীদের প্রতি যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করিতেছেন, তাহার মর্য্যাদা রক্ষার জন্য আমি উহা প্রচার করা আবশ্যক মনে করি। আমি জানি, তিনি স্বেচ্ছায় অতিরঞ্জন করিবেন না। ধর্ম্ম সম্বন্ধে কাহারও উপর কোন বাধ্যতা চাপান উচিত হইতে পারে না, শুধু ধর্ম্ম সম্পর্কেই কেন, কোন বিষয়েই নহে। জাতি, বর্ণ অথবা ধর্ম্ম যাহাই হউক না কেন কাহারও উপর কোনরূপ হিংসার আমি কিরূপ প্রবল বিরোধী, জনসাধারণ তাহা অবগত

আছেন। সুতরাং যাঁহাদের হাতে এই আন্দোলন পরিচালনার ভার আছে, তাঁহারা এ বিষয়ে সাবধান থাকিবেন যে ভাবী উপবাসব্রত অবলম্বন হইতে আমাকে রক্ষা করিবার ব্যগ্রতাবশতঃ তাঁহারা যেন নিন্দনীয় কোন উপায় অবলম্বন না করেন। যদি তাঁহারা উহা করেন, তদ্বারা আমার মৃত্যুই নিকটে টানিয়া আনা হইবে। এই আন্দোলনের পবিত্রতা নষ্ট হইতে দেখা আমার পক্ষে জীবন্মৃত্যুর সমান হইবে। গুণ্ডাদের নীতি অবলম্বন দ্বারা হরিজনদের অথবা হিন্দুধর্ম্মের কোন কল্যাণ সাধিত হইবে না। জগতের মধ্যে না হইলেও ভারতের মধ্যে সম্ভবতঃ ইহাই বৃহত্তম ধর্ম্ম সম্পর্কিত সংস্কারের আন্দোলন। ইহাতে প্রায় ৬ কোটি লোক স্বার্থসংশ্লিষ্ট রহিয়াছে। ইহারা ক্রীতদাসের জীবনযাপন করিতেছে। যে সব গোঁড়া সম্প্রদায় এই আন্দোলনকে অনুমোদন করেন না, তাঁহারাও সর্ব্বপ্রকার সৌজন্য এবং সুবিবেচনা পাইবার অধিকারী। প্রেমের দ্বারা, আত্মত্যাগের দ্বারা, সম্পূর্ণ সংযমের দ্বারা তাঁহাদের অন্তঃকরণে আমাদের জীবনের পবিত্রতার নীরব প্রভাবের দ্বারা তাঁহাদিগকে আমাদের জয় করিতে হইবে। সত্য এবং প্রেমের দ্বারা আমরা আমাদের বিরোধীদিগকে আমাদের পক্ষে আনিতে পারিব, এরূপ বিশ্বাস থাকা চাই। শুধু লোক দেখান আন্দোলনের যুগাগত নিষ্পেষণে নিষ্পেষিত ৬ কোটি লোকের মুক্তি যে সম্ভব হইবে না, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই আমাদের কার্য্যপদ্ধতি এরূপ শক্ত ও গঠনমূলক হওয়া চাই যে, আমরা সকল দিক হইতে আক্রমণ করিতে পারি। এই প্রচেষ্টায় সহস্র সহস্র পুরুষ, নারী, বালক এবং বালিকার কেন্দ্রীভূত কর্ম্মশক্তির প্রয়োজন। তাহাদিগকে সর্ব্বোচ্চ ধর্ম্ম প্রবৃত্তিতে অনুপ্রাণিত হইয়া কাজ করিতে হইবে। সেজন্য আমি বিনীতভাবে এই অনুরোধ করিতেছি যে, যাঁহারা এই আন্দোলনের ধর্ম্মের দিকটা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই তাঁহারা ইহতে দূরে সরিয়া যাইবেন। যাঁহাদের বিশ্বাস আছে, তাঁহাদের সংখ্যা বেশী না হউক, কিংবা কমই হউক, তাঁহারাই এদিকে কাজ করিতে থাকুন। অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের ফল রাজনীতি-ক্ষেত্রে অনেক প্রভাব বিস্তার করিতে পারে, বস্তুতঃ করিবেও। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহা রাজনৈতিক আন্দোলন নহে। ইহা হিন্দুধর্ম্মের সংস্কারের জন্য আন্দোলন মাত্র। হিন্দুধর্ম্মের কলুষ দূর করিতে হইলে পন্থাও নিষ্কলুষ হওয়া চাই। ভগবানকে ধন্যবাদ যে, ভারতের সকল অঞ্চলে সহস্র সহস্র না হইলেও শত শত ঐরূপ শুদ্ধচরিত্র ব্যক্তি আছেন। যাঁহারা অধীর এবং সংশয়াপন্ন, তাঁহারা প্রতীক্ষা করুন এবং দেখুন কিন্তু অসদুদ্দেশ্য দ্বারা প্রণোদিত হইলেও যেন অবিবেচিতভাবে হস্তক্ষেপ করিয়া এই আন্দোলনকে নষ্ট না করেন।"

গোবিন্দলালের কণ্টকীর্ত্তন

শ্রীসৌরেশচন্দ্র চৌধুরী

('কৃষ্ণকান্তের উইল' হইতে গৃহীত।)

রোহিণি! এই কি তুমি সেই রোহিণী সর্ব্বনাশী?
যার রূপের হাটে বিকাইয়ে হ'লাম আমি বনবাসী।
কৈ? কে তোর বাবু? কোথায় দেখি? হতভাগি!
কালামুখি!

তোর শয়তানিতে এত দুখেও পাচ্ছে হাসি;—
আবার বলা হ'চ্ছে ঢং ক'রে, "পায় য'দিন রাখ
ত'দিন দাসী।"

পায়ে ছেড়ে মাথায় তুলে রেখেছিলাম মনের ভুলে;
রাজৈশ্বর্য্য, নিষ্কলঙ্ক যশোরাশি,
বিমল স্বভাব, অটুট ধর্ম্ম, তোর লাগি সব গেছে ভাসি'।

(সুর—'যমুনে এই কি তুমি'—ইত্যাদি।)

তুমি কি রোহিণি! তোমার লাগি, হ'লাম তেমন
ভ্রমর ত্যাগী;

চিন্তায় সুখ, দুঃখে দিত কী আশ্বাসই!
তেমন সোনার ভ্রমরকে হায়! কে ভোলালে হা রাক্ষসি!
তোর ছিল নাত কোনই অভাব, বুঝেছি তোর এই
স্বভাব,

রাজরাণীও পায়না আদর ইহার বেশী।
কেন তবে করলি এমন ঘৃণিত কাজ অবিশ্বাসী!
রেখে দে কথার ধাঁচা, তোর কিছুতেই হবে না বাঁচা,
এনেছি পিস্তল দ্যাখ, গুলি ঠাসি',—
তুই থাকলে বেঁচে প্রতারণায় ম'রবে বেবাক [illegible]!

বিচিত্রা

"লালবাজার অঞ্চলের কোনও একখানি ইন্‌সিওরেন্স জর্ণালের" ও ইহার সম্পাদক সম্বন্ধে সহযোগী জন্মভূমি লিখিতেছেন "ইন্‌সিওরেন্স এসোসিয়েশন অফ ইণ্ডিয়ার অবৈতনিক সম্পাদকপদে ইনি অধিষ্ঠিত ছিলেন। হিসাব বুঝাইয়া দিতে অসমর্থ হওয়ায় উক্ত এসোসিয়েশনের সভাগণ তাঁহাকে suspend করেন। এই সম্পাদক পুঙ্গবই মুখার্জ্জি এণ্ড কোম্পানী নামে বহুবাজার ষ্ট্রীটস্থ কোন বীমা কোম্পানির চীফ্‌ এজেণ্ট নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কি অবস্থায় ঐ এজেন্সী terminated হয়—তাহা বীমা-সংশ্লিষ্ট সকলেই অবগত আছেন। এজেন্সী শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উক্ত সম্পাদক প্রবর নিজ কাগজে প্রোক্ত বীমা কোম্পানীর বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন ও অস্পষ্ট নিন্দাবাদ প্রচার আরম্ভ করেন। অজ্ঞাত নামা কোনও ব্যক্তির পলিসি সংক্রান্ত দাবী মিটাইয়া দেওয়া হয় নাই—এই এই মর্ম্মে উক্ত পত্রিকায় একখানি চিঠিও প্রকাশিত হইয়াছিল। সেইজন্য ও ব্যবসায়িক ভদ্রতা বিসর্জ্জন দিয়া সম্পাদক প্রবর উক্ত কোম্পানীর বিরুদ্ধে অযথা, অলীক ও অস্পষ্ট মিথ্যাবাদ প্রচার করিয়াছিলেন। কথিত কোম্পানী হইতে উকিলের চিঠি পাইলে সম্পাদক পুঙ্গব ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া নিষ্কৃতি লাভ করেন। কোনও কোম্পানী সম্পর্কে বিজ্ঞাপন কল্পে অনুরূপ মিথ্যাবাদ প্রচারের জন্য সম্পাদক পুঙ্গব একখানি ক্ষমাপ্রার্থনা পত্র দিয়াছিলেন। [illegible] মাসের পত্রিকায় ইহা প্রকাশ [illegible] করিবার প্রতিশ্রুতি ও তিনি দিয়াছিলেন—কিন্তু এই শ্রেণীর জীব যে প্রতিশ্রুতি পালন করিবে সে আশা করা অন্যায়! সম্পাদক প্রবর প্রতিশ্রুতি পালন করেন নাই—এই পত্রিকা এবং সম্পাদকের নাম উল্লেখ করিয়া ইহাদিগকে undue preferennce প্রদান করিতে চাই না"।

—টীকা নিষ্প্রয়োজন কিন্তু সাধু সাবধান।

• • • •

প্রবলা ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানী বাঙ্গালী শিক্ষিত ভদ্র-মহোদয়গণ কর্ত্তৃক পরিচালিত। ইহা অল্পদিনের প্রতিষ্ঠান হইলেও ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। এই প্রতিষ্ঠানে কতকগুলি চিত্তাকর্ষক বীমার ব্যবস্থা আছে। পুত্রকন্যার অভিভাবক তাঁহাদের পুত্র কিম্বা কন্যার নামে "বিবাহ-বীমা" করিলে তাঁহারা বিবাহ দেওয়ার সময় বহু অর্থ পাইবেন। পিতামাতার শ্রাদ্ধ বা বিদ্যাশিক্ষাকল্পের বীমারও বিশেষ বন্দোবস্ত আছে। কোম্পানীর এক বৎসর পূর্ণ না হইলেও ছয়টি বিবাহ দাবী দেওয়া হইয়াছে। আমরা প্রতিষ্ঠানটির সাফল্য কামনা করি।

• • • •

বীমা পত্রিকায় সাহিত্যিকের সমাবেশ বেশ উপভোগ্য বলিয়া অনুভূত হইতেছে এবং এ বিষয়ে Insurance worldএর প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। রবীন্দ্রনাথ উক্ত পত্রিকায় বীমার আশীর্ব্বচন করিয়াছিলেন এবং কবি প্রিয়ম্বদা গবেষণা সহকারে বীমার উপযোগিতার বর্ণনায় হাত দেখিয়া [illegible]

আমরা অনুযোগ করিয়াছিলাম "পত্রিকায় উৎসাহী সম্পাদক অভিমানী শরৎচন্দ্রকে বাদ দিলেন কেন" কিন্তু আমাদের এ আক্ষেপ বৃথায় যায় নাই দেখিয়া আমরা অতিশয় প্রীত। পূজা সংখ্যার কাগজে জয়ন্তীর মঙ্গল তিলক ললাটে অঙ্কিত করিয়া শরৎচন্দ্র বীমার বাণী বর্ষণ করিয়াছেন। শরৎচন্দ্র বাংলার দরদী কথা শিল্পী—দুঃখ-ক্লিষ্ট ব্যথিত মানবের জন্ম তিনি যে অশ্রুপাত করিয়াছেন তাহার এক কণাও হারাইয়া যায় নাই, সমবেদনায় ভাবপ্রবণ বাঙ্গালী হৃদয়কে সজল করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু জটিল অঙ্কশাস্ত্রের কসরৎ-প্রাঙ্গণে এই শিশুহৃদয় যশোলিপ্সা হীন ব্যক্তি যেন অধিক অগ্রসর না হন ইহাই আমাদের কামনা। এই প্রসঙ্গে সাহিত্যরাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত বীমার সম্পাদক মহাশয়কে আমরা একটি কথা বলিতে চাহিতেছি—কণ্টকাকীর্ণ বীমাক্ষেত্রে সাহিত্যলক্ষ্মীর প্রিয় দুলালদিগকে টানিয়া আনা ভাল নহে, যেমার রবীন্দ্র ইহার প্রকোপ সহ্য করিতে না পারিয়া নীলসিন্ধুর তীরে শান্ত স্নিগ্ধ জীবন অতিবাহিত করিতেছেন—সাহিত্যলক্ষ্মীর করুণাকাঙ্ক্ষী সম্পাদক মহাশয় আর এক ব্যবস্থা করিতে পারেন। তাঁহার বীমা-পত্রিকায় "সাহিত্য-প্রসঙ্গ" শীর্ষক একটি অধ্যায় খুলিয়া দিলে সাহিত্যিকগণের নিকট হইতে শুধু "message"টুকু নিয়াই তাঁহার আক্ষেপ করিবার কারণ থাকিবে না। "Insurance world"এর পরবর্ত্তী সংখ্যার জন্ম আমরা উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিলাম।

আগামী সংখ্যার পুষ্পপাত্রে বীমা সম্বন্ধে কয়েকটি উৎকৃষ্ট রচনা ও চিত্তাকর্ষক আলোচনা প্রকাশিত হইবে।

বাঙ্গালী ও The Englishman

শ্রীসুধাংশুকুমার মিত্র বি-এস-সি

কিছুদিন পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকুমার বসু মালব্যজীকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন যে পুণা সন্ধিতে যে রকম ভাবে বাংলাকে বাদ দিয়া কার্য্য করা হইয়াছে ভবিষ্যতে যেন বাংলার সমস্যা মীমাংসা সেরকম ভাবে না হয়। বাংলাকে যেন ডাকা হয় এবং এই উপলক্ষে তিনি আরও বলিয়াছিলেন যে অবাঙ্গালীরা যেন স্মরণ রাখেন যে বাঙ্গালীরা গত ১০০ বৎসরের শিক্ষা, সভ্যতা প্রভৃতির দিক দিয়া কি দান করিয়াছে। আজ অনেক অবাঙ্গালীর হয়ত স্মরণই নাই যে পরলোকগত মহামান্য গোখলে মহাশয় বাংলার সম্বন্ধে কি বলিয়া গিয়াছেন। "What Bengal thinks to-day India thinks to-morrow." একথা আজ হয়ত অনেক অবাঙ্গালীর কাছে শ্রুতিকটু ও বাড়ান মনে হইতে পারে কারণ তাহারা আজ অনেক বিষয়ে অগ্রসর হইতে সক্ষম হইয়াছে কিন্তু এমন কালও ছিল যখন এই উক্তিটি বিন্দুমাত্র অত্যুক্তি বলা যাইতে পারা যাইত না। কিন্তু আজকাল বাংলায় দুর্ভাগ্য, তাই আজ সুরেন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র, দেশবন্ধুর মত বাঙ্গালী পরলোকগত, অরবিন্দ ধর্ম্ম কারারুদ্ধ, সুভাষ ও যতীন্দ্রমোহন কারারুদ্ধ সেইজন্যই বাংলাকে কোন গুরুতর সমস্যা মীমাংসা বৈঠকে আহ্বান করা অবাঙ্গালীরা একটু বাহুল্য মনে করেন; এই রীতি যে যথার্থই ন্যায়শাস্ত্র বিরুদ্ধ কেবলমাত্র এইকথা স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য যখন শ্রীযুত বসু মালব্যজীকে এই কথা বলিয়াছিলেন উহা 'The Englishman'এর সহ্য হয় নাই। মানুষকে যখন ভূতে পায় মানুষই হয় তখন তাহার পরম শত্রু। আমাদের সহযোগীর অবস্থাও হইয়াছে তাই। 'বেঙ্গলিটেররিষ্টফোবিয়ায়' The Englishman আজ বাংলার ও বাঙ্গালীর সকলদানই ঘৃণার চক্ষে দেখিতেছেন। কিন্তু বাঙ্গালি টেররিষ্ট ও বাংলা কি এক? The Englishman লিখিয়াছেন—বাংলার [illegible] বটেই গত ২৫ বৎসরে ৩৪২টি টেররিষ্টদের [illegible] অনাচার হইয়াছে, ১০১টী খুন হইয়াছে। [illegible] হইতে ১৯৩১ সালেই ১০৩টী অনাচার [illegible] হইয়াছে। ১৯৩২ সালের তালিকা [illegible]

আজ ১০০ বৎসরের বাংলার ইতিহাস ঘাঁটিয়া কেবল মাত্র বাংলার টেররিষ্ট ইতিহাসই গবেষণা করিয়া বাহির করিলেন! বাংলা কি টেররিষ্ট অনাচার ভিন্ন আর কিছু উল্লেখযোগ্য কার্য্য এই একশো বৎসরের মধ্যে করে নাই? বাংলা ও বাঙ্গালীই আজ ভারতকে ভাবিতে শিখাইয়াছে স্বদেশ কি। ভারতে জাতীয়তার অনুভূতি বাংলা ও বাঙ্গালীর দান এ কথা কে অস্বীকার করিবে? কেবল মাত্র এই কথাই আমরা সহযোগীকে স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে প্রোপাগাণ্ডার ভিতরও কিছু সত্য রাখা প্রয়োজন কারণ আগাগোড়া মিথ্যাকথার প্রোপাগাণ্ডা বড় সহজেই ধরা পড়িয়া যায়। ১০০ বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালীর দান ভারতে কি এর মাপ আমাদের সহযোগীকে করিতে কেহ বলে নাই; বোধ করি এ মাপ করিবার ক্ষমতাও বর্ত্তমানে তাঁহাদের নাই! বাংলা ও বাঙ্গালীর দান কেবলমাত্র ভারতব্যাপী নহে উহা বিশ্বব্যাপী এবং এই কথা The Englishman স্বীকার না করিলেও পৃথিবীর পণ্ডিত-মণ্ডলী স্বীকার করিয়াছেন। কি রাজনৈতিক কি সামাজিক ও কি অর্থনৈতিক সর্ব্ব বিষয়ে বাঙ্গালীর দান অগ্রাহ্য করিবার নহে। কিছুদিন পূর্ব্বে টোকিওর ইয়ং ইষ্ট (Young East) পত্রিকায় জনৈক পাশ্চাত্য পণ্ডিত লিখিয়াছেন—"In future they will speak of Tagore as of Homer and study Bengali as we study Greek to read him in the original."

বিশ্বসাহিত্যে বাংলা ও বাঙ্গালীর দান কি ১০০ বৎসরের মধ্যেও কিছু নাই? The Englishman কি নোবেল প্রাইজকে—পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ উপহার বলিতে নারাজ? ২৫ বৎসরের মধ্যেইত রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজ লাভ করিয়াছেন। স্বামী বিবেকানন্দের মত ব্যক্তি সারা ভারতে কেন পৃথিবীর মধ্যেই কটা জন্মাইয়াছে?

মনিষী পণ্ডিত জে, টি, সাণ্ডারল্যাণ্ড লিখিয়াছেন—

"Bengalis, intellectually and especially in linguistic attainments and ability, are not second to any Indian people, if to any people in the world."

মহামান্য গোখলে বলিয়াছেন—

The Bengalis are in many respects a most remarkable people. It is easy to speak of their faults; they lie on the surface. But they have great qualities which are sometimes lost sight of. In almost all the walks of life open to Indians the Bengalees are the most distinguished. Some of the greatest social and religious reformers of recent times have come from their ranks. Of orators, journalists, politicians, Bengal possesses some of the most brilliant...Take, science and literature where you will find another scientist in all India to place beside Dr. (not sir) J. C. Bose, or Dr. (now sir) P. C. Roy, or a jurist like Dr. Ghose (late) or a poet like Rabindranath Togore? These men are not the freaks of nature. They are the highest products of which the race is regularly capable."

এর উত্তরে The Englishman এর বলিবার কি আছে? যে জাতি এতগুলি রত্ন প্রসব করিয়াছে উহার ১০০ বৎসরের দান কি কেবলমাত্র টেররিষ্ট অত্যাচার ও অনাচারেই পর্য্যবসিত হইল? বাংলাতেও বাঙ্গালীর দানকে অগ্রাহ্য করিবার কারণ কি? স্যার হেনরি কটনের কথায়—"The more intelligent, cultured or intellectual the Indians are the more they are disliked. • • They are pleased with backward Hindu than with his advanced compatriot because the former has made no attempt to attain equality with themselves."

ইংলিসম্যানের গবেষণার পাঠক অবশ্য অতি অল্প—তবু বাংলায় বসিয়া বাংলারই তাহাদের এরূপ অপব্যাখ্যা অতি বড় লজ্জাহীনতারই পরিচায়ক।

১৩৩৯ সনের কার্ত্তিক সংখ্যায় প্রবাসী—প্রথমেই শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটী রচনা ছাপিয়া রচনা-সম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছেন। "সাধারণ মেয়ে" হইলেও ইহা অনন্যসাধারণ। কাব্যামোদী পাঠক-পাঠিকাগণ এটি পাঠ করিয়া নিশ্চয় পরম আমোদ উপভোগ করিয়াছেন। ক্রম-বিকাশের মত প্রতিভার ক্রম-নিকাশও হইয়া থাকে এবং কেমন করিয়া তাহা ঘটে কবির ইদানীন্তনকার কবিতা-গল্প পাঠ করিলেই দেখা যাইবে।

শ্রীসরলা দেবী "সত্যের পরীক্ষা" নামে যাত্রার একটী পালা রচনা করিয়া আনন্দদানের ব্যর্থ প্রয়াস পাইয়াছেন। ইহাকে কোথাও গাওয়াইলেও পালা চাপা পড়িবার সম্ভাবনাই অধিক।

যাহারা বাঙ্গালীর পূর্ব্বেতিহাস জানিতে উৎসুক, শ্রীসুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের "শতবর্ষ পূর্ব্বেকার বাঙ্গালীর জীবনের ছবি" পাঠ করিয়া কিছু জানিতে পারিবেন। এখনকার এই বিংশ শতাব্দীর সভ্যতালোক-প্রাপ্ত বাঙ্গালী সেই কুসংস্কারাচ্ছন্ন বাঙ্গালী হইতে উন্নত ছিল, মিলাইয়া দেখায় লাভ আছে।

মিস্ ভায়ারিথ ম্যাক্কাই "মোহেন-জো-দাড়োর" এক পরিচয় দিয়াছেন, অবশ্য বাংলা ভাষাতেই সম্ভবতঃ অনেকেই পাঠ করিয়া থাকিবেন। ভাষার কথা না বলাই ভাল। লেখিকার বাংলা ইহার চেয়ে উৎকৃষ্ট না হওয়াই সম্ভব। তবে একটা বিষয় বিশেষ করিয়া চোখে পড়ে, তাহা প্রবন্ধগত নর্দ্দমা। মোহেন-জো-দাড়োতে নর্দ্দমার বাহুল্য যেমন ছিল, তেমনি ছিল তাহার খননের বাহাদুরী। আর, এই অদ্ভুৎ বিষয়টিকে পাঠকের চোখের সম্মুখে এত অধিকবার উপস্থাপিত করা হইয়াছে যে বিরক্তি আসে।

তিনটি ছোট গল্প এ সংখ্যায় পাঠ করা গেল।

প্রথমটি শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়ের "বেমানান।" লেখকের রচনা ভঙ্গীতে একটী পরিবর্ত্তন দেখা যাইতেছে। বলিবার ধরণ, ভাষা, ঘটনাসৃষ্টি, প্রকাশ ভঙ্গী ইত্যাদি পূর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর। আর একটী জিনিষ দেখা যায়, যাহা রচনায় একটী শ্রেষ্ঠ সম্পদ—সংযম।

গল্পটিতে দুটি চিত্র প্রধান। সকলগুলি মিলিয়া সুন্দর হইয়াছে।

দ্বিতীয়টি শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যালের "অচল।" তথাপি প্রবাসীতে চলিয়াছে।

তৃতীয়টি শ্রীমনোজ বসুর "শাস্তি।" মনোজবাবু কিছুকাল গল্প লেখা বন্ধ রাখিলে লাভ আছে নতুবা রচনা দিন দিন ইহা অপেক্ষাও নিকৃষ্ট হইয়া পড়িবে।

এ সংখ্যায় চারখানি রঙিন ছবি দেখিলাম,—মন্দ লাগে নাই।

* * * *

১৩৩৯ সনের আশ্বিন সংখ্যার বসুমতী—পূজার বাজারে এক বোঝা ছোট গল্প লইয়া বাহির হইয়াছে। ধৈর্য্যপরীক্ষার ইহা এক পরম উপায়। বাঙ্গালী পাঠকের কি উপকার যে বসুমতী করিলেন, তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না। স্তবোক্তি গল্প [illegible] ইহাদের ফাঁকে ফাঁকে, কোণে-ঘোঁচে [illegible] কবিতা—চলতি উপন্যাসগুলি ত আছেই।

কিন্তু সব গল্পের উপর "টেক্কা" [illegible]

ঢেঁকা নয়—একেবারে রঙের ঢেঁকা সব্যসাচীর "পালিক-পোষার" গল্প "বাল্য-প্রণয়।" বৃদ্ধ বয়সে কি দুর্ভোগ! এহেন বীর থাকিতে "সৎ-সাহিত্যের মোগল সম্রাটে"র কি ভয়, আর বাঙালী পাঠকেরই বা কি ভাবনা? Ever-ready dry cell battery! বিদ্যুৎ মজুৎ আছে। একটু ঠেকিলেই আলো।

যাহা হউক, গোটা কয়েকটা গল্পের কথা বলি।

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায় গঞ্জিকার গল্প ছাড়িয়া অধুনা জুয়াচোরের গল্প ধরিয়া একটা দিকে specialise করিতেছেন। তবে তাঁহার "একবৎসর" গল্পটি দরদ দিয়া লেখা। এই গল্পটি সত্যই পাঠোপযোগী—পাঠকের মনকে কারুণ্যে অভিসিঞ্চিত করে।

শ্রীরামেন্দু দত্তের "লেডীজ-রীষ্ট-ওয়াচ" কৌতুকাবহ ঘটনায় পরিপূর্ণ। ছোট কিন্তু বেশ।

কুমার শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের "স্পর্শের প্রভাব" প্রবলবেগে চলিতেছে। কিন্তু কয়টিকে স্বর্ণ ও রৌপ্য প্রযুক্ত করিল, বোঝা গেল না। তবে আশা করা যায়, ডুমুরপুষ্পের ন্যায় চক্ষুর অন্তরালে থাকিলেও প্রভাবের ফল ডুমুরের মতই কোথাও পরম সত্য হইয়া ফলিতেছে!

এ সংখ্যায় রঙিন্ ছবি দেখা গেল অনেকগুলি। তন্মধ্যে শ্রীচারুচন্দ্র সেনগুপ্তের "মিলন পূর্ণিমা" বেশ লাগিয়াছে। দরদ দিয়া অঙ্কিত।

* * *

১৩৩৯ সালের কার্ত্তিক সংখ্যায় ভারতবর্ষে—

ছোট গল্প পাঠ করা গেল চারটি।

প্রথমেই শ্রীসৌরেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের "সংসার কঠিন বড়।" "দুর্গভীর সমস্যা।"—ইহাতে সকলেই ঠেকে, অথচ পূরণ করিতে পারে না।

ব্যাপারটা এই—যৌবনে সংসারপাকের বহিঃসীমানায় নায়ক বিহারী যখন পরম আরামে (?) পরিভ্রমণ করিত তখন সে ছিল কবি। কলেজে পাঠকালেই মালতীমালার সহিত তাহার উদ্বাহ-ক্রিয়া সুসম্পন্ন হয়। একে কবি, তাহার উপর কলেজের ছেলে, কাজকর্ম করে প্রিয়া মালতী। কাজেই সে বিদ্যা বাদ দিয়া প্রেম-চর্চ্চা করিল। ফলে হইল পরীক্ষায় ফেল। ইহার মধ্যেও সান্ত্বনা ছিল, প্রিয়ার প্রেমও শুকায় নাই। কিন্তু ক্রমে পুত্র-কন্যা ও সংসারের ভারে তাহার যে অবস্থা হইল,—প্রিয়া তাহার প্রতি কিরূপ ব্যবহার সুরু করিল তাহা বিহারী স্ত্রীর নিকট একখানি পোষ্ট কার্ড চাওয়ায় অনুমিত হইবে।

"মালতীর পানে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাহিয়া বিহারী কহিল—একটা পোষ্ট কার্ড…

কঠিন দৃষ্টি স্বামীর মুখে নিবদ্ধ করিয়া মালতী কহিল—কোথায় রেখেচো?

—রাখিনি!

—তবে?

—খুঁজচি। ঘর-সংসারে মানুষ দু' একখানা খাম পোষ্টকার্ড রাখে তো! ইত্যাদি।

—বটে! পোষ্টকার্ডে আমার কি দরকার? কাকে চিঠি লিখচি ইত্যাদি।

—বাপের বাড়ীতেও চিঠি পত্র লেখ না?

—লিখি বই কি! শুধু চিঠি লেখা কি! পয়সা-কড়িও পাঠাই!"

এমন সব নিদারুণ বাক্য সত্ত্বেও মনে গল্পটির কোন ছাপ পড়ে না—শেষের ছত্রটি তো নিতান্ত অনাবশ্যক। কেবল অনাবশ্যক নয় art ও ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। তবে অধিক লোক গাঁতেও কলম বেচে লে চলে।

ইহার পরই শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যালের "অবৈধ।" গল্পে বর্ণিত ঘটনাটি এমন নূতন যে নিতান্ত অদ্ভুৎ ও অস্বাভাবিক ঠেকে।

ঐ ভারতবর্ষেই বারীনবাবুর এমনি ধরণের একটা গল্প কিছুকাল পূর্ব্বে পাঠ করা গিয়াছিল। তাহাতেও ছিল অবৈধ প্রণয় ও থিয়েটারে একটি শিশুকে ফেলিয়া মাতার পলায়ন! মাতাটি ছিল অপরূপ সুন্দরী ও তরুণী—যেন ছবি। আমরা বলিতেছি না যে "অবৈধ" তাহারই ছাপ লইয়া রচিত—Great minds think alike. বঙ্গ সাহিত্যের পরম ভাগ্য যে একদকে এতগুলি Great minds think করিয়া বৈধাবৈধে লিখে। গল্পটিতে মাতৃস্নেহ ধারা বহাইবার প্রয়াস আছে যথেষ্ট। ধারাও বহিয়াছে কিন্তু নির্ম্মল আনন্দ পাওয়া গেল না।

একটি কথা—"মুখের কাটুনি" কখনও শোনা যায় নাই, পড়িও নাই। বরং শুনিয়া আসিতেছি "সূতা কাটুনি", "পাট কাটুনি", "খড় কাটুনি"! ইহার পর শোনা যাইবে "পায়ের গড়ন" এক কথায় "পাটুনি" হইয়া দেখা দিয়াছে।

শ্রীপ্রভাত কিরণ বসু বি-এ "কবি প্রিয়ার" দ্বারা গ্রাম্য-জীবন অঙ্কিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, গ্রাম্য-জীবন যে সত্যই এমন ভয়াবহ নয়, ইহা গ্রামবাসী মাত্রেই জানে। তবুও লেখক গল্পে নানা অসুখকর ঘটনার সমাবেশ করিয়া একটা মূল্যবান রচনার পরিবেশে যে আনন্দলাভ হয়, তাহা কল্পনায় উপভোগ করিয়াছেন। অভিজ্ঞতা হইতে ইহা রচিত নয়। অবশ্য গল্পটির মধ্যে একটু যে নূতনত্বও নেই, তাহাও নয়। ইহার তলে কামাখ্যা ভ্রমণ ব্যাপারটাও লিখিত হইয়াছে—কিন্তু সবটাই আড়ষ্ট।

চতুর্থ গল্পের রচয়িতা শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার, নাম "দুর্জ্জয়" সত্যই দুর্জ্জয়। প্রথমে মনে করিয়াছিলাম বুঝি শরৎচন্দ্রও বুঝি এবার ঢাকাবীতে হারিয়া গেলেন। কিন্তু মাঝ বরাবর আসিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া হাল্কা হওয়া গেল। নাঃ! "দুর্জ্জয়" গঞ্জিকা-ধূম-যানে বহির্গত হইলেও চলিতে চলিতে একখানি পা তাহার মাটিতে ঠেকিয়া আছে।

পঞ্চম গল্প শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেন গুপ্তের "যেনাহং প্রভৃতি—" কয়েক ছত্রের পরই ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটায় অপঠিত রহিয়া গেল।

এ সংখ্যায় রঙিন ছবি আছে চারখানি।

গ্রন্থ-পরিচয়

হোমিওপ্যাথি মতে কিরূপে ঔষধ বাছিতে হয়——ডাক্তার ন্যাশের 'Regional Leaders' নামক বিখ্যাত হোমিওপ্যাথি গ্রন্থের ডাঃ জি, রায় প্রণীত বঙ্গানুবাদ। প্রকাশক ভারত পাবলিশিং হাউস, ২৭ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা। হোমিওপ্যাথিতে কিছুমাত্র দক্ষতা লাভ করিতে গেলেই যে সবপুস্তক পড়িতে হয় ডাঃ ন্যাশের অমূল্য গ্রন্থ গুলি তাহার অন্যতম। এই বইখানি লিখিতে ডাঃ ন্যাশের ত্রিশ বৎসর লাগিয়াছিল—ইহা ২৩টি বিষয় বিভাগে বিভক্ত—যথা মন, মস্তক, মুখ, চক্ষু, কর্ণ, নাসা, গলনালী, পাকস্থলী, উদর, মলদ্বার, মূত্রযন্ত্র, পুং জননেন্দ্রিয়, স্ত্রী জননেন্দ্রিয়, শ্বাসযন্ত্র, হৃৎপিণ্ড, পৃষ্ঠ হস্তপদ, নিদ্রা, ঘর্ম, শীত, জ্বর, ত্বক, অস্থি, ধাতুপ্রকৃতি। এই সব বিভাগে যতকিছু রোগ ও অশান্তি লক্ষণ আসিতে পারে তৎসম্বন্ধে যথাসম্ভব সিদ্ধ ফলপ্রদ ঔষধ দেওয়া হইয়াছে। এই গ্রন্থে শরীরের বিভিন্ন অংশের লক্ষণ থাকায় ঔষধ নির্ব্বাচনের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। রোগীর যে অঙ্গে পীড়া তাহার সমস্ত কথাই এক একটি বিশেষ অধ্যায় হইতে জানা যাইবে। এমন একখানি মূল্যবান হোমিওপ্যাথি পুস্তক বাংলায় প্রকাশ করিয়া অনুবাদক ও প্রকাশক ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। এই গ্রন্থ হোমিওপ্যাথি শিক্ষার্থী ও যে সব গৃহস্থ ঘরে হোমিওপ্যাথি বাক্স রাখেন তাঁহাদের পক্ষে বিশেষ কাজে লাগিবে। বইয়ের ছাপা, কাগজ, বাঁধা উত্তম।

'ফুলকলি'——ছোটদের কবিতার বই। শ্রীনিবারণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত। প্রকাশক ডাঃ শ্রীহেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। কামাল কাচনা, নবাবগঞ্জ, রংপুর। মূল্য চারি আনা। এই ছোট বইখানিতে ২৩টি কবিতা এবং সবগুলি কবিতাতেই শিশুচিত্তে সুন্দর কল্পনা প্রসার করিবার প্রয়াস লক্ষিত হয়। ভাষা সহজ, ভাবও কষ্টসাধ্য নহে। কবিতা গুলি শিশুরা উপভোগ করিতে পারিবে বলিয়াই মনে হয়।

'আনন্দ নাড়ু'——গানের বই। শ্রীচারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য তিন আনা। এই পত্রাঙ্ক শূন্য ক্ষুদ্র পুস্তিকার মধ্যে বহু রকম, বহু সুরের, বহু ভাবের গান আছে। কোনটার অর্থ এক আধটু বোঝা যায়—কোনটা অবোধ্য। লেখক নিজ খেয়ালে ইহা রচিয়াছেন ও সুর সংযোগ করিয়াছেন—সমালোচনার অতীত। গ্রন্থকারের একখানি চিত্রও আছে।

গবর্ণমেণ্ট নিজের মর্য্যাদাকে লোকচক্ষে মসীলিপ্ত করিতেছেন

ভারতবন্ধু সমিতির সভাপতির অনুরোধে রবীন্দ্রনাথের বিবৃতি

শান্তিনিকেতন, ১৫ই অক্টোবর

ভারতের বর্ত্তমান অবস্থার বিবরণ চাহিয়া এবং শান্তি ও আপোষের জন্য কবি রবীন্দ্রনাথের মতামত কি তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া লণ্ডনের ভারতবন্ধু সমিতির সভাপতি মিঃ কার্ল হিথ কবির নিকট যে তার করিয়াছিলেন তাহার উত্তরে রবীন্দ্রনাথ মিঃ হিথের নিকট নিম্নলিখিত বিবৃতি প্রেরণ করিয়াছেন :—

"প্রিয় বন্ধু,

আপনার তার হইতে একথা জানিয়া আনন্দিত হইলাম যে ইংলণ্ড এবং আমাদের মধ্যে যে সম্পর্ক আছে তাহার পরিবর্ত্তনকামী এক মনোভাব ইংলণ্ডের জন-সাধারণের মধ্যে জাগিয়াছে। আমার মনে হয় যে, ঠিক এই সময়ে ভারত গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে আমাদের দেশবাসীর সহিত সদিচ্ছা প্রণোদিত সহযোগিতা স্থাপনের চেষ্টা আরম্ভ করা উচিত। মহাত্মাজীর ব্রতে চারিদিকের আবহাওয়া নিষ্কলুষ হইয়াছে। কেবল বিশেষ সম্প্রদায়ের জন্য মহাত্মাজী এই ব্রত গ্রহণ করেন নাই; মানবের দুঃখকষ্টের জন্যই তাঁহার এই তপশ্চর্য্যা।

"মনুষ্যত্বের আহ্বানে সাড়া দিবার সুযোগ ভারতবর্ষে গত কয়েক বৎসরের মধ্যে অগণিত বার গবর্ণমেণ্টের নিকট আসিয়াছে। এইরূপ এক আহ্বান আসিয়াছিল যখন গোল টেবিল বৈঠক হইতে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া মহাত্মাজী বড়লাটের সহিত পরামর্শ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন কিন্তু মহাত্মাজীর ইঙ্গিত উপেক্ষিত হইল তাঁহাকে সরাসরি কারাগারে আবদ্ধ করা হইল। সেই সময় হইতেই গবর্ণমেণ্ট খোলাখুলিভাবে দমননীতি অবলম্বন করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট তাহার যুক্তিহীনতার উগ্রতায় কোটি কোটি নরনারীর চক্ষে নিজের মর্য্যাদাকে মসীলিপ্ত করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট এক ভুল হইতে অন্য ভুলে গিয়াছেন এবং অবশেষে ভারতবর্ষকে এমন পরিমাণে এক আসন্ন যুদ্ধ বিগ্রহের অবস্থায় টানিয়া আনিতে সফলকাম হইয়াছেন যে, বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক সমরনীতি ইহার মর্ম্মগ্রহণ করিতে সমর্থ।

স্বতন্ত্র ব্যক্তি বিশেষ কর্ত্তৃক বিপ্লব প্রচেষ্টা কেহই সমর্থন করেন না, তথাপি ইহাকে গবর্ণমেণ্টের কার্য্যের প্রত্যক্ষ ফল বলিয়াই স্পষ্ট বুঝিতে হইবে। একণে বাঙ্গলার বিভিন্ন গ্রামে বৃটিশ সৈন্য মজুত করা হইতেছে, উদ্দেশ্য বিপ্লবীগণকে উচ্ছেদ করা এবং আমাদের জনসাধারণকে পশুবলের সাহায্যে "একটী নৈতিক শিক্ষা" (এইরূপ বলা হয়) দেওয়া। ঢাকা, মেদিনীপুর, হিজলী এবং চট্টগ্রামে গবর্ণমেণ্ট যাহা করিয়াছেন, সে সকলের সেরা এই নূতন ব্যবস্থা ব্যাপক "বিপ্লব প্রচেষ্টার অনুকূলে এক আতঙ্কের আবহাওয়া সৃষ্টি করিবে।

সময় থাকিতে যদি বৃটিশ মন্ত্রিসভা এবং ভারত গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের ভারতীয় নীতি পরিবর্ত্তন করিতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে তাঁহাদিগকে নিম্নলিখিতরূপ দুইটি জিনিষের সম্মুখীন হইতে হইবে।

"(১) কোন দেশ তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে অন্য দেশ কর্ত্তৃক শাসিত হইতে পারে না। ভারতবর্ষকে আর জোর করিয়া শাসন করা চলিবে না, সে জোর যতই মমতাহীন এবং বৈজ্ঞানিকভাবে দক্ষতাপূর্ণ হউক না কেন। ইংলণ্ডের সহিত ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক এবং কৃষ্টিমূলক যোগাযোগ বজায় রাখিতেই হইবে, কিন্তু শুধু বন্ধুত্ব এবং বিশ্বাসের দ্বারাই উহা সম্ভব। এরূপ সহযোগিতার জন্য আমাদের দেশের লোক প্রস্তুত, কিন্তু গবর্ণমেণ্টের নির্দ্দিষ্ট কার্য্যাবলী দ্বারা তাহাদের বিশ্বাস পুনরুদ্ধার করিতে হইবে, গবর্ণমেণ্টকে স্পষ্টভাবে ন্যায়বিচার এবং আত্ম-নিয়ন্ত্রণে আমাদের দেশবাসীর অধিকার স্বীকার করিতে হইবে।

"(২) আমাদের এবং ইংরাজদের মধ্যে অবিশ্বাস এবং বিতৃষ্ণাকে

মহাত্মাজীর নেতৃত্বে পরিচালিত কংগ্রেসের প্রভাবই একমাত্র সন্ত্রাসত্য প্রতিরোধ করিতে পারে। অথচ. কংগ্রেসের সহস্র সহস্র শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে সধোয়ণ অপরাধীর ন্যায় কারাগারে আবদ্ধ করা হইয়াছে। তাঁহাদের একমাত্র অপরাধ মহাত্মাজীর প্রতি তাঁহাদের অনুরক্তি এবং যাহাদের স্বার্থ তাঁহারা একাগ্রভাবে সমর্থন করিয়াছেন সেই জনসাধারণের প্রতি তাঁহাদের একনিষ্ঠতা প্রতিষ্ঠান হিসাবে কংগ্রেসকে বে আইনী ঘোষণা করা হইয়াছে, তাহার টাকাকড়ি বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছে, তাহার প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন সকলকে গুপ্তভাবে এবং নির্মমভাবে দমন করা হইয়াছে। অবশ্য লোকের মনের উপর কংগ্রেসের যে নৈতিক প্রভাব আছে তাহা বিন্দুমাত্রও ক্ষুণ্ণ হয় নাই, এবং উহার প্রতিষ্ঠান ক্ষীণবল হয় নাই কিন্তু গবর্ণমেন্ট ইচ্ছাপূর্ব্বক নিজেকে এবং আমাদিগকে এই কল্যাণকর প্রতিষ্ঠানের সেবা হইতে বঞ্চিত করিয়া আমাদের শ্রেষ্ঠ নরনারীগণের কর্ম্ম-প্রচেষ্টাকে অন্তরাল পথ আশ্রয় করিতে বাধ্য করিয়াছেন। জনসাধারণের উপর গবর্ণমেন্টের এখনও যদি কোন ন্যায়সঙ্গত প্রভাব থাকে তাহা হইলে এইরূপে গবর্ণমেন্ট তাহা হারাইতে বসিবার গুরুতর দায়িত্ব লইয়াছেন শুধু তাহাই নহে, নিরপরাধ মনুষ্যের পক্ষে যে সকল প্রতিক্রিয়া মূলক কর্ম্মপ্রচেষ্টার ফল সর্ব্বনাশকর সেই সকল কর্ম্মপ্রচেষ্টাকে এইরূপে উৎসাহিত করিবার গুরুতর দায়িত্বও গবর্ণমেন্ট স্কন্ধে লইয়াছেন।

"গবর্ণমেন্টের পক্ষে সদিচ্ছাব্যঞ্জক ইঙ্গিত. শান্তিপ্রদ ব্যবস্থা এবং রাজনৈতিক চাতুর্য্য দ্বারা সংরক্ষিত কৌশলপূর্ণ প্রতিশ্রুতি নিক্ষেপ করার সময় আর নাই, অনেক বিলম্ব হইয়া গিয়াছে। গবর্ণমেন্টকে তাঁহার দমন এবং ভয় প্রদর্শনের দুর্ব্বল নীতি উল্টাইয়া দিয়া নির্দ্দিষ্ট প্রস্তাবসহ সম্মুখে দাড়াইতে হইবে; ভারতবর্ষকে স্বাধীনতার সাবস্ত দিয়া ঐ প্রস্তাব অবিলম্বে কার্য্যকরী করা যায়। প্রকৃত শাসন-সংস্কার দ্বারা এক বিবেচনাহীন গবর্ণমেণ্টের পঞ্জীভূত নির্ব্বুদ্ধিতা অপসারিত করিবার পূর্ব্বে মহাত্মা গান্ধী এবং কংগ্রেসের সভ্যগণকে নিশ্চয়ই মুক্তি দিতে হইবে এবং বিনাসর্ত্তে সমস্ত অডিন্যান্স প্রত্যাহার করিতে হইবে। এই সকল অর্ডিনান্স দ্বারাই স্পষ্টাস্পষ্টি স্বীকৃত হইতেছে যে, গবর্ণমেণ্ট শাসন করিতে অপারগ।

"আমি আন্তরিক ভাবে আশা করি যে ভারতের বর্ত্তমানের সঙ্কটাকার ব্যাপার যাহা তাহার সহিত বৃটিশ জনসাধারণকে পরিচিত করাইবার জন্য ভারতবন্ধু সমিতি তাঁহাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন এবং স্বাধীনতার আমাদের জন্মগত অধিকার এবং আমাদের ইচ্ছামত অন্যান্য দেশের সহিত সংযোগ রাখিবার ব্যবস্থা বাছিয়া লইবার জন্মগত অধিকারকে স্বীকার করিয়া লইবে এমন নির্দ্দিষ্ট কার্য্যক্রম এবং নীতি এই সমিতি অবলম্বন করিবেন। আমি জানি আপনাদের দেশবাসীর নিকট হইতে এরূপ আত্মার বীর্য্যের উপর আমি নির্ভর করিতে পারি।

"আমাদের মনুষ্যত্বের মূল দাবীকে যদি গবর্ণমেন্ট নির্ভীকভাবে স্বীকার করেন তবেই শুধু ভারতে প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে। মহাত্মাজী বিশ্বের নিকট তাঁহার উদ্দেশ্যের সততা প্রমাণিত করিয়াছেন; গবর্ণমেণ্ট কি সাড়া দিবেন?"

বিশ্ববিদ্যালয়ে মহিলা সদস্য :—বিহার ও উড়িষ্যার মহিলা সভা হইতে ল গ্রাজুয়েট শ্রীযুক্তা শৈলবালা হাজরা অধিকসংখ্যক ভোটে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী ৩ জন ভদ্রলোককে পরাজিত করিয়া পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন আইন অনুসারে এই নির্ব্বাচন হইয়াছে। উক্ত এ্যাক্ট অনুযায়ী স্থিরীকৃত হয় যে, বিহার উড়িষ্যার মহিলা সভা তাঁহাদের মধ্য হইতে একজন সভ্যকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য নির্ব্বাচিত করিতে পারিবেন ইহা ছাড়া উক্ত মহিলা সভাকে একটী সাধারণের সম্মেলন বলিয়া গবর্ণমেন্ট মানিয়া লইয়াছেন। বিহার-উড়িষ্যা মহিলা সভা অনেক সৎকার্য্যের সহিত জড়িত এবং বিশেষভাবে মহিলাগণের শিক্ষা প্রদান বিষয়ে উদ্যোগী। ইহাদের চেষ্টায় মহিলাগণের শিক্ষার প্রসার এবং সঙ্গীত বিজ্ঞানকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকার মধ্যে স্থান দেওয়া হইয়াছে।

নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলন :—৭ই নবেম্বর দিল্লী সরস্বতী ভবনে লেডী সর্কার সভানেত্রীত্বে নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলনের ষষ্ঠ বার্ষিক অধিবেশনে ১১টী প্রস্তাব গৃহীত হয়। ইহাদের মধ্যে হিন্দু স্ত্রীলোকদিগের সম্পত্তিলাভের অধিকার স্বীকার করিয়া এবং উহার প্রবর্ত্তনের জন্য আইন প্রণয়ন সমর্থন করিয়া, সারদা আইনকে কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য উপায় উদ্ভাবনের নিমিত্ত ব্যবস্থাপক সভার সদস্যগণকে অনুরোধ করিয়া এবং ইসলামের অনুশাসন অনুসারে মুসলমান স্ত্রীলোকদিগের বিবাহ-বিচ্ছেদের অধিকার বৃটিশ আদালতের থাকার ক। উচিত বলিয়া অভিমত জ্ঞাপন করিয়া প্রস্তাব সম্মেলনে গৃহীত হয়।

গোল টেবিলের কথা :—

গোল টেব্‌ল বৈঠকের মরশুম আরম্ভ হইয়াছে। ভারতবর্ষ হইতে যোশী, সপ্রু, গজনবী, পাত্র ইত্যাদি ধুরন্ধরগণ যাত্রা করিয়াছেন। বিলাতী সরকারের পক্ষ হইতে লর্ড রিডিং, লর্ড সাঙ্কি ও লর্ড উইনটারটন প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। এই বৈঠকের সাফল্য লইয়া অনেকেই গবেষণা করিতেছেন। বিলাত হইতে অধ্যাপক লাস্কি ও অন্যতম রাজনৈতিক লেখক ব্যারট্রাণ্ড রাসেল সপ্রু জয়াকরকে বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে, মহাত্মাজী এই বৈঠকে যোগদান না করিলে, তাঁহারাও যেন উক্ত বৈঠককে বয়কট করেন। এই অনুরোধের সাফাই গাহিবার জন্যই মিষ্টার জয়াকর বিলাত যাত্রা করিবার সময় বলিয়াছেন যে গোল টেবল বৈঠকে যে বিশেষ কাজ হইবে না এ ধারণা তাঁহারও আছে, তবে তিনি যাইতেছেন এই জন্য যে সরকার পক্ষ হইতে ভবিষ্যতে কোন প্রকার কথা উঠে না যে আমরা উহাতে যোগদান করিলাম না। এই বৈঠককে সাফল্য প্রদান করিবার জন্য সকল প্রকার চেষ্টা করিবই, কৃতকার্য্যের ভার ভবিতব্যের উপর। স্যার এ, পি, পাত্রও অনেকটা এই কথারই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। তিনি বলেন যে গোল টেবল বৈঠকে মহাত্মা গান্ধী ও কংগ্রেস যোগদান না করিলে উহাতে কোন প্রকার বিশেষ ফল পাওয়া যাইবে না। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথেরও সেই অভিমত। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন; যে কোন জাতি আর একটী জাতিকে ভয় প্রদর্শন করিয়া চিরকাল শাসন করিতে পারে না। ইংরাজ সরকার কংগ্রেস ও মহাত্মাজীকে বাদ দিয়া কোন প্রকার আপোষের কথা চালাইলে তাহা কোন রকমেই সর্ব্ববাদিসম্মতরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারিবে না। বিলাতী দুই-একখানি কাগজেরও নাকি এইরূপ ধারণা। সুতরাং প্রধান মন্ত্রী ও ভারত সচিব মহাশয় তৃতীয় গোল টেবিল বৈঠক আহ্বান করিয়া মহাত্মাজীকে উহাতে যোগদান করিতে আহ্বান না করায় আমাদের মনে হয় অনেকটা শিবহীন যজ্ঞেরই অনুষ্ঠান করা হইতেছে মাত্র। এবার গোল টেবল বৈঠকে বাংলার হিন্দুগণের পক্ষ হইতে বাংলার অন্যতম মন্ত্রী শ্রীযুত বিজয়প্রসাদ সিংহ রায়কে নাকি নির্ব্বাচিত করা হইয়াছিল। শ্রীযুত সিংহ রায় পারিবারিক প্রতিবন্ধকতায় এই আহ্বান গ্রহণ করিতে না পারায় বাংলার প্রসিদ্ধ আইন ব্যবসায়ী স্যর নৃপেন্দ্রনাথকে তৃতীয় গোল টেবল বৈঠকে যোগদান করিবার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে।

এবারকার গোল টেবিল বৈঠকে নানা প্রকার জটিল প্রশ্নের উত্থাপন হইবার সম্ভাবনা আছে বলিয়া নাকি ভারতীয় সামন্ত রাজগণ স্বয়ং না গিয়া তাঁহাদের প্রধান সচিবগণকে উক্ত বৈঠকে যোগাদান করিবার জন্য প্রেরণ করিতেছেন। ব্যবস্থা ভালই হইয়াছে। সামন্ত রাজগণ স্বয়ং উপস্থিত থাকিলে অনেক সময়েই চক্ষুলজ্জার খাতিরে অনেকটা সামলাইয়া চলিতেন, তাঁহাদের অন্নজীবিগণকে

প্রেরণ করিয়া এই বিপদের হস্ত হইতে রক্ষা পাইলেন। যাঁহারা ভাবিতেছেন যে এই তৃতীয় গোল টেবল বৈঠকে একটা মীমাংসা হইয়া যাইবে, তাঁহারা বিশেষ ভুলই করিতেছেন। ইংরাজজাতি যতদিন ভারতবর্ষকে কামধেনুবৎ দোহন যন্ত্র বলিয়া মনে করিবেন, ততদিন মীমাংসার কি বন্দোবস্ত হইতে পারে। ইংরাজের দেশে ভীষণ অন্নাভাব। তথায় বেকার সমস্যা ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিতেছে। কাজেই ইহাই স্বাভাবিক যে ইংরাজ ভারতকে তাহার এক বিস্তৃত কর্ম্মস্থল করিয়া ব্যবহার করিতে থাকিবে। ইংরাজ জাতি যদি আমাদিগকে তাহাদেরই একজন বলিয়া গ্রহণ করিত,তাহা হইলে সমস্যার সমাধানের জন্য এত দেরী হইবার কোনপ্রকার সম্ভাবনা থাকিত না।

দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় সমস্যা :—

দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় অধিবাসীগণের বসবাস করা ক্রমশঃ অসম্ভব হইয়া উঠিতে লাগিল। এই দক্ষিণ আফ্রিকা যখন জঙ্গল মাত্র ছিল, তখন ইংরাজ ব্যবসায়ীগণ দলে দলে ভারতীয় শ্রমজীবিগণকে লইয়া গিয়া তথায় নানাপ্রকার উপনিবেশ স্থাপন করেন। ভারতীয় শ্রমজীবি-দের সহিত দুই চারজন ব্যবসায়ী ও শিল্পী দক্ষিণ আফ্রিকায় গমন করে। দক্ষিণ আফ্রিকা যেমন সম্পদশালী জনপদে পরিণত হইয়া উঠিতে থাকে তথাকার বুয়ার অধিবাসীগণ ভারতীয়দের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সফলকাম হইতে না পারিয়া, শুধু 'গায়ের জোরে' তথা হইতে তাহাদিগকে নিষ্কাষিত করিয়া দিবার জন্য চেষ্টা করিতে থাকে। বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে ইংরাজদের সহিত বুয়ার জাতির সংঘর্ষ উপস্থিত হইলে ইংরাজগণ ভারতীয়দের সহানুভূতি লাভ করিবার জন্যই বলিয়াছিলেন যে তাঁহারা বুয়ারদিগকে পরাজিত করিতে চাহেন যেহেতু তাহারা ভারতীয়দের ন্যায্য দাবী স্বীকার করিয়া লইতে প্রস্তুত নহে। যুদ্ধে জয়লাভ করিবার পর ইংরাজ সরকার তাঁহাদের পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিবার কোন বিশেষ চেষ্টাই করিলেন না। দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় প্রাধান্য ক্ষুন্ন করিবার উদ্দেশ্যে ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ট্রানসভাল সরকার এক আইন প্রণয়ন করে। এই আইনের সাহায্যে তাঁহারা ভারতীয় দিগকে কতকগুলি জনাকীর্ণ ও বাণিজ্য প্রধান নগরীতে জমি ক্রয় করিবার নিষেধ আজ্ঞা প্রদান করেন। এই আজ্ঞা বলে ভারতীয়গণ বিশেষ প্রয়োজন অনুভব করিলেও, আইনবর্জ্জিত স্থান সমূহে কোন প্রকার সম্পত্তি ক্রয় করিতে পারিবেন না। ইহাতে ভারতীয়গণের শুধুই নাগরিক ক্ষমতার হ্রাস হয় তাহা নয় তাহাদিগের ব্যবসা-বাণিজ্যের অবাধ শ্রীবৃদ্ধির হানি হয়। বুয়ার যুদ্ধের পর দক্ষিণ আফ্রিকার রাজ্যগুলি সংমিলিত হইয়া একটী স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হইলে, ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে আর একটী নূতন আইন জারি করা হয়। এই আইনের নাম ট্রান্স-ভালের 'গোল্ড ল'। পূর্ব্বে কতকগুলি নির্দ্ধারিত স্থানে ভারতীয়গণকে সম্পত্তি ক্রয় করিতে নিষেধ করা হইয়াছিল এখন উক্ত স্থানগুলিতে বসবাস পর্য্যন্ত করিতে বারণ করা হয়। এই আইন প্রবর্ত্তিত হইলে ভারতীয়গণকে মাত্র 'কুলী' রূপেই দক্ষিণ আফ্রিকায় বসবাস করিতে হইবে এবং তাহাদিগকে সর্ব্বপ্রকার ব্যবসা-বাণিজ্যই ক্রমশঃ তুলিয়া দিতে হইবে এইরূপ আশঙ্কা করিয়া মহাত্মা গান্ধী এই আইনের বিরুদ্ধে ভীষণ আন্দোলন সুরু করিয়া দেন। এই আন্দোলনের ফলেই ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে গান্ধি-স্মাট সর্ত্তগুলি প্রবর্ত্তিত হয়। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে পর্য্যন্ত উক্ত সর্ত্ত অনুযায়ী কার্য্য করা হয়। 'গোল্ড' আইনে প্রবর্ত্তিত হইলেও, উক্ত আইন অনুযায়ী কোনপ্রকার কার্য্যই করা হয় নাই। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে আর একটী নূতন আইন জারী করিয়া দক্ষিণ আফ্রিকার সরকার তথাকার ভারতীয় গণকে সর্ব্বপ্রকার জমির মালিকানি সত্ত্ব ক্রয় করিতে নিষেধ করিয়া দেন এবং নূতন ট্রেড লাইসেন্স আর ভারতীয়গণকে প্রদান করা হইবে না বলিয়া ঘোষণা করেন। ১৯৩১ সালের যে নূতন আইন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে তাহাতে ভারতীয় ব্যবসায়ীগণের ব্যবসা করিবার সনন্দ যে কোন মুহূর্ত্তে কোন প্রকার কারণ দর্শন না করিয়া কাড়িয়া লওয়া হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত ব্যবস্থা গুলির উপর লক্ষ্য রাখিলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে ভারতীয়গণকে [illegible] ঠেলা করা হইতেছে। [illegible]

৫৫

নামে ভারতবাসী। কয়েক পুরুষ ধরিয়া তাহারা পুরুষানুক্রমে তথায় বসবাস করিয়া আসিতেছে। ইংরাজ, বুয়ার প্রভৃতি জাতিগণ তথায় গমন করিয়া যেমন উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছেন, ভারতীয়গণও তথায় কয়েক পুরুষ পূর্ব্বে গমন করিয়া তাহাদের জন্ম-মৃত্যুর দেশ বলিয়া দক্ষিণ আফ্রিকাকে বরণ করিয়া লইয়াছে। বর্ত্তমানে দক্ষিণ আফ্রিকায় যে বৈভব দেখিতে পাওয়া যায়, ভারতীয়গণের শ্রমই উহার মূল উপাদান। এখন নানা অজুহাতে এই ভারতীয়গণকে কেন্দ্রচ্যুত করিয়া দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে অপসারিত করিয়া দিলে তাহারা কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে। ভারতবর্ষে তাহাদের স্থান কোথায়। এখন কোন জাতি যদি অষ্ট্রেলিয়ায় গিয়া বলে যে ইংরাজগণ আবার ইংলণ্ডে ফিরিয়া যাউক, তাহা হইলে উহা যেমন অসম্ভব বলিয়া মনে হইবে, দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়গণকে দক্ষিণ আফ্রিকা ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে বলিলেও কি অনেকটা সেইরূপ হইবে না? ইহা ছাড়া ভারতেও অন্ন সমস্যা দিন দিন ভীষণ আকার ধারণ করিতেছে। এতগুলি বেকার দক্ষিণ আফ্রিকা ত্যাগ করিয়া ভারতে আসিলে আমাদের বেকার সমস্যা কি ভীষণ ভাবে বৃদ্ধি পাইবে না? আমরা ভারত সরকারকে এই বিষয়ে অবহিত হইবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিতেছি।

পরলোকে স্যর আলি ইমাম :—

স্যর আলি ইমাম দেহত্যাগ করিয়াছেন। ইনি ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে পাটনায় জন্ম গ্রহণ করেন। ইঁহার পিতামহ প্রথম ভারতীয় জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। স্যর আলি ইমাম ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে পাটনায় আইন ব্যবসা আরম্ভ করিবার অতি অল্পদিনের মধ্যেই বিশেষ যশ ও অর্থ উপার্জ্জন করেন। তাঁহার সুনাম চতুর্দ্দিকে এত বিস্তৃত হইয়া পড়ে যে ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা সরকার তাঁহাকে ষ্টাণ্ডিং কাউন্সেল পদ প্রদান করেন। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে স্বর্গীয় লর্ড সিংহ আইন-সচিব পদ পরিত্যাগ করিলে স্যর আলি ইমাম উক্ত পদে সরকার কর্ত্তৃক নিয়োজিত হ'ন। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া তিনি বিপুল যশ অর্জ্জন করেন। তাঁহারই উদ্যোগে বিহার একটী স্বতন্ত্র প্রদেশে পরিণত হয় এবং পাটনায় বর্ত্তমান হাইকোর্ট স্থাপিত হয়। উচ্চ রাজ কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি নব প্রতিষ্ঠিত পাটনা হাইকোর্টে কিছুদিনের জন্য আইন ব্যবসা চালাইয়াছিলেন। কিন্তু এই কার্য্য তাঁহাকে বেশীদিন করিতে হয় নাই। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পাটনা হাইকোর্টের জজ হয়েন। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে পাটনা শাসন পরিষদের অন্যতম সভ্যপদ প্রাপ্ত হন। উক্ত সময়ে নিজাম সরকার কোন বিশেষ প্রয়োজনে তাঁহাকে প্রধান সচিবের পদ প্রদান করিয়া হায়দ্রাবাদে লইয়া যান। লর্ড সিংহের ন্যায় স্যর আলি ইমামও বিশেষ কৃতী ও ভাগ্যবান পুরুষ ছিলেন। রাজনীতি ক্ষেত্রেও ইনি বিশেষ যশস্বী নেতা ছিলেন। নেহেরু রিপোর্টের অন্যতম স্বাক্ষরকারী ও জাতীয়তাবাদী মুসলমান নেতা হিসাবে চিরস্মরণীয় রহিবেন। তাঁহার হৃদয় উদার ও সর্ব্বপ্রকার কুসংস্কার বর্জ্জিত ছিল। আমরা তাঁহার আত্মার মঙ্গল কামনা করিতেছি।

পরলোকে রায় যদুনাথ মজুমদার :—

যশোহরের রায় বাহাদুর যদুনাথ মজুমদার মহাশয় স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। রায় বাহাদুর বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র ছিলেন। তিনি কিছুদিন কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতি করিয়াছিলেন। পাথুরিয়া ঘাটার মহারাজা স্যর যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয় রায় বাহাদুরের অসাধারণ গুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে তাঁহার ষ্টেটের ম্যানেজার পদ প্রদান করেন। রায় বাহাদুর বিশেষ দক্ষতা সহকারে এই কার্য্য করিবার পর লাহোরে টি বিউন পত্রিকার সম্পাদক পদ গ্রহণ করিয়া পাঞ্জাবে গমন করেন। পাঞ্জাবে অবস্থানকালে নেপাল সরকারের সহিত তিনি পরিচিত হয়েন। নেপালের স্বর্গীয় মহারাজ স্যর জঙ্গ বাহাদুর রায় বাহাদুরের বিশেষ ভক্ত ছিলেন। অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান না করায় রায় বাহাদুরের পূর্ব্ব গৌরব ক্ষুণ্ণ হয়। কিন্তু তিনি চিরকালই দেশসেবা করিয়া গিয়াছেন। তিনিই জেলাবোর্ডের প্রথম বে-সরকারী চেয়ারম্যান। তাঁহার পরিচালনায় যশোহর জেলাবোর্ডের বিশেষ উন্নতি হয়।

আমরা রায় বাহাদুরের শোকসন্তপ্ত পরিবারকে আন্তরিক সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছি।

এলাহাবাদে ঐক্য সম্মিলন :—

আজ কয়েক দিন হইল এলাহাবাদে ইউনিটী কনফারেন্স বা মিলন-সভার অধিবেশন চলিয়াছে। রাষ্ট্র-নায়কগণ এলাহাবাদকে অধিবেশনের কেন্দ্রস্থল করিয়া ভালই করিয়াছেন। ইতিহাসের দিক হইতে দেখিতে গেলে একথা সত্য যে এইখানে হিন্দুদের সহিত মুসলমানদের অপূর্ব্ব মিলন সংঘটিত হয়। হিন্দু প্রয়াগ মুসলমানদের হস্তে আসিয়া এলাহাবাদে পরিণত হইয়াছে। যুক্তবেণীর সহিত পীরের কবরের মহা সম্মিলন একমাত্র এলাহাবাদেই দেখিতে পাওয়া যায়। সম্মেলনের অধিবেশন যখন এখনও চলিতেছে, তখন আমরা কোনপ্রকার মন্তব্য প্রকাশ না করিয়া শুধু এইমাত্র বলিব যে,উক্ত অধিবেশনে একটী সমস্যার মীমাংসা হইয়াছে। সাইমন কমিশনে যেরূপ ব্যবস্থা করাই হউক না কেন বাংলার রাজনৈতিক ভাগ্য-ক্ষেত্রে কোনপ্রকার বিশেষ দূষণীয় বন্দোবস্ত করা হয় নাই। মিষ্টার ম্যাক্‌-ডোনাল্ডের ব্যবস্থায় বাংলার হিন্দুগণকে অনেকটা অস্পৃশ্য করিয়া তুলিবার ব্যবস্থাই করা হইতেছিল। জনসংখ্যা অনুযায়ী ভোটাধিকার প্রদান করিবার অজুহাতে মুসলমান গণকে কতকটা সেই অধিকার প্রদান করিলেও হিন্দুগণকে রসাতলে প্রেরণ করিবার ব্যবস্থা করা হয়। ইংরাজ ও আংলো-ইণ্ডিয়ানগণকে স্বজাতীয় হিসাবে অনেক বেশী ভোটাধিকার প্রদান করা হয়। এলাহাবাদে মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দ ইহা বুঝিতে পারিয়াছেন দেখিয়া আমরা সন্তুষ্ট হইয়াছি! জনসংখ্যা অনুপাতে মুসলমানগণ যদি ১২৭ জন প্রতিনিধি প্রেরণ করিবার অধিকার পান, তাহাতে আমাদের অমত করিবার কি আছে? সত্যকথা বলিতে কি ভারতীয় শাসন-সংস্কারকে জাতিধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত না করিলেই ভাল হইত। আশাকরি সিন্ধু সমস্যা ও কেন্দ্রীয় সরকারে প্রতিনিধিত্ব সমস্যাও মিটিবে। এই সম্মেলনে যাঁহারা সাফল্যের জন্য প্রাণপণ শ্রম করিতেছেন তাঁহারা ধন্যবাদের পাত্র।

বিলাতে বেকার :—

বিলাতের বেকারগণ সেদিন দলবদ্ধভাবে লণ্ডনের প্রধান রাস্তাগুলিতে বাহির হইয়া আসিয়া ভীষণ দাঙ্গা- হাঙ্গামা করিয়াছে। রাষ্ট্র সচিব বলেন যে বেকার সংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেকটা হ্রাসই পাইয়াছে। রক্ষণশীল দলের নেতা বল্ডুইন সাহেব বলেন যে বেকার সংখ্যা কমাইবার জন্য অচিরেই বিশেষ ব্যবস্থা করা হইবে। রাজার বক্তৃতায় তাহা প্রকাশ পাইবে। শ্রমিক নেতা লান্সবেরী বলেন, সরকার পক্ষ ঋণ করিয়া একটা বিপুল অর্থ সংগ্রহ করুণ এবং ঐ অর্থের সাহায্যে সেতুনির্ম্মাণ, পথ ঘাট তৈয়ারী ইত্যাদি কার্যে অর্থ ব্যয় করিয়া তাবৎ বেকার দলকে কার্য্যে লাগাইয়া দেওয়া প্রয়োজন। ইংলণ্ড স্বাধীন দেশ, তাহার সম্পদ-জগতের গৌরব। তাহার ব্যাঙ্কে পৃথিবীর তাবৎ ধনীরই গচ্ছিত অর্থ আছে। তথায় যখন বেকার সমস্যা চিন্তা ও গবেষণার বিষয় হইয়া পড়িয়াছে তখন ভারতে যে এই বেকার সমস্যা অতি উৎকটভাবে দেখা দিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

জার্ম্মেন সমস্যা :—

জার্ম্মাণীতে চীনের ন্যায় রাষ্ট্র-বিপ্লব লাগিয়াই আছে। সম্প্রতি নাকি নাজীদল কমিউনিষ্টদের সহিত মিলিত হইয়া এক শ্রমিক ধর্ম্মঘট করিয়াছে। ইহাতে প্রায় ২০ হাজার শ্রমিক যোগদান করিয়াছে। সরকার পক্ষ ইহাতে একটু বেশ ব্যতিব্যস্তই হইয়া পড়িয়াছে। হার হিটলারের নাজীদল উৎকট জাতীয়তাবাদী। তাহারা বলিতে চাহে যে জার্ম্মাণী কতকগুলি ইহুদীর মন্ত্রণায় ও ষড়যন্ত্রের ফলেই গত মহাযুদ্ধে মিলিত শক্তিপুঞ্জের নিকট পরাস্ত হয়। কার্লমার্ক একজন ইহুদি। এই ইহুদিই কমিউনিষ্ট ধর্ম প্রচার করিয়া কাইজার শাসিত জার্ম্মাণ সরকারকে দুর্ব্বল করিয়া দেয়। ইহুদিগণ চিরকালই খৃষ্টান ধর্ম্মদ্বেষী এবং খৃষ্টান ইউরোপের পরম শত্রু। শুধুমাত্র সঞ্চিত অর্থের সাহায্যে ইহুদিগণ ইউরোপের নানাদেশে বসতি স্থাপন করিয়া নানা প্রকার ব্যাঙ্ক স্থাপন করে। এই ব্যাঙ্কে শেয়ার ইত্যাদি খরিদ বিক্রয় করিয়া বিপুল বিত্ত অর্জ্জন করিয়া প্রভূত ধনশালী হয়। খৃষ্টান শক্তিকে খর্ব্ব করিবার

জন্যই কাল মার্ক প্রভৃতি ইহুদি নানাপ্রকার শিল্প-বাণিজ্যের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে। জার্ম্মানি যখন আভ্যন্তরিক বিবাদে দোদুল্যমান তখন ইহুদি ষড়যন্ত্রকারীগণ জার্ম্মানিকে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবার জন্য প্ররোচিত করে। যুদ্ধকালীন তাহাদের কমিউনিজম প্রচার করিয়া জাতির শক্তি হ্রাস করে। এইজন্য হিটলারের নাজীদল ইহুদিগণকে সর্ব্বপ্রকার রাজকার্য্য হইতে দূরে রাখিবার মতলব করিয়াছে। নাজীদল অর্থে সমন্বয় আনিবার জন্য কমিউনিষ্টদের সহিত একমত নহে। ইহারা ব্যাঙ্কে সঞ্চিত অর্থ ও শেয়ার প্রভৃতিকে জাতির সম্পত্তি বলিয়া ঘোষণা করিতে প্রস্তুত। কারখানার মূলধনকে ইহারা জাতীয় রুধির হিসাবে উহাকে রাখিবার জন্য কোন প্রকার পরিবর্ত্তন করিতেই প্রস্তুত নহে। কাজেই বর্ত্তমানে নাজীদলের সহিত কমিউনিষ্টদের যে মিলন দেখা যাইতেছে উহা অস্বাভাবিক, ক্ষণস্থায়ী মাত্র। বর্ত্তমান সরকার ধ্বংস করা উভয়েরই উদ্দেশ্য, এইজন্য উহাদের মধ্যে ক্ষণিক মিলন হইয়াছে।

আটোয়া সম্মেলন ও ভারত :—

প্রায় সকল বিশেষজ্ঞগণই বলিতেছেন যে আটোয়া কনফারেন্সের ফল ভারতের পক্ষে ভাল হইবে না। কেননা ভারতবর্ষ যাহা আমদানি করে তাহার অপেক্ষা অনেক অধিক মূল্যের মাল রপ্তানি করিয়া থাকে। রপ্তানী মালের অধিকাংশই জার্ম্মাণী, ফ্রান্স, আমেরিকা প্রভৃতি দেশ সমূহে গৃহীত হইয়া থাকে। ইংলণ্ডকে সুবিধা প্রদান করিবার জন্য উক্ত প্রদেশের পণ্যের উপর বিশেষ বাণিজ্য শুল্ক স্থাপিত হইলেই, তাহারাও ভারতকে জব্দ করিবার জন্য ভারতীয় পণ্যগুলির উপর অতিরিক্ত শুল্কের ভার চাপাইয়া দিবে। তাহা হইলেই ভারতীয় পণ্যের বহির্বাণিজ্য অসম্ভবরূপে কমিয়া যাইতে পারে। বিশেষজ্ঞগণ যাহা বলিতেছেন আমরা পূর্ব্ব হইতেই তাহা বলিয়া রাখিয়াছি।

মহাত্মা ও অস্পৃশ্যতা :—

জোর গুজব যে মহাত্মাজী আবার অনশন ব্রত অবলম্বন করিবেন। তিনি যেরূপভাবে অস্পৃশ্যতা দূর হইয়া যাইবে বলিয়া আশা করিয়াছিলেন তাহা হয় নাই বলিয়া তিনি বিশেষ দুঃখিত। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন যে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ অর্থে জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে ভোজন ও যৌন-সম্বন্ধ স্থাপন নহে তাহা তিনি জানেন, কেননা উহা ব্যক্তিগত ধ্যান ধারণার উপর নির্ভর করে, জোর করিয়া ঐরূপ ভাবে ঐক্যতা স্থাপনে তিনি নারাজ। তবে মহাত্মাজী চাহেন মানবের যাহা প্রাপ্য, মানুষ বলিয়া যাহা পতিত জাতি উচ্চ সম্প্রদায়ের হিন্দুগণের নিকট হইতে দাবী করিতে পারেন তাহা তাহাদিগকে দিতেই হইবে এবং আমরা তাহা তাহাদিগকে না প্রদান করিলে, কোন অজুহাতে তবে ইংরাজদিগের নিকট আমাদের জাতীয় অধিকার দাবী করিব। দেবতা সকলের উপাস্য। কোন শ্রেণী বিশেষের একচেটিয়া সম্পত্তি হইতেই পারে না। এইজন্য তাবৎ হিন্দু দেবালয় সকল জাতির নিকটই উন্মুক্ত করিয়া দিতে হইবে। স্পর্শ করিলে কখনই অশুচি আসিতে পারে না এইজন্য সকল সম্প্রদায়কেই সকল স্থলেই গমনাগমন করিবার জন্য অধিকার প্রদান করিতে হইবে। মহাত্মাজীর সমস্ত যুক্তিগুলিই বিশেষভাবে প্রণিধান যোগ্য। কোন এক সময়ে বিজেতা আর্য্যগণ বিজিত আর্য্যগণকে চিরকাল পদানত করিয়া রাখিবার জন্য অনার্য্য সম্প্রদায়ের জন্য কতকগুলি বিশেষ আইন বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন। এই আইনগুলি পাঠ করিলে আমরা দেখিতে পাই যে উক্ত আইনগুলির সঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকার সরকার কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত আইনগুলির অনেকটা সৌসাদৃশ্য আছে। দক্ষিণ আফ্রিকার সরকার ভারতীয়গণকে কুলীশ্রেণীতে পরিণত করিবার জন্য তাহাদিগের জন্য যে আইন নির্দ্ধারিত করিয়া দিতেছেন, ভারতীয় আর্য্যগণ ও অনার্য্যগণকে শূদ্র বা দাস জাতিতে পরিগণিত করিবার জন্য ধর্ম্মের নামে নানাপ্রকার অধর্ম্মের আশ্রয় লইয়াছিলেন! এখন আর্য্য ও অনার্য্য নির্ব্বিশেষে আমরা সকলেই দাস, আমরা সকলেই পতিত; সুতরাং মিলন সংঘটিত করিতে গেলে পূর্ব্বকার প্রবর্ত্তিত আইন বা প্রথাগুলি তুলিয়া দেওয়াই বুদ্ধিমানের কার্য্য তাহাতে কি কোনরূপ সন্দেহ আছে?

মান্দ্রাজের মন্ত্রী মণ্ডল :—

মান্দ্রাজের মন্ত্রী-মণ্ডলের পতন ও গঠন দেখিয়া মনে হইতেছে রাজনৈতিক চালে মান্দ্রাজ অনেকটা পাকিয়াছে।

প্রধান মন্ত্রী দেওয়ান বাহাদুর মুনিস্বামী নাইডু, তাঁহার দুই সহযোগী শ্রীযুত রাজান ও দেওয়ান বাহাদুর কুমার স্বামী রেডিয়ারের সহিত মতের অমিল হওয়ায় প্রধান মন্ত্রী ও অপর মন্ত্রীদ্বয় দুইটী দল সংগঠিত করেন। ভোটের সাহায্যে শ্রীযুত রাজান ও দেওয়ান বাহাদুর কুমার স্বামী জয়লাভ করায় দেওয়ান বাহাদুর নাইডুকে পদত্যাগ করিতে হইয়াছে। এখানে আমাদের এই জিজ্ঞাস্য যে ইহা কিরূপ ব্যবস্থা হইল? প্রধান মন্ত্রীই ইউরোপে তাঁহার মন্ত্রীমণ্ডলের যে দল তাঁহার নেতা। মন্ত্রীমণ্ডলের মন্ত্রীরা তাঁহার সহিত মনান্তর করিলে তাঁহারাই পদত্যাগ করেন, প্রধান মন্ত্রী অটুট থাকেন। এই ব্যবস্থার ফলেই স্যর জন হোর ইত্যাদি পদত্যাগ করিলেও মিঃ ম্যাকডোনাল্ড তাঁহার নিজের পদে বহাল থাকিয়া যান। মাদ্রাজে এই নূতন Precedent হইল কেন? এই নূতন ব্যবস্থা সমর্থন যোগ্য কি?

বাংলায় সৈন্য সমাবেশ :—

মেদিনীপুর ও ঢাকা জেলায় অতিরিক্ত সৈন্য সমাবেশ করা হইয়াছে। উক্ত দুইটী জেলা হইতেই সৈন্যদের নানাপ্রকার অত্যাচারের কথা প্রত্যহ দৈনিকপত্র সমূহে বাহির হইতেছে। যখন নূতন সৈন্য আমদানী করা হয় তখন জনসাধারণকে বলা হয় যে তাহাদের ভয়ের কোনরূপই কারণ নাই। শুধু মাত্র বিদ্রোহীদিগকে দমন করিবার জন্য তাহাদিগকে উক্ত জেলা দুইটীতে আনয়ন করা হইয়াছে। সৈন্যগণের সান্নিধ্যে বাস করিয়া যদি নিরীহ প্রজা ও জনসাধারণ নিত্য নানাপ্রকার অসুবিধা ও অত্যাচার ভোগ করে, তাহার জন্য সরকার পক্ষ কি ব্যবস্থা করিতেছেন। বিদ্রোহীদের দমন করিবার জন্য তাহাদিগকে আনয়ন করিতে কাহারই আপত্তি থাকিতে পারে না সত্য, কিন্তু এই সৈন্যের দল যদি সাধারণের সহিত সত্যসত্যই অসদ্ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়া থাকে অচিরেই যাহাতে তাহা বন্ধ করিতে পারা যায় এইরূপ ব্যবস্থা করা কি প্রয়োজন নয়?

স্বর্ণ চালানের ভবিষ্যৎ!!

প্রায়ই বে-সরকারী সংবাদে শুনিতে পাওয়া যায় যে ভারত হইতে প্রচুর স্বর্ণ বিদেশে রপ্তানী হইতেছে। এই রপ্তানী স্বর্ণই নাকি বিলাতী লণ্ডনীদের আন্তর্জাতিক মূল্য রক্ষা করিয়া ইংরাজ ব্যবসা-বাণিজ্য রক্ষা করিয়াছে। এইরূপ সাহায্য প্রদান করিতে প্রস্তুত থাকিলেও আমাদের এই মাত্র বক্তব্য যে স্বর্ণ ভারত হইতে চলিয়া গেলে উহার স্থলে কারেন্সি নোটেরই প্রচলন বাড়িবে। এই কারেন্সি নোট স্বর্ণের অভাবে মূল্যহীন হইয়া পড়িলে ভারতীয় অর্থ-জগতে জার্মানির মার্কের ন্যায় ভীষণ বিপ্লব দেখা দিবে। তখন শুধু ভারতীয় ব্যবসা-বাণিজ্য নয়, ইংলণ্ডের ব্যবসা বাণিজ্য ও বিশেষ বিপন্ন হইতে পারে। অটোয়া কনফারেন্সের সর্ত্ত অনুযায়ী ভারতীয় ব্যবসা-বাণিজ্য চলিলে উক্ত ক্ষতির মাত্রা বরং বৃদ্ধিই পাইবে, বিশেষজ্ঞগণ সে বিষয়ে চিন্তা করিয়া দেখিতেছেন কি?

অলক্ষ্য সিরিঞ্জ!

সামান্য ঘটনাকে বাড়াইয়া উহাকে কিরূপে ভীষণকার ধারণ করান যাইতে পারে, সম্প্রতি তাহা প্রমাণ হইয়া গিয়াছে। গুজব রটে যে কলিকাতায় কতকগুলি বিদ্রোহী বাঙ্গালী ইউরোপীয় ও এংলো-ইণ্ডিয়ান যুবতীগণের অঙ্গে কুষ্ঠ-রোগের বীজ কৌশল সহকারে প্রবেশ করাইয়া দিয়া উক্ত জাতি দুইটীকে সমূলে নির্ব্বংশ করিবার চেষ্টা করিতেছে। ইউরোপীয় ও এংলো ইণ্ডিয়ান যুবতীগণ ভীষণ ভয় পাইয়া অগত্যা পুলিশের শরণাপন্ন; পুলিশ তদারক আরম্ভ করিয়া একজন ইউরোপীয় ভদ্রলোককে ধৃত করেন। তিনি তাঁহার এয়ারগণের সাহায্যে যুবতীগণের অঙ্গে ইটকাদি নিক্ষেপ করিয়া কৌতুক করিতেন। এই ইউরোপীয় ভদ্রলোকটী নাকি বিশেষ সম্মানিত একজন নাগরিক। নানা কারণে পুলিশ তাঁহার নাম প্রকাশ করিতে নারাজ। যাহা হউক ব্যাপার ক্রমশঃই ভীষণাকার ধারণ করিতেছিল। অনর্থক কোনরূপ প্রমাণ না পাইয়া এইরূপ মিথ্যা জনরব প্রচার নিশ্চয়ই বিশেষ গর্হিত কার্য্য। 'ফরওয়ার্ড হরিফায়েড রিপোর্টারের' কাহিনী প্রকাশ করিয়া দণ্ডিত হইয়াছিল। তাহা অপেক্ষাও এই অদ্ভুত সংবাদ প্রকাশ করার জন্য যাহারা দায়ী তাহাদিগকে নিশ্চয়ই শাস্তি দিবার ব্যবস্থা করা উচিত।

ব্যবস্থাপক সভা :—

আগামী ২১শে নভেম্বর তারিখ হইতে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন আরম্ভ হইবে। এই অধিবেশনটীর পরমায়ু বেশীদিন না হইলেও শুনা যাইতেছে এই অধিবেশনে অনেক সরকারী ও বে-সরকারী বিল পেশ করা হইবে। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা এখন স্বাধীন হইয়াছে। লেজিস্‌লেটিভের তত্ত্বাবধান হইতে বাহির আসিয়া ব্যবস্থাপক সভা নূতন পর্য্যায়ে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। এই পর্য্যায়ে ইহার শাসনকার্য্য কিরূপ চলে তাহাই দেখিবার বস্তু।

পরলোকে ইউনান্ :—

কালকাতার প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথী চিকিৎসক ডাঃ ইউনান্ পরলোক গমন করিয়াছেন। এডিনবরা বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে এলোপ্যাথিক সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াও ডাঃ ইউনান হোমিওপ্যাথী আরম্ভ করিয়াছিলেন ও তাহাতে বিপুল যশোলাভ করিয়াছিলেন। ডাঃ ইউনানের মৃত্যুর সঙ্গে কলিকাতায় তেমন খ্যাতনামা হোমিওপ্যাথের একান্তই অভাব হইল।

আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট :—

প্রেসিডেণ্ট মিঃ হুভারের গৌরব সূর্য্য অস্তমিত হইল ও মিঃ রুজভেল্টের গৌরবসূর্য্য উদিত হইল। ডেমোক্রাটিক দলের পক্ষ হইতে মিঃ রুজভেল্ট প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হইলেন। মিঃ রুজভেল্টের আমলে আমেরিকা তথা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দেশের অবস্থা কেমন দাঁড়ায় আগামী কয় বৎসরে তাহার বিচার হইবে।

দেশের অবস্থা :—

কৃষিজাত পণ্য বিশেষ করিয়া পাটের দর এবারও না উঠায় দেশের আর্থিক অবস্থা শোচনীয়। আষাঢ়ে ধান ভাল হইয়াছিল—কিন্তু কার্ত্তিক অগ্রহায়ণের ধানের অবস্থা এই কার্ত্তিকের অসাময়িক বৃষ্টির দরুণ কেমন হইবে তাহা বলা যায় না। পাটের বাজার চড়িবে আশায় ও খদ্দের না থাকায় এখনও অনেক কৃষাণই পাট ধরিয়া রাখিয়াছে—কিন্তু কবে যে বাজার চড়িবে ভগবানই জানেন।

ষ্টেট্‌স্‌ম্যানের নূতন সম্পাদক :—

সার ওয়াটসন্ সুস্থ হইয়া বিলাত যাত্রা করিয়াছেন ও তাঁহার স্থানে মিঃ ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ ষ্টেট্‌ম্যানের অস্থায়ী সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছেন। মিঃ ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রিন্সিপাল ও শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর ছিলেন। ইনি কৃতী ও বিচক্ষণ লোক—ইনি ষ্টেটস্‌ম্যানের সম্পাদক নিযুক্ত হওয়াতে যোগ্য সমাদর হইয়াছে।

পরলোকে নিখিলনাথ রায় :—

সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক নিখিলনাথ রায় মহাশয় আর ইহলোকে নাই। বাংলার ইতিহাসের অনেক মূল্যবান তথ্য নিখিলবাবু সংগ্রহ করিয়াছেন এবং আজীবন ঐকান্তিক ভাবে সাহিত্যচর্চ্চা করিয়া গিয়াছেন। আমরা তাঁহার শোক সন্তপ্ত পরিজনবর্গের সহিত সহানুভূতি জানাইতেছি।

পরলোকে মহারাণী সুনীতি দেবী :—

কোচবিহারের রাজমাতা মহারাণী সুনীতি দেবী আর ইহলোকে নাই। ইনি ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের কন্যা ও স্বনামধন্য মহারাজ নৃপেন্দ্র নারায়ণের সহধর্ম্মিণী ছিলেন। মহারাণী সত্য বিদুষী ছিলেন ও এদেশে ও বিদেশে যশস্বিনী ছিলেন। শেষ জীবনে মহারাণী অনেক শোক পাইয়াছেন। আমরা তাঁহার আত্মার মঙ্গল কামনা করি।

তন্ময়—

শিল্পী—শ্রীহেমেন্দ্রনাথ মজুমদার।

লক্ষ্মীবিলাস প্রেস, লিঃ কলিকাতা।

সতীশচন্দ্র মিত্র প্রতিষ্ঠিত

৬ষ্ঠ বর্ষ | পৌষ—১৩৩৯ | ৯ম সংখ্যা

বর্ত্তমান সঙ্কট

বাংলা সাহিত্যের মধ্যে অভাবের তীব্র রূপ সে ভাবে দেখা না দিলেও বাংলার সর্ব্বসাধারণের মধ্যে তথা দেশ-ব্যাপী ভীষণ অভাব যে তীব্র ভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। জগৎজোড়া অর্থাভাব, দেশের শস্যাদির স্বল্প মূল্য এগুলি সাময়িক ভাবে অভাবকে ভীষণ রূপ দিলেও আমাদের অভাবের মূল কারণ যে শুধু বর্ত্তমানের এই কারণগুলিই তাহা নহে। আমাদের অভাব বহুদিন হইতে ক্রমাগত বাড়িয়াই চলিয়াছে এবং ইহার শেষ—স্বাভাবিক ভাবে অনশন মৃত্যু কিনা কে বলিবে?

আগে আমরা স্বল্পে সন্তুষ্ট ছিলাম। ভূমিকর্ষণে, পশু-পালনে, দেশের মধ্যে ব্যবসায়-বাণিজ্য করণে-এবং চাকরি-বাকরিতে একরকম ভাল খাইয়া পোষাইয়া যাইত। এখন সে স্থলে বিংশ শতাব্দীর শিক্ষা ও সভ্যতার নূতন আলোতে আমাদের আশা আকাঙ্ক্ষা অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে—এখন আমাদের শিক্ষিত শ্রেণী শুধু সন্তুষ্ট নহে, ভাল সারবান দ্রব্যের দিক দিয়া না হইলেও মুখরোচক খাবার ও মনোহর পরিবার দ্রব্যাদির উপর লোভ ক্রমেই বেশী হইতেছে।

শিক্ষিতের আদর্শই দেশের সাধারণ লোকদের মধ্যে চলিত হয় তাই সমগ্র দেশই এই পথে গা ভাসাইয়াছে। বর্ত্তমান আত্মসুখ-পরায়ণতার যুগে বিলাস ব্যসন যাহাদের করিবার সামর্থ্য আছে তাহাদের পক্ষে তাহা করা দোষের নহে—কিন্তু যাহাদের বিলাসিতা করিবার মত উপার্জ্জন নাই—যাহাদের বিলাসিতায় পেটের খাইবার অভাবই হইবে, তাহাদের সে পথে চলা যে কত সাংঘাতিক তাহা আমাদের দেশের দিকে চাহিলেই বোঝা যায়। আয় নাই অথচ বিলাস বা জীবনের অপ্রয়োজনীয় ব্যসনে ব্যয়ে আমরা উদার হইয়াছি তাই আমাদের অভাব দিনের দিন বাড়িয়াই চলিতেছে।

এ ব্যাপারে দেশের চিন্তাশীল মনীষীদের কাহারও কাহারও দৃষ্টি আকর্ষিত হইয়াছে—কেহ বা এ বিষয়ে

দেশকে প্রবুদ্ধ করিবার জন্ত পুনঃ পুনঃ সাবধান বাণীও উচ্চারণ করিতেছেন। বর্ত্তমান শিক্ষাধারায় আমাদের শিক্ষিত যুবকগণকে আরো বিভ্রান্ত করিয়া দিতেছে, তাহাদের জীবনযুদ্ধে জয়ী হইবার মত উত্তম হরণ করিয়া লইতেছে এ কথা শোনা যায়। যখন দেখা যায় আমাদের এই শিক্ষার উদ্দেশ্য শত করা নিরানব্বই ভাগই চাকুরী করা এবং আর কিছু করিবার নাই বলিয়াই শিক্ষাস্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়া যতদিন থাকা যায় ততদিনই ভাল, এই মনোবৃত্তিতে চলিতেছে তখন এ অভিযোগ কিছু অসত্য বলিয়া মনে হয় না।

শিক্ষা যেখানে ব্যবহারিক জীবনের সহায়ক না হইয়া বিঘ্নই জন্মায় সেখানে ফল আরো খারাপই দাঁড়ায়। আমাদের অবস্থাও হইয়াছে তেমনি। তাই আমরা জীবন-যুদ্ধে ক্রমাগত হটিয়াই যাইতেছি। শিক্ষা করিবার সময় মন আমাদের নানা বিলাসের চাকচিক্যে ভোলে, মুখরোচক অসার খাইবার রুচি বাড়ে—থিয়েটার সিনেমায় নয়ন তৃপ্তি পাইতে চাহে, এসেন্সে নাসা রন্ধ্র তৃপ্তি চাহে, অঙ্গ নানা ধরণের বসন ভূষণ চাহে—তারপর কর্ম্মজীবনে প্রবেশ করিয়া শত করা ৯৫ জন শিক্ষিত যখন ইহার প্রায় কিছুই লাভ করিতে পারে না তখন তাহাদের জীবন স্বভাবতই অতিষ্ঠ হইয়া উঠিতে পারে।

হইয়াছেও তাই—এবং এই অবস্থার হতাশ ও অতিষ্ঠ ভাব শিক্ষিতদের মধ্য হইতে সমাজের সর্ব্বস্তরে ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করিতে থাকিলেও ইহার মধ্য হইতেই আমাদের বাঁচিবার যোগ্য উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। যতদিন বিলাস ব্যসন ক্রয়ের যোগ্যতা না আসে ততদিন তাহার উপযোগী অর্থের সংস্থানের উপায় দেখিতে হইবে—বিলাস ব্যসনও যাহাতে দেশেই পূরণ হইতে পারে তাহাও দেখিতে হইবে। নিজেদের কষ্টসহিষ্ণু ও অর্থোপার্জ্জনের যোগ্যতা লাভ করিতে হইবে। বর্ত্তমানে শিক্ষার উদ্দেশ্যই জীবনযুদ্ধে জয়ী হইবার যোগ্যতা অর্জ্জন করা—ইহা ছাড়া শিক্ষার অন্য উদ্দেশ্য নাই। দেশের যুবকদের ইহা বিশেষ করিয়াই ভাবিতে হইবে। জীবন-যুদ্ধে জয়ী হইতে গেলে দৈহিক ও মানসিক বল প্রচুর থাকা চাই—তাহা যত বাড়ানো যায় জাতির পক্ষে ততই মঙ্গল। আমাদের নিশ্চেষ্টতা, উত্তমহীনতা ও ব্যর্থ শিক্ষা আজ জীবনের যে হতাশা ও অকর্ম্মণ্যতার সীমা রেখায় আমাদের আনিয়া ফেলিয়াছে—তাহার মোড় ফিরাইতেই হইবে—নতুবা সামনেই গভীর খাদ।

সঙ্গীত-বিহঙ্গ

শ্রীকালিদাস রায়

উড়ে যা আমার সঙ্গীত-বিহঙ্গ
দূর দিগন্ত পানে।
ঝঙ্কৃত করি শাশ্বত প্রসঙ্গ
ধ্রুব মঙ্গল তানে।
হেথায় কণ্ঠ পিঞ্জর নিষণ্ণ
কেন রবি তুই কুণ্ঠিত বিষণ্ণ
পবনে পবনে অম্বর তরঙ্গ
তোর আহ্বান আনে।

হেথা চারিধারে সংসার ঝঞ্ঝনা
চঞ্চল করে ত্রাসে
ঘুরিছে লুব্ধ হিংসার গঞ্জনা,
শ্যেন সম আশে-পাশে।
যারে যথা শুধু আনন্দ নীরন্ধ্র
প্রেম রবি তারা চন্দ্রমা অতন্দ্র
নীলে-নীলে করি ইঙ্গিত বিভঙ্গ
তোরে অনন্ত টানে।

টিক্‌টিকির ডিম

গল্প

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এল

শীতের সন্ধ্যায় আমরা কয়েকজন ক্লাবে বসিয়া রাজনৈতিক আলোচনা করিতেছিলাম, যদিও ক্লাবে বসিয়া উক্তরূপ আলোচনা করা ক্লাবের আইন বিরুদ্ধ। বেহার প্রদেশে বাস করিয়া বাঙালীর ক্লাব করিতে হইলে ঐ রকম গুটিকয়েক আইন খাতায় লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতে হয়।

আলোচনা ক্রমশঃ দুইজন সভ্যের মধ্যে বাগ্‌যুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিল। আমরা অবশিষ্ট সকলে মনোযোগ দিয়া শুনিতেছিলাম।

পৃথ্বী বলিল,—যাই বল, গান্ধীটুপী পরলেই দেশভক্ত হওয়া যায় না।

গান্ধীটুপী পরিহিত চুণী বলিল,—হওয়া যায়। বাংলাদেশের সাতকোটি লোক যদি গান্ধীটুপী পরে তাহলে অন্ততঃ এককোটি গজ খদ্দর বিক্রী হয়, তার দাম নিদেন পক্ষে ত্রিশ লক্ষ টাকা। ঐ টাকাটা দেশের লোকের পেটে যায়।

পৃথ্বী বলিল,—হতে পারে। কিন্তু টুপী পরলে বাঙালীর বিশেষত্ব নষ্ট হয়, তা সে যে-টুপীই হোক। 'নাঙ্গা শির' হচ্ছে বাঙালীর বিশেষত্ব!

চুণী চটিয়া উঠিয়া বলিল,—কেবল ওই বিশেষত্বের জোরে যদি বাঙালী বেঁচে থাকতে চায়, তাহলে তার গলায় দড়ি দিয়ে মরা উচিৎ।

দূরে টেবিলের এক কোণে বরদা কড়ি কাঠের দিকে চোখ তুলিয়া বসিয়া ছিল, হঠাৎ প্রশ্ন করিল,—টিকটিকিকে হাসতে দেখেছ?

অপ্রত্যাশিত প্রশ্নে তার্কিক দু'জনে কিছুক্ষণের জন্য গুম হইয়া গেল; তারপর সবাই একসঙ্গে হাসিয়া উঠিল।

হাসি থামিলে বরদা বলিল,—হাসির কথা নয়। মিথ্যে মিথ্যে গল্প বানিয়ে বলি আমার একটা দুর্নাম আছে; সেটা কিন্তু নিন্দুকের অপবাদ। গান্ধীটুপী পরলে দেশ উদ্ধার হয় কিনা বলতে পারি না কিন্তু গয়ায় পিণ্ডি দিলে যে বদ্ধ জীবাত্মার মুক্তি হয় তার সন্ত সন্ত প্রমাণ যদি চাও ত আমি দিতে পারি।

সকলেই বুঝিল একটা গল্প আসন্ন হইয়াছে। অমূল্য উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল,—এইবার গাঁজার শ্রাদ্ধ হবে, আমি বাড়ী চললুম—দরজা পর্য্যন্ত গিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল,—দেখ, তোমরা ভাল চাও ত বরদাকে ক্লাব থেকে তাড়াও বলছি; নইলে শুদ্ধ গাঁজার ধোঁয়ায় এ ক্লাব একদিন বেলুনের মত শূন্যে উড়ে যাবে—বলিয়া অমূল্য হন্‌হন্ করিয়া বাহির হইয়া গেল।

বরদা একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—সত্যি কথা যারা বলে তাদের এমনিই হয়, যীশুকে ত ক্রুশে চড়তে হয়েছিল। যাক্, হৃষী, একটা সিগার দাও ত।

হৃষী বলিল,—সিগার নেই। বিড়ি খাও ত দিতে পারি।

বরদা আর একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করিয়া বলিল,—থাক, দরকার নেই। দেখি যদি আমার পকেটে—

নিজের পকেট হইতে একটা সিগার বাহির করিয়া সযত্নে ধরাইয়া বরদা বলিতে আরম্ভ করিল,—ব্যাপারটা এতই তুচ্ছ যে বলতে আমারই সঙ্কোচ বোধ হচ্ছে। কিন্তু তোমরা যখন শুনবে বলে ঠিক করেছ তখন বলেই ফেলি। দেখ, শুধু যে মানুষ মরেই ভূত হয় তা নয়, পশুপক্ষী এমন কি কীটপতঙ্গ পর্য্যন্ত মৃত্যুর পর প্রেত-যোনি প্রাপ্ত হয়। তার প্রমাণ আমি একবার পেয়েছিলুম।

এই ত সেদিনের কথা—বড় জোর বছর-দুই হবে। ছুটির সময়, কাজের তাড়া নেই, তাই নিশ্চিন্ত মনে গী-ত মোপাসাঁর গল্পগুলো আর একবার পড়ে নিচ্ছি। আমাদের দেশের অকালপক্ব তরুণ সাহিত্যিকেরা গু-মোপাসাঁর বোধটি ষোলো আনা নিয়েছেন কিন্তু তার

গুণের কড়াক্রান্তিও পান নি। যাকে বলে, বিষের সঙ্গে খোঁজ নেই কুলোপানা চক্কর।

সে যাক্। সে-রাত্রে টেবিলে বসে একমনে পড়ছি, কেরাসিনের বাতিটা উজ্জ্বলভাবে জ্বলছে। হঠাৎ এক সময় চোখ তুলে দেখি একটা প্রকাণ্ড টিকৃটিকি কখন টেবিলের ওপর উঠে পোকা ধরে খাচ্চে। টিকৃটিকিটার স্পর্দ্ধা দেখে একেবারে অবাক হয়ে গেলুম।

জগতে যত রকম জানোয়ার আছে, আমার বিশ্বাস তার মধ্যে সব চেয়ে টিকৃটিকি বীভৎস। মাকড়শা, আরশোলা, শুঁয়োপোকা, কচ্ছপ, এমন কি ব্যাং পর্য্যন্ত আমি সহ্য করতে পারি, কিন্তু টিকৃটিকি—! জানো, টিকৃটিকির এক কাণের ভেতর দিয়ে আর এক কাণ পর্য্যন্ত পরিষ্কার দেখা যায়? তার ল্যাজ কেটে দিলে ল্যাজটা বিচ্ছিন্ন হয়ে আপনা-আপনি লাফাতে থাকে? মোট কথা, টিকৃটিকি দর্শন মাত্রেই আমার প্রাণে একটা অহেতুক আতঙ্কের সঞ্চার হয়, পেটের ভেতরটা কেমন যেন খালি হয়ে যায়, শিরদাঁড়া সিড়্সিড়্ করতে থাকে। হাসির কথা মনে হচ্ছে কিন্তু তা নয়; ডিউক্ অফ্ ওয়েলিংটনের বেরাল দেখলে ঐ রকম হ'ত।

যাহোক, টিকৃটিকিটাকে আমার টেবিলের ওপর স্বচ্ছন্দে বিচরণ করতে দেখেই আমি তড়াক্ করে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালুম, তারপর দূর থেকে তাকে একটা তাড়া দিলুম। সে ঘাড় বেঁকিয়ে আমার দিকে কটমট করে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে সব দাঁতগুলো বার করে একবার হেসে নিলে।

তাই তোমাদের জিজ্ঞাসা করছিলুম যে টিকৃটিকিকে হাস্‌তে দেখেছ কিনা। কুকুরের হাসি, বেরালের হাসি, শিম্পাঞ্জীর হাসি সম্বন্ধে অনেক বৈজ্ঞানিক গবেষণা পড়েছি কিন্তু টিকটিকি সম্বন্ধে এরকম একটা জনশ্রুতি পর্য্যন্ত কোথাও শুনেছি বলে স্মরণ হয় না।

এই টিকটিকটার মুখে বোধহয় পঞ্চাশ হাজার দাঁত ছিল; তার হাসিটা নিরতিশয় অবজ্ঞার হাসি। সে হাসির অর্থ দেখেই ত চেয়ার ছেড়ে পালালে, দূর থেকে বীরত্ব ফলাতে লজ্জা করে না?

বড় রাগ হল। একটা টিকটিকি—হোক না সে ছয় ইঞ্চি লম্বা—আমারই টেবিলের ওপর উঠে আমাকেই কিনা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে? ভারী দেখে একটা অভিধান—বোধহয় সেটা ওয়েব্‌ষ্টারের—হাত বাড়িয়ে তুলে নিয়ে তাই দিয়ে টেবিলের কোণায় দমাস্ করে এক-ঘা বসিয়ে দিলুম। টিকটিকিটা বিদ্যুতের মত ফিরে গোল গোল চোখ পাকিয়ে আমার পানে চেয়ে রইল—প্রায় দু'মিনিট! তারপর আবার সেই পঞ্চাশ হাজার দাঁত বার করে হাসি।

আমার গিন্নী পর্দ্দা ফাঁক করে পাশের ঘর থেকে আমাদের এই শব্দ ভেদী যুদ্ধ দেখ্‌ছিলেন, চুড়ীর শব্দে চেয়ে দেখি তিনিও নিঃশব্দে হাসছেন। টিকটিকি সম্বন্ধে আমার দুর্ব্বলতা তিনি আগে থেকেই জান্‌তেন।

রাগে সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে গেল। অভিধানখানা হাতেই ছিল, দুহাতে সেটা তুলে ধরে দিলুম টিকটিকি লক্ষ্য করে টেবিলের ওপর ফেলে!

হুলস্থূল কাণ্ড। ল্যাম্পটা উল্টে গিয়ে ডোম-চিম্‌নি ঝন্‌ঝন্ শব্দে ভেঙে ঘর অন্ধকার হয়ে গেল। মা রান্না-ঘর থেকে শব্দ শুনে রান্না ফেলে ছুটে এলেন; আমার ছোট ভাই পাঁচুর হিন্দুস্থানী মাষ্টার বাইরে ঘরে বসে পড়াচ্ছিল, 'ক্যাহুয়া ক্যাহুয়া' করে চেঁচাতে লাগল।

আমি চীৎকার করে ডাকলুম,—রঘুয়া, জল্‌দি একঠো লণ্ঠন লে আও।

অন্ধকারে দাঁড়িয়ে কেবলি ভয় হচ্ছিল পাছে টিকটিকিটা টেবিল থেকে নেমে এসে আমার পা বেয়ে উঠতে আরম্ভ করে!

রঘুয়া উর্দ্ধশ্বাসে লণ্ঠন নিয়ে হাজির হল। তখন দেখা গেল, ভাঙা কাঁচের মাঝখানে, বিরাট অভিধানের তলা থেকে টিকটিকির মুণ্ডটি কেবল বেরিয়ে আছে—ধড়টা পিষে ছাতু হয়ে গেছে। মুণ্ডটা একেবারে অক্ষত, যেন অভিধানের তলা থেকে গলা বাড়িয়ে আমাকে দেখছে আর অসংখ্য দাঁত বার করে একটা অত্যন্ত পৈশাচিক হাসি হাসছে!

আমার পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত দু'চার বার শিউরে শিউরে উঠল। বীভৎস মৃত দেহটাকে ফেলে দেবার হুকুম দিয়ে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লুম। সে রাত্রে আর ভাত খাবার রুচি হল না।

সমস্ত রাত্রি ঘুমের মধ্যে কতকগুলো দুঃস্বপ্ন ঘুরে ঘুরে বেড়াতে লাগল, সেগুলোকে চেতনা দিয়ে ধরাও যায় না অথচ কিছু নয় বলে উড়িয়ে দেখাও চলে না। সকালে যখন বিছানা ছেড়ে উঠলুম তখন শরীর মনে প্রফুল্লতার একান্ত অভাব।

বিরস মনে বাইরের ঘরে বসে চা খাচ্ছি হঠাৎ চোখ পড়ল টেবিলের ওপর। দেখি, দুটি ছোট ছোট ডিম্ পাশাপাশি রাখা রয়েছে। দেখতে ঠিক খড়ি-মাখানো করম্‌চার মত। ইতিপূর্ব্বে টিকটিকির ডিম কখনো দেখিনি কিন্তু বুঝতে বাকী রইল না যে এ দুটি সেই বস্তু। হাঁকাহাঁকি করে চাকরদের জেরা করলুম—কে এখানে ডিম রেখেছে? কিন্তু কেউ কিছু বলতে পারলে না, এমন কি প্রহারের ভয় দেখিয়েও তাদের কাছ থেকে কোনো কথা বার করা গেল না। তখন পেঁচোর ওপর ঘোর সন্দেহ হল। পেঁচোকে নিয়ে পড়লুম—সে শেষ পর্য্যন্ত কেঁদে ফেল্লে, কিন্তু অপরাধ স্বীকার করলে না। শাস্তি-স্বরূপ তাকে ডিম দুটো বাইরে ফেলে দেবার হুকুম দিলুম।

এ যে আমাকে ভয় দেখাবার উদ্দেশ্যে কোনো লোকের বজ্জাতি এই কথাই গোড়া থেকে আমার মনে বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে চাবি-দেয়া দেরাজ খুলেও যখন দেখলুম তার মধ্যে শাদা শাদা ক্ষুদ্রাকৃতি দুটি ডিম বিরাজ করছে তখন কেমন ধোঁকা লাগল। তাইত! এখানে ডিম কে রাখে?

তারপর দেখতে দেখতে বাড়ীময় যেন টিকটিকির ডিমের হরির লুঠ পড়ে গেল। যেদিকে তাকাই, যেখানে হাত দিই—সেইখানেই দুটি করে ডিম। হঠাৎ যেন জগতের যত স্ত্রী-টিকটিকি সবাই সঙ্কল্প করে আমার চারিপাশে ডিম পাততে সুরু করে দিয়েছে।

এম্‌নি ব্যাপার দু'দিন ধরে চলল। মন এমন সন্ত্রস্ত এবং বিভ্রান্ত হয়ে উঠল যে সহসা কোনো একটা জায়গায় হাত দিতে পর্য্যন্ত ভয় করতে লাগল, পাছে সেখান থেকে টিকটিকির ডিম বেরিয়ে পড়ে।

কিন্তু সাধারণ পাঁচজনের কাছে এ ব্যাপার এতই অকিঞ্চিৎকর যে মনের কথা কাউকে খোলসা করে বলাও যায় না। টিকটিকির ডিম দেখেছ তার আর হয়েছে কি? এ প্রশ্ন করলে তার সদুত্তর দেয়া কঠিন। আমিও নিজেকে বোঝাবার যথেষ্ট চেষ্টা করলুম, কিন্তু বিশেষ ফল হল না। বরঞ্চ সর্ব্বদা মনের মধ্যে এই কথাটাই আনাগোনা করতে লাগল যে এ ঠিক নয়, স্বাভাবিক নয়, কোথাও এর একটা গলদ আছে।

কিন্তু একটা টিকটিকিকে অপঘাত মেরে ফেলার ফলেই এই সমস্ত ব্যাপার ঘটছে সহজ-বুদ্ধিতে একথাও মেনে নেয়া যায় না। তবে কি এ?—অনেক ভেবেচিন্তে স্থির করলুম, সম্ভবতঃ যে টিকটিকিকে সেদিন অত্যন্ত অন্যায় ভাবে বধ করেছিলুম তারই গর্ভবতী বিধবা বিরহ যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে কেবলি ডিম পেড়ে বেড়াচ্ছে। এছাড়া আর যে কি হতে পারে তা ভেবে পেলুম না।

বাড়ীতে যখন মন অত্যন্ত বিভ্রান্ত হয়ে উঠেছে তখন একদিন সন্ধ্যাবেলা ভাবলুম—যাই ক্লাবে। ছুটির সময়, তোমরা কেউ এখানে ছিলে না, ক্লাব একরকম বন্ধ; তবু চাকরটাকে দিয়ে ঘর খুলিয়ে আলো জালিয়ে এই ঘরেই এসে বসলুম। টেবিলের ওপর পাৎলা একপুরু ধুলো পড়েছে; অন্যমনস্ক ভাবে একটা সিগারেট ধরিয়ে দেশালাইএর কাটিটা অ্যাশ-ট্রেতে ফেলতে গিয়ে দেখি,—ছাই ও পোড়া সিগারেটের কুচির মধ্যে দুটি ডিম।

তৎক্ষণাৎ উঠে বাড়ী চলে এলুম!

মা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন,—হ্যাঁ রে, কদিন থেকে তোর মুখখানা কেমন শুক্‌নো শুক্‌নো দেখছি—শরীর কি ভাল নেই?

আমি বললুম—হ্যাঁ—ঐ একরকম—বলে বাইরের ঘরে গিয়ে বসলুম।

ব্যাপার যে ক্রমে ঘনীভূত হয়ে আসছে তাতে আর সন্দেহ নেই। টিকটিকি-বধূর অস্তি প্রসবিতা বলে উড়িয়ে দেয়া আর অসম্ভব। এ আর কিছু নয়—ভূত, ডিমভূত! সেই প্রতিহিংসাপরায়ণ টিকটিকিটা প্রেতযোনি প্রাপ্ত হয়ে আমাকে ভয় দেখাচ্ছে; এবং ঐ ডিম ছাড়া আর কিছুতেই যে আমি ভয় পাবার লোক নয়, তা সে তার ভৌতিক বুদ্ধি দিয়ে ঠিক বুঝেছে।

ইতর প্রাণীর ওপর কেন যে আমাদের শাস্ত্রে দয়া-

দাক্ষিণ্য দেখাতে আদেশ করে গেছেন এবং কেন যে বুদ্ধদেব সামান্য ছাগলের প্রাণ বাঁচাবার জন্যে নিজের জীবন বিসর্জ্জন দিতে চেয়েছিলেন, আমার দৃষ্টান্ত দেখেও সে জ্ঞান যদি তোমাদের না হয়ে থাকে, তাহলে তোমাদের অদৃষ্টে কুম্ভীপাক নরক অনিবার্য্য। আসল কথা আমার মনে ঘোর অনুতাপ উপস্থিত হয়েছিল; অনুতপ্ত হয়ে সেই দংষ্ট্রাবহুল গতায়ু টিকটিকিকে উদ্দেশ করে কেবলি বলছিলুম—হে প্রেত! হে নিরালম্ব বায়ুভুত! যথেষ্ট হয়েছে, এইবার তোমার ডিম্ব সম্বরণ কর!

কিন্তু সম্বরণ করে কে? রাত্রে খেতে বসে ভাত ভেঙেই দেখলুম ভাতের মধ্যে দুটি সুসিদ্ধ ডিম্ব! কম্পিত কলেবরে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালুম। মা বললেন—কি হল, উঠলি যে?

শরীরের প্রবল কম্পন দমন করে বললুম—ক্ষিদে নেই—

বিছানায় শুয়ে শুনতে পেলুম মা বধূকে তিরস্কার করছেন—বোকা মেয়ে, করমচা কখনো ভাতে দিতে আছে! ওর যা ঘেন্নাটে স্বভাব, তাই দেখেই হয়ত না খেয়ে উঠে গেল।

রাত্রে এক অপূর্ব্ব স্বপ্ন দেখলুম। অপূর্ব্ব এই হিসাবে যে তার পূর্ব্বে কখনো অমন স্বপ্ন দেখিনি, এবং পরেও আর দেখবার ইচ্ছে নেই।

স্বপ্ন দেখলুম, যেন অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে বিছানায় শুয়ে পড়েছি। শোবামাত্র বুঝতে পারলুম যে বিছানায় চাদর পাতা নেই—তার বদলে আগাগোড়া টিকটিকির ডিম দিয়ে ঢাকা। আমার শরীরের চাপে ডিমগুলো ভেঙে যেতে লাগল আর তার ভেতর থেকে কালো কালো কঙ্কালসার সরীসৃপের মত লক্ষ লক্ষ টিকটিকির ছানা বেরিয়ে আমার সর্ব্বাঙ্গে চলে বেড়াতে লাগল। প্রাণপণে উঠে পালাবার চেষ্টা করলুম কিন্তু স্বপ্নে পালানো যায় না। সেইখানে পড়ে গোঁ গোঁ করতে লাগলুম আর সেই ধেড়ে টিকটিকিটা—যাকে আমি মেরে ফেলেছিলুম—আমার ঘাড় বেয়ে নাকের ওপর উঠে বসে একদৃষ্টে আমার পানে চেয়ে রইল।

গিন্নির ঠেলায় ঘুম ভেঙে দেখলুম সারা গা দিয়ে ঘাম ঝরছে এবং তখনো যেন টিকটিকির বীভৎস ছানাগুলো গা-ময় কিলবিল্ করে বেড়াচ্ছে।

ভাই, অনেক রকম দুঃস্বপ্ন আজ পর্য্যন্ত দেখেছি এবং আরো অনেক রকম দেখব সন্দেহ নেই। কিন্তু ভগবানের কাছে প্রার্থনা, এমনটি যেন আর দেখতে না হয়।

* * * *

ভয়ের যে বস্তুটা চোখ দিয়ে দেখা যায় না, যার ভয়ানকত্ব যুক্তির দ্বারা খণ্ডন করা যায় না এবং যার হাত থেকে উদ্ধার পাবার কোনো জানিত উপায় নেই, সেই বস্তুই বোধ করি জগতে সব চেয়ে ভয়ঙ্কর। ভূতের ভয় ঐ জাতীয়। তাই প্রাণের মধ্যে আমার বিভীষিকা যতই বেড়ে চলল তার হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার পন্থাটাও আমার কাছে তেমনি অজ্ঞাত রয়ে গেল। কি করব, কোথায় যাব—যেন কোনো দিকেই কিছু কিনারা পেলুম না।

এই রকম যখন মনের অবস্থা তখন একদিন ডাকে একখানা চিঠি এল। শুভেন্দু গয়া থেকে লিখেছে; চিঠি এমন কিছু নয়, 'তুমি কেমন আছ, আমি ভাল আছি' গোছের, কিন্তু হঠাৎ যেন আমার দিব্যদৃষ্টি খুলে গেল। মনে হল এ চিঠি নয়—দৈববাণী।

তৎক্ষণাৎ শুভেন্দুকে 'তার' করে দিলুম—আজই যাচ্ছি।

তারপর যথাকালে গয়ায় পৌঁছে টিকটিকির প্রেতাত্মার সদগতি সঙ্কল্প করে পিণ্ড দিলুম। গয়াতে আজ পর্য্যন্ত টিকটিকির পিণ্ডদান কেউ করেছে কি না জানি না কিন্তু সেই থেকে আমার ওপর আর কোনো উপদ্রব হয়নি।

সেই মায়ামুক্ত জীবাত্মা বোধ করি এখন দিব্যলোকে বৈকুণ্ঠের দেয়ালে উঠে পোকা ধরে ধরে খাচ্ছেন।

—

অকৃতজ্ঞ

গল্প

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম-এ, বি-টি

১

"না বাবু আপনি আর অমত কর্ব্বেন না—দুটিতে ঠিক রাধাকৃষ্ণের মত মানাবে। আর মাথার উপর আপনি রইলেন, এমন পাহাড়ের আড়ালে থাকলে বড় বড় ঝাপটার ধাক্কা গায়ে একটুও লাগবে না—আপনি পিসিমাকে ও ছোটমাকে বুঝিয়ে বল্লেই তাঁরা মত কর্ব্বেন। এমন ছেলে কিন্তু আজকালকার বাজারে মেলে না। আপনারও ছেলে নেই—তারও ত' এক বুড়ো মা ছাড়া তিনকুলে আর কেউ নেই।"

"তা ত'—সবই বুঝলুম ডাক্তার কিন্তু ওর বাপ যে ঘরামীর কাজ করেছে—এ পাড়ায় এসে অনেকরই চালে খড় গুঁজেছে সেও ত একটা মস্ত বড় কথা, পাড়ার লোকই বা বলবে কি। তাছাড়া, ছোটগিন্নির ঐ একটি মাত্র মেয়ে—তাকে চিরকালই ভাল ঘরে দেব মনে করে রেখেছি—এ হতে পারে না।"

"আপনি কি বলছেন বাবু? ঘন-শ্যামের বাপ ছিল ঘরামী—সে ত এখন আর কারও ঘর ছাইছে না। ঘনশ্যাম এখন আপনার দয়ায় একটা একটা করে তিনটা পাশ দিয়েছে—এখন আবার একসঙ্গে এম-এ ও ওকালতী পড়ছে—একি একটা যে সে কথা। পাশ কল্লে বড় একটা উকীল ত' হবেই—হয়ত হাইকোর্টের জজও হতে পারে"—

"কে হাইকোর্টের জজ হচ্ছে ডাক্তারের পো?"

"এই যে পিসিমা আসুন আসুন—আমি এই ঘনশ্যামের কথা বাবুকে বলছিলাম। সে অনেকগুলি পাশ দিয়েছে কিনা তাই বলছিলাম যে সে হয়ত ওকালতী পাশ কল্লে হাইকোর্টের জজ হতে পারে।"

"তাই নাকি—না ছেলেটা বেশ ধারালো।"

"তাই তো বাবুকে বলছি পিসিমা—আর আপনিও এসে পড়েছেন ভালই হয়েছে—এই আমি বলছিলাম কি যে এই ঘনশ্যামের সঙ্গে আমাদের এই ননীদি'র বিয়ে দিলে হয় না—দিদিরও ত আমাদের বিয়ে দেবার সময় হয়েছে—আপনি কি বলেন?"

"তুমি কি বলছো ডাক্তারের পো—ননীর সঙ্গে ঐ ঘনা'র বিয়ে—যার বাপ ছিল ঐ গিয়ে ঘরামী।"

"তাতে কি হয় পিসিমা—ঘনশ্যামের বাপ ঘরামী ছিল—সে বেটাত' ম'রে ভূত হয়ে গিয়েছে—আপনাদের ঘনা আর এখন ঘনা নেই—সে এখন ঘনশ্যামবাবু হয়েছে। সেই কথক ঠাকুরের কথা আপনার মনে আছে ত'—সেই অস্ত্র পরীক্ষা সভায় কর্ণ যখন বল্লে 'দৈবায়ত্ত কুলে জন্ম—মমায়ত্তং হি পৌরষং' তখন অত বড় রাজা ধৃতরাষ্ট্র সে পর্য্যন্ত চুপ হয়ে গেল। দুর্য্যোধন ত ছুটে এসে কর্ণকে জড়িয়ে ধল্লে—"সে কথা আপনি কি ভুলে গেছেন নাকি?"

"ভুলব কেন ডাক্তারের পো ভুলিনি—ও-সব কি আর ভোল্‌বার কথা—আমরা বিধবা মানুষ—শাস্ত্রের ঐ সব কথাই ত আমাদের এহকাল আর পরকাল। কিন্তু ও-সব শাস্ত্রের কথা ত আর এখন চল্‌বে না।"

"আপনি বলেন কি পিসিমা - শাস্ত্রের কথা চলবে না ত চলবে কি? জানেন ত আমি বামুন? আমাদের বামুনদের পেট থেকে পড়বার পরই শাস্ত্রের কথায় উঠতে বস্‌তে হয়—মুনি ঋষিদের লেখা শাস্ত্র কি কম জিনিস? যে বাড়ীতে শাস্ত্র পাঠ হয় স্বয়ং দেবতারা এসে সেই বাড়ী পাহারা দেয়—এসব কথা ত আর আপনার অজানা নয়।"

"তাত—সবি জানি ডাক্তারের পো,—কিন্তু"—

"ও সব কিন্তু টিন্তু নয় পিসিমা—ঘনশ্যামকে আপনারা চিন্তে পারেন নি—এখানে এসে ও চুপচাপ বসে থাকে বলে ওকে কম মনে কর্ব্বেন না। আমি মাসখানেক আগে নিজে ওষুধের অর্ডার দেবার জন্য কলকাতায় গিয়েছিলাম—ওর বোর্ডিংএ গিয়ে দেখা কর্ল্লুম। সে বোর্ডিং হচ্ছে চারতোলা বাড়ীতে, সর্ব্বের উপরে চারতলায়

একখানা ঘরে সে থাকে। তার সঙ্গে কত লোকের ভাব—ঘনশ্যামবাবু বলতে সবাই অজ্ঞান। পাশ করে বড় হাকিম হবে বলে এখন থেকেই লোকে ওর খোসামদ কচ্ছে। কত বড় বড় সায়েবের সঙ্গে ওর ভাব—তাদের সঙ্গে ও ফর্ ফর্ করে ইংরাজিতে কথা কয়—তাছাড়া ওর নাম ত বড় বড় লোকেদের কারও অজানা নয়—ও এখন আর কেউ কেটা নয়। বি-এ যখন পাশ কল্লে তখন সায়েবদের খবরের কাগজ—ইংরিজিতে লেখা—তাতে ওর নাম ছাপা হয়ে বেরুল—সায়েবদের খবরের কাগজ ইংরিজিতে লেখা স্বয়ং লাটসায়েব সেই কাগজ পড়েন তিনি শুদ্ধ দেখলেন ছাপা অক্ষরে বড় বড় করে লেখা রয়েছে 'শ্রীঘনশ্যাম বেরা'—এ কি যে সে কথা পিসিমা?"

"বলি হ্যাঁ ডাক্তারের পো এসব কি সত্যি কথা না সব বানিয়ে বলছ—তাহলে ত আমাদের সার্কেল ডিপুটি বাবুও ওর নাম ছাপার কাগজে পড়েছেন?"

"আরে পিসিমা আপনি বিশ্বাস কচ্ছেন না এসব কি আর যে সে কথা; সার্কেল ডেপুটি কেন বড় বড় রাজা-মহারাজা এমন কি আমাদের জেলা জজ ও ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব পর্য্যন্ত ওর নাম জানেন।"

"ও সর্ব্ব রক্ষে—তাহলে আমাদের ঘনা ত বড় কম লোক নয়—বাছা এবার এলে রাত্রে ওকে আর ভাত দেওয়া হবে না—পূজারী ঠাকুরকে বলতে হবে ঘনার জন্ম যেন এখন থেকে রাত্রে লুচির ব্যবস্থা করা হয়।"

"তাইত বলছি পিসিমা—আপনি ত সবই জানেন, সবই বোঝেন—বাবুকে ও ছোটমাকে বুঝিয়ে বলুন—এমন পাত্র যেন হাতছাড়া না হয়—এমন ছেলে পিসিমা বল্লে বিশ্বাস কর্ব্বেন না, লাখের ভেতর একটা পাওয়া যায়।"

"তাকি আমি জানিনে ডাক্তারের পো যে তুমি আমায় নতুন করে বলতে এসেছো, আমি সবই জানি। না, আমি বলছি ননীর সঙ্গে ঘনার বিয়ে দিতেই হবে। ওরে পীতু সব শুনলি ত—ঠাকুর মশায়কে খবর দিয়ে আনিয়ে একটা দিন দেখা—যত শীঘ্র হয় ওদের চার হাত এক করে দিতে হবে।"

"তা হ'লে দিদি তোমার কি ছোটগিন্নির এ বিয়েতে কোনও অমত নেই ত'? থাকে ত এখন খুলে বল—"

"এতে আবার মতামত কর্ব্বার কি আছে? ননীর আমাদের বরাৎ ভাল তাই এমন পাত্তরের হাতে পড়বে—ছোটবড়কে আমি সব বলবো—তার আবার অমত হবার কথা কি—আমি বল্লেই তার খুব মত হবে।"

সুতরাং ইহার পর বাবু পীতাম্বর ভুঁইয়া মহাশয়ের তৃতীয়া পত্নীর গর্ভজাত একমাত্র কন্যা নিস্তাননীর সহিত ঘনশ্যামের বিবাহের কথাবার্ত্তা ঠিক হইয়া গেল।

২

ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মেডিক্যাল কলেজ হইতে কৃতিত্বের সহিত এল-এম-এস পরীক্ষা পাশ করিয়া সরকারী চাকরী পাইলেও চাকরীর লোভে নিজ গ্রাম ত্যাগ করিয়া গেলেন না। নিজগ্রামে ডাক্তারখানা খুলিয়াই ব্যবসাক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। অর্থের অভাব তাঁহার বিশেষ ছিল না—অধিক অর্থের কামনাও তিনি করিতেন না; তাই ছোট বড় সকল প্রকারের লোকই বিনা দ্বিধায় তাঁহাকে ডাকিয়া পাইত। এইরূপে গ্রামের সমস্ত লোকের সুখ-দুঃখের অংশী হইয়া তিনি নিরাড়ম্বর জীবন-যাপন করিতেন। তথাপি মা লক্ষ্মীর কৃপাদৃষ্টি হইতে তিনি কোনও দিনই বঞ্চিত হন নাই। রোগীদের ঔষধ পথ্যাদির ভার লইয়াই সব সময়ে তিনি সন্তুষ্ট থাকিতেন না—অনেক গৃহস্থের অন্ন-বস্ত্রের ব্যবস্থাও তাঁহাকে করিতে হইত। তাই তাঁহার পোষ্যবর্গের সংখ্যা নিতান্ত অল্প ছিল না।

ক্ষুদিরাম বেরা হঠাৎ যখন কলেরায় আক্রান্ত হইয়া মারা গেল তখন তার ছেলে ঘনশ্যাম ঘাঁটাল হাইস্কুলের ৪র্থ শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিত। ঘনশ্যাম ছেলেটি ছিল ভাল; তাই যখন সে নীরদপুর মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় হইতে বৃত্তি পাইয়া এম-ই পরীক্ষা পাশ করিল তখন ডাক্তার সুরেন্দ্র বাবুর পরামর্শেই ক্ষুদিরাম তাহাকে চাষের কাজে না লাগাইয়া হাইস্কুলে উচ্চশিক্ষার জন্য পাঠাইয়া দিয়াছিল। বৃত্তির চারিটি টাকার উপর যাহা খরচ হইত [illegible] তাহা দিতেন। তারপর ক্ষুদিরামের [illegible] মাতাপুত্র উভয়েরই ভার লইতে হইল। [illegible]

পর এমনি করিয়াই ঘনশ্যামের অধ্যয়ন কার্য্য চলিতে লাগিল। প্রবেশিকা পরীক্ষায় ঘনশ্যাম মাসিক ১৫৲ টাকা বৃত্তি পাইল—তাহার ভবিষ্যৎ ভাবিয়া সদয় হৃদয় ডাক্তার বাবু তাহাকে প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন—এবং তাহার সমস্ত ব্যয় ভার নিজে বহন করিতে লাগিলেন। গরীবের ছেলে ঘনশ্যাম চিরকালই পাড়াগাঁয়ে মানুষ হইয়াছে, তাই হঠাৎ কলিকাতার মত সহরে আসিয়া সে নিজেকে ঠিক রাখিতে পারিল না। ডাক্তার বাবু প্রতিমাসেই নিয়মিতভাবে তাহাকে টাকা পাঠাইতেন—সেই টাকা ও নিজের বৃত্তির টাকায় সে খেয়ালমত থিয়েটার-বায়োস্কোপ দেখিয়া খরচ করিত। এ কারণে লেখাপড়ায় মনোযোগ দিবার সে সময় করিয়া উঠিতে পারিত না। সুতরাং যখন তাহার আই-এ পরীক্ষার ফল বাহির হইল তখন দেখা গেল যে সে কোনও প্রকারে প্রথম বিভাগে পাশ করিয়াছে বটে কিন্তু বৃত্তি পায় নাই। তাহার এই অমনোযোগিতার জন্য ডাক্তার বাবু তাহাকে প্রচুর তিরস্কার করিলেন এবং ভবিষ্যতের জন্য সাবধান হইতে বলিয়া প্রেসিডেন্সি কলেজেই তাহার বি-এ পড়ার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

এই প্রকারেই দিন চলিতেছিল—এমন সময়ে হঠাৎ ডাক্তার বাবুর স্ত্রী এক ভীষণ রোগে শয্যাশায়ী হইলেন। তিন মাস কাল যমরাজের সহিত যুদ্ধ করিয়া যখন ডাক্তার বাবু তাঁহাকে মরণের হাত হইতে ফিরাইয়া আনিলেন তখন তাঁহার স্ত্রীর শরীরের অবস্থানুযায়ী বায়ু পরিবর্ত্তনের আবশ্যক হইয়া উঠিল। বাঙ্গালাদেশের ছোট্ট একটি গ্রাম হইতে সুদূর ওয়াল্টারে রুগ্না স্ত্রীকে লইয়া বাহির হওয়ার যে কি ঝঞ্ঝাট তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই অবগত আছেন। ডাক্তার বাবু জমি-জমার, পোষ্যবর্গের সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া দেখিলেন এমতাবস্থায় ঘনশ্যামের কোনও ব্যবস্থা করা অসম্ভব। ঘনশ্যাম ছেলেটিকে তিনি নিজের ছেলের মতই ভাল বাসিতেন সুতরাং তাহার অবস্থার কথা স্মরণ করিয়া তিনি নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। তখন অনন্যোপায় হইয়া তিনি পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের বিপুল ধনাধিপতি জমিদার বাবু পীতাম্বর ভূঁইয়া মহাশয়ের শরণাপন্ন হইলেন।

পীতাম্বর ভূঁইয়া একজন খুব সম্পত্তিশালী ও অর্থবান লোক। ডাক্তার বাবুর নিকট নিজ প্রাণের জন্য তিনি বিশেষ ভাবে ঋণী। তিন তিন বার ডাক্তার বাবু তাঁহাকে আসন্ন মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করিয়াছেন। জগতে বোধ হয় ডাক্তার বাবুকে অদেয় তাঁহার কিছুই নাই। তাই যখন ডাক্তার বাবু ঘনশ্যামের কথা পীতাম্বর বাবুকে বলিলেন এবং নিজের অনুপস্থিতি এবং বর্ত্তমানে অর্থ-সাহায্য করিবার অসামর্থতা জ্ঞাপন করিয়া তাহার সম্বন্ধে একটা ব্যবস্থা করিবার অনুরোধ করিলেন তখন পীতাম্বর বাবু মাত্র বলিলেন, "ডাক্তার তুমি ত দেবতা—তোমাদের সব কাজই সাজে। আমরা ভিক্ষা করি নিজের জন্য কিন্তু তোমার এ ভিক্ষা যখন তোমার জন্য নহে—তোমার কোনও স্বজাতির জন্য নহে—বরং আমারই স্বজাতি একটী ছেলের জন্য তখন তোমার এ অনুরোধ আমার পক্ষে তোমার মধ্য দিয়া ভগবানের হুকুম। মাসিক কতটাকা হইলে ছেলেটির চলিবে আমায় বল, আমি ম্যানেজার বাবুকে আমার শোভাবাজারের গদির সরকারের কাছে তাহার সম্বন্ধে চিঠি পাঠাইয়া দিই।" তখন ঠিক হইল ঘনশ্যাম পীতাম্বর বাবুর শোভাবাজারের গদি হইতে মাসিক ৬০৲ হিসাবে এবং প্রয়োজন হইলে ১০০৲ টাকা পর্য্যন্ত লইতে পারিবে। এই ব্যবস্থা করিয়া ডাক্তার বাবু ওয়াল্টায়ারে চলিয়া গেলেন। এই ব্যবস্থার পর ঘনশ্যামও ডাক্তার বাবুর দয়ায় ও পীতাম্বর বাবুর অর্থে প্রেসিডেন্সি কলেজে বি-এ পড়িতে লাগিল।

পূর্ব্বের অভিজ্ঞতা এবার ঘনশ্যামকে সজাগ রাখিয়াছিল—তাই সে আর পাঠে অবহেলা করে নাই। সুতরাং বি-এ পরীক্ষা গণিতে "অনার্স" লইয়া সে খুব ভাল করিয়াই পাশ করিল। তৎপরে ডাক্তার বাবুর পরামর্শেই গণিতে এম-এ এবং ওকালতী একসঙ্গেই পড়িতে লাগিল। এমন সময়েই একদিন ডাক্তার বাবু ঘনশ্যামের বিবাহের সম্বন্ধ লইয়া পীতাম্বর বাবুর নিকট উপস্থিত হইলেন! ঘটকালী কার্য্যে তিনি কিরূপ সাফল্য লাভ করিলেন আমরা পূর্ব্বেই তাহার পরিচয় পাইয়াছি। সুদূর পল্লীগ্রামের সরলপ্রাণ অর্দ্ধশিক্ষিত নর-নারীকে কোনও কার্য্য করাইতে হইলে এইরূপ তর্ক-বিতর্ক না করিলে চলে না।

ডাক্তার বাবুর অনুগ্রহে ঘনশ্যাম রাজার মত ধনবান পীতাম্বর বাবুর—তৃতীয়া পত্নীর গর্ভজাত একমাত্র সুন্দরী কন্যা নিভাননীর পাণিগ্রহণ করিতে সক্ষম হইল। এ বিবাহে অনেকেরই আপত্তি থাকিলেও ডাক্তার বাবুর প্রস্তাব বলিয়া কেহই কিছু আপত্তি করিল না—কেননা সকলেই জানে ডাক্তারবাবু ভুলিয়াও কাহারও কিছু অনিষ্ট করেন না।

৩

যথাকালে ঘনশ্যাম এম-এ এবং বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল। পরীক্ষার ফল বাহির হইতে না হইতেই পীতাম্বর বাবু কন্যা জামাতার জন্য মেদিনীপুর স্কুল বাজারে জমি ক্রয় করিয়া ইমারৎ প্রস্তুতের যোগাড় করিতে লাগিলেন। বাটি প্রস্তুত হইলেই কন্যাকে সহরে জামাতার নিকট পাঠাইয়া দিবেন—এই বিষয়ের সমস্ত বন্দোবস্তই ঠিক হইয়া গেল। নিভাননীর মাতাও কন্যার গৃহসজ্জার সমস্ত আসবাব পত্র এবং বাসন প্রভৃতি সংগ্রহ করিতে লাগিলেন—কেন না পীতাম্বর বাবুর জামাতা উকীল হইয়া যখন সহরে বাস করিবে তখন তাহার আচার ব্যবহার এবং বাসগৃহ সঙ্গতিপন্ন লোকের মত না হইলে চলিবে কেন? সুতরাং ঘনশ্যামের মেদিনীপুরের বাটীর জন্য সকলেই উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গেল—এমন কি, পীতাম্বর বাবুও ঘন ঘন মেদিনীপুর যাইয়া গৃহ-প্রস্তুতের কর্ম্ম তদারক করিতে লাগিলেন।

ঘনশ্যামের এক দূর-সম্পর্কের আত্মীয় মেদিনীপুর কোর্টে মুহুরীর কার্য্য করিত। তাহার আয়ও নিতান্ত অল্প ছিল না। সুতরাং সহর হইতে বহুদূরে অবস্থিত তাহার নিজের ক্ষুদ্র গ্রামটিতে তাহার অসাধারণ প্রতিপত্তি ছিল। সকলেই জানিত নিবারণ মামলা-মোকর্দ্দমা তদ্বির করিলে ছয়কে নয় করিতে পারে। মামলা মোকর্দ্দমা তদ্বির থাকুক আর না থাকুক—পরের অর্থকে নিজস্ব করিবার তাহার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। তাই ঘনশ্যামের অবস্থার পরিবর্ত্তনের সময় হইতেই তাহার প্রতি সে দৃষ্টি রাখিয়াছিল। এখন যখন সে শুনিতে পাইল ঘনশ্যাম মেদিনীপুরে ওকালতী করিবে তখন তাঁহাকে দোহন করিবার ইচ্ছা নিবারণের বিশেষ বলবতী হইয়া উঠিল। এই উদ্দেশ্যে হঠাৎ অকারণ তাহার দূর-সম্পর্কের পিসি—ঘনশ্যামের মাতার জন্য তাহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। ঘনশ্যামের বাটী যাইয়া শুনিল ঘনশ্যাম তথায় থাকে না। যাহা হউক আপন উদ্দেশ্য সাধনের জন পিসিকে মেদিনীপুরের নিজ বাসায় লইয়া গেল এবং ঘনশ্যামকে দেখিবার জন্য বিশেষ উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিয়া তাহাকে এক পত্র লিখিল। ঘনশ্যাম তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে নিবারণ তাহাকে বিশেষরূপে আপ্যায়িত করিল এবং ওকালতী কার্য্যে তাহাকে প্রাণপণে সাহায্য করিবে বলিয়া প্রতিশ্রুত হইল। তাহার সাহায্য পাইয়া কোন কোন উকীল কত বড় লোক হইয়াছে ইহার নজীর সে বিস্তর উল্লেখ করিল এবং তাহার সাহায্য পাইলে তাহার ভ্রাতা ঘনশ্যামও যে একদিন খুব বড় উকীল হইবে এই কথা কথা খুব ভাল করিয়াই তাহার মাথায় প্রবেশ করাইয়া দিল। পরিশেষে ঠিক হইয়া গেল যে ঘনশ্যাম নিবারণের বাটিতে থাকিয়াই ওকালতী করিবে এবং আবশ্যক মত অর্থ সঞ্চয় করিলেই সে নিজ অর্থে বাটি প্রস্তুত করিয়া বাস করিবে। কেননা নিবারণ তাহাকে ভাল করিয়াই বুঝাইয়া দিয়াছিল 'পরভাতী বরং ভাল—কিন্তু পর ঘরা হওয়া বিশেষ অপমানজনক।' লেখাপড়া শিখিয়া একটা মানুষের মত মানুষ হইয়া ঘনশ্যামের অপমানিত হওয়া উচিত নহে। সুতরাং আপাততঃ ঘনশ্যাম তাহার স্ত্রীকে লইয়া এই বাটিতেই থাকুক—পীতাম্বরবাবু শুধু অর্থ-সাহায্য করিলেই চলিবে—তাঁহার নির্ম্মিত বাটীতে সে থাকিতে পারিবে না—ইহাই অবধারিত হইয়া গেল।

ইহার কিছুদিন পরে পীতাম্বরবাবু ঘনশ্যামের নিকট হইতে নিম্নে উদ্ধৃত পত্রখানি পাইলেন :—

মেদিনীপুর

মঙ্গলবার

"যথাবিহিত সম্মানপূর্ব্বক নিবেদন,—

আমার ভূমিষ্ঠ প্রণাম গ্রহণ করিবেন। আপনার আশীর্ব্বাদে বর্ত্তমানে এ বাটীর সমস্ত মঙ্গল। পত্রপাঠ আপনাদের কুশল জানাইয়া চিরবাধিত করিবেন।

আপনার দয়ায় আজ আমি দশজনের [illegible]

সক্ষম হইয়াছি—আপনার বহু অর্থই আমার জন্য অপব্যয়িত হইয়াছে। আমি এখন হইতে আপনার পায়ে দাঁড়াইবার চেষ্টা করিব এবং স্বোপার্জ্জিত অর্থে আপন পরিবার প্রতিপালন করিবার চেষ্টা পাইব।

আমার পূজনীয়া মাতাঠাকুরাণীর ইচ্ছা যে তাঁহার বধূমাতাকে এ বাসায় লইয়া আসেন। বর্ত্তমানে আমার সময়ের অত্যন্ত অভাব—সুতরাং অনুগ্রহ করিয়া কাহারও সহিত তাঁহাকে এ বাটিতে পাঠাইয়া দিবেন। আপনার কন্যার সুবিধার জন্য আপনার নিকট অর্থ সাহায্য লইতে আমার বিন্দুমাত্রও আপত্তি নাই।

আপনি আমার শতসহস্র প্রণাম গ্রহণ করিবেন। মাতঠাকুরাণীর ইচ্ছা যাহাতে শীঘ্র সফল হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে আজ্ঞা হয়।

বর্ত্তমানে আমি আমার মামাত' ভাই নিবারণ বাবুর বাসাতেই থাকিব।

ইতি—

প্রণতঃ ঘনশ্যাম।"

পীতাম্বরবাবু পত্রখানি পাইয়া অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইলেন এবং উত্তরে লিখিলেন—নিবারণের বাসায় তিনি তাঁহার কন্যাকে পাঠাইতে অপারগ। নূতন বাটীর নির্ম্মাণকার্য্য শেষ হইলেই তিনি স্বয়ং যাইয়া কন্যা ও জামাতাকে তথায় প্রতিষ্ঠিত করিয়া আসিবেন। ঘনশ্যাম যেন এ বিষয়ে অন্য কোনও মত না করে।

কুগ্রহের কবলে পড়িয়া মানুষ হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়ে। ঘনশ্যামেরও হইল তাহাই। তাই পীতাম্বর বাবুর পত্রোত্তরে সে লিখিল—সপ্তাহকাল মধ্যে পীতাম্বর বাবু যদি তাহার বাসায় তাহার কন্যাকে না পৌঁছাইয়া দেন ত সে আবার বিবাহ করিবে—কেননা ইহাই তাহার মাতার আদেশ—এবং এই ব্যাপার সম্বন্ধে ইহাই তাহার শেষ কথা।

তাঁহার অর্থে প্রতিপালিত একটা পথের ভিখারী আজ তাঁহাকে এইরূপভাবে অপমানিত করিতে উদ্যত হইয়াছে দেখিয়া পীতাম্বরবাবু অতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিলেন এবং ঘনশ্যামের পত্রের কোনও উত্তর দিলেন না।

এদিকে নিবারণ গোপনে সমস্ত সংবাদ পাইয়া ঘনশ্যামকে বিশেষ উত্তেজিত করিতে লাগিল এবং নিজের দূর সম্পর্কীয়া এক শ্যালিকার সহিত তাহার বিবাহের ঠিক করিয়া আপনার স্বভাবজাত কূটতর্কের দ্বারা ঘনশ্যামকে বিবাহে মত করাইল। বিবাহের দিন প্রভৃতি ঠিক করিয়া পীতাম্বরবাবুকে নিমন্ত্রণ পত্র পাঠাইল এবং শুভকর্ম্ম নির্ব্বিঘ্নে সম্পাদন করাইবার জন্য তাঁহার শুভাগমন প্রার্থনা করিল। ডাক্তারবাবুও এ নিমন্ত্রণ হইতে বঞ্চিত হইলেন না। পত্র পাইয়াই পীতাম্বরবাবু ও ডাক্তারবাবু নিভাননীকে লইয়া মেদিনীপুরে পৌঁছাইলেন এবং ঘনশ্যামের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য নিবারণবাবুর বাসায় উপস্থিত হইলেন—কিন্তু ঘনশ্যাম বা নিবারণ তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত করিল না। ভৃত্য আসিয়া বাবুদের ব্যস্ততার সংবাদ দিয়া গৃহদ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল। বিবাহের কথা যে মিথ্যা নহে তাহারও সঠিক সংবাদ পাওয়া গেল। পীতাম্বরবাবু ও ডাক্তারবাবু কাছারীতেও ঘনশ্যামের সন্ধান পাইলেন না। অবশেষে চতুর্থ দিবসে ডাক্তারবাবুর সহিত ঘনশ্যামের নদীতীরে সাক্ষাৎ হইল। ডাক্তারবাবুর অনুনয়-বিনয়েও ঘনশ্যামের মন গলিল না—সে তখন ভবিষ্যতের অনেকানেক রঙ্গিন স্বপ্নে মাতিয়া উঠিয়াছে—নিবারণের কথিত কাল্পনিক ভবিষ্যৎ জীবন সে তখন দৃঢ় বিশ্বাস করিতেছে—তাই সে অম্লান বদনে ডাক্তারবাবুকে বলিল—পীতাম্বরবাবু আমায় এবং আমার মাকে অপমানিত করিয়াছেন। সেই অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য এবং মাতৃআজ্ঞা পালন করিবার জন্য এ বিবাহ তাহাকে করিতেই হইবে। ইহার কোনও অন্যথা হইবার নহে। ডাক্তারবাবু আর কি করিবেন—স্বহস্ত বর্দ্ধিত বিষবৃক্ষের বিষময় ফলে জর্জ্জরিত হইয়া উত্তরীয়াঞ্চলে চক্ষু মুছিতে মুছিতে নীরবে স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। ঘনশ্যামও তাহার ভবিষ্যতের কথা ভাবিল না—ভাবিল না যে সে কি করিতে যাইতেছে,—ভাবিল না যে সরলা বালিকা নিভাননী তাহার নিকট কোন অপরাধে অপরাধী! নিবারণের চাটুবাক্যে প্রলুব্ধ হইয়া সে ভাবিল জগতে তাহার জীবন যাত্রার পথ ভবিষ্যতে বুঝি সে শুধু কুসুমাকীর্ণই হইবে—নিবারণ চিরকালই তাহাকে এইরূপ আপ্যায়িত করিবে—এবং অভাবের তাড়নায় আর তাহাকে জর্জ্জরিত হইতে হইবে না। তাই সে ডাক্তারবাবুর মত সদয়-হৃদয় বন্ধুর কথায় কর্ণপাত করিল না—তাই সে পীতাম্বরবাবুর মত মহৎ লোককেও গৃহদ্বার হইতে বিতাড়িত করিতে দ্বিধা-বোধ করিল না।

কিছুদিন পরেই একদিন মধ্যাহ্নে গভীর শঙ্খধ্বনি শুনিয়া চতুষ্পার্শ্বের সমস্ত লোক জানিতে পারিল দুরপনেয় কলঙ্কের কালিমায় মণ্ডিত হইয়াও ঘনশ্যাম তাহার মাতৃ-আজ্ঞা পালন করিতে সমর্থ হইয়াছে।

যৌবন-মুক্তি

(পুরাণ গল্প)

শ্রীউমাপদ ভট্টাচার্য্য

···গভীর নিস্তব্ধ বনভূমির বুকে শান্ত নির্জ্জন ঠাঁইটুকু। জ্যোৎস্না রাত্রি। চাঁদের আলোয় বনের সবুজ-কালো ছায়াঞ্চলে স্বপন মায়ার ঝিলিমিলি। তা'রি মাঝে ফুটিয়া আছে হেথায় সেথায় নানা বরণের শতেক ফুল—রূপ লেখায় আর অরূপ গন্ধে বনতলে এক মৌন-মাধুরীর জাল বুনিয়া!

জ্যোৎস্না মাখা ছায়া-বীথির তলে দু'টি মানব-মানবী। বনফুলের রুচির সজ্জায় অঙ্গ তাদের ঝলমল;—যেন বন-গহনের পুষ্প-পুরীর এই নিভৃত কক্ষে ফুলধনু আর ফুলরাণীটিই ফুল-শোভায় সাজিয়া পাশাপাশি দাঁড়াইয়া। পুষ্পোজ্জ্বল ধনুখানির উপর দেহের ভর রাখিয়া পুষ্পময়ী প্রেয়সীরই পানে বনচারী সে পুষ্পকুমার মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া!

পুষ্পধন্বা পাণ্ডুর-শ্রী এ পুরুষ হস্তিনাপতি মহারাজ পাণ্ডু; সঙ্গিনী তাঁর···দ্বিতীয়া মহিষী···অনুপম লাবণ্যময়ী রূপ-রাণী মাদ্রী।

মুগ্ধের কণ্ঠই বনবিজনের শুব্ধতা ভাঙিয়া প্রথম ডাকিল, মাদ্রি!

মুগ্ধা চকিতা তার উত্তর দিল, কেন ডাকলে রাজা?

—কী সুন্দর তুমি সেজেছ সত্যি···! এত রূপ...এত মাধুরী—, এ কি শুধুই দেখবার? এ কি শুধুই—"

সরম কুণ্ঠিতা অধীর কণ্ঠেই বাধা দিয়া বলিল,ছাই রূপ! যাও তুমি! অমন ক'রে বক্‌বে তো—

—কি কর্ব্বে, শুনি···?

প্রগল্‌ভ কণ্ঠেই উত্তর আসিল, ফেলে' দোব তোমারি দেওয়া এই পুষ্প-সজ্জা; ফেলে দোব এই দেহের আভরণ; মুছে ফেল্‌বো—

বাতাসের মাঝে শ্বসিয়া উঠিল একটা ব্যথার দীর্ঘশ্বাস! তারপর জাগিয়া উঠিল মুগ্ধের ব্যথিত, আহত বুকের ছোট্ট একটি করুণ সুর, সত্যি,...জীবনের এ কী অভিশাপ রাণি! ইচ্ছা হয়—! না থাক্···!...কিন্তু একটা কথা, মাদ্রি!

—কী?

—তোমার প্রার্থনা কুন্তীকে জানিয়েছিলাম!

—কী বল্‌লে?

—বল্লে, তুমি বড্ড লোভিনী! পুত্র লোভ তোমাকে এমনি অন্ধ করেছিল, যে, নারীত্বের স্বাভাবিক গণ্ডী ডিঙিয়ে...একই কালে তুমি দুটি দেবতার অঙ্কশায়িতা ছিলে! প্রথমবারেই তোমা দ্বারা এমনি মন্ত্রশক্তির অপব্যবহার হ'য়েছে। আর তোমাকে বিশ্বাস করা যায় না!

মাদ্রীর নিকট হইতে ইহার কোনোই প্রতিবাদ আসিল না। হয় তো তাহার বুকের আগুন বুকের ভিতরই গুমরিয়া উঠিল!

পাণ্ডু বলিল, সত্যি, তুমি অতি নির্লজ্জার মতোই ব্যবহার ক'রেছ! হয় তো অপ্রমত্ত ছিলে। কিন্তু জীবনের স্বাধীনতা তাতে সীমা ছাড়িয়েই মর্য্যাদা হারিয়েছে। কুন্তী তাই তোমার প্রার্থনাকে মঞ্জুর করে নি'।

মাদ্রী নীরবে নতনেত্রে দাঁড়াইয়া।

খানিকক্ষণ উভয়েই নির্ব্বাক। শেষে বনস্থলীর শুব্ধতা ভাঙিয়া পাণ্ডুই আবার আরম্ভ করিল, হয়তো শুনে ব্যথা পেলে! কিন্তু রাণী, নিজের ব্যথাটাকেই বড় করে না দেখে—বাইরের পানে যদি একটু চাও,—হয় তো সে ব্যথার খানিক্ লাঘব হবে।

একখানি খণ্ড মেঘে আকাশের চাঁদটিকে তখন ঢাকিয়া ফেলিতেছিল; তাহার পানে চাহিয়া পাণ্ডু সহসা বলিয়া উঠিল, ইস্,—চাঁদটা ডুবে গেল! ছোট্ট মেঘের টুকরোটিও সব অন্ধকার ক'রে ফেল্ল!

মুখের কথা ফুরাইতে না ফুরাইতেই মেঘের [illegible]

চাঁদের আলো হারাইয়া গেল। খানিকবাদে আবার জ্যোৎস্নার শুভ্রস্নিগ্ধ হাসির ঝিকিমিকি ফুটিতেই...পাণ্ডুর ব্যথিত কণ্ঠেও ভাষা ফুটিল, জীবনেও এমনি আলো-ছায়ার খেলা চলছে, দুঃখ-সুখে···হাসি-অশ্রুতে...পুলকে বিষাদে! কভু হয় সেটা এমনি ক্ষণিকের; কভু হয় দীর্ঘস্থায়ী...হয় তো বা জীবন-মৃত্যুর ব্যবধানকেও অতিক্রম ক'রে! কি,—কথা কচ্ছ না যে? শুনছো আমার কথা?

ছোট্ট মতোই একটি উত্তর আসিল, শুনছি!

—এত সংক্ষিপ্ত উত্তর···! এর চাইতে কি বড় ক'রে আর কিছু বল্‌তে পাচ্ছো না? যাক্‌,—তোমার মৌন-বেদনা বুকের তলেই তুমি গোপন রাখো। সেই ভালো! তবে অমন মলিন-মুখে না থেকে অভাগার পানে একটু প্রসন্ন দৃষ্টিতে চাও।

কৃত্রিম কোপে একটা কটাক্ষ হানিয়া মাদ্রী বলিল, যাও! কেন অমন বাজে বক্‌ছ?

তাহার চোখে চোখ রাখিয়া পাণ্ডু জবাব দিল, বাজে নয়, সুন্দরি! এই জীবনের সত্যিক ধ্বনি! প্রলাপ হলেও অন্তরের স্বপনে সে সমুজ্জ্বল! যেমন দেখা যায় দুটি একটি—পথ চল্‌তে ঘাসের ফুল!

মাদ্রী এইবার একটু আত্মস্থ হইয়াই বলিয়া উঠিল, এ কি,—আজ অমন ধারা একটা অদ্ভুত ভঙ্গীতে কথা বলছ কেন তুমি, মহারাজ?

পাণ্ডুর অন্তরটি যেন একটু হাল্‌কা হইল। বলিল, যাক্‌—এতক্ষণে তবে আমায় কতকটা বুঝেছ তুমি! বুঝেছ যে...আমি আজ একটু বদলে গেছি! সত্যি রাণী, এতদিন গোপনে গোপনে 'অন্তরের অন্তরালে' যে-রঙ সঞ্চিত হচ্ছিল, তা' আজ মনে প্রাণে, চোখে-মুখে, আশায়-ভাষায়—জীবনের প্রতিটি পত্রপল্লবের মাঝথেকেই ফুটে উঠতে চাচ্ছে! আজ আমি শুধু রূপ ভিখারী নই, দেবি,—আজ আমি তোমার রূপ-তৃষারীও বটে!

সচকিতে মাদ্রীর প্রশ্ন,—কী বল্‌ছো?

স্মিতকণ্ঠে পাণ্ডুর সকম্পিত উত্তর, বলছি—

নয়নে নয়নে রাখি' নিরখিয়া নিশিদিন না মিটল
আকাঙ্খি আশ।
রূপের-নিঝর নিতি নেহারিয়া নিরমল না ঘুচল
প্রাণের তিয়াস!

তাই আজ চাচ্ছি তোমার ঐ রূপের লাবণ্য-সরসীর হিম-জলের শীতল-অতলে ডুব গিয়ে অবগাহন-স্নানে একবার দেহমনের পিপাসা হরণ করতে!

সন্ত্রস্তা মাদ্রী ভীতিকম্পিত কণ্ঠে বলিল, এ কি,—পাগল হলে?

—না রাণী,—পাগল হই নি! জানি যে,—প্রাণের উদগ্র বাসনায় তোমার দেহলীন হ'তে গেলেই জীবন আমার ঐ দুরন্ত হাওয়ার মাঝে নিমেষে মিশে গিয়ে, তোমার নয়ন-পল্লব থেকে ঝরিয়ে যাবে অঝোর-ধারায় অশ্রু শিশির! ভুলিনি যে,—জীবন আমার এমনি অভিশাপময়! তবু চাই, তবু আমি পেতে চাই তোমার নিবিড়-স্পর্শ; তবু আমি করতে চাই তোমার দেহ থেকে জীবনের ক্ষুধা-হরণ সুধাহরণ; তবু আমি নিতে চাই তোমার রূপ-সমুদ্র মন্থন করে আমার বুকের কৌস্তুভ-মণির দীপ্ত-প্রভা।—তবু আমি চাই—চাই ঐ রূপ-সিন্ধুর এই শেষ-মন্থনের গরল পিয়ে মৃত্যুঞ্জয় হ'তে!!

ভীতি-শিহরিতা মাদ্রী বলিয়া উঠিল, কেন অমন বল্‌ছো? কেন অমন কচ্ছ তুমি, মহারাজ? জ্ঞানী তুমি, জিতেন্দ্রিয় তুমি;—এ কি তোমার মূঢ় প্রলাপ? এ কি তোমার রূঢ় সম্ভাষণ? নিশ্চিত মরণের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্যে কেন তোমার এই মুগ্ধ অভিলাষ?

পাণ্ডু জবাব দিল, তোমার ঐ ভীতি ও নীতির মাঝেই জীবনের সৃষ্টি নয়, রাণী! জীবনের প্রগতি পথেই তাদের বিকাশ আর অভ্যুদয়! জীবনই তাদের আপন খেয়ালে গড়ে ভাঙে! তাদের নিয়ে বৃথা বোঝাতে এসো না!... দু-দুটি তরুণী রূপের ডালি নিয়ে যার চোখের সামনে শুধু মাধুরী ফুটিয়েই গেল; বুকের দুয়ারে শুধু আগুনের স্বাক্ষর দিয়েই গেল; অন্তরে শুধু মধুর প্রলোভন জাগিয়েই তুল্‌লো;—কি এমন প্রয়োজন তার এই ক্ষুধা ও সুধার মাঝে দাঁড়ানো লুব্ধ, ক্ষতবিক্ষত, ভোগহীন জীবনে? জানো রাণী, অভাগের বেদনা? ঢাকতে পারো তোমার বুকে একখানা [illegible] রঙ [illegible] [illegible]

সচেতন ইন্দ্রিয়গ্রাম নিয়ে সহজ শরীরে দাঁড়িয়ে;—আর ভিতরে তারি প্রণয়িনী কার বাহু-বেষ্টনে তখন পুত্রার্থিনী হ'য়ে প্রীতি-পুলকে মুগ্ধ স্বপনময়ী!! কোন্ রক্ত তখন টগবগ করে ফুটে ওঠে ঐ জীবন্ত পুতুলের রক্তবহা পেশীর শিরায় শিরায়? সে কি প্রীতির,—না নীতির,—না, কোনো কুন্তীর? কোন্ পুরুষে সবল দেহ নিয়ে এমনি পুত্রার্থিনী প্রিয়ার চিরন্তন লীলা দেখতে?

মাদ্রী উত্তরহীনা।

পাণ্ডু বলিয়া চলিল, হস্তিনার অধীশ্বর হস্তী না মূর্খ,—সেই জানে। সে-ই শুধু দেখেছে, বা মনে-মনে কল্পনায় এঁকেছে—এমনি মধুরোজ্জ্বল কয়েকখানি ছবি! আরো আঁকতে বলো, মাদ্রি?

মাদ্রী বলিল, ক্ষমা কর নাথ, জ্ঞানহীনা মূঢ়ার সকল অপরাধ! আর আমি কিছু চাইবো না। তুমি শুধু প্রকৃতিস্থ হও, এই অভাগিনীর শেষ ভিক্ষা!

পাণ্ডু উত্তর দিল, ভিক্ষা বা ক্ষমার এতে কিছু নেই, রাণী! একজনের জীবন ব্যর্থ বা অভিশপ্ত হয়েছে বলে আর একজনের জীবনও সেই সঙ্গে তা হবে কেন? তাদের জীবনের ক্ষুধা বুকের তৃষ্ণা...তাদের ইচ্ছামতই মিটিয়ে নিতে দেওয়া সর্ব্বথা কর্ত্তব্য! তাই হস্তিনার সম্রাট নিজ থেকেই কুন্তীর দুয়ারে পুত্রার্থী হয়েছিল। সে তার মন্ত্র শক্তি প্রভাবে ধর্ম্মরাজকে আকর্ষণ করে তাঁর কাছ থেকে পেলো এক ধর্ম্মশীল পুত্র। দেখলাম, ক্ষত্রিয়োচিত গুণের চাইতে তার ভিতর ধর্ম্মজীবনের নিরীহ ভাবটিই বেশী পরিস্ফুট। এই ছলনায় আবার চাইলাম তার কাছে আর এক পুত্র! এবার ডাকলো সে মহাভীম প্রভঞ্জনকে—তার থেকে পেলো এক দুর্দ্দান্ত ভীম-কান্তি সন্তান! সেও ঠিক ক্ষত্রিয় হলো না। আবার করলাম পুত্র-ভিক্ষা। এবার দেবরাজ মহেন্দ্রের কাছ থেকে পেলো সে এক সত্যিকার বীর্য্যবান্ গুণবান্ ক্ষত্রিয় কুমার! তবু তার অন্তর পরীক্ষার জন্যে আবার তাকে পুত্রবতী হতে অনুরোধ করলাম; সে অতি-লোভকে দমন করে—জীবনের স্বাধীনতাকে সুনিয়ন্ত্রিত রেখে অস্বীকার পেলো। বুঝলাম, এ নারীর ভিতরে জীবনের তৃষ্ণা ও যৌবনের ক্ষুধার অন্তরালে আর একটা মহিমোজ্জল জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি আছে; যার কাছে আপনা থেকেই শির নত হয়ে আসে! তোমার অন্তরে-অন্তরে যে বাসনা এর মাঝে ধূমায়িত হয়ে উঠছিল, কোনোরূপ পরীক্ষার সুযোগ না দিয়েই তুমি একদিন আপনা থেকেই তা প্রকাশ করে বস্‌লে। তাই তোমার জন্যে আবার ধর্‌লাম তাকে; দিল সে দেব-প্রভাবে তোমাকেও পুত্রবতী হবার সুযোগ। মুগ্ধা অতি লুব্ধা তুমি...পারো নি, তোমার চিত্ত-চাপল্যে তার যথাযোগ্য মান রাখতে!

ক্ষুব্ধকণ্ঠে মাদ্রী বলিল, বুঝতে পারি নি—ক্ষমা কর!

পাণ্ডু বলিয়া চলিল, ক্ষমার এতে কিছু নেই, মাদ্রি! জীবনের স্বাভাবিক ধর্ম্মেই তুমি ক্রিয়াশীলা। তার উর্দ্ধে তুমি উঠে যাও নি,—বা, যেতে চাও নি! যৌবনের ক্ষুধায়—বাসনার বিলাস-প্রসাধনে আজও তোমার মন—এ অভাগোরি মতন—সজীব সচেতন। তাই তোমায় এত ভালো লাগে! কুন্তীর জীবন আজ মাতৃত্ব আর দেবীত্বের মহিমায় সমুজ্জল। সেখানে জীবনের তৃষ্ণা নিয়ে দাঁড়াতে সঙ্কোচে শির নুয়ে পড়ে। তোমার মাঝেই খুঁজে পাই আমি আমার 'মানবীয়' মনের অনু-মন! তাই তোমার জীবনতলেই নিতে এসেছি আমি আমার বুকের অবুঝ বাসনার—হয়তো বা এই শেষ বিশ্রাম!!

অনুতপ্ত স্বরে মাদ্রী শুনাইল, ভুল বুঝেছিলাম,—ভুল ভেঙেছে! এবার তোমারো ভুল ভাঙো মহারাজ!

পাণ্ডু বলিল, হয়তো সত্যিই এক কল্পিত-শঙ্কার শিহরণে ভুল তোমার ভেঙে থাকবে! হয়তো জীবন তোমার আজ কুন্তীর চাইতেও অধিক মহিমান্বিত হতেই পেরেছে! তার প্রশান্ত দিব্য-প্রভায় হয়তো এ যৌবন-পঙ্গুর জীবনের ভুলও তুমি ভাঙতে সক্ষম হতে পার! কিন্তু ভেঙে লাভ কি? কি চাও তুমি এ জীবনের-সত্যিকার দান? বেঁচে থেকে কোন্ প্রয়োজন?

মাদ্রী উত্তর দিল, তোমার মাঝে কত জীবনের আলো লুকানো, তা কি তুমি জানো না মহারাজ?

—যাদের মাঝে বহু-জীবনের আলো-অন্ধকার, হাসি-অশ্রু, সুখ-দুঃখ, পুলকব্যথা লুকিয়ে ছিল—বা লুকিয়ে থাকবে,—তারাই কি সব অমর হয়ে এসেছিল বা আসবে?

মৃদুল কণ্ঠের জবাব হইল আসে নি, আর আসবেও

না, তা ঠিক। কিন্তু স্বেচ্ছায় হয়তো কেউ তারা এমনি অকারণে মৃত্যু-বরণ করে নি, বা করবে না!

পাণ্ডু বলিল, সে প্রশ্নের মীমাংসা অতীত ভবিষ্যতেই করুক। আর জীবনকেও যে তাদেরি সাথে এক সূত্রে গাঁথতে হবে, তারও কোনো প্রয়োজন আমি দেখছি না। মোটের উপর কেউ অমর হয়ে আসি নি। অমর যখন নই-ই, তখন মৃত্যুশীল জীবনে কেন এই দুঃসহন অভিশাপ দীর্ঘকাল ব'য়ে যাওয়া? মরতে যখন হ'বেই তখন——

বাধা দিয়া ব্যথিতা মাদ্রী বলিয়া উঠিল, কেন অমঙ্গল বারবার মনে আন্‌ছো, নাথ? কেন তুমি জীবনকে এত ছোট করে দেখছ?

জীবনকে ছোট করে দেখি নি, রাণী! ছোট করেও তাকে ফেলতে চাই না! তাই তো আজ এমনি প্রাণের সহজ প্রেরণায় আমি প্রাণবন্ত;—মনের সরল কামনায় এমনি মৃত্যু ভিক্ষু!

—এ কী তোমার অদ্ভুত প্রহেলিকা, আমি যে কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না!

দৃঢ় স্বরে পাণ্ডু প্রশ্ন করিল, মরতে যখন হবেই, তখন কেমন মরণ আমার প্রার্থনা কর, রাণী?

মাদ্রী উত্তর দিল, সরল—সুন্দর—ক্ষত্রিয়োচিত বীরের মরণ!

—কিন্তু তার যে পথ বন্ধ, মুগ্ধ স্বপনময়ী! হরিণরূপী ঋষি-কুমারের অভিশাপ যে আমার জীবনের পিছনে-পিছনে ঘুরছে—তোমাদের কারো রূপের অনলে আমায় পুড়িয়ে মারবার পরিকল্পনায়। কেমন করে সে অভিশাপকে আমি এড়াব, রাণী? এ যে আমার নিজ হাতেই গড়া মৃত্যুবাণ! হায়,—কেন সেদিন মৃগয়ার কৌতুকে হরিণীর প্রেমমুগ্ধ নিরপরাধ সেই হরিণরূপী ঋষি কুমারকে মরণাহত করেছিলাম!!

বলিতেই কোন্ এক গভীর স্মৃতিতে পাণ্ডুর অন্তর-তল মথিত হইয়া উঠিল। বুক হইতে তার বড় রকমেরি একটা দীর্ঘ নিশ্বাস নামিয়া আসিল। মাদ্রীর বক্ষ ভেদ করিয়াও সেই সঙ্গে এক গভীর দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া গুৰু বনানীর নিস্তব্ধ সমীরণে স্পন্দিত হইয়া উঠিল।

খানিক দুজনেই নির্ব্বাক্!

তারপর পাণ্ডু আবার আরম্ভ করিল। রূপের অনলে পতঙ্গ হয়েই আমার পুড়ে মরতে হবে, রাণী! এই আমার অভিশপ্ত জীবনের পরিণতি! জ্যেষ্ঠতাত ভীষ্মদেবের মতোই তাই এক রকম স্বেচ্ছা মরণ আমার! ইচ্ছা করলে, তাঁরি মতো জিতেন্দ্রিয় হয়ে সাধনার বলে এ জীবনটাকে যতদূর সম্ভব দীর্ঘস্থায়ী করা যায়। কিন্তু করে লাভ? বার্দ্ধক্যে—শুভ্রকেশ, গলিত দন্ত আর লুলিত চর্ম্ম নিয়ে, বার্দ্ধক্য-শীর্ণা তোমাদেরি বা অন্য কোন লাবণ্যময়ী তরুণীর রূপভিক্ষু হয়ে ঘৃণিতের মতো মরণ-বরণ,—সে কি তোমারি অভীপ্সিত, না, কারুর সত্যিকার আকাঙ্ক্ষার জিনিষ? বলো,—সত্যি বলো, রাণী,—তাই কি স্বাভাবিক? আর তাই কি তুমি চাও?

বিষাদ-ম্লান অধর-পুটে ক্ষণিকের একটু মৃদুহাসি ফুটাইয়া মাদ্রী জবাব দিল, নিশ্চয় নয়!

—তবে?

—তোমারি মুগ্ধপ্রলাপ—

—একে তুমি প্রলাপ বল্‌ছো, নিষ্ঠুরা?

—না না,—প্রলাপ নয়,—তোমারি জীবন-বিলাপ তুমি শোনাচ্ছ; শেষটুকুও তুমিই শোনাও!

—শুনবে তো?

—এতক্ষণই যখন শুনলাম, তখন তোমার শেষ প্রশ্নের সমাধান শুনতে পার্ব্বো বৈ কি? অবিশ্যি যদি শুনতে ভালো লাগে,—আর শুনবার যোগ্য হয়! বলো তুমি।

পাণ্ডু বলিল, জীবনের আসন্ন-বিষাদকে লুকোতে গিয়ে চোখে-মুখে ব্যর্থ হাসির আভাই ফুটাতে চাচ্ছ, দুষ্টুটি! তবু বলি, ব্যথার ছায়াকে এমনি স্নিগ্ধ-হাসিতে মধুর করে নেওয়াতেও যেন জীবনে জাগে এক বিচিত্র পুলকে রোমাঞ্চন! সেইখানেই জীবন জীবন্ত; সেইখানেই প্রাণে চির-বসন্ত, সেইখানেই মন অনন্ত-যৌবনা চির-তরুণী! যাক্—

—হ্যাঁ, যাক্! এখন ঘরে চলো; আমার বড্ড ভয় কচ্ছে!

উচ্চহাস্যে পাণ্ডু বলিয়া উঠিল, ভয়! ভয় হ'লো তোমার—আমি এই সশস্ত্র জীবন্ত পুরুষটি তোমার সামনে

দাঁড়িয়ে থাক্‌তে? কিন্তু যতটুকু ভয় এখন পেয়েছ, তার চাইতেও ভীষণ ভয় যে তোমার জন্যে অপেক্ষা কচ্ছে, মাদ্রি;—তার জন্যেও প্রস্তুত হও! যখন লালসার লেলিহান শিখায় পলিতকেশ বৃদ্ধের অক্ষম্য পতঙ্গ-বৃত্তিটি আমার কাছে তুমি প্রত্যাশা করো নি রাণী,—তখন——

মাদ্রী বাধা দিল, আবার ঐ কথা?

পাণ্ডু বলিয়া চলিল, হাঁ—আবারো ঐ কথা! যখন সেটা চাও না,—তখন আজ যদি জীবনের স্বাভাবিক ধর্ম্মে প্রাণের সরল কামনায় তোমার ঐ নয়নতলে নয়ন দুটি রেখে, দেহের সনে দেহখানি মিশিয়ে জীবন-মৃত্যুর দোলন ছন্দে দুলে উঠে,—তোমার বুকেও রেখে যাই ক্ষণিকের এক বেদনানন্দের স্বপন দোলা;—বিশ্বের সহানুভূতি তাতে পাই-বা-না-পাই, জীবনের তাতে কোনো গ্লানি নেই! জ্ঞান-বৃদ্ধের দল তাতে স্বাধিকার প্রমত্ত যৌবনের চিত্ত-চাপল্যের অনিবার্য্য পরিণতি দেখে হয় তো একটু কৃপার হাসি হাসবেন! কিন্তু বার্দ্ধক্যের সে নির্লজ্জ অপরাধে অপরাধী হবার চাইতে···সে-ও জীবনের অনবদ্য সম্পদ! তাই তোমায় চাই—আজই চাই কোনো মানা শুন্‌বো না;—কোনো অনুনয়ে আর কাণ পাতবো না, রাণী!

কণ্ঠস্বর হঠাৎ নামিয়া আসিয়া কোন্ বেদনায় করুণ হইয়া উঠিল, শরতের এই জ্যোৎস্না-স্নাত পুষ্পময়ী রাত্রি;—কি সুন্দর রাণী, এর এই সৌন্দর্য্য ও আনন্দের সম্পদ! তবু কোন্ নিষ্ঠুর কোন্ নির্দ্দয় কে জানে কোন্ নির্ম্মম নিপীড়নে ফুলে ফুলে পাতায়-পাতায় ঝরিয়ে দেছে এর ক'ফোঁটা মুক্তা ধবল অশ্রু তরল শিশির জল! আনন্দের রূপোল্লাসে এ কি বেদনার সজল স্পর্শ সে বুলিয়ে চলেছে আজ! ব্যথা লাগে, ধরণীর এই মায়া-মধুর ছায়া-আলো এর মাঝে জীবনের 'দেনা-পাওনা' মিটিয়ে তোমার দেহ-তটে আঘাত হেনে হেনে' ঐ রূপ-সিন্ধুর অতল-তলে অবগাহনে নেমে চির-তরে ডুবে যাওয়ার পীড়ন বেদনায় তোমার চোখেও দুফোঁটা অশ্রু ঝরিয়ে যেতে, আজ এ বুকে সত্যিই ব্যথা লাগছে, রাণী! তবু আমি তোমায় কাঁদাতেই চাই। দুর্ব্বল ভীরুর মতো আর দূরে দূরে না থেকে বীরের মতো, ক্ষত্রিয়ের ছেলের মতোই—জীবনের সকল বীর্য্য, সকল শৌর্য্যে আজ মথিত করব তোমার দেহের শোণিত! তারি মাঝ থেকে উঠুক সুধা, উঠুক হলাহল সে হলাহলের তীব্র দাহে চলে পড়ি তারপর তোমারি উষ্ণ বুকের অশ্রু ধৌত স্নেহ-শীতল ঐ মরুস্থানে! 'মরীচিকা' আমায় ভুলায় নি,—'মরু-মায়ায়ও আমি ভুলি নি, রাণী; আমি এসেছি তোমার রূপের 'মরু-শিখায়ই আজ জ্বলে' পুড়ে' মরতে!! আমি এসেছি আজ জীবনের অভি-শাপকেই বরণ করে নিয়ে তার মাঝ থেকে জাগিয়ে তুলতে আমার অচল-যৌবনের নিরুদ্ধ প্রবাহের স্বাভাবিক গতিপথ! পালাতে চেয়ো না সুন্দরি, পারবে না! বৃথা চেষ্টা সে তোমার। ধরা দাও,—ধরা দাও এই সবল বাহু-তলে, এই তৃষিত অধর-পাশে, এই ক্ষুধিত—

কিন্তু ধরা সে সহজে দিল না। বনের সেই নিভৃত নিলয়ে গতির এক দ্রুত-স্পন্দন জাগাইয়া তুলিল—নিস্তব্ধকে খানিক ধ্বনি চঞ্চল করিয়া মুগ্ধ, লুব্ধ দয়িতকে সে খানিক-ক্ষণ তার পিছু-পিছু ছুটাইয়া লইল। তারপর কখন অকস্মাৎ কেমন করিয়া যেন সে তার সবল সক্রিয় বাহু দুটির নিবিড়-বন্ধনে বন্দিনী হইয়া, একান্ত অসহায়ার মতোই তার বক্ষতলে অবশ শিথিল দেহে ঢলিয়া পড়িল।

বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে তার মুখের পানে চাহিয়া সোহাগ-মিশ্রিত অনুযোগের স্বরে পাণ্ডু বলিল, ধরা নাকি তবে দেবে না, দুষ্টুটি?—এখন?

অধর কোণে মৃদুহাসি ফুটাইয়া বন্দিনী বলিল, কি এখন?

—এখন পালাবে কোথা?

—কোথাও না।

—তবে যে বড় পালাতে যাচ্ছিলে?

—কে বল্লে?

—অদ্ভুত প্রশ্ন! এতক্ষণ তবে ছুটোছুটি কল্লে কেন?

—কল্লম, করতে ভালো লাগলো, তাই! দেখলুম; কতক্ষণ এমনি মুগ্ধ প্রচেষ্টায় তুমি আমার পিছনে সত্যিই ছুটতে পারো! নৈলে—এতক্ষণ তোমার সঙ্গে না থেকে আমি যদি শুধুই ছুটে যেতাম, তা হলে কী তুমি আমায় ধরতে।

—তাহলে, ধরা দেবার শুভ-ইচ্ছাটাও তোমার মাঝে ছিল?

—ছিল বৈ কি!

—আপনার তুরন্ত-গতির সনে এমনি খানিক আমায় ছুটিয়ে নেবার অন্তরালে কেন যে লুকিয়েছিল তোমার সে দুরন্ত নিশ্চল রূপ, তা আমার ধারণার বাইরে! ধরা দেবার বাসনাই যদি ছিল মনের কোণে লুকিয়ে, তবে কেন এই অশান্ত অভিযানের পণ্ডশ্রম দেবি?

মাদ্রী উত্তর দিল, গতির মাঝেই জীবন গো,—গতির মাঝেই জীবনের আনন্দময় অভ্যুদয় আর বিচিত্র বিকাশ! অ-ধরাকে ধরবার বাসনায় জীবনের এই যে চিরন্তন অভিসার এর মাঝে কিছু যদি ধরা নাই পড়ে, জীবন হ'য়ে ওঠে তবে গতির অতি ক্লেশে শ্রান্ত, অবসন্ন, ক্ষুব্ধ, হতাশ, নিস্তেজ, নিষ্ক্রিয়! তাকে তাই সজীব সচেতন রাখতে মাঝে মাঝে জাগাতে হয় বৈ কি এমনি এক-আধটু মুগ্ধ আশা!

ছোট একটি নিশ্বাস ফেলিয়া পাণ্ডু বলিল, হুঁ! এই জন্যেই শুধু ধরা দিলে,—না, আরো কিছু কারণ ছিল?

ধীর কণ্ঠের উত্তর আসিল, সে কারণ তো তুমিই আগে ভেঙে দিয়েছ আমায়। তোমার নিরুদ্ধ যৌবনের মুক্তি-কল্পনায় তাকে অতি-ক্লেশের অবসাদ থেকে বাঁচিয়ে তুলতেই অবশেষে এই ধরা দেওয়া! আর—

কুতূহলী কণ্ঠে পাণ্ডু প্রশ্ন করিল, আর কি?

রক্ত ভালে লাজ-নম্রশিরে মাদ্রী বলিল, আর শুধু তো তোমার নয়,—আমারো মুগ্ধ যৌবনের সকল স্বপন, সকল বাসনা, সকল সাধনা যে তোমার সঙ্গে একই শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিতা হয়ে পথ হারা গতি হারা হয়ে বুকের নিরুদ্ধ বেদনায় অচলায়তনে বন্দিনীর বেশে পড়ে আছে! কত কাল—আর বইবো এ অভিশাপ? কতকাল বইবো এমনি—? তাই তোমায় এমনি আমার পিছু পিছু ছুটিয়ে নিয়ে জীবনের বেদনানন্দের স্বপন আলোকে দেখে নিলাম, তোমার পিছনেও এর পরে আমি সত্যই ছুটতে পার্ব্ব কি না!

পাণ্ডুর বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন ফুটিল, সত্য কি করতে চাও তুমি?

এ দেশের মেয়েরা প্রাণের দুরন্ত পুলক বাসনায় যা কত্তে পারে!

—অহু মরণ? হায় মুগ্ধ স্বপনময়ি, কালের পাথারে তিমির প্রবাহে নিরুদ্দেশের যাত্রী হয়ে কোথায় কে ভেসে যায়! সে অথৈ অন্ধকারে কোথায় আমার সন্ধান পাবে তুমি?

—জীবনের আলো, বাসনার আলো, সাধনার আলো সেখানে কি এতটুকু দীপ্তি ছড়াতেও অক্ষম?

—মহাকালের কুটিল হাস্যে নটরাজের তাণ্ডব-নৃত্যে প্রলয় ঝঞ্ঝার দমকা হাওয়ায় সে ক্ষীণ প্রদীপ নিভে যেতে কতক্ষণ?

—কাচের আবরণীর মতোই স্বচ্ছ নির্ম্মল অন্তরের অন্তরাল দিয়ে কি তাকে ঢেকে রাখা যায় না?

—তোমার ও ক্ষণভঙ্গুর কাচের আবরণও যে সে ক্ষুব্ধ-সিন্ধুর রুদ্রনাটে ভেঙে চুরমার হয়ে যাবার সম্ভাবনা! তবু স্বপন তোমার শোভন সুন্দর! তার মাঝে সত্যিকার কিছু প্রাপ্তির আনন্দ থাক্‌-বা-না থাক্‌,—সে যেন চলচ্ছন্দে অচলের বুকেও জাগিয়ে যায় এক গতির চাঞ্চল্য।

—আর সেই গতির মাঝেই জীবন; প্রগতির মাঝেই আলোকের অভ্যুদয়! তাই মনে হয়, শতবার পথহারা হয়ে শতবার নিরালোক হয়ে পথ-বিপথে ঘুরে ঘুরেও—'জীবনের লাগি জীবনের অভিসার' একেবারে ব্যর্থ না ও হতে পারে! আর অন্ধকারের অন্তরালে দাঁড়িয়ে জীবনের লাগি' জীবনের যে আকুল আহ্বান, তাও কি শুধু চিরন্তন ব্যর্থ প্রতিধ্বনি নিয়ে ফিরে আসে, সখা? তারও কি কোনো সুদূরের স্বপন-মাখা 'সাড়া' একেবারেই থাকতে নেই?

পাণ্ডু জবাব দিল, বলেছি তো স্বপন তোমার স্বপন হলেও শোভন সুন্দর! একজনের দূর লক্ষ্যে অশান্ত বাসনায় উধাও হয়ে ছুটে যাওয়া—আর একজনের পিছন হতে স্নেহ করুণ মুগ্ধ আহ্বান, ফিরে এসো, ফিরে এসো! ভাবতে সত্যি বেশ লাগে! তবে এসো সুন্দরি;—এসো আমার জীবন-মরণ, এসো আমার মানস-হরণ, এস সুন্দর, এস ভয়াল, এস রুদ্র, এস করুণ, এস শান্তি, এস ক্লান্তি, এস মধুর, এস উগ্র, এস সুধা, এস বিষ,—এসো আমার

অঙ্গে অঙ্গে, এসো আমার সঙ্গে সঙ্গে, অনাদি অনন্তকাল, বেদনানন্দে দুলে দুলে, আশায় স্বপনে ভুলে ভুলে, বিশ্ব-বিজনের সহযাত্রিণী বেশে !

উপায় হীনা মদ্ররাজ কুমারী মুগ্ধ দয়িতের বাহু বেষ্টনে এমনি করিয়াই ধরা দিল। হইল তাহাদের দেহের সনে দেহ লীন, নয়নতলে নয়ন নীল ! ভাঙ্গিয়া গেল তারপর নিমেষেই ক্ষণিকের মোহ, ক্ষণিকের স্বপন !

আকাশের চাঁদের চোখে—আর বন ভূমের তরুণীর চোখে কে পরাইয়া দিল খানিক ব্যথার কাজল। ঝরঝর্ করিয়া ঝরিয়া পড়িল তারি স্পর্শে বনের বিজনে তাহাদের চোখের জল !

এক দম্‌কা ঠাণ্ডা বাতাস হা হা করিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া অসহায়ের মতোই ঝাঁপাইয়া পড়িল অরণ্যের নিস্তব্ধ বক্ষে !!

—···—

ব্যথিতা

গল্প

শ্রীরেণুকা সিংহ

১

সরু গলির পাশে মাঝারি গোছের দোতলা একখানি বাড়ী। অমিয়া ক'দিন ধরে দেখছে বাড়ীটাতে প্রায়ই লোক আসা-যাওয়া করে ; এক বছর হোল বাড়ীখানি খালি পড়ে আছে। আজ এতদিন পরে তার ভাড়াটে আসছে বলে' বাড়ীওয়ালার তো আনন্দ হ'বার কথাই, কিন্তু সেই সঙ্গে অমিয়ারও যেন আনন্দে বুকখানা ভরে উঠেছিল।

তার কারণ,—অমিয়ার বাড়ীতে গল্প করবার কোন সমবয়স্কা সঙ্গিনী ছিল না ! বাড়ীতে, মাত্র তার স্বামী রমেন, বৃদ্ধা খাশুড়ি এবং সে, এই তিনটী প্রাণীর বাস—অবশ্য দাস-দাসীর কথা আলাদা।

রমেন ডাক্তার, কয়েক বৎসর ডাক্তারী 'পাস' করে প্র্যাক্‌টিস করছে।

২

অমিয়ার শোবার এবং বস্‌বার ঘর থেকে দোতলা বাড়ীর সবখানিই বেশ স্পষ্টভাবে দেখা যায়।

সে প্রত্যহ দুপুরবেলা কাজকর্ম্মাদি সারা হয়ে গেলে, জানালার ধারে সেলাই নিয়ে বসে এবং তার মানস-পটের কল্পিত সঙ্গিনীকে ঐ ভাড়াটে বাড়ীর মধ্যে বাস্তব সঙ্গিনীর মূর্ত্তিরূপে দেখবার জন্য উৎসুক নয়নে সেদিকে চেয়ে থাকে ; কিন্তু কোনদিনই তার সন্ধান মেলেনা। তবে, প্রত্যহই সে দেখে যে, তারই সমবয়স্কা একটি মেয়ে জানালার ধারে এসে কেবলি দাঁড়ায় এবং তার ঘরের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। অমিয়া মেয়েটার এই রকম অসভ্যর মত চেয়ে থাকাটাকে মোটেই পছন্দ করে না। একদিন সে মনে মনে দৃঢ়সঙ্কল্প করলে যে, আজ সে যেমন কোরেই হোক মেয়েটার সঙ্গে নিশ্চয় আলাপ করবে।

সেইদিন দুপুরে মেয়েটী যখন জানালার ধারে দাঁড়িয়েছিল, তখন অমিয়াও জানালা খুলে তার সঙ্গে আলাপ কর্‌বার জন্য গিয়ে দাঁড়াল ; কিন্তু মেয়েটী কথা বলা দূরে থাক, আস্তে আস্তে জানালার ধার থেকে সরে গেলো। এই দেখে অমিয়ার মনটা ভীষণ বিরক্তিতে পূর্ণ হ'য়ে উঠল। এই সব নানা কারণে তার সেই মেয়েটীর সঙ্গে আলাপের স্পৃহাও একেবারে চলে গেল।

দুপুরবেলা ; রমেন ডাক্তারখানা থেকে ফিরে স্নানাদি সেরে বিছানায় বিশ্রামসুখে মগ্ন ছিল ; অমিয়া তখন একটা কাজের জন্য ঘরে এসেছিল। হঠাৎ পাশের বাড়ীর দিকে চোখ পড়তে সে দেখলে যে, সেই মেয়েটী জানালায় কাছে দাঁড়িয়ে তাদের দেখছে ; তার সারা মনটা বিরক্ত হ'য়ে উঠল। সে রমেনকে বল্লে, "দেখ, মেয়েটী কি রকম অসভ্যর মত আমাদের দিকে চেয়ে রয়েছে, অথচ [illegible] করতে গেলে জানালার ধার থেকে [illegible] অসভ্য কিন্তু।"

রমেন অমিয়ার দিকে তাকিয়ে হেসে বল্লে, "তা কি আর হবে বল? ও যদি আমাদের দেখে একটু আনন্দ পায় তো দেখুকই না, তাতে আমাদের আর কি এসে যায়?" রমেনকে অপরের পক্ষ সমর্থন কর্‌তে দেখে অমিয়া মনে মনে আরো চটে গেল; কিন্তু মুখে আর কিছু না বলে মুখটা ভারী করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। রমেন সহাস্য নয়নে অমিয়ার গমনপথের দিকে তাকিয়ে রইল।

৩

গভীর রাত্রি, চারিদিক নিস্তব্ধ, কেবল মাঝে মাঝে এক একটা পথের কুকুর তাদের বিকট ঘেউ ঘেউ রবে রজনীর শান্তিময়ী নীরবতাকে ভয়ঙ্কর শব্দায়িত করে তুল্‌ছে।

এমন সময় একটি লোক ডাক্‌লেন, "ডাক্তার বাবু, বাড়ী আছেন?" দু'তিনবার এই রকম ডাকাডাকির পর রমেনের ঘুম ভেঙে গেল; সে বিছানা ছেড়ে উঠে ঘরের দরজা খুলে একেবারে বারান্দায় বেরিয়ে এসে বল্লে "কোত্থেকে আস্‌ছেন?"

ভদ্রলোকটী ব্যস্তভাবে উত্তর দিলেন "এই পাশের বাড়ী থেকে—আমি অবনী বাবু; আপনি দয়া করে একটু শীগগির আস্‌বেন বড় বিপদ।"

রমেন অমিয়াকে ডেকে দিয়ে এবং গায়ের ওপর একটি শার্ট চড়াতে চড়াতে, ষ্টেথিসকোপটি, নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

রাস্তায় যেতে যেতে সে অবনীবাবুর কাছে শুন্‌লো যে, তাঁর মেয়ের কলেরার মত হয়েছে। তিনি আরো অনেক কথা বল্‌তে বল্‌তে রমেনকে একেবারে রোগিণীর ঘরে এনে উপস্থিত কর্‌লেন। ঘরের মধ্যে একটি ক্ষীণ বৈদ্যুতিক আলো জলছিল। একটি মেয়ে অজ্ঞানের মত হয়ে তক্তার উপর শুয়ে আছে এবং একটি মহিলা তার মাথার কাছে বসে বাতাস কর্‌ছেন। রমেন আস্তে আস্তে রোগিণীর হাতের নাড়ী পরীক্ষা কর্‌লে এবং তাকে ভাল করে পর্য্যবেক্ষণ করে পাশের একটি ছোট ঘরে এসে বস্‌ল। একটা 'প্রেসক্রিপসান' লিখে অবনীবাবুকে দিয়ে বল্লে, "তাড়াতাড়ি এই ওষুধটা আন্‌তে দিন, আমি এইখানেই আছি।" অবনীবাবু চাকরকে ওষুধ আন্‌তে দিয়ে, ডাক্তার বাবুর কাছে বসে কন্যার সম্বন্ধে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন, অবশেষে রমেনের হাত দু'টী ধরে কাতরভাবে বল্লেন, "ডাক্তার বাবু আমার মেয়েকে বাঁচিয়ে দিন।"

রমেন তাঁকে শান্ত করে বল্লে, "দেখুন, আপনি অমন অধীর হবেন না, আমার যতদূর সাধ্য তা' আমি কর্‌ছি এবং কর্‌বোও—তারপর ভগবানের হাত।" রমেন মধ্যে মধ্যে গিয়ে রোগিণীকে দেখে ওষুধ খাইয়ে আবার পাশের ঘরখানিতে এসে বসছিল। অবনী বাবু কন্যার সম্বন্ধে আরো অনেক কথাই বলে যেতে লাগলেন। তার ভাবার্থ এই যে, "তিনি তাঁর কন্যার ৯ বৎসর বয়সে এক অবস্থাপন্ন জমিদারের ঘরে বিবাহ দেন এবং জামাইটীও স্বভাব চরিত্র সব দিক দিয়ে খুব ভাল হয়; কিন্তু তাঁদের ভাগ্যদোষে এবং অভাগিনী তার নিজের ভাগ্যদোষে এ সমস্ত অতি অকালে হারিয়ে ফেলে; মাত্র ১০ বৎসর বয়সে সে বিধবা হয়; সেই থেকে সে তার পিতামাতার কাছেই থাকে;—আজ এই ৬ বৎসর ধরে তাঁরা এই মেয়েটীকে নিয়ে বিধাতার কঠোর শাস্তি ভোগ কর্‌ছেন।"—কথাগুলি বল্‌তে বল্‌তে অবনীবাবুর গলার স্বর ভারি হয়ে এল, চোখ দিয়ে তাঁর টস্ টস্ করে জল গড়িয়ে পড়ল, তিনি কোঁচার খুঁটে চোখ মুছলেন; রমেনেরও মনটা বড় ব্যথিত হয়ে পড়ল। সে বুঝতে পারলে যে, এই মেয়েটীর কথাই অমিয়া প্রত্যহ তাকে বল্‌তো।

খানিকক্ষণ পরে আবার সে রোগিণীকে দেখতে গেল এবং নানারকম চেষ্টা কর্‌তে লাগল—তার জ্ঞান হ'বার জন্য; কিন্তু সমস্ত চেষ্টাই বৃথা হ'তে চল্‌ল; মেয়েটীর হাত পায়ের তলা ক্রমশঃ বরফের মত ঠাণ্ডা হতে লাগল। ওপার থেকে তখন তার প্রভুর ডাক এসেছে, সে এপারের শত চেষ্টা, পিতামাতার সহস্র যত্ন উপেক্ষা করে তার দেবতার সঙ্গে মিলিত হ'বার জন্য ছুটে চলেছে। ক্রমে ঘরে ঘরে রজনীর দীপ নেভার সঙ্গে সঙ্গে অভাগিনীর জীবন-প্রদীপও চিরদিনের জন্য নির্ব্বাপিত হ'য়ে গেল। অটুট মিলনের আনন্দে অভাগিনীর মুখখানি তখন উষার অরুণোদয়ের মতই দীপ্ত হ'য়ে উঠল। রমেন খানিকক্ষণ

বসে ধীরে ধীরে সেই বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়ল। তার সারা মনটা তখন বেদনায় ভারাক্রান্ত হ'য়ে উঠেছে।

সে বাড়ীতে এসে তার ঘরের বিছানায় শুয়ে পড়ল। অমিয়ারও তখন পাশের বাড়ীর কান্নার শব্দে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল; সে ব্যস্তভাবে স্বামীকে জিজ্ঞাসা করলে "ও বাড়ীতে কার কি হয়েছে?"

রমেন ব্যথিতস্বরে বল্লে "সেই মেয়েটা মারা গেছে" এবং একে একে মেয়েটীর সম্বন্ধে সব কথাই বল্‌তে লাগল। অমিয়ার বুকে কে যেন দুম্ করে এক ঘা হাতুড়ি মারল। সে তখন বুঝতে পারলে যে, কেন মেয়েটী তাদের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকত।

অভাগিনী তার এজন্মে কোনদিন স্বামীর পবি ভালবাসার আস্বাদ পায়নি, তাই বুঝি তাদের মিলনকে ে অবাক হ'য়ে চেয়ে দেখতো। আগেকার সেই কথাগুলে মনে করে আমরা মনে মনে বড়ই ব্যথিতা হয়ে পড়ল যার বিষয় নিয়ে কতদিন সে উপহাসচ্ছলে কত কথ বলেছে, আজ তারই আকস্মিক মৃত্যুসংবাদে সে যে নির্ব্বাক হয়ে গেল; শুধু অজ্ঞাতে তার চোখ দিয়ে কয়েক ফোঁটা সমবেদনার অশ্রুজল নীরবে গাল দু'টী ভিজিয়ে দিতে লাগল।

পথিক্

মিসেস্ আবু রহমান

মোর্ হৃদয়ের রুদ্ধ দ্বারে
খুল্‌তে এলে আঘাত করে
কোন্ বিদেশী পথিক্ তুমি?
পথের ধূলা দূর্ব্বা ঘাসে
বাঁকা পথ বনের পাশে
ধন্য তোমার চরণ-চুমি!

আধ্ ফোটা ফুল গন্ধ ঢেলে
লুটিয়ে হৃদয় চরণ তলে
ডাক্‌ছে ঐ চোখ্-ইশারায়
কিশোর লতা সোহাগ ভরে
ফুটিয়ে ফুল থরে-থরে
দুলছে ভোরে মৃদুল-বায়।

তাগদা

ভ্রমণ

শ্রীপ্রতীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী

পূজার ছুটীতে এবার আমরা যখন দার্জ্জিলিং ছিলাম, সেই সময় আমাদের এক মতলব হ'লো যে, তাগদাটা একবার দেখে এলে ভাল হয়। যাঁরা দার্জ্জিলিং গেছেন, তাঁরা অনেকেই হয়ত তাগদার নাম শুনে থাকতে পারেন। তাগদা একটী ছোট পার্ব্বতীয় উপত্যকা। ঘুম ষ্টেশন থেকে এই স্থানের দূরত্ব ১০ মাইল মাত্র। ইহার উচ্চতা প্রায় কার্শিয়ং-এর সমান অর্থাৎ ৫০০০ হাজার ফুট। পূর্ব্বে বঙ্গীয় সরকার এখানে একটি সৈন্যনিবাস স্থাপন করেছিলেন। স্থানটি খুব নির্জ্জন হওয়ায়, এবং বায়োস্কোপ ইত্যাদি কোন প্রকার আমোদ-প্রমোদের সুবিধা না থাকায় কয়েকজন সৈনিক নেহাৎ একঘেয়ে জীবনের হস্ত হতে আত্মাকে রক্ষা করবার জন্য আত্মঘাতী হয়। এইজন্যই সরকার পক্ষ বাধ্য হয়ে সেনা-নিবাসটী তুলে দেন।

তাগদা নির্জ্জন হ'লেও, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যসম্পদে খুবই গৌরবময়। ইহার একদিকে তিনটি প্রশস্ত উপত্যকা ভূমি, তিস্তা, রন্‌গীদ ও ন্যাপ্‌লাঙ ভ্যালি মিলিত হয়ে ভ্যালীর ত্রিবেণী সৃষ্টি করেছে। আর একদিকে গিরিরাজ হিমালয়ের শ্রেষ্ঠ শৃঙ্গ কাঞ্চনজঙ্ঘা নগ্নমূর্ত্তিতে দণ্ডায়মান থেকে দর্শককে মোহিত ও অদ্ভুত ভাবে আকর্ষণ করে। তাগদার উপর থেকে কার্শিয়ং ও শিলিগুড়ি দেখতে পাওয়া যায়। দূরে গাছের তলায়, পাহাড়ের নীচে যখন লাল সূর্য্য অস্ত যায়, তখন এক অভাবনীয় সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি হয়। তীস্তা নদী কালিদাসের তমালতালি বনরাজী নীলার ন্যায় প্রতীয়মান হয়।

পরামর্শের পর আমি বিন'দাকে আমার ইচ্ছার কথা বললে, বিন'দা খুব আগ্রহ সহকারেই রাজী হন। তাঁর রাজী হবার বিশেষ কারণও ছিল। বিন'দার ভায়রাভাই মিঃ মিত্র তখন তাগদায় বাস করছিলেন। মিঃ ডি, এন মিত্র কলিকাতায় হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারি করেন। মিঃ ডি, এন, মিত্র আমার অগ্রজ বিনদা উভয়ে মিঃ কে, সি, দের জামাতা। মিঃ দে ও মিঃ মিত্র তাগদায় জমি সংগ্রহ করে প্রাসাদ-সম বাসগৃহ নির্ম্মাণ করেছেন। বিন'দা পরামর্শ দিলেন যে পত্র লিখে যাওয়া ভাল, তাহ'লে সকাল বেলা, দার্জ্জিলিং থেকে রওনা হয়ে সেখানে গিয়ে আমরা 'লাঞ্চ' কর্ত্তে পারবো।

তাগদা

ইচ্ছানুসারে অনেক সময়েই বাঞ্ছিত দ্রব্য পাওয়া যায়, তারই প্রত্যক্ষ ফল আমাদের ফল্‌লো। মিঃ মিত্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা সেইদিনেই আমাদের সিতামারীর বাড়ীতে এসে তাগদায় যাবার নিমন্ত্রণ করে গেলেন। আমরা অনু

একটু মুচকে হেসে তাঁর আমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম। ঠিক হল, পরশু দিন সকাল বেলা, আমি, মাষ্টার মশাই, বিন'দা ও বিন'দার এক বন্ধু বিন'দার নূতন Plymouthএ চ'ড়ে তাগদায় রওনা হব। বাবার কাছে অনুমতি চাইতেই পাওয়া গেল।

সকাল বেলা উঠেই চা খেয়ে, পোষাক পরে বিন'দা আমাকে ডাকলেন। আমি ও মাষ্টার মশাই প্রস্তুতই ছিলাম। বিন'দার বন্ধুটীও আগে থেকে এসে অপেক্ষা করছিলেন। আমরা সকলে গিয়ে মোটরে উঠতেই, বিন'দা ড্রাইভারকে পাশে বসিয়ে স্বয়ং হুইলটা ঘুরিয়ে গাড়ী ষ্টার্ট করে দিলেন। গাড়ীখানা যথাসময়ে ঘুম পরিত্যাগ করে তাগদার আঁকা-বাঁকা পথ ধরলো। পথটা যেমন নির্জ্জন তিনটা বস্তী আছে। বস্তী তিনটি দুই মাইল অন্তর অবস্থিত। প্রথম বস্তীটী মরুভূমি বিশেষ, মাত্র কয়েক খানা ঘর আছে, কোন দ্রব্যাদি পাওয়া যায় বলে বোধ হল না। দ্বিতীয় বস্তীটীর নামই চারি মাইল, 'ঘুম' হতে চারি মাইল দূরে অবস্থিত। এ জায়গাটা অনেকটা প্রশস্ত। এখানে কতকগুলি বাড়ীও আছে। এখান থেকে তাগদা যাবার রাস্তাটা একটা দ্রুত বাঁকা পথ। এই বাঁকা পথে আমাদের গাড়ীখানা নামতে আরম্ভ করলে আমরা সকলেই ভয় পেলাম—কেননা, সম্মুখে কোন গাড়ী এলেই মুস্কিল, রাস্তাটা এত সঙ্কীর্ণ যে দুখানা গাড়ী পাশাপাশি যেতে পারে এমন পরিসর নাই। বিন'দা কিন্তু কিছুমাত্র ভয় পান্ নাই। খুব পাকা ড্রাইভারের

মিঃ মিত্রের বাড়ী

তেমনি ঘুরানো, spiral staircase এর মত ঘুরে ঘুরে নেমে চলেছে। তবে ঘুম ছাড়লেই বাঁ দিকে কাঞ্চনজঙ্ঘার যে দৃশ্য দেখলাম তার তুলনা হয় না। সেদিন আকাশ খুব পরিষ্কার ছিল। আমরা ডানদিকে দেখলাম খালি পাহাড়ের স্তূপ ও বরফের গভীর সরলরেখা। যতদূর দৃষ্টি চলে ততদূর ঐ সরল রেখা নেত্রপথে পড়ে, যেন তার শেষ নাই। পথে একটা স্তূপ দেখলাম, শৈব ধর্ম্মের নিদর্শন বলেই বোধ হল। বিনদ'াকে গাড়ীখানা থামাতে বল্লুম, স্তূপটার একটা ফটো নেবো বলে, বিন'দা বাঁকের মুখে গাড়ী থামাতে রাজী না হওয়ায় স্তূপটার আর ফটো নেওয়া হলো না। ঘুম ও তাগদার রাস্তা মত হুইলটাকে ধরে ইলেক্‌ট্রিক বেল বাজিয়ে ওয়াটালুঁ বিজয়ী বীরের মত গাড়ী হাঁকিয়ে চল্‌লেন ক্রমশঃ আমাদের ভয়ের মাত্রাটাও কমে এল। এই পথের স্মৃতটা রাখবার জন্য গাড়ীখানা থামিয়ে পথের একটা ফটো তোলা হয়।

বেলা প্রায় সাড়ে দশটার সময় আমরা তাগদায় উপস্থিত হ'লাম। তাগদা শিলংএর মত কয়েকটী [illegible] পর পর সমন্বয় সৃষ্টি, উপরকার উপত্যকায় তাগদা [illegible] এবং কয়েকটী বসতবাটী আছে। এই [illegible] দ্বিতীয় ঘরটির মুখে আমাদের গাড়ী রেখে [illegible] দ্বিতীয় উপত্যকায় উপস্থিত হলাম। দ্বিতীয় [illegible]

প্রবেশ করতে গেলেই প্রথমেই মিঃ কে, সি, দের বাড়ী দেখতে পাওয়া যায়। এই বাড়ীখানি দেখাবার জন্য বিন'দা

তাগদা

আমাদের সকলকে সঙ্গে করে মিঃ দের গৃহমধ্যে প্রবেশ করলেন। মিষ্টার দে'র বাড়ীখানি বেশ সুন্দর, সম্মুখেই ঢালু আরম্ভ হওয়ায় সমস্ত পথটাই খোলা। দার্জ্জিলিং অপেক্ষা তাগদা অনেক বেশী sunny। আমরা দার্জ্জিলিং থেকে গরম জামা কাপড় পরে বের হয়েছিলাম। তাগদায় এসে বেশ গরম বলে বোধ হতে লাগলো। গলার বোতাম গুলো খুলে দিলেও গরমটা কিন্তু কম্‌লো না।

মিঃ মিটারের ছোট ভাই এখানে আমাদের অভ্যর্থনা ক'রে নিয়ে যাবার জন্য দৌড়ে এলেন। তাঁকে আমরা প্রথমেই জিজ্ঞাসা করলাম, এখানে কি গরম? তিনি বল্লেন, "দার্জ্জিলিং অপেক্ষা শীত একটু কম।" বিনদার এক

প্রফেসার মিঃ দের বাড়ীতে ব'সেছিলেন। তিনি তাঁর প্রিয় শিষ্যকে উপস্থিত দেখে, তাকে আপন বাসস্থানে নিয়ে যাবার লোভ সামলাতে পারলেন না। বিনুদা আমাদের এগোতে বলে, তাঁর সঙ্গে উপরের উপত্যকায় চলে গেলেন, আমরা মিঃ মিত্রের ছোট ভাইয়ের সঙ্গে মিঃ মিত্রের আবাসস্থানে গিয়ে উপস্থিত হলাম।

এখানে যে অভ্যর্থনা পেলাম তা অভাবনীয়। লাট সাহেবকে আহ্বান করতে লোকে যেমন ব্যস্ত হয় এবং খাবার ইত্যাদি প্রস্তুত করে, সেইরূপ অভ্যর্থনা পেলাম এবং শুনলাম আমাদের 'লাঞ্চের' আয়োজন পূর্ব্ব বর্ণনানুযায়ী। পূর্ব্বরাত্রে মাষ্টার মশায়ের farewellএর জন্য

প্রাকৃতিক উষ্ণ প্রস্রবন

আমাদের পিতামাতার বাড়ীতে একটু ডিনারের বন্দোবস্ত ছিল। কাজেই আমরা সকলেই অল্প-বিস্তর অর্ধ ছিলাম। মিসেস মিত্র বিশেষ ব্যস্ত হয়ে আমাকে বড় অনির

মত স্নেহ করে ঘরে তুললেন। তাঁর প্রথম অভিযোগই হ'লো, এত কাছে থেকে আমরা তাঁদের বাড়ী দেখতে আসি না কেন। আমি একটু কুণ্ঠিত হ'য়ে আমার দোষ স্বীকার কর্ত্তে তিনি আনন্দে উৎফুল্ল হ'য়ে উঠে তাঁদের বাড়ীখানা আমাকে দেখাতে লাগলেন।

মিঃ মিত্রের বাড়ীখানা ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের লেকের বাড়ীরই অনেকটা অনুরূপ। এই বাড়ীর একদিকে গো-মুখীর ন্যায় খরস্রোতা একটী ঝরণা অনবরত বারি-ধারা বমন করে চলেছে, সম্মুখে ভীষণ ঢালু সীমাহীন অনন্ত সৃজন করে এক নূতন দৃশ্যের সৃজন করেছে। অপর পার্শ্বে কাঞ্চনজঙ্ঘার চির তুহিন শৃঙ্গরাজী বরফের সীমাহীন শ্বেত সরল রেখা আকাশ মার্গে অঙ্কন করে দিয়েছে। আমি কবি নই, নতুবা এই বাড়ীখানি নিয়ে একটী কবিতা রচনা করতে পারতাম। শিল্পী হ'লে তুলির সাহায্যে গৃহখানিকে অমরত্ব প্রদান করতে পারতাম। আমি

কাঞ্চন-জঙ্ঘা

একজন ক্ষুদ্র মানব, আমার শক্তি ততোধিক ক্ষুদ্র হওয়ায় বাড়ীখানাকে ক্যামেরার মধ্যে আবদ্ধ করে পাঠকগণকে উপহার দিলাম। আর একখানি চিত্রে যে ফোয়ারাটা রয়েছে, উহাই স্বাভাবিক ঝরণা।

আমরা যখন চারিদিক দেখে ঘুরে বেড়াচ্ছি তখন বিনদা ছাড় পেয়ে আমাদের সঙ্গে মিলিত হন। মিসেস মিত্র এসে আমাদিগকে পাকড়া করে খাওয়াতে নিয়ে গেলেন। এক প্রশস্ত গৃহে, প্রকাণ্ড টেবিলের চারিধারে আমরা বসে পড়লাম! মিসেস মিত্র স্বয়ং উপস্থিত থেকে

সিংবালী

আমাদের খাওয়াতে লাগলেন। তাঁর আদর ও অভ্যর্থনা কখনই ভুলবো না। বিনদার বন্ধুটী গতরাত্রের গুরু-ভোজনের জন্য বিশেষ জখম থাকায় তাঁকে তিনি সরিয়ে নিয়ে গিয়ে মিঃ মিত্রের আফিস ঘরে বসিয়ে রাখলেন। আমরা বরং বলেছিলাম যে তিনি আমাদের সঙ্গেই টেবিলে বসে থাকুন, মিসেস মিত্র বল্লেন, সেটা কিছুতেই Prudent হ'তে পারে না। খাবার সম্মুখে থাকলেই, ভোজনের স্পৃহা আসবে, স্থানান্তরে বসে থাকাই ভাল। কথাটা খুবই যুক্তিসঙ্গত ব'লে আমরা সকলেই মিসেস্ মিত্রের পরামর্শ গ্রহণ কর্ত্তে তাঁকে বলি। Menu কার্ডটা আর দোব না, কেননা ভ্রমণ-কাহিনীর সঙ্গে সেটা বড় সঙ্গত হবে না, তবু এটুকু [illegible] খাবার সকল প্রকার উপাদানই ছিল। [illegible]

মাছ, মাংস খান না, তাঁকে নিরামিষ পোলোয়া থেকে আরম্ভ করে সকল প্রকার নিরামিষ তরকারী দেওয়া হয়েছিল।

এবার আমাদের বিদায়ের পালা পড়লো। মিষ্টার মিত্র আমাদিগকে খুব যত্ন করে তাঁর বাড়ীখানি দেখাতে

কাঞ্চন জঙ্ঘার তুষার দৃশ্য

লাগলেন। তাঁর শোবার ঘর ও আফিসটী বাস্তবিকই সুরুচি পরিচায়ক। তাগদা স্থানটী তাঁর মুখে শুনলাম ক্রমশঃ জনপ্রিয় হইয়া উঠেছে। পূর্ব্বে এই দুর্গম স্থানে কেউ আসতে চাইতেন না। মিঃ কে, সি দেই এখানে বসতি স্থাপন কর্ব্বার জন্য প্রথমে উদ্যোগী হ'ন। তাঁর কাছ থেকে প্রেরণা পেয়ে ক্রমে ক্রমে অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিই এখানে বাস স্থাপন করছেন। ভূতপূর্ব্ব Excise Commissioner মিঃ রাহা, হ্যাপিভ্যালির মালিক মিঃ বানার্জ্জী প্রভৃতি ৪০ জন বাঙ্গালী এখানে বাংলো নির্ম্মাণ করেছেন। ভোজ্য দ্রব্যের অধিকাংশই এখানে পাওয়া যায়। সৌখীন ও প্রসাধন দ্রব্যাদি আনতে হ'লে দার্জ্জিলিং যেতে হয়। একখানি ছোট Baby Austin থাকলে আর কোন ভাবনাই থাকে না। তাগদা হ'তে কালিম্পঙ ও কার্শিয়ং যাওয়া যায়। কালিম্পঙ যাবার পথটী ভীষণ ঢালু। এখানে দাঁড়িয়ে সমস্ত প্লেনের সুন্দর একটী Panorama দেখতে পাওয়া যায়, যা সাধারণতঃ আমাদের চক্ষু-গোচরে পতিত হয় না।

দার্জ্জিলিং সজ্জিতা রমণী। হাবভাবে পরিপূর্ণা। বিলাসে তাহার সর্ব্বাঙ্গ নিমজ্জমান। তাগদা শান্ত, রমণীয় প্রকৃতি দেবীর নির্জ্জন আবাস। দার্জ্জিলিংএ ভদ্রতা করতে করতে প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে উঠে। তাগদার ও বালাই নাই। এখানে আমরা যেমন ভাবে ইচ্ছা থাকতে পারি। পোষাক-পরিবর্ত্তন করবার কষ্ট যাদের ব্যথিত করে, তাগদাই তাদের আদর্শ স্থান। কলিকাতার কঠোর পরিশ্রমে যাদের শরীর ও মন ভেঙ্গে পড়ে নগরের আচার ব্যবহার যাদের নিকট অত্যন্ত কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়, তারা তাগদায় গমন করলে নিশ্চয়ই শান্তি পাবেন। এখানে দার্জ্জিলিংএর ন্যায় শীতের প্রাদুর্ভাব নাই, অথচ প্লেনের গরমও এখানে নাই। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে তাগদা খুবই গৌরবময়। জমি এখানে সস্তায় প্রচুর পাওয়া যায়। তার উর্ব্বরা শক্তিও খুব প্রবল। প্রকৃতির

রেল পথ

সৌন্দর্য্যের মধ্যে প্রকৃতির সহিত বাস করতে পারা যায় বলেই তাগদা আমার অত্যন্ত ভাল লেগেছিল।

আসিবার সময় বিনদা ও আমি মিত্র পরিবারের

দার্জ্জিলিংএর দৃশ্য
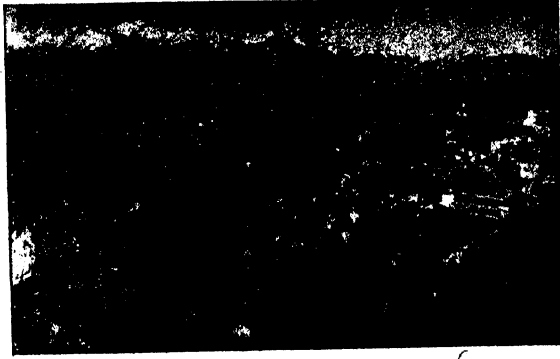
নিকট বিদায় গ্রহণ করে তাঁহাদের আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। বলা বাহুল্য যে মিসেস মিত্র আমার সহিত গল্প করতে করতে উপরে গাড়ী অবধি পৌঁছিয়ে দিলেন। বিদায় গ্রহণ কালে আবার এখানে এসোয়া লাঞ্চ খাবার নিমন্ত্রণ করে রাখলেন। তাঁহার স্নেহ বাস্তবিকই অদ্ভুতভাবে আকর্ষক, তাঁর আতিথেয়তা আমার হৃদয়ে বিশেষভাবেই অঙ্কিত থাকবে।

অসমাপ্ত

শ্রীঅমলা দেবী

কত বার ভেবেছিনু আপনার মনে
নিবেদন করি দেব তোমার চরণে
শেষের কথাটি মোর। তোমার মন্দিরে
সবার আরতি শেষে সন্ধ্যার সমীরে
অন্তরের সেই মোর অপূর্ব কাহিনী
ও তব চরণ তলে দিয়ে যাব আনি।
হে আমার জীবনের সাধনার ধন
তারি লাগি করেছিনু কত আয়োজন:
তবু গাওয়া হয় নাই। নিশীথ স্বপনে
এখন কাঁদিছে প্রাণ ঘুমে জাগরণে।

রুদ্ধ-দেউল

শ্রীঅমলা দেবী

রুদ্ধ দেউলের মাঝে একা শুধু আমি
তোমার চরণ প্রান্তে কত দিন স্বামী
বসে আছি চির স্তব্ধ বিনিদ্র নয়নে।
সুদূরের যাত্রীদল যবে আনমনে
শিয়রে আঘাত করি ডেকে ডেকে যায়
"পূজাঞ্জলি দিয়ে যাই তব দেবতায়।"
তোমার মলিন করে ভীত প্রাণে তাই
খুলিতে পারি না দ্বার শঙ্কিত সদাই।

কাশীর কথা

ভ্রমণ

কুমারী লতিকা মুখোপাধ্যায়

কাশী—বারাণসী—প্রাচ্যের বিচিত্র নগরী, হিন্দুর শ্রেষ্ঠ তীর্থ, অসি, বরণা, গঙ্গা তিন নদীর সঙ্গম স্থলে স্থাপিত অর্দ্ধচন্দ্রাকার কাশী মহাদেবের স্থাপিত বলিয়া বিখ্যাত। কোন যুগে, কত শতাব্দী পূর্ব্বে ইহা স্থাপিত হয় তাহা কেহ সঠিক বলিতে পারে না। বিশ্বনাথ ও অন্নপূর্ণার ভুবন বিখ্যাত মন্দির ছাড়াও এখানে নানা দেব দেবীর আরো প্রায় দুই হাজার মন্দির আছে। কাশীর দক্ষিণে অসি গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে এবং উত্তরে বরণা গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে। গঙ্গার তীরের নানা ঘাটগুলি বিচিত্র সৌন্দর্য্যে পূর্ণ—ট্রেণে গঙ্গার পুল হইতে কাশীর সৌন্দর্য্য অবর্ণনীয়।

কাশীতে মৃত্যু হইলে পুনর্জ্জন্ম হয় না—তার উপর বিশ্বেশ্বর অন্নপূর্ণা দেখিবার জন্য এখানে সর্ব্বশ্রেণীর হিন্দুর সমাগম হয়; অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বী ও বিদেশীয়েরাও কাশীর সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া আসেন।

নানা দেব-দেবী ও প্রাচীন মন্দিরাদি ছাড়াও কাশী বিখ্যাত শিক্ষা কেন্দ্র বলিয়া বিখ্যাত। এখানে বহু সংস্কৃত টোল ইত্যাদি ছাড়া বিখ্যাত এ্যানি বেসান্তের হিন্দু কলেজ, কুইনস্ কলেজ—পণ্ডিত মালব্যের হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি আছে। বাংলার ও ভারতের নানা প্রদেশের রাজা জমিদারেরা এখানে বহু দান করিয়া নানা সৎপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার সহায়তা করিয়াছেন। কাশী সিল্ক, বেণারসী শাড়ী, কাঠের ও পিতলের খেলনা প্রভৃতিও বিখ্যাত।

দু'পাশে দ্বিতল, ত্রিতল সু-উচ্চ বাটী—মাঝ দিয়া অতি সঙ্কীর্ণ গলিঘুঁজি—একটা রহস্যাচ্ছন্ন ভাব মনে আনিয়া দেয়।

ধর্ম্মের দিক দিয়া, প্রাচীনত্বের দিক্ দিয়া—কাশী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কাশীর যথাসম্ভব পরিচয় সম্বলিত পুস্তিকার অভাব কাশী ভ্রমণকামীরা অনুভব করিয়া থাকেন—নিজেও সে অভাব বিশেষভাবে বোধ করিয়াই নিজে দেখিয়া শুনিয়া নানা তথ্য সংগ্রহ করিয়া এই কাশী-পরিচয় রচনা করিলাম। কাশী ভ্রমণকারীরা ইহার সাহায্যে বিনা-গাইডে কাশীর উল্লেখ যোগ্য সব স্থানই দেখিতে পারিবেন।

কাশীর গঙ্গাতীর

দশাশ্বমেধ ঘাট

দশাশ্বমেধ ঘাট কাশীর গঙ্গাতীরের প্রায় মধ্যস্থলে অবস্থিত। ঘাটের উত্তর দিকের অংশকে ঘোড়া ঘাট বলে। দশাশ্বমেধ ও ঘোড়া ঘাট হইতে দুইটী প্রশস্ত রাস্তা বাহির হইয়া চিত্তরঞ্জন পার্কের কাছে মিলিত হইয়াছে। এই রাস্তা সহরের মধ্যে গোধূলিয়ার দিকে গিয়াছে। দশাশ্বমেধ ঘাট পর্য্যন্ত গাড়ী যায়। এই সকল কারণে দশাশ্বমেধ ঘাট অত্যন্ত জনপ্রিয়।

সকালে স্নানের জন্য বহু নর-নারী এই ঘাটে আসে এবং সন্ধ্যার পরও এখানে খুব জন সমাগম হয়।

সন্ধ্যার পর যখন মন্দিরে মন্দিরে আলো জলে ও আরতির বাদ্য বাজিতে থাকে, সেই সময় গঙ্গাতীরের শোভা অবর্ণনীয়। ঘাটে বসিয়া কেহ পূজারত, কেহবা ধর্ম্ম সঙ্গীত গান করিতেছেন। কোন স্থানে কথকতা ও শাস্ত্র ব্যাখ্যা হইতেছে।

কার্ত্তিক মাসে ঘাটের স্থানে স্থানে চৈচারির চুবড়ির মধ্যে প্রদীপ জ্বালিয়া দেয়। তখন ঘাটের শোভা আরো বাড়িয়া উঠে। মহিলারা গঙ্গাজলে প্রদীপ ভাসাইয়া দেন।

বিজয়া দশমীর দিন দশাশ্বমেধ ঘাটে প্রতিমা ভাসান একটী দেখিবার জিনিষ। নৌকার উপর প্রতিমা লইয়া বাইচ খেলা হয়। নৌকার উপর গান বাজনা হয়। আলোক শোভিত নৌকাগুলি গঙ্গার শোভা আরও বাড়াইয়া তুলে।

দশাশ্বমেধ ঘাট নামকরণের একটী কাহিনী আছে।

ব্রহ্মা কাশীরাজ দিবোদাসের সাহায্যে এখানে দশবার অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। ঘোড়া ঘাটও দশাশ্বমেধ ঘাটের অংশ।

ঘোড়া ঘাট ও দশাশ্বমেধ ঘাটের মধ্যে একটী ক্ষুদ্র ঘাটকে প্রয়াগ ঘাট বলে। এখানে অনেক যাত্রী মস্তক মুণ্ডন করিয়া থাকেন।

গঙ্গাতীরে ভ্রমণ—

শরৎ কাল হইতে বর্ষার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত দশাশ্বমেধ ঘাট হইতে গঙ্গার তীরবর্ত্তী ঘাট দিয়া বরাবর উত্তর ও দক্ষিণে গাড়ী যাতায়াতের উপযোগী প্রশস্ত রাস্তা আছে গাড়ী করিয়া এই ঘাটে যাওয়া যায়।

দশাশ্বমেধ ঘাট হইতে নৌকা লইয়া একদিক দক্ষিণ দিকে অসি সঙ্গম পর্য্যন্ত ও আর একদিক দশাশ্বমেধ ঘাটের উত্তর দিকে ডাফরিণ সেতু পার হইয়া বরুণা সঙ্গম পর্য্যন্ত বেড়াইলে কাশীর শোভা উপলব্ধি করা যায়।

দশাশ্বমেধ ঘাটের দক্ষিণে

ঘোড়া ঘাট হইতে দক্ষিণ দিকে গেলে পর পর এই
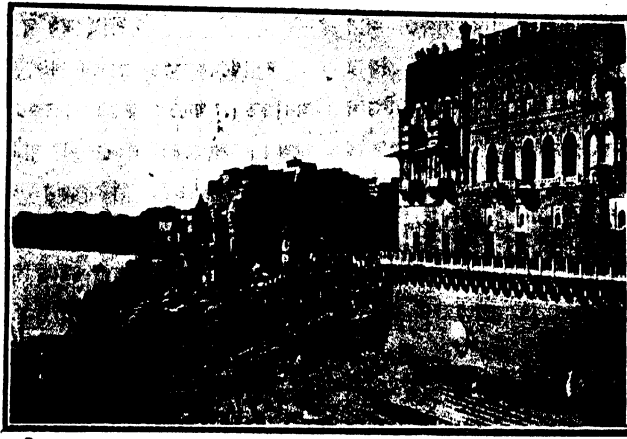
দশাশ্বমেধ ঘাট

বহুদূর যাওয়া যায়। কাশীর গঙ্গার তীরে প্রায় সমস্ত স্থানেই ঘাট আছে—যেখানে নাই, সেখানেও চলিতে অসুবিধা হয় না।

বর্ষাকালে গঙ্গা জলে পরিপূর্ণ হয় এবং স্রোতও প্রবল হয়। এই সময় ঘাটগুলি ও ঘাটে যে সব মন্দির আছে, সেগুলি জলের মধ্যে ডুবিয়া যায়। তখন গঙ্গার ধার ধরিয়া ঘাটগুলির উপর দিয়া বেড়ানো যায় না। বর্ষাকালে গঙ্গা স্নানেও বিপদের ভয় আছে।

শরৎকালে গঙ্গার জল যখন কমিয়া যায়, ঘাট ও মন্দিরগুলি আবার জল হইতে বাহির হয়। গঙ্গার মাটিতে অনেক সময় এগুলি চাপা পড়িয়া যায় এবং মাটি কাটিয়া ঘাট ও মন্দিরগুলি বাহির করিতে হয়।

বড় রাস্তা হইতে দশাশ্বমেধ ঘাট, পর্য্যন্ত

ঘাট পাওয়া যাইবে—ঘোড়া ঘাট, শীতলা ঘাট, দশাশ্বমেধ ঘাট, অহল্যাবাঈ ঘাট, মুন্সী ঘাট, রাণা ঘাট, চৌষট্টি যোগিনীর ঘাট, পাঁড়ে ঘাট, রাজা ঘাট, ছত্তর ঘাট, নারদ ঘাট, কেদার ঘাট, হরিশ্চন্দ্র ঘাট, শিবালা ঘাট, হনুমান ঘাট, প্রভুদাস ঘাট, তুলসী ঘাট ও অসি ঘাট।

শীতলা ঘাট—

দশাশ্বমেধ ঘাটের দিকে একটী একতল ক্ষুদ্র দালানের ন্যায় মন্দির আছে—তাহার মধ্যভাগে শিবলিঙ্গ। পাণ্ডারা বলে এখানে দশাশ্বমেধ যজ্ঞ হইয়াছিল। শীতলা দেবীর মূর্ত্তি ইহার একপাশে; কিন্তু যে মূর্ত্তিটিকে শীতলা বলা হয়, তাহা হরপার্ব্বতীর ন্যায়। নিকটবর্ত্তী ঘাটকে শীতলা ঘাট বলে। এই ঘাটটীও দশাশ্বমেধ ঘাটের অন্তর্গত।

অহল্যাবাঈ ঘাট—

দশাশ্বমেধ ঘাটের কাছে এই ঘাটটী অত্যন্ত সুন্দর এবং এখানে স্নানের খুব সুবিধা। স্ত্রীলোকদের স্নানের জন্য গঙ্গার জলের উপর ঘাটের পাশে একটা করগেটের ঘর আছে।

ঘাটের উপরই ইন্দোরের রাজার প্রাসাদ, অন্নসত্র, দণ্ডীর মঠ ও নহবৎখানা।

ইন্দোর রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা মলহর রাও হোলকার ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগ করিলে তাঁহার পুত্র কুন্দজী রাওয়ের বিধবা পত্নী অহল্যাবাঈ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি অনেক লোকহিতকর সৎকার্য্য ও দেব-মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কাশীর অহল্যাবাঈ ঘাট ও বিশ্বনাথের মন্দির তাঁহার কীর্ত্তি। হাওড়া হইতে কাশী পর্য্যন্ত একটী সুপ্রশস্ত রাজপথও তিনি প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। তাহা অহল্যাবাঈয়ের রাস্তা বলিয়া পরিচিত। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে তিনি স্বর্গারোহণ করেন।

মুন্সী ঘাট—

মুন্সী শ্রীধরের তত্ত্বাবধানে অহল্যাবাঈয়ের ঘাট নির্ম্মিত হয়। অহল্যাবাঈয়ের ঘাটের দক্ষিণে তিনি নিজেও একটী ঘাট তৈয়ারী করেন—ইহাই মুন্সী ঘাট।

এই ঘাটের উপরে দ্বারভাঙ্গার মহারাজার সুন্দর প্রাসাদ। এই প্রাসাদটী দেখিতে কতকটা দুর্গের ন্যায়।

মুন্সী ঘাটকে এখন দ্বারভাঙ্গা ঘাটও বলে, কারণ এই ঘাট এখন দ্বারভাঙ্গার মহারাজার সম্পত্তি।

রাণা ঘাট—

রাণা ঘাটের উপরে উদয়পুরের মহারাণার প্রকাণ্ড প্রাসাদ। ঘাটটী তেমন ভাল নয়।

চৌষট্টি যোগিনীর ঘাট—

এই ঘাটের উপরে চৌষট্টি যোগিনীর মন্দির ৫০০ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালার শেষ স্বাধীন হিন্দু রাজা প্রতাপাদিত্য কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত।

চৌষট্টি যোগিনী কালীর ৬৪ জন সঙ্গিনী। এই ঘাট তাহাদের অধিষ্ঠান স্থান।

ঘাট হইতে উপরে উঠিবার সিঁড়ি আছে; সিঁড়ি খাড়া বলিয়া উঠিতে একটু কষ্ট হয়।

ঘাট হইয়া উঠিয়া একটী গলি। এই গলির ডানদিকে চৌষট্টি যোগিনীর (ভদ্রকালীর) মন্দির (নম্বর ডি ২২।১৭) মন্দির মধ্যে বামদিকে মহিষাসুর মর্দ্দিনী মূর্ত্তি এবং ডান দিকে প্রতাপাদিত্য স্থাপিত ভদ্রকালী মূর্ত্তি।

পাঁড়ে ঘাট—

বর্ত্তমান ঘাটটী বর্দ্ধমান, বৈদ্যপুরের শ্যামাচরণ নন্দীর বিধবা পত্নী কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। পাঁড়ে ঘাটের উপর স্ত্রীলোক-দের কাপড় ছাড়িবার জন্য একটা টিনের ঘর আছে।

রাজা ঘাট—

পাঁড়ে ঘাটের পর রাজা ঘাট।

ছত্তর ঘাট—

ছত্তর ঘাটের উপর পেশোয়া বংশীয় অমৃত রাওয়ের বাড়ী।

নারদ ঘাট—

নারদ ঋষির নামে এই ঘাটের নাম নারদ ঘাট।

কেদারঘাট—

কেদারঘাটের উপরেই কেদারেশ্বরের মন্দির। মন্দিরের পূর্ব্ব প্রাচীর হইতে গঙ্গা পর্য্যন্ত প্রস্তর নির্ম্মিত বৃহদায়তন ঘাট। ঘাট উচ্চ বলিয়া উঠিতে নামিতে কষ্ট হয়।

ঘাটের সম্মুখে একটি প্রস্তর মণ্ডিত চৌবাচ্চা—তাহার মধ্যে দুর্গন্ধময় পচা জল। ইহার নাম গৌরীকুণ্ড। ইহার মধ্যে অনেকে স্নান করেন! হিমালয়ের কেদারের গৌরীকুণ্ডের ন্যায় ইহারও নাকি মহিমা।

কাশী কেদার মাহাত্ম্যের মতে কেদার ঘাটই আদি মণিকর্ণিকা।

কেদারেশ্বরের মন্দির প্রাচীন এবং দাক্ষিণাত্যের মন্দিরের অনুকরণে প্রস্তুত।

মন্দিরের দেয়ালে লাল ও সাদা ডোরা; উপরে একটি সাধারণ গুম্বজ (dome)। মন্দিরের ভিতরটী বেশ।

মন্দির মধ্যে কেদারেশ্বরের শিবলিঙ্গ। কেদারেশ্বর হিমালয়ের কেদারনাথেরই প্রতিরূপ—অনাদি লিঙ্গ।

এই মন্দিরে নেপালের মহারাজা প্রদত্ত একটী প্রকাণ্ড ঘণ্টা আছে।

হরিশ্চন্দ্র ঘাট—

হরিশ্চন্দ্র ঘাট কাশীর সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন শ্মশান। সহরের দক্ষিণ দিকের নিকট হইলেও, এই অঞ্চলেরও অধিকাংশ শব মণিকর্ণিকা ঘাটে লইয়া যায়।

এই ঘাটে একটী দালানে হরিশ্চন্দ্র ও শৈব্যার মূর্ত্তি আছে।

রাজা হরিশ্চন্দ্র অত্যন্ত দাতা ছিলেন। মহর্ষি বিশ্বামিত্র তাঁহার নিকট রাজ্য চাহিলে, তিনি অম্লান বদনে নিজের রাজ্য তাঁহাকে দান করিলেন। ব্রাহ্মণ ও ঋষিকে দান করিলে দক্ষিণা দিতে হয়। বিশ্বামিত্র রাজ্য গ্রহণ করিয়া দক্ষিণা চাহিলেন। হরিশ্চন্দ্র তখন সমস্ত দান করিয়াছেন, আর তাঁহার কিছুই ছিল না। সুতরাং তিনি কাশীতে গিয়া নিজেকে ও তাঁহার স্ত্রী শৈব্যাকে বিক্রয় করিয়া সেই অর্থ বিশ্বামিত্রকে দক্ষিণা স্বরূপ দিলেন।

হরিশ্চন্দ্রকে যে কিনিয়াছিল, সে চণ্ডাল। সে কাশীর এই শ্মশানের মালিক ছিল। হরিশ্চন্দ্র তাহার অধীনে এই ঘাটে কাজ করিতেন এবং যাহারা শব দাহ করিতে আসিত, তাহাদের নিকট সৎকারের জন্য শুল্ক আদায় করিতেন।

শৈব্যাকে এক ব্রাহ্মণ কিনিয়াছিলেন। তাহাদের শিশুপুত্র রোহিতাশ্ব মায়ের সঙ্গে এই ব্রাহ্মণের বাড়ীতে ছিল। একদিন সর্পদংশনে রোহিতাশ্বের মৃত্যু হইল। অভাগিনী শৈব্যা পুত্রের মৃতদেহ স্কন্ধে এই ঘাটে আসিলেন। তখন অন্ধকার রাত্রি ও ভয়ানক দুর্য্যোগ। হরিশ্চন্দ্র শৈব্যাকে চিনিতে পারেন নাই; তিনি যথারীতি সৎকারের শুল্ক চাহিলেন। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই শৈব্যার কণ্ঠস্বর শুনিয়া তাঁহার আর বুঝিতে বাকী রহিল না। তখন পুত্রের চিতার উপর স্বামী স্ত্রী দুইজনে মরিতে উদ্যত হইলেন।

ইতিমধ্যে বিশ্বামিত্র হরিশ্চন্দ্রের দানের মাহাত্ম্য বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তিনি শ্মশানে আসিয়া হরিশ্চন্দ্রকে তাঁহার রাজ্য ফিরাইয়া দিলেন। ধর্ম্মরাজের দয়ায় রোহিতাশ্বও বাঁচিয়া উঠিল।

দণ্ডীঘাট—

দণ্ডীঘাটের উপরে সাংখ্যদর্শন প্রণেতা কপিলমুনির মঠ আছে। এখানে সাংখ্যদর্শনের আলোচনা হয়।

শিবালা ঘাট—

কাশীরাজ চেতসিংহ গঙ্গাতীরে বাড়ী, শিবালয় ও ঘাট নির্ম্মাণ করেন। এই শিবালয় হইতে ঘাটের নাম শিবালয় বা শিবালা ঘাট হইয়াছে।

চেতসিংহের সঙ্গে যখন ওয়ারেন হেষ্টিংসের বিবাদ হয়, তখন রাজা কাশীর শিবালয় ঘাটের বাড়ীতে ছিলেন। হেষ্টিংসের আদেশমত ৫ লক্ষ টাকা না দেওয়ায় রাজাকে এই বাড়ীতে আটক রাখা হয়। রাজা জানালায় পাগড়ীর কাপড় বাঁধিয়া, শিবালয় প্রাসাদ হইতে পলায়ন করেন। তারপর গঙ্গামধ্যে অবস্থিত নৌকায় আরোহণ করিয়া রামনগরে যান। চেতসিংহের বিদ্রোহ ও রাজ্যচ্যুতি ইতিহাসে প্রসিদ্ধ ঘটনা।

হনুমান ঘাট—

এখানে হনুমানের একটী মূর্ত্তি আছে। হনুমান ঘাটের নিকটে বৈষ্ণবগুরু বল্লভাচার্য্যের আশ্রম ছিল। প্রবাদ যে তিনি শিষ্যদের উপদেশ দিবার সময় গঙ্গাগর্ভে পড়িয়া যান। সঙ্গে সঙ্গে সকলে দেখিল একটী জ্যোতি গঙ্গাগর্ভ হইতে আকাশে উঠিয়া গেল।

তুলসী ঘাট—

তুলসী ঘাট অসি সঙ্গমের নিকটেই অবস্থিত।

তুলসী ঘাটের উপর একটী দ্বিতল বাড়ীতে হিন্দী কবি ও সাধক তুলসীদাস বাস করিতেন বলিয়া প্রবাদ আছে।

তুলসীদাসের খড়ম ও দণ্ড এখনো সেখানে রক্ষিত আছে।

তুলসীদাসের রামায়ণ হিন্দুস্থানী জনসাধারণের আদরের জিনিষ। তুলসীদাস বান্দা জিলার রাজাপুর গ্রামের আত্মারাম ত্রিবেদীর পুত্র। ইনি ১৫৩১ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। যৌবনে তুলসীদাস অত্যন্ত স্ত্রৈণ ছিলেন। একদিন শ্বশুরের অনুরোধে স্ত্রীকে বাপের বাড়ী পাঠাইলেন বটে, কিন্তু নিজে পাল্কীর সঙ্গে সঙ্গে ছুটিয়া চলিলেন। ইহাতে তাঁহার স্ত্রী [illegible]

"এমনি টান যদি ভগবানের প্রতি দেখাতে, তাহলে পরকালের কাজ হত।" এই কথায় তুলসীদাসের মন পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। গৃহী তুলসীদাস সাধু হইলেন।

অসি ঘাট ও অসি সঙ্গম—

যে পাঁচটী ঘাটে যাত্রীদের স্নান করিতে হয় অসিসঙ্গম তাহার অন্যতম।

অসি একটী ক্ষুদ্র নদী। ইহা বারাণসীর দক্ষিণ সীমা। প্রবাদ যে শুম্ভ ও নিশুম্ভ বধের পর ক্লান্ত হইয়া দুর্গা এইখানে বসিয়াছিলেন। তাঁহার হাত হইতে অসি পড়িয়া মাটি কাটিয়া যায় এবং এই নদীর সৃষ্টি হয়। এজন্য এই নদীর নাম হইয়াছে অসি নদী।

অসি সঙ্গমের কাছে জগন্নাথের মন্দির আছে। মন্দিরের পূর্ব্বদিকের প্রাচীরের পাশ দিয়া অসি নদী প্রবাহিত হইতেছে। নানক পন্থীদের একটী আখড়াও অসি-সঙ্গমের কাছে।

দশাশ্বমেধ ঘাটের উত্তরে

দশাশ্বমেধ ঘাট হইতে উত্তরদিকে গেলে প্রয়াগ ঘাট, ঘোড়া ঘাট, মান মন্দির ঘাট, ত্রিপুর ভৈরবীর ঘাট, মীর ঘাট, নেপালী ঘাট, ললিতা ঘাট, জল শয়ন ও মণিকর্ণিকা ঘাট, সিন্ধিয়া ঘাট, বরোদার রাণী গহিনা বাঈ-য়র ঘাট, নাগপুরের রাজার ঘাট, বালা ঘাট, পঞ্চ গঙ্গা ঘাট, জৈন মন্দির ঘাট, ত্রিলোচন ঘাট এবং শেষে রেলের সেতুর অপরপারে বরুণা সঙ্গম।

মান মন্দির ঘাট—

ঘোড়া ঘাটের একটু দক্ষিণে। এই ঘাটের উপরেই সুপ্রসিদ্ধ মান মন্দির। ঘাটের সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া মান মন্দির দেখা যায়।

ত্রিপুর ভৈরবীর ঘাট—

এই ঘাটের উপরে যে গলি বাহির হইয়াছে তাহা হইতে ডানদিকে গেলে একটী অতি ক্ষুদ্র মন্দিরে ত্রিপুর ভৈরবীর মূর্ত্তি আছে, উহা হইতে ঘাটের নাম হইয়াছে। মন্দির দেখিবার উপযুক্ত নয়। ত্রিপুর ভৈরবী পার্ব্বতীর এক মূর্ত্তি।

মীর ঘাট—

এই ঘাটের উপরে একটী প্রাসাদ আছে—এখানে অষ্টাদশ শতাব্দীতে কাশীর ইজারাদার মীর রুস্তম আলি থাকিতেন। রামনগর রাজ বংশের প্রতিষ্ঠাতা মনসারাম মীর রুস্তম আলির কর্ম্মচারী ছিলেন। রুস্তম আলি অকর্ম্মণ্য ছিলেন। মনসারাম কালে প্রভুর ইজারাদারি লাভ করিয়া কাশীর রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন।

মীর রুস্তম আলির নামে এই ঘাটের নাম হইয়াছে মীর ঘাট।

ঘাটের উপর ডানদিকে একটী সরু গলির ভিতর একটি ক্ষুদ্র মন্দির আছে। প্রবাদ যে কাশীরাজ দিবোদাস একদিন এখানে পূজা করিতেছিলেন; এমন সময় স্বর্গ হইতে রথ আসিয়া তাঁহাকে স্বর্গে লইয়া যায়।

নেপালী ঘাট ও পশুপতিনাথ—

নেপালী ঘাটের উপর নেপালের মহারাজা নির্ম্মিত পশুপতিনাথের মন্দির। মন্দিরটী প্যাগোডা ধরণের এবং ইষ্টকনির্ম্মিত ও উপরে দুই স্তর টালির ঢালু ছাদ। সর্ব্বোপরি ঘণ্টা ও ত্রিশূল। কাঠের দরজাগুলির উপর সুন্দর কারুকার্য্য।

মণিকর্ণিকা ঘাট—

কাশীর তীর্থসমূহের মধ্যে মণিকর্ণিকা শ্রেষ্ঠ। ঘাটের নিকটেই একটী ক্ষুদ্র পুষ্করিণী রেলিং দিয়া ঘেরা আছে—উহা মণিকর্ণিকা কুণ্ড বা চক্রতীর্থ। এই কুণ্ডের নামে ঘাটের নামও মণিকর্ণিকা ঘাট হইয়াছে।

প্রবাদ বিষ্ণু এই কুণ্ড খনন করিয়া এখানে তপস্যা করিয়াছিলেন। তাঁহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া মহাদেব বর দান করিতে আসেন। সেই সময় শিবের মণিময় কর্ণালঙ্কার কুণ্ডমধ্যে পড়িয়া যায়। এই জন্য এই কুণ্ডের নাম হইয়াছে মণিকর্ণিকা কুণ্ড। বিষ্ণু সুদর্শন চক্র দিয়া এই তীর্থের সৃষ্টি করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার অন্য নাম চক্রতীর্থ।

মণিকর্ণিকায় যে সুপ্রশস্ত ঘাট ও তাহার দুই পাশে গৌতমেশ্বর ও অহল্যোদ্ধারকেশ্বর নামে দুইটী বিশাল শিবমন্দির আছে তাহা ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে অহল্যাবাঈ প্রতিষ্ঠা করেন।

মণিকর্ণিকা ঘাটেই কাশীর প্রধান শ্মশান। শ্মশানের ডানদিকে শ্মশানেশ্বর শিবের ক্ষুদ্র মন্দির।

শ্মশানের উপর রাজা রাজবল্লভের একটী বৃহৎ শিব-মন্দির আছে।

প্রবাদ শঙ্করাচার্য্য মণিকর্ণিকা ঘাটে বসিয়া গঙ্গা স্তোত্র রচনা করিয়াছিলেন।

জল শয়ন ঘাট—

মণিকার্ণিকা ঘাটের একাংশে মরণোন্মুখ ব্যক্তিদের গঙ্গাযাত্রা করা হয়। গঙ্গাজলের কাছে সামান্য ছাউনি করিয়া যেভাবে রাখা হয়, তাহাতে বর্ষা ও শীতকালে খুব কষ্ট হয় বলিয়া মনে হয়।

গোয়ালিয়রের বিধবা মহারাণী বৈজীবাঈ এই ঘাট নির্ম্মাণ করাইতেছিলেন। ভিত্তি দৃঢ় না হওয়ায় উহা ধ্বসিয়া যায়। ইহা সম্পূর্ণ হইলে একটী সুন্দর জিনিষ হইত।

এই সম্বন্ধে দুইটী অদ্ভুত জন প্রবাদ আছে। এক মতে—ঘাট নির্ম্মাণকালে মিস্ত্রিরা একটী গুহা দেখিতে পায়। এই গুহার মধ্যে একজন ঋষি তপস্যা করিতেছিলেন। খননের ফলে তাঁহার তপোভঙ্গ হয়। তাঁহার তপস্যা আরম্ভের পর দুই হাজার বৎসর চলিয়া গিয়াছিল। তিনি যখন জানিলেন যে কাশী বিধর্ম্মীর হাতে গিয়াছে,

মণিকর্ণিকার ঘাট

তখন গঙ্গাগর্ভে দেহত্যাগ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ঘাটটীও ধ্বসিয়া পড়িল।

অন্য মতে—যিনি এই ঘাট তৈয়ারী করাইয়াছিলেন, ঘাট নির্ম্মাণ শেষ হইলে তিনি বলেন—যে "মায়ের নামে এই ঘাট উৎসর্গ করিয়া, আজ আমি মাতৃঋণ শোধ করিলাম।" তাহার পরই ঘাট ধ্বসিয়া গেল। মাতৃঋণ কি কেহ কখনো পরিশোধ করিতে পারে?
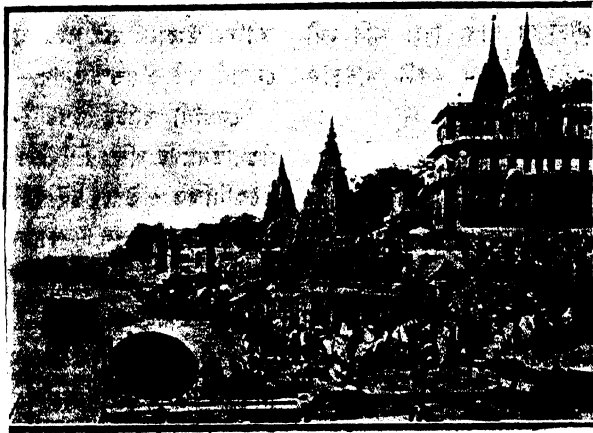
এই ঘাট হইতে উপরে উঠিতে বাঁ দিকে আমেথি রাজার সুন্দর দুর্গা মন্দির।

ইহার পর একটু উপরে সিঁড়ির ডানদিকে আলোয়ারের রাজার শিবমন্দির। এই দুইটী মন্দির চূড়ায় সুবর্ণ-খচিত নিশান ঘাট হইতে সুন্দর দেখায়।

বিশালাক্ষী দেবীর মন্দির মণিকর্ণিকা ঘাটের নিকটে একটী গলির মধ্যে।

সিন্ধিয়া ঘাট—

মণিকর্ণিকা ঘাটের উত্তরে একটী ঘাট দেখিলে মনে হয় যেন ভূমিকম্পে বা কোন আকস্মিক দুর্ঘটনায় ঘাটটী কাৎ হইয়া পড়িয়াছে।

গায়কবার ঘাট

বরোদার মহারাণী গহিনাবাঈ ১৮২০ খৃষ্টাব্দে এই ঘাট নির্ম্মাণ করেন। ঘাটের উপর বাড়ীতে [illegible] নাম লিখিত আছে।

ক্রমশঃ

ফাঁকির নেশা

সুরুচিবালা চৌধুরাণী

"না, আর হয়তো আপনার দেখা পাবো না"—

"সত্যি বলছি—আমি নিজে দেখা করবো—যেতে দিন"—

"তাহলে শনিবার ৭টার সময় গ্রাণ্ড হোটেলে আমার সঙ্গে দেখা করবেন বলুন"—

সুরমা খানিকক্ষণ উত্তর দিল না—তারপরে বলিল—"আচ্ছা তাই—আসবো"—

"আর যদি না আসেন—তাহ'লে আমি কি করতে পারি—আপনি আসবেন না"—

"মিঃ ঘোষ! আমার কথাই যথেষ্ট, তাছাড়া আসবো না কেন? ভয়ই বা করবো কেন? নিশ্চয় আসবো—এখানেই আপনার কথা শুনতুম কিন্তু দেখেছেন তো আশে পাশে শুভাকাঙ্ক্ষীরা সব—আর এক্ষুণি আমাকে যেতেও হবে একখানে,—আচ্ছা আসি—নমস্কার"—

ক্লোকরুম হইতে কোটটী হাতে লইয়া বাহিরে আসিয়া যেই পরিতে যাইবে—এমন সময়ে পিছন হইতে কে বিনা বাক্যব্যয়ে তাহা সরাইয়া লইল। সুরমা পিছন ফিরিয়া দেখিল অরিণ রায়। হঠাৎ এভাবে তাহার আবির্ভাবে ও নেহাৎ অভদ্রভাবে কোটটী সরাইয়া লওয়াতে সুরমা বিরক্ত ও বিস্মিত হইয়া প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে চাহিল। অরিণ বেশ সহজ ও সপ্রতিভভাবে "একটু সাহায্য করতে পারি কি?" বলিয়া একরকম জোর করিয়া কোটটি পরাইয়া দিয়া আর দ্বিতীয় কথা না বলিয়া চলিয়া গেল—আর সুরমা কি একটা জিজ্ঞাসা করিতে গিয়া মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল। আপন মনেই সে বলিল—"লোকটা পাগল নাকি?"

সুরমার সুদৃশ্য প্রকাণ্ড গাড়ীতে বসিয়া বিজয় বলিল—"সুরমা, হঠাৎ এ সব কেন? গাড়ীতে উঠতে দেখেছে অনেকে, ফলে কি হবে বলতে পার?"

"কি হবে? জানো বিজয়, অনাবশ্যক, অসত্য একজনার নামে সমানে যদি লোকে ব'লে যায়, তার ফলে কি হয়? ক্রমে সে নির্ভীক হ'য়ে ওঠে—তার পরে তার আর কোন আবরণ থাকে না।"

"তোমার মতলবটা কি শুনি।"

সুরমা ড্রাইভারকে আদেশ দিল—"ষ্ট্রাণ্ড"

বিজয় বলিল—"এই ঠাণ্ডায় ওদিকে কেন?"

"মন্দ কি সব কাঁচগুলো তোলা আছে, বেশ আরাম লাগছে বরং। জানো বিজয়! আমার স্বামী আমার জন্য বাড়ীতে অপেক্ষা করছে"—

বিজয় একটু অনুযোগের সুরে বলিল—"ছিঃ সুরমা, তবে বাড়ী যাও।"

সুরমা মৃদু হাসিল—"থাক্‌না—আমি এমন অনেকদিন অপেক্ষা করেছি, তবে ঠিক তারি প্রতিশোধ অবশ্য নেবার জন্য নয়, কিন্তু বেশ ভাল লাগে—আমি দেখেছি আগের জীবনটায় সুখ ছিল না মোটেই—নেহাৎ বাজে ছিলুম—একটুতেই মনে হত যেন সমস্ত পৃথিবীটা অন্ধকার হয়ে গেছে,—এখন শান্তি আছে, সোয়াস্তি আছে, মনটাকে ক্ষণে ক্ষণে একটা গুরু ভার এনে পিষে গুঁড়ো ক'রে ফেলতে চায় না, কিন্তু তবু যেন কি একটা খুঁজে পাচ্ছি না—মনে হয়,—যাগ্‌গে তবু বেশ আছি"—

"নিজেকে মিছিমিছি অসুখী ক'রে কি করবে? ভাবনার অন্ত নেই—বলতে গেলে সব পুরোণো কথাগুলোই বলতে হয়। তবে আমি তোমার অসুখের কোন কারণ দেখতে পাই না সুরমা, সুন্দর, সুপুরুষ স্বামী তোমার, ধনে মানে এককথায় স্ত্রীলোকের পক্ষে যা ঐশ্বর্য্য তাই তো তুমি পেয়েছ—তবে?"

"তবে? ঐ তো ঐখানেই গলদ,—আমিও অনেক-দিন এ দিকটা ভেবে দেখেছি, তবু নিজেকে সুখী মনে

করবার কোন সঙ্গত কারণ খুঁজে পাই না। কি জানো, ঠিক সেই ভাবটা আমার মনে কোনদিনই আসেনি বা আসে না, যাতে ক'রে ঐ বাড়ীকে, অথবা স্বামীকে ঠিক আমার ব'লে ভাবতে পেরেছি কোনদিন। মনে হয় যেন অনেক কিছু নেই, অনেক কিছু থাকলে ভাল হ'ত।"

"ও তোমার মনের দোষ আর কিছু নয়—"

"না মনেরও দোষ নয়, নইলে মনটা যে অনেক সময় আমাকে বশে আনতে চেষ্টা না করেছে, ঠিক তাও নয়, তবে কি? ভাগ্য মানি না, নইলে হয়তো বলতুম ভাগ্যেরই দোষ, কার দোষ বিজয়?"

"কার দোষ বলবো? তবে কি বলতে চাও তোমার স্বামীরই দোষ?"

"স্বামীর দোষ ঠিক কিনা তাও বলতে পারি না। স্বামীর দিক্ দিয়ে দেখতে গেলে ঠিক সেগুলোকে দোষ ব'লে মনে হয় না। তবু কি রকম মানুষের জীবনে এক একটা ঘটনাচক্র এসে পড়ে, ঠিক এমন ক্ষণে জীবনের বিশেষ একটা মুহূর্তে, ঠিক সেই সময়ে সেটা তার প্রভাব বিস্তার না ক'রে যায় না। আমার মনে হয় আমার স্বামী যদি সেদিন ঠিক ঐ সময়ে ঐ দিনে, আমার মনের ঠিক ঐ অবস্থায় আমাকে না চাইতেন, তাহ'লে আজ আমি তাঁর স্ত্রী হতুম কিনা কে জানে। এমন অনেক ঘটনাই হয়ে যায় জীবনে—যাক্ আজ যেন আমার কি হয়েছে বিজয়,—এ নিরপেক্ষ ভাবটাও হয়তো আসতো না কিন্তু ঠিক আমার ঐ দুর্ব্বল শরীর ও মনে আমি যদি ও আঘাতটা না পেতুম"—

সুরমা বিজয়কে নামাইয়া দিয়া বাড়ী অভিমুখে চলিয়া গেল।

৬৭

পরদিন উঠিয়াই সে রাজীবকে জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি কাল আমাকে কি কথা বলবে ব'লেছিলে?"

রাজীব একটু গম্ভীরভাবে বলিল—"বলেছিলুম, বলবো সুরমা, কিন্তু—না থাক্ এখন বলবো না, আর সে কথা এখন তুমি না শুনলেও বিশেষ কিছু যাবে আসবে না—আর একদিন বলবো"—

সুরমা একটু হাসিয়া বলিল—"কাল আমি দেরী ক'রে বাড়ী ফিরেছিলুম সেইজন্ত কি?"

রাজীব একটু ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া বলিল—"না সেজন্ত নয়, কোন কিছুর জন্তও নয়"—

"কাল আমি বাড়ী এসে তোমাকে পেলুম না—শেষে শুনলুম তুমি বেরিয়ে গেছ—"

"হ্যাঁ, বেরিয়ে গিয়েছিলুম, মাথা ধরেছিল সেইজন্যই।"

"তাহলে আজ বল—কি বলতে চেয়েছিলে।"

"না আজ নয়, আর একদিন।"

সুরমা এখন আর রাজীবকে কোন বিষয়ে পিড়াপিড়ি করে না—তাই সে খানিকক্ষণ অন্য কথা বলিয়া কার্য্যান্তরে চলিয়া গেল।

বিজয়ের সঙ্গ-নেশা সুরমাকে পাইয়া বসিয়াছিল, রোজ সে তাহাকে আশ্রম হইতে তুলিয়া লইয়া বেড়াইতে বাহির হয়। বিজয় মাঝে মাঝে আপত্তি করে কিন্তু সে আপত্তি টিকে না—বিজয় আপত্তি করিয়াও পরিশেষে সম্মত হয়, এ আপত্তি যেন সম্মতিরই অগ্রদূত। রোজ তাহারা বেড়ায় কোনদিন গঙ্গারধারে, কোনদিন বারাক-পুরের রাস্তায়, কোনদিন দমদমে—আর কোনদিন বা বালিগঞ্জ লেকে—একদিন বিজয় বেড়াইতে বেড়াইতে বলিল—"সুরমা, আর তোমার সঙ্গে বেড়াতে আসবো না—আর মেশাও ছেড়ে দেবো।"

"নতুন কথা বলছ কেন বিজয়—তোমার মন যখন সর্ব্বজয়ী তখন আর তোমার উচিত অনুচিত বাছ-বিচার করবার কোন দরকার নেই"—

"সর্ব্বজয়ী ব'লে এতদিন গর্ব্ব ছিল কিন্তু এখন দেখছি মানুষের কোন কিছু নিয়ে গর্ব্ব করা চলে না"—

"সত্যি?"

"হ্যাঁ, সুরমা সত্যি—"

"তাহলে তোমার মত লোকেরও পরাজয় হয়?"

"হয় বই কি, কেউ কখনো কি চিরজয়ী হ'তে পারে? "যা আমি জীবনে কল্পনাও করিনি তাও ক'রে ফেলেছি এবারে, সেজন্য প্রতিদিন নিজের বিবেকের কাছে তাড়া খেয়েও বেহায়ার মত চুপ করে আছি।"

"কি এমন পাপ ক'রে ফেলেছ?

"উত্তরবঙ্গে বন্যা হয়েছে, আমি যেতে পারিনি এবারে, কতগুলো মিথ্যে ওজর আপত্তি দিয়ে র'য়ে গেলুম—কেন সুরমা কিসের জন্য?"

"কেন বিজয়?"

"তোমারএই সঙ্গটুকু পাব ব'লে সেইজন্য।"

সুরমা হাসিয়া উঠিল—বলিল—"তাতে লাভ? তুমি একদিন আমাকে এই একই প্রশ্ন করেছিলে তাতে লাভ?"

"লাভ আমার তৃপ্তি, কিন্তু সে তৃপ্তিও আর এখন গণ্ডীভুক্ত থাকতে চাইছে না।"

"তৃপ্তির একটা সীমারেখা কখনো কেউ টানতে পেয়েছে বলেও তো আমার মনে হয় না। জানো বিজয়, আমি সেদিন মীরার মায়ের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলুম।"

কৌতূহলভরে বিজয় জিজ্ঞাসা করিল—"কেন?"

"তোমার জন্য, তাদের মত আছে—এবারে শুধু তোমার ইচ্ছে হলেই হয়।"

বিজয় একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—"আমি বুঝতে পারছি না সুরমা, কেন তুমি আমাকে বিয়ে দেবার জন্য এত ক'রে লেগেছ।"

"আমি না লাগবোই বা কেন? সত্যি বলছি বিজয় —তুমি বল আমি সব ঠিক করি।"

"আমার ইচ্ছে নেই, তোমাকে অনেকবার বলেছি—আর সব চেয়ে আমার দুঃখ হয় তুমি যখন আমাকে পর ক'রে দেবার চেষ্টা কর।"

"পর তোমাকে করছি না তো—যদি আমি তোমার আপন হই তবে তো চিরকালই আছি, বিয়ে ক'রে পর হবে কি করে তাও বুঝতে পারছি না—তাছাড়া আমি মীরাকে সুখী দেখতে চাই।"

"মীরাকে শুধু কয়েকটা মন্ত্র পড়িয়ে আমার জীবনের সঙ্গে বেঁধে দিয়েই যদি সে আর তোমরা সুখী হও, তবে আমি নাচার, যা নিয়ে লোকে সুখী হয় তাই যদি সে না পেল, তাহ'লে শুধু বিয়ে করে একটা তামাসা করায় লাভ আছে সুরমা?"

সুরমা কোন উত্তর দিল না। তখন ধীরে ধীরে গাড়ী চলিতেছিল গঙ্গার তীর বাহিয়া। বিজয় বলিল—"সুরমা, রাগ করলে।"

"না, রাগ ঠিক নয়, তবে ভাবছি—কি অদ্ভুত মন মানুষের, অন্ততঃ আমার। তুমি যে আমারি জন্য এতটা করছ তা বুঝতে পেরে একটু আনন্দ হয়, আর কি জানি একটু আত্মপ্রসাদও অনুভব করি, কিন্তু কি বাজে কথা বলছি—" সুরমা হাসিল—তারপরে আবার বলিল—"তবে তোমাকে বিয়ে দিতে ইচ্ছে হচ্ছে কারণ ঠিক একটা ত্যাগ বা একটা বিশেষ রকম কিছু করবার জন্য নয়, শুধু একটা জেদের বশে করছি—যখন সঙ্কল্প করেছি—তখন করবোই. আর তাছাড়া মীরাকে আমি ভালবাসি—"

বিজয় হাসিয়া বলিল "বেশ, এত কাণ্ড করছ সুরমা শুধু একটা জেদের বশে—? একটা কাজের উন্মাদনায়? তোমার এ কাজে প্রাণের কোন পরিচয় নেই? এর চেয়ে যদি একটা কিছু উদ্দেশ্য নিয়ে করতে তবুও তৃপ্তি পেতুম—"

"ওসব জানিনা বিজয়, তোমাকে বিয়ে করতেই হবে—"

বিজয় দৃঢ়স্বরে বলিল—"পারবো না সুরমা—আমার উপর তোমার এতটুকু ভাব নেই? একেবারে নির্ব্বিকার? আমার জন্য কিছু করছো না, করছ শুধু নিজের একটা খেয়ালের বশে—?"

"না তা নয়, প্রথমটা আরম্ভ করেছিলুম একটা উদ্দেশ্য নিয়ে কিন্তু এখন শুধু জেদ—" সুরমা হাসিয়া বলিল—"তোমার উপর একটা টান আছে বিজয়,—কি রকম জানি না, তোমার সঙ্গে সর্ব্বদা থাকতে ইচ্ছা করে, কথা বলতে ইচ্ছে হয়, এমন কি নির্জ্জন অবসরেও তোমার কথা মনে হয়—এক কথায় তোমাকে খুব ভাল লাগে—যাক্—আজ কি বার?

"শনিবার।"

"শনিবার? বিজয় একটু গ্রাণ্ড হোটেলে যাবো—বলিয়া সে ড্রাইভারকে চৌরঙ্গি অভিমুখে যাইতে বলিল।

বিজয় বলিল—"ওখানে কেন? আমি যাবো না—"

"আমি যাবো, একটা 'এন্‌গেজমেন্ট' ছিল। ১৫মিনিটে চলে আসবো বিজয়, লক্ষীটি গাড়ীতে একটু বসবে—ঈশ্‌ ৮টা বেজে গেছে ড্রাইভার জলদি যাও।"

হোটেলের সামনে নামিয়া সে তাড়াতাড়ি ভিতরে

প্রবেশ করিল। সেদিন নাচের জন্ত বহু নর-নারীর সমাগম হইয়াছে। তখনো নাচ আরম্ভ হয় নাই, সকলে খাইতেছিল। সুরমা এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিল—কিন্তু শরতকে দেখিতে পাইল না। হঠাৎ অদূরে এককোণে দেখিল পৃথার বন্ধু মিঃ উইলিয়াম্‌স্‌ বসিয়া কফি পান করিতেছে। তাহাকে দেখিয়াই তাহার মনে সমস্ত পূর্ব্ব স্মৃতি ভাসিয়া উঠিল। সুরমাকে দেখিয়া মিঃ উইলিয়াম্‌স্‌ উঠিয়া আসিয়া তাহাকে তাহার সঙ্গে কফি পান করিতে অনুরোধ করিল। সুরমা আপত্তি করিল না। কথাপ্রসঙ্গে মিঃ উইলিয়াম্‌স্‌ বলিল—সে বম্বে হইতে আসিতেছে। শুনিয়াই সুরমা জিজ্ঞাসা করিল সে পৃথার খবর জানে কি না! মিঃ উইলিয়াম্‌স্‌ বলিল পৃথার সঙ্গে তাহার দেখা হইয়াছে—সে সম্প্রতি করাচীতে গিয়া এরোপ্লেন চালানো শিক্ষা করিতেছে, এবং নিজে একটী এরোপ্লেনও কিনিয়াছে—সুরমা একথা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইয়া খানিকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। মুহূর্ত্তে কিসের একটা বিতৃষ্ণায় অনুশোচনায় তাহার সমস্ত মন ভরিয়া উঠিল, তাহা কিসের জন্ত কাহার জন্ত সে ঠিক বুঝিতে পারিল না। পৃথা সুনীলের স্মৃতিকে এই ভাবেই উপেক্ষা করিয়া আবার মাতিয়া উঠিয়াছে তাহার উদ্দাম উন্মত্ত খেলায়—এতো শিগগির!—সে চিঠির উত্তর দেয় না, অথবা আসেও না, কোনদিন তাহার নির্দ্দিষ্ট এক বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। সে চাহে না শান্তি, সে চাহে না নিরাবিল জীবন, সে চাহে না শোকে সান্ত্বনা, সে শুধু চাহে তাহার দুর্দ্দমনীয় প্রবৃত্তির ভোগ, তাহার প্রাণের অসীম বুভুক্ষার খাদ্য। মিঃ উইলিয়াম্‌স্‌ তারপরে বলিতেছিল "কিন্তু জানেন মিসেস বোস, মিসেস রয় চৌধুরীর অসাধারণ সহ্য করবার ক্ষমতা, অত বড় আঘাত বেশ সামলে উঠতে পেরেছে। মনে হয় তার স্বামী অন্য কোথাও গেছে, এইমাত্র—নইলে সে যে এ পৃথিবীতেই নেই এমন কোন ভাব মিসেস রায় চৌধুরী কাজে বা কথায় কাউকে বুঝতে দেয় না—"সুরমার আর এ বিষয়ে আলোচনা করিতে ইচ্ছা হইতেছিল না—সে দু' একটা অসংলগ্ন উত্তর দিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"মিসেস্ উইলিয়াম্‌স্ কোথায়?"

মিঃ উইলিয়াম্‌স্‌ একটু [illegible] হাসিয়া বলিল—"আমরা গত মাসে ছাড়াছাড়ি হয়েছি এবং সে আর আমি দুজনে নতুন প্রণয়ী ও প্রণয়িনীর সন্ধানে আছি—"

সুরমা মনে ভাবিল পৃথার এনগেজমেণ্ট আংটির জন্ত অর্থ দান একেবারে অসফল হইয়া গিয়াছে।

দুইটা নাচের পর সে দেখিল শরত কয়েকটী ফিরিঙ্গি মেয়ে লইয়া এককোণে একটু মাত্রা ছাড়াইয়া আমোদ করিতেছে—তাহাকে এই অবস্থায় দেখিয়া তাহার আর আলাপ করিবার বা তাহার বক্তব্য শুনিবার ইচ্ছা হইল না—এবং বিজয়কে গাড়ীতে বসাইয়া আসিয়াছে এই ভাবিয়াও সে তাহার সঙ্গীর কাছে বিদায় লইয়া তাড়াতাড়ি বাহিরে চলিয়া গেল। হোটেলের দরোয়ান গাড়ী ডাকিয়া আনিলে সে দেখিল গাড়ীতে বিজয় নাই—ড্রাইভার বলিল—বাবু তখনি নামিয়া হাটিয়া চলিয়া গিয়াছে। সুরমা ক্ষণিকের জন্ত একটু অপ্রস্তুত বোধ করিল। মনুষ্যত্ব বুঝি সে হারাইতে বসিয়াছে,—প্রাণের সব কোমলতা সততা ও পদমর্য্যাদার গৌরব সে কোথায় বিলাইয়া দিতেছে। এই কি জীবন? সেইখানে একটু দাঁড়াইয়া ভাবিতে না ভাবিতে ওদিকে সার্জ্জেণ্টের তাগিদে গাড়ী দূরে সরিয়া গেল অন্য আরো অনেকগুলি গাড়ীর পথ পরিষ্কার করিয়া দিবার জন্ত। সুরমার আর গাড়ীতে উঠা হইল না। কাজেই সে বাধ্য হইয়া অথবা ইচ্ছা সত্বেই আবার ফিরিয়া গেল ভিতরের দিকে।

শরত তখন বাহিরে আসিয়াছে। সে সুরমাকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিল "এই কি ৭ টা?"

"একটু দেরী হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু এসেও তো আপনাকে দেখতে পাইনি।"

"চলুন একটু বসি গিয়ে—"

"দুইজনে এককোণে দুইটী চেয়ার অধিকার করিয়া বসিল। শরত পানীয়ের হুকুম দিয়া বলিল—"আপনি এসেছেন দেখে খুব আনন্দিত হয়েছি—এই তো চাই—"

"কিন্তু আপনিই একদিন আমার [illegible] করেছিলেন আমার জীবনের লজ্জা সঙ্কোচ [illegible]।"

শরত হাসিয়া বলিল—"[illegible] [illegible] দিন [illegible] তখন একেবারে কণিকার হাতের [illegible]

আজ যে এই জীবন ভোগ করছি আপনারই জন্য, সেজন্য আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ—"

"আচ্ছা, আমি বুঝতে পারি না—কেন আপনি সমানে আমাকে দুষে যাচ্ছেন, আমি আপনার কি করেছি?"

"অনেক কিছু করেছেন, এক হিসাবে ভাল করেছেন—আর এক হিসাবে খারাপ—আজ একটু খোলাখুলি ভাবে আলাপ করি—"

"আচ্ছা আলাপ করুন, কিন্তু তার আগে বলুন কণিকাকে বাড়ীতে নিয়ে আসবেন?"

"তা আনতে পারি কিন্তু একটা সর্ত্তে যে কণা আমাকে আর চোখ রাঙিয়ে শাসন করতে আসবে না। আপনাকে দেখেই আমার প্রথম মনে হয়েছিল যে কণার মত স্ত্রী সকলের নয়, নইলে আপনি আপনার স্বামীর এত বড় অন্যায় সয়েও কি ক'রে হাসতেন? আর কি ক'রে তার সঙ্গে কোমল ব্যবহার করতেন?"

"কিন্তু মিঃ ঘোষ, কে বলেছে আমি সয়েছি? যা ক'রে আমি আমার অসহন ভাবটাকে প্রতিহত করতে চেষ্টা করেছি তার চেয়ে কণার মত ঝগড়া ক'রে চ'লে যাওয়া ঢের ভাল ছিল।"

"নিজের দোষগুলো ছোট ক'রে বলছেন কেন আমার সামনে মিসেস বোস? আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, যত উচ্চ করে কণাকে ধরলেও আমি কিন্তু অত বড় উঁচু স্থান তাকে দিতে পারবো না—"

"তা'হলে আপনার বুদ্ধি একটু পরিপক্কতা লাভ করেছে দেখতে পাচ্ছি—। কিন্তু আমার ও কথা বলবার অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না—সত্যি কথাই বলেছিলুম। কি বলবেন বলুন।"

"বলবার অনেক আছে—তবে কোনটা আগে আর কোনটা পরে বলবো তা ভেবে পাচ্ছি না। এই যে একটু আগে বলছিলুম আপনি আর খারাপ দুটোই এনে দিয়েছেন আমার জীবনে—একবার মনে হয় ভালই হয়েছে—দাসত্ব ছেড়ে অনেকটা স্বাধীনতা পেয়েছি, আর একবার মনে হয় এত কিছু [illegible] তৃপ্তি পাচ্ছি না কেন? [illegible] তৃপ্তি [illegible] পাচ্ছি [illegible] এই [illegible] জীবনেও কোন সার্থকতা খুঁজে পাচ্ছি না,—সমস্ত দিনটা একটা জ্বালার ভিতর দিয়ে কেটে যায় তারপরে আসে একটা অসাফল্যের অবসাদ—আর এর মূলে কে আছে? আপনি!"

"আমি! আমাকে কেন আপনি দোষ দিচ্ছেন বুঝতে পারছি না—"

"কেন দোষ দি জানেন—আমি আগে কণার একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলুম, আপনাকে দেখে সে নিষ্ঠা যে কোথায় গেল খুঁজে পেলুম না, তার উপর কণার ঝগড়া, তার কথা, তার মিথ্যা দোষারোপ আমাকে অতিষ্ঠ ক'রে তুলেছিল—সেইজন্য এই জীবন বেছে নিলুম,—বেশ আছি স্ফূর্তি নিয়ে—তবু ভাল লাগে দিন কেটে যায় বেশ—"

"তাহলে এর মূলে আমি একাই নই কণাও আছে। আচ্ছা এই যে বলছিলেন যদি সে আপনার সঙ্গে ঝগড়া করবে না ব'লে প্রতিশ্রুতি দেয় তাহলে তাকে ডেকে আনবেন—"

"তাতো বলেছি—আনবো কিন্তু আপনি—মিসেস বোস—"

"আমি কি? বলুন! আপনার সার্থকতা আমি এনে দেবো কি ক'রে?"

"আপনি পারেন—"

"কণাই আপনাকে সব কিছু এনে দিতে পারে।"

"তবে তার কথা আমাকে বলবেন না—আমি যেমন আছি তেমনি থাকি, আর পারি তো আমার সার্থকতাকে আমি আদায় ক'রে নেবো জোর ক'রে।"

সুরমা একটু বিরক্তিভরে বলিল—"মিঃ ঘোষ আপনার জীবন সম্বন্ধে আমি কোন কথা শুনতে আসিনি, শুধু এসেছিলুম আপনাকে কণার কথা বলতে—তা যখন আপনি শুনতে চান না তখন আর আপনার সঙ্গে আমার কোন কথা নেই, যেদিন আমার কথা শুনতে চাইবেন সেদিন আপনারও কথা শোনাতে ডাকবেন,—আমি উঠলুম।"

শরতের মুখে চোখে স্পষ্ট একটা নিদারুণ [illegible] তার [illegible] উঠিল—সে বলিয়া উঠিল—"এমন করে [illegible] [illegible] দিচ্ছি—"

সুরমা তাচ্ছিল্যভরে হাসিয়া বলিল—"আমার বিপদ আপনার কাছ থেকে আসতে পারে না অন্ততঃ এটুকু জানি।"

শরত সরোষে দাঁড়াইয়া বলিল—"আচ্ছা বেশ—জানেন লোকে মরিয়া হ'য়ে গেলে সব কিছু করতে পারে।"

সুরমা হাসিয়া বলিল—"এখানে একটা কাণ্ড করবেন না, আমি যাচ্ছি, আপনিও বাড়ী গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ুন।"

সুরমা যাইতেছিল, শরতও তাহার পশ্চাদনুসরণ করিয়া বলিল—"আজ আমার কথা শুনে যেতেই হবে।" সুরমা কি একটা উত্তর দিবার জন্য পিছনে চাহিয়া দুইপদ অগ্রসর হইতে কাহার সঙ্গে ঈষৎ ধাক্কা লাগিল,—সে "I'm sorry" বলিয়া সম্মুখে চাহিয়া দেখিল অরিণ রয়,—সুরমা অজ্ঞাতসারে হঠাৎ একটু বিব্রত হইয়া আরক্ত হইয়া উঠিল।

অরিণ বলিল—"বাঃ বেশ তো দেখা হয়ে গেল! মিঃ ঘোস কোথায়?"

সুরমা একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল—"না, তিনি—এখানে আসেন নি।"

"তার সঙ্গে আমার এখনি দেখা করা দরকার বাড়ীতে পাওয়া যাবে কি?"

"বোধহয় পাওয়া যেতে পারে।"

অরিণ একটু ভাবিয়া বলিল—"তাহলে তাই যেতে হবে"—

সুরমা হঠাৎ বলিয়া উঠিল—"আমার সঙ্গে আমার গাড়ীতে আসুন না, যদি মনে কিছু না করেন।"

অরিণ সুরমার দিক চাহিয়া ভাবিল, তারপরে বলিল—"না মনে করবার কি আছে!"

অরিণের সঙ্গে সুরমা চলিয়া গেল—যাইবার সময় পিছন ফিরিয়া দেখিল না। শরত তাহার এ তাচ্ছিল্য কি ভাবে গ্রহণ করিল।

সুরমার গাড়ী চলিতেছিল—এবং অরিণের প্রকাণ্ড বুইক গাড়ীখানি পিছনে আসিতেছিল। সুরমার মনটা হঠাৎ অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল। সে কাজ করে দোষের এবং অন্যায় জানিয়াও, কিন্তু পৃথা অন্যায় না ভাবিয়া নিঃসঙ্কোচে করিয়া যায়। এইখানেই তাহার সহিত পৃথার পার্থক্য। এত রাত্রে একটা এক রকম অপরিচিত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না ব্যক্তিকে পাশে বসাইয়া সে যাইতেছে—ইহা বাড়ীর লোকজন কি ভাবে দেখিবে—অথবা রাজীবই বা কি ভাবিবে। লোকটী বা কেমন, এতরাত্রে অন্য লোকের বাড়ী যাইতে চায়, কিন্তু সে তো বলে নাই তাহার সঙ্গেই যাইবে—তবে সেই বা কেন হঠাৎ খেয়ালের বশে তাহাকে ডাকিয়া আনিল—শরতকে অগ্রাহ্য বা এড়াইয়া আসিবার জন্যই তাহাকে ডাকিয়াছে, তবুও দোষ নয় কি? শরতের উপর রাগ হইল, বিজয়ের উপরেও রাগ হইল—কেন সে নামিয়া চলিয়া গেল। সুরমা অত্যন্ত অসোয়াস্তি বোধ করিতে লাগিল। কিন্তু অরিণ বেশ সপ্রতিভ ভাবে অনেক কথা বলিয়া যাইতেছিল কতগুলা সুরমা ভাল করিয়া শুনিতেছিল না, কতগুলা শুনিতেছিল—সে শুনিল অরিণ বলিতেছে—"এই যে আজ চারিদিকে একটা সোরগোল উঠেছে—তাতে বোঝা যায়——এখনো ম'রে যায়নি—বেঁচে আছে,—জড়তা মানুষকে এগিয়ে দেয় মৃত্যুর পথে, নিবৃত্তির পথে—ওসব সন্ন্যাসীদের দরকার, আমাদের মত মানুষের নয়, আমরা শুধু চাই, চাই এই মাত্র—এই চাওয়ার ইচ্ছা প্রবল হ'য়ে নূতন জীবন, নূতন আলো সমস্ত জগতকে এনে দিয়েছে—ফ্রান্স, জার্ম্মানী, আমেরিকা," সুরমা মনে মনে বলিল—"লোকটা বেশ কথা বলে—" তাহার ভাল লাগিল—সে বলিল—"কিন্তু যা চাওয়া যায় তা লাভ করবার শক্তি ও ক্ষমতা থাকা চাই তো?"

"নিশ্চয়ই তাতো চাই—কিন্তু সে শক্তি আপনা হ'তে এসে পড়ে, আর যত তার প্রয়োজন হিসাবে অনুশীলন করা যায় ততই তা বেড়ে যায়—ইতিহাসে দেখুন ছোট্ট স্পার্টা কি ক'রে সমস্ত গ্রীস্ ও অন্যান্য শক্তিকে পরাভূত ক'রে নিজেকে অক্ষুণ্ণ রেখেছিল কতদিন—"

"তাহ'লে শুধু চেয়ে চুপ ক'রে বসে থাকা ভুল—তা পাবার জন্য চেষ্টা উদ্যম দরকার? অথবা যা আছে তাই জোর করে রাখা দরকার?"

"জোর শুধু সেখানেই থাকা উচিত, যেখানে তা ন্যায় সঙ্গত। জোরেরই পক্ষপাতী আমি, কিন্তু তা ব'লে আপনার জিনিষ আমি জোর করে অন্যায় ক'রে কেড়ে নিলুম—এ অমানুষিক বর্ব্বরোচিত। কিন্তু আমার [illegible]

জোর যাতে থাকবে তা আমি পাব না কেন? আমার অধিকার, "তা থেকে আমি বঞ্চিত থাকবো কেন?"

"যদি কেউ বঞ্চিত করে রাখে তাহলে?"

"তা'হলে জোর করে তা নেওয়া উচিত—"

রাজীব সুরমার এই ভাবে আসাটাকে বেশ নির্ব্বিকার ভাবে গ্রহণ করিয়া—অরিণকে সাদরে অভ্যর্থনা করিল সুরমারও সঙ্কুচিত ভাব অনেকটা কাটিয়া গেল। অনেকক্ষণ ধরিয়া রাজীব ও সুরমার সহিত কথা বলিয়া অরিণ যখন উঠিল তখন বারোটা বাজিয়া গিয়াছে। সেদিন রাত্রে সুরমার অনেকবার অরিণের কথা মনে হইল—সে ভাবিল অরিণ অভদ্র নয়, মূর্খ নয় এবং ভাল করিয়া দেখিলে অসুন্দরও নয়—

কয়েকদিন আর সে বিজয়ের সঙ্গে দেখা করিতে পারিল না—অবশেষে একদিন টেলিফোন করিয়া জানিল বিজয় কোথায় চলিয়া গিয়াছে। এদিকে উপর্য্যুপরি কতকগুলি মিটিং ও সভার কাজ লইয়া সুরমা একটু ব্যস্ত হইয়া রহিল,—আরো রহিল অরিণকে লইয়া। সে আসে, মাঝে মাঝে তাহার বাড়ীতেও রাজীব ও সুরমাকে ডাকে —থিয়েটার রোডে তাহার সুসজ্জিত বড় বাড়ী। এই ভাবে রোজ তাহাদের দেখা হয়, রোজই সুরমা শুনে মন দিয়া অরিণের কথা, তাহার ঘটনা বহুল জীবনের চিত্তাকর্ষক কাহিনী। কিছুদিন কাটিয়া গেল, সেদিনও অরিণ সকালবেলা অনেক কথা বলিতেছিল—"জীবনে আমি অনেক কষ্ট সয়েছি, জাহাজে সামান্য কাজ করেছি, মোট বয়েছি কিন্তু তাতে আমার লজ্জা হয় না। কারণ মানুষকে জীবনভর খাটতে হবেই। গত যুদ্ধের সময় কত কষ্ট সহ্য করেছি, বন্দী হয়ে কত অপমানের ভিতর দিয়ে গেছি। আজ যে আমি এই আরামের ঘরে ব'সে আছি—বা যখন ব'সে থাকি, মোটরে বেড়াই, এ সব যেন মাঝে মাঝে আমাকে কেমন ক'রে তোলে।"

আরো কিছুক্ষণ আলোচনার পর বলিল—"যুদ্ধের সময় দেখেছি ভারতীয়েরা এখনো তাদের যোদ্ধার মনোবৃত্তি হারিয়ে ফেলেনি কারণ তারা সেই সময় যুদ্ধ করেছিল আর সব জাতিদের সঙ্গে সমান সাহসের সঙ্গে। তাদের অদ্ভুত ক্ষিপ্রকারিতা অনেক সময় অনেক সুযোগ এনে দিত—অনেক কাজে—"

এক সময় কথায় কথায় বলিল—"মানুষ কখনো কষ্টের ভিতর দিয়ে না গেলে কৃতকার্য্য হ'তে পারে না। এ কথা যেমন প্রতি মানুষ সম্বন্ধে সত্য তেমনি এক একটা জাতি সম্বন্ধেও সত্য। জগতে বড় বড় লোকেরাও যেমন সয়েছেন বড় জাতিও তেমনি সয়েছে। কি ধর্ম্ম কি রাজনীতি সবেতেই তাদের যেতে হয়েছে—এক অগ্নি পরীক্ষার মাঝ দিয়ে। ধর্ম্মের ভিতর যেমন খৃষ্ট-ধর্ম্ম সব চেয়ে বেশী নির্য্যাতন সয়েছিল ব'লেই খৃষ্ট-জগৎ আজ সব চেয়ে বড়।"

খানিকক্ষণ অন্যান্য কথার পর সুরমা প্রশ্ন করিল—"আপনি কোন কোন দেশ ঘুরেছেন?"

অরিণ বলিল—"সমস্ত পৃথিবী প্রায় ঘুরেছি, কাজেও, অকাজেও। এ আমার খেয়াল বিশেষতঃ প্রাচীন সভ্য দেশগুলোই আমাকে বেশী আকর্ষণ করে।

"ইজিপ্টে গেছেন?"

"হ্যাঁ, সেইখানে মজা হয়—সে সব পর একদিন বলবো—"

"ইজিপ্টে আমারও বড় যেতে ইচ্ছে করে পৃথিবীর ভিতর প্রথম সভ্য দেশ—"

"ম্যাসপারো ও আরো কয়েকজন এ কথা বললেও অনেকের মতে ইজিপ্ট নয়—প্রথম সভ্যজাতি হচ্চে চ্যালিডোসিয়ান ও ব্যাবিলোনিয়ান তারপরে, ইজিপ্ট।"

"তাহ'লে ভারত?"

অরিণ হাসিয়া বলিল—"ঠিক জানিনা, অনেকে বলে ভারতের সভ্যতাই পুরাতন কিন্তু আমরা নিজের জিনিষকে বড় বললে তার ঠিক মূল্য নিরূপণ হয় না। কোন কোন ফরাসী লেখক ভারতীয় সভ্যতাকেই প্রথম স্থান দিয়েছেন।"

এই ভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলাপ করিয়া যায় তাহারা, কোনদিন রাজীব উঠিয়া কার্য্যান্তরে চলিয়া যায়। কতক্ষণ চলিয়া যায় তবু তাহাদের কথা ফুরায় না। দুই জনায় অনেক মতের মিল, রুচির মিল হইয়া যায়, কখনো অরিণ উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিয়া উঠে আপনি ঠিক আমারি মত।"

সুরমার সারাদিন তাহার কথা মনে হয়। কল্পনায় সে দেখে মিশরের পিরামিড ও রহস্যবিজড়িত নানা চিত্র। সেইখানে নীল নদের তটে জীবনের সহিত সংগ্রামশীল অরিণ। কখনো সমুদ্রের বেলভূমে তরঙ্গ বিক্ষিপ্ত মর্ম্মোজ্জ্বল

অরিণ, কখনো দেখে মৃত্যু পথযাত্রী ক্লিষ্ট, ক্লান্ত, অরিণ অবিরাম পথ চলিয়াও দেহের ক্লান্তি উপেক্ষা করিয়া সংগ্রামে নাচিয়া উঠিয়াছে। যুদ্ধস্থানে উন্মত্ত যোদ্ধবীর অরিণ। সমস্ত ঘৃণা সমস্ত বিরক্তি সুরমার কোথায় চলিয়া গিয়া, তাহার অন্তর ভরিয়া রহিল শুধু অরিণের অরিন্দম নিরুপম রূপছবি।

সুরমা সন্ধ্যার পর অনেকক্ষণ একলা ঘুরিয়া বাড়ী ফিরিল। কিসের একটা শূন্যতা তাহাকে আকুল করিয়া তুলিল। কোথা হইতে ঘটনাচক্র কি করিয়া আসিয়া তাহাকে কোথায় লইয়া যাইতেছে কে জানে। আজকাল রাজীবের সঙ্গে সে ভাল করিয়া কথা বলিতে পারে না, এবং সে লক্ষ্য করিয়াছে রাজীবও পারে না। তাহারা দুইজনে বসিয়া থাকে—দু একটী কথা মনে মনে খুঁজিয়া বহুক্ষণ ভাবিয়া বাহির করে, তার ভিতর ঋতু সম্বন্ধে এবং দেশের অবস্থা সম্বন্ধে কথাই বেশী এবং মাঝে মাঝে প্রণবের কথাও থাকে, আর বিশেষ কিছু না। রাজীব কখনো তাহার কাজের সম্বন্ধে আলাপ করে। সে অরিণের অংশীদার হইয়াছে। শীঘ্রই তাহাকে সেখানে যাইতে হইবে এই পর্য্যন্ত—

সুরমা নিজের বসিবার ঘরে হাতের ভিতর মাথা গুঁজিয়া অনেকক্ষণ ভাবিল। প্রাণ তাহার কিসের জন্য হা-হুতাশে ভরিয়া উঠিল। সে বুঝিতে পারে না কি চায় সে। বিরাট শূন্যতার ভিতর কোন আশ্রয়কে আঁকড়িয়া উঠিতে চায়। স্বামী চায়, সংসার চায়, না উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খলতার আনন্দ চায়, অথবা চায় বিশ্রাম—শান্তি। কেন হইল না, কেন সে পাইল না, কার দোষে? বহুদূরে সে সরিয়া যাইতেছে বন্যার স্রোতে ভাসিয়া—স্বামী সংসার সমাজ সব কিছু অনেকদূরে ফেলিয়া আসিয়াছে—অস্পষ্ট, [illegible] হইয়া গিয়াছে তাহা তাহার দৃষ্টির সম্মুখে, সে আর কিছু ভাল করিয়া দেখিতে পায় না। শুধু চোখের সামনে দেখে সে উত্তাল অকূল সাগরের বাধাহীন জলরাশি।

সারা বাড়ী নিস্তব্ধ। উপরে প্রণব ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। রাজীব নাই; নির্জ্জনতা চারিদিক হইতে তাহাকে চাপিয়া ধরিতে চাহিতেছিল—সে উঠিয়া গিয়া ড্রইংরুমে প্রান্ত পিয়ানোটী খুলিয়া বসিল। পিয়ানোর উপর [illegible] একটী [illegible] ছবি, সেদিকে চাহিয়া তাহার সারা মন আরো বিষাদ ব্যথায় ভরিয়া উঠিল, সুরমা Chopinএর Funeral march বাজাইতে লাগিল।—সমাধি—সব সমাধি, জীবনের আশার সাধের সব কিছুর সমাধি হইয়া গিয়াছে তাহারও। অতি মধুর করুণ সুর বুকের পাথর গলাইয়া দিয়া সেখানে বহাইয়া দেয় অশ্রুর নির্ঝরিণী, প্রত্যেকটী মূর্চ্ছনা, বুকের প্রতি তন্ত্রীতে আঘাত করিয়া নমিত করিয়া আনে সারা দেহ মন, ব্যথায়, অসহ যন্ত্রণায়—দীর্ঘনিশ্বাস বাধা পাইয়া বুকের ভিতরেই তুমুল তুফান তুলে। সুরের প্রথমে আত্মার আকুলতা তাহার কাতরোক্তি ব্যাকুল যাতনার বিলাপ ধ্বনি ব্যথার তরঙ্গে নাচিয়া নাচিয়া উঠিতেছে মরণ উৎসবে, তারপরে সুর ধীর—সব জ্বালা যন্ত্রণা অবসিত করিয়া নামিয়া আসে। শান্তির অবসাদ, মৃত্যুর নীরবতা তাহাও ব্যথাভরা, শান্ত বিষাদের রঙে রঙীন ধূসর ছায়াময়-

"চমৎকার, চমৎকার!" কে বলিল—রুদ্ধস্বরে সুরমা ফিরিয়া দেখিল অরিণ—সে আশ্চর্য্য হইল না, শুধু বলিল—"কখন এসেছেন?"

অরিণ চোখ দুইটী মুছিয়া বলিল—"পৃথিবীতে আর কিছু আমাকে আকুল করতে পারে না—কিন্তু সঙ্গীত মিসেস্ বোস্। আশ্চর্য্য আপনার হাত আমি জানতুম না আপনি এত সুন্দর বাজাতে পারেন এবং সঙ্গীত ভাল বাসেন। আমি কঠিন, কিন্তু সঙ্গীত আমাকে একেবারে নরম করে দেয়; যুদ্ধে হাজার হাজার লোককে মরতে দেখেছি সে বাস্তবতা আমাকে চঞ্চল করেনি, কিন্তু তারই কল্পনা দিয়ে গঠিত এই যে দুঃখের অভিব্যক্তি এই যে দুঃখভোগের সৌন্দর্য্য আমাকে একেবারে অভিভূত ক'রে ফেলে। সঙ্গীত সুন্দর—কিন্তু সঙ্গীতজ্ঞ তার চেয়েও সুন্দর—বাজান—আবার বাজান।

সুরমা মন্ত্রমুগ্ধের মত আবার বাজাইল, কতক্ষণ কে জানে—হঠাৎ কে ডাকিল—"সুরমা দি"—

সুরমা প্রথমে কাহাকেও দেখিতে পাইল না, তারপরে ভাল করিয়া দেখিল অদূরে দরজার সামনে দাঁড়াইয়া আছে মীরা।

সুরমার নেশা কাটিয়া গেল। সে [illegible]

বলিল—"মীরা কি হয়েছে? হঠাৎ কোন বিপদ হয়েছে কি?"

মীরা বলিল—"না তেমন কোন বিপদ হয়নি সুরমা দি—তবে বিপদও বটে।"

"চল ভাই বসবে"—বলিয়া সে তাহাকে তাহার বসিবার ঘরে লইয়া গেল, তারপরে জিজ্ঞাসা করিল—"মীরা ব্যাপার কি?"

"ব্যাপার কি সুরমা দি, আপনিই বলুন না। আমাকে বেঁধে দেবার চেষ্টা করছেন কেন? কদিন থেকে বাবা মা আমাকে পিড়াপিড়ি ক'রে একেবারে অতিষ্ঠ করে তুলেছেন"—

"এতো শুভ সংবাদ মীরা, বিয়ে করবে না? বাপ মা তো ভালোই করছেন।"

"কিন্তু কাকে? আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করছি কাকে বিয়ে করবো?"

"কেন বিজয়কে?"

মীরা গর্ব্বিতভাবে বলিয়া উঠিল—"যিনি আমাকে উপেক্ষা করেছেন। যিনি আমাকে উপযুক্ত বলে মনে করেননি, কখনো। যিনি আমাকে উপযাচিকা ভেবে মনে মনে ঘৃণা উপহাস করেই এসেছেন, তাঁকে আমি বিয়ে করবো কেন? আমার জীবনে অন্য কোন কাজ নেই? কেন আমি এ দীনতা, এ নীচতা বরণ করে নেবো সুরমাদি—এ অপমানের বোঝা কেন আপনারা আমার উপর তুলে দিতে চাচ্ছেন? আমি জোর ক'রে কোন কিছুই নিতে চাই না, তাই আপনাকে বলতে এলুম।"

"কিন্তু মীরা, বিজয় তো তোমাকে উপেক্ষা করেনি—তোমাকে সে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করে।"

"মিছিমিছি আমাকে ভুলিয়ে লাভ নেই। আর আপনারা যাতে আমাকে এ বিষয় নিয়ে উত্যক্ত করতে না পারেন, আমি তার ব্যবস্থাও করে এসেছি"—

"কি ব্যবস্থা করেছ মীরা—কি পাগলামী করেছ?"

"পাগলামি নয় সুরমা দি, আমি বিয়ে ক'রে এসেছি।"

"কাকে? সুরমা অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল।

"জ্যোতীশ কে।"

"সে কে মীরা?

"তিনি একজন আশ্রমেরই কর্ম্মী—"

সুরমা ভাবিবার চেষ্টা করিয়া বলিল—"কৈ আমি তো দেখিনি, তবে নামটা নেহাৎ অচেনা নয়—"

"আপনি চেনেন না, কিন্তু মিঃ বোস তাঁকে চেনেন, লোকে বলে তিনি নাকি আগে খুব খারাপ ছিলেন। কিন্তু যে খারাপ হ'য়েও আবার ভাল পথে ফিরে আসতে পারে, তার একটা কৃতিত্ব আছে, বাহাদুরী আছে—সুরমাদি! তার সঙ্কল্পের জোর আছে। তবুও হোন্ তিনি খারাপ, তাতেও আমার আপত্তি নেই, কারণ তিনি আমাকে কখনো ফাঁকি দিতে পারবেন না—কোনদিন। যদি অদৃষ্টে থাকে তবে ঐ খারাপই আমার ভাল হ'য়ে উঠবে। ঐ ধূলোই আমার সোনা হবে একদিন আশীর্ব্বাদ করুণ সুরমাদি—"

সুরমা স্তম্ভিতভাবে বসিয়াছিল, সেই ভাবেই জিজ্ঞাসা করিল—"কিন্তু তোমার বাবা, মা—আশ্রম?"

"বাবা মা হয়তো রাগ করবেন, কিন্তু আমি জানি বাপ-মা কখনো পর হ'তে পারেন না—আশ্রম থাকবে—আমি যতদিন আছি, আগে একলা ছিলুম—এখন আর ভয় কি? দুজনে মিলে জীবন আমাদের উৎসর্গ করে দিয়েছি—দেশের পায়ে।"

মীরাকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া সুরমা বলিল—"মীরা বলে যাও, তোমার স্বামীকে তুমি ভালবেসেছ?"

মীরা ফিরিয়া বলিল—"ভালবাসা না বাসা জানিনা—তবে মনে হ'ল এই আশ্রয়ই আমার শ্রেষ্ঠ অটল—বড় বড় গাছ ঝড়ে ভেঙ্গে প'ড়ে যায়, কিন্তু ঘাস কখনো ভাঙ্গে না—ও, আমার ছোট, নগণ্য, দীনই ভাল।"

মীরা আর একটা কথা বল—"আমি—আমি তোমাকে এ কাজে উত্তেজিত করেছি কি পরোক্ষ বা অপরোক্ষ কোন ভাবে?"

মীরা খানিকক্ষণ চুপ করিয়া নতমুখে দাঁড়াইয়া, পদতলে প্রসারিত কার্পেটের একটী নক্সা মনোযোগ সহকারে দেখিতে লাগিল—তার পরে ধীরে মুখ তুলিয়া বলিল—"সত্যি বলবো?"

"হ্যাঁ, মীরা সত্যি বল, যদি তোমার রায় আমার বিপক্ষেও হয় তবুও আমি এতটুকুও দুঃখিত হব না।"

মীরা একটু থামিয়া বলিল—"হ্যাঁ সুরমাদি, আপনিই" বলিয়া সে দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

সুরমা সেইভাবেই অনেকক্ষণ সেখানে বসিয়া রহিল। রাজীব ততক্ষণে বাহির হইতে আসিয়া অরিণের সহিত অনেকক্ষণ ধরিয়া আলাপ করিতেছিল। কিন্তু সুরমার দুই কাণ ভরিয়া শুধু বাজিতেছিল Funeral marchএর বিষাদ-করুণ বিলাপ রাগিণী।

১৮

হঠাৎ কোনদিক দিয়া কি হইয়া গেল। মীরা কি কাণ্ড করিল। আর সে বিজয়ের সহিত সম্প্রতি মেলা-মেশার জন্য কি ওজুহাতে দিবে? ওদিকে মীরার সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে লইয়া কত আলোচনাই হয়তো হইয়া যাইতেছে। কে জানে!

অনেকগুলি নিমন্ত্রণের কার্ড, মিটিংএর নোটীশ জমা হইয়া উঠিল। কতকগুলি সভায় সভানেত্রীরূপে সে দেখিল বিনীতা দেবীর নাম। সবগুলি কার্ড চিঠি এক-পাশে সরাইয়া রাখিয়া সুরমা একদিন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া ভাবিল—বীণা ঠিকই বলিয়াছে তাহাকে দূরে সরিয়া যাইতে হইবে তাহাকেই সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া সমাজের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে হইবে। কি হইল তাহার জীবন—একটা বিরাট অসফলতার প্রতিমূর্ত্তিস্বরূপ চিরকাল কাটাইয়া দিতে হইবে তাহাকে। টাকা, পয়সা, পদমর্য্যাদা, সব কিছু আনিয়া দিতে পারে না—সঙ্গে সঙ্গে বুঝি আত্মমর্য্যাদাটুকুও চাই।

তাহার উপর আজ কতখানি কলঙ্কের বোঝা চাপিয়া বসিল, তাহা সে উপেক্ষা করিলেও, তাচ্ছিল্য করিয়া ফেলিয়া দিলেও তাহারি অনিবার্য্য, একান্ত হইয়া উঠিয়াছে যে, সে জোর করিয়া তাহা নামাইয়া রাখিলেও অবশেষে মাথায় তুলিয়া নিতেই হইবে—কারণ এ বোঝা তাহারই। বিজয়ের দোষ কি? না তাহারই দোষ? সেই কি সম্প্রতি তাহার সহিত অতিরিক্ত ঘনিষ্ঠতা করিয়া তাহাকে বৃথা আশায় আশান্বিত করিয়া মীরার প্রতি বিরূপ করিয়া তুলিয়াছিল? অথবা বিজয় তাহার প্রতি তাহার গভীর প্রেমের পরাকাষ্ঠা দেখাইতে গিয়া মীরাকে উপেক্ষা করিল? সুরমা তাহাকে সে অবসর দিল কেন?

মীরা সুখী হইবে কি না কে জানে! কে এ জ্যোতীশ? মীরা বলিয়াছে রাজীব তাহাকে জানে এবং লোকে তাহাকে খারাপও বলে—সে মীরার মূল্য বুঝিয়া তাহাকে যথাযোগ্য সমাদর করিতে পারিবে? বেচারা মীরা দারুণ অভিমানে হঠাৎ একটা অনির্দ্দিষ্ট পথ বাছিয়া লইয়া নিজের জীবনটা এ ভাবে নষ্ট করিয়া দিল কেন? সেও তাহাকে দুষিয়াছে এ লজ্জা, এ তিরস্কার তাহাকে আরো কঠিন আঘাতে জর্জ্জরিত করিয়া তুলিতে চায়। কিন্তু সে শুনিল না, সে বুঝিল না যে তাহার অন্তর্নিহিত গোপনতম ভাব খারাপ ছিল না, বিজয়ের সহিত ঘনিষ্ঠতা করার প্রকৃত উদ্দেশ্য দোষনীয় ছিল না। মীরা শুনিল না, তাহাকে তাহার সারা জীবনের জন্য দায়ী করিয়া কোথায় কোন অপরিচিত সহযাত্রীর হাত ধরিয়া কোন অনিশ্চিত পথে চলিয়া গেল। নিজের জীবনের উপর তাহার ধিক্কার জন্মিল—পৃথিবীতে সে কি শুধু আসিয়াছে অমঙ্গল সূচনাকারী একটা ধূমকেতুর মত? এই কি তাহার জীবনের পরিণতি?

কিছুদিন চলিয়া গিয়াছে। রাজীব ও অরিণ চলিয়া গিয়াছে কার্য্যস্থানে,—কাছাড় অঞ্চলের পাহাড়ে তাহারা তেলের খনি লিজ লইয়া দুইজনে অংশীদার হইয়া কাজ আরম্ভ করিয়াছে। সুরমা একলা থাকে। সে কোনখানে যায় না, কাহারও সহিত দেখা করে না, শুধু সন্ধ্যার সময় অনেকটা মোটরে ঘুরিয়া আসে। আর অন্য সময়গুলি শুধু তাহার কাটে চিন্তায় চিন্তায়। আরো সুনীলের স্মৃতিকে আবরিত করিয়া বিজয়কে অতল সাগরে ডুবাইয়া দিয়া তাহার অরিণের কথা মনে হয় সব সময়ে। সে তাহার কথা শুনিতে ভালবাসে—তাহার সে অপূর্ব্ব-কাহিনী শুনিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাইয়া দিতে ইচ্ছা হয়, তাহাতে সে শান্তি পায়। যখন চিন্তার ভাব, অসহ্য হইয়া উঠে, তখন সে বই পড়ে, বাজায়।

কিছুদিন পরে অরিণ ফিরিয়া আসিল।

সুরমা তাহাকে দেখিয়া খুশী হইয়া রাজীবের কথা ও তাহাদের কাজের কথা জিজ্ঞাসা করিল। অরিণ বলিল রাজীব বেশ ভাল আছে এবং যেখানে কাজ হইতেছে সেইখানে তেল পাইবার খুব সম্ভাবনা আছে। রাজীব শীঘ্রই আসিয়া আবার চলিয়া যাইবে।

অরিণ কিছুদিন কলিকাতায় রহিয়া গেল, এবং সেই দিন গুলি সুরমার এক নবীন আনন্দে কাটিয়া যাইতে লাগিল। সে রোজ আসে, বহুক্ষণ গল্প করিয়া কাটাইয়া দেয়, সুরমা তাহাকে দেখে, সুন্দর, বীর, অসমসাহসিক যোদ্ধা। কত কবিতা কত গান তাহার কথার ভিতর লুকানো থাকে, কত অজানা প্রেয়সীর হাসিকান্না খেলিয়া যায়, কত বুকের ব্যথা, কত অশ্রুর বন্যা, কত জাতির রহস্য, কত দেশের সমস্যা—সে খুঁজিয়া পায় তাহার কথার ভিতর। সুরমার কাছে অরিণ একটি রহস্য ভাণ্ডার, একটী কল্পনা,—সে সব ভুলিয়া গিয়া শুধু শুনে তাহার কথা, একদৃষ্টে চাহিয়া থাকে তাহার মুখের দিকে। তাহার কাছে জীবনের আর একটী আবরণ সরিয়া গিয়াছে,—এ যেন আর একটি অঙ্কের প্রারম্ভ।

শীত চলিয়া গিয়া বসন্ত আসিয়াছে—সারা প্রকৃতি নবীন জাগরণে জাগিয়া উঠিয়াছে—সুরমাও সঙ্গে সঙ্গে জাগিয়া উঠিয়া আবার তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া ডুবিয়া গিয়াছে এক অভিনব স্বপ্নরাজ্যে, যাহা তাহারি জন্য রচিয়া দিয়াছে অরিণ। তাহার উতল মন শান্ত হইয়া খুঁজিয়া পাইয়াছে কি এক নূতন স্বচ্ছন্দতা—বাহিরের সমস্ত সম্বন্ধ সত্যই রহিত করিয়া দিয়া, সে শুধু রহিল তাহার নবাবিষ্কৃত সুখের কল্পনা রাজ্যে। সে চিঠি লিখিয়া অনেক সমিতির সভ্য পদ অথবা সেক্রেটারী পদ ত্যাগ করিল—এবং যত কিছু কাজ কর্ম্ম, কাগজ পত্র ছিল সব অন্যকে ভারার্পণ করিয়া মুক্তির নিশ্বাস ফেলিল। সঙ্গে সঙ্গে একটু অনুশোচনাও বোধ করিল—সকলের ভিতর সেই বা কেন কলঙ্কভারগ্রস্ত হইয়া সভ্যসমাজ হইতে পলাইয়া আসিল? আর তো কেহ করে না, আর তো কাহারো নামে এ কালিমা লেপন হয় নাই। কোথাকার কে বিনীতা দেবী কোথা হইতে আসিয়া আজ পদমর্য্যাদার চরম শিখায় উঠিয়া দেশপূজ্যা হইয়া উঠিতেছে—আর সে!—শুধু অরিণের সঙ্গ সকল দুঃখ ভার লঘু করিয়া তাহার তাপিত প্রাণে শান্তির প্রলেপ লেপন করিয়া দেয়—এবং সেই তাহার একমাত্র সান্ত্বনা স্বরূপ সমস্ত দুঃখকে উজ্জ্বল করিয়া তুলে।

অরিণ ইতিমধ্যে আর একবার গিয়া ফিরিয়া আসিয়া জানাইয়াছে—কাজ ভাল চলিতেছে, তেলের সন্ধান মিলিয়াছে। রাজীবও সুরমাকে উৎসাহিত করিয়া চিঠি লিখিয়াছে, তারপরে পত্রের শেষাংশ একটু হাতাশা মিশ্রিত আক্ষেপে ভরিয়া দিয়া দুই লাইন লিখিয়াছে—"এত পরিশ্রম, এত সফলতা কার জন্য সুরমা? মনে হয় আমার সব শূন্য হয়ে গেছে, শুধু একমাত্র সান্ত্বনা প্রণব!

সুরমা চিঠি পড়িয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া ভাবিল, মনটা ক্ষণকালের জন্য ব্যথিত হইয়া উঠিল। একটু আত্মগ্লানি, একটু অনুতাপ, একটু সঙ্কোচ কিছুক্ষণের জন্য তাহার মনটাকে আন্দোলিত করিয়া দিয়া চলিয়া গেল। রাজীবের আজ এ হতাশার আক্ষেপ কেন? কেন তাহার সব শূন্য হইয়াছে? মিনতির পূর্ণ ভাণ্ডার আজ শূন্য হইল কাহার অভিশাপে? সে তো মনের সর্ব্বচিন্তা হইতে তাহাকে অপসারিত করিয়া দিয়াছে বহুদিন আগে, মনের এতটুকু ভাবনা দিয়াও তো সে তাহার কোন অনিষ্ট কামনা করে নাই, তবে রাজীবের আজ সব শূন্য কেন? আর, তাহার সুপ্ত ভাব গুলি জাগিয়া উঠিল কেন আজ বসন্তের অনন্ত আহ্বানে? সে জাগিয়াছে,—তাহাকে জাগাইয়াছে কে? অরিণ—অরিণ! উদ্দামতায় নয়, চঞ্চলতায় নয়, উচ্ছৃঙ্খলতায় নয়, উচ্ছ্বাসের প্রবলতায় নয়, শুধু দরদীর সতর্ক পরশে, বেদনার মৃদুগুঞ্জনে, মলয়ের শান্ত হিল্লোলে—। কোন দিনে, কোন মাসে, কোন ক্ষণে, তাহার প্রাণে বসন্ত আবার ফুলে ফলে ভরিয়া উঠিয়াছে, তাহার অন্তরের কুঞ্জবিতানে সকল পল্লব মুঞ্জরিত করিয়া হাজার কোকিল ডাকিয়া উঠিয়াছে, তাহা সে হিসাব করিয়া রাখে নাই—

"সুরমা" শুধু এই একটী মাত্র ডাকে সে পাইয়াছিল সমস্ত বিশ্বের মাধুরী,—প্রথম মানবের প্রথম বাণী স্ফুরণের আনন্দাপ্লুত বিস্ময়, ঐ একটী মাত্র ডাকে সে সব ভুলিয়া একেবারে আপন করিয়া লইয়াছিল তাহাকে,—আর

অরিণ ?—সেও নয় নাই কি ? তারপরে প্রতিদিনকার সাহচর্য্যে নিবিড় হইয়া উঠিল তাহাদের অন্তরের ভাবধারা, দুইজনে দুইজনকে আপন করিয়া লইয়া রচিয়া তুলিল নিভৃতে—তাহাদেরই একান্ত, নিজস্ব একটী রাজ্য,—জগতের বাহিরে সর্ব্বলোকের অন্তরালে।

অরিণ রোজ আসে—সুরমা বাজায়, অরিণ শোনে, অরিণ অন্তরের অর্ঘ্য নিবেদন করে, সুরমা গ্রহণ করে। কঠিনতার আবরণে আবৃত শুক্তির অন্তরশায়িনী মুক্তার মত তাহার মন নির্ম্মল, পবিত্র, মহামূল্য,—সুরমাকে মুগ্ধ করিয়াছিল। তাহার কাছে সে পায় শান্তি, বিরাম, জ্বালাহীন, উত্তাপহীন, স্নিগ্ধ আলো। দুঃখে সান্ত্বনা, সুখে উল্লাস আর কেহ তাহাকে দেয় নাই তো কোনদিন—অবাধে সে তাহার কাছে সমস্ত কথা বলিয়া যায়, তাহার জীবনের সুখ, দুঃখ, সমস্যার কথা—আর সে শোনে দরদ দিয়া, তারপরে অতি যত্নে আদরে, তাহাকে বুঝাইয়া দেয় সমাধান করিয়া দেয় সমস্ত জটিলতা। সে চিরসাথী রূপে তাহার হাত ধরিয়াছে ; জীবনের বন্ধুর পথে বুঝি চিরাশ্রয় পাইয়াছে সুরমা—আর পথ তাহার ভ্রষ্ট হইবার নয়। সেদিন সন্ধ্যার পর সে বসিয়াছিল, আর সুরমা বাজাইতেছিল—Beethoven এর Pathetique Sonata—প্রাণ দিয়া। সুরের ব্যথা ঘুরিয়া ফিরিয়া বার বার প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিতেছিল তাহাদের অন্তরের বেদনার বাণী—অনেকক্ষণ বাজাইয়া বাজনা থামাইয়া সুরমা বসিয়া রহিল। অনেকক্ষণ দুইজনে সে নিঃশব্দ ধ্বনি উপভোগ করিল—নিস্তব্ধ কক্ষতলে তখনো সুরের রেশ ঘুরিয়া মরিতেছিল—বাতাস কাঁপাইয়া, ফুলকে কাঁদাইয়া—অরিণ বলিয়াছিল "তোমাকে ভালবাসি বলবো না, কারণ জীবনে অনেকবার ও কথাটা বলেছি ও তার অমর্য্যাদা করেছি, কিন্তু তুমি আমার সমস্ত আত্মা জুড়ে একটা পূর্ণতা এনে দিয়েছ, আমার জীবনে এক অভিনব আনন্দ মূর্ত্তিতে এসে দেখা দিয়েছ।"

আর একদিন সে বলিয়াছিল—"স্ত্রীলোকের উপর আমার চিরকাল একটা ঘৃণা ছিল। পৃথিবীর সব জায়গা ঘুরেছি কিন্তু স্ত্রীজাতির প্রতি মুখে অনেকবার বললেও অন্তরে কখনো শ্রদ্ধা বা ভালবাসা অনুভব করিনি কিন্তু তুমি আমার সমস্ত জ্ঞান বিবেককে উজ্জ্বল ক... কি আনন্দের দীপশিখা জ্বালালে—কি চির রমণী... মধুর ছবি দেখালে ? তোমার চেয়ে সুন্দর... দেখেছি, তোমার চেয়েও বুদ্ধিমতী দেখেছি, তু... অসাধারণ নও, আশ্চর্য্য নও—তবু—তবু—তুমি যে আমারি অস্তিত্বকে সার্থক ক'রে তুলবার জন্য জগতে নেমে এসেছো। আমার কেউ নেই, এতদিন একা এ... থেকে এক দুর্দ্দান্ত জীবন যাপন করে এসেছি। কি... আর ভাল লাগছে না। এখন ইচ্ছা হয় শান্তভাবে শু... চুপ করে শুয়ে থাকি, আর তুমি আমাকে শুনিয়ে যা... শুধু অনন্ত সুরের অনন্ত রাগিণী। জীবনের পথে যাদে... সঙ্গে দেখা হয়েছিল। স্বল্প পরিচয়েই তাদের কাছে চিরবিদায় চেয়ে নিয়েছি,—কিন্তু তোমার সঙ্গে প্রা... চায় চির-বিশ্রাম, চির-অবিচ্ছিন্নতা।"

সুরমাও তাহাই চায়—স্নিগ্ধ মধুর জ্যোৎস্না-ধারা... তাহার নিদাঘ জ্বালা শান্তি পাইয়াছে। সমস্ত ক্ষতের যন্ত্রণা নিরাময় হইয়া সে নিরোগ হইয়া উঠিয়াছে।

তাহাদের কথার আড়ম্বর ছিল না। ব্যবহারের বাহুল্যতা ছিল না, শুধু দুইজনার আত্মা মিলিয়া এক হইয়া গিয়াছিল, এবং অন্তরে তাহারা বুঝিত পরস্পরের অন্তরের ভাষা। একদিন অরিণ বলিয়াছিল—"সুরমা, আমি নিজেকে বোঝাতে তোমাকে একটী কথাও বলবো না। কারণ এর আগে কথা আমি আরো অনেক বলেছি এবং এখনো বলতে পারি অজস্র, কিন্তু তোমার কাছে আমি শুধু কথা ব'লে তোমার অমর্য্যাদা করবো না, বা নিজেকেও খেলো করবো না।"

সুরমাও কিছু শুনিতে চায় না, বলিতেও চায় না, সেও শুধু অনুভব করিতে চায় প্রাণে—মনে।

তারপরে—একদিন অনেকদিন পরে সুরমা চমকিয়া দেখিল, অনেকদিন হইয়া গিয়াছে রাজীব আসে নাই। অরিণ ইতিমধ্যে আরো তিন চারবার গিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। রাজীব প্রত্যেকবারই বলে আসিবে আসিবে কিন্তু দিন চলিয়া যায়, মাস চলিয়া যায়। একটী না একটী ওজুহাত দিয়া রাজীব আসে না।

সেদিন সকালে অরিণ আসিয়া বলিল—...

পুষ্পপাত্র ফটোগ্রাফ প্রতিযোগিতা—৯ নং

—প্রথম পুরস্কার—

—"আমি ভাঙ্গিব পাষাণ কারা
আমি জগৎ জুড়িয়া বেড়াব গাহিয়া
আকুল পাগল পারা"—

শ্রীঅমিতেন্দ্র নাথ ঠাকুর
—কলিকাতা

"আঁটী আঁটী ধান চলে ভারে ভার"

*—

২য় পুরস্কার—
শ্রীক্ষীরোদকুমার চৌধুরী, কলিকাতা।

পুঃ ফঃ প্রতিযোগিতা নং ৮
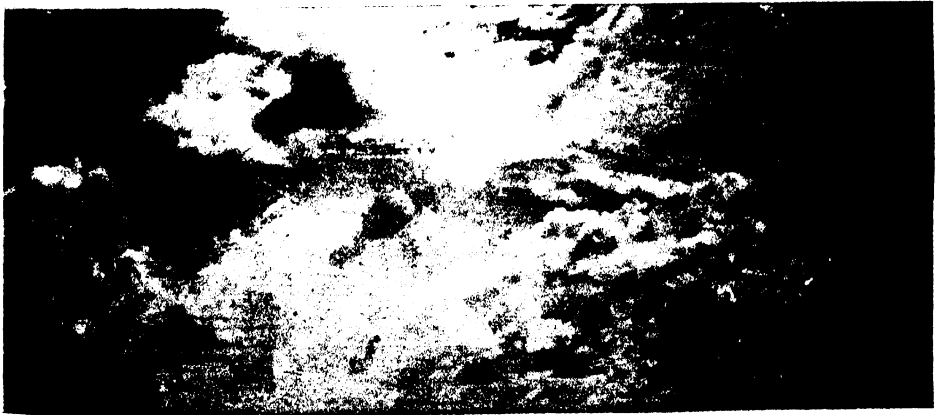
২য় পুরস্কার — মেঘমালা— শ্রীঅসীম চট্টোপাধ্যায়, বাঁকুড়া।

যাচ্ছি। আমি গেলে রাজীব অবসর হবে, আসতে পারবে।"

সুরমা জিজ্ঞাসা করিল—"আর তুমি ?"

"আমি ? আমিও শিগ্‌গিরই আসবো—কারণ তুমি জানো—তোমায় ছেড়ে বেশীদিন থাকতে পারি না। বিশ্বাস করছো না ? যদিও আমি জীবনে সত্যি কথা খুব কম বলেছি, কিন্তু তোমার কাছে আমি কখনো মিথ্যা বলতে পারি না।"

কিন্তু তোমাকে প্রথম দেখে মনে হয়েছিল তুমি ঠগ, জোচ্চোর, প্রতারক।"

অরিণ হাসিয়া উঠিল—"অতটা না হলেও কাছাকাছি ঠিক কল্পনাই করেছিলে। জীবনে তোমার জাতটাকে ঠকিয়েছি অনেকবার, আর ঠকিয়ে আনন্দও পেয়েছি—কিন্তু তোমার সঙ্গে কখনো প্রতারণা করতে ইচ্ছা হয়নি, একদিন কি ? এক মুহূর্ত্তের জন্যেও নয়।

আরিণ বিদায় লইয়া চলিয়া গেলে সুরমা বড়ই নিঃসঙ্গ বোধ করিল। কিন্তু কয়েকদিন পরেই আবার সে ফিরিয়া আসিতে, খুসি হইয়া সে রাজীবের কথা জিজ্ঞাসা করিল—"আমার স্বামী আসছে না কেন ?"

অরিণ বলিল—"আমি ঠিক বলতে পারছি না,—একটা জায়গায় যথেষ্ট তেল পাওয়া গেছে, ভাল কাজ চলছে। আমি তাকে বলেছিলুম আসবার কথা, কিন্তু সে বললো তার সেখানে থাকা বড্ড দরকার।"

সুরমা একটু ভাবিয়া বলিল—"কিন্তু অনেকদিন হয়ে গেছে যে—আর কোন বিশেষ কারণ আছে বলে কি তোমার মনে হয় ?"

অরিণ বলিল—"তা জানি না সুরমা—"

"আমার উপর কোন বিরক্তি বা অসন্তুষ্টি কিছু টের পেয়েছ কি ?"

"না সে রকম কিছু বুঝতে পারিনি—"

"তবে এই যে তুমি আসছ—বা আমার সঙ্গে মেলা-মেশা—এ সব জানে কি ?"

"কি জানি তবে সে নিজেই আমাকে বলেছে—আমার স্ত্রীকে দেখো।"

কথাটা শুনিয়া সুরমার বুক কাঁপিয়া উঠিল—রাজীব নিঃসঙ্কোচে, অটল বিশ্বাসে, তাহাকে দেখিতে বলে অরিণকেই, আর সে সেই বিশ্বাসেরই অপলাপ করিতেছে ! এ কি অন্যায়, এ কি অবিচার !

অবশেষে অনেকদিন পরে একদিন রাজীব ফিরিয়া আসিল। সুরমা তাহার আগমনে একটু খুসী হইলেও খানিকটা অসোয়াস্তি বোধ করিল। তাহার মনে হইল আর সে অত ঘনিষ্ঠভাবে হয়তো অরিণের সহিত মিশিতে পারিবে না। কিন্তু নিজেকেই আবার চোখ রাঙাইয়া শাসন করিয়া ভাবিল, রাজীব কোনদিন ব্যবহারে বা কথায়, তাহার কোন কাজে বা গতিবিধিতে তো বাধা দেয় নাই—তবে কেন ? গৃহস্বামী ফিরিয়া আসিয়াছে তাহার নিজগৃহে, তাহাতে তাহার মনে এ দ্বিধা বা আপত্তি কেন ? সুরমা নিজেকে তিরস্কার করিয়া পরক্ষণেই তাহাকে হাসিমুখে সম্বর্দ্ধনা করিল। সেদিন সে যত্ন করিয়া রান্নাঘরে পাকের ব্যবস্থা করিয়া দিল, রাজীব খাইবার সময়ে সামনে গিয়া বসিল—একটু বেশী করিয়া যত্ন, আপ্যায়ন করিতে ইচ্ছা হইল। কিন্তু হঠাৎ আজ এত আধিক্যই বা সে দেখাইতে চায় কেন ? নিজের পক্ষ দুর্ব্বল হইয়া গেলে লোকে এমন করিয়াই বুঝি নিজেকে সমর্থন করিতে চায় ? সুরমা ভাবিল এ কি তাহার রাজীবের প্রতি প্রীতি, অনুরাগ ? অথবা শুধু বিবেক-প্রণোদিত কর্ত্তব্য-বোধ ? না স্বামীর প্রতি অত্যাচারিণী পত্নীর "শূন্য-পাদ-পূরণ ?" কিন্তু হাসিতে গিয়া তাহার হাসি শুকাইয়া যায়, সে বেশীক্ষণ বসিয়া আলাপ করিতে পারে না—মন,প্রাণ আপনা হইতে সঙ্কুচিত হইয়া আসে—জোর করিয়া হাসিতে গেলে মনে হয়, অভিনয়ে আধিক্য-দোষ ঘটিতেছে বুঝি—। মনটা আন্দোলিত হইয়া উঠে—এ কি হইল তাহার ? স্বামী দূর হইতে দূরান্তরে কত দূরে চলিয়া গিয়াছে,—কত পর, কত অচেনা হইয়া গিয়াছে সে,আর একজন অপরিচিত আসিয়া আপন হইতে আপনতম হইয়া বসিল ?—আর এ কি, বিড়ম্বনা ! যে অনুরাগ যে সান্ত্বনা সে স্বামীর নিকট হইতে পায় নাই, তাহা সে পাইয়াছে এমন একজনার কাছে—যাহাকে কোন কিছু বলিয়া পরিচয় দিবার নাই। তবু সে পারে না মনকে জোর করিয়া অরিণের দিক হইতে ফিরাইয়া

আনিতে, তাহা একেবারে এক হইয়া মিশিয়া গিয়াছে তাহার সহিত, আর সাধ্য নাই তাহা সে চয়ন করিয়া পৃথক্ করে।

এক এক সময়ে সে নিজের পক্ষ-সমর্থন করিয়া ভাবে সে কিছুমাত্র অন্যায় করিতেছে না, তাহার প্রতি অন্যায়ের প্রতিশোধ লইতেছে মাত্র,—রাজীবের প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিতেছে মাত্র—কিন্তু পরক্ষণেই মনে হয় রাজীবের সমস্ত অপরাধের তুলনায়, এ প্রতিশোধের মাত্রা কত বেশী হইয়া গিয়াছে, তাহার প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিতে গিয়া সে নিজেকে কতখানি অপরাধী করিয়া তুলিতেছে, এত দিন সে তাহার উপর অন্যায় অবিচার করিয়াছে বলিয়া অন্তরে বাহিরে অনবরত ঘুষিয়াছে, তাহারই প্রতি আজ সে কত বড় অন্যায়, অবিচার করিতেছে। সুরমা একটু লজ্জিত হইল, রাজীবের প্রতি সমবেদনা অনুভব করিল—কিন্তু তাহার সমস্ত দ্বন্দ্বকে পরাভূত করিয়া, অটল অচঞ্চল হইয়া রহিল—তাহার অন্তরে আমূল প্রোথিত অরিণের নামাঙ্কিত রঙিন বিজয় নিশান—!

রাজীব আসিয়া বলিয়াছে শুধু তাহার কাজের কথা—"এত শিগ্‌গীর যে তেল পাওয়া যাবে সে কথা আমরা ভাবিনি—অনেক পরিশ্রম ক'রে তবে সন্ধান মেলে—কিন্তু আমাদের এটা প্রথমেই কৃতকার্য্য হয়েছে—"

সুরমা বলিল—"ওখানে নাকি খুব কলকারখানা বসানো হয়েছে?"

"হ্যাঁ ওটা একটা সহর বিশেষ হয়ে উঠেছে। কত লোক কত কুলী সমানে কাজ করছে—আমার সেখানে থাকতে ভাল লাগে—"

সুরমা দেখিল রাজীবের কিছুদিন পূর্ব্বের দ্বিধা ভাবটা একটু কাটিয়া গিয়াছে—সম্পূর্ণ না কাটিলেও,—এ কি দীর্ঘ বিচ্ছেদের ফলে? রাজীব বলিতেছিল—"তবু মাঝে মাঝে একটু এদিকে আসতে ইচ্ছা করে প্রণবের জন্য—আর—"একটু থামিয়া সে আবার বলিল—"বেশীদিন থাকতে পারবো না, আবার যেতে হবে—কিন্তু মনে হয়, এত করছি কিসের জন্য? টাকার আমার কোন দরকার নেই, আর এমন কোন অভাবও নেই যে টাকা দিয়ে পূর্ণ করা যায়,—তবে কি হবে? কিন্তু মনে হয় তুমি আছ—"

সুরমা লক্ষ্য করিল তাহার এইদিকে আসিবার প্রয়োজন হয় প্রণবের জন্য আর কার জন্য কি জানি, তাহার জন্য নিশ্চয় নয়,—আর টাকার প্রয়োজন হয় রাজীবের সুরমার জন্য—সুরমা টাকার কাঙাল, টাকারই সঙ্গে তাহার সহিত সম্পর্ক বেশী। কিন্তু সে কিছু বলিল না, শুধু বলিল "আমারও বড় একলা লাগতো—"কিন্তু কথাটা তাহার নিজের কাণে একটা উপহাসের মত শুনাইল!

অরিণ আগের মত আসে, রাজীব আগের মতই হাসিয়া সম্বর্দ্ধনা করিয়া অনেকক্ষণ কথা বলে,—তারপরে সে সরিয়া যায়—নিঃসঙ্কোচে, দ্বিধাবিহীন ভাবে,—তখন সুরমা অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বাজায় ও অরিণ শোনে—। রাজীব একবার খোঁজ লয় না, বা দেখিতে আসে না অরিণ রহিল কি গেল—। একদিন সুরমা অরিণকে বলিল—"দেখো আমি অন্যায় করছি বলে মনে হয়—"অরিণ বলিল—"তা হয়তো হয়, কিন্তু সত্যি করে ভাবতে গেলে অন্যায় করছ কি? আমি তো তোমাকে অন্যায়ের পথে নিয়ে যাচ্ছি না সুরমা, আমি চাই তুমি মানে, সম্মানে, তোমারই উপযুক্ত পদমর্য্যাদায় থেকে জগতে শ্রেষ্ঠ আসন লাভ কর,—তাতে সবচেয়ে আমারি আনন্দ বেশী হবে—আমি এমন কিছু করছি না যাতে রাজীবকে অন্যায় করা হচ্ছে সেইজন্য আমার বিবেক পরিষ্কার—

সুরমা আর কিছু উত্তর খুঁজিয়া পাইল না—কিন্তু তবু নিজেকে সে ভুলাইতে পারিল না—মন তাহার বার বারই বলিয়া উঠিল "অন্যায়—"

রাজীব কয়েকদিন রহিল। সেই ভাবে কাজ কর্ম্ম লইয়া, সুরমার সঙ্গে খুব কম কথা বলিয়া, রোজ বাহিরে একটু বেড়াইয়া আসে এবং সঙ্গে লইয়া যায় প্রণবকে। প্রণব এখন অনেক কথা বলিতে পারে, রাজীবকে ভালও বাসে খুব, মায়ের চাইতেও বেশী। সুরমা প্রায় তাহাদিগকে গল্প করিতে শুনে। প্রায় সমস্ত ক্ষণই রাজীব তাহাকে কাছে রাখে, তাহারই সঙ্গে হাসে, খেলা করে, গল্প করে। সন্ধ্যার পরে যখন তাহারা বেড়াইয়া বাড়ী ফিরিয়া আসে প্রণব উল্লসিত হইয়া তাহার কাছে দৌড়াইয়া আসিয়া নিত্য নূতন খেলনা দেখায়।

সুরমা দেখে রাজীবের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া

গিয়াছে। গাম্ভীর্য্য অনেক বেশী বাড়িয়া গিয়া তাহাকে আরো স্থির অচঞ্চল করিয়া দিয়াছিল। রাজীবের সমস্ত মন প্রাণ যেন গভীর ভাবে কোন পাথরের সহিত গ্রথিত হইয়া গিয়া, একেবারে বজ্রের মত কঠিন হইয়া, বিরাট পর্ব্বতের মত অটল হইয়া গিয়াছে। আর বিশ্বগ্রাসী প্রবল ঝঞ্ঝায় ভাঙ্গিবার নয়—প্রলয়ান্তকারী ভীষণ ভূমিকম্পেও টলিবার নয়। তাহার দুই পাশের চুল অনেকগুলি সাদা হইতে আরম্ভ হইয়াছে—বয়সের অধিক রেখা মুখে সুস্পষ্ট হইয়াছে। সুরমা বুঝিতে পারে তাহার মনের সহিত কি কতগুলি কথাও বুঝি সঙ্গে সঙ্গে পাথর হইয়া গিয়াছে—যাহা আর এ জীবনে ক্ষয় হইবার নয়,—কিন্তু কি সে কথা? কোন সে কাহিনী—? মিনতির না তাহার?

একদিন সন্ধ্যার সময় সুরমা প্রণবকে খুঁজিয়া খুঁজিয়া লাইব্রেরীতে প্রবেশ করিল, সেইদিন তাহার মানস-পটে ফুটিয়া উঠিল ঠিক আর একদিনের ছবি,—আর একদিন সে আসিয়াছিল—আর রাজীব শুনাইয়াছিল তাহাকে শেলীর কবিতা—সেদিন সে ছিল অনুরক্তা স্ত্রী, —প্রথম-সন্তান-স্নেহসিক্তা মা।—কিন্তু আজ সে কোথা হইতে কোথায় চলিয়া গিয়াছে—কাহার দোষে ও কিসের নেশায়? সেই সব আছে, সেই ঘর আছে, বাড়ী আছে—শুধু সে আর সে সুরমা নাই—রাজীব আর সে রাজীব নাই। নিঃশব্দে সে চারিদিকে চাহিয়া দেখিল,—ঠিক সেই রকম অর্দ্ধ আলোকিত ঘর, সে দেখিল ঠিক সেই দিনের মত একই স্থানে কে বসিয়া আছে, সুরমা বুঝিতে পারিল যে কে তাহার চোখ দুইটা জ্বালা করিয়া উঠিল,—সে দেখিল রাজীব টেবিলের উপর দুই হাতের ভিতর মাথা গুঁজিয়া বসিয়া আছে, আর প্রণব গম্ভীর হইয়া চিন্তিত ভাবে পিতার মাথায় ছোট্ট ছোট্ট হাত বুলাইয়া দিতেছে। সুরমা দ্রুতপদে নিঃশব্দে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল, তাহার চোখ ফাটিয়া জল আসিতেছিল। বড় বড় দুঃখ ভার আজ রাজীবের উপর নামিয়া আসিয়াছে—যাহা তাহার উন্নত শিরকে, হৃদয়কে, [illegible] এ ভাবে লুণ্ঠিত করিয়াছে। আর কি কেহ তাহাকে সান্ত্বনা দিবার নাই—একমাত্র শিশু প্রণব ছাড়া।

তাহার একবার ইচ্ছা হইল সে যায়, কিন্তু পা তাহার চলিতেছিল না, কলঙ্কিত হাতে আর সে স্পর্শ করিতে সাহস করে না রাজীবের দেহকে—

তারপর দিনই রাজীব হঠাৎ চাকরদের হুকুম দিল তাহার জিনিষপত্র ঠিক করিতে এবং বলিল সেই রাত্রে সে চলিয়া যাইবে খনিতে। সুরমার একবার ইচ্ছা হইল বলে আর কয়েকদিন থাকিয়া যাউক, কিন্তু বলিতে পারিল না।

সে সারাদিন রাজীবের কাছে কাছে ঘুরিয়া বেড়াইল, আর রাজীব সারাদিন প্রণবকে নিয়া রহিল, তারপরে পিতাপুত্রে দুইজনে বিকালে বাহির হইয়া প্রায় একগাড়ী খেলনা কিনিয়া আনিল।

রাজীবের বসিবার ঘরে প্রণব চারিদিকে খেলনা লইয়া উল্লসিত হইয়া খেলিতেছিল। সুরমা কিছু করিতে হইবে সেইজন্যই অনিচ্ছায় অন্যমনস্কভাবে প্রণবের উচ্ছ্বসিত কথার উত্তরে দু একটা কথা বলিয়া খেলনাগুলি দেখিতেছিল, আর রাজীব স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া বসিয়াছিল—মুখে মাঝে মাঝে একটা ব্যথার ভাব সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছিল, এবং কি বলিতে গিয়া ওষ্ঠপ্রান্তে সে কথা মিলিয়া যাইতেছিল।

ক্রমে যাত্রার সময় হইয়া আসিল। নীরবে রাজীব বিদায় গ্রহণ করিল, সুরমা মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"কবে আসবে?"

রাজীব শুষ্ক হাসি হাসিয়া বলিল—"জানিনা" শুধু প্রণবকে একবার বুকে চাপিয়া ধরিয়া সে দ্রুতপদে নীচে নামিয়া গেল—

মুখরা সুরমা আজ সব ভাষা হারাইয়া ফেলিয়াছে—সে চুপ করিয়া সিঁড়ির রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

কি এমন কি চিন্তা, কি এত ভাবনা রাজীবকে আচ্ছন্ন করিয়া ধরিয়াছে তাহার জানিতে ইচ্ছা হয়—কিন্তু জিজ্ঞাসা করিতে সাহস হয় নাই। মাঝে মাঝে মনে হয় সে কি তাহার সম্বন্ধে কিছু বুঝিতে পারিয়াছে? কিছু জানিতে পারিয়াছে কি? না বোধহয়—তাহা হইলে সে কি অরিণকে বন্ধু ভাবে সম্বোধন করিতে পারিত। যদিন আগে রাজীব তাহাকে কি বলিতে চাহিয়াছিল—

কিন্তু সেদিন বিজয়কে লইয়া বেড়াইয়া বাড়ী ফিরিতে তাহার দেরী হইয়া গিয়াছিল, তারপর হইতে সে আর তাহাকে কোন কথা বলে নাই, তারও পূর্ব্বে সে কতদিন কি কথা বলিবার আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছে, সুরমাই তাহা উপেক্ষা ভরে শুনে নাই। তাহা হইলে সে কি তাহার কাছে ফিরিয়া আসিতে চাহিয়াছিল—এবং সুরমাই কি অর্দ্ধপথ হইতে বিদায় করিয়া দিয়াছে তাহাকে? আর এত শিগ্‌গির তাহার এত পরিবর্ত্তন হইল কিসে? কাহার জন্য? তাহার কি? না মিনতির? অরিণের কাছে সে যাহা পাইয়াছে তাহা কি সে রাজীবের কাছে পায় নাই? অথবা পাইয়াও গ্রহণ করে নাই? কে বলিবে?

সুরমা ব্যথা পায় কিন্তু উপায়ও খুঁজিয়া পায় না। অন্যায় বুঝিয়াও সে নিজেকে বারণ করিতে পারে না, শেষ জানিয়াও সংশোধন করিতে পারে না—আর অরিণ, সে যে তাহারি হইয়া গিয়াছে—একান্ত ভাবে। তাহাকে ভুলিয়া যাওয়া বা দূরে সরাইয়া দেওয়া, এ প্রশ্ন তাহার মনে একবারও উঠে না, ইহা যেন নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় ও অসম্ভব।

কিন্তু সুরমার মনে কিসের একটা পীড়া, অশান্তি সমানে তাহাকে সব কাজে চঞ্চল, অস্থির করিয়া তুলে। মাঝে মাঝে সে ভাবে—বেশ তো নিশ্চিন্তভাবে নিজের জীবনটাকে সে গুছাইয়া আনিয়াছিল—কিন্তু এ অশান্তি কোথা হইতে আসিয়া তাহাকে ঘিরিয়া ধরিল? সে তো রাজীবের প্রতি, সংসারের প্রতি নির্ব্বিকার নিরপেক্ষ হইয়া সুখে ছিল এতদিন—কিন্তু আবার এ লিপ্সারভাব তাহার মনে উদয় হইয়া তাহাকে অধীর করিয়া তুলিতেছে কেন? এ কি অরিণের জন্য?

তবু মন তাহার উদাস হইয়া যায়—এই ভাবিয়া ঘর সংসার তাহার ভাঙ্গিয়া গিয়াছে—শুষ্ক নীরবতা বুকে লইয়া আর কি রাজীব কথা বলিবে? সে অরিণকে সব কথা বলে—কিন্তু সে অনেক কথা বলিয়া তাহাকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করিয়া বলে—"কিন্তু সুরমা—একি আমার দোষ?" সুরমা গাঢ়স্বরে বলে—"না, তোমার দোষ নয়—তুমি বরং আমাকে তবু বাঁচিয়ে রেখেছো অরিণ"—

কয়েকদিন পরে—অরিণও একদিন বিদায় লইয়া চলিয়া গেল। বলিল—আরো কয়েকটা জায়গা ঘুরিয়া সে রাজীবের সঙ্গে দেখা করিয়া ফিরিবে—অরিণ চলিয়া গেল, সুরমা নিজেকে আরো বেশী নিঃসঙ্গ মনে করিল—একলা অনেকক্ষণ পিয়ানো বাজাইয়া—তারপরে উঠিতে যাইবে, এমন সময়ে কার পদশব্দ, পরিচিত—অতি পরিচিত চলন ভঙ্গি তাহার কাণে বাজিয়া উঠিল—দ্রুত অসহিষ্ণু বারান্দা অতিক্রম করিয়া সেইদিকে আসিতেছে, সুরমা কম্পিত বুক একহাতে চাপিয়া রুদ্ধ নিঃশ্বাসে দাঁড়াইয়া রহিল—তারপরে আপাদমস্তক সাদা একটুকরা হাল্কা মেঘের মত পৃথা প্রবেশ করিয়া তাহার গায়ে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া বলিল—"বৌদি—আমি উড়ে এসেছি—what a thrill!"

ক্রমশঃ

ওয়াহিবী ধর্ম্মের মূলমন্ত্র—হজরত কোরাণের শ্লোকগুলির হাদিশ বা ব্যাখ্যা রচনা করিয়া জন সমাজে প্রচার করেন। কালক্রমে মুসলমান ধর্ম্ম জগতে ছড়াইয়া পড়িলে উহাতে বিশ্বজনীন ভাবধারা সংযোজিত করিয়া দিবার মানসেই ইমামগণ দেশকাল পাত্র অনুযায়ী নূতন হাদিশ বা ব্যাখ্যা প্রণয়ণ করেন। কাজেই কয়েক শতাব্দী গত হইলেই কোরাণ বর্ণিত মুসলমান ধর্ম্ম অনেকটা রূপান্তর গ্রহণ করে। ওয়াহিবী ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক মার্টিন লুথারের ন্যায় কোরাণের প্রত্যেক অক্ষরকে ভগবানের জলন্ত ও প্রত্যক্ষ আদেশ বলিয়া গ্রহণ করিতে তাঁহার অনুচরগণকে উপদেশ দেন। মুসলমান সমাজে যথেষ্ট বিলাস-ব্যসন প্রবেশ করায় উহার সৌভ্রাতৃত্ব-ভাবের অনেকটা ক্ষুন্ন হইয়াছিল। আরব কিন্তু পূর্ব্ববৎ দরিদ্র দেশ থাকায় এবং কোন প্রকার বিলাস-ব্যসন তথায় প্রবেশ করিতে না পারায় আরবের ওয়াহিবগণ সর্ব্বপ্রকার বিলাস-ব্যসনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। তুর্কীর সুলতান বা পারস্যের সাহ ওয়াহিবগণের এই ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। বাদশাহাগিরি করিতে গেলেই জাঁকজমক ও আড়ম্বরের প্রয়োজন। ওয়াহিবগণের আড়ম্বহীন জীবন-যাত্রা তাঁহাদের পক্ষে অগ্রহণীয়ই রহিয়া যায়। তাহার পর মুসলমান ধর্ম্ম জগতের নানা স্থলে প্রচারিত ও সেই স্থানের অধিবাসীগণ কর্ত্তৃক গৃহীত হইলে তথাকার আচার-ব্যবহার মুসলমান ধর্ম্মে খুব স্বাভাবিক ভাবেই আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। পারস্যের দর্শন ও কবিতা, ভারতের শিল্প ও কলা বিদ্যা, তুরস্কের শৌর্য্য মিলিত হইয়া এক নূতন মুসলমান সমাজ ও সভ্যতা সৃষ্ট হয় যাহাতে আরবের মুসলমানগণ আপনাদিগকে হারাইয়া ফেলেন। ওয়াহিবী ধর্ম্মে আরবের আরবত্বটুকু পুনর্জীবিত করিবার চেষ্টা করা হয়। এইজন্যই ওয়াহিবীগণ যখন হজরতের সমাধি আক্রমণ করিয়া উহার উপরকার সৌধ-ভবনটী ভাঙ্গিয়া দেয়, তখন তাহারা আরব-জাতির মর্ম্ম-কথাই প্রচার করে। মরুভূমির দেশ বালুকার উপর রাজত্ব স্থাপিত হইলে সৌধ নির্ম্মাণ করিবার অর্থ কোথা হইতে আসিবে। কিন্তু তুর্কীর অধীন থাকায় এই জাতীয়তা উনবিংশ শতাব্দীতে খুব স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হইতে পারিল না।

ওয়াহিবী ধর্ম্মের অন্যান্য শাখা প্রশাখা—পূর্ব্ব বর্ণিত সাহারা মরুভূমির সেনুসী মতবাদ ওয়াহিবী মতবাদেরই শাখা মাত্র। সাহারার গভীর মরু মধ্যে অবস্থিত থাকিয়া তাহারা অনেকটা স্বাধীন ভাবে আপনা-দিগকে প্রকাশিত করিতে পারে। তাহাদের শাসন প্রণালীও অনেকটা প্রশংসনীয়। বর্ত্তমান শতাব্দীতে মধ্য-আরবে ইবনে সাউদের নেতৃত্বে আহোভান নামক মুসলমান ধর্ম্মের এক নূতন শাখা দেখা দিয়াছে। মানবের ভ্রাতৃত্ব প্রকাশ করাই এই শাখার মুখ্য উদ্দেশ্য।

ইব্নে সাউদ একজন কর্ম্মী বীর পুরুষ। গত মহাযুদ্ধের পর তিনি মধ্য আরব দেশের বেদুঈনগণকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া এক ক্ষমতাশালী রাজত্ব স্থাপন করিয়াছেন। হেজাজ তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে। ইরাকের রাজা তাঁহার সহিত সখ্যভাবে আবদ্ধ হইয়াছেন। ইব্নে সাউদ এখন সমস্ত আরবদেশে এক বিস্তৃত জাতীয় রাজ্য স্থাপন করিবার স্বপ্ন দেখিতেছেন।

পারশ্য একটী বহু পুরাতন সাম্রাজ্য। তাহার ভাবধারা অনেকটা আমাদের ভাবধারারই মত। আরবের মুসলমানগণ এই রাজ্যটী জয় করিলে উহার সভ্যতার নিকট তাহাদিগকে অনেকটা শির নত করিতে হয়। আমাদের দেশের বেদান্তের ন্যায় এখানে সফি ধর্ম্মের বিকাশ ঘটিয়াছিল। পরাজিত পারশ্য আরবের ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেও আপনার প্রয়োজনানুযায়ী উহাকে রূপান্তরিত করিয়া লয়। হজরতের জামাতা আলিকে আরবের মুসলমানগণ খলিফার পদ প্রদান করিলেও তাঁহাকে একমাত্র খলিফা বলিয়া স্বীকার করেন নাই। পারশ্য নিজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিবার জন্য আরবের অভিজাতগণকে কোনরূপ প্রাধান্য না দিবার মানসেই আলিকে একমাত্র খলিফা বলিয়া ঘোষণা করেন। দামস্কসে ও বাগদাদে নিত্য নব খলিফার আবির্ভাব হইতে থাকিলে পারশ্য তাহার আন্তরিক স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্য আলি ও তাঁহার উত্তরাধিকারী দ্বাদশজনকে ইমাম বলিয়া স্বীকার করে। উক্ত ইমামগণের শেষ ইমাম সংসার ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া বনবাসে চলিয়া গেলে, আপনাদের ভাবধারা বজায় রাখিবার জন্য পারশিকগণ ঘোষণা করেন যে তিনি দেহ ত্যাগ করেন নাই, তিনি অবতার রূপে আবার একদিন আসিয়া দেখা দিবেন। তাঁহার তিরোধান ও আবির্ভাবের মধ্যবর্ত্তী সময়ে বাং বা দ্বারের সাহায্যে তাঁহারা কালানুযায়ী ধর্ম্মভাব প্রচার করিবেন। প্রত্যেক গুরু ধর্ম্ম প্রকাশের দ্বার বা বাং বলিয়া কথিত হইতে থাকে। এই গুরু মুখ হইতে গৃহীত ধর্ম্ম ব্যাখ্যার নামই বাবীজম বা বাবধর্ম্ম।

বাবধর্ম্ম অনেকটা dynamic বা পরিবর্ত্তনশীল ধর্ম্ম হওয়ায় আরবের স্থিতিশীল ধর্ম্মের সহিত উহার অনেক পার্থক্য সংঘটিত হইতে থাকে। ধর্ম্মের ধারক মুস্তাহিদ মোল্লাগণ ক্রমশঃ আপনাদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য বাবধর্ম্মকে সঙ্কীর্ণ ও স্বার্থময় করিয়া তুলে। এই সঙ্কীর্ণতার উচ্ছেদ সাধন করিবার জন্য জাতির আগ্রহ দেখা দিলে ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে মীর্জ্জা মহম্মদ আলী নামক একজন যুবক আপনাকে শেষ প্রচারক বা বাব বলিয়া প্রকাশ করেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার শিষ্য সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। রাজশক্তি ও পুরোহিত শক্তির সহিত এই নূতন ভাবধারার সংঘর্ষ হইলে বাব সনাতনী শক্তির নিকট পরাস্ত হইয়া বন্দী অবস্থায় নিহত হন।

বাবের মৃত্যু হইলে তাঁহার ধর্ম্ম-ভাবের জয়লাভ ঘটে। দেশের জনবৃন্দ সকলেই সনাতনী শাসনের উপর বীতশ্রদ্ধ ছিল। বাবের শিষ্যগণ আপনাদের মতবাদ প্রচার করিবার জন্য পাঞ্জাবের শিখদের ন্যায় অম্লান বদনে প্রাণ-বিসর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিয়া দেওয়ায় উহার লোক প্রিয়তা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। বাবের মন্ত্র শিষ্যগণ আপনাদের কর্ম্মক্ষেত্রকে অনেকটা নিরাপদ স্থানে সরাইয়া লইবার উদ্দেশ্যেই প্রথমে বাগদাদে ও পরে আদ্রিয়ানোপলে স্থানান্তরিত করে। ইউরোপে আসিয়া বাব ধর্ম্ম বিশ্বজনীন আকার ধারণ করে। বাহা উল্লা নামক বাবের এক শিষ্য ইউরোপের অনেক রাজধানীতে এই ধর্ম্মের কেন্দ্রস্থল স্থাপন করিয়া উহার প্রচার কার্য্য সুরু করিয়া দেন। সর্ব্বপ্রকার সঙ্কীর্ণতা অপসরণ করিয়া বিশাল মানবতাই এই ধর্ম্মের উদ্দেশ্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লয়েন। এইজন্য সর্ব্বপ্রকার জেহাদ ও ধর্ম্ম-সংক্রান্ত অত্যাচারকে অধর্ম্ম বলিয়া ঘোষণা করেন। সম্পূর্ণরূপে আধুনিক যুগের উপযোগী করিয়া তুলিবার জন্য বাহাউল্লা তাঁহার বাহিজিমে স্ত্রীজাতিকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করিয়া, বরখা হইতে টানিয়া বাহির করিয়া আনেন। স্ত্রীজাতিকে শিক্ষিত করিয়া তুলিবার জন্য পুরুষদিগের ন্যায় তাহাদিগকে শিক্ষা প্রদান করিতে থাকেন। ইউরোপীয় পোষাক পরিচ্ছদ বর্ত্তমান জীবন-যাত্রার পক্ষে বিশেষ সহায়ক বলিয়া বিবেচিত হওয়ায়, উহা ব্যবহার করিবার অনুমতি প্রদান করা হয়। সর্ব্বপ্রকার দাস-প্রথার অবসান করিয়া দিয়া মানব-জাতির ব্যক্তিগত

স্বাধীনতা মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করা হয়। অনুচরগণের মধ্য বিশ্বজনীন সৌভ্রাতৃত্ব ফুটাইয়া তুলিবার জন্য বাহাউল্লা বেশ জোর গলায় বলেন, পৃথিবীতে বাস করিতে গিয়া যদি তোমার মৃত্যু ঘটে সেও ভাল কিন্তু তুমি যেন কাহারও মৃত্যুর কারণ হইও না। নিজের দেশ ও ভাই-বোনকে সকলেই ভালবাসে, তাহাতে হৃদয়ের মহত্ত্ব প্রকাশ পায় না, সমস্ত জগতের লোককে অবিকৃত মনে ভাই-ভগ্নীভাবে প্রেম বিতরণ করাই প্রকৃত ধর্ম্ম। বাবের ও বাহাউল্লার শিষ্য ও প্রশিষ্যের সংখ্যা ক্রমশঃ পারশ্য দেশ মধ্যে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়ায় পারশ্যে জাতীয়তার ভাবের উদ্রেক হয়; সনাতনী ধর্ম্মের উপর এই নূতন মতবাদের বিশেষ আক্রোশ থাকায় সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী রাজশক্তি এই আন্দোলনকে সন্দেহ চক্ষে দেখিতে থাকে।

আহমেদিয়া আন্দোলন—আরবীয় ভাবধারায় যুগান্তর হইয়া গেলে, ভারতেও উহার একটী ঢেউ আসিয়া যেমন ওয়াহিবী শাখার একটি বিশেষ দল সৃষ্ট করে, তদ্রূপ এখানেও নূতন ধর্ম্মভাব দেখা দেয়। ভারতে আরবীয় ভাবধারায় নূতন আদর্শের নাম আহমেদিয়া আন্দোলন। এই নূতন ভাবধারার প্রবর্ত্তক মীর্জ্জা গুলাম আহম্মদ। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে লাহোরের নিকটবর্ত্তী কাদিয়ান নামক স্থানে তাঁহার জন্ম হয়। এই সময়ে হিন্দুধর্ম্মের যুগপ্রবর্ত্তকগণের সংস্পর্শে আসিয়া মুসলমানধর্ম্মের এক নূতন আদর্শ স্থাপন করিবার জন্য তিনি আপনাকে 'প্রচারক' বলিয়া ঘোষণা করেন। তাঁহার মতে প্রকৃত ইসলাম ধর্ম্ম কোন ধর্ম্মেরই অন্তরায় হইতে পারে না। ইসলাম ধর্ম্ম, বৌদ্ধধর্ম্ম, খৃষ্টান ধর্ম্ম ও ইহুদিদের ধর্ম্ম, অর্থাৎ সমস্ত ধর্ম্মের সার সঙ্কলন। অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার শিষ্যসংখ্যা প্রায় সত্তর হাজার হইয়া দাঁড়ায়। খুব জোর গলায় এই ধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য ইউরোপের অনেক রাজধানীতে উহার শাখা কর্ম্মস্থল স্থাপন করা হয়। ১৯০৮ সালে আহম্মদের মৃত্যু হইলে তাঁহার মনোনীত খলিফাগণ এই ধর্ম্মের ভাবধারা বহন করিয়া আছেন।

প্যান ইসলামিজম্—আরবীয় সভ্যতা ও ভাবধারা আরবজাতির অস্থিমজ্জাগত ছিল। আরবের মুসলমান ধর্ম্ম আরবজাতির নিকট শুধুই তাহার পারলৌকিক ধর্ম্ম ছিল না, উহা তাহার সামাজিক ও ব্যবহারিক ধর্ম্মও ছিল। খৃষ্টান ধর্ম্ম কি করিয়া ভগবানকে উপাসনা করিতে হয় তাহা শিক্ষা দিয়া নিবৃত্ত হয়। সমাজ ধর্ম্ম ও ব্যবহারিক ধর্ম্ম সুশৃঙ্খলে রাখিবার জন্য স্বতন্ত্র আইন কানুন রচিত হয়। মহম্মদীয় সমাজ মহম্মদীয় ধর্ম্মকে বাদ দিয়া তাহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব কল্পনাও করিতে পারে না। কোরাণ প্রত্যেক বিশ্বাসীর জীবন-যাত্রা প্রণালী সুশৃঙ্খলিত করিবার মানসে তাবৎ বিধিই লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু আরবজাতি যখন অন্যান্য দেশ জয় করিয়া সেই সব স্থানে তাহাদের স্বদেশী ধর্ম্ম প্রচার করে, তখন উক্ত দেশ সমূহে প্রচলিত সামাজিক ও ব্যবহারিক আইন কানুনের সহিত মহম্মদীয় ধর্ম্মানুমোদিত অনুশাসন গুলির সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। এই মনো-মালিন্য দূরীকরণ মানসেই মৌলানাগণ নূতন নূতন হাদিশকেই ধর্ম্মের প্রাণ বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হ'ন। কয়েক শতাব্দী গত হইলে আরবজাতি যখন আবার শতধা বিভক্ত ও অজ্ঞতার মহাসমুদ্রে নিমগ্ন হয়, তখন তাহাদের জাতীয়তা পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিবার জন্যই ওয়াহিবী বা সেনুসী ধর্ম্মমত প্রচার করে। ওয়াহিবী ধর্ম্মভাব প্রচার হইলেই উহার বিশেষত্ব খুব শীঘ্রই ধরা পড়িয়া যায়। জাতীয়তার ধারক ও বাহক হিসাবে অন্যান্য দেশে উক্ত ধর্ম্ম সাদরে গ্রহণ করা হয়। পারশ্য আপনার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিবার মানসে বাবীজম্ বা বাহীজম্ প্রচার করে। উন্নতিশীল জগতের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে গিয়া আধুনিক অনেক উন্নত ভাবধারা এই ধর্ম্মভাবে প্রবেশ করে। ভারতেও এই আন্দোলনের ঢেউ আসিয়া লাগায়, বিশ্বজনীন আহমেদিয়া শাখার আবির্ভাব হয়। সুতরাং অষ্টাদশ শতাব্দীতে মুসলমান ধর্ম্ম এইরূপ বহু শাখায় বিভক্ত হইয়া পড়ে।

গত শতাব্দীর শেষভাগে পৃথিবীর সর্ব্বত্রই মুসলমানগণ খৃষ্টীয় শক্তিগণের নিকট পরাস্ত ও বিধ্বস্ত হইয়া হটিয়া আসিতে থাকে। হজে প্রত্যেক বৎসর মুসলমান নেতাগণের মিলন সংঘটিত হইলে মুসলমান স্বার্থ রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে এক বিরাট মিলনে সংমিশ্রিত হইবার জন্য সকলেই

আগ্রহ প্রকাশ করিতে থাকেন। মূলতঃ মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বীদের মধ্যে নানা প্রকার বৈষম্য থাকিলেও উহাদের মধ্যে সাদৃশ্যও অনেক আছে।

মক্কা প্রত্যেক মুসলমানেরই প্রধান তীর্থ ক্ষেত্র, এবং এই তীর্থস্থল দর্শন করা প্রত্যেক মুসলমানের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। আরবী তাহাদের ধর্ম্মের মূল ভাষা। কোরাণ বিভিন্ন ভাষায় ভাষান্তরিত হইলেও মূল কোরাণ সরিফ পাঠ করাই প্রত্যেক বিশ্বাসীর জীবনের একটী মহৎ উদ্দেশ্য। মুসলমান ধর্ম্মের অনুশাসন গুলিও খুব স্বাভাবিক ও অনুসরণ যোগ্য। উহার মধ্যে কোনপ্রকার চতুরতা না থাকায় সাধারণের নিকট সহজেই প্রিয় হইয়া দাঁড়ায়। পৃথিবীর তাবৎ ধর্ম্মের মধ্যে একমাত্র ইসলাম ধর্ম্মেই মানবজাতির ভ্রাতৃত্ব ব্যবহারিক ভাবে স্বীকার করা হইয়াছে। একমাত্র মুসলমান ধর্ম্মেই কোন কুলগত পুরোহিত সম্প্রদায় না থাকায় ঐ ধর্ম্মে ধর্ম্মগত অভিজাত শ্রেণী সৃষ্ট হইতে পারে নাই।

কিন্তু এই সমস্ত সাদৃশ্য কিছুতেই ফলপ্রদ হইতে পারিত না, যদি না তুর্কীর সম্রাট আবদুল হামিদ Pan Islamismকে তাঁহার সাম্রাজ্যের ক্রীড় বা জপমন্ত্র রূপে গ্রহণ করিতেন। খ্রীষ্টান শক্তিগণের নিকট বারংবার অপদস্ত হইয়া তুর্কীর সম্রাট মুসলমান প্রধান দেশ সমূহে তাঁহার চর প্রেরণ করেন। তাহারা তুর্কীর সুলতানের খলিফাত্ব প্রচার করিতে থাকে। সার্ব্বজনীন মুসলমান ধর্ম্মের নিদর্শক হিসাবে তুর্কীর ফেজ প্রত্যেক মুসলমানের অবশ্য ব্যবহার্য্য হইয়া দাঁড়ায়। পৃথিবীর যেখানেই যে মুসলমান থাকুক না কেন তাঁহার নামে মসজিদে প্রার্থনা করিতে থাকে। এই আন্দোলনের ফলেই তুর্কী খ্রীষ্টান শক্তিগণকে দার্দ্দিনিলিজে পরাস্ত করিতে সমর্থ হয়। ইটালী ত্রিপোলী আক্রমণ করিলে আফ্রিকার আরবগণকে তুর্কীর ছত্রতলে সঙ্ঘভাবে আসিয়া দাঁড়াইতে দেখিয়া বিস্মিত হয়। এই ভাবের পূর্ণ বিকাশের জন্য ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে মদিনায় ও ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে জেরুজালেমএ ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়।

১৯১৪ সালে বিশ্বব্যাপী মহাসমর হওয়ায় এই Pan Islamismএ অনেকটা ভাঁটা পড়িতে আরম্ভ হয়। তুর্কীর সম্রাটের উদ্যমে ও উৎসাহেই প্যান ইসলাম ভাবধারা জগতে প্রচারিত হইতেছিল। তুর্কীর সম্রাট আবদুল হামিদ তাঁহার স্বদেশে একেবারেই জনপ্রিয় ছিলেন না। তাঁহার কল্পিত প্যান ইসলামের অন্তরালে সাম্রাজিকতা গোপনে লুক্কায়িত আছে সন্দেহ করিয়া দেশের নেতাগণ তাঁহার আন্দোলনে যোগদান না করিয়া ইউরোপীয় আদর্শে জাতীয়তা প্রবর্ত্তনের জন্যই আন্দোলন করিয়া যান, ফলে ১৯০৮ সালে তুর্কীতে নব-যুগের সূত্রপাত হয়। জাতীয় ভাবের পরিচালক হিসাবে তুর্কীর নূতন শাসকগণ আবদুল হামিদের ক্ষমতা হ্রাস করিয়া শাসন ভার গ্রহণ করেন। তাঁহারা গত মহাসমরে জার্ম্মানির সহিত মিলিয়া মিত্রশক্তি পুঞ্জের বিপক্ষে সমরে অবতীর্ণ হইলে, ইংরাজ ও ফরাসী জাতি তাঁহাদের অধীনস্থ মুসলমান জগতে তাহাদের বিরুদ্ধে অভিমত প্রকাশ করায় অনেক মুসলমান জাতিই ইংরাজদের সহিত যোগদান করে। মহাসমরের অবসান ঘটিলে, ইংরাজগণ আরবের আরবগণকে স্বাধীন বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়া তুরস্ক হইতে বিভিন্ন করিয়া লয়েন। ইরাক ও মেসোপটামিয়া নামক রাজ্য দুইটী সৃজন করিয়া মুসলমান জগতের ঐক্যতা বন্ধনের আর একটী প্রধান হন্তারক সৃজন করেন। মিশর স্বাধীনতা অর্জ্জনে ব্যস্ত হইয়া পড়ায়, তাহাকে Pan Islamism আন্দোলন হইতে সরিয়া দাঁড়াইতে হয়। এই সমস্ত বাধা সত্বেও ভারতীয় মুসলমানগণ খলিফা পদ বজায় রাখিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে থাকেন। এবং তাঁহাদের আক্লান্ত চেষ্টার ফলেই কামাল কর্ত্তৃক ইস্তাম্বুল অধিকৃত হইলেও, নির্ব্বাসিত সম্রাটের এক ভ্রাতাকে খলিফা বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া হয়। তাহার পর বিজয়ী বীর কামাল বর্ত্তমান সত্যের উপর তুর্কীকে প্রতিষ্ঠিত করিবার মানসে ঐ পদটী তুলিয়া দেন, তখন হইতে Pan Islamism ভাব ধারায় অনেকটা বন্যা পড়িয়া গিয়াছে।

Pan Orientalsm বা সার্ব্বনীন প্রাচ্য।—ভার্সিলিজ সন্ধি অনুযায়ী এশিয়া ও আফ্রিকার [illegible] শতধা বিভক্ত করিয়া ঐ সমস্ত বিভক্ত [illegible] ফরাসী জাতির প্রাধান্য স্থাপন [illegible]

জাতিবৃন্দ সঙ্ঘবদ্ধ ইউরোপের হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য বিশেষভাবে যত্নপরায়ণ হইয়া পড়েন। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে কাইরো নগরীতে Oriental League বা প্রাচ্য সঙ্ঘ স্থাপিত হয়। এশিয়ার সর্ব্বত্রই একদল জাতিভ্রষ্ট ইউরোপীয় আচার ব্যবহারে অভ্যস্ত নবীন সম্প্রদায় সৃষ্ট হইয়াছে। গত শতাব্দীতে তাহারা প্রাচ্যে বিশেষ কোন প্রকার সম্মানজনক পদ প্রাপ্ত হইত না। কিন্তু মহাসমরের অবসানের পর প্রাচ্য যখন স্পষ্টই দেখিতে পাইল যে ইউরোপ আপনাকে লইয়া অত্যধিকভাবে ব্যস্ত এবং সামান্য মাত্র স্বার্থত্যাগে তাহার কোনপ্রকার আগ্রহই নাই, তখন এই জাতিভ্রষ্ট নবীন সম্প্রদায় বিশেষ ভাবে তাহাদের স্বদেশে প্রিয় হইয়া উঠিতে থাকে। এই দলের নেতাগণ সাধারণতঃ কোনপ্রকার ধর্ম্মভাবই পোষণ করেন না। পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান ইঁহাদের আদর্শ হওয়ায় Materialism বা জড়বাদই ইহাদের জীবনযাত্রার মূল-মন্ত্র হয়। এই নবীন সম্প্রদায়ের মুখপাত্র হিসাবে জাপানের কর্ম্মী কাকুজো ওকাকুরা স্পষ্টই ঘোষণা করেন যে সমগ্র প্রাচ্য এক বিরাট প্রতিষ্ঠান। আরবের 'সিভালরি', পারস্যের কবিতা, চীনের সত্যপরায়ণতা ও ভারতের ভাবধারা সংমিলিত হইয়া এক বিরাট ও অখণ্ড প্রাচ্য সৃজন করিবে, যাহার আবহাওয়ায় এক নূতন সভ্যতা গজাইয়া উঠিবে, যাহার তুলনায় পাশ্চাত্য সভ্যতা অনেক পশ্চাতে পড়িয়া যাইবে। এশিয়ার ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভাবধারার কিঞ্চিৎ বিশেষত্ব লক্ষিত হইলেও মূলতঃ উহা একই। 'Islam itself may be described as Confucianism on horse back'. আরবের ইসলাম ধর্ম্মকে মনে হয় যেন চীনের ধর্ম্মমত কনফিউসিয়ানিজম অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়াছে মাত্র।

মিশরের জাতীয়তা-আন্দোলন—মিশর প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান থাকিয়া বহু পুরাতন যুগ হইতে দুই মহাদেশের ভাবধারা বহন করিয়া আসিতেছে। আসেরিয়া, ব্যাবিলনিয়ার ভাবধারা মিশরের মধ্য দিয়া প্রাচীন গ্রীসে প্রবাহিত হয়। ঐতিহাসিক যুগে আলেকজান্দ্রিয়া নগরী এই দুই মহাদেশের মধ্যে ভাবের আদান প্রদানের প্রধান কেন্দ্র স্থল ছিল। বর্ত্তমান যুগেও প্রাচ্যে জাতীয়তা আন্দোলনের সূত্রপাত মিশরেই প্রথম হয়। নেপলিয়ন ভারতে আসিবার জন্য কিছুকাল এখানে বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার সেনাপতি মেনু (Menu) মিশরেই বিবাহ করিয়া পাশ্চাত্য সভ্যতার আদর্শে মিশরকে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করেন। নেপোলিয়ন বা ফরাসীগণ মিশরে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে তথায় মামেলক নামক এক প্রকার বৈদেশিক অভিজাত সম্প্রদায় রাজত্ব করিতেন। তুর্কীর প্রধান ব্যক্তিগণ মিশরের বড় বড় রাজকর্ম্মে নিযুক্ত হইতেন। মিশরের জনসাধারণকে ফেলাহীন বা চাষা বলিয়া অভিহিত করা হইত। ইহারা মাটী কর্ষণ করিয়া জীবিকার্জ্জন করিত। তাহারা সকল বিষয়েই অজ্ঞ ছিল। নামে মুসলমান হইলেও তাহাদের আচার-ব্যবহার আরবের বা অন্যান্য দেশের মুসলমানদের সহিত কোন প্রকার সামঞ্জস্য ছিল না। তাহারা তাহাদের গৌরবময় অতীত একেবারেই বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিল। কয়েক বৎসর ফরাসী প্রাধান্য মিশরে প্রতিষ্ঠিত থাকিলে ফরাসী-বিদ্রোহের মূলমন্ত্র ঐক্য-মৈত্রী ও স্বাধীনতা এই দেশ মধ্যে প্রচার হইতে থাকে। ইংরাজ ইতিহাস লেখক স্পষ্টই বলেন যে এই সময়ে মিশর একটি স্বাধীন রাজত্ব থাকিলেও উহাকে কখনই National State বলা যাইতে পারিত না।

মহম্মদ আলী—নেপলিয়ন ও তাঁহার কর্ম্মচারীগণ মিশর দেশ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলে সমস্ত দেশে ভীষণ অরাজকতা দেখা দেয়। অলবেনিয়ার অধিবাসী মহম্মদ আলী এই রাষ্ট্র বিপ্লবের সময় আত্ম-প্রতিষ্ঠা করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হন। তিনি দেশের শাসক মামেলুকগণকে পরাস্ত করিয়া শাসন ভার গ্রহণ করেন। মহম্মদ আলী স্বয়ং নিরক্ষর হইলেও সর্ব্বপ্রকার শিক্ষাকেই বিশেষ সম্মানের চক্ষে দর্শন করিতেন। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে বিশেষভাবে শিক্ষিত করিয়া তুলিবার জন্য তিনি দলে দলে মিশরের যুবকবৃন্দকে ইউরোপে প্রেরণ করিতে আরম্ভ করেন। দেশের মধ্যে নানাপ্রকার স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেন। পাশ্চাত্যের নিকট মিশরের পরাজয় হইয়াছিল বলিয়া সমস্ত মিশরকে

পাশ্চাত্যের অনুগত শিষ্য করিয়া তুলিবার প্রয়াস করিতে থাকেন। তাঁহার প্রচেষ্টায় অতি অল্পদিনের মধ্যেই একদল জাতীয় নেতার আবির্ভাব হয়। তাহারা আপনাদিগকে 'মিশরী' এই আখ্যায় অভিহিত করিতে আর লজ্জা অনুভব করিল না। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সাহায্যে সমাজের অনেকে সংস্কার সাধিত হইতে থাকে। দেশের প্রাণ স্বরূপ কৃষাণগণের অবস্থারও বিশেষ উন্নতি সাধন করা হয়।

মহম্মদ আলী নেপোলিয়নের ন্যায় দিগ্বীজয়ী বীর ছিলেন। তাঁহার সৈন্যগণ ওয়াহিবগণকে পরাস্ত করিয়া মক্কা, মদিনা পুনরুদ্ধার করে। সিরিয়া দেশও অধিকৃত হইয়া যায়। ইউরোপের শক্তিপুঞ্জ মিশরের এই অভিযানের প্রধান অন্তরায় না হইলে কনস্তান্তিনোপল পর্য্যন্ত অধিকৃত হইয়া যাইত। এই দিগ্বীজয়ের মোহ ও গৌরব তাবৎ জাতিকে মুগ্ধ ও গৌরবান্বিত করিয়া তোলায় সাধারণ প্রজা তাঁহাকে বিশেষ সম্মানের চক্ষে দর্শন করিতে থাকে।

মহম্মদ আলীর উত্তরাধীকারীগণ—তাঁহার উত্তরাধিকারী সৈয়দের (said) আমলে মিশরের গৌরব পূর্ণমাত্রায়ই রক্ষিত হয়। সৈয়দের উত্তরাধিকারী ইসমেলের আমলে আমূল পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়। ইসমেল ও তাঁহার সভাসদগণ পাশ্চাত্যের সংস্পর্শে আসিয়া উহার বিলাস-ব্যসনে অত্যন্ত অভ্যস্ত হইয়া পড়ে। প্যারিসের এক পোষাক পরিচ্ছদের দোকানে ইস্‌মেলের কোন আত্মীয়ের শুধু কাপড় ইত্যাদি বাবদ ছয়লক্ষ পাউণ্ড ঋণ হয়। অতিরিক্ত বিলাস ব্যসনে মগ্ন থাকায় ইসমেল অনেক সময়েই বিব্রত থাকিতেন। মিশরে জাতীয়তা ভাব প্রতিষ্ঠা হওয়ার সহিত উহার দৈনন্দিন যে উন্নতি সংসাধিত হইতেছিল, এইখানে অর্থাভাবে বিশেষ বাধা প্রাপ্ত হয়। এই সময়ে সুয়েজখাল খনন করিবার প্রস্তাব উঠিলে উহাকে কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য একটি যৌথ সম্প্রদায় গঠন করা হয়। ঐ সম্প্রদায়ে ইস্‌মেলের যে সমস্ত অংশ বা সেয়ার ছিল উহা তিনি ইংরাজদিগকে বিক্রয় করিয়া দেন। এই শেয়ার ক্রয় করা অজুহাতে ইংরাজগণ মিশরদেশে প্রবেশ করিয়া স্বাধিকার বিস্তার করিবার সুযোগ অন্বেষণ করিতে থাকেন।

আরেবী পাশা—ইংরাজ জাতি মিশরে প্রবেশ করিলে আর একটি নূতন অভিজাত জাতির সৃজন হয়। ইংরাজ শাসক লর্ড ক্রোমার মিশরীয় শাসন স্থলে ইংরাজ প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য নানা কূট রাজনীতি জাল বিস্তার করিতে থাকেন। প্রত্যেক রাজকীয় পদে মিশরীয়দের সহিত ইংরাজ কর্ম্মচারী নিয়োগ করিতে থাকেন। তুর্কী বা ককেসীয়ানগণ মুসলমান ছিলেন। বহুদিন বসবাসহেতু তাঁহারা অনেকটা মিশরীয় ভাবাপন্নও হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু পাশ্চাত্য প্রভুত্ব মিশরীয়দের নিকট অসহ্য বলিয়া মনে হইতে লাগিল। আরেবী পাশা নামক একজন মিশরীয় এই আন্দোলনের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন।

আরবী পাশা মিশরীয় কোন কৃষকের পুত্র। বিখ্যাত মুসলমান বিশ্ববিদ্যালয় আলি আজহরে অধ্যয়ন কালীন যুগ প্রবর্ত্তক জামাল উদ্দিন আফগানির সংস্পর্শে আসেন। জামাল তখন একজন উদীয়মান লোক শিক্ষক। সম্ভবতঃ আফগানিস্থান তাঁহার জন্মভূমি। কিন্তু তিনি ভারতবর্ষের মধ্য দিয়া জন্মস্থান পরিত্যাগ করিয়া কনস্তানতিনোপল ও কাইরো নগরীতে গমন করেন। কনস্তানতিনোপলে অবস্থানকালে তিনি প্যান ইসলামিজমের পতাকা তলে দণ্ডায়মান হইয়া তখনকার প্রচলিত সকল প্রকার আচার-ব্যবহারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিতে থাকেন। কোরাণ ও সকল প্রকার হাদিসের সহিত খুব ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত থাকায়, তিনি খুবই দক্ষতার সহিত তাহাদের সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিতে পারিতেন। তিনি খুব স্পষ্ট ভাবেই বলিতেন যে কোন ধর্ম্মই সনাতনী হইতে পারে না, বিশেষতঃ মহম্মদীয় ইসলাম ধর্ম্ম কখনই সনাতনী নয়। কোরাণ ও হাদিস গুলির মতবাদকে অনবরত পরিবর্ত্তন করিয়া যুগাকার প্রদান করা কর্ত্তব্য। এইরূপ যুগান্তকারী মতবাদ প্রচার করিতে গিয়াই তুর্কীর সেখ-উল-ইসলামের সহিত তাঁহার সংঘর্ষ উপস্থিত হয় এবং তাহার ফলেই তুর্কী পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাকে কাইরো নগরীতে আসিতে

আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। আরেবী পাশা এই যুগ প্রবর্ত্তকের নিকট ধর্ম্মের নূতন ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া মিশরে ঐ সমস্ত ব্যাখ্যার অন্তরালে জাতীয়তার উদ্বোধন করিবার জন্য ব্যগ্র হয়েন। মিশরের প্রধান মোল্লা বা গ্রাণ্ড মুফ্‌তি মহম্মদ আবদু, বিদ্রোহী কবি আদিব ইশার যুগ-পরিবর্ত্তক জামাল উদ্দিনের মন্ত্র-শিষ্য ছিলেন। কাজেই আরেবী পাশাকে তাঁহার মতবাদ প্রচার করিবার জন্য বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হইল না। শীঘ্রই 'নবীন-মিশর' সম্প্রদায় গঠিত হয়। এই দলের প্রধান উদ্দেশ্য থাকে মিশর দেশে নূতন শাসন-সংস্কার আনয়ন করা। মিশরের বর্ত্তমান শাসকগণ অধিকাংশ বিদেশী ছিলেন। তাঁহাদের শাসন নীতিতে বিদেশ প্রীতিই বেশী প্রকাশ পাইত। খেদিভ তুফিকের (Tewfik) মন্ত্রী সেরিফ পাশা শাসন-প্রণালীকে জনমতের অনুকূল করিবার জন্যই খানিকটা সংস্কার দিবার প্রস্তাব আনয়ন করিলে, সনাতনীগণ তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া বাধা প্রদান করেন। মহম্মদ আলীর বংশধর হইয়াও খেদিভ বর্ত্তমানের বার্ত্তাকে ঠিক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন না। মিশরের আভ্যন্তরীণ গোলমাল লক্ষ্য করিয়া ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স তাঁহাদের স্বার্থ রক্ষার্থ মিশর সরকারের নিকট জবাবদিহি চাহিলে দেশের মধ্যে ভীষণ অশান্তি আসিয়া উপস্থিত হয়। ২রা ফেব্রুয়ারী সেরিফ পাশা পদত্যাগ পত্র দাখিল করিলেই, এক জাতীয় শাসন পরিষদ গঠিত হয়। পাশা সামী এই জাতীয় পরিষদের প্রধান মন্ত্রী ও আরেবী পাশা সমর সচিব হ'ন।

মিশরের শাসক খেদিব তুরস্ক-সম্রাট আবদুল হামিদের ন্যায় এই জাতীয় অভ্যুত্থানকে প্রীতির চক্ষে দর্শন করিতে পারিলেন না। তিনি স্পষ্টই অনুভব করিতে লাগিলেন যে উহার পশ্চাতে তাঁহার ক্ষমতা অপহরণ করিয়া লইবার ষড়যন্ত্র চলিতেছে। আত্মরক্ষার্থ এবং ক্ষুদ্র স্বার্থের দ্বারা পরিচালিত হইয়া তিনি ইংরাজ ও ফরাসী জাতির আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইংরাজ ও ফরাসী জাতি তাঁহাকে সাদরে আশ্রয় প্রদান করেন। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে ইংরাজ ও ফরাসীর নৌবহর আসিয়া সামী পাশা ও তাঁহার সহচরগণকে পদত্যাগ করিতে বাধ্য করেন। কিন্তু জাতীয়তার ধারক ও বাহক আরেবী পাশার সন্নিধানে সমগ্র জনসাধারণ আসিয়া দণ্ডায়মান হইলে খেদিভ তাঁহাকে সমরসচিব পদে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে বাধ্য হন। আরবী পাশা পণ্ডিত ও খুব বাগ্মী ছিলেন সত্য কিন্তু সৈন্যদল গঠন ও পরিচালনা করিবার তাঁহার কোন ক্ষমতাই ছিল না। এই জন্যই উচ্চ পদস্থ কয়েকজন তুর্কী সেনাধ্যক্ষকে অপসারিত করিয়া দিলেই সৈন্যদলের বল ক্ষয় হয়। ইংরাজ ও ফরাসীগণ আরবী পাশাকে একজন বিদ্রোহী, ধর্ম্মান্ধ স্বার্থপর জ্ঞানে অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন; তাঁহারা ইস্তাম্বুল হইতে তাহার পদচ্যুতির এক ফতোয়া সংগ্রহ করিয়া আনিয়া ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে ১৩ই সেপ্টেম্বর তারিখে তেল-আলকবির নামক স্থানে আরবী পাশাকে পরাস্ত করিয়া বন্দীভাবে সিংহলে প্রেরণ করে। মিশরের জাতীয়তা আন্দোলনের প্রথম যবনিকা এইখানে পতিত হয়।

লর্ড ক্রোমার ও মুস্তাফা কামাল—আরবি পাশা কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত ফেলাহিন আন্দোলন নেতা বিশেষের আন্দোলন ছিল। উহার সার্ব্বজনীন ভাব সত্ত্বেও মধ্যবিত্ত শ্রেণী কায়মনোবাক্যে উহা গ্রহণ করিতে পারে নাই। কৃষাণ সম্প্রদায় বহুদিন যাবৎ অভিজাতগণ কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইয়া আসিতেছিল বলিয়াই কতকটা ফরাসী আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া আরবী পাশা তাঁহার আন্দোলন চালাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। কর্ম্মক্ষেত্র হইতে তাঁহাকে সরাইয়া দিয়া ইংরাজগণ Benevolent despotism বা সাধারণের মঙ্গলকর স্বেচ্ছাচার রাজতন্ত্র মিশরে প্রবর্ত্তন করেন। এই শাসন সংস্কারের দ্বারা দেশে সৌভাগ্যের উদয় হয়। ফেলাহিন বা কৃষক সম্প্রদায়ের অর্থকৃচ্ছতা দূরীভূত হয়। মধ্যবিত্ত শ্রেণী রাজকর্ম্মচারীগণ কর্ত্তৃক সম্মানিত ও পুরস্কৃত হওয়ায় তাহারা মিশরের অভিজাত শ্রেণীকে অনেকটা হটাইয়া দিয়া একদল নূতন ধনী সম্প্রদায়ে পরিণত হইতে থাকে। ইংরাজ-শাসনের আবহাওয়ায় আসিয়া দেশে জন-সাধারণের মধ্যে শিক্ষা অতি দ্রুতভাবে বিকাশ পাইতে থাকে। মধ্যবিত্ত শ্রেণী ওকালতি ও ব্যবসা করিয়া তাহাদের আর্থিক উন্নতি করিয়া লয়। জনমত প্রচারের জন্য খবরের কাগজ আসিয়া দেখা দেয়। এই যুগের নেতা মুস্তাফা কামাল।

ইনি ফ্রান্সে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে তিনি যখন স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন, তখন দেখিতে পান যে মিশরীয় সরকার ইংরাজ জাতির সাহায্যে সুদান জয় করিবার জন্য তোড়জোড় করিতেছে। তিনি স্বয়ং একটী দল সংগঠন করিয়া এই সুদান-জয়ের বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ করেন। তিনি বলেন যে সুদান মিশরেরই একটী অধিকৃত প্রদেশ এবং সুদানকে বাদ দিলে মিশর একটী নগণ্য রাজ্যে পরিণত হয়। কিন্তু ইংরাজ-জাতির সাহায্যে সুদান জয় করিতে গেলে সুদানবাসীগণ উত্তেজিত হইয়া উঠিবে এবং উহারা কখনই মিশরের শাসক খেদিবের অধীন হইতে চাহিবে না। তাহা হইলেই দীর্ঘকাল ধরিয়া যুদ্ধ করিতে হইবে এবং যুদ্ধের পর জয়লাভ ঘটিলেও একটী বীর্য্যবান জাতিকে পদানত করিয়া রাখিতে যে অর্থের প্রয়োজন তাহাও মিশরের রাজকোষ হইতে দিতে হইবে। সুতরাং যাহা আপোষে বা অল্পব্যয়ে হইয়া যাইতে পারিত তাহার জন্য বিপুল বিত্ত ব্যয় করিতে হইবে এবং এই বিত্ত ব্যয় করাও মিশরের পক্ষে অসম্ভব। দেখিতে দেখিতে অসংখ্য ভক্ত তাঁহার পতাকা তলে দণ্ডায়মান হইতে লাগিল। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে কাইরো নগরে তিনি দুই হাজার শ্রোতার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া বক্তৃতা প্রদান করেন।

জাতীয়তা ভাব উন্মেষ করিবার জন্য কামাল দেশের নানাস্থানে জাতীয় স্কুল স্থাপন করেন। জাতীয় কলেজ স্থাপন করিবার জন্য সমস্ত ঠিক করিয়াছিলেন, সনাতনী-গণের নিকট হইতে বাধা প্রাপ্ত হইয়া সফলকাম হইতে পারেন নাই। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে আল্ লেওয়া (El Lewa) নাম দিয়া একখানি সংবাদ পত্র বাহির করেন। এই পত্র মারফৎ তিনি জনসাধারণের মধ্যে বেশ স্পষ্টভাবেই প্রকাশ করেন যে ইংরাজ জাতি মিশরে শিকড় গাড়িয়া বসিয়া থাকিলেই, তাহারা সুবিধামত প্রাচীন মিশরীয়দের ন্যায় সিরিয়া দখল করিয়া, মক্কা, মেদিনা ও জেরুজালেম প্রভৃতি মুসলমান তীর্থ ক্ষেত্রগুলি অধিকারভুক্ত করিয়া লইবে। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে কামালের মৃত্যু হইলে মিশরের জাতীয়তার ইতিহাসে দ্বিতীয় যবনিকা পতিত হয়।

স্যর এলডন্ গর্ষ্ট ও জগলুল পাশা —

১৯০৭ খৃষ্টাব্দে জনসঙ্ঘ বা People's party গঠন করিয়া জগলুল, কামালের পার্শ্বে আসিয়া দণ্ডায়মান হ'ন জগলুল মিশরের ফেলাহিনদের একজন। কামাল এর মৃত্যুর পর জগলুল সমস্ত মিশরের একচ্ছত্র নেতা হ'ন।

স্যার এলডন্ মিশরে পদার্পণ করিয়া কিছু শাসন-সংস্কার প্রদান করিয়াই দেশে শান্তি স্থাপনের আশা করিয়াছিলেন। কিন্তু গ্রাণ্ড আসেম্বলি সামান্য সংস্কারে সন্তুষ্ট হইতে না পারিয়া উত্তরোত্তর তাহাদের দাবী বৃদ্ধি করিয়া তুলিলে, ইংরাজশাসক খুব কঠোর হস্তে তাহা দমন করিয়া সমস্ত দেশকে Martial Law বা সামরিক আইন দ্বারা শাসন করিতে চাহিলেন। অশান্তির বহ্নি ভীষণ ভাবে প্রজ্জলিত হইয়া উঠিল। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে লর্ড কিচনারকে ইংরাজ জাতির প্রতিনিধি করিয়া মিশরে প্রেরণ করা হয়।

লর্ড কিচনার মিশরে পদার্পণ করিয়াই মিশরের জাতীয়তার গুরুত্ব বিশেষভাবেই হৃদয়ঙ্গম করেন। আরবী পাশা ফেলাহিনদের লইয়া যে আন্দোলন করিয়া গিয়াছিলেন, তাহার সহিত কামালের আন্দোলনের কোন সম্বন্ধ ছিল না। কামাল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মুখ পাত্র হিসাবে আন্দোলন চালাইয়া উহা মিশরের বাহিরে জনপ্রিয় করিয়া তুলিয়াছিলেন। ইটালীর কর্ম্মবীর গ্যারীবল্ডী একসময়ে কামালের সাহায্য করিতে মিশরে আসিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়াছিলেন। জগলুল স্বয়ং একজন ফেলাহিন বা কৃষক ছিলেন। উচ্চশিক্ষিত হইয়া তিনি মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে উন্নত হইয়া উক্ত সম্প্রদায়ের নেতা হইলে তাঁহার নেতৃত্বে মিশরের উচ্চ ও নিম্ন এই দুইটী শ্রেণী একত্রিত হইয়া যাওয়ায় জাতীয় আন্দোলন বিশালভাব ধারণ করে। মিশরে মিশরী ছাড়া আর একপ্রকার জাতি বাস করে তাহাদিগকে ইংরাজীতে কপট্ (Copt) বলে। ইহারা প্রাচীন মিশরীয় জাতি সম্ভূত এবং বর্ত্তমানে খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী। মিশরে কোন জাতীয় আন্দোলনে তাহারা আপনাদের স্বার্থহানির আশঙ্কায় কখনই যোগদান করিত না। জগলুলের নেতৃত্বে পরিচালিত হইয়া এই [illegible] জাতিও প্রবুদ্ধ হইয়া তাঁহার পতাকাতলে আসিয়া [illegible]

হয়। সর্ব্বজাতি ও শ্রেণী সমন্বয়ে এক বিশাল মিশরীয় জাতির বাহ্যিক অস্তিত্ব উপলব্ধি করিয়াই, ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে খানিকটা শাসন সংস্কার প্রদান করা হয়। জগলুল পাশা এই নূতন বিধান মতে আসেম্বলির অধ্যক্ষপদে জনসাধারণ কর্ত্তৃক বরিত হন। ১৯১৪ সালে বিশ্বব্যাপী সমর অতি উৎকট ভাবে আত্ম-প্রকাশ করিলে মিশরে এই নব-প্রবর্ত্তিত বিধিই বলবৎ থাকিয়া যায়।

যুদ্ধের সময় দেশ মধ্যে বাহ্যতঃ শান্তি স্থাপিত থাকিলেও জনসাধারণ ক্রমশঃই মিশরের শাসনতন্ত্রের উপর শ্রদ্ধাহীন হইয়া পড়িতেছিলেন। যুদ্ধের অবসানে মিত্রশক্তি ইরাক ও মেসোপটামিয়ায় স্বাধীন মুসলমান রাজ্য গঠন করিবেন বলিয়া ঘোষণা করিয়াও মিশরে ইংরাজ আধিপত্য প্রকাশ্যভাবে প্রতিষ্ঠিত রাখিতে দৃঢ় সঙ্কল্প হ'ন। ১৯১৮ সালে মিশরকে শাসন সংস্কার প্রদান করিবার জন্য এক কমিশন গঠিত হইলে, মিশরের প্রধান মন্ত্রী জগলুলকে উক্ত কমিশনের একজন সদস্য করিয়া লইবার জন্য ইংরাজদিগকে অনুরোধ করা হয়। ইংরাজ জগলুলকে উৎকট জাতীয়তা বাদী জানিয়া তাঁহাকে কোন প্রকার সরকারি পদে প্রতিষ্ঠিত রাখিতে অস্বীকৃত হ'ন। ইতিমধ্যে অনবধানতা বশতঃ কমিশনের গূঢ়তত্ত্ব খানিকটা প্রকাশিত হইয়া পড়িলে ১৩ই নভেম্বর ১৯১৮ সালে জগলুল (wafd) ওয়াফৎ বা জাতীয়দল স্থাপন করিয়া তাহাদের পক্ষ হইতে আপনাকে বিলাতে প্রেরণ করিবার জন্য আন্দোলন আরম্ভ করেন। তাঁহার যাহা কিছু বক্তব্য আছে তাহা লিখিয়া কমিশনের সম্মুখে দাখিল করিতে বলিলে তিনি স্পষ্ট বলেন যে লিখিয়া দাখিল করিবার কিছুই নাই, বিলাতে গিয়া মন্ত্রীদের সহিত তর্ক-বিতর্ক করিয়া এই উৎকট সমস্যার বিধান করিতে হইবে। ৩রা মার্চ্চ ১৯১৯ সালে জগলুল তাঁহার প্রস্তাবিত জাতীয় স্বাধীনতার প্রোগ্রাম বাহির করিলেই তাঁহাকে তাঁহার সহকর্মীদের সহিত দেশ হইতে নির্ব্বাসন করায়া হয়। জগলুলের নির্ব্বাসনের সহিত দেশমধ্যে তীষণ অসন্তোষ আত্মপ্রকাশ করে। জনসাধারণ ধর্ম্মঘট ও সত্যাগ্রহ অবলম্বন করিতে থাকে। এমন সময়ে মিশর দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য ইংরাজ সরকার লর্ড মিলনারকে তদন্ত করিবার ও ভবিষ্যৎ শাসন প্রণালীর একটা খসড়া প্রস্তুত করিবার জন্য প্রেরণ করেন। মিশর-বাসী দেখিলেন যে উক্ত মিলনার কমিশনে একজনও মিশরবাসী নাই। ওয়াফৎ বা National Delegation এই মিলনার কমিশনকে বয়কট করিবার জন্য জন-সাধারণকে অনুরোধ করিলে,এক বিরাট ধর্ম্মঘটের সূত্রপাত হয়।

১৯২০ সালে মিলনার কমিশন জগলুলের সহিত পরামর্শ করিয়া একটা শাসন সংস্কারের খসড়া তৈয়ারী করেন। এই খসড়া অনুযায়ী ইংরাজ মিশরকে একটা স্বাধীন দেশ বলিয়া স্বীকার করিয়া ল'ন; কিন্তু তথাকার বিদেশীগণের রক্ষাভার এবং রাজস্ব ও বিচারভার ইংরাজদের উপর থাকিবে এইরূপ বন্দোবস্ত হয়। এই বন্দোবস্ত অনুযায়ী মিশরে ইংরাজ প্রাধান্য যতদিন পর্য্যন্ত না লোপ পায় ততদিন মিশরীয় নেতাগণ কোন প্রকার দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন না বলিয়া অভিমত প্রচার করেন। এই জন্যই অক্টোবর মাসে মিলনার কমিশন মিশরে আসিয়া সমস্ত ব্যাপারের চূড়ান্ত মীমাংসা করিতে চেষ্টা করেন কিন্তু তাঁহারা ব্যর্থ মনোরথ হইয়া স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হ'ন।

১৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯২১ সালে মিলনার কমিশনের রিপোর্ট বাহির হয়। ইংরাজ কর্ত্তৃপক্ষ গোড়া হইতেই ঐ রিপোর্ট অনুযায়ী কাজ করিতে অস্বীকৃত থাকায় মিশরের শাসনকর্ত্তাকে সুলতান উপাধি প্রদান করিয়া তাঁহারা প্রধান মন্ত্রী আদ্‌লিকে মন্ত্রীসভা গঠন করিবার জন্য পরামর্শ প্রদান করেন। আদ্‌লি এই প্রস্তাব অনুযায়ী মন্ত্রীসভা গঠন করিবার ভার লইয়া জগলুলকে মিশরে প্রত্যাগমন করিয়া তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য আহ্বান করেন। ১৯২১ সালের এপ্রিল মাসে জগলুল মিশরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। মিশরের ফিরিয়া আসিয়াই জগলুল বুঝিতে পারিলেন যে তাঁহার যশঃপ্রভাব অনেকটা ক্ষুন্ন হইয়াছে। অভিজাতগণ জগলুলের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া তাহাকে অনেকটা অপদস্থ করিতে থাকেন। ইংরাজগণ জগলুলকে হীনপ্রভ হইতে দেখিয়া, ২৩শে ডিসেম্বর জগলুল যখন তাঁহার এক ফতোয়া বাহির করিয়া

কোনপ্রকার নিষেধ আজ্ঞা মানিতে অস্বীকার করেন, তখন তাঁহাকে বন্দী করিয়া নির্ব্বাসিত করেন।

দেশে আবার অরাজকতা ভীষণ ভাবে আত্মপ্রকাশ করিলে ইংরাজ প্রতিনিধি লর্ড এলেন বী স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া ইংরাজ কর্ত্তৃপক্ষগণকে মিশরীয় আন্দোলনের গুরুত্ব সম্বন্ধে বেশ স্পষ্ট করিয়াই বুঝাইয়া দেন। ১৯২২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে মিশরে ফিরিয়া আসিয়াই মিশরকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করেন। মিশরের খেদিব বা সুলতান কিংবা রাজা উপাধি গ্রহণ করেন। ইংরাজ সরকার মিশরের সুয়েজ খালের বাহিরে সৈন্য রাখিতে পারিবে এবং রাজস্ব ও বিচার বিভাগের তদন্তের ভার তাহাদের হস্তে ন্যস্ত থাকিবে এই সর্ত্তে উক্ত সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। ১৯২৩ সালে রাজনৈতিক বন্দীগণকে মুক্তি প্রদান করিলে, জগলুল স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন।

১৯২৪ সালেই মিশরদেশে তাহার জাতীয় মহাসভার প্রথম অধিবেশন হয়। এই সময় হইতে জগলুলের জনপ্রিয়তার হ্রাস ঘটিতে থাকে। ১৯২৪ সালে কলকারখানা স্থাপন করিয়া মিশরের মধ্যবিত্ত শ্রেণী বিশেষ অবস্থাপন্ন হইয়া উঠেন। শ্রমিক দল জগলুলের জাতীয় আন্দোলনের প্রোগ্রামে তাহাদের কোন উল্লেখ নাই দেখিয়া শ্রমিক নেতা হুস্নি আল ওরাবির অধীনতায় আপনাদের আর্থিক অবস্থা পরিবর্ত্তনের জন্য জোর আন্দোলন চালাইতে থাকে। জগলুল অনেকটা মুসোলিনীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া এই আন্দোলনের মর্ম্মকথা বুঝিতে কিছুমাত্র চেষ্টা করিলেন না। ইহার ফলে মিশরে নানাপ্রকার ধর্ম্মঘট দেখা দিলে জগলুল নির্দ্দয় হস্তে তাহা দমন করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়েন। এই সংঘর্ষে অভিজাত পরিচালিত দল ক্রমশঃ প্রবল হইয়া শাসনদণ্ড অধিকার করিয়া বসে।

নবীন তুরস্কের ভাবধারা—বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্য্যন্ত তুরস্কের বিভিন্ন ধর্ম্মমতগুলি এক একটি স্বতন্ত্র রাজ্য বিশেষ ছিল। তুরস্কের সুলতান তাহাদিগকে লইয়া এক সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়া রাজত্ব করিতেন মাত্র। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে বলকান অঞ্চলে খৃষ্টান শক্তিগণের নিকট পরাস্ত ও অপদস্থ হইয়া সমগ্র তুর্কীজাতি তাহার পুরাতন বাসস্থান ও ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে শিক্ষা করে। নবীন তুরস্কের অন্যতম কর্ণধার সিয়া বে সমগ্র তুর্কীজাতিকে একতা সূত্রে আবদ্ধ করিবার স্বপ্ন দেখেন তিনিই প্রথম তুরস্ক ভাষার সংস্কার সাধন করেন। উহাতে যে সমস্ত আরবী ও অন্যান্য বৈদেশিক শব্দ ছিল, সাধ্যমত তাহা বর্জ্জন করেন। আরবী সভ্যতাকে বাদ দিয়া, মাত্র প্রাচীন তুর্কীর কিম্বদন্তীগুলির উপর নির্ভর করিয়া সাহিত্য রচনা করিতে থাকেন। বিদ্যালয়ে বালকদিগকে পুরাতন আরব কাহিনীর ইতিহাস শিক্ষা না দিয়া তুর্কীর গল্প শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হয়। নামকরণেও আরবী ও পার্শী শব্দ পরিত্যাগ করিয়া বিশুদ্ধ তুর্কী শব্দই ব্যবহার করা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া ঘোষণা করা হয়। এই মনোভাব ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বেই এত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল যে তুর্কীর জননায়কগণ তুর্কমান লীগ স্থাপন করেন।

বিজয়ী তুর্কীগণ ইউরোপ জয় করিয়া ব্যবসা বাণিজ্য কখনই হস্তগত করিতে প্রয়াস পায় নাই। কামালপাশা গ্রীকদিগকে এশিয়া মাইনরে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া দেশত্যাগ করিয়া যাইতে বলিলে তুর্কী সমাজে কতকটা সামাজিক বিপ্লব সংঘটিত হয়। তৎপরতার সহিত ব্যাঙ্ক ও ব্যবসা বাণিজ্য স্থাপন করিয়া কামাল ও তাঁহার সহচরগণ এই ক্ষণিক বিপ্লবের হস্ত হইতে দেশকে রক্ষা করেন।

সনাতন প্রথাগুলিই প্রাচ্য দেশ সমূহের গলা টিপিয়া রাখিয়াছে এবং সনাতন প্রথার বন্ধনগুলি রক্ষা করিতে যাইয়াই প্রাচ্য প্রতীচ্যের বহু পশ্চাতে পড়িয়া গিয়াছে। তুর্কীর প্রধান ভাবুকগণ এই ভাব-ধারণার বশীভূত হইয়া মহাসমরের পূর্ব্বেই দেশের মধ্যে নানাবিধ ভাবধারার পরিবর্ত্তন করেন। ধর্ম্ম মানবজীবনকে পারলৌকিক সুখ সম্পদ প্রদান করিতে পারে কিন্তু ইহকালের জন্য ঐহিক সম্পত্তিই মূল এই ধারণা জনসমাজের মধ্যে প্রচার করিবার জন্য তাঁহারা প্রাণপণ চেষ্টা করিতে থাকেন। ধর্ম্মের দোহাই দিয়া সকল প্রকার স্বাস্থ্য রক্ষাকারী নিয়মগুলি লঙ্ঘন করিলে মৃত্যুই অনিবার্য্য, ধর্ম্মের দোহাই দিয়া সকল প্রকার ব্যবসা বাণিজ্যকে দূরে

করিলে দারিদ্র্যকেই বরণ করিয়া লইতে হইবে। তুরস্কের কবিগণ সম্পূর্ণ নূতন ছন্দে তাহাদের ভাবধারা আধুনিক করিয়া জনসমাজে প্রচার করিতে থাকেন। পারলৌকিক তত্ত্বগুলি পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারা মাটী, জল, ব্যাঙ্ক, রেলপথ ইত্যাদি নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি লইয়া তাঁহাদের নবীন গাথা রচনা করিতে থাকেন। প্রাচীন হিব্রু-জাতি তাহার রমণীগণের জন্য পর্দ্দা সৃষ্টি করিয়াছিলেন। মুসলমান ধর্ম্মে এই জন্যই বহু প্রাচীনকাল হইতেই নারীসমাজের মধ্যে পর্দ্দা প্রথা প্রচলিত ছিল। কামাল ও সহচরগণ নারীজাতিকে এই বন্ধনের হস্ত হইতে মুক্তি প্রদান করিবার জন্য, সর্ব্বপ্রকার পর্দ্দার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেন। তুর্কীর রমণীগণ ক্রমশঃ বিনা অবগুণ্ঠনে প্রকাশ্য জন সমাজে আসিয়া বক্তৃতা প্রদান করিতে আরম্ভ করেন। পুরাতনের সহিত সর্ব্বপ্রকার সম্বন্ধ বিচ্ছেদ করিবার জন্য পুরাতন ছুটীর দিন গুলি তুলিয়া দিয়া উহার স্থলে তুর্কীর স্বাধীনতা ঘোষণার দিন, কনস্তান্তিনোপল অধিকার করিবার দিন, সাধারণের বিশ্রাম দিন বলিয়া ঘোষণা করা হয়। শুক্রবারের স্থলে রবিবারকেই সপ্তাহের বিশ্রাম দিবস বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়।

এই সমস্ত সংস্কার দেশ মধ্যে অতি দ্রুত প্রবর্ত্তিত করিতে গিয়া কামাল খানিকটা বাধা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই বাধাই তাঁহাকে আরও দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ করিয়া তুলে। তাহাদিগকে সরকার পক্ষ হইতে সনাতনী বলিয়া সন্দেহ হইতে থাকে তাহাদিগকে অবরোধ করা আরম্ভ হয়। যে সমস্ত খবরের কাগজ সুলতান বা সনাতন ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া বর্ত্তমান ব্যবস্থার নিন্দা প্রচার করে তাহাদিগকে খুব কঠিন হস্তে দমন করা হয়। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত People's Party বা কামালের দলই খুব প্রবল ছিল। তাহার পর হইতে Progressive Republican দল নামক একটী রাজনৈতিক দল তুরস্কের আইন সভায় প্রবেশ করে। ১৯২৫ সালে এই দল মাথা তুলিয়া কুর্দ্দিস্থানে বিদ্রোহ উপস্থিত করিলে অতি নির্দ্দয় ভাবে উক্ত বিদ্রোহ অঙ্কুরেই বিনাশ করা হয়। এই বিদ্রোহের পর কামাল সমস্ত রাজকীয় কর্ম্মচারীগণকে ইউরোপীয় পোষাক পরিচ্ছদাদি পরিধান করিবার জন্য আদেশ প্রদান করেন। রমজানের উপবাস বন্ধ করিয়া দেন। মসজিদে জুতা খুলিয়া প্রবেশ করিবার প্রথা রহিত করেন। কতকগুলি বহু প্রাচীন ধর্ম্মের প্রথাকে অস্বাস্থ্যকর হিসাবে উঠাইয়া দেন। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে তুর্কী জাতীয় মহাসভা ইসলাম ধর্ম্মকে রাজধর্ম্ম হইতে পদচ্যুত করিয়া দেন, মহম্মদীয় আইন-কানুন বর্জ্জন করিয়া তুরস্ক সম্পূর্ণরূপে Materialestic রাজত্বে পরিণত হয়। তুরস্কের বর্ত্তমান জাতীয়তা, মিশর ও ইটালীর জাতীয়তার ন্যায় অনেকটা ফ্যাসিষ্ট মতবাদ। তুরস্কে কম্যুনিজম কখনই প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। সুতরাং উহার সেই ভয় নাই। স্বাধীন তুরস্ক কামালের অধীনতায় তুর্কীজাতিগণকে এক বিরাট জাতীয়তার মধ্যে আনয়ন করিবার স্বপ্ন দেখিতেছে। তুরস্কের বর্ত্তমান আন্দোলন অনেকটা মধ্যবিত্ত শ্রেণী কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, বর্ত্তমান তুরস্কের রাষ্ট্রটী ইউরোপের মধ্যযুগের National State.

বর্ত্তমান যুগের আরব—আরবের পূর্ব্ব ইতিহাস ইতিপূর্ব্বে কিঞ্চিৎ প্রদান করিয়াছি। এখানে আমরা আরবের বর্ত্তমান ইতিহাস বলিব। আরব বলিতে আমরা সাধারণতঃ এক বিস্তৃত মরুভূমি বুঝিয়া থাকি। এই দেশটী মোটামুটী তিনভাগে বিভক্ত। উত্তর ও মধ্য আরব, উহার অধিকাংশই মরুভূমি। পূর্ব্ব ও দক্ষিণ আরব, যেখানে পারস্য উপসাগরের উপকূলে আলহিসা ও ওমান প্রদেশে অবস্থিত। পশ্চিম ও দক্ষিণ আরব, যেখানে লোহিত সাগরের উপকূলে ইমেন ও হেজাজ প্রদেশে অবস্থিত। বর্ত্তমান আরব সিরিয়া, পালেষ্টাইন, ট্রান্স জোরডান, মধ্য-আরব, মেসোপটামিয়া এই পাঁচটী প্রদেশে বিভক্ত।

ক্রমশঃ

ভৃত্য

সেমিওনভের গল্প

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

জেরাসিম যখন মস্কোতে ফিরিয়া আসে, তখন চাকরী খুঁজিয়া পাওয়া খুবই কঠিন—খ্রীষ্টমাসের অল্পকাল পূর্ব্বেই, লোকে তখন সামান্য চাকরী হইলেও উপহারের লোভে টিকিয়া থাকে। এই কৃষকের ছেলেটি তিন সপ্তাহ ধরিয়া চারিদিকে একটা চাকরীর বৃথা অন্বেষণ করিয়া ফিরিতেছিল।

সে তাহার আত্মীয় ও গ্রামের লোকের নিকট থাকিত। এবং যদিও তাহাকে বিশেষ কোন অভাবে পড়িতে হয় নাই, তথাপি তাহার মত শক্ত ও সমর্থ যুবক যে বেকার ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, ইহাতেই সে অত্যন্ত নৈরাশ্য বোধ করিতেছিল।

জেরাসিম মস্কোতে শৈশব হইতে বাস করিতেছে। যখন সে নিতান্ত শিশু তখন এক মদের ভাঁটিতে বোতল-ধোওয়ার কাজে বহাল হয়; এবং পরে একটা বাড়ীতে চাকর থাকে। গত দুই বৎসর ধরিয়া সে এক সওদাগরের কাজে বহাল ছিল, এবং যদি না গ্রামে সৈনিকের কাজের জন্য তাহার ডাক পড়িত তাহা হইলে সে ঐ কাজেই টিকিয়া থাকিত। যাহা হউক, তাহাকে সে কাজ নির্ব্বাচিত করা হয় নাই। সে গ্রাম্য-জীবনে অভ্যস্ত ছিল না; গ্রামে সব কেমন একঘেয়ে লাগিত। সে কারণ, সে স্থির করিয়াছিল, বরং মস্কোর পাথর গণিবে তবুও গ্রামে থাকিবে না।

পথে পথে বেকার অবস্থায় ঘুরিয়া বেড়াইতে প্রতি মুহূর্ত্ত তাহার নিকট দুর্ব্বহ হইয়া উঠিতেছে। যে কোন একটা কাজের জন্য সে কোন চেষ্টাই বাকী রাখে নাই। তাহার পরিচিতদের উত্যক্ত করিয়াছে, এমন কি, পথে পথিকদেরও দাঁড় করাইয়া কাজের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছে কিন্তু সবই বৃথা।

পরিশেষে আত্মীয়গণের স্কন্ধে বোঝাস্বরূপ হইয়া থাকা জেরাসিমের অসহ্য বোধ হইল। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ জেরাসিমের যাওয়া-আসায় বিরক্ত হইল; কেহ কেহ আবার তাহার জন্য মনিবের অসন্তোষের ভাগী হইল। সে কি করিবে বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। কখন কখন সে অনাহারে কাটাইয়া দিত।

২

একদিন জেরাসিম তাহার গ্রামের এক বন্ধুর নিকট গিয়া উপস্থিত হইল। লোকটা মস্কোর একেবারে বহিঃসীমানায় সোকোল্‌নিকের নিকট থাকিত। সে শারভ্‌ নামে এক সওদাগরের কোচম্যান পদে বহু বৎসর ধরিয়া বহাল ছিল। সে মনিবকে বেশ হাত করিয়া লইয়াছিল; ফলে শারভ্‌ তাহাকে খুব বিশ্বাস করিত ও নানামতে অনুগ্রহ দেখাইত। প্রধানতঃ লোকটার স্বচ্ছন্দ কথাবার্ত্তাই তাহাকে মনিবের বিশ্বাসভাজন করিয়াছিল। সে আর সকল ভৃত্যের উপর প্রভুত্ব করিতে পারিত এবং এই কারণেই তাহার মনিবের নিকট তাহার আদর।

জেরাসিম উপস্থিত হইয়া তাহাকে প্রিয় সম্ভাষণ করিল। কোচম্যানও তাহার অতিথির যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করিয়া তাহাকে চা ও কিছু জল খাবার খাইতে দিয়া জিজ্ঞাসা করিল সে কেমন আছে।

জেরাসিম কহিল, "খুবই খারাপ, ইগর হানিলিচ। অনেকদিন আমি বেকার।"

"তোমার পুরাণো মনিবকে আবার তোমাকে কাজে বহাল করতে অনুরোধ কর নি?"

"করেছিলুম।"

"সে তোমাকে আর রাখবে না?"

"সে কাজে লোক নেওয়া হয়েছে।"

"ঠিকই হয়েছে। ঐ ভাবেই তোমাদের মত [illegible] কাজ কর। তোমরা অমুক-অমুক মনিবের কাছে [illegible] কর; আর যখন ছেড়ে যাও, তখন সচরাচর সব [illegible] করে যাও। তোমাদের এমন ভাবে কাজ করা উচিত যে, তারা তোমাদের কথা খুব ভাববে; [illegible]

আস্‌বে, তখন তারা ফিরিয়ে দেবে না। বরং যে লোকটাকে রাখা হয়েছে তাকে ছাড়িয়ে তোমাদের রাখবে।”

“লোকে কেমন কোরে তা পারে? আজকালকার মনিবরা ও-রকম হয় না। আর, আমরাও কিছু দেবদূত নই।”

“কথা কাটা-কাটিতে কি লাভ? এই আমার কথাই বলি। যদি কোন কারণে আমাকে চাকরী ছেড়ে বাড়ী যেতে হয়, আমি ফিরে এলে কেবল যে মিঃ শারভ আমাকে আবার রাখবেন তাই নয়, তাতে পরম খুশীও হবেন।”

জেরাসিম নতনেত্রে বসিয়া রহিল। সে বুঝিল, তাহার বন্ধু অহঙ্কার করিতেছে; এবং তাহার মনে হইল, তাহাকে খুশী রাখা দরকার।

সে কহিল, “আমি জানি। কিন্তু দানিলিচ তোমার মত লোক খুঁজে পাওয়া কঠিন। তুমি কাজের লোক নাহলে, তোমার মনিব তোমাকে বার বছর এক নাগাড়ে রাখতেন না।”

ইগর হাসিল। প্রশংসটা তাহার ভাল লাগিল।

সে কহিল, “তা বটে। তুমি যদি আমার মতে থাক আর কাজ কর তাহলে তোমার কাজের অভাব হবে না।”

জেরাসিম কোন উত্তর দিল না।

ইগরকে তাহার মনিব ডাকিল।

সে কহিল, “একটু দাঁড়াও; আমি এখনই আস্‌ছি।”

“বেশ।”

৩

ইগর ফিরিয়া আসিয়া বলিল যে, আধ ঘণ্টার মধ্যে ঘোড়া জুতিয়া তাহার মনিবকে শহরে লইয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। সে পাইপ ধরাইয়া বার কয়েক ঘরের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইল। তারপর জেরাসিমের সম্মুখে স্থির হইয়া দাঁড়াইল।

কহিল, “শোন বাপু, যদি তুমি ইচ্ছা কর, তোমাকে এখানে চাকর রাখবার জন্যে আমি কর্তাকে বলব।”

“তাঁর কি লোকের দরকার?

“একজন আছে, কিন্তু সে তেমন কাজের নয়। সে বুড়িয়ে যাচ্ছে; আর, তার পক্ষে কাজগুলো করা কঠিন হয়ে পড়ছে। খুব বরাত জোর, যে, এ দিকটা বেশ নিঝুম। আর, পুলিশও তেমন তাড়াহুড়ো করে না। নাহলে, বুড়োটা ঠিক ওদের মতলব মত জায়গাটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখ্‌তে পার্‌ত না।”

“যদি পার, দানিলিচ, আমার জন্যে দুএক কথা বলো। তোমার জন্যে আমি সারা জীবন ধরে প্রার্থনা করব। বেকার থাকা আমার অসহ্য হয়ে উঠেছে।”

“আচ্ছা, আমি তোমার জন্যে বল্‌ব। তুমি কাল এস। আর, এই দশ কোপেক ধর। কাজে লাগ্‌তে পারে।”

“ধন্যবাদ, দানিলিচ। তাহলে তুমি আমার জন্যে চেষ্টা করবেই? আমাকে এই অনুগ্রহটা করো।”

“আচ্ছা! আমি তোমার জন্যে চেষ্টা করব।”

জেরাসিম চলিয়া গেল এবং দানিলিচ ঘোড়া জুতিল। তারপর সে কোচম্যানের পোষাক পরিয়া গাড়ী হাঁকাইয়া সদর দরজার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। মিঃ শারভ ভিতর হইতে আসিয়া স্লেজে চাপিলেন, ঘোড়া দুইটি ছুটিতে লাগিল। তিনি শহরে গিয়া তাঁহার ব্যবসা দেখিলেন এবং বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন। ইগর মনিবের খোশ-মেজাজ দেখিয়া কহিল,

“ইগর ফিয়দরিচ, আপনার কাছে আমার একটী প্রার্থনা আছে।”

“কি?”

“আমাদের গাঁয়ের একটী ছোক্‌রা এখানে আছে, বেশ ভাল ছেলে। সে বেকার।”

“বটে?”

“তাকে আপনি রাখবেন না?”

“কিসের জন্যে তাকে আমার দরকার?”

“এই ঘর-দোরের সব কাজের জন্যে তাকে রাখুন।”

“পলিকারপিচের কি হবে?”

“সে কোন্ কাজের? এখন তাকে তাড়িয়ে দেওয়া উচিত।”

"সেটা ভাল হবে না। এতদিন সে আমার কাছে আছে। বিনা কারণে তাকে আমি ছাড়তে পারি না।"

"না হয় সে আপনার কাছে বহুকাল কাজ করেছে। সে তো মাঙ্‌না কাজ করে নি! তার জন্যে মাইনে পেয়েছে। সে নিশ্চয়ই তার বুড়ো বয়সের জন্যে কিছু টাকা জমিয়েছে।"

"জমিয়েছে! কি করে? কি থেকে? সে একলা নয়। তার স্ত্রীর খাওয়া-পরার জোগাড় তাকে করতে হয়।"

"তার স্ত্রীও ঘর-সংসারের ছুটকো-ছাট্‌কা কাজে উপায় করে।"

"অনেক টাকা সে বাঁচাতে পার্‌ত।"

"পলিকারপিচ্‌ আর তার স্ত্রীর জন্যে আপনার এত ভাবনার দরকার কি? সত্যি কথা বল্‌তে কি, ওটা নিতান্ত অকর্ম্মা চাকর। সময়মত ও তুষাররাশি সরাতে পারে না; কোন কাজই ঠিকমত করতে পারে না। রাতে যখন তার পাহারা দেবার পালা পড়ে, সে অন্ততঃ দশবার সরে পড়ে। ওর বড় শীত করে। দেখবেন, একদিন ওর জন্যে পুলিশের হাঙ্গাম পোয়াতে হবে। ইন্‌সপেক্‌টার সাহেব একদিন আমাদের ঘাড়ে চাপ্‌বে, আর ওর জন্যে দায়ী হওয়াটা আপনার একটু ভাল লাগবে না।"

"তবুও এটা খারাপ। সে আমার কাছে পনেরো বছর আছে। আর তার বুড়ো বয়সে এমন ব্যবহার—এতে পাপ হবে।"

"পাপ! তার কি ক্ষতি আপনি কর্‌ছেন? সে না খেতে পেয়ে মর্‌বে না। "আম্‌স্‌ হাউসে" যাবে। তার বুড়ো বয়সের পক্ষে বেশ নির্ঝঞ্ঝাট হওয়াতো ভালই।"

শারভ্‌ চিন্তা করিতে লাগিলেন।

পরিশেষে কহিলেন, "আচ্ছা, তোমার বন্ধুকে এনো। দেখব কি কর্‌তে পারি।"

"তাকে রাখুন কর্ত্তা। তার জন্যে আমার বড় দুঃখ হয়। ছোক্‌রা ভাল অথচ অনেকদিন বেকার বসে আছে। আমি জানি সে বেশ ভাল কোরে কাজ কর্‌বে, আর আপনার খুবই বিশ্বাসী হবে। সৈনিকের কাজে গিয়ে ছিল বলেই সে তার আগের চাক্‌রিটা হারিয়েছে। তা না হলে, তার মনিব তাকে ছাড়তেনই না।"

(৪)

পরদিন সন্ধ্যায় জেরাসিম আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আমার কিছু করতে পার্‌লে?"

"মনে হয়, কিছু। আগে চা খাওয়া যাক্‌। তারপর আমরা কর্ত্তার কাছে যাব।"

এমন কি চায়েও জেরাসিমের কোন আকর্ষণ ছিল না। সে একটা হেস্তনেস্তর জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু গৃহস্বামীর প্রতি বিনয়ে বাধ্য হইয়া সে দুই গ্লাস চা পান করিয়া ফেলিল। তারপর দুইজনে শারভের নিকট উপস্থিত হইল।

শারভ জেরাসিমকে জিজ্ঞাসা করিলেন, পূর্ব্বে সে সে কোথায় থাকিত এবং কি কাজ সে করিতে পারে? তারপর কহিলেন, তাহাকে তিনি সকল রকম কাজের জন্য রাখিতে প্রস্তুত। পরদিন সে যেন কাজে আসে।

ভাগ্যের এমন পরিবর্ত্তনে জেরাসিম হতবুদ্ধি হইয়া গেল। তাহার এমনি আনন্দ হইল যে, পা দুইখানি যেন আর চলে না। সে কোচম্যানের ঘরে গেলে ইগর কহিল, "বাবা, দেখ, তোমার কাজ-কর্ম্ম ঠিকমত করো যাতে আমাকে না লজ্জায় পড়তে হয়। তুমি তো জান মনিবরা কি চীজ্‌! যদি একবার অন্যায় কর, তাহলে তারা বরাবর তোমার দোষ দেখবে; কোনকালে সুস্থির হতে দেবে না।"

"ব্যস্ত হয়ো না, দানিলিচ্‌।"

"বেশ—বেশ!"

জেরাসিম্‌ আঙিনা পার হইয়া ফটক দিয়া যাইবার জন্য বিদায় লইল। পলিকারপিচের ঘরগুলি আঙিনারই এক-ধারে। একটা প্রশস্ত আলোকরশ্মি জানালাপথে আসিয়া জেরাসিমের পথের উপর পড়িয়াছিল। তাহার ভবিষ্যত বাস গৃহের মধ্যে এক ঝলক দেখিয়া লইতে জেরাসিমের বড় ইচ্ছা হইল। কিন্তু জানালার শার্সিগুলিতে তুষার থাকায় ভিতরটা দেখা সম্ভব হইল না। কিন্তু ভিতরের লোকেরা যাহা বলাবলি করিতেছিল, তাহা সে শুনিতে পাইল।

একটী নারীকণ্ঠে কথিত হইতেছিল "আমরা এখন কি করব ?"

"জানি না, জানি না।" নিঃসন্দেহে পলিকারপিচ্ উত্তর করিল। "ভিক্ষা করতে হবে।"

"ঐ আমরা করতে পারি। তা ছাড়া আর কোন উপায় নেই।" নারীটি কহিল। "হায় আমরা গরীবরা কি দুঃখের জীবন যাপন করি। আমরা কাজ করি। সেই সকাল থেকে নিশুতি রাত অবধি, দিনের পর দিন। তারপর যখন বুড়ো হয়ে পড়ি, তখন "দূর হও—"

"আমরা কি করতে পারি ? আমাদের মনিব তো আমাদের একজন ন'ন। তাঁর কাছে এ সব বলেও কোন লাভ নেই। তিনি কেবল তাঁরই সুবিধা চান্।"

"মনিবগুলো কি নীচ। তারা নিজের কথা ছাড়া আর কারো বিষয় ভাবে না। তাদের মাথায় এটা আসে না, যে, আমরা তাদের জন্যে বিশ্বস্ততা ও সততার সঙ্গে বহু বৎসর ধরে কাজ করি ; আর তাদেরই কাজে আমাদের সকল শক্তি ক্ষয় করি। তারা আমাদের আর একটা বছরও রাখতে ভয় পায়, এমন কি, তাদের কাজ করবার মত শক্তি আমাদের থাকতেও। আমাদের শরীরে সামর্থ্য না থাকলে আমরাই স্বেচ্ছায় চলে যেতুম।"

"কোচম্যানটার যত দোষ আমাদের মনিবের দোষ তত নয়। দানিলিচ্ তার এক বন্ধুর জন্যে একটা ভাল চাকরী চায়।"

"হ্যাঁ। ওটা একটা কালসাপ। কি করে যে, বশ করতে হয়, তা ও জানে। দাঁড়া, তুই বিষ-মুখো পশু। তোকেও দেখাচ্ছি। আমি সোজা মনিবের কাছে যাচ্ছি। গিয়ে বলব, কি কোরে ওটা ঘোড়ার বিচুলী আর দানা চুরি করে। আমি লিখে দেব। তাহলে কর্ত্তা জানতে পারবেন কি করে হতভাগাটা আমাদের সকলের নামে মিথ্যে লাগায়।"

"বলো না, গিন্নী, পাপ কোরো না।"

"পাপ ? আমি যা বলছি সব সত্যি নয় ? আমি যা বলছি তা আমি খুব ভাল কোরেই জানি। আমি সোজা গিয়ে কর্ত্তার কাছে নালিশ করব। তিনি নিজের চোখেই দেখবেন। কেনই বা নয় ? এখন আমরা কি করি ? কোথা যাই ? সে আমাদের সর্ব্বনাশ করেছে।"

বৃদ্ধা ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

জেরাসিম সমস্ত শুনিল। কথাগুলি ছুরিকার মত তাহাকে বিদ্ধ করিল। সে বুঝিল, এই বৃদ্ধ দম্পতীর জীবনে সে কত বড় দুঃখ আনিয়া দিয়েছে। এবং এই চিন্তা তাহাকে কাতর করিয়া ফেলিল। সে চিন্তামগ্ন হইয়া বহুক্ষণ সেখানে দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর ফিরিয়া দানিলিচের ঘরে গিয়া উপস্থিত হইল।

"তুমি কিছু ভুলে গিয়েছিলে বুঝি ?"

জেরাসিম ধীরে কহিল,"না, দানিলিচ্ আমি এসেছি—শোন—আমি তোমাকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিতে চাই—যেভাবে তুমি আমার অভ্যর্থনা করেছিলে আর—আমার জন্যে যে কষ্ট তুমি স্বীকার করেছ তার জন্য কিন্তু—আমি কাজটা নিতে পারি না।"

"কি ! তার মানে ?"

"কিছু না। আমি কাজটা চাই না। আমি আর একটা খুঁজে নেব।"

ইগর ক্রোধে উন্মত্ত হইল।

"তুমি আমাকে অপদস্থ করবার মতলব কোরেছিলে ? লক্ষ্মীছাড়া, বেল্লিক ! একেবারে ভেড়ার মত নিরীহ হয়ে আমার এখানে এসে বল্লে, "আমার জন্য চেষ্টা কর, দয়া করে চেষ্টা কর—"তারপর তুমি কাজটা নিতে অস্বীকার করছ ? পাজি, আমাকে তুই অপদস্থ করলি ?"

জেরাসিম উত্তর দিবার মত কোন কথা খুঁজিয়া পাইল না। সে রক্তিম মুখে চক্ষু নত করিল। ইগর ঘৃণায় তাহার দিকে পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইল এবং আর কিছু বলিল না।

তারপর জেরাসিম নীরবে টুপীটি কুড়াইয়া লইয়া কোচম্যানের ঘর ত্যাগ করিল। সে দ্রুতপায়ে আঙিনা পার হইয়া গেট ছাড়াইয়া রাস্তার উপর দিয়া চলিতে লাগিল। তাহার চিত্তভার তখন লঘু ও সারা অন্তর সুখে ভরপুর।

সমাজ-সংস্কারে মহাত্মা

"সংবাদপত্র সমূহে আমার এই পঞ্চম বিবৃতি প্রদান করিবার সময় সংবাদপত্রসমূহ আমার বিবৃতিগুলির এবং সাধারণভাবে এই আন্দোলনের যেভাবে আদায় কার্য্য করিতেছেন, তজ্জন্য আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। গত সপ্তাহে শ্রীযুত রাজভোজ এবং তাঁহার বন্ধুগণ আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তাঁহাদের সঙ্গে সমস্ত আন্দোলনের সম্পর্কে আমার আলোচনা হয়। ঐ সময় তাঁহাদের নিকট আমি যাহা বলিয়াছিলাম এই বিবৃতিতে আমি তাহার কতকাংশের কথা সংক্ষেপে বলিতে চাই। তাঁহারা একটি প্রশ্নের দ্বারা হরিজনদের এই আন্দোলনকে সাহায্য করিবার জন্য কি করিতে পারে, আমার নিকট হইতে তাহা জানিতে চাহেন। তাহারা এদিকে অনেক কাজ করিতে পারে। হরিজনদের সহিত সম্পূর্ণ সমধিকারের সর্ত্তে মেলামেশা করিতে অস্বীকৃতির সঙ্গতি দেখাইবার জন্য কোন কোন বর্ণ হিন্দু তাহাদের বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ আনয়ন করিতে পারেন হরিজনেরা পূর্ব্ব হইতে তাহা অনুমান করিয়া লইতে পারেন। হরিজনদের বিপুল জনসংখ্যার শোচনীয় দুর্দ্দশার জন্য বর্ণ হিন্দুরাই সম্পূর্ণভাবে দোষী, একথা আমি ইতিপূর্ব্বেই দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছি। আমি ইহাও বলিয়াছি যে, অস্পৃশ্যতা বর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের অবস্থারও উন্নতি ঘটিবে। অস্পৃশ্যতা দোষ দূর করিবার জন্য আমি কোন সর্ত্ত নির্দ্দেশ কখনই করিব না। তথাপি, বর্ত্তমান অবস্থার ভিতরও যতদূর সম্ভব নিজেদের আভ্যন্তরীণ সংস্কারের জন্য কাজ চালান হরিজনদের কর্ত্তব্য সুস্পষ্ট। নিম্নলিখিত কাজগুলিতে নিজেদের সমগ্র কর্ম্মশক্তি প্রয়োগ করা হরিজনসমাজের কর্ম্মিদের কর্ত্তব্য :—(১) হরিজনদের মধ্যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা এবং স্বাস্থ্যবিধির প্রসার। (২) যে সব কাজকে নোংরা কাজ বলা হয়,—যেমন, ময়লা পরিষ্কার করা, চামড়া পাকা করা প্রভৃতি কার্য্যগুলি উন্নত উপায়ে করা ; (৩) সম্পূর্ণরূপে সংস্কার মাংসাহার না করিলেও মৃত জন্তুর মাংস এবং গোমাংস আহার বর্জ্জন করা ; (৪) মদ্যপান পরিত্যাগ করা ; (৫) যে সব স্থানে দিনের বেলায় বিদ্যালয় আছে, সেই সব বিদ্যালয়ে শিশুদিগকে প্রেরণ করার জন্য তাহাদের পিতামাতাকে প্ররোচিত করা এবং যে সব স্থানে নৈশ বিদ্যালয় আছে, সে সব বিদ্যালয়ে পিতামাতারা নিজেরা যাহাতে যায় সেজন্য চেষ্টা করা ; (৬) নিজেদের মধ্যে অস্পৃশ্যতা দোষ দূর করা। ঐ বিষয়গুলির উদ্দেশ্য কি তাহা বুঝাইয়া দিবার জন্য আমি দফাওয়ারীভাবে ঐগুলির আলোচনা করিতেছি। আমাদের দেশের আবহাওয়া যেরূপ তাহাতে প্রত্যহ স্নান করা এদেশে আবশ্যক। কাপড়চোপড়ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা সর্ব্বদেশে সকল জলবায়ুতেই আবশ্যক। এক লোটা জল হইলেই একজনের ভাল স্নান হইতে পারে। একখানা পরিষ্কার তোয়ালে ভাল রকম করিয়া জলে ভিজাইয়া মাথা গা জোরে রগড়াইয়া ফেলিয়া তারপর একখানা শুকনা তোয়ালে দিয়া মুছিয়া ফেলিলেই চলে। প্রত্যহ যদি এইভাবে স্নান করা হয়, তাহা হইলে ভিজা তোয়ালেখানা ভালরূপে নিংড়াইয়া লইলেই উহদ্বারা শরীর মুছিয়া ফেলিবার কাজ চলিতে পারে।

এই দেশের আবহাওয়াতে শুধু একটা ল্যাঙ্গোট পরিয়া থাকিয়া ঐ কাপড় চোপড় তখন তখনই শুকাইয়া লওয়া যাইতে পারে। আমি জানি আমি নূতন কিছুই বলিতেছি না, তথাপি এই সব প্রাথমিক বিষয়গুলিই শতশত কর্ম্মীদিগকে আমাকে বাধ্য হইয়া বুঝাইয়া বলিতে হইতেছে। গ্রাজুয়েটরা পর্য্যন্ত স্বাস্থ্য বিষয়ের এইসব প্রাথমিক নিয়মগুলি অনেকে জানেন না। তারপর, ময়লা পরিষ্কারের উন্নত প্রণালীর কথা। স্বার্থপর অন্ত্যবর্ণ হিন্দুগণ সুরুচিসম্মতভাবে মানুষের মলমূত্র পরিষ্কার করা এরূপ অসম্ভব করিয়া তুলিয়াছেন। পায়খানাগুলি কেহ স্পর্শ করে না বলিয়া ঐগুলি এত অপরিষ্কার যে সে কথা বলিবার নহে। সেগুলি অন্ধকার, আলোবাতাস বর্জ্জিত এবং এরূপভাবে প্রস্তুত যে, সেগুলির খানিকটা মাত্র কিছু পরিষ্কার করা যাইতে পারে, তাহাও অত্যন্ত অপরিচ্ছন্ন ভাবেই সম্ভব। এই সব পায়খানা ব্যবহার করা প্রত্যহ নরকে যাওয়ারই সামিল। এদেশের আবহাওয়া যদি এরূপ ভাল না হইত, তাহা হইলে পায়খানার ভিতরগুলি অস্পৃশ্যদিগকে পরিষ্কার করিতে না দেওয়ার জন্য অথবা নিজেরা ঐগুলি পরিষ্কার না করার দরুণ অনেকে যেভাবে অকাল মৃত্যুর কবলিত হইয়া থাকে, তদপেক্ষা আরও অনেক বেশী লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইত। হরিজনদিগকে সকল রকম আবশ্যকীয় সমাজ-সেবার কার্য্যই করিতে হয়। বর্ত্তমান অবস্থার ভিতর তাঁহারা ঐগুলি পরিষ্কার করিবার অব্যবহিত কাল পরেই স্নান করিতে পারে এবং ঐগুলি পরিষ্কার করিবার জন্য সামান্য কিছু খড়ের পরিবর্ত্তে যথেষ্ট পরিমাণ শুকনা মাটি ব্যবহার করিতে পারে। আমি নিজেকে মেথরের কাজে একজন বিশেষজ্ঞ বলিয়া দাবী করিয়া থাকি, ঐ কাজ সুলভে এবং দক্ষতার সহিত ও সম্পূর্ণ পরিচ্ছন্নভাবে সম্পন্ন করিবার পক্ষে আমি অনেক উপায়ের কথা বলিয়া দিতে পারি। গ্রামবাসীরা ও সহরবাসী যদি এই কার্য্যে সাহায্য করে, তাহা হইলে ঐ ভাবে কাজ করিতে কিছুই অসুবিধা হয় না। এ বিষয়ে যাহারা জানিতে ইচ্ছুক, তাহারা স্বাস্থ্যবিধান সম্বন্ধে বিশেষভাবে গ্রাম্য স্বাস্থ্য বিধান সম্বন্ধে আমার লেখাগুলি পড়িয়া দেখিতে পারেন। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিবার কাজ চালাইবার সময় মেথরদের একটা বিশেষ পোষাক পরিধান করা উচিত। প্রত্যেক মনিব অথবা কয়েকজন মনিব একত্র হইয়া ঐ পোষাক সরবরাহ করিতে পারেন।

চামড়া পাকা করিবার কাজ অপেক্ষাকৃত কঠিন। [illegible]

চামড়া পাকা করা কাজ করে, তাহারা মৃত জন্তুর ছাল ছাড়াইবার আধুনিক রীতি জানে না। তথাকথিত উচ্চ-শ্রেণীরা তাহাদের স্বধর্মী এবং স্বদেশবাসী এই প্রয়োজনীয় সম্প্রদায়কেই অপরাধমূলক ভাবে উপেক্ষা করিয়া আসিতেছেন, তাহার ফলে মৃত জন্তুকে সরাইয়া লওয়া হইতে আরম্ভ করিয়া চামড়া পাকা করার কাজ পর্য্যন্ত অত্যন্ত আনাড়ী রকম হইয়া থাকে। নিকৃষ্ট ধরণের চামড়া তৈয়ার হয় বলিয়া উহাতে দেশের অগণিত অর্থের ক্ষতি ঘটিয়া থাকে। মধুসূদন দাস একজন প্রকৃত জনহিতৈষী পুরুষ। তিনি চামড়া পাকা করিবার আধুনিক পদ্ধতি নিজে আয়ত্ত করিয়াছিলেন। ধর্ম্মের নামে অস্পৃশ্যতার কুসংস্কারের জন্য বৎসরে বৎসরে এদেশের কি পরিমাণ ক্ষতি ঘটিতেছে হিসাবপত্রে তিনি তাহা দেখাইয়া দিয়াছিলেন। হরিজন কর্ম্মিগণ চামড়া তৈয়ারীর আধুনিক পদ্ধতি শিক্ষা করিতে যথাসম্ভব কার্য্যকরভাবে হরিজনদিগকে উহা শিখাইয়া লইতে পারেন। গৃহস্থদের উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করিতে মেথরেরা যাহাতে দৃঢ়ভাবে অস্বীকৃত হয়, তাহাদিগকে সেই শিক্ষা প্রদান করিতে হইবে। যতদূর সম্ভব নিষ্ঠুর ভাবে গৃহস্থেরা মেথরদিগকে, তাহাদের পাত্রের ভুক্তাবশেষ দিয়া থাকে। যুগাগত অভ্যাসবশতঃ এই বিষয়ে মেথরদের সৌন্দর্য্যানুভূতি নষ্ট হইয়া গিয়াছে, তাহারা অপরের পাত্রের উচ্ছিষ্ট আহার করার কোন দোষ দেখিতে পায় না। তাহাদের মনিবদের পাত্রের ভুক্তাবশেষ, তাহারা অত্যন্ত সুখাদ্য মনে করিয়া থাকে এবং তাহার জন্য লালায়িত হয়। আমি জানি, ভাঙ্গীদের ছেলেপিলেদিগকে এই সব উচ্ছিষ্ট স্পর্শ করিতে না দিয়া তাহাদিগকে তাহাদের ঘরের সেঁকা জওয়ারী অথবা বাজরায় সন্তুষ্ট থাকিতে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল বলিয়া তাহারা তাহাদের সন্তানদিগকে কতকগুলি বিদ্যালয় ছাড়াইয়া লইয়া গিয়াছিল।

যাহারা চামড়া পরিষ্কারের কাজ করে, তাহাদিগকে মৃত জন্তুর মাংস এবং গোমাংস বর্জ্জন করিতে শিক্ষা দিতে হইবে। আমি নিজে একজন নিরামিষাশী, আমি তাহাদিগকে মাংস মাত্রেই বর্জ্জন করিতে বলি। অনেকে তাহা করিতেছেও। কিন্তু যদি তাহারা ঐ সংস্কারের জন্য প্রস্তুত না থাকে, তাহা হইলে অস্বাস্থ্যকর মৃত জন্তুর মাংস পরিত্যাগ করিবার জন্য তাহাদিগকে শিক্ষাদান করা কর্ত্তব্য, গোমাংস হিন্দুদের আহার নিষিদ্ধ। আমি জানি মৃত জন্তু সরাইয়া লইবার মূল্য স্বরূপেও তাহারা ঐ সব জন্তুর মাংসকে গ্রহণ করিয়া থাকে। ডাক্তার আম্বেদকর আমাদিগকে বলিয়াছেন যে, মৃত জন্তুর মাংস আহার পরিত্যাগ করার জন্য কোথায়ও কোথায়ও গ্রামবাসীরা তাহাদিগকে এ কথা বলিয়া প্রহার করিয়াছে যে ইহা আহার করা তাহাদের ধর্ম্ম। তাহারা এই ভয় করিয়াছিল যে, ঐ সব লোকেরা যদি মৃত জন্তুর মাংস আহার করা ত্যাগ করে, তাহা হইলে মৃত জন্তু সরাইয়া লইবার জন্য তাহারা পয়সা চাহিবে। যাহাই হউক মৃত পশু ও গোমাংস ভক্ষণ ত্যাগ করিতে হইবে, এইটুকু আত্মসংযম হরিজনগণকে একেবারে বর্ণ হিন্দুদের চক্ষে অনেকটা উঁচু করিয়া তুলিবে এবং অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে অভিযানকারী সংস্কারকামীগণের কার্য্য অনেকটা সহজ করিয়া তুলিবে। চতুর্থ এবং ৫ম বিষয় সম্পর্কে টিকাটিপ্পনী অনাবশ্যক—উহাদের ব্যাখ্যা স্বতঃ স্ফূর্ত্তই আছে, সর্ব্বশেষ বিষয়টি হইতেছে অস্পৃশ্যগণের মধ্যে অস্পৃশ্যতা। এই সমস্যা সমাধানের বিশেষ প্রয়োজন বিদ্যমান। যদি এক সঙ্গে অস্পৃশ্যদের মধ্যে এই অস্পৃশ্যতা অর্থাৎ ডবল অস্পৃশ্যতা বিদূরিত না হয় তাহা হইলে অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে এই অভিযানকে জয়যুক্ত করা বিশেষ কষ্টসাধ্য হইবে। হরিজন সংস্কার কামীগণের পক্ষে এটা এক কঠোর কর্ত্তব্য বিশেষ কিন্তু উহারা যদি উপলব্ধি করিয়া থাকেন যে এই আন্দোলন প্রধানতঃ ধর্ম্মমূলক আন্দোলন এবং হিন্দু সমাজকে অপবিত্রতার কলঙ্ক মুক্ত করিবার জন্যই এই আন্দোলনের উদ্ভব হইয়াছে, তাহা হইলে বিরাট সংস্কার সাধনের উপযোগী সাহস ও আত্মনির্ভরতা উহারা পাইবেন। এবম্বিধ আন্দোলনের কর্ম্মীগণকে যে আত্মত্যাগী ও পবিত্র স্বভাব সম্পন্ন হইতে হইবে এ বিষয়টির উপর জোর দেওয়া আমি অনাবশ্যক বলিয়া মনে করি। আমি এ স্থলে যে গঠনমূলক কর্ম্মপন্থা বাতলাইয়া দিলাম উহাতে হরিজনদের মধ্যে অতিশয় উৎসাহসম্পন্ন সংস্কারকামীও সন্তুষ্ট হইবেন এবং ঐ কর্ম্মপন্থার অনুসরণে সমস্ত সময় সানন্দচিত্তে ব্যয় করিবেন, কিন্তু উহার মধ্যে এমন দুই একটী বিষয় আছে যাহা হরিজনগণ আমাদের হাতে অবশিষ্ট যে সময় আছে ঐ সময় মধ্যে করিয়া উঠিতে পারিবেন না। যাহাই হউক কোন হরিজনেরই কাহারও বিরুদ্ধে অনশন আরম্ভ করার প্রয়োজন নাই, কাহারও সত্যাগ্রহ অবলম্বনেরও আবশ্যকতা নাই—বর্ণ হিন্দুদের এখন একটা মহাপরীক্ষা চলিতেছে, উহাদের গতিবিধির উপর হরিজনগণ এখন লক্ষ্য রাখিয়াই সন্তুষ্ট থাকুন। যে সকল বাধাবিঘ্ন স্থানীয় বর্ণহিন্দুগণ হইতে হরিজনকে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে, ঐ সকল দূরীকরণ কল্পে বর্ণ হিন্দুগণ কি করেন হরিজনগণ তাহাই লক্ষ্য করিতে থাকুন। স্থানীয় বর্ণহিন্দুদের সঙ্গে উহারা এখন যেন কোন ঝগড়া বিবাদ বাধাইয়া না বসেন। হরিজনদের আচরণ সব সময়েই বিশেষতঃ এখন সৌজন্যপূর্ণ হওয়াই বাঞ্ছনীয়। গায়ের জোরে অর্জ্জন করিবার মত অনেক কিছু থাকিলেও অত্যাচারীর নিকট হইতে বলপূর্ব্বক কিছু আদায় করা যায় না, আত্মত্যাগ ও দুঃখ কষ্টের মধ্য দিয়াই ধর্ম্ম অর্জ্জন করিতে হয়। বর্ণহিন্দুগণকে রাজী করাইয়া অধিকার অর্জ্জনের মধ্যেই হরিজনদের কৃতিত্ব রহিয়াছে। বর্ত্তমানে অন্ততঃ ইহা মনে করিয়াও হরিজনদের আশ্বস্ত হইবার যথেষ্ট কারণ ঘটিয়াছে যে সহস্র সহস্র বর্ণহিন্দু আজ নিজেদের ত্রুটী সম্বন্ধে সচেতন হইয়াছেন এবং হরিজনদের ক্ষতিপূরণের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন। হরিজনগণ নিজেদের দাবীর যুক্তি-যুক্ততার উপর এবং ঐ দাবী পূর্ণ করাইয়া লইবার জন্য আত্মত্যাগের ক্ষমতায় পূর্ণ বিশ্বাস সম্পন্ন হইতে হইবে।

আগামী বিবৃতিতে বর্ণ হিন্দুগণ এই আন্দোলনে কি কি ভাবে সাহায্য করিতে পারেন, আমি তাহার উল্লেখ দান করিব।

পুণা, ১৫ই নবেম্বর—হরিজনদের মধ্যে এতাবৎ একমাত্র শ্রীযুক্ত রাজভোজই আমাদের কাছে জানিতে চাহিয়াছেন বটে যে, এই আন্দোলনের অগ্রগতি সাধনকল্পে হরিজনগণ কতদূর কি করিতে পারেন। কিন্তু ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে শত শত বর্ণহিন্দু নর, নারী, ছাত্র নির্ব্বিশেষে আমার নিকট পত্র লিখিয়া জানিতে চাহিয়াছেন, তাহাদের কাজ কারবারের স্বার্থ অব্যাহত রাখিয়া তাঁহারা এই আন্দোলনকে কি কি উপায়ে সাহায্য করিতে পারেন। অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন আন্দোলনটি জনসাধারণের পক্ষে মনোভাবের ও অনুন্নতদের প্রতি আচরণের পরিবর্ত্তন ছাড়া আর কিছুই নহে। কাজেই এই আন্দোলনের সহায়তা করণ সম্পর্কে উঁহাদের দৈনন্দিন কাজ কারবারের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হইবার কোনই আশঙ্কা নাই।

ঐ জন্য বিরাট বর্ণহিন্দুসমাজের দৈনন্দিন কাজ কারবারের উপর হস্তক্ষেপ অনাবশ্যক। হরিজনদের সেবা করিতে হইলে প্রত্যেককে সর্ব্বাগ্রে নিজকে অস্পৃশ্যতার ব্যাধি হইতে সর্ব্বতোভাবে মুক্ত করিতে হইবে, কিন্তু উঁহারা যদি বলেন যে অস্পৃশ্যদের মন্দির প্রবেশে তাঁহাদের ত কোন আপত্তি নাই ই। বরং অস্পৃশ্যগণ সাধারণ দেবমন্দির সমূহে প্রবেশাধিকার পায়, বিদ্যালয়, সরাই, রাস্তা, হাসপাতাল, চিকিৎসালয় প্রভৃতিতে উঁহাদের বর্ণহিন্দুদের তুল্যাধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়—এক কথায় ধর্ম্মের দিক দিয়া, সমাজের দিক দিয়া, আর্থিক অবস্থার দিক দিয়া রাজনীতির দিক দিয়া সর্ব্ববিষয়ে উঁহারা বর্ণহিন্দুদের তুল্যাধিকার লাভ করে ইহাই চাহেন; তাহা হইলে বুঝিতে হইবে তিনি নিজে ব্যক্তিগত ভাবে যতদূর প্রয়োজন অগ্রসর হইয়াছেন। কিন্তু প্রশ্নকর্ত্তাগণ শুধু উঁহাতেই সন্তুষ্ট হইতে নারাজ। অতদূর অগ্রসর হইয়াও তাঁহারা জানিতে চান, এই আন্দোলনের সহায়তাকল্পে তাঁহারা আরও কিছু করিতে পারেন কি না। এই সকল প্রশ্নকর্ত্তাগণ তাহাদের কার্য্যক্ষেত্রের গতি যেন নিজেদের পাড়া প্রতিবেশীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেন। উঁহাদিগকে দৈনন্দিন জীবনে যাহাদের সংশ্রবে আসিতে হয় তাহাদের মধ্যে উঁহারা নিজেদের মত প্রচার করিতে থাকুন ও উঁহাদিগকে নিজেদের মতে অনুপ্রাণিত করিতে চেষ্টা করিতে থাকুন। যদি উঁহারা (প্রতিবেশিগণ) অস্পৃশ্যতা বর্জ্জনের আবশ্যকতা উপলব্ধি করিতে না পারেন, তাহা হইলে উঁহারা (প্রশ্নকর্ত্তাগণ)—এই আন্দোলনের সকল বিষয় সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত থাকিলে, উঁহাদিগকে এই আন্দোলনের যুক্তিযুক্ততা বুঝাইতে চেষ্টা করিতে পারেন, আর যদি বুঝাইবার পক্ষে উঁহাদের (প্রশ্নকর্ত্তাদের) পর্য্যাপ্ত জ্ঞানের অভাব থাকে তাহা হইলে তাঁহারা ঐ সকল প্রতিবেশিগণকে প্রয়োজনীয় পুথিপুস্তকাদি আনিয়া দিবেন ও সকল প্রচারকার্য্যের যোগ্যতাসম্পন্ন সকল সময়ের জন্য নিযুক্ত প্রচার কর্ম্মিগণের সহিত উঁহাদের পরিচয় করাইয়া দিবেন। যদি ঐ সকল প্রশ্নকর্ত্তাগণ দেখেন যে, তাঁহাদের অঞ্চলে এই আন্দোলনের প্রভাব কিছুমাত্র বিস্তৃত হয় নাই তাহা হইলে এবং ঐ অঞ্চলের জনসাধারণের উপর তাঁহাদের কোন প্রভাব প্রতিপত্তি থাকিয়া থাকিলে উঁহারা জন সভা আহ্বান করিয়া বক্তৃতাদির ও এই আন্দোলনের সহায়তাকারী উৎসবাদির আয়োজন করিতে পারেন এবং ঐ সকল সভায় বক্তৃতা করিবার জন্য অপরকে আহ্বান করিতে পারেন, বর্ণ হিন্দুদের মধ্যে এই সব কাজ করা যাইতে পারে। কিন্তু এই সকল নরনারীগণের প্রকৃত কার্য্যক্ষেত্র হইবে হরিজনদের মধ্যে। যে সকল বর্ণ-হিন্দুগণ আমার পঞ্চম বিবৃতি পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা উহাতে দেখিয়া থাকিবেন যে, বেশী সময় অর্থ ও শক্তি ব্যয় না করিয়াও হরিজনদের সেবাকল্পে নীরবে অনেক কিছু ভাল কাজ করা যাইতে পারে। বর্ণ হিন্দুগণ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার বিধি প্রবর্ত্তন ও যথেষ্ট পরিমাণ জল সংগ্রহের জন্য অস্পৃশ্যগণের কূপ বা জলাশয়াদিতে সহজ প্রবেশাধিকার লাভকল্পে হরিজনকর্ম্মীদের চেষ্টার সাহায্য করিতে পারেন। উঁহারা হরিজনদের আধ্যুষিত অঞ্চলের নিকট অবস্থিত অথচ বর্ণ হিন্দুগণের একচেটিয়া অধিকারভুক্ত সাধারণের ব্যবহারের জন্য নির্ম্মিত কূপ বা জলাশয়াদি খুজিয়া বাহির করিয়া বর্ণ হিন্দুদের মধ্যে এই মত প্রচার করিতে পারেন যে; হরিজনগণেরও ঐ সকল সাধারণের ব্যবহার জন্য নির্ম্মিত কূপ বা জলাশয়াদি ব্যবহার করিবার আইনসঙ্গত অধিকার রহিয়াছে এবং বর্ণ হিন্দুগণের ঐ বিষয়ে সম্মতি পাওয়া গেলে যাহাতে হরিজনগণ বর্ণহিন্দুদের আপত্তি না হয় এভাবে ঐগুলি ব্যবহার করেন তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিতে পারেন। ধাঙ্গড় বা মেথরের কাজ সম্পর্কে উঁহারা হরিজনগণ যে সকল বাড়ীতে ধাঙ্গড় বা মেথরের কাজ করে ঐ সকল বাড়ীর মালিকদের নিকট যাইয়া হরিজনগণ যাহাতে সহজে স্বাস্থ্যকরভাবে তাহাদের পরিষ্কার করার কাজ সম্পন্ন করিতে পারে তাহার ব্যবস্থার আবশ্যকতা তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দিতে পারেন, এ বিষয়ে পায়খানা নির্ম্মাণের ও ময়লাদি অপসারণের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবগত হওয়া তাহাদের পক্ষে প্রয়োজন হইবে। উঁহারা বাড়ীর মালিকদের দ্বারা মেথর বা ধাঙ্গড়দের ব্যবহার জন্য বিশেষ পোষাক তৈয়ার করাইয়া লইতেও পারেন। ঐ সঙ্গে ধাঙ্গড় বা মেথরগণের মনেও তাঁহাদিগকে এই ধারণা জন্মাইয়া দিতে হইবে যে, ঐ সকল কাজে হীনতা বা অমর্য্যাদাসূচক কিছুই নাই।

ধাঙ্গড় বা মেথরগণকে বর্ণ হিন্দুগণের ভুক্তাবশেষ দানের বিরুদ্ধে ঐ সকল কর্ম্মিদের প্রচারকার্য্য চালাইতে হইবে এবং যে সকল স্থানে উঁহারা উপযুক্তরূপ বেতনাদি পায় না সে সকল স্থানে যাহাতে উঁহারা ভালরকম বেতন পায় তজ্জন্য মালিকগণকে প্রবুদ্ধ করিতে হইবে। চামড়া পাকা করা সম্পর্কে বেশী কিছু করা উঁহাদের পক্ষে কঠিন, তবে ঐ ধরণের কোন স্বেচ্ছাসেবকের কাহারও মধ্যে যদি যথেষ্ট সহানুভূতি ও উৎসাহ আগ্রহ থাকে তাহা হইলে তিনি পশাদির চামড়া ছাড়াইবার স্বাস্থ্যকর পদ্ধতি শিক্ষা করিয়া চামড়া পাকা করার কাজ যাহারা করে, তাহাদিগকে উহা শিখাইতে পারেন। তবে উঁহারা আর একটা কাজ অবশ্যই করিতে পারেন, উঁহারা মৃত পশাদি অপসারণের সম্পর্কে একটা ব্যবস্থা করিতে পারেন ও চামড়া পাকা করার কাজ যাহারা করে তাহারা যাহাতে যথেষ্ট পারিশ্রমিক পায় তাহার ব্যবস্থা করিয়ে [illegible]

যাহাদের সময় এবং ক্ষমতা আছে তাঁহারা দিবা ও নৈশ বিদ্যালয় সকল পরিচালনার ভার লইতে পারেন। ছুটির দিনে হরিজন বালক-বালিকা-গণকে বনভোজনে বা বেড়াইতে লইয়া যাইতে পারেন এবং সুবিধা হইলেই হরিজনদের গৃহে যাইয়া তাহাদিগের তত্ত্বাবধান করিতে পারেন। আবশ্যক হইলে তাহাদের চিকিৎসাদির ব্যবস্থা করিতে পারেন। এইভাবে ধীরে ধীরে উহাদের মনে এই ধারণা জন্মাইয়া দিতে পারেন যে, তাহাদের জীবনের নূতন অধ্যায় সুরু হইয়াছে ও তাহাদের আর নিজদিগকে হিন্দুসমাজের অবহেলিত ও ঘৃণিত অঙ্গ বিশেষ বলিয়া মনে করিবার কারণ নাই। আমি যে-সব পন্থা বাতলাইয়া দিলাম অতি সহজে ও বেশ যোগ্যতার সহিতই ছাত্রসম্প্রদায় ঐ পন্থার অনুসরণ করিতে পারেন। নীরবে অথচ উৎসাহ, আগ্রহ ও দৃঢ়তার সহিত বহু-সংখ্যক নরনারী যদি এই সকল কাজ করিয়া যান, তাহা হইলে এ বিষয়ে আমার কোনই সন্দেহ থাকিবে না যে, আমরা লক্ষ্যের দিকে অনেকটা আগাইয়া গিয়াছি এবং তখন দেখিতে পাইব যে, আমি যে-সব কাজের কথা বলিলাম উহা ছাড়াও করিবার মত আরও অনেক কিছু রহিয়াছে। করিবার মত যে-সকল বিষয় আমার চক্ষে পড়িয়াছে, উহার মধ্যে মাত্র কয়েকটী আমি এস্থলে বাছিয়া বলিলাম।

মহাত্মা গান্ধী তাঁহার নিম্নলিখিত সপ্তম বিবৃতি প্রচার করিয়া-ছেন:—"আমি বর্ত্তমান বিবৃতিতে যে-সব প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতে চেষ্টা করি, যদিও সেগুলি পূর্ব্ববর্ত্তী বিবৃতিগুলিতে ন্যূনাধিক পরিমাণে প্রকাশিত হইয়াছে, তথাপি একটী বিবৃতির ভিতর সেগুলির যতটা সম্ভব আলোচনা করা আমি সমীচীন মনে করি।

"একটি প্রশ্ন এইরূপ—আপনি কি লোকদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কোন কাজ করিতে তাহাদিগকে বাধ্য করিতেছেন না? অন্ততঃপক্ষে না করাই আমার মতলব। আমি যে উপবাসব্রত অবলম্বন করিবার মতলব করিতেছি, দুর্ব্বলকে শক্তিদান করা, অলসদিগকে কর্ম্মতৎপর করা এবং সংশয়ীদিগের মনে বিশ্বাসোৎপাদন করাই তাহার উদ্দেশ্য। এ বিষয়ে যিনি একটু ভাবিয়া দেখিয়াছেন, তিনি স্পষ্টই বুঝিতে পারিবেন যে, যাহারা এই সংস্কারের বিরোধী, উপবাস ব্রত তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিবে না, এবং যদি ঐ উপবাসব্রতের ফলে আমার মৃত্যু ঘটে, তাহা হইলে সম্ভবতঃ তাঁহারা আনন্দিতই হইবেন। তাঁহাদের সেরূপ আনন্দিত হইবার সঙ্গত কারণও বোধ হয় আছে। একজন ক্রুদ্ধ পত্র প্রেরক ঠিক এতগুলি কথায় তাঁহার ঐ মনোভাব ব্যক্ত করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই। কিন্তু অপর একজন পত্র-প্রেরক বলিতেছেন—"এই এই কাজ করা আপনার ইচ্ছা নহে, একথা বলা আপনার পক্ষে খুবই সহজ। আপনার অতিমাত্রায় আগ্রহপরায়ণ অনুগামীদের হাতে ব্যক্তিগত লাঞ্ছনার ভয়ে অনেক গোঁড়া লোকজন সাধারণের অনুগমন করিবে। প্রায় সব ক্ষেত্রেই এই ধরণের যুক্তি প্রদর্শিত হইতে পারে। আমি আমার জীবনে অনেক আন্দোলনের নেতৃত্ব করিয়াছি; সে সব কাজে উপবাসব্রত অবলম্বন করা আবশ্যক হয় নাই, কিন্তু যে অভিযোগের আমি আজ জবাব দিতে যাইতেছি, সে অভিযোগ এত অধিকবার আমার উপর আরোপিত হইয়াছে যে, আমার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করার পক্ষে তাহা পর্য্যাপ্ত। প্রস্তাবিত উপবাস ব্রতের অনিচ্ছাকৃত ফল যাহাই হউক না কেন, আমার ব্যক্তিগত মান-মর্য্যাদার প্রশ্ন ছাড়িয়া দিলেও দরকার হইলে উহা অবলম্বন করিবার অন্য কারণ রহিয়াছে; তাহা এই যে, উহা আমার উপর বিশ্বাসসম্পন্ন সহস্র সহস্র লোককে কর্ম্ম প্রচেষ্টায় প্রণোদিত করিবে। প্রত্যেক ধর্ম্মমূলক আন্দোলনের ক্ষেত্রেই এইরূপ ঘটিয়া থাকে।

দ্বিতীয় প্রশ্ন এই:—আপনি কি এক শ্রেণীর হিন্দুদিগকে অপর শ্রেণীর বিরুদ্ধে লাগাইতেছেন না? আমি দৃঢ়তার সহিত উহা অস্বীকার করি। প্রত্যেক সংস্কারেরই কিছু না কিছু বিরুদ্ধতা ঘটিতে দেখা যাইবে, ইহা অনিবার্য্য। কিন্তু কতকটা মাত্রা পর্য্যন্ত সমাজের ভিতর এই বিরুদ্ধতা এবং আন্দোলন সামাজিক সুস্থতারই লক্ষণ, সনাতনী এবং সংস্কারবাদীদের ভিতর স্থায়ী বিরোধ ঘটিবার কোনরূপ ভয় আমি রাখি না। সনাতনীদের বিরুদ্ধতা অথবা তাঁহাদের মনোভাবকে উপেক্ষা করিবার ইচ্ছা আমার থাকিতেই পারে না। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ সনাতন ধর্ম্ম বিপন্ন হইয়াছে বলিয়া যে আতঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছেন এ বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই। সনাতনীদের নিকট হইতে আমি যে-সব চিঠি পাইয়াছি, তাহার প্রত্যেকখানিতে এই কয়েকটি বিষয়ে স্বীকৃতি রহিয়াছে —(১) আমরা স্বীকার করি যে, হরিজনদের অবস্থার উন্নতি সাধনের জন্য এখনও অনেক কিছু করা দরকার। (২) আমরা স্বীকার করি যে, অনেক বর্ণহিন্দু হরিজনদের উপর দুর্ব্ব্যবহার করেন। (৩) আমরা স্বীকার করি যে, তাহাদের সন্তান-সন্ততিদের শিক্ষালাভ করা উচিত এবং তাহাদের থাকিবার জন্য অপেক্ষাকৃত ভাল বাড়ী-ঘরের ব্যবস্থা করা আবশ্যক। (৪) আমরা ইহা স্বীকার করি যে, স্নানের জন্য এবং তাহাদের নিজের জল তুলিবার জন্য যথোচিত ব্যবস্থা থাকা উচিত, (৫) আমরা ইহা স্বীকার করি যে, পূজার্চ্চনার জন্য তাহাদিগকে যথেষ্ট সুবিধা প্রদান করা কর্ত্তব্য; (৬) আমরা ইহা স্বীকার করি যে, তাহাদিগকে পূর্ণ রাজনৈতিক অধিকার প্রদান করা আবশ্যক; (৭) আমরা ইহা স্বীকার করি যে, অন্যান্য শ্রেণীরা যে সব পৌরাধিকার ভোগ করিয়া থাকে তাহাদিগকেও সেগুলি প্রদান করা কর্ত্তব্য।

কিন্তু এই সব সনাতনীরা বলেন যে, তাহাদিগকে স্পর্শ করিতে অথবা তাহাদের সংসর্গে বাস করিতে আমাদিগকে কিছুতেই বাধ্য করান উচিত নহে, তাহাদের বর্ত্তমান অবস্থায় তো নহেই। তাঁহাদিগকে আমি বলি, আপনারা যখন তাহাদিগকে নিজেদের সমান অধিকার দানের আবশ্যকতা স্বীকারই করেন, তাহা হইলে অন্যান্য বর্ণ হিন্দুগণ আরও একটু আগাইয়া গিয়া আপনারা যে সব শাস্ত্রে বিশ্বাস করেন, সেই সব শাস্ত্র-যুক্তির জোরে যদি এই বিশ্বাস করেন যে, তাহাদিকে অস্পৃশ্যরূপে গণ্য করা কর্ত্তব্য নহে, তাহাতে আপনারা চঞ্চল হইয়া পড়েন কেন? আপনারাও তাহাদিগকে ঐ সব সুযোগ সুবিধা প্রদান করিতে রাজী

আছেন, কিন্তু আপনারা ইহাই চাহেন যে, তাহারা আপনাদের হইতে তফাতে থাকিয়া ঐগুলি ভোগ করুক। নিশ্চয়ই আপনারা আপনাদের পক্ষে পথে চলিবার স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হইতে দিতে চাহেন না এবং জবরদস্তির কথা শুনিলেই ক্ষুব্ধ হন, আপনাদেরই মত সংস্কারকামীরাও তাহাদের নিজেদের পথে চলিবার স্বাধীনতা চাহিবে ইহা আপনাদের বুঝা উচিত। তাহাদিগকে জবরদস্তির দ্বারা আপনাদের মতে মত লওয়াইতে নিশ্চয়ই আপনারা চাহিবেন না। হরিজনদের অবস্থার উন্নতিসাধনের ইচ্ছার দিক হইতে সংস্কারকামীদের সহিত আপনারা একমত। এ পর্য্যন্ত কার্য্যতঃ আপনারা হরিজনদের সম্পর্কে সংস্কারকামীদের কার্য্যের জন্য তাহাদিগকে নির্য্যাতিত করেন নাই। আপনারা তাহাদিগকে তাহাদের নিজেদের পথে চলিতে দিয়াছেন। আপনারা তাহাদিগকে বর্জ্জন করেন নাই? আজ ঐ আন্দোলন পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর প্রবল এবং অধিকতর ব্যাপক হইয়াছে, শুধু এই জন্য আপনারা উহার বিরুদ্ধতা করিবেন, ইহার কোন অর্থ থাকিতে পারে না। পথে একটি অন্তরায় রহিয়াছে। বর্ত্তমানে যে-সব দেবমন্দির এবং অন্যান্য জনপ্রতিষ্ঠানে হরিজনদের প্রবেশাধিকার নাই, সেগুলি সনাতনীদেরই হাতে থাকিবে, না, সংস্কারকামীর দল হরিজনদের সহিত ঐগুলি ব্যবহার করিবেন? এই সমস্যা কাটাইবার সহজ পথ রহিয়াছে। উভয় পক্ষ যদি চিরকালের ভিতরকার ঈর্ষা-বিদ্বেষ এবং অশ্রদ্ধার ভাব পরিহার করেন, তাহা হইলে প্রত্যেক গ্রাম অথবা সমষ্টিগতভাবে কতকগুলি গ্রামের এবং প্রত্যেক সহরতলীর প্রত্যেক পাড়ার লোকদের মত কি, তাহা গ্রহণ করা যাইতে পারে। যেখানে যে দলের ভাগে ভোট বেশী হইবে, তাঁহারাই দেবমন্দির প্রভৃতি ব্যবহার করিবেন। সনাতনীদের পক্ষে যদি সংখ্যাধিক্য ঘটে, তাহা হইলে সংস্কারকামী এবং অস্পৃশ্যদিগকে তাঁহারা যে সাহায্য করিতেছেন, তাহা হইতে তাঁহাদিগকে বিরত হওয়াই সমীচীন হইবে।

এইরূপ ধারাবাহিক যুক্তির অনুসরণ করিলে পর সনাতনীগণ কোথায় অবিচার করা হইয়াছে তাহা দেখিতে পাইবেন। তাঁহাদিগকে অনুরূপ পূজার্চ্চনা প্রবর্ত্তন করার যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিতে হইবে। যেহেতু উক্ত পত্র হইতে আমি যাহা বুঝিতে পারিয়াছি এবং উপরে যাহা বিবৃত করিয়াছি তদ্দ্বারা ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, সনাতনীগণ এ পর্য্যন্ত যে পূজার্চ্চনার অধিকার পাইয়া আসিয়াছেন এবং হরিজনগণ যাহা হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন, সেই পূজার্চ্চনায় হরিজনদিগেরও সমান অধিকার আছে—সনাতনীগণ এই বিষয়ে একমত। যে-সব বিষয়ের প্রকৃতপক্ষে কোন অস্তিত্ব নাই সেই সব বিষয়ের অস্তিত্ব কল্পনা করিয়া সনাতনীগণ যেন পশ্চাৎপদ না হন। তাঁহাদিগকে স্পষ্টভাবে ইহাই বুঝিতে হইবে যে, বারবেদা-চুক্তি এবং অধুনা গঠিত নিখিলভারত অস্পৃশ্যতা বিরোধী সঙ্ঘের ঘোষণা অনুযায়ী অস্পৃশ্যতা বর্জ্জনের মধ্যে আমি যাহা বিবৃত করিয়াছি তাহার অধিক কিছুই নাই। ইহার কার্য্যপদ্ধতির মধ্যে আন্তর্জ্জাতিক ভোজ কিম্বা আন্তর্জ্জাতিক বিবাহের কোন উল্লেখ নাই। বহু হিন্দু (তন্মধ্যে আমিও আছি) আরো অধিক দূর অগ্রসর হইতে চাহেন দেখিয়া সনাতনীদের উদ্বিগ্ন হওয়া উচিত নহে। ব্যক্তিগত কার্য্যের উপর প্রকাশিত ব্যক্তিগত মতামতকে তাঁহারা বাতিল করিয়া দিতে চাহিবেন না। তাঁহারা যাহা বিশ্বাস করিয়া থাকেন তৎপ্রতি যদি তাঁহাদের দৃঢ় আস্থা থাকে তবে ভবিষ্যতে আর কি হইবে এই আশঙ্কায় তাঁহাদের উদ্বিগ্ন হওয়া উচিত নহে। কোন বিশেষ সংস্কারকার্য্যের যদি স্বাভাবিক শক্তি থাকিয়া থাকে এবং উহা যদি যুগধর্ম্মের অভাব পূরণের জন্য আসিয়া থাকে তাহা হইলে উহার অগ্রগতিতে পৃথিবীর কোন শক্তিই বাধা দিতে পারিবে না।

তৃতীয় প্রশ্ন এই:—"সামাজিক ও ধর্ম্মসংক্রান্ত সমস্যাসমূহ সম্পর্কে আপনার মতামতের প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া এবং ঐগুলি তাহাদের দ্বারা গ্রাহ্য করাইবার জন্য তুমুল আন্দোলনের ঝড় তুলিয়া আপনি কি রাজনৈতিক মুক্তির পথে বাধা উপস্থিত করিতেছেন না? অস্পৃশ্যতা বর্জ্জনের প্রচারকার্য্য চালাইবার জন্য বন্দী হিসাবে আমি সীমানির্দ্দেশ গ্রহণ করিয়াছি। তাহার গণ্ডী লঙ্ঘন না করিলে এই প্রশ্নের বিস্তৃত উত্তর প্রদান করিতে পারিব না। তবে আমি এইমাত্র বলিতে পারি যে, যাঁহারা আমাকে জানেন তাঁহাদের ইহা জানা উচিত যে, আমি রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্ম্মসংক্রান্ত এবং অন্যান্য সমস্যার মধ্যে বিশেষ কোন প্রভেদ দেখি না। আমি সর্ব্বদা এই মত পোষণ করিয়া আসিতেছি, যে, ঐগুলি পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। একটী সমস্যার সমাধান করিতে পারিলে অন্যগুলির সমাধান সহজসাধ্য হইবে।

পত্রপ্রেরকগণ যে সকল সমস্যা উত্থাপন করিয়াছেন, ইহাতেও উহার সবগুলির সমাধান হয় না। আমি স্বভাবতঃ যে ধরণের সহায়তা পাইয়া থাকি, তাহাতে উহার সবগুলি সমস্যা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত করিয়া উঠা আমার পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। যাহা হউক আমার আগামী বিবৃতিতে ঐগুলি সম্পর্কে আমি যথাসাধ্য আলোচনা করিব—আমি পত্রপ্রেরকগণকে আমার প্রতি অনুকম্পাশীল হইতে অনুরোধ করিতেছি। আমি প্রায় সবগুলি পত্র সম্পর্কেই প্রাপ্তি স্বীকার করিয়াছি। পত্র প্রেরকগণকে এখন হইতে আমি বিবৃতিগুলির মারফৎ যে সকল উত্তর দিতে সমর্থ হইব, উহাতেই সন্তুষ্ট থাকিতে অনুরোধ করিতেছি—পত্র প্রেরকগণ যেন সংক্ষেপে তাহাদের বিষয়গুলি জানান এবং তাঁহাদের বক্তব্যের মধ্যে মৌলিক কিছু যদি থাকে, শুধু তাহা হইলেই এবং এই আন্দোলন সম্পর্কিত যে সকল বিষয়ে নিজেরা বিচার বিবেচনা করিয়া একটা সিদ্ধান্তে পৌছাইবার পূর্ব্বে আমার নিকট হইতে উত্তরের প্রতীক্ষা করা তাহাদের পক্ষে অত্যাবশ্যক হয়, তাহারা যদি কেবল সেই সকল বিষয় সম্পর্কেই আমার নিকট পত্র লেখেন তাহা হইলে আমাকে এবং তাহাদিগের নিজদিগকে সাহায্য করা হইবে।

আর একটি প্রশ্ন অনেক পত্রপ্রেরক আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। প্রশ্নটি এই—"আপনি বলেন যে, আপনি শাস্ত্রে বিশ্বাস করেন, [illegible] দ্বারা আপনি কি বলিতে চাহেন, আমাদের যুক্তির অবকাশ [illegible]

আপনি নিজের মর্জ্জিমত শাস্ত্র-সমর্থিত অনেক বিষয়ই বাতিল করিয়া দিয়া থাকেন। আপনি অনেক সময়ই গীতার দোহাই দিয়া থাকেন, সেই গীতা পর্য্যন্ত শাস্ত্র-বিধি মান্য করিয়া চলিতে বলে।" ইহার উত্তরে আমি আমার পূর্ব্ববর্ত্তী একটি বিবৃতিতে যে কথা বলিয়াছি তাহারই পুনরাবৃত্তি করা আবশ্যক। আমি এই কথা বলিয়াছি যে গীতার প্রধান বক্তব্য বিষয়ের যাহা বিরোধী এমন কিছুই শাস্ত্র বলিয়া আমি মনে করি না, যেখানেই উহা মুদ্রিত থাকুক না কেন।

আমার গোঁড়া বন্ধুরা যদি শিহরিয়া না উঠেন, তাহা হইলে আমি আমার কথার অর্থ আরও স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারি। যে সমস্ত বিষয় বিশ্বজনীনভাবে নীতির প্রধান সূত্র বলিয়া গৃহীত নহে, এমন কিছুই আমি শাস্ত্রের দ্বারা সমর্থিত মনে করি না। নীতির প্রধান সূত্রগুলি লঙ্ঘন করা শাস্ত্রের উদ্দেশ্য নহে, ঐগুলিকে সমর্থন করাই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। গীতা শুধু যে বিশ্বজনীন নীতির প্রধান সূত্রগুলি সমর্থন করে এরূপ নহে, ঐগুলি প্রতিপালনে সর্ব্বতোভাবে নিষ্ঠাপরায়ণ হইবার পক্ষে অকাট্য যুক্তিও গীতাতে রহিয়াছে। কর্ত্তব্যনির্দ্দেশের এই পন্থা যদি আমি ধরিতে না পারিতাম, তাহা হইলে আমার ন্যায় সাধারণ লোককে পরস্পরবিরোধী মতের গহন অরণ্যের মধ্যে এবং সুন্দরভাবে মুদ্রিত ও তেমনই সুন্দর সুন্দর রকমে বাঁধাই রাশি রাশি সংস্কৃত পুথির ভিতর ঘুরিয়া মরিতে হইত। সংস্কৃত পুথির ঐ সমস্ত বাক্য লইয়া পণ্ডিতে পণ্ডিতে লড়াই চিরকাল চলিতেছে। প্রতিদ্বন্দ্বীরা প্রত্যেকেই নিজের নিজের মত বিধিনির্দ্দেশ বলিয়া দাবী করিয়া আসিতেছেন।

এমন অনেক স্মৃতি-শাস্ত্র আছে, অনেকে সেগুলির খোঁজই রাখে না, এবং সামান্য কয়েক শত মাত্র লোকই সেগুলিকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিয়া থাকে। সেগুলি কখন কোন সময় রচিত হইয়াছিল কেহই বলিতে পারেন না। দাক্ষিণাত্যে আমি ঐরূপ একখানা স্মৃতিশাস্ত্র দেখিয়াছিলাম। আমি সে খানির সম্বন্ধে আমার পণ্ডিত বন্ধুদিগকে প্রশ্ন করিলে তাঁহারা আমাকে বলেন যে, উহার কথা কিছুই জানেন না। অসংখ্য আগম আছে, পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে সেগুলি পরস্পর-বিরোধী, সামান্য কতকটা অঞ্চলের বাহিরে ঐগুলির কোন প্রভাব নাই। যদি এইসব পুস্তককেই হিন্দুর শাস্ত্রবিধান বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে হয়, তাহা হইলে এমন কোন দুর্নীতিই বোধহয় নাই যে, শাস্ত্রের নজীর তুলিয়া তাহা সমর্থিত না হইতে পারে। সর্ব্বজনমান্য মনুস্মৃতিতেও এমন অনেক বচন আছে যেগুলি মনুর বিধান কি না, এ বিষয়ে যথেষ্টই সন্দেহ আছে। মনুস্মৃতি হইতে যদি ঐ প্রক্ষিপ্ত বচনগুলি বাদ না দেওয়া যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে, উহার অনেকগুলির সহিতই মহতী মনুস্মৃতির উচ্চতম আধ্যাত্মিক অনুশাসনের বিরোধ রহিয়াছে।

ভগবদ্গীতায় একটিমাত্র শ্লোকে 'শাস্ত্র' এই কথাটি ব্যবহার করা হইয়াছে, সে স্থলে আমি ঐ কথাটি বলিতে গীতাতিরিক্ত পুস্তক বিশেষ এবং বিধান নিচয়কে বুঝি নাই; কিন্তু আমি জীবন্ত মানবসমাজের সাধু আচরণকেই বুঝিয়াছি। আমি জানি আমার সমালোচকগণ উহাতে সন্তুষ্ট হইবেন না; আমি একজন সাধারণ লোক। আমার পক্ষে এ বিষয়ে কোন নির্দ্দেশ প্রদান করা সম্ভব নহে। আমি শাস্ত্র বলিতে কি বুঝিয়া থাকি এই কথা বলিয়া আমার সমালোচকদের এই ঔৎসুক্য নিরসন করিতে পারি।

বিশেষ জোরের সঙ্গে আর একটি প্রশ্ন আমাকে করা হইয়া থাকে। প্রশ্নটি এই—"ভগবানের নির্দ্দেশ অথবা বিবেকবাণী বলিতে আপনি কি বুঝিয়া থাকেন? প্রত্যেকেই যদি নিজের কার্য্যের জন্য এরূপ বিবেকবাণীর দোহাই থাকে এবং তাহার প্রতিবেশীদের হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন পথে চলিতে আরম্ভ করে, তাহা হইলে আপনার অবস্থা এবং জগতের অবস্থাই বা কিরূপ হইয়া দাঁড়াইবে?"

প্রশ্নটি খুব সঙ্গত প্রশ্ন। ভগবান যদি আত্মরক্ষার কোন ব্যবস্থা না করিতেন তাহা হইলে আমাদিগকে বিষম অবস্থার ভিতর পতিত হইতে হইত। যে ব্যক্তি মিথ্যাভাবে ভগবন্নির্দ্দেশের দাবী করে, কিম্বা বিবেকের বাণী না পাইয়া উহা পাইবার দাবী করে, তাহার অবস্থা পার্থিব নৃপতির আদেশ অনুসারে কার্য্য করিতেছে বলিয়া যাহারা মিথ্যারূপে দাবী করে, তাহার অপেক্ষা অধিকতর খারাপ হইবে। শেষোক্ত ব্যক্তি ধরা পড়িলে শারীরিক ক্ষতিতেই নিষ্কৃতি পাইবে, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তির দেহ এবং আত্মা উভয়ই ধ্বংস হইতে পারে। উদার-চেতা সমালোচকগণ আমার উপর শঠতার অভিযোগ আনয়ন করেন না; কিন্তু তাঁহারা এইরূপ কথা বলেন যে, মতিবিভ্রমে পতিত হওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব নহে। সুতরাং যাহারা মিথ্যারূপে ভগবানের নির্দ্দেশের দাবী করে, তাহাদের অপেক্ষা আমার কার্য্যের ফল আমার পক্ষে ভিন্নরূপ হইবে। আমার ন্যায় আত্মজিজ্ঞাসু ব্যক্তির পক্ষে অত্যন্ত সতর্কতা এবং মতিস্থৈর্য্যের সহিত কার্য্য করা আবশ্যক। অহমিকাকে একেবারে বিলুপ্ত করিয়া দিলে তবে ভগবানের নির্দ্দেশ পাওয়া যায়। এ বিষয় লইয়া আমার বিশেষ বিব্রত হইবার কারণ নাই। আমি যে দাবী করি, তাহা কিছু অসাধারণ দাবী নহে, কিংবা কেবল আমিই একা ঐ দাবী করি নাই। দেহ-মন-প্রাণ সমস্ত দিয়া যে ভগবানের নিকট আত্ম-সমর্পণ করিতে পারে, ভগবান তাহাদের সকলের জীবনই নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকেন। গীতার ভাষায় যাহারা সর্ব্বত্র অনভিসক্ত অর্থাৎ অহমিকাশূন্য ভগবান তাহাদের ভিতর দিয়া কার্য্য করিয়া থাকেন।

আমি একটি সহজ বৈজ্ঞানিক সত্যের উল্লেখ করিয়াছি, যাঁহার ইচ্ছা আছে, ধৈর্য্য এবং অন্যান্য আবশ্যক গুণাবলী আছে, তাঁহারা সকলেই উহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। এই সত্য উপলব্ধি করা অত্যন্ত সহজ এবং সঙ্কল্প থাকিলেই উহা লাভ করা যায়। পরিশেষে, আমার বক্তব্য এই যে, আমার দাবীর সম্বন্ধে কাহারও মাথা ঘামাইবার আবশ্যক নাই। আমি কাহাকে কিছু করিতে বলিলেই যে, তাহা করিতে হইবে এমন কোন কথা নাই, তাঁহারা নিজের নিজের যুক্তির দ্বারা তাহার বিচার করিয়া দেখিতে পারেন।

আমি ইহ-জগত হইতে চলিয়া গেলেও অস্পৃশ্যতার পাপকে বিদূরিত

করিতে হইবে। আমার উপবাস ব্রতের পশ্চাতে ভগবানের অনুপ্রেরণা ছিল বা না ছিল, আমার নিতান্ত যাহারা অন্তরঙ্গ তাঁহাদেরও তাহা লইয়া বিব্রত হইবার কিছুমাত্র কারণ নাই। আমাকে যদি তাঁহারা ভালবাসেন, তবে শুধু সেই ভালবাসার দিক হইতেই দ্বিগুণ উৎসাহ সহকারে ঐ পাপ দূরীকরণে তাহারা ব্রতী হইতে পারেন। যদি ইহা প্রতিপন্নই হয় যে, ঐ উপবাস ব্রত তাহাদের একজন খামখেয়ালী বন্ধুর নির্ব্বুদ্ধিতারই ফল, তাহাতেও কোন রূপ বিপৎ-পাতের সম্ভাবনা নাই। আমার প্রতি যাহাদের ভালবাসা কিংবা বিশ্বাস নাই উহাতে তাহারা কোনরূপ চঞ্চল হইবেন না। আমার প্রস্তাবিত উপবাস-ব্রতের কথা কিম্বা তৎসম্পর্কে আমার দাবী দাওয়ার কথা অনবরত বিনাইয়া বিনাইয়া বলাতে জনসাধারণই মতিভ্রমে পতিত হইতে পারে এবং জাতির দৃষ্টি প্রারম্ভে মহাব্রত হইতে অন্যদিকে সরিয়া পড়িতে পারে। সুতরাং আমার নিকট যে রাশি রাশি চিঠিপত্র আছে; তাহার কয়েকটি বিষয়ের প্রতি আমার পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াই আমি আমার বক্তব্যের উপসংহার করিতেছি।

বোম্বাইয়ের সহরতলী ভিলে পালে হইতে একজন ধনী হিন্দু একখানা চিঠি লিখিয়াছেন। এখানে ১৭ শত ভিলা বা বাড়ী আছে। মিউনিসিপালিটির আয় ৭০ হাজার টাকা, ইহার মধ্যে ৩১ হাজার টাকা আবর্জনার পরিষ্কারের কাজে ব্যয় হইয়া থাকে। মেথরদিগকে যে মহল্লায় থাকিতে দেওয়া হইয়াছে, সেখানে কোন রাস্তা নাই, জল সরবরাহের ব্যবস্থা নাই বা স্বাস্থ্যরক্ষার বন্দোবস্ত নাই। জমিটা নীচু, ঘরগুলি ঝুপড়ির মত, ভাঙ্গা টীন দিয়া তৈয়ারী। এগুলি পূর্ব্বে আবর্জ্জনা পরিষ্কার কার্য্যে ব্যবহৃত হইয়াছিল। জলের কোন ব্যবস্থা নাই। কাছেই সহরতলীর ময়লা ফেলিবার জায়গা, তথা হইতে অবিরত পুতিগন্ধ নির্গত হইতে থাকে। আবর্জ্জনা পরিষ্কার বিভাগের মোটর লরীগুলি রাখিবার জন্য ঐ স্থানে একটী বাড়ী আছে। নোংরা টীনগুলি ধৌত করিবার জন্য তাহার সঙ্গে একটি জলের নল যুক্ত করা হইয়াছে এবং ওভারসিয়ারের মেজাজ যেদিন ভাল থাকে, সেদিন তিনি ঐ নল হইতে মেথরদিগকে তাহাদের ব্যবহারের জল লইতে দেন। অন্যধারে গরুর গাড়ীর সারি রহিয়াছে, ঐ সব গাড়ীতে করিয়া পায়খানার ময়লা বোঝাই টীন লইয়া আসা হয়। এইরূপ পারিপার্শ্বিক অবস্থার ভিতর মেথরদিগকে জীবনযাপন করিতে হয়। মেথরদের এই মহল্লায় চারিদিকে ময়দান, তাহা অধিকাংশ সময়ই জলমগ্ন থাকে; তাহা মশা, মাছি, বিছা, সাপ এবং মেঠো ইন্দুরের লীলাভূমি। এই অবস্থায় একত্রিশটী পরিবার জীবন যাপন করে। এই ৩১টী পরিবারে ৩৫ জন পুরুষ ২৫ জন স্ত্রীলোক ৩৪টি বালক, ১৫টী বালিকা আছে। এই ১০৯ জন লোকের মধ্যে ৯টি বালক মাত্র কষ্টে সৃষ্টে লিখিতে পড়িতে পারে। অন্যান্য সকলে একেবারে নিরক্ষর। এইরূপ সহরতলীতে কাজ করিবার যথেষ্ট ক্ষেত্র রহিয়াছে। সনাতনী ও সংরক্ষণকামী উভয়েরই এক্ষেত্রে কাজ রহিয়াছে।

ভিলাপালে মিউনিসিপালিটী তাহাদের আয় ৭০ হাজার টাকার মধ্যে ৩১ হাজার টাকা পরিচ্ছন্নতা রক্ষাকার্য্যে ব্যয় করিয়া থাকেন, একথা বলিলে আমার অভিযোগের কোন জবাব দেওয়া হইবে না। আমি জানি ভিলাপালের ধনীরা এইসব সমাজসেবকদিগের উন্নতির জন্য বিশেষ ট্যাক্স দিতে সক্ষম। নিখিল ভারত অস্পৃশ্যতা বিরোধী লীগের অক্লান্তকর্ম্মী শ্রীযুত এ, ভি, ঠক্কর লীগের পক্ষ হইতে তাঁহার পরিভ্রমণ কালে কয়েকটি স্থানের মেথর মহল্লার শোচনীয় অবস্থার অনুরূপ শোচনীয় চিত্রই প্রদর্শন করিয়াছেন। বিহারের দানাপুর এবং পাটনার নিকটবর্ত্তী কয়েকটি স্থানের ঐ সব মহল্লার শোচনীয় বিবরণ তিনি প্রদান করিয়াছেন। আমার নিতান্ত ইচ্ছা যে, অস্পৃশ্যতার সম্বন্ধে শাস্ত্রে কি আছে না আছে, এই অনর্থক বিতর্কে প্রবৃত্ত না হইয়া প্রত্যেকেই এই তথাকথিত অস্পৃশ্যদের শোচনীয় অবস্থার উন্নতি সাধনের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিবেন। আমার পত্র প্রেরকেরা সকলেই আমাকে এই আশ্বাস প্রদান করিয়াছেন যে, অনুন্নত দের আর্থিক এবং নৈতিক উন্নতি সাধনের কার্য্যে তাহাদের আকাঙ্ক্ষা কাহারও কম নহে ইহাদের সকলের জন্যই যথেষ্ট কার্য্য করিবার ক্ষেত্র রহিয়াছে।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

কাব্যের বোঁটা ও ফুল

যে কবিতার প্রথমাংশ সুরচিত নয় কিন্তু শেষাংশ সুরচিত—সে কবিতার বিচারে যখন পাঠক বলেন শেষাংশটুকু ভাল হইয়াছে—তখন পাঠকের মনোভাব বুঝিতে পারি। প্রথমাংশ যে কবিতার সুরচিত, শেষাংশ তেমন নয়—সে কবিতার বিচারে শেষাংশ সম্বন্ধে ক্ষোভ প্রকাশের হেতু পাওয়া যায়। কিন্তু যে কবিতা সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর সে কবিতার বিচারে যখন পাঠক বলেন শেষাংশটুকু ভাল হইয়াছে—তখন পাঠক ভাল করিয়া আর্ট বুঝেন না বলিয়া সন্দেহ হয়। কবিতামাত্রেরই শেষাংশে কবি চরম কথাটি বলেন অথবা রসটিকে ঘনীভূত করিয়া আনেন। ইহার অর্থ নয় যে কবি শেষাংশটুকুকে সুরচিত করিয়া তুলিয়াছেন এবং প্রথমাংশকে অবজ্ঞা করিয়াছেন। এ যেন রজনীগন্ধার ছোট গাছটি দেখিয়া বলা—গাছের পুষ্পিত অগ্রভাগটাই ভাল।

রসজ্ঞের চোখে গোটা ফুল গাছটিই সমান ভাল। পুষ্পিত অগ্রভাগ চমৎকার সন্দেহ নাই—রজনী-গন্ধা গাছের দণ্ড, পত্র, বৃন্তাদি যাহা তাহাকে চমৎকার করিয়া তুলিয়াছে তাহাও সমানই চমৎকার। পুষ্পের সৌকুমার্য্য, শ্রী ও সৌরভ কেহ গাছের অন্যান্য অংশে প্রত্যাশা করে না অন্য অংশের সহিত তাহার কেহ তুলনা করিয়া বলে না—অগ্রভাগের তুলনায় নিম্নভাগ অপকৃষ্ট।

রসজ্ঞ পাঠক কাব্যের শেষাংশকে মায়ের কোলে শিশুটির মতই দেখেন—মায়ের সঙ্গে সন্তানের তুলনা করেন না। রসজ্ঞ পাঠক একটি কবিতাকে সমগ্রভাবেই দেখেন—কবিতার যে যে উপাদান উপকরণ রসকে ঘনাইয়া তুলিবার সহায়তা করিয়াছে, তাঁহার কাছে তাহাদের সবই সমান চমৎকার। প্রথমাংশ যদি রস জমাইবার সহায়তা না করিয়া থাকে—তবে শেষাংশও চমৎকার নয়—চমৎকার বলিয়া মনে যাহা হইতেছে তাহা রসের পক্ষ হইতে নয়—ভাবের বা ভাষার পক্ষ হইতে। রসের পক্ষ হইতে বিচার করিলে কোন অংশ চমৎকার কোন অংশ চমৎকার নয় এরূপ কথাই উঠে না—সমস্তটাই চমৎকার।

প্রথমাংশ এক কারণে চমৎকার—দ্বিতীয়াংশ অন্য কারণে চমৎকার এবং প্রতি অংশ চমৎকার বলিয়াই সমগ্রটাই চমৎকার। সনেটের বিচারে এই ভুলটিই খুব বেশী হয়। সনেটের শেষ দুই ছত্রে কবি তাঁহার চরম কথাটি বলেন। অনেকের এই দুই পংক্তিকেই চমৎকার বলিয়া মনে হয়—আর মনে হয় এই দুটি পংক্তির জন্য বাকী দ্বাদশ পংক্তির বিশেষ কোন প্রয়োজন ছিল না।

যাঁহারা আর্ট বুঝেন—যাঁহারা রসজ্ঞ, তাঁহারা জানেন—ঐ দুটি পংক্তি একটি পল্লবিত সতেজ শ্যামল লতায় ফুলের মত ফুটিয়াছে—সমস্তটুকুই তাঁহার নিকট চমৎকার—পুষ্পিত লতাটিই চিত্ত হরণ করে। আর যাহারা সারগ্রাহী হিসেবী লোক তাহাদের কাছে লতাটার কোন মূল্য নাই—পুষ্পটিরই মূল্য আছে। তাহারা অনায়াসে পুষ্প দুটিকে তুলিয়া লইয়া দুই কাণে গুঁজিয়া চলিয়া যায় অর্থাৎ তাহারা ভালবাসে সূক্তি, সু-ভাষিত, Adage বা Maxim,—কাব্যের রস তাহাদের উপভোগ্য নয়।

লালিকার (প্যারডির) কথা—

কাহারও কাহারও বিশ্বাস কোন কবির কোন কবিতা বা গানের প্যারডি লিখিলে সেই কবিতা বা গানের অবমাননা করা হয়। প্যারডি-রচনা-পদ্ধতি বাংলা ভাষায় ছিল না—পূর্ব্বকালে চতুষ্পাঠীর পণ্ডিত ও ছাত্রগণ রসিকতা করিবার জন্য কোন কোন মহাকবি-রচিত শ্লোকের ভাষার ঈষৎ পরিবর্ত্তন করিয়া কৌতুকাকারে শ্লোক রচনা

করিতেন—সে সকল শ্লোক পণ্ডিতগণের মুখে মুখে প্রচারিত হইত—সেগুলি উদ্ভট শ্লোকের পর্য্যায়ে পড়ে। সেগুলিকে ঠিক প্যারডি বলা যায় না—তবে প্যারডির সগোত্র বটে।

বাংলার লোক-সাহিত্যের মধ্যে টুকরা টুকরা প্যারডির ছত্র পাওয়া যায়—সেগুলি কোন শ্রেণীর তাহা আভাস দিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার "মুচিরাম গুড়ে"র মধ্যে একস্থলের একদিন যাত্রার দলের ছোকরা মুচিরাম গান গাহিতেছে—একজন পিছন হইতে বলিয়া দিতেছে —মুচির'মের গানের পদ মনে থাকে না। মুচিরাম গাহিল,—"নীরদ কুন্তলা—থামিল, আবার পিছন হইতে বলিল—লোচনা চঞ্চলা—মুচিরাম ভাবিয়া চিন্তিয়া গাহিল—লুচি চিনি ছোলা—পিছন হইতে বলিয়া দিল—দধাতি সুন্দর রূপং—মুচিরাম না বুঝিয়া গাহিল—দধিতে সন্দেশ-রূপং—লোচনচঞ্চল,দধাতি সুন্দররূপং—ইহার প্যারডি দাঁড়াইল—"লুচি, চিনি, ছোলা দধিতে সন্দেশ রূপং" এই ভাবে "পার্ব্বতীসুত লম্বোদরে"র প্যারডি 'পাক দিয়া সুতো লম্বা করো" ইত্যাদি। মোট কথা—আমরা প্যারডি বলিতে আজকাল যাহা বুঝি—ঠিক সেই ধরণের সম্পূর্ণাঙ্গ প্যারডি কবিতা আগে ছিল না।

ইহা বিলাত হইতে আমদানী। অতএব বিলাতের লোকেরা যে ভাবে প্যারডির বিচার করেন, সেই ভাবেই বাংলার প্যারডিরও বিচার করা উচিত।

বাংলা ভাষার প্রথম প্যারডি ছুছুন্দর বধ-কাব্য। মেঘনাদবধের ভাষা ছন্দ ও ভঙ্গিকে ব্যঙ্গ করিয়া এই প্যারডি রচিত হয় পংক্তিতে পংক্তিতে অক্ষরে অক্ষরে বৃহৎ কাব্যের প্যারডি হইতে পারে না—সুর ছন্দ ও ভাষাভঙ্গিরই প্যারডি সম্ভব। গীতিকাব্যের দুই শ্রেণীর প্যারডিই হইতে পারে। সেই প্যারডিই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ যাহা—কেবল ভাষাভঙ্গির নয়—প্রত্যেক শব্দেরও প্যারডি। এইশ্রেণীর প্যারডিগুলি একটু কষ্টসাধ্য এবং কষ্টসাধ্য বলিয়াই স্বচ্ছন্দ ও প্রাঞ্জল হইয়া উঠে না,—স্থলে স্থলে দুষ্পাঠ্যও হইয়া উঠে।

যে কবিতা বা যে গানের প্যারডি করিতে হইবে তাহা পাঠকের সম্পূর্ণ পরিচিত, এমন কি, পাঠকের মুখস্থ না থাকিলে প্যারডির রসবোধ কিছুতেই সম্ভব নয়। সেজন্য মুখে মুখে যে গান বা কবিতা চলিতেছে তাহারই প্যারডি করিতে হয়। পাঠক-সাধারণ এই মূল কবিতা বা গানে প্রত্যেক শব্দটির সহিত তাহার প্যারডির তদনুবর্ত্তী শব্দটিকে মিলাইয়া দেখিতে পারেন কিরূপ আক্ষরিক সংযোটনার কৃতিত্ব ঘটিয়াছে এবং এই কৃতিত্ব কতটা রস-সম্পাতে সহায়তা করিতেছে।

প্যারডি উচ্চশ্রেণীর কাব্য নহে, উহা শব্দশিল্পমাত্র—উহা সম্পূর্ণ শব্দালঙ্কারের গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ। উহার অর্থে কোন অনির্ব্বচনীয়তা নাই, তবু উহা একপ্রকার রসের সৃষ্টি করে—ইহা কাব্যের ঘনীভূত রস নহে, ইহা তরল হাস্য রস।

উচ্চশ্রেণীর কাব্য না হইলেও উৎকৃষ্ট প্যারডি রচনা বড়ই কঠিন—ইহাতে যে কৃতিত্বের, যে কলাকৌশলের, যে সামঞ্জস্যবোধের প্রয়োগ করিতে হয় তারও মূল্য সামান্য নয়। প্যারডির হাস্যরস Wit শ্রেণীর হাস্যরস। সেজন্য এই রস সৃষ্টি করিতে হইলে লেখককে একাধারে পণ্ডিত, রসিক ও রসজ্ঞ হইতে হয়—নিখিল শব্দভাণ্ডারের অধিকারী হইতে হয়—অন্যান্য উপকরণের জন্য প্রথম শ্রেণীর Versifierও হইতে হয়।

সাধারণতঃ দেশবিখ্যাত কবির সর্ব্বজন-পরিচিত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সঙ্গীত বা কবিতারই প্যারডি রচিত হইয়া থাকে। যে সঙ্গীতের প্যারডি করা হয়—সে সঙ্গীতটী সম্পূর্ণ স্মরণে না থাকিলে প্যারডি উপভোগ করা যায় না। সেজন্য যে সঙ্গীতটী সকলেই জানেন তাহারি প্যারডি হইয়া থাকে। সর্ব্বজন-সমাদৃত সঙ্গীত, ভগবৎ-প্রেম, দেশপ্রেম বা নরনারীর পবিত্র প্রেমকে অবলম্বন করিয়াই সাধারণতঃ রচিত। ভাষার ঈষৎ পরিবর্ত্তন করিয়া ছন্দ সুর ও ধ্বনিকে অক্ষুন্ন রাখিয়া Sublime শব্দ সমুচ্চয়কে কেমন করিয়া Ridiculous করিয়া তোলা যায়, শাস্তর সোপেত রচনাকে কিরূপ কৌতুক রচনায় পরিবর্ত্তিত করা যায়, সেই কলা-কৌশল দেখাইবার জন্য প্যারডি। কাজেই প্যারডি রচনার দ্বারা আদৌ সূচিত হয় না যে প্যারডিকারের মূল সঙ্গীতের প্রতি ভক্তি বা শ্রদ্ধা নাই—অথবা সঙ্গীতের পবিত্র বিষয়বস্তুকে অবমাননা [illegible]

তাঁহার উদ্দেশ্য। বরং পক্ষান্তরে মহাকবির প্রতি প্যারডিকারের গভীর শ্রদ্ধাই সূচিত হয়। সেইজন্যই সাহিত্যগুরু বঙ্কিমচন্দ্র হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক কবি সজনী কান্ত পর্য্যন্ত অনেকেই নিঃসঙ্কোচে যুগ-পাবন শ্লোক বা সঙ্গীতের প্যারডি লিখিয়াছেন। বিষবৃক্ষে চণ্ডীর শ্লোকের প্যারডি পড়িয়া কে বলিবে চণ্ডীর প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের ভক্তি ছিল না। কে না জানে গীতা ও চণ্ডী বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনের প্রধান উপাস্য ছিল? তাই সতীশ চন্দ্র রচিত—"আমার জন্মভূমি" গানের প্যারডি "আমার কর্ম্মভূমি" ও 'সোনার তরী'র প্যারডি "সোনার ঘড়ি" পড়িয়া দ্বিজেন্দ্রলাল ও রবীন্দ্রনাথ কতই উল্লাস প্রকাশ করিয়াছিলেন।

মোট কথা, প্যারডি একশ্রেণীর শিল্পকলা। উহাকে শিল্প হিসাবেই বিচার করিতে হইবে—উহার ঈষদম্ল রস উপভোগ করিতে হইলে অন্য কোন রসের পাত্রে অথবা কোন বিশিষ্ট সংস্কারের পিতল-কাঁসার বাটিতে ঢালিয়া সেবন করিলে চলিবে না।

অনুকরণ ও অনুসরণ

যে কোন নূতন জিনিস আবিষ্কৃত বা প্রবর্ত্তিত হইয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেই চারিদিক্ হইতে তাহার অনুকরণ হয়। সাহিত্যক্ষেত্রে যে কোন ভাব, ভঙ্গি বা ছাঁদ নূতন বলিয়া সমাদর লাভ করিলেই তাহার অনুকরণ অনিবার্য্য। যে সাহিত্য অতুলনীয়, অনির্ব্বচনীয় ও অননুকরণীয় তাহারও অনুকরণ হয়—কিন্তু তাহার সহিত মূলের এত অধিক ব্যবধান থাকিয়া যায় যে, তাহাকে অনুকরণ বলিয়া ধরাই যায় না। আমাদের দেশের তথাকথিত সমালোচক-গণ তাহাকে ব্যর্থ অনুকরণ বলেন—কেহ কেহ ইংরেজীর Aping কথাটার অনুসরণে হনূকরণ বলেন। এগুলি আর যাহাই হউক অনুকৃতের কোন অনিষ্ট করে না—নিজেরাই উপহাস্য হয়। এই শ্রেণীর অনুকরণ যুগৈশ্বর্য্য-স্বরূপ সাহিত্যের চারিপাশে ভিড় করিয়া বা কোলাহল তুলিয়া তাহার স্বস্তিভঙ্গ করিতে পারে না।

যে সাহিত্য ঐ শ্রেণীর নয়—অথচ যাহার ভাবভঙ্গি কতকটা নূতন, তাহাকে অনুকরণই ক্রমে গ্রাস করিয়া ফেলে—অনুকৃতি নিজেও মরে—অনুকৃতকে মারে। এই শ্রেণীর অনুকরণকে অনুমরণও বলা যাইতে পারে।

কথাটাকে আর একটু পরিষ্কার করিয়া বলা যাক। বঙ্গ সাহিত্যে মাইকেলের মেঘনাদ বধ, বঙ্কিমের উপন্যাস, রবীন্দ্রনাথের কাব্য সম্পদ্ ও প্রবন্ধ, দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গান ও শরৎচন্দ্রের কোন কোন উপন্যাস এতই উচ্চ শ্রেণীর যে, ইহাদের তথাকথিত অনুকৃতিগুলি ইহাদের কোন ক্ষতিই করিতে পারে নাই।

উঁহাদের প্রতিভা-লোকের দীপ্তির সহিত তাহার প্রতিফলিত বিম্বগুলির এতই তফাৎ যে ঐগুলি কাহারও চোখেই পড়ে না। ঐ সকল সৃষ্টির অনুকৃতিগুলি নিজেরাই মরিয়াছে—মূল সৃষ্টির কোন ক্ষতি করিতে পারে নাই।

যে সকল সাহিত্য-সৃষ্টির অনুকরণ চলে—অনুকৃতি যাহাদের সমকক্ষ হইয়া উঠে অনুকরণের দ্বারা যাহারা অতিক্রান্ত হইয়া যায়—তাহাদের মৃত্যু হয় অনুসৃষ্টির জনতাতেই। উদ্ভিদ্ রাজ্যের দিকে চাহিলেই ইহার উপমান পাওয়া যাইবে।

যে অনুকরণ মূল সৃষ্টিকে অতিক্রম করিয়া উঠে তাহার বাঁচিবার কথা। কিন্তু তাহাও বাঁচে না—যাহাকে সে অতিক্রম করে তাহাকে সে গ্রাস করে। কিন্তু সে নিজেও কিছুক্ষণ স্থূলকায় দেখাইলেও, দীর্ণ-জঠর হইয়া শেষে মারা যায়। অর্থাৎ মূল সৃষ্টটী প্রতিষ্ঠা হারায়, অনুকৃতির দ্বারা আক্রান্ত হইয়া, আর অনুকৃতি প্রতিষ্ঠা হারায় পরকীয় উপকরণে গঠিত বলিয়া। উপবৃক্ষক (পরগাছা) নিজেও বাড়ে না—মূল বৃক্ষকেও বাড়িতে দেয় না।

এই কথা বহু লেখকের নিজের রচনার দ্বারাই প্রমাণিত হয়। অনুকরণ যেমন পরের হইতে পারে, তেমনি নিজেরও হইতে পারে। রবীন্দ্রনাথ যদি উর্ব্বশীর অনুকরণে উর্ব্বশীর ভাব-ভঙ্গি ও ছন্দে রম্ভা, তিলোত্তমা, ঘৃতাচী ইত্যাদি আরও কতকগুলি কবিতা লিখিতেন, তাহা হইলে রস-স্বর্গের মন্দাকিনীর জলে রম্ভা, তিলোত্তমা ইত্যাদি স্বর্গ-বনিতাগণ উর্ব্বশীকেও জড়াইয়া ধরিয়া ডুবিয়া মরিত। রবীন্দ্রনাথ এই সত্যটাকে যেমন বুঝেন, তেমনটী আর কেউ না। তাই রবীন্দ্রনাথ একই ভাবভঙ্গি ও ছাঁদের

দুইটা কবিতা লেখেন নাই। নব নব উন্মেষশালিনী বুদ্ধির সম্পূর্ণ সার্থকতা দেখিতে পাই রবীন্দ্রনাথে।

অর্দ্ধ শতাব্দী ধরিয়া মুহুর্মুহু নব নব ভাব-ভঙ্গি, ঢঙ ও ছাঁদের রস-সৃষ্টি করিতে পারিয়াছেন বলিয়াই এবং অনুকারকগণ সেইগুলির কাছাকাছি আসিতে পারে নাই বলিয়াই রবীন্দ্রনাথ এত বড় কবি। আশ্চর্য্যের বিষয়, রবীন্দ্রনাথের গল্প-উপন্যাসগুলির দুইখানিও এক শ্রেণীর নয়। রবীন্দ্রনাথের দুইখানি 'গোরা' বা দুইখানি 'চিরকুমার-সভা' লেখেন নাই। কেবলমাত্র সঙ্গীত ও রূপকনাট্যে রবীন্দ্রনাথ নিজের অনুকরণ নিজেই করিয়াছেন। বঙ্গসাহিত্যে রবি তাহার কোন আকাশেই হাজার তারার সৃষ্টি করিতে চাহেন নাই, তিনি চাহিয়াছেন তাহার সকল সৃষ্টিই হইবে—

Like a star when only one
Shining in the Sky.

কোন একটী বিশিষ্ট ভাব-ভঙ্গির চারিদিকে অনুকরণ হইলে দেশের যে কোন লাভ হয় না তাহা বলা যায় না। অনুকরণের বাহুল্যকে অনেকটা Broadcasting বলা যাইতে পারে। Broadcastingএর যে সার্থকতা, পাঠক সমাজ তাহাই লাভ করে। কিন্তু কে যে সেই ভাব-ভঙ্গির বা তত্ত্ব-তথ্যের প্রবর্ত্তক, সাহিত্যের ঐতিহাসিক ছাড়া অন্য কেহ খোঁজও করে না—মনেও রাখে না। কাহার দান আগে কাহার দান পরে—এ বিচার কেহ করে না এ বিষয়ে তাঁহাদের সৃষ্টির ক্রমটী পরম্পরা হারাইয়া এক সমতলে পাশাপাশি সমাসীন হইয়া পড়ে। অনুকরণের যোগ্যতা বা অনুবর্ত্তনীয়তার অপরাধেই সৃষ্টি তাঁহার স্রষ্টাকে ভুলাইয়া দেয়।

যে যুগের যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লেখক চারিদিক হইতে তাহার অনুকরণের প্রয়াস স্বাভাবিক ও অনিবার্য্য। আর কিছু না হউক ইহাতে তাহার সৃষ্টির গুণোপলব্ধি (appreciation) সূচিত হয়। কতকগুলি লেখক তাহার অনুকরণ করে—তাহাদের নূতন কিছু করিবার ক্ষমতা নাই বলিয়া। কিন্তু তাহারা রসজ্ঞ। আর কতকগুলি অক্ষম লেখক অনুকরণ করিতে না পারিয়া বিরক্ত বা কুপিত হইয়া ঐ যুগ-প্রবর্ত্তক লেখকের সৃষ্টিকে অসার প্রমাণ করিবার চেষ্টা করে,—নূতন কিছু সৃষ্টি করিব বলিয়া শাসাইতে থাকে। তাহাদের কোলাহলে যুগ-প্রবর্ত্তকের সৃষ্টির ধ্যান ভঙ্গ হয় না। কারণ, তাহাদের নূতন কিছু সৃষ্টি করিবার সঙ্কল্প তর্জ্জন-গর্জ্জনেই পর্য্যবসিত হয়। উপরন্তু প্রমাণিত হয় যে, তাহারা রসিক বা রসজ্ঞও নয়। যাহা অনুকরণের অতীত তাহাকে অনুকরণ করিতে না পারিলে যে বিরক্তি বা ক্রোধের কারণ নাই—এই সহজ বুদ্ধিটুকুও তাহাদের নাই। তাহাদের মধ্যে যাহারা অনুকরণ করিবার ব্যর্থ প্রয়াস করে, তাহারা বরং ভাল। তাহাদের রচনা সৃষ্টি হিসাবে বাঁচে না বটে, কিন্তু শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের গুণোপলব্ধি হিসাবে টিকিয়া যাইতে পারে।

কোন কোন অনুকারক ফাঁকি দিয়া অনুকৃতিকে বাঁচাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়াছে। পাঠকের দৃষ্টি ও বুদ্ধিকে ভিন্ন পথে পরিচালিত করিবার জন্য প্রাণপণে অনুকৃতকে ব্যঙ্গ করিয়াছে—যেন সে অনুকৃতের নিকট বিন্দুমাত্র ঋণী নহে। পাঠকসমাজ এত নির্ব্বোধ নয় যে তাহা ধরিয়া ফেলিতে পারিবে না। রবীন্দ্রনাথ তাহাদের লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—

ধ্বনিটিরে প্রতিধ্বনি সদা ব্যঙ্গ করে,
ধ্বনি কাছে ঋণী সে যে পাছে ধরা পড়ে।

রসবোধের একটি সূত্র

সাহিত্যের রসবোধ করিতে হইলে আমাদের মনটীকে যে কতদূর শাসন-সংযত, নিয়ন্ত্রিত ও একাগ্র করিতে হয়। তাহা কবিদের উপমা-প্রয়োগের কথা ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে।

অর্জ্জুন যখন একটী পাখীর চক্ষু বিদ্ধ করিবার জন্য আদিষ্ট হন তখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল—তুমি কি দেখিতেছ? অর্জ্জুন বলিয়াছিলেন—একটী পাখীর চোখ ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পাইতেছি না। সত্যই সে-সময়ের জন্য তাঁহার দৃষ্টি হইতে বিশ্বজগৎ অপসারিত হইয়াছে।

সাহিত্যের রসবোধ করিতে হইলে মনের বিভিন্ন বৃত্তিকে বিশ্লেষণ করিয়া কেবলমাত্র রসোপভোগিনী বৃত্তিকে উন্মুখ ও একাগ্র করিয়া তুলিতে হইবে—অর্থাৎ

কালের জন্য অন্যান্য বৃত্তির সহিত সম্বন্ধ লোপ করিতে হইবে। যাঁহারা ইহা করিতে পারিবেন না—তাঁহারা নাটক পাঠকালে ইতিহাসের মর্য্যাদা রক্ষিত হইল না—লালিকা (প্যারডি) পাঠকালে মহাকবির শ্রেষ্ঠ একটী রচনার অপমান হইল—উপন্যাস-পাঠকালে সামাজিক, পারিবারিক বা গার্হস্থ্য নীতি ক্ষুণ্ণ হইল—কবিতা পাঠকালে সনাতন ব্রাহ্মণ্য সমাজের অমর্য্যাদা হইল—মনে করিয়া ক্ষুব্ধ বা রুষ্ট হন; সেই ক্ষোভ বা রোষের জন্য তাঁহাদের ভাগ্যে সাহিত্য-রস-বোধের আনন্দ ঘটিয়া উঠে না।

আবার সাহিত্যপাঠকালে সাহিত্যের উপাদানের মধ্যে আপনার মনোমত সামাজিক, পারিবারিক, ধর্ম্মগত আদর্শকে পাইয়া অথবা আপনার চিরপোষিত মতামত, সিদ্ধান্ত, মীমাংসা ইত্যাদিকে পাইয়া চিত্তকে এই সকল অবান্তর ব্যাপারে উল্লাসিত করিয়াই সন্তুষ্ট হ'ন—ব্রহ্মস্বাদ সহোদর যে রস, তাহার উপভোগে যে আনন্দ তাহা তাঁহার ভাগ্যে ঘটে না। রঙ্গীন কাচ পাইয়াই সন্তুষ্ট—কাঞ্চনকে হেলায় ঠেলিয়া রাখেন। রসবোধের জন্য চিত্তকে কিরূপ ভাবে—শাসন-সংযত ও নিয়ন্ত্রিত করিতে হয়—কবিদের উপমা-প্রয়োগের প্রকৃতি হইতেই বুঝানো যাইতে পারে।

চন্দ্রবদন বলিলে চাঁদের এক কান্তি ছাড়া কিছু ভাবিতে হইবে না—ইহা অতি সোজা ব্যাপার। কিন্তু 'সাপের মত সুন্দরীর বেণী' বলিলে একমাত্র সাপের আকার, দোদুল্যমানভাব ও চিক্কণতাটুকু লইতে হইবে—সাপের সমস্ত উপদ্রব, সমস্ত বিষ, সরীসৃপের সমস্ত জঘন্যতা ভুলিতে হইবে। ইহার চেয়েও ভীষণ আছে—গৃধিনীর মত কান। গৃধিনীর সমস্তই ন্যক্কারজনক; কিন্তু সমস্ত ভুলিয়া তাহার আকারটুকুই লইতে হইবে। করিশুণ্ড ও সিংহকটীর উপমাতে আবার সমগ্র হইতে অংশ বাছিয়া লইতে হইবে। সেই অংশের আবার ক্ষীণতা বা পীনতাটুকু আকারের সঙ্গেই ভাবিতে হইবে। সবচেয়ে বেশী সতর্কতার প্রয়োজন 'গজেন্দ্র গমনে'। সব বাদ দিয়া শুধু গতিটুকুকে লইতে হইবে, একটু এধার-ওধার হইলেই বীভৎসতা। এই সকল উপমার রসবোধে যে সতর্কতার প্রয়োজন—সকল সাহিত্য-বিচারেই সেই সতর্কতার প্রয়োজন আছে—নতুবা রসের বদলে ন্যক্কারজনক বীভৎসতাই লভ্য হইবে।

একজন অখ্যাতনামা কবি বলিয়াছেন—

> শিরঃ শার্ব্বং স্বর্গাৎ পতিত শিরসস্তৎ ক্ষিতিধরং
> মহীধ্রাদুত্তুঙ্গাদবনিমবনেশ্চাপি জলধিং
> অধোগঙ্গা সেয়ং পদমুপগতা স্তোকমথবা
> বিবেকভ্রষ্টানাং ভবতি বিনিপাতঃ শতমুখঃ।

গঙ্গা যেমন স্বর্গ হইতে মহাদেবের শিরোদেশে পড়িয়া তথা হইতে গিরিশিখরে, গিরিশিখর হইতে ধরাতলে, ধরাতল হইতে সমুদ্রে এইরূপ ক্রমাগত নিম্নগামিনী, বিবেক-ভ্রষ্টদেরও সেইরূপ ক্রমে ক্রমে অধঃপতনও ঘটিয়া গঙ্গার মতই শতমুখী হইয়া শেষ হয়।

কি সর্ব্বনাশ! হরিপদোদ্ভবা গঙ্গার সঙ্গে বিবেক-ভ্রষ্টের অধঃপাতের উপমা! গঙ্গা যে হরিপদ হইতে মোহনা পর্য্যন্ত আগাগোড়া পতিতপাবনী এই ভাবটী মনকে সম্পূর্ণ অধিকার করিলেই রসাভাসই ঘটিবে। এখানে গঙ্গার পতনের ক্রমটীকে শুধু ভাবিতে হইবে, অন্য কিছু না।

সাহিত্য রসবোধ করিতে হইলে আপনার ব্যক্তিগত বৃত্তি, প্রবৃত্তি ও সংস্কারের দ্বারা রচনাবিশেষকে পরীক্ষা করিলে চলিবে না—ক্ষণকালের জন্য মনকে সর্ব্বসংস্কারের উপরে তুলিয়া কবির মনের কামনাকে অনুসরণ করিতে হইবে। কবির নিজের উদ্দেশ্যটীকে লক্ষ্য করিয়া কবির ইঙ্গিতে ও পরিচালনায় কবিরই সৃষ্ট বা কল্পিত পথে মনোরথ চালাইতে হইবে।

সাহিত্যে মৎস্য ন্যায়

ছোট মাছ ছোট ছোট পোকা ধরিয়া খায়, তাহাকে ধরিয়া খায় বড় মাছ, তাহাকে আবার ধরিয়া খায় তাহার চেয়ে বড় মাছ। সেই বড় মাছকে গিলিয়া ফেলে তিমি মাছ। তিমির চেয়েও বড়বড় জলচর জীব আছে—রামায়ণে তাই উক্ত হইয়াছে—

—"তিমিঙ্গিল-গিলোঽপ্যস্তি তদ্গিলোঽপ্যস্তি রাঘব।"

হে রাঘব, তিমিকে গিলিয়া ফেলে যে জীব তাহাকে গিলিয়া ফেলিতে পারে এমন জীবও আছে। মৎস্য ন্যায় বলিতে আমরা এই 'গ্রস্তগ্রাসক-পরম্পরা' বুঝি।

সাহিত্যক্ষেত্রে একটি যে কোন নূতন প্রয়াস হইলেই

তাহা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে কিন্তু তাহা কতক্ষণ? একই শ্রেণীর উৎকৃষ্টতর প্রয়াস হইলেই তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী প্রয়াসকে গ্রাস করিয়া ফেলে। গ্রাস করিয়া ফেলিলেও সেই প্রয়াসও চিরদিন টিকিয়া থাকে না—তাহারও আয়ু শেষ হয়। সেও উৎকৃষ্টতর প্রয়াসের দ্বারা গলাধঃকৃত হয়। এই ভাবে মাৎস্য ন্যায় ধর্ম্মে গ্রস্তগ্রাসক-পরম্পরা চলিতে থাকে। তারপর এমন একটি অপূর্ব্ব সৃষ্টি হয়—যাহা অপেক্ষা একই শ্রেণীর উৎকৃষ্টতর সৃষ্টি আর সম্ভব হয় না। তখন সে অমরতা লাভ করে।

পূর্ব্ববর্ত্তী সৃষ্টিগুলি উৎকৃষ্টতর পরবর্ত্তী সৃষ্টিকে পরিপুষ্টি দান করে—প্রেরণা যোগায়—আগাইয়া দেয় কিন্তু তাহারা পাঠক সাধারণের স্মৃতি পথ হইতে একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যায়—তাহাদের কথা আর কেহ ভাবিয়াও দেখে না। জাতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে তাহাদের নামোল্লেখ ও পরিচয় থাকে মাত্র। জাতীয় সাহিত্যের ইতিহাসের পাঠক তাহাদের কিছু সন্ধান রাখে—রসিক সমাজের সহিত তাহাদের আর সম্বন্ধ থাকে না।

সাহিত্যক্ষেত্রে অনুকরণকে সকলে উপেক্ষা করে—কিন্তু কত উৎকৃষ্ট সৎসাহিত্য যে পূর্ব্ববর্ত্তী সৃষ্টির অনুকরণ তাহা কেহ খোঁজ রাখে না। অনুকৃতি যদি মূলকে ভাবে ও রসে অতিক্রম করিয়া যায়—মূল অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর সৃষ্টি হইয়া পড়ে—তবে মূলকে আর কে মনে রাখে? তখন সে অনুকরণকে কে উপেক্ষা করিবে? মূলের কথাটা দুইদিন লোকে মনে রাখিতে পারে - কিন্তু ক্রমে মূল তাহার সকল গৌরব হারায়—অনুকৃতিই মৌলিক সৃষ্টি বলিয়া আদৃত হইতে থাকে। এইরূপ একটি উৎকৃষ্ট সৃষ্টি রসিক সমাজে সমাদৃত হইলে তাহার অসংখ্য অনুকরণ চলিতে থাকে—তাহার মধ্যে কোনটি যদি উৎকৃষ্টতর হইয়া পড়ে—তবে লব্ধ-প্রতিষ্ঠ পূর্ব্ববর্ত্তী সৃষ্টিরও আসন টলে—আর যদি সমকক্ষ হইয়া উঠে তবে সমকক্ষের দলে অনেক সময় মূল সৃষ্টিটি হারাইয়া যাইতে পারে। সেজন্য সাহিত্যের যাঁহারা ইতিহাস রচনা করেন—তাঁহারা পাঠক সমাজকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেন—কোনটি মৌলিক এবং কোনগুলি অনুকৃতির ফল। যাঁহার সৃষ্টি মৌলিক অথবা যাঁহার সৃষ্টি অনুকরণ রণে বিজয়ী হইয়া উঠিয়াছে—তাঁহার কৃতিত্ব—তাঁহার প্রতিভার মর্য্যাদা যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে—সেজন্য তাঁহারা যথেষ্টই চেষ্টা করেন।

আর অনুকৃতিগুলি যদি মৌলিক রচনা অপেক্ষা দুর্ব্বলতর হয়—তাহা হইলে মৌলিক রচনাটি একে একে সেগুলিকে গ্রাস করিতে থাকে। পূর্ব্ববর্ত্তী দুর্ব্বলতর প্রয়াস গুলিকে গ্রাস করিতে করিতে একটী সৃষ্টি যখন পবাক্রান্ত হইয়া উঠে—তখন সে পরবর্ত্তী অনুকৃতি-গুলিকেও গ্রাস করিতে থাকে।

মেঘদূত রচনার আগে ঠিক ঐ শ্রেণীর কত প্রয়াস হইয়াছিল তাহা আমরা জানি না—সে যুগের সাহিত্যের ইতিহাস পাওয়া যায় না। তবে মেঘদূতের অনুকরণে যে সকল কাব্য রচিত হইয়া তাহার সমকক্ষ হইয়া উঠিতে পারে নাই—তাহাদের সন্ধান আমরা কিছু কিছু রাখি।

মেঘদূত সে গুলিকে গ্রাসই করিয়াছে বলিতে হইবে। পবনদূত, হংসদূত, পদাঙ্কদূত—ইত্যাদির নাম লোকে শুনিয়াই আসিতেছে—আজ মুদ্রাযন্ত্রের কৃপায় সেগুলি অধিগম্য হওয়া সত্ত্বেও যে তাহাদের আদর নাই। তাহার কারণ মেঘদূতই তাহাদের সকল প্রতিষ্ঠা গ্রাস করিয়াছে। একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া কত দূত যে ভূত হইয়াছে—তাহার সন্ধানও আমরা জানি না।

পূর্ব্ববর্ত্তী কাব্যগুলিকে গ্রাস করিয়া মেঘনাদ-বধ বিজয়ী হইয়া উঠিয়াছে। এদেশে মেঘনাদ বধের অনুকরণে কত বধ কত 'সংহার' কত'পতনেই' না সৃষ্টি হইয়াছে—কিন্তু কেহই মেঘনাদ-বধকে বধ করিতে পারে নাই। মেঘনাদ বধই একে একে সকলগুলিকে গ্রাস করিয়াছে। সাহিত্যের ইতিহাসে তাহাদের নামের তালিকা পাওয়া যাইবে। রবীন্দ্রনাথের দুর্দ্দান্ত সর্ব্বগ্রাসী কাব্যও পূর্ব্ববর্ত্তী কবিতা-বলীকে গ্রাস করিয়া ফেলিতেছে। এই সংস্থ ভাবের ধারাই চিরদিন চলিতেছে।

কুঞ্জ মাঝে
কেন বাঁশী বাজে—

প্রত্যাবর্ত্তন

গল্প

শ্রীশরদিন্দু চট্টোপাধ্যায়

মথুরা ষ্টেশনে ট্রেণ হইতে নামিতেই পাণ্ডারা সন্তোষের উপর যেরূপভাবে ঝাঁপাইয়া পড়িল, ছেলের দল ঘুড়ি ধরিবার সময়েও সেরূপ করে না।

সকলেই মোটা মোটা লম্বা খাতা হাতে তারস্বরে চীৎকার জুড়িয়া দিল,—"পাণ্ডা কে আছে বাবু? নামটা বলিয়ে দিন; শুধু নামটা বলিতে কুছু হরজ্‌ত' নেহি।

সন্তোষের সঙ্গে কিছু কিছু মালপত্রও ছিল; একটা বড় সুটকেস্‌, একটা অনতিবৃহৎ বেডিং, পুঁটলির মত বাঁধা একটা ষ্টোভ, আরও দুটা একটা।

সেইগুলা লইয়াই সে চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার উপর আবার এই উৎপাত। সে বিরক্ত হইয়া বলিল,—পাণ্ডাকা কুছ্‌ কাম্‌ নেহি হায় হাম্‌রা; হাম্‌ শুধু ঘুম্‌নে আয়া বাবা; ঝুটমুট দিক্‌ মাৎ করো।

একজন দীর্ঘাকার পাণ্ডা তাহার সম্মুখে আসিয়া 'জিভ্‌ কাটিয়া' বলিল—ছিছিঁ বাবু, এ কোথা কেনো বোলেন, দিক্‌ কেনো কোর্‌বে। তাহার পর একটু নীচু হইয়া কাণের কাছে মুখ আনিয়া খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মত চুপিচুপি বলিল,—শুনেন, হামি ভালো কোথা আপনাকে বাৎলাইয়ে দেই; পোয়সা কোড়ির কোথা আপনি ভাববেন না; উওত' বহুৎ ছোটা কথা, নোংরা কোথা আছে; উও বাৎ ছোড়িয়ে দিন। হামার সাথে চোলেন, ভালা বাড়ী দিবো, একদম্‌ যমুনামাইকে উপরে, বহুৎ ভালা বাড়ী; বিস্‌রাম ঘাটকা একদম্‌ নগিজ্‌। চান্‌ কোরবেন, ঠাকুর-দর্শন ভি কোরবেন, ভালা প্রসাদ ভি আহার হোবে—আচ্ছা টাঙ্গা কর্‌কে ঘুম্‌নে যাবেন, বৃন্দাবন চলিয়ে যান, গোবিন্দজীউকি মন্দির, শেঠজীউকি, সোনেকা তালগাছ…

পাণ্ডাদের সেই ক্রমবর্দ্ধমান জনতার ঠেলাঠেলির মধ্যে পড়িয়া সন্তোষের অবস্থা তখন জোয়ারের ভাসমান পদার্থ বিশেষের মত হইয়া দাঁড়াইয়াছে; [illegible] ফিরিস্তি শুনিবার মত ধৈর্য্য তাহার নাই। সে উপায়ান্তর না দেখিয়া 'মরি কি বাঁচি' গোছের করিয়া 'মরিয়া' হইয়া বলিয়া ফেলিল,—আমি ধর্ম্মশালায় যা'ব।

তাহার কথাগুলা যেন পথহারা বালকের করুণ ক্রন্দনের মতই শুনাইল।

পূর্ব্বের পাণ্ডাটি সহসা তাহাকে ভিড়ের মধ্য হইতে টানিয়া যেদিকে টাঙ্গাগুলা দাঁড়াইয়াছিল, সেইদিকে লইয়া গেল। বলা বাহুল্য, অপর পাণ্ডাগুলা শান্তশিষ্ট বালকদের মত সেইস্থানে নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল না; কলরব করিতে করিতে তাহারাও পশ্চাদ্ধাবন করিল। তাহাদের মধ্যে একজন স্থূলবপু বলিষ্ঠ পাণ্ডা পূর্ব্বের পাণ্ডার নিকট হইতে সন্তোষকে ছিনাইয়া আনিল। বলিল,—শুনেন বাবু, ধরম্‌কা বাৎ চোলেন বাবু, ধরমশালামে, কুছ্‌ হরজ নেহি; এই টাঙ্গাবালে—টাঙ্গা আসিয়া হজির হইতেই পাণ্ডাঠাকুর পরম বন্ধুর মত তাহার হাত হইতে মালপত্র কাড়িয়া লইয়া টাঙ্গায় রাখিতে আরম্ভ করিল।

অপর পাণ্ডাগুলা তখনও একেবারে নিরাশ হইয়া রণে ভঙ্গ দেয় নাই; তাহারা কেহ সন্তোষের হাত চাপিয়া ধরিয়াছে, কেহ তাহার কর্ণে মন্ত্র দিতেছে, উহার সহিত সে যেন না যায়, উহার সহিত যাইলে তাহাকে অনেক অসুবিধায় পড়িতে হইবে, ইত্যাদি। ইতিমধ্যে তাহার সমস্ত মাল টাঙ্গায় স্থান লাভ করিয়াছিল। পাণ্ডাজী হাঁকিল,—আইয়ে বাবুজী, আরাম্‌সে বইঠিয়ে যান।

সন্তোষ কোনপ্রকারে সেই মালপত্রের উপর পা রাখিয়া হাঁটু মুড়িয়া জড়সড় হইয়া 'আরাম্‌সে' বসিয়া পড়িল; পাণ্ডাও গাড়োয়ানের পার্শ্বে বসিয়া বলিল,—চালাও।

পথের ধূলি উড়াইয়া টাঙ্গা ছুটিল; চারিদিক্‌ ধূলি জালে পাটল হইয়া উঠিল। সেই গীতগোবিন্দের নীল-[illegible] [illegible] পরম স্মরণ করিয়া সন্তোষের মন

কিন্তু ভক্তি রসাপ্লুত হইয়া উঠিল না; সে পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া নাক চাপিয়া ধরিল।

পাণ্ডা তখন বলিয়াই চলিয়াছে,—হামি ধরমশালামে লিয়ে যাব বাবু; আপ্‌কা পসিন্দ হুয়ে ত' হুঁয়াই রহিয়ে' যান, কুছ্ হরজ নেই; পসিন্দ নেহি হুয়ে ত' চলিয়ে হামার ডেরামে; কুছ্ তক্‌লিফ হোবে না, বহুৎ আরামসে রহিয়ে যাবেন, একদম্ যমুনামাইকে উপ্‌পরে।

ধর্ম্মশালার নিকট গাড়ী থামিলে পাণ্ডা নামিয়া পড়িল। সন্তোষও নামিতে যাইতেছিল, পাণ্ডা নিষেধ করিল; বলিল, তাহার এখন তাড়াতাড়ি নামিবার আবশ্যক নাই; সে আগে গিয়া দেখিয়া আসিবে, ভিতরে যাত্রীর স্থান আছে কিনা। পাঁচ সাত মিনিট পরেই সে এক অভিনব অভিনয়! কিন্তু সন্তোষ ব্যাপারটাকে মিথ্যা বলিয়া বুঝিতে পারিল না।

পাণ্ডাঠাকুর নগ্নগাত্র, নগ্নপদ, মলিনবাস পরিহিত একটা লোকের সঙ্গে কলহ করিতে করিতে বাহির হইয়া আসিল। লোকটা নাকি সেই ধর্ম্মশালার 'মানিজর'।

পাণ্ডা হাত-পা নাড়িয়া সন্তোষ শুনিতে পায় এমনভাবে বলিল,—কাহে নেহি রহেনে দেগা বাবুজী কো?

'মানিজর' বলিল,—তোম্‌কো আউর কেৎনা দফে বোলেগা ভাই; বোল্ দিয়া না তোম্‌কো হিঁয়া কোই বাঙ্গালীকো রহেনে দেনেকো মানা হায়; উলোক কান্থন মান্‌তা নেহি, ধরমশালাকো অন্দর মছ্‌লি খাতা।

পাণ্ডা একবার সন্তোষের দিকে চাহিয়া লইল; পরে বলিল,—কুছ্ পরোয়া নেহি! হাম্‌রা ডেরা যবতক হায়, বাবুজীকো তক্‌লিফ হোনে নেহি দেগা।

সন্তোষের দিকে চাহিয়া বলিল;—চলিয়ে বাবুজী; শালা লোককো ছোড়দিজিয়ে; চালাও হো টাঙ্গা।

এই দূরদেশে বিদেশীর মুখে বাঙালীদের নামে এই অপবাদ শুনিয়া সন্তোষের মন গ্লানিতে ভরিয়া উঠিল; সে দ্বিরুক্তি না করিয়া নির্ব্বাক হইয়া বসিয়া রহিল।

তাহার আহত চিত্ত উদ্‌ভ্রান্তের মত চারিদিকে ঘুরিতে লাগিল। সে দিল্লী হইয়া, আগ্রা হইয়া নানা দেশ দেখিতে দেখিতে আসিতেছে; অর্থ যাহা আনিয়াছিল, তাহা প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে; দিনকতক হইল সুলতার একখানা চিঠি আসিয়াছিল; তাহাতে সে লিখিয়াছে, "আর কেন? অনেক বেড়ানো ত' হইল; এইবার বাড়ী আসিয়া স্থির হইয়া বসিলে ভাল হয় না? আমার এখানে একলা আর ভাল লাগে না; তা'র ওপোর খোকার আবার জর। তুমি কবে আসিবে?" সত্যই মথুরা বৃন্দাবন ভ্রমণের প্রলোভনটা সামলাইয়া লইতে পারিলেই ভাল হইত; ফিরিবার পথে শেষবেলায় আর এরূপ দুর্গতি ভোগ করিতে হইত না।

সে মনে মনে একবার উদ্বৃত্ত অর্থের হিসাবটা করিয়া লইল। তারপর পাণ্ডাকে বলিল,—শুন্‌ছো পাণ্ডাঠাকুর আমি কিন্তু যা' বলেচি; তোমার ওখানে নিয়ে যাচ্ছো, কিন্তু পয়সা-কড়ি বাপু আমি বিশেষ কিছু দিতে পা'রব না; সমস্তদিন মথুরা-বৃন্দাবন দেখে আজ সন্ধ্যার গাড়ীতেই আবার চলে' যাব।

পাণ্ডা ঠাকুর আশ্বাস দিয়া বলিল,—হামি ত বলিয়ে দিয়েসি, আপনি খুসী হইয়ে যো কুছ দিবেন, মাথা পর তুলেলেবো; কুছ নেহি দেন, উস্‌মে ভি কুছ্ হরজ নেহি; শুধু হাম্‌রা খাতামে নাম্ লিখিয়ে দিবেন।

কিছুক্ষণ থামিয়া সন্তোষের মুখের কাছে হাত নাড়িয়া বলিল,—পোয়সার কোথা ছোড়িয়ে দিন; হামাকে বিশোয়াস কোরেন; ঝুটা নেহি বোলেগা বাবুজী; 'জবান্ ঠিক্ ত' জনম ঠিক্'।

অল্পক্ষণের মধ্যেই যমুনার ধারে রাস্তার উপর একটি ছোট ঠাকুরঘরের সম্মুখে টাঙ্গা থামিতেই পাণ্ডা নামিয়া পড়িল দেখিয়া সন্তোষও নামিল।

পাণ্ডাজী বলিল—হাঁ, হামি উৎরাইয়ে দিচ্ছি, বাবুজী। তাহার পর হাঁক দিল,—এ বোন্‌ওয়ারী-ই—

ভৃত্য আসিয়া মোটগুলা নামাইয়া লইয়া গেল।

দ্বিতীয়বার অভিনয় আরম্ভ হইল।

পাণ্ডাজী টাঙ্গাওয়ালাকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশে দেখাইয়া সন্তোষকে বলিল,—বাবুজী, টাঙ্গাকা ভাড়া—

সন্তোষ জিজ্ঞাসা করিল,—কত দিতে হবে?

পাণ্ডা বলিল,—চারা আনা দিয়ে দিন।

টাঙ্গাওয়ালা চেঁচাইয়া উঠিল,—নেহি বাবুজী, [illegible] বাৎ; দেড় রূপিয়াকা কবুতি—

সন্তোষের ভাড়া শুনিয়া চক্ষু তখন কপালে উঠিয়াছে; পনেরো মিনিটের রাস্তা আসিতে আঠারো আনা ভাড়া!

সে ভয়ে ভয়ে পাণ্ডাকে বলিল,—এক টাকা—

পাণ্ডা একটু হাসিয়া চুপি চুপি বলিল,—রাজী হোবে না বাবুজী; আচ্ছা, হামাকে একটা টাকা দিন, দেখি।

সে টাকাটা লইয়া গাড়োয়ানের সঙ্গে একটু আড়ালে চলিয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরে দু'জনে যখন ফিরিয়া আসিল, গাড়োয়ানটা তখনও গজরাইতেছে।

সন্তোষ বুঝিল না, একটাকার মধ্যে ছয় আনা তাহার আশ্রয়দাতার ট্যাকস্থ হইল।

ঠাকুরঘরের পাশেই একটি ছোট একতলা বাড়ী। যমুনার উপরেই ছোট ঘরখানি; ভিতরে একখানি তক্তাপোষ পাতা; দেওয়ালে নানা দেবদেবীর ছবি। প্রতিকোণে দড়িতে বোধ করি পাণ্ডাঠাকুরদেরই মলিন বস্ত্র শোভা পাইতেছে। মেঝের উপর সন্তোষের মালপত্র বিক্ষিপ্ত।

পাণ্ডা ঠাকুর সেই ঘরে সন্তোষকে লইয়া ঢুকিলেন;—ব্যস্, বাবুজী, আভি আরামসে বিস্রাম্ করেন।

সন্তোষ কিন্তু বিশেষ 'আরাম' অনুভব করিতে পারিল না। সে মনে করিয়াছিল, পৃথক একখানি ঘর সে পাইবে। কিন্তু এ ঘরখানির মধ্য দিয়া আর একটি ঘরে যাইবার একমাত্র পথ। যে সে ক্রমাগত ইহার ইহার মধ্য দিয়া যাতায়াত করিতেছে। ঘরখানির প্রবেশ-পথের মুখে রোয়াকে বসিয়া অতি স্থূলকায় প্রায় একই প্রকার আকৃতিবিশিষ্ট পাঁচ ছয়টি লোক বসিয়া কখনও অবোধ্য হিন্দুস্থানী ভাষায় গল্প করিতেছে, কখনও বোন্‌ওয়ারীকে হাঁকডাক দিয়া নানারক হুকুম চালাইতেছে। তাহারা যখন হো হো করিয়া হাসিতে থাকে, তাহাদের ভুঁড়ির নর্ত্তন, সে এক দেখিবার জিনিষ।

সন্তোষ জামা ছাড়িয়া মালপত্রগুলা একটু গুছাইয়া রাখিয়া বাহিরে আসিয়া চারিদিক দেখিতে লাগিল।

ছোট ঠাকুরঘরটির মধ্যে অন্ধকারে কি ঠাকুর আছেন বাহির হইতে ভাল দেখা যায় না। যাহারা কখনও মোটারকম কিছু দান করিয়াছেন, ঠাকুরঘরের চত্বরে তাঁহাদের নামাঙ্কিত প্রস্তরফলক গাঁথা রহিয়াছে; অধিকাংশই বাঙালীর নাম। ঠাকুরঘরের মাথায় বাহিরের দেয়ালে, একটি কাঠের সাইনবোর্ডে আঁকা বাঁকা বাঙলা অক্ষরে লেখা, "নাক-ফুঁড়ি সাড়ে পাঁচ ভাই। বাংগালী যাত্রীর বহু পুরাণো পাণ্ডা।"

নামের মধ্যের বৈচিত্র্যটুকু লক্ষ্য করিয়া সন্তোষ তাহার কৌতূহল দমন করিতে পারে নাই; সে পাণ্ডাঠাকুরকে এরূপ নামের অর্থ জিজ্ঞাসা করায় সে পরে ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়া দিয়াছিল যে নাসিকা বিদ্ধ করা উহাদের বংশগত প্রথা; সেই হইতে "নাকফুঁড়ি" কথার উৎপত্তি; আর উহাদের ছয় সহোদরের মধ্যে পাঁচজনের অর্দ্ধাঙ্গিনী আছে, অর্থাৎ তাহারা বিবাহিত; সর্ব্বকনিষ্টটীর এখন পর্য্যন্ত অর্দ্ধাঙ্গিনী যোগাড় হয় নাই বলিয়া সে পূর্ণাঙ্গ হইতে পারে নাই, এবং সেইজন্যই তাহারা "সাড়ে পাঁচ ভাই"।

পাণ্ডাঠাকুর বলিল সন্তোষ যদি 'বিস্রাম ঘাটে' স্নান করিতে যায় ত সে সাথে করিয়া লইয়া যাইবে যাহাতে সে 'আরামসে আস্নান' করিতে পারে সেই জন্য। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে সন্তোষকে ঠাকুরের প্রসাদ বাবদ আট আনা পয়সা অগ্রিম দিতে হইবে, যাহাতে সে স্নান করিয়াই 'আরামসে' প্রসাদ আহার করিতে পারে।

কিন্তু ঘোর কলিকাল! প্রসাদের মূল্যের বহর শুনিয়া সন্তোষ বিস্মিত হইল। তাহা বুঝিয়া পাণ্ডা ঈষৎ হাসিয়া জিভ কাটিয়া বলিল,—বিশোয়াস করেন বাবু, ইস্‌মে হামলোককা কুছু নাফা নেহি; ঝুটবাৎ কাহে বোলেগা?

সন্তোষ তাহাই বিশ্বাস করিল। পাণ্ডাজীরও আর একদফা কিছু 'লভ্য' হইল। ঘাটে যাইতে পাণ্ডাঠাকুর বহু দুঃখের কাহিনী অনর্গল বকিয়া যাইতে লাগিল; ইংরাজী পড়িয়া আজকালকার 'বাংগালী' বাবুদের দেবদ্বিজে ভক্তিশ্রদ্ধা কিছুই নাই; পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর কত ধার্ম্মিক 'বাংগালী' দেবদর্শন ও পূজা করিতে আসিতেন; পাণ্ডাদের খুশী করিতে কাতর হইতেন না। হায়, তে হি নো দিবসা গতাঃ, ইত্যাদি।

স্নান করিয়া আসিলে 'বোনওয়ারী' শালপাতাতে করিয়া প্রসাদ দিয়া গেল। পাণ্ডা আসিয়া বলিল,—আভি আরামসে খাইয়ে লিন। সন্তোষের [illegible]

দাউ করিয়া জ্বলিতেছিল, কিন্তু প্রসাদের চেহারা দেখিয়াই তাহা মুহূর্ত্তে নির্ব্বাপিত হইল। তাহাতে আছে শুধু একমুঠা শুক্‌না ভাত, একটা বেগুণের কৃষ্ণবর্ণ ব্যঞ্জন, আর 'কাড়ি' নামক এক না-টক না-ঝাল অপরূপ 'এ্যামালগাম'। একটা শালপাতার ঠোঙাতে করিয়া এক ফোঁটা দধিও আছে। তাহার উপর অসংখ্য মাছির অসহ্য উপদ্রব!

শেষ পর্য্যন্ত ক্ষুধার তাড়নে সন্তোষকে সেই প্রসাদই 'আরাম্‌সে' গলাধঃকরণ করিতে হইল।

তাহার পর সেই ঘরে বসিয়া বসিয়া সন্তোষ বাড়ীর কথা ভাবিতে লাগিল। তিন চারিদিন হইল সে সুলতাকে আগ্রা হইতে চিঠি দিয়াছে; তখন মথুরা আসিবার ঠিক ছিল না বলিয়া সে তখন সে কথা কিছু লেখেও নাই। হয়ত ইতিমধ্যে সুলতা আগ্রার ঠিকানায় চিঠি লিখিয়াছে; সে চিঠি পাইবার কোন আশা নাই। খোকাটার জ্বর হইয়াছিল, কেমন আছে কে জানে। সুলতাকে পয়সা-কড়ি যাহা দিয়া আসিয়াছিল, ফুরাইয়া গিয়াছে লিখিয়া-ছিল। সংসারের এই অভাব-অনটনের মধ্যে তাহার এ-ভাবে বেড়াইতে বাহির না হইলেই হইত!

সে সুলতাকে লিখিল, আর বেড়াইতে ভাল লাগিতেছে না! তাহাদের জন্য বড় মন কেমন করিতেছে। সে সেইদিনই সন্ধ্যায় বাড়ী রওয়ানা হইবে।

সারাদিন ধরিয়া বৃন্দাবনের অসংখ্য মন্দির, দেবালয়, মঠ প্রভৃতি ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিয়া সন্তোষ অপরাহ্নে যখন বাসায় ফিরিল, ক্লান্তিতে শরীর তখন তাহার ভাঙিয়া পড়িতেছে। অবসন্ন শরীরটাকে একটু এলাইয়া না দিলে আর চলে না। কিন্তু তক্তাপোষটার উপর, একটা লোক—আকৃতি দেখিয়া পাণ্ডা বলিয়াই মনে হয়,—একটা ছোট মেয়েকে লইয়া দিব্য ঘুমাইতেছে; নাসিকাধ্বনিতে ঘরটা যেন কাঁপিতেছে। অথচ, সন্তোষ তাহার নিজের বেডিংটা আর খুলিতে চাহে না; কয় ঘণ্টা পরেই আবার ট্রেণে উঠিতে হইবে; তখন আবার বেডিং বাঁধা; সেও ত' এক কাণ্ড।

অগত্যা সে দেয়ালে ঠেশ দিয়া বেডিংটার উপরেই আচ্ছন্নের মত বসিয়া রহিল।

সম্মুখে ঠাকুরঘরের দালানে প্রায় পনেরো কুড়িজন খুব নিম্নস্তরের বাঙালী নরনারী সারি দিয়া অতি সম্ভ্রস্ত-ভাবে বসিয়া আছে। তাহাদের সম্মুখে একজন পাণ্ডা খুব ধমক দিয়া দিয়া তাহাদের মন্ত্র পড়াইতেছে। বেশীক্ষণ নহে; মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই মন্ত্রপাঠ শেষ হইয়া গেল। পাণ্ডা খুব হুম্‌কি দিয়া দক্ষিণা চাহিল। লোকগুলো বলির পাঁঠার মত কাঁপিতে কাঁপিতে যে যাহা পারিল দিয়া 'সুফল' লাভ হইল মনে করিয়া পরম তৃপ্ত হইল।

সন্তোষ কখন তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল; হঠাৎ কাহার কর্কশস্বরে তন্দ্রা ভাঙিয়া গেল। পাণ্ডাঠাকুর তখন হাসিতে হাসিতে বলিতেছে,—বাবুজী বহুৎ ঘুমকে আভি আরাম্‌সে—সন্তোষ মনে মনে বিলক্ষণ চটিয়াছিল, তাহার উপর আবার এই 'আরাম্‌সে' তাহার অসহ্য হইল। সে বিরক্ত হইয়া চক্ষু রগড়াইতে রগড়াইতে বলিল,—এখন যা'তে আরাম্‌সে এই সন্ধ্যার গাড়ীতে বিদায় হ'তে পারি তাই করো দিকিন্। ইহার অধিক সে আর কিছু বলিতে পারিল না।

পাণ্ডাঠাকুর তাহাকে সঙ্গে করিয়া ঠাকুরঘরের সম্মুখে লইয়া গিয়া তাহার খাতা খুলিয়া তাহাকে দিয়া তাহার নাম ধাম সব লিখাইয়া লইল।

ইহার পর সন্তোষ একখানা টাঙ্গা লইয়া আসিল। পাণ্ডাজীর হুকুমে 'বোন্‌ওয়ারী' তাহার মালপত্র টাঙ্গায় তুলিয়া দিল।

বিদায়ের পূর্ব্বে সে বলিল,—পাণ্ডাঠাকুর তোমাকে কি দেবো, বল দিকিন্?

পাণ্ডাঠাকুর বিনীতভাবে বলিল,—বাবুজীকো যেইসা মর্জ্জি; হামার কাম হামি করেসি, আভি আপ্‌কা—

সন্তোষ বলিল,—আমি ত' আগেই তোমায় বলেছি বাবু; এখন এই ছ' আনা নাও, তারপর যখন মাইজীর আসবে—

পাণ্ডাঠাকুর তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিয়া বলিল,—ও আপনি লিয়ে যান্ বাবু, হামাকে কুছু দিতে হোবে না।

সন্তোষ বুঝিল, পাণ্ডাঠাকুরের 'খাঁই' বড় অল্প নহে। বলিল,—কত চাও তা হ'লে তুমি?

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া পাণ্ডা যেন বোমার মত ফাটিয়া পড়িল,—হাম্‌লোক্ কাঙালী নেহি আছে যে ছ' আনা পয়সা লোবো; এহি মথুরাকা সব্‌সে পুরাণা পাণ্ডা হাম্‌লোক্; দো রূপিয়াকা কোম্‌তি কভি লেতাই নেহি; বোন্‌ওয়ারীকোই দেনে পড়েগা ছ' আনা। উয়ো আপনার মোট উৎরাইয়েসে, তুলিয়েসে, উস্‌কো ভি ত' কুছ দেভেন? তবু?

ততক্ষণে সাড়ে পাঁচ ভাই সকলেই সন্তোষকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছে। সন্তোষের চক্ষের সম্মুখে যেন দিগন্ত-প্রসারী ক্ষেত্র; তাহাতে শুধু সর্ষপপুষ্পের সমারোহ। সন্তোষ এরূপ বিপদে আর কখনও পড়ে নাই। সে ভিতরে ভিতরে সাধ্যমত সাহস সঞ্চার করিয়া মরিয়া হইয়া বলিল,—এই সব-শুদ্ধ্যু দশ আনা দিচ্চি, নিতে হয় নাও; না নাও ত'—

সে টাঙ্গায় উঠিয়া বসিল।

সাড়ে পাঁচ ভাইরা ফিরিয়া যাইবার উপক্রম করিল, নিজেদের মধ্যে কলরব করিতে করিতে, "আরে যানে দেও ভাই, যানে দেও," "বাংগালী বাবু হায়, ওই ওয়াস্তে", "মুফত্‌সে ধরম হোগা।"

সন্তোষ বলিল,—চালাও টাঙ্গা, এই।

টাঙ্গা চালক বধির কিনা ঠিক্ বুঝা গেল না; সন্তোষ যত বলে, 'চালাও', সে পাণ্ডাদের দিকে চাহিয়া নির্ব্বিকার-ভাবে বসিয়া থাকে।

পাণ্ডাঠাকুর আবার আসিয়া হাজির;—শুনেন বাবু, কেত্তো দিতে পারভেন আপনি ঠিক্‌সে বলিয়ে দিন'।

পাণ্ডাঠাকুরের পশ্চাতে তাঁহার আরও আড়াই ভাই আসিয়া দাঁড়াইল; বাকি দুই ভাই তফাতে দাঁড়াইয়া।

অপমানে, লজ্জায় সন্তোষের চক্ষু তখন অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিয়াছে। সে ভয়ে ভয়ে জানাইল যে সে 'মেরে কেটে' একটা টাকা দিতে পারে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাহাকে দেড় টাকার রফা করিতেই হইল। তখন টাঙ্গাওয়ালা টাঙ্গা চালাইল।

যাইবার সময়ে সন্তোষের অসহায় অবস্থা দেখিয়া পাণ্ডাজীর বোধহয় একটু করুণার উদ্রেক হইল; না হইলেও টাকাটা যখন করতলগত হইয়াছে, তখন ভবিষ্যৎ চাহিয়া দুইটা মিষ্টমধুর বাক্যব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হওয়া ব্যবসায়ের দিক হইতে খুব বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে ভাবিয়াই কণ্ঠস্বর সাধ্যমত মোলায়েম করিয়া পাণ্ডাজী বলিল,—বাবুজী, গোসা মাৎ করিয়ে। ঠাকুর বাহমন্‌কা কুছ নেহি দেনেসে তীরথ্ করম্‌কা কুছ্ ফল হোয় না। আভি আপনি হামাকে যব থোড়াসে ভি খুসী করিয়েসেন, গোবিন্দজী আপ্‌কা ভাল কোর্‌ভেন, আপ্‌কা বহুৎ অরথ্‌লাভ হোবে, জরু লেড়কাকো ভি আচ্ছা হোবে। আপনি দেখিয়ে লেভেন, বাহমন্‌কা বাৎ ঝুটা হোয় না।

ট্রেণে উঠিবার পর সন্তোষের কেবল পাণ্ডার সেই কথাটা মনে হইতে লাগিল, "জবান্ ঠিক ত' জনম ঠিক।"

গাড়ীতে বেশী ভিড় ছিল না। সন্তোষ গাড়ীর একটি কোণ দখল করিয়া বসিয়াছিল। সম্মুখের খোলা জানালা দিয়া হু হু করিয়া বাতাস আসিতেছে। আধো-আলো আধো-অন্ধকারে চলন্ত গাড়ী হইতে বাহিরের অবস্থা নৈশদৃশ্য বায়স্কোপের ছবির মত মনে হয়। দূরের ঐ বনঝোপগুলোর মধ্যে যেন অপরিমেয় শান্তি বিরাজ করিতেছে; নৈশ প্রকৃতি যেন ঐখানে অঞ্চল বিছাইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। সন্তোষের মনের সমস্ত গ্লানি পুলকের উচ্ছ্বাসে ভাসিয়া গেল। সুলতার কথা খোকার কথা মনে হইতে লাগিল; বিগত অতীতের কত পুরাণো ঘটনার কথা, কত ভুলে-যাওয়া সুখ-স্মৃতি মনের মধ্যে ভাসিতে লাগিল। হয়ত' সুলতা এখন খোকাকে বুকের মধ্যে লইয়া তাহারই কথা ভাবিতেছে; কিম্বা যে রকম 'ঘুমকাতুরে', হয়ত' অগাধ নিদ্রায় মগ্ন হইয়া তাহার স্বপ্ন দেখিতেছে। সকালে যে চিঠিখানা সে লিখিয়াছে, সেটা সে পৌঁছিবার পূর্ব্বে সুলতা পাইবে কিনা কে জানে। না পাইলেও বিশেষ মন্দ হয় না; সে সূর্য্য উঠিবার আগেই ত' সেখানে গিয়া হাজির হইবে; সুলতা তখনও শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিবেই না হয় ত'। তাহাকে হঠাৎ দেখিয়া সে আকাশ হইতে পড়িবে; নিজের চক্ষুকে সহসা বিশ্বাসই করিতে পারিবে না। তাহার পর যখন সে তাহাকে দিল্লী হইতে কেনা উৎকৃষ্ট বাদলার শাড়ীখানা উপহার দিবে, খোকাকে যখন আগ্রার পাথরের খেলনাগুলা খেলিতে দিবে, তখন তাহার কৃত্র

সংসারটিতে ক্ষণেকের জন্ম আনন্দ-স্রোত উচ্ছল হইয়া উঠিবে। সন্তোষ ভাবিতে ভাবিতে ক্রমে যেন সেই পরম শুভক্ষণটির জন্ম অধীর হইয়া উঠিতে লাগিল। নিত্য অভাব অনটনের সংসারে, কখনও তাহাদের ভাল একটা কিছু খাইতে অথবা পরিতে দেওয়া সম্ভব হয় নাই। খেলনাগুলা হাতে পাইলে খোকা আনন্দে আত্মহারা হইয়া ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলিয়া যাইবে। সহসা মনে পড়িল, খোকাটা ইদানীং বড় রোগা হইয়া গিয়াছে, কেবল চাকুরী ও টিউশনীর মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টা ডুবিয়া থাকায়, সেদিকে নজর করিবার অবসর হয় নাই, খেয়ালও হয় নাই। এবার যেমন করিয়াই হউক, কিছুদিন তাহার শরীরটার দিকে দেখিতে হইবে; দুধ বাড়াইয়া দিতে হইবে, কড্‌লিভার খাওয়াইবার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। না হয় অফিস যাইবার সময় ট্রামে না গিয়া হাঁটিয়া যাইলেই চলিবে। এই খোকার জন্যই সুলতা কি কম পূজা মান ত করিয়াছিল।

সন্তোষ ঘুমাইয়া পড়িল; নিশা শেষে স্বপ্ন দেখিল, খোকা তাহার ঘুমন্ত মাতার কোলের মধ্য হইতে অতি সন্তর্পণে বাহির হইয়া হাসিতে হাসিতে তাহার বুকের উপর আসিয়া মাথাটি রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

প্রত্যূষে তাহাদের গলির মোড়ে গাড়ী দাঁড়াইল, সন্তোষ গাড়োয়ানের সঙ্গে যে লোক ছিল, তাহার মাথায় সুটকেশটা চাপাইয়া দিল; বলিল,—গলিকা ভিতর থোড়া যানে হোগা, তোম্ আও হামরা পিছু।

যাইতে যাইতে পাথরের খেলনাগুলোর কথা মনে পড়িতে বলিল,—বহুৎ হুঁসিয়ারসে লেও বাবা, উস্‌কা অন্দর ছোটা লেড়কাকা পাথল্‌কা চিজ্ হ্যায়, দেখো টুটেমাৎ।

সে নিজে বগলে করিয়া বেডিং ও দুইহাতে অনেক-গুলা পুঁটুলি লইয়া আগে আগে চলিল; কতক্ষণ ধরিয়া দরজার কড়া নাড়িতে হইবে কে জানে।

পথে বোসেদের বাড়ীর 'নিতাই খুড়ো'র সহিত দেখা। তিনি সন্তোষকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া বলিলেন,—এক্ষুণি আস্‌ছ? বৌমার চিঠি পেয়ে বুঝি? আহা-হা, একটু আগে আস্‌তে যদি; ভোর হওয়ার সাথেই—

সন্তোষের বুক অজানা বিপদের আতঙ্কে দুরুদুরু করিতে লাগিল,—কেন, কেন? কি হয়েছে? বাড়ী—

—যাও ভায়া, বাড়ী যাও, তারপর—

গলির মোড় ঘুরিতেই চোখে পড়িল, বাড়ীর সম্মুখে পাড়ার অনেকগুলা লোক জটলা করিতেছে। সুলতার হৃদয়ভেদী করুণ আর্তনাদ শুনিয়াই ব্যাপারটা তাহার নিকট দিনের মত স্পষ্ট প্রতিভাত হইল; তাহার এতক্ষণের সমস্ত সুখস্বপ্ন মুহূর্ত্তে যেন আকাশে বিলীন হইয়া গেল। সন্তোষের মাথা যেন ঘুরিতেছে—দুর্ব্বল পদদ্বয় টলিতেছে। সুলতার কাতর ক্রন্দনধ্বনি ক্রমে যেন ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া তাহার অচেতন মনকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছে। শত সহস্র ঝিল্লী যেন কাণের কাছে অবিরাম গুঞ্জন করিয়া বলিতেছে,—নাই, নাই, নাই। চক্ষুর সম্মুখ হইতে আলোকের ক্ষীণতম রশ্মিটুকুও যেন অন্তর্হিত হইল; অন্ধকার শুধু অন্ধকার, গাঢ়, ঘন, কঠিন, অন্তহীন অন্ধকার! খোকার ক্ষুদ্র, নশ্বর পেলব মূর্ত্তিটাও যেন সেই অন্ধকারে ক্রমে ক্রমে মিশাইয়া যাইতেছে। কেবল বহুদূর হইতে যেন কাহার অতি ক্ষীণ অথচ কর্কশ কণ্ঠস্বর ভাসিয়া আসিতেছে,—গোবিন্‌জী, আপ্‌কা ভালা কোরভেন; আপনি দেখিয়ে লেভেন, বাহমন্‌কা বাৎ কভি ঝুটা হোয় না।

তারপর? অতল, অপরিমেয়, অসীম বিস্মৃতি।

সাধারণ কর্ত্তৃক বোনাস পরীক্ষা

শ্রীপূর্ণচন্দ্র রায় এম্-এ, বি-এল

ভারতবর্ষে বীমার অনুশীলনের ফলে বহু জীবন-বীমা কোম্পানির সৃষ্টি হইয়াছে এবং তাহারা নূতন বীমা সংগ্রহের জন্য বিবিধি চিত্তাকর্ষক পদ্ধতির সাহায্যে পরস্পরের সহিত প্রতিযোগিতা আরম্ভ করিয়াছে। বীমাকারীর চিত্তাকর্ষণের জন্য দ্বিবল (double), ত্রিবল (trible) ও বহুবল উপকারযুক্ত বীমাচুক্তি, স্বতঃসংরক্ষণ অক্ষমতার সুবিধাযুক্ত বীমা এবং বহু প্রকারের বর্ণনীয় বিবিধ সুবিধাযুক্ত বীমাপত্রের প্রচলন হইতেছে। কিন্তু সর্ত্ত ও সুবিধা প্রদত্ত চাঁদার অতিরিক্ত হইতে পারে না সুতরাং গণিতশাস্ত্রের নির্দ্দেশানুযায়ী পদ্ধতিগুলি প্রতিযোগীগণের হস্তে নিঃশেষ হইয়া যাইতেছে এবং তাহারা বীমাকরণেচ্ছু ব্যক্তিগণের আকর্ষণের জন্য অন্য উপায়ের অনুসন্ধানে তৎপর হইতেছে। জীবনবীমা কোম্পানির সুদক্ষ পরিচালকগণ শীঘ্রই বুঝিতে পারিলেন যে মানুষের লাভের প্রতি তীব্র আসক্তি আছে এবং মোট যে টাকার জন্য বীমা হইয়াছে—তদপেক্ষা যদি কিছু বেশী দেওয়া যায় তাহা হইলে লাভলিপ্সাপরায়ণ মনুষ্যদিগকে আকর্ষণ করিবার উৎকৃষ্ট বিজ্ঞাপন হইবে। এই সিদ্ধান্ত খুবই কার্য্যকরী প্রতিপন্ন হইয়াছে এবং আধুনিক জীবনবীমার ব্যবসায় প্রতিযোগিগণের মধ্যে প্রত্যেক ভ্যালুয়েশানে অধিকতর চক্রবৃদ্ধি বোনাস ঘোষণায় পর্য্যবসিত হইয়াছে।

আমি এক মুহূর্ত্তের জন্যও বলিতেছি না ভারতীয় উৎকৃষ্ট জীবনবীমা কোম্পানিগুলি ভ্যালুয়েশান ভিত্তির উপর যথোচিত লক্ষ্য না রাখিয়া শুধু বিজ্ঞাপনের নিমিত্ত বোনাস (লভ্যাংশ) প্রদান করিতেছেন। আমার বক্তব্য এই যে অধিকাংশ স্থলেই এ লভ্যাংশ ঘোষণা কোম্পানী কর্ত্তৃক ধার্য্য চাঁদার হারের দ্বারা সমর্থিত হয় না এবং ব্যয়ের অনুপাতের সহিত সামঞ্জস্য বিহীন। বীমাকরণেচ্ছু অনভিজ্ঞ জনসাধারণ যাহাতে এ বিষয়ে একটা মোটামুটি ধারণা লইয়া কোন কোম্পানির লভ্যাংশকে তাহার অবিকল বিজ্ঞাপিত মূল্যস্বরূপ গ্রহণ না করিয়া নিজেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন সেজন্য এ প্রবন্ধ লিখিত হইল।

জীবনবীমা কোম্পানী চাঁদার যে হার নির্ণয় করে তাহাতে কোম্পানীর কার্য্যপরিচালনের ও অপ্রত্যাশিত প্রয়োজনের নিমিত্ত প্রকৃত চাঁদার (net primium) সহিত কিছু বেশী (loading) ধরা হয়। অনুমোদিত তালিকা হইতে মৃত্যুহারের অঙ্ক কষিয়া ও কোম্পানীর উদ্বৃত্ত অর্থের উপর আদায়যোগ্য সম্ভাব্য সুদের হার ধরিয়া প্রকৃত চাঁদা স্থির হয়। যেহেতু ভারতীয় কোম্পানীগুলি যে মৃত্যু তালিকা অনুধাবন করেন তাহা কার্য্যতঃ সমান এবং চাঁদার হার প্রভৃতে সুদের হারের বিভিন্নতা প্রায়শঃ দেখা যায় সুতরাং কার্য্যতঃ আমরা ধরিয়া লইতে পারি

যে ভারতীয় বীমা কোম্পানীগুলির প্রকৃত চাঁদার হার প্রায় একই। ভিন্ন ভিন্ন কোম্পানীর প্রচলিত চাঁদার হারে আমরা যে পার্থক্য দেখিতে পাই তাহা নিজ নিজ অপিসের কার্য্যপরিচালনার জন্য অতিরিক্তরূপে ধরা হয়। সুতরাং কার্য্যক্ষেত্রে বীমাকারীর মৃত্যুর কম বেশীর জন্য যে সামান্য লাভ হয় তাহা বাদ দিলে কোম্পানীর লাভ প্রধানতঃ ব্যয় সঙ্কোচতা এবং অনুমিত সুদের অতিরিক্ত উপার্জ্জনের উপর নির্ভর করে। এই লভ্যাংশ বীমাকারিগণের মধ্যে চক্রবৃদ্ধি বোনাসরূপে বিতরিত হইয়া থাকে।

সুদের হার যেখানে যত বেশী, মূলধন নষ্ট হইবার সম্ভাবনা তথায় ততোধিক। এই কথাটি সাধারণতঃ সত্য বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। জীবনবীমা কোম্পানীর দায়িত্ব বা ঋণ নির্দ্দিষ্ট, একদিন না একদিন তাহাদিগকে বীমাকারীর নিকট হইতে আদায়ী চাঁদার টাকা ফিরাইয়া দিতে হইবে—তাহা হয় বীমাকারীর মৃত্যু শেষে কিম্বা মেয়াদ শেষে অথবা বীমাকারীর অকাল মৃত্যুতে। অধুনা বীমার কার্য্যসংগ্রহের জন্য কোম্পানী-গুলিকে যেরূপ ব্যয় বহন করিতে হয় তাহাতে কোন বীমাপত্র বাজেয়াপ্ত হইলে বা সমর্পিত হইলে তাহার জন্য কোম্পানীর কোন লাভ হয় না। সুতরাং কার্য্যতঃ সুদ উপার্জ্জন কোম্পানীর একমাত্র লাভের উপায়। এই সুদ উপার্জ্জনও নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন অর্থাৎ অতিরিক্ত সুদের মোহে মূলধন নষ্ট হইবার আশঙ্কা না থাকে। সুতরাং দেশের বর্ত্তমান অবস্থার মধ্যে মূলধনের ক্ষতি না করিয়া শতকরা ৫৲ টাকার অধিক অর্জ্জিত হইতে পারে না এবং ভ্যালুয়েশানকালীন শতকরা ৪।০ বা ৪৸০ টাকা অধিক সুদের হার কোনক্রমেই ধরা যাইতে পারে না। আমি আনন্দিত যে আমাদের প্রায় সমস্ত জীবনবীমা কোম্পানীগুলিই হিসাব-নিকাশে এই সীমা অতিক্রম করিতেছেন না।

সুতরাং আমরা দেখিতেছি, বোনাস কার্য্যতঃ দুইটি বিষয় দ্বারা স্থির হইতেছে—

(ক) ধার্য্য চাঁদার হার।

(খ) ব্যয়ের অনুপাত।

অন্যভাবে বলা যাইতে পারে যে, সাধারণতঃ চাঁদার হার বেশী এবং ব্যয়ের অনুপাত যত কম হইবে বোনাসের হার তত বেশী হইবে। এবং চাঁদার হার যত কম এবং ব্যয়ের অনুপাত যত বেশী হইবে বোনাসের হার তত হ্রাস হইবে। সাধারণ অবস্থায় এইরূপই ঘটিয়া থাকে। ইহার ব্যতিক্রম দেখিলে লভ্যাংশ কোথা হইতে আসিল তাহার বিচার করিতে হইবে।

কতকগুলি প্রাচীন এবং সুপ্রতিষ্ঠ কোম্পানীর বোনাসের হার বিনা বিচারে স্বাভাবিক ধরিয়া লইয়া তুলনার জন্য তাহা অপর কতকগুলি কোম্পানীর সহিত মিলাইয়া তাহাদের চাঁদার হার, ব্যয়ের অনুপাত এবং বোনাসের নিম্নে প্রদত্ত হইল—

বয়স ৩০—২০ বৎসরের মেয়াদী বীমা (লাভসহ)

কোম্পানীর নাম	এক সহস্র টাকার চাঁদার হার টাকা আনা	শতকরা ব্যয়ের হার টাকা	বোনাস টাকা প্রতিসহস্র
ওরিয়েণ্টাল—	৫৫-৫	২৪—	২০
এম্পায়ার—	৫১-৪—	২৩—	১২
নর উইচ ইউনিয়ন—	৫৫-১২—	১৫—	২০
নর্থ বৃটিশ—	৫৪-২	১৭—	২০
হিন্দুস্থান কোয়াপেরেটিভ	৫২-১	৩৫—	২০
ইণ্ডিয়া ইকুইটেবল—	৫৪—	৪৫—	১২
হিন্দু মিউচাল—	৪৬-৮—	৩১—	

উপরের তালিকায় ৭টি কোম্পানীর মধ্যে চারটি কোম্পানী হাজার করা ২০৲ টাকা হারে, দুইটি কোম্পানী ১২৲ টাকা হারে বোনাস ঘোষণা করিয়াছেন এবং শেষোক্ত কোম্পানীটি কোন বোনাসই ঘোষণা করেন নাই।

উচ্চতম বোনাস ঘোষণাকারী চারটি কোম্পানীর মধ্যে তিনটি প্রায় ৫৫৲ টাকা হিসাবে চাঁদা গ্রহণ করিতেছেন কিন্তু অবশিষ্টটি ৩৲ টাকা কম চাঁদা লইতেছেন। উক্ত তিনটির ব্যয়ের অনুপাত শতকরা ১৫৲, ১৭৲ এবং ২৪৲ এবং অপরটি শতকরা ৩৫৲ টাকা অর্থাৎ ১১৲ [illegible] অধিক। সুতরাং সাধারণ অবস্থায় এই কোম্পানী [illegible] কোন বোনাস দিতে সমর্থ হইলে তাহার [illegible] অপেক্ষা অনেক কম হওয়া উচিত ছিল কিন্তু [illegible]

বোনাসের হার সমান রহিয়াছে। কথিত কোম্পানীর এই অস্বাভাবিক বোনাস ঘোষণা করিবার জন্য সুযুক্তিপূর্ণ কৈফিয়ৎ নিঃসন্দেহে থাকিতে পারে কিন্তু এই অস্বাভাবিক উচ্চহারের বোনাস এতই বিসদৃশ যে হিতাহিত জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি এই কোম্পানীর ভবিষ্যত বিষয়ে সন্তুষ্ট হইবার বা যন্ত্রচালিত যুগে অলৌকিক ঘটনায় বিশ্বাসস্থাপনের পূর্ব্বে ঐ কোম্পানীর আয়ের উৎস কোথায় অনুসন্ধান করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তাহা সমর্থন করা যায়। অন্যান্য দুইটি কোম্পানী হাজার করা ১২৲ টাকা মাত্র বোনাস ঘোষণা করিয়াছে। ইহার মধ্যে এম্পায়ারের খুব নিম্ন চাঁদার হার এবং খুবই স্বল্প ব্যয়ের হার—প্রকৃত পক্ষে ভারতীয় প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন বীমার কোম্পানীগুলির মধ্যে সর্ব্বনিম্ন ব্যয় হার সুতরাং তাহার পক্ষে ১২৲ টাকা বোনাস ঘোষণা স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয় কিন্তু ইণ্ডিয়া ইকুইটেবলের ২৸৹ চাঁদা বেশী সমেত ব্যয়ের হার এতই বৃদ্ধি পাইয়াছে যে তাহার পক্ষে ১২৲ টাকা বোনাস্ দেখিলে অবশ্যই তাহার কৈফিয়ৎ জানা স্বাভাবিক। শেষোক্ত হিন্দু মিউচাল সর্ব্বাপেক্ষা কম চাঁদা লইয়া থাকে এবং প্রথমোক্ত চারিটি কোম্পানী অপেক্ষা তাহার ব্যয়ের হার অনেক বেশী সুতরাং এ কোম্পানী যে কোন বোনাস্ ঘোষণা করিতে পারে নাই তাহাও স্বাভাবিক।

ওরিয়্যাণ্টাল, এম্পায়ার, নরউইচ ইউনিয়ন, এবং নর্থ বৃটিশের সিকিউরিটি এবং হিসাব নিকাশ বিষয়ে কেহ কোন আপত্তি করে নাই সেজন্য যে সমস্ত সাধারণ লোকেরা গণিতশাস্ত্রের নির্দ্দেশানুযায়ী লভ্যাংশ বিতরণ করিবার প্রণালীকে বিচার করিতে পারে না তাহাদের জন্য ঐ সকল কোম্পানীর হারগুলিকে standard বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। কাজেই আমার মনে হয় কোন কোম্পানী সাধারণের পৃষ্ঠপোষকতা প্রার্থী হইলে তিনি কতকগুলি প্রাচীন এবং সুপ্রতিষ্ঠ কোম্পানীর সহিত উহার চাঁদার হার, এবং ব্যয়ের অনুপাত তুলনা করিয়া দেখিলে ঐ কোম্পানীর লভ্যাংশ স্বাভাবিক কিনা তাহার একটা ধারণা করিতে পারে।

উল্লিখিত সাধারণ পরীক্ষানুযায়ী যদি তিনি বলিতে পারেন ঐ বোনাস অস্বাভাবিক অথবা বোনাসের হার মিথ্যা এই সিদ্ধান্ত কখনই না করিয়া এই অস্বাভাবিক বোনাসের একটি কৈফিয়ৎ গ্রহণ করিবেন এবং উক্ত কোম্পানীতে বীমা করিবার পূর্ব্বে ঐ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইবেন। তিনি আর একটু কষ্টস্বীকার করিলে তুলনা না করিয়াও কোন কোম্পানীর বোনাস হারটি চাঁদার হার এবং ব্যয়ের অনুপাতের সহিত সামঞ্জস্য আছে কিনা তাহা বিজ্ঞানসম্মত ভাবে বিচার করিয়া দেখিতে পারেন। তাহা হইলে তিনি সাধারণতঃ—প্রচলিত ও-এম্ নামক মৃত্যুতালিকার বয়সের সহিত ছয় বৎসরের যোগ করিয়া শতকরা ৪৲ বা ৪৷৹ সুদ ধরিয়া ঐ কোম্পানীর প্রকৃত চাঁদার হার স্থির করিতে পারিবেন। তিনি এই সকল বিষয় যে কোন একচুয়ারীর নিকট হইতে অনায়াসে পাইতে পারেন। এই প্রণালীতে ৩০ বৎসর বয়সে ১০ বৎসরের মেয়াদী বীমার হাজার করা প্রকৃত চাঁদা মোটামুটি ৮৫৲ টাকা হয় এবং ২০ বৎসরের মেয়াদী বীমার ৪০৲ টাকা হয়। এই অঙ্ক হইতে কোম্পানীর অপিস প্রিমিয়ামের জন্য অতিরিক্ত চাঁদা বাদ দিলে loading বা অতিরিক্ত চাঁদা ধরা যাইবে। যদি ব্যয়ের অঙ্ক এই অতিরিক্ত চাঁদার মধ্যে থাকে তবে কোম্পানীর পক্ষে বোনাস ঘোষণা করিবার সম্ভাবনা থাকে।

এই সঙ্গে দেখা উচিত কোম্পানী কিরূপ হারে সুদ অর্জ্জন করিতেছে এবং ভ্যালুয়েশনকালীন অনুমিত সুদের হইতে ইহা কত বেশী। যদি বেশী হয়, তবে ইহা বোনাস বিতরণের একটি উৎস বলিয়া ধরা যাইতে পারে। এখন যদি ঐ সুদ শতকরা ৫৲ টাকার অনেক বেশী হয় তবে দেখিতে হইবে কোম্পানীর লগ্নি-নীতি নিরাপদ কিনা। এই বিষয় এবং কোম্পানীর সম্পত্তিসমূহ প্রকাশিত উদ্বর্ত্ত পত্রে পরীক্ষিত হইতে পারে। এইরূপ পরীক্ষায় যদি দেখা যায়,- যে সুদ অর্জ্জনে এবং অতিরিক্ত চাঁদার বাড়তি (margin) ঐ হারে বোনাস ঘোষণা করিবার পক্ষে অপ্রচুর অথবা কোম্পানীর লগ্নি-প্রণালী সন্তোষজনক নহে তবে কোম্পানী ঐ বোনাস ঘোষণাসত্ত্বেও উহাকে পরিত্যাগ করিলে সুবিবেচনার কার্য্য করা হইবে।

ইহা সত্য একচুয়ারীর বিচার বিশ্বাসের উপর

বোনাস ঘোষিত হইয়া থাকে। হিসাব-নিকাশ হিসাবে তাহা ঠিক হয় কিন্তু ইহাও স্মরণ করা উচিত যে একচুয়ারীগণকে কোম্পানী ভ্যালুয়েশনের সময় যে সকল হিসাবপত্র (date) দেন তাহার সত্যাসত্য বিষয়ে কোম্পানীর চিত্তের গুণাগুণ সম্বন্ধে বা অর্জ্জিত সুদের একচুয়ারীগণ কোন নির্ভরতা দেন না।

যে সকল কোম্পানী তাহাদের সঞ্চিত অর্থ কোম্পানীর কাগজে কিম্বা বাজারের বিক্রয়যোগ্য সিকিউরিটিতে লগ্নী করে তাহাদের সম্পত্তির মূল্য সহজেই পরিমিত হইতে পারে। কিন্তু যে সকল কোম্পানী জমিতে বা অধিক লাভের প্রত্যাশাযুক্ত সিকিউরিটিতে (উঠা নামার জন্য যাহাদের কোন বিশ্বাস যোগ্য বাজার দর পাওয়া যায় না) লগ্নী করে তাহাদের কথা বলা শক্ত। আমি এ কথা বলিতেছি না যাহারা কোম্পানীর কাগজ বা বাজার বিক্রয়যোগ্য অন্ত সিকিউরিটিতে ধননিয়োগ না করে তাহাদিগকে বিশ্বাস করা যায় না কিন্তু আমার বক্তব্য এই যে উদ্বর্ত্ত পত্র দৃষ্টে সাধারণের পক্ষে এই সকল সম্পত্তির প্রকৃত মূল্য পরিমাপ করা নিতান্ত শক্ত। সুতরাং সাধারণ ব্যক্তি তাহার পছন্দের জন্য মোটামুটি জ্ঞানের উপরই নির্ভর করিবে।

উপসংহারে বলিতে চাই বীমাকরণেচ্ছু ব্যক্তিগণ কোন কোম্পানীর চক্রবৃদ্ধিরূপ বোনাসের হার দেখিয়াই মুগ্ধ না হন; তাঁহারা যেন কোম্পানীর চাঁদার হার এবং বিশেষতঃ ব্যয়ের অনুপাত এবং দাদননীতি বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া তারপর নির্ব্বাচন করেন।

লেখক কর্ত্তৃক লিখিত ১৯৩০এর বার্ষিক সংখ্যা ইণ্ডিয়ান ইনসিওরেন্স জর্ণাল এ সুবিখ্যাত মূল প্রবন্ধ "Examination of Bonus declaration by laymenএর অনুবাদ।"

বিচিত্রা

বীমাকরণেচ্ছু ব্যক্তিগণের আকর্ষণের জন্য বিভিন্ন কোম্পানীর সুদক্ষ অধ্যক্ষগণ যেমন উচ্চতম বোনাস ও নানারূপ চিত্তাকর্ষক প্রণালী ঘোষণা করিতেছেন সেইরূপ বীমাপ্রাণ বঙ্গদেশেও বীমাপত্রিকাগুলি আপনার বিজয়-নিশান উড্ডীয়মান করিবার জন্য একযোগে বাহির হইয়া পড়িয়াছেন। ক্ষাত্রতেজের জ্বলন্ত মূর্ত্তি, লোক অনুরাগ-প্রিয় রামচন্দ্র ১০৮টি রক্তজবার দ্বারা ইষ্টদেবের মনস্তুষ্টি করিয়াছিলেন কিন্তু বীমা-লক্ষ্মীকে অঙ্কশায়িনী করিতে হইলে যে ঘোরতর সাধনার প্রয়োজন দেখিতেছি। বোমা বিফল হইয়া গেল, বারীনদা অলীক বিদ্বেষদুষ্ট সংবাদদাতার দোহাই দিয়া আত্মরক্ষা করিলেন—বাণীর বরপুত্র ও কন্যাগণ বীমা-লক্ষ্মীর নৈবেদ্য সাজাইলেন—বীমার গীতা পর্য্যন্ত বাহির হইল—ভ্রাতা ভ্রাতার স্নেহপাশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইল—আত্মীয় স্বজন, বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে ঈর্ষা ও মনোমালিন্য দেখা দিল—কিন্তু লক্ষ্মী তো তথাপি প্রসন্নস্মিত হাস্যে দেখা দিলেন না।

বাংলার তপকুচ্ছ সাধনারত তরুণ আজ বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে—পাষাণী লক্ষ্মীর পূজা আর হইবে না—যোড়শোপচারের অর্ঘ্য সাজাইবার প্রয়োজন নাই!

* * * * *

আমরা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম কার্য্যের প্রসারহেতু লক্ষ্মী ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীর বঙ্গ দেশের শাখা অফিস ১৫নং চৌরঙ্গি স্কোয়ার এভিনিউ হাউসে স্থানান্তরিত হইয়াছে। লক্ষ্মীর অভ্যুত্থান ও কার্য্যবিস্তারের কাহিনী ভারতের বীমাজগতের এক রোমাঞ্চকর অধ্যায়। বঙ্গদেশস্থ শাখা বিভাগের অধিনায়ক শ্রীযুক্ত কে, বি, মুখোপাধ্যায় মহাশয় কর্ম্মক্ষম, সদাশয় ও অমায়িক বলিয়া পরিচিত—নবগৃহে প্রবেশ করিয়া আশা করি তিনি মহাজন বাক্য "মিষ্টান্ন মিতরেজনা"র অমর্য্যাদা করিবেন না। আগামী সংখ্যায় আমরা লক্ষ্মী সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিবার ইচ্ছা করি।

মিলন বৈঠক ও ভোট সমস্যা :— ইউনিটি কনফারেন্স বা সার্ব্বজনীন মিলন পরিষদের ব্যবস্থায় অনেকে সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। যাঁহারা ভারতে কোন প্রকার মিলনেরই পক্ষপাতী নহেন, তাঁহারা এই মিলনের প্রস্তাব হওয়া অবধিই একটু বক্র দৃষ্টিপাত করিয়া আসিতেছিলেন। কলিকাতার ইউরোপীয় সম্প্রদায় বা সাম্রাজ্যবাদী দল কখনই কোন প্রকার মিলন প্রস্তাবে সন্তুষ্ট হইতে পারে না, সুতরাং তাহারা যে সার্ব্বজনীর মিলন পরিষদের সিদ্ধান্তগুলি মানিয়া লইবে না তাহা পূর্ব্ব হইতেই অনেকের জানা ছিল। একদল মুসলমান আছেন তাঁহারা কোনপ্রকার মিলনই আকাঙ্ক্ষা করেন না, তাঁহারা শুধু চাহেন ইংরাজগণ তাঁহাদিগকে শাসন-পরিষদরূপ ব্যূহের অগ্রভাগে স্থাপন করুন। এই দলই ১৯০৬ খৃষ্টাব্দ হইতে যখনই কোন প্রকার শাসন-সংস্কার দিবার কথা উঠিয়াছে, তখনি আপনাদের তরফ হইতে নানা প্রকার ওজর দেখাইয়া সামর্থ্যের অতিরিক্ত সুবিধা ভোগ করিবার অধিকার দাবী করিয়া আসিয়াছেন! কলিকাতায় হিন্দুমহাসভার যে শাখা আছে তাঁহারাও লণ্ডনে মিঃ জায়কারকে তার করিয়া জানাইয়াছেন যে তাঁহারা পরিষদের সিদ্ধান্ত মানিয়া লইতে প্রস্তুত থাকিলেও সর্ব্বস্ব হারাইয়া হিন্দু-মুসলমান সদ্ভাব অর্জ্জন করিতে প্রস্তুত নহেন। তাঁহারা বলিয়াছেন যে সাইমন কমিশনের সিদ্ধান্তে বাংলার মুসলমানগণ বাংলার আইন পরিষদে যে কয়েকটী সদস্যপদ পাইতেছিলেন, মিঃ ম্যাকডোনাল্ডের প্রস্তাবে তাহা অপেক্ষা অধিক সংখ্যক সভ্য প্রদান করিবার প্রস্তাব হইয়াছে। মুসলমানগণ যেন সরকার পক্ষের নিকট হইতে আর অধিক সুবিধা অর্জ্জনের সুবিধা নাই দেখিয়া হিন্দুগণের সহিত নানাবিধ সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়া তাহাদের বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত ৫১টী সদস্যপদ চাহিতেছে। তাহাদের প্রস্তাব অনুযায়ী এই ৫১টী সদস্যপদ প্রদান করিতে গেলে বাংলার হিন্দুদের সদস্য সংখ্যা ৭৫টী মাত্র হইবে। তাহার পর পুণা প্যাক্ট অনুযায়ী ৩০টী সদস্যপদ অস্পৃশ্য সম্প্রদায়ের জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলে, উচ্চশ্রেণী হিন্দু সদস্য সংখ্যা বাংলায় মাত্র ৪০টী হইয়া দাঁড়ায়। হিন্দু সভা ঠিকই বলিয়াছেন যে যদি হিন্দুগণ সার্ব্বজনীন পরিষদের সিদ্ধান্তানুযায়ী শতকরা ৪৭টী সদস্য-পদ পায় তাহা হইলে মুসলমানগণকে ৫১টী পদ ছাড়িয়া দিতে তাঁহাদের কোন আপত্তি নাই। একটু বিশেষ করিয়া ভাবিলেই উহার গলদ কোথায় তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। হিন্দু সদস্য সংখ্যা শতকরা ৪৭টী এবং মুসলমান সদস্য সংখ্যা ৫১টী হইলে, মাত্র ২টী সদস্য পদ অবশিষ্ট থাকে। এই দুইটী পদ এংলো ইণ্ডিয়ান ও ইউরোপীয়গণকে প্রদান করিলে তাঁহারা কি তাহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারিবেন? পণ্ডিত মালব্যজী কলিকাতায় আসিয়াছিলেন শুনিয়াছি। তিনি নাকি কয়েকটী ভোজ সভায় অনেক ইউরোপীয় সদস্যগণের সহিত দেখা সাক্ষাৎ ও করিয়াছিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য কতদূর সফল হইয়াছে এখনও তাহা সর্ব্বসাধারণে প্রকাশিত হয় নাই। তবে উদ্দেশ্য সফল হইবার আশা অল্প তাহা বোঝা যাইতেছে।

গোলটেবিলের জের ঃ— বিলাতে তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠক বসিয়াছে। ঠিক হইয়াছে যে উহা আগামী বড়দিনের মধ্যে সমাপ্ত করিতে হইবে। তাহার কারণও আছে। ইংরাজ সাম্রাজ্য এখন খুব বড় বড় কথা লইয়া চিন্তিত। ১৫ই ডিসেম্বরের মধ্যে তাহাদিগকে আমেরিকার ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে।

অটোয়া কনফারেন্স লইয়া তাহারা বিশেষ ব্যতিব্যস্ত। চীন-জাপান সমস্যাও খুব সঙ্গীন। কাজেই ভারতবর্ষের ব্যবস্থাটা যতদূর শীঘ্র পারা যায় শেষ করাই যুক্তিসঙ্গত। ভারতবর্ষ হইতে সরকার পক্ষ কর্ত্তৃক মনোনীত যে সমস্ত সদস্য গিয়াছেন তাঁহারাও বলিয়াছেন যে, গোলটেবিলের কার্য্য বড়দিনের মধ্যে শেষে হইলেই ভাল। শীতটা বিলাতে ভীষণ, সুতরাং তাড়তাড়ি চলিয়া আসিতে পারিলে মন্দ হয় না। এই সমস্ত কার্য্য কারণ দেখিয়া মনে হয় গোল-টেবল বৈঠক আহ্বান না করিয়া, বিলাতী সরকার একটা খসড়া প্রস্তুত করিয়া ভারতবর্ষে পাঠাইয়া উহা অনুমোদিত করাইয়া লইলেই পারিতেন। সরকার পক্ষ হইতে স্পষ্টই বলা হইয়াছে যে কেন্দ্রীয় সরকারে যথেষ্ট ক্ষমতা রক্ষা করা হইবে। প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাগণকেও যথেষ্ট অতিরিক্ত ক্ষমতা প্রদান করা হইবে। উত্তরে আমরা পূর্ব্বেকার কথাই বলিতেছি; ভারতবর্ষ যখন ইংরাজ সরকারের হস্তগত হয় তখন উহার শাসন প্রথা কেন্দ্র কর্ত্তৃক স্থিরীকৃত হইত। দিল্লী ভারতের শাসক ছিল, প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাগণ, দিল্লীর আজ্ঞাবাহক ছিলেন মাত্র, পিটের ইণ্ডিয়া বিল ও রেগুলেটিং এ্যাক্টে ঐ প্রথায়ই নূতনভাবে চালান হইয়াছিল। দিল্লীর পরিবর্ত্তে কলিকাতাকে ভারতের কেন্দ্রীয় শাসনের পিঠস্থান করা হয়। বাংলার শাসন কর্ত্তাকেই সর্ব্বময় প্রভু করিয়া প্রাদেশিক গভর্ণরদিগকে তাঁহার তল্পিদার করিয়া দেওয়া হয়। এই প্রথায় যথেষ্ট সুফল পাওয়া যায়। অচিরেই সারা ভারতবর্ষ ইংরাজের মুঠার মধ্যে আসিয়া পড়ে। আমাদের সম্মুখে যখন এত বড় একটা ঐতিহাসিক সত্য বিদ্যমান রহিয়াছে তখন প্রদেশগুলিকে স্বতন্ত্র করিয়া দিবার কি প্রয়োজন? প্রত্যেক প্রদেশকে পূর্ব্বতন প্রথায় একজন শাসনকর্ত্তা ও চিফ্ সেক্রেটারির দ্বারা শাসন করিলেই ত চলিতে পারে। ভারতীয়গণকে শাসন পরিষদের মধ্যে লইবার প্রয়োজন হইয়াছে স্বীকার করিলে, তাহাদিগকে কেন্দ্রীয় সরকারেই ত লওয়া যাইতে পারে। এইরূপ বলিবার আমাদের যথেষ্ট কারণ আছে। কেন্দ্রীয় সরকারে কোন প্রকার সংস্কার প্রদান না করিলে প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্যের কোন মূল্য থাকে না, আবার শুধু মাত্র রাজনীতির উপর নজর রাখিয়া প্রদেশগুলিকে নূতন আকার প্রদান করিতে গেলে নানা প্রকার অসন্তোষ সৃজন করা হয়। মৌর্য্য সাম্রাজ্যের সময় হইতে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা একটী অবিভক্ত প্রদেশ বলিয়া বিবেচিত হইয়া আসিয়াছিল। বর্ত্তমান বেহারে বাঙ্গালী জাতির বহু কীর্ত্তি ও সম্পত্তি বিদ্যমান। বেহারী ভাষাও বাংলার অনুরূপ। এখন একটীর স্থলে তিনটী প্রদেশ গঠন করিয়া অনৈক্য প্রধান ভারতে কি নূতন বাধার সৃজন হইতেছে না! সিন্ধু চিরকালই বোম্বায়ের অন্তর্ভুক্ত থাকিয়া উহার সভ্যতা গঠন করিয়া আসিয়াছে। মহম্মদ বিণ কাশিমের আমলেও সিন্ধু বোম্বায়ের অধীন ছিল। উহাকে স্বতন্ত্র প্রদেশে পরিণত করিলে নূতন অনৈক্যেরই কি সৃজন হইবে না?

ইঙ্গ-ভারত বৈষম্য সমস্যা :—

ভারতের সামন্ত রাজগণ বাহ্যতঃ ফেডারল ভারতের পক্ষপাতী হইলেও কার্য্যতঃ সম্মিলিত ভারত তাঁহারা চাহেন না। সামন্ত রাজগণের অনেকেই বহুদর্শী ও বিজ্ঞ নৃপতি। তাঁহারা বৎসরের মধ্যে অনেক সময়ই ইউরোপ ও আমেরিকায় ভ্রমণ করিয়া থাকেন। তাঁহারা বিলক্ষণই অবগত আছেন যে, বর্ত্তমান Democratic যুগে তাঁহারা পুরাতন পুঁথির কীট-দষ্ট পৃষ্ঠা মাত্র। ভারতে প্রজাশক্তি বৃদ্ধি পাইলেই তাঁহাদিগকে বাণপ্রস্থ অবলম্বন করিতে হইবে। সুতরাং তাঁহারা সাধারণতন্ত্র অপেক্ষা রাজতন্ত্রেরই অধিক ভক্ত হইবেন ইহাত খুব স্বাভাবিক। বংশগত বৈশিষ্ট্য ও অর্থ তাঁহাদের কাম্য ও পূজ্য বস্তু। তাঁহারা বিনা আপত্তিতে তাহা পরিত্যাগ করিবেন কেন? ইংরাজ জাতি ও কূটরাজনীতিবিৎ। তাঁহারা দেখিতেছেন যে সভ্যতা বিকাশের সহিত পৃথিবীর তাবৎ বাজার গুলিই তাহাদের হস্তচ্যুত হইয়া যাইতেছে। উপনিবেশগুলি নামমাত্র অধীন থাকিলেও তাঁহারা স্ব স্ব প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। ভারতই একমাত্র কর্ম্মক্ষেত্র। কাজেই ভারতবর্ষকে তাঁহাদের করতলগত রাখিতে হইবেই। সাম্রাজ্যবাদীগণ এই কথা স্পষ্টই স্বীকার করেন। উদার নৈতিকগণের মধ্যে যাহারা ভারতবর্ষের [illegible] বলিয়া পরিচয় প্রদান করেন, তাঁহাদের মতে [illegible]

রাসেল, অধ্যাপক ল্যাস্কিও এই দলেরই লোক। তাঁহারা তাঁহাদের মন্তব্যটী বেশ ঢাকিয়া বলিতে পারেন বলিয়াই আমাদের কর্ণে শ্রুতিমধুর হয়। তাঁহারা চাহেন ভারত স্বতন্ত্র হউক, তাহা হইলে ভারত শান্ত শিষ্ট থাকিবে, অশান্ত ভারত অপেক্ষা শান্ত ভারতই তাঁহাদের স্বার্থ-সাধনের পক্ষে উপযোগী। এই জন্যই তাঁহারা কতকগুলি মুখ-রোচক কথা বলিয়া আমাদিগকে ভুলাইতে চাহেন। ভারতের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেও আমরা স্পষ্টই দেখিতে পাই যে, ভারতের সকলেও ভারতের স্বাতন্ত্র্য চাহেন না। এখানকার অভিজাত সম্প্রদায় ও মুসলমানগণ ইংরাজশাসনই প্রার্থনা করেন। জন-সাধারণ এখনও শিক্ষিত হইয়া উঠে নাই। তাহারা তাহাদের দাবী-দাওয়া কি, না বুঝাইয়া দিলে বুঝিতে পারে না। সুতরাং জন কয়েক স্বার্থান্বেষী ব্যক্তির জন্য শাসন-সংস্কার পরিবর্ত্তন করা যাইতে পারে কি? প্রাদেশিক শাসন-সংস্কার প্রদান করার অর্থ কি তাহাই নয়? কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে যদি সমস্ত ক্ষমতাই অটুট থাকে, তবে নূতন শাসন-সংস্কারের অর্থ কি ইহাই নয় যে মন্ত্রীপদ আর কয়েকটী বৃদ্ধি করা মাত্র। বর্ত্তমানকালে প্রত্যেক প্রদেশকে স্বাতন্ত্র্য প্রদান করিবার কোন অর্থ আছে কি। বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে লণ্ডনে বসিয়াই যখন সমস্ত বিশাল ইংরাজ সাম্রাজ্য নিয়ন্ত্রিত করা যাইতে পারে তখন দিল্লীতে বসিয়া ভারতবর্ষ শাসন করিতে পারা যাইবে না কেন? মোট কথা বলিতে কি ভারতের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ও চাহেন না যে ভারত হইতে ইংরাজ চলিয়া যাউক। তাহারা চাহেন যে ইংরাজ তাহাদের সহিত মিলিত হইয়া নূতন নূতন জীবিকা অর্জ্জনের পন্থা বাহির করুক। ইহাই প্রকৃত সমস্যা। উৎকোচ প্রদান হিসাবে কতকগুলি অভিজাতকে হস্তগত করিবার সময় চলিয়া গিয়াছে। বিজ্ঞ রাজনীতিকগণ এই সার সত্যটী কেন বুঝিতেছেন না।

অটোয়া কনফারেন্সের লাভ-অলাভ—

অটোয়া কনফারেন্সের সিদ্ধান্ত লইয়া বড়ই গোলমাল হইতেছে। অটোয়ায় ইংরাজ রাজনৈতিকগণ কতকগুলি নূতন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইংরাজ ব্যবসায়ীগণ তাহাদের উৎপন্ন মাল পৃথিবীর অন্যান্য দেশে প্রেরণ করিয়া বিক্রয় করিতে পারিতেছেন না। গত মহাযুদ্ধের পর হইতে প্রায় প্রত্যেক দেশই বাণিজ্য শুল্কের উচ্চ প্রাচীর তুলিয়া দিয়া সকলেই আপন আপন দেশে সকল প্রকার দ্রব্য উৎপন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছে। ইংরাজ অর্থবিৎগণ ইংরাজ সাম্রাজ্যের মধ্যে তাহাদেরই অনুকরণে বাণিজ্য শুল্কের প্রাচীর তুলিয়া দিয়া বিদেশী দ্রব্যের আমদানী ও রপ্তানী বন্ধ করিয়া দিতে চাহেন। তাঁহারা আর একটি নূতন জগৎ রচনা করিয়া আপনাদের মধ্যে দ্রব্যের আমদানী ও রপ্তানী করিয়া ব্যবসা-বাণিজ্যের নূতন শ্রী ফুটাইয়া তুলিতে বলিতেছেন। এই তত্ত্বটী হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে একটু পূর্ব্ব ইতিহাস জানা প্রয়োজন। গত শতাব্দীতে নেপোলিয়নের সহিত যুদ্ধ সমাপ্ত হইয়া গেলে ইংলণ্ড কল-কারখানায় মনোনিবেশ করে। তাহার কৃষিক্ষেত্র হইতে শ্রমিকগণকে টানিয়া লইয়া কারখানায় পুরিয়া দেওয়া হয়। তখন হইতে ইংলণ্ড ক্রমশঃ শিল্প প্রধান দেশ হইয়া উঠিতে থাকে। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার শাসনকালে ইংলণ্ডে উপর্যুপরি দুর্ভিক্ষ দেখা দিতে থাকে। আয়র্লণ্ডের প্রজাপুঞ্জ কয়েক বৎসর মাত্র আলু খাইয়া জীবন ধারণ করে। তখন বাণিজ্য জগতে স্বাধীন আদান প্রদান ছিল না। প্রত্যেক দেশই তাহার তাবৎ প্রয়োজনীয় দ্রব্য উৎপন্ন করিত। মাত্র কিছু বিলাসের দ্রব্যই আন্তর্জাতিক পণ্য হিসাবে জগতের বাজার সমূহে স্থান পাইত। ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী স্যর রবার্ট পীল স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন যে বিদেশ হইতে শস্য আমদানী করিতে না পারিলে ইংলণ্ডের সাধারণ প্রজা অনাহারে মারা যাইবে। ইংলণ্ডের অভিজাতগণ শস্য উৎপন্ন করিয়া খুব উচ্চ দরে বিক্রয় করায় তাঁহারা বিশেষ লাভবান হইতেছিলেন কাজেই বিদেশ হইতে কোন প্রকার শস্য আমদানীর বিরুদ্ধে তাঁহারা সর্ব্বদাই ষড়যন্ত্র করিতেন। ইংরাজ পার্লামেণ্টে তখন অভিজাতদের প্রাধান্য ছিল। পীল সাহেব বিশেষ চেষ্টা করিয়াও কোনরূপ কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। শস্যের মূল্য কমিয়া না গেলে মজুরদের পারিশ্রমিক হ্রাস করিতে পারা যায় না। অভিজাতদের ষড়যন্ত্রে তাহা সম্ভবপর হইতেছে

না বলিয়া কবডেন প্রভৃতি জন কয়েক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন নায়ক বিশেষ আন্দোলন সুরু করিয়া দেন। চার্টার বিদ্রোহ এই আন্দোলনের ফল। তাহার পর পার্লামেণ্টে অভিজাতদের ক্ষমতা হ্রাস করিয়া মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করা হয়। আডামস্মিথ ও রিকাডো নামক দুই জন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অর্থনৈতিক এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আন্দোলনে যোগদান করিয়া নূতন অর্থশাস্ত্র প্রণয়ণ করেন। তাঁহারা খুব জোরগলায় প্রকাশ করেন যে প্রত্যেক দেশের একটী বিশেষত্ব আছে, সুতরাং তাহাকে সেই দ্রব্য উৎপন্ন করিতে দিলে তাহাতে জগতের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি পাইবে। অর্থাৎ মরুভূমি প্রদেশে আঙ্গুর উৎপন্ন করিবার চেষ্টা না করিয়া ফুটী, তরমুজ ইত্যাদি বপন করাই যুক্তি-সঙ্গত। এই যুক্তির মূলের উপর দাঁড়াইয়া কবডেন প্রভৃতি রাজনৈতিকগণ শস্য শুল্কের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাইয়া উহা বন্ধ করিয়া দেন। শস্য শুল্ক বন্ধ হইয়া যাওয়ার সহিত মজুরদের পারিশ্রমিক হ্রাস হইয়া যাওয়ায় ইংরাজ পণ্য সমস্ত জগতে ছড়াইয়া পড়ে। অতি অল্প দিনের মধ্যেই ইংরাজজাতি প্রভূত বিত্তশালী হইয়া উঠেন। ফ্রান্স ও জার্ম্মাণি চিরকালই রক্ষণশীল। ইংরাজ-দের সৌভাগ্য অসম্ভবরূপে বৃদ্ধি পাইতেছে দেখিয়া তাঁহারাও তাঁহাদের মত বদলাইয়া ফেলেন, তাঁহারাও ক্রমশঃ Free trader বা শুল্ক-বিহীন ব্যবসাদার জাতিতে পরিণত হ'ন। এই ব্যবস্থায় আমেরিকার ক্ষতি হইতে থাকে। আমেরিকায় কৃষিকার্য্যের যথেষ্ট সুবিধা থাকিলেও শিল্পোৎপাদন করিবারও যথেষ্ট সুযোগ বর্ত্তমান আছে। আমেরিকার অর্থবিদ্ পণ্ডিতগণ ইহা বুঝিতে পারিয়াই আমেরিকাই প্রথম Free tradeএর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। গত মহাযুদ্ধে প্রত্যেক জাতিই বেশ বুঝিতে পারেন যে অন্য সময়ে যাহাই হউক অন্ততঃ জগৎব্যাপী যুদ্ধের সময় সর্ব্ববিষয়ে আত্মবশ না থাকিতে পারিলে ঐরূপ সংগ্রামে জয়লাভ করিতে পারা যায় না। এই জন্যই তাহারা নানা অজুহাতে বাণিজ্য শুল্কের প্রাচীর তুলিয়া দিয়া স্বাবলম্বী হইবার চেষ্টা করিতেছে। ইংরাজ জাতি কিন্তু শুধু মাত্র কৃষির উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে পারে না। বর্ত্তমানে তথায় যে ফসল উৎপন্ন হয় তাহাতে তাহাদের বৎসরে মাত্র তিন মাস চলিতে পারে শিল্পের বিনিময়ে কাঁচামাল ও খাদ্য দ্রব্য তাহাদিগকে বিদেশ হইতে আমদানী করাইতেই হয়। কাজেই ইংলণ্ডকে প্রাণধারণ করিবার জন্য আন্তর্জাতিক ব্যবসার উপর নির্ভর করিতে হয়। গত মহাযুদ্ধের পর হইতে ইংরাজ অর্থবিদ্‌পণ্ডিতগণ নানা প্রকার ব্যবস্থা করিয়া আসিতেছিলেন কিন্তু কোন প্রকারেই সফলকাম হইয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। অটোয়া কনফারেন্স এই চেষ্টার একটী নিদর্শন। ভারত ও ইংলণ্ডের মধ্যে অর্থ-নৈতিক সম্বন্ধ স্থাপিত হউক আমরা তাহার পক্ষপাতী। আমাদের পত্রিকায় আমরা বহুবারই বলিয়াছি যে সর্ব্ব-প্রকার সম্মেলন হইতেছে, কিন্তু ইকনমিক সম্মিলন হইতেছে না কেন? অটোয়া কনফারেন্সই সেই ইকনমিক কনফারেন্স। কিন্তু এই কনফারেন্সের সর্ত্তানুযায়ী যদি সমস্ত সুবিধাগুলিই ইংলণ্ডের পক্ষে থাকে এবং অসুবিধাগুলি আমাদিগকে ভোগ করিতে হয় তাহা হইলে আমরা আমাদের মত দিব কি প্রকারে। পশম ইংলণ্ডে উৎপন্ন হয় না। পশমী বস্ত্র ইংলণ্ড জার্ম্মাণীর তুলনায় সস্তায় কখনই প্রদান করিতে পারিবে না। পাট ভারতের একচেটিয়া পণ্য হইলেও, উহা গ্রহণ করিতে অসম্ভব মূল্য প্রদান করিতে হইলেই রাসায়নিক গবেষণার দ্বারা উহার কোন synthetic product বাহির করিবার চেষ্টা হইবে। কেমিক্যাল নীল বাহির হইবার পরেই, স্বাভাবিক নীল বাজার হইতে উঠিয়া গিয়াছে। নানা প্রকার লোহার দ্রব্য মেসিনারী আমাদের এখন বিশেষ প্রয়োজন। উহার মূল্য বৃদ্ধি হইলেও আমাদের অনেক শিল্পের মূলে কুঠারাঘাত করা হইবে। কথাটা স্পষ্ট করিয়া বলিলে বলিতে হয় যে, এখন যে শীতবস্ত্র দশ টাকা মূল্যে বিক্রীত হইতেছে অটোয়া সিদ্ধান্তের ফলে মূল্য বৃদ্ধি পাইয়া উহার দাম ১৫৲ টাকা হইলে, আমাদের মতন দরিদ্র দেশের অনেকেরই কষ্টকর হইবে। তাহার পর পাট বাজারে বিক্রয় না হইলে [illegible] ভীষণ বিপ্লব দেখা দিবে। এই সমস্ত কারণেই অটোয়া কনফারেন্সের সর্ত্তগুলি দেশবাসী কর্ত্তৃক গৃহীত [illegible] পারিতেছে না। সরকার পক্ষ যদি [illegible]

দেশবাসী কর্তৃক নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণকে তথায় প্রেরণ করিতেন, তাহা হইলে হয় ত অনেকটা যুক্তিযুক্ত প্রস্তাব সমূহ প্রণয়ণ হইতে পারিত।

দারিদ্র্য ও অর্থকৃচ্ছ্রতা—

অর্থ-সমস্যা ও বেকার সমস্যা জগতে উৎকট ভাবে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। যেখানেই বিপুল অর্থ সম্পদ বিদ্যমান সেইখানেই ভীষণ দারিদ্র্য। অনেকেই বলিতেছেন যে কলকারখানাই ইহার কারণ। প্রয়োজনের অতিরিক্ত দ্রব্য উৎপন্ন করিয়া কলকারখানা সমস্ত জগতের সম্মুখে এক ভীষণ আতঙ্ক আনয়ন করিয়াছে। কথাটা কতকটা সত্য। পূর্ব্বে চাহিদা অনুযায়ী দ্রব্য উৎপন্ন করা হইত। কলকারখানা প্রবর্ত্তিত হইলে চাহিদার মুখাপেক্ষী না হইয়া মাল উৎপন্ন করা হইতে থাকে। তখন জগতের চাহিদাও ছিল ভীষণ, কাজেই উৎপন্ন দ্রব্য কখনই চাহিদার অতিরিক্ত উৎপন্ন হইতে পারিত না। কল-কারখানার বৃদ্ধির সহিত উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ যেমন বৃদ্ধি পাইতে থাকে সেই পরিমাণে চাহিদাও হ্রাস পাইয়া ক্রমশঃ শূন্যের নীচে পড়িতে থাকে। তখন উৎপন্নকারীগণ বিভীষিকা দর্শন করিতে থাকেন। trust, bounty প্রভৃতি অস্ত্রগুলি চাহিদাকে উৎপন্ন দ্রব্যের সমান রাখিবার জন্য রচিত হয়। ক্রমশঃ উক্ত ব্রহ্মাস্ত্র গুলিও বিফল হইতে থাকিলে বাণিজ্যজগতে বিপ্লব দেখা দেয়। এখন সাধারণতঃ দেখা যায় যে প্রকৃত দারিদ্র্য বলিতে যাহা বুঝা যায়, জগতে তাহা আসে নাই, যাহা আসিয়াছে—উহাকে অর্থকৃচ্ছ্রতা বলা যাইতে পারে। রবার এত উৎপন্ন করা হইয়াছে যে, যে মূল্যে উহা বিক্রীত হইবে, তাহার খরিদ্দার নাই। মোটর গাড়ী ও বাজারে যথেষ্ট কিন্তু ক্রেতা নাই।

বিজ্ঞান—ব্যক্তিগত ও সার্ব্বজনীন উন্নতিঃ—

বিজ্ঞান সাধারণের সম্পত্তি। বিজ্ঞানের উন্নতি হইলে, সাধারণের উন্নতি হওয়ার আবশ্যক। কিন্তু বিজ্ঞানকে ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তি করিয়া উহার সাহায্যে প্রভূত-বিত্ত অর্জ্জন করিতে গেলেই সাধারণের অসুবিধা হয়। এইজন্যই বলিতে চাহি যে পৃথিবীতে এখন দিন আসার প্রয়োজন যখন প্রত্যেক গৃহস্থেরই একখানি করিয়া মোটর গাড়ী ও একটী করিয়া টেলিফোন থাকিবে। উহা সম্ভবপর হইতেছে না কেন, ফোর্ড সাহেব তাঁহার To day and to-morrw নামক গ্রন্থে এক বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন যে ইউরোপের ধনিকগণ শিল্প-উৎপাদনকে জাতীয় সম্পদ বলিয়া গ্রহণ করেন নাই, উহা তাহাদের নিজস্ব সম্পদ। এই জন্যই ইউরোপের ধনিকগণ বিজ্ঞানের সাহায্যে বিপুল অর্থ উপার্জ্জন করিলেও তথায় দারিদ্র্য অতি উৎকটভাবে আত্মবিকাশ করিতেছে। কারখানার সমস্ত মূলধন যদি ব্যক্তিগত ভাবে গৃহীত না হইয়া জাতীয় উন্নতি সম্পাদনে নিয়োজিত করা যায়, তাহা হইলে সার্ব্বজনীন আর্থিক উন্নতি হইবেই। যাঁহারা 'স্বদেশী' গ্রহণ কর বলিয়া আমাদের দেশে চেঁচান, তাঁহাদিগকে আমরা ফোর্ড সাহেবের উক্তিটী বিশেষ করিয়া অবধান করিতে অনুরোধ করিতেছি।

সমরঋণ—ইউরোপ ও আমেরিকাঃ—

আগামী ১৫ই ডিসেম্বর ইউরোপের আমেরিকার সমর-ঋণের সুদ শোধ দিবার দিন; ইংরাজ রাজনৈতিকগণ চিঠির উপর চিঠি দিয়া আমেরিকাকে কিছুতেই বুঝাইতে পারিতেছেন না যে, ইউরোপ এবং ইংলণ্ড বর্ত্তমানে ঋণ পরিশোধ করিতে পারিতেছেন না। প্রেসিডেন্ট হুভার আমেরিকান হইলেও রক্তগত সম্বন্ধে খাঁটি ইংরাজ। ইংরাজ-জাতির আশ্রয়ে থাকিয়াই চীন, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে নানাপ্রকার কার্য্য করিয়া বিপুল বিত্ত অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি ইংলণ্ডকে অনেকটা স্নেহ ও মমতার চক্ষেই দর্শন করিতেন। নূতন রাষ্ট্র-নায়ক রুজভেলট খাঁটি আমেরিকান। ইনিও জাতিতে ইংরাজ হইলেও কয়েক পুরুষ ধরিয়া আমেরিকায় বসবাস করিতেছেন। কাজেই মিষ্টার রুজভেলটের ধ্যান ধারণা প্রকৃত আমেরিকানদেরই মত। হুভার সাহেব জোড়াতাড়া দিয়া এক রকম চালাইতেছিলেন। ইংরাজগণ এই জোড়-তাড়ায় কতকটা সন্তুষ্টও ছিলেন। ইংরাজগণ বলিতেছেন যে তাঁহারাও ত অনেক টাকা ইউরোপীয় জাতিগুলের নিকট হইতে পাইবেন, তাঁহাদের প্রাপ্য ও দেয় ঋণের

পরিমাণ প্রায় সমান। ইউরোপীয় জাতিবৃন্দ সেই টাকা এই আর্থিক বিপ্লবের সময় দিতে পারিতেছে না বলিয়াই তাঁহারা তাঁহাদিগকে উক্ত ঋণ হইতে অব্যাহতি দিতেছেন। সুতরাং তাঁহারাও না কেন তাঁহাদের ঋণ হইতে অব্যাহতি পাইবেন। ফ্রান্স স্পষ্টই বলিতেছে যে ভারসিজলিজ ও লোকার্নো প্যাক্ট অনুযায়ী প্রাপ্য টাকাটা জার্ম্মানির নিকট হইতে পাইলেই, সে তাহার সমস্ত ঋণ পরিশোধ করিয়া দিবে। জার্ম্মাণি ঋণ পরিশোধ করিতে অক্ষম হইলে ফ্রান্সও অক্ষম হইবে। আর একদল বলেন, আমেরিকা ভীষণ স্বার্থপর। গত মহাসমরে যাহারা যুদ্ধ-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তাহারা সকলেই বলিয়াছিলেন যে তাঁহারা এক মহা উদ্দেশ্য সম্মুখে স্থাপন করিয়া কর্ম্ম-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেছেন। সুতরাং তখন যে যাহা পাইয়াছিল তাহাই দিয়া অপরকে সাহায্য করিয়াছিল। আমেরিকাই সকলের পর রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হয়, তাহার স্বার্থত্যাগ ও অন্যান্য জাতিগণের তুলনায় খুবই সামান্য, সুতরাং এই ঋণ লইয়া গোলমাল করা তাহার পক্ষে যুক্তি-যুক্ত নহে। ইহার উত্তরে আমেরিকা বলেন যে, সাধারণ প্রজাগণের নিকট সরকারের একটী দায়িত্ব আছে। আমেরিকার জন সাধারণ সরকারকে যে অর্থ কর্জ্জ দিয়াছিল, উহা ত্যাগ হিসাবে নয়, সরকারকে ঋণ হিসাবেই। ইউরোপীয় জাতিবৃন্দ এই ঋণ পরিশোধ না করিলে সরকার পক্ষ যে জন-সাধারণের নিকট মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া যাইবে। মোট কথা আমেরিকায় মূলধন সর্ব্বস্ব এক সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হইয়াছে। তাহারা তাহাদের মূলধন খাটাইয়া আপনাদের জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করে। আমেরিকার নিকট হইতে ঋণ হিসাবে গৃহীত অনেক টাকা এই শ্রেণীরই অর্থ। আমেরিকার কোন রাজ-নৈতিক দলই এই প্রবল দলটীকে অসন্তুষ্ট করিতে পারেন না। রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচনের সময় তাই এই কথাই তথাকার রাজনীতিক্ষেত্রে ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছে। ইংরাজের রাজনীতি বা ধর্ম্মনীতি তাহারা কিছুতেই গ্রহণ করিবে না। তবে সেখানে জোর প্রোপাগাণ্ডা চালাইয়া ইংরাজ জাতি যদি তথাকার শ্রমিক দলকে জাগাইয়া তুলিতে পারেন, তবে হয়তো এই ঋণ হইতে তাঁহারা অব্যাহতি পাইতে পারেন।

বাংলা সরকার ও ব্যয় সঙ্কোচ

বাংলার ব্যয় সঙ্কোচ কমিটী তাঁহাদের সিদ্ধান্ত জন-সমাজে প্রচার করিয়াছেন। আমরা তাঁহাদের মন্তব্যগুলি পাঠ করিয়া বিশেষ খুসীই হইয়াছি। সত্যই তিন জন মন্ত্রী ও চারিজন মেম্বার লইয়া শাসন পরিষদ গঠন করিবার কি প্রয়োজন। তাহার পর আমাদের আর একটী কথা সর্ব্বদাই মনে হয় যে, এই democratic যুগে কোথায় সকল প্রকার ব্যয় সঙ্কোচ সংসাধিত হইবে না উহার পরিবর্ত্তে দিন দিন শাসন-কার্য্যের জন্য ব্যয়ভার বৃদ্ধিই পাইতেছে। আমরা অনেক বারই বলিয়াছি যে ভারতীয়গণকে উচ্চ রাজকার্য্য প্রদান করিলে ইউরোপীয়-দের অনুপাতে তাহাদিগকে উচ্চহারে বেতন দেওয়া হইবে কেন। ইউরোপীয়দের উচ্চহারে বেতন দেওয়া হয় তাহার কারণ থাকিতে পারে কিন্তু ভারতীয়দিগকে উচ্চহারে বেতন দিবার কি কারণ আছে? পূর্ব্বে বাংলায় একমাত্র চিফ্ সেক্রেটারী যে কার্য্য করিতেন, বর্ত্তমান সময়ে চিফ্ সেক্রেটারী ব্যতীত আরও সাত জনকে বার্ষিক ৬৪ হাজার টাকা দিয়া সেই কার্য্য করিবার জন্য বহাল করা হইয়াছে। কাউন্সিলের সাজ-সজ্জা দেখিলে বাদসাহী যুগ ফিরিয়া আসিয়াছে বলিয়া মনে হয়। শাসন-সংস্কারের সহিত সরকার পক্ষের ব্যয় প্রায় বার্ষিক ২ কোটী টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। আমরা শাসন-সংস্কারের পক্ষপাতী কিন্তু ব্যয় বৃদ্ধি কোনরূপেই সমর্থন করিতে পারি না। বাংলার জেলা বোর্ডগুলি অবৈতনিক চেয়ারম্যান কর্ত্তৃক শাসিত হইতেছে, কিন্তু এইরূপ কি শুনা গিয়াছে যে ম্যাজিষ্ট্রেটকে সরাইয়া দিয়া এইরূপ ব্যবস্থা করায় কোনরূপ মন্দ ফল হইয়াছে। বাংলার মন্ত্রিগণকে বিনা বেতনে কার্য্য করিবার জন্য আহ্বান না করিলেও তাঁহাদিগকে পদমর্য্যাদা বজায় রাখিবার উপযুক্ত একটা ভাতা দিলেই ত হইতে পারে। এ অবধি যাঁহাদিগকে মন্ত্রী বা মেম্বার করা হইয়াছে, আমাদের মনে হয় তাঁহাদিগকে মাহিনা দেওয়া হইবে না বলিলেও মাত্র সম্মান লাভের জন্যই তাঁহারা উক্ত পদ গ্রহণ করিতেন। দেশবাসীকে স্বায়ত্ত-শাসনে অভ্যস্ত করিয়া লইতে হইবে এই অজুহাতে রাজ-কোষ উজাড় করিবার কি প্রয়োজন?

করপোরেশন ও ব্যয় সঙ্কোচ :—

করপোরেশনেও সেইরূপ ব্যবস্থা। উহাদের কাউন্সিল ঘর দেখিলে মনে হয় আমরা যেন দেওয়ানী আমে আসিয়া পড়িলাম। যেখানে একজন ঝানু সিভিলিয়ান অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং তাঁহাকে যে বেতন দেওয়া হইত সেখানে একজন ভারতবাসীকে বহাল রাখিয়া পূর্ব্বোক্ত বেতন দিবার কি অর্থ হইতে পারে। যোগ্যতা অর্থের উপর নির্ভর করিলে জাপানের মন্ত্রীগণ এত অল্প বেতন পান কেন? ইংলণ্ডের মন্ত্রীগণও আমাদের শাসনকর্ত্তাদের অপেক্ষা অল্প বেতন পান কেন? ১৯১০ সাল হইতে আমরা বেশ দেখিতে পাইতেছি যে যোগ্যতার নাম করিয়া অনর্থক ব্যয় বৃদ্ধি করা হইতেছে। তাহার পর আমাদের আরও একটা কথা মনে হয়। এই যুগে যখন আফিসে আমরা প্রায় একই শ্রেণীর শিক্ষিত লোক দেখিতে পাই, তখন সামান্য বেতনভোগী কর্ম্মচারী ও উচ্চ-বেতন ভোগী কর্ম্মচারী থাকিবার প্রয়োজন কি? যোগ্যতা অনুসন্ধান করিতে গেলে প্রায়ই ত দেখা যায় উভয় ক্ষেত্রেই সমান। ব্যয় সঙ্কোচ কমিটীর সদস্যগণ এই বিষয়টী যদি একটু তলাইয়া বুঝিবার চেষ্টা করেন তাহা হইলে অনেক ব্যয় সঙ্কোচ করিবার পন্থা উদ্ভাবন করিয়া দিতে পারিবেন।

জার্ম্মাণী ও হার হিটলার

অনেকেই মনে করিয়াছিলেন যে হার হিটলারই এবার চান্সেলার পদ পাইবেন। রাষ্ট্রপতি হিণ্ডেনবার্গও তাঁহাকে ডাকাইয়া পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু এখন শুনা যাইতেছে যে হার হিটলারকে উক্তপদ প্রদান করা হইল না। হার হিটলার জার্ম্মানির নাজী সম্প্রদায়ের দলপতি। নাজীদল উৎকট জাতীয়তাবাদী। হার হিটলারের পিতা একজন বোহেমিয়ান। কিন্তু অন্তরে অন্তরে ভীষণ aristocrat ছিলেন। রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া, বৃদ্ধ বয়সে বহু পুরাতন রাজ-পোষাকটী পরিয়া তিনি তাঁহার গ্রামের বাসিন্দা দিগের মধ্যে বেড়াইতে ভাল বাসিতেন। হার হিটলার পিতার নিকট হইতে তাঁহার অভিজাত গৌরবলাভ করেন। অল্প বয়সেই পিতৃ-মাতৃহীন হইয়া হার হিটলার বোহেমিয়ার রাজধানীতে আসিয়া সামান্য রাজ-মজুরী আরম্ভ করেন। কিন্তু রাজ-মজুর হইলেও হিটলার তাঁহার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া চলিতেন। এইজন্য তাঁহার সহকর্ম্মীগণ তাঁহাকে 'আভিজাত' বলিয়া ঘৃণা করিত। এই সময় ইউরোপের মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইলে হিটলার সামান্য সৈনিক পদ গ্রহণ করিবার জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট গতায়াত সুরু করেন। তাহার পর বহুকষ্টে উক্ত পদ গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়া একেবারে Front এ গিয়া উপস্থিত হন। তিনি দীর্ঘ চারি বৎসর যুদ্ধ-ক্ষেত্রে অবস্থান করিয়াছিলেন। এইখানে তাঁহার সামান্য পদ বৃদ্ধি হয়—তিনি Lans corporal হইয়াছিলেন। যুদ্ধের শেষভাগে একটি ট্রেঞ্চে তিনি ভীষণভাবে আহত হইয়া হাসপাতালে প্রেরিত হন। চিকিৎসকগণ বলেন যে তাহার চক্ষু দুইটী খুবই বিপদগ্রস্ত, হয়ত উহা উপাড়িয়া ফেলিতে হইবে। প্রায় ছয়মাস শয্যাশায়ী থাকিবার পর হিটলার যখন হাসপাতাল হইতে মুক্তিলাভ করেন, তখন শুনিতে পান যে মহাযুদ্ধের অবসান ঘটিয়াছে। তখন তাঁহার বয়স, মাত্র ৩২। হিটলার কর্ম্মচ্যুত হইয়া অন্নহীন হইয়া পড়েন। তাহার পর নানাস্থলে ভ্রমণ করিয়া জার্ম্মানির একটী গুপ্ত রাজ-নৈতিক দলের সভ্য হন। হিটলার যখন এই দলে প্রথম নাম লেখান তখন উহার সভ্য সংখ্যা ছিল মাত্র তিন। হার হিটলার দেখিতে পাইলেন যে এই দলের মতের সহিত তাঁহার মতের অনেকটা ঐক্য আছে। এই দলের সভ্যগণ ভাবিতেন যে জার্ম্মানির উচ্চ কর্ম্মচারিগণ প্রাণপণ করিয়া যুদ্ধ করেন নাই। দেশের ইহুদিগণ বিদ্রোহী হইয়া দেশমধ্যে অর্থ-সঙ্কোচ আনয়ন করিয়াছিল। হিটলার ক্রমশঃ এই দলের অধিনায়কত্ব গ্রহণ করিয়া তাঁহার বর্ত্তমান নাজীদল গঠন করিতে আরম্ভ করেন। Nordic superiorityই তাঁহার দলের বীজমন্ত্র। নাজীগণ বলিতে চাহেন যে ইহুদিগণ আর্য্য-জাতির সর্ব্বনাশ সাধন করিবার জন্য সেই বাইবেলের যুগ হইতে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। কার্ল মার্কস একজন জার্ম্মাণ হইলেও রক্তগত সম্পর্কে তিনিও একজন ইহুদি। রিকাডোও একজন ইহুদি। রাশিয়ার কমিউনিষ্ট আন্দোলনের মূলেও ইহুদিদের ষড়যন্ত্র ছিল। লেনিন রাশিয়ান হইলেও, অন্তরে একজন পুরাদস্তুর

ইহুদি। এই ইহুদি ব্যূহ ভেদ করিবার জন্য নাজীগণ সর্ব্বস্ব পণ করিয়াছে। স্বস্তিকা চিহ্ন অঙ্গে ধারণ করিয়া নাজীগণ সর্ব্বত্রই আপনাদের বিশেষত্ব রক্ষা করিয়া চলে। ১৯২৪ সালে নাজীদল বিদ্রোহ করিলে, হিটলার ও তাঁহার সহকর্ম্মীগণ কারাগারে প্রেরিত হন। নাজীদল তখন আশা করিয়াছিল যে জার্ম্মানীর সেনাধ্যক্ষকগণ তাহাদিগকে সাহায্য করিবেন। কিন্তু কার্য্যকালে নাজীদল তাহাদের নিকট হইতে কোনরূপ সাহায্যই পায় নাই। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে কারাগার হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া নাজীদল ক্রমশঃই প্রবল হইয়া উঠিতেছে। তাহাদের সঙ্ঘবদ্ধ হইবার ক্ষমতা অনন্যসাধারণ। রাষ্ট্রের মধ্যে রাষ্ট্র স্থাপন করিয়া হিটলার এক নূতন ব্যাপার সৃজন করিয়াছেন। বর্ত্তমান বৎসরে হিটলার যদিও ব্যর্থকাম হইলেন আমাদের মনে হয় হিটলার ভবিষ্যতে জার্ম্মানীর চান্সেলার বা রাষ্ট্রপতি হইবেনই।

পরলোকে দানিবাবু :—

বঙ্গীয় নাট্যশালার স্বনামধন্য বাবু সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ—সর্ব্বসাধারণে অতি সুপরিচিত দানিবাবু ৬৪ বৎসর বয়সে পরপারের যাত্রী হইয়াছেন। দানিবাবু বঙ্গীয় রঙ্গালয়ের অন্যতম জনক ৺গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের পুত্র এবং অপূর্ব্ব অভিনয় ক্ষমতা অনেকটা উত্তরাধিকার-সূত্রেই লাভ করেন। দানিবাবুর সাধারণ শিক্ষা বেশী ছিল না - কিন্তু নাট্য-চরিত্রকে রূপদানে জীবন্ত করিয়া তুলিবার স্বাভাবিক প্রতিভা ছিল। প্রায় অর্দ্ধশতাব্দীকাল ইনি বাংলা রঙ্গমঞ্চের শ্রেষ্ঠ নট হিসাবে সম্মান পাইয়া গিয়াছেন। বাংলা ও বাংলার বাহিরে যেখানেই বাংলা নাটক অভিনীত হইয়াছে ভাল অভিনেতারা দানীবাবুকেই আদর্শ ধরিয়া নিয়াছেন। ইহার চরিত্রাভিনয় যত আলোচিত হইয়াছে এমন বোধহয় কাহারও হয় নাই। সামাজিক, ঐতিহাসিক, নানারসের চরিত্রাভিনয়েই ইনি সমান দক্ষ ছিলেন। সিরাজদ্দৌলা, মিরকাসিম ছত্রপতি প্রভৃতি জাতীয় চরিত্র অভিনয়ে ইহার যশ সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেও দ্বিজেন্দ্রলালের রাণাপ্রতাপ, ঔরংজেব, চাণক্য প্রভৃতি সুকঠিন চরিত্রে প্রাণ সঞ্চার করাতেই ইহার খ্যাতি আরো বর্দ্ধিত হয়। ভ্রান্তিতে রঙ্গলাল, অশোকে অশোক, করুণাময়, দুলালচাঁদ, প্রসন্নকুমার, যোগেশ ইহার প্রতিটি অভিনয়ই উল্লেখযোগ্য। দানীবাবু বিবাহ করেন নাই। তাঁহার আর একটি বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে আজীবন রঙ্গালয়ের সংসর্গে কাটাইলেও কেহ কোন দিন তাঁহাকে রঙ্গমঞ্চে বা বাহিরে উচ্ছৃঙ্খল, বে-তাল, বে-হুঁস অবস্থায় দেখে নাই। আলাপে ইনি সু-রসিক মৃদুভাষী ছিলেন। শেষ কাল পর্য্যন্তও ইনি রঙ্গালয়ের মোহ ছাড়িতে পারেন নাই এবং পোষ্যপুত্রের শ্যামাকান্তের অভিনয় ইহার শেষ অভিনয়। বাংলা রঙ্গালয়ের ইতিহাসে দানিবাবুর নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হইবে। আমরা তাঁহার আত্মার কল্যাণ কামনা করি।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র সম্বর্দ্ধনা :—

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় দ্বিসপ্ততিতম বর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন। চিরকুমার আচার্য্য দেব জীবনভর জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দেশের সেবায় কাটাইতেছেন। রসায়নে ও খদ্দর আন্দোলনে তাঁহার দান অসামান্য—দেশের যুবকদিগকে জীবনের সত্যপথ প্রদর্শনে তাঁহার একান্ত চেষ্টাও উল্লেখযোগ্য। ভারতীয়মাত্রেই আচার্য্যদেবের এই সম্বর্দ্ধনায় মনে প্রাণে যোগ দিয়াছে। প্রফুল্লচন্দ্র দীর্ঘজীবি হইয়া দেশের সেবা ও রসায়ন শাস্ত্রের উন্নতি করুন—বিশ্বসভায় ভারতের নাম উজ্জ্বল করুন ইহাই কামনা।

অস্পৃশ্যতা ও মহাত্মার অনশন—

গুরুভায়ুর মন্দির প্রবেশ সমস্যা লইয়া আগামী ২রা জানুয়ারী হইতে মহাত্মাজীর আবার উপবাস আরম্ভের কথা। এ মন্দির যদি সাধারণের সম্পত্তি হয়—এবং জনমত যদি ইহাতে প্রবেশাধিকার চায় তবেই মহাত্মাজী সেই অধিকার পাইবার জন্য উপবাস করিবেন। মন্দির অধিকারী জামোরিণ এখনও অস্পৃশ্যদের মন্দিরে অধিকার না দিবার সম্বন্ধে অটল আছেন। মহাত্মাজী বলিতেছেন—'হয় অস্পৃশ্যতা যাইবে নতুবা আমি প্রাণ দিব। দুইয়ের এক সাথে থাকা অসম্ভব।' মহাত্মাজীর জীবন রক্ষা করিবার জন্যই যে সমগ্র ভারতের ৩৩' [illegible] লোক একমত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। আগামী নববর্ষের এই সমস্যা কি ভাবে মেটে [illegible] সকলেই বিশেষ উদ্‌গ্রীব আছে।—মহাত্মাজীর সঙ্কল্প কঠোর—এবং ভারতের হিন্দুসমাজকে বাঁচিতে হইলে মিথ্যা গোঁড়ামী ছাড়িয়া ইহা অবলম্বন করিতেই হইবে।

প্রবাসী অগ্রহায়ণ ১৩৩৯—এ সংখ্যায় চারিটি গল্প পাঠ করা গেল। প্রথম গল্প "পঞ্চায়তের বিচার"—লেখক শ্রীব্রহ্মানন্দ সেন। একটী ছাগল লইয়া "পঞ্চায়েতের বিচার কার্য" চলিয়াছে। তাহার মধ্যে কথকঠাকুরের প্রেম-কীর্ত্তন পর্য্যন্ত শুনিতে পাওয়া যায়। ভাষা বেশ ঝরঝরে; কিন্তু গল্পটির রস যে জমাট, সে কথা বলা যায় না। ছাগল-চুরির মোকর্দ্দমা—ইহা অপেক্ষাও রসালো হওয়া উচিত ছিল। আরও একটী কথা—আমরা এতকাল জানিতাম "পঞ্চাইত বা পঞ্চায়েত।" গ্রামে "পঞ্চাইতি বা পঞ্চায়েতি" করিতে দেখিয়াছি এবং "পঞ্চাইতের বা পঞ্চায়েতে"র বিচারে কাহার ধোপা-নাপিত বন্ধ হইয়া গেল এ কথাও শুনিয়াছি। তবে আজকাল সাধুজন সংসর্গে কথাটি ইকার বা একার বর্জ্জন করিয়া ঐরূপ ভদ্রবেশ ধারণ করিয়া থাকিবে।

দ্বিতীয় গল্প শ্রীমণীন্দ্রলাল বসুর "যূথিকা।" পাঠ করিয়া মনে হয়, মণীন্দ্রবাবু বুঝি অধুনা দাঁতাল হাতী পুষিতেছেন। যেরূপ গজদন্তের ছড়াছড়ি! কিন্তু এমন মূল্যবান সামগ্রী, ক্রাইজলার মোটর, সেন্ট-লণ্ড, রেডিও, গ্রামোফন ও ক্রিসেনথেমাম প্রভৃতি থাকাতেও গল্পটি ভাল লাগিল না!

তৃতীয় গল্প শ্রীসুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়ের "চোর।" প্রথম দিকটা বেশ হইয়াছে।

চতুর্থ গল্প শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়ের "অন্নের জন্ত।" মন্দ লাগে নাই। বিশেষ করিয়া প্রথম ভাগ বেশ লাগে।

শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়ের "পারস্ত ভ্রমণের" এই কীর্ত্তি তেমন উপাদেয় হয় নাই—স্থানে স্থানে সাধু ও অসাধু ভাষার সংমিশ্রণ হেতু অতিমাত্রায় শ্রুতিকটু লাগে।

শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বর্ম্মণের "নটরাজ" ও শ্রীব্রতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "পথে বিশ্রাম" ছবি দুখানি মন্দ লাগে নাই।

শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের "শারদাঞ্জলি" কবিতাটি সময়োপযোগী না হইলেও মন্দ হয় নাই। কিন্তু "চন্দ্র তপন ধুয়ে দেয় পথ ঢালি আলোকের চন্দন" লিখিতে ও পড়িতে বেশ লাগিলেও অর্থ করিলে একটু খট্‌কা লাগে। "চন্দনে" কি প্রক্ষালনের কাজ চলে? অবশ্য এক কলসী জলে কয়েক ফোঁটা "চন্দনের নির্য্যাস" (বেঙ্গল কেমিক্যাল যদি প্রস্তুত করিয়া থাকেন) ছাড়িয়া দিলে একথা বলা যায়। কেননা তাহা হইলে ফল সমানই হইবে।

অতঃপর "নির্ম্মল শ্যাম কুঞ্জকানন পুষ্পভরা যৌবন"—"প্রাণ-ফুলে ফুলে করে টলমল নিখিলের মধু যৌবন"—এই দুই প্রকার "যৌবনের" কোন্‌টি আসল? মৌ-বন-যৌবনে, না, যৌবন-মৌ-বনে একাকার?

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্তের রহস্যপূর্ণ উপন্যাস "যাগতায়" একটী চরিত্র দেখা গেল—কামিনী। কামিনী কুলবধূ নয়—কিন্তু ভাবে জানা যায় তাহার ঘরে কুলতিলকগণের গোপনে যাওয়া-আসা চলিত। প্রবাসীতে তাহার আবির্ভাব দেখিয়া রহস্য বেশ ঘোরালো লাগে। কেবল তাহাই নয়, তাহার কার্য্য-কলাপে বেশ একটু [illegible] পরিচয় পাওয়া গেল, যাহাকে নির্ম্মল বলা চলে না।

• • • •

বসুমতী অগ্রহায়ণ ১৩৩৯—গল্প পাঠ করিতে ভাল লাগিল না, পাতা উল্টাইতেই চোখে পড়িল "বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস" লিখিতেছেন শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। সবটুকু পড়িয়া সবেমাত্র বিষয়ান্তরে গমনের উদ্যোগ করিতেছি এমন সময় বাতগ্রস্ত ক্লান্ত অশ্বের মত ধীরে ধীরে আমাদের ভূতনাথ ঘরে প্রবেশ করিল। ত্রস্তে উঠিয়া বসিলাম। ভূতনাথ গিয়াছিল বিশ্বেশ্বর দর্শনে। কিন্তু এটি তাহার বেশ-ভূষা ও মুখচ্ছবি? মাথায় পাগড়ী, গায়ে কম্বল, পায়ে তৈলসিক্ত ভারী নাগরাই, মুখখানি অতীব ম্লান। এরূপ হইবার কারণটি অনুধাবন করিতে পারিলাম না। যতদূর জানি, সে অকৃতদার। একবার ভাবিলাম, সাহসে ভর করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলি, কি ব্যাপার? কিন্তু সাহসে কুলাইল না। তাহার পূর্ব্বেই হঠাৎ সে আমার পাশে একদম শুইয়া পড়িয়া কেবলই বলিতে লাগিল"হায়! হায়! হায়!" ইহাতে বড়ই ভীত হইয়া পড়িলাম। তাড়াতাড়ি চৌকী হইতে নামিয়া কুঁজা হইতে এক গেলাস শীতল জল গড়াইয়া তাহার মুখে, চোখে, মাথায় ও পেটে বর্ষণ করিবার উদ্যোগ করিতেই সে কম্বলের মধ্য হইতে একখানি হাত বাহির করিয়া আমার চোখের সামনে তুলিয়া ধরিল। হাতখানেক দূরে সরিয়া গিয়া তাকাইয়া দেখি "পঞ্চপুষ্প।" সে বলিতে লাগিল, "কিনেছি সেই গয়ায়। কিন্তু সবটা পড়তে পারি নি। এক "লীলাবতী" নাটকের আলোচনায়ই ঘায়েল হয়ে গেছি। হায়! হায়! আমি পাঠক হয়ে মৃতপ্রায়। না জানি ব্রজেন বাঁড়ুয্যের প্রাণটা এতক্ষণ কি কর্‌ছে! হয়ত বা নে-ই। কিন্তু তাহলে খবরের কাগজে নিশ্চয়ই জানা যেত"—বলিয়াই সে একটা উদ্গার তুলিল। তাহার স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলার রীতি এইরূপ। আমি তাহার হাত হইতে পত্রিকাখানি টানিল লইয়া পড়িতে বসিলাম। সবটুকু পড়িলাম—পাকা লেখা, ভারী সরস, বিশেষ করিয়া শেষের দিকটা। কিন্তু কেমন যেন খট্‌কা লাগিয়া গেল। "পুরাণ প্রসঙ্গ", অমৃতলাল বসুর স্মৃতিকথা ত আমরাও পাঠ করিয়াছি। ভূতনাথও তড়াক করিয়া উঠিয়া বসিল, বলিল—"আলবাৎ পড়েছি। বার কর পুরাণপ্রসঙ্গ"—তাহার আজ্ঞাবহন করিয়া কেরোসিন কাঠের সেল্‌ফ হইতে পুস্তকখানি পাড়িয়া লইতেই সে আমার হাত হইতে তাহা কাড়িয়া লইয়া ফড়াৎ করিয়া বাহির করিল—"অর্দ্ধেন্দু আমাকে জোর করিয়া যোগজীবনের ভূমিকা লওয়াইলেন। তালিম দেওয়া যখন শেষ হইয়া আসিল (আলোচক লিখিয়াছেন—শেষ হইল) কাশী হইতে লোকনাথবাবু কলিকাতায় আসিয়া আমাকে কাশীতে ফিরাইয়া লইয়া গেলেন। বন্ধুরা কাকুতি মিনতি করিলেন, তিনি কাহারও কথায় বিচলিত হইলেন না।"

এ পর্য্যন্ত মিলিল। কিন্তু ইহার পরই এ কি? আলোচক উদ্ধৃত করিতেছেন "আমার আর ষ্টেজে দাঁড়ান হইল না ইত্যাদি।"

ভূতনাথ আবার "হায়! হায়!" করিতে লাগিল। শেষের ও পূর্ব্বের উদ্ধৃত অংশের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড প্যারাই যে "Mediocre" গবেষক "Original" গবেষককে হঠাইতে বাদ দিয়াছেন! টাইকোব্রাহীর নাসিকা কি এমনই বেমালুম ভাবে যুক্ত হইয়াছিল?

আমাদের সহৃদয় পাঠক-পাঠিকা হয়ত "ঐতিহাসিক হায়েনার" লড়াইয়ের খবর একটু জানিতে ইচ্ছুক। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে দীনবন্ধু মিত্রের "লীলাবতী" নাটক কলিকাতায় গিরিশ ঘোষ, অর্দ্ধেন্দু মুস্তফী, রাধামাধব কর কর্ত্তৃক প্রথম অভিনীত হয় ১৮৭২ সালে মে মাসে। কিন্তু অনেক "ঐতিহাসিক হায়েনার" মতে বিশেষ করিয়া "পঞ্চপুষ্পের"র "লীলাবতী নাটকের অভিনয়ের Mediocre আলোচকের গবেষণায় তাহা তাহার এক বৎসর পূর্ব্বে ১৮৭১ সালের জুন মাসে। ব্রজেন্দ্র বাবু তাঁহার প্রমাণগুলি "অগ্রহায়ণের" বসুমতীতে লিখিত প্রবন্ধে স্পষ্ট ভাবে খাড়া করিয়াছেন। কিন্তু গবেষক মহাশয় সেগুলি অনুধাবন ত করেনই নাই, উপরন্ত originalityর লোভ তাঁহাকে এমনি চাপিয়া ধরিয়াছে যে quotationও distorted

হায়! হায়! করিতে করিতে ভূতনাথ পড়িতে লাগিল (উদ্ধৃত প্যারাটির ঠিক পরের প্যারাটি)

"আমাদের রিহার্সাল হইত গোবিন্দ গাঙ্গুলীর বাড়ীতে; গাঙ্গুলী হাইকোর্টের কর্ম্মচারী ছিলেন। বেশ সৎ লোক; কিন্তু তাঁহাকে লইয়া আমরা কিছু [illegible]

করিতাম। একদিন আমাদের পুরা মজলিস্ বসিয়াছে; গোবিন্দ হাইকোর্ট হইতে প্রত্যাগমন করিয়া অত্যন্ত গম্ভীরস্বরে আমাদিগকে বলিলেন—'দেখ, হাইকোর্টে শুনে এলাম, সত্য-মিথ্যা বলতে পারি না লর্ড মেয়োকে না কি আণ্ডামান দ্বীপে খুন করেছে। সেদিন মজলিস্ বন্ধ হইয়া গেল, অনতিবিলম্বেই সহরময় কথাটা রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। সরস্বতী পূজার ধূমধামের আয়োজন সর্ব্বত্রই আপনা আপনি বন্ধ হইয়া গেল।"

"লোকনাথ বাবুর সহিত কাশী চলিয়া গেলাম। ইত্যাদি।"

(লর্ড মেয়ো ১৮৭২ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে আততায়ীর হাতে নিহত হন।)

অতঃপর ভূতনাথ পুস্তকখানি বন্ধ করিয়া রাখিয়া দুই রগ টিপিয়া বলিতে লাগিল, "ব্রজেনবাবুই ঠিক—। যাক্! এতকাল সাহিত্যিক মোরগের লড়াই দেখেছি—এবার দেখ্‌ব "ঐতিহাসিক হায়েনার" লড়াই"। "মা, বঙ্গবাণী তোর বরাতে এতও ছিল?" বলিয়াই সে পঞ্চপুষ্পখানি কুড়াইয়া লইয়া কম্বলখানি বেশ করিয়া গায়ে জড়াইতে জড়াইতে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। অগত্যা আমিও চিৎ হইয়া শুইয়া পড়িয়া ভাবিতে লাগিলাম "mediocre" ও "original" এতদুভয়ের মধ্যে কোন্‌টি মুল্যবান? Original;—নতুবা আর কাহাকে original বলিয়া গালি দিয়া সুখ?

ভারতবর্ষ, অগ্রহায়ণ—১৩৩৯

শ্রীমাণিকচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের ছোটগল্প "কনকাঞ্জলি" সুন্দর হইয়াছে। কিন্তু theosophyর একটু গন্ধ ছাড়ে। তাহা হোক, স্বর্গতা মাতার কন্যাকে বিদায় বেলায় আশীর্ব্বাদ করিতে আবির্ভাবের বর্ণনাটুকু অতি চমৎকার। ভাষা এইখানে এমন সংযত ও এমন একটী রূপ ধরিয়াছে যে ধীরে মনোজগতের পর্দ্দাখানি সরাইয়া একটী আলোক রেখা চোখের সম্মুখে স্পষ্ট ভাসিয়া উঠিয়া তেমনি ধীরে মিলাইয়া যায়। কিন্তু তাহার স্মৃতিখানি স্পষ্ট জাগিয়া থাকে। মাণিকবাবুর হাত হইতে এমন গল্প বহুদিন বাহির হয় নাই।

শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর গল্প "দর ও দস্তুর" চমৎকার হইয়াছে।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়ের গল্প "অপূর্ণ" আর যাহাই হোক গল্প হইয়া উঠে নাই।

শ্রীপাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের গল্প "দাহ" আদি-রসাত্মক। লাগিয়াছেও বেশ। পায়ের কাছে রূপসীর দল লুটাইয়া যায়, সে ভোগও করেও, কিন্তু নিজেকে কাহারও প্রেমডোরে বাঁধিতে দেয় না, এমন যে কয়টি পুরুষ আছে তাহাদের লইয়া গ্যাঁড়াতলার একটা মাঠে এই শীতের সময় রং-তামাসার হিড়িকে একটা Carnival খুলিলে কেমন হয়? আশা করা যায়, পুরুষ দর্শকের ভীড় কম হইলেও তরুণীরা আসিবে ঝাঁকে ঝাঁকে।

কুমার শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের গল্প "শেষ স্মৃতি" কুমারোচিত রচনা। রাজাসাহেব, কাকাসাহেব, দার্জ্জিলিঙ্, সোণার লাঠি, কুমার, কুমারী (Miss) প্রভৃতি ইহাতে অনেক আছে। আর আছে (?) প্রশ্ন চিহ্নের ছড়াছড়ি। পড়িতে পড়িতে মনে হয়, বসুমতীর কোন ছোট গল্প লেখকের ধারকরা কলমে বুঝি লেখা হইয়াছে। ভবিষ্যতে কুমার বাহাদুর শব্দের পরিবর্ত্তে প্রতি পৃষ্ঠায় একটি করিয়া প্রশ্ন চিহ্ন ছাড়িয়া দিবেন, তাহা হইলেই তাহাতেই সরস রচনার কাজ চলিবে। পাঠক-পাঠিকাগণ পরস্পরের মুখ চাওয়াচায়ি করিয়া এমন এক রসের সৃষ্টি করিবে যে, Tear gasএও সে হাসি থামিবে না।

এ সংখ্যায় চারখানি রঙীন ছবি দেখা গেল।

তাম্রকূট

শ্রীসৌরেশচন্দ্র চৌধুরী

নেশাপুরী অভিধানের পাতায় কবি কালিদাস গেছেন খুলি,
মদ খেলে লোকে 'মাতাল' বলিবে, 'গুলাল' বলিবে খাইলে
গুলি।
চণ্ডু খাইলে 'চণ্ডাল' ক'বে, 'গেঁজেল' কহিবে খাইলে গাঁজা,
কাজ কিবা ছাই বিড়ি খেয়ে ভাই! 'মেউ মেউ করা
'বিড়েল' সাজা?
স্বরগের সুখ পিয়াসী গো যাঁরা জরা ব্যাধি ভরা এ মর ভবে,
তাম্রকূটের রসাস্বাদনে উঠে প'ড়ে তাঁরা লাগুন সবে।

হোক্ মিঠে কড়া, খোসবয় ভরা অম্বুরী, আলা, কিম্বা কড়া,
যেইভাবে তাতে মজে যার মন সেই ভাবে তাহা হোক্ না
গড়া!
হোক্ না যন্ত্র-হুঁকা, গড়্গড়া, ফরসী যাহার যেমন জুটে,
ক্ষেত্র বিধায় হস্ত, কাগজ, কিম্বা মাত্র পত্রপুটে!
স্বরগের সুখ পিয়াসী—ইত্যাদি।

নিত্য সত্য সনাতন হেন সাত্বিক নেশা মিলে না ভাই!
ত্বরায় হরিতে ত্রিতাপ যাতনা ধরায় এমন কিছুই নাই।
টানে টানে মনে কি চেতনা আনে, প্রাণের জড়তা পলায়
ছুটে,
সত্বগুণে সে তত্ত্বজ্ঞান মগজের মাঝে গজিয়ে উঠে।
স্বরগের সুখ পিয়াসী—ইত্যাদি।

ত্যাগের দেবতা আশুতোষ তাঁর প্রিয়ভোগ মহাতাম্রকূট,
তন্ত্র খুলিয়া পারি দেখাইতে সত্য এ কথা নহেক ঝুট।
দেবদুর্লভ তাম্রকূটের মধুর কাহিনী শুনিলে কানে,
কৈলাস হ'তে শিবদূত যত মুক্তির রথ বহিয়া আনে।
স্বরগের সুখ পিয়াসী—ইত্যাদি।

তাম্রকূটের অনাবিল ধূমে কণ্ঠনালীটি রাখিলে ঠাসি',
খুক খুকুনির অন্তে স-টান ভক্তিপন্থে মিলিবে কাশি।
কাশিতে এ দেহ পিঞ্জর ছাড়ি' প্রাণ-বিহঙ্গ যাইলে উড়ি',
শিবত্বলাভ হবেই হবে, পুরাণে তাহার প্রমাণ ভূরি।
স্বরগের সুখ পিয়াসী—ইত্যাদি।

আলেয়া

শ্রীবিজয়মাধব মণ্ডল

দুর্গম পথে আজি যে তোমায় বেসেছি ভালো,
আলো মায়াময়ী—আলো তব পথ-ভুলানো আলো!
পশ্চিমাকাশে সমুখে আমার,
ডুবে গেছে রবি, সন্ধ্যা আঁধার
নামিয়া এসেছে বিছায়ে আঁচল নিকষ কালো,
অনল-ভাষিণী—ললাটে আবার অনল জ্বালো!

ডুবাইয়া দাও আঁধারে আমার চলার পথ,
চোখের উপরে চালাও তোমার খেয়ালী রথ।
এই প্রান্তর, ঐই নদীতীর—
দূর বনভূমি, শূন্য তিমির
পারে পারে রথ ছুটুক তোমার তড়িৎবৎ
মর্ত্ত্য বিজলী—চালাও তোমার খেয়ালী রথ!

তোমারে পেয়েছি [illegible] হারায় বিজন দেশে,
তোমারে চিনেছি নয়ন-ভুলানো আঁধার দেশে।
হাত ধ'রে মোরে নিয়ে চল সখি,
বন্ধুর পথ—ধীরে চল—ও কি
কোথায় লুকালে উল্কামুখীর হাসিটি হেসে
ওলো মায়াবী—কোথায় মিলালে আঁধারে [illegible]

চমকিতা

শিল্পী—বিমলাচরণ লাহা

৬ষ্ঠ বর্ষ | মাঘ—১৩৩৯ | ১০ম সংখ্যা

শিক্ষাধারা ও জীবনধারা

দেশের প্রত্যেক লোককে সাধারণ শিক্ষা পাইতে হইবে—আধুনিক যুগে শিক্ষার আলোকে বঞ্চিত থাকার অর্থ—অন্ধকারে বাস করা। আমাদের এই সভ্য দেশে এখনও যত অশিক্ষিত আছে এমন বোধ হয় কোন সভ্য দেশেই নাই। সার্ব্বজনীন শিক্ষার প্রসারের জন্য জনসাধারণের ও দেশের গবর্ণমেন্টের যে উদ্যম থাকা দরকার এখনও এদেশে তাহা দেখা যায় না।

দেশের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় ও অর্থবান সম্প্রদায় উচ্চ শিক্ষার জন্য লালায়িত দেখা যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্য চাকুরীলাভ ও অর্থোপার্জ্জন। উচ্চশিক্ষার মোহে বাঙ্গালী ভদ্রসমাজ যেমন মজিয়াছিল তেমনি দেশের সরকারে ও অন্যান্যক্ষেত্রে তাহাদের উচ্চ কার্য্যও জুটিয়াছিল। কিন্তু কোন দেশেই সকলেই চাকুরী করিয়া খাইবে ইহা সম্ভবপর নয়। তাই ক্রমশঃ শিক্ষার বিফলতা আজ এমন ভাবে দেশে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে যে উচ্চ শিক্ষিত মাত্রেই হায় হায় করিতেছে। শিক্ষাশেষে তাহারা জীবনে কোন পথে চলিবে, কি ভাবে জীবনোপায় উপার্জ্জন করিবে তাহা বুঝিতে না পারিয়া একান্ত হতাশ হইয়া পড়িতেছে।

—একেবারে শিক্ষাহীনতা যেমন খারাপ আবার উচ্চ শিক্ষার উদ্দেশ্য চাকুরী মাত্র হওয়াও তেমনি খারাপ। বাংলার কৃষাণ সম্প্রদায় শিক্ষার অভাবে কৃষিকার্য্যের কোন উন্নত ব্যবস্থা অবলম্বন যেমন করিতে পারে নাই—তেমনি শিক্ষিত হইয়া ভদ্রসন্তানেরাও চাকুরী ছাড়া অন্য কোন কার্য্য করার প্রবৃত্তি হারাইয়া ফেলিয়াছে। বাংলার শিক্ষিত অশিক্ষিত দুয়ের অবস্থাই তাই সমান দাঁড়াইয়াছে। কাহারও কোন দিক দিয়াই উন্নতি দেখা যাইতেছে না।

দেশের ব্যবসায় বাণিজ্য ও অন্যান্য বৃত্তি যাহাতে দেশের শ্রী-সম্পদ বৃদ্ধির সহায়তা করে ক্রমশঃ তাহা অ-বাঙ্গালীর হাতে চলিয়া গিয়াছে। বাংলায় বসিয়াই অ-বাঙ্গালীরা ধনী হইতেছে—অজস্র সুখ সম্পদের মধ্যে বাস করিতেছে—আর বাঙ্গালীরা তাহাদের কাছেই চাকুরীর উমেদারী করিয়া ঘুরিয়া মরিতেছে।

উচ্চ শিক্ষিতের আদর্শে অল্প শিক্ষিতেরাও ভুল পথে চলিয়াছে—নিজবৃত্তি ছাড়িয়া সামান্য মাহিয়ানায় সামান্য লেখাপড়ার কিছু কাজ করিয়া ভদ্র সাজিবার চেষ্টা করিতেছে। কিছু বেশী-কম লেখা পড়া শিখিয়া শিক্ষিত সাধারণ মাত্রেই বাঙ্গালী শিক্ষিতেরা এখন তাহাদের

জীবন অবসান করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া চলিয়াছে এমনি মনে হয়।

ব্যবসা-বাণিজ্য মুখে সব সময় বলিলেও কার্য্যে তাহা করা সহজ নহে—তার উপর বিদ্যামন্দিরে জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় ও উৎসাহ উদ্যম ব্যয় করিয়া ও-দিকের কষ্ট সহ্য করা একরূপ অসম্ভবই হইয়া দাঁড়ায়। ব্যবসা-বাণিজ্যে মানুষকে আত্মনির্ভরশীল, ঘাত-প্রতিঘাত সহনক্ষম করে। কিন্তু তাহাতে শারীরিক ও মানসিক শ্রম যথেষ্টই প্রয়োজন। গড়িয়া তুলিবার সময় প্রতিপদে দুর্ভাবনারও অন্ত থাকে না। কিন্তু ইহাতে মানুষকে সত্যি মানুষ করিয়া গড়িয়া তুলিবারও সহায়তা করে। আর চাকুরী লাভার্থে শিক্ষা মানুষের মনুষ্যত্ব ক্রমশঃ লোপ করিয়াই দেয়।

বাংলার উৎসাহ উদ্যম ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে দেখিয়া—দেহ ও মনে একান্ত ম্রিয়মান বাঙ্গালী তরুণদের দেখিয়া তাই আমাদের উত্থান সম্বন্ধে একান্ত হতাশা আসিয়াই আমাদের চিত্ত বিক্ষিপ্ত করিয়া তুলিতেছে। জাতির শ্রেষ্ঠ মনীষীগণ ইহা ভাবিয়া বিচলিত হইয়াছেন। সম্মুখে সমস্যা আমাদের ভীষণ—একদিকে অশিক্ষা আর একদিকে উচ্চশিক্ষা রূপ কু-শিক্ষার মোহ দুই-ই কোন জাতির পক্ষে ঘোরতর অভিশাপ স্বরূপ।

আমাদের দেশের সর্ব্বসাধারণকে শিক্ষিত করিতে হইবে—শিক্ষা হিসাবে উচ্চ শিক্ষাকেও সার্থক করিতে হইবে। আর কিছু নাই বলিয়া ইউনির্ভাসিটি ডিগ্রির পেছনে ধাবমান হওয়ার মোহ ছাড়িতে হইবে। সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া সাধারণকে জীবন-পথে নানা বৃত্তির অনুসরণ করিতে হইবে—ঝড় ঝঞ্ঝা মাথায় তুলিয়া লইবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে—তজ্জন্য চাই বিপুল দৈহিক ও মানসিক ক্ষমতা—জীবনধারার পরিবর্ত্তন।

দেশের ভীষণ দারিদ্র্য, তরুণগণের নিরাশ ভারগ্রস্ত অবসন্ন জীবন এসব কি এসব ব্যবস্থার পরিবর্ত্তনে সহায়তা করিবে না? সমস্যা ক্রমশঃ এত সঙ্গীন হইতেছে যে শীঘ্র জাগিয়া অবস্থা বুঝিয়া স্রোত পরিবর্ত্তন না করিলে উদ্ধার নাই। জীবনযুদ্ধে বাঁচিতে হইলে বাঙ্গালীকে শিক্ষাধারা ও জীবনধারার পরিবর্ত্তন করিতেই হইবে।

শীত-ঋতু

শ্রীঅরুণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

শীত-ঋতুর ঐ আহ্বান আসে
উত্তর-বায়ু সঙ্গে।
হৈমন্তিক ধান কাটা সারা,
কৃষাণ-বন্ধু হ'লো শ্রমহারা,
নব-অন্নের মহা আয়োজন—
শেষ হয়ে গেছে বঙ্গে।

কনক প্রভাত শীত সমাপনে
আঁধার কুহেলি মগ্ন।
অলস দিবস-যামিনী এখন,
শীতল নিশাস ফেলিছে পবন,
বাহির আঁধার, হৃদয় আঁধার,
আনন্দ-হারা, ভগ্ন।

ঝরিয়া পড়িছে পত্র-নিচয়,
পাদপেরে দিতে দুঃখ।
তব আগমন, ওগো নিরদয়!
ধরা হ'তে সুখ করেছ বিলয়,
একি গো ধরম! একি গো করম!
ধরিত্রী কেন রুক্ষ?

প্রেতিনী

গল্প

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

শহরের একটি বড় রাস্তার পাশে ছোট একখানি ঘর ভাড়া করিয়া তখন আমি সবেমাত্র জ্যোতিষী হইয়া বসিয়াছি। দশ টাকা খরচ করিয়া প্রকাণ্ড একটা সাইন-বোর্ড টাঙানো হইয়াছে, ঘরের মধ্যে আসবাব পত্রেরও অভাব নাই, মোটা মোটা কেতাবের পিছনে সোনার জলে নাম লিখাইয়া ছোট একখানি কাঁচের আলমারি প্রায় ভর্ত্তি করিয়া ফেলিয়াছি, কাপড়ের উপর বড় বড় পাঁচটা আঙুল-ওয়ালা হাতের তালু, মানুষের মুণ্ডু ইত্যাদি আঁকাইয়া দেওয়ালে ঝুলানো হইয়াছে, টেবিল, চেয়ার, ঘড়ি, তস্‌বির—সবই আছে। নাই শুধু মক্কেল। প্রায় মাস-তিনেক হইতে চলিল, অন্ততঃ হাত দেখাইবার জন্য একটা লোকও আসে না। দিন-দশেক আগে কোথাকার একটা ফাজিল ছোকরা একদিন আসিয়াছিল বটে। আসিয়াই জানিতে চাহিল আমি কোষ্ঠী তৈরি করিবার জন্য কত পারিশ্রমিক লইয়া থাকি। বলিলাম, 'দশ টাকা'।

'হুঁ।' বলিয়া খানিকক্ষণ কি যেন ভাবিয়া বলিল, 'আমার ভাগ্‌নের একটা দরকার। আচ্ছা দাঁড়ান্ আমি বলব তাকে।'

তাহার পর হাত দেখিবার চার্জ্জ, প্রশ্ন গণনা করিবার ফি, বিবাহের ফলাফল, ব্যবসায় উন্নতি-অবনতি ইত্যাদি হেনো-তেনো সাত-সতেরো অনেক কিছু জানিতে চাহিয়া আমাকে বকাইয়া বকাইয়া মারিয়া শেষে হঠাৎ এক সময় বলিয়া বসিল, 'আপনি কবচ-টবচ দেন ত?'

বলিলাম,—'হ্যাঁ দিই।'

'সব রকমের কবচ?'

জিজ্ঞাসা করিলাম, 'সব রকম মানে?'

'এই ধরুন—ধনদা, জ্ঞানদা···আহা হা নামগুলো সব মনেও পড়ে না যে ছাই। ধরুন—বশীকরণ—'

কবচ যদিও তখনও পর্য্যন্ত কাহাকেও দিই নাই, তবু বলিলাম, 'দিই।'

ছোকরাটি আবার খানিকক্ষণ কি যেন ভাবিল। তাহার পর জিজ্ঞাসা করিল, 'আচ্ছা ওই যে বললেন বশীকরণ কবচের কথা, আচ্ছা ধরুন—কেউ যদি নেয় ত' তার ফল ঠিক হবেই, কি বলেন?'

বলিলাম, 'হবে বই-কি। নিশ্চয়ই হবে।'

'আচ্ছা ধরুন, এই যে বিজ্ঞাপনে লেখা থাকে, অসৎ 'পার্‌পাশে' নেওয়া উচিত নয়। তা ধরুন—অসৎ উদ্দেশ্যেও ত' অনেকে নিয়ে থাকে, তাদের কি আর কার্য্যসিদ্ধি হয় না বলতে চান? হ্যাঃ, অসৎ 'পারপাশ' না ঘেঁচু! কাজ ঠিক হয়ে যায়, আল্‌বাৎ হয়। কি বলেন?'

এই বলিয়া সে আমার মুখের পানে তাকাইয়া রহিল।

বলিলাম, 'চাই আপনার?'

'কত দাম?'

'পাঁচ সিকে।'

'পাঁশিকে?' বলিয়া একবার এ-পকেট ও-পকেট হাতড়াইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল, 'আজ ত' অত পয়সা নেই আমার কাছে। আচ্ছা কাল নিয়ে যাব। আসি। নমস্কার।'

এই বলিয়া সেই যে সে চলিয়া গিয়াছে, আর আসে নাই।

সেদিন অমনি একাকী বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছি, ছোঁড়াটাকে ছাড়িয়া দেওয়া বোধ হয় আমার উচিত হয় নাই। পকেটে তাহার দু' চার আনা যাহা ছিল তাহাই লইয়া ছাই ভস্ম একটা পুঁটুলি বাঁধিয়া কবচ তৈরি করিয়া দিলেই পারিতাম। এবার যদি কেহ আসে ত' তাহাকে আর এমন করিয়া হাত-ছাড়া করিলে চলিবে না। শত্রুক গৃহমাগতম্! কিছুই না পাওয়ার চেয়ে যাহা পাই তাহাই লাভ।

এমন সময় পায়ের শব্দে সুমুখে তাকাইয়া দেখি, মোটা-সোটা বেঁটে মত এক ভদ্রলোক ঘরে ঢুকিতেছেন। নমস্কা

করিয়া পাশের একটা চেয়ার দেখাইয়া দিয়া বলিলাম, 'বসুন!'

কিন্তু তিনি বসিলেন না। সরাসর আমার টেবিলের কাছে আগাইয়া আসিয়া টেবিলের উপর দুইটি হাত রাখিয়া আমার মুখের পানে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনি জ্যোতিষী?'

সবিনয়ে ঘাড় নাড়িয়া জবাব দিলাম, 'আজ্ঞে হাঁ।'

'বেশ।' বলিয়া কেমন যেন একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া তিনি চেয়ারে উপবেশন করিলেন। দেখিলাম, গায়ে একখানি কালো রঙের অত্যন্ত ময়লা কোট, কাপড়খানিও ততোধিক অপরিষ্কার, পায়ে একজোড়া ছেঁড়া স্যাণ্ডেল, মাথার চুল উস্কো-খুস্কো, দেখিলে মনে হয়—লোকটা মাসাধিককাল স্নান করে নাই। চেয়ারে বসিয়াই তিনি আবার আর-একবার আমার মুখের পানে তাকাইয়া বলিলেন, 'জল আছে মশাই আপনার এখানে? দিন ত, এক গ্লাস, খাই।'

ঘরের কোণে কুঁজো ভর্ত্তি জল ছিল, উঠিয়া তাঁহাকে দিতে যাইব, তিনি হাঁ হাঁ করিয়া নিষেধ করিলেন। বলিলেন, 'থাক্, আমি নিজেই নিচ্ছি। কাউকে বিশ্বাস নেই মশাই, কাউকে আমি বিশ্বাস করি না।'

সর্ব্বনাশ! আবার আর-এক উন্মাদের পাল্লায় পড়িলাম হয়ত'। অদৃষ্ট যখন মন্দ হয় তখন এম্‌নিই হয়।

জল খাইয়া গ্লাসটি তিনি টেবিলের উপর নামাইয়া রাখিলেন। বলিলেন, 'ভয় নেই মশাই ধুয়ে দেবো, আমি বামুনের ছেলে। এই দেখুন পৈতে।'

এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ আমার গলার নীচে দুটি আঙুল চালাইয়া অত্যন্ত মলিন পৈতে গাছটি বাহির করিয়া আমায় দেখাইলেন। বলিলেন, 'ভাগ্যিস্ এইটে এখনও রেখেছি গলায়। নইলে—বামুনের ছেলে যদি না হ'তাম মশাই, তাহ'লে দিত এদ্দিন সাবাড় করে'। শালী আজও আমার পেছন্ নিয়েছে।'

বলিয়াই একবার তিনি তাঁহার পিছনের দিকে একবার দরজার দিকে তাকাইয়া বলিলেন, 'এখানে আসতে পারবে না, কি বলেন? আপনারা ত' জ্যোতিষী, মন্তর্ তন্তর্ ঝাড়্ ফুঁক্ জানা আছে নিশ্চয়ই। এ্যাঁ?'

পাগলকে বিশ্বাস নাই। এখনই হয়ত একটা বিভ্রাট কাণ্ড বাধাইয়া বসিবে ভাবিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দিব কিনা চিন্তা করিতেছি, এমন সময় তিনি আবার আমার টেবিলের কাছে উঠিয়া আসিলেন। আবার তেমনি ঝুঁকিয়া পড়িয়া নিতান্ত কাতরকণ্ঠে চুপিচুপি বলিলেন, 'গা'টা আমার একবার বেঁধে দেবেন মশাই?'

কথাটার অর্থ ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। বলিলাম, 'কি বলছেন ঠিক বুঝতে পারলাম না।'

তিনি বুঝাইয়া বলিলেন, 'মন্তর্ পড়ে' আমার শরীরটে আপনি বেঁধে দিন। এবার বুঝলেন ত? মাগী আমার পিছনে ধাওয়া করেছে আজ চার বছর—হ্যাঁ, ঠিক চার বছর। তা করুক্। তা সে করবেই। কিন্তু আমার অনিষ্ট যেন কিছু না করতে পারে। বাস্, আর কিছু চাই না। এ উপকারটুকু আপনি আমার করুন দাদা, বামুনের ছেলে আমি আপনার হাতে ধরছি।'

হাত দুইটা ধরিবার জন্য তিনি হাত বাড়াইয়াছিলেন, বলিলাম, 'বসুন, দিচ্ছি।'

লোকটা উন্মাদ হইলেও অভদ্র নয়। ঠকাইবার মতলব মাথায় আসিতেছিল। যা পাই দু'আনা চার আনা লইয়া মন্ত্রের মত বিড় বিড় করিয়া যা মুখে আসে তাই বলিয়া দিই উহার গা বাঁধিয়া। কিন্তু মুখখানি তাহার এমনি করুণ যে, উহাকে ঠকাইয়া পয়সা লইতে আমার মত পাষণ্ডেরও আর প্রবৃত্তি হইল না।

যাই হোক্, ব্যাপারটা কি জানিবার কৌতূহল হইতেই একটা কাগজ কলম লইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আপনার নাম?'

নাম বলিতে তিনি একটুখানি ইতস্ততঃ করিতেছেন দেখিলাম। বলিলাম, 'বলুন।'

তিনি আবার একবার তেমনি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমার মুখের পানে তাকাইলেন। বলিলেন, 'আসল নামটাই বলি। না বললে হয়ত মন্তরটা ঠিক খাটবে না। হ্যাঃ, তাতে আর কি হয়েছে। আপনি ত' আর পুলিশের লোক ন'ন্ মশাই, আপনি গণৎকার। নিন্ লিখুন—আমার নাম, শ্রীশ্রীপতি বন্দ্যোপাধ্যায়। পিতার নাম চাই? পিতার নাম?'

ঘাড় নাড়িয়া বলিলাম, 'না'।

'কিন্তু দাদা, আগেই বলে রাখি, আজ আমি আপনাকে দিতে কিছুই পারব না। তবে একটা চাকরির জোগাড়ে আছি, হয়ে যদি যায় ত' তখন দেখবেন পাওনা আপনার কড়ায় গণ্ডায় শোধ করে' দিয়ে যাব। আমি সেরকম লোক নই মশাই, আমি ভদ্দর লোকের ছেলে।'

এই বলিয়া আবার তিনি একবার তাঁহার পিছনের দিকে ঘাড় ফিরাইয়া কি যেন তাকাইয়া দেখিলেন। তাহার পর আবার বলিতে লাগিলেন, 'পয়সা কড়ি এক সময় আমার অনেক ছিল দাদা, কিন্তু সেই মাগীই আমায় একেবারে মূলে হাভাত করে' দিয়ে গেছে। বুঝলেন? আজকে আমার এই দশা, এই ছেঁড়া কাপড়, এই ময়লা জামা, এই জুতো,—দুবেলা পেট ভরে' খেতে পাই না মশাই, দুঃখের কথা আর কি বলব আপনাকে, এই দেখুন।

বলিয়া তিনি তাঁহার কোটের পকেটে হাত ডুবাইয়া তলার কাপড়টা পর্য্যন্ত টানিয়া তুলিয়া আনিলেন। দেখা গেল, পকেটে মাত্র একটি দিয়াশালাই ও একটুকরা পোড়া বিড়ি ছাড়া আর কিছুই নাই। কিন্তু দেখিলাম, চোখ দুইটা তখন তাঁহার ছল্ ছল্ করিতেছে। ভদ্রলোক কাঁদিয়া ফেলিয়াছেন।

টেবিলের ড্রয়ার টানিয়া একটি বিড়ি বাহির করিয়া তাঁহার হাতে দিলাম। বলিলাম, 'খান্।'

কোঁচার খুঁটে তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া বিড়িটি তাঁহার হাত পাতিয়া লইবার সে কি আগ্রহ! মুখে কিছুই বলিতে পারিলেন না বটে, কিন্তু চোখ দেখিয়া বুঝিলাম তিনি মনে মনে আমায় অজস্র ধন্যবাদ দিতেছেন। বিড়িটি ধরাইয়া টানিতে টানিতে বলিলেন, 'থাক্, ভগবান এদ্দিন পরে জুটিয়ে দিলেন দাদা, আমি বাঁচলাম। নইলে এমন করে' মানুষ আর কতদিন বাঁচে! দিন নেই রাত নেই—চব্বিশ ঘণ্টা আমার পিছনে লেগে আছে! কেনরে বাপু, যা হয়েছে, হয়েছে, চুকে বুকে গেছে, তার জন্যে আবার মরে' ভূত হয়েও তুই আমার পিছনে লেগে কি করবি বল ত? মেরে ফেলবি, এই ত' মতলব? তা আমি বুঝতে পেরেছি। তা—বাবা বাবা বাবা, মেরেই ফ্যাল্। মরেই ত' আছি, এর চেয়ে বেশী আর কি করবি বল্!'

বলিতে বলিতে হঠাৎ তাঁহার গা বাঁধিবার কথাটা মনে পড়িয়া গেল। বলিলেন, 'কই দিন্ না দাদা, গা'টা আগে আমার বেঁধেই দিন্ না!'

বিধাতার রাজ্যে মানুষের জীবনকে অবলম্বন করিয়া কত রকমের কত বিচিত্র কাহিনীই না গড়িয়া ওঠে! শ্রীপতি বলিয়া এই যে অর্দ্ধ উন্মাদ জীবটি আজ আমার কাছে আসিয়া জুটিয়াছেন তাঁহার কথাবার্ত্তা শুনিয়া মনে হইল, তাঁহারও জীবনে অমনি একটি রহস্যময় কাহিনী হয়ত গড়িয়া উঠিয়াছে। জানিবার কৌতূহল বহুক্ষণ হইতেই হইতেছিল, এইবার সরাসরি বলিয়া বসিলাম, 'কিন্তু কি হয়েছে আগাগোড়া সব খুলে আমায় বলতে হবে শ্রীপতিবাবু। তা যদি না বলেন ত' আমার মন্ত্রে হয়ত কোনও কাজ করবে না।'

শ্রীপতি কিয়ৎক্ষণ মাথা হেঁট করিয়া রহিলেন, তাহার পর ধীরে-ধীরে চোখ তুলিয়া বলিলেন, 'আগাগোড়া সব বলতে হবে? তা—তা আমি পারি বলতে, কিন্তু কই আমার পৈতে ছুঁয়ে দিব্যি করে' বলুন দেখি, কাউকে আপনি বলবেন না।'

আমিও ব্রাহ্মণ। পৈতা আমারও ছিল। অতখানি কষ্ট স্বীকার করিয়া উঠিয়া গিয়া তাঁহার সেই মসীবর্ণ যজ্ঞোপবীত স্পর্শ করিয়া শপথ করিতে হইল না। নিজেরটিই বাহির করিয়া বলিলাম, 'এই দেখুন, পৈতে ছুঁয়েই আমি শপথ করছি—কাউকে কিছু বলব না।'

তখন তিনি তাঁহার চেয়ারটাকে টানিয়া টানিয়া একেবারে আমার গা ঘেঁসিয়া আসিয়া বসিলেন এবং চুপি চুপি বলিলেন, 'তবে শুনুন! আপনার লোকজন কেউ এসে পড়বে না ত?

কে-ই বা আসিবে? ঘাড় নাড়িয়া বলিলাম, 'না, আপনি নির্ভয়ে বলতে পারেন।'

নির্ভয়ে কি সভয়ে ঠিক বুঝিলাম না, তিনি তাঁহার জীবনের গল্প আমায় বলিলেন। আদ্যোপান্ত মন দিয়া শুনিবার পর সত্যই তাঁহার জন্য বেদনা বোধ করিলাম। মন্ত্রের মত বিড় বিড় করিয়া যা খুশী তাই আওড়াইয়া গিয়া তাঁহার গা বাঁধিয়া দিলাম। সান্ত্বনা দিয়া বলিলাম, 'যান্, আর ভয় নাই, আপনার কোনও অমঙ্গল অনিষ্ট করা দূরে

থাক, সে প্রেতাত্মা ভয়ে আর আপনার ছায়াও মাড়াবে না।'

শ্রীপতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া আমায় ধন্যবাদ দিয়া নমস্কার করিয়া এদিক-ওদিক ঘন-ঘন তাকাইতে তাকাইতে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া যাইতেছিলেন, কি ভাবিয়া হঠাৎ বলিয়া বসিলাম, 'আবার আসবেন ত' দয়া করে'? কেমন থাকেন আমায় জানিয়ে যাবেন যেন।'

ঘাড় নাড়িয়া শ্রীপতি বলিলেন, 'আসব।'

তাহার পর সেই যে সে অদ্ভুত ব্যক্তিটি আমার চোখের সুমুখ হইতে অন্তর্হিত হইয়া গেলেন, কেমন আছেন বলিবার জন্য কোনদিনই তিনি আর ফিরিয়া আসেন নাই। কিন্তু আমার হৃদয়ের পটে তাঁহার সেই বিষণ্ণ করুণ মূর্ত্তিটি এমনভাবে অঙ্কিত হইয়া গেছে যে, আজ সুদীর্ঘ দশ বৎসর পরেও একাকী বসিয়া বসিয়া সেই তাঁহারই কথা ভাবিতেছি। ভাবিতেছি, মিথ্যা চাতুরী অবলম্বন করিয়া মন্ত্রের নামে যা-তা' বলিয়া তাঁহার গা বাঁধিয়া দেওয়া আমার উচিত হইয়াছিল কি না। উচিত না হোক্, গর্হিত কিছু হয় নাই। যে নারীকে আমরা দেবীর আসনে বসাইয়া চিরকাল পূজা করিয়া আসিতেছি, তাহাদেরই জাতের একজনের অমানুষিক নৃশংসতায় জীবন যাহার জলিয়া পুড়িয়া খাক্ হইয়া গেছে, তাহাকে যদি ক্ষণিকের সান্ত্বনা দিবার জন্য আমি একটু-খানি মিথ্যাচার অবলম্বন করিয়াই থাকি ত' বিধাতা হয় ত' আমার সে-অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। আজ সে দুর্ভাগ্যদগ্ধ নিতান্ত অসহায় নিরবলম্ব বিকৃত-মস্তিষ্ক সে অর্দ্ধ উন্মাদ শ্রীপতির কোনও সংবাদই আমি জানি না, তাহার সে দুর্ব্বহ জীবনভার এখনও সে ঠিক তেমনি করিয়াই বহন করিতেছে কিনা কে জানে, কিম্বা সুদীর্ঘ চারি বৎসর ধরিয়া যে প্রেতিনী তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিতেছিল শেষ পর্য্যন্ত হয় ত' তাহারই করুণায় আত্ম-সমর্পণ করিয়াছে।

যাহাই করুক্, আজ—আমি তাহারই জীবনের সেই বৈচিত্র্যপূর্ণ রহস্যময় প্রবঞ্চিত জীবনের সকরুণ কাহিনী লিপিবদ্ধ করিতে বসিয়াছি। জানি না শ্রীপতির উপর কোনও অবিচার করিতেছি কিনা, যদি করিয়াই থাকি, যেখানেই থাকুন, আশা করি তিনি আমায় ক্ষমা করিবেন।

শ্রীপতির কাহিনী

শ্রীপতিকে যখন আমরা দেখিলাম তখন তাহার জরাজীর্ণ শেষ অবস্থা। কিন্তু যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন শ্রীপতিবাবু,—যৌবনমদগর্ব্বিত জনৈক ধনী সন্তান, কলিকাতা সহরের উপর নিজের বাড়ী, ব্যাঙ্কে প্রচুর অর্থ, অথচ খাওয়াইয়া পরাইয়া খরচ যোগাইবার মত আত্মীয় পোষ্য কেহ কোথাও নাই, নিজে আর তাঁহার পরমাসুন্দরী যুবতী স্ত্রী বাসন্তী। স্ত্রীকে ভালবাসিয়া স্ত্রীর ভালবাসা পাইয়া পরমানন্দে তখন তাঁহার দিন কাটিতেছে।

একদা এক প্রভাতবেলায় কোনও এক বন্ধুর অনুরোধে বন্দুক লইয়া তিনি দূরের একটা গ্রামে শীকার করিতে বাহির হইলেন। কথা রহিল সন্ধ্যায় আবার কলিকাতায় ফিরিয়া আসিবেন।

বাসন্তী বলিল, 'দেখো, আস্‌তে ভুলো না যেন। আমি একা থাক্‌ব।'

শ্রীপতি তাহাকে কাছে টানিয়া আদর করিয়া শপথ করিল, সে নিশ্চয়ই ফিরিবে।

গ্রামের চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া গোটাকয়েক পাখী শীকার করিয়া গ্রামে যখন তাঁহারা ফিরিলেন তখন সূর্য্যাস্ত হইয়াছে।

শ্রীপতি বলিলেন, 'আমায় বাড়ী ফির্‌তে হবে।'

বন্ধু জেদ ধরিয়া বসিল, তা হয় না। যে পাখী শীকার করিয়াছ এইখানেই সেগুলা রান্না করিয়া খাইয়া যাইতে হইবে।

শেষ পর্য্যন্ত তাহাই স্থির হইল। কলিকাতা যাইবার ট্রেণের অভাব নাই। রাত্রি এগারোটা পর্য্যন্ত ট্রেণ। যখন খুশী সে যাইতে পারে।

পাখীগুলা বাড়ীর ভিতর মেয়েদের কাছে পাঠাইয়া দেওয়া হইল। রান্না করিতে আর কতক্ষণই বা লাগে! ট্রেণের এখনও অনেক দেরী। উঠাউঠি একটার পর একটা অনেকগুলা ট্রেণ।

কিন্তু ততক্ষণ সময়ই বা তাদের কাটে কেমন করিয়া! গ্রামেও কয়েকজন সঙ্গী জুটিয়া গেল।—'আসুন, ততক্ষণ তাস খেলা যাক্।'

ছোট্ট একটি খড়ো বৈঠকখানা ঘরের মধ্যে তাসখেলা চলিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা হইল, আলো জ্বলিল, ঘরের বাহিরে পল্লীগ্রামের নিস্তব্ধ অন্ধকার থম্‌থম্ করিতে লাগিল।

ঘরের দক্ষিণদিকের একটা জানালা ছিল বন্ধ। শ্রীপতি সেটা হাত দিয়া যেমনি খুলিতে যাইবে, ঘরের অন্যান্য কয়েকজন হাঁহাঁ করিয়া নিষেধ করিয়া উঠিল—'খুলবেন না মশাই, ও জানালা খুলবেন না।'

শ্রীপতি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কেন ?'

'কেন ?' তার অনেক ব্যাপার।—'এই যে জানালার সুমুখে বড় দোতালা বাড়ীটা দেখছেন ওটা ভূতুড়ে বাড়ী। বছরের পর বছর ধরে অমনি পড়েই আছে। মালিক যিনি তিনি কল্‌কাতায় বাস কর্‌ছেন।'

'তাতে কি ?'

'তাতে কী ! একবার খুলেই দেখুন না ! দিনে দুপুরে চব্বিশ ঘণ্টা মশাই ওই বাড়ীতে ভূত ঘুরে বেড়ায়, আমাদের নিজের চোখে দেখা। এই জানালাটা খুললে বাড়ীর ভেতর পর্য্যন্ত দেখা যায় বলে' এই জানালার ওপর ভূতগুলোর ভারি রাগ। ওই ত' খুলেছেন, বাস, বসুন ওই জানালার ধারে, দেখুন মজা।'

শ্রীপতি জোর করিয়াই জানালার ধারে বসিয়া রহিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরেই জানালার ওপর ঝড়াং করিয়া এক শব্দ ! প্রকাণ্ড একটা ভাঙা ইট জানালার গায়ে আসিয়া লাগিয়াছে এবং লাগিবামাত্র ভাঙিয়া গুঁড়া হইয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

'দেখলেন ত ? এবার দিন বন্ধ করে।'

জানালাটা শ্রীপতি বন্ধ করিয়া দিয়াই সেখান হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

'উঠ্‌লেন যে ?'

ঘরের কোণে ঠেস্ দেওয়া দো-নলা বন্দুকটা তুলিয়া লইয়া শ্রীপতি বলিলেন, 'আপনারা বসুন এইখানে, অপেক্ষা করুন। বন্দুকের গুলির আওয়াজ যদি শুন্‌তে পান তাহ'লে আপনারা সকলে মিলে একসঙ্গে ওই বাড়ীতে গিয়ে ঢুকবেন, আর যদি কোনও আওয়াজ না হয় তাহ'লে যাবেন না, জানবেন আমি ফিরে আসছি।'

এই বলিয়া এক হাতে টর্চ্চ ও এক হাতে বন্দুক লইয়া সাহেবী পোষাকপরা শ্রীপতি তৎক্ষণাৎ বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেলেন। সমবেত দু একজন শ্রীপতিকে নিষেধ করিল, কিন্তু শ্রীপতি তাহাদের কোনও কথাই শুনিলেন না।

প্রকাণ্ড বাড়ী। ফটক পার হইয়া শ্রীপতি সেই বাড়ীর মধ্যে ঢুকিলেন। চারিদিক ঘোর অন্ধকার। কোথায় সিঁড়ি কোথায় পথ কিছুই ঠাহর করিবার উপায় নাই। হাতের টর্চ্চ জ্বালিয়া শ্রীপতি আগাইয়া গেলেন। সিঁড়ি ধরিয়া উপরে উঠিলেন। দেওয়ালের চুণ খসিয়া পড়িয়াছে। পুরাতন বাড়ী, ঘরগুলি ধূলায় বালিতে বোঝাই, চারিদিক অপরিচ্ছন্ন। কোথাও কিছুই নাই। ভূত বলিয়া কোনও বস্তু পৃথিবীতে থাকিতে পারে না ইহাই শ্রীপতির দৃঢ় বিশ্বাস। প্রত্যেকটি ঘর তন্ন তন্ন করিয়া খুজিয়া শ্রীপতি আবার নীচে নামিয়া আসিতেছিলেন, পাশেই একটা ঘরের দরজায় হঠাৎ খট্ করিয়া একটা আওয়াজ হইল। তাড়াতাড়ি বন্দুকটাকে ঠিক করিয়া ধরিয়া তিনি সেইদিকে অগ্রসর হইলেন। দেখিলেন, কে একটা লোক সিঁড়ির উপর লাফাইয়া পড়িয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। ভূত নয়,—মানুষ। শ্রীপতি তাহাকে গুলি করিতে পারিতেন কিন্তু মানুষ দেখিয়া গুলি ছুঁড়িতে গিয়া তাঁহার হাত কাঁপিয়া গেল। গুলি আর ছুঁড়িলেন না। তেমনি দৃঢ় মুষ্টিতে বন্দুকটাকে বগলে চাপা গিয়া একহাতে টর্চ্চ জ্বালিয়া তিনি সেই ঘরের মধ্যে ঢুকিলেন। কিন্তু ঘরে ঢুকিয়াই টর্চ্চের আলোয় তাঁহার চোখের সুমুখে যাহা দেখিলেন, তাহা যে দেখিবেন সে আশা অবশ্য তিনি করেন নাই। দেখিলেন একটি নারীমূর্ত্তি ভয়ে একেবারে কাঠ হইয়া গিয়া দেওয়াল ঘেঁসিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। বন্দুক দেখাইয়া শ্রীপতি তাহার কাছে আগাইয়া গিয়া বলিলেন, 'পালাবার চেষ্টা কোরো না, মরে যাবে।'

রমণী পালাইবার চেষ্টা করিল না বটে, কিন্তু ভয়-চকিত চক্ষে টর্চ্চের আলোয় মুখ তুলিয়া সে একবার শ্রীপতির মুখের পানে তাকাইল। সর্ব্বনাশ ! এত রূপ ! মেয়েটির চোখ মুখ স্বাস্থ্য যৌবন এবং অবয়ব দেখিয়া

শ্রীপতির চোখ দুইটা যেন ঝলসিয়া গেল। এত সুন্দরী নারী জীবনে বোধ হয় তিনি এই প্রথম দেখিলেন। মেয়েটি কিন্তু চুপ করিয়া রহিল না। হাত দুইটি বাড়াইয়া শ্রীপতির একখানি হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, 'আমায় বাঁচান। আমি—আমি—' আর কিছু সে বলিতে পারিল না, থর থর করিয়া ঠোঁট দুইটি তাহার কাঁপিতে লাগিল।

শ্রীপতি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'যে চলে গেল ও কে?'

মেয়েটি নীরবে তাহার মাথা নত করিল। সিঁথিতে সিঁদুর নাই। বোধ করি বিধবা।

শ্রীপতি বলিবার মত কোনও কথা খুঁজিয়া পাইতেছিলেন না। বলিলেন, 'লোকটাকে তুমি ভালোবাসো, আর ও তোমায় এমনি একলা বিপদের মাঝে ফেলে দিয়ে পালালো?'

মেয়েটি অনুচ্চকণ্ঠে কহিল, 'অনেক বললাম, কিছুতেই শুনলো না।'

'তোমার বাড়ী কোথায়?'

মেয়েটি আঙুল বাড়াইয়া দেখাইয়া দিয়া বলিল, 'ওই পাশের বাড়ী।'

'বাড়ীতে কে কে আছে?'

'দাদা আর বৌদি, আর কেউ নেই।'

'এর পর তুমি কি করবে? আমি যদি সব গোলমাল করে' দিই।'

'মরব। মরা ছাড়া আমার আর কি উপায় আছে?'

'মরবে কেন? যাকে তুমি ভালোবাসো, তাকে নিয়ে কোনো দেশে চলে গেলেও ত' পারো!'

'তাই ত' চাই! কিন্তু ও যেতে কিছুতেই চায় না। এখানে আমার কিছু ভাল লাগে না।'

শ্রীপতির মাথার ভিতরটা হঠাৎ কেমন যেন গোলমাল হইয়া গেল। জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি যাবে? আমি যদি তোমায় এক্ষুনি নিয়ে যেতে চাই, তুমি যাবে আমার সঙ্গে?'

মেয়েটি ঠোঁটের ফাঁকে ম্লান একটুখানি হাসিল। বলিল 'এক্ষুনি চলুন। কিন্তু কেউ যদি জানতে পারে?'

'কেউ জানবে না, চল। আমি তোমায় কলকাতা নিয়ে যাব।' বলিয়াই শ্রীপতি তাহার একখানি হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, 'এসো।'

মেয়েটি বিনা বাক্যব্যয়ে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

সিঁড়ির কাছে আসিয়া শ্রীপতি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমার নাম? কি বলে ডাকব?'

'আমার ডাক-নাম টুনু। ভাল নাম—কিশোরী।'

তাহার পর অতি সন্তর্পণে দু'জনে সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিয়া টর্চ্চ নিবাইয়া অন্ধকার পথে গিয়া দাঁড়াইল। টুনু বলিল, 'ষ্টেশনে যাবেন ত?'

শ্রীপতি বলিল, 'হাঁ, এক্ষুনি একটা ট্রেণ আসবে।'

টুনু বলিল, 'তাহ'লে এই পথে আসুন। ও-পথে গেলে লোকজন দেখতে পাবে।'

তাহার পর দুজনে একটা সুঁড়ি পথ দিয়া যথাসম্ভব দ্রুতগতিতে গ্রামের বাহিরে চলিয়া গেল। ধানের মাঠের আলি রাস্তা দিয়া সোজাপথ ছাড়িয়া বাঁকা পথে তাহাদের ষ্টেশনে পৌঁছিতে দেরী হইল না। ছোট ষ্টেশন। টিম্ টিম্ করিয়া গোটাকতক কেরোসিনের আলো জ্বলিতেছে। লোকজন একরকম নাই বলিলেই হয়। প্ল্যাটফর্ম্মের একপাশে অন্ধকারে জড়োসড়ো হইয়া টুনু বসিয়া রহিল। শ্রীপতির আসাযাওয়ার টিকিট ছিল। টুনুর জন্য একখানি টিকিট তিনি কাটিয়া আনিলেন।

দেখিতে দেখিতে ট্রেণ আসিয়া দাঁড়াইল। টুনুর হাতে ধরিয়া শ্রীপতি ট্রেণে চড়িলেন। কামরায় দুজনমাত্র লোক বসিয়া আছে।

বেঞ্চির একপাশে শ্রীপতির কাছ হইতে টুনু একটুখানি দূরে বসিতেছিল, শ্রীপতি তাঁহার হাতের বন্দুক ও টর্চ্চটি নামাইয়া রাখিয়া বলিলেন, 'সরে এসো।'

সলজ্জ সঙ্কোচে একটুখানি জড়োসড়ো হইয়া টুনু একেবারে তাঁহার গা ঘেঁসিয়া আসিয়া বসিল। শ্রীপতি বলিলেন, 'তোমার কি ভয় করছে নাকি?'

ঘাড় নাড়িয়া টুনু ঈষৎ হাসিয়া বলিল, 'না।'

শ্রীপতিও হাসিয়া চুপি চুপি বলিলেন, 'তোমায় যদি কলকাতার মত শহরে নিয়ে গিয়ে আমি পথে বসিয়ে দিই?'

টুনু তাঁহার হাতখানি হাতের মধ্যে লইয়া আঙুলগুলি নাড়াচাড়া করিতে করিতে বলিল, 'বেশ ত', আমার যা অদৃষ্টে আছে তাই হবে।'

শ্রীপতি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আচ্ছা, দাদা তোমার পুলিশে যদি খবর দেয়? আমি আর তুমি একসঙ্গে একই দিনে দু'জনে গ্রাম ছেড়ে এলাম। পুলিশের ধরতে বিশেষ কষ্ট হবে না।'

টুনু ঠোঁট উল্‌টাইয়া মুখে একপ্রকার শব্দ করিয়া বলিল, 'দাদার বয়ে গেছে পুলিশে খবর দিতে! কিচ্ছু করবে না দেখবেন। আর যদি ধরাই পড়ি ত' বলব আমি আপনার সঙ্গে ইচ্ছে করে' এসেছি।'

শ্রীপতি তাহার মুখের পানে একদৃষ্টে তাকাইয়া ছিলেন। টুনু জিজ্ঞাসা করিল, 'কি দেখছেন অমন করে?'

'দেখছি তুমি সত্যিই ভারি সুন্দরী। আমার খুব আনন্দ হচ্ছে।'

টুনু মুখ নামাইয়া কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর হঠাৎ এক সময় মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনি বুঝি অনিলদাদাদের বাড়ী এসেছিলেন?'

'হ্যাঁ, অনিল এনেছিল শীকার করতে।'

টুনু আবার হাসিল। বলিল, 'শীকার ত' করে' নিয়ে চললেন, এখন এ শীকার আপনি রাখবেন কোথায়? আপনার বাড়ীতে ত' আমার স্থান হবে না!'

শ্রীপতি বলিলেন, 'তাই ভাবছি। আজ রাত্রের মত কোনো হোটেলে কাটিয়ে কাল তোমার জন্যে আলাদা একটা বাড়ী ভাড়া করে' দিয়ে থাকবার ব্যবস্থা করে' দেবো।'

'বাড়ীতে আপনার স্ত্রী আছেন ত? ছেলেমেয়ে?'

'স্ত্রী আছেন কিন্তু ছেলেমেয়ে হয় নি।'

টুনু আবার তাঁহার হাতখানি চাপিয়া ধরিয়া বলিল, 'আমার জন্যে কেন আপনি এত কষ্ট করলেন বলুন ত'? ভূত ধরতে এসেছিলেন, ফিরে গিয়ে বললেই হতো— ভূতের দেখা পেলাম না।'

শ্রীপতি হাসিলেন। বলিলেন, 'যুগে যুগে মানুষ যার জন্যে বহু কষ্ট স্বীকার করে এসেছে আমিও করলাম শুধু তারই জন্যে কিশোরী। তবে তোমার মত সুন্দরীকে পেতে হলে যে কষ্ট মানুষের সত্যিই পাওয়া উচিত, আমি ত' তার কিছুই পেলাম না, সেজন্যে নিজেকে ত' আমি সৌভাগ্যবান ভাবছি।'

কিশোরী আবার একটুখানি হাসিল।

কিশোরীকে লইয়া আসার জন্য যতখানা গোলমাল হইবে ভাবিয়াছিলেন, শ্রীপতি দেখিলেন তাহার কিছুই হইল না। একটা হোটেলে গিয়া স্বামী-স্ত্রী বলিয়া পরিচয় দিয়া সে রাত্রি তাঁহারা দুজনে এক সঙ্গেই কাটাইলেন। কিশোরী বড় চমৎকার মেয়ে। শ্রীপতি ভাবিলেন, বিবাহ যদি তিনি না করিতেন ত' কি সুখেরই না হইত! দুজনে স্বামী-স্ত্রীর মত একসঙ্গে নিজের বাড়ীতে থাকিয়াই চিরজীবন কাটাইয়া দিতে পারিতেন।

যাই হোক্ পরদিন প্রাতে কিশোরীকে হোটেলে রাখিয়াই তিনি বাড়ী গেলেন। তাহার পর বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া কিশোরীর একটা ব্যবস্থা করিবার জন্য তিনি আবার বাড়ী হইতে তৎক্ষণাৎ বাহির হইয়া পড়িলেন। প্রথমেই ডাকঘরে গিয়া বন্ধু অনিলকে এই বলিয়া একখানি টেলিগ্রাম করিয়া দিলেন যে, শীঘ্র আসিয়া তুমি আমার সঙ্গে দেখা কর। যে বিস্ময়কর ঘটনা কাল রাত্রিতে ঘটিয়াছে সেরূপ ঘটনা জীবনে কখনও ঘটিবে বলিয়া আমি কোনদিনই ভাবিতে পারি নাই।

হাতে টাকা থাকিলে সবই সম্ভব। সেইদিনই একখানি আলাদা বাড়ী ভাড়া করিয়া বাড়ীর যাবতীয় আসবাবপত্র কিনিয়া বাড়ী সাজাইয়া কিশোরীকে তিনি হোটেল হইতে সেইখানে আনিয়া রাখিলেন।

বৈকালে বাড়ী ফিরিয়া শুনিলেন, অনিলবাবু একবার দেখা করিতে আসিয়া ফিরিয়া গিয়াছেন, আবার আসিবেন। কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিতেই বন্ধু আসিলেন। আসিয়াই বলিলেন, 'কি ব্যাপার বল ত?' আমরা ত' সারারাত ভেবেই অস্থির।'

কি বলিবেন শ্রীপতি আগেই ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন। বলিলেন, 'কাল হয় ত' মরেই যেতাম ভাই। কোনোরকমে যে বেঁচে গেছি এই যথেষ্ট। তোমাদের সব বলে কয়ে ত' গেলাম সেখানে। টর্চ্চের আলোয় পথ দেখে দোতলায় উঠলাম। হঠাৎ শুনি—দোতলায়

একটা ঘরের মধ্যে কেমন যেন একটা শব্দ হচ্ছে। দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকতেই মনে হলো যেন একসঙ্গে অনেক লোক হো হো করে' হেসে উঠলো! তোমরা সে হাসি শুনতে পেয়েছিলে কি না জানি না। বিকটকায় দৈত্যের মত একটা মানুষ—মানুষ কি অন্য কিছু ঠাহর করতে পারলাম না,—আমার দিকে এগিয়ে এলো। বন্দুক আমার হাতেই ছিল, যেমনি গুলি ছুঁড়তে যাব, বাস্ চারিদিক থেকে কারা যেন একসঙ্গে আমায় জড়িয়ে ধরলো। তারপর কি যে হয়েছে কিছু আমার মনে নেই। হয়ত অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম। জ্ঞান যখন হ'লো তখন দেখি আমি একটা ট্রেনের কামরায় শুয়ে আছি। ট্রেণখানা চলছে। উঠে বসলাম। দেখি, বন্দুক আর টর্চ্চ দুটিই আমার পাশে নামানো। গাড়ীর এককোণে এক ভদ্রলোক মুড়িসুড়ি দিয়ে বসেছিলেন। তাঁকে কিছু জিজ্ঞেস করতে আমায় ভয় করছিল। অনেকক্ষণ পরে জিজ্ঞেস করলাম, ট্রেণখানা কোথায় যাচ্ছে মশাই? তিনি বললেন, শিয়ালদা। বাস্, শিয়ালদায় নেমে ট্যাক্সি করে বাড়ী এলাম। সকালেই তোমায় টেলিগ্রাম করেছি। তারপর এই ত' দেখছ স্বয়ং বসে আছি।'

অনিলবাবু অবাক্ হইয়া কিয়ৎক্ষণ বসিয়া রহিলেন। তাহার পর মুখ তুলিয়া বলিলেন, 'কিন্তু আর একটা মজার ব্যাপার ঘটে গেছে ওখানে। ওই বাড়ীটার পাশেই এক ভদ্রলোকের বাড়ী! কিশোরী বলে তার একটি বিধবা বোন ছিল। ভারি সুন্দরী মেয়ে। তাকেও কাল রাত্রি থেকে পাওয়া যাচ্ছে না।'

শ্রীপতি যেন আকাশ হইতে পড়িলেন। বলিলেন, 'সর্ব্বনাশ! পাওয়াই যাচ্ছে না। ছাখো আবার ভূতে তাকে মেরেটেরে ফেললে নাকি!'

অনিলবাবু বলিলেন, 'ভূতের কাণ্ড ও হয়ত নাও হতে পারে। মেয়েটার স্বভাব চরিত্র তেমন ভাল ছিল না। পালিয়েও যেতে পারে।'

'ও!' বলিয়া নিতান্ত উদাসীনের মত কথাটা শ্রীপতি তাচ্ছিল্যভরে উড়াইয়া দিয়া অন্য কথা পাড়িলেন।

তাহার পর সচরাচর যাহা ঘটিয়া থাকে তাহাই ঘটিল। কিশোরীর প্রেমে মশগুল হইয়া শ্রীপতি তাঁহার স্ত্রীকে অবহেলা করিতে সুরু করিলেন।

কিশোরীর রূপ একেবারে বদলাইয়া গেল। একে সুন্দরী তায় আবার হিরায় জহরতে সোনায় দানায় তাহার সর্ব্বাঙ্গ ভরিয়া উঠিল। তাহার মনের মত নিত্য নূতন নূতন সাজ-পোষাক আসিতে লাগিল। কিশোরীর বাড়ীতে স্ফূর্ত্তির আনন্দের হাট বসিয়া গেল। কিশোরীকে শ্রীপতি একটু একটু করিয়া মদ্যপান করাইতে শিখাইলেন।

এবং তাহার ফল হইল যে, একটি বৎসর ঘুরিতে না ঘুরিতেই দেখা গেল, শ্রীপতির সঞ্চিত অর্থ সবই শেষ হইয়া গিয়াছে, এইবার বাড়ীখানি তাঁহার বিক্রি করিবার জন্য খরিদ্দার খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন।

স্ত্রী বাসন্তীর সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি শ্রীপতির অনেকদিন হইতেই হইতেছিল, এইবার তাহা বড় ভীষণ রূপ ধারণ করিল। বাসন্তী নিতান্ত নিরীহ মেয়ে, স্বামীকে কোনো দিনই সহজে কিছু বলিতে চায় না, কিন্তু কিছুদিন হইতে অত্যাচার তাহার উপর এত বেশি হইতেছিল যে, তাহারও এবার মুখ ফুটিয়াছে। মাসের মধ্যে প্রায় পনরকুড়ি দিন স্বামী তাহার বাড়ীতে রাত্রিবাস করে না, রাত্রিবাস যেদিন করে সেদিন ট্যাক্সি চড়িয়া মত্ত অবস্থায় বাড়ী যখন আসে, রাত্রি তখন প্রায় দুইটা বাজিয়া যায়। সেই অত রাত্রি পর্য্যন্ত বেচারা বাসন্তী নিজে না খাইয়া স্বামীর জন্য খাবার চাপা দিয়া অধীর আগ্রহে আধ-জাগ্রত আধ-ঘুমন্ত অবস্থায় জানালার কাছটিতে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। বাড়ীতে ঠিকা-ঝি একজন কাজ করিয়া দিয়া চলিয়া যায়। চাকর একটা ছিল তাহাকে ছাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। দরজার কড়া নাড়িলেই বাসন্তীকে নিজে গিয়া দরজা খুলিয়া দিতে হইবে, কাজেই তাহার জাগিয়া থাকা ছাড়া উপায় কি!

বাসন্তী প্রায়ই আজকাল অসুখে ভোগে। শরীর তাহার অত্যন্ত শীর্ণ হইয়া গিয়াছে। মনের অবস্থাও ভাল নয়। কাজেই শ্রীপতিকে যেদিন সে মনের দুঃখে কোনো কথা বলিতে যায় সেদিন হয়ত তাহা একটুখানি অতিরিক্ত রকমের রূঢ়ই হইয়া যায়, কিংবা হয়ত নিজেই কাঁদিয়া ভাসায়। ইহার জন্য তাহাকে দোষ [illegible]। [illegible]

শ্রীপতি বলেন, 'তুমি ছোটলোক। স্বামীকে ভক্তি করাই হিন্দুনারীর একমাত্র কর্ত্তব্য, তা সে যে অবস্থাতেই হোক্ না। কিন্তু তোমার মধ্যে সে ভক্তিটুকুও নেই।'

বাসন্তী হয়ত' রাগের মাথায় জবাব দিয়া বসে, 'তা না থাক্। তোমার ওপর ভক্তি আমার কম ছিল না। সেটুকু আজকাল তুমি নিজেই খুইয়েছ।'

শ্রীপতি বলেন, 'তাহলে আজকাল তুমি আমায় ঘৃণা কর?'

বাসন্তী বলে, 'তা করি বৈ কি!'

শ্রীপতির মাথার রক্ত তৎক্ষণাৎ গরম হইয়া ওঠে। বলেন, 'তবে এই আবার আমি চললাম বাড়ী থেকে বেরিয়ে। তুমি মর এইখানে পড়ে পড়ে।'

বাসন্তী নিরুপায়। ভয়ে তাহার বুকের ভিতরটা দুর্ দুর্ করিতে থাকে। স্বামীকে বিশ্বাস নাই। আবার হয়ত চলিয়া যাইতেও পারেন। মান অভিমান সমস্তই বিসর্জ্জন দিয়া ছুটিয়া সে পথরোধ করিয়া দাঁড়ায়। বলে, 'যেয়ো না, তোমার পায়ে পড়ি।'

এমনি করিয়াই দিন কাটে।

স্ত্রীর এই সব অনর্থক ঝগড়াঝাঁটির কথা কিশোরীর কাছে গিয়া সবিস্তারে বর্ণনা করিয়াও তবু শ্রীপতি খানিকটা শান্তি পান। গুম্ হইয়া খানিকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া বলেন, 'আর পারি না বাপু, জীবনটা আমার গেল।'

কিশোরী তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া সেইখানেই শোয়াইয়া দিয়া মাথার চুলে তাঁহার হাত বুলাইতে বুলাইতে বলে, 'ওগো, অত ভেবো না। ভেবে ভেবে শরীরটা যে গেল! কি আর করবে। বলুক না সে যা বলে তাতে তুমি কাণ দিও না।'

শ্রীপতি বলেন, 'দূর দূর, হারামজাদী এবার মরে ত বাঁচি। দিব্যি কেমন আমরা দু'জনে—'

কিশোরী ঈষৎ হাসিয়া বলে, 'সে রকম অদৃষ্ট কি আমার—'

কথা আমাদের অর্দ্ধপথেই থামিয়া যায়। দু'জন দু'জনের আলিঙ্গনবদ্ধ হইয়া চুপ করিয়া পড়িয়া থাকে।

বাড়ীখানি কুড়ি হাজার টাকায় বিক্রি করিয়া শ্রীপতি একদিন বাসন্তীকে লইয়া ছোট একখানি ভাড়াটে বাড়ীতে উঠিয়া গেলেন।

বাড়ী যে তাহাদের বিক্রি হইয়া গেছে বাসন্তী সেকথা জানিল না। বাসন্তীকে শ্রীপতি যাহা বুঝাইয়া দিলেন সরল বিশ্বাসে সে তাহাই বুঝিল। সে জানিল, বাড়ীখানা বহুদিন যাবৎ মেরামত হয় নাই, এবার একবার আগাগোড়া ভাল করিয়া মেরামত না করিলে চলিবে না, তাই তাঁহারা কিছুদিনের জন্য এই বাড়ীতে উঠিয়া আসিলেন মাত্র।

হাতে টাকা পাইয়া শ্রীপতির স্ফূর্ত্তির মাত্রা আবার বাড়িয়া গেল। কিশোরী বলিল, 'না এরকম করলে ত চলবে না। এই টাকাতেই আমাদের জীবন কাটাতে হবে। টাকা তুমি নিজের হাতে রেখো না, দাও আমার হাতে দাও।'

শ্রীপতি সেইদিনই সমস্ত টাকা ব্যাঙ্ক হইতে তুলিয়া আনিয়া কিশোরীর হাতে দিয়া বলিলেন, 'এইবার তোমার নামে ছোট্ট একখানি বাড়ী কিনে ফেলি, আর বাকি টাকা দিয়ে তোমারই নামে ব্যাঙ্কে একটা একাউন্ট খুলে দিই, কেমন?'

কিশোরী বলিল, 'তাই কোরো, কিন্তু এখন না। হবে এরপর। তুমি দিনকতক একটুখানি হাত-টান করতে শেখো।'

কিন্তু এদিকে এক মজা হইয়া গেল। বাসন্তী কেমন করিয়া না জানি বুঝিতে পারিল, বাড়ীখানি তাহাদের বিক্রি করিয়া ফেলা হইয়াছে। শুনিয়া অবধি তাহার দুঃখের আর সীমা রহিল না। শ্রীপতিকে বলিল, 'তার চেয়ে আমায় পথে বের করে' দিলেই ত' হ'তো।'

শ্রীপতি মদ্যপান করিয়াছিলেন। বলিলেন, 'তাই দেবো ভাবছি।'

বাসন্তী বলিল, 'দিতে আর বাকি রাখলে কোথায়? আমার মা নেই বাবা নেই, আত্মীয় স্বজন কেউ কোথাও নেই, কোথায় যে দাঁড়াব তার ঠাঁই নেই, আর তুমি কি না ফুর্ত্তি করবার জন্যে বাড়ীখানিও দিলে বিক্রি করে?'

শ্রীপতি বলিলেন, 'ও, আমি মরবার পর তুমি কি করবে সেই কথাই বোধ হয় তুমি ভাবো দিনরাত? কেমন?'

'তা আমায় ভাবতে হয় বই-কি!'

'এই বুঝি তোমার ভালবাসা?'

বাসন্তী রাগিয়া বলিল, 'তা যদি বোঝো ত' তাই। ভাল আমি তোমায় বাসি না। হ'লো ত?'

এমনি করিয়া কথায় কথায় সেদিন আবার তাহাদের বেশ খানিকটা ঝগড়া হইয়া গেল। শ্রীপতি রাগ করিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

যাইবেন আর কোথায়? গেলেন কিশোরীর বাড়ী।

কিশোরী বলিল, 'আর পারি না বাপু! তার চেয়ে এক কাজ কর না, হয় ওকে নয় আমাকে, দুজনের মধ্যে একজনকে তুমি মেরে ফ্যালো, আলাজঞ্জাল চুকে যাক্।'

শ্রীপতি বলিলেন, তোমায় কেন মারবো কিশোরী, মারতে হয় ওকেই মারব। কিন্তু কি করে মারি বল ত?'

কিশোরী হাসিল। বলিল, 'কেমন করে' মারবে? কেন, মেয়েদের মারতে দেরি হয় নাকি? ধর না আমার গলাটা চেপে। দ্যাখো না, এক্ষুনি মরে যাব।'

শ্রীপতি বলিয়া উঠিলেন, 'গলা টিপে মেরে ফেলব? যদি না মরে?'

'বেশ ত। গঙ্গায় নিয়ে যাও, দুজনে সন্ধ্যেবেলা নৌকোয় চড়ে হাওয়া খেতে খেতে ধীরে ধীরে একটিবার শুধু—'

বলিয়া শ্রীপতিকে দুহাত দিয়া ঠেলিয়া দিয়া হো হো করিয়া হাসিতে লাগিল।

শ্রীপতি সে হাসিতে যোগ দিলেন না। মনে-মনে ইহাই তিনি স্থির সঙ্কল্প করিলেন, উহার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে হইলে ইহাই সহজ উপায়। কিশোরী বুদ্ধিমতী। সে ঠিক কথাই বলিয়াছে।

বাসন্তীর সঙ্গে শ্রীপতি আর ঝগড়াঝাঁটি করেন না। বাসন্তী যদি বা মাঝে মাঝে দু একটা কটু কথা বলে ত' শ্রীপতি তাহা নীরবে সহ্য করেন।

বাসন্তীর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে শ্রীপতি আজকাল বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছেন। দুদিন দুশিশি ঔষধ কিনিয়া আনিয়া তাহাকে তিনি খাইতে দিলেন।

বাসন্তী অবাক্।

বলে, 'কেন গো, তোমার সেই তিনি কি মরেছেন নাকি? আমার আজকাল এত যত্ন যে?'

শ্রীপতি বলেন, 'নাঃ, ভেবে দেখলাম, তোমার ওপর সত্যিই আমি অবিচার করেছি, আর করব না।'

বাসন্তীর আনন্দের আর সীমা নাই। স্বামীর মতি পরিবর্ত্তন হইয়াছে। আর তাহার কিছুই চাই না। বলে, 'ওষুধ না খেলেও শরীর আমার এবার দেখো এমনিই সেরে যাবে।'

শ্রীপতি কিন্তু তাহা চান না। পরের দিন একটা ডাক্তার ডাকিয়া আনেন।

ডাক্তার নাকি বলিয়াছেন, গঙ্গার হাওয়ায় বাসন্তীর শরীর ভাল হইবে। সুতরাং বাসন্তীর রোজ একটু করিয়া গঙ্গার হাওয়া খাওয়া প্রয়োজন।

বাসন্তী বলে, 'তা আর কেমন করে' হবে? কে আমায় গঙ্গায় হাওয়া খাইয়ে আনবে? তোমার সময় কোথায়?

শ্রীপতি বলেন, 'তা সময় একটু করে' নিতে হবে বই-কি!'

বাসন্তী বলে, 'তাহ'লে ত' সময় আমার ফিরেছে বলতে হবে।'

তাহার পর একদিন দেখা গেল, বাসন্তীকে সঙ্গে লইয়া শ্রীপতি সত্যই বাহির হইয়াছেন। পায়ে হাঁটিয়া হাঁটিয়া দুজনে তাঁহারা গঙ্গার তীরে গিয়া দাঁড়াইলেন। সূর্য্যাস্তের পর চারিদিকে তখন ধীরে-ধীরে অন্ধকার নামিতেছে। গঙ্গার ওপারে কি আছে কিছুই ভাল দেখা যায় না। কিন্তু ঘাটে একটিও খেয়া নৌকা নাই, কোথায় গেলে নৌকা পাওয়া যায়, কি বলিয়াই বা তাহাদের ডাকিতে হয় কিছুই তিনি জানেন না। এই চিন্তার সূত্র ধরিয়া পথ চলিতে চলিতে সহসা তাহার চোখের সুমুখে একটা ভয়াবহ কাল্পনিক দৃশ্য ভাসিয়া উঠিল। নীল নিস্তরঙ্গ অতলস্পর্শ গঙ্গার জল, তাহার উপর দিয়া একখানি মাত্র নৌকা ভাসিয়া চলিয়াছে।

হঠাৎ ঝপ্ করিয়া একটা শব্দ, ভীষণ একটা আর্ত্তনাদ এবং সঙ্গে সঙ্গে সব শেষ। শ্রীপতি শিহরিয়া উঠিলেন। তা হোক্, কতক্ষণই বা লাগে! তাঁহাকে শক্ত হইতে হইবে। তাহা না হইলে এই দোটানা জীবন তাঁহার পক্ষে অসহ্য। আচ্ছা, আজ থাক্, আর-একদিন আসিলেই চলিবে।

রাস্তার উপর এক বৃদ্ধকে দেখিয়া শ্রীপতি থমকিয়া দাঁড়াইয়া প্রশ্ন করিলেন, 'নৌকো কোথায় পাওয়া যায় বল্‌তে পারেন মশাই ?'

বৃদ্ধ আঙুল বাড়াইয়া দূরের একটা ঘাট দেখাইয়া দিয়া বলিলেন, 'ওই যে ওখানে যান, গেলেই দেখবেন বিস্তর নৌকো।'

কাল কিম্বা পরশু আসিলেই চলিবে। আজ তাঁহার মনের অবস্থা ভাল নয়। শ্রীপতি বলিলেন, 'চল আজ বাড়ী ফেরা যাক্। কিন্তু নৌকোয় না চড়লে গঙ্গার হাওয়া ঠিক পাওয়া যায় না।'

বাসন্তী বলিল, 'নৌকোয় চড়্‌তে আমার কিন্তু ভয় করে।'

অন্যমনস্কের মত শ্রীপতি কহিলেন, 'তা করুক্।'

আবার আর-একদিন।

শ্রীপতি ডাকিলেন, 'কিশোরী, শোনো।'

কিশোরী কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

'সন্ধ্যে হ'তে আর দেরি নেই। এই ঠিক সময়। আমি চল্‌লাম।"

কিশোরী সাবধান করিয়া দিল, 'কিন্তু দেখো যেন কেউ জান্‌তে না পারে।'

'জানবে আবার কে ? নৌকো যখন গঙ্গার মাঝখানে গিয়ে পৌছোবে, তখন ঝপ্ ক'রে এক সময় দেবো ঠেলে। বাস, চুকে যাবে। তারপর হৈ—হৈ চেঁচিয়ে উঠব। বল্‌ব,—পড়ে গেল।'

কিশোরী বলিল, 'মাঝিরা কেউ যেন দেখতে না পায়।'

শ্রীপতি বলিলেন, 'কেউ দেখবে না। আর দেখলেও ওরা গরীব মানুষ, দু'চারটাকা পেলেই সব চুপ হয়ে যাবে।'

কিশোরী বলিল, 'পুলিশে যদি টের পায় ত' টানাটানি কর্‌তে ছাড়বে না। বেফাঁস্ কারও মুখ দিয়ে কোনও কথা বেরিয়ে পড়লেই সর্ব্বনাশ, আমাকেও তখন বাদ দেবে না।'

শ্রীপতি তাহাকে যথেষ্ট সাহস দিয়া নিশ্চিন্তে বসিয়া থাকিতে বলিয়া সেখান হইতে বাহির হইয়া গেলেন। প্রচুর মদ্যপান করিয়া তখন তিনি নেশায় একেবারে চুর হইয়া আছেন।

পায়ে হাঁটিয়া নয়, ট্যাক্সি করিয়া বাসন্তীকে লইয়া তিনি গঙ্গার ধারে গিয়া হাজির হইলেন। অন্ধকারে জোনাকীর মত চারিদিকে তখন আলো জ্বলিয়াছে। ট্যাক্সি ছাড়িয়া দিয়া সেইদিনের সেই বৃদ্ধের নির্দ্দেশমত বহু দূরের যে-ঘাটে নৌকা পাওয়া যায় সেইখানে গিয়া একজন মাঝিকে ডাকিয়া বলিলেন, 'চলো, আমাদের একটুখানি ওপার থেকে বেড়িয়ে আন্‌বে চল।'

দু'তিন জন মাঝি একসঙ্গে রাজি হইল। তাহাদের মধ্যে একজনকে ডাকিয়া শ্রীপতি বাসন্তীকে লইয়া নৌকার পাটাতনের উপর গিয়া বসিলেন। নৌকা ছাড়িয়া দিল।

শ্রীপতি একটিবারের জন্যও বাসন্তীর মুখের পানে আজ আর তাকাইতে পারেন নাই! নিতান্ত উদাসীন অন্যমনস্কের মত বাসন্তীর দু'একটা কথার তিনি জবাব দিতেছিলেন।

নৌকা যখন মাঝ-দরিয়ায়, শ্রীপতির বুকের ভিতরটা তখন গুর্‌গুর্ করিতেছে, হাত দুইটা থর্‌থর্ করিয়া কাঁপিতেছে। তা কাঁপুক্। শ্রীপতি বলিলেন, 'এইখানে উঠে বোসো, এসো—এই আমার পাশে। ওখানে বসলে হাওয়া আর পাবে কোথায় ?'

বাসন্তী ধীরে-ধীরে অতি সাবধানে স্বামীর পাশে একেবারে নৌকার কিনারে গিয়া বসিল। বলিল, 'হ্যাগা, এখানে বসতে যে ভয় কর্‌ছে।'

'ভয় কিসের ? এই ত তোমায় আমি জড়িয়ে ধ'রে আছি।'

বাসন্তী বলিল, 'আজ তুমি আবার মদ খেয়েছ ? ছিঃ'

'বেশ করেছি। এখানেও ওই-সব কথা। চুপ কর।'

'হ্যাঁ, ভালকথা বল্‌তে গেলে তোমার রাগ হয়।'

'হ্যাঁ হয়। তোমার জালায় আমি গেলাম দেখছি।'

বাসন্তী বলিল, 'তা আমার জ্বালা আর তোমায় বেশিদিন সইতে হবে না গো, যে-রোগে আমায় ধরেছে এ-রোগ আর তোমার গঙ্গার হাওয়ায় সারবে না।'

'তবে এই গঙ্গার জলে সারুক্।' বলিয়াই শ্রীপতি তাহাকে জলের দিকে সজোরে ঠেলিয়া দিলেন।

কিন্তু আশ্চর্য্য, বাসন্তী কোন্ সময় প্রাণপণে নৌকাটা দু'হাত দিয়া চাপিয়া ধরিয়াছে। সে একটুখানি টাল্ খাইয়া সাম্‌লাইয়া লইল, নৌকাটাও একটুখানি নড়িল। এবং তাহার ফল হইল এই যে, শ্রীপতির মনের ইচ্ছা বাসন্তীর বুঝিয়া ফেলিতে আর দেরি হইল না। অন্ধকার নদীর উপর বাসন্তী তাহার স্বামীর মুখের পানে সকরুণ দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকিয়া বলিল, 'ও, এতদিন ত' তোমার এ মনোভাব আমি বুঝতে পারিনি। এই জন্যেই আমায় গঙ্গায় তুমি নিয়ে আসবার জন্যে এত ব্যস্ত হ'য়েছিলে?'

শ্রীপতি বলিলেন, 'এসব তুমি কি বল্‌ছ বাসন্তী?'

বাসন্তী বলিল, 'ঠিকই বল্‌ছি। তা তুমি আগেই বল্‌লে পার্‌তে!'

বলিতে বলিতে বাসন্তীর গলার আওয়াজ দারুণ অভিমানে রুদ্ধ হইয়া আসিল, চোখ দিয়া দর্‌দর্ করিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। বলিল, 'বাঁচা আমার আর উচিত নয় তা জানি। কিন্তু তোমারই জন্যে মর্‌তে পারিনি। ভালই হ'লো, মরবার পথ দেখিয়ে দিলে।'

এই বলিয়া হাত বাড়াইয়া বাসন্তী তাহার স্বামীর পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া তাঁহাকে একটি প্রণাম করিল এবং দেখিতে দেখিতে সেই অতলস্পর্শ গঙ্গার জলে ঝুপ্ করিয়া লাফাইয়া পড়িয়া প্রবল স্রোতের তলায় কোন্‌দিক দিয়া যে তলাইয়া গেল কিছুই ঠিক ঠাহর হইল না।

'গেল—গেল' বলিয়া শ্রীপতি হাত বাড়াইয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন, মাঝি দুইজন হাঁ হাঁ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, [illegible] সেই কনকনে ঠাণ্ডা জলের উপর একজন মাঝি ঝাঁপাইয়া পড়িল, কিন্তু বৃথাই কিয়ৎক্ষণ সাঁতার কাটিয়া এদিক-ওদিক খুঁজিয়া শেষে নৌকায় উঠিয়া বলিল, 'না বাবু লাশ্ তলিয়ে গেছে।'

শ্রীপতির মুখে কথা নাই, চোখে জল নাই। নিশ্চল পাষাণমূর্ত্তির মত তখন তিনি একেবারে শক্ত কাঠ হইয়া গিয়া একদৃষ্টে নদীর জলের দিকে তাকাইয়া আছেন।

নৌকার মোড় ফিরাইয়া মাঝিরা তীরে আসিয়া পৌঁছিল। ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে শ্রীপতি নৌকা হইতে অবতরণ করিলেন। মাঝিদের পয়সা না দিয়াই তিনি চলিয়া যাইতেছিলেন, হঠাৎ কি ভাবিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। পকেটে হাত দিয়া চার-পাঁচটা টাকা একসঙ্গে তুলিয়া আনিয়া না গুণিয়াই তিনি এক জন মাঝির হাতে তুলিয়া দিয়া ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া সেই অন্ধকার কৃষ্ণবর্ণ স্রোতস্বতীর দিকে কিয়ৎক্ষণ তাকাইয়া রহিলেন, তাহার পর সহসা কিশোরীর কথা মনে পড়িতেই তাড়াতাড়ি কোথায় কোন্‌দিক দিয়া যে অদৃশ্য হইয়া গেলেন কেহই দেখিতে পাইল না।

মাঝিরা বলাবলি করিতে লাগিল—লোকটা পাগল হইয়া গেছে।

শহরের পথে আসিয়া শ্রীপতির ইচ্ছা করিতেছিল, পায়ে হাঁটিয়া নয়, গাড়ী চড়িয়াও নয়, উড়িয়া যদি তিনি কিশোরীর কাছে গিয়া পৌঁছিতে পারেন ত' ভাল হয়।

যাক্, বাসন্তীর কথা ভাবিয়া আর লাভ নাই। এইবার কিশোরীকে লইয়া সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে নিশ্চিন্তে নির্ভাবনায় পরমানন্দে তাঁহার দিন কাটিবে।

কিন্তু অবাক্ কাণ্ড, শ্রীপতি গাড়ী হইতে নামিয়া উন্মাদের মত ছুটিয়া গিয়া কিশোরীর ঘরে ঢুকিয়া দেখিলেন ঘর অন্ধকার, কিশোরী নাই।

ডাকিলেন, 'কিশোরী! কিশোরী!'

অন্ধকার ঘরের মধ্যে কাহারও কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না।

আলো জ্বালিয়া দেখিলেন, ঘরের আসবাবপত্র যেখানে যেমনটি ঠিক তেমনিই আছে, শুধু যে [illegible] বাড়ী বিক্রির নগদ টাকা তিনি [illegible]

সেই গহনা ও টাকার বাক্সটি নাই, আলমারির কাপড় জামার মধ্যে ভাল ভাল যাহা তাহাই লইয়া গিয়াছে।

খুনে আসামীকে আশ্রয় দেওয়ার ভয়েই বুঝি কিশোরী পলায়ন করিয়াছে। কিম্বা আর কিছু মতলব আছে কি না তাই বা কে জানে!

নিঃসম্বল শ্রীপতি পথে-পথে কিশোরীর অনুসন্ধান করিয়া ফেরেন।

কিন্তু কোথায় কিশোরী? স্বেচ্ছায় যে নারী নিরুদ্দেশ হইয়াছে তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করা কঠিন। তবু শ্রীপতির খুঁজিবার বিরাম নাই। তাঁহার জীবনের যা-কিছু সম্বল সবই ত' তাহার কাছে!

সেদিন অমনি এক গভীর রাত্রে কলিকাতার একটা জনহীন নোংরা পথে শ্রীপতি ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন, সহসা তাঁহার মনে হইল, কানের কাছে কে যেন বলিল, 'ওগো শুনছ?'

শ্রীপতির সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। স্পষ্ট বাসন্তীর কণ্ঠস্বর! পিছন ফিরিয়া দেখিল, কেহ নাই।

সেই দিন হইতে শ্রীপতির আবার এক নূতন উপসর্গ জুটিয়াছে। দিনে দুপুরে যখন তখন কেবলই মনে হয়, বাসন্তী তাঁহার পিছু ধরিয়াছে। সুমুখে কিশোরী, পশ্চাতে বাসন্তী! শ্রীপতি কি যে করিবেন কিছুই বুঝিতে পারেন না।

অস্নাত অভুক্ত ক্ষুধার্ত্ত শ্রীপতির তবু সন্ধানের বিরাম নাই। কিন্তু দিবারাত্রি কোনও অশরীরী প্রেতাত্মা যদি এমনি করিয়া তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করে ত' তিনি চলেনই বা কেমন করিয়া!

রাধা

—কবিতা— শ্রীদিলীপকুমার রায়

আজো শূন্য এ দেহ- মন্দিরে কেহ
গাহে নি তো সেই বন্দন!
মোর আশা-বীথিকায় এলো না তো হায়
সে-অতিথি ফুলনন্দন!…
রহে প্রতি তনু-অণু বন্ধ্যা…
নিতি অবেলায় নামে সন্ধ্যা…
কোন্ দূর বিস্মৃত
নূপুর নিভৃত
বাজে লো উদাসী-রঞ্জন…
তাহে পঞ্জর তলে
কী তৃষা উথলে
অশ্রু-পাথার মন্থন
শশি' ইতি উতি চাই… তারে তো না পাই
যাহার মিলন-অঙ্কিত
মোর মর্ম্ম-অতলে নির্জ্জনে জলে
প্রার্থন-দীপ শঙ্কিত!…
তারি ইঙ্গিতদ্যুতি ভাবি' যায়
করি বরণ…পলকে আবিলায়…

হয় সোনামুঠি হায়
ধূলামুঠি প্রায়
বিনা মোর চিরবাঞ্ছিত!…
খুঁজি কোথা সে-কলিকা
জ্বালে প্রেমশিখা…
যে-পরাগে ব্রজ গন্ধিত?
(আঁখর)
আমি ইতি উতি চাই পাই না…
সখি পাই না…
যদি আছে হৃদে মণি পাই না…
কেন চাহিলে অমনি পাই না?…
তার বাঁশি আলো বাজে
অন্তর-মাঝে
ধরিতে ধাইলে পাইনা
কেন শুনিতে চাইলে পাই না?
না না ওই বুঝি ওই বাজে বাঁশি নাই
বিরহে যাহার যন্ত্রণা

মোর বিথারে পরাণে জাগরে ধেয়ানে
দেয় ও কী কাণে মন্ত্রণা ?
ও কী ঘর ছাড়া রাগে ঝঙ্কল ?···
কোন্ ছায়া-মঞ্জীর শিঞ্জিল ?···
মোর বন্দী স্বপন
কাটে বন্ধন···
কাঁপে অভিসার উন্মনা !···
যবে— "কুল তেয়াগিয়া
আয় আয় প্রিয়া"—
গায় মুরলিয়া মূর্চ্ছনা !···
(আঁখর)
কত মূর্চ্ছনা···
সুর- আল্পনা
আঁকি' দেয় অভিসার-মন্ত্রণা !···
যায় ধীরে ধীরে আঁধা কেটে—এ কী ! বাধা
শৃঙ্খলও হয় কিঙ্কিণী।
কোন্ অচিন পুলকে নিখিল ঝলকে···
পথে ধায় রাজনন্দিনী !
বাঁশি আরো কাছে উঠে বাজিয়া !
ধরা নীলে নীলে যায় প্লাবিয়া !···
ওকে শ্যামল মোহন !···
থমকে চরণ !···
ডাকে :—"আয় লীলাসঙ্গিনী !"
আজি লভিল কি কুল
বরিয়া বিপুল
মুক্তিরে চিরবন্দিনী ?
(আঁখর)
প্রভু, এ কী লীলা তব হেরি অভিনব
মোরে ডাকো—"রাধে সঙ্গিনী !"
নাথ কমল-চরণ বন্দি' শরণ
মাগিছে হে চির-বন্দিনী।
মোর যাহা আছে হায়, লহ' লহ'—পায়
রেখো শুধু শরণার্থিণী।
আমি ধন্য কেবল আজিকে শ্যামল
অভয়-চরণ-বন্দিনী ;
প্রভু লুঠে শ্রীপদে বন্দিনী ;
প্রিয় ধন্য চরণ-অর্চ্চিণী ;
ওই রাতুল চরণ স্বপিত গোপন
শৃঙ্খলে-বাঁধা বন্দিনী ;
আজ সফল স্বপন রাধিকা-জীবন !
মুক্তি লভিল বন্দিনী ;
হ'ল কিঙ্করী লীলা-সঙ্গিনী
তব করুণায় সে অশঙ্কিনী।
যত চিন্তা-সাধন হৃদয়-রাধন
চেতনে কাঁপন স্পন্দে···
যত উছাস উছল চলচঞ্চল
দীপ্ত তোমারি ছন্দে···
প্রতি দেহকণা···লহু বিন্দু
শুধু তোমারি—হে দানসিন্ধু !
তুমি হরষ বেদন
জীবন মরণ
যাহা দিবে—সে আনন্দে
মোর লুণ্ঠিত.ভূমি
চিত্ত কুসুমি'
উঠিবে অমৃত গন্ধে।
(আঁখর)
মোর চেতনা-রন্ধ্রে-রন্ধ্রে
গুণি ! তোমারি ছন্দ মন্দ্রে,
মম নন্দনে বঁধু ক্ষরে প্রেমমধু
তোমারি মলয়-চন্দ্রে।
প্রভু দিবে যায়···
প্রিয় যাহা দিতে তব প্রাণ চায়···
তুমি দিও তায়···
আমি নাহি করি কোনো প্রশ্ন—বরণ
করিব নামিয়া তব পায়
গীতি ছন্দে···
তব শরণ-বরণানন্দে।*

* "অনামী" হইতে

আসামের প্রাচীন নৃত্যভঙ্গী

শ্রীধর্ম্মনাথ ডেকা বি-এ

প্রাচীনকালে আসামে নৃত্যকলার বিশেষ আদর ছিল। খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর ভাস্কর্য্যে এই দেশের

প্রাচীন নৃত্যভঙ্গীর নিদর্শন আছে। মন্দিরের গাত্রে এবং বিক্ষিপ্ত শিলাখণ্ডে এই নৃত্যভঙ্গী অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায়। হাজো, ডুবি ও দেবগ্রামের দেবালয়ের নর্ত্তকীর নাচে এবং কামাখ্যার দেবধা ও দেবধনীর নাচে আসামের প্রাচীন নৃত্য এখনও বিদ্যমান। অঙ্ক-গ্রথিত "ভাওনা" অভিনয়ে এবং সূত্রধারীর নাচে নৃত্যের বিবিধ ভঙ্গীর এখনও অনুশীলন হইতে পারে। কোন কোন প্রাচীন পুস্তকেও নৃত্যপরায়ণা স্ত্রী বা নর্ত্তকীর চিত্র অঙ্কিত আছে। কামরূপের মদন কামদেবের মন্দিরের একটা ভগ্ন প্রস্তর মূর্ত্তিতে শৃঙ্গার রসের নৃত্য-পরায়ণা নর্ত্তকীর নিদর্শন আছে। শিঙরীর পেশ্বর মন্দিরের শিলাতে এবং তেজপুরের হুর্জ্জয় ার শিবমন্দিরের কতিপয় শিলাতে নৃত্যভঙ্গীর নিদর্শন আছে। নীলাচল পর্ব্বতের গাত্রে একটা বৃহৎ শিলাখণ্ডে রত বটুক ভৈরবের মূর্ত্তি অঙ্কিত আছে। নটরাজ সদাশিবের মূর্ত্তিতে ভারতীয় নৃত্যের বিশিষ্টতা প্রকাশ পাইতেছে।

শিবসাগরের জয়দোলের গাত্রে নানা জীবজন্তুর মূর্ত্তি ও অন্যান্য বিবিধ চিত্রের সহিত বিহুনাচের চিত্র অঙ্কিত আছে। এই প্রকার নানা স্থাপত্য ও চিত্র-শিল্পের বিবরণে প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি না করিয়া নিম্নে তেজপুরে আবিষ্কৃত নৃত্যভঙ্গীযুক্ত ভাস্কর্য্য প্রকাশিত হইল। ইহা নৃত্যের অতি আদি অবস্থার নিদর্শন বলিয়া অনুমিত হয়।

আসাম দেশের প্রাচীন নৃত্যভঙ্গীসকল এখনও সমাজে বিদ্যমান। এতৎসঙ্গে কামরূপের প্রচলিত দেবধনী-নাচের কয়েকখানা প্রতিকৃতি মুদ্রিত হইল। এই প্রতিকৃতিগুলি প্রাচীন নৃত্যের ভাবভঙ্গী প্রকাশ করিবে। কিন্তু অধুনা দেবধনী নাচের অনেক অবনতি ঘটিয়াছে। "স্বর পরিচয়" গ্রন্থের ১৪৪ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত

শাস্ত্র রচনানুযায়ী অঙ্গসৌষ্ঠব, দেহসৌন্দর্য্য এবং নৃত্যের বিবিধ ভঙ্গীসকল এই প্রতিকৃতিগুলিতে কতদূর প্রকাশ পাইয়াছে তাহা নৃত্যবিদগণের বিচার্য্য।

দেবধনীনৃত্য "ওঝাপালি" গানের আনুষঙ্গিক। এই ওঝাপালি প্রধানতঃ দুই প্রকার,—(১) "বিয়াহ" গাওয়া

এবং (২) "শুকনান্দী" গাওয়া। প্রথম বিধে মহিষ-মর্দ্দিনী দুর্গাদেবীর পদ গীত হয়। দ্বিতীয় বিধে পদ্মাদেবী বা মনসাদেবীর পদের সহিত সুকবি নারায়ণদেব রচিত

বেহুলা-লখিন্দরের পদ গীত হয়। দুই প্রকার পদেই দেবধনী নাচ চলিতে পারে, তবে "শুকনান্দী" পদ গাইতে হইলে দেবধনী না হইলে হয় না। দেবধনীর পরিবর্ত্তে দেবধাও নাচে। নর্ত্তককে দেবধা ও নর্ত্তকীকে দেবধনী বলা হয়। দেবধনী সচরাচর চিরকুমারী হইয়া থাকে। ওঝাপদ গীত আরম্ভ করে, সঙ্গীদল তান ধরে আর দেবধনী সেই পদের লালিত্য অনুযায়ী লয় বা তাল-মান রক্ষা করিয়া বিবিধ ভঙ্গীতে নৃত্য করে। সঙ্গীরা সর্ব্বদা মন্দিরা বাজায় এবং দেবধনী নাচের সময়ে কখন কখন ছোট ঢোল বাজান হয়। ওঝা পদ গাহিতে গাহিতে নানা প্রকারের মুদ্রা দ্বারা যে রকম ভাবে শ্রোতার মন-আকর্ষণ করে দেবধনীকেও সেই রকমে নাচের আনুষঙ্গিক শরীরের ভঙ্গী এবং

হাতের মুদ্রা দ্বারা নৃত্য করিতে হয়। দেবধনী আসামে প্রচলিত রূপসজ্জা পরিচালন করে। বুক হইতে জানু পর্য্যন্ত প্রশস্ত একখানা রক্তবর্ণ কাপড় মেখলার উপরে জড়াইয়া পরে। বুকের উন্নত পয়োধর একখানা ফুল-তোলা গামছা দ্বারা পৃষ্ঠদেশে খুব শক্ত করিয়া বাঁধিয়া রাখে। ওঝা গেরুয়া কাপড় ও জামা পরে, মাথায় দীর্ঘ পাগড়ী বাঁধে, কাণে-কুণ্ডল ও কপালে ফোঁটা বা রেখা দেয়।

দেবধনী নৃত্য প্রধানতঃ এই কয় প্রকার—(১) "বুলনি নৃত্য" (২) "ছিট্কি" নৃত্য (৩) "[illegible]" নৃত্য (৪) দেবনৃত্য (৫) খর্গনৃত্য (৬) [illegible] নৃত্য (৭) [illegible]

নৃত্য (৮) ঘূর্ণী নৃত্য (৯) "চালি" নৃত্য (১০) চণ্ডীনৃত্য (১১) ভবানী নৃত্য (১২) ব্রহ্মা নৃত্য (১৩) সদাশিব নৃত্য।

দেবধনী ও ওঝা কর্ত্তৃক চণ্ডী ও সদাশিব নৃত্য দর্শন কালে বহু প্রকারের অদ্ভুত ভঙ্গী দৃষ্ট হয় এবং নটরাজের নৃত্যের বিবিধ ভঙ্গীর সহিত এই দুই নাচের নৃত্যভঙ্গীর অল্পবিস্তর সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

এতৎ সম্পর্কে দেবধনী নৃত্যের কয় প্রকার প্রতিকৃতি প্রকাশিত হইল। সঙ্গে নটরাজের নৃত্য ভঙ্গিমায় উৎকৃষ্ট নিদর্শনও প্রকাশিত হইল। আশাকরি প্রাচীন

কামরূপের তথা ভারতের নৃত্যকলার বিশিষ্টতা প্রমাণিত করিবার নিমিত্ত এইগুলি নৃত্য ও পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণের প্রনিধানযোগ্য হইবে।

"অশ্রুজল"

শ্রীমতী মাহমুদা বানু

ওরে ও অশ্রুজল!
তুই কোথা হতে এলি বল্?
ওরে তুই, নিভৃতে থাকিস্ জুড়ে,
হৃদয়ের, কেন্ সে গোপন পুরে?
ক্ষণে ক্ষণে হায় কেনরে আসিস্
আমার নয়ন পাতে—
কেন উপাধান করিস সিক্ত
নীরব নিঝুম রাতে।

ওরে বাঁধন হারা অশ্রুজল!
ঝরণারধারা সম তুইরে চঞ্চল্—
কঠিন ব্যথার সুরে
পড়িস্‌রে ঘুরে ঘুরে,—
না মেনে শাসন—
ঐ উষ্ণ জল তোর—
সহিতে পারেনা মোর—
কোমল নয়ন।

ও মোর অশ্রুজল্!
তুই কেনরে এমন চপল্,
কি হবে মিছে কাঁদিয়ে বল?
সে অকরুণ—গ'লবে না রে—
গলাবি তায় কেমন করে?
শুধুই চরণ করবি সিক্ত
অঝোর্ ঝ'রে!

স্বামীজীর জন্মতিথি

কুমারী ছায়াদেবী

বর্ত্তমান মাসে স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম-তিথি পূজা। ৯১ বৎসর পূর্ব্বে এই তিথিতে স্বামী বিবেকানন্দ বাংলায় অবতীর্ণ হন। রাজা রামমোহন রায় হইতে ভারতবর্ষের নব-জাগরণের যুগ। রাজা রামমোহন রায় নিজে শাক্ত হইয়া বৈদিক ধর্ম্ম প্রচার করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই যুগে একমাত্র রাজা রামমোহন রায়ের ভিতর প্রখর বুদ্ধি ও বহু-চিন্তাশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। রাজা রামমোহন রায় সমস্ত হিন্দুজাতির সর্ব্ববিষয়ে উন্নতির শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। সেই জন্য তিনি সমস্ত বিষয় লইয়া আলোচনা করিয়াছিলেন। রাজনীতি তাঁহার নিকট অস্পৃশ্য ছিল না। তিনি নব্য-ভারতের একনিষ্ঠ সাধক ছিলেন। কেশবচন্দ্র সেন বৈষ্ণব ধর্ম্মের সহিত খৃষ্টীয় ধর্ম্মের মিলন করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন; কারণ এই দুটি বিষয়ের প্রভাব তাঁহার ভিতর যথেষ্ট ছিল। ধর্ম্ম, সমাজ ও রাজনীতি যে পরস্পর অঙ্গাঙ্গী এ জ্ঞান রাজা রামমোহন রায় ব্যতীত ব্রাহ্মসমাজের ভিতর তৎকালে আর কাহারও ছিল না। সে সময় তাঁহার মতো পরাধীন জাতির ব্যথা কেহ ততটা অনুভব করিতে পারেন নাই।

স্বামী বিবেকানন্দ কিন্তু বর্ত্তমান ভারতের প্রথম জাগ্রত প্রতীক্। স্বামী বিবেকানন্দই প্রথম জাতির জয়-যাত্রা আরম্ভ করিলেন। তাঁহার ত্যাগ, শৌর্য্য, বীর্য্য ও তেজোদীপ্ত বাণী জাতিকে সজাগ করিয়া দিল। ঘুমন্ত জাতিকে একেবারে দাঁড় করাইয়া দিলেন, অনুনয় বিনয় করিয়া নয়, গালিগালাজ করিয়া নয়, শুধু ধাক্কা দিয়া বলিলেন, "অনেক ঘুমিয়েছিস্ এখন মানুষের মত মানুষ হয়ে একবার দাঁড়া। আহাম্মক! তোর সমাজ, তোর ধর্ম্ম কর্ম্ম, তোর দেশ জাহান্নমে চলে যাচ্ছে আর তুই এখন ঘুমুচ্ছিস্? নিজের মঙ্গল নিজে যদি না করিস্ কেও তোর মঙ্গল করবে না।"

বাল্যকালে যদিও স্বামীজী ব্রাহ্মসমাজে ধর্ম্মের জন্য মিশিয়াছিলেন কিন্তু ব্রাহ্ম সমাজের প্রভাব তাঁহার উপর বিশেষরূপে বিস্তার করিতে পারে নাই। স্বামীজীর সময় কেশবচন্দ্র সেন বঙ্গীয় যুবকদের একমাত্র নেতা ছিলেন। কেশবচন্দ্র সেনের বাক্য যুবকদের নিকট বেদবাক্য ছিল। অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় স্বামী বিবেকানন্দের উপর কেশবচন্দ্র সেনের কোন প্রভাবই পড়িল না। স্বামীজীর-জীবনে বাল্যকালে দু'টি ব্যক্তির প্রভাব বিস্তার লাভ করিয়াছিল—বুদ্ধদেব ও হার্ব্বাট স্পেন্সর। চিন্তা-জগতে দু'জনাই বিপ্লবী ছিলেন। সেই জন্য স্বামী বিবেকানন্দ পরবর্ত্তী জীবনে চিন্তাজগতে একজন শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী হইয়াছিলেন। একথা সত্য অবশ্য পরবর্ত্তী জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাব তাঁহার জীবনীতে যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়।

স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের মন্ত্র শিষ্য হইলেও তাঁহার নিজস্ব একটি চিন্তাধারা জগতে দিবার ছিল যাহা তিনি নির্ভীক হৃদয়ে ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন।

সাধারণতঃ স্বামীজীর জীবনী অধ্যয়ন করিলে আমরা প্রথমে দেখিতে পাই—তাঁহার আত্মনির্ভরশীলতা। পরমুখাপেক্ষিতাকে তিনি ঘৃণা করিতেন। তিনি স্বজাতিকে আত্মনির্ভরশীল হইবার জন্য বারংবার বলিয়া গিয়াছেন। তিনি জানিতেন আত্মনির্ভরশীলতা ব্যতিরেকে জীবের মঙ্গল হইতে পারে না। দুর্ব্বলতাকে তিনি অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন। তিনি জানিতেন, স্বাধীনতা ব্যতিরেকে মানবের আত্মমর্য্যাদা হয় না; আত্মমর্য্যাদা ব্যতিরেকে জীব কোন শুভকর্ম্ম করিতে পারে না। সেইজন্য তিনি স্বজাতিকে বলিয়াছিলেন, "হউন যুধিষ্ঠির বা রামচন্দ্র বা ধর্ম্মাশোক বা আকবর পরে যাহার মুখে সর্ব্বদা অন্ন তুলিয়া দেয়, তাহার অন্ন উঠাইয়া খাইবার শক্তি লোপ হয়। সর্ব্ববিষয়ে অপরে যাহাকে রক্ষা করে, তাহার আত্মরক্ষা-শক্তির স্ফূর্ত্তি কখনও হয় না। সর্ব্বদাই শিশুর ন্যায় পালিত

হই। অতি বলিষ্ঠ যুবাও দীর্ঘকায় শিশু হইয়া যায়। দেশের ন্যায় রাজা যারা পালিত প্রজাও কখনও স্বায়ত্তশাসন শিখে না, পরমুখাপেক্ষী হইয়া ক্রমে নির্বীর্য্য ও নিঃশক্তি হইয়া যায়।" তিনি জানিতেন নিজের উপর বিশ্বাস না হইলে কোন কাজই সম্ভবপর নয়। তিনি দেখিয়াছিলেন, জগতের প্রত্যেক জাতি নিজের উপর বিশ্বাস রাখিয়া ধীরে ধীরে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। উন্নতির মুখ্য-সহায় আত্মনির্ভরশীলতা। আত্মনির্ভরশীল না হইলে কোনরূপ উন্নতিই সম্ভবপর নহে। জগতের কোন নর-নারীকে তিনি পরাধীনতায় জীবন-যাপন করিতে পছন্দ করিতেন না। স্বামীজী বলিতেন, "ইংরাজ নর-নারী অপেক্ষা আমরা কম বিশ্বাসী; সহস্রগুণ কম বিশ্বাসী। প্রভেদ এই, ইংরাজ নিজের উপর বিশ্বাসী তোমরা নহ। সে বিশ্বাস করে, সে যখন ইংরাজ, তখন সে যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারে, এই বিশ্বাস বলে তাহার অন্তর্নিহিত ব্রহ্ম জাগিয়া উঠেন, সে তখন যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারে। অতএব আপনাতে বিশ্বাসী হও।"

দুর্ব্বলতাকে তিনি ঘৃণা করিতেন। নিজে বলিষ্ঠ ছিলেন, সেই জন্য সমস্ত নর-নারীকে তিনি সবলতার উপদেশ দিতেন।

"আমি তোমাদিগকে স্পষ্ট ভাষায় বলিতেছি, আমরা দুর্ব্বল, আমরা অতি দুর্ব্বল। প্রথমতঃ আমাদের শারীরিক দৌর্ব্বল্য। এই শারীরিক দৌর্ব্বল্য আমাদের অন্ততঃ এক তৃতীয়াংশ দুঃখের কারণ। আমরা অলস, আমরা কার্য্য করিতে পারি না; আমরা পরস্পরকে ভালবাসি না; আমরা ঘোর স্বার্থপর, আমরা তিনজন একসঙ্গে মিলিলেই পরস্পরকে ঘৃণা করিয়া থাকি, পরস্পরের প্রতি ঈর্ষা করিয়া থাকি।

ইহার কারণ কি? শারীরিক দুর্ব্বলতাই ইহার কারণ। দুর্ব্বল মস্তিষ্ক কিছুই করিতে পারে না। আমাদিগকে উহা বদলাইয়া সবল মস্তিষ্ক হইতে হইবে। আমাদের যুবকগণকে প্রথমতঃ সবল হইতে হইবে; ধর্ম্ম পরে আসিবে। তোমাদের স্নায়ুকে সতেজ কর। আমাদের আবশ্যক—লৌহ ও বজ্র দৃঢ় পেশী ও স্নায়ু সম্পন্ন হওয়া। আমরা অনেকদিন ধরিয়া কাঁদিয়াছি। এখন আর কাঁদিবার প্রয়োজন নাই, এখন নিজের পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া মানুষ হও। আমাদের এখন এমন ধর্ম্ম চাই যাহাতে আমাদিগকে মানুষ করিতে পারে। আমাদের এখন এমন সকল মতবাদের আবশ্যক যাহাতে আমাদিগকে মানুষ করে। যাহাতে মানুষ প্রস্তুত হয় এমন সর্ব্বাঙ্গ-সম্পন্ন শিক্ষার প্রয়োজন। যাহাতে তোমার শারীরিক, মানসিক বা আধ্যাত্মিক দুর্ব্বলতা আনয়ন করিবে তাহা বিষবৎ পরিহার কর।"

স্বামীজীর বেদান্ত প্রচারের মূল কারণ হইল জাতিকে বীর্য্যবান করা। তিনি জানিতেন একমাত্র বেদান্তদ্বারা জাতিকে সবল করা যাইবে। বর্ত্তমানে ভক্তিবাদের দ্বারা এ দেশে কোন উপকার হইবে না। বেদান্তের দ্বারাই জাতি আত্মনির্ভরশীলতা শিক্ষা পাইবে। তিনি বলিয়াছিলেন, "আমাদের দেশে এখন আর কাঁদিবার সময় নাই—এখন কিছু বীর্য্যের আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। তুমি আপনাকে দুর্ব্বলভাব, তবে তুমি দুর্ব্বল হইবে, তেজস্বী ভাবিলে তেজস্বী হইবে। তুমি আপনাকে অপবিত্র ভাব,তবে তুমি অপবিত্র; আপনাকে বিশুদ্ধ ভাবিলে বিশুদ্ধই হইবে। সেইজন্য যাহাতে জাতি তেজস্বী হয়, বীর্য্যবান ও মেধাবান হয়' তাহার চেষ্টা তিনি আমরণ করিয়া গিয়াছেন। জাতিকে এরূপ আশাপ্রদ বাণী বর্ত্তমান যুগে স্বামীজীর পূর্ব্বে কেহ শুনায় নাই। অদ্বৈতবাদ প্রচারের মূল উদ্দেশ্য হইল জাতিকে, জগতের প্রত্যেক নর-নারীকে সবল, সতেজ করা। তাঁহার জীবনের একমাত্র বাসনা ছিল যাহাতে প্রত্যেক জাতি সবল, বীর্য্যবান ও পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হয়। অদ্বৈতবাদ শিক্ষা দেয়—অতি শৈশবাবস্থা হইতেই তোমাদের সন্তানগণ তেজস্বী হউক; নিজের পায়ে নিজেরা দাঁড়াইতে শিখুক; সাহসী, সর্ব্বজয়ী ও সর্ব্বংসহ হউক। যাহাতে মানবত্ব নষ্ট হয় স্বামীজী তাহার ঘোর বিরোধী ছিলেন। দেবত্ব প্রচার করাই তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল।

স্বামীজী নিজের জাতিকে কখনও গালি দেন নাই। তিনি জানিতেন গালিগালাজ বা নিন্দা করিয়া কোন সংস্কার করা যায় না। তিনি বলিতেন,—"Denunciation is not the way to uplift a

nation" কথাটা অতিসত্য। যাঁহারাই নিন্দাবাদের দ্বারা সংস্কার করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহারাই অকৃতকার্য্য হইয়াছেন। এগিয়ে যাওয়াই তাঁহার স্বভাব ছিল। তিনি নিজে আগাইয়া যাইতে আনন্দ বোধ করিতেন ও জাতিকে আগাইয়া লইয়া যাইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন। অতীতের মোহে তিনি আকৃষ্ট ছিলেন না; সম্মুখে আগাইয়া যাওয়াই ছিল তাঁর বাণী। "পশ্চাতে চাহিও না, কে পড়িল দেখিতে যাইও না—এগিয়ে যাও, সম্মুখে, সম্মুখে একজন পড়িতে আর একজন তাহার স্থান অধিকার করিবে! আমি আমার জাতিকে বলি,—যাহা করিয়াছ, বেশ করিয়াছ; আরও ভাল করিবার চেষ্টা কর। আমরা একস্থানে চুপ্ করিয়া থাকিতে পারিনা। যদি একস্থানেই বসিয়া থাকি, তবে আমাদের মৃত্যু অনিবার্য্য। হয় আমাদিগকে সম্মুখে নয় পশ্চাতে যাইতে হইবে। হয় আমাদিগকে উন্নতি করিতে হইবে নতুবা আমাদের অবনতি হইবে। এখন পশ্চাতে হটিয়া গিয়া অবনত হওয়া—ইহা কিরূপে হইতে পারে? তাহা হইতে পারে না; তাহা কখনই হইতে দেওয়া হইবে না। পশ্চাতে হাটিলে জাতির অধঃপতন ও মৃত্যু হইবে। অতএব অগ্রসর হও এবং মহত্তর কর্ম্মসমূহের অনুষ্ঠান কর। ইহাই তোমাদের নিকট আমার বক্তব্য।"

স্বামীজী ছিলেন, বিরাট প্রতিভাসম্পন্ন ঋষি তিনি যাহা বলিয়া গিয়াছিলেন, সেই সকল বিষয়ই আজকাল সকলে চর্চ্চা করিতেছেন। আজ যে অস্পৃশ্যতার সম্বন্ধে দেশময় আন্দোলন হইতেছে—সেই দরিদ্র নারায়ণদের জাগ্রত করিবার জন্য স্বামীজী প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। ভারতের দরিদ্রনারায়ণদের জাগ্রত করিবার চেষ্টা স্বামীজীর পুস্তকাবলীতে ওতঃপ্রোতভাবে আছে। তিনিই প্রথমে বর্ত্তমান ভারতবর্ষে এই আন্দোলন আনয়ন করেন। দরিদ্রনারায়ণদিগকে জাগরিত করিবার উদ্দেশ্যেই স্থানে স্থানে মঠপ্রতিষ্ঠা। একবার জনৈক অন্যধর্ম্মী স্বামিজীর হাত হইতে প্রসাদ লইতে গিয়া বলিয়াছিলেন, "স্বামীজী জাত যাবে না তো?" তদুত্তরে স্বামীজী বলিয়াছিলেন, "জাত যাবে কিরে শালা, জাত হবে। তোদের কি কখনও জাত ছিল? এবার জাত হবে।"

সংক্ষেপে স্বামীজীর বিষয় আলোচনা করা বিড়ম্বনা মাত্র। কেবল আজকের দিনে শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের জন্য যৎসামান্য আলোচনা করিলাম। স্বামীজী ছিলেন বর্ত্তমান ভারতের সবিতা। শ্রদ্ধেয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় একবার দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন,—"বর্ত্তমান ভারতের কুসংস্কার একমাত্র স্বামী বিবেকানন্দই তাড়িয়ে দিতে পার্ত্তেন; কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য যে আমরা তাঁকে অল্প বয়সেই হারিয়েছি।"

বর্ত্তমান ভারতকে জাগরিত করিবার দুটিমাত্র পন্থা স্বামীজী বলিয়া গিয়াছেন—ত্যাগ ও সেবা। স্বামীজী বুঝিয়াছিলেন যে,—ত্যাগ ও সেবার দ্বারা ভারত যতশীঘ্র উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে অন্য কোন উপায় দ্বারা তত শীঘ্র সম্ভবপর নয়। এই মহা ঋষির জন্মদিনে সমগ্র ভারতবাসী স্মরণ করুক সেই সবিতাকে যিনি আজও অজ্ঞাতে নবজাতির ধীশক্তি পরিচালিত করিতেছেন।

কাশীর কথা

— ভ্রমণ —

কুমারী লতিকা মুখোপাধ্যায়

নাগপুর (ভোঁসলে) ঘাট—

নাগপুরের রাজার নির্ম্মিত।

বালা ঘাট—

বালাঘাট গোয়ালিয়রের সিন্ধিয়া মহারাজা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। ঘাটটী সুন্দর এবং পঞ্চগঙ্গা ঘাটের দক্ষিণে অবস্থিত। বালা ঘাটের উপরে একটী সুন্দর মন্দির মধ্যে শ্রীবালাজীর মন্দির।

পঞ্চগঙ্গা ঘাট—

প্রবাদ যে এই স্থানে পাঁচটী নদীর জল মিশিয়াছে। গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী এলাহাবাদে মিশিয়াছে এবং সেই জল গঙ্গা এখানে বহিয়া আনিতেছে। ইহা ছাড়া ভূতপপা ও কির্ণা নামে দুটী ক্ষুদ্রকায়া তটিনী বোধ হয় এককালে এখানে গঙ্গার সহিত মিশিত। সে নদী নাই—শুধু তাহাদের স্মৃতি ও নামমাত্র রহিয়াছে।

পঞ্চগঙ্গা ঘাটের উপর ইলেক্‌ট্রিক আলোর দক্ষিণে একটী সিঁড়ি খাড়াভাবে উপরে উঠিয়াছে। এই সিঁড়ির ডানদিকে একটী ক্ষুদ্র ঘরে বৈষ্ণব ধর্ম্ম-প্রচারক রামানন্দের আসন ও পদচিহ্ন আছে। রামানন্দ চতুর্দ্দশ শতাব্দীর একজন প্রসিদ্ধ মহাপুরুষ। তিনি এই স্থানে বসিয়া ধ্যান করিতেন। যে বেদীর উপর পদচিহ্ন রহিয়াছে, তাহার গায়ে হিন্দীতে রামানন্দের নাম লেখা আছে। ইলেক্‌ট্রিক ল্যাম্প পোষ্টের পাশেই এই ঘর সংলগ্ন একটী মন্দির চূড়া আছে—তাহার গায়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কলসাকার গুটির ন্যায় থাকায় একটু নূতন রকমের দেখায়। রামানন্দের আসনের দক্ষিণে দিকে যে সিঁড়ি আছে তাহা দিয়া বেণীমাধবের ধ্বজায় যাওয়া যায়; কিন্তু এই সিঁড়ি অত্যন্ত খাড়া, এজন্য উঠিতে কষ্ট হয়।

বেণীমাধবের ঘাট—

পঞ্চগঙ্গা ঘাটের উত্তরে বেণীমাধবের ঘাট। এই ঘাট দিয়া উঠিলে, ডানদিকে বেণীমাধবের মন্দির ও ... মসজিদের উপর বেণীমাধবের ধ্বজা। উপরে উঠিবার পক্ষে এই ঘাটটীই ভাল।

বেণীমাধবের ধ্বজার উপর হইতে কাশীর দৃশ্য একটী দেখিবার জিনিষ।

ত্রিলোচন ঘাট—

প্রবাদ এইখানে বিষ্ণু শিবের আরাধনা করিয়াছিলেন। একদিন পূজার জন্য সহস্র নীলপদ্মের মধ্যে একটী পদ্ম
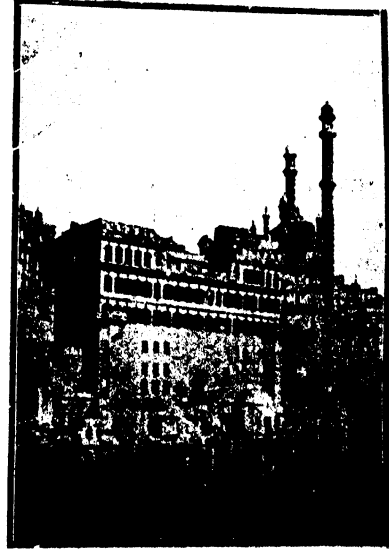
বেণীমাধবের ধ্বজা

পাওয়া গেল না। তখন বিষ্ণু নিজের একটী চক্ষু উৎপাটন করিয়া শিবের অর্ঘ্য দেন। এইরূপে শিবের একটী চক্ষু বেশী হইল। সেই অবধি শিব ত্রিলোচন।

রাজঘাট—

কাশী ষ্টেশনের কাছে ডাফরিণ সেতুর পাশেই এই ঘাট।

বরুণা সঙ্গম ও ঘাট—

রেলের ডাফরিণ ব্রিজ পার হইয়া উহার উত্তরে বরুণা নদী যেখানে গঙ্গায় মিশিয়াছে সেই স্থান পাওয়া যাইবে। বরুণা ঘাট নাটোরের রাণী ভবানী কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। এই ঘাটের উপরে আদি কেশবের মন্দির আছে।

পঞ্চতীর্থ ও কাশী পরিক্রমা—

অসি, দশাশ্বমেধ, মণিকর্ণিকা, পঞ্চগঙ্গা ও বরুণা—এই পাঁচটী ঘাটকে পঞ্চতীর্থ বলে। কাশীতে যাঁহারা তীর্থ করিতে যান, তাঁহারা এই পাঁচটী ঘাটে স্নান করেন।

কাশীর সীমা বেষ্টন করিয়া একটী পথ আছে তাহাকে পঞ্চক্রোশী পথ বলে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই পথ প্রায় পঁচিশ ক্রোশ হইবে। কাশী পরিক্রমা করিতে হইলে, মণিকর্ণিকা ঘাট হইতে আরম্ভ করিয়া অসিঘাট হইয়া এই পথে ভ্রমণ করিয়া আবার মণিকর্ণিকা ঘাটে ফিরিতে হয়। পথে যাত্রীরা কর্দ্দমেশ্বর, ভীমচণ্ডী, রামেশ্বর, শিবপুর ও কপিলধারা চটীতে থাকিতে পারেন। এই পরিক্রমায় পাঁচদিন লাগে।

বিশ্বনাথের গলি—

দশাশ্বমেধ ঘাট হইতে (গোধূলিয়ার দিকে) যাইবার সময় ডানদিকে বিশ্বনাথের মন্দিরের গলি পড়ে। এই গলির দুই পাশে খেলনা প্রভৃতির দোকান আছে। এই

বিশ্বনাথের মন্দির চূড়া

গলির ভিতর সোজা যাইতে হইবে। এই পথে বাঁ দিকের একটী বাড়ীতে সাক্ষী বিনায়কের মন্দির। ইহার পর একটু দূরে বাঁ দিকে ঢুকিতে হয়; তারপর ১০।৫৫ নম্বর বাড়ীর কাছে ডানদিকে গেলেই ঢুণ্ডি গণেশ, অন্নপূর্ণা ও বিশ্বনাথের মন্দির দেখা যায়।

প্রথমেই বাঁ দিকে ঢুণ্ডি গণেশ; তারপর বামদিকে সত্যনারায়ণের মন্দির; ডানদিকে অন্নপূর্ণার মন্দির। ইহার পর ডানদিকে শনির মন্দির ও তাহার প্রায় সম্মুখে বিশ্বনাথের মন্দির। বিশ্বনাথের মন্দির মধ্য দিয়া ঘুরিয়া গেলে জ্ঞানবাপী দেখা যাইবে।

চকের রাস্তা (লাজপত রায় রোড) দিয়াও জ্ঞানবাপী ও বিশ্বনাথের মন্দিরে যাওয়া যায়। চকের রাস্তায় কারমাইকেল লাইব্রেরী যে বাড়ীতে তাহার পরেই ডানদিকে (কোতোয়ালির দিকে যাইতে) যে সরুগলি আছে, তাহা দিয়া গেলেই জ্ঞানবাপী পাওয়া যাইবে।

দশাশ্বমেধ ঘাটে স্নান করিয়া বেশীভাগ লোক ঘাটের সম্মুখের রাস্তা হইয়া বিশ্বনাথের গলি দিয়া মন্দিরে যায়।

এই গলি এবং অন্নপূর্ণা ও বিশ্বনাথের মন্দিরের ভিতরে স্থান অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ বলিয়া অল্পেই ভীড় বলিয়া মনে হয়। এই ভীড়ে স্ত্রীলোক বিশেষতঃ বৃদ্ধাদের খুব কষ্ট ও লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়। এইরূপ অসহায়া বৃদ্ধবৃদ্ধাদের ও মাতৃজাতিকে পদদলিত করিয়া যাঁহারা জগজ্জননী ও বিশ্বনাথকে দেখিতে যান, তাঁহারা কি পুণ্য অর্জ্জন করেন তাহা বলিতে পারি না।

মন্দির দেখিবার জন্য পাণ্ডা লইবার প্রয়োজন নাই। কাশীতে যদি কেহ পরিচিত লোক থাকেন তাঁহাকে সঙ্গে লইতে পারিলে সুবিধা হয়, তাহা না হইলে এই বর্ণনা দেখিয়া সকল স্থান দেখা যাইবে। পাণ্ডারা কেবল অর্থশোষণের চেষ্টা করে; মন্দির মধ্যে লইয়া গিয়া বল "নমঃ" বলিয়া মন্ত্র পড়াইতে আরম্ভ করে এবং প্রত্যেকস্থানেই দক্ষিণা আদায়ের জন্য উৎপীড়ন করে। অনেক সময় যা' তা' দেখাইয়া দেয়।

কাশীর মন্দিরগুলির একটী বিশেষত্ব এই যে কালীঘাট প্রভৃতি মন্দিরের ন্যায় পয়সা আদায়ের জন্য চেষ্টা নাই। যাত্রী কিছু না দিলেও কেহ চাহে না। কেবল পাণ্ডা সঙ্গে থাকিলেই যত গোলযোগ।

ঢুণ্ডি গণেশ :—

ঢুণ্ডি গণেশ কাশীর রাজা দিবোদাসকে কাশী হইতে তাড়াইয়া এখানে বিশ্বনাথকে আনেন।

ঢুন্টি গণেশের উপবিষ্ট মূর্ত্তি বিশ্বনাথের মন্দিরের গলি পথের দ্বারদেশে বামদিকে অবস্থিত।

অন্নপূর্ণার মন্দির :—

অন্নপূর্ণার মন্দির উত্তর মুখ। মন্দিরের ভিতর প্রবেশ করিলে সামনেই নাটমন্দির; ইহার মধ্যে অন্নপূর্ণা মূর্ত্তি রহিয়াছে।

অন্নপূর্ণা :—

অন্নপূর্ণার শুধু স্বর্ণনির্ম্মিত মুখখানি দেখা যায়। দেবীর সম্মুখে একটী শিবলিঙ্গ। সন্ধ্যারতির সময় দেবীর মাথায় একটী স্বর্ণমুকুট পরাইয়া দেওয়া হয়।

[অন্নকূটের সময় সোনার অন্নপূর্ণা দেওয়া হয়; তাঁহার এক হাতে অন্ন ও অন্য হাতে হাতা থাকে। সামনে শিব দাঁড়াইয়া ভিক্ষা করিতেছেন। এই মূর্ত্তি কেবল অন্নকূটের সময় বাহির করা হয়।

দ্বিতলের সোনার অন্নপূর্ণা—কার্ত্তিক মাসের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী, অমাবস্যা ও শুক্ল প্রতিপদ তিথিতে মন্দিরের দ্বিতলে যে আর একটী অন্নপূর্ণার সোনার মূর্ত্তি আছে তাহা সাধারণকে দেখিতে দেওয়া হয়; অন্যদিন দ্বিতলের এই মূর্ত্তি কাহাকেও দেখিতে দেওয়া হয় না।

দ্বিতলের সোনার অন্নপূর্ণার মূর্ত্তি সুন্দর। তাঁহার বাম হাতে অন্নভাণ্ড অন্য হাতে হাতা। বাম পাশে রৌপ্যনির্ম্মিত শিব অন্ন ভিক্ষা করিতেছেন। শিবের গলদেশে মুণ্ডমালা। অন্নপূর্ণার ডানদিকে সোনার লক্ষ্মী ও বামদিকে শ্রীভূমিজী (ধরিত্রী দেবী)]

বাড়ীর ভিতর উঠানের মাঝখানে অন্নপূর্ণার মন্দির। এই মন্দিরের চারিদিক প্রদক্ষিণ করিলে এক এক কোণে এক একটী দেবমূর্ত্তি দেখা যাইবে।

অন্নপূর্ণা মূর্ত্তির পশ্চাদ্ভাগ যেদিকে মন্দিরের সেই অংশে অঙ্গনের দুইকোণে কুবেরেশ্বর শিবলিঙ্গ ও সূর্য্যমূর্ত্তি আছে। গলি হইতে অন্নপূর্ণার মন্দিরে প্রবেশ করিয়া বামদিকে গেলে যে কোন তাহাতে কুবেরেশ্বর শিবলিঙ্গ।

সূর্য্যমূর্ত্তি বেশ সুন্দর। সপ্তাশ্ববাহিত রথ সারথি চালাইতেছেন, রথোপরি সূর্য্যদেব। সূর্য রশ্মি সাতটি রঙে তৈয়ারী, একন্ত সূর্য্যের সাতটী ঘোড়া কল্পনা করা হইয়াছে।

অন্নপূর্ণার মূর্ত্তির সম্মুখভাগ যেদিকে অঙ্গনের সেই অংশের এক কোণে গণেশ ও সদর দরজার ডানদিকে হনুমান মূর্ত্তি।

অন্নপূর্ণার মূর্ত্তির সম্মুখভাগ যেদিকে অঙ্গনের সেই অংশের এককোণে গণেশ ও সদর দরজার ডানদিকের কোণে হনুমূর্ত্তি।

অন্নপূর্ণা মূর্ত্তির মুখ যেদিকে, সেই দিকে (পশ্চিমে) বাটীর ভিতর আর একটী অঙ্গন আছে। এই অঙ্গনে প্রবেশ করিলে বামদিকে দ্বিতলের সিঁড়ির কাছে কালী ঘাটের কালীমূর্ত্তি। তাহার পর একটী ক্ষুদ্র গণেশ ও পরে লক্ষ্মীমূর্ত্তি।

এই অঙ্গনের সম্মুখেই (পশ্চিমে) পাশাপাশি কয়েকটী সুন্দর দেবমূর্ত্তি আছে; বামদিক হইতে পর পর তাহাদের নাম দেওয়া হইল—ভগীরথ ও গঙ্গাবতরণ, লক্ষ্মী নারায়ণ, রাম রাজা ও গণেশ জননী। এই মূর্ত্তিগুলির বর্ণনা নিম্নে প্রদত্ত হইল—

কালীঘাটের কালী—

কালী প্রতিমা ঠিক কালীঘাটের মতন। নীচে বেদীর সম্মুখে শয়ান শিবমূর্ত্তি খোদিত রহিয়াছে।

গঙ্গাবতরণ—

মহাদেবের মস্তকোপরি গঙ্গাদেবী স্বর্গ হইতে অবতরণ করিতেছেন। মহাদেবের উপরের দুই হাতে ত্রিশূল; নীচের ডান হাতে কুঠার ও বাম হাতে সাপ। মাংসপেশী-গুলি সুন্দর দেখানো যাইতেছে। উপরে জলস্রোতের মধ্যে গঙ্গামূর্ত্তি। মহাদেবের ডানদিকে পার্ব্বতী ও বাম দিকে ভগীরথ দণ্ডায়মান।

লক্ষ্মীনারায়ণ—লক্ষ্মী ও নারায়ণের মূর্ত্তি দুইটীও সুন্দর।

রামরাজা—রাম ও সীতা বসিয়া আছেন; পিছনে লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন দণ্ডায়মান। ডানদিকে হনুমান।

রাধাকৃষ্ণ—কৃষ্ণের মূর্ত্তি শ্বেতবর্ণ।

গণেশজননী—শিব ও দুর্গা উপবিষ্ট; দুর্গার কোলে গণেশ।

নৃসিংহ অবতার—নৃসিংহ ও তাঁহার ডানদিকে প্রহ্লাদ। মন্দিরে কয়েকটী গরু ও ময়ূর আছে।

অন্নপূর্ণা মন্দির বিষ্ণু মহাদেও নামক একজন মহারাষ্ট্র দেশীয় ধনী কর্ত্তৃক নির্ম্মিত।

শনি—

শনি মূর্ত্তি বিশ্বেশ্বর মন্দিরের প্রায় সম্মুখে পথের ধারে প্রতিষ্ঠিত।

রৌপ্যময় মুখমণ্ডলে গোঁফ রহিয়াছে।

মন্দিরের কাছে গেলে পুরোহিত কপালে ভস্মের ফোঁটা দেন।

বিশ্বনাথের মন্দির—

বিশ্বনাথের মন্দির ক্ষুদ্র হইলেও সুন্দর। মন্দিরটী লাল বালি পাথরে গঠিত। মন্দিরের ছাদের উপর একটী ডুম (dome) আছে; তাহার পশ্চিম দিকে লাল পাথরের চূড়া এবং পূর্ব্বদিকে স্বর্ণমণ্ডিত চূড়া; এই জন্য এই মন্দিরকে সাহেবরা সোনার মন্দির বলে। মন্দিরটী ৩৪ হাত উচ্চ। মন্দিরের দ্বার দক্ষিণ দিকে।

বিশ্বনাথের পুরাতন মন্দির ভাঙ্গিয়া আওরঙ্গজেব মসজিদ তৈয়ারী করেন। বর্ত্তমান বিশ্বনাথের মন্দিরের কাছে যে মসজিদ দৃষ্ট হয়, পূর্ব্বে সেইখানেই বিশ্বনাথের মন্দির ছিল। এখন যে মন্দির দেখা যায়, তাহা অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইন্দোরের মহারাণী অহল্যাবাই তৈয়ারী করিয়া দেন। পরে পঞ্জাবের সুপ্রসিদ্ধ শিখ রাজা রণজিৎ সিংহ মন্দিরের উপরিভাগ সোনা দিয়া মুড়িয়া দেন।

মন্দির মধ্যে নাট-মন্দিরের মাঝখানে সম্মুখেই যে শিবলিঙ্গ আছে, তাহার নাম বৈকুণ্ঠেশ্বর শিব। নাট-মন্দিরের বাঁদিকে নেপালের মহারাজা প্রদত্ত একটী বড় ঘণ্টা আছে—যাত্রীরা সকলেই একবার ঘণ্টাধ্বনি করেন। একটী ডমরুও রহিয়াছে।

নাটমন্দিরের একদিকে বিশ্বনাথের ঘর ও অপর-দিকে পঞ্চানন শিবের ঘর ঠিক সাম্‌না সাম্‌নি।

রৌপ্য নির্ম্মিত দ্বার দিয়া বিশ্বনাথের নাট-মন্দিরের পূর্ব্বদিকে মূল মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিতে হয়। লিঙ্গমূর্ত্তি ক্ষুদ্রাকার।

জাতিনির্ব্বিশেষে সকলেই শিবের মাথায় গঙ্গাজল ও বিল্বপত্র দিয়া শিবলিঙ্গের উপর হাত বুলাইয়া থাকেন। রাজবেশ যখন হয়, এই লিঙ্গের উপর একটী সোণার সাপ বসাইয়া দেওয়া হয়।

অন্নকূটের সময় শৃঙ্গারবেশ হয়। এই সময় শিবমূর্ত্তি স্থাপন করা হয়। এই মূর্ত্তিটীর (bust) মুখ একদিকে অল্প বাঁকানো, মাথায় গঙ্গার মুখ; হাতে ডমরু ও সাপ। শিবের পাশে পার্ব্বতীর মূর্ত্তি দেওয়া হয়। এই সোণার মূর্ত্তিগুলি তুলিয়া রাখা হয় এবং কেবলমাত্র শৃঙ্গার বেশের সময় বাহির করা হয়।

নাট-মন্দিরের পশ্চিম অংশে একটী ঘরের মেঝের দণ্ডপাণি শিবলিঙ্গ। বেদীর উপর পঞ্চানন মহাদেবের সুন্দর মূর্ত্তি। এই ঘরে লক্ষ্মীনারায়ণ ও দুর্গা মূর্ত্তিও আছে।

নাট-মন্দিরের চারিদিক প্রদক্ষিণ করিলে মন্দিরের চারি কোণে দেবমূর্ত্তি দেখা যাইবে। ঢুণ্ডিগণেশের গলি হইতে প্রধান দ্বার দিয়া বিশ্বনাথের মন্দিরে প্রবেশ করিলে দ্বারের ডানদিকের কোণে অর্থাৎ অগ্নিকোণে (বিশ্বনাথের মূর্ত্তির ডানদিকে) অবিমুক্তেশ্বর (বা মুক্তি-নাথ) শিবলিঙ্গ ও বামদিকের কোণে (অর্থাৎ নৈঋত কোণে) লক্ষ্মীনারায়ণ।

বিশ্বনাথের বামদিকে যে কোণ অর্থাৎ ঈশান কোণে (অবিমুক্তেশ্বরের সামনা সামনি) একটী ঘরে অন্নপূর্ণা। মন্দিরের ঐ পাশের বাকি কোণে অর্থাৎ বায়ু কোণে (লক্ষ্মীনারায়ণের সম্মুখে) পার্ব্বতী মূর্ত্তি।

এই দুই দেবমূর্ত্তির মাঝখানে পশ্চিমদিকে মন্দিরের একটী পথ আছে। তাহা দিয়া গেলে বাঁদিকে প্রথমেই আনন্দ-ভৈরবের মূর্ত্তি। তারপর মুক্তি মণ্ডপ—এখানে বহুসংখ্যক শিবলিঙ্গ সারি সারি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে; উহাদের বাম পাশে কপিল মুনির মূর্ত্তি। মুক্তিমণ্ডপের সম্মুখে ডানদিকে সাবিত্রীর মূর্ত্তি।

বিশ্বনাথের আরতি—

বিশ্বনাথের সন্ধ্যারতি একটী দেখিবার জিনিষ। আটজন পুরোহিত মন্দির মধ্যে বসিয়া মন্ত্রপাঠ করিতে থাকেন। একজন বড় ডমরু এক হাতে লইয়া একটী কাঠি দিয়া তাল দেন। পুরোহিতেরা ফুলের মালাগুলি গোলাকার করিয়া শিবলিঙ্গের চারিদিকে একটীর উপর

আর একটী দিতে থাকেন এবং শেষে শিবলিঙ্গ ফুলে ঢাকিয়া যায়।

একটী রূপার বাঁকের মত জিনিষের উপর পাঁচটী সাপের ফণা আছে। সেইটী শিবলিঙ্গের উপর বসাইয়া দেওয়া হয়। তাহার পর যে কুণ্ডের মধ্যে শিবলিঙ্গ আছে তাহার চারিপাশে বেড় বসাইয়া উহার উপরে কতকগুলি প্রদীপ জ্বালিয়া দেওয়া হয়।

পঞ্চপ্রদীপ জ্বালিয়া আটজন পুরোহিত বাম হাতে ঘণ্টা ও ডান হাতে পঞ্চপ্রদীপ লইয়া ডমরুর তালে তালে গানের ন্যায় সুর করিয়া মন্ত্রপাঠ করিতে থাকেন।

আরতি শেষ হইবার সময় একজন ডমরুটী নাড়িয়া বাজাইতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে ঘণ্টাধ্বনি হয়। বিশ্বনাথের আরতির সময় চারিদিকে একটা পবিত্র গম্ভীর ভাবের সৃষ্টি হয়।

জ্ঞানবাপী—

বিশ্বনাথের মন্দির মধ্য দিয়া জ্ঞানবাপীতে যাইতে হয়। কিন্তু চক দিয়া আসিলে প্রথমে জ্ঞানবাপী ও তাহার পরে বিশ্বনাথের মন্দির পড়িবে।

জ্ঞানবাপী একটী কূপ। চারিদিকে একটী উচ্চ বেড় আছে। কূপের মুখে একখানি কাপড় ঢাকা থাকে। লোকে উহার উপর ফুল প্রভৃতি ফেলে।

কূপের নিকট একজন পাণ্ডা একটী হাতা হাতে বসিয়া থাকেন। যাত্রীদের ঐ হাতা করিয়া কূপের জল দেন ও তাহারা উহা ভক্তিভরে পান করে।

জ্ঞানবাপীর উপরে একটী সুন্দর ছাদ আছে। উহা ৪০টী পাথরের থামের উপর স্থিত। ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে গোয়ালিয়রের মহারাজা দৌলত রায় সিন্ধিয়ার বিধবা পত্নী বৈজবাই ইহা নির্ম্মাণ করাইয়া দেন।

আওরঙ্গজেব যখন বিশ্বনাথের মন্দির ভগ্ন করেন, তখন পাণ্ডারা বিশ্বনাথের লিঙ্গ এই কূপমধ্যে লুকাইয়া রাখেন। অবশেষে নারায়ণ ভট্ট নামক একজন দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণ এই লিঙ্গ পুনরায় তুলিয়া প্রতিষ্ঠা করেন। এই জন্যই হিন্দুর নিকট ইহা এত পবিত্র। কাশীখণ্ডে ইহার জ্ঞানতীর্থ, শিবতীর্থ ও মোক্ষতীর্থ প্রভৃতি নাম দেওয়া হইয়াছে।

নন্দিকেশ্বর—

দালানের পূর্ব্বদিকে একটী বৃহদাকার বৃষ-মূর্ত্তি আছে; ইহার নাম নন্দিকেশ্বর। এইটী নেপালের মহারাজা প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

গৌরীশঙ্কর শিব—

জ্ঞানবাপীর উত্তরে গৌরীশঙ্কর শিবের ক্ষুদ্র মন্দির। শিব বসিয়া আছেন, পাশে পার্ব্বতী।

নিম্নে যে ক্ষুদ্র শিবলিঙ্গ আছে, তাহার নাম তারকেশ্বর শিব। পাশে পদচিহ্ন।

কাশী করোয়াট—

জ্ঞানবাপীর সামনে একটী পথ উত্তর দিকে আওরঙ্গজেবের মসজিদের পাশ দিয়া গিয়াছে; এই পথ দিয়া গিয়া মসজিদের ফটকের কাছে ডানদিকের গলিতে বাঁকিবে। তারপর যে তেমাথা পাওয়া যাইবে যেখানে বাঁয়ে একটু গেলেই পথের বামপাশে কাশী করোয়াট।

কাশী কর্ব্বট বা কাশী করোয়াট একটী চতুষ্কোণ কূপ। এই কূপের মধ্যে আদি বিশ্বনাথ আছেন ইহা এখানকার পাণ্ডারা বলেন।

কাশী করোট কূপের মধ্যে পড়িয়া মরিলে পুনর্জন্ম হয় না এই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া পূর্ব্বে অনেক লোক ইহার মধ্যে আত্মহত্যা করিত। এজন্য এখন এই কূপের মুখের কাছে লোহার শিক দেওয়া হইয়াছে। একখণ্ড কাগজে একটু কর্পূর লইয়া, আগুন জ্বালিয়া কূপের মধ্যে ফেলিয়া দিতে হয়। সেই আলোকে কূপ নিম্নে যে শিবলিঙ্গ আছে তাহা দেখা যায়।

সাক্ষী বিনায়ক—

দশাশ্বমেধ রোড হইতে বিশ্বনাথের গলির মধ্যে প্রবেশ করিয়া বিশ্বনাথের মন্দিরের দিকে যাইতে পুতুল প্রভৃতি দোকানের মধ্যে একটী বাড়ীতে খুব বড় গণেশ মূর্ত্তি আছে। ইনি সাক্ষী বিনায়ক। সাক্ষী বিনায়কের নাম অনুসারে বিশ্বনাথের গলির আর একটী নাম সাক্ষী বিনায়ক গলি, সাক্ষী বিনায়ক না দেখিলে কাশী আসা নাকি ব্যর্থ হয়। কে কাশী আসিয়াছে সে সম্বন্ধে ইনি সাক্ষ্য দেন।

আওরঙ্গজেবের মসজিদ—

জ্ঞানবাপীর উত্তর দিকে পাশেই আওরঙ্গজেবের মসজিদ।

আওরঙ্গজেব বিশ্বনাথের মন্দির বিধ্বস্ত করিয়া সেই স্থানে সেই প্রস্তরে এই মসজিদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

মসজিদের পিছন দিকে এখনো প্রাচীন বিশ্বনাথের মন্দিরের একাংশ ও দ্বার দেখিতে পাওয়া যায়।

শুক্রবার দিন ছাড়া এই মসজিদে কেহ যায় না। আওরঙ্গজেব যে মোল্লার উপর মসজিদের ভার দিয়াছিল, এখনকার মোল্লা তাহার বংশধর।

দণ্ডপাণি—

বিশ্বনাথের মন্দির হইতে ঢুণ্ডি গণেশের কাছে আসিয়া ডানদিকে বেঁকিয়া গেলেই পথের বাঁদিকে দণ্ডপাণির মূর্ত্তি দেখা যায়। মন্দিরের উপর দণ্ডপাণি লেখা আছে। কৃষ্ণবর্ণ মূর্ত্তি প্রায় ৩ হাত উচ্চ। নীচে দুই পাশে সুমতি ও কুমতির মুখ।

কাশীখণ্ডের মতে দণ্ডপাণি পূর্ণভদ্র নামক যক্ষের পুত্র; ইহার নাম ছিল হরিকেশ। শিবের আরাধনা করিয়া ইনি বিশ্বনাথের নিত্য পার্শ্বচরত্ব লাভ করেন।

প্রতি মঙ্গল ও রবিবারে যাত্রীগণ দণ্ডপাণির পূজা করেন।

সঙ্কটা—

সর্ব্বসঙ্কটহারিণী দশভূজা দুর্গা মূর্ত্তি এই মন্দিরে বিরাজিত।

বীরেশ্বর—

সঙ্কটার দক্ষিণদিকে বীরেশ্বর শিবের মন্দির। প্রবাদ যে সঙ্কটা ও বীরেশ্বর শিবের পূজা করিলে বন্ধ্যার সন্তান-লাভ হয়।

অন্নকূট উৎসব—

কার্ত্তিক মাসে কালী পূজার পরের দিন প্রতিপদ তিথিতে অন্নপূর্ণার মন্দিরে অন্নকূট এবং বিশ্বনাথের শৃঙ্গারবেশ হয়। এই উপলক্ষে নানাদেশ হইতে বহু যাত্রী কাশীতে আসেন।

অন্নকূটের দিন জ্ঞানবাপীর দিকে বিশ্বনাথের মন্দিরের পিছনে যে পথ আছে, সেইদিক দিয়া যাত্রীদের প্রবেশ করাইয়া সম্মুখদ্বার দিয়া অন্নপূর্ণার মন্দিরের দিকে বাহির করিয়া দেওয়া হয়।

জ্ঞানবাপীর একদিকে স্ত্রীলোক ও অন্যদিকে পুরুষ জড় হয়। বিশ্বনাথের মন্দিরের পথে পুলিশ ও স্বেচ্ছাসেবকগণ থাকেন। মধ্যে মধ্যে একদল করিয়া লোককে ভিতরে যাইতে দেওয়া হয়। ইহার ফলে ভিতরে ধাক্কাধাক্কি হয় না এবং সকলেই দেখিতে পান।

বিশ্বনাথ—

বিশ্বনাথের মন্দিরের পিছনের পথ দিয়া প্রবেশ করিয়া মন্দিরের এক পাশ প্রদক্ষিণ করিয়া নাটমন্দিরে যাইতে হয়। নাটমন্দিরের মধ্যস্থানে যেখানে বৈকুণ্ঠেশ্বর শিবলিঙ্গ আছেন, সেখানে মন্দিরের মত করিয়া খাবার সাজান হয়।

বিশ্বনাথের লিঙ্গমূর্ত্তি দেখা যায় না। তাহার স্থানে একটী সোনার শিবমূর্ত্তির উপরার্দ্ধ (bust) স্থাপিত হয়। শিবের মস্তকোপরি আর একটী মুণ্ড—গঙ্গার মূর্ত্তি। শিবের মুখ একপাশে সামান্য বাঁকানো। পাশে পার্ব্বতীর মূর্ত্তি।

বিশ্বনাথের মন্দিরের সামনের দ্বার দিয়া বাহির হইয়া জনতা ডানদিকে চলে। পথে বামদিকে শনি ও ডানদিকে হনুমানের মন্দির।

তারপর বামদিকে অন্নপূর্ণার মন্দির।

অন্নপূর্ণা—

অন্নপূর্ণার মন্দিরে প্রবেশ করিয়া সিংহাসনের উপর অলঙ্কারভূষিত অন্নপূর্ণা মূর্ত্তি ও তাহার সম্মুখে একপাশে শিবমূর্ত্তি দেখা যায়।

নাটমন্দিরের পশ্চিমদিকে অন্নপূর্ণামূর্ত্তির সামনে খাবারের পাহাড় তৈয়ারী করিয়া তাহার উপর সাধারণতঃ বৃন্দাবন লীলা দেখান হয়। শ্রীকৃষ্ণ বাঁশী বাজাইতেছেন। একজন গোয়ালা বাঁক কাঁধে যাইতেছে। রাখালরা গরু চরাইতেছে। এগুলি ছোট ছোট মাটীর পুতুল।

আর এক পাশে খাবারের স্তূপের উপর শ্রীকৃষ্ণ গরু চরাইতেছেন এইরূপ একটী পুতুল থাকে।

অন্নপূর্ণার মন্দিরের প্রবেশ দ্বারের ডানদিকে মন্দিরের দ্বিতলে যাইবার সিঁড়ি আছে। এই সিঁড়ি দিয়া লোককে উপরে উঠিতে দেওয়া হয়। তারপর দ্বিতলের বারান্দা প্রদক্ষিণ করিয়া কালীঘাটের কালীমূর্ত্তির কাছে যে সিঁড়ি আছে তাহা দিয়া সকলে নামেন।

মন্দিরের দ্বিতলের উত্তর পূর্ব্ব দিকের ঘরে সোনার অন্নপূর্ণার সুন্দর মূর্ত্তি স্থাপিত আছে। অন্নপূর্ণা দেবীর

বাম হাতে অন্নভাণ্ড; ডান হাতে হাতা করিয়া শিবকে অন্ন দিতেছেন। শিব অন্নভিক্ষা করিতেছেন। শিবের গলদেশে মুণ্ডমালা। শিবমূর্ত্তি রৌপ্যনির্ম্মিত।

অন্নপূর্ণা মূর্ত্তির বাম দিকে লক্ষ্মীমূর্ত্তি ও অন্যপাশে শ্রীভূমিজী (পৃথিবী)। এই দুইটী মূর্ত্তিও স্বর্ণনির্ম্মিত।

অন্নপূর্ণার ঘর হইতে বাহির হইয়া বারান্দা ঘুরিয়া মন্দির বাটীর পশ্চিমাংশে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকের সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিতে হয়। এই সিঁড়ির নীচে নামিতেই কালীঘাটের কালী প্রতিমা দেখা যাইবে।

মন্দিরের পশ্চিম দিকের অঙ্গনে—

মন্দিরের পশ্চিম দিকের অঙ্গনে গোলাকার কাঠের উচ্চ প্লাটফর্ম্ম করিয়া তাহার উপর অন্নব্যঞ্জনাদি সাজান হয়। ইহাই অন্নকূট।

এই অঙ্গনের চারিদিকে যে সব দেবমূর্ত্তিগুলি আছে, তাহাদেরও সাজান হয় এবং প্রত্যেকের সামনেই অনেক গুলি বড় বড় থালা ভরিয়া খাবার দেওয়া হয়।

মানমন্দির—

কাশীর দশাশ্বমেধ ঘাট হইতে ঘাট দিয়া একটু উত্তরে গেলেই মানমন্দির ঘাট। সিঁড়িগুলি খুব খাড়া ভাবে উপরে উঠায়, উঠিতে একটু কষ্ট হয়। ঘাটের উপরেই মানমন্দির।

দশাশ্বমেধের রাস্তা হইতে যাইতে হইলে, টাকি নিবাসের সাম্নে, ঘাট হইতে যাইবার সময় ডানদিকে যে একটী গলি আছে তাহা দিয়া গেলে সুবিধা হয়। একটু গিয়া প্রথমে ডানদিকে ও তারপর বাঁদিকে বাঁকিলেই মানমন্দির পাওয়া যাইবে। মানমন্দিরের বাড়ীর নম্বর D/16/12.

মানমন্দিরের দ্বিতলে জ্যোতিষের প্রাচীন যন্ত্রগুলি আছে।

জ্যোতিষের যন্ত্রগুলির বর্ণনা—

(১) দিগংশ যন্ত্র—এই যন্ত্র দ্বারা গ্রহ-নক্ষত্রাদির দিগংশ (azimuth) দেখা হইত। মধ্যে একটী লৌহদণ্ড ও তাহাকে কেন্দ্র করিয়া প্রথমে একটী বৃত্তাকার প্রাচীর ও তাহার বহির্দ্দেশে আর একটী উচ্চতর প্রাচীর আছে। এই প্রাচীরগুলির উপরিভাগ সূক্ষ্মভাগে বিভক্ত। ইহা দ্বারা এক বৎসর পূর্ব্বে সূর্য্য ও চন্দ্রগ্রহণ গণনা করা যায়।

(২) সম্রাট যন্ত্র—

মানমন্দিরে দুইটী সম্রাট যন্ত্র আছে।

সম্রাট যন্ত্রে নক্ষত্রের ক্রান্তি (declination and angle of heavenly bodies), বিষবাংশ এবং সময় জানা যায়।

একটী ঢালু মতন প্রাচীর আছে; উহার নিম্নপ্রান্ত হইতে রাত্রে আকাশের দিকে চাহিলে ধ্রুবনক্ষত্র দেখা যায়।

সম্রাট যন্ত্রের নীচেই ঘড়ি-যন্ত্র।

ঢালু প্রাচীরটীর ছায়া ইহার উপর কোন স্থানে পড়ে তাহা দেখিয়া সময় ঠিক করা যায়।

(৩) নাড়ীযন্ত্র (Sun dial)—

ইহা দ্বারা উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ণ বুঝা যায় (to find whether heavenly bodies are in the northeorn or southern hemisphere)। ইহাদ্বারা সময়ও জানা যায়।

(৪) চক্র-যন্ত্র—

এই যন্ত্রটী পিত্তলের একটী চাকার মতন। ইহা দ্বারা সূর্য্য, চন্দ্র ও নক্ষত্রগুলির ক্রান্তি (decilination of the sun, moon and stars) এবং তাহাদের দূরত্ব (distance in time from the meridian) জানা যায়।

(৫) দক্ষিণোত্তরভিত্তি যন্ত্র—

মধ্যাহ্নকালে গ্রহ-নক্ষত্রাদির উচ্চতা(altitude of heavenly bodies when on the meridian) জানা যায়।

মানমন্দির ১৬০০ খৃষ্টাব্দে আকবরের সেনাপতি অম্বররাজ মানসিংহ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। পরে মানসিংহের বংশধর জয়পুর সহরের প্রতিষ্ঠাতা সওয়াই জয় সিংহ এই মানমন্দির ব্যবহার করেন। জয় সিংহ তাঁহার সময়ের শ্রেষ্ঠ জ্যোতির্ব্বিদ ছিলেন এবং হিন্দু, আরব দেশীয় ও ইউরোপীয় জ্যোতিষে তাঁহার বিশেষ অধিকার ছিল। তিনি জয়পুর, উজ্জয়িনী, মথুরা এবং দিল্লীর বিখ্যাত 'যন্তর মন্তর' নামক মানমন্দির স্থাপন

করিয়াছিলেন। কাশীর মান-মন্দিরস্থ যন্ত্রগুলি জয়সিংহের প্রতিভার নিদর্শন।

মণিকর্ণিকা ঘাটের নিকট

বিশালাক্ষী—

মণিকর্ণিকার ঘাটের অনতিদূরে বিশালাক্ষীর ক্ষুদ্র মন্দির। মণিকর্ণিকা ঘাটের শ্মশানের একটু দক্ষিণে একটী গলি ঘাট হইতে বাহির হইয়াছে। এই গলিটী কতকটা ঢালুভাবে উচ্চে উঠিয়াছে। একটী মন্দিরের কাছে বাঁয়ে ও তাহার পর D3/46 নম্বরের বাড়ীর কাছে ডানদিকে বেঁকিলে বিশালাক্ষীর মন্দির পাওয়া যাইবে।

বিশ্বনাথের মন্দির হইতে যাইবার পথও নিম্নে বর্ণিত হইল। বিশ্বনাথের মন্দিরের প্রধান দ্বার দিয়া বাহির হইয়া বাঁহাতে বেঁকিবে। তারপর তেমাথার কাছে ডানদিকে যাইবে। রাজস্থান সংস্কৃত কলেজের কাছে বাঁদিকের গলিতে বেঁকিবে। তারপর ৩/৮১ নম্বর বাড়ীর কাছে বাঁয়ে বেকিবে। ইহার পরই এই গলি ডানদিকে গিয়াছে। পথের ডানদিকে বিশালাক্ষীর মন্দির। মন্দিরের নম্বর D3/85।

বিশালাক্ষীর মন্দির কুম্ববিশাকম্ নামক এক ভদ্র-লোক ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। মন্দিরটী ছোট, কিন্তু দেখিতে মন্দনয়। বিশালাক্ষী দেবীর মূর্ত্তি ক্ষুদ্র; কেবল মুখখানি দেখা যায়, বাকি সব মালা দিয়া ঢাকা।

মূল দেবীমূর্ত্তির চারিদিকে অনেকগুলি শিবলিঙ্গ ও অন্যান্য দেব মূর্ত্তি আছে।

বিশালাক্ষী দেবীর মন্দির ভারতের ৫১ পীঠস্থানের অন্যতম। পিতা দক্ষের মুখে শিবনিন্দা শুনিয়া সতী দেহত্যাগ করেন। সতীর মৃতদেহ স্কন্ধে লইয়া শোক বিহ্বল শিব যখন ভারতের চারিদিকে ভ্রমণ করেন, তখন বিষ্ণু সুদর্শন চক্র দিয়া ঐ দেহ খণ্ড খণ্ড করিতে থাকেন। ৫২ খণ্ডে বিভক্ত হইয়া সতীদেহ যে ৫২ স্থানে নিপতিত হয়, সেই ৫২ স্থানই ৫২ পীঠস্থান হইয়াছে। দেবীর কুণ্ডল কাশীতে পড়িয়াছিল। এজন্য কালীঘাটের মন্দিরের ন্যায় এই মন্দিরও পবিত্র।

পঞ্চগঙ্গা ঘাটের নিকট

বেণীমাধবের ধ্বজা—

বেণীমাধবের ধ্বজা গঙ্গাতীরের অতি নিকটে অবস্থিত। পঞ্চগঙ্গা ঘাট হইতে উঠিয়া ধ্বজায় যাওয়া যায়।

বিন্দু মাধবের প্রাচীন মন্দির ভাঙ্গিয়া সেইস্থানে আওরঙ্গজেব এই মস্‌জিদটী করেন। মস্‌জিদের উপর যে স্তম্ভ দুইটী আছে তাহাদের বেণী মাধবের ধ্বজা বা মাধো রায়ের ধরারা বলে। এই স্তম্ভ দুইটী অবসান গঞ্জের মাধব রায়ের দ্বারা নির্ম্মিত।

মস্‌জিদের দ্বারের মধ্যে সামনেই একটি বিস্তৃত বাঁধানো উঠান। তাহার পর মস্‌জিদের বাড়ী। বাড়ীর সাম্‌নে জুতা খুলিতে হয়।

মস্‌জিদের ছাদের সিঁড়ির কাছে একজন লোক দাঁড়াইয়া থাকে। ধ্বজায় উঠিতে হইলে প্রত্যেক লোককে এখানে দুই পয়সা হিসাবে দিতে হয়।

মস্‌জিদের ছাদে উঠিবার সিঁড়ি খাড়াভাবে উঠিয়াছে। সিঁড়ির দুই দিকে মোটা দড়ি আছে; উহা ধরিয়া উঠিতে হয়।

মসজিদের ছাদের উপর হইতে বেণীমাধবের ধ্বজার সিঁড়ি আরম্ভ হইয়াছে। দুই পাশে দুইটী ধ্বজা আছে; বাম দিকেরটীতে উঠিলে চারিপাশের দৃশ্য আরো ভাল দেখা যায় বলিয়া অধিকাংশ লোক এইটীতে উঠেন।

বেণীমাধবের ধ্বজার সিঁড়ি কলিকাতার মনুমেণ্টের মতন ঘুরিয়া ঘুরিয়া উঠিয়াছে। ভিতরে বেশ আলো আছে। ধ্বজা ১১৫ হাত উচ্চ এবং ৯০ হাতের পর বসিবার স্থান। এই ঘোরানো সিঁড়িতে সর্ব্বশুদ্ধ ৮২ ধাপ আছে।

বিন্দুমাধবের মন্দির—

মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিয়া দ্বিতলে উঠিলে বিন্দু-মাধবের মূর্ত্তি দেখা যাইবে।

এই ঘরের মধ্যেই ডানদিকে একস্থানে রামলক্ষ্মণ ও জানকীর সুন্দর মূর্ত্তি ও তাহাদের পিছনে একাদশী দেবীর মূর্ত্তি। তারপর পঞ্চগঙ্গেশ্বর নামে একটি শিবলিঙ্গ।

(ক্রমশঃ)

ব্যবসায়ে বাঙ্গালী

শ্রীসুধাংশুকুমার মিত্র বি, এস্, সি,

ব্যবসা জগতে বাঙ্গালীর স্থান এখনও সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নি, কিন্তু ঐজন্য বাঙ্গালীর যে ব্যবসায় করিবার ক্ষমতা কখনও ছিল না বা নাই একথা স্বীকার করি না। কেন স্বীকার করি না উহার কারণ বলিতেছি। ইংরাজ রাজত্বের পূর্ব্ব-মূহূর্ত্ত পর্য্যন্ত এবং ইংরাজ রাজত্বের কিছুকাল বাংলার ব্যবসা বাঙ্গালীর ব্যবসা সমগ্র জগতে ব্যাপ্ত ছিল। ঢাকার মস্‌লিন, মুর্শিদাবাদের সিল্ক প্রভৃতি ব্যবসা ও উহার ধ্বংসের কারণ অনেকেই জানেন। বাংলা কৃষি-প্রধান দেশ এবং বাংলার তিনটী প্রধান ফসলই—চা, ধান এবং পাট মারওয়াড়ী ও ইংরাজদের করতলে। বাংলার গ্রামে গ্রামে এখন পাগড়ী পড়া লোক দেখিতে পাওয়া যায়। ধান পাট জন্মাইবার পূর্ব্বে কৃষকদিগকে দাদন দিয়ে আসা এবং ফসল হইলেই অর্দ্ধমূল্যে ঐসব কেনা মারওয়ারীদের একচেটে ব্যবসা হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং তারপর ঐসকল দ্রব্য আরৎদার বা সাহেব ব্যবসায়ীদের নিকট লাভ মূল্যে বিক্রয় করিয়া মারওয়াড়ীরা লক্ষপতি হইয়া কলিকাতার উপর-বড় বড় বাড়ী করিতেছে এবং সাহেবেরাও অপর পক্ষে ঐসকল দ্রব্য রপ্তানী দিয়া উহার বিনিময়ে বিলাতী কাপড়, চিনি, প্রসাধন দ্রব্য ও বাবুয়ানা করিবার সামগ্রী জুটাইতেছে। ভাতের বদলে আমরা কাপড়, সাবান, এসেন্স কিনিতেছি। ঐ ব্যবসা চক্রের মধ্যে বাঙ্গালীর ঢুকিবার যেন কোন অধিকার নাই। অনন্যউপায় বাঙ্গালী যুবক সামন্য মাহিনার চাকুরীর জন্যই উমেদারী করিয়া ফিরিতেছে।

ইংরাজ সকল বলে বলীয়ান হইয়া ভারতে ব্যবসার উদ্দেশ্যে আসিয়াছিল, তাহাদের বল ও কৌশলের নিকট বাঙ্গালীর তখনকার বল ও কৌশল নগণ্য পরিগণিত হইল ফলে ইংরাজ বাংলার সকল ব্যবসা করতলগত করিল। কিন্তু ইংরাজ ব্যবসায়ীরা ব্যবসা-জগতে বাঙ্গালীর সাহায্য একান্ত অনুভব করিল এবং যেদিন বাঙালী মধ্যবিত্ত লোকেরা ইংরাজদের বড় বড় চাকরীর মোহে আচ্ছন্ন হইয়া তাহাদের এযাবৎকাল পরিচালিত ব্যবসা ও বাণিজ্য পরিত্যাগ করিয়া চাকরীর মোহে মজিল সেইদিন হইতে বাঙালীর ব্যবসা করিবার ক্ষমতা লুপ্ত হইল। তখন হইতে চাকরীই বাঙালীর ধর্ম্ম ও কর্ম্ম হইয়া আসিতেছে; প্রায় বাঙালী ছেলেই এখনও ভাবিতে শিখে নাই যে চাকরী ব্যতীত টাকা উপার্জ্জন তাহাদের পূর্ব্ব-পুরুষদের দ্বারা কখনও সম্ভব হইয়াছিল এবং বেশী পরিমাণেই। বাঙালীর শিশুকে মা আদর করিতে করিতে শুনান "যে ছেলে তাঁর বড় হয়ে চাকরী করে বড়লোক হবে।

ফলে সাবালক হইয়াই তাহারা চাকরীর আশায় আফিসে আফিসে ধন্না দেয়। এখন মাদ্রাজী কেরাণীর আমদানিতে বাঙালী কেরাণীদের দুর্দ্দশা আরম্ভ হইয়াছে। মাদ্রাজীরা এখন কোন প্রসিদ্ধ ইংরাজ ব্যবসায়ীর মতে "Better Servants" রূপে পরিগণিত হওয়ার বাঙালী কেরাণীর স্থানাভাব ঘটিতেছে। উহা ব্যতীত আবার সরকার কর্ত্তৃক মুসলমান ও ফিরিঙ্গীদের অধিক পরিমাণে চাকরী দান বাঙালী কেরাণীর বাজার মন্দ হইতে মন্দতর করিয়া দিতেছে। যদিও এযাবৎকালের মসীজিবী বাঙালীকে গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য কিছু কষ্ট স্বীকার করিতে হইতেছে কিন্তু উহার অবশ্যম্ভাবী ফল বাংলা ও বাঙালীর পক্ষে অত্যন্ত আশাপ্রদ।

এখন বাঙালীকে ব্যবসা করিতে অনেক ক্ষতি ও অসুবিধা স্বীকার করিয়া লইতে হইবে কারণ একদিকে তাহাদের জ্ঞানের ও শিক্ষার অভাব আছে। দুশো বৎসরের চাকুরীর ফলে বাঙালীকে আজ তাহার সকল

ব্যবসাবুদ্ধি হারাইতে হইয়াছে এবং অপর পক্ষে অন্য ব্যবসায়ীরা ঐ সময়ের জন্য ব্যবসা করার দরুণ ক্রমাগত সূক্ষ্ম শিক্ষালাভ করিয়া আসিতেছে ফলে তাহাদের ব্যবসাবুদ্ধি যথেষ্ট প্রখরতা লাভ করিয়াছে। অতএব বাঙালীকে এখন ব্যবসা-জগতে প্রবেশ করিতে হইলে যথেষ্ট বাধা অতিক্রম করিতে হইবে। ভয়ে পিছাইলে চলিবে না। একদিকে চাকরী গ্রহণ করিয়া সমগ্র জাতির সর্ব্বনাশ ও অপর পক্ষে ব্যবসা করিয়া জাতির উন্নতির চিত্র বাঙালীর মনে সকল সময়ের জন্য জাগরিত রাখিতে হইবে। ব্যবসা-বাণিজ্য করিয়া তাহাদের পুনঃ প্রতিষ্ঠার মনোরম চিত্র আঁকিয়া তাহাদের মনকে এদিকে প্রলুব্ধ করিতে হইবে। কারণ এই হইবে তাহার দুর্গম পথের একমাত্র পাথেয়। বাঙালীকে আজ ব্যবসা-জগতের মধ্যে প্রবেশ করিতে হইলে কি "প্রিমিয়াম" দিয়াই প্রবেশ করিতে হইবে, কিন্তু তাই বলিয়া অদৃষ্ট-অভিনয়ের পাট হইতে তাহারা বাদ পড়িবে কেন? কেবলমাত্র রঙ্গালয়ের দ্বারী হইয়াই জীবন কাটাইবে না বলিয়া বাঙালীকে আজ জীবন-মরণ পণ করিতে হইবে।

যাহারা এযাবৎকাল বাংলায় ব্যবসা করিয়া আসিয়াছে বাংলার সোণার ফল তাহারা বিনা বাধায় কুড়াইয়া লইয়াছে ফলে বাংলা মায়ের সন্তানই আজ অনাহারী। এপথে বাঙালী বাঙালীকে সাহায্য করিতে বাধ্য এবং করিতে হইবেও। আগে বাংলা পরে ভারত,—এই হইবে আত্মপ্রতিষ্ঠার মূলমন্ত্র। বাঙালীকে বাঁচিবার পথেই চলিতে হইবে।

গান

শ্রীকালিদাস রায়

মিলন সঙ্গীত

এ কেমন হলো, আহা মরি মরি
আজিকে—তোমার সাথে আমার মিলন
ছড়িয়ে গেল ভুবন ভরি'।
এ মিলন—দেখছি সবার মনে মনে
গগনে—মাঠে ঘাটে বনে বনে
রাজিছে—দিশি-দিশি দেশে দেশে
আলিঙ্গনের রূপটি ধরি'।
আজিকে—বাণীর সাথে সুরের মিলন কানে বাজে
সুষমার—রূপের সাথে মধুর মিলন চোখে রাজে
মাধুরীর—মিলন হলো রসের সনে
আদরের—মিলন হলো যশের সনে
ভকতির, মিলন হলো পূজার সাথে
দেউল বেদীর সোপান পরি।
আজিকে—ঢেউয়ের সাথে ঢেউয়ের মিলন গলাগলি
পাখীরা—ছায়ায় মিলে তাহাই করে বলাবলি
সমীরণ-গন্ধ সনে আজকে মিলে
এ মিলন—রটিয়ে বেড়ায় এই নিখিলে
তৃতীয়ার—চাঁদ যেন আজ নীল যমুনায়
দ্যুলোক ভূলোক মিলন-তরী।

ঝাঁকিয়ে নেশা

সুরুচিবালা চৌধুরাণী

(পূর্ব্বপ্রাশিতের পর)

১৯

সুরমা জীবনে কখনো এত বিস্মিত হয় নাই। সে কিছু ভাবিতে পারিল না, উপলব্ধি করিতে পারিল না। তাহার সমস্ত ধারণা শক্তিকে এক মুহূর্ত্তে শিথিল অবশ করিয়া দিল পৃথা—

কিন্তু একটু পরেই সমস্ত বিস্ময়কে ছাপাইয়া উঠিল তাহার আনন্দ। এতদিন পরে দেখা—কতদিন! যেন একটা যুগ চলিয়া গিয়াছে। একটা জীবন কাটিয়া গিয়াছে, কত কথা বলিবার আছে, জিজ্ঞাসা করিবার আছে। সে আগ্রহে আনন্দে একটু অস্থির হইয়া উঠিল। কিন্তু পৃথা, সে যেন সেইদিন মাত্র চলিয়া গিয়া আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। এইটুকু সময়ের ভিতর কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই, কোন কিছু ঘটিয়া যায় নাই। পৃথা নির্ব্বিকার ভাবে বসিয়া যত কথা বলিল—তার ভিতর তাহার এরোপ্লেন চালানো শিক্ষার কথাই বেশী। সুরমা অনেক প্রশ্ন করিল—সে কেমন আছে, বিমু, মোনা কেমন আছে, তাহারা কোথায়, সে এতদিন কি করিতেছিল, কোথায়, কোথায় ঘুরিল—কিন্তু পৃথা সবগুলার উত্তর না দিয়া শুধু বলিল—আমি ভালই আছি। অনেকখানে ঘুরলুম, বিমু, মোনা তাদের শিক্ষয়িত্রীর সঙ্গে আসছে আজই। তুমি জানো না বৌদি—এতদূর ওড়ার কি আনন্দ! একদিন তোমাকে আমার 'মথ'এ উঠতে হবে।"

"আচ্ছা, সে দেখা যাবে—আপাততঃ কোত্থেকে আসছ?"

"এখন আসছি—করাচী থেকে—"

"তোমার হঠাৎ এ খেয়াল হ'ল কেন?"

"খেয়াল? অনেক আগে থেকেই তো ছিল—তাছাড়া" —বলিয়া পৃথা একটু গম্ভীর হইয়া কি ভাবিল—তারপরে বলিল,—"কিন্তু জানো এরোপ্লেন চালানোটা মোটেই কঠিন নয়, মোটরের চেয়েও সহজ—তবে তালটা খুব ঠিক রাখতে হয়—নয়তো একেবারে—ওলট-পালট।

"ভয়ের নয় কি?"

"ভয় হলেই বা কি?"

"তুমি চালাতে শিখেছ তো ভাল করে?"

"এ' লাইসেন্স নিয়েছি—'বি' তো এখানে পাওয়া যাবে না তার জন্য আমায় ইউরোপে যেতে হবে।"

সুরমা, এই পৃথার জন্যই ভাবিয়া ভাবিয়া কত বিনিদ্র রাত্রি কাটাইয়াছে মনে করিয়া একটু হাসিল—সে যখন তাহার জন্য কাঁদিয়াছে, সে যে তখন এমন করিয়া হাসিয়াছিল তা যদি তখন জানিতে পারিত। অজ্ঞাতসারে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সে বলিল—"এত দেরী ক'রে এলে পৃথা—তোমার তো আরো আগে আসবার কথা ছিল ভাই!"

"ছিল তো বৌদি—কিন্তু আমি আসি আসি করেও—তারপরে ওদের স্কুল ছিল—"বলিয়া হঠাৎ উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"গাড়ী আছে তো? আমি একটু ঘুরে আসি—"

"কোথায় আর এখন ঘুরতে যাবে? স্নান করে খাও তারপরে বরং যেয়ো—"

"না—বাইরেই খাবো। দাদা কোথায়?"

সুরমা রাজীবের তেলের খনির কথা বলিল—পৃথা খানিকক্ষণ শুনিয়া আবার বলিল—"এবারে যাই—"

সুরমা বলিল—"এতদিন পরে এলে একটু বসই না—"

পৃথা হাসিল—"তাতে কি হয়েছে—আর এই তো সেদিন গেছি—"

সে বসিল না দুই একটা কথা বলিয়া গাড়ী লইয়া বাহির হইয়া গেল।

সর্ব্বাগ্রে সুরমার মনে হইল অত্যধিক শোকে পৃথার মাথা খারাপ হয় নাই তো! নানা কথা ভাবিয়া সে উঠিয়া দুইটী ঘর তাহার জন্য ঠিক করাইয়া দিল, তারপরে বিকালে ছেলেদের ষ্টেশন হইতে আনিতে গেল। তাহাদের লইয়া ফিরিয়া আসিয়াও সে দেখিল পৃথা তখনও বাড়ী আসে নাই—

সন্ধ্যার পরে সে ফিরিয়া আসিলে সুরমা বলিল—"সারাদিন কোথায় যে ঘুরলে আর বেরিও না কিন্তু ছেলেরাও এসেছে তুমি একটু ঠাণ্ডা হ'য়ে বসো—"

পৃথা বলিল—"না আজ আর বেরোবোনা বোধ হয়—"

চা খাইতে খাইতে সে বলিল—"আমার অনেকগুলো মতলব আছে—তোমাকে বলবো একদিন, আমার ইচ্ছা হয়—একটা অদ্ভুত কিছু করবার। কেন পারবো না? অন্য দেশের মেয়েরা পারে আর আমরা পারবো না?"

"চেষ্টা করলে পারবে না কেন—নিশ্চয় পারবে—" সুরমা জানিত ইহার বিরুদ্ধে কোন কথা বলিলে সে হাসিয়া উড়াইয়া দিবে—। পৃথা বলিল—"এখন তোমাকে সে সব বলবো না, তবে একদিন জানতে পারবে নিশ্চয়, জীবনটাকে বাঁচবার মত ক'রে তোলা উচিত—তুমি আজকাল কোথাও বেড়াও না?"

"না ভাল লাগে না—"

"কেন? এখনো শুধু ভাবছই নাকি?"

"না পৃথা—ভাবি না আর, তবে রোজ বেড়াতে ভাল লাগে না—"

"তোমার বন্ধুরা?"

"আমার বন্ধু কে আর আছে, কেউ নেই—আর আমি কারও সঙ্গে বড় সম্পর্কও রাখি না—"

"বন্ধু মন্দ লাগে না, কখনো ওরা খুব ভাল হয়—তুমি বাজে ভাবনা করা ছেড়ে দিয়েছ—"

"হ্যাঁ—"

"ভালোই করেছ—কিন্তু আমি?" বলিয়া সে একটু নড়িয়া বসিল—তারপরে "কাপড় ছাড়ি গিয়ে" বলিয়া হঠাৎ উঠিয়া চলিয়া গেল।

সুরমা দেখিল পৃথা যেমন ছিল ঠিক তেমনি আছে—অথবা তাহার খাম-খেয়ালীর মাত্রা একটু বাড়িয়াই গিয়াছে। সে পূর্ব্বের মতনই অথবা একটু বেশী হাসে গল্প করে, বেড়ায় এবং বন্ধু-বান্ধবদিগের সঙ্গে মিশে! এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার জগতের উপর তাচ্ছিল্যের ও বিদ্রূপের ভাবটাও বাড়িয়া গিয়াছে। শোকের অগ্নিশিখা তাহাকে দগ্ধ করিয়া দেয় নাই—তাহা তাহাকে উজ্জ্বল ও দীপ্ত করিয়াছে মাত্র, বিনির্ধূত সাগরের মত পৃথা, জীবনের ঝড়ে আরো চঞ্চলা উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছে মাত্র।

সে সমস্ত দিন বাড়ীতে থাকে না—সকালে উঠিয়া সে বাহিরে যায়, আর ফিরিয়া আসে হয় বিকালে, নয় সন্ধ্যায়; বাড়ীতেও বিশেষতঃ সন্ধ্যার পর, অভ্যাগত বন্ধু-বান্ধবদের ভিড় হয়—সেইটুকু সময় পৃথার তাহাদের সহিত আলাপ করিয়াই কাটে, তার উপর তার পরেও তাহাকে বাড়ীতে কচিৎ পাওয়া যায়—কাজেই সুরমার সহিত তাহার কথা বলিবার অবসর হয় না। সকল অপেক্ষা বেশী সময় সে কাটায় দম্ দম্ এরোড্রোমে, উড়ার নেশা তাহাকে চাপিয়া বসিয়াছিল—নিজে ও বন্ধুদের লইয়া তাহার অধিকাংশ সময় আকাশেই অতিবাহিত হয়। একদিন সে সুরমাকেও লইয়া গিয়াছিল।

সে ডান্সে, ডিনারেও যায়, শুধু তাহার অবস্থার মর্য্যাদা রাখিয়া সে সাদা রং পরে। কিন্তু তাহা সে হয়তো পরে শুধু নিজের ব্যক্তিত্বকে সুস্পষ্ট করিয়া তুলিবার জন্য—এ ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্য ছিল না। সাদাতে তাহাকে অতি সুন্দর দেখায়—সুরমা একদিন কাহাকে তাহার সহিত ম্যাগনোলিয়া গ্রাণ্ডি ফ্লোরো ফুলের তুলনা করিতে শুনিয়াছে। কিন্তু সে সাদার উপর যে সৌখীন বস্ত্র ব্যবহার করে—তাহা অন্য যে কোন রঙীন অপেক্ষা—শ্রেষ্ঠ বলিয়া তাহার মনে হয়।

সুরমা ভাবে রাজীব থাকিলে বিধবা ভগিনীর এ স্বেচ্ছাচার কি ভাবে গ্রহণ করিত—তাহারই চোখে যাহা দৃষ্টিকটু মনে হয়। পৃথা বংশ মর্য্যাদাকে তুচ্ছ করিয়া সাংসারিক রীতি নীতি অগ্রাহ্য করিয়া জাতিধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়া কি করিতেছে। যদিও তাহার নিজেরও এ বিষয়ে সমালোচনা করিবার কোন অধিকার নাই তবুও পৃথা—

ইহার চাইতে বিবাহ করাও ভাল। সুনীলের কথা কি সে একেবারে ভুলিয়া গিয়াছে, সে একদিন ভুলিয়াও তো তাহার কথার উল্লেখ করে না।

কিন্তু তার ভিতরেও সে সব কিছু অবহেলা করিয়া চলে—বহুমূল্য শাড়ী গহনা কোথায় ছিঁড়িল কি পড়িল সে বিষয়ে তাহার কোন খেয়াল নাই। একদিন তাহার আয়া এই মর্ম্মে নালিশ করিয়া সুরমাকে অনেকগুলি ছিন্ন শাড়ী, কাপড়, দেখাইয়া আপশোষ করিয়া বলিয়াছিল, মেমসাহেবের কোন জিনিষের উপর মায়া নাই, এবং বোম্বাইতে সাহেব মারা যাইবার পর অনেকগুলা কাপড়, জিনিষ সে যাকে তাকে বিলাইয়া দিয়াছে। সুরমা সেদিন একলা বসিয়াছিল, আয়া হঠাৎ কাপড়ের কথা বলিতে বলিতে বলিল—সাহেব মারা যাইবার কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে নাকি কি অসুখ হইয়াছিল—সাহেব বাহিরে কোথাও যাইত না, কাহাকেও কিছু বলিত না—কিন্তু মেমসাহেবকে বলিয়া জোর করিয়া বাহিরে বেড়াইতে, খানা খাইতে, নাচে পাঠাইয়া দিত। সে মেমসাহেবকে পর্য্যন্ত বুঝিতে দেয় নাই, শেষে একদিন হঠাৎ শরীর বেশী খারাপ হইল, সেদিন মেমসাহেব জানিতে পারিয়া অস্থির হইয়া ১০।১২ জন ডাক্তার ডাকাইয়া আনিল, কিন্তু তখন আর ডাক্তার কি করিবে—তার পরের দিন রাত্রে সাহেব মারা গেল। সুরমা চুপ করিয়া শুনিতেছিল, আয়া বলিতেছিল,—মেমসাহেব তখন ঐখানেই বসিয়াছিল,—ডাক্তার সাহেবরা চলিয়া গেল,—মেমসাহেব কিন্তু চুপ করিয়া বসিয়া রহিল—মৃত সাহেবের পাশে। আয়ারা, গভরনেস মেম, নোকর, চাকর, সকলে সভয়ে উঁকি মারিয়া দেখিল, মেমসাহেব ঠিক সেইভাবে বসিয়া আছে,—কেহ তাহাকে ডাকিতে সাহস করিল না, সমস্ত রাত্রি কাহারও ঘুম নাই, খাওয়া নাই,—আর মেমসাহেব একদৃষ্টে চাহিয়া বসিয়া রহিল—সাহেবের মুখের দিকে—সাহেবের হাত ধরিয়া। পরদিন সকালে অনেক বন্ধুলোক আসিয়া তাহাকে কত কি বুঝাইল, কিন্তু বুঝাইবার কোন দরকারও ছিল না—সে নিজেই বলিল—সে সাহেবকে সাজাইয়া দিবে—কতগুলি টাকা ফেলিয়া দিয়া কাহাকে ফুল আনিতে পাঠাইল—তারপরে গরম জলে খুসবাই ঢালিয়া নিজের হাতে স্নান করাইয়া, আলমারি খুলিয়া সুন্দর ধোতি, কুর্ত্তা চাদর বাহির করিয়া পরাইল, মাথার চুল আঁচরাইয়া দিয়া, ফুল দিয়া সাজাইয়া দিল, তারপরে বুকের উপর মাথা রাখিয়া অনেকক্ষণ পড়িয়া রহিল—অনেকক্ষণ পরে উঠিয়া ধীরে কপালে, মাথায়, চোখে চুমা দিয়া, কোথায় চুল সরিয়া গিয়াছে, কোথায় কাপড় পড়িয়া গিয়াছে তাহা যত্নে ঠিক করিয়া দিয়া সকলকে ডাকিল। অনেকে সঙ্গে গেল অনেকে না। যাহারা রহিল তাহারা মেমসাহেবকে হাত মুখ ধুয়াইবার জন্য অনেক সাধাসাধি করিয়াছিল, কিন্তু সে সকলকে শান্ত ভাবে বলিল যে একটু পরে নিজেই ধুইবে। তারপরে আর বরিষভর সে কোথাও যায় নাই, মাঝে খুব অসুখও হইয়াছিল। কিন্তু সেই বরিষপর কি হইয়াছে, সে একদিনও বাড়ীতে থাকে না, সারাদিন উড়া জাহাজে ঘুরে, আর এদেশ, ওদেশ বেড়ায় আর এক জায়গায়ও বেশীদিন থাকে না।

চাবী টাবী কোথায় পড়িয়া থাকে তাহার কোন ঠিক ঠিকানা নাই, গয়না, কাপড় অত টাকা পয়সা কোন কিছুর চাবী মেমসাহেব রাখে না, তবে ম্যানেজার সাহেব বড় ভাল, সে ও তাহার স্ত্রী গভরনেস মেম সমস্ত জিনিষ সামলাইয়া রাখে, সে নিজে ইচ্ছা করিলে কত কাপড় সরাইতে পারে, কারণ মেমসাহেবের তো কোন বিষয়ে কোন খেয়াল নাই,—যখন যা দরকার হয় গভরনেস মেমের কাছে চায়, নয়তো ম্যানেজার সাহেবের কাছে চায়। অনেকদিন খাটিয়া তাহার ইচ্ছা হয় এখন কিছুদিন ঘরে বসিয়া থাকে, কিন্তু মেমসাহেবের এ হাল দেখিয়া তাহাকে ছাড়িয়া যাইবার ইচ্ছা করে না, কি জানি কে আসিয়া ঠকাইয়া তাহার সর্ব্বনাশ করিবে।

আয়ার কথা শুনিতে শুনিতে সুরমার মন উদাস উধাও হইয়া কোথায় চলিয়া গেল, মনে হইল পৃথা কি?—ভাব-লেশহীন,পাষাণময় কি তাহার অন্তর?—অথবা আর কি,কে জানে? তবে সে এইটুকু বুঝিতে পারে—পৃথা সব কিছু তুচ্ছ করিয়া চলে, তাহার কোন বিষয়ে খেয়াল নাই, সে পরিতে হয় বলিয়া পরে, থাকিতে হয় বলিয়া থাকে—তাহার মন সর্ব্বদা কোন কল্পনা রাজ্যে ঘুরিয়া বেড়ায়, তাহা সুরমা বুঝিতে পারে না—যদিও কোন কোন সময় সে কথা বলে,

পৃথা অসংলগ্ন ভাবে দু'এক কথায় উত্তর দিয়া হয় উঠিয়া যায়, নয় অন্য অবান্তর কথা বলে। তবে হয়তো তাহাই ঠিক—তাহার ভিতর সে অনন্ত প্রাণের স্পন্দন থামিয়া গিয়াছে—সে আছে শুধু জোর করিয়া, একটা কলের পুতুলের মত, যেদিন তাহার চাবী ফুরাইয়া যাইবে সেদিন তাহারও প্রাণহীন দেহ লুটাইয়া পড়িবে। রাজীব হয়তো ঠিকই বলিয়াছিল—যে অন্তর তাহার জ্বলিয়া গিয়াছে। কিন্তু সত্যই কি তাহাই? অথবা ইহা পৃথার সুনীলের প্রতি হৃদয়হীন তাচ্ছিল্যের পরিণতি মাত্র?

সেদিন পৃথা সন্ধ্যার সময় আসিয়া খুব দামী শাড়ী ও গহনায় সাজিয়া আবার বাহিরে যাইতেছিল, সুরমা জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যাচ্ছ?"

"যাচ্ছি বৌদি ডান্সে—"সহজ ও সপ্রতিভভাবে বলিয়া সে একগুচ্ছ রজনী গন্ধার মত সৌরভ বিলাইয়া নামিয়া গেল। সুরমা চুপ করিয়া বারান্দায় বড় কৌচটাতে অলস ভাবে শুইয়া রহিল। চারিদিকের অস্বাভাবিক আবহাওয়া তাহাকে পীড়া দিতেছিল, চিন্তাধারা উদাস হইয়া দিগন্তে মিশিয়া গিয়া বিরাট শূন্যে নিঃস্ব হইয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল—সুনীলের কথা মনে হইল, যদি আত্মা থাকে তাহা হইলে পৃথাকে আজ এ ভাবে দেখিয়া সে কি করিতেছে? অথবা সে এখনো সর্ব্বত্যাগী প্রেমিকের মত অলক্ষ্যে থাকিয়া প্রিয়ার সমস্ত আনন্দে পুলকিত হইয়া উঠিতেছে? পৃথা এ ভাবে কতদিন থাকিবে? কি হইবে? তাহারি বা কি হইবে? রাজীবের কথা মনে হইল, সে একা নিঃসঙ্গ দিনগুলি কি করিয়া কাটাইতেছে? সে গিয়াছে কতদিন হইয়া গেল, কিন্তু গিয়া সে একটী মাত্র চিঠি লিখিয়াছে—নেহাৎ মামুলি চিঠি, পৌছিয়াছে, ভাল আছে, প্রণব কেমন আছে? এই মাত্র, আর কোন কথা নাই, কিছু নাই! থাকিতে পারেই বা কি? আদান-প্রদানের সম্পর্ক বা অধিকার তো চুকিয়া গিয়াছে অনেক আগে—তবে আর কি? তাহার কিছু না পাইলেও চলে, হয়তো রাজীবেরও চলে—। অরিণের চিঠি সে পাইয়াছে—ছোট চিঠি—বেশী কিছু না থাকিলেও তাহারি ভিতর অনেক আছে—কিন্তু সে লিখিয়াছে হঠাৎ তাহাকে কোন জরুরী কার্য্যোপলক্ষে প্যারিসে যাইতে হইতেছে—হয়তো যাইবার আগে দেখা করিতে পারিবে না—কিন্তু মাস ছয়েকের মধ্যেই সে ফিরিবে নিশ্চয়—আর তাহাকে দেখিবার আশা তাহার সব কাজে তাহাকে উৎসাহিত করিবে—যাত্রাপথে তাহারই মুখখানি চির উজ্জ্বল হইয়া তাহাকে পথ দেখাইয়া লইবে। অরিণ চলিয়া যাইবে ভাবিয়া সে হতাশ হইয়া উঠিল—মনটা অনেকখানি শূন্য বোধ হইল—সারা জগতটা ফাঁকা মনে হইল—ধরিয়া থাকিবার যেন কিছুই নাই—ভাবিতে ভাবিতে কখন সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল জানিতে পারে নাই অনেক রাত্রে পৃথা আসিয়া তাহাকে ডাকিয়া লইয়াছিল।

সেদিন সারাদিন পরে ঘুরিয়া আসিয়া পৃথা বলিল—"বৌদি, দাদা কবে আসবে?"

"জানি না কবে আসবে।"

"তুমি চিঠি লিখে দাও—আমি যাবার আগে দেখা ক'রে যাবো—"

"কোথায় যাবে?"

"অনেকখানে ঘুরবো—এখনো ঠিক বলতে পারছি না—ইউরোপে ঘুরবো কি জানি আর কবে ফিরবো সকলের সঙ্গে দেখা ক'রে যাই—"তারপরে একটু হাসিয়া বলিল "লোকে বলে কাজের ভিতর ডুবে থাকলে সব ভুলে যাওয়া যায়—কিন্তু সব ভোলা যায় না,—তবে ঐ কাজের ভিতরে তার ফাঁকে ফাঁকে যখন স্মৃতি জেগে ওঠে, তখন তা তেমনি সত্য—তেমনি সুন্দর বলে মনে হয়—আর কিছু না করে চুপ ক'রে ভাবলে স্মৃতি ও পুরোণো এক ঘেয়েহ'য়ে মিথ্যে হয়ে যায়—তখন সে স্মৃতির আর মাধুর্য্য থাকে না—মনটা তখন আরো কিছু চায়—তুমি আজকাল এমন হয়ে গেছ কেন, বৌদি? "আজ ডান্সে যাবে? তোমারও তো কার্ড আছে—"

সুরমার প্রথম "না" বলিবার ইচ্ছাই প্রবল হইয়াছিল, পৃথা আবার বলিল—"যেতে হবে বৌদি—চল।" সুরমা আর আপত্তি করিল না। সে একটু ইচ্ছা ও একটু অনিচ্ছা লইয়া পৃথার সহিত প্রিন্স লিওভানীর অনুষ্ঠিত "বলে" গেল।

পৃথা সেদিন সুন্দর সাজে সাজিয়াছে। প্রিন্সের সাময়িক প্রকাণ্ড বাসগৃহের নৃত্য সভা আলোতে আনন্দে জ্বলিয়া উঠিয়াছে, তার ভিতর শত সুন্দর, সুন্দরীর সমাগম

হইয়াছে। সেখানে ফুলের ছড়াছড়ি গন্ধের মাতামাতি— তার উপর আনন্দের কলহাসি সব মিলিয়া এক মনোরম মায়ারাজ্য রচনা করিয়া তুলিয়াছে, সুরমার মনে হইল, জরা, ব্যাধি, মৃত্যু, হাহাকার এ পুলক কোলাহল হইতে ভয় পাইয়া দূরে সরিয়া থাকে,—জীবন অনন্ত আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়। তাহার বহুদিনের পুঞ্জীভূত জড়ভাব কোথায় উধাও হইয়া চঞ্চল তরলতায় তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিল,—সে আবার হাসিল। নাচের পর নাচ চলিয়াছে, বাজনার পর বাজনার মোহময়ী রাগিণী শিহরিয়া উঠিয়া, প্রতি শিরায় কম্পন তুলিয়াছে—সুরমা সেদিন বহু পুরাতন ও নব পরিচিতের সঙ্গে হাস্যালাপ করিল, নাচিল—। মনের বাঁধন একবার খসিয়া পড়িলে, আর কোন কিছু দিয়াই তাহাকে রোধ করা যায় না বুঝি। কিন্তু সে লক্ষ্য করিল— পৃথা এক পার্শ্বে বসিয়া অনেকের সঙ্গে আলাপ করিতেছে— এবং সে একবারও নাচিল না। একটু পরে সুরমার দৃষ্টি হইতে পৃথাও কোথায় সরিয়া গেল। অনেকক্ষণ পরে কে একজন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—"বলতে পারেন পৃথা কোথায় ?

সে একটু আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—"কেন? তিনি কি এখানে নেই ?"

"না" বলিয়া লোকটী চলিয়া গেল।

সুরমা একটু ভাবিল—তারপরে,হয়তো আছে কোথাও বলিয়া লঘুভাবে পৃথাকে মন হইতে সরাইয়া আমোদে যোগ দিল।

অনেকক্ষণ পরে সে সত্যই খুঁজিতে গিয়া পৃথাকে কোনখানে পাইল না, অনেককে জিজ্ঞাসা করিল—কিন্তু কেহ বলিল অনেকক্ষণ তাহাকে দেখে নাই, কেহ বলিল কিছুক্ষণ আগে দেখিয়াছে, কেহই সঠিক খবর দিতে পারিল না। সে একটু চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিল—এমন সময় খবর পাইল কে তাহাকে টেলিফোনে ডাকিতেছে—সুরমা টেলিফোন ধরিয়াই শুনিল পৃথার গলা—সে বলিতেছিল— "বৌদি, আমি বাড়ীতে, আমার জন্য অপেক্ষা করো না, চলে এসো—"তারপরেই সে সংযোগ বিচ্যুত করিয়া দিল! নানা কথা ভাবিয়া সুরমা তৎক্ষণাৎ বাড়াতে আসিয়া দেখিল পৃথা ঐ পোষাকে বসিয়া আছে। বলিল—"বেশ, জোর ক'রে নিয়ে গিয়ে বুঝি এমনি করে ফেলে আসা হ'ল, কি হয়েছে তোমার?" পৃথা একটু অসহিষ্ণুভাবে বলিয়া উঠিল—"ভালো লাগে না বৌদি—কি সব তুচ্ছ ব'লে মনে হয়। বেশাক্ষণ বরদাস্ত করতে পারি না তাই চ'লে এসেছি। ও সবে কি আছে? নেহাৎ বাজে—"

"তুমি ডান্স করনি?"

"না, করতে পারি না—পা ফেলতে ভুল হয়—"

"তুমি তো অনেকক্ষণ আগে চলে এসেছো!"

"হ্যাঁ—একটু ওড়া গেল। রাত্রে আকাশে উড়তে বড় ভাল লাগে—মনে হয় কোথায় কোন অসীমে ভেসে চলেছি—সেই অনন্ত শূন্যে আর রাত্রে—স্তব্ধ অন্ধকারে— নীচে সব আলো, সব হাসি সব উৎসব ফেলে যেন চলে যাচ্ছি কোন সে বিরাট গাম্ভীর্য্যের কোলে—"

সুরমা একটু চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

পৃথা বলিল—"তুমি বেশ উপভোগ করেছো না ?"

"হ্যাঁ,অনেকদিন পরে বেশ লাগলো,—বাড়ীর কর্ত্তাকেও ব'লে আসোনি ?"

'না খুঁজে পাইনি—কেন বলতে পার বৌদি—হঠাৎ এক মুহূর্ত্তে সমস্ত আলোগুলো ঝাপসা হয়ে যায়, সব বাজনাগুলো যেন বেসুরো বাজে—ইচ্ছে হয়—পায়ের আঘাতে সারা জগতটা চূর্ণ করে ভেঙ্গে ধূলোর সঙ্গে মিলিয়ে দিয়ে আমিও সেই সঙ্গে সেই ধূলোয় মিশে যাই—"

সুরমা একটু হাসিয়া বলিল—"তুমি অদ্ভুত পৃথা।" পৃথা কোন উত্তর না দিয়া নিঃশব্দে সেখান হইতে উঠিয়া চলিয়া গেল। সুরমারও মনের সমস্ত উল্লাস একটু ম্লান হইয়া আসিল। একটা আবেগময় অধীরতা তাহাকে ঘিরিয়া ধরিল,—তাহারও কিছু ভাল লাগিল না—এতখানি আনন্দ এতটা উন্মাদনা—অতৃপ্ত, অসম্পূর্ণ হইয়া অঙ্গহীনা সুন্দরীর মত বিষাদ ব্যথায় কাঁদিয়া উঠিল—

সুরমা দেখে পৃথা নাচে যায় কিন্তু নাচে না, ভোজে যায় খায় না—তবু সে যায়, হয়তো একটা অভ্যাস বশতঃই যায়, কিন্তু অন্তরের শূন্যতা তাহার সমস্ত অনুভূতি শক্তিকে নিস্পন্দ ও অচেতন করিয়া তাহাকে নির্জ্জনতায় টানিয়া লইয়া যায়। সে মুখে বা কাজে কিছু না দেখাইয়া ভাবকে চাপিয়া রাখিতে চায়, কিন্তু হৃদয়ের ভাব ব্যক্ত হইয়া সকল

বাধা ঠেলিয়া আপনা হইতে ফুকারিয়া উঠে, তাহা আর কেহ না বুঝিলেও সুরমা বুঝিতে পারে।

আর একদিন আর এক নাচের মজলিসে গিয়া সে খানিক পরে পৃথাকে দেখিতে পাইল না—সে বুঝিতে পারিল পৃথা হয়তো হঠাৎ বিরক্ত, বিতৃষ্ণ হইয়া কোথায় গিয়া আপন চিন্তায় ডুবিয়া গিয়াছে—সত্যই সে গিয়া দেখিল—পুষ্পলতাশোভিত জ্যোৎস্নাপ্লাবিত বারান্দার এক কোণে বাহিরের দিকে চাহিয়া একটী শ্বেতমর্ম্মর মূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া আছে পৃথা। সুরমা দেখিয়া ধীরে সরিয়া আসিয়াছিল—তার একটু পরেই সে আসিয়া বলিয়াছিল—"বৌদি বাড়ী চল—"

একদিন সুরমা তাহাকে বলিয়াছিল—"যদি ভাল লাগে না, তবে যাও কেন?"

পৃথা তুচ্ছভাবে হাসিয়া উত্তর দিয়াছিল—"কে বললো ভাল লাগে না? বেশ লাগে তো—"

"তবে যে চুপ করে স'রে যাও?"

সে এক একদিন ভাল লাগে না বলে—কিন্তু সুরমা বুঝিতে পারে ভাল লাগে না তাহার একদিনও—।

রাজীবকে আসিবার জন্য চিঠি লেখা হইয়াছিল—কিন্তু সে এ পর্য্যন্ত একটীরও কোন উত্তর দেয় নাই, সেদিন পৃথা রাগ করিয়া ৪ পাতা টেলিগ্রাম দিতে, পরদিন উত্তর আসিল "শীঘ্র আসিতেছি—" আরো কিছুদিন চলিয়া গেল।—

সেদিন পৃথা কোথায় গিয়াছে বোধ হয় কোন নাচে—সুরমা অভ্যাসমত শিগগীর ঘুমাইতে না পারিয়া, তখনো জাগিয়া বই পড়িতেছিল—তখন রাত্রি ১২টা—পৃথা আসিয়া এমন সময় একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িল। সুরমা বই হইতে মুখ তুলিয়া বলিল—"নাচ হয়ে গেলো?"

"না এখনো হয় নি—আমি চলে এসেছি—"

সুরমা সহানুভূতিপূর্ণ স্বরে বলিল—"কেন পৃথা?"

পৃথা একটু হাসিয়া বলিল—"কি জানি. বৌদি, ভাল লাগলো না,—তুমি একটা কিছু বাজাও শুনি—"

"ওখানকার অত বাজনা ফেলে এলে বুঝি আবার পচা বাজনা শুনতে?"

"হ্যাঁ, তাই ইচ্ছে হ'ল, নিজেরটাই ভাল লাগে—বাইরের Oh dash it :—তা না হ'লে চল একটু বেড়িয়ে আসি—পুরোবেগে, আর তা যদি না যাও, তবে আমি চললুম আমার আকাশ ভ্রমণে—"

সুরমা হাসিয়া উঠিল—"এত রাত্রে? রক্ষে কর পৃথা, আমি বাজাই শোন—"

"না বৌদি বেড়াতে যাবো—"

"তবে চল অগত্যা—" বলিয়া সুরমা উঠিল।—দুই ঘণ্টা লক্ষ্যহীন ভাবে অবিরাম ঘুরিয়া যখন তাহারা বাড়ী ফিরিল তখন ২টা বাজিয়া গিয়াছে।

বাড়ী আসিয়াই পৃথা হঠাৎ হাসিয়া উঠিল। সুরমা বলিল—"হাসছ কেন? পাগল হলে?"

"না, হাসছিলুম এই সব লোকগুলোর কথা ভেবে—"

"কোন লোক?

"সব লোক বৌদি" একটু থামিয়া সে আবার বলিল—"আমি তো কিছু চাই না, তবু কেন তারা আসে আমাকে দিতে? এদের একটা অনুভূতি নেই, আমার কোন অভাব নেই—আমি রাণী কিছু আমার অভাব নেই, তবু কেন? সেইজন্যই ওখান থেকে চলে এসেছি—অতিষ্ঠ লাগে—" সুরমা কোন উত্তর দিল না, পৃথা বলিতেছিল—"ভালবাসায় আমি ডুবে আছি—আমি অন্যের কাছ থেকে কিছু চাই না—অথবা আমার ভালবাসার ঘরের দরজায় একেবারে তালা প'ড়ে গেছে, আমার কিছু নেবারও নেই দেবারও নেই—" একটু হাসিয়া বলিল—"প্রিন্স. আজ আমাকে চেয়েছিলেন—বিয়ে—তখুনি এমন বিশ্রী লাগলো।" খানিক থামিয়া সে আবার বলিল—"আমার এত হঠাৎ চলে আসবার ইচ্ছে ছিল না কিন্তু এমন একটা বিরক্তি এসে আমাকে জেঁকে ধরলো কিছুতেই থাকতে পারলুম না—কেনো এরা বোঝে না! ওদের সঙ্গে আমার মিশতে ভাল লাগে—ওদের বন্ধুত্ব হারাতে চাই না আমি কিন্তু উপযাচক হ'য়ে কেউ কিছু দিতে এলেই আমার সমস্ত শরীর ও মন সঙ্কুচিত হয়ে আসে—তারপরে হাসি পায়। কেন এরা নিজেদের বোকা বানিয়ে তোলে? অপ্রয়োজন ও অহেতুক সব কিছুই হাস্যকর হয়ে ওঠে প্রয়োজন হিসাবে যে জিনিষের দর, তা কি ওরা বোঝে না?"

"কি বলে এলে?"

"আমি চেষ্টা করে বেশ স্বাভাবিক স্থির ভাবে বলে এসেছি—যে এখনো আমার তেমন কোন ইচ্ছে হয়নি,

তবে যদি কখনো হয় তবে তার কথাই আমার সর্ব্বাগ্রে মনে হবে—সে বললো সেই দিনের জন্য সে অপেক্ষা করবে—" একটু থামিয়া পৃথা বলিল যেন আপন মনে "কিন্তু আমার মনে হয়—ওকে অপেক্ষা করতে হবে চিরকাল—কারণ যেদিন আমার সে ইচ্ছা হবে তার আগে আমি বেঁচে থাকবো কি না তাও ঠিক বলতে পারি না। সুনীলকে ভুলে যাবার আগে তার অভাব বোধ করবার আগে সে ইচ্ছাও হবে না—আর পৃথিবীতেও আমি থাকবো না—সে আছে, আমারি চারিদিকে ঘিরে আছে, আমি কাঁদলে সে দুঃখিত হয়, হাসলে হাসে, তাই হাসি। আমার অস্তিত্ব সুনীলময়—তাই আমার ভিতর দিয়ে সেও পৃথিবীর আনন্দ ভোগ করে—যেদিন তাকে আমার কাছে আর দেখতে পাব না—সেদিন, সেদিন আর আমাকেও কেউ দেখতে পাবে না—তাই ভাল লাগে হাওয়ার ভিতর ভেসে বেড়াতে। সময় তো চলে যাচ্ছে তীব্র বেগে—দিন আর কই—আমি শুধু সামনে চেয়ে আছি—"

পৃথার কণ্ঠস্বর কাঁপিয়া উঠিতেছিল অদম্য আবেগে—সে তাহার কথা শেষ করিয়া উঠিয়া চলিয়া গেল হঠাৎ তাহার ঘরে।

সুরমা তাহার সমস্ত পূর্ব্ব-সিদ্ধান্ত গুলিকে মন হইতে একেবারে মুছিয়া ফেলিল—পৃথার জন্য কষ্ট হইল, মনশ্চক্ষে তাহার ভাসিয়া উঠিল কঠোর ব্রতধারী সৈনিক, সহর, গ্রাম নগর, পর্ব্বত উল্লঙ্ঘন করিয়া চলিয়া যায়, কিন্তু কোন দিকে তাহার ফিরিয়া চাহিবার অবসর নাই—সে জানে শুধু 'সমুখ চলিতে'। তাহার মনে হইল সাগরের উত্তাল তরঙ্গ নিজে চঞ্চলা, অধীরা, কত উপকূলে কত তটে লাফাইয়া পড়ে মনের আবেগে, কত কিছু দুই হাতে গ্রহণ করে, তারপরে উদাসভাবে তুচ্ছ করিয়া সমস্ত ফেলিয়া দিয়া যায়—সেই বেলা তটে,—যায়,—রিক্ত, নিঃস্ব হইয়া অনন্ত গর্ভে বিলীন হইতে। তাহা হইলে ভুল হইয়াছে কি তাহারি? পৃথা কি সত্যই চরম ভোগের ভিতর থাকিয়াও অন্তরে গৈরিকধারিণী সন্ন্যাসিনী?—অথবা সে নিজের কার্য্যকলাপকে সমর্থন করিয়া তাহার সততা প্রমাণ করিবার জন্য কতগুলা ফাঁকা কথা তাহাকে বলিল? কিন্তু তাহাতে তাহার লাভ? সে তো কাহাকেও ভয় করিয়া চলে না।

তবে পৃথা সত্য কি?—আর সে? সে শুধু কুড়াইয়া লইয়াছে কতগুলা আবর্জ্জনা,—জঞ্জাল, যাহা তাহারি সঙ্গে মিশিয়া থাকিবে শেষদিন পর্য্যন্ত।—কতক্ষণ কাটিয়া গিয়াছে, বড় ঘড়িটা সশব্দে জানাইয়া দিল ৪টা বাজিয়া গিয়াছে—সুরমা তখনো জাগিয়া বসিয়া—।

দুইদিন পরে পৃথা বলিল—"বৌদি আজ আমি চলে যাবো—বিমু আর মোনা তোমার এখানে থাক্—এখন কোথায় ঘুরবো ঠিক নেই, ওরা কোথায় যাবে—এক জায়গায় ঠিক হলে তখন ওদের পাঠিয়ে দিও।"

"বেশ তো ওরা থাক্—কিন্তু তুমি কোথায় ঘুরবে?"

"জানি না, এখানে থাকতে ভাল লাগছে না—দাদা তো এলো না, কিন্তু কি করবো—থাকতে পারছি না আমি—কি জানি কোথায় চ'লে যেতে ইচ্ছে হয়। এখানকার সব বাজে—হাসি পায়। সৃষ্টির নিছক সত্যের বিরুদ্ধে এ সংসারটা একটা হাস্যকর 'কমেডি' আর সেইজন্য ট্রাজেডিও বটে। প্রবোধ নেই—সান্ত্বনা নেই, এগুলো সত্যটাকে হাতের কাছে এনে দেয় না—শুধু ঘুরিয়ে মিথ্যে ফাঁকি-বাজি দেখিয়ে কোথায় নিয়ে ফেলে বোঝা যায় না—" একটু হাসিয়া সে বলিল—"আমি বেশ থাকি উড়ে—তারপরে একলা মাঝে মাঝে থাকতে ভাল লাগে—"

"কিন্তু তুমি তো গম্ভীর হ'তে চাও না পৃথা—"

"না এই "কমেডি" দেখে গম্ভীর হতে চাই না—তাতে কোন লাভ নেই। কি রকম মনে হয়—এও থেমে যাবে—বাজনাও থেমে যাবে—নাচও থেমে যাবে—কিন্তু তাতে এমন কিছু নেই যা অনাহত অব্যাহত। এমন কোন উল্লাস আছে যা অনবদ্য, অনাঘাত হ'য়ে অন্তরে বয়ে যাবে? সেই সত্য—সব থেমে যায়, সব কোথায় মিশিয়ে যায়, ইচ্ছে হয় কি জানো বৌদি? কোথায় ছুটে চলে যাই, কোথায় কোন শূন্যে উল্কার মত, তীব্র গতিতে ছুটে গিয়ে আগুনের মত ঝ'রে পড়ি—"

সুরমা চুপ করিয়া শুনিল, সে বাধা দিল না বা তাহাকে রহিতেও বলিল না, কিন্তু পৃথা রহিয়া গেল বাধ্য হইয়া কারণ সেইদিন সে টেলিগ্রাম পাইল রাজীব পরদিন আসিতেছে।

রাজীব আসিতেছে। সুরমা তাহাকে দেখিতে চায়,

কিন্তু আবার শঙ্কাকুল মন তাহার পিছাইয়া যায়, সঙ্কোচে, ভয়ে, মনে হয় যদি সে কিছু বুঝিতে পারে—জিজ্ঞাসা করে, যদি চোখে মুখে তাহার হৃদয়ের ছবি প্রতিফলিত হইয়া উঠে? কি বলিবে সে কি কৈফিয়ত দিবে? তাই সে চায় রাজীব আসুক কিন্তু তাহার বিচারকের পদ না লইয়া, তাহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিবার অধিকারী না হইয়া।

কিন্তু সে দেখিল, রাজীব আসিল, তাহার সহিত অনাগ্রহ ভাবে কথা বলিল, শুধু কাজের কথা। সে সেই রকমই আছে গম্ভীর, অটল।—চোখ থাকিয়াও অন্ধ, কান থাকিয়াও বধির, নির্ব্বিকার, নিরপেক্ষ। সুরমা মানসিক একটু আশ্বস্ত হইলেও, একটু ক্ষুণ্ণও হইল, কিসের একটা আক্ষেপ, অনুশোচনা, তাহার সারা প্রাণ মথিত করিতেছিল, অশ্রুর বন্যা বার বার ঠেলিয়া উঠিতে চাহিতেছিল রুদ্ধ আবেগে।—

পৃথা রাজীবের কথায় আরো একদিন রহিল—কিন্তু পরদিনই সে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। সুরমার চোখ ফাটিয়া জল আসিতেছিল। পৃথার এ যাত্রা তাহাকে কেন কি জানি ব্যথিত করিয়া তুলিতেছিল। আর কবে দেখা হইবে—অথবা হইবে কিনা তাও বা কে জানে?—কোন অনির্দ্দিষ্ট পথে চলিয়া যাইবে সে তাহার সমস্ত তেজ উদ্যম লইয়া কোথায় জ্বলিয়া উঠিয়া কি দগ্ধ করিবে, অথবা একেবারে নিঃশেষে পুড়িয়া নিজে ছাই হইয়া যাইবে।—

পৃথা হাসিল কথা বলিল—ছেলেমেয়েদের আদর করিল—তারপরে সে সুরমাকে প্রণাম করিয়া যখন উঠিয়া দাঁড়াইল তখন সুরমার চোখ ভরিয়া আসিয়াছে—সে হাসিয়া বলিল "বৌদি, চল্লুম। তোমার কথা মনে হবে। তাতে কি? যদি বেঁচে থাকি তবে দেখা হবে নিশ্চয়—আর যদি মরে যাই তাহলে—তাহলেও দেখা হবে,—কারণ আমি জানি এ জীবনের ওপারেও আর একটা জীবন আছে।"

পৃথা অন্যদিকে সরিয়া যাইতে সুরমার চোখের জল ঝরিয়া পড়িল। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া সে মুখে চোখে জলের ঝাপটা খানিকটা দিয়া সিঁড়ির দিকে যাইবার সময় দেখিল রাজীবের বসিবার ঘরে—পৃথা তখনো যায় নাই, সে দাদার বুকে মাথা গুঁজিয়া গুমরিয়া উঠিতেছে, আর রাজীব দুই হাতে তাহাকে বেষ্টন করিয়া নিঃশব্দে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে তাহার দিকে—আর মুখ তাহার বেদনাহত হইয়া সাদা। হইয়া গিয়াছে। পৃথা চলিয়া গেল।

তার পরদিন রাজীবও চলিয়া গেল। সুরমা বলিয়াছিল, "এতদিন পরে এলে, আর চিঠিও লেখোনা, আবার কবে আসবে?"

রাজীব উত্তর দিল—"কি করব সুরমা,অত বড় কাজের বোঝা যখন মাথায় নিয়েছি, তখন তা না দেখলে কি চলে? পূর্ব্বের মত হইলে সুরমা হয়তো অনেক তর্ক করিত, কিন্তু এখন সে চুপ করিয়া রহিয়া শুধু ভাবিল অত বড় কাজটা কি চিঠি লেখা অথবা আসার উপর নির্ভর করিয়া আছে তাহার? আর কি নিয়াই বা তর্ক করিবে সে। রাজীবের কণ্ঠে অনুযোগ নাই, শ্লেষ নাই, উষ্মা নাই, সরল স্বাভাবিক স্বরে সে কথা বলিল, ইহার উত্তরে কি বলিবে সুরমা, উত্তর ওষ্ঠে আসে না, কেবল কণ্ঠে আসিয়া থামিয়া যায়।

যাইবার সময়ে রাজীব ছেলেদের রক্ষণাবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধান সম্বন্ধে সুরমাকে কিছু না বলিয়া উপদেশ দিল বাড়ীর লোকজন, আয়া, গভরনেসকে ডাকিয়া। ইতিমধ্যেই তাহা হইলে রাজীব সুরমার অস্তিত্ব লোপ করিয়া দিতে চাহিতেছে। সুরমা দেখিল সে থাকিল বা গেল তাহাতে কাহারো কিছু যায় আসে না। প্রণব তাহার চাইতে পিতাকে ভালবাসে বেশী, তারপরেই সে ভালবাসে তাহার আয়া ও পুরণো চাকর মোহনকে। আর রাজীব সে তো তাহার উপস্থিতিকে সর্ব্বপ্রকারে অস্বীকার করিয়া চলিয়া গেল। তাহা হইলে এখানে তাহার আবশ্যক কি? এ বাড়ীতে বাস করিবার তাহার অধিকার কোথায়? সে মনে করিল তাহার বাপের বাড়ীতে গিয়া কিছুদিন থাকিয়া আসিবে, তাহার দাদাও বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিবে শীঘ্রই, ইতিপূর্ব্বে বহু আগে তাহার ফিরিয়া আসিবার কথা ছিল, নানাকারণে আসিতে পারে নাই, তাহার মনে হইল বেশ নিশ্চিন্তে, নির্ভাবনায় শান্তিতে কিছুদিন কাটিবে।

তবু তাহার মনে হয় রাজীব কি আসিবে না? এক

একবার ভাবে সে আসিলে এবারে সব কিছু বলিয়া একটা মিটমাট করিয়া লইবে—কিন্তু আত্মাভিমান বাধা দেয়, মনে হয় সে তো তাহার কথা কিছুই বলিল না, তাহা হইলে সেই বা অনর্থক নিজে খাটো হয় কেন? আর সে যদি তাহাকে ক্ষমার চক্ষে না দেখে?

মাঝে মাঝে নিজের চিন্তায় জর্জ্জরিত হইয়া ভাবে, পৃথার মত উদ্দাম হইয়া সেও সব কিছু ভুলিয়া যায় না কেন? কিন্তু পৃথা সেও ভুলিতে পারিয়াছে কি? তাহার মন অস্থির হইয়া উঠে—তাই সে নাচ, ভোজগুলি বাদ না দিয়া প্রত্যেকটীতে যাইতে লাগিল। আর অরিণ কর্ত্তৃক পুনর্জাগরিত বসন্ত ফুলে ফুলে ভরিয়া উঠিয়া তাহাকে চঞ্চলও করিয়া তুলিয়াছিল অনেকখানি তাই সে নূতন করিয়া আবার বাহিরের আনন্দে মাতিয়া উঠিয়া দেখিল রাজীবের চিন্তা অপেক্ষাকৃত কম তাহার মনকে পীড়া দেয়, অরিণের বিরহ বিশেষ কাতর করিয়া তুলে না, তবে সে জানে তাহার সকল বিরহ শীঘ্রই হাসিয়া উঠিবে আবার মিলনের বসন্ত উৎসবে। অরিণের চিঠি সে পায় মাঝে মাঝে কিন্তু ছোট—কিছুদিন কাটিয়া গেল।

অরিণের অপেক্ষায় সুরমা ছয় মাস কাটাইল, এক বছরও কাটিয়া যায় বুঝি, তবুও অরিণ আসিল না।

সেদিন সারাদিন সকাল হইতে বর্ষার আবদারভরা কান্না আরম্ভ হইয়াছে, তাহার সহিত সুরমার অন্তরের কান্না কিছুতেই থামিতে চাহিতেছিল না। সারাদিন একলা বসিয়া বসিয়া তাহার সমস্ত মন মেঘাচ্ছন্ন হইয়া কালো হইয়া গিয়াছে, সেখানে বিদ্যুতের ক্ষীণ আলোক রেখাও যেন উঁকি মারিয়া দেখিতে ভয় পায়। অনেক কথা মনে হইতেছিল, পৃথার কথা, রাজীবের কথা, অরিণের কথা। মনে হইল, সভা সমিতির কাজ লইয়া থাকিলে হয় তো সে তবু নিজেকে ভুলিয়া থাকিতে পারিত। কিন্তু এ কি উদ্দেশ্যহীন—আশাহীন জীবন তাহার? রাজীব কি আসিবে না? অরিণও আসিবে না কি? পৃথার তবু লক্ষ্য আছে। সকলেরই চাহিয়া দেখিবার কিছু আছে—কিন্তু তাহার চাহিবার মত কিছু নাই—না সামনে,—না পিছনে। বিজয়ের খবরও সে অনেকদিন পায় নাই,—অন্যমনস্ক মন তাহার কোথায় কোন মেঘের বুকে ভর দিয়া ভাসিয়া চলিল, পৃথার মতন তাহার ইচ্ছা হয় উড়িয়া বেড়াইতে। পৃথা কিছুদিন আগে জার্ম্মানী হইতে একটী ছোট্ট চিঠি লিখিয়াছিল শুধু ভাল আছে তার পরে যাইবে সুইট্‌জারল্যাণ্ডে এই পর্য্যন্ত—আর অরিণ!

এমন সময় আয়া আসিয়া একটী চিঠি রাখিয়া গেল—হস্তাক্ষর অরিণের দেখিয়া সুরমা তাড়াতাড়ি চিঠিখানি খুলিয়া পড়িল, তাহাতে লেখা ছিল—

"সুরমা, তুমি আমাকে উন্নত করে তুলেছ—তোমার অতুল প্রেমের জ্যোতি দেখিয়ে,—তাই দেখে আমি নিজেকে আজ অনেকখানি তুলে ধরতে শিখেছি,—তাই দেখেছি অশান্ত জীবন বহন করে সুখ পাওয়া যায় না। কাল আমি বিয়ে করেছি একটী মেয়েকে—সে গরীব। এ ধর্ম্ম এ জীবন আলাদা, কিন্তু তুমি আমার কাছে চিরকাল যা ছিলে তাই থাকবে। জীবনে কখনো তোমাকে ভুলবো না, আর তুমিও ভুলোনা—তুমি আমার একান্ত আপনার—প্রিয়।

তুমি জগতে বিখ্যাত হও,—তোমার সুনামে দেশ সুরভিত হোক্—তাতে আমারি গর্ব্ব হবে বেশী। মর্য্যাদা, সম্মান, যশ, গৌরব এইগুলো উপার্জ্জন করা জীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত। যদি কখনো আমাকে এতটুকুও প্রীতির চক্ষে দেখে থাকো, তবে জেনো তোমাকে বড় হ'তে দেখলে আমি সুখী হব, সন্তুষ্ট হব। ভারতে শীগ্‌গির ফিরতে পারবোনা—এখানে অনেক কাজ আমার। আমার তেলের অংশ তোমার ছেলেকে আশীর্ব্বাদী দিলুম—তবে আমি আসবো নিশ্চয়—অন্ততঃ তোমাকে দেখতেও। মাঝে মাঝে চিঠি দিও ইতি—"

সুরমার অবশ হাত হইতে চিঠিখানি খসিয়া পড়িল। অরিণ অবশেষে কি এই করিল? সে কি তাহাকে প্রতারণা করিয়া গেল? কিন্তু প্রতারণাই বা কি করিয়া বলিবে সে? অরিণ তাহাকে বিবাহ করিতে পারে না বা লোকসমাজে তাহাকে তাহার প্রাণের বিন্দুমাত্র অংশ দিয়াছে বলিয়া প্রচার করিতে পারে না—এ সবই তো সে জানে—তবে প্রতারণা সে করিল কি করিয়া? সে বরং তাহাকে উন্নত করিতে চেষ্টা করিয়াছে তাহার

সমস্ত প্রেরণা দিয়া। প্রথম পরিচয়, তারপরে ঘনিষ্ঠতা কিন্তু তার বেশী আর কিছু লোকতঃ ধর্ম্মতঃ হইতে পারে কি? সে অবিবাহিতা মেয়েও নয় যে অরিণকে কোন রকম প্রতিজ্ঞাভঙ্গের দোষে দোষী করিবে,—অথবা তাহার চিরকুমার জীবনযাপন, ইহাই বা সে কি করিয়া দাবী করিতে পারে? তবে? ভাবিয়া দেখিলে দোষ অরিণের নয়, দোষ তো তাহারই। পৃথা ঠিকই বলে—জগতের 'কমেডি'গুলাকে গম্ভীর করিয়া নিলেই দুঃখ-কষ্ট ভোগ করিতে হয়—কিন্তু সবার সব হইল শুধু সেই একা সব হারাইয়া আজ পথের ভিখারীরও অধম হইয়া উঠিয়াছে।

অরিণ বলিয়াছে যশ, গৌরব, সুখ্যাতি, কিন্তু তাহারা তাহাকে বহুদিন আগে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে যে, তাহার সমস্ত অর্থের বিনিময়েও তো তাহা ফিরিয়া আসিবার নয়। সমস্ত ব্যর্থতার ক্ষোভ তাহাকে বাঁধিয়া নিষ্পেষিত করিয়া তুলিল, কাহার উপর রাগ হইল, দুঃখ হইল—কিসের একটা দারুণ শোকে তাহার সমস্ত বুক ভাঙিয়া যাইতে চাহিল। ব্যর্থ—ব্যর্থ—তাহার বাঁচিয়া থাকা একেবারে ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে।

২০

সুরমার সমস্ত মন কিছুদিন একেবারে দমিয়া রহিল। অরিণের কোন অপরাধ নাই, তবুও তাহার মনে হয় অরিণের যেন আরো কি করা উচিত ছিল, আরো যেন কি সে না করিলেও পারিত, তবু সে অপরাধী। হ্যাঁ অপরাধী বৈ কি! আজ সে বিবাহ করিয়া আবার উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছে সুরমা তাহারই প্রিয়া হইয়া রহিবে চিরকাল, তাহা হইলে আর একজনকে জীবনের সাথী করিয়া সে আজ আর একজনকে প্রিয়া সম্ভাষণ করে কেন? আর কি করিতে পারিত অরিণ? সুরমা ভাবিয়া স্থির করিতে পারে না, সে কি করিতে পারিল না অথবা আরো সে কি করিতে পারিত। অভিমান করিয়া সে অরিণের স্মৃতি মন হইতে সরাইয়া ফেলিতে চেষ্টা করিল।

রাজীবকে দুইখানা চিঠি লিখিয়াও কোন উত্তর পাইল না—অবশেষে কয়েক দিন পরে সে সকল ভাবনা ঘুচাইয়া দিয়া একটা সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলিল—রাজীব তাহাকে ত্যাগ করিয়াছে—আর অরিণও সকল সম্পর্ক ভাঙিয়া ফেলিয়াছে, ভালোই হইল,—এবারে তাহার কাছে আর কাহারও দাবী-দাওয়া নাই। তাহাকে প্রশ্ন করিবার আর কাহারও কিছু নাই। তাহা হইলে তাহার পরিত্যক্ত উপেক্ষিত জীবনটা লইয়া সে যা খুসী তাহাই করে না কেন? উচ্ছৃঙ্খল মন তাহার বার বার চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠে—যদি ব্যর্থই হইল সব তাহা হইলে বাকি জীবনটুকু সে ভোগ করিয়া লয় না কেন? ভোগ উৎসবের শেষ ধাপে কি আছে দেখিয়া লইলেই তো পারে। যশ সুখ্যাতি যখন মুখ ফিরাইয়াছে তখন অযশ, অখ্যাতিকেই সে বরণ করিয়া আনুক। তাহার মনে হয় রাজীব তাহাকে দিয়াছে ব্যথা আর অরিণ তাহাকে দিয়াছে শান্তির অবসাদ এবং সব কিছু ভুলাইয়া তাহার সমস্ত প্রাণ নির্জীব করিয়া তুলিয়াছে,—শান্তি সে চায় না, স্নিগ্ধ, তরল, কৌমুদীর রজতধারায় সে অবগাহন করিতে চায় না, সে চায় আবেগ, সে চায় রবির তীব্র উত্তাপ, আলোর উত্তপ্ত ঔজ্জ্বল্য। অরিণ তাহাকে শান্ত সমাহিত করিয়া ফেলিয়াছে, অরিণ তাহাকে গভীর ভিতর টানিয়া আনিয়াছে, কিন্তু সুরমা তাহা চাহে না, সে চায় জাগিয়া থাকিতে, স্বপ্নময় ঘুমে আর তাহার দরকার নাই।

তারপরে সুরমা নিজের মনের ও গতির বল্গা অবাধে ছাড়িয়া দিল। নিরর্গল, বাধাহীন ভাবে সে ছুটিতে ছুটিতে জগৎ-সংসার একেবারে মন হইতে মুছিয়া ফেলিয়া দিল। কি এক নতুন নেশা, উন্মাদনা তাহাকে পাইয়া বসিল?

থিয়েটার, বায়োস্কোপ, নাচ তোজ তাহার নিত্য সহচর হইয়া উঠিল—। বন্ধুরও অভাব হয় না—সারা বাড়ী মুখরিত থাকে সারাদিন, তাহার আর ভাবিবার অবসর হয় না, রাত্রি ২টা ৩ টার সময় যখন সে ক্লান্তভাবে বিছানায় শুইয়া পড়ে, তখন তাহার মাথার ভিতর শুধু গান বাজনার তুমুল কোলাহল বিঘূর্ণিত হইতে থাকে।

কেহ তাহাকে তিরস্কার করে না কারণ বাপা মা কাহারো সহিত দেখা হয় না, কেহ তাহাকে বিদ্রূপও করে না, কারণ বিদ্রূপ নাই—তাই তাহার দিনগুলি বেশ কাটিতেছিল এক ভাবেই। রাজীবের জন্য সে একটু [illegible]

ভয় তাহাকে পীড়া দিত মাঝে মাঝে তাহাও তাহার উদ্দামতাকে পথ করিয়া দিয়া সরিয়া গেল। আর কি এইবারে সে একেবারে মুক্ত।

সুরমার কানের কাছে কত জনে কত গুঞ্জন করে—শ্রুতি মধুর কথাগুলা শুনিতে তাহার কখনো ভাল লাগে, কখনো বিরক্ত হইয়া উঠে,—কাহারও কথা সে হাসিয়া উড়াইয়া দেয়, কখনো কাহারও কথার উত্তরও দেয়। কত জন তাহার মনোরঞ্জন করিতে চায়, কতজন তাহার মন জোগাইয়া চলে—নিজের রূপ-গুণের কথায় সে আনন্দিত হয়, আত্মপ্রসাদ লাভ করে, কখনো সব কিছুর উপর দারুণ বিতৃষ্ণা হয়—সে সেই সময়ে কয়েকদিন কাহারো সহিত দেখা করে না চুপ করিয়া বাড়ীতে বসিয়া থাকে।

সকলের ভিতর একজনকে তাহার ভাল লাগিত—ঠিক একটা সখের কুকুর বা বিড়ালকে যেমন লোকের ভাল লাগে ঠিক সেই রকম। তাহাকে সকলে ইংরাজীতে "Pet" বলিয়া ডাকিত। লোকটার স্ত্রীলোকের মত কমনীয় সুন্দর মুখ দেখিয়া সকলে তাহাকে ভাল বাসিত। সে অনর্গল ভাষায় সুরমার স্তুতি গায়, সারাদিন,—দাসানুদাসের মত চক্ষের ইঙ্গিতে তাহার আদেশ পালনে অগ্রসর হয়। সুরমা তাহাকে লইয়া কৌতুক করে, হাসে, তিরস্কার করে, আবার আদর করিয়া কাছেও ডাকিয়া আনে। সে ধনীর পুত্র এবং নিজেও খুব সৌখীন, কিন্তু সকলে বলে তাহার পিতা "বওয়াটে" বলিয়া তাহাকে "ত্যজ্যপুত্র" করিয়াছে—তবুও তাহাতে তাহার বিশেষ ক্ষতি হয় নাই কারণ তাহার মাতৃপরিত্যক্ত সম্পত্তি হইতে তাহার সৌখীনতা বাবুগিরি বেশ চলিয়া যায়। সুরমাও বুঝিতে পারে যে মস্তিষ্ক বা বুদ্ধি বলিয়া কোন বালাই তাহার সুডৌল মাথাটার ভিতর ছিল না,—কিন্তু ঐ বোকামির ভিতরও তাহার একটা ধূর্ত্তামি, চালাকি ছিল যাহা দেখিয়া অনেকে মাঝে মাঝে ভাবিত, লোকটা সত্যই বোকা, না ইচ্ছা করিয়া বোকা সাজে—। আসল নামটা তাহার সকলে জানে নলিনী, নলিনীকান্ত অথবা মোহন বা নাথ তাহা কেহ জানিত না, সকলে শুধু নলিনী বলিয়াও ডাকিত!

সে সুরমাকে অনেকভাবে তাহার প্রেম নিবেদন করে, তাহাতেও সে কান দেয় না, শুধু হাসে মাত্র! কিন্তু একদিন তাহার কতকগুলি কথা সুরমার বেশ মনে লাগিল, এবং সেদিন সে বিরক্ত হইয়া তাড়াতাড়ি বাড়ী আসিয়া অনেকক্ষণ ঐ কথাগুলি লইয়া ভাবিয়াছিল। সে সেদিন অনেক কথার পর বলিয়াছিল—"আমি অনেক সময় ভাবি যেখানে আপনার কোন প্রয়োজন নেই, সেখানে আপনি থাকেন কি করে? তার চেয়ে আর কোনখানে গিয়ে হয়তো আর অন্য কোন জীবন সার্থক করে তুলতে পারেন।"

সুরমা এ কথায় অত্যন্ত রাগ করিয়া বলিল—এ সব উপদেশের কথা তোমার কাছে তো আমি শুনতে চাই নি কখনো, কেন বলছ?" দিব্য সপ্রতিভভাবে সে বলিল—"রাগ করছেন, কিন্তু ভেবে দেখুন, আপনার এখানে কি সম্মান, কি মর্য্যাদা আছে? আমার উপর রাগ করলেন, কিন্তু সকলে জানে আপনার স্বামী আপনাকে ত্যাগ করেছেন—" "কোন অধিকারে এ সব কথা বলছ নলিনী। চুপ করে থাক, আমার স্বামী সম্বন্ধে আমি ভাল বুঝি—" "তাতো বুঝলেন কিন্তু তিনি যে আপনার কাছ থেকে স'রে থাকবার জন্য এখানে আসেন না তা সকলে জানে"—"তিনি যদি কোন কাজে ব্যস্ত থাকেন"—"তা থাকলেও এমন কোন কাজ কারো থাকতে পারে না, যে তিনি বাড়ীতে আসতে পারেন না একবারও—"

"ও সব তোমাদের বাজে কথা রাখো—" "আপনাকে যে এমন ভাবে উপেক্ষা ক'রে ফেলে যায় তাঁর বাড়ীতে বসে আপনি কি করে হাসতে পারেন। আমি বুঝতে পারি না,—আপনাকে তিনি অপমান করেছেন, একটিবার খোঁজ নেন্ না, এমন করে সামান্য একটা স্ত্রীলোকের মত প'ড়ে আছেন। আপনাকে দেশের লোকের সমালোচনার উপাদান ক'রে দাঁড় করিয়েছেন তিনি! কি বলবো—আমার আপনাকে দেখে কষ্ট হয়, আপনার অন্যায়কারীর উপর রাগ হয়, তাই বলি। আপনার একেবারে অন্য খানে চলে যাওয়া উচিত!"

সুরমা তাহার কথায় অত্যন্ত রাগ করিয়া তাহার সঙ্গে দেখা করিল না কয়েকদিন। কিন্তু কথাগুলা ঠিক মনের ভিতর গ্রথিত হইয়া রহিল। সত্যই তাহার মনে হইল, মিছামিছি সে ভারস্বরূপ এখানে থাকে কেন? রাজীব

তাহাকে চায় না, সংসার তাহাকে চায় না। সে যদি আজ সরিয়া যায়, তাহা হইলে রাজীব হয়তো নূতন করিয়া আবার সংসার পাতিতে পারে। সে আবার বিবাহ করুক, অথবা মিনতিকে লইয়া আসুক,—তাও ভালো। গৃহস্বামী কেন তাহার জন্য গৃহহীন হইয়া প্রবাসে দিন কাটায়, সে বেশ বুঝিতে পারে রাজীব তাহার জন্যই আজ ঘর ছাড়িয়া বাহিরে ঘুরিতেছে! কি অধিকার আছে তাহার, যে তাহাকে উপেক্ষা করে তাহারই গৃহে গৃহকর্ত্রী স্বরূপ একটা মিথ্যার অভিনয় করিবার? উপেক্ষাভরে ফেলিয়া দেওয়া রাজীবের প্রদত্ত অন্ন গ্রহণ করে সে কোন লজ্জায়, কোন দাবীতে? তাহার অপরাধের মাত্রা হিসাব করিয়া ধরিতে গেলেও এ বাড়ীর উপর সে সমস্ত অধিকার হারাইয়া ফেলিয়াছে—এখানের প্রতিটী মুহূর্ত্ত তাহার জোর করিয়া, চুরী করিয়া, প্রতারণা করিয়া লওয়া। তাছাড়া বিবাহের পর হইতে তাহাদের ভিতর পবিত্র দাম্পত্য ভাব, কখনই ছিল না, ছিল শুধু একটা লিপ্সা, লালসা,—কর্ত্তব্য বলিয়া বা হৃদয়ের সম্মিলিত ভাবের আদান-প্রদান তাহাদের ভিতর কখনো হয় নাই, এই যদি এত বৎসর ধরিয়া তাহার পত্নীত্ব ও রাজীবের স্বামীত্ব হয় তাহা হইলে তাহাদের এ ফাঁকির বন্ধন একেবারে টুটিয়া যাওয়াই ভাল।

একমাত্র বন্ধন প্রণব!

প্রণবের কথা মনে হইতে তাহার মনটা দুলিয়া উঠিল। ব্যথায় ভরিয়া উঠিল। কিন্তু তাহার উপযুক্ত পিতার হাতে সে যদি তাহাকে ছাড়িয়া যায়, তাহা হইলে তাহার কর্ত্তব্যের কি ত্রুটি হইবে? বরং সে কোন সুদূর দেশে গিয়া প্রচার করিয়া দিবে যে সে মরিয়া গিয়াছে, তাহা হইলে মৃতের প্রতি সম্মান অথবা সহানুভূতি করিয়াও অন্ততঃ তাহার সমস্ত অপযশ, কলঙ্ক, প্রণব ও রাজীব একদিন ক্ষমার চক্ষে দেখিতে পারিবে কিন্তু এইভাবে বাঁচিয়া থাকিলে কেহ তাহাকে ক্ষমা করিবে কি? বিশেষতঃ পুত্রের চক্ষে মায়ের কলঙ্ক অমার্জ্জনীয় অপরাধ যে। এ ভাবনার মাত্রা সে কিছুতেই কমাইতে পারিল না এবং প্রত্যেকটী দিন তাহার কাটিতে লাগিল এক অসহ্য যন্ত্রণার ভিতর দিয়া। খাইতে শুইতে প্রত্যেক কাজে তাহার বিবেক তাহাকে বিঁধিয়া অস্থির করিয়া তুলিল।

কয়েকদিন সে নলিনীর সহিত দেখা করিল না, আসিলে বাড়ী নাই বলিয়া দিত।

কিন্তু সেদিন হঠাৎ এক বন্ধুর বাড়ীতে তাহার সহিত দেখা হইতে সে অনেক অনুনয়-বিনয় করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিল। তারপরে কয়েকদিন পর সে একদিন সন্ধ্যার সময় আসিয়া হাজির হইল। সুরমা তাহাকে দেখিয়া বলিল,—"তুমি এসেছ বোস কিন্তু বাজে কথা বলে আমার মাথা গরম ক'রে দিওনা—বুঝলে?"

সে বলিল—"না আপনার মাথা গরম করবো না, কিন্তু আমি যে আমার প্রাণের দায়ে বলি সেকথা বুঝতে পারেন না?—"

"না আমি বুঝতে পারি না, বুঝতেও চাইনা—"

"রাগ করবেন না মিসেস বোস আপনার ভালোর জন্য বলছিলুম,—দেখুন আমি আপনাকে যেদিন থেকে দেখেছি—সেই দিন থেকেই—"

"ভালেবেসেছ?—"

"হ্যাঁ। যদি তা বুঝতেই পেরেছেন, তবে আর আমি কি বলবো? তবে এটুকু বলতে পারি যে, আমার এ সামান্য জীবনটা একেবারে ধন্য হ'য়ে যেতো যদি আপনাকে আমার জীবনের সঙ্গিনীরূপে পেতুম—"

সুরমা রুঢ়স্বরে বলিল—"তুমি বড় বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেছ—Pet! যা তা কথা বলোনা ভদ্রভাবে কথা বল!"

ঈষৎ হাসিয়া Pet বলিল—"কিন্তু আপনি এখানে কোন অধিকারে থাকতে চাচ্ছেন, তাও তো বুঝতে পারছিনা। আপনার স্বামীর নামে কি যেনো একটা গুজব শুনেছিলুম—বহু আগে, আর আপনাকে তো তিনি ত্যাগই করেছেন, তার উপর সেখানে তিনি কি করছেন তাই বা কি ক'রে জানেন? এই জীবন যাপন ক'রে কি লাভ? তার চেয়ে চ'লে আসুন, মিসেস্ বোস আমার ক্ষুদ্র কুটিরে আপনার পা রাখবার অনেক জায়গা হবে—"

ক্রমশঃ

কাজল-লতা

—গল্প—

শ্রীহৃষীকেশ মৌলিক

রাস্তার পারেই ঘরখানা, বড়। সমস্ত মেঝে জুড়িয়া একখানা কার্পেট। তার উপর গোটা তিনচার ইজেল; তাতে অদ্‌সংখ্যক সমাপ্ত অসমাপ্ত কয়েকখানি ছবি। আরও নানা ছবি দেয়ালে হেলানো, কার্পেটের ধারে ধারে। কিন্তু ঘরের দেয়ালে একখানি ছবিও টাঙ্গানো নাই। একটি স্নিগ্ধ সবুজ রঙে তাহা অনুলেপিত। একদিককার দেয়ালে মাত্র একখানা দেয়াল পঞ্জী। ঈশান কোণে জানালার ধারে ছোট একটি টিপয়, তাতে ঢাকনি নাই। কাঠের আচ্ছাদনটি চিত্রাঙ্কিত। পিতলের একটি ফুলদানীতে শুষ্ক একতোড়া ফুল। একটা কাঠের চোঙ্গায় উর্দ্ধমুখ হয়ে সরুমোটা নানা রকম তুলি। ঘরে আরও ঢের জিনিষ আছে; কিন্তু ঘরের অধিকারী গৌতম দেউলিয়া হইয়া যায় নাই এবং আমরা তার বেবাক্ অস্থাবর সম্পত্তির লিষ্টি করিয়া নীলামে চড়াইতেও যাইতেছি না। ও তখন দরজার উল্টোদিকের দেয়ালের কাছে বসিয়া নিবিষ্টমনে একখানা ছবি আঁকিতেছিল। হঠাৎ দেয়ালে একটি ছায়া পড়িল, হট্ করিয়া দরজা ভেজানোর একটা শব্দ হইল। রংদানীটা নামাইয়া রাখিয়া পিছন ফিরিয়া গৌতম চাহিল। ঠিক কলের পুতুলের মত ও উঠিয়া দাঁড়ায়। চোখকে ওর বিশ্বাস হইতেছিল না।

ভাল করিয়া চশমাটা মুছিয়া চোখে লাগাইয়া বলিল – "একি, তুমি?...একলা...এখানে...রাত্তিরে?"

"চিন্‌তে পার্‌ছ ত?" "সেকি কথা অসি? ঠাট্টা কর্‌চ?"

"কিন্তু তুমি কি আমাকে ঠিক তা-ই করোনি?" "কেমন করে অসিতা?"

"এই দেড় মাসের ভিতর একটি দিনও আমাদের বাড়ী যাওনি কেন? এতদিন প্রত্যহ সকাল-সন্ধ্যা আমাদের বাড়ী অনুগ্রহ করে পদার্পণ কর্‌লে, তারপর হঠাৎ না বলে-কয়ে একেবারে দেড় মাসের জন্ম অন্তর্ধান, একি পরিহাস নয়?"

"কাজ ছিল অসিতা?"

"কাজ? কাজ কার নেই? আমার কাজ ছিল না? তবুও কেন রোজ সন্ধ্যায় তোমার পথ চেয়ে আমি বসে থাকতাম? প্রতিটি সেকেণ্ড মিনিটের মত, প্রতিটি মিনিট ঘণ্টার মত ভারী হয়ে কেন আমার বুকে চেপে বসে থাক্‌ত? কাজ কোন পুরুষের নেই? আমি থাকতাম তোমার পথ চেয়ে আর তুমি—!"

হাতের তুলিটা বাঁ হাতের চেটোয় বুলাইতে বুলাইতে নতমুখে গৌতম দাঁড়াইয়া রহিল। অসিতার মুখের পানে তাকাইতে ওর সাহস হইতেছিল না। হঠাৎ কেন অসিতার এত উষ্মা প্রকাশ গৌতম ভাবিয়া ঠিক করিতে পারে না।

যেন ভয়ে ভয়ে বলিল—'তোমারি জন্যে—"

"আমার তাজমহল তৈরী করে রাখোনি, ঠিক! আর রাখলেও আমি তোমাকে মাপ কর্‌তাম না। তোমার এই দেড় মাসের অবহেলা আমাদের দেড়ের দ্বিগুণ তিন বছরের ঘনিষ্ঠতার পথে ব্যাষ্টাইল দুর্গের দেয়াল তুলে দিয়েছে—।"

গৌতম মাথা তুলিয়া অসিতার মুখের পানে চাহিল। কিন্তু সে দীপ্ত মুখের ভাবরাশির কোন কূলকিনারা পাইল না। মধ্যাহ্ন সূর্য্যের খরকিরণোদ্ভাসিত মহা-সমুদ্রের উজ্জ্বল অসীমতা অসিতার মুখে।

গৌতম বলিল—'এত রাগ করছ কেন অসিতা? আমার কোন কথা না শুনেই—! এমন ত তোমায় কখনো দেখিনি অসি? কেউ তোমাকে রাগালে ঘাড় বাঁকিয়ে নিজের বেণীটার উপরেই ত নির্দ্দয় হতে, দেখেছি। তাই বলে এমনি তাড়া করে আসা! আশ্চ...?'

"আশ্চর্য্য তুমি আমায় করোনি?"

"সে যাক্। এখন যে-জন্ম যেতে পারিনি তা-ই শোন।"

"না আমি শুনতে চাইনে"—বলিয়া ঘাড় ফিরাইয়া একখানি ছবির পানে অসিতা চাহিয়া রহিল।

"এখানে যদি না শুনতে চাও তা হলে একটা 'বেয়ারিং' চিঠি করে তোমার কাছে লিখে পাঠাব'খন। তখন যেন 'রিফিউজ' করোনা—।"

এইবার অসিতার মুখে একটি হাসির বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। কিন্তু তা সে ক্ষণপ্রভার মতই ক্ষণিক। পরক্ষণেই মুখ অন্ধকার করিয়া ছবিটার উপর অধিকতর অভিনিবেশ দৃষ্টি প্রেরণ করিল ও।

একটু হাসিয়া গৌতম বলে—আমার চেয়ে ছবির ঐ মুখটি-ই তোমার চোখে বেশী সুন্দর লাগছে বুঝি? তা হলে ত দেখছি—।"

দৃষ্টি ফিরাইয়া আনিয়া অসিতা বলিল—"কি বল্‌বে বলেছিলে, বল?"

"কিন্তু তার আগে একটি কথা তোমার জিজ্ঞেস কর্‌ছি অসি, রাগ করোনা। আমি এদ্দিন কেন যাইনি তা-ই জানতেই কি তুমি এসেছ? চিঠি লিখেই ত জান্‌তে পার্‌তে?"

"যে আমায় এমন অবহেলা করেছে তার কাছে আমি চিঠি লিখব কেন?"

হাসিয়া গৌতম বলিল—"কিন্তু তার কাছেইত এসেছ দেখছি? একা রাত্তির করে?"

"কেন তাতে হয়েছে কি?"

তেমনি ভাবে হাসিয়া গৌতম কহিল—"তোমার একাকীত্বের সুযোগ গ্রহণ করে তার কোন অপব্যবহার যদি আমি করি।"

অসিতা গৌতমের মুখের পানে চাহিয়া কেমন এক রকম হাসিল। সে হাসিতে অবজ্ঞা, আত্মনির্ভরতা, দৃঢ়-চিত্ততা সকলই একসঙ্গে ফুটিয়া উঠিল।

গৌতম মনে মনে তিন পা পিছাইয়া যায়। সে ভাবটা বাতাসের মুখে সমর্পণ করিয়া কহিল—যা বলছিলাম শোন। সেই মহারাজার বাড়ী থেকে একটা অর্ডার অনেক কষ্টে যোগাড় করেছি। চারখানা 'অয়েল পেন্টিং দু'হাজার টাকা—।"

"তা সে জন্যে কী? আমাদের বাড়ী যেতে পারোনি? আমায় বল্‌তে পারোনি গিয়ে! আমাদের তোমরা পেয়েছ কী? আমরা কি দুর্গোপূজোর প্রতিমা যে, তিনদিন ঘটা করে পূজো দিয়ে চার দিনের দিন নদীর জলে ভাসিয়ে দিয়ে আসবে। দু'দিন একটু আদর কর ভালবাসা দেখাও, তারপর যখন চলে যাও মনে একটুও দাগ থাকে না। সব ধুয়ে মুছে ফেলে মাজা শ্লেটটির মত পরিষ্কার হয়ে বসে থাক।"

"না, না, ওসব কি? ছবি এঁকেটেকে একেবারে টাকা আদায় করে তোমায় শুনিয়ে 'সারপ্রাইজ' করে দেব ভেবেছিলাম, অসি!"

"দেখো ঐ 'সারপ্রাইজ' জিনিসটা আমাদের মেয়েদের ধাতে সয়না। আমরা নিজেরাও 'সারপ্রাইজ' নই, কাউকে 'সারপ্রাইজ' কর্‌তেও চাইনা। সৌদামিনীর স্ত্রীলিঙ্গটা ভুল। তরঙ্গিনীতে স্ত্রীলিঙ্গ হতে পারে; কারণ স্রোতের চঞ্চলতার সঙ্গে মেয়েদের স্থিরত্বও সেখানে আছে। কিন্তু—।"

"ব্যাকরণের আলোচনা—?"

অসিতার মুখে লজ্জার গোধূলি।

সেটা ঢাকিবার জন্যই যেন তাড়াতাড়ি বলিল—"তা তোমার টাকার দরকার হল যে হঠাৎ? রাতদিন বোধ হয় খাটছ। চেহারাটা দস্তুরমত খারাপ করে তুলেছ, দেখছি।"

—বলিয়া গৌতমের সমস্ত দেহময় একটি দৃষ্টিও বুলাইয়া নিল। প্রবাস প্রত্যাগত অসুস্থ পুত্রের প্রতি মা যে-রকম করিয়া চাহেন।

গৌতম আশ্চর্য্য। এই অদ্ভুত চরিত্রা মেয়েটীর জন্য ওর মনের টান দ্বিগুণ হইয়া যায়। একহাতে ও গৌতমকে বর্শাবিদ্ধ করিয়া অন্যহাতে যেন শান্তির প্রলেপ লাগাইয়া দিতেছে।

ওর স্বাস্থ্যের জন্য তরুণী প্রিয়ার এই শঙ্কা প্রকাশে গৌতম মনে মনে পুলকিতও হইয়া ওঠে।

আজ সকালে ছবির একটি তরুণীর ঠোঁটের কোণে, একটি রেখার টানে অভিলষিত ভাবটিকে প্রকাশ করিতে পারিয়া যে আত্মপ্রসাদ ও লাভ করিয়াছিল এ আনন্দ তার চেয়ে এক তিল কম নয়।

আনন্দের ভাবটা কাটিয়া গিয়া মাথার ঘনচুলে গোটা চার দাগ কাটিয়া বলে—"আমার অবস্থা ত জান! কিছু টাকা সংগ্রহ না করে কেমন করে তোমাকে—।"

"কিন্তু তোমার টাকা নেই জেনেও আমি তোমায় ভালবেসেছিলাম। টাকার কথা ত আমার কোনদিন মনে হয় নি। আজ মনে হ'ল তোমার কথায়—"

"অকারণে আমার কথায় বেঁধে লাভ কি অসি! কিছু টাকা সংগ্রহ না করে কেমন করে আমার ঘরের লক্ষ্মীকে ঘরে এনে তুলি ?"

"কিন্তু তোমার গৃহে আমায় চরণপাতে যিনি সোনার কমল ফুটে না-ই ওঠে, তবে আমার লক্ষ্মী বলে, লক্ষ্মী নামের আর অপমান করো না। টাকা হাতে করে কে কবে লক্ষ্মীকে অভ্যর্থনা করতে গিয়েছে। তপস্যার মত তপস্যা করলেই—"

"সেই তপস্যাই ত করছিলাম অসি! স্বর্ণলক্ষ্মী, রৌপ্য লক্ষ্মী দুই-ই একবারে ঘরে তুলতাম।"

"কিন্তু রৌপ্যলক্ষ্মীর তপস্যা করতে গিয়ে স্বর্ণলক্ষ্মীর দিকে অমনোযোগী হলে তিনি যদি পরের ঘরে গিয়ে ওঠেন ? তখন কি করবে ? দু' নৌকোয় একসঙ্গে পা দিতে শাস্ত্রের যে নিষেধ আছে তা কি জান না ?"

একটু হাসিয়া আত্মগতভাবে গৌতম বলে—"কিন্তু আমার স্বর্ণলক্ষ্মীকে যে আমি ভাল করে চিনি। দেড় বছরের প্রতিটি দিনের ঘনিষ্ঠতা।"

"কিন্তু কে তোমাকে টাকার তপস্যা করতে বলেছিল ? জ্যোছনা রাতের ঝিরঝিরে হাওয়ায়, বোটানিকাল গার্ডেনের বকুল তলায়, ভবিষ্য সংসারের যে প্ল্যান আমরা করেছিলাম সে কি এই ? টাকা পয়সার ত কোন কথা কোনদিন হয়নি! তুমি ছবি আঁকবে, আমি কাছে বসে তোমার 'ক্যানভাসের' ছবিতে প্রাণসঞ্চার করব। পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্য্যন্ত আমার দেহের অফুরন্ত ঐশ্বর্য্য রঙ্গে রেখায় ফুটিয়ে তুমি অমর করে রাখবে। টাকা পয়সার কোন কথা ত হয় নি ?"

"আর দারিদ্র্য ? তাকে ভয় কি ? তুমি যেখানে আমায় ভালবাস, আমি যেখানে তোমায় ভালবাসি দারিদ্র্য সেখানে এসে করবে কি ? আমায় আসন যদি তোমার সমস্ত মন জুড়ে না থাকে, টাকার চিন্তা যদি সেখানে এসে স্থান নেয় তবে তোমার মনোরাজ্যে ঐ অর্থচিন্তার সতীন হয়ে আমি থাকতে চাইনে। আমি জানতাম আর্টিষ্টরা টাকার কাঙাল নয়, তাইত তোমাকে।"

"কিন্তু আমি ভেবে দেখেছি অসিতা, আজকালকার মতো টাকা না হলে চলে না, তুমি আমি যে স্বপ্নজাল রচনা করতাম সে আমার ভেঙ্গে গেছে অসি! হতে পারে যৌবনে যখন প্রাণে অফুরন্ত আনন্দ থাকে তখন এই পৃথিবীর ভালমন্দ সবতাতেই আনন্দ খুঁজে পাওয়া যায়। দুঃখ-দৈন্যের আঘাত বার বার এসে নিষ্ফল হয়ে ফিরে যায়। কিন্তু যৌবনের সঙ্গে সঙ্গে আনন্দরসের উৎসও ফুরিয়ে যায়, প্রাণে। তখন তিল পরিমাণ দুঃখ তাল পরিমাণ বলে মনে হবে—অসহ্য বলে মনে হবে।"

"কিন্তু এ কি তোমার নূতন আবিষ্কার! এ 'ফিলজফি' তোমার আগে কোথায় ছিল ?"

"হাঁ নূতন আবিষ্কার। তোমার কাছে যখন যেতাম অসিতা, শুধু সন্ধ্যা আর সকাল নিয়ে যখন আমার দিবারাত্র গঠিত ছিল, যখন সকালে তোমার সঙ্গে কাটিয়ে সন্ধ্যার প্রতীক্ষায় থাকতাম, সন্ধ্যায় থাকতাম প্রভাতের প্রতীক্ষায় তুমি ছিলে, তোমার চিন্তা ছিল আমার সমস্ত মনোরাজ্যে অধিকার করে। বাহিরের জগতের এতটুকু চাঞ্চল্য কোন উদ্বেগ, আশঙ্কা সেখানে প্রবেশাধিকার পায়নি। কিন্তু তোমার কাছ থেকে একটু দূরে সরে আসতেই বিশেষতঃ একটি ঘটনায়"—

"তোমার কাছে জাজ্বল্যমান হয়েছে যে অর্থই সংসারের সর্ব্বস্ব—।"

"তা নয়, একটি সর্ব্বস্বের জন্য অর্থ অবশ্য—।"

অসিতা ঘাড় ফিরাইল, অকারণে নয় বোধ হয়।

চোখ বুজিয়া অসিতা মিনিট দুই কি চিন্তা করিল। তারপরে মুখে একটা বে-পরোয়া ভাব আনিয়া কহিল—"আর আমার বিয়ে।"

গৌতমের পায়ের সমুখের মেঝেটা ফাটিয়া চৌচির হইয়া ধ্বসিয়া পড়িল কি ?—এক্ষণি বুঝি ও সে অতলতলে তলাইয়া যাইবে।

অসিতা আঁচলের নীচ হইতে একটি কাজললতা বাহির করিয়া গৌতমের বিস্মিত বিস্ফারিত নেত্রের সম্মুখে নাচাইয়া নিল। ঘাতকের উত্তোলিত শাণিত খড়্গ-বিচ্ছুরিত সূর্য্য-রশ্মি, অপরাধীর চোখের সামনে যেমন করিয়া নাচিয়া যায়।

অসিতার মুখে কেমন একটা অস্বাভাবিক ভাব। নির্দ্দয় ভাবে ও বলিতে লাগিল—ভবানীপুরের সতীশবাবুর বাড়ী থেকে আজ আমার গায়ে হলুদের তত্ত্ব এসেছিল। ওঃ সে কত জিনিষ! তারপর আমায় সবাই মিলে হলুদ মাখিয়ে চান করিয়ে দিল, হাতে দিল একটা কাজল লতা। সতীশবাবুর ছেলের সঙ্গেই—।"

দু'পা পিছু হঠিয়া দেয়ালে ভর রাখিয়া গৌতম কহিল—'অসিতা এত নিষ্ঠুর তুমি? আমার কাছে তুমি বল্‌তে এসেছ, তুমি নিজে। আমার—।"

—সুখ-স্বপ্ন-ভঙ্গজনিত একটা প্রবল বাষ্পোচ্ছ্বাসে কণ্ঠ ওর রুদ্ধ হইয়া যায়। নিজহাতে কাটা পাঁঠার প্রতি লোকে যেমন করিয়া চায়, আর্ত্ত গৌতমের পানে অসিতাও তেমনি করিয়া চাহিল। কিন্তু সহিতে না পারিয়া দৃষ্টি নীচু করিল; কিন্তু বলিয়া চলিল—"তোমার আমাদের ওখানে শেষ যাবার কয়েকদিন পরই, ঢাকা থেকে পিসীমা সতীশবাবুর ঐ ছেলের সঙ্গে আমার বিয়ের প্রস্তাব করে পাঠালেন। ছেলে বি-এ পাশ করে বাপের কারবার দেখছে, মস্ত কারবার। পণের গয়নার দাবী-দাওয়া কিছু নেই। বাবা ত লাফিয়ে উঠলেন, খোঁজখাজ করে সব ঠিক করে ফেল্লেন। তোমার আমার চেনা-পরিচয় একদম ভুলে গেলেন। সে-রকম টাকা পয়সা নাই দেখে বাবা কোন দিনই তোমার প্রতি খুব প্রসন্ন ছিলেন না। কিন্তু এসব আমার আহার-নিদ্রায় কোন ব্যাঘাত কর্ত্তে পারেনি; নিয়মিত স্কুলেও যেতে লাগলাম। আমি ভাবতাম তুমি একদিন এলেই, তোমার কাছে সব খুলে বল্লে এসব সম্বন্ধ-টম্বন্ধ উড়ে যাবে। কিন্তু তুমি যখন বিয়ের তারিখের হপ্তা খানেক আগে পর্য্যন্তও এলেনা, তখন আমারও রাগ হলো। যে আমাকে এমন করে ভুলে থাক্‌তে পারে, তারই ঘর আমার কর্ত্তে হবে, আমারই বা এমন কি দায়! বাবা-মা যেখানে বিয়ে দিচ্ছেন সে-খানেই গিয়ে করব।"

গৌতম ওর শক্তির সর্ব্বশেষ বিন্দুটি পর্য্যন্ত সংগ্রহ করে বল্‌তে পার্‌লে—"কিন্তু এসব কথা কি আমাকে কোন রকমেই জানাতে পারলে না অসি! তবে কেন এসেছ আজ, আমার মনের চন্দন বনে আগুন ধরাতে—।"

"কেন এসেছি তাই শোন। কাল রাত্তির চারটার সময় যখন আমার ঘুম এলো তখনও আমার এ সঙ্কল্প ঠিক ছিল। কিন্তু আজ ভোরের আলোর সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে হতে লাগল এ যেন হতে পারে না। অসম্ভব! তাই আজ সমস্ত দিন মনের সঙ্গে যুদ্ধ করে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছি। তোমার অবহেলা আমার হৃদয়ে বড় বেজেছে, তাই অসম্ভব সম্ভব বলে মনে করেছিলাম। কিন্তু সারাজীবন তিল তিল করে স্মৃতির দংশন কেমন করে সহ্য করব। যাকে কোনদিন দেখিনি, জানিনি, হঠাৎ একরাত্রে কেমন করে তাকে আমার সমস্ত দেহ মনের অধিকারী বলে বরণ করে নেব। বিয়েটা আমি লটারী বলে মনে করিনা। মনোমত স্বামী হলে সুখে জীবন কাটাব, আর নয়ত জীবনটাকে একটা গাধার বোঝার মত সারা জীবন বয়ে বেড়াব, অসহ্য। যাকে প্রিয়তম বলে সম্বোধন করব সমস্ত মরমে সে প্রিয় কিনা তাই আগে দেখে নেব। তাই সমস্ত অভিমান পদদলিত করে তোমার কাছে এসেছি। আমি জানি তুমি আমার পরাজয়ের সমস্ত গ্লানি, আমায় গ্রহণ করে ধুয়ে মুছে দেবে। দুঃখ শুধু এই বিধাতাকে অভিশাপ দিতে ইচ্ছা করে, নারী কেন তার মান অভিমানের রাগ বিরাগের শেষ রক্ষা করতে পারে না।"

গৌতমের মুখ উন্মাদ আনন্দে ভরিয়া উঠিল। কিন্তু তারপর অসিতা যাহা করিল তাহা যেমন অচিন্তিত তেমনি অভূতপূর্ব্ব।

ব্লাউজের ফাঁক হইতে অসিতা ছোট একটি মালা বাহির করিল। ধীরে ধীরে মালাটি গৌতমের গলায় পরাইয়া দিয়া কহিল—"এতক্ষণে বিয়ের লগ্ন আরম্ভ হয়ে গেছে শুভলগ্নে আমি তোমার গলায় মালা দিলাম।"

নতমুখে গৌতম দাঁড়াইয়া রহিল। অসিতার দেওয়া মালা পরিয়া, প্রিয়তমার উষ্ণ কোমল স্তনস্পৃষ্ট মালা বুকে করিয়া গৌতম বিহ্বল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মিত্র এম্-এ

সিরিয়া—বহু পুরাতন দেশ। প্রাচীন যুগে এই-খানেই ফিনিসিয়ার নগরগুলি ছিল। প্রকৃতি দেবী এই দেশকে ধন-ধান্যে ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে সুশোভিত করিয়া রাখিলেও বহু পুরাতন অতীত হইতেই এই হতভাগ্য দেশটী কোন না কোন শক্তির অধীন থাকিতে বাধ্য হয়। মিশরের ফারোয়াগণ, আসেরিয়ার নৃপতিগণ এই দেশ অধিকার করিয়া শাসন করিয়াছিলেন। দারিয়সের আমলে পারশ্য এই দেশটী জয় করিয়া শাসন করেন। গ্রীক প্রাধান্য এশিয়া মাইনরে প্রবল থাকিতে সিরিয়ার অধিকাংশ স্থল গ্রীকগণ কর্ত্তৃক শাসিত হইত। রোমীয় যুগের সিরিয়া রোমের অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হয়। উনবিংশ শতাব্দীতে নেপলিয়ন ভারত আক্রমণ করিবার জন্য মিশর দেশে আসিলে এই পুরাতন দেশটীর উপর আবার জাতিবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়। নেপলিয়ান স্থির করিয়াছিলেন যে মিশর জয় করিয়া তথা হইতে সিরিয়া জয় করিবেন। তাহার পর আরব, পারস্য ও আফগানিস্থানের মধ্য দিয়া উনবিংশ শতাব্দীর আলেকজাণ্ডাররূপে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিবেন। তাঁহার এই কল্পনা ইংরাজদিগের দৃষ্টি এই রাজ্যের দিকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করে কিন্তু কোন সুবিধা না হওয়ায় তাঁহাদিগকে সুযোগের অপেক্ষায় বসিয়া থাকিতে হয়।

গত মহাসমরের পূর্ব্বে সিরিয়া তুরস্কের একটি প্রদেশ মাত্র ছিল। এক শত বৎসর পূর্ব্বে এই প্রাচীন দেশটির কোন প্রকার জীবিত থাকার চিহ্ন ছিল না। মিশরের মহম্মদ আলী ওয়াহিবীগণকে শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে সিরিয়া দখল করিতে বাধ্য হন। তখন সিরিয়ায় জাতীয়তার খানিকটা উন্মেষ ঘটে। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে কর্ণেলিয়স্ ভান ডাইক (Cornelius Van Dyke) নামক একজন আমেরিকান পাদরী একটি মেডিকেল কলেজ স্থাপন করেন। ইংরাজী ভাষার সাহায্যে শিক্ষা প্রদান না করিয়া আরবী ভাষার সাহায্যে প্রদান করিতে আরম্ভ করা হয়। ১৮৭৫ সালে ফরাসী পাদরীগণ বেরুৎনগরে সেন্ট জোসেফ নামক একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেন। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে আল আজহার কলেজের একজন ছাত্র সেখ আহম্মদ আব্বাস একটি ওসমানিয়া কলেজ স্থাপন করেন। এই সমস্ত শিক্ষা কেন্দ্র গুলিতে ফরাসী ভাষা ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও দর্শন শিক্ষা প্রদান করা হইত।

এইরূপে পাশ্চাত্যের সংস্পর্শে আসিয়া সিরিয়ার জাতীয়তা ভারতীয় জাতীয় ভাবের ন্যায় সাহিত্যের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিতে আরম্ভ করে। আল বুসটানি নামক একজন মারোটাইনই এই বিষয়ে প্রথম পথ প্রদর্শন করেন। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে নাফির সুরিয়া বা Syrian Trumpet নাম দিয়া একখানি সংবাদপত্র বাহির করেন। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে বুসটানি সমস্ত বিজ্ঞানের সার সংগ্রহ করিয়া সিরিয়ান ভাষায় একখানি এনসাইক্লোপিডিয়া প্রকাশ করেন। তাঁহারই পরামর্শে তুর্কীর শাসনকর্তা সর্ব্ব-প্রকার পাশ্চাত্য ধ্যান-ধারণা সিরিয়া প্রদেশে যাহাতে প্রচার হয় সরকারী হিসাবে তাহার ব্যবস্থা করেন।

বুস্টানির পরই বিখ্যাত পণ্ডিত নাসিফ আল জাসিজীর নাম উল্লেখযোগ্য। মারোনাইটিদিগের প্রধান পাদরী ইয়ুফ আল দেব ছয় খণ্ডে সিরিয়ার ইতিহাস সঙ্কলন করেন।

সিরিয়ান ভাবধারার পরিচয় দিবার জন্য আমরা দুইটী উদাহরণ প্রদান করিতেছি। জি, মালুফ একজন বিখ্যাত সিরিয়ান সাহিত্যিক। তিনি বলেন, 'সমাজের তাবৎ অংশ ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিলে ঐ সমাজ স্থিতিশীল হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। প্রাচ্যের সমস্ত দুর্ঘটনাই তাহার ধর্ম্মসংক্রান্ত বিশ্বাস হইতে সংঘটিত হইয়াছে এবং ধর্ম্ম-প্রচারকগণ মহামারী বিশেষ।" ফরাচ আনটুম্ নামক আর একজন লেখক বলিয়াছেন যে, 'ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে বিজ্ঞানই পৃথিবীর তাবৎ পণ্য এরোপ্লেনের সাহায্যে দেশ হইতে দেশান্তরে লইয়া যাইবে। আমি স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছি মানব পক্ষীজাতির ন্যায় দ্রুতবেগে বিভিন্ন দেশের পণ্য লইয়া যাতায়াত করিতেছে। আমি ইহাও দেখিতেছি এক মহাদেশের লোক অন্য মহাদেশের লোকের সহিত এমন ভাবে কথাবার্ত্তা কহিতেছে যেন বোধ হয় একঘরের লোক পার্শ্ববর্ত্তী ঘরের লোকের সহিত আলাপ করিতেছে। আমি ইহাও দেখিতে পাইতেছি যে সাম্য ও মৈত্রীর দিন অতি শীঘ্র নিকটবর্ত্তী হইতেছে, শ্রমিকগণ বিজ্ঞের ন্যায় বিস্তৃত সাম্রাজ্য-শাসনভার গ্রহণ করিবে।' খালিল জুব্রান নামক একজন ঔপন্যাসিক তাঁহার এক উপন্যাসে তাহার নায়িকা যখন তাহার বিবাহিত স্বামীর গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতেছে, তাহাকে দিয়া বলাইয়াছেন যে, 'স্বার্থপর মানব আপনার ক্ষুদ্র স্বার্থসিদ্ধির জন্যই সমাজের শতপ্রকার বেষ্টনী সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে। আজ আমি স্বামীগৃহ ত্যাগ করিয়া আমার সাধারণ মনোবৃত্তির যে স্বাধীনতা রক্ষা করিলাম, নীচমনা সামাজিক জীবগণ তাহাতে তাহাদের স্বার্থের হানি হইল দেখিয়া আমাকে পাপীয়সী আখ্যা প্রদান করিয়া কলঙ্ক-কালিমা আমার সর্ব্বাঙ্গে লেপিয়া দিবে।" আর একজন নেতা এমিন রিথানি তাঁহার বক্তৃতায় বিংশ শতাব্দির সত্যপ্রিয়তাই বেশ স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি একস্থলে বক্তৃতা দিতে বলেন যে, 'যদি ধর্ম্মের গূঢ় তত্ত্ব নির্দ্ধারণ করাই তোমার উদ্দেশ্য হয়, তবে উহা লইয়া তোমার মাথা ঘামাইবার বিশেষ প্রয়োজন নাই কেন না জগতের অনেক সাধু সন্ন্যাসী এই বিষয় লইয়া সারাজীবন মস্তিষ্ক-চালনা করিয়াও কোন স্থির-সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই।' অভিজাতদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলেন যে, "তুমি যদি অভিজাত হও, তোমার গৌরব করিবার কিছুই নাই, কেন না তোমারও আমার বংশধরগণ একই প্রকারে কোন প্রকার জানোয়ার হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন।" এই সমস্ত ভাবধারা ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই এত স্পষ্টভাবে সিরিয়ায় প্রকাশ পায় যে,'১লা মে'র উৎসব করিবার জন্য অনেকেই ব্যগ্র হয়।

তাহার পর ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে নবীন রাষ্ট্র নায়কগণ সমগ্র তুরস্ক-সাম্রাজ্যে এক বিরাট বিদ্রোহ সংঘটিত করিয়া বিনারক্তপাতে তুর্কী রাষ্ট্রের কর্ণধার আবদুল হামিদের নিকট হইতে শাসন-সংস্কার আদায় করিয়া ল'ন। জাতীয়তাবাদী নবীন তুরস্কদল সমগ্র সাম্রাজ্যকে এক বিরাট জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিবার জন্য, আরবী ভাষাকে সরকারী দপ্তর হইতে নির্ব্বাসন করেন। সাম্রাজ্যের মধ্যে অবস্থিত তাবৎ জাতিকেই তুর্কীয় আচার-ব্যবহার গ্রহণ করিবার জন্য আদেশ প্রদান করেন। এই নির্ব্বুদ্ধিতার ফলে তুরস্কের অধীনস্থ দেশে ভীষণ অশান্তি আসিয়া দেখা দেয়। সিরিয়ার জন নায়কগণ তুরস্কের স্বাধীনতা অর্জ্জন করিবার উদ্যম খুব শ্রদ্ধার সহিত লক্ষ্য করিয়া আসিতেছিলেন। নবীন তুরস্কের নেতাগণের কার্য্যকলাপে তাঁহাদের যথেষ্ট সহানুভূতি ছিল। কিন্তু নবীন তুরস্কের পরিচালকগণ সফলতা লাভ করিয়াই যখন উৎকট জাতীয়তাবাদ প্রচার করিতে বদ্ধ পরিকর হন, তখনই তাহাদের সহিত সিরিয়ার জনসমাজের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। সিরিয়ার অধিনায়কগণ বলেন যে, তাঁহারা তুরস্কের অধীন থাকিতে প্রস্তুত আছেন কিন্তু তাহাদিগকে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রদান করিতে হইবে। সিরিয়ার আরবী ভাষাই সরকারী ভাষা বলিয়া গৃহীত হইবে, কিন্তু তুর্কীর সহিত আদান-প্রদানে তুর্কী ভাষা ব্যবহার করা হইবে। রাজকর্ম্মচারীগণকে আরবীভাষা শিক্ষা

করিতে হইবেই। সিরিয়ানরা কিরূপ স্বায়ত্ত শাসন চাহেন তাহা নির্ণয় করিবার জন্য বেরুৎ নগরে একটী রিফর্ম্ম ক্লাব স্থাপন করা হয়। সরকার পক্ষ হইতে এই ক্লাবটী বে-আইনী প্রতিষ্ঠান বলিয়া ঘোষণা করা হইলে, পরবর্ত্তী দিনে তাবৎ সংবাদপত্রই এই খবরটী বড় বড় অক্ষরে ছাপিয়া, অন্যান্য স্থল সাদা রাখিয়া মুদ্রিত হয়। দুইদিন ধরিয়া এক বিরাট ধর্ম্মঘট করিয়া সমগ্র দেশ গভীর মর্ম্ম-বেদনা প্রকাশ করে।

মহাসমরের অবসান ঘটিলে, পরাজিত জাতিবৃন্দ সকলেই আশা করিয়াছিল যে, ভারসিলিজ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মিত্রশক্তিগণ সকলকেই স্বাধীনতা প্রদান করিবে। মক্কার সেরিফ হোসেন ইব্‌নে আলি যুক্ত আরবের নূতন নৃপতি হইবেন বলিয়া আশা করিতে থাকেন। আরব প্রধানগণ বহুদিন হইতেই যুক্ত-আরব রাজত্বের স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে আরবজাতির জাতীয় কংগ্রেসে এই প্রস্তাবটী গৃহীত হইয়াছিল। আরব জাতির জাতীয়তার প্রোগ্রাম মহাযুদ্ধের পূর্ব্বেই স্থিরীকৃত হইয়াছিল। আরবের পাঁচটী রাজ্য একত্র মিলিত করিয়া একটী ফেডারল ষ্টেট স্থাপন করা হইবে এই ব্যবস্থা পত্রের এই বিধানই ছিল।

মিত্রশক্তিগণ আরবজাতিকে স্বাধীনতা প্রদান করিবেন বলিয়া ঘোষণা করেন। এরোপ্লেন হইতে ইস্তাহার ফেলিয়া এই বিষয়ে সাধারণকে উৎসাহিত করা হয়। মক্কার সেরিফ কোরেশ বংশজাত। ১৯১৬ সালে যুক্ত আরবের রাজা করা হইবে আশ্বাস প্রদান করিয়াই তাঁহাকে সমরে যোগদান করান হইয়াছিল। হোসেনও এই আশা অনেকটা হৃদয়ে পোষণ করিতেন বলিয়াই মুসলমানগণকে তুর্কীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবার জন্য ফতোয়া প্রদান করেন। ইংরাজগণও হোসেনকে তাঁহাদের বিশেষ অনুগত বলিয়া মনে করিতেন, তাঁহার পুত্রগণ কনষ্টানটীনোপল ও ফ্রান্সে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মধ্য-আরবের উদীয়মান নেতা বীর ইব্‌নে সাউদ হোসনকে সমগ্র আরবের রাজা বলিয়া স্বীকার করা দূরে থাকুক, তাঁহাকে আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। হোসেন তাঁহার এক পুত্রকে ইব্‌নে সাউদের নিকট পাঠাইয়া একটা সামঞ্জস্য করিতে চেষ্টা করিয়া বিফল মনোরথ হ'ন। হোসেন রাজা উপাধি গ্রহণ করিলে তাঁহাকে অনেকটা অগ্রাহ্য করিয়াই ইব্‌নে সাউদ আরবের সুলতান উপাধি গ্রহণ করেন।

এই সময়ে হেজাজের রাজার পুত্র ফৈসল তাঁহার বাহিনী লইয়া দামস্কসনগরে উপস্থিত হন। স্বাভাবিক চতুরতার সহিত উচ্চবংশজাত তাবৎ সম্ভ্রান্ত অভিজাতগণকেই হস্তগত করিয়া আপনাকে জন-সাধারণের মধ্যে অধিকতর প্রিয় করিয়া তুলেন। এক বিরাট সম্মিলনে আরবের বিভিন্ন নেতা সম্মিলিত হইয়া ফৈসলকে আরবের রাজা বলিয়া ঘোষণা করেন। League of Nations বা জাতিসঙ্ঘও ফৈসলকে আরবের রাজা বলিয়া স্বীকার করিলে, ৮ই মার্চ্চ ১৯২০ সালে ফৈসল, ফৈসল প্রথম উপাধি গ্রহণ করিয়া দামস্কস নগরে যুক্ত আরবের সিংহাসনে আরোহণ করেন।

মিত্রশক্তিগণ এপ্রিলমাসে সান রেমোর মন্ত্রণালয়ে এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তাঁহাদের আদেশ প্রদান করেন। মিত্রশক্তিগণ সমগ্র সিরিয়া ফরাসীগণকে Mandated রাজ্য হিসাবে প্রদান করেন। ফৈশলকে এই সিদ্ধান্ত মানিয়া লইবার জন্য আদেশ করা হইলে ফৈশল প্রস্তুত আছেন বলিয়া সম্মতি প্রদান করিবার পূর্ব্বেই জাতীয় মহাসভা এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার বিরুদ্ধে মন্তব্য প্রকাশ করেন। ২৫শে জুলাই ফরাসী সৈন্য আসিয়া দামস্কস নগর দখল করিলে ফৈশল সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করেন।

তাহার পর কয়েক বৎসর ফরাসীগণ কঠিন হস্তে সিরিয়া শাসন করিবার প্রয়াস পান। ফরাসী শাসকগণ সিরিয়ায় সকলপ্রকার জাতীয় ভাবকে পদদলিত করিয়া সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠিত করেন। অবশেষে ১৯২৫ সালে এক বিরাট জাতীয় বিদ্রোহ দেখা দেয়। ছয় মাস রক্তপাতের পর লেজনোন প্রদেশটী ব্যতীত সমস্ত সিরিয়া বিদ্রোহীদের হস্তগত হয়। এই যুদ্ধের পর সিরিয়া প্রদেশকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করা হয়।

প্যালেষ্টাইন—প্যালেষ্টাইন ইহুদিদের জন্ম-ভূমি। প্যালেষ্টাইনের প্রধান নগরী জারুজালেম যীশু খৃষ্টের

জন্মস্থান। কয়েক শতাব্দী ধরিয়া ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জ জারুজালেম জয় করিবার জন্য প্রাণপাত করিয়াছিল। তুর্কীগণ কর্ত্তৃক প্যালেষ্টাইন অধিকৃত হইবার পর হইতে এই খানে মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। জেরুজালেম নগরটী ক্রমশঃ ইহুদি, খৃষ্টান ও মুসলমানদের একটী তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়। মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে, ইউরোপে জিয়োনিষ্ট (Zionist) আন্দোলন নামক একটী নূতন সমস্যা উদয় হয়। ইহুদিগণ পৃথিবীর তাবৎ অংশে ছড়াইয়া পড়িয়া বসবাস করিতেছিল। তাহাদের হঠাৎ প্যালেষ্টাইনে ফিরিয়া গিয়া স্বাধীন ইহুদি রাজ্য স্থাপন করিবার জন্য আগ্রহ উপস্থিত হয়। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত থিয়োডর হারজলের নেতৃত্বে জিয়োনিষ্ট সঙ্ঘ হয়। দুই হাজার বৎসর পরে সমগ্র ইহুদি জাতি এক বিরাট সঙ্ঘের অধীনে আসিয়া একত্রিত হয়। ইউরোপের রাজন্যবর্গ ইহুদিগণকে লইয়া অনেক সময়েই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িতেন। যে সমস্ত ইহুদি তাহাদের জাতীয়তা বিসর্জ্জন দিয়া যে যে দেশে বাস করিতেছিল সেই সেই দেশের জাতীয়তা অবলম্বন করে, তাহাদিগকে ইউরোপের শক্তিপুঞ্জ একরকম অন্তর্ভুক্ত করিয়া নিশ্চিন্ত হ'ন। কিন্তু যাহারা বহু শতাব্দি ধরিয়া কোন দেশে বাস করিয়াও আপনাদিগের বিশেষত্ব রক্ষা করিয়া আসিতেছিল, তাহারাই মহা সমস্যার কারণ হইয়া দাঁড়ায়। এই জন্যই গত শতাব্দির শেষভাগে জিয়োনিষ্ট (Zionist) আন্দোলন মাথা তুলিলে সকলেই এই আন্দোলনে সহানুভূতি প্রকাশ করিতে থাকে। ধনী ইহুদিগণ জিয়োনিষ্ট প্রতিষ্ঠানের জন্য একটী স্বতন্ত্র অর্থ-ভাণ্ডার স্থাপন করিয়া যে সমস্ত ইহুদি প্যালেষ্টাইনে যাইয়া বাস করিতে চাহিলেন, তাহাদিগকে অর্থ সাহায্য করিয়া তথায় প্রেরণ করিতে আরম্ভ করেন। জেরুজালেম নগরী মুসলমান প্রধান হওয়ায় তথায় বাস করিবার স্থানাভাব ঘটে। এইজন্য উহার চতুষ্পার্শ্বে ইহুদিগণ বসবাস স্থাপন করিতে থাকেন। কুড়ি বৎসর পর, ১৯১৭সালে বৃটিশ সরকার সরকারী ভাবে জিয়োনিষ্ট আন্দোলনকে স্বীকার করিয়া ল'ন এবং এই আন্দোলনে তাঁহাদের সহানুভূতি আছে তাহাও প্রকাশ করেন। এই ঘোষণায় প্যালেষ্টাইনের আরবগণ অসন্তুষ্ট হওয়ায় উহার প্রতি-আন্দোলন সুরু করিয়া দেয়। জাতিসঙ্ঘের ২২ ধারা অনুযায়ী ইহাই স্থিরীকৃত হয় যে প্যালেষ্টাইনে শক্তিপুঞ্জ শুধুই যে তথাকার অধিবাসী আরবগণকে স্বাধিকারতন্ত্রে প্রবুদ্ধ করিয়া তুলিবেন তাহাই নহে, পরন্তু পৃথিবীর সর্ব্বত্র যে সমস্ত ইহুদিগণ বিক্ষিপ্তভাবে আছেন তাঁহাদিগকে একত্রিত করিয়া, এইখানে বসবাস করিবার জন্য সাহায্য করিবেন। জাতিসঙ্ঘ ইহাও বলেন যে ইহুদিরাজ্য স্থাপন করিয়া আরবগণকে উদ্বাস্তু করা তাঁহাদের উদ্দেশ্য নয়, তবে ইহুদি-আরবজাতি সম্মেলনে এক নূতন স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করাই তাহাদের অভিপ্রায়। এই নব-প্রতিষ্ঠিত রাজ্যে আরব ও ইহুদিগণ জাতি-নির্ব্বিশেষে সমান অধিকার ভোগ করিবে।

ইহুদিগণ সাধারণতঃ ব্যবসায়ী। প্যালেষ্টাইনে বসবাস করিতে যাইয়া দেখিল যে মাটীর সহিত সংস্পর্শ না রাখিতে পারিলে সেখানে শিকড় গাড়িয়া বাস করা তাহাদের পক্ষে অসম্ভব। এইজন্য ইহুদি পরিবার স্বেচ্ছায় কৃষকবৃত্তি অবলম্বন করিয়া মাটীর সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন করিতে থাকেন। ইহুদিগণের আগমনের সহিত ক্রমশঃ দেশের আর্থিক উন্নতি ঘটিতে থাকে। ব্যাঙ্ক, কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটী সমূহ স্থাপিত হইতে থাকে। আরব দেশের অন্যান্য প্রদেশে যেমন অর্থ-কৃচ্ছ্রতা দেখা দেয়, এখানে সেইরূপ আর্থিক স্বচ্ছলতা উপস্থিত হয়। বাসিন্দা আরবগণ সাধারণতঃ দরিদ্রই ছিল। তুর্কীর অধীনে তাহারা সামান্য উপায়ে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিত। দেশ মধ্যে অর্থের বন্যা বহিয়া যাওয়ায়, তাহাদেরও আর্থিক উন্নতি ঘটিতে থাকে। সুতরাং ১৯১৭সালের ব্যালফোর প্রস্তাবে যেমন জোর প্রতিবাদ করিয়াছিল, তাহার তীব্রতা ক্রমশঃ হ্রাস হইতে থাকে। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে জিয়োনিষ্ট কংগ্রেসে আরব জাতির অধিকার স্বীকৃত হয়। ইহুদি প্রধানগণ স্পষ্টই বলেন যে আরবদিগের সম্পত্তি হরণ বা তাহাদের ক্ষমতা নাশ করা তাহাদের উদ্দেশ্য নয়, তাহারা শুধু আরবদের পার্শ্বে থাকিয়া একটী স্বাধীন রাজ্য গঠন করিতে চাহে, যাহাতে আরব ও ইহুদিগণ সমান অধিকার ভোগ করিতে পারিবে।

প্যালেষ্টাইনে বৃটীশ ম্যানডেট বেশ সফল হইয়াছিল

১৯২৮ অব্দে আরবজাতির জাতীয় কংগ্রেস হইতে প্যালেষ্টাইনে সাধারণতন্ত্রের জন্য দাবী করা হইলে, বৃটীশ শাসনকর্ত্তা স্যর হার্বার্ট স্যামুয়েল উক্ত প্রস্তাবটী গ্রাহ্য করিয়া লইয়া, আরব-ইহুদীগণের মনোমালিন্য দূর করিবার জন্য নানা সন্তোষজনক পন্থা উদ্ভাবন করেন।

Trans Jordan (ট্রান্স-জোরডান)। নেজ্দ প্রদেশের উত্তরে, বোগদাদ ও হেজাজের মধ্যে অবস্থিত ভূভাগের নাম ট্রান্স-জোড়ডান বা জোড়ডান নদীর অপর তীরস্থ ভূভাগ। জেনেভার জাতীয়সঙ্ঘ এই বিস্তৃত ভূভাগকে একটী স্বাধীন রাজ্য বলিয়া স্বীকার করিয়া, ঐ দেশকে সুসভ্য ও আধুনিক শাসনতন্ত্রে সুনিপুণ করিয়া তুলিবার জন্য ইংরাজগণকে Mandate প্রদান করেন। মহা সমরের অবসান ঘটিলে ফৈসল এখানকার রাজা হন। তাঁহার পতন ঘটিলে ইংরাজগণ এই দেশটী তাহাদের Mandated রাজত্ব বলিয়া দখল করেন। দেশটির লোক সংখ্যা খুবই অল্প, মাত্র দুই লক্ষ বেদুঈন এখানে বাস করে। প্যালেষ্টাইনের ইংরাজশাসক ১৯২২ সালে এই প্রদেশকে একটী স্বতন্ত্র প্রদেশ বলিয়া ঘোষণা করেন। আমার আবদুল্লাকে এই প্রদেশের শাসনকর্ত্তা পদে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। ১৯২৪ সালে ফৈসলের প্রধান মন্ত্রী আলি রিধা পাশা রিকাবীকে প্রধান মন্ত্রীর পদ প্রদান করা হয়। এই স্থানটী ইংরাজের নিকট অত্যন্ত মূল্যবান। কেননা ইহার রাজধানী আম্মান, প্যালেষ্টাইনকে বেদুঈনদের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার একটী বিশেষ কেন্দ্র। বাগদাদ-হাইফা রেলওয়ে এই রাজ্যের মধ্য দিয়া, স্থলপথে ভারতবর্ষে আসিবার একটি নূতন পথ প্রস্তুত করিয়াছে। শূন্যে ভারতবর্ষে আসিতে গেলে এখানে একবার থামিতে হয়। ১৯২৮ সালে ইংরাজজাতির সহিত ট্রান্স জোরডান সরকারের এক সন্ধি হইয়া গিয়াছে, এই সন্ধি অনুযায়ী এখানেও নির্ব্বাচনমূলক শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে।

মেসোপটামিয়া।—টাইগ্রীস ও ইউফ্রেটীজ নদীর মধ্যে অবস্থিত ভূভাগের সাধারণ নাম মেসোপটামিয়া। এই বিস্তৃত ভূভাগ চিরকালই উর্ব্বর। আরবদেশের সহিত উহার কোন সৌসাদৃশ্য নাই। প্রাকৃতিক নিয়ম অনুযায়ী ইহাকে একটি স্বতন্ত্র দেশও বলিতে পারা যায়। প্রাচীন কালের ব্যাবিলোনিয়া বর্ত্তমান মেসোপটামিয়ার দক্ষিণ অংশ, আসেরিয়া উহার উত্তর ভাগ। পুরাতন মিশর দেশের ন্যায় আসেরিয়া ও ব্যাবিলোনিয়া পৃথিবীকে অনেক নূতন তত্ত্ব শিক্ষা প্রদান করিয়াছে। জেনেভার জাতিসঙ্ঘ এই ভূভাগ আরবদেশের সান্নিধ্যে অবস্থিত এবং উহার অধিবাসীরা অধিকাংশই আরবজাতি বলিয়া, তাহাদের ব্যবস্থাপত্রে এই দেশটীকেও আরবদেশের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া ধরা হয়। বহুকাল তুর্কীজাতির অধীন থাকিয়া মেসোপটামিয়া তাহার বিশেষত্ব হারাইয়া ফেলিয়াছিল। কুট-আল-আমরার যুদ্ধের পর ইংরাজ বাহিনী এই দিক দিয়া অগ্রসর হইলে সমস্ত প্রদেশটী ইংরাজজাতির করতলগত হয়। যুদ্ধের অবসান ঘটিলে জাতি-সঙ্ঘ ইংরাজ জাতিকে এই দেশটী শাসন করিয়া সুসভ্য করিয়া তুলিবার Mandate বা বিধি প্রদান করেন। তদবধি এই প্রদেশটী ইংরাজের শাসনাধীনে থাকিয়া শাসিত হইতেছে।

১৯২০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মেসোপটামিয়া সামরিক শাসনাধীনে থাকে। রাজা ফৈসল দামস্কসে স্বাধীন আরব রাজ্য স্থাপন করিবার প্রস্তাব ঘোষণা করিলে মেসোপটামিয়ার অধিবাসীগণের মধ্যে জাতীয় ভাবের উদ্রেক হয়। সিরিয়ায় স্বতন্ত্র স্বাধীন রাজ্য স্থাপিত হইলে, আপনাদিগকে পরাধীনতার বন্ধন হইতে মুক্ত করিবার জন্য এখানেও জোর আন্দোলন চলিতে চলিতে বিদ্রোহানল প্রজ্জলিত হইয়া উঠে। সিয়া ও সুন্নিগণ আপনাদের মধ্যে ধর্ম্মগত পার্থক্য ভুলিয়া ছয়মাস ধরিয়া স্বাধীনতা সমর চালাইয়াছিলেন। ১৯২০ সালে অক্টোবর মাসে ইংরাজ প্রতিনিধি স্যর পারসি কক্স মেসোপটামিয়ায় পদার্পণ করিয়া দেশে শান্তি স্থাপন করেন। বাগদাদের সম্ভ্রান্ত বংশজাত বৃদ্ধ নাকিবকে প্রধান মন্ত্রী পদে নিযুক্ত করিয়া একটী শাসন-যন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিতে অনুরোধ করেন। নাকিবরাই বহু পুরাতন কাল হইতে দেশের সেনাধ্যক্ষ ছিলেন। তুর্কীর শাসনকালেও তাহাদের সম্মান জনক পদবীর কোন হানি হয় নাই।

এই নব-বিধান মেসোপটামিয়ার জাতীয়তাবাদী দলের নেতাগণের মনোপূত হইল না। তাহারা স্পষ্ট

করিয়াই বলেন যে তাহারা সম্পূর্ণ স্বাধীনতা চাহেন। ইংলণ্ডের অনুকরণে একটী Constitutional রাজত্ব স্থাপন করিয়া, জনপ্রিয় নেতা তালিব পাশাকে রাজতক্ত দিতে চাহেন, ইহাই তাহাদের অভিপ্রায় তালিব পাশা আধুনিক শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্রগণ ইংলণ্ডে বিদ্যা অর্জ্জন করিতেছিলেন। ইংরাজ জাতির ঔপনিবেশিক তন্ত্রধার চার্চ্চহিল জনসাধারণের প্রস্তাবে কর্ণপাত না করিয়া তাঁহার প্রিয়পাত্র ফৈসলকে বাগদাদের রাজা করিয়া মেসোপটামিয়ায় প্রতিষ্ঠিত করিবেন সঙ্কল্প করেন। তাঁহার এই উদ্দেশ্য স্যর পারসীকে গোপনে জ্ঞাপন করিলে, স্যর পারসী তালিবকে একটী চা-পার্টিতে নিমন্ত্রণ করিয়া, বন্দী করেন। এই বন্দী অবস্থায় তাঁহাকে সিংহলে প্রেরণ করা হয়। ২৩শে আগষ্ট ১৯২১ সালে প্রকাশ্য দরবারে ফৈলসকে মেসোপটামিয়ার রাজা বলিয়া ঘোষণা করা হয়। এই ব্যবস্থায় জনসাধারণ ভীষণ অসন্তুষ্ট হইয়া উঠে। সিয়া ও সুন্নি উভয় সম্প্রদায় একযোগে সম্মিলিত হইয়া বৃটিশ মানডেট তুলিয়া দিবার জন্য দাবী করিতে থাকে। ইংরাজগণ কঠিন হস্তে শাসনদণ্ড ধারণ করিয়া থাকিলেও, জনসাধারণের অভিমত অগ্রাহ্য করিয়া চলা অসম্ভব জানিয়া, ১০ই অক্টোবর, ১৯২২ খৃষ্টাব্দে মেসোপটামিয়াকে স্বাধীনতা প্রদান করা হইবে ও জেনেভার জাতিসঙ্ঘে এই দেশকে ঢুকাইয়া লওয়া হইবে বলিয়া আশা প্রদান করিয়া এই অসন্তোষ বহ্নি নিবারণ করা হয়। এই সর্ত্ত অনুযায়ী মেসোপটামিয়া দ্রুত উন্নতি করিতেছে, ১৯৩২ সালে তাহার Mandateএর মেয়াদ ফুরাইবে।

মধ্য-আরব ও ইব্‌নে সাউদ—মধ্য-আরবে বে-দুঈন আরবদিগের দুইটী রাজত্ব ছিল, রিজাজ ও জেবেল সামার। ওয়াহিবী নেতা ইব্‌নে সাউদ নিজ বাহু ও বুদ্ধি বলে আরবের বিভিন্ন জাতিগুলিকে একত্রিত করিয়া তাঁহার পতাকা তলে দণ্ডায়মান করান। জেবেল সামারকে নষ্ট করিতে না পারিলে তাঁহার ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণ অন্ধকারময় জানিয়া বিপুল বিক্রমে এই রাজ্যটী আক্রমণ করিয়া ধ্বংস করেন। এই রাজ্যের রাজ-পরিবারকে রক্ষা করিয়া বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হ'ন। সুতরাং বংশগত শত্রুকে মিত্র ও আত্মীয়ে পরিণত করিয়া মধ্য-আরবে একটী প্রবল আরব রাজত্ব স্থাপন করেন।

মহাযুদ্ধের অবসানের পর তাঁহার রাজ্যের উত্তর ভাগে হেজাজের সেরিফের পুত্র আবদাল্লাকে ট্রান্স জোরডান প্রদেশে প্রদান করা হয় ও তাহারই আর এক ভ্রাতাকে তাঁহার রাজ্যের দক্ষিণে মেসোপটামিয়ায় রাজা করিয়া তক্তে বসান হয়, ইব্‌নে সাউদ খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহা লক্ষ্য করিতেছিলেন। হোসেন তাঁহার চিরশত্রু। হোসেনের পুত্রগণ তাঁহার রাজ্যের সীমানায় রাজ্য পাইয়া রাজ-তক্ত স্থাপন করিলে তিনি খানিকটা বিব্রত হইয়া পড়েন। ইংরাজ রাজনৈতিকগণ ইব্‌নে সাউদকে বিশেষ ভয়ই করিতেন। তাঁহাকে দমন করা অনেক সময় সম্ভব নয় এবং উহা কার্য্যে পরিণত গেলে বিশেষ বলক্ষয় করিতে হইবে জানিয়া, বাৎসরিক ৬০,০০০ পাউণ্ড করিয়া তনখা প্রদান করিতে স্বীকৃত হ'ন। এই বাৎসরিক চৌথ ব্যতীত বৃটিশ সরকার ইব্‌নে সাউদকে ৩৫,০০০ রাইফল ও প্রদান করেন। ইব্‌নে সাউদ ইংরাজের এই দান গ্রহণ করেন সত্য, কিন্তু তাঁহার উচ্চাশা ইহাতে নিবৃত্তি হয় না। প্যালেষ্টাইন ও ট্রান্স জোরডান হইতে মেসোপটামিয়ায় যাইতে হইলে, তাঁহার রাজ্যের মধ্য দিয়াই যাইতে হয়। তাঁহার রাজত্ব পশ্চিমে লোহিত সাগর ও পূর্ব্বে পারস্য উপসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। চতুর্দ্দিকে শত্রুগণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া ইব্‌নে সাউদ স্থির করেন হেজাজ দখল করিয়া সমস্ত নেজ প্রদেশের রাজা বলিয়া আপনাকে ঘোষণা করিতে পারিলেই সমগ্র আরবদেশ তাঁহার করতলগত হইতে পারিবে। হোসেন তাঁহার চিরশত্রু। ইতিপূর্ব্বে ১৯১৯ সালে হোসেনের সহিত তাহার সংঘর্ষ উপাস্থত হইলে তিনি হোসেনকে বিশেষ ভাবেই পরাস্ত করিয়াছিলেন। ১৯২৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে, ওয়াহিবীগণ হেজাজ-সীমানা অতিক্রম করিয়া উক্ত রাজত্ব আক্রমণ করে। ৯ই নভেম্বর তাইফ নগর দখল করে। ক্রমশঃ মক্কা, মদিনাও তাহাদের করতলগত হয়। ১৯২৬ সালে ইবনে সাউদ আপনাকে হেজাজের রাজা বলিয়া ঘোষণা করেন। ১৯২৭ সালে নেজের রাজা এই উপাধিও গ্রহণ করেন। ঐ সনে

বৃটিশ সরকার ইবনে সাউদকে নেজ্দ ও হেজাজের স্বাধীন ভূপতি বলিয়া স্বীকার করবেন।

গত শতাব্দীতে ইবনে সাউদের পূর্ব্বপুরুষ মক্কা মদিনা জয় করিয়া নগর দুইটির উপর অকথিত অত্যাচার করিয়াছিলেন। বিংশ শতাব্দীতে ওয়াহিবীগণ ধর্ম্মমত সম্বন্ধে একটু উদার হওয়ায়, ইবনে সাউদ মক্কা ও মদিনায় কোনরূপ অত্যাচার করেন নাই। স্বয়ং একজন ভক্ত এই হিসাবে কাবা মসজিদে প্রবেশ করিয়া নামাজ করেন। হোরেশ বংশধরদিগের সহিত সখ্যভাব স্থাপন করিয়া বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হ'ন। সুতরাং পুরাতন মনোমালিন্য একেবারেই দূরীভূত হইয়া যায়।

আরবদেশে জাতীয়তা আন্দোলন অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক পশ্চাতে পড়িয়া আছে ইহা সত্য। সমগ্র তুরস্ক যেমন কামালপাশার নেতৃত্বে বা সমগ্র মিশর যেমন জগলুল পাশার সাধনায় এক একটী বিরাট জাতিতে পরিণত হইয়াছে, আরবদেশে এক মধ্য আরবে ইবনে সাউদের অধীনতায় খানিকটা সেইরূপ আকার ধারণ করিয়াছে। উহার অন্যান্য প্রদেশে স্বাধীনতা অর্জ্জন করিবার দারুণ স্পৃহা বেশ তীব্রভাবেই বিদ্যমান রহিয়াছে। সুদূর ভবিষ্যতে এই আরবদেশে একটি ফেডারল গভর্ণমেণ্ট স্থাপিত হইবে বলিয়াই আশা করা যায়। ইবনে সাউদ ব্যক্তিগত হিসাবে খুব প্রবল হইয়া উঠিলেও, তাঁহার দ্বারা সমগ্র আরব দেশটী জয় করা কখনই সম্ভবপর হইবে না। তাঁহার মৃত্যু ঘটিলে মধ্য-আরব যদি বেশ সুশিক্ষিত ও সুসভ্য হইয়া না উঠে তবে আবার পূর্ব্বেকার অসভ্য অবস্থায় ফিরিয়া যাইতে পারে। তবে এইটুকু আশা করা যায় যে বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক যুগের আবহাওয়ায় যে জাতি একবার জাগিয়াছে, অজ্ঞতার সূচিভেদ্য অন্ধকার সেই জাতিকে আর কখনই গ্রাস করিতে পারিবে না।

পারশ্য দেশ।—প্রথম স্তর—পারশ্যের পুরাতন নাম ইরাণ। ইহা একটী প্রাচীন দেশ। ইহার সভ্যতাও বহু পুরাতন। আরবের মুসলমানগণ প্রবল হইয়া ইরাণ দখল করিলে, ইরাণের সভ্যতার নিকট তাহাদিগকে শির নত করিতে হয়। ইরাণ আরবীয় ভাবধারায় শিক্ষিত হইয়া মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে, কায়মনোবাক্যে আপনাদের বিশেষত্ব রক্ষা করে। পারশ্যভাষা আরবীভাষার প্রতিদ্বন্দ্বী রহিয়া যায়। সিয়া মতকে সৃজন করিয়া পারশ্য আরব হইতে 'ধর্ম্মমতে অনেকটা পৃথক হইয়া পড়ে। তাহার পর তাহার কবিতা ও সুফিজম্ অনেকটা বেদান্ত দর্শন রচনা করে। পশ্চিমের যুগান্তর আনয়নকারী হাওয়া উনবিংশ শতাব্দীতে প্রবল ভাবে বহিতে থাকিলে উহার একটী ঘূর্ণাবর্ত্ত পারশ্য দেশেও প্রবেশ করে।

আব্বাস মীর্জ্জা তাব্রিজের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তিনি ফরাসী ও ইংরাজ শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া স্বদেশবাসীকে বিজ্ঞান ও পাশ্চাত্য ভাবধারা শিক্ষা দিতে থাকেন। তিনি কয়েকজন যুবককেও ইউরোপ ও আমেরিকায় শিক্ষা গ্রহণ করিবার জন্য প্রেরণ করেন। তিনিই পারশ্যদেশে প্রথম মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করেন, এবং নেপলিয়ন, পিটার দি গ্রেট, আলেকজাণ্ডার দি গ্রেট প্রভৃতি ইউরোপীয় বীর পুরুষগণের জীবনী পারশ্য ভাষায় অনুবাদিত করিয়া প্রকাশ করেন। পারশ্য সম্রাট নাসির উদ্দিনের প্রধান সচিব মীর্জ্জা তাগী খাঁন, ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে ইরাণ নামক প্রথম সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠা করেন।

এই সময়ে বাবীজম পারশ্য দেশে স্বাধীন চিন্তার পথ অনেকটা উন্মুক্ত করিয়া দেয়। সম্রাট এই আন্দোলন দমন করিবার জন্য আন্দোলনকারীগণকে দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করেন। তাহার পর যথেচ্ছচার শাসন প্রবর্ত্তিত হয়। সম্রাট ও ধর্ম্ম-পুরোহিতগণ আপনাদের খেয়াল ও সুখ-সুবিধার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া দেশটীকে শাসন করিতে থাকেন। এই প্রকার শাসন প্রণালীতে অভিজাতগণই বিশেষ সুখ-সুবিধার অধিকারী হ'ন। দরিদ্র প্রজাগণের স্কন্ধে তাবৎ ব্যয় ভার অর্পিত হওয়ায় তাহারা অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়ে। সম্রাট ইউরোপ ভ্রমণ করিতে বহির্গত হইলে, রাজকোষে অর্থাভাব ঘটে। এই অর্থাভাব দূর করিবার জন্য বৈদেশিকগণের নিকট ঋণগ্রহণ করিয়া নানা প্রকার অধিকার তাহাদিগকে প্রদান করা হয়।

প্রাচীন পারশ্যে বর্ত্তমান যুগের আবহাওয়া আনয়ন করিবার জন্য দুইজন প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন, জামালউদ্দিন ও মালকোম খাঁন। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে

সম্রাট নাসিরউদ্দিন জামাল উদ্দিনকে রাজধানী তেহরাণে আহ্বান করিয়া আনেন। জামাল দুই বৎসর পারস্যে বাস করিতে পাইয়াছিলেন। এই অল্পসময়ের মধ্যেই তিনি পারস্যে নূতন ভাব ধারার বন্যা বহাইয়া দিলে সম্রাট সনাতনী প্রথার ধ্বংস সাধন হইলে তাঁহার সার্ব্বভৌম ক্ষমতার হ্রাস ঘটিবে এই আশঙ্কায় তাঁহাকে দেশ হইতে নির্ব্বাসন করেন।

মালকোম খাঁন ইস্পাহান বাসী একজন আর্ম্মেনিয়ান। প্রথম জীবনে তিনি তেহারণে শিক্ষকতা করিতেন, তাহার পর লণ্ডনে পারস্যের রাজদূত হ'ন। ইংলণ্ডে অবস্থান কালীন পাশ্চাত্য সভ্যতার মধ্যে বাস করিয়া পারস্যকে স্বাধীন জাতিগুলির মধ্যে একটী উন্নতশির জাতিতে পরিণত করিবার জন্য সাহকে কতকগুলি শাসন সংস্কার সম্পাদন করিবার জন্য প্রস্তাব করেন। সাহ তাঁহার সদুপদেশ গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলে তিনি পদত্যাগ করিয়া লণ্ডন হইতে 'কানুন' নাম দিয়া পারস্য ভাষায় একখানি সংবাদপত্র বাহির করেন ও সংবাদপত্রখানি পারস্য দেশে গুপ্তভাবে প্রচার করিবার ব্যবস্থা করেন। এই পত্রিকায় তিনি পারস্যদেশের রাজতন্ত্রকে আক্রমণ করিয়া নির্দ্দয়ভাবে উহার সমালোচনা করিতে থাকেন। উক্ত পত্রিকার একটি বিশিষ্ট সংখ্যায় তিনি বলেন যে, "হজরত মহম্মদের আবির্ভাবের সহিত ধর্ম্মপ্রচারকগণের আবির্ভূত হওয়া শেষ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তাঁহাদের বাণী প্রত্যেক জাতির অন্তরে স্বাধীন হইবার আকাঙ্ক্ষায় পরিণত হইয়াছে। ধর্ম্মের বেষ্টনী মানবকে ক্ষুদ্র ও হীনমনা করে। ধর্ম্ম প্রচারকগণের উত্তেজক বাণী প্রত্যেক মানবকে উন্নত হইয়া স্বাধীনভাবে পৃথিবীতে চলা ফেরা করিতে শিক্ষা দিতেছে। যে লোক টেলিগ্রাফ, টেলিফোন প্রস্তুত করিয়াছে, সনাতনী ধর্ম্মে তাহাদের কোন উচ্চ আসন না থাকিলেও, অর্দ্ধ নগ্ন ফকির বা দরবেশ অপেক্ষা তাহারা কোন অংশে হীন?" কানুন পত্রিকার সাহায্যে মালকোম খাঁ বর্ত্তমান যুগের অনেক বাণী তাঁহার দেশবাসীকে শ্রবণ করান।

ক্রমশঃ ধর্ম্মজীবি পুরোহিতগণের মধ্যে আত্ম-চেতনা উপস্থিত হয়। হাজি-সেখ হাদি নাজিম আবাদি নামক একজন মুজতাহিদ বা পুরোহিত, প্রচার করেন যে সকল ধর্ম্মেই সার সত্য আছে। কোন ধর্ম্মই সকল সত্যের একচেটিয়া ভাবে অধিকারী নহেন। তিনি প্রত্যহ সন্ধ্যাবেলা তাঁহার গৃহের বহির্ভাগে বসিয়া থাকিতেন। তথায় নানা ধর্ম্মাবলম্বী লোকের সমাবেশ হইত। সকলেই তাঁহাকে নানাপ্রকার প্রশ্ন করিতেন। তিনি দ্বিধাহীন ভাবে তাঁহাদের সকলের প্রশ্নগুলির উত্তর প্রদান করিতেন। তাঁহার নিকট ধনী বা দরিদ্র বলিয়া কোন পার্থক্য ছিল না। তিনি তাঁহার পুত্র ও আত্মীয় স্বজনকে কঠোর পরিশ্রম করিয়া জীবিকা উপার্জ্জন করিবার জন্য উপদেশ প্রদান করিতেন। এইরূপে নবীন পারস্য সম্প্রদায় সংগঠিত হইয়া উঠিলে, স্বেচ্ছাচারী সম্রাট নাসির-উদ্দিন তাহাদেরই একজন কর্ত্তৃক একদিন নিহত হ'ন।

নাসীর উদ্দিনের মৃত্যুর পর মুজাফর উদ্দিন রাজ তক্তে আরোহণ করেন। তিনি অত্যন্ত দুর্ব্বল প্রকৃতি ছিলেন, তাঁহার কোন ব্যক্তিত্ব ছিল না। তাঁহার আমলে রাজ্যের বিশেষ অধিকারগুলি বিদেশী বণিকগণকে বিক্রয় করা খুব প্রবলভাবেই চলিতে থাকে। এই সময়ে মাত্র ৬৫০,০০০ পাউণ্ড মুদ্রা গ্রহণ করিয়া পারস্য সরকার দেশমধ্যে তামাক বিক্রয় করিবার তাবৎ অধিকার একটী বিদেশী বণিক সম্প্রদায়কে প্রদান করেন। ইহাতে তামাকের মূল্য অসম্ভবরূপে বৃদ্ধি পাইলে, জনসাধারণ ধর্ম্মঘট করা সুরু করিয়া দেয়। মজঃফর উদ্দীন অবশেষে বিশেষ বিব্রত হইয়া অন্যত্র হইতে উক্ত অর্থ কর্জ্জ লইয়া কোম্পানীকে ফেরৎ দিয়া উহাদের একচেটিয়া অধিকার রহিত করিয়া দিতে বাধ্য হ'ন। এই আন্দোলনে সফলকাম হয়া পারস্যের জনসাধারণ আত্মশক্তিতে বিশ্বাসী হইয়া উঠে।

পারস্যে আত্ম-শাসন—পারস্যের দুর্ব্বলতা লক্ষ্য করিয়া উত্তরে রুশজাতি এবং দক্ষিণে ইংরাজ-জাতি ক্রমশঃ আত্মাধিকার বিস্তার করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। উত্তর ও পশ্চিম পারস্যে রেলপথ নির্ম্মাণ করিবার অধিকার রুশ-জাতি একচেটিয়াভাবে লাভ করেন। ইংরাজগণ পূর্ব্ব ও দক্ষিণ অঞ্চলে আপনাদের আধিপত্য বিস্তার করিতে ব্যস্ত হইয়া উঠেন। বর্ত্ত

কার্জ্জন ইংরাজ প্রাধান্য স্থাপন করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও সফলকাম হইতে পারিলেন না। তাহার কারণ রুষ-জাতি পারস্যের সনাতনীদের সহিত মিশিয়া তাহাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত রাখিবার চেষ্টাই করিতেন। পারস্যের অভিজাতগণ রাশিয়ার নিকট অনবরত কর্জ্জ করিয়া একেবারে রাশিয়ার অধীন হইয়া পড়ে। রাশিয়ার ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রের তাবৎ খরচের অর্থ পূর্ব্বাহ্নে দিয়া উহার রাজস্ব হইতে ঐ টাকা আদায় করিয়া লইত। ইংরাজগণ উন্নতিশীল পারস্য নেতাগণের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়াছিলেন। এই সমস্ত নেতাগণের অনেকেই ইংলণ্ডে শিক্ষাপ্রাপ্ত হওয়ায় তাঁহাদের সকলেরই বৃটীশ প্রীতি প্রবল ছিল। নূতন দল সংখ্যায় অল্প হইলেও ক্রমশঃ প্রবল হইয়া উঠিতে থাকে।

১৯০৬ সালে রাশিয়ায় বিদ্রোহ সংঘটিত হইলে, উহার আংশিক ফল পারস্যেও প্রকাশ পায়। নবীন নেতাগণ পারস্যের পুরাতন প্রথানুযায়ী তেহরাণের নিকটবর্ত্তী একটী স্থানে একত্রিত হইয়া তাহাদের কতকগুলি দাবী পূরণ না করিলে তাহারা আর রাজধানীতে ফিরিয়া যাইবে না বলিয়া সরকার পক্ষকে জানান। এই স্থানান্তর গমন করার নাম 'ব্যস্ত'। এইখানে নেতাগণ বাস করিলে সরকার পক্ষ তাঁহাদিগকে গ্রেপ্তার বা কোনরূপ দণ্ড প্রদান করিতে পারিতেন না। সরকার পক্ষ প্রথমে রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিলেও অবশেষে জনসাধারণের দাবী মানিয়া লইতে হয়। ১৯শে আগষ্ট মজলিস-ই-মিলি (Megliss-i-milli) বা জাতীয় মহাসভা স্থাপন করা হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হয়। এই মজলিসে ১৬০ জন প্রতিনিধি থাকিবেন। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে ৭ই অক্টোবর পারস্যে প্রথম জাতীয় মহাসভা বা পার্লামেণ্টের প্রথম অধিবেশন বসে। সরকার পক্ষ এই মহাসভায় সরকারী ঋণের প্রস্তাব উত্থাপন করিলে, প্রতিনিধিগণ এই ঋণ প্রদান করিতে অস্বীকার করেন। এই মহাসভা সম্রাটের অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁহাকে স্বীকার করাইয়া লয় যে তিনি এখন হইতে এই মজলিসের পরামর্শ অনুযায়ী দেশ শাসন করিবেন, কোন প্রজাকে বিনা কারণে শুধু তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী কারারুদ্ধ করিতে পারিবেন না, আর জাতীয় মহাসভা সরকারী বজেট প্রস্তুত করিবেন। সম্রাটের পারিবারিক খরচার সহিত সরকারী বজেটের কোন সংস্পর্শ থাকিবে না স্থিরীকৃত হয়।

সম্রাট ও তাঁহার অনুচরগণ পারস্যে জাতীয়ভাব জাগরিত হইলে আপনাদের ক্ষমতার হ্রাস ঘটিবে বলিয়া বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়েন। এই সময়ে সম্রাট মুজাফর হোসেনের মৃত্যু হইলে, মহম্মদ আলি পারস্যের সাহ বা সম্রাট উপাধি ধারণ করিয়া উহার তক্তে উপবেশন করেন। দৌলত বা কোর্ট পার্টি নূতন সম্রাটকে হস্তগত করিয়া রাশিয়ার সাহায্যে পাল্টা-বিদ্রোহ করিয়া জাতীয় মহাসভাকে ধ্বংস করিবার স্বপ্ন দেখিতে থাকেন। পারস্যের বিভিন্ন প্রদেশের শাসনকর্ত্তাগণকে ইস্তিব-ডাডিস (Istibdadis) বলিয়া অভিহিত করা হইত। তেহারণের কেন্দ্রীয় শাসনতন্ত্রে জনসাধারণের কর্ত্তৃত্ব স্থাপিত হইলে তাহাদের সমূহ স্বার্থহানি বলিয়া অতিশয় ভীত হইয়া উঠে এই ইসতিবডাডিসগণ তাঁহাদের আত্মীয় স্বজনকে আপনাদের খেয়াল অনুযায়ী পেন্‌সন বা মাসিক অর্থ সাহায্য করিতেন। এই সমস্ত মাসহারা গ্রহণকারীগণ রাষ্ট্রকে কোনরূপ কার্য্য দ্বারাই সাহায্য করিতেন না। পারসিক অভিজাতগণ কোনরূপ কর প্রদান করিতেন না। প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাগণ সংগৃহীত রাজস্ব হইতে আপনাদের বিলাস-ব্যসনের জন্য যথেষ্ট অর্থ সংগ্রহ করিয়া লইত। রাশিয়াও পারস্যের এই জাতীয় অভ্যুত্থান ঘটিলে তাহাদের স্বার্থের সম্পূর্ণ হানি হইবে বলিয়া শিহরিয়া উঠে। রাশিয়ার অভিজাতগণ পারস্যের অভিজাতগণকে লোক বল, অর্থ বল, ইত্যাদি দিয়া বিধি-মতে সাহায্য করিবেন বলিয়া উত্তেজিত করিতে থাকেন।

পারস্যের প্রথম জাতীয় মহাসভায় তিনটী রাজনৈতিক দলের আবির্ভাব হয়। উত্তর-পশ্চিম পারস্যের প্রতিনিধি-গণ সকলেই ইউরোপীয় আচার-ব্যবহারে অভ্যস্ত ও ইউরোপীয় ভাবাপন্ন হইয়াছিলেন। তাঁহারা পারস্যকে ইউরোপের আদর্শে নূতন করিয়া গঠন করিতে চাহিতেন। জাতীয় দল, পারস্যের জাতীয় ধর্ম্ম ও আচার-ব্যবহার রক্ষা করিয়া দেশের উন্নতি করিতে চাহিতেন। দৌলত দল বা কোর্ট পার্টি কোনরূপে আর একটী পাল্টা

বিদ্রোহের দ্বারা সকল প্রকার শাসন-সংস্কার দেশমধ্যে প্রচার হওয়া রহিত করিতে চাহিতেন। এই তিনটী দলের পশ্চাতে জনমত গঠন করিবার জন্য প্রত্যেক দলের নিজস্ব সংবাদ পত্র ছিল। সংবাদপত্রের সম্পাদকগণ আপনাদের দলগুলির পুষ্টি সাধনতা করিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তখন পারস্যের জনসাধারণ মূর্খ ছিল বলিলে অত্যুক্তি করা হয় না। সাধারণ ভাষা ব্যতীত অন্য কোন ভাষায় লিখিত সংবাদপত্র তাহারা বুঝিতে পারিবে না বলিয়া খুব সাধারণ ভাষায় সংবাদ গুলি লিপিবদ্ধ হইয়া তাহাদের মধ্যে প্রচারিত হইতে থাকে। কাফি-খানাগুলি এক একটী দলের রাজনৈতিক আড্ডা ছিল। এই সমস্ত কাফিখানায় পেশাদার রীডার বা পাঠকগণ অজ্ঞ জনসাধারণকে সংবাদগুলি পাঠ করিয়া ও প্রয়োজন মত ব্যাখ্যা করিয়া শুনাইত। অনেকে একত্রিত হইয়া ভাটমুখে সাহনামার গল্প শুনা পারশ্যজাতির অস্থিমজ্জাগত ছিল। সময়ের পরিবর্ত্তনের সহিত এই ব্যবস্থাকে রূপান্তরিত করিয়া পারস্যের নেতাগণ জনমত আপনাদের অনুকূলে শিক্ষিত করিবার উপযুক্ত উপায় নির্দ্ধারণ করেন। সংবাদ পত্র, উহার পাঠক ও নানাপ্রকার প্রচারক পাঠাইয়া মফঃস্বলেও একটী বিশেষ রাজনৈতিকদল গঠিত হইয়া উঠিতে লাগিল। পারস্যের ইস্তিবডাডিস্ বা প্রাদেশিক শাসন কর্ত্তাগণ দৌলৎদল বা কোর্ট-পাটিকে সাহায্য করিবার জন্য এই সমস্ত কাফি-আড্ডাগুলি ভাঙ্গিয়া দিতে চেষ্টা করিলে বিদ্রোহের বহ্নি ক্রমশঃ রাজধানী হইতে প্রদেশ সমূহেও ছড়াইয়া পড়িতে থাকে।

জন সাধারণের এইরূপ উত্তেজিত অবস্থায়, ইংরাজ রাশিয়ার ভাগ-বাটোয়ারার কথা দেশমধ্যে প্রচারিত হইয়া পড়ে। ১৯০৭ সালে ইংরাজ সরকার রাশিয়ার জারের সহিত একমত হইয়া পারস্যের উত্তর ভাগ রাশিয়া সরকারের অধীন বলিয়া স্বীকার করিয়া ল'ন। রাশিয়াও পারস্যের পূর্ব্বপ্রান্ত ইংরাজ সরকারের Sphere of influence বা আয়ত্তাধীন বলিয়া স্বীকার করেন। মাত্র পশ্চিম পারশ্য নিরপেক্ষ প্রদেশ থাকিবে বলিয়া রাশিয়া ও ইংরাজ আপনাদের মধ্যে ঠিক করিয়া ল'ন। এই সংবাদ প্রচারিত হইলে পারস্যের মজলিস-এ-মিলি বা জাতীয় মহাসভা এই ব্যবস্থার ঘোরতর প্রতিবাদ করিবার জন্য সম্রাটকে অনুরোধ করেন। সম্রাট বাহ্যতঃ কোন প্রকার চেষ্টা না দেখাইলে, জাতীয় মহাসভার সহিত সম্রাটের কলহভাব দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া, উহা বিদ্রোহের আকার ধারণ করে। সম্রাট অনেকটা ভীত হইয়া মহাসভার নায়ক ও প্রধান মন্ত্রী নাসির-উল-মুলককে গ্রেপ্তার করেন। নাসির-উল-মলক্ কোনরূপে মুক্তি লাভ করিয়া পলায়ন করিলেই চতুর্দ্দিকে বিদ্রোহ-বহ্নি জ্বলিয়া উঠে।

সম্রাট রাশিয়ার সাহায্য চাহিয়া পাঠাইলেই, রাশিয়া হইতে সৈন্যদল আসিয়া উপস্থিত হয়। তেহারাণ ও তাহার নিকটবর্ত্তী স্থান সম্রাটের অধীন থাকিলেও পারস্যের প্রদেশ গুলিতে জাতীয়দলের আধিপত্যই স্থাপিত হইয়া যায়। সম্রাট কঠোর হস্তে সমস্ত সংবাদপত্র ও আঞ্জুমান নামক গুপ্ত রাজনৈতিক দলগুলিকে দমন করিতে লাগিলেন। মোল্লাগণকে হস্তগত করিয়া রাজধানীর অজ্ঞ জনসাধারণকে জাতীয় মহাসভার বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত করিয়া তুলেন। এই ক্ষিপ্ত জনতাই একদিন উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া পারস্যের জাতীয় মহাসভার অধিবেশন গৃহটী পুড়াইয়া নষ্ট করিয়া দেয়। এই সময়ে তুরস্ক-বিদ্রোহের কথা আসিয়া পড়িলে পারস্যের আঞ্জুমান দলগুলি আরও জোর আন্দোলন চালাইয়া সমগ্র জনসাধারণকেই জাতীয় মহাসভার দলভুক্ত করিয়া তুলিলে সম্রাট হতাশ হইয়া পড়েন। ১৩ই জুলাই ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে জাতীয় দল তেহরাণ অবরোধ করিয়া উহা পুনরুদ্ধার করেন। তাহার পর জাতীয় দল সম্রাট মহম্মদ আলিকে নির্ব্বাসন করিয়া তাঁহার স্থলে আহমদ নামক একটী এগার বৎসর বয়স্ক বালককে পারস্যের রাজতক্তে বসাইয়া দেন। পরাজিত ও লাঞ্ছিত সম্রাট দেশ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলে, জাতীয় মহাসভা তাঁহার ভরণপোষণের জন্য একটী বৃত্তি নির্দ্ধারণ করিয়া দেন। জাতীয়দল স্বাধীনতাসমরে অসাধারণ সফলতা লাভ করিয়া খুব ধৈর্য্য সহকারেই শাসনদণ্ড গ্রহণ করেন। সংবাদপত্রসমূহ স্বাধীনতা লাভ করিয়া বেশ ধৈর্য্যের সহিতই তাহাদের মতামত প্রকাশ করিতে থাকে। এইখানে জাতীয়তার উন্মেষের প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত হয়।

পারস্যের উন্নতিশীল (progressive Party) দলের

নেতা নাসীর-উল-মুলুককে রিজেণ্ট (Regent) পদ প্রদান করা হয়। নাসীর ইংরাজী শিক্ষা দীক্ষায় সুশিক্ষিত হইয়াছিলেন। তিনি কিছুদিন অক্সফোর্ড বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। ইউরোপীয় আদর্শ ও ভাবধারার পূর্ণ প্রতীক ছিলেন ইনি। রাজ্যের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া নাসীর জাতীয় মহাসভার অধিবেশন গৃহটী নূতন করিয়া নির্ম্মাণ করান। সভ্যদের বসিবার স্থানগুলি ইউরোপীয় কায়দায় অর্দ্ধ বৃত্তাকারে সাজান হয়। পারস্থে আর একটী রাজনৈতিক দল তখন প্রবল হইয়া উঠিতেছিল। ইহারা আপনাদিগকে সাধারণ তন্ত্র বাদী বলিতেন। তাঁহারা পারস্থের সনাতনী ধর্ম্ম ও আচার ব্যবহার রক্ষা করিয়া যতটা উন্নতি সম্ভব তাহার জন্যই যত্নশীল ছিল। উন্নতিশীল দলের নেতাগণের সহিত তাহাদের মতভেদ ও মনান্তর প্রায় ঘটিত। নাসীর-উল-মুলুকের ব্যবস্থাফলে উভয়দলের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছেদ ঘটিবার কোন সুযোগ উপস্থিত হইতে পারিত না। নাসীর অন্যদিকে খুব দুর্ব্বল ছিলেন। পারস্থের ন্যায় বিরাট রাষ্ট্রের প্রধান কর্ণধার হইয়া তিনি দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্য একদল জাতীয় সৈন্য গঠন করিতে অক্ষম হ'ন। এই দুর্ব্বলতা খানিকটা অনুভব করিয়াই রাশিয়া তাহার বাহিনী পারস্থে আনয়ন করিয়া খুব দৃঢ়তার সহিত উত্তরাঞ্চল করায়ত্ত করিয়া অবস্থান করিতে লাগিল। রাজকোষে অর্থাভাব পারশ্য-সাম্রাজ্যের পতনের আর একটী কারণ। এই অর্থ কৃচ্ছতা দূরীকরণ মানসেই পারশ্যের বর্ত্তমান কর্ণধারগণ মরগান সুষ্টার (Morgan Shuster) নামক একজন আমেরিকানকে আনয়ন করিয়া তাহাকে পারশ্যের রাজস্ব সচিব পদে নিযুক্ত করেন। এই ব্যবস্থার ফলে পারশ্যের অর্থ কৃচ্ছতা দূর হইতে পারে এই আশঙ্কায় রাশিয়া যে সমস্ত অভিজাতগণ কোনরূপ করই প্রদান করিতেন না তাহাদের পক্ষ অবলম্বন করিয়া দেশমধ্যে এক মহা অশান্তি সৃজন করেন। গোলমাল ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইলে রাশিয়া সরকার সুষ্টারকে তাড়াইয়া দিবার জন্য পারশ্য সরকারকে অনুরোধ করেন। এই অনুরোধ রক্ষা করা না হইলে, রাশিয়া হইতে একদল সৈন্য আসিয়া জাতীয় মহাসভার অধিবেশন ভাঙ্গিয়া দেয়। তাহার পর ১৯১২ সাল হইতে ১৯১৪ সাল পর্য্যন্ত পারশ্য একরূপ রাশিয়ারই করতলগত থাকে।

কুচিক খাঁন ও পারশ্যে ইংরাজ প্রাধান্য—১৯১৪ সালে পারস্থে জাতীয় মহাসভার তৃতীয় অধিবেশন বসে। ১৯১৫ সাল পর্য্যন্ত এই অধিবেশন স্থায়ী হইয়াছিল। এই তৃতীয় মহাসভার অধিবেশনে সাধারণতন্ত্রীগণই সংখ্যায় প্রবল হইয়া মজলিসে প্রবেশ করেন। তাহারা সকলে সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। এইজন্য তুরস্কও জার্ম্মাণীর পক্ষ অবলম্বন করিয়া যুদ্ধ চালাইতে মনস্থ করেন। রাশিয়ার বাহিনী উত্তর দিক হইতে আসিয়া সমস্ত উত্তর পূর্ব্ব অংশ করায়ত্ত করিয়া উত্তর-পশ্চিম অংশে জার্ম্মাণ-তুরস্ক সৈন্যের সহিত যুদ্ধে নিযুক্ত হয়। বসরায় পেট্রোল ইত্যাদি লইয়া যাইবার জন্য ইংরাজগণ দক্ষিণ অংশে সৈন্য সন্নিবেশ করিয়া ক্রমশঃ ১১ হাজার রাইফেল ধারী সৈন্য উত্তর দিকে রাশিয়ার সঙ্গে একযোগে কার্য্যের জন্য পাঠান। রাশিয়া যুদ্ধে নিবৃত্ত হইলে, ইংরাজগণ পারস্থ রক্ষার তাবৎ ভার আপনাদের হস্তে গ্রহণ করেন। কুচিক খাঁন নামক একজন পারসিক একদল দস্যু সংগ্রহ করিয়া পারস্থ পারস্থজাতির এই কথা ঘোষণা করেন। ক্রমশঃ এই দলের সহিত ইংরাজদের সংঘর্ষ উপস্থিত হইলে, ইংরাজ প্রতিনিধি স্যর পারশি কক্স ১৯১৯ সালে তেহারণে আসিয়া পারস্থ সরকারকে স্বীকার করাইয়া ল'ন ইংরাজ জাতিই পারস্থ দেশের রক্ষকরূপে পারস্থের শত্রু পক্ষের সহিত যুদ্ধ করিবে এবং পারস্থের সৈন্য ও শাসন ভার ইংরাজ হস্তে অর্পিত হইবে। পারস্থ সরকারের সহিত ইংরাজ জাতির এই ব্যবস্থা হইয়া গেলেও পারস্থের মন্ত্রীসভা এই সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিতে সাহসী হ'ন নাই। 　　ক্রমশঃ

গ্রন্থাগারের কথা

ডাঃ শ্রীগুরুদাস রায়

যে কোন একটী অনুষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণ ভার গ্রহণ করা যে গুরুদায়িত্ব তাহাতে আর কোন সন্দেহই নাই—সেই দায়িত্ব পালনের শক্তি বা অধিকার আমার আছে বলিয়াই যে আমি সভাপতির পদ গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইয়াছি তাহা নহে; গ্রহণ করিয়াছি, কারণ গ্রহণ করার যে গৌরব তাহা আমি অস্বীকার করিতে পারি না। আপনাদের সঙ্ঘের যে উদ্দেশ্য এবং তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য যে অনন্যসাধারণ অধ্যবসায়ের সহিত আপনারা এই প্রতিষ্ঠানকে এত শীঘ্রই গৌরবান্বিত করিতে পারিয়াছেন তজ্জন্য আপনাদের ধন্যবাদ দিলে পাছে আপনাদের নিবিড় নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতাকে ছোট করিয়া ফেলা হয় এই আশঙ্কায় তাহা হইতে বিরত রহিলাম।

গ্রন্থাগারের ইতিহাস ও তাহার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আপনারা আমার নিকট হইতে যাহা জানিতে চাহিয়াছেন তাহা দেশের এই বর্ত্তমান অবস্থায় একেবারেই কার্য্যকরী করা সম্ভব হইয়া উঠিতেছে না এবং আমাদের দেশও ইহাকে অন্তর দিয়া গ্রহণ করিতে পারিতেছে না।

মিশরের গ্রন্থাগার—গ্রন্থাগারের ইতিহাস বহু প্রাচীন—অনেকে মনে করেন যে ইংরাজ শাসনের ফলেই বুঝি আমাদের দেশে গ্রন্থালয়ের সৃষ্টি হইয়াছে। বর্ণমালা আবিষ্কৃত হইবার বহু পূর্ব্বে মানুষ যখন তাহার অন্তরের ভাবকণা কোনরূপে আঁকিয়া দেখাইতে শিখিয়াছে তখন হইতেই গ্রন্থাগারের উৎপত্তি। মিশরের প্রাচীন সভ্যতা ও শিল্পকলার জীবন্ত বিগ্রহ যে পিরামিড তাহা তৈয়ারী হওয়ারও পূর্ব্বে যীশুর জন্মের প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে ঐ মিশরেই পাথরের টালির পাঠাগার এখনও মাটী খুঁড়িয়া বাহির করা হইতেছে—আর সেই সব টালিতে শুধু আছে কতকগুলি ছবি আঁকা। আমেরিকার অধ্যাপক মিঃ হিলব্রেড্ ব্যাবিলনের নিপুর সহরে মাটীর নীচে পঁচিশ হাজার মৃত্তিকা ফলক সমেত একটা বড় গ্রন্থাগারের ধ্বংসাবশেষ বাহির করেন এবং প্রমাণ করেন যে সেটি অন্ততঃ খৃষ্টের জন্মের চার হাজার বছর আগের। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে মিঃ লেয়ার্ড নিনেভা সহরে ৩০।৪০ ফুট খনন করার পর একটী বড় বারান্দায় ত্রিকোণ অক্ষর সমন্বিত কতকগুলি পাথরের টালি পান, এবং পণ্ডিতরা আবিষ্কার করেন যে ইহা এসিরিয়ার রাজা সার্ডানোপলসের পাঠাগার। আর সেই পাঠাগার হইতেই ইস্তার ও ইস্দুবাল নামে একখানি মহাকাব্য ও সুমের ও আকাদ্ নামে দুইটী জাতির অতি প্রাচীন ইতিহাস এবং আরও কত কি আবিষ্কৃত হয়।

গ্রীসের গ্রন্থাগার—তারপর পৃথিবীর ইতিহাসে যবনের দেশ গ্রীসও একদিন শিক্ষা ও সভ্যতার দীপ্ত আলোকে ভাস্বর হইয়া উঠিয়াছিল। দেশের বুকের উপর জ্ঞানের মৃত সঞ্জীবনী সুধা ছিটাইয়া দিয়া সমস্ত জাতিকে শক্তিমান করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু ইহারও ভিত্তি ছিল পাঠাগার। সেই মৌলিক সাহিত্য সৃষ্টির যুগেও ইউক্লিড পিজিস্‌ট্রেটাস্, প্লেটো, আরিষ্টটল প্রভৃতি সকলেরই নিজস্ব পাঠাগার ছিল—এবং সেইখানেই তাঁহারা তাঁহাদের জীবনের সাধনা পরিসমাপ্তি করিয়া গিয়াছেন। ঐ সময়েই গ্রীসে সমালোচনার প্রসার এতদূর বৃদ্ধি পায় যে লুসিয়ানের সময় নানা প্রকারের নূতন নূতন পুস্তকাদি সংগৃহীত হইতে থাকে—এবং শেষে উহা একপ্রকার বিলাসিতা পর্য্যায়ভুক্ত হইয়া পড়ে। এবম্প্রকারে পুস্তক সংগ্রহের ফলে আলেকজান্দ্রিয়ার পাঠাগার সমস্ত পাঠাগারকে অতিক্রম করিয়া উঠিয়াছিল। মহাবীর আলেকজান্দারের সেনাপতি প্রথম টলেমী ঐখানে দুইটী গ্রন্থালয় স্থাপন করেন—একটী ব্রুকিয়ামে এবং আর একটী সেরাপিয়ামে। দ্বিতীয় টলেমী আবার এই পাঠাগার দুইটীতে সর্ব্বসমেত সাত আট লক্ষ পুস্তক সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তৃতীয়

টলেমীর সময় উৎপীড়ন করিয়া পুস্তক সংগ্রহের চেষ্টা হয় এবং সেইজন্য আলেকজান্দ্রিয়ার বন্দরে কোনও জাহাজ পুস্তক লইয়া আসিলেই সেই জাহাজের অধ্যক্ষের নিকট হইতে বল প্রয়োগের দ্বারা সেই সমস্ত পুস্তক হস্তগত করা হইত। শুধু এই ভাবেই পুস্তক সংগ্রহ করিয়া তাহারা নিশ্চিন্ত ছিল না—নানা দেশ দেশান্তর হইতে পণ্ডিত কবি সাহিত্যিক ও লেখক আনিয়া স্ক্রীপটোরিয়মে (নকলখানা) তাহাদের দ্বারা হাজারে হাজারে নানা দেশের বই নকল করা হইত—টীকা টিপ্পনি লেখান হইত—এবং কত নূতন নূতন পুস্তকও রচিত হইত। এতখানি অক্লান্ত চেষ্টা ও পরিশ্রমের ফলে আলেকজান্দ্রিয়ার পাঠাগার যখন সর্ব্বজনবিদিত হইয়া উঠিয়াছিল সেই সময় জুলিয়াস সিজার উদগ্র জয় লালসায় অধীর হইয়া একদিন আলেকজান্দ্রিয়ার সমস্ত নৌবহরে আগুন লাগাইয়া দেন—আর সেই আগুনের লেলিহান শিখার মুখে সমুদ্রের নিকট ঐ বড় পাঠাগারটী ভস্মীভূত হইয়া যায়। সিজরের বন্ধু এণ্টনি ক্ষতি পূরণ স্বরূপ পার্গামাসের একটী প্রকাণ্ড পাঠাগার ক্রকিয়াম পাঠাগারের অন্তর্ভুক্ত করিয়া দেন—কিন্তু খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে অরেলিয়সের আক্রমণের সময় এই পাঠাগারটীও অগ্নিদাহ হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে নাই।

রোমের গ্রন্থাগার :—এইবার রোমের গ্রন্থালয়। রোমীয়েরা ছিল স্বাধীনতার অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত, সমরকুশলী সুদক্ষ বীরের জাত যাহারা রক্তের নেশায় নাচিয়া উঠিয়া শুধু রণ দেবতাকেই জাতির যুগ-গুরু বলিয়া মানিয়া লইয়াছিল—অসি করে রণ প্রাঙ্গণে রক্তের আঁখরে তাহারা জাতির ইতিহাস লেখার প্রথম সূচনা দেখাইয়াছিল—এমন কি কার্থেজ ধ্বংসের সময় পর্য্যন্ত পাশবিকতার প্রবল স্পৃহা তাহাদের প্রাণের পরতে পরতে বিদ্যুতের শিহরণ আনিয়া দিয়া সকলকে রণোন্মাদনায় মাতাইয়া তুলিয়াছিল—তাই এখনও লোক বলে "Greece conquered Rome by spiritual force while Rome conquered Greece by brute force." শিক্ষায় এতখানি অনাসক্তির মধ্যেও তাহাদের দেশেও বহু গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। খৃষ্টের জন্মাইবার প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে ইলিরিয়ান যুদ্ধের পর এসিনিয়াসপলিও এভেনটাইন পাহাড়ের উপরে প্রথম পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করেন তখন হইতে প্রথম শতাব্দীর মধ্যেই রোমে বহু পাঠাগার স্থাপিত হয়। তবে এলপিয়াস ট্রাজানুসের গ্রন্থাগারই সর্ব্বাপেক্ষা সমৃদ্ধিশালী বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল। কনস্টানটাইন যখন বাইজানটীয়াস্ বা কনস্টান্টিনোপলে তাঁহার রাজধানী পরিবর্ত্তিত করেন তখন সেখানেও অনেক সুবৃহৎ পাঠাগার প্রতিষ্ঠিত হয়। তন্মধ্যে একটি গ্রন্থাগারে দুই লক্ষাধিক পুস্তক ছিল। কিন্তু পুনঃ পুনঃ অগ্নিদাহে কনস্টান্টিনোপলে প্রায় ত্রিশটী গ্রন্থালয় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তারপর রোম রাজ্য যখন নষ্ট হইয়া গেল তখন পোপেরাও অনেক পাঠাগার স্থাপন করিয়াছিলেন এবং সাধারণের পাঠের সুবিধা ও সুবন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন।

আরবের গ্রন্থাগার :—আরবীয়েরাও গ্রীকদের মত পুস্তক সংরক্ষণে ও সংগ্রহে সচেষ্ট ছিল—হারুণ-অল্-রশিদও তাঁহার ছেলেদের রাজত্ব সময়ে বাগদাদ্, বসোরা, কার্ডাভা প্রভৃতি নানা স্থানে গ্রন্থালয় স্থাপিত হইয়াছিল—কাইরো সহর বিখ্যাত শিক্ষাকেন্দ্র হইয়া উঠিয়াছিল এবং সেখানকার ফতিমিদ্ বংশীয়দের পাঠাগারে প্রায় দেড় লক্ষ আন্দাজ পুস্তক ও পুঁথি পত্রাদি সংগৃহীত হইয়াছিল। শেষে তুর্কদের দ্বারা বিতাড়িত হওয়ার পরও তাঁহারা আবার নূতন নূতন গ্রন্থালয় পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে আরবদের অধিকারভুক্ত স্পেন রাজ্য ইউরোপের মধ্যে অন্যতম শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হইয়া উঠিয়াছিল—সেখানে অল্ হাকিম নামে একজন আরবীয় পণ্ডিতের চেষ্টায় ও যত্নে কার্ডাভার গ্রন্থালয়ে প্রায় ছয় সাত লক্ষ পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছিল।

ওয়াশিংটনের গ্রন্থালয় :—বর্ত্তমানে আমেরিকার রাজধানী ওয়াশিংটন নগরে একটী নূতন পাঠাগার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে সেখানে এক কোটীরও অধিক পুস্তক রাখার ব্যবস্থা হইয়াছে এবং প্রয়োজন হইলে আরও অধিক সংখ্যক পুস্তক রাখিবার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। সেখানকার গ্রন্থাধ্যক্ষদের পুস্তক সাজান ও তালিকাভুক্ত করায় জন্য

কঠিন পরীক্ষা দিতে হয় এবং তাহাদের সুবিধার জন্য বহুসংখ্যক মাসিক পত্রিকাও প্রকাশিত হয়।

ভারতের গ্রন্থালয় :—অনেকক্ষণ বিদেশের কথা আলোচনার করার পর এইবার আমাদের ভারতবর্ষের কথা আলোচনা করা যাক্। আমাদের ভারতবর্ষ সেই দেশ যেখান হইতে অন্যান্য জাতি শিক্ষা ও সভ্যতার নবমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া ধন্য হইত—সুদূর চীন, জাপান কোরিয়া প্রভৃতি স্থান হইতে পরিব্রাজকেরা আসিয়া এই ভারতের করুণাকণার ভিখারী হইত। যদিও সর্ব্বপ্রথমেই আমাদের দেশে লিপির প্রচলন হয় নাই তথাপি এই ভারতের এক একটী পণ্ডিতের স্মৃতিভাণ্ডারে যেটুকু সযত্নে সংরক্ষিত হইত তাহাই এক একটি গ্রন্থাগারের ফল উৎপাদন করিত—এবং সেই জন্যই সাঙ্গ চতুর্ব্বেদ প্রভৃতি গ্রন্থলিপি প্রচলনের পূর্ব্ববর্ত্তী কালেও ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছিল।

তক্ষশিলা ও নালন্দা আজও ভারতের স্মৃতিতে প্রোজ্জ্বল হইয়া আছে। লিপি প্রচলনের যুগে বৌদ্ধদের চেষ্টার ফলেই ইহারা ভারতের সর্ব্বপ্রধান শিক্ষাকেন্দ্ররূপে পরিগণিত হইয়াছিল।

এই নালন্দাতেই ফা হিয়ান, ইংসিং, ইয়ানসাং প্রভৃতি চৈনিক পরিব্রাজকেরা শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া স্বদেশে ফিরিবার সময় কুড়ি ঘোড়ার পিঠে বোঝাই দিয়া এখানকার বহুসংখ্যক পুঁথিপত্র লইয়া যান এবং সেইগুলি এখন নানা পণ্ডিতের দ্বারা অনূদিত হইয়া ভারতের অতীত গৌরবকাহিনী প্রচার করিতেছে। নালন্দায় রত্নোদধি নামে একটী নয়তলবিশিষ্ট প্রাসাদে এত পুঁথি ছিল যে ভারতের প্রাচীন শিক্ষা ও সভ্যতা সম্বন্ধে অক্ষয়কীর্ত্তি থাকিয়া যাইত। কিন্তু বিশেষ দুঃখের বিষয় যে কতকগুলি বৌদ্ধদ্বেষী সন্ন্যাসী অত বড় গ্রন্থাগারটীকেও অগ্নিসংযোগে নষ্ট করিয়া দেয়।

সিংহলের একটী কাহিনী হইতে আমরা জানিতে পারি যে খৃষ্টের জন্মাইবার অষ্ট-আশী বৎসর পূর্ব্বে বৌদ্ধ এবং জৈন ভিক্ষুরা দেখিলেন যে তাঁহাদের গুরুর উপদেশাবলী হয়ত বা উত্তরকালে লোকে বিস্মৃত হইবে সেইজন্য তাঁহাদের মধ্যেও পুস্তক প্রচারের আকাঙ্ক্ষা উদ্দীপিত হয় এবং তদনুযায়ী ভারতের বহু সমৃদ্ধিশালী লোক বিদ্যোৎসাহের জন্য পুঁথি লিখাইতে আরম্ভ করেন।

তারপর বারানসী, বিক্রমশিলা, জগদ্দলবিহার উদন্তপুরী প্রভৃতি পাঠাগারও বিশ্ববিশ্রুত হইয়া উঠিয়াছিল—সেখানে হিন্দু বৌদ্ধ উভয় ধর্ম্মসম্বন্ধেই পুঁথি রাখা হইত। উদন্তপুরী পাঠাগার এত বড় ছিল যে বক্তিয়ার খিলিজী বাংলার রাজধানী মনে করিয়া প্রথমে এই পাঠাগারই আক্রমণ করিয়াছিলেন এবং শেষে যখন দেখিলেন যে ইহা একটী শিক্ষাকেন্দ্র তখন তাঁহার অতৃপ্ত লুণ্ঠন লালসা পরিতৃপ্ত হইল না বলিয়া ক্রোধে অগ্নি সংযোগে পাঠাগারটী নষ্ট করিয়া দিলেন। বিক্রমশিলার পাঠাগারও এই প্রকারে নষ্ট হয়। বল্লাল সেনের একটী প্রকাণ্ড পাঠাগার ছিল কিন্তু তাহাও মুসলমান আক্রমণের হাত হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে নাই। প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও যখন এই পাঠাগারকে মুসলমানের নির্ম্মম কবল হইতে রক্ষা করা সম্ভব হইল না; তখন কতকগুলি বৌদ্ধ সন্ন্যাসী গোপনে কয়েকখানি মাত্র গ্রন্থ লইয়া নেপালে পলায়ন করিতে সক্ষম হইয়াছিল।

তিব্বতের গ্রন্থাগার :—তিব্বতেও বহু বৌদ্ধভিক্ষু ধর্ম্ম প্রচারের জন্য গিয়াছিল এবং সেই নালন্দার অতীত গরিমার যুগে অনেক সংস্কৃত ও পালি গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। পৌষ্কর সংহিতায় আমরা একটী গ্রন্থাগারের বিবরণী পাই। এক প্রকাণ্ড মর্ম্মর প্রস্তর-নির্ম্মিত প্রাসাদে এই গ্রন্থালয়টী অবস্থিত ছিল। বিজ্ঞান ও ধর্ম্ম সংক্রান্ত সহস্র পুঁথি, কাপড় এবং সূতা দিয়া পৃথক পৃথক বাঁধা ছিল—এবং পুঁথিগুলি লৌহের আলমারীতে রক্ষিত ছিল। সুবিখ্যাত গ্রন্থাধ্যক্ষ সার এনথনি পাঁইজীর এইরূপ একটী লৌহের আলমারী আবিষ্কার করিয়াছেন। হায়দ্রাবাদের প্রত্নতত্ত্ববিভাগ সম্প্রতি একটী প্রাচীন পাঠাগার আবিষ্কার করিয়াছেন। নাগাইয়ের অন্তর্গত ওয়াদী গ্রামে এগার শত শতাব্দীতে জনৈক চালুক্যরাজের সেনাপতি ও মন্ত্রী মধুসূদন এই গ্রন্থাগারটী স্থাপন করেন। সেখানে প্রায় তিন শত শিক্ষার্থী ও বার জন গ্রন্থাধ্যক্ষের থাকিবার বন্দোবস্ত ছিল।

শুধু যে বৌদ্ধ ও জৈনদের বিহারে বিহারে এবং

উপাশ্রয়ে উপাশ্রয়ে পাঠাগার থাকিত তাহাই নহে—রাজাদের নিজের নিজের পাঠাগারও তখন অনেক ছিল। ধার রাজ্যের ভোজরাজার পাঠাগার ভারতের অন্যতম পাঠাগারে পরিণত হইয়াছিল। মালবপ্রদেশ জয় করার পর চালুক্যরাজ বিজাপুরের যে প্রস্তরনির্ম্মিত প্রকাণ্ড ত্রিতল বিদ্যামন্দির স্থাপন করেন সেই বিদ্যামন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আজও তাহার জীর্ণ-স্মৃতি বুকে করিয়া অতীত গৌরবের সাক্ষ্য দিতেছে। এতদ্ব্যতীত ভারতী ভাণ্ডার জয়পুর, যোধপুর, ঝান্সী, তানজোর, বরোদা, মহীশূর প্রভৃতি রাজ্যের গ্রন্থালয়গুলিও সেই সুপ্রাচীন যুগেও একদিন সমগ্র বিশ্বের বুকের উপর জ্ঞানের আলো জ্বালিয়া দিয়াছিল।

নেপালের গ্রন্থালয়:—নেপালে অনেক দিন পর্য্যন্ত মুসলমান আক্রমণ হয় নাই বলিয়া সেখানকার নিবার রাজারা প্রায় দুই সহস্র বৎসরের পুরান পুঁথি সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন। তৎপরে নিবার রাজাদের হাত হইতে গুর্খা রাজাদের হাতে রাজ্য আসিবার সঙ্গে সঙ্গে সেই পাঠাগারটিও লুণ্ঠিত হয়। তবে সুখের বিষয় এই যে প্রায় সত্তর বৎসর হইল জঙ্গ বাহাদুরের সময় হইতে এই পাঠাগারটীর সঙ্গে একটী বিস্তীর্ণ হল (Hall) ও ঘণ্টা ঘর তৈয়ারী হইয়াছে এবং ইহাতে তিন হাজার তাল পাতার পুঁথি, কুড়ি হাজার সংস্কৃত পুঁথি, দশ হাজার ভোট দেশের পুঁথি, পাঁচ হাজার চীন দেশের ত্রিপতক পুঁথি এবং এতদ্ব্যতীত অনেক পুরাতন ও নব্যতন্ত্রের ইংরাজী বই ও ছবি আছে। রাজপুতনার প্রায় সকল রাজার কেল্লাতেই পুঁথিখানা ছিল—এখনও আট দশ হাজার পুঁথি অনেক কেল্লাতেই আছে। মহারাজ রণজিৎ সিংহের পুরোহিত মধুসূদন অনেক বই সংগ্রহ করিয়াছিলেন—গুজরাটের জৈনেরা আলাউদ্দীনের সময় বহুসংখ্যক পুঁথি পত্রাদি লইয়া যশল্মীরে পলায়ন করেন। বরুণার ধারে প্রায় পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে সর্ব্ববিদ্যানিধান কবিন্দ্রাচার্য্য সরস্বতী নামে এক সন্ন্যাসী একটি প্রকাণ্ড পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

মুসলমান শাসনকালের গ্রন্থাগার:—মুসলমান শাসনকালেও গ্রন্থাগার আন্দোলন বিশেষ হ্রাস প্রাপ্ত হয় নাই। অবশ্য প্রথম প্রথম তাঁহারা সমর লিপ্সা চরিতার্থ করিবার জন্য যদিও নৃশংসভাবে হিন্দু ও বৌদ্ধ শিক্ষা কেন্দ্রগুলি ধ্বংস করিয়াছিল, কিন্তু ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই তাহাদের মধ্যেও প্রবল সাহিত্যানুরাগের সৃষ্টি হয়। তাই প্রায় সমস্ত মুসলমান সম্রাটদেরই এক একটি নিজস্ব গ্রন্থালয় ছিল এবং ইহাতে যে শুধু আরবী ও পার্শী গ্রন্থই থাকিত তাহা নহে। হিন্দুস্থানের অন্যান্য অনেক পুস্তকই সেখানে স্থান পাইত; এবং শিক্ষানুরাগী বাদসাহেরা অন্যান্য ভাষার পুস্তকগুলি আরবী ও পার্শীতে অনূদিত করার জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করিতেন। খিলিজী রাজবংশের স্থাপয়িতা সম্রাট জালালউদ্দীনের নিজের জন্য একজন গ্রন্থাধ্যক্ষ ছিলেন এবং তিনি ওমরাহের মত সম্মান পাইতেন। সম্রাট ফিরোজ তুঘলখের সময়ে গ্রন্থাগার আন্দোলন বিশেষ বৃদ্ধি পায়—সম্রাট স্বয়ং একজন বিদ্যোৎসাহী ও সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি শুধু যে হিন্দুকেই যোগ্যতা অনুসারে চাকরী দিতেন তাহাই নহে, মুসলমানেরাও যাহাতে হিন্দুদের পুস্তকাদি পাঠ করে তাহার জন্য তিনি যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন। নগরকোটে একটি প্রকাণ্ড সংস্কৃত গ্রন্থাগার তিনি পারস্য ভাষায় অনূদিত করিবার জন্য বহু লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিয়াছিলেন। আমেদনগরে বাহামণী রাজারও একটি গ্রন্থাগার ছিল। ডাক্তার ফারগুসন বলেন যে তিনি যে সমস্ত ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করিয়াছেন তাহাতে অনুমিত হয় যে বিজাপুর প্রভৃতি স্থানেও প্রাচীনকালে অনেক বড় বড় পাঠাগারই ছিল। ১২৮২ খ্রীষ্টাব্দে নাদির শাহ (বাংলার রাজা) মহাভারতের অনুবাদ করিবার জন্য বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। বাবর ও হুমায়ুনের সময়ে অনেকগুলি গ্রন্থাগার ছিল এবং হুমায়ুন যখন যেখানে যাইতেন এমন কি রাজ্যাভিযানে যাইবার সময়েও চলনশীল গ্রন্থালয় (Travelling Library) সঙ্গে লইয়া যাইতেন। আকবর একজন বিজীত গুজরাটী রাজার এবং তাঁহার নিজের মন্ত্রী ফৈজির গ্রন্থালয় তাঁহার নিজ গ্রন্থাগারের অন্তর্ভুক্ত করেন এবং সাহিত্য, দর্শন, কবিতা, বিজ্ঞান, সঙ্গীত, ভাষাতত্ত্ব, ধর্ম্ম প্রভৃতির বিভিন্ন বিষয়ের নিয়মিত ভাবে সূচীপত্র প্রস্তুত করেন। তাঁহার সময়ে বহুল সংখ্যায় সচিত্র

পুস্তক প্রকাশিত হয়। অযোধ্যা, লক্ষ্ণৌ, কাশ্মীর, আলোয়ার প্রভৃতি স্থানের রাজাদেরও নিজ নিজ গ্রন্থাগার ছিল।

বর্ত্তমান শিক্ষার ফল:—আজ আমরা প্রায় দুই শত বৎসর ইংরাজ শাসনাধীনে আসিয়া তাঁহাদের ঔদার্য্য এবং অক্লান্ত পরিশ্রম ও অজস্র অর্থ ব্যয়ের ফলে শতকরা ছয় জন মাত্র লিখিতে পড়িতে শিখিয়াছি—অথচ সোভিয়েট শাসনতন্ত্রের অধীনে মধ্য-এশিয়ার উজবেগীস্থানের অধিবাসীরা (যাহাদের আমরা ঘৃণাভরে বর্ব্বর মূর্খ প্রভৃতি জ্ঞাপন করিবার উদ্দেশ্যে "উজবুক" বলিয়া থাকি) শতকরা ৭২ জন পুরুষ ও ৬৫ জন স্ত্রীলোক মাত্র সাত আট বৎসরের মধ্যেই লেখা পড়া শিখিতে সক্ষম হইয়াছে; সুতরাং ইহার উপর টীকা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু এই ভারতবর্ষেই এমন দিন ছিল যখন অধিবাসীরা প্রায় সকলেই সুশিক্ষিত ছিল বলিয়া অগাধ পাণ্ডিত্য থাকা সত্ত্বেও শুধু গ্রাসাচ্ছাদনের জন্যই বর্ত্তমানের আমেরিকার মত দ্বারবানের কার্য্যও করিত;—এবং এই জন্যই পূর্ব্বোল্লিখিত নালন্দা বিক্রমশীলা প্রভৃতি শিক্ষা কেন্দ্রগুলিতে যে সমস্ত দ্বারবান থাকিত বিদেশী পর্য্যটকেরা সর্ব্বপ্রথমে তাহাদের তর্কে পরাভূত করিতে পারিলে তবে যোগ্যতা অনুসারে শিক্ষা কেন্দ্রের ভিতরে প্রবেশের অনুমতি পাইত। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ আমরা এসব কথা ভুলিয়া গিয়াছি—আমাদের দেশের অতীত কীর্ত্তিকাহিনী ক্রমশঃ আমাদের স্মৃতির পাতা হইতে মুছিয়া ফেলিতেছি। আমরা বিদেশের কথা জানি, কিন্তু জানি না কেবল আমাদের এই সোনার ভারতের কথা—এই নদীহার মেখলা শস্যশ্যামলা স্বর্ণপ্রসূ দেশের কথা। সেইজন্য এখন আমাদের গ্রন্থালয়গুলিতে এরূপ পুস্তক সংগ্রহ করা উচিত যাহাতে আমাদের এই গোপন বেদনা-কাতর প্রাণ-সম্পুটে আবার দেশের কথা ফুটিয়া উঠে—যাহাতে জাতির এই জীবন-রচনার গোপন সাধনার সাফল্যের কথা ভারতের ইতিহাসে সোনার অক্ষরে ভাস্বর হইয়া থাকে।

শিক্ষালয় ও গ্রন্থাগার:—জাতির জীবনে গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীতা অন্যান্য দেশের লোকেরাও যেমন স্বীকার করেন আমাদের দেশের লোকও ঠিক তেমনিই স্বীকার করেন। স্কুল কলেজগুলি যেরূপ শিক্ষা-বিস্তারের সহায়তা করে গ্রন্থালয়গুলিও অনুরূপ ভাবেই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির কার্য্যই করিয়া থাকে, একথা আমাদের দেশে সকলেই স্বীকার করেন। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলি যে উদ্দেশ্যে রচনা করা হয়, গ্রন্থালয়গুলিও ঐ একই উদ্দেশ্য লইয়া স্থাপন করা হয়। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য যেমন প্রথমে ঘর বাড়ী টেবিল চেয়ার, আলমারী, বই এবং আনুসঙ্গিক সরঞ্জাম প্রভৃতি সংগৃহীত হয়, গ্রন্থাগারের জন্যও আমাদের দেশের লোক ঘর বাড়ী, টেবিল চেয়ার, আলমারী এবং বই সংগ্রহ করার বন্দোবস্ত করেন। ঐগুলি সংগৃহীত হওয়ার পর শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের জন্য যেমন ছাত্র সংগ্রহ হয় গ্রন্থাগারের জন্য তেমনি পাঠক বা সদস্য সংগ্রহ করা হয়। এতদূর পর্য্যন্ত শিক্ষালয় ও গ্রন্থালয় স্থাপনে আমাদের দেশের লোক একই উদ্দেশ্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া একই প্রকার উপকরণ সংগ্রহে সচেষ্ট হইয়া থাকেন; কিন্তু ইহার পর হইতেই তাঁহাদের চেষ্টার মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। ঐ সমস্ত উপকরণ এবং ছাত্র সংগ্রহের পরও শিক্ষালয়গুলির কর্ত্তৃপক্ষ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য শিক্ষকের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন এবং এতদুদ্দেশ্যে শিক্ষকদের বেতনের জন্য অর্থসংগ্রহেরও বন্দোবস্ত করেন, ও যতদিন পর্য্যন্ত তাঁহাদের অন্ততঃ গ্রাসাচ্ছাদন উপযোগী অর্থ সংগৃহীত না হয় ততদিন পর্য্যন্ত স্কুল কলেজ চলিতে পারে না ইহা তাঁহারা জানেন এবং সেইজন্য অন্ততঃ চালাইবার মত অর্থাগমের বন্দোবস্ত করিয়া তবে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। কিন্তু গ্রন্থাগারগুলির পরিচালনার জন্য আমাদের দেশের লোকেরা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকের মত গ্রন্থাধ্যক্ষেরও প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন;—তবে গ্রন্থাধ্যক্ষের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য কোন অর্থসংগ্রহের চেষ্টাই করেন না এবং তাঁহারা মনে করেন যে গ্রন্থাধ্যক্ষকে বেতন দিয়া যে অর্থ ব্যয়িত হইবে তাহার দ্বারা গ্রন্থালয়ে আরো বহু সংখ্যক পুস্তকই সংগৃহীত হইতে পারিবে,—অর্থাৎ তাঁহাদের ধারণায় গ্রন্থালয়গুলি যেন পুস্তকের দোকান এবং যে গ্রন্থালয়ে দোকান সাজাইবা

যতবেশী পুস্তকই আহরণ করিতে পারিবে সেই গ্রন্থালয়ই সর্ব্বাপেক্ষা সমৃদ্ধিসম্পন্ন বলিয়া জনসাধারণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিবে। সুতরাং গ্রন্থাধ্যক্ষের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য বেতন দান নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন এই নীতিই আমাদের দেশের লোকেরা পালন করিয়া থাকেন, ইহাই আমার বদ্ধমূল ধারণা। নিখিল ভারত গ্রন্থালয় সমিতির সহযোগী-সম্পাদক হিসাবে এবং বঙ্গীয় গ্রন্থালয় পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির অন্যতম সদস্যরূপে গ্রন্থালয় পরিদর্শনের জন্য ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিয়া এবং গ্রন্থালয়গুলির কর্ত্তৃপক্ষের সহিত আলোচনার ফলে নিতান্ত দুঃখের সহিতই আমাকে স্বীকার করিতে হইতেছে যে শতকরা প্রায় ৯০টী গ্রন্থালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ উপরোক্ত ধারণাই সযত্নে পোষণ করিয়া থাকেন। এই ধারণা যতদিন পর্য্যন্ত আমাদের দেশবাসীর অন্তর হইতে নিশ্চিহ্ন হইয়া না যায় ততদিন পর্য্যন্ত আমাদের দেশে গ্রন্থালয়গুলির উদ্দেশ্য সফল হওয়া সুদূর পরাহত। এক মাত্র বরদা রাজ্যই ভারতবর্ষের মধ্যে এই ধারণা হইতে বিমুক্ত, এবং সেইজন্যই সেখানে গ্রন্থাগার আন্দোলন বিশেষ ব্যাপকভাবেই বিস্তৃতিলাভ করিয়াছে ইহা আশা করি অনেকেরই অজ্ঞাত নহে।

আমাদের দেশের গ্রন্থাধ্যক্ষ :—আমার বলিবার কথা হইতেছে যে পাঠাগার ও পুস্তকের দোকান একই পর্য্যায়ভুক্ত নয়; আমাদের দেশবাসীরাও মৌখিক অবশ্য একথা স্বীকার করিলেও কার্য্যতঃ যাহা করেন তাহাতে পুস্তকের দোকানেই পর্য্যবসিত হয়। একজন অর্দ্ধ-শিক্ষিত বিক্রেতা যেমন নাম ও দাম দেখিয়া ক্রেতাকে পুস্তক বিক্রয় করিয়া থাকেন তদনুরূপ বেতন দেওয়া যে অপব্যয় এবং পুস্তক বৃদ্ধির পথে অন্তরায় এই নীতির সমর্থক এবং পরিপোষক গ্রন্থালয়গুলির কর্ত্তৃপক্ষেরাও ভাল লোক খুঁজিয়া না পাইয়া যে অর্দ্ধশিক্ষিত গ্রন্থাধ্যক্ষকে নিযুক্ত করেন তিনিও বিক্রেতার মত কোন প্রকারে নাম দেখিয়া পাঠককে বিক্রয়ের পরিবর্ত্তে বই পড়িতে দেন—এবং এইখানেই তাঁহার যত কিছু কর্ত্তব্য ও গুরুদায়িত্বের অবসান হয়।

গ্রন্থালয় ও গ্রন্থাধ্যক্ষের কর্ত্তব্য :—গ্রন্থাগারে যত কম সংখ্যক পুস্তকই থাকুক না কেন সেইগুলি প্রত্যেক পাঠককে পড়াইতে পারিলেই গ্রন্থাগার স্থাপনের উদ্দেশ্য পরিপূর্ণরূপে সফল হয়। আমার মতে দশ হাজার পুস্তক-সম্বলিত একটি বিরাট গ্রন্থালয় বনাম পুস্তকের দোকান জনসাধারণের বিশেষ কোন উপকারই করে না—কিন্তু মাত্র এক শ' খানি সংগৃহীত পুস্তকের একটি অতি ক্ষুদ্র ও দরিদ্র পাঠাগার যদি তাহার পাঠকদের ঐ কয়খানি পুস্তকই সযত্নে ও সাগ্রহে পড়াইতে সক্ষম হয় তাহা হইলে সেই পাঠাগারও ঐ দশ হাজারের অপেক্ষা বহুল পরিমাণেই শ্রেষ্ঠ এবং জাতীয়-জীবন রচনার পক্ষে একান্ত উপযোগী। আমি এমন পাঠাগারও দেখিয়াছি যেখানে তাকের পর তাক-সজ্জিত করিয়া পুস্তকের সৌধ রচনা করা হইয়াছে কিন্তু পড়ান এবং পড়ার অভাবে সেই মূল্যবান ও প্রয়োজনীয় গ্রন্থগুলির ভিতরের সমস্ত পাতা কীট-দষ্ট ও ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গিয়াছে—এরূপ গ্রন্থালয় বাঙলাতেও আছে এবং বাঙলার বাহিরে অন্যান্য প্রদেশেও দেখিয়াছি। সেইজন্য গ্রন্থালয়গুলির কর্ত্তৃপক্ষের সর্ব্বাগ্রে এই লক্ষ্যই থাকা উচিৎ যে গ্রন্থালয় যত ক্ষুদ্রই হউক না কেন তাহার পুস্তকগুলি পড়াইবার জন্য একজন উপযুক্ত গ্রন্থাধ্যক্ষের আবশ্যক। শিক্ষক ব্যতিরেকে যেমন কোনো শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান চলিতে পারে না এবং সেই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠনে চালাইবার জন্য যেমন করিয়াই হউক অর্থসংগ্রহ করিয়া শিক্ষক রাখিতেই হয় ঠিক তেমনি যেমন করিয়াই হউক অর্থসংগ্রহ করিয়া গ্রন্থাধ্যক্ষও রাখিতে হইবে—নতুবা উপযুক্ত লোকাভাবে গ্রন্থালয় পরিচালনা ও তাহার উদ্দেশ্যকে সাফল্যমণ্ডিত করা অসম্ভব। অনেকে কৈফিয়ৎ দিতে পারেন যে পাঠকের প্রদত্ত চাঁদা হইতে গ্রন্থাধ্যক্ষের বেতন সঙ্কুলান অসম্ভব—আমিও সেইরূপ উত্তর দিই যে প্রথমে শিক্ষালয়গুলিও ছাত্রদের প্রদত্ত বেতন হইতে শিক্ষকগণের বেতন দেওয়া ঠিক ওই একই প্রকারের অসম্ভব হওয়া সত্ত্বেও যেমন বেতন দিবার জন্য অর্থসংগ্রহ করা হয়—কারণ, তাহা না করিলে শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্য সফল হইবে না :—সেইরূপ ওই একই শিক্ষাপ্রসারের উদ্দেশ্যে গ্রন্থাধ্যক্ষের জন্য অর্থ সংগ্রহ

না করিয়া পাঠাগার স্থাপনের গৌরব লইয়াই আত্ম-প্রসাদ অনুভব করিলেও প্রকৃত শিক্ষাবিস্তারের মূল লক্ষ্য ব্যর্থ হইবে। অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য গ্রন্থাধ্যক্ষের বেতনের বন্দোবস্ত করিলে এই নিদারুণ অর্থ-কৃচ্ছ্রতা ও চাকুরী সমস্যার যুগে গ্রন্থাগার পরিচালনার নিয়মাবলী শিক্ষা করিবার জন্যও বহুসংখ্যক পাঠক ছাত্ররূপে গ্রন্থাগারের সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইবে। শিক্ষালয় গুলিতে ছাত্রহিসাবে যাহারা বেতন দেয় তাহাদের অনেকেরই যেমন ভবিষ্যতের জন্য এই আকাঙ্ক্ষাই প্রোজ্জ্বল থাকে যে পাঠ শেষের পর তাহারা অন্ততঃ যে কোনো একটা চাকুরী পাইবে, ঠিক সেইরূপ গ্রন্থালয়ে ভবিষ্যতে চাকুরী লইবার আশায়ও অনেকেই গ্রন্থালয়ে চাঁদা দিয়া সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইবে এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।—তখন গ্রন্থাধ্যক্ষের বেতনের জন্য বাহির হইতে খুব বেশী অর্থ সংগ্রহের আর প্রয়োজন হইবে না; শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলিও যেরূপ আত্মনির্ভরশীল হইয়া চলিয়া থাকে গ্রন্থালয়গুলিও সেই ভাবেই নিজ ব্যয় ভার বহন করিতে সক্ষম হইবে। ভারতবর্ষে যতগুলি গ্রন্থালয় আছে সেগুলি যদি উপযুক্ত গ্রন্থাধ্যক্ষের দ্বারা পরিচালিত হয় এবং আমাদের বঙ্গীয় গ্রন্থালয় পরিষদ অথবা নিখিল ভারত গ্রন্থালয় সমিতির অন্তর্ভুক্ত থাকে, তাহা হইলে আমার আবিষ্কৃত পদ্ধতি অনুযায়ী ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ, জেলা কিংবা গ্রাম যেখানে একটী ক্ষুদ্রতম গ্রন্থালয় আছে সেখানকার পর্য্যন্ত রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক প্রভৃতি যে কোনো প্রকার সংবাদ কিংবা বর্ত্তমান অবস্থার বিষয় যে কেহ নিজের বাড়ীতে বসিয়াই অতি সহজেই জানিতে পারিবেন। এ সম্বন্ধে যদি কাহারও কিছু জ্ঞাতব্য থাকে তাহা হইলে সাময়িক পত্রিকার মারফৎ কিম্বা ব্যক্তিগত ভাবে আমাকে জানাইলে আমি বিষদ বিবরণী জনসমক্ষে প্রকাশ করিব—অনেকগুলি গ্রন্থালয়ের কর্তৃপক্ষের নিকট পরিদর্শন কালে এই পদ্ধতির কথা বলিয়াছি কিন্তু বিশেষ দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে গ্রন্থালয় আন্দোলনকে সেভাবে গ্রহণ না করায় এবং উপযুক্ত গ্রন্থাধ্যক্ষ না থাকায় সে পদ্ধতি এ পর্য্যন্ত বিশেষ কিছু ফলদায়ক হইয়া উঠে নাই।

গ্রন্থাধ্যক্ষের সর্ব্ব প্রথম কর্তব্য হইতেছে জনসাধারণের মধ্যে পুস্তক পাঠের আকাঙ্ক্ষা উদ্দীপিত করা। এইজ[ন্য] প্রতি সপ্তাহে সভাসমিতি করিয়া পার্শ্ববর্ত্তী স্থানের যুব[ক] এবং তরুণসম্প্রদায়কে তাহাতে আহ্বান করিয়া গ্রন্থাল[য়] ব্যবহারের ও পুস্তকপাঠের প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতি শিক্ষা দিতে হইবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কোন একটি পাড়াগাঁ[য়ে] হয়ত একটি যাত্রার আখড়া আছে—তাহারা শুধু বটতলা[র] যাত্রার বই ছাড়া অন্য কিছুই পড়ে না। তাহাদের বই— পড়াইতে হইলে ক্রমশঃ দ্বিজেন্দ্রলালের উত্তেজনাপ্র[দ] পুস্তকাবলী যথা—মেবার পতন, রাণা প্রতাপ, দুর্গাদা[স] প্রভৃতি পড়াইয়া তারপর রবীন্দ্রনাথের রাজারাণী, বিসর্জন প্রভৃতি পড়াইয়া ক্রমশঃ তাহাদের মনোবৃত্তিকে উন্নত করিয়া তুলিতে হইবে। কেহ হয়ত পাঁচকড়ি দে[র] ডিটেকটিভ উপন্যাস পড়িতেই ভালবাসে তাহাকে ক্রমশঃ দিনেন্দ্রকুমারের পুস্তকাবলী তারপর বঙ্কিমচন্দ্রের রোমাঞ্চ-কর উপন্যাসগুলি যথা, দুর্গেশনন্দিনী, সীতারাম, রাজসিংহ, চন্দ্রশেখর প্রভৃতি পড়াইয়া শেষে বিষবৃক্ষ এবং তৎপরে রবীন্দ্রনাথেরও উপন্যাস পাঠের দ্বারা তাহার চিন্তাশক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির যাহাতে স্ফুরণ হয় সেজন্য গ্রন্থাধ্যক্ষকে সাহায্য করিতে হইবে। অর্থাৎ কোন্ বইয়ের পর কোন্ বইখানি কি প্রকার পাঠকের পক্ষে পাঠযোগ্য এসম্বন্ধে গ্রন্থাধ্যক্ষকে সম্যক অভিজ্ঞ থাকিতে হইবে ও তাঁহার সাধারণ মনস্তত্ব জ্ঞানও থাকিবে। নতুবা পাঠকের ইচ্ছামত পুস্তক আদান প্রদানের মধ্য দিয়া গ্রন্থাধ্যক্ষের কোনো কর্ত্তব্যই পালন করা হয় না।

ভ্রাম্যমান পাঠাগার:—ভ্রাম্যমান পাঠাগার প্রত্যেক পল্লীতে পল্লীতে স্থাপন করিতে হইবে। প্রত্যেক পাঠাগারের গ্রন্থাধ্যক্ষকে ভ্রাম্যমান পাঠাগারের উপযোগীতা সম্বন্ধে দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে হইবে। যে দেশের রাজকরের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ অংশ শান্তি রক্ষার নামে পুলিশ ও সেনাদলের জন্য ব্যয়িত হয়, সে দুর্ভাগা দেশের অধি-বাসীদের মধ্যে শিক্ষালাভের স্বতঃস্ফূর্ত্ত আকাঙ্ক্ষা যে থাকিতে পারেই না একথা প্রত্যেক মনস্তত্ত্ববিদই স্বীকার করিবেন। সুতরাং সেখানে গৃহে গৃহে ভ্রাম্যমান পাঠা-গারের সাহায্যে পুস্তক বিতরণ করিয়া সর্ব্বপ্রথম শিক্ষা-লাভের জন্য আন্তরিকতা এবং আগ্রহকে সৃষ্টি করিয়া

তুলিতে হইবে—প্রাদেশিক ভাষায় লিখিত প্রত্যেকখানি উপযোগী পুস্তকই ঘরে ঘরে পৌঁছাইয়া দিয়া জাতির অন্তরে দেশাত্মবোধ সঞ্চারিত করিতে হইবে—এবং ভ্রাম্যমান পাঠাগারের সাহায্য ব্যতিরেকে জাতিকে ব্যাপকভাবে শিক্ষার আদর্শে অনুপ্রাণিত করা ছাড়া এই নিজ্জিত জাতির পক্ষে আর কোন উপায়ান্তরই নাই। বরদায় এই ভ্রাম্যমান পাঠাগার সেখানকার অধিবাসীদের মধ্যে যে ভাবে জ্ঞানের আলো ছড়াইয়া দিয়াছে তাহা আমাদের প্রত্যেক গ্রন্থালয়েরই অনুকরণীয়। দক্ষিণ কলিকাতাস্থ দীপক সঙ্ঘের এই ভ্রাম্যমান পাঠাগারের পরিকল্পনা এবং প্রচেষ্টা আমাদের কলিকাতার অনেকগুলি গ্রন্থালয়কেই আশা করি এ বিষয়ে উৎসাহিত ও সচেষ্ট করিয়া তুলিবে—এখানকার কর্তৃপক্ষের ক্ষুদ্রশক্তির অনুপাতে যে পরিমাণে কার্য্য হইয়াছে তাহা প্রত্যেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে বলিয়াই বিশ্বাস করি।

উপসংহার :—বর্ত্তমান শাসনতন্ত্রের দ্বারা পরিচালিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি যে কারাগারের আদর্শেই গঠিত এবং দিনের পর দিন ধরিয়া ছাত্রদের অন্তরে ক্রমান্বয়ে দাসমনোবৃত্তি প্রচার করিতেই সচেষ্ট এবিষয় ধারাবাহিক ভাবে বহুসংখ্যক প্রবন্ধ লিখিয়া আজ কয়েক বৎসর হইল আমি ভারতের অধিকাংশ ইংরাজী ও বাংলা সাময়িক পত্রিকার মারফৎ জ্ঞাপন করিয়া আসিতেছি—বর্ত্তমানের এই শিক্ষার ফলেই আজ আমরা এমন করিয়া নির্লজ্জভাবে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদের পূজারী হইয়া উঠিয়াছি—মানুষ হইয়া মানুষের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করিতেছি—তাহাকে দাস করিয়াছি এবং তাহাদেরই শ্রমের ফল লুণ্ঠন করিয়া আত্ম-প্রসাদ অনুভব করিতেছি—তাই মানবাত্মা আজ মানুষ-পশুর কাছে পীড়িত, লাঞ্ছিত ও উপদ্রুত। সেইজন্য এই সব সহস্র সহস্র পীড়িতের কণ্ঠ দিয়া মানবাত্মার মুক্তির বাণী ফুটাইতে হইলে সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন হইতেছে এই সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে আমূল সংস্কার করা; কিন্তু বর্ত্তমান শাসনতন্ত্রের অধীনে আপাততঃ সেরূপ কোনো দ্রুত পরিবর্ত্তন এবং সংস্কার সম্ভব নয় বলিয়াই গ্রন্থাগারের মধ্য দিয়া জাতির অন্তরে শিক্ষা ও দেশাত্মবোধ জাগ্রত করিতে হইবে। সমস্ত প্রপীড়িত ও পরাধীন জাতিই সর্ব্বপ্রথমে এই ভাবে গ্রন্থগারের সাহায্যে ভ্রাম্যমান পাঠাগার হইতে গ্রামে গ্রামে পুস্তক বিতরণ করিয়া জনসাধারণকে আত্ম-প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষায় উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল। জাতীয় শিক্ষা এবং জাতীয় ভাষাকে প্রতিষ্ঠিত ও প্রচার করা ছাড়া স্বাধীনতা আন্দোলনের এক অঙ্গ যখন একেবারেই পঙ্গু হইয়াই থাকে তখন প্রার্থনা করি আমাদের এই গ্রন্থাগার আন্দোলনের মঙ্গল প্রচেষ্টা যেন সার্থক ও ধন্য হইয়া উঠে—ইহার প্রত্যেকটি অনুষ্ঠান যেন শুভ ও কল্যাণের অমোঘ স্পর্শে জাতিকে সঞ্জীবিত করে। *

* দীপকসঙ্ঘ, ভ্রাম্যমান পাঠাগারের উদ্যোগে কলিকাতার পাঠাগার সম্মেলনীতে সভাপতির প্রদত্ত অভিভাষণ।

শ্রীমতী অনুরূপা দেবীর অভিভাষণ

গত ১৮ই ডিসেম্বর পাটনা কলেজের ব্যায়ামাগারে পাটনা কলেজ বঙ্গসাহিত্য সমিতির সভায় সভানেত্রী শ্রীমতী অনুরূপা দেবী নিম্নলিখিত অভিভাষণ পাঠ করেন:—পুত্রগণ! তোমাদের এই বঙ্গসাহিত্যসম্মেলন সভায় এসে তোমাদের আমার ঐকান্তিক স্নেহ আশীর্ব্বাদ জানিয়ে দিয়ে ফিরে যেতে পেলেই আমার পক্ষে খুব ভাল হ'তো; কিন্তু তোমরা কি স্বাভাবিকক্রমে তোমাদের যেটুকু নিজস্ব :পাওনা, ঠিক সেইটুকুই পেলেই খুসী হবে? বঙ্গসাহিত্য বিষয়ক দু'চারটে কথা আমার কাছ থেকে তোমরা শুনতে চেয়েছ। বিপদ যে আমার সেইখানেই ঘটেছে। ছেলেদের কাণে ঠাকু'মা শোনাতেন রূপকথা। শুনে তারা লাভ ক'রতো পরম প্রীতি এবং লোভ ক'রতো ফিরে শোনবার; মায়ের ভাগে কিন্তু রাজকন্যা আর স্বপ্নপুরীর আখ্যান-ব্যাখ্যানের পরিবর্ত্তে অত্যন্তই অনুপাদেয় এবং হয়ত সময় সময় একান্তই অতৃপ্তিকর উপদেশের খণ্ড-লড্ডুক বেঁটে দেবার ভার চেপে রইলো। দু'জনেই সমান হিতাকাঙ্ক্ষিনী; অথচ দুজনাকার কর্ত্তব্য এবং দেয় ঠিক এক নয়। একজন জোগান দেন আমাদের অন্তরের খোরাক, তাঁদের দান আমাদের কল্পনাকে প্রসারিত করে, কৌতূহলকে উদ্দীপিত ক'রে তোলে, এবং বিস্ময়-চকিত চিত্তকে পরমাশ্চর্য্যের ভিতর দিয়ে স্বর্গ থেকে পাতালে, উন্নত-গিরিশিখর হ'তে সাত সমুদ্রের এপারে ওপারে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়ায়। আর একজন দান করেন যা, তার থেকে মনের মধ্যে বিস্ময়ও জাগে না, কৌতূহলাবৃত্তিও চরিতার্থতা প্রাপ্ত হয় না; তা আমাদের নিত্যকার জীবনযাত্রায় প্রতি-নিয়ত ব্যবহৃত অতি সাধারণ কর্ত্তব্যের নির্দ্দেশ মাত্র, যে কর্ত্তব্য সম্পাদনে পুণ্যলাভ পর্য্যন্ত ঘটে না, পরন্তু অপালনে প্রত্যবায় ঘটে; শুধু সেই সাধারণ ধর্ম্মের নির্দ্দেশযাত্রা রসমাধুর্য্য তার মধ্যে যদিই বা ছিটেফোটা খুজে মেলে, তো সে রস আমাদের জন্মক্ষণে পাওয়া স্বর্ণমর্দ্দিত খাঁটা মধুর মতই অতি-পরিচয়ের অভ্যাসে অভ্যস্ত। ভোজের সভার বা জন্মতিথি-উৎসবের বিশিষ্টভাবে পরিবেশিত পায়সপিষ্টকের মিষ্টান্ন পক্বান্নের স্বাদ মাধুর্য্য এতে নাই। তা ছাড়াও মধুর সঙ্গে আবার তুলসীপাতা আদার রসও মায়ের হাত হ'তে আমাদের যখন তখন পেতে হয়। স্বাস্থ্যের খাতির তার ভেতর থাকতে পারে, মুখরোচক হয় না। এ ক্ষেত্রেও সে ভাবনা রয়েছে।

তার ওপর আর একটা কথা। আধুনিককার বাঙ্গালাসাহিত্যের সম্বন্ধে আলোচনা (ষোড়শোত্তীর্ণতায় মিত্রবৎ আচরণে আদিষ্ট হলেও) ছেলেদের সঙ্গে মায়ের চলে কি না ঠিক বুঝতে পারি নে। (অবশ্য আমি শুধু হাল্কা সাহিত্য সম্বন্ধেই একথা বলছি।) আমাদের কালে রায়গুণাকর প্রভৃতির রচনা বা বটতলায় ছাপা উপন্যাসগুলি, বিদেশী রেণল্ড, জোলা প্রভৃতির লেখা নিয়ে তো গুরুজনদের সঙ্গে আলোচনার কথা ভাবাই চলতো না, তবে আজকালকার দিনে নাকি লজ্জাকর বলে আর কোন কিছুই থাকছে না, তাই এদিনের বঙ্গসাহিত্যের মহা মহারথী-দের এবং তাঁদের সারথিদের সগর্ব্বে প্রচারিত ফ্রয়েডিয়ান মতবাদযুক্ত রচনাবলীসংযুক্ত মাসিকগুলিকে সযত্নে বাঁধিয়েই রাখি; কিন্তু অভ্যাস-বশতঃ ছেলেমেয়েদের নিয়ে ওগুলির থেকে আলোচনা করতে মন এখনও ঠিক যেন সায় দেয় না। বোধ করি আমাদের উত্তরপুরুষে এই বাধ-বাধ ভাবটুকু কেটে যেতে পারবে। আমাদের সাহিত্যজগতের ক্রমোন্নতি এবং হিন্দুসমাজের সংস্কার যেরূপ দ্রুত পরিক্রমায় ছুটে চলেছে, তা'তে করে হয়ত বা সেদিনে আর ও সকল জটীল চরিত্রের নরনারী উপন্যাসের পাতার মধ্যে আটকে না থেকে—এখনকার মতন কচিৎদৃষ্ট নন—ভদ্র-সমাজের ঘরে ঘরেই আবির্ভূত হয়ে ধরণীকে ধন্য করবেন। তা' যা' হ'বার হ'বে। যিনি ভাঙবার গড়বার মালিক তাঁর প্রবৃত্তি মতনই তিনি প্রেরণা দান করেন; তিনি যদি এই আধুনিক সাহিত্যের মডেল দিয়ে এদেশের নিয়মতান্ত্রিক সমাজকে গড়াতে চান, তা'হলে বারণ করবে কে? করলেই বা শুনছে কারা? আর যদি তাঁরও আমাদের মত এতৎকালের সুনিয়ন্ত্রিত ত্যাগসংযমের দীক্ষায় দীক্ষিত বহুদিনের প্রাচীন সমাজটার 'গয়া গঙ্গা গদাধরো হরিঃ' করে পিণ্ড প্রদান করে ফের টেলে সাজার মতলব না থাকে, এই সব তোমাদেরই তরুণ প্রাণে তাঁর আশীর্ব্বাদের কিরণলেখা বিকীর্ণ করে দিয়ে সেই আলোতে আশপাশের আবর্জ্জনা সংস্কার করিয়ে নেবেন। এর দৃঢ় ভিত্তিকে শাবল মারার ঘা থেকে বাঁচাবেন। শিব এবং সুন্দর ব'লে যাঁর সর্ব্ববিদিত পরিচয়, তিনি কখনই তাঁর সন্তানতুল্য মানবকে অ-শিবের অকল্যাণময় রূপের চির উপাসনা করতে দিতে পারেন না; যথার্থ যা সুন্দর, যা সত্য, যা মহৎ—তাতেই স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রীতি ও আনন্দ একদিন না একদিন এনে দেবেন।

সাহিত্যকে বলা হয় সমাজের দর্পণ, অর্থাৎ সাহিত্যিকেরাও তো সামাজিক জীব ব্যতীত আর কিছুই নন, নিজ নিজ সমাজগত জীবনযাত্রার মধ্যে এবং পারিপার্শ্বিকতার ভিতর দিয়ে যা' পাওয়া যায়, প্রধানতঃ সাহিত্যিক তাঁর সাহিত্যিক সৃজনের মধ্যে তাকেই রং ছড়িয়ে ফুটিয়ে তোলেন। সাহিত্যসৃষ্টিতে যদিচ কল্পনার স্থান খুবই উচ্চে, তথাপি সাহিত্যসেবার জন্য তার চাইতেও বেশী করে দরকারী সর্ব্ববিষয়িনী সাংসারিক অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে কল্যাণময় সূক্ষ্ম দৃষ্টি। কল্পনায় আমরা ততটুকু পর্য্যন্তই অগ্রসর হ'তে পারি যতটুকু পর্য্যন্ত আমাদের জ্ঞানের সীমানা। তার বাইরে আমাদের কল্পনার রথ আমাদিগকে বহন করতে পারে না; সেই জন্যই সাহিত্যস্রষ্টাকে জীবনের সকল ক্ষেত্রেই অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে হ'বে; সাহিত্যস্রষ্টার শিক্ষায় ও জ্ঞানে যতই ত্রুটী থেকে যাবে, তাঁর সৃজনশক্তি ততই সীমানিষিদ্ধ হয়ে পড়বে এবং তাঁর সৃজিত বিষয়বস্তুও ততই ত্রুটিপূর্ণ ও অসম্পূর্ণ হবে। তবে সাহিত্যজগতে সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ হয়েও যদি অন্তর্দৃষ্টির অভাব থেকে যায়, সেই ত্রুটিই সবার চাইতে বড় ত্রুটী। এই জন্যই প্রাচীন ভারতের সৃষ্টিকর্ত্তারা সকলেই ব্রহ্মা ছিলেন—সৃষ্টিকরার দায়িত্ব এতই গভীর।

সাহিত্যসৃষ্টির অনেকগুলি উদ্দেশ্য আছে। সাহিত্য মানব জীবনের একটি আশ্চর্য্যকর ও মহত্তর শিল্পসৃষ্টি সাহিত্যের কাছে আমাদের যে দাবী, সে বড় সহজ ও সোজা দাবী নয়, কারণ সাহিত্যের মধ্য দিয়া আমরা অনেক কিছুই পেতে চাই। সংসারের ঘাতপ্রতিঘাতজর্জ্জরিত, নিয়তভাপদগ্ধ জীবনের একটুখানি শীতল প্রলেপ, আর্ত্তহৃদয়ের অশেষ সান্ত্বনা বাণী, সৌন্দর্য্যবিলাসীর আনন্দবিলাস এবং সকলকার জন্যই অনাবিল আনন্দ এবং শান্তি সাহিত্যরচনার মধ্য দিয়ে আমরা পাবার আশা রাখি। অভিজ্ঞ মানবের অন্তররুদ্ধ সৌন্দর্য্যবোধকে বহিঃবিকাশ করে সহস্র চিত্তের আনন্দ বেদনাকে আকর্ষণ ক'রে নেওয়া—এ ভার সাহিত্যের উপরেই। সাহিত্যের সোনার চাবি প্রতি মানুষের প্রত্যেক মনের অব্যক্ত ভাবনিচয়কে নিজের থেকে ভাষা দিয়ে সুপ্রকাশিত করে তুলে তাদের ঘুম ভাঙিয়ে দেবে, সহানুভূতির গভীর রসে মনকে সরস করে নেবে। সাধারণের জ্ঞানের অতীত, শিক্ষার অতীত, কল্পনার অতীত—অথচ তাদেরই সরল সহজ জীবনযাত্রায় পূর্ণভাবে পরিচিত কিম্বা অপরিচিত তা কোথাও থাকলেও সহজেই পরিচিত করে নিলে প্রচুরতর ভাবে তার থেকে লাভ করতে পারা যাবে; অন্ততঃ লাভ বেশী না করতে পারলেও লোকসান মোটেই দিতে হবে না; শুধু একটু আনন্দ বেদনা, কল্পনায় একটুখানি মনচমকানো তড়িৎস্ফূর্ত্তিতে একলহমার একটুখানি আলোকরেখা; কিন্তু সেই আলোকদ্যুতির মধ্যেও ফুটে উঠবে সুন্দরের মুখের সেই কল্যাণস্নিগ্ধ ঈষৎ হাসিটুকু। সাহিত্যের আর একটি মস্ত বড় বিরাট দিক আছে,—এই দিকটাই তার ব্যাপকতর এবং সার্থকতার দিক। সাহিত্য শুধু সমাজের দর্পণ নয়, সাহিত্য সমাজের চিরন্তন শিক্ষক। আবহমানকাল ধরে, সেই শ্লোকরচনার সময় থেকে অদ্যাবধি ধর্ম্মতত্ত্ব, ইতিহাস, পুরাণ, ভূগোল, খগোল, জ্যোতিষ, দর্শন, বিজ্ঞান থেকে কাব্য, মহাকাব্য এবং গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, নীতিকথা, জীবনকথা এতৎসমুদয় মিলেই মানসমাজের শিক্ষকতার কার্য্য করে এসেছে। যখন সে লঘুসাহিত্যের রূপ ধরে শান্ত সন্ধ্যায় শ্রান্তদেহে এলিয়ে পড়েছে, তখনও সে তার কর্ত্তব্যে শৈথিল্য প্রদর্শন করেনি। ঘুমের ঘোরে ঘুমপাড়ানিয়া গানে সে আমাদের খোকাখুকুদের মনের মধ্যে তাদের ভাবী শিক্ষার বীজ বপন করেছে। সোজা কথায়, সাহিত্যের কাছ থেকে এমন কিছু আমরা পেতে চাই, যার থেকে মনের মধু তার মাধুর্য্য হারিয়ে ফেলে মদের মতন গাঁজিয়ে উঠে অনভ্যস্ত কাঁচা মনকে মাতাল করে তুলতে পারে। মাদকতার মধ্যেই মত্তারও স্থান। সাহিত্যিক সমাজ শিক্ষার শিক্ষক, তাঁর দায়িত্ব বড় সহজ নয়। যিনি এই সাহিত্যিক শিল্পকলায় যত বড় কুশলী হ'বেন, তাঁর অন্তর্দৃষ্টিকে ততই দূরপ্রসারী করতে হবে, নিজের দায়িত্ব সম্বন্ধে ততই চিন্তাশীল হ'তে হ'বে। তাঁর সেই সূক্ষ্ম বিশ্লেষণাত্মক চারুশিল্প অতি সহজেই সামাজিক তরুণচিত্তকে আকর্ষণ করবে, এবং এটা একান্তই স্বাভাবিক যে যে বিষয় আমাদের মনোগ্রাহী, আমাদের চরিত্র গঠনের সহায়তা সব চেয়ে বেশী সেই করে। ব্যক্তিগত মনের ক্রিয়া আর সমাজগত মনের ক্রিয়ার নিয়ম একই। অসৎসাহিত্য সমাজগঠনের পক্ষে অনুকূল হতেই পারে না। শিক্ষার্থিদের মধ্যে সহজ পথের যাত্রীই বেশী, সমাজগঠনে তার ক্রিয়া গভীর। সেইজন্য সমাজের আদর্শ যাতে পবিত্র থাকে, সমাজশিক্ষকরূপী সাহিত্যসেবকদের সেদিকে লক্ষ্য থাকা একান্তই কর্ত্তব্য। ভদ্রসমাজকে অভদ্রসমাজে পরিণত করায় কোন সার্থকতা নেই, মর্য্যাদাও নেই। এদেশে অভদ্রসমাজ ভদ্রসমাজের হিসাবে কম নয়, বরং অনেক বেশীই; তাদের ভদ্র করারই মহা দায়িত্ব বরং বাকী পড়ে রয়েছে। তাদের আদর্শ দিতে হবে, তাদের আদর্শ আজ নেবার দিন নয়। ইন্দ্রিয় বিলাস, ফ্রয়েডের বিশ্লেষণ, ত্যাগ, সংযম, শুচিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পূর্ণ অভিযান। এ সমস্ত যদি সমাজের পক্ষে প্রকৃতপক্ষেই মঙ্গলের নিদান হ'তো, তাহ'লে আজকের দিনেও কৃচ্ছসাধনের মহত্ত্বে মহীয়ান নরনারীর সাক্ষাৎ আমরা খুঁজে হাতড়েও হয়ত পেতুম না। আপাতরমণীয় এবং পরিণামে বিষোপম উপদেশ এবং আদর্শ মানবসমাজে তো আজকে শুধু আমদানি হয়ে আসেনি; এর সৃষ্টি হয়েছে সেই আদিকালের কোন এক চার্ব্বাক মুনির যুগ থেকে। তবে আজকের দিনে নাকি দিন পড়েছে, এখনকার চার্ব্বাক মুনিরা শুধু তাঁদের নিজ সমাজকেই তাঁদের সহজ পন্থার শিক্ষা দিয়ে সহজিয়া তৈরী করে ক্ষান্ত হন না তো। এরোপ্লেন, রেডিওর যুগে পৃথিবীর যে এক বৈদ্যুতিক সূত্রে সবার সঙ্গে গাঁথা পড়ে গেছেন। তাই ভারতের বাইরের চার্ব্বাক ঋষির বংশধরের যে সমস্ত সমাজ-বিধ্বংসী মতবাদ দিয়ে তাদের সমাজ ভাঙছেন, সেই

বিধ্বস্ত সমাজসৌধের ছেটকানো টুকরো এসে পড়েছে অথবার এই গরীব সমাজের উপর তার অন্ততঃ আপাতঃ কোনই দরকার ছিল না। হাতে কাজ এবং মাথায় তার যা আছে তাই তার পক্ষে দুরূহ।

সাহিত্যশতদল নিত্যকালের অবিনশ্বর রূপের রসে ও গন্ধে ভরপুর হয়ে থেকে প্রতি'দল তার অক্ষয় গন্ধকোষ থেকে সুগন্ধ বিলাবে—এই তার কাজ। সংসারের চারিদিকে যেমন দেখতে পাই, সবাই একবার পুরোণো হয়ে যায়, আবার তারাই দেখা দেয় নূতনের রূপ নিয়ে। বসন্ত আসে শীতশেষের ঝরাপাতার জায়গায় নূতন নূতন পত্রে মুকুলে বনস্থলীকে পুলকাভারাকুল করে দিয়ে চূতমুকুলকে ফুটিয়ে তুলে, রুদ্ধকণ্ঠে কোকিলের কণ্ঠে কুহুধ্বনির বন্দনা জাগিয়ে, ঘুমিয়ে পড়া অলিকুলকে জাগিয়ে আনে। শীত কুহেলিকার আবেষ্টন থেকে মুক্তি দিয়ে অম্লান, সিত জ্যোৎস্নার অমল ধারায় ধরাতল স্নান করায়। সে যে এর আগেও এসেছিল, অতএব আর আমরা তাকে চাইনে—এমন কথা কেও কোনদিন বলতে পারেনি। সে যখনই আসে, তখনই নূতন হয়ে আসে; কিন্তু প্রত্যেকবারই তো সে তার সেই আদিম বসন্ত প্রভাতের মতই তার সেই আদিম কর্তব্যগুলি থেকে অদ্ভুত, নূতন কিছুই করে না।

বিশ্বজগতে যেমন সাহিত্যজগতেও সেই একই ধারা। এখানেও সেই চির শাশ্বত সত্যের এবং শিব সুন্দরের কল্যাণময় রূপকেই নব নব বেশে ভূষায় ভূষিত করে, নূতন রসে রসিয়ে নিয়ে অভিনব কল্পনার তুলিকাসম্পাতে রাঙিয়ে দিয়ে সাহিত্যামোদিদের মনকে চমকে দিতে হবে; অথচ তার যেটা প্রধান লক্ষ্য, তার থেকে তার একটু-খানিও সরে দাঁড়াবার উপায় নেই। নূতন সৃষ্টির কোন খাতিরে নয়। বিশ্বের প্রত্যেক অণু-পরমাণুর সঙ্গে যেমন বিশ্বাত্মা ওতঃপ্রোতভাবে মিশে রয়েছেন, তাঁর সৃষ্টির মধ্য থেকে তাঁকে যেমন কোন ফাক দিয়েই বাদ দেওয়া চলে না, তেমনি এই সাহিত্যজগৎসৃষ্টির মধ্যেও সেই সত্যশিবসুন্দরের অকল্যাণ বিধ্বংসী মহিমরূপকে ওতঃপ্রোতভাবে মিলিয়ে রেখে তবেই স্রষ্টা তাকে সংযোজিত করে তুলতে পারবেন; নতুবা তাঁর কর্তব্যের বিচ্যুতি ঘটিবে।

বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্যসম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণ

সভাপতি কবি কায়কোবাদ সাহেবের অভিভাষণের সারমর্ম :—

আমি জানি, আমি অযোগ্য—যোগ্যজনের প্রতি এই গুরু কর্তব্য-ভার অর্পিত হইলেই সুশোভন হইত। তথাপি আমার অকিঞ্চিৎকর সাহিত্য-সাধনার কথা স্মরণ করিয়া যাঁহারা আমাকে এই মহাগৌরবের আসন প্রদান করিয়াছেন, আমি তাঁহাদিগকে সর্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

এই সুধীজনপরিবৃত সম্মেলনের অযোগ্য সভাপতিরূপে আমি যদি বঙ্গভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে দু'চারিটী কথা বলি, তাহা বোধ হয় বর্তমান ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক ও অশোভন হইবে না। বাঙ্গালার মুসলমানের ধর্ম-ভাষা আরবী, ফারসী এবং উর্দ্দুও প্রায় সেই পর্য্যায়ভুক্ত। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের মুসলমানদের সহিত ভাবের আদান প্রদান করিতে উর্দ্দু ভাষা শিক্ষারও প্রয়োজন আছে। মুখ্য প্রয়োজন হইল, মাতৃ-ভাষার ভিতর নিজেদের জাতীয় জীবন গড়িয়া তোলা।

বঙ্গভাষা যে বঙ্গীয় মুসলমানদের মাতৃভাষা এ সম্বন্ধে বোধ হয় এখন আর দ্বিমত নাই। অন্ততঃ অধিকাংশ বঙ্গীয় মুসলমানই একথা একবাক্যে স্বীকার করেন। অল্প সংখ্যক যাঁহারা করেন না, তাঁহারা এখনও উর্দ্দুর স্বপ্নেই বিভোর হইয়া আছেন। দীর্ঘ নিদ্রার পর তাঁহারা মাঝে মাঝে গা ঝাড়া দিয়া উঠেন, এবারও সেইরূপ কিছু আয়োজন দেখা যায়। কিন্তু তাহাতে ভয় বা আশঙ্কার কোন কারণ নাই। প্রকৃতির নিয়মকে উল্টাইয়া দিয়া উর্দ্দু কোনরূপেই বাঙ্গলার মুসলিম জনসাধারণের ভাষা হইতে পারিবে না। উহা কয়েকজন ভাব-বিলাসীর ভাষা হইতে পারে, ইহার বেশী কিছু নয়।

আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে, বাঙ্গালা ভাষা কেবল আমাদের মাতৃভাষা নয়, জন্মভূমির ভাষা। ইহা হিন্দুরও ভাষা, মুসলমানেরও ভাষা, ইহার উপর হিন্দু-মুসলমান সকলের তুল্য অধিকার। আজ হয়ত কাহারও নিকট মুসলমানের সাহিত্য-সাধনার—বাঙ্গলা সাহিত্য-সাধনার কোন মূল্য নাই,—কিন্তু এমন একদিন আসিবে, যেদিন ইহার দেহে মুসলমানের দেওয়া অলঙ্কার দেখিয়া কেহ আর শিহরিয়া উঠিবেন না; হয়ত সেদিন মুসলমানের পরিচর্যার ফলে বাঙ্গালা ভাষা নবজীবন লাভ করিবে, উহার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আদর্শের ছাপ, আমাদের ভাবের ছাপ, আমাদের সাধনার ছাপ দীপ্যমান হইয়া উঠিবে। আমি সেই আশার স্বপ্ন দেখি।

আমার মাতৃভাষার পরিবর্তনপ্রয়াসী মুষ্টিমেয়কে আমি বলিতে চাই, আমার মায়ের যে ভাষা, যে ভাষায় আমি প্রথম কথা বলিতে শিখিয়াছি, যে ভাষা আমি সকল প্রাণমন দিয়া শিক্ষা করিয়া, যে ভাষায় আমি গল্প করিয়াছি, স্বপ্ন দেখিয়াছি—বন্ধুবান্ধবের সহিত মন খুলিয়া নানা বিষয়ে আলাপ ও আলোচনা করিয়াছি—গীত গাহিয়াছি, কবিতা লিখিয়াছি, সেই অমৃতোপম ভাষা আমার মাতৃভাষা না হইয়া বাঙ্গালার বাহিরের একটি ভাষা যে কেমন করিয়া আমার মাতৃভাষা হইতে পারে, তাহা আমি বুঝিতে পারি না।

একথা অবিসংবাদিত সত্য যে, মাতৃভাষার অনুশীলন ব্যতীত আমাদের জাতীয় জীবন সম্যকরূপে গঠিত ও প্রস্ফুটিত হইতে পারে না। যাঁহারা বাঙ্গালী মুসলমানের জন্য এক প্রকারের বাঙ্গলা ভাষা এবং বাঙ্গালী হিন্দুর জন্য আর এক প্রকারের বাঙ্গলা ভাষার প্রচলন দেখিতে চান, আমি তাঁহাদের কেহ নহি। আমি বাঙ্গলার হিন্দু এবং বাঙ্গলার মুসলমানদের জন্য এক মিলিত ভাষা চাই। মুসলমানের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার কোনই প্রয়োজন অনুভব করি না।

আমার বক্তব্য এই যে, বাঙ্গলা ভাষার গতি ও প্রকৃতির প্রতি লক্ষ্য

রাখিয়াই সাহিত্যের দিক দিয়া সকল প্রকার সাধনা করিতে হইবে। আমার নিবেদন এই যে, আমরা যেন বাঙ্গলা ভাষাকে অস্বাভাবিক না করিয়া তুলি। বাঙ্গলা সাহিত্যের বুকে ইসলামী ছাপ ফুটাইয়া তুলিতে হইলে ভাবের দিক দিয়াই উহার বিকাশ করিতে হইবে, প্রচুর আরবী-ফারসী শব্দের প্রচলন দ্বারা তাহা সম্ভব হইবে না। আমরা যাহা রচনা করিব তাহা যেন আমাদের প্রতিবেশীরাও অনায়াসে বুঝিতে পারেন সে বিষয়ে আমাদের লক্ষ্য রাখিতে হইবে। নতুবা আমাদের রচিত ভাষা বা সাহিত্য সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য ভাষা বা সাহিত্য বলিয়া পরিগণিত হইবে না।

বাঙ্গালা দেশ যে আমাদের মাতৃভূমি এ বিষয়ে বোধ করি, এখন আর কোন শিক্ষিত মুসলমানের সংশয় নাই। এই মাতৃভূমির ভাষা হইবে এক ও অখণ্ডিত। ইহাকে যাঁহারা খণ্ডিত করিতে চান; আমি তাঁহাদের রুচির এবং দেশপ্রেমের প্রশংসা করিতে পারি না। আমার ভরসা আছে, মাতৃভাষাকে দ্বিধাবিভক্ত না করিয়াও আমরা আমাদের কৃষ্টি, সভ্যতা এবং বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিতে পারিব। উহা বজায় রাখাই আমাদের কাজ,—ভাষাকে দ্বিখণ্ডিত করা নয়।

মুসলমানগণ আজ দুর্দ্দিনের যাত্রী, আমি নিজেও সেই যাত্রীদলের একজন। আমি জানি, আমাদের সম্মুখে কত বাধা ও কত অন্তরায়। বাধা ও অন্তরায়কে পদদলিত করাই পুরুষের কাজ। যুগে যুগে অগণিত মানবমণ্ডলী কত বাধা ও কত অন্তরায়কে অতিক্রম করিয়া নিজেদের গন্তব্যস্থানে গিয়া পৌঁছিয়াছে, কাম্যলাভে সমর্থ হইয়াছে। আমাদের সাহিত্যকে সজীব ও উন্নত করিবার পথে যে সকল বাধা আছে, আমরা নিশ্চয় তাহা অতিক্রম করিয়া বাঞ্ছিত স্থানে গিয়া পৌঁছিতে পারিব—এ বিষয়ে আমি দ্বিধাহীন। হয়ত আপনাদের সম্বন্ধেও আমি বলিতে পারি যে, আপনারাও দ্বিধাহীন।

আমার বক্তব্য শেষ হইয়াছে। এখন আমি সর্ব্বশক্তিমান সর্ব্বদর্শী পরম করুণাময় খোদাতালার নিকটে আপনাদের মঙ্গল প্রার্থনা করিয়া আপনাদিগকে আমার বিনীত সালাম জানাইতেছি।

জন্মগত অস্পৃশ্যতা:—আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় শ্রীযুক্ত রাজগোপাল আচারীয়াকে বলেন 'হিন্দুধর্ম্ম ব্যতীত জগতের কুত্রাপি এইরূপ বর্ণগত কর্ম্ম-নির্দ্দেশ বা অস্পৃশ্যতা নাই। চীনদেশে পঁয়তাল্লিশ কোটি লোকের বাস, সেখানে এ পাপ নাই; ইংলণ্ডে নাই, আমেরিকায় নাই। ইংরেজ ও আমেরিকান লেখকেরা বলেন, বিগত তিন হাজার বৎসরের ইতিহাসে এর কোন দৃষ্টান্ত তাঁহারা খুঁজিয়া পান নাই। সর্ব্বত্র এই দেখি, সকল বর্ণের লোকেই স্ব স্ব ইচ্ছা ও সুযোগ অনুযায়ী সকল কর্ম্মই অবলম্বন করিতে পারে। কোথাও দেখিনা, পুরুষ পরম্পরায় চামার, মেথর বা হাজামের অতলগহ্বরে পড়ে রহিয়াছে। চামার, মেথরের কাজও সব দেশে কেউ ঘৃণ্য বলে মনে করেই না বরং নগরীর উপকণ্ঠে যে সকল কৃষক আছে, তাহারা সাররূপে ব্যবহারার্থ বিষ্ঠা প্রভৃতি নাগরিক দিগের নিকট যাজ্ঞা করিয়া থাকে। আর ভারতে যে চামার, মুচি ডম্বিল সে চিরদিনই চামারই রহিয়া গেল। চামার থেকে রাজ্যে সর্ব্বোচ্চ পদ অধিকার করিয়াছে, এরূপ দৃষ্টান্ত বহু আছে। লয়েড জর্জ্জের বাপ যখন মারা যান, তখন তার বয়স সবে মাত্র তিন। তাকে প্রতিপালনের ভার গ্রহণ করেন তার মামা এই মামাই একজন চর্ম্মকার। সোভিয়েটতন্ত্রের কর্ত্তা ষ্টালিনের পিতা একজন মুচি—চামারও নয় বাল্যকালে ষ্টালিন জুতা সেলাই করিয়া অন্ন সংগ্রহ করিতেন। কোটিপতি মিঃ বাটাও জন্মগ্রহণ করেছিলেন মুচি-গৃহে:ইনি, অল্প দিন মারা গিয়াছেন। আজ এর ছেলে দশ খানি এরোপ্লেনের মালিক। তাই চাপিয়া তিনি সারা পৃথিবী ঘুরিয়া বেড়ান। তারপর জীবাণু বিজ্ঞানের যিনি পত্তন করেন, সেই লুই পাস্তুর জন্মেছিলেন এক দরিদ্র চর্ম্ম পরিষ্কারকের কুটীরে। রবার্ট, ডিউক অব নরম্যাণ্ডি বিবাহ করিয়া ছিলেন এক চর্ম্মকারের কন্যাকে আর তাঁহারই গর্ভে জন্মেছিলেন—উইলিয়ম দি কঙ্কার। মিসনারী উইলিয়াম ক্যারী সাহেব যাকে বাঙ্গলা গদ্য-সাহিত্যের প্রবর্ত্তক বলা যায়, বাল্যকালে মুচির কাজ করিতেন। কি ইংলণ্ড কি আমেরিকা—সর্ব্বত্র এইরূপ-সমাজের সর্ব্বস্তরের লোক ইচ্ছানুরূপে বৃত্তি গ্রহণ করিয়া কালে তত্তৎব্যবসায়ে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে। একমাত্র ব্যতিক্রম এই ভারতে। চামার চিরকালই চামার। বৃহদক্ষরে তাহার দ্বারদেশে লিখিত রহিয়াছে—"যাহারা এ দ্বারপথে প্রবেশ করিবে, তাহাদিগকে চিরতরে সকল উচ্ছাস বিসর্জ্জন দিতে হইবে"। এই পাপ দূর করিতে আমাদিগকে সকল শক্তি নিয়োগ করিতে হইবে।

ছাত্রদের প্রফুল্ল জয়ন্তী:—গত ১০ই পৌষ রবিবার কলিকাতা সিনেট গৃহে অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্রের সপ্ততম জন্মতিথি উপলক্ষে বাঙ্গলার ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষ হইতে আচার্য্যদেবকে অভিনন্দিত করা হইয়াছে এই উপলক্ষে আচার্য্য বলেন,—"প্রতিভাষণ সুরু করিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেছি; কেন না, যিনি সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাকে আপনি সম্বোধন করা যায় কিনা, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। কারণ তিনি আমার প্রিয়তম ছাত্র। আমার সম্বর্দ্ধনা সভায় যাঁহারা নীলরতন ধরকে সভাপতির আসন প্রদান করিয়াছেন, তাঁহাদের বুদ্ধির প্রশংসা করি। কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে আমি নীলরতনকে প্রথম দেখি। তখনই তাঁহার মৌলিক গবেষণার তথ্য আমাকে মুগ্ধ করিয়াছিল। আমি আজ আমার অশেষ কৃতী ছাত্রদের প্রতিভার কাছে ম্লান হইয়া গিয়াছি। "পুত্রাৎ শিষ্যাৎ পরাজয়ম্" ইহার চেয়ে আমার আর কি গৌরবের কথা আছে! আমি তাহাদের দেখিয়া

যাই, সেইখানেই আমার এই প্রতিভাদীপ্ত ছাত্রদের দর্শন করিয়া হৃদয়ে অপার আনন্দ লাভ করি। আমি ইঁহাদের প্রতিভার মধ্য দিয়াই বাঁচিয়া থাকিতে চাই।

এখানে আজ যে সকল ছাত্র-ছাত্রী আগমন করিয়াছেন, তাঁহারা হয়ত মনে এই কথা ভাবিয়া অভিযোগ করিতে পারেন যে, আমি কেবল আমার রসায়নবিদ্ ছাত্রদের কথাই বলিতেছি। তাঁহাদের অভিযোগের উত্তরে আমার বক্তব্য এই যে, আমি ভ্রমক্রমে রাসায়নিক হইয়া পড়িয়াছি। আমার সাহিত্য ভাল লাগে বেশী এবং এখনও গলস্ওয়ার্দি, টমাস হার্ডি প্রভৃতি ইংরেজী সাহিত্যরথীদের গ্রন্থ আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়া থাকি। কাজেই আমার সাহিত্য-বিভাগের ছাত্রদের প্রতি আন্তরিক মমত্ব আছে।

"আজকাল দেখা যাইতেছে যে, আই-সি-এস, একাউন্টেন্সী প্রভৃতি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় বাঙ্গালী দিনের পর দিন হাটিয়া যাইতেছে। পাশ যদি করে ত বড় জোর একজন। আমার মনে হয় আর কতিপয় বৎসর পরে আর একটী বাঙ্গালীও ঐ সকল বিভাগে দেখিতে পাইব না। যদি বুঝিতাম, বাঙ্গালী ছেলেরা চাকুরী চাহে না,—ব্যবসায়ের দিকে ঝুকিয়া পড়িতেছে, তবু শান্তি পাইতাম, কিন্তু সত্য ব্যাপার তাহা নয়। বাঙ্গালী ব্যবসায়ে অনগ্রসর। তাঁহাদের যে অন্নচিন্তা চমৎকারা। যাঁহারা মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী বুদ্ধিমান, তাঁহারা অধিকাংশই দারিদ্র্যপীড়িত। তাঁহাদের যখন দেখি, তখন আমার মুখ শুকাইয়া যায়। দৈন্য ইঁহাদের সমগ্র গুণরাশি গ্রাস করিয়াছে।

"মহাত্মা গান্ধী যে তারের সংবাদ প্রেরণ করিয়াছেন, তাহাতে তিনি অনুযোগ করিয়াছেন যে, তিনি কার্য্যসূচী প্রাপ্ত হন নাই ও উহাতে অস্পৃশ্যদের ক্লেশ মোচনের উপযোগী কোন কার্য্যক্রম আছে কিনা। দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, সমাজ সংস্কারে বাঙ্গালী ছাত্রেরা বড়ই উদাসীন। তাঁহাদের এই উদাসীনতা আমার অন্তরে ব্যথা দেয়। আজ কারারুদ্ধ মহাপ্রাণ মহাত্মার আবেদন যেন তোমাদের কাছে ব্যর্থ না হয়। মনে রাখিবে, এই অস্পৃশ্যতা পরিহার ভিন্ন মাতৃভূমির স্বরাজ সুদূরপরাহত।

"বাঙ্গলা দেশের বিশেষত্ব এখনও নিঃশেষ হইয়া যায় নাই, এখনও তোমরা আছ। দেশের মৃতপ্রায় শিল্প, পরকরতলগত বাণিজ্য, অনুন্নত কৃষি তোমাদেরই তারুণ্যদীপ্ত মুখশ্রীর পানে তাকাইয়া আছে। তোমাদের অক্লান্ত উদ্যমের উপর সকল নির্ভর করে। তোমরা দেশের তরুণ-তরুণী—অনাগত যুগের গৌরবপূর্ণ পথ রচনার দায়িত্ব তোমাদেরই। আমি বৃদ্ধ জীর্ণ মানুষ, এই মাতৃভূমিকে তোমাদের যুবকদের কর্ম্ম-দীপ্তিতে দীপ্ত দেখিতে চাই। আজ যে অপূর্ব্ব মানপত্র তোমরা আমায় দিয়াছ, তাহা আমার জীবনের শেষক্ষণ পর্য্যন্ত স্মরণ রাখিব। ইহা আমার অহঙ্কারের জিনিষ। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, মঙ্গলময়ের চির কল্যাণ-আশীর্ব্বাদ যেন—হে, বাঙ্গলা দেশের আমার প্রিয়তম তরুণ-তরুণী সম্প্রদায়, তোমাদের শিরে বর্ষিত হয়, তোমাদের সকল শুভবুদ্ধি, শুভ চেষ্টা যেন সফল হয়, এই প্রার্থনা।"

শান্তিনিকেতনে মালব্যজী ঃ—গত ২রা ডিসেম্বর মালব্যজী শান্তিনিকেতনে আসেন। রবীন্দ্রনাথ মালব্যজীকে অভিনন্দন করিয়া বলেন।

"বন্ধু, সর্ব্বজনবন্ধু, ভারতবর্ষ যে দেবতাকে বলেচেন, এষ দেবো বিশ্বকর্ম্মা মহাত্মা, সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ সেই সর্ব্বজনের হৃদয়বাসী পরম দেবতার উপাসনায় তুমি আজ পৌরহিত্য পদ গ্রহণ করেচ, আমি তোমাকে অভিবাদন করি।

তুমি ব্রাহ্মণ, সর্ব্ববর্ণকে সম্মানিত করবার উদার অধিকার তোমার, সেই অধিকারকে তুমি অসঙ্কুচিত অধ্যবসায়ে স্বীকার করেচ, ভারতে ব্রাহ্মণকে ধন্য করেচ, ব্রাহ্মণ্যকে সত্য করেচ, তোমাকে অভিবাদন করি।

আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে আছে,

সুখং হ্যবমতঃ শেতে সমুঞ্চ প্রতিবুদ্ধ্যতে,
সুখং চরতিলোকেঽস্মিন্ হ্যবমন্তা
বিনশ্যতি।

ভারতে আমরা দীর্ঘকাল মানুষকে অবমানিত করেছি, তাকে হীন করে রেখেছি, সেই পাপে আমরা বিনাশের পথে চলেছিলুম, সেই পাপ মোচন করে' বিনাশের থেকে দেশকে রক্ষা করবার চেষ্টায় তুমি প্রবৃত্ত তোমাকে আমি অভিবাদন করি।

সংসারে পাণ্ডিত্য দুর্ল্লভ নয় যে পাণ্ডিত্য আক্ষরিক। তুমি ভারতের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাকে আত্মায় গ্রহণ করেচ, সেই বিদ্যার প্রভাবে দেশকে মোহমুক্ত করবার জন্য তোমার উদ্যম, সেই বিদ্যাকে তুমি মানব ইতিহাসে ফলশস্যশালী করে তুলবে, তোমাকে অভিবাদন করি।

দেশে একদা শিক্ষার ক্ষেত্র তুমি প্রসারিত করেছ আজ তুমি ভারতের স্বরাষ্ট্রের পথকে প্রশস্ত করবার জন্য তোমার অসামান্য শক্তিকে নিযুক্ত করেচ। রাষ্ট্রপতির ইচ্ছা তোমার চেষ্টার সমর্থন না করাতেও পারে, কিন্তু যে সাধনা মহতী ব্যর্থ হলেও তা দেশের লোকের পক্ষে চির সম্পদ, সেই সম্পদ থেকে কোন প্রতিকূলতা দেশকে বঞ্চিত করতে পারবে না। তোমাকে অভিবাদন করি।

সমস্ত ভারতবর্ষের নামে এখানে আমরা তপস্যা ক্ষেত্র রচনা করেছি। দেশের চিত্তকে স্বকৃত ও পরকৃত সকল প্রকার বন্ধন থেকে মুক্ত করব, এই আমাদের সংকল্প। আমাদের অল্প শক্তিতে এই সংকল্প সমস্ত বিরুদ্ধতা অতিক্রম করে সম্পূর্ণ সিদ্ধিলাভ করবে কিনা জানি না। কিন্তু দুঃসাধ্যতার ভয়ে চেষ্টামাত্র না করলে যে অগৌরব ঘটত, তার থেকে উদ্ধার পাবার জন্য দীর্ঘকাল সকল

প্রকার আঘাত-ব্যাঘাত, বিদ্রূপ ও বিমুখতার সঙ্গে সংগ্রাম করে এসেছি। হে কৃতী যশস্বী আজ আমাদের সেই সাধনার ক্ষেত্র তোমার প্রসন্ন আগমনের দ্বারা সার্থক হোলো, তোমাকে আমি অভিবাদন করি।"

অতঃপর মালব্যজী পল্লীবাসী বিপুল জনসঙ্ঘকে লক্ষ্য করিয়া নিম্নলিখিত বক্তৃতা দেন।

"শান্তিনিকেতনে আসিবার জন্ম আমার বহুদিন হইতে ইচ্ছা ছিল। মহর্ষির ইহা সাধনার স্থল। তাঁহার কৃতীপুত্র জগদ্বিখ্যাত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহর্ষির সেই সাধনাকে আরও ব্যাপক করিয়া ভারতের পক্ষে একটি বিরাট কল্যাণকর প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিয়াছেন। এই শ্রীনিকেতনও তাঁহারই গড়া। পল্লী-কল্যাণের জন্ম এখানে যে বিরাট আয়োজন হইয়াছে, তাহার বিভিন্ন বিভাগগুলি দেখিয়া আমি অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়াছি। আপনারা চারিদিকের গ্রাম হইতে এখানে আসিয়াছেন। শ্রীনিকেতনের সহযোগিতায় আপনারা গ্রামগুলিকে স্বর্গে পরিণত করুন। শাস্ত্রে আছে 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।" আপনারা আপনাদের প্রত্যেকের গ্রামকে স্বর্গের মত সুখকর ও রমণীয় করিতে পারেন। এই সংগঠন কার্য্যে সকলকে সম্মিলিত হওয়ার জন্ম আমি অনুরোধ করি। গ্রামের ভিতরে যাহারা অবনত সম্প্রদায় রহিয়াছে, তাহাদের সেবায় প্রবৃত্ত হউন তাহাদিগকে মানুষ করিয়া তুলুন। মনে রাখিবেন, আমাদের যে দুটি হাত আছে, তার একটা যদি অবশ হয়, তবে কাজ করিবার শক্তি কমিয়া যাইবে। অতএব যাহারা অবনত তাহারা মানুষ না হইলে আমরা চিরকাল দুর্ব্বল থাকিয়া যাইব। হাতের পাঁচ আঙ্গুল তার সবগুলি সুস্থ থাকিলে যে জোর পাই, চারিটি আঙ্গুলে সে জোর পাই না। হিন্দু-মুসলমান, খৃষ্টান সকলকে নিয়াই জাতি। মুসলমানের খোদা, খ্রীষ্টানের God ও হিন্দুর পরমাত্মা বিভিন্ন নহে। আমরা সকলেই সেই একের সন্তান এবং এই একই দেশে বাস করিতেছি। অতএব এ সকল ভেদ বিভেদ ভুলিয়া গিয়া আমাদিগকে মিলনের সাধনায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে, তাহা হইলেই আমরা সিদ্ধিলাভ করিতে পারিব।"

হিন্দুস্থান আমাদের স্বদেশ :—পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি বিতরণোৎসব উপলক্ষে লেপ্টেনেন্ট কর্ণেল স্যার হাসান সুরবর্দী ছাত্রদিগকে বলেন :—তোমাদের দেশের সম্মুখে ভবিষ্যৎ অতি গুরুত্বপূর্ণ, যে সময় তোমরা সংসারে প্রবেশ করিতেছ। শাসনতন্ত্রের বিরাট পরিবর্ত্তন হইতেছে, দেশের সন্তানদের হস্তে অধিকতর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অর্পিত হইতেছে। বহুযুগের আচার ও সামাজিক প্রথার পরিবর্ত্তন হইতেছে। আর্থিক ও শিল্পজগতে ভীষণ বিপর্য্যয় আসিতেছে। এ সময় মাতৃভূমির ভবিষ্যৎ গঠনে তোমাদের অনেক করণীয় থাকিবে। আমাদের সম্মুখে যে কার্য্য আসিতেছে, তাহাতে যাহাতে তোমরা উপযুক্ত অংশ গ্রহণ করিয়া দেশের প্রতি কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিতে পার, তজ্জন্য তোমাদিগকে জাতীয় সমুন্নতির পথগুলি পরিষ্কারভাবে জানিয়া রাখিতে হইবে।

সামাজিক পরিবর্ত্তন :—অস্পৃশ্যতা, পর্দাপ্রথা, বাল্য-বিবাহ, জাতিভেদ প্রভৃতি বিষয় ভবিষ্যৎ উন্নতির পরিপন্থী—যাহা মানুষে মানুষে ভেদ সৃষ্টি করে তাহা গণতন্ত্রের সহায়ক হইতে পারে না। তরুণ তরুণীগণ, আমি তোমাদিগকে অনুরোধ করি যে, এই সমস্ত গুরু বিষয়ে তোমরা মনোনিবেশ করিবে। একটা বিষয়ে তোমাদিগকে সাবধান করিয়া রাখিতেছি। যে আদর্শ পাশ্চাত্যের জীবনধারাকে নিয়ন্ত্রিত করে, সে আদর্শ যদি না গ্রহণ করিতে পার, তবে পাশ্চাত্যের বাহ্য অনুকরণ করিতে যাইও না। পাশ্চাত্যের অনেক জিনিষ আছে যাহা গ্রহণ করিলে আমাদের মঙ্গল হইতে পারে, কিন্তু তোমাদের প্রাচীন ভাবধারা এবং সভ্যতাকেও সম্মান ও শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে হইবে। যদি তাহা কর, তাহা হইলেই তোমরা নিজেদের বৈশিষ্ট্য ও সত্তা বজায় রাখিতে পারিবে। আমাদের প্রাচীন বনিয়াদের উপর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের উৎকৃষ্টতম উপকরণ মিলাইয়া সুন্দর সুদৃঢ় সৌধ গঠন করা মাত্রই কঠিন নহে।

রাজনৈতিক অশান্তি :—শিক্ষিত লোকদের মধ্যে রাজনৈতিক অশান্তির কথা আলোচনা করিয়া বক্তা বলেন যে, বেকার সমস্যা এই অশান্তির একটা কারণ। তবে কিনা বক্তার সুদৃঢ় অভিমত এই যে, পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে বিদ্যার্থীদের দেহ মন সম্যক পুষ্টিলাভ করিতে পারে না বলিয়াই এই অশান্তির সৃষ্টি হইয়াছে।

সাম্প্রদায়িক ঐক্য :—গত কয়েক বৎসর এদেশে যে ভীষণ সাম্প্রদায়িক কলহ চলিতেছে তাহাতে আমার মনে হয় যে, শিক্ষার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইয়াছে। উদার এবং আত্মবিশ্বাসে আস্থাবান নাগরিক সৃষ্টি করাই বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য। অজ্ঞতার অন্ধকার দূর করিয়া সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামি হইতে মুক্ত করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য, সুতরাং আমাদিগকে স্বতন্ত্রতা, সঙ্কীর্ণতা এবং স্বার্থপরতা পরিহার করিতে হইবে। তোমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতবিদ্য ছাত্রগণ, হিন্দু, মুসলমান, শিখ সকলেই এক উৎস হইতে জ্ঞানলাভ করিয়াছ। একসঙ্গে খেলা-ধূলা করিয়াছ, তোমাদের মধ্যে বন্ধুভাব সৃষ্টি হইয়াছে, তোমরা কি তোমাদের আদর্শ লাভের জন্য হাত ধরাধরি করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে পার না?

আমরা সকলেই সমান, এই বোধ যদি না থাকে, তবে প্রকৃত বন্ধুত্ব হইতে পারে না। জাতিভেদের অত্যাচার দূর না করিতে পারিলে প্রকৃত বন্ধুত্ব অসম্ভব। যাহারা শিক্ষিত এবং যাহাদের আর্থিক অবস্থা ভাল, তাহারা যদি অশিক্ষিত অনুন্নতদের শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দেয়, তাহা হইলে মানবজাতির মহা কল্যাণ হইবে।

প্রত্যেক সম্প্রদায়ের কর্ত্তব্য অপর সম্প্রদায়কে নিজ বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিতে দেওয়া। এক সম্প্রদায়ের উচিত নহে অপর সম্প্রদায়কে

দলিত করিয়া রাখা, বরং যাহাতে সে তাহার নিজস্ব কৃষ্টি অনুযায়ী গড়িয়া উঠিতে পারে, সে চেষ্টা করাই কর্ত্তব্য। বিভিন্ন বর্ণ ও গন্ধের ফুলরাজি যেমন উদ্যানের শোভা করিয়া থাকে, সেরূপ বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের ছাত্রগণও ভারতোদ্যানের শোভাবর্দ্ধন করুক।

কবির ভাষায় আমি বলি—যাত্রা সুরু হইয়াছে; গন্তব্যস্থল এখনও বহুদূর। পথের বিঘ্ন অনেক, কষ্ট অনেক।

সঙ্কীর্ণতা ও ঈর্ষার সময় ইহা নহে।

এখন আমাদের মিলিত হইয়া সমবেত কণ্ঠে বলা উচিত—"আমরা হিন্দী, হিন্দুস্থান আমাদের মাতৃভূমি।"

এস আমরা বিভেদ ভুলিয়া এক হই, আমাদের মধ্য হইতে যাহারা বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, তাহাদিগকে একত্র করি, 'তুমি' ও 'আমি'র ভেদ ভুলিয়া এক হই। মায়ের মন্দিরে সকলকে ডাক, সে ডাকে মন্দিরের ব্রাহ্মণের গীতের সহিত মুয়াজ্জিনের কণ্ঠ মিশ্রিত হউক।

প্রেমের আগুন বিভেদের সমস্ত উপকরণ দগ্ধ করিয়া সমস্ত সম্প্রদায়কে এক করুক।

ধর্ম্ম অপরকে অবিশ্বাস করিতে বা হিংসা করিতে শিক্ষা দেয় না, আমরা সকলেই ভারত মাতার সন্তান, হিন্দুস্থান আমাদের সকলেরই মাতৃভূমি।

আমাদের সুর ও স্বর পৃথক হইতে পারে, কিন্তু সকলেই যেন মাতৃভূমির প্রেমে অনুপ্রাণিত হইয়া গান করি।

নিখিল ভারত নারী সম্মেলন :—নিখিল ভারত নারী সম্মেলনের শেষ অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। এই অধিবেশনে কৃত্রিম উপায়ে জন্মনিরোধ, ব্যবস্থাপক সভাসমূহে নারীদের প্রতিনিধিত্ব ও শ্রমিকগণের আর্থিক উন্নতি সম্পর্কে প্রস্তাব গৃহীত হয়। কৃত্রিম উপায়ে জন্মনিরোধ সম্পর্কে সভায় তুমুল বিতর্ক উপস্থিত হইলে কয়েকজন প্রতিনিধি উহা পাপের কার্য্য বলিয়া ঘৃণা প্রকাশ করেন। জনসাধারণের দারিদ্র্যের পক্ষে বহু সন্তান ভয়াবহ বলিয়া ডাঃ মাথুলক্ষ্মী উক্ত প্রস্তাব গ্রহণ করিবার জন্য সদস্যগণকে অনুরোধ করেন। অতঃপর বহুসংখ্যক ভোটে প্রস্তাবটী গৃহীত হয়। সম্পত্তি, চাকুরী ও বেতন সম্পর্কে পুরুষের সহিত সম অধিকার দাবী করিয়া এবং জন্মনিরোধ, বিবাহবিচ্ছেদ ও মাতৃত্বের জন্য নারীর বিশেষ ব্যবস্থার দাবী করিয়া সভায় স্ত্রীস্বাধীনতা সঙ্ঘ কর্ত্তৃক একখানি ইস্তাহার বিতরণ করা হয়।

বোম্বাইয়ে মহিলাদের এক বিরাট সভায় লেডি শীতলাবাদ সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করেন, হরিজনদিগকে দেবমন্দিরে প্রবেশ অধিকার দান করিবার জন্য ডাক্তার সুব্বারায়ান মাদ্রাজ ব্যবস্থাপক সভায় যে বিল উপস্থিত করিতে চেষ্টা করিতেছেন, তাহা উপস্থিত করিবার জন্য অবিলম্বে তাঁহাকে অনুমতি দানের নিমিত্ত বড়লাটকে অনুরোধ করিয়া সভায় একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রস্তাবে বলা হয়, উক্ত বিলে যে সংস্কারের প্রচেষ্টা করা হইয়াছে, সে সংস্কার বহুপূর্ব্বেই করা উচিত ছিল, হিন্দুদের মধ্যে অনেকেই ঐরূপ আইন সমর্থন করেন। এই সম্বন্ধে নারী সমাজের মত জানাইবার জন্য বড়লাটের নিকট মহিলাদের একটি ডেপুটেশন প্রেরণ করা হইবে এরূপ স্থির হইয়াছে।

মহাত্মার উপবাস :—গুরুবায়ুরের ভোট গ্রহণ প্রণালী বিস্তারিত বর্ণনা করিয়া মহাত্মা গান্ধী বলেন, যেদিক দিয়াই ঐ ভোটাভুটি বিচার করা যায় না কেন, অধিকাংশ বর্ণ-হিন্দুই যে হরিজনদিগকে দেব-মন্দিরে প্রবেশ করিতে দিবার পক্ষে, তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। ইহাতেই প্রমাণ হইবে, গুরুবায়ুর মন্দিরে প্রবেশাধিকারীদের অধিকাংশই হরিজনদিগকে সেই অধিকার দানের পক্ষপাতী—মিঃ কেলাপ্পানের এই কথা সত্য। গবর্ণমেণ্ট বলিয়াছেন, ডাঃ সুব্বারায়ণের বিলে বড়লাটের সম্মতিলাভ করিতে ১৫ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত সময় লাগিবে, সুতরাং ২রা জানুয়ারী তারিখে যে প্রায়োপবেশন অবলম্বনের কথা ছিল, তাহা অনির্দ্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত রহিল অন্ততঃ বড়লাটের ঘোষণার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রয়োপবেশন আরম্ভ হইবে না। মিঃ কেলাপ্পানও ইহাতে মত দিয়াছেন।

শাস্ত্রানুসারে অস্পৃশ্য কাহারা!

অস্পৃশ্যতা শাস্ত্রানুমোদিত কি শাস্ত্র বিরোধী তদ্বিষয়ে মহাত্মাজীর সহিত শাস্ত্রীয় তর্ক করিতে যে সকল শাস্ত্রী ও পণ্ডিত এস্থানে আসিয়াছেন মহাত্মাজী তাঁহাদের উপর একটি কাজের ভার চাপাইয়া দিয়াছেন। হরিজনদিগকে মন্দিরে প্রবেশাধিকার দানের পক্ষপাতী ও তাহার বিরোধী উভয় পক্ষীয় শাস্ত্রীদিগকেই তিনি নিম্নলিখিত দশটি প্রশ্নের উত্তর দানের নিমিত্ত অনুরোধ করিয়াছেন :—

(১) শাস্ত্রানুসারে অস্পৃশ্যতার সংজ্ঞা কি?

(২) শাস্ত্রোক্ত সংজ্ঞানুসারে আধুনিক তথাকথিত অস্পৃশ্যদিগকে 'অস্পৃশ্য' আখ্যায় অভিহিত করা যায় কি না?

(৩) অস্পৃশ্যগণের প্রতি শাস্ত্রে কি কি বিধি-নিষেধ বিহিত আছে?

(৪) কোনও অস্পৃশ্য কি ইহজীবনে অস্পৃশ্যতা-মুক্ত হইতে পারে?

(৫) অস্পৃশ্যগণের সহিত স্পৃশ্যগণের আচরণ সম্পর্কে শাস্ত্রোক্ত বিধান কি?

(৬) কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে অস্পৃশ্যগণের দেবমন্দিরে প্রবেশ শাস্ত্রানুমোদিত?

(৭) শাস্ত্র কাহাকে বলে?

(৮) শাস্ত্রসমূহের প্রামাণ্যতা নিরূপণের উপায় কি?

(৯) শাস্ত্রানুশাসনের পরস্পর বিরোধী সংজ্ঞা এবং ব্যাখ্যার সামঞ্জস্য বিধানের উপায় কি?

(১০) আপনার ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত কি?

শাস্ত্রীদের মুখপাত্র তর্কতীর্থ লক্ষ্মণ শাস্ত্রী অস্পৃশ্যগণের মন্দির প্রবেশ সমর্থন করিয়া বলেন, বর্ত্তমান জগতে যাহাদিগকে অস্পৃশ্য বলা হয়,

উহারা প্রকৃত শাস্ত্রোক্ত অস্পৃশ্য নহে, স্মৃতিতে দুই শ্রেণী অস্পৃশ্য আছে, "মহাপাতকী" অর্থাৎ নিকৃষ্ট শ্রেণীর পাপী, দ্বিতীয় জন্মগত অস্পৃশ্য অর্থাৎ চণ্ডাল, ভেনা, ভিপভেনা; যবন ও অপর সকল "অন্ত্যজ"গণ। এই দুই শ্রেণীর লোককে অস্পৃশ্য বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। কেন না, উহারা আচার ব্যবহারে অপরিষ্কার, অপরিচ্ছন্ন, নৈতিকতার দিক হইতে দুর্ব্বল ও অসাধু উপায়ে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহে অভ্যস্ত, জাতির অপর সকল অংশকে নিরাপদ রাখিবার উদ্দেশ্যে উহাদিগকে স্বতন্ত্র করিয়া রাখার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। বর্ত্তমানে অপরাধপ্রবণ জাতিদের সম্বন্ধে যেরূপ ব্যবস্থা প্রচলিত রহিয়াছে উক্ত 'অন্ত্যজ' ও 'মহাপাতকীদের সম্বন্ধেও অতীতকালে শাস্ত্রকারগণ তদ্রূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। অপরাধপ্রবণ জাতিরগণকে শিক্ষা দান করিয়া যেমন সংস্কৃত করা সম্ভবপর উক্ত অস্পৃশ্যগণকেও তদ্রূপ উহাদের অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্নতার ও অসাধু উপায়ে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের পথ হইতে ফিরাইয়া আনিয়া স্পৃশ্য করা যাইতে পারে। অস্পৃশ্যের যে সংজ্ঞা শাস্ত্রে প্রদত্ত হইয়াছে বর্ত্তমানকালের অস্পৃশ্যগণের সম্বন্ধে উহা প্রযুক্ত হইতে পারে না। অতএব অস্পৃশ্যগণের সম্পর্কে শাস্ত্রে যে সকল বাধা নিষেধ প্রযুক্ত রহিয়াছে উহা বর্ত্তমানকালীন তথা কথিত অস্পৃশ্যগণের সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইতে পারে না—কাজেই উহাদিগকে মন্দিরে প্রবেশ করিতে দেওয়া যাইতে পারে। মহাত্মার নবম প্রশ্নের উত্তরে পণ্ডিত লক্ষণশাস্ত্রী বলেন, যে ব্যাখ্যা সত্য ও নৈতিকতার মূল ভিত্তির বিরোধী ; হিন্দুশাস্ত্র উহা কখনও অনুমোদন করে না।

দোকানদারী আভ্যাস কর :—গত বুধবার "কমার্শিয়াল হস্পিটাল ফর অন্‌এম্প্লয়মেণ্টের" প্রথম বাৎসরিক সভায় শ্রীযুত জে, এন্, বসু এম, এল, সি সভাপতি বলেন যে, ভারতে ব্রিটিশের রাজনৈতিক ও ব্যবসায় বাণিজ্য বিষয়ক স্বার্থের সৃষ্টির প্রারম্ভেই এদেশে কতকগুলি আফিস খোলা হয় এবং এই সমস্ত আফিসের কাজ চালাইবার জন্য অতি সামান্য লেখাপড়া জানিলেই চলিত। এই হেতু ৫০।৬০ বৎসর পূর্ব্বে যে ব্যক্তি সামান্য ইংরেজী লেখাপড়া জানিতেন, তিনিই বেশ ভাল বেতনের চাকুরী পাইতেন। কিন্তু কালক্রমে অবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। চাকুরীর ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ ; কিন্তু চাকুরীপ্রার্থীর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়ায় অবস্থা ক্রমেই গুরুতর হইতেছে। তাই আজ এই দারুণ বেকার সমস্যায় সমস্ত দেশবাসী সন্ত্রস্ত। আমাদের দুর্ভাগ্য যে আজও দেশে জীবিকা অর্জ্জনের জন্য অতি অল্পই নূতন পন্থা দেখা যায়। পুরাতন পন্থা, যেমন, আইন, চিকিৎসা ও শিক্ষা বিভাগ ইত্যাদিতে ইতিপূর্ব্বেই বহুসংখ্যক লোক হইয়াছে। এই সমস্ত কারণেই আজকালকার একজন শিক্ষিত যুবকের পক্ষে নিজের জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য কোন কাজ পাওয়া দুষ্কর হইয়াছে। আমাদের সম্মুখে আজ যে গুরুতর অন্নসমস্যা উপস্থিত, তাহার সমাধান করিতেই হইবে, নচেৎ আমাদের সামাজিক ও জাতীয় শক্তি ধ্বংস হইয়া যাইবে। আমাদিগকে এখন জীবিকা উপার্জ্জনের নূতন পথ আবিষ্কার করিতে হইবে। এই কার্য্যের জন্য আমাদিগকে দেশের যাবতীয় সম্ভবপর বিষয় ও উপায়ের প্রতি মনোযোগ দিতে হইবে। কুটীর-শিল্পের পুনরুজ্জীবনের সঙ্গে সঙ্গেই কি করিয়া উহাদের উন্নতি করা যায় এবং লাভজনক ব্যবসায় হিসাবে এই প্রতিযোগিতার বাজারে উহাদের প্রচার বৃদ্ধি করা যায় তাহার পথ বাহির করিতে হইবে। অতীব দুঃখের বিষয় এই যে, বাঙ্গলার ব্যবসায় ও শিল্পের বাজারে উদ্যমশীল বাহিরের লোক আসিয়া বাঙ্গলাকে শোষণ করিয়া নিতেছে। এই ধ্বংসের হাত হইতে দেশকে রক্ষা করিবার জন্য আমাদিগকে প্রথমে পাকা দোকানদার হইতে হইবে। স্বভাবতঃই বাঙ্গালীর ব্যবসায় বুদ্ধি কম। আমাদের নির্ব্বিকার ভাব দূর করিতে হইবে এবং ব্যবসায় ও দোকানদারীকে আমরা যে দৃষ্টিতে দেখি সেই বিভিন্নতা দূর করিতে হইবে এবং জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য এইগুলি বিপুল উৎসাহে গ্রহণ করিতে হইবে।

ভারত ও জাপানের যোগসূত্র

বিখ্যাত জাপানী চিত্রকর শ্রীযুক্ত কোসেৎসু নসু সারনাথের মূলগন্ধকুটি বিহারের প্রাচীরগাত্রে বৌদ্ধচিত্র অঙ্কিত করিবার জন্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কলিকাতায় জাপানের প্রধান রাজদূত মিঃ হারা নিপ্পণ ক্লাবে এই বিখ্যাত চিত্রকরকে এক প্রীতিসম্মেলনে আপ্যায়িত করেন। এতদুপলক্ষে কবি-সম্রাট শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন—"তিনি যখন জাপানে ছিলেন, তখন যে আতিথ্য তথায় লাভ করিয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, পৃথিবীর বৃহৎ সভ্যতাগুলি বৃহৎ নদীর মত। এই সমস্ত নদী দূরদূরান্তের দেশগুলির মধ্যে ঘনিষ্ঠ সংযোগ সাধন করিয়া সম্পর্ককে নিবিড়তর করিয়া তোলে এমন এক সময় ছিল, যখন ভারতের শ্রেষ্ঠ মণীষিগণ সমগ্র এশিয়া ভূখণ্ডে ভ্রমণ করিয়া প্রেম ও সত্যের বার্ত্তা প্রচার করিয়াছিলেন। সেই সময়েই জাপান জননী ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক সংস্পর্শের নিকটবর্ত্তী হয়। ইতিহাসের সেই গৌরবময় যুগ শতাব্দীর অন্ধকারের মধ্যে স্তিমিত হইয়া আসিয়াছে, কিন্তু প্রেমের যে শিখা প্রজ্জ্বলিত হইয়াছিল, তাহা এখনও নির্ব্বাপিত হয় নাই। কবিবর যখন জাপানে ছিলেন, তখন তিনি উপলব্ধি করিলেন যে, জাপান ও ভারতবর্ষের সেই মানবতার চৌহদ্দি এখনও লুপ্ত হয় নাই। পৃথিবীর সমস্ত ধর্ম্মের ভিতরই এমন জীবন্ত মানব হৃদয়ের সৃষ্টি হইয়া থাকে, যাহা সংস্কার ও আচারের প্রাণহীন গণ্ডীর ভিতর চিরকাল আবদ্ধ থাকিতে পারে

না। তিনি জাপানে অবস্থানের সময় লক্ষ্য করিয়াছেন যে, সেই ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন যদিও বাহ্যিকভাবে জাপানের একথা বিশেষরূপ গ্রহণ করিয়াছে, তথাপি তাহা বর্ত্তমান সময়েও জীবন্ত ধর্ম্মের মত বাঁচিয়া রহিয়াছে। জাপান ভারতবর্ষ হইতে যাহা পাইয়াছিল, তাহা সে কোনমতে অন্ধের মত অনুকরণ করে নাই, পরন্তু সে এই ধর্ম্মকে স্বকীয় রূপের মধ্যে ধর্ম্মান্তরিক করিয়া লইয়াছিল।

জাপানীরা তাঁহাকে প্রথমতঃ একজন নোবেলপুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরূপেই জানিতেন, কিন্তু তাহাতে তিনি সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। একদিন সকাল বেলা তিনি কোবে সহরে অবস্থানের সময় দেখিলেন, প্রভাতের আলো তাঁহার গৃহ বাতায়নে প্রবেশ করিয়াছে এবং সেই আলোকে তিনি চাহিয়া দেখিলেন, কয়েকজন সাধারণ শ্রেণীর জাপানী নারী তাঁহার সমক্ষে নতজানু হইয়া তাঁহাকে সম্মান দেখাইতেছে। তিনি এই সমস্ত সাধারণ রমণীর মধ্যে প্রাচীন যুগের সেই বিস্মৃত স্মৃতিকে অনুভব করিলেন। যে দেশে তাহাদের প্রভু বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এই নারীগণ, অর্থাৎ জাপানের ধীবরগণ সেই দেশের ভাবধারাকে উপলব্ধি করিয়াছে এবং এই জন্যই তাঁহার ব্যক্তিত্বের প্রতি তাহারা শ্রদ্ধা দেখাইতেছিল। তাহাদের এই সহানুভূতির পশ্চাতে ভারতের পূর্ব্বপুরুষদের সৃষ্টি ইতিহাসের ভাবধারা রহিয়াছে এবং সেই ভাবধারা হইতেছে সত্য ও প্রেমের অমর বার্ত্তা। ভারতবর্ষ ও জাপানের মধ্যে যে সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল, তাহা ভৌগলিক সম্বন্ধ নহে, তদপেক্ষা গভীরতর এবং বৃহত্তর এই সম্পর্ক। ইহা বৃহত্তর ভারতের আধ্যাত্মিক ইতিহাসের সম্পদ, কিন্তু কালক্রমে নানা বিপর্য্যয়ের মধ্যে ভারতবর্ষ ইহা বিস্মৃত হইয়াছে। যেদিন সমগ্র পূর্ব্ব এশিয়া ভারতের ঘনিষ্ঠতর সম্পর্কের মধ্যে আসিবে, সেদিনও ইতিহাসের এই স্মরণীয় ঘটনা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গৌরবজনক ঘটনারূপে প্রতিভাত হইবে।

কিন্তু আবার কি সেই যুগ ফিরিয়া আসিবে? সম্ভবতঃ নয়। আজিকার সময় তাহার অনুকূল নহে, আজিকার জীবনধারা জটিল হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু সেই প্রাচীন যুগে মানুষ সহজভক্তির দ্বারা অনুপ্রাণিত হইত এবং সত্যকে তাহারা শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সহিত গ্রহণ করিত। তবে বর্ত্তমান যুগে বিজ্ঞান তাঁহাদিগকে পরস্পরের সান্নিধ্যে আনয়ন করিয়াছে। মানবতার সেই সহানুভূতি সম্পর্ক অনুশীলনের সুযোগ তাঁহারা পাইয়াছেন। একদিন তাঁহারা হয়তো পরস্পরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিবেন,—"বন্ধু চিনিতে পার কি," তখন তাঁহারা হয়তো উপলব্ধি করিবেন যে, তাঁহারা জন্মিবার পূর্ব্বেই তাঁহাদের পরস্পরকে চিনিতেন।

প্রিয়া

শ্রীকর্ম্মযোগী রায়

বসন্তের অর্থ বুঝি প্রিয়তমে হেরি রূপ তব
যে রূপে নীলিমা ভোলে অরুণের বর্ণে অভিনব !!
তারি সম বুঝি আমি ঐ তব মুগ্ধ দৃষ্টিখানি
সব অশ্রু হাসি হয়, সব ব্যথা হ'য়ে ওঠে বাণী
তোমারে নেহারি যবে, আজ বুঝি অতন্দ্র আকাশে
কেন ওঠে লক্ষ তারা, হেমন্তের হিমেল বাতাসে।

কেন ওঠে দীর্ঘশ্বাস, মিলন ও বিচ্ছেদের দাহ
তোমারে হেরিয়া বুঝি আনে কোন রহস্য প্রবাহ !
মানুষ বাঁচিতে চাহে কেন, তাহা আজ যেন বুঝি
মানুষ মরিতে চাহে কেন কারে লোকান্তরে খুঁজি
সকল সুস্পষ্ট হয়, মনে হয় কিছু নাই চাই
প্রথম প্রেমের মত সত্য নাই কোন সত্য নাই !

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

বর্ত্তমান সাহিত্যের পরমায়ু

আজকাল একটা কথা উঠিয়াছে—রবীন্দ্রনাথের পূর্ব্বের বা পরের বাঙ্গালা সাহিত্য টিকিবে না। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য যে হিসাবে টিকিবে, হয়তো সেই হিসাবে কোনটাই টিকিবে না, কিন্তু উদ্ধত কণ্ঠে কেহ যদি বলেন, কোনটাই বেশীদিন টিকিবে না—তাহা হইলে দুই একটা কথা বলিতে হয়। আমি জিজ্ঞাসা করি,—যদিই বা রবীন্দ্রেতর সাহিত্য নিজ গুণে নাই টেকে, ক্রমোন্নতিশীল জাতির স্বাভাবিক সংরক্ষণী প্রবৃত্তি কি তাহাকে টিকাইয়া রাখিবে না?

এ প্রবৃত্তি আগের চেয়ে আজকাল যে ঢের বেশী বাড়িয়া গিয়াছে এ কথা কেহ অস্বীকার করিবেন না। এ প্রবৃত্তি আমাদের একপ্রকার ছিল না বলিলেই হয়—এটা ইউরোপীয় শিক্ষা হইতেই পাওয়া, এ প্রবৃত্তি ছিল না বলিয়াই এদেশের ইতিহাস নাই—অনেক উৎকৃষ্ট জিনিসও ক্রমে ধ্বংস পাইয়াছে। এখন জ্ঞানভাণ্ডারের তুচ্ছ জিনিষটী পর্য্যন্ত রক্ষা করিবার যে একটা প্রবৃত্তি জাগিয়াছে—তাহা ক্রমে বাড়িয়াই চলিবে বলিয়া মনে হয়।

গুণী, জ্ঞানী ও শিল্পিগণ শিক্ষা, দীক্ষা, শিল্প ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে যাহা কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা উৎকৃষ্ট হউক অপকৃষ্ট হউক, সমস্তকেই নির্ব্বিচারে রক্ষা করিবার চেষ্টা ও বাসনা বর্ত্তমান সভ্যতার একটা অঙ্গ। এ প্রবৃত্তিটা অনেকটা ঐতিহাসিক প্রেরণার নামান্তর। যাহা কিছু প্রাচীন তাহার প্রতি একটা শ্রদ্ধা—এই প্রবৃত্তিরই অঙ্গীভূত।

ইতিহাস-রচনার উপকরণ হিসাবে—জ্ঞানপিপাসুদিগের কৌতূহল চরিতার্থ করিবার উদ্দেশ্যে সকল সৃষ্টিকেই তাই রক্ষা করা হয়। বর্ত্তমান সভ্যতা একদিকে সর্ব্বধ্বংসী মহাকালের সঙ্গে যেমন যুদ্ধ করিতেছে—অন্যদিকে তেমনি রসায়ন প্রয়োগে অল্পায়ুর আয়ু বৃদ্ধি করিতেছে।

দেশাত্মবোধের চক্ষে দেশের তুচ্ছতম সৃষ্টিটী পর্য্যন্ত আদরের জিনিস, দেশাত্মবোধ যত বাড়িবে—দেশের সাহিত্যিকদের রচনার আদরও তত বাড়িবে। জীবিত সাহিত্যিককে কতকটা উপেক্ষা করিলেও মৃত সাহিত্যিকের রচনাকে দেশের লোক ক্রমে আরও শ্রদ্ধাই করিবে—কতকটা উদারতার সহিতই বহু সাহিত্যিকের রচনাকে গ্রহণ করিবে এবং দোষ ত্রুটী ক্ষমা করিবে। সাহিত্যকে জাতীয় জীবনের অভিব্যক্তি বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়া সাহিত্যের অপকৃষ্টতা বা আদর্শের হীনতার জন্য জাতীয় জীবনকেই দায়ী করিবে—সাহিত্যিকের সারস্বত সাধনার অবমাননা করিবে না।

যতদিন বিদেশীয় সাহিত্য দেশে সমাদৃত হইবে—ততদিন দেশী সাহিত্যেরও সমাদর থাকিতে বাধ্য। অপকৃষ্ট হইলেও আমাদের যে জাতীয় সাহিত্য বলিয়া কিছু আছে তাহার গৌরব করা দেশাত্মবোধেরই অঙ্গ।

একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির জীবন-চরিত লিখিতে হইলে তাঁহার পিতা-পিতামহের, পুত্র-পৌত্রাদিরও পরিচয় দিতে হয়। কোন্ আবহাওয়াতে কাহাদের সংস্পর্শে তিনি প্রতিপালিত হইয়াছেন তাহাও বলিবার প্রয়োজন হয়। দেশে যদি একজনও অলৌকিক প্রতিভা-সম্পন্ন মৃত্যুঞ্জয় সাহিত্যিক জন্মিয়া থাকেন—তবে তাঁহার অভ্যুদয়ের মূলে যে সকল শক্তি ক্রিয়াশীল ছিল—তাহাদেরও সন্ধানের প্রয়োজন। দেশের যে যে লেখক বিবিধ যে শ্রেণীর রচনার দ্বারা দেশের সাহিত্যধারাকে পরিপুষ্ট করিয়া মহাকবির হাতে সমর্পণ করিয়াছেন, তাঁহাদের জীবনযাত্রা এবং তাঁহাদের রচনা চিরদিনই আলোচনার বস্তু হইয়া থাকিবে। চরম সার্থকতার পূর্ব্ববর্ত্তী স্তরগুলি কখনই উপেক্ষণীয় নহে,

সাহিত্যের যাহারা ইতিহাস অনুসন্ধান করিবে, তাহাদের কাছে সে সকল স্তরের মূল্য ঢের বেশী। জাতীয় সাহিত্যের বিচারে অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণ, সকল মহাকবিরই রস-সৃষ্টির উপাদান, মূলসূত্র, অঙ্কুর—এমন কি প্রেরণা পর্য্যন্ত পূর্ব্ববর্ত্তী সাহিত্যের মধ্যেই অনুসন্ধান করিয়া থাকেন। অন্যান্য মহাপুরুষের জন্মের মত কোন মহাকবির জন্মই আকস্মিক নহে। বাল্মীকির মত কেহ ভুঁইফোড় (স্বয়ম্ভূ) নহেন। মহাকবির অভ্যুদয়ের আগে বহুদিন ধরিয়া সাহিত্যরাজ্যে যে বিরাট্ আয়োজন চলে তাহা কে অস্বীকার করিবে? সাহিত্য ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রেও হয় তো তাঁহার অভ্যুদয়ের সমান আয়োজনই চলে—কিন্তু অনুসন্ধিৎসু মনীষীরা সে ধারা সর্ব্বাগ্রে সাহিত্য-রাজ্যেই অনুসন্ধান করিয়া থাকেন—এমন কি তাঁহারা পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণকে মহাকবির শিক্ষা-গুরুই মনে করিয়া থাকেন। এরূপ ক্ষেত্রে মহাকবির পূর্ব্ববর্ত্তী কবিরা যে শ্রেণীরই হউন মহাকবির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের মর্য্যাদা টিকিয়া যাইবেই।

তার পর মহাকবির সমসাময়িক ও অব্যবহিত পরের সাহিত্যিকদিগেরও যথাযোগ্য মর্য্যাদা স্বীকার করিতে হয়, মহাকবির প্রসাদে তাঁহারাও বাঁচিয়া যান। জাতীয় সাহিত্যের একই শক্তি যাহা একজনে চরম সার্থকতা লাভ করে—অন্যান্য অনেকের মধ্যে তাহার আংশিক অভিব্যক্তি ঘটে, সম-সাময়িক অন্যান্য সাহিত্যিকদিগের মধ্যে কি ভাবে তাহা ঘটে তাহাও আলোচনা করিবার ও লক্ষ্য করিবার বিষয়। সমসাময়িক সাহিত্যিকেরা যদি আত্মস্বাতন্ত্র্য রাখিতে পারিয়া থাকেন—মহাকবির বিশ্বগ্রাসী প্রভাবে যদি অভিভূত না হইয়া থাকেন—তবে তাঁহাদের মর্য্যাদাও তো অল্প নহে। আর যদি তাঁহাদের শক্তি পরিপূরক (Supplementary) হিসাবে মহাকবির শক্তির সহিত যুক্ত হইয়া সমগ্র জাতীয় জীবনের পূর্ণাভিব্যক্তি ঘটাইয়া থাকে, তাহাতেও সমসাময়িক সাহিত্যিকদের কিছু কৃতিত্ব ও মর্য্যাদা অবশ্যই আছে। আর সমসাময়িক সাহিত্যিকদিগের মধ্যে যদি দেশের জাতীয় জীবনের অভিব্যক্তি ঘটে, আর মহাকবি যদি জাতীয় জীবনকে অতিবর্ত্তন করিয়া উঠেন—অর্থাৎ সমগ্র মহাদেশ বা মহামানবের কবি হইয়া উঠেন—সমস্ত জগৎই যদি তাঁহাকে মহাকবি বলিয়া স্বীকার করিয়া লয়,—তবে সীমাবদ্ধ জাতীয় জীবনের পক্ষ হইতে—কেবলমাত্র দেশবাসীর পক্ষ হইতে মহাকবি বাদশার মর্য্যাদা পাইলে ঐ সমসাময়িক সাহিত্যিকগণ অন্ততঃ সুবাদারের মর্য্যাদা তো পাইবেনই।

আর সমসাময়িক সাহিত্যিকগণ যদি মহাকবির প্রভাবের দ্বারাই সম্পূর্ণ অনুপ্রাণিত হন, তবে তাঁহারা এবং মহাকবির পরবর্ত্তী শিষ্যস্থানীয় সাহিত্যিকগণও যে কোন মর্য্যাদাই পাইবেন না এমনটাও হইতে পারে না। সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁহাদের রচনারও স্থান আছে। মহাকবির দুর্জ্জয় প্রভাব ও অলৌকিক শক্তি জাতীয় সাহিত্যে কি ভাবে ক্রিয়াশীল হইয়াছে তাহা লক্ষ্য করিবার জিনিস, মহাকবির ভাব-সম্পদ ও রসসম্পদ কি ভাবে তাঁহার সহচর ও শিষ্যগণের দ্বারা দেশময় বিকীর্ণ হইয়াছে তাহাও আলোচনার বিষয়। একটা বিরাট্ শক্তি একটা বিরাট্ ব্যক্তিত্বকে আশ্রয় করিয়া কিরূপে বিম্বে প্রতিবিম্বে বিচ্ছুরিত হইয়াছে—তাহার সন্ধান লইতে গেলেই মহাকবির প্রবর্ত্তিত যুগের সকল সাহিত্যেকের রচনাই আলোচ্য হইয়া পড়ে। একটা কেন্দ্রে বহু শক্তির সংশ্লেষণও যেমন গবেষণার বস্তু। একটী মহা-শক্তির বহুচ্ছটায় বিশ্লেষণও তেমনি গবেষণার বস্তু, সাধারণ লোক কেবল সূর্য্যকেই দেখে—কিন্তু জ্ঞান-পিপাসু সূর্য্যকে অসংখ্য গ্রহ-উপগ্রহের সঙ্গে মিলাইয়া সৌর-জগতের কেন্দ্র-স্বরূপ দেখে—তাহার কাছে প্রত্যেক গ্রহ-উপগ্রহেরও মূল্য মর্য্যাদা আছে।

এক শতাব্দীর মধ্যে মাত্র একজন মহাকবি জন্মগ্রহণ করিতে পারে—কিন্তু তাই বলিয়া দেশ কখনও একজনের গৌরব করিয়াই তুষ্ট থাকে না। এক শতাব্দীর মধ্যে আর কোন কবি জন্মে নাই—একথা কোন্ দেশ স্বীকার করিবে? যিনি মহাকবি তাঁহাকে মহাকবির মর্য্যাদা দিবে—আর যাহারা শুধু কবিমাত্র—সাহিত্যিকমাত্র তাহাদের কথাও বিস্মৃত হইবে না। এ দেশের লোক বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসকে মহাকবি মনে করে,—তাই বলিয়া গোবিন্দদাস জগদানন্দ জ্ঞানদাসকেও ভুলিয়া যায় নাই। ভারতচন্দ্রকে মহাকবি বলিয়া পূজা করিলেও রামপ্রসাদকে কে ভুলিয়াছে? তার পর কাব্য ছাড়া সাহিত্যের অন্যান্য অঙ্গও আছে—সে সকল অঙ্গে যাহারা কৃতিত্ব

দেখাইয়াছেন—তাঁহাদের মর্য্যাদা মহাকবির অত্যুজ্জল আলোকেও কখনও ম্লান হইবে না। চৈতন্ত চরিতামৃতকার কৃষ্ণদাসকে কে ভুলিতে পারে? ৫০০ বৎসর পরেই বা কে তাঁহাকে ভুলিবে?

বিশ্বব্যাপী খ্যাতি শতাব্দীতে কচিৎ কাহারও ভাগ্যে ঘটে। দেশব্যাপী খ্যাতিও অতি অল্প সাহিত্যিক্যের ভাগ্যে ঘটে, দেশের অংশ বিশেষে বা জাতির অংশ বিশেষে অনেকের খ্যাতি থাকিয়া যায়, যাহারা দেশের অংশ-বিশেষকে দেশ বলিয়া মনে করে তাহারা নিজেদের অঞ্চলের কবির খ্যাতিকে বাঁচাইয়া রাখিতে চেষ্টা করে। আবার যাহারা নিজেদের সম্প্রদায়কেই জাতি বলিয়া কল্পনা করে, তাহারা নিজেদের সম্প্রদায়ের কবির খ্যাতি নষ্ট হইতে দেয় না। সংকীর্ণ প্রকৃতির হইলেও ইহাও এক প্রকারের দেশাত্মবোধ বা জাতি-প্রেম।

এক শতাব্দী পরে রবীন্দ্রনাথ ছাড়া কাহারও নাম থাকিবে না—একথা যাহারা বলে, তাহারা ঠিক করিয়াছে —একশত বৎসর পরে সমস্ত বাঙ্গালী জাতির রুচি ও আদর্শ হইবে আজকালকার ব্রাহ্ম প্রভাব-পুষ্ট সাহিত্যিকদের মত আমরা কিন্তু তাহা মনে করি না—বাঙ্গালী বিদ্যা, জ্ঞানে ও রসজ্ঞতায় যতই উন্নতি করুক—একশত বৎসর পরেও বাঙ্গালীর খুব কম ধরিয়াও শতকরা ৯০ জন লোক রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের উচ্চ আদর্শ ধরিতেই পারিবে না বা রবীন্দ্র-সাহিত্যের রস উপলব্ধি করিতে পারিবে না। এখনকার মত তখনও অধিকাংশ লোকই আরও নিম্ন-গ্রামের বা বিভিন্নস্তরের সাহিত্যেই আনন্দ পাইবে। চিত্ত-বিনোদনের জন্য তাহারা সাহিত্য চাহিবেই। অবশ্য সম সাময়িক সাহিত্যিকদের নিকট হইতে কতকটা পাইবে। কিন্তু সব যুগের লোকের মতই তাহারাও বর্ত্তমান অপেক্ষা অতীত সাহিত্যকেই বেশী মর্য্যাদা দিবে। বর্ত্তমানের প্রতি উপেক্ষা এবং অতীতের প্রতি শ্রদ্ধা মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। কাজেই তাহারা বর্ত্তমান শতাব্দী ও গত শতাব্দীর সাহিত্যকেই বেশী বেশী খুঁজিবে। রবীন্দ্র-সাহিত্য যতটা পারিবে বুঝিবে—অধিকাংশ ক্ষেত্রে এখনকার মতই না বুঝিয়াই রবীন্দ্রনাথের গৌরব করিবে। রবীন্দ্রেতর সাহিত্যকে ভাল করিয়া বুঝিতে পারিবে বলিয়া খুব গৌরব না দিক্—আদর করিবে।

সে হিসাবে—আজিকে জীবিত থাকার অপরাধে যাহারা কতকটা অনাদৃত তাহাদের আদর বাড়িবে বৈ কমিবে না।

তাহা ছাড়া, বাঙ্গালী জাতি যদি আত্মস্বাতন্ত্র্য না হারায় —তাহার মূল ধাতু যদি বদলাইয়া না যায়—তবে তাহার বৃত্তি, প্রবৃত্তি, রুচি তাহার জাতীয় জীবনের বৈশিষ্ট্য—এমন কি দুর্ব্বলতাগুলি পর্য্যন্ত কতক কতক থাকিয়াই যাইবে। দেশশুদ্ধ লোকই কিছু বিদগ্ধজন হইয়া উঠিবে না। বর্ত্তমান যুগে বা পূর্ব্ববর্ত্তী যুগে যে সকল কবি উচ্চশ্রেণীর রসের সাধনা না করিয়া কেবল বাঙ্গালী জাতির রুচিপ্রবৃত্তিকে অনুসরণ করিয়া অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ পরিসরের রসসৃষ্টি করিয়াছেন, বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের অভিব্যক্তিকেই ভাষায় ঝঙ্কৃত ও রূপায়িত করিয়াছেন,—তাহাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুখ দুঃখের কথা লিখিয়া গিয়াছেন—তাহাদের দুর্ব্বলতার ও দীনতার জন্য সহানুভূতি দেখাইয়াছেন—তাঁহাদের আদর তখনও থাকিবে। লোকে তখনও তাঁহাদের রচনায় অন্তরের সাড়া পাইবে। রবীন্দ্র সাহিত্যকে তাহারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গৌরবের বস্তু মনে করিলেও বহু ক্রটী সত্বেও রবীন্দ্রেতর সাহিত্যকে তাহারা ভাল না বাসিয়া পারিবে না—নিজেদের আশা আকাঙ্ক্ষা তাহাদের ভাষাতেই প্রকাশ করিতে চাহিবে।

তাহা ছাড়া দেশের সাহিত্যকে টিকাইয়া রাখিবার জন্য—আরও অনেক শক্তি আছে।

(১) বিশ্ববিদ্যালয়। ভবিষ্যতে এই বিশ্ববিদ্যালয় সম্পূর্ণ বাঙ্গালা ভাষারই বিশ্ববিদ্যালয় হইবে। একা রবীন্দ্র-সাহিত্য তাহার উপজীব্য হইবে না।

(২) পাঠ্য পুস্তক।—একা রবীন্দ্রনাথের রচনা লইয়াই পাঠ্য পুস্তক গঠিত হইবে না।

(৩) সঙ্কলন পুস্তক। নানাজনের রচনা লইয়া এ শ্রেণীর পুস্তক ক্রমেই বাড়িয়া যাইবে।

(৪) শোভন সংস্করণ। প্রকাশকগণ শোভনতর সংস্করণ করিয়া পুরাতন সাহিত্য প্রচার করিবে।

(৫) পাঠাগার।—গ্রামে গ্রামে পাঠাগার হইবে। পাঠাগারে কি শুধু রবীন্দ্র-সাহিত্য থাকিবে?

(৬) সাহিত্য-সভা, সাহিত্য-পরিষদ, সাহিত্য-

সম্মিলনী ইত্যাদি সাহিত্যিক অনুষ্ঠান দেশে ক্রমেই বাড়িবে। তাহাদের আলোচ্য কি হইবে ?

(৭) সংবাদ পত্রাদি। তাহারা কি দেশের অন্যান্য কৃতী লোকদিগের সঙ্গে সাহিত্যিকগণের স্মৃতিকে নানা ভাবে সঞ্জীবিত রাখিবে না ?

(৮) মাসিক পত্র। মাসিক পত্রের সংখ্যা আরও বাড়িবে, দেশের সর্ব্ববিধ পুরাতন সাহিত্য লইয়াই তাহাদের আলোচনা করিতে হইবে।

(৯) কৃতী ছাত্রেরা যে অবজ্ঞাত বিস্মৃতপ্রায় সাহিত্যিকের সাহিত্য আলোচনা করিয়াও ডিগ্রী লইবে এ বিষয়ে সংশয় নাই।

(১০) যুগধর্ম্মের পরিবর্ত্তনে লোকের রুচি প্রবৃত্তির দ্বন্দ্বসংঘর্ষে কখন যে কোন্ সাহিত্যিকের রচনায় টান পড়িবে তাহাও বলা কঠিন।

তাহা ছাড়া আর একটা মস্ত জিনিষ আছে। আজ যে সাহিত্য অনাদৃত—বাচ্যার্থসর্ব্বস্ব বলিয়া যাহা মর্য্যাদা পাইতেছে না, তাহা পুরাতন হইলেই ব্যঙ্গার্থে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে। উৎসাহী পাঠকগণ তাহাতে নূতন নূতন অর্থ আরোপ করিবে—আপন মনের মাধুরী মিশাইয়া এ সাহিত্যকে নূতন করিয়া গড়িয়া লইবে। আপনাদিগের সাধনার্জ্জিত বা যুগধর্ম্মের গুণে প্রাপ্ত অনেক সম্পদেরই পূর্ব্বাভাস বা পূর্ব্ব বিম্ব তাহারা এ সাহিত্যের মধ্যে দেখিতে পাইবে।

আজ যে মধুতে নেশা হয় না, পুরাতন হইলে সে মধু "মাধ্বী" হইয়া উঠিবে, তাহাতে নেশাও ধরিবে। ভবভূতি বলিয়া গিয়াছেন "কালোহহ্যয়ং নিরবধিঃ বিপুলা চ পৃথ্বী" —সমান ধর্ম্মার অভাব কোন যুগেই হয় না। দার্শনিকেরা ধর্ম্মগুরুদেব গোটাকতক উপদেশকেও একটি ধর্ম্মতত্ত্বে পরিণত করিতে পারেন, ভাষ্যকারগণ 'হিং টিং ছট 'বা ওঁ তট ভট তোটয়ে'র ব্যাখ্যা করিয়াও একটা শাস্ত্র গড়িতে পারেন। আর নবীনচন্দ্র, গিরীশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল, শরৎচন্দ্রের সাহিত্যের জন্য দুই চারি জন Boswellও জুটিবে না ? দেশের লোকের বৈদগ্ধ্য যত বাড়িবে, প্রাচীন সাহিত্যের গৌরব ততই বাড়িবে বৈ কমিবে না। এ যুগে ভারতচন্দ্র যদি প্রমথনাথকে পান, বিহারীলাল যদি মোহিতলালকে পান—তবে শরৎচন্দ্র বা সত্যেন্দ্রনাথ কি কোন শক্তিমান্ ভক্তিমান্ পূজারী পাইবেন না ?

বাস্তব সত্য ও সাহিত্যের সত্য

ফোটোগ্রাফী প্রকৃত আর্ট নয়—বিজ্ঞানের কৃতিত্বের নিদর্শন মাত্র! শিল্পীর মনের রঙে রসের তুলিকায় অঙ্কিত না হইলে আর্ট হইয়া উঠে না। বাহিরের কোন দৃশ্যের বা ঘটনার যথাযথ বর্ণনা অথবা অন্তরের মনোবৃত্তির লীলার বিবৃতি মাত্র—কেবল সত্যের দোহাই দিয়া সাহিত্য হইয়া উঠে না। কবির মনের রসাবেশ তাহাকে অভিনব সৃষ্টিতে রূপান্তরিত না করিলে সাহিত্য হয় না। কবি ত একজন নকলনবিশ Imitator বা Reporter বা Recorder মাত্র নহেন—তিনি স্রষ্টা। যথাযথ বিবৃতিই সৃষ্টি নয়, কবির মনের রসাবেশ যাহা বাস্তব তাহাকে আপনার রসনীতির সুবিধানুসারে পরিবর্ত্তিত করিয়া লয় —তবে অভিনব সৃষ্টি সম্ভব হয়। সেজন্য প্রাকৃত সত্য নগ্ন—সাহিত্যের সত্য রসানুরঞ্জিত। দ্বিতীয়তঃ— বাস্তব সত্য কবি-স্রষ্টার রসকল্পনার মধ্য দিয়া প্রকাশ লাভ করিলে সাহিত্যের বাহিরে তাহার যেমন রূপটি ছিল—সাহিত্যে তাহার ঠিক সেইরূপটি থাকে না— রূপান্তর লাভ করে। তৃতীয়তঃ—অনেক সময় বাস্তব সত্য—সাহিত্য-সৃষ্টির উপাদান মাত্র—সাহিত্যের সত্য ঐ সত্যের সাহায্যে গঠিত। উপাদান ও সৃষ্টি যেমন এক নহে, বাস্তব সত্য ও সাহিত্যের সত্য তেমনি এক নহে। বাস্তব সত্য বাহিরে অপরতন্ত্র—কিন্তু সাহিত্যে তাহা একটি রসাদর্শের বশীভূত, অনুগামী বা অনুচর মাত্র।

বাস্তব জগতে যাহা অসত্য রস-জগতে তাহা সত্য হইতে পারে। আবার বাস্তব জগতে যাহা সত্য-রসজগতে তাহা অসত্য হইতে পারে। সাহিত্যের সত্য বিচারের আদর্শ রস। রসোত্তীর্ণ হইলেই সকল ভাব বা বস্তুই সাহিত্যের সত্য হইয়া উঠে।

সাহিত্য-জগতে এমন সত্য অনেক আছে বাস্তব জগতে তাহার অস্তিত্বও নাই। আবার বাস্তব-জগতে এমন অনেক সত্যই আছে যাহার সাহিত্যে প্রবেশাধিকারই নাই অর্থাৎ সত্য হইলেই সাহিত্যে স্থান পাইতে পারে

না। বিজ্ঞান-জগতে সত্যমাত্রেরই প্রবেশাধিকার আছে। বিজ্ঞান-জগৎ আর সাহিত্যের জগৎ এক ত নহেই—এক প্রকৃতিরও নয়। বিজ্ঞানের জগতে বাস্তব সত্যের প্রতিষ্ঠা দেখিয়াও আমাদের আনন্দ জন্মে—কিন্তু সে আনন্দ বোধানন্দ। আর সাহিত্যের সত্য আমাদিগকে যে আনন্দ দেয়—তাহা রসানন্দ। সাহিত্যের সত্য সুন্দর বলিয়াই সত্য। বাস্তব সত্য যখন সাহিত্যে মাধুর্য্য ও সৌন্দর্য্য লাভ করে তখনই তাহা সাহিত্যের সত্য হইয়া উঠে। বাস্তব সত্য যাহাতে সুন্দর হইয়া রসানন্দ দান না করে—তাহা সাহিত্য নয়, বৈজ্ঞানিক বা ঐতিহাসিক বিবৃতি মাত্র। বাস্তব জগতে এমন বহু সত্যই আছে যাহাকে কিছুতেই মাধুর্য্যের আবেষ্টনীর মধ্যে সুন্দর করিয়া তোলা যায় না—সেজন্য বলা হয়, অনেক সত্যেরই সাহিত্যে প্রবেশাধিকার নাই।

একটি বাস্তব সত্যকে সাহিত্যের সত্য করিয়া তুলিতে হইলে কত আয়োজনই না করিতে হয়।

বাস্তব সত্য অনেক সময় কঙ্কাল ছাড়া কিছুই নয়—সেই কঙ্কালে রক্ত, মাংস, চর্ম্ম ও লাবণ্য যোগ করিতে হয় সাহিত্যিককে, তবে তাহা সাহিত্যের সত্যসুন্দররূপ ধারণ করে। উদাহরণ স্বরূপ—রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদা পতিতা ইত্যাদির নাম করা যাইতে পারে। যে সকল বাস্তব সত্যকে অবলম্বন করিয়া এইগুলি কাব্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে—সেগুলি কোথায় যে অন্তর্নিহিত আছে তাহা খুঁজিয়াই পাওয়া যায় না।

নর-নারীর যৌন-জীবনের অনেক তথ্যই সত্য হইলেও সাহিত্যে স্থান পাইতে পারে না অর্থাৎ কিছুতেই তাহাদের কুশ্রীতা ও জঘন্যতাকে মার্জ্জিত, আবৃত বা আচ্ছাদিত করা যায় না। অনেক তথ্য সাহিত্যের সত্য হইয়া উঠিয়াছে—কিন্তু সেজন্য কবিদিগকে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইয়াছে। পবিত্র প্রেমের আবেষ্টনীর মধ্যে মার্জ্জিত ও সংযত ভাষায় তথ্যগুলিকে উপস্থাপন করিতে হইয়াছে—অনেক সময় শান্ত-দান্ত প্রকৃতির সঞ্চারী ভাবের সাহায্য লইতে হইয়াছে—অনেক সময় ধর্ম্মভাবের সহিত সংযোগ সাধন করিতে হইয়াছে।

যাঁহারা যৌন জীবনের বাস্তব তথ্যগুলিকে যথাযথ ভাবে বর্ণনা করিয়া সাহিত্যের সত্য হইল মনে করেন তাঁহারা ভ্রান্ত। যৌনজীবনের যথাযথ বর্ণনায় যে একটা হর্ষোদ্গম হয়—তাহা স্নায়বিক পুলকমাত্র—তাহা রসানন্দ নয়। ঐ স্নায়বিক পুলককেই রসানন্দ বলিয়া কবি ও তাঁহার পাঠকগণ ভ্রম করেন। সেই ভ্রমের ফলেই কাম সাহিত্যের সৃষ্টি। কাম সাহিত্যের লেখকগণ মনে করেন তাঁহারা সত্য প্রচারই করিতেছেন—অসত্য কথা ত কিছু বলিতেছেন না। কিন্তু তাঁহারা ভুলিয়া যান—তাঁহাদের প্রচারিত সত্য সাহিত্যের সত্য নয়—কারণ উহা রসোত্তীর্ণ নয়—বাস্তব সত্যকেই তাঁহারা আরও লোভনীয় করিয়া বর্ণনা করিতেছেন মাত্র। লোভনীয় করা আর শোভনীয় করা এক কথা নহে।

বাস্তব সত্যের মধ্যে আমরা জীবন-সংগ্রাম করিয়া কোনরূপ টিকিয়া আছি। বাস্তব সত্য অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের পীড়াদায়ক—বিরক্তিকর ও নীরস। বাস্তব সত্যের হাত হইতে অব্যাহতি লাভের জন্যই—বিক্ষত চিত্তকে সান্ত্বনা ও শান্তি দেওয়ার জন্যই আমরা সাহিত্যে শরণাপন্ন হই। সেই সাহিত্যের মধ্যেও আমরা যা বাস্তব সত্যকেই দেখিতে পাই—তবে আমরা দুদণ্ড বিশ্রাম করি কোথায়—জুড়াই কোথায়? সাহিত্যের সত্যই আমাদিগকে বাস্তব সত্যের উৎপীড়ন হইতে শান্তি ও সান্ত্বনা দান করে।

বর্ত্তমান সাহিত্য

বর্ত্তমান সাহিত্যে কিছুকাল হইতেই একটা বিদ্রোহ ভাব আত্মপ্রকাশ করিয়া উঠিয়াছে। এ সম্বন্ধে পাঠক-লেখক ও সমালোচক মণ্ডলীর মধ্যে অনবরত বাদানুবাদ চলিয়া আসিতেছে। একটা বিদ্রোহ জাগিলেই তাহার দমনের যে স্পৃহা শান্তিপ্রিয় সামাজিকগণের মনে স্বতই প্রবুদ্ধ হয় সে স্পৃহা সর্ব্বত্রই উৎকট।

আধুনিক সাহিত্যে এ বিদ্রোহ ত শুধু নরনারীর যৌন সম্পর্ক লইয়া নহে—আমাদের রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, সাহিত্যিক, সাংসারিক, পারিবারিক, নৈতিক, দাম্পত্য ও ধর্ম্মজীবনে যাহা কিছু গতানুগতিক, অন্ধ-সংস্কারাচ্ছন্ন, যাহা কিছু অসত্য, যাহা কিছু জীর্ণ, শীর্ণ-জীবনহীন ও

নিস্তেজ—যাহা কিছু হীন স্বার্থের খেলা—যাহা কিছু ফাঁকি, ভেজাল, চালাকি, ভূয়ো, ভণ্ডামি তাহার বিরুদ্ধে নব-সাহিত্যের এই বিদ্রোহ—ইহার মূল উৎস খুঁজিতে গেলে রামমোহনে পৌছিতে হয়।

প্রত্যক্ষভাবে এই বিদ্রোহের গুরু ও জন্মদাতা এযুগে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র।

সাহিত্যে নরনারীর যৌন-সম্পর্ক লইয়া যে স্বেচ্ছাচার ও বিদ্রোহিতা, তাহা ঐ জাতীয় মহাবিদ্রোহেরই একটি বিকৃত অঙ্গমাত্র। অর্দ্ধ-শতাব্দীর বঙ্গ-সাহিত্য অধ্যয়ন করিলে দেখা যায় যে, আমাদের দেশ ঐ জাতীয় মহাবিদ্রোহের অন্যান্য প্রায় সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে ক্রমে মঙ্গলদায়ক ও "পরিণাম-রমণীয়" বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছে—অন্ততঃ সেগুলির সম্বন্ধে সুতীব্র অভিযোগ বড় কিছু শোনা যায় না। কেবল দাম্পত্য জীবন-চিত্র সম্বন্ধে ও নরনারীর যৌন সম্পর্ক সম্বন্ধে সাহিত্যে উচ্ছৃঙ্খলতা বঙ্গসাহিত্যসেবীরা আজও বরদাস্ত করিতে পারিতেছেন না। আর যাহাই হউক,—এই আন্দোলন হইতে বুঝা যায় যে, বর্ত্তমান সাহিত্য প্রাণরসে ভরপূর, উন্মাদনার প্রাচুর্য্যে চঞ্চল। বর্ত্তমান সাহিত্য আর যাহাই হউক,—নিস্তেজ, ক্লীব, গতানুগতিক ও জড়ভাবাপন্ন নহে।

এ সাহিত্যকে পালন করিবেন করুন, শাসন করিবেন করুন, কিন্তু ইহাকে উপেক্ষা করিতে পারেন না। রোগকেও আমরা উপেক্ষা করি না—শত্রুকেও আমরা উপেক্ষা করি না—দস্যু আততায়ীকেও আমরা উপেক্ষা করি না—আমি সে উপেক্ষার কথা বলিতেছি না। সত্য-মিথ্যার সংগ্রামে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার যোগ্যতা এ সাহিত্যের আছে বলিয়া প্রকারান্তরে আমরা স্বীকার করিয়া লইয়াছি। এ সাহিত্যের সমর্থন করিবার জন্য যাঁহারা অগ্রসর, তাঁহারাও সাহিত্যের একজন রথী মহারথী। চোখা চোখা ব্যঙ্গ ও শ্লেষের শরাঘাত করিলেই তাঁহাদিগকে ধরাশায়ী করা যাইবে না।

উচ্ছেদ-সাধনই যে বিদ্রোহ দমন নয়, তাহা সকল দেশের সাহিত্যই স্বীকার করিয়া লইয়াছে।—আমাদের দেশের সাহিত্যও জাতীয় বিদ্রোহের অন্যান্য অঙ্গ সম্বন্ধে তাহা স্বীকার করিয়াছে। যুগে যুগে আমাদের সাহিত্য বিদ্রোহীদলের সহিত সন্ধি করিয়া, আপোস নিষ্পত্তি ও রফা করিয়া নব নব ভাবে সামঞ্জস্য বিধানে তাহাদিগকে আপনার জীবন্ত সংসার বা গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছে। যুগধর্ম্মের শাসনে এ বিধি মানিতে আমরা বাধ্য। উদাহরণস্বরূপ রচনাভঙ্গি ও ভাষাবিষয়ে সবুজপত্রের বিদ্রোহের পরিণাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। ভারতীয় চিত্রকলা-পদ্ধতির নামও করা যাইতে পারে।

বর্ত্তমান সাহিত্যের দুঃসহ বিদ্রোহ ও উচ্ছৃঙ্খলতার পরিণাম সম্বন্ধেও চিরন্তন বিধির ব্যতিক্রম হইবে বলিয়া মনে হয় না। বিদ্রোহীর সংখ্যা এত বেশী এবং তাহারা এত শক্তিমান্ যে, তাহাদের সঙ্গে একটা সন্ধি অদূর ভবিষ্যতেই ঘটিয়া যাইবে এইরূপ অনুমান করা যায়।

"ত্যাজ্যো দুষ্টঃ প্রিয়োহপ্যাসীদঙ্গুলিউরগক্ষত" এবিধি এক্ষেত্রে চলিবে না, কারণ তাহাতে জীবন বাঁচিয়া গেলেও অঙ্গহানি থাকিয়া যায়। অমরী বঙ্গবাণীর কোন অঙ্গ হানি'ত চলিতে পারে না।

সর্ব্বাপেক্ষা আশার কথা বঙ্গসাহিত্যে নব 'জীবন সঞ্চার, তাহার তুলনায় তরুণ সাহিত্যের উচ্ছৃঙ্খলতা খুব বেশী নৈরাশ্যের কথা নহে।

মৃতদেহে পচন আরম্ভ হইলেই—স্বাস্থ্য ও স্বাচ্ছন্দ্যের পক্ষে বিপদ। ক্রমোপচীয়মাণ শক্তির ভাণ্ডার যে 'জীবন্ত দেহ' তাহাতে সকল ক্ষতই, সকল ক্ষতিই বিনা চিকিৎসাতে ও নিরাময় হইয়া যায়। বিনা চিকিৎসা—কুচিকিৎসা, বা হাতুড়ের চিকিৎসা হইতে ঢের ভালো,—সু-চিকিৎসকের অধীরতাও ক্ষত বাড়াইয়া দিতে পারে। কেবল ধীর সহিষ্ণু বিচক্ষণ চিকিৎসক ভার লইলে আর আপত্তির কারণ থাকে না।

তরুণ সাহিত্যিকগণের উদ্দেশে এই প্রসঙ্গে প্রবীণ সাহিত্যিকরা ও সুনীতি-সুরুচির পক্ষপাতিগণ যেসকল উপদেশ ও অনুশাসন-বাক্য প্রয়োগ করিতেছেন, সে-গুলি তরুণ সাহিত্যিকরা ও যে জানেন না তাহা নয়। ইহারাও জানেন, তবে সকলে মানেন না, সাহিত্য-সৃষ্টি ও রস-বিচারের মূল আদর্শের বৈষম্যের জন্য কতকটা। কতকটা—

জানামি ধর্ম্মং নচ মে প্রবৃত্তিঃ
জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ—

ধরণের ভাবপোষণের জন্য অনুশাসন ও উপদেশের মর্ম্মার্থ কার্য্যে পরিণত হয় না।

"যাহা কিছু সত্য—যাহা কিছু সংসারে নিত্যই ঘটে—যাহা কিছু মনে উদিত হয়—তাহারই অবিকল বর্ণনার নাম সাহিত্য নহে।"

"Criminology অথবা আর কোন Logyর বিবৃতিই সাহিত্য নহে।"

"সাম্যবাদ কি আর কোন "বাদ"-প্রচারই অথবা সাম্রাজ্যবাদ কি আর কোন "বাদের" সঙ্গে বিবাদ বা বাদানুবাদই সাহিত্য নহে।"

নরনারীর আকর্ষণ মাত্রই প্রেম নহে। কামায়ন কখনো রামায়ণের মর্য্যাদা পাইতে পারে না।

"কুলী মুটে, মজুর পতিতাদের জীবন-কাহিনীমাত্রই সাহিত্য নহে। ইত্যাদি ইত্যাদি।

এসকল কথা আধুনিক সাহিত্যিকরাও জানেন—তাঁহারাও বুঝেন। তাঁহাদিগকে বুঝাইবার চেষ্টা পণ্ডশ্রম। এসকল কথা জানিয়াও কেহ কেহ ভুল যে কেন করেন ইহার উত্তর কে দেবে? বোধ হয় বর্ত্তমান ইউরোপীয় সাহিত্যিক-দের অনুকরণের লোভ তাঁহারা সম্বরণ করিতে পারেন না। সেই অনুচিকীর্ষাবৃত্তির প্রাবল্যের জন্যই, যে সকল সমস্যা আজিও আমাদের জাতীয় জীবনে সমুপস্থিত হয় নাই—কখনো হইবে কিনা সন্দেহ—সেই সকল সমস্যা লইয়া গল্প বা উপন্যাস রচনা করেন। সরস ও কলা-কৌশলময় করিয়া বলিতে পারিলেই সকল সত্য, সকল তথ্য, সকল তত্ত্ব সাহিত্য হইয়া উঠিবে এই ধারণায় বিষয় বা আখ্যেয় বস্তু নির্ণয়ে তাঁহারা কতকটা অসতর্ক হইয়া পড়েন। যাহা সরস ও কলাকৌশলময় হয় না—তাহা জঘন্য অসাহিত্য হইয়া উঠে,—যাহা সরস ও কলাসুন্দর হয় তাহা লইয়াও পাঠকসমাজে মতদ্বৈধ ও দ্বন্দ্ব ঘটে।

ইউরোপে আজকাল বড় বড় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত-গণ ও লোকগুরু শ্রেণীর মনীষিগণ আপনাদের মতামত, জীবনের অভিজ্ঞতা, শিক্ষাদীক্ষা, সিদ্ধান্ত, সমস্যা এমন কি জীবনের ধ্রুব বাণীটি পর্য্যন্ত কথা-সাহিত্যের মধ্য দিয়া প্রকাশ করিতেছেন,—তাহাতে সরস সৎসাহিত্যের পরিমাণ যেমন বাড়িতেছে—পাঠক সংখ্যাও তেমনি বাড়িতেছে।

আমাদের নবীন সাহিত্যিকগণ কি ঐসকল পণ্ডিত গণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিতেছেন? তাহা যদি হয় তবে জ্ঞানে ও বয়সে তাহাদের মত প্রবীণ না হইলে চলিবে না। সেইজন্যই কি তরুণ সাহিত্যিকদের অনেক রচনা তত্ত্বও হয় না, সাহিত্যও হয় না?

নবীন প্রবীন উভয় শ্রেণীর মধ্যে আর একদল সাহিত্যিক কুৎসিতরুচির পুস্তক কিংবা অদ্ভুত ঘটনাবহুল উন্মাদক উপন্যাস খুব বেশী বিক্রীত হয় বলিয়া, বহুল পরিমাণে লিখিয়া থাকেন। তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র, সাহিত্য-সরস্বতীর শাসনের মধ্যে তাঁহারা পড়েন না, তাঁহারা বাণিজ্য-লক্ষ্মীর অধিকারভুক্ত।

ক্রমশঃ

"শব"

মিসেস্ আবু রহমান

দীপ-শিখা আজি নিভে গেছে,
রয়েছে পিদিম্ পরি।
রিক্ত শাখা আছে পড়িয়া,
ফুল-পাতা গেছে ঝরি।

সুখ হরষা চলে গেছে,
রয়েছে বেদনা খালি।
কে, দিবে গো শূন্য পিদিমে,
আবার আগুন জালি?

আধুনিক সাহিত্য

(বেদে ও বিবাহের চেয়ে বড়ো)

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মিত্র এম-এ

বাংলার বড়ই দুর্ভাগ্য যে বাংলায় এখন অবধি কেহ ডিকেন্স বা গরকী হইয়া জন্মাইলেন না। বাংলার উর্ব্বর সাহিত্যক্ষেত্রে বঙ্কিমবাবু হইতে রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র পর্য্যন্ত যত সাহিত্যিক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই একটী গণ্ডির মধ্যে বসিয়া থাকিয়া জগৎ পরিদর্শন করিয়াছেন, সে গণ্ডির যে সীমানা তাহা সঙ্কীর্ণ না হইলেও অনেক সময়েই কল্পিত। বঙ্কিমচন্দ্রকে মৃণালিনী লিখিবার সময় কল্পনার সাহায্য লইতে হইয়াছে। রাজসিংহ লিখিতে বসিয়া বঙ্কিমবাবু স্পষ্টই বলিয়াছেন তিনি ইতিহাস লিখিতেছেন না, উপন্যাস বা রূপকথা লিখিতেছেন। দেবী-চৌধুরাণী, সীতারাম, আনন্দমঠ তাঁহার মানস কন্যা, বাস্তব জগতের সহিত উহাদের কতটুকু সম্বন্ধ সে বিষয়ে যথেষ্টই সন্দেহ আছে। এখানে বঙ্কিমবাবুর ধারাবাহিক সমালোচনা করিতে বসি নাই, বর্ত্তমান প্রবন্ধের জন্য যতটুকু বলা প্রয়োজন ততটুকুই বলিব।

বঙ্কিমী যুগে বাস্তবের কোন পসার ছিল না। কল্পনা ও আদর্শ লইয়া তখন সাহিত্য-রচনা হইত, এইজন্যই আমরা হেমচন্দ্র, মধুসূদন, নবীনচন্দ্র প্রভৃতি রস-বেত্তা উচ্চাঙ্গ কবিগণের কল্পনা গ্রথিত সাম্রাজ্য দেখিতে পাই। আশা-কাননে বা পদ্মের মৃণালে কবি হেমচন্দ্র কল্পনারই আশ্রয় লইয়াছেন, বীরাঙ্গনা কাব্যে মধুসূদন মহাভারতের নূতন Inter pretation দিবার অজুহাতে বিস্তৃত কল্পনা-জাল বিস্তার করিয়াছেন মাত্র। নবীনচন্দ্রের কুরুক্ষেত্র, রৈবতক ও প্রভাস কল্পনার কুহকেই মহিমান্বিত। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার অসীম কবিত্বশক্তির দ্বারা এই কল্পনাকে একটী নূতন রূপ প্রদান করিতে চাহিয়াছেন, তাহা এতই সুন্দর যে সময়ে সময়ে উহা বাস্তব বলিয়া ধারণা হয়। তাঁহার রাজর্ষি বা বিসর্জ্জন নাটকে এই সত্যটা বেশ জাজ্বল্যমান। বৌঠাকুরাণীর হাটে কবি বঙ্কিমী-প্রথাই অনুসরণ করিয়াছেন, রাজসিংহের ন্যায় রূপকথাই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তবে রাজসিংহ এবং বৌঠাকুরাণীর হাটের মধ্যে কিছু পার্থক্য লক্ষিত হয়। বৌঠাকুরাণির হাটে কল্পনার এমন একটা মোহিনী শক্তি দেখিতে পাই, যাহাকে বাস্তব বলিয়া ক্ষণকালের জন্য ভ্রান্তি হয়। পরবর্ত্তীযুগে কবিবর চোখের বালি ও নৌকাডুবি লিখিয়া বাস্তব-জগতে ফিরিয়া আসিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু এখানে তাঁহার লেখনীকে পরাস্ত মানিতে হইয়াছে। যাঁহার প্রেরণা স্বপ্ন-রাজ্যেই বিচরণ করে, শেলীর Skylarkএর মতন যে শূন্যে শূন্যেই বিহার করে, তাহাকে বাস্তবজগতে আনিতে গিয়া, ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের Skylarkএর অপেক্ষা অধিকতর হীনদশা প্রাপ্ত হইতে হইয়াছে।

কল্পিত আদর্শ সাহিত্য ভাল কি বাস্তব সাহিত্য ভাল, বর্ত্তমান প্রবন্ধে উহা বিচার করিবার উদ্দেশ্য নাই। এখানে বাংলা সাহিত্যে যেরূপ ক্রম-বিকাশ হওয়া উচিত ছিল তাহা হইতেছে কিনা দেখাইব মনে করিতেছি।

ইউরোপীয় সাহিত্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে আমরা দেখিতে পাই যে সভ্যতার বিস্তারের সহিত মানবজাতির অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। নিউটন তাঁহার যুগে একজন মস্তবড় পণ্ডিত হইলেও বর্ত্তমান সময়ে যে সমস্ত ছাত্র উচ্চ-গণিত বিদ্যা অধ্যয়ন করেন তাঁহারা সকলেই নিউটন অপেক্ষা অনেক অধিক জ্ঞান অর্জ্জন করিবার অধিকার পাইয়া থাকেন। বিশ্ব-বিজয়ী নাবিক ড্রেক, কুক পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইলেও তাঁহাদের পৃথিবী সম্বন্ধে যে জ্ঞান ও ধারণা ছিল, এখন যে কোন ছাত্র উচ্চ ভূগোল শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন, তাঁহাদের অপেক্ষা ঢের বেশী জ্ঞান গৃহে বসিয়াই অর্জ্জন করিতে পারেন। ভূয়োদর্শনজনিত জ্ঞানের ব্যাপকতাই বর্ত্তমান যুগের বিশেষত্ব। ইংরাজী, ফরাসী, জার্ম্মান, নরওয়ে ও রাশিয়ায় সাহিত্যে এই সার সত্যটাই ধীরে ধীরে প্রকাশ পাইতেছে, সেক্সপীয়ার বিশ্বপূজ্য হইলেও ইবসেনের প্রভাব পড়িয়া তাঁহার সঙ্কীর্ণতা ধরা পড়িতেছে। ওয়ালটার স্কট

প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক হইলেও, ডিকেন্সের সার্ব্বজনীনতা তাঁহার যশোপ্রভা মলিন করিয়া দিতেছে। এইরূপ বলিবার যথেষ্ট কারণ আছে। যাঁহারা সভ্যতার ক্রম-বিকাশের ইতিহাসের সহিত পরিচিত তাঁহারা সকলেই জানেন যে, মানব-সমাজের বিশিষ্টতা যুগের সহিত কেমন পরিবর্ত্তিত হইয়া চলিয়াছে। গোষ্ঠি-সমাজ যুগে গোষ্ঠ-পতিই একমাত্র Proper noun ছিলেন। গোষ্ঠভুক্ত অন্যান্য লোকেরা সকলেই Common noun ছিলেন। এই জন্যই এযুগে গোষ্টিপতির সুখ দুঃখ, তাঁহার আচার-ব্যবহার লইয়া সাহিত্য রচিত হইত। এই যুগ আমাদের ভারত-বর্ষে রামায়ণ-মহাভারতের পূর্ব্ববর্ত্তীযুগ, গ্রীসে হোমারের পরবর্ত্তী সময়। তাহার পর সংঘবদ্ধ হইয়া মানব যখন Clan state এ বাস করিতে আরম্ভ করে তখনই Heroic যুগের সূত্রপাত হয়। এই যুগে Hero একমাত্র Proper noun হইলেও তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গগণের অনেক স্বাধীনতা থাকিত। এই স্বাধীনতা যদিও অধিকাংশ সময়েই Heroর মুখাপেক্ষী হইয়াই বর্দ্ধিত হইত তত্রাচ ব্যক্তিগত বৈষম্য উঁকি মারিতে আরম্ভ করে। বিভীষণ রাবণের সহিত এক মত হইতে পারে নাই। সুগ্রীব বালীর আজ্ঞাবহ হইতে অস্বীকার করে। গ্রীসেও অনেকেই আকীলিসের নিকট আত্ম-বিক্রয় করিতে অসমর্থ হয়। যাহা হউক, এই যুগেই Epic লিখিত হয়। সর্ব্বদেশের Epicই আমরা দেখিতে পাই যে Heroর সুখ সুবিধা বর্দ্ধনের জন্য কতকগুলি নীতি, প্রথা, আচার, ব্যবহার প্রচলিত হয়। এই সমস্ত নীতি, আচার, ব্যবহারই ক্রমশঃ সমাজের ভিত্তি ও মূল হিসাবে গৃহীত হইয়াছে। Hero একজন বড় ভূস্বামী। তাঁহার অধীনস্থ সকল সামন্তগণই ছোট ছোট ভূস্বামী। এইজন্য জমিকেই মালিকানি সত্ত্ব বলিয়া গ্রহণ করা হয়। যাহার জমি আছে তাহাকে 'ভদ্র' আখ্যা দেওয়া হয়। জমি বা বৃত্তি নির্দ্ধারিত থাকায় তাহারা নানাবিধ অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিতে থাকে। সকলদেশের 'এপিক'গুলিতে হীরোর চরিত্রের গুণগানের সহিত অভিজাতগণ কর্ত্তৃক অর্জ্জিত অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে।

তাহার পরবর্ত্তীযুগে সামন্তগণ রাজক্ষমতা হস্তগত করিলে Heroic যুগের অবসান ঘটে। এই জন্যই এই যুগে স্পেন্সারকে 'ফেয়ারী কুইন' বা চসারকে 'কান্টারবেরী টেল্‌স' লিখিতে হয়। আরবের আরব্যোপন্যাসও এই যুগের রূপ-কাহিনী। কালিদাস, মাঘ, ভবভূতি এই যুগের কবি। খণ্ড কবিতা এই যুগের সাহিত্য। মধ্য-বিত্ত শ্রেণী ভারতবর্ষে কোনকালেই প্রবল হইয়া উঠিতে পারে নাই। কলকারখানার আবির্ভাবের সহিত এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী ইউরোপে প্রবল হইয়া শির উত্তোলন করিলে, তথায় এই শ্রেণীর লোক রাজ-ক্ষমতা হস্তগত করে। বুর্জোয়া সাহিত্য এই যুগেই জন্মগ্রহণ করে। ফ্রান্সের ভিক্টর, হুগো, রুসো, ইটালীর পেট্রার্ক, দান্তে, ইংলণ্ডের ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, শেলী, স্কট এই যুগের সাহিত্য রথী। ইংরাজাধিকারের সহিত ভারতবর্ষেও এই ইউরোপীয় সাহিত্যের ভাবধারা আসিয়া উপস্থিত হয়, আমাদের সাহিত্যে তখনও Heroic যুগেরই প্রভাব বিদ্যমান। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর বা কবিকঙ্কণের চণ্ডীতে Heroic যুগের ছবি দেখিতে পাই। তবে যুগধর্ম্মের মহিমায় এই ছবিতে মলিনতা পড়িয়াছে। সাহিত্যিকগণ প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও মহাকবি হইতে পারিতেছিলেন না। ইংরাজীশিক্ষা বিস্তারের সহিত নূতন সাহিত্যরথীগণ দেখা দিলে তাঁহারা ইংরাজী ভাবের সাহায্যে এখানে যে সাহিত্য রচনা করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন তাহা ঠিক Heroicও নয়, বা বুর্জোয়াও নয়। মেঘনাদবধ কাব্যে লক্ষ্মণকে রাবণ-সন্তানের নিকট হীনপ্রভ করিয়া দেওয়ায় অনেকেই মাইকেলকে অভিসম্পাত প্রদান করিয়া থাকেন। তাহার নানা প্রকার ব্যাখ্যা প্রদান করা হইয়াছে। মনে হয় মাইকেল বুর্জোয়া প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই বলিয়াই 'এপিক' লিখিতে বসিয়া Heroic যুগের তত্ত্বটিকে অপমানিত করিয়াছেন, Heroic যুগের মূলমন্ত্রই হীরোর যশোগান করা। হীরো সর্ব্বপ্রকার অপরাধের উপর। কিন্তু তাহা হইলে বুর্জোয়া প্রভাবে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন, এইজন্যই লক্ষ্মণকে তিনি ইন্দ্রজিতের নিকট হীনপ্রভ করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন। এই প্রভাব হেমচন্দ্রেও যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান আছে। কবির এই Heroic যুগের আব-হাওয়াকে ফুটাইয়া তুলিবার

চেষ্টা করিয়াছেন সত্য, কিন্তু বুর্জ্জোয়া সাহিত্যও রচনা করিতে পারেন নাই। কবি রবীন্দ্রনাথ প্রথম বয়সে বঙ্কিমীযুগেই বাস করিতেন বলিয়া তাঁহার ব্যর্থ প্রয়াস বেশই স্পষ্ট। পরিণত বয়সে বুর্জ্জোয়া সাহিত্য রচনা করিবার আবার চেষ্টা করিয়া কতকটা কৃতকার্য্য হ'ন, কিন্তু ঐ কৃতকার্য্যতার পরিমাণ এত অল্প যে উহা জাতির মনে কোন ছাপ ফেলিতে পারে নাই, চোখের বালী, নৌকাডুবি এই যুগের। ঘরে-বাহিরে ও গোরায় কবি বুর্জ্জোয়াঁর মনোভাব আঁকিতে বসিয়া আদর্শ সম্মুখে স্থাপন করায় বাস্তবকে ক্ষুণ্ণ করিয়াছেন। তাঁহার পরিণত বয়সের শেষের কবিতা ও যোগাযোগ উৎকৃষ্ট Lyric বা খণ্ড কাব্য, উহাকে রূপ-কথা বলা যাইতেই পারে না।

কবীন্দ্র রবীন্দ্রের পর আসিলেন শরৎচন্দ্র। বুর্জ্জোয়া সাহিত্য তাঁহার হস্তে পড়িয়া মূর্ত্তিমন্ত হইয়া উঠে, এ কথা খুবই সত্য। এতদিন আমাদের সাহিত্যের দৃষ্টি রাজ-রাজড়া বা তাহার সামন্তগণের উপরেই ছিল। শরৎবাবু নূতন সাহিত্য-রচনা করিয়া এই দৃষ্টিশক্তিকে প্রসারিত করিয়া দেন। আমাদের ধ্যান-ধারণা এতদিন একটি কূপ মধ্যে আবদ্ধ থাকায় সাহিত্য-জগতে শুধু পুনরাবৃত্তিই ঘটিতেছিল, শরৎচন্দ্র সেখানে নূতন মৌলিকতা আনয়ন করেন। ইহাই শরৎবাবুর কীর্ত্তি, বাঙ্গালীমাত্রেই সেজন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। কিন্তু এই বিশালতায়ও সঙ্কীর্ণতা আসিয়া দেখা দিতে লাগিল। অভিজাতদের সংস্কারগুলি বুর্জ্জোয়াযুগে খানিক পরিসর প্রাপ্ত হইয়াছিল। উদাহরণ স্বরূপ বলি যে Heroic যুগে রাজার জন্য প্রাণ পরিত্যাগ করাই ছিল পরম ধর্ম্মের কথা। সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় ভীষ্ম কৌরবগণকে অত্যাচারী ও মহাপাপী জানিয়াও, যেহেতু তাঁহারা রাজ-তক্ত গ্রহণ করিয়া বসিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাদিগকে ত্যাগ করিতে পারেন নাই। ক্ষত্রিয় বৃত্তিধারী-গণেরও সেই দশা। শূদ্র অন্নে পুষ্ট মহাবীর কর্ণও অভি-জাতগণের সংস্পর্শে আসিয়া এই সত্যটীকেই জীবনের মূলমন্ত্র বলিয়া গ্রহণ করেন। মহা অন্যায় করিলেও লক্ষ্মণ রামচন্দ্রকে দেবতাই ভাবিয়া আসিয়াছেন। বঙ্কিমী-যুগে Heroic যুগের এই সমস্ত তত্ত্বেরই বাহুল্য দেখা দেয়। শৈবলিনী প্রতাপকে ভালবাসিত, কেননা দুইজনে একত্রে প্রতিপালিত। যৌবনে উভয়ে বিবাহের বিধানে স্থানান্তরিত হইলেও, বাল্যের মোহ অতিক্রম করিতে পারিলেন না, ইহাও বাস্তবতা। তাহার পর বঙ্কিমবাবু যাহা করিয়াছেন তাহা Heroic যুগের মোহে অভিভূত ছিলেন বলিয়াই। বিন্দুর ছেলে বা রামের সুমতিতে আমরা শরৎচন্দ্রকে বুর্জ্জোয়া রূপেই দেখি। তাঁহার কোন আভিজাত্য নাই, তাঁহার সঙ্কীর্ণ মনোভাবের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। বিরাজ বৌতে শিল্পী শরৎচন্দ্র Heroic যুগের সত্যের নিকট মাথা নত করেন। স্বামী দেবতার নিকট মাথা নত করাটা Heroic যুগের সত্য এই জন্যই সীতা রাম কর্ত্তৃক নির্ব্বাসন আজ্ঞা শির নত করিয়া লইয়াছিলেন। স্বয়ং রামচন্দ্র যে নতশিরে পিতার আজ্ঞা বিনা প্রতিবাদে গ্রহণ করিয়া-ছিলেন, তাহাও এই সত্যের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য। শরৎচন্দ্র 'চরিত্রহীনে' বুর্জ্জোয়া স্বরূপ ধারণ করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু Heroic যুগের দুই একটা তত্ত্ব তখনও উঁকি-ঝুঁকি মারিয়াছে। কিরণময়ী দিবাকরের সহিত সর্ব্বপ্রকার সান্নিধ্য জনিত সুখ উপভোগ করিলেও, 'নারী-ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ রত্নটীকে রক্ষা করিবার জন্য শয়ন-কালীন উভয়ের মধ্যে একটী উপাধান রাখিতেন।' কোটেসনটী আমাদের—উহার দ্বারা তাঁহার মনোভাব ব্যক্ত করিলাম। শরৎবাবু শ্রীকান্তে এই ভাব অনেকটা কাটাইয়া উঠিতে পারিয়াছেন বলিয়াই শ্রীকান্ত তাঁহার একটী মহা কাব্য। অন্যত্র সর্ব্বত্রই তাঁহার জড়তা উপলব্ধি হয়। Communist কমল শেষ প্রশ্নে শরৎবাবুকে অনেকটা আগাইয়া দিয়াছে। কিন্তু এইখানেই শরৎ সাহিত্যে যবনিকা পতিত হইয়াছে।

Proletariat আন্দোলনের সহিত ইউরোপীয় সাহিত্য ক্ষেত্রে এখন Proletariat সাহিত্যই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। এই যুগের নেতা গর্কী, হুটহামসেন। দুই জনেই সকল প্রকার সংকীর্ণতা বা গণ্ডি বানের জলে ভাসাইয়া দিয়াছেন। শ্রীকান্তের দাদা ভদ্রলোক চোর। শ্রীকান্তের প্রথম পর্ব্বে শরৎচন্দ্র মৎস্যচুরির যে আলেখ্য দিয়াছেন, আমি বলি উহা প্রাণহীন। কেননা উহা যেন অনেকটা Hero যুগের হীরোদের মৃগয়া করা। মৃগয়া করিতে গেলেও সেকালে রাজা-

রাজড়াদের বহু আয়াস স্বীকার করিতে হইত। বাস্তব আকারে গৃহীত হইলেও উহাতে কল্পনারই আশ্রয় লইতে হয়, কল্পনার মোহ ধারা মৃগয়া-বাহিনী চালিত না করিলে উহা কখনও সু-পাঠ্য হয় না। কিন্তু গর্কীর 'চেলকাস্' নামক গল্পে যে চৌর্য্য-কাহিনী অঙ্কিত করা হইয়াছে উহা একেবারে আধুনিক, নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। সমাজের নানা শ্রেণীর চাপে পড়িয়া যে সমস্ত অস্থি-মজ্জাহীন জীব বাস করে তাহাদিগকে আপনাদের প্রাণ রক্ষা করিবার জন্য এইরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান নিত্য অনুষ্ঠিত করিতে হইতেছে। গর্কী যাহা বলিয়াছেন উহা একেবারে বাস্তব—কল্পনার লেশও সেখানে নাই, এই জন্যই উহা অত স্পষ্ট, অতটা প্রাণবান।

বাংলায় এইরূপ সাহিত্য রচনা করিবার প্রয়াস দুই একজন করিতেছেন। অচিন্ত্য সেনগুপ্ত তাঁহাদেরই একজন অন্যতম শিল্পী। এই শ্রেণীর লেখকগণ যে সমস্ত উপাদান বাংলায় দিতেছেন, তাহা বাংলায় নূতন। কিছুদিন পূর্ব্বে বাংলা ভাষায় ভীষণ ভাবে সাহিত্য দ্বন্দ্ব চলিয়াছিল। একদল সুনীতি অজুহাতে এই শ্রেণীর সাহিত্যের গলা টিপিয়া সূতিকাগারেই উহার বিনাশ সাধন করিতে চাহিয়াছিলেন, আর একদল বাস্তবের দোহাই দিয়া এই প্রকার সাহিত্যের গলদেশে বর-মাল্য প্রদান করিতে ব্যগ্র হন। এখনও এই কলহের অবসান হয় নাই একথা সত্য। সত্য বলিয়াই বর্ত্তমান প্রবন্ধের অবতারণা করিতেছি।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি বাস্তব সাহিত্য বড় কি কল্পিত আদর্শ সাহিত্য বড় সে বিষয়ের এখন কোন উত্থাপন করিব না, বিষয়টী এত বড় যে বর্ত্তমান প্রবন্ধে উহার মীমাংসা করা সম্ভবপর নহে। সময়ান্তরে এই বিষয়টী লইয়া আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। এখন এই কথা মাত্র বলিতে চাহি যে বাস্তব সাহিত্য আসিয়া যখন আত্ম-প্রকাশ করিতেছে তখন তাহা কিছুই নহে বলিয়া উড়াইয়া দিতে যাওয়া বাতুলতা মাত্র। তবে একথাও সত্য যে বাস্তবের দোহাই দিয়া অশ্লীলতাকে প্রশ্রয় দেওয়া সাহিত্য নহে। তাহাই যদি হইত তাহা হইলে বটতলার বাজে চমকপ্রদ বইও সাহিত্য নাম অর্জ্জন করিতে পারিত।

বাস্তব সাহিত্য কি? বর্ত্তমান যুগে অভিজাত, পুরোহিত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী ব্যতীত আর একটী শ্রেণী শির উত্তোলন করিতেছে, ইহারাই প্রোলেটারিয়েট। সমাজে চিরকালই বিদ্যমান ছিল, কিন্তু তাহারা ছিল মূক। তাহাদের চক্ষু থাকিলেও অন্ধ ছিল, মুখ থাকিলেও, কোন ভাষা ফুটিত না। এই জন্যই এই শ্রেণীর জনসাধারণকে Heroic যুগে ও বুর্জ্জোয়া যুগে Common noun এই আখ্যা প্রদান করিয়াছি। ইহারা সূর্য্য উদয়ের সহিত শারীরিক পরিশ্রম করিতে সুরু করিত এবং সূর্য্যাস্তে—উহাদের কার্য্যের শেষ হইত। জীবন-ধারণোপযোগী জীবিকামাত্র প্রাপ্ত হইয়াই ইহারা সন্তুষ্ট থাকিত। উহা না প্রাপ্ত হইলে অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া ক্ষুদ্র-কীট পতঙ্গের ন্যায় প্রাণ পরিত্যাগ করিত। গ্রীসের Herlot এবং ভারতের শূদ্র এই শ্রেণীর জীব। বর্ত্তমানকালের শ্রমজীবিরা পূর্ব্বকার আখ্যায় অভিহিত হইলেও, তাহারা এখন প্রত্যেকেই Proper nounএ পরিণত হইয়াছে। এখন তাহাদের মধ্যে কেয়ার হার্ডি হইতে আরম্ভ করিয়া, মাকডোন্যাল্ড পর্য্যন্ত বাহির হইতেছেন। বাস্তব জগতের এই আলেখ্য পিকউইক পেপারে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। গরকীর প্রত্যেক নভেলে এই বাস্তবকে প্রাণবান করিয়া খাড়া করা হইয়াছে। বাংলায় যাঁহারা এই বাস্তবকে লইয়া কথা-সাহিত্য গঠন করিতেছেন তাঁহারা বাস্তব-ঘটিত সারসত্যটীকে বুঝিবার যে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন তাহা বলিয়া মনে হয় না। অনেক সময়েই বাস্তবের নাম করিয়া যে কথা-সাহিত্য প্রকাশিত করিবার চেষ্টা দেখা যায়, উহাতে শুধু কাম-পিপাসা মাত্র আছে। বাস্তবের প্রধান অঙ্গই Materialism, অর্থাৎ উদর ও 'সেক্স'। উদর ও 'সেক্স'কে অতিক্রম করিয়া কোন সত্যই গঠিত হইতে পারে না। কিন্তু Sexএর ক্রমপরিবর্ত্তন দেখাইবার ছল করিয়া আপনার ব্যর্থ কাম-বৃত্তি চরিতার্থের ইতিহাসই বাস্তব-সাহিত্য নয়। প্রচলিত সর্ব্বপ্রকার আইন-

কাঞ্চনকে পদদলিত করাই সাহিত্য নয়। এই জন্যই এ প্রচেষ্টায় বাংলায় বিস্তর আগাছা জন্মাইয়াছে। শনির চিঠির মারফৎ এইরূপ কদর্য্য সাহিত্যের পরিচয় পাঠকগণ অনেকে পাইয়াছেন, উহার পুনরুল্লেখ করিবার এখানে কোন প্রয়োজন নাই।

অচিন্ত্য সেন গুপ্তের নাম এখন সাধারণ বাংলা সাহিত্যে বিশেষ সুপরিচিত। প্রবন্ধ লেখক তাঁহার সহিত একেবারেই পরিচিত নহেন। সুতরাং এখানে যাহা বলিতেছি তাহা বন্ধুজনোচিত মিষ্টবাক্য নহে। বেদে বহিখানি আমি সম্প্রতি পাঠ করিয়াছি। শুনিয়াছি কবীন্দ্র রবীন্দ্র পর্য্যন্ত নাকি উহার সুখ্যাতি করিয়াছেন। Proletariat সাহিত্য হিসাবে এই উপন্যাসখানি একখানি উচ্চাঙ্গের পুস্তক। বেদের নায়ক সদ্বংশজাত হইলেও পিতৃহীন, আত্মীয়-স্বজন কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত। এক কদর্য্য অনাথ-আশ্রমে তাহার বাল্য-জীবন অতিবাহিত হয়। এখানে তাহার নাম কাঁচা। এই নাম রাখিবার গূঢ় অভিপ্রায় আছে। বেদের নায়ক 'কাঁচা' ভাবে অসহায় অবস্থায় জীবন-যাত্রা সুরু করিয়া কেমন থাকিবেন, তাহাই গ্রন্থকার দেখাইবেন। মানব-জীবনের দুই ক্ষুধা আছে, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, উদরগত ক্ষুধা ও যৌনগত ক্ষুধা। এই কাঁচার দুইটী ক্ষুধারই dormant অবস্থা এই অনাথ-আশ্রমে বাল্যকালীন দেখান হইয়াছে। পেটের ক্ষুধার তাড়না সে তেমন ভোগ করে না, কেন না সময় মত খাইতে পায়, কিন্তু যৌন ক্ষুধার অনুভূতি তাহার হইয়াছে। এইজন্য সে বা তাহার সহচরগণ কোন প্রকার Conventional নীতি মানে না বা জানে না। তাহারা চুরি করে, পাপের ভয়ও তাহাদের মনে স্থান পায় না; ক্ষুধা নিবারণ করাই তাহাদের রক্ত মাংসের শরীরের মুখ্য উদ্দেশ্য। কাঁচার কোন প্রকার সংস্কার নাই, আভিজাত্য গৌরব নাই। কোন Proletariat এরই তাহা থাকিতে পারে। অনাথ আশ্রম ত্যাগ করিয়া কাঁচা মুসলমান দর্জ্জির নিকট আশ্রয় গ্রহণ করে। এখানেও যৌনক্ষুধাই তাহাকে উৎপীড়িত করিতে থাকে। পেটের ক্ষুধার কোনরূপে নিবৃত্তি হয়। তার পর 'কাঁচা' 'কাঞ্চনে' পরিণত হইয়া এক অভিজাত-গৃহে আশ্রয় পায়। এখানে সে ভাল খাইতে পাইত ভাল পরিতে পাইত; কিন্তু Proletariatদের ইহাই এক দুঃখ যে নারীজাতি তাহার নিকট আসিতে চাহে না। রমণী বীর ভোগ্যা। None but the brave deserves the fair ইত্যাদি Heroic যুগের মোহ এখনও চলিতেছে। স্বয়ং রমণীগণও যে এখনও বীর কান্তই পছন্দ করেন। চঞ্চল কুমারী বৃদ্ধ রাজসিংহকে বিবাহ করিয়া সপত্নীর সহিত গার্হস্থ্য ধর্ম্ম পালন করিবেন সেও ভাল তথাপি বীরপতি তাঁহার চাই। এই তত্ত্বটা রমণীগণের অস্থি মজ্জাগত হইয়া থাকায় উদীয়মান 'কাঁচা'গণ সঙ্গিহীন হইয়া অশেষ কষ্ট প্রাপ্ত হন, তৃতীয় স্তরে গ্রন্থকার অতি নিপুণ হস্তে তাহা দেখাইয়াছেন।

'বাবুর ভগ্নী' বা রেলওয়ে ট্রেণ যোগে 'কাঁচা' যে ভদ্রলোকটীর অনুসরণ করিয়াছিলেন, তাঁহার পত্নী, 'কাঁচা'কে নিকটেই আসিতে দিল না, কাঁচা ফুটনোন্মুখ হইয়াও মুষড়াইয়া পড়িল, এইখানেই গ্রন্থকার তাঁহার কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। কাঁচা বাহিরেও কাঞ্চন হইবার জন্য প্রাণ-পণ করিল, সে আবার ফিরিল, স্ত্রী-সহবাস তাহার লাভ হইল বটে কিন্তু Proletariat রমণীদের মধ্যে, যেখানে কাঁচা একজন Hero। বিশ্ব বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়া M.A. পড়িতে লাগিল, তাহার 'কাঞ্চনত্ব' দেখিয়া বুর্জ্জোয়াঁ নারী ভালবাসিল, এইরূপ ভালবাসাই সে চাহিয়াছিল, এই রমণীর প্রেম লাভ করিলে কাঁচা হয়তো বা বুর্জ্জোয়াঁ জীবন যাপন করিত, কিন্তু কোন বুর্জ্জোয়াঁই বুর্জ্জোয়াঁ নয়, যদি তাহার অর্থ না থাকে। বুর্জ্জোয়াঁ নারী অর্থকেই প্রেমের উপর স্থান প্রদান করে, এইজন্যই কাঞ্চনের অভিলাষ পূর্ণ হইল না, তাহাকে আবার উদ্দেশ্যহীন জীবন লইয়া বাহির হইয়া পড়িতে হইল। প্রকৃত Proletariat বেদে। তাহার জীবনে উন্নতি সংঘটিত হইলে সে যখন বুর্জ্জোয়াঁ হয় তখনই তাহার বেদেত্ব নষ্ট হইয়া যায়। কাঞ্চন অর্থ লাভ করিলেও তাহার বেদেত্ব ঘুচিল না, কেন না তাহাকে ভদ্র করিয়া তুলিতে পারে এমন বুর্জ্জোয়াঁ নারী তাহার গলদেশে মাল্য দিতে চাহিল না। এ কথা সত্য নহে যে কাঞ্চন দেখিতে কুৎসিৎ ছিল, তাহার দেহে রূপের অভাব ছিল; তাহার এক মস্ত বড় দোষ ছিল সে অর্থহীন। অর্থহীন কোন proletariat [illegible]

বুর্জ্জোয়া রমণী ভালবাসিতে পারে না, কেন না তাহাতে যৌন ক্ষুধার নিবৃত্তি ঘটিলেও পেটের ক্ষুধা যে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া অশেষ প্রকার বিভীষিকা রচনা করে।

'বিবাহের চেয়ে বড়ো' গ্রন্থকারের আর একখানি পুস্তক। বাংলার সাধারণ পাঠকগণ বলেন 'বেদে' অপেক্ষাও 'বিবাহের চেয়ে বড়ো' বইখানি ভাল। এইরূপ বলিবার কারণ আছে। বেদের ভাষা প্রাণবান। প্রথম পর্ব্বে উহা ভাঙ্গা চূর্ণ, অস্পষ্ট, ভাব-গৌরবে হীন, কেন না proletariatএর উপযুক্ত ভাষা করিতে গেলে ঐরূপ করাই যুক্তিযুক্ত। মূর্খ, অজ্ঞ proletariat কখনই Logic ঠিক করিয়া সাধু ভাষায় কথা বলিতে বা চিন্তা করিতে পারে না। এইরূপ ভাষায় প্রথম পর্ব্ব রচনা করায় অচিন্ত্য বাবুর যথেষ্ট কেরামতী প্রকাশ পাইয়াছে। কাঁচা যেমন ক্রমশঃ পাকিয়াছে, ভাষাও সেইরূপ পাকিয়া, পরিশেষে সাধুত্ব লাভ করিয়াছে। এই অস্পষ্ট ভাব', ভাব ধারণা সাধারণ পাঠককে প্রথমেই ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলে বলিয়া তাঁহারা ধৈর্য্য সহকারে 'বেদে' বইখানি পড়িতে পারেন না।

"বিবাহের চেয়ে বড়" বই খানিতে ভাষার লালিত্য আছে, অধিকাংশ স্থলেই সাধু ভাষারই ব্যবহার করা হইয়াছে, এই জন্যই উহা সু-পাঠ্য। নায়ক প্রভাত ও নায়িকা অশ্রু দুই জনই সুশিক্ষিত, এইজন্য দুই জনেই বেশ সংযতভাবে চিন্তা করেন, তাঁহাদের সমস্ত গবেষণাই সু-যুক্তিতে পরিপূর্ণ।

এই পুস্তকখানি গ্রন্থকারের 'অধিবাস' নামক একটী ছোট গল্পের প্রসার মাত্র। এই পুস্তকে লেখক নায়ক-নায়িকার মধ্য দিয়া উহাদের হৃদয়ের যৌন-ক্ষুধার উন্মেষ দেখাইয়াছেন। বেদেতে আমরা যাহা দেখিয়াছি, এখানে সেই ভাব-ধারণা একটী নির্দ্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ করিয়া ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। প্রভাত ও অশ্রু বুর্জ্জোয়া নর নারী। উভয়েই উভয়কে ভালবাসে। তবে উভয়েরই একটু স্বতন্ত্রতা আছে। সাধারণতঃ দেখা যায় যে বুর্জ্জোয়া নারী অর্থকেই মোক্ষ ধরিয়া লয় বলিয়া প্রেমকে তুচ্ছ করিয়া অর্থকেই প্রাধান্য প্রদান করে। বেদের শেষ নায়িকাটী তাহাই করিয়াছিল। কিন্তু অশ্রু তাহা করিল না। সে জানিত যে প্রভাত দরিদ্র, তাহাকে ভাল বাসিতে গেলে আজীবন দারিদ্র্যকে বরণ করিয়া লইতে হইবে, তথাচ সে শির নত করিয়া প্রেমকেই প্রাধান্য প্রদান করে। এটা কিন্তু বাস্তব নহে, এটা একটা আদর্শ মাত্র। বাস্তব ও আদর্শের সম্মিলনে সে সাহিত্য রচনা হয়, 'বিবাহের চেয়ে বড়ো' তাহাই। প্রভাত অশ্রুর সান্নিধ্য চাহে, অশ্রু নিকটে আসে, কিন্তু—আত্ম-সমর্পণ করেনা। ইহার কারণ প্রভাত জিজ্ঞাসা করিলে সে তাহাকে বলিয়াছিল, আমাদের দৈহিক মিলনে আমাদের নৈতিক পতন ঘটিবে, কেননা অর্থাভাব। অর্থাভাবের জন্যই সে প্রভাতকে দেহ দান করিতে রাজী হয় নাই এবং এই জন্যই সামাজিক নিয়মগুলির গণ্ডির মধ্যে পা দেয় নাই। কেহ কেহ অবশ্যই একথা বলিতে পারেন যে, কোন নারী কোন যুবককে বিবাহ না করিয়া তাহার সহিত একত্র রাত্রিবাস করিলে, উহাদের কি নীতিচ্যুত হইতে হয় না? একথার অর্থ পূর্ব্বেই প্রদান করিয়াছি। Heroic যুগের নীতি, বুর্জ্জোয়া যুগে চলে না, বুর্জ্জোয়া যুগের নীতিও সেইরূপ—Proletariat যুগে চলিবে কেন? যে যুগে সহস্র নর-নারী একত্র আট দশ ঘণ্টা কাজ করিতেছে সে যুগে দুইজন নর-নারী একত্র দুই চারি রাত্রি বাস করিলেই নীতিচ্যুত হইবে কেন? সনাতনীগণ বলিতে পারেন বিবাহের মন্ত্রই নর-নারীর যৌন-সম্বন্ধের প্রাণ। ইহাও কি ঠিক সত্য? বহুকাল হইতেই ত ইউরোপে Intelletual marriage চলিয়া আসিতেছে। দার্শনিক মিল ত তাঁহার পত্নীকে কোন প্রকার মন্ত্রের দোহাই না দিয়াই গ্রহণ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়েও ত Companion marriage ইত্যাদির প্রচলন হইতেছে। সুতরাং গ্রন্থকার তাঁহার নায়ক-নায়িকাকে কোন প্রকার মন্ত্রের বিনা সাহায্যেই যদি একত্রিত করিয়া দেন তবে তাহা দূষ্য হইবে কেন? অশ্রু প্রভাতকে চাহে, মনে প্রাণে ভালবাসে এই ভালবাসা সত্য কিনা পরীক্ষা করিবার জন্য সে আরও দুই-একজনকে ভালবাসিয়াছে—কিন্তু ঐরূপ চেষ্টা তাহাকে আরও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ করিয়া তুলিয়াছে। শেষে

সে যখন প্রভাতকে ত্যাগ করিয়া নিজের কর্ম্মস্থলে চলিয়া যায়, তখনও তাহার ভগ্ন-হৃদয়ে একটী ভগ্ন-সঙ্গীত উত্থিত হইয়াছিল।

তবে একথা সত্য যে বেদের ন্যায় 'বিবাহের চেয়ে বড়' একখানি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর পুস্তক নহে। এই পুস্তকে লেখক বাস্তবের সহিত আদর্শের সম্মিলন করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন যাহা কোন বাস্তব-কাহিনী লেখকের কর্ত্তব্য নহে। এই গল্পে গ্রন্থকার বুর্জ্জোয়াঁ মনোভাবের মোহে আচ্ছন্ন বলিয়াই বই খানির এই অদ্ভুত ভাবে নামকরণ করিয়াছেন। তাঁহার নামকরণেই মনে হয় তিনি বিবাহ জিনিষটাকে সনাতন সত্য বলিয়া মানিয়া লইয়া উহার উপর আর একটী সত্যের প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিতেছেন, ইহা তাঁহার দুর্ব্বলতা। তাঁহার স্মরণ রাখা উচিত ছিল শ্রীরাধার সহিত বিবাহ হওয়াত দূরের কথা, শ্রীরাধা পরকীয়া, বিবাহিতা পত্নী, তত্রাচ তিনি শ্রীকৃষ্ণের অনুরাগিনী। বৈষ্ণব-গাথা এখানে একটী বাস্তব-চিত্র দিয়াছেন বলিয়াই, চৈতন্যদেবকে স্বীকার করিতে হইয়াছিল—'সবার উপর মানব।' চণ্ডিদাস রামীকে বিবাহ করেন নাই, রামী বিধবা। ইহাও একটী বাস্তব চিত্র। নাম-করণে গ্রন্থকারের যথেষ্ট দুর্ব্বলতা প্রকাশ পাইয়াছে।

জীবন বীমা প্রসঙ্গ

বীমা পত্রিকায় কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব

শ্রীশনি—

ভারতবর্ষে জীবনবীমা কোম্পানীগুলি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে বীমা সংক্রান্ত কাগজ যে জন্মায় নি এটা অনেকেই জানেন। কিন্তু পরে দেখা গেল যে বীমা-কোম্পানীর প্রচার কার্য্যে সহায়তা করিতে গেলে এবং সাধারণকে প্রবুদ্ধ রাখিতে গেলে এইরূপ সংবাদ সাহিত্যের নিতান্ত প্রয়োজন কাজে কাজেই ক্রমানুগতিকে এই বীমা পত্রিকাগুলির আবির্ভাব হইয়াছে এবং হইতেছে। বীমা পত্রিকা বলিতে আমরা বুঝিব যে তাহাতে মৌলিক যাহা লেখা থাকিবে সেগুলি ভাবপ্রবুদ্ধকারক ও শিক্ষাপ্রদ এবং অন্যান্য খবরের মধ্যে যে সকল বীমা কোম্পানী আমাদের দেশে কাজ করিতেছে তাহাদের সম্বন্ধে নূতন খবরাদি আমাদের দেশের জনসাধারণের গোচরার্থ প্রকাশ করা যথা উদ্বৃত্তপত্র প্রকাশ করা এবং যদি পত্রিকার সম্পাদকীয় ক্ষমতায় কুলায় তাহার সঠিক ও নিরপেক্ষ সমালোচনা করিয়া দেওয়া। এই সকল মূল খবর ব্যতীত বীমা অফিস গুলিতে ভিতরে কোন কোন পরিবর্ত্তন হইল তাহার খবর প্রকাশ করা এবং কেবলমাত্র বীমা ব্যবসায় সংশ্লিষ্ট সংবাদ সাহিত্য প্রচার কার্য্যে নিযুক্ত থাকা। মোটামুটি আমরা বীমা-বিষয়ক পত্রিকা বলিতে এই বুঝি এবং ঐ সঙ্গে আরও বুঝি যে ঐরূপ কাগজে বীমা-কোম্পানীগুলির বিজ্ঞাপন থাকিলে তাঁহাদের নিজেদের ব্যবসায়ের—সুবিধাই হয়—পরন্তু কাগজওয়ালারও বেশ দুই পয়সা আমদানী হইতে থাকে।

দেখা যায় কালক্রমে আমাদের দেশে ভারতবাসী দ্বারা চালিত ইংরাজী পত্রিকা যাহাতে কেবল বীমা সম্বন্ধে প্রবন্ধাদিই প্রকাশিত হয় সেইরূপ কাগজ প্রায় ৭।৮ খানি আছে, বাংলায় মাদ্রাজী বা গুজরাটী ভাষায় প্রকাশিত বীমা পত্রিকা ৩।৪ খানি এবং মিশ্রিত পত্রিকা যাহাতে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে দুই এক ছত্র বা পৃষ্ঠা জীবন-বীমা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া বা সাময়িক প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়া যাহাতে বীমাকোম্পানীগুলির দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় সেইরূপে বাহবা লইবার চেষ্টাও মাসিক দেশীয় ভাষায় কাগজের মধ্যে ৬।৭ খানি আছে। ইংরাজীতে দৈনিক কাগজের মধ্যেও এই কার্য্যের জন্য সপ্তাহে একদিন বা দুইদিন বীমা বিষয়ক প্রবন্ধাদি বাহির হয়।

এক্ষণে আমরা সহজে অনুমান করিতে পারি যে এই সকল পত্রিকার সম্পাদনভার গ্রহণ করিবার মত সুযোগ্য লোকের অভাব আমাদের দেশে নাই। কিন্তু দুঃখের

বিষয় কয়েকটি এমন অযোগ্য লোকের হাতে দুই একখানা কাগজের সত্বাধিকারিত্ব বা তন্নামীয় সম্পাদনের ভার পাড়য়াছে যাহা দেখিলে মনে হয় যে ঐগুলির অস্তিত্ব কেবল দুর্ব্বল বীমাকোম্পানী গুলিকে চোখ রাঙ্গাইয়া দুই পয়সা উপায় করিয়া নিজেদের উদরপূর্ত্তি করা ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই। সম্পাদক হিসাবে যিনি ভার লইবেন তাঁহার জ্ঞান বা পরিচালনা বুদ্ধি সাধারণ লোক অপেক্ষা অনেক উচ্চস্তরের হওয়াই স্বাভাবিক। কয়েটি মূর্খ জুয়াচোর এই কার্য্যের ভার লইয়া শুধু হুমকীর উপর বিজ্ঞাপন আদায় করিয়া সমাজে বেশ চলিয়া যাইতেছে। কাজে কাজেই সকল কাগজের সকল সম্পাদকী মন্তব্য বা সমালোচনা যে কোনপ্রকারে হিতকারী হইতে পারে ইহা কোনমতেই ধারণা সাপেক্ষ নয়। এমন কি কয়েকখানি কাগজের লেখার ধারা দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে উদ্দেশ্য সাধু নয় বরং হুমকী দিয়া বিজ্ঞাপন আদায় করিবার পন্থা করাই প্রধান উদ্দেশ্য। যদি বা এই উদ্দেশ্য লইয়াই কয়েকটি কাগজ বেশ সচ্ছন্দে নিজেদের ভরণপোষণ চালাইতে সক্ষম হইতেছে তথাপি সাধারণ পাঠকের কর্ত্তব্য হিসাবে তাহাদের সেই কাগজের পরিচালকদের চিনিয়া লইতে বেশী বিলম্ব হওয়া উচিৎ নয় এবং যাহাতে তাহারা অবাধে এইরূপ জঘন্যবৃত্তি চালাইতে না পারে সেই বিষয়েও সচেষ্ট হওয়া উচিৎ। এক হিসাবে যেমন নির্ভীক পত্রিকার অস্তিত্ব থাকা বিশেষ প্রয়োজনীয় ও বাঞ্ছনীয়। আর এক হিসাবে যাহাতে এই স্বাধীন সমালোচনা হুমকীতে গিয়া পরিণত না হয় তাহাও আমাদের সমষ্টি হিসাবে দেখা উচিৎ। তাহা হইলে দেখা যায় যে সাধারণের পক্ষ হিসাবে বীমা পত্রিকার অস্তিত্বের সার্থকতাও যেমন আছে আবার তাহার অসদ্ব্যবহারের গতিরোধ করায়ও পুণ্য আছে। এক সময়ে বিলাতে 'জন্ বুল্' কাগজের প্রতাপে কতকগুলি বীমা ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলি ভয়ে কম্পমান ছিল কিন্তু পরে প্রমাণ পাওয়া যায় সেই কাগজের কর্ণধার ও পরিচালক হোরেসিও বটমলি এক মহা জুয়াচোর লোক যাহার শ্রীঘরই হইল শেষে উপযুক্ত বাসস্থান। আমাদের দেশে এইরূপ পরিচালকের অভাব নাই যাহারা দেশীয় বীমাকোম্পানীগুলির প্রসাদেই বেশ কায়েমীভাবে দিনপাত করিতেছে। বীমা পত্রিকায় মৌলিক লেখা থাকা নিতান্ত প্রয়োজন তদ্ব্যতীত সাময়িক খবর থাকা প্রয়োজন। ইহা ছাড়া সাধারণের গোচরার্থ যে সকল খবর পড়িলে বীমাকারীদের বীমা-সম্বন্ধে একটা আগ্রহ জন্মায় সেইরূপ প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়াও নিতান্ত প্রয়োজন। বীমা পত্রিকা নামে যে সকল কাগজ আমাদের দেশে প্রকাশিত হয় তাহারা সকলেই প্রায় জীবন বীমা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া থাকেন। কিন্তু বীমা ব্যবসায় যে কেবল জীবন বীমার কার্য্যেই আবদ্ধ নয় তাহা কাহাকেও বলা নিষ্প্রয়োজন। বীমা পত্রিকায় লেখক হিসাবে বীমা সম্বন্ধে আলোচনা করা সুকঠিন নিশ্চয় কিন্তু আবার বটম্লীর মত সমালোচনা হিসাবে ব্যক্তিগত সমালোচনা বা চুট্‌কী মুখরোচক খবর ছাপিয়া বাহবা লইতে যাইয়া কাগজের দায়িত্বকে বা গুরুত্বকে লঘু করায় তাহাকে আর বীমা পত্রিকা বলিয়া ধরা যায় না। যে কয়খানা পত্রিকা আমাদের দেশে ছাপা হইয়া প্রচলিত হইতেছে তন্মধ্যে কয়েকখানির জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যু হইলে দেশেরও দশের কোন ক্ষতি হইত না আবার কয়েকখানা কাগজ এখন দাঁড়াইতেছে যাহাদের সাধু উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। নিরপেক্ষভাবে সমালোচনা করিবার ক্ষমতা এবং মৌলিক প্রবন্ধাদি প্রকাশ করিয়া বরং তাহারা দেশের ও দশের উপকারই করিতেছেন। কিন্তু মনে হয় তাহাদের গণ্ডী শুধু জীবন-বীমাতে আবদ্ধ না রাখিয়া বীমা ব্যবসায়ের সর্ব্বপ্রকার শাখাকেই অবলম্বন করিয়া প্রবন্ধ ও রচনাদি প্রকাশ করিলে সাধারণের বীমা বিষয়ক কৌতূহল নিবারিত হইতে পারে। যদি সাধারণকে সহজভাবে বীমা সম্বন্ধে শিখাইয়া লইতে এবং উন্মার্গগামী কোম্পানি-গুলিকে সাধুভাবে সরলপথে আনিতে পারে তবেই পত্রিকার সার্থকতা বুঝিতে পারা যাইবে। নতুবা 'বটম্লী' বটমলীই থাকিলেন এবং দেশে কেবল বিষ ছড়াইতে থাকিলেন। উপকার না হইয়া অপকারই হইতে থাকে।

আবার দেখা যায় আমাদের দেশে বিজ্ঞ সাহিত্যসেবী

কাগজও মধ্যে মধ্যে বীমা বিষয়ক প্রবন্ধাদির আলোচনা করিয়া থাকেন। উদ্দেশ্য সাধু নিশ্চয়ই কিন্তু সময়ে সময়ে দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই সাধু উদ্দেশ্যের অন্তরালে দ্বেষ, হিংসা ও জিঘাংসা বর্ত্তমান কেননা অধিকাংশই সমালোচনাই ব্যক্তিগত। কোথায় কোন ব্যক্তি বিতাড়িত হইল অমনি তিনি শোধ লইবার জন্ম কলম ধরিয়া নিজের বিষ উদ্গীরণ করিলেন। এমনি ভাবে পাল্টা জবাব চলিতে থাকে ক্রমে একশ্রেণীর পাঠকের এইরূপ প্রবন্ধাদি বেশ মুখরোচক হইয়া উঠে এবং তাহাদের নিজেদের হিংসাবৃত্তিও ইহাতে বেশ চরিতার্থ হয়। দুঃখের বিষয় এইরূপ নিষ্কর্ম্মা পরদ্বেষী লোকের অভাব আমাদের দেশে নাই। কয়েকখানি মাসিক ও সাপ্তাহিক কাগজ নিজেদের গুরুত্ববোধে বাজে খবর লইয়া কাগজের পাতা পূরণ করিতে চান না আবার এমন কয়েকখানি কাগজ আছে যাহাতে সত্য সংবাদ প্রকাশে সাধারণ পাঠকের বীমা জগতের অনেক নিভৃত খবর লোক চক্ষু সমক্ষে ধরা পড়িয়া যায়। এই সকল কাগজের বীমা বিষয়ক প্রবন্ধাদি প্রকাশ করায় বরং সুফল আছে। কেননা নিছক্ বীমা সম্বন্ধে পত্রিকা পাঠ করিতে অনেক পাঠকের ধৈর্য্য থাকে না পরন্তু প্রবন্ধ হিসাবে পড়িলে অপরাপর প্রবন্ধের বীমা প্রসঙ্গও সময় সময় বেশ মনোহারী হয়।

মোট কথা এই যে খাঁটি বীমা বিষয়ক পত্রিকাগুলির উপকারিতা মানিতেই হইবে আবার মিশ্রিত প্রবন্ধাদি প্রচারক সাহিত্য ও সাময়িক পত্রিকাগুলির অস্তিত্বও মানিতে হয়। এই প্রকারের পত্রিকাগুলির অস্তিত্বের প্রধান সহায়ক হইল বীমা কোম্পানিগুলিরা নিজেরাই। তাহাদের বিজ্ঞাপন ছাপিয়া এবং স্থানে স্থানে আবশ্যক মত সম্মার্জ্জনী ব্যবহার করিয়া বিজ্ঞাপনের মূল্য হিসাবে কাগজগুলির পরিচালকদের যে অর্থোপার্জ্জন হয় তাহাতে একাধারে কাগজ পোষণ হয় এবং কোম্পানিগুলির নিজেদের ব্যবসারও প্রসার বেশ হয়। আমাদের দেশে আজকাল কাগজগুলিতে যে ভাবে প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হয় তাহাতে মনে হয় কয়েকখানি পত্রিকার অস্তিত্ব কেবল এই বিজ্ঞাপনেরই আকর্ষণ অর্থাৎ বিজ্ঞাপন লব্ধ অর্থের দ্বারা নিজেদের গ্রাসাচ্ছাদন চালান। কাজেই যখন কয়েকছত্র চুট্‌কী খবর ছাপিলেই বা কোন বীমা কোম্পানীকে গুপ্তঘাতী আক্রমণ করিয়া পরের নাম দিয়া কয়েকখানি চিঠি ছাপিলেই আক্রান্ত দুর্ব্বল কোম্পানীগুলির কর্ত্তৃপক্ষগণ পত্রিকার পরিচালকের পদপ্রান্তে আসিয়া আশ্রয় ভিক্ষা করেন এবং অযাচিত বিজ্ঞাপন ছাপাইয়া তাহার উদর পূর্ত্তি করিতে দাসখত লিখিয়া দিয়া যান তখন আর নিছক্ সাহিত্য পত্রিকাগুলিতেও বীমা-বিষয়ক এবং ব্যক্তিগত প্রবন্ধাদি ছাপা হইবে ইহার আর আশ্চর্য্য কি? এই দুর্দ্দিনে অর্থোপার্জ্জন করিবার ইহা হইতে প্রকৃষ্ট উপায় আর কি আছে সামান্য ছাপার কালী আর কয়েক ফর্ম্মা কাগজ খরচ করিলেই যখন উদর পূর্ত্তির বেশ সহজ উপায় হয়।

গতবর্ষ :—

১৯৩২ সালকে বিদায় দিবার সময় আমাদের অনেক পুরাতন কাহিনীই মনে পড়িতেছে। সারা ভারতবর্ষে এই বৎসর যে অসাড় ভাব আসিয়াছিল এখনও তাহার অবসান ঘটে নাই। মনের শান্তি, কার্য্যে উৎসাহ হারাইয়া ভারতবাসী এক বিরাট হাহাকারের সম্মুখে উপস্থিত হয়। শস্যক্ষেত্রে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে শস্য জন্মাইলেও বিক্রয় হইতেছে না, সুতরাং কৃষিজীবি হাহাকার করিতেছে। ব্যবসা-বাণিজ্যে উন্নতির স্রোত বন্ধ হইয়া যাওয়ায় অনেককেই কর্ম্মচ্যুত হইতে হইয়াছে। দেশীয় পণ্য অল্প মূল্যে বাজারে বিক্রীত হইবার জন্য সজ্জিত থাকিলেও—তাহার ক্রেতার অভাব।

এই অভাবের করুণ মূর্ত্তি সারা বিশ্বেও প্রতিফলিত হইয়াছে। সামরিক ব্যয় হ্রাস করিবার জন্য পৃথিবীর অনেকগুলি শক্তিমান জাতি বার বার মিলিত হইয়াও নানাপ্রকার কল্পনা-জল্পনা করিলেও কোনপ্রকার সিদ্ধান্তেই পৌঁছাইতে পারিতেছেন না। জাতি-সঙ্ঘ পৃথিবীতে শান্তি স্থাপন করিবার মানসে নানাপ্রকার বিধি-ব্যবস্থা প্রণয়ন করিলেও, উহা শুধুই লিপিবদ্ধ অবস্থায় রহিয়া গেল, কার্য্যতঃ যে বিশেষ ফলোদায়ক হইবে তাহা মনে হইতেছে না। জাতি-সঙ্ঘের অন্যতম উদ্দেশ্য হইতেছে যে কোন প্রবল ও শক্তিশালী জাতিকে কোন দুর্ব্বল জাতির উপর অত্যাচার করিতে দেওয়া হইবে না। মানচুরিয়া একটী দুর্ব্বল রাষ্ট্র, জাপান এই দেশটীকে বলপূর্ব্বক দখল করিতে চাহিতেছে। কিন্তু মাঞ্চুরিয়া মান্ধাতা যুগ হইতে পুরাতন চীনের সহিত গাঁট-ছড়া বাঁধা অবস্থায় অবস্থিত। লীগ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া মানচুরিয়া কমিশন জাপানকে অনেকগুলি অধিকার ছাড়িয়া দিতে বলিয়াছিলেন। জাপান দীনদর্পে তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিয়াছেন, বিনা যুদ্ধে সূচাগ্র মেদিনী প্রদান করা হইবে না। সুতরাং লীগের সিদ্ধান্ত শিকায় তুলিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

গত বৎসরে আমরা কতকগুলি ভারত-বিখ্যাত কর্ম্মীকে হারাইয়াছি। স্যর মহম্মদ সফি, স্যর আলি ইমাম মুসলমান হইলেও তাঁহারা ভারতেরই কল্যাণ কামনা করিতেন। উদারপন্থী মুসলমানদের মধ্যে স্যর মহম্মদ সফি ও স্যর আলি ইমামের নাম স্বর্ণ-অক্ষরে ভারতের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় লিখিত থাকিবে। বিখ্যাত কংগ্রেস কর্ম্মী ও উচ্চ রাজকর্ম্মচারী স্যর বি, এন্, শর্ম্মার মৃত্যুতেও দেশ অনেকটা দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। বাংলাও রাজা গোপেন্দ্রকৃষ্ণ দেব ও বাবু গোলাপ লালের মৃত্যুতে অনেকটা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

গোলটেবিল :—

গোল টেবিল বৈঠক ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। স্যর তেজ বাহাদুর ও শ্রীযুত জয়াকর স্বদেশ অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন বলিয়া শুনিতেছি। ভারত-সচিব স্যর সামুয়েল হোর তাঁহার লম্বা বিবৃতিতে অনেক কথারই আলোচনা করিয়াছেন। উহা পাঠ করিয়া আমাদের এই ধারণা জন্মিয়াছে যে ভারত-শাসন সংস্কারে আমাদের অবস্থার কোন বিশেষ পরিবর্ত্তনই হইবে না, আমরা যে তিমিরে সেই তিমিরেই থাকিব। স্যর সামুয়েল বলিয়াছেন যে সৈন্য-বিভাগ ও কেন্দ্রীয় সরকার বর্ত্তমানে যে অবস্থায় আছে, ঐরূপ অবস্থায়ই থাকিবে। প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্যতার সহিত প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসন প্রবর্ত্তিত করা হইবে। আমরা বলিয়া আসিতেছি যে তাহাতে আমাদের মিলনের পক্ষে নূতন বাধাই সৃষ্ট হইবে। প্রত্যেক প্রদেশকে স্বাধীন করিয়া দিয়া তাহাদিগকে আপন আপন ইচ্ছানুযায়ী ব্যবস্থা

করিতে দিলে federal সরকারের সমস্ত দোষগুলি মানিয়া লওয়া হইবে, অথচ federal সরকারের একটী মস্তবড় সুবিধা, কেন্দ্রীয় সরকারের পরাধীনতা। কেন্দ্রীয় সরকার কতকগুলি কেন্দ্র সংক্রান্ত ব্যাপার ব্যতীত প্রত্যেক বিষয়েই প্রাদেশিক সরকারের মুখাপেক্ষী থাকে। ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার সারা ভারতের ভাগ্য-বিধাতা থাকিলে এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিবে। সুতরাং federal সরকারের দোষগুলি ভারত-শাসনের মধ্যে সংরক্ষিত থাকা সত্ত্বেও ভারত সরকার উহার গুণাবলী প্রাপ্ত হইবে না।

ভারত-শাসন সংস্কার প্রবর্ত্তিত করিবার একটী বিশেষ দিন লইয়া সাপ্রু-জয়াকারের সহিত অনেক কথা কাটা-কাটি হইয়া যাইবার পর গুজব উঠিল যে ভারত-সরকার শীঘ্রই ভারতবিল পার্লামেণ্টে পেশ করাইয়া পাশ করাইয়া লইবেন। পরের খবরে প্রকাশ যে উহা গুজব মাত্র। বিল কবে পার্লামেণ্ট মহাসভায় হাজির করা হইবে এখন তাহার কোন স্থিরতা নাই। জানুয়ারী মাসে সিলেক্ট কমিটী যদি গঠিত না হয় তাহা হইলে আগামী এপ্রিল মাসে ভারত-শাসন-সংস্কার আইন বিলটী কখনই পার্লামেণ্টে উপস্থিত করা যাইতে পারে না। এবং তাহা না করিতে পারিলে, আগামী নভেম্বর হইতে উক্ত আইন প্রচলন করিবার কোন প্রস্তাব করাই যাইতে পারে না। দেশীয় রাজন্যবর্গের সহিত এখনও সমস্ত কথাবার্ত্তা শেষ হয় নাই। Reserve ব্যাঙ্ক স্থাপন না করিলে শাসন-সংস্কার প্রদান করা হইবে না। এইরূপ চিন্তাও হৃদয়ে স্থান দিতে পারা যায় না।

মহাত্মার মুক্তি ও নব-শাসনতন্ত্র—

মহাত্মাজীর মুক্তির জোর গুজব প্রায়ই শুনা যায়। মহাত্মাজীকে নাকি ১লা জানুয়ারী মুক্তি প্রদান করার কথা ছিল। ভাবিলাম হয়ত বা হইতে পারে। কিন্তু পরে শুনা গেল ও দেখিলাম একেবারেই ভিত্তি হীন। মহাত্মাজীকে ও তাঁহার সহকর্ম্মীগণকে মুক্তি—প্রদান করিলে, তাঁহাদের স্বাধীন মতবাদ অনেকটা শুনা যাইতে পারিত। একথা সত্য যে একদল Die Hards সর্ব্বদাই ভাবিয়া থাকেন যে মহাত্মাজীকে কর্ম্মক্ষেত্র হইতে সরাইয়া দিতে পারিলে ভাল হয় না, কেননা কংগ্রেস ওয়ালারা পূর্ব্বেকার ন্যায় শাসন-দণ্ড অচল করিয়া দিবার সঙ্কল্পে পার্লামেণ্টে প্রবেশ করিলে নূতন আইন-পরিষদ গুলিতে তাহারা যথেষ্ট ক্ষতি করিতে পারিবে। আর একদল ভাবেন যে ভারতবর্ষকে কোনরূপে শান্ত রাখিতেই হইবে, সুতরাং নূতন ব্যবস্থা প্রণয়নকালীন কংগ্রেসকে মত প্রকাশ করিতে অনুমতি দেওয়া খুবই যুক্তিসঙ্গত। এই উভয় মতের মধ্যেই সত্য নিহিত আছে। দেখা যাক্ ভারত-সরকার কি করেন?

ইকনমিক কন্‌ফারেন্স :—

ক্রমশঃ দেখিতেছি ইকনমিক কন্‌ফারেন্সের যুগ আসিয়া পড়িল। অটোয়ার পর ভারতবর্ষেও একটী ইকনমিক কন্‌ফারেন্স আহ্বান করিবার তোড়জোড় চলিতেছে শুনা যাইতেছে। কলিকাতায় শ্বেতাঙ্গ বণিকগণ বেঙ্গল চেম্বারের পক্ষ হইতে একটী ইকনমিক কমিটি গঠন করিয়াছেন। তাঁহাদের উদ্দেশ্য হইতেছে যে কোন কোন শিল্পের এখানে উন্নতি করা যাইতে পারে এবং কোন কোন পণ্য লইয়া এখন ব্যবসা-বাণিজ্য করিয়া লাভবান হওয়া যাইতে পারা যায়। কর্ম্মহীন বা কর্ম্মচ্যুত যুবকের সংখ্যা যেরূপ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে এইরূপ একটী কমিটীর প্রয়োজন আছে আমরা বহুবারই তাহা উল্লেখ করিয়া আসিয়াছি। চতুর্দ্দিকেই ব্যয়ভার যেরূপ বাড়িয়া যাইতেছে তাহাতে জন-সাধারণের আয় বৃদ্ধি না পাইলে মহা মুস্কিল তাহাতে আর সন্দেহ কি?

বড় দিনের বৈঠক :—

বড় দিনের সময় প্রায়ই নানা প্রকার সভা-সমিতির অধিবেশন হইয়া থাকে। এ বৎসরেও যতগুলি সভা-সমিতির বৈঠক বসিয়াছিল, তাহার মধ্যে কলিকাতায় মুসলমান-সমিতি, মাদ্রাজে ডাক্তার সঙ্ঘ ও এলাহাবাদে কায়স্থ মজলিস-ই প্রধান। মুসলমান-সমিতির তরফ হইতে স্পষ্টই বলিয়া দেওয়া হইয়াছে যে মুসলমানগণ বাংলায় শতকরা ৫১ জন সদস্য সংখ্যা লাভ করিবার জন্য ইউরোপীয়গণের সহিত বিবাদ করিতে প্রস্তুত নহেন। পাল্টা জবাবে হিন্দুগণও বলিয়াছেন যে তাঁহারা এলাহাবাদে গৃহীত প্রস্তাবগুলি তাহা হইলে মানিয়া

হইতে বাধ্য থাকিবেন না। আমরা বলি, মিলন যখন সম্ভবপর নয়, তখন এই বৃথা মিলন সংঘটন করিবার জন্য শক্তি হ্রাস করিবার প্রয়োজন কি? মুসলমানগণ সিন্ধুকে একটী স্বতন্ত্র প্রদেশ করিতে চাহিয়াছিলেন কেননা তাহা হইলে কেন্দ্রীয় সরকারে তাঁহাদের প্রদেশ হিসাবে শক্তি গঠন করিতে গেলে বলবৃদ্ধি হইবে। উড়িষ্যাকে একটী নূতন প্রদেশে পরিণত করা হইবে শুনিয়া তাঁহারা অতি সহজ ভাবেই চমকাইয়া উঠিবেন, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? অন্ধ্র যদি আর একটী প্রদেশ হয় তাহা হইলে আরও ভাবিবার কথা। কিন্তু ভারতীয় রাজনৈতিকগণ একথা কেন বুঝিতেছেন না যে প্রদেশ সংখ্যা এইরূপে বৃদ্ধি করিয়া গেলে, মিলন পথের নূতন নূতন ব্যবধানই সৃষ্টি হইবে মাত্র। হিন্দু মুসলমান বিবাদ ভারতে সনাতন প্রথা। প্রদেশে প্রদেশে বৈরীভাব প্রবর্ত্তন করিতে পারিলে নূতন অন্তরায় উপস্থিত করা হইবে। তাহার পর জাতিগত, অর্থগত, সমাজগত বৈষম্য ত আছেই।

স্পৃশ্য অস্পৃশ্য :—

মহাত্মা গান্ধি ১লা জানুয়ারী হইতে উপবাস করিবার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া ভালই করিয়াছেন। আমাদের বর্ণগত বৈষম্য যে কি ভীষণ সেই বিষয়ে আলোচনা করা বিশেষ প্রয়োজন। বর্ত্তমান হিন্দু-সমাজ মনু প্রণীত অনুশাসনগুলি দ্বারা শাসিত হইতেছে। মনুসংহিতা নামক যে ধর্ম্ম-সংহিতা এখন আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি, উহা অবিকৃত মনুসংহিতা নহে, কেননা উক্ত সংহিতায় স্পষ্টভাবে বলা আছে যে, সংহিতায় সূত্রগুলি মনু প্রোক্তম্, অর্থাৎ মনু কর্ত্তৃক প্রণীত বটে কিন্তু তাঁহার শিষ্য-বিশেষ কর্ত্তৃক সংগঠিত। সুতরাং মনু সংহিতার সূত্রগুলি যে যুগে প্রণয়ন করা হইয়াছিল, তাহার পরবর্ত্তীযুগে উহাকে যুগ ধর্ম্মের অনুযায়ী করিবার জন্য শিষ্য প্রবরকে বিশেষ প্রয়াস পাইতে হইয়াছে। মনুসংহিতায় চতুর্ব্বর্ণের কথা উল্লিখিত হইলেও নানা প্রকার বর্ণশঙ্কর জাতির কথাও বলা হইয়াছে। সমাজ কোন প্রকারে জাতিকে চালাইতে দিতে গেলেই তাহাকে জীবনধারণের জন্য একটী পেশা নির্দ্দেশ করিয়া দিতে হয়, এই জন্যই মনুসংহিতায় সকল প্রকার বর্ণশঙ্কর জাতিরই কোন-না-কোন প্রকার পেশার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। চণ্ডাল, কিরাত ইত্যাদি বর্ণশঙ্কর জাতি। নানাপ্রকার যৌন-মিলনের ফলে তাহাদের উদ্ভব হয়। যৌন-মিলনের নানা প্রকার পন্থা ঠিক করা থাকিলেও, মনু কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট বিবাহ বিধিগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিলে ইহাই মনে হয় যে তখন নর-নারীর আকর্ষণই একমাত্র বিধি ছিল। এই আকর্ষণকে সামাজিক ভাবে অবলম্বন করিবার জন্যই মনু বিবাহ বিধির নানা প্রকার আইন রচনা করিয়াছেন। এখন যে সমস্ত জাতি আপনাদিগকে উচ্চ বংশ সম্ভূত বলিয়া অহঙ্কার করেন, তাঁহারা অনেকেই এই মনু প্রবর্ত্তিত আইন বলেই অভিজাত্য গৌরব লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। চণ্ডাল যদি শূদ্র ভর্ত্তা কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণ পত্নীর গর্ভজাত সন্তান হয়, তবে চণ্ডাল সমাজে এত হেয় হইবে কেন? ইহা যেন অনেকটা বর্ত্তমান ইউরোপীয়দের অবলম্বিত প্রথা। শ্বেতাঙ্গগণ যাহাতে এশিয়া ও ইউরোপের অধিবাসিগণ মিলিত না হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন, আর্য্যগণ প্রবর্ত্তিত উক্ত বিধিও কি ঠিক তাহার অনুরূপ নয়, এ্যাংলো ইণ্ডিয়ানগণকে ইউরোপীয়গণ ঘৃণা করেন। ইউরোপীয় মহিলা ভারতীয় স্বামী গ্রহণ করিলে জাতিচ্যুতা হন। চণ্ডালকে হীনজাত বলিয়া ঘোষণা করায় আর্য্য-জাতির সেই মনোবৃত্তিরই পরিচয় পাওয়া যায়। বর্ত্তমানে নানা প্রকার বৈষম্যের ঢেউ উঠিয়াছে। হিন্দুদিগের এই বর্ণগত বৈষম্য দূর করিবার সময় আসিয়া পড়িয়াছে। হিন্দুজাতিবৃন্দ যদি শাস্ত্রীয় চতুর্ব্বর্ণে ফিরিয়া যাইতে পারে তাহারই ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িতেছে।

ডাক্তারী কনফারেন্স :—

ডাক্তারী কনফারেন্সে ডাক্তারগণ বলিয়াছেন যে সারা ভারতে প্রায় দুই লক্ষ চিকিৎসকের প্রয়োজন, বর্ত্তমান যে সমস্ত শিক্ষাকেন্দ্র আছে সেইগুলির সাহায্যে পূর্ব্বোক্ত সংখ্যক চিকিৎসক সংগ্রহ করিতে বহু বৎসর সাপেক্ষ। প্রাদেশিক সরকারগুলি অর্থাভাবে বিশেষ পঙ্গু, সুতরাং তাঁহারা স্বাস্থ্য-বিভাগের উন্নতি কল্পে যে অর্থব্যয় করিতেছেন, তাহার অধিক অর্থ যে ব্যয় করিতে পারিবেন তাহাও বোধ হয় না। কাজেই তাঁহারা বলেন যে আমাদিগকে স্বতঃপ্রবৃত্ত

হইয়া নানা প্রকার দল গঠন করিয়া লোক শিক্ষায় নিযুক্ত হইতে হইবে। কথাটার মধ্যে যথেষ্ট উদারতা আছে তাহা আমরা অবশুই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিব। কিন্তু কার্য্যতঃ তাঁহারা যে কিছুই করিবেন না ইহাও ধ্রুব সত্য। আমরা তাঁহাদিগকে উচ্চ আদর্শ পরিত্যাগ করিয়া একটু নীচু সঙ্কল্পকে জাপটাইয়া ধরিতে বলি। অনেক সময়েই দেখা যায় যে বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ অত্যন্ত নির্দ্দয়ভাবে তাঁহাদের ফী বাড়াইয়া চলেন। পসার বৃদ্ধির সহিত ফী বাড়ান এখনকার ডাক্তার মহলে নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। আমাদের ছেলেবেলায় আমরা দেখিয়াছি যে দুইটাকা, চারিটাকা এবং আট টাকা ভিজিটই খুব বেশী। সাধারণতঃ একটাকা, দুই টাকা ও চারিটাকা ভিজিটেরই চলন ছিল। দয়াল সোম, ডাক্তার জগবন্ধু প্রভৃতির ভিজিট শেষকালে আট টাকা হইলেও চারিটাকাই তাঁহারা গ্রহণ করিতেন। এখন সেই স্থলে ষোল টাকা ও বত্রিশ টাকা এবং স্থলবিশেষে ৬৪৲ টাকা ফী লোমহর্ষণ ব্যাপার নয়? মহাসমরের অবসান ঘটিলে সকলেরই অর্থ স্বচ্ছলতা উপস্থিত হয়। সেই সময় নাপিত ধোবা হইতে আরম্ভ করিয়া সকলেই তাহাদের পারিশ্রমিকের হার বৃদ্ধি করিয়া লয়। এই সময়েই ডাক্তারগণের ফী ষোল টাকা হইতে বত্রিশ টাকায় গিয়া দাঁড়ায়। এই অর্থ-কৃচ্ছতার যুগে যখন সকলেরই আয় কমিয়া গিয়াছে, তখন ডাক্তারগণ পূর্ব্বকার বর্দ্ধিত হারে ফী কেমন করিয়া গ্রহণ করিতেছেন? একটা রিজলুশান করিয়া তাঁহারা এই ফী-এর হারটা কি কমাইতে পারেন না?

কায়স্থ সম্মেলন :—

এলাহাবাদে কায়স্থ কন্ফারেন্সে কায়স্থ-জাতির উন্নতি করিবার জন্য অনেক কথা আলোচিত হইয়াছে। সমগ্র ভারতে কায়স্থ জাতি পদ-মর্য্যাদায় ব্রাহ্মণের নীচেই আসন গ্রহণ করিয়া আছে। সুতরাং জাতি হিসাবে কায়স্থগণ যে খুব বড় তাহার ঘোষণা করিবার কোন প্রয়োজনই নাই। তবে এই প্রকার অধিবেশন জাতির পক্ষে মঙ্গলজনক বলিয়াই মনে হয়। প্রত্যেক জাতি গুলি যদি তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন শাখাগুলির ভিতর যে ব্যবধান আছে তাহা ভগ্ন করিয়া দিয়া একটি অবিভক্ত জাতিতে পরিণত করিতে পারেন—তাহা হইলে জাতীয়তা হিসাবে আমাদের নিশ্চয়ই লাভ হইবে।

মহিলা সম্মেলন ঃ—

এবার ভারতীয় রমণীগণও গোয়ালিয়রের রাণী লক্ষ্মী বাঈয়ের নেতৃত্বে একটী সম্মেলনে মিলিত হইয়াছিলেন। শিক্ষিতা ও উচ্চ বংশজাত রমণীগণ একত্রিত হইয়া অতি পুরাতন তত্ত্বগুলির অর্থাৎ বালিকা-বিবাহ, বিধবা-বিবাহ, পণ-প্রথার নিরোধ ইত্যাদি বিষয়গুলির আলোচনা করিয়াই সভাভঙ্গ করিয়াছেন। এইরূপ সম্মেলনে কোন উদ্দেশ্যই সাধিত হয় না। আমরা রমণীগণের নিকট হইতে অনেক প্রকার উৎসাহের জন্য মুখাপেক্ষী হইয়া থাকি। রমণীগণই মাতা ও স্ত্রী ভাবে আমাদিগকে পালন ও শাসন করিয়া থাকেন। তাঁহারা যদি পর্দ্দা ফেলিয়া দিয়া, সকল প্রকার সঙ্কীর্ণতা পায়ে ঠেলিয়া পুরুষের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইতে পারেন, তাহা হইলে ভারতবর্ষের উন্নতি করিতে কত দেরী হয়! স্ত্রী-স্বাধীনতা বলিয়া যে গগনভেদী চীৎকার শুনা যায়, উহার অর্থ এই যে রমণীগণ সর্ব্বপ্রকার বাধার মধ্যে একটু শিক্ষিতা হইতে চাহেন। ইহাই যদি ইহার সার অর্থ না হয় তাহা হইলে Co-education এখনও কেন প্রবর্ত্তিত হইল না। সমবয়স্ক যুবকের পার্শ্বে আসিয়া সমবয়স্কা যুবতীর একত্র দণ্ডায়মান হইতে এখনও কেন সঙ্কোচ হয়। যুবক-যুবতীর মধ্যে যে কৃত্রিম ব্যবধান আছে, তাহার সীমানা এখনও কেন যত্ন পূর্ব্বক রক্ষিত হইতেছে। বিধবাকে বিবাহ করিবে কে? পুরুষ জাতি! সেই পুরুষজাতিকে শত্রুজ্ঞানে যদি কোন বিধবা তাহার সংস্পর্শে না আসে তবে তাহাকে পত্নীভাবে সে গ্রহণ করিবে কেন? নারীকে শ্রদ্ধা করিতে শিক্ষা না করিলে পণ-প্রথা উঠিয়া যাইবে কেন? নর-ও নারী শিক্ষিত হইলেও যে সংস্কারহীন ও উদারচিত্ত হইবে এইরূপ ধারণা করা বাতুলতা মাত্র। পরস্পর যদি পরস্পরের সাহচর্য্যে না আসে তবে পরস্পর পরস্পরের সহিত মিলিত হইবার জন্য অন্তরের টান অনুভব করিবেন কেন?

সনাতন কি ?

সনাতন কথাটীর একটী আকর্ষণ আছে। সাধারণতঃ আমাদিগকে বুঝান হয় যে যাহা সনাতন তাহাই সত্য। যাহা চিরকাল সত্য তাহাই সনাতন। এই জন্যই আমরা আমাদের ধর্ম্মকে সনাতন ধর্ম্ম আখ্যা প্রদান করিয়া গর্ব্ব অনুভব করি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ধরিতে গেলে সনাতন বা চির সত্য বলিয়া কোন কিছুই থাকিতে পারে না। পরিবর্ত্তনশীল জগতে এক যুগের সত্য অন্য যুগে রূপান্তর আকার ধারণ করিতেছে। এইজন্য সনাতনী জাতিবৃন্দ সনাতন মতাবলম্বী হইলে তাহাদের পতন অনিবার্য্য হইয়া থাকে। হিন্দুগণ যখন উন্নতির উচ্চতম সোপানে আরোহণ করিয়া নানা সংহিতার শ্লোকের রচনা করিয়া তাহাদের বৃহদায়তন সমাজকে চলিবার শক্তিহীন সনাতন সমাজে পরিবর্ত্তিত করেন তখন হইতে তাঁহাদের পতন সূত্রপাত হয়। প্রথম পাণিপথ যুদ্ধে বাবর কামান লইয়া আসিলে, অসিধারী ইব্রাহীম বহু সৈনিকের প্রভু হইয়াও বাবরের নিকট পরাজয় স্বীকার করেন। সেই কারণেই কয়েক শতাব্দীর পর ক্লাইভ ও ডুপ্লে ভারতে ইউরোপের নূতন অস্ত্র আনয়ন করিয়া চির স্থবির ভারতকে চমৎকৃত করিয়া দিয়াছিলেন।

আন্তর্জাতিক শিল্প-প্রদর্শনী ঃ

১৯৩৩ সালে আমেরিকার চিকাগো নগরে এক আন্তর্জাতিক শিল্প-প্রদর্শনী বসিবে। ভারতবর্ষীয় শিল্প সংগ্রহ করিবার জন্য ও ভারতের পক্ষ হইতে তথায় একটী বিভাগ খুলিবার জন্য আমেরিকা হইতে ডাক্তার ভারনন্ ও মিষ্টার জে, জে, সিং আসিয়াছেন। তাঁহারা এই উদ্দেশ্যে ভারতের বিভিন্নস্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন।

ব্রহ্ম ও ভারত :—

বর্ম্মা বেশ স্পষ্ট ভাবেই জানাইয়া দিয়াছে যে, তাহারা ভারতবর্ষের সহিত সম্বন্ধ বিছিন্ন করিতে সম্পূর্ণ নারাজ। ব্রহ্মদেশকে পৃথক করিয়া দিবার জন্য যে সমস্ত রাজনৈতিকগণ বিশেষ গবেষণায় ব্যস্ত, তাঁহাদের স্মরণ রাখা উচিত যে বাংলা দেশের সহিত ব্রহ্মদেশের বহুদিন হইতেই অতি নিকট সম্বন্ধ। ইংরাজরাজ যে ব্রহ্মদেশ জয় করিতে গিয়াছিলেন তাহার প্রধান কারণই ছিল বঙ্গদেশকে ব্রহ্মরাজের হস্ত হইতে রক্ষা।— বহু প্রাচীনকালে সমগ্র ব্রহ্মদেশ ভারতবর্ষ হইতেই তাহার নৈতিক ও সামাজিক ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল। জলপথে বঙ্গদেশ ব্রহ্মদেশের সহিত ব্যবসা বাণিজ্য চালাইত। এই অবিচ্ছেদ্য বন্ধন ইংরাজ অধিকারের সহিত দৃঢ় হয় মাত্র। কয়েকজন স্বার্থান্বেষী ব্যবসায়ীর সুবিধার জন্য ব্রহ্মদেশ স্বতন্ত্র প্রদেশে পরিণত করিতে চাহিলে তথাকার জনসাধারণ যে এই প্রস্তাবে সম্মতি দিবে না ইহাত স্বাভাবিক।

ফ্যাসিসিজম্ :—

জাপানে ফ্যাসিসিজাম্ চলিতে পারে কিনা সেই সম্বন্ধে অনেক গবেষণা চলিতেছে। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে জাপান যখন ইউরোপকে আদর্শ করিয়া বর্ত্তমান-জীবন বরণ করিয়া লইতে দৃঢ় সঙ্কল্প করে তখনকার অভিজাত সামুরিয়াগণ জাপানকে উন্নতির পথে আগাইয়া দিবার জন্য প্রাণপণ করিয়াছিলেন। আমেরিকান একখানি গণ্‌বোট (Gun boat) জাপানের সমুদ্রের মধ্যে ঢুকিয়া কামান দাগিয়া ঘুমন্ত জাপানকে যখন জানাইয়া দেয় যে সে বহু শতাব্দীর পিছনে পড়িয়া আছে তখন সদ্য সুপ্তোত্থিত জাপান চক্ষু মুছিতে মুছিতে পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন হইতে চাহে। সামুরিয়াগণ জাপানের নেতা হইয়া অতি অল্প সময়ের মধ্যেই জাপানকে একটী শক্তিশালী সাম্রাজ্যে পরিণত করেন। তাহার পর কলকারখানা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠার সহিত জাপানে একদল ধনিক সম্প্রদায় আসিয়া দেখা দেয়। এই ধনিক সম্প্রদায় সামুরিয়াগণের সাহায্যে বিশাল শিল্প-সম্ভার প্রস্তুত করিয়া প্রভূত বিত্ত অর্জ্জন করিয়া মহাবলশালী হইলে সামুরিয়াগণকে কর্ম্মক্ষেত্র হইতে হটাইয়া দিতে থাকেন। জাপানের জনসাধারণ সামুরিয়াগণ ও ধনিক কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া আত্মোৎসর্গের জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকিত। জাপানের অভিজাত ও ধনিক সম্প্রদায়ও যাহাতে দেশের মধ্য অন্ন-সমস্যা না ঘটে তাহার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেন। গত মহাযুদ্ধের পর হইতে সমস্ত দেশে অন্ন-সমস্যা অতি ভীষণ

ভাবে আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে। কাজেই শ্রমিক সম্প্রদায় তাহাদের শির উত্তোলন করিতেছে। তাহারাও অন্যান্য দেশের শ্রমিকগণের ন্যায় রাজনৈতিক ক্ষমতার মালিক হইয়া আপনাদের আর্থিক উন্নতি করিতে চাহে। এই শ্রমিক দলের সংখ্যা সম্প্রতি জাপনে খুবই কম। তত্রাচ এই দল যে ভবিষ্যতে না প্রবল হইবে এমন সম্ভাবনা কোথায়? এই জন্যই তথাকার রাজনৈতিকগণ ভাবিতেছেন যে, এমন একজন বিচক্ষণ ব্যক্তি যদি তথাকার রাজনৈতিক জগতে আবির্ভূত হইয়া শ্রমিক ও ধনিক সম্প্রদায়ের মধ্যে সখ্য স্থাপন করিয়া নূতন একটী দল সৃজন করিতে পারেন তাহা হইলেই জাপানে ফ্যাসিসিজম্ সৃষ্টি হইতে পারে। জাপানের রাজনৈতিকগণ এই ব্যবস্থা করিবার জন্যই সম্প্রতি ব্যগ্র।

পরলোকে জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস :—

'সময়' সম্পাদক জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস মহাশয় পরিণত বয়সে পরলোকের যাত্রী হইয়াছেন। ইনি হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ উকিল ৺শ্রীনাথ দাস মহাশয়ের পুত্র ছিলেন এবং নিজেও বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। পিতার বিত্ত ও শিক্ষা যথেষ্ট পাইলেও আজীবন ইঁহাকে জীবন-সংগ্রামেই কাটাইতে হইয়াছে। 'সময়' সাপ্তাহিকের জন্য ইনি যথেষ্ট শ্রম করিতেন—ইনি অতি অমায়িক মানুষ ছিলেন। আমরা ভগবানের কাছে ইঁহার আত্মার কল্যাণ কামনা করি।

পরলোকে ললিতমোহন দাস :—

ললিতবাবু বিখ্যাত কংগ্রেসকর্ম্মী, সমাজ-সংস্কারক ও ব্রাহ্ম-সমাজের আচার্য্য স্থানীয় ছিলেন। ইনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক ও সহ-সম্পাদক ছিলেন—রাজনীতিক কারণে কারাদণ্ডও ভোগ করিয়াছিলেন। অতি অমায়িক মানুষ ছিলেন। আজীবন ইঁহাকেও জীবন-সংগ্রামে কাটাইতে হইয়াছে। ভগবান ইঁহার আত্মার মঙ্গল করুন।

পরলোকে হেমচন্দ্র সরকার :—

ব্রাহ্ম সমাজের অন্যতম আচার্য্য হেমচন্দ্র সরকার মহাশয় আর ইহলোকে নাই। ইনি উচ্চ শিক্ষিত, ধার্ম্মিক, সমাজ-সংস্কারক ছিলেন। ধর্ম্ম সম্বন্ধে ইঁহার গ্রন্থাদিও উচ্চাঙ্গের। অতি অমায়িক লোক ছিলেন। ভগবান ইঁহার আত্মার মঙ্গল করুন।

চিত্রে নাট্যে বামন :—

টালিগঞ্জে নিউ থিয়েটারস্ কোম্পানীর যে ষ্টুডিও আছে সেখানে একটী মারহাট্টি বামন আসিয়াছে। এই বামনটী নাকি এক হাতের অধিক উচ্চ নহে। তাহার সমগ্র শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি এই উচ্চতার অনুপাতে সংগঠিত। এই মারহাট্টী বামনের বয়স বর্ত্তমানে ২৮ বৎসর। ইনি ছয়টী ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন। ইংরাজী ভাষায় বক্তৃতা পর্য্যন্ত দিতে পারেন। নিউ থিয়েটার কোম্পানী এই বামনকে লইয়া একটী হাস্যকর নাটক রচনা করিবেন বলিয়া সঙ্কল্প করিয়াছেন।

সম্রাটের আদেশ :—

মহামান্য সম্রাট সম্প্রতি অনুজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন যে তাঁহার দেহরক্ষী সৈনিকগণকে গোঁফ রাখিতে হইবে। এই সংবাদে নাকি ফ্রান্স বিশেষ উৎফুল্ল হইয়াছেন। তাঁহারা বলিতেছেন তাহা হইলে যুবরাজকেও এই আদেশ মান্য করিতে বাধ্য করা উচিত। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে যুবরাজ দেহরক্ষী সৈন্যদল ভুক্ত নহেন।

নারীর পোষাক :—

ইউরোপের ন্যায় চীন দেশেও নারী মহলে Short skirtএর ভীষণ প্রচলন হওয়ায় তথাকার কর্ত্তৃপক্ষ বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহারা সম্প্রতি এক আইন পাশ করিতেছেন তাহাতে মহিলাদের পোষাক কতটা পর্য্যন্ত অঙ্গ ঢাকিয়া রাখিবে তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দিবে।

রেডিও :—

Radio ক্রমশঃই দেখিতেছি বিশ্বব্যাপী হইয়া চলিল। সম্প্রতি Empire Radio খোলা হইয়াছে। গ্রীনউইচ নগরী হইতে এই Radio মারফৎ ইংলণ্ডের অনেক কথা জানিতে পারা যাইবে।

দ্রব্য বিনিময় যুগ :—

দেখিতে দেখিতে ক্রমশঃ দক্ষিণ আফ্রিকাও স্বুবর্ণমান ত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। স্বুবর্ণ যুগের আসান্ন ঘটিলে অনেকেই সন্দেহ করিতেছেন যে পৃথিবীর জাতিবৃন্দ আবার দ্রব্য-বিনিময় যুগে ফিরিয়া যাইতে পারে। আমরা বলি সেই ভাল, তাহা হইলে আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ে জাতিতে জাতিতে যে দ্বন্দ্বের অভিনয় তাহা বন্ধ হইয়া যাইবে।

আশাপথ

লক্ষ্মীবিলাস প্রেস, লিঃ কলিকাতা।

সতীশচন্দ্র মিত্র প্রতিষ্ঠিত

৬ষ্ঠ বর্ষ | ফাল্গুন—১৩৩৯ | ১১শ সংখ্যা

শিক্ষার হাহাকার

বাংলায় শিক্ষার স্রোত খুব বাড়িয়া গিয়াছে। দুই তিন. যুগ পূর্ব্বে শিক্ষার প্রসার খুব আনন্দের কথা থাকিলেও এখন আর তাহা নাই—কারণ শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে দেশের দারিদ্র্য বৃদ্ধি পাইতেছে—শিক্ষিতেরা হাহাকার করিতেছে। শিক্ষা বৃদ্ধির প্রথম অবস্থায় এমন সময় ছিল যখন স্বল্প সংখ্যক শিক্ষিত দেশের লোকের দর্শনীয় বস্তু ছিল। শিক্ষিত হইলেই তখন লোকে বেশী মাহিনার উচ্চ কাজ কর্ম্ম নানা বিভাগে পাইত। এখন শিক্ষিত হইয়াও লোকে কাজ কর্ম্ম না পাইয়া কর্ম্ম সন্ধানে যত্র-তত্র ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বাড়িতেছে। তাহাদের কেহ আত্মহত্যা করিতেছে—কেহ অবাঞ্ছনীয় নানা কার্য্যে প্ররোচিত হইতেছে। তাহাদের জীবন আশা আনন্দহীন অবসাদপঙ্গু হইয়া যাইতেছে।

সাধারণ প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতির উপর লোকের আর তেমন আস্থা নাই—শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সহিত সংসৃষ্ট এবং দেশের মনস্বীরাও অনেকেই বলিতেছেন সাধারণ শিক্ষার মোহ হইতে যুবকদের মুক্ত হইতে হইবে, নতুবা দেশের মঙ্গল নাই—ক্রমশই অন্নাভাব আর হাহাকার বাড়িয়াই চলিবে।

বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতির ফলে আমাদের দেশে অনেক বড় বড় লোকের সৃষ্টি হইলেও সাধারণভাবে এ শিক্ষা কেরাণীকুলেরই সৃষ্টি করিয়াছে। নানাবিভাগে কেরাণী যতটা লওয়া চলিতে পারে তাহা লওয়াও হইতেছে—কিন্তু কেরাণী লওয়ার একটা সীমা আছে—অথচ শিক্ষিতের সংখ্যা ক্রমেই বাড়িতেছে—সুতরাং শিক্ষিতদের পোষণ চলিবে কোথা হইতে।

সাধারণ শিক্ষা যখন ব্যবহারিক জীবনে একান্ত নিষ্ফল হইয়া চলিয়াছে তখন 'টেকনিক্যাল এডুকেশন' বা কার্য্যকরী শিক্ষা বেশীভাবে চালাইবার কথা উঠিয়াছে। যদি তাহা কোন দিন সম্ভব হয় তাহা হইলেই যে দেশব্যাপী শিক্ষিতের অন্ন-সমস্যা মিটিয়া যাইবে তাহাও তো মনে হয় না। কার্য্যকরী শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া তাঁহারা সকলেই যদি সেইদিকেই চাকুরী খোঁজেন তবে তাহাই বা পাওয়া সম্ভব হইবে কোথা হইতে?

আমাদের যুবকদের ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত করাইতে হইলে

প্রথমতঃ দেখিতে হইবে তাহাদের ব্যবসায়ীর মনোবৃত্তি আসিয়াছে কিনা। মূলে ব্যবসায়ীর মনোবৃত্তি না আসিলে ব্যবসায় শিক্ষা পাইয়াও চাকুরীর আরাম পাইবার জন্যই তাহারা লালায়িত হইবে। ব্যবসায়ের শিক্ষার প্রয়োজন আছে বটে কিন্তু তাহার জন্য সকলকেই যে কার্য্যকরী স্কুল কলেজে যাইতে হইবে এমন কোন কথা নাই। মাড়বাড়ী, ভাটিয়া, দিল্লীওয়ালা এবং ভারতেরই অন্যান্য ব্যবসায়ী জাতিদের ছেলে-পিলে কয় জন কোন কার্য্যকরী কলেজেই বা লেখাপড়া শিখিয়াছে ? প্রথম এবং প্রধান কথা—তাহাদের ব্যবসায়ী মনোবৃত্তি আছে এবং ছেলেবেলা হইতে হাতে কলমে তাহারা সেইভাবেই শিক্ষা পাইতেছে।

সামান্য সাধারণ শিক্ষা ভাল—কিন্তু অনন্যগতি হইয়া সেই পথেই জীবন-যৌবন চালিয়া দিলে তাহাতে শুধু পদে পদে ব্যর্থতা ও হাহাকারই আসিবে—এ শিক্ষা বার বার তীব্রভাবে পাইয়াও এখনো আর কিছু করিবার নাই বলিয়াই দেশের ছেলেপিলেরা দলে দলে শিক্ষা-মন্দিরে উদ্দেশ্যহীন ভাবে প্রেরিত হইতেছে। এ মনোবৃত্তি ছাড়িয়া দিয়া অভিভাবকদের ও ছেলেদের এখন সুনির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্য লইয়া চলিতে হইবে। শিক্ষা-পথে ছেলেদের চালাইয়া দেওয়া মাত্রই অভিভাবকের একমাত্র কর্ত্তব্য যে নহে ইহা তাহাদের বুঝিতে হইবে।

ছেলেদেরও উচিত যে এখন তাহারা যতশীঘ্র সম্ভব বিশ্ববিদ্যালয়ের মোহপাশ এড়াইয়া জীবনে অর্থকরী ও কার্য্যকরী কোন ব্যবসায়ের পথ অবলম্বন করুন। এ পথে প্রথমে ব্যর্থতা, নৈরাশ্য আসিতে পারে। সতর্ক ভাবে চলিয়াও কিছু ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া অদৃষ্টে থাকিতে পারে—কিন্তু এ পথ পরিণামে মঙ্গলজনকই হইবে। মনে রাখিতে হইবে ব্যবসায়ী জাতিরাই আজ জগতে উত্থান পথে চলিয়াছে—তাহারাই সুখ শান্তি, সাংসারিক সর্ব্বপ্রকার আরাম উপভোগ করিয়া বিশ্বের অন্যান্য সকলকে চালাইতেছে।

বাংলারই নানা ব্যবসা বাণিজ্যে অবাঙ্গালীরা প্রচুর অর্থ অর্জ্জন করিতেছে অথচ বাঙ্গালীরাই চাকুরীর জন্য তাহাদের দ্বারে দ্বারে ঘুরিতেছে ও অন্নাভাবে নিজের ও পরিবারবর্গের ভরণ পোষণে অসমর্থ হইয়া হাহাকার করিয়া বেড়াইতেছে, ইহা শিক্ষার অপমান, শিক্ষিতের অপমান—শিক্ষার মর্ম্মন্তুদ হাহাকার।—বাঙ্গালীর অবিলম্বে তাহা বুঝিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে হইবে।

বস্তীর বুকে

গল্প

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

আধুনিক কয়েকটা গল্প পড়িয়া অন্নদার চিত্তে যে-কয়টি পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল, তাহার মধ্যে একটির উল্লেখ বিশেষ-ভাবে করিতে চাই। কারণ, সে পরিবর্ত্তনের সঙ্গে আমাদের আজিকার কাহিনীর সম্পর্ক কিছু ঘনিষ্ঠ।

সে-পরিবর্ত্তন,—বস্তীর উপর তার তীব্র বিদ্বেষ!

এ কয়টি গল্প পড়িবার পূর্ব্বে বস্তীর সম্বন্ধে তার ধারণা ছিল,—বস্তীর লোক বড় গরীব, তারা খাটিতে মজবুত, এই দারিদ্র্য-অভাবের মধ্যে সারাদিনের পরিশ্রমের পর তাদের যা-কিছু আরাম, তা ঐ জীর্ণ গৃহে, পত্নীর প্রেমে, দাস্তে, পরিচর্য্যায় ছেলেমেয়েদের হাসি-খেলায়! বেচারী বস্তীর অধিবাসী! তারা আমাদের দরদের পাত্র, স্নেহের কাঙাল। কিন্তু এই সব গল্প পড়িয়া…

সেই কথাই বলি।

বস্তীর নামে অনেকে শিহরিয়া ওঠেন—তাঁরা শুচিবায়ু-গ্রস্ত! বস্তী নোংরা, বস্তীতে আবর্জ্জনা, বস্তীর লোক-জন পরিচ্ছন্নতার ধার ধারে না, নানা রোগের ব্যাসিলিতে বস্তীর আকাশ-বাতাস পরিপূর্ণ—এমনি তাঁদের বিশ্বাস।

অন্নদা সেরূপ শুচিবায়ুগ্রস্ত নয়—সে হইয়াছে রুচিবায়ু-গ্রস্ত। তার ধারণা, বস্তীগুলা যত দুর্নীতির খনি! বস্তীর পুরুষ মদ খায়, বেলেল্লাগিরি করিয়া বেড়ায়; বস্তীর নারী প্রেমের পিপাসায় সারাক্ষণ অধীর—এবং সে-পিপাসা মিটাইতে চায় আশ-পাশের মেশের তরুণ চিত্ত-পেয়ালায় প্রীতি পান করিয়া! তাই সে যথাসম্ভব বস্তীর ছোঁয়াচ, বাঁচাইয়া চলিতে সুরু করিয়াছে!

তার এ ধারণা ভুল—পাঁচজন বন্ধু বহু তর্কে, বিবিধ যুক্তিতে এ-ভুল ভাঙ্গিবার প্রয়াস পাইয়াছে, কিন্তু অন্নদা কোনো যুক্তি মানিবে না, পণ করিয়াছে!

সেদিন সে থিয়েটার দেখিতে গিয়াছিল। বড়দিনের বাজার। জাইগান্টিক থিয়েটারে নূতন নাটকের অভিনয়। বন্ধুরা ছাড়িবে না,—একা কাহাকেও সঙ্গী পাইবে না! অগত্যা দলে পড়িয়া তাকে থিয়েটারে ভিড়িতে হইল।

নূতন নাটকের নাম, "বুকের মণি"। নাম শুনিয়া বুঝিবার উপায় নাই, কার বুকে কি মণি দীপ্তরাগে ফুটিয়া দেখা দিবে! অভিনয় দেখিয়া রাগে অন্নদার আপাদ-মস্তক জ্বলিয়া উঠিল। থিয়েটারেও বস্তীর ছোঁয়াচ লাগিয়াছে! যেখানে রাম, সীতা, সতী সাবিত্রী, শ্রীচৈতন্য, বিল্বমঙ্গল, জয়দেব, রামপ্রসাদের ভক্তিস্রোত ঝর-ঝর ধারে প্রবাহিত হইত, সেখানেও আজ বস্তীর আবর্জ্জনা! পুরুষের সেই মত্ততা, নারীর সেই অবৈধ প্রণয়-লীলা! এক মাতাল ঘরামির তরুণী পত্নী লাঞ্ছনা-পীড়নের তলে নিষ্পেষিতা হইয়াও প্রেমের 'লাগি পাগলিনী'! পড়িয়া পড়িয়া স্বামীর লাথি খায়, আর পাড়ার এম-এ পাশ তরুণ প্রফেসার হিমাংশুকুমারের পাশে গোপনে আসিয়া দাঁড়ায়, বুকে তার মণির জৌলুস!

থিয়েটার ভাঙ্গিলে বন্ধুরা পাণ-বিড়ি-সিগারেট উড়াইয়া গৃহে ফিরিতেছিল। অভিনয়ের নানা কথায় সকলে মশ্‌গুল! নায়িকা মুঙলীর ভূমিকায় মিস্ পারুলবালার অভিনয়—ওঃ, তার তুলনা নাই! আর হিমাংশু? Simply superb! মাতাল গোবরা…আঃ, গণেশ চাটুয্যের এমন টাইপ-চরিত্র-সৃষ্টির কুশলতা—এমন make-up—বাঙলা রঙ্গমঞ্চের গৌরব! এ-গৌরব-রশ্মি অচিরে পশ্চিম গগন স্পর্শ করিবে, ভুল নাই! এমনি কলরব! অন্নদা এ কলরবে যোগ দেয় নাই—গুম্ হইয়া পথে চলিয়াছিল;

বন্ধুরা একে-একে বিদায় লইল। অন্নদা একা! থাকে সে বাদুড় বাগানের ও-দিক। ঝামাপুকুরের মধ্য দিয়া গেলে 'সর্ট-কাট্' হয়। কিন্তু পথের দুধারে বস্তী—মস্ত বস্তী! অন্নদা বারেক থমকিয়া দাঁড়াইল। তার পর মনে হইল, নিশুতি রাত—বস্তী এখন নীরব। ক্ষতি কি!

বস্তীর সরু গলি ধরিয়া ধীরে ধীরে সে অগ্রসর হইল।

দুটা মোড়ের পর দুপাশে শুধু খোলার ঘর। একটা মুচির দোকানে ল্যাম্প জ্বালিয়া এক মুচি বসিয়া চামড়া কাটিতেছে। জুতার দোকানটা অন্নদা পার হইয়াছে,

এমন সময় কোথা হইতে এক নারী-মূর্ত্তি আসিয়া তার সামনে দাঁড়াইল, ডাকিল,—বাবু…

করুণ কণ্ঠ! অন্নদার মনে হইল, স্বপ্ন! দুঃস্বপ্ন! সদ্য যে নাটকের অভিনয় দেখিয়া আসিয়াছে, সে নাটকে হুবহু এই দৃশ্য! স্বামীর লাথি খাইয়া মঙলী ঠিক এমনিভাবে প্রফেসার হিমাংশুর সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিল—এমনি সুরেই ডাকিয়া ছিল, বাবু!

পাশে গ্যাসের বাতি জ্বলিতেছে! ওদিককার বড় রাস্তা দিয়া একখানা ট্যাক্সি তীরবেগে ছুটিয়া গেল, তার শব্দে স্তব্ধ আকাশ কঁপিয়া উঠিল! অন্নদা বুঝিল, না, স্বপ্ন নয়…মঙলীর ভূমিকায় মিস্ পারুলবালা এ নয়… জীবন্ত নারী, এক তরুণী তার পথ আগুলিয়া দাঁড়াইয়াছে!

ঘৃণায় অন্নদার মন রী-রী করিয়া উঠিল। তার পাশ কাটাইয়া অন্নদা অগ্রসর হইবে, নারী পায়ে হাত দিল, ডাকিল—বাবু…

অশ্রুর বাষ্পে আর্দ্র স্বর! তরুণী পা ছাড়িতে চায় না! দায়ে পড়িয়া অন্নদাকে তার পানে তাকাইতে হইল। নারীর চোখের দৃষ্টি তার দৃষ্টির সহিত মিলিল। আধুনিক গল্পের সকল সংস্কার ঠেলিয়া এ বয়সের যত আবেগ অন্নদার চিত্তে অমনি উথলিয়া উঠিল। তরুণীর সে দৃষ্টি নিমেষের জন্য তাকে টলাইল। সে কহিল—কি বলচো?

নারী কহিল—বড় বিপদ। আপনি বাঁচান।

অন্নদার বুক কাঁপিল! এ যে অবিকল সেই গল্পের মত! তবু কৌতূহলও অল্প নয়!

অন্নদা কহিল—কি বিপদ?

নারী কহিল,—আমার স্বামী…

অশ্রুর বাষ্পে নারীর কণ্ঠ রুদ্ধ হইল, মুখে আর কথা বাহির হইল না।

অন্নদা কহিল,—স্বামী কি করেচে?

নারী উঠিয়া দাঁড়াইল—একটা নিশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিয়া রহিল।

অন্নদার মনে যত রাজ্যের গল্পের প্লট উঁকি দিতে লাগিল! এমনি ভাবেই স্বামীর বিপদের কথা পাড়িয়া বস্তীর তরুণীগুলা বেচারা ভদ্র ব্যক্তিদিগের দরদ জাগাইয়া দুর্দ্দশাগ্রস্ত করে…! সেই কে মাঠের ধারে বসিয়া ছিল—এক তরুণী আসিয়া স্বামীর হাতে লাঞ্ছনার করুন কাহিনী বর্ণনা করিয়া আশ্রয় চায়, এবং সরল বিশ্বাসে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে বাহির হইয়া দরদী ভদ্রলোক দেখে, কি গভীর ষড়-যন্ত্র! বহু অর্থ সেলামি দিয়া তবে বেচারা পরিত্রাণ পায়! এ'ও তেমনি…?

অন্নদা তরুণীর পানে চাহিল,—তরুণীর চোখে অশ্রুর পর্দ্দা! মুখে কাতরতার পাথার বহিয়া চলিয়াছে! অন্নদার বুক আবার কাঁপিল?

অন্নদা কহিল—কি বিপদ, বলো?

তরুণী কহিল,—আমার স্বামী—তার ভারী নরম মন। পাঁচজনের সঙ্গে মিশে জুয়ার নেশায় মজে চাকরি খুইয়েছিল। অনেক কষ্টে সে নেশা ছাড়িয়েছিলুম। আবার নতুন চাকরি হয়েচে। কিন্তু সেই বদ সঙ্গীগুলো আবার এসে জুটেচে। আজ বাড়ী থেকে বেরিয়ে আর ফেরেনি। সদ্য মাহিনা পেয়েচে। খপর পেয়েচি, কোথায় আছে।… সেখানে যায়, গিয়ে তাকে ফিরিয়ে আনে, এমন কেউ নেই। আমি মেয়েমানুষ—যেতে বুক কাঁপে।

অন্নদা কহিল—তা আমায় কি করতে হবে?

তরুণী কাতর-নয়নে অন্নদার পানে চাহিল, কহিল—দয়া করে তাকে যদি ধরে আনেন। নাহলে সব পয়সা জলে দিয়ে আসবে!

অন্নদা কহিল—কোথায় সে বাড়ী? তা ছাড়া আমি তাকে চিনবো কি করে?

নারী ক্ষণেক চুপ করিয়া রহিল, তারপর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল,—সে-বাড়ী আমি চিনি।

অন্নদা কহিল—বাড়ী যেন চিনলুম্—তোমার স্বামীকে চিনবো কি করে? তার নাম জানি না, চেহারা চিনি না।

তরুণী কি ভাবিতেছিল। যেন সে অকূল সমুদ্রে পড়িয়াছে! কূল দেখা যায়—কিন্তু ঢেউগুলা পাহাড়ের মত উঁচু!

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া তরুণী কহিল—নাম হীরেলাল। নাম বলতে নেই, জানি। কিন্তু না বলে উপায় কি!

অন্নদার মমতা হইল—তরুণীর কথায়, ভঙ্গীতে সত্যই সারল্য আছে! রচা গল্পের নায়িকাদের মত প্রগল্‌ভতা এর কোথাও নাই—বেশ শান্ত, সলজ্জ শ্রী!

অন্নদা ভাবিল, এ্যাডভেঞ্চার! জীবনে এমন ঘটনা ঘটিবে, সে কখনো কল্পনা করে নাই! একান্তে সহসা যদি এমন সুযোগ—মন্দ কি!

অন্নদা কহিল—বেশ, বাড়ী দেখিয়ে দাও।

তরুণী কহিল—আসুন। বলিয়া সে অগ্রসর হইল।

তার গতিতে উৎসাহের চাঞ্চল্য—কণ্ঠে আশার সুর! অন্নদা তরুণীর পিছনে চলিল।

গলির পর গলি—আরো সরু, আরো বাঁকা! শুব্ধ রাত্রি। শুধু পথের ঝাঁজরিগুলায় জল পড়ার অবিরাম শব্দ! অন্নদা ভাবিল, এত গলিও এই ক্ষুদ্র জায়গাটুকুর মধ্যে ছিল! যেন সার্ভে ম্যাপ!

একটা বাঁকের মাথায় বালি-খশা ভাঙ্গা দেওয়াল— একখানা কোঠা বাড়ী। তরুণী সেই বাড়ী দেখাইয়া একটু মৃদু স্বরে কহিল—এই বাড়ী।

অন্নদা তার পানে চাহিয়া দ্বারের কড়ায় হাত দিল। তরুণী ইঙ্গিতে নিষেধ জানাইল, কহিল—না, না, ওভাবে নয়…

বিস্ময়ে অন্নদা তরুণীর পানে চাহিল—ইহাতে আবার ভাব কি! তার সন্দেহ হইল—পা কাঁপিল। তরুণী তবে…? আবার সেই গল্পের প্লট্ মাথার মধ্যে ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাকাইয়া জাগিয়া উঠিল।

তরুণী কহিল—দলের লোক ছাড়া কাকেও ওরা ভিতরে ঢুকতে দেয় না!…যদি পুলিশ হয়…

অন্নদার বিস্ময় বাড়িল। এত কথা তরুণী কি করিয়া জানিল? তবে কি তার মনে কোনো অভিসন্ধি আছে? কোনো চক্রান্ত?…

তরুণী কহিল,—আপনি বল্‌বেন, খেলতে এসেচেন—তবেই আপনাকে ঢুকতে দেবে। তারপর আমার স্বামীর সন্ধান নেবেন। তাকে দেখ্‌তে…

বর্ণনায় তরুণী চেহারার একটু আভাস দিল, দিয়া কহিল—তাতে হবে না। আমিও আপনার সঙ্গে যাবো। কি বলেন? এরা ভারী বদ্ লোক—একা যেতে ভয় হয়। মেয়ে মানুষ, যদি অপমান করে!

অন্নদার সংশয়ের অন্ত ছিল না। নিমেষের মোহ! মোহ বৈ কি! তরুণী না হইয়া এ যদি…আর চোখের দৃষ্টিতে ঐ আলোর আভাস যদি…অন্নদা কখনো এ-রাত্রে এমন জায়গায় আসিত না! নিমেষের মোহে এ কোন্ পথে আসিয়া পড়িল? কে জানে, তরুণীর মনে কি অভিসন্ধি আছে! শীকার ভাবিয়া তাকে…

কিন্তু শীকারের মত তার বেশ নয়, ভূষা নয়! চেহারা? চেহারা লইয়া কি ইহারা ধুইয়া খাইবে!

একবার ভাবিল, চলিয়া যায়! আবার মনে হইল, এতখানি পথ আসিয়া শেষ অবধি না দেখিয়া ফেরা—না, ঠিক হইবে না! মনে কৌতূহল অল্প নয়! আইন-পুলিশের দিন—কি আর এরা করিবে? বড় জোর, সঙ্গে দু'চার টাকা যা আছে, কাড়িয়া লইতে পারে! ক্যানিবলের দেশ নয় যে তাকে কাটিয়া তার মাংস রাঁধিয়া খাইবে! প্রণয়-অভিনয়? তার জন্য দেশে মানুষের এমন অভাব আজও ঘটে নাই…

তরুণী কহিল—বাড়ীওলার নাম রহিম। ডাকুন…

অন্নদা কড়া নাড়িল—বহুবার।

একটা টিনের ডিবা হাতে লুঙ্গি-পরা এক জুয়ান মুসলমান আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল, কহিল—কি চাই?

অন্নদা কহিল—খেলবো।

মুসলমানটা অন্নদার পানে ক্ষণেক চাহিয়া তাকে নিরীক্ষণ করিল, পরে কহিল—হুঁ, নতুন মুখ।…তা হঠাৎ আস্তানা খুঁজে বার করলে কি করে বাবা?

বস্তীর গল্প ভাগ্যে পড়া ছিল, অন্নদা কহিল—কাজের কাজী—খোঁজ রাখ্‌তে হয় বৈ কি ভাই।

মুসলমান কহিল—আর কখনো এসেছিলে?

—এসেচি বৈ কি! কতবার।

—এসো।

অন্নদা ভিতরে আসিল,—তরুণী সঙ্গে আসিতেছিল—মুসলমান কহিল—ওরৎ সঙ্গে!

মুসলমানটার মুখে মৃদু হাসি! অন্নদা কহিল—হাঁ।

মুসলমান কহিল,—নাচতে গাইতে জানে?

অন্নদা তরুণীর পানে চাহিল,—তরুণীর মুখের ভাব…! অন্নদার মনে পড়িল, কোন্ মাসিক পত্রে সম্প্রতি ভয়-চকিতা'র এক ছবি দেখিয়াছিল। হুবহু তেমনি!

তরুণী মুহূর্ত্তে সে-ভাব সাম্‌লাইয়া লইল, কহিল,—জানি।

মুসলমান কহিল,—বহুৎ খুব! এসো…

দু'তিনটা ছোট ঘর পার হইয়া মস্ত দালান। একখানা ভাঙ্গা টেবিলের ধারে পাঁচ-সাতজন লোক বসিয়া। তাসের আসর! বাজির খেলা—তবু এতটুকু কলরব নাই। কয়জনে বসিয়া যেন রাজ্যের কি সব গূঢ়-তত্ত্বের আলোচনা করিতেছে! যে-মুসলমান সঙ্গে ছিল, সে কহিল,—বসে যাও বাবু—বলিয়া সে ডাকিল,—ইদ্‌রিশ…

ইদ্‌রিশ আসিল—সেই আরব-রজনীর কাহিনীতে মেঝেয় পদাঘাত করিবামাত্র পর্দ্দা ঠেলিয়া খোজা প্রহরী যেমন চকিতে আসিয়া উদয় হইয়াছিল—এও ঠিক তেমনি!

প্রথম মুসলমান কহিল,—বাবুকে লে'যা করিমের কামরায়। খেলবে।

ইদ্‌রিশ ইঙ্গিত করিল। হৃৎকম্প হইলেও অন্নদাকে ইদ্‌রিশের অনুসরণ করিতে হইল।

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া অন্নদা চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। সেই তরুণী? নাই! মনটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল,—তাইতো, কোথায় গেল? তবে কি ষড়? কিন্তু কিসের ষড়?

ইদরিশ কহিল—আসেন বাবু…

এ কথার পর দাঁড়ানো চলে না। বুকে ভারী পাথর বহিয়া অন্নদা ইদরিশের সঙ্গে চলিল।

তাস হাজির—কিন্তু খেলিবে কি? তাসের গ্রাবু খেলা সে জানে—কিন্তু কদিনই বা খেলিয়াছে! তবু বসিতে হইল।

বাজী চলিল। পাঁচ মিনিট পরে ইদরিশ হাঁকিল,—দো রূপেয়া…

দুটা টাকা তখনি বাহির করিয়া দিতে হইল। সঙ্গে সঙ্গে শরীরে রোমাঞ্চ! টাকাগুলা জলে যাইবে, সন্দেহ নাই! তারপরে? হয়তো প্রহার…শুধু শুধু এ দুর্গ্রহ কেন যে ডাকিয়া আনিল! নারীর রূপ! কিন্তু সে কামনা তার মনের কোণেও ঠাঁই পায় নাই!

দ্বিতীয় বাজি চলিল।—হারের দিকেই খেলা চলিয়াছে!

সহসা ওদিক হইতে নারী-কণ্ঠের আর্ত্তনাদ—বুক কাঁপিয়া উঠিল। থমকিয়া অন্নদা ইদরিশের পানে চাহিল। ইদরিশ লাফাইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

অন্নদাও বসিয়া থাকিতে পারিল না। সেই নারীই…? কে জানে, ইহার মধ্যে কি রহস্য!—সেই দালান! খেলার আসর ভাঙ্গিয়া গিয়াছে! একজন নারী—চীৎকার করিতেছে, আর তাকে ঘিরিয়া একরাশ লোক…

সেই নারী! হাঁ, ভুল নাই! একটা জুয়ান পুরুষ নারীর কেশের রাশি টানিয়া তাকে প্রহার করিতেছে—কিল, চড়, লাথি—পুরুষগুলা অবিচল দাঁড়াইয়া তামাসা দেখিতেছে! নারী-কণ্ঠে স্বর—মারো, আমায় মেরে ফেলো—কিন্তু ওটার সর্ব্বনাশ করো না…আমি তা কর্‌তে দেবো না।

পুরুষটাও সমানে গর্জ্জন তুলিয়াছে,—দরদ একেবারে উথলে উঠেচে! ও—ও তো পুরুষমানুষ…

অন্নদার চোখের সামনে থিয়েটারের ষ্টেজখানা যেন কে ধরিয়া দিল—সেখানে এমনি পীড়ন সত্য দেখিয়া আসিয়াছে—কিন্তু সে পীড়ন অভিনয়! আর…!

পুরুষের শক্তি লইয়া অন্নদা সেই ভিড়ে ঝাঁপাইয়া পড়িল।—যে লোকটা নারীকে প্রহার করিতেছিল, তার ঘাড় ধরিয়া টানিয়া নারীকে তার গ্রাস হইতে মুক্ত করিল,—পুরুষটা বিস্ময়ে হতভম্ব! যে-লোকগুলা তামাসা দেখিতেছিল, তাদের অবস্থাও তাই! অন্নদা নারীর হাত ধরিয়া তাকে কহিল—চলে এসো…

নারী কহিল—আমার গেলে চল্‌বে না। আমার ভাই, বিধু—ছেলেমানুষ—কিছু জানেনা। নিজে গোল্লায় গেছে—বললে শুন্‌বে না—তাকে নিয়ে এসেচে এই নরকে! তাকে—তাকে ঐ ঘরে আট্‌কে রেখেচে—ছাড়চে না।

ভগ্ন স্খলিত স্বরে কোনোমতে কথাগুলা বলিয়া তরুণী একটা ঘরের দিকে অগ্রসর হইল। সে পুরুষটা কহিল—খবর্দ্দার!

নারী কহিল—আমায় মেরে ফেল্‌লেও আমি ওকে এখানে রেখে যাবো না…

অন্নদা কহিল—কোন্ ঘরে আছে তোমার ভাই?

—ঐ—ঐ—ঐ ঘরে…

তরুণীর নির্দ্দেশমত অন্নদা অগ্রসর হইল। পুরুষটা কহিল—এটি আবার কে?

সেই মুসলমান—রহিম! হাসিয়া রহিম কহিল—তোমার জরুর মানুষ...

লোকটা হা-হা করিয়া হাসিল। কহিল,—বটে! আমার ওস্মান...বলিয়াই অন্নদার পানে চাহিয়া কহিল—ভালোয় ভালোয় সরে পড়ো চাঁদ...নাহলে মাথাটি রেখে যেতে হবে!

যে-চেহারায় যে ভঙ্গী করিয়া লোকটা এ-কথা বলিল...দেখিয়া অন্নদার বুক কাঁপিল। অন্নদা কহিল—এসো, যা করতে পারো, করো! সে বুঝিল, এই লোকটাই নারীর স্বামী—হীরালাল!

হীরালাল ঘুষি বাগাইয়া আগাইয়া আসিল। অন্নদা তখন মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে,—সে-আক্রমণ-রোধের জন্য প্রস্তুত! সহসা হীরালাল আর্ত্তনাদ তুলিয়া পড়িয়া গেল—পিছন হইতে একখানা কাঠ বায়ুবেগে আসিয়া তার মাথায় লাগিল। অন্নদা চাহিয়া দেখে, সেই নারী...কিন্তু চকিতে এ কি বেশ! যেন উন্মাদিনী! চেয়ারের আর এক-খানা ভাঙ্গা পায়া তার হাতে,—বিস্রস্ত বসন, দুই চোখে আগুন জ্বলিতেছে! নারী কহিল—যে বাধা দেবে,—তাকেই খুন করবো—খুন!...

লোকগুলা চুপচাপ সরিয়া পড়িল। হীরালাল তখনো পড়িয়া আছে,—হাঁটুতে চোট লাগিয়াছে...

নারী ছুটিয়া আসিয়া ঘরের দ্বার ঠেলিয়া ডাকিল—বিধু বেরিয়ে আয়—শীগ্‌গির...

ষোল-সাতেরো বৎসর বয়সের একটি ছোকরা—শীর্ণ দেহ, ভয়ে পাংশু মূর্ত্তি—বাহিরে আসিল। তার হাত ধরিয়া টানিয়া তাকে আনিয়া অন্নদার সাম্‌নে দাঁড় করাইয়া দিয়া নারী কহিল—একে নিন—সঙ্গে নিন্। নিয়ে চলে যান আপনি।

অন্নদা অবাক্! কহিল—তুমি?

নারী কহিল—আমার জন্য ভাববেন না বাবু। পাপের ভোগ ভুগতে হবে তো! হাঁটুতে খুবই চোট্ লেগেচে। যেমন কর্ম্ম! আমার কি অপরাধ! দেখি, ওকে যেমন করে হোক, নিয়ে যেতে হবে...

অন্নদা দাঁড়াইল। কি করিয়া এই নারীকে ইহাদের এখানে দলে ফেলিয়া যায়? নারী কহিল,—যান, দেরী করবেন না...

অন্নদা আবার কহিল—তুমি এসো।

নারী কহিল—আমার যাবার উপায় নেই। দেখচেন না...

নারী হীরালালের পানে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিল—হীরালাল হাঁটু ধরিয়া কাতরাইতেছে!

নারী হাতের কাঠ না ফেলিয়া হীরালালের কাছে আসিয়া বসিল। হীরালাল ঝাঁজালো স্বরে কুৎসিত গালি দিল।

নারী অন্নদার পানে চাহিল, চাহিয়া কহিল—এখনো দাঁড়িয়ে রইলেন! যান্, যান্—দয়া করে যান বাবু। আমার জন্য ভাববেন না। আমার স্বামী কাছে আছে। বড়-জোর মেরে ফেলবে, অপমান করতে পারবে না তো!...

তার স্বরে মিনতি,চোখের দৃষ্টিতে সেই কাকুতি! যে দৃষ্টির কাকুতিতে ভুলিয়া অন্নদা এখানে আসিতে দ্বিধা করে নাই! অগত্যা বিধুকে লইয়া চলিয়া যাইতে হয়।

নারী কহিল—পারেন, একজন পাহারওয়ালা ডেকে দেবেন। যাক, ধরেই নিয়ে যাক্—এর চেয়ে জেলও ভালো...

অন্নদা দাঁড়াইল না—বিধুকে লইয়া সে-স্থান ত্যাগ করিল।

পথে বিধুর কাছে নানা প্রশ্ন করিয়া বৃত্তান্ত কতক জানিল।

হীরালাল ভালো ইলেকট্রিক মিস্ত্রী। এক সাহেবের দোকানে পঞ্চাশ টাকা মাহিনায় চাকুরি করিত; জুয়ার নেশায় সে চাকুরী খোয়ায়। তারপর সম্প্রতি আর এক অফিসে চাকুরি জুটিয়াছে। এখানে মাহিনা পঁয়তাল্লিশ, তা'ছাড়া উপরি-পাওনা আছে। পয়সার সঙ্গে সঙ্গে আবার সেই জুয়ার নেশা ভুতের মত তাকে পাইয়া বসিয়াছে। ঐ নারী হীরালালের স্ত্রী, নাম কুমুদ—বিধুর ছোটদি। ছোটদির দুঃখের সীমা নাই। পয়সার অভাবে মাস-খানেক পূর্ব্বে চার বছর বয়সের ছেলেটি রোগে ভুগিয়া বিনা চিকিৎসায় মারা গিয়াছে। বিধু আসিয়াছিল দেশ হইতে কলিকাতায়—খুড়ার মেয়ের বিবাহ—সেই বিবাহের জন্য বাজার করিতে। নগদ দুশো টাকা সঙ্গে ছিল। বাজার করিয়া দিবে বলিয়া বিধুকে সঙ্গে লইয়া হীরালাল এই

আড্ডায় আনিয়া জোর করিয়া তাকে খেলায় বসাইয়াছে—পঞ্চাশ টাকা হারিয়াছে বলিয়া লোপাট করিয়াছে—বাকী টাকা হীরালালের কাছে এখনো আছে!

কাহিনী শুনিয়া অন্নদা দ্বিধায় পড়িল—পাহারাওয়ালা লইয়া যাইবে? না…?

বিধু কহিল—পাহারওলা ডাকুন। না'হলে টাকা-গুলো পাঁচ ভূতে লুঠে নেবে। দিদি হাজার হোক মেয়েমানুষ…

তাহাই হইল।—পাহারওয়ালা সঙ্গে অন্নদা ফিরিয়া দেখে, বাড়ীতে কেহ নাই। কোথা হইতে আগুন জড়ো করিয়া কুমুদ বসিয়া সেই হতভাগা স্বামীর পায়ে সেঁক দিতেছে!

পুলিশ কহিল—রহিম কোথা গেল?

কুমুদ কহিল—কেউ নেই। পালিয়েচে।

পুলিশ কহিল—একে মেরেচে কে? থানায় যাবে?

কুমুদ কহিল—আমি মেরেচি। আমার স্বামী।

হীরালাল কহিল—না, না, কেউ মারেনি। পড়ে গিয়ে পা ভেঙ্গে গেছে।

কুমুদ কহিল—টাকাকড়ি সঙ্গে ছিল। তারা নিয়ে সরেচে—ঐ রহিম, আর…

পুলিশ চুপ করিয়া ক্ষণেক দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর কহিল—দিল্লাগী পুলিশকা সাথ…আঁ!

বলিয়া রক্ত দৃষ্টিতে সকলের পানে চাহিল, চাহিয়া ভারী জুতায় খট্‌খট্ শব্দ তুলিয়া বিদায় লইল।

বিধু ডাকিল—দিদি…

কুমুদ কহিল—কি ভাই?

—রিক্‌শ গাড়ী আছে—দু'খানা। ওঁকে নিয়ে বাড়ী চলো। ডাক্তার দেখাবে।

কুমুদ করুণ চোখে বিধুর পানে চাহিল, চাহিয়া কহিল,—টাকাগুলো গেল ভাই!…এমন স্বামীর মুখদর্শন করতে আছে! কুমুদ নিশ্বাস ফেলিল। তারপর অন্নদার পানে চাহিল, কহিল—আপনি ভগবান!

অন্নদা কহিল—টাকাগুলো উদ্ধার হলো না তো!

কুমুদ কহিল,—না!

পরের দিন অন্নদা হীরালালকে দেখিতে আসিল। পায়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হীরালাল বিছানায় পড়িয়া আছে, কুমুদ তার সেবা করিতেছে।—পা ভাঙ্গে নাই, মচকাইয়া ব্যথা হইয়াছে। বিধুর টাকা?…কুমুদ কহিল—সে কি আর ফেরে?

আরো চার-পাঁচ দিন অন্নদা আসিল। তার ভারী ভালো লাগিতেছিল—এই কুমুদ—বস্তীর নারী। চমৎকার। আর গল্পে উপন্যাসে বস্তীর এই লাঞ্ছিতা নারীকে কি মূর্ত্তিতেই না ইহারা গল্পে গড়িয়া পাঁচজনকে দেখাইতে চায়!

হীরালালকে সে বহু হিত-কথা বলিল। হীরালাল নিঃশব্দে শুনিল, শুনিয়া কহিল,—আর নয় বাবু—এই কাণ মলচি!…

তারপর নানা কাজ। অন্নদার মন ছুটিয়া আসিতে চায় এই বস্তীর জীর্ণ গৃহে—কিন্তু অবসর আর মিলে না!…

প্রায় মাসখানেক পরে কি কাজে এদিকে আসিয়াছিল—হঠাৎ মনে পড়িল, কুমুদ! হীরালাল!

তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে—পথে গ্যাস জ্বলিতেছে। অন্নদা আসিয়া ডাকিল,—হীরালাল আছো?

দ্বার খুলিয়া কুমুদ আসিয়া দেখা দিল, কহিল—আপনি! ভালো আছেন?

—আছি!…তোমরা?…হীরালাল?

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কুমুদ কহিল—কাল মাহিনা পেয়েচে—সেই আড্ডায় গিয়ে জুটেচে। আমার বরাত, বাবু…এর আর নড়চড় হবে না! আপনি কি-বা করবেন!

শরৎচন্দ্রের সমাজ ও ধর্ম্মের আদর্শ

—প্রবন্ধ—

শ্রীহেমন্তকুমার চক্রবর্ত্তী এম-এ

"শাস্ত্রের বচন সত্য—কিংবা সত্য
মর্ম্মের কাহিনী
হৃদয়ের ধর্ম্ম-ছাড়া
অন্য ধর্ম্ম মানিব না প্রভু!
শুষ্ক শাস্ত্রের বচন
লোকাচার সমাজ নিয়ম
যার চাপে নির্দ্দোষীর বুক ভেঙ্গে যায়
তারে সত্য বলি মানিব না—"

পাষাণ প্রাচীরের মত গুরুভারে অন্তর যখন ভাঙ্গিয়া পড়ে অসীম অতলস্পর্শ হাহাকার যখন বুকে চাপিয়া বসে তখন বিপ্লবী মনে শাস্ত্রের বচন সত্য কিংবা মর্ম্মের কাহিনীই সত্য এ প্রশ্ন আসিয়াই দেখা দেয়। শোকার্ত্ত হৃদয়ের বেদনাবিদ্ধ হাহাকারের সহিত যোগ-সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে বলিয়াই শরৎচন্দ্র সর্ব্বত্র হৃদয়ের ধর্ম্মকেই শ্রদ্ধার স্বর্ণপীঠে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ঐশ্বর্য্যময়ী প্রকৃতির অনন্ত বৈচিত্র্যের মাঝে "সমস্ত বিধিনিষেধই সকলকে এক দড়িতে বাঁধিতে পারে না।" (শ্রীকান্ত ২য়) যে রোগের বীজ এক জনের পক্ষে মারাত্মক তাহাই হয়ত আর একজনকে স্পর্শ করে না, সে জন্যই বেদে বালিকার প্রণয়-মুগ্ধ মিত্র বংশীয় মৃত্যুঞ্জয়কেও তিনি শাস্ত্র বচনের দোহাই দিয়া 'ছি ছি' করিয়া উঠিতে পারিলেন না, তিনি বলেন—"তত বড় ভালবাসকে অপমান করিতে পারি নীতি শাস্ত্রের পুঁথি আমি অত বেশী পড়ি নাই।" (শ্রীকান্ত ২য়) কাজেই বিলাসীর পলে পলে আত্মদানের মাধুর্য্যকেও তিনি অপমানিত করিবেন কিরূপে? "বিলাসীকে যাঁহারা পরিহাস করিয়াছিলেন তাহারা সকলেই সাধ্বি গৃহিণী—অক্ষয় সতীলোক তাঁরা সবাই পাইবেন তাও আমি জানি, কিন্তু সেই সাপুড়ের মেয়েটি যখন একটি পীড়িত শয্যাগত লোককে তিল তিল করিয়া জয় করিতেছিল তাহার তখনকার সে গৌরবের কণামাত্রও হয়ত আজিও ইহাদের কেহ চোখে দেখেন নাই। মৃত্যুঞ্জয় হয়ত নিতান্তই একটা তুচ্ছ মানুষ ছিল, কিন্তু তাহার হৃদয় জয় করিয়া দখল করার আনন্দটাও তুচ্ছ নয় সে সম্পদ ও অকিঞ্চিৎকর নয়—" (বিলাসী)

অবনত মস্তকে কিংবা চক্ষু মুদ্রিত করিয়া আদেশ মানিয়া নেওয়ার মাঝেই চরম তৃপ্তি থাকিতে পারে কিন্তু চরম সার্থকতা বা গৌরব আছে বলিয়া তিনি বিশ্বাস করেন না! সে জন্যই বলেন—"যা সত্য তাকেই সকল সময় সকল অবস্থায় গ্রহণ করবার চেষ্টা করবে। তাতে বেদই মিথ্যা হোক আর শাস্ত্রই মিথ্যা হয়ে যাক্। সত্যের চেয়ে এরা বড় নয়, সত্যের তুলনায় এদের কোন মূল্য নেই। জিদের বশে হোক্, মমতায় হোক্, সুদীর্ঘ দিনের সংস্কারে হোক্ চোখ বুজে অসত্যকে সত্য বলে বিশ্বাস করায় কিছুমাত্র পৌরুষ নেই।" (চরিত্রহীন) স্মৃতি বা তন্ত্রের বচন যদি মানুষের সত্যপ্রয়োজনে সৃষ্ট হইয়া থাকে তবে মানুষেরই সত্য প্রয়োজনে তাহার পরিবর্ত্তন সাধিত হইতে পারে না এ কথাকে স্বীকার করা তাঁহার পক্ষে শক্ত। তাহা ছাড়া তাঁহার মতে চরম সত্য বা পরম সত্য বলিয়া কোন জিনিষ নাই। সত্য শাশ্বত সনাতন বা অপৌরুষেয়ও নহে। মিথ্যার মতই তাহাকে মানবজাতি অহরহ সৃষ্টি করিয়া চলে—তাহারও জন্ম আছে, মৃত্যু আছে, তিনি বলেন—

"এই পরিবর্ত্তনশীল জগতে সত্যোপলব্ধি বলিয়া কোন নিত্য বস্তু নাই। তাহার জন্ম আছে, মৃত্যু আছে, যুগে যুগে কালে কালে তাহাকে মানবের প্রয়োজনে নূতন হইয়া আসিতে হয়। অতীতের সত্যকে বর্ত্তমানে স্বীকার করিতেই হইবে এ বিশ্বাস ভ্রান্ত, এ ধারণা কুসংস্কার—"

যাহাদের মতে বাঁচিয়া থাকাই চরম সার্থকতা, কিম্বা হিন্দু সমাজের অস্তিত্বের প্রমাণই তাহার শ্রেষ্ঠতা নির্দ্দে-

শক, অথবা যাহারা মনে করেন, হিন্দু-সমাজ তাহার নির্ভুল বিধি ব্যবস্থার জোরেই অত শতাব্দীর অত বিপ্লবের মধ্যেও বাঁচিয়া আছে, তাহাদের তিনি ইহাই বলিতে চাহেন—"কোনমতে টিকিয়া থাকাই কি চরম সার্থকতা? এমন অনেক জাতিইত টিকিয়া আছে। কুকিরা আছে, কোল, ভীল, সাঁওতালরা আছে, প্রশান্ত মহাসাগরের অনেক ছোটখাট দ্বীপের অনেক ছোটখাট জাতিরা মানুষ সৃষ্টির সুরু হইতেই বাঁচিয়া আছে। আফরিকায় আছে, আমেরিকায় আছে তাহাদেরও এমন সকল কড়া সামাজিক আইন-কানুন আছে যে শুনিলে গায়ের রক্ত জল হইয়া যায়। বয়সের হিসাবে তাহারা ইউরোপের অনেক জাতির অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহের চেয়েও প্রাচীন, আমাদের চেয়েও পুরাতন। কিন্তু তাই বলিয়াই যে ইহারা আমাদের চেয়ে সামাজিক আচার ব্যবহারে শ্রেষ্ঠ এমন অদ্ভুত সংশয় বোধ করি কাহারও মনে উঠেনা।"

হিন্দুর-পৃথিবীর সেরা সনাতন, বশিষ্ঠ, অত্রি পরাশরের বিধি নিষেধে ঘেরা—প্রাচীন সমাজ-অন্তরের সম্পদ এবং সহজ সুনীতি সুরুচি হারাইয়া মনুষ্যত্বের কোন নিম্নস্তরে গিয়া পৌছিয়াছে তাহা তিনি অনেক স্থলে আলোচনা করিলেও বিশেষভাবে সুপরিস্ফুট করিয়াছেন "পল্লী সমাজে" ও "বামুনের মেয়ে"তে। ইহা সমাজের ব্যঙ্গ চিত্র নয়। শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট বিধি ব্যবস্থার সার্কাসী কসরৎ কিংবা আচার ব্যবহারের চুলচেরা হিসাব ধর্ম্মের মাপকাঠি হইতে পারে না। মানুষ যেখানে ব্যর্থ সেখানে তার কর্ম্ম অসত্য ধর্ম্ম প্রাণহীন, জীবন একটা নিরেট ব্যঙ্গ,অচলায়তন মানব মনের চিরদিনের মরণ সমাধি। বুকফাটা ক্রন্দনের সুরে পঙ্কের যে গান সে গান তার একার নয়। 'বসন্ত সমাগমে রুদ্ধকণ্ঠ কোকিলের আকুলতার মত, ছায়ায় ঘেরা কুসুমলতার আলোক পানে দৃষ্টির মত'—ঐ গান সমস্ত বিশ্বের। সর্ব্বপ্রকার দুর্নীতি এবং অসত্যকে আশ্রয় করিয়াও অত্রি পরাশরের বিধি ব্যবস্থার জোরে এবং যথাযথ নিয়ম মানিয়া চলায় যেখানে সমাজের শীর্ষে আরোহণ করা যায়, মানবতার মাপকাঠিতে তাহাকে আদর্শ মনে করা যায় কিরূপে? শরৎচন্দ্র বলেন—"এই আচার বিচার বা বিবর্ণ বিকৃত শবদেহটাকে হতভাগ্য গ্রাম্য সমাজ যে যথার্থ ধর্ম্ম মনে করিয়া প্রাণপণে জড়াইয়া ধরিয়া তাহারই বিষাক্ত পূতিগন্ধময় পিচ্ছিলতায় অহর্নিশি অধঃপথেই নামিয়া চলিয়াছে" (পল্লী-সমাজ) আহারে বিহারে সংযমের প্রয়োজনীয়তা আছে সে কথা ঠিক। কিন্তু কেবল মাত্র খাওয়া ছোঁওয়া বাঁচাইয়াই পাপের সমস্ত অন্যায় হইতে পরিত্রাণ পাওয়ার মত হাস্যকর ব্যাপার আর নাই। আচারের নামে চিরাগত সংস্কার হয়ত কাহারও মনে কিছুমাত্র চিহ্নও আঁকিয়া দেয় না, কিন্তু যাহার হৃদয় আছে, মানুষের নিকট হইতে মানুষের লাঞ্ছনা তাহাকে বেদনায় বিদ্ধ করে। অসহায়া নিরাশ্রয় দুলে বিধবার, ধর্ম্মবুদ্ধি সম্পন্ন হিন্দু সমাজে কোথাও আশ্রয় মিলিল না; সমুদ্রজল স্পর্শ করার অপরাধে জাতিচ্যুত, বিদেশ-প্রত্যাগত অরুণ তাহাকেই কোলে তুলিয়া লইল। কারণ শরৎচন্দ্র বলেন—"তার জাত ভগবানের বরে অমর হয়ে গেছে।" (বামুনের মেয়ে) ঘরে বাইরে আগুন জ্বলিয়া উঠিয়া অচলার জীবন যখন শ্মশান হইয়া গেল তখন তার দগ্ধ অদৃষ্টে বিন্দুমাত্র অমৃতবারি সিঞ্চনের চেষ্টা না করিয়া যে ভট্টাচার্য্য গঙ্গার পুণ্যোদকে দেহের পবিত্রতা সম্পাদনের জন্য অধীর হইয়া ছুটিয়া গিয়াছিলেন তাহার ধর্ম্মনিষ্ঠা ও শুচিতার আদর্শকে সত্য বলিয়া মানিয়া নেওয়া যায় কিরূপে? সেজন্যই সত্যাশ্রয়ী বিপ্লবী মন এ প্রশ্নই করিয়া বসে "ব্রাহ্মণের এই ধর্ম্ম কোন সত্যকার ধর্ম্ম যাহা সামান্য একটা মেয়ের প্রতারণায় এক নিমিষে ধুলিসাৎ হইয়া গেল। যে ধর্ম্ম অত্যাচারীর আঘাত হইতে নিজেকে এবং অপরকে রক্ষা করিতে পারেনা, বরঞ্চ তাহাকেই মৃত্যু হইতে বাঁচাইতে সমস্ত শক্তি অহরহঃ উদ্যত রাখিতে হয়, সে কিসের ধর্ম্ম ও মানব জীবনে তাহার প্রয়োজনীয়তা কোনখানে? যে ধর্ম্ম স্নেহের মর্য্যাদা রাখিতে দিল না, নিঃসহায় আর্ত্ত নারীকে মৃত্যুর মুখে ফেলিয়া যাইতে একটুকু দ্বিধাবোধ করিল না, আঘাত খাইয়া যে ধর্ম্ম এত বড় স্নেহশীল বৃদ্ধকেও এমন চঞ্চল প্রতিহিংসায় এরূপ নিষ্ঠুর করিয়া দিল সে কিসের ধর্ম্ম? ইহাকে যে স্বীকার করিয়াছে সে কোন সত্যবস্তু বহন করিয়াছে? যাহা ধর্ম্ম সে ত বর্ম্মের মত আঘাত সহিবার জন্যই। সেইত তাহার শেষ পরীক্ষা" (গৃহদাহ)

রবীন্দ্রনাথ কবির ভাষায় বলেন—

… … শুচিত্ব কেবল
চিত্তহীন অর্থহীন অভ্যস্ত আচার—
ধর্ম্ম প্রাণহীন
ভারসম চেপে আছে আড়ষ্ট কঠিন।
(নৈবেদ্য)

বিশ্বব্যাপী অবিচ্ছিন্ন নিখিল সত্যের সাক্ষাৎ পাইয়া যে মন সে সত্যের অনুসরণ করে, প্রাণহীন জড় শাস্ত্রীয় যুক্তির বিচারে তাহা যত বড়ই অপরাধী হউক, অচিন্ত্য ব্রহ্মাণ্ডের লোক লোকান্তরে যাঁহার অনন্ত শাসন, তিনি তাহাতে ক্ষুব্ধ হইবেন না ইহা সুনিশ্চিত। যাহারা নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দেওয়া দূরে থাকুক, আশ্রয় দেওয়ার অপরাধে অন্যকে জাতিচ্যুত এবং নির্য্যাতিত করে, অন্তরের কোমলতার দণ্ড স্বরূপ যাহারা আশ্রয়দাতার মৃতদেহ সংকারকে "শাস্ত্র বিরুদ্ধ অপকর্ম্ম" বলিয়া মনে করে এবং "জীবিত থাকিতে অশাস্ত্রীয় কাজ সমাজের মধ্যে কিছুতেই হইতে দিতে পারিবে না" বলিয়া অহঙ্কার করে, শরৎচন্দ্র তাহাদের অন্তরের দৈন্যকে কোনদিনই সম্মানের আসন দিতে পারেন নাই। তাঁহার ইন্দ্রনাথ অপূর্ব্ব মমতায় অপরিচিত মৃতদেহের শিরশ্চুম্বন করে কারণ তাহার মতে "শুষ্ক আমগাছ জামগাছের কাঠে তৈরী ডিঙ্গিটার মত মড়ারও জাত থাকে না" (শ্রীকান্ত) এ যুক্তি হয়ত নিতান্তই সামান্য কিন্তু ইহার মধ্যেও যে তীক্ষ্ণ সত্য অন্তর্নিহিত নাই তাহা জোর করিয়া বলা শক্ত। শরৎচন্দ্র বলেন—"ইন্দ্র ঐ বয়সে নিজের অন্তরের মধ্যে যে সত্যটির সাক্ষাৎ পাইয়াছিল অত বড় সমাজ-পতিরা অতটা প্রাচীন বয়স পর্য্যন্ত তাহার কোন তত্ত্বই পান নাই—"(শ্রীকান্ত) মহাপ্রাণতার পদতলেই শরৎচন্দ্র তাঁহার সমগ্র সাহিত্যে পূজার বেদী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, ইহাই তাঁহার মতে মানুষের সর্ব্ব যুগের চিরন্তন আদর্শ। ইন্দ্রনাথের প্রসঙ্গেই তিনি বলিতেছেন—"ভগবান্, টাকাকড়ি, ধনদৌলত. বিদ্যাবুদ্ধি, ঢের ত তোমার অফুরন্ত ভাণ্ডার হইতে দিতেছে দেখিতেছি, কিন্তু এত বড় একটা মহাপ্রাণ আজ পর্য্যন্ত তুমিই বা কয়টা দিতে পারিলে ? "(শ্রীকান্ত) জীবনে বিধিব্যবস্থার হয়ত প্রয়োজনীয়তা আছে কিন্তু সে বিধি-ব্যবস্থাই যদি বড় হইয়া অন্তরের সহজ ধর্ম্মের গলা চাপিয়া বসে তখন উভয় দিকেই আঘাত ও অমঙ্গলের দিন আসে। স্রোতের জল অবরুদ্ধ হইলেই পচিয়া ওঠে, অচল সমাজের প্রাচীন সংস্কার মিথ্যাকেই মর্য্যাদা দিয়া যত বাড়িয়া উঠে ততই তাহাতে গ্লানি, পঙ্ক ও অনাচার জমা হইয়া উঠিতে থাকে। এ মিথ্যা এবং সমাজের দাম্ভিক অনুশাসনকেই শরৎচন্দ্র তীব্র নিষ্করুণ তীক্ষ্ণ আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত করিয়াছেন।

দয়া, মায়া স্নেহ প্রীতি প্রভৃতি অন্তরের সুকুমার বৃত্তিকে শরৎচন্দ্র যত শ্রদ্ধা করেন, ত্রুটী বিচ্যুতি কিংবা ক্ষণিক দুর্ব্বলতায় মানুষ যখন 'আত্মহত্যা' করিয়া বসে তখনও তাহাকে তিনি তত ক্ষমা করিতে পারেন। সে জন্যই সমাজে লাঞ্ছিতা অবমানিতা পতিতাদের প্রতিও তাঁহার সমবেদনা অপরিসীম। ক্ষণিক দুর্ব্বলতার অপরাধে কাহাকেও সমাজ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেই যে হিন্দুসমাজ অধিক পবিত্র হইয়া উঠিবে না শ্রীকান্তের 'অভয়া'র মুখেই তাহা তিনি সুপরিস্ফুট করিয়াছেন। কলুষিত বাষ্পে এবং কদাচারে অন্তর যখন ভরিয়া উঠে তখনই বাহিরের শুচিতা অ-শুচিতা বাঁচাইয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা করা হয়। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেন—"আচারের দ্বারা মানুষের মনকে বিশুদ্ধ করা যায় না, বরঞ্চ তার বাড়াবাড়িতে চরিত্রের মূলে দুর্ব্বলতা ও নিজের প্রতি অ-শ্রদ্ধা আসে। ভিতরের মানুষের উপরেই দাবী রাখতে হবে, দারোয়ানের 'পরে নয়।"

স্ত্রীলোকের অবগুণ্ঠন যে আন্তরিক পবিত্রতার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন নয় কিংবা অবাধ মেলামেশাই যে অশুচিতার কিংবা অসংযমের প্রমাণ নয় এ প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্র বলেন— "এই যে ইহারা চতুর্দ্দিকে আনন্দ সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে— সে কি অবহেলার জিনিষ ; রমণীদের এতখানি স্বাধীনতা দিয়া এ দেশের পুরুষেরা কি এমন ঠকিয়াছে এবং আমরাই বা তাহাদের অষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধিয়া রাখিয়া জীবনটা পঙ্গু করিয়া দিয়া কি এমন জিতিয়াছি ;" (শ্রীকান্ত ২য়) আর রবীন্দ্রনাথ বলেন—"শুচিতা ও শোভনতার আদর্শ মেয়েদের অন্তরের জিনিষ; চিরদিন আমি এই সংস্কারকেই মনে রেখেছি এইজন্যই বাইরের শাসন অতি কঠোর করে

আমি তাদের অসম্মান করতে বেদনা পাই; কিন্তু ওরা নিজের স্বভাবের সৌন্দর্য্য ও নির্ম্মলতার নিয়ম সংযম নিজেই অস্খলিত তপস্যার দ্বারা রক্ষা করবে এইটে যেন হয় আনন্দময় স্বধর্ম্ম" তিনি আরও বলেন—"খোলা বাতাসে কোন কোন অতি দুর্ব্বলকে রোগে ধরে, তাই বলেই নিখিলের পক্ষেই বদ্ধ বাতাসই নিরাময় ও নিরাপদ বলে গণ্য করতে পারিনে, খোলা-বাতাসেই ব্যাধির বিরুদ্ধে শরীর সুদৃঢ় হয়। মেয়েদের আন্তরিক আত্ম-গৌরব আমরা যেন কিছুতেই দুর্ব্বল না করি।"

কঠোর ব্রহ্মচর্য্যরূপ বালবিধবার যে মুক্তির সহজ ও সরল উপায়, মানবতার আদর্শে তাহাকেই চরম এবং পরম শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে করা যায় কিরূপে? ব্যর্থতার গুরুভারে নিরানন্দ জীবনে যখন পলের পর পল হাসি মিশাইয়া যায়, তখন হৃদয়ের যে দেবতা হাসিয়া খেলিয়া মানব মনে ফুলশর বর্ষণ করেন, তিনি তাহাতে উৎফুল্ল হইয়া উঠেন কিনা জানি না, কিন্তু চিরাচরিত প্রথা মানিয়া চলাকেই যাহারা মুক্তির উপায় কিংবা শ্রেষ্ঠ কল্যাণ বলিয়া মনে না করে, বেদনার রুদ্ধ উৎসে তাহাদের কণ্ঠে হাহাকার এবং নয়নে অশ্রু ছাপাইয়া উঠে, শরৎচন্দ্র গৃহদাহে ইহার এক মর্ম্মান্তিক চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তিনি বলেন—"আমি বিধবা বিবাহের ভালমন্দের তর্ক তুল্‌ছিনে, কিন্তু এই ক্ষেত্রে তোমার সমস্ত হিন্দুসমাজ চীৎকার করে মলেও আমি মানব না, এই ব্যবস্থাই ওই দুঃখের মেয়েটার পক্ষে চরম শ্রেয়……সমস্ত জীবনটা কি তোমরা খেলার জিনিষ পেয়েছ যে, ব্রহ্মচর্য্য ব্রহ্মচর্য্য ক'রে চেঁচালেই সারা দুনিয়াটা ওর জন্যেই রাতরাতি বদ্‌লে ঋষির তপোবন হয়ে উঠবে" আবার শ্রীকান্ত (২য়) বলেন—"বিধবার আচরণ—তার সঙ্গে ব্রহ্মের বিন্দু-বিসর্গ সম্বন্ধ নাই, বিধবার চাল-চলন টাই যে ব্রহ্ম লাভের উপায় আমি তাহা মানি না। কুমারী সধবা বিধবা যে কেহ তাহার নিজের নিজের পথে ব্রহ্মলাভ করিতে পারে; বিধবার চাল্‌চলনটাই সে জন্য একচেটিয়া করিয়া রাখা হয় নাই।"

বিবাহ সম্পর্কে অর্থ, রূপ, কুলমর্য্যাদা প্রভৃতি নানা বিষয়েই সমাজে সমস্যা আসিয়া দেখা দিয়াছে; বিভিন্ন দিক হইতেই শরৎচন্দ্র তাহাদিগকে যথাযথ আলোচনা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

বিবাহিত জীবনে মাধুর্য্য থাকিতে পারে, কিংবা প্রকৃতির দুর্জ্জয় শক্তির দুর্লঙ্ঘ্য নাগপাশকে উপেক্ষা বা অবহেলা করা সুকঠিন হইতে পারে, কিন্তু তাহাই কখনও মানুষের চরম কর্ত্তব্য বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে না, সে জন্যই সন্ধ্যার (বামুনের মেয়ে) মুখ দিয়া তিনি একথাই বাহির করিয়াছেন—"মেয়ে মানুষের বিয়ে করা ছাড়া পৃথিবীতে আর কোন কাজ আছে কিনা, আমি সেইটে জান্‌তেই বাবার সঙ্গে যাচ্ছি, যে ভিত্তির উপর হিন্দু সমাজের বিবাহ ব্যবস্থা সু-প্রতিষ্ঠিত শরৎচন্দ্র তাহাকে শ্রদ্ধার আসন দিতে পারেন নাই। অন্যত্র আছে—

"যে সমাজে কেবল পুত্রার্থে-ই ভার্য্যা গ্রহণের বিধি আছে, নারী হয়ে তাকেও আমি শ্রদ্ধার চক্ষে দেখতে পারিনে; আপনি সতীত্বের চরম উৎকর্ষের বড়াই কর্‌ছিলেন, কিন্তু এই যে দেশে বিবাহের ব্যবস্থা সে দেশে ও বস্তু বড় হয় না, ছোটই হয়,……। এই ব্যর্থ বিবাহিত জীবনের মোহ নারীকে কাটাতেই হবে, এতে তার লজ্জাই আছে, গৌরব নেই।" পঞ্জিকায় অপরাপর নিষিদ্ধ বস্তুর সাথে নারীত্বের অবমাননা ব্যঞ্জক যে উক্তি জড়িত আছে, তাহা নির্ভুল স্মৃতি বিচারের মীমাংসা ফল হইতে পারে; কিন্তু মানবাত্মার তত বড় লাঞ্ছনায় গৌরবান্বিত ও উৎফুল্ল হইয়া উঠিবার কোনও কারণ নাই।

বিবাহের বাহ্যিক নিয়ম প্রণালী তাঁহার মতে সত্যিকার জিনিষ নয়, কিংবা কোনও এক বিশিষ্ট দিনে কতগুলি ব্যবস্থা মানিয়া চলিলেই অন্তরের সত্য মিলন সাধিত হইতে পারেনা, কারণ সত্যের স্থান বুকের মধ্যে, মুখের মধ্যে নয়, তিনি বলেন—"মনের মিলনই সত্যিকার বিবাহ। নইলে বিয়ের মন্ত্র বাংলা হবে কি সংস্কৃত হবে, ভট্‌চায্যি মশাই পড়াবেন, কিংবা আচার্য্য মশাই পড়াবেন, তাতে কি আসে যায়? (দত্তা)

"বিয়ের মন্ত্র কর্ত্তব্য-বুদ্ধি দিতে পারে, ভক্তি দিতে পারে, সহমরণে প্রবৃত্তি দিতেও পারে, কিন্তু মাধুর্য্য দেবার শক্তি ত তার নেই" (চরিত্রহীন)

"বিবাহ ব্যাপারটা যাহাদের শুধু নিছক Contractতা সে যতই কেননা বৈদিক মন্ত্র দিয়া document পাকা হোক্, সে দেশের লোকের সাধ্যই নাই, মৃত্যুঞ্জয়ের অন্ন পাপের কারণ বুঝে" (বিলাসী)

"কেন মানুষ গায়ে পড়িয়া আপনার মানব-আত্মাকে এমন করিয়া অপমানিত করে! সে মন্ত্র পড়া স্ত্রী না-ই বা হইল, কিন্তু সে ত নারী!...তাহারই আশ্রয়ে সে ত এ সুদীর্ঘকাল স্বামীর সমস্ত অধিকার লইয়া বাস করিয়াছে, তাহার বিশ্বস্ত হৃদয়ের সমস্ত মাধুর্য্য, সমস্ত অমৃত সে ত সমস্ত কায়মনে তাহাকেই নিবেদন করিয়া দিয়াছিল।"

(শ্রীকান্ত ২য়)

বিভিন্ন জাতিতে বিবাহ ভাল কি মন্দ; সে প্রশ্নের উত্তর তিনি কোথাও দিতে চেষ্টা করেন নাই; কিন্তু একই জাতিতে "কেবল মাত্র আলাদা ধর্ম্ম মতের জন্যই" তাঁহার মতে বিবাহ অসম্ভব নয়।

স্বামী যদি শ্রদ্ধার ন্যায্য আসন হইতে বিচ্যুত হয় এবং তাহাতে যদি অব্যক্ত বিতৃষ্ণায় অপর পক্ষে অন্তর ভরিয়া উঠে, তাহা হইলেও শুদ্ধ মাত্র বৈদিক মন্ত্রের অর্থহীন আবৃত্তির জোরে বিবাহের সমস্ত বন্ধন এবং সমস্ত দায়িত্বই স্ত্রীকে যাবজ্জীবন মানিয়া চলিতে হইবে এবং তাহাই তাহার নারী-জীবনের চরম সার্থকতা ইহা তিনি স্বীকার করিতে পারেন নাই। নিরর্থক প্রলাপের মত বিবাহের মন্ত্র যদি পুরুষের প্রবৃত্তিকে বাধা দিতে না পারে, তবে তাহাই বা নারীকে ভাল বাসার ন্যায্য গৌরব ও মাধুর্য্যের স্বর্গ হইতে বঞ্চিত করিবে কেন? এখানেই নিজের বিবেক ও প্রচলিত সংস্কারে, স্বাধীন চিন্তায় ও পরাধীন জ্ঞানে সংঘর্ষ বাধে। মুক্তিকামীShelleyর বিদ্রোহী মানবাত্মাও ইহাকে স্বীকার করিতে পারে নাই,—

"Woman for no other crime than having followed the dictates of a natural appetite, are driven wiih fury from the comforts and sympathies of society. It is less venial than murder. Has a woman obeyed the impulse of unerring nature,—society declares war against her, pitiless and eternal war: she must be the tame slave, she must make no reprisals. Theirs is the right of persecution, hers the duty of endurance" Notes by Shelley on Queen Mab.

"সন্ন্যাসী যখন নিদারুণ শীতে আকণ্ঠ জলমগ্ন হইয়া, এবং ভীষণ গ্রীষ্মের দিনে রৌদ্রের মধ্যে অগ্নিকুণ্ড করিয়া, মাটীতে মাথা এবং আকাশে পা করিয়া থাকে' তখন তাহার দুঃখ ভোগের কঠোরতা দেখিয়া প্রলুব্ধ চিত্ত ঈর্ষাকুল হইয়া উঠিতে পারে, কিংবা জীবনের মানদণ্ডে একদিকে যত বেশী দুঃখের বোঝা চাপান যায়, আর একদিকে মুক্তির স্বর্গ তত বেশী নিকটবর্ত্তী হইতে পারে, কিন্তু নিখিল বিশ্ব যদি বুদ্ধ বা খৃষ্টের সহনশীলতার আদর্শে গড়িয়া না উঠে, তাহাতেই বা দোষ দেওয়া যায় কিরূপে? শরৎচন্দ্র এ প্রশ্নই করেন—"স্বামী যখন শুদ্ধ একগাছা বেতের জোরে স্ত্রীর সমস্ত অধিকার কেড়ে নিয়ে তাকে অন্ধকার রাত্রে একাকী ঘরের বার কোরে দেন, তার পরেও বিবাহের বৈদিক মন্ত্রের জোরে স্ত্রীর কর্ত্তব্যের দায়িত্ব বজায় থাকে কিনা আমি সেই কথাই ত আপনার কাছে জান্‌তে চাহিছি।" (শ্রীকান্ত ২য়)

তিনি এখানেই নিবৃত্ত হন্ নাই, সমাজের নির্ম্মম বিধি ব্যবস্থার উপর উলঙ্গ আঘাতে তিনি একদিকে দুঃসাহসিক এবং অপর দিকে অটুট আত্মবিশ্বাসের পরিচয় দিয়াছেন সন্দেহ নাই। তিনি আরও বলেন—

"একদিন আমাকে দিয়ে বিয়ের মন্ত্র বলিয়ে নেওয়া হয়েছিল, সেই বলিয়ে নেওয়াটাই কি আমার জীবনে একমাত্র সত্য, আর সমস্তই একেবারে মিথ্যা? এত বড় অন্যায়, এত বড় নিষ্ঠুর অত্যাচার কিছুই একেবারে কিছু না! আর আমার পত্নীত্বের অধিকার নেই, মা হবার অধিকার নেই, সমাজ, সংসার, আনন্দ কিছুতেই আর আমার কিছুমাত্র অধিকার নেই? একজন নির্দ্দয় মিথ্যাবাদী কদাচারী স্বামী বিনাদোষে তার স্ত্রীকে তাড়িয়ে দিল বলেই কি তার সমস্ত নারীত্ব ব্যর্থ পঙ্গু হওয়া চাই? এই জন্যেই কি ভগবান্ মেয়ে মানুষ গড়ে তাকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন। সব জাতে সব ধর্ম্মেই এ অবিচারের প্রতিকার আছে,—আমি হিন্দুর ঘরে জন্মেছি বলেই কি আমার সকল দিক্ বন্ধ হয়ে গেছে?" (শ্রীকান্ত ২য়)

আর একস্থানে বলেন—"তাঁর ভালবাসা কিছুই আমার নিজের নয়, তবুও তাঁরই কাছে তাঁর একটা গণিকার মত পড়ে থাকাতেই কি আমার জীবন ফুলে ফুলে ভরে উঠে সার্থক হত ?...আর সেই নিষ্ফলতার দুঃখটাই সারা জীবন বয়ে বেড়ানই কি আমার নারী জন্মের সব চেয়ে বড় সাধনা ?"···"একটা রাত্রির বিবাহ অনুষ্ঠান যা—স্বামী-স্ত্রী উভয়ের কাছেই স্বপ্নের মত মিথ্যা হয়ে গেছে, তাকেই জোর ক'রে সারাজীবন সত্য বলে খাড়া রাখবার জন্যে এই এত বড় ভালবাসাটা একেবারে ব্যর্থ করে দেব। যে বিধাতা ভালবাসা দিয়েছেন তিনি কি তাতেই খুসী হবেন ?"

এ সমস্যাকে ইউরোপ কিংবা তৎপ্রভাবান্বিত দেশ যে ভাবে মীমাংসা করিতে চাহিয়াছে, তাহা ভাল কি মন্দ, এ প্রবন্ধ তাহার বিচার স্থল নহে তবে যেখানে ন্যায্য অধিকার এবং মর্য্যাদায় আঘাত লাগে সেখানে এ প্রশ্ন স্বাভাবিক এবং কোনও মতে অত্রি-পরাশরের বিধি ব্যবস্থার জোরে তাহাকে উড়াইয়া দিলেও চলিবে না। যথা-সময়ে অর্থাৎ দ্বাদশ বর্ষের মধ্যে কন্যার বিবাহ দিতে না পারিলে প্রাচীন হিন্দু সমাজে জাতিচ্যুত এবং নির্য্যাতিত হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে, অথচ কুলে, রূপে, অর্থে কতই না বিঘ্ন ! সমাজের নানাবিধ দুর্নীতির প্রতিই তিনি অঙ্গুলী-সঙ্কেত করিয়াছেন, তাঁহার তীক্ষ্ণ ও ব্যাপক দৃষ্টি কোনও অন্যায় অধর্ম্ম বা অসত্যকেই প্রশ্রয় দিতে চাহে নাই।

"যে সমাজ দুঃখীর দুঃখ বোঝে না, বিপদে সাহস দেয় না শুধু চোখ রাঙায় আর গলা চেপে ধরে, সে সমাজ আমার নয়।···আজ আমার বিয়ে দিয়ে কাল যদি বিধবা হয়ে ঘরে ফিরে আসি, তা হলে ত জাত যাবে না।"

(পরিণীতা)

"ওরে পোড়া সমাজ, তুই কুলশীল স্বভাব চরিত্র কিছুই যদি দেখবিনে, মেয়ে শুধু কালো বলেই ঘরে ঠাঁই দিবিনে, তবে সে মেয়ের বিয়ে না হলেই বা বাপ মাকে দণ্ড দিবি কেন ?"

(অরক্ষণীয়া)

"এই যে কুলের মর্য্যাদা এ যে কত বড় পাপ, কত বড় ফাঁকির বোঝা ; এ যদি টের পেতে ত নিজের মেয়েটাকে এমন করে বলি দিতে পারতে না" (বামুনের মেয়ে] বিবাহের কঠোর বিধি ব্যবস্থায় কোনও পথ খুঁজিয়া না পাইয়া কত বালিকাকে যে সামাজিক যুপকাষ্ঠে বলি দিতে হয় তাহার সুপরিস্ফুট চিত্র আঁকিয়াছেন তিনি শ্রীকান্তে (১ম পর্ব্ব) "দিদি রাজপুরে যাবার জন্য দিন রাত কাঁদত ও খেত না, শুতনা, তাই তার চুল আড়ায় বেঁধে তাকে সারাদিন রাত দাঁড় করিয়ে রেখেছিল। তাই দিদি গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে।"······"তোমাকে কি মারধর করে ?" "এই দেখনা", বলিয়া মেয়েটী বাহুতে পিঠের উপর, গালের উপর দাগ দেখাইয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল—"আমি দিদির মত গলায় দড়ি দিয়ে মরব।" শরৎচন্দ্র বলেন—"যে সমাজ এই দুটি নিরুপায় ক্ষুদ্র বালিকার জন্যও স্থান করিয়া দিতে পারে নাই, যে সমাজ আপনাকে এতটুকু প্রসারিত করিবার শক্তি রাখেনা, সেই পঙ্গু আড়ষ্ট সমাজের জন্য মনের মধ্যে কিছুমাত্র গৌরব অনুভব করিতে পারিলাম না—"

ঈশ্বর বা এই বিরাট সৃষ্টির অদৃষ্ট নিয়ন্তার অস্তিত্বে তিনি আস্থাশীল—"এত বড় দুনিয়াটা চোখের উপর রেখেও অনেকে ঈশ্বরের প্রমাণ খুঁজে পায়না—(চরিত্রহীন) কিন্তু নৃশংসতা বা অন্তরের দৈন্যকে কোন দিনই তিনি হিন্দুরই হউক বা আর কোনও জাতিরই হউক 'ধর্ম্ম' আখ্যা দিতে পারেন নাই, ইহাকে কবির ভাষায় বলিতে গেলে—

"দেখিবে কর্ত্তব্য যাহা জ্ঞানের আলোকে
সেই ধর্ম্ম সেই পথ চল সেই পথে (রৈবতক)

আধুনিক সাহিত্য

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মিত্র এম-এ

(Abrass hut in no man's land ও Mata Hari)

A brass hut in no man's land গত মহাযুদ্ধের বিবিধ তত্ত্বপূর্ণ একখানি গ্রন্থ। ইহার রচয়িতা একজন ইংরাজ সেনানায়ক। যাঁহারা All quiet on the western front পড়িয়াছেন, তাঁহাদিগকে এই পুস্তকখানি পড়িবার জন্য অনুরোধ করিতেছি। All quietএর লেখক একজন জার্ম্মান। তিনি দেখাইয়াছেন যে, জর্ম্মান সৈন্যগণ কেন রণস্থলে মিত্রশক্তিগণের নিকট বিধ্বস্ত হইয়া গেল। তাহাদের দর্প, কৌশল ও বীর্য্য শত্রুগণের অপেক্ষা বহু অংশেই শ্রেষ্ঠ ছিল, তত্রাচ তাহারা নতজানু হইয়া শির নত করিতে বাধ্য হয়, তাহার প্রধান কারণই এই যে জর্ম্মান সেনানায়কগণ তাঁহাদের অধীনস্থ সৈন্যগণকে অনেকটা মেসিন রূপেই ব্যবহার করিয়াছিলেন। সাধারণ সৈন্যগণকে তাহাদের স্ত্রী-পুত্রগণের নিকট হইতে ছিন্ন করিয়া লইয়া, সর্ব্বপ্রকার বিপদের মুখে তাহাদিগকে ঠেলিয়া দেওয়া হয়। ইউরোপের সভ্যদেশ সমূহের জনসধারণ শৈশবকাল হইতেই নানা প্রকার বিলাস বিভবে অভ্যস্ত। এই বিলাস ব্যসন চ্যুত হইলে তাহারা তাহাদের কর্ম্ম-প্রবণতা হারাইয়া ফেলে। জার্ম্মান সৈন্যগণের খাদ্য ভুষি মিশ্রিত আটার পাউরুটীতে পরিণত হয়। যে জাতি রমণী সাহচর্য্য লাভ করিতে সর্ব্বদাই অভ্যস্ত তাহাদিগকে সকল প্রকার রমণী সহবাস হইতে বঞ্চিত করা হয়। জার্ম্মান সৈন্যগণ তিনটী ফরাসী রমণীর সন্ধান পাইয়া কিরূপ ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে, All Quiet লেখক তাঁহার নিপুণ-লেখনী সাহায্যে বিশেষ ভাবে তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন। ট্রেণচের দুঃসহ জীবন বৎসরের পর বৎসর অতীত হইলে তাহাদের ভীষণ বিভিষিকা সৃজন করিতে থাকে।

A bras hut লেখক তাঁহার পুস্তকে ঠিক বিপরীত দিকটী, দেখাইয়াছেন। একজন ইংরাজ যুবক সাধারণ সৈনিক হইয়া সৈন্যদলে প্রবেশ করিলেই, তাহার আত্মীয় স্বজন, পরিচিত বা অপরিচিত সকলেই তাহাকে সহস্র ধন্যবাদে উৎফুল্লিত করিয়া তুলিত। তাহাকে যেখানে সৈন্যদলে ভর্ত্তি করা হইত সেইখান হইতে সমুদ্রতীরস্থিত বন্দর অবধি, তাহার গমন কালে পুরবাসীগণ তাহার মস্তকে পুষ্প বর্ষণ করিত। দেশের যাবৎ অনূঢ়া কন্যাই তাহার নিকট সহজলভ্য ছিল। ফ্রান্সে আসিলে সকল প্রকার বিলাস বস্তুই তাহার নিকট সুপ্রাপ্য হয়। যুদ্ধে গমন করিবার পূর্ব্বে যাবৎ ফরাসী দেশীয়া বালিকাই এই যুবকগণকে নানাপ্রকার আমোদ-প্রমোদে তাহাদের চিত্ত বিনোদন করিত। সমর ক্ষেত্রের মধ্যেও তাহারা তাহাদের প্রণয়িনীয়দের পত্র ও উপহার প্রাপ্ত হইত। একটী নির্দ্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হইলে কিছুকাল বিশ্রামের জন্য তাহাদিগকে বিপুল বিলাস-সম্ভারে সুসজ্জিত নগরী সমূহতে ছাড়িয়া দেওয়া হইত। মোট কথা যে সমস্ত বিলাস-ব্যসন ভোগ করিবার কথা বিশেষ বিত্তশালী না হইলে কল্পনায়ও আনিতে পারা যায় না, সেই সমস্ত সুখৈশ্বর্য্য, সাধারণ সৈনিকগণকে প্রদান করা হইত। এই জন্যই মিত্রশক্তিগণের সৈন্যগণ জীবন-পণ করিয়া যুদ্ধ-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে পারিয়াছিল।

Mati Hari, a courtesan and a spy যাঁহারা সিনেমা দেখেন তাঁহারা সকলেই মাতা হারির নাম শ্রবণ করিয়াছেন। এই পুস্তকখানি একজন আমেরিকান গোয়েন্দা কর্ত্তৃক লিখিত। পর্দ্দায় মাতাহারির যে জীবন-দৃশ্য দেখান হয় উহাতে বাস্তবের সহিত কল্পনার সমাবেশ করা হইয়াছে। বর্ত্তমান পুস্তকখানি কল্পনা-বর্জ্জিত সত্য তথ্যে পূর্ণ। ইংলণ্ডে যেমন Scotland yard বা ডিটেক্টিভদের প্রধান আড্ডা আছে, ফরাসী দেশে এইরূপ একটী প্রতিষ্ঠান আছে উহার নাম Second Bureau। লেখক এই উভয়স্থল হইতে মাতাহরির জীবনের অনেক জটিল তত্ত্ব সংগ্রহ করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়াছেন। মাতাহরি একজন হলাণ্ডবাসী। ভগবান তাঁহাকে প্রভূত

রূপ ও লাবণ্য প্রদান করিয়াছিলেন। এই অপূর্ব্ব সুন্দরী রমণী যৌবনে পদার্পণ করিলে একজন অফিসারের নেত্রপথে পতিত হন। এই অফিসারটীর বয়স তখন প্রায় চল্লিশ বৎসর। মাতাহরি' শুধুমাত্র সৈনিকের বীর-বেশ দেখিয়া মুগ্ধ হ'ন। কিন্তু বিবাহ হইবার পরই সৈনিকটীর উচ্ছৃঙ্খল জীবনের সংবাদ পাইয়া বিশেষ ব্যথিত হ'ন। এই সৈনিকটীর সহিত মাতাহরি জাভা ও তাহার সান্নিধ্যে আসিয়া বাস করেন। খুব সম্ভব এইখান হইতেই মাতাহরি ভারতীয় শিব-নৃত্য শিক্ষা করেন। দেশে প্রত্যাগমন করিবার পর স্বামীর সহিত ক্রমশঃই তাঁহার মনো-বিবাদ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এই সময়ে স্বামী তাঁহাকে নিরাশ্রয় অবস্থায় তাঁহার শিশু কন্যার সহিত পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলে মাতাহরি পারিসে যাইয়া নর্ত্তকী-জীবন গ্রহণ করিবার প্রয়াস পাইতে থাকেন। এই সংবাদে তাঁহার স্বামী তাঁহার আভিজাত্য গৌরবে কলঙ্ক পড়িবার ভয়ে, নর্ত্তকী জীবন ত্যাগ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিবার জন্য আদেশ প্রদান করিলে, মাতাহরি দুঃখিতা হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক একটী মঠে প্রবেশ করিয়া সন্ন্যাসিনী জীবন যাপন করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হ'ন। এখানে কয়েক বৎসর কাটিয়া গেলে মাতাহরি আবার পারিসে ফিরিয়া গিয়া স্বামীর নাম না লইয়া মাতা-হরি নাম গ্রহণ পূর্ব্বক পারিস রঙ্গমঞ্চগুলিতে ভারতীয় নৃত্যকলা প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করেন। অত্যল্প সময়ের মধ্যে তাঁহার সুযশ চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়ে। মাতাহরি বিপুল ঐশ্বর্য্যের সহিত প্রচুর সম্মান ও প্রতিপত্তি অর্জ্জন করেন। তাঁহার নাম ক্রমশঃ পশ্চিম ইউরোপের প্রত্যেক রাজধানীতেই সুপরিচিত হইয়া যায়। তাহার পর জার্ম্মান যুদ্ধকালে মাতাহরি জার্ম্মাণদের Spy হইয়া ইংরাজ ও ফরাসী সৈনিকগণের সর্ব্বনাশ সাধন করিতে থাকে।

এই বিশ্ব-বিখ্যাত নর্ত্তকী বড় বড় সেনানায়কগণকে তাঁহার হাব-ভাবে মুগ্ধ করিয়া অনেক গুপ্ত সমর কৌশল সংগ্রহ করিয়া জার্ম্মান শিবিরে প্রদান করিতেন। ইংলণ্ডের 'স্কটলাণ্ড ইয়ার্ডই' প্রথম এই রমণীর কুট অভিপ্রায় অবগত হইয়া ফ্রান্সের গোয়েন্দা বিভাগে খবর প্রদান করে। কিন্তু ফ্রান্সের Second Bureau প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়াও মাতাহরির ছল ধরিতে সমর্থ হয় না। মাতাহরি ফ্রান্সের বড় বড় সেনানায়কগণকে তাহার মায়ামন্ত্রে মুগ্ধ করিয়া নির্ভীক হৃদয়ে চলা-ফেরা করিতেন। গত মহাযুদ্ধের ইতিহাস যাঁহারা মনোযোগ সহকারে পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই জানেন যে মহা সমরে বিজয় লাভ করিবার জন্য সামরিক অস্ত্র-শস্ত্র ব্যতীত, প্রচার-বিভাগ এক মহা ব্রহ্মাস্ত্র ছিল। মাতা হরির জীবনী পাঠ করিলে দেখা যায় যে Spy system খুব কৌশলময় না হইলে যুদ্ধে বিজয়ী হওয়াও অসম্ভব হইত।

প্রত্যেক সেনাপতিই তাঁহার গুপ্তচরের নিকট হইতে শত্রুপক্ষের তাবৎ খবর সংগ্রহ করিয়া সৈন্য পরিচালনা করিতেন। মাতাহরি ফ্রান্সের একটী ভীষণ যুদ্ধে, মিত্র শক্তির তাবৎ তত্ত্ব জার্ম্মানগণের নিকট প্রেরণ করিলে, এই একমাত্র যুদ্ধে মিত্রশক্তিগণের ৫০,০০০ হাজার সৈনি-ককে প্রাণ হারাইতে হয়। যুদ্ধের শেষ ভাগে টাঙ্কের কথা রাষ্ট্র হইয়া পড়িলে, জর্ম্মানগণ ঐTank-এর স্বরূপ জানিবার জন্য মাতাহরিকে নিয়োগ করেন। মাতাহরি বহু চেষ্টা করিয়া উহার প্রকৃত তত্ত্ব জানিতে পারেন নাই কেননা তখন তাঁহার spy বলিয়া ভীষণ অখ্যাতি রটিয়া গিয়াছে।

নর-নারী উভয়েই গুপ্তচর দলে প্রবেশ করিতে পারিত। নারীগণকে এরোপ্লেন যোগে শূন্য হইতে কোন গুপ্ত প্রদেশে নামাইয়া দিয়া এরোপ্লেন উড়িয়া যাইত। তাহার পর শত্রু পক্ষের গুপ্ততত্ত্ব সংগ্রহ করিয়া নারীগণ সঙ্কেত অনুযায়ী স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলে তাহাদিগকে এরো-প্লেন যোগে উদ্ধার করিয়া লইয়া যাওয়া হইত। বিখ্যাত নর্ত্তকী বা সম্ভ্রান্ত বংশীয়া মহিলাগণ বিশেষ গুপ্তচর হিসাবে কার্য্য করিতেন, কেননা তাঁহাদের চলা-ফেরা সাধারণতঃ কোন প্রকার সন্দেহের কারণ হইত না। গুপ্তচরগণ কর্ত্তৃপক্ষের বিশ্বাস হারাইলে তাহাদিগকে শত্রু গণের হস্তে ধরাইয়া দেওয়া হইত। কখনও বা কোন গুপ্তচর বিশ্বাস-অর্জ্জন করিবার জন্য শত্রুপক্ষের একটী গুপ্ততত্ত্বের কথা প্রাকাশ করিয়া দিত। তখন সন্দেহ-ভাজন গুপ্তচরকে নির্দ্দিষ্ট সময়ে নির্দ্দিষ্ট স্থানে একান্ত অতর্কিত ভাবে প্রেরণ করিলে, শত্রুপক্ষ কর্ত্তৃক নিহত হইত।

মাতাহরি যখন Tankএর গুপ্ততত্ত্ব জানিবার জন্য বিশেষ ব্যস্ত, French বুরোঁর বিশ্বাস অর্জ্জন করিবার জন্য মাতাহরি আলজিরিয়ায় কোথায় জার্ম্মান সাব-মেরিণ তথাকার বিদ্রোহীদিগকে বন্দুক ও কামান যোগান দেয় তাহা বলিয়া দেন। সংবাদটী সত্য প্রতিপন্ন করিবার জন্য কতকগুলি অবিশ্বাস ভাজন জার্ম্মান গুপ্তচরকে এক-খানি সব-মেরিণে চড়াইয়া নির্দ্দিষ্ট স্থলে প্রেরণ করিলে, ফরাসী গোলায় তাহারা প্রাণত্যাগ করে।

এই সমস্ত গুপ্তচরগণকে যাহা মাহিনা দেওয়া হইত, তাহা খুবই সামান্য। জীবনকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া তাহারা বিপদকে বরণ করিয়া লইত অর্থের জন্য নহে, কতকটা স্বদেশ প্রীতির জন্য। এবং কতকটা শুধু নাম করিবার অভিলাষে। মাতাহরি হলাণ্ডবাসী হইয়া জার্ম্মানীর গুপ্তচর হইয়াছিলেন, তাহা শুধু অর্থের জন্য নহে, কেননা মাতাহরির যথেষ্টই অর্থ ছিল। শুনা যায় যে অনেক সময় মাতাহরি রাজপথের উপরস্থিত কোন জানালায় বসিয়া,মুঠা ভরিয়া টাকা রাস্তায় ছড়াইয়া দিতেন। ঐশ্বর্য্য তাঁহার বিপুল ছিল। ভালবাসা তাঁহার পায়ের ভৃত্য ছিল বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি করা হয়না কেননা ফ্রান্সের তাবৎ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, জার্ম্মান সেনানায়কগণ এমনকি জার্ম্মান যুবরাজ পর্য্যন্ত তাঁহার প্রেমাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। মাতাহরি কেন যে গুপ্তচর বৃত্তি অবলম্বন করিলেন এই বিষয় লইয়া গ্রন্থকার অনেক গবেষণা করিয়াছেন। তাঁহার মতে একপ্রকার নর-নারী দেখা যায় তাহারা শুধু নিত্য নূতন বিস্ময়কর কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতে ভালবাসেন। মাতাহরি এই শ্রেণী-রই একজন। ধনীর কন্যা হইলেও মাতাহরি পিতা-মাতার স্নেহ বিশেষরূপে প্রাপ্ত হন নাই। যৌবনে পিতৃস্থানীয় পতি লাভ করিয়া তাহার নিকট বিশেষ দুর্ব্যবহারই লাভ করেন। যৌবনের অন্তে অগণ্য প্রেম-প্রার্থী লাভ করিয়া মাতাহরি মানবহৃদয় লইয়া ছিনি-মিনি খেলিতে আরম্ভ করেন। সেনানায়কগণই তাঁহার প্রণয় পাত্র ছিল। মাতাহরিই স্পষ্টই বলিতেন যে সেনানায়কগণই তাঁহাকে বাল্যকাল হইতে বিশেষভাবে আকর্ষণ করিয়া আসিয়াছে। মাতাহরি সেনানীগণকে বিশেষভাবেই চিনিয়া লইয়াছিলেন। ইচ্ছা করিলে মাতাহরি কোন বিখ্যাত সেনানীকে বিবাহ করিয়া খুব ভদ্রভাবেই জীবন নির্ব্বাহ করিতে পারিতেন কিন্তু মাতা-হরির উচ্ছৃঙ্খল জীবন ইহা সহ্য করিতে পারে নাই।

মাতাহরির শিব-নৃত্য প্যারিসের জন-মণ্ডলীকে বিশেষ-ভাবে আকর্ষণ করিয়াছিল। মাতাহরি আপনাকে মালা-বার বাসী একজন ব্রাহ্মণ কন্যা বলিয়া অভিহিত করিতেন। তিনি তাঁহার মন্ত্রমুগ্ধ নায়কগণকে বলিতেন যে অতি শৈশবে মালাবারের কোন একটী শিব-মন্দিরে তাঁহার তথাকথিত পিতামাতাগণ তাঁহাকে দেবদাসী রূপে নিযুক্ত করিয়া দেন। মাতাহরিকে এখানে একেবারে উলঙ্গ অবস্থায় ধ্বংসের অবতার শিবের নিকট নৃত্য করিতে হইত। এখান হইতেই কোন ইংরাজ সেনানী তাঁহাকে মুক্তিদান করিয়া বিবাহ করেন। এই বিবাহের ফলে তাঁহার একটী পুত্র-সন্তান জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু হিংসাপরায়ণ মাদ্রাজী আয়া বিষ দানে তাঁহার শিশু-সন্তানের প্রাণ নাশ করে। পূর্ব্বোক্ত সমস্ত তত্ত্বটাই মাতাহরির কল্পনা প্রসূত। এইরূপ মোহ ও বিস্ময়জাল বিস্তার করিয়া, কল্পিত জীবনের রহস্যজাল দ্বারা মাতাহরি তাঁহার অতীত জীবনকে স্বপ্নময় ও কুহেলিকা-ময় করিয়া তুলিয়া একান্ত অতর্কিতভাবে প্রায় অর্দ্ধ নগ্নভাবে শিবনৃত্য সুরু করিয়া দিতেন। শিব মাতাহরির নিকট ছিলেন ধ্বংসের প্রতীক, সৃষ্টি ধ্বংস করিবার জন্য যত প্রকার পাপের বিকাশ করা প্রয়োজন, নৃত্যের লাস্যের মধ্য দিয়া তাহা ফুটাইয়া তুলিয়া মাতাহরি একান্ত তন্ময় ভাবে নাট্য-পিঠের মধ্যে ঢুলিয়া পড়িতেন।

সৌন্দর্য্যময়ী রমণী তাহার যৌবনঅন্তে যে মোহজাল বিস্তার করিয়াছিলেন, বিখ্যাত সুন্দরীগণের ঐতিহাসিক তত্ত্বও তাহার নিকট হীনপ্রভ হয়। নর্ত্তকীর বিলাস-ইঙ্গিতে সম্ভ্রান্ত রাজ কর্ম্মচারীগণও কিরূপ কাম-বিচলিত হইতেন মাতাহরির বর্ত্তমান জীবনীতে গ্রন্থকার তাহা বেশ দেখাইয়াছেন।

রায়চৌধুরী শ্রীরবীন্দ্রনাথের শিল্প-প্রতিভা পরিচিতি

শ্রীপ্রভবদেব মুখোপাধ্যায় এম্‌-এ

আলোকচিত্র-শিল্প যাদুবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত নয়। কিন্তু, শিল্পীর শক্তি যখন সৃজনলীলায় মেতে ওঠে, তার প্রকাশ তখন যাদুকরের প্রভাবকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। প্রকৃত-পক্ষে, হাতের কৌশল বা কলের কারসাজি হোতেই শিল্পের সৃষ্টি। তার সঙ্গে যদি মস্তিষ্কের যোগ থাকে, তাহলে অসম্ভবে সম্ভবত্ব জেগে ওঠে, অকল্পিত এসে শোভা ধরে বাস্তবের অন্তরে।

আলোকচিত্র-শিল্পকে এতকাল আমরা এই বোলে জানতাম :--আরে, এও আবার একটা বিদ্যা নাকি!—মূর্খের সময় হরণের উপায় বোলে এই অবিদ্যাকে বাঙ্গালী হেলায় দূরে ঠেলে রেখে-ছিলো। পরের দেশে যখন অবিদ্যার বিদ্যার গরীমায় গরীয়সী হোয়ে লক্ষ্মীর কোলে স্থান পেলো, তখন আমাদের দৃষ্টি উঠ্‌লো জেগে এবং ফলে, আলোক-চিত্র শিল্পকে বিদ্যার বিষয়ীভূত কোরে তার অনুশীলনে যাঁরা ব্যাপৃত হোলেন, রায়চৌধুরী শ্রীরবীন্দ্রনাথ তাঁদের অন্যতম অগ্রণী।

চিত্রে ছায়ার ছাপকে এই তরুণ শিল্পী কত কৌশলেই না বিকশিত কোরেছেন এবং তাঁর শিল্পপ্রতিভা যে কত বিচিত্র মৌলিক উপায় অবলম্বন কোরে চিত্রের সৃজন কোরেছে, শিল্পী ও সাধারণের কাছে তা বিস্ময়ের বস্তু, প্রকৃতই উপভোগের উপকরণ।

করে, মুগ্ধ করে। এই ছবিটি পূর্ব্বে কলিকাতার "Statesman" ও বোম্বাইর "Weekly of India" পত্রিকায় প্রকাশিত ও উচ্চ প্রশংসিত হয়। এই উপায়ে চিত্রিত

আক্ষরিক লিপি যন্ত্রের (Typewriting Machine) সাহায্যে, অর্থাৎ, তুলির বা অন্য কোনও বাহ্যিক সাহায্য ব্যাতিরেকে কেবল যন্ত্রের অক্ষর সমূহের নিপুণ ব্যবহারে তিনি দিল্লীর সুবিখ্যাত কুতুবমিনারের চিত্রকে অঙ্কিত কোরেছেন, এবং এই অঙ্কনের অন্তরে এমন একটি সহজ সুসঙ্গতি বিরাজমান, যা সকল দৃষ্টিকেই অনায়াসে আকর্ষণ

আর একটি ছবি আমেরিকার Remington magazine পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

কেশবিন্যাসের সাধারণ ব্যবহার্য্য বুরুশের চুলের কুচি-গুলি (Hairbrush Bristles) একখণ্ড সমতল কাঠের উপর সংস্পৃষ্ট কোরে শিল্পী কল্পিত বৃদ্ধের যে চিত্র অঙ্কিত কোরেছেন, তার ভিতরে তাঁর প্রতিভা ও মৌলিকতা

প্রতীয়মান। এই চিত্র রচনায় তাঁর অদ্ভুত ধৈর্য্য ও বুদ্ধির পরিচয় পাই। একদিকে, সহজ ও সাধারণ ন তাঁর অন্তরে প্রেরণার সৃষ্টি করে, অন্যদিকে তাহারাই নি চিত্রাঙ্কনের ব্যবহার্য্য বস্তুরূপে তাঁর শক্তির নিকট দেয়। এই অদ্ভুত চিত্রটি বোম্বাইএর বিখ্যাত সাহিক—"The Illustrated Weekly of India"তে প্রকাশিত হয়। সম্পাদক মহাশয় এই চিত্রটি সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্যে বলেন ;—"An unique portraiture······

ever Indian Artist's Medium······From the frowns of the old man down to every scratch in the sketch are all cut bristles which we must say have been very skillfuly placed and the picture possesses a real artistic softness and finish......"

ক্যামেরার (camera) সম্মুখস্থ বৃত্তাকার কাচখণ্ড (Lens) ভেদ করে যন্ত্রের সুড়ঙ্গপথে যে আলোছায়া প্রবেশ লাভ করে চিত্র রচনায় সুযোগ দেয়, তাকে আয়ত্ত করে তিনি আলোক চিত্রাঙ্কনে যে মায়ার সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন, বহু প্রশংশিত "ওমার খৈয়াম ও সাকী"র চিত্রটী তার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। "নাচঘরের" সুযোগ্য সম্পাদক মহাশয় বলেন ;—"······ইংরাজীতে বলে ক্যেমেরা কখনো মিথ্যে কথা বলে না। কিন্তু ক্যেমেরা যে কত বড় মিথ্যাবাদী হোতে পারে এবং তার মিথ্যাবাদীতার সাহায্যে কি সুন্দর এক নূতন আর্ট সৃষ্টি করা যায়

সন্তোষের দ্বিতীয় কুমার শ্রীযুক্ত রবীনের চিত্রে তার প্রমাণ পেলাম……। এই ছবিগুলি ভারতের ও বিলাতের নানান্ বিখ্যাত পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হোয়েছে এবং বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে উচ্চ প্রশংসা ও পুরস্কার লাভ মূর্ত্ত কোরেছেন, তাকে আমরা লাভ কোরেছি কল্পলোকাধিপ ষড়ভুজ কোন বিগ্রহের চিত্রে। সাধারণ হোয়েছে এ চিত্রে অসাধারণ, রূপ এখানে ধীর প্রশান্তির স্পর্শে হোয়েছে অপরূপ। রুচি, সঙ্গতি এবং কৌশলের একত্র

করেছে।" এই চিত্রে "ওমার খৈয়াম, সাকী"ও আলোকচিত্রকররূপে রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রতিভার অন্তরে যে সুপ্ত-শিল্পীকে গুপ্ত রেখেছেন তাকে আমরা অভিনেতারূপেও দেখতে পাই।

আলোছায়ার মায়ার খেলায় শিল্পী যে অভিনবত্বকে মিলনে যে অভিনব মৌলিকতা বিকাশ লাভ কোরেছে তাই দিয়ে একজন আলোকচিত্রকর ও শিল্পীরূপে তাঁর প্রতিষ্ঠা চিরস্থায়ী হবে সন্দেহ নাই। এই ছবিখানি যখন একটি Trick-Photographs Competitionএ প্রথম পুরস্কার (First prize) লাভ করে "weekly of

India" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, বিশ্বের বরেণ্য কবিগুরু শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রকাশিত চিত্রটি দেখে শিল্পীকে নিম্নোদ্ধৃত পত্রটি লেখেন :—

শান্তিনিকেতন।

কল্যাণীয়েষু,

টাইম্‌স্ অফ্ ইণ্ডিয়াতে তোমার ফোটোগ্রাফিনৈপুণ্যের পরিচয় পেয়ে বিস্মিত হোয়েছি। কোনো এক অবকাশে তোমার সঙ্গেও আমার পরিচয় হবে আশা রইলো। আমার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করো।

ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী

স্বাক্ষর—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শান্তিনিকেতনে জন্মোৎসবের পর দার্জ্জিলিং শৈলাবাসের অবকাশেই কবিগুরুর সঙ্গে তরুণ শিল্পী রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটে। উভয়ের আলাপকালীন কথাপ্রসঙ্গে আলোক চিত্র ও ছায়াচিত্রাদি শিল্প বিষয়ে কবিগুরু যে আলোচনা করেন শিল্পী রবীন্দ্রনাথ তা তাঁর রোজনামচায় লিখে রেখেছেন।

রায়চৌধুরী রবীন্দ্রনাথ নিজ আবাসের নির্জ্জন পরিবেষ্টনীর মাঝখানে স্বাধীনভাবে একা শিল্পসাধনায় এতকাল নিরত থেকে আজ কবিগুরুর আশীর্ব্বাদ জয় কোরেছেন। সেই আশীর্ব্বাদ হোতে প্রেরণার শত কণা পুষ্পবৃষ্টির মত শিল্পীর শিরে বর্ষিত হয়ে তাঁকে অভিনব সৃষ্টির রাজ্যে চির জাগরুক রাখুক।

—

দগ্ধ কাব্য

—গল্প—

শ্রীনকুড়চন্দ্র মিত্র বি-এ

একে—চন্দ্র

রেখা অনেক মেয়ের সঙ্গে মিশিয়াছে, কিন্তু সুনৃতাকে তাহার যেমন ভাল লাগে, এমন আর কাহাকেও নয়। বাঙালী ঘরের চির-নির্য্যাতিত, দলিত-পিষ্ট স্ত্রীলোকদের মধ্যে যে একটা জাগরণের সাড়া আসিয়াছে, তাহাতে সুনৃতা যতটা জাগিয়াছে, এমন আর কোন মেয়ে নয়—অন্ততঃ রেখার জ্ঞানে। মুখে অমন অনেকেই সাম্য স্বাধীনতার কথা বলে, কিন্তু আসলে তাহারা সেঁতসেঁতে অন্তঃপুরের যে মিন্‌মিনে বাঙালী-মেয়ে, সেই বাঙালী-মেয়ে!

এই যে বিশ্ববিদ্যালয়ের নব-নির্দ্ধারিত ম্যাট্রিক্ সিলেবাস—এই যে মেয়ে-পুরুষের মধ্যে শিক্ষা-বৈষম্য, এটা স্ত্রীলোকদের উপর কত বড় একটা অবিচার—অপমান! সুনৃতা ইহার বিরুদ্ধে যতটা অগ্নি-মুখী হইয়া তর্ক-বিতর্ক করে, এমন করিতে পারে কোন মেয়ে?

গানে, কবিতা রচনায়, আবৃত্তিতে, মাসিকে গল্প-লেখায় সুনৃতা সিদ্ধহস্ত। গলাটা তাহার তেমন মিষ্ট না হইলেও গান জিনিষটা সে বুঝে। কবিতায় এখনও তেমন হাত পাকিয়া না উঠিলেও, অন্যের কবিতার রস-বোধ তাহার আছে। রেখার গানের উৎস—কবিতার প্রেরণা, এই সুনৃতা!

দুই সখীতে মিলিয়া কাব্য রচনা করে—অতি-আধুনিক বাংলা কথা-সাহিত্যের মধ্যে এখনও কোথায় পুরাতনী' ঢঙ্‌ বজায় আছে, তাহার বিচার করে—'সাহিত্যে দুর্নীতি বলিয়া যে একটা নূতন কথা উঠিয়াছে, তাহা লইয়া হাস্যপরিহাস করিয়া বলে, এমন অ-সাহিত্যিক কথা তাহারা জনমেও আর শুনে নাই—ভাবের স্বাভাবিক, আবিবৃত অভিব্যক্তিই হইল সাহিত্য—সাহিত্যের আবার গাঁই গোত্র কি, ধর্ম্মনীতি কি—সসীম সংসার ও সমাজে সাহিত্য, সঙ্গীত বা স্থাপত্য অসীমের বারতা লইয়াই ভূমণ্ডলে নামিয়াছে—তাহাদের ন্যায়-নীতি—লোকাচারের গণ্ডীর মধ্যে শৃঙ্খলিত করিতে গিয়া মানুষ কেবল আপনাদেরই ক্ষুদ্রত্বের পরিচয় দেয়।

আজকালকার পুরুষমানুষগুলার আচরণে তাহারা অবাক! তাহারা লক্ষ্য করে, ইদানিং উহাদের মধ্যে রস-মাধুর্য্যের সাধনাটা যেন দিনই কমিয়া যাইতেছে এবং তৎপরিবর্ত্তে কোথা হইতে একটা প্রবল অর্থনৈতিক উপসর্গ আসিয়া জুটিতেছে! বিদ্যাচর্চ্চার আর তেমন আদর নাই—ঝোঁক কেবল অর্থ-রোজগারের দিকে। টাকা, আর টাকা! টাকা রোজগার করিতে না পারিলে জীবন ব্যর্থ হইল ভাবে—উপার্জ্জনক্ষম হোক, ক্ষতি নাই,—কিন্তু 'টাকা' 'টাকা' করিয়া প্রাণটাকে মাড়োয়ারী করিয়া তুলিলে, এই বাংলার জল, বায়ু ও মাটিতে তাহারা টিকিবে কয়দিন? নিছক অর্থ-নৈতিক আদর্শ লইয়া মানুষ বাঁচিতে পারে কিরূপে? এ আর কিছু নয়—এটা পুরুষগুলার মধ্যে গভীর ভাব-দারিদ্র্য, রস-সৌন্দর্য্য-বোধের একান্ত শক্তিহীনতা!

কথায়-কথায় নিজেদের কবি জীবনের শেষ বাস্তব পরিণতির কথাটাও যে না উঠিয়া পড়ে এমন নয়! তাহাদের ভাব-লোকের কোন্ রাজাধিরাজ কবে আসিয়া তাহদের জীবনের কাব্যোৎসকে পূর্ণাঙ্গ করিয়া তুলিবে, একথা তাহাদের মনের কোণে দরজার ফাঁক দিয়া কুল-বধূর মত মাঝে মাঝে উঁকি ত দেয়ই—নানাবিধ রস-সাহিত্য আলোচনার মধ্যেও কথাটা না আসিয়া পড়িয়া পারে না। রেখা বলে, "সুনৃতা, মনের মানুষ কোনদিন পাই তবেই বিবাহ, নইলে"—সুনৃতা, বলে "নইলে, তোর আর আমার সমানই অবস্থা"।

দু'য়ে—পক্ষ

ফু'ল ফু'টিল—দু'ই সখীরই বিবাহ হইয়া গেল। রেখাদের অপেক্ষা সুনৃতাদের অবস্থা ঢের ভাল—তাই ভাল ঘরে পড়িল। রেখার মা-বাপ গরীব বলিয়া রেখাকে একটি দরিদ্র সংসারে পড়িতে হইল।

হোক্ দরিদ্র—রেখার স্বামী সুনৃতার স্বামী অপেক্ষা অধিক লেখাপড়া জানে; সমর বি, এ, অবধি পড়িয়াছে—অবিনাশ এম, এ, পাশ।

বিবাহের পর প্রথম স্বামীগৃহ করিতে আসিয়া রেখা তাহার পরিপার্শ্বিক আব-হাওয়া দেখিয়া স্বভাবতঃই বড় চঞ্চল হইয়া উঠিল। দরিদ্রের ঘর দুয়ার—দরিদ্রের সংসার! কিন্তু, উৎসাহে বুক বাঁধিয়া সে এই দরিদ্র কুটীরকেই আপনার কাব্য-ভুবন করিয়া তুলিবে, এইরূপ সঙ্কল্প করিল। এইখানেই সে তাহার আবাল্যের কাব্যসাধনাকে জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে জাগাইয়া তুলিয়া জীবনে সার্থকতা আনয়ন করিবে।

প্রথমেই রেখা তাহার নিজের ঘরখানিকে শৃঙ্খলা ও কলা-কৌশলের সহিত সাজাইল গুছাইল—যাহা দেখিয়া অবিনাশ একদিন মুগ্ধ হইয়া গিয়া বলিল, চমৎকার! কিন্তু পরদিন সকালে অফিসে বাহির হইবার সময় যখন তাহার হাতে কয়েকখানি আসবাব ও ছবি ক্রয়ের ফর্দ্দ আসিয়া পড়িল তখন তাহার মুখ শুকাইয়া গেল। রেখা জিদ করিয়া ধরিল, "এগুলো না হ'লে আমার কিছুতেই চলবে না—ঘরে আমার মন বসবে না!" অবিনাশ 'তাইত' করিয়া অবশেষে রাজী হইয়া গেল—পত্নীর এই প্রথম অনুরোধ সে আর এড়াইতে পারিল না। অফিস হইতে টাকা ধার করিয়া অবিনাশ আসবাব পত্রাদি ক্রয় করিয়া আনিয়া রেখার মুখে হাসি ফুটাইল।

সন্ধ্যার সময় ফু'ল না হইলে এবং সেই ফু'লের মালা গাঁথিয়া স্বামীর গলায় না পরাইয়া দিলে রেখার সন্ধ্যাটা বৃথায় যায়—অবিনাশ একটা গলিপথের ফু'ল-ওয়ালাকে নিযুক্ত করিল, সে প্রত্যহ ফু'ল দিয়া যাইত।

বসন-ভূষণ ও অঙ্গসৌষ্ঠবের সাধ রেখার আজিকার নয়—বিবাহের পূর্ব্ব হইতেই। কাজেই ইহার জন্ম অবিনাশকে আর আলাহিদা অনুরোধ করিতে হইল না।

অবিনাশ ভাবিল, প্রথম বিবাহিত জীবনে পত্নীর আদর আবদার একটু সহিতেই হয়—এ নেশা আর কয়দিন?

সুসজ্জিত কক্ষে সুসজ্জিত-বসনে জানালার পার্শ্বে ইজি-চেয়ারখানায় শিথিল দেহ এলাইয়া দিয়া রেখা গলির ফাঁক দিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া দিন রাত কি ভাবে, আর মাঝে মাঝে একটা বাঁধান খাতায় পেন্সিল দিয়া কি লেখে। দূরে বিছানার উপর পড়িয়া অবিনাশ ডাকে, "রেখা উঠে এস—কাছে এস, দু'টো কথা কও, কি যে দিন রাত লেখ"! রেখা ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া অবিনাশের গায়ের উপর খাতাখানা ছুড়িয়া দিয়া বলে, "পড়েই দেখনা—কি লিখ্‌ছি"! অবিনাশ কবিতার ছত্র কয়টির উপর চক্ষু বুলাইয়া, তাচ্ছিল্যের সহিত হঠাৎ খাতাখানা মুড়িয়া ফেলিয়া বলে, মাথা আর মুণ্ড! অক্ষরে অক্ষরে মিল হলেই যদি কবিতা হ'ত তাহ'লে ছাত্রজীবনে আমিও একজন মস্ত কবি ছিলাম একথা স্বীকার করতে হবে"। ইচ্ছা করিয়া অবিনাশ কথাটা রূঢ় করিয়া বলে—কারণ রেখার ব্যাপারে সে যেন অতিষ্ঠ! স্বামীর নিকট হইতে এইরূপ নির্ম্মম সমালোচনা শুনিয়া রেখার সর্ব্বাঙ্গ জ্বালা করিয়া উঠে। হইত সুনৃতা—এ লেখার কদর বুঝিত! হৃদয়হীন দারিদ্র্য-ক্লিষ্ট পুরুষের সাধ্য কি যে এ কবিতার মর্ম্ম বুঝে! কিন্তু এখানেই রেখার চিন্তা নিঃশেষিত হয়না। গুম্‌রাইতে গুম্‌রাইতে সে এমন এক স্থানে গিয়া পড়ে যেখানে গিয়া সে নিজের ভাগ্যকে ধিকার দিয়া মনে মনে বলে—হায়, এমনও অরসিক স্বামীর হাতেও সে পড়িয়াছিল! এ হেন পাষাণ মূর্ত্তিকে লইয়া তাহার কাব্যোৎসব! দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া রেখা চেয়ার হইতে উঠিয়া ঘরের বাহিরে চলিয়া যায়।

অবিনাশ দরিদ্রের ছেলে। অল্প বয়সে তাহার বাপ মারা যায়। মাথায় মোট করিয়া সে সংসার করিতে শিখিয়াছে। কোনদিন তাহার বেশের পরিপাট্য নাই। জুতার অবস্থা দেখিয়া ছাতা কাঁদে, ছাতার অবস্থা দেখিয়া জুতা কাঁদে! সপ্তাহে দুই দিনের অধিক ক্ষৌর কার্য্য করে না। টেরি কাটে বিস্তৃতভাবে—কিন্তু

মাথার চুলগুলাকে কোনবারেই ভদ্র করিয়া ছঁ'টে না। কথাবার্ত্তা বড়ই অগোছালো। হাসে উৎকট আন্তরিকতার সহিত!

রেখা বুঝিয়া দেখিল, এমন শুষ্ক কাষ্ঠকে লইয়া তাহার দিন চলিবে না। প্রথমটা সে স্বামীকে আপনার মন-মত করিয়া তুলিবার বহু প্রয়াস পাইল। কিন্তু দেখিল, স্বামী তাহার বনিয়াদি চাল গুলার একটিকেও ছাড়িতে প্রস্তুত নন। সে তখন স্বামীর সহিত সমস্ত সম্পর্ক ঘুচাইয়া দিয়া আপনার কবিতা ও ভাব-জগত লইয়াই পড়িল!

তিনে—নেত্র

কবিতা-রচনার মধ্য দিয়া রেখা পূর্ব্বরাগ, মিলন ও বিরহের সুখ ও দুঃখ উভয়ই উপভোগ করে। কবিতা রচনার মধ্য দিয়া আপনার সংসার সৃষ্টি করে! কবিতা রচনার মধ্য দিয়া সাংসারিক সফলতা-বিফলতার জন্য কখন হাসে, কখন কাঁদে! কবিতার কল্প-লোকে তাহার মানস স্বামী ও মানস পুত্রকন্যাগুলিকে লইয়া বড় আনন্দেই তাহার দিন কাটে!

এই সময়ে একবার সুনৃতা তাহাকে যে একখানি পত্র দেয় তাহার উত্তরে সে একস্থানে লেখে—"সুনৃতা তোর বিবাহিত জীবন সফল হওয়ায় তুই আপনাকে যেমন সুখী ব'লে মনে কচ্ছিস্, জানিস্ আমার বিবাহিত জীবন ব্যর্থ হওয়ায় আমি তেমনই সুখী—কি তার বাইরেও! আমার আজীবনের কাব্য-সাধনা আজ যথার্থই অর্থ-পূর্ণ হয়েছে—আমার তপস্যা সার্থক হ'য়েছে!"

কিন্তু……মাটীর পৃথিবী! এখানে কল্পলোক রচনা করিয়া মানুষের আর কয় দিন চলে? বিবাহের প্রথম একটা বৎসর এক রকমে কাটিয়া গেল—কিন্তু রেখাকে লইয়া অবিনাশ ক্রমেই বড় বিব্রত হইয়া পড়িল। অবিনাশ একদিন রেখার মেজাজ বুঝিয়া তাহার নিকটে আসিয়া ধীরভাবে কহিল,—"রেখা, সংসারের দিকে আর ত তোমার উদাসীন্ থাকলে চলবে না—এবার লেখাপড়া একটু কমাও।" রেখা নয়ন কুঁচকিয়া বলিল,—"সংসার যেমন চলচে তেমনই চলুক না—আমি ত আর তার' পথে বাধা হ'য়ে দাঁড়াই নি। আমি আমার কবিতার নক্ষত্র-লোকে বাস কর্‌চি—সংসারের সঙ্গে আমার কি সম্বন্ধ!" কণ্ঠস্বর আর একটু স্পষ্ট করিয়া অবিনাশ বলিল,—"দেখ, ওসব ভাবুকতা ছাড়—আমি কি তোমায় পড়াশোনা করতে বারণ কর্‌চি? কেবল বল্‌চি, দরিদ্র ঘরে ওসব শোভা পায় না—মা বুড়োমানুষ, কদ্দিন আর সংসারে খাটবেন? আমারও চাকরি বাকরির স্থিরতা কিছুই নেই। কবিতা-ফবিতা ওসব বড় মানুষদের—তোমার আমার জন্য নয়।" নত বেত্রকে হঠাৎ ছাড়িয়া দিলে তাহা যেমন শূন্যে খাড়া হইয়া উঠে, রেখা ঠিক তেমনি ভাবে চেয়ার হইতে ক্ষিপ্রভাবে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "সংসারের হীন, তুচ্ছ কাজ আমার দ্বারা হবে না। তোমার সংসারের দাসীবৃত্তি করবার জন্য তোমায় আমি বিবাহ করিনি—আমার কাব্য সাধনার উপাদান রূপেই তোমায় বিবাহ করেছিলাম।—কিন্তু পরে বুঝেছি, তুমি আমার কাব্যের অতি অযোগ্য উপাদান! তোমার সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ আর নেই, জেনো।" বলিয়া রেখা দুম দুম্ করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

অবিনাশ সেইখানে নীরবে দাঁড়াইয়া কত কি ভাবিতে লাগিল। হঠাৎ একবার শিহরিয়া উঠিল—রেখা বিকৃত-মস্তিষ্কা নয় ত!

চতুঃ—র্ব্বেদ

জীবনে যখন আর শান্তির লেশমাত্র অবশিষ্ট রহিল না, তখন অবিনাশ হঠাৎ একদিন গৃহত্যাগ করিয়া কোথায় চলিয়া গেল। দুই সপ্তাহ তাহার আর কোন খোঁজ পাওয়া গেল না। পক্ষকাল পরে মাকে পত্র লিখিয়া জানাইল—সে মুঙ্গেরে আসিয়া স্কুলমাষ্টারি করিতেছে—বড় শান্তিতে আছে—এখন আর বাড়ী ফি'রবে না—পূর্ব্বের ব্যবস্থামত সংসারের যাবতীয় খরচই সে মাসে মাসে পৌঁছাইয়া দিবে—কাহারও সুখস্বচ্ছন্দে এতটুকু ঘা দিবে না।

মুঙ্গেরে গিয়াছে—যাক! শান্তিতে আছে—আচ্ছা, থাকুক! আর মুঙ্গেরে যাক বা না যাক, শান্তিতে থাকুক বা নাই থাকুক, তাহাতে রেখার কি যায় আসে! রেখার অন্তর যাহাকে আপনার বলিয়া স্বীকার করে না, তাহার সহিত আর কি সম্বন্ধ! দুই সপ্তাহের পর রেখা আবার

তাহার কবিতার খাতাখানা হাতে লইয়া ইজিচেয়ারে ঢলিয়া পড়িল এবং আপনার ভাব-জগতে প্রবেশ করিল।

রেখা কবিতা লেখে—আজকাল তাহার কবিতা যেন প্রস্রবণের মত আপনিই উৎসারিত হইয়া আসে। রেখা নিজেই আশ্চর্য্য হইয়া যায়! সুনৃতাকে মাঝে মাঝে আপনার রচিত কবিতা পাঠাইয়া দেয়—সুনৃতা উত্তরে পূর্ব্বের মত আর কোন কবিতা লেখে না, কেবল লেখে—"আমার কবিতার উৎস-ধারা কোথায় যেন নিজেকে হারায়ে ফেলেছে—তাই আর আমার কবিতা বের হয় না; কিন্তু তোমার কবিতা আজকাল বড় সুন্দর হচ্চে—ওগুলোকে তুমি মাসিকে পাঠিও—সম্পাদক মশায় আদর ক'রেই ছাপাবেন।"

রেখা মাসিকে কবিতা লিখিতে সুরু করিল। অল্প-দিনেই তাহার সুনাম হইল। এই সুনামের নেশা রেখাকে পাইয়া বসিল।

কিন্তু, হঠাৎ কবিতা লেখায় রেখার কেমন অরুচি জন্মিল। কবিতা লিখিতে বা পড়িতে তাহার যেন আর ভাল লাগে না। শত চেষ্টাতেও সে একছত্র কবিতাও লিখিতে পারে না। দিন আর কাটে না। কেবল ভাবনা---আর ভাবনা। কিসের ভাবনা? কবিতার ভাবনা নয়। এলোমেলো নানা ভাবনা! গ্রন্থে বা মাসিকে, অন্যের কবিতা পড়িতে গেলে হঠাৎ তাহার মন হু হু করিয়া কবিতার অক্ষর ছাড়িয়া উধাও হইয়া যায়। কবিতাটা যেন তাহাকেই লক্ষ্য করিয়া লেখা—যেন তাহারই মনের কোন্ গোপন অজ্ঞাত স্থাকে সে বাহিরে প্রকাশ করিতে চায়! অন্যের কবিতা সে যেন আর পড়িতেই সাহস করে না!

বাদলের ধারা আকাশ হইতে ভূতলে ঝরে, শীতল-রাত্রের নগ্ন শৈত্য অঙ্গ শিহরিয়া তুলে, নব-বসন্তের কোকিল কুজন করে, পূর্ণিমার চাঁদ আকাশে হাসে, প্রভাত সূর্য্যের কিরণ বাতায়ন দিয়া বিছানায় ঘাসিয়া পড়ে—রেখার মনে এ সকল আর কবিতা জাগায় না, জাগায় কি যেন, কিসের যেন একটা অভাব!

সেদিন রেখার নামে একখানা চিঠি পিয়ন দিয়া গল। রেখার বুকের ভিতরটা হঠাৎ ঢিপ্ ঢিপ্ করিয়া উঠিল! কম্পিত হস্তে রেখা চিঠি খুলিয়া দেখিল—সুনৃতার চিঠি। রেখা অশ্বস্ত হইল। সুনৃতার একটি পুত্র সন্তান হইয়াছে! সুনৃতা রেখাকে অনুরোধ করিয়াছে, রেখা ঐ সম্বন্ধে একটা কবিতা লিখিয়া যেন তাহাকে উপহার দেয়!

রেখা তৎক্ষণাৎ সেই বাঁধান খাতা ও পেন্সিল লইয়া বসিল। কিন্তু একবর্ণও কবিতা লিখিতে পারিল না। কবিতার প্লট ভাবিতে বসিয়া সে যাহা ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ আপনার জ্ঞানে ফিরিয়া আসিল, তাহাতে তাহার মুখখানা রাঙা হইয়া উঠিল!

সময় আর কাটে না। রেখা তাই আজকাল একটু একটু সংসারের কাজে হাত দেয়। শাশুড়ীকে কোন দিন বা বলে, "আপনি মা, বুড়োমানুষ, সরুন, আমি আজ রাঁধি!"

ঘরের অনর্থক আসবাব গুলাকে রেখা একদিন তাহার এক প্রতিবেশিনী বন্ধুকে বিক্রয় করিয়া দিল—ছোট্টঘর, এও ঘিঞ্জি করিলে টেকা দায়!

পূজার সময় অবিনাশের মা অবিনাশকে বাড়ী আসিবার জন্য পত্র লিখিলেন। কিন্তু অবিনাশ এই ছুটিতে তাজমহল দেখিতে যাইবে বলিয়া পত্রেই মাকে বিজয়ার প্রণাম জানাইল—বাড়ী ফিরিল না।

কলিকাতা হইতে অবিনাশের নামে একখানি অতি ক্ষুদ্র পত্র গেল—তাহাতে বিজয়ার প্রণাম ছাড়া আর কোন কথা নাই!

এবার রেখাকে দিয়া লিখাইয়া জননী অবিনাশকে বাড়ী ফিরিবার জন্য পত্র দিলেন। অবিনাশ কয়েক-দিনের বিলম্বের পর সে পত্রের যে জবাব দিল, তাহাতে লিখিল—"মা, তুমি আর আমায় বাড়ী ফে'রবার কথা ব'ল না। দেখ মা, আমি কারও জীবনের পথে বাধা হয়ে উচ্চাভিলাষ ও আদর্শকে ক্ষুন্ন করতে চাই না! এই বিদেশে আমি বেশ আছি। তুমি ত জান মা, বাবার মৃত্যুর পর হ'তে আমি জীবনে এ পর্য্যন্ত কত কষ্ট পেয়েছি। আশা ক'রেছিলেম, বিবাহ করে জীবনের দুঃখের ভাগ অন্যকে দিয়ে কতকটা শান্তি পাব। তাই আমি শিক্ষিত মেয়ে দেখেই বিবাহ করেছিলাম, কারণ

জানতেম, শিক্ষাপ্রাপ্ত মার্জ্জিত-বুদ্ধি স্ত্রী অতি সহজে স্বামীর মনে প্রবেশ কর্‌তে পারে এবং স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হ'য়েই সে স্বামীর দুঃখকে আপনার দুঃখ ক'রে নেয়। কিন্তু ভাগ্য আমার এমনি, ঠিক তার বিপরীত ঘট্‌লো। যাই হোক, কারও বিরুদ্ধে আমার কিছু বলবার নেই—আমার কর্ত্তব্য আমি পালন ক'রে যাচ্ছি, এই টুকুই আমার সান্ত্বনা।"

মাথার যাতনায় রেখা সেদিন আর রান্নাঘরে গেল না—শাশুড়ীর হাতে রান্না দিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বেই আপনার ঘরে গিয়া দরজা বন্ধ করিল। সারারাত্রি সে আর কিছু খাইল না, বা ঘরের বাহির হইল না। সকালে তাহার মুখচোখের অবস্থা দেখিয়া শাশুড়ী বলিলেন "হাঁ মা, অসুখ করল নাকি! রেখা মৃদুকণ্ঠে বলিল, "না মা"। বলিয়া অন্যত্র গেল।

দিন দুই পরে, মুঙ্গেরে অবিনাশের নামে একখানা রেজেষ্টারি করা প্যাকেট গিয়া পৌঁছিল। প্যাকেট দেখিয়া অবিনাশ একটু বিস্মিত হইল। কি এটা? প্যাকেট একটু ছিঁড়িতেই, হঠাৎ কতকগুলো পোড়া কাগজ ও ছাই বাহির হইয়া তাহার কোলের উপর পায়ের উপর পড়িল! প্যাকেট খুলিয়া অবিনাশ দেখিল রেখার সেই কবিতার বাঁধান খাতাখানা অর্দ্ধ-দগ্ধ অবস্থায়, এবং তাহার সহিত একটুকরা কাগজ তাহাতে লেখা আছে—"ফিরে এস—অপরাধ ক্ষমা কর।—রেখা।

সেই দিন রাত্রের ট্রেনেই অবিনাশ মুঙ্গের ত্যগ করিয়া কলিকাতা রওনা হইল।

কাশীর কথা

— ভ্রমণ —

কুমারী লতিকা মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

কালভৈরব :—

বিশ্বেশ্বরের মন্দির হইতে কালভৈরবের মন্দির একটু দূরে অবস্থিত। যাহারা গলি দিয়া যাইতে না চান জ্ঞানবাপী হইতে নিকটেই চকের রাস্তায় (লাজপত রায় রোড) পড়িবেন। চকের রাস্তা ধরিয়া উত্তরমুখে কোতোয়ালির দিকে যাইবেন এবং কোতয়ালি ছাড়িয়া নীচিবাগে আসিবেন। নীচিবাগের আগেই (দক্ষিণ দিকে) উহার পাশে যে রাস্তা গিয়াছে, ঐ পথে গেলে কালভৈরবের মন্দির পাওয়া যাইবে। এই পথে একটু গিয়া প্রথমে ডানদিকে, তারপর রাজা সত্যানন্দ সিংহের বাড়ীর কাছে বাঁয়ে যাইতে হয়। ইহার পর একটী চৌমাথা আছে, সেখানে ডানদিকের গলিতে গেলেই কালভৈরবের মন্দির পাওয়া যাইবে।

মহাদেব ব্রহ্মার গর্ব্ব খর্ব্ব করিবার জন্য ভৈরবনাথকে সৃষ্টি করেন। কালভৈরব কাশীর বিচারকর্ত্তা। কাশীর মধ্যে কোন পাপকার্য্য করিলে কালভৈরবের কাছে তাহার বিচার হইবে। কালভৈরব কাশীর পুরাতন শিব।

কালভৈরবের মুখ রৌপ্য নির্ম্মিত, গোফ আছে। তাঁহার দেহ কাপড় ও ফুলের মালায় ঢাকা। কাছেই তাহার বাহন কুকুরের মূর্ত্তি রহিয়াছে।

মন্দিরের সম্মুখে কালো দড়ি বিক্রয় হয়। এই কালো দড়ি গলায় পরিলে কালভৈরব কাশীতে টানেন।

কালভৈরবের মন্দিরের পাণ্ডা যাত্রীদের ময়ূরপুচ্ছের ঝাঁটা দিয়া প্রহার করেন; তাহাতে পাপ নষ্ট হয়।

অগ্রহায়ন মাসের কৃষ্ণাষ্টমীতে উপবাস করিয়া রাত্রি জাগরণ ও পূজা করিলে পাপ দূর হয়।

কালভৈরবের মন্দির পেশোয়া বাজীরাও কর্ত্তৃক নির্ম্মিত।

এই মন্দিরের সম্মুখে একটী মন্দিরে রাম সীতার মূর্ত্তি আছে।

কালভৈরবের দণ্ড :—

কাল ভৈরবের মন্দির হইতে বাহির হইয়া একটু বাঁয়ে গিয়া, প্রথমে ডানদিকে ও পরে বাঁয়ে গলিতে

বেঁকিলে পথের বামদিকে একটী মন্দির পাওয়া যায়। মন্দিরের নম্বর কে ৩১।৪৯,

কালভৈরব যে দণ্ডের দ্বারা শাস্তি দেন, তাহা এই মন্দিরে আছে।

ত্রৈলঙ্গ স্বামীর মন্দির :—

চকের রাস্তার ডানদিকে ঠাটেরি বাজার। এই বাজারের রাস্তা দিয়া সোজা গিয়া, যেখানে ইহা শেষ হইয়াছে, সেই জায়গার সামনে একটী ফটক আছে; তাহার মধ্য দিয়া যাইতে হয়।

পথে দুধবিনায়কের মন্দির পড়িবে। এই স্থানকে দুধ বিনায়ক মহল্লা বলে।

পথের ডানদিকে ত্রৈলঙ্গ স্বামীর মঠ। একটী সাধারণ বাড়ী বলিয়া মনে হয়। নম্বর কে ২৩।৯৫

মঠের মধ্যে প্রবেশ করিলে ডানদিকের ঘরেই ত্রৈলঙ্গ স্বামীর উপবিষ্ট মূর্ত্তি দেখা যাইবে। গলদেশে তাঁহার ব্যবহৃত মালা। সম্মুখে তাঁহার খড়ম দুইটী রক্ষিত হইয়াছে।

ভিতরে উঠানে প্রকাণ্ড শিবলিঙ্গ। ইহার নাম ত্রৈলিঙ্গেশ্বর শিব।

বাড়ীর ভিতরদিকে রাধাকৃষ্ণের ও কালীর মূর্ত্তি আছে।

ত্রৈলঙ্গস্বামী দাক্ষিণাত্যে ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কাশীতে পঞ্চনদ তীর্থের উপর বাস করিতেন ও অধিকাংশ সময় জলের মধ্যে থাকিতেন। প্রবাদ তিনি মৃতদেহে প্রাণসঞ্চার করিতে পারিতেন এবং নিজে ২৮০ বৎসর জীবিত ছিলেন।

জঙ্গম বাড়ী রোডের দিকে

তিলভাণ্ডেশ্বর :—

গোধূলিয়া হইতে জঙ্গমবাড়ী রোড ধরিয়া গেলে ডানদিকে বাঙ্গালীটোলা হাই স্কুল পড়ে। এই স্কুল বাড়ীর আগে ডানদিকে যে গলি তাহার মধ্যে প্রায় ২০খানি বাড়ীর পর ও পথের ডান পাশে একটী ক্ষুদ্র মন্দির আছে। বাহির হইতে দেখিলে একটী সাধারণ বাড়ী বলিয়া মনে হয়।

মন্দির মধ্যে বামদিকের ঘরে তিলভাণ্ডেশ্বর শিবের প্রকাণ্ড মূর্ত্তি। প্রবাদ যে এই মূর্ত্তি প্রতিদিন একতিল করিয়া বড় হয়। সামনের দালানে একটী কূপের ন্যায় গহ্বরের মধ্যে পাতালেশ্বর শিবলিঙ্গ।

তিলভাণ্ডেশ্বরের বামদিকের দেওয়ালে বিষ্ণুপাদ ও সত্যনারায়ণের মূর্ত্তি। তিলভাণ্ডেশ্বরের সম্মুখের উঠানে একটী ক্ষুদ্র মন্দিরে বীরভদ্রের মূর্ত্তি।

পরেশনাথের জন্মস্থান :—

জৈনদের দ্বিতীয় তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ কাশীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি কাশীরাজ অশ্বসেনের পুত্র। ৭৭৭খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে পার্শ্বনাথ যৌবনে সংসার ত্যাগ করিয়া জৈনমত প্রচার করেন।

ভেলুপুরায় ইজয়নগরের (ভিনিয়ানাগ্রাম) মহারাজের প্রাসাদের পশ্চিমাংশ সংলগ্ন বাড়ীতে পার্শ্বনাথ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এজন্য এইস্থান জৈনদের একটী তীর্থ।

দশাশ্বমেধ ঘাট হইতে গোধুলিয়ার মোড় পার হইয়া গোধুলিয়া গির্জ্জার পরেই বাঁয়ে যে রাস্তা গিয়াছে, তাহা দিয়া গেলে ইজয়নগর রাজবাড়ী পাওয়া যায়। রাজবাড়ীর পাশেই পরগসেন উদয়রাজের শোরীপুর জৈন মন্দির, তাহার পরেই পরেশনাথের মন্দিরের ফটক।

অথবা গোধুলিয়া হইতে জঙ্গমবাড়ী রোড দিয়া দক্ষিণ দিকে গিয়া সোনারপুরার মোড়ে ডানদিকে বেঁকিলে একটী চৌমাথার পরই ইজয়নগর রাজবাড়ী ও পার্শ্বনাথের মন্দির পাওয়া যায়। মন্দিরের সদর ফটক পার হইয়া একটী ছোট অত্যন্ত নীচু দরজা দিয়া ভিতরের অঙ্গনে প্রবেশ করিতে হয়।

সামনে শ্বেতাম্বর জৈনদের মন্দির। একটী মঞ্চের উপর মাঝখানে পার্শ্বনাথের মূর্ত্তি; তাঁহার একপাশে শান্তিনাথ, অন্যপাশে মহাবীরের মূর্ত্তি। সম্মুখে একটু নীচে রেখাবজী ও নেমিনাথের মূর্ত্তি।

এই মন্দিরের ডানদিকে দিগম্বর জৈনদের একটি ক্ষুদ্র মন্দির। ছোট ছোট পাহাড়ের ন্যায় লাল সিন্দুর মাখানো মূর্ত্তি।

বামদিকে সামান্য দূরে দাদাজীর পদচিহ্ন। এই মন্দিরের পাথরের জালিকাজ একটী দেখিবার জিনিস।

দুর্গা-মন্দির :—

ইজয়নগর রাজবাড়ীর পাশ দিয়া একটী রাস্তা গিয়াছে। এই পথের যেদিকে ভেলুপুরার থানা সেদিকে না গিয়া, প্রাসাদের পাশ দিয়া এই রাস্তা ধরিয়া বরাবর দক্ষিণ দিকে গেলে বাঁয়ে দুর্গাকুণ্ড ও মন্দির পড়ে।

গোধূলিয়া হইতে জঙ্গমবাড়ী রোড দিয়াও যাওয়া যায়। বাঙ্গালী টোলা স্কুল ছাড়িয়া একটু গেলেই সোনারপুরার মোড়। এখানে বাঁয়ে গিয়া বাঁয়ে বেঁকিলে ভিজিয়ানাগ্রাম বা ইজয়নগর রাজবাড়ী ও পার্শ্বনাথের মন্দির এবং দুর্গাবাড়ীর রাস্তা পাওয়া যায়।

দেবী ভাগবতের মতে ইক্ষ্বাকু বংশীয় ধ্রুবসন্ধির পুত্র সুদর্শন দুর্গামূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। বর্ত্তমান মন্দির রাণী ভবানী কর্ত্তৃক নির্ম্মিত।

রাণী ভবানী নাটোরের রাজা রামকান্ত রায়ের পত্নী।

শারদীয়া দুর্গা ও বাসন্তী পূজার সময় কাশীবাসী-গণ দুর্গা দর্শন করিয়া থাকেন। শ্রাবণ মাসের প্রতি মঙ্গলবার এখানে মেলা হয়।

রাস্তার উপরে বাঁয়ে পাথর বাঁধানো প্রকাণ্ড পুকুর—দুর্গাকুণ্ড। প্রবাদ যে ভগবতী যুদ্ধ জয় করিয়া এই কুণ্ডের তীরে বসিয়া বিশ্রাম করিয়াছিলেন। পুকুরটীর পাশেই উহার দক্ষিণ দিকে দুর্গা-মন্দির। দুর্গাকুণ্ডের দিক হইতে মন্দিরটী সুন্দর দেখায়।

দুর্গা মন্দিরের প্রবেশ দ্বারের নিকটে বলিদানের স্থান। ভিতরের অঙ্গনের মাঝখানে একটী মন্দিরের ভিতরে দুর্গামূর্ত্তি। দুর্গার কেবল সুবর্ণ-প্রতিম মুখখানি দেখা গেল।

ভিতরে অঙ্গনে প্রবেশ করিলে ডানদিকে ভদ্রকালী মূর্ত্তি এবং তাহার পরে লক্ষ্মী ও সরস্বতী।

ভাস্করানন্দ স্বামী :—

দুর্গাকুণ্ডের পাশ দিয়া একটী পথ বাহির হইয়া পূর্ব্ব দিকে গিয়াছে; এই পথে কুণ্ড যেখানে শেষ হইয়াছে তাহার পর আমেথির রাজার আনন্দবাগ নামক বাগান। ইহার মধ্যেই ভাস্করানন্দ স্বামীর সমাধি মন্দির। এই বাগানটী দুর্গা মন্দিরের পূর্ব্বে অবস্থিত।

ভাস্করানন্দ স্বামীর পিতৃদত্ত নাম মতিরাম। কাণপুর জেলার মৈথিলীপুর গ্রামে ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইনি সাতাশ বৎসর বয়সে সংসার ত্যাগ করিয়া ভাস্করানন্দ নাম গ্রহণ করেন এবং পরে কাশীতে আসিয়া দুর্গাবাড়ীর কাছে অবস্থান করেন।

ভাস্করানন্দ স্বামী খুব পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার খ্যাতি শুধু ভারতে সীমাবদ্ধ ছিল না। বিদেশীয় পণ্ডিত ও নরপতিগণ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ধন্য মনে করিতেন। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে রুষ সম্রাট এবং তাহার পর সুপ্রসিদ্ধ লেখক মার্ক টোয়েন্ তাহার সহিত দেখা করিয়াছিলেন। জীবনের শেষ ২৬ বৎসর কাল তিনি উদ্যানে সমাধি-মন্দিরের পিছনের বাড়ীতে ছিলেন। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে ৬৬ বৎসর বয়সে ভাস্করানন্দ দেহত্যাগ করেন।

বাগানের ভিতরে প্রবেশ করিলে বাঁয়ে একটী ক্ষুদ্র ঘরে শ্বেত মর্ম্মর প্রস্তরে নির্ম্মিত সুন্দর মূর্ত্তি। প্রতিভা-মণ্ডিত মুখ ও তীক্ষ্ণ চক্ষু মূর্ত্তিতে বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। মুখখানি দেখিতে অনেকটা দান্তের মতন।

ফটকের সাম্‌নে বাগানের মাঝখানে একটী মর্ম্মর গঠিত সুন্দর মন্দির মধ্যে ভাস্করানন্দের সমাধি। দেহত্যাগের পর তাঁহার নশ্বর দেহ এইখানে প্রোথিত হইয়াছিল। সমাধির উপর একটী মার্বেল পাথরের বেদী ও তাহার উপর শিবলিঙ্গ আছে। ভাস্করানন্দের একজন শিষ্য এই সমাধি মন্দির তৈয়ারী করিয়া দিয়াছিলেন।

সমাধি মন্দিরের পিছনে যে একটী ক্ষুদ্র বাড়ী আছে, সেখানে ভাস্করানন্দ থাকিতেন। এই বাড়ীর ভিতর বাঁদিকে একটী সিঁড়ি দিয়া নীচে একটী ঘরে যাওয়া যায়; এই ঘরটী প্রায় মৃত্তিকা নিম্নে। ইহার ভিতর ভাস্করানন্দ তপস্যা করিতেন।

শঙ্কট মোচন :—

দুর্গামন্দিরের দক্ষিণে একটু দূরে শঙ্কট মোচন।

কাশীর মঠ

কাশীতে সাধুদের অনেকগুলি মঠ আছে। ইহাদের মধ্যে কয়েকটী জ্ঞান ও ধর্ম্ম আলোচনার জন্য বিখ্যাত।

প্রাচীন মঠগুলির মধ্যে শঙ্করাচার্য্যের মঠ, কবীর, তুলসীদাস, নানক প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মঠ, কপিল মুণির মঠ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। শঙ্করাচার্য্যের আশ্রমে শঙ্করাচার্য্যের সুন্দর মূর্ত্তি আছে। এই আশ্রম থিয়োজফিক্যাল সোসাইটীর একটু পশ্চিমে। আধুনিক মঠগুলির মধ্যে রামকৃষ্ণ মিশন ও ভারত ধর্ম্ম মহামণ্ডল উল্লেখযোগ্য।

পবিত্র কূপ ও কুণ্ড

লক্ষ্মী কুণ্ড ও লক্ষ্মীদেবীর মন্দির :—

দশাশ্বমেধ ঘাট হইতে যে বড় রাস্তা বাহির হইয়াছে তাহার নাম লক্ষ্মীকুণ্ড রোড। গোধূলিয়া পার হইয়া গির্জ্জার পাশ দিয়া এই রাস্তা ধরিয়া সোজা যাইতে হয়। মিস্‌রিপুখরার রোড়ের মোড় পার হইয়া ডানদিকে যে গলি আছে, তাহার মধ্যে লক্ষ্মীকুণ্ড।

লক্ষ্মী কুণ্ড একটী বড় পুষ্করিণী—চারিপাশ পাথর দিয়া বাঁধানো। জল সেরূপ পরিষ্কার নয় এবং ঘাটগুলিও অপরিচ্ছন্ন।

কুণ্ডের নিকটে গলির ভিতর লক্ষ্মীদেবীর ক্ষুদ্র মন্দির। মন্দিরের নম্বর ডি ৫২।৪০।

লক্ষ্মী মূর্ত্তির একপাশে সরস্বতী ও অন্যপাশে কালী মূর্ত্তি।

পিশাচমোচন পুষ্করিণী—

পিশাচমোচন পুষ্করিণী বেনারস ক্যান্টনমেণ্ট ষ্টেশনের নিকটে চিতগঞ্জে অবস্থিত।

গৈবী কূপ ও বৃদ্ধকালেশ্বর কূপের জল উপকারী বলিয়া প্রসিদ্ধ।

এতদ্ব্যতীত পিতৃকুণ্ড, মাতৃকুণ্ড, ললারক কুণ্ড প্রভৃতি আছে।

অন্যান্য দ্রষ্টব্য স্থান

কাশীতে মন্দির ব্যতীত আরও অনেক দেখিবার জিনিষ আছে তন্মধ্যে মতি ঝিল একটী।

মতিঝিল—

গোধূলিয়া হইতে লক্ষ্মীকুণ্ড রোড ধরিয়া সোজা যাইতে হয়। রামকৃষ্ণমিশন হাসপাতালের কাছ হইতে এই রাস্তার নাম রামকালী চৌধুরী রোড হইয়াছে। রামকৃষ্ণ মিশন হাসপাতাল এইখানে।

আজমতগড় প্যালেস পোষ্ট অফিস ছাড়িয়া একটু গেলেই রাস্তার বামদিকে রাজা মতিচান্দের সুন্দর বাগান বাড়ী।

প্রাসাদের সম্মুখে সুন্দর ফুলের বাগান। নানাজাতীয় ফুল ফুটিয়া বাগানটীকে ছবির মতন করিয়াছে।

প্রাসাদের পিছন দিক দিয়া গেলে মতি ঝিল দেখা যাইবে।

কলিকাতার ইডেন গার্ডেনের মতন সুন্দর ঝিল। ঝিলের উপরে একটি সেতু দিয়া গেলে অপর পারে বাগানে যাওয়া যাইবে।

বাগানের মাঝখানে একটী কৃত্রিম ঝরণা। ঝরণার জল যাহাতে পড়ে, সেখানটীর রচনা অত্যন্ত সুন্দর।

কাশীর গোধূলিয়া হইতে মতিঝিল যাতায়াতের এক্কা ভাড়া দশ আনা এবং টোঙ্গা সাধারণতঃ ১৲ টাকা লইয়া থাকে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

কাশী বিদ্যাপীঠ—

কাশী বিদ্যাপীঠ ক্যান্টনমেণ্ট ষ্টেশনের নিকট বিদ্যাপীঠ রোডে অবস্থিত। এটী একটী জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। শ্রীভগবান দাস ও শ্রীশিবপ্রসাদ গুপ্তের যত্নে এই বিদ্যাপীঠ গড়িয়া উঠিয়াছে। এখানে শিল্প শিক্ষার ব্যবস্থা আছে।

সংস্কৃত কলেজ (Queen's College)—

কাশী চিরদিন সংস্কৃত শিক্ষার জন্য বিখ্যাত। কাশীর সংস্কৃত কলেজ বিশ্ববিখ্যাত। ইহার 'সরস্বতী ভবন' নামক গ্রন্থাগারে অনেক মূল্যবান পুঁথি আছে।

হিন্দু ইউনিভার্সিটি

কাশীর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় একটী দেখিবার জিনিষ। দশাশ্বমেধ ঘাটের নিকট বাস পাওয়া যায়—যাতায়াতে ছয় আনা পড়ে। বিশ্ববিদ্যালয় সহরের উপকণ্ঠে নাগোয়া অঞ্চলে অবস্থিত।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বাড়ীগুলি একটী বিস্তীর্ণ ভূমির উপর অর্দ্ধচন্দ্রাকারে সজ্জিত। ইহাদের পশ্চাতে ছেলেদের

বোর্ডিং, অধ্যাপকদের বাসস্থান প্রভৃতি রহিয়াছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রায় দেড় কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছে। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায় এখানেও বি-এ, এম্-এ, ওকালতি প্রভৃতি পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ বিখ্যাত। ইলেক্‌ট্রিক ইঞ্জিনিয়ারিং, ধাতুবিদ্যা (মেটালার্জি) প্রভৃতির বিশেষ শিক্ষা ও উপাধি পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে একটী আয়ুর্ব্বেদীয় বিভাগও আছে; কিন্তু ইহার ব্যবস্থা খুব ভাল নয়।

সম্প্রতি একটী কৃষি কলেজ খোলা হইয়াছে।

হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের কীর্ত্তি।

কাশী সহর

কাশী একটি প্রকাণ্ড সহর। এই সহরের এক অংশকে বেনারস ক্যাণ্টনমেণ্ট বা সিক্‌রোল এবং অপর অংশকে বেনারস সিটি বলে।

ষ্টেশন—

কাশীতে দুইটী ষ্টেশন আছে—কাশী ও বেনারস ক্যাণ্টনমেণ্ট। যাহারা চকের দিকে থাকে, কাশী ষ্টেশন তাহাদের পক্ষে সুবিধা; কিন্তু এখানে গাড়ী অল্পক্ষণ থামে বলিয়া সাধারণ যাত্রীদের পক্ষে ক্যাণ্টনমেণ্ট ষ্টেশনই সুবিধাজনক। বেনারস এক্সপ্রেস্ ক্যাণ্টনমেণ্ট ষ্টেশনে শেষ হইয়া যায়; অন্যান্য গাড়ীও এখানে অনেকক্ষণ থামে।

ক্যাণ্টনমেণ্ট ষ্টেশনের কাছে বাস্, গাড়ী, ট্যাক্সি, এক্কা ও টোঙ্গা প্রভৃতি পাওয়া যায়। বাসের ভাড়া প্রতি লোকে ৵৹ হিসাবে। গোধুলিয়া পর্য্যন্ত এক্কা ।৹ আনা এবং টোঙ্গা ৷৹ আনায় পাওয়া যায়।

কাশীতে গলিগুলির ভিতর গাড়ী যায় না এবং অনেকস্থলে বাড়ী হয়ত রাস্তা হইতে অনেক দূরে। এরূপস্থলে রাস্তার উপর মালপত্র নামাইয়া বাড়ী খুঁজিয়া লইতে অনেককে বিব্রত হইতে হয়; এজন্য যাহারা বাড়ী ঠিক করিয়া যাইবেন, তাহারা কাহাকেও ষ্টেশনে থাকিতে বলিলে সুবিধা হইবে।

যে সকল যাত্রী ২।৩ দিনের জন্য যান তাঁহারা হোটেলে উঠিতে পারেন; হোটেলগুলি রাস্তার উপরে। দশাশ্বমেধ ঘাটের কাছে অনেকগুলি হোটেল আছে।

দশাশ্বমেধ ঘাট হইতে প্রায় অসিঘাট পর্য্যন্ত অংশে বাঙ্গালীর বসতি বেশী।

সহরের পথ :—

ক্যাণ্টনমেণ্ট ষ্টেশন হইতে বিশ্বনাথের মন্দিরের দিকে যাইতে হইলে ভারতবর্ষ মহামণ্ডলের বাড়ীর পরে ডানদিকের রাস্তায় বেঁকিতে হয়। বাঁদিকে মিউনিসিপ্যাল অফিস্ ও ভিক্টোরিয়া পার্ক পড়ে।

তারপর গোধুলিয়ার গির্জ্জার নিকট একটী চৌমাথা। বাঁ দিকে (পূর্ব্বদিকে) দশাশ্বমেধ ঘাটের পথ (লক্ষ্মীকুণ্ড রোড); ডানদিকে ও (পশ্চিমদিকে) লক্ষ্মীকুণ্ড রোড রামাপুরা, লক্ষ্মীকুণ্ড, লাক্সি, রামকৃষ্ণ মিশন ও মতিঝিলের দিকে গিয়াছে।

এখান হইতে সোজা গির্জ্জার পশ্চিমে যে একটী সরু পথ গিয়াছে তাহা দিয়া দক্ষিণ দিকে গেলে রেওড়ি পুকুর, ভেলুপুরা, পরেশনাথের মন্দির, দুর্গাবাড়ী ও ভাস্করানন্দ স্বামীর সমাধি যাওয়া যায়।

গোধুলিয়ার মোড়ে যে চৌমাথা, সোজা পূর্ব্বদিকে লক্ষ্মী কুণ্ড রোড ধরিয়া গেলে দশাশ্বমেধ ঘাট; এই রাস্তা হইতেই বাঁদিকে একটী গলি দিয়া বিশ্বনাথের মন্দিরে যাইতে হয়।

গোধুলিয়ার মোড় হইতে বাঁয়ে (উত্তরদিকে) চকের রাস্তা (লাজপত রায় রোড—এদিকে সোজা গেলে মদন থিয়েটার, চিত্রা, রেলওয়ে সিটি বুকিং আফিস, থানা (কোতয়ালি), ঠটেরি বাজার, নীচিবাগ, টাউনহল কাল ভৈরবের মন্দির প্রভৃতি পড়ে; বিশ্বনাথের মন্দির এইপথ হইতে কারমাইকেল লাইব্রেরীর পাশের গলি দিয়া যাওয়া যায়।

গোধুলিয়ার মোড় হইতে ডানহাতের দিকে (দক্ষিণে) জঙ্গমবাড়ী রোড; এইপথে গেলে মদনপুরা, ফরিদপুরা, বাঙ্গালীটোলা হাই স্কুল, তিলভাণ্ডেশ্বর, সোনারপুরা, পীতাম্বরপুরা, শিবালা পল্লী, জলের কল প্রভৃতি পড়িবে।

বাড়ীর নম্বর—

কাশী সহরটীকে অনেকগুলি মহল্লায় ভাগ করা হইয়াছে; প্রত্যেক মহল্লার একটী বিশেষ সংখ্যা দেওয়া আছে, যেমন মিসরিপুখ্‌রা মহল্লার ৪৮ সংখ্যা।

মহল্লার নম্বর উপরে দিয়া বাড়ীর নম্বর উহার নীচে দেওয়া হয়। যথা মিসরিপুখরায় ১নং বাড়ী লিখিতে হইলে ডি ৪৮।১ লিখিতে হয়। প্রথমে যে ডি লেখা হইল উহা কাশীর দশাশ্বমেধ পল্লীর আদ্যক্ষর। যে মহল্লায় যাইতে হইবে, সেখানে গিয়া বাড়ীর নম্বর দেখিলে বাড়ী সহজে খুঁজিয়া বাহির করা যায়।

ব্যবসায় বাণিজ্য :—

কাশী পবিত্রস্থান বলিয়া যেমন বিখ্যাত, সেই রকম ব্যবসায়ের একটী কেন্দ্রস্থান।

কাশীর চকে কলিকাতার বড়বাজারের ন্যায় নানারূপ জিনিষের দোকান আছে।

কাশীর কাঁসার ও জার্ম্মান সিলভারের ও মিনাকরা বাসন বিখ্যাত।

চকের রাস্তার ডানদিকে একটী গলির ভিতর ঠটেরি বাজার; ইহার মধ্যে কাঁসার ও জার্ম্মান সিলভারের অনেক খেলনা ও বাসনের দোকান আছে। কাঁসার বড় বক, ইলেক্‌ট্রিক আলোর বাতিদান (Lamp stand) প্রভৃতি সুন্দর। মিনা করা কাঁসার ফুলদানির উপর কারুকার্য্য সুন্দর। পিতলের নানারূপ দেবমূর্ত্তি, সিংহাসন, ফুলের সাজি প্রভৃতি আছে।

জার্ম্মান সিলভারের বড় ময়ূর—উহার পিঠে একটী ঢাকনি আছে; ভিতরে পান প্রভৃতি রাখা যায়। বড় ময়ূর ৪৻৫ টাকায় হয়; ছোট ময়ূরগুলির ৷৷০ এইরকম দাম। সিন্দুর কৌটা, পানের ডিবা, সিগারেট কেস, রেকাব, গেলাস প্রভৃতি পাওয়া যায়। ইহাদের উপর নাম লিখাইতে প্রত্যেক অক্ষরে বাজারের ভিতর ৻১০ হিসাবে ও বাহিরে একপয়সা হিসাবে লইয়া থাকে। জর্ম্মান সিলভারের বাসন ভরি হিসাবে বিক্রয় করে; পুতুল প্রভৃতি থাওকা দরে বিক্রয় হয়।

কাঠের খেলানা :—

কাঠের উপর রং ও পালিশ করা কৃষ্ণ, রাধা, শিব প্রভৃতি দেবমূর্ত্তি, জীবজন্তু, সিন্দুর কৌটা প্রভৃতি পাওয়া যায়। ছোট ছোট দেবমূর্ত্তির পুতুল ও সিন্দুর কৌটাগুলি সুন্দর। কাঠের সিন্দুর কৌটার উপর নাম লিখানো যায়। তাহার জন্য পৃথক দাম লাগে না। বিশ্বনাথের গলিতে অনেক খেলনার দোকান আছে।

কাশী সিল্ক :—

কাশী সিল্কের কাপড় ও ব্লাউজ পিস্‌ দর যাচাই করিয়া কেনা ভাল, নহিলে ঠকিবার সম্ভাবনা। সাধারণতঃ ইটালী দেশীয় সিল্কের সুতায় এই কাপড় তৈয়ারী হয়।

বেনারসী সাড়ীগুলিতে রেশমী কাপড়ের উপর জরীর কাজ সুন্দর। আজকাল বেশীভাগ নকল বিদেশীয় রেশম ও জরী দিয়া এই কাপড় তৈয়ারী করা হয়। কাশীতে জরীর সুতা তৈয়ারীর কয়েকটী কারখানা আছে। তাঁতিরা বেশীভাগ মুসলমান।

মাটির খেলানা :—

কাশীর মাটীর খেলনাও সুন্দর ও খুব সস্তা। কাশী হইতে মাটির জিনিষ আনিলে সোনা চুরি করা হয়, এই প্রবাদের ফলে কেহ মাটির খেলানা ক্রয় করেন না।

পাথরের বাসন :—

চুণার ও মির্জ্জাপুর হইতে পাথরের বাসন ও খেলানা আসে।

কাশীর জর্দ্দা ও সুর্ত্তি :—

কাশীর জর্দ্দা ও সুর্ত্তি বিখ্যাত। পানের মসলাও ভাল।

জলহাওয়া—

কাশীর জলহাওয়া পূজা হইতে ফাল্গুন মাস পর্য্যন্ত ভাল। শীতকালে বেশ শীত পড়ে; এজন্য এ সময় আসিলে কম্বল ও গরম জামা ও মোজা লইয়া আসা উচিত। এ সময় গঙ্গার জল অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার। শীতকালে কাশী স্বাস্থ্যকর।

গ্রীষ্মকালে অত্যন্ত গরম। বেশীভাগ বাড়ী পাথরের এজন্য গরম খুব বেশী বোধ হয়। একতলায় ছাড়া উপরের তলার ঘরে থাকা কষ্টকর হইয়া উঠে। কিন্তু এসময় গঙ্গা স্নান খুব তৃপ্তিকর এবং অসুখ কম হয়।

কাশী সহর কঙ্করময় উচ্চ ভুমির উপর নির্ম্মিত বলিয়া এখানে শীত ও গ্রীষ্মের এত আধিক্য।

সাধারণ স্বাস্থ্য :—

কিরূপ স্থানে থাকা উচিত—

কাশীর বিশেষতঃ বাঙ্গালীটোলার গলিগুলি অত্যন্ত অপরিচ্ছন্ন। গলিগুলি এত সরু যে ২।৩ জনের বেশী লোক পাশাপাশি যাইতে পারেনা। দুইপাশে উচ্চ বাড়ী থাকায় গলির মধ্যে কখনো রৌদ্র আসে না। প্রায়ই লোকে পথের উপর মলমূত্র ত্যাগ করে। বায়ুপরিবর্ত্তনে যাহারা যান,এরূপ গলির মধ্যে থাকা কখনো উচিত নয়। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এরূপ স্থানে বাস করিয়াও অনেক বৃদ্ধকে অধিক বয়সেও যুবকের ন্যায় চলাফেরা করিতে দেখা যায়, মিসরি পুখরা, রামাপুরা, লাকৃসি, ভেলুপুরা প্রভৃতি স্থান এখনো খারাপ হয় নাই। বড় রাস্তাগুলির একমাত্র অসুবিধা যে পথে বড় ধূলা।

বায়ুসেবন—

কাশীর গঙ্গার ঘাটগুলি অত্যন্ত সুন্দর। এইখানে সকালে ও সন্ধ্যায় মুক্তবায়ু সেবন করিলে উপকার হয়। এতদ্ব্যতীত অনেকগুলি দেবমন্দির আছে; এক সঙ্গে মন্দিরগুলি দর্শন ও ভ্রমণ হয়। গঙ্গাবক্ষে নৌকাবিহারও স্বাস্থ্যকর। গলিগুলির ভিতর না বেড়ানো ভাল। দুর্গন্ধ, জনতা ও ষাঁড়ের উৎপাত গলিতে বেশী।

পানীয় জল—

কাশীতে কলের জল আছে। কূপও আছে, কিন্তু রাস্তার ধারে যে সব কুয়া আছে তাহার জল ভাল নয়। বড় গৈবী ও বৃদ্ধ কালেশ্বর এই দুইটী কুয়ার জল প্রসিদ্ধ। উদরাময় রোগীর পক্ষে বড় গৈবীর জল এবং কোষ্ঠকাঠিন্তে বৃদ্ধ কালেশ্বরের জল উপকারী।

পায়খানা ও আস্তাকুড়—

সহরের মধ্যে ড্রেণ পায়খানা আছে। মলত্যাগের পর পায়খানার মধ্যে ঘটি করিয়া জল ঢালিয়া দিতে হয়; তাহা না হইলে ড্রেণ বন্ধ হইয়া যায়।

বাড়ীর মধ্যে আঁস্তাকুড় যাহাতে না থাকে তাহা দেখা উচিত। কাশীতে মাছির উপদ্রব অত্যন্ত অধিক। খাবার জিনিস ঢাকা দিয়া রাখিলে মাছি বসিতে পারিবে না। মনে রাখিবে, মাছি কলেরা, টাইফয়েড ও রক্ত আমাশয় রোগের বীজাণু খাবারে মিশাইয়া দেয়।

ডাক্তার—

ডাক্তার অনেক আছেন। অনেকে কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া একসঙ্গে কাশীবাস ও চিকিৎসা দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিতেছেন।

লক্ষ্মীকুণ্ড রোডের নাম যেখানে রামকালী চৌধুরী রোড হইয়াছে, সেইখানে রামকৃষ্ণ মিশনের একটী হাসপাতাল আছে। বাড়ীগুলি ও বাগান ছবির মত।

গোধূলিয়ার মোড়ে মাড়ওয়ারিদের একটী হাসপাতাল আছে। এতদ্ব্যতীত ভেলুপুরায় একটী ক্ষুদ্র হাসপাতাল আছে।

বাড়ীভাড়া—

কাশীতে বাড়ীভাড়া খুব সস্তা। অপেক্ষাকৃত ফাঁকা জায়গায় দ্বিতল বাড়ী—উপরে তিনখানি ও নীচে তিনখানি ঘর; এরূপ বাড়ী ১৫।১৬ টাকা ভাড়ায় পাওয়া যায়।

বাঙ্গালীটোলা গলির ভিতর ১০।১২ টাকায় বাড়ী মিলে।

পূজা হইতে কালীপূজা পর্য্যন্ত এবং তাহার পর বড় দিনের সময় কাশীতে খুব ভিড় হয় এবং এই সময় বাড়ী ভাড়াও বাড়ে।

বাড়ীর গায়ে To Let লাগান না থাকায় অধিকাংশ বাড়ী খালি থাকা স্বত্বেও অনেক সময় লোকে বাড়ীর জন্য অসুবিধায় পড়েন।

(ক্রমশঃ)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

সুরমা হঠাৎ অত্যন্ত রাগিয়া উঠিয়া আবার নিজেকে সংযত করিয়া বলিল—"তোমাকে বারবার বারণ করেছি নলিনী এসব কথা বলবে না,—আমার পা রাখবার জায়গা পৃথিবীতে অনেক আছে—" একটু থামিয়া বলিল—"আমি তোমার ওখানে যাই—আর আমার স্বামী মামলা আনলে তুমি যে জেলে যাবে সেটুকু বুঝবার বুদ্ধি আছে?—"

নলিনী হাসিয়া বলিল—"তা আর নেই? তারও উপায় ভেবে রেখেছি,—অন্য ধর্ম্ম নিয়ে বিয়ে করতে পারি—"

সুরমা ক্রুদ্ধ-বিস্ময়ে খানিকক্ষণ তাহার দিকে চাহিয়া বলিল—"তুমি ভয়ানক লোক। যাও এখান থেকে, এইমাত্র চ'লে যাও আর বেহায়ার মত এখানে এসোনা।"

সুরমা সেদিনও মনে মনে অনেকক্ষণ ভাবিল—সত্যই তাহার এ-বাড়ীতে জোর করিয়া পড়িয়া থাকিবার কোন অধিকার নাই। বাপের বাড়ীও যাওয়া যায় না,—তাহারা জিজ্ঞাসা করিবে, সন্দেহ করিবে, নানা কথা বলিবে তার পরে তাহার জন্য দুঃখ করিবে। সব চাইতে ভাল সে চলিয়া যাইবে পৃথারই মত বহুদূরে। সুরমা তাহার টাকা পয়সার হিসাব করিতে লাগিল।

কয়েকদিন আর সে কাহারও সঙ্গে মিশিল না—এবং তাহার হিসাব লইয়া অত্যন্ত ব্যস্ত রহিল। রাজীবের আর সে এক পয়সাও লইবে না স্থির করিল। তাহার পিতা প্রদত্ত যৌতুক কুড়ি হাজার টাকা ব্যাঙ্কে জমা ছিল এবং অলঙ্কার, এই সম্বল তাহার, রাজীবের প্রদত্ত কোন অলঙ্কারও সে নিবে না। মাত্র এইটুকু দিয়া তাহার কি হইবে? অত বড় জীবনটা তাহার কি করিয়া চলিবে? তবু যাহা হয় হউক, দুঃখ, কষ্ট, দারিদ্র্য যাহা বরণ করিতে হয় সে করিবে, তবু তাহাই হইবে তাহার এক নবজীবনের প্রারম্ভ। সে কোন এক নির্জ্জন স্থান বাছিয়া লইবে—এবং যেমন সকলে তাহাকে দূরে ঠেলিয়া সরাইয়া দিয়াছে, তেমনি সে সকলের স্মৃতি হইতে নিজের অস্তিত্ব একেবারে মুছিয়া ফেলিবে। স্ফূর্ত্তির স্রোতে নিজেকে ভাসাইয়া দিয়াও তো দেখিল যে তাহাতে সুখ নাই, শান্তি নাই! সকলের সঙ্গে মিশিতে গেলে একটা অস্বাভাবিক কিছু করিয়া সকলকে "অবজ্ঞা" করিয়া চলা যায় না জগতে। পৃথা পারে, তাহার সে শক্তি আছে, সুরমা দুর্ব্বল—তাই সে পৃথা কর্ত্তৃক প্রভাবান্বিত হইয়াও তাহার মত হইতে পারিল না—জীবনে শুধু কতগুলা অসফলতাই কুড়াইয়া পাইল।

বহুদিন পরে একদিন সে হঠাৎ বিজয়ের এক চিঠি পাইল বিজয় লিখিয়াছে—

"সুরমা, উপরে ঠিকানা দেখে বুঝতে পারছ আমি এখন কতদূরে! তোমাকে আজ কাছে না পেয়ে অনেক কিছু বলতে পারলুম না, সেইজন্য একটু আপশোষ হচ্ছে মাত্র, কারণ তুমি আমার প্রাণে এই তেজ, এই সাহস প্রবুদ্ধ করে তুলেছ, তুমি নিজে যাই হও, কিন্তু তুমি আমাকে পথ দেখিয়ে দিয়েছ।

প্রথমে তোমাকে দেখেছিলুম অন্যরূপে। তুমি ছিলে তখন শুভ্র, পবিত্র, সুগন্ধযুক্ত ফুলের মত,—তারপরে দেখলুম তোমাতে অনেক রঙের সমাবেশ, লাল, হলদে, সবুজ,—চোখ তৃপ্ত হয়—মন হয় না,—তারপরে গন্ধ ও শোভা দুইই হারালে, তবু তুমি আমার অন্তরে যা ছিলে তাই আছ, সে ফুলই আছ। এতে ক্ষতি আমার কিছু হয় নি, হয়েছে তোমার, ভেবে দেখো।

সেদিন আমাকে গাড়ীতে বসিয়ে রেখে নেমে গেলে, কেমন ইচ্ছে হ'ল গিয়ে দেখি কি কর; না গেলেই ভাল হ'ত হয়তো, কারণ তোমার পক্ষে খুব বিশেষ কিছু না হ'লেও, এই ভারতের স্নেহরসে পুষ্ট, হিন্দুর ছেলের পক্ষে

সেটা বড়ই দৃষ্টিকটু মনে হ'ল, কে যেন চাবুক মেরে আমাকে সেখান থেকে বের ক'রে দিল!

কিসের জন্য আজ আমি কর্ত্তব্যে অবহেলা ক'রে এখানে আছি—এই প্রশ্নই মনে হ'ল প্রথমে—তারপরে তা সে তোমারি জন্য—মনে করে দারুণ আত্মগ্লানি এলো, পরদিনই বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ না ভেবে, বেড়িয়ে পড়লুম—।

এ উন্মাদনা,—এ আনন্দ আলাদা। আশ্রমের শান্তি কুঞ্জের আনন্দ নয় এ, সুরমা এ কি? ভাষায় বোঝাতে পারি না, হয়তো কাছে থাকলে দেখতে পেতে আমার সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে ঝরে পড়ছে সে আনন্দের ঔজ্জ্বল্য,—সে পুলকের বিদ্যুচ্ছটা—।

তোমার জন্য দুঃখ হয়, তোমরা এ স্বাদ পেলে না। অলঙ্কার আর সাজ-পোষাকের অন্তরালে কি রকম মন নিয়ে তোমরা হাস, বেড়াও – দেখলে ভয় হয়, দুঃখ হয়, কষ্ট হয়, তোমাদের ভিন্ন জীব বলে মনে হয়, ঠিক যেন ভাবলেশহীন,—প্রাণহীন—কতগুলো কি—!

জীবন ক' দিনের? তাকে সার্থক ক'রে তোল—আর, এ সার্থকতার চেয়ে জগতে আর কোন সার্থকতা বড় আছে ব'লে আমি জানি না—ব্রাহ্মণ, বয়সেও বড়, তাই আশীর্ব্বাদ করি—তোমার সুমতি হোক্।

পুঃ—মীরার সঙ্গে দেখা হয়েছে—সে তার স্বামীকে নিয়ে খুব সুখে আছে। তার কল্যাণ-স্পর্শে অনেকের অনেক অকল্যাণ দূরে স'রে গেছে। অনাথ আশ্রম তার এখন অনেকগুলো। দেখে বড় তৃপ্ত হয়েছি, আরো তৃপ্ত হয়েছি সুরমা,—তার একটী সুন্দর ছোট মেয়ে আমাকে মুখ ভ'রে ডাকে 'মামা' বলে—

চিঠি পড়িয়া সুরমা মৃদু হাসিল। সার্থকতা, মহত্ত্ব এ সব জিনিষের কোন মাপকাঠি আছে কি? যে যাহার খেয়াল লইয়া, মতামত লইয়া নিজেকে নিজে বড় মনে করিয়া ঘুরিতেছে, এবং একজন আর একজনকে দেখিয়া হাসিতেছে। পৃথা ঠিকই বলে "সংসারটা একটা প্রহসন আর তাই দেখে হাসতে পারাতেই সুখ। মানুষগুলো কি অদ্ভুত—" তবু আছে। আছে বৈ কি! এমন কতগুলা কি আছে, যাহা জগতব্যাপী, সর্ব্ববাদীসম্মতভাবে সত্য—ধ্রুব এবং মহৎ। বিজয় সেইপথ বাছিয়া লইয়াছে—মীরাও তাহাই ধরিয়া আজ সুখী, সার্থক হইয়া উঠিয়াছে। ভালোই হইয়াছে, বিজয় সুখী হইয়াছে, মীরা সুখী হইয়াছে! মীরার স্পর্শে অকল্যাণ দূরে সরিয়া যায়, আর তাহার স্পর্শে অকল্যাণ ঘনীভূত হইয়া আসে—। তবে সকলের সব অকল্যাণ সে নিজে মাথায় করিয়া লইয়া গঙ্গায় ডুবিয়া তাহার প্রায়শ্চিত্ত করুক—ইহাই বুঝি এখন তাহার জীবনের শেষ সুকাজ—?"

কয়েকদিন পরে সে একদিন, গভরনেসের কাছে খবর পাইল রাজীব আসিতেছে—এবং সে দুই দিন পরেই ছেলেদের লইয়া কোথায় চলিয়া যাইবে—তার জন্য তাহারা যেন প্রস্তুত থাকে—!

সুরমার বুক কাঁপিয়া উঠিল, মুখ শুকাইয়া গেল, এবারে সত্যই তাহা হইলে রাজীব তাহাকে ত্যাগ করল! তাহারই জন্য সে এইবারে ছেলেদের লইয়া তাহার বিষাক্ত সংস্পর্শ হইতে দূরে সরিয়া যাইতেছে? তাহারই কর্ম্মফলে, তাহারই পাপে! তার চাইতে, কাজ নাই! তাহারা এখানে থাকুক্—তাহারা এখান হইতে সরিবার পূর্ব্বে সেই দূরে চলিয়া যাইবে। মন স্থির করিয়া সুরমা রহিল রাজীবের আসার অপেক্ষায়!

রাজীব আসিল, আসিয়া সকলকে বলিল, গোছ গাছ করিবার জন্য। এবং একটু বেশী রকম গোছগাছের আয়োজন চলিতে লাগিল। শুধু সুরমাকে সে বলিল—"ছেলেদের কোন এক স্বাস্থ্যকর স্থানে রেখে, ওদের লেখাপড়ার ব্যবস্থা করে দিয়ে—আমি একটু ঘুরবো—তেলের খনি তো এক কোম্পানীকে 'লিজ' দিয়ে দিলুম, তাই—এখন চাই একটু বিশ্রাম—আর তোমার মাসহরা এইখানে আসবে—"সুরমা স্থির স্বরে শুধু বলিল—"আচ্ছা" কিন্তু বুক তাহার জ্বলিয়া যাইতেছিল। এই রাজীবই একদিন বলিয়াছিল—"চল সুরমা, একবার ঘুরে আসি—"যাক্—সে কথা—

দুই দিন পরে সকলে যাইবে। বড় বড় কাঠের বাক্স বন্ধ হইতে লাগিল; ছোট বড় কাপড়ের বাক্স ভরিয়া উঠিতে লাগিল, কতগুলা কি আসবার পত্রও কাঠের আবরণে বন্দী হইতে লাগিল এবং সমস্ত বাড়ী বিশৃঙ্খল হইয়া উঠিল। ছেলেরা যাইবার উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া

উল্লাসে দৌড়াদৌড়ি করিয়া বেড়াইতেছিল—এক সময়ে সকলকে লুকাইয়া প্রণব আসিয়া মায়ের গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—

"মা, তোমার বাক্স ?—"

সুরমার কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া আসিল, সে গলাটা পরিষ্কার করিয়া জোর করিয়া হাসিয়া বলিল—"আমি তো যাব না বাবা! তোমার বাবার সঙ্গে দাদা দিদির সঙ্গে তুমি থাকবে কেমন ?" প্রণব বড় বড় চোখে খানিকক্ষণ মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া, মাথা নাড়িয়া বলিল—"আচ্ছা"

সুরমা লক্ষ্যহীন ভাবে এ-ঘর ও-ঘর সারাদিন ঘুরিয়া বেড়াইল, একখানে ছোট ছোট কতগুলি বাক্সে ছেলেরা ছেঁড়া কাপড়, খেলনা, পুতুল ভরিতেছিল, হঠাৎ প্রণব বলিয়া উঠিল, "আমাকে এটা বাবা দিয়েছে—" বিমু হাসিয়া মুখ ফিরাইয়া বলিল—"আমাকেও মামা দিয়েছে—আরো খেলনা বাবা আনতে গেছে—"

সুরমার চোখ দুইটা জ্বালা করিয়া উঠিল, সে অন্যদিকে মুখ ঘুরাইয়া সরিয়া গেল।

রাত্রি তখন ৮টা বাজিয়া গিয়াছে! সুরমা চিঠি লিখিতেছিল—"আমার কাছ থেকে দূরে স'রে যাবার কোন দরকার নেই,—আমিই আজ নিজেকে সরিয়ে নিলুম। তোমার সব জিনিষ পত্র গয়না ইত্যাদি, আমাকে যা দিয়েছিলে সব রইল, আর আমার উপর ন্যস্ত তোমার ষ্টেটের উপর যত কিছু ক্ষমতা ছিল, সে সব আমি ছেড়ে দিয়ে গেলুম, আর তোমার বা তোমার সম্পত্তির উপর আমার কোন অধিকার বা দাবী রইল না। ইতি—"

চিঠিখানিতে পূর্ণ নাম স্বাক্ষর করিয়া সে রাজীবের টেবিলের উপর রাখিয়া আসিল।

তবুও ঘুমন্ত ছেলেদের ঘরে গিয়া তাহার চোখ জলে ভরিয়া আসিল, সকলের কপালে এক একটিবার হাত বুলাইয়া ভাবিল, আর যাহাই হউক, সে মা—তাহার আশীর্ব্বাদ করিবার অধিকারটুকু আছে! তারপরে সিঁড়ি দিয়া শেষ নামিবার সময়, তাহার পা বার বার কাঁপিয়া উঠিল। এই বাড়ী! রাজীব একদিন বলিয়াছিল বড় করিতে হইবে—সেই স্বপ্ন কি এই ভাবে আজ সত্য হইয়া উঠিল ?

সুরমা মোটরে উঠিল,—নিজের মোটরে,—হাতে একটি ছোট চামড়ার ব্যাগে তাহার নিজের ব্যাঙ্কের বই, আর কতগুলি কি কাগজ ও চিঠি পত্র লইয়া, তারপরে ড্রাইভারকে আদেশ করিল—"হাওড়া ষ্টেশন—"

পুরী এক্সপ্রেস দাঁড়াইয়া আছে—ছাড়িবার বেশী দেরী নাই। মোটর বিদায় দিয়া সুরমা তাড়াতাড়ি ফার্ষ্ট ক্লাস টিকিট একখানি কিনিয়া উঠিয়া বসিল। মনের ভিতর তখন এলোমেলো হাজার চিন্তা খেলিয়া যাইতেছিল দু' এক মিনিট পরেই ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল, গাড়ী ছাড়ে—এমন সময়ে হঠাৎ নলিনী—"আরে, আপনি কোথায়—" বলিয়া দরজা ঠেলিয়া উঠিয়া পড়িল,—সুরমা "নলিনী এসোনা বলছি—নেমে যাও—" বলিতে বলিতে সভয়ে দেখিল—গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিয়াছে—তারপরে সে ভয়ে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া দেখিল—গাড়ী প্ল্যাটফরম্ ছাড়াইতেছে ধীরে ধীরে, এবং সেইখানে শরৎ দাঁড়াইয়া বিস্ময়, বিদ্রূপ কৌতূহল ভরে তাহার দিকে চাহিয়া আছে, —আর তখন সুরমারই পাশে বসিয়া নলিনী—!

অনেকগুলা অজানা ভাব একত্র হইয়া সুরমার মূর্চ্ছা হইবার উপক্রম হইল। তাহার সহজ সরল যাওয়াটা যে এইভাবে জটিল ও বক্র হইয়া উঠিবে তাহা কি সে একবারও ভাবিয়াছিল ? আর,—আর কেহ নয়—তাহাকে দেখিয়াছে স্বয়ং শরৎ—

২১

গাড়ী ছুটিয়া চলিয়াছিল, সুরমা স্থির দৃষ্টিতে চাহিল নলিনীর দিকে। নলিনী সে দৃষ্টির সামনে একটু সঙ্কুচিত হইয়া বাঙ্কের গদিটার দিকে চাহিয়া আবার মুখ তুলিল। সুরমা বলিল—"এমন ক'রে তুমি কেন উঠলে ?"

তাতে কোন দোষ হ'তে পারে আমি বুঝতে পারিনি। সত্যি বলছি, আপনি কোথায় যাচ্ছেন, কেন যাচ্ছেন, আমি কিছু জানিনা। হঠাৎ দেখেই কথা বলবার জন্য উঠেছি। আর অমনি ট্রেণ ছেড়ে দিয়েছে।"

"আচ্ছা, বেশ করেছ, এখন পরের ষ্টেশনে নেবে যেও বুঝলে ?" নলিনী সম্মতি কিম্বা অসম্মতি কিছুই প্রকাশ করিল না। সুরমা বলিল—"হ্যাঁ তুমি নামবে—আর

ততক্ষণ পর্য্যন্ত যদি ভদ্রভাবে না থাকতে চেষ্টা কর, তা'হলে তোমাকে জানালা দিয়ে আমি একেবারে নীচে ফেলে দেবো, ব'লে দিলুম কিন্তু! আমি চেনও টানবো না, কেলেঙ্কারীও করবোনা—সোজা নীচে—"

নলিনী অবিশ্বাস ভরে হাসিয়া বলিল—"অত জোর আপনার আছে বুঝি?"

"আছে কি নেই, সে আমি জানি, তুমি যাচ্ছ কোথায়?"

"আমি যাচ্ছি ভুবনেশ্বরে সেখানে আমার মাসী থাকেন—আপনি?"

"আমি চেঞ্জে যাচ্ছি—"

"চেঞ্জে কি রকম একলা, সঙ্গে লোকজন নেই, বিছানা বাক্স—"

"অত প্রশ্ন করোনা—"

"কোথায় যাচ্ছেন?"

"যাচ্ছি পুরী—আচ্ছা pet, ঐ শরৎ ঘোষ লোকটাকে তুমি চেনো?"

"হ্যাঁ চিনি বৈ কি! সে তো আমাকেই উঠিয়ে দিতে এসেছিল—" তারপরে একটা অর্থ পূর্ণ হাসি হাসিয়া সে মাথা নত করিল—সুরমা বলিল—"হাসলে যে?"

সলজ্জ ভাবে নলিনী বলিল—"সে আপনার কথা অনেক কিছু বলেছে আমাকে, তা আমি তো সে সব প্রকাশ করি না—আমায় আপনি যতটা ঘৃণা করেন, দূর দূর করেন, তবুও আপনাকে কত ভালবাসি, কাছে আসি—"

বিরক্তি ভরে স্বরে সুরমা বলিল—"বাজে কথা রাখো, সে কি বলেছে?"

অপাঙ্গে কটাক্ষ করিয়া নলিনী হাসিয়া বলিল—"সে সব বলা যায় না—"

সুরমা আবার বিরক্ত হইল—

"আঃ, ফাজলেমি রাখো ঠিক ক'রে বলো—"

"সে সব যাচ্ছেতাই কথা, হাজার খারাপ হই—আমার কিন্তু অতটা ভাল লাগে না। সে যখন সেবারে তেলের খনিতে গেল আপনার স্বামীর সঙ্গে দেখা করতে—"

সুরমার বুকে খানিকটা রক্ত হঠাৎ ঢেউ খেলিয়া গেল—সে বলিল—"কি বললে? সে কোথায়—কবে গিয়েছিল শরৎ? ঠিক ক'রে গুছিয়ে বল না—"

"এই তো বলছি। আমাকে সঙ্গে নেবার জন্য—"

"আঃ চুলোয় যাও তুমি—কবে শরৎ গিয়েছিল?"

"সে তখন আমি আপনাকে চিনি না—সে অনেকদিন হবে—"

সুরমা ভাবিতেছিল এ দিকে নলিনী অনর্গল কি কি বকিয়া গেল, কিছুই তখন সে শুনিতেছিল না। এমন সময়ে ষ্টেশনে গাড়ী থামিল, নলিনী ভয়ে ভয়ে উঠিয়া সুরমার দিকে চাহিতে—সুরমা বলিল "আচ্ছা—এর পরেরটায় যেও।"

সে পরম আপ্যায়িত হইয়া আবার বসিল!

সুরমা বলিল—"সে কেন গিয়েছিল বলতে পারো?"

"খুব পারি, সে আপনার কথাই বলতে গিয়েছিল—"

"আর কারো নাম আমার নামের সঙ্গে জড়িত করেছিল কি?"

নলিনী একটু ভাবিয়া বলিল—"হ্যাঁ, কে একজন অরিন রয়, কিন্তু নিজের নামটাই বেশী বলে সে। তাঁর স্ত্রীটি আরো সরেস।"

"কে কণিকা?" সুরমা আগ্রহভরে বলিল—

"হ্যাঁ তিনি। তিনিও অনেক কিছু বলেন।"

"সে এখন কোথায় বলতে পার?"

"তিনি তো মাঝে ঝগড়া ক'রে বাপের বাড়ী চ'লে গিয়েছিলেন, আপাততঃ ফিরে এসেছেন আবার।" সুরমা আবার অন্যমনস্ক হইয়া চুপ করিয়া রহিল। নলিনী বলিতেছিল "দেখুন, ও শরৎ ঘোষকে আমারও ভাল লাগে না, সে আপনার নামে যত কিছু বলেছে,—আমি একটুও কিছু বিশ্বাস করিনি, আর সেই জন্যই আমার রাগ হয়েছিল আপনার স্বামীর উপর, কেন তিনি আপনার স্বামী হ'য়ে আপনাকে চিনলেন না, যে-সে এসে একটা কথা ব'লে গেল, আর তাই শুনে তিনিও বিশ্বাস করলেন। আপনি মিছিমিছি আমার উপর রাগ করেন, কিন্তু আমি আপনার জন্য feel করি ব'লেই আপনাকে যা তা বলি, শেষে কিন্তু বুঝি বলাটি অন্যায় হয়ে যায়।"

সুরমা ঈষৎ হাসিয়া বলিল—"বোঝ তো ভালই কর pet! তুমি আলাদা! কিন্তু স্বামী—তার অধিকার আছে, যার তার কথা শুনে স্ত্রীকে শাস্তি দেবার, আর আমি যদি তাদের বলতে না দিতুম, তা'হলে তারা কখনো বলতে সাহসও করতো না। কই হাজার খারাপ লোক হ'লেও তো মিসেস সিংহের নামে—মিসেস ঘোষের নামে কিছু বলে না! আমার নামেই বা বলে কেন?"

"তা যাই বলুন—আমার কিন্তু আপনার উপর অটল ভক্তি!"

সুরমা তাহার কথা শুনিয়া হাসিল, বলিল—"দেখো, আজ শরৎ তোমাকে আমাকে একলা এই ট্রেণে উঠে চলে আসতে দেখেছে। ফলে কি হবে বলতে পারো?"

চমকিয়া নলিনী বলিল—"কি হবে?"

"সে যা তা একটা রটাবে, বুঝতে পারছ?" মাথা নাড়িয়া নলিনী বলিল—"বুঝতে পারছি। তাই আপনি এত রাগ করেছিলেন? তাহলে এখন কি করা যায়?" নলিনী হতাশ ভাবে বাহিরের দিকে চাহিয়া বলিল—"আপনি তখন বলেছিলেন আমাকে ফেলে দেবেন, কিন্তু আমার নিজেরই লাফ দিয়ে পড়তে ইচ্ছা হচ্ছে—"

সুরমা একটু হাসিয়া বলিল—"তুমি লাফ দিলে লাভ? তুমি আমাকে সেদিন বিয়ে করবে বলে তোমার বাড়ীতে ডাকছিলে না?"

নলিনী অপ্রতিভ ভাবে "সে আলাদা কথা—কিন্তু তা'হলে যে আগে convert হ'তে হয়—"

সুরমা হাসিয়া বলিল—"pet সব সময়ে হাসিও না, ভাল লাগে না, খাপও খায় না, যাক্ তুমি এক কাজ কর। ভুবনেশ্বরে গিয়ে আর কাজ নেই।"

আশ্চর্য্য হইয়া নলিনী বলিল—"কেন?"

"শোন বলছি, পরের ষ্টেশনে নেবে পরের ট্রেণে তুমি কলকাতায় ফিরে যাও, এবং আমাকে দেখেছ কি ট্রেণে উঠেছ সে কথা ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ করোনা। সকলের সঙ্গে বেশ স্বাভাবিক ভাবে দেখা সাক্ষাৎ কর; তারপরে ইচ্ছে হয় আর একদিন ভুবনেশ্বরে চলে যেও—"

"কিন্তু শরৎ যখন বলবে আমাকে গাড়ীতে তুলে দিয়েছে ষ্টেশনে পৌঁছে দিয়েছে?"

"ওঃ তুমি বলে দিও হঠাৎ কোন কাজে আবার বাড়ী ফিরে গেছে অথবা যা খুসী হয় বলো। বুঝলে pet? আমার কথা রাখবে?"

নলিনী ইতস্ততঃ করিয়া বলিল—"আচ্ছা, তা না রেখে আর কি করি বলুন, আপনি যখন বলছেন। আপনি তাহলে কাউকে না জানিয়ে যাচ্ছেন না?"

"হ্যা তাই—। আর দেখো, এর পর আর আমাকে দেখবার চেষ্টা করোনা, আমি কিছুদিন নির্জ্জনে থাকতে চাই—,'

ক্ষুণ্ণস্বরে নলিনী বলিল—"দেখাও করবেন না?"

সুরমা চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—"না, করবো হয়তো পরে—কিন্তু এখন নয়। তোমাকে আমি খুব স্নেহ করি—জেনো, অন্ততঃ তোমার খোঁজ নিয়ে আমি তোমাকে এক দিন ডেকে পাঠাবো তখন এসো। এখন নেমে যাও ষ্টেশন এলো।"

নলিনী বাধ্য শিশুর মত সজল চোখে নামিয়া গেল। সুরমা দুই দরজার চাবী বন্ধ করিয়া দিয়া বাঙ্কের উপর ক্লান্ত ভাবে শুইয়া পড়িয়া ভাবনার অন্ধকারে নিজেকে হারাইয়া ফেলিল।

শরৎ তাহার কথা অনেক কিছুই বলিয়া রাজীবের মন বিষাক্ত করিয়া তুলিয়াছে। নলিনী বলিয়াছে যার তার কথা শুনিয়া সে বিশ্বাস করিল কেন? কিন্তু শুধু তাই কি? সুরমাও তাহাকে শরতের কথার বিশ্বাসযোগ্য উপযুক্ত অসংখ্য প্রমাণ নিজে যোগাইয়া দেয় নাই কি? মিথ্যার মোহ পড়িয়া অনর্থক সে নিজের জীবন অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়া আজ স্বামী,পুত্র, গৃহ ছাড়িয়া কোন অনির্দ্দিষ্ট সাগরে ঝাপ দিতে চলিয়াছে! ওদিকে আর একজনারও জীবন ব্যর্থ করিয়া দিয়া! আর কি হয় না? আর কি ফিরিয়া যাওয়া যায় না?—রাজীব তাহার চিঠি পাইয়া কি করিয়াছে? প্রণব কাল কি করিবে? কাল প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে তাহার কলঙ্কের কথা শত তীক্ষ্ণ শরের মত কাহার বুকে বিঁধিবে? হয়তো বিঁধিবে না—রাজীব হয়তো সুখীই হইবে—কে জানে?

সুরমার নূতন নিঃসঙ্গ জীবনের দিনগুলা কাটিয়া যাইতেছিল। কতদিন কাটিয়া গেল, অনেক দিন বুঝি?

ছয় মাস না এক বছর চোখের সম্মুখ দিয়া দেখিতে না দেখিতে, বুঝিতে না বুঝিতে, ধরিতে না ধরিতে বিদ্যুৎ গতিতে একটা মুহূর্ত্তের মত চলিয়া গেল—সুরমা অবাক বিস্ময়ে একদিন তাহাই ভাবিল।

প্রথম দিকে তাহার দিন কাটিত শঙ্কায় উদ্বেগে—ভয়ে ভয়ে, এই বুঝি কে আসিল, কে ধরিয়া ফেলিল, এই ভয়ে সে নিজেকে লুকাইয়া বহু স্থান ঘুরিল। পুরীতে দুইদিন মাত্র থাকিয়া সেখান হইতে মাদ্রাজ, তারপরে দক্ষিণের অনেকগুলি স্থান ঘুরিয়া ঘুরিয়া কিছুদিন কাটাইল—ঠিক বালকদের মত লুকোচুরী খেলার নেশায় মাতিয়া, একটা পলাইয়া বাঁচিবার, লুকাইয়া থাকিবার উত্তেজনা তাহাকে এদেশ হইতে ওদেশ ঘুরাইয়া লইয়া ফিরিতেছিল পাগলের মত। তারপরে একদিন সে যখন ক্লান্ত হইয়া ভাবিল তাহাকে কেহ ধরিতে চাহিতেছেনা, সে সমুদ্র গর্ভে ডুবিয়া লুকাক্, অথবা পর্ব্বত কন্দরে নিজেকে সমাবিষ্ট করিয়া রাখুক, কেহ তাহার জন্য ব্যাকুল নয়, কেহ তাহাকে খুঁজিতে চায় না—তখন তাহার মনে নিজেকে ধরা দিবার ইচ্ছা প্রবল হইয়া উঠিল। সে সমস্ত সঙ্কল্প হারাইয়া মনে মনে সিদ্ধান্ত করিল আবার কলিকাতায় ফিরিয়া যাইবে। প্রণবের জন্য প্রাণ তাহার হাহাকার করিয়া কাঁদিয়া উঠে। আর রাজীব—? তাহারও জন্য নহে কি? তাহারা সকলে তাহাকে ভুলিয়াছে। তাহার বাপ মা সকলেই ভুলিয়াছে। আর প্রণবকে হয়তো তাহারা তাহাকে উদ্দেশ করিয়া তাহার স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছে, ঊর্দ্ধদিকে। যে সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য সে এতদূর ছুটিয়া আসিয়াছে, ঠিক সেই আশঙ্কায় তাহার প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল কেন? মনে হইল না গো না এত শীঘ্র সে মৃত্যুকে বরণ করিয়া লইতে চাহিয়াছে কেন? বাঁচা তো তাহার হয় নাই—জীবনে তাহার কিছুই হয় নাই, আরো চায় সে জীবন,—যৌবন,—স্বামী, মাতৃত্ব,, সব চায়! এত শীঘ্র সব শেষ হইয়া যাইবে কেন? সে বাঁচে নাই, বাঁচে নাই—সুদীর্ঘ জীবনের বৎসরগুলি তাহার একেবারে মিথ্যা হইয়া গিয়া—একটা দুঃস্বপ্নের ভিতর দিয়া কাটিয়া গিয়াছে—।

কলিকাতা—শত স্মৃতি-ঘেরা তাহার সুখের রাজ্য—দুঃখের সিংহাসন,—তবু সেখানে গেলে আড়াল হইতে, যদি কখনো সে তাহাদের কাহাকেও দেখিতে পায়—একবার চোখের দেখা শুধু—কিন্তু ভয় হয়,—লজ্জা হয়—তাহাতেই বা লাভ কি? দরকার কি? তাহারা তাহাকে তো চায় না।

তাহার চক্ষের সম্মুখ হইতে আলো হাসির ঔজ্জ্বল্য, তাহার উচ্ছৃঙ্খল জীবনের সমস্ত উন্মাদনা—জ্বলিয়া উঠিয়া চির-নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছে—পৃথার মত তাহারও মনে হয় সব ফাঁকি!—

কেন সে আসিল—একটা মিথ্যা খেয়ালের বশে, অনাবশ্যক প্ররোচনার বশবর্ত্তী হইয়া—। মীরাকে সে একদিন নিজেই উপদেশ দিয়াছিল—দুঃখকষ্ট বরণ করিয়া নিজের কর্ত্তব্য করিয়া যাওয়াই সংসারে নারীর উপযুক্ত কাজ—সেইখানেই নারীর মহত্ত্ব—মনে করিয়া সে হাসে। মানুষ কি? নিজে মুখে অনেক কিছু বলে কিন্তু কার্য্যকালে তাহার কিছুই মনে হয় না। মানুষ এত অব্যবস্থিত মন লইয়া কেন থাকে—?

জীবনের সমস্ত দিনগুলির হিসাব নিকাশ করিয়া দেখিয়া সে একদিন চমকিয়া উঠিল। আর বাকি কতদিন? জীবন ফুরাইয়া আসিল প্রায়, কিন্তু পিছনে চাহিয়া দেখিলে সে দেখে সব অন্ধকার, কুজ্ঝটিকার প্রারম্ভে মসীঘন মেঘের মত তমোময়! কি করিয়াছে সে? জীবনের সুন্দর, শুভ্র সোনার বাঁধাই পাতা গুলিতে সে শুধু কালি ছিটাইয়া কদর্য্য করিয়া রাখিয়াছে মাত্র—আর কিছু করে নাই—!

সে ভুল বুঝিয়াছিল। অরিন তাহাকে শান্তির অবসান আনিয়া দেয় নাই, সে তাহাকে দিয়াছে—তাহার ভিতরে জাগাইয়া তুলিয়াছে—শান্তির তৃপ্তি,—তৃপ্তির আকাঙ্ক্ষা গৃহ সুখের প্রবল ইচ্ছা—। কতগুলা কি আপশোষ হয়। মনে হয় কেন সে একদিন রাজীবকে সমস্ত কথা বলিল না। আবার কোথা হইতে কে যেন বলিয়া উঠে—কই সেও তো তাহাকে কোনদিন ডাকিয়া লইতে চায় নাই—তবে?

সেতুবন্ধ রামেশ্বর! ঠিক সাগর-সৈকতে বালুর কোলে

সুরমা একটী বাড়ী ভাড়া করিয়া সেইখানেই কিছুদিন বাস করিতেছিল। মন প্রাণ তাহার আকুল হইয়া লুটাইয়া পড়িয়া মিশিয়া যাইতে চায় ঐ সমুদ্রের বেলা-ভূমির বালুকণাগুলির সহিত,—উহাতেই বুঝি সুখ আছে, নিবৃত্তি আছে।

স্থানটী তাহার ভাল লাগে নির্জ্জন বলিয়া, এবং পরিচিত কাহাকেও দেখিবার আশঙ্কা নাই বলিয়া। রোজ সকাল বিকাল সে নীল সাগরের ধূসর বালুতটে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে—। তাহার ভাল লাগে। ধীর স্থির ঐ সাগর চঞ্চল নয়, অস্থির নয়, অধীর নয়, সমস্ত বাসনা কামনার নিবৃত্তি হইয়া তাহা যেন একেবারে সৌম্য, প্রশান্ত হইয়া গিয়াছে! তবু— তবু মাঝে মাঝে কি চায় সে? উদাস হাওয়া হুহু করিয়া চলিয়া যায়, কি চাহিয়া? প্রাণের কি গোপন বার্ত্তা জানাইয়া? সন্ধ্যা আসিয়া চলিয়া যায়, রাত্রি আসে—সে তবু বসিয়া থাকে—। একটী স্থানীয় স্ত্রীলোক তাহার কাছে থাকিয়া কাজ করে, সে আসিয়া রোজ তাগিদ দিয়া তাহাকে লইয়া যায়—বলে "এ সাগর ঠাণ্ডা, জলজন্তুরা রাত্রে সব পারে ওঠে"

সেদিনও সে বসিয়াছিল, সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। সাগরের জল গাঢ় নীল উত্তরীয় উড়াইয়া দিয়া আপন হরষে আপনি দুলিতেছিল। সন্ধ্যার ধূসর ছায়ায় প্রায় মিলিয়া গিয়া একটী মূর্ত্তি ধীরে ধীরে তাহার দিকে অগ্রসর হইয়া আসিতেছিল,—আরো কাছে, কাছে! সুরমা প্রথমে অন্যমনস্কভাবে দেখিল, তারপরে মনোযোগ দিয়া দেখিল, তারপরে সভয়ে দেখিল কে এ মূর্ত্তি? স্ত্রীলোক—একে? সুরমা বিদ্যুদ্বেগে উঠিয়া সরিয়া যাইবার উপক্রম করিতে সে বলিল—"দিদি সরে যেও না, আমি—"

সুরমা শুষ্কস্বরে বলিল—"তুমি কে? আমি তো তোমাকে জানিনা—"

উত্তর হইল—"আমি মিনতি—"

নিমেষে তাহার অবশ শরীর যেন বালুর ভিতর প্রোথিত হইয়া গেল। সমস্ত দেহ ঘামিয়া উঠিল, সে বজ্রাহত হইয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, কথা বলিতে পারিল না।

মিনতি বলিল—"ঐ কি তোমার বাড়ী—চল দিদি কথা আছে।"

বিহ্বলতা কাটিয়া গেলে সুরমার অত্যন্ত রাগ হইল, আত্মাভিমান গর্জ্জন করিয়া উঠিল, সেই মিনতি আজ আসিয়াছে তাহাকে দেখিয়া বিদ্রূপ করিতে—না তাহার সুখের বারতা তাহাকে জানাইয়া ব্যঙ্গ করিতে? মিনতি, যে তাহার সমস্ত জীবন আজ ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে! যে তাহাকে টানিয়া আনিয়াছে এইখানে—মিনতি বলিল—"আমার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করো দিদি।—তারপরে আমার কথা শোন—"

কণ্ঠে জ্বালা মিশাইয়া সুরমা বলিল— "তুমি এখানে কেন এসেছ?"

"সব বলছি ঘরে চল।"

বাড়ীর ভিতর গিয়া সুরমা নিজের চোখকে বিশ্বাস করিতে পারিলনা। সে দীপের আলোকে দেখিল. এতো মিনতি নয়! এযে বিনীতা দেবী! সে মৃদু হাসিয়া বলিল—"আমিই বিনীতা—সেই কথাই বলতে এসেছি।" বিনীতা যাহার ছবি সে সেদিনও কাগজে দেখিয়াছে! বিনীতা—নারী-মণ্ডলীর আদর্শস্বরূপিনী বিনীতা দেবী,—মিনতি! সুরমা কি পাগল হইয়াছে? অথবা ঐ স্ত্রীলোকটাই পাগল?

বিস্তৃত খোলা বারান্দায় কতগুলি বেতের চেয়ার সাজানো ছিল, সুরমা নিম্নস্বরে "বোস" বলিয়া নিজে বসিয়া পড়িল। মিনতি বসিয়া বলিল—"দিদি আমার সব কথা আজ তোমায় বলবো। বলবার বেশী নাই, বলবার মত বিশেষ কিছু আমার জীবনে ঘটেও যায় নি —সেই জন্য দুএক কথায় সব বলে যাব। ভগবানের আশীর্ব্বাদে আমার যশ মান অনেক কিছুই হয়েছে—কিন্তু সে সবই আমার কাছে অসার ব'লে মনে হয়েছে এতদিন, মনে হয়েছে এ সবের জন্য ঋণী আমি তোমার কাছে, আর যতদিন তোমাকে সব ব'লে তোমার ক্ষমা না নিয়েছি—ততদিন আমার এসব কিছুই প্রাপ্য নয়!

কোনদিন কার সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল, মনে নেই, সেই ছয় বৎসর বয়সে, তারপরে ক'মাস পরে তিনি মারা যান। শৈশব কৈশোর দুঃখ দারিদ্র্যের ভিতর

বাপের সঙ্গে কাটিয়েছি সেই এক পাড়াগাঁয়ের ভিতর —সেই সময় বাবা আমার জীবন গ'ড়ে তুল্‌বার জন্য সংস্কৃতে নানা রকম শিক্ষা দিতে লাগলেন।—তারপরে একদিন বাড়ী আর জমিটুকু নিলাম হ'য়ে গেল। বাবা আমার হাত ধ'রে গিয়ে উঠলেন—তোমার বাড়ীতে। তখনো তুমি আসোনি, এরপর আর আমার কিছু না বল্‌লেও চলে, কারণ—বোধ হয় তোমার সব জানা আছে! তোমার স্বামীকে আমি দেবতার মত ভক্তি করেছি, ভালোবেসেছি—সেকথা বল্‌তে আজ আমার লজ্জা নেই—কারণ স্বামী বলে আর আমি অন্য কাউকে চিনিনা, জানিনা। বাবা মারা যাবার পর কোথায় গিয়ে পড়তুম, কি হ'ত কে জানে। কিন্তু আজ আমার জীবন এ ভাবে সার্থক ও ধন্য ক'রে দিয়েছেন শুধু তিনি! তোমার বিয়ের পর থেকে আমার মনে একটা দ্বিধা ভাব এসে ঢুকেছিল। তবে ভাবতুম কি জানো? আমি একটী সামান্য স্ত্রীলোক—তুমি রাজরাজেশ্বরী, তোমার কৃপা-প্রার্থিনী হ'য়ে পড়ে থাকায় আমার লজ্জা কি? তাই যা পেতুম তা তোমারই দান ভেবে মাথা পেতে নিতুম! তোমাকে একদিন এসে প্রণাম করবারও ইচ্ছে ছিল—কিন্তু সাহস হয়নি, তাই ইতস্ততঃ ক'রে দিন কেটে গেল। তোমার খোকা হ'ল, দেখতে ইচ্ছে হয়েছিল খুব—কিন্তু আসিনি—সেই কারণেই! তারপরে দ্বিধা ভাবটা আমার মনের উপর খুব বেশী ক'রে চেপে বসলো! আমি দেখলুম মিথ্যে আমি—একটা ব্যবধান সৃষ্টি ক'রে রেখেছি তোমার ও তোমার স্বামীর ভিতরে। তোমার স্বামী, তোমার ছেলে, তাদের বংশের উজ্জ্বল নামে কতগুলো ছাই ছড়িয়ে দিয়েছি আমি—এই কথাই ভাবছিলুম—। তখন তোমার খুব অসুখ—তারপর একদিন তাঁর অনুমতি নিয়ে বেশ শান্ত ভাবে আমার পথ বেছে নিলুম—তিনিও সেদিন বললেন—"ভেবে দেখেছি সুরমার উপর অন্যায় করা হচ্ছে—!"

তারপর থেকে তাঁর সঙ্গে আমার আর একটী দিনের জন্য দেখা হয়নি। জীবনে আর দেখা করবোও না এই প্রতিজ্ঞাই করেছি—আমরা দুজনে!—আমার ভাই ছোট বেলা থেকে নিরুদ্দেশ হয়ে যেদিন ফিরে এলো সর্বাঙ্গে কলুষের কাদা মাটি লাগিয়ে তাকেও ধুয়ে মুছে মানুষ করে দিয়েছেন তিনি, আজ সে বিয়ে করে সুখী হয়ে সভ্য সমাজে ঘুরে বেড়াচ্ছে শুধু তাঁরই দয়ায়!"—

সুরমা হঠাৎ প্রশ্ন করিল—"কাকে বিয়ে করেছে?"

"মীরা ব'লে একটী মেয়েকে—তিনি আমাকে কিছু টাকা দিয়েছেন—তাঁর দান আমি নিয়েছি—এবং তা পরের কাজে ব্যয় করতে চেষ্টা করছি—। নিজের খাওয়া পরা চ'লে যায় যা নিজে খেটে উপার্জ্জন করি তা'ই দিয়ে—। তাঁর বিধবাশ্রমে আমি কাজ ক'রে বেতন স্বরূপ কিছু পাই।—এই যে বল্‌লুম সঙ্কোচ-ভয়ে আমি তোমার কাছে আসতে পারিনি—কিন্তু সেদিন পণ ক'রে বেরোলুম তোমার সঙ্গে দেখা করবো ব'লে—কিন্তু তোমার বাড়ীতে গিয়ে শুনলুম তুমি, চেঞ্জে এসেছ! এক বছর ধ'রে কি রকম চেঞ্জ! সন্দেহ হ'ল, তারপরে খোঁজ নিতে লাগলাম—ভারতের প্রায় সব বড় বড় তীর্থগুলোতে আমার সেবা-সমিতি আছে, সেইগুলো দেখবার জন্য আর তোমারও খোঁজ নেবার জন্য আমিও একদিন বেড়িয়ে পড়লুম—প্রথম পুরী থেকে তোমার সন্ধান পাই!—প্রায় চার পাঁচ মাস ধ'রে আমিও ঘুরছি—ঘুরে ঘুরে অনেক কষ্টে আজ তোমাকে পেলুম দিদি—যদি মনে কোন দুঃখ নিয়ে চ'লে এসে থাকো—তবে আমাকে ক্ষমা ক'রে তোমার স্বর্ণ-পুরীতে ফিরে যাও। সেখানকার পাপ পঙ্কিলতা অনেকদিন আগে থেকেই তো বিদেয় হয়েছে—আর তোমার স্বামী—এক কথায় দেবতা,—শুনেছি তাঁর শরীরও ভালো নয়—আমার প্রার্থনা তুমি ফিরে যাও—"

অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সুরমা বলিল—"মিনতি, তোমার উপর আর আমার কোন ক্ষোভ নেই—আমি চল্‌লুম—তাঁরই কাছে—"

* * * *

সুরমার মনের সঙ্গে গাড়ীও ছুটিয়া চলিতে পারিতেছিল না—সব চিন্তা সে ভুলিয়া গিয়াছে—সব ভাবনা জমিয়া গিয়াছে—শুধু মনে হইতেছিল হেলায় কি হারাইয়া বসিল সুরমা—!—আর কি সে তাহা ফিরিয়া পাইবে? আর ভিক্ষাপাত্র লইয়া সে যখন তাহার সম্মুখে দাঁড়াইবে তখন কি বলিবে সে?—

কলিকাতার কাছাকাছি একটী ষ্টেশন—সে দেখিল

নলিনী তাহার গাড়ীর সম্মুখ দিয়া যাইতে যাইতে হঠাৎ তাহাকে দেখিয়া থামিয়া পড়িল,—আনন্দে বিহ্বল হইয়া সে বলিল—"আপনি কেমন আছেন—কোত্থেকে ? কতদিন পরে—কোথায় যাচ্ছেন ?"—

সুরমা কোন কথার উত্তর না দিয়া বলিল—"এইখানে উঠে এসো নলিনী।"

নলিনী পরম আনন্দিত হইয়া উঠিয়া বলিল—"কতদিন পরে দেখা, আমি কয়েকদিন পরেই ফিরে এসে পুরী গিয়ে আপনার খোঁজ করলুম কিন্তু পেলুম না—কোথায় ছিলেন ?"

"সে সব পরে বলছি pet, আগে বল কলকাতার খবর কি ?"

একমুখ হাসিয়া নলিনী বলিল "কলকাতার খবর সব ভাল।"

"তুমি আমার কথামত ফিরে গিয়েছিলে ?"

"ফিরে যাইনি ? বলেন কি ? আপনাকে কথা দিয়ে গেলুম! কয়েকদিন ছিলুমও! চারিদিকে খোঁজ নিতে বেরোতুম প্রায়—আমি কিন্তু এ বিষয়ে খুব expert—জানেন একবার আমি আগে একবার—

"খোঁজ ক'রে কি জানলে শোনবার জন্য আমি বড় ব্যাকুল হয়েছি pet !"

"ও শরৎ ঘোষ খুব জব্দ হয়েছে—"

"কিসে ?"

"সে এমন খারাপ লোক—সেই রাত্রেই আপনার স্বামীকে গিয়ে সব বলেছে যে আপনাকে আমার সঙ্গে এক গাড়ীতে চ'লে যেতে দেখেছে—"

রুদ্ধশ্বাসে সুরমা বলিল—"তার পর !"

"তারপর" নলিনী খুব হাসিতে লাগিল—"তারপর আর কি! তিনি নাকি বললেন—হাঁ৷ তিনি changeএ গেছেন—"

সুরমা কোন কথা বলিতে পারিতেছিল না, সে ক্ষোভে দুঃখে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল! জগতের সমক্ষে তাহার মান সম্মান রক্ষা করিয়াও রাজীব তাহার সম্বন্ধে কোন ধারণা পোষণ করিয়া আছে ? এ কথা যে মিথ্যা সে তাহাকে যখন বলিবে তখন সে বিশ্বাস করিবে কি ?

নলিনী বলিল—"আগে মিঃ বোসের উপর আমার খুব রাগ হ'ত, কিন্তু ক্রমেই লোকটার উপর আমার ভক্তি বেড়ে গেছে—শরৎ ঘোষ আর তার স্ত্রীটি আপনার সঙ্গে শত্রুতা করতে কম করেনি—শুনেছি মিসেস ঘোষও অনেক কথা বলেছে—তা আমি এই কথা শুনে ভাবলুম—মিঃ বোস মুখে যাই বলুন না কিন্তু নিজের মনে তো জেনে রাখলেন—তাই ভাবলুম যা থাকে বরাতে একদিন গিয়ে সব বলে আসি, কিন্তু সাহস হলোনা—ব্যগ্রভাবে নলিনীর একটি হাত চাপিয়া ধরিয়া সুরমা বলিল—"কেন গেলে না pet! কেন বলে এলে না আমি একাই গেছি—তুমি আমার সঙ্গে যাওনি—"

"ঐ যে বললুম ভয়ানক ভয় হ'ল, তা আপাততঃ যাচ্ছেন কোথায় ?"

"কলকাতায়—"

"কার কাছে ?"

"আমার স্বামীর কাছে—"

"কিন্তু তিনি তো সেখানে নেই—"

"নেই—" কণ্ঠস্বরে হতাশ ভরিয়া সুরমা আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল—"নেই ? তবে কোথায় ?"

"তিনি সকলকে নিয়ে বোম্বাই চ'লে গেছেন—"

"কেন ?"

বিদেশ ভ্রমণের জন্য মালোজা জাহাজে—তবে কোন দিন sail করছে তা জানিনা—শুনেছি, উইল টুইল ক'রে, সমস্ত সম্পত্তির বিলি ব্যবস্থা ক'রে তিনি চলেছেন—"

সুরমা বিস্ফারিত চোখে নলিনীর দিকে চাহিয়া বলিল—"নলিনী তুমি আর শরৎ ঘোষ মিলে শেষে এই করলে ?—কেন করলে ?"

নলিনী একটু বিস্মিত হইয়া সভয়ে বলিল—"কিন্তু আমার দোষ কি আমি তো কিছু করিনি—"

ঠোঁটে ঠোঁট চাপিয়া সুরমা স্থির হইয়া বসিয়া রহিল—সব কিছুর সমাপ্তি কি এই ভাবে হইয়া যাইবে—জীবনে দেখা কি হইবে না ?

সেইদিন কলিকাতা পৌছিয়াই সুরমা বোম্বাই উদ্দেশে ছুটিল। শুধু একটিবার সে তাহাকে দেখিতে

চায়, দেখিয়া সব কথা বলিতে চায় তাহাকে—এত বড় ভুল মানুষে করে? কেন সে চিনিল না—কেন বুঝিল না—দারুণ অনুতাপের যন্ত্রণায় সে অস্থির হইয়া উঠিতেছিল—আর আকুল হইয়া টাইমটেবল ও ঘড়ির দিকে দেখিতেছিল বার বার—আর কতদূর—

বোম্বে—। কোথায় রাজীব কোথায় কে! সুরমা সাধ্য মত খোঁজ করিয়া জানিল—পূর্ব্বদিন মাসোজা জাহাজ বন্দর ত্যাগ করিয়াছে, যাত্রীদিগের ভিতর ছিল রাজীব বোস, তিনটি বালক বালিকা, গভরনেস, আয়া ও বেয়ারা।

সুরমা তাজমহল হোটেলের সুসজ্জিত কক্ষতলে লুটাইয়া পড়িল, ইচ্ছা হইতেছিল ঐ চঞ্চল সমুদ্রে সে ঝাপ দিয়া পড়িয়া সকল যন্ত্রণার অবসান করে। কত কি বলা হইল না, শুনা হইল না, জীবনে আর কি দেখা হইবে? আর কি সে অবসর মিলিবে? ফাঁকিতে পড়িয়া, তাহাকে না চিনিয়া যে ভুল করিয়া বসিয়াছে—আর সেই ভুল সংশোধন করিবার কোন উপায় কি রহিল না? তাহার সারা প্রাণ মন ভাঙ্গিয়া গুঁড়া হইয়া পড়িতে চাহিতেছিল ব্যথায় যন্ত্রণায় অনুতাপের তীব্র জ্বালায়।

সারাদিন কাটিয়া গেল—সে ঠিক করিল সেও তাহার পিছনে ছুটিবে—তাহাকে বাহির করিবে—দেখা করিবে—করিয়া সব বলিয়া, ক্ষমা চাহিবে—তারপরে সে যদি আবার তাহাকে গ্রহণ করে তাহা হইলে? সব তো শেষ হইয়া যায় নাই এখানে—এখনো—আশা থাকিতে পারে না কি?

সন্ধ্যার সময়ে সে মুখ ধুইয়া নিজেকে একটু সংবৃত করিয়া লইল—একবার বাহির হইয়া তাহার নিজের যাত্রাপথ ঠিক করিয়া লইবে—মন তাহার কাঁদিয়া উঠিতেছিল বার বার—

ওগো কত গভীর মর্ম্মব্যথা বুকে নিয়ে দেশত্যাগী হ'লে কে জানে?

ধীরে ধীরে সে সিঁড়ি বাহিয়া নীচের দিকে নামিতেছিল, এমন সময় দেখিল একজন উপরে উঠিয়া আসিতেছে—সুরমা তাহাকে দেখিয়া চমকিয়া উঠিল—ইচ্ছা হইল পিছন ফিরিয়া পলায়ন করে কিন্তু সে ব্যক্তি তখন তাহার নিকটে আসিয়াছে—এবং দুই চক্ষে বিস্ময় ভরিয়া তাহার দিকে চাহিয়া আছে! তাহার মুখে ক্রো ও বিরক্তি সুস্পষ্ট। সুরমা তাহার সে দৃষ্টির সাম নতমস্তকে দাঁড়াইয়া রহিল—সে বলিল—

"তুমি?—আশ্চর্য্য! কোথেকে এলে? এ মুখ আ দেখাতে এলে কেন? গঙ্গার জলে ডুবে ম'রতে পারনি এদিকে চ'লে এসো আমার ঘরে, তোমার স কথা আছে—।" বিচারকের সম্মুখে অপরাধীর মত লজ্জা ভয়ে অভিভূত সুরমা মন্ত্রচালিত হইয়া তাহার পশ্চা নুসরণ করিল।—

একটী সুন্দর সজ্জিত কক্ষে প্রবেশ করিয়া অজি বলিল—"তুমি আমার বোন—কিন্তু তোমাকে আজ চিতায় তুলে দিতে পারলেও অত দুঃখ হ'তনা! সুরমা বাবা এখনো তোমার নামে পৃথিবীর সমস্ত প্রশংসার অলঙ্কার পরিয়ে দেন—। এই দেখতেই দেশে ফিরে এলুম।—এখানে তুমি কি করছ?"

"আমি এসেছিলুম দেখা করতে—"

"তা'হলে রাজীব চ'লে গেছে তা তুমি জানো?"

"জেনেছি পরে কিন্তু দেখা হয়নি—আজ এসেছি—"

"আমি তাকে পৌচাতে এসেছি—মালোজা কাল চলে গেছে, কিন্তু তুমি দেখা করতে এসেছ...কোন লজ্জায়, কোন সাহসে?—তোমায় ভাই বলে লজ্জায় ধিক্কারে আমারই মাথা—রাজীবের কাছে একেবারে মাটীতে লুটিয়ে পড়েছে—বংশ মর্য্যাদাকে এই ভাবে অপমান করলে।—তুমি কার মেয়ে কার বৌ সেকথা ভুলে গেছ?—"

সুরমা নতমস্তকে চুপ করিয়া বসিয়াছিল।

অজিত বলিল—"রাজীব আমাকে কিছু বলেনি—। যখন সেদিন এলুম তোমাদের দেখতে, এসে দেখলুম তোমাদের বাড়ীটী বিষাদে শুষ্ক হয়ে আছে—রাজীবকে জিজ্ঞাসা করলুম তোমার কথা—সে একটু চুপ করে থেকে উত্তর দিল, তুমি changeএ, কোথায় জিজ্ঞাসা করতে বললো, পুরী—কিন্তু এ কোনদেশী change সুরমা? পুরীর ঠিকানা চাইলুম সে দিতে পারলোনা—তুমি কি এতো change নিচ্ছিলে যে স্বামী তোমার গভীর ব্যথা বুকে চেপে অনির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য দেশত্যাগী

হ'ল, তোমার ছেলে ছোট ছোট চোখদুটী দিয়ে নীরবে তোমাকে ডেকে ডেকে—নিষ্ফল আগ্রহে তীরের দিকে চেয়ে তোমাকে খুঁজে খুঁজে ভেসে চলে গেল, তখন তুমি কি করছিলে, কোথায় ছিলে সুরমা ? তুমি কি ?—"

অস্ফুটস্বরে সুরমা বলিল—"আর বোলোনা—দাদা—"

"না আর বলবোনা—আর না ব'লেও তো পারি না—কিন্তু দোষ যদি কারো থাকে তবে সে দোষ তোমার—আমি জানি রাজীবের নয়—তুমি তাকে কত বড় ব্যথায় ব্যথিত করে তুলেছ—কি ক'রে তার সমস্ত গৃহসুখকে ব্যর্থ ক'রে দিয়েছ কে জানে ! সে কিছু না বললেও তার অন্তরের ভাষা মুখে যখন সুস্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠতো তখন আমারি বুকে তা এসে বাজতো খুব বেশী করে, তা শুধু তোমারি সৃষ্টি ব'লে—আর বেশী ব'লে তোমাকে লাভ নেই—হারালে যা তা আর ফিরে পাবে কি ?—এখন কি করবে ?"

"আমিও যাবো দাদা—সেই ব্যবস্থা ক'রে দাও—"

"তুমি যাবে—গিয়ে কোথায় খুঁজবে ? সে ঠিকানা দিয়ে যায়নি আর দেবেও না বোধহয়—আর সে ছেলেদের লণ্ডনে রেখে নিজে যে কোথায় ঘুরবে তাও জানিনা—এ্যাল্পস্ পাহাড়ের উপর অথবা নর্থ পোল বা সাউথ পোলে আজ যদি তাকে চ'লে যেতে শুনি তাহলেও আমি আশ্চর্য্য হবনা সুরমা—"

সুরমা দুইহাতে মুখ ঢাকিল—খানিকপরে বলিল—'ফিরবার কথা কিছু বলেছেন ?"

"হ্যাঁ বলেছে—ফিরবে নিশ্চয়—কিন্তু কবে তা সে নিজেই জানে না—"

সুরমা মনে মনে বলিল—তাহলে তোমার জন্যই অপেক্ষা করি—লোকালয় ছেড়ে দূরে, প্রকৃতির নিভৃত ছায়ায়। যদি কোনদিন মনে পড়ে তবে ফিরে এসো,—জীবনের শেষক্ষণে—এতদিনের সমস্ত ব্যর্থতা সার্থক ক'রে তুলতে পারবে না ? যতদিন পর্য্যন্ত না ফেরো ততদিন আমার কাটবে অপেক্ষার স্বপ্নঘোরে, তারপরে তুমি এনে দেবে পূর্ণ জাগরণ,—আর যদি না ফেরো তাহ'লে সেই স্বপ্নঘোরেই প্রাণ আমার জীবনের পরপারে গিয়ে থাকবে শুধু অপেক্ষায় অপেক্ষায়—

অজিত বলিল—"তার চেয়ে বাড়ী চল—যতদিন থাকো সেইখানেই থাকবে, বাপ মায়ের কোল সন্তানের জন্য সর্ব্বদা পাতা থাকে সুরমা—"

"না! সেখানে আমি যাব না দাদা—"

"তবে আর কোথায় যাবে ?"

"রূপনগরে সাগর বিলে—"

জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে অজিত চাহিল—সুরমা বলিল—ডুবে মরবো না—সেখানেই থকবো—"

একটু ভাবিয়া অজিত বলিল—"তাই যেও—তবে তার আগে বাপ মার সঙ্গে দেখা ক'র একবার, বাবার শরীর ভাল নয় তাঁরাও তোমাকে দেখতে চান—তাদেরকে যদি এই বয়সে এসব জানিয়ে কষ্ট দিতে না চাও তবে সেখানে তাদের কাছে কিছুদিন থেকে তোমার সাগর বিলে যেও—আমি তোমাকে বাধা দেব না—নিশ্চিন্তে বসে নিজেকে একটু ভাল ক'রে ভেবে দেখে শুধরে নিতে চেষ্টা ক'র সুরমা—যাতে সেদিন তোমার আসে—তাহলে তাকে যেন সার্থক, পবিত্র ক'রে তুলতে পার—সেই সাধনাই কর—রাজীব তোমার জন্য একটা চিঠি রেখে গেছে এই নাও—! আর আমি চললুম গাড়ী রিজার্ভ করতে—" অজিত নিঃশব্দে দরজা বন্ধ করিয়া চলিয়া গেল—সুরমা কম্পিত হাতে চিঠি খুলিয়া পড়িল—

"সুরমা,

তুমি এখন কোথায়, কিভাবে আছ তা জানিনা তবু আমার মন বলছে, তোমাকে কিছু বলে যাওয়া উচিত!

কি জানি এ চিঠি তুমি কবে কোনদিন, কোথায় ব'সে পাবে সে ছবি আমার মানসচক্ষে ফুটে উঠছেনা—তবে চিঠি তুমি পাবে তা জানি—এবং এও জানি একদিন বুঝবে—একদিন জানবে—আমি তোমার উপর অন্যায় করিনি,—এবং তোমাকে কখনো উপেক্ষাও করিনি—!

কেন যাচ্ছি তা জানিনা তবে দেশের লোককে প্রণবের বাপ মায়ের কথা একেবারে ভুলিয়ে দেবার জন্যই বোধ হয়—আমি দেশ ছেড়ে চললুম। তোমার জন্য অপেক্ষা করেছিলুম এতদিন—ভেবে দেখ কতদিন—কিন্তু তুমি

এলে না! ছেলেদের সেখানে রেখে আমি কোথায় যাবো ঠিক নেই—। একবার ইচ্ছে হয়েছিল তোমাকে দেখে যাই—কিন্তু মনে হ'ল তোমার পথে এসে কখনো দাঁড়াবো না—সেইজন্য দেখা কর্‌তে আর ইচ্ছে হলনা—তা'ছাড়া তুমি এখন কোথায় তাও জানিনা—অথবা আমার আর দেখা কর্‌বার অধিকার আছে কিনা তাই বা কে জানে—!

যাবার সময়, তুমি না চাইতেই ক্ষমা করে গেলুম! অন্তর আমার তোমাকে ক্ষমা ছাড়া আর কিছু করেনি। তুমি আমাকে যেদিন ছেড়ে গেলে,—সেদিন মনে প্রাণে সর্ব্বাগ্রে তোমায় ক্ষমা করেছি,—যেদিন তোমার বন্ধু কণিকা এসে আমার কাছে তোমার নামে কত কি কথা ব'লে গেল—সেদিন ব্যথা পেয়েও ক্ষমা করেছি—আর আজকেও করছি। আমি বড়, তুমি ছোট—তোমার জীবনের সমস্ত সুখ দুঃখ যে আমার কাছে গচ্ছিত ছিল সুরমা! আমার কাছে তুমি শত অপরাধী হ'লেও যে ক্ষমার্হ তাও কি বোঝনা?—

প্রথম অন্যায় ছিল আমারি তা আমি বুঝি—কিন্তু সব অন্যায় সব দোষ শুধরে নিয়ে যেদিন তোমার কাছে ফিরে এলুম—সেদিন দেখলুম আমার দেরী হ'য়ে গেছে। তোমাকে বাধা দিতে ইচ্ছে হ'লনা, তোমার পথ ছেড়ে দিয়ে আমি নিজে স'রে গেলুম অন্তরালে। তবে—তোমার কাছ থেকে দূরে স'রে না গিয়ে আরো কাছে গিয়ে তোমাকে চিনে নিলেও পারতুম, কিন্তু তা করিনি। তোমার অসুখের পর থেকে যে মিনতির সঙ্গে আর আমার কোন সম্পর্ক ছিলনা—। সেদিন মনে পড়ে—তোমাকে এই কথা শোনাবার জন্যই ডেকেছিলুম, কিন্তু সেই সময়ে ঠিক তোমার অনুপস্থিতিতে তোমার বন্ধু এসে কি বিষ-বাণ যে আমার কানে নিক্ষেপ করে গেল যাতে আমার সমস্ত ইচ্ছাগুলো বিষাক্ত হয়ে আমার বলার সব শক্তি লোপ করে দিল—তারপরে আর তুমিও শুনলে না। হয়তো তাদের কথা শুনে অতটা অভিভূতও হতুম না, কিন্তু—নিজের চোখকে অবিশ্বাস করতে পারিনি, এবং উপেক্ষাও করতে পারিনি, কারণ আমি তোমার স্বামী এবং তার উপরেও তোমাকে ভাল বাসি।

আমাদের কাজের ন্যায় অন্যায়ের আলোচনা আর করবোনা—যদি আমারও কিছু অন্যায় বুঝে থাক তবে ক্ষমা করো—শাস্ত্রমতে মনোক্ষোভ রাখতে পারিনা, তাতে তোমার অমঙ্গল হবে—সেইজন্য সর্ব্বান্তকরণে তোমাকে ক্ষমা করে গেলুম!—সমস্ত যুক্তি-তর্ক আজ এখানে হার-মেনে সমাপ্ত হ'য়ে যাক্—। এইখানে সব কিছুর মীমাংসা হ'য়ে যাক্ - ওগুলো আর বাধা-স্বরূপ হয়ে আমাদের মনের ভিতর এসে—আমাদের শেষ জীবনকে আর যেন ধূলি-ধূসরিত ক'রে না দেয়!—

জানিনা, তুমি কোথায়! তোমাকে এ চিঠি লিখবার অধিকার আছে কিনা তাও আজ জানিনা—!—যদি আমাকে ছেড়ে গিয়ে তুমি সুখী হ'য়ে থাকো—যদি সুখের সন্ধান, আনন্দ তৃপ্তি পেয়ে থাক—তবে আমিও সুখী হব,—আর যদি—সুখী না হও তা'হলে চিরজীবনের জন্য আমারও অনেকগুলি আক্ষেপ থেকে যাবে—!

একটা শেষ কথা বলবো—প্রণবের মুখ পৃথিবীর কাছে একেবারে হেঁট ক'রে দিওনা সুরমা। আমার কথা ভুলে গিয়ে শুধু ভেবো প্রণবের কথা—সে এখনো তোমায় ভোলে নি!

একখানি দানপত্র রেখে গেলুম। সম্পত্তি আমার যা আছে তাতে প্রণবের জীবনে অভাব হবে না। আর তেলের খনি তোমার। অরিনের অংশ দান প্রণব নিতে পারেনি, সে তা আবার তাকেই ফিরিয়ে দিয়েছে। কল-কাতার বাড়ীও তোমার। —কারণ প্রণব আর ও বাড়ীতে গিয়ে কখনো বাস করবে না।

একদিন ফিরে আসবে—প্রাণ আমার দেশের কোলেই ছুটে আসবে—কর্ম্মশেষে বিশ্রামের অবসরে—আর যদি তার আগে জীবন শেষ হ'য়ে যায়—তবে এই চিঠির ভাষায়, তোমার কাছে বিদায় চেয়ে নিলুম—

পৃথার ছেলে মেয়ে আমার কাছে—কারণ তাদের আর কেউ রইল না,—পৃথার চঞ্চল জীবন এ্যাটলাণ্টিক মহাসাগ-রের অসীমতায় সমাধি লাভ করেছে—তার এরোপ্লেনে আমেরিকার পথে—"

—সুরমা আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল—বুকের ভিতর তুমুল তুফান বহিয়া তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিল—পৃথাও অবশেষে,—একে একে সকলে চলিয়া গেল—দুই হাতে বুক চাপিয়া সে বসিয়া রহিল—ওপাশের ঘরে কে বাজাইতেছিল Funeral march—সুরমার অন্তরের জ্বালা অশ্রুধারে গলিয়া পড়িতে লাগিল—অঝোরে—।

নারী

গল্প কুমার কোকনদাক্ষ রায়

দেখতে দেখতে দিনের শেষ আলোটুকুও কোথায় মিলিয়ে গেল। মনেই ছিল না বেলা আজ ডেকে পাঠিয়েছে। দুপুরে যখন অপ্রত্যাশিতভাবে তার একখানি ক্ষুদ্র চিঠি অনিলা আমার হাতে এসে দিল আমার মনে হোল যেন কোন স্বপ্নলোক থেকে এক নিমন্ত্রণের চিঠি এসেছে। ভুলেই গিয়েছিলুম বেলার কথা। এই চলার পথে কে ক'জনকে স্মরণ রাখতে পারে? হাঁ—যেতে হবে বই কি, বিশ্বসংসার ধ্বংস হয়ে গেলেও কি বেলার ডাকে সাড়া না দিয়ে শান্ত হয়ে লক্ষ্মীছেলের মত বাড়ীর এক-কোণে বইগুলো নিয়ে চুপ করে বসে থাকতে পারি? আমাকে যেতেই হবে কি জানি হয়ত বেলার আহ্বানের ভেতর কোন যাদু বা মায়া মাখানো রয়েছে।

ধীরে ধীরে সন্ধ্যার অন্ধকারে বেড়িয়ে পড়লুম বেবী অষ্টিনখানা নিয়ে। কি জানি প্রাণের ভেতর আজ কি এক অপরিসীম আনন্দের রাগিণী বড় করুণ সুরে বাজতে সুরু করেছে। এত আনন্দ কি পারব সইতে? এই আনন্দের ঢেউ যেন আমায় আজ একেবারে আত্মহারা করে দিচ্ছে। রাস্তার আলো জ্বলছে। রাস্তার দুধারের বাড়ীর আলোও জ্বলে উঠেছে। আজ চারিদিকে শুধু আনন্দের সুর। দূরের আলোটা দেখে মনের কোণে ভেসে উঠল বহুদিনের একখানি পুরানো সুখের স্মৃতির ছবি। এমনি এক আলোর নীচে দাঁড়িয়ে বেলা আমার হাতের উপর হাত রেখে বলেছিল, "আমি তোমায় ছাড়া কাকেও জানিনে তুমিই আমার ইহ-জীবনের একমাত্র ধ্রুব তারা।"

সে অনেক দিনের কথা। আমি যেন এখনও দেখতে পাচ্ছি বেলার দুচোখে প্রথম যৌবনের প্রেমের অশ্রু মুক্তার ন্যায় জ্বলছে। তখন বিশ্বসংসার ভুলে গিয়ে বেলাকে বুকের কাছে টেনে এনে সান্ত্বনার স্বরে বলেছিলুম, "এই ত মাত্র চারটী বৎসর দেখতে দেখতে চলে যাবে। কোন চিন্তা নাই। বিলেত ত কাছেই। কত লোক যাচ্ছে! ছিঃ! কেঁদোনা লক্ষ্মীটী," বেলা আরও কাঁদতে কাঁদতে আমার বুকে তার মুখখানি লুকিয়ে বলেছিল, "আমি জীবনে মরণে তোমারই আশায় ঐ পথের পানে চেয়ে থাকব। বল তুমি আসবে—বল তুমি এসে আমায় তোমারই করে নেবে?"

আমি বেলার মাথায় হাত রেখে তিন সত্য করে বললাম, "হাঁ—বেলা, আমি চিরদিন তোমারই।" তারপর আজ চারবৎসর কেটে গিয়ে পাঁচটী বৎসর চলে যেতে বসেছে। আমি ফিরে এলুম—কিন্তু আমি যেমন করে সেই সুদূর দেশে গিয়েও বিদায় বেলার অশ্রুভরা একজোড়া ভুবনভুলানো আঁখি দিনের পর দিন নানাভাবে, নানারূপে মনের কোণে শতরূপে বাঁধতে লাগলুম জীবন-মরণের সেই চিরন্তনী সুরের সাথে—এসে দেখলুম সেই বেলা আর নেই। বেলার বিয়ে হয়ে গেছে। বৌদি লিখে জানিয়েছিল। কিন্তু আমার কিছুতেই বিশ্বাস হয়নি। কখনও বেলার বিয়ে হতে পারে না। যতবার সেই নিঝুমরাতের বেলার কান্নার সুরটী মনে বেজে উঠে ততবার ভাবি—না—না—মিথ্যা কথা। বেলা আমারই একান্ত আমারই। বৌদি ঠাট্টা করে লিখেছে মাত্র। লণ্ডনের প্রত্যেক নারীর চাহনীর ভেতরও যেন দেখতে পাই বেলার সেই চিরপরিচিত—চাহনীটী। কিন্তু এসে দেখলুম সত্যই বেলার বিয়ে হয়ে গেছে—আমি আসবার একটী বৎসর আগে। ঘৃণায়, দুঃখে, আর এক-বারটীও তার মুখখানি দেখতে সাধ হয় নি। তার চেয়ে মনে হয়—আমি আঘাত অনেক কম পেতুম যদি দেখতুম সে মৃত্যু-পথের যাত্রী হয়েছে। সে আমায় ঠকিয়েছে—ধর্ম্মকে ঠকিয়েছে—বিশ্বাসকে ঠকিয়েছে—সমস্ত নারী-

জাতির অপমান করেছে। এর চেয়ে মরণ তার শতগুণে শ্রেয় ছিল,—শতগুণে গৌরবের ছিল। যাক্ সে যখন নিজেই বিয়ে করে সুখী হয়েছে তখন আমার আর কোন দুঃখ করবার কারণ থাকতে পারে না। সে সুখী হোলেই আমি সুখী। আমার সমস্ত জীবনের একমাত্র ধারণা ছিল তাকে সুখী করা। কিন্তু বেলা নিজেই তার পথ বেছে নিয়েছে আমার ধ্বংসের উপর। তবুও আশীর্ব্বাদ করি সে সুখী হউক।

এমনি ভাবনা-রাজ্যের ভেতর নিজেকে হারিয়ে ফেলেছি। কি জানি কেমন করে গাড়ীখানা অবাধে ড্রাইভ করে নিয়েছিলুম। যখন গাড়ী হ্যারিসন রোডের ৩৩ নম্বর বাড়ীর ফটকের সামনে এসে দাঁড়াল আমার আবার চৈতন্য ফিরে এল। ফটক বন্ধ। মনে হোল ফিরে যাই। গিয়ে কাজ নেই। আবার ভাবলুম না দেখা করে যেতেই হবে। কাপুরুষের মত ফিরে যাব না। সমস্ত বন্ধনকে আমার অতিক্রম করতে হবে। আর একবার হর্ণ দিতেই ফটকের দ্বার খুলে গেল। আমি গাড়ী নিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়লুম। এ বাড়ীতে আর কখনও আসিনি। আমার অচেনা।

আমাকে আর বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হোলনা, একজন 'বয়' এসে সেলাম করে "আমার সঙ্গে আসুন" বলে আমার আগে আগে সিঁড়ি বেয়ে পথ দেখিয়ে চলল। আমি তাকে অনুসরণ করলুম। সিঁড়ি বেয়ে দোতালার ড্রইং রুম পার হয়ে তারপর পর পর আরও তিনটী ঘর পার হয়ে 'বয়' আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে বললে, "মেম সাহেব ঐ ঘরে আছেন—আপনাকে যেতে বলেছেন" আমি তার উপদেশ মত ধীরে ধীরে রঙ্গিন পর্দ্দাখানা দু'হাতে সরিয়ে ভেতরে ঢুকতেই দেখলুম বেলা বিছানায় শুয়ে শুয়ে কি একটী বই পড়ছে। আমায় দেখে বিন্দুমাত্র অবাক্ না হয়ে বেলা বেশ সহজ সুরেই বললে, "এসো," তার পর নিজে উঠে আস্তে আঙুল দিয়ে পালঙ্কের দিকে দেখিয়ে বললে, "উনি আজ বাড়ী নেই।"

আমি তার কথামত শয্যার একপ্রান্তে বসলুম। অনেকক্ষণ খুঁজেই পেলুম না কোন কথা।

প্রথমেই বেলা বললে, "আমি ভেবেছিলুম তুমি বুঝি আজ আর আসবে না।"

আমি একটু হেসে বললুম, "আমাকে আসতেই হোল—কি জানি হয়ত তোমার আহ্বানের ভেতর কোন যাদু লুকানো রয়েছে।"

বেলাও হেসে বললে, "কি জানি হয়ত থাকতেও পারে, তবে এইটুকু সত্য আমি যাদু বিদ্যে কোন কালেই জানতুম না এবং এখনও তেমন বিশেষ কিছু জানিনে।"

"তা কি করে বলি, কবিরা ত বলেন নারী যাদুকরী।" দুজনে আবার স্তব্ধ হয়ে গেলাম। আমার আবার মনে পড়ছিল বহু বৎসরের একখানি পুরানো ছবি। তখন ছিল বেলা একটী ফুলের মত সুন্দর। আজ বেলার সে রূপ নেই—সে শ্রী নেই। আজকের বেলা যেন সেই বেলাই নয়।

বেলা ধীরে ধীরে বললে, "কেমন ছিলে বিলেতে।"

"বেশ ছিলুম—আশা করি তুমিও ভাল ছিলে?"

"তোমার কি মনে হয় আমি খুব ভালই ছিলুম?"

"না ছিলে কি করেই বা বলি।"

অনেকক্ষণ দুজনের ভেতর বিলেতের নানান গল্প চলল। কেমন ছিলুম—কেমন লাগত। বাড়ীর জন্য মন কেমন করত। তার কথা মনে ছিল কিনা। এই সব।

এমনি নানা কথার ভেতর দেখতে দেখতে রাত ১০টা বেজে গেল।

আমি বললাম,—"এবার তবে আসি—কেমন?"

বেলা বললে,—"আজ ত আর বলা হোলনা—তবে কাল একবারটী কি সময় হবে?"

আমি বললাম,—"তা জানিনে—বিকেলে অনেক কাজ থাকে। অবসর খুবই কম।" একটু থেমে বললাম,—"আমার মনে হয় আর এসেও কোন কাজ নেই। আমি এতদিনে নিশ্চিন্ত হোলুম তুমি বেশ সুখে আছ জেনে।"

বেলা এবার মিনতিমাখানো সুরে বললে,—"কিন্তু আমি যে নিশ্চিন্ত হতে পাচ্ছিনে? আমি তোমার কাছে যে অন্যায় করেছি তারজন্য যে ক্ষমা ভিক্ষারও অযোগ্য।"

বেলা একটু থামলে। গলার সুরটী আরও [illegible]

বল্‌তে লাগলে,—"আমি বড়ই সুখী হব—যদি তোমায় আমার মত একজনের হাতে সঁপে দিয়ে একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে মরতে পারি। তুমি আর কতদিন এমনি করে কাটাবে?"

বুকের ভেতর গিয়ে বাজল বেলার এই কথাগুলো।—অনেকক্ষণ জবাব দিতেই পারলুম না। যে বেলা চেয়েছিল সংসার, সমাজ, শত বাধাকে উপেক্ষা করে আমার সাথে জগতের এককোণে গিয়ে দুজনে একখানি সুখের নীড় রচনা করব বলে; আজ সে বেলা আমায় এমনি করে অনুরোধ করছে। আমার মনে হোল এই নারী যেন কুমারী বেলার প্রাণহীন প্রতিমূর্ত্তি মাত্র সে প্রাণ নেই—সে শক্তি নেই—সে আত্মাও নেই। সেই বেলা মরে গিয়ে যেন আজ একখানি প্রাণহীনা, নির্ম্মম, পাষাণী নারীর রূপ, নিয়ে এসেছে। আমি চুপ করে রইলুম। অনেকক্ষণ পরে বেলার মুখের পানে চেয়ে দেখলুম সে আমার বাঁহাতখানা তার দু'হাতের ভেতর নিয়ে চেপে ধরে করুণ সুরে বল্‌ছে,—"বল তুমি আমার অনুরোধ উপেক্ষা করবেনা—বল তুমি বিয়ে করে সুখী হবে?"

আমি ধীরে ধীরে আমার হাতখানা মুক্ত করে নিয়ে উঠ্‌তে উঠ্‌তে বল্‌লাম "এই ত তোমার কথা? যাক বাঁচা গেল। আমি ভেবেছিলুম অন্য কিছু হবে। আমি আর দেরী করতে পারিনে—বৌদি আমার অপেক্ষায় বসে থাকবে। তবে আসি" বলতে বলতে বেরিয়ে পড়লুম ঘর ছেড়ে। গাড়ীতে এসে বসে আমার পিঠের উপর কার একখানা কোমল হাতের মৃদু স্পর্শ অনুভব করলুম। চেয়ে দেখি বেলা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে—তার উজ্জল কালো চোখের ঘনদীর্ঘ পাতায় তারার ক্ষীণ আলো প্রতিফলিত হয়ে জানিয়ে দিলে সে কাঁদছে।

আমি নিজেকে হারিয়ে ফেললুম বেলার ঐ চোখদুটীর ভেতর। ঐ চোখদুটী যে সন্ধ্যা তারার চেয়েও—ঐ চোখের কান্না যে শ্রবণরাতের বর্ষণের চেয়েও করুণ—ঐ মুখখানি যে আমার অন্তরের প্রত্যেক পরতে পরতে আঁকা রয়েছে। আমি কেমন করে ভুলবো ঐ ভুবন ভুলানো মূর্ত্তিখানা! কত দিন কত রাত পথে পথে কাটিয়েছি অমনি একখানি নরীর রূপ দেখব বলে। ইচ্ছে হলো আর একবারটী সেই বহু দিনের মত বেলাকে বুকের কাছে টেনে এনে শেষবারের জন্য প্রাণভরে বুভুক্ষু অন্তরের পিপাসা মিটিয়ে যাই।

যাক সমস্ত জগত লুপ্ত হয়ে ঐ নারীর রূপে। বিশ্বসংসার তলিয়ে যাক নারীর ঐ কান্নার ভেতর,—যাক ধর্ম্ম লুপ্ত হয়ে—শুধু জেগে থাক সমস্ত প্রাণের আকুল পিপাসা। না, সে হয় না। অতি কষ্টে নিজেকে দমন করে নিলুম।

বেলার মাথায় একখানি হাত রেখে স্নেহভরা কণ্ঠে বল্‌লাম, "বেলা তুমি আমায় আর পাগল করে দিও না। আমার সমস্ত সঙ্কল্প চূর্ণ করে দিও না। আমি তোমার কান্না দেখতে পারিনে। যাও তুমি এবার ভেতরে। ক্ষমা কর বেলা তুমি আজ যা বলছ তা হয় না। আমি সুখে আছি বড়ই সুখে আছি—এর বেশী কি মানুষ কখনও সুখী হতে পারে? না, আমি চাইনে আমার এই ছন্নছাড়া বে-সুরা জীবনের সঙ্গে আর একখানি সুন্দর, তরুণ জীবনকে এনে বাঁধতে যাকে আমি প্রাণ দিতে পারব না—সুখী করতে পারব না। তাতে সেও মরবে—আমিও মরব। আমার ইহকাল পরকাল দুইই যাব। যাও বেলা তুমি ভেতরে যাও—আমি সুখী হোলুম তুমি সুখে আছ জেনে। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি তুমি যেন আরও সুন্দর হয়ো।"

বেলা কান্নার সুরে বললে, "কিন্তু আমার যে নরকেও স্থান হবে না?"

"ও কিছুই নয়। জগতে কে কʼজনকে সুখী করতে পারে! এই মিথ্যা সংসারে নিজের সুখ—নিজের আনন্দ বজায় রেখে তবেই পরের দিকে দেখতে হয়। যাও আমি আশীর্ব্বাদ করছি তুমি সুখী হবে।"

ধীরে ধীরে ফটকের বাইরে এসে পড়লুম। কোনদিকে চাইবার সাহস হোল না। তবুও একবারটী পেছন ফিরে চাইলুম। দেখলুম বেলার দেহখানি ধীরে ধীরে চল্‌তে চল্‌তে মাটীর উপর লুটিয়ে পড়ছে। ইচ্ছে হোল ফিরে যাই, হয়ত এবার নিজের সংযম রাখতে পারব না—তার স্নেহের কোমল স্পর্শে। আর কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে গাড়ী চালিয়ে বড় রাস্তায় এসে পড়লুম। পথে গাড়ীর ভিড় কমে গিয়েছে। নেই বললেই হয়। ট্রামও তখন বন্ধ হয়ে গেছে। রাস্তায় লোকের চলাচল নেই। আকাশ

মাঝে কুয়াসার ঝাপসা হাওয়া চোখে মুখে এসে আঘাত করছে। প্রাণের ভেতর আজ কিসের এক উন্মাদনা—এক নিষ্ঠুর প্রলয়ের সঙ্গীত। জানিনে কেমন করে বাড়ী ফিরে যাব। সমস্ত পৃথিবী যেন সম্মুখ থেকে ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে—ঐ বৃহৎ দালানগুলোও যেন একটার পর একটা মাটীর উপর—ভেঙ্গে পড়ছে। গাড়ীর চাকার তল থেকেও যেন পৃথিবী সরে যাচ্ছে। আকাশে বাতাসে কি এক ধ্বংসের রাগিণী। আমি যেন আজ পাগল হয়ে যাব। কেন আমি এমনি এক ছন্নছাড়া অভিশপ্ত জীবন নিয়ে এসেছিলুম?

আমি কী হতে পারতুম,—আর আজ আমি কী? জানিনে কি কুক্ষণে বেলার-আমার প্রণয়কুসুম প্রস্ফুটিত হয়ে ছিল। দুজনে ঝরে পড়ছি পলে পলে পলে এক অদৃষ্ট ঝঞ্ঝা হাওয়ায়।—তোমারও সুখ সেই—আমারও শান্তি নেই। কেন বেলা।—এমনি ভুলটী করে বসলে? আমার প্রতিজ্ঞা ত আমি অক্ষরে অক্ষরে রেখেছি। কিন্তু তুমি কেন এমন করলে? আজ তোমার সেই মিথ্যা প্রতিজ্ঞার শাস্তি দু'জনকেই ভোগ করতে হবে। তুমিও মরবে আমিও মরব। ভেবেছিলুম বেলা বিয়ে করে সুখী হয়েছে। কিন্তু সেই মিথ্যা ধারণা আজ আমার একেবারে টুটে গেল। বেলার প্রত্যেক কথায় ফুটে উঠছিল তার অশান্তি বেদনা।

বাড়ী এসে মাতালের মত টল্‌তে টল্‌তে ক্লান্ত দেহখানি বিছানার উপর এলিয়ে চোখ বুজে রইলুম। বৌদি তখনও আমায় অপেক্ষায় টেবিলের ধারে বসে গালে একখানি হাত রেখে মন দিয়ে কি একটা বই পড়্‌ছেন। জানি আমার উপর আজ অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়েছেন। কিন্তু পারিনে আর সকলের মন রেখে চল্‌তে। নিজের জীবনের ভারে নিজেই হাঁপিয়ে উঠেছি। আমি ধীরে ধীরে বল্লুম,—"আমি খেয়ে এসেছি হোটেলে—তুমি ঘুমোতে যাও বৌদি, আমি আজ আর খাবনা।"

হয়ত বেলা এখনও ধূলায় মূর্চ্ছিত হয়ে লুটিয়ে আছে—একটী সুন্দর, শুভ্র, সদ্য বৃন্তচ্যুত নির্ম্মল শেফালির মত। হয়ত চোখের কোণে শিশিরের কণার মত স্বচ্ছ দু'ফোটা অশ্রু ক্ষীণ তারার আলোয় মুক্তার মত এখনও শোভা পাচ্ছে। আজ দু'টি জীবন এমনি করে অকালে ঝরে পড়্‌ছে। আমাদের মিলনে আজ বিশ্ব-বিধাতার মন্দিরে কত মঙ্গলের ধ্বনি বেজে উঠ্‌ত। কেন এমন ভুল করলে বেলা? এ ভুলের যে আর কোন উপায় সেই। সত্যই নারী তুমি কুহেলিকা। নিজেও সুখী হোলেনা পরকেও সুখী হতে দিলেনা। ধ্বংসই কী নারীর লীলা—ধ্বংসই কী নারীর খেলা—ধ্বংসেই কী নারীর একমাত্র আনন্দ। আজ অনেকদিন পরে দুচোখ ফেটে কান্না আসছে। অনেকদিন কাঁদিনি! জমাট মেঘের মত বুকের মাঝখানে পুঞ্জিভূত হয়ে ছিল। কিছুতেই আর চেপে রাখতে পাচ্ছিনে—শুধু একটী ছোট শিশু তার—একখানি প্রিয় খেলার সামগ্রী নষ্ট হয়ে গেলে বা কেউ ভেঙ্গে দিলে যেমনি প্রাণভরে কাঁদতে থাকে আজ আমারও তেমনি কাঁদতে সাধ হচ্ছে প্রাণ খুলে।

উষ্ণ কপালের উপর একখানি কোমল হাতের স্পর্শ অনুভব করলাম—বৌদি হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন।

বৌদি কাতর হয়ে বল্লেন,—"অমল তোমার কি কোন অসুখ করেছে?"

আমি বল্লাম,—"না, কিছুই হয়নি। তুমি শুতে যাও। আমায় আজ একলা থাকতে দাও, আলোটা নিভিয়ে দিয়ে যাও আমার আলো সহ্য হয়না।"

বৌদি গেলনা। কিছুমাত্র বিচলিত হোলনা আমার রূঢ় কথায়,—বরং আরও যত্ন করে কপালে ওডিকোলন ঢেলে দিতে দিতে বল্লে,—"তুমি চুপ করে ঘুমোও আমি বাতাস করছি। তোমার মাথা ধরেছে—আমি বুঝতে পাচ্ছি।"

তর্ক করবার মত শক্তি আমার নেই। চুপ করে রইলুম। বৌদি তেমনি বাতাস করে যাচ্ছেন। শুধু বারবার মনে পড়ছে বেলার সেই ব্যথিত মুখখানি। যতবার তাকে ভাবতে যাই আমার সমস্ত চিন্তার স্রোত কোথায় হারিয়ে ফেলি;—আমার বুকের স্পন্দনটী পর্য্যন্ত থেমে যেতে চায়। কপালে কার দু'ফোটা অশ্রু ঝরে পড়ল। চোখ খুলে চেয়ে দেখি বৌদি কাঁদছে। আমি শুধু এক দৃষ্টে তার ঐ স্নেহভরা মুখখানির পানে চেয়ে রইলুম অনেকক্ষণ। ঐ চোখ দুটী করুণায় ভরপুর—স্নেহে উথলে যাচ্ছে—সমবেদনায় আরও করুণ হয়ে উঠেছে।

ধীরে ধীরে তার একখানি হাত বুকের উপর টেনে নিলুম। কী করে বুঝাব তাকে আমার কী হয়েছে—কী করে বুঝাব তাকে আমার কিছু হয়নি? নারীর কান্না আমি দেখতে পারিনে—আমার সমস্ত অন্তর ব্যথিয়ে তোলে—আমায় কেমন করে দিয়ে যায়।

আমি ধীরে ধীরে তার মুখের পানে চেয়ে বল্লাম,—"আমার কিছুই হয়নি বৌদি—বিলেতে এমনি অসুখ আমার প্রায়ই হোত—আজ আবার সেই অসুখ আরম্ভ হয়েছে।"

জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখি দূর-দিগন্তে তখনও তিনটী তারা উজ্জ্বল হয়ে আকাশের গায়ে শোভা পাচ্ছে।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মিত্র এম-এ

রিজা খাঁন (Riza Khan)—তুরস্কের কামাল পাশা, কিম্বা মিশরের জগলুল পাশার ন্যায়, বর্ত্তমান পারস্যের প্রধান ভাগ্য বিধাতার নাম রিজা খাঁন। নাসীর-উল-মুলুক ইউরোপীয় সভ্যতায় সুশিক্ষিত হইলেও তিনি সৈনিক হইতে পারেন নাই। সমস্ত পারস্যের ভাগ্য-বিধাতা হইবার অবসর প্রাপ্ত হইয়াও, শুধু সৈন্যদল সংগঠন করিতে পারিলেন না বলিয়াই তাঁহার পতন হয়। রিজা খাঁন একজন ভাগ্যবান পুরুষ। তিনি একজন কশাক। যুদ্ধ তাঁহার জাতীয় ব্যবসা। রাষ্ট্র বিপ্লবের গোলযোগে পারস্যে আগমন করিয়া নাদির শাহের ন্যায় ইহার শাসক হইয়া বসিয়াছেন।

প্রথম জীবনে রিজা খাঁ পারশিক কশাক সৈন্যদলের একজন সামান্য সৈনিক মাত্র ছিলেন। ১৯২৯ সালের একদল সৈন্য সংগ্রহ করিয়া সর্দ্দার-ই-সিপাহ বা সেনা নায়ক উপাধি গ্রহণ পূর্ব্বক সমর-সচিবের পদ গ্রহণ করেন। তিনিই তাঁহার সৈন্য দলের সাহায্যে জাতীয় দলকে সবল করিয়া তুলিয়া, সিয়া এদ্দিন নামক এক ব্যক্তিকে প্রধান মন্ত্রীর পদ প্রদান করেন। ১৯২০ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাস হইতে সোভিয়েট রাশিয়ার সৈন্যগণ উত্তর পারস্যের দিকে বৃটিশ বাহিনীকে আক্রমণ করিবার জন্য অভিযান আরম্ভ করে। ১৯২১ সালে পারস্য সরকারের পক্ষ হইতে একজন রাজদূত রাশিয়ায় গমন করিলেই সোভিয়েট সরকার রথষ্টীনকে (Rothstein) তাহাদের প্রতিনিধি হিসাবে পারস্যে প্রেরণ করেন। এই সময়ে ইংরাজগণ তাঁহাদের সৈন্যদল সরাইয়া লইলে, রাশিয়ার বাহিনীও পারস্যে প্রবেশ না করিয়া বাকুতে ফিরিয়া যায়। ১৯২১ সালের ২২শে জুন পারস্যে জাতীয় মহাসভার চতুর্থ অধিবেশন বসে। দৌলৎ পার্টি ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে রিজা খাঁর বিরুদ্ধে এক ষড়যন্ত্র করিলে, রিজাখাঁ সিয়াএদ্দিনকে সরাইয়া দিয়া স্বয়ং প্রধান মন্ত্রীর পদ গ্রহণ করেন। তাহার পর কামালের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া রিজাখাঁ সাহকে নির্ব্বাসিত করেন। পারস্য সাম্রাজ্যে সাধারণতন্ত্র স্থাপন করাই তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। এই উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিবার তাঁহার যথেষ্ট সুবিধাও ছিল। পারস্যের যাবৎ সামরিক কর্ম্মচারীগণ তাঁহার সহায়ক ছিলেন। পারস্য সম্রাট রাশিয়ার জারের সহিত একযোগে বহুদিন প্রজা দমন করিয়াছিলেন বলিয়া জনসাধারণও তাঁহার উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু দেশ সম্পূর্ণ সাধারণ-তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত দেখিতে প্রস্তুত ছিলনা। ধর্ম্মান্ধ মোল্লা ও অভিজাতগণ বহুদিন হইতে রাজতন্ত্রের সান্নিধ্যে প্রতিপালিত হইয়া নানা প্রকার সুখ সুবিধা ভোগ করিয়া আসিয়াছিল। বর্ত্তমানে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেলে, গণ-প্রধান রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং তাহার সহিত তাঁহাদের সমস্ত সুখ-সুবিধার তিরোধান ঘটিবে এই আশঙ্কায়, তাহারা রিজা খাঁকে নাদিরের

ন্যায় সম্রাটপদে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে বরং ইচ্ছুক আছেন এই অভিমত প্রকাশ করেন। ১৯২৪ সালে স্বাধীন পারশ্যের প্রথম জাতীয় মহাসভার অধিবেশন হইলে জাতীয় এই মনোভাব খুব স্পষ্টভাবে আত্মপ্রকাশ করে। চতুর রিজাখাঁ সাধারণের এই মনোভাব বুঝিতে পারিয়া কমের (Qum) মুজতাহিদগণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিয়া, পারশ্যে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা দেশের পক্ষে মঙ্গলজনক হইবে না বলিয়া ঘোষণা করেন। পারশ্যের নারী জাতি ও জনসাধারণকে শিক্ষিত না করিয়া তুলিতে পারিলে পাশ্চাত্য-শাসন প্রণালী পারশ্যে প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব হইবে এই ধারণা ক্রমশঃ রিজাখাঁর মনে সুদৃঢ় হওয়ায়, সর্ব্বপ্রকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির তিনি আমূল পরিবর্ত্তন করিতে আরম্ভ করেন। স্ত্রীজাতিকে সুশিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করেন। রাজস্বের সুব্যবস্থা করিবার জন্য একজন অর্থশাস্ত্রবিৎ আমেরিকানকে আনয়ন করিয়া রাজস্ব সচিব পদ প্রদান করেন। সোভিয়েট রাশিয়া জার শাসিত রুশ সরকারের যে সমস্ত দাবী দাওয়া ছিল সে সমুদায় হইতে নূতন পারশ্য সরকারকে অব্যাহতি দেওয়ায়, পারশ্য সরকারের আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল হইয়া উঠে। পারশ্যের নেতাগণ পলায়মান অভিজাতগণকে ধৃত করিয়া তাহাদের বহুপুরুষ ধরিয়া সঞ্চিত অর্থের কিয়দংশ বর্ত্তমান সরকারকে প্রদান করিতে বাধ্য করেন।

রিজা খাঁ ও বর্ত্তমান পারশ্য :—১৯৩১ সালের ৩১শে অক্টোবর মজলিস-এ-মিলি বা জাতীয় মহাসভা পারশ্যের রাজবংশকে সিংহাসন হইতে অপসৃত করিয়া রিজাখাঁকে পারশ্যের সাহ বা সম্রাট উপাধি প্রদান করিয়া রাজমকুট তাঁহার শিরে স্থাপন করে। রিজাখাঁ এই নূতন দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া পারশ্যের পূর্ব্ব-গৌরব প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন। বিজ্ঞান ও আধুনিক যন্ত্রপাতি রাজ্যে আমদানী করিয়া পারশ্যকে সম্পূর্ণরূপে ইউরোপীয় প্রথায় গড়িয়া তুলিবার চেষ্টায় আছেন। ধর্ম্মের প্রভাবকে অনেকটা সংযত করিয়া জাতীয়তাকে প্রশ্রয় দিতেছেন। যে সমস্ত প্রাচীন সামাজিক আচার-ব্যবহার একান্ত অর্থহীন ও প্রাণহীন হইয়াছে তাহাদের সংস্কার করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন।

আফগানিস্থান :—পারশ্য ও ভারতবর্ষের মধ্যস্থলে অবস্থিত হইয়া আফগানিস্থান ভারতের প্রবেশপথ রূপেই ব্যবহৃত হইয়া আসিয়াছে। আলেকজাণ্ডার হইতে আরম্ভ করিয়া যে সমস্ত বৈদেশিক আক্রমণকারীগণ স্থলপথে ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই আফগানিস্থান দিয়াই ভারতে প্রবেশ করিয়াছেন। পাঠান ও মোগল যুগে আফগানিস্থান বলিয়া কোন স্বতন্ত্র রাজ্য না থাকিলেও কাবুল ও কান্দাহার অনেক সময়ই দিল্লীর সম্রাটের অধিকারভুক্ত থাকিত। আমেদসা আবদালীই পারশ্য হইতে এইখানে আসিয়া সর্ব্বপ্রথম আফগানিস্থান রাজ্য স্থাপন করেন। আমেদসা আবদালী ও তাঁহার উত্তরাধিকারীগণ কাবুলের আমীর হিসাবে আর কতকগুলি আমীরের উপর তাঁহাদের সার্ব্বভৌম ক্ষমতা পরিচালন করিতেন মাত্র। জাতীয় স্বাধীনতাবাদী আফগানিস্থান তখন স্বপ্নেরও অতীত। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে আবদার রহমান কাবুলের আমীরত্ব লাভ করিয়া, কান্দাহার, গজনী প্রভৃতি কতকগুলি স্থানের উপর তাঁহার প্রভুত্ব চিরস্থায়ীভাবে স্থাপন করিয়া উক্ত প্রদেশগুলির অধিনায়কদিগকে শাসন কর্ত্তার পদে পরিণত করেন। তাঁহারই শাসনকালে আফগানিস্থান একটী মিলিত রাজ্যে পরিণত হয়। এই দেশকে শাসন করিবার জন্য আবদার রহমান নূতন আইন প্রণয়ন করেন। সর্ব্বপ্রকারে স্বাধীন ভাবে শাসন দণ্ড পরিচালনা করিলেও আবদার রহমানকে ভারতের বৃটিশ সরকারকে সার্ব্বভৌম রাজশক্তি বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। পর-রাজ্যের সহিত কোন রাজনৈতিক আদান-প্রদান করিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল না।

১৯০১ খৃষ্টাব্দে আবদার রহমানের মৃত্যু হইলে, তাঁহার পুত্র হাবিবউল্লা কাবুলের তক্তে আরোহণ করেন। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে ইংরাজের সহিত হাবিবউল্লার এক নূতন সর্ত্তে সন্ধি হইলে, ভারত-সরকার তাঁহাকে স্বাধীন নৃপতি হিসাবে 'হিজ ম্যাজেষ্টি' উপাধি প্রদান করিতে স্বীকৃত হইলেও পররাষ্ট্রসংক্রান্ত স্বাধীনতা প্রদান করিলেন না। হাবিবউল্লা তাঁহার মৃত্যু পর্য্যন্ত ইংরাজদের সহিত মিত্রতা

বন্ধন অক্ষুণ্ন রাখিয়াছিলেন। ১৯১৪ সালে বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ আরম্ভ হইলে পারশ্য ও তুরস্ক চর পাঠাইয়া তাঁহাকে উত্যক্ত করিয়া তুলিলেও তিনি ইংরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন নাই। হয়ত এই কারণেই ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে এক গুপ্ত ঘাতকের হস্তে তাঁহাকে প্রাণত্যাগ করিতে হয়।

হাবিবউল্লার সময়ে আফগানী স্থানে কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। পার্ব্বতীয় রাস্তা তাঁহার সময়ে রচিত হয়। শিক্ষাদানের জন্য কয়েকটি স্কুল খোলা হয়। টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন লাইন প্রস্তুত হয়। তুরস্ক সেনানীদের দ্বারা সৈন্য সংস্কারও করা হইয়াছিল।

১৯১৯ সালে এপ্রিল মাসে, হাবিবউল্লার দ্বিতীয় পুত্র, আমানুউল্লা নাম গ্রহণ করিয়া পিতার সিংহাসনে আরোহণ করেন। সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই আমীর আমানুল্লা আফগানিস্থানের সর্ব্বপ্রকার স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ইংলণ্ডও আফগানিস্থানের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া ল'ন। তাহার পর আফগানিস্থান তুরস্ক, সোভিয়েট রাশিয়া, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জাপান প্রভৃতি দেশে রাজদূত প্রেরণ করেন। সোভিয়েট রাশিয়ার সন্নিধানে বাস করায় এবং ভারতে ইংরাজ সরকারের সহিত সর্ব্ব প্রকার সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করায় আমানুউল্লা খাঁকে খুব স্বাভাবিক ভাবেই রাশিয়ার ভাবে মুগ্ধ হইয়া পড়িতে হয়। রাশিয়ার আদর্শে কাবুলে নূতন বিশ্ব-বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল। আমানুউল্লা ইহাও লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে মধ্য এশিয়ার মুসলমান রাজ্যগুলি সোভিয়েট রাশিয়ার সংস্পর্শে আসিয়া কেমন উত্তরোত্তর সভ্য হইয়া উঠিতেছিল। আপনার স্বদেশকে তাহাদেরই ন্যায় উন্নত করিয়া তুলিবার জন্য পিটার-দি গ্রেটের ন্যায় তিনি নিত্য নূতন ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। পিতার আমলে দেশমধ্যে বিদ্যাশিক্ষা প্রচলন হইলেও উহা বাড়াইয়া তুলিবার জন্য অসংখ্য স্কুল স্থাপন করিতে থাকেন। স্ত্রী-জাতিকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করিবার জন্য মুসলমান প্রথাকে অগ্রাহ্য করিয়া প্রকাশ্য রাজপথে বরখা পরিধান করিবার প্রথা তুলিয়া দেন। ১৯২১ সালে মস্কো নগরীতে তুরস্কের সহিত আফগান রাজ্যের একটী সন্ধি হয়, এই সন্ধি অনুযায়ী ইহাই স্থিরীকৃত হয় যে কোন সাম্রাজ্যবাদী জাতি উহাদের কাহাকেও আক্রমণ করিলে অপর রাজ্য তাহাকে শত্রুজ্ঞানে তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিবে। এই সন্ধিপত্রেই আপনাকে অনেকটা বলবান মনে করিয়া আমানুল্লা তাঁহার সংস্কারগুলি দ্রুতভাবে দেশের মধ্যে প্রচার করিতে সাহসী হ'ন।

সর্ব্বপ্রকার সনাতনী প্রথার শিরোপরি পদাঘাত করিয়া আফগানরাজ তাঁহার পত্নীকে সম্পূর্ণরূপে ইউরোপীয় পোষাকে সজ্জিত করিয়া ইউরোপ ভ্রমন করিয়া আসিলেই দেশে ধূমায়মান অশান্তি বহ্নি প্রজ্জলিত হইয়া উঠে। আমানুল্লাকে এই বহ্নির মুখে আত্মাহুতি প্রদান করিতে হইলেও, আফগানিস্থানের পরিবর্ত্তন পূর্ব্ববৎই চলিতেছে। আমানুউল্লার পতনের পর কিছুদিন রাজ্যে অশান্তি বিরাজ করে। তাহার পর বর্ত্তমান আমীর নাদীর উহার শাসনতন্ত্র খুবই কঠিনহস্তে ধারণ করিয়াছেন।

নাদীর খাঁ ইউরোপে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছেন। নির্ব্বাসিতভাবে তিনি অনেকদিন ফ্রান্সের প্যারী নগরীতে বাস করিয়াছিলেন। আমানুল্লার আরব্ধ অনেক সংস্কার আপাততঃ স্থগিত রাখিলেও নাদীর খাঁর সমস্ত অন্তঃকরণই ইউরোপের দিকে। রাশিয়া হইতে বিশেষজ্ঞগণকে আনয়ন করিয়া নাদীর খাঁ দেশমধ্যে শিল্প প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করিতেছেন। সরকারী বাজেটের ব্যবস্থা করিয়া আমীরের পারিবারিক খরচ পৃথক করিয়া দিয়াছেন।

নূতন আফগানিস্থানে এখন জাতীয়তার বন্যা বহিয়া যাইতেছে। এই আফগানগণ আপনাদিগকে সংখ্যায় অল্প জানিয়াই, মধ্য এশিয়ায় সোভিয়েট রাশিয়ার অধীনে যে সমস্ত মুসলমান রাজত্ব আছে তাহাদের সহিত জাতীয়তা স্থাপন করিয়া বহির্জ্জগতের সহিত পরিচিত হইবার চেষ্টায় আছে।

ভারতীয় ভাবধারা

আরবীয় ভাবধারার বিশেষত্ব :—সমগ্র এশিয়ায় দুইটা ভাবধারা বহু প্রাচীনকাল হইতে বিদ্যমান আছে। আমরা যাহাকে মুসলমান ভাবধারা বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া আসিলাম, উহা প্রাচীন সেমিটিক জাতির তত্ত্বকথা। জুডাইজম (Judaism) বা ইহুদিদিগের ধর্ম্ম বহু প্রাচীন। খৃষ্ট পূর্ব্ব এক হাজার বৎসর পূর্ব্বেই এ ধর্ম্মের বিকাশ হয়। ইহুদিগণ শতধা বিভক্ত হইয়া আরবের বিভিন্ন

স্থলে বাস করিত। মেসোপটামিয়ার প্রাচীন রাজ্য দুইটী ব্যাবীলোনিয়া ও আসেরিয়া প্রবল হইয়া ইহুদিগণকে তাহাদের বাসস্থানগুলি হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া দিলে তাহারা মিসরাধিপতি ফ্যারোয়ার আশ্রয় গ্রহণ করে। এখানে দাসত্ব-শৃঙ্খল ক্রমশঃ কঠিনভাবে তাহাদের পদ-দেশে বিজড়িত হইতে আরম্ভ হইলে, মিশরবাসী ইহুদিগণ মিসর পরিত্যাগ করিয়া আবার স্বদেশে প্রত্যাগমন করে। ডেভিডের সময়ে তাহারা প্যালেষ্টাইনে তাহাদের জাতীয় স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করে।

এই ক্ষুদ্র জাতি অতি শৈশব অবস্থা হইতেই এক ঈশ্বরে বিশ্বাস স্থাপন করে। এই ঈশ্বর তাঁহাদিগকে বিশেষ করিয়া সৃজন করিয়াছেন এবং তাহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য সতত যত্নপরায়ণ আছেন এইরূপ প্রবাদ তাহাদের প্রচারকগণ এই জাতির মধ্যে প্রচার করিয়া তাহাদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করিবার চেষ্টা করে। অবশেষে অনবরত চেষ্টার ফলে একটী জাতীয় রাজত্ব প্যালেষ্টাইনে স্থাপিত হয়। পরাক্রান্ত জাতিসমূহের সান্নিধ্যে এই রাজ্যটী স্থাপিত হওয়ায় এই রাজ্যের স্বাধীনতা বহুদিন রক্ষিত হয় নাই। জেরিমিয়ায় প্যালেষ্টাইনের পতনের কথা জলন্ত ভাষায় লিপিবদ্ধ করা আছে। এই জেরিমিয়া গুলিতে জাতির পতনের ইতিহাস জলন্ত অক্ষরে লিপিবদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে আবার সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া প্রবুদ্ধ করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করা হইয়াছে।

ইহুদি ধর্ম্মের বিশেষত্ব এই যে, এই ধর্ম্ম এক জাতীয় ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া, অপর জাতি ও তাহাদের ধর্ম্মগুলিকে বিজাতীয় ঘৃণা করিতে শিক্ষা প্রদান করে। পৃথিবীর ইতিহাসে ইহুদি ধর্ম্ম বহুদিন হইতেই বিলুপ্ত হইয়া যাইত, যদি না এই ধর্ম্মাবলম্বীগণ দারুণ বিজাতীয় ঘৃণা হৃদয়ে পোষণ করিয়া আপনাদিগের অস্তিত্ব বজায় রাখিবার চেষ্টা করিত। রাজ্য নষ্ট হইয়া গেলে, দেশ হইতে বিতাড়িত হইয়া, শতধা বিভক্ত ইহুদিগণের মূলধনই ছিল অপর সমস্ত জাতিকে ঘৃণা করা। এই জন্যই ইউ-রোপের তাবৎ জাতিবৃন্দই ইহুদিগণের উপর ভীষণ অত্যাচার করিয়া আসিয়াছে।

খৃষ্টান ধর্ম্ম, এবং মুসলমান ধর্ম্ম ও এই সেমিটিক জাতির ধর্ম্ম। উভয় ধর্ম্মেরই পুরাতন কাহিনী ও ইতিহাস Old testamentএ লিখিত আছে। উভয় ধর্ম্মেই সাম্যবাদ প্রচারিত হইলেও, আরবীয় আবহাওয়ায় প্রতিপালিত হওয়ায় জাতীয় ধর্ম্মেই পরিণত হয়। ইউরোপ এসিয়ার নিকট হইতে আরবীয় খৃষ্টান ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়া উহাকে আপনাদের উপযোগী করিয়া লইবার জন্য জাতীয় ধর্ম্মে পরিণত করিয়া লয়। সুতরাং স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে ইউরোপীয় জাতীয়তাবাদের মূলে জুডাইজম আত্মগোপন করিয়া রহিয়াছে।

আরবীয় সভ্যতার মূল মন্ত্রই জাতীয়তাবাদ। ইহুদী ধর্ম্মে এই জাতীয়তার মূলমন্ত্র প্রথম প্রচারিত হয়। সেমিটিক জাতির অন্যান্য শাখাগুলিকে একত্রিত করিয়া সঙ্ঘবদ্ধ করিতে না পারিলে প্রবল রোমসাম্রাজ্যের আব-হাওয়ায় আসিয়া প্রাচীন জুডাইজম বিনাশ প্রাপ্ত হইতে পারে, এই আশঙ্কায় জুডাইজমকে প্রচারিত করিয়া খ্রীষ্ট ধর্ম্মে পরিণত করা হয়। রোমানগণ এই ধর্ম্মকে প্রথমে অনেকটা জুডাইজমই জ্ঞান করিয়া ঘৃণা করিতেন। রোমের বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যে যখন বিদ্রোহ দেখা দেয় তখন ঐ সাম্রাজ্যকে একটী জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিবার উদ্দেশ্যে খ্রীষ্টান ধর্ম্ম গৃহীত হয়। বিশ্বজনীনত্ব ভাব আসিয়া উপস্থিত হওয়ায় জুডাইজমের মূল সূত্রগুলি নষ্ট হইয়া যায় দেখিতে পাইয়া, প্রাদেশিক স্বতন্ত্রতা ও ব্যক্তি গত প্রাধান্য স্থাপন করিবার জন্যই 'প্রোটেষ্টাণ্ট' ধর্ম্ম প্রচার করা হয়। পশ্চিম ইউরোপ এই প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করে তাহার পর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতীয় জনপদগুলি স্থাপন করিয়া শীঘ্রই অন্ন সংগ্রহের জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠে। ব্যবসা বাণিজ্য ও নগর স্থাপন করাও আরবীয় ভাবধারার একটী প্রধান অঙ্গ। বহু প্রাচীনকাল হইতেই আরবজাতিরই একটী শাখা ফিনিসিয়ায় গমন করিয়া বিশ্ব-ব্যাপী ব্যবসা-বাণিজ্য স্থাপন করিয়াছিল। ফনিসিয়ানদের নগরগুলি আধুনিক যুগের বাণিজ্যকেন্দ্র গুলির অনুকরণ মাত্র ছিল। ইহাদেরই একটী শাখা কার্থেজে বিস্তৃত ব্যবসা-কেন্দ্র স্থাপন করে। পশ্চিম ইউরোপ আরবীয় ভাবধারার মূল মন্ত্র জাতীয়তাবাদ গ্রহণ করিয়া ক্ষমতাশালী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতীয় জনপদ সৃজন করিবার

পর আরবী সভ্যতার দ্বিতীয় তত্ত্বটীর উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। তখন তাহারা দেখিতে পায় যে আরব ব্যবসাদারগণ তখনকার সমুদ্র পথ গুলি দখল করিয়া বসিয়া আছে। বিখ্যাত ভিনিসের ব্যবসায়ীগণ আরবগণের সহায়তায় তাঁহাদের ব্যবসা চালাইতেন; ব্যবসা-জগতে তাঁহাদের স্বতন্ত্র কোন অস্তিত্ব ছিল না। আরব দেশটী বিশাল হইলেও প্রচুর লোক সংখ্যাকে অন্ন যোগান দিবার ক্ষমতা উহার না থাকায়, ব্যবসা বুদ্ধির উন্মেষ এইখানেই প্রথম হইয়াছিল। অতি প্রাচীনকাল হইতেই আরবীয় বণিকগণ ভারতবর্ষ, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশ সমূহ হইতে পণ্য লইয়া গিয়া ইউরোপের দেশ সমূহে বিক্রয় করিত। রোম প্রবল হইয়া কার্থেজকে নির্দ্দয়ভাবে ধ্বংস করে। কেন না তখন রোমীয় ভাবধারার সহিত আরবীয় ভাবধারার ঘোরতর সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। রোম কার্থেজ নগর ধ্বংস করিতে না পারিলে আরবীয় সভ্যতা সেই প্রাচীনযুগেই ইউরোপে ছড়াইয়া পড়িত।

ব্যবসা-ধর্ম্মের সহায়ক বিদ্যাগুলিও ইউরোপের অধীত বিষয় হইয়া পড়ে। পশ্চিম ইউরোপ খুব আগ্রহের সহিত আরবের পাটীগণিত, বীজগণিত, দর্শন ও বিজ্ঞান পাঠ করিতে আরম্ভ করে। যৌবনের প্রবল তাড়নায় তাহারা বিজ্ঞানকে আপনাদিগের প্রধান অবলম্বন করিয়া লইয়া উহাকেই উন্নতির মূলমন্ত্র জ্ঞানে জাপটাইয়া ধরে। এই সাধনার ফলেই আজ ইউরোপে বিজ্ঞান ও জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রের প্রাবল্য দেখা দিয়াছে। প্রত্যেক রাষ্ট্রকে বিশেষ করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই, দেখিতে পাওয়া যাইবে যে উহার তলদেশে উৎকট জুডাইজম্ বিদ্যমান আছে। আপনার ধর্ম্ম ও সভ্যতাই প্রকৃত সভ্যতা, অপর ভাবধারা বর্ব্বরতা মাত্র; এইরূপ ধারণার বশীভূত হইয়াই জর্ম্মানগণ আপনাদের Kulturেকে প্রতিষ্ঠিত করিতে গিয়া জগতে দারুণ সমরানল প্রজ্জ্বলিত করিয়াছিল। বিজ্ঞানই তাহাদের পূজিত দেবতা, বাইবেলের ভগবান মাত্র রবিবার দিন এক ঘণ্টা উপাসনা পাইয়া থাকেন। ব্যবসা-বাণিজ্য তাহাদের প্রধান মোহ। কায়িক সুখ ঐশ্বর্য্য তাহাদের চরম লক্ষ্য।

ভারতীয় ভাবধারার বিশেষত্ব :—ভারতীয় ভাবধারা এই আরবীয় ভাবধারা হইতে পৃথক থাকিয়া অনেকটা আপনার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। ভারতবর্ষ বিশাল ও উর্ব্বর দেশ। এখানকার প্রাকৃতিক শোভা জগতে অতুলনীয়। এখানকার বিশালতা মানবকে উদার ও মহান করিয়া গড়িয়া তুলে। আর্য্যগণ যখন ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন তখন তাঁহারা সকলেই গোষ্ঠীযুগে বাস করিতেন। গোষ্ঠপতিগণ আপনাদের গোষ্ঠীর গণ্ডির মধ্যে সকল প্রকার সাম্যই রক্ষা করিতেন। অনার্য্যগণ এই এই গোষ্ঠীরাজগণকে পদে পদে বাধা প্রদান করিলে আর্য্যগণ তাহাদিগকে সমূলে বিনাশ করেন। আমেরিকায় ইউরোপীয়গণ তথাকার আদিম অধিবাসীগণকে যেমন স্ববংশে ধ্বংস করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন, ভারতবর্ষে আর্য্য-বাসস্থান স্থাপন করিবার জন্য আর্য্যগণ সেইরূপ কঠোর হস্তেই অনার্য্য দলন করিয়া অনেক স্থলেই তাহাদিগকে নির্ব্বংশ করেন। অনার্য্যদিগের মধ্যে যাহারা অধীনতা স্বীকার করে, আর্য্যগণ তাহাদিগকে দাস জাতিতে পরিণত করেন। আর্য্যাবর্ত্ত জয় করিয়া লইবার পর ভারতীয় ভাবধারায় কতকটা বিশালতা আসিয়া দেখা দেয়। প্রাকৃতিক দৃশ্যগুলিকে এক একটী নাম দিয়া উহাদিগকে দেবদেবী বলিয়া সাধারণের নিকট প্রচার করা হয়। এই নব-প্রচারিত আর্য্যধর্ম্মের মূলে কোন প্রকার ঈর্ষা বা বিজাতীয় বৈরীভাব ছিল না। যে কেহ এই সমস্ত দেবদেবীকে পূজা করিয়া ভারতীয় হইয়া যাইতে পারিত। পরবর্ত্তীযুগে হূন, শক ইত্যাদি যে সমস্ত জাতি ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছে তাহারা সকলেই আর্য্য-জাতির শাখাভুক্ত হইয়া ভারতবর্ষে স্থান পাইয়াছে। এখানকার শিক্ষিতগণ আপনাদের জন্য বিশাল বৈদান্তিক ধর্ম্ম আবিষ্কার করেন। এই ধর্ম্মের মূলতত্ত্বে ঈশ্বরের ঐক্যতার সহিত তাঁহার বিশালতা ও সার্ব্বজনীনভাব স্বীকৃত হয়। বিরাট ভগবান কখনও কোন জাতি বা ধর্ম্ম-বিশেষের পূজিত দেবতা হইতে পারেন না। সমস্ত আকাশ তাঁহার শিরদেশ, শূন্য তাঁহার বপু এবং পৃথিবী পাদপীঠ। এই বিরাটের পরিবাদে আসিয়া ভারতীয় আর্য্যগণের মধ্যে সার্ব্বজনীন

উদার ভাব আসিয়া দেখা দেয়। পণ্ডিত মহলে এই ধর্ম্ম প্রচারিত হওয়ায় একদল সর্ব্বস্বত্যাগী সন্ন্যাসী সৃষ্টি হয়। এই ধর্ম্মের ব্যাখা করিতে গিয়াই নানাবিধ দর্শন লিখিত হয়। তখনকার রাষ্ট্র-স্থাপনকারী পণ্ডিতগণ এই বিশাল ধর্ম্মের আবির্ভাবে যেন খানিকটা বিচলিত হইয়াই কতকগুলি লোকাচারকে ধর্ম্ম বলিয়া জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করেন। এই লোকাচার বা লৌকিক ধর্ম্মের নামই মানবধর্ম্ম। যে শাস্ত্রে এই ধর্ম্মের মূলতন্ত্র লিখিত হইয়াছে তাহার নাম মানব ধর্ম্মশাস্ত্র। উক্ত ধর্ম্ম-শাস্ত্রের মূলতত্ত্বগুলি ক্রমশঃ বিকৃত আকার ধারণ করিয়া নিকৃষ্ট স্বার্থের প্রশ্রয়দায়ক জড়োপাসনায় পরিণত হইলে, বৌদ্ধ ধর্ম্মের আবির্ভাব হয়। পুরাতন বৈদান্তিক ধর্ম্ম সাধারণের বুদ্ধিগম্য হইবে না বলিয়াই বুদ্ধদেব প্রাদেশিক ভাষা গুলির সাহায্যে মানবধর্ম্মশাস্ত্রকে নূতন মূর্ত্তি প্রদান করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ঈশ্বরের বিশালতা ও সার্ব্বজনীনভাব সাধারণের বোধগম্য হইবে না জানিয়া বুদ্ধদেব অস্তিত্ব স্পষ্টভাবে অস্বীকার না করিলেও, ঈশ্বরে বিশ্বাস স্থাপন করিতে বলেন নাই। প্রত্যেক রাষ্ট্রেই কতকগুলি লোক শাসক হিসাবে ইহার রাজদণ্ড পরিচালনা করিয়া থাকেন আর কতকগুলি লোক ঐ রাজ-দণ্ডকে নতশিরে স্বীকার করিয়া লয়। নূতন রাষ্ট্র স্থাপন করিবার জন্যই বুদ্ধদেব সকলপ্রকার বাধাবিহীন সাধারণের বোধগম্য তাঁহার সরল ধর্ম্ম প্রচার করেন। রাষ্ট্রে বাস করিতে গেলে যে সমস্ত লোকাচার ও সংযম শিক্ষা করিতে হইবে তাঁহার অনুশাসনে তাহাই প্রচার করা হয়। এখানেই ভারতের বিশেষত্ব। ভারতীয় ভাবধারা আরবীয় ভাবধারার সহিত মিলিত হইয়া এসিয়ায় একটী অখণ্ড মতবাদ সৃজন করিতে পারে নাই।

ভারতে মুসলমান রাষ্ট্র স্থাপিত হইলে, হিন্দুগণ এক প্রকার বিনা যুদ্ধেই মুসলমান নৃপতিগণকে স্বীকার করিয়া ল'ন। মুসলমান ভাবধারার প্রভাবে মধ্য এশিয়ার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিগুলি দলবদ্ধভাবে প্রবল হইয়া উঠে। তাহার পর ভোগসুখের মোহ তাহাদিগকে ভীষণভাবে আক্রমণ করিলে, তাহারা জনপদের পর জনপদ দখল করিতে থাকে। অবশেষে ভারতবর্ষে আসিয়া ভোগের চরম উপাদানগুলি এইখানে প্রাপ্ত হওয়ায় তাহাদের বিশ্বজয় করিবার ক্ষমতা অনেকটা আপনা হইতেই নিস্তেজ হইয়া পড়ে। ভারতীয় হিন্দুগণ মুসলমানদিগের বিরুদ্ধে কখনই সঙ্ঘবদ্ধভাবে বিদ্রোহ করে নাই। কালক্রমে এই মুসলমান ধর্ম্মকে ভারতীয় আবহাওয়ায় আনিয়া ফেলিবার জন্য পাঞ্জাবে নানকপন্থী, বাংলায় চৈতন্যপন্থী ও দাক্ষিণাত্যে কবিরপন্থী সম্প্রদায়গুলির সৃজন হয়। বিশাল ভারতীয় আবহাওয়ায় আসিয়া আকবরের ইলাহি ধর্ম্ম জাতীয় ধর্ম্মে পরিণত হইবার উপক্রম হইয়াছিল। বৈদেশিক মৌলানা-গণ আরঙ্গজেবের রাজ-সভায় উপস্থিত থাকিয়া উক্ত ধর্ম্মে বাধা প্রদান না করিলে, ভারতবর্ষে ভারতীয় ভাবধারা ও আরবীয় ভাবধারার সংমিশ্রনে নূতন একটী সভ্যতা সৃজন করিতে পারিত। মুসলমান লেখকগণ একথা স্বীকার করিয়া থাকেন যে ভারতীয় মুসলমান ধর্ম্ম একটী স্বতন্ত্র বস্তুই ছিল। কাশ্মীরের মুসলমানগণ কিছুদিন পূর্ব্বেও মক্কাকে তাহাদের তীর্থক্ষেত্র বলিয়া স্বীকার করিত না। অসংখ্য হিন্দু দেব দেবীর উপাসনা পদ্ধতি মুসলমান ধর্ম্মে প্রবেশ করিয়া উহাকে বিশ্বজনীন ধর্ম্মে পরিণত করিয়া তুলিয়াছিল। পাঞ্জাবের আহমেদিয়া মতবাদ এই বিশ্ব-জনীন মতবাদের আধুনিক সংস্কার মাত্র।

ভারতে নূতন মুসলমান ধর্ম্ম :—ভারতীয় ভাব-ধারার আবহাওয়ায় প্রতিপালিত হইয়া যখন ভারতীয় মুসলমান ধর্ম্ম নূতন আকার ধারণ করিতেছিল, তখন কতকগুলি উচ্চশিক্ষিত মুসলমান আরবীয় সভ্যতা ও উহার ভাবধারা ভারতে প্রবর্ত্তিত করিতে পারিলে ঐহিক সুখ-ঐশ্বর্য্য লাভ করিতে পারা যাইবে এই আশায় প্রলুব্ধ হইয়া ভারতবর্ষে মুসলমান ধর্ম্মের সংস্কার আরম্ভ করেন। সার আহমেদ খাঁন্ এই আন্দোলনের প্রথম প্রবর্ত্তক। তিনিই মোল্লাগণকে বিভিন্ন প্রদেশে ও জেলায় প্রেরণ করিয়া জড়োপাসক মুসলমানগণকে একেশ্বরবাদী করিয়া তুলিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে থাকেন। মাস্তবর আগা খাঁর উপাসকগণ ব্যবসা-বাণিজ্যকে তাহাদের প্রধান অবলম্বন বলিয়া আঁকড়াইয়া ধরে। পূর্ব্বে ভারতীয় মুসলমানগণ তুরস্কের তুর্কীগণের ন্যায় এখানকায় অভিজাত ও কৃষক ছিলেন। এই নূতন আন্দোলনের ফলেই খোজা

ও দিল্লীবাসী অভিজাতগণ, মুসলমান ব্যবসায়ী দলে পরিণত হয়। উৎকট জাতীয় ভাবের প্রধান ধারক সুশৃঙ্খলিত জাতীয় ভাষা। দান্তে বর্ত্তমান ইতালিকে জাতীয়তা গ্রহণ করিতে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। গেটে বর্ত্তমান জার্ম্মান রাজ্যটী সংগঠিত করেন। তুরস্কের উদীয়মান কবি ও লেখকগণই "নবীন-তুরস্কের" জনক বলিলে কিছু-মাত্র অত্যুক্তি করা হইবে না। সিরীয়ায়ও জাতীয়তা-বাদের আবির্ভাব হইবার পূর্ব্বে তথাকার জাতীয় ভাষা ও সাহিত্য কিরূপ উন্নতিলাভ করিয়াছিল আমরা তাহা দেখিয়াছি। ভারতবর্ষও উৎকট আরবীয় ভাব-ধারার প্রচারের সহিত সমগ্র মুসলমান জাতির ব্যবহারযোগ্য উর্দ্দু ভাষাকে পুনর্জ্জীবিত করিয়া তুলিবার চেষ্টা চলিতে থাকে। উর্দ্দু ভাষা পূর্ব্বে রাজদরবারে ব্যবহৃত হইলেও উহা ভারতের Lingua Franca মাত্র ছিল। স্যর আহমেদের সাহায্যে ও আন্তরিক সাধনায় উহা ভারতীয় মুসলমানগণের জাতীয় ভাষায় পরিণত হয়।

ঠিক এই সময়ে সৈয়দ আলতাফ হোসেনের আবির্ভাব হয়। সৈয়দ আলতাফ্ একজন ক্ষণজন্মা মহাকবি। স্যর আহমেদের প্ররোচনায় ও উৎসাহে সৈয়দ আলতাফ্ ভারতীয় মুসলমানগণের জাতীয় মহাকবি হইবার জন্য চেষ্টা করিতে থাকেন। ভারতীয় ভাবধারার যাহা বিশেষত্ব তাহা পরিত্যাগ করিয়া সৈয়দ আলতাফ্ সঙ্কীর্ণ জাতীয়তার মধ্যে আপনাকে হারাইয়া ফেলেন। তাঁহার লিখিত 'ইসলামে জোয়ার ভাঁটা' নামক বিশ্ব-বিখ্যাত কবিতা সমগ্র ভারতীয় মুসলমানগণের জাতীয় সঙ্গীতে পরিণত হয়। কবিতার সহিত গদ্যের ও আবির্ভাব হয়। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে স্যর সয়েদ আহমেদ 'তাজিব আল্ আলাক' নাম দিয়া একখানি সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠা করেন। আরবীয় ভাবধারাকে সম্পূর্ণ নূতন ভাবে প্রচার করিবার জন্য নানা প্রকার আঞ্জুমান দলগুলি গঠিত হইতে থাকে। স্যর ইকবল Pan Islamism বা আরবীয় ভাবধারার মহাকবি।

ভারতীয় মুসলমান সম্প্রদায় শিক্ষা-বিস্তারের সহিত ভারতীয় ভাবধারাকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়া আরবীয় ভাবধারার সাহায্যে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র-গঠনের জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেই ভারতে উৎকট 'কম্যুনালিজম্' বা ধর্ম্মান্ধতা দেখা দেয়। ভারতীয় রাজনৈতিকগণকে কতকটা সন্তুষ্ট করিবার জন্য ১৯০৯ সালে শাসন-সংস্কার প্রদান করিবার কথা উঠিলেই মান্যবর আগা খাঁর নেতৃত্বে মুসলমানগণ ইংরাজ সরকারের নিকট চিরকাল বশ্যতা স্বীকার করিবেন বলিয়া অভিমত প্রচার করেন। এইজন্যই মিণ্টো-মর্লি সংস্কারে মুসলমানগণকে অধিকতর সুখ-সুবিধা প্রদান করা হয়। তাহার পর ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে তুরস্কের ভাগ্য-বিপর্য্যয় আরম্ভ হয়। বলকানের যুদ্ধে তুরস্কের সম্রাট খৃষ্টান শক্তিগণের নিকট বিপর্য্যস্ত হইয়া উঠেন। গত মহাসমরের সময় মক্কার সেরিফ হোসেন তুরস্কের সম্রাটকে ধর্ম্মদ্রোহী বলিয়া ঘোষণা করিলেও ইংরাজ তাঁহাকেই খলিফাপদে প্রতিষ্ঠিত করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিলেই ভারতীয় মুসলমানগণ ভ্রিয়া মহম্মদ আলী কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া হিন্দু প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মুসলমানগণ আপনাদের জন্য একটী স্বতন্ত্র লীগ স্থাপন করিয়া নিজেদের স্বতন্ত্রতা রক্ষা করিয়া আসিতে-ছিলেন। ইংরাজ কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া মিত্রশক্তিগণ তুরস্ককে অন্তিম দশায় আনয়ন করিলে মুসলমানগণ হিন্দুর আশ্রয়প্রার্থী হইয়া উঠে। এই আকস্মিক বিপদই ১৯২০ সালে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করিয়াছিল এবং ঐক্য সংসাধিত হইতে দেখিয়া সমস্ত বিশ্ব চমকিত হইয়া গিয়াছিল।

ভারতীয় ভাবধারার ক্রম পরিবর্ত্তন (১৭৫৭-১৮৫৭)।—ভারতীয় ভাবধারার প্রধান মূলমন্ত্র শান্তি। পেটে ক্ষুধা থাকিলেও মুখে তাহা প্রকাশ না করিয়া ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করিয়া শান্ত চিত্তে বাস করার নামই ভারতীয় ভাবধারা অনুযায়ী শান্তি শব্দের প্রকৃত ব্যাখ্যা। কতকগুলি অভিজাত যাবতীয় সুখ স্বাচ্ছন্দ্য আপনাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট রাখিয়া জনসাধারণকে দেহরক্ষা উপযোগী ভরণপোষণের ব্যবস্থা করিয়া নিশ্চিন্ত হইতেন। যে বৎসর সুজন্মা হইত সে বৎসর প্রজাগণের কোন কষ্ট থাকিত না। কিন্তু দুর্ভিক্ষ হইলে তাহারা নিঃশব্দে

প্রাণত্যাগ করিত। জল ও ঝড়ের ন্যায় দুর্ভিক্ষ ও একটী প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা। ইহাও ঠিক একটী নির্দ্দিষ্ট সময়েই আসিয়া থাকে। সমাজের ব্যবহারিক জ্ঞান না থাকায় দুর্ভিক্ষকে তখনকার বিজ্ঞেরা ভগবানের ক্রোধ বা অভিসম্পাৎ বলিয়া অভিহিত করিয়া গিয়াছেন। অজ্ঞ জনসাধারণ ও তাই যখনই এই অভিসম্পাতের সম্মুখীন হইত, তখনি মৃত্যুর জন্য অম্লান বদনে প্রস্তুত হইত। মহামারী একটী দৈনন্দিন ব্যাপার হইলেও, উহাকে দেব বা দেবী বিশেষের ক্রোধ বলিয়া বর্ণনা করা হইত। গ্রামে ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব হইলে ওলাদেবীর উপাসনা করাই যুক্তি-সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইত! বসন্ত রোগের নিবারণের জন্য কোন প্রকার স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় নিষেধক প্রচলিত না থাকায় অনার্য্য দেবতা শীতলা দেবীর শরণাপন্ন হওয়া ব্যতীত অন্য কোন উপায় ছিল না। একেবারে নিঃস্ব ও আত্ম-শক্তিতে বিশ্বাসহীন জনসাধারণ গ্রামে সর্পের উপদ্রব ঘটিলে মনসা দেবীর উপাসনা করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকিত।

মুসলমান বিজয়ের সহিত সমাজের উচ্চস্তরগুলি তাহাদের পেশা হারাইয়া ফেলে। হিন্দুগণ আরবজাতির ন্যায় ব্যবসা বাণিজ্যও করিত। রাষ্ট্র মুসলমানদের হস্তগত হইলে, উহার সহিত উচ্চস্তরের জনসাধারণের তাবৎ পেশাই মুসলমান অভিজাতগণের করতলগত হইয়া যায়। হিন্দুগণকে তাহাদের চাষের জমি মাত্র লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে হয়। তথাকথিত ভদ্রলোকগণ তাবৎ 'চাষী জমি' মালিকানী সত্বে অধিকারভুক্ত করিয়া লইয়া আপনারা জমিদার, জোৎদার ইত্যাদি হ'ন এবং জমির প্রকৃত মালিকগণকে জমির মজুরে পরিণত করিয়া ফেলেন। এই ব্যবস্থাকে সনাতনী প্রথায় প্রবর্ত্তিত করিবার জন্যই রঘুমণির প্রয়োজন হয়। রঘু-নন্দনের স্মৃতির বিধানগুলি একটু মনোযোগ সহকারে পাঠ করিলেই বেশ বুঝিতে পারা যায় যে মানুষের কৌতূহল ও অভিনব ধ্যান-ধারণার গঙ্গাযাত্রা কিরূপ করা হইয়াছে। সমাজকে চিরকাল স্থায়ী বন্ধনে না বাঁধিতে পারিলে উচ্চস্তরের ক্ষমতা লোপ প্রাপ্ত হইবে এই জন্য নানা প্রকার শ্লোক রচনা করিয়া ইহাই নির্দ্দেশ করা হয় যে, ব্রাহ্মণ প্রভৃতি উচ্চ জাতিগুলির সেবা করিলেই নিম্নস্তরের জন সাধারণের পারলৌকিক মুক্তি সুনিশ্চিত। বহির্গমন করিলে নূতন ভাব-ধারণার অধীন হইতে পারিবে এই ভয়ে সর্ব্বপ্রকার বিদেশ-যাত্রা শাস্ত্রকারগণ কর্ত্তৃক নিষিদ্ধ হয়। এমন কি নীতিকারগণও অঋণী, অপ্রবাসী ইত্যাদি সূত্রে, 'এই গাঁয়েতে জন্ম যেন এ গাঁয়েতে মরি' এই প্রকার প্রবাদ বচন রচনা করেন।

১৭১৭ খৃষ্টাব্দে, ভারতের সর্ব্বত্রই এইরূপ অসাড় সমাজ-শরীর লইয়া নানা প্রকার রাষ্ট্র গঠিত হইয়াছিল। দিল্লীর সিংহাসন লইয়া ভীষণ কলহ চলিলেও কেহই তাহার জন্য ব্যস্ত হইতেন না। ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে তৃতীয় পাণিপথের যুদ্ধ হয়; মহারাষ্ট্রগণ পরাজিত হ'ন। ভারতের সৌভাগ্যরবি অস্তমিত হয়, কিন্তু হিন্দুসমাজের অঙ্গে উক্ত রাষ্ট্রবিপ্লবের কোন ঝাঁজ লাগে নাই। শুনা যায় যে ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশী ক্ষেত্রে সিরাজ পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলেন এই বার্ত্তা হুগলী জেলার গ্রাম সমূহে পৌছাইতে দশ বৎসর লাগিয়াছিল। মহারাষ্ট্রেও তৃতীয় পানিপথ বিশেষ কিছু চাঞ্চল্য আনিতে পারে নাই। এই সংঘর্ষের ফলে পেশওয়ার হস্ত হইতে কর্ত্তৃত্ব চলিয়া যায় এবং মহারাষ্ট্রীয় সামন্তরাজগণ রাজনীতিক্ষেত্রে প্রাধান্য লাভ করেন। এই রাষ্ট্র-বিপ্লবের সহিত জন-সাধারণের কোন সম্বন্ধ ছিল না।

বাংলায় ইংরাজ রাজ্য স্থাপিত হইলে, ঐ রাজ্যকে রক্ষা ও উহার পুষ্টি সাধন করিবার জন্য একদল অভিজাতের আবশ্যক হয়। ইংরাজগণ জানিতেন যে প্রাচীন অভিজাতগণ ইংরাজ শাসন সন্তুষ্ট চিত্তে মানিয়া লইবে না। কেন না ইংরাজগণ মুসলমানদের ন্যায় শাসনদণ্ড তাহাদের হস্তে রাখিতে রাজী হন নাই। ভারতে যে সকল Feudal Lords ছিল তাহারা আপনাদের ক্ষমতা হ্রাস ঘটিতেছে দেখিয়া ক্রমশঃই ক্ষুন্ন হইতে থাকে। তাহার পর জমিদারী সমূহের নিত্য নূতন বন্দোবস্তের ফলে বাংলার জমিদারগণও নিঃস্ব হইয়া পড়িতে থাকে। ইংরাজরাজকে কায়মনোবাক্যে সমর্থন করিতে পারে এইরূপ একদল অভিজাতশ্রেণী সৃজন করিবার জন্যই লর্ড ক্লাইভ ও হেষ্টিংশ পুরাতন জমিদারগণের সম্পত্তি কোনরূপে বাজেয়াপ্ত করিয়া লইয়া ঐ সম্পত্তিগুলির সাহায্যে নূতন অভিজাতশ্রেণী সৃষ্টি

করেন। এই নূতন দলের অভ্যুদয়ে পুরাতন দল ভীত হইয়া ইংরাজ রাজের শরণাপন্ন হইলেই ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ভারতে প্রবর্ত্তিত করিয়া ইংরাজ-অভিজাতদিগের অনুকরণে বাংলায় নূতন ও পুরাতনের সংমিশ্রনে একদল স্থায়ী অভিজাত শ্রেণী সৃষ্টি করা হয়। জমিদারগণ চিরকালই রাজস্ব সংগ্রহ করিয়া নবাব দরবারে পৌঁছাইয়া দিতেন, জমিতে তাঁহাদের কোন প্রকার অধিকারই স্বীকৃত হইত না। টোডর মল্লের নিরিখ অনুযায়ী হাল খাজনা তাঁহাদিগকে দিতে হইত এবং মধ্যে মধ্যে জমি জরিপ করিয়া ঐ হাল খাজনার পরিমাণ বৃদ্ধি করা হইত। বান্ধবহীন ইংরাজ বাংলায় জমিদারগণকে জমির মালিকানি প্রদান করিয়া শুধুই যে ক্ষুদ্র অভিজাতগণকে তুষ্ট করিয়াছিলেন তাহাই নয়, উহার সহিত আপনাদিগকে সমর্থন করিবার জন্য ক্ষমতাশালী রাজভক্ত অভিজাত শ্রেণীও রচনা করেন।

এইখানে বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে, তৎকালে গ্রামের জমির অধিকাংশই সাধারণের সম্পত্তি বলিয়া বিবেচিত হইত। গোচারণ ও গ্রাম্য-দেবতার দেবোত্তর ব্যতীত, নানা প্রকার জোৎ গ্রামের সাধারণ সম্পত্তি ছিল। ১৭৯১ খৃষ্টাব্দের নূতন বিধানে জমিদারগণ তাবৎ জমির মালিক বলিয়া ঘোষিত হইলে, সর্ব্বপ্রকার জমি সাধারণ প্রজার মধ্যে বিলি হইয়া যায়। যে সমস্ত সাধারণ জোৎ ছিল তাহা অনেকস্থলেই জমিদারগণের হস্তগত হয়। সাধারণ প্রজা তাহার নিজের জমিতে কৃষক বা মজুর মাত্র হইয়া সামান্য পারশ্রমিক মাত্র গ্রহণ করিয়া পরিশ্রম করিতে থাকে। এই ব্যবস্থা বাংলায় যুগান্তর আনয়ন করে।

ক্রমশঃ সম্পত্তিহীন একদল নিঃস্বের সংখ্যা বাংলায় বৃদ্ধি পাইতে থাকে। উচ্চস্তরের অভিজাতগণ ব্যতীত, যে সমস্ত মধ্যবিত্ত শ্রেণী ইংরাজ ব্যবসায়ীদের সংস্পর্শে আসিয়া উহাদের মজুন্দী ইত্যাদি হইতে থাকে, তাহারাও কালক্রমে বিপুলবিত্ত অর্জ্জন করিয়া জমিদার শ্রেণীতে পরিণত হয়। সিপাহী বিদ্রোহের কিছু পূর্ব্বে, ইংরাজশাসিত ভারতবর্ষে এইরূপ দুইটী শ্রেণী সৃষ্ট হয়। ধনিক জমিদারগণ ইংরাজ অনুগ্রহে প্রতিপালিত হইতেছিলেন বলিয়া তাঁহারা পরম রাজভক্ত ও ইংরাজের ন্যায়পরায়ণতায় অগাধ বিশ্বাসভাজন হ'ন। দরিদ্র কৃষকগণ কোনপ্রকার শিক্ষাপ্রাপ্ত না হইয়া জড়ের ন্যায় অজ্ঞ, নিশ্চল ও নির্ব্বাক সম্প্রদায়ে পরিণত হয়। যে সমস্ত সামন্তরাজগণ ইংরাজ সরকার কর্ত্তৃক আপনাদিগের রাজ্য হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলেন তাঁহারাই ইংরাজকে ভারত হইতে অপসারিত করিবার জন্য সময় ও সুবিধা অন্বেষণ করিতেছিলেন। ক্রিমিয়ায় ও আফগানিস্থানে ইংরাজগণকে বিধ্বস্ত হইতে দেখিয়া ইংরাজগণকেও যুদ্ধক্ষেত্রে হটাইতে পারা যায় তাঁহারা এই জ্ঞানলাভ করেন। তাহার পর ইংরাজকে বিধ্বস্ত করিবার জন্য আপনাদের অনুচরগণকে সঙ্গে লইয়া বিদ্রোহে অবতীর্ণ হ'ন। যাঁহারা ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহকে সামরিক বিদ্রোহ মাত্র বলিয়া সন্তুষ্ট থাকেন তাঁহাদের জানা উচিত যে উহা সামরিক বিদ্রোহ নহে। ভারতীয় সৈনিকগণ ভারতীয় সামন্তগণের অর্থে অনেকদিনই পুষ্ট হইয়া আসিতেছিল। তাঁহাদের পুরাতন মনিবগণ যখন তাহাদের নিকট আসিয়া নূতন সুখ-সুবিধা দিবে বলিয়া আশ্বাস প্রদান করে, তখন তাহারা বিচলিত হইয়া উঠে। এইপ্রকার বিচলিত হইবার আর একটী কারণ ছিল। ভারতীয় সৈনিকগণের অধিকাংশ কৃষক শ্রেণী হইতে সংগৃহীত হইত। ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দের নূতন বিধানবলে তাহারা জমিতে স্বত্ব হারাইয়া বসিয়াছিল। পুরাতন অভিজাতগণ তাহাদিগকে নূতন সুখ-সুবিধা দিবে বলিয়া আহ্বান করিলেই তাহারা উত্তেজিত হইয়া বিদ্রোহে যোগদান করে। এই বিদ্রোহও সর্ব্বত্রই একই সময়ে সৃষ্ট হয় নাই। অভিজাতগণ চর পাঠাইয়া ও নানা প্রকার প্রলোভন দেখাইয়া এক একটী প্রদেশের সৈন্যদলকে বহু আয়াসে হস্তগত করিতে পারিয়াছিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে বাংলার নূতন অভিজাতগণ ইংরাজকে দেবতা বলিয়া মনে করিতেন। এই অভ্যুদয়ে তাঁহারা আপনাদিগকে বিপন্ন করিয়াও ইংরাজকে রক্ষা করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হ'ন। সামন্তরাজগণ বাংলার জমিদার বা পাঞ্জাবের শিখ সর্দ্দারগণকে হস্তগত করিতে পারেন নাই তাহার প্রধান কারণ এই যে, বাংলার জমিদারগণ ইংরাজ অনুগ্রহে জমির মালিক হইয়া কয়েক বৎসরের মধ্যেই প্রভূত বিত্তশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন। বিদ্রোহের ফলে

নূতন রাজ হিন্দুস্থানে প্রতিষ্ঠিত হইলে, তাহাদের সম্পত্তি ও অর্থহানি ঘটিবেই এই আশঙ্কায় তাহারা অনেকটা অস্থির হইয়া পড়েন। নব-বিজিত পাঞ্জাবে ইংরাজগণ রণজিৎ সিংএর সর্দ্দারগণকে দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধের পূর্ব্বেই বেশ হস্তগত করিয়া রাখিয়াছিলেন, দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধের পর সমস্ত পাঞ্জাব ইংরাজ কর্তৃক অধিকারভুক্ত হইলেও ইংরাজ সরকার সর্দ্দারগণকে পদচ্যুত করেন নাই। বিদ্রোহের ফলে, মুসলমান রাজ্য পুনর্ব্বার প্রতিষ্ঠিত হইলে, তাহাদের সমূহ স্বার্থহানি হইবে এই আশঙ্কায়ই শিখসর্দ্দারগণ বিদ্রোহের সময় প্রাণপণ করিয়া ইংরাজের সাহায্য করিয়াছিল।

বুদ্ধিমান ইংরাজ বিদ্রোহের প্রকৃত কারণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে প্রজাগণের স্বত্ব রক্ষা করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠেন। যে সমস্ত সামন্তরাজগণ পূর্ব্বে সরকারের চক্ষুশূল ছিলেন ও যাহাদিগকে সিংহাসন হইতে নামাইয়া দিয়া একদল নূতন অভিজাত শ্রেণী তৈয়ারী করিবার স্বপ্ন ইংরাজ জাতি দেখিতেছিলেন ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ঘোষণায় তাঁহাদের রাজত্বে তাঁহাদের অধিকার ও স্বত্ব স্বীকৃত হওয়ায়, তাঁহারা নবগঠিত অভিজাত শ্রেণীদের ন্যায় রাজভক্ত শ্রেণীতে পরিণত হ'ন। কৃষক ও পুরাতন অভিজাতগণই এই ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের বিদ্রোহের জনক ও পরিচালক ছিলেন বলিয়া ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দ হইতে তাহাদের উন্নতির জন্য ইংরাজ সরকারের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষিত হয়। এই জন্যই ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে প্রজাস্বত্ব আইন লিপিবদ্ধ হয়। সামন্ত রাজগণকে ইউরোপীয় প্রথায় শিক্ষিত করিয়া তুলিবার জন্য পৃথক শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন ও বিশেষ ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করা হয়।

ভারতীয় ভাবধারার ক্রম-পরিবর্ত্তন। (১৮৫৭ ১৯০৯)—ইংরাজ রাজত্ব ক্রমশঃ দেশে বদ্ধমূল হইয়া গেলে, ইংরাজী ভাবধারা কতকটা দেশের উচ্চস্তরে প্রবেশ করে। যে সমস্ত দেশীয় কর্ম্মচারীগণ ইংরাজদের সহিত অনবরত মেলামেশা করিতেন, ইংরাজদের সহিত যাঁহাদিগকে অনেক সময়েই কার্য্যোপলক্ষে একসঙ্গে বাস করিতে হইত, তাঁহারা স্বভাবতঃই কতকটা উদার মতাবলম্বী হ'ন। সনাতনী সমাজের যে সমস্ত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ইংরাজ-সহবাস রূপ সৌভাগ্যলাভ ঘটিল না তখন তাহারা আপনাদিগকে কৃত্রিমউপায়ে বড় করিয়া রাখিবার জন্য নানা ছল ও স্থবিধা অন্বেষণ করিতে থাকেন। শাস্ত্রের তথা রচিত সূত্রগুলির দোহাই দিয়া অচলায়তন সমাজকে আরও পঙ্গু করিয়া দিবার মতলব করিতে থাকেন। তাঁহাদেরই যে সমস্ত আত্মীয় কলিকাতা, পাটনা ও মুর্শিদাবাদে ইংরাজ-সরকারের সান্নিধ্যে থাকিয়া প্রচুর বিত্ত অর্জ্জন করিয়া জীবনের শেষ ভাগে গ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করিত তাহাদিগকে 'একঘরে' করা ইত্যাদি নানাপ্রকার সামাজিক ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা ব্যতিব্যস্ত করিতে আরম্ভ করে। এই জন্যই এখন হইতে ইংরাজ শাসিত ভারতবর্ষে দুইটী অভিজাতশ্রেণী সৃষ্টি হয়। সনাতনী অভিজাতগণ সনাতনীকে প্রশ্রয় দিতে থাকেন, নূতন অভিজাতগণ পরিবর্ত্তনকে বরণ করিয়া লইবার জন্য বিশেষ ব্যগ্র হইয়া পড়েন। এই দ্বন্দ্বের ফলেই স্বর্গীয় রাজা রামমোহন রায়ের আবির্ভাব হয়।

রাজা রামমোহন রায় বাংলার একজন জমিদার পুত্র ছিলেন। কিন্তু তাঁহার পিতা ইংরাজ রাজের আনুকূল্যে প্রতিপালিত হইয়া ঐহিক বিভব লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র রামমোহন এই জন্যই সনাতনী প্রথায় আবদ্ধ থাকিলে আপনাদের অনেক অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে বলিয়াই নূতন-বিধান আনয়ন করিবার চেষ্টা করেন। কি হিন্দু রাজত্বে, কিম্বা মুসলমান শাসনকালে জন সাধারণকে শিক্ষা প্রদান করা রাজধর্ম্ম বলিয়া বিবেচিত হইত না, কেন না তখনকার অভিজাতগণ জনসাধারণকে অজ্ঞ রাখিতে পারিলেই আপনাদের আধিপত্য অক্ষুণ্ণ থাকিবে, এই ধারণার বশীভূত হওয়ায়, সরকারকেও এই নিম্নশ্রেণীকে উচ্চ করিবার জন্য উপদেশ দিতেন না। ইংরাজ সিপাহী বিদ্রোহের ফলে বেশ বুঝিতে পারেন যে ভারতে রাজত্ব করিতে গেলে উহার জন-সাধারণের সহিত বিশেষ করিয়া আত্মায় আত্মায় মিলাইয়া না দিতে পারিলে তাহাদিগকে চিরকালই কতকগুলি উচ্চাকাঙ্ক্ষী 'অভিজাতের হস্তে ক্রিড়নক মাত্র হইয়া থাকিতে হইবে এবং এই অভিজাতগণ যখনি ইচ্ছা করিবে তখনি তাহাদিগকে রাজ্যচ্যুত করিতে পারিবে। পাঠান ও মোগল জাতির ইতিহাসের প্রত্যেক পৃষ্ঠায় এই সত্যই জলন্ত অক্ষরে লিখিত আছে। সেই জন্যই দেশে শান্তি স্থাপনের

সহিতই, দেশবাসী জনসাধারণকে কতকটা শিক্ষা প্রদান করিবার জন্য ইংরাজ সরকার বিশেষ ব্যস্ত হ'ন। ঠিক এই সময়ে রামমোহন রায় কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া এই শিক্ষার ধারা কিরূপ হইবে তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দেন। তিনি যখনি শ্রবণ করেন যে, সরকার কলিকাতায় সংস্কৃত কলেজ স্থাপন করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন তখনি তিনি বড়লাট মহোদয়কে এক খোলা চিঠি লিখিয়া স্পষ্টই বিজ্ঞাপিত করেন যে, এই দেশে আরবী, পার্শী শিক্ষা প্রদান না করিয়া ইংরাজী ভাষা, দর্শন ও বিজ্ঞান শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করাই বিশেষ প্রয়োজন। রামমোহন রায়ই সকল প্রকার সঙ্কোচ অবলীলাক্রমে পদদলিত করিয়া বাংলা ভাষায় নানা প্রকার পুস্তিকা প্রণয়ন করিতে আরম্ভ করেন। সত্য কথা বলিতে কি বর্ত্তমান বাংলার গদ্যের জনক তিনিই।

ধর্ম্ম বা সামাজিক আচার ব্যবহার অবলম্বন করিয়া বাসাই করাই ভারতীয় ভাবধারার বিশেষত্ব। মুসলমানী যুগে অভিজাতগণ মুসলমানী ভাষা, পরিচ্ছদ ও আদব-কায়দার সহিত উক্ত ধর্ম্মের অনেক আচার ব্যবহারও বিরাট হিন্দু প্রতিষ্ঠানের অঙ্গীভূত করিয়া ল'ন। চোগা ও চাপকান যেমন প্রত্যেক অভিজাতের অঙ্গ ভূষণ হয়, মুসলমানী বরখা ও তেমনি পর্দ্দায় পরিণত হইয়া আমাদের মেয়েদের আবরু রক্ষা করিতে থাকে। মুসলমানী উপাধি খাঁ, রায়সাহেব ইত্যাদি যেমন আমাদের সামাজিক সম্মান বৃদ্ধি করে, উচ্চ-প্রাচীর তুলিয়া দিয়া আমরা প্রত্যেক পরিবারেই তেমনি 'হেরেম' তৈয়ারী করিয়া ছিলাম। পলোয়া, কালিয়া আমাদের উপাদেয় ভোজ্যে পরিণত হয়। আতর আমাদের অঙ্গে সুগন্ধ বিস্তার করিত। মোট কথা বলিতে গেলে আরবী ভাব-ধারা আমাদের একান্ত অজানিত ভাবেই সমাজে প্রবেশ করে। জাতীয় বন্ধনকে কতকটা শিথিল করিবার জন্যই বাংলায় চৈতন্য ধর্ম্ম ও পাঞ্জাবে নানক ধর্ম্ম প্রচারিত হয়। উভয় ধর্ম্মেই আরবীয় ভাবধারায় মূলমন্ত্র ঐক্যতা গ্রহণ করা হইয়াছে। ইংরাজ রাজত্বের প্রারম্ভে এই কথাই উঠে যে ইংরাজদের সহিত পা ফেলিয়া চলিতে গেলেই আমাদিগকে অনেকটা খৃষ্টান ভাবাপন্ন হইতে হইবেই। জাতীয় কঠিন গণ্ডী ভাঙ্গিয়া খানিকটা স্বাধীন ভাবে চলা-ফেরা করিতে হইবেই। পল্লী গ্রামে ছোঁয়াচে রোগ বজায় রাখিয়া বাস করা সম্ভব, কিন্তু সহরে উহা একেবারেই অসম্ভব। রাজাকে ম্লেচ্ছ বা অস্পৃশ্য বলিয়া দূরে রাখিলে সম্পদ ও গৌরব লাভ করিতে পারা যায় না; কাজেই রাজার সান্নিধ্যে আসিলেই যাহাতে শুচির হানি না হয় এরূপ ব্যবস্থা করিবার বিশেষ প্রয়োজন হয়। তখনকার উন্নতিশীল অভিজাতগণ এই জন্যই একটী নূতন ধর্ম্ম মত প্রচার করেন তাহারই নাম ব্রাহ্মধর্ম্ম। ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথম ব্রাহ্মধর্ম্ম ভারতে প্রচারিত হয়। বাংলায় এই নূতন ধর্ম্ম প্রচারিত হইলেও, ইংরাজ অধিকৃত অন্যান্য প্রদেশে তাহার নকল চলিতে থাকে। মহাত্মা রানাডে বোম্বায়ে প্রার্থনা সমাজ নাম দিয়া উন্নতিশীল হিন্দুধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করেন। পাঞ্জাবে দয়ানন্দ স্বামী আর্য্য সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন।

রামমোহন রায় শুধুই নূতন ধর্ম্মমত প্রচার করিয়া ক্ষান্ত হন নাই। জনসাধারণকে উন্নত করিবার জন্য Social serviceএর অবতারণা করেন। এতদিন পর্য্যন্ত অসাড় হিন্দুসমাজের কোন প্রকার চৈতন্যই ছিল না। তাহার বিরাট দেহ যেন পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইয়া নিশ্চল অবস্থায় থাকিত। Social service রূপ খুব কঠিন 'ইন্‌জেকৃশনে'র ব্যবস্থা করিয়া মহাত্মা রামমোহন হিন্দু জাতির সামাজিক শরীরে চৈতন্য ফিরিয়া আনিবার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করেন। তৎকালে যে সমস্ত সামাজিক সামাজিক ব্যবস্থা ক্রমশঃই অথর্ব্ব হইয়া উঠিতেছিল সেগুলি আমূল পরিবর্ত্তন করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হ'ন। বিজ্ঞান প্রচার হওয়ার সহিত যখন সকল প্রকার সত্য তত্ত্বগুলি প্রচার হইতে থাকে তখন পুরাতনী প্রথাগুলির উচ্ছেদ সাধন করিবার জন্য তিনিও জোর আন্দোলন চালাইতে থাকেন। সতীদাহ বা গঙ্গাসাগরে সন্তান নিক্ষেপ প্রথা বর্ব্বর যুগেরই নিদর্শন, মানব প্রকৃতিদেবীর শক্তির মূল তত্ত্বের কোন সন্ধানই করিতে পারিত না। ওলাউঠার বীজ কিরূপে সংক্রামক ভাবে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে যখন সকলে অবগত হইলেন, তখন ওলাদেবীর পূজা বৃথা। এইরূপ অজ্ঞতা জনিত যত প্রকার জড়বাদ ও কুসংস্কার ছিল, লোক-শিক্ষা প্রচারের সহিত তিনি সেগুলির মূলে কুঠারাঘাত করিতে থাকেন। ক্রমশঃ

প্রাচীন ভারতে যন্ত্রপাতি ও আগ্নেয়াস্ত্র

প্রবন্ধ

শ্রীরমেশচন্দ্র মিত্র

আজকাল অনেকেই প্রাচীন ভারতে আগ্নেয়াস্ত্র ছিল কি না তাহার সম্বন্ধে সন্দিহান। অনেক মহাপণ্ডিত সংস্কৃত শ্লোকের কূটার্থ করিয়া প্রতিপন্ন করিবার বিশেষ আয়াস পাইয়াছেন যে ভারতে কোনকালে বারুদ বা সেইরূপ কোন পদার্থের ব্যবহার ছিল না। আমি আলোচ্য প্রবন্ধে আমার সামান্য বুদ্ধিতে যেরূপ বুঝিয়াছি, তাহাতে দেখাইবার চেষ্টা করিব যে ভারতে আগ্নেয়াস্ত্র ছিল ও তাহা নিক্ষেপ করিবার জন্য যে বারুদের আবশ্যক তাহাও তখন "অগ্নিচূর্ণ" বলিয়া প্রচলিত ছিল।

যাহারা পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ সভ্যতার শিখরে আরূঢ় হইয়া জ্ঞান গরিমায় বর্ত্তমান জগতকে বিমোহিত করিয়াছে তাহারা যে সামান্য বারুদ বা আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার জানিত না ইহা যেন আমার মনে কেমন কেমন ঠেকে। এই বিষয়ের যথাসাধ্য আলোচনা করিবার জন্যই এই প্রবন্ধের অবতারণা। প্রবন্ধটীকে সম্পূর্ণ করিবার জন্য যে সব পুস্তকের প্রয়োজন দুর্ভাগ্যক্রমে অনেক চেষ্টা করিয়াও আমি তাহা এখানে সংগ্রহ করিতে পারি নাই—কাজেই আমার অনেক বক্তব্য পরিষ্কার করিয়া বুঝাইতে পারি নাই।

প্রাচীন পুরাণাদি ও অন্যান্য গ্রন্থ আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বৈশম্পায়ন বিরচিত "নীতি প্রকাশিকা" ও শুক্রাচার্য্য প্রণীত "শুক্রনীতিতে" আগ্নেয়াস্ত্রের বর্ণনা আছে। মহাভারতের পূর্ব্ব হইতে শুক্রাচার্য্যের শুক্রনীতি প্রচলিত ছিল তাহা যাঁহারা ভাল করিয়া মহাভারত পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন। কাজেই মহাভারতের মহাযুদ্ধের পূর্ব্ব হইতেই যে আগ্নেয়াস্ত্র ভারতে প্রচলিত ছিল তাহা আমি রামায়ণ ও মহাভারত হইতে দেখাইবার চেষ্টা করিব তাহাতে পাঠক সহজেই আমার প্রবন্ধের মর্ম্ম-কথা বুঝিতে পারিবেন।

রামায়ণে আছে যে বিশ্বামিত্র মুনি রামচন্দ্রকে আগ্নেয় ও শিখর অস্ত্র দিয়াছিলেন—(Carey ও Marshman) শিখর শব্দের মানে যাহার শিখা আছে অর্থাৎ অগ্নি শিখা আছে এইরূপ মানে করিয়াছেন। (Hindu Superiority P303)

আগ্নেয়াস্ত্র প্রদীপ্ত ও ভয়ঙ্কর শব্দকারী ছিল (কর্ণ-৮৯; ১৭.১৮) কুরুক্ষেত্রে ইহার ব্যবহার হইয়াছিল—মহাভারতে অন্যান্য পর্ব্বেও তাহার উল্লেখ (কর্ণপর্ব্ব, ২৪৪-৭; বিরাট ৫২-৫৮; উদ্‌যোগ ১৮২-১২) আছে। হরিবংশ ও বায়ুপুরাণে পরশুরাম কর্ত্তৃক মহারাজ সাগরকে আগ্নেয়াস্ত্র দানের কথা আছে (বায়ু ৮৮-১৩৫)।

বন্দুকের কথা কৃষ্ণ যজুর্বেদের ১৫।৬।৭; ঋক্‌বেদের টিকাকার সায়নাচার্য্যের টিকায় এইরূপ আছে লৌহ নির্ম্মিত অস্ত্র, অভ্যন্তরে ছিদ্র মধ্যে প্রজ্বলিত অগ্নি, যাহা বাহির হইয়া আসে তাহাও জ্বলন্ত। বৈশম্পায়নের 'নীতি প্রকাশিকায়' বন্দুকের এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন—নালিকার আকার সোজা, সরু ছিদ্র বিশিষ্ট ও কৃষ্ণবর্ণ। ইহাদের মধ্যে ক্ষুদ্র লৌহগুলি আসিয়া মর্ম্মচ্ছেদ করিয়া থাকে। এই বর্ণনা ও শুক্রনীতিতে নালিকার যে বর্ণনা আছে তাহাতে বর্ত্তমানের বন্দুকের সহিত মিলে। কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধে উভয়পক্ষে নালিকাস্ত্র ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা আমরা মহাভারতে উদযোগ, কর্ণ, সৌপ্তিক, স্ত্রী, ভীষ্ম, দ্রোণ পর্ব্বে পাই। মহাভারতে আরো আছে দ্রোণাচার্য্য অর্জ্জুনকে ব্রহ্মশির অস্ত্র দিয়াছিলেন (আদি-১৩৩-১৮,১৯২০ ১৩৯-০,১১। মহাভারতে অয়কণকের উল্লেখ আছে (অয়—কণা অর্থাৎ যাহা লোহার গুলি উদরস্থ করে এবং আগ্নেয় উপায়ের দ্বারা দূরে নিক্ষেপ করে।

রামায়ণে শতঘ্নী অস্ত্রের কথা পাঠ করি ইহা ইস্পাতনির্ম্মিত পরিষ্কার ও ভীষণ (রামা-লঙ্কা ৩-১৩) বৃহৎ বৃষের ন্যায় আকার ও মেঘের ন্যায় গর্জ্জনকারী (Hindu Superiority P. 315) মহাভারতে ইহার এইরূপ বর্ণনা আছে যে ৪টী চাকা বিশিষ্ট ও কৃষ্ণ লৌহ

নির্ম্মিত ও স্থূল ও শতঘ্নকে এক সঙ্গে নষ্ট করিতে পারে (দ্রোণ-১৯৮-১৯ ; ১৭৭-৩৬, ৩৭১৬) মৎস্য পুরাণে দুর্গের উপর শতঘ্নী সাজাইয়া রাখার কথা আছে। রামায়ণে আছে অযোধ্যায় শত শত শতঘ্নী ছিল ও লঙ্কায় রাক্ষসেরা শত শত শতঘ্নী দুর্গদ্বারে সাজাইয়া রাখিয়াছিল (রামা আদি ৫-১১, লঙ্কা ৩-১৭) মহাভারত পাঠে অবগত হওয়া যায় যে পাণ্ডবেরা ইন্দ্রপ্রস্থে শতঘ্নী ও লৌহচক্রের দ্বারায় শোভিত করিয়াছিলেন—নগর দ্বারেও শতঘ্নী থাকিত (মহা আদি ২০৭,৩৫, বন ১৫-৭, শান্তি ৯-৪৫) কুরুক্ষেত্রে উভয়পক্ষে শতঘ্নী ব্যবহৃত হইয়াছিল—(উদ ১৯৫-১৪ ৪৯-৭৯ ভীষ্ম ৯৬-৫৮, ১১৯-২ ; দ্রোণ ১০০-২৯, ১৩৬-২০,১৫৪-১৪১, ১৭৩-৪০, কর্ণ ১১-৮,২৭-৩০,৫৮-১৫)। তুলাগুড় বলিয়া চক্রযুক্ত কামানের বর্ণনাও দেখিতে পাই। মহাভারতে প্রজ্বলিত মুখ বৃহদাকার নাগ নামক যন্ত্রের উল্লেখ আছে (বন-৪২-৫)। রামায়ণে ব্রহ্মাস্ত্রের এইরূপ বর্ণনা আছে—বজ্রতুল্য অতি কঠিন, ভয়ঙ্কর শূন্যময় শরীর অথচ অত্যন্ত ভারী, সধূম অগ্নিবৎ দীপ্ত বায়ুর ন্যায় বেগশালী, মহাশব্দকারী রথ, অশ্ব ও গিরিভেদকারী (লঙ্কা-১১০-৬) মহাভারতেও ইহার সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণনা আছে যে ব্রহ্মাস্ত্র প্রজ্বলিত হইত ও ধূম নির্গত হইত এবং পরশুরাম দ্রোণাচার্য্যকে প্রয়োগ উপসংহার রহস্যের সহিত দান করিয়াছিলেন (উদ-১৮৬-১৫,১৬,১৭,২১ ; আদি ১৬৬-১৩,১৩০-৬৩,৬৫)। কুরুক্ষেত্রে উভয়পক্ষে ব্রাহ্মাস্ত্র ব্যবহৃত হইয়াছিল—(দ্রোণ ২৬-২০,৯০-৯,১২ ; ১২৩-১২,১৩,১৫৫-৩৯,৪১,১৮৭-৪৮, ১৯১-২৫, ১৯৮-৩৪,২০০-৩৬, কর্ণ ৪৯-৩৬ ৮৯-৫০,৯১-২০,২১, বিরাট ৫১-৮, ১১)। কুরুক্ষেত্রে বর্ত্তমান কালের ন্যায় explosive ব্যবহার হইয়াছিল দেখা যায় অর্জ্জুন যে 'ঐন্দ্র' অস্ত্র ব্যবহার করেন তাহা হইতে শত শত দিব্যাস্ত্র সকল বাহির হইয়া শত্রু-সংহার করিত। অশ্বত্থমার নারায়ণ অস্ত্রের কথা সকলের নিকট সুবিদিত—উক্ত অস্ত্র হইতে অগ্নিতুল্য বহু অস্ত্র উৎপন্ন হইয়া পাণ্ডবদিগকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছিল, তাঁহারা অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া রথ হইতে নামিয়া পড়ায় তবে রক্ষা পাইয়াছিলেন (দ্রোণ—১৯৮)।

মহাভারতে যে সম্মোহন অস্ত্রের উল্লেখ আছে তাহা পাঠ করিলে মনে হয় যে উহা কোন বিষাক্ত গ্যাসপূর্ণ। গত জার্ম্মাণযুদ্ধে আমরা এইরূপ সম্মোহন গ্যাসের কথা পাঠ করি। ভারতবাসীরা পূর্ব্বকালে যুদ্ধে দাহ্য পদার্থ ও বিষের ব্যবহার করিতে জানিত তাহাও মহাভারত পাঠে অবগত হওয়া যায় (সভা ৫-১২২, বন ১৫-৬, উদ ১৫৪-৫,৭,৯ ; রামা লঙ্কা—৪-১১ ; মনু ৭-১৯৫,১৯৬)। অর্জ্জুন গন্ধর্ব্ব চিত্ররথের রথ দগ্ধ করিয়াছিলেন তাহাও জানা যায়।

মহাভারত, রামায়ণ পুরাণাদিতে আমরা মোটামুটি নিম্নলিখিত অস্ত্রের বর্ণনা পাঠ করি। আমরা পাঠকদিগের সহজে বুঝিবার জন্য ইহার ইংরাজী প্রতিশব্দ দিলাম—ইহা হইতে প্রাচীনকালে অস্ত্রবিজ্ঞান কতটা উন্নত হইয়াছিল বুঝা যাইবে।

ধনুক—Bow-ইহা সকলেই দেখিয়াছেন ও ইহার ব্যবহার সকলের জানা আছে।

ভিন্দিপাল—Crooked club ; শক্তি—Spear : দ্রুঘ (Hatchet) ; তোমর—Tamahawk—wooden body and metal head, formed like a bunch of flowers ; নালিক—Musket ; লগুড়—Club ; পাশ—(Lasso) ; চক্র—Discus circular disk ; ভুষণ্ডী—Octogonal Club—has broad knots and broad body and good handle for fist ; পরশু—axe, গো-শীর্ষ—Cow horn spear ; অসিধেনু—Stiletts useful for fighting in near quarters : লাভিত্র—Scythe—Crooked shaped instrument ; অস্ত্র—Bumarang has knots at the foot ; পিণাক—Trident ; গদা—Club—Sharp iron has100 spikes at its broad head and is covered on the sides with spikes.

মুদ্গর—Hammer ; শীরা—Plow-share ; মুষল—Pestle ; পর্শ্চিস্—Battle axe ; মনস্থিসা—Dagger ; পরিঘ—Battering ram ; ময়ুখ—Pole ; শতঘ্নী—Hundred killer—Camon made of iron very hard.

পাঠক প্রাচীন অস্ত্র-শস্ত্রের বিবরণ হইতে সহজেই বুঝিতে পারিতেছেন যে বর্ত্তমান সময়ে শত্রু পরাজয়ে যে

সব আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহৃত হয় তাহা অপেক্ষা প্রাচীন ভারত কোন অংশে হীন ছিল না. এই অস্ত্রগুলির ব্যবহার শিক্ষা করিতে বহু সময় লাগিত এবং সাধারণের নিকট পরীক্ষা দিয়া তবে পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইতে হইত। সেই সময়ে সম্রাট স্বয়ং ও অন্যান্য রাজারা ও রাজমহিষীরা এই পরীক্ষা দেখিতে আসিতেন। মহাভারতে কর্ণ ও অর্জ্জুনের অস্ত্র পরীক্ষা আদিপর্ব্বে বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

শুক্রাচার্য্য দুই প্রকার নালিকার বর্ণনা করিয়াছেন—বৃহৎ ও ক্ষুদ্র নালিকা লৌহ ও সিসাগুলি "অগ্নিচূর্ণ" দ্বারা দূরে নিক্ষিপ্ত হইত। এই অগ্নিচূর্ণের যে বর্ণনা শুক্রাচার্য্য দিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া বোধ হয় যে ইহা বর্ত্তমান কালের পারদ ছাড়া আর কিছুই নহে। সংস্কৃত শ্লোকের অনুবাদ করিলে এইরূপ হয়—"সোয়ারা ৫ পল, গন্ধক ১ পল,স্নুহী অংগার পৃথক পৃথক চূর্ণ করিবে। তারপর এক করিয়া মিশাইবে, তৎপরে সিজার ও রশুনের রসের আটা দিয়া পেষণ করিবে—অনন্তর তাহাকে রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া পুনর্ব্বার পেষণ করিবে—এইবার পেষণ করিলেই বালুকার ন্যায় "অগ্নিচূর্ণ" প্রস্তুত হইবে।" ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে মহাভারতীয় মহাযুদ্ধে ও তৎপূর্ব্বে কি প্রকারে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহৃত হইয়া দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল।

পৌরাণিক বা মহাভারতীয় সময়ের কথা ছাড়িয়া দিলেও আমরা নিম্নলিখিত ঘটনাগুলির বর্ণনা হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারি যে ইয়োরোপীয় সভ্যতার অনেক পূর্ব্বে ভারত আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার জানিত। মহাবীর অলেকজন্দার ভারত জয় করিতে আসিয়া তাঁহার গুরু পণ্ডিত-প্রবর আরিষ্টটলকে লিখিয়াছিলেন যে "ভারতীয়রা আমার সৈন্য সকলের উপর ভীষণ আগুন প্রক্ষিপ্ত করিয়াছিল।" গ্রীকেরা তখন পর্য্যন্ত আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার জানিত না। "Mr. Halhad in his preface to A code of Gentoo Law Said "The word and arms is literally Sanskrit Agne-Aster a weapon of fire, the first species of it have been a kind of dart-arrow tipt with fire and discharged upon the enemy."

হালকু খাঁ পশ্চিম এসিয়ার মুঘল সম্রাজ্যের স্থাপনকর্ত্তা। তাঁহার দূত যখন দিল্লীতে উপস্থিত হন সেই সময় তাঁহার সংবর্দ্ধনার্থ আট শত Firecars উপস্থিত ছিল তাহা ফেরিস্তা পাঠে অবগত হই। যখন টাইমুর ভাট্‌নীরের দুর্গ আক্রমণ করেন সেই সময়ে তাঁহার সৈন্যগণের উপর আগ্নেয়াস্ত্র বর্ষণ হইয়াছিল (Elliot-Vol. V. P 423·24) মহামতি কর্ণেল টড্ তাঁহার রাজস্থানে "নলগোলার" বর্ণনা করিয়াছেন (Rajasthan V. I. P. 310) কাশ্মিরের রাজা হাল নামক নরপতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন—কিন্তু হাল্ কতগুলি মাটির হাতি গড়িয়া রাখিয়াছিলেন—সেইগুলির পেট হইতে হঠাৎ বজ্র শব্দে আগুন বাহির হইয়া কাশ্মির নরপতির সৈন্য মধ্যে বিষম আতঙ্কের সঞ্চার করায় তাঁহার পরাজয় হয়—এই প্রসঙ্গে পণ্ডিতবর Sir H. Elliot বলেন—

"The testimony is valuable for this was translated a century previous from a Sanskrit original even then acknowledged to be very old ; we have other eastern stories all hearing the same characters and all composed long before the invention of gunpowder was made and therefore the writers had no opprtunity applying modern knowledge to the bistory of a more remote era." (Elliot vol. vi, P. 475);

তারিখ-ই-ফেরিস্তা-পাঠে অবগত হওয়া যায় যে ১৩৬৮ খৃঃ অব্দে প্রথম মহমদ্ সা বাহামণি বিজয়নগরের রাজা কৃষ্ণরায়কে পরাজিত করিয়া তাঁহার ৩০০ শত কামান অন্যান্য দ্রব্যের সহিত দখল করিয়াছিলেন।

রাইখরের যুদ্ধে বিজয়নগরের রাজার ৪০০ শত বৃহৎ ভারী কামানের ও ৯০০ শত কামন গাড়ীর কথা Sewell's Forgotten Empire নামক পুস্তকের ৩৩২ পৃষ্ঠায় পাঠ করি। যখন ভাসকোডিগামা প্রথমে কালিকটে আসিয়া উপনীত হন তখন তাঁহার সম্মানের জন্য নায়ারেরা আগ্নেয়াস্ত্র ছাড়িয়াছিল।

(Elliot vi. P. 467) Mr. W. Sinclair had written in the Indian Antiquary Sep. 1878—

Europeans did not apply flints or fire-locks to guns before the 17th century but the Indians Hindu did. তুজাহি বাবরি (বাবরের আত্মজীবনীতে) বর্ণনা আছে—The Bengalees are famous for the skill in artillery on the occasion we had a good opportunity of observing them."

রামনাদের আদি জগন্নাথ দেবের মন্দির বহু পুরাতন বলিয়া পণ্ডিত সমাজে স্বীকৃত—ইহাতে কতকগুলি ক্ষোদিত সৈনিক মূর্ত্তিতে তাহারা আগ্নেয়াস্ত্র লইয়া যাইতেছে এইরূপ আছে।

কুম্ভকোনামে বিষ্ণুমন্দিরের বহু বহু বৎসরের নির্ম্মিত বলিয়া খ্যাতি আছে—এই বিষ্ণু-মন্দিরের গাত্রে ইট ও পাথরের দ্বারা ক্ষোদিত সিপাহির হস্তে পিস্তলের ন্যায় বন্দুক আছে দেখা যায়। কাঞ্জিভিরামের শত স্তম্ভ মণ্ডপে একটি সৈনিক ঘোড়ায় চাপিয়া শত্রুকে বন্দুকের দ্বারা হত্যা করিবার জন্য উহা উত্তোলন করিতেছে এইরূপ মূর্ত্তি আছে।

টানজোরের স্বর্গ একাদশির গেটের পাথরের উপর ক্ষোদিত কারবাইনের ন্যায় বন্দুক হস্তে সিপাহির মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়।

কোইমবেটুরের নিকট একটি শিব মন্দিরে সৈনিক-দিগের হস্তে হস্তে বন্দুক রহিয়াছে—এইরূপ চিত্র দর্শক সেখানে গেলে দেখিতে পাইবেন।

এই প্রসঙ্গে প্রাচীন ভারতে বর্ত্তমান কালের ন্যায় অতি আধুনিক কতকগুলি যন্ত্রের কথা আলোচনা করা অন্যায় হইবে না। ইহার কতকগুলির বর্ণনা 'কথাসরিৎ সাগরে' আছে—এই পুস্তকখানি যে অতি প্রাচীন তাহা ইতিহাসজ্ঞ কোন ব্যক্তিকে বলিয়া দিতে হইবে না—। ইহাতে নিম্নলিখিত কয়েকটী যন্ত্রের কথা পড়ি ;

তেজোময় যন্ত্র—তেজো-ময়স্তু যদ্ যন্ত্রং তদ্ জ্বালা পরি-মুঞ্চতি—তেজোময় যে যন্ত্র তাহা অগ্নিশিখা উদ্গিরণ করে—বোধ হয় বর্ত্তমান কালের Electricity সংক্রান্ত কোন যন্ত্র হইতে পারে।

বাত যন্ত্র —বাত যন্ত্রং যকুরুতে চেষ্টাগত্যা গমাদিকাঃ—চেষ্টা, গতি, আগম ইত্যাদি কার্য্য বাতযন্ত্রে গঠিত হয়। এই বাতযন্ত্র বায়ুচালিত যান বিশেষ হওয়া সম্ভব।

আকাশ সম্ভব যন্ত্র—ব্যক্তিকরোতি চালাপম যন্ত্র মাকাশ সম্ভবম—এই যন্ত্র বাক্যকে প্রকাশ করে—তাহা হইলে অনেকটা বর্ত্তমানকালের ফনোগ্রাফ যন্ত্রের ন্যায় কোন যন্ত্র হইতে পারে।

বিমান যন্ত্র—বর্ত্তমানকালের উড়ো জাহাজের সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে। তবেই দেখা যাইতেছে যে বর্ত্তমানের উড়ো জাহাজের ব্যবহার প্রাচীন ভারতীয়রাও জানিত।

ময়দানব কর্ত্তৃক যুধিষ্ঠিরের সভা—ইহার কথা মহা-ভারত পাঠজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই জানেন—কিন্তু ইহা উঠাইয়া অন্যস্থানে লইয়া যাইতে পারা যাইত তাহা অনেকেই জানেন না। এই বাটী উঠান বিদ্যায় বর্ত্তমানকলে আমে-রিকানরা অগ্রণী। এই কঠিন কাজ ময়দানব কেমন করিয়া জানিল—তাহা বস্তুবিক ভাবিবার বিষয় নয় কি ?

বক্ষমাণ প্রবন্ধে ও পূর্ব্বের অনেক প্রবন্ধে (যাহা-অদ্যা-বধি পুষ্পপাত্রে প্রকাশিত হইয়াছে) তাহাতে প্রাচীন ভারতে আমাদের জ্ঞান কতদূর পর্য্যন্ত বিস্তার করিয়াছিল তাহা প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছি। আমার এই অক্ষম প্রচেষ্টায় যদি কাহারো ভারতীয় প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাস গবেষণা করিবার ইচ্ছাকে প্রবুদ্ধ করে তাহা হলে আমি আমার এই কঠোর পরিশ্রম ও চেষ্টাকে ফলবতী মনে করিয়া ধন্য হইব।
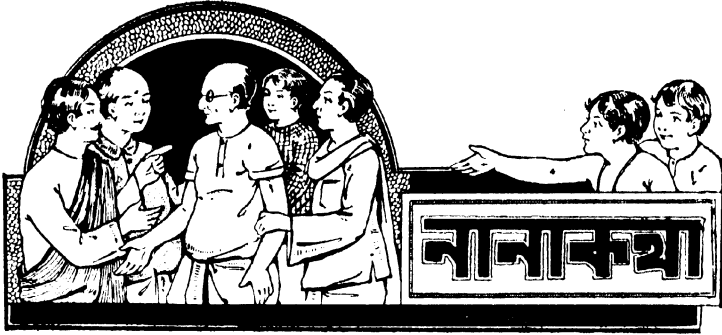
স্বদেশীর মাঝেই অর্থনৈতিক মুক্তি

গত ১২ জানুয়ারী ইন্দোর-স্বদেশী প্রদর্শনীর উদ্বোধন উপলক্ষে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় বলেন "জাতীয়তা ও স্বদেশী আন্দোলন শুধু ব্রিটিশ ভারতেই সীমাবদ্ধ হইয়া রহে নাই, উহা এই বিরাট দেশের এক তৃতীয়াংশ স্থান পরিবৃত এক তৃতীয়াংশ লোকের আবাস ভূমি দেশীয় রাজ্য-গুলিতেও ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সেই জন্যই আমাকে যখন ইন্দোর স্বদেশী প্রদর্শনীর উদ্বোধন করিবার জন্য আমন্ত্রণ করা হয়, তখন- আমার শত বাধা সত্ত্বেও আমি সেই আমন্ত্রণ উপেক্ষা করিতে পারি নাই।

স্বদেশীর বহুল প্রচারের জন্য মাঝে মাঝে এই প্রকার প্রদর্শনী খোলার বিশেষ প্রয়োজন অনুভূত হয়। বহু শতাব্দী হইতেই ভারতবর্ষ চিত্রকলা ও গৃহশিল্পের সমাদর করিয়া আসিতেছে। প্রাচীন রোমের বিলাসিনী মহিলাগণ মণিমুক্তায় পরিশোভিত হইয়া ঢাকা মসলিন পরিধান করিয়া গর্ব্বানুভব করিতেন। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ভারতের সম্পদ বিদেশীদের ঈর্ষা সৃষ্টি করিত। কিন্তু যান্ত্রিক সভ্যতার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শ্রমশিল্পের আদর কমিয়া গিয়াছে। আজ আমাদিগকে ঐ সকল কথা আলোচনা করিলে চলিবে না, বর্ত্তমান সময়ে আমাদিগকে লুপ্তশিল্পের পুনরুদ্ধার করিয়া নব নব প্রতিষ্ঠান গঠন করিতে হইবে। আমি জানিয়া সুখী হইয়াছি যে, অধুনা আমাদের দেশের বহু কারখানায় কলম, নিব, শীসার পেন্সিল, কার্ব্বনপেপার, রিবন, রবারের জুতা, অয়েলক্লথ, সাবান ও বহুবিধ জিনিষ প্রস্তুত হইতেছে।

মেকলে বলিয়াছেন যে, "আমাদিগকে ভারতে একশ্রেণীর লোক তৈরী করিতে হইবে, যাহারা রক্তে মাংসে ভারতীয়, কিন্তু রুচিতে ইংরেজ"। আমাদের দেশে একসময় ঠিক সেই ভাব প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল এবং আমাদের দেশের কৃষকগণ পর্য্যন্ত পাশ্চাত্যের বিলাসের পিছনে ছুটিয়াছিল, একবার লর্ডকার্জ্জন দেশীয় রাজাগণকে লক্ষ্য করিয়া তিরস্কার করিয়াছিলেন যে, তাহারা সুন্দর ও উৎকৃষ্ট প্রণালীর প্রস্তুত দেশীয় কার্পেট ক্রয় না করি বিদেশী কার্পেট ক্রয় করেন। আমাদের দেশের রাজগণের দেশী প্রস্তুত দ্রব্যের প্রতি ঔদাসীন্য বাস্তবিকই দুঃখের বিষয় বলি হয়।

কম দরে বিদেশী দ্রব্যের বহুল প্রচলনের ফলে আমাদে দেশের লক্ষ লক্ষ কাটুনী, তাঁতি, কামার ও অন্যান্য ব্যবসায়ে ব্যবসা নষ্ট হইয়া বেকার হইয়া পড়িয়াছে। বৎসরের কতকটা অং কৃষকগণ কৃষিকার্য্য করে আর অন্য সময় বাড়ীতে অলসভাবে সম কাটায়। বোম্বাইয়ের কটন মিলগুলির ৩ ৪ লক্ষ লোক এব হুগলীর ও করনপুরের পাটকল-গুলি আরও হয়ত ২৷৩ লক্ষ লোকে গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করিয়াছে, কিন্তু ভারতের অবশিষ্ট লোকদে জন্য কি ব্যবস্থা করা হইবে? আপনারা কি এখনও ম্যাঞ্চেষ্টার লিভারপুল, গ্লাসগো ও ডাণ্ডির অনুকরণ করিবেন? আপনারা কি দেশীয়-শিল্পের উৎসাহ প্রদান করিবেন না? আপনারা যদি দেশী শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িবার ব্যবস্থা না করেন তবে বড়কথা বলিয় কোনই লাভ নাই।

ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ এবং উহার উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করি বার চেষ্টা করাই প্রধান কাজ এবং সঙ্গে সঙ্গে গ্রামবাসীদের দুইট পয়সা আয়ের ব্যবস্থা করাও প্রধান কর্ত্তব্য। আমার মনে হয়, চরকা ও তাঁত যদি ভারতের সর্ব্বত্র প্রচলন হয় তবে খুব ভাল হয়, কারণ, হিসা করিয়া দেখা গিয়াছে যদি ভারতের এক অষ্টমাংশ লোক দৈনিক দুই পয়সা করিয়া রোজগার করে, তবে সমগ্র ভারতে দৈনিক ১২৫০০০০, টাকা এবং বৎসরে ৪৫৫২৫০০০০৲ টাকা আয় বাড়ে।

আমি একজন রাসায়নিক এবং এই বয়সে এখনও যদি আমা ছাত্রদের সঙ্গে ঐ সম্বন্ধে পরীক্ষাগারে গিয়া দৈনিক ৪।৫ ঘণ্টা গবেষণ না করি, তবে আমি আনন্দ পাই না। ইহা সত্ত্বেও আমাকে অনেকে বহু শিল্প-প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন। আমি চরকা প্রচলনের সমর্থক এবং এই বিষয়ে মহাত্মা গান্ধীর একজন অযোগ্য শিষ্য বলিয়া গর্ব্বানুভব করি।

আমি স্বদেশীকে আমরা ধর্ম্মের অপরিহার্য্য অঙ্গ বলিয়া বিবেচনা করি। স্বদেশী দ্রব্য মোটা বা দেখিতে বিশ্রী হইলেও যদি উহা ব্যবহার করিবার জন্য প্রতিজ্ঞা গ্রহণ না করা হয়, তবে স্বদেশী প্রদর্শনী খোলার কোনও সার্থকতা থাকে না। চিম্নি এবং হারিকেন বর্ত্তমান সময় আমাদের দেশে অতি উৎকৃষ্ট ধরণের প্রস্তুত হইতেছে। যদি কোন ভারতীয় আমাদের দেশের প্রস্তুত দ্রব্যকে উপেক্ষার চোখে দেখে আমি তাহাকে "দেশদ্রোহী" বলিয়া মনে করি।

আজ দেশের বড় শুভদিন আসিয়াছে, সমগ্র ভারতে প্রদর্শনী খুলিবার উৎসাহ লোকের বাড়িয়া গিয়াছে। লোকজন তামাসা বা দলাদলি বা জুয়াখেলা খেলিবার জন্য প্রদর্শনীতে ভীড় করে না; তাহারা জিনিষ দেখিবার জন্যও বিশেষভাবে তাহাদের স্বদেশী প্রীতিই প্রদর্শনীতে যাইতে তাহাদিগকে প্রেরণা দিতেছে। প্রদর্শনীর দ্বারা প্রচারের খুব সুবিধা হয়, যাহারা প্রদর্শনীতে যাতায়াত করে, তাহারা সাধারণতঃ দ্রব্য সামগ্রী খরিদ করে না, কিন্তু ইহা সত্য যে, প্রদর্শনীর বহু জিনিষ তাহাদের মনের মধ্যে জাগরূক থাকে এবং ভবিষ্যতে ক্রয় করিবার জন্য আগ্রহান্বিত থাকে।

প্রদর্শনীগুলি যে আজকাল আমাদের দেশে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে তা নয়, বহু পূর্ব্ব হইতে উহা আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল। কুম্ভমেলায় যে শুধু সাধু সমাগম হয় তা নয়, বহু ক্রেতা-বিক্রেতাও তথায় উপস্থিত হয়। পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মেলা হরিহরছত্রের মেলায়ও বহু ব্যবসায়ীর সমাবেশ হয়।

স্বদেশীমেলা অন্য ধরণের প্রদর্শনী, এখানে বাজারের সাধারণ জিনিষ-পত্র আসে না, কারণ আমাদের দেশে বাজার বা দোকানের অভাব নাই।

আমাদের স্বদেশবাসীদের প্রস্তুত দ্রব্য দেখিয়া স্বতঃই আমাদের প্রাণ নাচিয়া উঠে, আমাদের দেশবাসিগণ যতই এই সকল দ্রব্য ক্রয় করিবেন ততই এই সকল দ্রব্যের প্রচলন বাড়িয়া যাইবে, স্বদেশী প্রদর্শনীর দ্বারা আমাদের দেশীয় দ্রব্যের প্রতি দেশবাসীর আগ্রহ উত্তরোত্তরই বর্দ্ধিত হইতে থাকে, এই আগ্রহ বাড়িলেই ভবিষ্যতে বিদেশী দ্রব্যের চাকচিক্য ও সুলভমূল্য সত্ত্বেও তাহারা আর বিদেশী দ্রব্য ক্রয় করিবার জন্য ঝুঁকিবে না। আইন দ্বারা ঐ প্রকার আগ্রহ বৃদ্ধি করা সম্ভব হয় না।

বিদেশী দ্রব্যের আমদানী বন্ধ করিয়া আমাদের দেশের অর্থশোষণ বন্ধ করিবার জন্য জোর প্রচারকার্য্য চালাইবার প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ১৯২৫-২৯ সন পর্য্যন্ত বাজে সিল্কের আমদানী হইয়া প্রায় চারি কোটী টাকা বিদেশে চলিয়া গিয়াছে। ফলে, মুর্শিদাবাদ ও মালদহের সিল্কের ধ্বংস সাধিত হইয়াছে। বিদেশ হইতে ৪ কোটী টাকার মোটর গাড়ী, ২ কোটী টাকার সিগারেট, ৬৩ কোটী টাকার সূতা, ২ কোটী টাকার ঔষধ ও ২॥০ কোটী টাকার রাসায়নিক দ্রব্য আমদানী করা হইয়াছে। আমাদের ছাত্রগণ যখন গ্রামে তাহাদের বাড়ী যাইবে তখন যেন তাহারা স্বদেশী প্রচারে আত্ম-নিয়োগ করে এবং তাহারা যাহা প্রচার করে, তাহা যেন কাজেও করে। হে আমার স্বদেশপ্রেমিক তরুণ বন্ধুগণ, তোমরা এই ক্ষেত্রে প্রচারকের ব্রত গ্রহণ করিয়া স্বদেশ ও স্বজাতির কল্যাণসাধন কর। স্মরণ রাখিও, স্বদেশীর ভিতরে জাতির অর্থ-নৈতিক মুক্তি অন্তর্নিহিত রহিয়া গিয়াছে।

দাম্পত্য কলহের কারণ ঃ—ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের মনস্তত্ত্ব বিভাগের প্রেসিডেণ্ট এবং কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ব্যবহারিক মনস্তত্ত্ব বিভাগের প্রধান বক্তা ডাঃ গিরীন্দ্রশেখর বসু ডি, এস্-সি এম্, বি, গত ৬ই জানুয়ারী অপরাহ্নে পাটনার বি, এন্ কলেজে "দাম্পত্য-কলহ" সম্বন্ধে এক বক্তৃতা দেন। তিনি বলেন, ঈশ্বর আদমকে সৃষ্টি করার পরও ইডেন উদ্যানে পূর্ণ শান্তিই বিরাজ করিত। আদমের সাথীর জন্য অতঃপর সৃষ্টি কর্ত্তার ভাবনা হইল। তিনি আদমের একখানি পাঁজরার হাড় হইতে প্রথম নারী সৃজন করিলেন। সৃষ্টিকর্ত্তা এই স্থানেই এক মহা অবিবেচনার কার্য্য করিয়া ফেলিলেন। কারণ প্রত্যেকটী মানুষই তখন হইতে তাহার স্ত্রীর উপর কায়েমী স্বত্ব দাবী করিয়া আসিতেছে এবং প্রত্যেকটী নারীই তাঁহার স্বাধীনতা কায়েম করার জন্য চেষ্টিত হইয়াও পুরুষের দেহাংশ বিশেষ হইতে সৃষ্ট বলিয়াই তাঁহাদের স্বভাবগত মনোবৃত্তিগুণে পুরুষের বশ্য হইবার জন্যই তাঁহারা প্রেরণা অনুভব করিয়া আসিতেছেন। দাম্পত্য জীবনের এরূপ আকর্ষণ ও বিকর্ষণের অদ্ভুত সংমিশ্রণের ফলেই মতানৈক্যরূপ বীজের উর্ব্বর ভূমি সৃষ্ট হইয়া থাকে। দাম্পত্য কলহের কথা আবহমান কাল হইতেই শুনা যাইতেছে। এমন কি পৌরাণিক দেব-দেবীগণের মধ্যেও দাম্পত্য কলহের কথা শুনা যায়।

মানবের (আদিম) পূর্ব্ব-পুরুষেরাও ঠিক ঐরূপ মনোবৃত্তি সম্পন্ন ছিলেন। তাঁহারা নারীর সহিত মিলন কালে তাঁহাদের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিতেন। নারীরাও বোধ হয় পুরুষের যুদ্ধ-শক্তিকেই তাহাদের গ্রহণের মাপকাঠি ধরিয়া লইতেন। যাঁহারা শক্তিশালী যোদ্ধা তাঁহাদিগকে নারীরা গ্রহণ করিতেন। এমন কি বর্ত্তমান যুগেও বিশিষ্ট সভ্য-সমাজে যৌন-নির্ব্বাচনে ঐরূপ বৈশিষ্ট্যই পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। সামাজিক বিবিধ বিপদ হইতে আত্মরক্ষার্থ নারী তাঁহার সংগ্রামশীল স্বামীকেই অস্ত্ররূপে ব্যবহার করিয়া থাকেন। কিন্তু নারীরা জানে না যে, যে অস্ত্র ব্যবহার করেন তাহা দুইদিক দিয়াই কাটে এবং হয়ত ঐ অস্ত্রই কখন তাঁহাদেরই উপর আসিয়া পড়িতে পারে।

আপনাদের মধ্যে কতজনই বা বিবাহিত এবং কতজনই বা ভাবী বিবাহের গোলাপী নেশায় বিভোর আমি সেই কথা ভাবিয়াই আশ্চর্য্য হই। "দিল্লীকা লাড্ডু যো খায়া ওভি পস্তায়া, যো নেহি খায়া ওভি পস্তায়া"—এইরূপেই বিবাহিত জীবনের তুলনা করা হইয়াছে। কিন্তু বিষয়টীর একদিক দেখিয়াই কেবল ঐরূপ বিচার করা হইয়াছে। প্রাচীন হিন্দুরা তাঁহাদের ভবিষ্যৎ স্ত্রীর সহিত মনোমালিন্যের ভয়ে কখনই বিবাহে অনিচ্ছা প্রকাশ করিতেন না।

সংস্কৃত কবি দাম্পত্য কলহের উপমা কালে প্রভাতী মেঘের কথা তুলিয়াছেন। প্রভাতী মেঘ প্রথমে খুবই আতঙ্কজনক বলিয়া মনে হইলেও সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই ঐ মেঘ অপসারিত হয়। সেইরূপ দাম্পত্য কলহও ক্ষণস্থায়ী। বিশেষরূপে মিলনকামী স্ত্রী, পুরুষের নিকট অধিকতর প্রীতি ও আকর্ষণ স্থল বলিয়াই প্রতীত হয়। অতএব, পূর্ব্বকালের রাজা মহারাজাদের কথা ছাড়িয়া দিলেও, প্রাচীন ঋষিরা যে, সময়ে সময়ে শতাধিক স্ত্রী গ্রহণ করিতেন তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই। আসলে তাঁহারাই প্রকৃত সাহসী ছিলেন। তবে এইটুকুই আশ্চর্য্যের বিষয় যে, তখন নারীরা যেরূপ সুখী বা দুঃখী ছিলেন বর্ত্তমানে অধিকতর সভ্য তাঁহাদের ভগিনীরাও ঠিক সেইরূপ সুখী বা দুঃখীই আছেন।

মুসলমান আইনানুসারে ৪টি স্ত্রী গ্রহণ করা যায়। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, ইসলাম আইনকারীরা দাম্পত্য মনোমালিন্য সম্বন্ধে অত চিন্তিত ছিলেন না। আজকালই দাম্পত্য কলহ একটা সমস্যা বলিয়াই সমাজে চিন্তার বিষয় হইয়া পড়িয়াছে।

দাম্পত্য কলহরূপ সমস্যার সমাধান করিতে বসিয়া এখনত আর আদিমকালের কতকগুলি সামাজিক রীতি নীতির পুনঃপ্রবর্ত্তন করিতে পারা যায় না, অর্থাৎ পর্দ্দা প্রথার পুনঃপ্রবর্ত্তন, নারী শিক্ষা বা তাঁহাদের ভোটাধিকার রদ করা যায় না। ইহারা এখন জ্ঞানবৃক্ষের অধিকাংশ ফলই খাইয়া ফেলিয়াছেন। তাই এত সহজে তাঁহার ব্যক্তিত্বকে চাপিয়া রাখার আর উপায় নাই। আদম বর্ত্তমানে নিজের ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য আর করিতে পারেন না। আমি দোষের কথা কিছুই বলিতেছি না, আধুনিক নারীরা নিজেদের অনুন্নত সম্প্রদায়ের সভ্য বলিয়াই মনে করেন, এমন কি তাঁহারা তাঁহাদের স্বামীর সমপর্য্যায়ে থাকিয়া আর সন্তুষ্ট নহেন; তাঁহারা বিশিষ্ট সুবিধা দাবী করিতেছেন। দাম্পত্য সমস্যা আজ জটিল হইয়া পড়িয়াছে। সমাজ সংস্কারকগণ একত্রিত হইয়া পরস্পর হৃদয়ের আদান প্রদান, ঐক্য সমিতি, সালিশী, সাময়িক ও সাহচর্য্য মূলক বিবাহ, সহজ বিবাহবিচ্ছেদ, ষ্টেট কর্ত্তৃক শিশুদিগের ভরণপোষণ প্রভৃতি কত রকম পরামর্শই না দিলেন, কিন্তু দাম্পত্য মিলনের কোন হদিশই এতাবৎ পাওয়া গেল না।

কি করিলে দাম্পত্য জীবন সুখের হইবে বা কিজন্য দাম্পত্য জীবন দুঃখের আকর হয়, তাহার এত বিবিধ কারণই রহিয়া গিয়াছে যে, তাহার ফলাফল সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করা অসম্ভব। বিবাহকে 'টিকা'র সঙ্গেই তুলনা করা হইয়াছে; এই টিকা কখনও বা কার্য্যকরী এবং কখনো বিফল হয়। আমি বেশ পরিষ্কার রূপেই জানাইতেছি যে, বিবাহিত জীবনে কিরূপে সুখী হওয়া যায় তাহার কোন বিশেষ পথই আমার জানা নাই। আমার শ্রোতৃবর্গের মধ্যে ঐরূপ দুঃখী যাহারা তাহাদিগকে আমি কোন উৎকৃষ্ট পন্থা বলিয়া দিতে অক্ষম।

ভাবে বিচার করিতে হইবে। শান্তিস্থাপক ও মনস্তত্ত্ববিদে বিশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও দাম্পত্য কলহ থাকিয়াই যাইবে।

এই সমস্যাটী যাদুদণ্ডের তাড়নায় সমাধান করার উপায় নাই ইহার ভিত্তি জৈবিক। তবে প্রয়োজন হইলে স্বামী বা স্ত্রী যে কেহ একটু ফোঁস না করিলে অশান্তি ক্রমেই বাড়িয়া উঠে। ক্রোধের ভাব দেখান উচিত, কিন্তু তাই বলিয়া সত্য সত্যই রাগ করিলে চলিবে না। তাহা হইলে বিরুদ্ধ পক্ষ নাগালের বাহিরে গিয়া পড়িবে।

মহাত্মা গান্ধী ও অসবর্ণ বিবাহঃ—সম্প্রতি কতিপয় ভদ্রলোক যারবেদা কারাগারে মহাত্মা গান্ধীর সহিত নানা সামাজিক প্রসঙ্গের আলোচনা করেন। অসবর্ণ বিবাহ সম্পর্কে মহাত্মার সহিত মিঃ শিকারে নামক জনৈক ভদ্রলোকের কথোপকথন হইয়াছে—নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল :—

মিঃ শিকারে—মহাত্মাজী, অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন আন্দোলনে আপনি অবশ্যই অসবর্ণ বিবাহ সমর্থন করেন না, কিন্তু আপনি অসবর্ণ বিবাহের বিরোধী নহেন। অসবর্ণ বিবাহে বর্ণসাঙ্কর্য্য ঘটে বলিয়া আপনার মনে হয় না?

মহাত্মা—না; বর্ণসঙ্কর সম্পর্কে আমার ধারণা এই যে, অসমীচীন এবং অনভিপ্রেত যৌন মিলনেই বর্ণসঙ্করের সৃষ্টি হয়। যদি কোনও পুরুষ কেবল কাম-তাড়নায় কোনও নারীতে উপগত হয়, তাহা হইলে বর্ণসঙ্করের উদ্ভব হয়। কিন্তু যদি কোনও পুরুষ ও কোনও নারীর মধ্যে চিরকাল প্রেম বন্ধন অক্ষুণ্ণ থাকে এবং যদি তাহারা প্রজাসৃষ্টির উদ্দেশ্যে অথবা সেবাধর্ম্মের মহান আদেশে, অথবা ভগবৎ-সাধনার নিমিত্ত বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়, ঐ পুরুষ এবং ঐ নারী সবর্ণ না হইলেও তাহাদের সন্ততিবর্গ বর্ণসঙ্কর নহে। কিন্তু যে বিবাহে ঐরূপ উচ্চ আদর্শের অভাব এবং যে বিবাহের উদ্দেশ্য স্বার্থপরতা অথবা অপর কোনও ঘৃণিত ও কুৎসিত বৃত্তির চরিতার্থতা, সেই বিবাহ সবর্ণ বিবাহ হইলেও তাহাতে নিশ্চয়ই বর্ণসঙ্করের সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে পবিত্র এবং সুখকর বিবাহের বহু দৃষ্টান্ত আমি বেদ ও পুরাণ হইতে দেখাইতে পারি।

"সমাজের বৃত্তিগত বর্ণ বিভাগ অত্যাবশ্যক। তাহাতে কর্ম্মশক্তি ঘনীভূত হয় এবং গুণোৎকর্ষ পুরুষানুক্রমে সঞ্চালিত হয়। কিন্তু অন্যায় অধিকার ও সুবিধা সৃষ্টির উদ্দেশ্য প্রণোদিত বর্ণবিভাগ সমর্থনযোগ্য নহে, সমাজের প্রতি মনুষ্যের দায়িত্ব পালনই বর্ণ বিভাগের উদ্দেশ্য হওয়া উচিৎ। ধর্ম্মই পুরুষ ও নারীর সম্পর্ক নিয়ামক 'সুতরাং যে কোন বর্ণের মহামনা পুরুষ ও মহতী নারীর বিবাহ নিশ্চয়ই মঙ্গলপ্রদ।

মিঃ শিকারে—দ্রাবিড় ও আর্য্যজাতির সংমিশ্রণের ফলে উভয় জাতির অবনতি হইবে না কি?

মহাত্মাজী—না,—ইতিহাসে তাহার কোনও প্রমাণ নাই। [illegible]

কোনও কার্য্যকরী পরামর্শ দিবার পূর্ব্বে তাঁহাদের অবস্থা পৃথক পাই, কোঙ্কণস্থ ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় মূলতঃ মিশর দেশীয় এবং আর্য্য

সম্প্রদায় মূলতঃ ইটালিয়ান। বর্ত্তমান হিন্দু জাতীর ধমনীতে বহু বিভিন্ন জাতির শোণিত প্রবাহিত। প্রাচীন হিন্দুরা কোনও বৈদেশিক জাতির শ্রেষ্ঠাংশ আত্মস্থ করিয়া লইতে কুণ্ঠিত হইতেন না। অবশ্যই তাহার ফলেই বৈদেশিকদের কোনও কোনও দোষ হিন্দু সমাজে সংক্রামিত হইয়া থাকিবে। কিন্তু মোটামুটি বিবেচনা করিতে গেলে এই মিশ্রণের ফলে হিন্দু সমাজের বিশেষ উপকার সাধিত হইয়াছে স্বীকার করিতে হইবে।

প্রেমের উপাদান কি ?—"রেভ্যু দ্য লা ফাম" নামক একখানা ফরাসী সংবাদপত্র প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছিলেন, 'পেমপাত্রী হইতে হইলে নারীর পক্ষে কি সুন্দরী হওয়া আবশ্যক?" সেনেটার পার্লিয়ামেণ্টের মেম্বর, কমেদি-ফ্রাসেজের সদস্য, ব্যারিষ্টার, ঔপন্যাসিক শিল্পী, পোষাক-নির্ম্মাতা এবং আরও শত শত লোক ঐ প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন। সোজাসুজি "না" হইতে আরম্ভ করিয়া সুস্পষ্ট 'হাঁ এবং এই দুই ধরণের মাঝামাঝি বহু রকমের উত্তর পাওয়া গিয়াছে এই সমস্ত উত্তরগুলি পরীক্ষা করিয়া উক্ত সংবাদপত্র এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন,—প্রেমের উপাদান পাঁচটি। যথা সৌন্দর্য্য, দৈহিক ঠমক, মানসিক ঠমক, বুদ্ধিবৃত্তি এবং ঔদার্য্য। অধিকন্তু, বয়স যত কম হয়, প্রেমপাত্রীর পক্ষে সৌন্দর্য্যের আবশ্যকতা তত অধিক; কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সহিত সৌন্দর্য্যের আবশ্যকতা ক্রমশঃ লোপ পায়।

কোন্ বয়সে স্ত্রীলোকের পক্ষে কোন্ উপাদান কি পরিমাণে আবশ্যক, তাহার একটি তালিকা দেওয়া হইল:—

১৬ বৎসরে—সৌন্দর্য্য শতকরা ৮০, মানসিক ঠমক ২০।

২০ বৎসরে—সৌন্দর্য্য শতকরা ৭০, দৈহিক ঠমক ১০, মানসিক ঠমক ২০।

২৫ বৎসরে—সৌন্দর্য্য শতকরা ৬০, দৈহিক ঠমক ১০ মানসিক ঠমক ১৫, বুদ্ধি বৃত্তি ১৫।

৩০ বৎসরের—সৌন্দর্য্য শতকরা ৫০, দৈহিক ঠমক ১০, মানসিক ঠমক ১৫, বুদ্ধিবৃত্তি ১৫, ঔদার্য্য ১০।

৪০ বৎসরে—সৌন্দর্য্য শতকরা ৩০, দৈহিক ঠমক ১০, মানসিক ঠমক ১০, বুদ্ধিবৃত্তি ২৫, ঔদার্য্য ১৫।

৫০ বৎসরে—সৌন্দর্য্য শতকরা ১০, দৈহিক ঠমক ১০, বুদ্ধিবৃত্তি ৪০, ঔদার্য্য ১০।

দুইজন বিশিষ্ট মাড়োয়ারী

(আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়)

গত ৩ মাসের মধ্যে শিল্প প্রদর্শনীর দ্বার উদঘাটন করিবার জন্য নিমন্ত্রিত হইয়া আমাকে করাচা ও ইন্দোরে যাইতে হইয়াছিল। প্রথমে করাচীর কথা বলি। সেখানকার ধনী ব্যবসায়ী, শিক্ষিত সম্প্রদায় এবং জনসাধারণ আমাকে যেভাবে আদর অভ্যর্থনা করেন, তাহা আমি কখনও ভুলিতে পারিব না। করাচীর ২ জন মহানুভব ব্যক্তি বিশেষভাবে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তত্রস্থ কর্পোরেশনের সভাপতি শ্রীযুত জামসেদজী মেহতা এবং শেঠ শিউরতন মোহত্তা। জামসেদজী সম্বন্ধে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। ২ বৎসর পূর্ব্বে করাচীতে যখন কংগ্রেসের অধিবেশন হয়, তখন তিনি, এত লোক সমাগম সত্বেও যাহাতে স্বাস্থ্যের কোন ব্যাঘাত না ঘটে, তাহার জন্য সুন্দর ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। মহাত্মাজী স্বয়ং তাঁহাকে অশেষ ধন্যবাদ দেন।

শেঠ শিউরতন একজন ধনী মাড়োয়ারী ব্যবসায়ী তাহা ছাড়া একজন বড় কন্‌ট্রাক্টার। কিন্তু যেজন্য ইঁহার কথা আমি বলিতেছি তাহা এই যে, তিনি অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন ও হরিজনদের উন্নয়নের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। সহরের একাংশের নাম নারায়ণপুর। শ্রীযুত নারায়ণ দাস একজন ত্যাগীপুরুষ, সর্ব্বস্ব বিলাইয়া হরিজনদের সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। তাঁহারই নাম অনুসারে এই অঞ্চলের নাম হইয়াছে নারায়ণপুর। কর্পোরেশন অনেক বিঘা জমি মেথর ও ধাঙ্গড়দের বাসস্থানের জন্য দান করিয়াছেন। নারায়ণ দাস ইঁহাদের সঙ্গে সর্ব্বক্ষণ থাকেন এবং এখানে একটা 'আদর্শ-বস্তী' নির্ম্মাণ করিয়াছেন। যাহাতে এইসব হরিজনেরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে এবং কোনরূপ ব্যসনাসক্ত, না হয়, তাহার জন্য কতিপয় যুবকের সহিত সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া তিনি বস্তীতে বিশুদ্ধ আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং নৈশ বিদ্যালয় খুলিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে একটা কো-অপারেটিভ ষ্টোরও খোলা হইয়াছে। বস্তীর লোকেরা পাইকারী দরে চাল, ডাল ও আটা ইত্যাদি খাদ্য দ্রব্য পায়। এই শ্রেণীর মধ্যে যাহারা উচ্চবিদ্যালয়, বা কলেজ পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিতেছে, তাঁহাদের জন্য শেঠ শিউরতন সুন্দর ছাত্রাবাস নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। ইঁহার বিশেষত্ব ইনি সমানভাবে হরিজনদের সঙ্গে মেলামেশা করেন। এমন কি, দেখিলাম, সভা-সমিতিতে তাহাদের ভিতরে আসন গ্রহণ করেন। কখনও স্বতন্ত্রভাবে উপবেশন করিতে চাহেন না। শেঠজী কলিকাতার বিখ্যাত ব্যবসায়ী ঘনশ্যাম দাস বিড়লা মহাশয়ের বৈবাহিক। সুতরাং সংস্কারপন্থী উন্নতিশীল মাড়োয়ারীদের মধ্যে অগ্রণী। তিনি স্বসম্প্রদায়ের জন্য নয়, অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্যও নিজব্যয়ে একটি বিদ্যালয় পরিচালনা করেন। তাঁহার সঙ্গে আমার খুব মেলামেশা হইয়াছিল; কথা প্রসঙ্গে আমার নবপ্রকাশিত গ্রন্থের (আত্মচরিত) কথা উঠে। আমি বলিলাম, কলিকাতার মাড়োয়ারীদের প্রতি আমাকে একটু তীব্রভাষা ব্যবহার করিতে হইয়াছে। তিনি গম্ভীরভাবে বলিলেন যে, আমি যাহা লিখিয়াছি, তাহা তাঁহার সম্পূর্ণ অনুমোদিত। অর্থাৎ কলিকাতার বাসিন্দা হইয়া, বঙ্গদেশে প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন ও সঞ্চয় করিয়া, তাঁহারা বাঙ্গলায় জন্য স্কুল, হাসপাতাল প্রভৃতি করেন না, সমস্ত টাকা স্বীয় প্রদেশে পাঠাইয়া দেন। ইহা সঙ্গত নয়।

এখন ইন্দোর সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিব। স্তর স্বরূপচাঁদ হুকুমচাঁদের সঙ্গে আমার পূর্ব্বে পরিচয় ছিল না। তবে আমার আত্ম-

চরিত্রে তাঁহার কথা দুই এক স্থলে দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করিয়াছি। কারণ, তিনি কলিকাতার একজন বিখ্যাত ইণ্ডাষ্ট্রীয়ালিষ্ট। গঙ্গার উপরে যে ৮০টি পাটের কল আছে, তাহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ হুকুমচাঁদ জুট মিল। এতদ্ভিন্ন বালিগঞ্জে হুকুমচাঁদ ষ্টীল ওয়ার্কস নামে যে বিরাট ব্যাপার, তাহাও ইহারই কীর্ত্তি। ইহার ধনশালিতার বিষয়ে এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, গত ইউরোপীয় যুদ্ধের পরই যখন গবর্ণমেণ্ট সমর ঋণ খুলিলেন, তখন হুকুমচাদ সর্ব্বপ্রথম এক কোটী টাকার বণ্ড ক্রয় করেন।

আমি স্বাস্থ্যের জন্য প্রথমত: ইন্দোরে যাইবার নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিতে বাধ্য হই। কিন্তু শেঠ হুকুমচাদ প্রমুখ ইন্দোরবাসিগণ আমাকে পুনঃপুনঃ সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিয়া এমনভাবে তার করিতে লাগিলেন যে, আমি নিমন্ত্রণ অস্বীকার করিতে পারিলাম না। কিন্তু আমি ইন্দোরে যাইয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে ধন্য হইলাম। ইন্দোরবাসিগণ আমাকে যে প্রকার অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন, তাহা উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু শেঠজী সম্বন্ধে যাহা দেখিলাম, তাহা প্রত্যেক বাঙ্গালীর প্রণিধান করা কর্ত্তব্য। ইনি আদৌ ইংরাজী জানেন না। কেবলমাত্র ইন্দোরেই তিনি চারিটি কাপড়ের কলের মালিক এবং ম্যানেজিং এজেণ্ট। ইনি যে ইন্দ্রপুরীতে বাস করেন, সেখানে কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে আমি নিমন্ত্রিত হই। ঐ প্রাসাদ দেখিয়া আমার তাক লাগিয়া গেল। আমার ধারণা ছিল যে, সাধারণ বাঙ্গালী বা মাড়োয়ারী যে প্রকার জবর জং বাড়ী তৈরী করে, সেইরূপ হইবে। অর্থাৎ কেবল রাশীকৃত ঘর, বাতাস আলোর সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নাই। কিন্তু এই প্রাসাদটী যেন একটী সুন্দর ছবির মত। আমি হিন্দীতে জিজ্ঞাসা করিলাম, শেঠজী আপনি তো টাকা দিয়া খালাস, এই বাড়ীর নক্সা কে করিয়া দিল এবং কণ্ট্রাক্টরই বা কে? শেঠজী সস্মিতভাবে বলিলেন,—"নক্সাও আমার এবং নিজে থাকিয়া দেশী রাজমিস্ত্রীর দ্বারা তৈরী করাইয়াছি।" দ্বিতলে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া আমি আরও অবাক হইলাম। বাড়ীর ভিতর প্রশস্ত অঙ্গন এবং প্রত্যেক ঘরে সমান আলো বাতাস প্রবেশের ব্যবস্থা। একদিন সন্ধ্যার পর, তাঁহার নিজ ব্যয়ে এবং নিজের পরিকল্পনায় নির্ম্মিত দেবমন্দির দেখিয়া আমি আরও বিস্ময়াভিভূত হইলাম। তাহার ভিতরকার কারুকার্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম। স্যর স্বরূপচাঁদ হুকুমচাঁদ দিগম্বর সম্প্রদায়ভুক্ত জৈন। লোকের নিকট শুনিলাম, তাঁহার এই বাসভবনে ১৫ লক্ষ টাকা এবং দেবমন্দিরে ১২ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে। ইহার কিছু কমবেশীও হইতে পারে। আমরা নির্ধন বাঙ্গালী, আমাদের কাছে লাখ টাকা "দুকুড়ি দশ টাকা।" এস্থলে বলা প্রয়োজন যে, শেঠজী সাবেককালের মত পোষাক পরেন। এইজন্য ধরমশালা, হাসপাতাল এবং নানাবিধ হিতকর কাজে অজস্র দান করেন। স্থানীয় লোক তাঁহাকে "দানবীর" বলিয়া থাকেন। বড়ই আনন্দের কথা, ইহার এক পুত্র কলেজে পড়েন এবং নব্যভাবাপন্ন।

শেঠজীর জামাতা উজ্জয়িনীর একজন প্রধান ব্যবসায়ী এবং কাপড়ের কলের মালিক। ইন্দোর হইতে উজ্জয়িনী ৪৩ মাইল দূরে। স্যর হুকুমচাঁদের জামাতা আমাকে মোটরযোগে তথায় লইয়া যান এবং সেখানে একটি বিরাট সভায় আমাকে অভিনন্দন করেন ও অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন তথা হরিজনদের জন্য মন্দিরদ্বার উদ্ঘাটন সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে অনুরোধ করেন। বড়ই আনন্দের বিষয়, সেখানে যে কয়েক সহস্র লোক উপস্থিত ছিলেন, সকলেই এই সমাজ সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন।

উপসংহারে বলিতে চাই যে, একজন ইংরাজী ভাষা অনভিজ্ঞ ব্যক্তি কিরূপে এতগুলি ব্যবসা সুন্দরভাবে পরিচালনা করেন এবং ভারতের একজন প্রধান ইণ্ডাষ্ট্রীয়ালিষ্ট বলিয়া গণ্য হইয়াছেন, তাহা প্রত্যেক শিক্ষিত বাঙ্গালীর ভাবিয়া দেখা কর্ত্তব্য। বাঙ্গালীর কেতাবী বিদ্যার মূল্য কতটুকু? সেদিন বার্ণার্ড শ প্রথমেই একজন "ইণ্টারভিউয়ারকে" বলিলেন,—বাপু, আমাকে আর ডাঙ্গায় যাইতে বল কেন, আমি তোমাদের খবর রাখি। Touch a Hindu and he will vomit 12 volumes of Herberts Spencer! আমাদের শিক্ষাহীনতা ও সামাজিক আচার ব্যবহারের একটা অদ্ভুত ব্যবধান—পরে এক সময়ে তাহা বলিবার ইচ্ছা রহিল।

হিন্দু-ধর্ম্মকে রক্ষা করিবার জন্য মহাত্মার আবেদন :—"১৯১৫ সাল হইতে আমি আপনাদের সমক্ষে বক্তৃতা দিয়া আসিতেছি, অস্পৃশ্যতা সম্পর্কে আমি আপনাদিগকে অনেক কিছু বলিয়াছি, আপনারাও অনেক সময় অস্পৃশ্যতার তীব্র নিন্দাবাদ করিয়াছেন।" 'গুজরাটের তথাকথিত উচ্চবর্ণের ভ্রাতা ভগ্নিগণকে সম্বোধন করিয়া মহাত্মা গান্ধী পূর্ব্বোক্ত মর্ম্মে একখানা পত্র লিখিয়াছেন। মহাত্মা লিখিয়াছেন—"আমি 'তথাকথিত' আখ্যাটি ইচ্ছা করিয়াই জুড়িয়া দিয়াছি। কেন না, আমি জাতিগতভাবে উচ্চ নীচের মধ্যে কোন পার্থক্য দেখিতে পাই না। ধর্ম্ম আমাকে এই শিক্ষা দেয় যে, নিজকে উচ্চ বলিয়া মনে করা পাপ। ভগবান বিভিন্ন জাতি ও শ্রেণী সৃষ্টি করিয়াছেন সত্য, কিন্তু উচ্চনীচ বলিয়া কোন শ্রেণী বিভাগ করিয়া দেন নাই।" ঐ পত্রে মহাত্মা লিখিয়াছেন—"আমার বিরুদ্ধে ইস্তাহার সকল প্রচার করা হইতেছে আমাকে গালিগালাজ করা হইতেছে। আমার লেখাগুলিকে বিকৃত ভাবে প্রকাশ করিয়া আমার বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হইতেছে। আমি উহাতে মোটেই ক্রুদ্ধ হই না, যাহারা জনসাধারণের সেবাকার্য্যে আত্মনিয়োগ করে, তাহারা এই ধরণেই ব্যবহার পাইয়া থাকে। জনসেবকগণ এ সমস্ত সহ্য করিয়া চলিলেই লাভবান হয়। আমি বহুদিন হয় ঐ সকল সহ্য করিতে অভ্যস্ত হইয়াছি।"

গুজরাটের হরিজনকে সম্বোধন করিয়া অপর একখানা পত্রে মহাত্মা লিখিয়াছেন,—"দু'দিন আগেই হউক, পরেই হউক, মন্দির প্রবেশে অপরাপর হিন্দুদের তুল্যাধিকার তোমরা পাইবেই, কিন্তু ভগবানের পূজার্চ্চনার আত্মনিয়োগ করিতে হইলে অন্তরে বাহিরে যথা সম্ভব শুদ্ধ হওয়া বাঞ্ছনীয়। অন্য হিন্দুদের মধ্যেও অনেকে অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্ন

খোকার হাসি

লক্ষ্মীবিলাস প্রেস, লিঃ কলিকাতা।

আছে, ওজর দেখাইও না যাহারা ভুল করিয়াছে, তাহাদের দৃষ্টান্ত কখনও অনুসরণ করিও না।

"গুজরাটের তথাকথিত উচ্চবর্ণের হিন্দুদের প্রতি লিখিত খোলা চিঠিখানায় মহাত্মা লিখিয়াছেন—"অধুনা এদেশে যে ধরণের অস্পৃশ্যতা বিদ্যমান এবং যাহার উচ্ছেদ সাধনে আমি অনশন অবলম্বনেও প্রস্তুত, উহা হিন্দুধর্ম্ম কেন, জগতের কোন ধর্ম্মই অনুমোদন করে না। উহা কেবলমাত্র দেশাচারসম্মত। দেশাচারকে যদি ধর্ম্মের অনুশাসন বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে সমাজের ধ্বংস অনিবার্য্য।"

বর্ত্তমানে হিন্দুসমাজের মধ্যে বহু কু-প্রথা বিদ্যমান—কিন্তু উহার কোনটাই ধর্ম্মানুমোদিত নহে। কিন্তু আমার কথা হইতেছে এই যে, এই সকল ব্যাখ্যা বিচারের সময় কি এই? আমি ১৯১৫ সাল হইতে আপনাদের নিকট বক্তৃতা দিয়া আসিতেছি, অস্পৃশ্যতা সম্বন্ধে আপনাদের নিকট আমি অনেক কিছু বলিয়াছি, আপনারাও উহার উচ্ছেদসাধনের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন—এক্ষণে হয় ঐ প্রতিশ্রুতি পালন করুন, নতুবা—এখানে মহাত্মা ইঙ্গিতপূর্ণভাবেই বাক্যটি অসমাপ্ত রাখিয়াছেন এবং উচ্চবর্ণের হিন্দুগণকেই বাক্যটী সম্পূর্ণ করিতে অনুরোধ জানাইয়াছেন (ইহার অর্থ এই যে, ঐ প্রতিশ্রুতি যদি বর্ণহিন্দুগণ পূরণ করিতে না পারেন, তাহা হইলে মহাত্মা মরণ বরণ করিবেন)। মহাত্মা লিখিয়াছেন—আমার অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন কার্য্যতালিকার মধ্যে অন্তর্বিবাহ বা একত্র পান ভোজন অন্তর্ভুক্ত নহে, অস্পৃশ্যতা বর্জ্জনের অর্থ—স্কুলে, বাড়ীতে, দেবমন্দিরে, হোটেলে ও অপরাপর স্থানে বর্ণহিন্দুদের প্রতি আমরা যেরূপ আচরণ করিয়া থাকি, হরিজনদের প্রতিও ঠিক তদ্রূপ আচরণ করা। আপনাদের মন হইতে এবং আচার ব্যবহার হইতে স্পৃশ্যাস্পৃশ্যের এই পার্থক্য বিদূরিত করা আপনাদের সুস্পষ্ট কর্ত্তব্য। হরিজনগণ যদি অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্ন হইয়া থাকে, সেজন্য তোমরাই দায়ী। আমার কথা বিশ্বাস করুন, অস্পৃশ্যদের প্রতি আমাদের এই যে আচরণ ইহা ধর্ম্ম নহে। হিংসা যদি কখনও ধর্ম্ম বলিয়া বিবেচিত হয় তাহা হইলে তখনই অস্পৃশ্যদের প্রতি আমাদের আচরণকে ধর্ম্ম বলিয়া মনে করা যাইতে পারিবে। অস্পৃশ্যতার কলঙ্ক বিদূরিত হইলে কখনই বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম বিলুপ্ত হইবে না।

মহাত্মা গুজরাটের বর্ণ হিন্দুগণকে অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন করিয়া এবং হরিজনগণকে উন্নত করিয়া হিন্দু ধর্ম্মকে রক্ষা করিবার অনুরোধ জানাইয়াছেন। গুজরাটের হরিজনগণকে সম্বোধন করিয়া মহাত্মা লিখিয়াছেন যে, এক্ষণে তাহাদের মহাত্মার কথা অনুযায়ী চলিতে হইবে, তাঁহাদের মধ্যে যে সকল কুপ্রথা আছে। উহার উচ্ছেদ সাধন করিতে হইবে। মৃত পশুর মাংস ভক্ষণ ও পানদোষ বর্জ্জন করিতে হইবে ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিতে অভ্যস্ত হইতে হইবে। মহাত্মা এই নির্দ্দেশের উপর বিশেষ জোর দিয়াছেন যে, হরিজনগণকে আত্মশুদ্ধির এই ব্যবস্থা অদ্য হইতেই গ্রহণ করিতে হইবে। এই পত্র দুইখানা গুজরাট অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন সঙ্ঘের হাতে পড়িয়াছে, এবং উহার ৫০ সহস্র কপি মুদ্রিত হইয়াছে, গুজরাটের প্রত্যেক সহরে ও গ্রামে উহা বিতরণ করা হইবে।

পরলোকগত জন গলস্‌ওয়ার্দ্দি:—প্রসিদ্ধ ইংরেজ ঔপন্যাসিক ও নাট্যকার জন গলস্‌ওয়ার্দ্দি ৩১শে জানুয়ারী পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার সময়ের প্রধান সাহিত্যরথীদের তিনি অন্যতম। গত বৎসর তিনি সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ লাভ করিয়াছিলেন। গলস্‌ওয়ার্দ্দি ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং হেরো ও অক্সফোর্ডের নিউ কলেজে শিক্ষালাভ করেন। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে ওকালতিতে যোগদান করেন কিন্তু ওকালতি না করিয়া আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, ইজিপ্ট ও রুশিয়ায় তিনি বিস্তৃতভাবে ভ্রমণ করেন। দেশে ফিরিয়া তিনি সংবাদপত্রসেবায় আত্মনিয়োগ করেন এবং ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে উপন্যাস লিখিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু প্রথম প্রথম তাঁহার উপন্যাস বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপন্যাস "দি ফরসাইট সাগার" প্রথম পুস্তক "দি ম্যান অব্ প্রপার্টিস্" প্রকাশিত হয়। এই উপন্যাসে তিনি কয়েক-পুরুষ ধরিয়া এক ধনী পরিবারের ত্যাগের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। পুস্তকটি ছয়টি বড় ও চারিটি ছোট উপন্যাসে বিভক্ত এবং বাইশ বৎসর ধরিয়া ইহা লিখা হইয়াছিল। শেষ উপন্যাসটির বেশীর ভাগই ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণ আফ্রিকায় অবস্থানকালে লিখিত হইয়াছিল। ইত্যবসরে গলস্‌ওয়ার্দ্দি আরও বহু উপন্যাস, নাটক ও প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এই সব লেখার প্রধান সুর, নির্য্যাতিত মানুষ ও পশুর জন্য করুণা, স্নেহ, সুস্থ বিচার এবং জীবন সম্বন্ধে নৈরাশ্যবাদ। "জাষ্টিস্" নামক নাটক লিখিয়া তাঁহার খ্যাতি অত্যন্ত বাড়িয়া যায়। এই নাটকের ফলে ইংলণ্ডের জেল সংস্কার হয়। হামবার্গে "জাষ্টিসের" অভিনয় কালে কয়েকজন স্ত্রীলোক মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। ইহা হইতেই বুঝা যাইবে তাঁহার নাটক সমূহ কতদূর বাস্তব এবং উহারা মানব মনে কি গভীর রেখাপাত করে। অনেকের মতে "ষ্ট্রাইক" তাঁহার সর্ব্বপ্রধান নাটক। গলস্‌ওয়ার্দ্দির চরিত্রসমূহ সাধারণের কার্য্যে যোগদান করে এবং পাঠক তাহাদের চক্ষু দ্বারা সমসাময়িক ইতিহাস পাঠ করিতে ও তাহাদের উপর তাহার প্রতিক্রিয়া কি তাহা বুঝিতে পারেন। তিনি তাঁহার লেখা বরাবর পাঠ করিতেন এবং নির্দ্দয়ভাবে পরিবর্ত্তন করিতেন। তাঁহার লেখা বেশীর ভাগই টাইপ করিতেন তাঁহার স্ত্রী এবং তিনিই ছিলেন তাঁহার লেখার তীব্রতম সমালোচক। গলস্‌ওয়ার্দ্দি তাঁহার স্ত্রীর তীক্ষ্ণ সমালোচনা ক্ষমতার মূল্য বুঝিতেন। তাঁহারই উপদেশে ২৮ বৎসর বয়সে তিনি সাহিত্যিকের কাজ অবলম্বন করেন। তাঁহার সামান্য কিছু স্বাধীন আয় ছিল সুতরাং সাধারণতঃ যে কারণে লোকে লিখিয়া থাকে তাঁহার সে প্রয়োজন ছিল না। তিনি যে সব সংস্কার চাহেন তাহা নির্দ্দেশ করিয়া বলেন, শিশুদিগকে পশু-পক্ষীর প্রতি সদয় হইতে শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। পশুপক্ষী হত্যা করিয়া শিকারের আমোদের তিনি প্রবল বিরোধী ছিলেন। দুষ্কর্ম্মকারী পতিতদের প্রতি তিনি যথোপযুক্ত ব্যবহারের দাবী করেন। তাঁহার মতে সুস্থ মস্তিষ্কে হত্যা সাধন ও সাময়িক উত্তেজনা বশে হত্যার মধ্যে পার্থক্য করিয়া দণ্ডের তারতম্য করা উচিত। ভাস্কর্য্যের ধ্বংসকারীদের লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিয়াছেন যে, প্রতি রবিবারে গির্জ্জায় এইরূপ প্রার্থনা করা উচিত—"হে প্রভু, আমাদের সময়ের লোকদের সুরুচি দাও।" অঙ্কুরেই গোলযোগের নিপাত করার জন্য তিনি শ্রমিক ও মালিকদের একটী মিলিত স্থায়ী সমিতি গঠনের উপদেশ দিয়াছেন। তিনি রাজনৈতিক দলাদলি হইতে ৩টী বিষয় বাদ দিতে বলিয়াছেন,—তাহা হইতেছে—মাটী, বস্তী ও বিদেশাগত। যদি শিশুদিগকে স্বরবর্ণের (ভাওয়েলস্) যথাযথ উচ্চারণ শিশুকাল হইতেই শিখান হয় তবে তিনি মনে করেন যে, জাতিগত বৈষম্য অনেকটা দূর হইবে। এক সময়ে গলস্‌ওয়ার্দ্দী নাইট উপাধি প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন কিন্তু ১৯২৯ সনে তাঁহাকে অর্ডার অব মেরিট উপাধিতে ভূষিত করা হয়। তাঁহার গ্রন্থসমূহ বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হইয়াছে এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশে তাঁহার নাটক সমূহ সাগ্রহে অভিনীত হইতেছে এবং বর্ত্তমানযুগের সার্ব্বজনীন ইংরেজ লেখক বলিয়া তিনি তথায় শ্রদ্ধা পাইতেছেন। ১৯৩০ সনে তাঁহার "এসকেপ" নামক নাটকখানিকে সবাক ফিল্মে রূপান্তরিত করায় সময় তিনি দেখাশুনা করিয়াছিলেন।

—

দেশের দুঃখের মূর্ত্তি

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অনেকদিন আগের কথা, যখন বাংলাদেশে স্বদেশ সম্বন্ধে প্রথম মনের উদ্বোধন হোলো তখন আমার বয়েস অল্প। তখনকার দিনে আমার দাদা, রাজনারায়ণ বাবু, নবগোপাল বাবু এবং শিক্ষিত সমাজে যাঁরা লব্ধপ্রতিষ্ঠ ছিলেন তাঁরা সবাই মিলে প্রথম হিন্দুমেলা অনুষ্ঠান করলেন। সে ছিল বার্ষিক মেলা; তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, প্রদর্শনীর মধ্য দিয়ে মনকে সঞ্চারিত করা, উদ্বোধিত করা। তখনকার দিনের সাহিত্যেও এই দেশাত্মবোধের প্রকাশ ছিল; মুক্তির জন্য স্বাধীনতার জন্য কামনার আভাস সেদিন ফুটে উঠেছিল। ক্রমে ক্রমে এইভাবে ভদ্রসমাজের মধ্যে এই রাষ্ট্রবোধ জাগরিত হতে লাগল। তারপর যখন আমার বয়েস অধিক হোলো, তখন দেখলেম কংগ্রেসের সূচনা হয়েছে; জনকয়েক ইংরেজ ও আমাদের দেশীয়দের মধ্যে সুরেনবাবু, ডিব্লিউ, সি, ব্যানার্জ্জি প্রভৃতি যোগ দিয়ে এই কংগ্রেস অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রবোধ জাগ্রত কর্‌বার চেষ্টা কর্‌লেন। সেদিনের এই সমস্ত প্রচেষ্টার মধ্যে দুটি ভাববার কথা আছে। প্রথম, হিন্দুমেলার আরম্ভে সমগ্র ভারতের রূপ ছিল না; তা' না থাকবার প্রধান কারণ যাঁরা এই চেষ্টায় প্রবৃত্ত ছিলেন তাঁরা নগরবাসী,—পল্লীর সঙ্গে তাঁদের সব সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন ছিল; সামাজিক ও প্রাণের দুইই। তখনকার দিনে নগরে যাঁরা প্রাধান্যলাভ করেছিলেন তাঁদের অধিকাংশই হিন্দু। মুসলমানদের সংখ্যা ছিল স্বল্প; নগরের আকর্ষণ তাদের ছিল না তারা ছিল গ্রামে।

কংগ্রেসের আরম্ভে জনসমাজের সাড়া পাওয়া যায়নি; তারা ছিল অন্ধকারে আচ্ছন্ন, শিক্ষিত সমাজের মত নিজের পায়ে দাঁড়াবার মত শক্তি তাদের ছিল না; কারণ তারা অবোধ, তারা অজ্ঞান তাদের শিক্ষা নেই। তখনকার দিনে ভদ্রসমাজকে নিয়েই দেশ, জনসাধারণ ছিল অবজ্ঞার পাত্র। যে কোনো উন্নতির চেষ্টা তখন হয়েছিল তা' এই অবনত জনসাধারণকে বাদ দিয়ে।

সেদিন রাজভাষা ছিল আমাদের শিক্ষিত সমাজের মাতৃভাষা,—রাষ্ট্র-সভায় সেই ভাষারই প্রচলন ছিল। মায়ের মুখের যে ভাষা সেই বাংলা ভাষার দিকে তারা ফিরেও তাকাননি এবং সেই সঙ্গে দেশের গ্রামবাসীদেরও অবজ্ঞা করা হোলো। যদিও তখন সমগ্র ভারতবর্ষকে ইংরেজী ভাষা ছাড়া সম্মিলিতভাবে দেখবার কোনও উপায়ই ছিল না, তবুও বাংলা ভাষাকে আমরা সব দিক দিয়ে উপেক্ষা করে এসেছি; তারি সঙ্গে বাংলার পল্লী-মায়ের ছেলেমেয়েদের সুখ দুঃখের কথা বুঝতে চেষ্টা করিনি, তারা মনের ভিতর থেকে সুদূরে পড়েছিল।

আমার সেই অল্প বয়সের দিনে পরম সৌভাগ্য ঘটেছিল—এই গ্রামবাসীদের কাছে আসবার। তখন আমাদের জমিদারীর ভার ছিল আমার উপর, সেই সূত্রে গ্রামের লোকদের সঙ্গে আত্মীয়তার ঘনিষ্ট সম্বন্ধ স্থাপন করবার সুযোগ আমার হয়েছিল। সে আমার জীবনে আজ পর্য্যন্ত একটী অমূল্য সম্পদরূপে প্রতিষ্ঠিত। তখন সেই নিরক্ষর নিরন্ন গ্রামবাসীদের অব্যক্ত দুঃখ ক্রন্দন আমার হৃদয় গভীর ভাবে স্পর্শ করেছিল; আমি তাদের আমার সমস্ত প্রাণ ঢেলে দিয়ে ভাল বেসেছিলাম, তারাও তাদের সমস্ত অন্তরের সঙ্গে আমায় ভালবেসেছিল। তখন আমার চোখে পড়ল যে, জনসাধারণের মধ্যে প্রাণের স্পন্দন ক্ষীণ, দুর্ব্বল। তাদের অন্তরে দুঃখের জোয়ার ভাটা খেল্‌চে। এতদিনের পীড়ন, অবজ্ঞা ও অপমানের চোখের জল আমাদের কাছে অজ্ঞাত ছিল। আমাদের সাহিত্যেই

তাদের দুঃখের কথা প্রকাশিত হয়নি। তাদের হৃদয়ের কাছে এসে দেখলেম তাদের তৃষ্ণার জল নেই, ক্ষুধার অন্ন নিঃশেষ, পীড়িত হ'লে রক্ষার জন্য দৃষ্টি নেই। রাষ্ট্রনেতারা ছিলেন এদের প্রতি উদাসীন। যারা সমাজপতি, যারা শিক্ষিত তারা সবাই নিশ্চেষ্ট হয়ে শুধু নিজের স্বার্থ নিয়ে বসেছিলেন। তার কারণ এরা নিজেদের প্রকাশ করতে পারেনি; এরা চীৎকার করে বলতে পারেনি এদের দুঃখ দৈন্য নির্য্যাতন, এদের লাঞ্ছনার কথা।

তখন পল্লীগ্রাম ছিল নানা জাতির শিক্ষিত অশিক্ষিতের উচ্চনীচের ঐক্য স্থল। সেখানে সামাজিক অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানে সকলের সমান অধিকার; সেখানে শিক্ষিত অশিক্ষিত হিন্দু-মুসলমান সকলে একসঙ্গে মিলেমিশে জীবন যাপন করতে বাধ্য। কিন্তু ইংরিজি শিক্ষিত বাবুর দল গ্রাম ছেড়ে চলে এল এবং পরে যখন তাদের উপকার করতে গেল তখন সে উপকারের মধ্যে অন্তরের অনুভূতি ছিল না—সে ছিল ঐশ্বর্য্যের অহঙ্কার।

তাই তারা বাবুদের উপকারকে ভয় করত। প্রতি পদে পদে তারা উপকার পেয়ে অপমানিত হয়ে এসেছে 'ঠকে' এসেছে; তাই যারা উপকার করতে আসে তাদের প্রতি ওদের বিশ্বাস নেই। সেই বিশ্বাস জয় করবার চেষ্টা আমাকে সব দিয়ে করতে হয়েছিল এবং আমি তা' পেয়েও ছিলেম। আমি দেখেছিলেম যে, দেশের যারা গৃহস্থ তাদের শিক্ষা দুর্ব্বল, সে শিক্ষা দেশের জমিতে শিকড় বিস্তার করতে পারেনি। চোখ বুজে আমরা বিদেশী শিক্ষার নকল করে এসেছি, প্রাণবান শিক্ষা আমরা পাইনি। আজ সেই শিক্ষার প্রয়োজন। তাই আমার বহুদিনের চেষ্টা ছিল যে এই জনসাধারণ যারা, যারা অন্ন দিয়ে রক্ত দিয়ে দেশের প্রাণকে বাঁচিয়ে রেখেছে, যারা দেশকে মাথার উপর ধারণ ক'রে রেখেছে—যেমন বাসুকী ধরিত্রীকে ধারণ করে আছে—তারা কি করে শক্তি লাভ করবে। এক সময় দেশের ভিত্তি ছিল পল্লীতে। দেশের শক্তি ছড়িয়ে ছিল প্রতি গ্রামে প্রতি ঘরে। আজ সে শক্তিকে আমরা টেনে এনেছি নগরীতে গ্রামবাসীদের দুর্ব্বল, ক্ষীণ, অপমানিত করে। তখনকার দিনে সামাজিক যোগসূত্রে ব্রাহ্মণ নমঃশূদ্রের মধ্যে আদান প্রদান ছিল, আত্মীয়তার সম্বন্ধ ছিল। জমীদার তার কর্ত্তব্য করেছে, পুরোহিত তার অনুষ্ঠানে সবাইকে ডেকেছে। এই আত্মীয়তার সম্বন্ধ সেদিন ছিল বলে গ্রামবাসীদের পীড়ন করেনি। দুঃখের সুরু হোলো তখনই যখন ভদ্রসমাজ বিলাসের লালসায় সহরের আকর্ষণে দলে দলে গ্রাম ছেড়ে চলে এল। সেদিনের সেই সুন্দর সামাজিক ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ল। যারা পড়ে রইল তারা উপেক্ষিত অবজ্ঞাত। যেমন নদীর স্রোত মরে গেলে তলার পাঁক ও পাথর কঠিন, পীড়াজনক হয় এ তেমনি। দেশের আন্তরিক দুর্গতির সুরু হোলো সেদিন থেকে, এবং শিক্ষিত সমাজই তার জন্য সম্পূর্ণ দায়ী। তখন দেশের নেতারা মেতে ছিলেন নিজেদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের ব্যবস্থার জন্য। উপরের শ্রেণীর সুখ-সুবিধা আলোচনা করাই ছিল তখনকার Political agitationএর মূলকথা। আমরা তখন গাছের ফুল ও ফলের প্রস্ফুরণ ও পরিপুষ্টির কথা ভেবেছি—কিন্তু যে মাটি থেকে রস আহরণ করে গাছ ফুল ফোটাবে, ফল পাকাবে সেই মাটিতে খাদ্য যোগাতে আমরা পারিনি। পল্লী-সমাজের কাছ থেকে আমরা শুধু শুষে নিয়েছি, তাকে ফিরিয়ে দিইনি কিছুই। তাই তারা অজ্ঞান। যেখানে দৈন্য, অবজ্ঞা সেখানে বাঁচবার আশা করা মিথ্যে—সেখানে আমরা মরতে বাধ্য।

যেদিন প্রথম ক্ষীণ শক্তি শূন্য ভরসা নিয়ে এই কাজে নামলেম তখন স্বদেশবাসীরা আমাকে সাহায্য করতে এলেন না! তাঁদের কাছে শুধু নিন্দার তীব্র বাক্য পেয়েছিলাম। সমস্ত নিন্দাকে মাথা পেতে নিয়ে একলাই দিনের পর দিন আমার সব কিছু দিয়ে, এই অনুষ্ঠানটির মধ্য দিয়ে গ্রামবাসীদের মধ্যে প্রাণসঞ্চার করবার চেষ্টা করেছিলাম। তখন কাউকে আমার পাশে পাইনি, কেবল কালীমোহন তার রুগ্ন শরীর নিয়ে, অন্তরে গভীর প্রেরণা ও সেবার উদ্যোগ নিয়ে আমার পাশে

এসে দাঁড়িয়েছিল। যা' দীন নিঃসহায় ভাবে, দেশের নিন্দা অপবাদ বিরুদ্ধতার মধ্য দিয়ে, ক্ষীণ দুর্ব্বল হাতে আরম্ভ করেছিলাম তা বাইরের দিক দিয়ে না হলেও অন্তরের দিক দিয়ে প্রাণসঞ্চার করেছে—এই আমার আনন্দ। এখানে যাঁরা কর্ম্মীরূপে আছেন তাঁরা তপস্বী, পল্লীর সেবা করা তাঁহাদের জীবনের সাধনা। আজ আমার আহ্বানের দিন এসেছে, গর্ব্বের সঙ্গে আপনাদের ব'লব, যাঁরা বাইরে থেকে এসেছেন তাঁদের বলব, যে সত্য এতদিন প্রচ্ছন্ন ছিল শিশু হয়েছিল আজ তা' প্রকাশিত হয়েছে, বড়র আকার ধারণ করেছে। আজ এর দাবী মেটাতে হবে, একে রক্ষা করতে হবে যদি দেশের প্রতি আপনাদের মমতা থাকে।

লোকে আমাকে জিজ্ঞাসা করে এসেছে আজ এই রাষ্ট্রনৈতিক গোলোযোগের দিনে তুমি কি দিলে, কি করলে। এর উত্তর মুখে দেবো না, উত্তর একদিন আপনা থেকেই ফুল ফলে প্রকাশিত হবে। আমি যখন নিন্দিত হয়েছিলাম তখনও উত্তর দিইনি, জানি কথার উত্তর প্রকৃত উত্তর নয়, তাতে শুধু কথা কাটাকাটিই বাড়ে। আমার কাজ আমার উত্তর দেবে।

আমার এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আমি চেয়েছিলাম গ্রামবাসীর শিক্ষাদানের দ্বারা বুঝিয়া দিতে—কোথায় তাদের কি প্রয়োজন, কি দাবী। যেদিন ওরা বুঝতে পারবে নিজেদের দায়িত্ব সেই দিনই সুরু হবে দেশের প্রকৃত কাজ। আজকের দিন সব চেয়ে বড় কথা হচ্ছে হিন্দুমুসলমান নমঃশূদ্র ব্রাহ্মণের মিলন-গ্রন্থিকে দৃঢ় করা, সত্য করে তোলা। আজ যাঁরা বাইরে থেকে এই অনুষ্ঠানের উৎসবে যোগ দিয়াছেন তাঁরা দেখুন বড় দুঃখের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে এই অনুষ্ঠান জাগ্রত হয়ে উঠেছে।

কোন মঙ্গল কাজ বিচ্ছিন্ন হয়ে করলে বেদনা থেকে যায়। আমাদের এই মঙ্গল কাজের মধ্যে যে গভীর বেদনা নিহিত সে কাউকে সাহায্যের জন্য না পাবা'র বেদনা। সকলকেই পাবার আশা করেছিলাম, কারণ স্বার্থের জন্য ডাকিনি। নিজের স্বার্থকে এর জন্যে সম্পূর্ণ বিসর্জ্জন দিয়ে স্বদেশবাসীকে ডেকেছিলেম এই কল্যাণ ব্রত সাধন করতে

আমাদের দেশের জনকয়েক সাহিত্যিক লিখে জানিয়ে ছিলেন যে, আমি দেশের এই দুর্দ্দিনে ভাববিলাসে মগ্ন কেবল কবিত্বই করি। অনেকেই বলেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কবিত্ব নিয়েই মেতে আছেন। একথা শুধু বাংলা-দেশ আমায় বলেছে, সমুদ্র পারের লোকেরা নয়। আমার দেশবাসীরা মনে করেন—কর্ম্ম করেন তাঁরাই, যাঁরা ভোটযুদ্ধ ও ভোট গণনায় ব্যস্ত। এই অভিযোগের প্রতিবাদ রয়েছে আমার এই কর্ম্মক্ষেত্রে। দুঃখের সঙ্গে জানাতে হোলো যে আমি শিক্ষিত সমাজের কাছ থেকে কিছুই পেলাম না, কিন্তু আমার সান্ত্বনা শুধু এই এবং এই বিশ্বাস নিয়েই আজ আমি আমার কাজে এতদূর অগ্রসর হতে পেরেছি যে, গ্রামবাসীরা আমাকে পরমাত্মীয় করে নিয়েছে। তাদের অন্তরের ভালবাসা ও উপকার আমি পেয়ে এসেছি। আজ আমি বিনা দ্বিধায় বলতে পারব যে, এই অনুষ্ঠানের বিনাশ নেই, এ প্রতিদিন শাখা প্রশাখায় ফুলে পল্লবে বিস্তার লাভ করবে। আমার এই সৃষ্টিকার্য্যের প্রধান সম্পদ আমার চারিপাশের গ্রামবাসীদের শ্রদ্ধা। আমার বিশ্বাস যে, আমি আমার মৃত্যুর পূর্ব্বে দেখে যেতে পারব যে আমার কাজ আপনাতে আপনিই বিকশিত হয়ে উঠেছে। ৩৩ কোটীর জন্য ভাবতে পারিনি, ভাববার মত শক্তি সামর্থ্য ছিলনা। এই প্রান্তরের প্রান্তরে সঙ্কীর্ণ সীমায় যে আলো জ্বলেছে, আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, সে একদিন না একদিন সমগ্র দেশকে আলো দান করবে।

যে প্রদীপ এখানে জ্বলেছে তাকে উৎসর্গ করলেম দেশের জন্য। আমি শুধু চাই আমার অন্তরের বন্ধু গ্রামবাসীদের শ্রদ্ধা, সহযোগিতা, যাদের মুখে বাণী নেই যাদের ভিতরে আলো জ্বলেনি। তারা নিঃসঙ্কোচে নির্ব্বিঘ্নে তাদের যা কিছু আহুতি দেবার জন্য নিয়ে আসুক এই যজ্ঞক্ষেত্রে এবং তাই নির্ব্বাণহীন নির্ম্মল আলো হয়ে চিরকাল জ্বলবে।

(শ্রীনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা—শান্তিনিকেতনের শ্রীসাগরময় ঘোষ কর্ত্তৃক অনুলিখিত)।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

অধিকাংশ বর্ত্তমান সাহিত্যিক আর যতই জানুন, সংযম যে সর্ব্বাপেক্ষা বড় সাহিত্যধর্ম্ম, তাহা তাঁহারা জানেন না। সংযমই সাহিত্য রচনার ও রস-সৃষ্টির মূলমন্ত্র একথা তাঁহারা স্বীকার করেন না বলিয়াই তাঁহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ নানা আকার ধারণ করিয়া মুখর হইয়া উঠিয়াছে। হয়ত এই সংযমের সীমানা কোথায় কেহ জিজ্ঞাসা করিবেন। সংযমের সীমানা সভ্য-শিক্ষিত কৃতবিদ্য ব্যক্তিদিগকে দেখাইয়া দিতে হয় না, তাঁহারা জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রেই সংযম রক্ষা করিয়া সভ্যসমাজে সসম্মানে চলিতেছেন, সাহিত্য-ক্ষেত্রই কি সংযমের সীমানা ধরিতে পারিবেন না? এবিষয়ে রবীন্দ্রনাথের রচনাকে আদর্শ ধরিলেই গোল চুকিয়া যায়।

নর-নারীর বৈধ প্রণয়ই হউক আর অবৈধ প্রণয়ই হউক উদাসীনভাবে তাহার প্রাসঙ্গিক বর্ণনায় কোন দোষ নাই। কিন্তু যখনই, আদ্যোপান্ত মূলসৃষ্টির সহিত সামঞ্জস্য না রাখিয়া, সমগ্রের সহিত কলাশৃঙ্খলার সম্বন্ধ ভুলিয়া গিয়া, লেখকের মন ঐ বর্ণনাতেই কামাবেশ-সঞ্চারে অতিরিক্ত রসিয়া উঠে, মোহাবিষ্ট লেখনী সহজে বিষয়ান্তরে যাইতে চাহে না,—তখনই সংযমের (অন্ততঃ ভাষায়) বিশেষ প্রয়োজন হইয়া উঠে।

লেখকের স্নায়ু-মণ্ডলই সংযমের কথা স্মরণ করিয়া দিতে পারে। মূলের সহিত সামঞ্জস্য-রক্ষা না করিয়া মসগুল হইয়া কামকেলি বর্ণনা করিলে সে বর্ণিত অংশ সমগ্র রচনার অঙ্গে অর্ব্বুদের (Tumour) এর মত বিকট হইয়া উঠিবে। যতই সুপুষ্ট, চিক্কণ ও সুশ্রী হউক অর্ব্বুদে কখনো অঙ্গ-সৌষ্ঠব বাড়ে না।

একদা নাগরগণের 'বিলাসকলাসু কুতুহল' পরিতৃপ্তির জন্য কামলীলার বর্ণনা সাহিত্যে চলিত। পরে ধর্ম্মের নামে, সহজিয়া রস-সাধনার নামে আমাদের দেশে দৈহিক লালসা ও রিরংসা সাহিত্যের বিষয়ীভূত হইয়াছিল। এই সকল সাহিত্যের স্রষ্টারাও রস-শিল্পী ছিলেন। এযুগে ঐরূপ রস সাহিত্য শ্রেষ্ঠ শিল্পী দ্বারা রচিত হইলেও কেহ সহ্য করিবে না।

আজকাল আবার বৈজ্ঞানিক সত্যের দোহাই দিয়া রিরাংসাবৃত্তির বিশ্লেষণ আরম্ভ হইয়াছে। যাঁহারা একার্য্যে ব্রতী, তাঁহারা কেহই শ্রেষ্ঠ শিল্পী নহেন, কলাশ্রীর ভব্যতাটুকুও না থাকায় তাঁহাদের রচনা জঘন্য হইয়া উঠিতেছে। ইহারা কামকে বিষয়বস্তু-স্বরূপ অবলম্বন করিয়া সুলভ সাহিত্যও রচনা করিতে পারেন না, কামকেলির মোহময়ী বর্ণনাকেই সাহিত্য মনে করেন। উপাদান উপকরণ যতই হেয় বা জঘন্য হউক তাহা যখন কোন গঠন-সৌষ্ঠবের বা শিল্পশ্রীর অঙ্গীভূত হয় তখন তাহার আদিম নিজস্ব জঘন্যতা আর থাকে না। কিন্তু ঐ উপাদান উপকরণ এর পুঞ্জকেই কোন গঠনও বলা যায় না, কোন মর্য্যাদাও দিতে পারা যায় না।

সাহিত্য-সেবার নামে যাহাদের কামনাময় আস্ফালন, কবির কথায় বলিতে গেলে,—

দেহ ভরি' কর' পান কবোষ্ণ এ প্রাণের মদিরা,
ধূলা মাখি খুঁড়ি লও কামনার কাচমণি হীরা।
অন্ন খুঁটি লব মোরা কাঙ্গালের মত
ধরণীর স্তনযুগ করি দিব ক্ষত
নিঃশেষ শোষণে, ক্ষুধাতুর দশন আঘাতে করিব জর্জ্জর
আমরা বর্ব্বর।"

—তাহারা ধরণীর কি সম্পদ বাড়াইবে? 'সন্দীপের'

বৃত্তিপ্রবৃত্তি লইয়া কোন' কল্যাণের সৃষ্টি সম্ভব নয়—সাহিত্যই বা জন্মিবে কিরূপে? এই কামনাময়ী বৃত্তির সহিত পণ্ডিত্যের যোগ থাকিলে আরো বেশী অকল্যাণ সাধিত হইতে পারে—

মণিনা ভূষিতঃ সর্পঃ কিমসৌ ন ভয়ঙ্কর?"

কলা-সৌন্দর্য্যের দিক হইতে কামকেলি বর্ণনা সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা, অন্যান্য সমস্ত মনোবৃত্তির অভিব্যক্তি সম্বন্ধেও তাহাই।

স্বভাব বর্ণনাতেও অবিকল পুঙ্খানুপুঙ্খ নিঃশেষ করিয়া বলিবার প্রয়াসও অসংযমের লক্ষণ! এ বিষয়ে সংযম অবলম্বন করিলে রচনা ব্যঞ্জনাময়ী হইতে পারে—বর্ণনা ফোটোগ্রাফীর অবৈচিত্র্য হইতেও রক্ষা পাইবে। ফটোগ্রাফী ত উচ্চ শ্রেণীর আর্ট নহে।

সজিনা ফুলও স্থলবিশেষে প্রয়োগগুণে সাহিত্যে চলিতে পারে—কিন্তু জোর করিয়া ঐ শ্রেণীর ফুলের তালিকা দিলে অথবা চাঁপা বেলা চামেলী গোলাপ জুঁইকে অপমান করিয়া কিংবা তাহাদিগের হীনতা প্রমাণের জন্য সজিনা ফুলকে অথবা মর্য্যাদা দিলে যে অসংযম বা উদ্ধত অধীরতার ভুল ফুটিয়া উঠে, তাহা সাহিত্যে রস সৃষ্টির অন্তরায়।

সাহিত্য যে কেবল অভিজাতসম্প্রদায়ের সেবা করিবে ইহা কখনো বাঞ্ছনীয় নহে। তাহাকে দীনদুঃখী অধঃপতিত পতিতা অনুন্নত জনশ্রেণীর ব্যথার ব্যথীও হইতে হইবে। কিন্তু তাহাদের অধঃপতনের সীমানা দেখানো-ইত সাহিত্য নহে। তাহাদের অশ্রু বর্ষণের অনুপাতানুসারেও সাহিত্যের মর্য্যাদা নির্দ্দিষ্ট হইবে না। সেখানেও সংযমের প্রয়োজনীয়তা আছে। তাহাদের জীবনের গুহ্যকারজনক চিত্রত তাহাদের পল্লীতে বেড়াইয়া অসিলেই দেখা যায়। সাহিত্যিককে আপন মনের মাধুরী মিশাইয়া সেখানেও সৌন্দর্য্যসৃষ্টি করিতে হইবে। সাহিত্যিক Municipal Inspector নহেন,—সমস্ত গলি ঘুঁজি গুহা কোটর তন্নতন্ন করিয়া তাঁহাকে দেখিতে বা দেখাইতে হইবে না। সংযত লেখনীর ব্যঞ্জনার ইঙ্গিত যাহা দেখাইতে পারে ও ভাবাইতে পারে অবিকল বর্ণনা তাহা পারে না। সাহিত্যিকের মনে রাখিতে হইবে পতিত অধমের জীবন চিত্র দেখানোই তাঁহার উদ্দেশ্য নহে—তাহাদের জীবন লইয়া সাহিত্য সৃষ্টিই উদ্দেশ্য। সেজন্য এস্থলে সহানুভূতির উচ্ছ্বাসের মধ্যেও সংযম চাই।

উপন্যাসের মধ্যে সুশিক্ষিত পাত্রপাত্রীদের কথোপকথন বিদ্যাবত্তা প্রকাশ বা বক্তৃতা বিলাসে পরিণত না হয় সে বিষয়ে সতর্কতার প্রয়োজন আছে। তাহার ভাষাও যাহাতে বাংলা হরপে ইংরাজী (Anglicised) অথবা অতিরিক্ত পেঁচালো না হয় সে বিষয়ে সংযত হওয়া উচিত। আবার নিম্নশ্রেণীর ইতর পাত্রপাত্রীদের মুখে,—অকৃত্রিমতা সৃষ্টির লোভে যেমনটি তাহারা বলিয়া থাকে, ঠিক তেমনি অভব্য কথাবার্ত্তা বসানোই উৎকৃষ্ট সাহিত্য নয়। এ বিষয়েও সংযমের প্রয়োজন আছে।

তাহাদের মুখের সকল কথাই সাহিত্যের মর্য্যাদা পাইতে পারে কি? দুইজন নিম্নশ্রেণীর লোকের কলহের কথা অবিকল যদি গ্রামোফোনে ধরা যায় অথবা পুস্তকে লেখা যায়—তবে কি সাহিত্য হইবে? উপন্যাসের মধ্যে পাত্র পাত্রীর মুখের কথাই থাকে তাহার অধিকাংশ জুড়িয়া। কোন' উপন্যাসের ঘটনাসংস্থান যদি কোন জেলার পল্লীবিশেষ হয় এবং তাহার পাত্রপাত্রী যদি তাহাদের নিজের ভাষায় নিজের উচ্চারণে সমস্ত কথা বলিতে থাকে—তবে উপন্যাসখানির আগাগোড়া সাহিত্যের ভাষায় অনুবাদ করিয়া লইতে হয় না কি? স্বাভাবিকতা সৃষ্টি বিষয়েও সেজন্য সংযমের প্রয়োজন আছে।

চল্‌তি ভাষা, সাহিত্যের ভাষা বলিয়া ইদানীং চলিয়াছে। বর্ত্তমান সাহিত্যিকগণের অনেকেই এই চল্‌তি ভাষার পক্ষপাতী। কিন্তু চল্‌তি ভাষার অর্থ ইতর ভাষা নহে,—যে ভাষা ভদ্রলোকের মুখে মুখে চলে তাহাই সাহিত্যের ভাষা বলিয়া গণ্য। গ্রাম্য ইতর লোক বা অশিক্ষিত লোক শোভনতর মার্জ্জিততর ভাষার অভাবে যে ভাষায় কোন' প্রকারে ভাব প্রকাশ করে তাহাকে সাহিত্যের ভাষা করিয়া তোলা অসংযম ও উচ্ছৃঙ্খলতারই লক্ষণ। উপন্যাস-নাট্যাদিতে পাত্র পাত্রীর মুখের কথা হিসাবে তাহা অনেকক্ষেত্রে কিছু বৈচিত্র্য সম্পাদন করে স্বীকার করি,—কিন্তু আগাগোড়া সেই ভাষাতেই গোটা বই লিখিলে বক্তব্যের মর্য্যাদা

রক্ষিত হইবে না। বাংলা ইডিয়ম ব্যবহার করায় ভাষা বেশ জোরালো হয় সত্য, কিন্তু 'টেনে বুনে' জোর করিয়া ইডিয়ম ব্যবহার অথবা যে সকল ইডিয়ম সুপরিচিত নয়, সহজ সরল সাহিত্যের চিরপরিচিত ভাষার বদলে সেগুলিকে জোর করিয়া ঢুকাইলে ভাষার প্রসাদ-গুণ নষ্ট হইয়া যায়। এ বিষয়েও তাই সংযম চাই।

বাক্যে শব্দ বাহুল্য, শব্দে বাহুল্য অক্ষর বাহুল্য, ক্রিয়া ও ক্রিয়া-বিশেষণের অযথা দার্ঘতা, ভাবপ্রকাশে ভাষার অতিপল্লবিত বিস্তার এবং কর্ত্তা কর্ম্ম ক্রিয়া বিশেষণ ও ক্রিয়ার যথাক্রমে চিরন্তন প্রথাগত সংস্থিতি আজকালকার লেখকেরা পছন্দ করেন না। পছন্দ না করার যথেষ্ট হেতুও আছে। অযথা ভারাক্রান্ত ভাষা স্বচ্ছন্দে চলিতে পারে না। বর্ত্তমান লেখকগণ ঐ গুলি পরিহার করিয়া চলিতে চাহেন—তাই তাঁহাদের বাক্যগুলি অধিকাংশস্থলে বেশ ছোট ছোট। বাক্যবিন্যাসে, অনুচ্ছেদ-বিন্যাসে ও ছেদ-সংস্থানেও ইহারা প্রাচীন পদ্ধতি মানিয়া চলেন না। এবিষয়েও কিন্তু কেহ কেহ অত্যন্ত অসংযমের পরিচয় দিতেছেন। ফলে ইঁহাদের অনেকের ভাষা কৃত্রিমতায় পূর্ণ, বা ন্যাকামিতে ভরা, অনেক সময় আগাগোড়া ঠাকুরমার রূপকথায় গল্প বলিয়া যান, অথচ পরীর গল্পও নয়—সুয়ো-রাণী দুয়ো রাণীর গল্পও নয়—রীতিমত জীবন মরণের সমস্যার কথা।

কথা-সাহিত্যের মত অনেক বর্ত্তমান কবিদের রচনাতেও অসংযমের উদ্দামতা স্পষ্ট। কি বিষয়-নির্ব্বাচন, কি অলঙ্কার, মিল, অনুপ্রাস নির্ব্বাচন, কি কল্পনার লীলা—সমস্ত বিষয়েই বল্গা-ছেদনই ইঁহাদের ধর্ম্ম হইয়া উঠিয়াছে।

প্রভাব সকল সময়ই উপর হইতে নীচেই সংক্রামিত হয় না—প্রভার মত প্রভাবও নীচে হইতে উপরের দিকে উঠিতে পারে। অপেক্ষাকৃত প্রবীণ সাহিত্যিকগণ কোন কোন বিষয়ে তরুণ সাহিত্যিক গণের মনোভাবে অল্পবিস্তর আবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছেন। এমন অনেক সাহিত্যিকের নাম করা যাইতে পারে যাঁহারা যৌবনে সংযমশৃঙ্খলা—মানিয়া আসিয়াছেন কিন্তু প্রৌঢ় বয়সে আর মানিতেছেন না। ইঁহাদের অন্তরে উচ্ছৃঙ্খলতা কি এতদিন সুপ্ত অথবা গুপ্ত ছিল? আজিকে দলে সহযোগী পাইয়া সসাহসে জাগিয়া উঠিল? অথবা যুগধর্ম্মের তাড়নায় বা প্রেরণায় তাঁহারাও চঞ্চল হইয়া উঠিলেন? 'যুগ'-ধর্ম্মের শাসনের গণ্ডীর মধ্যে যাঁহারা অভিভূত, তাঁহারা প্রবীণই হউন আর নবীনই হউন একই ধর্ম্মইত পালন করিবেন—ইহাতে বৈচিত্র্য কি আছে?

কেহ কেহ বলিতে পারেন, "তারুণ্যের বিরুদ্ধে অসংযমের অভিযোগ কেন? অসংযম ত তারুণ্যের পক্ষে স্বাভাবিক।" এ কথার উত্তরে আমি বলিতে চাই—সংযমই বরং তারুণ্যের পৌরুষদ্যোতক ধর্ম্ম।—জরা আপনা হইতে বিধি-বিধানে সংযত হইতে বাধ্য—প্রলোভনও তাহাকে কৃপা করিয়া ত্যাগ করিয়া যায়। যৌবনেরই সংগ্রাম করিবার, জয় করিবার শক্তি আছে, সংযম তাহার নিকটই প্রত্যাশা করিব। যেখানে জীবনের প্রাচুর্য্য, সেখানেই সংযমের ক্রিয়াশীলতা—জড়তায় বা জরায় সংযমের প্রসঙ্গই নাই।

যৌবনকেই জানিয়া রাখিতে হইবে শৃঙ্খলের বাঁধনের মধ্যে শৃঙ্খলা—বিধি-বিধানের গণ্ডীর মধ্যেই স্বাধীনতা ছাড়া কোন আর্টের সৃষ্টি হইতে পারে না। Unchartered freedom অথবা অবাধ অবরিত মুক্তির মধ্যে বুদ্ধির অপচয়ই ঘটে—শক্তির হরিলুট হইয়া যায়—কল্পনা ধূলোট উৎসবে মাতিয়া উঠে। সংযমই সকল শ্রীসৌষ্ঠব ও মাধুর্য্যের বৃন্তস্বরূপ—শিথিলতা তাহাকে জীর্ণ করে। বিশ্ব-প্রকৃতিতেই হউক আর মানব প্রকৃতিতেই হউক—রূপেই হউক আর রসেই হউক,—সফলের মূলে ঐ সংযম। সঙ্গীতাদি অন্যান্য শিল্প-কলার পদ্ধতি বা প্রকৃতির প্রতি লক্ষ্য করিলেই এ সত্য সহজেই ধরা যাইবে। অন্যান্য শিল্প-কলারও যে ধর্ম্ম সাহিত্যেরও সেই ধর্ম্ম। সাহিত্য কোন দিনই ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করে নাই।

সাহিত্যে নৈতিক আদর্শ

সাহিত্য সৌন্দর্য্যানুভূতির সৃষ্টি—একথা যখন আমরা বলি তখন সৌন্দর্য্যের প্রাধান্যের কথাই মনে করি—তাহার মধ্যে জ্ঞান বা নীতির কোন স্থানই নাই একথা কখনও

মনে করি না। শিব ও সত্যকে বাদ দিয়া সুন্দরের অস্তিত্ব বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ পদ্ধতিতেই দেখানো যায়—কোন সৃষ্টিতে বা জীবনে দেখানো যায় না। সাহিত্য জীবনের অভিব্যক্তি এবং রসসৃষ্টি। ইহার মধ্যে বাস্তবজীবনের আদর্শ বা নীতিরও স্থান আছে—অবশ্য সেস্থান গৌণ।

নৈতিক আদর্শকে একেবারে উপেক্ষা করিয়া সৎ সাহিত্যসৃষ্টি সম্ভব নয় একথা এযুগের বহু মনীষীই স্বীকার করিয়াছেন। যাহারা যৌবনে স্বীকার করেন নাই—তাঁহারা শেষ বয়সেও স্বীকার করিয়াছেন। অবশ্য কোন দেশ, সমাজ বা সম্প্রায়-বিশেষের নৈতিক আদর্শই সাহিত্যিকের অবশ্য অবলম্বনীয় নয়। সাধারণ পাঠক আপন আপন সমাজের নৈতিক আদর্শকেই সাহিত্যিকের সাহিত্য-সৃষ্টিতে দাবি করে—না পাইলে অপ্রসন্ন ও বিরক্ত হয়। অপ্রসন্ন ও বিরক্ত চিত্তে রসোপভোগ সম্ভব হয় না। নৈতিক আদর্শের অনৈক্যের জন্য সৎসাহিত্যও সাহিত্যিকের, আপন সমাজে সমাদৃত হয় না। সেজন্য অনেক সাহিত্যিক ভ্রান্ত বলিয়া জানিয়াও, আপন সমাজের নৈতিক আদর্শের সম্পূর্ণ অনুবর্ত্তী হইয়া চলিয়াছেন—আত্মবঞ্চনা করিয়াছেন হয়ত বা রসসৃষ্টিরও হানি করিয়াছেন। অনেকে আবার আপন সমাজের নৈতিক আদর্শকে ভ্রান্ত বলিয়া বুঝিয়া আপনার পরিকল্পিত নৈতিক আদর্শকেই রসসৃষ্টির সহায়ক করিয়া তুলিয়াছেন—পাঠকসাধারণের সহানুভূতি তিনি পান নাই—কিন্তু ভরসা রাখেন দেশের মধ্যে তাঁহার ভাবের ভাবুকও আছেন—ভরসা রাখেন, দেশের নৈতিক আদর্শ পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে—এমনও ভরসা করেন—তাঁহার সাহিত্যের পরিকল্পিত আদর্শই একদিন দেশের লোক গ্রহণ করিবে। পাঠকসাধারণ বলে—"তোমার রচনা দুর্নীতিমূলকও কল্যাণকর। ইহা সাহিত্যই নয়। আমাদের সামাজিক জীবনের সহিত ইহার অন্তরের যোগ নাই।"

সাহিত্যিক বলেন—আমার সাহিত্য নীতিভ্রষ্ট বা দুর্নীতিমূলক নয়—তোমাদের' নৈতিক আদর্শই ভ্রান্ত, তোমরা গতানুগতিক এবং তোমাদের আদর্শ স্বার্থদ্বারা প্রণোদিত। তোমরা মনে মনেও অনেকে জানো তোমাদের সংস্কারগুলি অসত্য, তবু কেবল স্বার্থহানি ও অশান্তির ভয়ে সত্যকে অস্বীকার করিতেছ? যে আদর্শ সত্য আমি তাহাকেই অনুসরণ করিয়াছি আমার রচনায়।"

পাঠক-সাধারণ বলেন—"আমাদের আদর্শ আজিকার আদর্শ নয়। ইহা বহুদিনকার শিক্ষাদীক্ষা সভ্যতা সাধনা ও অভিজ্ঞতার ফল—ইহা বহুবার পরীক্ষিত হইয়া বিপ্লবোত্তীর্ণ হইয়া আছে। আর যদি এ আদর্শ ভ্রান্তই হয়—তোমার আদর্শই যে সত্য তাহা কে বলিল? তোমার আদর্শ যুগযুগান্ত ধরিয়া পরীক্ষিত হইয়া সগৌরবে ত উত্তীর্ণ হয় নাই। তোমার আদর্শ সত্য হোক, মিথ্যা হোক—আমাদের সমাজের পক্ষে প্রতিকূল। অতএব তোমার সাহিত্যও বর্জ্জনীয়।"

সাহিত্যিক বলিবেন—"আমিত কেবল বর্ত্তমান যুগ ও বর্ত্তমান সমাজের জন্যই লিখি নাই—আমার সাহিত্যের জীবনক্ষেত্র ঢের বড়—নিরবধিকাল ও বিপুল পৃথ্বী। তোমরা ইহার মর্য্যাদা না বোঝ—উত্তর কাল বুঝিবে।"

এইরূপ ভাবে সাহিত্যিক ও পাঠক-সাধারণের মধ্যে দ্বন্দ্ব চলিতে থাকে। সাহিত্যের মধ্যে যদি কোন একটা বিশিষ্ট নৈতিক আদর্শ থাকে তাহা হইলেই যথেষ্ট। তবে তাহা বর্ত্তমান সমাজের নৈতিক আদর্শের সঙ্গে না মিলিলেও কোন ক্ষতি নাই।

সাহিত্যিক একজন সহসা আবির্ভূত একটি অদ্ভুত জীব নহেন। যখন তিনি আবির্ভূত হন—তখন তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অনেক সমানধর্ম্মাই আবির্ভূত হয় অর্থাৎ তিনিও একটি সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীরই প্রতিনিধি। অতএব তাঁহার নবকল্পিত নৈতিক আদর্শের সহিত অনেকেরই আদর্শ মিলে। যাহাদের সঙ্গে মিলে তাহারা তাহাদের প্রতিনিধির রচনার আদরই করে। সাহিত্যিকের প্রবর্ত্তিত বা প্রচারিত আদর্শ অনেকের নৈতিক আদর্শকে পরিবর্ত্তিত করিয়া দেয়। আর সাহিত্যিকের সমানধর্ম্মারাও নিশ্চেষ্ট থাকে না—তাহারাও তাহাদের আদর্শ প্রচার করে। সাহিত্যিক নিজেও কেবল রসসাহিত্যে নয়—অন্যভাবেও তাঁহার আদর্শ প্রচার করেন। তাঁহার রচনার রস বত্তার পরিমাণ প্রভূত হইলে পাঠকের আদর্শনিষ্ঠতাকে অতিক্রম করিয়াও হৃদয় জয় করে।

অনেকে আপন নৈতিক আদর্শকে অভ্রান্ত জানিয়াও নবীন আদর্শকে স্বীকার করে—অন্ততঃ সহ্য করে। আবার অনেকে বাস্তব জীবনে স্বকীয় সমাজের আদর্শ অনুসরণ

করে বটে—কিন্তু ভাবজীবনে নবীন আদর্শকে স্বীকার করিয়া লয়। স্বার্থহানি বা অশান্তির ভয়ে যাহারা স্বসমাজের আদর্শ ত্যাগ করে না—তাহারা সাহিত্যের নবাদর্শকে উপভোগ করিতে পারে। ফলে অভিনব নৈতিক আদর্শ অনুসরণ করিয়াও বহু সাহিত্যিকই, দীর্ঘায়ু লাভ করিলে, আপনাদের সাহিত্যের যথেষ্ট সমাদর দেখিয়া যাইতে পারেন।

মোটের উপর কোন সমাজবিশেষের আদর্শের সঙ্গে মিলুক আর নাই মিলুক—কোন একটা নৈতিক আদর্শ সাহিত্যের জীবনসূত্রস্বরূপ সাহিত্যিককে অবলম্বন কবিতেই হইবে। যে সাহিত্যে কোনপ্রকার নৈতিক মেরুদণ্ড নাই—তাহার দৃঢ়তাও নাই। অর্থাৎ সুন্দরের সহিত শিবের মিলন চাই-ই। শিবের যে রূপই হউক তাহাতে কিছুই আসে যায় না। সৌন্দর্য্যেরই প্রাধান্য থাকিবে—কিন্তু একটা কল্যাণময় আদর্শ তাহার সঙ্গে যুক্ত থাকা চাই। নতুবা শুধু Art for art's sake এই অছিলায় কোন সৎসাহিত্য রচিত হয় না।

কথা সাহিত্য

ছোট গল্প কথা সাহিত্যের লিরিক। যিনি মানব-জীবনধারাকে নিবিষ্টচিত্তে অধ্যয়ন করেন নাই—জীবনের অপূর্ব্ব বৈচিত্র্যকে আয়ত্ত করেন নাই—মানব মনকে তন্ন তন্ন করিয়া বিশ্লেষণ করেন নাই—উৎকৃষ্ট ছোট গল্প তিনিও লিখিতে পারেন। কারণ, যে কোন একটা অনুভূতি, যে কোন একটা দৃশ্য বা ঘটনা অবলম্বনেই ছোট গল্প রচিত হইতে পারে। উপন্যাস-রচনায় সাফল্যলাভ করিতে হইলে ব্যাপকভাবে মানবজীবনের অনুশীলনের প্রয়োজন। যাহারা বিচিত্র মানবজীবনকে শুধু ভাসাভাসা চোখে দেখিয়াছে,—তাহারা উপন্যাসে যে সকল চরিত্র অঙ্কন করে—সে সকল চরিত্র সম্পূর্ণাঙ্গ জীবন্ত মানুষ নয়। তাহারা নানা জীবনের নানা অংশ লইয়া এক একটি চরিত্র সৃষ্টি করে। মানবজীবন সম্বন্ধে যাঁহার গভীর অভিজ্ঞতা আছে—জীবনের বৈচিত্র্য যিনি গভীর অভিনিবেশের সহিত লক্ষ্য করিয়াছেন, তিনিই উপন্যাসে রক্তমাংসের জীবন্ত চরিত্রের সৃষ্টি করিতে পারেন। জীবন্ত মানুষের তুলনায় সে চরিত্র কম প্রাণবান্ নয়। তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রগুলির মধ্যে বৈচিত্র্যও থাকে যথেষ্ট। একাধিক চরিত্র একই ভাবের বা একটি ঢঙের হইয়া পড়ে না—অর্থাৎ একটি মানুষই বিভিন্ন ছদ্মে বিভিন্ন নামে দেখা দেয় না। জীবন্ত মানুষ বিশুদ্ধ মানবই হয়, দানবও হয় না—দেবতাও হয় না। দোষগুণের ছায়ালোক-সম্পাতেই তাহার সৃষ্টি। তাঁহার উপন্যাসের চরিত্রও সেজন্য দেব-দানব না হইয়া খাঁটি মানুষই হয়।

যাঁহারা বিশিষ্ট কোন কোন নরনারীর জীবনকে চিত্রিত না করিয়া General Typeকে চরিত্র-স্বরূপ গ্রহণ করেন—অর্থাৎ এমন চরিত্র অঙ্কন করেন—যে চরিত্র সমগ্র একটি শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি-স্বরূপ, তাঁহাদেরও ব্যাপকভাবে বিচিত্র মানবজীবনকে পর্য্যবেক্ষণ করিতে হয়। কারণ, বহুকে না জানিলে তাহার প্রতিনিধিকে জানা হয় না।

প্রথমোক্ত শ্রেণীর ঔপন্যাসিক ব্যক্তির সহিত ব্যক্তির জীবনের, দ্বিতীয়শ্রেণীর ঔপন্যাসিক শ্রেণীর সহিত শ্রেণীর সংঘাত-সংঘর্ষ সংশ্লেষ-বিশ্লেষ দেখান। উপন্যাস অগ্রসর হয় ঘটনা-পরম্পরায় ও চরিত্রগুলির মুখের স্বভাবসঙ্গত বক্তব্যের অভিব্যক্তিতে।

আর একশ্রেণীর ঔপন্যাসিক আছেন—তাঁহারা মানবজীবনের বৈচিত্র্যের দিকে আদৌ অবহিত হন না, মানবজীবনের রূপ-বৈচিত্র্যকে ফুটাইয়া তোলাও তাঁহাদের উদ্দেশ্য নয়। তাঁহারা আপনার মনকেই অতি গভীরভাবে বিকলন ও বিশ্লেষণ করেন এবং আপন মনেরই নানাভাব ও অনুভূতির মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ সংশ্লেষ-বিশ্লেষকে লক্ষ্য করেন। ঐ ভাব ও অনুভূতিগুলিকেই রূপায়িত করেন এক একটি চরিত্রে—মূর্ত্তিদান করেন এক একটি কল্পিত জীবনে। রক্তমাংসের জীবন্ত মানুষের সঙ্গে সেই চরিত্রগুলির অবিকল মিল হয় না। উপন্যাস ঘটনাপরম্পরায় দ্বারা অগ্রসর হয় না—অগ্রসর হয় ভাবের সহিত ভাবের সংঘর্ষে চিন্তাসূত্র ধরিয়া, পাত্রপাত্রীর কথোপকথনে—কখনও বক্তৃতায়, কখনও উচ্ছ্বাসে—কখনও যুক্তিধারায়—কখনও তত্ত্ব-সমস্যার বিবৃতিতে। এইগুলি সবই কবির নিজস্ব

—কেবল ভিন্ন ভিন্ন পাত্রপাত্রীর চরিত্র ও প্রকৃতির অনুগত করিয়া তাহাদেরই মুখে বসানো মাত্র। প্রথম শ্রেণীর ঔপন্যাসিক এবং কতকটা দ্বিতীয় শ্রেণীর ঔপন্যাসিকদের সৃষ্ট চরিত্রগুলির নিজস্ব জীবনধারা প্রকৃতির নিয়মানুসরণ করিয়া যে পথে চলে—ঔপন্যাসিকের লেখনীকে সেই পথেই চলিতে হয়। জীবনপথের ঐ যাত্রীগুলির কোথাও থামিবার কথা নহে—চিরকাল ধরিয়াই চলিবার কথা। ঔপন্যাসিক একস্থলে Thus far and no further বলিয়া থামাইয়া দিতে বাধ্য হন। তাই গ্রন্থে তাহাদের যাত্রা থামিয়া যায় বটে, কিন্তু পাঠকের মনের পথ ধরিয়া তাহারা সমান তালেই চলিতে থাকে।

তৃতীয় শ্রেণীর ঔপন্যাসিকের চরিত্রগুলি অগ্রসর হয়—স্রষ্টার চিন্তা-সূত্র ধরিয়া, তাহার ভাব-পরম্পরার ক্রমাভিব্যক্তি অনুসরণ করিয়া। ইহার একটা স্বাভাবিক অবসান আছে—একটা সমস্যা বা দ্বিধার সমাধান বা অবসাদের মধ্যে আসিয়া তাহার পরিসমাপ্তি হয়। এই শ্রেণীর উপন্যাসে অনেক সময় মনে হয়—ভাবুক সাহিত্যিক তাঁহার বিদ্যা, চিন্তা, অভিজ্ঞতা, সমস্যা, তত্ত্ব ও মনোবিকলনের ফলকে অন্যভাবে প্রকাশ না করিয়া উপন্যাসের ভঙ্গীতে সরস করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন মাত্র। সেজন্য রসজ্ঞ সুধীগণ এই শ্রেণীর উপন্যাসকে উচ্চশ্রেণীর কথাসাহিত্যের আখ্যা দেন না।

ঔপন্যাসিকতার বিভিন্ন প্রকৃতি বুঝিবার ও বুঝাইবার জন্য এইরূপ ভাগ করিয়া দেখা হইল মাত্র। প্রকৃত পক্ষে একই উপন্যাসের মধ্যে কোন চরিত্র বিশিষ্টব্যক্তিদ্যোতক, কোন চরিত্র শ্রেণী বা সম্প্রদায়ব্যঞ্জক, আবার কোন চরিত্র পরিকল্পিতমূর্ত্তি ভাব বা অনুভূতিমাত্র হইতে পারে। অনেক উৎকৃষ্ট উপন্যাসই সঙ্কর বা মিশ্র প্রকৃতির। শক্তিমান শিল্পী সকল শ্রেণীর চরিত্র লইয়াই একটি সুশৃঙ্খল ও সুসমঞ্জস সৌষম্য সৃষ্টি করিতে পারেন। সকল উপন্যাসেই মনোবিশ্লেষণের অল্পাধিক প্রয়োজন যে আছে—সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কেবলমাত্র মনোবিকলনের ফলই উৎকৃষ্ট উপন্যাস হইতে পারে না। মানব-জীবনের বৈচিত্র্য সম্বন্ধে নিবিড় অভিজ্ঞতা ছাড়া কোন উপন্যাসই সাফল্য বা সার্থকতা লাভ করিতে পারে না। মানবের জীবনধারাকে সমগ্রভাবে পর্য্যবেক্ষণ না করিয়া কেবল ভাসা-ভাসা দৃষ্টিতে দেখার ফলে অথবা কতকগুলি খণ্ড সত্য বা খণ্ড দৃশ্য একত্র আহরণের ফলে জোড়া তালি দিয়া যে চরিত্র-সৃষ্টি—তাহার দ্বারা কোন উপন্যাসই জমিতে পারে না। ছোট গল্পকে তরলায়িত করিয়া অথবা প্রচণ্ড চেষ্টায় টানিয়া বাড়াইয়া অথবা একাধিক গল্প বা চিত্রকে কোন প্রকারে গ্রন্থিবদ্ধ করিয়া উপন্যাস হয় না।

একটা স্বাভাবিক ক্রম (Sequence) না থাকিলে কথাসাহিত্য উপন্যাসে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে না—সে ক্রম জীবন্ত চরিত্রের জীবনধারার ঘটনা পরম্পরার ক্রমই হউক—আর লেখকের মনের ভাবপুঞ্জের সংশ্লেষ-বিশ্লেষের প্রগতির ক্রমই হউক।

এই কথাগুলি মনে না রাখিয়া মানবজীবনের গভীর অভিজ্ঞতা না লইয়া অনেক কথাসাহিত্যিক বাহিরের তাগিদে উপন্যাস লিখিতে বসেন বলিয়া তাঁহাদের রচনা উপন্যাসের মর্য্যাদা লাভ করিতে পারে না। তাই শুনি—অমুক ছোট গল্পগুলি বেশ লেখেন,—কিন্তু একখানা উপন্যাসও জমাইতে পারেন নাই।

তালিকা ও মালিকা

চাণক্য মাণিক্য গণ্য বাণিজ্য লাবণ্য পণ্য
বেণু বীণা কঙ্কণ কফোণি
ফণাদ কঙ্কণ মণি স্থাণু পুণ্য বেণী ফণী
অণু বাণ আপণ বিপণি
কণিকা-লাবণ্য বাণী গণিকা নিপুণ পাণি
গৌণ কোণ ভাণ শণ শাণ
চিক্কণ নিক্কণ তূণ মৎকুণ বণিকগুণ
শোণিত গণনা শোণ কাণ।

ইহাকে নিশ্চয়ই কেহ কবিতা বলিবেন না—কিন্তু যে কোন প্রাচীন খণ্ডকাব্য খুলিলেই দেখা যায় এই শ্রেণীর তালিকাকে কাব্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লওয়া হইয়াছে। প্রাচীন কবিগণ কেন যে নিঃশেষে বস্তু ও ব্যক্তির তালিকা দিয়া তাঁহাদের কাব্যের অঙ্গে অর্ব্বুদের সৃষ্টি করিতেন—তাহা বলা কঠিন। হেতু

ছাড়া কোন কর্ম্মই হয় না। বস্তুজগতের জ্ঞানের পরিচয় দিয়া তাঁহারা বোধ হয় আনন্দই পাইতেন। অবশ্য এই প্রথা ইহারা সংস্কৃত কাব্য হইতেই পাইয়া-থাকিবেন। কিন্তু সংস্কৃতে শ্লেষযমকাদির তালিকা আছে—নায়িকার প্রত্যেক অঙ্গ ধরিয়া রূপবর্ণনার জন্য অলঙ্কারের তালিকা আছে, মালোপমার তালিকা আছে—যেমন, রামায়ণের সীতার মুখে 'যদন্তরং সিংহশৃগালয়োর্বনে ইত্যাদি।' কিন্তু নিছক নামের তালিকা কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। অর্থাৎ সংস্কৃত কবির তালিকাগুলি প্রায়ই সব **মালিকা**।

প্রাচীন বাংলা কাব্যে আমরা কোথাও ব্যঞ্জন বা ভোজ্য দ্রব্যের, কোথাও ফল, ফুল, পশুপক্ষীর কোথাও অমাত্য, সহচর, সহচরীদের নামের তালিকা দেখিতে পাই। কোথাও দেখি, কবি স্থানের তালিকা দিয়া ভৌগোলিক জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন। কোথাও ব্যানিজ্য দ্রব্যের তালিকা দিয়া ব্যবসায়-বিস্তার, কোথাও ফলফসলের তালিকা দিয়া কৃষিবিস্তার—কোথাও পূজোপচারের তালিকা দিয়া পৌরোহিত্য-বিস্তার জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন। আবার নানা পশুর মাংসের তালিকা দিয়া ব্যাধ-কষায়ের বৃত্তির সংবাদ দিয়াছেন। এগুলি কাব্যের কোন সহায়তা করে নাই।—এগুলি কাজে লাগিতেছে যাঁহারা প্রাচীন বাংলা সাহিত্য লইয়া Thesis লিখিতেছেন কেবল তাঁহাদের।

এখানে একটি তালিকার উৎকলন করিয়া দেখাই। পাঠকের মনোযোগকে ক্লান্ত করা উদ্দেশ্য নয়, তালিকার দীর্ঘতা দেখিয়া পাঠক একটা ধারণা করিয়া লউন।

চারিভিতে তরুলতা পশু-পাখীগণ।
সমাকুল শতদলে খঞ্জনী খঞ্জন॥
চকোর চকোরী নাচে চাহিয়া চপলা।
চিত্তচোর উপরে উড়িছে মেঘমালা॥
রাজহংস সহিতে নাচিছে শারী শুক।
চক্রবাক বকীবক বিহরে উলুক॥
কাক কঙ্ক কোকিল করিছে কলরব।
সবে শব্দ না শুনি সাক্ষাৎ চিত্র সব॥
ঘোরনাদে ঘুঘু যেন ঘন ঘন তানে।
গদ্‌গদ্ গরুড় গোবিন্দ গুণগানে॥
হাঁটি যায় গরুড় গমন গুড়িগুড়ি।
গায় গোদা ভারুই গগন মার্গে উড়ি॥
টেটারি টৌটক টিয়া চটকা চটকী।
ধানসাধি ধানফুলি ধাতক ধাতকী॥
ডাহুক ডাহুকী নাচে ডিমে দিয়ে তা।
তপস্বী বাদুড় ঝোলে উচু করি পা॥
মীনমুখে মাছরাঙা মানায় মহত।
প্রিয়ামুখে পিয়ে মধু পিক পারাবত॥
বাবুই বসন্ত বউ রাঙা রায়মণি।
হরিগুণ গানেতে ময়না মহামুনি॥
চঞ্চল চেতন চিত্র চায় চর্ম্মচিল।
কূর্ম্মকোলে কাঁককঙ্ক করে কিল্‌কিল॥
জলপিপি ফিঙ্গা ফামি চাঁস বাঁশপাতা।
প্রবল কুবল পক্ষ চক্ষু যার রতা॥
তাতারা তিতির তোতা তাতেলে বিহগ।
রামসরি শালিকী শালিকী চিত্রখগ॥
ইত্যাদি ইত্যাদি (ধর্ম্মমঙ্গল)

তালিকা দেওয়াই যখন তাঁহাদের প্রথার মধ্যেই দাঁড়াইয়া-ছিল—তখন কেহ কেহ তালিকাকে মালিকায় পরিণত করিবার চেষ্টাও যে তাঁহারা করেন নাই—তাহা নহে। উদাহরণস্বরূপ—(১) নায়িকার রূপ বর্ণনায় প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সহিত কবিপ্রসিদ্ধি অনুযায়ী নানা দ্রব্যের উপমার তালিকা অনেকক্ষেত্রে মালিকার মাধুর্য্য লাভ করিয়াছে।

(২) কোন কোন বৈষ্ণব কবির পদে অনুপ্রাসের তালিকা দেখা যায়। গোবিন্দদাস এই প্রকার অনু-প্রাসের মালিকা গাঁথিয়াছেন। জগদানন্দ আবার একাক্ষরের অনুপ্রাসে একএকটি সমগ্র পদ লিখিয়াছেন—সেগুলিকেও মালিকার মধ্যে গণ্য করা যাইতে পারে।

(৩) নানাবিধ কাব্যালঙ্কারের দৃষ্টান্তের তালিকা যে মালিকার গৌরব লাভ করিবে সে বিষয়ে সন্দেহ কি? ভারতচন্দ্রকৃত মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভা ও সভাসের বর্ণনার নাম করা যাইতে পারে।

(৪) সুনাগর-দর্শনে নারীগণের পতিনিন্দা একটা কবিপ্রসিদ্ধির মধ্যে গণ্য হইত,—সংস্কৃত হইতেই পাওয়া। ইহাও তালিকা ছাড়া কিছুই নয়। তবে কবি সেকালের রুচিসম্মত রসিকতা কিছু কিছু উহাতে যোগ দিয়া তালিকাকে কতকটা মালিকায় পরিণত করিয়াছেন।

(৫) 'অঙ্গদ রায়বার'-জাতীয় রচনাও তালিকা— কিন্তু উহাতে একটু কৌতুকরস থাকায় মালিকায় পরিণত হইয়াছে। কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গের চেষ্টা সম্বন্ধেও এই কথা।

(৬) রাজসূয় সভাবর্ণনা ও স্বর্ণলঙ্কার বর্ণনায় তালিকা দেওয়া হইয়াছে—কিন্তু তাহার সার্থকতা আছে। অশ্বমেধের অশ্বের দেশ পর্য্যটন সম্বন্ধে ঐ কথা।

(৭) কতকগুলি গুণপরিচায়ক নামবাচক বিশেষ্য বিশেষণের তালিকা দিয়া স্তব-রচনার পদ্ধতি ছিল। এই গুলিকেও মালিকার মধ্যে গণ্য করা যায়। প্রথমতঃ— এইগুলিতে ব্যবহৃত পরিচায়ক শব্দগুলির কিছু-কিছু সার্থকতা আছে, দ্বিতীয়তঃ—ভক্তিরস এই স্তবের প্রেরণা। পাঠকালে পাঠকের মনে ভক্তিরস সঞ্চারিত হয়। তৃতীয়তঃ— শব্দ-প্রয়োগের স্বাধীনতা থাকায় এইগুলির ছন্দোবন্ধে একটু বৈচিত্র্য সৃষ্টি সম্ভব হইয়াছিল—যেমন—

জয়—শিবেশ শঙ্কর বৃষধ্বজেশ্বর
মৃগাঙ্ক-শেখর দিগম্বর।
জয়—শ্মশান-নাটক বিষাণ-বাদক
হুতাশ-ভালক মহেশ্বর ॥
জয়—পুরারিনাশন বৃষেশবাহন
ভুজঙ্গভূষণ জটাধর।
জয়—ত্রিলোককারক, ত্রিলোকপালক,
থলান্ধকারক হতস্মর।
(ভারত চন্দ্র)

(৮) আর একপ্রকার তালিকা প্রাচীন বাংলার প্রায় সকল কাব্যেই দেখা যায়—তাহার নাম বারমাস্যা। বিরহী বা বিরহিণীর জীবনে মাসে মাসে প্রকৃতির প্রভাবে যে পরিবর্ত্তন হয়—তাহারই বর্ণনা। এই তালিকাটি কেবল মালিকা নয়—অনেক সময় কাব্যের কাছাকাছি হইয়া পড়িয়াছে।

(৯) শুক-সারীর দ্বন্দ্বচ্ছলে তাহাদের মুখ দিয়া রাধা শ্যামের গুণবর্ণনার যে তালিকা—তাহা যে চমৎকার মালিকায় পরিণত হইত সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

এইরূপ তালিকা দেওয়ার প্রথা কাব্য সাহিত্য হইতে একেবারে তিরোহিত হয় নাই। দাশুরায়ের পাঁচালিকে মোটামুটি তালিকা-সাহিত্য বলিলে দোষ হয় না। দাশুরায় তালিকাকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মালিকায় পরিণত করিণত করিয়াছেন—অবশ্য তখনকার গ্রাম্য রুচির বিচারে।

দাশুরায়কে বাদ দিলে ঈশ্বরগুপ্ত হইতেই নবযুগ ধরা যাইতে পারে। গুপ্তকবি কেবল শ্লেষ যমক অনুপ্রাসেরই তালিকা দেননাই—বস্তু-তালিকার দিকেও তাঁহার ঝোঁক ছিল অত্যন্ত বেশী। তাঁহার ঋতুবর্ণনামূলক কবিতাগুলি গাছপালা ফলফসলের সপরিচয় তালিকা ছাড়া আর কিছুই নয়।

রঙ্গলাল তালিকায় কাব্যের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি হয় মনে করিতেন—

মরকত পদ্মরাগ বিদ্রুম বৈদূর্য্য
রত্নরাজ হীরা যথা গ্রহপতি সূর্য্য,
মণিময় মুক্তাময় প্রকারে প্রকার
গোস্তন নক্ষত্র মালা, আদি নানাহার,
অঙ্গুরীয় কর্ণিকার কেয়ূর কটক,
কিঙ্কিণী কঙ্কণ কাঞ্চী মঞ্জীর হংসক
চূড়ামণি, চন্দ্রসূর্য্য, কিরীট তরল
ললাটিকা সীমন্তিকা রত্ন ঝলমল।
বসিয়াছে সাজাইয়া তন্তুবায়গণ
কৌষেয় রাঙ্কব ক্ষৌম কার্পাসবসন,
দুকুল নিবীত চেলি চেলামি কাঁচুলি
জড়িত জরির কাজে জলিছে বিজুলি ॥
ইত্যাদি (কাঞ্চীকাবেরী)

দীনবন্ধুর সুরধুনী কাব্য প্রসিদ্ধ স্থান ও ব্যক্তিগণের পরিচয়ের তালিকা। সুরধুনী কাব্য ছন্দে লেখা উত্তর ভারতের বিশেষতঃ বাঙ্গালা দেশের ভূগোল—অতএব ইহাতে সর্ব্বাঙ্গীন তালিকা থাকিবারই কথা।

ক্রমশঃ

বাংলা কাউন্সিল ও শাসন সংস্কার :—

সম্প্রতি খবর আসিয়াছে যে শাসন-সংস্কার প্রবর্ত্তিত হইতে এখনও যথেষ্ট বিলম্ব আছে। এই বৎসরের মার্চ্চ মাসের মধ্যে উহার একটা খসড়া প্রস্তুত হইলেও, পার্লামেণ্টে উক্ত খসড়া পেশ করাইয়া পাশ করাইয়া লইতে গেলে অন্ততঃ পক্ষে আট বা দশ মাস লাগিতে পারে। সুতরাং ১৯৩৪ সালের পূর্ব্বে কোনপ্রকারে শাসন-সংস্কার আইন বিধিবিদ্ধ হইতে পারেনা। তা যদি না হয় তাহা হইলে নব বিধানে ইলেকসন করিতে গেলে ১৯৩৪ সালের মার্চ্চ বা এপ্রিল মাসেই করিতে হইবে। এখন কথা হইতেছে যে এইরূপ করিতে গেলে বর্ত্তমান আইন পরিষদ গুলির পরমায়ু বৃদ্ধি করিয়া দিতে হয়। অনেক প্রদেশেরই আইন পরিষদ গুলির পরমায়ু কাল প্রায় ফুরাইয়া আসিল। সাধারণ নিয়মে বড়লাট বাহাদুর ইচ্ছা করিলে আইন পরিষদগুলির পরমায়ু কাল এক বৎসর পর্য্যন্ত বাড়াইয়া দিতে পারেন। নব প্রবর্ত্তিত শাসন সংস্কার যদি ১৯৩৪ সালের পূর্ব্বে কোন মতেই প্রচলিত করিতে পারা না যায় তাহা হইলে খুব সম্ভব বড়লাট বাহাদুর আইন পরিষদ গুলির পরমায়ু কাল বাড়াইয়া দিবেন। এই ব্যবস্থানুযায়ী বিধান করিতে গেলে বাংলার আইন-পরিষদ সম্বন্ধে একটু গোলযোগ উপস্থিত হয়। গত বৎসর জুনমাসে বাংলার আইন পরিষদের পরমায়ু ফুরাইয়া গিয়াছিল। সরকার বাহাদুর অতিরিক্ত ক্ষমতা ব্যবহারে উহার পরমায়ু কাল এক বৎসর বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন। এইরূপ অতিরিক্ত ক্ষমতার পরিচালনা সরকার বাহাদুর কোন ব্যবস্থা পরিষদের পক্ষে একবার মাত্রই করিতে পারেন। কাজেই বাংলার আইন পরিষদের পরমায়ু ফুরাইয়া গেলে, উহার পরমায়ুকাল বৃদ্ধি করিতে গেলে সাধারণ আইনের দ্বারা তাহা আর সম্ভবপর হইবে না। এই জন্যই অনেকে অনুমান করিতেছেন যে ভারত-সরকারকে এই পরমায়ু বৃদ্ধি করাইয়া লইবার জন্য বৃটিশ পার্লামেণ্টের সাহায্যপ্রার্থী হইতে হইবে। বৃটিশ পার্লামেণ্ট ভারতের হর্ত্তাকর্ত্তা তাহার সিদ্ধান্তের উপর কাহারই কোন কথা খাটেনা। সরকারী কর্ম্মচারী ও ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্যগণ অনেকেই এইজন্য একটু ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। এইরূপ ব্যস্ত হইয়া পড়া তাঁহাদের পক্ষে স্বাভাবিক। সরকার বাহাদুর ও এইরূপ ব্যবস্থা করিলে ভালই হয়। ভবিষ্যৎকে যত ভাল করিয়াই বুঝিবার চেষ্টা করা হউক না কেন উহা অনিশ্চিতই থাকে। শাসন-সংস্কার সুফল প্রসব করিবে কি কুফল প্রসব করিবে উহা একরূপ এখন অনিশ্চিত। বর্ত্তমানে কিন্তু আমারা বেশ দেখিতে পাইতেছি যে শাসন পরিষদ গুলি নির্ব্বিবাদে তাহাদের কাজ করিয়া চলিয়াছে। অ-সহযোগের যুগে শাসন পরিষদ গুলিকে লইয়া সরকার পক্ষকে অনেকটা ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিতে হইয়াছিল। সে ভাব এখন নাই, সুতরাং বর্ত্তমান ব্যবস্থা অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য নাই হউক, কিছুদিনের জন্য বজায় রাখিলে ক্ষতি কি ?

সংস্কারে ভারতশাসনের রূপ—

তৃতীয় গোলটেবল বৈঠকে ভবিষ্যৎ শাসন-সংস্কার সম্বন্ধে যাহা স্থিরীকৃত হইয়াছে তাহার একটি ছোট ইস্তাহার সম্প্রতি বাহির হইয়াছে। এই ইস্তাহারে জানিতে পারি যে প্রাদেশিক শাসন-পরিষদগুলি মন্ত্রী-

গণেরই কবলিত হইবে। তাঁহারা প্রায় স্বাধীনভাবেই তাঁহাদের শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতে পারিবেন। তবে গভর্ণরের কতকটা দায়িত্ব থাকিবেই কেননা তিনি বিলাতী পার্লামেণ্টের লোক বলিয়া বিবেচিত হইবেন। অর্থাৎ দ্বিধা-শাসন উঠাইয়া দিলেও দ্বিধা-ভাব ঘুচিবে না। মন্ত্রীগণ ব্যবস্থা-পরিষদের সভ্য হওয়ায় এবং সাধারণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হওয়ায় তাঁহাদিগকে ব্যবস্থা-পরিষদের অধীন থাকিতে হইবে। গভর্ণর বা প্রাদেশিক শাসন কর্ত্তাগণ সম্রাট কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইয়া বিলাতী পার্লামেণ্টের অধীন থাকিবেন। এইরূপ হইবার কারণ প্রদর্শন করা হইয়াছে। ভারতকে স্বায়ত্তশাসন প্রদান করা হইলেও ভারতকে স্বাধীন করিয়া দেওয়া হইতেছে না, সুতরাং অন্যান্য স্বায়ত্ত শাসিত উপনিবেশগুলির মত ভারতকেও ইংরাজ সম্রাটের অধীন থাকিতে হইবে। এইজন্য অনেকগুলি বিষয়ে বিলাতী পার্লামেণ্ট ভারতের শেষ বিচারক থাকিবেন। বিষয়টী সামান্য হইলেও উহার গুরুত্ব অনেক। কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া এবং দক্ষিণ আফ্রিকা, ও নিউজিল্যাণ্ড ইংরেজগণের স্বায়ত্তশাসিত উপনিবেশ। উক্ত দেশগুলির শাসন প্রণালী বিভিন্ন হইলেও ১৯২৭ সালের উপনিবেশ সমূহের সম্মিলনে যে সমস্ত প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল, তাহার দ্বারা ইহাই স্থিরীকৃত হইয়াছে যে উহারা আর পার্লামেণ্টের অধীন বলিয়া বিবেচিত হইবে না, তবে উহারা সকলেই বৃটিশ সম্রাটকে তাহাদের সার্ব্বভৌম অধিপতি বলিয়া স্বীকার করিবে। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এখন বিলাতী পার্লামেণ্ট আর তাহাদের মধ্যে ঐক্যবন্ধন নহে, স্বয়ং মহামান্য সম্রাটই একমাত্র বন্ধন। আমাদের বক্তব্য এই যে আমরাও বৃটিশ সরকার হইতে মুক্ত হইতে চাহিনা। হয়ত দুই একজন সম্পূর্ণ মুক্তি কামনা করেন, কিন্তু যাহারা পুর্ণ মুক্তি চাহে না তাহাদেরই সংখ্যাধিক্য আছে। আমরা চাহিনা যে ভারত এই দুর্য্যোগের সময় সহায়হীন হইয়া দাঁড়াক। কিন্তু পার্লামেণ্টের সহিত গাঁট-ছড়া বাঁধিয়া রাখিয়া দিলে ভারতকে তাহার পুর্ণ বিকাশের সুবিধা দেওয়া হইবে কি না সেইটাই বিবেচ্য। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে কোম্পানীর হস্ত হইতে মহারাণী ভিক্টোরিয়া শাসনভার যখন স্বয়ং গ্রহণ করেন, তখন এই কথাই বলা হইয়াছিল যে কোম্পানী ভারত-শাসন ব্যাপারে তাহাদের ব্যবসা জনিত আয়-ব্যয়ই লক্ষ্য করিত, রাজ্য-শাসন সু বা কু হইবে তাহা বড় লক্ষ্য করিত না। সেই যুগে যদি এই কথা যুক্তি-সঙ্গত হয় তবে বর্ত্তমান যুগে সেই যুক্তি চলিবে না কেন? পার্লামেণ্ট কথার অর্থ বৃটিশ জাতির মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আধিপত্য। ভারতকে পার্লামেণ্টের অধীন করিতে গেলে ভারতকে মধ্যবিত্ত শ্রেণীরই কি অধীন করিয়া দেওয়া হয় না? এই জন্যই কি "ফেডারল্ ইণ্ডিয়া" তৈয়ারী হইলেও ভারতীয় সামন্তগণকে কতকগুলি সন্ধির দোহাই দিয়া উহাদিগকে মহামান্য সম্রাটের অধীন রাখার প্রস্তাব হইয়াছে। মহারাণীর ঘোষণাপত্রে সামন্ত রাজগণকে অনেক পৃথক ব্যবস্থার কথা বলা হয় সত্য এবং ভিন্ন ভিন্ন সময়ে তাঁহাদের সহিত ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর যে সমস্ত সন্ধি হয় তাহাতেও তাহাদিগের অনেক প্রকার দাবী-দাওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে সত্য, কিন্তু—তাহারা সব সময়েই ভারতের রাজ-প্রতিনিধির অধীন থাকিবেন, ইহাই স্থিরীকৃত হইয়াছিল। ভারতীয় রাজপ্রতিনিধি মহামান্য সম্রাটের পক্ষ হইয়া ভারত শাসন করিবেন, এই ব্যবস্থা যদি মানিয়া লওয়া যায় তাহা হইলে "ফেডারল-ইণ্ডিয়ার" ভিতর সমস্ত রাজন্যগণ ত আসিয়া পড়েনই এবং ভারতকেও বিলাতি পার্লামেণ্টের হস্ত হইতে মুক্ত করিতে পারা যায়। আমাদের এইরূপ বলিবার যথেষ্ট কারণ আছে। উদাহরণ স্বরূপ বলিতে পারা যায় যে, ম্যানচেষ্টারের ব্যবসায়ীগণ তাহাদের বয়ন শিল্পকে পুনঃর্জ্জীবিত করিবার জন্য যদি পার্লামেণ্টকে অনুরোধ করেন যে ভারতে যাহাতে তাহাদের পণ্য বিক্রীত হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা হউক পার্লামেণ্ট তাঁহাদের অনুরোধ রক্ষা করিতে বাধ্য, কেননা অধিকাংশ সভ্য ইংলণ্ডের মধ্যবিত্ত শ্রেণী কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইয়া আসেন। এই শ্রেণীর সুখ দুঃখ পরিদর্শন করা যে তাঁহাদের পক্ষে স্বাভাবিক হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি আছে। পার্লামেণ্ট Commercial discrimination এর মধ্যে ইহাদের অনুরোধকে ঢুকাইয়া লইবার জন্য বড়লাট মহোদয়কে বলিলে বড়লাট মহোদয় তাঁহার জন্য যে সমস্ত নূতন ক্ষমতা সংরক্ষিত হইতেছে, তাহারই সাহায্যে কোনরূপ একটা অনুকূল

ব্যবস্থা করিবার চেষ্টা করিবেন। তখন ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের সহিত খুব স্বাভাবিক ভাবেই মনান্তর ঘটিতে পারে। একটা উদাহরণ দিলাম। এইরূপ মনান্তর ঘটিবার অনেক কারণই তখন ঘটিতে পারে। তবে একথা সত্য যে আমরাও যদি কোনরূপ স্বার্থত্যাগ স্বীকার না করি তবে ইংরাজ জাতিই বা কেন তাঁহাদের সমূহ স্বার্থত্যাগ করিবেন। স্বার্থত্যাগ ও পরস্পরের আদান প্রদানেরই উপর বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। এই জন্যই আমরা বহুবারই বলিয়াছি যে ভারতকে স্বার্থত্যাগ করিতেই হইবে এবং এই ত্যাগের মাত্রাটা ইংরাজ জাতির ত্যাগের অনুপাতে সমান হওয়া চাই। তবে ইংরাজ জাতিকে স্পষ্টই স্বীকার করিতে হইবে আমরা তাঁহাদের সহযোগী, অধীনস্থ প্রজামাত্র নহি। অধীনস্থ প্রজার সহিত সহযোগিত্ব করা যায় না। তাঁহারা যদি আমাদিগকে অধীনস্থ প্রজা করিয়া রাখিতে চাহেন, তাহা হইলে তাঁহাদের আমাদের সহিত সহযোগিত্বের কথা তুলিতে যাওয়াই অন্যায়। এবং সেরূপ সহযোগিত্বে মনের নিভৃত কক্ষে দাসত্বের বেড়ী পরাইয়া রাখিবার বাসনা লুকাইয়া রাখা হয়। ইংরাজ রাজনীতি জগতের আদর্শ বস্তু। অনেক ঝঞ্জার মধ্য দিয়া সাম্রাজ্য নীতি প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিতেছে। একা ডারহাম বা সিসিল রোডস্ বৃটিশ সাম্রাজ্য স্থাপন করিতে পারেন নাই। একা ডিজরেলী বা কিপলিংই কিছু সাম্রাজ্য-তন্ত্র রচনা করিতে পারেন নাই। সাম্রাজ্যবাদ ইংরাজ জাতির অস্থি-মজ্জাগত, উহাদের হৃদয়ের শোণিত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই কথা যদি সত্য হয় তাহা হইলে দেখা যায় য বহুদিনের অভিজ্ঞতার ফলে ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ রাজ-নৈতিকগণ স্পষ্টই বুঝিতে পারেন যে উপনিবেশগুলিকে বশীভূত রাখিতে গেলে তাহাদিগকে ভ্রাতৃত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিতে হইবে। ঠিক এই জন্যই ত পার্লামেন্টের শাসন তাহাদিগের উপর হইতে তুলিয়া লওয়া হয়। বড় বড় সাম্রাজ্যবাদীগণ ত আরও একটু অগ্রসর হইয়া উপনিবেশগুলিকে পার্লামেন্টে আসন দিতে পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। তাহারই ফলে বাৎসরিক অধিবেশন বসিয়া আসিতেছে। ইহাই যদি অভিজ্ঞতার আধুনিকতম সিদ্ধান্ত তবে ভারতকে নূতন শাসন সংস্কার প্রদান করিতে গিয়া ইংরাজ-জাতি সেই কথা বিস্মৃত হইতেছেন কেন?

সংস্কারে স্পষ্ট ভাবের আদান-প্রদান:—

নূতন শাসন-সংস্কারে কতকগুলি রক্ষা-কবচ সৃজন করিবার ব্যবস্থা হইতেছে। প্রাদেশিক শাসন কর্ত্তারা সংখ্যায় ন্যূন জাতিদের স্বার্থ রক্ষার জন্য বা কেন্দ্রীয় সরকারের স্বার্থ রক্ষার জন্য আপনাদের দায়িত্বে কার্য্য করিতে পারিবেন। বড়লাট বাহাদুর সৈন্য-বিভাগ, সরকারী কর্ম্মচারী বিভাগ, দেশীয় রাজন্য বিভাগ, পররাষ্ট্র-নীতি বিভাগ ইত্যাদির জন্য ব্যবস্থা পরিষদের মুখাপেক্ষী হইবেন না, কেননা এইগুলির জন্য সাক্ষাৎ ভাবে বিলাতী সরকারের বা পার্লামেণ্টের অধীন থাকিবেন। ইহা অবশ্যই দ্বৈত-শাসন। এই জন্যই অনেক প্রকার কথা বলিবার প্রয়োজন হইয়াছে। কিন্তু এইরূপ করিবার কারণ কি ইহাই নয় যে ভারতকে এখনও বৃটিশ পার্লামেণ্টের অধীন রাখা হইবে যেহেতু ভারত এখনও ইংরাজ-জাতির মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কর্ম্মক্ষেত্র। ইহাই যদি সত্য হয়, তাহা হইলে উহা স্পষ্ট বলাই ত ভাল। আমাদিগকে কতগুলি ইংরাজ কর্ম্মচারীকে বহন করিতে হইবে, কোন কোন পণ্যদ্রব্য ব্যবহার করিতে হইবে তাহার একটা তালিকা করিয়া দেওয়া হউক না কেন, আমরা যদি উহা করিতে ইচ্ছুক বলিয়া সন্ধি পত্রে স্বাক্ষর প্রদান করিতে রাজী হই, তবে কোন উপযুক্ত রক্ষা-কবচ তৈয়ারী করিয়া তাহাকেই আমাদের প্রতিশ্রুতির একমাত্র যন্ত্র করিয়া, আমাদিগকে পূর্ণ সহযোগিতা প্রদান করিলে ক্ষতি কি? আমরা আরও একবার বলিয়াছিলাম, শাসকগণকে ভারতবর্ষ বরাবরই পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ভরণ-পোষণ দিয়া আসিয়াছে। হিন্দু শাসনকালে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণের তাবৎ ভার আমরা স্কন্ধে বহন করিয়া আসিয়াছি, মুসলমান যুগে বাদসাহ ও ওমরাহগণকে মাথায় করিয়া রাখিয়াছি। বর্ত্তমান কালেই বা সম্মান দিব না কেন? স্পষ্টই বলা ভাল, কেননা অস্পষ্ট আভাসে অনেক মনোমালিন্যের সৃজন হইয়াছে। যদি পরিষ্কার ভাবেই শাসন-সংস্কার প্রবর্ত্তিত করিতে হয়

তবে স্পষ্ট ভাবেই কথা কহিবার সময় কি আসে নাই? আমাদের এইরূপ বলিবার কারণও আছে! বিলাতি মর্ণিংপোষ্ট প্রভৃতি কতকগুলি সংবাদ পত্র স্পষ্টই বলিয়াছেন যে কংগ্রেসকে বাদ দিয়া কোনরূপ শাসন-সংস্কার প্রবর্ত্তিত করা যাইতে পারে না। গলদ এই স্থানেই। শাসন-সংস্কার ভারতবাসী মানিয়া লউক সকলেই চাহেন। ভারত সরকারও চাহেন যে শাসন-সংস্কার কার্য্যকরী হউক। এই জন্যই তাঁহারা রাজ-বন্দীগণকে মুক্তিপ্রদান করিতে চাহিতেছেন না। ভারতের রাজ-বন্দীগণ নূতন গোলযোগ সৃজন করিয়া শাসন-সংস্কার অচল করিয়া দিতে পারে এই ধারণা তাঁহাদের পূর্ব্বকার অভিজ্ঞতার ফল। কিন্তু এই সমস্ত আশঙ্কা বৃথা হইয়া যায়, যদি ভারতের জনসাধারণকে ইংলণ্ডের জনসাধারণের সহিত এক সমতলক্ষেত্রে দাঁড় করান যাইতে পারে। চালাকীর দ্বারা ক্ষণিক কার্য্যসিদ্ধি হইলেও, আন্তরিকতাই প্রকৃত মৈত্রী স্থাপনের একমাত্র পন্থা, একথা বৃটিশ জাতি বিস্মৃত হইতেছেন কেন? কংগ্রেসকে ভয় করিবার কোন কারণই থাকে না, যদি ভারতের জনমত তাঁহাদের জনমতের অনুকূলে হয়।

সনাতনী ও অসনাতনী :—

এবার ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে সনাতনী ও অসনাতনীদের দ্বন্দ্ব হইয়া গিয়াছে। অসনাতনীগণ চাহেন যে অস্পৃশ্যতা দূরীভূত হউক, তাঁহাদেরই মধ্যে যাঁরা আর একটু অগ্রসর হইয়াছেন তাঁহারা চাহিয়াছেন বিবাহে 'ডিভোর্স' প্রথা প্রচলিত হউক। এইখানে বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে অসনাতনীদের মধ্যেই ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী আছে। সনাতনীগণের মধ্যে তেমন বিশেষ শ্রেণী বিভাগ নাই। তাঁহারা পুরাতনকে ভাল বাসেন কেননা পুরাতনেরই উপর তাঁহাদের প্রতিষ্ঠা। কোন জমিদারই অসনাতনী হইতে পারেন না, কেননা পূর্ব্বপুরুষ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত জমিদারীই তাঁহার একমাত্র সম্বল। সেইরূপ সমস্ত ধনিকই সনাতনী, কেননা ধন বা ঐশ্বর্য্য একপুরুষের অর্জ্জিত নহে। উহা অর্জ্জিত হইয়া বংশ পরম্পরায় ভোগদখল করা হয়। অসনাতনীগণ কিন্তু সনাতনীদের মতন পুরাতনের ভক্ত না হইলেও যেখানেই তাঁহারা আপনাদের স্বার্থ হানির আশঙ্কা অনুভব করেন সেইখানেই সরিয়া দাঁড়ান। তাঁহারা পরিবর্ত্তন চাহেন, বর্ত্তমানকে সাহায্য করিবার জন্য বা উহাকে ফুটাইয়া তুলিবার জন্য, নূতনকে বরণ করিয়া লইবার মতন বুকের জোর তাঁহাদের নাই। মন্দির প্রবেশের অধিকার লইয়া অনেক বিজ্ঞ আইনজ্ঞ বলিয়াছেন বটে সময় পরিবর্ত্তনশীল, সমাজকেও এইজন্য পরিবর্ত্তিত হইতে হইবে। কোন দাতা উইল করিয়া কোন একটি প্রতিষ্ঠানে কিছু অর্থ দান করিয়া যাইবার সময় সময়োপযোগী কতকগুলি সর্ত্ত করিয়া যান, কিন্তু সর্ত্ত চিরকালই অবিকৃত থাকিবে তাহা তাঁহারা কখনই চাহেন না। নীচজাতির আচার ব্যবহার লক্ষ্য করিয়াই হয়ত প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ কোন কোন ক্ষেত্রে এবং কোথাও কোথাও কোন কোন নীচ জাতিকে মন্দির প্রবেশ করিতে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন কিন্তু মানবতাকে অপমান করা তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল না। যাঁহারা এই মহাসত্যটীকে উপলব্ধি করিয়া জোর গলায় উহা প্রকাশ করিতেছেন, তাঁহাদিগকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে তাঁহারা বর্ত্তমানে যে পিতৃসম্পত্তি ভোগ করিতেছেন উহা তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ কর্ত্তৃক অর্জ্জিত হইলেও বর্ত্তমানে যখন ভীষণ অর্থকৃচ্ছ্রতা দেখা দিয়াছে তখন কি তাঁহাদের উচিত নয় যে তাঁহারা তাঁহাদের উক্ত সম্পত্তির কিয়দংশ সাধারণের দুঃখ উপশম করিবার জন্য ব্যয় করা? এ কথাও কি ঠিক নয় যে সেই সমস্ত মহাপ্রাণ পুরুষগণ জীবিত থাকিলে তাঁহাদের আর্জ্জিত বিত্তের অনেক অংশই এইরূপে ব্যয় করিতেন? এই কথার উত্তরে আইনবিৎ পণ্ডিতগণ Private property অস্পৃশ্য ও সমস্ত আইনের বাইরে বলিয়া বাসবেন। অসনাতনীদের ইহাই মৌলিকতা। তাঁহাদের নিজেদের যাহা নাই, তাহা পরকে দিবার জন্য তাঁহারা সর্ব্বদাই উদার হৃদয় প্রদর্শন করিয়া থাকেন, কিন্তু আপনাদের স্বার্থে আঘাত লাগিলেই শামুকের ন্যায় তাঁহাদের উদারতা গুটাইয়া যায়। এই জন্যই বোধ হয় আমাদের প্রবাদ বাক্য পরোপদেশে প্রাজ্ঞ কথাটী প্রচলন হয়। সনাতনীগণ একথা ঠিক বলিতেছেন তাঁহারা একটী সুখ-

সুবিধা সনাতনীদের পূর্ব্ব-পুরুষ কর্ত্তৃক অর্জ্জিত সম্পত্তির ন্যায় ভোগ দখল করিয়া আসিতেছে। দাক্ষিণাত্যে যে সমস্ত মঠ আছে, সেগুলিত এক একটী বিরাট জমিদারী বলিয়াই শুনিতে পাই। সাধারণ আইনে পিতার বিত্তে পুত্রের অধিকার জন্মায়। মঠের মেহান্তগণ বিবাহ করিতে পারেন না। এইজন্য পুত্রের অভাবে তাঁহাদের সম্পত্তি শিষ্যের করতলগত হয়। আমরা যদি আমাদের পৈতৃক বিত্ত ত্যাগ করিতে না পারি মঠাধিকারীগণই বা কেন তাহাদের মঠের তাবৎ সম্পত্তি ও অধিকার ত্যাগ করিবেন। কথা হইতে পারে যে এখানে ত সম্পত্তির কথা হইতেছে না, এখানে একটু অধিকার প্রদানের কথা হইতেছে। মন্দির সাধারণ সম্পত্তি নহে উহা মঠাধিকারী-গণের নিজস্ব সম্পত্তি সুতরাং মন্দিরে প্রবেশাধিকার সে কাহাকে দিবে এবং কাহাকে দিবে না, সাধারণ আইন অনুযায়ী কি তাহাই একমাত্র বিবেচনাধীন হওয়া উচিত নয়? একশ্রেণীর অসনাতনী যাঁহারা মন্দিরেঅ স্পৃশ্যগণকে প্রবেশাধিকার দিতে ব্যগ্র হইয়াছেন, তাঁহারা একথা বুঝিতে পারিতেছেন না কেন যে সনাতনীগণ ভাবিতেছেন যে এইরূপ একবার কোন স্বার্থত্যাগ করিলে শেষে কথা উঠিতে পারে যে মন্দির সাধারণের সম্পত্তি, দেবতা সাধা-রণের সুতরাং মন্দির সাধারণ কর্ত্তৃক চালিত হইবে এবং দেবতাও সাধারণ কর্ত্তৃক পূজিত হইবেন। এই আশঙ্কা শুধু কল্পনা-মূলক নহে, উহা সত্য। অনেক স্থলেই ত অসনাতনীগণ এইরূপ যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন। যে থানে স্বার্থের ঘাত প্রতিঘাত আছে সেখানে কোনরূপ Logic খাটে কি? আমাদের মনে হয় এইজন্যই সনাতনী-গণের আন্দোলন ফলপ্রদ হইতেছে না। সত্যকে দেখিবার অভিলাষ থাকিলে সমগ্র সত্যকেই দেখিবার চেষ্টা করিতে হয়, উহার খানিকটা অংশ ঢাকিয়া রাখিয়া উহাকে আংশিকভাবে দেখিবার চেষ্টা করিলে সত্যের অবমাননা করা হয়।

বিবাহ-বিচ্ছেদ-আইন ও সমাজ :—

ডাক্তার গৌরএর বিবাহ-বিচ্ছেদ আইন সম্বন্ধেও সেই কথা বলা চলে। ডাক্তার গৌর প্রভৃতি বিলাত ফেরতা দল বাহিরের আবহাওয়ায় শিক্ষিত হইয়া আসিয়া নিজের দেশে সেই আবহাওয়া সৃজন করিতে চাহিতেছেন। ওঝা প্রভৃতি যাঁহারা ভারতেই শিক্ষিত ও দীক্ষিত তাঁহারা এই প্রস্তাবেই চমকাইয়া উঠিয়াছেন। সত্য কোনটা? সতীত্ব যদি আমাদের আদর্শ হয় এবং সমস্ত হিন্দুসমাজের সার নীতিই যদি নারীর সতীত্ব ধর্ম্মরক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে, তবে বিধবা-বিবাহ আইন বিধিবদ্ধ হইয়াও যেমন একেবারেই অকেজো ভাবে পড়িয়া আছে, এই নূতন আইনও তাহাই থাকিবে। ক্ষণিক উত্তেজনার মধ্যে কোন কোন দম্পতি হয় ত বিবাহ-বন্ধন বিচ্ছেদ করাইয়া লইতে পারেন, কিন্তু তাহার পরই যখন দেখিবেন তাঁহাদের এই ব্যবস্থা সমাজ প্রীতির চক্ষে দর্শন করিতেছে না তখন ভবিষ্যতে কোন দম্পতি কি ঐরূপ করিতে আর অগ্রসর হইবেন? বিধবা-বিবাহ আইন বিধিবদ্ধ হইলেও উহা সমাজে চলিল না। প্রত্যেক সমাজ-সংস্কার সভায় আমরা জোরগলায় উহার উপকারিতা ঘোষণা করিলেও উহা কার্য্যকরী হইল না। তাহার কারণ আমাদের পর্দ্দা-প্রথা। নর-নারী যদি পরস্পর পরস্পরের সহিত অবাধ ভাবে মেলা-মেশা করিতে না পারে তাহা হইলে বিধবাগণ বিবাহিতা হইবেন কেমন করিয়া? বর্ত্তমান সমাজে বিধবাকে বিবাহ করিলে কতকগুলি অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। কাজেই স্বেচ্ছায় কেহ বিধবাকে বিবাহ করিতে রাজী হইতে পারে না। কিন্তু অবাধ মিলনের ফলে কেহ কেহ বিধবাকে ভাল বাসিলে তাহাকে সে বিবাহ করিবেই, শত বন্ধনও তাহার নিকট তুচ্ছ বলিয়া মনে হইবে। সেইরূপ বিবাহ-বিচ্ছেদ আইন পাশ হইলে উহা আইন পুস্তকের মধ্যেই থাকিয়া যাইবে, কেননা কোন পুরুষই বিবাহচ্যুতা কোন নারীর স্পর্শে আসিয়া আকর্ষিত না হইলে শুধুমাত্র একটা আদর্শের জন্য বিবাহ করিবে না। পাশ্চাত্যে যাহা স্বতঃ সিদ্ধ বলিয়া মনে হয় তাহা তথাকার আবহাওয়ার দরুণ। এই জন্যই আমরা বলিতেছিলাম যে আইন করিয়া সমাজ-সংস্কার করিতে যাওয়া বাতুলতা মাত্র। সর্দ্দা-আইন কি অনেকটা পঙ্গু হইয়া নাই। কালের চক্রে আবর্ত্তিত হইয়া সমাজ

যখন যেরূপ ধারণ করিবে তাহার আদর্শও তখন সেইরূপই ধারণ করিতে বাধ্য, সুতরাং এখানে দলাদলি করিয়া নূতন মনান্তর সৃজন করিবার প্রয়োজন কি? আগামী যুগে নারীগণ শিক্ষিতা হইয়া পর্দ্দার বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেই বিধবা বিবাহ চলিবে ও বিবাহ-বিচ্ছেদও হইতে থাকিবে, আইন তখনই প্রয়োজন হইবে। অস্পৃশ্যতা সম্বন্ধেও ঐ একই কথা বলা যাইতে পারে। অস্পৃশ্য জাতি যখনই বুঝিতে পারিবে স্থান বিশেষে ভগবান আবদ্ধ নাই, স্থান বিশেষ সাধারণের সম্পত্তি হইতে পারে, কিন্তু ভগবান সর্ব্বত্রই আছেন, তখন নূতন মঠ, নূতন মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে। মঠাধিকারীগণ লাভ লোকসান খতাইয়া আপনা হইতেই তখন মন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিবেন, তাহার জন্য দলাদলি বা নূতন বন্ধন সৃজন করিতে হইবে না।

ডিপ্রেসড্ ক্লাস ও নূতন দলাদলি :—

কথা প্রসঙ্গে আমরা এখানে আমাদের বাংলার কথা বলিতেছি। সত্য কথা বলিতে গেলে বাংলায় অস্পৃশ্যতা কোথায়? কোন জলাশয়ে বা কোন মন্দিরে জাতি বিশেষের প্রবেশ নিষিদ্ধ বাংলা প্রদেশে নাই। অথচ কতকগুলি ধাপ্পাবাজ রাজ-নৈতিক মাদ্রাজের অনু করণে এখানে এক Depressed Class সমস্যা সৃজন করিয়া বসিয়াছেন। সম্প্রতি বাংলা সরকারও এই আন্দোলনের ফলে Depressed Class এর একটী লিষ্ট সাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশিত করিয়াছেন। যেখানে হিন্দু-মুসলমান সমস্যার কোন মীমাংসাই হইল না, সেখানে মনগড়া Depressed Class রচনা করিয়া রাজনৈতিক ঐক্য সম্পাদনের পথে আর একটী অন্তরায় সৃজন করা হইল মাত্র। বাংলায় বাস্তবিকই কি কিছু Depressed Class আছে? যদি বাংলায় Depressed Classএর কল্পনাই করিতে হয় তাহা হইলে বলিতে হয় এখানে সকলেই Depressed Class বা এখানে Depressed Class কেহই নাই। ব্রাহ্মণ বর্ণ শ্রেষ্ঠ। বাংলায় কায়স্থগণের সামাজিক প্রতিষ্ঠা ব্রাহ্মণগণের পরই। কিন্তু ব্রাহ্মণদের মধ্যে যাঁহারা শূদ্রের দান গ্রহণ করেন, যাঁহারা নবশাক ব্যতীত অন্যান্য জাতির যজমানগিরি করেন তাঁহারা কি অনেকটা পতিত জাতি নহেন? কায়স্থদের মধ্যে কয় ঘর কুলীন ও মৌলিক ছাড়িয়া দিলে, অপরঘর কায়স্থগুলি পূর্ব্বোক্তগুলির তুলনায় Depressed নহেন? সুতরাং এখানে অস্পৃশ্যতাও যেমন নাই, সেইরূপ Depressed Class আছে বলিলে সত্যের অপলাপ করা হয়। অথচ মহাত্মা গান্ধি হইতে আরম্ভ করিয়া অনেক অর্ব্বাচীন রাজ-নৈতিক পর্য্যন্ত এই Depressed Class কথাটী লইয়া বিশেষ মাথা ঘামাইতেছেন। দোষ ত আমাদের এই খানেই, নূতন দলাদলি সৃজনে। গত সহস্র বৎসর ধরিয়া আমাদের অধীনস্থ—মানবজাতিকে আমরা অজ্ঞ ও মূর্খ করিয়া রাখিয়াছি, পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার যদি প্রয়োজন অনুভব করিয়া থাক ত এই বিরাট অজ্ঞতা দূর করিয়া দাও। বিরাট মানব জাতিকে শিক্ষিত করিয়া তোল। তাহা হইলেই এখন যাহার জন্য তোমরা ব্যস্ত হইয়াছ, সময়ের পাকা ফলের মত তাহা তোমাদের হস্তগত হইবে এবং উক্ত প্রথাগুলি সময়ের ফলের ন্যায় সু-স্বাদুও হইবে। নতুবা কটু ও কষায়ই থাকিয়া যাইবে। নূতন আইন তৈয়ারী করিতে গিয়া দলাদলি, মন কষাকষি কি ভীষণ অপ্রিয় ও অশান্তিকর নহে?

ডি-ভ্যালেরা ও হার হিটলার :—

হার হিট্‌লার ও ডি-ভ্যালেরা দুই জনেই কৃতী পুরুষ। উভয়েই সময়োপযোগী মন্ত্র দিয়া তাঁহাদের স্বদেশকে চৈতন্য দান করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। ডি-ভ্যালেরা দেখিয়াছেন আয়র্লাণ্ড রাজ্ঞী এলিজাবেথের সময় হইতে ইংলণ্ডের অধীনে থাকিয়া বিশেষ লাভবান হইতে পারে নাই। এই সময়েই অলষ্টারের সৃজন হয়। এই অলষ্টারই এখন তাহার বক্ষের মহাক্ষত। আয়র্লণ্ডের প্রতিনিধিগণকে ইংলণ্ডের পার্লামেণ্ট মহা-সভায় বসিতে দেওয়া হইত। তাহাতে তাহারা দেখিয়াছিল যে কোন একটী বড় দলের লেজুর হইয়া থাকিলে বড় দলের খেয়াল অনুযায়ী সামান্য সুখ-সুবিধা কখনও কখনও পাইয়াছে মাত্র। কংগ্রেস শাসিত আয়র্লাণ্ডে জন-সাধারণের আর্থিক অবস্থা উন্নত হয় নাই। এখন দুই একজনের সুবিধা সংগ্রহ করিবার যুগ চলিয়া গিয়াছে। সুখ-সুবিধা সাধারণকে বণ্টন করিয়া দিতে না পারিলে কোন জাতি

স্থায়ী হইতে পারে না। ডি-ভ্যালেরা সাধারণ আকাঙ্ক্ষাকে মূর্ত্তি দিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন বলিয়াই আজ জনপ্রিয়। বংশগত মর্য্যাদা বা বিপুল অর্থ তাঁহাকে বড় করিয়া তুলে নাই, সাধারণ তাঁহাতে আপনাকে দেখিতে পাইতেছে বলিয়াই আজ তিনি আয়র্লণ্ডের পূজ্য।

হার হিট্‌লার সম্বন্ধে ইহা আরও অধিক ভাবে প্রযোজ্য। আমরা এক সংখ্যায় হার হিট্‌লারের সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রদান করিতে গিয়া স্পষ্টই বলিয়াছিলাম যে, হার হিট্‌লার ভবিষ্যতে চান্সেলার হইবেনই, হয় ত প্রেসিডেণ্ট পর্য্যন্ত হইতে পারেন। আমাদের ভবিষ্যৎ বাণীর এক অংশ সত্য হইয়াছে। আজ হার হিট্‌লার জার্ম্মান চান্সেলার। এইরূপ কেন হয়, তাহার কারণ অন্বেষণ করিলে আমরা দেখিতে পাই হিট্‌লার নিঃস্ব, তাহার কোন বংশ মর্য্যাদাই নাই। গত মহাযুদ্ধে হিট্‌লার সামান্য সৈনিক হইয়াই কাইজারের বিরাট বাহিনীতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। যুদ্ধাবসানে জার্ম্মানির মধ্যবিত্ত শ্রেণী ভীষণ দুরবস্থায় পতিত হয়। পুত্রহীন, বিত্তহীন সাধারণ গৃহস্থ সামান্য অন্ন সংগ্রহের জন্য পাগল হইয়া উঠে। শুনা যায় যে সামান্য একখানি রুটীর জন্য অনেক সম্ভ্রান্ত মহিলাকে বেশ্যাবৃত্তি পর্য্যন্ত করিতে হইয়াছে। হার হিট্‌লার এই নৈরাশ্যকে আপনার মানস-পথে স্থাপন করিয়া তাহার প্রতিমা রচনা করিয়াছেন। তিনি ইহার প্রধান হোতা হিসাবে সাধারণকে আসিয়া অঞ্জলি দিতে বলিতে-ছেন, ইহাই তাঁহার বিশেষত্ব। ইহুদিগণ দেশের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছে বলিবার অর্থ এই যে যাহারা সঞ্চিত অর্থের সুদ লইয়া জীবন ধারণ করে তাহারা সমাজের কলুষিত অংশ, হিট্‌লার তাহাদিগকে সমাজ হইতে দূর করিয়া দিতে চাহেন। কার্য্যের উপর আত্ম-প্রতিষ্ঠা তাঁহার লক্ষ্য। এই জন্যই কর্ম্মপ্রবণ জার্ম্মান তাঁহার মন্ত্র শিষ্য হইয়াছে।

মাঞ্চু-সমস্যা :—

মানচুরিয়া সমস্যার আজ অবধি কোন মীমাংসাই হইল না, অদূর ভবিষ্যতে যে হইবে এরূপ আশা করা যায় না। লীগ বলিতেছেন বটে যে তাঁহারা জাপানকে বাধ্য করিবেন। কিন্তু উহা বোধ হয় মৌখিক, লীগের নির্দ্দেশ জাপানত আরও দুই একবার শুনে নাই। উহাই ত লীগের দুর্ব্বলতা। লীগ আন্তর্জ্জাতিক পরামর্শ সভা হইলেও উহার সিদ্ধান্তকে কার্য্যকরী করিয়া লইবার জন্য যেরূপ অস্ত্রের প্রয়োজন তাহা উহার নাই। তাই মানচুরিয়া সমস্যার মীমাংসার সম্ভাবনা খুবই অল্প। শুনা যাইতেছে চীন ঘুমাইয়া নাই, চীন ভীষণ তোড়-জোড় করিতেছে। চীন যদি তাহা করিতে পারে অর্থাৎ শক্তিমান জাপানের সহিত শক্তিতে বড় না হউক সমান হইতে পারে তখনই মানচুরিয়া সমস্যার সমাধান হইয়া যাইবে।

সরকারী ঋণ—সুসময় ও দুঃসময় :—

সরকারী ঋণ শতকরা ৪ টাকা সুদে সম্পন্ন হইতেছে বলিয়া অনেকেই মনে করিতেছেন অর্থ-সঙ্কটের যুগ গত প্রায়। আমাদের মনে হয় এখনও কাটিয়া যায় নাই তবে শীঘ্রই কাটিতে পারে। ইনসিওরেন্স কোম্পানী-দের অনেক টাকা সরকারী ঋণে খাটান হয়। কিন্তু ব্যবসা-বাণিজ্য জোর চলিলে উহাদের সঞ্চিত অর্থের একটা চাহিদা বাজারে দেখা দিলে উহারা বর্দ্ধিত হারে সুদ পাইবার আশায় উক্ত মূলধন অন্যত্র খাটাইবার চেষ্টা করেন। এখন দেখা যাইতেছে যে উক্ত চাহিদা একেবারেই নাই। ইনসিওরেন্স কোম্পানী গুলি ও ব্যাঙ্ক-গুলিকে টাকা সুদে খাটাইতে হইবেই, কাজেই তাহারা সরকারী ঋণ কিনিতে বাধ্য হইতেছে এই জন্য সুদের হার কমিয়া যাইতেছে। তবে এইরূপ কম হার খুব বেশী দিন থাকিবে বলিয়া মনে হয় না। কেননা ব্যবসা-বাণিজ্যের মন্দারও একটা পরিমাণ আছে। এই মন্দা শেষ সীমানায় পৌছাইলেই আবার উন্নতির দিকে উঠিতে থাকে। আমাদের মনে হয় মন্দার শেষ সীমানা আসিয়াছে। এইবার উন্নতি-যুগ আসিবে। সুতরাং টাকার চাহিদা তখন বাড়িয়া যাইবে এবং সেই সঙ্গে সুদেরও হার বাড়িয়া যাইবে।

সমর-ঋণ :—

গত মাসে ইয়োরোপের কতকগুলি রাজ্য আমেরিকায় ঋণ পরিশোধ করিতে পারে নাই। যাহারা ঋণের প্রাপ্য

অংশ এবং সুদ দিয়াছেন তাঁহারা স্পষ্টই বলিতেছেন যে নূতন ব্যবস্থা না করিলে ভবিষ্যতে আর কোনরূপ অর্থ প্রদান করিবেন না। আমেরিকার নবনিযুক্ত যুক্ত রাষ্ট্রপতি এই জন্য বিশেষজ্ঞদের লইয়া নূতন ব্যবস্থা প্রণয়ন করিবার জন্য মাথা ঘামাইতেছেন। এই ঋণ লইয়া অনেক কথা কাটাকাটি হইয়াছে। দেখা যাউক মিঃ রুজভেল্ট কি করেন?

হিমগিরি অভিযান :-

কাঞ্চনজঙ্ঘাও গৌরীশঙ্করে আরোহণ করিবার জন্য বিদেশ-আগত অভিযানকারীগণ প্রাণপণ করিতেছেন। কিন্তু আজ অবধি কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। আগামী নূতন বর্ষে আবার একবার চেষ্টা করা হইবে এই জন্য তোড় জোড় চলিতেছে। হিমালয়ের উচ্চাংশে কি কি প্রাণী বা উদ্ভিদ চক্ষু গোচর হয় তাহা প্রদর্শন করাইবার জন্য একটি মিউজিয়ম খোলা হইয়াছে। এবার এরোপ্লেন যোগে শৃঙ্গদ্বয়ে আরোহণ করিবার চেষ্টা করা হইবে। এমন এরোপ্লেন পাওয়া যাইবে যাহাতে উচ্চে ৩৩,০০০ হাজার ফিট পর্য্যন্ত উঠিতে পারা যাইবে। উচ্চতাই যে একমাত্র অন্তরায় তাহা নহে। ভ্রমণকারীগণ অনেক সময়েই বলিয়াছেন যে কাঞ্চনজঙ্ঘা বা গৌরীশঙ্করে তাঁহারা আরোহণ করিতে পারিতেন, কিন্তু সফল-কাম হইতে পারেন নাই, তাহার কারণ তুষার-বাত্যা। বিশহাজার ফুট অতিক্রম করিলে এই তুষার ঝড় এত প্রবল হয় যে মানুষের শরীরের রক্তমাংস তাহার নিকট পরাস্ত স্বীকার করে। আমুণ্ডসেন দক্ষিণ মেরু আবিষ্কার করিতে গিয়া এইরূপ অনেক ঝড়ের কথা বলিয়াছেন কিন্তু তিনি সফল-কাম হইতে পারিয়াছেন বলিয়াই আমাদের দক্ষিণ মেরু সম্বন্ধে ধারণা এত পরিষ্কার। আশা করা যায় যে হিমালয় শৃঙ্গে আরোহণ করিয়া সেইরূপে কেহ নূতন তত্ত্ব প্রচার করিবেন।

ফোর্ডের কারখানায় ধর্ম্মঘট :—

শুনা গেল যে আমেরিকার বিখ্যাত ধনী ও কর্ম্মী ফোর্ড সাহেব বিশেষ বিপদগ্রস্ত। এই ফোর্ড সাহেব দুইখানি জগৎ বিখ্যাত পুস্তক রচনা করিয়াছেন, তাহার নাম, To day and to morw এবং My life and work. উভয় গ্রন্থেই তিনি ইউরোপীয় ধনিকগণকে স্বার্থপর বলিয়া গালি দিয়াছেন। তাঁহার মতে ধনীর অর্থ সাধারণের সম্পত্তি না হইলেও সাধারণের উন্নতির জন্য নিয়োজিত হওয়া চাই। কোন কারখানা হইতে যে মুনাফা হয় উহার সমগ্র অংশটাই ধনীর সুখের জন্য ব্যয়িত হইলে ধনিক শ্রমিক সমস্যা উৎকট মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া দেখা দেয়। এইজন্য তিনি তাঁহার মুনাফার একটা অংশ তাঁহার কর্ম্মচারীগণের সুখ সুবিধার জন্য ব্যয় করিতেন। তাঁহার কারখানায় প্রায় একলক্ষ লোক অন্ন সংগ্রহ করিত, এখন শুনা যাইতেছে যে মন্দাবাজারে কারখানার কর্ম্মচারীদের শ্রমিক হার কমাইয়া দিলে, তাহারা ধর্ম্মঘট করে। মিঃ ফোর্ড তাহাতে কারখানাটী বন্ধ করিয়া দিয়া পুলিশের হেপাজাতে কারখানা গৃহটি রখিয়াছেন।

অপরাজিত

শ্রীবিহারীলাল বড়ুয়া

হে বিধাতা, বহু দুঃখ দিয়েছ আমায়,—
তব-সৃষ্টি-লীলাভার করিতে বহন
আনিয়াছি অশ্রুধারে শ্রাবণ বর্ষণ
সহিয়াছি বজ্রাঘাত শত ব্যর্থতায়;
কোটি কোটি জনমের বেদন-মালায়
শোভিয়াছি কণ্ঠ মোর, এসেছে মরণ
বার বার হরিবারে জীবন-রতন
আবরি' চেতনা মোর তমসা-মায়ায়।

কহি আজ তুলি' মোর জ্যোতি দৃপ্ত শির
মিথ্যা সেই বন্ধনের ক্রন্দন উচ্ছ্বাস।
সত্য শুধু অন্তহীন আনন্দ অস্থির
ঝঙ্কৃত কল্লোল-বীণা, মৃত্যুর নিশাস
নন্দন-সুরভি-সম অক্ষয় রুচির,—
অকুণ্ঠিত সৌন্দর্য্যের সুচির প্রকাশ।
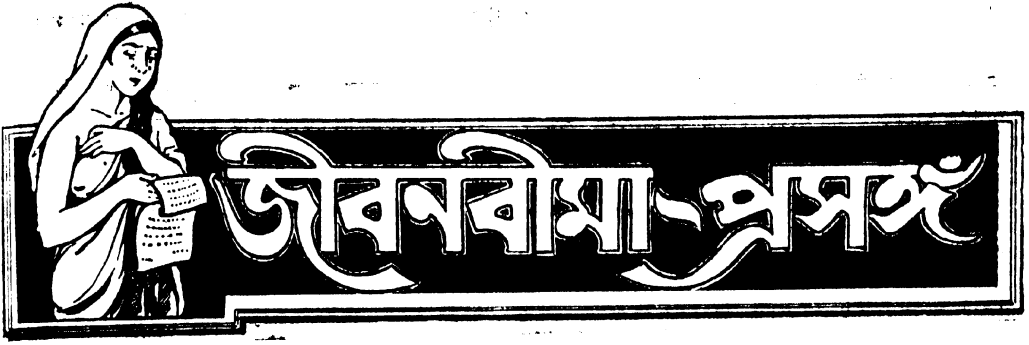
গ্রেট-ইণ্ডিয়া ইন্‌সিওরেন্স লিঃ

[পুষ্পপাত্র বীমা-সম্পাদক কর্ত্তৃক]

গ্রেট-ইণ্ডিয়া ইন্‌সিওরেন্স ১৯৩১ সালের রিপোর্ট, উদ্বৃত্ত পত্র ও হিসাব আমরা সমালোচনার জন্য প্রাপ্ত হইয়াছি। ১৯৩১ সালের হিসাব ১৯৩৩ সালের জানুয়ারী মাসে সাধারণ্যে প্রকাশ করায় উহার প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধিত হয় না। আমরা আশা করি কোম্পানীর পরিচালকবর্গ হিসাব-নিকাশ প্রকাশ সম্বন্ধে একটু তৎপর হইবেন।

আলোচ্য বর্ষে কোম্পানী ১৭,১৮,২৫৫৲ টাকার পলিসি প্রদান করিয়াছেন—ইহা প্রথম বর্ষ অপেক্ষা প্রায় ৭০০০, ০০৲ টাকা অধিক। দ্বিতীয় বর্ষেই এ পরিমাণ নূতন কার্য্য সংগ্রহ করায় কোম্পানীর পরিচালকবর্গ যথার্থ গৌরব অনুভব করিতে পারেন। কোম্পানীর মৃত্যুর হারও বিশেষ সন্তোষজনক।

আমরা কিন্তু কোম্পানীর উদ্বৃত্ত পত্র দেখিয়া বিশেষ হতাশ হইয়াছি।

বীমা তহবিল	১২,৫৩৫,৮৭৲
মূলধন	১,১৬০০০৲
ম্যানেজিং এজেন্টগণ কর্ত্তৃক দেওয়া	২০৪৪২৲
অন্যান্য দেনা	২৭,০১২/১০
	১,৭২,১৮৮৸৶১

এই ১৭২১৮৭৸৶১ পাই এর হিসাব কোম্পানী কি ভাবে দিতেছেন তাহা দেখিলেই সাধারণে আমাদের হতাশ হইবার কারণ বুঝিতে পারিবেন।

১। কোম্পানীর কাগজ	২০,২০০।৫
২। পলিসি বন্ধকে দাদন	৮৫০৲
৩। আসবাব	৮৫৫১৯/০
৪। পুস্তক	১৯৩/১০
৫। পাওনা প্রিমিয়াম	৪১৩৩৶০
৬। সুদ পাওনা	৯১।৶৫
৭। প্রাথমিক ব্যয়	৮৪৭২৫
৮। সেয়ার বিক্রয়ের কমিশন	৫৪৮৫৲
৯। অর্গানাইজেশন খরচ	৫১৫২৬৲
১০। সাস্‌পেন্স	১১২৫৫৸৫
১১। পাওনা	২৪১৫।৵৫
১২। এজেন্ট	২০৫৫৪॥৵৫
১৩। ছাপা কাগজ ইত্যাদিতে	২৫০৯৸৶০
১৪। ব্রাঞ্চ ও আফিস ইত্যাদি স্থাপন খরচ	৩৫১১৪।/৫
নগদ ও ব্যাঙ্ক	৮৩৬।৫
	১,৭২,১৮৮৸৶১

উপরোক্ত হিসাবের ৭ দফা হইতে ১৪ দফা পর্য্যন্ত যে অঙ্ক রহিয়াছে তাহার প্রায় সমস্তই খরচের অঙ্ক অথচ তাহাকে স্থিতি asset কোম্পানীর মূলধন ও দেনার বিরুদ্ধে দেখান হইয়াছে। এসমস্ত অঙ্ক প্রায় ১২৫০০০৲ টাকাকে কোনরূপেই স্থিতি বা asset বলিয়া ধরা যায় না। কোম্পানীর প্রথম বৎসরে কতক টাকা মূলধন খরচ করিয়া কার্য্যের প্রসারের চেষ্টা করা যাইতে পারে

কিন্তু দ্বিতীয় বৎসর হইতে অর্থাৎ renewal premium পড়িতে থাকিলেই ব্যয় সংযত করিয়া সেই সমস্ত অঙ্ককে ক্রমে কমাইয়া আনিতে হয়। আমরা বিশেষ দুঃখের সহিত বলিতে বাধ্য হইতেছি যে Great India'র পরিচালকবর্গ এই সাধারণ নিয়মটিও পালন করা আবশ্যক বোধ করেন নাই। এই সমস্ত অঙ্ক প্রথম বৎসরের উদ্বৃত্ত পত্রে যাহা ছিল দ্বিতীয় বর্ষে তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক হইয়া গিয়াছে।

এই ১২৫০০০৲ টাকা বাদ দিয়া ধরিলে কোম্পানীর বীমা তহবিল ১২৫০০৲ টাকা না হইয়া শূন্য (০) অপেক্ষাও ১১২৫০০৲ টাকা কমে দাঁড়ায়। অর্থাৎ কোম্পানী এ পর্য্যন্ত যে ১০৪০০০৲ টাকা প্রিমিয়াম আদায় করিয়াছেন তাহার উপরও ১১২৫০০৲ টাকা খরচ করিয়াছেন।

কোম্পানীর পরিচালকবর্গের জানা উচিত যে প্রথম বর্ষের প্রিমিয়ামের সমস্ত ও দ্বিতীয় বর্ষের প্রিমিয়ামের শতকরা ১০৲ হইতে ১৫৲ টাকার উপর ব্যয় করিয়া কোন কোম্পানীই ভবিষ্যতে টিকিয়া থাকিবার আশা করিতে পারে না। মূলধন ব্যয় করিয়া কোন কোম্পানীই বীমার ব্যবসায় চালাইতে পারে না। পরিচালকবর্গ যেমন বীমাকারিদের স্বার্থও দেখিবেন অংশীদারদের অর্থেরও যাহাতে অপব্যয় না হয় তাহা তাঁহাদের দেখা বিশেষ কর্ত্তব্য।

গ্রেট-ইণ্ডিয়া অতি অল্প দিন কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছে—এখনও সময় আছে। ব্যয়-সংযত করিয়া স্থিরভাবে ব্যবসা চালাইলে সমস্তই সময়ে ঠিক হইয়া যাইতে পারে।

আমরা এই নবীন কোম্পানীর ১৯৩২ সালের হিসাব দেখিয়া সুখী হইতে পারিব আশা করি এবং নূতন কার্য্য সংগ্রহের সফলতার সহিত অন্যান্য বিষয়েও সফলতার আশা করি।

বিচিত্রা

"ইন্‌সিওরেন্স ওয়ারলড" পত্রিকার অন্যতম পরিচালক শ্রীমান অতুলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য আর ইহজগতে নাই—দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া অকালে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। অতুলচন্দ্র অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া তাঁহার পত্রিকার অনেক উন্নতি সাধন করিয়া গিয়াছেন এবং প্রাণখোলা অমায়িক ব্যবহারের জন্য অতি অল্পকালের মধ্যে বীমা-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের নিকট আদৃত হইয়াছিলেন।

০ ০ ০ ০

গত সংখ্যায় প্রকাশিত "শ্রীশনি" লিখিত "বীমা পত্রিকার দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য"—প্রবন্ধটি আমরা বীমা-সংশ্লিষ্ট সমস্ত ব্যক্তিগণকে পাঠ করিতে অনুরোধ করি। "শ্রীশনি" বীমা-জগতে বহুদিন কার্য্য করিয়া প্রভূত অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন—তাঁহার যুক্তিগুলি বর্ণে বর্ণে সত্য। বীমাক্ষেত্রে অপ্রিয় সত্যের প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।

০ ০ ০ ০

"লালবাজারের" কোনও পত্রিকায় বীমা-প্রসঙ্গ শীর্ষক 'গবেষণায়' বাংলাদেশের বীমাজগতের গৌরব ন্যাশানাল বীমা প্রতিষ্ঠানের কৃতি সম্পাদক শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে "হেরিডিটারী" বীমাবিদ্ বলিয়া উপহাস করিয়াছে! সত্যেন্দ্রনাথ বাংলাদেশ হইতে বীমা বিষয়ে প্রথম বৈজ্ঞানিক শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছেন—বীমার Principle ও Practice সম্বন্ধে তাঁহাপেক্ষা অভিজ্ঞ ব্যক্তি বাংলায় খুব বেশী

আছেন বলিয়া মনে করি না···অন্ততঃ আক্রমণকারী তাঁহার পদতলে বসিয়া আজীবন বীমা বিষয়ে শিক্ষা লাভ করিতে পারেন।

° • ° ° °

ভারত ইনসিওরেন্স কোম্পানীর বঙ্গদেশস্থ শাখা বিভাগের সুযোগ্য ম্যানেজার মিঃ টি, এন, গুপ্তকে উক্ত লেখক "স্কুল মাষ্টার" ইত্যাদি সম্বোধনে আপ্যায়িত করিয়া লোকচক্ষে হেয় করিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু তাহার ফলস্বরূপ ভারতের বাংলাদেশে কার্য্যের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি ঘটিতেছে। কর্ম্মজীবনের প্রারম্ভে গৌরবময় স্কুলমাষ্টারের কার্য্যও করিতে হয় আবার কাহাকেও স্কুলমাষ্টার না হইয়া আবার পাওনাদারের দাবী মিটাইতে না পারিয়া ঘরবাড়ী বন্ধক রাখিয়া সদাশয় জজসাহেবের করুণায় আত্মসমর্পণ করিয়া কালাতিপাত করিতে হয়—জীবনের বৈচিত্র্যই ইহাই ?

° • ° •

কিন্তু বাংলাদেশের বুকে বসিয়া বিদেশীর অর্থে পুষ্ট হইয়া বাংলার আদরের ধন, গৌরবস্তম্ভগুলিকে বিদ্রূপ, অপমান এবং হেয় করিবার প্রচেষ্টা ফলবতী হইবে না।

'বিসর্জ্জন'

শ্রীদেবপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল

রূপে অনুপমা সোণার প্রতিমা
ছিল সে ভরিয়া হৃদয়-পুর,
ঘন বনছায়ে এসেছি ফেলিয়া
গৃহ হ'তে তারে অনেক দূর;
সরল উদার হাস্য-তরল
অমিয় মাখান শিশুর মুখ,
আর না জাগাবে অভাগা হৃদয়ে
অমরা-পুরীর গোপন সুখ!
শয্যা তাহার রহিবে বিছান
প্রাসাদে তাহার খাটের পর,
শিশু যে আমার অঘোরে ঘুমায়,
জনহীন মাঠে, ঘাসের পর,—
কে জাগাবে তারে, কে ভাঙাবে ঘুম,
কে দিবে আনিয়া আমার কোলে ?
শয্যা তাহার রহিবে শূন্য
আমারে ভাসাতে নয়ন জলে;
অভিমানী মেয়ে কেন সে আসিবে
দিয়াছি যে আমি বিসর্জ্জন
গৃহ হ'তে যারে করেছি বিদায়,
সে কেন তুষিবে আমার মন ?
এই ত' আমার যোগ্য শাস্তি
এই ত' আমার পাপের ফল,
এমনি করিয়া সারাটা জীবন
ঝরিবে আমার নয়ন জল!
দেবীরে যে জন তনয়ার রূপে
স্বপনেও কভু পাইতে চায়,
শোকের দহনে পুড়ে অন্তর
হাহাকারে তার, গগন ছায়!
এতটা গর্ব্ব বুকেতে যার
চূর্ণ তাহা হ'তেই হবে,
আনন্দ তার অশ্রু হ'য়ে—
অনন্তকাল ঝরতে রবে!

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত

জে, কে, শীল,

সেদিন এক জার্ম্মান ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হল। 'বীর-পদভরে কাঁপায়ে মেদিনীর' কথা আপনারা গল্পে পড়েছেন আর আমি সেদিন চাক্ষুষ দেখলাম। যেমন শরীর তেমনই আবার চলন ও কথা বলার ধরণ। হাজার লোকের মধ্যে মিশে গেলেও এই লোকটীর প্রতি সকলের নজর পড়বেই পড়বে। সমস্ত পৃথিবী ঘুরে ঘুরে ইনি কতকগুলা ঔষধ ও রাসায়নিক দ্রব্য বিক্রয় করে থাকেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম এত ঘোরাঘুরির মধ্যে তাঁর স্বাস্থ্য থাকে কি করে? তিনি হেসে বললেন, 'দেখ স্বাস্থ্য রক্ষা করা কঠিন নয়। ভগবানের রাজ্যে জল বাতাস ও আলোর অভাব আছে কি? আর অন্ন-বস্ত্রের কথা যদি ধর-ত আমি বলি যার শক্তি আছে, যে পরিশ্রমকাতর নয় তার ওদুটোর অভাব কোনদিন হয় না। আমি যখনই যা চাই জোর ক'রে চাই—সবটা না পেলেও তার কত পাইই। কিন্তু চাইবার মত করেই চাইতে হয়। গলার স্বরে যদি শরীরের ৩২০ টা পেশীর রেশ এক সাথে ধ্বনিত না হয় ত চাওয়াই হল না। আপনাদের দেশের ছোট-বড় অনেক ব্যবসায়ীর সঙ্গে আমার আলাপ আছে। তাঁদের পণ্যবিনিময়ের প্রস্তাব ভিক্ষার্থীর প্রার্থনার মত শোনায়—তাঁরা বলেন কুর্ণিশ করার মত করে। আর শক্তির অপচয় বুদ্ধির অপচয় আপনারা যতটা করেন এতটা আমি আর কোন দেশে দেখিনি। শক্তি অর্জ্জনের চেয়ে অপচয় বাঁচানর প্রয়োজনীয়তা যে কত বেশী সে শিক্ষা যেন আমাদের নাই। আমি তো দেখি আপনাদের শরীরের গঠন প্রায় আমাদেরই মতন। অভাব শুধু রক্তমাংসের। আমি জানি আপনি দারিদ্র্যের দোহাই দেবেন কিন্তু আমাদেরই দেশের মুটে মজুর যারা সারাদিন খাটে, মাত্র একবেলার অন্নসংস্থান করে তাদের স্বাস্থ্যও আপনাদের চেয়ে ভাল। আপনাদের স্কুল-কলেজে আজকাল খেলাধূলার ব্যবস্থা হয়েছে। কিন্তু ব্যায়াম অনুশীলনের সঙ্গে সঙ্গে নিয়মিত স্বাস্থ্য-বিধি পালন ও সংযম অভ্যাস না করলে ত ফলই পাওয়া যাবে না। একদিন আপনাদের ফুটবল খেলা দেখতে গিয়েছিলাম। কিন্তু তাদের মধ্যে শতকরা এক জনকেও মাথা উঁচু করে বুক ফুলিয়ে চলতে দেখলাম না। খেলোয়াড়রাও দেখলাম শক্তির অভাব পূরণ করছে গতি ও দক্ষতা দিয়ে। খেলার পরে যুবকদের কথাবার্ত্তায় দেখি Injured innocence ও একটা নিশ্চেষ্টতার ভাব মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে। Referee ন্যায় বিচার করেনি। জলে ও কাদায় মাঠ ছিল খেলবার অনুপযুক্ত। আমি বলি দেশত আপনাদেরই—প্রতিযোগিতামূলক খেলাগুলিতে স্থানীয় দলগুলির মধ্যে সংখ্যায় আপনারাই বেশী। অথচ আপনাদের অভিযোগের প্রতিকার হয় না কেন? এক দিন আপনাদের একটা বড় স্কুল দেখতে গিয়েছিলাম। ছেলেদের স্বাস্থ্যহীনতার কথা শুনলাম কিন্তু প্রতিকার করবার উদ্যোগ নাই। ছেলেদের নাকি তাড়াতাড়ি খেয়ে আসতে হয়। তাদের ব্যায়াম করার পোষাক নাই। স্বাস্থ্যবিধি সম্বন্ধে তারা এবং তাদের অভিভাবকরা একেবারেই অজ্ঞ। আমার ত মনে হয় এ সবগুলিরই সমাধান স্কুলের কর্তৃপক্ষরা ইচ্ছা করলেই করতে পারেন। ছেলেদের হাতে স্বাস্থ্যবিধির পুস্তক দেখলাম। পুস্তকের তালিকায় ঐ সঙ্গে বা উহার পরিবর্ত্তে একটা ছোট ইজেরের ব্যবস্থা থাকলে ছেলেদের স্বাস্থ্যের দিক দিয়ে লাভের সম্ভাবনাই বেশী। ছেলেদের স্বাস্থ্য-পরীক্ষাও ত প্রতি বৎসর হয় শুনেছি—কিন্তু যারা Undesirably Weak তাদের সুস্থ সবল করে তোল্‌বার ভার নেবে কে? চরিত্রগঠনের জন্য যেমন

স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যও তেমনই ছেলেদের চাই একটা আদর্শ। স্কুল কলেজে যেমন একটা Intellectual atmosphere আপনাদের দেশে আছে তেমনি একটা Physical atmosphereএর সৃষ্টি করতে হবে। স্বাস্থ্য-হীনতা, দুর্ব্বলতা ছাত্র ও শিক্ষক উভয়ের পক্ষেই লজ্জার বিষয় করে তুলতে হবে। ছেলেদের বুঝিয়ে দিতে হবে যে "Weakness is a crime"—দুর্ব্বলের পৃথিবীর কোন সম্পদেই অধিকার নাই। আপনাদের জীবনযাত্রা প্রণালীর এই যে আমি প্রতিকূল সমালোচনা করছি এর কারণ আপনাদের কল্পনা শক্তি, আপনাদের ভাবপ্রবণতায়, আমি মুগ্ধ হয়েছি—এই গুণগুলির সঙ্গে শুধু যদি শক্তি ও নিয়মানুবর্ত্তিতার সমন্বয় হ'ত!

এখন আমার কথা বলি। আমি প্রত্যহ অন্ততঃ দশ মিনিটকালও ব্যায়াম অনুশীলন করে থাকি। ক্ষুধা না পেলে আমি কোন দিনই আহার করিনা ও লাভের অথবা আনন্দের সম্ভাবনা থাকলেও স্বাস্থ্য বিরোধী কোন চিন্তা বা কার্য্যের প্রশ্রয় আমি কোন দিনই দিইনা। শুচিতা রাখতে আমি বিশেষ করে মনের ও দেহের আভ্যন্তরিক পরিচ্ছন্নতার কথা বুঝে থাকি। যারা কুচিন্তা করে বা দেহের ভিতর মল জমা হতে দেয় বহু মূল্য পরিচ্ছদ, সাবান, পাউডার প্রভৃতি প্রসাধন বস্তুর দ্বারা বিভূষিত হলেও তারা অস্পৃশ্য। আমার টাকা কড়ি ও ব্যবসায়ের হিসাব-নিকাশের সঙ্গে প্রতিদিন আমি প্রাণশক্তি সঞ্চয় ও অপচয়ের খবর রাখি আর এ দেহটাকে আমার পূজনীয় পিতামাতার স্নেহের দান মনে ক'রে যথাসাধ্য সুস্থ ও পবিত্র রাখতে চেষ্টা করি।"

এই জার্ম্মান অসুরটীর কথাগুলি অপ্রিয় হ'লেও সত্য ও তার মধ্যে আমাদের শিখবার অনেক কিছু আছে মনে ক'রেই লিপিবদ্ধ ক'রে রেখেছিলাম। শুধু যদি তাঁর মত শক্তি, গলার জোর আমার থাকৃত তা'হলে সমস্ত বাংলার ছাত্রদের দেখে আজ বলতাম "উত্তিষ্ঠত। জাগ্রত!"

কোমলতা*

শ্রীদিলীপকুমার রায়

জননি! করুণা তোর দেখেও দেখেনি আঁখি অভিমান
আঁধিয়ার আলিঙ্গনি' নিতি,
কামনা-কুহেলি-লোল লক্ষ দাবী-দাওয়া বরি' ছিল প্রাণ
নিরুৎসার—তাই তোর গীতি
প্ররোহে ঝরিয়া যেত হিয়ার কদম্বশাখে,—বাসনা-আবিল
আঁখি রাখিত ঢাকিয়া,
বিকচ ভকতি প্রেম-নবাঙ্কুর,—কিশলয় উন্মুখি' উঠেনি
তাই,—রহিয়া রহিয়া
নিরুদ্ধ আতপ্ত অশ্রু উদ্বেলিত সিন্ধুসম,—
নির্ম্মুক্ত নক্ষত্রকান্তি পারেনি বিম্বিতে
লক্ষ শান্তিমণিহারা ভ্রান্তিজ্বালা বীচিফণী,—ধূসরিত দম্ভে
তারা কাহার ইঙ্গিতে?
কাহার ইঙ্গিতে বল্ তোর মন্দাকিনী ডাকে পাতিতে
চাহিনি কান জীবন মেলায়!
তর্জ্জনীহেলনে কার স্ফুরৎ-আসঙ্গ রঙ্গ-মরীচিকা
পানে এইপথের চলায়
ধাইতাম নিরন্তর? কত না অপূর্ণ আশা দিকে দিকে
লিপ্সালিহ স্ফুলিঙ্গ জ্বালিয়া
ধাঁধিত বিমুগ্ধ দিঠি কামনা-বাসনা পারে অচঞ্চল
ঊর্দ্ধদিশা নিত্য আবরিয়া!

---

* "অনামী" হইতে।

যখনি করুণা ভরা অন্তর্গূঢ় রেশ তোর প্লাবিতে চেয়েছে
শুষ্ক হৃদয় বেলায়,
কার মিথ্যা নিরুৎসাহ বিবর্ণ শূন্যতা শাপে বুলায়েছে
অবিশ্বাস মোহিনী মায়ায়?
দিন পিছু দিন মোর গেছে কেটে…'নিষ্করুণা' কহেছি মা
তোরে—যাব ও-পদছায়ায়
মিলেনি আশ্রয়নীড়. পঙ্কিল পরুষ রূঢ় বর্ত্তমান তুচ্ছতার
খর দাহনায়
গগনবল্লভ যত মেদুর মঞ্জরী মোর…সুপেলব মিড় যত…
বল্লরীর বাণী
নির্ম্মম অনন্ত তাপে অঙ্গারে হয়েছে হীরা--সার্থকতা
চাহি নাই তাই আত্মদানি';
সন্ধ্যাভ্র-তিয়াসী মোর নিরম্বু আকুতি যত করেছে প্রণতি
কৃষ্ণ রসাতল-পায়,
যে-নির্ম্মাল্য তোর-দেওয়া, তোরে অঞ্জলিতে হবে—সঁপেছি
বাসনাবেদীমূলে বঞ্চনায়!
অন্তরে মা থাকি' থাকি' মঞ্জীর-শিঞ্জিনী তোর ফল্গুতালে
কিঙ্কিত কী অনীন্দ্য অনুপ
স্বপন-সুন্দর গন্ধে অনশ্বর আলিম্পনা—মৃত্তিকা-মন্দিরে রচি
নতি নম্র ধূপ!
কায়ার কঠিন কারা তোর স্পর্শে আচম্বিতে ব্রততী-বিতান
সম হ'ত সুকোমল…
জীবনের কুঞ্জহারা বন্ধুর প্রান্তর হ'ত মোহন মুরলীধারে
পল্ল:-পুষ্পল!…
কেনলতা!...কোমলতা!…গাহিত অন্তরতমা, পৌরুষ
জাগাল তবু রুধিত তাহারে
পাষাণে পরশ তোর ফাটিত নলিনীনৃত্যে—বরিতাম
তবু দিশা হারা বারতারে!
নূপুর-নন্দিতা নদী—নীলাম্বুদয়িতা—নীল গানে যার
অভিসার-উদাত্ত লহরী
ঠমকে ঠমকে ছন্দুরে বিমুগ্ধ বিলাস বোলে—মরুভূ চুম্বিল
সে-ই আপনা পাসরি'!

পঙ্কজ তপনতালে তাল দিয়া নাহি ফুটি' বিসর্জ্জিল বর্ণবাণী
পঙ্কে প্রাণ সঁপি'
মলয়-মূর্চ্ছনা যার তন্ত্রে কাঁপে সে-রবাব দারুদেহ আপনার
রহিল মা জপি'?
বেণুর পবন—যাহে শ্যামলের রাধাডাক চিরকল্লোলিত—
সেও কহে: "আমি শুধু
বাষ্পতনু…বস্তুসার?—আকাশ-কুসুমাঙ্কুর কেন ধরে বুকে
অন্তহীন মরু ধূ ধূ!"
দেবত্ব-স্বরূপ-নিজ চলাচল কেন তুলে! বারিহীন ঊষরতা
বরিয়া কেমনে
বন্ধ্যা অভিমানে ফুল বলে: "মেলিব না দল!"—সূর্য্যমুখী
আধমুখী কার প্ররোচনে!
অন্তরে বাহিরে যার ছন্দিত নীলিমা নীলা-নিরালোক
পরিখা সে রচি' মাগো হায়,
দুর্ব্বিনীতি দুর্গমাঝে রহে কোন্ আত্মাদরে! ইন্দ্রধনু তমসায়
কেমনে মিলায়?
আজি মা কোমলতমে! কোমলতারসে তোর প্রতি তনু-
অণু মম উঠিল উৎসবি'
বাস্তব-মেখলা ধরা উদ্ভাসিল অ-ধরার ছন্দে-শুষ্ক শৈল হল
নির্ঝর বৈভবী!
রেণু হ'তে রেণু সম মনে হয় আপনারে…নিযুত কঙ্কর
হয় ছায়া পরিমল!
তনুগ্লানি অতনুর ব্যাপ্তি লভে লহমায়…ধূলিবুকে ছায়াপথ
মন্দ্রে সমুচ্ছল!
শিশুর জীবন হর্ষে বালুকণে স্বর্ণসৌধ রচি…শুধু নহে তাহা
তাসের প্রাসাদ…
রাজরাজ বিশ্বরূপ-শিখে শিখিবই! লাজে যুযুৎসু ডম্বর
নত...মৌন সিংহনাদ!
বিন্দু পরিমাণ তোর অমিয়া হিল্লোলে মাগো, বিষ মেঘও
ঝরে প্রেম ঝাঙ্কৃত ঝর্ঝরে
কোমলতা!…কোমলতা!…গঙ্কিত মরমকুঞ্জে মঞ্জুল
বাঁশরীবালা গাহে সপ্তস্বরে!

সাহিত্যে অনাধকার

কাদের নওয়াজ

চায়ের মজলিসে সেদিন আলোচনা হচ্ছিল একটা বিষয় নিয়ে। বিষয়টা বিশেষ কিছু নয়, নেহাতই মামুলী। এক সাহিত্যিক বন্ধু বলে উঠলেন সব পয়লা, এ বাংলা সাহিত্য বে-ওয়ারিস মাল হয়ে গেছে আজকাল। অনধিকার চর্চ্চা বলে তাতে আর নেই কিছু, সবাই মিলে সায় দিলুম তাতে। এক তরুণ বন্ধু বললেন— সত্যি কথা নিছক সত্যি কথা সন্দেহ নাই একটুও তাতে।"

এমনি ধারা গল্প চল্‌চে বেশ, দিনটা বড় ছায়া ছায়া মেঘলা দিন। এমনি সময় বলে উঠলেন এক বন্ধু বেশ সাগ্রহে "আর দেখেচ বন্ধু ডাঃ মোহাম্মদ সহিদুল্লা সাহেবের "গজল কবিতা" (মাসিক মোহাম্মদী পৌষ ১৩৩৯) একেবারে পণ্ডিত থেকে গজলকবি যথা—তার লেখার চোটে বিজলী ছোটে হার মেনে যায় হাফেজ কবি। বিশেষ কিছু বুঝা গেল না প্রথমে। পরে দেখলুম একটী কবিতা অবশ্য গজল কবিতার অনুবাদ। কবিবর হাফেজের সাথে শহিদুল্লা সাহেবের দেখা হলে ভারি খুসী হতেন শহিদুল্লা সাহেব ত বটেই কিন্তু হায় পরাণ যায় সে দিন আসার নেই যে উপায়। হাফেজ লিখচেন সবা ব-লুত্‌ফ বেলো আঁ গ' যালে রা' নারা ইত্যাদি ডাঃ সাহেব লিখবেন—

> ভোরের হাওয়া চুপি চুপি ক'য়ো হরিণ ছানারে
> "পাগল পারা ঘুরাও তুমি পাহাড় বনে আমারে।"
> চিনিওয়ালী (বাড়ুক তাহার পরমায়ু) কেন যে •
> অনুগ্রহ করে নাক চিনি খেকো তোতারে
> বন্ধু সাথে ব'সে ব'সে শরাব যখন ওড়াবে
> একটুখানি স্মরণ ক'রো যত লক্ষী ছাড়ারে।
> ইত্যাদি (পৌষ সংখ্যা মাসিক মোহাম্মদী) ১৩৩৯

হাফেজ সম্বন্ধে যা কিছু আমরা জানি আজ পর্য্যন্ত তা থেকে কেউ খুঁজে বের করতে পারি নি কোন রকমেই যে হাফেজ ছিলেন এক তীরন্দাজ কিরাত, অথবা এক বন্দুকধারী হরিণ শিকারী। কথাটা এই—হাফেজ বেচারা হরিণের মাংস ভালবাসতেন খুব বেশী, কিন্তু কি করেন হরিণ ত মিলে না কাজেই হরিণ ছানার পিছুই পাহাড়-বনে ঘুরে ঘুরে "জান্‌-হয়রাণ"। তাই শাহিদুল্লা সাহেব অনুবাদ করেছেন —

> ভোরের হাওয়া চুপি চুপি ক'য়ো হরিণ ছানারে,
> "পাগল-পারা ঘুরাও তুমি পাহাড় বনে আমারে।"

আমরা কিন্তু অনুবাদক সাহেবকে আর একটা কথা দিচ্ছি স্মরণ করিয়ে। "গাজাল" মানে শুধু হরিণছানা নয় ছাগল ছানাও বটে, তবে হাফেজ ছাগ শিকারীও ছিলেন সেটা লেখা উচিত ছিল ডাক্তার সাহেবের কবিতা অনুবাদে, অন্ততঃ "সূর্য্য" টার উল্লেখ করাত দরকার খুবই ছিল।

সত্যি কিন্তু, অনুবাদক হওয়া চাই ঠিক এমনি ধারাই। যেমন বাঁধাঘাটের ইংরাজি অনুবাদ tied ghat তেমনি "গাজালের" অনুবাদও এস্থলে "হরিণছানা" (হরিণী-নয়না নয় কিন্তু) ডক্টর সাহেব লিখচেন———"মূলে কাফিয়াঃ "আরা" আছে আমার অনুবাদে "আরে" মিল্‌ আছে। এক বন্ধু করেছিলেন অনুবাদ ইংরাজি "Barbar" কথাটীর যথা "নাপেরে" (আর এর স্থলে আরে) "কবিতা যদি এমনি হয় তবে আর ভয় কি বন্ধু" এই বলে

একবন্ধু চায়ের মজলিসেই রচনা করেছিলেন একটী কবিতা যথা—

চলো চলো সই ভোর হল ওই
দোর খুলে জোরে হাঁচি, কাশি
চিলে ও মোরগে লড়াই লেগেছে
দেখি আর দোঁহে কাঁদি হাসি
"কুড়ল্" "কোদাল" "কামার" "চামার"
কেউ কারো নাহি বাদ সাধে
আফ্‌সোস্ হায় হাফেজী 'গজল্'
"গজাল্" হইল অনুবাদে।

দুঃখ আর রাখি কোথা, এক বন্ধু বল্লেন "ভেদ নাই কিন্তু পাণ্ডিত্বে ও কবিত্বে"। অর্থাৎ কবি হ'লে পণ্ডিত না হয় নাই হ'ক পণ্ডিত হ'লে কবি হ'তে হয় তাকে। সেটা না হলেই সাহিত্যে অনধিকার চর্চ্চা বুঝলে কিনা? সব চুপ চাপ লেখকের ত কথাই নাই।

"ফাল্গুন এল"

শ্রীক্ষণপ্রভা দেবী

ফাগুন এল ধরার বুকে, পুষ্প রথে,
সবুজ তারি ওড়না খানি, কুঞ্জ পথে,
লুটিয়ে দিয়ে। পুষ্পকলি উঠল জেগে,
দখিন হাওয়ার ওই, পরশ লেগে।
মন মাতান সৌরভে তার পেয়ে সাড়া,
মত্ত মধুপ গুঞ্জরণে আপন হারা
রঙ্গীন নেশায় বিভোর মধু সন্ধানে
ছুটছে বনে—আজি এ নবীন ফাল্গুনে।
বাগিচায় পাপিয়া ওই গাইছে গীতি
সঙ্গীতে তার আকুল হল, ছায়া বীথি।
অঝোরে তার ঝরছে সুধা, গানের সুরে,
হর্ষে হিয়া বন-রাণীর উঠল পুরে।
কিশলয়ের কচি বুকের যত কথা
সহসা আজ জেনে নিল কানন লতা।
দখিন হাওয়া ফুলের সাথে আনমনে
কইছে কথা—আজি এ নবীন ফাল্গুনে।
ফাগুন এল চির নব মোহন সাজে।
চরণে তার রিণিঝিনি নূপুর বাজে।
লহর মালা বুকে গেঁথে ছুটছে নদী,
আকুল প্রাণে গানের টানে—বাধা যদি,
আসে তবু থামবে না ওর চলার গতি
পরাণ তারি এত টানে সাগর প্রতি।
শিহর লেগে কাঁপছে পুলক স্পন্দনে,
সারা ভুবন—আজি এ নবীন ফাল্গুনে।

সখি

শ্রীমতী পূর্ণশশী দেবী

তুমি—সেই যে বাঁশী বাজিয়েছিলে চাঁদনী রাতে
শুনেছিলাম কাণটী পেতে
আলোর—নেশায় বিভোর হয়ে—পুলক ভরে,
সে বাঁশী আর বাজবে নাকি?

এই—অমা-নিশায় স্তব্ধ-নিঝুম্
সব-হারানো অন্ধকারে,
আমি—সুরটুকু তার শুনতে চাই
ব্যথার-স্বপ্ন ঘোরে।
তুমি—যে গানখানি গেয়েছিলে শরত প্রাতে
ফুল-ফোটানো মধুর রাতে
শিহরিত—মুগ্ধ প্রাণে শুনেছিলাম হেসে,—
সে গান আর গাইবে নাকি?

এই—বাদল বেলায় ব্যাকুল সাঁঝে
ফুল-ঝরানো উতল শ্বাসে
আমি—সে গান তোমার শুনতে চাই
নয়ন জলে ভেসে।

আনমনা

লক্ষ্মীবিলাস প্রেস, লিঃ কলিকাতা।

সতীশচন্দ্র মিত্র প্রতিষ্ঠিত

৬ষ্ঠ বর্ষ | চৈত্র—১৩৩৯ | ১২শ সংখ্যা

মেয়েদের শিক্ষা

কিছু দিনের মধ্যে মেয়েদের শিক্ষার প্রসার একটু বাড়িয়া গিয়াছে মনে হয়—ক্রমশঃ আরো বাড়িতেছেই। মফঃস্বলে, পল্লীগ্রামে অনেক জায়গায় মেয়েদের ইস্কুল স্থাপিত হইতেছে, তাহাতে সর্ব্বশ্রেণীর মেয়ের সংখ্যাও ক্রমাগত বাড়িয়া চলিয়াছে। আর কলিকাতারও প্রায় সকল পল্লীতেই মেয়েদের দু'চার পাচটি ইস্কুল চলিয়াছে—আরো করিবার উদ্যোগ চলিয়াছে। কোন ইস্কুলই নেহাৎ ছাত্রীর অভাবে বসিয়া নাই—কোন কোন ইস্কুলে বেশ বেশী ছাত্রীই হইয়াছে। বেথুন, ডায়োসেসান বা সিটিকলেজের দু'চারিটি ছাত্রীর মধ্যেই এখন মেয়েদের কলেজ-শিক্ষা সীমাবদ্ধ নাই—কলিকাতার অনেক কলেজেই এখন মেয়েরা পড়িতেছে—তাহাদের সংখ্যাও কম নয়। এইসব কলেজে মেয়েদের জন্য সকালে ক্লাস হয়—দুপুরে ছেলেদের ক্লাস হয়! এইসব স্কুল বা কলেজের মেয়েদের মধ্যে সনাতনী অসনাতনী, রক্ষণশীল সংস্কারকামী, নানাজাতি ও বর্ণের মেয়েই আছে। ছেলেমেয়েদের সহ-শিক্ষায় এখন অনেকের আপত্তি থাকিলেও কালক্রমে তাহা থাকিবে কিনা সন্দেহ।

বাংলায়ই কিছুদিন পূর্ব্বে এমন এক কাল ছিল যখন মেয়েদের ইস্কুল কলেজে দিতে অভিভাবকদের রাজি করানো এক মহা দুর্ঘট ব্যাপার ছিল। এখন কালচক্রে সে অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। মেয়েদের শিক্ষার আদৌ প্রয়োজন নাই—একথা লইয়া এখন আর তর্ক ওঠে না। এখন কথা হয় মেয়েদের শিক্ষা ধারা কি ভাবে পরিচালিত হইবে—তাহাদের রান্না কতটুকু শিখিতে হইবে, সঙ্গীত, শেলাই কতটুকু শিখিতে হইবে, ঘর-গেরস্তালীর কি কি সে শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত হইবে তাহা লইয়া। প্রাথমিক শিক্ষায় এসব লইয়া কথা হইতে পারে—তাহার পর সাধারণ শিক্ষায় মেয়েরাও যতই উচ্চস্তরে যাইতে থাকে তখন তাহার ও পুরুষের শিক্ষা এক পর্য্যায়েই আসিয়া পড়িতে বাধ্য হয়।

মেয়েদের অষ্টম বা নবম বর্ষে বিবাহ দিয়া গৌরী-দান ফল লাভ করিতে হইবে—রজোদর্শনের পর বিবাহ দিলে সাত পুরুষ নরকে যাইবে—ইহা গর্ব্বচ্ছলে কেহ এখন বলিলেও—এসব কথা এখন অতীতের স্বপ্ন

হইয়াছে। মেয়েদের বিবাহের বয়স—সমাজের উচ্চস্তরে অন্ততঃ—সর্দ্দা আইনে বাড়াইয়া দেয় নাই, কালের প্রভাবেই তাহা আপনা হইতে বাড়িয়া যাইতেছে। নারী-জীবনেও শিক্ষার একান্ত আবশ্যক আছে একথা মনে করিয়াই যে সকল অভিভাবক তাহাদের কন্যাদের স্কুল কলেজে পাঠাইতেছেন তাহাও সত্য নহে। মেয়েদের বিবাহ ইচ্ছা হইলেও সকালে দিবার উপায় নাই, এরূপ অবস্থায় তাহাদের সময় কাটাইবার কিছু অবলম্বন দরকার তাই মেয়েদের মধ্যেও এই শিক্ষাস্রোত ক্রমশঃ বিস্তৃতিলাভ করিতেছে মনে হয়।

মেয়েদের মধ্যে উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়া কেহ চাকুরী করিতেছেন, দু'চার জন সামান্য কোন ব্যবসায়েও লিপ্ত হইয়াছেন। অধিকাংশেরই এখনো কিছুদূর শিক্ষার পর বিবাহ হইতেছে। 'মেয়েরা বেশী লেখাপড়া শিখিয়া তো আর চাকুরী করিয়া সংসার চালাইবে না—তাহাদের কাজ ঘর-সংসার করা—ইত্যাদি' একথা এখনো শোনা যায় বটে—কিন্তু হিন্দু-সমাজের উচ্চশ্রেণীর মধ্যে কন্যাদায় যেরূপ ভীষণ হইয়াছে তাহাতে উচ্চশিক্ষিত মেয়েরা আর এক যুগ সময় মধ্যে এভাবে দায়স্বরূপ সমাজ ও সংসারের গলগ্রহ হইয়া বিবাহ করিয়া সংসার ধর্ম্ম পালনে স্বচ্ছন্দ চিত্তে রাজি হইবে কিনা সে সম্বন্ধে ভীষণ সংশয় যে আসিয়া পড়িবে তাহা নিঃসন্দেহ।

মেয়েদের অবস্থা সমাজে এখন কিরূপ—মেয়ে হইবার সংবাদেই পিতা-মাতার মুখ কিছু ভার একটা সমূহ দায় ঘাড়ে পড়িল বলিয়া—তারপর কিছুকাল লালন-পালন, সামান্য কিছু শিক্ষা, তারপর বাল্য অতিক্রম করিয়া কৈশোরে পা দিতে না দিতেই বিবাহের ভাবনা—বরপক্ষের অর্থ-চাপ, সেই অর্থ জোগাইতে অনেক কন্যার পিতা-মাতার সর্ব্বস্বান্ত হওয়া—তারপর মেয়ের ভাগ্যে শ্বশুর ঘরের সুখ-দুঃখ—ভবিতব্য। এই যে মেয়েকে দায়স্বরূপ মনে করা ইহা সমাজের কত বড় নিস্পেষণের অভিশাপ সমাজপতিগণ তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন কিনা জানি না—কিন্তু চারিদিকের এত হা-হুতাশে, অনেক মেয়ের আত্ম-বলিদানেও এ অবস্থার পরিবর্ত্তন আসে নাই।—কিন্তু মনে হয় এ অবস্থার পরিবর্ত্তন মেয়েদের এই শিক্ষা-বিস্তৃতির মধ্য দিয়াই আসিবে।

শিক্ষায় মেয়েদের আত্মবোধ জাগিবে, নিজেরা শুধু মাত্র একটা ভার নহে—ইচ্ছা করিলে তাহারাও কিছু উপার্জ্জন করিয়া স্বাধীন থাকিতে পারিবে এটুকু জ্ঞান জন্মিলেই সমাজের আঘাত—বরপণের দাবী এ সমস্ত কিছুতেই আর তাহারা সুস্থচিত্তে মানিয়া নিতে পারিবে না। যখন মেয়েরা তাহা পারিবে না তখন সমাজ-বিদ্রোহ কোন-না-কোন ভাবে দেখা দিবে।

—সেদিন এক বন্ধু বলিতেছিলেন 'যে মেয়েটির বয়স ১৪।১৫ হইয়াছে সে ইস্কুলে পড়িতে থাকিলেও তাহার বিবাহ না দিয়া উপায় নাই। কিন্তু যার বয়স ৫।৬ বৎসর সে শেষ পর্য্যন্ত পড়িবেই—এবং তাহার বিবাহের ভাবনা আমাকে ভাবিতে হইবে না—নিজে যোগ্য হইয়া যাহা ভাল মনে করে করিবে।'

শিক্ষায় এটুকু আত্মনির্ভর যদি মেয়েদের আসে তবে তাহাকে সনাতনী তথা সমাজ-ধ্বংসী বলিব, না—মেয়েদেরও মনুষ্যত্ব জাগিয়াছে তাহাই বলিব?

মিলন-গীতির অন্তরালে

—গল্প—
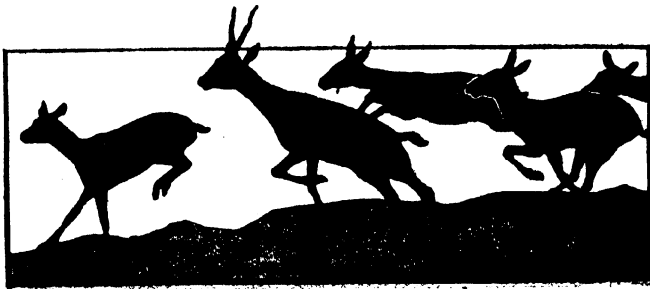
শ্রীজ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী বি-এল

বসন্তের এক স্নিগ্ধ অপরাহ্নে শিউলী তার বৃহৎ অট্টালিকার ছাদের উপরে একাকী দাঁড়িয়ে উত্তরের দিকে চেয়ে চেয়ে কত কি দেখছিল।

বয়স তার এমন বেশী কিছু নয়—একুশ কি বাইশ হবে—কিন্তু রূপে বুঝি উর্ব্বশীও হার মানে—এমনি তার দীর্ঘ ঋজু দেহের শ্রী—এমনি মনোরম তার মুখ, যেন একটী বস্‌রার গোলাপ। অথচ আজ তাতে একটু চিন্তার ছাপ।

সে তখন দেখ্‌ছিল, তাদেরই সুবৃহৎ পুকুরের উত্তর পাড়ে যে বটগাছটা কত যুগ-যুগান্ত থেকে মাথা খাড়া করে দাঁড়িয়ে আছে, আজ তার নীচে কত যুবক যুবতী, বৃদ্ধ বৃদ্ধা এসে জড় হয়েছে ঐ দীনু ক্ষ্যাপার আশ্রমে।

ভাবে, মানুষগুলো কি অশিক্ষিত—এখনও সাধু সন্ন্যাসীর উপর কী অগাধ শ্রদ্ধা তাদের—যেন তারা এক একটা কাঁচা খেকো দেবতা—

কথাটা শিউলী অম্‌নি অনেক দিনই ভাবে। কিন্তু তবুও যেন মনের ভেতর কেমন একটা খট্‌কা বাধে—বুকটা দুরু দুরু করে কেঁপে উঠে—সমস্ত দেহ অবসন্ন হয়ে আসে। সেদিনও তাই হ'ল—শিউলী কোনরূপে টলে টলে এসে শয্যার উপর লুটিয়ে পড়লো।

কিন্তু তাতেও শান্তি পেল না—কোথা থেকে কত কি এলোপাথাড়ী ভাব্‌না এসে তাকে বিব্রত করে তুল্‌লে। তখন কেবলই তার মনে হতে লাগলো, কেন সে আর সব মূর্খ সেকেলে গেঁয়োদের কথা শুনে এ কাজ করে বস্‌লো—কী দরকার ছিল তার ঐ বুড়ো ক্ষ্যাপাটাকে ডেকে এনে হাত দেখাবার? কবে নাপিত বৌয়ের হাত দেখে সে বলেছিল এক বৎসরের মধ্যে ছেলে হবে—কবে ওপাড়ার কাদু মাসীর হাত দেখে বলেছিল যে তিন মাসের মধ্যে তাঁর বড় ছেলের চাকরী হবে—তা নাকি আবার অক্ষরে অক্ষরে ফলেছে!

এরা যেন সব কী—ঐ ক্ষ্যাপাটার মাইনে করা ক্যানভাসার—চৌ'পর রাত ঘ্যানর ঘ্যানর—তাই না সে নিজেও এই কিছুদিন পূর্ব্বে...

কিন্তু এ কি সর্ব্বনাশ! দীনুক্ষ্যাপা তার জীবনের স্বাচ্ছন্দ্যকে এমন নির্ম্মম পিশাচের মত দুমড়ে দিলে—তার নিরবিচ্ছিন্ন সুখ, নির্ম্মল শান্তি এক নিমিষে মাত্র একটী কথায় পুড়ে ভস্ম করে দিলে। কি আশ্চর্য্য! সে অদূর ভবিষ্যতে অসতী হবে! একি অদৃষ্টের লিখন—একি মর্ম্মন্তুদ বিধিলিপি! কেন সে অসতী হবে? তার স্বামীর মত এমন রূপ-গুণ-সম্পন্ন স্বামী ক'জনের ভাগ্যে মেলে?

না—না—তা হতে পারে না—অসম্ভব—অসম্ভব—এ ঐ দীনু ক্ষ্যাপার বুজ্‌রুকি—আর যাই হোক—শিউলী আর যত দোষেই দোষী হোক্, নিমিষের তরেও সে পথভ্রষ্টা হতে পারে না—

মনকে সে এমনি প্রত্যহ প্রতিনিয়তই প্রবোধ দেয়—কিন্তু তথাপি মনের কোণের সেই তুচ্ছ কাঁটাটা উঠ্‌তে বস্‌তে বেঁধে। তাই পাঁজি খুলে যতগুলো ব্রত-পার্ব্বণ পায় সবগুলোই সে একের পর এককরে কোরে যায়—শুধু তাইই নয়, স্বামীর চরণ দুটো সব সময়েই যেন সে পূজো করতে পার্‌লে বাঁচে। বিষ্ণুপদ হেসে বলে,—দিনে দিনে তুমি হলে কী শিউলী? আমি যেন তোমার এক দেবতা—

শিউলী বলে—নয়? বল কি—স্ত্রীর আবার স্বামীর চেয়ে বড় দেবতা আছে নাকি?

বিষ্ণুপদ দুটো হাত বাড়িয়ে তাকে বুকের কাছে

টেনে এনে চোখের ওপর চোখ রেখে বলে, তাই নাকি গো ঠাকরুণ ?

চোখে তার ভালবাসার নেশা।

এমনি ভাবে দিন যায় দিন আসে—শিউলীর পূজো পার্ব্বণের ঘটা বাড়ে—স্বামী-ভক্তি বাড়ে—কিন্তু তবুও অন্তরের ব্যথাটা সারে না—এক একবার মাথা তুলে দাঁড়ায়।

সেদিন অপরাহ্নে এই ব্যথাটা একটু বেশী টন্ টন্ করে উঠেছিল। কারণ বিশেষ কিছু নয় বটে—কিন্তু খুব সামান্যও তাকে বলা চলে না।

হঠাৎ পুরাণো একটা গান গাইবার সখ হওয়ায়, সে সেদিন বাক্স হাত্ড়িয়ে গানের খাতাটা বার করতে' গিয়েছিল—কিন্তু খুঁজে পেতে খাতাটা এনে হারমোনিয়মের কাছে বসে যেই তা খুলেছে, অমনি দেখলে ঠিক সেই গানটী অরুণের নিজের হাতে লেখা। গান তার গাওয়া হ'ল না—উপরন্তু মাথার ভেতরকার শিরাগুলো যেন কেমন ঝিম ঝিম করে উঠ্লো।

তাই যখন সে দীনুক্ষ্যাপার ভবিষ্যদ্বাণীকে বুজরুকী বলেই অন্য দিনের মত সেদিনও বিছানায় শুয়ে শুয়ে গায়ের জোরে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করছিল—ঠিক সেই মুহূর্ত্তে তার মনে পড়লো আবার ঐ অরুণের কথা।

অরুণ—তার প্রথম যৌবনের অনাঘ্রাত অর্ঘ পাবার জন্য যার আগ্রহের অন্ত ছিল না—চেষ্টা যত্নের ত্রুটী ছিল না—এ সেই অরুণ—প্রিয়দর্শন, মিষ্টভাষী, সুশিক্ষিত অকৃত্রিম প্রেমিক অরুণ!

কিন্তু সে কি তার মর্য্যাদা রেখেছে? সেকি তার চোখের ভেজা কাতর কাকুতিতে সাড়া দিয়েছে ?

হাঁ— সে দিয়েছিল বটে—বৈশাখের এক মধুর প্রভাতে তার হাতখানি শিউলীনি জের হাতের উপর রাখতে দিয়েছিল—কিন্তু সেত মাত্র এক মুহূর্ত্তের জন্য—তারপর ?

তারপর শিউলি তার সহস্র অনুনয়কে নিষ্ঠুরের মত পায়ে দলে একদিন এক অচিন পথিকের সারাজীবনের সহযাত্রী সাজ্লে—আর সেই ব্যর্থ প্রেমিক ?

না—না—আর সে কিছু ভাববে না—অরুণের কাতর অনুনয়কে তুচ্ছ করে এসেছে সে—চিরদিন চিরজীবন এমনি তুচ্ছ করেই শিউলি চলে যাবে তার অন্তঃ দিয়ে স্বামীকে সুখী করবে—এতে যদি অরুণ তার নিজের দেহটাকে তিলে তিলে ধ্বংস করে ফেলে, শিউলীর চোখ হতে একটী ফোঁটা জলও সেই হতভাগ্যের জন্য কখনও ঝরবে না।

একান্ত বিপর্য্যস্ত মনের ভেতর এই ভাবে সে শান্তি আনতে চেষ্টা করলো—কিন্তু কোথায় শান্তি? শিউলীর অন্তরের ভেতর তখন কুরুক্ষেত্রের দাপাদাপি—

মনে পড়লো—অরুণের শেষ বিদায়ের ক্ষণটী—তার সজল আয়ত চোখ দুটোর ভেতর কি সে ভালবাসার মৌনবাণী—যেন দুরূহ প্রশ্নে ভরা—

শিউলীর তখন সত্যিই সাধ হয়েছিল, একবার ছুটে গিয়ে তার পায়ের উপর মাথা রেখে বলে, ওগো তোমার প্রশ্নের কী উত্তর আমি আর দেব—আমি তো স্বাধীন নই ?

কিন্তু একরাশ কুণ্ঠা এসে পা দুটোকে শ্লথ করে দিয়েছিল—বিয়োগ বেদনা এসে অন্তরের ভেতর দাহের সৃষ্টি করেছিল—তাই তখন লগ্ন সরে গেল।

শিউলীর জীবনে সেই লগ্ন সরে গেল—আর তা এলো না—তার পর থেকেই অভিভাবক তার ভাগ্য নিয়ন্ত্রন করবার জন্য অতি মাত্রায় ব্যস্ত হয়ে পড়লেন এবং আষাঢ়ের এক শুভদিনে তাঁরা তাঁদের কর্ত্তব্য শেষ করলেন—উৎসবের কোলাহলের ভিতর দিয়ে—

বাঙ্গালীর মেয়ে সে—লজ্জা তার দেহের আভরণ, কুণ্ঠা তার পথের কাঁটা—কিন্তু অরুণ? ষোল বছরের একটী নির্ম্মল তরুণীর চিত্তকেই সে শুধু জয় করতে শিখেছিল—চোখের ভাষায়, কথার ছটায়,—আর কি কিছু সে শেখে নি? সে কি শেখে নি কী তার কর্ত্তব্য।

সেদিনের সেই সন্ধ্যায় শিউলীর ব্যথাতুর চোখ দুটো তার প্রতীক্ষায় পথের পানে চেয়ে চেয়ে অবশেষে ক্লান্ত হয়ে পড়লো।—তাই ক্ষোভে, দুঃখে ও রাগে সে তার মনটাকে একেবারে ঘুরিয়ে দিলে বর্ত্তমান বাস্তবের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে। ভাব্লে, মুহূর্ত্তের ভুলটা ভুলই —তার জের টানবার জন্য সে আর বিদ্রোহী হয়ে লজ্জার মাথা খেতে পারে না।

এ হচ্ছে পাঁচ বছরের পূর্ব্বের কথা—কিন্তু আজ আবার সেই অতীতের স্মৃতি তার চোখের সম্মুখে সুস্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠলো—বায়স্কোপের ছবির মত একটীর পর একটী কোরে। মন ও অন্তর কান্না জুড়ে দিল। বিবেক যেন চেঁচিয়ে বল্‌লে, ওরে ছন্নছাড়া, সেদিন তোর নিজেরও কি কোন কর্ত্তব্য ছিল না—লজ্জাই কি তোর সব?

বুকটা তখন সত্যি সত্যিই ভেঙ্গে যাচ্ছিল। কিন্তু শিউলী বুদ্ধিমতী—তাই চট্ করে সে সামলিয়ে নিল—ভাব্‌লে, এ কী পাগলামী—তার সংযমের বাঁধ আজ এমন শিথিল কেন? দেবতুল্য স্বামীর সহধর্ম্মিণী হয়েও আজ সে চিন্তা কর্‌ছে কিনা একটী পরপুরুষের! ছিঃ ছিঃ, তার পক্ষে অত্যন্ত অন্যায়, অসঙ্গত।

কাণের কাছে অনবরত এসে বাজতে লাগলো দীনু ক্ষ্যাপার ভবিষ্যদ্বাণী—তার কেমন ভয় হ'ল—অজ্ঞাত আশঙ্কায় সমস্ত দেহ থর থর করে কাঁপছিল—তন্মুহূর্ত্তেই সে শয্যা হতে উঠে দেওয়ালে টাঙ্গানো নারায়ণের ছবির নিকট বার বার মাথা ঠেকিয়ে বল্‌তে লাগল, 'ঠাকুর, আমায় রক্ষে কর—রক্ষে কর—জীবনে একটী মুহূর্ত্তের তরেও আমার নারী-ধর্ম্ম যেন এক চুলও নষ্ট না হয়'—

হঠাৎ সিঁড়ির উপর কা'র পায়ের শব্দ শোনা গেল—শিউলীর চিত্তের ভেতর তখন আনন্দের বন্যা—সে তাড়াতাড়ি চোখ দু'টো আঁচল দিয়ে মুছে ছুটে গেল দরজার দিকে। সম্মুখে বিষ্ণুপদকে পেয়েই তার পায়ের উপর মাথা রেখে গদ্‌গদ্ কণ্ঠে বল্‌লে, আমি ব্রহ্মা বুঝি নে, বিষ্ণু বুঝি নে, তুমিই আমার প্রাণের ঠাকুর—আমার সকল দেবতার বড় দেবতা—

বিষ্ণুপদ অবাক হ'ল—তাকে দু'হাত দিয়ে তুলে ধরে হেসে ব'ল্‌লে, তুমি হ'লে কি শিউলী? ক্ষ্যাপার বাণীকে ব্যর্থ ক'রবার জন্য দিনে দিনে যে অক্ষয় কবচ তুমি বাঁধছো—তাতে কিন্তু আমার পায়ে ফোস্কা পড়্‌বার যো হ'ল—কিন্তু তুমি শুনে অবাক্ হবে, ঐ ক্ষ্যাপার কথাটার উপর মূল্য দিয়ে মনের ভেতর তোমার মত অশান্তি আন্‌বার জন্য এক নিমিষও আমার বুদ্ধিভ্রম হয় নি—বা কখন হবেও না—

শিউলী তাড়াতাড়ি বল্‌লে, না—না—তার জন্য নয়—তবে কি না পতিকে ভক্তি করা স্ত্রীর অবশ্য কর্ত্তব্য—কারণ……

মাপ কর রাণী, অত কারণ-টারণ আমি বুঝিনে—আমি এই বুঝি যে এ ভাবে বেশী দিন থাক্‌লে হয়তো আমার সাত রাজার ধন এক মাণিক এই শিউলী মণিকে শেষকালটায় হারিয়ে বস্‌বো—

একটু মৌন থেকে তাকে দু'টো বাহু দিয়ে বুকের আরও কাছে টেনে এনে কোমল গালে মৃদু মৃদু আঘাত করতে করতে পুনরায় স্নেহসিক্ত কণ্ঠে বল্‌লে, "তুমি জান না শিউলী, আমার কতখানি হৃদয় জুড়ে তুমি বাস করচো—যেদিন তোমাকে পেয়েছি, সেদিন থেকেই আমার বাইরে ফুটে উঠেছে কমনীয় স্নিগ্ধ শ্রী—আর ভেতরে অনবদ্য প্রেমপদ্মের অপূর্ব্ব মাধুর্য্য। আকাশে বাতাসে আমার এই চোখ দু'টো শুধু দেখতে পায় তোমার সৌন্দর্য্য! স্বর্ণরেণু—সন্ধ্যাতারার মত উজ্জ্বল—প্রভাতী তারার মত অনুপম—কিন্তু সেই তুমি যদি আজ একটা তুচ্ছ ক্ষ্যাপার কথায়……

শিউলীর ছিপ্‌ছিপে দীর্ঘ দেহ তখন বেতস লতার মত থর থর করে কাঁপছিল—আনন্দে? হয় তো তাই হবে, কিন্তু সে বিষাদ কণ্ঠে বল্‌লে, বল তবে ক্ষ্যাপার কথা মিথ্যা, কখনও সত্যি হবে না—

নিশ্চয় না—নিশ্চয় সত্য হবে না—তা ছাড়া তোমাকে কি আর আমি চিনি নে রাণী?

একটু থেমে আবার বল্‌লে, তা যাক্, আমি স্থির করেছি দিন সাতেকের মধ্যে একবার পুরীতে বেড়াতে যাব—না হলে তুমি ঠিক ক্ষেপে উঠবে এ আমি বেশ দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি—

এখানকার বর্ত্তমান আব্‌হাওয়ায় শিউলীর মনটা বাস্তবিকই বড় বিষাক্ত হয়ে উঠেছিল—কাজেই সে বিদেশে যাবার কথায় আনন্দিত হয়ে বল্‌লে, তাই চল—তাই চল—

(২)

কয়েক দিন পরের কথা—বিষ্ণুপদ শিউলীকে নিয়ে পুরী এসেছে। দিব্যি ফুটফুটে ঝক্‌ঝকে সুন্দর বাড়ী—

সহরের কোলাহলের ভেতর নয়—চক্রতীর্থের ঝিঞ্জি পাড়ার ভেতর নয়—স্বর্গদ্বারের এক প্রান্তে—সমুদ্রের উপর। পশ্চিমে খোলা বিস্তীর্ণ মাঠ—আর দক্ষিণে বিরাট সমুদ্র, সেখানে নীলাভ পর্ব্বতপ্রমাণ ঢেউগুলো একটীর পর একটী উঠে নৃত্য করছে—এ তাদের চিরন্তনের নৃত্য—কবে কোন্ সুপ্রভাতে তাদের প্রাণের ভেতর আনন্দের বান ডেকেছিল, তাই এই আত্মভোলা উদ্দাম নৃত্য—আজো তার নিবৃত্তি নেই—ভবিষ্যতেও হয়ত হবে না।

শিউলী প্রত্যহই এই অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখে—মনে তার অনন্ত তৃপ্তি, অফুরন্ত আনন্দ। দূরাগত অতীত ফিরে ফিরে আসে—তার চিত্তে আবার প্রথম যৌবনের দুরন্ত উন্মাদনা দেখা দেয়—সে আত্মহারা নববধূর মত স্বামীকে তার হাসি দিয়ে তৃপ্তি দেবার জন্য ব্যগ্র হয়ে পড়ে।

প্রতিদিন দু'বেলা সে বিষ্ণুপদর সহিত বেলাভূমিতে বেড়াতে যায়—ঢেউটা যখন সরে যায় সে তাড়াতাড়ি যায় কড়ি কুড়াতে—পরক্ষণেই আবার আর একটা ঢেউ যখন রাক্ষসের মত হাঁ করে তাকে গিল্‌তে আসে সে দেয় দৌড়—হয়ত কখন বালির ভেতর হুমড়ি খেয়ে পড়ে যায়—কিন্তু মুখে তখনও হাসি। বিষ্ণুপদ হেসে বলে, তোমার বয়স পাঁচ কি পনর বোঝা শক্ত—

শিউলী তখন ছুটে এসে স্বামীর পিঠে একটা কিল বসিয়ে দেয়।

এমনি প্রাণঢালা সুখ ও আনন্দের ভেতর দিয়ে দিনগুলো তাদের বেশ কাট্‌তে লাগলো। কিন্তু তথাপি তার পুজা-পার্ব্বণের একটু এদিক্ ওদিক্ হ'বার যো নেই—সেই ভোর থেকে উঠেই স্নান আহ্নিক, তারপর স্বামীর পা ধুয়ে এনে সেই জল মাথায় দেওয়া—জিভে দেওয়া।

এমনি রোজই ঘটে। বিষ্ণুপদ মনে মনে হাসে—কিন্তু চিত্ত তার উল্লাসে ভরা। হ'বার কথাও বটে—এমন পতিপ্রাণা স্ত্রী ক'জনের আছে?

দিন কয়েক পরে একদিন শিউলী পাশের বাড়ীর প্রফেসারগিন্নী রমাদেবীর সঙ্গে সমুদ্রে স্নান করতে গিয়েছিল। এঁদের সঙ্গে আসার পর থেকেই শিউলীর খুব ভাব হয়েছে।

বাজার থেকে বিষ্ণুপদ ক্লান্ত হয়ে বাসায় ফিরে যখন জানালার ধারে প্রতিদিনের মত সেদিন আর তাকে দেখতে পেলে না—তখন তার মনটা কেমন হাঁপিয়ে উঠলো। সে ঝিকে জিজ্ঞেস করে তাড়াতাড়ি ছুটে গেল সমুদ্রের ধারে।

শিউলী তখন আত্মভোলা হয়ে ঢেউ নিচ্ছিল—কখনো পাহাড়ের উপর, আবার কখনো বা পাতালে—তারপর ধুলোয় জলে একেবারে লুটোপুটী—বসন এদিকে-সেদিকে বিক্ষিপ্ত। কিন্তু এইরূপই নাকি তার সত্যিকার রূপ—ঠিক যেন একটী তরুণী জলনারী—অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য তার সারা মুখে—অপূর্ব্ব যৌবন-শ্রী তার সারা দেহে।

বিষ্ণুপদ বিস্মিত নয়নে তার দিকে চেয়ে চেয়ে ভাব্‌ছিল, এখানে আসার পর শিউলীর দেহটা একটু ফিরেছে—কিন্তু আরও খানিকটা ফিরাতে হবে। তার মনের ভেতর দীনু ক্ষ্যাপা যে বিষ ধরিয়ে দিয়েছে, তা সম্পূর্ণরূপে দূর কর্‌তে হবে তাকে আনন্দের ভেতর রেখে—তাকে স্বাধীনতা দিয়ে। প্রতি কাজে এবং হাব-ভাবে সে তাকে বুঝিয়ে দিবে যে, একটা দীনু ক্ষ্যাপা কেন, এক লক্ষ দীনু ক্ষ্যাপাও যদি ঐ একটা কথাই বার বার বলে তবুও তা'তে সে পদাঘাত করে। স্ত্রীর উপর—বিশেষতঃ শিউলীর মত স্ত্রীর উপর তার এতবড় বিশ্বাস চিরদিনই আছে এবং থাক্‌বেও।

সেই দিনই অপরাহ্নে সে শিউলীকে ডেকে বল্‌লে, দেখ, এখানে আসার পর থেকে তোমার শরীরটা একটু সেরে উঠেছে—মনের ভেতর স্ফূর্ত্তি আন—আর রাত-দিন বেড়াও, তা হ'লে আরও সারবে'খন্—

একটু মৌন থেকে পুনরায় বল্‌লে, কিন্তু যে কুঁড়ে আমি—ভাব্‌ছিলুম কি, এখানে আমার দু'তিনটী বন্ধু এসেছে—বড় ভাল লোক তারা, আর তাদের সঙ্গে একটী মজার লোকের সাথেও আলাপ হ'ল—নাম তার অরুণ, তোমার বাপের বাড়ীর দেশে ওকালতি কর্‌তো—কিন্তু এখন নাকি এক অদ্ভুত মানুষ—চুলগুলো উস্কোখুস্কো, চোখ গাঁথেপড়া—সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে কেমন যেন উদাসীনের ভাব—হ্যাঁ, যা বল্‌ছিলুম, তারা সবাই খুব

বেড়ায়—বেশী দূরে নয়, ঐ ভিক্টোরিয়া ক্লাবেই থাকে—তাদের সঙ্গে তোমার পরিচয় করে দিলে বেশ হবে —খুব বেড়াতে পারবে তাদের সাথে, কি বল?

এ ভাবে কথাটা পাড়বার একটু উদ্দেশ্যও ছিল অর্থাৎ বিষ্ণুপদ শিউলীকে বুঝিয়ে দিতে চায়, সে তাকে কত বেশী বিশ্বাস করে—তা'তে হয়তো তার মনের খট্‌কাটা মিলিয়ে যাবে।

কিন্তু শিউলী কথাটা শুনে একটু কেমন যেন চিন্তিত হয়ে পড়লো। অরুণ এসেছে—এ সেই অরুণ, তার অতীত জীবনের বন্ধু—যৌবন প্রভাতের প্রথম অতিথি—যে একদিন এসেছিল যৌবনের বার্ত্তা তার কাণের কাছে পৌছে দিতে, স্নিগ্ধ চোখের মৌন ভাষায়—অনুপম রূপ মাধুর্য্যে। এ যেন ঠিক তারই কায়ার ছায়া—পাশে পাশেই ঘুরে বেড়ায়—হয় তো বা বেলা ১২টার সুযোগ খোঁজে কায়ার ভেতর ছায়াকে পরিপূর্ণরূপে মিলিয়ে দিতে!

একটু নীরব থেকে পরে আবার দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁট কাম্‌ড়ে ধরে মনে মনে বল্‌লে, কি স্পর্দ্ধা তার! কবে কি দেওয়া নেওয়া হয়েছিল, আজ বুঝি সে তার হিসেব নিকেশ কর্‌তে চায়—আরও পেতে চায়!

শিউলীর সমস্ত প্রাণ, মন ও অন্তর অরুণের বিরুদ্ধে খাড়া হয়ে উঠ্‌ল—রাগে ও ঘৃণায় তার শরীর ঈষৎ কাঁপ্‌ছিল। কিন্তু নিজেকে সংযত করে সে বল্‌লে,—না—আমি তা পারবো না—তাদের সঙ্গে আমি বেড়াতে পারবো না। আচ্ছা, তুমি কেন আমাকে এত কাছ ছাড়া কর্‌তে চাও বল তো?

চোখে তার আতঙ্ক ও আশঙ্কা—মুখে কালিমা।

বিষ্ণুপদ তাড়াতাড়ি তাকে কাছে টেনে এনে স্মিত হাস্যের সহিত বল্‌লে, ভয় নেই গো ভয় নেই—আমি তোমাকে এক মুহূর্ত্তও কাছ ছাড়া করবো না—কিন্তু দীনু ক্যাপা দেখ্‌ছি তোমার বিভীষিকা হয়ে দাঁড়াল! বলি রাণী, ঈশ্বর না করুন—ক্যাপার ক্যাপামীই যদি কোনদিন সত্যি হয়ে দাঁড়ায়, তা'তে ক্ষতি কার বেশী—তোমার না আমার? অথচ সেই আমিই এক নিমিষের তরেও তো ঐ কথার এতটুকু বিশ্বাস করিনে—

শিউলীর বুকের ভেতর তখন অজ্ঞাত আশঙ্কার পাহাড়। কিন্তু জোর করে পাতলা ঠোঁট দুটোতে মৃদু হাসি ফুটিয়ে স্বামীকে বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরে বুকের উপর মাথা রেখে উত্তর করলে, আমারও তাই মশাই—আমারও তাই—তোমার পায়ের ধুলোর জোরে আমি একটা ক্যাপা কেন এক লক্ষ ক্যাপার কথাও বিনে বাধায় ডিঙ্গিয়ে যেতে পারবো এ সাহস আমার আছে।

এক মাসের জন্য তা'রা পুরী এসেছিল—কিন্তু দু'মাস কাট্‌বার পরও তা'দের দেশে ফিরবার হুঁস্ হ'ল না। সমুদ্রের হাওয়ায় তা'দের দেহও যেমন সারলো, মনও তেম্‌নি হাল্কা হ'ল।

আজকাল আর শিউলীর নিজের উপর অনাস্থা নেই—ক্যাপার ভবিষ্যদ্বাণী মনকে আর তেমন তিক্ত করে তোলে না। স্বামীর প্রাণঢালা ভালবাসায় সে এখন ভরপুর—ভাবে, এই তো আমার অক্ষয় কবচ—তবে আর ভয় কি—পা ফস্কাবার কোন কারণ নেই—

কিন্তু একদিন কারণ এল সম্পূর্ণ অকারণের ভেতর দিয়েই। শরতের আকাশ যখন ছিল নির্ম্মল, মেঘমুক্ত—বাতাস যখন ছিল মৃদু মধুর,—ঠিক সেই সময়েই কাল বোশেখের রুদ্র দেবতা মাথা নেড়ে উঠ্‌লো—চোখে তার আগুন, হাতে শাণিত অস্ত্র।

রমার সঙ্গে শিউলীর এখন বড় ভাব—দু'বেলাই প্রায় তার সঙ্গে বেড়াতে যায়। বেশীর ভাগ পশ্চিমের ফাঁকা যায়গায়—সমুদ্রের ধার দিয়ে দিয়ে দিয়ে মাঠের দিকে। সঙ্গে পুরুষের মধ্যে থাকে মাত্র পুষ্পকুমার—রমার ঠাকুরপো। বয়স তার বেশী নয়, ষোল কি সতর। শিউলী তা'কে খুব স্নেহ করে—কারণ তার একটী মাত্র ছোট ভাই আজ যদি বেঁচে থাকৃতো তো ঠিক এত বড়টী হ'ত।

যুবক জমিদার বিষ্ণুপদ'র হঠাৎ খেয়াল হ'ল, যেমন করেই হোক পুরীতে একখানা বাড়ী করতে হবে—অন্ততঃ শিউলীর মনস্তুষ্টির জন্যও এর প্রয়োজন। বাড়ীটা হবে সমুদ্রের ঠিক ধারেই—সম্মুখের দু'পাশে হবে নাতিদীর্ঘ ফুলের বাগান—আগাগোড়া তৈরী হবে

ইটে নয়—কাঠে—চীন থেকে না হোক্ অন্ততঃ রেঙ্গুন থেকে আনা হবে পাকা চীনে মিস্ত্রী।

তাই রাত দিন বিষ্ণুপদ ইঞ্জিনিয়ার ডেকে যায়গা খুঁজে বেড়ায়—কখনো বা ফিতে দিয়ে মাপ জোক্ করে—প্ল্যান করে—এ বেলার প্ল্যান ও বেলায় ভাঙ্গে—আবার ও বেলার প্ল্যান ভাঙ্গে পরদিন সকালে। নবীন প্রেমিকের সুখ স্বপ্ন ইঁটের উপর ইঁট দিয়ে ইমারত গড়ে যায়—স্পর্দ্ধা তার দিনের আলোকেও গ্রাহ্য করে না—ভবিষ্যৎকেও ভয় করে না।

এমনি ভাবেই আজকাল সে অত্যন্ত বিব্রত—তাই দু'বেলাই শিউলীকে বেড়াতে হয় রমা ও পুষ্পর সঙ্গে।

একদিন অপরাহ্ণে পুষ্প এসে খবর দিল, বৌদি, আজ এক নতুন খবর নিয়ে এলেম জেলেদের কাছ থেকে—ঐ যে মাঠ দেখ্ছো না—ঠিক ঐ মাঠ্টার উঁচু যায়গায় দাঁড়ালে নাকি দেখা যায় এক পাল বুনো হরিণ এসে ওর কাছেই জলা যায়গায় ঘাস খায়। আশ্চর্য্য কিন্তু—দেখ্তে যাবে কাল?

শিউলী কৌতুহল ভরা দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বল্লে, সত্যি নাকি ঠাকুর পো—কই এতদিন তো কিছু বলনি?

কি করে বল্বো, বৌদিটা কী ক্ষ্যাপা দেখ—জান্লেম তো এই মাত্র। ভাগ্যিস জেলেদের কাছে গিয়েছিলেম—নইলে—তা যাকগে—কিন্তু ঠিক দেখ্তে যাবে তো বৌদি? খুব ভোরে কিন্তু—তা না হলে রোদ্ উঠেছে কি ব্যস্—অমান নাকি টেনে লম্বা—

অত্যন্ত ঔৎসুক্য সহকারে শিউলী বল্লে, তাই নাকি ঠাকুরপো? আচ্ছা, তবে তুমি খুব ভোরেই এস—রমাদিতে আর আমাতে সেই বুনো হরিণগুলোর পেছনে দৌড়ে দৌড়ে ঠিক একটা সুন্দর বাচ্চা নিয়ে আস্ব'খন—তা হলে বেশ মজা হবে—কেমন?

সেদিন সারাটা রাত্রিই প্রায় শিউলী জেগে জেগে কাটালো। মনে তার আকাশকুসুমের কেয়ারী চল্ছে—ফুল সেখানকার লাল, নীল, হলুদ। ভাব্‌ছে বিষ্ণুপদকে আগেভাগে কিছু সে বল্বে না—খুব ভোরে হয় তো বা তার ঘুম না ভাঙ্তেই সে ছুটে যাবে ঐ মাঠের দিকে—তারপর রমাদি'কে ঠিক পেছনে ফেলে সে দৌড়ে একটা হরিণের বাচ্চা নিয়ে আস্বে—এনেই বিষ্ণুপদ'র কোলের উপর ছেড়ে দেবে—আর যেই সে চম্‌কে উঠ্বে, শিউলী হাতে তালি দিতে দিতে হেসে গড়িয়ে পড়বে।

শিউলীর আনন্দের অন্ত নেই—কল্পনার শেষ নেই। ভাবলে, এই বেশ হবে, আহা, তার ছেলে নেই—মেয়ে নেই—স্বামীর এমন ভালবাসার বিনিময়ে সে তাকে কোন পুরস্কার দিতে পারে নি—তার বুভুক্ষিত মাতৃহৃদয় অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা নিয়ে দিনের পর দিন কাটিয়ে চলেছে—নারীত্বের এতবড় নিষ্ফলতা প্রতিনিয়ত তা'কে ব্যঙ্গ করে, ব্যথা দেয়—স্বামীর কাছে, বিশ্বের লোকের কাছে তা'কে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর তোলে।

তাড়াতাড়ি আঁচলে চোখ দু'টো মুছে সে আবার কল্পনার স্বপ্ন সৌধে চূণকাম করতে লাগলো। ভাবলে, যা নেই তা নেই—তার জন্য দুঃখ করে লাভ কি? বরং এই হরিণের বাচ্চাটাকে দু'জনে মিলে বড় করে তুল্বো—কখনো স্বামী তার মুখে চুমু দেবে—কখনো সে নিজে দেবে।

হঠাৎ স্বামীর দিকে নজর পড়তেই দেখলে জানালা দিয়ে একফালি চাঁদের আলো এসে তার ঘুমন্ত মুখকে আরো কমনীয় করে তুলেছে। মুগ্ধ শিউলি—বিমোহিত শিউলীর কেমন লোভ হ'ল—ওষ্ঠ প্রান্ত ভিজে উঠলো—তারপর সে আস্তে আস্তে নিজের পাতলা ওষ্ঠ দুটো বিষ্ণুপদ'র ওষ্ঠের উপর একবার আল্‌গোছে স্থাপন করেই, পরমুহূর্ত্তে তাকে বাহুদিয়ে জড়িয়ে ধরে পাশেই শুয়ে পড়লো।

শেষ রাত্রেই পুষ্প এসে জানালার ধারে হাজির—ভোর হতে তখনও প্রায় ঘণ্টা খানেক দেরী। পুষ্প ডাক্‌লে, বৌদি বৌদি—

অমনি ধড়্‌ফড় করে শিউলি উঠে পড়লো—তারপর কোনরকমে চোখে মুখে জল দিয়ে, স্যাণ্ডাল জোড়া পায়ে পড়ে, পাতলা পুলওভারটা গায়ে জড়াতে জড়াতে মৃদু পাদক্ষেপে বাইরে বেরিয়ে গেল।

বাইরে এসেই গলাটা একটু খাটো করে জিজ্ঞেস করলে, কই ঠাকুরপো, রমা দি এলো না?

কি করে আসবে? ঘুম নয়তো যেন কুম্ভকর্ণের নিদ্রা—আমি তো বাপু ডেকে ডেকে হয়রাণ—

শিউলী একটু থম্‌কে দাঁড়াল। আঁধার এখনও কাটেনি—তা ছাড়া, মাঠের দিকে একবার তাকিয়ে দেখলে, সেখানে বিরাট নিস্তব্ধতা থম্ থম্ করছে। এই অসাড় স্তব্ধ প্রান্তরের দিকে একটী যুবককে সঙ্গে নিয়ে সে কি করে যায়!

কিন্তু এর জন্য যে ভাবনা তার মনে উপস্থিত হ'ল, তা যেমন এসেছিল, তেমনি আবার পর মুহূর্ত্তেই মিলিয়ে গেল। সত্যিই তো, পুষ্পকে ভয় করবার কি আছে—সে যে তার ছোট ভাইটীর মতই সরল, কচি।

তারপর তা'রা দ্রুতপদে ছুট্‌লো মাঠের দিকে—সমুদ্রের ধার দিয়ে দিয়ে—মনে তা'দের অদম্য উদ্যম—অন্তরে উল্লাস। প্রায় মাইল খানেক পথ গিয়ে তা'রা উঠলো একটা উঁচু টিপের উপর—সূর্য্য তখন সবে মাত্র পূর্ব্ব আকাশে তা'র সপ্তাশ্ব ছেড়ে দিয়েছে। সম্মুখে অদূরে জলাভূমি—জল তা'তে বেশী নেই বটে—কিন্তু জলা ঘাস আছে খুব। হরিণরা নাকি এই ঘাস খেতে খুব ভালবাসে।

শিউলী ও পুষ্প দেখতে পেল, সেখানে কতকগুলো নানা রঙের ও নানা সাইজের হরিণ এসে ঘাস খেতে সুরু করেছে। আনন্দ তা'দের কূল ছেপে উথলে উঠলো—হবার কথাও বটে, এমন স্বাভাবিক প্রাকৃতিক দৃশ্য কোথায় মেলে? প্রকৃতি মায়ের আদরের দুলাল কি সুন্দর স্বচ্ছন্দ ভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে—মনে তা'দের কি স্ফূর্ত্তি, কি আত্মভোলা ভাব! কিন্তু বাচ্চা তারা ধরবে কি প্রকারে?

পাশ দিয়ে একটা জেলে যাচ্ছিল, শিউলীর প্রশ্নের উত্তরো বললে, বাচ্চা এখান থেকে ধরা যাবে না মা—ও ধরতে অনেক কারসাজি করতে হয়—আগে থেকেই ঐখানটায় গিয়ে মড়ার মত শুয়ে থাকতে হয়।

তবে কাল শেষ রাত্রে গিয়ে ওখানে মড়ার মত পড়ে থাক্‌বো—কি বল ভাই ঠাকুরপো? বলেই সে পুলক-ভরা চোখে তারদিকে চাইলে। পুষ্প উত্তর করলে, আচ্ছা, তাই হবে'খন—এখন চল ফিরি বৌদি। তারপর তা'রা ফিরতে লাগলো।

(৪)

দিন কয়েক হয় অরুণ পুরী এসেছে—সখ করে নয়—চোখের তৃপ্তির জন্য। শিউলী তা'র জীবনের ধ্রুবতারা—কবিতার উৎস, কল্পনার অলকা—তা'র জীবন-মধ্যাহ্নের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানসী। কিন্তু তারই কাছ থেকে সে পেয়েছে আঘাত—নিজেকে রিক্ত করে সে তাকে ভাল বেসেছিল, বিনিময়ে পেয়েছে ব্যথার বেদন—তারপর থেকে সে সেজেছে ঘর ছাড়া পাগল।

এমনি করেই সে এই কয়েকটা বছর কাটিয়ে এসেছে—বাকী জীবনটাও এই ভাবে কাটাবে এ তার সঙ্কল্প। বিস্মৃতিকে আন্‌বার জন্য দিনরাত চেষ্টা করেছে বটে—কিন্তু শত কাজের ভেতর সহস্র ব্যস্ততার ভেতর আঁধার রাতের উজ্জ্বল সন্ধ্যাতারার মত একটি জিনিষ তার চোখের সম্মুখে ফুটে উঠতো—মনে পড়তো সেই সেদিনকার চারিটী হস্তের মিলন, শিউলীর হাত তারই হাতে এলিয়ে দেওয়ার মাঝে—প্রশান্ত মনে এবং পরিপূর্ণ রূপে।

অরুণের চোখের কোণ ঝাপসা হ'য়ে উঠতো—ভাব্‌তো, সেই শিউলীর আজ এমন কেন হ'ল—কি দোষ ছিল তার? কেন সে তার জীবনে এত বড় ব্যর্থতা এনে দিল? এই ব্যথা—ব্যর্থতার এই বেদনা নিয়ে সে বাঁচবে কি করে?

কিন্তু তবুও তাকে বাঁচ্‌তে হ'ল। এই বাঁচায় সুখ নেই তার এতটুকু—আছে কেবল অস্বস্তি—অতৃপ্তি।

এই ভাবেই সে সুদীর্ঘ দিন গুলো কাটিয়ে এসেছে। কিন্তু এক একদিন মনের দোর গোড়ায় চাপা দেওয়া পাথরটা কিছু সরে যেত—সেদিন আর তার শিউলীকে একটু চোখের দেখা দেখবার জন্য ব্যাকুলতার অন্ত থাকতো না। পুরীতে আস্‌বার কারণও তার তাই। শিউলীর রূপের পূজারী সে—সে চায় তার মানস প্রতিমাকে চোখের পরদায় ফুটিয়ে তুলে নিভৃতে তার পুজো—তাই সে খোঁজ খবর নিয়ে একদিন চেপে বসলো

পুরী এক্সপ্রেসে। পুরীতে এসে ভিক্টোরিয়া ক্লাবে সে বাস করতে করতে একদিন অকস্মাৎ বিষ্ণুপদর সঙ্গে আলাপ করবার সুযোগ পেল, কাজেই সে জান্‌লে শিউলীরা স্বর্গদ্বারে থাকে।

গত কয়েকটা দিনই সে এদিকে সেদিকে তাকে খুঁজে বেড়িয়েছে কিন্তু পায়নি—তাই অবশেষে সেদিন সে স্বর্গদ্বারের দিকে সকাল বেলায় বেরিয়ে পড়লো।

যেতে যেতে অরুণ ভাব্‌ছিল, আজ নিশ্চয়ই শিউলীর সঙ্গে তার দেখা হবে—অত্যন্ত অকস্মাৎ সাক্ষাৎ—সে হয়তো তখন কমলা রঙের কি আস্‌মানী রঙের শাড়ীখানা ড্রেস্‌ করে পরে একবার এই দিকে লক্ষ্য করেই মুখ খানি রাঙা করে অম্‌নি সেখানে বসে পড়বে—জাপানী খোঁপার উপর তখন হয়তো একটু নড়ে উঠ্‌বে সদ্য আঁটা দোলনচাপা ফুলটা। কিন্তু অম্‌নি বসেই সে থাক্‌বে না নিশ্চয়—আবার অন্তরের উল্লাস চাপ্‌তে না পেরে সেই মুহূর্ত্তেই মৃদু হেসে ওখান থেকেই তার প্রীতি সম্ভাষণ জানাবে—হয়তো বা একটু চোখের জলও……

এম্‌নি ভেবে ভেবেই সে একটীর পর একটী করে অনেক গুলো ছোট বড় বাড়ী পার হয়ে গেল—কিন্তু কই শিউলী;—তার হৃদয় লক্ষ্মী,—স্বপ্নপুরীর মানসী?

এই ভাবনার জের টেনে সে স্বর্গদ্বার পেরিয়ে একেবারে পশ্চিমের খোলা মাঠের পাশে সমুদ্রের ধার দিয়ে যাচ্ছিল—হঠাৎ কার কণ্ঠস্বরে তার চিন্তার রশ্মি আচম্‌কা ছিঁড়ে গেল। অরুণ চোখ তুলে দেখ্‌লো কে এক যুবতী একটী কিশোরকে নিয়ে তারই পাশ দিয়ে যাচ্ছে।

অরুণ একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে রইলো। বোধ হয় এই মুখের সঙ্গেই সে আর একখানা মুখ মিলিয়ে দেখ্‌ছিল—ঠিক সেই মুহূর্ত্তে, সহসা স্মিত হাস্য করে যুবতী বলে উঠলো, এ কি—অরুণদা যে—

অরুণের বিস্ময়ের ভাবটা কাট্‌তে যুবতী তার পায়ের উপর মাথা নোয়াইয়া বল্‌লো, আজ আমাকে চিন্‌তে পারবে না—বটে কিন্তু একদিন তো আমি অচেনা ছিলুম না অরুণদা।

অরুণ চোখ দু'টো বিস্ফারিত করে সেই নারীকে ভাল করে দেখে পরক্ষণেই আনন্দে চেঁচিয়ে বল্‌লো, ও চিনেছি চিনেছি—শিউলী—সেই শিউলী তুমি—

হ্যাঁ—আমি সেইই বটে—কিন্তু এ কি হয়েছে, সোনার দেহ এমন করলে কি করে?

এর উত্তরে অরুণের অনেক কিছু বল্‌বার ছিল—কিন্তু আজ তার ভাষা মূক—তা ছাড়া এমন করে কাঁদুনি গেয়ে লাভ কি? তাই সে কি বল্‌তে বল্‌তে যেন থেমে গেল—ঠোঁট দু'টো কেবল ঈষৎ নড়ে উঠ্‌লো। বুদ্ধিমতী শিউলীর কিছু বুঝতে বাকী রইলো না। সে তখন একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বিরাট সমুদ্রের দিকে তার উদ্দেশ্যহীন দৃষ্টি নিক্ষেপ করে নীরবে দাঁড়িয়ে রইলো বটে—কিন্তু অন্তরের ভেতর এই উদাসীন লোক-টার জন্য শুধু সহানুভূতিই নয়, বেদনারও সঞ্চার হ'ল।

হঠাৎ পুষ্পর দিকে দৃষ্টি পড়তেই সে আবার সংবিৎ ফিরে পেল। ভাব্‌লো, এ মোটেই ভাল হচ্ছে না—ছি, ছি, পুষ্প কি মনে করছে!

তাই সে তাড়াতাড়ি বল্‌লে, ঠাকুরপো ইনি আমার দাদা—আমার পিসীমার গাঁয়ে বাড়ী—বিশেষ ঘনিষ্ঠতা…

মুহূর্ত্তকাল নীরব থেকে পুনরায় বল্‌লে, হ্যাঁ ভাই ঠাকুরপো, একটা কাজ করবে? আমার খেলার কড়ি কম পড়ে গেছে—আট ন' টা হলেই বেশ হয়—তা তুমি ঐ ওখান থেকে, ঢেউ যখন সরে যায় তখন—দেখো, সেদিনকার মত ভিজে যেয়ো না যেন—চট্‌ করে—

পুষ্প বল্‌লে, আচ্ছা, যাচ্ছি বৌদি, ঠিক নিয়ে আস্‌বো'খন—

পুষ্প কড়ি আন্‌তে গেল। এতদিন পরে অরুণের সঙ্গে দেখা—তার সুখ-দুঃখের অনেক কিছু জানার আজ প্রয়োজন, তাই সে ফাঁকি দিয়ে পুষ্পকে পাঠিয়ে দিয়ে অরুণকে নিয়ে পাশাপাশি বসে পড়লো।

শিউলী শুদ্ধবিস্ময়ে তার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইলো। অরুণ অকস্মাৎ তার কোমল হাতখানি নিজের মুষ্টির ভেতর নিয়ে বল্‌লো, হিন্দু আইনে না হোক, অন্য আইনে বিবাহ-বিচ্ছেদ আছে—তা যদি তুমি অন্য ধর্ম্ম—মাত্র কিছুদিনের জন্য—তারপরই আবার আমরা বিয়ের পর শুদ্ধি করে …

শিউলীর সমস্ত দেহের শিরা-উপশিরার ভেতর দিয়ে উষ্ণ রক্ত ছুটাছুটি আরম্ভ করলো—সে এক অজ্ঞাত আশঙ্কায় থর থর করে কাঁপ্ছিল—চোখের কোণে কিন্তু ভয়ানক অগ্নিশিখা। এ কি? অরুণ,—তার চির-শুভানুধ্যায়ী অরুণ আজ এ কি বলে?

কাণের ভেতর আঙুল দিয়ে কয়েক পা সরে গিয়ে ক্রুদ্ধা ফণিণীর মত মাথা তুলে সে রুদ্ধকণ্ঠে বল্লে, এত নীচ, এত ঘৃণ্য তুমি—ছি, ছি,—ধিক্ তোমাকে—

ঠিক্ সেই মুহূর্ত্তে দূরে একটা ছাদের উপর বিষ্ণুপদ দাঁড়িয়ে-হাতে তার দুরবীণ।

(৫)

রোজই সকালে শিউলী বিষ্ণুপদকে জাগিয়ে কখনো বা একটা চুমু দিয়ে এবং পায়ের ধূলো মাথায় নিয়ে বেড়াতে যায়—কিন্তু সেদিন আর সেসব কিছু হয় নি। ঘুম ভাঙ্বার পর থেকেই শিউলীকে ঘরের ভেতর না পেয়ে তার মনটা কেমন ফাঁকা বোধ হতে লাগ্লো।

কাজের ভেতর মন বসাতে গেল—কিন্তু পার্লে না। রাত্রিতে তার সম্বন্ধে যে দুঃস্বপ্নটা দেখেছিল, তাই কেবল ঘুরেফিরে বিষ্ণুপদ'র মনের ভেতর উঁকি-ঝুঁকি মার্‌ছিল। সে তাকে দেখ্বার জন্য অতিমাত্রায় ছট্‌ফট্ করে বেড়াতে লাগ্লো। শিউলী তার হৃদয়লক্ষ্মী মনস্বর্গের ইন্দ্রাণী—তারই সম্বন্ধে সে দেখেছে দুঃস্বপ্ন—অথচ আজ এখন সে কাছে নেই। তার একান্ত ব্যাকুল চিত্তকে কোনমতেই সে স্থির রাখ্তে পার্‌ছিল না—কেবল ভাব্ছিল, কেমন আছে সে, কোথায় গেল, না বলেই বা গেল কেন—কই, এখনও যে ফির্‌ছে না!

কিছুকাল পরে সে দুরবীণটা হাতে নিয়ে ছাদের উপর গেল—তারপর তা চোখে লাগিয়ে চারদিকে লক্ষ্য কর্‌তে কর্‌তে হঠাৎ পশ্চিমের দিকে দেখ্লে, শিউলী বেলাভূমিতে বসে—পাশে একটী যুবক!

বিষ্ণুপদ'র চোখ দু'টা কেমন জ্বালা করে উঠ্লো। সে চোখকে আরও একটু বিস্ফারিত করে দেখলে, সেই যুবকটীর মুষ্টির ভেতর শিউলীর হাত!

একি সর্ব্বনাশ! তার প্রাণাপেক্ষা প্রিয় শিউলী ভ্রষ্টা! দেহের ভেতরকার রক্ত যেন ঝিম্‌ঝিম্ করে উঠলো—হাতের শিরাগুলো টন্‌টন্ কর্‌তে লাগলো। মনে পড়লো দীনুক্ষ্যাপার ভবিষ্যদ্বাণী—সন্দেহের স্থান নিশ্চিত বিশ্বাস এসে অধিকার কর্‌লো। তার চোখের সম্মুখে জগতের সবটুকু আলো যেন ধপ করে এক নিমিষেই নিভে গেল—তারপর সব অন্ধকার। বিষ্ণুপদ'র ক্ষুব্ধ অন্তর চেঁচিয়ে বল্লে, একনিষ্ঠ সাধকের বাণী কি কখনো মিথ্যে হয়?

সে তা বেশ করে কাণ পেতে শুন্‌লে—তারপর আপন মনেই বলে উঠলো, দীনুক্ষ্যাপা, তুমি মানুষ নও—দেবতা, দেবতা—

দপ দপ করে সে নীচে নেমে এসে বাক্সে রিভলবর খুঁজলে—কিন্তু হায়, ভুলে যে একটী অস্ত্রও সে সঙ্গে আন্‌তে পারে নি।

মনটা তার ভয়ঙ্কররূপে জ্বলে যাচ্ছিল—কী সে জ্বালা, কী সে যন্ত্রণা! বিষ্ণুপদ মুহূর্ত্তকাল কি ভাবলে, তারপর একখানা দশ টাকার নোট নিয়ে বাজারের দিকে গেল অস্ত্র কিনতে।

সে তো চন্দ্রশেখরের মত ধৈর্য্য ধারণ কর্‌তে শেখেনি—সে শিখেছে ওথেলো'র মত প্রতিশোধ নিতে—প্রাণাপেক্ষা প্রিয় ডেস্‌ডেমনা'র রক্তপান কর্‌তে—নিতান্ত পরিচিত রাস্তার ভেতর পা দিয়েই সে চম্‌কে উঠলো—এ কি? ধূলি ও ধোয়ার পাশে অসংখ্য কাঁকড়া—দু'পাশের বাড়ী, ঘর, গাছের দিকে চেয়ে দেখলো সেখানেও তাই। পথ চল্‌তে চল্‌তে তার গা শিউরে উঠতে লাগলো।

কিন্তু তবুও চল্‌তে হবে—অস্ত্র যে না কিন্‌লেই নয়—অন্ততঃ একটা ভোজালী—তারপর—তারপর শিউলীর.....

বুকটা কেমন ছ্যাৎ করে উঠলো—কিন্তু তা মুহূর্ত্তের তরে, পরক্ষণেই সমুদ্রের ধারের সেই দৃশ্য মনে পড়লো।

সে প্রতারিত হয়েছে—শিউলীর মিথ্যা ভালবাসার অভিনয়ের সে হয়েছে মূর্খ রাজ্যেশ্বর—বিপুল অসত্যই তার একমাত্র পুঁজিপাটা। কিন্তু আজ তার নেশা ছুটেছে—রঙ্গমঞ্চের বাইরের রূপ এখন প্রকট—সেখানে সে নিঃস্ব, রিক্ত, দীন, কাঙ্গাল। আর শিউলী?

মাথাটা কেমন ঝিম্‌ঝিম্ করে উঠলো—বুকের ভেতর দুঃসহ দাহ। বাজারে ঢুকেই ডান দিকে সে দেখলে একটা মদের দোকান। মদে নাকি ব্যথা ভোলায়—তাই সে চট্ করে সেই দোকানে ঢুকে পড়লো।

সম্পূর্ণ অনভ্যাস—তাই বোতলের সবটা একবারে শেষ কর্‌তে পারলে না—খানিকটা ঢক্ ঢক্ করে গলায় ঢেলেই বোতলটা বগলে নিয়ে সে বেরিয়ে পড়লো।

কোণারকের রাস্তা ধরে যেতে যেতে একটা গাছের তলায় বসে পড়লো—

চোখের সম্মুখে ফুটে উঠলো,—দীনুক্ষ্যাপা, শিউলী, তার প্রণয়ী—

সারাটা দিন নেশার ঘোরে অজ্ঞানের মত গাছ-তলায় পড়ে থেকে রাত্রি ৯টায় সে যখন বাসায় ফিরলো, তখনও তার তেমন জ্ঞান হয় নি। বাড়ী ঢুকেই সে সম্মুখে দেখতে পেল শিউলীকে—চুল তার এলেমেলো—চোখ দু'টী চিন্তা-ব্যাকুল—কিন্তু ওষ্ঠপ্রান্তে অপূর্ব্ব হাসি।

সারাটা দিন সে অনাহারে থেকে, স্বামীর খোঁজে চারদিকে মানুষ পাঠিয়ে—দেবতার কাছে মানত করে, মাথা খুঁড়ে, চোখের জল ফেলে এদিকে-সেদিকে ছুটাছুটি করে, অবশেষে তাকে যখন দূর থেকে দেখতে পেল, তখন তার চিত্তের ভেতর আনন্দের প্রবল তরঙ্গের উদ্দাম-নৃত্য আরম্ভ হয়েছে।

শিউলী উন্মাদিনীর মত ছুটে গিয়েছিল স্বামীকে বরণ করে আন্‌তে—কিন্তু প্রতিদানে যে পুরস্কার সে লাভ কর্‌লো বোধকরি তার বিধাতাপুরুষও তা কখনও ভাবতে পারে নি।

হিংস্র বাঘ যেমন করে তার শিকারকে আক্রমণ করে ঠিক তেম্‌নি করে বিষ্ণুপদ অকস্মাৎ শিউলীর চুলের মুঠা ধরে চেঁচিয়ে বিকৃতস্বরে বলে উঠলো, কুলটা, তাই এত ভোরে তুই বেরিয়েছিলি তোর জারের সঙ্গে মিল্‌তে—দুরবীণ দিয়ে আমি সব দেখেছি—ছিঃ ছিঃ এমন চরিত্রহীন তুই—কুলটার এ বাড়ীতে স্থান নেই—যা—এই মুহূর্ত্তে এখান থেকে বেরিয়ে যা—

এই বলেই সে এমন ভাবে তাকে টান্‌তে টান্‌তে ফটকের বাইরে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলে যে একটা ইটের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে গিয়ে তার কপাল অনেকটা চিরে রক্ত পড়তে লাগলো।

শিউলী—অভাগিনী শিউলী অত্যন্ত দুঃখে, ভয়ে ও আঘাতে সেখানে সেই ভাবে মূর্চ্ছিতা হয়ে পড়ে রইলো—যখন মূর্চ্ছা ভাঙ্গলো তখন রাত্রি বোধ হয় ২টা হবে।

সে তার কাতরতাপূর্ণ ম্লান চোখ দু'টো দিয়ে চেয়ে দেখলে, এ বাড়ীর ফটক তার বিরুদ্ধে রুদ্ধ! একদিন নয়—দু'দিন নয়—চিরদিনতরে এ ফটক তার বিরুদ্ধে রুদ্ধ হ'য়ে গেছে—তার চোখের জলের বন্যাতেও এর এতটুকু কব্জা শিথিল হবে না।

হায় রে, কী অপরাধ আজ তার সুখ-শান্তিকে এম্‌নি করে দুম্‌ড়ে দিলে? তার এতবড় ঐশ্বর্য্যের ভাণ্ডারে দু'মুঠো ভস্ম ভিন্ন এখন আর কি আছে?

নিরুপায় অসহায় শিশুর মত চারদিকে সে ফ্যাল ফ্যাল করে চাইতে লাগলো—হঠাৎ মনে পড়লো শ্যামবাজারের মাসীর বাড়ীর কথা—মনে পড়লো অরুণের কথা—সে হয় তো তাকে সেখানে রেখে আসতে পারে। অম্‌নি চিত্তের অবরুদ্ধ ক্ষোভ ও ব্যথাকে কোনরূপে বুকে চেপে টলে টলে ভিক্টোরিয়া ক্লাবের দিকে যেতে লাগলো।

* * * *

......বিষ্ণুপদ মাস দুই নানাদেশ ঘুরে একদিন দেশে ফিরেই দীনুক্ষ্যাপার পায়ের উপর উপুড় হয়ে পড়ে বললে,—ঠাকুর, তোমাকে চিন্‌তে পারিনি, তাই চেয়েছিলুম তোমার এই ঘর ভাঙতে—কিন্তু আজ আমার নিজের ঘর ভাঙায় বুঝেছি তুমি কত বড়। সেইদিন থেকেই বিষ্ণুপদ ক্ষ্যাপার শিষ্য—আর শিউলী?

অরুণের অবৈধ ভালবাসার একমাত্র অধিকারিণী হয়েও আজ যদি সে অতীতের জন্য দু'ফোঁটা চোখের জল ফেলে, তার জন্য দায়ী কে? সে, ক্ষ্যাপা, না তার বিধাতা?

রাষ্ট্র বনাম ধর্ম্ম

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী এম, এ

সম্প্রতি সোভিয়েট্ রাশিয়া এই মর্ম্মে একটী পঞ্চ-বার্ষিক-কার্য্যসূচী প্রণয়ন করিয়াছে যে তাহার ফলে আগামী পাঁচ বৎসরের মধ্যে রাষ্ট্র হইতে ধর্ম্মের একেবারে উচ্ছেদ সাধন হইয়া যাইবে। অত্যুগ্র সংস্কারপন্থী রাশিয়ার এই অদ্ভুত সঙ্কল্প সমগ্র জগতের "ধার্ম্মিক-গণের" চিত্তে এক দারুণ বিক্ষোভের সৃষ্টি করিয়াছে। অনেকেই বলিতেছেন, "এইবার রাশিয়া একেবারে চির দিনের মত অতল তলে ডুবিয়া গেল। সর্ব্বনাশ! ধর্ম্মই যদি না থাকিল, তবে জাতি থাকিবে কি করিয়া? ধর্ম্মহীন হইলেই ত মানুষের চরম অধঃপতন! ধর্ম্মহীন রাষ্ট্রের কল্পনা যে একেবারেই অসম্ভব! এ পর্য্যন্ত জগতে যত বড় বড় রাষ্ট্রের পতন ঘটিয়াছে, সকলেরই মূলে ছিল ধর্ম্মভ্রষ্টতা। প্রাচীন মিশর, ব্যাবিলন, গ্রীস, রোম ভারতবর্ষ, সকলেরই অধঃপতনের প্রধান কারণ ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুতি। সোভিয়েট শাসনতন্ত্রের নিতান্তই মরণদশা ঘটিয়াছে, তাই ধর্ম্ম-প্রচারের প্রচেষ্টা না করিয়া রাষ্ট্র হইতে ধর্ম্মের উচ্ছেদসাধনের জন্য তাহারা এই সর্ব্বনাশকর প্রয়াসে আত্মনিয়োগ করিতেছে।"

বস্তুতঃই ধর্ম্মহীন রাষ্ট্রের কল্পনা জগতের পক্ষে একটী অভিনব বস্তু। সমস্ত সভ্য দেশেই State Reilgion বা "রাষ্ট্র-ধর্ম্ম" বলিয়া এক একটা ধর্ম্ম প্রচলিত আছে —যেমন ইংলণ্ডের রাষ্ট্রধর্ম্ম, খৃষ্টধর্ম্ম, জাপানের বৌদ্ধধর্ম্ম; আফ্‌গানিস্থানের ইসলাম্ ইত্যাদি। এই সকল রাষ্ট্র-ধর্ম্ম, আছে বলিয়াই যে তত্তৎ দেশের সমস্ত লোকই "ধার্ম্মিক" একথা অবশ্য বলা যায় না; কারণ কেহ কাহাকেও জোর করিয়া "ধার্ম্মিক" করিয়া দিতে পারে না। কিন্তু রাষ্ট্রধর্ম্ম বলিয়া স্বীকৃত যে ধর্ম্ম উহা রাজকোষ হইতে যথেষ্ট অর্থ সাহায্য পাইয়া থাকে এবং এই সকল ধর্ম্মের যাঁহারা "বাহন" বা প্রচারক তাঁহারা ও রাজ-অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত হন না। এই রাষ্ট্রধর্ম্মের সংরক্ষণ ও বিস্তারের জন্য রাজস্বের একটী বিশেষ অংশ ব্যয় করা হইয়া থাকে। বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ্‌গণ মনে করেন যে রাষ্ট্রধর্ম্মের প্রসার যত অধিক হয় রাষ্ট্রের পক্ষে ততই মঙ্গল। কারণ সমধর্ম্মাবলম্বী হইলে প্রজাশক্তি রাজশক্তিকে অন্ততঃ বি-ধর্ম্মী বলিয়া তৎপ্রতি বিদ্বেষপোষণ করিতে পারে না। এই হিসাবে রাজশক্তির সহিত রাষ্ট্র ধর্ম্মের একটা অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ আছে। সুতরাং রাষ্ট্র যদি ধর্ম্ম-বিবর্জ্জিত হয়, তবে এই অন্যতম প্রধান যোগসূত্রের অস্তিত্ব আর থাকে কোথায়? ধর্ম্মের বিলোপ সাধন-রূপ দুষ্ট প্রচেষ্টা দ্বারা রাশিয়া আজ "নিজের পায়ে নিজেই কুড়ুল মারিতে" উদ্যত হইয়াছে। ইহার পরিণাম যে অতি ভয়াবহ তাহাতে অনুমাত্রও সন্দেহ নাই। একটী উদাহরণের দ্বারা এই বিষয়টীকে আরও পরিস্ফুট করা যাক্। মনে করুন আজ রাশিয়া যদি আফ্‌গানিস্থান আক্রমণ করে, আফ্‌গানগণ-স্বাধীনতা রক্ষার জন্য ও যুদ্ধ ত করিবেই, উপরন্তু ইসলামের গৌরব রক্ষার জন্যও প্রাণ পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিতে কুণ্ঠিত হইবে না। দেশরক্ষার সহিত ধর্ম্মরক্ষার গৌরব সংযুক্ত হইয়া তাহা-দিগকে দ্বিগুণ উৎসাহিত করিয়া তুলিবে। আর যদি নয়া রাশিয়ার দৃষ্টান্তে আফগানিস্থান হইতে আজ ইসলাম ধর্ম্ম বিতাড়িত হইয়া শুধু "যুক্তি"র (Reasoning) উপর জাতীয়তা প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে ধর্ম্মযুদ্ধের যে উদ্দীপনা তাহার কি অবসান ঘটিবে না? অবশ্য জাতীয়ভাব যদি প্রত্যেক নর নারীর অন্তরে সর্ব্বদা জাগ-রূক থাকে—জাতীয়তা যদি ধর্ম্মের অপেক্ষা না রাখে, তবে এ কথা আর খাটিতে পারে না। এখন সমস্যার বিষয় হইতেছে এই, কোনটী বড়? জাতীয়তা না ধর্ম্ম? কে কাহাকে রক্ষা করে? রাষ্ট্রের রক্ষক ধর্ম্ম, না ধর্ম্মের রক্ষক রাষ্ট্র?

এখানে বলা আবশ্যক, যে ধর্ম্ম কথাটীর দ্বারা আমরা

কেবলমাত্র আনুষ্ঠানিক ধর্ম্ম বা আচারগত ধর্ম্মবিধিকে বুঝাইতে চাহিতেছি। ধর্ম্মে "বিশ্বাস" থাকা আর ধর্ম্ম-বিধির অনুষ্ঠান করা এই দুইটীর মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। ধর্ম্মের বাহ্যানুষ্ঠান না করিয়াও লোকে প্রকৃত ধার্ম্মিক হইতে পারে, আবার "বার মাসে তের পার্ব্বণ" পালন করিয়াও লোকে ঘোরতর অধার্ম্মিক হইতে পারে। বিশ্বাস অন্তরের বস্তু, বাহ্যানুষ্ঠান বা প্রচলিত বিধি-নিষেধের "ষোল আনা" অনুবর্ত্তন অনেকটা বাহিরেরই জিনিষ। সোভিয়েট শাসনতন্ত্রই হউক আর যে কোন শক্তিশালী রাষ্ট্রই হউক—আইন-কানুন বা জবরদস্তি দ্বারা অন্তরের বিশ্বাসকে টলাইবার শক্তি কাহারও নাই। সমস্ত রাশিয়ার গির্জ্জাঘর আজ নিরীশ্বরবাদী সোভিয়েটের নির্দ্দেশে শ্রমিক ও কৃষকের ক্লাবগৃহ বা প্রমোদাগারে পরিণত হইতে পারে—কিন্তু রাশিয়ায় যদি একজনও "বিশ্বাসী" ব্যক্তি থাকেন তাঁহারই অন্তরের অন্তঃস্তলে যীশুর পবিত্র ভজনাগার চিরদিন সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিবে।

অভিনব গণ-আন্দোলনের প্রবর্ত্তন দ্বারা যাহারা সমগ্র সভ্য জগতের চিন্তাধারায় এক তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছে—তাহারা কি এই সামান্য বস্তুটী ভাবিয়া দেখে নাই? ঈশ্বরের সহিত মানুষের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করা কোন মানুষী শক্তির সাধ্যায়ত্ত নহে। মানুষের সাধ্য নাই যে ঈশ্বরকে অস্বীকার করে। "নাস্তিক" শুধু একটা কথারই কথা—এ পর্য্যন্ত জগতে একজনও নাস্তিকের আবির্ভাব হয় নাই, হয়ত, হইতে পারিবেও না। "নাস্তিক" বলিতে বুঝায় তাহাকে যে কোন প্রচলিত ধর্ম্মমত মানে না—নতুবা "নাস্তিক" আখ্যাধারী ব্যক্তিরাও ভগবানের চিন্তা করে,—এক স্বতন্ত্র, বিশিষ্টভাবে, সাধারণের অনুবর্ত্তন তাহারা করে না এইটুকু মাত্র পার্থক্য।

নয়া রাশিয়া বুঝিয়াছে,জাতীয়তার পরিপন্থী যদি কোন বস্তু থাকে তবে তাহা আনুষ্ঠানিক ধর্ম্মমত। এই ধর্ম্মানুষ্ঠান লইয়া এ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে যত বাদ বিসম্বাদ হইয়াছে, এত আর কোন বস্তুকে উপলক্ষ করিয়া নহে। ধর্ম্মসম্বন্ধে মানুষের যত দৃঢ়তা, এরূপ দৃঢ়তাও যেমন অন্য কোন বিষয়ে নাই, আবার ধর্ম্মসম্বন্ধে মানুষের যত দুর্ব্বলতা তত দুর্ব্বলতাও অপর কোন বস্তুতে দেখা যায় না। ধর্ম্মের খাতিরে মানুষ দেশ ত্যাগ করিয়াছে, স্বাধীনতাকে বিসর্জ্জন দিয়াছে—ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত সকল দেশের ইতিহাসেই পাওয়া যায়; কিন্তু দেশের জন্য যে কেহ "ধর্ম্ম" ত্যাগ করিয়াছে ইহার উদাহরণ আজিও একান্ত বিরল। "ধর্ম্ম" মানুষের মধ্যে মিলন-সেতু রচনা করুক আর নাই করুক, বিচ্ছেদ সিন্ধু যে অনেক ক্ষেত্রেই সৃষ্ট করিয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। জগতের এক একটা জাতির ইতিহাস ধর্ম্মকে উপলক্ষ করিয়া পরস্পরের মধ্যে রক্তারক্তির রোমহর্ষণ বৃত্তান্ত। একজন আর এক জনের ধর্ম্মমত মানেনা বলিয়া মানুষ মানুষকে জীবন্ত দগ্ধ করিতেও কুণ্ঠা বোধ করে নাই। ধর্ম্মের নামে মানুষের প্রতি মানুষের এই পাশব অত্যাচার,—মনুষ্যত্বের অপমান, ইতিহাসের পৃষ্ঠাকে চিরদিনের জন্য কলঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে। উদাহরণের আবশ্যক নাই—যে কোন দেশের যে কোন জাতির ইতিবৃত্ত ইহার যাথার্থ্য প্রতিপন্ন করিবে।

যে সকল বস্তু মানুষের স্বাধীন চিন্তাকে পদে পদে বাধা প্রদান করিয়া তাহাকে সঙ্কীর্ণতার গণ্ডীর মধ্যে টানিয়া আনে, আনুষ্ঠানিক ধর্ম্মমত তাহাদিগের অন্যতম। এই জন্য কোন কোন দার্শনিক বলেন যে ধর্ম্ম মানিয়া চলা একটা দুর্ব্বলতা মাত্র। চিন্তা করিয়া দেখিলে কথাটীকে একেবারে হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না। সাধারণতঃ ধর্ম্ম বলিতে আমরা যে জিনিষটী বুঝি তাহা কতকগুলি লোকাচার ও সংস্কারের সমষ্টি মাত্র। ধর্ম্মের অনুশাসন অনেক সময়ে মনুষ্যত্ব প্রকাশের পরিপন্থী হইয়া দাঁড়ায়। বর্ত্তমান ভারতের অস্পৃশ্যতা আন্দোলনকে ইহার একটী উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বলিয়া গণনা করা যায়। মানুষ হিসাবে মানুষকে ঘৃণা করার মত পাপ আর কি আছে? যতই যুক্তিতর্ক উপস্থাপিত করা হউক না কেন, জাতি বা শ্রেণী হিসাবে মানুষকে যুগযুগান্ত ধরিয়া "অস্পৃশ্য" বলিয়া মানুষের ন্যায্য দাবী হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখার মূলে যে বস্তুটী আছে, সেটীকে "ঘৃণা" ও "ক্ষুদ্রস্বার্থ" ছাড়া আর কিছুই বলা যাইতে পারে না। যে দেবতার নামমাত্র গ্রহণে মানুষ সর্ব্বাবস্থায় "শুচি" হইয়া থাকে, তাঁহারই মূর্ত্ত প্রতীক্ বিগ্রহ দর্শন ও স্পর্শনে মানুষ স্বয়ং আরও পবিত্র না হইয়া সেই দেবতাকে পর্য্যন্ত অপবিত্র করিয়া

ফেলিবে,—এই মনোভাবের রহস্য কে উদ্ঘাটন করিবে? তবু মানুষ শাস্ত্রের দোহাই দিয়া, ধর্ম্মের নামে, মানুষকে দেব মন্দিরের প্রাঙ্গণ হইতে শৃগাল-কুকুরের ন্যায় দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিতেছে। এই যদি ধর্ম্ম হয়, তবে কি করিয়া বলা যায় যে এই ধর্ম্ম মানুষকে বড় করিতেছে, মানুষকে দেবত্বের পথে লইয়া যাইতেছে? হয়ত কেহ বুঝিতেছে, ইহা উচিত নহে, ভগবানের অর্চ্চনায় সকল মানুষেরই সমান অধিকার আছে, দেবতা কাহারও নিজস্ব সম্পত্তি নহেন,—দেবতা বিশ্বজনের; তথাপি সকলের নিকট সে মন্দির দ্বার উন্মুক্ত করিতে পারিতেছে না—তাহার সংস্কারে বাধিতেছে—সে হয়ত ভাবিতেছে, বুঝি বা এই কার্য্যের দ্বারা আমি ধর্ম্মের অনুশাসন লঙ্ঘন করিলাম—হয়ত প্রত্যবায় ভাগী হইলাম। ধর্ম্মের শাসন তাহার উদার মনকে সঙ্কুচিত করিয়া ফেলিতেছে। দেবতার সহিত মিলন ত দূরের কথা, মানুষের সঙ্গেই ধর্ম্ম তাহার বিচ্ছেদ ঘটাইয়া দিতেছে।

রাষ্ট্রের মধ্যে আধুনিক যুগোপযোগী সংস্কার প্রবর্ত্তনে ধর্ম্ম যে কত বড় অন্তরায় হইতে পারে, তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তুরস্ক ও আফ্‌গানিস্থান। গাজী মুস্তাফা কামালের প্রবল শাসনে তুরস্কে যাহা সম্ভব হইয়াছে,—মহানুভব আমীর আমানুল্লাহ্ স্বীয় রাজ্যে তাহারই প্রবর্ত্তন করিতে গিয়া কুটচক্রী ধর্ম্মধ্বজাগণের চক্রান্তে রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া আজ সাধারণ কৃষক-র ন্যায় ইতালীতে নির্ব্বাসিতের জীবন-যাপন করিতেছেন। সকল দেশের নব নব সংস্কারে, চিন্তাধারার নূতনতম বিকাশে, সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল বাধা দেয় "ধর্ম্মের অগ্রদূতগণ"। বিধিনিষেধের নিদারুণ নিগড়ে মানুষের মনকে চিরদিনের জন্য বাঁধিয়া রাখিবার জন্য ইহারা একান্ত উৎসুক। কালের গতিতে সকল বিষয়েরই যে পরিবর্ত্তন ঘটে এবং এই পরিবর্ত্তনই যে একান্ত স্বাভাবিক, তাহা ইহারা কিছুতেই বুঝিতে চাহে না এবং অন্য কেহ বুঝাইতে চাহিলেও তাহা শুনে না। কিন্তু কাল তাহাদের অপেক্ষা রাখে না, সে স্বাভাবিক নিয়মে আপনার কার্য্য করিয়া চলিয়া যায়—। যে দাস-মানাভাব মানুষকে রাষ্ট্রীয় জীবনে পরাধীনতার শৃঙ্খলে দীর্ঘদিন আবদ্ধ করিয়া রাখে—ধর্ম্মবিশ্বাস ও ধর্ম্মানুষ্ঠান হইতেই তাহার প্রথম সূচনা হয়। নির্ব্বিচারে শাশ্বত সত্য বলিয়া কোন বস্তুকে মানা এবং ব্যক্তি বিশেষকে "ভবপারের কাণ্ডারী" বলিয়া স্বীকার করতঃ তাহারই নির্দ্দেশে চলার মুক্ত পথে বিধি নিষেধের গণ্ডী রচনা করা—মানুষের স্বাভাবিক বিবুদ্ধিকে সঙ্কুচিত করিয়া ফেলে; স্বাধীন চিন্তাকে খর্ব্ব ও পঙ্গু করিয়া দেয়; "পরানুকরণ" ও "পরানুসরণের" জন্য মানুষ তখন আপন স্বাধীন সত্তার কথা একেবারে ভুলিয়া যায়। দাস মনোবৃত্তির উদ্ভব হয় এই ভাবে এবং ক্রমে ক্রমে তাহার প্রভাব জীবনের অপর সকল ক্ষেত্রে বিস্তারিত হইয়া পড়ে। "গুরু বাদ" ও "অবতার বাদ" এদেশের যত অধিক ক্ষতি করিয়াছে, তত আর কোন কিছুতেই নহে। মানুষ "পাপী" মানুষ "অসহায়"—পাদরি মোল্লা বা গুরু ছাড়া তাহাকে মুক্তির সন্ধান বলিয়া দিবার আর কেহ নাই—এই কথা শুনিতে শুনিতে মানুষ সত্যই যেন অসহায় হইয়া পড়িয়াছে—মানুষের মধ্যে জাতির মধ্যে দেশের মধ্যে একটা জাড্যের ভাব আসিয়া গিয়াছে। যে দেশ গোঁড়ামি ও ধর্ম্মান্ধতা হইতে যত মুক্ত, সেই দেশ সভ্যতার ক্ষেত্রে তত উন্নত।

পরাধীন দেশে রাষ্ট্রীয় ঐক্য সংগঠন ব্যাপারে ধর্ম্মের মত এত বড় বিঘ্ন আর নাই,—বিশেষতঃ সেই দেশে যদি একাধিক ধর্ম্মমত প্রচলিত থাকে। কোন কিছু ঘটিবার আগেই ধর্ম্মধ্বজীগণ "কালনেমীর লঙ্কা ভাগ" কার্য্য সুরু করিয়া দেন,—ভবিষ্য শাসনতন্ত্রে কোন্ ধর্ম্মাবলম্বীর জন্য কতটা স্থান নির্দ্দিষ্ট থাকিবে তাহার নির্ণয়ের জন্য। রাষ্ট্রের সহিত ধর্ম্মের এ ভাগাভাগি বাস্তবিকই বড় অদ্ভুত! রাষ্ট্রে স্থান লাভ হওয়া উচিত; —"নাগরিক হিসাবে," দেশের অধিবাসী হিসাবে—তাহা না হইয়া কে কোন্ ধর্ম্মে বিশ্বাস করেন বা কে কোন্ ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন ইহাই হইল রাষ্ট্রীয় জীবনের মাপ কাঠি! ফলে ঐক্য আর কখনও হয় না,—ভাগ-বাঁটোয়ারার গণ্ডগোল লইয়াই দিন কাটিয়া যায়। পরাধীনতার শৃঙ্খল দীর্ঘ হইতে দীর্ঘতর হইয়া পড়ে!

ধর্ম্মবস্তুটী ব্যক্তিগত হওয়াই উচিত। যাহার যেমন

প্রবৃত্তি, তিনি সেই ধর্ম্মেরই অনুসরণ করুন। একই পরিবারের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি যদি বিভিন্ন ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন তাহাতেই বা ক্ষতি কি! ব্যক্তিগত বিশ্বাসকে পারিবারিক জীবনে বা রাষ্ট্রনৈতিক জীবনে টানিয়া আনিবার আবশ্যক কি? সম ধর্ম্মাবলম্বীগণের মধ্যের যদি মিলন হয় হউক, তাহাতে লাভ ভিন্ন ক্ষতি নাই। কিন্তু আমার ধর্ম্ম অন্যে মানে না বলিয়াই যে আমার জন্য রাষ্ট্রেও একটা স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করিতে হইবে ইহা রাষ্ট্রের উন্নতির একান্ত পরিপন্থী। বিভিন্ন দাবীদারগণের সংখ্যা যতই অধিক হইবে রাষ্ট্রশক্তিও তত বিচ্ছিন্ন ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে; পরিণামে হয়ত রাষ্ট্রের অধঃপতন ঘটিবে। স্থূলতঃ যাহাই হউক সূক্ষ্মতঃ বিচার করিলে বুঝা যায় রাষ্ট্রের সহিত ধর্ম্মের বিশেষ কোন অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ নাই। রাষ্ট্রের মুখাপেক্ষী না হইয়াও যখন লোকে ধর্ম্মাচরণ করিতে পারে, তখন ধর্ম্মের বোঝা রাষ্ট্রের ঘাড়ে না চাপানোই ভাল।

ধর্ম্ম রাষ্ট্রের কল্যাণ করিতে যতটা পারুক আর নাই পারুক রাষ্ট্রীয় নাগরিকগণের মধ্যে ধর্ম্মগত অধিকা[র] লইয়া অকল্যাণ বহন করিয়া আনিবার শক্তি তাহা[র] যথেষ্টই আছে।

সোভিয়েট রাশিয়া যে আজ জবরদস্ত আইন-কানুনে[র] দ্বারা দেশ হইতে ধর্ম্মের উচ্ছেদসাধনের প্রচেষ্টা ন[া] করিয়া, ধীরে ধীরে "যুক্তি ও বিচার মুলক" কার্য্যে[র] দ্বারা ধর্ম্মবিধির বিলোপসাধন করিতে চাহিতেছে— ইহাকে একরূপ মন্দের ভাল (?) বলিতে হইবে। তাহাদের এই প্রয়াস সফল হইবে কি না—তাহা[র] বিচার করিবার দিন আসিবে পাঁচ বৎসর পরে। বর্ত্তমানে এই কথাটী শুধু নিঃসঙ্কোচে বলা যায়—যে তাহাদের এই অভিনব সঙ্কল্পের দ্বারা তাহারা আজ জগতের সমস্ত রাজনৈতিক মহলে একটী নূতন সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে—ধর্ম্মকে বাদ দিয়া রাষ্ট্র টিকিতে পারে কিনা। এ পরীক্ষা বড় কঠোর! তাই সমগ্র সভ্য জগৎ আজ বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে নয়া রাশিয়ার দিকে চাহিয়া আছে—এই বিপ্লবী তরুণের দল কোন্ পথে চলিয়াছে—সর্ব্বনাশের না কল্যাণের?

আকাঙ্ক্ষা

শ্রীঅর্পিতা দেবী

এসেছে জীবন-সন্ধ্যা আজি,
যৌবনের অভিনয়ে নামে ধীরে যবনিকা
সমাপনী শঙ্খ উঠে বাজি।
আজি শুধু বলো একবার
মোরে বেসেছিলে ভালো বন্ধু হে আমার!
এসেছে মলিন হয়ে প্রভাতের রবি ভাতি,
বন্ধু! এই মহা শুভলগন;
প্রেমের দীপালী জ্বালি জাগো মোর শুকতারা,
উজলিয়া আঁধার গগন।

যৌবনের খর-সূর্য্য করে
যে আলো লুকানো ছিলো আজি তা উঠুক ফুটে
সায়াহ্নের শ্যামল অম্বরে।
দিবসের কোলাহলে যে রাগিণী ছিলো মিশে,
এ নীরব নিভৃত সন্ধ্যায়
তোমার বাঁশরি-রন্ধ্র পরিপূর্ণ করি আজ
সেই সুর শুনাও আমায়।
বলো, শুধু বলো একবার,—
হাসি, অশ্রু, সুখে, দুখে, মোর তরে ঐ বুকে
ভরা ছিলো প্রণয় তোমার।

নিয়তির খেলা

গল্প—

শ্রীরেণুকা দাস

দেয়ালের বড় ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া ছয়টা বাজিয়া গেল। ঘণ্টার শব্দে অনিলার ঘুম ভাঙ্গিয়া ধর-ফর করিয়া বিছানায় উঠিয়া বসিল। দুইহাতে চক্ষু রগড়াইতে রগড়াইতে জোর করিয়া উঠিয়া দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিয়া ভাল করিয়া একবার চাহিয়া লইল, কিন্তু চোখের ঘুম কিছুতেই ছুটিতে চাহে না। খানিকটা জল চোখে ছিটাইয়া দিয়া নিদ্রার জড়তা দূর করিতে চেষ্টা করিল। তারপর গোবর গুলিয়া উঠানময় ছড়া দিল। হাত ধুইয়া অনু যখন রান্নাঘরের দরজা খুলিল, তখনও তাহার চোখে ঘুমের জড়তা রহিয়াছে। প্রতিদিনই তাহার কাছে সকাল বেলাটা একটা রুক্ষ মমতাহীন মূর্ত্তি লইয়া দাঁড়ায়। শীতের কুয়াশাচ্ছন্ন সকালে যখন রবির কিরণে সোনালী আভা বিস্তার করে, তার বহু পূর্ব্বেই অনুর সকল কাজ শেষ হইয়া যাওয়া চায়। তাই সকালে উঠিয়াই একবার ইচ্ছা হয় কাঁদিয়া লয়, কিন্তু তারও যেন সময় নাই। রান্নাঘর নিকানো হইলে সকাল বেলার বাসি ঠাণ্ডাজলে অনুর আঙ্গুল গুলি যখন বাঁকিয়া ওঠে, একহাত দিয়া অপর হাতের আঙ্গুলগুলি টানিয়া লয়।

তারপর সকাল বেলার খাওয়ার পর্ব্ব। এর ওটা চাই, তার এটা চাই করিতে করিতে ঘণ্টার কাটা প্রায় আটটার কাছে আসিয়া দাঁড়ায়। অনু অস্থির হইয়া রান্নার জোগাড়ে লাগিয়া যায়। রান্নাবারার কাজ শেষ করিয়া ছেলেদের ইস্কুলে পাঠাইয়া—অনু বাতে অচল শাশুড়ীকে স্নান করাইয়া যখন ভাত খাওয়াইয়া দেয়, তখন এগারটা বাজিয়া যায়। নিজের স্নান খাওয়া কোন প্রকারে সারিয়া, রান্না ঘরের খুটি নাটি কাজগুলি শেষ করিয়া, দরজায় শিকল তুলিয়া দিয়া, নিজের ঘরটীতে আসিয়া শুইয়া একটু গড়াইয়া লয়। উদয়াস্তের মধ্যে অনুর দুপুরের এই কয়েকঘণ্টা মাত্র ছুটী। সারাদিনের মধ্যে তার যেন নিশ্বাস লইবার সময় নাই। দিবা-নিদ্রা অনুর স্বভাব-বিরুদ্ধ, তাই দুপুরটাকে মধুময় করিবার জন্য সে তাহার সযত্ন সঞ্চিত চিঠির প্যাড্‌খানা লইয়া বসে। আজও অনুর বিছানা ভাল লাগিল না, উঠিয়া সে চিঠির প্যাড্‌খানা আনিয়া ছোট বড় মাঝারী অনেকগুলি খাম বাহির করিল, এবং ভিতর হইতে চিঠি গুলি টানিয়া বাহির করিয়া পড়িতে লাগিল। এই কাজটা যেন তাহার নিত্য কর্ম্মের মধ্যে গণ্য হইয়াছিল। ইহা যে তাহার স্বামীর চিঠি, অনুর বড় আদরের। নিয়মিতভাবে প্রতি সপ্তাহে একখানা করিয়া চিঠি স্বামী তাহাকে লিখে, কদাচ ইহার ব্যতিক্রম হয় না, কিন্তু ছয়মাস যাবত ক্রমে ক্রমে হ্রাস হইয়া আসিতেছে, অনু চিন্তা করিয়া ঠিক করিতে পারে না কেন এমন হয়। লিখিলে জবাব দেয়, "বড্ড কাজের তাড়া, সময় হয় না„ তুমি চিন্তা করো না।" অনু ভাবে—দুঃখের দিন বুঝি অবসান হইবার পথে আসিয়াছে। অনুর বুক আনন্দে দুর দুর করিয়া উঠে, হয়তঃ কাজ এত বেশী যে তিনি সময় মত চিঠি-লিখিতেও পারেন না। এতদিনে যদি চিররুগ্না মাতা ও ছোট ভাই-বোন গুলিকে সুখী করিতে পারেন। তাদের দরিদ্রের সংসার, অভাবের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়াই অভ্যস্ত, সচ্ছলতা কাহাকে বলে স্বামী কিম্বা মাতা কেহই জানেন না। এই সকল দুঃখ কষ্ট ঝড় ঝাপ্‌টা মাথায় লইয়া সুদূর বিদেশে স্বামীকে যাইতে হইয়াছে—অর্থোপার্জ্জনের জন্য। ভবিষ্যতের সুখের কল্পনা মনে আঁকিয়া অনু, চিঠি না পাওয়ার বেদনা ভুলিতে চেষ্টা করে। তাই গত সপ্তাহে ও যখন চিঠি আসিল না, অনু, পুরানা চিঠি বাহির করিয়া পড়িতে লাগিল। সংসারের কাজের মধ্যে অনু, নিজ্‌কে ডুবাইয়া রাখে, কিন্তু প্রাণে শান্তি পায় না।

এক শ্রাবণে শুক্ল পঞ্চমী তিথিতে অনু একরাশ রূপ ও দুই হাজার টাকা লইয়া যখন স্বামী জয়ন্তের

পাশে দাঁড়াইল, শাশুড়ী সেদিন আনন্দে কাঁদিয়া ফেলিয়াছিলেন, অনুর—জগদ্ধাত্রীর মত রূপ আর একসঙ্গে এতগুলি টাকা, যাহা তিনি কোনদিন কল্পনাও করিতে পারেন না, একসঙ্গে দুই অমূল্য সম্পদ লাভ করিয়া আনন্দের আতিশয্যে—শাশুড়ীর চোখে জল গড়াইয়া পড়িয়াছিল।

জয়ন্ত তখন সবে মাত্র বি-এ পাশ করিয়া বাহির হইয়াছে, অনুর সুন্দর মুখখানা একহাতে তুলিয়া ধরিয়া জয়ন্ত বলিয়াছিল, "অনু আমরা বড় গরীব, তোমাকে অনেক দুঃখ কষ্ট সইতে হবে। আমার ছোট ভাই বোনদের—ভার, আজ হ'তে তোমার উপর। মাকে তো দেখ্‌তেই পাচ্ছ চিররোগা, কোনদিন দুবেলা সমানে রেঁধে আমাদের' দুটী খেতে—দিতে পারেনি, কিন্তু সবই তাঁকে করতে হতো অদৃষ্টের দোষে। বাবা যতদিন বেঁচে ছিলেন, তবুও খাওয়া পরার জন্য বিশেষ ভাব্‌তে হয়নি, কিন্তু তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই সকল দায়িত্ব আমাকে ভর কর'ল। বাবার মৃত্যুর পর আমরা একেবারে নিরাশ্রয় হয়ে পড়ি, সেই দুঃখের কাহিনী তোমাকে বল্লে, বড় ব্যথা পাবে। জানি না ভগবানের কোন্ মহৎ উদ্দেশ্য আমা দ্বারা সাধন হবে, তাই এই দুঃখ দারিদ্র্যের মধ্যে তোমাকে আজ সাথী পেলাম। অনু বড় বিশ্বাস, তোমাকে দিয়ে আমার সকল সাধনা সফল হবে।" সেদিন অনু মনে মনে প্রার্থনা করিয়াছিল সে যেন এ বাড়ীতে সুখের প্রদীপ জ্বালাতে পারে। অনুর আন্তরিক প্রার্থনা কিছুটা সফল হইয়াছিল।

নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাসে ধনীর দুলালী অনু—এ-বাড়ীতে আসিয়াছিল। বিবাহের পর অনুর পিতা জয়ন্তকে এম-এ পড়িতে অনেক উপদেশ দিয়াছিলেন, কিন্তু সে উপদেশ জয়ন্ত রক্ষা করিতে পারিল না। সে অনুকে বিবাহ করিয়া, নিজেকে সর্ব্বদাই অনুর নিকট অপরাধী মনে করিত, যে অনুর—একটা মুখের কথার অপেক্ষায় কত দাস দাসী থাকিত, সেই অনুকে আনিয়া সে কোথায় ফেলিয়াছে। তাই সে পড়া ছাড়িয়া টাকা রোজগারের চিন্তা করিতে লাগিল। প্রায় বছর খানেক নানাদিকে চেষ্টা করিয়া যখন কোন সুবিধাই হইল না, তখন জয়ন্ত ব্যবসা করিতে সঙ্কল্প করিল। শ্বশুরের দেওয়া টাকা হইতে, এবং আরো কিছু টাকা সংগ্রহ করিয়া, জয়ন্ত রেঙ্গুন যাত্রার উদ্যোগ করিতে লাগিল। অনু কিন্তু কিছুতে রাজী হইল না, অনুর বাবাও সংবাদ পাইয়া অনেক বুঝাইয়া চিঠি লিখিলেন। কিন্তু জয়ন্ত কোন বাধাই মানিল না সে অদৃষ্টের সঙ্গে যুঝিয়া দেখিবে, দিন ফিরে কিনা। ধনী শ্বশুরের টাকায় বসিয়া বসিয়া মূঢ়ের ন্যায় বিলাসে দিন কাটাইবে ইহা তাহার আত্মসম্মানে ঘা লাগে। মা কাঁদিয়া অস্থির হইয়া বলিলেন,—"এদেশে কি চাক্‌রী মেলেনা বাবা, তোকে ঐ সাত সমুদ্র তের নদীর পারে বনবাসী করে, আমি কোন প্রাণে ঘরে থাক্‌বো?"

জয়ন্ত মাকে ও অনুকে বুঝাইয়াছিল, প্রথম দু'এক বছর, তারপর যদি কপাল লেগে যায়, তবে তোমাদের সবাইকে আমার কাছে নিয়ে যাব—'মা'। জয়ন্তের যাত্রার দিন খুব ভোরে উঠিয়া অনু, গৃহদেবতা নারায়ণের ঘরে গিয়া করজোড়ে প্রার্থনা করিতে বলিল, "হে ঠাকুর ওঁকে সকল বিপদ হ'তে রক্ষা করো।" যাত্রার সময় মঙ্গলচণ্ডীর দুর্ব্বা রুমালের এক কোণে বাঁধিয়া দিয়া, শাড়ীর আঁচলে একবার চোখ মুছিয়া লইল। তারপর যখন জয়ন্ত মাকে প্রণাম করিয়া ভাই-বোনদের আদর করিয়া, অনুর ঘরে আসিয়া বসিল, জয়ন্তের চোখ দিয়াও দু'ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল। অনু নিজেকে খুব শক্ত করিয়া প্রস্তুত হইয়াই আসিয়াছিল, তাই শাড়ীর আঁচলে জয়ন্তের ভিজা চোখ দুটী মুছাইয়া দিয়া বলিল, "প্রতি সপ্তাহে চিঠি লিখতে ভুলো না।" জয়ন্ত অনুর ডান হাতখানা চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "যদি পারি এক বছরের মধ্যেই তোমাকে আমার কাছে নিয়ে যাবো অনু।" চিরদিন তোমাকে চোখের সামনে রাখতে পারি সেই আশায়, আজ তোমার প্রাণে যে ব্যথা দিলুম, তার চতুর্গুণ ব্যথা আমি নিজে পেয়ে এই দূর দেশে যাচ্ছি। তারপর অনেক আলাপ আলোচনার পর, চোখের জলের ভিতর দিয়া বিদায় দৃশ্য সমাপ্ত হইল।

জয়ন্ত রেঙ্গুন গিয়াছে, ঠিক তিন বছর, ইহার মধ্যে সে দুইবার দেশে আসিয়াছে। কিন্তু অনু ও মাকে নিজের কাছে নিয়া যাইতে পারে নাই। কারণ সেখানে গিয়া জয়ন্ত ব্যবসার কোন সুবিধাই করিতে পারিল না। প্রথম বছর হ'তের সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়া কোন কারবারই খাড়া করিতে পারিল না। বহুদিন পর অনেক চেষ্টার পর এক ভদ্রলোকের সহায়তার জয়ন্তের একটা ভাল কাজ জুটিয়া গেল। নিজের জন্য যৎসামান্য টাকা রাখিয়া, জয়ন্ত সমস্ত টাকা বাড়ী পাঠাইয়া দিত। এবং লিখিয়া দিল একটা চাকর যেন রাখা হয়। অনু যে কত কষ্টে সংসারের কাজ করে, তাহা মাতার চেয়ে জয়ন্ত বেশী জানে। অনু কিন্তু চাকর রাখিল না, সেই টাকায় ছোট দুটী ননদকে স্কুলে ভর্ত্তি করাইয়া দিল। সংসারের কাজ নিজেই করিয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু স্বামীর চিঠি রীতিমত আসে না বলিয়া মাঝে মাঝে বড় মুস্‌ড়াইয়া পড়িতে লাগিল। এইভাবে আরো কিছুদিন কাটিয়া গেল। জয়ন্তের চিঠি ক্রমে ক্রমে কমিয়া গিয়া একেবারেই বন্ধ হইয়া গেল। শাশুড়ী কাঁদিয়া শয্যাগত হইলেন। অনু প্রথম কাঁদিল, তারপর মন ঠিক করিয়া পিতাকে জানাইল, এবং স্বামীর নিকট, এই বলিয়া টেলি পাঠাইয়া দিল যে, অনুর বড় অসুখ, সত্বর চলিয়া আস। কিন্তু তার না আসিল জবাব না আসিল জয়ন্ত নিজে। অনু একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। উপায়ান্তর না দেখিয়া, তাহাকে লইয়া যাইবার জন্য পিতাকে চিঠি লিখিল। অনু ধনীর মেয়ে হইলেও কোনদিন শ্বশুর বাড়ী ছাড়িয়া, বাপের বাড়ী যাইতে চাহিত না। নিজে গরীব বলিয়া প্রতিবেশী কিম্বা বাড়ীর দাস দাসীরা তাহাকে কৃপার চক্ষে দেখিবে, তাহা সে সহিতে পারিত না। তাই প্রথম কয়েকবার গিয়াছিল। স্বামী বিদেশে যাওয়ার পর অনু আর পিত্রালয়ে যায় নাই। বৃদ্ধ পিতা এই জন্য সর্ব্বদা মর্ম্মান্তিক ব্যথা লইয়া থাকিতেন তাই যেদিন অনুর চিঠি পাইলেন, সে দিনটা তাঁহার বড় আনন্দের দিন। যথা সময়ে লোক পাঠাইয়া অনুকে আনাইলেন।

অনুর চেহারা দেখিয়া পিতা বড়ই আতঙ্কিত হইলেন। তাহার এত আদরের অনুর একি চেহারা হইয়াছে, অনু বহুদিন পরে পিতাকে পাইয়া বড়ই কাঁদিল, যেদিন সে এ বাড়ী ছাড়িয়া স্বামীর সঙ্গে চলিয়া যায়, সেদিন তাহার এই বৃদ্ধ ছেলেটীকে কত অসহায় করিয়া ফেলিয়া গিয়াছিল। চাবির গোছাটী পর্য্যন্ত যাওয়ার সময় বাবার হাতে দিয়া বলিয়াছিল, 'বাবা নীচের দেরাজে তোমার গরম পোষাক, মাঝেরটাতে ধুতি, চাদর, পাঞ্জাবী—রুমাল। ক্যাস বাক্সের অমুক খোপে অত টাকা' ইত্যাদি বার বার বলিয়া গিয়াছিল। তারপর যে দুইবার সে আসিয়াছে, তখন জয়ন্ত সঙ্গে ছিল।—এইসব দেখিবার যেন তাহার সময়ই হয় নাই। আজ বহু-দিন পরে অনু তার স্নেহের নীড়ে ফিরিয়া আসিয়াছে, পূর্ব্বের সকল কথা মনে হইয়া দুঃখে সকল হৃদয় হাহাকার করিয়া উঠিল। সে জয়ন্তের জন্য সকল সুখ-বিসর্জ্জন দিয়াছে, অসহায় বৃদ্ধ পিতার বুকে দুঃখের শেল হানিয়াছে। আর আজ—জয়ন্ত অনায়াসে তাহাকে ভুলিয়া গিয়াছে। সেই বা পারিবে না কেন ? তাই জয়ন্তের স্মৃতি ঝাড়িয়া ফেলিয়া অনু নূতন করিয়া পিতার সেবায় মন দিল। আর না, এবার সে মন স্থির করিয়াছে। রাত্রে আহারের সময় অনু পিতার পাতের কাছে বসিয়া রহিল। কিন্তু একটা কথাও বলিতে পারিল না। কি যেন একটা ব্যথার কাঁটা তাহার গলার মধ্যে বিঁধিয়া গিয়াছে। অনেক-ক্ষণ—চুপ চাপ থাকার পর পিতা অনুকে বলিলেন—"অনু জয়ন্ত বাড়ীতে টাকা পাঠায় না, তবে তোমাদের কি ভাবে চলে ?" অনুর বুকের ভিতরটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল, জয়ন্ত যে টাকা পাঠায় না, এ খবরও বাবা তা হলে রাখেন। লজ্জায় রাঙ্গা হইয়া অনু পিতাকে জানাইল, যে সম্প্রতি তাহার বড়—দেওরটী বি-এ পাশ করিয়াছে, সে দুই জাগায় দুইটী টিউশনী জোগাড় করি-য়াছে। এবং দিন-রাত হাড় ভাঙ্গা খাটুনী খাটিয়া সংসার চালাইতেছে। ইহার অধিক কথা অনু আর সেদিন বলিতে পারিল না। তাহার সমস্ত অন্তর বিদ্রোহী হইয়া জাগিয়া উঠিল জয়ন্তের বিরুদ্ধে। কিন্তু জয়ন্ত কি জন্য—কেন—টাকা পাঠায় না—বা তাহাদের কোন খোঁজ খবর লয় না, সে কথা অনু

একবারও ভাবিয়া দেখে নাই। তাহার মনে হইয়াছে, জয়ন্তের এটা খাম খেয়ালী ছাড়া কিছুই নয়। আহারের পর অনু, পিতার মশারী ফেলিয়া দিতে গিয়া দেখিল, পূর্ব্বেই চাকর দ্বারা এই কাজ সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে অনুর যাওয়ায় এই সকল ছোট খাট কাজও চাকদের হাতে গিয়া পড়িয়াছিল। কোনও কথা না বলিয়া ঘর হইতে চলিয়া গেল, এবং পাশের ঘরে গিয়া অনু তাহার শ্রান্ত-দেহ বিছানায় এলাইয়া দিয়া অচিরে ঘুমাইয়া পড়িল। পরদিন অভ্যাসমত খুব ভোরে উঠিয়া অনুর প্রথম শাশুড়ীকে মনে পড়িল। সে চলিয়া আসিয়াছে, আজ—তাঁহার না জানি কত কষ্ট হইতেছে। কিন্তু তাকে বাধ্য হইয়া এই কষ্ট দিতে হইয়াছে।

সকাল বেলাকার খাওয়া কোনপ্রকারে শেষ করিয়া, অনু পিতার টেবিলের নিকটে গিয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতেছিল, বহুদিন পূর্ব্বে-নিজের হাতে; এই লিখিবার টেবিলখানা না গুছাইলে সে তৃপ্তি পাইত না, যে ভাবে সে আগে টেবিল সাজাইয়া রাখিত, লিখিবার সরঞ্জাম, কাগজ পত্র আজও সেইভাবে সাজানে রহিয়াছে তবুও অনুর ইচ্ছা হইল, সে ঝাড়িয়া মুছিয়া টেবিল-খানা নূতন করিয়া গুছাইয়া দেয়। আস্তে আস্তে সব গুলি কাগজ পত্র বই মাটিতে নামাইয়া রাখিয়া, মনের মত করিয়া গুছাইল। ড্রয়ার খুলিয়া সব চিঠি পত্র ঢালিয়া—সে গুছাইতে গুছাইতে—খান কয়েক চিঠি—পড়িয়া একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল। তারপর তাড়াতাড়ি কোন প্রকারে—চিঠিগুলি পুনরায় ড্রয়ারে গুঁজিয়া সশব্দে বন্ধ করিয়া, বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িল। তাহার মুখ পাথরের মত কঠিন, সকল রহস্যের সমাধান হইয়া গেল। পিতার বুকের ভিতরটা স্বচ্ছ জলের মত তাহার চোখে ভাসিয়া উঠিল। সারাদিন অনু কিছু খাইল না, সকলকে জানাইল তাহার অসুখ হইয়াছে। সূর্য্য যখন প্রায় ডুবু-ডুবু--অনু হঠাৎ এক লাফ দিয়া উঠিল, সূর্য্যদেবকে জোড়হাতে প্রণাম করিয়া মনে-মনে প্রার্থনা করিল, তোমার মত শক্তি যেন শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত থাকে।

গভীর রাত্রে অনু জাগিয়া সমস্ত বিষয়টা চিন্তা করিয়া দেখিল, বাবাকে সে সকল কথা বলিয়া নিজের বুকের ভার কিছু লাঘব করিবে, এবং বাবাকে স্নেহাই দিবে। যে জ্বালা লইয়া অহ-রহ—পিতা তাহাকে এড়াইয়া চলেন, অনু আসার পর হইতে ইহা লক্ষ্য করিয়াছে। কিন্তু কারণ বুঝিতে পারে নাই। এই প্রকার মরণ যন্ত্রনায় অনুর আরো একসপ্তাহ কাটিয়া গেল। এবং পিতার ড্রয়ার খুলিয়া, একে—একে নানা লোকের চিঠি পড়িয়া জয়ন্ত সম্বন্ধে সমস্ত বিষয় অবগত হইল।

সেদিন সারা-দিনই টিপ-টিপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতে ছিল খুব জরুরি কাজ না হইলে, লোক ঘরের বাহির হইতে চাহে না, এমনি কদর্য্য দিন। জয়ন্তের অধঃ-পতনের সীমা চরম সীমায় ঠেকিয়াছে,—সে ব্রহ্মমহিলা লইয়া সুখে সংসার পাতিয়াছে।—অনু তাহার পূর্ব্ব পরিচিত—একজন বান্ধবী মাত্র।

রাত্রি তখন সাড়ে বারোটা।—অনু আর চিন্তা করিতে পারিল না, মাথার শিরাগুলি দপ্ দপ্ করিয়া উঠিল। তাহার ইচ্ছা হইতেছিল, পিতাকে গিয়া জিজ্ঞাসা করে, কেন এই সকল কথা এতদিন গোপন রাখিলেন, আগে জানিলে অনু কি করিতে পারিত, সেটুকু সে ভাবিল না। শাশুড়ীর জলভরা চোখদুটী মনে করিয়া অনু কাঁদিয়া ফেলিল। সবই যদি গেল সেই বা—কিসের মোহে জগতে বাঁচিয়া দুঃখের আগুনে জলিয়া মরিবে। মরণ যেন তাহাকে হাতছানি দিয়া ডাকিতেছে। আর ইতঃস্তত নয়—এই সময়। অনু কাগজ কলম লইয়া, পিতাকে লিখিল। "বাবা" ছোট বেলায় মাকে হারাইয়া তোমার বুকে—বাড়িয়াছিলাম, তারপর আজ যাকে হারাইয়াছি, এরপর আর বাঁচিতে সাহস হয় না, যদি বা তোমাকেও হারাইয়া ফেলি, সেই ভয়ে আগেই পালাই।

তোমার অযোগ্য সন্তান—'অনু'—

বিছানার উপর চিঠিটা মেলিয়া রাখিয়া, অনু সন্তর্পণে ঘরের দরজা খুলিয়া বাহির হইল। বাবাকে দেখিবার একটু সাধ হইল না। মায়ের মুখ মনে জাগিল না, বিনা আড়ম্বরে অনু ঘরের বাহির হইয়া,—এক দৌড়ে রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইল। তখনও ছিট বৃষ্টি হইতেছিল। অনু কোন্ সময় যে নদীর পারে আসিয়া দাঁড়াইল, সে মোটেই টের পাইল না। তারপরই ধুপ করিয়া একটা শব্দ হইয়া—নদীর স্রোতের জলে অনুর সুন্দর দেহ তলাইয়া গেল।

আধুনিক সাহিত্য

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মিত্র এম-এ

'Saint's Progress' by John Galsworthy.

যাঁহারা বাংলা সাহিত্যে দুর্নীতির গন্ধে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছেন, তাঁহাদিগকে এই পুস্তকখানি পাঠ করিতে অনুরোধ করি। সাহিত্য কি এবং সাহিত্যের গতি কোথায় শেষ হয় তাই লইয়া যাঁহারা আলোচনা করেন, তাঁহারা কি জানেন না সাহিত্যের ব্যাপকতাই তাহারা প্রাণ। ক্ষুদ্র জলাশয় যতই বৃহৎ হউক না কেন উহা ক্ষুদ্র, হইতে পারে উহার জল মিষ্ট, কিন্তু সমুদ্র চিরকালই বিশাল এবং কোনকালেই উহার লবণাক্ততা ঘুচিবে না। সাহিত্যের গতির দিকে দৃষ্টিপাত করিলে আমরা এই সত্যটী বেশ স্পষ্ট করিয়াই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি। অসভ্য জাতিদের সাহিত্য কত ক্ষুদ্র, তাহার পর জাতি যেমন সভ্য হইতে থাকে তাহার সাহিত্যেও সেইরূপ বিশালতা আসিয়া দেখা দেয়। মধ্যযুগে ইউরোপের প্রত্যেক দেশগুলির দৃষ্টি Chivalry প্রভৃতি কয়েকটী তত্ত্বের মধ্যেই আবদ্ধ থাকিত। এইজন্য এই যুগে Canterbury tales ব্যতীত সেক্সপীয়ারের কোন নাটক রচিত হইতে পারে নাই। বাংলার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেও এই সত্যই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায়। বাঙ্গালী জাতি এককালে ব্যবসা-বাণিজ্য করিত। সপ্তগ্রাম তাহার প্রধান বন্দর ছিল। বাংলার ব্যবসায়ী জাতির প্রচুর অর্থ ও ঐশ্বর্য্য ছিল। কবিকঙ্কণের চণ্ডি, মনসার ভাসান, বেহুলা প্রভৃতি কাব্যে তাহার সুস্পষ্ট আলেখ্য প্রস্ফুটিত হইয়া আছে। তাহার পর বাংলার দৃষ্টি যখন সীমাবদ্ধ হইয়া আসে, তাহার ব্যবসা-বাণিজ্য লুপ্ত হইয়া যায়, তখনকার যুগে আমরা অন্নদা-মঙ্গল, বিদ্যাসুন্দর, রাম-প্রসাদী গানই দেখিতে পাই।

সাহিত্য কি এ কথার উত্তর দিতে গেলে বলিতে হয়, সাহিত্য জাতির ধ্যান-ধারণার একখানি জীবন্ত আলেখ্য। সত্য কথা অনেক সময়েই শ্রেণী বিশেষের তৃপ্তিকর না হইতে পারে, কিন্তু জগত তাহাতে সাড়া দিয়া থাকে। এইজন্য যখন আলেখ্য খুব সুস্পষ্ট হয়, তখনই দেশে সাড়া পড়িয়া যায়, আন্দোলন উপস্থিত হয়। সংসারে সনাতন বলিয়া কিছুই নাই, সবই যুগধর্ম্ম। যুগে যুগে ধর্ম্ম ভিন্নাকার ধারণ করিয়া থাকে। গীতার ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয় যে যুগে যুগে যুগাবতারের প্রয়োজন হয় নূতন যুগধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য, নূতন সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য। বেদোক্ত ধর্ম্মের সহিত পৌরাণিক যুগের অনেক পার্থক্য লক্ষিত হয় নাকি? আবার পৌরাণিক যুগের সহিত প্রাথমিক ঐতিহাসিক যুগের অনেক পার্থক্য নাই কি? সুতরাং যাহা ছিল—তাহার জন্য দীর্ঘ-শ্বাস না ফেলিয়া, যাহা আসিতেছে তাহাকে যুগের উপযুক্ত সহায়করূপে বরণ করিয়া লওয়াই কি যুক্তিযুক্ত নয়।

যাঁহারা ভাবেন সাহিত্য শুধু মাত্র 'রস'ই সৃষ্টি করে, আমাদের মনে হয়, তাঁহারা সাহিত্যকে খুবই অস্পষ্ট ও সঙ্কীর্ণতার গণ্ডির মধ্যে বাঁধিতে চাহেন। সুকণ্ঠে সঙ্গীত গীত হইলে রস সৃষ্টি করে, নর্ত্তকীর পদ-হিল্লোলে রস সৃষ্ট হয়, কিন্তু উহার স্থিতি ক্ষণস্থায়ী, কেন না সাময়িক আনন্দ রচনা করিয়া উহা বিনাশ প্রাপ্ত হয়। সাহিত্য স্থায়ী রস সৃষ্টি করে, ভাষার আবরণ দিয়া তাহাকে অমর করিয়া রাখে। কবিতার ছন্দে ধ্বনিত হইয়া বংশ পরম্পরায় উহা আমাদের আরাম ভোগ্য হয়, যাঁহারা শুধু এই কথাই ভাবেন, আমাদিগকে অতি দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে হইতেছে, সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁহাদের যে জ্ঞান আছে

তাহাতে কোনরূপ ব্যাপকতা নাই। যাহার সৌন্দর্য্য যতই মনোরম হউক না কেন কালের আবর্ত্তনচক্রে পেষিত হইয়া মানব-মন ভিন্নাকার ধারণ করিলে, সেই সুন্দর বস্তুর কোন সৌন্দর্য্য নষ্ট না হইলেও, উহার চিত্তা-কর্ষণ করিবার ক্ষমতা কমিয়া যায়। ভারতচন্দ্রের কবিতা পাঠ করিয়া আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের বৃদ্ধগণ যে আনন্দ অনুভব করিতেন, সেই যুগের নব্যগণ মাইকেল পাঠ করিয়া তাহা পাইতেন। আবার আমাদের যুগে রবীন্দ্রনাথ পাঠ করিয়া সাধারণ পাঠক যে আনন্দ লাভ করেন, মাইকেল, হেমচন্দ্র ও নবীন চন্দ্র লাইব্রেরীতে থাকিলেও, তাঁহাদের তত আদর আর আছে কি? ইহার কারণই সৌন্দর্য্যের ধারণা ও গতি কালের সহিত পরিবর্ত্তিত হয় বলিয়া এক যুগের সাহিত্য অন্যযুগে Classic এ পরিণত হয়। সাহিত্যকে জীবিত রাখিতে গেলে উহাকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হইবে। মানব-শিশু যেমন নানা উত্থান-পতনের মধ্য দিয়া তাহার জীবন-পথে অগ্রসর হয়, সাহিত্যকেও সেইরূপ সর্ব্ব-ক্ষেত্রের আলেখ্য রচনা করিয়া জাতি বিশেষকে জাগাইয়া রাখিতে হয়। এই জন্যই আমাদের মনে হয়, কতকগুলি নীতি প্রচারের নাম সাহিত্য নয়। তাহা যদি হইত তাহা হইলে কবি কালিদাস প্রমুখ কবিগণের কোনরূপ প্রয়োজন থাকিত না।

আরও স্পষ্ট করিয়া বলিতে গেলে বলিতে হয় সাহিত্য জাতির আত্ম-জীবনী। প্রকৃত আত্মজীবনীতে সকল গুহ্য-তত্ত্বই লিপিবদ্ধ করিতে হয়, প্রকৃত জাতীয় সাহিত্যেও সেইরূপ সমস্তই তত্ত্বই আসিয়া প্রতিফলিত হয়। উহাকে আইনের নাগপাশে বাঁধিতে গেলে যেমন জাতিকে পঙ্গু করা হয়, সেইরূপ একশ্রেণীর লোকমত দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করিতে গেলে উহার কর্ম্মক্ষমতার হ্রাস করা হয়। এই জন্যই মনে হয় সাহিত্য শুধু কোনরূপ রস-সৃষ্টি বা নীতি প্রচার করিয়াই ক্ষান্ত থাকে না উহা জাতির অদৃষ্টও নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে। জগতের বিখ্যাত সাহিত্যগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে আমরা দেখিতে পাই, সে সমস্ত সাহিত্যই ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া রচিত এবং এই জন্যই তাহাদের অধিকাংশই Propaganda work. হোমারের ওডেসী ও ইলিয়াড রচিত হইয়াছে বলিয়া ঐতিহাসিক যুগে গ্রীকগণ এসিয়া মাইনরে অবস্থিত গ্রীক নগরগুলি ও পারস্য জয় করিবার জন্য অধীর হইয়া উঠে। এনিডই রোমসাম্রাজ্যের প্রধান স্তম্ভ। ভোলটেয়ার ও রুসো ফরাসী বিদ্রোহের জনক। সেক্সপিয়ার ইংলণ্ডের সমস্ত গৌরবের প্রধান কারণ। দান্তে অখণ্ড ইটালীকে এক মহাশক্তিশালী জাতিতে পরিণত করেন। গেটেই জার্ম্মানীর স্বপ্নকে রঙ্গিন করিয়া তুলিয়াছিলেন। কিপ-লিংই বর্ত্তমান সাম্রাজ্যিক নেতাদের মন্ত্রদাতা গুরু। বর্ত্তমান তুরস্কের স্রষ্টা তথাকার নবীন কবি ও লেখকগণ। ইহাই যদি সত্য হয়, তবে সাহিত্যে Propaganda থাকিবে না কেন? যে সমস্ত লেখক উপন্যাস লিখিয়া নোবেল প্রাইজ পাইয়াছেন তাঁহাদের প্রায় সকল উপন্যাস গুলিতেই কি Propaganda চালান হয় নাই? সুতরাং যাঁহারা সাহিত্যকে এক সনাতন গণ্ডির মধ্যে ধরিয়া রাখিতে চাহেন তাঁহারা যেমন ভুল করেন সেইরূপ যাঁহারা ভাবেন সাহিত্যের রসসৃষ্টি করা ব্যতীত আর কোন কর্ত্তব্য নাই তাঁহারাও ঠিক সেইরূপ অন্যায় করিয়া থাকেন।

'সেণ্টস্ প্রোগেস' বিখ্যাত লেখক গলসোর্য়দির এক-খানি উপন্যাস। গত মহাযুদ্ধের সময় নীতির বন্ধন পাশ্চাত্য দেশ সমুহে অনেকটা হ্রাস করিয়া দিতে হইয়াছিল। গত মাসে Brigadier General ক্রোজি-য়ারের পুস্তকে উহার যে বিবৃতি আছে তাহারই একটা সংক্ষিপ্তসার আমরা দিয়াছিলাম। 'সেণ্টস প্রোগেসের লেখক উহার একটী জীবন্ত আলেখ্য প্রদান করিয়াছেন। কোন ধর্ম্ম প্রবণ পাদরীর একটী কন্যা, যুদ্ধক্ষেত্রে গমন-কামী একটী যুবকের সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইয়া পড়ায়, তাহার গর্ভ-সঞ্চার হয়। যুবক-যুবতী উভয়েই তাহাদের এই সম্বন্ধকে পাকা করিয়া লইবার জন্য বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ হইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে। যুবক-টীর কোনরূপ পরিচয় ছিলনা। যে সমস্ত হাজার হাজার সৈনিক যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিতেছে সে তাহাদেরই একজন ছিল। কন্যার পিতা অভিজাত্যাভিমানে একটু গর্ব্বিত হওয়ায় এই বিবাহে সম্মতি প্রদান করিতে

পারিলেন না। যুবক যথা সময়ে যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিল। মূর্ত্তিমান ধ্বংসের নিকট আত্ম বলিদান দিতে তাহাকে বেশী প্রয়াস করিতে হইল না। যথাসময়ে এই হৃদয়-বিদারক বার্ত্তা অবিবাহিতা কুমারীর নিকট পৌঁছাইলে ভয়ে ও শোকে যুবতী খুব অভিভূত হইয়া পড়ে। পরে যখন তাহার গর্ভের কথা প্রকাশ পায়, অভিজাত পিতা সমস্ত ব্যাপারটা গোপন রাখিবার জন্য কোন পল্লীর নিভৃত আবাস স্থানে তাহার খুল্লতাতের তত্ত্বাবধানে তাহাকে প্রেরণ করে। এইখানে তাহার একটী সন্তান ভূমিষ্ট হয়। সন্তানের মুখে তাহার কান্তের বদন মণ্ডল সুন্দরভাবে খোদিত দেখিয়া, সে তাহাকে বক্ষে তুলিয়া লয়। সন্তানটীকে তাহার নিকট হইতে সরাইয়া লইবার চেষ্টা করিলেও, কুমারী তাহার সন্তানকে বক্ষ-চ্যুত করিতে চাহিল না।

যথা সময়ে কুমারী-জননী সন্তানসহ সহরে তাহার পিতার নিকট ফিরিয়া আসিল, সমাজে প্রথম কাণাঘুষা ও পরে নানাপ্রকার কলঙ্কের কথা প্রচার হইতে থাকে। অভিজাত পিতা কন্যাকে ত্যাগ করিতে না পারায় তাঁহাকেও ক্রমশঃ নানাপ্রকার অপমান স্পর্শ করিতে আরম্ভ করে। কন্যাবৎসল পিতা কন্যাকে কোনরূপ অপমানের কথা না বলিয়া সমাজের তাবৎ অপমানই অম্লানবদনে সহ্য করিতে থাকেন। এই সময়ে আর একজন অৰ্দ্ধবয়েসী যোদ্ধা এই কুমারীর সৌন্দর্য্যে আকর্ষিত হইয়া তাহাকে ভালবাসে। প্রথম সে জানিত না সে নীতি ভ্রষ্টা। তাহার প্রেম যখন গাঢ় হইয়া আসিয়াছে তখন সে হঠাৎ একদিন এই কথা শুনিতে পায়। তখনি তাহার মনে আঘাত লাগে। সে কন্যাটীকে ভাল না বাসিবার চেষ্টা করে, কিন্তু নানা ঘটনা সমন্বয়ে সে তাহাকে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারিল না। পিতাও চাহিতেছিলেন না যে কন্যা আবার বিবাহ করে। পুরাতন সনাতনী-মোহে মুগ্ধ পিতা কন্যাকে রক্ষা করিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিলেন, কিন্তু এই অনূঢ়া কন্যার সহিত এই অৰ্দ্ধ-বয়েসী যোদ্ধার বিবাহ-বন্ধন পিতার বিনা অনুমতিতেই সংঘটিত হইয়া গেল।

এই পুস্তকখানি কি একখানি Propaganda পুস্তক নয়? গত মহাযুদ্ধের সময় অনেক war baby জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। সেগুলিকে সমাজে চালাইতে গেলে, তাহাদের কুমারী-জননীদের বিবাহ হওয়া উচিত। অথচ এইরূপ কুমারী-জননীকে কোন কুমার বিবাহ করিবে না। তাহাদিগকে অৰ্দ্ধ-বয়েসী অথবা সম্পত্তিশালী ব্যক্তিগণ বিবাহ করিলে সমাজ রক্ষা হইতে পারে। এইরূপ নূতন ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই কি পুস্তক-খানি রচিত হয় নাই। সুতরাং 'রস' সৃষ্টিই সাহিত্যের প্রধান বস্তু, প্রোপাগাণ্ডা থাকিলে উহা তৃতীয় শ্রেণী হইয়া যায়, ইত্যাদি প্রকার অভিমত ভ্রমসঙ্কুল। Saint's Progress—গ্রন্থকারের লিপিচাতুর্য্যের অভাব নাই। রসসৃষ্টি করিবার প্রয়াস সর্ব্বস্থলেই আছে। রসসৃষ্টি করিতে না পারিলে উহা ত শুধু Pamphlet হইয়া যাইত, বৎসরে দুইবার করিয়া উহার সংস্কার হইবে কেন?

রাতের পথিক

গল্প

শ্রীপূর্ণশশী দেবী
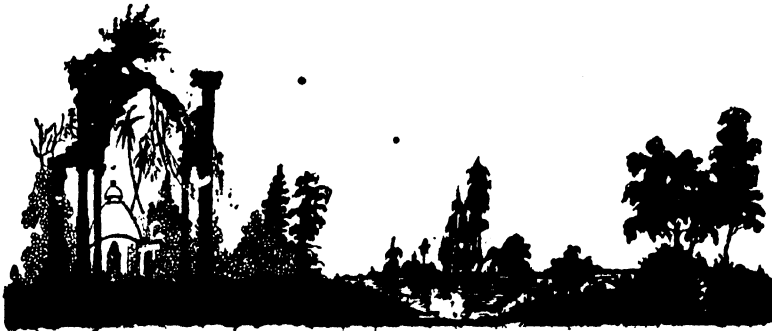
জনবিরল ছোট ষ্টেশনে ক্ষণেকের জন্য একটা চাঞ্চল্য জাগিয়ে রাত বারেটায় এক্সপ্রেস্‌খানা বেরিয়ে গেল গম্ গম্ করে। প্রতিধ্বনি তখনও ছুটাছুটি করছে দিকে দিকে--দিশে হারা হয়ে। দূরে—নৈশ আঁধারে অদৃশ্যমান ট্রেণের আলো গুলো নক্ষত্রের মালার মত জল্ জল্ করছিল—বীথি আন্‌মনে তাই দেখছিল,—খোলা জানালায় মাথাটী রেখে অলসভরে, ঘুমে জড়িয়ে আসা চোখের পাতা দুখানা জোর করে মেলে।

স্বামী এসিষ্ট্যাণ্ট ষ্টেশন মাষ্টার নিজের 'ডিউটী'তে গেছেন এখনই ফিরবেন, বীথি এতরাত্তে জেগে বসেছিল তারই প্রতীক্ষায় হয়তো, কিন্তু রেল দেখাও তার ভারি একটা বাতিক। রেলের ঘণ্টা ও এঞ্জিনের হুইসেলের শব্দ কানে গেলেই সে শত কাজের ব্যস্ততার মধ্যেও ছুটে আসে এই জানালায়, রেল দেখতে, দিনে রাতে সোদক্ থেকে যতগুলি গাড়ী যাওয়া আসা করে কোনটাই বোধ হয় বাদ যায় না।

মালগাড়ী হলেও,—প্যাসেঞ্জার হলে তো কথাই নাই, অবাক্ অনিমেষ হয়ে, সে কতক্ষণ চেয়ে থাকে, কেন—কিসের মোহে কে জানে। কোনো পরিচিতের আসার আশা নেই, একখানি চেনা মুখ চোখে পরবারও সম্ভাবনা নেই তবু—সেই দূর দুরান্তর—দেশ-দেশান্তর হ'তে ছুটে আসা বাষ্পযান প্রবাসিনী মেয়েটীর প্রাণে-কি এক অপরূপ ভাব,—পুলক-ব্যথা বিমিশ্র কিসের একটা বিচিত্র অনুভূতি জাগিয়ে তোলে, তা সে যেন নিজেই বুঝতে পারে না তবুও দেখে। সে যেন এক নেশা। দূরের আলো গুলো অদৃশ্য হয়ে গেল দেখ্‌তে দেখ্‌তে, প্রতিধ্বনি মিলিয়ে গেল নিশীথ রাতের গাঢ় নীরবতায়। ষ্টেশনের হৈ চৈ থেমে গেছে। ক্লান্ত দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে বীথি উঠ্‌ছিল—এমন সময় কাণে গেল বড় মিষ্টি একটা বাঁশীর সুর—সুরটা যেন চেনা। শুধু আজই নয় বীথি ক'দিন ধরেই এই বাঁশীর গান শুনছে গভীর রাতে, তন্দ্রাঘোরে স্বপ্নের মত অলস মধুর কিন্তু বাদক অ-দৃষ্ট। তাকে দেখবার জন্য মনে একটু কৌতূহল আসাই স্বাভাবিক, তাই সে বেশ উৎসুক হয়ে—জানালায় বাইরে চেয়ে রইল।

তাদের বাড়ীর পেছন দিক্ পানে ঘাসও আগাছার মাঝখান থেকে যে পায়ে হাঁটা সরু পথটুকু জানালার ধার দিয়ে চলে গিয়েছে সেই পথেই সে যাচ্ছিল, মৃদু মন্থর গতিতে, বাঁশীও মৃদু মৃদু বাজ্‌ছে, ভীরু হিয়ায় চাপা উচ্ছ্বাসের মত—কিন্তু কি মিষ্ট করুণ সুর!

জনহীন অন্ধকার পথে তাকে একখানা ছায়ার মত দেখাচ্ছিল কিন্তু জানালার কাছাকাছি আস্‌তেই ঘর থেকে বাইরে ছিট্‌কে পড়া আলোয় বীথি দেখ্‌তে পেলে—আশ্চর্য্য! এতদিন ঘুমের ঘোরে শোনা বাঁশীর সুর থেকে অ-দেখা বংশী বাদকের যে রূপটী সে কল্পনা করেছিল, এ যেন ঠিক তাই! লোকটা একহারা গৌরবর্ণ ঈষৎ দীর্ঘ আকৃতি, মুখখানা ভাল নজরে পড়ে না, তবু তার ভাবটুকু যেন তেমনি সুন্দর তেমনি উদাস মনে হল। একখানা সাদা ধুতি আর কুর্ত্তা পরা, মাথায় এলো মেলো লম্বা চুল গুলো কপালে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। বয়স আর কতই?—যার চেহারায় অমন তারুণ্য—আপন মনে বাঁশী বাজাতে বাজাতে সে চলে গেল কি জানি কোথায়—তার গন্তব্যস্থান কতদূরে!

আর দেখা যায় না। বাঁশীর সুর আরো, মৃদু মৃদুতর, রেশটুকুও তার মিলিয়ে গেল—মুগ্ধা শ্রোত্রীর বিস্মৃত প্রায় স্মৃতির কোন্ গোপন গহনতলে চকিতে একখানা ছায়া ফেলে।—তার বাঁশীতেও বুঝি এমনি প্রাণ উদাস করা ব্যথার সুর বাজত, সে সুর যেন আরও মধুর করুণতর।

একটা সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে সেদিক্ থেকে ফিরতেই বীথি দেখে স্বামী আলনার কাছে দাঁড়িয়ে কাপড় ছাড়ছেন। তার সচকিত মুখের পানে তাকিয়ে মহিম সহাস্যে জিজ্ঞাসা করলে—রেল দেখ্ছিলে? বাঃ বাঃ! আচ্ছা বাতিক যাহোক্,—অৰ্দ্ধেক রাত্তিতে ঘুম থেকে উঠে—বীথি লজ্জিত হয়ে বল্লে—আমিতো তখুনি উঠে-ছিলুম তুমি যখন গেলে—

—কেন উঠ্লে? দরকার তো ছিল না, তোমার ঘুম ভেঙ্গে যাবে বলেই আমি ভজুয়াকে ডেকে—

—তা হলেও ঘুম যে আপনি ভেঙ্গে যায়, এই নির্জ্জন অজগর বিজন বনে থাকা।—

মহিম বিছানায় গা ঢেলে দিয়ে সিগারেট ধরিয়ে বল্লে—তোমার একলাটী থাক্তে ভয় করে না? কিন্তু এখানে ভয়ের কারণ কছু নেই। এই তো এদ্দিন রয়েছি, সে এখানে যখন প্রথম আসে, তোমার চেয়ে বয়সে ছোটই ছিল বোধ হয় কিন্তু তার জন্মে তো কই……

এরপর যে কথা আসবে বীথির তা জানাই ছিল—স্বর্গীয়া সপত্নীর গৃহিণীপণার তারিফ, তার অসামান্য বুদ্ধি-মত্তা, পতিভক্তি ও নির্ভীকতার কাহিনী, সে সব কথা স্বামীর মনে প্রীতি বা পীড়াদায়ক যাই হোক্ না, বীথির পক্ষে কোনো মতেই শ্রুতিসুখকর হতে পারে না, সুতরাং প্রসঙ্গটা সেইখানেই চাপা দেবার অভিপ্রায়ে সে তাড়াতাড়ি বলে উঠল—নাঃ, ভয় কিসের? আমিতো এম্নি…… ঘুমটা চটে গিছল্ কিনা তাই……একটী ছেলে কি সুন্দর বাঁশী বাজাচ্ছিল—বড় জোর একুশ কি বাইশ বছর হবে, কিন্তু বাঁশী যা বাজাচ্ছিল তুমি যদি শুন্তে—

—ওঃ! তুমি আজ শুন্লে? আমি তো রোজই শুনি ওর বাঁশী ষ্টেশন থেকে আসতে ঠিক এই সময়টীতে, তবে সে ছেলে কি বুড়ো তা জানি না—কারণ আমি—'তারে চোখে দেখেনি শুধু বাঁশী শুনেছি!—'

স্বামীর মুখপানে উৎফুল্ল দৃষ্টিতে তাকিয়ে বীথি হাস্তে হাস্তে বল্লে—সবটাই বলো না থামলে কেন?

—ঐ পর্য্যন্তই, মেড়ুয়ার দেশে বারোমাস বাস করা—বাংলা গান কি আর মনে থাকে ছাই! সব ভুলেই যাচ্ছি। মহিম বীথির দিকে পাশ ফিরে শুয়ে বল্লে—হ্যাঁ, তারপর বংশীওয়ালার সঙ্গে তোমার আলাপ হল।

—যাও! কি যে বলো! আমি কি ওকে চিনি না কখনো দেখেছি। বাঁশীর সুরটা বেশ লাগল তাই জানলা থেকে শুনছিলুম, কি গান বাজাচ্ছিল কে জানে? বাংলা তো নয়ই—

—না, বাংলা এখানে কে জানে? ও উর্দ্দু গান—গজল্।

—গজল? ও! তাই এত মিষ্টি সুর, বাঁশীতে এমন চমৎকার শোনাচ্ছিল—

—এতই কি ভাল,—অমন তো পথে ঘাটে আক্চার শোনা যায়।

—কি জানি, বাঁশী আমার বড্ড ভাল লাগে, সেই জন্যেই তো জ্যোতিষদা আমাকে—

—জ্যোতিষদা? সে আবার কে?

—ওঃ! তুমি তাকে দেখনি না? দেখলে কিন্তু খুসী হতে, বড্ড ভাল ছেলে…এমন চমৎকার বাঁশী বাজাতেন কি বল্ব? আমি তার কাছে শিখতে চেয়েছিলুম কিন্তু মা বারণ করলেন। মেয়ে মানুষে বাঁশী বাজাতে নেই নাকি? এ সব অদ্ভুত বিধান যে কেন—মহিম পোড়া চুরুটটা ফেলে দিয়ে মুচকি হেসে বললে—কেন আর?—ঐ সর্ব্বনেশে বাঁশীর সুরে একদিন গোকুলে কি বিতিকিচ্ছি কাণ্ড ঘটেছিল—জান তো? সেইজন্যই তো বলছিলুম সাবধান! ওসব বংশীওয়ালাদের—

—আবার! যাও, তোমার সকল তাতেই ঠাট্টা।

এক মুহূর্ত্ত নীরব থেকে বীথি যেন আত্মগত ভাবেই বলে উঠল—আশ্চর্য্য! অত রাত্তিরে একলাটী বনবাদার ভেঙ্গে যায়, এক আধ দিন নয় রোজ—ফেরে যে কখন্—দিনে তো দেখতে পাই না—

—রাতারাতি যায় রাতারাতি ফেরে, এতে আর আশ্চর্য্য হবার কি আছে?

—কিন্তু কোথায় যায় কে জানে?

—তাও বল্তে হবে?

মহিমের তখন চোখ বুজে আস্ছিল, বীথিকে বাহু পাশে টেনে নিয়ে তার কাণের কাছে মুখ এনে সে চুপি

চুপি বল্লে—ও যায় অভিসারে বুঝলে তো? এখন ঘুমিয়ে পড়ো দেখি, সকাল করে না উঠলে আবার···

মহিম অচিরে ঘুমিয়ে পড়ল। কিন্তু বীথির চোখে ঘুম এলো না অনেকক্ষণ, তার ভাব প্রবণ তরুণ চিত্তে ঘুরে ফিরে কেবলই আসছিল সেই অজানা রাতের পথিকের কথা, ওকে? কোথায় যায়? বাস্তবিক—অভিসারে কি? তা হলে অমন উদাস কেন? ওর সে ব্যথার সুরের শেষ রেশটুকু যেন এখনো তার বুকের মধ্যে বাজছে!

ভাবতে ভাবতে বীথির সহসা মনে হল—শুধু আজই নয় তার অন্তরের অন্তরতম দেশে—এ-সুরের মূর্চ্ছনা বুঝি অহরহই গুঞ্জরিত হচ্ছে—সে শুনতে পায় না—অথবা শুনতেই চায় না হয়তো—

দুই

গরীবের মেয়ে, পিতৃ মাতৃহীন, মামার বাড়ী মানুষ, রূপেও এমন কিছু বিশেষত্ব নেই যাতে সুন্দরী বলা যায়, কাজেই বিপত্নীক মহিম যখন বীথিকে তার শূন্য গৃহের গৃহলক্ষ্মী করে সুদূর পশ্চিমে নিয়ে গেল তখন পাড়াপ্রতিবাসী—বীথির বিয়ের ভাবনায় যাদের নিদ্রা দুর্লভ হয়ে উঠেছিল, তাদেরও একবাক্যে স্বীকার করতে হল আর যাই হোক—মেয়েটার বরাতে জোর আছে।

মামা সস্তায় মেয়ে পার করে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন। মামী ক্রন্দনরতা মেয়ের মাকে সান্ত্বনা দিয়ে বোঝালেন আর কি চাই—; এ যে আশার অধিক হয়েছে। রোজগেরে জামাই, দেখতে শুনতেও মন্দ না। ব্যাটা-ছেলের ছাত্রিশ সাইত্রিশ কি আর বয়স?—ও পক্ষের ছেলে পিলেও নেই যে তার হাঙ্গামা পোহাতে হবে,—তোমার বীথির ভাগ্য ভাল যে এমন বর জুটে গেছে—। এক যা অসুবিধে, বড্ড দূর। কিন্তু তাতেই কি আসে যায়—জামাই রেলে কাজ করেন—যখন খুসী—আসতে পারে। আর মেয়ে যদি সুখে থাকে—তাহলে······

কথাগুলো নির্ব্বিচারে মেনে নিলেও বীথির মা চোখ মুছে একটা গভীর নিঃশ্বাস ফেললেন। মেয়ের সুখ অক্ষয় হোক্,—কিন্তু জ্যোতিশের সঙ্গে হলে যেমনটী মানাত ······যাক্; যা হবার নয়। তার জন্য মনে আপশোষ না রাখাই উচিত। ভগবান্ বীথিকে সুখী করুন।

বাস্তবিক—বীথি এ বিয়েতে সুখী হয়নি, বা স্বামীকে তার পছন্দ হয় নি এমন নয়, যে দেশের মেয়েরা পতিশ্চঃ নিগু'ণাধরেঃ ব্রহ্মরূপ···বলে সাকার দেবতা—পতির আরাধনা করতে পারে সেই দেশের মেয়ে সে সুতরাং—

মহিম যখন তার মৃতা পত্নীর পরিত্যক্ত বস্ত্রালঙ্কার, অগোছান গৃহস্থালী এবং নিজেকে শুদ্ধ নবপরিণীতাকে অকুণ্ঠ নির্ভরতার সহিত সমর্পণ করে ফেল্লে, তখন মনে একটু 'কিন্তু' ভাব এলেও সে ভাব বীথি প্রসন্নচিত্তেই গ্রহণ করেছিল। সেই নবলব্ধ অধিকারের সমস্ত দায়িত্ব নিখুঁত-ভাবে পালন করতে সে সততই তৎপর থাকে তার সতেরো বছরের অভিজ্ঞতা দিয়ে, তাতে তার ক্লান্তি ছিলনা—কিন্তু তৃপ্তিও ছিল না। কেমন একটা দ্বিধা জড়িত সঙ্কোচের ভাব মন থেকে কিছুতেই যায় না, কেবল মনে হয় এ যেন কার কাজ কে করছে, কার আশা আকাঙ্ক্ষার জিনিস কে এসে ভোগ করছে! তাই স্বামীর স্নেহাদরও বীথি অকুণ্ঠিত চিত্তে নিতে পারে না। তার ওপর আবার তরুণী ভার্য্যাকে নীতিশিক্ষাদান-চ্ছলে মহিম কথায় কথায় স্বর্গগতা পত্নীর গুণ কীর্ত্তন করে—বীথির সেই ব্যথা-বিমিশ্র সঙ্কোচের ভাব যেন আরো পরিস্ফুট করে দেয়। নিজের অপারগতায় লজ্জিত ক্ষুব্ধ হয়ে বীথি ভাবে তেমনটী হতে পারবে সে কি করে? দুজন লোক ঠিক একই ধাতের হওয়া কি সম্ভবপর?

বন বাদাড়ের মাঝখানে এই ক্ষুদ্র কোয়ার্টারের অপরিসর অবেষ্টনীর মধ্যেই ভাগ্যবতী সপত্নী তার বছরের পর বছর কাটিয়ে গেছে সচ্ছন্দে, বন্দীত্বের বেদনা তাকে এমন করে একদিনের তরেও ব্যথিত করে নি হয়তো, কিন্তু বীথি—সেই যে বিয়ের সঙ্গে সঙ্গে ধূলো পায়ে দ্বিরাগমনের পাঠ সেরে সে এখানে এসেছে—কাশী-বাসিনী শাশুড়ী মাসখানেক তার কাছে এসে ছিলেন মাত্র। বধূকে তার কর্ত্তব্য বুঝিয়ে দিয়ে তিনি নিশ্চিন্ত হয়ে ফিরে গিয়েছেন বিশ্বনাথের চরণাশ্রয়ে।

যাবেন না কেন? এতো সত্যি সত্যি কনে বউটী নয় যে আগ্‌লে থাকতে হবে?

তারপর নূতন গৃহিণীপনার উৎসাহে উল্লাসে বীথি প্রথম প্রথম কোনো অভাব অনুভব করতে পারেনি,

কিন্তু এখন যত দিন যাচ্ছে, স্বামীগৃহের নিঃসঙ্গতা ততই তার ক্লান্তিকর হয়ে উঠছে যেন। স্বামীতো সকল সময় কাছে থাকতে পারেন না। সংসারের কাজ তাই বা কতটুকু?—দুটী তো মানুষ! একলাটী সময় কাটে যে কি করে!—তবু জ্যোতিশদা চেষ্টা করে একটু লেখা পড়া শিখিয়েছিলেন ভাগ্যে তাই—কিন্তু পড়বার বই-ই বা আসে কোত্থেকে?—বিয়ের সময় যে ক'খানা বই উপহার পেয়েছিল তা কবে শেষ হয়ে গেছে,—এখানে 'কুসুমে কণ্টক' 'ছিন্ন মুণ্ড' 'রক্তনদী' এইরকম কোন্ মান্ধাতার আমলের পোকায় খাওয়া খানকতক ডিটেক্টিভ উপন্যাস একটা কুলুঙ্গীর মধ্যে গোজ্‌ড়ানো ছিল। সে গুলোও জোড়াতাড়া দিয়ে পড়ে ফেলেছে,—এখন আর কিছু নেই, দিন কাটানো ভার! নিষ্ক্রিয় ভাবে চুপ করে বসে থাকলেই প্রাণটা উদাস হয়ে যায়, শুধু মনে পড়ে মায়ের অশ্রুসজল মুখখানি,—আদরের ভাইটির ব্যথা ছল ছল ম্লান আঁখি দুটী আর সেখানকার সকলকেই —যে মামীমার কাছে বিয়ের দু দিন আগে পর্য্যন্ত রূঢ় তিরস্কার ভিন্ন একটী মিষ্টি কথা সে শুনতে পায়নি এই দূর প্রবাসে তার জন্যও মন কেমন করে।

আর—আর যে একজন—নিস্পর নিরাত্মীয় হলেও যাকে একান্ত আপন জন বলে মনে হয়,—যার নিঃস্বার্থ স্নেহ, অকপট কল্যাণ-কামনা সেই অনাদৃতার অসার জীবনকে সার্থকতায় মণ্ডিত করতে সতত সচেষ্ট,—রাতের পথিকের বাঁশীর সুরে যার ছাপ—নাঃ এমন করে কি পারা যায়!

মর্ম্মস্থল বিমথিত করে অতর্কিতে বেরিয়ে আসে একটা গাঢ় দীর্ঘশ্বাস। বুকখানা যেন ভারি হয়ে ওঠে অভিমানের বেদনায়। এ অভিমান কার উপর? যা'রা তাকে সুদূর নির্ব্বাসনে পাঠিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে আছে তাদের উপর কি?—তাই হবে।

তিন

দুপুর বেলা। বীথি তার নির্জ্জন ঘরটীতে বসে চিঠি পড়ছিল। কাঁচা হাতের বড় বড় হরফে লেখা ছোট্ট একটুখানি চিঠি, তাই সকাল থেকে বোধ হয় বার দশেক পড়া হয়ে গেছে,—তবু পড়ে যেন আশা মেটে না, চিঠিখানা তার ছোট ভাই মণ্টুর, সে লিখেছে—দিদি ভাই! তুমি কবে আসবে? তোমার জন্য ভারি মন কেমন করে, সত্যি। মা বলেন আসবে রে আসবে—তাড়াতাড়ি কি?—শোনো কথা! ছ'মাস বুঝি তাড়াতাড়ি হল?—এমন রাগ ধরে শুনে! তুমি যাবার পর জ্যোতিশদাও বড় একটা আসেন না—তার নাকি অনেক কাজ। আচ্ছা দিদি,—জামাইবাবু যে বলেছিলেন পূজোর সময় তোমাকে আনবেন—তা কই?—পূজো তো এসে পড়ল"—

পূজো এসে পড়ল!—হাঁ, তাইতো। এ পোড়া দেশে তো, কিছু বোঝবার জো নেই। আজকাল গাড়ীগুলোয় বুঝি সেই জন্যেই এত ভিড়? রোজ ট্রেণ ভর্ত্তি হয়ে কত দেশ-বিদেশের যাত্রী যাওয়া আসা করে, তার মধ্যে বাঙ্গালী দেখলেই যেন চেনা চেনা মনে হয়।

আঙ্গিনায় ছোট শিউলী গাছটা ফুলে ফুলে ভরে গেছে, মিষ্ট গন্ধে তার দেশের কথা যেন আরো বেশী করে মনে পড়ে কিন্তু……—সেখানে যাওয়া যে বীথির কতদিনে ঘটবে! মা যদি একটু জোর দিয়ে লেখেন—তাহলেও সে স্বামীকে ধরতে পারে—যাওয়ার জন্য…কিন্তু আগ্রহ থাকলে তো?—আপদ বিদায় করে হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছেন সব।—নইলে গোটা ছ'মাস হয়ে গেল এখনো বলেন কি না—তাড়াতাড়ি কি?—হুঁঃ, কার কত মায়া তা বোঝা গেছে এবার। ঐ মণ্টুটাই যা ছট্‌ফট্ করছে—তা ছাড়া, আর সব…জ্যোতিশদাও ভুলে গেছে…ওতো ভুলবেই, জগতে যার বাড়া আর কেউ নেই সেই মা-ই যখন এমন… থাকগে—সে আর ডাকলেও যাবে না—কিন্তু মণ্টুটা…… ব্যথা ও অভিমানের প্রবল উচ্ছ্বাসে বীথির বুকখানা দুলে উঠল। চোখ দুটীতে জল ভরে এলো।

মায়ের মঙ্গলেচ্ছা হৃদয়ঙ্গম করবার মত অবস্থা তার যে তখনো হয়নি,—স্বামীর সাথে ঘনিষ্ঠতাও এমন গাঢ় হয় নি, যাতে সে আর সব ভুলে স্বচ্ছন্দে থাকতে পারে, এতো কেউ বোঝে না।

—এখন এ চিঠির উত্তর কি দেবে?—চিঠি পরে স্বামী তো হাঁ, না, কিছুই বল্লেন না—মুখখানা কেমন

ভার ভার···নাঃ,—যাওয়া আর হয়েছে! এই নির্ব্বাসনেই তার জীবন···তাই হোক্—তাই ভালো!—

উদ্বেলিত অশ্রুজল আঁচলে মুছে ফেলে, চিঠিখানা যথাস্থানে রেখে জানালায় এসে দাঁড়ালো। মন যখন বড় ব্যাকুল হয়,—নিঃসঙ্গতায় প্রাণ যখন হাঁপিয়ে ওঠে, বীথি তখন—এই জানালাতেই ছুটে আসে—এসে সান্ত্বনা পায়, —ক্ষুদ্র বাতায়ন—এই বুকচাপা কঠিন অবরোধের মধ্যেও তা'কে—মুক্তির আনন্দ এনে দেয় বুঝি!

যতদূর দেখা যায় শুধু মাঠ আর গাছপালা, ঝোপ্‌ঝাপ, তার সীমানা যে কোথায় কে জানে!—ওই যে ওধারে পুষ্পিত শুভ্র শর বনের মাঝখান থেকে রেলের লাইনটা এঁকে বেঁকে চলে গেছে—ওরই বা শেষ কোথায়? উপরে অনন্ত নীলিমা, তারও শেষ নেই, সীমা নেই। বীথির ভাব-মুগ্ধ ক্ষুধিত চিত্ত যেন সেই অশেষ অসীমতার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে—বন্দীত্বের বাঁধন ছিঁড়ে ফেলে উধাও হয়ে যায়—কোন্ সুদূর স্বপনের দেশে—

বীথির একঘেয়ে জীবন-যাত্রায় এইটুকুই বৈচিত্র্য।

আজ সেখানে এসে দাঁড়াতেই বীথির প্রথমেই দৃষ্টি পড়ল সাম্‌নের সরু রাস্তাটায়, এই পথেই সে যায়—নিঝুম নিশুতি রাতে,—বাঁশীর গানে প্রাণের আবেগ ঢেলে, কোথায় যায়? তার নিষ্করুণা প্রিয়ার কাছে মর্ম্মব্যথা নিবেদন করতে কি?—তাই হবে,—চোখে না দেখ্‌লেও বাঁশীর সুর থেকে বীথি অনুভব কর্‌তে পারে। এমন একদিন নয়,—নিত্য।

ওর সে ব্যথা-ব্যাকুলতা সেই পাষাণীর পাষাণ প্রাণে বাজে না হয় তো,—তবু যায়—প্রাণের টানে—আহা বেচারা!—এসব নিছক কল্পনা হলেও বীথির সুকোমল নারীচিত্ত সমবেদনায়, ভরে উঠ্‌ল। যথার্থ আন্তরিকতার সহিত সে মনে মনে বল্লে আহা! ওর এ সাধনা ভগবান সফল করেন যেন।

চার

রাত্রে বীথি স্বামীকে জিজ্ঞাসা করলে—মনটুর চিঠির কি জবাব দেব?—সে যে যাবার জন্যে লিখেছে—

—হুঁ, লিখেছে তো,—কিন্তু···মহিম ইতঃস্ততঃ করে বল্লে,—যাওয়া তো মুখের কথাটী নয়,—দেখি যদি সুবিধে হয়ে ওঠে—তাহলে অবিশ্যি নিয়ে যাব—এই কথা লিখে দাও।

বীথি চুপ করে রইল। স্বামীর কাছে এই রকম উত্তরের প্রত্যাশাই সে করেছিল—তবু মনে একটু আঘাত লাগ্‌ল।

তার মৌন ক্ষুব্ধ মুখের পানে তাকিয়ে—মহিম বল্লে—কি করি বলো? যাব মনে করলেই তো যাওয়া ঘটে না, পরের চাকর ছুটী না পেলে—

—কিন্তু—অন্ততঃ দু'দিনের জন্যেও নিয়ে আমাকে সেখানে রেখে আস্‌তে পার তো?—

—তা যেন গেলুম,—কিন্তু এখানে—আমি যে একেবারে একলাটী·····ক্ষুব্ধ নিঃশ্বাস ফেলে মহিম বল্লে,—তুমি এখনো ছেলে মানুষ বীথি,—বুঝতে পারো না, সংসারে স্ত্রীলোকের স্বামীর চেয়ে বড়, স্বামীর চেয়ে প্রিয় আর কিছু নেই। সে আমাকে ছেড়ে বাপের বাড়ীও যেতে চাইত না, গেলেও দুদিন সুস্থির হয়ে থাকতে পারত না, পাছে—আমার কষ্ট হয়।—এত মায়া ছিল তার চলে যাবে বলেই কি···আঃ!—

মহিমের গলার স্বর যেন ভিজে—উঠল।

একটা উদ্বেলিত দীর্ঘশ্বাস চেপে নিয়ে বীথি আস্তে আস্তে বল্লে—থাক্, তোমার যদি কষ্ট হয়—তবে...

—এই তো লক্ষ্মীটীর মত!—বলছি একটু সুবিধে হলেই তোমাকে নিয়ে যাব যত শীগগির পারি।

মহিম এবার পুলকিত হয়ে স্ত্রীকে আদর করে বল্লে—আর দিনকতক সবুর করে থাকো,—আমি বুঝতে পারছি তোমার মা'র জন্যে বড় মন কেমন কেমন কর্‌ছে—

বীথি মাথা নেড়ে—ধীরে ধীরে বল্লে,—মা'র চেয়েও মনটুর জন্যে যেন আরো বেশী—

আর?—আর কারুর জন্যে নয়? সেই যে তোমার জ্যোতিশদা...ওকি?—রাগ হয়ে গেল?—এইটুকুতেই?—বারে! আমি তো তামাসা কর্‌ছিলুম—সত্যি কি আর—

—থাক্! তামাসা আমার ভাল লাগে না—

বীথি আরক্ত মুখে স্বামীর বাহুপাশ থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে পাশ ফিরে শুলো।

মহিমের পরিহাসোক্তির মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন খোঁচা ছিল, যাতে বীথির নিভৃততম অন্তরের গোপন ক্ষতটা টন্ টন্ করে উঠ্‌ল। হায়! একি মর্ম্মান্তিক উপহাস! যেখানটায় মানুষ একটুখানি দরদের প্রত্যাশা করে, ঠিক সেইখানটীতেই এমন অকরুণ ভাবে আঘাতের পর আঘাত করা, এ নির্দ্দয়তা নয় কি?

তখন কত রাত কে জানে? এক্সপ্রেসখানা বেরিয়ে গেছে অনেকক্ষণ। তারপর একটা মালগাড়ীও গেছে। মহিম অঘোরে নিদ্রিত। নিদ্রা নেই শুধু বীথির চোখে। ঘুম না এলে ঘুমের ভাণ করে পড়ে থাকা বড় কষ্টকর। তাই কতক্ষণ এপাশ ওপাশ করে, কতক্ষণ চোখ বুজে আড়ষ্ট হয়ে পড়ে থেকে শেষে বিরক্ত হয়ে সে উঠে পড়ল।

শরতের জোৎস্না রাত, বাইরে চাঁদের আলোর ঢেউ খেল্‌ছে। জানালার ফাঁকে শুভ্র যুঁইফুলের একগাছি গোড়ে মালার মত একফালি জোৎস্না এসে পড়েছে। বীথি আস্তে আস্তে জানালাটা খুলে দিলে। কি নির্ম্মল সুন্দর রাত্রি!

আবার সেই মধুর চাঁদিনী রাতকে মদির মোহ-স্বপ্নে আচ্ছন্ন করে ওকে গান গান গায় না,—এ যে সেই গান—এবার আর বাঁশীর সুরে নয়— মুখের ভাষায়, কিন্তু তেমনি বুক কাঁপানো প্রাণ গলানো সুর ওর—বীথি রুদ্ধশ্বাস হয়ে কাণ পেতে রইল, ধীরে গাইলেও রাতের গভীর নীরবতার মধ্যে বেশ শোনা যায়, সে গাইছে—

"হায়! কিসি কি ইয়াদনে
কবরোঁ মেঁ দিল্ হিলা দিয়া"—

গানের শব্দগুলো স্পষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্রালোকিত-পথে দেখা গেল গায়ককে, এযে সেই রাতের পথিক! যেদিকে যায় সেই দিক্ থেকেই বোধ হয় ফিরছিল। আজ বাঁশী তার নেই,—বুঝিবা হারিয়ে গেছে!

অভাগার আবেদন নিবেদন সব বুঝি নিষ্ফল হয়েছে। যার কাছে ব্যথা জানাতে যায় সে শুধু ব্যথা দিয়েই ফিরিয়ে দিয়েছে!

তাই গভীর মর্ম্মবেদনায় যেন গুমরে গুমরে সে গাইছিল
'কিস্ নে হঁয় মারে ফুল ইয়ে
তুরবৎ পে মেরে জোর সে?
অথমি থা ইয়ে দিল্ মেরা
কিস্‌নে উসে রুলা দিয়া?'*

সে গানের অর্থ বীথির অবোধ্য হলেও যেটুকু বোঝা গেল তাই যথেষ্ট। এ যেন বুকের দরদ দিয়ে গাওয়া! কি জানি কত ব্যথা পেয়ে……

কাছাকাছি এসে গায়ক একবার চকিতে চাইল জানালার দিকে, ফুট্‌ফুটে জ্যোৎস্নায় বীথি দেখতে পেলে, তার চোখ দুটী যেন অশ্রু ভরে টল্‌মল করছে।

একটা নিবিড় দীর্ঘশ্বাস বীথির বুক কাঁপিয়ে বেরিয়ে গেল। হায়! এমনি দুটী সজল চোখের ছায়া বুঝি বীথির প্রাণে এখনো……

পলকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে সে চলে গেল—তেমনি করে গাইতে গাইতে, মুগ্ধা শ্রোত্রীর দরদী চিত্তে একটা বিহ্বলতা জাগিয়ে। বীথির দূর-প্রসারিত দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এলো। কি জানি কতদিনকার বিন্দু বিন্দু সঞ্চিত ব্যথা তার আজ সহসা উদ্বেল হয়ে দুচোখ ছাপিয়ে ঝরে পড়ল ঝর্ ঝর্ করে। কিন্তু এ ব্যথা ব্যাকুলতা তার কেন? এযে অন্যায়—অনুচিত, তবু—অবোধ মন বুঝেও বোঝে না—কেন?

* * * *

সেই শেষ। তারপর সে আর আর আসে না। রাতের পর রাত চলে যায়—ঘুমের পসরা বয়ে, শ্লথ মন্থর চরণে নীরবে—

কিন্তু নিভৃতকে সুন্দর করে, কল্পনাকে মনোরম করে, ব্যথাকে মধুময় করে, বীথির অন্তরের নিরালা কোন্‌টীতে ঝিমিয়ে পড়া স্মৃতি-স্বপ্নকে চকিত করে সেই উদাসী রাতের পথিকের বাঁশী আর বাজে না।

শুধু তার হারিয়ে যাওয়া সুরটুকু কখন এসে চুপি চুপি দোল দিয়ে যায় বীথির সুর-ভোলা মর্ম্মবীণায় কোন অলস অসতর্ক ক্ষণে—চকিতে মনে পড়ে যায়—সেই ক্ষণ-দৃষ্ট আকুল আর্ত্ত আঁখি দুটী—সে আঁখি যেন অসহায় বেদনায় কেঁদে বলে—

হায়! অথমী থা ইয়ে দিল্ মেরা
কিস্‌নে উসে রুলা দিয়া,—

* মরণাহত প্রাণে স্মৃতিটী কা'র
আজি থর থর কাঁপিছে হায়!
কে ছড়ালো ফুল এমন করে
জীর্ণ আবার সমাধি পরে?—
দীর্ণ হিয়া ছিল ব্যথা জর জর
কে গো! সে নিঠুর কাঁদালে তায়?

বাস্তব ও কল্পনা

গল্প

শ্রীবিজয়কুমার বড়াল

অতিশয় বিরক্তিতে মেয়েটির মুখখানি বিকৃত হ'য়ে উঠেছিল, হাতের মাসিক পত্রখানা সশব্দে পাশে ফেলে দিয়ে সে বাইরের দিকে চাইল।

ট্রেনে তার এক কামরার সহযাত্রীটি ব'লে উঠ্‌ল, "ভারি বিশ্রী, না?"

তাকে একটা কড়া কথায় তিরস্কার করবার ইচ্ছায় মেয়েটি সামনের বেঞ্চের দিকে মুখ ফিরাল, কিন্তু ছেলেটীকে শিক্ষিত ভদ্রলোক ব'লে বুঝতে পেরে নিজেকে দমন ক'রল। সে দেখল যে ছেলেটিও তারই মতো একখানা মাসিক-পত্র মেঝের উপর ফেলে দিয়েছে।

সে মৃদু হেসে ব'ল্‌ল, "কথায় বোঝানো যায় না, এত বিশ্রী।"

"কোন্ গল্পটা জান্‌তে পারি?"

"দ্বিতীয়টা—'মিলন-তীর্থ'।"

"বা! আমারও তাই। একদম বাজে!" ছেলেটি উৎসাহের সঙ্গে ব'লে উঠ্‌ল, "লোকে যে এমন লেখা কেন লেখে আর ছাপায় তাই ভাবি।"

"না, লেখাটা মন্দ নয়, কিন্তু ব্যাপারটা এমন অসম্ভব!"

"আমারও ঐ মত। যেন বাস্তব জীবনে এমন ঘটনা হামেসাই ঘট্‌চে!"

"সম্পূর্ণ অপরিচিত দুটি তরুণ তরুণী একটা ট্রেনের কামরায় ব'সে আছে,"...মেয়েটি ব'ল্‌ল।

"আর তরুণটি সবেমাত্র যে বইখানা পড়েচে তরুণীটি সেই বইই একখানা ফেলে দিয়ে,"...ছেলেটী বিদ্রূপ ক'রে ব'ল্‌ল।

"তারপরই দু'টি সুখী তরুণ মন সেইটাকে কেন্দ্র ক'রে সুদীর্ঘ আলোচনা,"—মেয়েটি হাস্‌তে লাগল।

ছেলেলেটিও হেসে ব'লল, "তাইতো। যখন লেগে থাকে তখন এসব লেখকগুলো করে কি? এমন সব ব্যাপার যে গল্পের বাইরে কোথাও ঘট্‌তে পারে না তা' কি কেউ তাদেরকে বুঝিয়ে দিতে নেই?"

মিষ্ট তিরস্কারের সুরে মেয়েটি ব'লল, "আহাঃ গল্পের বাইরে যে কি ঘট্‌চে তা' তারা জানেই না। বাস্তব জীবন সম্বন্ধে কোনো জ্ঞানই তাদের নেই।... গল্পের নায়িকাকেই দেখুন—একজন পেন্সনভোগী ভদ্র-লোকের মেয়ে, সম্ভ্রান্ত সমাজের সঙ্গে যথেষ্ট সম্পর্ক আছে, সুশিক্ষিতা, সুন্দরী, এবং আরো কত কি। এমনি একটি মেয়ের যে-কোনো অপরিচিত লোকের সঙ্গে অতটা ভাব জমিয়ে ফেলা—সে কি হয়? আর তার প্রেমে পড়া—একেবারে 'ইডিয়টিক্'।"

"বিশেষ ক'রে" ছেলেটি আরো খানিকটা পরিষ্কার করে আন্‌ল, "এই রকমের একটা ছেলের সঙ্গে। মানে, —সে একজন একাউন্ট্যান্টের কেরাণী; ধ'রে নেওয়া গেল যে তা'র অবস্থা ভালো, কিন্তু এমন একটি সম্ভ্রান্ত, অভিজাত শ্রেণীর মেয়ের সঙ্গে মেলামেশা করবার মতো—হুঁ, 'হি উড্ ফিল্ রাইট্ অভ্ হিজ এলিমেণ্ট।'

মেয়েটি বিদ্রূপের ভঙ্গীতে ব'লে উঠ্‌ল, "আবার এটাও মনে রাখবেন যে, এই পৃথিবীব্যাপী প্রসিদ্ধ দুঃসময়ের দিনে মেয়েটির বাবার দশাও কাহিল হ'য়ে প'ড়েচে, তাই সে, যা'কে বলে, 'নিউ পুওরদের একজন হ'য়ে দাঁড়িয়েচে!"

"আর, এসব গল্পে যা' দেখা যায়, ছেলেটিরও উন্নতির আশা নিশ্চিত ব'লে জানানো হয়েচে! তা' হলেও বাস্তব জীবনে কি এসব বিশেষ পার্থক্যের সৃষ্টি ক'রতে পারে"?

"নিশ্চয় না," মেয়েটি অবজ্ঞাভরে স্বীকার ক'রল, "এমন কি লেখকটিও এ ব্যাপার লক্ষ্য ক'রেচে দেখছি; এই জন্যই সে পরস্পরকে তা'দের পরিচয় জানতে দিল না—যতক্ষণ না তাদের প্রেমের পথ পরিষ্কার হ'য়ে গেল, —কিন্তু তখন তো আর ভয় নেই!"

"এ-কি হাস্যকর নয়? বাস্তব ক্ষেত্রে তাদের সাক্ষাৎ হ'লে যেন দু'মিনিটেই পরস্পরের পরিচয় জান্‌তে পেতো

না!—কিন্তু এছাড়া উপায়ও নেই, গল্প লেখবার জন্যে এরকম অবস্থার সৃষ্টি করা চাই-ই!"

মাথাটি একদিকে একটু কাৎ করে মেয়েটি ব'লল, "আমারও তাই মনে হয়। কিন্তু বাড়াবাড়িটা না করলেই ভালো। যেমন এই লেখাটিই দেখুন, এমন অস্বাভাবিক পথে দু'জনের সাক্ষাৎ ঘটিয়ে দিল, তাতেও কুলোয় না, কি করা যায়? একই দেশে তাদের ছুটী কাটাবার জন্যে দুজনকেই নামিয়ে দাও।"

মুখের মধ্যে একটা শব্দ ক'রে ছেলেটি ব'লল, "হাঁ; তার পরও আরো গভীরতায় টেনে আনা হয়েচে। তারা এও জান্‌তে পারল যে একই হোটেলে তা'দের কামরা ঠিক হ'য়ে আছে! দেখুন একবার!"

"এটা কিন্তু আমার কাছে ততটা খটোমটো লাগে না। ও রকমের একটা জংলীদেশে অস্থায়ীভাবে থাকবার জায়গা বেশী না থাকাটাই সম্ভব। আর যে রকম দিন-কাল পেন্সনভোগী ভদ্রলোকের মেয়ে যে ব্যয়-বহুলভাবে ছুটি উপভোগ করতে পারবে না তা আর বিচিত্র কি? মানে একই দেশে যখন যাচ্চে, অপরিচিত জায়গা, একই হোটেলে স্থান পাওয়া—কিন্তু মাত্রাটা অতিরিক্ত রকমের হয়ে উঠেছে তাদের উদ্দেশ্যটায়—প্রজাপতির সখ! দুজনকে একসঙ্গে করবার কি হাস্যকর ছল দেখুন! একজন মেয়ের পক্ষে প্রজাপতি ধরার উৎসাহ কিছু নূতন নয়, কিন্তু একজন সহুরে বাঙ্গালী কেরাণীর! কোয়াইট্ এবসর্ড। আর যাই হোক, কোনো দুর্লভ প্রজাপতির খোঁজে দু'জনায় ঠিক একই সময়ে, একই জায়গায় জুটেচে—না, এ সত্যই শক্ত।"

একটুখানি লাল হ'য়ে উঠে ছেলেটী ব'ল্লে, "হাঁ হ'য়ে, তবে, আমার কাছে এটা একটুও বেয়াড়া বলে মনে হয়নি। অনেক—মানে—কেরানীরই এমন দু'একটা সূক্ষ্ম রকমের সখ আছে। সংসারের ঝুঁকি ঝামেলার হাত থেকে খানিক ক্ষণের জন্যে পরিত্রাণ, একটু খোলা হাওয়া, তা'রই সঙ্গে মনের একটা সৌন্দর্য্য পিপাসার তুষ্টি—এ সকলেই চায়। আর দুজনার যদি কোনো একটা বিশেষ সখ থাকে—ধরুণ ঐ প্রজাপতির কথাই, ওটার জন্য একই জায়গায়, একই সময়ে উপস্থিত না হলে চলে না, কারণ সব জিনিষেরই একটা মরসুম্ আছে তো!...আমার নিজেরই এ বিষয়ে কিছু অভিজ্ঞতা রয়েছে, কারণ আমার সখ—পাখী, মানে, তা'দের ফটো নেওয়া। কোনো একটা দুর্লভ জাতের পাখীর ফটো নিতে হলে, আপনাকে একটা বিশেষ সময়ে একটা বিশেষ স্থানে উপস্থিত হতে হবে।..."

হঠাৎ সে দেখতে পেল যে মেয়েটি কামরার গায়ে হেলে পড়ে মুখ চোখ লাল ক'রে চাপা হাসি হাস্‌চে, অপ্রতিভ হ'য়ে ছেলেটি চুপ ক'রে গেল।

মেয়েটি উচ্ছসিত স্বরে ব'লল, "সত্যই অসাধারণ ব্যাপার!"

ছেলেটি দৃষ্টি সঙ্কুচিত ক'রে ব'লল, "কি?"

"এই অংশের জন্য গল্পের লেখককে আমরা বেশ ভালো 'মার্ক'ই দিতে পারি।"

"অ্যাঁ!" ছেলেটি একরকম রুদ্ধ নিঃশ্বাসেই জিজ্ঞাসা ক'রল, "আপনিও তা' হলে—ই'য়ে—,"

মেয়েটি যে কেবল স্বীকার-সূচক মাথা নাড়ল তা' নয়, 'র‍্যাক্' থেকে একটা বাক্স পেড়ে নিয়ে, সেটা তা'র সামনে খুলে ধ'রলো।

"বাঃ!" ছেলেটি সহর্ষে ঝুঁকে প'ড়ল, "এ যে 'টেলিস্কোপিক্' ক্যামেরা দেখচি! কি সুন্দর! বার ক'রতে পারি?"

ক্যামেরাটা বা'র ক'রে তা'রা আধ ঘণ্টা ধরে সেই টা নিয়ে নানা প্রকারের পরীক্ষা ও আলোচনা করল। তারপর ছেলেটি নিজের ক্যামেরাটাও নামিয়ে নিল এবং আরো আলোচনার মধ্যে আধঘণ্টা সুখে কেটে গেল। শেষে বাইরে ঘূর্ণ্যমান প্রান্তরের দিকে চেয়ে ব'লল, "আপনিও কস্তুরা-কস্তুরি পাখার সন্ধানে চলেছেন

ক'য়েক মুহূর্ত্ত বিস্মিত দৃষ্টিতে তা'র দিকে চেয়ে মেয়েটি ব'লল, "ঠিক ধ'রেচেন দেখ্‌চি! আমার পাখী পোষা সখ, আসামের দিকটায় অনেক রকমের পাখীর সংবাদ সংগ্রহ করেচি, বিশেষ ক'রে ঐ পাখারই একজোড়া জোগাড় করবার ইচ্ছে অনেক দিন ধরেই আছে, কিন্তু সময় আর সামর্থ্যের অভাবে এতদিন হ'য়ে ওঠেনি।"

"আমারও তা'ই। আফিসের যা'-কিছু কাজ সব এই সময়েই তেড়ে ধরে,—এবার যা' হোক একটু সুবিধে পাওয়া গেছে।"

মেয়েটি চম্‌কে জিজ্ঞাসা ক'রল, "আপনি সহর থেকেই আসচেন ?"

"অবশ্যই। জনসন্ জ্যাক্‌সন্ কোম্পানীর 'একাউণ্ট্যাণ্ট বিভাগের 'হেড্ বুক-কিপার'। চা আর কাঠের 'লাইনে' চাটুগাঁয়ে ওরাই সব চেয়ে বড়ো, নাম শুনেচেন, বোধ হয় ?" "তা'র দৃষ্টি মেয়েটির সুন্দর মুখের উপর স্থির হ'য়ে রইল, "তাদের কর্ম্মচারীদের ভবিষ্যতের আশা খুব উজ্জ্বল।"

মেয়েটি মৃদু হেসে ব'ললে, "নামটা শুনেচি বোধ হয়।" পরে একটু ইতঃস্তত করে ব'লল, "আমার কিন্তু এমন কোনোই আশা নেই···অবস্থা উপস্থিত খারাপ যাচ্চে, তাই খুচরো কাজকর্ম্ম ক'রেই···টীচারী, গবর্নেস্—এই সব। আমার বাবার যদি মেয়েদেরকে কাজের লোক ব'লে কিছু খেয়াল থাকতো !—লেখা-পড়া তো বিশেষ শিখতে পেলুম না।"

ছেলেটি একটু আগ্রহের সঙ্গেই জিজ্ঞাসা ক'রল, "কিছু মনে ক'রবেন না, আপনার পিতা কি—মানে জীবিত ?"

"তা অবশ্যই, বুড়ো মানুষ, উপস্থিত—পেন্সন নিয়ে বিশ্রাম ক'রচেন।"

"বা. এমন তো মনেই হয়নি!" ছেলেটি ব'লে ফেল্‌ল।

যেন আমোদ পেয়েছে এমন ভাবে হেসে মেয়েটি ব'লল, "আমার গন্তব্য স্থান 'বোকাজান'।"

ছেলেটি সোৎসাহে ব'লে উঠ্‌ল, "কি আশ্চর্য্য আমারও!···আর আপনি নিশ্চয়—হোটেল এই জায়গা ঠিক করেননি ?"

"নিশ্চয় ক'রেচি!" মেয়েটি স্নিগ্ধভাবে হাস্‌তে লাগল, "ও ছাড়া ওখানকার আর কোনো হোটেলের নাম জানা নেই, আর আমার বাবাই ওসব ঠিক ক'রে দিয়েছেন।"

ছেলেটি এবার প্রায় চীৎকার করে ফেল্‌ল, "বাই' জোভ'! আমরা একসঙ্গেই শীকার ক'রতে পারবো ?"

সপ্রতিভ হাসি হেসে মেয়েটি ব'লল, "তা' পারবো।" তা'র চোখের ঔজ্জ্বল্য দেখে মনে হ'ল যে ব্যাপারটা তা'র ভালোই লাগ্‌চে।···

পরস্পরের সঙ্গ লাভ করায় তা'রা পরিপূর্ণ ভাবে মুগ্ধ হ'য়ে গিয়ে নিজেদের সব জিনিষ-পত্র সব এক জায়গায় ক'রে বেঁধে ফেল্‌ল।···

গাড়ী ষ্টেসনে দাঁড়াল। উৎসাহে মেতে উঠে ছেলেটী দেখতেই পেল না যে মেয়েটির দেহে যথেষ্ট ক্ষমতার লক্ষণ প্রকাশ পাচ্চে, সে কেবল তা'র উষ্ণ, সুপুষ্ট হাতের স্পর্শে পুলক-শিহরণ লাভের একটা অদম্য আকাঙ্ক্ষায় চালিত হ'য়ে তা'কে ট্রেন থেকে নামতে সাহায্য ক'রল। মেয়েটিও পুরুষ ও কেরাণী কুলের উপর অবজ্ঞার কথা ভুলে গিয়ে শুধু সাহায্য গ্রহণের জন্য যেটুকু সময়ের দরকার তা'র চেয়েও বেশীক্ষণ নিজের হাতের আঙ্গুল গুলি ছেলেটির মুঠোর মধ্যে ছেড়ে দিল।

কুলির মাথায় জিনিষ পত্র চাপিয়ে দিয়ে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে ছেলেটি ব্যস্তভাবে ব'ল্‌ল, "ওহো, আমাদের মাসিক পত্র-দুখানা ফেলে এলুম্ যে!"

"যাক্ গে!" পেন্সন-ভোগী ভদ্রলোকের মেয়েটি কেরাণীটির মুখের দিকে চেয়ে একটু হাসল, ব'ল্‌ল, "ও সব বেয়াড়া কাল্পনিক জিনিষ আমি আদপেই পছন্দ করি না।"

কেরাণীটিও পেন্সন-ভোগী ভদ্রলোকের মেয়েটির মুখের দিকে চেয়ে মৃদু হাস্‌ল, ব'ল্‌ল, "ভয় নেই, আমিও বাস্তব জিনিষই ভালোবাসি!"···

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মিত্র এম-এ

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথও একজন জমিদার কিন্তু ইনিও প্রাচীন জমিদার বংশজাত নহেন। ইঁহাদেরও বংশ ইংরাজী আমলেই বিত্ত অর্জ্জন করিয়া উন্নতি লাভ করেন। ইঁহারা ব্রাহ্মণ হইলেও কোন এক অমূলক অপবাদে সমাজে প্রায় অচল অবস্থায়ই থাকিতেন। অর্থাগমের সহিত সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাভ করিবার দারুণ ইচ্ছা আপনা হইতে আসায় মহর্ষির পিতা দ্বারকানাথ ঠাকুর স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া ব্রাহ্ম হন। বিত্ত ও বিদ্যার সাহায্যে সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাভ করিলে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্রের সহিত একমত হইয়া ব্রাহ্ম সমাজকে প্রসারিত করিয়া সার্ব্বজনীন প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিতে অসম্মত হন। উদীয়মান কেশবচন্দ্র জাতিতে বৈদ্য ছিলেন, তাঁহার বংশ মর্য্যাদা বিশেষ ছিল না। জ্ঞান ও বিদ্যাই তাঁহার একমাত্র সম্বল ছিল। প্রথম কয়েক বৎসর কেশবচন্দ্র মহর্ষির সন্নিধানে অবস্থান করিয়া একযোগে কাজ করিবার পরে স্পষ্টই বুঝিতে পারেন যে এই ধর্ম্মকে সঙ্কুচিত অবস্থায় রাখিলে এই ধর্ম্ম প্রচারকের উদ্দেশ্য সফল হইবে না। ব্রহ্মধর্ম্ম প্রথম হইতেই উন্নতিশীল ও অর্থবান অভিজাতদের ধর্ম্মমত বলিয়া দেশে প্রসিদ্ধি লাভ করে। সমস্ত অভিজাতগণকেই জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে এই ধর্ম্মের অ.ঙ্ক আশ্রয় প্রদান করিতে না পারিলে শীঘ্রই এই ধর্ম্মের অব্যাহত গতি সংযত করিয়া দেওয়া হইবে, এই অজুহাতে কেশবচন্দ্র মহর্ষির সহিত মনান্তর করিয়া সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠিত করেন। মহর্ষি কর্ত্তৃক পরিচালিত আদি ব্রাহ্মসমাজ অনেকটা হিন্দু-ধর্ম্মেরই অংশ বিশেষ হইয়া রহিয়া যায় কেননা উহার প্রবর্ত্তকগণের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল সমাজে খানিকটা প্রতিষ্ঠা লাভ করা। এই ধর্ম্মপ্রচারের সহিত উক্ত উদ্দেশ্য সফল হইয়া গেলে তাঁহারা আর অগ্রসর হইতে হইতে চাহিলেন না। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজও যে উদ্দেশ্যে স্থাপিত হয় কেশবচন্দ্র নানা কারণে তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারিলেন না। এই সমাজটী তখনকার উদীয়-মান বংলার একমাত্র অবলম্বন হইলেও উহার সার্ব্বজনীন ভাব ইহাতে প্রকাশ পাইল না। সেইজন্য এই দুইটী সমাজ ব্যাপক ভাবে দেশে প্রচার লাভ করে নাই।

কয়েক বৎসর ধরিয়া ইংরাজ জাতির সন্নিধানে বাস করিয়া বাংলা ইংরাজ জাতির ভাবধারা তাহার অস্থি মজ্জা-গত করিয়া লইতে সমর্থ হয়। কিন্তু সদ্য বিজিত পাঞ্জাব বাংলার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াও প্রাচীনকে পরি-ত্যাগ করিতে পারিল না। বাংলা তাহার সনাতন ধর্ম্ম, আচার-ব্যবহার, পোষাক-পরিচ্ছদ ত্যাগ করিয়া এক নূতন ভাবধারা সৃজন করে বলিয়াই, ব্রাহ্ম ধর্ম্মকে এই নূতন ভাবধারার ধারকগণের আশ্রয়স্থলরূপে সৃজন করিতে হয়। পাঞ্জাব তাহার পুরাতনীকে অটুট রাখিয়া নূতনের আদর্শে উহাকে ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করে। স্বামী দয়ানন্দের সহিত মহাত্মা রামমোহনের এইখানেই পার্থক্য। মহাত্মা রামমোহন পাশ্চাত্য জ্ঞানকে বরণ করিয়া লইয়া ভারতবর্ষে উহাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন,

স্বামী দয়ানন্দ পুরাতনীকে ইংরাজী হ্যাট কোট দিয়া নূতনত্ব প্রদান করিতে সঙ্কল্প করেন। দয়ানন্দ স্বামী প্রচার করেন যে বেদই সকল জ্ঞানের মূল, বেদে যাহা নাই এমন কোন পার্থিব জ্ঞান থাকিতে পারে না। এই জন্য সকল প্রকার অজ্ঞতা দূরীকরণ মানসে হিন্দু জাতির সমস্ত সম্প্রদায়েরই বেদে সম্পূর্ণ অধিকার আছে বলিয়া ঘোষণা করেন। পুরাতন বেদের আধুনিক ব্যাখা দিয়া উহার এক অভিনবত্ব সম্পাদন করেন। তিনিও মহাত্মা রামমোহন রায়ের ন্যায় একটী নূতন অভিজাতদের ধর্ম্ম সৃষ্টি করিবার মানসে তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্ম মত হইতে সকল প্রকার জাতিভেদ উঠাইয়া দেন। রাজার ন্যায় তিনিও সকল প্রকার সামাজিক কুসংস্কার গুলির আমুল পরিবর্ত্তন করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হ'ন। জ্ঞানই মানবকে উন্নত করিয়া নূতন অভিজাতত্ব প্রদান করিতে পারে এই ধারণার বশীভূত হইয়াই তিনি বিদ্যাশিক্ষা প্রদান করিবার জন্য বিদ্যালয় ও কলেজ স্থাপন করেন। মহারাষ্ট্রেও এই আন্দোলনের ঢেউ আসিয়া প্রার্থনা-সমাজের মধ্য দিয়া নূতন ধর্ম্ম প্রচারিত হয়। এই নূতন ধর্ম্মের প্রচারকগণ সকল প্রকার সমাজ সংস্কার করিবার জন্য বদ্ধ পরিকর হ'ন। লোকমান্য তিলক এই আন্দোলনের শ্রেষ্ঠ দান।

যখন এইরূপ আন্দোলন চলিতেছিল, তখন ইংরাজী শিক্ষা লাভ করিয়া নূতন অভিজাতশ্রেণী সরকারের নিকট হইতে কতকটা সম্মান ও উচ্চ পদবী লাভ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠেন। ইংরাজ জাতি এখানে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াই উহা শাসন করিবার জন্য একদল শাসকশ্রেণী সৃষ্টি করেন, এই শাসকশ্রেণীরই নাম সিভিলিয়ান। এই সিভিলিয়ানগণ তখন সকলেই ইংরাজ হইতেন এবং দেশীয় অভিজাতগণকে বিশেষ সম্মানজনক চক্ষে দর্শন করিতেন না। রাজ্যশাসন করিতে গেলে কোন প্রকার পক্ষপাতিত্ব দোষ স্পর্শ না করে এইজন্য তাঁহারা ধনিক ও শ্রমিককে কঠোর হস্তে একই প্রকার আইন দ্বারা শাসন করিতেন। জমিদারগণ এই বিধি আদপেই পছন্দ করিতেন না। সেইজন্য ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ লাট-সকাশে গতায়াতের সহিত নূতন রাজশক্তি পাইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়েন। ম্যাজিষ্ট্রেট তখনকার সমাজে সম্রাট বিশেষ ছিলেন। তাঁহার ক্ষমতা অসীম ছিল। এই সরকারী পদ লাভ করিতে পারিলে আত্মমর্য্যাদা লাভ করিতে পারা যায় ভাবিয়া দেশীয় অভিজাতগণ আন্দোলন আরম্ভ করেন। তাঁহারা প্রথমে অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ ও পরে ডেপুটীগিরি লাভ করিতে সক্ষম হইয়া খোদ ম্যাজিষ্ট্রেট হইবার জন্য আন্দোলন করিতে থাকেন। দেশে ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপিত হইলে দুইচারিজন ইংরাজী ভাষায় জ্ঞান লাভ করিয়া ইংরাজী সংবাদপত্র বাহির করেন। এই অভিজাতশ্রেণীর মুখপাত্র হিসাবেই ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার ঠাকুর বংশের উদ্যোগে বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন স্থাপিত হয়। স্বর্গীয় দ্বারকানাথ ঠাকুরই ইহার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং তাঁহার পুত্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এই এসোসিয়েসনের প্রথম সম্পাদক। কলিকাতার অন্যতম অভিজাতবংশ, শোভাবাজারে বংশধরগণও এই আন্দোলনে যোগদান করেন। স্যার রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর এই সভার প্রথম সভাপতি। স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রায় বিশ বৎসর কাল এই সভার সম্পাদক পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ভারতে রাজনৈতিক আন্দোলনের সূত্রপাত এইরূপে সংঘটিত হয়।

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে স্যার সুরেন্দ্রনাথ কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া ভারতীয় রাজনৈতিকদলের পাণ্ডা হ'ন। স্যার সুরেন্দ্রনাথ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মুখপাত্র হিসাবে রাজনীতিকে অভিজাতগণের নিকট হইতে টানিয়া বাহির করিয়া আনিয়া সর্ব্বপ্রকার আন্দোলনকে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর করায়ত্ব করেন। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা, বোম্বাই এবং মাদ্রাজে বিশ্ব বিদ্যালয় স্থাপিত হইলে, উচ্চশ্রেণীর মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকগণ তথা হইতে শিক্ষালাভ করিয়া ব্যারিষ্টার, উকিল, ডাক্তার প্রভৃতি হইতে থাকেন। এই সমস্ত পেশায় তাঁহাদের বিপুল অর্থাগম হইতে থাকিলেই তাঁহারা অভিজাত শ্রেণীতে উন্নীত হইয়া যান। তখনকার অভিজাতগণও এই উদীয়মান শ্রেণীকে বিবাহাদি দ্বারা আত্মীয়তা-সূত্রে আবদ্ধ করিয়া অনেকেটা একই সম্প্রদায়ে পরিণত হ'ন। ১৮৮৫

সালে কংগ্রেস স্থাপিত হইলে, কংগ্রেস এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হস্তে আসিয়া উহাদের আত্ম-উন্নতির একটী পন্থায় পরিণত হয়।

সিপাহী বিদ্রোহের পর ভারতীয় অভিজাতগণকে আপনাদের চক্ষের সম্মুখে রাখিবার জন্য এবং তাহাদিগকে রাজনৈতিক আন্দোলন হইতে অনেকটা নিরস্ত করিবার উদ্দেশ্যেই ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে আইন পরিষদগুলিতে সরকার কর্ত্তৃক মনোনীত সদস্য গ্রহণ করিবার বিধি প্রবর্ত্তিত হয়। এই বিধান অনুযায়ী ভারতীয় অভিজাতগণই আইন পরিষদে প্রবেশ করিতে পারিতেন। উদীয়মান মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নেতাগণ এই ব্যবস্থায় অনেকটা অসন্তুষ্ট হইয়াই আপনাদের প্রবেশাধিকার লাভ করিবার জন্য আন্দোলন সুরু করেন। এই আন্দোলনের ফলেই লর্ড ডাফরিণের শাসন সংস্কার প্রবর্ত্তিত হয়।

প্রচুর ভাবে সরকারী চাকুরি লাভ করা ও সিভিলিয়ান হইবার জন্য ভারতবাসীকে সর্ব্বপ্রকার সুযোগ ও সুবিধা প্রদান করা, এই দুইটী মূলমন্ত্রই ছিল স্যার সুরেন্দ্রনাথের প্রথম রাজনৈতিক জীবনের সম্বল। বোম্বায়ের নেতাগণ কংগ্রেসে যোগদান করিলে, কাপড়ের উপর যে আবগারী শুল্ক ছিল উহা উঠাইয়া দেওয়া আর একটী উদ্দেশ্যে পরিণত হয়। বড়দিনের উৎসবে কংগ্রেসের অধিবেশন বসিত, দেশের তাবৎ উচ্চশ্রেণী এই কংগ্রেসে যোগদান করিয়া নাম ও স্বার্থসিদ্ধি করিতেন। কংগ্রেসের সভ্য হইতে পারিলে কাগজে নাম বাহির হয় ও দেশ-বিদেশে পরিচিত হইতে পারা যায় বলিয়াই তখনকার তাবৎ ব্যারিষ্টার ও উকিলগণ কংগ্রেস ফণ্ডে সামান্য চাঁদা দিয়া উহার সভ্য তালিকায় নাম লিখাইতেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জামাতা ৺জানকীনাথ ঘোষাল বহু বৎসর ধরিয়া কংগ্রেসের সম্পাদকতা করিয়াছিলেন। এই কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্র হইলেও উহার সহিত জনসাধারণের অন্তরের যোগ ছিল না। তখনকার কংগ্রেস অভিজাত ও উচ্চ-মধ্যবিত্তশ্রেণীর সুখ-সুবিধার জন্যই আন্দোলন করিতেন, শ্রমিক বা কৃষকদিগের জন্য তাঁহারা বিশেষ চিন্তা করিবার যুক্ত খুঁজিয়া পাইতেন না।

এই সময়ে রামকৃষ্ণ দেবের আবির্ভাব হয়। সাধারণ মানব দেব-অনুগ্রহ লাভ করিতে পারিলে সকলেরই বড় হইতে পারে, তাঁহার জীবনে ইহাই প্রমাণিত হয়। মূর্খ ও সর্ব্বপ্রকার বিদ্যা বিবর্জ্জিত পরমহংসদেবকে, বৈজ্ঞানিক মহেন্দ্র সরকার হইতে আরম্ভ করিয়া পরিব্রাজক প্রতাপ মজুমদার পর্য্যন্ত ভক্তি চক্ষে দর্শন করেন দেখিয়া, দলে দলে জনসাধারণ তাঁহার স্মরণাপন্ন হয়। মহাত্মা রামমোহন রায় একজন অভিজাত ছিলেন। তিনি পাশ্চাত্য সভ্যতাকে গ্রহণ করিয়া ভারতবর্ষে যে ভাবধারা সৃষ্টি করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন তাহাতে অভিজাতগণেরই সুবিধ হয়। জনসাধারণ এই আন্দোলনে প্রাণ খুলিয়া যোগদান করিতে পারে নাই। রামকৃষ্ণদেব যে ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করেন তাহাতে জনসাধারণের আকাজ্ক্ষা তৃপ্তি লাভ করে। এই জন্যই অতি অল্প সময়ের মধ্যেই এই নূতন ধর্ম্ম জনসাধারণের প্রিয় হইয়া উঠে। কর্ম্মী নরেন্দ্রনাথ বিবেকানন্দ নাম গ্রহণ করিয়া এই ধর্ম্মকে কতকটা রাজনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রয়াস পান। বিজ্ঞানের সহিত ভারতের দর্শনকে সংযোজিত করিয়া দেওয়াই ছিল তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য। সে সময়ে পাশ্চাত্যে বিজ্ঞানের বিশেষ উন্নতি হইলেও চরম উন্নতি সংঘটিত হয় নাই। সেই জন্যই পাশ্চাত্য নর-নারীগণ তাহাদের বিজ্ঞানের সহিত ভারতীয় দর্শনকে মিশ্রিত হইতে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া পড়ে এবং তাবৎ বিশ্বে একটা জোর আন্দোলন চলিতে থাকে। যাহার ফলে ভারতবর্ষ বিশ্বের দরবারে পরিচিত হয়। একথা সত্য, বিবেকানন্দই ভারতবর্ষকে বিশ্বের দরবারে উপস্থিত করাইয়া উহার গলে গৌরব-মাল্য প্রদান করেন।

Consent বিল জাতীয়-আন্দোলনকে নূতন আকার প্রদান করে। সরকারী পক্ষ এই বিলটী আইনে পরিণত করিবার জন্য দেশবাসীর নিকট অভিমত চাহিলে, সমগ্র দেশে একটা জাগরণের আভাস পাওয়া যায়। সনাতনীগণ এতদিন অনেকটা নির্ব্বাক থাকিয়াই উন্নতিশীলদের সর্ব্বপ্রকার আন্দোলন সহ্য করিয়া আসিতে-

ছিলেন। সরকারী আইন পরিষদের সদস্য পদ ত্যাগ করায় বাল গঙ্গাধর তিলকের রাজমান্য (Honourable) এই পদবটী খসিয়া পড়িলে, জনসাধারণে তাঁহাকে "লোকমান্য" উপাধি প্রদান করে। তিলকই কংগ্রেস আন্দোলনকে সাধারণের আন্দোলনে পরিণত করিবার জন্য ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে উহা দখল করিবার চেষ্টা করেন। অশিক্ষিত জনসাধারণ ইউরোপের যুক্তি ও ন্যায়ের কোন ধারা বুঝিতে না পারিয়া উন্নতিশীল দলের নিকট এতদিন নতশির হইয়াছিল। রাজনীতি ক্ষেত্রে তিলকের অভ্যুদয় হইলে এই দল শক্তি-সংগ্রহ করিয়া প্রবল হইয়া উঠিতে থাকে। তিলক পাশ্চাত্য উচ্চশিক্ষায় বিশেষ সুশিক্ষিত হইলেও ভারতীয় ভাবধারার সহিত তাঁহার নাড়ীর টান ছিল। সমগ্র বেদ অধ্যয়ন করিয়া তিনি আর্য্যজাতির বহু প্রাচীনত্ব প্রমাণ করেন। Consent বিল সম্বন্ধে তিনি এই অভিমত প্রচার করেন যে, বিলটীর উদ্দেশ্য সাধু হইলেও সামাজিক আচার-ব্যবহার মানব-জাতির স্বাধীন মত দ্বারা পরিবর্ত্তিত হওয়াই উচিত, উহাতে সরকার পক্ষ হস্তক্ষেপ করিলে বড়ই অন্যায় করা হইবে। সনাতনীগণ তিলকের পশ্চাতে থাকিয়া পুরাতনীকে আগ্‌লাইয়া ধরিয়া থাকিবার জন্য ব্যস্ত হন।

ক্রমশঃ উচ্চ মধ্যবিত্ত দলের সহিত নিম্নশ্রেণী মধ্য-বিত্ত দলের সংমিশ্রণ হওয়ায়, কংগ্রেস শাসন-সংস্কার পাইবার জন্য ব্যগ্র হয়। ১৯০৫ সালের বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনকে উপলক্ষ করিয়া সারা ভারতবর্ষে ভীষণ অসন্তোষ আত্মপ্রকাশ করিলে ইংরাজ ১৯০৯ সালে মিণ্টো-মর্লি শাসন-সংস্কার প্রদান করেন। তাহার পর বলিয়া দেওয়া হয় যে ভারতকে ভবিষ্যতে আর কোন প্রকার অধিকার প্রদান করা হইবে না, কেননা ভারতবর্ষকে কোন কালেই ইংরাজ-অধ্যুষিত উপনিবেশ-গুলির সহিত এক আসনে বসিতে দেওয়া যাইতে পারে না। অনেকেই ভাবিয়াছিলেন যে ভারতে রাজনৈতিক আন্দোলনে যবনিকা পতন হইল।

১৯০৯—১৯২৮।—তাহার পর ১৯১৪ সালে ইউরোপ আত্মক্ষয়কর মহাযজ্ঞে প্রবৃত্ত হইলে, ভারতের সাহায্য প্রার্থী হয়। ভারতও সর্ব্বপ্রকার স্বার্থত্যাগ করিয়া ইউরোপকে সাহায্য করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়। যুদ্ধের অবসানে আমেরিকার যুক্তরাজ্যগুলির সভাপতি অধ্যাপক উইল্‌সন্ সাহেব খুব বড় গলায় পরাধীন জাতিগুলিকে অদূর ভবিষ্যতে স্বাধীনতা প্রদান করা হইবে বলিয়া আশ্বাস প্রদান করেন। এইজন্য ভারত স্বভাবতঃই একটু অধীর হইয়া উঠে। খলিফা-সংবাদে উৎকণ্ঠিত মুসলমান সমাজ হিন্দুগণের পার্শ্বে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলে এখানকার কংগ্রেস আন্দোলন ভীষণাকার ধারণ করে। অশান্ত ভারতকে শান্ত করিবার জন্যই মণ্টাগু সাহেব ভারতকে অনেকটা স্বায়ত্ত-শাসন প্রদান করিয়া, ভবিষ্যতে উহা পূর্ণ মাত্রায় প্রদান করা হইবে বলিয়া রাজ-ঘোষণা প্রচার করেন।

এই মহেন্দ্রক্ষণে তিলকের মৃত্যু হয়। ১৯২০সালে তিলকের মৃত্যু হইলে মহাত্মা গান্ধী আসিয়া কংগ্রেসের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। মহাত্মাজী যখন রাজনৈতিক বল্গা ধারণ করেন তখন ভারতের জনসাধারণ অনেকটা প্রবুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। শ্রমিকগণ দলবদ্ধ ভাবে পাশ্চাত্যের আদর্শে ইউনিয়ন সংগঠন করিতে আরম্ভ করে। কৃষকগণও দলবদ্ধ ভাবে আন্দোলন চালাইতে শিক্ষা করে। সকল শ্রেণীর মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য কোন প্রকার উপায়ের পন্থা না দেখিয়া হতাশ হইয়াই অনেকটা মরিয়া হইয়া উঠে। মহাত্মা গান্ধীজী এই সকল আন্দোলনের মূলক্ষেত্র কংগ্রেসের প্রধান পাণ্ডা হইয়া আন্দোলন চালাইতে থাকেন। ১৯২১ সাল এই আন্দোলনের শেষ পরিণতি। মহাত্মাজী তাঁহার কথামত কার্য্য করিতে না পারায় জনসাধারণ হতাশ হইয়া পড়ে।

তাহার পর দেশবন্ধু, পণ্ডিত মতিলাল ও হাকিম আজমল ইহাঁরা তিনজনে মিলিয়া কংগ্রেস আন্দোলনকে প্রকৃত রাজনৈতিক আন্দোলনে পরিণত করিবার চেষ্টা করেন। কংগ্রেস যতদিন মধ্যপন্থীদের হস্তে ছিল ততদিন উহা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান থাকিলেও ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় তাবৎ গবেষণা এখানে স্থান পাইত। মহাত্মাজী কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া কংগ্রেস অনেকটা নৈতিক

খোকার প্রার্থনা

লক্ষ্মীবিলাস প্রেস, লিঃ কলিকাতা।

সভায় পরিণত হয়। দেশবন্ধু দাশ কংগ্রেসকে সকল প্রকার বন্ধন হইতে মুক্তি প্রদান করিয়া উহাকে প্রকৃত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিবার জন্য প্রাণপণ যত্ন করিতে থাকেন। দেশবন্ধু দাশ জানিতেন যে কংগ্রেসকে প্রকৃত জাতীয় মহাসভায় পরিণত করিতে গেলে উহাকে জনসাধারণের মিলনস্থল করিয়া তুলিতে হইবে। এই জন্যই তিনি ইহার সভ্যের বার্ষিক দেয় চাঁদার হার মাত্র চারি আনা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া দেন। পল্লীগঠন ও সংস্কার করা তাঁহার জীবনের আর একটী মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। জীবিত থাকিলে তিনি হয় ত উহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারিতেন এবং তাহা হইলেই কংগ্রেসও প্রকৃত জনসাধারণের মিলন স্থল হইতে পারিত। তাঁহার অকাল মৃত্যু দেশকে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে বাধা প্রদান করে।

নানাবিধ আন্দোলনে ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া ইংরাজ শাসন সংস্কারের আমূল পরিবর্ত্তন করিতে স্বীকৃত হইয়া লণ্ডনে গোলটেবিল বৈঠক বসান। এই বৈঠকের সভ্য সংখ্যা এমন ভাবে নিয়ন্ত্রিত করা হইয়াছিল যে উহাতে শুধু ভারতের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে যে মনোমালিন্য এখনও বিদ্যমান আছে এই গোল টেবিলের অধিবেশন সময়ে শুধুই তাহার ঘাত-প্রতিঘাত দেখিতে পাওয়া যায়। দেশের মঙ্গলকর কোন পরামর্শ তথায় গৃহীত হইতে পারে নাই। ভারতকে উন্নতির পথে আগাইয়া দিবার জন্য যাঁহারা ব্যস্ত ছিলেন সেই সমস্ত লোকের পরামর্শ গ্রহণ করিতে সরকার দ্বিধা বোধ করায় ভারতীয় রাজনীতি ক্ষেত্রে এখন আর একটী নূতন যুগের আবির্ভাব হইয়াছে।

ভারতীয় বিপ্লববাদ।—প্রকৃতপক্ষে বলিতে গেলে ১৯০৫ সালে বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের সহিতই ভারতে বিপ্লব-বাদ প্রথম দেখা দেয়। তখনকার বিপ্লবপন্থীগণ অতি অল্প সময়ের মধ্যে ধরা-পড়ায় কিছুকালের জন্য এই বিপ্লববাদ কমিয়া যায়। অবাধ উচ্চশিক্ষা প্রচলনের সহিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীরও আশা উচ্চ হইয়া উঠে। তাহারা নানাপ্রকার ক্লেশ সহ্য করিয়া ও বাক্স-ভার বহন করিয়া বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধি লাভ করিয়াও যখন কোন প্রকার অর্থকরী চাকুরী সংগ্রহ করিতে পারিল না তখনই আবার বিপ্লববাদ বেশ উৎকট ভাবে আত্ম-প্রকাশ করে। ভারতীয় বিপ্লববাদের মূলে কোন প্রকার চিন্তাশক্তি বা ভাবধারা নাই। অনেক সময়েই যে সমস্ত লোমহর্ষণ ব্যাপার সংঘটিত হয়, তাহা ব্যক্তি বিশেষের চেষ্টার ফল। একটু ভাল করিয়া লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পাওয়া যায় যে এই বিপ্লব পন্থীগণের অধিকাংশই নিম্নশ্রেণীর মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়। কৃষক বা ধনিক সম্প্রদায়ের সহিত তাহাদের কোন সম্বন্ধই নাই। জার্ম্মানীর হার হিটলারের বা ইটালীর মুসলিনীর সম্প্র-দায়ের অনুকরণে ইহারা রাজশক্তি করতলগত করিয়া আপনাদের আর্থিক উন্নতি করিতে চাহে। নিম্নশ্রেণী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের যদি কোন প্রকারে আর্থিক উন্নতি করিয়া দিতে পারা যায় তাহা হইলে নিশ্চয়ই বিপ্লববাদী-দিগকে শান্তিবাদী দলে পরিণত করা যাইতে পারে।

ধর্ম্ম-বনাম রাজনীতি।—যাঁহারা ভাবেন রাজনীতি হইতে ধর্ম্মকে বর্জ্জন করা যাইতে পারে না তাঁহারা নিশ্চয়ই অনেকটা ভুল ধারণা করিয়া করিয়া বসিয়া আছেন। ধর্ম্ম আমা দর প্রাচীন রাজনীতির অঙ্গ ছিল এ কথা সত্য। রাজার রাজ্যশাসন প্রণালীর নাম ছিল রাজধর্ম্ম, এবং যে শাস্ত্রের সাহায্যে সামাজিক আইন-কানুন নির্ণয় করা হইত তাহাকে মানব ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া অভিহিত করা হইত। তখনকার সমাজে এইরূপ ব্যবস্থার প্রচলন বিশেষ প্রয়োজন ছিল। আর্য্য জাতির মুষ্টিমেয় জনকয়েক অভিজাত রাজদণ্ড পরিচালনা করিতেন। সাধারণকে তাঁহাদের বশীভূত রাখিবার জন্য রাজাকে ভগবানের অংশ এবং প্রত্যেক রাজ-বিধিকেই ভগবানের আদেশ বলিয়া প্রচার করিতে হয়। সার্ব্বজনীন শিক্ষা প্রচলন করিতে অসমর্থ হওয়ায় প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য কতকগুলি নীতি রচনা করিয়া তাহাদিগকে শিক্ষা প্রদান করা হয়। এই সমস্ত নীতিকে অপরিবর্ত্তনীয়, নিত্য সত্য, বলিয়া ঘোষণা করা হয়। এই জন্যই কোন প্রকার Strike বা কার্য্য বন্ধ করিয়া আন্দোলন করার নাম

ধর্ম্মঘট। ধর্ম্মকে হিন্দু জাতির অস্থি মজ্জাগত করিয়া দিয়া এই জাতির গঙ্গাযাত্রা করা হইয়াছিল।

এই দাস মনোবৃত্তি খণ্ডন করিবার জন্য রামমোহন রায় যুক্তিতর্কের অবতারণা করিয়া সাধারণ বিশ্বাসকে ভিত্তি করিয়া তাঁহার ধর্ম্মমত গঠন করেন। এই ধর্ম্মমতের সাহায্যেই হিন্দুধর্ম্মের অনেক বাহিক পরিবর্ত্তন হয়। তখনকার সরকার যদি রামমোহন রায়কে বিশেষভাবে সাহায্য প্রদান করিতেন তাহা হইলে আজ ভারতবর্ষ এক নূতন দেশে পরিণত হইতে পারিত। ইংরাজ রাজকর্ম্মচারীগণ কতকটা ভীতচিত্তে ও কতকটা আপনাদের ক্ষমতার হ্রাস ঘটিবে আশংকায় মহাত্মা রামমোহন রায়কে প্রাণ খুলিয়া সাহায্য করেন নাই। সার সুরেন্দ্রনাথ ধর্ম্ম-বিবর্জ্জিত রাজনৈতিক আন্দোলন আরম্ভ করিয়া যথেষ্ট ফল প্রাপ্ত হ'ন। স্বদেশীযুগে খানিকটা অন্ধবিশ্বাস বশতঃই সার সুরেন্দ্রনাথ আপনাকে সামলাইতে না পারিয়া ধর্ম্মের সহিত রাজনীতি মিশাইয়া ফেলিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার রাজনীতিতে ধর্ম্মের উৎকট গন্ধ প্রকাশ পাইত না। মহাত্মাজী একজন ত্যাগী মহাপুরুষ। তাঁহার মহৎ আদর্শে ও ত্যাগ সমস্ত পৃথিবী চমৎকৃত হইয়াছে। এই মহাপুরুষ রাজনীতি আন্দোলনে আকর্ষিত হইয়া আসিয়া ধর্ম্মের সহিত উহার যোগ সংসাধন করেন। কংগ্রেস-খিলাফৎ-আন্দোলন তাঁহার চেষ্টারই ফল মাত্র। আদর্শ হিসাবে অনেক নীতি মানব-জাতির সম্মুখে খাড়া করিয়া রাখিবার যোগ্য হইলেও, রাজনীতি-ক্ষেত্রে উহার কোন যোগ্যতা নাই, পৃথিবীর ইতিহাসে তাহা বহুবার প্রমাণিত হইয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডের রাজনীতির পরিচালক গ্লাডষ্টোন্ রাজনীতির মধ্যে খানিকটা ধর্ম্মভাব সংযোগ করিয়া দিয়াছিলেন বলিয়াই ভবিষ্যৎ বংশধরগণ তাঁহাকে দোষী সাব্যস্ত করেন। তাহার পর বর্ত্তমান যুগে ধর্ম্মের কোন প্রকার অস্তিত্বই যখন সম্ভবপর হইতেছে না, তখন রাজনীতি ক্ষেত্রে সন্দেহ-মূলক জাতির কূট প্রশ্ন গুলিকে আনয়ন করিয়া উহাকে পঙ্গু করিয়া দেওয়া কি যুক্তিযুক্ত? ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমান জাতিদ্বয়ের মধ্যে যে আত্ম-বিরোধ দিন দিন ভীষণভাবে প্রকাশ পাইতেছে তাহার মূলে দুইটী ভাবধারার নৈতিক নীতিগুলির বৈষম্যই প্রধান কারণ। আরবীয় ভাবধারা জাতীয়তা বিকাশের প্রধান সহায়ক, এইজন্য সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে বাস করিবার উপদেশ এই ভাবধারায় যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। ভারতীয় ভাবধারা অনেকটা উদার, ব্যক্তিগত প্রাধান্য অপেক্ষা গোষ্ঠীগত প্রতিষ্ঠা এখানে অধিকভাবে সমর্থিত হয়। মুসলমান জাতি চাহে সাংসারিক উন্নতি, অর্থ, মান ও যশ। হিন্দুগণ চাহেন সমাজের স্থিতিশীলভাব, যে যেখানে যে অবস্থায় আছে তথায় তাহার অবস্থিতি, অর্থাৎ সকল প্রকার স্থিতিশীলতা! মূলতঃ দ্বন্দ্ব এই খানেই। এই জন্য মনে হয় জাতীয় ভাব-ধারার মধ্যে ধর্ম্মের সকল প্রকার প্রভাব বর্জ্জন করাই প্রয়োজন।

চীন। ভারতের সহিত আত্মীয়তা।—চীন জাতিহিসাবে পৃথক হইলেও ভাবধারা হিসাবে ভারতের অতি নিকট জাতি। চীন ভারতের ন্যায়ই বিশাল। ভারতের ন্যায় চীনও বহুবার নানা বৈদেশিকগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে এবং ভারতবর্ষের ন্যায় চীনও সেই সমস্ত বৈদেশিকগণকে জাতিত্ব সূত্রে আবদ্ধ করিয়া আত্মসাৎ করিয়া ফেলিয়াছে। ভারতের মত চীনের জনসংখ্যাও বিরাট এবং তাহাদের আর্থিক অবস্থা আমাদের মতই চিরকালই দুঃখ ও দরিদ্রতায় পরিপূর্ণ।

পূর্ব্বোক্ত সাদৃশ্যগুলি হয়ত স্বাভাবিক ভাবেই সম্পাদিত হইয়াছে কিন্তু উভয় দেশের ভাবধারায় যে ঐক্য দৃষ্ট হয় উহা অনেকটা উভয় জাতির চেষ্টার ফল ইহা সুনিশ্চিত। মহাচীন ভারতের ন্যায় একটী মহাদেশ বলিলেও অত্যুক্তি করা হয় না। কাজেই এই বিস্তৃত ভূভাগে নানা প্রকার জাতি ও ভাষার প্রচলন খুব স্বাভাবিক ভাবেই হইয়াছিল। চীনের বিভিন্ন জাতিগুলি পরস্পর পরস্পরের নিকট হইতে পৃথক হইলেও উহারা সকলেই মঙ্গলীয় জাতি। চীনে এক দেশের ভাষার সহিত অন্য প্রদেশের ভাষার যথেষ্ট পার্থক্য লক্ষিত হয়। চীন বিশেষজ্ঞরা সাধারণতঃ বলিয়া থাকেন যে সমগ্র চীনে দুইটী ভাষা প্রচলিত আছে, উত্তর চীনের পিকিনী ভাষা এবং দক্ষিণ চীনের কাণ্টনী ভাষা। সমগ্র

চীন ভাষাকে মাত্র দুইটী শ্রেণীতে বিভক্ত করিলে চীনের ভাষাগত পার্থক্য ঠিক স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করা হয় না। প্রত্যেক প্রদেশের ভাষা অন্য প্রদেশ হইতে স্বতন্ত্র। আবার একই প্রদেশের একটী জেলার ভাষা ঐ প্রদেশেরই অন্য একটী জেলার ভাষা হইতে স্বতন্ত্র। এইরূপ হইবার মূল কারণ এই যে চীনে ক্লাসিক বা পুরাতন সাহিত্যের যথেষ্ট সম্মান থাকিলেও বাল্মিকী বা হোমারের ন্যায় কোন মহাকবির আবির্ভাব ঘটে নাই। এইরূপ কোন মহাকাব্য কোন প্রদেশ-বিশেষের ভাষায় লিখিত হইলে, কালক্রমে উক্ত প্রদেশের ভাষাই সমগ্র দেশের ভাষায় পরিণত হইতে পারিত। দ্বিতীয় কারণটী চীনের বহু প্রাচীন অক্ষর-মালা। মানবজাতি যখন লিখিতে শিক্ষা করে তখনই তাহারা নানাপ্রকার ছবির সাহায্যে আত্মভাব প্রকাশ করিত। সভ্যতা বিকাশের সহিত তাহারা ক্রমশঃ সরল ও বোধগম্য লিপি প্রণালীর সাহায্য লইতে বাধ্য হয়। অনেকটা এই ধারণার বশীভূত হইয়াই, তুরস্কের বর্ত্তমান ভাগ্যনিয়ন্তা কামাল কষ্টদায়ক আরবী ভাষার লিপিমালা পরিত্যাগ করিয়া সহজ ও অল্প আয়াসে বোধগম্য গ্রীক্ লিখন প্রণালীকে তুরস্ক জাতির বর্ণমালা করিয়া লইয়াছেন। বর্ত্তমান চীন এখনও তাহার প্রাচীন লিপি প্রণালী বজায় রাখিতে পারিয়াছে বলিয়াই ভাষাগত শত পার্থক্য থাকিলেও এক প্রদেশের সহিত অন্য প্রদেশের ভাবের আদান-প্রদান করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হয়না। চীনা ভাষাকে আধুনিক ভাষা হিসাবে ভাষা বলিয়া অভিহিত করিলে অনেকটা সত্যের অপ-লাপ করা হয় মাত্র। এই ভাষার কোন প্রকার ব্যাকরণ নাই। কাজেই পদ, কারক সমাস, তদ্ধিত প্রত্যয় ইত্যাদি কিছুই নাই। এই ভাষায় খালি কতকগুলি অক্ষর আছে। অক্ষর গুলির একত্রে সমাবেশে একটী পদ বা Sentence রচিত হয়। সমগ্র ভাষায় এইরূপ শব্দের পরিমাণ প্রায় ৫৪০০০। কাজেই কোন একজন ব্যক্তির পক্ষে এই ভাষাটীকে একান্ত আপনার করিয়া আয়ত্ত করা একেবারেই ক্ষমতার অতীত। প্রত্যেক অক্ষর একটী ছবি বিশেষ। উহার উচ্চারণ প্রদেশ বিশেষে বিভিন্ন। পাটীগণিতের সংখ্যা চিহ্নগুলি যেমন পৃথিবীর সর্ব্বত্রই ব্যবহৃত হয় কিন্তু দেশ-বিশেষে উহার উচ্চারণ বিভিন্ন, সেইরূপ চৈনিক প্রত্যেক শব্দটীর অর্থ একই, প্রদেশ-বিশেষে উহার উচ্চারণ একটু পৃথক মাত্র। এই জন্যই এই বিরাট জাতির ভাষা বিভিন্ন হইলেও উহা মূলতঃ একই।

চীনের দ্বিতীয় বিশেষত্ব: উহার সকল প্রকার ধর্ম্ম-জ্ঞান-হীন উদার মত বাদ। প্রাচীন যুগে চীনেই বিজ্ঞান শাস্ত্রের প্রথম বিকাশ ঘটে। এই শাস্ত্রের উন্নতি এখানে কতটা সংসাধিত হইয়াছিল তাহার পর্য্যাপ্ত প্রমাণ এখন না পাওয়া গেলেও জগতের জ্ঞান ভাণ্ডারে চীন যে অমূল্য রত্ন দান করিয়াছে একথা সর্ব্ববাদিসম্মত ভাবে স্বীকৃত হইয়াছে। খাদ্য দ্রব্য রন্ধন করিয়া খাইতে হয়, চীনই জগতের জাতিবৃন্দকে ইহা প্রথম শিক্ষা প্রদান করে। ছাতার উদ্ভাবন চীনেই হইয়াছিল! চীনই যুদ্ধের বর্ত্তমান খোরাক বারুদ ও কামানের প্রথম আবিষ্কারক, চীনই অক্ষর ফলক নির্ম্মাণ করিয়া মুদ্রা যন্ত্রের প্রবর্ত্তন করে। কোন ঘটনাই আকস্মিক ভাবে হয়না, ঘটনাগুলির মধ্যে কার্য্য-কারণ হিসাবে যোগ থাকে এই তত্ত্বকে স্বীকার করিয়া লইতে গেলে, একথা স্বভাবতঃই মনে হয় চীনেই হয়ত বিজ্ঞানশাস্ত্র প্রথম জন্মগ্রহণ করে। তাহার পর কোন এক অজ্ঞাত কারণে এখানে উহার বিকাশ না ঘটায়, উক্ত শাস্ত্র ইউরোপে বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে।

পুরাতন চৈনিক ধর্ম্ম।—তাওয়িজম (Taoism) চীনের একটী পুরাতন ধর্ম্মমত। লাওতাজির Lao-Tze নামক একজন চীনবাসীই এই ধর্ম্ম মতের প্রতিষ্ঠাতা। এই ধর্ম্মমত বলে যে প্রত্যেক ব্যক্তির স্বতন্ত্র সত্তা আছে। রাজার যেমন একটী বিশেষত্ব আছে, ভিখারীরও সেইরূপ একটী স্বকীয় বিশেষত্ব আছে। ভিখারী রাজা হইতে গেলে যেমন স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রম করা হয়, রাজাকে ভিখারী করিলেও তাহাই করা হইয়া থাকে। লাও তাজির শিষ্য চুয়াং তাজির (Chuang Tzeর) হস্তে এই ধর্ম্মমতটীর বিশেষ উন্নতি হয়। চুয়াং

তাজি বলেন যে প্রত্যেক ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে সে কোন কার্য্য করিবার জন্য সংসারে আসিল। সেই ব্যক্তি এই তত্ত্বটী হৃদয়ঙ্গম করিয়া যদি আপন অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিয়া হাসিমুখে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করে, তাহা হইলে পৃথিবীর অনেক অশান্তি দূরীভূত হইয়া যাইতে পারে। মানব-হৃদয়ের উচ্চাকাঙ্ক্ষা মানবকে ভিন্ন পথগামী করিয়া সংঘর্ষ সৃজন করে, তাহার ফলেই জগতে যতপ্রকার অনর্থ হয়। চুয়ান-তাজি আরও বলেন যে ভদ্রভাবে শান্ত-শিষ্ট জীবন যাপন করাই প্রকৃত দেবীর উদ্দেশ্য। ঘোড়ায় চড়িয়া দৌড়াদৌড়ি করা, তাড়াতাড়ি গমন করা বা আহার করা প্রকৃতির অভিপ্রেত নয়, এই জন্যই এই প্রকার কার্য্য অত্যধিক পরিমাণে করিলে মানব-শরীরে পীড়া দেখা দেয়।

বৈজ্ঞানিক ধর্ম্ম তাও-জিম অজ্ঞব্যক্তিগণের হস্তে পড়িয়া ক্রমশঃ সকলপ্রকার কুসংস্কারের আকর হইয়া উঠে। গ্রামের বৃদ্ধগণ তাওজিমের মূলতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া, এই ধর্ম্মকে ম্যাজিকের জন্মদাতা করিয়া উহার গাত্রে মিথ্যার প্রলেপ লেপিয়া দেয়। জনসাধারণ তাও জিমের গুরুগণের নিকট শারীরিক ব্যাধির জন্য ঔষধ ভিক্ষা করিলে তাহারা তাহাদিগের মনোযোগ আকর্ষণ করিবার জন্য ম্যাজিকের আশ্রয় লয়। এইরূপে কালক্রমে এই বৈজ্ঞানিক ধর্ম্মের পতন ঘটে।

পরবর্ত্তীযুগে কন্‌ফিউজিম ধর্ম্ম প্রচারিত হয়। ইহাকে ঠিক কোন ধর্ম্মমত বলা যাইতে পারে না। এই ধর্ম্ম-মতে শুধু কতকগুলি নীতি আছে। কোন রাষ্ট্রে বাস করিতে গেলে প্রজার কর্ত্তব্য কি? রাজার কর্ত্তব্য কি? ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ের গবেষণামূলক সারনীতি এই ধর্ম্ম মারফৎ প্রচার করা হইয়াছে। এই ধর্ম্মই চীনের শাসক সম্প্রদায় গ্রহণ করিলে উহা বিশ্বজনীন ভাবে তাবৎ চীন সাম্রাজ্যে ছড়াইয়া পড়ে। ভারতবর্ষ হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম চীনে প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত হইলেও কন্‌ফিউজিম চীন দেশে শাসকগণের ধর্ম্মমত রহিয়া যায়। এইরূপ হইবার প্রধান কারণ এই যে আমলা-তন্ত্র চীনকে শাসন করিত। অভিজাত বলিতে আমরা সাধারণতঃ যাহা বুঝি প্রাচীন চীনে তাহা কিছুই ছিল না। অতি প্রাচীন কাল হইতেই প্রতিদ্বন্দ্বীতামূলক সিভিল সার্ভিস চীনে প্রচলিত থাকায় দরুণ চীনের শাসক সম্প্রদায় চীনদেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্য হইতেই নির্ব্বাচিত হইত। এই সমস্ত আমলাগণ দেশকে নিরুপদ্রবে শাসন করিবার জন্য কোন প্রকার যুযুধমান মতবাদের প্রশ্রয় দিতেন না, এই জন্যই চীনে বৌদ্ধধর্ম্ম বিশেষভাবে প্রচারিত হইলেও এবং জনসাধারণ কর্ত্তৃক নিতান্ত আগ্রহ সহকারে উহা গৃহীত হইলেও উহার শাসক সম্প্রদায় কন্‌ফিউজিম অবলম্বন করিয়াই থাকেন।

চৈনিক রাজনীতি।—ভারতবর্ষের ন্যায় চীনেও সর্ব্বসাধারণের সহিত তথাকার রাজনীতির কোন সম্বন্ধ ছিল না। বিদ্রোহের পর বিদ্রোহ সংঘটিত হইয়া গিয়াছে, চীনের সাধারণ প্রজার কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। চীনের সাধারণ প্রজা সরকার পক্ষকে রাজস্ব প্রদান করিয়া নিশ্চিন্ত হইত। অত্যাচারী নৃপতির আমলে তাহাদের ভূমির কর যখন অত্যধিক মাত্রায় পরিবর্দ্ধিত হইত তখন তাহারা একটু বিপদগ্রস্ত হইত মাত্র, প্রতিকার করিবার জন্য কোন প্রকার পন্থারই অনুসন্ধান করিত না। দুর্ভিক্ষ আসিলে হাসিমুখে জীবন বিসর্জ্জন দিত, কিন্তু এই দুর্ঘটনার জন্য রাজা বা কোন রাজপুরুষকে দোষী সাব্যস্ত করিত না। কোন প্রকার মড়ক অতি ভীষণ ভাবে আত্মপ্রকাশ করিলে, চীনাগণ মশা মাছির ন্যায় জীবন আহুতি প্রদান করিত তত্রাচ কোনরূপ বিচলিত ভাব দেখাইত না। রাষ্ট্র-বিপ্লব চীনে কখনই ঘটে নাই, একথা সত্য নহে। রাষ্ট্র-বিপ্লব অনেক সময়েই শাসকগণ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইত, চীনের সাধারণ প্রজা অত্যন্ত অনিচ্ছায় বা একান্ত বাধ্য হইয়া কখনও কখনও যোগদান করিত মাত্র। কিন্তু এই রাষ্ট্র-বিদ্রোহেরও বিশেষত্ব ছিল। এই বিপ্লব সংঘটিত করিবার জন্য যতটুকু রক্তপাত প্রয়োজন, ততটুকু রক্তপাত করিয়াই এই বিদ্রোহ বহ্নি নির্ব্বাপিত হইয়া যাইত। পাশ্চাত্যের তুলনায় চীনের এই রাষ্ট্রবিপ্লব অতি নগণ্য ব্যাপার বলিলেও অত্যুক্তি করা হয় না।

অষ্টবিংশ শতাব্দি হইতে চীনে ইউরোপীয়গণের আবির্ভাব হইতে থাকে। চীনের সরকার এই বৈদেশিক অভিযানের গতিরোধ করিতে অক্ষম হইয়া অনেকটা রাজশক্তি তাহাদিগের হস্তে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হয়। বৈদেশিকগণ সনাতনী চীনে তাহাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র গঠন করিয়া উহার অর্থ আত্মসাৎ করিতে থাকে। ইহার ফলে চীনে ভীষণ অর্থ সঙ্কট উপস্থিত হয়। চীনের শাসক সম্প্রদায় ক্রমশঃ আপনাদের হস্ত হইতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হইয়া যাইতেছে দেখিয়া ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িতে থাকে। চীনের রাজ সরকার বৈদেশিকগণের হস্তে ক্রীড়নক মাত্রে পরিণত হইয়া যাওয়ায়, চীনের আদিম শাসকগণের সাংসারিক অর্থ কষ্ট উপস্থিত হয়। এই সম্প্রদায়ই বিশেষ যত্ন ও চেষ্টা করিয়া উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই চীনে বক্সার আন্দোলনকে প্রবল করিয়া তোলেন। এই আন্দোলনের ফলেই চীনে অনেকটা জাতীয় ভাবের বন্যা আসিয়া দেখা দেয়।

চীন চিরকালই শিক্ষার পক্ষপাতী। পুরাতন চীনে সকল প্রকার ক্লাসিকই অধীত বিষয় ছিল। পাশ্চাত্যের সংস্পর্শে আসিয়া চীনা ছাত্রগণ পাশ্চাত্য ভাষা ও বিজ্ঞান শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়া দেয়। বৈদেশিক বণিকগণ এই শিক্ষাদান কার্য্যে বিশেষ সহায়তা করেন। আমেরিকা চীনে কয়েকটী শিক্ষাকেন্দ্র এবং একটী বিশ্ব-বিদ্যালয় স্থাপন করে। বক্সার যুদ্ধের পর, খেসারৎ হিসাবে পাশ্চাত্য জাতিবৃন্দ চীনের নিকট অনেক টাকা দাবী করেন। বাৎসরিক কিস্তি হিসাবে চীনকে এই অর্থ পরিশোধ করিতে বাধ্য করা হয়। বৈদেশিকগণ এই অর্থের সাহায্যে চীন দেশেই পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্ত্তন করিবার জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত করেন। শিক্ষিত চীনা ছাত্রগণ নগর হইতে গ্রামে ফিরিয়া, নৈশ-বিদ্যালয় ইত্যাদি স্থাপন করিয়া জন-সাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করিবার জন্য চেষ্টা করিতে থাকেন।

১৯১২সাল।—সান-ইয়েট-সান ও তাঁহার কয়েক জন সহকর্ম্মী বহুদিন ইউরোপে অবস্থান করিয়া ইউরোপীয় ভাব-ধারার সহিত বিশেষ পরিচিত হন। সমগ্র চীন জাতিকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া, বিশাল চীন মহাদেশে একটী সাধারণতন্ত্র স্থাপন করিবার জন্য ইঁহারা স্বপ্ন দেখিতে আরম্ভ করেন। বিস্তর প্রয়াসের পর ১৯১২ সালের বিদ্রোহ হয়। বহু পুরাতন প্রাচীন রাজবংশকে অপেক্ষাকৃত অল্পায়াসেই সিংহাসনচ্যুত করা হয়। সিংহাসনচ্যুত রাজাকে প্রাণে বিনাশ না করিয়া, একটী পেন্সন দিয়া ও রাজা উপাধি ব্যবহার করিতে পারিবেন এই আদেশ দিয়া পিকিন হইতে তাঁহাকে স্থানান্তরিত করিয়া দেন। এই খানেই চীনের বিশেষত্ব বেশ ব্যক্তিগত ভাবে প্রকাশ হইয়া পড়ে।

কাশী ভ্রমণ

— ভ্রমণ —

কুমারী লতিকা মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)
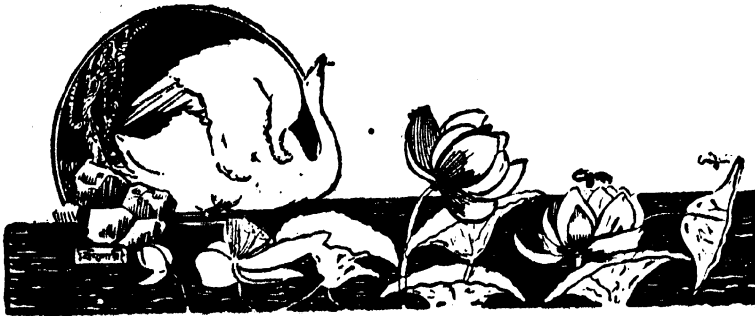
খাদ্যদ্রব্য—

কাশীতে খাবার জিনিষ কলিকাতা অপেক্ষা সস্তা। পূজা ও বড়দিনের সময় লোকের ভীড় খুব বেশী হয় বলিয়া সে সময় জিনিষপত্রের দাম একটু বাড়ে।

পূজার সময় দুধ টাকায় ৴৫॥০ সের; ঘি ১॥০ টাকা সের; সর্ষপ তৈল ।৵০ সের, চাল ৪৲ মন। রুইমাছ ॥৵০ ও ইলিশ ।৴০ সের। ইলিশ মাছগুলি কলিকাতার ন্যায় সুস্বাদু নয়। যখন ভীড় থাকে না, ইলিশ মাছ ৵০ আনা সের দরেও পাওয়া যায়।

শাক সব্জীর মধ্যে পূজার সময় আলু ৵১০ সের, বেগুন ‹১৫ সের; বরবটি, ঢেঁড়স, এক আনা সের; ফুলকপি ৵০ প্রত্যেকটী (পূজার পর ‹১০ প্রত্যেকটী)। রামনগরের বেগুন মাখনের মতন নরম। আমলকীও বিখ্যাত।

কাশীতে দুই পয়সায় যে রকম সন্দেশ, রসগোল্লা, লেডিকেনি, কালাকান্দ, ছানার জিলাপি প্রভৃতি পাওয়া যায়, কলিকাতায় তাহার দাম এক আনা। ছানার পোলাও ভাল দোকান হইতে চাকিয়া লইতে হয়; বাসি জিনিষ টক। এখানে রাবড়ি খুব ভাল পাওয়া যায়।

কাশীর পেয়ারা ও ল্যাংড়া আম অত্যন্ত সুস্বাদু।

বিশ্বনাথের গলি ও কচুরি গলিতে কচুরি, ডালপুরী গজা প্রভৃতি পাওয়া যায়।

রামনগর

রামনগর গঙ্গার দক্ষিণ তীরে অবস্থিত।

দশাশ্বমেধ ঘাট হইতে নৌকা লইয়া দক্ষিণ দিকে গেলে গঙ্গার অপর পারে রামনগরে যাওয়া যায়।

আহারাদির পর দুপুরবেলা দুইটার সময় নৌকা লওয়াই সুবিধাজনক। রৌদ্র থাকিলে নৌকায় ছাউনি করিয়া দিবে, ফিরিবার সময় খুলিয়া দিলেই হইবে।

দশাশ্বমেধ ঘাট হইতে রামনগর নৌকাভাড়া যাতায়াতে ১॥০ পড়ে। একটী নৌকায় ১৪। ১৫ জন লোক ধরে। রামনগরে লোক পিছু যাইবার সময় দুই পয়সা ও ফিরিবার সময় দুই পয়সা হিসাবে কর (টোল) আদায় করা হয়। লোক প্রতি এই এক আনা হিসাবে বেশী খরচ পড়ে।

কাশীর দুর্গাবাড়ী

রামনগরে খাবারের ভাল দোকান নাই, এজন্য খাবার সঙ্গে লইয়া যাওয়া ভাল। রামনগর যাইবার সময় নৌকা স্রোতের বিপরীতে যায় বলিয়া প্রায় দেড় ঘণ্টা সময় লাগে। যাইবার সময় নৌকা রামনগরের তীর ধরিয়া যায়। এইদিকে গঙ্গা অত্যন্ত অগভীর এবং তীর হইতে অনেক দূরেও মাত্র কোমর পর্য্যন্ত জল।

নৌকা ক্রমে অহল্যাবাই ঘাট, কেদার ঘাট, হরিশ্চন্দ্র

ঘাট, জলের কল ও অসিসঙ্গম পার হইয়া যায়। এই-খানে বামদিকে বেঁকিতে হয়।

যাইবার সময় পথে নৌকার মাঝি নৌকা থামাইয়া লোক প্রতি দুই পয়সা হিসাবে টোল দেয়।

তারপর রামনগরের প্রাসাদের আগে একটী ঘাটে নৌকা থামে। গঙ্গায় ঘাটের কাছে রামনগরের রাজার ময়ুরপঙ্খী ও জোড়া ঘোড়াওয়ালা নৌকা থাকে।

রামনগরের রাজপ্রাসাদ গঙ্গার উপর হইতে দুর্গের ন্যায় দেখায়।

রামনগর দুর্গ :—

রামনগরের দুর্গ রাজা বলবন্ত সিংহের দ্বারা অষ্টাদশ শতাব্দীতে নির্ম্মিত।

প্রাসাদের ফটক পূর্ব্বদিকে। গঙ্গার ঘাট হইতে উঠিয়া সোজা গিয়া ডানদিকে বেঁকিলে প্রাসাদের ফটক দেখা যাইবে। ফটকের ভিতর কয়েকটী বন্দুক সাজানো এবং সিপাহী পাহারা থাকে। এই ফটক দিয়া প্রবেশ করিলেই দুর্গের বহিরাঙ্গন, তারপর ভিতরদিকের অঙ্গন।

প্রাসাদ :—

রামনগরের মহারাজা অধিকাংশ সময় এই প্রাসাদে থাকেন। মহারাজা না থাকিলে সাধারণকে প্রাসাদের ভিতর কয়েকটী ঘর দেখিতে দেওয়া হয়। এই প্রাসাদ দুর্গমধ্যে অবস্থিত।

প্রাসাদের মধ্যে দ্বিতলে রাজার বৈঠকখানা। ঘরের মেঝেয় বাঘের ছাল পাতা। দেওয়ালে অনেকগুলি ছবি আছে।

একটী হস্তীদন্তের গাছ আছে, তাহার কারুকার্য্য অত্যন্ত সুন্দর।

একটী ঘরের দেওয়ালে কদম গাছ প্রভৃতির চিত্র অঙ্কিত আছে।

প্রাসাদের গঙ্গার দিকে বারান্দায় একটী পাথরের বসিবার জায়গা আছে। সেখান হইতে গঙ্গার দৃশ্য মনোরম।

ব্যাসদেবের মন্দির :—

দুর্গের ভিতর প্রাসাদ ছাড়িয়া গঙ্গার দিকে গেলে ডানদিকে গঙ্গার সমান্তরাল একটী পথ আছে। দুর্গের এই অংশে মকরবাহিনী গঙ্গার সুন্দর মূর্ত্তি আছে।

দুর্গের পশ্চিমোত্তর কোণে ব্যাসেশ্বর শিবের মন্দির। এই মন্দিরের ভিতর ব্যাসদেবের একখানি প্রাচীন তৈলচিত্র রহিয়াছে। প্রবাদ, ব্যাসদেব কাশী হইতে বিতাড়িত হইয়া এই স্থানে বাস করিয়াছিলেন।

হরপার্ব্বতীরও একটী মন্দির আছে।

দুর্গের এই স্থান হইতে গঙ্গা ও অপর পারে কাশীর দৃশ্য অত্যন্ত সুন্দর।

পশুশালা :—

দুর্গ হইতে বাহির হইয়া ফটকের ঠিক সম্মুখে যে পথ তাহা দিয়া একটু সোজা গেলেই পথের ডান-দিকে রাজার পশুশালা। এখানে চারিটী সিংহ আছে। একটী সিংহকে জাহাঙ্গীর শাহ বলিয়া ডাকিলেই উঠিয়া আসে। পশুশালায় অন্য কোন পশু নাই।

রামনগর দুর্গাবাড়ী :—

রামনগরের দুর্গাবাড়ী প্রাসাদের উত্তরপূর্ব্বদিকে অব-

রামনগর দুর্গাবাড়ী
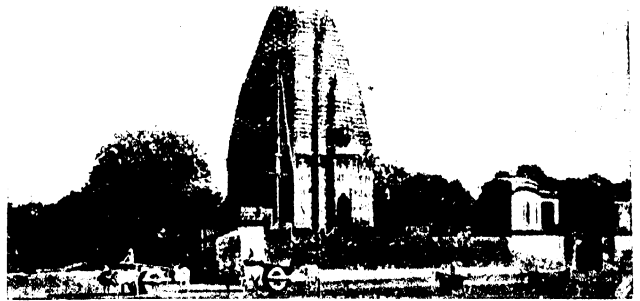
স্থিত। দুর্গাবাড়ী যাইতে হইলে দুর্গের ফটকের সামনে রাস্তায় শেয়ারে বাস বা এক্কা পাওয়া যায়। প্রাসাদ হইতে দুর্গাবাড়ী হাটিয়া গেলে প্রায় ৪০ মিনিট লাগে।

দুর্গের ফটকের সামনে বিস্তৃত পথ ধরিয়া যাইতে হয়। পথে ইলেকট্রিক আলো এবং মধ্যে মধ্যে জলের কল আছে।

একটী তোরণের কাছে বাঁয়ে বেঁকিতে হয়। এই পথের পাশে একটী স্কুল আছে; স্কুলের বাড়ীটী সুন্দর।

এই পথ ধরিয়া একটী তেমাথা পাওয়া যায়;

সেখানে ডানদিকে বেঁকিয়া কিছুদূর গেলে রামনগরের রাজার উদ্যান।

রাজার উদ্যান :—

রাজার বাগানটী সুন্দর। বাগানের মধ্যে একটী মার্ব্বেল পাথরের pavilion আছে। উহাকে ইচ্ছামত যথেচ্ছা খুলিয়া লইয়া যাওয়া যায়।

প্রতি বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে এখানে খুব ঘটা করিয়া

দুর্গাবাড়ীর প্রাচীরগাত্রে কারুকার্য্য

রামলীলা অভিনয় হয়। রামলীলার অবসানে প্রবোধ-চন্দ্রোদয় নাটকের হিন্দী অনুবাদের অভিনয় হয়। কাশী-রাজের পূর্ব্বপুরুষ কৃষ্ণমিত্র প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের প্রণেতা। স্ত্রী ও পুরুষ সকল অংশই বালকদের দ্বারা অভিনীত হয়।

রামনগরের দুর্গাকুণ্ড :—

রাজার বাগানের বামদিকে একটী প্রকাণ্ড সুন্দর দীঘি আছে। এই দীঘির পাড়গুলি পাথরে বাঁধানো এবং সুন্দর সিঁড়ি আছে।

কাশীর রাজা চেতসিংহ এই দীঘি খনন করান।

দীঘির পাড় দিয়া দুর্গা মন্দিরে যাওয়া যায়। দীঘির পূর্ব্বতীরে দুর্গা মন্দির।

রামনগর দুর্গা মন্দির :—

দুর্গা মন্দির চুনারের বালি পাথরে প্রস্তুত। মন্দিরের গায়ে নানা দেবদেবীর মূর্ত্তি কারুকার্য্য ক্ষোদিত রহিয়াছে।

মন্দিরের পিছনদিকে পাথরের দ্বার, তাহাতে সুন্দর কারুকার্য্য।

দুর্গা মন্দির ১০০ ফিট উচ্চ। কাশীর ঘাট হইতে এই মন্দির দেখা যায়। মন্দিরচূড়ায় স্বর্ণমণ্ডিত নিশান নীল আকাশে সুন্দর দেখায়।

মন্দির মধ্যে পার্ব্বতীর মূর্ত্তি। তাহার একপাশে হংসোপরি সরস্বতী ও অন্যদিকে রাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তি।

মন্দিরের বাহিরে বাম পাশের দ্বারের সম্মুখে গরুড়-মূর্ত্তি এবং অন্য পাশে বৃষমূর্ত্তি রহিয়াছে। নিকটে একটী পক্ষযুক্ত সিংহ মূর্ত্তি রহিয়াছে।

রামনগরের দুর্গামন্দির রাজা চেতসিংহের কীর্ত্তি।

দুর্গামন্দির দেখিয়া পুনরায় দুর্গের পাশে গঙ্গার ঘাটে নৌকা লইতে হয়। ফিরিবার সময় আবার দুই পয়সা হিসাবে টোল আদায় করে।

রামনগর হইতে কাশী ফিরিবার সময় স্রোতের অনুকূলে যায় বলিয়া নৌকা মাত্র আধ ঘণ্টায় কাশী দশাশ্বমেধ ঘাটে পৌঁছায়।

সারনাথ

সারনাথ বারানসীর ৪ মাইল উত্তরে। সারনাথের প্রায় আধ মাইল পূর্ব্বদিকে সারনাথ মহাদেবের মন্দির আছে। সারঙ্গনাথ (বা মৃগপতি) শিবের নাম হইতে এই স্থানের নাম হইয়াছে সারনাথ। কিন্তু এই নাম খুব আধুনিক। ইহার প্রাচীন নাম ঋষিপতন বা মৃগদাব (হরিণ বন)।

সারনাথ বৌদ্ধদের তীর্থস্থান।

কপিলবাস্তুর রাজার ছেলে সিদ্ধার্থ। রাজ্য, সুন্দরী স্ত্রী এবং শিশুপুত্রকে ছাড়িয়া তিনি একদিন রাত্রে পলাইয়া সন্ন্যাসী হন। তারপর বুদ্ধগয়ায় তপস্যা করিয়া বুদ্ধত্ব লাভ করেন। তখন তাঁহার নাম হইল বুদ্ধ বা জ্ঞানী। তাঁহার নূতন ধর্ম্ম প্রথমে এই সারনাথে প্রচার করেন এবং তাঁহার পাঁচজন শিষ্য এখানে হইয়াছিল। সেই ঘটনা স্মরণীয় করিবার জন্য ঐখানে চৌখণ্ডী স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছিল। সারনাথকে কেন্দ্র করিয়া সমগ্র প্রাচ্য ভূখণ্ডে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল।

খৃষ্ট জন্মের ২৫০ বৎসর পূর্ব্বে সম্রাট অশোক

এখানে আসেন এবং সেই ঘটনার স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ অশোক স্তম্ভ স্থাপিত হয়। সে আজ প্রায় ২২০০ বৎসর পূর্ব্বের কথা।

চীন দেশ হইতে ফাহিয়ান সপ্তম শতাব্দীতে এবং হিউয়েন্ সাং সপ্তম শতাব্দীতে সারনাথে আসেন। তাঁহাদের লিখিত ভ্রমণকাহিনীতে সারনাথের বর্ণনা আছে। হিউয়েন সাংয়ের সময় (সপ্তম শতাব্দীতে) এখানে ত্রিশটী বিহার (বৌদ্ধমঠ) ছিল এবং ১৫০০ ভিক্ষু (বৌদ্ধ সন্ন্যাসী) এখানে নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন।

সারনাথের ধ্বংশাবশেষ দেখিলে মনে হয় যেন কোন আকস্মিক দুর্ঘটনায় এরূপ হইয়াছে। কুতবদ্দীনের নেতৃত্বে বর্ব্বর পাঠান মুসলমান সৈন্যগণ ১১৯৪ খৃষ্টাব্দে সারনাথ লুণ্ঠন ও ধ্বংশ করে এবং বহু মূল্যবান প্রাচীন পুথি পুড়াইয়া দেয়।

সারনাথের পথেঃ—

সারনাথ যাইতে হইলে দশাশ্বমেধ ঘাটের রাস্তায় শেয়ারে বাস পাওয়া যায়—যাতায়াতে প্রত্যেকের ॥০ আনা হিসাবে বাস্ ভাড়া পড়ে। এক্কা ১৷০ পাঁচ সিকিতে হইতে পারে। বাসে যাইতে প্রায় আধঘণ্টা লাগে। তিনটায় কাশী হইতে বাসে গেলে সারনাথ দেখিয়া ৬টায় ফিরিয়া আসা যায়।

বেনারস ক্যাণ্টনমেণ্ট ষ্টেশনের দিকে গোধুলিয়া গির্জ্জার সম্মুখ দিয়া যে রাস্তা গিয়াছে সেই রাস্তা দিয়া যাইতে হয়। ষ্টেশন যাইতে হইলে ষ্টেশনের কাছে এই পথ হইতে বাঁয়ে বেঁকিতে হয়। কিন্তু সারনাথে যাইতে হইলে ডানদিকে যাইতে হয়।

পথে বরণা নদীর সেতু পড়ে। কোর্টের সামনে ডানদিকে বেঁকিতে হয়। তারপর আজমগড় রোডের চৌমাথায় আসিয়া বরাবর সোজা যাইবে। বি, এন্, ডব্লিউ রেল যেখানে এই পথটী কাটিয়া গিয়াছে তাহার একটু আগে বাঁয়ে বেঁকিতে হয়। সারনাথ রেল ষ্টেশন ইহার খুব কাছে। এখান হইতে একটু দূরেই বাঁয়ে চৌখণ্ডী স্তূপ পড়ে। তার একটু দূরে সারনাথ।

চৌখণ্ডী স্তূপ—

সারনাথের প্রায় অর্দ্ধ মাইল আগে পথের বাম দিকে চৌখণ্ডী স্তূপ।

এইস্থানে প্রথম পাঁচজন লোক বুদ্ধদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই স্তূপ সেই স্মৃতির নিদর্শন। হিউয়েন সাং সপ্তম শতাব্দীতে যখন ইহা দেখিয়াছিলেন, তখন স্তূপটী ৩০০ ফিট উচ্চ ছিল।

চৌখণ্ডী স্তূপের ইষ্টক নির্ম্মিত ভগ্নাবশেষের উপর একটী অষ্টকোণ মন্দিরের মতন আছে। সম্রাট হুমায়ুন একদিন এই স্তূপের উপর উঠিয়া বসিয়াছিলেন। তাঁহার স্মৃতি চিহ্ন স্বরূপ আকবর ১৫৮৮ খৃষ্টাব্দে এই অষ্টকোণ মন্দির (tower) নির্ম্মাণ করেন। পারসী ভাষায় দ্বারের উপর এ কথা লেখা আছে।

সারনাথের যাদুঘর—

বড় রাস্তার ডানদিকে যাদুঘর। যাদুঘরের বাড়ী পাশ্চাত্য শিল্প পদ্ধতিতে প্রস্তুত। যাদুঘরটি ক্ষুদ্র হইলেও সারনাথে প্রাপ্ত সকল মূর্ত্তি প্রভৃতি এখানে রক্ষিত হওয়ায় ইহা প্রত্যেকেরই দেখা উচিত।

যাদুঘর নিম্নলিখিত সময়ে খোলা থাকে; ১৬ই মার্চ্চ হইতে ১৫ই সেপ্টেম্বর—সকালে ৭টা হইতে ১১টা এবং বৈকালে ৩টা হইতে ৬টা; ১৬ই সেপ্টেম্বর হইতে ১৪ই মার্চ্চ পর্য্যন্ত সকাল ৮টা হইতে বৈকাল ৫টা পর্য্যন্ত খোলা থাকে।

যাদুঘরে প্রত্যেককে ৵০ হিসাবে প্রবেশ মূল্য দিতে হয়। ১২ বৎসরের অনধিক শিশুদের জন্য ⁄০ আদায় করা হয়।

সম্মুখের বড় ঘরে প্রসিদ্ধ অশোক স্তম্ভের চূড়া (সিংহ স্তম্ভ) রহিয়াছে। প্রস্তরের উপর এরূপ সুন্দর কারুকার্য্য দেখা যায় না। খৃষ্টপূর্ব্ব ২৫০ শতাব্দীতে অর্থাৎ দুই হাজার বৎসরের অধিক পূর্ব্বে ইহা নির্ম্মিত হইয়াছিল। সারনাথের ধ্বংশাবশেষের মধ্যে যে অশোক স্তম্ভের ভগ্ন নিম্নাংশ দেখা যায়, সেখানে যে প্রকাণ্ড স্তম্ভ ছিল তাহার উপর এই চূড়াটী বসান ছিল।

অশোকস্তম্ভের চূড়া ৭ ফিট উচ্চ। ইহার উপরে চারিটী সিংহ—প্রত্যেকের পিছনদিক কেন্দ্রের অভিমুখে।

ইহাদের নীচে একটী গোলাকার অংশের গায়ে সিংহ, হস্তী, অশ্ব ও ষণ্ড ক্ষোদিত আছে। সর্ব্বোপরি একটী ধর্ম্মচক্র ছিল; তাহার ভগ্নাংশমাত্র পাওয়া গিয়াছে। অশোকস্তম্ভের নিম্নাংশ এখনো তাহার পূর্ব্বস্থানে মাঠের মধ্যে আছে, কেবল উপরিভাগ যাদুঘরে আনিয়া রাখা হইয়াছে।

একপাশে একটী প্রকাণ্ড পাথরের ছাতা আছে। উহা যে বোধিসত্ত্ব মূর্ত্তির উপরে স্থাপিত ছিল, তাহাও উহার একটু দূরে রহিয়াছে। বোধিসত্ত্ব বুদ্ধদেবের পূর্ব্ব জন্মের অবস্থা। এই মূর্ত্তি দ্বিতীয় শতাব্দীর এবং মথুরার পাথরে প্রস্তুত।

বুদ্ধদেবের নানা মুদ্রায় অবস্থিত অনেকগুলি মূর্ত্তি আছে।

যাদুঘরের ডানদিকের ঘরে একদিকে গিরি গোবর্দ্ধন-ধারী শ্রীকৃষ্ণ এবং অন্যদিকে প্রকাণ্ড শিবমূর্ত্তি রহিয়াছে।

যাদুঘর হইতে বাহির হইয়া প্রথমে পথের বাঁ দিকে যাদুঘরের সামনে মাঠের উপর যে সব ভগ্নাবশেষ আছে সেইগুলি দেখিবে। তারপর ধামেক স্তূপ, জৈন মন্দির ও নূতন বৌদ্ধ মন্দির দেখিয়া ঐ মন্দিরের সম্মুখস্থ রাস্তা দিয়া বামে ফিরিয়া আসিবে।

ঋষিপতন মৃগদাবের ধ্বংশাবশেষ—

গাড়ী হইতে নামিয়া বাঁদিকে মাঠের উপর দিয়া যে পথ গিয়াছে তাহা দিয়া গেলে প্রাচীন বৌদ্ধমন্দির গুলির ধ্বংশাবশেষ দেখা যাইবে।

প্রাচীন বৌদ্ধ বিহারগুলির স্থানে কাঠের সাইনবোর্ড দিয়া কোথায় কোনটী ছিল তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। বৌদ্ধ মন্দির ও সন্ন্যাসীদের আশ্রমকে বিহার ও চৈত্য (Monastery) বলিত।

ধর্ম্মরাজিক চৈত্যের ধ্বংশাবশেষ সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। প্রাচীন যুগে জল নিকাশের জন্য ভূমধ্যস্থ যে সুন্দর ড্রেনের ব্যবস্থা ছিল, তাহা দেখিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়।

অশোক স্তম্ভ (Asoka Column)—

ধর্ম্মরাজিক চৈত্যের পশ্চিমে অশোক স্তম্ভ। স্তম্ভের যে ভগ্নাংশগুলি পাওয়া গিয়াছে, তাহার মাপ হইতে মনে হয় যে এই স্তম্ভ ৫০ ফিট উচ্চ ছিল। অশোক স্তম্ভের সিংহ মণ্ডিত চূড়া যাদুঘরে উঠাইয়া রাখা হইয়াছে। স্তম্ভের নিম্নাংশের ব্যাস মাত্র আড়াই ফিট।

অশোক স্তম্ভ বালি পাথরের তৈয়ারী; কিন্তু ইহার পালিশ এমন সুন্দর যে মনে হয় যেন গ্র্যানাইট্ কিম্বা মার্ব্বেল।

ধামেক স্তূপ—

বড় রাস্তার বাঁদিকে এবং জৈন-মন্দিরের একটু উত্তর-পূর্ব্ব দিকে একটী প্রকাণ্ড স্তূপ আছে—উহাই ধামেক স্তূপ।

ধামেক স্তূপ

ধামেক স্তূপ ১৪৩ ফিট উচ্চ। স্তূপের নিম্নের ৪৩ ফিট প্রস্তরনির্ম্মিত; পরস্পরের সঙ্গে লৌহ দ্বারা সংযুক্ত। নিম্নাংশে নানারূপ জ্যামিতিক ডিজাইন এবং তাহার পরই ফুল ক্ষোদিত আছে।

স্তূপের উপরদিকের ১০০ ফিট ইষ্টক নির্ম্মিত।

এই স্তূপের মধ্যে যে সকল বৃহদাকার ইট পাওয়া গিয়াছে, সেই ধরণের ইট খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতাব্দীর ভারতীয় স্থাপত্যের নিদর্শন।

জৈনমন্দির—

বড় রাস্তার বাঁদিকে জৈন মন্দির। মন্দিরে

শ্রীঅয়োংসনাথের মূর্ত্তি আছে। অয়োংসনাথ জৈনদের একাদশ তীর্থঙ্কর।

মন্দির মধ্যে একটী উঠান; সম্মুখে অয়োংসনাথের মূর্ত্তি।

এই জৈন মন্দির ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত।

রাস্তার ডানদিকে মতিচাঁদ ফুলচাঁদের জৈন ধর্ম্মশালা আছে।

মূল গন্ধকুটি বিহার—

রাস্তার বামদিকে নূতন বৌদ্ধ মন্দির। প্রস্তর নির্ম্মিত সুন্দর বাড়ী—প্রাচীন ভারতীয় পদ্ধতিতে নির্ম্মিত। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে ইহার নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ হয় এবং মাত্র ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে সম্পূর্ণ হইয়াছে। মন্দির মধ্যে বুদ্ধদেবের একটী সুন্দর মূর্ত্তি আছে।

প্রতি বৎসর বড়দিনের সময় এখানে একটী উৎসব হয়।

গভর্ণমেণ্টের প্রত্নতত্ত্ববিভাগ দাক্ষিণাত্যের নাগার্জ্জুনি কুণ্ড স্তূপ মধ্যে বুদ্ধের চিতাভস্ম আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ভারত গভর্ণমেণ্ট সম্প্রতি সেই পবিত্র চিতাভস্ম এই বিহারে দান করিয়াছেন।

রাস্তার ডানদিকে বিহারের লাইব্রেরী ও বামদিকে বৌদ্ধ যাত্রী নিবাস আছে।

কাশীর ইতিহাস

বরণা ও অসি এই দুইটী নদীর মধ্যে অবস্থিত বলিয়া কাশীর অপর নাম বারাণসী। হরিবংশের মতে কাশ রাজার নাম হইতে কাশী নাম হইয়াছে।

কাশীর প্রাচীনত্ব—

কাশী যে অত্যন্ত প্রাচীন সহর সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কাশী রহস্যের মতে ব্রহ্মাণ্ডের সকল স্থান অপেক্ষা কাশী প্রাচীন; অন্যান্য স্থানের সৃষ্টি হইয়াছে পরে। এইজন্য কাশীকে লোকে পৃথিবীর বাহিরে বলে। কাশী রহস্য গ্রন্থ মহাভারত রচয়িতা বেদব্যাস প্রণীত বলিয়া লোকের বিশ্বাস।

কাশীর ইতিহাস—হিন্দু রাজত্বে—

দিবোদাস ইন্দ্রের আদেশে কাশী নগরী প্রতিষ্ঠিত করিয়া এইখানে থাকেন। তিনি চিকিৎসা বিদ্যায় অত্যন্ত পণ্ডিত ছিলেন এবং লোকে তাঁহাকে সাক্ষাৎ ধন্বন্তরী বলিত। কথিত আছে যে সুশ্রুত কাশীতে আসিয়া দিবোদাসের নিকট চিকিৎসা বিদ্যায় শিক্ষালাভ করেন। মীর ঘাটের নিকটে দিবোদাসেশ্বরের মন্দিরের দেবমূর্ত্তি দিবোদাসের প্রতিষ্ঠিত। বিশ্বনাথের আদেশে গণেশ দিবোদাসের নিকট কাশী চাহিয়া লন এবং তখন হইতে কাশীতে বিশ্বনাথের আধিপত্য স্থাপিত হইয়াছে। বিশ্বনাথের মন্দির পথের দ্বারদেশে ঢুণ্ডি গণেশের মূর্ত্তি রহিয়াছে।

কাশী ভারতের প্রাচীনতম নগরী। আর্য্যেরা ভারতে আসিয়া আর্য্যাবর্ত্তে যে সকল রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন কাশী তাহার মধ্যে একটী। বর্ত্তমান কাশী এই রাজ্যের রাজধানী ছিল। ইহা বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বের কথা। প্রাচীন কালে আর্য্যেরা আধুনিক পদ্ধতিতে তারিখ দিয়া ইতিহাস লিখিতেন না, এজন্য প্রাচীন ভারতের ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায় না।

মহাভারতে দেখা যায়, কাশীরাজ তাঁহার কন্যাদের বিবাহের জন্য স্বয়ম্বর সভার আয়োজন করিয়াছিলেন। কাশীরাজের কন্যাদের মধ্যে অম্বিকা ও অম্বালিকার সঙ্গে হস্তিনাপুরের রাজা বিচিত্রবীর্য্যের বিবাহ হয়। অম্বিকার গর্ভে ধৃতরাষ্ট্র ও অম্বালিকার গর্ভে পাণ্ডু জন্মগ্রহণ করেন।

বৌদ্ধযুগে—

বৌদ্ধযুগ হইতে কাশীর যথার্থ ইতিহাস পাওয়া যায়। বুদ্ধদেব বর্ত্তমান নেপালের অন্তর্গত কপিলবাস্তুর রাজার ছেলে। তিনি সন্ন্যাসী হইয়া বুদ্ধগয়ায় তপস্যা করিয়া সিদ্ধিলাভ করেন। তখন তাঁহার নাম হইল বুদ্ধ বা জ্ঞানী। জ্ঞানলাভ করিয়া তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া রহিলেন না। যে সত্যের সন্ধান পাইয়াছেন তাহা সকলকে দিবার জন্য তিনি কাশীতে আসিলেন। কাশীর নিকট সারনাথে প্রথম পাঁচজন লোক বুদ্ধের শিষ্য হন। কাশীরাজ যশোরথ এই প্রথম পাঁচজন শিষ্যের মধ্যে অন্যতম। এই ঘটনা চিরস্মরণীয় করিবার জন্য পরে ঐ স্থানে চৌখণ্ডী স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছিল। কাশী যেমন হিন্দুদের তীর্থস্থান, বৌদ্ধদেরও তেমনি।

চীন, জাপান, শ্যাম প্রভৃতি সুদূর দেশ হইতে বহু তীর্থযাত্রী সারনাথে আসেন।

বুদ্ধদেব যিশুখৃষ্টের জন্মের ৪৮৭ বৎসর পূর্ব্বে নির্ব্বাণলাভ করেন। বুদ্ধদেবের সময়ে অর্থাৎ প্রায় আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বেও কাশী একটী বড় সহর ছিল।

হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়

জৈনদের তীর্থ—

জৈনদের অন্যতম মহাপুরুষ পার্শ্বনাথ বুদ্ধদেবের প্রায় দুই শত বৎসর পূর্ব্বে এই কাশীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কাশী-রাজ অশ্বসেনের পুত্র এবং বুদ্ধের মত ত্রিশ বৎসর বয়সে সংসার ত্যাগ করেন। কাশীর ভেলু-পুরায় পার্শ্বনাথের জন্মস্থানে একটী জৈন মন্দির আছে। পার্শ্বনাথ হাজারিবাগের নিকটে পরেশনাথ পাহাড়ে দেহত্যাগ করেন। কাশী জৈনদেরও একটী পবিত্র স্থান।

শঙ্করাচার্য্যের যুগ—

বৌদ্ধযুগের অবসানে অষ্টম শতাব্দীতে শঙ্করাচার্য্য কাশীতে বেদান্ত মত প্রচার করেন। কাশীর থিয়ো-জফিক্যাল্ সোসাইটীর জমির একটু পশ্চিমে শঙ্করাচার্য্যের একটী মঠ আছে। উহার মধ্যে শঙ্করাচার্য্যের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে।

শঙ্করাচার্য্যের যুক্তিতে বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ পরাজিত হইয়া তাঁহার শিষ্য হন এবং আবার কাশীতে প্রাচীন হিন্দু ধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়।

মুসলমান যুগ—
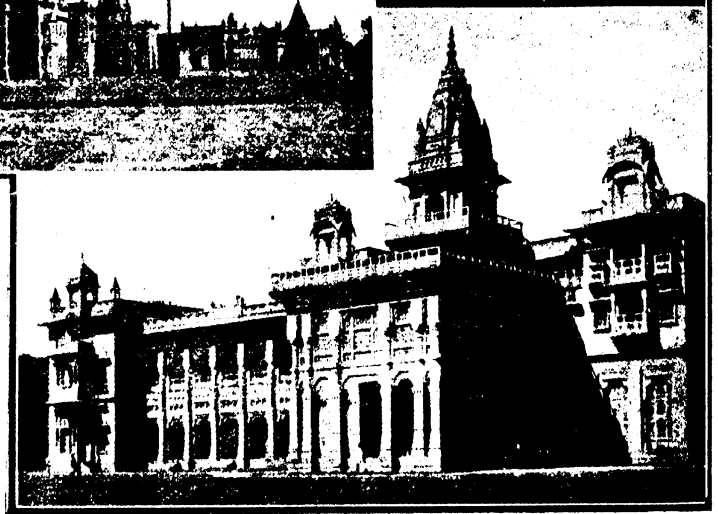
একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে আর একটী ধর্ম্মমত কাশীর উপর তাহার আধিপত্য স্থাপনের চেষ্টা করে—উহা মুসলমান ধর্ম্ম। বুদ্ধ ও শঙ্করাচার্য্যের ন্যায় যুক্তি তাহাদের অস্ত্র ছিল না; তাহাদের ধর্ম্ম-প্রচারের উপায় তরবারি—হয় মৃত্যু, নয় মুসলমান ধর্ম্ম। শত শত সুন্দর নগরী অসভ্য পাঠান ও মোগল সৈন্যদের হাতে বিধ্বস্ত ও লুণ্ঠিত হইল।

কুতবউদ্দীনের সময়ে সারনাথ ধ্বংস করা হইল। মুসলমান সৈন্যগণ বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদিগকে মারিয়া তাঁহাদের বহুমূল্য পুঁথিগুলি পোড়াইয়া দিয়াছিল। এই সকল বর্ব্বর ধনলোভী জাতি জগতের সভ্যতার কতদূর ক্ষতি করিয়াছিল তাহা বুঝিবার শক্তি তাহাদের ছিল না। হিন্দু সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া অসভ্য মোগল ও পাঠান-গণ সভ্য হইয়াছিল।

আকবরের রাজত্বকালে হিন্দুধর্ম্মের উপর অত্যাচার

থামিয়া গেল। কিন্তু আওরঙ্গজেব আবার পূর্বোদ্যমে অত্যাচার আরম্ভ করে। আওরঙ্গজেবের আদেশে কাশীর বিশ্বনাথ ও বেনীমাধবের মন্দির ভাঙ্গিয়া দুইটী মসজিদ নির্ম্মিত হয়।

পরে মহারাষ্ট্র শক্তির আবির্ভাবে যখন মোগল সাম্রাজ্য ধ্বংসপ্রায় হইল, তখন ভগ্ন মন্দিরগুলির স্থানে আবার শত শত নূতন মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইল। শঙ্খ ঘণ্টার শব্দে আবার গঙ্গাতীর মুখরিত হইতে লাগিল। মুসলমান ধর্ম্ম কাশীর উপর কয়েকটী নির্জ্জন মসজিদ ব্যতীত অন্য কোন চিহ্ন রাখিয়া যাইতে পারে নাই।

মহারাষ্ট্র গৌরব ইন্দোরের মহারাণী অহল্যাবাই কাশীর বিশ্বনাথের নূতন মন্দির তৈয়ারী করাইয়া দেন। পঞ্জাবের শিখ রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা রণজিৎ সিংহ এই মন্দিরচুড়া স্বর্ণ-মণ্ডিত করিয়া দেন।

কাশী রাজ বংশ—

দিল্লীর বাদশাহের পতনের পর কাশী অযোধ্যার নবাবের হাতে যায়। তিনি মীর রুস্তম আলিকে কাশী ইজারা দেন। রুস্তম গঙ্গাপুরের জমিদার মনসা রামের উপর রাজ্যভার দেন। কালে মনসারাম বুদ্ধিবলে কাশীরাজ্য নিজের করিয়া লন।

মনসারামের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র বলবন্ত সিংহ ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে রাজা হন। তিনি রামনগরে দুর্গ নির্ম্মাণ করেন।

বলবন্তের মৃত্যুকালে তাঁহার একমাত্র কন্যা তাঁহার শিশুপুত্র মহীপনারায়ণের জন্য সিংহাসন দাবী করেন। বলবন্তের পান্না নামে এক রাজপুত দাসীর গর্ভে চেত সিংহ নামে এক পুত্র হয়। চেত সিংহ সিংহাসন অধিকার করেন। ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে বারানসী রাজ্য কোম্পানীর করদ রাজ্যে পরিণত হয়। ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে ফরাসীদের সঙ্গে যুদ্ধে অর্থের অনটন হওয়াতে হেষ্টিংশ চেতসিংহের নিকট পাঁচ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত কর চাহিলেন। চেত-সিংহ উহা দিতে বিলম্ব করায় হেষ্টিংশ ক্রুদ্ধ হইলেন। চেতসিংহের অপরাধের শাস্তি দিবার জন্য হেষ্টিংশ কাশীতে উপস্থিত হইলেন এবং রাজার বহু অনুনয় সত্বেও তাঁহাকে বন্দী করিলেন। রাজা কোন বাধা দিলেন না। কিন্তু কাশীর প্রজারা ক্রুদ্ধ হইয়া রেসিডেন্সির সৈন্য ও ইংরাজ সেনাপতিদের হত্যা করিল। বেনারস ক্যাণ্টনমেণ্ট ষ্টেশন হইতে কাশী যাইবার পথে থানার কাছে একটী স্মৃতিফলকে এই ঘটনার স্থান চিহ্নিত করা আছে।

চেত সিংহ শিবালা প্রাসাদ হইতে জানালায় পাগড়ির কাপড় বাঁধিয়া গঙ্গাতীরে অবস্থিত নৌকা করিয়া রাম-নগরে পলায়ন করেন। চেত সিংহ প্রথমে জয়লাভ করিলেও পরে পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন।

ইংরাজেরা চেত সিংহের ভাগিনেয় মহীপনারায়ণকে কাশীর রাজা করেন। বর্ত্তমান রামনগরের রাজা এই মহীপনারায়ণের বংশধর।

াশীর মেলা

কাশীতে প্রায় বার মাসই একটী না একটী মেলা বা উৎসব লাগিয়া থাকে।

বৈশাখমাসে—বাসন্তী পূজার সময় দুর্গাবাড়ীতে মেলা হয়।

জ্যৈষ্ঠমাসে—শুক্লাদশমী তিথিতে গঙ্গাপূজা উপলক্ষে গঙ্গাতীরে উৎসব হয়। এইদিন গঙ্গার উপর সাঁতার একটী দেখিবার জিনিষ।

ভাদ্রমাসে—শুক্লাষষ্ঠীর দিন লোলার্ক কুণ্ডে উৎসব হয়।

ভাদ্রমাসের শুক্লাষ্টমী হইতে আশ্বিনমাসের কৃষ্ণাষ্টমী পর্য্যন্ত পনের দিন ধরিয়া লক্ষ্মীকুণ্ডে একটী মেলা বসে।

আশ্বিন ও কার্ত্তিকমাসে—দুর্গাপূজা উপলক্ষে দুর্গা-বাড়ীতে মেলা বসে।

বিজয়া দশমীর দিন দশাশ্বমেধ ঘাটে অনেকগুলি প্রতিমা ভাসান হয়, এবং এজন্য খুব ভীড় হয়।

বিজয়া দশমীর পরদিন রামলীলা। ভরতমিলাপের শোভাযাত্রা একটী দেখিবার জিনিষ।

কার্ত্তিকমাসে পঞ্চগঙ্গার মেলা ও স্নান হয়।

কালীপূজার রাত্রে ঠাঠারি বাজারে 'ধনতেরস মেলা' বসে।

কালীপূজার পরদিন অর্থাৎ কার্ত্তিক মাসের শুক্লা প্রতিপদ তিথিতে বিশ্বনাথের ও অন্নপূর্ণার মন্দিরে অন্নকূট উৎসব হয়।

অগ্রহায়ণ মাসে—কৃষ্ণা অষ্টমীতে কালভৈরবের মেলা এবং শুক্লা চতুর্দ্দশীতে পিশাচ মোচনের মেলা হয়।

মাঘ মাসে—রামনগরে বেদব্যাসের মেলা বসে।

ফাল্গুন মাসে—ফাল্গুন পূর্ণিমা দোল যাত্রার দিন কাশীতে হোলির খুব ঘটা হয়।

দোল যাত্রার পর বুড়ুয়া মঙ্গলের মেলা বসে। সাতদিন ধরিয়া গঙ্গায় নৌকার উপর নৃত্যগীত হয়।

ফাল্গুন মাসে কৃষ্ণাচতুর্দ্দশীতে শিবরাত্রি এবং শুক্লা একাদশীর (রং-ভরী একাদশী) দিন বিশ্বনাথের মন্দিরে খুব ঘটা হয়।

বিশ্বনাথের মন্দিরের নিয়মাবলী—

বিশ্বনাথের মন্দির কোন সময় খোলা থাকে এবং পূজা ও আরতির সময় জানা থাকিলে যাত্রীদের সুবিধা হইতে পারে ; এজন্য নিম্নে উহা দেওয়া হইল।

বিশ্বনাথের মন্দিরের দ্বার মঙ্গল আরতির পর ভোর চারিটার সময় খোলা হয় এবং সকাল ১১টা পর্য্যন্ত যাত্রীরা মন্দির মধ্যে গিয়া পূজা করিতে পারেন। ১১টা হইতে ১২টা পর্য্যন্ত ভোগ হয়। ১২টা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত আবার সকলকে ভিতরে যাইতে দেওয়া হয়। সন্ধ্যা ৭টায় ছোট আরতি এবং রাত্রি ৯টায় ভোগ ও বড় আরতি হইয়া থাকে। তারপর রাত্রে শয়ন আরতি হইয়া, ১১টার সময় মন্দির বন্ধ হইয়া যায়।

গ্রন্থ-পরিচয়

'লক্ষ্যহারা'—উপন্যাস। শ্রীক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক গোলাপ পাবলিশিং হাউস্। ১২, হরিতকী বাগান লেন, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা। উপন্যাসের প্রারম্ভে একজন নায়কের 'বলশেভিজমের ইতিহাসের পাতায় মন তখন ক্ষেপা ঘোড়ার মত ছুটে চলেছে, তবু থামতে হয়।' এই থামার মধ্যেই বোধ হয় লক্ষ্যহারার আরম্ভ ও সমাপ্তি ঘটিয়াছে। অন্যতম নায়ক অশান্তর ব্যাপার পড়িয়া সহানুভূতি জাগে—সাকিনার সহিত তাহার প্রেম-ব্যাপার অসম্ভব মনে হইলেও কৌতূহল জাগায়। শ্রমিক ও হা-ঘরে পুরুষ ও নারীদের লইয়া অশান্তের মনুষ্যত্ব জাগরণের কারবার, সাকিনার উপর তাহার দরদ—অথচ বড় আদর্শের জন্য তার চেয়েও বেশী দরদ, উষার বাল্যজীবন ও বিধবা-জীবন ও শেষকালের অধঃপতন এ গুলিও মনকে সাড়া দেয়। লেখকের ভাষা ভাল—কল্পনাও উচ্ছ্বসিত—কিন্তু বইখানা সমগ্রভাবে দেখিতে গেলে সত্যই কেমন যেন লক্ষ্যহারা—বে-তাল হইয়া গিয়াছে মনে হয়। বলশেভিজমের ইতিহাসের পাতায় মন ক্ষ্যাপা ঘোড়ার মত ছুটিলেও বাস্তবতাই সে ইতিহাসের প্রাণ, তাই এ-ধরণের উপন্যাস রচনায় লেখক যতটা অ-বাস্তব না হইয়া পারেন তাহাই সঙ্গত নহে কি ?

'কাল বৈশাখী'—নাটক। শ্রীমনীন্দ্রনাথ সিংহ বি, এস্‌-সি প্রণীত। মূল্য আট আনা। নাটকখানি রঙমহলে অভিনীত হইয়াছিল। গ্রন্থের কথোপকথনের ভঙ্গি ইত্যাদি ভাল কিন্তু মূল গল্পটি যাহার উপর নাটক গড়িবার আয়োজন ও যবনিকা পতন হইয়াছে তাহা একটি অদ্ভুত হেঁয়ালী। কেন যে দাদা আর বৌদি গেলেন—কেনই বা তাহাদের অভ্যর্থনার রাত্রে আবার কন্যার অনুরোধ সত্ত্বেও পিতা বলিতেছেন—'মায়ায় ভুলিস্ নি কমল—দুয়ার খুলিস নি।' তাহা বোঝা দুর্ঘট। তার পরেই বৌদির মুখে দাদার মৃত্যু সংবাদ। তার পর পিতা ভুবনের অট্টহাস্যে—'বোলেছিলাম। মায়ায় ভুলিসনি—হাঃ হাঃ হাঃ—'ইত্যাকার অসম্বন্ধ প্রলাপের সহিত যবনিকা পতন—। লেখকের আগামী কোন পুস্তক সর্ব্বসাধারণের বোধ্য হইবে ইহাই আশা করি।

'মুসাফির'—কবিতার বই। শ্রীদিলীপকুমার দাশ গুপ্ত প্রণীত—দাম আট আনা। ভূমিকাভাবে লেখা হইয়াছে—'ছাত্র-ছাত্রী মহলে শ্রীমান দিলীপ দাশ গুপ্ত বহু নিন্দিত ও বহু প্রশংসিত। ইহার বৈশিষ্ট্য যে লিখনভঙ্গী সাবলীল—ছন্দোবদ্ধ ও নির্ভীকতার পরিচায়ক। স্থানে স্থানে অর্থহীন রূপেও একটা সহজ গতির প্রবর্ত্তক তাই ইহার এই সৃষ্টির সাথে ভাবী সাহিত্যিক ও কবির আসন অক্ষুণ্ণ অম্লান ও বৈচিত্র্যময় হইবে জানিয়াই 'লেখ্য বাসর' ইহার লেখাই সর্ব্বাগ্রে প্রকাশিত করিয়াছে।' ভাল বোধগম্য হইল না। মুসাফির লেখক শ্রীমান দিলীপকুমার ছাত্র—বোধ হয় বয়সও অল্প—এখন হইতেই যদি দোষগুলিকে গুণ রূপে চালানোর প্রবৃত্তি তাহার মনে জাগে তবে তাহা সু-ফলপ্রসূ হইবে কিনা সন্দেহ আছে। ভবিষ্যতে তাহার কবিত্বশক্তির সুপ্রকাশ দেখিতে পাইব আশা করি।

'স্বাস্থ্য ও ব্যায়াম'—শ্রীবিধুভূষণ জানা প্রণীত। মূল্য ১৷৷০ এই পুস্তকে স্বাস্থ্য ও ব্যায়ামের কতকগুলি নীতি ও কার্য্যকারিতা এবং কয়েকজন ব্যায়ামবীরের পরিচয় ও প্রতিকৃতির সহিত গ্রন্থকারের প্রতিকৃতি আছে। যাঁহারা সুস্থ সবল থাকিতে চাহেন এবং স্বাস্থ্য রক্ষার প্রধান উপাদান ব্যায়ামে যাঁহাদের অভিরুচি আছে তাঁহারা এই পুস্তক পাঠে উপকৃত হইবেন আশা করা যায়।

সামঞ্জস্য-বোধ

উৎকৃষ্ট সাহিত্য-সৃষ্টির মূলে কবিচিত্তের সামঞ্জস্যবোধ। আলম্বন-বস্তু বা ভাব, বিভাব, অনুভাব, সঞ্চারীভাব, অর্থগৌরব, অলঙ্কার, ছন্দ, পদবিন্যাস ইত্যাদির শোভন, সঙ্গত ও সংযত সামঞ্জস্যেই রসের সৃষ্টি। ইহাদের কোন-না-কোনটির অতিরিক্ত প্রতিপত্তি বা প্রাবল্য ঘটিলেই, সমস্ত থাকা সত্বেও, উৎকৃষ্ট সাহিত্যসৃষ্টি হইবে না। যে সকল কবিভণিতি উৎকৃষ্ট সাহিত্যের পদবীতে স্থান পায় নাই,—অনুসন্ধান করিলেই দেখা যাইবে তাহাদের উক্ত উপকরণ ও অঙ্গগুলির মধ্যে সৌষম্য বা সামঞ্জস্য নাই,—কোনটি বা অতিরিক্ত নিস্তেজ, কোনটি বা অতিরিক্ত প্রবল। বিরোধী ভাব ও রসের সঙ্করে যে সাহিত্য নষ্ট হইয়া যায়, তাহা সকলেই জানেন। ছন্দ, অলঙ্কার, ভাষা ইত্যাদিও ভাবোপযোগী না হইলেও ঐরূপে সাহিত্যশ্রী নষ্ট হইয়া যায়।

কোন কবির গৌরব-কীর্ত্তনের জন্য যখন অর্থগৌরব বা পদলালিত্যের বিশেষ করিয়া নাম করিতে হয়—তখন বুঝিতে হইবে অর্থগৌরব বা পদলালিত্য ঐ কবির কাব্যে অতিরিক্ত প্রতিপত্তিলাভ করিয়াছে, অন্যান্য অঙ্গের সহিত সামঞ্জস্য নাই। অতএব ইহা প্রশংসার কথা নয়। কালিদাসকে উপমার জন্য বাহাদুরী দিয়া যে মাঘ-ভক্ত পাঠক মাঘে তিনগুণের শোভন সমাবেশ দেখিয়াছিলেন, তিনি মাঘকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন নাই। সৎকাব্যে ঐ তিনটি ছাড়া আরও অনেক অঙ্গ আছে—সে গুলির সম্বন্ধে ঐ পাঠক নীরব। ঐ তিনটি গুণের সহিত সে গুলিরও সামঞ্জস্য থাকিলে মাঘ অবশ্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি হইতে পারিতেন।

যিনি ঐকথা বলিয়াছিলেন—তিনি যদি কাব্যের অন্যান্য অঙ্গের সন্ধান রাখিতেন—তবে কালিদাসকে উপমার কবি বলিয়াই বিদায় দিতেন না। কাব্যের সমস্ত অঙ্গের শোভন সামঞ্জস্য যদি কোন সংস্কৃত কবির মধ্যে ঘটিয়া থাকে—তবে তাহা কালিদাসে,—ভবভূতি শ্রীহর্ষ, বাণভট্টেও নয়।

কালিদাসের মেঘদূতই কাব্যের সর্ব্ব অঙ্গের শোভন সামঞ্জস্যের সর্ব্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ। সামঞ্জস্যের প্রধান ধর্ম্ম সংযম। সংযম ছাড়া সামঞ্জস্য বা Harmony র সৃষ্টি হইতে পারে না। মেঘদূত করুণ-বিপ্রলম্ভ রসের কাব্য। কারুণ্য আছে,—তাহাতে অসংযম নাই, চিত্তকে ব্যথিত করিয়া তুলে না। অনুরাগ স্থায়িভাব, কিন্তু রাগসম্ভোগে অসংযম নাই। সঙ্গীত আছে,—কিন্তু সে সঙ্গীত কারুণ্যের বার্ত্তাবাহী মেঘেরই উপযুক্ত মন্দাক্রান্তছন্দে, সুরের দ্বারা অর্থকে অস্পষ্ট করিয়া তুলিবার প্রয়াস নাই। চিত্র আছে, আবেগের সুর চিত্রাধিক্য জন্মিতে দেয় নাই। গদ্যাত্মক অংশ কিছু কিছু আছে, কিন্তু নির্ব্বাচিত ছন্দের গুণে, রসে পরিপাক লাভ করিয়াছে। পদলালিত্য আছে, যক্ষের অনুরাগময় জীবনের জন্য তাহার প্রয়োজনীয়তাও আছে,—তাই বলিয়া এত অধিক নাই যে মেঘের গাম্ভীর্য্য তাহাতে নষ্ট হইয়া যায়, বা মেঘ হংসে পরিণত হয়। তাহা ছাড়া, কোমলে কঠোরে গঠিত মন্দাক্রান্তা ছন্দই পদলালিত্যের প্রাধান্য ঘটাইতে দেয় নাই, অর্থগৌরবের সহিত পদলালিত্যের সামঞ্জস্য ঘটাইয়াছে। যেমন স্বপ্নলোক অলকা, যেমন স্বপ্নরসিক নায়ক যক্ষ,—যেমন কল্পলক্ষ্মী তাহার নায়িকা, যেমন তাহার স্বাধিকার-প্রমাদ,—যেমন তাহার অভিশাপ,—তেমনি বার্ত্তাবহ নবীন আষাঢ়ের মেঘ। কোথাও অসামঞ্জস্য নাই।

কাব্যের যতগুলি প্রত্যঙ্গ আছে, সবগুলিই একটি কোন বিশেষ কাব্যে থাকিবেই এমন কিছু কথা নাই। যেগুলিকে কাব্যে স্থান দেওয়া হইতেছে, সেইগুলির মধ্যে শোভন সামঞ্জস্য সাধন করিতে পারিলেই অনুপস্থিতের অভাব

অনুভূত হইবে না। কাব্যে আমরা যে অঙ্গ বা যে প্রত্যঙ্গের প্রত্যাশা করি, তাহাকে না পাওয়ার ক্ষোভ অনায়াসেই মিটিয়া যায় বাকীগুলির শোভন সামঞ্জস্যে। মহাকবি মাইকেল ক্রোধ উৎসাহ ও কারুণ্য ভাবের সমন্বয়ের উপযোগী ছন্দ খুঁজিয়া বাহির করিলেন। মহাশিল্পিসুলভ সামঞ্জস্য-বোধই তাঁহাকে ঐ ছন্দ আবিষ্কারে প্রেরণা দিয়াছিল। ঐ ছন্দে মিল থাকিল না—মিত্রাক্ষর কাব্যপাঠে অভ্যস্ত কর্ণের পক্ষে একটা মস্তবড় অভাব অনুভূত হইল। মাইকেল একটা সামঞ্জস্য সাধন করিলেন এমনি যে, মিলের জন্য আর ক্ষোভ থাকিল না। তিনি মিত্রাক্ষর হরণ করিলেন, কিন্তু দিলেন ছন্দঃস্পন্দ বা Rhythm,—দিলেন ঘনঘন অনুপ্রাস,—দিলেন একটা পৌরুষ সবলতা, আর দিলেন ছত্র হইতে ছত্রান্তরে ভাবের অবাধ প্রবাহ। তাঁহার অনুকারকগণের ঐ সামঞ্জস্য বোধ ছিল না। তাঁহারা মিত্রাক্ষর ত্যাগ করিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন,—মনে করিলেন দায়িত্ব কমিয়া গেল,—বদলে কিন্তু কিছুই দিলেন না। ফলে, অকাব্য কুকাব্যের সৃষ্টি হইতে লাগিল।

রবীন্দ্রনাথের সামঞ্জস্য-বোধ অপূর্ব্ব। কোন্ রস বা কোন ভাবের পক্ষে কোন ছন্দে কি প্রকারের ভাষা ও কি শ্রেণীর অলঙ্কারের প্রয়োজন আছে, তাঁহার মত আর কেহই বুঝেন না। উদাহরণ-স্বরূপ,—তাঁহার যৌবন-স্বপ্ন-সম্ভোগের কবিতাগুলির কথা ধরা যাক। ঐ কবিতাগুলির ভাব রিরংসার উদ্দীপক, রিরংসার উদ্দীপনা করিলে হর্ষ স্নায়বিক রাজ্যেই থাকিয়া যায়—অনির্ব্বচনীয় রসে পৌঁছাইতে পারে না। তাই যাহাতে স্নায়বিক রাজ্যে চাঞ্চল্য না ঘটাইয়া একেবারে রস-লোকে উঠিতে পারে, সেজন্য ছন্দ ও ভাষার সঙ্গে ভাবের রসানুকূল সামঞ্জস্য ঘটাইয়াছেন। কবিতাগুলি যদি,—

'এস তুমি বাদল বায়ে ঝুলন ঝুলাবে—'

এইরূপ ছন্দে ও ভাষায় লিখিত হইত, তাহা হইলে স্নায়বিক রাজ্যেই উহার পরিসমাপ্তি হইত, রসলোকে উঠিতে পারিত না। সে জন্য কবি ঐগুলিকে সনেটের রুক্ষকঠোর পিঞ্জরে বদ্ধ করিয়াছেন—গাঢ়বন্ধ গৌড়ীয় রীতিতে মার্জ্জিত বিদগ্ধ-জন-পরিসেবিত ভাষাতেই ঐগুলিকে রচনা করিয়াছেন। শৃঙ্গার রসকে শৃঙ্গার বেশে না সাজাইলে রসলোকে পূজা পায় না—কবি তাহা জানেন। বিজয়িনী বা চিত্রাঙ্গদার মত কবিতার স্থায়িভাব আদিরসাভিমুখী অনুরাগ—অথচ কোন পাঠকের ঐ দুইটি কবিতা পড়িয়া কোন দিন ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্য-গত উল্লাস জন্মিয়াছে এমনত শুনি নাই। কেন? ভাষা ও ছন্দের সহিত এবং সঞ্চারী ভাবের সহিত স্থায়িভাবের রসানুকূল সামঞ্জস্য আছে। কামোদ্ধত তরুণ কবিরা কি এ কথা বুঝিবেন?

আবার অধ্যাত্মভাবের কবিতাগুলির কথা ভাবিয়া দেখা যাক। কবি দেখিলেন—অধ্যাত্মভাব সহজে পাঠকের চিত্তস্পর্শ করে না—উহাকে যদি সনেট বা ঐরূপ কোন রুক্ষকঠোর ভঙ্গিতে প্রকাশ করা হইত, তাহা হইলে পাঠক-চিত্তে কিছুতেই রসসঞ্চার করিতে পারিত না—নৈবেদ্যে আগেই একটা Experiment হইয়া গিয়াছিল। তাই কবি আধ্যাত্মভাবকে সঙ্গীতে ঢালিয়া দিলেন—ভাব যাহা পারিবে না—সুর তাহা নিশ্চয়ই পারিবে;—তাই গীতালি, গীতিমাল্য, গীতাঞ্জলি ইত্যাদির সৃষ্টি।

একটি তত্ত্ব বা তথ্যকে কঙ্কাল-স্বরূপ অবলম্বন করিয়া কাব্য রচনা করিতে হইলে যে কত আয়োজন করিতে হয়—তাহা রবীন্দ্রনাথ জানেন। আজ যাহারা সত্য-প্রচারের নামে কেবল তথ্য-তত্ত্বের বিবৃতি ও ঘোষণা করিয়া কাব্যরচনা করিতেছি, মনে করেন— তাঁহারা কাব্যের কিছুই বোঝেন না। দেহের অন্যান্য উপকরণ, পুষ্টি, কান্তি, গঠনসৌষ্ঠব কত কি যে আহরণ করিয়া এবং কি ভাবে তাহাদের সামঞ্জস্য-সাধন করিয়া কঙ্কালকে ডুবাইতে ও ভুলাইতে হয়—তাহা রবীন্দ্রনাথ দেখাইয়াছেন—চিত্রাঙ্গদা, বিদায়-অভিশাপ, পতিতা, ব্রাহ্মণ ইত্যাদি কবিতায়।

এই সকল ক্ষেত্রে একটি উপাখ্যান বা পৌরাণিক কাহিনী খুঁজিয়া বাহির করিতে হইয়াছে। কিন্তু সকল তত্ত্ব-তথ্যের উপযোগী উপাখ্যান-ত খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। অথচ এজগতের অসংখ্য তত্ত্ব-তথ্য বা ভাব তাঁহার কাছে "রূপের মাঝারে অঙ্গ" খুঁজিতেছে। কবি সেগুলিকে অনুভূতির মাধুর্য্য দিয়া কাব্যে পরিণত করিয়াছেন—কোথাও বা Symbolএ বাস্তব রূপ

দিয়াছেন। সকল ক্ষেত্রেই একটা আবেগের সুরের সাহায্য লইতে হইয়াছে—প্রচলিত কোন ছন্দে এই আবেগের সুর অবাধ বা স্বাধীনভাবে খেলিতে পায় না বলিয়া অসমমাত্রিক ছন্দের সৃষ্টি করিতে হইয়াছে। কতটা সামঞ্জস্য-বোধ থাকিলে তবে গতিতত্ত্ব বা জীবন-তত্ত্বকে এবং জ্ঞানদৃষ্টিতে আহৃত সত্যগুলিকে কাব্যে পরিণত করা চলে একবার ভাবিয়া দেখার প্রয়োজন। আমি বলাকা ও পূরবীর কোন কোন কবিতার কথা বলিতেছি।

কারুণ্যে অসংযম ঘটিলে তাহা যে আমাদের হৃদয়কে ব্যথিতই করে,—রসলোকে উঠিতে পারে না—রবীন্দ্রনাথ তাহা বুঝেন। তাই তিনি কারুণ্যের আলম্বন নির্ব্বাচনের সময় এমন কোন আখ্যানবস্তু গ্রহণ করেন নাই যাহাতে আমাদের অন্তর আর্ত্তনাদ করিয়া উঠে। যে দুঃখ রস-বিলাসে পরিণত হয়—সেই দুঃখ লইয়াই তিনি কাব্য রচনা করেন এবং তাহার মধ্যেও এমন সব সঞ্চারী ভাবের যোগ থাকে, যাহাতে লৌকিক বেদনা উপশান্ত হয়। প্রয়োজন হইলে বিরোধিভাবের আশ্রয় লইয়াও কারুণ্যকে রসে উত্তীর্ণ করিয়াছেন—'পুরাতন ভৃত্য' কবিতাটির নাম করা যাইতে পারে।

রবীন্দ্রনাথ যেখানে কাব্যে অন্তরঙ্গ সঙ্গীত দিতে পারেন নাই—সেখানে বহিরঙ্গের সঙ্গীত সৃষ্টি করিয়া ক্ষতিপূরণ করিয়াছেন। যেখানে প্রসাদগুণের সৃষ্টি করিতে পারেন নাই, —সেখানে রচনাকে অলঙ্কার প্রয়োগে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। গদ্যে যেখানে যুক্তি দুর্ব্বল,সেখানে উপমান বা Analogyর সাহায্য লইয়াছেন। যেখানে উপমান বা যুক্তি দুইই অচল, সেখানে মনোবেগের পরম্পরার (Emotional Ssquence) আশ্রয় লইয়াছেন। যেখানে রসাত্মক কথার কিছুই নাই—সেখানে মিলের চাতুরী ও রসিকতার দ্বারাই কাব্যসৃষ্টি করিয়াছেন—তাঁহার শিলঙের চিঠির কথা স্মর্ত্তব্য।

মোটকথা,—কোথাও তিনি একেবারে বঞ্চিত করেন নাই। যেখানে কাব্যের অনেক অঙ্গকে বাদ দিয়াছেন—সেখানে বাকীগুলির শোভন সামঞ্জস্যেই সৎকাব্যের সৃষ্টি করিয়াছেন। তাই তাঁহার হাতে 'মেঘদূত' বা 'সেকাল' নামক কবিতা তালিকা হইয়া উঠে নাই। একটা অপূর্ব্ব শোভন সামঞ্জস্য ও সংযমের গুণে তাঁহার অধিকাংশ রচনাই সৎ সাহিত্য-গোষ্ঠীতে স্থান পাইয়াছে।

সাহিত্যে কৌলীন্য

সংস্কৃত সাহিত্যের যে কোন পুস্তক খুলিলেই দেখা দেখা যায়—তাহাতে যাহাদের কথা আছে তাহারা হয় দেবদেবী,—নয় ধনেমানে কুলেশীলে সম্ভ্রান্ত নরনারী। ইহার কতকগুলি কারণ আছে। পূর্ব্বে সাহিত্য রসজীবন ও জ্ঞান-জীবনের বিলাস বলিয়াই গণ্য হইত—'বিলাস কলাসু কুতূহলং' চরিতার্থ করিবার জন্যই সাহিত্য সৃষ্টি হইত। জনসাধারণের মধ্যে কোন প্রকার কৃষ্টি বা বৈদগ্ধ্যের বিতান বা শিক্ষাপ্রচার ছিল না। জন-সাধারণের সঙ্গে সাহিত্যের কোন সম্পর্ক ছিল না—তাহাদের জীবনও সেজন্য সাহিত্যের আলম্বন বা উপজীব্য হইয়া উঠে নাই।

পুর-জনপদই তখন সাহিত্যের পটভূমি ছিল না—রাজসভা, রাজ অন্তঃপুর, তপোবন, স্বর্গলোক, কল্পলোক ইত্যাদি ছিল পটভূমি। এইরূপ পটভূমি নির্ব্বাচন না করিলে সাহিত্যের গৌরব, শ্রী ও আভিজাত্য নষ্ট হইবে, এইরূপ ধারণাই ছিল প্রাচীন সাহিত্যিকদের। এইরূপ পটভূমিতে জনসাধারণের কোন ঠাঁই নাই।

উচ্চ সাহিত্যকে চতুঃষষ্টিকলার মধ্যে ধরা হইত না—ইহাকে অপরাবিদ্যার মধ্যেও ধরা হইত না। ইহাকে ধর্ম্মতত্ত্ব ও পরাবিদ্যার শ্রেণীতেই অনেকটা গণ্য করা হইত। সেজন্য চতুঃষষ্টিকলার মত অথবা অপরা বিদ্যার মত ইহা জনসাধারণের অধিগম্য হয় নাই। যাহাদের অধিগম্য বা অধিকারভুক্ত নয়—তাহাদের কথা সাহিত্যে স্থান পাইবার কথাও নয়। কলাবিদ্যাগুলিকে সাহিত্যের তুলনায় অনেক নিম্নস্তরের বস্তু মনে করা হইত,—সেজন্য যাহারা কলাবিদ্যাগুলির চর্চ্চা করিত তাহাদিগকে জাত্যংশে হীন বলিয়া গণ্য করা হইত।

জীবনের যে বিস্ময়োদ্বোধক বৈচিত্র্য ও নানাপ্রকারের রসসমাবেশের দ্বারা সাহিত্য রচিত হয়, আগেকার সাহিত্যিকদের বিশ্বাস ছিল—তাহা জনসাধারণের জীবনে

আদৌ মানায় না—নিম্নশ্রেণীর নরনারীর পক্ষে তাহা শোভন সমঞ্জস হয় না,—রসাভাস ঘটিবার সম্ভাবনা।

ইহা ছাড়া,—সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, তখনকার দিনে রাজরাজন্য বা ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ—আজকালকার মত জনসাধারণ তাহার পৃষ্ঠপোষক ছিল না। সেজন্য সাহিত্যেও পৃষ্ঠপোষকশ্রেণীর লোকদের জীবনযাত্রাই হইয়াছিল প্রধান উপজীব্য।

জনসাধারণের জ্ঞানজীবন না থাকিতে পারে—কিন্তু রসজীবন কি ছিল না? রসজীবনের ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য তাহারা কি করিত? তাহারাও নিশ্চয়ই নিজেদের ভাষায় নিজেদের জীবন-যাত্রা অবলম্বনে একপ্রকার সাহিত্য রচনা করিত এবং উপভোগ করিত। কিন্তু তাহা রক্ষা পায় নাই—বিদ্বৎসমাজ নিশ্চয়ই তাহাকে রক্ষণীয় বলিয়া মনে করেন নাই।—জনসাধারণ কুল-পরম্পরায় যতদিন পারিয়াছে বাঁচাইয়া গিয়াছে। কিন্তু এদেশের জাতীয়-জীবনে যে মুহুর্মুহুঃ দশাবিপর্য্যয় ঘটিয়াছে ও যে দৈবদুর্বিপাকের ঝঞ্ঝা বহিয়া গিয়াছে, তাহাতে সব বিলুপ্ত হইয়াছে। তাহাদের সাহিত্য যে বিলোপ পাইয়াছে—তাহার প্রমাণ হয়, বর্ত্তমান যুগের প্রচণ্ড চেষ্টায় তাহার কোন কোন অংশের আবিষ্কারের দ্বারা। দৃষ্টান্তস্বরূপ,—মৈমনসিং ব্যালাডের উল্লেখ করা যাইতে পারে। জনসাধারণের সাহিত্যকে বিদ্বৎসমাজ উৎকৃষ্ট সাহিত্য ও রক্ষণীয় সাহিত্য মনে করেন নাই বলিয়া তাহা নিকৃষ্টশ্রেণীর বস্তু নয়—রসবৈভবে দরিদ্র নয়। মৈমনসিংহ ব্যালাডই তাহার সাক্ষ্য দিবে।

ঐহিক সুবিধার জন্য বর্ণাশ্রমের অভিভাবকগণকে ও অভিজাত-সম্প্রদায়কে কোন কোন সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের প্রচার করিতে হইয়াছে। তাহার ফলে জনসাধারণের জন্যও সাহিত্য রচনা করিতে হইয়াছে। তাহাদের জন্য সাহিত্য রচনা করিতে হইয়াছে বলিয়াই সাহিত্যে তাহাদের জীবন যাত্রা বিশিষ্ট স্থান পায় নাই। দেবদেবী, রাজা, রাজপুত্র, শ্রেষ্ঠী সওদাগরগণের জীবন-যাত্রা সে সাহিত্যের মুখ্য উপজীব্য হইয়াছে। তবে জনসাধারণের জীবনকে তাঁহারা একেবারে বঞ্চিত করিতে পারেন নাই—কোথাও কোথাও তাহাদের জীবন-কথা মূল আখ্যায়িকার পরিপোষণের জন্য আসিয়া পড়িয়াছে।

আভিজাত্যগর্ব্বী বর্ণাশ্রমের বিরুদ্ধে এদেশে প্রধানতঃ বৌদ্ধ, সহজিয়া, বৈষ্ণব ও মুসলমান ধর্ম্মের প্রতিপত্তি ঘটিয়াছে—এইগুলি সমস্তই গণতন্ত্রীয় ধর্ম্ম। এইগুলির প্রচার-কল্পে যে সাহিত্য রচিত হইয়াছে, তাহাতে জনসাধারণকে একেবারে উপেক্ষা করা হয় নাই। বৌদ্ধ পালি-সাহিত্যে সাধারণ গৃহস্থ ও শ্রমণ শ্রমণীদের জীবন কথা পাওয়া যায়। সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্যে একমাত্র মৃচ্ছকটিকে অসম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের জীবনের কিছু কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায়। বসন্তসেনার কথা ধরি না—কারণ সে গণিকা হইলেও রাজরাণী অপেক্ষা প্রভাব প্রতিপত্তিতে ন্যূন নয়—সে বিদুষী ও ধনবতী,—সংস্কৃতে কথা বলে। পালি-সাহিত্যেই সর্ব্বপ্রথম তথাগতের কৃপায় পতিতা ও নটীদের স্থান হইয়াছে।

পালি-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠী ও উচ্চশ্রেণীর শ্রমণ ভিক্ষুদের কথা বাদ দেওয়া যাইতে পারে—কিন্তু ক্ষপণকগণ জনসাধারণেরই প্রতিনিধি। বাঙ্গালা দেশে বৌদ্ধ সাহিত্যে যোগী, হাড়ি, ডোম্নী ইত্যাদির জীবন-কথার উল্লেখ আছে বটে—কিন্তু তাহা সৎসাহিত্যের গোষ্ঠীতে স্থান পাইতে পারে নাই।

সহজিয়াগণ এদেশে যে সাহিত্য রচনা করিয়াছিলেন তাহাকে, যে বন্যায় শান্তিপুর ডুবুডুবু নদে ভেসে যায়, সেই বন্যাই ডুবাইয়া দিয়াছে। এক রজকিনী রামীর জীবন-তরীটি নীলশাড়ীর বিতান তুলিয়া তাহাতে ভাসিতেছে। বৈষ্ণব-সাহিত্য প্রধানতঃ রাধাশ্যামের প্রেমলীলা অবলম্বনে রচিত—কিন্তু ঐ সাহিত্যের ব্রজভূমিটি অনেকস্থলেই আমাদের বাঙ্গালারই পল্লীভূমি,—গোকুলগোষ্ঠ আমাদের রাঢ় দেশেরই গোঠ-বাথান—যমুনা অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের অজয়-ভাগীরথী। বৈষ্ণব-সাহিত্য বাঙ্গালার পল্লী-জীবনকেই প্রকারান্তরে রস-বলয়িত করিয়াছে। বৈষ্ণব-সাহিত্যের যে অংশ শ্রীচৈতন্যের জীবন লইয়া রচিত—তাহার মধ্যেও বাঙ্গালীর জনসাধারণের জীবন-কথা উপেক্ষিত হয় নাই।

মুসলমানধর্ম্ম-প্রচারের উদ্দেশে যদি কিছু সাহিত্য রচিত হইয়া থাকে—তবে তাহা লুপ্ত। সুফীধর্ম্মের সহিত হিন্দুধর্ম্মের মিলনে এদেশে যে সকল ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছে, তাহারা একশ্রেণীর সাহিত্য

রচনা করিয়াছে; কিন্তু তাহা আধ্যাত্মিক সাহিত্য, আখ্যায়িকা-মূলক নহে। কাজেই তাহাতে জাতীয়-জীবনের বহিরঙ্গের কোনস্থানই হয় নাই। বাঙ্গালাদেশে মুসলমানগণের পৃষ্ঠপোষকতায় যে সাহিত্য রচিত হইয়াছে—তাহা অনুবাদ সাহিত্য। তাহা জনসাধারণের উপভোগ্য হইয়াছে বটে—কিন্তু তাহাদের জীবন-কথা তাহাতে প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই। মুসলমান ও হিন্দুজনসাধারণ মিলিয়া পূর্ব্ববঙ্গে যে গীতিকা-সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহারই উপজীব্য হইয়াছে জনসাধারণেরই জীবন-যাত্রা।

পাঁচালী ছড়া, আগমনী-বিজয়ার গান ইত্যাদি লোক-সাহিত্য সাধারণতঃ দেবদেবী লইয়া রচিত হইলেও দেবদেবীদের লীলাজীবনের অন্তরালে বাঙ্গালার পল্লী-বাসীদের জীবন-কথাই বিবৃত হইয়াছে। কিন্তু এইগুলিকে সৎ সাহিত্যের গোষ্ঠীতে স্থান দেওয়া হয় নাই।

ইংরাজীযুগে ভারতে ইতিহাসের উদ্ধার হওয়ার পর ইতিহাসের চরিত্রগুলি বাঙ্গালা সাহিত্যের পাত্রপাত্রী হইয়া পড়িল। যে ইতিহাস অবলম্বনে এদেশে সাহিত্য-রচনার সূত্রপাত হইল, তাহা প্রধানতঃ বাঙ্গালার বাহিরের ইতিহাস। কাজেই বাঙ্গালীর জনসাধারণের জীবন-চিত্র ঐতিহাসিক চরিত্রগুলিতে পাওয়া গেল না। ঐ চরিত্রগুলি সাহিত্যে একটা অভিনব আভিজাত্যেরই সৃষ্টি করিল। কাব্যে দেবদেবী ও মহাভারত-রামায়ণের চরিত্রেরই প্রাধান্য থাকিয়া গেল।

বঙ্কিমচন্দ্র লিখিলেন উপন্যাস,—কিন্তু তাঁহার উপন্যাসে জনসাধারণের বড় একটা সাক্ষাৎ পাওয়া গেল না—অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তিনি ইতিহাস ও দেশের ধনিকসম্প্রদায় হইতে চরিত্র নির্ব্বাচন করিলেন। তবে তিনি একেবারে জন-সাধারণকেও বাদ দিতে পারিলেন না—অন্ততঃ তাঁহার উপন্যাসে শিক্ষিত বাঙ্গালীর গার্হস্থ্য-জীবনের চিত্রও পাওয়া গেল।

এ বিষয়ে আগাইয়াছিলেন দীনবন্ধু। তাঁহার নাটকে আমরা সকল শ্রেণীর বাঙ্গালীজীবনের সাক্ষাৎ পাইলাম। সাহিত্যের আভিজাত্য-ব্রতভঙ্গ প্রকৃতপক্ষে দীনবন্ধু হইতে সূত্রপাত। রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসে, বঙ্কিম-চন্দ্রের প্রথাই অনুসরণ করিয়াছেন। কাব্যে তিনি পল্লী-নিসর্গকে প্রাধান্য দিয়াছেন। গল্প-সাহিত্যে তিনি গণতন্ত্রীয় পথে অনেকটা আগাইয়া গিয়াছেন।

এখন দেশে যথেষ্ট শিক্ষাবিস্তার হইয়াছে—রস-জীবনের সঙ্গে সঙ্গে দেশবাসীর একটা জ্ঞান-জীবন ও গড়িয়া উঠিয়াছে। এখন কোন রাজরাজন্য সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক নয়—তাহারাই এখন সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ও উপভোক্তা। তাহারা এখন শুধু সাহিত্যের রস উপভোগ করিতে চায় না—সাহিত্যের মধ্যে তাহাদেরই জীবন-কথা শুনিতে চায়। তাহাদের মধ্যে হইতেই শক্তিমান্ সাহিত্যিকের জন্ম হইতেছে, তাহারা অনবরত দেব-দেবী, রাজ রাজন্য, বীর-বীরাঙ্গনা, ও ধনীর দুলাল-দের লীলাবৈচিত্র্যের উপাখ্যান শুনিয়া শুনিয়া বিরক্ত। তাহারাও মানুষ, তাহাদের জীবন-কথাও অতিবিচিত্র—তাহাদের জীবনযাত্রায় বৈচিত্র্যের সহিত বৈশিষ্ট্য ও অপূর্ব্বতা আছে, তাহাদের জীবন-কথা অন্য দেশেও যেমন সাহিত্যের সর্ব্বপ্রধান উপজীব্য হইয়াছে, তাহারা চায়—এদেশের সাহিত্যেও তাহাই হউক।

এদেশে শরৎচন্দ্র তাহাদের জীবনকথাকেই সাহিত্যের সর্ব্বপ্রধান উপাদান করিয়া তুলিয়া তাহাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিয়াছেন। তাই বাঙ্গালী শরৎচন্দ্রকে এত ভালবাসিয়াছে এবং আপনাদের অন্তরঙ্গ জন বলিয়া মনে করিয়া লইতে পারিয়াছে।

শরৎচন্দ্র দেখিলেন, সাহিত্যের অন্যান্য শাখা জন-সাধারণকে বাদ দিয়াও সাফল্য লাভ করিতে পারে—কিন্তু উপন্যাস তাহা পারে না। অভিজাত-সম্প্রদায়ের কথাই নানা ভাবে সাহিত্যের নানা শাখার এতদিন উপজীব্য হইয়া আসিয়াছে—তাহাতে আর না আছে অভিনবত্ব, না আছে বৈচিত্র্য,—না আছে অপূর্ব্বতা। জনসাধারণের জীবন ছাড়া উপন্যাসের গত্যন্তর নাই,—উপন্যাসের পাঠক ও অভিভাবকও তাহারাই। বলা বাহুল্য, শরৎ-চন্দ্র এ দীক্ষা কতকটা ইউরোপীয় সাহিত্য হইতেই পাইয়াছেন। আমাদের দেশে জনসাধারণের গণতন্ত্রীয় জাগরণের অনেক আগেই ইউরোপে জাগরণ হইয়াছে এবং সাহিত্যও সেইভাবে রূপান্তর লাভ করিয়াছে।

রবীন্দ্রোত্তর কাব্য-সাহিত্যের আর কোন গুণ না থাক, উহাতে বাঙ্গালার জনসাধারণের জীবনের একটা বিশিষ্ট স্থান হইয়াছে। কেবল পল্লীনিসর্গ নয়—পল্লী-বাসীর জীবন-যাত্রাকে রবীন্দ্র-শিষ্যগণ কাব্যের একটি প্রধান উপজীব্য করিয়া তুলিয়াছেন।

শরৎচন্দ্রের পর কথা-সাহিত্যে দেশের দীনতম ঘৃণ্যতম, বন্যতম, জঘন্যতম জীবনটিও স্থান প্যইতেছে, তাহাদের সুখ দুঃখের অপূর্ব্ব বৈচিত্র্য নব নব রসসৃষ্টির সহায়তা করিতেছে। তরুণ কথা-সাহিত্যিকগণের কেহ কেহ দেশের যে শ্রেণীর লোক সাহিত্যের পাঠকই নয়, যাহারা আজিও নিজেদের জীবনকে সাহিত্যে প্রতিফলিত দেখিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতে শিখে নাই, তাহা-দের জীবন-কথাকেও বিশিষ্ট স্থান দিতেছেন। কাব্য-সাহিত্যেও ঠিক সমান্তরাল পদ্ধতিই অনুসৃত হইতেছে। নাট্য সাহিত্য এতদূর আগায় নাই—শরৎচন্দ্র উপন্যাসে যতদূর আগাইয়াছেন, নাট্যসাহিত্য ততদূর পর্য্যন্ত আসি-য়াই থামিয়াছে। বোধহয়, তাহার পক্ষে আর আগানো সঙ্গত-ও নয়।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র ও শিক্ষাধারা

"আমি যদি একদিনের জন্যও দেশের 'ডিক্টেটর' হইতাম, তাহা হইলে বিভিন্ন আইন কলেজ ভূমিসাৎ করিতাম এবং তাহার দ্বারা ভারতের অগণিত পুষ্পসদৃশ যুবককে অকালে শুকাইয়া যাওয়া হইতে রক্ষা করিতাম।" হিন্দু কলেজে ছাত্র ও অধ্যাপকদের এক সভায় আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় এই কথা বলেন। তিনি ছাত্রদিগকে বিদ্যালয়ের ডিগ্রীলাভের জন্য—বর্ত্তমানে কার্য্যতঃ যাহার কোন মূল্যই নাই—চেষ্টা করিয়া প্রকৃতির দান—তাহা-দের মূল্যবান মস্তিষ্ক ক্ষয় করিতে নিষেধ করেন। তিনি ছাত্রদিগকে বিজ্ঞান ও ভারতীয় শিল্পের প্রতি মনোযোগ প্রদান করিতে উপদেশ দেন।

আচার্য্য রায় বলেন যে—বাঙ্গালী শিক্ষাটিকে ভুল-ভাবে গ্রহণ করিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সর্ব্ব-সাধারণের অনুপযোগী। যে সব ছাত্র প্রকৃতই প্রতিভাবান এবং যাদের লক্ষ্যই হবে শিক্ষাবিভাগে কাটানো, কেবল তাদেরই উচ্চ শিক্ষা দেওয়া উচিত; অন্যদের ব্যবসাবাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রথম থেকেই নিয়োগ করা উচিত। অর্থোপার্জ্জনের জন্য উচ্চ শিক্ষার যে একান্তই প্রয়োজন আছে, তা নয়—এই বিষয়টি তিনি নানা দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়া দেন। বাঙ্গালীরা প্রায়ই অভিযোগ করেন যে ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে সুবিধা ও সুযোগ কোথায়? এসম্বন্ধে তিনি বলেন যে, ভারতবর্ষের অন্যান্য যে সব জাতি ব্যবসা-বাণিজ্যে দক্ষতা লাভ করেছে, বাঙ্গালীরা তাদের মত কষ্টসহিষ্ণু নয়, অধ্য-বসায়ী নয়,—সেই জন্যই তারা ব্যবসায়ে কিছু করতে পারে না। তাদের সেই সকল গুণ নিতে হবে—শিখতে হবে। তাহলে আমাদের সুবিধা ও সুযোগ আসবে। অতএব বাঙ্গালীরা যদি উচ্চশিক্ষার মোহ এবং বৃথা অভিমান ত্যাগ করিয়া কষ্ট সহিষ্ণু হয়, তবেই তারা ভারতের অন্যান্য জাতির মত জীবন সংগ্রামে টিকিয়া থাকিবে।

ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রে অতিলৌকিক ঘটনা

শ্রীহেমন্তকুমার চক্রবর্ত্তী এম-এ

স্বপ্নের ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত কল্পলোকে মানুষ নিত্য বিহার করে; মানুষের জগতে বুঝি তত সুখ নাই। স্বপ্ন যদি বাস্তবে পরিণত হয় তবে তাহা সুখের হয় সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহা স্বাভাবিক বলিতে পারিনা। কুন্দনন্দিনী স্বপ্ন দেখিতেছে—বেলাবিহীন অনন্ত সাগর পারস্থবৎ অপরিজ্ঞাত নক্ষত্রলোকে চন্দ্রমণ্ডল মধ্যবর্ত্তিনী তাহার মাতা অঙ্গুলী সঙ্কেতে গগনোপান্তে তাহাকে দুইটী মনুষ্যমূর্ত্তি প্রদর্শন করিতেছে এবং বলিতেছে,—"এই দুই মনুষ্যই ইহলোকে তোমার শুভাশুভের কারণ হইবে, যদি পার তবে ইহাদিগকে দেখিলে বিষধরবৎ প্রত্যাখ্যান করিও,"। কুন্দ তাহাদিগকে আর কখনও দেখে নাই; সুতরাং তাহাদিগকে কল্পনা করাও তাহার পক্ষে সম্ভবপর নহে। বঙ্কিমচন্দ্র এই স্বপ্ন বৃত্তান্তকে সাফল্য-প্রদান করিয়াছেন, এবং এই পরিচ্ছেদকে "ছায়া পূর্ব্ব-গামিনী" নামে আখ্যাত করিয়াছেন। বিপদ যদি বিপদের বেশেই মানুষকে সতর্ক করিয়া দেয় তবে পৃথিবীর অনেক দুঃখকেই সুখের আকারে পরিণত হইতে হইত।

যাহাকে হারাইয়াছি, যাহাকে হারাইয়া পৃথিবীর সমস্ত সৌন্দর্য্য ম্লান হইয়া গিয়াছে, যাহা প্রমোদে হর্ষ, বিষাদে শান্তি, চিন্তায় বুদ্ধি, কার্য্যে উৎসাহ—দর্শনে আলোক, শ্রবণে সঙ্গীত, নিঃশ্বাসে বায়ু, স্পর্শে জগৎ, নিদ্রায় মানস নয়নে যদি তাহাই প্রত্যক্ষ করা যায়, আর জাগিয়া বসিয়া চক্ষু উন্মীলন করিয়া, কল্পনায় নহে বাস্তব চক্ষুতেও যদি তাহাই দৃষ্টিগোচর হয়, তাহাতে হৃদয় উৎফুল্ল হইয়া উঠে সন্দেহ নাই এবং মানুষের ভাষায় তাহার রূপ দেওয়াও কখনও সম্ভবপর নহে, কিন্তু এবম্বিধ ঘটনাকে কোনও মতেই স্বাভাবিক বলা চলিবে না। হেমচন্দ্র কর্ত্তৃক উপেক্ষিতা সোপানোপরি নিদ্রিতা মৃণালিনী স্বপ্ন দেখিতেছে—সমর বিজয়ী বীর হেমচন্দ্র। অগ্র পশ্চাতে কত হস্তী অশ্ব পদাতি; মৃণালিনীকে পদদলিত করিয়া যাইতেছে, মৃণালিনী বলিতেছে—অনেক যন্ত্রণা পাইয়াছি দাসীকে আর ত্যাগ করিও না; হেমচন্দ্রও যেন বলিতেছে আর কখনও তোমায় ত্যাগ করিব না। জাগিয়া চক্ষু উন্মীলন করিয়াও মৃণালিনী তাহাই দেখিতেছে, হেমচন্দ্র বলিতেছে আর একবার ক্ষমা কর, আর কখনও তোমায় ত্যাগ করিব না। মনুষ্যের জগতে কি এত সুখ আছে? জানিনা, থাকিলে পৃথিবীও স্বপ্নে পরিণত হইত।

বঙ্কিমচন্দ্র প্রাচীন সমাজে প্রচলিত অবলৌকিক ক্রিয়ায় আস্থাবান ছিলেন বলিয়া মনে হয়। (১) তাঁহার মতে সে সকল ক্রিয়া কলাপও বর্ত্তমান বিজ্ঞান-সভ্যতার ন্যায় সূক্ষ্ম অনুসন্ধানের উপর নির্ভর করে। দক্ষিণ চক্ষু কিম্বা বাম চক্ষু স্পন্দিত হইয়া যদি মঙ্গলামঙ্গলের সূচনা করে, তবে তাহাতে বিস্মিত হইবার কি কারণ আছে। বিজ্ঞানের অনেক গোড়ার প্রশ্নেরই উত্তর মানুষ জানেনা, হয়ত বা জানিবেও না; কিন্তু যে নির্দ্দিষ্ট পথে প্রকৃতি আপন রথ পরিচালনা করে মানুষ আপন বুদ্ধিবত্তায় তাহা জানিয়া নেয় এবং সে নির্দ্দিষ্ট পথে অগ্রসর হইয়া প্রকৃতিদত্ত সামগ্রীর সাহায্যেই আপন সুখের সংসার স্থাপন করে। অনেক প্রাচীন বিধি যাহাদিগকে আমরা বর্ত্তমান হঠাৎ আলোকে কুসংস্কার বলিতে শিখিয়াছি, তাহার ভিতর যে প্রকৃতির সত্য নিহিত নাই এবং তাহাও যে ভূয়োদর্শনের ফল নহে, তাহা মনে করার যথেষ্ট হেতু নাই। বঙ্কিমচন্দ্রও ইহাই বলেন; রজনীতে সন্ন্যাসীর মুখে তিনি এই কথাই প্রকাশ করিয়াছেন—"তোমরা লৌহের তারে পৃথিবী-ময় লিপি চালাইতে পার, আমরা কি নলটী চালাইতে পারি না? তোমাদের একটা ভ্রম আছে, তোমরা মনে কর যে, (যাহা

(১) "মন্ত্রশক্তিতে বঙ্কিমবাবুর বিশেষ আস্থা ছিল বলিয়া মনে হয়" বঙ্কিমজীবনী হারান রক্ষিত পৃঃ ১৮৶০

ইংরাজেরা জানে তাহাই সত্য, যাহা ইংরেজ জানেনা তাহাই অসত্য, তাহা মনুষ্যজ্ঞানের অতীত, তাহা অসাধ্য। বস্তুতঃ তাহা নহে। জ্ঞান অনন্ত কিছু তুমি জান, কিছু আমি জানি, কিছু অন্যে জানে, কিন্তু কেহই বলিতে পারে না যে, আমি সব জানি, আর কেহ আমার জ্ঞানের অতিরিক্ত কিছুই জানে না। কিছু ইংরেজ জানে, কিছু আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা জানিতেন। ইংরাজেরা যাহা জানে, ঋষিরা তাহা জানিতেন না; ঋষিরা যাহা জানিতেন ইংরাজেরা তাহা এ পর্য্যন্ত জানিতে পারে নাই। সেই সকল আর্য্যবিদ্যা প্রায় লুপ্ত হইয়াছে। আমরা কেহ কেহ দুই একটী বিদ্যা জানি যত্নে গোপনে রাখি, কাহাকেও শিখাই না"।—(রজনী—পৃঃ ২৩৬ বঃ সঃ) (২)

দৈববল এবং নানা প্রকার তান্ত্রিক অনুষ্ঠানে এদেশে রোগ আরোগ্য করার প্রথা বর্ত্তমান সময়ও প্রাচীন সমাজে প্রচলিত আছে, নব্য সমাজ যে সকল প্রথাকে কুসংস্কার বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাহেন, বঙ্কিমচন্দ্র তাহাতে বিশ্বাস করিতেন। রজনীতে শচীন্দ্রের নিতান্ত দুশ্চিকিৎস্য বায়ুরোগ আরোগ্য প্রসঙ্গে সন্ন্যাসীঠাকুর বলিতেছেন—"আমি ডাক্তারী শাস্ত্রের কিছুই জানিনা। ডাক্তারদিগের দ্বারা এ রোগ উপশম হইতে পারে কি না তাহা বিশেষ বলিতে পারিনা; কিন্তু ডাক্তারেরা কখনও এসকল রোগের প্রতিকার করিয়াছে আমি এমন শুনি নাই। রজনী পৃঃ ২৪৭

চন্দ্রশেখরেও রামানন্দ স্বামী প্রদত্ত ঔষধে হতচেতন শৈবলিনী চেতনা ফিরিয়া পাইতেছে,—"ঔষধ আর কিছুই নহে কমণ্ডলুস্থিত জল মাত্র" কিন্তু এ ঔষধ প্রয়োগের সকলের অধিকার নাই—ইহার জন্য বিশেষরূপে আত্ম-শুদ্ধি প্রয়োজন। চন্দ্রশেখর "সহজে জিতেন্দ্রিয়, ক্ষুৎপিপাসাদি শারীরিক বৃত্তি সকল অন্যাপেক্ষা তিনি অধিক বশীভূত করিয়াছিলেন। কিন্তু এক্ষণে তাহার উপরে কঠোর অনশন ব্রত আচরণ করিয়া আসিয়াছিলেন। মনকে কয়দিন হইতে ঈশ্বরের ধ্যানে নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন। পরমার্থিক চিন্তা ভিন্ন অন্য কোন চিন্তা মনে স্থান পায় নাই"। বঙ্কিমচন্দ্র বলেন—ইহা কি "যোগবল না সাইকিক ফোরস্?"

আনন্দমঠে যাহার প্রভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ হারাইয়াও জীবানন্দ পুনর্ব্বার জীবন লাভ করিলেন তাহাও কি যোগবল? বঙ্কিমচন্দ্র এই যোগবলে বিশেষ আস্থাবান ছিলেন বলিয়াই বোধ হয়। তিনি এ প্রসঙ্গে আরও একটু অতিলৌকিকতার আশ্রয় লইয়াছেন—"শান্তি বলিল, তোমারই জয়, এই মহাত্মাকে প্রণাম কর।—তখন উভয়ে দেখিল কেহ কোথাও নাই কাহাকে প্রণাম করিবে?"

মনে হয় বঙ্কিমচন্দ্র নিজে ফলিত জ্যোতিষশাস্ত্রেও বিশেষ পারদর্শী ছিলেন (৩) এবং হস্তরেখা প্রভৃতি দর্শনে যে মানুষের ভবিষ্যৎ নিরূপণ করা যায়, তাহা বিশ্বাস করিতেন। ইহাও তিনি ভূয়োদর্শনের ফল বলিয়া স্বীকার করেন। হস্তরেখা মানুষের ভাগ্য নির্দ্দিষ্ট করে না, কিন্তু হস্তরেখা দর্শনে ভাগ্য নিরূপণ করা যায় ইহাই তিনি বলিতে চাহেন। প্রকৃতিও একটী নির্দ্দিষ্ট নিয়ম অনুসরণ করিয়া চলে; বিশেষ পর্য্যবেক্ষণে সে চলার নিয়ম বা সঙ্কেতটী আবিষ্কৃত হইলেই মানুষ তাহা দ্বারা নিজ অভীষ্ট বা কার্য্যোদ্ধার করিয়া লয়। রজনীতে তিনি ইহাই বলিতেছেন—

"আমরাও তত্ত্বানুসন্ধান জন্য এ সকল করিয়া থাকি। শুনিয়াছি বিলাতী পণ্ডিতের মধ্যে অনেকে বলেন, লোকের মাথার গঠন দেখিয়া তাহার চরিত্রের কথা বলা যায়। যদি মাথার গঠনে চরিত্র বলা যায়, তবে হাতের রেখা দেখিয়াই বা কেননা বলা যাইবে? ইহা মানি যে হাতের রেখা দেখিয়া কেহ এ পর্য্যন্ত ঠিক বলিতে পারে নাই কারণ এই হইতে পারে যে, ইহার প্রকৃত সঙ্কেত অদ্যাপি পাওয়া যায় নাই, কিন্তু ক্রমে ক্রমে হাত দেখিতে দেখিতে প্রকৃত সঙ্কেত পাওয়া যাইতে পারে।" রাজসিংহে দরিয়া জ্যোতিষীকে মবারকের

(২) আমার কথা শেষ হইবামাত্র বঙ্কিমবাবু বলিয়া উঠিলেন যে তিনি ঠিক ঐ মন্ত্রটী জানেন, ঐ মন্ত্রটার কোন বিপরীত ফল ফলিবার আশঙ্কায় তিনি সকলকে মন্ত্রের প্রয়োগ শিখাইতেন না—কালীচরণ দত্ত—বঙ্কিমচন্দ্র—প্রদীপ ভাদ্র ১৩০৬

(৩) জ্যোতিশাস্ত্রেও বঙ্কিমবাবুর বিশেষ আস্থা ছিল। বাংং চেষ্টা করিয়া জ্যোতিষ কিছু কিছু শিখিয়াছিলেন—বঙ্কিম জীবনী পৃঃ ২ হারাণ রক্ষিত।

হাত দেখিতে এবং অদৃষ্ট গণনা করিতে বলিতেছে। "জ্যোতিষী বলিল আপনি কোন রাজপুত্রীকে বিবাহ করুন।" মবারক বলিল "তাহা হইলে কি হইবে?" জ্যোতিষী উত্তর করিল, তাহা হইলে খুব পদবৃদ্ধি হইবে।" (রাজসিংহ) বলা বাহুল্য মবারক শাহজাদী জেবউন্নিসাকে বিবাহ করেন এবং ঘটনাচক্র অদৃষ্টকে যে ভাবেই গঠন করুক না তিনি যে দুই হাজারী মনসবদার হইয়াছিলেন সে কথা সত্য। সীতারামে জয়ন্তী সমভিব্যাহারে স্ত্রী বিরূপাতীরে হস্তীওস্কায় গঙ্গাধর স্বামীকে আপন হস্ত পরীক্ষা করিতে বলিতেছেন,— "গঙ্গাধর স্বামী শ্রীকে বাহিরে আনিয়া তাহার বাম হস্তের রেখা সকল নিরীক্ষণ করিলেন। খড়ি পাতিয়া জন্মশক, দিন, বার, তিথি, দণ্ড, পল সকল নিরূপণ করিলেন। পরে জন্মকুণ্ডলী অঙ্কিত করিয়া গুহাস্থিত তালপত্র লিখিত প্রাচীন পঞ্জিকা দেখিয়া দ্বাদশ ভাগে গ্রহগণের যথাযথা সমাবেশ করিলেন…"ইত্যাদি।

(সীতারাম)

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রায় প্রত্যেক উপন্যাসেই জ্যোতি-গণনার উল্লেখ আছে; বলা নিষ্প্রয়োজন সর্ব্বত্রই ভবিষ্যদগণনা সাফল্য লাভ করিয়াছে; ইহাতে মনে হয় বঙ্কিমচন্দ্র বিশেষরূপেই ইহাতে আস্থাবান ছিলেন। মৃণালিনীতে মাধবাচার্য্য মগধ রাজপুত্র হেমচন্দ্রকে আপন নষ্ট পিতৃরাজ্য উদ্ধারের জন্য মুসলমানদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে উৎসাহিত করিতেছেন এবং বলিতেছেন "কয়মাস পর্য্যন্ত আমি কেবল গণনায় নিযুক্ত আছি;— গণিয়া দেখিলাম যবন সাম্রাজ্য ধ্বংস বঙ্গরাজ্য হইতে আরম্ভ হইবে।" (মৃণালিনী) ধর্ম্মাধিকারের বিশ্বাস-ঘাতকতায় বখতিয়ার কর্ত্তৃক নবদ্বীপ অধিকৃত হইলে হেমচন্দ্র মাধবাচার্য্যের উপদেশে দক্ষিণে সমুদ্রতীরে এক হিন্দুরাজ্য সংস্থাপন করেন। তখন মাধবাচার্য্য বলিতেছেন —"জ্যোতিষ গণনা মিথ্যা হইবার নহে; অবশ্য সফল হইবে, তবে আমার এক ভ্রম হইয়া থাকিবে। পূর্ব্ব দেশে যবন পরাভূত হইবে; ইহাতে আমরা নবদ্বীপেই যবন জয় করার প্রত্যাশা করিয়া ছিলাম, কিন্তু গৌড় রাজ্য ত প্রকৃত পূর্ব্ব নহে কামরূপই পূর্ব্ব—বোধ হয় তথায়ই আমাদের আশা ফলবতী হইবে।"—(মৃণালিনী)

দুর্গেশনন্দিনীতে অভিরামস্বামী গড়মান্দারণ দুর্গের অধিপতি বীরেন্দ্র সিংহকে মোগল-পাঠান যুদ্ধে মোগল পক্ষ অবলম্বন শ্রেয়স্কর বলিয়া পরামর্শ দিতেছেন। তিনি বলিতেছেন—"কয়েকদিন পর্য্যন্ত জ্যোতিষী গণনায় নিযুক্ত আছি…দেখিলাম যে মোগল সেনাপতি হইতে তিলোত্তমার মহৎ অমঙ্গল…মোগলের বিপক্ষ হইলেই তৎকর্ত্তৃক তিলোত্তমার অমঙ্গল সম্ভবে। স্বপক্ষ হইলে সম্ভাবনা নাই, এজন্যই আমি তোমাকে মোগল পক্ষে প্রবৃত্তি লওয়াইতে ছিলাম।" (দুর্গেশনন্দিনী) বীরেন্দ্র সিংহ যুদ্ধে মোগলপক্ষ অবলম্বন করেন সত্য; কিন্তু বিধিলিপি কিংবা গণনা ব্যর্থ হইবার নহে। গড়-মান্দারণের যুদ্ধেও মোগল সেনাপতি নামে পাঠান সৈনিকই সর্ব্বপ্রথম গুপ্তস্থানে তিলোত্তমার সন্ধান পায়।

যুগলাঙ্গুরীয়ে হিরণ্ময়ীর বিবাহোপলক্ষ্যে আনন্দস্বামী ধনদাস নামা শ্রেষ্ঠীকে যে পত্র প্রেরণ করিতেছেন তাহার প্রতিলিপি এইরূপ "জ্যোতিষী গণনা করিয়া দেখিলাম যে, তুমি যে কল্পনা করিয়াছ তাহা কর্ত্তব্য নহে। হিরণ্ময়ী তুল্য সোণার পুত্তলীকে কখন চির বৈধব্যে নিক্ষিপ্ত করা যাইতে পারে না। তাহার বিবাহ হইলে ভয়ানক বিপদ, তাহার চির বৈধব্য ঘটিবে গণনা দ্বারা জানিয়াছি—তবে পঞ্চ বৎসর পর্য্যন্ত পরস্পরে যদি দম্পতি মুখদর্শন না করে তবে এই গ্রহ হইতে যাহাতে নিষ্কৃতি হইতে পারে তাহার বিধান আমি করিতে পারি।"—(যুগলাঙ্গুরীয়) উক্ত ব্যবস্থায় পঞ্চ বৎসর অতীতে গ্রহ বৈগুণ্য হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া দম্পতি সুখে বাস করিয়াছিলেন—ইহাই বঙ্কিমচন্দ্রের উপসংহার। চন্দ্রশেখরে যুদ্ধকালে এবং যুদ্ধপরে দলনী বেগম কোথায় থাকিবে তাহা জানিবার নিমিত্ত মীরকাশিম চন্দ্রশেখরকে ডাকিয়া পাঠান, "চন্দ্রশেখর ভবিষ্যৎ গণিয়া দেখিলেন এবং রাজকর্ম্মচারীকে বলিলেন,— আপনি নবাবকে বলিবেন, আমি গণিতে পারিলাম না…সকল কথা গণনায় স্থির হয় না। বিশেষ জ্যোতিষে আমি অপারদর্শী। রাজপুরুষ বলিলেন, অথবা রাজার

অপ্রিয় সংবাদ বুদ্ধিমান লোক প্রকাশ করে না।" বাস্তবিক পক্ষে ইহাই সত্য। দলনীর ভীষণ শোচনীয় পরিণামের কথা চন্দ্রশেখর রাজসমীপে ব্যক্ত করা যুক্তিযুক্ত মনে করেন নাই; কারণ তিনি জানিতেন বিধিলিপি কিংবা গণনা অভ্রান্ত। কলিকাতার পথে ফষ্টর পরিত্যক্ত দলনী নবাবের নিকট গমনের অভিলাষ প্রকাশ করিলে চন্দ্রশেখর বলিতেছেন, "তুমি নবাবের নিকট যাইবার বাসনা পরিত্যাগ কর—অমঙ্গল ঘটিবে।" পরে বলিতেছেন, "তোমার কপালে মুঙ্গের দর্শন নাই।" মহম্মদ তকী মুর্শিদাবাদে দলনীকে বিষপানে হত্যা করে।

রাজসিংহে নির্ম্মল জ্যোতিষীকে চঞ্চলকুমারীর অদৃষ্ট এবং কবে বিবাহ হইবে, তাহাই জিজ্ঞাসা করিতেছে, —"জ্যোতিষী আবার লিখিল, পরে খড়ি পাতিতে লাগিল, লগ্নসারণী দেখিল—যদি সসাগরা পৃথিবীপতির মহিষী আসিয়া কখনও তোমার সখীর পরিচর্য্যা করে তবে বিবাহ হইবে, নহিলে হইবে না।" (রাজসিংহ) রাজসিংহ কর্ত্তৃক ঔরঙ্গজেবের দহনারম্ভের পর উদীপুরী কর্ত্তৃক চঞ্চলের পরিচর্য্যার কথা বলার বিশেষ আবশ্যকতা নাই। সীতারামে "শ্রী প্রিয়প্রাণ-হন্ত্রী হইবে" এই দৈবজ্ঞ গণনার উপর আস্থা স্থাপন করিয়াই সীতারামের পিতা শ্রীকে পরিত্যাগ করেন, কেননা বঙ্কিমচন্দ্র বলিতেছেন, "সাধারণতঃ স্ত্রী জাতির পতিই প্রিয়, কিন্তু যে পতি স্ত্রীর অপ্রিয় হয় সেখানে এই ফল পতির প্রতি না ঘটিয়া অন্য প্রিয়জনের প্রতি ঘটিবে।" (সীতারাম) পরিণামে শ্রী যে পরোক্ষভাবে "প্রিয়" গঙ্গারামের হত্যার কারণ হইয়াছিল, তাহা বঙ্কিমচন্দ্র দেখাইয়াছেন; দৈবজ্ঞ গণনাকে সত্যের আসন দেওয়াই তাঁহার অভিপ্রেত।

বঙ্কিমচন্দ্র যে নিজে জ্যোতিষ শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ছিলেন তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি, বর্ত্তমানে তাহার কিছু পরিচয় দিয়াই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

হত্যাকারী গঙ্গাধর স্বামী শ্রীর মুখপানে নিরীক্ষণ করিয়া তাহার রাশি নক্ষত্র (কর্কট, পুষ্যা) বলিয়া দিতেছেন। এ প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র পাদটিকায় কোষ্ঠি প্রদীপ হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছেন:—

"পরকণক শরীরো দেবমন্ত্র প্রকাশো।
ভবতি বিপুলবক্ষাঃ কর্কটো যস্য রাশিঃ॥

স্বামী আরও বলিতেছেন—"তোমার লগ্নে স্বক্ষেত্রস্থ পূর্ণচন্দ্র ও সপ্তমে বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র তিনটী শুভগ্রহ আছেন। তুমি সন্ন্যাসিনী কেন? তুমি যে রাজমহিষী— "জায়াস্থে চ শুভত্রয়ে প্রণয়িত্রী রাজ্ঞী ভবেৎ ভূপতেঃ। তারপর আরও বলিতেছেন,—"এই সপ্তমস্থ বৃহস্পতি নীচস্থ এবং শুভগ্রহত্রয় পাপগ্রহের ক্ষেত্রে (মকরে) পাপদৃষ্ট হইয়াছেন। তোমার অদৃষ্টে রাজ্যভোগ নাই।" এই সকল উক্তি যে জ্যোতিষশাস্ত্রের অভিজ্ঞতার ফল তাহা বলা বোধ হয় নিষ্প্রয়োজন।

বিবাহের পর দৈবজ্ঞ গণনা করিয়া দেখিল যে শ্রী প্রিয়প্রাণ-হন্ত্রী হইবে; সীতারাম শ্রীর নিকট তাহারই কারণ বিশ্লেষিত করিতেছেন, "তোমার কোষ্ঠিতে বলবান্ চন্দ্র, স্বক্ষেত্রে অর্থাৎ কর্কট রাশিতে থাকিয়া শনির ত্রিংশাংশগত হইয়াছিল" বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার এ উক্তির প্রমাণ স্বরূপ জাতকাভরণ হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছেন।

"চন্দ্রাগারে যাগ্নিভাবে কুজস্য
স্বেচ্ছাবৃত্তির্জ্জস্য শিল্পে প্রবীণা
রাজ্ঞা পত্যুঃ সদ্‌গুণা ভার্গবস্য
সাধ্বী মন্দস্য প্রিয়প্রাণ-হন্ত্রী—"

রাজনীতি, সমাজ-নীতি, ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্ম্মতত্ত্ব সমস্তকে আশ্রয় করিয়াই বঙ্কিমচন্দ্রের অতুল প্রতিভা প্রকটিত ও পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। বাংলার, বাঙ্গালীর শুভ পুণ্য দিনে বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম। জাতীয়তার গুরু বন্দেমাতরম—মন্ত্রদ্রষ্টা এ মহামনীষীকে বাঙ্গালী বেদনাতুর হৃদয়ের অশ্রুসিক্ত ভক্তি অর্ঘ্য নিবেদন করিয়া ধন্য হইতেছে।

মাদুলী

গল্প

শ্রীইন্দ্রভূষণ সেন

কি একটা পর্ব্ব। ঘোষালদের বাড়ী উৎসব। গাঁয়ের স্ত্রী-পুরুষ সবাই আসিয়া জড় হয়। মেয়ের দল গালে হাত দিয়া গান সুরু করিয়া দেয়। রমলা আসিয়া সেখানে দাঁড়ায়।

ঘোষাল গিন্নী বলে, "বসো বৌ।"

রমলা বসে।

ছোট্ট একটি ছেলে হামাগুড়ি দিয়া চলে। রমলাকে দেখিয়া শিশুসুলভ হাসি হাসে, হাত দু'খানি আগাইয়া দেয়। রমলা হাত বাড়াইয়া কোলে লয়, আদর করে। আবার হাত ধরিয়া মাটিতে নামাইয়া বলে, "থির, থির, থির।" শিশু খল্-খল্ করিয়া হাসে। তারপর রমলা কি ভাবিয়া একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে।

ছেলের মা রমলার দিকে চাহিয়া চমকিয়া উঠে। তাড়াতাড়ি রমলার কোল হইতে ছেলেকে ছিনাইয়া লয়।

ছেলের মা অপরার নিকট ফিস্ ফিস করিয়া বলে, আঁটকুড়ে মাগীর কি শোয়াগ বাবা। পরের ছেলে পিলে দেখে যেন একেবারে জলে-পুড়ে মরে। এই জন্যেই ত ভগবান এমন বিরূপ।"

রমলা ঘৃণিত মন্তব্য কান পাতিয়া শুনে। তারপর লজ্জায় ব্যথায় মেয়ের দল ছাড়িয়া বাহির হইয়া আসে।

বাড়ী আসিয়া বিছানার উপর উপুড় হইয়া পড়ে; আর ভাবে, সে ভগবানের নিকট এমন কি অপরাধ করিয়াছে, যাহার জন্য অপরের নিকট তাহাকে অপমানিত হইতে হয়? জানে ত সে কোন অপরাধ করে নাই। কেন তাহার উপর বিধাতার এই নিষ্ঠুর পরিহাস!

সন্ধ্যা হয়। অদূরে কোথাও শঙ্খ কাঁসি বাজিয়া উঠে। একবার চোখ মেলিয়া রমলা বাহিরের দিকে চায়, আবার চোখ বুজিয়া বিছানায় মরার মত পড়িয়া থাকে।

রাত্রি হয়। সুধা অফিস হইতে আসে, কিছুক্ষণ বিছানার উপরে বসিয়া থাকে; তারপর ডাকে, "কি গো, কিছু খেতে টেতে দেবে নাকি"? রমলা ঈষৎ লজ্জিত হইয়া বিছানা হইতে উঠে।

সুধামাধব কলিকাতায় কোনও একটা সদাগড়ি অফিসে চাকরী করে। ডেইলি প্যাসেঞ্জার সে; কেরাণীগিরি করিয়া একরকম দিন চালায়। ভোর ৮টায় সময় বাড়ী হইতে যায়, আর অফিস করিয়া আসে রাত্রি ৯টায়। বাড়ী আসিয়া পরিশ্রমের লাঘব হয়। শুধু প্রাণখোলা একটু অনাবিল হাসি, শুধু মনোমুগ্ধকর দুইটি সুচারু চক্ষুর চাহনি, শুধু একটু আবেগ-কম্পিত প্রগাঢ় চুম্বনের রেশ জীবনে বিচিত্র সুখ—মাদকতা সৃষ্টি করে।

ছুটির দিনে আহার করিয়া সুধা বিছানায় গড়াগড়ি দেয়। আর রমলা আঙুল দিয়া মাথার চুলগুলি নাড়িয়া চাড়িয়া সুরসুরি লাগায়। সুধার চক্ষুদুটি যখন ঘুমালসে বুজিয়া আসে—তখন রমলা কঙ্কণধ্বনি সংযোগে পিঠে একটু মৃদু করাঘাত করিয়া সোহাগ—উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে, "ওগো ঘুমুলে নাকি?

সুধা অর্দ্ধনিদ্রিত অবস্থায় সাড়া দেয়," হঁ।"

"কেবল ঘুম, একটু কথাই বলো না; না হয় একটা গল্পই করো"।

সুধা আর কিছুই বলে না। তাহার নাকের নিঃশ্বাস সজোরে বহিতে থাকে।

রমলা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে। নিস্তব্ধ বিরল মধ্যাহ্নে বিছানায় শুইয়া জানালার বাহিরে তাকাইয়া ভাবে। ভগবান তাহার জন্যই শুধু নির্জ্জনতা সৃষ্টি করিয়াছেন! মাসের পর কত মাস, বছরের পর কত বছর চলিয়া গিয়াছে, তাহাতে কাহারও কিছুই আসে যায় নাই, কাহারও কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হয় নাই। কিন্তু জীবনের পথে বিগত ৬টি বৎসর যেন তাহার বুকে একটা কঠিন

পাষাণের মত দাগ কাটিয়া বসিয়া রহিয়াছে। এই ছয়টা বৎসর যেন তাহার কাছে একটা বিপুল রহস্যের আদি ও অন্ত।

ভাবিতে ভাবিতে রমলার চোখের কোণে জল আসিয়া পড়ে। নিজেকে প্রবোধ দিবার জন্য আপনা আপনিই বলিয়া উঠে, "কেন আমার মত কি কেহ নাই এ জগতে?—আছে ঢের লোক আছে।"

বাতাসে অদূরের ঝাউগাছটা সন্‌সন্‌ করিয়া উঠে।

দিনের পর দিন চলিয়া যায়। রমলার কত কি মনে হয়, জাগিয়া থাকিবার আকাঙ্ক্ষা লইয়া কত বিনিদ্র রজনী সুখাবেশে কাটাইয়া দিয়াছে, চাঁদের অম্লান জ্যোৎস্নায় যখন সমস্ত জগৎ শুভ্র রজতের মত হাসিয়া উঠিয়াছে, যখন আকাশের সহস্র সহস্র তারকা মেঘ-মুক্ত নীল আকাশের তলে জ্বলিয়া উঠিয়াছে তখন তাহারা দুইটি প্রাণী হাত ধরাধরি করিয়া বিরাট আকাশের তলে নামিয়া আসিয়াছে। সেই সুন্দর জীবনের সরল রেখা যেন একেবারে জটিল হইয়া গিয়াছে। সেই দিনকার সেই আনন্দ-সমুদ্র আর উদ্বেল হইয়া উঠেনা। অনন্ত সমুদ্র যেন বিশুষ্ক সাহারায় পরিণত হইয়াছে।

অনেক দুর্ভাবনাই রমলা ভাবে, কিন্তু কূল পায়না।

সুধা অফিস হইতে আসিলে রমলা জুতা মোজা ছাড়াইয়া লয়, গায়ের জামাটা খুলিতে অর্দ্ধেক সাহায্য করে; আলনায় রাখিয়া দেয়। কিন্তু তাহার সেবার বিনিময়ে সুধার মুখে আর হাসি ফুটিতে চায়না। এমনি করিয়াই দিন চলে।

পাড়ার ঘোষাল গিন্নী রমলার কাছে আসিয়া গল্প করে। তাহাকে সামনে টানিয়া আদর করে, মাথার চুল বাঁধিয়া দেয়, কপালে সিঁদুরের টিপ পরাইয়া বলে, "তোমাকে বেশ মানিয়েছে বৌ।"

তারপর ঘোষাল গিন্নী দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলে, "শুনছ বৌ, ঐ পাড়ার বিন্দীর ছেলেটি যেন একেবারে কার্ত্তিক; একেই বলে বৌ গোবরে পদ্মফুল।'

রমলা দূরের দিকে চাহিয়া থাকে।

ঘোষাল গিন্নী বলিয়া যায়, কোথাকার কোন সাধু কোন ফকির কাহাকে কয়টা মাদুলী দিয়াছিল, কাহার ভূতের দৃষ্টি সারাইয়া দিয়াছিল, কোন বন্ধ্যার কয়টি সন্তান হইয়াছিল।

তারপর আবার বলে, "আচ্ছা বৌ, একবার জগা সাধুর কাছ থেকে এলে হয় না,—যদি একটা মাদুলী দেয় তবে হয়ত"—

উৎসাহে রমলার চক্ষু দুটি একটু উজ্জ্বল হইয়া উঠে, আকুল সমুদ্রে যেন কূল পায়।

"চল বৌ, ওর কাছ থেকে না হয় একবার আসা যাক"।

রমলা কিছুক্ষণ কি ভাবিয়া বলে, "চলুন"।

ঘোষাল গিন্নীর চেষ্টায় রমলার বাম হাতে মাদুলীর স্থান হইল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইলনা। দেখিতে দেখিতে বাম হাতের কনুইটি অসংখ্য মাদুলীতে ভরিয়া গেল, জায়গার সঙ্কুলন হইল না, গলায়ও কয়েকটা মাদুলী উঠিল।

বছরের পর বছর কাটিয়া গেল। অবশেষে কি জানি কোন্ এক দৈবদত্ত মাদুলের বৈদ্যুতিক সংস্পর্শে রমলার রমণীয় দেহ মাতৃত্বের নবভাবে সঞ্জীবীত হইয়া উঠিল। তাহার নারী-জীবনের আয়াস লব্ধ মাতৃত্বের বিকাশ-সম্ভাবনায় সুধার এক ঘেয়ে চলমান কেরাণী-জীবনের মধ্যেও একটা অনাবিল আনন্দ ও উৎসাহের রেখাপাত করিল। এই আনন্দ ও উৎসাহের ভিতর দিয়া সংসারের নূতন দিনগুলি কাটিয়া যাইতে সুরু করিয়াছে।

রমলা কল্পনায় নূতন সংসার গড়িতে বসিয়াছে। ছোট্ট একটি শিশু তুলতুলে নরম দেহ লইয়া আঙ্গিনায় খেলিয়া বেড়াইবে, নিস্তব্ধ বাড়ীখানি হাসিয়া কাঁদিয়া মুখর করিয়া তুলিবে, আরও কতকি। শিশুর আবির্ভাবে যে অশান্তির কালো ছায়াটার তিরোভাব হইবে একথা ভাবিতেও রমলা কথঞ্চিত আনন্দ পায়।

ঘোষাল গিন্নী আসিয়া বলে, "দেখ বৌ শরীরটার প্রতি একটু যত্ন নিও; সাবধানে চলাফেরা করো।—আর দু'মাস বুঝি বাকি"?

রমলা মাথা নত করে।

সুধার কাছে ঘোষাল গিন্নী বলে, "দেখো বাবা

আমাদের কিন্তু ভুলে যেয়ো না, সন্দেশ খাইয়ে দিতে হবে,—এখানকার ভোলা ময়রার সন্দেশ চলবে নাগো, সেই কলকাতার ভীমনাগের সন্দেশ"।

সুধা প্রাণভরা তৃপ্তি লইয়া হাসিয়া বলে, "আচ্ছা গিন্নী ঠাকরুণ তার জন্যে কি, আশীর্ব্বাদ করো যাতে,"—

"কি হলো বাবা, আমরা কি আর আশীর্ব্বাদ করিনে।" এই কথা বলিয়া রমলার মুখের দিকে একবার তাকায়, তারপর বলে, "বো'র যে ছেলে হবে"।

"দেখা যাবে গিন্নী ঠাকরুণ, কেমন সত্যি কথা তোমার।"

গিন্নী ঠাকরুণ তাহার কথার সত্যতার প্রমাণ করিয়া দেখাইয়া দেয়। এমনি ভাবেই দিনগুলি আনন্দ ও আশঙ্কার ভিতর দিয়া চলিয়াছে।

কিছুদিন পর! ছোট্ট একটি শিশু রমলার কোল জুড়িয়া বসিল। মায়ের বুক আনন্দে ভরিয়া গেল। কিন্তু ভয় হয়, তাদের অদৃষ্টে এমন ছেলে,—না ভগবান তত নিষ্ঠুর নন, কাঙালের ধন হাতের নুড়িটিকে তিনি ছিনাইয়া লইবেন না।

মা ছেলের মুখে শত শত চুম্বন করে। সে মুখের দিকে তাকাইয়া নিজেকে গৌরবান্বিত অনুভব করে।

ছেলে হাঁটু দিয়া গড়াইয়া হাঁটে, ফিক্ করিয়া হাসে, আচ্ছা করিয়া কাঁদে; ধূলাবালি যাহাই পায় সবই মুখে পুরিয়া দেয়। আর রমলা আসিয়া বাজের মত ছোঁ মারিয়া ছেলেকে কোলে লইয়া বুকের দুধটা মুখে পুরিয়া দেয়। খোকা চোঁ—চোঁ করিয়া দুধ খায়; সদ্যোত্থিত দাঁত দিয়া কট্ করিয়া কামড় দেয়। মা বলে, "উঃ"। পরে সুধার কাছে আগাইয়া বলে, "খোকার জ্বালায় আর পারছিনে, দুষ্টুটা কট্ ক'রে কামড়ে দেয়,—বড্ড লাগে, শীগগীরই ওর মুখে ভাত দিয়ে দাও।"

সুধা রমলার গালে চিমটি কাটিয়া দেয়, হাসিয়া বলে, "কেন, ওইটুকু কষ্ট আর সহ্য করতে পারো না? ছেলের মা ত হয়েছ; একটু কষ্ট না করলে চলবে কেন?"

রমলা হৃদয়ভরা তৃপ্তি লইয়া মুখটা একটু গম্ভীর করিয়া বলে, "যাও! তোমার ওসব আমার ভাল লাগেনা। তুমি কি আর ছেলের বাপ নও, তুমিই বা এমন কি কষ্ট করেছ বা করছ?"

"কি গো, রাণীর আবার রাগ হ'লো নাকি?"

"যাও, অমন রাণী রাণী করোনা, ভারি ত!"

সুধা প্রসঙ্গটা বদলাইয়া খোকার দিকে অনিমেষ নয়নে চাহিয়া থাকে; তারপর বলে, "খোকার চেহারাটি ঠিক রাজপুত্রের মত, নাগো?"

"তুমি অমন কথা বলোনা,—খোকার অমঙ্গল হ'বে।"

সুধা অফিস হইতে ফিরিয়া আসে, আদর করিয়া ছেলেকে কোলে লয়। ছেলে পিতার কোলে বসিয়া খল্ খল্ করিয়া হাসে।

রমলা আসিয়া বলে, "দুষ্টুর চোখে যেন ঘুম নেই। যাও, ওকে ফেলে রাখো; খাওয়া দাওয়া নেই বুঝি? অমনি আর যখন তখন কোলে করো না—ওকে; কেমনতরো বদ্-অভ্যেস হয়ে গেছে, মাটিতে আর পা পড়েনা। বছর পেরিয়ে গেল, হাঁটতেই শিখলো না। ওই বাড়ীর পুঁটির ছেলে কেমন সুন্দর হেঁটে বেড়ায়। পুঁটির ছেলে আর ও-ত একদিনেই হয়েছে; কিন্তু ও-ছেলে যেন ওকে চিপে মারতে পারে।"

সুধা খোকাকে কোলে লইয়া খাইতে বসে। রমলা ভাতের থালা আগাইয়া দেয়।

অনেক দিন পরের কথা। মা-ষষ্ঠী যে কৃপণ নয়, একথার অপ্রমাণ রহিল না। তাহার অকৃপণতায় আর একটি মেয়ে ও দুইটি ছেলের আবির্ভাব হইয়াছে। কাঁদিয়া, হাসিয়া নাচিয়া বাড়ীখানি একরকম মাথায় করিয়া তোলে। নির্জ্জনতার রেখা কোথাও নাই, বাড়ীখানির আনাচে কানাচে সজীবতার সুর।

একটা লাউ গাছ রান্নাঘরের চালটাকে জড়াইয়া ধরিয়াছে। ইহার ফুল ফুটিতে আরম্ভ করিয়াছে, কয়েক-দিন পরেই হয়ত লাউ ধরিবে। কে বা কাহারা তাহার গোড়াটা কাটিয়া দেয়।

রমলা আসিয়া খুকীকে মার দেয়। খুকী কাঁদিয়া বলে, "আমি না,—আমি না মা।"

"বল্ তবে কে করেছে ?"

"পঁচা।"

রমলা লাঠি লইয়া পঁচার দিকে ছুটিয়া যায়; পঁচা দৌড়াইয়া পলায়, আর বলে,—"আমি নাকি ? ছোল্দা করেছে।"

খুকী কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতে থাকে, "সবই বুঝি আমার দোষ।"

ঘোষাল গিন্নী উঠানে পা ফেলিয়াই রমলাকে বলে, "তোমার বড্ড রাগ বৌ, অমন করে ছেলেপিলেকে মারতে আছে ?"

খুকীর কাছে গিয়া বলে,—"আহা, পাঁচটা অঙ্গুল যেন বাছার গালে একেবারে বসে গেছে। অতটুকুন মেয়ে কি অন্যায়ই বা করেছে !"

রমলা বলে, "ওদের নিয়ে আর পেরে উঠছিনা গিন্নী ঠাকরুণ। ওই দেখুন না কত বড় লাউ গাছটা ছুই একটা লাউ হ'ত; তার দফা একেবারে নিকেষ ক'রে দিয়েছে।"

"ওরা যে ছেলেমানুষ, অত কি আর বোঝে ?"

"বুঝিয়ে বল্লেও-ত শুন্‌বে না। ওই ডালিম গাছটার ফুলগুলো সব ফেলে দিয়েছে কাল্‌ক;—অতবড় ধাড়ি মেয়ে ওকি আর বোঝেনা ওসব ? বড় খোকাকে নিয়ে কিন্তু এত যন্ত্রণায় পড়িনি গিন্নী ঠাকরুণ।"

"তা হোক বউ, অত মেরোনা ওদের।"

"নাঃ, আর পারিনে গিন্নী ঠাকরুণ; খেতে, বসতে উঠতে, চল্‌তে ওদের পিছনে মুখ খিঁচিয়ে চল্‌তে হয়।—মরার ভগবান ওদের চোখেও দেখে না।"

"অমন কথা বলোনা বৌ। চোখ রাঙিয়ে শাসন কর্‌লেই চলে।" এই কথা বলিতে বলিতে হিতাকাঙ্ক্ষিণী ঘোষাল গিন্নী বাড়ী হইতে চলিয়া যায়।

সুধা রাত্রে বিছানায় শুইয়া রমলাকে বলে,—"এবার বুঝি চাকরী যায় গো; আমাদের আপিসে দশ জনের চাকরী গিয়েছে।"

অমলা চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলে, "কেন ?—কোন দোষ টোষ বুঝি করেছিল ?

"দোষের চাকরী যাওয়া নয়গো এ, এ হচ্ছে সময়ের ফের। ব্যবসা-বাণিজ্য ত একেবারেই মন্দা, আবার তার উপর পথে ঘাটে হৈ হৈ, স্বদেশী স্বদেশী চীৎকার !"

রমলা বলে, "তাই ত।"

সুধা আর কিছুই বলে না। তাহার কর্ম্মক্লান্ত দেহ অবসন্ন হইয়া পড়ে। নিদ্রা আসিয়া মাতার মতন সর্ব্ব দেহে শান্তির শীতল স্পর্শ বুলাইয়া দেয়।

রমলা চোখ বুজিয়া পড়িয়া থাকে। দুর্দ্দিনের কত কথাই না তাহার মনে পড়ে। কি জানি কেমন করিয়াই বা তাহাদের দিন চলিবে, যদি,—আবার মনটা বিদ্রোহে ভরপুর হইয়া উঠে। বৃশ্চিক-দংশনের মত একটা তীব্র জ্বালা অন্তরে অনুভূত হইতে থাকে। মনে হয়, দেবতার অভিশাপের মতন রাশিকৃত মাদুলি-গুলি ছিঁড়িয়া জানালা দিয়া গড়াইয়া স্তূপীকৃত অন্ধকারের মধ্যে বিলীন করিয়া দেয়। মাদুলির অবিচ্ছিন্ন সূত্র ছিঁড়িয়া ফেলিতে যায়; কিন্তু আঁতকিয়া উঠে। মাদুলি ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিবার নিষেধ তাহার সম্মুখে জ্বলন্ত হইয়া ফুটিয়া উঠে এবং কি একটা অমঙ্গলের ভয়ে মাদুলি হইতে হাতটা টানিয়া আনে।

রমলার চক্ষে ঘুম আসিতে চায় না। আশঙ্কা ও উদ্বেগ লইয়া সারা রাত্রি চাহিয়া থাকে; কাণ পাতিয়া কি শুনে,—একটা দমকা বাতাস বহিয়া যায়।

ছুটী যাপন

ভ্রমণ--

—শ্রীঅমরেন্দ্র নাথ ভাদুড়ী

পূজার ছুটীর মাস খানেক পূর্ব্বেই কে কোথায় যাবে এই নিয়ে বন্ধুদের মধ্যে বেশ হৈ-চৈ পড়ে গেল। আমি যে কোথায় যাব তখনও কিছুই ঠিক ছিল না। তবে বাল্যকাল হ'তে ভ্রমণের নামে প্রাণ আমার নেচে উঠে। আর এত বড় একটা ছুটী ব'সে কাটানও এক দুরূহ ব্যাপার। বহু

বিচার বেদী দিল্লী।

গবেষণার পর স্থির কর্লাম যে পশ্চিমের দিকেই যাব এবং প্রথমেই বৃন্দাবন। একজন সঙ্গী বৃন্দাবন হ'তে হাতরাস এসে আমার জন্য অপেক্ষা কর্ব্বে এইরূপ বন্দোবস্ত করে ২৮শে সেপ্টেম্বর তুফান মেলে রওনা হলাম।

গাড়ীতে বেশী ভীড় ছিল না। ছোট একটী কামরায় আমরা পাঁচজন যাত্রী ছিলাম তিনজন বাঙ্গালী এবং দুইজন মাড়য়ারী। সবাই চুপ চাপ ব'সে ছিলাম। বাইরে ঝির ঝির ক'রে বৃষ্টি পড়ছিল। গাড়ী বর্দ্ধমান ছেড়ে যখন আসানসোলে এসে দাঁড়াল, তখন বেশ রাত্রি হ'য়ে গেছে। টিফিনকেরিয়ার থেকে কিছু খাবার বের ক'রে খেতে আরম্ভ কর্লাম। মাড়য়ারীরা পেঁয়াজের গন্ধে ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে অনবরত জানালা দিয়ে থুথু ফেল্‌তে লাগলো। মনে মনেও বোধ হয় আমার চৌদ্দ পুরুষকে উদ্ধার কর্চ্ছিল। ট্রেনের ভিতর জলযোগ করাও যেন মহাপাপ! আবার সম্মুখে চেয়ে দেখি এক চেকার বাবু
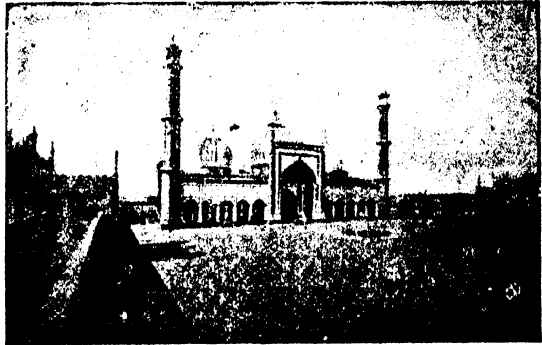
জুম্মা মসজিদ্ দিল্লী

লোলুপ দৃষ্টিতে খাবারের দিকে চেয়ে আছে। কি বিপদ! এহেন দৃষ্টির মাঝে খাওয়া মোটেই সুবিধাজনক নয়। পাশে মধ্যবয়স্ক একটী বাঙ্গালী ভদ্রলোক ছিলেন। জিজ্ঞাসা করে জান্‌লাম তিনি দিল্লী যাচ্ছেন। তাঁর সঙ্গে এক কথায় দু কথায় বেশ গল্প জমে উঠ্‌লো। তারপর কলিকাতার রাজনীতি, সমাজনীতি ও অস্পৃশ্যতা থেকে আরম্ভ করে দুগ্ধসমস্যায় এসে সমাধান হ'ল। ট্রেন কিন্তু হুহু শব্দে চলে যাচ্ছিল। মনে হ'ল এ যেন চিরকাল এমনি ভাবে চল্‌বে—এর যেন বিরাম নাই। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই গাড়ীখানা এসে যেখানে থামলো—সেটা ধানবাদ ষ্টেশন। মাড়য়ারীদ্বয় এখানে কোলাহল কর্ত্তে কর্ত্তে নেমে গেল। আমিও হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। বিছানাটা বিছিয়ে একেবারে সটান শুয়ে পড়লাম। পাশের

গাড়ী থেকে একদল ফিরিঙ্গির বিকট অট্টহাস্য মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছিল। মনে হ'ল তারা সুরা পানে উন্মত্ত। দার্জ্জিলিং থেকে দিল্লী ভ্রমণে যাচ্ছে, তাই তাদের এত

তাজ তোরণ—আগ্রা।

আনন্দ—এত উল্লাস। আমাদের গাড়ীর ভদ্রলোকটীও ফিরিঙ্গি গুলোর ভবিষ্যৎ যে গাঢ় অন্ধকারময় এই নিয়ে গবেষণা কর্ত্তে কর্ত্তে ঘুমিয়ে পড়লেন। আমিও সবেমাত্র নিদ্রাদেবীর আরাধনায় মগ্ন হ'য়েছি, হঠাৎ "গোমা" "গোমা" চিৎকারে তন্দ্রা ভেঙ্গে গেল। উঠে দেখি এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক একটী ঘটী হাতে ক'রে দরজার সাম্‌নে। "আরে মশাই! গোমার জল সোডাওয়াটারকেও হার মানিয়ে দেয়। এ জল আমাকে নিতেই হবে।" তাঁরও গাড়ী থেকে নামা আর গাড়ী দিল ছেড়ে। ভদ্রলোক তো হাঁপাতে হাঁপাতে এসে উঠ্‌লেন। কিন্তু গাড়ীর ভিতর তখন হাসির রোল পড়ে গেছে। তখন তিনি যুক্তি-তর্ক দিয়ে প্রমাণ কর্ত্তে লাগলেন যে গোমার জলে সত্যই নাকি ironএর ভাগ বেশী। বেচারার এ হেন অবস্থা দেখে আমাদের ও তাকে সমর্থন করা ছাড়া উপায় ছিল না। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে বহু চেষ্টা সত্যেও তিনি এই সোডাওয়াটার তুল্য জল নিতে পার্লেন না। সত্যই বেচারীর জন্য এখনও মাঝে মাঝে দুঃখ হয়

তারপর শোবার পালা। নীচের তিনখানা বেঞ্চই আমরা অধিকার ক'রে ছিলাম। তিনি নিরাশ ভাবে একবার আমাদের দিকে চেয়ে সভয়ে বাঙ্কের পানে চাইলেন। কিন্তু এইরূপ স্থূল বপু নিয়ে ওপরে উঠা দুঃসাধ্য মনে ক'রে, গাড়ীর মেজেতেই অগত্যা বিছানা কর্ত্তে লাগলেন। গাড়ী শুদ্ধ সকলের সমবেত দৃষ্টি তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিলে যে এটা আরও বিসদৃশ। তখন তিনি নিরুপায় হ'য়ে অগতির গতি সেই বাঙ্কেই কোন প্রকারে আশ্রয় নিলেন। তারপর কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম মনে নাই। ফেরী ওয়ালাদের অসম্ভব চীৎকারে ঘুম ভেঙ্গে গেল। চেয়ে দেখি গাড়ীখানা খুব বড় একটা ষ্টেশনে দাঁড়িয়ে আছে। জিজ্ঞাসা ক'রে জান্‌লাম "এলাহাবাদ"। কত যাত্রী নেমে গেল, কত এল —তার ইয়ত্তা নাই। কত ছোট ছোট ষ্টেশন অবজ্ঞা ক'রে, বড় ষ্টেশনগুলিতে দাঁড়িয়ে ট্রেন যখন হাতরাশ এসে পৌঁছল—তখন বেলা দেড়টা। গাড়ী থেকে নামতেই সঙ্গীকে দেখে প্রাণ আনন্দে নেচে উঠলো। উদ্বেগ, দুর্ভাবনা, ভ্রমণজনক ক্লান্তি সব যেন দূর হ'য়ে গেল।

কিছুক্ষণ পরে আমরা মথুরার ট্রেনে চেপে বস্‌লাম। তার সঙ্গে অনেকদিন পর দেখা—তাই নানা প্রকারের আলোচনাদি হ'তে লাগ্‌লো। উভয়েরই প্রাণ যে আনন্দে

দেওয়ানী খাস দিল্লী।

ভরপুর হ'য়ে উঠিছিল—তাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। মাঝে মাঝে আমার দৃষ্টি জানালার ভিতর দিয়ে বহুদূর বিস্তৃত মাঠের ওপর গিয়ে পড়ছিল। স্ত্রী পুরুষে একসঙ্গে কোমর বেঁধে কাজ, দু একটা হরিণ ও ময়ূরের ইতস্ততঃ

ভ্রমণ, কোথাও অনুর্ব্বর ক্ষেত্র ধূ ধূ কচ্ছে—আবার কোথাও বা সবুজ বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র। সঙ্গীটী আমার একরকম এদেশ বাসী। তার এ দৃশ্য কেমন লেগেছিল জানি না—আমি কিন্তু মুগ্ধ হ'য়েছিলাম। সম্মুখে চেয়ে দেখি ট্রেণখানা একটা সেতুর ওপর। সঙ্গী বল্লো "যমুনা নদী। ওপারে মথুরা দেখা যাচ্ছে।" বন্যায় তখন যমুনার জল দুকূল ছাপিয়ে উঠেছিল। পরিশ্রান্ত সূর্য্যদেব পশ্চিম গগনে ঢলে পড়েছেন। তাঁর শেষ রক্তিমাভা খরস্রোতা যমুনার জলের ওপর। যমুনা যেন লাল হ'য়ে তাঁর সেই হারান বঁধুয়ার জন্য মাথা খুঁড়ে মরছিল। তাই বোধ হয় তায় এত আস্ফালন—এত উন্মত্ততা। ওপারে অতীত গৌরব মহিমা-মণ্ডিত মথুরা নগরী যমুনার জলে যেন ভাসমনে। ট্রেণ থেকেই দেখ্‌তে পেলাম—হিন্দুর চিরআরাধ্য মথুরার বক্ষপরে একটী প্রকাণ্ড মস্‌জিদ।

সঙ্গীকে জিজ্ঞাসা ক'রে জান্‌লাম হিন্দু বিদ্বেষী ঔরংজেব কৃষ্ণের জন্মস্থান কংসকারাগারকে দলিত মথিত ক'রে এই মস্‌জিদ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

তারপর ট্রেণ এসে মথুরা ষ্টেশনে দাঁড়াল। আমরা একখানা টাঙ্গা ভাড়া ক'রে বৃন্দাবন অভিমুখে রওনা হলাম। সহরের ভিতর দিয়েই যেতে হয়। সহরে ঢুক্‌তেই হার্ডিঞ্জগেট। আমাদের টাঙ্গা চল্‌তে লাগলো। দুইধারে অপরিচ্ছন্ন রাস্তা। লোক চলাচল খুবই বেশী। প্রতি মুহূর্ত্তেই তাদের গাড়ী চাপা পড়ার সম্ভাবনা। মানুষ, গরু, মহিষ সকলেই একসঙ্গে মাল টান্‌ছে। দুইধারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোকানের সারি। ক্রমে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এল। ঘরে ঘরে বিজলী বাতি জ্বলে উঠলো। আমরা আর একটী বিশাল মস্‌জিদ অতিক্রম ক'রে, সহরের বাহিরে এসে পড়লাম। উন্মুক্ত মাঠের ভিতর দিয়ে রাস্তা। তার দুইধারে কুঞ্জ বনের মত ঝোপ। গরু মহিষাদি সন্ধ্যার পরেও নির্ভয়ে সেখানে বিচরণ করে। তাদের গলার ঘণ্টা ঠুং ঠুং ক'রে বাজছিল। দলে দলে গোপিনীরা দুগ্ধ সংগ্রহ করে সহরের দিকে কলরব কর্ত্তে কর্ত্তে ফিরে যাচ্ছিল। সেদিন শুক্ল পক্ষের দ্বিতীয়া। ক্ষীণ চন্দ্রালোকে টাঙ্গাখানি ধীরে ধীরে অগ্রসর হ'তে লাগলো। রাত সাড়ে সাতটার সময় বৃন্দাবনে সঙ্গীর সঙ্গে নৃসিংহ বাবুর বাড়ীতে পৌঁছলাম। পরিশ্রমে শরীরটা বড়ই ক্লান্ত হ'য়েছিল। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর স্নানাহার ক'রে একেবারে ঘুমিয়ে পড়িলাম।

পরদিন প্রত্যূষে ময়ূরের ডাকে ঘুম ভেঙ্গে গেল। তারপর প্রাতকৃত্যাদি শেষ করে বেরিয়ে পড়লাম মন্দির দেখতে। শুন্‌লাম যে বৃন্দাবনে পাঁচ হাজারের ওপরে মন্দির আছে। কাজেই সবগুলো দেখবার মত সময় ও সৌভাগ্য আমার হয় নাই। তবে মোগল সম্রাট ঔরংজেব কর্ত্তৃক বিধ্বস্ত গোবিন্দ জীউর মন্দিরের গাম্ভীর্য্য, শাহজী ও
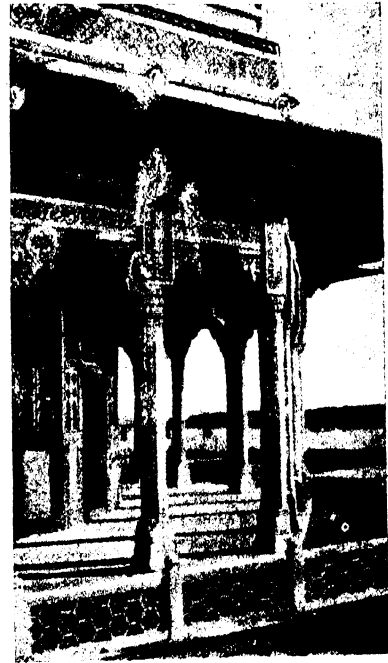
সামনবুরুজ।

শেঠজীর মন্দিরের ঐশ্বর্য্য এবং বিপুলতা গোবিন্দ, গোপীনাথ, মদনমোহনের মন্দিরের পবিত্রতা দেখে, সত্যই মুগ্ধ হ'য়েছিলাম। তারপর দেখলাম লক্ষীবাঈয়ের মন্দির। লক্ষীবাঈ প্রথম জীবনে বেশ্যা ছিলেন। কিন্তু আজ তাঁর মন্দির প্রতিষ্ঠা, বিগ্রহের সেবা নৈপুণ্য এবং একনিষ্ঠ ভক্তি দেখে মনে হয় তিনি তার কৃতকর্ম্মের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্তই করেছেন। এমন ক'রে যে মানুষ প্রস্তর মূর্ত্তিকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসতে পারে—তা আমার ধারণার অতীত ছিল। ঐ বিগ্রহই তাঁর ধ্যান, বিগ্রহই তাঁর জ্ঞান, এর সেবাই আজ

তাঁর জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কার্য্য। এই মন্দিরটী আমার সব চেয়ে ভাল লেগেছিল। যাহোক প্রতি মন্দিরেই শিল্প-কারুকার্য্য এবং সেবার ব্যবস্থা চমৎকার। এখানকার পাণ্ডাদের পূর্ব্বে খুবই দুর্নাম শোনা যেত কিন্তু আধুনিক সভ্যতার আবহাওয়ায় তারাও যেন সভ্য হ'তে আরম্ভ ক'রেছে। তাই আজকাল আর তাদের উৎপাত সেরকম নাই। তীর্থ হিসাবে বৃন্দাবন অন্য কোন তীর্থের চেয়ে হীন নয়। আমাদের প্রায় চারদিনই মন্দির দেখ্‌তে কেটে গেল। তারপর ঘাট ও বন দেখতে আরম্ভ কর্লাম। কেশী ঘাট, কালীয় দমনঘাট, নিধুবন ও নিকুঞ্জবন—আরও অনেক আছে। কিন্তু সবগুলির নাম মনে রাখা

জাহাঙ্গীর মহল।

সম্ভবপর নয়। তবে স্থানগুলি খুবই সুন্দর এবং চমৎকার। প্রাণে বেশ শান্তি পাওয়া যায়।

৩রা অক্টোবর ঠিক হ'লে যে আমরা বলদেউজীতে যাব। লোকে এখন ইহাকে দেউজী বলে। বৃন্দাবন থেকে প্রায় চৌদ্দ মাইল দূরে অবস্থিত একটী দুর্গমতীর্থ। বাঙ্গালী যাত্রীরা সাধারণতঃ ওখানে যায় না। ৪ঠা অক্টোবর খুব ভোরে আমরা একখানা টাঙ্গায় ক'রে দেউজী অভিমুখে রওনা হলাম। দেউজীর মন্দির দ্বার আবার বেলা বারটার সময় বন্ধ হ'য়ে যায়। কাজেই টঙ্গা চালকের সঙ্গে কন্‌ট্রাক্ট হ'ল যে আমাদের বারটার পূর্ব্বে পৌছে দিতে না পার্‌লে, সে ভাড়া পাবে না। সেও তার চুক্তি রক্ষার্থে প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগলো। অশ্বটী কশাঘাতের পর কশাঘাতে তার প্রভুর অভিপ্রায় বুঝ্‌তে পেরেই বোধ হয় পূর্ণোদ্যমে ছুটতে আরম্ভ করলো। তীর্থ থেকে বহু যাত্রী বোঝাই গাড়ী ফেরৎ আসছিল। চালকটী পর পর তাদের প্রত্যেককেই জিজ্ঞাসা কর্ত্তে লাগলো সে নির্দ্দিষ্ট সময়মত মন্দিরে প্রবেশ কর্ত্তে পার্ব্বে কিনা? কারও কাছে আশা, কেউ বা তাকে নিরাশ ক'রে পাশ কাটিয়ে বিদ্যুৎবেগে ছুটে চলে গেল। কখনও বা ভয় উদ্বেগ ও নিরাশায় বেচারীর মুখখানা শুকিয়ে এতটুকু হচ্ছিল—আবার কখনও আনন্দে আশায় উৎফুল্ল হ'য়ে সে প্রাণপণে গাড়ী চালাচ্ছিল। উদ্বেগ যে আমাদেরও না হ'য়েছিল তা নয়! আর চৌদ্দ মাইল রাস্তা এভাবে অতিক্রম করাও বড় বিরক্তিকর। তবে মাঝে মাঝে অসংখ্য ময়ূর, হরিণ ও উষ্ট্রবাহী গাড়ী দেখতে পেয়ে যথেষ্ট আনন্দও পাচ্ছিলাম। নির্দ্দিষ্ট সময়ের পনর মিনিট পূর্ব্বেই আমরা সেখানে পৌছলাম।

চারিদিক হ'তে পাণ্ডারা তাদের বড় বড় খাতাপত্র নিয়ে রবাহূতের মত এসে হাজির হ'ল। কিন্তু আমাদের বাপ দাদা চৌদ্দ পুরুষ কারও নাম তাতে দেখা গেল না। অবশেষে দু আনা দিয়ে একজনকে ঠিক ক'রে তারই সহায়তায় ঠাকুরের পূজা ও ভোগ দেখে, বেলা দেড় টার সময় ব্রহ্মাণ্ড ঘাট দেখতে পেলাম। ইহা যমুনার একটী অতি প্রাচীন বড় ঘাট। এখানে ৪।৫টী মন্দির আছে। দু একজন সাধু সন্ন্যাসীও এখানে বাস ক'রেন। মন্দিরের দেয়ালে কয়েকখানি প্রাচীন চিত্র ঝুলান আছে। স্থানটী বড়ই মনোরম এবং শান্তিপূর্ণ। প্রবাদ আছে যে শ্রীকৃষ্ণ নাকি বাল্যকালে একদিন এই স্থানে মাটী খেয়েছিলেন। যশোদা তাঁর মুখে মাটী দেখ্‌তে গিয়ে একেবারে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড দেখে স্তম্ভিতা এবং ভীতা হ'য়েছিলেন। সেই থেকে এ স্থানের নাম হ'য়েছে ব্রহ্মাণ্ড ঘাট। তারপর প্রায় আধ ঘণ্টা পরে ওখান থেকে আমরা পুরাতন গোকুলে

এলাম। এখানে নন্দরাজার প্রাসাদ ছিল। ধ্বংসাবশেষ দেখে এখনও সহজেই অনুমান করা যায় যে এক কালে এটা খুবই বিশাল এবং সুন্দর ছিল। বড় একটী মাটীর ঢিলার ওপরে এই প্রাসাদটী অবস্থিত। ইহার ভিতরে যশোদা গোপালের জন্য ছানা-ননী প্রস্তুত করতেন। প্রায় ৪০।৪৫টা থাম আছে কোনটার সঙ্গে কোনটারই মিল নাই। প্রত্যেকটীতেই ভিন্ন ভিন্ন কারুকার্য্য। প্রবাদ যে বিশ্বকর্ম্মা স্বয়ং নাকি এই থামগুলি গড়ে মর্ত্তে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এ স্থানেও বহু বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছে। এখানে কয়েকটী মন্দিরে স্ত্রীলোক সেবাইত আছে। এখান থেকে গোকুল সহর খুবই নিকটে। কিছুক্ষণ পর আমরা সহরে এসে জলযোগ কর্লাম। সহরটী খুবই পুরাতন এবং অপরিচ্ছন্ন। অধিবাসীগণ ততোধিক অপরিচ্ছন্ন। বাড়ীগুলো খুবই পুরাতন। খাদ্যদ্রব্যের ভিতরে ছানা, মাখন রাবড়ী প্রভৃতি দুগ্ধের জিনিষ খুবই সুলভ। এখানে মুসলমানের সংখ্যা কম নহে। এখান থেকে নতুন গোকুল দেখ্‌তে যাত্রা কর্লাম।

বেলা তখন প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছিল। সারাদিনের পথশ্রান্তিতে শ্রান্ত অশ্বটী ধীর-মন্থর গতিতে চলতে লাগলো! বহুদূর থেকে আসছিল রাখাল বালকের করুণ বংশীধ্বনি। প্রায় পাঁচটার সময় আমরা নতুন গোকুলে পৌঁছলাম। এ সহরটী নেহাৎ মন্দ নয়। তবে স্বভাবদোষ যাবে কোথায়? লোকের রাস্তায় ব'সে মল মূত্র ত্যাগ করা একেবারে যেন মজ্জাগত হয়ে গেছে। এখানে গুজরাটী মহিলাদেরই প্রাদুর্ভাব খুব বেশী। এখানেও অনেকগুলি মন্দির আছে। ইহার মধ্যে গোকুল নাথ জীউর মন্দিরই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিগ্রহটীর বাৎসল্য ভাবে সেবা হয়। শুনলাম এখানে মুসলমানদিগকে বাস কর্ত্তে দেওয়া হয় না। এই সহরে অসংখ্য বানর দেখ্‌তে পাওয়া যায়।

ছটার সময় বৃন্দাবনের দিকে রওনা হলাম। মথুরার ভিতর দিয়েই ফিরতে হয়। ঠিক সন্ধ্যার সময় আমরা মথুরায় এসে পৌছলাম। মন্দিরে মন্দিরে তখন সন্ধ্যা আরতি হচ্ছিল। অসংখ্য দীপমালায় যমুনার কালজলে যেন দেওয়ালী সুরু হয়েছে। আমরা যমুনার আরতি দেখবো ব'লে তাড়াতাড়ি বিশ্রাম ঘাটে এসে উপস্থিত হলাম। শ্রীকৃষ্ণ নাকি কংসবধ ক'রে এই স্থানে এসে বিশ্রাম ক'রেছিলেন। এই জন্য ঘাটকে বিশ্রামঘাট বলা হয়। যমুনার মাঝখান থেকেই আরতি ভাল দেখায়। কাজেই আমরা একখানি নৌকায় ক'রে আরতি দেখ্‌লাম। এই ঘাটে অসংখ্য কচ্ছপ দেখ্‌তে পাওয়া গেল। আরতির সময় খুবই লোক সমাগম হয় এবং ভজন
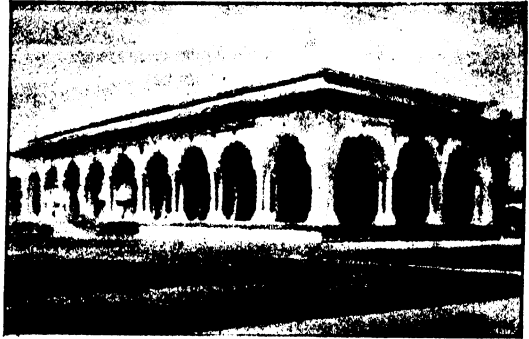
দেওয়ানী আম আগ্রা।

সঙ্গীতগুলি বড়ই শ্রুতি মধুর। আরতি দেখা শেষ করে আমরা দ্বারকনাথ জীউর মন্দির দেখতে গেলাম। এ মন্দিরটি খোলার কোনই স্থিরতা নাই। ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করার পর বিগ্রহাদি দর্শন ক'রে রাত্রি প্রায় সাড়ে নটার সময় বৃন্দাবনে ফিরে এলাম। সমস্ত দিন পথশ্রমে শরীর খুবই ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছিল। তাড়াতাড়ি কোন রকমে খাওয়া-দাওয়া শেষ ক'রে বিছানায় এলিয়ে পড়লাম। পরদিন ঘুম ভেঙ্গেছিল প্রায় বেলা আটটায়। পূর্ব্বেই ঠিক ছিল এখান হ'তে আগ্রা যাব।

তাই ৬ই অক্টোবর বেলা চারটার সময় আগ্রা অভিমুখে যাত্রা করা গেল। মথুরা ষ্টেশন থেকে আগ্রা যেতে ৪.৫ ঘণ্টা সময় লাগে। রাত্রি প্রায় সাড়ে আটটায় আমরা আগ্রা ক্যান্টনমেন্ট ষ্টেশনে পৌছলাম। ষ্টেশনের পিছনেই একটী হোটেলে থাকার বন্দোবস্ত হ'ল।

পরদিন ৭ই অক্টোবর পাশের ঘরের গোলমাল ও অট্টহাসিতে খুব ভোরেই ঘুম ভেঙ্গে গেল। ব্যাপার কি

দেখতে গিয়ে শুনলাম যে এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক এসে পাশের ঘরের ভদ্রলোকদের জিজ্ঞাসা ক'রেন, এখানে জ্বালানী কাঠ পাওয়া যায় কিনা? স্বপাক খাবেন কিনা জিজ্ঞাসা করায় তিনি নাকি উত্তর দেন, কেন মশাই? আমি তো এখনও বিপাকে পড়ি নাই যে স্বপাক খাব? গৃহিণীতো আমার সঙ্গে রয়েছেন।' ভদ্রলোকদের মধ্যে অধিকাংশই কেরাণী। আগ্রা ভ্রমণ শেষ ক'রে সেই দিনই কোথায় চলে যাবেন। তাই বিছানা-পত্র বাঁধতে বাঁধতে এই নিয়ে অলোচনা চলিল কে কার স্ত্রীকে কি ভাবে ফাঁকি দিয়া ভ্রমণে এসেছেন এবং কার বুদ্ধি কত প্রখর। এর ভিতরে আবার ঐ ভদ্রলোকের প্রশ্নোত্তর। আর যায় কোথায়?—অট্টহাসি। কিন্তু উভয়ের সংমিশ্রণে যে হোটেলটী তোলপাড় হয়ে উঠেছিল—তা তাঁদের খেয়ালই ছিল না। আমরা নতুন যাত্রী। তাঁদের সঙ্গে পরামর্শ করাই সমীচিন বোধ হ'ল। কোন্‌টা আগে দেখলে সুবিধা

দেওয়ানী খাস—অদূরে তাজ।

হয় জিজ্ঞাসা করায় এক ভদ্রলোক বলে উঠলেন—মশাই, আগে ফতে করে আসুন।'' তাঁর পরামর্শ মত ফতেপুরসিক্রীতেই আগে যাওয়া স্থির হ'ল। তাড়াতাড়ি আহারাদি শেষ করে আগ্রা থেকে ট্রেনে চেপে বেলা আটটা দশ মিনিটে ফতেপুর পৌছলাম।

ফতেপুরশিক্রী আকবর নির্ম্মাণ করেছিলেন। কিছু দিন তিনি এখানে বাসও করেন। ফতেপুর শিক্রীর স্থাপত্য শিল্প এবং কারুকার্য্য—খুবই উচ্চ অঙ্গের। আমরা ষ্টেশন থেকে কিছুদূর অগ্রসর হ'য়েই সামনে এক বিশাল গেট দেখতে পেলাম। ট্রেন থেকে নামবার পরই একজন গাইড জুটেছিল। সে তার বিদ্যা জাহির কর্ত্তে সুরু করল। তার কোনটা ঠিক—আবার কোনটা হয়তো তারই মস্তিষ্ক প্রসূত। মোগলসম্রাজ্যের আগাগোড়া ইতিহাস অনর্গল ব'কে যাচ্ছিল। আরও কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর গেটের নিম্নদেশে গিয়ে উপস্থিত হলাম। সেই অভ্রভেদী তোরণ দ্বার দেখে বিস্ময়ে নির্ব্বাক হয়ে গেলাম। কি অপূর্ব্ব তার কারুকার্য্য! চোখে না দেখলে অনুমান করা একেবারেই দুঃসাধ্য। এইটাই ভারতের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ গেট। ইহাকে বুলন্ত দরওজা বা Gate of victory বলে তোরণদ্বার পার হ'য়ে আমরা সুপ্রশস্ত চত্বরে এলাম। চত্বরটার ঠিক মাঝখানে সেক্ সেলিম চেস্তির ছোট একটি শ্বেত পাথরের সমাধি মন্দির--নির্জ্জন, সুন্দর এবং পবিত্র এই স্থানটী। ধুপগুগগুলের সুগন্ধে সর্ব্বদাই আমোদিত। ভিতরের শিল্প কারুকার্য্য দর্শকের চিত্তাকর্ষক। চারিদিকে সুউচ্চ প্রাচীর দ্বারা এই চত্বরটী বেষ্টিত। হিন্দু-পারস্য স্থাপত্য রীতিতে আকবর ইহা নির্ম্মাণ করেছিলেন। এখান হ'তে গাইডের নির্দ্দেশ অনুযায়ী দেওয়ান-ই-খাস্ দেখ্‌তে গেলাম। ইহা যেমন অদ্ভুত তেমনই কৌতূহলোদ্দীপক। বাহির হ'তে দেখ্‌লে দোতলা বলে মনে হয়—কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করলে্‌ই সে ভ্রম কেটে যায়। এখানে আকবর সপার্ষদ জরুরী দরবারে বস্‌তেন। তারপর আমরা একেএকে বীরবল প্রসাদ, হাওয়া মহল, টাকশাল, হাতীশালা, ঘোড়া শালা, হারিন্‌মিনার, পাঁচমহল, আবুলফজলের গৃহ, তুর্কী সুলতানের বাসস্থান, বেগমদের স্নানাগার, নহবৎখানা, দেওয়ান-ই-আম ইত্যাদি দেখে, আকবরের প্রথমা হিন্দু মহিষী যোধাবাঈয়ের প্রাসাদ দেখ্‌লাম। ইহার গঠন নৈপুণ্য ও কারুকার্য্য মন্দ নয়। আকবরের আদেশ অনুযায়ী যোধাবাঈ এখানে হিন্দুধর্ম্ম মতে পূজা-পার্ব্বণ কর্ত্তেন। হিন্দু-বিদ্বেষী, ধূর্ত্ত ঔরংজেবের দৃষ্টিকে ফাঁকী দিয়ে আজও একটী প্রস্তর খোদিত শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তি এই প্রাসাদের এককোণে দেয়ালগাত্রে বিরাজমান। গুণী আকবরের ফতেপুর শিক্রী এক অদ্ভুত সৃষ্টি—আর এই স্থানেই তার শিল্পানুরাগের, প্রখর বুদ্ধিমত্তার এবং রাজনৈতিকতার জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ

পাওয়া যায়। এখানে দেখ্‌বার আরও অনেক কিছু আছে ৩.৪ ঘণ্টায় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখা অসম্ভব। বেলা এগারটা বেজে গেল। খালি পেটে আর কতক্ষণ বেড়ান যায়? যতই বেলা বেশী হ'তে লাগল ক্ষুধা তৃষ্ণাও প্রবল হতে প্রবলতর হয়ে উঠলো। লোকচলাচল ক্রমশঃই কমে যাচ্ছিল। দুর্দ্দান্ত অপরাজেয় মোগলের সাধের সুরম্য হর্ম্ম্য শ্রেণী, সুউচ্চ তোরণদ্বার, সুবিশাল চত্বর ঘুমন্ত পুরীর ন্যায় খাঁ খাঁ কচ্ছিল। মোগল সম্রাটদের ভিটাতে অবিশ্রান্ত ঘুঘুর ডাক শোনা যাচ্ছিল। হায়রে নিয়তি!

মোতি মসজিদ্‌।

এই সব দেখে আমরা সদর দরজা দিয়ে বাহির হলাম। সাম্‌নেই বাজার। কিছু ফল ও মিষ্টান্ন কিনে নির্জ্জন একটী ইঁদারার পার্শ্বে বসে খেতে আরম্ভ করলাম। আহারাদির পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম ক'রে বেরিয়ে পড়লাম্‌—আগ্রাদুর্গ দেখতে। লালপ্রস্তর নির্ম্মিত কতকটা অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি, যমুনার পশ্চিম পারে, ঠিক ষ্টেশনের সম্মুখেই এই দুর্গটী অবস্থিত। আকবরের রাজত্ব-কালেই ইহা নির্ম্মিত হয়। পর পর দুইটী সুদৃঢ় প্রস্তর নির্ম্মিত প্রাচীর দ্বারা এই দুর্গটী বেষ্টিত। ভিতরের প্রাচীর ৭০ফিট উচ্চ। চারিদিকে একটী পরিখা দ্বারা সম্পূর্ণ দুর্গটী ঘোরা! পরিখাটী প্রস্থে ৩০ফিট এবং ৩৫ফীট গভীর। চারিধারে চারটা গেট আছে। অমরসিংহ গেট দিয়েই সর্ব্বসাধারণকে যাতায়াত কর্ত্তে দেওয়া হয়। এখন এই দুর্গের এক অংশে একটী বৃটীশ সেনানিবাস আছে। আমরা সর্ব্বপ্রথমেই জগদ্বিখ্যাত মতিমস্‌জিদ দেখলাম—শ্বেত পাথরের ওপরে সাধারণ কারুকার্য্য খচিত হ'লেও—ইহা তুলনাহীন। সৌন্দর্য্যপ্রিয় সাজাহানের মতিমস্‌জিদ্‌ আর একটী অপূর্ব্ব কীর্ত্তি। মস্‌জিদটীতে স্ত্রীলোকদিগের উপাসনার জন্য স্বতন্ত্র জায়গা ছিল। একদিন যেদিন সুদিন ছিল, রাজ্যের শ্রেষ্ঠ আমীর ওমরাহগণ এই মস্‌জিদে নমাজ পড়তে পারলে নিজেদের ধন্য জ্ঞান করতো—আর আজ সেখানে এক অশীতিপর বৃদ্ধ মোল্লা ব্যতীত নমাজ দিবার ভক্ত জোটেনা।

তার পর দেওয়ানী ই-খাস ও দেওয়ান-ই-আম দেখ্‌লাম। ফতেপুরের চেয়ে এখানে ইহা অনেক উচ্চস্তরের। গাইড খাসমহল ও আঙ্গুরীবাগ দেখান। এখন আঙ্গুরবাগানের কোন চিহ্নই নাই। তারপর নগিনা মস্‌জিদ, মীনাবাজার সীসমহল, জাহাঙ্গীরের মহল, সাজাহান মহল এবং যোধা-বাঈয়ের মহল দেখলাম। এখানেও যোধাবাঈ মহলের ভাস্কর্য্য ধর্ম্মান্ধ ঔরংজেব সমূলে ধ্বংস করেছেন। তারপর সামন বুরুজ। ইহারই একটী নিভৃত কক্ষে বৃদ্ধ সম্রাট সাজাহান বন্দী অবস্থায় ধীরে ধীরে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। গাইডের অনর্গল বক্তৃতায় আমাদেরও হৃদয় দ্রবীভূত হ'ল। আমরা ভারাক্রান্ত মন নিয়ে ফিরবো এমন সময়ে গাইড বললো—নওরোজের বাজার দেখ্‌তে যাবেন না?

সঙ্গী বলে উঠলে, নিশ্চই যাব আকবরের সাধের নওরোজের বাজার—আর এখানেই সাজাহান ও মমতাজে প্রথম দেখা। এটা দেখ্‌তেই হবে।" সন্ধ্যার আর বেশী দেরী ছিলনা। ব্যথিত চিত্তে নওরোজের বাজার দেখে আমরা দুর্গ হ'তে বাহির হ'য়ে জুম্মামস্‌জিদ দেখ্‌তে গেলাম। সাজাহান দুহিতা জাহানারা এই মস্‌জিদটি নির্ম্মাণ করেন।

তখন নমাজের সময় ছিল। আমরা তাই ভিতরে প্রবেশ কর্ত্তে পার্লে'ম না। বাহির হ'তে দেখা শেষ ক'রেই ক্লান্ত শ্রান্ত হ'য়ে হোটেলে ফিরে এলাম। পরদিন বাল্যের স্বপ্ন, সপ্তাশ্চর্য্যের একটি, সম্রাট সাজাহানের অপূর্ব্ব কীর্ত্তি তাজ দেখবার পালা।

অতি প্রত্যূষেই ঘুম ভেঙ্গে গেল। তাড়াতাড়ি একখানা টাঙ্গায় করে তাজমহল দেখ্‌তে দুর্গ অতিক্রম করে ইডেন্‌-গার্ডেন্‌ সদৃশ একটী উদ্যানের ভিতর দিয়ে টাঙ্গাখানি একেবারে তাজমহলের গেটের নিকটে এসে দাঁড়াল। গেট পার হ'য়ে ভিতরে প্রবেশ করেই সম্মুখে দেখলাম—অদ্ভুত, অপূর্ব্ব, অতুলনীয়, অবর্ণনীয় শারদ প্রভাতের শিশিরসিক্ত তাজ তরুণ তপনের কিরণছটায় ঝলমল করছে। যতই অগ্রসর হ'তে লাগলেম, ততই যেন বিস্ময় স্তম্ভিত হ'য়ে গেলাম। ভিতরে প্রবেশ কর্ত্তেই কর্ণকুহরে প্রবেশ কর্লে বৃদ্ধ মোল্লার "আল্লাহোআকবর" ধ্বনি। হাহাকার কর্ত্তে কর্ত্তে যেন তার প্রতিধ্বনি মিলিয়ে গেল দিগন্তের কোলে। পাশাপাশি সাজাহান ও মমতাজের সমাধি বিচিত্র বর্ণের পুষ্পমালায় বিভূষিতা। চারিধারে ধূপধুনার গন্ধে আমোদিত।

আমরা বাহিরে এসে তাজকে প্রদক্ষিণ ক'রে যমুনার অপূর্ব্ব শোভা নিরীক্ষণ কর্লাম। অনেকক্ষণ আমাদের মধ্যে কোন কথা বার্ত্তা হয় নাই। উভয়েই যন্ত্রচালিতের মত কেবল দেখেই যাচ্ছিলাম। কিন্তু সঙ্গীর আমার বড়ই সখ হ'ল তাজের টাওয়ারের ওপরে উঠবার। সুতরাং পিছনের একটা টাওয়ারের ওপর আমরা উঠলাম। তারপর আমরা এখান হ'তে ইতমাদ্‌ উদ্দৌল্লার সমাধি মন্দির দেখে সেকেন্দ্রা দেখ্‌তে গেলাম। মোগল সম্রাটগণ ভারতে হিন্দু-পারস্য স্থাপত্য রীতি প্রচলন করেছিলেন। আকবর ও জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে ঐ প্রকার অনেক সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা নির্ম্মিত হয়েছিল। জাহাঙ্গীরের সময়ে নির্ম্মিত নূরজাহানের পিতা ইতমাদ্‌ উদ্দৌল্লার এই সমাধি মন্দির শিল্প হিসাবে চমৎকার কিন্তু তাজই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থাপত্য নিদর্শন। আমরা যখন এখান থেকে সেকেন্দ্রার গেটের নিকটে এসে পৌঁছলাম—বেলা তখন দশটা। গেটের ওপরে চারদিকে চারটা তুষার ধবল মিনারেট আছে। আগ্রা হতে সেকেন্দ্রা ছয় মাইল দূরে। আকবর নিজের এই সমাধি সৌধ নিজেই নির্ম্মাণ করান। তারপরে জাহাঙ্গীর ইহার বিশেষ উন্নতি করিয়েছিলেন। প্রকাণ্ড প্রান্তর, দেয়াল দিয়ে ঘেরা, চারিদিকে চারিটা ফটক—একটী আসল তিনটী নকল।
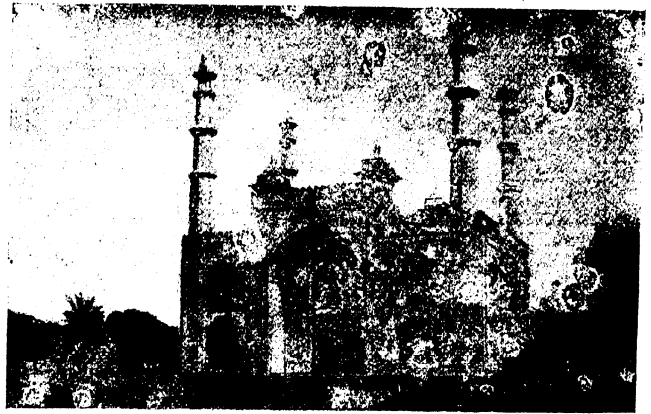
সিকান্দ্রা।

প্রায় মাঝখানে বিরাট সমাধি সৌধ। প্রধান ফটকটার গায় আরবি ও পার্শিতে আকবরের কীর্ত্তি গাথা লেখা আছে। ফটক হতে সমাধিমন্দির পর্য্যন্ত ভাস্কর্য্যের চরম নিদর্শন পাওয়া যায়। আসল সমাধি স্থানে আলো নিয়ে যেতে হয়। এই সমাধি আচ্ছাদনের জন্য বর্দ্ধমানের মহারাজা একখানি বহুমূল্য কারুকার্য্য খচিত কার্পেট দিয়েছেন। লর্ড কার্জ্জন একটী কক্ষের হাতখানেক স্থান সংস্কার কর্ত্তে গিয়ে অসম্ভব খরচা দেখে পিছিয়ে পড়েন। আগ্রাদুর্গ তাজমহল, ইতমাদ্‌ উদ্দৌল্লা ও সেকেন্দ্রার বহু মূল্যবান প্রস্তর সকল অপহৃত হয়েছে। দুর্দ্দান্ত জাঠ এবং রোহিলাগণ প্রতিহিংসা চরিতার্থ কর্ত্তে মোগলের অমূল্য কীর্ত্তি বিনাশ করেছে। যে মোগলের বীরপদভরে একদিন ধরণী কম্পিত হ'য়েছিল—তাদেরই সাধের অতি গৌরবের পবিত্র মস্‌জিদ এবং মহার্ঘ কারুকার্য্য

প্রাসাদের কক্ষগুলি বিজিত সৈন্যগণ রন্ধনাগারে পরিণত ক'রেছিল। তারপর নাদীরশা যা ক'রেছেন, সত সুবিদিত।

সেকেন্দ্রা দেখতে দেখ্‌তেই প্রায় বারটা বেজে গেল। আমরা বাজারের ভিতর দিয়ে হোটেলে ফিরে এলাম। আহারাদির পরই জয়পুর যাব ঠিক হ'য়ে গেল। প্রায় সাড়ে চারটার সময় আগ্রা ভ্রমণ শেষ ক'রে পাঁচটা-পনেরর ট্রেনে জয়পুর অভিমুখে রওনা হলাম।

গাড়ীতে ভয়ঙ্কর ভীড় ছিল। সাম্‌নের বেঞ্চে ঐ দেশীয় একজন সাধুবাবাজী আধ্যাত্মিক আলোচনা করছিলেন। তিনি নাকি রেল কোম্পানীকে ফাঁকী দিয়ে বহু তীর্থ ঘুরে যথেষ্ট পূণ্য সঞ্চয় করেছেন। যাহোক আমাদের বসে বসে ঝিমুতে ঝিমুতেই রাতটা প্রায় কেটে গেল। শেষরাত্রে ট্রেন এসে জয়পুর ষ্টেশনে থাম্‌লে সঙ্গীর গায়ের চাদরখানা খুঁজে পাওয়া গেল না। একমাত্র বাবাজীই তখন আমাদের কামরা থেকে নেমে গেছেন। গাড়ী থেকে নেমে কুলি সর্দ্দারকে সঙ্গে করে একটা ধর্ম্মশালায় গিয়ে উঠলাম। কিন্তু সেখানে সিট পাওয়া গেল না। অগত্যা টাঙ্গা ভাড়া ক'রে এডওয়ার্ড মেমোরিয়াল হোটেলের দিকে—রওনা হলাম। তখন রাত প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছিল। বেশ শীত অনুভব হওয়ায় ফ্যানালের জামা গায় দিলাম। চিত্তরঞ্জন এভিনিউ সদৃশ রাজপথের উপর দিয়ে টাঙ্গাখানা বিদ্যুৎবেগে চল্‌তে লাগলো

কাষ্টম্‌স্‌ হাউসে মাল-পত্র দেখিয়ে, আমার ক্যামেরার জন্য দু টাকা জমা দিয়ে আমরা যখন হোটেলে পৌছলাম, তখন ফরসা হ'য়ে গেছে। হোটেলটী বেশ ভাল। তাড়াতাড়ি স্নান ও কিছু জলযোগ ক'রে বাহির হলাম—সহর দেখ্‌তে। জয়পুরের রাস্তাগুলির বিশেষত্ব আছে। এক একটা রাস্তা যেন এক একটা সরল রেখা। একপ্রান্তে দাঁড়ালে, অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত দেখা যায় এবং প্রত্যেকটি রাস্তাই বেশ সুপ্রশস্ত। রাস্তাগুলির ধারে মাঝে মাঝে ছোট ছোট শিব মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে। সহরের অধিকাংশ অট্টালিকাগুলিই লাল পাথরের দ্বারা নির্ম্মিত এবং দেখতে প্রায় এক রকমেরই। গোবিন্দ মন্দির, অম্বর প্রাসাদ, যাদুঘর, চিড়িয়াখানা, হাওয়া মহল এবং চন্দ্র মহলই উল্লেখ যোগ্য। গোবিন্দ মন্দিরটী চন্দ্র মহলের পিছনে অবস্থিত। এই চন্দ্র মহলেই বর্ত্তমান মহারাজা বাস করেন। প্রবাদ আছে ঔরংজের যখন বৃন্দাবন আক্রমণ ক'রেন, গোবিন্দজীর এই বিগ্রহটী তখন এখানে আনা হয়। এই মন্দিরের পুরোহিতগণ বাঙ্গালী। অম্বর প্রাসাদ জয়পুর হতে অনেক দূরে। মহারাজা মানসিংহ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। সুউচ্চ পর্ব্বতের উপর এই বিশাল প্রাসাদ অবস্থিত। ইহার ভাস্কর্য্য এবং গঠননৈপুণ্য মোগলদের চেয়ে কোন অংশেই হীন নয়। ভিতরে একটী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। এই মূর্ত্তিটী নাকি রাজা মানসিংহ কর্ত্তৃক যশোহর হ'তে আনীত হয়েছিল। এখানে বাঙ্গালী যাত্রীদের খুবই সমাগম হয়। চিড়িয়াখানার উদ্যানের মধ্যস্থলে জয়পুরের মিউজিয়াম অবস্থিত। মিউজিয়ামটী খুবই সুন্দর। চিড়িয়াখানা তেমন উল্লেখ-যোগ্য নয়। এই সব দেখা শেষ কর্ত্তেই দুটা বেজে গেল। হোটেলে ফিরে খাওয়া দাওয়া ক'রে একটু ঘুমিয়ে—বিকালে বাজার দেখ্‌তে গেলাম। এখানে শ্বেতপাথরের এবং মিনার কাজ করা পিতলের দ্রব্যাদি বেশ ভাল পাওয়া যায়। বাজার থেকে কিছুদূর অগ্রসর হ'তেই বহু দূরে পাহাড়ের ওপরে একটা দুর্গ দেখে জিজ্ঞাসা ক'রে জান্‌লাম—ভীলদের দুর্গ। ওখানে নাকি কাহাকেও প্রবেশ কর্ত্তে দেওয়া হয় না। তারাও কখন বাহিরে আসে না। শোনা যায় যে ঐ দুর্গের ভিতরে প্রচুর ধনরত্ন আছে। কথাটা কতদূর সত্য ঠিক জানি না। আগের দিনের রাত্রি জাগরণ ও সারাদিনের পরিশ্রমে আমাদের শরীর ও মন ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছিল। কাজেই সন্ধ্যা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই হোটেলে ফিরে প্রচুর পরিমাণে আহার করে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

পরদিন ৯ই অক্টোবর ভোর ছটার সময় আমরা গলতা পাহাড় দেখতে গেলাম। কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পরই সম্মুখে দেখলাম এক উন্মত্ত অশ্ব তীরবেগে ছুটে আসছে। তার গলার সঙ্গে বেশ বড় একখণ্ড কাঠ লম্বমান রজ্জু দিয়ে বাঁধা ছিল। রাস্তার জনতা সমস্বরে চীৎকার ক'রে বলছে—"হটযাও—হটযাও।" অশ্বটী বিদ্যুৎবেগে আমাদের টাঙ্গাখানাকে অতিক্রম ক'রে চলে গেল। আমা-

দের দুখের হাসি মিলাতে না মিলাতেই ঘোড়ার গলার কাঠ আর আমাদের গাড়ীর চাকায় হ'ল সংঘর্ষ। সঙ্গে সঙ্গে আমরা পপাত ধরণীতলে। ধূলিধূসরিত অঙ্গে উঠে দাঁড়াতেই সামনে দেখি সঙ্গীটী আমার সহাস্য বদনে দণ্ডায়মান। ভগ্নচক্র টাঙ্গাখানার চারিদিকে লোকে লোকারণ্য আর টাঙ্গা-চালক ও অশ্ব-মালিকে হাতাহাতির উপক্রম। যা হ্বার তা হ'য়ে গেল। ভগবানের চরণে অজস্র প্রণাম জানিয়ে অন্য একখানি টাঙ্গায় পুনরায় গল্‌তার দিকে রওনা হওয়া গেল।

প্রায় দশটায় গলতা থেকে ফিরে এলাম। সেদিন আর কোন খানে যাওয়া হ'লনা। হোটেলওয়ালার কাছে শুনলাম যে বিকালে সৈন্যদের প্যারেড হ'বে। চারটার সময় আমরা প্যারেড দেখ্‌তে গেলাম। বিকালে গিয়ে সন্ধ্যা হ'ল তবুও প্যারেডের খোঁজ নাই। বহুক্ষণ এধার ওধার ঘুরে হয়রান হ'য়ে পরলাম। অনেক লোক সমাগমও হয়েছিল। প্রায় সাতটার সময় হঠাৎ প্যারেড আরম্ভ হল ময়দান ও, পর্ব্বতোপরি জয়পুর রাজ্যের দুর্গ বিদ্যুৎ আলোকে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠলো। প্রতিবৎসরই দশমীর দিনে নাকি এখানে প্যারেড হয়। আধঘণ্টা পর হোটেলে ফিরে এলাম।

বাড়ীর কথা আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধবদের কথা আজ এই বিজয়ার দিনে বিশেষ ক'রে মনে হ'তে লাগলো, শুষ্ক মরুময় প্রান্তর ছেড়ে প্রাণটা যেন ছুটে চলে গেল—বহুদূরে সেই চিরপরিচিত বাংলার পানে। এতক্ষণ হয়তো বাংলার প্রতি ঘরে ঘরে মায়ের শূন্য মণ্ডব খাঁখাঁ কচ্ছে। মনটা যেন কেমন হ'য়ে গেল। সে রাত্রে আমাদের মধ্যে বিশেষ কোন কথাবর্ত্তা হয় নাই।

পরদিন স্থির হ'ল যে আমরা আজমীর হ'য়ে পুষ্কর যাব। সেইদিন বেলা দশটার সময়ে রওনা হ'য়ে প্রায় তিনটার সময় আজমীরে পৌছলাম। তখনই একখানি টাঙ্গা ভাড়া করে সহরটা ঘুরে নিলাম। সহরটা মন্দ নয়। মুসলমান অধীবাসীদের সংখ্যাই বেশী। ঘণ্টা দুই পর মোটরে পুষ্করের দিকে যাত্রা করলাম। আজমীর ও পুষ্করের মাঝখানে বিশাল প্রাচীর সদৃশ আরাবল্লী পর্ব্বত শ্রেণীর উপর দিয়ে আমাদের মোটর খানি দ্রুতবেগে চল্‌তে লাগলো কখনও উঁচু, কখনও নীচু কখনও সমতল। বিস্মিত আতঙ্কে আমরা চেয়ে ছিলাম। একটু ভয় যে না হ'য়েছিল তা নয়। স্থান চ্যুত হ'লে একেবারে গভীর গহ্বরে নিমগ্ন হ'তে হবে। তবে পড়ে যাবার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। রাস্তাটার নির্ম্মাণ কৌশল সত্যই প্রশংসার। এই ভাবে ভয়ে ও বিস্ময়ে, পর্ব্বতশ্রেণীর অপূর্ব্ব শোভা দেখ্‌তে দেখ্‌তে পুষ্করে পৌছলাম। সূর্য্য দেব তখন পশ্চিম গগনে ঢলে পড়েছেন। সম্মুখেই প্রকাণ্ড একটী পুষ্করিণী দেখতে পেলাম। তার স্বচ্ছ সলিলে অস্তাচল গমনোন্মুখ দিবাকরের ক্ষীণ আলোক রশ্মি এসে পড়েছিল। সঙ্গী বল্‌লো—"এটা পুষ্কর হ্রদ। মহাতীর্থ। এখানে স্নান কর্লে নাকি পুনর্জন্ম হয় না।" পুনর্জন্ম পরের কথা এমন পরিষ্কার জলে স্নান করার ইচ্ছা মানুষ মাত্রেই হয়। অন্ততঃ আমার তো খুবই ইচ্ছা হ'য়েছিল। কিন্তু নিকটে গিয়েই স্নান তো দূরের কথা—পালাতে পার্লে বাঁচি। উঃ কী অদ্ভুত কাণ্ড! অসংখ্য নরখাদক কুম্ভীর সেই স্বচ্ছ সলিলে ভাসমান। মনের বাসনা মনে রেখেই ওখান থেকে ফির্‌লাম। পূর্ব্বে পাণ্ডা ঠিক ছিল। তার সাহায্যেই ভরতপুর রাজ্যের ধর্ম্মশালায় গিয়ে উঠলাম।

পরদিন ভোরে পুষ্কর থেকে মাইল খানেক দূরে পাহাড়ের উপর অবস্থিত সাবিত্রী মন্দির দেখতে গেলাম। এই পাহাড়ে উঠা এক দুরূহ ব্যাপার। অতি কষ্টে যখন আমরা পর্ব্বতোপরি মন্দির দ্বারে পৌছলাম—দিগন্তব্যাপি মরুভূমির বুক চিরে তখন সূর্য্যোদয় হ'য়েছে। সমুদ্রের বুকে বহুবারই সূর্য্যোদয় দেখেছি—এবার দেখলাম মরুর বুকে সূর্য্যোদয়। কী সুন্দর—কী প্রশান্ত সে দৃশ্য। ওপরে উদার উন্মুক্ত নীলাকাশ—নিম্নে ধূ ধূ মরুময় প্রান্তর। সেই সীমাহীন বালুকা রাশির ওপর দিয়ে পিপীলিকা শ্রেণীর ন্যায় অগণিত উষ্ট্র শ্রেণী ধীর মন্থর গতিতে চলেছে। কোথায় তাদের গন্তব্য স্থান কে জানে? পশ্চাতে কুয়াসাবৃত পর্ব্বতশ্রেণীর মাঝে চারি ধারে ধর্ম্মশালা বেষ্টিত পুষ্কর হ্রদের স্বচ্ছ বারি রাশি দেখে মরুভূমির মাঝে মরুদ্যানের কথা মনে হ'ল। সূর্য্যোত্তাপ ক্রমেই প্রখর হ'য়ে উঠছিল। আর বিলম্ব না ক'রে মন্দির দর্শন করে ফিরে যাওয়াই সমীচিন বোধ হ'ল। এ মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী নাকি সতীকুল শিরোমণি সাবিত্রী দেবী নয়—ইনি গায়ত্রীর বোন

সাবিত্রী। মন্দিরটী ছোট হ'লেও সুন্দর। বাঙ্গালী যাত্রী-দেরই বেশী সমাগম হয়। এ স্থানের পাণ্ডাদের ব্যবহার বাস্তবিকই নিন্দনীয়। সেদিন ধর্ম্মশালায় ফিরে আহারাদির পর আরও কয়েকটী মন্দির দেখেছিলাম। ক্রমাগত রাত্রি জাগরণে ও ভ্রমণ জনিত ক্লান্তিতে উভয়েই পরিশ্রান্ত হ'য়ে পড়েছিলাম। বিশ্রাম একান্ত প্রয়োজন। পরদিন ১২ই অক্টোবর সমস্ত দিন বিশ্রাম নিয়ে রাত্রি এগারটার ট্রেণে আজমীর হ'তে চিতোরাভিমুখে যাত্রা করলাম।

রাজপুতনার মরুভূমির উপর দিয়ে গাড়ীখানা উর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে লাগলো। আমাদের কামরায় একেবারেই ভীড় ছিল না। আর ভোর সময় চিতোর পৌছব জেনে আমরা নিশ্চিন্ত মনে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঠিক পাঁচটার সময় চিতোরগড় ষ্টেশনে পৌছলাম। ট্রেণ থেকে নেমে অনুসন্ধান ক'রে জানলাম যে এখানে কোন হোটেল নাই। এক কুলি আশ্বাস দিয়ে একটী মুসাফির খানায় নিয়ে গেল। বহুকষ্টে একখানি ছোট ঘর আমাদের ভাগ্যে মিলল। তাড়াতাড়ি কিছু জলযোগ ক'রে চিতোর গড় যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলাম। সঙ্গী একখানা টাঙ্গা ডেকে নিয়ে এল। জীর্ণ শীর্ণ ঘোড়াটা দেখেই তো একেবারে চক্ষু স্থির। ইতিহাসে পড়া প্রভুভক্ত চৈতকের বংশধরের কি আজ এই পরিণাম? যাহোক বেলা সতটার সময় যাত্রা করা গেল। রেল লাইন পার হ'য়ে, সুবিস্তীর্ণ প্রান্তরের ওপর দিয়ে টাঙ্গাখানা ধীরে ধীরে চল্‌তে আরম্ভ কর্লো। কোথাও শস্যক্ষেত্র—কোথাও বা অনুর্ব্বর ভূমি আর ছোট ছোট পাথরের স্তূপ। জনমানবশূন্য এই বিরাট প্রান্তর দেখে মনে হ'ল যে এখনও হয়তো এ স্থানের মাটী খুঁড়লে রাজপুতের তপ্ত রক্ত দেখতে পাওয়া যাবে। আরও কিছুদূর অগ্রসর হ'য়ে দেখলাম রাণা প্রতাপের জন্মভূমি, শৌর্য্য বীর্য্য শালী রাজপুতের অপূর্ব্ব কীর্ত্তি চিতোর দুর্গ পর্ব্বত-শিরে কীরিটের ন্যায় শোভা পাচ্ছে। কি অসীম সাহসিকতা, কি অদম্য উৎসাহ ছিল এই রাজপুত জাতির। এরা যে শুধু বীর ছিল তা নয়। চিতোর দুর্গ দেখে এদের প্রখর বুদ্ধিমত্তরও যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। ক্রমে আমরা পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত গ্রামে এসে উপস্থিত হলাম। ইহাকে সহরও বলা যেতে পারে। সহর অতিক্রম ক'রে সৈন্যদের ঘাঁটীগুলি পিছনে রেখে—স্বাধীনতার লীলাভূমি চিতোর দুর্গের প্রথম তোরণদ্বারে এসে আমরা উপস্থিত হলাম। দরজায় অসংখ্য লৌহ শলাকা দেখে চন্দাবৎ শক্তাবতের অসীম দুঃসাহসিকতার কথা মনে পড়ছিল।

জয়মল্লর স্মৃতি স্তম্ভ অতিক্রম ক'রে ক্রমে ক্রমে চারটা গেট পার হ'য়ে, পর্ব্বতের উপর সমতল স্থানে এসে পৌছলাম। চারিদিকে কেবল ধ্বংসস্তূপ—কোথাও বিরাম নাই। রাণা প্রতাপের সাধের চিতোর—যা হারিয়ে তিনি নিজের সুখ স্বাচ্ছন্দ ত্যাগ ক'রে, স্ত্রী পুত্র নিয়ে পর্ব্বতে পর্ব্বতে অনাহারে অর্দ্ধাহারে কাল যাপন ক'রেছেন, জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত যার পানে তিনি সতৃষ্ণ নয়নে চেয়ে থাকতেন—মোগলের অত্যাচারে, তাঁর সেই সাধের চিতোর আজ এক মহাশ্মশানে পরিণত হ'য়েছে। আরও কিছুদূর অগ্রসর হ'য়ে গাইড একটা যায়গা দেখাল। এখানে আকবর ত্রিশ হাজার নিরীহ রাজপুতকে বিনা অপরাধে হত্যা ক'রেছিলেন। মনে হ'ল—একি সেই আকবর বাদশা?

কিছুদূর অগ্রসর হ'য়ে গাইডের সঙ্গে আমরা মহারাণা কুম্ভের জয়স্তম্ভের নিকট এসে পৌছলাম। ইহার উচ্চতা মন্দ নহে। আপাদমস্তক দেবদেবীর মূর্ত্তি দ্বারা অলঙ্কৃত। ম্লেচ্ছ বিজেতাগণ কর্ত্তৃক প্রতিটী মূর্ত্তি অঙ্গহীন। ইহার ভিতরের পথ দিয়ে আমরা শীর্ষে উপনীত হলাম। ওপর থেকে সম্পূর্ণ চিতোর দেখ্‌তে পাওয়া যায়। এখান থেকে আমরা উদয়পুরের মহারাণার নব নির্ম্মিত প্রাসাদ দেখ্‌তে পেলাম। বহু লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে আধুনিক রুচিসম্মত ভাবে এই প্রাসাদটী নির্ম্মিত হ'য়েছে।

তারপর পদ্মিনীর জহর ব্রতের স্থান রাজ সন্ন্যাসিনী মীরাবাঈয়ের মন্দির এবং একটী কালী মন্দির দেখলাম। এই মন্দিরটীতে নাকি পূর্ব্বে সূর্য্যোপাসনা হইত। এখান থেকে গাইড আমাদিগকে পদ্মিনীর মহল দেখ্‌তে নিয়ে গেল। এই দ্বিতল অট্টালিকাটী একটী শুষ্ক প্রায় হ্রদের মাঝে অবস্থিত। যদিও ইহাতে স্থাপত্য বিদ্যার তেমন কিছু নিদর্শন পাওয়া যায় না—তথাপি মনোহর। মিনারেটের ওপরের স্ফটিকগুলি সূর্য্য কিরণে

ঝক্ ঝক্ করছিল। তারপর রাজপুতের প্রাচীন অস্ত্রাগার দেখ্‌তে গেলাম। তৎকালের তরবারি, বর্শা, বন্দুক, কতকগুলি ছোট ছোট এবং দুইটী বিশাল কামান উল্লেখ-যোগ্য। বড় একটী কমানের নাম শুন্‌লাম—"দুষমন্ দমন"। চিতোরের মহা শ্মশান পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখ্‌তে গেলে—এখনও অনেক কিছু দেখ্‌বার আছে। কিন্তু মন খুবই উদ্বেলিত হয়ে উঠে—এই সব ধ্বংসলীলা দেখে। যাহোক অস্ত্রাগার দেখা শেষ ক'রে আমরা বিশ্রামের জন্য একটী গাছের তলায় এসে বস্‌লাম। সামনেই প্রকৃতি থেকে পাথর দিয়ে ঘেরা একটী পুরাতন জলাশয় দেখা যাচ্ছিল। সেওলাতে তার তার জল বিবর্ণ হয়ে গেছে। অসংখ্য লাল মাছ তার মধ্যে নির্ভয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। দ্বিপ্রহর তখন অতীত প্রায়। জঠরাগ্নি প্রজ্জলিত। কাজেই অন্যদিকে মন না দিয়ে আমরা অবিলম্বে সরাইখানায় ফিরে এলাম।

বেলা তিনটার সময় উদয়পুরের দিকে যাত্রা কর্‌লাম। প্রান্তরের ভিতর দিয়ে ট্রেণ ধুমোদ্গীরণ কর্ত্তে কর্ত্তে চল্‌তে লাগলো। আমরা অনিমেষ নয়নে কালজয়ী চিতোর দুর্গের পানে চেয়ে ছিলাম। ক্রমে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এল দুর্গটীও অস্পষ্ট হ'তে অস্পষ্টতর হ'য়ে ধীরে ধীরে আকাশের কোলে মিলিয়ে গেল।

রাত্রি সাড়ে সাতটার সময় আমরা উদয়পুরে পৌছলাম। অপরিচ্ছন্ন একটী ধর্ম্মশালায় গিয়ে উঠা গেল। সঙ্গীর চাইতে আমিই বেশী ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছিলাম। এখানে এসেই জ্বর জ্বর বোধ হ'তে লাগলো। রাত্রে কিছু আহার না করেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। পরদিন অসুস্থ শরীরেই সহর দেখ্‌তে বেরিয়ে পড়লাম। চারিধারে পর্ব্বত-বেষ্টিত এই সহরটী মন্দ নয়। জলাশয়ের ভিতরে মহারাণার প্রাসাদ রাজহংসের ন্যায় শোভা পাচ্ছে। অনেক ভাল ভাল জিনিষও অসুস্থতার জন্য খারাপ বোধ হচ্ছিল। ধর্ম্ম-শালায় ফিরে, সামান্য কিছু আহার করে বেলা চারটার সময় সঙ্গীর সখ মিটাতে রাজপুতনার অন্যতম শ্রেষ্ঠ তীর্থ নাথ দুয়ারায় শ্রীনাথজী দেখতে চল্‌লাম। সন্ধ্যা সাতটায় যখন নাথ দুয়ারায় পৌছলাম—আমার শরীর তখন খুবই খারাপ বোধ হ'তে লাগলো। সঙ্গীকে অসুস্থতার কথা বলি নাই। তাহ'লে সে খুবই উদ্বিগ্ন হ'য়ে উঠতো। শ্রীনাথজীর মন্দির নাথ দুয়ারা ষ্টেশন থেকে সাত মাইল দূরে অবস্থিত। একখানি মাত্র মোটর বাস ছিল কোন রকমে সঙ্গীর সাহায্য একটু স্থান সংগ্রহ করা গেল। ষ্টেশনকে পিছনে ফেলে বাসখানা দ্রুতবেগে চল্‌তে লাগলো। জ্যোৎস্নাময়ীরাত্রি। বহুদূরে অস্পষ্ট ছায়ার ন্যায় পর্ব্বতশ্রেণী দেখা যাচ্ছিল। কিন্তু শরীর যেন আমার ক্রমশই অবসন্ন হ'য়ে পড়ছিল। খুব শীত অনুভব কর্লাম। ধর্ম্মশালায় যখন এসে পৌছলাম—তখন আমার বেশ জ্বর হ'য়েছে। সঙ্গীকে তখন কিছু না ব'লে তাড়াতাড়ি বিছানা পেতে শুয়ে পড়লাম। শুয়ে শুয়ে বাড়ীর কথা মনে হচ্ছিল। চিন্তাও যে না হ'য়ে ছিল—তা নয়। আত্মীয় স্বজনবিহীন এই বিদেশে যদি বেশী কাতর হ'য়ে পড়ি তবে কি উপায় হবে? এইসব দুশ্চিন্তা কর্ত্তে কর্ত্তে কখন যে ঘুমের ঘোরে অচেতন হ'পেড়েছিলাম ঠিক স্মরণ হয় না। পরদিন জ্ঞান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সঙ্গীকে মাথার কছে উদ্বিগ্নচিত্তে ব'সে দেখলাম। প্রবল জ্বর এবং সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত শরীরে অসহনীয় বেদনা। সঙ্গী খোঁজ করে জেনে এল এখানে কোন ডাক্তার পাওয়া যায় না। ...
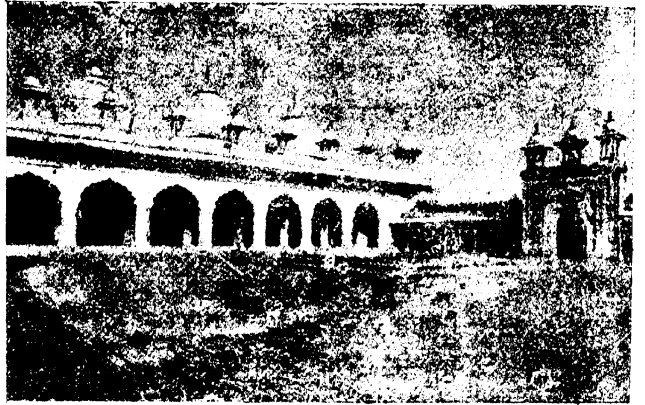
আর পাম্বা খেলেই নাকি ওদেশের জ্বর সেরে যায়। বাঙ্গালীর ছেলে' জন্মাবধি অসুখ হ'লে ঔষধই খেয়েআস্‌ছি। এই অদ্ভুত চিকিৎসা প্রণালী শুনে আমারতো হার্টফেল হবার উপক্রম। সমস্তদিন একভাবেই জ্বরের ঘোরে কেটে গেল। এখানে থাকলে মৃত্যু অনিবার্য্য জেনে সঙ্গীর পরামর্শে দিল্লীতে এক আত্মীয় বাড়ী আছে—সেখানে যাওয়াই ঠিক হ'ল কারণ দিল্লীতে এইভাবে বিনা চিকিৎসায় মারা যাবনা। তাড়াতাড়ি তখনই পাঁচটার গাড়ীতে রওনা হলাম। মোটরে এবং তারপর গাড়ীতে যে কী ভয়ানক অবস্থা হয়েছিল তা বর্ণনাতীত। তবে নিজের মনের বলে এবং সঙ্গীর অক্লান্ত সেবা শুশ্রূষায় অনেকটা শান্তি পেয়েছিলাম। বাস্তবিকই দেশ ভ্রমণের পক্ষে এইরূপ প্রাণবান সঙ্গীরই প্রয়োজন।

পরদিন ১৬ অক্টোবর দিল্লী জংসন ষ্টেশনে পৌছলাম। ষ্টেশনটী যেন ছোটখাটো একটী হাওড়া ষ্টেশন। এখানেও টাঙ্গার প্রচলন কম নয়। আমরা একখানা টাঙ্গা ভাড়া ক'রে নতুন দিল্লীতে যতীনবাবুর কোয়াটারের দিকে রওনা হলাম। যদিও জ্বর ছিল—তবুও শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল হ'য়ে পড়েছিল। টাঙ্গাখানা সহরের ভিতর দিয়ে চলতে লাগল। ঠিক যেন চিৎপুরের রাস্তা। যান-বাহনাদির চলাচল খুবই বেশী। রাস্তার একধারে ট্রামের Single line ট্রামগুলি দেখ্‌তে টিনের বাক্সর মত। আমরা সহরের কোলাহল ছেড়ে, একটা নির্জ্জন প্রান্তর অতিক্রম করে ক্রমে ইংরেজের নতুন দিল্লীতে উপস্থিত হলাম। সব কোয়াটারগুলিই দেখ্‌তে অনেকটা একরকম' কিছু খোঁজা খুঁজি ক'রে আমাদের গন্তব্য স্থান এডোয়ার্ড স্কোয়ারে যতীন বাবুর কোয়া-টারে পৌছলাম। একে বিদেশে স্বজন—তার উপর আত্মীয়। কাজে কাজেই তারা আমাদিগকে পরম সমাদরে গ্রহণ করলেন। তবে আমার অসুস্থতার জন্য তাঁদের খুবই দুশ্চিন্তা এবং দুর্ভাবনার মধ্যে পড়্‌তে হয়েছিল। এখানে এসেও প্রবল জ্বর। তবে ভগবানের কৃপায় ৪।৫দিন পরই জ্বর একদম ছেড়ে গেল। দিনদুই বিশ্রাম ক'রে ২৫শে অক্টোবর সকালবেলা আমরা কুতব মিনার দেখ্‌তে চললাম। বামে বৃত্তাকার সদৃশ বিশাল Assembly House এবং ইন্দ্রপুরীতুল্য বড়লাটের প্রাসাদ দক্ষিণে রেখে ক্রমে এগিয়ে গেলাম। পথের মাঝে শব্দার জঙ্গ একটা দেখবার জিনিষ।

এরোড্রমকে পিছনে ফেলে ক্রমে কুতুবমিনারের নিকটে পৌছলাম। ছবিতে দেখে ইহার উচ্চতা ও গঠননৈপুণ্য কল্পনাই করা যায় না। ইহার কিছুদূরেই প্রথম ভারত সম্রাজ্ঞী রিজিয়ার সমাধি মন্দির ভগ্নাবস্থায় দেখতে পেলাম। এখান থেকে গেলাম নিজামুদ্দিনের সমাধি মন্দির দেখতে। স্থানটী শান্তিপূর্ণ। এখানে নিজামুদ্দিনের সমাধিমন্দির এবং একটী পবিত্র পুষ্করিণী আছে। তার পর ভাগ্য প্রপীড়িত দ্বিতীয় মোগল সম্রাট হুমায়ুনের সমাধিমন্দির দেখে - আমরা দিল্লীর পুরাতন কেল্লা দেখলাম এখানে নাকি পাণ্ডবদের হস্তিনাপুর ছিল। কেহ কেহ এখনও ইহাকে যুধিষ্ঠির কেল্লা বলে। হুমায়ুন এই দুর্গটী নির্ম্মাণ করেছিলেন এবং সেরশাহ ইহার অনেক উন্নতি সাধন করান। ইহা এখন প্রায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত।

এখানে কুন্তীদেবীর একটা ছোট মন্দির এবং সেরশাহের একটী মস্‌জিদ্ আছে। যে ইমারতের সোপানচ্যুত হ'য়ে হুমায়ুন মৃত্যুমুখে পতিত হন—এখনও তা তাঁর মৃত্যুর সাক্ষী স্বরূপ দণ্ডায়মান। বেলা বারটায় ইংরাজের কীর্ত্তিস্তম্ভ ওয়ার মেমোরিয়াল গেটের ভিতর দিয়ে কোয়াটারে ফিরে এলাম। বিকাল তিনটায় সময় বাহির হলাম দিল্লীর মোগলদুর্গ দেখতে। সুরঙ্গ সদৃশ পথ দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করলাম - গেটে সঙ্গীনধারী ইংরেজ সেনা পাহারা দিচ্ছে। আগ্রার মত এ ফোর্টেরও এক পার্শ্বে ব্রিটিশ সেনানিবাস। এখানে দেওয়ান্-ই-আম দেওয়ানি-ই-খাস Scale of justice, রংমহল, সমান বুরুজ, পুরাতন এবং ওয়ার মেমো-রিয়াল মিউজিয়ম উল্লেখযোগ্য। পুরাতন মিউজিয়ামটীতে বাদশাহী আমলের নানা প্রকার দ্রব্যসম্ভার এবং ওয়ার মেমোরিয়ালে গত মহাসমরের ইংরাজ ও জার্ম্মাণীর অস্ত্র শস্ত্র, পোষাক-পরিচ্ছদ এবং চিত্রাদি রক্ষিত আছে। পুরাতন মিউজিয়ামে ঔরংজেবের বন্দুকটী বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। দিল্লীর এই দেওয়ানী আমেই সাজাহানের জগদ্বিখ্যাত ময়ুরসিংহাসন স্থাপিত ছিল। আমার কিন্তু সবচেয়ে ভাল লেগেছিল ঔরংজেবের মতিমস্‌জিদটী। এখান হ'তে বাহির হ'য়ে সহরের ভিতর কিছুক্ষণ বেড়িয়ে কোয়াটারে ফিরে এলাম। ২৬শে আর কোথাও যাওয়া হ'ল না।

২৭শে তারিখ সকালবেলা কয়েকজন নবপরিচিত ভদ্রলোকের সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম পুরান দিল্লীর দিকে। পথে পথে ঘুরে ঘুরে দীপালির মেলা দেখে জুম্মামসজিদ দেখতে গেলাম। এই মসজিদটী পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্ব বৃহৎ। ইহার একদিকের একটি টাওয়ারে উঠে আগাগোড়া দিল্লীসহর দেখে নিলাম। এই মসজিদ প্রবেশে অমুসলমানদের জন্য অনেক কিছু বিধি নিষেধ আছে। এই সব দেখা শেষ ক'রে কেয়াটারের দিকে রওনা হলাম। কেমন একটা অবসাদ অনুভব করছিলাম। মন যেন ডেকে ডেকে বলেছিল—ফিরেচল' আপন ঘরে„ বাস্তবিকই প্রাণটা যেন আকুল হ'য়ে উঠলো ছুটে যেতে—সোণার বাংলার শীতল ছায়ায়। না থাকুক তার বুকে বিরাট প্রাচীন সৌধশ্রেণী না থাকুক কারুকার্য্য খচিত স্থাপত্য কলার চরমনিদর্শন—তবুও —তবুও সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা বাংলার সঙ্গে কোন দেশেরই তুলনা হয় না।

কোয়াটারে ফিরে তখনই ঠিক হ'ল "আরনা"—কালই ফিরতে হবে।

কাজেই ২৮শে অক্টোবর দিল্লী হ'তে সেই তুফান মেলেই কলিকাতা রওনা হলেম। হাওড়াস এসে সঙ্গী ছেড়ে গেল। কতদিনে আবার দেখা হ'বে কে জানে?

বিশ্বজগৎ

═চক্রপাণি═

মোটর সাইকেলে "ফুটবল" খেলা

আমরা ছেলে বেলা থেকেই শুনে আসছি যে ফুটবল খেলা পা দিয়েই হয় ও সেজন্যই খেলার নামও ফুটবল খেলা হয়েছে—ফুটবল অর্থে যে বল পায় করে খেলা হয়! কিন্তু
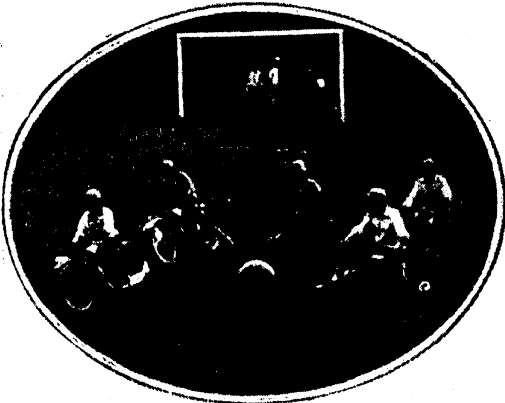
মোটর সাইকেলে ফুটবল খেলা।

এ গেলত আমাদের কথা। যেখানে আমরা পার উপর ভর দিয়ে হাঁটি। এখন যে দেশে পায় কদর নেই অর্থাৎ ভগবানের দান যারা সব দিক দিয়ে উপেক্ষা করে নিজেদের বল প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে তাদের বেলাত সবই আলাদা। সে জন্য ওসব জায়গায় অর্থাৎ পাশ্চাত্য দেশ সমূহে 'ফুটবল' খেলাও কল দিয়ে হোতে দোষ কি! এখনই জাহাজে লোক না নিয়ে দূর থেকে 'রেড়িওর' সাহায্যে চালান হচ্ছে, আমরা কি কাজ করি সেটা যখন ইচ্ছে করলে আমেরিকা থেকে 'টেলিভিসানের' সাহায্যে দেখা যাওয়াও খুব বড় কথা নয় তখন কোন দিন হয়ত দেখব যে 'ফুটবল'ও লোকের বিনা সাহায্যেও 'ওয়ারলেশে' এ গোল্ থেকে ও গোলে যাচ্ছে। যে দলের সেট বলবান সে দলই তখন জয়লাভ করবে। এ জিনিষটার যখন চলন কলকাতার মাঠেও দেখা যাবে তখন অনেককে আর বেলা ১২টা থেকে মোহন বাগানের ম্যাচ দেখার জন্য বসে থাকতে হবে না। টেলিভিস্যণ ও ওয়ারলেসের সাহায্যে সব জিনিষই তারা বাড়ীর বৈঠকখানায় বসে দেখে নেবে—আর খেলওয়ারদের দশা তখন কি হবে সেটা না বলাই ভাল। সম্প্রতি যে ছবিটা দেখা যাচ্ছে তাতে 'ফুটবল'

খেলা মটর সাইকেলের সাহায্যে হচ্ছে। এটা কম মজার কথা নয়।

অদ্ভুত মোষের সিঙ

বোম্বাই দেশের কোন একটী প্রদর্শনিতে নিচে যে ছবিটা দেখান যাইতেছে ঐ অদ্ভুত শিঙওলা মোষটী একটী বিশেষ আকর্ষণের বস্তু ছিল। বেশ সহজেই বুঝা যায় যে

অদ্ভুত মহিষের সিঙ।

ঐরূপ শিঙ সাধারণ মহিষের মধ্যে নাই। আমরাত এতদিন ওসব দেশ সম্বন্ধে অনেক কিছুই বিচ্ছিরি ধারণা পোষণ করে আসছি। আচ্ছা, তাদের কি কোন জিনিষই সুন্দর হতে নেই!

জাপানে খড়ম পূজা—৩

রামায়ণের কালে আমরা শুনিছি যে ভরত রামচন্দ্রের খড়ম জোড়া সিংহাসনে বসিয়ে রাজপ্রতিনিধি হিসাবে রাজত্ব করিতেন। কিন্তু কথায় বলে সে রামও নেই সে অযোধ্যাও নেই, তার মানে তখনকার কালে যা সম্ভব ছিল এখন তা হয়েছে অসম্ভব, বিশেষত সে সব দেশেই যারা শৌর্য্য, বীর্য্যে সভ্যতার অগ্রণী। এদের মধ্যে জাপানও আছে তাই যখন আমরা শুনি যে জাপানের মত আধুনিক রাজ্যে খড়ম পূজার মত কুসংস্কার বর্ত্তমান তখন আমাদের একটু আশ্চর্য্য হতে হয় বই কি। জাপানের লোকেরা এখনও বিশ্বাস করে যে কতকগুলি অসুখ বিসুখ খড়ম পূজা করলে সেরে যায়। এখানে কতকগুলি জাপানী বালিকাকে খড়ম পূজা করতে দেখা যাচ্ছে।

জাপানে খড়ম পূজা।

বিশ্বজাতি সঙ্ঘের সভাপতি ডি ভেলেরা—৪

সম্প্রতি পাশ্চাত্য দেশের একটী নামজাদা কাগজ এখন পৃথিবীর মধ্যে কারা বড় লোক এই প্রসঙ্গে মহাত্মা গান্ধী, ডি ভেলেরা প্রমুখ কয়েকটী ব্যক্তির নাম করেছে। এই কয়মাস ডি ভেলেরা যেরূপ ভাবে আবার আয়ারল্যাণ্ডকে পরিচালিত করেছেন তাতে তাঁর নাম এখন বিশ্বব্যাপিয়া পরিচিতি লাভ করেছে। এই স্থানে যে চিত্রটী দেখান হয়েছে তাতে ডি ভেলেরা বিশ্বজাতি সঙ্ঘ কাউন্সিলের ৬৮ম অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করেছেন। জার্ম্মানী ইটালী আদি সকল বলবান জাতির প্রতিনিধিই তাতে উপস্থিত ছিলেন। একটা অর্দ্ধ স্বাধীন দেশের নেতা হিসাবে এটা ডি ভেলেরার কম কৃতিত্বের কথা নয়।

লণ্ডনের নূতন ব্যবস্থা

লণ্ডনের নূতন ব্যবস্থা—৫

লণ্ডন পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয় সহর হিসাবে গণ্য হয় সে জন্য সেখানে যানবাহনাদির গমনাগমন নির্দ্ধারণ করা একটা মস্ত বড় সমস্যা। যতই পৃথিবী সভ্যতার দিকে অগ্রসর

হচ্ছে মানুষের ঐ সব প্রাসঙ্গিক বিপদ ও বৃদ্ধিলাভ করছে ফলে মানুষকে বাঁচতে হলে নিত্যই নূতন ব্যবস্থারও প্রচলন করতে হচ্ছে। সম্প্রতি লণ্ডনে ঘোড়া থেকে যানবাহনাদির গমনাগমন নির্দ্ধারণ করার নতুন নিয়ম

লণ্ডনে নূতন ব্যবস্থা

প্রবর্ত্তন করা হয়েছে, এবং এই স্থানে যে সুবিধা দেখান হচ্ছে তাতে লণ্ডনের একটী ঘোড় সোয়ার ঐরূপ কার্য্য করিতেছে।

মৃত স্বামীর মাথা বিধবাদের অলঙ্কার ?

আফ্রিকা অসভ্যদের কেন্দ্র স্থল। নিউগিনি নামে ঐ মহাদেশে এক রাজ্য আছে। রাজ্যটা অবশ্য পাশ্চাত্য শক্তির (imperialistic) পলিসি ত্যাগ করছে তত্তদিন এই কিন্তু তাদের যা কাজ অর্থাৎ ব্যবসা বাণিজ্য করা সেকাজ ছাড়া তারা ঐদেশের বিশেষ কোন উন্নতি করেনি তাই আফ্রিকার অবস্থা শোচনীয়। ভারতে যে রকম আগে একটা সতীদাহ প্রথা ছিল সেই রকম ঐ দেশের নিউগিনি রাজ্যের বিধবারা মৃত স্বামীর মাথা অলঙ্কার করে ব্যবহার করতে গৌরব লাভ করে থাকে। এখানে যে ছবিটী দেখান যাচ্ছে তাতে তিনটী বিধবা স্ত্রীলোক মৃত স্বামীর মাথা কেমন ভাবে যত্ন করে পরে আছে দেখা যাবে।

জেনেভায় নিরস্ত্রীকরণ সম্মিলনীর অধিবেশন

পাশ্চাত্য জাতি সমূহের নিরস্ত্রীকরণ সভা (Disarmament conference) যেন কংগ্রেসের মিটিং হইয়াছে-কথায় কথায় বসছে আর কথায় কথায় ভেঙ্গে যাচ্ছে। এখানে যে ছবিটী দেখান হচ্ছে সেটা জেনেভার নিরস্ত্রীকরণ সভা ও তার সভাপতি ছিলেন মিঃ আর্থার হেণ্ডারসন। ঐ সভার একটী বিশেষত্ব ছিল যে কোন জার্ম্মান প্রতিনিধি তাতে যোগদান করেনি। গত মহাযুদ্ধের পর থেকে জার্ম্মানকে পাশ্চাত্য দেশ সমূহ যেন কোন 'পাওয়ার' হিসাবেই গণ্য করতে চান না ফলে সকল রকম সভা থেকে তাদের বাদ দিয়ে কাজ করা যেন একটা প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু যত বারই না কেন নিরস্ত্রীকরণ সভার অধিবেশন হোক যতদিন 'পাওয়ার' রা তাদের 'ইম্‌পিরিয়ালিস্‌টিক'

জেনেভার নিরস্ত্রীকরণ সম্মিলনীর অধিবেশন

ান আসান নেই। প্রভুত্ব করবার জন্য জন্ম হইতে যে সনা, সে ইচ্ছার ত্যাগ যতক্ষণ না পাশ্চাত্যজাতির মধ্যে াপ পাবে ততক্ষণ সভার পর সভা হয়ে যাবে কিন্তু ল কিছুই হবে না। ঐ পরধন হরণ প্রবৃত্তির হ্রাস খনই সম্ভব হবে না যতক্ষণ পাশ্চাত্য জাতিরা তাদের থ্যা বস্তুতান্ত্রিক জীবনধারা পরিত্যাগ করছেন (materi-lism and false standard of living.)

লোকহিতার্থে রেলের সংঘর্ষ

আমেরিকার সব ব্যাপারই কি আলাদা! আমরাত ানি যে গত তিন বৎসর ধরে পৃথিবীর উপর দিয়ে যে র্থকৃচ্ছতার (depression) স্রোত বয়ে যাচ্ছে তা সার্ব্বভৌ-ক সেজন্য আজ অল্প বিস্তর সকল দেশই আক্রান্ত হয়েছে ন্তু মার্কিণ দেশের সবই অদ্ভুত। এই ছবিটিতে দুটো েল গাড়ীর ভীষণ সংঘর্ষ দেখান হয়েছে। এই ব্যাপারটা আকস্মিক নহে উহা ইচ্ছাকৃতই অর্থাৎ শত শত বেকার লোকের সংস্থানের জন্য আমেরিকায় ঐরূপ সকল বন্দোবস্ত

করা হয়েছিল। ঐ মজা দেখতে ৫৫,০০০ মানুষের সমাগম হয়েছিল।

পুতুল

শ্রীসুনীল কুমার বসু

স্নেহের "পুতুল" ঘুমায়ে পড়েছে,
ভাঙ্গায়ে দিওনা তাহার ঘুম।
কতনা যাতনা সহিয়া মাণিক,
আঁখিতে মেখেচে ঘুমের চুম॥

দেব শিশু হায় গেল দেবধামে
জানিনে কেমনে আমারে ভুলে!
কি সাধ্য আমার রাখিব তাহারে.
মহাকাল যদি ল'ন কোলে তুলে॥

আধ আধ স্বরে করিত আহ্বান—
ভাবিলেও তাহা কেঁদে উঠে প্রাণ;
কোন মহাদোষে হেন অভিশাপ
সহিতে হইবে ওগো ভগবান।

কোন নিরদয় লইল ছিনায়ে,
স্নেহের বাছারে বুক হতে মোর।
বিহনে স্নেহের মধুমাখা মুখ
শূন্য হৃদয়—আঁখি ভরা লোর॥

জন্ম-অপরাধী

গল্প—

— শ্রীনরেন্দ্র নাথ বসু

ভূমিষ্ঠ হইবার অল্পদিন পূর্ব্বেই তাহার জন্মদাতার অকস্মাৎ মৃত্যু ঘটিয়াছিল। সেজন্য সংসারের লোকে তাহাকেই অপরাধী স্থির করিয়াছিল। যিনি জন্ম-মৃত্যুর অদৃশ্য নিয়ন্তা তাঁহার অপরাধের কল্পনা করাও যে মহাপাপ, কেহ তাহা করিতেও সাহস করে নাই।

যে শিশু মৃত ভূমিষ্ঠ হইলেও সংসারের লোকে এতটুকু দুঃখিত হইত না, বিধাতার ইচ্ছায় সে শিশুও বাঁচিয়া রহিল, অন্য সকল শিশুর মত মাতার যত্নে ক্রমশঃ বড় হইতে লাগিল। লোক দেখিলে কিন্তু যখন হাসিয়া হাত বাড়াইত, কেহ তখন সেই অপয়া ছেলেকে কোলে লইবার আবশ্যকতা বোধ করিতনা। বরং মুখ ফিরাইয়া লইত। শিশুরও হাসি থামিয়া যাইত, সে ধীরে ধীরে নিজের মায়ের কোলে যাইয়া বসিত। মাতা হতভাগ্য শিশুকে আঁকড়াইয়া ধরিতেন।

মাতা ছাড়া সংসারে আর কাহাকেও সে আপনার বোধ করিতে পারিতনা, সেজন্য সকল সময় মায়ের কাছেই থাকিতে ভালবাসিত। বৃহৎ সংসারে ছেলেমেয়ের অভাব ছিল না। অতি শৈশবেই সে বুঝিয়া লইয়াছিল যে, অপর ছেলেমেয়েদের সঙ্গে তাহার কোথায় যেন কিছু তফাৎ আছে। পিতামহী অন্য নাতি নাতনীদের আদর করিতেন, কিন্তু সে কাছে যাইলেই তাঁহার মুখ গম্ভীর হইয়া যাইত। সেজন্য পারত পক্ষে সে তাঁহার দিকে ঘেঁসিত না। সংসারের অন্য গুরুজনরাও যে সকলে তাহার প্রতি সদয় ছিলেন, এমন বোধ হইত না।

যখন আরও একটু বড় হইল, বুঝিল তাহার অপরাধ কি। লোকে তাহার সমুখেই বলিত যে, সে তাহার পিতাকে গ্রাস করিয়া তবে জগতে আসিয়াছে। কিন্তু কিরূপে সে গ্রাস করিল, তাহা তাহার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে ভাবিয়াও ঠিক করিতে পারিত না। বয়স্কদের মুখে অনবরত ঐ কথাটা শুনিয়া সে বিশেষ সঙ্কুচিত হইত। ছোটদের মুখে যখন শুনিত, তখন মনে বড় ব্যথা অনুভব করিত। মা অন্য সন্তানদের ভার নিজের উপর রাখেন নাই, তিনি কোলের ছেলেকেই যথাসাধ্য আগলাইয়া থাকিতেন এই একমাত্র সান্ত্বনা ছিল যে, সে মায়ের মুখে কখনও কথাটা উচ্চারিত হইতে শুনে নাই।

অনাদর বাধা বিঘ্ন ঠেলিয়া সে বড় হইয়া উঠিল। মাতাও অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলেন। যাহার আগমন সময়ে সংসারের লোকে মোটেই আনন্দিত হয় নাই, মনে হইতে লাগিল, যেন এখন তাহার স্থিতি লোকের কাছে অপ্রীতিকর নয়। পূর্ব্বের ইতিহাস যেন সকলেই ভুলিয়া গিয়াছিল, এমন কি তাহার নিজেরই শৈশবের মন কষ্টের কথা সকল সময়ে স্মরণেও আসিত না।

হতভাগ্য কোলের সন্তান এখন পূর্ণ যুবায় পরিণত, সংসারের দশজনের মধ্যে একজন বলিয়া গণ্য। তাহার দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবার আবশ্যকতা আর নাই, মাতা নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। তিনি এখন নাতি-নাতনী পরিবৃত বৃহৎ সংসারের কর্ত্রী।

সংসারের নানা গণ্ডগোলের মধ্যে সকল সময়ে কাহারও মস্তিষ্ক স্থির থাকিতে পারেনা। হঠাৎ রাগের মাথায় একদিন মাতার মুখ দিয়াই উচ্চারিত হইল যে, "সে তাহার পিতাকে গ্রাস করিয়া তবে জগতে আসিয়াছে।"

বক্ষে যেন কেহ প্রচণ্ড মুগুরের আঘাত করিল। তবে কি মায়ের মনেও এই ধারণা বদ্ধমূল। যে অমার্জ্জনীয় গুরু অপরাধের কথা অপরাধী এতদিন ভুলিয়াছিল, তাহা আবার নূতন করিয়া তাহার মনে জাগিয়া উঠিল। মায়ের মনের কথা, কি শুধু মুখের কথা, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিবার ধৈর্য্যও সে হারাইয়া বসিল।

তাড়াতাড়ি নিজের ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া গৃহ কর্ম্মনিরতা স্ত্রীকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, "আমার ছেলে ভূমিষ্ঠ হবার আগেই যদি আমি হঠাৎ মারা যাই, সেজন্য কখনও যেন তাকে অপরাধী কোরো না।"

স্বামীর মুখের দিকে ক্ষণ মাত্র নির্ব্বাক ভাবে চাহিয়া থাকিয়া, সন্তান সম্ভবা তরুণী সজল নেত্রে মুখ নত করিল।

বিচিত্রা

গত ২৪শে ফেব্রুয়ারী, কলিকাতা হিন্দুস্থান বিল্ডিংসে ইণ্ডিয়ান লাইফ অফিস এসোসিয়নের বার্ষিক সভা হইয়া গিয়াছে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে প্রতিষ্ঠা সম্পন্ন কোম্পানীর ম্যানেজারগণ এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। সভাপতি শ্রীযুত নলিনীরঞ্জন সরকার মহাশয়ের সুলিখিত বক্তৃতার সারাংশ এই সংখ্যায় প্রকাশিত হইল। বর্ত্তমান বৎসরের জন্য সভাপতি নির্ব্বাচিত হইলেন মিঃ কে, সি দেশাই (ইন্ডাষ্ট্রিয়াল ও প্রুডেনসিয়াল)।

* * * *

সভাপতির অভিভাষণ ঃ—সভাপতি শ্রীযুত নলিনীরঞ্জন সরকার তাঁহার বক্তৃতায় বলেন সমিতির সভ্য-শ্রেণীভুক্ত বীমা কোম্পানী সমূহের নিকট আমাদের দেশের ছয়লক্ষ লোকের সঞ্চিত মোট প্রায় ২২ কোটি টাকা গচ্ছিত আছে এবং তাহাদের পলিসিসমূহের মোট মূল্য প্রায় ১০০কোটি টাকা। জনসেবা ও সামাজিক উপযোগিতায় এই মূল্য অপরিমেয়। জনসেবা ও বিশেষভাবে স্বদেশীয়দের সেবা জীবনবীমার কার্য্য হইলেও এই সমিতির তিনটি বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। প্রথমতঃ ভারতীয় বীমা কোম্পানী-সমূহের জন্য এদেশে তাহাদের ন্যায্য স্থান লাভ করা; দ্বিতীয়ত ভারতীয় বীমা কোম্পানীসমূহ যে বিশেষ অবস্থায় কাজ করিতেছে তাহাতে তাহাদের সুবিধার জন্য মৃত্যু, সংগঠনের সারূপ্য ও দাবীপূরণ প্রভৃতি বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ, এবং তৃতীয়তঃ বাহিরের কর্ম্মচারিবর্গ, ডাক্তারী পরীক্ষাকারিগণ ও পলিসি হোল্ডারদের সম্বন্ধে কারবারের নিয়মে কতকটা সাম্যতা বিধান। আমরা এসববিষয়ে যে ভাবে সফলকাম হইয়াছি তাহা বলিতে পারিনা। কিন্তু ইহার একমাত্র কারণ এই যে, আমাদের সমিতি এখনও খুব তরুণ। তবু এই অল্প কয় দিনেই আমাদের সমিতি এসব বিষয়ে যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছে। আমার মনে হয়, আমাদের এই সাফল্যের কারণ এই যে লোকে জীবন বীমার সামাজিক মূল্য এবং জাতির অর্থনৈতিক পুনরভ্যুদয়ে ইহার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়াছে। বিশ্বব্যাপী ব্যবসায় মন্দা ভারতবর্ষকে রেহাই দেই নাই। কিন্তু এই দুর্দ্দিনেও ভারতের জীবন বীমা ক্ষেত্রে কতকটা আশার আলোক দেখা যাইতেছে। ভারতীয় জীবন বীমার উন্নতির একটি প্রধান অন্তরায় বৈদেশিক প্রতিযোগিতা। ব্যবসায়ের অন্যান্য ক্ষেত্রের ন্যায় এক্ষেত্রেও বিদেশী কোম্পানী সমূহ বহু পূর্ব্বে কাজ আরম্ভ করিয়া সুপ্রতিষ্ঠ হইয়া বসিয়াছে। শুধু তাহাই নহে, দেশী ও বিদেশী কোম্পানী সমূহের মধ্যে সরকার বহু বিষয়ে অন্যায় পার্থক্য করিয়া থাকেন।

* * * *

বাংলাদেশ গৃহবিবাদের জন্য বিখ্যাত। ব্যবসায়ক্ষেত্রে এই গৃহবিবাদ কিরূপে আত্মঘাতী হইয়া উঠিয়াছে বীমা জগতের সংবাদ যাহারা জানেন তাঁহারাই ইহা ভালরূপে বুঝিতে পারিবেন। বাংলার এক কোম্পানীর সহিত অন্য কোম্পানীর সদ্ভাব বিরল—বাংলাদেশের পরিচালিত বীমা প্রতিষ্ঠানগুলি বাংলার প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন কোম্পানীর ছিদ্রানুসন্ধানে তৎপর। ইহার সুযোগ ও সুবিধা লইয়াছে বোম্বাই-বাসীরা। গৃহবিবাদে উন্মুখ বংলাদেশ তাহাদের কার্য্যের প্রসার ঘটাইয়াছে। বাঙ্গালী চরিত্রের ইহা এক লজ্জাজনক ব্যাপার।

বীমাপত্রিকাগুলি যদি নিরপেক্ষরূপে কোম্পানীর দোষ-

গুণ পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করে তবে উক্ত পত্রিকাগুলির অস্তিত্বের সার্থকতা বুঝিতে পারা যায়। বীমাকরণেচ্ছু জনসাধারণের প্রতি মমতাবোধ কি ইহাদের আছে ? চতুর দালালগণ উচ্চ কমিশনের মোহে পড়িয়া দুর্ব্বল কোম্পানীর প্রচার কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়া দেশবাসীগণকে সর্ব্বনাশের জালে জড়াইতেছে। বাংলাদেশে নিত্যনূতন কোম্পানীর অভ্যুদয় হইতেছে—অক্ষম এবং অকৃতী ব্যক্তিগণ পরিচালিত এই প্রতিষ্ঠানগুলি দেশবাসীর সর্ব্বাংশে পরিত্যাজ্য।

* * * *

বীমাজগতে বোনাস ঘোষণা করিবার কলরোল পড়িয়া গিয়াছে। ব্যয়ের হার, লভ্যাংশ এবং চাঁদার হারের সহিত সামঞ্জস্য বিহীন হইল ক্ষতি কি—বোনাস ঘোষণা করিতে কে বাধা দিবে ? কেননা বোনাস তো এখন বিতরণ করা হইতেছে না—ভবিষ্যতে দিবার প্রতিশ্রুতি রহিল মাত্র। শতাব্দীব্যাপী ন্যূনতম গৌরবের সহিত কার্য্য চালাইয়া আজ যে বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানগুলি যে বোনাস ঘোষণা করিতে পারিল না অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল কোম্পানীগুলি তাহা অনায়াসে ঘোষণা করিয়া ঢাকঢোলে চারিদিক আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। কোন সুবিখ্যাত বীমাবিদ লিখিয়াছিলেন—

" It is one thing to declare a bonus and it is another thing to pay the same"

আগামী সংখ্যায় এবিষয় আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

* * * *

পঞ্চনদে শিল্পপ্রতিষ্ঠার প্রবর্ত্তক, স্বজনবৎসল স্বদেশপ্রেমিক শ্রীযুত লালা হরকিষণ লাল কলিকাতায় বাংলাদেশের কেন্দ্র অপিস পরিদর্শন করিতে আসিয়াছেন। চিত্তরঞ্জন এভিনিউর উপর প্রসাদোপম মনোরম অট্টালিকা ভারতের বিস্তৃত কার্য্যাবলীর নিদর্শন দিতেছে। আমরা আশাকরি ভারত আত্মকলহ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া উত্তরোত্তর দেশসেবার গৌরব অর্জ্জন করিবে।

ভারতের শিল্পোন্নতি *

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

বিভিন্ন প্রদেশগুলির মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা বং শিল্প ও অর্থনৈতিক চুক্তির বিষয়ে আমি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। অধুনা সাম্রাজ্যের পণ্যকে সুবিধা প্রদান এবং ডোমিনিয়নগুলির মধ্যে প্যাক্ট ও চুক্তি করার কথা প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায় এই সময়ে আমি প্রস্তাব করি যে, ভারতের প্রদেশগুলির মধ্যেও অর্থনৈতিক ব্যাপারে একটা চুক্তি হইতে পারে। এক প্রদেশে যে জিনিষ প্রস্তুত হয় অথবা যে কাঁচা মাল উৎপন্ন হয়, অন্য প্রদেশে তাহা হয় না। সুতরাং ভারতের সেই প্রদেশ কেন ভারতের অপর প্রদেশের উৎপন্ন দ্রব্য ও কাঁচা মালকে সুবিধা দিবে না ? ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যগুলির মধ্যে একটি "অর্থনৈতিক চক্র" গঠিত হউক। অধুনা ভারতবর্ষের রাজনৈতিক যুক্তরাষ্ট্র গঠনের কাজ চলিতেছে। একটি অর্থনৈতিক যুক্তরাষ্ট্র গঠন করাও অসঙ্গত হইবে না। আপাততঃ এরূপ অর্থনৈতিক যুক্তরাষ্ট্র হয়ত গবর্ণমেণ্টের অনুমোদন পাইবে না। তাহা না হইলেও কংগ্রেসের ন্যায় এই প্রতিষ্ঠানের দ্বারা অনেক উপকার হইতে পারে এবং আমি আশা করি যে, ভবিষ্যতে একদিন প্রকৃত অর্থনৈতিক যুক্তরাষ্ট্রই গঠিত হইতে পারিবে। বলিতে গেলে ভারতবর্ষ একটী মহাদেশ। শীঘ্রই ইহার প্রদেশগুলিতে স্বায়ত্তশাসন প্রবর্ত্তিত হইবে। এ সময়ে বেসরকারীভাবে বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে একটী অর্থনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হইলে সমগ্র ভারতের শিল্পোন্নতি এবং আর্থিক উন্নতির সাহায্য হইবে। আমি এমন দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারি যে, বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে সহযোগিতার অভাবে কোন কোন প্রদেশ বিশেষভাবে

ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। আমি অবশ্য রাজনীতিক অথবা অর্থনীতিক নহি। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে আমার মনে এই প্রস্তাব উদিত হইয়াছে। বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণ এবিষয়ে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

এস্থলে আমি আর একটি কথা বলিতে চাই। প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসন সম্পর্কে আমার কতকগুলি সংশয় আছে। এতদ্বারা প্রদেশগুলির মধ্যে ঈর্ষার ভাব প্রবল হইতে পারে। কার্য্যতঃ তাহা লইলে ভারতের জাতীয় জীবনের অপূরণীয় ক্ষতি হইবে এবং বিদেশী বণিকদের সুবিধা হইবে। প্রত্যেক প্রদেশই নিজের স্বার্থরক্ষার চেষ্টা করিবে, ইহাতে অবশ্য অন্যায় কিছুই নাই। তবে কোন কোন সময়ে নিজের কোন ক্ষতি না করিয়া প্রতিবেশী অপর প্রদেশের উপকার করাও তাহার কর্ত্তব্য। তাই আমি আন্ত-প্রাদেশিক অর্থনৈতিক চুক্তি ও স্বদেশী প্রদর্শনীর প্রস্তাব সমর্থন করি।

জাতীয় প্রদর্শনীর প্রস্তাবঃ—আজকাল নানা স্থানেই প্রদর্শনী হইতেছে। এই সম্পর্কে আমার একটু বক্তব্য আছে। স্বদেশী প্রদর্শনী করা সম্পর্কে একটি সুনিয়ন্ত্রিত পরিকল্পনা করা আবশ্যক। আমি দেখিতেছি, আজকাল একই সময়ে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে একাধিক প্রদর্শনী হইতেছে। বিশিষ্ট ফার্ম্মগুলির ইহাতে অসুবিধা হয়। কারণ তাহারা একই সময়ে ৬৭টি প্রদর্শনীতে জিনিষপত্রাদি পাঠাইতে বাধ্য হয় শিল্পীগণের পক্ষে ইহা বড়ই অসুবিধার কথা। ইহাতে প্রদর্শনীর উদ্দেশ্যও সম্যকরূপে সফল হয় না। আমি প্রস্তাব করি, কংগ্রেসের ন্যায় পালাক্রমে এক একবার এক এক প্রদেশে নিখিল ভারত স্বদেশী প্রদর্শনী করা হউক। সকল প্রদেশ মিলিয়া এই প্রদর্শনীর সাহায্য করিবে। কংগ্রেসের ন্যায় ইহা একটী জাতীয় অনুষ্ঠান হওয়া চাই।

তারপর ইচ্ছা করিলে প্রাদেশিক ও জেলা সম্মেলনের ন্যায় প্রাদেশিক ও জেলাপ্রদর্শনীও করা যাইতে পারে। তবে নিখিল ভারত প্রদর্শনী একটিই হইবে। প্রত্যেক বৎসর ইহার অনুষ্ঠান করিবার দরকার নাই। কংগ্রেসের এক সঙ্গে ইহা করাও সঙ্গত নহে। কারণ কংগ্রেসের সময় রাজনীতি লইয়া সকলেই বিশেষ ব্যতিব্যস্ত থাকেন। তখন অনেকেই প্রদর্শনীর প্রতি তেমন মনোযোগ দেন না।

বাঙ্গলার প্রচীন শিল্পঃ—এককালে ভারতবর্ষ শিল্পোন্নতির চরম শিখরে উঠিয়াছিল। কিন্তু আজ আমরা অন্যান্য দেশের পশ্চাতে রহিয়াছি।

লর্ড ক্লাইভ পার্লামেন্টের এক কমিটির নিকট সাক্ষ্যদান কালে বলেন---"মুর্শিদাবাদ নগরী লণ্ডনের মতই সুবিস্তৃত, জনসঙ্কুল ও সম্পন্ন। পার্থক্যমাত্র ইহাই যে লণ্ডন অপেক্ষা মুর্শিদাবাদের লোক অধিকতর ধনী।" আজ মুর্শিদাবাদের সেই সম্পদের চিহ্নমাত্র নাই। প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে ঢাকা সহরের বাণিজ্য সমৃদ্ধি ছিল প্রায় ১ কোটী টাকার। ঢাকার জনসংখ্যা ছিল দুইলক্ষ। ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে ৩০ লক্ষ টাকার ঢাকাই মসলিন বিলাতে চালান যায়, আর ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে সমস্তই লুপ্ত। যাহারা ধনী ছিল তাহারা দারিদ্র্যের কষাঘাত সহ্য করিতে লাগিল।

সপ্তদশ শতাব্দীর পরিব্রাজক বার্নিয়ার বাঙ্গালার রেশম শিল্প সম্বন্ধে বলে,—"বাঙ্গালায় এত তুলা ও রেশম যে, মনে হয় মাত্র হিন্দুস্থানের নহে, মাত্র মোগল সাম্রাজ্যের নহে, বঙ্গদেশ, প্রতিবেশী রাজ্যসমূহ এমন কি ইউরোপেরও ভাণ্ডারী।" টাভের্নিয়র বলেন—"বাঙ্গালা রাজ্যের এক পল্লী কাশিমবাজার, প্রতি বৎসর দুই হাজার গাঁইট রেশম রপ্তানি করে। ইহার এক এক গাঁইটের ওজন প্রায় ৫০ সের।" আজ মালদহ ও মুর্শিদাবাদের রেশম বাণিজ্য একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

টেলর ঢাকার পূর্ব্ব সমৃদ্ধির কথা বলিতে গিয়া বলিয়াছেন—"মেয়েরা অবসর সময়ে সূতা কাটিত। ইহাতে জেলার সর্ব্বস্তরের লোক কাজ পাইত। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে যখন জেলায় সর্ব্বপ্রথম বিলাতী সূতার আমদানী হইল তখন হইতেই এই শিল্প আহত হয়। ১৮২৮ খৃষ্টাব্দ হইতে এই শিল্প অবনতির মুখে যাইতে থাকে।

দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনে প্রদর্শনীর প্রয়োজনীয়তা আছে তাহা স্বীকার করি, কিন্তু অনেক সময় ইহার মূল্য অতি রঞ্জিত করিয়া বলা হইয়া থাকে। গত দশ

বৎসরের অভিজ্ঞতা হইতে আমার মনে হয় প্রদর্শনী যে শিল্প বাণিজ্যের সহায়ক সে কথাটা ভুলিয়া যাইয়া আমরা ইহাকেই উদ্দেশ্য করিয়া তুলিয়াছি। প্রদর্শিত দ্রব্যাদি দেখিয়া একথাই মনে হইয়াছে যে, আমাদের গন্তব্য স্থান এখনও বহু দূর। এক বস্ত্র শিল্প ভিন্ন অন্যান্য সমস্ত ব্যাপারে আমরা বহু পশ্চাতে পড়িয়া আছি।

কুটীর শিল্পের উপযোগিতা ঃ—কিন্তু একটা কথা আছে। শিল্পবাণিজ্য ভাল কিন্তু কারখানাজাত দ্রব্যের বহুল উৎপত্তির ফলে আজ যে ইয়োরোপ এবং আমেরিকায় কি দারুণ দারিদ্রের সৃষ্টি হইয়াছে তাহাও বিস্মৃত হইতে পারি না। উৎপাদন ব্যাপারে বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্য গ্রহণ করায় সেখানে যন্ত্র শ্রমজীবীর স্থান পরিগ্রহ করিয়াছে। আমেরিকার শ্রমিক কমিশনার তাঁহার রিপোর্টে বলিয়াছেন যে, যন্ত্র আমদানীর পূর্ব্বে যে কাজ সম্পন্ন করিতে দুই কোটি দশ লক্ষ লোক লাগিত আজকাল লাগে মাত্র ৪০ লক্ষ লোক। প্রোফেসর এক সভী আধুনিক বাণিজ্য সম্বন্ধে মন্তব্য করিতে যাইয়া বলেন যে, আজ আর ভূমিজাত শস্যাদির অভাবে দুর্ভিক্ষ হয় না, প্রাচুর্য্যের মাঝখানে বসিয়া লোক অনাহারে মারা যাইতেছে। আমেরিকায় যে কি মর্ম্মান্তিক দারিদ্র্য বিরাজ করিতেছে তাহার সম্বন্ধে দু' একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তির বর্ণনা হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি, মিঃ ফেনার ব্রকওয়ে লিখিয়াছেন :-ব্যক্তিগত ধনতন্ত্রবাদের পরিণতি যে কত শোচনীয় হইতে পারে, তাহার পরিচয় এক আমেরিকায় গেলে মিলিতে পারে। সেখানে একদিকে দেখা যায় গগনস্পর্শী সুরম্য হর্ম্ম্যরাজি আবার হয়তো দেখা যায় তারই ছায়াতলে চাকুরীহীন নিরন্ন লোকেরা কোন-ক্রমে একটু চালা তুলিয়া মাথা গুঁজিয়া আছে। মনোরম মোটর গাড়ী চাপিয়া বিলাসী নরনারীর দল হোটেলে যাইয়া একদিনকার খানায় শত শত পাউণ্ড উড়াইয়া দিতেছে আবার তারই কিয়দ্দূরে যুবক, বৃদ্ধ, প্রৌঢ় সর্ব্ব-বয়সের নরনারী এক টুকরা রুটির জন্য মিনতি করিয়া বেড়াইতেছে। পনেরো শিলিং ব্যয় করিলে হোটেলে রাজার আরামে থাকা যাইবে, বিলাস ও স্বাচ্ছন্দ্যের সর্ব্ব-প্রকার সাজসরঞ্জামই মিলিবে কিন্তু এই সহরেই দরিদ্র পল্লীতে নরনারী ঠাসাঠাসি হইয়া প্রত্যেক ঘরে বসবাস করে। জর্জ্জ ওয়াসিংটন ব্রিজ তৈরী করিতে কত টাকা ব্যয়িত হইয়াছে আর তার গঠনে কত নিপুণতা প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু সহরের পর সহরে দরিদ্রগণ কি কুৎসিৎ কুটিরেই না বাস করে। এইরূপ বৈসাদৃশ্য সর্ব্বত্র আমেরিকায় শস্য এত প্রচুর পরিমাণে জন্মায় যে ক্রেতার অভাবে তাহা মাঠে পচিয়া যায় অথচ প্রত্যহ সংবাদপত্রে দেখা যাইবে যে বহু লোক দারিদ্র্য-যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া আত্মহত্যা করিতেছে। দক্ষিণ দিকের রাজ্যগুলিতে বস্তা বস্তা তুলা অবিক্রীত পড়িয়া থাকে আর ডেট্রয়েট সহরে পাঁচ হাজার বালক বালিকা বস্ত্রাভাবে বিদ্যালয়ে যাইতে পারে না।

কিছুদিন আগে 'ষ্টেট্‌স্‌ম্যান' কাগজেও অনুরূপ সংবাদ বাহির হইয়াছিল যে নিউইয়র্ক সহরের এক তৃতীয়াংশ লোক আজকাল বেকার ইউরোপ এবং আমেরিকায় মোট বেকারের সংখ্যা ন্যূনাধিক তিন কোটি। আমাদের বাঙ্গলাদেশেও দেখিতে পাই যে দারিদ্র ও প্রাচুর্য্য যেন হাত ধরাধরি করিয়া চলিয়াছে। পল্লীগ্রামে চালের মণ একটাকা চারি আনা। যারা খাটিয়া খায় তাহারা এত অল্প দাম সত্ত্বেও চাউল কিনিবার পয়সা জুটাইতে পারে না। আমাদের দেশের পক্ষে গৃহশিল্পের অবনতি যে কতদূর অনিষ্টকর ইহা হইতেই প্রতীতি হইবে। আধুনিক ব্যবস্থার আমদানীর ফলে পল্লীবাসীগণ দারুণ বিপদগ্রস্ত। কেবল মাত্র পাশ্চাত্যের অনুকরণে বৈদ্যুতিক শক্তি প্রভৃতির সাহায্যে উৎপাদন ব্যবস্থা করিলেই দেশবাসি-গণের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধিত হইবে না।

আপনারা মহাত্মা গান্ধী প্রবর্ত্তিত খদ্দর আন্দোলনের কথা নিশ্চয়ই শুনিয়াছেন। তাঁহার উদ্দেশ্য, ধ্বংসপ্রায় গৃহশিল্পের পুনরভ্যুত্থান করাইয়া পল্লীবাসী জনগণের শোচনীয় অবস্থার উন্নতি সাধন করা। আমাকে দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে এই আন্দোলন আশানুরূপ সাফল্য লাভ করে নাই।

অনাবশ্যক বিলাস ঃ—এই উপলক্ষে আমি আর একটি কথা বলিতে চাই। বর্ত্তমানে বিলাসের সামগ্রী

উপর জনসাধারণের খুবই আকর্ষণ দেখা যাইতেছে। আমি ইহার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করি।

জগতের নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদির সম্বন্ধে সাধারণের রুচির ঘোর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। জীবন ধারণের জন্য খাদ্য বস্ত্রাদি যাহা প্রাথমিক প্রয়োজন তৎসমুদায়ের উপর মানুষের লক্ষ্য কমিয়া গিয়াছে আর তৎস্থলে সখ মিটাইবার জন্যই সাধারণের আগ্রহ বাড়িয়াছে বেশী। যাহা আসল প্রয়োজন তাহা পশ্চাতে ঠেলিয়া দিয়া মানুষ চিত্তবিনোদনের অবসর খুঁজিতেই আজ ব্যস্ত। বিলাসের সামগ্রী - তাহা আবার খাঁটীও নহে—সকলের উপরই আগ্রহ বেশী এবং তাহা চাইই। জগতের উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে মোটরকার, গ্রামোফোন, রেডিও, বৈদ্যুতিক সাজসরঞ্জাম, টেলিফোন, ক্যামেরা প্রভৃতি দ্রব্যের উপর চাহিদাই খুব বেশী দেখা যায়। আমেরিকার সাধারণ পরিচ্ছদ কেহ ব্যবহার করে না তূলার বস্ত্র ত নহেই। তাহারা সিল্ক ব্যবহার করিতে চায়, কিন্তু খাঁটী সিল্কের স্থানে তাহারা নকলটাই চায় বেশী, আর এই কারণেই তূলার বাজারের পড়তি এত বেশী। বস্তুতঃ জনসাধারণের মধ্যে গণতান্ত্রিক ভাবের প্রসারের ফলেই ঐরূপ পরিণতি ঘটে। জনসাধারণ বিধিনিষেধের ভারে ক্লান্ত হইয়া জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য খুঁজিয়া বেড়ায়।

জীবন যাপনের সাধারণ দায়িত্বজ্ঞান হ্রাস, মিতব্যয়িতার অভাব এবং আমাদের জীবন ক্ষণস্থায়ী হঠাৎ এইটি আবিষ্কার করার ফলে মানবসমাজের মধ্যে চিত্তবৃত্তি চরিতার্থের জন্য এরূপ ঘোরতর আন্দোলন দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছে। এই বিষয়টীতে আমেরিকা ও ইউরোপের জাগরণ খুব বেশী করিয়া অনুসরণ করিতেছে এসিয়া ও আফ্রিকা।

আমেরিকার রপ্তানি মালের মধ্যে মোটরকার, সিনেমা ফিল্ম, রেডিও, টাইপরাইটার, সেলাইয়ের কল প্রভৃতির চাহিদা খুবই বেশী। ঐগুলির ফ্যাসান মাফিক তৈরী করা হয় বটে কিন্তু দীর্ঘকাল টিকে না।

দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের দরিদ্র দেশেও ঠিক ঐরূপ মনোভাবের দ্রুত প্রসার ঘটিতেছে।

স্বদেশী দ্রব্যের উপর জগদ্ব্যাপী আকর্ষণ খুবই বাড়িতেছে। এ বিষয়ে গ্রেটব্রিটেনের উদাহরণ বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। "বাই ব্রিটিশ" একথাটী রাজকুমার হইতে একটা চাষার মুখেও শুনা যায়। প্রত্যেকটি দেশের অধিবাসিরাই আজ স্ব স্ব দেশজাত দ্রব্যাদি ব্যবহারের জন্য উন্মুখ কেবল ভারতবাসীকি এই বিষয়ে সকলের পশ্চাতে পড়িয়া থাকিবে? আমি আমার দেশবাসী সকলকে বিশেষরূপে অনুরোধ করিতেছি তাঁহারা যেন স্ব স্ব আলস্য ত্যাগ করিয়া স্বদেশী ব্যবহারে উঠিয়া পড়িয়া লাগেন। জগৎ দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছে—আজ অলস হইয়া বসিয়া সেই দৃশ্য দেখিলে আমাদের চলিবে না। আজ যে উৎসাহ লইয়া আপনার এই প্রদর্শনীটি খুলিয়াছেন ঐ উৎসাহ দ্বিগুণতর হইয়া যেন দেশের সম্পদ বহু গুণে বৃদ্ধি করিতে পারে ইহাই আমার আশা।

* ১লা মার্চ্চ তারিখে দিল্লীতে নিখিল ভারত স্বদেশী শিল্প প্রদর্শনীর উদ্বোধন উপলক্ষে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের বক্তৃতা।

পরলোকে কিশোরীলাল ঘোষ

উদীয়মান সংবাদপত্রসেবী ও শ্রমিক সংগঠনকারী কিশোরীলাল ঘোষ আর ইহলোকে নাই। দীর্ঘকাল মীরাট মামলায় রাজবন্দী থাকিয়া সসম্মানে সর্ব্ব অভিযোগ হইতে মুক্তিলাভ করার অব্যবহিত পরেই মহাকালের আহ্বানে মাত্র ৪২ বৎসর বয়সেই তিনি পরকালের যাত্রী হইলেন। কিশোরীলাল ইংরাজীতে অনারস্ সহ বি-এ পাশ করেন—ইকনমিকসে এম-এ পাশ করেন। বাল্য-জীবন হইতেই কিশোরীলাল চমৎকার ইংরাজীতে কথোপ-কথন করিতে পারিতেন। ওকালতী পাশ করিয়া কোর্টেও তিনি যাইতেন বটে কিন্তু কর্ম্মজীবনে সংবাদপত্র সেবাকেই বিশেষ ভাবে অবলম্বন করিয়াছিলেন। ইনি প্রথমে সার্ভাণ্ট, তার পরে অমৃতবাজার, পরে ফরওয়ার্ড এবং সর্ব্বশেষে আবার অমৃতবাজারে যোগদান করেন। সকল পত্রেই ইনি সহযোগী সম্পাদকরূপে কাজ করিয়াছেন। —এবং অসংখ্য সম্পাদকীয় লীডার ও প্যারা লিখিয়াছেন। তাঁহার ইংরেজী লেখার ভঙ্গি অতি সুন্দর ও সুযুক্তিপুর্ণ ছিল। এই সময়েই তিনি শ্রমিক আন্দোলনে যোগ দেন, শ্রমিকদের অবস্থা নিজে বিশেষ ভাবে দেখিয়া তিনি তাহাদের উন্নতির চেষ্টা করিতেছিলেন ইহাই জানিতাম। কিন্তু কোনরূপ বৈপ্লবিক আন্দোলনে তিনি ছিলেন ধারণা হয় নাই। এই সময়ে মীরাট মামলায় আসামীরূপে তিনি ধৃত হন। পরে শুনিলাম মিঃ স্প্রাটের বৈদেশিক চিঠি-পত্র তাঁহার ঠিকানায় আসিত বলিয়াই পুলিস তাঁহাকে সন্দেহ করিয়াছিল। কিশোরীলাল শ্রমিক ও কম্যুনিষ্ট আন্দোলন সম্বন্ধে যথেষ্ট পুঁথিপত্র পাঠ করিয়াছিলেন এবং এ সম্বন্ধে তিনি একজন বিশেষজ্ঞ ছিলেন বলিয়া মীরাট মামলার রথী-মহারথীগণও তাঁহার সুখ্যাতি করিয়াছেন শুনিয়াছি। এই মামলার পর বাঁচিয়া থাকিলে কিশোরীলাল সমধিক বিখ্যাত হইবার সুযোগ পাইতেন। কিশোরীলাল আমাদের বাল্যবন্ধু—১৯১০ সাল হইতে আমাদের পরিচয় ও বন্ধুত্ব হয়। তাহার পর মাঝে মাঝে কোন সময় মত বিরোধ হইলেও বন্ধুত্ব ক্ষুণ্ণ হয় নাই। কর্ম্মক্ষেত্রে আমরা বিপরীত পথে কোন সময়ে চলিলেও কাহারো পথ কাহারো অজ্ঞাত ছিল না। কর্ম্ম জীবনে প্রবেশ করিয়া ও প্রবেশের পূর্ব্বে আমরা বহুদিন ও রাত ঘণ্টার পর ঘণ্টা একসঙ্গে কাটাইয়াছি—নানা বিষয়ে কয় বন্ধুতে মিলিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলাপ করিয়াছি! কখনো বা হয়তো খেয়ালের বশে রাত্রিযোগে হাওড়া ষ্টেশনে ট্রেণে চাপিয়া সমস্ত রাত্রি বর্দ্ধমানের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া সকাল ৬টায় কলিকাতা ফিরিয়াছি। আজ আমরা একজন বড় অন্তরঙ্গ বন্ধু ও দেশবাসী একজন বিশেষ কর্ম্মী হারাইলেন। কিশোরীলাল আমাদের বন্ধু সু-সাহিত্যিক শ্রীযুত ফণীন্দ্র নাথ পালের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার দু'টি শিশু সন্তান আছে। আজ কিশোরীলালের মৃত্যুতে আমরা বিশেষ বেদনা অনুভব করিতেছি—তাঁহার আত্মীয়-স্বজনের সহিত সমবেদনা জানাইতেছি। ভগবান তাঁহার আত্মার মঙ্গল করুন।

পরলোকে রবীন্দ্রনাথ মৈত্র

সু-সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ মৈত্রও আর ইহলোকে নাই। মাত্র ৩৬,৩৭ বৎসর বয়সে তিনি পরলোকের যাত্রী হইলেন। ৭।৮ বৎসর মাত্র পূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। হিন্দু সংগঠনেও ইনি বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। তাঁহার অনেক গল্পে দেখা যায় সাম্প্রদায়িকতার মূল কোথায়। শেষ দিকে ইনি ব্যঙ্গ ও রস রচনায় বিশেষ খ্যাতি লাভ [illegible]

বারের চিঠিতে দিবাকর শর্ম্মা নামের রচনা ও আনন্দবাজারে লিখিত দধিকর্দ্দম বিশেষ আদৃত হয়। মানময়ী গার্লস্ স্কুল নামে তাঁহার একখানি সুন্দর নাটিকাও ষ্টারে অভিনীত হইতেছে। কলিকাতা হইতে রবীন্দ্রনাথ রুগ্না মাতাকে দেখিবার জন্য রংপুর মাহিগঞ্জে গিয়াছিলেন। সেই খানেই একদিনের অসুখে তাঁহার মৃত্যু হয়। আজকাল রবীন্দ্রনাথ অনেকটা সাহিত্যের উপর নির্ভর করিয়াই কলিকাতা বাস করিতেছিলেন। তাহাতে অনেক সময়ই তাঁহাকে অর্থাভাবে থাকিতে হইত মনে হয়। ষ্টার থিয়েটার একটা বেনিফিট নাইটের আয়োজন করিয়া তাহাতে প্রাপ্ত অর্থ রবীন্দ্রনাথের পরিবারবর্গকে দিলে ভাল হয়। আমরা রবীন্দ্রনাথের আত্মীয়স্বজনকে তাঁহাদের গভীর শোকে সমবেদনা জানাইতেছি ও ভগবানের কাছে তাঁহার আত্মার কল্যাণ কামনা করি।

কর্পোরেশনের বাজেট

বর্ত্তমান মাসে নানা প্রকার সাধারণ প্রতিষ্ঠানের আয়-ব্যয়ের খসড়া জনসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হইয়াছে। এই খসড়াগুলির প্রতি দৃষ্টি রাখিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এই বৎসরেও অর্থকৃচ্ছতার কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই। সর্ব্বপ্রথমই কলিকাতা করপোরেশন বাজেট আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কয়েক বৎসর হইতে করপোরেশনের কর্ত্তৃপক্ষগণ যে বাজেট পেশ করিয়া আসিতেছেন উহাতে আয়-ব্যয়ের সমতা রক্ষা করিতে পারিতেছেন না। ফলে করপোরেশনের যে রিজার্ভ ফণ্ড ছিল উহা হইতে অর্থ লইয়া কোনরূপে উহার ব্যয় সঙ্কুলান করিয়া আসা হইতেছে। বর্ত্তমান বৎসরে হিসাবে দেখান হইয়াছে, ব্যয় ২ কোটী ৬৯ লক্ষ টাকা আয় ২ কোটী ৬০ লক্ষ পাঁচ হাজার টাকা, অর্থাৎ প্রায় ৯ লক্ষ টাকা ঘাটতি পড়িয়াছে। করপোরেশনের আয় কিরূপ কমিয়া যাইতেছে নিম্নে একটী তুলনামূলক তালিকা দেওয়া গেল।

করের সংজ্ঞা	১৯৩৩-৩৪	১৯৩২-৩৩
সাধারণ বাড়ীর ট্যাক্স	১,৯৪,৯৬,০০০	১,৮৬,০০,০০০
দোকানদার ও ব্যবসাদারদের উপর নির্দ্ধারিত কর	১২,৯৮,০০০	১৩,১০,০০০
মটর গাড়ীর ট্যাক্স	৪,০০,০০০	৪,৫০,০০০
বাজার শুল্ক	১৫,২৩,০০০	১৫,২০,০০০
ট্রাম, টেলিফোন ও ইলেকট্রীক কোম্পানী প্রদত্ত কর	৯৭,৯০০	৯৭,০০০
জমি বিক্রয় হেতু অর্থ	২,৫১,৩০০০	২,৫২,৩০০
সরকার কর্ত্তৃক প্রদত্ত অর্থ	৭৮,৬০০	১৪৩,২০০০
শ্মশান ও কবরস্থান হইতে সংগৃহীত অর্থ	২৯,০০০	২৬,৫০০
গরু গাড়ীর লাইসেন্স	৭৫,২০০	৫৩,৯০০
ঘোড়া গাড়ীর লাইসেন্স	৪,০০০	১,০০০
জল বিক্রয় অর্থ	৫,৭২,০০০	৫,২০,০০০
মৃত শব ইত্যাদি	৫১,০০০	৬০,০০০
ফাইন ইত্যাদি	৯৭,০০০	১,০২,০০০
সঞ্চিত অর্থের সুদ	৩,০০,০০০	৪,০০,০০০
কর্ম্মচারীগণের যোগদানের জমা অর্থ	৩,০০০	৩,০০০
খেসারৎ	৮০০০	৫০০০
পুরাতন জিনিষ বিক্রয় লব্ধ অর্থ	৪৫,০০০	৪৫,০০০
মুর স্কিমের জমা অর্থ	১,৫৫,০০০	—
নানাবিধ জমা	১১,৯২,১০০	১০,৫৫,২০০
	২,৬০,০৫,৩০০	২,৫১,২১,৬০০

পূর্ব্বোক্ত তালিকাটীর প্রতি দৃষ্টি দিলে আমরা দেখিতে পাই বাড়ীর ট্যাক্স অধিক পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। গত মহাযুদ্ধের সময় বাড়ীর টাক্স অতি অসম্ভব রূপে বৃদ্ধি পায়। দ্বিতলের একখানি গৃহের ভাড়া সাধারণতঃ মাসিক ১২ টাকা ও একতলায় উহার ভাড়া ৮ টাকা হইতে ১০ টাকা ধার্য্য করা হইত। ইহাতে সাধারণের যে কতদূর কষ্ট হইয়াছিল তাহাকে বলাই নিষ্প্রয়োজন। বাঙ্গালী জাতির মাসিক আয় গড় পড়তা ১০০ টাকা ধরিয়া লইলেও বসবাসের জন্য চারিটী ঘর ভাড়া করিলে তাহাকে ৩০ টাকার উপর বাড়ী ভাড়া দিতে হয়, সুতরাং তাহার দুরবস্থা হইবে না কেন। এখন বাড়ীর ট্যাক্স কমিয়া যাওয়ার সহিত বাড়ী ভাড়ারও হ্রাস হওয়া উচিত। কিন্তু সেরূপ হইতেছে বলিয়া

মনে হয় না। বড় বড় বাড়ীর ভাড়া কিছু হ্রাস পাইয়াছে সত্য, কিন্তু ছোট বাড়ীর ভাড়া পূর্ব্ববৎ না থাকিলেও ট্যাক্সের অনুপাতে কমে নাই ইহা খুবই সত্য। আমরা করপোরেশনকে অনুরোধ করিতেছি যে তাঁহারা যে সমস্ত ভাড়াটিয়া বাড়ীর ট্যাক্স কমাইয়া দিতেছেন, সেই সব বাড়ীর ভাড়া ঠিক ঐ ট্যাক্সের অনুপাতে কমান হইতেছে কিনা যেন সন্ধান লন। ইহাতে তাঁহাদের যাহা ব্যয় হইবে আয়ের অনুপাতে তাহা বিশেষ অধিক হইবে বলিয়া আমাদের মনে হয় না, অথচ সাধারণ গৃহস্থের বিশেষ উপকার হইতে পারে।

বাংলা সরকারের বাজেট

বাংলা সরকার তাঁহার বজেট পেশ করিয়াছেন। এই বৎসরে বাংলার বাজেটের নূতন বিশেষত্ব কিছুই নাই, সেই পুরাতন দুঃখের কথাই আছে! ১৯২১ সালে যখন শাসন সংস্কার প্রদান করা হয় তখন মেষ্টনী ব্যবস্থার ফলে বাংলাকে যে সমস্ত রাজস্ব প্রদান করা হয় তাহার পরিমাণ ছিল মাত্র ১০ কোটী টাকা। নানা প্রকার ব্যয় সঙ্কোচ করিয়াও বাংলার সরকারী ব্যয় ১১ কোটী টাকার কম করিতে পারা যায় নাই। সুতরাং প্রথম হইতেই বাংলার সরকারী বাজেটে ঘাট্তি ছিল। তাহার পর আর্থিক কৃচ্ছতা উপস্থিত হওয়ায় বাংলা সরকারের আয় কমিয়া যাইয়া ৯ কোটী টাকায় উপস্থিত হয় অথচ ব্যয় নানা কারণে বৃদ্ধি পাইয়া ১২ কোটী টাকায় দাঁড়ায়। আমোদ-কর ইত্যাদি স্থাপন ও কোর্ট ফি বৃদ্ধি করিয়াও বাংলা তাহার আয়-ব্যয়ের সমতা রক্ষা করিতে পারিল না, সুতরাং পূর্ব্ব সঞ্চিত অর্থ হইতে তাহার অতিরিক্ত ব্যয়ের ভার বহন করিয়া আসা হইতেছে। বর্ত্তমান বৎসরে বাংলার বাজেটে প্রায় দুই কোটী টাকা ঘাট্তি দেখান হইয়াছে। এখন কথা হইতেছে যে এই ঘাট্তি দূর করিবার জন্য বাংলা সরকার কি চেষ্টা করিতে পারেন? বাংলার সরকারের প্রধান আয়ের পন্থা, ভূমির রাজস্ব, কোর্ট-ফী ও আবগারী বিভাগ। ভূমির রাজস্ব চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অনুযায়ী চিরস্থিরীকৃত হইয়া আছে, উহার পরিমাণ প্রায় বার্ষিক তিন কোটী টাকা। উহা কোনরূপেই বৃদ্ধি করিতে পারা যাইবে না। আবগারী বিভাগের আয় নন-করপোরেশনের যুগ হইতে কমিয়াই আসিতেছে। আর্থিক কৃচ্ছতা উৎকট ভাবে আত্ম প্রকাশ করায় উহা আরও কমিয়া যাইবে। বাংলার জমিদার ও প্রজারাই কোর্ট-ফি দিয়া থাকে। তাহাদের আয়ই যখন কমিয়া যাইতেছে তখন তাহাদের মামলা করিবার প্রয়োজন ও প্রবৃত্তিও যে হ্রাস পাইবে তাহাও স্বাভাবিক। কাজেই দেখা যাইতেছে বাংলার রাজস্ব শুধুই স্থিতিশীল তাহা নয় উহার পরিমাণ দিন দিন হ্রাসই পাইবে, উহার বৃদ্ধি সংসাধন কোন দিন করা যাইতে পারিবে না। অথচ অন্যান্য প্রদেশগুলির তুলনায় বাংলা প্রদেশ জনসংখ্যায় ও শিক্ষা-দীক্ষায় অনেক অগ্রবর্ত্তী। সেই সব প্রদেশ মেষ্টনী ব্যবস্থা ফলে অনেক অধিক টাকা রাজস্বের অধিকারী হইয়াছে। মাদ্রাজের বার্ষিক আয় প্রায় ১৭ কোটী টাকা, বোম্বায়ের ১২ কোটী, যুক্ত-প্রদেশের ১১ কোটি টাকা। এই জন্যই নানাপ্রকার চেষ্টা করিয়াও নূতন শাসন সংস্কার বাংলায় বিশেষ কার্য্যকরী করা যাইতে পারে নাই। অবশ্য এ কথা নিশ্চয়ই স্বীকার্য্য, যে শাসন ব্যয় কমান যাইতে পারে। ব্যয়-সঙ্কোচ কমিটীর প্রস্তাব অনুযায়ী দেড় কোটী টাকা শাসন ব্যয় কমাইলেও আয়-ব্যয়ের সমতা রক্ষা হয় নাই, সুতরাং অন্য উপায়ের ব্যবস্থা করা খুবই প্রয়োজন হইতেছে।

স্যার নৃপেন্দ্র নাথ সরকার গত গোল টেবিল বৈঠকে বাংলার তরফ হইতে এই বিষয়টী বিলাতী সরকারের নিকট জ্বলন্ত ভাষায় বর্ণনা করিয়াছিলেন। শুনা যাইতেছে যে নূতন শাসন সংস্কার প্রদান করিবার সময় বাংলাকে নাকি ৩ কোটী ৭৫ লক্ষ টাকা জুট ডিউটী বা পাট হইতে গৃহীত শুল্ক দেওয়া হইবে। সাধারণের অবগতির জন্য এইখানে একটু পূর্ব্ব ইতিহাস দিয়া দিতেছি। আয়করের সমস্ত অংশই কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাপ্য অংশে দেওয়া হয়। তাহার কারণ এইরূপ নির্দ্দেশ করা হয়। মেষ্টন সাহেব বলেন যে কলিকাতা একমাত্র বাংলার বন্দর নহে। কলিকাতা বন্দর হইতে সমস্ত ভারতেরই ব্যবসা-বাণিজ্য হয়, সুতরাং উক্ত বন্দর হইতে যে সমস্ত দ্রব্য প্রেরিত হইয়া অন্যত্র বিক্রীত হয়, তাহা ভারত সরকারেরই প্রাপ্য। এই জন্যই ও জুট-ডিউটী

ভরত সরকারকে প্রদান করা হয়। এই ব্যবস্থার ফলেই আজ বাংলার এই শোচনীয় অবস্থা হইয়াছে। আয়-ব্যয়ের কথা ছাড়িয়া দিলেও পাট হইতে প্রাপ্ত ৩ কোটী, ৭৫ লক্ষ টাকা বাংলা ফিরিয়া পাইলে, বাংলার সরকার শুধুই যে আয়-ব্যয়ের সমতা রক্ষা করিতে পারিবেন তাহা নয়, কিছু অংশ উদ্বৃত্তও হইতে পারে।

ভারতসরকারের বাজেট

কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্ব সচিব স্যার জর্জ্জ সুষ্টার এই-বার একটু সুনাম করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার কার্য্যকাল মাত্র আর একবৎসর আছে। গত কয়েক বৎসর কেন্দ্রীয় সরকারের আয় অপেক্ষা ব্যয়ই অধিক হইয়া আসিতেছিল। বর্ত্তমান বৎসরে তথায় বাকী টাকার উপরে উদ্বৃত্ত দেখানো হইয়াছে। সাধারণে অবশ্য এই ব্যবস্থার বলে তাহাকে যথেষ্টই প্রশংসা করিবে, আমরাও তাঁহার এই কৃতকার্য্যতার জন্য সুখ্যাতি করিতেছি। কিন্তু একথা কি সত্য যে আর্থিক কৃচ্ছতার অবসান ঘটিয়াছে? আমাদের তাহা মনে হইতেছে না। সরকারী ঋণে সুদ হ্রাস করিয়া দিতে পারায় অনেক ব্যয় লাঘব হইয়াছে। তাহার পর প্রয় এককোটী টাকা ব্যয় সঙ্কোচ করা হইয়াছে। এই সমস্ত কারণেই কেন্দ্রীয় সরকারের অবস্থা কতকটা আশা জনক। কিন্তু রেলওয়ে বাজেটের অবস্থা খুবই শোচনীয়। উহার ঘাটতির পরিমাণ প্রায় দশ কোটি টাকা। উভয় বাজেট একত্রিত করিলে ছয় কোটি টাকা ঘাটতিই হয়। এইরূপ বলিবার আমাদের আরও একটা কারণ আছে। আমাদের রপ্তানি দ্রব্যের পরিমাণ হ্রাসই পাইতেছে, স্যার জর্জ্জ সুষ্টার নিজেই বলিয়াছেন যে ১৯১৩—১৪সালের তুলনায় রপ্তানি দ্রব্যের হ্রাসের পরিমাণ প্রায় শতকরা ২৩ ভাগ হ্রাস পাইয়াছে। গত দশ মাসে আমরা ১১০½ কোটী টাকার দ্রব্য রপ্তানি করিয়াছে এবং উহার পরিবর্ত্তে ১১৯½ কোটী টাকার দ্রব্য আমদানী করিয়াছি অর্থাৎ আমাদের আমদানী দ্রব্যের পরিমাণ রপ্তানী দ্রব্যের পরিমাণ অপেক্ষা ১½কোটি অধিক। মাত্র এই অংশটুকু হইলেই আমরা দুঃখিত হইতাম না। সাধারণ নিয়মে ভারতবর্ষের রপ্তানি দ্রব্যের পরিমাণ আমদানী দ্রব্যের পরিমাণ অপেক্ষা প্রায় ২২হইতে ২৫ কোটী টাকার অধিক হওয়া উচিত। কেননা আমরা ইংলণ্ডকে টাকার সুদ, ব্যবসার লাভ, সিভিল সার্ভেন্টদের পেনসন বাবদ ২২ হইতে ২৫ কোটি টাকা হোম চার্জ্জ দিয়া থাকি। এই টাকার পরিবর্ত্তে আমরা কোন পণ্য দ্রব্য প্রাপ্ত হইনা। বর্ত্তমান হিসাবে দেখা যাইতেছে যে রপ্তানি দ্রব্যের পরিমাণ আমদানী দ্রব্যের পরিমাণ অপেক্ষা এককোটী টাকার উপর। পূর্ব্বোক্ত হোস চার্জ্জেস্ উহাতে যোগ দিলে উহার পরিমাণ ২৫.২৬ কোটি টাকায় গিয়া দাঁড়াইবে সার জর্জ্জ সুষ্টার বলিতেছেন এই টাকাটা ভারত তাহার সঞ্চিত সুবর্ণ ভাণ্ডার হইতে প্রদান করিতেছে, সুতরাং ভয়ের কোন কারণ নাই। কিন্তু আমরা তাহা ঠিক মনে করিনা। এখন অর্থ কাহারই সঞ্চিত নাই এবং লোক ক্রমশঃ নিঃস্ব হইয়া যাইতেছে ইহাই আমাদের ধ্রুব বিশ্বাস। বাংলা ও বোম্বাই সরকারের অনুরোধে ব্যাঙ্কের চেকের উপর আবার ষ্ট্যাম্প ফিঃ বসিতেছে। ইহাও আমরা সমর্থন করিতে পারিলাম না। লোকের ব্যাঙ্কের মারফত টাকা পয়সার কারবার করিবার যেটুকু ইচ্ছা হইতেছিল তাহাও ইহাতে হ্রাস পাইবে।

আসন্ন কর্পোরেশনের নির্ব্বাচন

করপোরেশনের নির্ব্বাচন আগত প্রায়। আমাদের দৈনিক ও সাপ্তাহিক সহযোগিগণ এ সম্বন্ধে নানা প্রকার তত্ত্ব প্রকাশ করিতেছেন; আমরা আমাদের মন্তব্য সাধারণ ভাবেই বলিতেছি। দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর তাঁহার শিষ্যমণ্ডলী দুইটী দলে বিভক্ত হইয়া পড়েন। সুভাস বাবু ও তাঁহার ভ্রাতা শরৎ বাবু অধিকাংশ শিষ্যের নেতা হইয়া বড় দলের নেতা হন। শ্রীযুত সেনগুপ্তকে অবশিষ্টাংশ শিষ্যগণের নেতৃত্ব লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে হয়। গত কয়েক বৎসর এই দুই দলের কলহ ও স্বার্থপরতাই আমাদের নাগরিক জীবনের পুরা ইতিহাস। একবৎসর পূর্ব্বে উভয় দলই উভয় দলের নানা প্রকার দোষের ও স্বার্থপরতার তালিকা নানা প্রকার সংবাদ পত্রে প্রকাশ করিয়া দিয়াছিলেন। কলিকাতার করদাতাগণ এই সমস্ত সংবাদ সম্পূর্ণই অবগত আছেন। এখন সময় আসিয়াছে ভাবিবার জন্য। নাগরিক জীবনকে শৃঙ্খলিত করিতে

গেলে নগরের স্বার্থ রক্ষা করিবার জন্য আমাদের সকল প্রকার দলাদলি ও হিংসা পরিত্যাগ করা উচিত। যাঁহারা কাউনসিলার হইতে ইচ্ছুক তাহাদের স্মরণ রাখা উচিত যে তাঁহারা এক মস্তবড় দায়িত্ব স্বেচ্ছায় স্কন্ধে লইতেছেন। নগরের মালিক হইবার ইচ্ছাই তাঁহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়, ইহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। ১৯২৪ সালে যখন দেশবন্ধু নগরবাসীগণকে তাঁহার মনোনীত ব্যক্তিগণকে কাউন্সিলার পদে বরণ করিয়া লইবার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন তখন তাবৎ নগরবাসী তাঁহার আবেদন শিরোধার্য্য করিয়াছিলেন। তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন যে দেশবন্ধু কর্ত্তৃক পরিচালিত করপোরেশনে তাহারা নানা প্রকার সুখ সুবিধা পাইবে। তাহার পর আরও দুইবার নির্ব্বাচন হইয়া গিয়াছে। সাধারণ ভোট দাতাগণ কংগ্রেস কর্ত্তৃক মনোনীত ব্যক্তিগণকেই ভোট দিয়াছিলেন কিন্তু এই নয় বৎসরে তাহারা কি লাভ করিয়াছেন দেখিলে দেখিতে পাইবেন যে তাহারা তাহাদের বিশ্বাসের বিনিময়ে সহরের বর্ত্তমান দুরবস্থা বরণ করিয়া লইয়াছেন। যাঁহারা বর্ত্তমান রাস্তাগুলির উপর লক্ষ্য করিয়াছেন তাহারা দেখিয়া থাকিবেন যে ঐ গুলির অবস্থা কতটা শোচনীয় হইয়াছে। টারমাকাডাম যাহা অন্ততঃ বিশ বৎসর থাকিবার কথা, দুই বৎসর না যাইতেই উঠিয়া যায়। আবর্জ্জনা রাশি রাস্তার পার্শ্বে পড়িয়া পচিতেছে, সময় মত উহা সরাইয়া লইবার ব্যবস্থা করা হয়না। এই জন্যই আমরা ভোটদাতাগণেকে অনুরোধ করিতেছি যে তাঁহারা যাহাদিগকে ভোট দিবেন তাহারা ত তাহাদেরই ওয়ার্ডের লোক একটু ভাল করিয়া বিবেচনা করিয়া যাহাকে ভোট দিবেন স্থির করিতে ক্ষতি কি? ক্যানভাসারদের কথায় কর্ণপাত করিবার কোন প্রয়োজন আছে কি?

চীন জাপান যুদ্ধ

বর্ত্তমান চীন-জাপানের যুদ্ধ লইয়া অনেকেই মাথা ঘামাইতেছেন। চীন জাপানের বর্ত্তমান যুদ্ধ অনেকটা যুদ্ধের অভিনয়—উহা প্রকৃত যুদ্ধ নয়। এইকথা আমরা অনেকবারই বলিয়াছি। জাপানে এখন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শাসনকাল চলিতেছে। এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী তাহাদের আধিপত্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য কলকারখানার মালিক থাকিতে চাহেন। কাজেই তাঁহাদের কাঁচামালের যেমন প্রয়োজন, ঐ কাঁচামালকে পাকামাল করিয়া বিক্রয় করিবার জন্য বাজারেরও সেইরূপ দরকার। মাঞ্চুরিয়ার বিস্তর খনিজ পদার্থ পাওয়া যায়। জাপানে কোন প্রকার খনিজ পদার্থ নাই। এই জন্যই জনহীন মান্চুরিয়া তাহাদের বিশেষ প্রয়োজন। চীন একটু জাগ্রত হইলেও, উহা এখনও সুপ্তভাবেই আছে। উহার বিরাট প্রজাসঙ্ঘ এখনও মূর্খ এবং নিরক্ষর। জাপান এইজন্যই চীনকে তাহার পণ্য দ্রব্যের বিপণী করিতে চাহে। চীনে এখন যে রাজতন্ত্র চলিতেছে সে জনকতক স্বার্থান্বেষীর নিজস্ব বিধান মাত্র। সাধারণ প্রজা এখন অবধি অসাড় অবস্থাই আছে। তবে তথকার ছাত্রসঙ্ঘ জাগিয়া উঠিয়াছে। বলশেভিকগণের সংস্পর্শে আসিয়া তাহারাই গোলমাল করিতেছে। এই শিক্ষিত ও জাতীয়ভাবে উত্তেজিত ছাত্র সম্প্রদায়কে দমন করাই জাপানের প্রধান উদ্দেশ্য। ইংলণ্ডের সরকার মুখে যাহা বলুন না কেন তাহার কম্যুনিষ্ট জাপানেরই পক্ষে থাকিতে বাধ্য। কেননা বলশেভিক চায়না তাঁহাদের পরম শত্রু হইয়া উঠিতে পারে। ফরাসী রাষ্ট্র স্বদেশে সাধারণতন্ত্রবাদী হইলেও পূর্ব্ব উপদ্বীপে উক্ত রাষ্ট্র সাম্রাজ্যতন্ত্রই সমর্থন করেন। ফরাসী রাষ্ট্রও জানেন যে জাপানের সরকারই তহাদের মিত্র থাকিবেন, বলশেভিক চায়না তাহাদের পরম শত্রু হইবে? এই জন্যই জেনেভা লীগ মনুষ্যত্বের দোহাই দিয়া মাঝে মাঝে হুমকি প্রদান করিলেও উহা তাহাদের মনের কথা নয়। ফাসিষ্ট জাপানও জানে যে কয়েক সহস্র ছাত্রব্যতীত চীনের অভিজাতগণ ও জনসাধারণ তাহাদের শত্রু নহেন। অভিজাতগণ তাহাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত রাখিতে চাহেন সুতরাং তাঁহারা জাপানের সহিত মিতালি করিতে বাধ্য। চীনের সাধারণ প্রজা এখনও নিরক্ষর ও অজ্ঞ। সুতরাং তাহাদিগকে কোনরূপে ভুলাইয়া রাখিবার দিন এখনও চলিয়া যায় নাই। এ জন্যই চীন জাপানের নিকট হারিয়া যাইতেছে এবং শেষ পর্য্যন্ত তাহারা হারিয়াই যাইবে। জাপান বর্ত্তমানে তাহার স্বার্থ রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে।

ডি ভ্যালেরা

ডি ভ্যালেরার বিজয় দর্শন করিয়া যাহারা বিস্মিত হইয়াছেন তাঁহাদের স্মরণ রাখা উচিত এখন সারা জগতে ফ্যাসিসিজমেরই যুগ চলিতেছে। তবে একথা সত্য যে এই যুগ স্থায়ী হইতে পারে না। শীঘ্রই হয় ধনিকগণ আবার তাহাদের পূর্ণ ক্ষমতা ফিরিয়া পাইবে, নতুবা শ্রমিকগণ তাবৎ রাষ্ট্রেরই কর্ণধার হইবেন। আয়র্লণ্ডে রাজ্ঞী এলিজাবেথের সময় হইতে অভিজাতগণেরই রাজত্ব চলিতেছিল। রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার সময় মধ্যবিত্ত শ্রেণী শিক্ষিত হইয়া উঠিলেন। রাজক্ষমতা লাভ করিবার জন্য তাঁহারা ব্যস্ত হইয়া পড়েন। ও-কোনেল ও পারনেল এই যুগের নেতা। হোমরুল ছিল তাহাদের সাধনার বস্তু। গত মহাযুদ্ধের পর সেই হোমরুল আয়র্লণ্ডকে প্রদান করা হয়। কিন্তু সময়ের পরিবর্ত্তনের ফলে নিম্নস্তরের মধ্যবিত্ত শ্রেণীগণও শিক্ষায় উন্নত হইয়া উঠেন। তাঁহারাও তাহাদের উর্দ্ধস্তরের সহিত রাজক্ষমতা পরিচালনা করিবার জন্য ব্যগ্র হন। এই জন্যই একই মধ্যবিত্তশ্রেণীর দুটি দল হয়। বড়দলের নায়ক কস্‌গ্রেভ এবং ছোট বা নিম্নস্তরের নেতা হন ডি-ভ্যালেরা। অভিজাতগণের হস্ত হইতে রাজক্ষমতা হস্তান্তর করিবার সময় এই ক্ষমতা ইংরাজগণ বড়দলের হস্তে অর্পণ করেন। কিন্তু নূতন সংস্কারের আইনে নিম্ন-স্তরের ভোটার সংখ্যা অসম্ভব রূপে বৃদ্ধি পায়। ডি-ভ্যালেরা প্রাণপাত করিয়া নিম্নস্তরকে সঙ্ঘবদ্ধ করেন। সঙ্ঘবদ্ধ নিম্নস্তর যে উপরের দল অপেক্ষা ক্ষমতা শালী হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? ইহা ব্যতীত ডি-ভ্যালেরার ভবিষ্যৎ দৃষ্টিও যে খুব তীক্ষ্ণ একথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। তিনি জানেন যে তাহার ফাসিসিজম সাময়িক মাত্র। সর্ব্বসাধারণের রাজ ক্ষমতা লাভ অনিবার্য্য; এই জন্যই তিনি তাহার দলকে শ্রমিক দলের সহিত সংযুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন। শ্রমিক-গণের অনেক প্রস্তাবই তিনি সমর্থন না করিলেও, তিনি তাহাদিগকে শত্রু সম্প্রদায়ে পরিণত করিতে সাহসী হন নাই। ইহাই ডি-ভ্যালেরার কৃতকার্য্যতার পরিচয়।

কংগ্রেস

কংগ্রেস তাহার বার্ষিক অধিবেশন করিতে চাহে সাধারণ ভাবে। উদ্দেশ্য বোধহয় নূতন শাসন সংস্কার সম্বন্ধে তাহার মনোভাব প্রকাশ করা। সরকার পক্ষ কংগ্রেসকে স্পষ্ট ভাবে বে আইনী সভা বলিয়া ঘোষণা না করিলেও কোন রূপ অধিবেশন করিতে দিতে প্রস্তুত নহেন। সরকারপক্ষ চাহেন কংগ্রেস স্পষ্টভাবে বৈরী ভাব ত্যাগ করিলে, তাহার যে সমস্ত স্বাভাবিক দাবী আছে তাহা গ্রাহ্য করা হইবে। উভয় দলের এই সম্বন্ধে কথা কাটাকাটি হইতেছে এখন অবধি কোন মীমাংসাই হয় নাই। আমরা বলি সরকার ভুল করিতেছেন। একথা কি সত্য নয় যে কংগ্রেসই দেশের জনমতের প্রকৃত আলেখ্য। যদি তাহা হয় আমাদের মনে হয় কংগ্রেসকে প্রাণ খুলিয়া কথা বলিবার অবসর দেওয়া খুবই প্রয়োজন। বিরাট জনমতকে পদদলিত করিয়া রাষ্ট্রশাসন ইতিহাসে অসম্ভব ঘটনা নয় সত্য—কিন্তু উহার পরিণাম অতি ভীষণ। ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া শাসন দণ্ড পরিচালনা করাই প্রকৃত রাজনীতি।

স্পেন

স্পেনের গোলমাল এখনও চলিতেছে। তারের খবর হইতে যতদূর জানা যায় তাহা হইতে এইটুকু বুঝা যাইতেছে যে তথায় কয়েকজন "রাষ্ট্রতন্ত্র পুণরায় প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ মনোরথ হইয়াছেন। অভিজাত-তন্ত্র জগতে মরিয়া গিয়াছে এ কথা সত্য। বর্ত্তমান জগত যেরূপ ভাবে জাগরিত হইয়াছে তাহাতে কোনরূপ পুরাতন সত্য টিকিবে না। অভিজাতগণের একমাত্র সম্পত্তি সনাতন-প্রথা। কাজেই যখন সকল প্রকার সনাতন প্রথারই উচ্ছেদ হইতে চলিয়াছে তখন অভিজাত-তন্ত্র আর কি রূপে রক্ষা পাইতে পারে?

উচ্চশিক্ষা

সার পি সি রায় দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে একটী বিশেষ হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দিয়াছেন। তিনি ঠিকই বলিয়াছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষাই আমাদের দেশে উৎকট বেকার সমস্যা সৃজন করিয়াছে। যাঁহারা স্যাড্‌লার কমিশনের রিপোর্ট পড়িয়াছেন তাঁহারা অবগত আছেন যে উচ্চশিক্ষার হার আমাদের দেশে অন্যান্য দেশের তুলনায় কত অধিক। উচ্চশিক্ষিত যুবক দীর্ঘকাল অধ্যয়নের পর তাহার অধ্যয়নের কাল শেষ হইলে চাকুরি চাহিবে ইহাই স্বাভাবিক। তাহাকে ব্যবসা কর বলিলে তাহাকে বিদ্রূপ করা হয় মাত্র। উচ্চ শিক্ষার পরিমাণ কমাইয়া প্রাথমিক শিক্ষার পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে পারিলে অনেক উপকার হইত। নেতাগণ একমত হইয়া একটা খসড়া প্রস্তুত করিয়া আইন পরিষদে উহা পাশ করিতে পারেন না কি?

প্রাচীন ভারতে সাধারণতন্ত্র

শ্রীপ্রমথ নাথ ঘোষ

এক কথায় প্রাচ্য সভ্যতাকে অন্তর্মুখী তথা পাশ্চাত্য সভ্যতাকে বহির্ম্মুখী বলিয়া নির্দেশ করা হইয়া থাকে। প্রাচীন ভারত ধর্ম্ম, আধ্যাত্মিকতা নৈতিকতা, চিন্তাশীলতা, কলাবিদ্যা প্রভৃতি মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠতম বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় সকল বিষয়েই যে উন্নতির অত্যুচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিল, তাহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্বীকৃত হইয়াছে। তবে অনেকেই বলেন যে মানসিক ও অধ্যাত্মিক বিষয়গুলিতে ভারতের অসাধারণ কৃতিত্ব থাকিলেও পার্থিব জীবনকে য়ুরোপ যেমন শক্ত সমর্থ ও উন্নতিশীলভাবে সঙ্ঘবদ্ধ ও সুগঠিত করিতে পারিয়াছে, ভারত তাহা করিতে সমর্থ হয় নাই। য়ুরোপের ন্যায় ভারত রাষ্ট্রনীতি সমাজনীতি বা অর্থনীতিকে প্রধান স্থান দিতে পারে নাই। উন্নতি বলিলে কেবল ইহাই বুঝায় না যে শুধু অধ্যাত্মিকতার উৎকর্ষ সাধন করিতে হইবে, রাষ্ট্র, সমাজনীতি, অর্থনীতিকেও এমন শক্ত সমর্থ করিয়া গড়িতে হইবে যাহাতে একটা জাতি জীবন সংগ্রামে টিকিয়া রহিতে পারে ; কেবল ব্যক্তিগত ভাবে নহে, জাতিগত ভাবে পূর্ণতার দিকে নিশ্চিতভাবে অগ্রসর হইতে পারে, এবং জাতির সুস্থ দেহে আত্মা ও মনের ক্রীড়া স্বচ্ছন্দে প্রকাশিত হইতে পারে। ইহাকেই পূর্ণাঙ্গ সভ্যতা বলে।

কিন্তু প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের বক্ষস্থ কালো পর্দা যতই উঠিয়া যাইতেছে ততই আমরা নব নব জিনিষ আবিষ্কার করিতেছি। রাষ্ট্রনীতিক ব্যাপারে যে ভারত একেবারে অক্ষম ছিল এতদিন আমাদের এই অসম্পূর্ণ ধারণা ছিল। আজ নব নব আবিষ্ক্রিয়ার ফলে জানিতে পারিতেছি যে প্রাচীন ভারত তাহার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির দিনে রাষ্ট্রনীতিক উন্নতি সাধন করিতেও পশ্চাৎপদ ছিল না। রাজ্যশাসন ও রাজ্য-রক্ষণ কার্য্য যথেষ্ট সঙ্ঘবদ্ধ ও সুগঠিত উপায়েই নিয়মিত হইত। রাজতন্ত্রের পাশাপাশি ভারতে সাধারণতন্ত্রও বিরাজমান ছিল। প্রাচীন ভারতের এই সাধারণ তন্ত্র অনেকটা বৃটিশ পার্লামেন্টারি অনুষ্ঠানের মতই ছিল।

আমাদের এতদিন ধারণা ছিল যে ভারত বৈদিক যুগের স্বাধীন ব্যবস্থা হইতে একেবারে ব্রাহ্মণদিগের প্রভুত্ব ও অত্যাচার পীড়িত সমাজ-ব্যবস্থায় এবং স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্রের অধীন যথেচ্ছাচারে উপনীত হইয়াছিল। এবং ভারত তদানীন্তন কাল হইতে ক্রমাগত স্বেচ্ছাচারী রাজা ও অত্যাচারী ব্রাহ্মণদিগের হস্তে লাঞ্ছিত হইয়া কষ্টে দিন যাপন করিতেছিল। কিন্তু ঐতিহাসিক গবেষণা দ্বারা ইহা মিথ্যা প্রমাণিত হইয়াছে। মিঃ ডেভিড্স এবং জয়স্বালই প্রথমে আমাদের দেখান যে ভারত কেবল রাজ-তন্ত্রের বশবর্ত্তী ছিল না, ঐ রাজতন্ত্রের পাশাপাশি সাধারণতন্ত্রও বেশ গজাইয়া উঠিয়াছিল।

এক্ষণে কথা হইতেছে যে কি করিয়া প্রাচীন ভারতে সাধারণতন্ত্রের আবির্ভাব হইয়াছিল? মনু লিখিয়া গিয়াছেন :—

> অরাজকেহি লোকেস্মিন্ সর্ব্বতো বিদ্রুতে ভয়াৎ।
> রক্ষার্থমস্য সর্ব্বস্য রাজানস্‌জৎ প্রভুঃ॥
> ......সুরেন্দ্রানাং শত্রাভ্যো নির্মিতো নৃপঃ।
> তস্মাদভিভত্যেষ সর্ব্বভূতানি তেজসা॥

মনুর কথা থেকে আমরা বেশ বুঝতে পারি যে তিনি divine theory of Kingshipএর প্রচার করিয়াছিলেন। আরও দুই একখানি প্রাচীন গ্রন্থপাঠে বোঝা যায় যে তদানীন্তন কালে divine origin of Kingship theoryই সর্ব্বসাধারণের ধারণার মধ্যে ছিল। শতপথ ব্রাহ্মণে দেখা যায় যে divine origin theory সকলের মধ্যে বিদিত ছিল। তবে প্রাচীন শাস্ত্রাদি আরও একটু গবেষণা করিলে দেখা যায় যে Social contract theoryটাও লোকের নিকট বিশেষ জ্ঞাত ছিল। কৌটিল্য প্রাচীন ভারতীয় সাধারণতন্ত্র সম্বন্ধে অনেক কিছু আভাষ দিয়াছেন। তাঁহার অর্থশাস্ত্রে আমরা তাঁহার divine origin of kingship theoryতেই যে বেশী আস্থা দেখি তাহা নহে। উক্ত theory ও Social contract theoryএই দুইয়েরই তিনি সমর্থক কৌটিল্যের ন্যায় বৌধায়ণকেও আমরা অনেকটা ঐ মতেরই পরিপোষক বলিতে পারি। ভাল করিয়া বিবেচনা করিলে কিন্তু মনে হয় যে কৌটিল্য ও বৌধায়ণ social contract theoryরই সমর্থক। মহাভারত শান্তিপর্ব্বে উক্ত দুই মতেরই যথেষ্ট উল্লেখ আছে।

যাহা হউক social contract theory যে ভারতে বিদিত ছিল তাহা সকলেই মানিয়া লইতে বাধ্য। এক্ষণে দেখা যাক, সংঘবদ্ধতা বলিয়া যে একটী জিনিষ—যাহাকে সাধারণতন্ত্রের একটি প্রধান পরিপোষক বলিয়া ধরা হয়, তাহা প্রাচীন ভারতীয়দের মধ্যে ছিল কিনা। সংঘবদ্ধতা যে সাধারণতন্ত্রের পৃষ্ঠপোষক এবং ইহা ব্যতিরেকে ঐ তন্ত্র যে সম্ভবপর হয় না তাহা ঠিক। ঐতিহাসিক ডাঃ আর, সি মজুমদার মহাশয় লিখিয়াছেন যে প্রাচীন রাষ্ট্রে, কি বা ব্যবসাক্ষেত্রে কিবা ধর্ম্মক্ষেত্রে সর্ব্বত্রই সংঘবদ্ধতামূলক ভাব পরিলক্ষিত হইত। ব্যবসাক্ষেত্রে যে সকল [illegible]

তাহাদিগকে শ্রেণী বা যুগ বলা হইত অথবা কুল বলা হইত। তাহাদের মধ্যে হুণ্ডি বা letters of creditএর বিশেষ সম্মান ছিল। তাহাদের নামাঙ্কিত মুদ্রারও চলন ছিল। বৌদ্ধ ভিক্ষুসঙ্ঘ ধর্ম্মক্ষেত্রে বিশেষ আদর শ্রদ্ধা পাইয়া থাকিতেন। *

ঐসকল সংঘের প্রত্যেকের মাথায় যাঁহারা থাকিতেন তাঁহাদের বলা হইত 'জ্যেষ্ঠক'। আবার এই জ্যেষ্ঠকদের উপরে যাঁহারা থাকিতেন তাঁহাদের আখ্যা দেওয়া হইত 'মহাশ্রেষ্ঠী'। জ্যেষ্ঠকরা তাঁহাদের নিজেদের দলের শাসন ও নেতৃত্ব করিতেন। রিস্ ডেভিডস্ বলেন, এই সংঘবদ্ধতামূলক ভাব ভারতীয়দের মধ্যে বিশেষভাবে বর্ত্তমান ছিল। রাজা এই সংঘগুলির বিশেষ ভক্ত ছিলেন এবং এই সংঘের মধ্য দিয়াই যুদ্ধার্থে তিনি প্রজাদিগের সাহায্য প্রার্থনা করিতেন।

অতঃপর আমরা প্রাচীন ভারতীয় রাষ্ট্রীয় দলের কথা বলিব। প্রাচীন গ্রন্থাদি পাঠে আমরা বিশেষভাবে অবগত হই যে প্রাচীন ভারতেও বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় দলের উদ্ভব সম্ভব হইয়াছিল। রাষ্ট্রীয়দল ভিন্ন যে সাধারণতন্ত্র উত্তমরূপে গঠিত হইতে পারে না তদ্বিষয়ে মতান্তর নাই। রাষ্ট্রীয়দল বলিতে আমরা কি বুঝি সে বিষয়ে আমরা একখানি আধুনিক রাজনীতিক পুস্তক হইতে বিশদ করিয়া বলিতেছি।

"People holding similiar opinions on political questions from a party. A political party is an organised group of citizenes who profess to the same political views and who by acting as a political unit, try to control the Govt. The chief aim of a party is to make its own opinions and policy prevail. To do so it is necessary to control the legislation in the State......Party division is natural outcome of Govt. by disunion."

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র হইতে আমরা অবগত হই যে প্রাচীনভারতে জনমত বলিয়া একটা জিনিষ ছিল এবং জনসাধারণের মধ্যে বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় দলও ছিল। প্রজাদের হাতে কোনো কষ্ট না হয় তদ্বিষয়ে নীতিবিদ দলনেতাদের কথামত রাজাদের চলিতে হইত। ক্ষমতাশালী দলের নেতাদিগকে রাজা সম্মান করিয়া চলিতে বাধ্য হইতেন। রাজশক্তি তাহাদের হাতে সীমাবদ্ধ থাকিত। রাজা অত্যাচারী হইলে তাহারা অনেক সময় রাজাকে পরিত্যাগ করিয়া বিদেশী শত্রুকে বরণ করিয়া লইত। কৌটিল্য প্রজাদের কর্ত্তাকে বেশ সম্মান করিয়া চলিতেন। জনসাধারণের মধ্যে রাষ্ট্রীয় জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা যথেষ্ট পরিমাণেই ছিল। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা অর্জ্জন ও রক্ষণ করিবার ক্ষমতাও তাহাদের যথেষ্ট ছিল। সর্ব্বতোভাবে সীমাবদ্ধ ছিল। তজ্জন্য অনেকস্থলে ঘোষণা করিতে বাধ্য হইতেন যে তিনি কেবল বেতনভোগী কর্ম্মচারী মাত্র।

এক্ষণে আমরা প্রাচীন ভারতে স্বায়ত্বশাসন সম্বন্ধে কিছু বলিব। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার মূলে আছে স্বায়ত্ব-শাসন ক্ষমতা। কোনো দেশের স্বায়ত্ব-শাসনে জ্ঞান-স্পৃহা ও অভিজ্ঞতা না থাকিলে সে দেশের পক্ষে যে স্বাধীনতা লাভ অসম্ভব একথা অনিবার্য্য। এখন দেখা যাক প্রাচীন ভারতে স্বায়ত্ব শাসন যুক্ত কার্য্য পরিচালন পদ্ধতি কেমন ছিল।

প্রাচীন ভারতে পল্লীসমিতি বা জনপদগুলিতে স্বায়ত্ব শাসন কার্য্য উত্তমরূপে পরিদৃষ্ট হইত। ব্যাডেন পাওয়েল, ডাঃ আর, সি, মজুমদার, ডাঃ আর কে মুখার্জ্জী প্রভৃতি অনেকে পল্লীসমিতিগুলির স্বায়ত্ত-শাসন কার্য্য প্রণালী কি প্রকার ছিল তাহা বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন। বৈদিক যুগ হইতে এই বিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত আমরা এই আত্মতুষ্ট শান্তিপ্রিয় পল্লীগুলির সমাবস্থা দেখিয়া অবাক হই। এই আত্মনির্ভরপ্রিয় স্বাবলম্বী পল্লীগুলির শাসন প্রণালী দেখিলে সত্যই বলিতে ইচ্ছা করে:—"The village Communities are little republics, having nearly everything they can want within themselves, and almost independent of foriegn relations. They seem to last where nothing else lasts. Dynasty after dynasty tumbles down, revolution succeeds to revoluton, Hindu, Pathan, Mogal, Sikh, English, are masters in town, but the village community remains the same."

Elphinstone এই সব পল্লীগুলির সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—These communities contain in miniature all the materials of a state within themselves and are almost sufficient to protect their members if all their Govt. were withdrawn (Elphinstone, Report on the Terretories acquired from Peshwar 1879.)

আমরা এই সকল আলোচনা হইতে কৃতনিশ্চয় হইতে পারি যে সাধারণতন্ত্র গঠন-মূলক কোন জিনিষের অভাব প্রাচীন ভারতে ছিল না। অন্যান্য দেশের ন্যায় ভারতেও রাজাই প্রথমে শাসনতন্ত্রের অধিপতিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু ভারতের ইতিহাসে সর্ব্বদা দেখিতে পাওয়া যায় যে এক বিপরীত প্রচেষ্টা রাজতন্ত্রের বিস্তারের মুখে সর্ব্বদাই বাধাস্বরূপে দণ্ডায়মান থাকিত এবং এই প্রচেষ্টার ফল স্বরূপেই বহু প্রাদেশিক বা সাম্প্রদায়িক বা সংঘবদ্ধ সাধারণ তন্ত্র

হইয়াছিল। রাজতন্ত্রাবলম্বী দেশগুলিতে রাজা a limited or constitutional monarch একটা আইন অধীনস্থ সীমাবদ্ধ অধিপতি। অরাজতন্ত্রী সঙ্ঘগুলিতে রাজা সাধারণতন্ত্রের নির্ব্বাচিত বংশানুক্রমিক প্রেসিডেন্টের কাজ করিতেন। কোনো কোনো স্থানে আবার রাজার অস্তিত্বই একেবারে উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। জনসাধারণের মেলামেশার স্বাভাবিক ক্রমবিকাশের ফলেই স্থানে স্থানে এই সব সাধারণতন্ত্রের আবির্ভাব হইয়াছিল কোন কোনও স্থানে আবার প্রজাগণ রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া সাধারণতন্ত্র স্থাপন করিয়াছিল। এই সাধারণ তন্ত্র কোনো কোনো জাতির মধ্যে শেষ পর্যন্ত জয়যুক্ত হইয়াছিল এবং বিশেষ দক্ষতার মধ্য দিয়া পরিচালিত হইয়া শতাধিক বর্ষ অক্ষুণ্ণ ছিল।

রিস ডেভিডস ও জয়স্বাল প্রথমে আমাদের দেখাইয়া দেন যে প্রাচীন ভারত কেবল অধ্যাত্মিক ভাবে বিভোর ছিল না, রাজনীতির ক্ষেত্রেও সে বহু প্রাচীনকাল হইতে যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিয়াছিল কেবল রাজতন্ত্রের বশবর্ত্তী ছিল না, ঐ রাজতন্ত্রের পাশাপাশি সাধারণতন্ত্রেও ভারতবর্ষে স্থানাধিকার করিয়াছিল। তবে রিস ডেভিস ও জয়স্বাল বৌদ্ধ ও জৈন পুথি হইতেই

ভিন্সেন্ট স্মিথ সাহেব লিখিয়াছেন যে ম্যালইক্যথই বলিয়া পাঞ্জাবে আলেকজান্দারের আক্রমনের পূর্ব্বে যে রাজ্য ছিল তংলাদের মধ্যে সাধারণতন্ত্রের নিদর্শন পাওয়া যায়।......

সাধারণতন্ত্রের অস্তিত্ব প্রমাণ করেন। ব্রাহ্মণ ও গ্রীক সাহিত্য; অথবা প্রাচীন শিলালিপিতেও আমরা সাধারণতন্ত্রের উল্লেখ দেখি। বরাহমিহিরে 'গণরাজ্যের' উল্লেখ দেখি। কৌটিল্য 'রাম শব্দোপজীবনঃ' রাজ্যের বিষয় জানিতেন। কাত্যায়নের পানিনি হইতে জানা যায় যে সেই সময় সাধারণতন্ত্রের প্রচলন ছিল। ঐতয়ের ব্রাহ্মণে উক্ত আছে যে রামতন্ত্র হইতে ভিন্ন শাসন পদ্ধতি মুক্ত রাজ্য ছিল যাহাকে 'জনপদ' বলা হইত।

গ্রীকসাহিত্য অ্যারিয়ণ, টলেমি, ডায়োডোরাস, মেগাস্থিনিস প্রভৃতি সকলে সাধারণতন্ত্রের অস্তিত্বের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। নারদসংহিতা, শুক্রনীতি বা কৌটিল্যেও উহার ভূরি ভূরি উল্লেখ আছে। মহাভারতে গণরাজ্যের কথা আছে। অয়রঙ্গসূত্তে গণরাজ্য দ্বোরাজ্য, অরাজ্য, যুবরাজ্য প্রভৃতির উল্লেখ আছে। অবদানশতককার 'রাজাধিনা, ও গণাধিনা রাজ্যের উল্লেখ করিয়াছেন।

খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠশতাব্দীতে ভারতে কোন সাম্রাজ্যের যে কোন অস্তিত্ব ছিলনা তাহা অবধারিত; সেই সময় উত্তর ভারতে যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল তাহাদের মধ্যে কতকগুলি রাজতন্ত্রাবলী ও কতকগুলি অরাজতন্ত্রাবলম্বী ছিল। রিস্ ডেভিড্স বলেন, সেই সময় কোশল, অবন্তী, বৎস ও মগধ এই চারিটি সমৃদ্ধিসম্পন্ন রাজ্য বর্ত্তমান ছিল। তদ্ভিন্ন অগণিত সাধারণতন্ত্র দেশ ভর্ত্তি ছিল। বৌদ্ধ পুথি হইতে নিম্নলিখিত অরাজ তন্ত্রাবলম্বী সম্প্রদায়ের নাম জানিতে পারা যায়ঃ—

১। কপিলাবস্তুর শাক্যগণ
২। রামগ্রামের কলিয়গণ
৩। বৈশালীর লিচ্ছবিগণ
৪। মিথিলার বিদেহগণ
৫। কুশীনগর ও পাভার মল্লগণ
৬। পিগ্‌কলিবনের মেরিয়গণ
৭। অল্লপক্যের বুলিগণ।

ভারতীয় সাধারণতন্ত্রের শাসনাবলী সম্বন্ধে মাত্র শাক্য রাজ্য ছাড়া অন্য কোন রাজ্যের বিষয় আমরা ভাল করিয়া জানিতে পারিনা। যতদূর সম্ভব অন্যান্য সাধারণতন্ত্রের শাসনাবলী শাক্য রাজ্যের অনুরূপই ছিল। কোন রাজ্যে কুলাধিপত্য, যাহাকে ইংরাজীতে Tribal republic বলে অথবা কোন রাজ্যে প্রজাতন্ত্র বা democracy ছিল আবার কোনো কোনো রাজ্যে oligarchy বা মুখ্যতন্ত্র, কিম্বা গণাধিপত্য বা federation প্রচলিত ছিল। কুলনেতৃগণ বংশপরম্পরায় রাজ্য শাসন করিয়া যাইতেন। কুলনেতা স্বেচ্ছাচারী হইবার সুযোগ মোটেই পাইতেন না। রাজ্যের সমস্ত কার্য্যই সাধারণ সভায় আবালবৃদ্ধবনিতার দ্বারা সম্পন্ন হইত। সংঘবদ্ধ হইয়া সাধারণের শাসন [illegible] সংক্রান্ত কার্য্যাবলী পরিচালনা করিতে হইত। বৃহদারণ্যকোপানিষদে এবং পাণিণিতে গণাধিপত্য বা federation এর কথা আছে। অ্যারিয়ণ, টলেমি প্রভৃতি গ্রীক ঐতিহাসিকগণ প্রাচীন ভারতের প্রজাতন্ত্রের (democratic states) কথা উল্লেখ করিয়াছেন। প্রফেসর [illegible] দুই প্রকারের প্রজাতন্ত্রের কথা লিখিয়াছেন, [illegible] বিস্তীর্ণ প্রদেশব্যাপী প্রজাতন্ত্রকে 'জনপদ' বলা [illegible]

ভারতের সাধারণতন্ত্রগুলি বহু প্রাচীনকালে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং যথেষ্ট দৃঢ়ভাবে পরিচালিত হইত। [illegible] গ্রীসে যে সময় ক্ষণস্থায়ী সাধারণতন্ত্রগুলির আবির্ভাব [illegible] তাহারও বহুপূর্ব্বে ভারতবর্ষে এই সকল সাধারণতন্ত্র [illegible] লিত ছিল এবং গ্রীসের সাধারণতান্ত্রিক স্বাধীনতা [illegible] পাওয়ার বহুকাল পর পর্য্যন্ত ভারতে বর্ত্তমান [illegible] কোন ভারতীয় সাধারণতন্ত্র প্রাচীন রোম [illegible] কাল দৃঢ়তা ও সুশাসনের মধ্য দিয়া নিজ নিজ স্বাধীনতা ভোগ ও রক্ষা করিতে সমর্থ ছিল।

* R. C. Majumbar's Corporate life in Ancient India Chap. III.